বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ

(ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান)

প্রথম খণ্ড

কলিম খান রবি চক্রবর্তী

এই শব্দার্থকোষ কী কাজে লাগতে পারে

শব্দের ভেতর থেকে
তার মানে বের করা যাবে।

এক ক্রিয়াজাত অনেক শব্দ
গুচ্ছ ধরে শেখা যাবে।

বাংলা শব্দভাণ্ডার সহজেই
পাঠকের আয়ত্তে এসে যাবে।

বাংলাভাষার বিপুল ঐশ্বর্যের
উপলব্ধি ঘটবে।

ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে
হীনমন্যতা থেকে মুক্তি আসবে।

প্রকৃত বঙ্গমানসকে চিনে নিয়ে
তাকে পুনরুদ্ধার করা যাবে।

রামায়ণ-পুরাণাদি গ্রন্থের মানে
বোঝার উপায় পাওয়া যাবে।

দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানার
উপায় পাওয়া যাবে।

প্রবাদ প্রবচন ছড়া জনশ্রুতি
আচার সংস্কার ইত্যাদির মানে
বোঝার উপায় পাওয়া যাবে।

বাংলাভাষীর মনুষ্যত্বকে
পূর্ণমহিমায় পুনরুদ্ধার করা যাবে।

মানবসভ্যতার আদিম ইতিহাস
স্পষ্ট রূপে জানা যাবে।

যে ভাষাতত্ত্ব পড়ানো হয়
তা আগাগোড়া বদলে যাবে।

ইংরেজি ভাষার শাসন থেকে
বাংলা মনকে মুক্ত করা যাবে।

ইংরেজি সহ দুনিয়ার সব ভাষাকে
পথ দেখানো যাবে।

নয় শত টাকা

"... ... বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি তার পদাবলী কীর্তনে। এ সাহিত্যের প্রাণ এবং দেহ উভয়ই খাঁটি বাঙালী। এ সাহিত্যে শুধু যে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ বাঙলায় খাঁটি কানুরূপ ধারণ করেছেন তাই নয়, শ্রীমতী রাধাও যে একেবারে খাঁটি বাঙালী মেয়ে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ভাটিয়ালির নায়িকা, বাউলের ভক্ত, মুর্শীদীয়ার আশিক ও পদাবলীর শ্রীরাধা একই চরিত্র একই রূপে প্রকাশ পেয়েছেন।

বাঙালীর চরিত্রে বিদ্রোহ বিদ্যমান। তার অর্থ এই যে, কি রাজনীতি, কি ধর্ম, কি সাহিত্য, যখনই যেখানে সে সত্য শিব সুন্দরের সন্ধান পেয়েছে তখনই সেটা গ্রহণ করতে চেয়েছে; এবং তখন কেউ 'গতানুগতিক পন্থা', 'প্রাচীন ঐতিহ্য'-এর দোহাই দিয়ে সে প্রচেষ্টায় বাধা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, — যখন সে বিদ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হতে চেয়েছে, তখন তার বিরুদ্ধে আবার বিদ্রোহ করেছে।

এ বিদ্রোহ বাঙালী হিন্দুর ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙালী মুসলমানও এ কর্মে পরম তৎপর। ধর্ম বদলালেই জাতির চরিত্র বদলায় না। ..."

সৈয়দ মুজতবা আলী

বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ

(ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান)

প্রথম খণ্ড

কলিম খান

রবি চক্রবর্তী

ভাষাবিন্যাস

Bangiya Sabdarthakosh
A Collection of Bengali Words
with their Verb-based and Letter-based Meanings
by Kalim Khan & Ravi Chakravarti
Price : Rs 900.00

ISBN : 978 81 908349 5 7

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৪১৬

পুনর্মুদ্রণ
চৈত্র ১৪১৭

প্রচ্ছদ
রাজু দেবনাথ

প্রকাশক
ভাষাবিন্যাস
আশীর্বাদ অ্যাপার্টমেন্ট, ৪১৬ বি, পর্ণশ্রী পল্লী, কলকাতা ৭০০ ০৬০
ফোন : (০৩৩) ২৪৯২-৫১৬৪, ২৪৫৩-৭০৬৬

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
৫১ এ, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

বাঁধাই
ওরিয়েন্টাল বাইন্ডার্স
৪৭ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

পরিবেশক
একুশ শতক
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন : ৯৮৩০২৯৪৬৪৯

নয় শত টাকা

যে বঙ্গমানস
কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মঙ্গলকাব্যপ্রণেতাগণের সৃষ্টিতে ভরে উঠেছিল
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বৈষ্ণবদর্শনের ও হিন্দুমুসলিম পদকর্তাদের বিশাল পদাবলী সাহিত্যের ধারক হয়ে উঠেছিল
কবিগানে কথকতায় নামসঙ্কীর্তনে ও মুর্শীদা ফকিরি জারি আলকাপ পটুয়ার গানে যা বিধৃত ছিল
রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ ভবাপাগলা লালনফকির হাসনরাজাদের গানের ধারায় প্রবাহিত ছিল
ভারতচন্দ্র, আলাওল, সৈয়দ সুলতান, ফয়জউল্লাহ্-রা যে-ধারায় মগ্ন থাকতেন
যার খবর রাখতেন রবীন্দ্রনাথ, হরিচরণ, নজরুল, সৈয়দ মুজতবা আলী
এখনও যা বিধৃত হয়ে রয়েছে বাংলাভাষার পঞ্চভুবনের সকল প্রান্তে
রয়েছে সমগ্র গ্রামবাংলায়, মেয়েদের ভাষায়, আচারে-সংস্কারে
রয়েছে তথাকথিত 'মূর্খ-বাঙালি'র বয়ানে ...
সেই বঙ্গমানস সরোবরে এই অঞ্জলি
নিবেদিত হল।

লেখকদ্বয়ের পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ

(ক) বাংলা বানান বাংলা ভাষা (২০০৪ কলকাতা)
(খ) বাংলাভাষাঃ প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ (২০০৬, ২য় মুদ্রণ ২০০৮, কলকাতা)
(গ) অবিকল্পসন্ধান : বাংলা থেকে বিশ্বে (২০০৮, কলকাতা)

কলিম খান-এর পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ

(ঘ) মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে (১৯৯৫, ২য় সংস্করণ ২০০৪, কলকাতা)
(ঙ) দিশা থেকে বিদিশায় (১৯৯৯ কলকাতা)
(চ) ফ্রম এনলাইটেনমেন্ট টু ইমোশনাল বন্ডেজ (২০০০ কলকাতা)
(ছ) পরমাভাষার সংকেত (২০০১ ঢাকা)
(জ) আত্মহত্যা থেকে গণহত্যা (২০০২ কলকাতা)
(ঝ) পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন (২০০২ কলকাতা)

রবি চক্রবর্তী-র পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ

(ঞ) India Rediscovered (2002)

সূচীপত্র

(প থেকে হ পর্যন্ত বাকি অংশ পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে)

এই শব্দার্থকোষ পড়বেন কীভাবে —

ক) **আপনি যদি শুধুমাত্র এক বা একাধিক শব্দের অর্থ জানতে চান** — সবার আগে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো নির্ঘণ্ট বা Index-এ আপনার প্রয়োজনীয় শব্দটি রয়েছে কি না, দেখুন। শব্দটিকে সেখানে না পেলে বুঝতে হবে, এই শব্দার্থকোষে শব্দটি এখনও অন্তর্ভুক্ত হয়নি; অর্থাৎ এই শব্দার্থকোষ এখনও আপনার চাহিদা মেটানোর যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। আর, শব্দটিকে সেখানে পেয়ে গেলে দেখবেন, শব্দটি কত পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে, সেকথা পাশেই লেখা রয়েছে; তখন সেই পৃষ্ঠাতে যান। সেখানে শব্দটির বিস্তারিত অর্থ পেতে পারেন, নাও পেতে পারেন। না-পেলে কী করতে হবে, সেকথা পরে বলছি। যদি পেয়ে যান, তাহলে দেখবেন, সেই অর্থ দেওয়া আছে মোট ছয়রকম ভাবে। সর্বাগ্রে ১. সংখ্যায় পাবেন শব্দটির ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ শব্দটির উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে, তার বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা নেওয়া হয়েছে বঙ্গীয় শব্দকোষ (ব.শ.) থেকে। অন্য কোনো অভিধান থেকে নেওয়া হয়ে থাকলে পাশে সেকথার উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। ২. সংখ্যায় পাবেন শব্দটির ক্রিয়ামূল থেকে জাত ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ, যা আমাদের নিজস্ব অনুসন্ধানের ফল। এটি সবসময়ই দেওয়া হয়েছে বাঁকা হরফে। অন্য কোনো সূত্রে শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ পাওয়া গেলে, '/' চিহ্নের পরে সে-অর্থও সরবরাহ করা হয়েছে, অবশ্যই উৎস উল্লেখ করে। ৩. সংখ্যায় পাবেন শব্দটির প্রতীকী অর্থ, প্রচলিত অভিধান ও শব্দকোষগুলিতে যা পাওয়া যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষের ক্ষেত্রে (ব.শ.), ছাত্রবোধ অভিধানের ক্ষেত্রে (ছা.অ.), ঢাকার বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের ক্ষেত্রে (ব্য.বা.অ.ঢাকা) এবং পৌরাণিক-অভিধানের ক্ষেত্রে (পৌ.অ.) প্রভৃতি লিখে উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। ৪. সংখ্যায় শব্দটি বর্তমানে বাংলাভাষীদের মধ্যে কী অর্থে প্রচলিত কিংবা শব্দটি অপ্রচলিত কি না, সেকথা জানতে পারবেন। শব্দটি আদৌ প্রচলিত না থাকলে 'অপ্রচলিত' (অপ্র.) লিখে সেকথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৫. সংখ্যায় পাবেন শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা; দেখানো হয়েছে কেমন করে তা প্রতীকী অর্থগুলিতে পরিণত হল। যা কিছু প্রাসঙ্গিক কথা, তার অধিকাংশই বলা হয়েছে এইখানে। ৬. সংখ্যায় পাবেন সেই শব্দের সমপর্য্যায়ের উত্তরাধিকার পাশ্চাত্যের ভাষা কী শব্দে পেয়েছে, তার সংবাদ।

কিন্তু নির্ঘণ্টে উল্লিখিত পৃষ্ঠায় শব্দটির পৃথক ভুক্তি যদি না পান, তাহলে তাকে সেই পৃষ্ঠায় বর্ণানুক্রমিকভাবে কোনো বিশেষ শব্দ-পরিবারের সদস্য রূপে অবশ্যই পাবেন। সেক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ আপনি প্রস্তুত বা রেডিমেড পাবেন না। পাবেন, শব্দটির পরিবার-কর্তার ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য শব্দসমূহের উল্লেখ; পাবেন পরিবার-কর্তার অর্থ, সেই পরিবারের কোনো কোনো সদস্য-শব্দের অর্থ। তাদের সাহায্যে আপনাকে নিজেকেই অতঃপর শব্দটির অর্থ নিষ্কাশন করে নিতে হবে। এই কষ্ট করে উঠতে না পারলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে, যতদিন পর্যন্ত 'ক্রিয়াভিত্তিক—বর্ণভিত্তিক সম্পূর্ণ বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' সংকলিত হয়ে বাজারে না আসে।

খ) **আপনি যদি আপনার প্রয়োজনীয় শব্দটির বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানতে চান** — তাহলে আপনাকে এই শব্দার্থকোষ কীভাবে লিখিত হয়েছে, সেকথা জানতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনাকে এই গ্রন্থের **ভূমিকা** আগাগোড়া পড়ে নিতে হবে। গ্রন্থটির কাঠামো বিষয়ে মনে রাখতে হবে যে, এর দুটি প্রধান বিভাগ রয়েছে। প্রথমটিতে বর্ণানুক্রমিকভাবে রয়েছে প্রায় ২৮,০০০ শব্দ। দ্বিতীয় বিভাগে রয়েছে সেই ২৮০০০ শব্দ যে ২২৪টি শব্দ-পরিবারে জন্মেছে, সেই পরিবারগুলির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। যে শব্দ কোন পরিবারের সদস্য, তা এখনও ঠিকঠাক জানা যায়নি, তাকে রাখা হয়েছে 'নিপাত'-এর ঘরে। অতঃপর সেই ২২৪টি শব্দ-পরিবার যে ২৪টি (অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন) বর্ণ থেকে প্রসূত হয়েছে, সেই ২২৪টি শব্দ পরিবারের প্রারম্ভে যে ক্রিয়ামূল রয়েছে, তাকে শনাক্ত করে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমে দেওয়া হয়েছে বর্ণের অর্থ ও ব্যাখ্যা। যেমন **অ**-বর্ণের শুরুতে দেওয়া হয়েছে 'অ'-এর মানে। তারপর দেখানো হয়েছে, সেই বর্ণ থেকে মোট কতগুলি ক্রিয়ামূল উদ্ভূত হয়েছে অর্থাৎ কতগুলি (এক্ষেত্রে ১৯টি) শব্দবংশের বা শব্দ-পরিবারের সূত্রপাত হয়েছে। এর পর বর্ণানুক্রমিকভাবে শব্দবংশের নামগুলি উল্লেখ করা হয়েছে; যথা, অংশ্, অঙ্ক্, অঞ্জ্ ... ইত্যাদি। তারপর প্রথম শব্দবংশটির নাম লিখে, সেই শব্দবংশে কী কী শব্দের জন্ম হয়েছে, অর্থাৎ সেই শব্দপরিবারের সকল সদস্যদের নাম বর্ণানুক্রমিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর বর্ণানুক্রমিকভাবে সেই শব্দবংশে জাত শব্দগুলির অর্থ নিষ্কাশন করা হয়েছে। সবার আগে বংশকর্তার নাম ও তার ব্যাখ্যা, এবং তারপর তার থেকে জাত শব্দসমূহের অর্থ দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে নির্বাচনের আশ্রয় নিতে হয়েছে; সকল শব্দের অর্থ দেওয়া হয়নি। কারণ, শব্দবংশের কর্তার মানে জেনে নেওয়ার পর পাঠক বহু ক্ষেত্রে নিজেই সদস্য শব্দদের অর্থ বুঝে নিতে পারবেন। শব্দার্থকোষের অবয়বের কথা ভেবেও এই নীতি গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। ...

বয়ানের ভেতরে যেখানেই মোটা হরফ রয়েছে, বুঝতে হবে সেটির অর্থ তার নিজস্ব ভুক্তিতে অবশ্যই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, যদি কোনো বিবরণের ভিতরে মোটা হরফে **অজয়** লেখা থাকে, বুঝতে হবে, এই শব্দার্থকোষে যেখানে **অজয়** শব্দটিকে পাওয়ার কথা, সেখানে তার বিস্তারিত অর্থ অবশ্যই পাওয়া যাবে। যেখানে '??' চিহ্ন রয়েছে, বুঝতে হবে সেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি এখনও অস্পষ্ট, অথবা এমন স্পষ্টতায় বোঝা সম্ভব হয়নি, যা পাঠক-সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা যায়। 'ক', 'খ', 'গ' ... ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য লেখা থাকলে বুঝতে হবে, সূচীপত্রের আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া গ্রন্থগুলির কোনো একটির কথা বলা হচ্ছে।

ভূমিকা

ভূমিকার সূচী

কথারম্ভ : আত্মপরিচয়

সুধী পাঠক, যে গ্রন্থটি হাতে নিয়েছেন, শ্রেণীগত পরিচয়ে সেটি অবশ্যই অভিধান-পদবাচ্য; কিন্তু গ্রন্থের ভিতর প্রবেশ করলে দেখবেন, এটি একটি নতুন ধরনের অভিধান। প্রচলিত অভিধানগুলিতে ভাষার শব্দভাণ্ডার থাকে শব্দের আদ্য-অক্ষরের বর্ণকে ভিত্তি করে বর্ণমালার ক্রম অনুসারে সাজানো; এ গ্রন্থটি তেমন নয়। আবার এটি কোনো সমার্থবাচক থিসরাস (thesaurus) বা অমরকোষের সগোত্রও নয়। যে তত্ত্বের ভিত্তিতে এখানে বাংলা শব্দভাণ্ডারকে আনা হয়েছে তা এই যে, মানুষের ভাষার প্রতিটি বর্ণই মূলত কোনো না কোনো ক্রিয়ার অর্থবহন করে এবং প্রতিটি ভাষার প্রতিটি শব্দই আদিতে সৃষ্টি হয়েছিল এবং এখনও অনেকাংশে হয় কোনো একক ধাতু, verbroot বা ক্রিয়ামূল কিংবা তাদের সমষ্টি থেকে। এই তত্ত্বটি আমরা প্রথম আবিষ্কার করলাম এমন নয়। তত্ত্বটি অন্য দেশের জ্ঞানীদের গোচরে না এলেও, এটি অতীতকালে ভারতীয় মনীষার জ্ঞানচর্চায় স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল; যদিও পরবর্তীকালে তাঁদের উত্তরসূরীগণ বহুলাংশে এই তত্ত্ব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যান। আমাদের ভাবনা, আলোচনা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে আমরা এই তত্ত্বটি পুনরুদ্ধার করে যাচ্ছি এবং যুগোপযোগী বিকাশের মধ্য দিয়ে সেই তত্ত্বকে সমুচিত মহিমায় প্রতিষ্ঠা দেওয়ার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি, করছি। সেই সূত্রেই এই অভিধানের উদ্ভব। শব্দার্থ উদ্ধারের এই নিরন্তর প্রক্রিয়ায় সমাজ ও জীবনসত্যের নানাবিধ আলোয় আমরা বারেবারে উদ্ভাসিত হয়েছি এবং নিজেদের ধন্য মেনেছি এই কাজে ব্যাপৃত থাকার জন্য।

এই শব্দার্থকোষ কী কাজে লাগতে পারে

- শব্দের ভেতর থেকে তার মানে বের করা যাবে।
- এক ক্রিয়াজাত অনেক শব্দ গুচ্ছ ধরে শেখা যাবে।
- বাংলা শব্দভাণ্ডার সহজেই পাঠকের আয়ত্তে এসে যাবে।
- বাংলাভাষার বিপুল ঐশ্বর্যের উপলব্ধি ঘটবে।
- ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে হীনমন্যতা থেকে মুক্তি আসবে।
- প্রকৃত বঙ্গমানসকে চিনে নিয়ে তাকে পুনরুদ্ধার করা যাবে।
- পুরাণ-তন্ত্রাদি গ্রন্থের মানে বোঝার উপায় পাওয়া যাবে।
- রামায়ণ-মহাভারতাদির মানে বোঝার কৌশল জানা যাবে।
- দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারার উপায় পাওয়া যাবে।
- প্রবাদ প্রবচনের মানে বোঝার উপায় পাওয়া যাবে।
- ছড়া ও জনশ্রুতির মানে বোঝার কৌশল পাওয়া যাবে।
- আচার-সংস্কারের মানে বোঝার কৌশল জানা যাবে।
- বাংলাভাষীর মনুষ্যত্বকে পূর্ণমহিমায় পুনরুদ্ধার করা যাবে।
- মানবসভ্যতার আদিম ইতিহাস স্পষ্ট রূপে জানা যাবে।
- যে-ভাষাতত্ত্ব পড়ানো হয়, তা আগাগোড়া বদলে যাবে।
- ইংরেজি ভাষার শাসন থেকে বাংলা-মনকে মুক্ত করা যাবে।
- ইংরেজি সহ দুনিয়ার সব ভাষাকে পথ দেখানো যাবে।

তবে আমাদের কাজটি এত নতুন ধরনের যে এর সম্বন্ধে একই সময়ে উৎসাহী সমর্থন, উপেক্ষা, ও প্রচ্ছন্ন কুশলী বিরোধিতা, এই সব রকমের প্রতিক্রিয়া দেখতে পেয়েছি বারবার। আমরা ভাল করে জানি আমাদের উদ্দেশ্য ও যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে, কেন-না আমাদের কাজের পিছনে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সনদ নেই। বিশেষত, আমাদের দুজনের মধ্যে বয়স, পেশা ও সামাজিক পটভূমির বড় রকমের ফারাক থাকায় আমাদের সহযোগিতার চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন উঠবে অনেকের মনে। তাই সমাজের কাছে নিজেদের অর্ঘ্যস্থাপনের কালে আত্মপরিচয় দেওয়ার বঙ্গীয় রীতি মেনেই আমাদের দুজনের স্বতন্ত্র নিবেদন পেশ করছি।

রবি চক্রবর্তীর আত্মপরিচয়

আমার অনেক বন্ধু ভেবে পান না প্রায় তিরিশ বছর ধরে কলেজ স্তরে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করার পর বৃদ্ধ বয়সটা আমি বাংলা আর সংস্কৃতের চর্চা করে কাটাচ্ছি কেন। যাঁরা ভাবেন আমি এটা করছি আমার মতিভ্রমের জন্য, তাঁদের কথা ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না। কিন্তু যাঁরা মনে করেন এর মূলে আছে আমার সুপ্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের তৃপ্তি, তাঁদের সংশয় কাটান আমার অবশ্য কর্তব্য।

এটা সত্যি, বৈদিক ব্রাহ্মণের সন্তান (জন্ম ২৪ অক্টোবর, ১৯২৯) হিসেবে ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারা আমার ভিতরে জোরাল ভাবে উপস্থিত থাকতে পারত। আমার আত্মীয়বর্গের অনেকের মধ্যে সংস্কৃতভাষার চর্চা ও ব্রাহ্মণ্যপন্থী লোকাচারের অনুসরণ ভালো মাত্রায় বজায় ছিল, অন্তত ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগের আগে পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের পরিবারটা নানা কারণে অনেক আগেই একটু অন্য ধরনের হয়ে যায়। অবিভক্ত বঙ্গে পদ্মাপারের নাটোর-সন্নিপাতী হাতিয়ান্দহ গ্রামের বাসিন্দা আমার পিতৃকুল বংশমর্যাদার অধিকারী হলেও কট্টরপন্থী ব্রাহ্মণ্যচর্চা করত না। আর মাতৃকুলে আমার মাতামহের পিতামহ অবিভক্ত বঙ্গের যশোর জেলার নড়াইল-বাসী, তৎকালের বিখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত, পার্ব্বতীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (১৮০২-১৮৯৭) একালকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁর জীবনে। তিনি সমর্থন করেছিলেন বিদ্যাসাগরের সংস্কারপন্থী আন্দোলনকে আর নিজের দুই পুত্রকে ইংরেজি বিদ্যায় শিক্ষিত করেছিলেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, আমার পিতা রমণীকান্ত চক্রবর্তী নিজেই ছিলেন একজন জীবন্তমাত্রায় আধুনিক মানুষ। তিনি ছিলেন সামাজিক অচলায়তন ও সকল রকমের পুরোহিততন্ত্রের একান্ত বিরোধী, এবং সহজ মানবতায় বিশ্বাসী। সত্যনিষ্ঠা, বিদ্যানুরাগ, তেজস্বিতা — সবই ছিল তাঁর সহজাত মনুষ্যত্বের অঙ্গ। দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হলেও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য ছিল তাঁর চর্চার প্রধান বিষয়। আধুনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে উৎসাহের পাশাপাশি তাঁর মনে ছিল গীতা এবং উপনিষদ কথিত সত্যে ঐকান্তিক বিশ্বাস। নিয়মনিষ্ঠা ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে যে তিনি কতটা মর্যাদা দিতেন, তা স্পষ্ট হয়েছিল তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের প্রতি ব্যবহারে এবং তাঁর কর্মক্ষেত্রে।

আমার পিতার কর্মজীবনের বৃত্ত পূর্ণ হয়েছিল কোন্নগর হাইস্কুলে দীর্ঘ বাইশ বছরের প্রধান শিক্ষকতায়। আমি ছিলাম সেই স্কুলেরই ছাত্র। বাড়িতে একটি সাধারণ নিয়মে চলার চাপ থাকলেও পড়াশোনার ক্ষেত্রে — পাঠ্য ও পাঠ্য-বহির্ভূত কোনটি পড়ব, কখন পড়ব, কেমন করে পড়ব, এ সবে ছিল আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। আমার কৈশোরের উন্মেষকালে যখন বলে দিয়েছিলাম আমি বিজ্ঞানচর্চা করেই জীবন কাটাবো, কোনো বড় চাকরির চেষ্টা করব না, তাও মেনে নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, কলকাতার সান্নিধ্যহেতু ব্রাহ্ম আন্দোলনের তথা রামকৃষ্ণ সঞ্চরণের স্মৃতিধন্য গ্রাম্যতা-রিক্ত কোন্নগরে ১৯৪৭-এর আগে পর্যন্ত ছিল অতীত গৌরবের স্মৃতিমেদুরতা আর একধরনের অবসন্নতা। বড় জগতের খবর তবু পেয়ে যেতাম দুটি ধারায়। এক, আমার পিতা আর দুই, আমার আত্মীয়-পরিজন, যাঁরা পূর্ববাংলার গ্রামজীবন ছেড়ে কলকাতায় এসে ভাগ্যান্বেষণ করছেন এবং যাঁদের একটা বড় অংশ শিক্ষক-অধ্যাপক-গ্রন্থকার এমনকি নিদেনপক্ষে পুস্তকব্যবসায়ী এবং যাঁদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি রাজরোষের শিকার। বাবার ছাত্রজীবনের শেষ চার বছর কেটেছিল কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে যথাক্রমে বিএ অনার্স এবং এমএ-র ছাত্র রূপে। প্রেসিডেন্সিতে যখন এমএ পড়ছেন, তখন সেখানে অধ্যাপক হিসেবে দেখেছেন বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে, আর ছাত্র হিসেবে দেখেছেন সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখকে, এবং ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দেখেছেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে; তাঁর হাত থেকে নিজে মেডেলও পেয়েছেন। আর, রাজশাহী শহরে স্কুলের শিক্ষা শেষ করা এবং কলেজের শিক্ষার প্রথম দুবছরের সময় বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন দেখা এবং কিছুটা অংশ নেওয়া — সবই তাঁর ভাগ্যে ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলের সভায় তিনি উপস্থিতও ছিলেন সাধারণ শ্রোতা হিসাবে। সুতরাং অনেক ইতিহাস জমা ছিল তাঁর স্মৃতির ভাঁড়ারে, এবং তার কিছু কিছু অংশ শুনে ইতিহাসের অনেক কিছু আমার অবলীলায় জানা হয়ে গিয়েছিল। তেমনি কলকাতাবাসী আত্মীয়দের কাছ থেকে চলতি সময়ের রাজনীতি-সংস্কৃতি-সাহিত্য-জগতের খবরও পেয়ে যেতাম। আত্মীয়তার সূত্রেই আমার চেয়ে তিন বছরের বড় কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাথে ঘনিষ্ঠতা ঘটে যায় কৈশোরজীবনে। সুকান্তর সঙ্গে ঘরে বসে বা পথচলতি আলাপ-আলোচনায়, এবং বিভিন্ন সভাসমিতিতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ১৯৪৩-৪৪ সালে ওয়াকিবহাল হয়ে যাই কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে।

১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন (= মাধ্যমিক) পরীক্ষা পাশ করার পর ঘটে যায় জীবনের এক অপূর্বকল্পিত পালাবদল। কলকাতার কলেজে পড়তে ভর্তি হই, কিন্তু বিচিত্র কার্যকারণের সূত্রে হঠাৎই আবাসিক হয়ে যাই রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নির্বেদানন্দজী পরিচালিত কলকাতা ছাত্রাবাসে। সে সময়ের রামকৃষ্ণ মিশন আজকের রামকৃষ্ণ মিশন থেকে অন্যরকম ছিল; বাহ্যসম্পদে আজকের থেকে হীন, কিন্তু মানসিক সম্পদে আজকের থেকে অনেক উন্নত। যে তিন বছর ওখানে ছিলাম, সমগ্র সত্তা নিয়ে আন্দোলিত হয়েছি ওখানকার ভালোবাসায় আর শাসনে। আবার, ঐ একই সময়কালে কিঞ্চিৎ মাত্রায় রবীন্দ্রানুসারীদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম ভগিনীপতি ভবশরণ সরকারের (ওরফে ভনুদার) সুবাদে। এই ভনুদার (যাঁর সঙ্গে ১৯৪৪ সালে আমার বড়দিদি জ্যোতির্ময়ীর অসবর্ণ তথা বিধবাবিবাহের মধ্য দিয়েই আমাদের পরিবার, বিশেষত বাবা আর মা সামাজিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন) সৌহার্দ্যের সূত্র ধরে আবার রাজনীতি ও সংস্কৃতি জগতের অনেক ব্যক্তিকে কাছে থেকে দেখি এবং কিছুটা মেশারও সুযোগ পাই।

সুতরাং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা, রবীন্দ্রসংস্কৃতি ও বঙ্গীয় কমিউনিস্ট আন্দোলন — তিনটি আদর্শের মধ্যে কিয়দংশে সহযোগী আবার বহুলাংশে বিরোধী টানের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যাওয়ার ফলে, এবং আমি সব ক'টির ডাকে সাড়া দিতাম বলে, আমার অবস্থা হয়ে গিয়েছিল দিশাহারা। তবে এতগুলি ভিন্নমুখী ধারার মাঝে পড়ে যাওয়ায় নিছক নিজত্ববোধ নিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদেই অনেক সচেতন হয়ে যাই দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে। দেশের জীবনকে মাটির কাছে থেকে ছোঁয়ার সুযোগ না পাওয়ায় যে বিরাট অভাব ছিল আমার জীবনে, তার অনেকটা পুষিয়ে গেল সমাজের উপরের স্তরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্রোতের আবর্তে পড়ে যাওয়ায়। অন্তত মনের অজান্তেই একটা মাপকাঠি তৈরি হয়ে যেতে লাগল, যার জোরে সহজেই আর বাত্যাতাড়িত না হই।

ততদিনে একটা জিনিস বুঝে গিয়েছিলাম। তা এই যে, কথার জালেই মানুষের চিন্তা আটকে যায়, আর সে জাল ছিন্ন করে বেরোতে হয় কথারই সহযোগিতাতে। সেজন্য বিজ্ঞানচর্চা ছেড়ে ভাষা আর সাহিত্যকেই আমার প্রধান চর্চার বিষয় করব, এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই। আর তাই যদি করি, তবে বাংলা বা সংস্কৃতকে কেন বাছতে যাব? যে তিনটি ভাষা — ইংরেজি, ফরাসি আর জারমান — তৎকালীন বিশ্বের সভ্যতার প্রধান বাহন হিসেবে স্বীকৃত হত, তার মধ্যে শুধু ইংরেজিই ছিল সহজলভ্য। সুতরাং আমি ভর্তি হলাম কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি অনার্সের ছাত্ররূপে। হিন্দু কলেজের উত্তরসূরী প্রেসিডেন্সি কলেজের অলিন্দে অলিন্দে তখনও ইতিহাসের সৌরভ! কিন্তু আমার অন্বেষার কতটা সিদ্ধি ঘটল? সতীর্থ যাদের পেলাম তাদের প্রায় সকলেই খুঁজছিল নিরাপদ জীবন আর সামাজিক প্রতিষ্ঠা। আর, অল্প একটা অংশ পথ খুঁজে মরছিল ছকে বাঁধা রাজনীতির মধ্যে। সতীর্থ যাদের পেয়েছিলাম তারা পরবর্তীকালে দেশের কত পয়লা সারির উচ্চ পদে আসীন হয়ে গেল! তাদের মধ্যে যারা এখনও জীবিত আছে, নামধাম উল্লেখ করে তাদের আর বিব্রত করি কেন! তারা আমাকে আদর করে তাদের সঙ্গে সামিল হওয়ার ডাক অবশ্যই দিত। কিন্তু আমি সাড়া দিতে পারলাম কই! আমি যে বাঁধা আছি অন্য সুরে। অধ্যাপক হিসাবে পেলাম যাঁদের, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করব কিংবদন্তীতুল্য তারকনাথ সেন, মার্জিত রুচিবান সোমনাথ মৈত্র, কবি বিষ্ণু দে, ইংরেজি উপন্যাস লিখে বিখ্যাত দিল্লি-মীরাট অঞ্চলের আহ্‌মেদ আলী প্রমুখ। নিঃসন্দেহে এঁরা আমার মনের ব্যাপ্তি ঘটিয়েছিলেন; তারকনাথ তো ছিলেন গ্রন্থাকারে লভ্য বিদ্যার অতি উচ্চ মানের ধারক ও বাহক। কিন্তু যে সমাজসত্য জীবনের দরজায় এসে ধাক্কা দিয়ে যাচ্ছে, তাতে সাড়া দেওয়ার মতো জ্ঞানী তো পেলাম না! কবি হিসাবে বিষ্ণু দে হয়তো সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, কিন্তু অধ্যাপক হিসেবে, দার্শনিক গবেষক হিসেবে পথ দেখানোর মতো কাউকে তো পেলাম না। খুব স্নেহের সঙ্গেই অধ্যাপক সোমনাথ মৈত্র আমায় বলেছিলেন, 'রবি, তোমার লেখায় supersubtle philosophical spinning কর কেন? ঝরঝরে পরিষ্কার লেখা লিখলেই তো বেশি নম্বর পাবে।' বুঝলাম যে, লেখায় কতটা সত্য থাকল, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা লেখার রচনাশৈলী! সত্যের সন্ধান বড় কথা নয়, বড় কথা হল সত্যের ভান আর চপল মধুর কথা! আর, তখনও যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি, বাংলা প্রভৃতি বিভাগে মার্কস, ফ্রয়েড প্রমুখের তত্ত্বের প্রবেশাধিকার ঘটেনি, সেকথা তো ভাল করেই জানতাম।

সুতরাং ১৯৪৯ সালে ইংরেজিতে অনার্স সহ বিএ পাশ করার পর গতানুগতিকের রাস্তায় এমএ পড়ার কোনো চেষ্টাও করলাম না। আমার পরিবারের লোকেরা আমায় ভুল বুঝলেন আর ক্ষুণ্ণ হলেন। নিজের মতো করে নানা বই পড়ি, সাহিত্য রাজনীতি ... ইত্যাদি বোঝার চেষ্টা করি, লেখালিখির চেষ্টা করি, আর চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করি। এক-দেড় বছরের মধ্যে পুরো স্বনির্ভর হয়ে যাই, সরকারি হিসাবখানায় কেরানী পদ পাওয়ার পর। বছর খানেকের মধ্যে এক বাঙালি খ্রিস্টান তরুণীকে বিয়ে করার ফলে কয়েক বছরের জন্য কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি পবিবার ও আত্মীয়স্বজন থেকে। ...

কলেজে পড়া কালে Christopher Caudwell-এর সাহিত্য সমালোচনা (Illusion and Reality, Studies in a Dying Culture, Further Studies in a Dying Culture), Ralph Fox রচিত The Novel and the People, George Thompson-এর লেখা Marxism and Poetry এবং Edgar Snow-র সাংবাদিকতা (Red Star over China) পড়ার ফলে কমিউনিস্ট আদর্শের দিকে বেশ কিছুটা ঝুঁকেও ছিলাম আগে থেকে। অফিসে থাকা কালে কোনো রকমের পার্টি সদস্য না হয়েও অফিস কর্মচারী আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে যাই। রোষে পড়ে যাই সরকারের। সে অবস্থায় ঐ চাকরির সূত্র ধরে পণ্ডিত নেহরুর ঢক্কা-নিনাদিত সমাজতান্ত্রিক প্রকল্পের ডি.ভি.সি.-র এলাকায় চলে যাই এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুস্থ দেহে ও স্বাধীন মন নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করি। এমনকি আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেও কোনো নিরাপদ কোণ পাওয়া যায় কি না, তারও সন্ধান করি দেড়-দুই বছর। শেষ কালে একটা বড় আন্দোলন ভেঙে যাওয়ায় সর্বব্যাপী হতাশার কালে দশ বছরের সরকারি চাকরি ছেড়ে দিই আর স্কুল-শিক্ষকতা করতে চলে যাই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ি গ্রামে। সেখানে চোদ্দ-পনের মাস

শিক্ষকতা করার কালে প্রাতিষ্ঠানিক ছাপের জোরে অপেক্ষাকৃত গ্লানিমুক্ত জীবিকা পাওয়ার আশায় সম্পূর্ণ প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির (গ্রুপ এ) এমএ পরীক্ষায় বসি ১৯৬১ সালে এবং ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যাই। বলে রাখা যেতে পারে, আমার এমএ পরীক্ষা বৈতরণী পারের প্রধান প্রেরণা ও অবলম্বন ছিল পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত Pelican Guide to English Literature। এই গ্রন্থের মধ্যে পেয়েছিলাম যাবতীয় বাধানিষেধ-মুক্ত গবেষণা লব্ধ তত্ত্বের সসম্মান প্রতিষ্ঠা। যাই হোক কলেজের শিক্ষকতা বা অধ্যাপনায় এসে গেলাম ১৯৬২ সালের গোড়ায়, প্রথমে চার বছর মেদিনীপুর কলেজে এবং পরে খ্রিস্টান মিশনারি মহাত্মা উইলিয়াম কেরি প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামপুর কলেজে, আর প্রায় তিরিশ বছর অধ্যাপনার শেষে অবসর নিলাম ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে।

ছাত্র-জীবনে একটি কষ্ট নিরন্তর পেতাম, সেটি অধ্যাপক-জীবনে পেলাম আরও বেশি করে। এ কষ্টটি সহজে বোঝানো যাবে না ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান বা কোনো কারিগরি বিদ্যার ছাত্রদের। এই সব বিভাগে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত তথ্য ও তত্ত্ব বোঝানো ও বুঝতে পারাটাই হল শিক্ষক ও ছাত্রের মুখ্য লক্ষ্য। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব বিচার না থাকলে, কি ছাত্র কি শিক্ষক, উভয়েই হয়ে যান নানা রকম পরস্পরবিরোধী মতামতের প্রসারণ-খাত মাত্র। আমার খারাপ লাগত আমাদের শিক্ষক-অধ্যাপকরা অন্যের কথা বুঝে নেওয়ায় অনেক দক্ষতা দেখালেও নিজস্ব বিচারে যেতে তাঁরা প্রায়শই অনিচ্ছুক এবং হয়তো-বা অপারগও। এর কারণটা বোঝার অনেক চেষ্টা আমি করেছি। শেষে দেখলাম, এর কারণটা রয়েছে আমাদের বর্তমান শিক্ষাপ্রকল্পেই। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান হচ্ছে পশ্চিম দেশের রাষ্ট্রিক-সামাজিক-ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত তত্ত্ব, যেটা ঐ পরিমণ্ডলে বেড়ে-ওঠা মানুষ সহজে অনুধাবন করতে পারে; অন্যে পারে না। আবার আমাদের দেশের শিক্ষক-অধ্যাপককুল তো দেশীয় ধ্যানধারণার জগৎ থেকেও বিচ্ছিন্ন। স্বাভাবিক ভাবেই বইয়ে পড়া ধ্যানধারণাকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার তাগিদও তাঁদের মধ্যে স্ফূর্তিলাভ করেনি। সুতরাং গোটা বিদ্যাটিই হয়ে যেত মুখস্থ করা বিদ্যা, যেন তোতা পাখির বুলি। পশ্চিমে ব্যাখ্যাত আধুনিক তত্ত্ব যদি-বা কিছুটা নিতে পারতেন, ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের যে নব মূল্যায়ন T S Eliot প্রমুখ মনস্বীদের মননের মধ্য দিয়ে উঠে আসছিল, তা তাঁরা কিছুই ধরতে পারতেন না। যদি-বা কখনো পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিদ্যার সমন্বয়ের চেষ্টা হত, তবে তা হত বহিরঙ্গভিত্তিক এবং স্বভাবতই নিম্ন মানের। মোট কথা, একটি সত্য আমি নিশ্চিতভাবে বুঝে গিয়েছিলাম। তা হল এই — দেশের ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে আমরা দিন দিন হারিয়ে ফেলছি দেশের ভাবসম্পদে আমাদের উত্তরাধিকার। তাই শহরের মানুষ আর গ্রামের মানুষের মধ্যে ভাবের লেনদেন গেছে থেমে; বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ থেকে কলেজ স্ট্রিট পৃথক হয়ে গেছে, সমগ্র বঙ্গমানসের অর্জন আগের মতো আর উঠে আসছে না সমাজের উপরিতলের অ্যাকাডেমিতে, অ্যাকাডেমির অর্জন পৌঁছোচ্ছে না চণ্ডীমণ্ডপে। রাজনীতি যাঁরা করছেন, তাঁদের সকল আত্মত্যাগ ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা দেশের মানুষের মনে সাড়া তুলতে পারছেন না, তাঁরা দেশের মানুষের ভাষা বোঝেন না। তাঁদের রাজনীতি তো তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি মতোই হবে! আর আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার জ্ঞানচর্চার শিকড় তার মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে তাই আসছে বন্ধ্যাত্ব আর সামাজিক জীবনে ঘটে যাচ্ছে এক রকমের 'পচন'।

এ অবস্থা থেকে মুক্তির একটা রাস্তাই আমি দেখতে পেতাম; তা হল দেশের ঐতিহ্যটা বুঝে নেওয়া। সেই ঐতিহ্যের মধ্যে পা রাখলে একদিকে যেমন সশ্রদ্ধ আত্মপরিচয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়, তেমনি অন্য দেশের ভাবনার মুখোমুখি হওয়ার আগ্রহ আর যোগ্যতা দুই-ই আসে মানুষের মনে। কিন্তু ঐতিহ্য তো আসলে নানান ধারণা, বিশ্বাস ও আচরণের সমষ্টি, যাদের পরিচয় পেতে গেলে প্রধানত যেতে হয় দেশের সংস্কৃতিতে, ভাষা ও সাহিত্যে। তাহলে আমাদের ঐতিহ্যকেও বুঝে নিতে হবে আমাদেরই ভাষা ও সাহিত্য থেকে। এই বিশ্বাসের জোরে ১৯৬৮ সালে কিছু ব্যতিক্রমী কাজ আমি করেছিলাম। ঐ বছরে শ্রীরামপুর কলেজের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলেজ পত্রিকার Terjubilee সংখ্যায় Thoughts for the Terjubilee শীর্ষক স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি এই কয়টি বক্তব্য রেখেছিলাম : ১. আমাদের দেশের ভাবনালোক থেকে বিচ্ছিন্ন পশ্চিমী ধ্যানধারণাসর্বস্ব উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে একটি কৃত্রিম কাগজের ফুল। ২. ঐ শিক্ষার প্রভাবে আমাদের ভাষার পারিভাষিক শব্দগুলি বেশি করে অর্থান্তরের বিকৃতিতে চলে যাচ্ছে। ৩. আমাদের ভাষার শব্দাবলীর প্রকৃত অর্থ উদ্ধার আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের আবশ্যিক প্রথম ধাপ। ... ইত্যাদি। কিন্তু এতদূর বুঝেও আমি থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। নিজের জীবনজীবিকার চাহিদা মিটিয়ে কী করে যে বাংলা এবং সংস্কৃতের যৌথ সম্পদভাণ্ডারে প্রবেশ করব, তার কোনো দিশা পাইনি বহুদিন।

আমার সে অবস্থা কাটল ১৯৯৮ সালে। আমার হাতে আসে আগে-না-শোনা নামের লেখক কলিম খান-এর বই 'মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে'। বইটি পড়তে দিয়েছিল আমার পূর্বতন ছাত্র, কোন্নগরের শঙ্কর রায়মিত্র। বইটি পড়ে আমি অভিভূত

হই। আমাদের ভাষাসম্পদ এবং সাধারণভাবে ভাষা সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারপদ্ধতি এই বইটির মধ্যে পেলাম, তার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলা এবং সংস্কৃতের শব্দভাণ্ডারে প্রবেশের একটা রাস্তাই শুধু পেলাম তাই নয়, কলিম খান-এর লেখায় পেলাম কয়েকটি অসামান্য তত্ত্ব। তার দু-একটি এখানে উল্লেখ করা যায় : ১) এই উপমহাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ — দলিত, আদিবাসী, মুসলিম যাই হোক না কেন, এ দেশের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির পূর্ণ উত্তরাধিকারী। ২) মৌলবাদ মানে শুধু ধর্মীয় কট্টরপন্থা নয়, মৌলবাদ একটি অভ্যাস বা ক্রিয়া যার আসল চরিত্র হল শুধু একই পথে চলা, বা পুনরাবৃত্তি করে যাওয়া। ৩) বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস নয়, ক্ষমতার উৎস সত্যগোপন। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত এই বই অথবা পরে প্রকাশিত 'দিশা থেকে বিদিশায়' প্রভৃতি গ্রন্থের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের সংস্কৃতিজগতের অভিভাবকেরা যে কিছু-খবর-না-পাওয়ার ভান এখনও করে যাচ্ছেন, তা অতিমাত্রায় দুঃখের। আমি প্রথমেই বুঝতে পারি, আমার সমস্ত বিদ্যাচর্চা মিথ্যা হয়ে যায় যদি আমি সেই তত্ত্বকে দু-হাত তুলে স্বাগত না জানাই। এ কথা জানতাম যে, কলিম খান-এর তত্ত্বকে গ্রহণ করেছি ব্যাখ্যা সহ তা ঘোষণা করলে অপবাদ আসবে — আমার মৌলিকতা নেই, আমি কেবল অন্যের আলোয় উদ্‌ভাসিত হই ... ইত্যাদি। কিন্তু আমার গভীরের বিশ্বাস, সত্যের সঙ্গে কারচুপি চলে না। সত্য বুঝেও যদি চুপ থেকে যাই, তবে ভাবী কাল আমাকে ধিক্কার দেবে। আর তা ছাড়া আমার নিজের কাছেই আমি ছোট হয়ে যাব। বয়সে বা বই থেকে পাওয়া বিদ্যায় কলিম খান আমার সামনে না পিছনে, সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা সত্যের গৌরব তাঁর কতটা। অতএব পশ্চিমবাংলার আর অধ্যাপকরা যদি চুপও থেকে যান, 'একলা চলোরে' নীতি মেনে কলিম খানকে আমি অভ্যর্থনা, অভিনন্দন আর শ্রদ্ধা জানাই।

তা ছাড়া, কৃৎকৌশল (technology) প্রয়োগের বেলায় ব্যক্তিগত মালিকানার প্রশ্ন উঠতে পারে, কিন্তু কোনো তত্ত্ব বা বৈজ্ঞানিক সত্য কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সে তত্ত্বের সাহায্যে যে কোনো মানুষ ব্যক্ত জ্ঞানের এলাকা সম্প্রসারিত করতে পারেন। এবং নানা মানুষের প্রয়াসে উপর্যুপরি প্রয়োগের মধ্য দিয়েই প্রতিটি তত্ত্ব শুদ্ধতর ও পূর্ণতর রূপ পায়। একই তত্ত্বের ওপর বহু মানুষ তাদের চর্চা চালিয়ে যান, তবে তত্ত্বের বিকাশ হয়, নতুন তত্ত্বের জন্ম হয়, আর এগিয়ে যায় মানুষের সভ্যতা। কলিম খান-এর তত্ত্বকে গ্রহণ করার সময় এ রকম ভাবনাই ছিল আমার প্রেরণা। আমি আকৃষ্ট হই এই নতুন ভাষাতত্ত্বের দিকে আর ক্রমে কলিম খান-এর সঙ্গে সামিল হয়ে যাই এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার কাজে। মুগ্ধ হয়ে দেখি এই তত্ত্বের সাহায্যে কত দুর্বোধ্য পুরাণকথা, সামাজিক প্রথা, এবং রাষ্ট্রিক ক্রিয়াকলাপকে একেবারে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। উপলব্ধি করি, এই তত্ত্বের সাহায্যে শুধু অধিকতর সূক্ষ্মতার সঙ্গে ভাব প্রকাশ করতে পারি তাই নয়, একই সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে একটি প্রজ্ঞাদৃষ্টিও অর্জন করি। ক্রমে কলিম খান-এর সঙ্গে আমার সহযোগিতার একটা বনেদ আস্তে আস্তে তৈরি হয়ে গেল। ব্যক্তিগত পরিচয় অবশ্যই ঘটেছিল, এবং তা হয়েছিল আমার ভাগিনেয় অরিন্দম চক্রবর্তীর সুবাদে, যে মাত্র কয়েক মাস আগে কলিম খান-কে খুঁজে বার করেছিল তাঁর লেখা পড়বার পর।

তবে একথা মানতেই হবে যে, কলিম খান ও আমার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল পরস্পরবিচ্ছিন্ন এবং ভিন্ন রকমের দুটি ক্ষেত্রে, এবং দুজনের প্রজ্ঞা ও অর্জিত জ্ঞানের মধ্যে তারতম্য ছিল ও আছে। কিন্তু গভীরে ছিল একটা মিল; জীবনের পরমার্থ বিচারে আমাদের অভিমুখ ছিল এক রকমের। তার ফলে শুধু সহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল এমন নয়, এক ধরনের সম্পূরকতার সম্পর্কও গড়ে উঠল দুজনের মধ্যে। কলিম খান-এর সঙ্গে আমার সহযোগিতার সূত্রে বেশ কিছু মূল্যবান কথা বুঝে যাই। বুঝতে পারি, বাংলাদেশের তরুণসমাজ কেন বাংলাভাষার প্রশ্নে উত্তাল হয়ে উঠেছিল এবং এখনও পশ্চিমবঙ্গ থেকে তারা কেন অনেক বেশি স্পন্দিত। এ কথা ভাল করে খেয়াল হয় যে, বাঙালি-হিন্দু বাংলাভাষাকে পেয়েছে কোনো বিশেষ ত্যাগ ছাড়াই; আর বাঙালি-মুসলিম বাংলাভাষাকে অর্জন করেছে উর্দু-আরবির চাপ সরিয়ে তার সচেতন বিচার, সক্রিয়তা, এমনকি জীবনদানের মূল্যে। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি মুসলমান বাঙালি লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী আর আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর লেখায় এত প্রাণ কেন। আর এ-খবরও পেয়ে যেতে থাকি যে, পশ্চিমবাংলায় গ্রামের বাঙালি-মুসলিমের জীবনে বঙ্গসংস্কৃতি এখনও কতটা সক্রিয় আছে। কলিম খানও হয়তো আমার কাছ থেকে নতুন কিছু পেয়ে থাকবেন। মোট কথা, শেষ পর্যন্ত শুধু যৌথ গ্রন্থ প্রণয়ন নয়, যৌথ প্রবন্ধ লেখা পর্যন্ত সম্ভব হয়ে গেল আমাদের পক্ষে।

সন্দেহ নেই, একক কলিম খান-এর ক্ষেত্রে যেমন, তেমন আমাদের যৌথ উদ্যোগ সম্বন্ধেও উপেক্ষা-নীতি গ্রহণ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিজগতের অভিভাবকেরা। ২০০০ সালে আমার লেখা India Rediscovered : Kalim Khan And His Verb-based Semantics গ্রন্থটিও তাঁদের অবজ্ঞার শিকার হল। ভেবেছিলাম, জীবিত উপরন্তু অখ্যাত ব্যক্তির কাজ নিয়ে গ্রন্থ রচনার স্পর্ধা এবং নতুনত্ব হয়তো কিছু সাড়া তুলবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষিকার কাছ থেকে অভিনন্দন ও জিজ্ঞাসাপত্র পর্যন্ত পেলাম, কিন্তু কলকাতায় কোনো হেলদোল দেখা গেল না। *আনন্দবাজার*-এর মতো সংবাদপত্রের অঙ্গন

একদিনের মতো খুলে গিয়েছিল আমাদের জন্য (২৩.০৭.২০০৬-এ), তারপর আবার বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু আমরা স্বাগত পেয়েছিলাম পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম, ত্রিপুরা ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যবাসী ও দূর বিদেশবাসী বাঙালির পরিচালিত বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিন থেকে ও আগরতলার দৈনিক *স্যন্দন পত্রিকা* থেকে। কলিম খান-কে তাঁরা আগে থেকেই তারিফ করতেন; আমাকেও তাঁরা সাদরে গ্রহণ করে নিলেন তাঁদের অঙ্গনে।

প্রথম দিকে ভাবতাম, এই শব্দার্থতত্ত্বের চরম সার্থকতা এই যে, এর সাহায্যে আমরা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের তাৎপর্য বুঝতে পারব, এবং তারপর ক্রমে বুঝে যাব ভারতের তথা পৃথিবীর মানুষের সামাজিক ইতিহাস ও মানসিক বিবর্তন। কলিম খান তো তাঁর প্রথম দিকের লেখাতে দশাবতার তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছিলেন, ভারতের মানুষ পুঁজির বিকাশকে কত সূক্ষ্ম পর্যায়ক্রমের হিসাবে বুঝে নিয়েছিল, তার সাক্ষ্য বহন করে এই দশাবতার তত্ত্ব। আরও অনেক লেখায় কলিম খান দেখিয়েছেন, পুরাণ বা রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীগুলি আসলে ভারতে পুঁজির বিকাশ, এবং বিভিন্ন রকমের বণিক, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ও শূদ্র (বা মেহনতি মানুষ)-এর মধ্যেকার নানারকম সংঘর্ষ ও সহযোগিতার ইতিহাস। আমিও আমার মতো করে একটি উদ্যোগ নিলাম। একটি পুরাণের কাহিনী কী করে একই সঙ্গে অনেক রকমের সত্যকে ধারণ করতে পারে, সেটি বোঝবার চেষ্টা করলাম আমার 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা' নামের প্রবন্ধে।

ক্রমে বোঝা যেতে লাগল, আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বাংলা ভাষাটিও ধ্যানধারণার দিক থেকে কত সমৃদ্ধ। প্রতিটি শব্দের আছে স্বকীয় মহিমা, এবং তারা আবার সকলেই একে অন্যের আলোয় উদ্‌ভাসিত। অনেক আগে পৃথকভাবে আমরা দুজনেই বুঝেছিলাম এবং এখন ক্রমেই স্পষ্ট হতে লাগল, ইংরেজ শাসনের সূত্রে ইংরেজি ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ক্রমাগত চেষ্টা হয়েছে আমাদের সকল শব্দের অর্থকে ইংরেজি শব্দের সংকীর্ণ অর্থের মাপে ছেঁটে নেওয়ার। স্বতঃই এই দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তাল, আমাদের মনোজগতের আত্মবিচ্ছেদকে ঘুচিয়ে দেওয়ার স্বার্থেই, যখনই যতটা সম্ভব, আমাদের ভাষার নানান শব্দকে তাদের প্রাপ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করে দেওয়ার। এরই মধ্যে আবার প্রকট হয়ে পড়ল যে, আমাদের শিক্ষাজগতের অভিভাবকরা ভাষাশিক্ষাকে যুগোপযোগী করার উদ্‌ভ্রান্ত চেষ্টায় নানারকমের হানিকর উদ্যোগ নিয়ে চলেছেন। সুতরাং তাঁদের কালাপাহাড়ি কর্মধারার বিরোধিতা করতে হল এবং সেই সূত্রে আমাদের ভাষার নানা সম্পদের উদ্‌ঘাটনকেও আমাদের কর্তব্য বলে মানতে হল। আমাদের *'বাংলাভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ'* গ্রন্থে সেই সব প্রচেষ্টা সংকলিত আছে।

কিন্তু এখানে থেমে যাওয়াও সম্ভব হল না আমাদের পক্ষে। 'নতুন' শব্দার্থতত্ত্বের সুবাদে একটার পর একটা নতুন দিগন্ত খুলে যেতে লাগল আমাদের দুজনের চোখের সামনে : কোনোটার উন্মোচনে প্রধান দায়িত্ব কলিম খান-এর এবং কোনোটার ক্ষেত্রে বা আমার। সে নতুন দিগন্ত কখনও ইতিহাসের, কখনও-বা ঐতিহ্যের — কখনও স্বদেশের, কখনও বা বিদেশের। বৃহৎ সম্ভাবনাময় অনেক নতুন তত্ত্বের আবাহনই যে শুধু সম্ভব হল তা নয়। আরও অনেক কিছু হল। একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ সুপ্ত-অর্ধবিলুপ্ত-প্রায়বিস্মৃত সম্পদকে পুনরুজ্জীবিত করা যেতে লাগল, অন্যদিকে তেমনি অতীত দিনের বিষয়ে অনেক ভুল ধারণাকে ধূলিসাৎ করা গেল। মোটামুটি দুই ধারায় আমাদের কাজ চলতে থাকে — মুখ্যত, বাংলা শব্দার্থ উদ্ধারের মধ্য দিয়ে দেশের ঐতিহ্যের উপর আলোকপাত আর ভবিষ্যতের দিশা খোঁজা, আর গৌণভাবে অন্ধ-আত্মঘাতী-আধুনিকীকরণের বিরোধিতা করা।

বছর দশেক আগেই গুণগ্রাহী পাঠকমহল থেকে কলিম খান-এর কাছে প্রস্তাব আসতে থাকে, তাঁর অনুসন্ধানলব্ধ নতুন ব্যাখ্যাদি দিয়ে পৌরাণিক অভিধান প্রকাশিত হোক। আবার এ প্রসঙ্গে এ ভাবনাও মাথা চাড়া দেয় — বাংলা তথা সংস্কৃত ও লৌকিক শব্দভাণ্ডারের প্রয়োজনীয় অংশসমূহের যথার্থ তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটিত না হলে, শুদ্ধ পৌরাণিক অভিধান কোন ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে? সুতরাং যথামর্যাদায় বাংলা শব্দার্থকোষ তৈরি হোক এবং তার মধ্যে উপযুক্ত ব্যাখ্যাসহ পৌরাণিক কাহিনীগুলিও স্থান পেয়ে যাক। এই অবস্থায় ২০০২ সালের মধ্যে কলিম খান প্রণীত পৌরাণিক অভিধানের আদিখণ্ড (অ — ঔ)-এর একটি প্রাথমিক খসড়া তৈরি হয়ে যায়। ঢাকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদক মীজানুর রহমান (প্রয়াণ ২০০৬) কলিম খান-এর হাত থেকে ২০০২ সালে সেই খসড়াটিই নিয়ে নেন এবং তাঁর নিজের পত্রিকার পরিকল্পিত 'জ্ঞানকোষ'-এর অগ্রিম প্রকাশিত অংশ হিসেবে তাঁর ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ছাপতে শুরু করে দেন।

সম্ভবত ২০০৪-এর মার্চ-এপ্রিল মাসে, কলিম খান বলেন, শব্দার্থ উদ্ধারে যখন আমি ওনার সঙ্গে একমত, তখন শব্দার্থকোষ প্রণয়নের কাজে অংশ নিলেও তো পারি; তাতে অন্তত আরব্ধ কাজ ত্বরান্বিত হয়। বৈদগ্ধ্যের হিসেবে আমাদের মধ্যেকার তারতম্য এবং অধিক বয়সের কারণে আমার শারীরিক তথা মানসিক অক্ষমতার কথা তুলে দ্বিধা প্রকাশ করি অনেকবার। কিন্তু কলিম খান-এর উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐকান্তিকতায় আমার সব আপত্তি ক্রমে বাতিল হয়ে যায়; অভিধান সংকলনের কাজে আমি সহযোগী

হয়ে পড়ি। টেলিফোনে অধিক মাত্রায় আলাপ, লিখিত বা টাইপ-করা কপি চালাচালি, এবং প্রতিমাসে এক বা একাধিক বার একত্র বসে মুখোমুখি আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের কাজ এগিয়ে চলতে থাকে। প্রসঙ্গত বলা যায়, ব্যাপকভাবে কমপিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার করা গেছে বলে আমাদের কাজ অনেক সুসাধ্য হয়েছে। অপরপক্ষে সম্পূর্ণ নতুন রীতিতে অভিধান তৈরি করতে হচ্ছে, এই কারণে হয়ে যাওয়া কাজকেও বারে বারে ঢেলে সাজাতে হয়েছে। বর্তমানে শব্দার্থকোষ প্রণয়নের কাজ প্রায় ৮০ শতাংশ সম্পন্ন হয়ে গেছে। তবু প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য এই কাজের মধ্যে একটা যতি টানতে হল এবং প্রকাশিত হল 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ'-এর ১ম খণ্ড (অ — ন)।

এই শব্দার্থকোষ প্রস্তুতিতে মুখ্য কৃতিত্ব কলিম খান-এর। এটা ঠিক যে আজ থেকে চল্লিশ বছরেরও আগে আমি বুঝেছিলাম এবং সেইমতো লিখেছিলাম — জাতীয় পুনরুজ্জীবনের অতি জরুরি শর্ত হল আমাদের দেশের ভাষার প্রকৃত শব্দার্থ উদ্ধার। কিন্তু সেই উদ্ধারের পথটি তো কলিম খানই দেখালেন, সিন্ধু-গঙ্গা বিধৌত উপমহাদেশের প্রাচীন শব্দার্থতত্ত্ব পুনরুদ্ধার করে এবং তাকে নতুন যুগের জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে। প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সেই তত্ত্বের বিকাশ সাধনের কাজে আমি যোগ দিই কলিম খান-এর সাথে এবং সেই কাজে ব্যাপৃত আছি গত নয়-দশ বছর। এই কোষগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট তথ্য ও তত্ত্বের সংগ্রহ ও উদ্ভাবন, এক কথায় এই কোষগ্রন্থের প্রস্তুতি, যে বিপুল পরিশ্রম দাবি করে তার সিংহভাগ দাবি পূরণ করেছেন কলিম খান; আর সে কাজে যেখানেই প্রয়োজন হয়েছে, সেখানেই আমি আমার ভূমিকা পালন করার সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেছি। ফলে, এই কাজে আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতার এমন মিশ্রণ ঘটে গেছে যে, কোন ক্ষেত্রে আমরা কে কী অবদান রাখতে পেরেছি আজ আর তা পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। সেই সুবাদে আমি বলতে পারি, এই কোষগ্রন্থে যা কিছু রয়েছে, তার দায় যৌথভাবে আমাদের দুজনের।

বাংলাভাষা সম্বন্ধে আমাদের যত বক্তব্য আছে, তার সবই এই গ্রন্থে দেওয়া যায়নি। তার একটি বড় অংশ এখনও অপ্রকাশিত। রাষ্ট্র বা কোনো অ্যাকাডেমির পোষকতা আমরা পাইনি, তবে আমরা পেয়েছি বেশ কিছু বন্ধুর আন্তরিক উৎসাহ ও সাহায্য। সাধুবাদ দিই বারে বারে সেই সব বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের। একটা কথা ভেবেই মনে বল সংগ্রহ করি — নতুন পথে হাঁটতে গেলে তার মূল্যটাও দিতে হয়। আমরা সেই মূল্যটাই দিয়েছি এবং দিয়ে যাচ্ছি।

কলিম খান-এর আত্মপরিচয়

মেদিনীপুরের ডেবরার কাঁসাই নদীর ধারে এক গণ্ডগ্রামের কৃষক পরিবারে আমার জন্ম। দিনটা ১৯৫০-এর ১ জানুয়ারি (রবিবার) বলে শুনেছি। পরিবারে একদিকে ছিল বঙ্গীয় সুফি উত্তরাধিকারের ধ্বংসাবশেষ, অন্যদিকে ছিল সনাতন শূদ্র সংস্কৃতির সঙ্গে আরব্য ক্ষত্রিয় সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের বিমিশ্রণ। ইস্কুলের বাংলা-সংস্কৃত-ইংরেজি শিক্ষা এবং বাবা-কাকা-জেঠামশায়ের সরকারি চাকরির সুবাদে ছিল আধুনিকতার হাতছানি। বাইরে সাদা জামা-ধুতি, ঘরে লুঙ্গি ফতুয়া গেঞ্জি তাঁদের পোষাক ছিল। আরবি-ফারসি-হিন্দি-বাংলা-মিশ্রিত 'খেড়িয়া-বোলি' বা 'খেড়ে-বুলি' ছিল আমার মাতৃভাষা। আপন 'খেড়ে-মুসলিম' সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাংলাভাষী অন্ত্যজ 'নেড়ে-মুসলিম' এবং আশেপাশে ঘিরে থাকা ঠার-ভাষী সাঁওতাল, ভূমিজ, মাহালী প্রভৃতি আদিবাসী ও বাংলাভাষী কৈবর্ত্ত-চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ হিন্দু সম্প্রদায়কে নিয়ে গড়ে উঠেছিল আমার গ্রামীণ পরিবেশ। আন্তর্গোষ্ঠী-কথাবার্তার সাধারণ মাধ্যম ছিল বাংলাভাষা। গোধূলি-প্রভাতে পাখির বিপুল কলকাকলি ও হাঁসমুরগি-গরুছাগলের চিৎকার-ডাকাডাকির সঙ্গে সারারাতব্যাপী মুসলিমদের 'ভাঁড়-নাচ' নামক গান-কথকতা, ধর্মসভা, কাওয়ালি, মহরম, লাঠিনাচ, ওলাবিবি, পৌষ-পার্বণ, নারকেল লড়াই, জ্যৈষ্ঠের কাদাগড়াগড়ি দিয়ে মেঘ-দে পানি-দে ... ইত্যাদি, আদিবাসীদের ভাদু, টুসু, মকর, গরুনাচ, কাঠিনাচ, মুরগি লড়াই ... ইত্যাদি এবং হিন্দুদের জলতুলসী-শঙ্খনাদ, কীর্তন, কবিগান, সারারাতব্যাপী হরিনাম-সংকীর্ত্তনের কলকাকলিতে রসেবশে থাকা মানুষজনের মাঝে কেটেছে আমার বাল্যকাল। পালা-পার্বণ বিয়ে-সাদীর নানা গান-কথা-ছড়া ও সংস্কারের পাশাপাশি মুসলিম ভিখারীদের দল বেঁধে জারিগান, সারিগান, হরবোলা, হাপু ... ইত্যাদি ছাড়াও ছেলেমেয়েদের অজস্র প্রকারের খেলা তো ছিলই। চাষাবাদের কাজ, নদীতে মাছধরা, বানবন্যার মোকাবিলা, হাটবাজার, খেলাধুলা ... সবকিছুতে সব সম্প্রদায়ের লোকজন ও ছেলেমেয়েরা অংশ নিত। সাম্প্রদায়িক ভেদ যে একটা বাধা, বাল্যকালে সেরকম কিছু টেরই পাইনি। তখনও জানতাম না যে, মেদিনীপুরের যে বাঙালিরা হিন্দু-শূদ্র ও আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের 'খেড়ে-মুসলিম' এবং যারা বৌদ্ধ সম্প্রদায় থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের 'নেড়ে-মুসলিম' বলে। আমাদের হাইস্কুলে আরবি পড়ানো হত না, ছিল সংস্কৃত। বাড়িতে মা-জেঠিমা-ঠাকুমা ও বাবার ধর্মকেন্দ্রিক উর্দু-আরবি-ফারসির চর্চা ছিল সামান্য মাত্রায়। আমার দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়ই বাবার স্ট্রোক হয়, বামাঙ্গ নিষ্ক্রিয়প্রায় হয়ে যায়, তিনি চাকরি ছাড়েন, বাবা-কাকাদের

৩৭ সদস্যের হৈহৈ-করা যৌথপরিবার ভেঙে যায়, নানান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিই। বাড়ি ছেড়ে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে পাঁশকুড়ায় গিয়ে দোকানে সেলস্‌ম্যানের চাকরি নিয়ে, টিউশন করে কলেজে ভর্তি হই বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, দর্শন, অর্থনীতি ও অঙ্ক নিয়ে পড়ব বলে। পরে অঙ্ক ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু তারপর এমন বিশ্রী রাজনৈতিক ও মানসিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় যে অ্যাকাডেমিক শিক্ষার প্রতি একপ্রকার অশ্রদ্ধা জন্মে যায়। কলেজ ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাই। নিজগ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। সেটি গড়ে তুলি। পরের বছর নিমরাজি মন নিয়ে কোনোমতে 'পার্ট ওয়ান' পরীক্ষা দিই, তাতে উত্তীর্ণও হই, কিন্তু তারপর কলেজ চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করে পুনরায় গ্রামে ফিরে যাই। আমার অ্যাকাডেমিক শিক্ষার এখানেই ইতি ঘটে।

১৯৬৫ সালে কলেজে পা দিয়েই পড়ে যাই মার্কসীয় তত্ত্বের সামনে। পড়ুয়া ছাত্র ছিলাম। ফলত সেই তত্ত্ব আমার মস্তিষ্কের ভিতরে যেন এক বিশাল মুগুর হয়ে বনবন ক'রে ঘুরে ঘুরে আমার মনের চারদিকে সে-যাবৎ যত বিশ্বাস ও ধারণা গড়ে উঠেছিল, সবকিছুকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করে দেয় — এই তুমি, তোমার এই পরিবার, এই অজ গ্রাম, এই মেদিনীপুর জেলা, এই বঙ্গদেশ, এই ভারত, এটুকুই মাত্র তোমার নয়; পাঁচ মহাদেশ নিয়ে এই যে বিশাল পৃথিবী, তাকে ঘিরে যে-মহাবিশ্ব, এই সমগ্র মহাবিশ্বের ভালো-মন্দ এখন থেকে তোমার হাতে! বোঝো ঠেলা! গণ্ডগ্রামের এক কৈশোরোত্তীর্ণ সদ্য-তরুণ, পারিবারিক ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক অর্থনৈতিক সামাজিক বিধি-নিষেধের অজস্র সঙ্কীর্ণ ঘেরাটোপের সুনির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে যার সসংকোচ-জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল সবেমাত্র, তার কাছে যেন চারদিকের সব দেয়ালগুলো নিমেষে উবে গেল! সহসা আলোর উদ্ভাসে মনের চারদিকের অন্ধকার কেটে গিয়ে সারা দুনিয়া যেন একেবারে চোখের সামনে সটান দাঁড়িয়ে পড়ে। এ-যে কী বিস্ময়কর-রোমাঞ্চকর ব্যাপার, সেকথা বুঝিয়ে বলার ভাষা আমার জানা নেই। যাঁর জানা ছিল তিনি এই মানসিক পরিস্থিতিকে বোঝানোর জন্যই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি লিখে গিয়েছেন। পরে বুঝেছি, পারিপার্শ্বিকতা থেকে রস আহরণ করে মানুষের মনটাই সত্যলাভের যোগ্য হয়ে উঠতে থাকে, একসময় অকস্মাৎ তার উত্তরণ ঘটে; ব্রহ্মবাদ, গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ ... এসবের কোনো একটি নিমিত্ত রূপে দেখা দেয় মাত্র। তাছাড়া, বিষয়টি তো নতুন কিছু নয়, এ হল বিশ্বজগৎকে নিজের মধ্যে দেখতে পাওয়া, নিজেকে বিশ্বজগতের সর্বত্র দেখতে পাওয়া। বাড়িতে বাবা ও তাঁর পীরভাইদের গভীর রাত্রি পর্যন্ত যে ধর্মসভা বসত প্রতি মাসের ছ'তারিখে ('ছ-তারিখের মজলিশ'), তাতে এ সত্যলাভের কথা আমি আমার কৈশোরেই বহুবার শুনেছি। কিন্তু এতদিন তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারিনি। মার্কসবাদ নিমিত্ত রূপে আবির্ভূত হয়ে সেই মহত্ত্বকে উপলব্ধি করবার সূচনা করে দিল। কিন্তু মার্কসবাদের হিংসা ও ব্যক্তিহত্যার রাজনীতিকে আমার সুফি-সংস্কার স্বীকার করে নিতে পারল না। এইখানে মার্কসবাদের সঙ্গে আমার একটা বিরোধ ভেতরে ভেতরে কাজ করতে থাকে, যদিও আমার চারদিকে চলা শোষণ-পীড়নের প্রকৃত প্রতিবাদী রূপে তার চেয়ে ভাল কোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব তখনও আমার চোখে পড়েনি।

সে যাই হোক, এর পর শুরু হয় নানা ঘাটের জল খাওয়া। ঈশ্বরবাদী ধর্মে বিশ্বাস কিন্তু ঈশ্বরবাদী-ধর্মপ্রতিষ্ঠানে অবিশ্বাস যেমন কোনো কোনো সুফিসাধকের জীবননীতি ছিল, নিজের অজান্তেই আমার অবস্থাটা হয়ে গেল সেইরকম। মার্কসবাদে বিশ্বাস কিন্তু মার্কসবাদী-দলে অবিশ্বাস আমার স্বভাব হয়ে গেল। দেশে যে বহুরকম মার্কসবাদী পার্টি রয়েছে, শুরুতে সেটাও ঠিকঠাক জানতাম না। লোকমুখে শুনেছিলাম, মার্কসবাদীদের ছাত্রদলের নাম হয় 'ছাত্র ফেডারেশন'। সেই তথ্য সম্বল করে শুধুমাত্র মার্কসবাদের বইপত্র পড়ে, প্রথমদিকে প্রায় একক চেষ্টায় 'পাঁশকুড়া ছাত্র ফেডারেশন' সাইনবোর্ড টাঙিয়ে কলেজে ছাত্রদল গড়ে তুলি এবং পরে একসময় নির্বাচনে জিতে যাই। এর পর বিভিন্ন দলের নেতারা যোগাযোগ করেন। সিপিআই, সিপিএম, আরএসপি, এসইউসি এবং পরবর্তীকালে নকশাল আসে। কিন্তু যথার্থে কোনো দলে নাম না-লিখিয়েই আমি সিপিআই সিপিএমের ছাত্র আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, খাসজমি ভাগজমি দখলের আন্দোলন, প্রথম যুক্তফ্রন্টের ও প্রথম বামফ্রন্টের ভোটের প্রচার, সবই করেছি। মাঝ থেকে কংগ্রেস জেনেছে আমি সিপিএম, সিপিএম সন্দেহ করেছে আমি নকশাল কিংবা সিপিআই, সিপিআই জেনেছে আমি সিপিএম, নকশাল জেনেছে আমি প্রতিক্রিয়াশীল, প্রিয়জনেরা ডেকেছে 'পাগলা' বলে। তারপর সব ছেড়ে দিয়ে পরিবার-বাঁচানোর জন্য বইব্যবসা, খড়ব্যবসা ইত্যাদি করেছি। দাদা সরকারি চাকরি পেয়ে আমাদের ১২ সদস্যের পরিবারের দায় নিয়ে নিলে, চলে যাই অজ্ঞাতবাসে, হলদিয়ার জনারণ্যে — প্রায় তিন বছর একটানা অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করি, ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় হয় প্রাইভেট টিউশন; সঙ্গে সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক স্বপাক আহার, যোগ ইত্যাদির অভ্যাস। এই পাঠাভ্যাস পরবর্তীকালে শত কাজের মধ্যেও বেড়েছে বই কমেনি। অতঃপর চলে যাই মেদিনীপুর শহরে, শ্রদ্ধেয় নরেন দাসের অধীনে কাজ করার জন্য। মেদিনীপুর তিনজন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করেছিল। সেই হত্যাকাণ্ডের শেষ কাণ্ডটি ঘটিয়েছিলেন বিপ্লবী নরেন দাস, তাঁর কিশোর বয়সে। তাই তাঁর ফাঁসি হয় না, হয় দ্বীপান্তর। ভারত স্বাধীন হলে তিনি দেশে ফেরেন,

মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সেই পদ ত্যাগ করেন। ... পান্নালাল দাশগুপ্তের মতো একক চেষ্টায় গ্রাম গড়ার চেষ্টা চালান। তাঁর সেই গ্রাম-গড়ার সংগঠনের 'কৃষককল্যাণ' পত্রিকায় একমাত্র সহযোগী রূপে কাজ করি প্রায় একবছর; মেদিনীপুর জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রাম চষে বেড়াই। একসময় 'কৃষককল্যাণ' বন্ধ হয়। আমি চিরকুমার নরেন দাসের মহত্তম সান্নিধ্যের অর্জন, সংযমী জীবনযাত্রা ও একনিষ্ঠ মন নিয়ে ফিরে যাই হলদিয়ায়; শ্রমিকদের ভিতরে কাজ করার জন্য যোগ দিই হলদিয়ার এক কনস্ট্রাকশন কোম্পানির চাকরিতে এবং শ্রমিক আন্দোলন তথা গণ আন্দোলনের ভিতরে গোপন সংগঠকের কাজ করি কিছুদিন, দলহীন কর্মীরূপে। কর্মক্ষেত্রে ক্রমে কনস্ট্রাকশনের কাজকর্ম কমবেশি শিখে নিয়ে 'সাইট-ইনচার্জ'-এর দায়িত্বে উন্নীত হয়েছি, যদিও তখনও গোপন সংগঠকের কাজও করছি। ... অবশেষে ১৯৭৬ সালে রাজনৈতিক আন্দোলন ইত্যাদি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে কেবল অধ্যয়ন ও চাকরিতে আত্মনিয়োগ করি। এর পর আর কখনো কোনো রাজনৈতিক কর্মে কোনোভাবেই যুক্ত হইনি।

লোকে বলে, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ নাকি দৈবের নির্বন্ধ। এতদিন সনাতন, বৌদ্ধ (নেড়ে), হিন্দু, মুসলিম প্রভৃতি ধর্ম-সংস্কৃতির গন্ধ মেখেছিলাম, এবার খ্রিস্ট ধর্ম-সংস্কৃতির গন্ধ পাই — এক মালয়ালী-ব্রাহ্মণ-বাবা ও মারাঠি-খ্রিস্টান-মায়ের কন্যা আমার জীবনে আসেন জীবনসঙ্গিনী হয়ে। পেশা রূপে তখন বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে চাকরি, সাময়িক ঠিকাদারি, আবার চাকরি ... ইত্যাদি এবং নিত্য অধ্যয়ন, এই নিয়ে কাটতে থাকে। ইতোমধ্যে দুই কন্যা ও এক পুত্রের জন্ম হয়। ১৯৮৫ সালে চলে আসি কলকাতায় কনস্ট্রাকসনের চাকরি নিয়ে। পেয়ে যাই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের লাইব্রেরি। পুরোদমে অধ্যয়ন ও কিছু কিছু লেখালেখির সূত্রপাত হয়। 'কমল দাশগুপ্ত' ছদ্মনামে *দেশ* ও *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় চিঠিপত্র প্রকাশিত হতে শুরু করে। অবশেষে চাকরি ছেড়ে ১৯৯৫ সাল থেকে সম্পূর্ণরূপে লেখাজোখায় আত্মনিয়োগ করি। ততদিনে পিতৃবিয়োগ মাতৃবিয়োগ ঘটে গেছে। প্রথম দুটি বই প্রকাশ করতে গিয়ে ভাগে পাওয়া পৈতৃক সম্পত্তি খরচ হয়ে যায়। মাসছয়েকের মেয়াদে একটি সাময়িক চাকরি করতে বাধ্য হই। এই সময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বন্ধু অরবিন্দ প্রধান, অরিন্দম চক্রবর্তী, নারায়ণচন্দ্র দাস। ২০০০ সালে কবি ও বন্ধু অরবিন্দ প্রধান একটি কমপিউটার কিনে দেন। আমার লেখকজীবনে এই সহায়তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাতে নিজের লেখার কাজ যেমন সবেগে চলতে শুরু করে, তেমনি পরিচিতদের পত্রপত্রিকা, গ্রন্থাদির ডিটিপি করে কিছু রোজগারও হতে থাকে। লেখাজোখা ও গ্রন্থাদি থেকেও কিছু আর্থিক আগম ঘটে। শব্দার্থকোষে হাত দিই ২০০২ সালে, কিন্তু সে-কাজে বারংবার বাধা পড়ে, পেটের দায়ে ডিটিপি করতে হয়। ২০০৭ সালের শেষ অধ্যায়ে ডিটিপি-র রোজগেরে-কাজে সম্পূর্ণ ইতি টানতেই হয়। রবি চক্রবর্তীর সঙ্গে একত্রে নারায়ণচন্দ্র দাস, অরিন্দম চক্রবর্তী ও দেশবিদেশের পাঠকবন্ধুরা আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এর ফলে অবশেষে সম্পূর্ণ অনুদাননির্ভর হয়ে আমি প্রায় দু'বছর পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করে এই শব্দার্থকোষের কাজ করবার সুযোগ পাই। সেভাবেই আজ পর্যন্ত চলেছে এবং এই 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ, ১ম খণ্ড' গ্রন্থটি প্রস্তুত করা গেছে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রায় অর্ধেক কাজও হয়ে গেছে।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে, রাজনীতিতেই যার জীবনযৌবন ব্যতিব্যস্ত দেখা যাচ্ছে, সে হঠাৎ বাংলা শব্দার্থ নিয়ে পাগল হতে গেল কেন? এখন তাহলে সে-প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

১৯৬৭ সালের প্রথম দিকে মার্কসবাদী তত্ত্বের কয়েকটি বড় ফাঁক আমার চোখে পড়ে যায়। মানুষ তো কেবলমাত্র দেহসম্বল জীব নয়, তার মন বলে একটি পদার্থ আছে এবং বহু ক্ষেত্রে সেটিই প্রধান। অন্যের কথা বলতে পারব না, আমি যে বঙ্গমানসকে দেখেছি, যে পরিবেশে জন্মেছি, বড় হয়েছি, সেখানে এরকম মানুষই আমি বেশি দেখেছি যাঁরা পেটের জ্বালা খুব সইতে পারেন কিন্তু মনের জ্বালা সইতে পারেন না। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর মাত্র একমুঠো পান্তা খেয়ে সারারাত ধরে ভাঁড়-গায়কদের কথকতা কিংবা হরিনাম সংকীর্তন শুনে আনন্দরসে মগ্ন হতে আমি আমার নিজের ও আশেপাশের গ্রামবাসীকে দেখেছি। আর, অভিমানে না-খেয়ে থাকা তো এক সাধারণ ব্যাপার ছিল আমাদের সম্প্রদায়ে। তাঁদের বিচারে পেটের ক্ষুধা কী আর ব্যথা দেয়, মনের ব্যথাই বড়ো ব্যথা! হেনস্থা ও অসম্মানের মাছ-মাংস-পোলাওয়ের চেয়ে ভালোবাসা ও সম্মানের পান্তাও তাঁদের রোচে বেশি। আধুনিক অ্যাকাডেমি শিক্ষিত মানুষেরা এবং আমার দেখা মার্কসবাদীরা তাঁদের বলতেন 'আবেগপ্রবণ'। আর, বাঙালি তো রসেবশে-থাকা আবেগপ্রবণ জাতিই বটে! দেখতে পাই, মার্কসবাদ মানুষের মনকে, মনের ক্ষুধা, মনের পুষ্টিকে হিসেবের মধ্যেই গণ্য করেনি। তার কথা শুধুই দেহ নিয়ে; তাও দেহের সব ব্যাপার নিয়ে নয়। বলতে কী, শুধুমাত্র পেটের ক্ষুধার ব্যাপারেই মার্কসবাদ নিতান্তই একদেশদর্শী। সে বুঝতেই পারে না যে, শুধুমাত্র পেটভরে খেলেই মানুষ মানুষ হয় না। মানুষের যে জৈব প্রবৃত্তি, তার নারী-পুরুষ সম্পর্ক, যৌনজীবন, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, জন্মপূর্ব ও মৃত্যু-পরবর্তী সংস্কারাদি — এসব সম্পর্কে মার্কসবাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য খুঁজে পাই না আমি। বন্ধুর গৃহে সন্তানের আগমন কিংবা গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা পুত্রবধূর আগমনে মার্কসবাদীর কী করা

উচিত, কারও মৃত্যু হলেই বা কী করা উচিত, মার্কসবাদ তা জানে না। একজন নারী বা পুরুষ বিপরীত লিঙ্গের কাছে রতি-প্রার্থনা করলে তার কী করা উচিত, মার্কসবাদের কাছে তার উত্তর নেই। সে উত্তরের জন্য হাত পাততে হয় প্রচলিত ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতির সিদ্ধান্তের কাছে। মোটকথা প্রচলিত আচার-সংস্কারাদির বিষয়ে মার্কসবাদীর কাছে হাতুড়ে নিদান পাওয়া যায় মাত্র। যে অখণ্ড যুক্তিশৃঙ্খলা মানুষকে সর্বোচ্চ মানসসম্পদের আরাধনা থেকে শুরু করে মলমূত্রত্যাগ পর্যন্ত তার সমস্ত নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্মের যাথার্থ্য জোগায়, মার্কসবাদ সেই অখণ্ড যুক্তিশৃঙ্খলা সরবরাহ করতে পারে না। সে কমপার্টমেন্টালাইজড্, খণ্ড যুক্তিশৃঙ্খলার প্রকল্প মাত্র। যে যুক্তিশৃঙ্খলা দিয়ে সে তার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে সংগত বলে বিবেচনা করে ও সক্রিয় হয়, সেই একই যুক্তিশৃঙ্খলা দিয়ে সে তার সমস্ত জৈব ও পারিবারিক আচরণকে প্রমাণসিদ্ধ (জাস্টিফাই) করতে পারে না; তার জন্য পৃথক বা বিপরীত যুক্তিশৃঙ্খলার আশ্রয় নিতে হয় তাকে। পরে দেখেছি, একথা শুধু মার্কসবাদ নয়, সমগ্র 'মডার্নিজম' বা আধুনিকতার তত্ত্বের ক্ষেত্রেই কমবেশি খাটে।

তবে সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয় মানবসভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসবাদের ঘোরতর অজ্ঞতা। মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ জানেই না যে, যে-পণ্যউৎপাদনকে সে বর্তমান মানবজাতির সমস্ত অহিতের মূল বলে মনে করে, মানবসমাজে সেই 'পণ্য উৎপাদন' সম্ভব হয়েছিল কীভাবে। পণ্য উৎপাদন আগে সম্ভব হয়েছিল, নাকি শ্রমবিভাজন? গাছ আগে না ফল আগে? একবার গাছটি বানিয়ে নিতে পারলে আর তো ঝামেলা নেই, সেই গাছ থেকে ফল হবে, ফল থেকে পুনরায় গাছ হবে। তো, প্রথম গাছটি কে কোথায় কীভাবে বানিয়েছিল? না, ইয়োরোপের প্রাচীন ইতিহাসে এই প্রশ্নের উত্তর নেই, মার্কসসাহেব পাননি, রয়েছে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে। আর, মার্কস সাহেবের গৌরব ঠিক এইখানে যে, তাঁর শ্যেনদৃষ্টি সেই অতীতকে দেখতে পেয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি স্পষ্ট লিখে যান — '**Primitive Indian community has made division of labour before production of commodity**।' তবে ঠিক কীভাবে প্রাচীন ভারতীয় গোষ্ঠী তা করতে সক্ষম হয়েছিল, মার্কসসাহেব সেকথা জানতে ও জানাতে পারেননি। তিনি বলে যান, সেই আদি 'কমোডিটি' প্রাচীন ভারত থেকে পৃথিবীর সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সমস্ত দেশের সমাজকে ভেঙে দিয়ে পণ্যবাহী সমাজে পরিণত করেছে। অতঃপর, সেই পণ্যবাহী সমাজ বিকশিত বা অধঃপতিত হতে হতে আজকের নিপীড়ক-নিপীড়িতদের সমাজে পর্যবসিত হয়েছে। এই হল মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ইতিহাসবোধ। তাহলে তো প্রাচীন ভারতের ইতিহাসটা জেনে-বুঝে নেওয়া একান্তই জরুরি। সেই কারণে গিয়েছিলাম প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে। আর তা করতে গিয়েই পড়ে যাই বাংলাভাষার শব্দার্থ-সমস্যার গভীর গাড্ডায়।

রামায়ণ-মহাভারতই আমাদের ইতিহাস — রবীন্দ্রনাথের এই কথাটায় বিশ্বাস করেছিলাম। সেই বিশ্বাস নিয়ে পড়তে গিয়েছিলাম কৃত্তিবাসী রামায়ণ, আর প্রথম ছত্রেই গিয়েছিলাম আটকে। '*গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর। লক্ষ্মী সহ তথায় আছেন গদাধর।।*' — এর মানে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, অন্ততপক্ষে ইংরেজিতে অনুবাদযোগ্য সর্বজনবোধ্য মানে। বহু বহু পুরাণাদি গ্রন্থ, বহু অভিধান, শব্দকোষ, ঐতিহাসিকদের নানা গ্রন্থ ঘেঁটে ঘেঁটে হয়রান, উত্তর মেলে না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে যায়, কূলকিনারা পাই না। মাস চলে যায়, বছর চলে যায়, হাঘরের মতো ঘুরতে থাকি। জনে জনে জিজ্ঞেস করে, বহু ঘাট ঘুরে, বহু পথ পেরিয়ে অবশেষে যে সত্যের মুখোমুখি হয়েছিলাম, তা এক কথায় ভয়ানক। ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত মানুষের সকল অতীতকথা রামায়ণ-মহাভারতে লিপিবদ্ধ থাকলেও, জনসাধারণ তাঁদের জীবনযাত্রায় ধর্মানুষ্ঠানাদির মাধ্যমে, তাঁদের সমগ্র সংস্কৃতি ও প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে সেই ইতিহাসকে কিছু বুঝে এবং অধিকাংশ না বুঝে বহন করে নিয়ে চললেও, আমাদের আধুনিক অ্যাকাডেমিগুলি সেই ইতিহাসের ব্যাপারে কিছুই জানে না। এমনকি তাঁদের এই অজ্ঞতার ব্যাপারেও তাঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আর, এ-ব্যাপারে কলকাতার তথাকথিত বুদ্ধিজীবী জ্ঞানীগণের চরম অজ্ঞতা দেখে বিস্মিত, বিরক্ত এবং খানিকটা ক্রুদ্ধও হয়েছিলাম। যে মানুষ তার বাপ-ঠাকুর্দার নামধাম ভাষাসংস্কৃতি ভুলে গেছে, অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুতোকাটা ঘুড়ির মতো ইতঃস্তত লতপত উড়ে-ঘুরে পড়ে যাচ্ছে, সে মানুষকে কি পণ্ডিত ভাবা চলে? ভাবতে অবাক লেগেছিল যে, সমগ্র বাঙালি জাতির মস্তিষ্কস্বরূপ এই জ্ঞানীজনেরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের লিখে রেখে-যাওয়া ইতিহাসের মানে জানেন না! আমাদের প্রাচীন পুরুষদের অর্জিত জ্ঞানের ভাণ্ডারস্বরূপ বেদপুরাণ-রামায়ণ-মহাভারত-তন্ত্রাদি গ্রন্থের বিশাল সম্ভার রয়েছে, রয়েছে হিন্দু-মুসলিম পদকর্তাদের বিশাল পদাবলী সাহিত্য। সেই গ্রন্থসম্ভারের প্রায় একটিরও যথার্থ মানে না জেনে এঁরা নিজেদের জ্ঞান নিয়ে সন্তুষ্ট আছেন কীভাবে? আপন সমাজের অতীত থেকে গোটা জাতির এবং সেই জাতির পরিচালক জ্ঞানী-গুণীদের আত্মবিচ্ছেদের পরও এমন আত্মসন্তুষ্টি দেখে আমার ভয় ধরে গিয়েছিল, বিশ্বাস টলমল করে উঠেছিল। তার ওপর কোনো কোনো উচ্চ-পদাভিষিক্ত অ্যাকাডেমিশিয়ান বাঙালি পণ্ডিতের আত্মগরিমা দেখে আমি অ-বাক হয়ে গিয়েছিলাম।

এই পরিস্থিতিতে একদিন অকস্মাৎ পরিত্রাতা রূপে দেখা দেন শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৮৬ সালের জুলাই মাসে একদিন তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' খুলে ইতঃস্তত পাতা ওলটাচ্ছি, হঠাৎই একটি অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ে যায়। দেখি কী, বেশ কিছু শব্দের অর্থ প্রদান কালে হরিচরণ একটি বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তা হল, বাক্যের সাহায্যে মানে দেওয়া। যেমন, 'গো' মানে 'যে যায়', 'অক্ষ' মানে 'যাহার দ্বারা দেবন হয়' ... ইত্যাদি। ব্যাপার কী? বেশ কয়েকদিন ধরে তাঁর সমগ্র শব্দকোষটাই আগাগোড়া একটানা পড়ে ফেলি। ক্রমে বুঝতে পেরে যাই, শব্দের ভেতরেই শব্দের মানে থাকে। শব্দের বানানে যে বর্ণ বা ধ্বনিগুলি থাকে, সেগুলিই অর্থকে বহন করে। ক্রমে ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের সাক্ষাৎ পেয়ে যাই। তাহলে তো এই পদ্ধতিতে রামায়ণ-মহাভারত পুরাণাদির অর্থ বুঝলেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসটা পেয়ে যাওয়া যাবে! যা ভাবা তাই কাজ! পুনরায় রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি পড়তে শুরু করি এবং নতুন পদ্ধতিতে সেগুলির মানে বোঝার চেষ্টা করতে থাকি। ছ-সাত মাস প্রায় পাগলের মতো দিনরাত কোথা দিয়ে কেটে যায়, ঠাহর করতে পারি না। অবশেষে নিশ্চিত হই, যে, মানবসভ্যতার আদি ইতিহাসটি কমবেশি ঠিকঠাক পাওয়া যাচ্ছে। প্রাচীন ভারতে কীভাবে প্রথম পণ্য উৎপাদন ও শ্রমবিভাজন সম্ভব হয়েছিল সেই সব তথ্যও বিস্তারিতভাবে পেয়ে যাই। প্রাপ্ত সেই ইতিহাস নিজের মতো করে বুঝে নিয়ে লিখে ফেলি আমার প্রথম গ্রন্থ 'মৌলবিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে'। ১৯৯৫ সালের শেষ পর্বে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে যায়।

এরপর স্বাভাবিকভাবেই দুধরনের কাজ শুরু হয়। একদিকে নতুন উদ্ধার করা ইতিহাসের বিভিন্ন অংশ নিয়ে নিয়মিত প্রবন্ধাদি লেখা, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা এবং অন্যদিকে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা। ইতিহাস বিষয়ক কাজের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মানবসভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসটাকে প্রচলিত ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দর্শনের সঙ্গে এবং তথাকথিত আধুনিকতা-উত্তরাধুনিকতার সঙ্গে মিলিয়ে বোঝার চেষ্টা চালাতে থাকি; ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে শুরু করি দেশবিদেশের ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থাদি সংগ্রহ করে অধ্যয়ন। এর ফলে, ভাষাতত্ত্বের যে-তথ্য সামনে উঠে আসে, সংক্ষেপে তা হল, ভাষার দুটি পা — শব্দের পাশে শব্দ গাঁথবার নিয়ম বা ব্যাকরণ (syntax), এবং শব্দের ভেতরে অর্থ রাখার ও বের করার নিয়ম বা নিরুক্ত (semantics)। দেখি কী, ব্যাকরণের ক্ষেত্রে প্রতীকী ভাষার প্রায় সমস্ত নিয়মই কমবেশি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং অ্যাকাডেমিতে সেগুলি পড়ানোও হয়। এ বিষয়ে অগ্রণী পণ্ডিত চমস্কি। কিন্তু নিরুক্তের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত কোনো নিয়মই আবিষ্কৃত হয়নি। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, শব্দের ভেতরে কোনো মানেই থাকে না, মানে থাকে শব্দের বাইরে, মানুষের মনে, অভিধানে, শব্দকোষে। ঘোষণা করে রাখা হয়েছে, বিশেষ শব্দের বিশেষ অর্থ একটা নিয়মহীন 'খামখেয়ালি' ব্যাপার ('arbitrary')। অর্থাৎ, লোকে যে 'আম' বললে একটি ফলকে বোঝে, সেটার কোনো নিয়ম নেই। ...

কিন্তু আমি যে একটা নিয়ম দেখে ফেলেছি, সেটি তবে কী? ... ক্রমে বুঝতে পারি, ভাষাতত্ত্বের একটি বড় খামতি আমি আমার অজান্তেই পূরণ করে ফেলেছি। সেটি হল, শব্দের ভেতরে অর্থ থাকার নিয়মের পুনরুদ্ধার। ১৯৯৯ সালে লিখে ফেলি 'পরমাভাষার সংকেত', যা ঢাকার 'মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা'য় দু-ভাগে প্রকাশিত হয়ে যায়। ২০০০ সালে ঢাকার 'প্যাপিরাস' সংস্থা সেই প্রকাশিত লেখাকে সংকলিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। ২০০২ সালে সে গ্রন্থই আরও দুটি অধ্যায় যুক্ত হয়ে পরিমার্জিত-পরিবর্দ্ধিত হয়ে 'পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন : ভাষাবিজ্ঞানের ক্রিয়াভিত্তিক রিইঞ্জিনিয়ারিং' নামে কলকাতা থেকেও প্রকাশিত হয়। ...

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও দু'দিক থেকেই নিজেকে আমার অরক্ষিত অপূর্ণ অক্ষম বলে মনে হতে থাকে। একদিকে যেমন প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস ও ক্রিয়াভিত্তিক দর্শন হাতে এসে যাবার পরও মার্কসবাদ পেরিয়ে নতুন সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক-অর্থনৈতিক-দার্শনিক তত্ত্ব গড়ে তুলতে পারছিলাম না; অপরদিকে তেমনি শব্দার্থতত্ত্ব বুঝে ফেলবার পরও তাকে বিশ্বের ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে যথোচিত স্থানে প্রতিষ্ঠা দিতে পারছিলাম না। বুঝতে পারি, বীজ হাতে পেয়ে গেলেই চাষ করা যায় না, ক্ষেত চিনতে হয়, বীজ ও ক্ষেত দুটোকেই পরস্পরের উপযুক্ত করে প্রস্তুত করতে হয়, জগতে চাষাবাদের প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে হয়। এবং সন্দেহ নেই, দু'দিক থেকেই আমি ছিলাম আন-কোরা। এশিয়ার পরিস্থিতি কমবেশি বুঝলেও ইউরোপ, আমেরিকা ... প্রভৃতি দেশের ইতিহাস দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ে আমি যথেষ্ট জানি না; এমনকি দেশের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রায়োগিক রূপ বিষয়েও আমার গম্যি নেই। অপরদিকে প্রাচ্যের ভাষাগুলি সম্পর্কে কমবেশি জানলেও পাশ্চাত্যের ভাষাগুলি বিষয়ে আমার প্রায় কোনো জ্ঞানই নেই। ... ঠিক এই সময় আমার জীবনে এলেন রবি চক্রবর্তী, ঠিক সেই সেই বিষয়গুলি হাতে নিয়ে, যেগুলির অভাবে আমি রীতিমতো ভুগছি। জীবনে এক-একটি ঘোরতর মানসিক সমস্যায় পড়েছি, আর কপালগুণে একজন করে জ্ঞানতাপসকে পেয়ে সেই সমস্যা থেকে উদ্ধার পেয়েছি। তাঁদের সকলের কথা বলার স্থান এখানে নেই। রবি চক্রবর্তী তাঁদেরই একজন।

তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল ১৯৯৯ সালেই। ভরা কলসির আওয়াজ হয় না, তাই ভিতরে কী আছে বুঝতে সময়

লেগে যায়। তিনি আমার 'দিশা থেকে বিদিশা' গ্রন্থটির একটি আলোচনা লিখেছিলেন, সেই সূত্রে আলাপ ঘনিষ্ঠতার দিকে মোড় নেয়। টোকায় টোকায় বেরোতে থাকে ভিতরের সৌরভ। আরে! এ তো সেই নিষ্কলুষ সনাতন মানবসত্তা, বিবেক যাকে ঠিক বা 'সত্য' বলে, সেই সত্যই যাঁর একমাত্র অবলম্বন, যে-সত্যের জন্য সবকিছুই সে গ্রহণ বা ত্যাগ করতে পারে। এই তো সেই সনাতন 'লোক'সত্তা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শিক্ষা-অর্থ ইত্যাদি যার গায়ে আঁচড়টুকুও কাটতে পারে না। এই সনাতন শিবসত্তার কথাই আমি আমার 'চ' গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় 'হীরের টুকরো ছেলে'র বিশ্লেষণে এবং ১৮ পৃষ্ঠায় 'লোক'রহস্যের ব্যাখ্যায় বিবৃত করেছিলাম। এই সত্যের জোরেই বৈদিক-পূর্ব সনাতন সভ্যতায় শিব হয়েছিলেন সমাজপরিচালক। ...

কিন্তু মজা হচ্ছে সমাজের শীর্ষে যাঁরা বিরাজ করেন, তাঁদেরকে তাঁদের সেই সত্য কেবল উত্তরাধিকারসূত্রে পেলেই চলে না, নিজ নিজ জীবনেও তা পুনরায় অর্জন করতে হয়। রবি চক্রবর্তীর সত্যনিষ্ঠা কেবল পুরুষানুক্রমে অর্জিত উত্তরাধিকারই নয়, তাঁর নিজের জীবনেও পুনরায় অর্জিত। সমাজশীর্ষে থাকার কারণে নানান মতবাদের ঝড় সামলাতে হয়, আর সেই ঝড় সামলে সনাতন মানবসত্তাটিকে তার স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখতে হয়; এবং সেই দায় বহন করতে গিয়ে রবি চক্রবর্তী মহাশয়কে অনেক কিছুই হারাতে হয়েছে। ব্রাহ্মণের উদারনৈতিক পারিবারিক উত্তরাধিকার তাঁর জন্মসূত্রে লব্ধ, 'বড়ো-ইংরেজের' ভাষাসংস্কৃতি ও সভ্যতার আলোর ছটা তিনি পিতা ও কতিপয় শিক্ষকের মধ্যেই দেখে ফেলেছিলেন। তাঁর সেই মানসিক ভিত্তির উপর দিয়ে বয়ে গেছে রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, মার্কসবাদের তত্ত্বের ঝড়। রবি চক্রবর্তী জীবন দিয়ে সেই ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়েও তাঁর সনাতন মানবসত্তাকে অক্ষত রাখতে পেরেছেন দেখে আমি নতজানু হয়ে যাই। যারা সমাজের নীচুতলায় থাকে, সাধারণত এসব ঝড়ের মুখে তাদের পড়তে হয় না। তাদের সত্যনিষ্ঠাতে ক্লেদ জমলে সমাজেরও খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। কিন্তু যাঁরা ইতিহাসের কারণে পরিচালকের আসনে অধিষ্ঠিত, তাঁদের সত্যনিষ্ঠাতে ক্লেদ জমলে গোটা সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের দেশে আজ তো সেটিই সবচেয়ে বড় সমস্যা। সেই সমস্যা থেকে যে দু-চারজন আজও নিজেকে রক্ষা করে চলেছেন, রবি চক্রবর্তী তাঁদের একজন।

অথচ আলাপের পর নিজের অর্জন সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলেন না। কেবল মার্কস, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথের ভেতর থেকে তিনি তাঁর নিজের সনাতন মানবসত্তার পুষ্টিসাধনকারী নতুন প্রজ্ঞাই আহরণ করেননি, ইয়োরোপীয় আধুনিকতার জেল্লাকে অতিক্রম করে-তার মধ্যযুগের প্রকৃত অর্জনকেও তিনি ঠিকই আত্মস্থ করে নেন। অথচ, সেকথা চিৎকার করে তিনি বলেন না। তিনি যে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হয়েও এম এ পরীক্ষায় দৃশ্যত দ্বিতীয় কিন্তু কার্যত প্রথম হয়েছিলেন, সে কথাও তিনি মুখ ফুটে বলেন না। পরে শুনেছি, সেবারে প্রথম হয়েছিলেন লরেটোর এমন এক সন্ন্যাসিনী (nun) যাঁর মাতৃভাষা ইংরেজি এবং যিনি সে-সময়েই একজন অধ্যাপকের কাছে পৃথকভাবে প্রাইভেট পড়তেন। আর, তৃতীয় হয়েছিলেন শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। অথচ রবি চক্রবর্তী বলেন তিনি 'ভালভাবে উত্তীর্ণ' হয়েছিলেন মাত্র।

সে যাই হোক, আমার তো দরকার ছিল এমন একটি জ্ঞানভাণ্ডার যেখানে মানুষের যে 'বড়ো-আমি', তার এযাবৎ যাবতীয় অর্জনকে যেন একস্থানে মজুত পেয়ে যাই। নিজেকে একটুখানি খুলতে শুরু করতেই আমি দেখতে পেয়ে যাই, এই সেই জীবন্ত লাইব্রেরি যাকে আমি হন্যে হয়ে খুঁজছি। ল্যাটিন, জারমান, গ্রীক, ফরাসি ... কিসের খবর নেই তাঁর হাতে! যখন যে দেশের সাহিত্য-ইতিহাস-দর্শন নিয়ে আলোচনায় যান, তা সে প্রাচ্যের কিংবা পাশ্চাত্যের যে দেশেরই হোক, তখন সেই দেশের সংস্কৃতির মাটিতে বা মনোলোকে তাঁর পা থাকে। এই ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের ছিল, জগদীশচন্দ্র বসুরও ছিল। বাঙালিদের ভেতরে এই পূর্ণতার সাক্ষাৎ মেলে খুবই কম। আমি যেমন আমার বঙ্গমানস-লোকেই কেবল পা রেখে দাঁড়াই, অন্যত্র যেতেই পারি না। আমার সেই অভাব পূর্ণ করার জন্যই যেন আমার জীবনে তাঁর আগমন। মোট কথা, ইয়োরোপের বড়ো-আমির সমস্ত অর্জনই তাঁর নখদর্পণে, ভারতীয় বড়ো-আমির বহু অর্জনই তাঁর জন্মসূত্রে লব্ধ, অ্যাকাডেমির বাঁধা গৎতে যেমন দীর্ঘ হেঁটেছেন, তেমনি তার বাইরেই যে জ্ঞানের বিশাল দুনিয়াটা বিদ্যমান সে-বিশ্বাসটিও তাঁর গড়ে উঠেছে নিজের মতো করে। অ্যাকাডেমির বাইরেই যে জ্ঞানের সমুদ্র বিদ্যমান, সেই সমুদ্র থেকে কুড়োনো নুড়ির দেখ্‌ভাল করার জন্যই যে অ্যাকাডেমি গড়ে উঠেছে, একথা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে দেখিনি। রবি চক্রবর্তীকে দেখলাম, তিনি প্রকৃতই রবীন্দ্রানুসারী। ...

তাহলে দেরি কেন! শুরু হয়ে গেল যুগলবন্দী; দুই ধারার মিলনে সম্পূর্ণ হয়ে আমাদের চিন্তাভাবনার টইটম্বুর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে দিল; শুরু হয়ে গেল যৌথ রচনা। ক্রমে একদিকে মার্কসবাদ পেরিয়ে আমরা 'সুন্দরসমাজ'-এর তত্ত্বে পৌঁছে যেতে পারলাম, অপরদিকে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শব্দার্থকোষ সংকলন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হতে লাগল। তারই একটি সুফল আজকের এই 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ, ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান, ১ম খণ্ড'।

অভিধান-কথা : এই কোষগ্রন্থের ভাবসম্পদ

কাজের কথা : উপযোগিতা

১) এই গ্রন্থের নাম **বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ**। এর সাহায্যে বাংলা শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ জানা যাবে। এর দ্বিতীয় পরিচয় হল, এটি **ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান**। অর্থাৎ, এতে বাংলা শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে শব্দের বানানের (বর্ণের বা বর্ণসমবায়ের, অর্থাৎ ধ্বনির বা ধ্বনিসমবায়ের) ভিতরে যে ক্রিয়াবাচক অর্থ রয়েছে, তার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, 'অজ' শব্দের মানে পাবেন 'অ' আর 'জ' এই দুটি বর্ণ বা ধ্বনির ভেতর থেকে (তার 'অ' = না-থাকা, এবং 'জ' = জনন করা, এই দুই ক্রিয়া থেকে; গ্রন্থের ভিতরে **অজ** শব্দটি দেখুন)। শব্দের অর্থ জানার জন্য শব্দের বাইরে গিয়ে তার 'প্রতীকী অর্থ'কে ('arbitrary meaning'-কে) নিয়ে আসার যে-বিধি একালের অভিধান বা শব্দকোষগুলি অনুসরণ করে থাকে, এ গ্রন্থ সে-বিধি অনুসরণ করে না। শব্দের ভেতরে শব্দের যে নিহিত অর্থ থাকে, এই কোষগ্রন্থটি শব্দের সেই নিজস্ব অন্তর্নিহিত অর্থ নিষ্কাশন করার বিধি অনুসরণ করে। একই সঙ্গে একথাও সে জানিয়ে দেয় যে, শব্দের এই ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থই অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে স্থির রূপ গ্রহণ করতে করতে কালক্রমে শব্দটির মৃত অনড় প্রতীকী অর্থে পর্যবসিত হয়েছে। তার মানে, একালের অভিধান ও শব্দকোষগুলি শব্দের বাইরে থেকে শব্দের (লোকমুখে কিংবা অ্যাকাডেমিতে প্রচলিত) যে-অর্থ সংগ্রহ করে আমাদের জানায়, শব্দের সঙ্গে সেই প্রতীকী অর্থেরও একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্কসূত্র আছে; সে-অর্থও নিতান্ত 'খামখেয়ালী' (= 'arbitrary') অর্থ নয়। 'শব্দের ভেতরে শব্দের অর্থ নেই', 'শব্দের অর্থের সঙ্গে শব্দের কোনো তাদাত্ম্য-সম্পর্ক নেই, সেটি arbitrary', 'অর্থ বলতে এক শব্দকে অন্য শব্দের সাহায্যে ইঙ্গিত করা বোঝায়' ... ইত্যাদি — আধুনিক ভাষাতত্ত্বের এইসকল সিদ্ধান্তকে, এই শব্দার্থকোষ, ভ্রান্ত প্রমাণ করে।

২) এই শব্দার্থকোষ স্বভাবতই যে কোনো শব্দের — তা সে জানা-অজানা, দেশী-বিদেশী, আধুনিক-প্রাচীন ... যেমন শব্দই হোক না কেন — তার ভিতর থেকে তার মানে বের করে আনার পথ দেখায়। বাংলার 'দিল', ফারসির 'দিল্', ইংরেজির 'deal' ... তার কাছে একই নিয়মে গম্য এবং বোধ্য। আমাদের সমস্ত না-বোঝা পৌরাণিক শব্দের মানে (যথা অগস্ত্য, অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র, দশরথ, দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, দ্রৌপদী, গঙ্গা, গৌরী, গোদাবরী ... ইত্যাদি), সকল আচার-আচরণের মানে (বুড়ো আঙুল দেখানো ... ইত্যাদি), প্রবাদ-প্রবচনের মানে (আঙুল ফুলে কলাগাছ ... ইত্যাদি), জনশ্রুতিতে থাকা ছড়াসমূহের মানে (চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে ... ইত্যাদি) ... সবই এই শব্দার্থকোষের সাহায্যে জানা যেতে পারে। এমনকি লোকে কেন মিশরকে 'ইজিপ্ট', নিপ্পনকে 'জাপান', ব্রিটিশকে 'ইংরেজ (ইঙ্গ্রেজ)', ভারতবর্ষকে 'ইন্ডিয়া (হিন্দুস্থান)' ... ইত্যাদি বলতে গেল, এই শব্দার্থকোষ তারও সদুত্তর দেওয়ার ক্ষমতা ধরে। বলতে কী, মানুষের কোনো ভাষার কোনো শব্দই এই শব্দার্থকোষের বিচারে অগম্য নয়। এই শব্দার্থকোষের সাহায্যে শব্দের ধ্বনি বা বর্ণের অর্থধারণের নিয়মগুলি জেনে বুঝে রপ্ত করে নিয়ে আমরা ক্রমান্বয়ে এবং কালে কালে বিশ্বের সমস্ত ভাষার সকল শব্দের অর্থ সেই শব্দের ভেতর থেকেই জেনে নিতে পারব। এই 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' সেই সুবিশাল মানসিক মহাকাশে পৌঁছানোর সূচনা করছে। আবারও বলি, সূচনা করছে।

৩) এই শব্দার্থকোষ সপ্রমাণ ঘোষণা করে যে, জীবন্ত সচল ক্রিয়াভিত্তিক বাংলা শব্দের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে যে সকল ভাষায়, একালের অ্যাকাডেমি তাদেরকে 'উপভাষা', 'লৌকিক-ভাষা', 'গ্রাম্যভাষা', 'কথ্যভাষা', 'বাঙাল-ভাষা', 'ঘরোয়া-ভাষা', 'মেয়েলি-ভাষা', 'অশ্লীল-ভাষা' ... ইত্যাদি ছাপ দিয়ে সারস্বত লোকে তাদেরকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছে। অ্যাকাডেমি জানে না যে, সেই জীবন্ত ক্রিয়াভিত্তিক বাংলা শব্দভাণ্ডারের উপর নির্ভর করেই বাংলাভাষার স্বর্ণযুগে গড়ে উঠেছিল আমাদের বাংলা রামায়ণ-মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, বিশাল পদাবলী সাহিত্যের সম্ভার। বিপরীতে অনড় মৃত প্রতীকী বাংলা শব্দের ব্যাপক ব্যবহার করে থাকে একালের অ্যাকাডেমি। বাংলার এই 'একঝোঁকা' শব্দ-ব্যবহারের দোষ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে ইংরেজির সংস্পর্শে। যান্ত্রিকতার দুনিয়ায় (অফিস-কাছারি ও আইনের দুনিয়ায়) সুনির্দিষ্ট মৃত প্রতীকী শব্দের ব্যবহার সমাজশাসনের পক্ষে সুবিধাজনক। মানুষ নিজে এখনও পুরোপুরি যন্ত্রে পরিণত হয়নি বলে, যে যে ক্ষেত্রে মানবিকতার আবহ বেশি, সেই সেই ক্ষেত্রে এখনও জীবন্ত ক্রিয়াভিত্তিক শব্দের ব্যবহার বেশি চলে এবং যে যে ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতার দাপট বেশি, সেই সেই ক্ষেত্রে মৃত প্রতীকী শব্দের ব্যবহার অধিক চলে। প্রাচীন বাংলার (= সংস্কৃতের) ও মধ্যযুগের বাংলার ভাষাজ্ঞানীরা 'লোকমুখে প্রচলিত' (= প্রাকৃত) শব্দের ভিতরের অর্থধারণ-প্রক্রিয়া বা প্রাণ দেখতে পেতেন, এবং সেই সমস্ত শব্দকে সংগ্রহ করে এনে 'সংস্কার' করে সজীব-সপ্রাণ অবস্থায় উপস্থাপন

করতেন; তখনই সেটা হয়ে যেত 'সংস্কৃত' শব্দ। ফলে সংস্কৃতে প্রাকৃতে কার্যত ফারাক থাকত না; মানুষের মুখের ভাষা আর যথার্থ ভাষাজ্ঞানীর ভাষা একরকম লাগত। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য, যার উপভোক্তা ছিলেন সমগ্র বাংলাভাষী জনসাধারণ। একালের অ্যাকাডেমিক ভাষাজ্ঞানীরা শব্দের সেই প্রাণটাই দেখতে পান না। তাঁরা যাঁদেরকে লৌকিক শব্দ, গ্রাম্যশব্দ ... ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পাঠান, তাঁদেরকে সজীব-সপ্রাণ শব্দসংগ্রহের কৌশলটাই শেখান না; নিজেদের তা জানা নেই বলে। ফলে, শব্দসংগ্রহকারীদের বিপুল পরিশ্রম মাটি হয়। তাঁদের শব্দসংগ্রহের প্রক্রিয়াটি দাঁড়িয়ে যায় ইঁদুরশিকারীর মতো, অজস্র ইঁদুর ধরে মেরে তাদের নাকে-মুখে ঘাসের দড়ি গলিয়ে ঝুলিয়ে সে হাজির হয়ে যায়। এর ফলে তাঁরা হয়তো বড়জোর একটা করে ডক্টরেট পান, সমাজ কিছুই পায় না। অথচ এইসব নিষ্ঠাবান শব্দসংগ্রহকারীদের থেকে যে কী বিপুল অবদান পাওয়া যেতে পারত, তা কল্পনা করা যায় না, যদি তাঁরা শব্দগুলিকে সংগ্রহ করে সজীব-সপ্রাণ অবস্থায় উপস্থাপন করতে পারতেন। বাংলার কাব্যসাহিত্য ভরে উঠত মানবজমিনের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ফসলে। এই শব্দার্থকোষে সেরকম কিছু কিছু 'গ্রাম্যশব্দ' সংগ্রহ করে তাদের অর্থধারণকৌশল আমরা দেখিয়েছি। উদাহরণস্বরূপ, একজন গ্রাম্য বাংলাভাষী গাড়োয়ান 'অধিক চাপ' বোঝাতে 'দাব' বলেন, কিন্তু কেন সেরকম বলেন? এই প্রশ্নের উত্তরসহ 'দাবু' শব্দটিকে অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছি আমরা। 'দাবু' মানে শুধুমাত্র 'অধিক চাপ' লিখে দিলে 'দাবু' শব্দটিকে স্থির-অনড়-অর্থবাচক করে দিয়ে মেরে ফেলা হয়। আমরা তা হতে দিইনি।

৪) এই শব্দার্থকোষ সুস্পষ্টরূপে জানিয়ে দেয় যে, মানববিশ্বে ভাষা একটিই, যদিও তার অজস্র শাখা-উপশাখা-প্রশাখা তস্য প্রশাখা রয়েছে; যে প্রশাখাগুলিকে গুনে হিসেব করে একালের খণ্ডভাষাজ্ঞানী বলেন — ভাষার সংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। এই শব্দার্থকোষ আরও জানায় যে, ভাষা একটি মাত্র হলেও তা দু'রকমভাবে পাঠ করার বা ব্যবহার করার রীতি রয়েছে। প্রথম আদি ও অকৃত্রিম রীতি হল ভাষার শব্দগুলির ভিতর থেকে অর্থ জেনে নিয়ে পাঠ করা, এবং দ্বিতীয় রীতি হল শব্দগুলির বাইরে থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পাঠ করা। দ্বিতীয় রীতিটি এখন সারা বিশ্বে প্রচলিত এবং প্রথম রীতিটি প্রায় বিস্মৃত। এই শব্দার্থকোষ সেই প্রথম রীতিটিকে পুনরুদ্ধার করে প্রকাশ করার সূচনা করছে।

দোষগুণকথা : নয়া চাল ও তার সমস্যা

১) এই কোষগ্রন্থের কাজ শুরু হয় ২০০২-এ। অভিধানগুলি যেমন বর্ণানুক্রমে শব্দ সাজায়, সেভাবে শব্দবিন্যাস করে অর্থ দেওয়া চলছিল। ২০০৭-এর মাঝামাঝি সময়ে মহাবিপত্তি দেখা দেয়। শব্দের যেটি প্রাণ, তার বর্ণের বা বর্ণসমবায়ের অর্থধারণ-প্রক্রিয়া, দেখা যায়, বর্ণানুক্রমে শব্দভুক্তির কারণে সেই প্রক্রিয়াটি স্তব্ধ হয়ে শব্দটি নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ছে; তাকে কিছুতেই অক্ষত সজীব রাখা যাচ্ছে না। হিটলারের সেনাবাহিনী নগর ঘিরে অধিবাসীদের রাস্তায় নামিয়ে নেংটো করে গলায় যদি একটি করে 'বন্দি-নম্বর' ঝুলিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়, তাতে নগরবাসীদের যে দুরবস্থা হয়, একালের বর্ণানুক্রমিক অভিধানগুলিতে শব্দসমূহের ঠিক সেই অবস্থা! অথচ মানুষ মাত্রেই একটি বিশেষ বংশধারার সন্তান, বিশেষ ইতিহাসের, বিশেষ জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের অধিকারী! শব্দও সেরকমই। তাকে তার পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে সে অনাথ অসহায় সর্বহারা হয়ে মনমরা হয়ে যায় কিংবা মারা যায়। 'অজ' শব্দকে তার স্বরূপে পেতে হলে 'জন্'-ক্রিয়ার শব্দ-পরিবারের প্রায় ৩০০ সদস্যের (এই গ্রন্থের ৩৭৮ পৃষ্ঠা দেখুন) মাঝে তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থানেই পেতে হবে, নইলে প্রাণবন্ত অবস্থায় তাকে কিছুতেই পাওয়া যাবে না। প্রচলিত অভিধানগুলির বর্ণানুক্রমিক শব্দবিন্যাসবিধি শব্দের সেই স্বাভাবিক অবস্থানটাই লোপাট করে দেয়; শব্দকে তার পরিবার থেকে, তার ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেংটো করে লাইনে দাঁড় করিয়ে দেয়। ফলে অভিধানের শব্দ পরিণত হয় 'মনমরা' শব্দে। আমরা সেই বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিই অনুসরণ করছিলাম। তাই এই মহাবিপত্তি! এই উপলব্ধির ফলে ২০০৭-এর জুন পর্যন্ত করা এই শব্দার্থকোষের কৃতকর্মের বহুলাংশ ফেলে দিতে হয় এবং বাকি অংশ নতুন করে আগাগোড়া সাজাতে হয়। প্রথমে এক-একটি শব্দ-পরিবারের স্রষ্টা ক্রিয়ামূলকে তার পরিবার-সদস্যসহ উদ্ধার করে সাজিয়ে নেওয়া হয়। পাওয়া যায় প্রায় ৫০০ ক্রিয়ামূল এবং তাদের যার যার তার তার পারিবারিক সদস্য শব্দসমূহকে। দেখা যায়, তাতে প্রায় ৭২০০০ শব্দ বিভিন্ন শব্দ-পরিবারের সদস্য রূপে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে; যদিও অনেকেই ভুল পরিবারে ঢুকে পড়েছে। তবে খোঁজার সুবিধার জন্য প্রতি পরিবারের সদস্য শব্দগুলিকে তাদের পরিবারের মধ্যেই বর্ণানুক্রমে সাজিয়ে নেওয়া হয়। অতঃপর এক একটি শব্দ-পরিবারের যে-কয়েকটি শব্দের অর্থ দিলে তাদের বাকি সদস্য-শব্দগুলিকে বুঝে নেওয়া যাবে বলে মনে হয়, তাদের অর্থই বিস্তারিত করা হয়। কীভাবে তা করা হয়, এই গ্রন্থের 'ভূ-১' পৃষ্ঠাতে তা বিস্তারিতভাবে বলা আছে।

২) যে শব্দগুলির সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি যে, তারা কোন শব্দ-পরিবারের সন্তান, তাদের স্থান দেওয়া হয়েছে প্রতিটি বর্ণের নিপাত অংশে। 'ই' ও 'ঋ' ক্রিয়ামূলের অবশ্য কোনো নিপাত নেই। এমন বর্গও পাওয়া গেছে, যার কোনো ক্রিয়ামূলই নেই, সবটাই নিপাত, যেমন 'থ'। এর ক্রিয়ামূল আবিষ্কার করতে হবে, আপাতত তাকে 'থ্' ধরে নিয়েই কাজ চালানো হয়েছে; 'স্থ' ধরা হয়নি। দেখা গেছে, বেশ কিছু শব্দ-পরিবারের সদস্য-সংখ্যা খুবই কম; যেমন ঈ, ঐ, ঔ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ফ, ষ। সংস্কৃত পাঠে এই বর্গগুলিতে শব্দ সৃষ্টি হয়নি বললেই চলে। খ, ঘ, ছ, ড, য প্রভৃতি বর্গেও সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ বেশ কম। এই বর্গগুলিতে যেসকল শব্দ সৃজিত হয়েছে, তা সবই হয়েছে মধ্যযুগের বাংলায়। এমনকি একালের গ্রাম্য-বাংলাভাষীরা যে শব্দসম্ভার ব্যবহার করেন, তাতেও এই 'হীন' বর্গগুলির অধিকতর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়; অর্থাৎ এই ক্ষেত্রগুলিতে নতুন শব্দের সৃজনকর্ম আজও অব্যাহত। ব্যুৎপত্তির ক্ষেত্রে আমরা যেখানে যেমন পেয়েছি, তারই একটি বা একাধিক তুলে দিয়েছি। আমরা প্রধানত জোর দিয়েছি ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে এবং তার ব্যাখ্যায়। যে শব্দগুলির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ বঙ্গীয় শব্দকোষে বা ছাত্রবোধ অভিধানে পাওয়া গেছে, তাকে অবিকল তুলে দেওয়া হয়েছে। সেটি একশোভাগ ঠিক হলে, সেক্ষেত্রে আমরা আর কোনো ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিইনি। কিন্তু যে যে ক্ষেত্রে মনে হয়েছে, অন্যতর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থও হওয়া সম্ভব সেক্ষেত্রে আমাদের নিষ্কাশিত অর্থটিও দিয়ে দিয়েছি।

৩) বর্ণার্থ দেওয়ার ক্ষেত্রে এক একটি বর্ণের যে অর্থ দেওয়া হয়েছে, তাতে প্রায় অব্যক্ত অর্থকে জোরপূর্বক ব্যক্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। যেমন ক = কারী, গ = গামী ... ইত্যাদি। আমাদের পূর্বসূরীরাই এরকম করে গেছেন। আমরা সেগুলিই অনুসরণ করেছি। কিন্তু একথাও উপলব্ধি করেছি যে, যে-মুহূর্তে ক বর্ণে ধৃত ধারণাকে 'কারী'-রূপ শব্দার্থে স্থির করে দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে তা সত্য থেকে খানিকটা বিচ্যুত হয়ে যায়। তাছাড়া তো উপায়ও নেই। ক-এর অর্থ বলতে হবে, অথচ বলার উপায় নেই, এমতাবস্থায় সবচেয়ে কাছাকাছি যা দিয়ে বিষয়টিকে বোঝানো সম্ভব, ক-এর অর্থকে সেই খাঁচায় বন্দী করে উপস্থাপন করতে হয়, আমাদের পূর্বসূরীরাই করেছেন, আমরা সেই পথই অনুসরণ করেছি। আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, স্বরের মূল ভাবটি সুরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সুর ধরে নামতে নামতে তার গোড়ায় পৌঁছে সমস্ত সুরজ্ঞানীদের নিকট আবেদন করেন, তাঁরা যেন সুরের ভিতরে কী নিয়মে ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটে তা আবিষ্কার করার জন্য যত্নবান হন। আমরা স্বর ধরে নামতে নামতে তার গোড়ায় পৌঁছে স্বরজ্ঞানীদের নিকট এই আবেদন রাখি, তাঁরা যেন স্বরের ভিতরে কী নিয়মে ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটে তা আবিষ্কারে যত্নবান হন। অধিকন্তু আমরা জানিয়ে রাখি যে, আমাদের গবেষণা থেকে আমরা বুঝেছি, স্বর ও সুর যখন অবিভাজ্য ছিল, তখনই তাতে ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে। কিন্তু ঠিক কীভাবে তা হয়, আমরা এখনও তা জানতে পারিনি। আমরা শব্দার্থনিষ্কাশন করেছি আমাদের পূর্বসূরীদের আবিষ্কৃত বর্ণার্থের উপর ভিত্তি করে। আর তা করেছি যাস্কের নির্দেশ মেনেই। তাঁর মতে, 'শব্দের অর্থসাধন করা নিরুক্তের কার্য্য। যদি দেখা যায় ব্যাকরণানুমত প্রণালী অবলম্বন করিয়া কোনও শব্দবিশেষের অর্থ সাধন করা যায় না ... ... তাহা হইলে বর্ণসামান্যের ও অক্ষরসামান্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।' (নিরুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯১, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩)

৪) যেহেতু শব্দের ভিতরেই তার অর্থ রয়েছে, তাই ভুক্তির বেলায় শব্দটির প্রকৃত 'অর্থধারী-বর্ণময়' বা 'সংস্কৃত' বানানকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; কিন্তু মূল বয়ানের ক্ষেত্রে প্রচলিত বানানই অনুসরণ করা হয়েছে। বঙ্গীয় শব্দকোষ ও পৌরাণিক অভিধান থেকে যে উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে, সেগুলিকে অবিকল রেখে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থের সংবাদ শব্দের বানানেই রয়েছে, সুতরাং বানান বিষয়ে অধিকতর সতর্ক হওয়ার কথা আমাদেরই। তথাপি এভাবে সবরকম বানান মেনে নেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে যে-কারণে তা হল, অন্যথায় পাঠকপাঠিকা অসুবিধায় পড়তেন — তাঁদের হাতে পাওয়া বা কানে শোনা শব্দের অর্থটি খুঁজতে এই শব্দার্থকোষের শরণাপন্ন হলে তাঁদেরকে সবার আগে শব্দটির সঠিক বানান জানার বাধ্যবাধকতায় পড়তে হত। সেরকম যাতে না হয়, সেকারণেই শব্দ সংকলনের ক্ষেত্রে আমরা উদারনীতি গ্রহণ করেছি। কিন্তু শব্দার্থের ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় শব্দটির সঠিক বানান কেমন হওয়া উচিত, কেমন হলে শব্দটির অর্থের সঙ্গে তার বানানের সামঞ্জস্য বজায় থাকে, যথাসাধ্য তার ব্যাখ্যা দিয়েছি।

৫) গায়ত্রী ও গায়ত্ত্রী শব্দ দুটি যে পৃথক শব্দ, তার প্রমাণ রয়েছে তার অর্থের ভিন্নতায়। কিন্তু একালে দুটোকেই এক করে দেওয়া হয়েছে; পূর্ব্ব, সর্ব্ব, কর্ম্ম, ধর্ম্ম প্রভৃতি শব্দকে পূর্ব, সর্ব, কর্ম, ধর্ম করে ফেলা হয়েছে। কাজটি এমনই বিবেচনাহীন ভাবে করা হয়েছে যে, এখনকার কমপিউটারে ত-য় ত-য় র-ফলা লেখাই যায় না; লিখতে হলে লিখতে হয় পুত্‌ত্র, পত্‌ত্রিকা, ক্ষত্‌ত্রিয়। প্রশ্ন হল, সত্যিই কি এই দ্বিত্বের প্রয়োজন আছে? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি — যদি বয়ানটির

ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ নিষ্কাশন করতে হয়, তাহলে দ্বিত্বের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। তা না হলে, যে-কোনো বানানই লেখা চলে; উচ্চারণ ঠিকঠাক হলেই হল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে এর ঐতিহাসিক কারণে। একালের মতো সেকালেও কিছু পণ্ডিত জন্মেছিলেন, যাঁরা সব ক্ষেত্রেই দ্বিত্ব প্রয়োগ করে গেছেন কোনো বিচারবিবেচনা ছাড়াই; যেমন কিনা একালের কিছু পণ্ডিত সব ক্ষেত্রেই দ্বিত্ব উড়িয়ে দিয়েছেন কোনো বিবেচনা ছাড়াই। ফলে কোন শব্দে আদিতে দ্বিত্ব ছিল, আর কোনটায় আদৌ ছিল না, তা খুঁজে বের করাই এখন এক মুশকিল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, গায়ত্রী, পত্র, পত্রিকা, পুত্র, কর্ম, ধর্ম — এইরকম কিছু শব্দ রয়েছে, যার দুইরকম অর্থই হয়; অতএব এগুলি যে দুরকম বানানে ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আবার, কর্তব্য, কর্তৃক, দুর্বল, মর্তমান, খর্জুর প্রভৃতি শব্দের একটা করেই মানে বেরোয়। সেই কারণে এই শব্দগুলির বানানে আদিতে দ্বিত্ব ছিল না বলেই মনে হয়।

৬) সবশেষে, সুধী পাঠক, আমাদের অক্ষমতার বিষয়টি আপনাকে জানিয়ে রাখা জরুরি মনে করি। শব্দার্থের ক্ষেত্রে আমরা যা পেয়েছি, তাকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করার একটিই 'ফুলপ্রুফ' উপায় হতে পারত — প্রয়োজনীয় কলাকুশলীর সাহায্যে ইন্টারনেটে চলমান শব্দার্থকোষ সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা। অন্তত পক্ষে ২০/৩০ জন ভাষাজ্ঞানী ও সহযোগী কমপিউটার-কৃৎকুশলীদের নিয়ে কমপক্ষে বছরখানেক ধরে শব্দার্থকোষটি প্রণয়ন করতে পারলেও তার ফলাফলটি মনঃপূত হতে পারত। ('বাংলা বিশ্বকোষ' নামক গ্রন্থটি ৬৭ জন পণ্ডিতের প্রায় ২৫ বছরের পরিশ্রমের ফল।) সেরকম কোনো সুযোগই আমরা পাইনি। এই শব্দার্থকোষ প্রস্তুত করেছি আয় ও আয়ুর সঙ্কটে ভোগা আমরা দুজন। ফলে, একদিকে যেমন উদ্ধার করা তথ্যসমূহের অনেকটাই দেওয়া হয়ে ওঠেনি, তেমনি, যাকে বলে 'উপস্থাপনকে পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করা', তারও প্রায় কিছুই করা যায়নি। এমনকি নির্ঘণ্টের পৃষ্ঠার সঙ্গে মূল কোষের পৃষ্ঠা মেলানোর কাজও করতে হয়েছে আমাদেরকেই। ফলে, সব মিলিয়ে উপস্থাপনের বহু বহু ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে গেছে। এসব বিষয়ে আমরা মাফ চাইতে পারি, কিন্তু তাতে ত্রুটিবিচ্যুতি শুধরে যায় না। আমাদের আবেদন, যে-ব্যবস্থা নিলে একটি ত্রুটিমুক্ত সম্পূর্ণ বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ প্রণীত হতে পারে, তার উপায় করার কথা সবাই মিলে ভাবুন।

বিবিধ কথা : কথা প্রসঙ্গে

১) শব্দের ভিতর থেকে শব্দের মানে বের করার রীতিটি সুপ্রাচীন। ভারতের যাস্ক-প্রণীত 'নিরুক্ত' থেকে শুরু করে বৌদ্ধযুগের 'অমরকোষ' বেয়ে বহু পণ্ডিতের বহু অভিধানের ভিতর দিয়ে ধারণাটি ক্রমক্ষীয়মান হয়ে হয়ে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' পর্যন্ত পৌঁছেছে। একালের ভাষাতত্ত্ব এই রীতিটিকে একেবারেই ভুলে গেছে, যদিও এটিই ছিল মানুষের আদি শব্দার্থ-নিষ্কাশন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিই কালে কালে খণ্ডিত, স্থিরীকৃত রূপ গ্রহণ করে আজকের 'প্রতীকী শব্দার্থবিধি'তে পরিণত হয়েছে, যা 'শব্দার্থ-নিষ্কাশন' করে না, শব্দের বাইরে থেকে 'শব্দার্থ-সংগ্রহ' করে।

২) এই শব্দার্থকোষ মনে করে, বিশ্বের সমস্ত ভাষার মূলে রয়েছে আঠাশটি বর্গ (order); বাংলায় তার সঙ্গে আরও সাতটি অনুবর্গ যুক্ত হয়ে বর্গসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫টি (পরে যার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫টি)। বাংলা ভাষায় যত শব্দ আছে, তা এই (৭ × ৫ =) ৩৫টি বর্গের থেকেই জন্মেছে। বিশ্বে যা কিছু আছে, তা এই সাতে-পাঁচে অবশ্যই আছে। 'সাতে-পাঁচে নেই' মানে বিশ্বের কোথাও কোনো কিছুতেই নেই। এই সাত-পাঁচ পঁয়ত্রিশটি বর্গ থেকেই প্রথমে জাত হয়েছে প্রায় ৫০০ টি ক্রিয়ামূল, যে ক্রিয়ামূল ক্রমবিকশিত হয়ে বাংলাভাষার লক্ষাধিক শব্দের শব্দসম্ভার সৃষ্টি করেছে। সেই শব্দসম্ভারই এই বিশ্বজগৎকে প্রতিধ্বনিত করবার ও বিশ্বজগতের প্রতিনিধিত্ব করবার যোগ্য হয়ে উঠেছে।

৪) বাংলাভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির কথা জানিয়ে দেয় এই শব্দার্থকোষ। বলে দেয়, বাংলাভাষায় বাক্য নির্মাণের কৃৎকৌশল — বিস্তার, স্বল্প উপকরণে অধিক কার্যসিদ্ধির ক্ষমতা, উদ্ভাবনী সৃজনশীলতা, স্বচ্ছতা এবং অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞাদৃষ্টি কতখানি প্রবল। এই সব ক'টি গুণের মূলে আছে আমাদের ভাষায় শব্দগঠন ও শব্দ-ব্যবহারে ক্রিয়াভিত্তিকতার নীতি। এই নীতি পালনের মধ্যে জটিলতা নেই। সাধারণ বাংলাভাষী নিজের অজান্তে এই কাজ অনায়াসেই করেন। বাংলায় মূল ক্রিয়া বা ধাতুর সংখ্যা ইংরেজি verb-এর সংখ্যার তুলনায় অনেক অনেক কম। কিন্তু প্রয়োজন মতো ধাতুর শেষে আসে প্রত্যয় আর বিভক্তি এবং আগে বসে যায় উপসর্গ। সেই ধাতু-প্রত্যয়-বচন-বিভক্তি-উপসর্গের সংখ্যাই বা কত? সব মিলিয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫০০টি মূল ধাতু, তার ৭ বিভক্তি, ৩ বচন, প্রায় ২০০ প্রত্যয় ও ২০টি উপসর্গ। লিঙ্গ সন্ধি সমাসের কথা বাদ দিয়ে দিলেও কত শব্দের প্রজনন-ক্ষমতা ধরে আমাদের এই ভাষা? ৫০০ × ৭ × ৩ × ২০০ × ২০ = ৪,২০,০০,০০০। এত বেশি অবশ্য হয় না, কারণ প্রত্যয়-উপসর্গাদি সর্বত্র ব্যবহৃত হয় না। সংখ্যাটি তাই বেশ খানিকটা

কমে যায়। তা সত্ত্বেও তা ইংরেজির তুলনায় বহু গুণ বেশি। ঢাকায় শহিদুল্লাহ্ সাহেবের নেতৃত্বে বাংলার উপভাষিক শব্দই সংগৃহীত হয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ। আমাদের গবেষণায় আমরা দেখেছি, গ্রামবাংলার বাংলাভাষীর মুখে যত শব্দ ব্যবহৃত হয়, অভিধানে তার অর্ধেকও স্থান পায় না। অর্থাৎ আমাদের ভাষায় দৃশ্যত এই স্বল্প উপকরণের সাহায্যে, নানারকম সংযোজনের জোরে, অর্থের এক বিশাল এলাকায় আমাদের দখল কায়েম হয়ে যায়। ভাষার এই নীতি চালু রাখার জন্য প্রয়োজন হয় পরিলক্ষিত জগতের যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চরিত্র বিচার — যার ফলে বহু অসদৃশ প্রাণী বা বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াগত সমধর্মিতা সহজেই চোখে এসে যায়। ফলে বিশাল এলাকার যাবতীয় ক্রিয়ার যথাযথ বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হয়; ভাষার উদ্ভাবনী সৃজনশীলতা অব্যাহত থাকে। এবং অবশ্যই শব্দসম্ভারের স্বচ্ছতা মানুষকে দিতে পারে ভাব ও চিন্তার জগতে বিরাট মুক্তি। পাশ্চাত্য-প্রভাবিত আধুনিক অ্যাকাডেমিক বাংলাভাষার চর্চা আমাদের এই বাংলাভাষাকে হিমালয় থেকে উইয়ের ঢিপিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছে।

			০			
অ	ক	চ	ট	ত	প	ঃ
ই	খ	ছ	ঠ	থ	ফ	শ
উ	গ	জ	ড	দ	ব	ষ
ঋ	ঘ	ঝ	ঢ	ধ	ভ	স
ঌ	ঙ	ঞ	ণ	ন	ম	হ

সা রে গা মা পা ধা নি
সাতস্বর (সাতসুর, সাতরং) গুণিত পঞ্চবর্গ।

৩) এই শব্দার্থকোষ মনে করে, বিশ্বের সব ভাষাই একই আদি উৎস বা একই ৫০০ বা ততোধিক ক্রিয়ামূল থেকে জন্মেছে। সংস্কৃতের 'ক্রিয়েৎ', ইংরেজির 'create', বাংলার 'করণীয়', আরবির 'করিম', ফারসির 'কারখানা' — সবই আসলে 'ক্' বর্গের 'কৃ' শব্দ-পরিবারের সদস্য এবং পরস্পরের ভাই। বাংলা ভাষায় এত যে ফারসি শব্দের ছড়াছড়ি তার কারণ হল, মধ্যযুগের বাংলাভাষীরা ফারসি শব্দগুলিকে আত্মীয় বলে চিনতে পেরেছিলেন এবং আপন করে নিয়েছিলেন। আমরা বুঝেছি, শেষ বিচারে 'বিদেশী' বলে কোনো শব্দই হয় না।

৪) ভারতে স্থান-নামের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। হিমালয়, বিন্ধ্য, শতদ্রু, সিন্ধু, প্রাগজ্যোতিষপুর, কাটোয়া, কাবেরী, কনখল, ইত্যাদি দেশ-পাহাড়-নদী প্রভৃতি স্থাননাম স্বভাবতই এসেছে। ইয়োরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলিকে বুঝতে গেলে কিছুতেই বোঝা যাবে না। কেননা, ইয়োরোপীয় নদীর পুংলিঙ্গ নদ হয় না, পর্ব্বতের ডানা গজায় না, আমাদের পর্বতের ডানা গজায়। আসলে আমাদের রয়েছে দুটো ভূগোল, একটা বাহ্য, যাকে আমরা রেলগাড়ি চেপে গিয়ে চাক্ষুষ দেখে আসতে পারি; আর একটা মানসিক, যাকে দেখতে হয় মনের চোখ দিয়ে। এই দুটো ভূগোলকে এক করে দেখা যায় না। সে চেষ্টা করে অগ্রজ পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের ত্রিশ বছর খরচ হয়ে গিয়েছিল, ফলত আমাদের ত্রিশ বছর বেঁচে গেছে; তাঁর প্রাপ্তি রেডিমেড পেয়ে আমরা আর সে পথে হাঁটিনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — কবি, তব মনোভূমি অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো। এর মানে ভারতবর্ষের কবির মনোভূমিতে যেসকল দেশ-নদী-পর্বত রয়েছে, তা বাস্তবের দেশ-নদী-পর্বতের চেয়েও সত্য। আমাদের তাই দুরকম দেশ-নদী-পর্বত রয়েছে। বাস্তবের হিমালয়, কৈলাস, কনখল, অযোধ্যা যেমন রয়েছে, তেমনি আমাদের প্রাচীন চিন্তাবিদদের মনোলোকের হিমালয়, কৈলাস, কনখল, অযোধ্যাও রয়েছে। সেজন্যেই ভারতবর্ষে ৮২টি রামপুর রয়েছে, অজস্র ব্রহ্মপুর, গোলোকপুর, অযোধ্যা, নন্দীগ্রাম — এসব রয়েছে। (দ্রষ্টব্য **কৈলাস**)।

৫) এই 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' একটি খসড়া মাত্র, বাংলাভাষার পঞ্চভুবনের বাংলাভাষাপ্রেমীরা হাত লাগালে, তবেই একাজ 'সম্পূর্ণ' হতে পারবে। আর তার একমাত্র উপায় হল ইন্টারনেটে চলমান শব্দার্থকোষ সকলের জন্য অবাধ করে দেওয়া। সবাই নিজ নিজ অবদান সেখানে রাখুন। তাহলেই একদিন একটি 'সম্পূর্ণ বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ' প্রস্তুত হতে পারবে। তখন তার উপর নির্ভর করেই বিশ্বের প্রতিটি ভাষার নিজ নিজ ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থকোষ প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করা যাবে। এ ব্যাপারে বাংলা ভাষাই বিশ্বের অন্যান্য ভাষাকে পথ দেখাতে পারে। তারপর যদি বিশ্বের সব ভাষার জ্ঞানীগুণী মানুষেরা হাত লাগান, কেবল তখনই আগামী যুগের 'সুপার-ল্যাঙ্গুয়েজ' গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আর তখনই, যে-কোনো আওয়াজ শুনেই কমপিউটার বলে দিতে পারবে, আওয়াজটির ভিতরে কী মানে রয়েছে; তা সে মানুষের উচ্চারিত শব্দ হোক, আর জীবের বা জড়ের উৎপাদিত শব্দই হোক কিংবা এই ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে থেকে আসা কোনো অদ্ভুত শব্দই হোক।

মূলকথা : দার্শনিক ভিত্তি ও তাত্ত্বিক বনিয়াদ

১) অভিধান বা শব্দকোষ পড়ে সাধারণ মানুষ ভাষা শেখে না, ব্যবহারও করে না। বিশ্বের সব ভাষাতেই শব্দের ভেতরে অর্থ ঢোকানো ও বের করার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের মনের মাটির নীচে ফল্গুধারার মতো আজও অন্তঃসলিলা। পশ্চিমী ভাষাবিদদের 'খামখেয়ালি' বা 'arbitrary' তত্ত্বের 'একঝোঁকা' প্রভাবে সেই অন্তঃসলিলা স্বাভাবিক নিয়মটি

এতদিন কারও চোখে পড়েনি। নিয়মটি আমাদের চোখে ধরা দেয়, তার সাহায্যে আমরা বাংলা শব্দের ভিতরের সেই অর্থ নিষ্কাশন করে এই শব্দার্থকোষের মাধ্যমে পরিবেশন করেছি।

২) এই কোষগ্রন্থ মনে করে, মানুষের প্রাচীন পূর্বপুরুষরা দৃশ্যবস্তুকে বোঝানোর জন্য শব্দ সৃষ্টি করেননি। 'অদৃশ্য কিন্তু সমাজে সক্রিয়' বিষয়কে বোঝানোই ছিল তাঁদের শব্দ সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। যে-ব্যক্তি তাসত্ত্বেও বুঝতে পারছে না, সেইরকম 'নিম্ন-অধিকারী'কে বোঝানোর জন্যই সমস্বভাবের বাহ্যবস্তুকে একই শব্দে উল্লেখ করা হত। অদৃশ্য সমাজশরীরকে 'কায়া' বোঝালেই কায়স্থ শব্দের একটা জুতসই মানে হয়। এর সাম্প্রতিক উদাহরণ হল 'মাথামোটা', 'কানপাতলা', 'কাছাখোলা' ... ইত্যাদি শব্দ। দৃশ্যত এই মাথা মোটা নয়, এ-কানও পাতলা নয়, এবং এই খোলা দেখাও যায় না। এই শব্দগুলির প্রধান উদ্দেশ্য অদৃশ্য মোটা-পাতলা-খোলা ব্যাপারকে বোঝানো।

৩) মানুষের উৎপাদিত বস্তুসমূহের চারটি প্রধান ধারা — ক) প্রকৃতিজাত; খ) কারুশিল্পজাত বা শিল্পজাত; গ) আমদানিকৃত; এবং ঘ) অন্য গোষ্ঠীর বিদ্যা-ক্ষমতা (নোহাউ-পুঁজি) প্রয়োগ করে নিজ এলাকায় উৎপাদিত। এরই সমান্তরালে মানুষের ভাষার শব্দসম্ভারও প্রধানত চাররকম ভাবে উৎপাদিত হয়ে থাকে — ক) স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়মে তৈরি শব্দ; খ) রেডিমেড শব্দ জুড়ে জুড়ে বানানো শব্দ; গ) আমদানীকৃত শব্দ; ঘ) নিজেদের শব্দকে শাসকভাষার নিয়মে জুড়ে নতুন শব্দ বানানো, অর্থাৎ অন্য গোষ্ঠীর বিদ্যা-ক্ষমতার জোরে নিজেদের শব্দগুলিকে তাদের মতো করে বানানো শব্দ। প্রকৃতপক্ষে মূল শব্দ উৎপাদিত হয় প্রথম ক্ষেত্র থেকে, বাকি তিনটি ক্ষেত্রের শব্দসৃজনের কাজ চলে প্রথম ক্ষেত্রের উৎপাদিত শব্দের উপর ভিত্তি করে। সেই বিচারে, শব্দসৃজনের একটিই প্রধান আদি অকৃত্রিম ধারা এবং সেটিই ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দ সৃজনের ধারা। সেই ধারায় প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষ আজও নতুন নতুন শব্দসৃজন করে থাকেন; সেকালের ভাষাজ্ঞানীরা তাকেই সংস্কার করে উপস্থাপন করতেন। বাকি তিনটি ধারাতেও কিছু কিছু শব্দসৃজন চলে, তবে সেগুলি মৌলিক শব্দ নয়, ইতোপূর্বে উৎপাদিত শব্দ জুড়ে জুড়ে বানানো; সেগুলিকেই একালের অভিধানকারগণ 'নতুন শব্দ' বলে থাকেন। যথা 'কর্মবিরতি', 'আজগুবি' ... প্রভৃতি। শব্দোৎপত্তির প্রধান ধারাটিই আমাদের বিচার্য।

৪) মানুষ তার স্বভাববশত জগৎকে কীভাবে দেখে? এই প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়ে গড়ে উঠেছিল অধ্যাত্মবিদ্যা থেকে শুরু করে নানাবিধ দর্শন। সব দর্শনের শুরুতে তাই জগদ্দর্শনের নিজ নিজ রীতির কথা আছে। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি সেই সমস্ত দর্শনের সমস্ত প্রশ্নোত্তরের গোড়ায় পৌঁছে যায়। আপন অনায়াস স্বাভাবিকতায় সে ঘোষণা করে — জগদ্দর্শনের একটিই রীতি। যাকে দেখা হচ্ছে, সে করছে-টা কী? কী করছে সত্তাটি, বস্তুটি বা বিষয়টি? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরই গড়ে উঠেছিল মানুষের প্রাচীন অধ্যাত্মবাদ। আজও প্রতিটি শিশুই এই রীতিতেই জগদ্দর্শন করে থাকে। মানুষ তার উদ্ভবের কাল থেকে আজও এক এবং একমাত্র উপায়েই জগদ্দর্শন করে, ভবিষ্যতেও সেভাবেই সে জগতের দিকে তাকাবে। প্রকৃতির কাছ থেকে জগদ্দর্শনের এই এক ও অদ্বিতীয় রীতি অনুসরণ করার যোগ্যতা লাভ করে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। এই হল ক্রিয়াভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। পরে পরে মানুষের এই দৃষ্টিভঙ্গি গুলিয়ে যায়, ফলে তার অধ্যাত্মবোধে ফাটল ধরে এবং প্রাচীন অধ্যাত্মবাদ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে নানারকমের দর্শনতত্ত্বের জন্ম হয়। ... ভাষার ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ে। প্রাচীন পৃথিবীতে যে বস্তু বা বিষয় মানুষের সম্বন্ধে (দূর থেকে চোখে দেখাও এক প্রকার সম্বন্ধ) এসে যে প্রতিক্রিয়া ঘটাত, তাই দিয়ে ঠিক হত বস্তুটির নাম। ফলে, যে সত্তা যে-ক্রিয়া ঘটাত, তার নাম হয়ে যেত সেই ক্রিয়ার কারী রূপে (করণ করে যে = ক, গমন করে যে = গ ... ইত্যাদি)। এই নিয়মে যে সকল সত্তা একই রকমের প্রতিক্রিয়া ঘটাত, তাদের সকলের একটাই নাম হয়ে যেত। আবার, এক বস্তু বহু রকমের প্রতিক্রিয়া ঘটালে তার বহু নাম হয়ে যেত। এই সেই কাণ্ড, যে কাণ্ডের কারণে আমাদের উত্তরাধিকারে এক শব্দে বহু সত্তার উল্লেখ পাওয়া যায় (লোকে 'আম' শব্দে 'আম-ফল', 'আম-বাত', 'আম-ইট', 'আম-রোগ' বা 'আমাশা' ইত্যাদি বোঝে), আবার বহু শব্দে একটি মাত্র সত্তার উল্লেখ পাওয়া যায় (অষ্টোত্তর শত নাম)। সমাজে একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি অনুসরণকারী দক্ষের বা স্পেশালাইজেশনের রমরমা হলে এক শব্দে একই বস্তুকে বারংবার উল্লেখ করা একটি প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। তখন আর ক্রিয়া দেখাব দরকার হয় না, রূপ দেখেই মনে পড়ে যায়, তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে। ফলত, রূপভিত্তিক বা দেহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়। সে-দৃষ্টিভঙ্গিই 'প্রতীকী শব্দার্থবিধি'র ভিত্তিতে দর্শনরূপে সক্রিয় হয়ে যায়।

৫) ক্রিয়া (action) ও ক্রিয়াকারী (actor), এই দুই সত্তা অদ্বৈত রূপে সক্রিয় থাকে। এমন একটি ক্রিয়ারও সাক্ষাৎ মেলে না, যে, ক্রিয়াকারীকে বাদ দিয়ে সক্রিয় হওয়ার যোগ্যতা ধরে। কথাটি বিপরীতভাবেও সমান সত্য। তাই এরা দুই হয়েও এক, two in one, দ্বৈত কিন্তু অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত। এই যে 'দ্বি', সেটিই 'দ' ও 'ব'-এ বিশ্লিষ্ট হয়ে দু, দুই, দো

(দোনলা, দোচালা ...) ইত্যাদি এবং বার, বাইশ, বত্রিশ ... ইত্যাদিতে পরিণত হয়। ইংরেজিতে তাকেই আমরা dual, bi-focal ... ইত্যাদি রূপে দেখতে পাই। স্বভাবতই সেই দুই রয়েছে বঙ্গ ও বাংলার 'ব'-এ। যে **অঙ্গ** দুইকে নিয়ে এক অঙ্গ হয়ে চলে, 'দ্বি-রহস্যরূপী গমন যাহার', সেই হল বঙ্গ (দ্র. **ঘটী**)। বঙ্গমানসের সেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ নিয়ে উঠে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, নবরূপে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বঙ্গীয় সুফিসাধকেরা, উঠে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'তিনি ও আমি এক', 'সো-অহং', 'অন্‌ল্-হক্', 'আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর'। বঙ্গমানসের গভীরে এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদ আজও সক্রিয় বলেই, সে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দের ব্যবহার আজও করে চলেছে। কীভাবে, সেকথা আমরা সপ্রমাণ দাখিল করেছি আমাদের 'খ' গ্রন্থের ২৬২-৬৩ পৃষ্ঠায়।

৬) ক্রিয়া অনন্ত অসীম অখণ্ড গতিশীল, ধরা দেয় মনে; ক্রিয়াকারী খণ্ড অন্তবান সীমায়িত স্থিতিশীল, ধরা থাকে দেহে। ক্রিয়াভিত্তিক-মনভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে অখণ্ড মনোলোক, ক্রিয়াকারীভিত্তিক-দেহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে খণ্ড মনোলোক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমরা হলাম মনবাদী বা আত্মাবাদী, আর পাশ্চাত্য হল দেহবাদী। আমরা স্বভাবতই অখণ্ড মন নিয়ে চলি, পাশ্চাত্য খণ্ড মন নিয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দুটোই চাই, গতি চাই স্থিতিকেও চাই, অখণ্ডকে চাই খণ্ডকেও চাই, নইলে মানুষ পূর্ণ হয় না। দুইকে নিয়ে চলাই বঙ্গমানসের বিশেষত্ব। বঙ্গভাষী আপন স্বভাববশতই তার অখণ্ডবাদী মনোলোকে পা রেখে জগদ্দর্শন করে থাকেন। এমনকি রামমোহন-বিদ্যাসাগরেরাও ব্রিটিশকে ও তাদের খণ্ডবাদী দেহবাদী সংস্কৃতিকে স্বাগত জানানোর কালে আপন অখণ্ডবাদী মনোলোকে পা রেখেই দাঁড়িয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নজরুল সহ আরও বহু বঙ্গসন্তান কদাচ তাঁদের স্ব-ভাব ত্যাগ করেননি। সাধারণভাবে কবি-গায়ক-শিল্পীদের পক্ষে মনের ভিত্তিবদল করা খুবই কঠিন। কিন্তু পরবর্তীকালের কিছু পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি তাঁদের মনোলোকটিই বদলে ফেলেন, তাঁরা পা রাখেন পাশ্চাত্যের খণ্ডবাদী-দেহবাদী মনোলোকে, অথচ সক্রিয় হন বাংলার ভাষা-সংস্কৃতিতে। বাংলাভাষা চর্চার ক্ষেত্রে অনবধানবশত এই ক্ষতিকর কাজটি করে ফেলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁকেই অনুসরণ করেন বাংলার অ্যাকাডেমিগুলি। এর ফল ভাল হয় না, স্বল্পমেধা ও মধ্যমেধার বুদ্ধিচর্চায় নেমে আসেন বাংলাভাষী বুদ্ধিজীবীরা। কারণ, অখণ্ড মনোলোকে পা রেখে খণ্ডকে বোঝা যেতে পারে, কিন্তু খণ্ডে পা রেখে অখণ্ডকে বোঝা কঠিন। যে-জেলে সমুদ্রে মাছ ধরে, সে পুকুরেও অনায়াসে মাছ ধরতে পারে, কিন্তু পুকুরে-মাছধরা জেলের পক্ষে সমুদ্রে মাছ ধরা প্রায় অসম্ভব। তবে একথা ভুললে চলবে না, শহরে, শাসনে, আইনে, পৌত্তলিকতার সীমায়, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়, যান্ত্রিকতায়, প্রযুক্তিতে বা টেকনোলজিতে খণ্ডবোধই সাফল্য আনে; গ্রামে, মুক্তিতে, মায়ায়, অসীমে, স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক শিক্ষায়, প্রেমে, শিবতায় অখণ্ডবোধই মোক্ষফল দান করে। সমাজ যতদিন শহরে-গ্রামে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও লৌকিক শিক্ষায়, প্রেমে ও যান্ত্রিকতায় ... বিভাজিত হয়ে রয়েছে, ততদিন আমাদের দুই সত্তাকেই চাই; অখণ্ডকে চাই, খণ্ডকেও চাই; ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিকে চাই, প্রতীকী শব্দার্থবিধিকেও চাই। কোনো একটি সত্তাকে বাদ দিয়ে 'একঝোঁকা' হয়ে গেলে, সমগ্র সমাজের পক্ষেই তা ক্ষতিকর।

সারকথা : অর্ঘ্য-নিবেদনান্তে প্রার্থনা

১) যাঁরা বিশ্বের প্রথম রেলযাত্রার ঘটনাটি জানেন না, তাঁদের জানাই — প্রথম রেলযাত্রার দিন ঘোড়াগাড়ির সঙ্গে রেলের প্রতিযোগিতা হয়েছিল এবং রেলগাড়ি হেরে গিয়েছিল; গন্তব্যে আগে পৌঁছেছিল ঘোড়াগাড়ি। উপযোগিতার বিচারে প্রচলিত অভিধানগুলির তুলনায় আমাদের এই শব্দার্থকোষ এই মুহূর্তে অকার্য্যকর মনে হলেও হতে পারে; কিন্তু আমরা নিশ্চিত, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই শব্দার্থকোষের প্রদর্শিত রীতি ও পন্থাই সকল ভাষাচর্চাকারীদের কার্য্যকরী সহায়ক হয়ে উঠবে। কিন্তু তা হয়ে উঠবে কীভাবে? সবাই হাত লাগান, এই আমাদের প্রার্থনা।

০৯.০৯.২০০৯ **রবি চক্রবর্তী কলিম খান**

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

আমরা দুজন আজ একটি মানসফসল নিয়ে সকলের সামনে এসেছি। এর যেসব ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে গেছে, সে আমাদের দুজনের। কিন্তু এতটা যে হতে পারল, তার গৌরব শুধুমাত্র আমাদের নয়। এই অভিনব ফসলের পেছনে যে সহযোগিতার হাতগুলি সক্রিয় থেকেছে, তাঁরাও সেই গৌরবের অধিকারী। এর মধ্যে চার শ্রেণীর মানুষজন রয়েছেন, মানসিক সহযোগী, আর্থিক সহযোগী, ধারণ-সহযোগী, ও বিরোধী-সহযোগী। মানসিক সহযোগী রূপে যাঁদের আমরা পেয়েছি, তাঁরা হলেন ব্রহ্মপুরের বিজ্ঞানী ড. শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রয়াত), শ্রীরামপুরের অধ্যাপক প্রতাপনারায়ণ বিশ্বাস (প্রয়াত), দমদমের গ্রীক-ভাষাবিদ অসিত চক্রবর্তী (প্রয়াত), মানিকতলার অম্বিকাপ্রসাদ সাহা (প্রয়াত), বাংলাদেশের শ্রদ্ধেয় লেখক-সম্পাদক মীজানুর রহমান (প্রয়াত) ও কবি তুষার গায়েন, ঝাড়গ্রামের অধ্যাপক সমরীকান্ত সামন্ত, জামশেদপুরের কবি বারীন ঘোষাল ও নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শিলিগুড়ির নারায়ণচন্দ্র দাস, হাওড়ার অরবিন্দ প্রধান, কলকাতার অরিন্দম চক্রবর্তী ও সৌরভ চক্রবর্তী, বারাসতের শঙ্কর কর্মকার, কালিকাপুরের রাজু দেবনাথ ও সালকিয়ার শুভঙ্কর ভট্টাচার্য।

আর্থিক সহযোগিতার বিষয়ে কী যে বলি! শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমাদের সেরকম কেউ নেই। আমরা গেছি সাধারণ পাঠকের কাছে। তাঁদের মধ্যেই অনেকে আমাদের প্রবন্ধাদি পড়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের নামোল্লেখে কারও কারও ঘোরতর আপত্তি ছিল, কেননা, কেউ দিয়েছেন অঙ্কের গুনতিতে কম তো কেউ দিয়েছেন অনেক অনেক বেশি। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিই, আর্থিক সহযোগীদের শুধুমাত্র নামোল্লেখ করে যাব। কারণ, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আমরা যখন আমাদের জীবন পরিবার সবকিছু বাজি রেখে চরম অসুবিধার মধ্যে বাংলাভাষার সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করে চলেছি, কোনো সরকারি সাহায্য পাইনি, পাওয়ার সুযোগ দু-একবার এলেও নিজেদের গবেষণার স্বাধীনতা বাঁচাতে সে-সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করিনি, তখন আমাদের পরিচিত অ্যাকাডেমিতে উচ্চশিক্ষিত দক্ষিণ কিংবা বামপন্থায় বিশ্বাসী প্রান্তিক মানুষ কিংবা উচ্চপদস্থ সরকারি আমলাও এমন কথা জিজ্ঞেস করতে পিছপা হননি যে, আমরা এতগুলি বই প্রকাশ করেছি কার টাকায়, কে দেয় আমাদের? বিজেপি দেয় না তো? আই এস আই দেয় না তো? মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর দেয় না তো? ...

তাই আমরা ঠিক করেছি, এ পর্যন্ত যাঁরা আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন, বর্ণানুক্রমিকভাবে এখানে তাঁদের নামোল্লেখ করে যাব। তাঁদের আর্থিক সাহায্যের সময়কাল ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ২০০৯-এর আগস্ট পর্যন্ত, প্রায় ১১৫ মাস। তার মধ্যে ২০০৭ সালের নভেম্বর মাস থেকে প্রায় নিয়মিত প্রতিমাসে গড়ে প্রায় দশ হাজার টাকা করে মাসোহারা দেওয়া হয়েছে কলিম খানকে। বাকি টাকা বইপ্রকাশ, কমপিউটার ও তার যন্ত্রপাতি কেনা প্রভৃতি খাতে খরচ করা হয়েছে। এই সাহায্যকারীরা হলেন — ড. অজিত রায় (টেক্সাস, আমেরিকা), অতনু দাস (বারাসত), অরবিন্দ প্রধান (হাওড়া), অরিন্দম চক্রবর্তী (কলকাতা), আশীষ মুখোপাধ্যায় (কলকাতা), ইন্দুকান্ত শুক্ল (সান পেড্রো, আমেরিকা), ইন্দ্রনীল ঘোষ (জামশেদপুর), ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য (কলকাতা), গৌতম ভাদুড়ী ও শ্রাবণী ভাদুড়ী (শিলিগুড়ি), চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা), চৌধুরী সালাউদ্দীন মাহমুদ (টেক্সাস, আমেরিকা), জিতেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (মুম্বাই), জ্যোতির্ময়ী সরকার (কলকাতা), ডা. তপনকুমার গায়েন (নর্থ ক্যারোলিনা, আমেরিকা), তাপসকুমার গায়েন (নিউইয়র্ক, আমেরিকা), তুষার গায়েন (ঢাকা, পরে টরন্টো, কানাডা), দীপঙ্কর সরকার (কলকাতা), দিলীপ ফৌজদার (দিল্লি), দেবাশিস ভট্টাচার্য (কলকাতা), নারায়ণচন্দ্র দাস (শিলিগুড়ি), নিখিল দেবনাথ (আগরতলা), পূর্ণেন্দু মিত্র (কলকাতা), বারীন ঘোষাল (জামশেদপুর), বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য (হাইলাকান্দি, আসাম), (২০০৭-এ প্রয়াত) মীজানুর রহমান (ঢাকা), রঞ্জন চক্রবর্তী (কোন্নগর), ডা. রবীন্দ্রনাথ হালদার ও ডা. কৃষ্ণা গায়েন (ঢাকা), রমাপ্রসাদ বসু (কোন্নগর), রাজসী চক্রবর্তী (কোন্নগর), শুভদীপা সরকার (কলকাতা), সঞ্জয় ভৌমিক (কলকাতা), সুবিমল চক্রবর্তী (টেক্সাস, আমেরিকা), সুভাষ গুহ (কোন্নগর), সৌরদীপ সরকার (কলকাতা), স্বপন কর্মকার (কলকাতা), ড. স্বপনকুমার গায়েন (নিউ জার্সি, আমেরিকা), হৈমন্তী দাশগুপ্ত (কোন্নগর)।

কিছু সহযোগী আছেন, যাঁরা আমাদের বক্তব্যকে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে সহায়তা করেছেন। তাঁরা হলেন কিছু লিটল ম্যাগাজিন ও তার সম্পাদক কিংবা তাঁর সহযোগী। যেমন *অগ্রবীজ* (চৌধুরী সালাউদ্দীন মাহমুদ, টেক্সাস), *অনীশ সংস্কৃতি, কথা সাময়িকী* (সমীরণ মজুমদার, কলকাতা), *অপর, রোয়াক* (সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা), *আবহমান* (আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ঢাকা), *আমরা সমন্বয়* (ইমন সাঁতরা, হুগলী), *একক মাত্রা* (অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, কলকাতা), *একালের রক্তকরবী* (প্রদীপ ভট্টাচার্য, কলকাতা), *এবং* (ধূর্জটি চন্দ, কলকাতা), *কম্পাস* (পান্নালাল দাশগুপ্ত, কলকাতা), *কালধ্বনি* (প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়,

কলকাতা), *কালিমাটি* (কাজল সেন, জামশেদপুর), *কৌরব* (কমল চক্রবর্তী, জামশেদপুর), *খনন* (সুকুমার চৌধুরী, নাগপুর), *গল্পসরণি* (অমর দে, বীরভূম), *ছন্নছাড়া* (অতনু দাস, সুবীর সাহা, বারাসত), *দধীচি* (ডলি দত্ত, কলকাতা), *দিবারাত্রির কাব্য* (আফিফ ফুয়াদ, কলকাতা), *দিল্লি হাটার্স* (দিলীপ ফৌজদার, দিল্লি), *নজরুল ফাউন্ডেশন পত্রিকা* (এম এ জব্বার, কলকাতা), *নিসর্গ* (সরকার আশরাফ, বগুড়া, বাংলাদেশ), *ফিরে দেখা* (মলয় বসু, হাওড়া), *মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা* (মীজানুর রহমান, ঢাকা), *যুক্তাক্ষর* (সঞ্জিত ঘোষ, হাওড়া), *রবীন্দ্রনাথ* (পূর্ণেন্দু মিত্র, কলকাতা), *রিষড়া সমাচার* (স্বপন পাঁজা, রিষড়া), *শতাব্দীর কলকাতা* (সুবীর সাহা, বারাসত), *শহর* (অজিত রায়, ধানবাদ), *সাহিত্য* (বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, হাইলাকান্দি, আসাম), *শৈল্পিক উজ্জীবন* (সৌকত আলী, নদীয়া), *হাওয়া ৪৯* (সমীর রায়চৌধুরী, কলকাতা)।

এছাড়াও ত্রিপুরার আগরতলা থেকে প্রকাশিত দৈনিক *স্যন্দন পত্রিকা* দীর্ঘকাল ধরে (২০০৭-২০০৯) আমাদের বিভিন্ন প্রবন্ধ, গ্রন্থাংশ কবি স্বপন সেনগুপ্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে প্রায় প্রতি রবিবার প্রকাশ করে চলেছেন। আর, আধার রূপে মাত্র একদিনের জন্য হলেও সক্রিয় হয়েছিল কলকাতার দৈনিক *আনন্দবাজার পত্রিকা* (২৩ জুলাই, ২০০৬)।

আমাদের বিষয় নিয়ে banglasemantics.net নামক ওয়েবসাইট নারায়ণচন্দ্র দাস, অরিন্দম চক্রবর্তী, সৌরভ চক্রবর্তী, শুভঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজন মিলে করলেও, এর প্রধান দায়িত্ব পালন করে চলেছেন সৌরভ চক্রবর্তী।

না, এখানে তাঁদের নাম লিখব না, যাঁরা বিরোধিতা করে আমাদের গবেষণাকে, বক্তব্যকে যথাযথ হতে সাহায্য করেছেন। তাঁদেরও একটি বড় ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। বিরোধিতাই মানুষকে তার নিজের যাথার্থ্য খুঁজে সঠিক ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সাহায্য করে। সেই জন্য যে কোনো অর্জনের ব্যাপারে বিরোধীদের অত্যন্ত শুভ ভূমিকা থাকে। তাঁরা সত্যকে মিথ্যা বলে, গালমন্দ করে, বিরোধিতা করে নিজেদের অজান্তে আসলে সত্যেরই সাধনা করে ফেলেন। আমাদের বঙ্গদেশের সংস্কৃতিতে এঁদের সেইরকম সাধক বলা হয়, যাঁরা 'শত্রু রূপে সাধনা' করেন। সবাই জানেন, নরম-গরমে প্রার্থিত বস্তু গড়ে ওঠে। এঁরা না থাকলে গরমের দিকটি আমরা পেতাম না। শুধু নরমে আমাদের গড়ে ওঠা ব্যাহত হত। অতি নরমে ও অতি গরমে সব নষ্ট হয়ে যায়। একেবারে সম্পূর্ণ নষ্ট করার চেষ্টা যাঁরা করেছেন, তাঁদের সংস্পর্শ আমরা সাধ্যমতো ত্যাগ করেছি। কিন্তু যাঁরা তত্ত্ব ও তথ্যগত ভাবে আমাদের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান বজায় রেখে আমরা আত্মোৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হয়েছি। সেরকম বিরোধীদের প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

পরিশেষে, আমাদের সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও যদি ভুলবশত কোনো শুভার্থী বা সহায়কের নাম বাদ পড়ে থাকে, বা নামোল্লেখের মধ্যে কোনো ভুল হয়ে থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে আমরা মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। আর একটি কথা, আমাদের উভয় পরিবারের সদস্যবর্গ, যাঁরা অবিরাম আমাদের পাশে থেকেছেন, এবং সকল রকমের সহযোগিতা দিয়ে গেছেন, তাঁদের সকলকে আমরা যুগ্মভাবে আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

০৯.০৯.২০০৯ **রবি চক্রবর্তী কলিম খান**

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অ			অংশুহস্ত	অশ্	৪৭	অকলঙ্ক	কল্	১৬৪	অকুতভয়	ক্	২৩৭	অক্রেয়	ক্রী	২২০
			অংস	অংশ্	৪	অকলঙ্কী	কল্	১৬৪	অকুতোভয়	ক্	২৩৭	অক্রোধ	ক্রুধ্	২২১
অ	—	২	অংসকূট	অংশ্	৪	অকল্ক	কল্	১৬৪	অকুতোমৃত্যু	ক্	২৩৭	অক্রোধন	ক্রুধ্	২২১
অই	অব্	৩২	অংসত্র	অংশ্	৪	অকল্প	ক৯প্	২১৭	অকুপার	ক্	২৩৭	অক্রোধী	ক্রুধ্	২২১
অইসন	অ	৫৯	অংসত্র	ত্র	৪৮৮	অকল্পিত	ক৯প্	২১৭	অকুমার	কম্	১৫৪	অক্রৌর্য্য	কৃৎ	২১৩
অউনিএগা	অঞ্জ্	১১	অংসপৃষ্ঠ	অংশ্	৩	অকল্মষ	কল্	১৬৪	অকুমারী	কম্	১৫৪	অক্লিষ্ট	ক্লৃ	২২২
অঋণী	ঋ	১১৩	অংসফলক	অংশ্	৩	অকল্য	কল্	১৬৪	অকুমারীব্রত	কম্	১৫৪	অক্লিষ্টকর্ম্মা	ক্লৃ	২২২
অং	অম্	৩৬	অংসবান	অংশ্	৩	অকল্যাণ	কল্	১৬৪	অকুল	কুল্	১৯৭	অক্লিষ্টকারী	ক্লৃ	২২২
অংরূপিণী	অম্	৩৭	অংসভারিক	অংশ্	৩	অকষ্ট	কশ্	১৭৩	অকুলন	কুল্	১৯৭	অক্লেশ	ক্লৃ	২২২
অংশ্	অংশ্	৩	অংসল	অংশ্	৫	অকষ্টবদ্ধ	কশ্	১৭৩	অকুলান	কুল্	১৯৭	অক্ষ	অশ্	৪৭
অংশ	অংশ্	৩	অংসারূঢ়	অংশ্	৩	অকস্মাৎ	ক্	২৩৭	অকুলীন	কুল্	১৯৭	অক্ষকিতব	অশ্	৪৬
অংশক	অংশ্	৩	অংস্বরূপা	অম্	৩৬	অকাজ	কৃ	২০০	অকুশল	কশ্	১৭৩	অক্ষকুশল	অশ্	৪৬
অংশকল্পনা	অংশ্	৪	অংহ	অ	৫৯	অকাট্য	কৃৎ	২১৩	অকুস্থল	ক্	২৩৭	অক্ষকোবিদ	অশ্	৪৬
অংশগত	অংশ্	৪	অংহসংঘ	অ	৫৯	অকাট্য	কট্	১৩৬	অকূপার	ক্	২৩৭	অক্ষক্রীড়া	অশ্	৪৮
অংশগ্রাহী	অংশ্	৪	অংহহর	অ	৫৯	অকাণ্ড	কন্	১৫০	অকূল	কুল্	১৯৭	অক্ষগ্রহ	অশ্	৪৬
অংশন	অংশ্	৪	আঁধার	অন্	২৮	অকাতর	ক্	২৩৭	অকৃত	কৃ	২০০	অক্ষজ	অশ্	৪৬
অংশনীয়	অংশ্	৩	আঁধিয়ার	অন্	২৮	অকাম	কম্	১৫৪	অকৃতকর্ম্মা	কৃ	২০০	অক্ষণ	অশ্	৪৬
অংশবিবর্ত্তী	অংশ্	৪	অক	ক্	২৩৭	অকামিক	কম্	১৫৪	অকৃতজ্ঞ	কৃ	২০০	অক্ষণিক	অশ্	৪৬
অংশভাক্	অংশ্	৪	অকটবিকট	কট্	১৩৬	অকায়	ক্	২৩৭	অকৃতদার	কৃ	২০০	অক্ষণিক	ক্ষ	২২৩
অংশভাগী	অংশ্	৪	অকন্টক	কণ্	১৪০	অ-কার	অ	৫৯	অকৃতধী	কৃ	২০০	অক্ষত	ক্ষ	২২৩
অংশমান	অংশ্	৩	অকন্টবিদ্ধ	কণ্	১৪০	অকার	কৃ	২০০	অকৃতবুদ্ধি	কৃ	২০০	অক্ষতত্ত্ব	অশ্	৪৬
অংশল	অংশ্	৪	অকণ্ডিত	কণ্	১৪০	অকারণ	কৃ	২০০	অকৃতা	কৃ	২০০	অক্ষতযোনি	ক্ষ	২২৩
অংশহর	অংশ্	৪	অকথন	কথ্	১৪৭	অকারান্ত	কৃ	২০০	অকৃতাত্মা	কৃ	২০০	অক্ষত্র	ক্ষ	২২৩
অংশহারী	অংশ্	৩	অকত্থন	কথ্	১৪৭	অকারিয়া	কৃ	২০০	অকৃতার্থ	কৃ	২০০	অক্ষদেবন	অশ্	৪৬
অংশা-অংশী	অংশ্	৪	অকথিত	কথ্	১৪৭	অকার্য্য	কৃ	২০০	অকৃতাস্ত্র	কৃ	২০০	অক্ষদ্যূত	অশ্	৪৬
অংশাংশ	অংশ্	৪	অকথ্য	কথ্	১৪৭	অকার্য্যকারী	কৃ	২০০	অকৃতি	কৃ	২০০	অক্ষদেবী	অশ্	৪৬
অংশাংশি	অংশ্	৪	অকথ্য-কথন	কথ্	১৪৭	অকাল	কল্	১৬৪	অকৃতী	কৃ	২০০	অক্ষধর	অশ্	৪৬
অংশাংশী	অংশ্	৪	অকন্যা	কন্	১৫০	অকালকুষ্মাণ্ড	কল্	১৬৪	অকৃতোদ্বাহ	কৃ	২০০	অক্ষধুঃ	অশ্	৪৬
অংশাবতরণ	অংশ্	৩	অকম্প	কম্প্	১৬০	অকালকুসুম	কল্	১৬৪	অকৃত্ত	কৃ	২০০	অক্ষধূর্ত্ত	অশ্.	৪৬
অংশাবতার	অংশ্	৪	অকম্পন	কম্প্	১৬০	অকালজ	কল্	১৬৪	অকৃত্ত	কৃৎ	২১৩	অক্ষপটল	অশ্	৪৬
অংশিত	অংশ্	৪	অকম্পিত	কম্প্	১৬০	অকালজলোদয়	কল্	১৬৪	অকৃত্য	কৃ	২০০	অক্ষপাটি	অশ্	৪৬
অংশী	অংশ্	৪	অকর	কৃ	২০০	অকালজাত	কল্	১৬৪	অকৃত্রিম	কৃ	২০০	অক্ষপাত	অশ্	৪৬
অংশীদার	অংশ্	৪	অকরণ	কৃ	২০২	অকালজ্ঞ	কল্	১৬৪	অকৃপ	কৃপ্	২১৪	অক্ষপাতন	অশ্	৪৬
অংশানো	অংশ্	৪	অকরণী	কৃ	২০০	অকালবোধন	কল্	১৬৪	অকৃপণ	কৃপ্	২১৪	অক্ষপাদ	অশ্	৪৮
অংশু	অশ্	৪৭	অকরণীয়	কৃ	২০০	অকালমেঘোদয়	কল্	১৬৪	অকৃষ্ট	কৃশ্	২১৫	অক্ষবতী	অশ্	৪৬
অংশুক	অশ্	৪৭	অকরুণ	কৃ,	২১১	অকালসন্ধ্যা	কল্	১৬৪	অকৃষ্টপচ্য	কৃশ্	২১৫	অক্ষবাট	অশ্	৪৯
অংশুজাল	অশ্	৪৭	অকর্ণ	কৃ	২০০	অকালসহ	কল্	১৬৪	অকৃষ্ণ	কৃশ্	২১৫	অক্ষবাপ	অশ্	৪৬
অংশুধর	অশ্	৪৭	অকর্ণ	কর্ণ্	১৬০	অকিঞ্চন	কঞ্চ্	১৩৪	অকেজো	কৃ	২০০	অক্ষবিদ	অশ্	৪৬
অংশুপট্ট	অশ্	৪৭	অকর্ত্তব্য	কৃ	২০০	অকিঞ্চিৎকর	কঞ্চ্	১৩৪	অকৈতব	কিৎ	১৮৩	অক্ষবিদ্যা	অশ্	৪৬
অংশুপতি	অশ্	৪৭	অকর্ত্তা	কৃ	২০০	অকিঞ্চিৎকর	কৃ	২০০	অকোটি	কট্	১৩৬	অক্ষবেত্তা	অশ্	৪৬
অংশুভর্ত্তা	অশ্	৪৭	অকর্ম্ম	কৃ	২০০	অকীর্ত্তি	কৃৎ	২১৩	অক্কা	ক্	২৩৭	অক্ষবৃত্ত	অশ্	৪৬
অংশুমান	অশ্	৪৭	অকর্ম্মক	কৃ	২০০	অকু	ক্	২৩৭	অক্ত	অঞ্জ্	১১	অক্ষভার	অশ্	৪৬
অংশুমালা	অশ্	৪৭	অকর্ম্মকৃৎ	কৃ	২০০	অকুণ্ঠ	কণ্	১৪০	অক্রিয়	কৃ	২০০	অক্ষভূমি	অশ্	৪৬
অংশুমালী	অশ্	৪৭	অকর্ম্মণ্য	কৃ	২০০	অকুণ্ঠিত	কণ্	১৪০	অক্রূর	কৃ	২০০	অক্ষম	ক্ষম্	২২৭
অংশুল	অশ্	৪৭	অকর্ম্মা	কৃ	২০০	অকুণ্ডল	কণ্	১৪০	অক্রূর	কৃৎ	২১৩	অক্ষমদ	অশ্	৪৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অক্ষমা	ক্ষম্	২২৭	অক্ষিলোম	অশ্	৪৬	অগম্যা	গম্	২৬২	অগ্নিকোণ	অঞ্জ্	১১	অগ্নিভূ	অঞ্জ্	১১
অক্ষমালা	অশ্	৪৬	অক্ষুণ্ণ	ক্ষুদ্	২৩৫	অগর	গৃ	২৯০	অগ্নিক্রিয়া	অঞ্জ্	১১	অগ্নিভূতি	অঞ্জ্	১১
অক্ষমালিকা	অশ্	৪৬	অক্ষুব্ধ	ক্ষুভ্	২৩৬	অগরু	গৃ	২৯০	অগ্নিক্রীড়া	অঞ্জ্	১১	অগ্নিমণি	অঞ্জ্	১১
অক্ষমালী	অশ্	৪৬	অক্ষেআতি	খ্যা	২৫১	অগর্ব্ব	গৃ	২৯০	অগ্নিগর্ভ	অঞ্জ্	১১	অগ্নিমন্থন	অঞ্জ্	১১
অক্ষয়	ক্ষি	২৩০	অক্ষেত্র	ক্ষি	২৩০	অগর্হিত	গর্হ্	২৭৮	অগ্নিগৃহ	অঞ্জ্	১১	অগ্নিময়	অঞ্জ্	১১
অক্ষয়তৃণ	ক্ষি	২৩০	অক্ষেত্রজ্ঞ	ক্ষি	২৩০	অগস্ত্য	গম্	২৬৩	অগ্নিচয়ন	অঞ্জ্	১১	অগ্নিমান	অঞ্জ্	১১
অক্ষয়তৃতীয়া	ক্ষি	২৩০	অক্ষেত্রবিৎ	ক্ষি	২৩০	অগহীন	গুহ্	২৮৯	অগ্নিচিৎ	অঞ্জ্	১১	অগ্নিমান্দ্য	অঞ্জ্	১১
অক্ষয়বট	ক্ষি	২৩০	অক্ষেত্রী	ক্ষি	২৩০	অগস্ত্যমার্গ	গম্	২৬২	অগ্নিচূর্ণ	অঞ্জ্	১১	অগ্নিমুখ	অঞ্জ্	১১
অক্ষয়লোক	ক্ষি	২৩০	অক্ষেম	ক্ষম্	২২৭	অগস্ত্যযাত্রা	গম্	২৬২	অগ্নিজ	অঞ্জ্	১১	অগ্নিমূর্ত্তি	অঞ্জ্	১১
অক্ষয্য	ক্ষি	২৩০	অক্ষোট	খ্	২৫২	অগস্ত্যসংহিতা	গম্	২৬২	অগ্নিজন্মা	অঞ্জ্	১১	অগ্নিমূল্য	অঞ্জ্	১১
অক্ষয্যোদক	ক্ষি	২৩০	অক্ষোটক	খ্	২৫২	অগস্ত্যসেবিত	গম্	২৬২	অগ্নিজিহ্ব	অঞ্জ্	১৪	অগ্নিরক্ষণ	অঞ্জ্	১১
অক্ষর	অশ্	৪৯	অক্ষোভ	ক্ষুভ্	২৩৬	অগস্ত্যাচরিত	গম্	২৬২	অগ্নিতুল্য	অঞ্জ্	১১	অগ্নিরেতঃ	অঞ্জ্	১১
অক্ষর	ক্ষর্	২২৮	অক্ষোভ্য	ক্ষুভ্	২৩৬	অগস্ত্যোদয়	গম্	২৬২	অগ্নিত্রয়	অঞ্জ্	১১	অগ্নিলোক	অঞ্জ্	১১
অক্ষরচুঞ্চু	অশ্	৪৬	অক্ষৌহিণী	অশ্	৪৬	অগা	জ্ঞা	৪০০	অগ্নিত্রেতা	অঞ্জ্	১১	অগ্নিশরণ	অঞ্জ্	১১
অক্ষরচ্ছন্দঃ	অশ্	৪৬	অখঁডিত	খণ্ড্	২৪৭	অগাধ	গাহ্	২৮১	অগ্নিদগ্ধ	অঞ্জ্	১১	অগ্নিশালা	অঞ্জ্	১১
অক্ষরজননী	অশ্	৪৬	অখট্টি	খ্	২৫২	অগার	গম্	২৬২	অগ্নিদাতা	অঞ্জ্	১১	অগ্নিশিখ	অঞ্জ্	১১
অক্ষরজীবী	অশ্	৪৬	অখণ্ড	খণ্ড্	২৪৭	অগিনি	গম্	২৬২	অগ্নিদিক	অঞ্জ্	১১	অগ্নিশিখা	অঞ্জ্	১১
অক্ষরতুলিকা	অশ্	৪৬	অখণ্ডন	খণ্ড্	২৪৭	অগিম	গৃ	২৯০	অগ্নিদীপন	অঞ্জ্	১১	অগ্নিশুদ্ধি	অঞ্জ্	১১
অক্ষরন্যাস	অশ্	৪৬	অখণ্ডনীয়	খণ্ড্	২৪৭	অগুণ	গুণ্	২৮৭	অগ্নিদেব	অঞ্জ্	১১	অগ্নিশুশ্রূষা	অঞ্জ্	১১
অক্ষরবিন্যাস	অশ্	৪৬	অখণ্ডমণ্ডল	খণ্ড্	২৪৭	অগুণতি	গুণ্	২৮৭	অগ্নিধারণ	অঞ্জ্	১১	অগ্নিষ্টোম	অঞ্জ্	১৫
অক্ষরব্যক্তি	অশ্	৪৬	অখণ্ডিত	খণ্ড্	২৪৭	অগুরু	গৃ	২৯০	অগ্নিনক্ষত্র	অঞ্জ্	১১	অগ্নিসংস্কার	অঞ্জ্	১১
অক্ষরভূমিকা	অশ্	৪৬	অখণ্ড্য	খণ্ড্	২৪৭	অগূঢ়	গুহ্	২৮৯	অগ্নিনয়ন	অঞ্জ্	১১	অগ্নিসখ	অঞ্জ্	১১
অক্ষরমুষ্টিকাকথন	অশ্	৪৯	অখদ্যে-অবদ্যে	খা	২৫০	অগৃহ	গ্রহ্	৩০১	অগ্নিপক্ক	অঞ্জ্	১১	অগ্নিসঙ্কাশ	অঞ্জ্	১১
অক্ষরসংস্থান	অশ্	৪৬	অখন	ক্ষ্	২২৩	অগেআন	জ্ঞা	৪০০	অগ্নিপরিক্রিয়া	অঞ্জ্	১১	অগ্নিসংকার	অঞ্জ্	১১
অক্ষরসমাম্নায়	অশ্	৪৬	অখর্ব্ব	ক্ষর্	২২৮	অগেয়ান	জ্ঞা	৪০০	অগ্নিপরিচ্ছদ	অঞ্জ্	১১	অগ্নিসন্দীপন	অঞ্জ্	১১
অক্ষরার্থ	অশ্	৪৬	অখলা	ক্ষল্	২২৯	অগেয়ানি	জ্ঞা	৪০০	অগ্নিপরিশুদ্ধি	অঞ্জ্	১১	অগ্নিসম্ভব	অঞ্জ্	১১
অক্ষরেখা	অশ্	৪৬	অখাত	খন্	২৪৮	অগোর	গৃ	২৯০	অগ্নিপরীক্ষা	অঞ্জ্	১৪	অগ্নিসহায়	অঞ্জ্	১১
অক্ষশলাকা	অশ্	৪৬	অখাদ্য	খা	২৫০	অগো	গম্	২৬২	অগ্নিপুরাণ	অঞ্জ্	১১	অগ্নিসাক্ষিক	অঞ্জ্	১১
অক্ষসূত্র	অশ্	৪৬	অখিল	ক্ষি	২৩০	অগোচর	চর্	৩৪০	অগ্নিপ্রণয়ন	অঞ্জ্	১১	অগ্নিসাক্ষী	অঞ্জ্	১৫
অক্ষহৃদয়	অশ্	৪৬	অখিলাত্মা	ক্ষি	২৩০	অগৌণ	গুণ্	২৮৭	অগ্নিপ্রবেশন	অঞ্জ্	১১	অগ্নিসাদ	অঞ্জ্	১১
অক্ষাংশ	অশ্	৪৬	অখেদ	ক্ষ্	২২৩	অগৌণে	গুণ্	২৮৭	অগ্নিপ্রবেশ	অঞ্জ্	১১	অগ্নিস্তম্ভন	অঞ্জ্	১১
অক্ষাগ্রকীল	অশ্	৪৬	অখেয়াতি	খ্যা	২৫১	অগৌণেতে	গুণ্	২৮৭	অগ্নিপ্রস্তর	অঞ্জ্	১১	অগ্নিস্বাত্ত	অঞ্জ্	১৫
অক্ষান্তি	ক্ষ্	২২৩	অখ্যাতি	খ্যা	২৫১	অগৌর	গৃ	২৯০	অগ্নিবর্ণ	অঞ্জ্	১১	অগ্নিহোত্র	অঞ্জ্	১৬
অক্ষাবলী	অশ্	৪৬	অগ	গম্	২৬৩	অগ্নি	গম্	২৬২	অগ্নিবর্দ্ধক	অঞ্জ্	১১	অগ্নিহোত্রী	অঞ্জ্	১১
অক্ষারলবণ	ক্ষর্	২২৮	অগড়বঁগড়	গড়্	২৫৬	অগ্নি	অঞ্জ্	[illegible]২	অগ্নিবর্দ্ধন	অঞ্জ্	১১	অগ্নীধ্র	অঞ্জ্	১৬
অক্ষি	অশ্	৪৯	অগণন	গণ্	২৫৭	অগ্নি	নী	৬৫৫	অগ্নিবাণ	অঞ্জ্	১১	অগ্নীন্ধন	অঞ্জ্	১১
অক্ষিকম্প	অশ্	৪৬	অগণিত	গণ্	২৫৮	অগ্নি-অবতার	অঞ্জ্	১১	অগ্নিবাহ	অঞ্জ্	১১	অগ্নীয়	অঞ্জ্	১১
অক্ষিকূট	অশ্	৪৬	অগণ্য	গণ্	২৫৭	অগ্নিকর্ম্ম	অঞ্জ্	১১	অগ্নিবাহন	অঞ্জ্	১৪	অগ্নীষোম	অঞ্জ্	১১
অক্ষিকোটর	অশ্	৪৬	অগতি	গম্	২৬২	অগ্নিকলা	অঞ্জ্	১৩	অগ্নিবিন্দু	অঞ্জ্	১১	অগ্ন্যাগার	অঞ্জ্	১১
অক্ষিগত	অশ্	৪৬	অগতিক	গম্	২৬২	অগ্নিকল্প	অঞ্জ্	১১	অগ্নিবিসর্প	অঞ্জ্	১১	অগ্ন্যস্ত্র	অঞ্জ্	১১
অক্ষিগোচর	অশ্	৪৬	অগত্যা	গম্	২৬৩	অগ্নিকাণ্ড	অঞ্জ্	১১	অগ্নিবীজ	অঞ্জ্	১১	অগ্ন্যাত্মক	অঞ্জ্	১১
অক্ষিগোলক	অশ্	৪৬	অগথ	গম্	২৬২	অগ্নিকার্য্য	অঞ্জ্	১১	অগ্নিবীর্য্য	অঞ্জ্	১১	অগ্ন্যাধান	অঞ্জ্	১১
অক্ষিপক্ষ্ম	অশ্	৪৬	অগদ	গদ্	২৬১	অগ্নিকাষ্ঠ	অঞ্জ্	১১	অগ্নিবৃদ্ধি	অঞ্জ্	১১	অগ্ন্যালয়	অঞ্জ্	১১
অক্ষিপটল	অশ্	৪৬	অগম	গম্	২৬২	অগ্নিকুণ্ড	অঞ্জ্	১১	অগ্নিবৃষ্টি	অঞ্জ্	১১	অগ্ন্যাহিত	অঞ্জ্	১১
অক্ষিপাক	অশ্	৪৬	অগম্য	গম্	২৬২	অগ্নিকুমার	অঞ্জ্	১৩	অগ্নিবেশ	অঞ্জ্	১৫	অগ্ন্যুৎপাত	অঞ্জ্	১১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অগ্ন্যুদ্গম	অঞ্জ্	১১	অগ্রাক্ষি	অঞ্জ্	১১	অঘোরা	ঘূর্ণ্	৩১২	অঙ্কুশিত	অঙ্ক্	৬	অঙ্গমর্দ্দী	অঙ্গ্	৬
অগ্ন্যুদ্গার	অঞ্জ্	১১	অগ্রাণ	অঞ্জ্	১১	অঘোরি	ঘূর্ণ্	৩১২	অঙ্কুস	অঙ্ক্	৫	অঙ্গমোড়া	অঙ্গ্	৬
অগ্ন্যুদ্গিরণ	অঞ্জ্	১১	অগ্রাণীক	অঞ্জ্	১১	অঘোরী	ঘূর্ণ্	৩১২	অঙ্কোট	অঙ্ক্	৫	অঙ্গযজ্ঞ	অঙ্গ্	৬
অগ্ন্যুদ্ধার	অঞ্জ্	১১	অগ্রানীক	অঞ্জ্	১১	অঘোষ	ঘুষ্	৩১১	অঙ্কোঠ	অঙ্ক্	৫	অঙ্গযষ্টি	অঙ্গ্	৬
অগ্র	অঞ্জ্	১৬	অগ্রাসন	অঞ্জ্	১১	অঘৌষ	ঘুষ্	৩১১	অঙ্কোল	অঙ্ক্	৫	অঙ্গযাগ	অঙ্গ্	৬
অগ্রকর	অঞ্জ্	১১	অগ্রাহ্য	গ্রহ্	৩০১	অঘ্রাণ	অঞ্জ্	১১	অঙ্ক্য	অঙ্ক্	৫	অঙ্গরক্ষক	অঙ্গ্	৬
অগ্রকায়	অঞ্জ্	১১	অগ্রিম	অঞ্জ্	১১	অঘ্রান	অঞ্জ্	১১	অঙ্খোর	অঙ্ক্	৫	অঙ্গরক্ষণী	অঙ্গ্	৬
অগ্রগ	অঞ্জ্	১১	অগ্রিয়	অঞ্জ্	১১	অঘ্রেয়	ঘ্রা	৩১৬	অঙ্গ	অঙ্গ্	৭	অঙ্গরক্ষিণী	অঙ্গ্	৬
অগ্রগণী	অঞ্জ্	১১	অগ্রীয়	অঞ্জ্	১১	অঙ্ক্	অঙ্ক্	৫	অঙ্গ	গম্	২৬২	অঙ্গরাখি	অঙ্গ্	৬
অগ্রগণ্য	অঞ্জ্	১১	অগ্রে	অঞ্জ্	১১	অঙ্ক	অঙ্ক্	৫	অঙ্গক	অঙ্গ্	৬	অঙ্গরাখী	অঙ্গ্	৬
অগ্রগামী	অঞ্জ্	১১	অগ্রেদিধিষু	অঞ্জ্	১১	অঙ্ককরণ	অঙ্ক্	৫	অঙ্গকর্ম্ম	অঙ্গ্	৬	অঙ্গরাগ	অঙ্গ্	৬
অগ্রজ	অঞ্জ্	১৬	অগ্রেসর	অঞ্জ্	১১	অঙ্কগত	অঙ্ক্	৫	অঙ্গক্রিয়া	অঙ্গ্	৬	অঙ্গরাজ	অঙ্গ্	৬
অগ্রজন্মা	অঞ্জ্	১১	অগ্র্য	অঞ্জ্	১১	অঙ্কতন্ত্র	অঙ্ক্	৫	অঙ্গগ্রহ	অঙ্গ্	৬	অঙ্গরুহ	অঙ্গ্	৬
অগ্রজা	অঞ্জ্	১১	অগ্‌গদানী	অঞ্জ্	১১	অঙ্কধারণ	অঙ্ক্	৫	অঙ্গগ্লানি	অঙ্গ্	৬	অঙ্গলেপ	অঙ্গ্	৬
অগ্রজাত	অঞ্জ্	১১	অঘ	ঘ্	৩১৭	অঙ্কন	অঙ্ক্	৫	অঙ্গজ	অঙ্গ্	৬	অঙ্গলোক	অঙ্গ্	৬
অগ্রজাতি	অঞ্জ্	১১	অঘকৃৎ	ঘ্	৩১৭	অঙ্কনৃত্য	অঙ্ক্	৫	অঙ্গজনু	অঙ্গ্	৬	অঙ্গশুদ্ধি	অঙ্গ্	৬
অগ্রজিহ্বা	অঞ্জ্	১১	অঘঘ্ন	ঘ্	৩১৭	অঙ্কপরিবর্ত্ত	অঙ্ক্	৫	অঙ্গজনুঃ	অঙ্গ্	৬	অঙ্গসংস্কার	অঙ্গ্	৬
অগ্রণী	অঞ্জ্	১১	অঘট	ঘট্	৩০৩	অঙ্কপাত	অঙ্ক্	৫	অঙ্গজা	অঙ্গ্	৬	অঙ্গসংক্রিয়া	অঙ্গ্	৬
অগ্রণী	নী	৬৫৫	অঘট-ঘটক	ঘট্	৩০৩	অঙ্কপাশ	অঙ্ক্	৫	অঙ্গণ	অঙ্গ্	৬	অঙ্গসংহতি	অঙ্গ্	৬
অগ্রত	অঞ্জ্	১১	অঘটন	ঘট্	৩০৩	অঙ্কপূরণ	অঙ্ক্	৫	অঙ্গত্রাণ	অঙ্গ্	৬	অঙ্গসঙ্গ	অঙ্গ্	৬
অগ্রতঃ	অঞ্জ্	১১	অঘটনঘটন	ঘট্	৩০৩	অঙ্কবাচক	অঙ্ক্	৫	অঙ্গদ	অঙ্গ্	৭	অঙ্গসেবক	অঙ্গ্	৬
অগ্রদানী	অঞ্জ্	১১	অঘটনঘটনা	ঘট্	৩০৩	অঙ্কবিদ	অঙ্ক্	৫	অঙ্গদা	অঙ্গ্	৬	অঙ্গসেবা	অঙ্গ্	৬
অগ্রদানীয়	অঞ্জ্	১১	অঘটনা	ঘট্	৩০৩	অঙ্কবিদ্যা	অঙ্ক্	৫	অঙ্গধৌতি	ধু	৬০৩	অঙ্গসৌষ্ঠব	অঙ্গ্	৬
অগ্রস্থিত	গঠ্	২৫৪	অঘটিত	ঘট্	৩০৩	অঙ্কমুখ	অঙ্ক্	৫	অঙ্গন	অঙ্গ্	৬	অঙ্গহানি	অঙ্গ্	৬
অগ্রপাণি	অঞ্জ্	১১	অঘনাশক	ঘ্	৩১৭	অঙ্কলক্ষ্মী	অঙ্ক্	৫	অঙ্গনা	অঙ্গ্	৬	অঙ্গহার	অঙ্গ্	৬
অগ্রপাতী	অঞ্জ্	১১	অঘনাশন	ঘ্	৩১৭	অঙ্কশাস্ত্র	অঙ্ক্	৫	অঙ্গনাজন	অঙ্গ্	৬	অঙ্গহীন	অঙ্গ্	৬
অগ্রপাদ	অঞ্জ্	১১	অঘমর্ষণ	ঘ্	৩১৭	অঙ্কস্থ	অঙ্ক্	৫	অঙ্গনাথ	অঙ্গ্	৬	অঙ্গা	অঙ্গ্	৬
অগ্রপূজা	অঞ্জ্	১১	অঘর	ঘ্	৩১৭	অঙ্কস্থিত	অঙ্ক্	৫	অঙ্গনাপ্রিয়	অঙ্গ্	৬	অঙ্গাঙ্গী	অঙ্গ্	৬
অগ্রবীজ	অঞ্জ্	১৭	অঘর্ম্ম	ঘ্	৩১৭	অঙ্কাগত	অঙ্ক্	৫	অঙ্গন্যাস	অঙ্গ্	৬	অঙ্গাঙ্গিত্ব	অঙ্গ্	৬
অগ্রবীর	অঞ্জ্	১১	অঘা	ঘ্	৩১৭	অঙ্কাবতার	অঙ্ক্	৫	অঙ্গপ্রত্যঙ্গ	অঙ্গ্	৬	অঙ্গাধিপ	অঙ্গ্	৬
অগ্রভাগ	অঞ্জ্	১১	অঘাট	ঘট্	৩০৩	অঙ্কিত	অঙ্ক্	৫	অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত	অঙ্গ্	৬	অঙ্গাধীশ	অঙ্গ্	৬
অগ্রভূমি	অঞ্জ্	১১	অঘাট-অপাট	ঘট্	৩০৩	অঙ্কিনী	অঙ্ক্	৫	অঙ্গবিকল	অঙ্গ্	৬	অঙ্গাধীশ্বর	অঙ্গ্	৬
অগ্রমাংস	অঞ্জ্	১১	অঘাটি	ঘট্	৩০৩	অঙ্কী	অঙ্ক্	৫	অঙ্গবিকার	অঙ্গ্	৬	অঙ্গাঙ্গিভাব	অঙ্গ্	৬
অগ্রমাস	অঞ্জ্	১১	অঘান	অঞ্জ্	১১	অঙ্কুর	অঙ্ক্	৬	অঙ্গবিকৃতি	অঙ্গ্	৬	অঙ্গার	অঙ্গ্	৭
অগ্রযান	অঞ্জ্	১১	অঘায়ুঃ	ঘ্	৩১৭	অঙ্কুরণ	অঙ্ক্	৬	অঙ্গবিক্ষেপ	অঙ্গ্	৬	অঙ্গারক	অঙ্গ্	৬
অগ্রযায়ী	অঞ্জ্	১১	অঘাস	গ্রস্	৩০০	অঙ্কুরপর্ব্বত	অঙ্ক্	৬	অঙ্গবিদ্যা	অঙ্গ্	৬	অঙ্গারকারক	অঙ্গ্	৬
অগ্রযোধী	অঞ্জ্	১১	অঘাসি	গ্রস্	৩০০	অঙ্কুরি	অঙ্ক্	৫	অঙ্গবিধি	অঙ্গ্	৬	অঙ্গারকারী	অঙ্গ্	৬
অগ্রসংখ্যা	অঞ্জ্	১১	অঘাসুর	ঘ্	৩১৮	অঙ্কুরী	অঙ্ক্	৫	অঙ্গবৈকৃত	অঙ্গ্	৬	অঙ্গারধানিকা	অঙ্গ্	৬
অগ্রসন্ধ্যা	অঞ্জ্	১১	অঘোর	ঘূর্ণ্	৩১২	অঙ্কুরিত	অঙ্ক্	৬	অঙ্গবৈগুণ্য	অঙ্গ্	৬	অঙ্গারধানী	অঙ্গ্	৬
অগ্রসর	অঞ্জ্	১৭	অঘোরঘোররূপ	ঘূর্ণ্	৩১২	অঙ্কুরোদ্গম	অঙ্ক্	৫	অঙ্গভঙ্গ	অঙ্গ্	৬	অঙ্গারপর্ণ	অঙ্গ্	৭
অগ্রসারী	অঞ্জ্	১১	অঘোরপথ	ঘূর্ণ্	৩১২	অঙ্কুশ	অঙ্ক্	৬	অঙ্গভঙ্গি	অঙ্গ্	৬	অঙ্গারপাত্রী	অঙ্গ্	৬
অগ্রসূচী	অঞ্জ্	১১	অঘোরপথী	ঘূর্ণ্	৩১২	অঙ্কুশগ্রহ	অঙ্ক্	৬	অঙ্গভঙ্গী	অঙ্গ্	৬	অঙ্গারশকটী	অঙ্গ্	৬
অগ্রহস্ত	অঞ্জ্	১১	অঘোরপন্থী	ঘূর্ণ্	৩১২	অঙ্কুশদুর্দ্ধর	অঙ্ক্	৫	অঙ্গভূ	অঙ্গ্	৬	অঙ্গারিকা	অঙ্গ্	৬
অগ্রহায়ণ	অঞ্জ্	১১	অঘোরপ্রমাণ	ঘূর্ণ্	৩১২	অঙ্কুশমুদ্রা	অঙ্ক্	৫	অঙ্গমর্দ্দ	অঙ্গ্	৬	অঙ্গির	অঙ্গ্	৬
অগ্রহার	অঞ্জ্	১৭	অঘোরমার্গ	ঘূর্ণ্	৩১২	অঙ্কুশি(শী)	অঙ্ক্	৬	অঙ্গমর্দ্দক	অঙ্গ্	৬	অঙ্গিরসগণ	অঙ্গ্	৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অঙ্গিরা	অঙ্গ্	৮	অঙ্ঘ্	অঙ্গ্	৬	অচিরে	চি	৩৪৬	অজর	জৄ	৩৯৭	অজিহ্মগ	জ্	৪০৩
অঙ্গী	অঙ্গ্	৬	অঙ্ঘ	অঙ্গ্	৬	অচিহ্ন	চিন্ত্	৩৫২	অজরা	জৄ	৩৯৭	অজিহ্মগামী	জ্	৪০৩
অঙ্গীকর	অঙ্গ্	৬	অঙ্ঘঃ	অঙ্গ্	৮	অচেত	চি	৩৪৬	অজরাইল	জৄ	৩৯৭	অজী	জন্	৩৭৮
অঙ্গীকরণ	অঙ্গ্	৬	অঙ্ঘ্রি	অঙ্গ্	৮	অচেতন	চি	৩৪৬	অজরামর	জৄ	৩৯৭	অজীগর্ত্ত	জন্	৩৮১
অঙ্গীকরণ	কৃ	২০০	অঙ্ঘ্রিকমল	অঙ্গ্	৬	অচেনা	চি	৩৪৬	অজল	জ্	৪০৩	অজীব	জীব্	৩৯৪
অঙ্গীকার	কৃ	২০০	অঙ্ঘ্রিজা	অঙ্গ্	৮	অচেষ্ট	চেষ্ট্	৩৫৬	অজল-অস্থল	জ্	৪০৩	অজীবন	জীব্	৩৯৪
অঙ্গীকার	অঙ্গ্	৮	অঙ্ঘ্রিপ	অঙ্গ্	৬	অচৈতন্য	চি	৩৪৬	অজস্র	জ্	৪০৪	অজীর্ণ	জৄ	৩৯৭
অঙ্গীকার্য্য	অঙ্গ্	৬	অঙ্ঘ্রিপঙ্কজ	অঙ্গ্	৬	অচ্ছ	ছো	৩৭০	অজা	জন্	৩৭৮	অজীর্ণী	জৄ	৩৯৭
অঙ্গীকার্য্য	কৃ	২০০	অঙ্ঘ্রিপঞ্জর	অঙ্গ্	৬	অচ্ছাবাক	ছো	৩৭০	অজাকৃপাণীয়	জন্	৩৭৮	অজু	উজ্	৮৪
অঙ্গীকৃত	কৃ	২০০	অঙ্ঘ্রিপদ্ম	অঙ্গ্	৬	অচ্ছোদ	ছো	৩৭০	অজাগর	জন্	৩৭৮	অজুগুপ্সা	গুপ্	২৮৮
অঙ্গীকৃত	অঙ্গ্	৬	অচক্র	চক্	৩১৯	অচ্ছিদ্র	ছিদ্	৩৬৭	অজাগলস্তন	জন্	৩৭৮	অজুগুপ্সিত	গুপ্	২৮৮
অঙ্গীভূত	অঙ্গ্	৮	অচক্ষু	চক্	৩১৯	অচ্ছিদ্রাবধারণ	ছিদ্	৩৬৭	অজাজীব	জন্	৩৭৮	অজুনামা	উজ্	৮৪
অঙ্গুটী	অঙ্গ্	৬	অচক্ষুঃ	চক্	৩১৯	অচ্ছিন্ন	ছিদ্	৩৬৭	অজাশু	জন্	৩৭৮	অজুহাত	উজ্	৮৪
অঙ্গুরি	অঙ্গ্	৬	অচক্ষুর্বিষয়	চক্	৩১৯	অচ্ছেদ	ছিদ্	৩৬৭	অজাত	জন্	৩৭৮	অজেয়	জি	৩৯১
অঙ্গুরী	অঙ্গ্	৬	অচঞ্চল	চম্	৩৩৭	অচ্ছেদ্য	ছিদ্	৩৬৭	অজা'ত	জন্	৩৭৮	অজৈকপাদ	জন্	৩৭৮
অঙ্গুরীয়	অঙ্গ্	৬	অচট	চট্	৩২৪	অচ্যুত	চ্যু	৩৫৬	অজাতপক্ষ	জন্	৩৭৮	অজ্যেষ্ঠবৃত্তি	জ্	৪০৩
অঙ্গুরীয়ক	অঙ্গ্	৬	অচণ্ড	চণ্	৩২৮	অচ্যুতাগ্রজ	চ্যু	৩৫৬	অজাতব্যঞ্জন	জন্	৩৭৮	অজ্ঞ	জ্ঞা	৪০০
অঙ্গুল	অঙ্গ্	৮	অচর	চর্	৩৪০	অচ্যুতাঙ্গজ	চ্যু	৩৫৬	অজাতব্যবহার	জন্	৩৭৮	অজ্ঞাত	জ্ঞা	৪০০
অঙ্গুলি	অঙ্গ্	৮	অচরম	চর্	৩৪০	অচ্যুতাত্মজ	চ্যু	৩৫৬	অজাতশত্রু	জন্	৩৮০	অজ্ঞাতকুলশীল	জ্ঞা	৪০০
অঙ্গুলী	অঙ্গ্	৮	অচল	চল্	৩৪৫	অচ্যুতি	চ্যু	৩৫৬	অজাতশ্মশ্রু	জন্	৩৭৮	অজ্ঞাতবাস	জ্ঞা	৪০০
অঙ্গুলিচালন	অঙ্গ্	৬	অচলকন্যকা	চল্	৩৪৫	অছ	অস্	৫৬	অজাতারি	জন্	৩৭৮	অজ্ঞাতচর্য্যা	জ্ঞা	৪০০
অঙ্গুলিত্র	অঙ্গ্	৬	অচলকন্যা	চল্	৩৪৫	অজ	জন্	৩৭৯	অজাতি	জন্	৩৭৮	অজ্ঞাতযৌবনা	জ্ঞা	৪০০
অঙ্গুলিত্রাণ	অঙ্গ্	৬	অচলনন্দিনী	চল্	৩৪৫	অজক্ষীর	জন্	৩৭৮	অজান	জন্	৩৭৮	অজ্ঞাতসারে	জ্ঞা	৪০০
অঙ্গুলিধ্বনি	অঙ্গ্	৬	অচলজ	চল্	৩৪৫	অজগন্ধা	জন্	৩৭৮	অজানত	জন্	৩৭৮	অজ্ঞাতি	জ্ঞা	৪০০
অঙ্গুলিপঞ্চক	অঙ্গ্	৬	অচলপতি	চল্	৩৪৫	অজগন্ধিকা	জন্	৩৭৮	অজানা	জন্	৩৭৮	অজ্ঞান	জ্ঞা	৪০০
অঙ্গুলিপর্ব্ব	অঙ্গ্	৬	অচলরাজ	চল্	৩৪৫	অজগব	জন্	৩৭৯	অজানি	জন্	৩৭৮	অজ্ঞানতঃ	জ্ঞা	৪০০
অঙ্গুলিপীড়িত	অঙ্গ্	৬	অচলা	চল্	৩৪৫	অজগর	জন্	৩৭৯	অজানিত	জন্	৩৭৮	অজ্ঞানতিমির	জ্ঞা	৪০০
অঙ্গুলিমুখ	অঙ্গ্	৬	অচাক	চক্	৩১৯	অজঘন্য	জ্	৪০৩	অজাপুত্র	জন্	৩৭৮	অজ্ঞানী	জ্ঞা	৪০০
অঙ্গুলিমুদ্রা	অঙ্গ্	৬	অচাকনির্ম্মাণ	চক্	৩১৯	অজচ্ছল	জন্	৩৭৮	অজামিল	জন্	৩৮০	অজ্বর	জ্বর্	৪০২
অঙ্গুলিমোটন	অঙ্গ্	৬	অচিকিৎসা	চি	৩৪৬	অজজীবিক	জন্	৩৭৮	অজারেণু	জন্	৩৭৮	অঝর	ঝৄ	৪১৩
অঙ্গুলিসংজ্ঞা	অঙ্গ্	৬	অচিকিৎস্য	চি	৩৪৬	অজড়	জ্	৪০৩	অজাশাল	জন্	৩৭৮	অঝরনয়ন	ঝৄ	৪১৩
অঙ্গুলিসন্দেশ	অঙ্গ্	৬	অচিৎ	চি	৩৪৬	অজদেবতা	জন্	৩৭৮	অজিত	জি	৩৯২	অঝরনয়নে	ঝৄ	৪১৩
অঙ্গুলিস্ফোটন	অঙ্গ্	৬	অচিত্ত	চি	৩৪৬	অজন	জন্	৩৭৮	অজিতবল্লভা	জি	৩৯১	অঝোর	ঝৄ	৪১৩
অঙ্গুলী	অঙ্গ্	৮	অচিন	চি	৩৪৬	অজন্ত	জ্	৪০৩	অজিতাত্মা	জি	৩৯১	অঝোরঝরণে	ঝৄ	৪১৩
অঙ্গুলীপঞ্চক	অঙ্গ্	৬	অচিন্তনীয়	চিন্ত্	৩৫২	অজন্মা	জন্	৩৭৮	অজিতেন্দ্রিয়	জি	৩৯১	অঝোরনয়নে	ঝৄ	৪১৩
অঙ্গুলীয়	অঙ্গ্	৬	অচিন্তিত	চিন্ত্	৩৫২	অজন্মিত	জন্	৩৭৮	অজিন	জন্	৩৮০	অঞ্চ্	অঞ্চ্	৯
অঙ্গুলীয়ক	অঙ্গ্	৬	অচিন্ত্য	চিন্ত্	৩৫২	অজন্য	জন্	৩৭৮	অজিনপত্রা	জন্	৩৭৮	অঞ্চ	অঞ্চ্	৯
অঙ্গুষ্ঠ	অঙ্গ্	৬	অচির	চি	৩৪৬	অজপ	জপ্	৩৮৭	অজিনপত্রী	জন্	৩৭৮	অঞ্চল	অঞ্চ্	৯
অঙ্গুষ্ঠপুরুষ	অঙ্গ্	৬	অচিরক্রিয়	চি	৩৪৬	অজপা	জপ্	৩৮৭	অজিনবাসী	জন্	৩৭৮	অঞ্চলপ্রভাব	অঞ্চ্	৯
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ	অঙ্গ্	৬	অচিরদ্যুতি	চি	৩৪৬	অজবীথি	জন্	৩৭৮	অজিনযোনি	জন্	৩৮০	অঞ্চিত	অঞ্চ্	১০
অঙ্গুষ্ঠমাত্র	অঙ্গ্	৬	অচিরপ্রভ	চি	৩৪৬	অজবীথী	জন্	৩৭৮	অজির	জন্	৩৭৮	অঞ্জ	অঞ্জ্	১৭
অঙ্গুষ্ঠমাত্রক	অঙ্গ্	৬	অচিরাংশু	চি	৩৪৬	অজমীঢ়	জন্	৩৭৮	অজিরাবতী	জন্	৩৭৮	অঞ্জন	অঞ্জ্	১৭
অঙ্গুষ্ঠমূল	অঙ্গ্	৬	অচিরাৎ	চি	৩৪৬	অজমুখ	জন্	৩৭৯	অজিহ্ম	জ্	৪০৩	অঞ্জনশলাকা	অঞ্জ্	১১
অঙ্গোত্তম	অঙ্গ্	৬	অচিরাতে	চি	৩৪৬	অজয়	জি	৩৯২	অজিহ্ম	জি	৩৯১	অঞ্জনা	অঞ্জ্	১৮
অঙ্গোপাঙ্গ	অঙ্গ্	৬	অচিরাভা	চি	৩৪৬	অজয়া	জি	৩৯২	অজিহ্ম	জ্	৪০৩	অঞ্জনাগিরি	অঞ্জ্	১১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অঞ্জনাদ্রি	অঞ্জ্	১১	অণুবীক্ষণ	অণ্	২১	অতপস্ক	তপ্	৪৫৯	অতিদর্প	দৃপ্	৫৬৫	অতুল	তু	৪৭৪
অঞ্জনাহৃদয়নন্দন	অঞ্জ্	১১	অণুমাত্র	অণ্	২১	অতপাঃ	তপ্	৪৫৯	অতিদর্শী	দৃশ্	৫৬৬	অতুলন	তু	৪৭১
অঞ্জনিকা	অঞ্জ্	১১	অণুমাত্রিক	অণ্	২১	অতয়ে	অত্	২২	অতিদান	দা	৫২১	অতুলনীয়	তু	৪৭১
অঞ্জনিত	অঞ্জ্	১১	অণুরেণু	অণ্	২১	অতর্ক	তর্	৪৬৪	অতিদারুণ	দৃ	৫৬০	অতুলিত	তু	৪৭১
অঞ্জলি	অঞ্জ্	১৮	অণ্ড	অণ্	২১	অতর্কিত	তর্	৪৬৪	অতিদাহ	দহ্	৫২০	অতুল্য	তু	৪৭৪
অঞ্জলিকর্ম্ম	অঞ্জ্	১১	অণ্ড	অঙ্গ্	৬	অতর্কিতোপপন্ন	তর্	৪৬৪	অতিদীন	দী	৫৪৪	অতৃপ্ত	তৃ	৪৭৭
অঞ্জলিপুট	অঞ্জ্	১১	অণ্ড	অম্	৩৬	অতর্ক্য	তর্	৪৬৪	অতিদীর্ঘ	দৃ	৫৬০	অতেব	অত্	২২
অঞ্জলিবন্ধন	অঞ্জ্	১১	অণ্ডক	অম্	৩৬	অতল	তল্	৪৬৫	অতিদুর্গত	গম্	২৬২	অতৈল	তি	৪৬৭
অঞ্জস	অঞ্জ্	১৮	অণ্ডক	অণ্	২১	অতলন্ত	তল্	৪৬৫	অতিদূর	ই	৬৫	অতৈলপুর	তি	৪৬৭
অঞ্জসা	অঞ্জ্	১৮	অণ্ডকটাহ	অণ্	২১	অতলস্পর্শ	তল্	৪৬৫	অতিদেব	দিব্	৫২৭	অত্তব্য	অদ্	২৬
অঞ্জিত	অঞ্জ্	১১	অণ্ডকটাহ	অম্	৩৬	অতলান্ত	তল্	৪৬৫	অতিদেশ	দিশ্	৫৩৬	অত্তা	অদ্	২৫
অঞ্জীর	অঞ্জ্	১১	অণ্ডকাটা	অণ্	২১	অতসী	অত্	২৩	অতিদোহ	দুহ্	৫৫৬	অত্যঙ্কুশ	অঙ্ক্	৫
অট্	অট্	২০	অণ্ডকোশ	অম্	৩৬	অতি	অত্	২৩	অতিদোহন	দুহ্	৫৫৬	অত্যধিক	ধা	৫৯০
অট	অট্	২০	অণ্ডকোশ	অণ্	২১	অতিকথা	কথ্	১৪৭	অতিনীচ	চি	৩৪৬	অত্যন্ত	অম্	৩৬
অট-অট	অট্	২০	অণ্ডকোষ	অণ্	২১	অতিকল্য	কল্	১৬৪	অতিনিদ্র	দ্রা	৫৭৪	অত্যন্ত	অত্	২৪
অটন	অট্	২০	অণ্ডকোষ	অম্	৩৬	অতিকশ	কশ্	১৭৩	অতিপরিচয়	চি	৩৪৬	অত্যন্তকোপন	অম্	৩৬
অটনী	অট্	২০	অণ্ডকোষক	অম্	৩৬	অতিকা	ক্	২৩৭	অতিপ্রকাশ	কশ্	১৭৩	অত্যন্তগত	অম্	৩৬
অটবি	অট্	২০	অণ্ডকোষক	অণ্	২১	অতিকায়	ক্	২৩৭	অতিপ্রকৃত	কৃ	২০০	অত্যন্তনিবৃত্তি	অম্	৩৬
অটবী	অট্	২০	অণ্ডজ	অণ্	২২	অতিকাল	কল্	১৬৪	অতিপ্রণয়	নী	৬৫৫	অত্যন্তবিমুখ	অম্	৩৬
অটল	টঙ্গ্	৪২২	অণ্ডজ	অঙ্গ্	৬	অতিকৃচ্ছ্র	কৃ	২০০	অতিপ্রাকৃত	কৃ	২০০	অত্যন্তশিশু	অম্	৩৬
অটুট	ট্	৪২৩	অণ্ডজ	অম্	৩৬	অতিকৃত	কৃ	২০০	অতিপ্রাকৃত	অত্	২৩	অত্যন্তাভাব	অম্	৩৬
অট্ট্	অট্	২০	অণ্ডজেশ্বর	অম্	৩৬	অতিক্রম	ক্রম্	২২০	অতিবাহ	অত্	২৪	অত্যম্ল,	অম্	৩৬
অট্ট	অট্	২০	অণ্ডজেশ্বর	অণ্	২১	অতিক্রমণ	ক্রম্	২১৯	অতিবাহক	অত্	২৩	অত্যয়	ই	৬৫
অট্ট-অট্ট	অট্	২০	অণ্ডবর্দ্ধন	অণ্	২১	অতিক্রমণীয়	ক্রম্	২১৯	অতিবাহিত	অত্	২৪	অত্যর্থ	অর্থ্	৪৩
অট্টট্ট	অট্	২০	অণ্ডবর্দ্ধন	অম্	৩৬	অতিক্রমী	ক্রম্	২১৯	অতিব্যয়	ই	৬৫	অত্যল্প	অল্	৪৪
অট্টহসিত	অট্	২০	অণ্ডবৃদ্ধি	অম্	৩৬	অতিক্রান্ত	ক্রম্	২১৯	অতিব্যস্ত	অস্	৫৬	অত্যশন	অশ্	৪৬
অট্টহাস	অট্	২০	অণ্ডবৃদ্ধি	অণ্	২১	অতিক্রূর	কৃৎ	২১৩	অতিব্যাপক	আপ্	৫৯	অত্যহিত	ধা	৫৯০
অট্টহাসি	অট্	২০	অণ্ডাকর্ষণ	অম্	৩৬	অতিক্ষীণ	ক্ষি	২৩০	অতিব্যাপ্ত	আপ্	৫৯	অত্যাগ	ত্য	৪৮৭
অট্টহাস্য	অট্	২০	অণ্ডাকার	অণ্	২১	অতিখর	ক্ষর্	২২৮	অতিযশাঃ	অশ্	৪৬	অত্যাগসহন	ত্য	৪৮৭
অট্টাল	অট্	২০	অণ্ডাকার	অম্	৩৬	অতিগ	গম্	২৬২	অতিরেক	ই	৬৫	অত্যাগী	ত্য	৪৮৭
অট্টালক	অট্	২০	অণ্ডাকৃতি	অম্	৩৬	অতিগণ্ড	গণ্	২৫৭	অতিসঞ্চয়	চি	৩৪৬	অত্যাচার	চর্	৩৪০
অট্টালিকা	অট্	২০	অত্	অত্	২৩	অতিগন্ধ	গণ্	২৫৭	অতিসন্ধান	ধা	৫৯০	অত্যাচার	অত্	২৪
অট্টালিকাকার	অট্	২০	অত	অত্	২৩	অতিগহন	গুহ্	২৮৯	অতিসন্ধি	ধা	৫৯০	অত্যাচারী	চর্	৩৪০
অট্টালী	অট্	২০	অতএ	অত্	২৩	অতিগুণ	গুণ্	২৮৭	অতিসন্ধিত	ধা	৫৯০	অত্যাজ্য	ত্য	৪৮৭
অঠেল	ঠ্	৪২৮	অতএব	অত্	২৩	অতিগুরু	গৃ	২৯০	অতিসন্ধ্যা	ধ্যৈ	৬১৫	অত্যাদর	দৃ	৫৬০
অড়	ড্	৪৩৯	অতঃ	অত্	২৩	অতিচার	চর্	৩৪০	অতিসন্নিধান	ধা	৫৯০	অত্যানন্দ	নন্দ্	৬২৭
অঢেল	ঢঙ্গ্	৪৪৮	অতঃপর	অত্	২৩	অতিজব	জু	৩৯৬	অতিসমীপ	আপ্	৫৯	অত্যাহিত	ধা	৫৯০
অণ্	অণ্	২১	অতট	তৃ	৪৯৫	অতিজর	জৃ	৩৯৭	অতিসুন্দর	উন্দ্	১০২	অত্যুগ্র	উচ্	৮২
অণি	অণ্	২১	অতদ্গুণ	তৃ	৪৯৫	অতিজাত	জন্	৩৭৮	অতিসৌহিত্য	ধা	৫৯০	অত্যুচ্চ	চি	৩৪৬
অণিমা	অণ্	২১	অতনু	তন্	৪৫৩	অতিডীন	ডী	৪৩৭	অতীত	ই	৬৭	অত্যুৎকট	কট্	১৩৬
অণী	অণ্	২১	অতন্ত্র	তন্	৪৫৩	অতিতর	তৃ	৪৭৭	অতীত	অত্	২৪	অত্যুষ্ণ	উষ্	১০৯
অণীমাশুব্য	অণ্	২১	অতন্ত্রী	তন্	৪৫৩	অতিতার	তৃ	৪৭৭	অতীতবেদী	ই	৬৫	অত্র	অদ্	২৬
অণীয়ান	অণ্	২১	অতন্দ্র	তন্	৪৫৩	অতিতৃপ্ত	তৃ	৪৭৭	অতীন্দ্রিয়	হন্দ্	৭৪	অত্রত্য	অদ্	২৫
অণু	অণ্	২১	অতন্দ্রিত	তন্	৪৫৩	অতিতৃষ্ণ	তৃ	৪৭৭	অতীব	অত্	২২	অত্রপ	ত্র	৪৮৮
অণুবাদ	অণ্	২১	অতন্দ্রী	তন্	৪৫৩	অতিথি	অত্	২৩	অতুর	তৃ	৪৯৫	অত্রপা	ত্র	৪৮৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অত্রভবান	অদ্	২৫	অদিন	দো	৫৬৯	অদ্বয়	দ্বি	৫৮০	অধর্ম্ম	ধৃ	৬০৬	অধিদেবতা	ধা	৫৯৩
অত্রযোগ	অদ্	২৫	অদিতি	দো	৫৬৯	অদ্বয়বাদ	দ্বি	৫৮০	অধর্ম্মদণ্ডন	ধৃ	৬০৬	অধিদেবী	ধা	৫৯৩
অত্রস্ত	ত্র	৪৮৮	অদিষ্ট	দৃশ্	৫৬৬	অদ্বয়বাদী	দ্বি	৫৮০	অধর্ম্মনিয়ম	ধৃ	৬০৬	অধিদৈব	ধা	৫৯১
অত্রস্থ	অদ্	২৬	অদীন	দী	৫৪৪	অদ্বার	দ্বি	৫৮০	অধর্ম্মভীরু	ধৃ	৬০৬	অধিদৈবত	ধা	৫৯১
অত্রি	অদ্	২৫	অদীনসত্ত্ব	দী	৫৪৪	অদ্বিতীয়	দ্বি	৫৮০	অধর্ম্মাচারী	ধৃ	৬০৬	অধিনাথ	ধা	৫৯১
অত্রিজ	অদ্	২৫	অদীর্ঘসূত্র	দৃশ্	৫৬৬	অদ্বৈত	দ্বি	৫৮১	অধর্ম্মিষ্ঠ	ধৃ	৬০৬	অধিনী	ধা	৫৯১
অত্রিজাত	অদ্	২৫	অদূর	ই	৬৫	অদ্বৈতবাদ	দ্বি	৫৮০	অধর্ম্মী	ধৃ	৬০৬	অধিপতি	ধা	৫৭৩
অত্রিনেত্রজ	অদ্	২৫	অদূরদর্শী	ই	৬৫	অদ্বৈতবাদী	দ্বি	৫৮০	অধর্ম্ম্য	ধৃ	৬০৬	অধিবাস	ধা	৫৯৩
অত্রিনেত্রপ্রভব	অদ্	২৫	অদূরবর্ত্তী	ই	৬৫	অদ্বৈধ	দ্বি	৫৮০	অধস্তন	ধা	৫৯১	অধিবাসডালা	ধা	৫৯৩
অত্রিনেত্রপ্রসূত	অদ্	২৫	অদৃশ্য	দৃশ্	৫৬৬	অধ	ধা	৫৯১	অধস্তল	ধা	৫৯১	অধিবাসদ্রব্য	ধা	৫৯৩
অত্রিনেত্রভব	অদ্	২৫	অদৃষ্ট	দৃশ্	৫৬৬	অধঃ	ধা	৫৯১	অধানন	ধা	৫৯১	অধিবাসন	ধা	৫৯৩
অত্রিসংহিতা	অদ্	২৫	অদৃষ্টকর্ম্মা	দৃশ্	৫৬৬	(অধস্)	ধা	৫৯১	অধার্ম্মিক	ধা	৫৯১	অধিবিন্না	ধা	৫৯১
অত্বরা	ত্বৃ	৪৯৪	অদৃষ্টচর	দৃশ্	৫৬৬	অধঃকরণ	ধা	৫৯১	অধার্য্য	ধা	৫৯১	অধিবেদ	ধা	৫৯১
অথ	থ	৪৯৭	অদৃষ্টপূর্ব্ব	দৃশ্	৫৬৬	অধঃকৃত	ধা	৫৯১	অধি	ধা	৫৯১	অধিবেদন	ধা	৫৯১
অথই	থ	৪৯৫	অদৃষ্টবান	দৃশ্	৫৬৬	অধঃপতন	ধা	৫৯১	অধিক	ধা	৫৯২	অধিবেষ্টিত	ধা	৫৯১
অথচ	থ্	৪৯৭	অদৃষ্টায়ত্ত	দৃশ্	৫৬৬	অধঃপাত	ধা	৫৯১	অধিকদন্ত	ধা	৫৯১	অধিভূ	ধা	৫৯১
অথবা	থ্	৪৯৭	অদেখ	দৃশ্	৫৬৬	অধঃশিরা	ধা	৫৯১	অধিকন্তু	ধা	৫৯১	অধিভূত	ধা	৫৯১
অথবেথে	অস্	৫৬	অদেখা	দৃশ্	৫৬৬	অধঃশিরস	ধা	৫৯১	অধিকম্	ধা	৫৯১	অধিমাস	ধা	৫৯১
অথব্যথে	অস্	৫৬	অদেব	দিব্	৫২৭	অধগতি	ধা	৫৯১	অধিকরণ	কৃ	২০০	অধিযজ্ঞ	ধা	৫৯১
অথর্ব্ব	থ্	৪৯৮	অদেবমাতৃক	দিব্	৫২৭	অধন	ধন্	৫৮৭	অধিকরণ	ধা	৫৯২	অধিযোধ	ধা	৫৯১
অদ্	অদ্	২৫	অদেয়	দা	৫২১	অধন্য	ধুন্	৫৮৭	অধিকরণিক	ধা	৫৯২	অধিরথ	ধা	৫৯৪
অদক্ষিণ	দক্ষ্	৫০২	অদেশ	দিশ্	৫৩৬	অধপাত	ধা	৫৯১	অধিকর্ত্তা	ধা	৫৯২	অধিরাজ	ধা	৫৯১
অদগ্ধ	দহ্	৫২০	অদৈন্য	দী	৫৪৪	অধভূম	ধা	৫৯১	অধিকাঙ্গ	ধা	৫৯১	অধিরাজ্য	ধা	৫৯১
অদণ্ড্য	দং	৫১০	অদোষ	দু	৫৪৬	অধম	ধা	৫৯১	অধিকার	কৃ	২০০	অধিরূঢ়	ধা	৫৯১
অদত্ত	দা	৫২১	অদ্দ	ঋধ্	১২১	অধমর্ণ	ধা	৫৯১	অধিকার	ধা	৫৯২	অধিরোপণ	ধা	৫৯১
অদন	অদ্	২৫	অদ্দেক	ঋধ্	১২১	অধমা	ধা	৫৯১	অধিকারী	ধা	৫৯১	অধিরোহ	ধা	৫৯১
অদন্ত	দং	৫১০	অদ্ধে	ধা	৫৯১	অধমাঙ্গ	ধা	৫৯১	অধিকারী	কৃ	২০০	অধিরোহণী	ধা	৫৯১
অদভ্র	দং	৫১০	অদ্ধেক	ঋধ্	১২১	অধমাধম	ধা	৫৯১	অধিকারস্থ	ধা	৫৯২	অধিরোহিণী	ধা	৫৯১
অদম্ভ	দং	৫১০	অদ্য	অদ্	২৬	অধমুখ	ধা	৫৯১	অধিকারারূঢ়বৈশিষ্ট্য	ধা	৫৯১	অধিরোহী	ধা	৫৯১
অদম্য	দং	৫১০	অদ্য	অ	৫৯	অধর্ম্ম	ধৃ	৬০৬	অধিকৃত	কৃ	২০০	অধিশ্রয়	ধা	৫৯১
অদয়	দয়্	৫১৮	অদ্যকার	অ	৫৯	অধর	ধৃ	৬০৬	অধিক্ষিপ্ত	ক্ষিপ্	২৩৩	অধিশ্রয়ণ	ধা	৫৯১
অদরিদ্র	দৃ	৫৬০	অদ্যকালে	অ	৫৯	অধরপান	ধৃ	৬০৬	অধিক্ষেপ	ক্ষিপ্	২৩৩	অধিশ্রী	ধা	৫৯১
অদর্শন	দৃশ্	৫৬৬	অদ্যতন	অ	৫৯	অধরবিম্ব	ধৃ	৬০৬	অধিগত	গম্	২৬২	অধীত্ত	ই	৬৫
অদলবদল	দ্	৫৮৪	অদ্যপ্রসূত	অ	৫৯	অধরবিম্বক	ধৃ	৬০৬	অধিগন্তব্য	গম্	২৬২	অধীন	ধা	৫৯৪
অদলা	দ্	৫৮৪	অদ্যভক্ষ্য	অ	৫৯	অধরমদিরা	ধৃ	৬০৬	অধিগমন	গম্	২৬২	অধীনস্থ	ধা	৫৯১
অদাতা	দা	৫২১	অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ	অ	৫৯	অধরমধু	ধৃ	৬০৬	অধিগম্য	গম্	২৬২	অধীনী	ধা	৫৯১
অদান	দা	৫২১	অদ্যাপি	অ	৫৯	অধররস	ধৃ	৬০৬	অধিগুণ	ধা	৫৯১	অধীনে	ধা	৫৯১
অদায়	দা	৫২১	অদ্যাবধি	অ	৫৯	অধরসঙ্গম	ধৃ	৬০৬	অধিজনন	ধা	৫৯১	অধীয়মান	ধা	৫৯১
অদায়াদ	দা	৫২১	অদ্রি	অদ্	২৭	অধরসুধা	ধৃ	৬০৬	অধিজিহ্বা	ধা	৫৯১	অধীর	ধ্যৈ	৬১৫
অদায়াদবান্ধব	দা	৫২১	অদ্রিকা	অদ্	২৭	অধরামৃত	ধৃ	৬০৬	অধিজ্য	ধা	৫৯১	অধীশ	ধ্	৬১৯
অদায়িক	দা	৫২১	অদ্রিজ	অদ্	২৭	অধরীকৃত	ধৃ	৬০৬	অধিজ্যকার্ম্মুক	ধা	৫৯১	অধীশ্বর	ধা	৫৯১
অদার	দৃ	৫৬০	অদ্রিজা	অদ্	২৭	অধরীভূত	ধৃ	৬০৬	অধিজ্যচাপ	ধা	৫৯১	অধুনা	ধ্	৬১৯
অদাস	দা	৫২১	অদ্রিনাথ	অদ্	২৫	অধরু	ধৃ	৬০৬	অধিত্যকা	ধা	৫৯৩	অধুনা	ধু	৬০১
অদাহন	দহ্	৫২০	অদ্রিপতি	অদ্	২৫	অধরোত্তর	ধৃ	৬০৬	অধিদন্ত	ধা	৫৯১	অধুনাতন	ধু	৬০১
অদাহ্য	দহ্	৫২০	অদ্রোহ	দ্রুহ্	৫৭৯	অধরোষ্ঠ	ধৃ	৬০৬	অধিদেব	ধা	৫৯৩	অধুনাতন	ধৃ	৬১৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অধৃষ্য	ধৃ	৬০৬	অধ্যাহরণ	ধা	৫৯১	অনন্তবিজয়	অম্	৩৬	অনপেক্ষী	ঈক্ষ্	৮০	অনাঘ্রাত	ঘ্রা	৩১৬
[illegible]	ঋধ্	১২১	অধ্যাহার	ধা	৫৯১	অনন্তব্রত	অম্	৩৬	অনপেত	ই	৬৫	অনাচরণ	চর্	৩৪০
অধৈর্য্য	ধ্যৈ	৬১৫	অধ্যাহার্য্য	ধা	৫৯১	অনন্তমূল	অম্	৩৬	অনবকাশ	কশ্	১৭৩	অনাচার	চর্	৩৪০
অধোক্ষজ	ধা	৫৯১	অধ্যাহৃত	ধা	৫৯১	অনন্তর	অম্	৩৬	অনবগত	গম্	২৬২	অনাচারী	চর্	৩৪০
অধোগতি	ধা	৫৯১	অধ্যেষণ	ধা	৫৯১	অনন্তরজ	অম্	৩৬	অনবগীত	গাহ্	২৮০	অনাটন	অট্	২০
অধোগামী	গম্	২৬২	অধ্রুব	ধ্রু	৬১৮	অনন্তরজাত	অম্	৩৬	অনবগ্রহ	গ্রহ্	৩০১	অনাতপ	তপ্	৪৫৯
অধোতে	ধা	৫৯১	অন্	অন্	২৮	অনন্তরিত	অম্	৩৬	অনবগুণ্ঠিত	গুণ্	২৮৭	অনাতুর	তৃ	৪৯৫
অধোদ্বার	ধা	৫৯১	অন	অন্	২৯	অনন্তরূপ	অম্	৩৬	অনবধান	ধা	৫৯৮	অনাত্মবর্গ	অত্	২২
অধোধিক	ধা	৫৯১	অনংশ	অংশ্	৫	অনন্তশয়ন	অম্	৩৬	অনবধি	ধা	৫৯১	অনাত্মবান	অত্	২২
অধোদৃষ্টি	[illegible]	৫৯১	অনক্ষর	অশ্	৪৬	অনন্তশয্যা	অম্	৩৬	অনবহিত	ধা	৫৯১	অনাত্মবেদী	অত্	২২
অধোদেশ	ধা	৫৯১	অনগ্নি	অঞ্জ্	১১	অনন্তা	অম্	৩৬	অনবেক্ষক	ঈক্ষ্	৮০	অনাত্মা	অত্	২২
অধোনিবাসী	ধা	৫৯১	অনঘ	ঘ্	৩১৭	অনন্য	অন্	২৮	অনভিজ্ঞ	জ্ঞা	৪০০	অনাত্মীয়	অত্	২২
অধোপুর	ধা	৫৯১	অনঙ্কুশ	অঙ্ক্	৫	অনন্যকর্ম্মী	অন্	২৮	অনভিপ্রেত	ই	৬৫	অনাথ	নাথ্	৬৩৮
অধোবন্ধন	ধা	৫৯১	অনঙ্গ	অঙ্গ্	৯	অনন্যকায়	অন্	২৮	অনভ্যাস	অস্	৫৬	অনাথপিণ্ড	নাথ্	৬৩৮
অধোবায়ু	ধা	৫৯১	অনঙ্গতপ্ত	অঙ্গ্	৬	অনন্যগতি	অন্	২৮	অনভ্র	অ	৫৯	অনাথপিণ্ডদ	নাথ্	৬৩৮
অধোবাস	ধা	৫৯১	অনঙ্গমোহন	অঙ্গ্	৬	অনন্যগতিক	অন্	২৮	অনভ্রবৃষ্টি	অ	৫৯	অনাথপিণ্ডিক	নাথ্	৬৩৮
অধোভাগ	ধা	৫৯১	অনঙ্গমোহিনী	অঙ্গ্	৬	অনন্যচিত্ত	অন্	২৮	অনম্বর	অম্	৩৬	অনাথা	নাথ্	৬৩৮
অধোভুবন	ধা	৫৯১	অনঙ্গলেখ	অঙ্গ্	৬	অনন্যচেতা	অন্	২৮	অনয়	নী	৬৫৫	অনাথিনী	নাথ্	৬৩৮
অধোমুখ	ধা	৫৯১	অনঙ্গসমর	অঙ্গ্	৬	অনন্যদৃষ্টি	অন্	২৮	অনর্গল	অর্জ্	৪২	অনাথী	নাথ্	৬৩৮
অধোলোক	ধা	৫৯১	অনচির	চি	৩৪৬	অনন্যপর	অন্	২৮	অনর্ঘ	অর্হ্	৪৩	অনাদর	দৃ	৫৬০
অধ্বগ	অদ্	২৫	অনঞ্জন	অঞ্জ্	১১	অনন্যপরায়ণ	অন্	২৮	অনর্ঘ্য	অর্হ্	৪৩	অনাদি	দা	৫২২
অধ্বর	অদ্	২৭	অনটন	অট্	২০	অনন্যপীরিতি	অন্	২৮	অনর্থ	অর্থ্	৪৩	অনাদিনিধন	দা	৫২২
অধ্বর্য্যু	অদ্	২৭	অনড়	অন্	২৮	অনন্যপূর্ব্ব	অন্	২৮	অনর্থক	অর্থ্	৪৩	অনাদিনী	দা	৫২২
অধ্বান	অদ্	২৫	অনড়	নহ্		অনন্যবিষয়	অন্	২৮	অনর্থকর	অর্থ্	৪৩	অনাদিমধ্যান্ত	দা	৫২২
অধ্বা	অদ্	২৫	অনত	অন্	২৮	অনন্যবৃত্তি	অন্	২৮	অনর্থপাত	অর্থ্	৪৩	অনাদিষ্ট	দিশ্	৫৩৬
[illegible]	অশ্	৪৬	অন্-তর	অন্	২৮	অনন্যভাক্	অন্	২৮	অনর্থী	অর্থ্	৪৩	অনাদৃত	দৃ	৫৬০
অধ্যবসান	ধা	৫৯১	(এন্তার)	অন্	২৮	অনন্যভাব	অন্	২৮	অনর্পণ	ঋ	১১৩	অনাদেয়	দা	৫২১
অধ্যবসায়ী	ধা	৫৯১	অনতিক্রমণীয়	ক্রম্	২১৯	অনন্যমনা	অন্	২৮	অনর্হ	অর্হ্	৪৩	অনাদেশ	দিশ্	৫৩৬
অধ্যয়ন	ই	৬৫	অনতীতবাল্য	ই	৬৫	অনন্যমানস	অন্	২৮	অনল	অন্	২৯	অনাদ্য	দা	৫২১
অধ্যাক্রান্ত	ধা	৫৯১	অনখ	অর্থ্	৪৩	অনন্যশরণ	অন্	২৮	অনলঙ্করণ	অল্	৪৪	অনাধি	ধা	৫৯১
অধ্যাত্ম	ধা	৫৯৪	অনদেখা	দৃশ্	৫৬৬	অনন্যশরণ্য	অন্	২৮	অনলপ্রিয়া	অন্	২৮	অনাধৃষ্য	ধৃ	৬০৬
অধ্যাত্মজ্ঞান	ধা	৫৯৪	অনধিক	ধা	৫৯১	অনন্যসদৃশ	অন্	২৮	অনলভাবিনী	অন্	২৮	অনাপ্ত	আপ্	৫৯
অধ্যাত্মবিদ্যা	ধা	৫৯৪	অনধিকার	কৃ	২০০	অনন্যসাধারণ	অন্	২৮	অনল্প	অল্	৪৪	অনাবিষ্কৃত	কৃ	২০০
অধ্যাত্মরামায়ণ	ধা	৫৯১	অনধিগত	গম্	২৬২	অনন্যসামান্য	অন্	২৮	অনশন	অশ্	৪৬	অনামুখ	খন্	২৪৮
অধ্যাপক	ই	৬৭	অনধীত	ই	৬৫	অনন্বয়	অন্	২৮	অনশ্ব	অশ্	৪৬	অনামুখো	খন্	২৪৮
অধ্যাপক	ধা	৫৯৪	অনধ্যয়ন	ই	৬৫	অনন্বিত	অন্	২৮	অনশ্বর	নশ্	৬৩২	অনায়ক	নী	৬৫৫
অধ্যাপন	ধা	৫৯৪	অনধ্যায়	ই	৬৫	অনপকরণ	কৃ	২০০	অনহঙ্কার	কৃ	২০০	অনায়স	ই	৬৫
অধ্যাপনা	ই	৬৭	অননুগতি	গম্	২৬২	অনপক্রিয়া	কৃ	২০০	অনা	অ	৫৯	অনায়ুষ্য	ই	৬৫
অধ্যাপনা	ধা	৫৯৪	অননুজ্ঞাত	জ্ঞা	৪০০	অনপাকরণ	কৃ	২০০	অনাকাঙ্ক্ষিত	কাঙ্ক্ষ্	১৮৩	অনার্জ্জব	অর্জ্	৪২
অধ্যায়	ই	৬৭	অনন্ত	অম্	৩৮	অনপাকর্ম্ম	কৃ	২০০	অনাকাল	কল্	১৬৪	অনার্ত্তব	ঋ	১১৩
অধ্যারূঢ়	ধা	৫৯১	অনন্তচতুর্দ্দশী	অম্	৩৬	অনপায়	ই	৬৫	অনাকাশ	কশ্	১৭৩	অনার্ষ	ঋষ্	১২২
অধ্যারোপণ	ধা	৫৯১	অনন্ততৃতীয়া	অম্	৩৬	অনপায়ী	ই	৬৫	অনাকুল	কুল্	১৯৭	অনার্য্য	ঋ	১১৩
অধ্যাস	ধা	৫৯১	অনন্তদেব	অম্	৩৬	অনপেক্ষ	ঈক্ষ্	৮০	অনাকৃষ্ট	কৃষ্	২১৫	অনাশী	নশ্	৬৩২
অধ্যাসিত	ধা	৫৯১	অনন্তনাগ	অম্	৩৮	অনপেক্ষা	ঈক্ষ্	৮০	অনাগত	গম্	২৬২	অনাস্তিক	অস্	৫৬
অধ্যাসীন	ধা	৫৯১	অনন্তপার	অম্	৩৬	অনপেক্ষিত	ঈক্ষ্	৮০	অনাগম	গম্	২৬২	অনি	অন্	২৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অনুমেয়	অন্	২৮	অনুশীলনী	অন্	২৮	অন্যূন	ঊন্	১১২	অন্তঃশিলে	অম্	৩৬	অন্তরযামিনী	অম্	৩৬
অনুমোদ	অন্	২৮	অনুশীলিত	অন্	২৮	অনূপ	অন্	৩১	অন্তঃশীলা	অম্	৩৬	অন্তরস্থ	অম্	৩৬
অনুমোদন	অন্	২৮	অনুশোচ	অন্	২৮	অনূরু	অন্	৩১	অন্তঃশীলে	অম্	৩৬	অন্তরহিয়া	অম্	৩৬
অনুযাত	অন্	২৮	অনুশোচক	অন্	২৮	অনূরু	উর্	১০৩	অন্তঃশুদ্ধ	অম্	৩৬	অন্তরা	অম্	৩৬
অনুযাতব্য	অন্	২৮	অনুশোচন	অন্	২৮	অনূর্দ্ধ	উর্	১০৩	অন্তঃশূন্য	অম্	৩৬	অন্তরাকাশ	অম্	৩৬
অনুযাতা	অন্	২৮	অনুশোচনা	অন্	২৮	অনূর্দ্ধসমান	উর্	১০৩	অন্তঃসংজ্ঞ	অম্	৩৬	অন্তরাগার	অম্	৩৬
অনুযান	অন্	২৮	অনুশোচনীয়	অন্	২৮	অনূষ্ণ	উষ্	১০৯	অন্তঃসত্ত্ব	অম্	৩৬	অন্তরাত্মা	অম্	৩৬
অনুযাত্র	অন্	২৮	অনুশোচিত	অন্	২৮	অনৃজু	ঋজ্	১২১	অন্তঃসত্ত্বা	অম্	৩৬	অন্তরাপত্য	অম্	৩৬
অনুযুগ	অন্	২৮	অনুষক্ত	অন্	২৮	অনৃণ	ঋ	১১৩	অন্তঃসলিল	অম্	৩৬	অন্তরায়	অম্	৩৮
অনুযোগ	অন্	৩১	অনুষিক্ত	অন্	২৮	অনৃণী	ঋ	১১৩	অন্তঃসলিলা	অম্	৩৬	অন্তরারাম	অম্	৩৬
অনুরণন	অন্	২৮	অনুষ্টুপ	অন্	২৮	অনৃত	ঋ	১১৩	অন্তঃসার	অম্	৩৬	অন্তরাল	অম্	৩৯
অনুরত	অন্	২৮	অনুষ্টুভ	অন্	২৮	অনৃতী	ঋ	১১৩	অন্তঃস্থ	অম্	৩৬	অন্তরিক্ষ	অম্	৩৬
অনুরথ	অন্	২৮	অনুষ্ঠাতব্য	অন্	২৮	অনৃতু	ঋ	১১৩	অন্তঃস্থল	অম্	৩৬	অন্তরিত	অম্	৩৬
অনুরথ্যা	অন্	২৮	অনুষ্ঠাতা	অন্	২৮	অনৃশংস	নৃ	৬৬২	অন্তকর	অম্	৩৬	অন্তরিন্দ্রীয়	অম্	৩৬
অনুরস্ত	অন্	২৮	অনুষ্ঠিত	অন্	২৮	অনেক	ই	৬৫	অন্তকরণ	অম্	৩৬	অন্তরীক্ষ	অম্	৩৯
অনুরস	অন্	২৮	অনুষ্ঠেয়	অন্	২৮	অনেকচিত্ত	ই	৬৫	অন্তকনগর	অম্	৩৬	অন্তরীক্ষগ	অম্	৩৬
অনুরসিত	অন্	২৮	অনুসংবীত	অন্	২৮	অনেকজ	ই	৬৫	অন্তকসদন	অম্	৩৬	অন্তরীক্ষচর	অম্	৩৬
অনুরাগ	অন্	২৮	অনুসংহিত	অন্	২৮	অনেকপ	ই	৬৫	অন্তকারী	অম্	৩৬	অন্তরীক্ষবাণী	অম্	৩৬
অনুরাগিণী	অন্	২৮	অনুসঙ্গী	অন্	২৮	অনেকমুখ	ই	৬৫	অন্তকাল	অম্	৩৬	অন্তরীণ	অম্	৩৬
অনুরাগিনী	অন্	২৮	অনুসন্ততি	অন্	২৮	অনেকশফ	ই	৬৫	অন্তকৃৎ	অম্	৩৬	অন্তরীপ	অম্	৩৬
অনুরাগী	অন্	২৮	অনুসন্ধান	ধা	৫৯৮	অনেকাশ্রিত	ই	৬৫	অন্তগ	অম্	৩৬	অন্তরীয়	অম্	৩৬
অনুরু	অন্	৩১	অনুসন্ধানী	অন্	২৮	অনৈক্য	ই	৬৫	অন্তগত	অম্	৩৬	অন্তরে	অম্	৩৬
অনুরূপ	অন্	২৮	অসন্ধিৎসু	অন্	২৮	অনোচিত	উচ্	৮২	অন্তচর	অম্	৩৬	অন্তর্গত	অম্	৩৬
অনুরোধ	অন্	৩১	অনুসন্ধেয়	অন্	২৮	অনৌচিত্য	উচ্	৮২	অন্তজ	অম্	৩৬	অন্তর্গর্ভ	অম্	৩৬
অনুরোল	অন্	২৮	অনুসম্প্রাপ্ত	অন্	২৮	অনৌদ্ধত্য	উৎ	৮৪	অন্তত	অম্	৩৬	অন্তর্গূঢ়	অম্	৩৬
অনুলগ্ন	অন্	২৮	অনুসর	অন্	২৮	অনৌরস	উর্	১০৩	অন্ততঃ	অম্	৩৬	অন্তর্ঘাত	অম্	৩৬
অনুলিপ্ত	অন্	২৮	অনুসার	অন্	২৮	অন্ত	অম্	৩৮	অন্তদন্ত	অম্	৩৬	অন্তর্জগৎ	অম্	৩৬
অনুলেপ	অন্	২৮	অনুসারণা	অন্	২৮	অন্তঃ	অম্	৩৮	অন্তপাল	অম্	৩৬	অন্তর্জ্জল	অম্	৩৬
অনুলেপন	অন্	২৮	অনুসারী	অন্	২৮	অন্তঃকরণ	অম্	৩৬	অন্তবান	অম্	৩৬	অন্তর্জ্জলী	অম্	৩৬
অনুলেপিত	অন্	২৮	অনুসূয়ে	অন্	২৮	অন্তঃকলি	অম্	৩৬	অন্তবাসী	অম্	৩৬	অন্তর্জ্যোতিঃ	অম্	৩৬
অনুলেহ	অন্	২৮	অনুসূচক	অন্	২৮	অন্তঃপট	অম্	৩৬	অন্তবেলা	অম্	৩৬	অন্তর্দ্দশা	অম্	৩৬
অনুলোম	অন্	২৮	অনুসেবী	অন্	২৮	অন্তঃপাত	অম্	৩৬	অন্তযমক	অম্	৩৬	অন্তর্দাহ	অম্	৩৬
অনুর্ব্বর	ঋ	১১৩	অনুস্মরণ	অন্	২৮	অন্তঃপাতী	অম্	৩৬	অন্তর	অম্	৩৮	অন্তর্দুষ্ট	অম্	৩৬
অনুশয়	অন্	২৮	অনুস্যূত	অন্	২৮	অন্তঃপাল	অম্	৩৬	অন্তরঈশ্বর	অম্	৩৬	অন্তর্দৃষ্টি	অম্	৩৬
অনুশয়ী	অন্	২৮	অনুস্বান	অন্	২৮	অন্তঃপুর	অম্	৩৬	অন্তরকাঁপ	অম্	৩৬	অন্তর্দ্ধান	অম্	৩৯
অনুশস্ত্র	অন্	২৮	অনুস্বার	অন্	২৮	অন্তঃপুরচর	অম্	৩৬	অন্তরঙ্গ	অম্	৩৬	অন্তর্নিবিষ্ট	অম্	৩৬
অনুশায়ী	অন্	২৮	অনুহরণ	অন্	২৮	অন্তঃপুরচারিণী	অম্	৩৬	অন্তরচক্র	অম্	৩৬	অন্তর্নিহিত	অম্	৩৬
অনুশাসন	অন্	২৮	অনুহারক	অন্	২৮	অন্তঃপুরাধ্যক্ষ	অম্	৩৬	অন্তরজ্ঞ	অম্	৩৬	অন্তর্ব্বর্ণ	অম্	৩৬
অনুশাসনীয়	অন্	২৮	অনুহার্য্য	অন্	২৮	অন্তঃপুরিক	অম্	৩৬	অন্তরটিপনি	অম্	৩৬	অন্তর্ব্বর্ত্নী	অম্	৩৬
অনুশাসিতা	অন্	২৮	অনুহ্লাদ	অন্	২৮	অন্তঃপুরিকা	অম্	৩৬	অন্তরটিপুনি	অম্	৩৬	অন্তর্ব্বর্ত্তী	অম্	৩৬
অনুশাস্তা	অন্	২৮	অনুহ্লাদ	অন্	২৮	অন্তঃপ্রকৃতি	অম্	৩৬	অন্তরটিপ্পনি	অম্	৩৬	অন্তর্ব্বস্ত্র	অম্	৩৬
অনুশিষ্ট	অন্	২৮	অনূচান	অন্	২৮	অন্তঃপ্রবিষ্ট	অম্	৩৬	অন্তরপাষণ্ড	অম্	৩৬	অন্তর্ব্বাষ্প	অম্	৩৬
অনুশিষ্য	অন্	২৮	অনূদিত	অন্	২৮	অন্তঃপ্রসৃপ্ত	অম্	৩৬	অন্তরপুরুষ	অম্	৩৬	অন্তর্ব্বাসঃ	অম্	৩৬
অনুশীঘ্র	অন্	২৮	অনুদ্দেশ	অন্	২৮	অন্তঃশরীর	অম্	৩৬	অন্তরপ্রভব	অম্	৩৬	অন্তর্ব্বাসিক	অম্	৩৬
অনুশীলন	অন্	২৮	অনুন	উৎ	৮৪	অন্তঃশল্য	অম্	৩৬	অন্তরবয়ব	অম্	৩৬	অন্তর্বিপ্লব	অম্	৩৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অন্তর্ব্বৃত্তি	অম্	৩৬	অন্ত্যেষ্টি	অম্	৩৬	অন্নজল	অদ্	২৫	অন্যন্তর	অন্	২৫	অন্বয়	অন্	২৫
অন্তর্বেদনা	অম্	৩৬	অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	অম্	৩৬	অন্নজীবী	অদ্	২৫	অন্যন্তরে	অন্	২৫	অন্বয়	ই	৬৫
অন্তর্ভাব	অম্	৩৬	অন্ত্র	অম্	৩৬	অন্নদ	অদ্	২৫	অন্যত্র	অন্	২৫	অন্বয়ব্যতিরেক	ই	৬৫
অন্তর্ভাবিত	অম্	৩৬	অন্ত্রবৃদ্ধি	অম্	৩৬	অন্নদাতা	অদ্	২৫	অন্যথা	অন্	২৫	অন্বয়ব্যাপ্তি	ই	৬৫
অন্তর্ভূত	অম্	৩৬	অন্ত্রাপত্য	অম্	৩৬	অন্নদান	অদ্	২৫	অন্যথাকরণ	অন্	২৫	অন্বয়মুখ	ই	৬৫
অন্তর্ভুক্ত	অম্	৩৬	অন্ত্রে	অম্	৩৬	অন্নদায়	অদ্	২৫	অন্যথাকার	অন্	২৫	অন্বয়াগত	ই	৬৫
অন্তর্ভেদ	অম্	৩৬	অন্ধ	অন্	৩১	অন্নদাস	অদ্	২৫	অন্যথাকৃত	অন্	২৫	অন্বাচয়	চি	৩৪৬
অন্তর্ভেদী	অম্	৩৬	অন্ধক	অন্	৩১	অন্নদোষ	অদ্	২৫	অন্যথাত্ব	অন্	২৫	অন্বাদেশ	দিশ্	৫৩৬
অন্তর্ভৌম	অম্	৩৬	অন্ধকঘাতী	অন্	২৮	অন্নধ্বংস	অদ্	২৫	অন্যথাবাদী	অন্	২৫	অন্বাধি	ধা	৫৯০
অন্তর্মনা	অম্	৩৬	অন্ধকরিপু	অন্	২৮	অন্ননালী	অদ্	২৫	অন্যথাবৃত্তি	অন্	২৫	অন্বাধেয়	ধা	৫৯০
অন্তর্মনাঃ	অম্	৩৬	অন্ধকশত্রু	অন্	২৮	অন্নপক্তি	অদ্	২৫	অন্যথাভাব	অন্	২৫	অন্বাসন	অস্	৫৬
অন্তর্মাতৃকা	অম্	৩৬	অন্ধকান্তক	অন্	২৮	অন্নপাক	অদ্	২৫	অন্যথাসিদ্ধ	অন্	২৫	অন্বাসিত	অস্	৫৬
অন্তর্মুখী	অম্	৩৬	অন্ধকার	অন্	৩১	অন্নপাত	অদ্	২৫	অন্যদা	অন্	২৫	অন্বাসীন	অস্	৫৬
অন্তর্মৃত	অম্	৩৬	অন্ধকারিত	অন্	২৮	অন্নপান	অদ্	২৫	অন্যদীয়	অন্	২৫	অন্বর্থ	অন্	২৫
অন্তর্যামিনী	অম্	৩৬	অন্ধকুণ্ড	অন্	২৮	অন্নপানি	অদ্	২৫	অন্যনাভি	অন্	২৫	অন্বহ্	অন্	২৫
অন্তর্যামী	অম্	৩৯	অন্ধকূপ	অন্	২৮	অন্নপানী	অদ্	২৫	অন্যন্তরে	অন্	২৫	অন্বিত	ই	৬৫
অন্তর্লীন	অম্	৩৬	অন্ধগজন্যায়	অন্	২৮	অন্নপূর্ণ	অদ্	২৫	অন্যপুষ্ট	অন্	২৫	অন্বিষ্ট	ইষ্	৭৮
অন্তর্লোম	অম্	৩৬	অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়	অন্	২৮	অন্নপূর্ণা	অদ্	২৫	অন্যপূর্ব্বা	অন্	২৫	অন্বীক্ষণ	ঈক্ষ্	৮০
অন্তর্হাস	অম্	৩৬	অন্ধতম	অন্	২৮	অন্নপ্রাশন	অদ্	২৫	অন্যবিধ	অন্	২৫	অন্বীক্ষা	ঈক্ষ্	৮০
অন্তর্হিত	অম্	৩৬	অন্ধতমঃ	অন্	২৮	অন্নবিকার	অদ্	২৫	অন্যভৃৎ	অন্	২৫	অন্বেষ	ইষ্	৭৮
অন্তর্হৃদয়	অম্	৩৬	অন্ধতমস	অন্	২৮	অন্নব্রহ্ম	অদ্	২৫	অন্যমনস্ক	অন্	২৫	অন্বেষক	ইষ্	৭৮
অন্তশয্যা	অম্	৩৬	অন্ধতামসী	অন্	২৮	অন্নময়	অদ্	২৫	অন্যমনা	অন্	২৫	অন্বেষণ	ইষ্	৭৮
অন্তশ্চর	অম্	৩৬	অন্ধতামিস্র	অন্	৩২	অন্নমল	অদ্	২৫	অন্যরূপ	অন্	২৫	অন্বেষিত	ইষ্	৭৮
অন্তস্তল	অম্	৩৬	অন্ধতামস	তম্	৪৬২	অন্নমেরু	অদ্	২৫	অন্যসংক্রান্ত	অন্	২৫	অন্বেষী	ইষ্	৭৮
অন্তস্তাপ	অম্	৩৬	অন্ধতামিস্র	তম্	৪৬২	অন্নরস	অদ্	২৫	অন্যসাধারণ	অন্	২৫	অন্বেষ্টব্য	ইষ্	৭৮
অন্তস্তোয়	অম্	৩৬	অন্ধদর্পণন্যায়	অন্	২৮	অন্নলোভাতুর	অদ্	২৫	অন্যস্ত্রী	অন্	২৫	অন্বেষ্টা	ইষ্	৭৮
অন্তস্থ্	অম্	৩৬	অন্ধনী	অন্	২৮	অন্নসংস্কার	অদ্	২৫	অন্যাদৃশ	অন্	২৫	অন্বেষ্য	ইষ্	৭৮
অন্তস্পট	অম্	৩৬	অন্ধপঙ্গুন্যায়	অন্	২৮	অন্নসংস্থান	অদ্	২৫	অন্যান্তর	অন্	২৫	অপ্চ	আপ্	৫৯
অন্তস্পুর	অম্	৩৬	অন্ধপরম্পরান্যায়	অন্	২৮	অন্নসত্র	অদ্	২৫	অন্যান্য	অন্	২৫	অপ্চর	আপ্	৫৯
অন্তাবশায়ী	অম্	৩৬	অন্ধপুতনা	অন্	২৮	অন্নহীন	অদ্	২৫	অন্যায়	ই	৬৭	অপ্ছরা	আপ্	৫৯
অন্তি	অম্	৩৬	অন্ধবেগ	অন্	২৮	অন্নহুড়	অদ্	২৫	অন্যায়	নি	৬৫৪	অপ	আপ্	৬০
অন্তিক	অম্	৩৬	অন্ধরাজ	অন্	২৮	অন্নহুড়ো	অদ্	২৫	অন্যায্য	নি	৬৫৪	অপকরণ	কৃ	২০০
অন্তিম	অম্	৩৬	অন্ধা	অন্	২৮	অন্নাদ্য	অদ্	২৫	অন্যায্য	ই	৬৫	অপকরুণ	আপ্	৫৯
অন্তজ	অম্	৩৬	অন্ধার	অন্	২৮	অন্নাভাব	অদ্	২৫	অন্যার্থ	অন্	২৫	অপকর্ত্তা	কৃ	২০০
অন্তেবাসী	অম্	৩৬	অন্ধিয়ার	অন্	২৮	অন্নায়ুঃ	অদ্	২৫	অন্যাসন	অন্	২৫	অপকর্ম্মা	আপ্	৫৯
অন্ত্য	অম্	৩৬	অন্ধিসন্ধি	অন্	২৮	অন্নার্থী	অদ্	২৫	অন্যোন্য	অন্	২৫	অপকর্ষ	আপ্	৫৯
অন্ত্যকর্ম্ম	অম্	৩৬	অন্ধীকৃত	অন্	২৮	অন্নাশন	অদ্	২৫	অন্যোঢ়া	অন্	২৫	অপকর্ষক	আপ্	৫৯
অন্ত্যক্রিয়া	অম্	৩৬	অন্ধু	অন্	২৮	অন্য	অন্	২৫	অন্যোদর্য্য	অন্	২৫	অপকর্ষণ	আপ্	৫৯
অন্ত্যজ	অম্	৩৬	অন্ন	অদ্	২৮	অন্যকাম	অন্	২৫	অন্যোন্যসদৃশ	অন্	২৫	অপকলঙ্ক	আপ্	৫৯
অন্ত্যজাতি	অম্	৩৬	অন্নকষ্ট	অদ্	২৫	অন্যক্ষেত্র	অন্	২৫	অন্যোন্যধ্যাস	অন্	২৫	অপকার	কৃ	২০০
অন্ত্যযমক	অম্	৩৬	অন্নকূট	অদ্	২৫	অন্যগ	অন্	২৫	অন্যোন্যাভাব	অন্	২৫	অপকারক	আপ্	৫৯
অন্তযোনি	অম্	৩৬	অন্নকোষ্ঠ্যা	অদ্	২৫	অন্যগামী	অন্	২৫	অন্যোন্যাশ্রয়	অন্	২৫	অপকারী	আপ্	৫৯
অন্ত্যানুপ্রাস	অম্	৩৬	অন্নক্ষেত্তর	অদ্	২৫	অন্যতঃ	অন্	২৫	অন্যোন্যোক্তি	অন্	২৫	অপকীর্ত্তি	আপ্	৫৯
অন্ত্যাবশায়ী	অম্	৩৬	অন্নচিন্তা	অদ্	২৫	অন্যতম	অন্	২৫	অন্ববায়	ই	৬৫	অপকৃত	কৃ	২০০
অন্ত্যাশ্রম	অম্	৩৬	অন্নছত্র	অদ্	২৫	অন্যতর	অন্	২৫	অন্ববেক্ষা	ঈক্ষ্	৮০	অপকৃত্য	কৃ	২০০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অবক্রয়	ক্রী	২২০	অবচূর্ণন	অব্	৩২	অবদান	অব্	৩২	অবনি	অব্	৩২	অবম	অব্	৩২
অবক্রীত	ক্রী	২২০	অবচূর্ণিত	অব্	৩২	অবদারক	অব্	৩২	অবনিকন্টক	অব্	৩২	অবমত	অব্	৩২
অবক্ষয়	ক্ষি	২৩০	অবচূল	অব্	৩২	অবদারণ	অব্	৩২	অবনিচর	অব্	৩২	অবমতি	অব্	৩২
অবক্ষিপ্ত	ক্ষিপ্	২৩৩	অবচ্ছদ	অব্	৩২	অবদারিত	অব্	৩২	অবনিদেব	অব্	৩২	অবমন্তব্য	অব্	৩২
অবক্ষেপ	অব্	৩২	অবচ্ছিন্ন	অব্	৩৪	অবদীর্ণ	অব্	৩২	অবনিনাথ	অব্	৩২	অবমন্তা	অব্	৩২
অবক্ষেপণ	অব্	৩২	অবচ্ছেদ	অব্	৩২	অবধাতব্য	অব্	৩২	অবনিপতি	অব্	৩২	অবমন্থ	অব্	৩২
অবক্ষেপণী	অব্	৩২	অবচ্ছেদক	অব্	৩২	অবধান	ধা	৫৯৮	অবনিপাল	অব্	৩২	অবমর্দ্দ	অব্	৩২
অবক্ষুত	অব্	৩২	অবচ্ছেদন	অব্	৩২	অবধানী	অব্	৩২	অবনী	অব্	৩২	অবমর্দ্দন	অব্	৩২
অবখণ্ডন	অব্	৩২	অবচ্ছায়া	অব্	৩২	অবধার	অব্	৩২	অবনী-অমর	অব্	৩২	অবমর্দ্দিত	অব্	৩২
অবগণন	অব্	৩২	অবজয়	অব্	৩২	অবধারক	অব্	৩২	অবনীধ্র	অব্	৩২	অবমর্দ্দী	অব্	৩২
অবগণ্ড	অব্	৩২	অবজান	অব্	৩২	অবধারণ	অব্	৩২	অবনীমুখ	অব্	৩২	অবমর্শ	অব্	৩২
অবগত	গম্	২৬২	অবজিত	অব্	৩২	অবধারণীয়	অব্	৩২	অবনীশ	অব্	৩২	অবমর্ষ	অব্	৩২
অবগতি	গম্	২৬২	অবজিতি	অব্	৩২	অবধারিত	অব্	৩২	অবনীশ্বর	অব্	৩২	অবমর্ষণ	অব্	৩২
অবগন্তব্য	অব্	৩২	অবজ্ঞা	অব্	৩২	অবধার্য্য	অব্	৩২	অবনেজন	অব্	৩২	অবমর্ষিত	অব্	৩২
অবগম	অব্	৩২	অবজ্ঞা	জ্ঞা	৪০০	অবধারল	অব্	৩২	অবন্তি	অব্	৩২	অবমান	অব্	৩২
অবগমন	অব্	৩২	অবজ্ঞাত	অব্	৩২	অবধি	ধা	৫৯৫	অবন্তিকা	অব্	৩২	অবমানন	অব্	৩২
অবগর	অব্	৩২	অবজ্ঞান	অব্	৩২	অবধিয়া	অব্	৩২	অবন্তী	অব্	৩২	অবমাননা	অব্	৩২
অবগলিত	অব্	৩২	অবজ্ঞেয়	অব্	৩২	অবধীর	অব্	৩২	অবপতন	অব্	৩২	অবমাননীয়	অব্	৩২
অবগাই	অব্	৩২	অবট	অব্	৩২	অবধীরণ	অব্	৩২	অবপন্ন	অব্	৩২	অবমানিত	অব্	৩২
অবগাঢ়	অব্	৩৩	অবটি	অব্	৩২	অবধীরণা	অব্	৩২	অবপাত	অব্	৩২	অবমানী	অব্	৩২
অবগাঢ়ি	অব্	৩২	অবটী	অব্	৩২	অবধীরিত	অব্	৩২	অবপাতন	অব্	৩২	অবমান্য	অব্	৩২
অবগান	অব্	৩২	অবটু	অব্	৩২	অবধীরী	অব্	৩২	অবপাদ	অব্	৩২	অবমার্জ্জন	অব্	৩২
অবগাহ	অব্	৩৩	অবডীন	ডী	৪৩৭	অবধৃত	ধু	৬০২	অবপাশিত	অব্	৩২	অবমূর্দ্ধশয়	অব্	৩২
অবগাহক	অব্	৩২	অবডাল	ড্	৪৩৯	অবধৃতচন্দ্র	অব্	৩২	অবপীড়	অব্	৩২	অবমূর্দ্ধা	অব্	৩২
অবগাহন	অব্	৩৩	অবতংস	অব্	৩২	অবধৃতবেশ	অব্	৩২	অবপীড়ন	অব্	৩২	অবমোচন	অব্	৩২
অবগাহিত	অব্	৩২	অবতংসক	অব্	৩২	অবধৃতরায়	অব্	৩২	অবপীড়না	অব্	৩২	অবয়বধর্ম্ম	অব্	৩২
অবগাহ্য	অব্	৩২	অবতংসিত	অব্	৩২	অবধৃতী	ধু	৬০২	অবপীড়িত	অব্	৩২	অবয়বার্থ	অব্	৩২
অবগীত	অব্	৩৪	অবতত	অব্	৩২	অবধূনন	অব্	৩২	অবপ্লুত	অব্	৩২	অবয়বী	অব্	৩২
অবগুণ	অব্	৩২	অবতমস	অব্	৩২	অবধূপিত	অব্	৩২	অববাদ	অব্	৩২	অবর	অব্	৩২
অবগুণ্ঠন	অব্	৩২	অবতর	তৃ	৪৭৭	অবধৃত	অব্	৩২	অববুদ্ধ	অব্	৩২	অবরুগ্ণ	অব্	৩২
অবগুণ্ঠনবতী	অব্	৩২	অবতরণ	তৃ	৪৭৭	অবধেয়	অব্	৩২	অববোদ্ধব্য	অব্	৩২	অবরুদ্ধি	অব্	৩২
অবগুণ্ঠনমুদ্রা	অব্	৩২	অবতরণিকা	অব্	৩২	অবধৌত	অব্	৩২	অববোধ	অব্	৩২	অবরোধক	অব্	৩২
অবগুণ্ঠবতী	অব্	৩২	অবতরণী	অব্	৩২	অবধ্যাত	অব্	৩২	অববোধক	অব্	৩২	অবরোধন	অব্	৩২
অবগুণ্ঠিকা	অব্	৩২	অবতান	অব্	৩২	অবধ্বংস	ধ্ব্	৬১৯	অববোধন	অব্	৩২	অবরোধিক	অব্	৩২
অবগুণ্ঠিত	অব্	৩২	অবতার	অব্	৩৪	অবধ্বস্ত	অব্	৩২	অবভগ্ন	অব্	৩২	অবরোধী	অব্	৩২
অবগ্রহ	অব্	৩৪	অবতারক	অব্	৩২	অবন	অব্	৩২	অবভঙ্গ	অব্	৩২	অবরোপণ	অব্	৩২
অবগ্রহণ	অব্	৩৪	অবতারণ	অব্	৩২	অবনত	নম্	৬৩০	অবভঞ্জন	অব্	৩২	অবরোহক	অব্	৩২
অবগ্রাহ	অব্	৩৪	অবতারণা	অব্	৩২	অবনদ্ধ	অব্	৩২	অবভর্জ্জন	অব্	৩২	অবরোহী	অব্	৩২
অবঘট্টন	অব্	৩২	অবতারবীজ	অব্	৩২	অবনমিত	অব্	৩২	অবভাসক	অব্	৩২	অবলগিত	অব্	৩২
অবঘর্ষণ	অব্	৩২	অবতারিত	অব্	৩২	অবনম্র	অব্	৩২	অবভাসন	অব্	৩২	অবলগ্ন	অব্	৩২
অবঘাটন	অব্	৩২	অবতারী	অব্	৩২	অবনয়	অব্	৩২	অবভাসিত	অব্	৩২	অবলম্ব	অব্	৩৫
অবঘৃষ্ট	অব্	৩২	অবতীর্ণ	তৃ	৪৮৫	অবনাম	অব্	৩২	অবভাসী	অব্	৩২	অবলম্বন	অব্	৩৫
অবচয়	অব্	৩২	অবতু	অব্	৩২	অবনামক	অব্	৩২	অবভুগ্ন	অব্	৩২	অবলম্বিত	অব্	৩২
অবচারণ	অব্	৩২	অবদংশ	অব্	৩২	অবনামী	অব্	৩২	অবভৃথ	অব্	৩২	অবলম্বিতব্য	অব্	৩২
অবচূড়	অব্	৩২	অবদাত	অব্	৩২	অবনাহ	অব্	৩২	অবভৃথাপ্লুত	অব্	৩২	অবলম্বী	অব্	৩২

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অভিগত	গম্	২৬২	অভ্রভেদী	অ	৫৯	অম্বিকানন্দন	অম্	৩৬	অম্ভসাংনিধি	অম্	৩৬	অযশঃ	অশ্	৪৬
অভিগমন	গম্	২৬২	অভ্রাবকাশ	অ	৫৯	অম্বিকাপতি	অম্	৩৬	অম্ভোজ	অম্	৩৬	অযশস্কর	অশ্	৪৬
অভিগামী	গম্	২৬২	অভ্রাবকাশিক	অ	৫৯	অম্বিকাসম্ভব	অম্	৩৬	অম্ভোজন্ম	অম্	৩৬	অযশস্য	অশ্	৪৬
অভিচার	চর্	৩৪০	অভ্রাবকাশী	অ	৫৯	অম্বিকাসুত	অম্	৩৬	অম্ভোজন্মজনি	অম্	৩৬	অযশাঃ	অশ্	৪৬
অভিজন	জন্	৩৭৮	অভ্রিত	অ	৫৯	অম্বু	অম্	৩৬	অম্ভোজযোনি	অম্	৩৬	অয়শোভী	অশ্	৪৬
অভিজিৎ	জি	৩৯১	অম্	অম্	৩৬	অম্বুক্রিয়া	অম্	৩৬	অম্ভোজষণ্ড	অম্	৩৬	অয়	ই	৬৫
অভিজ্ঞ	জ্ঞা	৪০০	অম্হার	অম্	৩৬	অম্বুঘন	অম্	৩৬	অম্ভোজিনী	অম্	৩৬	অয়	ই	৬৫
অভিধা	ধা	৫৯৫	অম্হি	অম্	৩৬	অম্বুচর	অম্	৩৬	অম্ভোদ	অম্	৩৬	অয়ং	ই	৬৫
অভিধা (ন)	ধা	৫৯৮	অম	অম্	৩৭	অম্বুচারী	অম্	৩৬	অম্ভোধর	অম্	৩৬	অয়ঃ	ই	৬৫
অভিনন্দন	নন্দ্	৬২৮	অমত্র	অম্	৩৬	অম্বুজ	অম্	৩৬	অম্ভোধি	অম্	৩৬	অয়ঃকণ	ই	৬৫
অভিনন্দিত	নন্দ্	৬২৭	অমা	অম্	৩৬	অম্বুজনাভ	অম্	৩৬	অম্ভোনিধি	অম্	৩৬	অয়ঃকণপ	ই	৬৫
অভিনয়	নী	৬৫৫	অমাত্য	অম্	৩৬	অম্বুজাসন	অম্	৩৬	অম্ভোরুট্	অম্	৩৬	অয়ঃপান	ই	৬৫
অভিনীত	নী	৬৫৫	অমাবসী	অম্	৩৬	অম্বুজাসনা	অম্	৩৬	অম্ভোরুহ	অম্	৩৬	অয়ঃপিণ্ড	ই	৬৫
অভিনেতা	নী	৬৫৫	অমাবসু	অম্	৩৯	অম্বুদ	অম্	৩৬	অম্র	অম্	৩৬	অয়ঃপ্রতিমা	ই	৬৫
অভিপ্রায়	ই	৬৫	অমাবস্যা	অম্	৩৬	অম্বুদানীক	অম্	৩৬	অম্রেত	অম্	৩৬	অয়ঃশঙ্কু	ই	৬৫
অভিপ্রেত	ই	৬৫	অমাবাসী	অম্	৩৬	অম্বুধর	অম্	৩৬	অম্ল	অম্	৪০	অয়ঃশূল	ই	৬৫
অভিব্যঞ্জন	অঞ্জ্	১১	অমাবাস্যা	অম্	৩৬	অম্বুনাথ	অম্	৩৬	অম্লক	অম্	৩৬	অয়ন	ই	৬৫
অভিব্যঞ্জক	অঞ্জ্	১১	অমিখ	ঈক্ষ্	৮০	অম্বুনিধি	অম্	৩৬	অম্লচুক্রিকা	অম্	৩৬	অয়নকাল	ই	৬৫
অভিব্যক্ত	অঞ্জ্	১৮	অমিত্তি	অম্	৩৬	অম্বুপ	অম্	৩৬	অম্লচূড়া	অম্	৩৬	অয়নবৃত্ত	ই	৬৫
অভিব্যক্তি	অঞ্জ্	১৮	অমুক	অম্	৩৬	অম্বুপাত	অম্	৩৬	অম্লজম্বীর	অম্	৩৬	অয়নভাগ	ই	৬৫
অভিমুখ	খন্	২৪৮	অমুকনামা	অম্	৩৬	অম্বুপায়ী	অম্	৩৬	অম্লনায়ক	অম্	৩৬	অয়নাংশ	ই	৬৫
অভিসংস্কার	কৃ	২০০	অমুকশর্ম্মা	অম্	৩৬	অম্বুপ্রসাদ	অম্	৩৬	অম্লপঞ্চক	অম্	৩৬	অয়নান্ত	ই	৬৫
অভিসন্ধান	ধা	৫৯৮	অমুত্র	অম্	৩৬	অম্বুবাচী	অম্	৩৬	অম্লপঞ্চফল	অম্	৩৬	অয়নান্তবৃত্ত	ই	৬৫
অভিহিত	ধা	৬০০	অমুত্রত্য	অম্	৩৬	অম্বুবাহ	অম্	৩৬	অম্লপনস	অম্	৩৬	অয়স	ই	৬৫
অভীশু	অশ্	৪৬	অমুত্রার্থ	অম্	৩৬	অম্বুবাহিনী	অম্	৩৬	অম্লপিত্ত	অম্	৩৬	অয়স্কান্ত	ই	৬৫
অভীষঙ্গ	ইষ্	৭৮	অমুষ্যায়ণ	অ	৫৯	অম্বুবাহী	অম্	৩৬	অম্লপুর	অম্	৩৬	অয়স্কার	কৃ	২০০
অভীষ্ট	ইষ্	৭৮	অম্ময়	আপ্	৫৯	অম্বুবিম্ব	অম্	৩৬	অম্লফল	অম্	৩৬	অয়স্কুম্ভ	ই	৬৫
অভীষ্টিত	ইষ্	৭৮	অম্ব্	অম্	৩৬	অম্বুভৃৎ	অম্	৩৬	অম্লবর্গ	অম্	৩৬	অয়স্কৃতি	ই	৬৫
অভীষু	ইষ্	৭৮	অম্ব	অম্	৩৬	অম্বুমুক্	অম্	৩৬	অম্লবাস্তুক	অম্	৩৬	অয়ান্বিত	ই	৬৫
অভ্যন্তর	অম্	৩৬	অম্বক	অম্	৩৬	অম্বুরাশি	অম্	৩৬	অম্লবীজ	অম্	৩৬	অয়ি	ই	৬৫
অভ্যর্থনা	অর্থ্	৪৩	অম্বর	অম্	৩৯	অম্বুরাশিপতি	অম্	৩৬	অম্লবৃক্ষ	অম্	৩৬	অয়ে	ই	৬৫
অভ্যসন	অস্	৫৬	অম্বরগ	অম্	৩৬	অম্বুরশনা	অম্	৩৬	অম্লবেতস	অম্	৩৬	অয়োগুড়	ই	৬৫
অভ্যস্ত	অস্	৫৬	অম্বরচর	অম্	৩৬	অম্বুরি	অম্	৩৬	অম্লমধু	অম্	৩৬	অয়োগুল	ই	৬৫
অভ্যাগত	গম্	২৬২	অম্বরপুষ্প	অম্	৩৬	অম্বুরী	অম্	৩৬	অম্লমধুর	অম্	৩৬	অয়োঘন	ই	৬৫
অভ্যাস	অস্	৫৬	অম্বরযুগ	অম্	৩৬	অম্বুরুট্	অম্	৩৬	অম্লমেহ	অম্	৩৬	অয়োজাল	ই	৬৫
অভ্যুদয়	ই	৬৭	অম্বরলেখী	অম্	৩৬	অম্বুরুহ	অম্	৩৬	অম্ললোণিকা	অম্	৩৬	অয়োধাতু	ই	৬৫
অভ্যুদিত	ই	৬৭	অম্বরিষ	অম্	৩৬	অম্বুরুহা	অম্	৩৬	অম্ললোণী	অম্	৩৬	অয়োময়	ই	৬৫
অভ্র্	অ	৫৯	অম্বরীষ	অম্	৩৬	অম্বুরুহিণী	অম্	৩৬	অম্ললোনিকা	অম্	৩৬	অয়োমল	ই	৬৫
অভ্র	অ	৫৯	অম্বরৌকাঃ	অম্	৩৬	অম্বুরোহিণী	অম্	৩৬	অম্ললোনী	অম্	৩৬	অয়োমুখ	ই	৬৫
অভ্রক	অ	৫৯	অম্বল	অম্	৩৬	অম্বুসেচনী	অম্	৩৬	অম্লশাক	অম্	৩৬	অয়োহৃদয়	ই	৬৫
অভ্রঘন	অ	৫৯	অম্বষ্ঠ	অম্	৩৬	অম্বুকৃত	অম্	৩৬	অম্লসার	অম্	৩৬	অর	ঋ	১১৩
অভ্রঙ্কষ	কশ্	১৭৩	অম্বা	অম্	৪০	অম্ভ	অম্	৩৬	অম্লহরিদ্রা	অম্	৩৬	অরগুণ	ঋ	১১৩
অভ্রচ্ছায়া	অ	৫৯	অম্বালিকা	অম্	৪০	অম্ভঃ(ম্ভস্)	অম্	৩৬	অম্লিকা	অম্	৩৬	অরঘট্ট	ঋ	১১৩
অভ্রপটল	অ	৫৯	অম্বিকা	অম্	৪০	অম্ভঃকণ	অম্	৩৬	অম্লোদগার	অম্	৩৬	অরঘট্টক	ঋ	১১৩
অভ্রবৃন্দ	অ	৫৯	অম্বিকানগর	অম্	৩৬	অম্ভঃপতি	অম্	৩৬	অযশ	অশ্	৪৬	অরণ	ঋ	১১৪

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অরণি	ঋ	১১৪	অর্কজা	অর্চ্	৪১	অর্জ্জুন	অর্জ্	৪২	অর্থপ্রাপ্তি	অর্থ্	৪৩	অর্থিজন	অর্থ্	৪৩
অরণ্য	ঋ	১১৪	অর্কতনয়	অর্চ্	৪১	অর্ণঃ	ঋ	১১৩	অর্থবন্ধ	অর্থ্	৪৩	অর্থিত	অর্থ্	৪৩
অরতি	ঋ	১১৩	অর্কনন্দন	অর্চ্	৪২	অর্ণব	ঋ	১১৩	অর্থবাদ	অর্থ্	৪৩	অর্থিতা	অর্থ্	৪৩
অরবিন্দ	ঋ	১১৫	অর্কপক্ব	অর্চ্	৪১	অর্ণবনেমি	ঋ	১১৩	অর্থবান	অর্থ্	৪৩	অর্থী	অর্থ্	৪৩
অরবিন্দদলপ্রভ	ঋ	১১৩	অর্কপ্রকাশ	অর্চ্	৪১	অর্ণবপোত	ঋ	১১৩	অর্থবিজ্ঞান	অর্থ্	৪৩	অর্থীয়	অর্থ্	৪৩
অরবিন্দনাভ	ঋ	১১৩	অর্কফলা	অর্চ্	৪১	অর্ণবোপম	ঋ	১১৩	অর্থবিদ	অর্থ্	৪৩	অর্থে	অর্থ্	৪৩
অরবিন্দবন্ধু	ঋ	১১৩	অর্কবংশ	অর্চ্	৪১	অর্ণবযান	ঋ	১১৩	অর্থবিত্ত	অর্থ্	৪৩	অর্থোপক্ষেপক	অর্থ্	৪৩
অরবিন্দাক্ষ	ঋ	১১৩	অর্কবন্ধু	অর্চ্	৪১	অর্ত্তি	অ	৫৯	অর্থবিদ্যা	অর্থ্	৪৩	অর্থোপমা	অর্থ্	৪৩
অরবিন্দিনী	ঋ	১১৫	অর্কবল্লভ	অর্চ্	৪১	অর্থ্	অর্থ্	৪৩	অর্থবিপত্তি	অর্থ্	৪৩	অর্থোষ্মা	অর্থ্	৪৩
অরর	ঋ	১১৩	অর্কবান্ধব	অর্চ্	৪১	অর্থ	অর্থ্	৪৩	অর্থবৈকল্য	অর্থ্	৪৩	অর্থ্য	অর্থ্	৪৩
অররু	ঋ	১১৩	অর্কবিবাহ	অর্চ্	৪১	অর্থকর	অর্থ্	৪৩	অর্থব্যক্তি	অর্থ্	৪৩	অর্দ্দ্	অ	৫৯
অরহর	ঋ	১১৩	অর্কবৃক্ষ	অর্চ্	৪২	অর্থকরী	অর্থ্	৪৩	অর্থভাণ্ডার	অর্থ্	৪৩	অর্দ্দন	অ	৫৯
অরাল	ঋ	১১৩	অর্কব্রত	অর্চ্	৪১	অর্থকাম	অর্থ্	৪৩	অর্থমাত্র	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধ	ঋধ্	১২১
অরালকেশী	ঋ	১১৩	অর্কসুত	অর্চ্	৪১	অর্থকার্শ্য	অর্থ্	৪৩	অর্থযুক্ত	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধক	ঋধ্	১২১
অরালপক্ষ্মা	ঋ	১১৩	অর্কসূনু	অর্চ্	৪১	অর্থকৃচ্ছ্র	অর্থ্	৪৩	অর্থলাভ	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায়	ঋধ্	১২১
অরি	ঋ	১১৫	অর্কোপল	অর্চ্	৪১	অর্থকৃৎ	অর্থ্	৪৩	অর্থশালী	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধকৈশিক	ঋধ্	১২১
অরিত্র	ঋ	১১৫	অর্গল	অর্জ্	৪২	অর্থকৃত	অর্থ্	৪৩	অর্থশাস্ত্র	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধগুঞ্জা	ঋধ্	১২১
অরিনন্দন	ঋ	১১৩	অর্গলা	অর্জ্	৪২	অর্থকৃত্য	অর্থ্	৪৩	অর্থশাস্ত্রকার	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধচতুর্থ	ঋধ্	১২১
অরিন্দম	ঋ	১১৫	অর্গলিকা	অর্জ্	৪২	অর্থকৃত্যা	অর্থ্	৪৩	অর্থশাস্ত্রব্যবহারী	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধচন্দ্র	ঋধ্	১২১
অরিভদ্র	ঋ	১১৩	অর্গলিত	অর্জ্	৪২	অর্থকোবিদ	অর্থ্	৪৩	অর্থশৌচ	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়	ঋধ্	১২১
অরিভুক	ঋ	১১৩	অর্গলী	অর্জ্	৪২	অর্থগৃহ	অর্থ্	৪৩	অর্থশ্লেষ	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধতৃতীয়	ঋধ্	১২১
অরিমণ্ডল	ঋ	১১৩	অর্ঘ	অর্হ্	৪৩	অর্থগৌরব	অর্থ্	৪৩	অর্থশ্লোক	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধত্রয়োদশ	ঋধ্	১২১
অরিমর্দ্দ	ঋ	১১৩	অর্ঘবলাবল	অর্হ্	৪৩	অর্থঘ্ন	অর্থ্	৪৩	অর্থসংকট	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধদিবস	ঋধ্	১২১
অরিমর্দ্দন	ঋ	১১৩	অর্ঘবিৎ	অর্হ্	৪৩	অর্থচিন্তক	অর্থ্	৪৩	অর্থসংগ্রহ	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধদৃষ্টি	ঋধ্	১২১
অরিমিত্র	ঋ	১১৩	অর্ঘভাক্	অর্হ্	৪৩	অর্থজ	অর্থ্	৪৩	অর্থসংস্থান	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধধার	ঋধ্	১২১
অরিষড়বর্গ	ঋ	১১৩	অর্ঘসংস্থাপন	অর্হ্	৪৩	অর্থজাত	অর্থ্	৪৩	অর্থসঞ্চয়	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধনারাচ	ঋধ্	১২১
অরিহ	ঋ	১১৩	অর্ঘ্য	অর্হ্	৪৩	অর্থজ্ঞ	অর্থ্	৪৩	অর্থসম্পদ	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধনারীশ	ঋধ্	১২১
অরিহর	ঋ	১১৩	অর্চ্চ্	অর্চ্	৪৩	অর্থতঃ	অর্থ্	৪৩	অর্থসম্পাদন	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধনারীশ্বর	ঋধ্	১২১
অরুণ	ঋ	১১৫	অর্চ্চ	অর্চ্	৪৩	অর্থতত্ত্ব	অর্থ্	৪৩	অর্থসম্বন্ধী	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধপঞ্চম	ঋধ্	১২১
অরুণকঞ্জ	ঋ	১১৩	অর্চ্চক	অর্চ্	৪৩	অর্থতন্ত্র	অর্থ্	৪৩	অর্থসাধক	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধপঞ্চাশৎ	ঋধ্	১২১
অরুণনন্দন	ঋ	১১৩	অর্চ্চন	অর্চ্	৪৩	অর্থদ	অর্থ্	৪৩	অর্থসার	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধপণ	ঋধ্	১২১
অরুণপ্রিয়া	ঋ	১১৩	অর্চ্চনা	অর্চ্	৪৩	অর্থদণ্ড	অর্থ্	৪৩	অর্থসিদ্ধ	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধপথ	ঋধ্	১২১
অরুণা	ঋ	১১৩	অর্চ্চনীয়	অর্চ্	৪৩	অর্থদর্শন	অর্থ্	৪৩	অর্থহর	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধবীক্ষণ	ঋধ্	১২১
অরুণাত্মজ	ঋ	১১৩	অর্চ্চা	অর্চ্	৪৩	অর্থদূষণ	অর্থ্	৪৩	অর্থহীন	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধভাগ	ঋধ্	১২১
অরুণারুণ	ঋ	১১৩	অর্চ্চার্হ	অর্চ্	৪৩	অর্থনা	অর্থ্	৪৩	অর্থাগম	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধমাত্রক	ঋধ্	১২১
অরুণিত	ঋ	১১৩	অর্চ্চি	অর্চ্	৪৩	অর্থনাশ	অর্থ্	৪৩	অর্থাৎ	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধমার্গ	ঋধ্	১২১
অরুণিম	ঋ	১১৩	অর্চ্চিঃ(বর্চ্চঃ)	অর্চ্	৪৩	অর্থনিবন্ধন	অর্থ্	৪৩	অর্থাধিকার	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধমাস	ঋধ্	১২১
অরুণিমা	ঋ	১১৩	অর্চ্চিত	অর্চ্	৪৩	অর্থনিশ্চয়	অর্থ্	৪৩	অর্থান্তর	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধরথ	ঋধ্	১২১
অরুণীকৃত	ঋ	১১৩	অর্চ্চিষ্মান	অর্চ্	৪৩	অর্থন্যূন	অর্থ্	৪৩	অর্থান্তরন্যাস	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধরাত্র	ঋধ্	১২১
অরুণোদয়	ঋ	১১৩	অর্চ্চ্য	অর্চ্	৪৩	অর্থপতি	অর্থ্	৪৩	অর্থাপত্তি	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধলিখিত	ঋধ্	১২১
অরুন্তুদ	ঋ	১১৩	অর্জ্জ	অর্জ্	৪২	অর্থপর	অর্থ্	৪৩	অর্থারি	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধশত	ঋধ্	১২১
অরে	ঋ	১১৩	অর্জ্জক	অর্জ্	৪২	অর্থপরিগ্রহ	অর্থ্	৪৩	অর্থার্থ	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধসপ্তশত	ঋধ্	১২১
অরেরে	ঋ	১১৩	অর্জ্জন	অর্জ্	৪২	অর্থপিশাচ	অর্থ্	৪৩	অর্থার্থী	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধসীরী	ঋধ্	১২১
অর্ক	অর্চ্	৪১	অর্জ্জনীয়	অর্জ্	৪২	অর্থপূর্ণ	অর্থ্	৪৩	অর্থালঙ্কার	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধহর	ঋধ্	১২১
অর্কজ	অর্চ্	৪২	অর্জ্জিত	অর্জ্	৪২	অর্থপ্রয়োগ	অর্থ্	৪৩	অর্থিক	অর্থ্	৪৩	অর্দ্ধা-অর্দ্ধি	ঋধ্	১২১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অর্দ্ধাংশ	ঋধ্	১২১	অর্শোঘ্ন	ঋ	১১৩	অলিকেশ	অল্	৪৪	অল্পায়ু	অল্	৪৪	অশ্রি	অশ্	৪৬
অর্দ্ধাচিত	ঋধ্	১২১	অর্হ্	অর্হ্	৪৩	অলিগলি	অল্	৪৪	অল্পায়ে	অল্	৪৪	অশ্রী	অশ্	৪৬
অর্দ্ধার্দ্ধ	ঋধ্	১২১	অর্হ	অর্হ্	৪৩	অলিজিহ্বা	অল্	৪৪	অল্পাল্প	অল্	৪৪	অশ্রু	অশ্	৪৬
অর্দ্ধাবলীঢ়	ঋধ্	১২১	অর্হণ	অর্হ্	৪৩	অলিজিহ্বিকা	অল্	৪৪	অল্পাসু	অল্	৪৪	অশ্রুপরিপূর্ণ	অশ্	৪৬
অর্দ্ধাবশিষ্ট	ঋধ্	১২১	অর্হণা	অর্হ্	৪৩	অলিঞ্জর	অল্	৪৪	অল্পাহারী	অল্	৪৪	অশ্রুপরিপ্লুত	অশ্	৪৬
অর্দ্ধাবশেষ	ঋধ্	১২১	অর্হণীয়	অর্হ্	৪৩	অলিন	অল্	৪৪	অল্পিত	অল্	৪৪	অশ্রুপাত	অশ্	৪৬
অর্দ্ধাসন	ঋধ্	১২১	অর্হৎ	অর্হ্	৪৪	অলিনী	অল্	৪৪	অল্পিষ্ঠ	অল্	৪৪	অশ্রুপূর্ণ	অশ্	৪৬
অর্দ্ধিক	ঋধ্	১২১	অর্হন্	অর্হ্	৪৩	অলিন্দ	অল্	৪৪	অল্পেতর	অল্	৪৪	অশ্রুবারি	অশ্	৪৬
অর্দ্ধেক	ঋধ্	১২১	অর্হা	অর্হ্	৪৩	অলিবিরাব	অল্	৪৪	অল্পেয়ে	অল্	৪৪	অশ্রুসলিল	অশ্	৪৬
অর্দ্ধেন্দু	ঋধ্	১২১	অর্হিত	অর্হ্	৪৩	অলিবিরুত	অল্	৪৪	অলম্	অল্	৪৪	অশ্রুময়	অশ্	৪৬
অর্দ্ধোক্ত	ঋধ্	১২১	অর্হনীয়	অর্হ্	৪৩	অলী	অল্	৪৪	অলর্ক	অল্	৪৪	অশ্রুমুখ	অশ্	৪৬
অর্দ্ধোদয়	ঋধ্	১২১	অর্হ্য	অর্হ্	৪৩	অলীক	অল্	৪৪	অশ্	অশ্	৪৬	অশ্রুলেশ	অশ্	৪৬
অর্দ্ধোদিত	ঋধ্	১২১	অল্	অল্	৪৪	অলে	ঋ	১১৩	অশকুন	অশ্	৪৬	অশ্রুলোচন	অশ্	৪৬
অর্পণ	ঋ	১১৬	অল	অল্	৪৪	অলেলে	ঋ	১১৩	অশন	অশ্	৫০	অশ্ব	অশ্	৫০
অর্পণীয়	ঋ	১১৩	অলক	অল্	৪৪	অলো	ঋ	১১৩	অশনা	অশ্	৪৬	অশ্বকন্দা	অশ্	৪৬
অর্পয়িতা	ঋ	১১৩	অলককুন্তল	অল্	৪৪	অলোপ্পেয়ে	অল্	৪৪	অশনায়া	অশ্	৪৬	অশ্বকর্ণ	অশ্	৪৬
অর্পিত	ঋ	১১৬	অলকতিলক	অল্	৪৪	অল্প	অল্	৪৫	অশনায়িত	অশ্	৪৬	অশ্বকর্ণক	অশ্	৪৬
অর্প্য	ঋ	১১৩	অলকনন্দা	অল্	৪৪	অল্পক	অল্	৪৪	অশনি	অশ্	৪৬	অশ্বকুটী	অশ্	৪৬
অর্ব্বন্	ঋ	১১৬	অলকমেঘ	অল্	৪৪	অল্পকার্য্য	অল্	৪৪	অশবার	অশ্	৪৬	অশ্বকোবিদ	অশ্	৪৬
অর্ব্বা	ঋ	১১৬	অলকা	অল্	৪৪	অল্পক্রীত	অল্	৪৪	অশিত	অশ্	৪৬	অশ্বক্রান্ত	অশ্	৪৬
অর্ব্বাক	অঞ্চ্	১০	অলকাতিলক	অল্	৪৪	অল্পগন্ধ	অল্	৪৪	অশিতা	অশ্	৪৬	অশ্বক্ষুর	অশ্	৪৬
অর্ব্বাককাল	অঞ্চ্	৯	অলকাতিলকা	অল্	৪৪	অল্পচ্ছদ	অল্	৪৪	অশীতি	অশ্	৪৬	অশ্বগন্ধা	অশ্	৪৬
অর্ব্বাক্কালিক	অঞ্চ্	৯	অলকাধিপ	অল্	৪৪	অল্পজ্ঞান	অল্	৪৪	অশীতিক	অশ্	৪৬	অশ্বঘাস	অশ্	৪৬
অর্ব্বাককূল	অঞ্চ্	৯	অলকানন্দা	অল্	৪৫	অল্পতা	অল্	৪৪	অশীতিকাবর	অশ্	৪৬	অশ্বচক্র	অশ্	৪৬
অর্ব্বাকতন	অঞ্চ্	১০	অলকাপতি	অল্	৪৪	অল্পদক্ষিণ	অল্	৪৪	অশীতিপর	অশ্	৪৬	অশ্বচালনা	অশ্	৫০
অর্ব্বাকস্রোতাঃ	অঞ্চ্	১০	অলকেশ্বর	অল্	৪৪	অল্পদর্শন	অল্	৪৪	অশীতিবর্ষ	অশ্	৪৬	অশ্বচেষ্টিত	অশ্	৪৬
অর্ব্বাচীন	অঞ্চ্	১০	অলগর্দ্দ	অল্	৪৪	অল্পদৃষ্টি	অল্	৪৪	অশ্ম	অশ্	৪৬	অশ্বডিম্ব	অশ্	৪৬
অর্ব্বুদ	অ	৫৯	অলগর্দ্দ	ঋ	১১৩	অল্পধী	অল্	৪৪	অশ্মক	অশ্	৪৬	অশ্বতর	অশ্	৪৬
অর্ব্বুদ-খর্ব্বট	অ	৫৯	অলগর্দ্ধ	ঋ	১১৩	অল্পপুণ্য	অল্	৪৪	অশ্মকুট্ট	অশ্	৪৬	অশ্বতরী	অশ্	৪৬
অর্ভ	ঋ	১১৩	অলঙ্করণ	অল্	৪৫	অল্পপ্রাণ	অল্	৪৪	অশ্মকুট্টক	অশ্	৪৬	অশ্বত্থ	অশ্	৫০
অর্ভক	ঋ	১১৩	অলঙ্করিষ্ণু	অল্	৪৪	অল্পবাধ	অল্	৪৪	অশ্মগুড়	অশ্	৪৬	অশ্বত্থামা	অশ্	৫১
অর্ভকলীলা	ঋ	১১৩	অলঙ্কর্ত্তা	অল্	৪৪	অল্পবিদ্য	অল্	৪৪	অশ্মগুড়ক	অশ্	৪৬	অশ্বদ	অশ্	৪৬
অর্ভকহার্য্য	ঋ	১১৩	অলঙ্কার	অল্	৪৫	অল্পবিদ্যা	অল্	৪৪	অশ্মচূর্ণ	চুর্	৩৫৪	অশ্বপ	অশ্	৪৬
অর্য্য	ঋ	১১৩	অলঙ্কারক	অল্	৪৪	অল্পবিষয়	অল্	৪৪	অশ্মজ	অশ্	৪৬	অশ্বপতি	অশ্	৪৬
অর্য্যমা	ঋ	১১৩	অলঙ্কৃত	অল্	৪৪	অল্পবুদ্ধি	অল্	৪৪	অশ্মন্ত	অশ্	৪৬	অশ্বপাল	অশ্	৪৬
অর্য্যা	ঋ	১১৩	অলঙ্কৃতি	অল্	৪৪	অল্পমতি	অল্	৪৪	অশ্মন্তক	অশ্	৪৬	অশ্বপালক	অশ্	৪৬
অর্য্যাণী	ঋ	১১৩	অলঙ্ক্রিয়া	অল্	৪৪	অল্পভাগ্য	অল্	৪৪	অশ্মপ্লব	অশ্	৪৬	অশ্ববক্ত্র	অশ্	৪৬
অর্য্যী	ঋ	১১৩	অলঙ্কুম	অল্	৪৪	অল্পমাত্র	অল্	৪৪	অশ্মবর্ষ	অশ্	৪৬	অশ্ববদন	অশ্	৪৬
অর্শ	ঋ	১১৩	অলপ	অল্	৪৪	অল্পমেধাঃ	অল্	৪৪	অশ্মবৃষ্টি	অশ্	৪৬	অশ্ববন্ধ	অশ্	৪৬
অর্শঃ	ঋ	১১৩	অলপ্পেয়ে	অল্	৪৪	অল্পশঃ	অল্	৪৪	অশ্মময়	অশ্	৪৬	অশ্ববন্ধক	অশ্	৪৬
অর্শা	ঋ	১১৩	অলা	ঋ	১১৩	অল্পশরীর	অল্	৪৪	অশ্মরী	অশ্	৪৬	অশ্ববহ	অশ্	৪৬
অর্শান	ঋ	১১৩	অলি	অল্	৪৪	অল্পসরঃ	অল্	৪৪	অশ্মসার	অশ্	৪৬	অশ্ববার	অশ্	৪৬
অর্শায়	ঋ	১১৩	অলি-অছি	অল্	৪৪	অল্পসার	অল্	৪৪	অশ্মা	অশ্	৪৬	অশ্ববারক	অশ্	৪৬
অর্শে	ঋ	১১৩	অলিকদম্বক	অল্	৪৪	অল্লাই	অল্	৪৪	অশ্মান্তক	অশ্	৪৬	অশ্ববাহ	অশ্	৪৬
অর্শী	ঋ	১১৩	অলিকুল	অল্	৪৪	অল্পস্বল্প	অল্	৪৪	অশ্র	অশ্	৪৬	অশ্ববাহক	অশ্	৪৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
অস্তশিখর	অস্	৫৬	অস্থিমান	অস্	৫৬	আইড়	ড়	৪৩৯	আউলে	কুল্	১৯৭	আঁখি-আড়	অশ্	৪৬
অস্তসংখ্যা	অস্	৫৬	অস্থিমালা	অস্	৫৬	আইডাহি	ঋ	১১৩	আউশ	অশ্	৪৬	আঁখিঠার	অশ্	৪৬
অস্তাচল	অস্	৫৬	অস্থিশৃঙ্খলা	অস্	৫৬	আইঢাই	ঋ	১১৩	আউতিয়া	উল্	১০৭	আঁখিমল	অশ্	৪৬
অস্তাদ্রি	অস্	৫৬	অস্থিসংহার	অস্	৫৬	আই-মা	ধু	৬০১	আউলা	কুল্	১৯৭	আঁগ	অঙ্গ্	৬
অস্তি	অস্	৫৬	অস্থিসঞ্চয়	অস্	৫৬	আইয়াতি	ধু	৬০১	আউলা	উল্	১০৭	আঁগন	অঙ্গ্	৬
অস্তিত্ব	অস্	৫৬	অস্থিসঞ্চয়ন	অস্	৫৬	আইয়ো	ধু	৬০১	আএল	উল্	১০৭	আঁগিনা	অঙ্গ্	৬
অস্তু	অস্	৫৬	অস্থিসঞ্চারিণী	অস্	৫৬	আইয়্য	ধু	৬০১	আও	উল্	১০৭	আঁগুলি	অঙ্গ্	৬
অস্ত্র	অস্	৫৮	অস্থিসন্ধি	অস্	৫৬	আইয়্যত	ধু	৬০১	আওত	উল্	১০৭	আঁচ	অঞ্চ্	১০
অস্ত্রকার	অস্	৫৬	অস্থিসমর্পণ	অস্	৫৬	আইল	ড়	৪৩৯	আওতা	তপ্	৪৫৯	আঁচ	অর্চ্	৪১
অস্ত্রকারক	অস্	৫৬	অস্থিসম্ভব	অস্	৫৬	আইশাশ	ধু	৬০১	আওরৎ	উর্	১০৩	আঁচড়	চট্	৩২৪
অস্ত্রকারী	অস্	৫৬	অস্থিসার	অস্	৫৬	আইস	গম্	২৬২	আওরা	তু	৪৭১	আঁচড়া	চট্	৩২৪
অস্ত্রগড়	অস্	৫৬	অস্থিস্থূণ	অস্	৫৬	আইহ	ধু	৬০১	আওল	উল্	১০৭	আঁচড়া-আঁচড়ি	চট্	৩২৪
অস্ত্রগুরু	অস্	৫৬	অস্মদ্	অস্	৫৬	আউ	ই	৬৫	আওল	গম্	২৬২	আঁচড়-কামড়	চট্	৩২৪
অস্ত্রচিকিৎসক	অস্	৫৬	অস্মদাদি	অস্	৫৬	আউগাও	অঞ্জ্	১১	আওলাত	উল্	১০৭	আঁচড়ান	চট্	৩২৪
অস্ত্রজীব	অস্	৫৬	অস্মদীয়	অস্	৫৬	আউড়	ড়	৪৩৯	আওলাদ	উল্	১০৭	আঁচড়ান-কামড়ান	চট্	৩২৪
অস্ত্রজীবী	অস্	৫৬	অস্মদ্বিধ	অস্	৫৬	আ-উতা	তপ্	৪৫৯	আওসা	অশ্	৪৬	আঁচতাকুড়	চম্	৩৩৭
অস্ত্রধারী	অস্	৫৬	অস্মাকম	অস্	৫৬	আউওল	উল্	১০৭	আংটা	অঙ্গ্	৬	আঁচ-পাঁচ	অর্চ্	৪১
অস্ত্রপাণি	অস্	৫৬	অস্মাদৃশ	অস্	৫৬	আউগাও	উল্	১০৭	আংটি	অঙ্গ্	৬	আঁচ-মন	অর্চ্	৪১
অস্ত্রবিৎ	অস্	৫৬	অস্মি	অস্	৫৬	আউড়ে	উল্	১০৭	আংঠি	অঙ্গ্	৬	আঁচল	অঞ্চ্	১০
অস্ত্রবিদ্	অস্	৫৬	অস্র	অস্	৫৬	আউড়ে	কুল্	১৯৭	আংরাখা	অঙ্গ্	৬	আঁচা	অঞ্চ্	১০
অস্ত্রবিদ্যা	অস্	৫৬	অস্রি	অস্	৫৬	আউঢাউ	উল্	১০৭	আঁইষ	অম্	৩৬	আঁচাআঁচি	অঞ্চ্	১০
অস্ত্রবৃষ্টি	অস্	৫৬	অস্রু	অস্	৫৬	আউতন	উল্	১০৭	আঁওলা	অম্	৩৬	আঁচি	অঞ্চ্	১০
অস্ত্রমন্ত্র	অস্	৫৬	অস্বীকার	কৃ	২০০	আউতন	চর্	৩৪০	আঁক	অঙ্ক্	৬	আঁচিল	অঞ্চ্	১০
অস্ত্রমার্গ	অস্	৫৬	অহ	অ	৫৯	আউদড়	উল্	১০৭	আঁকড়	কৃশ্	২১৫	আঁচীল-পাঁচীল	অঞ্চ্	১০
অস্ত্রমার্জ্জ	অস্	৫৬	অহঙ্কার	কৃ	২০২	আউদড়	কুল্	১৯৭	আঁকড়দড়ি	কৃশ্	২১৫	আঁজলা	অঞ্জ্	১৮
অস্ত্রমার্জ্জক	অস্	৫৬	অহন	অ	৫৯	আউদর	কুল্	১৯৭	আঁকড়ষি	কৃশ্	২১৫	আঁজি	অঞ্জ্	১৮
অস্ত্রলাঘব	অস্	৫৬	অহিত	ধা	৬০০	আউদল	কুল্	১৯৭	আঁকড়া	কৃশ্	২১৫	আঁজিনা	অঞ্জ্	১৮
অস্ত্রলেখা	অস্	৫৬	অহিতকারী	ধা	৫৯০	আউনিঞা	অঞ্জ্	১১	আঁকড়া-আঁকড়ি	কৃশ্	২১৫	আঁজিলা	অঞ্জ্	১৮
অস্ত্রশস্ত্র	অস্	৫৬	অহিতমনাঃ	ধা	৫৯০	আউনিঞা	উল্	১০৭	আঁকড়ান	কৃশ্	২১৫	আঁজুল	অঞ্জ্	১৮
অস্ত্রশিক্ষা	অস্	৫৬	অহিতলক্ষণ	ধা	৫৯০	আউনি-বাউনি	উল্	১০৭	আঁকশলা	অশ্	৪৬	আঁট	অট্	২০
অস্ত্রসন্ধি	অস্	৫৬	অহিতহিত	ধা	৫৯০	আড়ুরা	উল্	১০৭	আঁকশলী	অশ্	৪৬	আঁট	অশ্	৪৬
অস্ত্রহীন	অস্	৫৬	অহিতা	ধা	৫৯০	আউরা	তু	৪৭১	আঁকসলি	অশ্	৪৬	আঁট	নহ্	৬৩৫
অস্ত্রাগার	অস্	৫৬	অহিনকুল	ন্	৬৬৮	আউল	উল্	১০৮	আঁকা	অঙ্ক্	৬	আঁটন	নহ্	৬৩৫
অস্ত্রাঘাত	অস্	৫৬	অহিহন	অ	৫৯	আউল	কুল্	১৯৭	আঁকশি	অঙ্ক্	৬	আঁটরা	নহ্	৬৩৫
অস্ত্রাবচারণীয়	অস্	৫৬				আউলঝাউল	কুল্	১৯৭	আঁকাগন্ধ	অঙ্ক্	৫	আঁটরা-বাঁট	নহ্	৬৩৫
অস্ত্রী	অস্	৫৬	**আ**			আউলঝাউল	উল্	১০৭	আঁকাজোকা	অঙ্ক্	৬	আঁটসাঁট	নহ্	৬৩৫
অস্থি	অস্	৫৬				আউল-বাউল	উল্	১০৮	আঁকাবাঁকা	অঙ্ক্	৬	আঁটসাঁট	অট্	২১
অস্থিচর্ম্মশেষ	অস্	৫৬	আ	—	৫৯	আউলা	উল্	১০৮	আঁকুড়ি	কৃশ্	২১৫	আঁটা	অট্	২০
অস্থিচর্ম্মসার	অস্	৫৬	আই	ঋ	১১৩	আউলা	কুল্	১৯৭	আঁকুর	অঙ্ক্	৫	আঁটা	নহ্	৬৩৫
অস্থিচর্ম্মী	অস্	৫৬	আই	ধা	৫৯০	আউলান	কুল্	১৯৭	আঁকুশ	অঙ্ক্	৫	আঁটাআঁটি	নহ্	৬৩৫
অস্থিপঞ্জর	অস্	৫৬	আইঅত	ধু	৬০১	আউলান	উল্	১০৭	আঁকুশি	অঙ্ক্	৫	আঁটাসাঁটা	নহ্	৬৩৫
অস্থিপ্রক্ষেপ	অস্	৫৬	আইও	ধু	৬০১	আউলিয়া	উল্	১০৮	আঁখ	অশ্	৪৬	আঁটি	নহ্	৬৩৫
অস্থিভঙ্গ	অস্	৫৬	আইওত	ধু	৬০১	আউলিয়া	কুল্	১৯৭	আঁখর	অশ্	৪৬	আঁটি	অট্	২০
অস্থিভেদ	অস্	৫৬	আইচ	দো	৫৬৯	আউলী	কুল্	১৯৭	আঁখরিয়া	অশ্	৪৬	আঁটিয়া	নহ্	৬৩৫
অস্থিমাত্রসার	অস্	৫৬	আইজ	অ	৫৯	আউলী	উল্	১০৭	আঁখি	অশ্	৪৬	আঁটিসাঁটি	নহ্	৬৩৫

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
আঁটু	অট্	২০	আঁশাল	অশ্	৩৬	আকষ	কশ্	১৭৩	আকাশভারতী	কশ্	১৭৩	আক্রোশ	ক্রুশ্	২২২
আঁটুনি	নহ্	৬৩৫	আঁশাল	অংশ্	৩	আকসার	অশ্	৫৬	আকাশমণ্ডল	কশ্	১৭৩	আক্রোশক	ক্রুশ্	২২২
আঁটুনি	অট্	২০	আঁষ	অংশ্	৩	আকা	অর্চ্	৪১	আকাশযান	কশ্	১৭৩	আক্রোশন	ক্রুশ্	২২২
আঁটুয়া	নহ্	৬৩৫	আঁষ	অশ্	৫৫	আকাঁড়া	কম্	১৫৪	আকাশরক্ষী	কশ্	১৭৩	আক্রোষ্টা	ক্রুশ্	২২২
আঁটুবাঁটু	নহ্	৬৩৫	আঁষ	অম্	৩৬	আকাঁড়ি	কম্	১৫৪	আকাশশয়ন	কশ্	১৭৩	আক্লেদ	ক্লু	২২২
আঁটুলবাঁটুল	নহ্	৬৩৫	আঁষটিয়া	অম্	৩৬	আঁকুপাঁকু	কিৎ	১৮৩	আকাশশায়ী	কশ্	১৭৩	আক্ষদ্যূতিক	অশ্	৪৬
আঁটুলি	নহ্	৬৩৫	আঁষটিয়া	অশ্	৫৫	আকস্মিক	ক্	২৩৭	আকাশসম্ভব	কশ্	১৭৩	আক্ষপাটিক	অশ্	৪৬
আঁঠি	নহ্	৬৩৫	আঁষটে	অম্	৩৬	আকাঙক্ষা	ক্	২৩৭	আকাশসলিল	কশ্	১৭৩	আক্ষপাদ	অশ্	৪৬
আঁঠি	অট্	২০	আঁষটে	অশ্	৫৫	আকাঙক্ষা	কাঙক্ষ্	১৮৩	আকাশস্থ	কশ্	১৭৩	আক্ষমা	ক্ষম্	২২৭
আঁড়রা	অণ্	২১	আঁষটে	অংশ্	৩	আকাঙিক্ষত	ক্	২৩৭	আকিঞ্চন	ক্	২৩৭	আক্ষার	ক্ষর্	২২৮
আঁত	অম্	৩৬	আঁষল	অংশ্	৩	আকাঙক্ষী	ক্	২৩৭	আকীর্ণ	কৄ	২১১	আক্ষারণ	ক্ষর্	২২৮
আঁতড়ি	অম্	৩৬	আঁস্তাকুড়	চম্	৩৩৭	আকাঙক্ষ্য	ক্	২৩৭	আকুক্ষি	কশ্	১৭৩	আক্ষারণা	ক্ষর্	২২৮
আঁতড়ী	অম্	৩৬	আক	অর্চ্	৪১	আকাট	কট্	১৩৬	আকুঞ্চন	কুচ্	১৯৪	আক্ষারিত	ক্ষর্	২২৮
(অ্যাঁতড়ি)	অম্	৩৬	আক	ইষ্	৭৮	আকাটা	কট্	১৩৬	আকুট	কুচ্	১৯৪	আক্ষালিত	ক্ষল্	২২৯
আঁতর	অম্	৩৬	আকক্ষ	কশ্	১৭৩	আকাঠা	কশ্	১৭৩	আকুত	কিৎ	১৮৩	আক্ষি	অশ্	৪৬
আঁতি	অম্	৩৬	আকছার	অশ্	৪৬	অকান্দনে	ক্রন্দ্	২১৯	আকুতি	কিৎ	১৮৩	আক্ষিক	অশ্	৪৬
আঁতুড়	অম্	৩৬	আকটবিকট	কট্	১৩৬	আ-কার	আ	৬৪	আকুতি	কু	১৮৫	আক্ষিপ্ত	ক্ষিপ্	২৩৩
আঁতুড়ঘর	অম্	৩৬	আকণ্ঠ	কণ্	১৪০	আকার	কৃ	২০০	আকুমার	কম্	১৫৪	আক্ষেটি	খ্	২৫২
আঁতুআঁতু-পুঁতুপুঁতু	অত্	২২	আকথা	কথ্	১৪৭	আকারগুপ্তি	কৃ	২০০	আকুল	কুল্	১৯৭	আক্ষেপ	ক্ষিপ্	২৩৩
আঁতুপুঁতু	অত্	২৪	আকথন	কথ্	১৪৭	আকারণ	কৃ	২০০	আকুলতা	কুল্	১৯৭	আক্ষেপক	ক্ষিপ্	২৩৩
আঁদিসাঁদি	অন্	২৮	আকন্দ	কন্	১৫০	আকারপ্রকার	কৃ	২০০	আকুলি	কুল্	১৯৭	আক্ষেপণ	ক্ষিপ্	২৩৩
আঁধ	অন্	২৮	আকপিল	কন্	১৫০	আকারসদৃশ	কৃ	২০০	আকুলিত	কুল্	১৯৭	আক্ষেপী	ক্ষিপ্	২৩৩
আঁধল	অন্	২৮	আকম্প	কম্প্	১৬০	আকারিত	কৃ	২০০	আকুলিব্যাকুলি	কুল্	১৯৭	আক্ষোট	খ্	২৫২
আঁধা	অন্	২৮	আকম্পন	কম্প্	১৬০	আকারেঙ্গিত	কৃ	২০০	আকুলীকরণ	কুল্	১৯৭	আক্ষোড়	খ্	২৫২
আঁধার	অন্	২৮	আকম্পিত	কম্প্	১৬০	আকাল	কল্	১৬৪	আকুসি	অঙ্ক্	৫	আক্কারা	ক্রী	২২০
আঁধারি	অন্	২৮	আকম্প্য	কম্প্	১৬০	আকালি	কল্	১৬৪	আকূত	কিৎ	১৮৩	আক্কুটে	কট্	১৩৬
আঁধারিয়া	অন্	২৮	আকম্প্র	কম্প্	১৬০	আকালিক	কল্	১৬৪	আকূত	কু	১৮৫	আক্খুটে	কট্	১৩৬
আঁধিয়ার	অন্	২৮	আকর	কৃ	২০০	আকাশ	কশ্	১৭৪	আকূতি	কু	১৮৫	আখ	অশ্	৪৬
আঁধুনি	অন্	২৮	আকরজ	কৃ	২০০	আকাশবাণী	কশ্	১৭৩	আকৃতি	কৃ	২০০	আখ	ইষ্	৭৮
আঁধুয়া	অন্	২৮	আকরবিক্রয়	কৃ	২০০	আকাশকক্ষা	কশ্	১৭৩	আকৃষ্ট	কৃশ্	২১৫	আখটি	কট্	১৩৬
আঁধোল	অন্	২৮	আকরিক	কৃ	২০০	আকাশকথা	কশ্	১৭৩	আকেকর	কৄ	২১১	আখড়া	অশ্	৫৫
আঁব	অম্	৩৬	আকরী	কৃ	২০০	আকাশকুসুম	কশ্	১৭৩	আকোট	কুচ্	১৯৪	আখড়াই	অশ্	৪৬
আঁব-আদা	অম্	৩৬	আকরোদ্ভব	কৃ	২০০	আকাশগ	কশ্	১৭৩	আক্ত	অঞ্জ্	১১	আখণ্ড	খণ্ড্	২৪৭
আঁবসন্দেশ	অম্	৩৬	আকর্ণ	কৃ	২০০	আকাশগঙ্গা	কশ্	১৭৫	আক্রন্দ	ক্রন্দ্	২১৯	আখণ্ডল	খণ্ড্	২৪৭
আঁবহলদি	অম্	৩৬	আকর্ণ	কর্ণ	১৬০	আকাশচারী	কশ্	১৭৩	আক্রম	ক্রম্	২২০	আখণ্ডলচাপ	খণ্ড্	২৪৭
আঁবুই	অম্	৩৬	আকর্ণন	কৃ	২০০	আকাশজননী	কশ্	১৭৩	আক্রমণ	ক্রম্	২২০	আখণ্ডলধনু	খণ্ড্	২৪৭
আঁবর	অম্	৩৬	আকর্ষ	কৃশ্	২১৫	আকাশদিউটি	কশ্	১৭৩	আক্রমণীয়	ক্রম্	২১৯	আখণ্ডিত	খণ্ড্	২৪৭
আঁশ	অশ্	৫৫	আকর্ষক	কৃশ্	২১৫	আকাশদীপ	কশ্	১৭৩	আক্রা	ক্রী	২২০	আখনিক	খন্	২৪৮
আঁশ	অংশ্	৩	আকর্ষণ	কৃশ্	২১৫	আকাশপ্রদীপ	কশ্	১৭৩	আক্রান্ত	ক্রম্	২২০	আখর	অশ্	৪৬
আঁশটে	অংশ্	৩	আকর্ষিণী	কৃশ্	২১৫	আকাশদুহিতা	কশ্	১৭৩	আক্রান্তি	ক্রম্	২১৯	আখরিয়া	অশ্	৪৬
আঁশবঁটি	অশ্	৫৫	আকর্ষিত	কৃশ্	২১৫	আকাশনন্দিনী	কশ্	১৭৩	আক্রীড়	ক্রীড়্	২২১	আখরোট	খ্	২৫২
আঁশলা	অশ্	৫৫	আকর্ষী	কৃশ্	২১৫	আকাশপথ	কশ্	১৭৩	আক্রীড়ন	ক্রীড়্	২২১	আখাত	খন্	২৪৮
আঁশা	অংশ্	৩	আকল	কল্	১৬৪	আকাশবচন	কশ্	১৭৩	আক্রীড়ভূমি	ক্রীড়্	২২১	আখাতলি	কশ্	১৭৩
আঁশা	অশ্	৩৬	আকলন	কল্	১৬৪	আকাশবন্যা	কশ্	১৭৩	আক্রুষ্ট	ক্রুশ্	২২২	আখায়িল	ক্ষল্	২২৯
আঁশান	অশ্	৩৬	আকল্প	কৢপ্	২১৭	আকাশবর্ত্ম	কশ্	১৭৩	আক্রেতি	কৃ	২০০	আখি	অশ্	৪৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
আখুটি	কট্	১৩৬	আগম	গম্	২৬৪	আগুদল	অঞ্জ্	১১	আঙরা	অঞ্জ্	১১	আচ্ছাদী	ছদ্	৩৫৯
আখু	খন্	২৪৮	আগমন	গম্	২৬২	আগুয়ান	অঞ্জ্	১৯	আঙ্গারি	অঞ্জ্	১১	আচ্ছিদ্র	ছিদ্	৩৬৭
আখুবাহন	খন্	২৪৮	আগমনী	গম্	২৬৪	আগুরি	ঘৃ	৩১৭	আঙ্গিরসগণ	অঞ্জ্	৯	আচ্ছিন্ন	ছিদ্	৩৬৭
আখুরথ	খন্	২৪৮	আগমবাগীশ	গম্	২৬২	আগুল	অঞ্জ্	১১	আঙ্কুড়ী	অঙ্ক্	৫	আছ	অস্	৫৬
আখুভুক্	খন্	২৪৮	আগমবৃদ্ধ	গম্	২৬২	আগুল	অর্জ্	৪২	আঙ্কুর	অঙ্ক্	৫	আছড়া	ছর্দ্	৩৬৪
আখুভুজ	খন্	২৪৮	আগমবেদী	গম্	২৬২	আগুলি	অর্জ্	৪২	আঙ্কুশিক	অঙ্ক্	৫	আছাটা	ছিদ্	৩৬৭
আখেট	খ্	২৫২	আগমরহিত	গম্	২৬২	আগুলি	অঞ্জ্	১১	আচট	চট্	৩২৪	আছাড়	ছর্দ্	৩৬৪
আখেটক	খ্	২৫২	আগমশাস্ত্র	গম্	২৬৪	আগুলী	অর্জ্	৪২	আচন্ত	চম্	৩৩৭	আছি	অস্	৫৬
আখেটি	খ্	২৫২	আগমিত	গম্	২৬২	আগুসর	অঞ্জ্	১১	আচম	চম্	৩৩৭	আছিদর	ছিদ্	৩৬৭
আখেটিক	খ্	২৫২	আগয়ান	গম্	২৬২	আগে	অঞ্জ্	১৯	আচমকা	চম্	৩৩৭	আছে	অস্	৫৬
আখ্যা	খ্যা	২৫২	আগর	গল্	২৭৮	আগেকার	অঞ্জ্	১৯	আচমন	চম্	৩৩৭	আছোলা	ক্ষু	২৩৪
আখ্যাত	খ্যা	২৫২	আগল	গল্	২৭৮	আগোর	ঘৃ	৩১৭	আচমনি	চম্	৩৩৭	আজ	অদ্	২৫
আখ্যাতব্য	খ্যা	২৫১	আগলিত	গল্	২৭৮	আগোর	অঞ্জ্	১৯	আচমনী	চম্	৩৩৭	আজ	অ	৫৯
আখ্যাতা	খ্যা	২৫১	আগর	গৃ	২৯০	আগোর	ঘৃ	৩১৭	আচমনীয়	চম্	৩৩৭	আজ	জন্	৩৭৮
আখ্যাতি	খ্যা	২৫১	আগর	কৃ	২০০	আগোরি	অঞ্জ্	১৯	আচমান	চম্	৩৩৭	আজকাল	অদ্	২৫
আখ্যান	খ্যা	২৫২	আগরি	অঞ্জ্	১১	আগ্নিক	অঞ্জ্	১১	আচম্বিত	চম্	৩৩৭	আজগব	জন্	৩৭৮
আখ্যানক	খ্যা	২৫১	আগরি	উচ্	৮২	আগ্নিমাঠর	অঞ্জ্	১৯	আচর	চর্	৩৪০	আজগবি	জন্	৩৭৮
আখ্যায়িক	খ্যা	২৫১	আগরি	ঘৃ	৩১৭	আগ্নিমারুত	অঞ্জ্	১১	আচরণ	চর্	৩৪১	আজগর	জন্	৩৭৮
আখ্যায়িকা	খ্যা	২৫২	আগরী	উচ্	৮২	আগ্নীধ্র	অঞ্জ্	১৯	আচর্য্য	চর্	৩৪১	আজগুবি	জন্	৩৭৮
আখ্যায়ী	খ্যা	২৫১	আগরী	অঞ্জ্	১৮	আগ্নেয়	অঞ্জ্	১৯	আচান্ত	চম্	৩৩৭	আজগুবি	গৃ	৩০৩
আখ্যেয়	খ্যা	২৫১	আগল	কৃ	২০০	আগ্নেয়কীট	অঞ্জ্	১১	আচান্তকুণ্ড	চম্	৩৩৭	আজড়া	ঝট্	৪১১
আগ	অঞ্জ্	১৮	আগলদিঘল	অঞ্জ্	১৮	আগ্নেয়গিরি	অঞ্জ্	১১	আচাভুয়া	চম্	৩৩৭	আজনন	জন্	৩৭৮
আগঃ	ই	৬৫	আগলসুক্য	অঞ্জ্	১৮	আগ্নেয়পুরাণ	অঞ্জ্	১১	আচাম	চম্	৩৩৭	আজনম	জন্	৩৭৮
আগআন	অঞ্জ্	১১	আগলা	অঞ্জ্	১৮	আগ্নেয়াস্ত্র	অঞ্জ্	১১	আচার	চর্	৩৪১	আজন্ম	জন্	৩৭৮
আগচ্ছ	গম্	২৬২	আগলি	অঞ্জ্	১৮	আগ্রথন	গঠ্	২৫৪	আচারদীপ	চর্	৩৪০	আজব	জন্	৩৭৮
আগড়	অর্জ্	৪২	আগস	ই	৬৫	আগ্রয়ণ	অঞ্জ্	১১	আচারপূত	চর্	৩৪০	আজবক	জন্	৩৭৮
আগড়	গড়্	২৫৬	আগস্ত্য	গম্	২৬২	আগ্রহ	গ্রহ্	৩০১	আচারবর্জ্জিত	চর্	৩৪০	আজমীঢ়	জন্	৩৭৮
আগড়বাগড়	গড়্	২৫৬	আগা	অঞ্জ্	১৮	আগ্রহায়ণ	অঞ্জ্	১১	আচারবান	চর্	৩৪০	আজা	ঋ	১১৩
আগড়র্ম-বাগড়ম	গড়্	২৫৬	আগাও	অঞ্জ্	১৮	আগ্রহারিক	অঞ্জ্	১১	আচারব্যপেত	চর্	৩৪০	আজাড়	ঝট্	৪১১
আগড়া	গড়্	২৫৬	আগাছা	গম্	২৬২	আগ্রাসন	গ্রস্	৩০১	আচারভ্রষ্ট	চর্	৩৪০	আজানু	জন্	৩৭৮
আগড়ুম-বাগড়ুম	গড়্	২৫৬	আগাড়	অঞ্জ্	১৮	আগ্‌গা	জ্ঞা	৪০০	আচারী	চর্	৩৪০	আজানুলম্বিত	জন্	৩৭৮
আগডোমবাগডোম	গড়্	২৫৬	আগাড়ি	অঞ্জ্	১৮	আঘট্টক	ঘট্	৩০৩	আচারহীন	চর্	৩৪০	আজানুলম্বিনী	জন্	৩৭৮
আগ'ড়ে	গড়্	২৫৬	আগাম	গম্	২৬২	আঘর্ষ	ঘৃ	৩১৪	আচার্য্য	চর্	৩৪১	আজি	অদ্	২৫
আগণ	গণ্	২৫৭	আগামিকা	গম্	২৬২	আঘাট	ঘট্	৩০৩	আচার্য্যক	চর্	৩৪০	আজি	জন্	৩৭৮
আগণা	গণ্	২৫৭	আগামী	গম্	২৬২	আঘাটা	ঘট্	৩০৩	আচার্য্যকরণ	চর্	৩৪০	আজিকালি	অদ্	২৫
আগণি	অঞ্জ্	১১	আগামুক	গম্	২৬২	আঘাণ	ঘ্রা	৩১৬	আচার্য্যদেব	চর্	৩৪০	আজিকে	অদ্	২৫
আগত	গম্	২৬২	আগার	গৃ	২৯০	আঘাসা	অদ্	২৫	আচার্য্যমিশ্র	চর্	৩৪০	আজী	ঋ	১১৩
আগতখামার	গম্	২৬২	আগারে	অঞ্জ্	১৮	আঘুরি	ঘৃ	৩১৭	আচার্য্যা	চর্	৩৪০	আজীব	জীব্	৩৯৪
আগতরাইয়তী	গম্	২৬২	আগালে	অঞ্জ্	১৮	আঘূর্ণন	ঘূর্ণ্	৩১২	আচেষ্টিত	চেষ্ট্	৩৫৬	আজীবক	জীব্	৩৯৪
আগনলা	নট্	৬২২	আগি	অঞ্জ্	১৮	আঘোষ	ঘুষ্	৩১১	আচোট	চট্	৩২৪	আজীবন	জীব্	৩৯৪
আগনি	অঞ্জ্	১১	আগিলা	অঞ্জ্	১৮	আঘোষণ	ঘুষ্	৩১১	আচ্ছন্ন	ছদ্	৩৫৯	আজীব্য	জীব্	৩৯৪
আগন্তু	গম্	২৬২	আগু	অঞ্জ্	১৯	আঘ্রাণ	ঘ্রা	৩১৬	আচ্ছাদ	ছদ্	৩৫৯	আজু	অদ্	২৫
আগন্তুক	গম্	২৬২	আগুআন	গম্	২৬২	আঘ্রাত	ঘ্রা	৩১৬	আচ্ছাদক	ছদ্	৩৫৯	আজুক	অদ্	২৫
আগন্তুকজ্বর	গম্	২৬২	আগুড়ি	অঞ্জ্	১১	আঘ্রান	ঘ্রা	৩১৬	আচ্ছাদন	ছদ্	৩৫৯	আজুকা	অদ্	২৫
আগন্তুজ	গম্	২৬২	আগুন	অঞ্জ্	১৯	আঘ্রেয়	ঘ্রা	৩১৬	আচ্ছাদিত	ছদ্	৩৫৯	আজুকাইল	অদ্	২৫

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
আজুকার	অদ্	২৫	আঙিনা	অঙ্	৬	আটচালা	চল্	৩৪৫	আড়খেমটা	ড্	৪৪০	আণব	অণ্	২১
আজে	জন্	৩৭৮	আঙুল	অঙ্	৬	আটত্রিশ	অশ্	৪৬	আড়গড়া	ড্	৪৪০	আণবিক	অণ্	২১
আজ্ঞপ্ত	জ্ঞা	৪০০	আঙ্গ	অঙ্	৬	আটদিক	অশ্	৪৬	আড়ঘোমটা	ড্	৪৪০	আণ্ডা	অণ্	২১
আজ্ঞা	জ্ঞা	৪০০	আঙ্গটা	অঙ্	৬	আটন	অট্	২০	আড়ঙ্গ	ড্	৪৪১	আণ্ডিয়া	অণ্	২১
আজ্ঞাকর	জ্ঞা	৪০০	আঙ্গটিয়া	অঙ্	৬	আঁটনি	অশ্	৪৬	আড়ঙ্গছাটা	ড্	৪৩৯	আণ্ডির	অণ্	২২
আজ্ঞাকারী	জ্ঞা	৪০০	আঙ্গন	অঙ্	৬	আটপ	অট্	২০	আড়ঙ্গধোপ	ড্	৪৩৯	আণ্ডীর	অণ্	২২
আজ্ঞাকরণ	জ্ঞা	৪০০	আঙ্গরাখা	অঙ্	৬	আটপিঠে	অশ্	৪৬	আড়চা	ড্	৪৪০	আণ্ড্রা	অণ্	২১
আজ্ঞাচক্র	জ্ঞা	৪০০	আঙ্গারখি	অঙ্	৬	আটপৌরে	অশ্	৪৬	আড়চাল	ড্	৪৪০	আণ্ড্রাকাটা	অণ্	২২
আজ্ঞাদান	জ্ঞা	৪০০	আঙ্গি	অঙ্	৬	আটব	অট্	২০	আড়চোখ	ড্	৪৪০	আঁতকা	তন্	৪৫৩
আজ্ঞাধীন	জ্ঞা	৪০০	আঙ্গিক	অঙ্	৬	আটবাহু	অশ্	৪৬	আড়নয়ন	ড্	৪৪০	আত	তপ্	৪৫৯
আজ্ঞানুবর্ত্তী	জ্ঞা	৪০০	আঙ্গিনা	অঙ্	৬	আটবিক	অট্	২০	আড়ত	ড্	৪৪০	আতঙ্ক	তন্	৪৫৩
আজ্ঞানুযায়ী	জ্ঞা	৪০০	আঙ্গিরস	অঙ্	৯	আটবী	অট্	২০	আড়ন	ড্	৪৪০	আতঙ্কিত	তন্	৪৫৩
আজ্ঞানুসারী	জ্ঞা	৪০০	আঙ্গুল	অঙ্	৬	আটভাজা	অশ্	৪৬	আড়নিঞা	ড্	৪৪০	আতঙ্গ	তন্	৪৫৩
আজ্ঞাপক	জ্ঞা	৪০০	আঙ্গুলহাড়া	অঙ্	৬	আটলা	অট্	২০	আড়পাগলা	ড্	৪৪০	আতঞ্চন	তন্	৪৫৩
আজ্ঞাপত্র	জ্ঞা	৪০০	আঙ্গস্তানা	অঙ্	৬	আটশিরা	অশ্	৪৬	আড়পার	ড্	৪৪০	আতত	তন্	৪৫৪
আজ্ঞাপান	জ্ঞা	৪০০	আঙ্গোছা	অঙ্	৬	আটষট্টি	অশ্	৪৬	আড়বাঁকা	ড্	৪৪০	আততাই	তন্	৪৫৪
আজ্ঞাপালন	জ্ঞা	৪০০	আচট	চট্	৩২৪	আটা	অট্	২০	আড়বাঁকী	ড্	৪৪০	আততায়ী	তন্	৪৫৪
আজ্ঞাপিত	জ্ঞা	৪০০	আচড়	চট্	৩২৪	আটা-আটি	অট্	২০	আড়বাঁশি	ড্	৪৪০	আতপ	তপ্	৪৫৯
আজ্ঞাপ্য	জ্ঞা	৪০০	আচণ্ডালাদি	চণ্	৩২৮	আটাইশ	অশ্	৪৬	আড়বাড়	ড্	৪৪০	আতপচাল	তপ্	৪৫৯
আজ্ঞাবন্দী	জ্ঞা	৪০০	আচয়	চি	৩৪৬	আটাকাঠি	অট্	২০	আড়মাদলা	ড্	৪৪০	আতপতাঁড়ুল	তপ্	৪৫৯
আজ্ঞাবহ	জ্ঞা	৪০০	আচিত	চি	৩৪৬	আটা-নেবড়ান	অট্	২০	আড়ম্বর	ডং	৪৩২	আতপত্র	তপ্	৪৫৯
আজ্ঞাভঙ্গ	জ্ঞা	৪০০	আচির	চি	৩৪৬	আটাল	অট্	২০	আড়ম্বরি	ডং	৪৩২	আতপত্রক	তপ্	৪৫৯
আজ্ঞামালা	জ্ঞা	৪০০	আচির-প্রাচীর	চি	৩৪৬	আটাশ	অশ্	৪৬	আড়রি	ড্	৪৪০	আতপবারণ	তপ্	৪৫৯
আজ্ঞে	জ্ঞা	৪০০	আচূষণ	চূষ্	৩৫৫	আটান্তর	অশ্	৪৬	আড়ষ্ট	ড্	৪৪০	আতপলঙ্ঘন	তপ্	৪৫৯
আজ্য	অঞ্জ্	১১	আচোট	চট্	৩২৪	আটানব্বই	অশ্	৪৬	আড়া	ড্	৪৪০	আতপাত্যয়	তপ্	৪৫৯
আজ্যধানী	অঞ্জ্	১১	আট	অশ্	৪৬	আটাম্ন	অশ্	৪৬	আড়া-আড়ি	ড্	৪৪০	আতবচিঁড়া	তপ্	৪৫৯
আজ্যপ	অঞ্জ্	১১	আটই	অশ্	৪৬	আটাশী	অশ্	৪৬	আড়াই	ড্	৪৪০	আতবতণ্ডুল	তপ্	৪৫৯
আজ্যপাত্র	অঞ্জ্	১১	আটক	অশ্	৪৬	আটাশে	অশ্	৪৬	আড়াইরাজ	ড্	৪৪০	আতর	তৃ	৪৭৭
আজ্যভুক	অঞ্জ্	১১	আটকড়াইয়া	অশ্	৪৬	আটি	অট্	২০	আড়াকুশি	ড্	৪৪০	আতর	অম্	৩৬
আঝর	ঝ্	৪১৩	আটকড়ায়ে	অশ্	৪৬	আটুপাটু	অট্	২০	আড়াঠেকা	ড্	৪৪০	আতর	অস্	৫৬
আঝাড়া	ঝট্	৪১১	আটকপালিয়া	ঋধ্	১২১	আটেকাটে	অশ্	৪৬	আড়ানা	ড্	৪৪০	আতর্পণ	তৃ	৪৭৭
আঝালা	ঝ্	৪১৩	আটকপালে	ঋধ্	১২১	আটেপীঠে	অশ্	৪৬	আড়ানি	ড্	৪৪০	আতাই	তৃ	৪৭৭
আঞিও	ঞ	১১৩	আটকা	অশ্	৪৬	আঠার	অশ্	৪৬	আড়ানী	ড্	৪৪০	আতাপি	তৃ	৪৭৭
আঞ্জন	অঞ্জ্	১১	আটকিয়া	অশ্	৪৬	আঠাল	অট্	২০	আড়ামোড়া	ড্	৪৪০	আতাপী	তৃ	৪৭৭
আঞ্জনেয়	অঞ্জ্	১১	আটকে	অশ্	৪৬	আড়	ড্	৪৩৯	আড়াল	ড্	৪৪০	আতাম্র	ত্	৪৯৫
আঞ্জল	অঞ্জ্	১১	আটকুড়া	অশ্	৪৬	আ'ড়	ড্	৪৩৯	আড়ি	ড্	৪৪১	আতার	তৃ	৪৭৭
আঞ্জলী	অঞ্জ্	১১	আটকুড়ি	অশ্	৪৬	আড়-ওড়	ড্	৪৩৯	আড়িউড়ি	ড্	৪৩৯	আতারিকাতারি	তৃ	৪৭৭
আগিনা	অঙ্	৬	আটকৌড়ীয়া	অশ্	৪৬	আড়ং	ড্	৪৪১	আড়িবক	ড্	৪৪২	আতিথেয়	অত্	২২
আঙট	অঙ্	৬	আটকৌড়ে	অশ্	৪৬	আড়কাঁথি	ড্	৪৩৯	আড্ডা	ড্	৪৪২	আতিথ্য	অত্	২২
আঙটা	অঙ্	৬	আটখান	অশ্	৪৬	আড়কাতী	ড্	৪৩৯	আঢ়ক	ড্	৪৩৯	আতিথ্যসৎকার	অত্	২২
আঙটি	অঙ্	৬	আটখানা	অশ্	৪৬	আড়কাট	ড্	৪৩৯	আঢ়াই	ড্	৪৪০	আতিথ্যসৎক্রিয়া	অত্	২২
আঙন	অঙ্	৬	আটঘাট	অশ্	৪৬	আড়কাটি	ড্	৪৩৯	আঢ্য	ড্	৪৪০	আতিবিতি	অস্	৫৬
আঙনা	অঙ্	৬	আটচল্লিশ	অশ্	৪৬	আড়কাঠি	ড্	৪৪০	আঢ্য	ধ্যৈ	৬১৫	আতিরৈক্য	ই	৬৫
(আঙরা)	অঙ্	৬	আটচাল	অশ্	৪৬	আড়কোল	ড্	৪৪০	আণ	অন্	২৮	আতু	তু	৪৭১
আঙলা	অম্	৬	আটচালা	অশ্	৪৬	আড়কোলা	ড্	৪৪০	আণ	নী	৬৫৫	আতু-আতু	অত্	২২

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
আতুপুতু	অত্	২২	আত্মঘ্রাণ	অত্	২২	আত্মবিধিৎসা	অত্	২২	আত্মসম্ভাবনা	অত্	২২	আথেব্যাথে	অস্	৫৬
আতুপুতু	তু	৪৭১	আত্মদর্শ	অত্	২২	আত্মবিনিগ্রহ	অত্	২২	আত্মসম্মিত	অত্	২২	আথেব্যাথে	অস্	৫৬
আতুর	অম্	৩৬	আত্মদর্শন	অত্	২২	আত্মবিশুদ্ধি	অত্	২২	আত্মসহায়তা	অত্	২২	আদ	ঋধ্	১২১
আতুর	তৃ	৪৯৫	আত্মদান	অত্	২২	আত্মবিশ্বাস	অত্	২২	আত্মসাৎ	অত্	২২	আদ	দা	৫২১
আতুর	তু	৪৭১	আত্মদেবতা	অত্	২২	আত্মবিসর্জন	অত্	২২	আত্মসাৎকৃত	অত্	২২	আদত	দা	৫২১
আতৃপ্য	তৃ	৪৭৭	আত্মদেশ	অত্	২২	আত্মবিস্মরণ	অত্	২২	আত্মসুখ	অত্	২২	আদত্ত	দা	৫২১
আতেলা	তি	৪৬৭	আত্মদ্রোহী	অত্	২২	আত্মবিস্মরিত	অত্	২২	আত্মস্তব	অত্	২২	আদপে	দা	৫২১
আতৈল	তি	৪৬৭	আত্মন্	অত্	২৫	আত্মবিস্মৃতি	অত্	২২	আত্মস্থ	অত্	২২	আদবে	দা	৫২১
আতোদ্য	তু	৪৭১	আত্মনিত্য	অত্	২২	আত্মবিহারী	অত্	২২	আত্মস্বরূপ	অত্	২২	আদয়	দা	৫২১
আত্ত	অত্	২২	আত্মনিন্দা	অত্	২২	আত্মবিহ্বল	অত্	২২	আত্মহত্যা	অত্	২২	আদর	দৃ	৫৬০
আত্ত	আপ্	৫৯	আত্মনিবেদন	অত্	২২	আত্মবুদ্ধি	অত্	২২	আত্মহনন	অত্	২২	আদরক	ঋ	১১৩
আত্ত	দা	৫২১	আত্মনিষ্ঠ	অত্	২২	আত্মবৃত্ত	অত্	২২	আত্মহা	অত্	২২	আদরণীয়	দৃ	৫৬০
আত্তমা	অত্	২২	আত্মনীন	অত্	২২	আত্মবোধ	অত্	২২	আত্মহারা	অত্	২২	আদরবাদর	দৃ	৫৬০
আত্তিসো	আপ্	৫৯	আত্মনিয়োগ	অত্	২২	আত্মভব	অত্	২২	আত্মা	অত্	২৫	আদরসিংহাসন	দৃ	৫৬০
আত্ম	অত্	২৫	আত্মনির্ভর	অত্	২২	আত্মভর্ৎসন	অত্	২২	আত্মাধিক	অত্	২২	আদরা	দৃশ্	৫৬৬
আত্মক	অত্	২২	আত্মনির্ভরশীল	অত্	২২	আত্মভাব	অত্	২২	আত্মাধীন	অত্	২২	আদরিণী	দৃ	৫৬০
আত্মকর্ম্ম	অত্	২২	আত্মনেপদ	অত্	২২	আত্মভূ	অত্	২২	আত্মানন্দ	অত্	২২	আদর্ত্তব্য	দৃ	৫৬০
আত্মকার্য্য	অত্	২২	আত্মপক্ষ	অত্	২২	আত্মভূত	অত্	২২	আত্মানুগমন	অত্	২২	আদর্শ	দৃশ্	৫৬৬
আত্মকাম	অত্	২২	আত্মপরিত্যাগ	অত্	২২	আত্মমগ্ন	অত্	২২	আত্মানুরূপ	অত্	২২	আদর্শক	দৃশ্	৫৬৬
আত্মকীয়	অত্	২২	আত্মপরায়ন	অত্	২২	আত্মমতি	অত্	২২	আত্মানুশাসন	অত্	২২	আদর্শচরিত্র	দৃশ্	৫৬৬
আত্মকুল	অত্	২২	আত্মপীড়ন	অত্	২২	আত্মময়	অত্	২২	আত্মানুসন্ধান	অত্	২২	আদর্শন	দৃশ্	৫৬৬
আত্মকৃত	অত্	২২	আত্মপূজা	অত্	২২	আত্মমানী	অত্	২২	আত্মাপরাধ	অত্	২২	আদর্শপুরুষ	দৃশ্	৫৬৬
আত্মগত	অত্	২২	আত্মপ্রকাশ	অত্	২২	আত্মমূর্ত্তি	অত্	২২	আত্মাপহার	অত্	২২	আদর্শবিম্ব	দৃশ্	৫৬৬
আত্মগতি	অত্	২২	আত্মপ্রতিকৃতি	অত্	২২	আত্মম্ভরি	অত্	২২	আত্মপুরুষ	অত্	২২	আদর্শমণ্ডল	দৃশ্	৫৬৬
আত্মগরিমা	অত্	২২	আত্মপ্রতিষ্ঠা	অত্	২২	আত্মযাজী	অত্	২২	আত্মাবমাননা	অত্	২২	আদল	দৃশ্	৫৬৬
আত্মগুণ	অত্	২২	আত্মপ্রবঞ্চনা	অত্	২২	আত্মযোনি	অত্	২২	আত্মাভিমানী	অত্	২২	আদলি	দ	৫৮৪
আত্মগ্রাহী	অত্	২২	আত্মপ্রভ	অত্	২২	আত্মরক্ষক	অত্	২২	আত্মাভূ	অত্	২২	আদহন	দহ্	৫২০
আত্মগ্লানি	অত্	২২	আত্মপ্রশংসক	অত্	২২	আত্মরক্ষা	অত্	২২	আত্মারাম	অত্	২২	আদা	ঋ	১১৩
আত্মঘাত	অত্	২২	আত্মপ্রশংসা	অত্	২২	আত্মরতি	অত্	২২	আত্মার্থ	অত্	২২	আদাকাসুন্দি	ঋ	১১৩
আত্মঘাতী	অত্	২২	আত্মপ্রসাদ	অত্	২২	আত্মরূপ	অত্	২২	আত্মাশ্রয়	অত্	২২	আদাগা	দহ্	৫২০
আত্মঘোষ	অত্	২২	আত্মবঞ্চক	অত্	২২	আত্মলাভ	অত্	২২	আত্মাহুতি	অত্	২২	আদাড়	ড্	৪৩৯
আত্মজ	অত্	২২	আত্মবৎ	অত্	২২	আত্মশক্তি	অত্	২২	আত্মীয়	অত্	২২	আদাড়বাদাড়	ড্	৪৩৯
আত্মজন্মা	অত্	২২	আত্মবত্তা	অত্	২২	আত্মশুদ্ধি	অত্	২২	আত্মেশ্বর	অত্	২২	আদাড়ীয়া	ড্	৪৩৯
আত্মজয়	অত্	২২	আত্মবধ	অত্	২২	আত্মশ্লাঘা	অত্	২২	আত্মোৎসর্গ	অত্	২২	আদাড়ে	ড্	৪৩৯
আত্মজাত	অত্	২২	আত্মবধী	অত্	২২	আত্মসংবরণ	অত্	২২	আত্মোদয়	অত্	২২	আদাতব্য	দা	৫২১
আত্মজীবনী	অত্	২২	আত্মবধ্যা	অত্	২২	আত্মসংযম	অত্	২২	আত্মোদ্ভব	অত্	২২	আদাতা	দা	৫২১
আত্মজ্ঞ	অত্	২২	আত্মবন্ধু	অত্	২২	আত্মসংস্তুতি	অত্	২২	আত্মোন্নতি	অত্	২২	আদান	দা	৫২২
আত্মজ্ঞান	অত্	২২	আত্মবর্গ	অত্	২২	আত্মসংস্থ	অত্	২২	আত্মোপজীবী	অত্	২২	আদানপ্রদান	দা	৫২২
আত্মতত্ত্ব	অত্	২২	আত্মবশ	অত্	২২	আত্মসন্তুষ্ট	অত্	২২	আত্মোপম	অত্	২২	আদাব	দা	৫২১
আত্মতন্ত্র	অত্	২২	আত্মবান	অত্	২২	আত্মসন্দেহ	অত্	২২	আত্মৌপম্য	অত্	২২	আদায়	দা	৫২১
আত্মতা	অত্	২২	আত্মবান্ধব	অত্	২২	আত্মসম	অত্	২২	আত্যন্তিক	অম্	৩৬	আদায়ী	দা	৫২১
আত্মতুষ্ট	অত্	২২	আত্মবিক্রয়	অত্	২২	আত্মসমর্পণ	অত্	২২	আত্যয়িক	ই	৬৫	আদি	দা	৫২২
আত্মতুষ্টি	অত্	২২	আত্মবিচ্ছেদ	অত্	২২	আত্মসমালোচনা	অত্	২৫	আত্রেয়	অদ্	২৮	আদিক	দা	৫২১
আত্মতৃপ্ত	অত্	২২	আত্মবিদ্	অত্	২২	আত্মসম্পন্ন	অত্	২২	আত্রেয়ী	অদ্	২৫	আদিকচ্ছপ	দা	৫২৩
আত্মত্যাগ	অত্	২২	আত্মবিদ্যা	অত্	২২	আত্মসম্ভব	অত্	২২	আথিবিথি	অস্	৫৬	আদিকর্ম্ম	দা	৫২১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
আদিকর্ত্তা	দা ৫২১	আদুল	উল্ ১০৭	আধমন	ধা ৫৯০	আনক	অন্ ২৮	আনম্র	নম্ ৬৩০
আদিকবি	দা ৫২১	আদুরী	দৃ ৫৬০	আধমর্ণ	ধা ৫৯০	আনকদুন্দুভি	অন্ ২৮	আনয়ন	নী ৬৫৫
আদিকাণ্ড	দা ৫২১	আদৃত	দৃ ৫৬০	আধমুচকি	ঋধ্ ১২১	আনকোরা	কৃৎ ২১৩	আনয়িতব্য	নী ৬৫৫
আদিকারণ	দা ৫২১	আদৃষ্টি	দৃশ্ ৫৬৬	আধর্ষ্য	ধৃ ৬০৬	আনখা	দিশ্ ৫৩৬	আনর্ত্ত	নৃত্ ৬৬৭
আদিকাল	দা ৫২১	আদেখ	দৃশ্ ৫৬৬	আধর্ষ	ধৃ ৬০৬	আনচান	অন্ ২৮	আনর্ত্তন	নৃত্ ৬৬৭
আদিকাব্য	দা ৫২১	আদেখলে	দৃশ্ ৫৬৬	আধলা	ঋধ্ ১২১	আনত	নম্ ৬৩০	আনর্ত্তিত	নৃত্ ৬৬৭
আদিজননী	দা ৫২১	আদেবক	দিব্ ৫২৭	আধশশী	ঋধ্ ১২১	আনদেখা	দিশ্ ৫৩৬	আনল	অন্ ২৮
আদিতঃ	দা ৫২১	আদেয়	দা ৫২১	আধা	ঋধ্ ১২১	আনদ্ধ	নহ্ ৬৩৬	আনলা	নট্ ৬২২
আদিতাল	দা ৫২১	আদেশ	দিশ্ ৫৩৮	আধা-আধি	ঋধ্ ১২১	আনদ্ধ-সন্নদ্ধ	নহ্ ৬৩৫	আনহি	অন্ ২৮
আদিতেয়	দো ৫৬৯	আদেশক	দিশ্ ৫৩৬	আধাতা	ধা ৫৯০	আনন	অন্ ৩২	আনা	নী ৬৫৫
আদিত্য	দো ৫৬৯	আদেশকর	দিশ্ ৫৩৬	আধান	ধা ৫৯৮	আনন্তর্য্য	অম্ ৩৬	আনাগনা	গম্ ২৬২
আদিত্য	দা ৫২৩	আদেশকারী	দিশ্ ৫৩৬	আধায়ক	ধা ৫৯০	আনন্ত্য	অম্ ৩৬	আনাগোনা	গম্ ২৬২
আদিত্যদর্শন	দো ৫৬৯	আদেশন	দিশ্ ৫৩৬	আধার	ধৃ ৬০৭	আনন্দ	নন্দ্ ৬২৮	আনাচ-কানাচ	আ ৬৪
আদিত্যপাক	দো ৫৬৯	আদেশানুযায়ী	দিশ্ ৫৩৬	আধারশক্তি	ধৃ ৬০৭	আনন্দক	নন্দ্ ৬২৭	আনাচ-কানাচ	কর্ণ্ ১৬২
আদিত্যবর্ণ	দো ৫৬৯	আদেষ্টা	দিশ্ ৫৩৬	আধারাধেয়ভাব	ধৃ ৬০৬	আনন্দকন্দ	নন্দ্ ৬২৭	আনাজ	অদ্ ২৫
আদিত্যসুনু	দো ৫৬৯	আদৌ	দা ৫২৩	আধি	ধা ৫৯৫	আনন্দকানন	নন্দ্ ৬২৭	আনাড়	নহ্ ৬৩৫
আদিত্যসূনু	দা ৫২১	আদ্ধা	ঋধ্ ১২১	আধিকরণ	ধা ৫৯০	আনন্দবন	নন্দ্ ৬২৭	আনাড়ি	অন্ ২৮
আদিৎসা	দা ৫২১	আদ্ধি	ঋধ্ ১২১	আধিকরণিক	ধা ৫৯০	আনন্দগিরি	নন্দ্ ৬২৭	আনাহ	নহ্ ৬৩৫
আদিদেব	দা ৫২১	আদ্য	দা ৫২৩	আধিক্য	ধা ৫৯০	আনন্দঘন	নন্দ্ ৬২৭	আনায়	নী ৬৫৫
আদিদৈত্য	দা ৫২৩	আদ্যকবি	দা ৫২১	আধিক্ষীণ	ধা ৫৯০	আনন্দজ	নন্দ্ ৬২৭	আনি	নী ৬৫৫
আদিপর্ব্ব	দা ৫২১	আদ্যকাণ্ড	দা ৫২১	আধিজ	ধা ৫৯০	আনন্দধাম	নন্দ্ ৬২৭	আনীত	নী ৬৫৬
আদিপুরাণ	দা ৫২১	আদ্যকাল	দা ৫২১	আধিজ্ঞ	ধা ৫৯০	আনন্দধারা	নন্দ্ ৬২৭	আনীল	নী ৬৫৫
আদিপুরুষ	দা ৫২১	আদ্যকৃত্য	দা ৫২১	আধিদৈবিক	ধা ৫৯৬	আনন্দন	নন্দ্ ৬২৭	আনু	অন্ ২৮
আদিব	দা ৫২১	আদ্যগঙ্গা	দা ৫২১	আধিবন্ধ	ধা ৫৯০	আনন্দপট	নন্দ্ ৬২৭	আনুকল্পিক	অন্ ২৮
আদিবংশ	দা ৫২১	আদ্যন্ত	দা ৫২১	আধিবেদনিক	ধা ৫৯০	আনন্দবর্দ্ধন	নন্দ্ ৬২৭	আনুকূল্য	অন্ ২৮
আদিবরাহ	দা ৫২১	আদ্যবীজ	দা ৫২১	আধিব্যক্তি	ধা ৫৯০	আনন্দবিধান	নন্দ্ ৬২৭	আনুগত্য	অন্ ২৮
আদিবল	দা ৫২১	আদ্যরস	দা ৫২১	আধিব্যাধি	ধা ৫৯০	আনন্দময়	নন্দ্ ৬২৭	আনুগুণ্য	অন্ ২৮
আদিবশ্যা	দা ৫২১	আদ্যশ্রাদ্ধ	দা ৫২১	আধিভোগ	ধা ৫৯০	আনন্দমূর্চ্ছা	নন্দ্ ৬২৭	আনুপাম	অন্ ২৮
আদিবস	দিব্ ৫২৭	আদ্যা	দা ৫২৩	আধিভৌতিক	ধা ৫৯৬	আনন্দয়িতা	নন্দ্ ৬২৭	আনুপূর্ব্ব	অন্ ২৮
আদিবৃক্ষ	দা ৫২৩	আদ্যিকাল	দা ৫২১	আধিরথি	ধা ৫৯০	আনন্দরস	নন্দ্ ৬২৭	আনুপূর্ব্বক	অন্ ২৮
আদিভব	দা ৫২১	আদ্যিরস	দা ৫২১	আধিরাজ্য	ধা ৫৯০	আনন্দলহরী	নন্দ্ ৬২৭	আনুপূর্ব্বিক	অন্ ২৮
আদিভূত	দা ৫২১	আদ্যোপান্ত	দা ৫২২	আধুত	ধু ৬০১	আনন্দলাড়ু	নন্দ্ ৬২৭	আনুবেশ্য	অন্ ২৮
আদিম	দা ৫২৩	আধ	ঋধ্ ১২১	আধুনিক	ধু ৬০১	আনন্দসাগর	নন্দ্ ৬২৭	আনুমানিক	অন্ ২৮
আদিমান	দা ৫২১	আধকপালে	ঋধ্ ১২১	আধুলি	ঋধ্ ১২১	আনন্দাত্মা	নন্দ্ ৬২৭	আনুযাত্রিক	অন্ ২৮
আদিরস	দা ৫২১	আধকপালী	ঋধ্ ১২১	আধৃষ্য	ধৃ ৬০৬	আনন্দাশ্রু	নন্দ্ ৬২৯	আনুরক্তি	অন্ ২৮
আদিরাজ	দা ৫২১	আধবয়সী	ঋধ্ ১২১	আধৃষ্ট	ধৃ ৬০৬	আনন্দিত	নন্দ্ ৬২৭	আনুরূপ্য	অন্ ২৮
আদিশক্তি	দা ৫২১	আধ	ঋধ্ ১২১	আধৃষ্টি	ধৃ ৬০৬	আনন্দী	নন্দ্ ৬২৭	আনুলৌমিক	অন্ ২৮
আদিশরীর	দা ৫২১	আধ-আধ	ঋধ্ ১২১	আধেক	ঋধ্ ১২১	আনবেশ	অন্ ২৮	আনুশাসনিক	অন্ ২৮
আদিশূকর	দা ৫২১	আধই	ঋধ্ ১২১	আধেয়	ধা ৬০৭	আন-মন	অন্ ২৮	আনুশ্রবিক	অন্ ২৮
আদিশূর	দা ৫২১	আধক	ঋধ্ ১২১	আধো-আধো	ঋধ্ ১২১	আনমন	নম্ ৬৩০	আনুষঙ্গ	অন্ ২৮
আদিষ্ট	দিশ্ ৫৩৬	আধকড়ে	ঋধ্ ১২১	আধ্মাত	ধক্ ৫৮৫	আন-মনস্ক	অন্ ২৮	আনুষঙ্গিক	অন্ ২৮
আদিসর্গ	দা ৫২১	আধখেঁচড়া	ঋধ্ ১২১	আধ্যাত্মিক	ধা ৫৯৪	আন-মনা	অন্ ২৮	আনুসুয়	অন্ ২৮
আদীপক	দীপ্ ৫৪৫	আধপাকা	ঋধ্ ১২১	আধ্যান	ধ্যৈ ৬১৫	আনমনীয়	নম্ ৬৩০	আনূপ	অন্ ২৮
আদীর্ঘ	দৃ ৫৬০	আধপাগলা	ঋধ্ ১২১	আন	অন্ ২৮	আনমিত	নম্ ৬৩০	আনৃণ্য	ঋ ১১৩
আদুড়	উল্ ১০৭	আধবুড়ো	ঋধ্ ১২১	আন	নী ৬৫৫	আনম্য	নম্ ৬৩০	আনৃশংস	নৃ ৬৬২

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
আনৃশংস্য	নৃ	৬৬২	আপেক্ষিক	ঈক্ষ্	৮০	আবিষ্করণ	আ	৬৪	আমশ্রাদ্ধ	অম্	৩৬	আম্লী	অম্	৩৬
আনেতব্য	নী	৬৫৫	আপ্ত	আপ্	৬১	আবিষ্কার	আ	৬৪	আমসত্ত্ব	অম্	৩৬	আম্মা	অস্	৫৬
আনেয়	নী	৬৫৫	আপ্তকাম	আপ্	৫৯	আবিষ্কর্ত্তা	আ	৬৪	আমা	অম্	৩৬	আম্মি	অস্	৫৬
আন্তঃপুরিক	অম্	৩৬	আপ্তকারী	আপ্	৫৯	আবিষ্কারক	আ	৬৪	আমাকে	অস্	৫৬	আয়	ই	৬৭
আন্তর	অম্	৩৬	আপ্তকার্য্য	আপ্	৫৯	আবিষ্কৃত	আ	৬৪	আমাতিসার	অম্	৩৬	আয়ড়	ড্	৪৩৯
আন্তরতম্য	অম্	৩৬	আপ্তখুদী	আপ্	৫৯	আবিষ্কৃতি	আ	৬৪	আমাদের	অস্	৫৬	আয়ত	গম্	২৬২
আন্তরিক	অম্	৩৬	আপ্তগণ	আপ্	৫৯	আবিষ্ক্রিয়া	আ	৬৪	আমাদেরকে	অস্	৫৬	আয়ত	ধু	৬০১
আন্তরীক্ষ	অম্	৩৬	আপ্তগরজী	আপ্	৫৯	আবীর	অ	৫৯	আমানত	অম্	৩৬	আয়তি	ধু	৬০১
আন্ত্র	অম্	৩৬	আপ্তগ্রাসী	আপ্	৫৯	আবুড়াখাবুড়া	অ	৫৯	আমানি	অম্	৩৬	আয়তী	ধু	৬০১
আন্ত্রিক	অম্	৩৬	আপ্ততা	আপ্	৫৯	আবেদন	নি	৬৪৪	আমান্ন	অম্	৩৬	আয়তীগব	গম্	২৬২
আন্দারিয়া	অন্	২৮	আপ্তদক্ষিণ	আপ্	৫৯	নিবেশ	নি	৬৪০	আমাবস্যা	অম্	৩৬	আয়ল	গম্	২৬২
আন্দোল	দল্	৫১৮	আপ্তদূতী	আপ্	৫৯	আব্দিক	আপ্	৫৯	আমার	অস্	৫৬	আয়স	ই	৬৫
আন্দোলন	দল্	৫১৯	আপ্তবচন	আপ্	৫৯	আভ	অ	৫৯	আমাশয়	অম্	৩৬	আয়স্ত্রী	ধু	৬০১
আন্দোলায়মান	দল্	৫১৮	আপ্তবধী	আপ্	৫৯	আভনক	অ	৫৯	আমাশা	অম্	৩৬	আয়স্থান	ই	৬৫
আন্ধ	অন্	২৮	আপ্তবাক্	আপ্	৫৯	আম	অম্	৪০	আমি	অম্	৪১	আয়ান	ই	৬৫
আন্ধল	অন্	২৮	আপ্তবাক্য	আপ্	৫৯	আমগন্ধী	অম্	৩৬	আমিন	অম্	৩৬	আয়ি	ঋ	১১৩
আন্ধার	অন্	২৮	আপ্তবিক্রয়পত্র	আপ্	৫৯	আমগর্ভ	অম্	৩৬	আমিনি	অম্	৩৬	আয়িল	গম্	২৬২
আন্ধারি	অন্	২৮	আপ্তব্য	আপ্	৫৯	আমজ্বর	অম্	৩৬	আমির	অম্	৩৬	আয়িলা	গম্	২৬২
আন্ধারিয়া	অন্	২৮	আপ্তভাব	আপ্	৫৯	আমট	অম্	৩৬	আমিষ	অম্	৪১	আয়ী	ঋ	১১৩
আন্ধিআরী	অন্	২৮	আপ্তশ্রুতি	আপ্	৫৯	আমড়া	অম্	৩৬	আমিষ	নি	৬৫১	আয়ু	ই	৬৮
আন্ধুয়া	অন্	২৮	আপ্তসহায়ক	আপ্	৫৯	আমতা	অম্	৩৬	আমিষগন্ধী	অম্	৩৬	আয়ুঃ	ই	৬৮
আন্ধ্র	অন্	২৮	আপ্তসার	আপ্	৫৯	আমতা-আমতা	অম্	৩৬	আমিষাশী	অম্	৩৬	আয়ুর্দ্রব্য	ই	৬৫
আন্বয়িক	অন্	২৮	আপ্তসুখী	আপ্	৫৯	আমতেল	অম্	৩৬	আমিষ্য	অম্	৩৬	আয়ুর্ব্বল	ই	৬৫
আন্বাহিক	অন্	২৮	আপ্তি	আপ্	৫৯	আমতৈল	অম্	৩৬	আমীর	অম্	৩৬	আয়ুর্বৃদ্ধি	ই	৬৫
আন্বীক্ষিকী	ঈক্ষ্	৮০	আপ্তবান	আপ্	৫৯	আমদরবার	অম্	৩৬	আমুখ	খন্	২৪৮	আয়ুর্ব্বেদ	ই	৬৮
আপ্	আপ্	৫৯	আপ্য	আপ্	৫৯	আমদানি	অম্	৩৬	আমুষ্যায়ণ	অ	৫৯	আয়ুর্ব্বেদিক	ই	৬৫
আপ	আপ্	৬০	আপ্যায়(ই)	আপ্	৫৯	আমবাত	অম্	৩৬	আমেজ	অম্	৩৬	আয়ুষ্কর	ই	৬৫
আপগা	গম্	২৬২	আপ্যায়ন	আপ্	৫৯	আমমহল	অম্	৩৬	আম্রেড়ন	অ	৫৯	আয়ুষ্কাম	ই	৬৫
আপগেয়	গম্	২৬২	আপ্যায়না	আপ্	৫৯	আমমোক্তার	অম্	৩৬	আম্বড়া	অম্	৩৬	আয়ুষ্কাল	ই	৬৮
আপন	আপ্	৬১	আপ্যায়িত	আপ্	৫৯	আময়	অম্	৩৬	আম্ববতী	অম্	৩৬	আয়ুষ্টোম	ই	৬৫
আপন-ওয়ালী	আপ্	৫৯	আপ্রচ্ছন্ন	ছদ্	৩৫৯	আমরক্ত	অম্	৩৬	আম্বল	অম্	৩৬	আয়ুষ্মত্ত্ব	ই	৬৫
আপনকার	আপ্	৫৯	আবছা	অব্	৩২	আমরস	অম্	৩৬	আম্বা	অম্	৩৬	আয়ুষ্য	ই	৬৫
আপনঘাতী	আপ্	৫৯	আবছায়া	অব্	৩২	আমরা	অম্	৩৬	আম্বিকেয়	অম্	৩৬	আয়ুদ্ধার	ই	৬৫
আপনহারা	আপ্	৫৯	আবডাল	ড্	৪৩৯	আমরা	অস্	৫৬	আম্বুয়ানগর	অম্	৩৬	আয়ুষ্মান	ই	৬৫
আপনা	আপ্	৬১	আবড়োখাবড়ো	অ	৫৯	আমরান	অম্	৩৬	আম্র	অম্	৩৬	আয়োদধৌম্য	ই	৬৫
আপনাপন	আপ্	৫৯	আবস্ত্য	অব্	৩২	আমল	অম্	৩৬	আম্রকাসুন্দী	অম্	৩৬	আর	ঋ	১১৬
আপনাবিস্মৃত	আপ্	৫৯	আবর	অব্	৩২	আমলক	অম্	৪০	আম্রকূট	অম্	৩৬	আরত	ঋ	১১৩
আপনার	আপ্	৫৯	আবরা	অব্	৩২	আমলকী	অম্	৪০	আম্রখণ্ড	অম্	৩৬	আরতিল	ঋ	১১৩
আপনারই	আপ্	৫৯	আবর্জ্জনা	ঋ	১১৩	আমলনামা	অম্	৩৬	আম্রপেশী	অম্	৩৬	আরবার	ঋ	১১৩
আপনারে	আপ্	৫৯	আবান্তর	অব্	৩২	আমলা	অম্	৪১	আম্রবণ	অম্	৩৬	আরভট	ঋ	১১৩
আপনি	আপ্	৬১	আবার	ঋ	১১৩	আমলাফয়লা	অম্	৩৬	আম্রসার	অম্	৩৬	আরশুলা	ঋ	১১৩
আপনে	আপ্	৫৯	আবিঃ	আ	৬৪	আমলি	অম্	৩৬	আম্রাতক	অম্	৩৬	আরশি(শী)	দৃশ্	৫৬৬
আপস্তম্ব	আপ্	৫৯	আবিক	অব্	৩২	আমশী	অম্	৩৬	আম্রাবর্ত্ত	অম্	৩৬	আরসি(সী)	দৃশ্	৫৬৬
আপস্তম্ভ	আপ্	৫৯	আবির্ভবন	আ	৬৪	আমসী	অম্	৩৬	আম্ল	অম্	৩৬	আরা	ঋ	১১৩
আপায়	ই	৬৫	আবির্ভাব	আ	৬৪	আমশূল	অম্	৩৬	আম্লা	অম্	৩৬	আরাকর	ঋ	১১৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
ইক্ষুমার	ইষ্	৭৮	ইতরাম	ই	৬৫	ইন্দুকক্ষা	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রদারু	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়গ্রাম	ইন্দ্	৭৪
ইক্ষুমূল	ইষ্	৭৮	ইতরামি	ই	৬৫	ইন্দুকলা	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রদ্যুম্ন	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়গোচর	ইন্দ্	৭৪
ইক্ষুমেহ	ইষ্	৭৮	ইতরেতর	ই	৬৫	ইন্দুকলিকা	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রদ্রু	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়ঘাত	ইন্দ্	৭৪
ইক্ষুযন্ত্র	ইষ্	৭৮	ইতলা	ই	৬৫	ইন্দুকান্ত	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রদ্রুম	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়দোষ	ইন্দ্	৭৪
ইক্ষুসমুদ্র	ইষ্	৭৮	ইতস্তত	ই	৬৫	ইন্দুকিরীট	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রধনু	ইন্দ্	৭৬	ইন্দ্রিয়নিগ্রহ	ইন্দ্	৭৪
ইক্ষ্বাকু	ইষ্	৭৮	ইতস্ততঃ	ই	৬৮	ইন্দুকুন্দসোমবর্ণ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রধনুক	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র	ইন্দ্	৭৪
ইঙ্খ্	ই	৬৫	ইতি	ই	৬৯	ইন্দুক্ষয়	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রধনুঃ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়পরবশ	ইন্দ্	৭৪
ইঙ্	গম্	২৬২	ইতিউতি	ই	৬৫	ইন্দুজ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রধ্বজ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়পরায়ণ	ইন্দ্	৭৪
ইঙ্গ	ই	৬৫	ইতিকথ	ই	৬৫	ইন্দুজনক	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রনীল	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়বধ	ইন্দ্	৭৪
ইঙ্গিত	গম্	২৬২	ইতিকথা	ই	৬৫	ইন্দুদল	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রপর্ব্বত	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়বর্গ	ইন্দ্	৭৪
ইঙ্গিতকোবিদ	গম্	২৬২	ইতিকরণীয়	ই	৬৫	ইন্দুনিভ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রপাত	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়বিপ্রতিপত্তি	ইন্দ্	৭৪
ইঙ্গিতাকার	গম্	২৬২	ইতিকর্ত্তব্য	ই	৬৫	ইন্দুবদন	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রপুষ্পা	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়বিষয়	ইন্দ্	৭৪
ইঙ্গিতাধ্যাসিত	গম্	২৬২	ইতিকার্য্য	ই	৬৫	ইন্দুবাসর	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রপুষ্পিকা	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়বৃত্তি	ইন্দ্	৭৪
ইঙ্গুদ	গম্	২৬২	ইতিকৃত্য	ই	৬৫	ইন্দুবিন্দুবান	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রপুষ্পী	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়বোধন	ইন্দ্	৭৪
ইঙ্গুদী	গম্	২৬২	ইতিবৃত্ত	ই	৬৯	ইন্দুবিম্ব	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রপ্রমতি	ইন্দ্	৭৬	ইন্দ্রিয়রাজ	ইন্দ্	৭৪
ইঙ্গুলী	গম্	২৬২	ইতিমধ্যে	ই	৬৫	ইন্দুব্রত	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রপ্রমিতি	ইন্দ্	৭৬	ইন্দ্রিয়সংযম	ইন্দ্	৭৪
ইচ্ছ	ইষ্	৭৮	ইতিমাত্র	ই	৬৫	ইন্দুভৃৎ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রপ্রস্থ	ইন্দ্	৭৭	ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ	ইন্দ্	৭৪
ইচ্ছা	ইষ্	৭৯	ইতিহ	ই	৬৯	ইন্দুমণি	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রবজ্রা	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়সুখ	ইন্দ্	৭৪
ইচ্ছাবান	ইষ্	৭৮	ইতিহাস	ই	৬৯	ইন্দুমণ্ডল	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রবল্লরী	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়সেবন	ইন্দ্	৭৪
ইচ্ছামতী	ইষ্	৭৮	ইতিহাস	আস্	৬৩	ইন্দুমতী	ইন্দ্	৭৫	ইন্দ্রবল্লী	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়সেবা	ইন্দ্	৭৪
ইচ্ছাময়	ইষ্	৭৮	ইতু	ই	৬৫	ইন্দুমুখ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রবস্তি	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়স্বাপ	ইন্দ্	৭৪
ইচ্ছাময়ী	ইষ্	৭৮	ইতে	ই	৬৫	ইন্দুমৌলী	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রবারুণিকা	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়াদি	ইন্দ্	৭৪
ইচ্ছামৃত্যু	ইষ্	৭৮	ইতোমধ্যে	ই	৬৫	ইঁদুর	উন্দ্	১০৩	ইন্দ্রবারুণী	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা	ইন্দ্	৭৪
ইচ্ছাশক্তি	ইষ্	৭৮	ইত্যবকাশে	ই	৬৫	ইন্দুর	উন্দ্	১০৩	ইন্দ্রবীজ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়ায়তন	ইন্দ্	৭৪
ইচ্ছাসম্পৎ	ইষ্	৭৮	ইত্যবসরে	ই	৬৫	ইন্দুরেখা	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রব্রত	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়ারাম	ইন্দ্	৭৪
ইচ্ছাসুখে	ইষ্	৭৮	ইত্যাকার	ই	৬৫	ইন্দুলেখা	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রমথ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়ার্থ	ইন্দ্	৭৪
ইচ্ছিত	ইষ্	৭৮	ইত্যাকারক	ই	৬৫	ইন্দুলোক	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রমহ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়াসঙ্গ	ইন্দ্	৭৪
ইচ্ছু	ইষ্	৭৮	ইত্যাদি	ই	৬৫	ইন্দুলৌহ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রমিঠা	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়েশ	ইন্দ্	৭৪
ইচ্ছুক	ইষ্	৭৮	ইত্বর	ই	৬৫	ইন্দুশেখর	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্ররাজ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়েশ্বর	ইন্দ্	৭৪
ইট	ইষ্	৭৯	ইত্থম্	ই	৬৫	ইন্দুসুত	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রলুপ্ত	ইন্দ্	৭৭	ইন্দ্রেন্দ্রাণী	ইন্দ্	৭৪
ইটা	ইষ্	৭৮	ইত্থি	ই	৬৫	ইন্দুসূনু	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রলুপ্তক	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রেশ্বর	ইন্দ্	৭৪
ইটা-ভিটা	ইষ্	৭৮	ইত্থিউত্থি	ই	৬৫	ইন্দ্র	ইন্দ্	৭৫	ইন্দ্রলোক	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রোৎসব	ইন্দ্	৭৪
ইটাল	ইষ্	৭৮	ইত্থে	ই	৬৫	ইন্দ্রকর্ম্মা	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রশক্র	ইন্দ্	৭৪	ইন্ধ্	ন্ধ্	৭৮
ইড়কি	ঈর্	৮০	ইদং	ই	৬৫	ইন্দ্রকীল	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রশৈল	ইন্দ্	৭৪	ইন্ধন	ইন্ধ্	৭৮
ইড়া	ই	৬৮	ইদম	ই	৬৫	ইন্দ্রকৃষ্ট	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রসাবর্ণি	ইন্দ্	৭৪	ইব	ই	৬৫
ইড়িক	ঈর্	৮০	ইদানীং	ই	৬৫	ইন্দ্রকোশ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রসুত	ইন্দ্	৭৪	ইভ	ই	৬৫
ইৎসা	ইষ্	৭৮	ইদানীন্তন	ই	৬৫	ইন্দ্রগোপ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রসূনু	ইন্দ্	৭৪	ইভাবলি	ই	৬৫
ইত	ই	৬৮	ইদ্ধ	ইন্ধ্	৭৮	ইন্দ্রচাপ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রাণী	ইন্দ্	৭৪	ইভেন্দ্র	ই	৬৫
ইতঃ	ই	৬৮	ইধ্ম	ইন্ধ্	৭৮	ইন্দ্রজাল	ন্দ্	৭৬	ইন্দ্রানুজ	ইন্দ্	৭৪	ইভ্য	ই	৬৫
ইতঃপর	ই	৬৫	ইন	ই	৭৪	ইন্দ্রজালিক	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রাবরজ	ইন্দ্	৭৪	ইমন	ই	৬৯
ইতঃপূর্ব্বে	ই	৬৫	ইনি	ই	৬৫	ইন্দ্রজালী	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রায়ুধ	ইন্দ্	৭৪	ইয়ান	ই	৬৫
ইতবার	ই	৬৫	ইন্দ্	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রারি	ইন্দ্	৭৪	ইয়ৎ	ই	৬৫
ইতর	ই	৬৯	ইন্দিবর	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রতুল	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রাসন	ইন্দ্	৭৪	ইয়ত্তা	ই	৬৫
ইতরতঃ	ই	৬৫	ইন্দিরা	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রতুলক	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রি	ইন্দ্	৭৪	ইরম্মদ	ই	৬৫
ইতরবিশেষ	ই	৬৫	ইন্দু	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রত্ব	ইন্দ্	৭৪	ইন্দ্রিয়	ইন্দ্	৭৭	ইরা	ই	৭০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
উচাটন	উৎ	৮৪	উচ্ছর্গন	উৎ	৮৪	উজাগর	উৎ	৮৪	উড়কি	উৎ	৮৪	উড্ডয়ন	ডী	৪৩৭
উচিত	উচ্	৮৪	উচ্ছল	উৎ	৮৪	উজাড়	উজ্	৮৪	উড়কুড়	উৎ	৮৪	উড়্পড়া	উৎ	৮৪
উচু	উচ্	৮২	উচ্ছাদন	উৎ	৮৪	উজান	উৎ	৮৭	উড়তি	উৎ	৮৪	উড়্ভিটা	উৎ	৮৪
উচোট	উচ্	৮২	উচ্ছাল	উৎ	৮৪	উজানি	উৎ	৮৭	উড়ন	উৎ	৮৮	উণাদি	উ	৮৪
উচ্চ	উৎ	৮৬	উচ্ছান্তরবর্ত্তী	উৎ	৮৪	উজালা	উৎ	৮৪	উড়ন	ডী	৪৩৭	উৎ	উৎ	৮৬
উচ্চ	চি	৩৪৬	উচ্ছিগ	উৎ	৮৪	উজোর	উৎ	৮৪	উড়নচড়ে	উৎ	৮৪	উৎক	উৎ	৮৪
উচ্চকৈঃ	উৎ	৮৪	উচ্ছিগুঘন	উৎ	৮৪	উজ্জয়িনী	উৎ	৮৭	উড়নচণ্ডী	উৎ	৪৩৭	উৎকচ	উৎ	৮৮
উচ্চক্ষুঃ	উৎ	৮৪	উচ্ছিত্তি	উৎ	৮৪	উজ্জয়িনী	জি	৩৯১	উড়নচণ্ডী	ডী	৪৩৭	উৎকঞ্চুক	উৎ	৮৪
উচ্চটিত	উৎ	৮৪	উচ্ছিরাঃ	উৎ	৮৪	উজ্জাগর	উৎ	৮৪	উড়নপেকে	উৎ	৮৪	উৎকট	উৎ	৮৪
উচ্চণ্ড	উৎ	৮৪	উচ্ছিলীন্ধ্র	উৎ	৮৪	উজ্জাপন	উৎ	৮৪	উড়নি	উৎ	৮৮	উৎকণ্ঠ	উৎ	৮৪
উচ্চতর	উৎ	৮৪	উচ্ছিষ্ট	উৎ	৮৭	উজ্জীবন	উৎ	৮৪	উড়নী	উৎ	৮৮	উৎকণ্ঠা	উৎ	৮৮
উচ্চতম	উৎ	৮৪	উচ্ছিষ্টভোজন	উৎ	৮৪	উজ্জৃম্ভ	উৎ	৮৪	উড়নীয়া	উৎ	৮৪	উৎকন্ধর	উৎ	৮৪
উচ্চনীচ	উৎ	৮৪	উচ্ছিষ্টভোজী	উৎ	৮৪	উজ্জ্বল	উৎ	৮৪	উড়পাক	উৎ	৮৪	উৎকম্প	উৎ	৮৪
উচ্চবাচ্য	উৎ	৮৪	উচ্ছিষ্টলেপ	উৎ	৮৪	উজ্জ্বল	জ্বল্	৪০৩	উড়পেকে	উৎ	৮৪	উৎকর	উৎ	৮৪
উচ্চয়	উৎ	৮৪	উচ্ছিষ্টিত	উৎ	৮৪	উজ্ঝ	উৎ	৮৪	উড়শি	উৎ	৮৪	উৎকর্ণ	উৎ	৮৪
উচ্চয়	চি	৩৪৬	উচ্ছীর্ষক	উৎ	৮৪	উজ্ঝটিকা	উৎ	৮৪	উড়স	উৎ	৮৪	উৎকর্ত্তন	উৎ	৮৪
উচ্চরণ	উৎ	৮৪	উচ্ছূন	উৎ	৮৪	উঝট	উৎ	৮৪	উড়ুষ	উৎ	৮৪	উৎকর্ত্তন	কৃৎ	২১৩
উচ্চরায়	উৎ	৮৪	উচ্ছৃঙ্খল	উৎ	৮৭	উঝল	উৎ	৮৪	উড়া	ডী	৪৩৭	উৎকীর্ত্তন	কৃৎ	২১৩
উচ্চল	উৎ	৮৪	উচ্ছে	উৎ	৮৭	উঝার	উৎ	৮৪	উড়াও	উৎ	৮৪	উৎকর্ষ	কৃশ্	২১৫
উচ্চললাটা	উৎ	৮৪	উচ্ছেত্তা	উৎ	৮৪	উঝাল	উৎ	৮৪	উড়াতাড়া	উৎ	৮৪	উৎকর্ষ	উৎ	৮৯
উচ্চললাটিকা	উৎ	৮৪	উচ্ছেষ	উৎ	৮৪	উঝ্ঝল	উৎ	৮৪	উড়ান	উৎ	৮৪	উৎকৃষ্ট	কৃশ্	২১৫
উচ্চলিত	উচ্	৮২	উচ্ছোষণ	উৎ	৮৪	উঞ্জ	উ	১১১	উড়ান	ডী	৪৩৭	উৎকল	কল্	১৬৪
উচ্চাট	উৎ	৮৪	উচ্ছ্রয়	উৎ	৮৪	উঞ্ছি	উ	১১১	উড়ানি	ডী	৪৩৭	উৎকল	উৎ	৮৪
উচ্চাবচ	উৎ	৮৪	উচ্ছ্রায়	উৎ	৮৪	উঞ্ছ	উ	১১১	উড়ানি	উৎ	৮৪	উৎকলাপ	উৎ	৮৪
উচ্চার	উৎ	৮৬	উচ্ছ্রিত	উৎ	৮৭	উঞ্ছ	উ	১১১	উড়ানিয়া	উৎ	৮৪	উৎকলিক	উৎ	৮৪
উচ্চারক	উৎ	৮৪	উচ্ছ্রিতি	উৎ	৮৪	উঞ্ছধর্ম্মা	উ	১১১	উড়ানী	ডী	৪৩৭	উৎকলিকা	উৎ	৮৪
উচ্চারণ	উৎ	৮৬	উচ্ছ্বস	উৎ	৮৪	উঞ্ছবৃত্তি	উ	১১১	উড়ানী	উৎ	৮৪	উৎকলিকা	কল্	১৬৪
উচ্চারণীয়	উৎ	৮৪	উচ্ছ্বসন	উৎ	৮৪	উঞ্ছশীল	উ	১১১	উড়ানীয়া	উৎ	৮৪	উৎকলিকাকুল	উৎ	৮৪
উচ্চারিত	উৎ	৮৪	উচ্ছ্বাস	উৎ	৮৪	উঞ্ছোপজীবী	উ	১১১	উড়াপাক	উৎ	৮৪	উৎকলিত	উৎ	৮৪
উচ্চার্য্য	উৎ	৮৪	উচ্ছ্বাসিত	উৎ	৮৪	উঠ	উৎ	৮৪	উড়ামালা	উৎ	৮৪	উৎকষণ	উৎ	৮৪
উচ্চিংড়া	উৎ	৮৪	উচ্ছ্বাসী	উৎ	৮৪	উঠতি	উৎ	৮৪	উড়ি	উৎ	৮৪	উৎকার	উৎ	৮৪
উচ্চিঙ্গট	উৎ	৮৪	উচ্‌পিচা	উৎ	৮৪	উঠনা	উৎ	৮৪	উড়িয়া	উৎ	৮৮	উৎকারিকা	উৎ	৮৪
উচ্চিত	উৎ	৮৪	উছ	উৎ	৮৪	উঠনো	উৎ	৮৪	উড়িল	উৎ	৮৪	উৎকাস	উৎ	৮৪
উচ্চিত্র	উৎ	৮৪	উছগ্‌গ	উৎ	৮৪	উঠন্ত	উৎ	৮৪	উড়িষ্যা	উৎ	৮৮	উৎকাসন	উৎ	৮৪
উচ্চূড়	উৎ	৮৪	উছট	উৎ	৮৪	উঠা	উৎ	৮৭	উড়ু	উৎ	৮৪	উৎকির	উৎ	৮৪
উচ্চূল	উৎ	৮৪	উছর	উৎ	৮৪	উঠাউঠি	উৎ	৮৪	উড়ুউড়ু	উৎ	৮৪	উৎকীর্ত্তন	উৎ	৮৪
উচ্চৈ	উৎ	৮৪	উছল	উৎ	৮৪	উঠান	উৎ	৮৭	উড়ুক্কু	উৎ	৮৪	উৎকুণ	উৎ	৮৪
উচ্চৈঃ	উৎ	৮৪	উছলপাছল	উৎ	৮৪	উঠানি	উৎ	৮৪	উড়ুনী	উৎ	৮৪	উৎকুল	উৎ	৮৪
উচ্চৈঃপদ	উৎ	৮৪	উছলিত	উৎ	৮৪	উঠিত	উৎ	৮৪	উড়ুপ	উৎ	৮৪	উৎকুজ	উৎ	৮৪
উচ্চৈঃশিরা	উৎ	৮৪	উছস	উৎ	৮৪	উঠাউঠি	উৎ	৮৪	উড়ুপতি	উৎ	৮৪	উৎকুর্দ্দন	উৎ	৮৪
উচ্চৈঃশ্রবা	উৎ	৮৭	উজ্	উজ্	৮৪	উঠাবসা	উৎ	৮৪	উড়ুপুড়ু	উৎ	৮৪	উৎকূল	উৎ	৮৪
উচ্চৈঃশ্রবাঃ	উৎ	৮৭	উজড়	উজ্	৮৪	উঠুডুবু	উৎ	৮৪	উড়ুম্বর	উৎ	৮৪	উৎকৃন্ত	উৎ	৮৪
উচ্চৈঃস্থান	উৎ	৮৪	উজবক	জন্	৩৭৮	উঠোধান	উৎ	৮৪	উড়ুষ	উৎ	৮৪	উৎকৃষ্ট	উৎ	৮৯
উচ্ছন্ন	উৎ	৮৪	উজর	উজ্	৮৪	উড্র	উন্দ্	১০২	উড়ডম্বর	উৎ	৮৪	উৎকোচ	উৎ	৮৯
উচ্ছব	উৎ	৮৪	উজা	উৎ	৮৪	উড়	উৎ	৮৮	উড্ডয়ন	উৎ	৮৪	উৎক্রম	উৎ	৮৪

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
উৎক্রান্তিদা	উৎ	৮৪	উৎপিষ্ট	উৎ	৮৪	উতঙ্ক	উৎ	৮৮	উত্তরকোশল	উৎ	৮৪	উত্তরাংস	উৎ	৮৪
উৎক্রামণ	উৎ	৮৪	উৎপীড়	উৎ	৯০	উতথ্য	উৎ	৮৮	উত্তরক্রিয়া	উৎ	৮৪	উত্তরাকাণ্ড	উৎ	৮৪
উৎক্রুষ্ট	উৎ	৮৪	উৎপীড়ন	উৎ	৯০	উতপত	উৎ	৮৪	উত্তরঙ্গ	উৎ	৮৪	উত্তরাধর	উৎ	৮৪
উৎক্লেদ	উৎ	৮৪	উৎপুচ্ছ	উৎ	৮৪	উতপতি	উৎ	৮৪	উত্তরচ্ছদ	উৎ	৮৪	উত্তরাধিকার	উৎ	৮৪
উৎক্লেশ	উৎ	৮৪	উৎপুট	উৎ	৮৪	উতর	উৎ	৮৪	উত্তরণ	উৎ	৮৪	উত্তরাধিকার	তৃ	৪৭৭
উৎক্ষিপ্ত	উৎ	৮৪	উৎপুলক	উৎ	৮৪	উতরল	উৎ	৮৪	উত্তরণ	তৃ	৪৭৭	উত্তরাপথ	উৎ	৮৪
উৎক্ষিপ্ত	ক্ষিপ্	২৩৩	উৎপেতে	উৎ	৮৪	উতরালি	উৎ	৮৪	উত্তরতঃ	উৎ	৮৪	উত্তরাভাস	উৎ	৮৪
উৎক্ষেপ	উৎ	৮৪	উৎপ্রবন্ধ	উৎ	৮৪	উতরোল	উৎ	৮৪	উত্তরত্র	উৎ	৮৪	উত্তরায়ণ	উৎ	৮৯
উৎক্ষেপক	উৎ	৮৪	উৎপ্রাস	উৎ	৮৪	উতল	উৎ	৮৪	উত্তরদায়ক	উৎ	৮৪	উত্তরায়ণ	—	৫১০
উৎক্ষেপণ	উৎ	৮৪	উৎপ্রেক্ষণ	উৎ	৮৪	উতলা	উৎ	৮৪	উত্তরদিকপাল	উৎ	৮৪	উত্তরায়ণি	উৎ	৮৪
উৎক্ষেপণ	ক্ষিপ্	২৩৩	উৎপ্রেক্ষা	ঈক্ষ্	৮০	উতা	উৎ	৮৪	উত্তরদিগীশ	উৎ	৮৪	উত্তরার্দ্ধ	উৎ	৮৪
উৎক্ষেপণী	উৎ	৮৪	উৎপ্লব	উৎ	৮৪	উতাপ	উৎ	৮৪	উত্তরপক্ষ	উৎ	৮৪	উত্তরাশা	উৎ	৮৪
উৎক্ষেপী	উৎ	৮৪	উৎফাল	উৎ	৮৪	উতার	উৎ	৮৪	উত্তরপট	উৎ	৮৪	উত্তরাষাঢ়া	উৎ	৮৪
উৎক্ষোভিত	উৎ	৮৪	উৎফুল্ল	উৎ	৮৪	উতাল	উৎ	৮৪	উত্তরপথ	উৎ	৮৪	উত্তরাসঙ্গ	উৎ	৮৪
উৎখচিত	উৎ	৮৪	উৎস	উৎ	৯১	উতালি	উৎ	৮৪	উত্তরপদ	উৎ	৮৪	উত্তরাস্য	উৎ	৮৪
উৎখাত	উৎ	৮৪	উৎসঙ্গ	উৎ	৮৪	উতাহো	উৎ	৮৪	উত্তরপশ্চিম	উৎ	৮৪	উত্তরাহ	উৎ	৮৪
উৎখাত	খন্	২৪৮	উৎসঙ্গিত	উৎ	৮৪	উতাহোস্বিৎ	উৎ	৮৪	উত্তরপাদ	উৎ	৮৪	উত্তরাহি	উৎ	৮৪
উৎখাতকেলি	উৎ	৮৪	উৎসঙ্গী	উৎ	৮৪	উত্তংস	উৎ	৮৪	উত্তরপুরুষ	উৎ	৮৪	উত্তরী	উৎ	৮৪
উৎখ্যাত	উৎ	৮৪	উৎসঞ্জন	উৎ	৮৪	উত্তট	উৎ	৮৪	উত্তরপুরুষ	তৃ	৪৭৭	উত্তরীয়	উৎ	৮৪
উৎপক্ষ্ম	উৎ	৮৪	উৎসন্ন	উৎ	৮৪	উত্তপ্ত	উৎ	৮৪	উত্তরপূর্ব্ব	উৎ	৮৪	উত্তরীয়	তৃ	৪৭৭
উৎপচিষ্ণু	উৎ	৮৪	উৎসব	উৎ	৯১	উত্তম	উৎ	৮৯	উত্তরপ্রচ্ছদ	উৎ	৮৪	উত্তরেণ	উৎ	৮৪
উৎপতন	উৎ	৮৪	উৎসবসঙ্কেত	উৎ	৮৪	উত্তমঃশ্লোক	উৎ	৮৪	উত্তরপ্রত্যুত্তর	উৎ	৮৪	উত্তরোত্তর	উৎ	৮৪
উৎপতাক	উৎ	৮৪	উৎসর্গ	উৎ	৯১	উত্তমপুরুষ	উৎ	৮৪	উত্তরফাল্গুনী	উৎ	৮৪	উত্তরোত্তর	তৃ	৪৭৭
উৎপতি	উৎ	৮৪	উৎসর্গন	উৎ	৮৪	উত্তমমধ্যম	উৎ	৮৪	উত্তরবয়স	উৎ	৮৪	উত্তরোল	উৎ	৮৪
উৎপত্তি	উৎ	৯০	উৎসর্জ্জন	উৎ	৮৪	উত্তমর্ণ	উৎ	৮৪	উত্তরবস্তি	উৎ	৮৪	উত্তরোষ্ঠ	উৎ	৮৪
উৎপত্তিক্রম	উৎ	৮৪	উৎসর্প	উৎ	৮৪	উত্তমর্ণিক	উৎ	৮৪	উত্তরবস্ত্র	উৎ	৮৪	উত্তর্জ্জন	উৎ	৮৪
উৎপত্তিবাক্য	উৎ	৮৪	উৎসাদ	উৎ	৮৪	উত্তমশ্লোক	উৎ	৮৪	উত্তরবাসঃ	উৎ	৮৪	উত্তান	উৎ	৮৯
উৎপত্তিব্যুৎক্রম	উৎ	৮৪	উৎসাদন	উৎ	৮৪	উত্তমসাহস	উৎ	৮৪	উত্তরবাদী	উৎ	৮৪	উত্তান	তন্	৪৫৩
উৎপৎস্যমান	উৎ	৮৪	উৎসারক	উৎ	৮৪	উত্তমাঃ	উৎ	৮৪	উত্তরবাহিনী	উৎ	৮৪	উত্তানপাণি	উৎ	৮৪
উৎপথ	উৎ	৮৪	উৎসাহ	উৎ	৯১	উত্তমাঙ্গ	উৎ	৮৪	উত্তরবেদী	উৎ	৮৪	উত্তানপাদ	উৎ	৮৯
উৎপথগামী	উৎ	৮৪	উৎসিক্ত	উৎ	৮৪	উত্তমাধ্যমধ্যম	উৎ	৮৪	উত্তরভাদ্রপদ	উৎ	৮৪	উত্তানশয়	উৎ	৮৪
উৎপথপ্রতিপন্ন	উৎ	৮৪	উৎসুক	উৎ	৮৪	উত্তমান্তঃ	উৎ	৮৪	উত্তরভাদ্রপদা	উৎ	৮৪	উত্তানহস্ত	উৎ	৮৪
উৎপথস্থ	উৎ	৮৪	উৎসূত্র	উৎ	৮৪	উত্তমার্দ্ধ	উৎ	৮৪	উত্তরভারতী	উৎ	৮৪	উত্তানিত	উৎ	৮৪
উৎপন	উৎ	৮৪	উৎসুর	উৎ	৮৪	উত্তমাশা	উৎ	৮৪	উত্তরমীমাংসা	উৎ	৮৪	উত্তাপ	উৎ	৮৪
উৎপন্ন	উৎ	৮৪	উৎসূর্য্য	উৎ	৮৪	উত্তমাহ	উৎ	৮৪	উত্তরমেরু	উৎ	৮৪	উত্তার	উৎ	৮৪
উৎপবন	উৎ	৮৪	উৎসৃজ্য	উৎ	৮৪	উত্তমৌজাঃ	উৎ	৮৪	উত্তররাড়ী	উৎ	৮৪	উত্তাল	উৎ	৮৪
উৎপল	উৎ	৯০	উৎসৃষ্ট	উৎ	৯১	উত্তম্ভ	উৎ	৮৪	উত্তররাঢ়ী	উৎ	৮৪	উত্তাল	তল্	৪৬৫
উৎপলাক্ষ	উৎ	৮৪	উৎসেক	উৎ	৮৪	উত্তম্ভন	উৎ	৮৪	উত্তররামচরিত	উৎ	৮৪	উত্তিষ্ঠ	উৎ	৮৪
উৎপলিনী	উৎ	৮৪	উৎসেধ	উৎ	৮৪	উত্তর	উৎ	৮৯	উত্তরলী	উৎ	৮৪	উত্তিষ্ঠমান	উৎ	৮৪
উৎপাট	উৎ	৮৪	উৎস্নাত	উৎ	৮৪	উত্তর	তৃ	৪৭৭	উত্তরশিয়র	উৎ	৮৪	উত্তীর্ণ	উৎ	৮৪
উৎপাত	উৎ	৮৪	উৎস্ময়	উৎ	৮৪	উত্তরকাণ্ড	উৎ	৮৪	উত্তরশিয়রী	উৎ	৮৪	উত্তীর্ণ	তৃ	৪৮৫
উৎপাদ	উৎ	৮৪	উৎস্বন	উৎ	৮৪	উত্তরকায়	উৎ	৮৪	উত্তরসাক্ষী	উৎ	৮৪	উত্তুঙ্গ	উৎ	৮৪
উৎপাদন	উৎ	৯০	উৎস্বপ্ন	উৎ	৮৪	উত্তরকাল	উৎ	৮৪	উত্তরসাধক	উৎ	৮৪	উত্তেজক	উৎ	৮৪
উৎপিঞ্জর	উৎ	৮৪	উৎস্বপ্নায়িত	উৎ	৮৪	উত্তরকালীন	উৎ	৮৪	উত্তরসাধক	তৃ	৪৭৭	উত্তোরণ	উৎ	৮৪
উৎপিৎসু	উৎ	৮৪	উত	উৎ	৮৪	উত্তরকুরু	উৎ	৮৪	উত্তরা	উৎ	৮৪	উত্তোলন	উৎ	৮৪

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
উত্ত্যক্ত	উৎ	৮৪	উদঙ্ক	অঞ্চ	৯	উদরী	উৎ	৮৪	উদীক্ষা	উৎ	৮৪	উদ্‌ঘুষিত	উৎ	৮৪
উত্ত্রস্ত	উৎ	৮৪	উদচ	অঞ্চ	৯	উদর্ক	উৎ	৮৪	উদীচী	অঞ্চ	১১	উদ্‌ঘূর্ণ	উৎ	৮৪
উত্থ	উৎ	৮৪	উদঞ্চন	অঞ্চ	৯	উদর্চ্চিঃ	উৎ	৮৪	উদীয়মান	উৎ	৮৪	উদ্দংশ	উৎ	৮৪
উত্থান	উৎ	৮৪	উদধি	উৎ	৮৪	উদলা	উৎ	৮৪	উদীরণ	উৎ	৮৪	উদ্দণ্ড	উৎ	৮৪
উত্থানথালা	উৎ	৮৪	উদন্ত	উৎ	৮৪	উদলা	উল্	১০৭	উদীর্ণ	উৎ	৮৪	উদ্দান	উৎ	৮৪
উত্থানৈকাদশী	উৎ	৮৪	উদন্যা	উৎ	৮৪	উদশ্রু	উৎ	৮৪	উদীর্ণ	ঋ	১১৩	উদ্দাম	উৎ	৮৪
উত্থাপক	উৎ	৮৪	উদন্বান	উৎ	৮৪	উদস্র	উৎ	৮৪	উদূখল	উৎ	৮৪	উদ্দাল	উৎ	৮৪
উত্থায়ী	উৎ	৮৪	উদপাত্র	উৎ	৮৪	উদশ্বিৎ	উৎ	৮৪	উদুম্বর	উৎ	৮৪	উদ্দালক	উৎ	৯২
উত্থাস	উৎ	৮৪	উদপান	উৎ	৮৪	উদসন	উৎ	৮৪	উদূখল	উৎ	৮৪	উদ্দিষ্ট	উৎ	৮৪
উত্থিত	উৎ	৮৪	উদবাস	উৎ	৮৪	উদস	উৎ	৮৪	উদূঢ়	উৎ	৮৪	উদ্দিষ্ট	দিশ্	৫৩৬
উত্যাক্ত	উৎ	৮৪	উদবাহ	উৎ	৮৪	উদস্ত	উৎ	৮৪	উদেজয়	উৎ	৮৪	উদ্দীপ	উৎ	৮৪
উত্র	উৎ	৮৪	উদবাহন	উৎ	৮৪	উদস্র	উৎ	৮৪	উদো	উৎ	৮৪	উদ্দীপ	দীপ্	৫৪৫
উত্রী	উৎ	৮৪	উদমাদা	উৎ	৮৪	উদহার	উৎ	৮৪	উদোম	উৎ	৮৪	উদ্দীপনা	দীপ্	৫৪৫
উথ	উৎ	৮৪	উদয়	উৎ	৮৪	উদাত্ত	উৎ	৯২	উদগত	উৎ	৮৪	উদ্দীপ্ত	উৎ	৮৪
উথল	উৎ	৮৪	উদয়	ই	৬৫	উদাত্ত	দা	৫২১	উদগত	গম্	২৬২	উদ্দীপ্ত	দীপ্	৫৪৫
উথলপাথল	উৎ	৮৪	উদয়কাল	উৎ	৮৪	উদান	উৎ	৯২	উদগন্ধি	উৎ	৮৪	উদ্দেশ	উৎ	৯২
উথলিত	উৎ	৮৪	উদয়গিরি	উৎ	৮৪	উদান	অন্	২৮	উদগম	উৎ	৮৪	উদ্দেশ	দিশ্	৫৩৮
উথাল	উৎ	৮৪	উদয়ন	উৎ	৮৪	উদাপ্লুত	উৎ	৮৪	উদগমনীয়	উৎ	৮৪	উদ্দেশ্য	দিশ্	৫৩৬
উদ্	উৎ	৮৪	উদয়ন	ই	৬৫	উদাবর্ত্ত	উৎ	৮৪	উদগলিত	উৎ	৮৪	উদ্দেশ্য	উৎ	৯২
উদ	উৎ	৮৬	উদয়াস্ত	ই	৬৫	উদাম	উৎ	৮৪	উদগাঢ়	উৎ	৮৪	উদ্দ্যোত	উৎ	৮৪
উদক্	উৎ	৮৪	উদয়পর্ব্বত	উৎ	৮৪	উদায়ুধ	উৎ	৮৪	উদগাতা	উৎ	৮৪	উদ্দ্রাব	উৎ	৮৪
উদক	অঞ্চ	১১	উদয়পুর	উৎ	৮৪	উদার	উৎ	৮৪	উদগাতা	গাহ্	২৮০	উদ্ধত	উৎ	৯৩
উদকদ	উৎ	৮৪	উদয়বান	উৎ	৮৪	উদারতা	উৎ	৮৪	উদগার	গৃ	২৯০	উদ্ধব	উৎ	৮৪
উদকদাতা	উৎ	৮৪	উদয়বেলা	উৎ	৮৪	উদারদর্শন	উৎ	৮৪	উদগার	উৎ	৮৪	উদ্ধম	উৎ	৮৪
উদকদান	উৎ	৮৪	উদয়মান	উৎ	৮৪	উদারধী	উৎ	৮৪	উদ্‌গিরিত	উৎ	৮৪	উদ্ধয়	উৎ	৮৪
উদকদান	অঞ্চ	৯	উদয়রাশি	উৎ	৮৪	উদারমতি	উৎ	৮৪	উদ্‌গীত	উৎ	৮৪	উদ্ধরণ	উৎ	৮৪
উদকদায়ী	উৎ	৮৪	উদয়শিখরী	উৎ	৮৪	উদারমনাঃ	উৎ	৮৪	উদগীত	গাহ্	২৮০	উদ্ধর্ষ	উৎ	৮৪
উদকপরীক্ষা	উৎ	৮৪	উদয়শৈল	উৎ	৮৪	উদাররমণীয়	উৎ	৮৪	উদ্‌গীর	উৎ	৮৪	উদ্ধান	উৎ	৮৪
উদকবাদ্য	উৎ	৮৪	উদয়াচল	উৎ	৮৪	উদারসত্ত্ব	উৎ	৮৪	উদ্‌গীরণ	উৎ	৮৪	উদ্ধার	উৎ	৯৩
উদকমেহ	উৎ	৮৪	উদয়াদ্রি	উৎ	৮৪	উদারা	উৎ	৮৪	উদগীরিত	উৎ	৮৪	উদ্ধুর	উৎ	৮৪
উদকশান্তি	উৎ	৮৪	উদয়ান	উৎ	৮৪	উদাস	উৎ	৮৪	উদগীর্ণ	উৎ	৮৪	উদ্ধূত	উৎ	৮৪
উদকহার	উৎ	৮৪	উদয়াস্তগিরি	উৎ	৮৪	উদাস	আস্	৬৩	উদগীর্ণ	গৃ	২৯০	উদ্ধূপন	উৎ	৮৪
উদকান্ত	উৎ	৮৪	উদয়ী	উৎ	৮৪	উদাসিতা	উৎ	৮৪	উদ্‌গূর্ণ	উৎ	৮৪	উদ্ধূলন	উৎ	৮৪
উদকার্থী	উৎ	৮৪	উদয়োন্মুখ	উৎ	৮৪	উদাসিনী	উৎ	৮৪	উদগ্রথিত	উৎ	৮৪	উদ্ধৃত	উৎ	৮৪
উদকুম্ভ	উৎ	৮৪	উদর	উৎ	৮৪	উদাসী	আস্	৬৩	উদগ্রহণ	উৎ	৮৪	উদ্ধৃতি	উৎ	৮৪
উদক্য	উৎ	৮৪	উদর	ঋ	১১৩	উদাসী	উৎ	৮৪	উদগ্রীব	উৎ	৮৪	উদ্‌ধ্মান	উৎ	৮৪
উদগ	উৎ	৮৪	উদরমরা	উৎ	৮৪	উদাসীন	উৎ	৯২	উদগ্রীব	গৃ	২৯০	উদ্র	উন্দ্	১০২
উদগত	উৎ	৮৪	উদরম্ভরি	উৎ	৮৪	উদাসীন	আস্	৬৩	উদঘটিত	উৎ	৮৪	উর্দ্র	উন্দ্	১০২
উদগয়ন	উৎ	৮৪	উদরশয়	উৎ	৮৪	উদাসীনী	উৎ	৮৪	উদঘট্টন	উৎ	৮৪	উদ্বদ্ধ	উৎ	৮৪
উদগাবৃত্তি	উৎ	৮৪	উদরসর্ব্বস্ব	উৎ	৮৪	উদাহরণ	উৎ	৯২	উদঘন	উৎ	৮৪	উদ্বন্ধ	উৎ	৮৪
উদগ্‌দিক	উৎ	৮৪	উদরসাৎ	উৎ	৮৪	উদি	উৎ	৮৪	উদঘর্ষণ	উৎ	৮৪	উদ্বপন	উৎ	৮৪
উদগ্র	উৎ	৮৪	উদরাধ্মান	উৎ	৮৪	উদিআন	উৎ	৮৪	উদঘাট	উৎ	৮৪	উদ্বমন	উৎ	৮৪
উদঙ্ক	উৎ	৮৪	উদরাময়	উৎ	৮৪	উদিত	উৎ	৮৪	উদঘাটন	উৎ	৯২	উদ্বর্ত্ত	উৎ	৮৪
উদঙ্মুখ	উৎ	৮৪	উদরাবর্ত্ত	উৎ	৮৪	উদিত	ই	৬৫	উদঘাটন	ঘট্	৩০৮	উদ্বর্ত্তন	উৎ	৮৪
উদজ	উৎ	৮৪	উদরিক	উৎ	৮৪	উদীক্ষণ	উৎ	৮৪	উদঘাত	উৎ	৮৪	উদ্বস্তি	উৎ	৮৪

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
উপজীবতা	জীব্	৩৯৫	উপধি	উৎ	৮৪	উপপুর	উৎ	৮৪	উপর	উৎ	৯৭	উপশিষ্য	উৎ	৮৪
উপজুষ্ট	উৎ	৮৪	উপধূপিত	উৎ	৮৪	উপপুরাণ	উৎ	৮৪	উপরক্ত	উৎ	৮৪	উপশোভন	উৎ	৮৪
উপজ্ঞা	উৎ	৮৪	উপধ্মান	উৎ	৮৪	উপপ্রদান	উৎ	৮৪	উপরক্ষণ	উৎ	৮৪	উপশোষণ	উৎ	৮৪
উপড়	উৎ	৮৪	উপনক্ষত্র	উৎ	৮৪	উপপ্রলোভন	উৎ	৮৪	উপরচিত	উৎ	৮৪	উপশ্রয়	উৎ	৮৪
উপড়া	উৎ	৮৪	উপনখ	উৎ	৮৪	উপপ্রাপ্ত	উৎ	৮৪	উপরত	উৎ	৮৪	উপশ্রুত	উৎ	৮৪
উপডাল	উৎ	৮৪	উপনগর	উৎ	৮৪	উপপ্রেক্ষণ	উৎ	৮৪	উপরত্ন	উৎ	৮৪	উপশ্লিষ্ট	উৎ	৮৪
উপঢৌকন	উৎ	৮৪	উপনত	উৎ	৮৪	উপপ্লব	উৎ	৮৪	উপরন্ত	উৎ	৮৪	উপসংক্রমণ	উৎ	৮৪
উপঢৌকন	ঢক্	৪৪৪	উপনত	নম্	৬৩০	উপবক্তা	উৎ	৮৪	উপরন্তু	উৎ	৮৪	উপসংক্ষেপ	উৎ	৮৪
উপতন্ত্র	উৎ	৮৪	উপনদ	উৎ	৮৪	উপবঞ্চিত	উৎ	৮৪	উপরম	উৎ	৮৪	উপসংক্ষেপ	উৎ	৮৪
উপতপন	উৎ	৮৪	উপনদী	উৎ	৮৪	উপবন	উৎ	৮৪	উপরস	উৎ	৮৪	উপসংক্ষেপ	ক্ষিপ্	২৩৩
উপতীর্থ	উৎ	৮৪	উপনন্দ	উৎ	৮৪	উপবন্ধ	উৎ	৮৪	উপরাগ	উৎ	৮৪	উপসংখ্যান	উৎ	৮৪
উপত্যকা	উৎ	৯৫	উপনয়	উৎ	৯৬	উপবর্ণ	উৎ	৮৪	উপরাজ	উৎ	৮৪	উপসংগ্রহ্	উৎ	৮৪
উপত্যকা	ত্য	৪৮৭	উপনয়	নী	৬৫৫	উপবর্ণন	উৎ	৮৪	উপরাণী	উৎ	৮৪	উপসংঘাত	উৎ	৮৪
উপদংশ	উৎ	৮৪	উপনহ্	উৎ	৮৪	উপবর্ত্তন	উৎ	৮৪	উপরি	উৎ	৯৭	উপসংবাদ	উৎ	৮৪
উপদর্শক	উৎ	৮৪	উপনহন	উৎ	৮৪	উপবর্হ্	উৎ	৮৪	উপরিচর	উৎ	৯৭	উপসংব্যান	উৎ	৮৪
উপদা	উৎ	৮৪	উপনিক্ষেপ	উৎ	৮৪	উপবর্হণ	উৎ	৮৪	উপরিতন	উৎ	৮৪	উপসংযম	উৎ	৮৪
উপদিক	উৎ	৮৪	উপনিধাতা	উৎ	৮৪	উপবসথ	উৎ	৮৪	উপরিভাগ	উৎ	৮৪	উপসংস্কৃত	উৎ	৮৪
উপদিগ্ধ	উৎ	৮৪	উপনিপাত	উৎ	৮৪	উপবাহী	উৎ	৮৪	উপরিয়া	উৎ	৮৪	উপসংহার	উৎ	৯৯
উপদিষ্ট	উৎ	৯৫	উপনিবদ্ধ	উৎ	৮৪	উপবিদ্যা	উৎ	৮৪	উপরিষ্টাৎ	উৎ	৮৪	উপসঙ্গত	উৎ	৮৪
উপদিষ্ট	দিশ্	৫৪১	উপনিবিষ্ট	উৎ	৮৪	উপবিষ	উৎ	৮৪	উপরুদ্ধ	উৎ	৮৪	উপসত্তি	উৎ	৮৪
উপদীকা	উৎ	৮৪	উপনিষদ	উৎ	৯৬	উপবিষ্ট	উৎ	৮৪	উপরূঢ়	উৎ	৮৪	উপসন	উৎ	৮৪
উপদীকৃত	উৎ	৮৪	উপনিষাদী	উৎ	৮৪	উপবীত	উৎ	৯৬	উপরূপক	উৎ	৮৪	উপসন্ন	উৎ	৮৪
উপদেব	উৎ	৮৪	উপনিষ্ক্রমণ	উৎ	৮৪	উপবৃংহণ	উৎ	৮৪	উপরে	উৎ	৯৭	উপসন্ন্যাস	উৎ	৮৪
উপদেবতা	উৎ	৮৪	উপনিহিত	উৎ	৮৪	উপবৃক্ষ	উৎ	৮৪	উপরোক্ত	উৎ	৮৪	উপসম্পত্তি	উৎ	৮৪
উপদেশ	উৎ	৯৫	উপনীত	উৎ	৯৬	উপবেদ	উৎ	৮৪	উপরোধ	উৎ	৮৪	উপসম্প্রাপ্ত	উৎ	৮৪
উপদেশ	দিশ্	৫৩৬	উপনীত	নী	৬৫৫	উপবেশ	উৎ	৮৪	উপর্য্যধো	উৎ	৮৪	উপসম্ভাষা	উৎ	৮৪
উপদেশ	—	৫৪১	উপনৃত্ত	উৎ	৮৪	উপব্রাহ্মণ	উৎ	৮৪	উপর্য্যুপরি	উৎ	৮৪	উপসর	উৎ	৮৪
উপদেষ্টা	দিশ্	৫৪১	উপনেতব্য	উৎ	৮৪	উপভাষা	উৎ	৮৪	উপল	উৎ	৯৮	উপসর্গ	উৎ	৯৯
উপদেহ্	উৎ	৮৪	উপনেতা	উৎ	৮৪	উপভুক্ত	উৎ	৮৪	উপলক্ষ(-ক্ষ্য)	উৎ	৯৮	উপসর্জ্জন	উৎ	৮৪
উপদোহ্	উৎ	৮৪	উপন্যস্ত	উৎ	৮৪	উপভূষণ	উৎ	৮৪	উপলক্ষক	উৎ	৮৪	উপসর্প	উৎ	৮৪
উপদোহন	উৎ	৮৪	উপন্যস্ত	অস্	৫৬	উপভৃত	উৎ	৮৪	উপলক্ষণ	উৎ	৮৪	উপসর্য্যা	উৎ	৮৪
উপদ্রব	উৎ	৯৫	উপন্যাস	অস্	৫৬	উপম	উৎ	৮৪	উপলব্ধ	উৎ	৯৮	উপসাগর	উৎ	৮৪
উপদ্রব	দ্রু	৫৭৬	উপপতি	উৎ	৮৪	উপমন্ত্রণ	উৎ	৮৪	উপলব্ধি	উৎ	৯৮	উপসান্ত্বন	উৎ	৮৪
উপদ্রষ্টা	উৎ	৮৪	উপপত্তি	উৎ	৮৪	উপমন্ত্রী	উৎ	৮৪	উপলভ্য	উৎ	৮৪	উপসুন্দ	উৎ	৮৪
উপদ্রুত	উৎ	৮৪	উপপত্নী	উৎ	৮৪	উপমন্যু	উৎ	৮৪	উপলেপ	উৎ	৮৪	উপসূর্য্যক	উৎ	৮৪
উপদ্রুত	দ্রু	৫৭৬	উপপথ	উৎ	৮৪	উপমর্দ্দ	উৎ	৮৪	উপশম	উৎ	৯৮	উপসৃষ্ট	উৎ	৮৪
উপদ্বার	উৎ	৮৪	উপপদ	উৎ	৮৪	উপমা	উৎ	৯৭	উপশয়	উৎ	৮৪	উপসেক	উৎ	৮৪
উপদ্বীপ	উৎ	৮৪	উপপন্ন	উৎ	৮৪	উপমাতা	উৎ	৮৪	উপশল্য	উৎ	৮৪	উপসেবক	উৎ	৮৪
উপধর্ম্ম	উৎ	৮৪	উপপর্ব্বত	উৎ	৮৪	উপমিত্র	উৎ	৮৪	উপশাখা	উৎ	৮৪	উপস্কর	উৎ	৮৪
উপধা	উৎ	৮৪	উপপাত	উৎ	৮৪	উপযন্তা	উৎ	৮৪	উপশান্ত	উৎ	৮৪	উপস্তম্ভ	উৎ	৮৪
উপধা	ধা	৫৯০	উপপাতক	উৎ	৮৪	উপযন্ত্রিত	উৎ	৮৪	উপশান্তি	উৎ	৮৪	উপস্তরণ	উৎ	৮৪
উপধাতু	উৎ	৮৪	উপপাদ	উৎ	৮৪	উপযাচক	উৎ	৮৪	উপশায়	উৎ	৮৪	উপস্ত্রী	উৎ	৮৪
উপধান	উৎ	৮৪	উপপাপ	উৎ	৮৪	উপযাত	উৎ	৮৪	উপশায়ী	উৎ	৮৪	উপস্থ	উৎ	৮৪
উপধান	ধা	৫৯৮	উপপার্শ্ব	উৎ	৮৪	উপযুক্ত	উৎ	৯৭	উপশিক্ষণ	উৎ	৮৪	উপস্থিত	উৎ	৯৯
উপধাবন	উৎ	৮৪	উপপীড়ন	উৎ	৮৪	উপযোগিতা	উৎ	৮৪	উপশিরা	উৎ	৮৪	উপস্নেহ	উৎ	৮৪

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
উপস্পর্শ	উৎ	৮৪	উপানহ	উৎ	৮৪	উপেন্দ্র	উৎ	৮৪	উয়ল	উৎ	৮৪	উলটা	উল্	১০৩
উপস্মৃতি	উৎ	৮৪	উপানহী	উৎ	৮৪	উপোঢ়	উৎ	৮৪	উয়া	উৎ	৮৪	উক	উল্	১০৭
উপস্বত্ব	উৎ	৮৪	উপান্ত	উৎ	৮৪	উপোত্তম	উৎ	৮৪	উয়াড়	অব্	৩২	উক	উষ্	১০৯
উপস্বেদ	উৎ	৮৪	উপান্তিক	উৎ	৮৪	উপোদিকা	উৎ	৮৪	উয্যুগ	উৎ	৮৪	উকা	উষ্	১০৯
উপহত	উৎ	৮৪	উপান্তিম	উৎ	৮৪	উপোদঘাত	উৎ	৮৪	উর্	উর্	১০৩	উকা	উল্	১০৭
উপহব	উৎ	৮৪	উপান্ত্য	উৎ	৮৪	উপোষ	উৎ	৮৪	উর	উর্	১০৩	উখলি	উল্	১০৭
উপহরণ	উৎ	৮৪	উপাবর্ত্তন	উৎ	৮৪	উপোস	উৎ	৮৪	উরঃ	উর্	১০৩	উট	উষ্	১০৯
উপহার	উৎ	৯৯	উপাম	উৎ	৮৪	উপোষণ	উৎ	৮৪	উরঃ	ঋ	১১৩	উটক	উষ্	১০৯
উপহাস	উৎ	১০০	উপায়	উৎ	১০১	উফড়	উৎ	৮৪	উরগ	উর্	১০৩	উটজ	উষ্	১০৯
উপহস্তিকা	উৎ	৮৪	উপায়	ই	৬৫	উফরধাফর	উৎ	৮৪	উরঙ্গ	উর্	১০৩	উটপাখী	উষ্	১০৯
উপহিত	উৎ	৮৪	উপায়ধি	উৎ	৮৪	উফরিফাঁফরি	উৎ	৮৪	উরজ	উর্	১০৩	উমাবড়ি	উষ্	১০৯
উপহূত	উৎ	৮৪	উপায়ন	উৎ	৮৪	উফাড়	উৎ	৮৪	উরণ	ঋ	১১৩	উমামুড়ি	উষ্	১০৯
উপহূতি	উৎ	৮৪	উপায়াত	উৎ	৮৪	উব	উৎ	৮৪	উরণা	উর্	১০৩	উল্	উল্	১০৮
উপহৃত	উৎ	৮৪	উপারত	উৎ	৮৪	উবজ	উৎ	৮৪	উরত	উর্	১০৩	উলকা	উল্	১০৭
উপহ্বর	উৎ	৮৪	উপারম	উৎ	৮৪	উবটন	উৎ	৮৪	উরথ	উর্	১০৩	উলঙ্গ	উল্	১০৮
উপা	উৎ	৮৪	উপারম্ভ	উৎ	৮৪	উবড়া	উৎ	৮৪	উরশ্ছদ	উর্	১০৩	উলঙ্গিনী	উল্	১০৭
উপাঅ	উৎ	৮৪	উপারূঢ়	উৎ	৮৪	উবর	উৎ	৮৪	উরস	উর্	১০৩	উলঙ্গী	উল্	১০৭
উপাংশু	উৎ	৮৪	উপার্জ্জক	উৎ	৮৪	উবা	উৎ	৮৪	উরসি	উর্	১০৩	উলট	উল্	১০৮
উপাকরণ	উৎ	৮৪	উপার্জ্জক	অর্জ	৪২	উবু	উৎ	৮৪	উরস্ত্রাণ	উর্	১০৩	উলটকম্বল	উল্	১০৭
উপাখ্য	উৎ	৮৪	উপার্জ্জন	অর্জ	৪২	উবুড়	উৎ	৮৪	উরস্	উর্	১০৩	উলটপালট	উল্	১০৮
উপাগত	উৎ	৮৪	উপার্জ্জন	উৎ	১০১	উব্জ	উৎ	৮৪	উরস্য	উর্	১০৩	উলটা	উল্	১০৭
উপাগ্র	উৎ	৮৪	উপালব্ধ	উৎ	৮৪	উভ	উ	১১১	উরস্থান	উর্	১০৩	উলটাপালটা	উল্	১০৭
উপাঙ্গ	উৎ	৮৪	উপাশ্রয়	উৎ	৮৪	উভয়	উ	১১১	উরাত	উর্	১০৩	উলটি	উল্	১০৮
উপাঙ্গ	অঙ্	৬	উপাষ	উৎ	৮৪	উভয়চর	উ	১১১	উরু	উর্	১০৪	উলটিপালটি	উল্	১০৭
উপাচার্য্য	উৎ	৮৪	উপাস	উৎ	৮৪	উভয়ত	উ	১১১	উরুত	উর্	১০৩	উলপ	উল্	১০৭
উপাঞ্জন	উৎ	৮৪	উপাসক	উৎ	১০১	উভয়তঃ	উ	১১১	উরুথ	উর্	১০৩	উলম	উল্	১০৭
উপাড়	উৎ	৮৪	উপাসক	আস্	৬৩	উভয়ত্র	উ	১১১	উরোগম	উর্	১০৩	উলমতি	উৎ	৮৪
উপাত্ত	উৎ	৮৪	উপাসনা	আস্	৬৩	উভয়থা	উ	১১১	উরোঘাত	উর্	১০৩	উলস	উৎ	৮৪
উপাত্যয়	উৎ	৮৪	উপাসনা	উৎ	১০১	উভয়পক্ষ	উ	১১১	উরোজ	উর্	১০৩	উলসিত	উৎ	৮৪
উপাদান	উৎ	১০০	উপাসঙ্গ	উৎ	৮৪	উভয়পদী	উ	১১১	উরোভূ	উর্	১০৩	উলা	উল্	১০৭
উপাদান	দা	৫২১	উপাসী	উৎ	৮৪	উভয়বিধ	উ	১১১	উরোহস্ত	উর্	১০৩	উলাট	উল্	১০৭
উপাদানলক্ষণা	উৎ	৮৪	উপাস্ত্র	উৎ	৮৪	উভয়বেতন	উ	১১১	উর্জ্জ	ঋজ্	১২১	উলাড়	উল্	১০৯
উপাদেয়	উৎ	১০০	উপাহিত	উৎ	৮৪	উভয়সঙ্কট	উ	১১১	উর্জ্জিত	ঋজ্	১২১	উলান	উল্	১০৭
উপাদেয়	দা	৫২১	উপাহৃত	উৎ	৮৪	উভয়স্নাতক	উ	১১১	উর্ণনাভ	উর্	১০৩	উলাস	উল্	১০৭
উপাধান	উৎ	৮৪	উপুড়	উৎ	৮৪	উভয়াত্মক	উ	১১১	উর্ণনাভি	উর্	১০৩	উলি	উল্	১০৭
উপাধি	উৎ	১০০	উপুর	উৎ	৮৪	উভার	উ	১১১	উর্ণা	উর্	১০৩	উলিপালি	উল্	১০৭
উপাধি	ধা	৫৯০	উপে	উৎ	৮৪	উমঙ্গ	উ	১১১	উর্দ্দি	উর্	১০৩	উলু	উল্	১০৯
উপাধিক	উৎ	৮৪	উপেক্ষ	উৎ	১০১	উমড়	উৎ	৮৪	উর্দ্দু	উর্	১০৩	উলুই	উল্	১০৭
উপাধেয়	উৎ	৮৪	উপেক্ষক	উৎ	১০১	উমত	উৎ	৮৪	উর্ব্ব	উর্	১০৪	উলুউলু	উল্	১০৭
উপাধ্যা	উৎ	৮৪	উপেক্ষক	ঈক্ষ্	৮০	উমদা	উৎ	৮৪	উর্ব্বর	উর্	১০৫	উলুখল	উল্	১০৭
উপাধ্যায়	উৎ	১০০	উপেক্ষা	ঈক্ষ্	৮০	উমা	উ	১১১	উর্ব্বরা	উর্	১০৫	উলুক (উলূক)	উৎ	১০১
উপাধ্যায়	ই	৬৫	উপেক্ষা	উৎ	১০১	উমান	উৎ	৮৪	উর্ব্বরিত	উর্	১০৩	উলুপ	উল্	১০৭
উপান	উৎ	৮৪	উপেখ	উৎ	৮৪	উমেশ	উ	১১১	উর্ব্বশী	উর্	১০৫	উলুপী	উল্	১০৭
উপানৎ	উৎ	৮৪	উপেত	উৎ	৮৪	উম্বর	উৎ	৮৪	উর্ব্বী	উর্	১০৩	উলুপী (উলূপী)	উৎ	১০১
উপানদ	উৎ	৮৪	উপেত	ই	৬৫	উয়	উৎ	৮৪	উর্ষ	উর্	১০৩	উল্কা	উল্	১০৭

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
উল্কা	উষ্ ১০৯	উষ্ণক	উষ্ ১০৯	ঊনমৌলিক	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধফণ	উর্ ১০৩	ঊহাপোহ	ঊহ্ ১১২
উল্কি	উৎ ৮৪	উষ্ণা	উষ্ ১০৯	ঊনলক্ষ	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধবর্ম্ম	উর্ ১০৩	ঊহিনী	ঊহ্ ১১২
উল্মুক	উষ্ ১০৯	উষ্ণাংশু	উষ্ ১০৯	ঊনশত	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধবাট	উর্ ১০৩	ঊহ্য	ঊহ্ ১১২
উল্লঙঘন	উৎ ১০১	উষ্ণাগম	উষ্ ১০৯	ঊনষষ্টি	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধবাত	উর্ ১০৩		
উল্লম্ফ	উৎ ৮৪	উষ্ণাভিগম	উষ্ ১০৯	ঊনষাট	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধবায়	উর্ ১০৩	**ঋ**	
উল্লম্ফন	উৎ ৮৪	উষ্ণালু	উষ্ ১০৯	ঊনসত্তর	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধবায়ে	উর্ ১০৩		
উল্লস	উৎ ৮৪	উষ্ণিক্	উষ্ ১০৯	ঊনা	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধবাহু	উর্ ১০৩	ঋ	— ১১২
উল্লসন	উৎ ৮৪	উষ্ণিকা	উষ্ ১০৯	ঊনিশ	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধবৃত	উর্ ১০৩	ঋং	ঋ ১১৩
উল্লা	উল্ ১০৭	উষ্ণীষ	উষ্ ১১০	ঊফর	উৎ ৮৪	ঊর্দ্ধমন্থী	উর্ ১০৩	ঋ-কার	ঋ ১১৩
উল্লাপ	উৎ ৮৪	উষ্ণিষী	উষ্ ১০৯	ঊব	উৎ ৮৪	ঊর্দ্ধমান	উর্ ১০৩	ঋক	ঋচ্ ১১৯
উল্লাল	উৎ ৮৪	উষ্ণোদক	উষ্ ১০৯	ঊরব্য	উর্ ১০৩	ঊর্দ্ধমুখ	উর্ ১০৩	ঋক্ছন্দঃ	ঋচ্ ১১৯
উল্লাস	উৎ ৮৪	উষ্ম	উষ্ ১০৯	ঊরাত	উর্ ১০৩	ঊর্দ্ধমুখীন	উর্ ১০৩	ঋক্থ	ঋচ্ ১২০
উল্লিখিত	উৎ ৮৪	উষ্মা	উষ্ ১১০	ঊরু	ঊ ১০৬	ঊর্দ্ধরাও	উর্ ১০৩	ঋক্থী	ঋচ্ ১২০
উল্লীঢ়	উৎ ৮৪	উসখুস	উষ্ ১০৯	ঊরুত	উর্ ১০৩	ঊর্দ্ধরাজি	উর্ ১০৩	ঋক্ষ	ঋষ্ ১২২
উল্লুক	উৎ ৮৪	উসকোখুসকো	উৎ ৮৪	ঊরু	উর্ ১০৪	ঊর্দ্ধরেখা	উর্ ১০৩	ঋক্ষনাথ	ঋষ্ ১২২
উল্লুঞ্চন	উৎ ৮৪	উসর	উৎ ৮৪	ঊরুগ্রাহ	উর্ ১০৩	ঊর্দ্ধরেতা	উর্ ১০৭	ঋক্ষপতি	ঋষ্ ১২২
উল্লুণ্ঠন	উৎ ৮৪	উসস	উৎ ৮৪	ঊরুজ	উর্ ১০৩	ঊর্দ্ধরেতাঃ	উর্ ১০৭	ঋক্ষরজা	ঋষ্ ১২৩
উল্লুক	উৎ ৮৪	উসিমুসি	উৎ ৮৪	ঊরুজন্মা	উর্ ১০৩	ঊর্দ্ধলিঙ্গ	উর্ ১০৩	ঋক্ষরাজ	ঋষ্ ১২২
উল্লোল	উৎ ৮৪	উস্র	উৎ ৮৪	ঊরুপর্ব্ব	উর্ ১০৩	ঊর্দ্ধলোক	উর্ ১০৩	ঋক্ষেষ্টি	ঋষ্ ১২২
উল্ব	উল্ ১০৭	উহ্	উহ্ ১১০	ঊরুপর্ব্বা	উর্ ১০৩	ঊর্দ্ধশায়ী	উর্ ১০৩	ঋক্সংহিতা	ঋচ্ ১১৯
উল্বণ	উৎ ৮৪	উহ	উহ্ ১১০	ঊরুফলক	উর্ ১০৩	ঊর্দ্ধশ্বাস	উর্ ১০৩	ঋক্সাম	ঋচ্ ১১৯
উশকা	উৎ ৮৪	উহা	উহ্ ১১০	ঊরুমাত্র	উর্ ১০৩	ঊর্দ্ধস্রোতাঃ	উর্ ১০৩	ঋগ	ঋচ্ ১১৯
উশখুশ	উৎ ৮৪	উহান	উহ্ ১১০	ঊরুস্তম্ভ	উর্ ১০৩	ঊর্ম্মি	ঋ ১১৩	ঋগ্গাথা	ঋচ্ ১১৯
উশখুশ	ক্ষ্ ২২৬	উহি	উহ্ ১১০	ঊর্জ্জ্	উর্ ১০৪	ঊর্ম্মিকা	ঋ ১১৩	ঋগ্বেদ	ঋচ্ ১১৯
উশ্তাদ্	উৎ ৮৪	উহু	উহ্ ১১০	ঊর্জ্জ্	ঋজ্ ১২১	ঊর্ম্মিলা	উর্ ১০৭	ঋগ্যজুষ	ঋচ্ ১১৯
উশনা	উৎ ৮৪	উহুঁ	উহ্ ১১০	ঊর্জ্জঃ	উর্ ১০৪	ঊর্ম্মিমান	ঋ ১১৩	ঋচ	ঋচ্ ১১৯
উশিজ	উৎ ৮৪	উহ্য	উহ্ ১১১	ঊর্জ্জস্কর	উর্ ১০৩	ঊর্ম্মিমালী	ঋ ১১৩	ঋচীক	ঋচ্ ১২১
উশীনর	উৎ ১০২	উহ্যমান	উহ্ ১১০	ঊর্জ্জস্বল	উর্ ১০৩	ঊর্ম্মিলা	ঋ ১১৩	ঋচীষ	ঋচ্ ১১৯
উশীর	উৎ ৮৪			ঊর্জ্জস্বান	উর্ ১০৩	ঊষ	উষ্ ১০৯	ঋজ্	ঋজ্ ১২১
উশুল	উৎ ৮৪	**ঊ**		ঊর্জ্জস্বী	উর্ ১০৩	ঊষঃ	উষ্ ১০৯	ঋজু	ঋজ্ ১২১
উশকখুশক	উৎ ৮৪			ঊর্জ্জিত	উর্ ১০৩	ঊষক	উষ্ ১০৯	ঋজুকরণ	ঋজ্ ১২১
উষ্	উষ্ ১০৯	ঊ	— ১১২	ঊর্ণা	উর্ ১০৩	ঊষর	উষ্ ১০৯	ঋজ্বায়ত	ঋজ্ ১২১
উষ (উস)	উষ্ ১০৯	ঊ-কার	ঊ ১১২	ঊর্ণায়ু	উর্ ১০৩	ঊষা	উষ্ ১০৯	ঋজ্বী	ঋজ্ ১২১
উষঃ	উষ্ ১০৯	ঊকি	ঊ ১১২	ঊর্দ্ধ	উর্ ১০৬	ঊষী	উষ্ ১০৯	ঋণ	ঋ ১১৭
উষঃকাল	উষ্ ১০৯	ঊন্	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধ	উৎ ১০১	ঊষ্ম	উষ্ ১১০	ঋণলেখ্য	ঋ ১১৩
উষণ	উষ্ ১০৯	ঊন	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধগ	উর্ ১০৩	ঊষ্মপ	উষ্ ১০৯	ঋণশেষ	ঋ ১১৩
উষত	উষ্ ১০৯	ঊনআশী	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধগতি	উর্ ১০৩	ঊষ্মবর্ণ	উষ্ ১০৯	ঋণাদান	ঋ ১১৩
উষর্বুধ	উষ্ ১০৯	ঊনকোটি	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধগপুর	উর্ ১০৩	ঊষ্মা	উষ্ ১১০	ঋণাপনয়ন	ঋ ১১৩
উষসী	উষ্ ১০৯	ঊনচল্লিশ	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধগমন	উর্ ১০৩	ঊহ্	ঊহ্ ১১২	ঋণাপনোদন	ঋ ১১৩
উষা	উষ্ ১০৯	ঊনত্রিশ	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধতিলক	উর্ ১০৩	ঊহ	ঊহ্ ১১২	ঋণাপাকরণ	ঋ ১১৩
উষিত	উষ্ ১০৯	ঊননব্বই	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধদৃষ্টি	উর্ ১০৩	ঊহন	ঊহ্ ১১২	ঋণার্ণ	ঋ ১১৩
উষিপিষি	উষ্ ১০৯	ঊনপঞ্চাশ	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধদেহ	উর্ ১০৩	ঊহনী	ঊহ্ ১১২	ঋণিক	ঋ ১১৩
উষিমিষি	উষ্ ১০৯	ঊনপাঁজুরে	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধপথ	উর্ ১০৩	ঊহনীয়	ঊহ্ ১১২	ঋণী	ঋ ১১৩
উষ্ট্র	উষ্ ১০৯	ঊনবিংশ	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধপুণ্ড	উর্ ১০৩	ঊহা	ঊহ্ ১১২	ঋণোদ্ধার	ঋ ১১৩
উষ্ণ	উষ্ ১০৯	ঊনবিংশতি	ঊন্ ১১২	ঊর্দ্ধপুণ্ডক	উর্ ১০৩	ঊহিত	ঊহ্ ১১২	ঋত	ঋ ১১৭

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
এত্তেলা	ই	৬৫	এয়োত	ধৃ	৬০১	ঐক্ষাক	ইষ্	৭৮	ওকিল	উচ্	৮২	ওনাদের	উ	১১১
এতহি	ই	৬৫	এয়োরাণী	ধৃ	৬০১	ঐচ্ছিক	ইষ্	৭৮	ওগয়রহ	উচ্	৮২	ওনাদের	উহ্	১১০
এতহুঁ	ই	৬৫	এয়োস্ত্রী	ধৃ	৬০১	ঐছন	ই	৬৫	ওগরা	উচ্	৮২	ওপর	উৎ	৯৭
এতা	ই	৬৫	এর	ই	৬৫	ঐছে	ই	৬৫	ওগা	উচ্	৮২	ওম	অব্	৩৬
এতাদৃক	ই	৬৫	এরপর	ই	৬৫	ঐণ	ই	৬৫	ওঘ	উচ্	৮২	ওয়াড়	অব্	৩২
এতাদৃশ	ই	৬৫	এরূপ	ই	৬৫	ঐণেয়	ই	৬৫	ওঘবতী	উচ্	৮২	ওল	উন্দ্	১০৩
এতাদৃশ	দৃশ্	৫৬৬	এরে	ই	৬৫	ঐতরেয়	ই	৭৩	ওঙ্কার	উ	১১১	ওলটপালট	উল্	১০৮
এতাধিক	ই	৬৫	এলনা	উল্	১০৭	ঐতিহাসিক	ই	৬৫	ওঙ্কার	অব্	৩৬	ওলন	অব্	৩২
এতানি	ই	৬৫	এলা	উল্	১০৭	ঐতিহ্য	ই	৭৩	ওচ-খোচ	উচ্	৮২	ওলা	উল্	১০৭
এতাবতা	ই	৬৫	এলাকা	ই	৬৫	ঐন্দব	ইন্দ্	৭৪	ওচনেচ	উচ্	৮২	ওলাউঠা	উল্	১০৭
এতে	ই	৬৫	এলাকাড়ি	ই	৬৫	ঐন্দ্র	ইন্দ্	৭৪	ওজঃ	উজ্	৮৪	ওলান	উল্	১০৭
এতেক	ই	৬৫	এলাচ	উল্	১০৭	ঐন্দ্রজালিক	ইন্দ্	৭৪	ওজন	উজ্	৮৪	ওলাবিবি	উল্	১০৭
এথা	ই	৬৫	এলাচি	উল্	১০৭	ঐন্দ্রি	ইন্দ্	৭৪	ওজর	উজ্	৮৪	ওলাহন	উৎ	৮৪
এথাকার	ই	৬৫	এলো	উল্	১০৭	ঐন্দ্রিয়	ইন্দ্	৭৪	ওজস	উজ্	৮৪	ওলো	ঋ	১১৩
এথাতে	ই	৬৫	এলোচুল	উল্	১০৭	ঐন্দ্রিয়িক	ইন্দ্	৭৪	ওজু	উজ্	৮৪	ওশ	উৎ	৮৪
এথায়	ই	৬৫	এলোখেলো	উল্	১০৭	ঐমত	ই	৬৫	ওজুনামা	উজ্	৮৪	ওষ	উষ্	১১০
এথেক	ই	৬৫	এলোবিলি	উল্	১০৭	ঐমনি	ই	৬৫	ওজস্বান	উজ্	৮৪	ওষধি	উষ্	১১০
এদানী	ই	৬৫	এলোমেলো	উল্	১০৭	ঐরাবণ	ই	৬৫	ওজস্বিনী	উজ্	৮৪	ওষধিজ	উষ্	১০৯
এদিক	ই	৬৫	এষণ	ইষ্	৭৯	ঐরাবত	ই	৬৫	ওজস্বী	উজ্	৮৪	ওষধিপতি	উষ্	১০৯
এদিক	দিশ্	৫৩৬	এষণা	ইষ্	৭৯	ঐরি	ঋ	১১৩	ওঝা	উৎ	৮৪	ওষধীশ	উষ্	১০৯
এনঃ	ই	৬৫	এষণী	ইষ্	৭৯	ঐরী	ঋ	১১৩	ওট	উৎ	৮৪	ওষধিপ্রস্থ	উষ্	১০৯
এনা	ই	৬৫	এহ	ই	৬৫	ঐল	ই	৬৫	ওঠ	উৎ	৮৪	ওষুধ	উষ্	১১০
এনারা	ই	৬৫	এহন	ই	৬৫	ঐশ	ঈশ্	৮১	ওঠা	উৎ	৮৪	ওষ্ঠ	উষ্	১১০
এন্তকাল	ই	৬৫	এহনা	ই	৬৫	ঐশান	ঈশ্	৮১	ওঠে	ই	৬৫	ওষ্ঠ্য	উষ্	১০৯
এন্তার	অন্	৩২	এহা	ই	৬৫	ঐশিক	ঈশ্	৮১	ওড্র	উন্দ্	১০২	ওস্তাদ	উৎ	৮৪
এব	ই	৬৫	এহি	ই	৬৫	ঐশ্বর	ঈশ্	৮১	ওড্র	উৎ	৮৪	ওস্তাদি	উৎ	৮৪
এবং	ই	৬৫	এহেন	ই	৬৫	ঐশ্বরিক	ঈশ্	৮১	ওড়	উল্	১০৭	ওহ	উহ্	১১০
এবঞ্চ	ই	৬৫	এহো	ই	৬৫	ঐশ্বর্য্য	ঈশ্	৮১	ওড়	উৎ	৮৪	ওহা	উহ্	১১০
এবড়োখেবড়ো	অ	৫৯	এহোঁ	ই	৬৫	ঐষীক	ঈষ্	৮২	ওড়কচু	উৎ	৮৪	ওহে	উহ্	১১০
এবমস্তু	ই	৬৫	এহ্মান	ই	৬৫	ঐসন	ই	৬৫	ওড়ন	উৎ	৮৪	ওহো	উহ্	১১০
এবম্প্রকার	ই	৬৫				ঐহলৌকিক	ই	৬৫	ওড়নষষ্ঠী	উৎ	৮৪	ওগো	গম্	২৬২
এবম্বিধ	ই	৬৫	**ঐ**			ঐহিক	ই	৬৫	ওড়নি	উৎ	৮৪	ওঁচলা	চঙ্	৩৪৫
এবম্ভূত	ই	৬৫							ওড়নী	উৎ	৮৪	ওষধি	ধা	৫৯০
এবার	ই	৬৫	ঐকতান	ই	৬৫				ওড়ব	উৎ	৮৪			
এবিধ	ই	৬৫	ঐকপত্য	ই	৬৫	**ও**			ওড়া	উৎ	৮৪	**ঔ**		
এবে	ই	৬৫	ঐকমত্য	ই	৬৫	ও-কার	উ	১১১	ওড়িকা	উৎ	৮৪			
এমত	ই	৬৫	ঐকাগ্র্য	ই	৬৫	ওঁকার	উ	১১১	ওতপ্রোত	আ	৬৫	ঔখধ	উষ্	১০৯
এমতন	ই	৬৫	ঐকাত্ম্য	ই	৬৫	ওঁচলা	উচ্	৮২	ওথা	ই	৬৫	ঔগ্রসেনি	উচ্	৮২
এমতি	ই	৬৫	ঐকান্ত	ই	৬৫	ওঁচা	উ	১১১	ওথায়	ই	৬৫	ঔগ্র্য	উচ্	৮২
এমন	ই	৬৫	ঐকান্তিক	ই	৬৫	ওঁছা	উ	১১১	ওদন	উন্দ্	১০৩	ঔচিত্য	উচ্	৮২
এমনই	ই	৬৫	ঐ-কার	ই	৬৫	ওক	উ	১১১	ওদর	উৎ	৮৪	ঔজ্জ্বল্য	উৎ	৮৪
এমনি	ই	৬৫	ঐকাহিক	ই	৬৫	ওক	উচ্	৮২	ওন	উহ্	১১০	ঔডুম্বর	উৎ	৮৪
এমন্ত	ই	৬৫	ঐক্য	ই	৬৫	ওকঃ	উচ্	৮২	ওনা	উহ্	১১০	ঔড্র	উৎ	৮৪
এয়ো	ধৃ	৬০১	ঐক্যতা	ই	৬৫	ওকালতি	উচ্	৮২	ওনা	উ	১১১	ঔৎকণ্ঠ্য	উৎ	৮৪
এয়োজাত	ধৃ	৬০১	ঐক্ষব	ইষ্	৭৮	ওকালতনামা	উচ্	৮২	ওনাকে	উ	১১১	ঔৎকর্ষ	উৎ	৮৪

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
ঔৎকর্ষ্য	উৎ	৮৪	ঔশনস	উৎ	৮৪	ককুদ্মান	কক্	১২৮	কচড়া	কচ্	১৩১	কঞ্চী	কঞ্চ্	১৩৪
ঔত্তরেয়	উৎ	৮৪	ঔশীর	উৎ	৮৪	ককুন্মৎ	কক্	১২৮	কচপক্ষ	কচ্	১৩১	কঞ্চু	কঞ্চ্	১৩৪
ঔৎপাতিক	উৎ	৮৪	ঔষধ	উষ্	১১০	ককুভ্	কক্	১২৮	কচপাশ	কচ্	১৩১	কঞ্চুক	কঞ্চ্	১৩৪
ঔৎসর্গিক	উৎ	৮৪	ঔষধ	ধা	৫৯০	ককুভ	কক্	১২৮	কচভার	কচ্	১৩১	কঞ্চুকী	কঞ্চ্	১৩৫
ঔৎসুক্য	উৎ	৮৪	ঔষধীয়	উষ্	১০৯	কক্কোল	কক্	১২৮	কচহস্ত	কচ্	১৩১	কঞ্চুলিকা	কঞ্চ্	১৩৪
ঔদক	উৎ	৮৪	ঔষ্ট্র	উষ্	১০৯	কক্খট	ক্	২৩৭	কচমচ	কচ্	১৩১	কঞ্চুলী	কঞ্চ্	১৩৪
ঔদনিক	উৎ	৮৪	ঔষ্ট্রক	উষ্	১০৯	কক্খন	ক্	২৩৭	কচরকচর	কচ্	১৩১	কঞ্জ	কম্	১৫৫
ঔদরিক	উৎ	৮৪	ঔষ্ঠ্য	উষ্	১০৯	কক্ষ	কশ্	১৭৫	কচরমচর	কচ্	১৩১	কঞ্জ	জন্	৩৭৮
ঔদরেয়	ঋ	১১৩	ঔষ্ণ্য	উষ্	১০৯	কক্ষণ	ক্	২৩৭	কচরচনা	কচ্	১৩১	কঞ্জুস	কম্	১৫৫
ঔদার্য্য	উৎ	৮৪	ঔষ্ম্য	উষ্	১০৯	কক্ষপট্টি	কশ্	১৭৩	কচলা	কচ্	১৩২	কঞ্জেক্ষণ	কম্	১৫৪
ঔদাসীন্য	উৎ	৮৪				কক্ষান্তর	কশ্	১৭৩	কচলান	কচ্	১৩২	কট্	কট্	১৩৬
ঔদাসীন্য	আস্	৬২	**ক**			কক্ষাপট	কশ্	১৭৩	কচহরি	কচ্	১৩২	কট	কট্	১৩৬
ঔদাস্য	উৎ	৮৪				কক্ষাপাত	কশ্	১৭৩	কচা	কচ্	১৩২	কটক	কট্	১৩৭
ঔদুম্বর	উৎ	৮৪	ক	—	১২৫	কক্ষাবন্ধ	কশ্	১৭৩	কচাকচ	কচ্	১৩১	কটকট	কট্	১৩৬
ঔদ্দালক	উৎ	৮৪	ক (কতি)	ক্	১২৬	কক্ষাবেক্ষক	কশ্	১৭৩	কচাক্চ	কচ্	১৩১	কটকটা	কট্	১৩৬
ঔদ্ধত্য	উৎ	৮৪	ক (করে যে)	ক্	১২৭	কক্ষ্য	কশ্	১৭৩	কচাকচি	কচ্	১৩১	কটকটিয়া	কট্	১৩৬
ঔদ্ভিদ	উৎ	৮৪	ক (কথি)	কথ্	১৪৭	কখন	ক্	২৩৭	কচাৎ	কচ্	১৩১	কটক'টে	কট্	১৩৬
ঔদ্বাহিক	উৎ	৮৪	ক-অক্ষর	ক্	২৩৭	কখান	ক্	২৩৭	কচান	কচ্	১৩১	কটকবালা	কট্	১৩৬
ঔধস	উৎ	৮৪	কই (কোথায়)	ক্	২৩৭	কখানা	ক্	২৩৭	কচাল	কচ্	১৩১	কটকার	কট্	১৩৬
ঔন্নত্য	উৎ	৮৪	কই (মাছ)	ক্	২৩৭	কখানি	ক্	২৩৭	কচি	কশ্	১৭৩	কটকিনা	কট্	১৩৬
ঔপচারিক	উৎ	৮৪	কইল	কৃ	২০০	কঙর	কম্	১৫৪	কচু	কচ্	১৩২	কটকী	কট্	১৩৬
ঔপচারিক	চর্	৩৪০	কইলে	কম্	১৫৪	কঙল	কম্	১৫৪	কচুপোড়া	কচ্	১৩১	কটকেনা	কট্	১৩৬
ঔপদেশিক	উৎ	৮৪	কউতর	ক্	২৩৭	কঙ্ক	কঙ্ক্	১৩০	কচুরি	ঋ	১১৩	কটপূতন	কট্	১৩৬
ঔপদেশিক	দিশ্	৫৩৬	কউতুক	কিৎ	১৮৩	কঙ্কই	কঙ্ক্	১৩০	কচোরী	ঋ	১১৩	কটফল	কট্	১৩৬
ঔপনায়নিক	উৎ	৮৪	ক-এক	ক্	২৩৭	কঙ্কট	কঙ্ক্	১৩০	কচ্চ	কশ্	১৭৩	কটভী	কট্	১৩৬
ঔপনিষদ	উৎ	৮৪	কএত	কট্	১৩৬	কঙ্কটক	কঙ্ক্	১৩০	কচ্চর (ক্যাচড়া)	কু	১৮৫	কটমট	কট্	১৩৭
ঔপন্যাসিক	উৎ	৮৪	কএথ	কট্	১৩৬	কঙ্কণ	কঙ্ক্	১৩০	কচ্ছ	কচ্	১৩২	কটরকটর	কট্	১৩৬
ঔপম্য	উৎ	৮৪	কং	কং	১২৬	কঙ্কত	কঙ্ক্	১৩০	কচ্ছ	ক্	২৩৭	কটরমটর	কট্	১৩৬
ঔপয়িক	উৎ	৮৪	কংস	কং	১২৭	কঙ্কতি	কঙ্ক্	১৩০	কচ্ছ	ছো	৩৭০	কটরা	কট্	১৩৬
ঔপল	উৎ	৮৪	কংসকার	কৃ	২০০	কঙ্কত্রোট	কঙ্ক্	১৩০	কচ্ছপ	ক্	২৩৭	কটলেট	কট্	১৩৬
ঔপসর্গ	উৎ	৮৪	কংসকার	কং	১২৭	কঙ্কত্রোটি	কঙ্ক্	১৩০	কচ্ছপ	কচ্	১৩৩	কটস্থল	কট্	১৩৬
ঔপসর্গিক	উৎ	৮৪	কংসনদী	কং	১২৭	কঙ্কপত্র	কঙ্ক্	১৩০	কচ্ছটি	কশ্	১৭৩	কটা	কট্	১৩৬
ঔপাধিক	উৎ	৮৪	কংসবতী	কং	১২৭	কঙ্কবদন	কঙ্ক্	১৩০	কচ্ছ(চ্ছ্য)টিকা	কশ্	১৭৩	কটাকট	কট্	১৩৬
ঔপায়িক	উৎ	৮৪	কংসাবতী	কং	১২৬	কঙ্কমুখ	কঙ্ক্	১৩০	কচ্ছা	কচ্	১৩১	কটাক্ষ	কট্	১৩৭
ঔর	ঋ	১১৩	কংসারাতি	কং	১২৬	কঙ্কর	কঙ্ক্	১৩০	কচ্ছু	কশ্	১৭৩	কটাগ্নি	কট্	১৩৬
ঔরৎ	উর্	১০৭	কংসারি	কং	১২৬	কঙ্করোল	কঙ্ক্	১৩০	কচ্ছুটিয়া	কশ্	১৭৩	কটাৎ	কট্	১৩৬
ঔরস	উর্	১০৭	কঁহি	ক্	২৩৭	কঙ্কাস	কঙ্ক্	১৩০	কচ্ছুরা	কশ্	১৭৩	কটান্ত	কট্	১৩৬
ঔরস্য	উর্	১০৭	ককান	ক্	২৩৭	কঙ্কালী	কঙ্ক্	১৩১	কচ্ছূ	কশ্	১৭৩	কটার	কট্	১৩৬
ঔর্ণ	উর্	১০৭	ককান	কক্	১২৮	কঙ্গু	কং	১২৮	কজলবাস	কু	১৮৫	কটাল	কট্	১৩৬
ঔর্দ্ধদেহ	উর্	১০৭	ককানি	ক্	২৩৭	কঙ্গুনী	কং	১২৮	কজলবাশ	কু	১৮৫	কটাশ	কট্	১৩৬
ঔর্দ্ধদেহিক	উর্	১০৭	ক-কার	ক্	২৩৭	কঙ্গুরা	কং	১২৬	কজ্জরী	কু	১৮৫	কটাশীয়া	কট্	১৩৬
ঔর্ব্ব	উর্	১০৪	ককিয়	ক্	২৩৭	কচ	কচ্	১৩১	কজ্জল	কু	১৮৫	কটাশে	কট্	১৩৬
ঔর্ব্বর	উর্	১০৭	ককুৎস্থ	কক্	১২৮	কচকচি	কচ্	১৩১	কঞ্ঞান	ক্	২৩৭	কটাহ	কট্	১৩৬
ঔর্ব্বশেয়	উর্	১০৭	ককুদ	কু	১৮৫	কচকা	কচ্	১৩১	কঞ্চট	কঞ্চ্	১৩৪	কটি	কট্	১৩৭
ঔর্ম্মিলেয়	ঋ	১১৩	ককুদ	কক্	১২৮	কচগ্রহ	কচ্	১৩২	কঞ্চি	কঞ্চ্	১৩৪	ক'টি	কট্	১৩৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
কটিকূপ	কট্ ১৩৬	কড়কড়	কট্ ১৩৬	কড়িহার	কট্ ১৩৬	কণ্ঠগত	গম্ ২৬২	কণ্ডূরসা	কণ্ ১৪০
কটিতট	কট্ ১৩৬	কড়কড়ান	কট্ ১৩৬	কড়ী	কট্ ১৩৬	কণ্ঠগ্রহ	কণ্ ১৪০	কণ্ডূল	কণ্ ১৪০
কটিত্র	কট্ ১৩৬	কড়কড়ানি	কট্ ১৩৬	কড়ী	ক্ ২৩৭	কণ্ঠতট	কণ্ ১৪০	কণ্ডোল	কণ্ ১৪০
কটিত্র	ত্র ৪৮৮	কড়কা	কট্ ১৩৬	কড়ুয়া	কট্ ১৩৬	কণ্ঠদঘ্ন	কণ্ ১৪০	কণ্ব	ক্ ২০০
কটিপট্টসূত্রডোরী	কট্ ১৩৬	কড়কান	কট্ ১৩৬	কড়ুই	কট্ ১৩৬	কণ্ঠনাল	কণ্ ১৪০	কণ্যান	কণ্ ১৪০
কটিবন্দ	কট্ ১৩৬	ক'ড়কে	কন্ ১৫০	ক'ড়ে	কট্ ১৩৬	কণ্ঠপাশক	কণ্ ১৪০	কণ্ব	কণ্ ১৪৩
কটিবন্ধ	কট্ ১৩৬	কড়খা	কট্ ১৩৬	ক'ড়ে আঙুল	কন্ ১৫০	কণ্ঠবন্ধ	কণ্ ১৪০	কত	ক্ ২২৩
কটিবসন	কট্ ১৩৬	কড়ঙ্কর	কট্ ১৩৬	কড়েরাড়ী	কন্ ১৫০	কণ্ঠবর্ত্তী	কণ্ ১৪০	কত	ক্ ২৩৭
কটিবাত	কট্ ১৩৬	কড়ঙ্কস্য	কট্ ১৩৬	কঢ়া	কন্ ১৫০	কণ্ঠবিদার	কণ্ ১৪০	কতই	ক্ ২৩৭
কটিবাস	কট্ ১৩৬	কড়চা	কট্ ১৩৬	কঢ়া	কণ্ ১৪০	কণ্ঠভূষণ	কণ্ ১৪০	কতক	ক্ ২৩৭
কটিভূষণ	কট্ ১৩৬	কড়তা	কট্ ১৩৬	কঢ়ী	ক্ ২৩৭	কণ্ঠভূষা	কণ্ ১৪০	কতক্ষণ	ক্ ২৩৭
কটিয়া	কট্ ১৩৬	কড়পা	কন্ ১৫০	কণ্	কণ্ ১৪০	কণ্ঠমণি	কণ্ ১৪০	কতক্ষণ	ক্ষ ২২৩
কটিশূল	কট্ ১৩৬	কড়মড়	কট্ ১৩৬	কণ	কণ্ ১৪০	কণ্ঠমালা	কণ্ ১৪০	কতখান	ক্ ২৩৭
কটিশৃঙ্খলা	কট্ ১৩৬	কড়মা	ক্ ২৩৭	কণআ	কন্ ১৫০	কণ্ঠমূল	কণ্ ১৪০	কতখানি	ক্ ২৩৭
কটিসূত্র	কট্ ১৩৬	কড়ম্ব	কন্ ১৫০	কণকণ	কণ্ ১৪০	কণ্ঠরোধ	কণ্ ১৪০	কতগুলা	ক্ ২৩৭
কটীধরা	কট্ ১৩৬	কড়ম্বী	কন্ ১৫০	কণা	কণ্ ১৪১	কণ্ঠলগ্ন	কণ্ ১৪০	কতগুলি	ক্ ২৩৭
কটু	কট্ ১৩৮	কড়রমড়র	কট্ ১৩৬	কণাটুক	কণ্ ১৪০	কণ্ঠলতা	কণ্ ১৪০	কতটা	ক্ ২৩৭
কটুআ(য়া)	কট্ ১৩৬	কড়সি	কট্ ১৩৬	কণাটুকু	কণ্ ১৪০	কণ্ঠশোষ	কণ্ ১৪০	কতটুক	ক্ ২৩৭
কটুক	কট্ ১৩৬	কড়সী	কট্ ১৩৬	কণাদ	কণ্ ১৪১	কণ্ঠশ্বাস	কণ্ ১৪০	কতটুকু	ক্ ২৩৭
কটুকন্দ	কট্ ১৩৬	কড়া	কট্ ১৩৬	কণামাত্র	কণ্ ১৪০	কণ্ঠসূত্র	কণ্ ১৪০	কতদূর	ক্ ২৩৭
কটুতা	কট্ ১৩৬	কড়া	কন্ ১৫০	কণি	কণ্ ১৪০	কণ্ঠস্থ	কণ্ ১৪০	কতবার	ক্ ২৩৭
কটুতৈল	কট্ ১৩৬	কড়া	ক্ ২৩৭	কণিক	কণ্ ১৪০	কণ্ঠহার	কণ্ ১৪০	কতবে	ক্ ২৩৭
কটুত্রয়	কট্ ১৩৬	কড়াই	কট্ ১৩৬	কণিকার	কণ্ ১৪০	কণ্ঠা	কণ্ ১৪০	কতয়ে	ক্ ২৩৭
কটুপাক	কট্ ১৩৬	কড়াই	কল্ ১৬৪	কণিশ	কণ্ ১৪০	কণ্ঠাগত	কণ্ ১৪০	কতমত	ক্ ২৩৭
কটুপ্রায়	কট্ ১৩৬	কড়াকড়	কট্ ১৩৬	কণীয়ান	কণ্ ১৪০	কণ্ঠাগ্র	কণ্ ১৪০	কতহি	ক্ ২৩৭
কটুফল	কট্ ১৩৬	কড়াকড়ি	কট্ ১৩৬	কণুই	ক্ ২৩৭	কণ্ঠাবলী	কণ্ ১৪০	কতহু	ক্ ২৩৭
কটুবিপাক	কট্ ১৩৬	কড়াকীয়া	কট্ ১৩৬	কণ্ট্	কণ্ ১৪০	কণ্ঠাবসক্ত	কণ্ ১৪০	কতহুঁ	ক্ ২৩৭
কটুল	কট্ ১৩৬	কড়াকের	কট্ ১৩৬	কণ্ট	কণ্ ১৪১	কণ্ঠাভরণ	কণ্ ১৪০	কতহোঁ	ক্ ২৩৭
কটুত্তরে	কট্ ১৩৬	কড়াটিকের	কট্ ১৩৬	কণ্টক	কণ্ ১৪১	কণ্ঠশ্লেষ	কণ্ ১৪০	কতি	ক্ ২৩৮
কটোর	কট্ ১৩৬	কড়াক্কড়	কট্ ১৩৬	কণ্টকদ্রুম	কণ্ ১৪০	কণ্ঠি	কণ্ ১৪০	কতিচিৎ	ক্ ২৩৭
কটোরা	কট্ ১৩৬	কড়াক্কীয়া	কট্ ১৩৬	কণ্টকনগর	কণ্ ১৪২	কণ্ঠিকা	কণ্ ১৪০	কতিপয়	ক্ ২৩৭
ক'টে	কট্ ১৩৬	কড়াক্কে	কট্ ১৩৬	কণ্টকফল	কণ্ ১৪০	কণ্ঠী	কণ্ ১৪০	কতিবিধ	ক্ ২৩৭
কট্ট	কৃৎ ২১৩	কড়াৎ	কট্ ১৩৬	কণ্টকবিশোধন	কণ্ ১৪২	কণ্ঠীধারী	কণ্ ১৪০	কতিহু	ক্ ২৩৭
কট্টমট	কৃৎ ২১৩	কড়া(রা)র	কট্ ১৩৬	কণ্টকশোধন	কণ্ ১৪০	কণ্ঠীবদল	কণ্ ১৪০	কতিহুঁ	ক্ ২৩৭
কট্টার	কৃৎ ২১৩	কড়া(রা)র	ক্ ২৩৭	কণ্টকারিকা	কণ্ ১৪০	কণ্ঠীরব	কণ্ ১৪০	কতুক	কিৎ ১৮৩
কঠ্	কঠ্ ১৩৯	কড়ি	কঠ্ ১৩৯	কণ্টকারী	কণ্ ১৪০	কণ্ঠৌষ্ঠ	কণ্ ১৪০	কতেক	ক্ ২৩৭
কঠ	কঠ্ ১৪০	কড়ি	কট্ ১৩৬	কণ্টকাশন	কণ্ ১৪২	কণ্ঠ্য	কণ্ ১৪০	কতো	ক্ ২৩৭
কঠিন	কঠ্ ১৪০	কড়ি	কন্ ১৫০	কণ্টকিত	কণ্ ১৪০	কণ্ঠ্যৌষ্ঠ্য	কণ্ ১৪০	কতোয়াল	কট্ ১৩৬
কঠিল্ল	কঠ্ ১৩৯	কড়ি	ক্ ২৩৭	কণ্টকিফল	কণ্ ১৪০	কণ্ড	কণ্ ১৪২	কত্তা	ক্ ২০০
কঠিল্লক	কঠ্ ১৩৯	কড়িপাতি	ক্ ২৩৭	কণ্টকী	কণ্ ১৪০	কণ্ডন	কণ্ ১৪২	কত্তাল	ক্ ২০০
কঠোপনিষদ	কঠ্ ১৪০	কড়িবউলি	কট্ ১৩৬	কণ্টকীফল	কণ্ ১৪০	কণ্ডু	কণ্ ১৪২	কথ্	কথ্ ১৪৭
কঠোর	কঠ্ ১৪০	কড়ি(ড়ী)ফটকা	কট্ ১৩৬	কণ্টকোদ্ধরণ	কণ্ ১৪০	কণ্ডূ	কণ্ ১৪০	কথন	কথ্ ১৪৭
কড়	কুল্ ১৯৭	কড়িবৌলি	কট্ ১৩৬	কণ্ঠ	কণ্ ১৪২	কণ্ডূতি	কণ্ ১৪০	কথ্	কথ্ ১৪৭
কড়্	কট্ ১৩৬	কড়িয়াল	কট্ ১৩৬	কণ্ঠগ	কণ্ ১৪০	কণ্ডূয়ন	কণ্ ১৪২	কথ	কথ্ ১৪৭
কড়ক	কট্ ১৩৬	কড়িয়ালি	কট্ ১৩৬	কণ্ঠগত	কণ্ ১৪০	কণ্ডূয়নক	কণ্ ১৪০	কথ	ক্ ২২৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
কথক	কথ্ ১৪৭	কদরদান	দৃ ৫৬০	কনকাচল	কন্ ১৫০	কন্দুল	কন্ ১৫০	কপালিকা	ক্ ২৩৭
কথঞ্চন	কথ্ ১৪৭	কদর্থ	কথ্ ১৪৭	কনকাঞ্জলি	কন্ ১৫০	কন্দোট	কন্ ১৫০	কপালী	ক্ ২৩৭
কথঞ্চিৎ	কথ্ ১৪৭	কদর্থন	কথ্ ১৪৭	কনকানটিয়া	কন্ ১৫০	কন্ধর	কম্ ১৫৪	কপালে	ক্ ২৩৭
কথঞ্চিত	কথ্ ১৪৭	কদর্থীকৃত	কথ্ ১৪৭	কনকনটে	কন্ ১৫০	কন্ন	কর্ণ্ ১৬০	কপি	কন্ ১৫২
কথন	কথ্ ১৪৭	কদর্য্য	কু ১৮৫	কনকারাঙা	কন্ ১৫০	কন্না	কন্ ১৫০	কপিকল	কন্ ১৫০
কথম্প্রভাব	কথ্ ১৪৭	কদল	কথ্ ১৪৭	কনখল	ক্ ২৩৭	কন্য	কর্ণ্ ১৬০	কপিঞ্জল	কন্ ১৫২
কথা	কথ্ ১৪৭	কদল	ক্ ২৩৭	কনখল	কন্ ১৫১	কন্যকা	কন্ ১৫১	কপিত্থ	কন্ ১৫২
কথাক্রম	কথ্ ১৪৭	কদলক	ক্ ২৩৭	কনয়	কন্ ১৫০	কন্যা	কন্ ১৫১	কপিন	কন্ ১৫০
কথাচ্ছল	কথ্ ১৪৭	কদলক	কথ্ ১৪৭	কনয়া	কন্ ১৫০	কন্যাকর্ত্তা	কন্ ১৫০	কপিলা	কন্ ১৫০
কথানক	কথ্ ১৪৭	কদলি	কথ্ ১৪৭	কনি	কন্ ১৫০	কন্যাকাল	কন্ ১৫০	কপিলাবস্তু	কন্ ১৫৩
কথানুকথন	কথ্ ১৪৭	কদা	কথ্ ১৪৭	কনিষ্ঠ	কন্ ১৫০	কন্যাকুব্জ	কন্ ১৫১	কপীন	কন্ ১৫০
কথান্তর	কথ্ ১৪৭	কদা	ক্ ২৩৭	কনীনিকা	কন্ ১৫০	কন্যাকুমারী	কন্ ১৫০	কপ্নি	কন্ ১৫০
কথাপুরুষ	কথ্ ১৪৭	কদাকার	কথ্ ১৪৭	কনীয়ান	কন্ ১৫০	কন্যাগর্ভ	কন্ ১৫০	কপ্নী	কন্ ১৫০
কথাপ্রবন্ধ	কথ্ ১৪৭	কদাচ	ক্ ২৩৭	কনুই	ক্ ২৩৭	কন্যাতী	কন্ ১৫০	কপিনাশ	কন্ ১৫০
কথাবার্ত্তা	কথ্ ১৪৭	কদাচন	ক্ ২৩৭	কনে	কন্ ১৫০	কন্যাদায়	দয়্ ৫১৮	কপীনাস	কন্ ১৫০
কথামাত্র	কথ্ ১৪৭	কদাচিৎ	ক্ ২৩৭	কনেচন্দন	কন্ ১৫০	কন্যাদূষী	কন্ ১৫০	কপিবক্ত্র	কন্ ১৫০
কথামুখ	কথ্ ১৪৭	কদাপি	ক্ ২৩৭	কনেচয়ন	কন্ ১৫০	কন্যাযাত্র	কন্ ১৫০	কপিল	কন্ ১৫২
কথারম্ভ	কথ্ ১৪৭	কদি	ক্ ২৩৭	কনেঠ	কন্ ১৫০	কন্যাযাত্রী	কন্ ১৫০	কপিলভোগ	কন্ ১৫০
কথালাপ	কথ্ ১৪৭	কদিম	ক্ ২৩৭	কনেবউ	কন্ ১৫০	কন্যারত্ন	কন্ ১৫০	কপিলাভোগ	কন্ ১৫০
কথাশেষ	কথ্ ১৪৭	কদু	কথ্ ১৪৭	কনেবৌ	কন্ ১৫০	কন্যারাশি	কন্ ১৫০	কপিলারাই	কন্ ১৫০
কথাসরিৎসাগর	কথ্ ১৪৭	কদুক্তি	কথ্ ১৪৭	কনেযাত্র	কন্ ১৫০	কন্যাশুল্ক	কন্ ১৫০	কপিশ	কন্ ১৫০
কথি	ক্ ২৩৭	কদুত্তর	কথ্ ১৪৭	কনেযাত্রী	কন্ ১৫০	কন্যাসন্তান	কন্ ১৫০	কপিশা	কন্ ১৫০
কথিত	কথ্ ১৪৭	কদুষ্ণ	কথ্ ১৪৭	কনস্টেবল	কন্ ১৫০	কন্যাহরণ	কন্ ১৫০	কপীন্দ্র	কন্ ১৫০
কথিতপদতা	কথ্ ১৪৭	কদ্দিন	ক্ ২৩৭	কনে	কন্ ১৫০	কন্প্	কন্ ১৫০	কপোত	ক্ ২৩৮
কথীকৃত	কথ্ ১৪৭	কদ্রু	কথ্ ১৪৯	কনেরাঁড়ী	কন্ ১৫০	কন্ব	কর্ণ্ ১৬০	কপোতপালি	ক্ ২৩৭
কথোপকথন	কথ্ ১৪৭	কদ্রূ	কথ্ ১৪৭	কন্ত	কম্ ১৫৪	কপ্	কন্ ১৫০	কপোতবৃত্তি	ক্ ২৩৮
কথোপকথা	কথ্ ১৪৭	কন	কন্ ১৫০	কন্থ	কম্ ১৫৪	কপচা	কন্ ১৫০	কপোতহস্ত	ক্ ২৩৭
কথ্য	কথ্ ১৪৭	কনক	কন্ ১৫০	কন্থা	কম্ ১৫৪	কপট	কন্ ১৫২	কপোতহস্তক	ক্ ২৩৭
কদ্	কথ্ ১৪৭	কনকন	কন্ ১৫০	কন্দ্	কন্ ১৫০	কপটলেখ্য	কন্ ১৫০	কপোতারি	ক্ ২৩৭
কদক্ষর	কথ্ ১৪৭	কনকনানি	কন্ ১৫০	কন্দ	কন্ ১৫১	কপটিয়া	কন্ ১৫০	কপোতিনী	ক্ ২৩৭
কদগ্নি	কথ্ ১৪৭	কনকনি	কন্ ১৫০	কন্দ	ক্রন্দ্ ২১৯	কপটিনী	কন্ ১৫০	কপোল	কন্ ১৫০
কদস্তন	কথ্ ১৪৭	কনক'নে	কন্ ১৫০	কন্দন	ক্রীড়্ ২২১	কপটী	কন্ ১৫০	কপোলকল্পিত	কন্ ১৫০
কদন	কথ্ ১৪৭	কনকপিঙ্গল	কন্ ১৫০	কন্দমূল	কন্ ১৫০	কপর্দ্দ	ক্ ২৩৭	কপ্পূর	কৃপ্ ২১৪
কদন্ন	কথ্ ১৪৭	কনকপেচুয়া	কন্ ১৫০	কন্দর	কম্ ১৫৫	কপর্দ্দক	ক্ ২৩৮	কফ	ক্ ২৩৭
কদম	কথ্ ১৪৮	কনকপ্রসবা	কন্ ১৫০	কন্দর্প	কম্ ১৫৫	কপর্দ্দিনী	ক্ ২৩৭	কফণি	ক্ ২৩৭
কদম	ক্ ২৩৭	কনকময়	কন্ ১৫০	কন্দল	কন্ ১৫১	কপর্দ্দী	ক্ ২৩৮	কফল	ক্ ২৩৭
কদম	দং ৫১০	কনকমহেশ	কন্ ১৫০	কন্দলি	কন্ ১৫০	কপাট	ক্ ২৩৮	কফান্তক	ক্ ২৩৭
কদমা	কথ্ ১৪৭	কনকরস	কন্ ১৫০	কন্দলিত	কন্ ১৫০	কপাটি	ক্ ২৩৭	কফারি	ক্ ২৩৭
কদমী	দং ৫১০	কনকরেখা	কন্ ১৫০	কন্দলিয়া	কন্ ১৫০	কপাল	ক্ ২৩৮	কফোণি	ক্ ২৩৭
কদম্ব	কথ্ ১৪৮	কনকলেখা	কন্ ১৫০	কন্দলীয়া	কন্ ১৫০	কপালতটী	ক্ ২৩৭	কব	কথ্ ১৪৭
কদম্বা	কথ্ ১৪৭	কনকলতা	কন্ ১৫০	কন্দাশন	কন্ ১৫০	কপালফলক	ক্ ২৩৭	কব	কু ১৮৫
কদম্বানিল	কথ্ ১৪৭	কনকসাঁপুড়া	কন্ ১৫০	কন্দু	কন্ ১৫০	কপালভৃৎ	ক্ ২৩৭	কবক	কথ্ ১৪৭
কদর	ক্ ২৩৭	কনকসূত্র	কন্ ১৫০	কন্দুআ	কন্ ১৫০	কপালমালী	ক্ ২৩৭	কবচ	কু ১৮৫
কদর	কথ্ ১৪৯	কনকস্থলী	কন্ ১৫০	কন্দুক	কম্ ১৫৪	কপালমোচন	ক্ ২৩৮	কবচী	কু ১৮৫
কদর	দৃ ৫৬০	কনকাঙ্গদ	কন্ ১৫০	কন্দুপক	কন্ ১৫০	কপালি	ক্ ২৩৭	কবজ	কু ১৮৫

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
কবজী	কৃ ২৩৭	কবীরপন্থী	কৃ ২৩৭	কমলাসন	কম্ ১৫৪	করকোষ	কৃ ২০০	করন্দা	কৃ ২০০
কবন্ধ	কৃ ২৩৮	কবীশ্বর	কূ ১৮৫	কমলিনী	কম্ ১৫৪	করকোষ্ঠী	কৃ ২০০	করন্যাস	কৃ ২০০
কবন্ধন	কৃ ২৩৭	কবুল	কথ্ ১৪৭	কমলে	কম্ ১৫৪	করগ	কৃ ২০০	করপত্র	কৃ ২০০
কবয়ি(য়ী)	কৃ ২৩৭	কবুল	কৃ ২৩৭	কম্প্	কম্প্ ১৬০	করগ্রহ	কৃ ২০০	করপল্লব	কৃ ২০০
কবর	কূ ১৮৬	কবুলিয়ত	কথ্ ১৪৭	কম্প	কম্প্ ১৬০	করগ্রহণ	কৃ ২০০	করপাল	কৃ ২০০
কবরী	কূ ১৮৬	কবুতর	কথ্ ১৪৭	কম্পমান	কম্প্ ১৬০	করঘাত	কৃ ২০০	করপীড়ন	কৃ ২০০
কবরেজ	কূ ১৮৫	কবে	কৃ ২৩৭	কম্পায়মান	কম্প্ ১৬০	করঙ্ক	কৃ ২০০	করপুট	কৃ ২০০
কবর্গ	কৃ ২৩৭	কবো	কৃ ২৩৭	কম্পিত	কম্প্ ১৬০	করঙ্গ	কৃ ২০০	করপুটাঞ্জলি	কৃ ২০০
কবর্দ্দক	কৃ ২৩৭	কবোষ্ণ	কূ ১৮৫	কম্পিল	কম্প্ ১৬০	করচা	কৃ ২০০	করপৃষ্ঠ	কৃ ২০০
কবল	কৃ ২৩৯	কব্য	কূ ১৮৬	কম্পিল্য	কম্প্ ১৬০	করজ	কৃ ২০০	করপ্রণী	কৃ ২০০
কবলা	কৃ ২৩৭	কব্যবাহ	কূ ১৮৬	কম্পিল্ল	কম্প্ ১৬০	করজোড়	কৃ ২০০	করপ্রদ	কৃ ২০০
কবলিত	কৃ ২৩৭	কব্যবাহন	কূ ১৮৫	কম্পীল	কম্প্ ১৬০	করঞ্চ	কৃ ২০০	করপ্রাপ্ত	কৃ ২০০
কবহি	কথ্ ১৪৭	কভু	কৃ ২৩৭	কম্পী	কম্প্ ১৬০	করঞ্জ	কৃ ২০০	করবদর	কৃ ২০০
কবহ	কথ্ ১৪৭	কম্	কম্ ১৫৪	কম্প্য	কম্প্ ১৬০	করঞ্জক	কৃ ২০০	করবাত	কৃ ২০০
কবহুঁ	কথ্ ১৪৭	কম	কম্ ১৫৪	কম্প্র	কম্প্ ১৬০	করঞ্জা	কৃ ২০০	করবাল	কৃ ২০০
কবাট	কৃ ২৩৭	কমঠ	কম্ ১৫৪	কম্বল	কম্ ১৫৪	করট	কৃ ২০০	করবালিনী	কৃ ২০০
কবাটি	কৃ ২৩৭	কমতি	কম্ ১৫৪	কম্বলী	কম্ ১৫৪	করড়া	কৃ ২০০	করবী	কৃ ২০০
কবাবহ	কৃ ২৩৭	কমন	কম্ ১৫৪	কম্বু	কম্ ১৫৪	করড়ী	কৃ ২০০	করবীর	কৃ ২০০
কবামাত্র	কথ্ ১৪৭	কমন	কৃ ২৩৭	কম্বুকঙ্কণ	কম্ ১৫৪	করড়ীয়া	কৃ ২০০	করভ	কৃ ২০০
কবালী	কথ্ ১৪৭	কমণ্ডল	কৃ ২৩৭	কম্বুকণ্ঠ	কম্ ১৫৪	করণ	কৃ ২০২	করভূ	কৃ ২০০
কবি	কূ ১৮৬	কমণ্ডলু	কৃ ২৩৭	কম্বুগ্রীব	কম্ ১৫৪	করণ-কারণ	কৃ ২০০	করভোরূ	কৃ ২০০
কবিকঙ্কণ	কূ ১৮৬	কমণ্ডলু	কম্ ১৫৬	কম্বুবলয়	কম্ ১৫৪	করণাধিপ	কৃ ২০০	করম	কৃ ২০০
কবিকণ্ঠহার	কূ ১৮৫	কমনীয়	কম্ ১৫৪	কম্বুরাজ	কম্ ১৫৪	করণাপাটব	কৃ ২০০	করমচা	কৃ ২০০
কবিকল্পিত	কূ ১৮৫	কমনে	কৃ ২৩৭	কম্বোজ	কম্ ১৫৪	করণী	কৃ ২০২	করমজা	কৃ ২০০
কবিকা	কূ ১৮৬	কমন্তর	কম্ ১৫৪	কম্ম	কৃ ২০০	করণীক	কৃ ২০০	করমর্দ্দ	কৃ ২০০
কবিগুরু	কূ ১৮৫	কমপোক্ত	কম্ ১৫৪	কম্র	কম্ ১৫৪	করণীয়	কৃ ২০০	করমর্দ্দক	কৃ ২০০
কবিজ্যেষ্ঠ	কূ ১৮৫	কমবক্তা	কম্ ১৫৪	কয়	কথ্ ১৪৭	করণ্ড	কৃ ২০০	করমালা	কৃ ২০০
কবিতা	কূ ১৮৫	কমর	কম্ ১৫৪	কয়	কৃ ২৩৭	করণ্ডক	কৃ ২০০	করম্ব	কৃ ২০০
কবিতাই	কূ ১৮৫	কমরপটী	কম্ ১৫৪	কয়ড়া	কশ্ ১৭৩	করত	কৃ ২০০	করম্ভ	কৃ ২৩৯
কবিত্ব	কূ ১৮৫	কমরবন্ধ	কম্ ১৫৪	কয়া	কথ্ ১৪৭	করতব	কৃ ২০০	করযুক্ত	কৃ ২৩৭
কবিশ্ব	কন্ ১৫০	কমল	কম্ ১৫৬	কয়াধু	কথ্ ১৪৭	করতল	কৃ ২০০	কররুহ	কৃ ২০০
কবিনাস	কন্ ১৫০	কমলকান্ত	কম্ ১৫৪	কয়াধূ	কথ্ ১৪৭	করতলামলক	কৃ ২০০	করলা	কৃ ২০০
কবিন্দ্র	কূ ১৮৫	কমলকুমারী	কম্ ১৫৪	কয়াল	কথ্ ১৪৭	করতা	কৃ ২০০	করশাখা	কৃ ২০০
কবিপনা	কূ ১৮৫	কমলখণ্ড	কম্ ১৫৪	কয়েক	কৃ ২৩৭	করতার	কৃ ২০০	করশীকর	কৃ ২০০
কবিবর	কূ ১৮৫	কমলগর্ভ	কম্ ১৫৪	কর	কৃ ২০২	করতাল	কৃ ২০০	করশুদ্ধি	কৃ ২০০
কবিরত্ন	কূ ১৮৫	কমলঙ্গ	কম্ ১৫৪	করক	কৃ ২০০	করতালিকা	কৃ ২০০	করষি	কৃ, ২১১
কবিরাজ	কূ ১৮৫	কমলরমণ	কম্ ১৫৪	করকচ	কৃ ২০০	করতালী	কৃ ২০০	করসাদ	কৃ ২০০
কবিরাট্	কূ ১৮৫	কমলা	কম্ ১৫৬	করকচি	কৃ ২০০	করতোয়া	কৃ ২০০	করসান	কৃ ২০০
কবিরায়	কূ ১৮৫	কমলাকর	কম্ ১৫৪	করকঞ্জ	কৃ ২০০	করত্রাণ	কৃ ২০০	করসূত্র	কৃ ২০০
কবিসময়খ্যাত	কূ ১৮৫	কমলাক্ষ	কম্ ১৫৪	করকটে	কৃ ২০০	করদ	কৃ ২০২	করস্ফোট	কৃ ২০০
কবিপ্রসিদ্ধি	কূ ১৮৫	কমলাগুড়ি	কম্ ১৫৪	করকমল	কৃ ২০০	করদন্ত	কৃ ২০০	করস্বন	কৃ ২০০
কবীন্দু	কূ ১৮৫	কমলাপতি	কম্ ১৫৪	করকর	কৃ ২০০	করদায়	কৃ ২০০	করহীন	কৃ ২০০
কবীন্দ্র	কূ ১৮৫	কমলাবিলাস	কম্ ১৫৪	করকলিত	কৃ ২০০	করদীকৃত	কৃ ২০০	করা	কৃ ২০০
কবীলা	কৃ ২৩৭	কমলারি	কম্ ১৫৪	করকিসলয়	কৃ ২০০	করধা	কৃ ২০০	করাকরি	কৃ ২০০
কবীর	কৃ ২৩৭	কমলালয়	কম্ ১৫৪	করকুষ্ঠি	কৃ ২০০	করধৃত	কৃ ২০০	করাগ্র	কৃ ২০০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
করাত	কৃ ২০০	কর্ণ	কর্ণ্ ১৬০	কর্ণাট	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মকারী	কৃ ২০০	কর্ম্মসংন্যাস	কৃ ২০০
করার	কৃ ২০০	কর্ণকণ্ডু	কর্ণ্ ১৬০	কর্ণান্তিক	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মকৃৎ	কৃ ২০০	কর্ম্মসঙ্গ	কৃ ২০০
করাল ·	কৃ ২০৩	কর্ণকষায়	কর্ণ্ ১৬০	কর্ণাবতংস	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মক্ষম	কৃ ২০০	কর্ম্মসচিব	কৃ ২০০
করাস্ফোট	কৃ ২০০	কর্ণকীটা	কর্ণ্ ১৬০	কর্ণাভরণ	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মক্ষেত্র	কৃ ২০০	কর্ম্মসন্ন্যাস	কৃ ২০০
করি-অরি	কৃ ২০০	কর্ণকীটী	কর্ণ্ ১৬০	কর্ণামৃত	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মগতি	কৃ ২০০	কর্ম্মসম্ভব	কৃ ২০০
করিকর	কৃ ২০০	কর্ণগূথ	কর্ণ্ ১৬০	কর্ণাল	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মচণ্ডাল	কৃ ২০০	কর্ম্মসাক্ষী	কৃ ২০০
করিকা	কৃ ২০০	কর্ণগোচর	কর্ণ্ ১৬০	কর্ণাস্ফাল	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মচাণ্ডাল	কৃ ২০০	কর্ম্মসাধন	কৃ ২০০
করিতকর্ম্মা	কৃ ২০০	কর্ণগ্রাহ	কর্ণ্ ১৬০	কর্ণিক	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মচারী	কৃ ২০৫	কর্ম্মসূত্র	কৃ ২০০
করি(রী)ম	কৃ ২০০	কর্ণ(র্ণে)জপ	কর্ণ্ ১৬০	কর্ণিকার	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মচেষ্টা	কৃ ২০০	কর্ম্মস্থান	কৃ ২০০
করিয়া	কৃ ২০০	কর্ণজাপ	কর্ণ্ ১৬০	কর্ণী	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মজ	কৃ ২০৫	কর্ম্মাঙ্গ	কৃ ২০০
করি(রী)র	কৃ ২০০	কর্ণজ্বর	কর্ণ্ ১৬০	কর্ণীরথ	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মজন্য	কৃ ২০০	কর্ম্মাজীব	কৃ ২০০
করি(রী)র	কৃ$_{২}$ ২১১	কর্ণতাড়	কর্ণ্ ১৬০	কর্ণোপকর্ণিকা	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মজ্ঞ	কৃ ২০০	কর্ম্মাধ্যক্ষ	কৃ ২০০
করী	কৃ ২০৩	কর্ণতাল	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্ত	কৃৎ ২১৩	কর্ম্মঠ	কৃ ২০০	কর্ম্মানুবন্ধ	কৃ ২০০
করীন্দ্র	কৃ ২০০	কর্ণদর্পণ	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্তন	কৃৎ ২১৩	কর্ম্মণ্য	কৃ ২০০	কর্ম্মানুরূপ	কৃ ২০০
করীশ্বর	কৃ ২০০	কর্ণদুন্দুভি	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্তরিকা	কৃৎ ২১৩	কর্ম্মদুষ্ট	কৃ ২০০	কর্ম্মান্ত	কৃ ২০০
করীষ	কৃ$_{২}$ ২১১	কর্ণধার	কর্ণ্ ১৬১	কর্ত্তব্য	কৃ ২০০	কর্ম্মদোষ	কৃ ২০০	কর্ম্মান্তর	কৃ ২০০
করুণ	কৃ$_{২}$ ২১১	কর্ণধার	কৃ ২০০	কর্ত্তা	কৃ ২০৩	কর্ম্মধারয়	কৃ ২০০	কর্ম্মান্তিক	কৃ ২০০
করুণবেদী	কৃ$_{২}$ ২১১	কর্ণনাদ	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্তাভজন	কৃ ২০০	কর্ম্মধ্বংস	কৃ ২০০	কর্ম্মার	কৃ ২০০
করুণা	কৃ$_{২}$ ২১১	কর্ণপত্রক	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্তাভজা	কৃ ২০০	কর্ম্মনাশা	কৃ ২০০	কর্ম্মার্হ	কৃ ২০০
করুণাত্মা	কৃ$_{২}$ ২১১	কর্ণপত্রভঙ্গ	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্তিত	কৃৎ ২১৩	কর্ম্মনিষ্ঠ	কৃ ২০০	কর্ম্মিষ্ঠ	কৃ ২০০
করুণানিধান	নি ৬৪৬	কর্ণপথ	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্তুকা	কৃৎ ২১৩	কর্ম্মন্যাস	কৃ ২০০	কর্ম্মী	কৃ ২০০
করূষ	কৃ ২০৩	কর্ণপরম্পরা	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্তুম	কৃ ২০০	কর্ম্মপথ	কৃ ২০০	কর্ম্মেন্দ্রিয়	কৃ ২০০
করেণু·	কৃ ২০০	কর্ণপর্ব্ব	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্তৃক	কৃ ২০০	কর্ম্মপাক	কৃ ২০০	কর্শন	কৃশ্ ২১৫
করোট	কৃ ২৩৭	কর্ণপাক	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্তৃকা	কৃ ২০০	কর্ম্মপাশ	কৃ ২০০	কর্ষ	কৃশ্ ২১৫
করোয়া	কৃ ২০০	কর্ণপালি	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্তৃক	কৃ ২০০	কর্ম্মফল	কৃ ২০০	কর্ষক	কৃশ্ ২১৫
করোয়াত	কৃ ২০০	কর্ণপালী	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্তৃকা	কৃ ২০০	কর্ম্মফের	কৃ ২০৫	কর্ষণ	কৃশ্ ২১৫
কর্ক	কৃ ২০০	কর্ণপাশ	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্তৃত্ব	কৃ ২০০	কর্ম্মবন্ধ	কৃ ২০০	কর্ষাপণ	কৃশ্ ২১৫
কর্কট	কৃ ২০৩	কর্ণপুট	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্তৃবাচ্য	কৃ ২০০	কর্ম্মবশ	কৃ ২০০	কর্ষিত	কৃশ্ ২১৫
কর্কটক্রান্তি	কৃ ২০০	কর্ণপুর	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্ত্য	কৃৎ ২১৩	কর্ম্মবিধি	কৃ ২০০	কর্ষী	কৃশ্ ২১৫
কর্কটশৃঙ্গিকা	কৃ ২০০	কর্ণপেয়	কর্ণ্ ১৬০	কর্ত্ত্রিকা	কৃৎ ২১৩	কর্ম্মবিপর্য্যয়	কৃ ২০০	কল্	কল্ ১৬৫
কর্কটশৃঙ্গী	কৃ ২০০	কর্ণফুল	কর্ণ্ ১৬০	কর্দ্দম	কৃ ২০৪	কর্ম্মবিপাক	কৃ ২০৫	কল	কল্ ১৬৫
কর্কটি	কৃ ২০০	কর্ণবালা	কর্ণ্ ১৬০	কর্দ্দমিত	কৃ ২০০	কর্ম্মবিশেষ	কৃ ২০০	কল(কল্য)	কৃশ্ ২১৫
কর্কটিকা	কৃ ২০০	কর্ণবিট	কর্ণ্ ১৬০	কর্পট	কৃ ২০০	কর্ম্মব্যতিহার	কৃ ২০০	কল	কৃ ২৩৭
কর্কটিমাটি	কৃ ২০০	কর্ণবিষ	কর্ণ্ ১৬০	কর্পটি	কৃ ২০০	কর্ম্মভূ	কৃ ২০০	কলকণ্ঠ	কল্ ১৬৪
কর্কন্ধু	কৃ ২০০	কর্ণবেধ	কর্ণ্ ১৬০	কর্পটিক	কৃ ২০০	কর্ম্মভূমি	কৃ ২০০	কলকল	কল্ ১৬৪
কর্কর	কৃ ২০০	কর্ণবেধনিকা	কর্ণ্ ১৬০	কর্পটী	কৃ ২০০	কর্ম্মমার্গ	কৃ ২০০	কলকলি	কল্ ১৬৪
কর্‌কর্	কৃ ২০০	কর্ণবেধনী	কর্ণ্ ১৬০	কর্পাস	কৃ ২০০	কর্ম্মমাস	কৃ ২০০	কলকে	কল্ ১৬৪
কর্কশ	কৃ ২০০	কর্ণবেষ্ট	কর্ণ্ ১৬০	কর্ব্বুর	কৃ ২০০	কর্ম্মমীমাংসা	কৃ ২০০	কলক্কল ·	কল্ ১৬৪
কর্কোট	কৃ ২০০	কর্ণবেষ্টক	কর্ণ্ ১৬০	কর্পর	কৃপ্ ২১৪	কর্ম্মযোগ	কৃ ২০০	কলঘোষ	কল্ ১৬৪
কর্কোটক	কৃ ২০৩	কর্ণমদ্গুর	কর্ণ্ ১৬০	কর্পূর	কৃপ্ ২১৪	কর্ম্মরঙ্গ	কৃ ২০০	কলঙ	কল্ ১৬৪
কর্চ্চরিকা	কৃ ২০০	কর্ণমল	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্ম	কৃ ২০৪	কর্ম্মশাল	কৃ ২০০	কলঙ্ক	কল্ ১৬৫
কর্চ্চরিকা	ঋ ১১৩	কর্ণমূল	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মকর	কৃ ২০৫	কর্ম্মশালা	কৃ ২০০	কলঙ্ক	কৃ ২৩৭
কর্জ্জ	কৃ ২০০	কর্ণরসায়ন	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মকর্ত্তা	কৃ ২০০	কর্ম্মশীল	কৃ ২০০	কলঙ্ককর	কল্ ১৬৪
কর্জ্জল	কৃ ২০০	কর্ণশূল	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মকাণ্ড	কৃ ২০০	কর্ম্মশূর	কৃ ২০০	কলঙ্কিত	কল্ ১৬৪
কর্ণ	কৃ ২০০	কর্ণাকর্ণি	কর্ণ্ ১৬০	কর্ম্মকার	কৃ ২০৫	কর্ম্মশৌচ	কৃ ২০০	কলঙ্কিনী	কল্ ১৬৪

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
কলঙ্কী	কল্ ১৬৪	কলাধর	কল্ ১৬৪	কল্পসূত্র	কঌপ্ ২১৮	কষায়ণ	কশ্ ১৭৩	কহি	কথ্ ১৪৭
কলত্র	কল্ ১৬৫	কলানাথ	কল্ ১৬৪	কল্পাদি	কঌপ্ ২১৭	কষায়িত	কশ্ ১৭৩	কহিনী	কথ্ ১৪৭
কলধৌত	কল্ ১৬৪	কলানিধি	কল্ ১৬৪	কল্পান্ত	কঌপ্ ২১৮	কষায়ী	কশ্ ১৭৩	কহিয়ে	কথ্ ১৪৭
কলধ্বনি	কল্ ১৬৪	কলান্তর	কল্ ১৬৪	কল্পি	কঌপ্ ২১৭	কষি	কশ্ ১৭৩	কহিল	কথ্ ১৪৭
কলন	কল্ ১৬৫	কলাপ	কল্ ১৬৮	কল্পিত	কঌপ্ ২১৭	কষিত	কশ্ ১৭৩	কহু	কথ্ ১৪৭
কলন্তর	কল্ ১৬৪	কলাপাত	কল্ ১৬৪	কল্মষ	কল্ ১৬৪	কষিল	কশ্ ১৭৩	কহোড়	ক্ ২৩৯
কলন্দর	কল্ ১৬৪	কলাপাতা	কল্ ১৬৪	কল্মষ	ক্ ২০০	কষ্ট	কশ্ ১৭৬	কহ্লার	ক্ ২৩৭
কলপ	কল্ ১৬৪	কলাপী	কল্ ১৬৪	কল্মাষ	কল্ ১৬৪	কষ্টশ্রোত্রিয়	কশ্ ১৭৩	কা	ক্ ২৩৭
কলবল	কল্ ১৬৪	কলাপূর্ণ	কল্ ১৬৪	কল্মাষপাদ	কল্ ১৬৪	কষ্টি	কশ্ ১৭৩	কাআ	ক্ ২৩৭
কলবিঙ্ক	কল্ ১৬৬	কলাবউ	কল্ ১৬৪	কল্য	কল্ ১৭১	কষ্টিপাথর	কশ্ ১৭৬	কাই	ক্ ২২৩
কলভ	কল্ ১৬৪	কলাবড়া	কল্ ১৬৪	কল্যবর্ত্ত	কল্ ১৬৪	কষ্টেসৃষ্টে	কশ্ ১৭৩	কাইট	ক্ ২২৩
কলভাষণ	কল্ ১৬৪	কলাবত	কল্ ১৬৪	কল্যাণ	কল্ ১৬৪	কস	কশ্ ১৭৬	কাইত	কিৎ ১৮৩
কলম	কল্ ১৬৬	কলাবান	কল্ ১৬৪	কল্যাণকর	কল্ ১৬৪	কসকস	কশ্ ১৭৩	কাইল	কল্ ১৬৪
কলমকসুর	কল্ ১৬৪	কলাবিলাস	কল্ ১৬৪	কল্যাণকার	কল্ ১৬৪	কসটি	কশ্ ১৭৩	কাইল	ক্ ২৩৭
কলমদান	কল্ ১৬৪	কলাভৃৎ	কল্ ১৬৪	কল্যাণকারক	কল্ ১৬৪	কসতা	কশ্ ১৭৩	কাউ	কক্ ১২৮
কলমপেশা	কল্ ১৬৪	কলায়	কল্ ১৬৪	কল্যাণকারী	কল্ ১৬৪	কসন	কশ্ ১৭৩	কাউআ	কক্ ১২৮
কলমা	কল্ ১৬৪	কলায়ত	কল্ ১৬৪	কল্যাণী	কল্ ১৬৪	কসনি	কশ্ ১৭৩	কাউয়া	কক্ ১২৮
কলিম	কল্ ১৬৪	কলালাপ	কল্ ১৬৪	কল্যাণীয়	কল্ ১৬৪	কসবহ	কশ্ ১৭৩	কাউকে	ক্ ২৩৭
কলিমা	কল্ ১৬৪	কলাহক	কল্ ১৬৪	কল্যাণীয়া	কল্ ১৬৪	কসবা	কশ্ ১৭৩	কাওরা	ক্ ২৩৭
কলমী	কল্ ১৬৪	কলি	কল্ ১৬৮	কল্লোল	কল্ ১৬৪	কসবি	কশ্ ১৭৩	কাওরা	কু ১৮৫
কলম্ব	কল্ ১৬৬	কলিকা	কল্ ১৬৪	কল্লোলিত	কল্ ১৬৪	কসবী	কশ্ ১৭৩	কাংস্য	কং ১২৮
কলম্বা	কল্ ১৬৪	কলিকাতা	কল্ ১৬৮	কল্লোলিনী	কল্ ১৬৪	কসরৎ	কশ্ ১৭৩	কাঁউর	কম্ ১৫৪
কলম্বিকা	কল্ ১৬৪	কলিঙ্গ	কল্ ১৬৯	কশকশ	কশ্ ১৭৩	কসরত	কশ্ ১৭৩	কাঁও(ঙ)ল	কম্ ১৫৪
কলম্বোগ	কল্ ১৬৪	কলিজা	কল্ ১৬৪	কশা	কশ্ ১৭৬	কসা	কশ্ ১৭৩	কাঁক	কঙ্ক ১৩০
কলরব	কল্ ১৬৪	কলিত	কল্ ১৬৪	কশাকশি	কশ্ ১৭৩	কসাই	কশ্ ১৭৩	কাঁকই	কঙ্ক ১৩০
কলরোল	কল্ ১৬৪	কলিদ্রুম	কল্ ১৬৪	কশাড়বন	কশ্ ১৭৩	কসাকস	কশ্ ১৭৩	কাঁকড়া	ক্ ২০০
কলল	কল্ ১৬৪	কলিন্দ	কল্ ১৬৪	কশি	কশ্ ১৭৩	কসাকসি	কশ্ ১৭৩	কাঁকড়ি	ক্ ২০০
কলশ	কল্ ১৬৬	কলিপ্রিয়	কল্ ১৬৪	কশে(সে)রু	কশ্ ১৭৩	কসামাজা	কশ্ ১৭৩	কাঁকণ	কঙ্ক ১৩০
কলশি	কল্ ১৬৬	কলিযুগ	কল্ ১৬৯	কশে(সে)রু	ক্ ২৩৭	কসি	কশ্ ১৭৩	কাঁকর	ক্ ২০০
কলস	কল্ ১৬৪	কলিল	কল্ ১৬৪	কশ্মল	কশ্ ১৭৩	কসিত	কশ্ ১৭৩	কাঁকরোল	ক্ ২০০
কলসি	কল্ ১৬৬	কলু	কল্ ১৬৪	কশ্মীর	কশ্ ১৭৩	কসিল	কশ্ ১৭৩	কাঁকলা	ক্ ২০০
কলস্বন	কল্ ১৬৪	কলুষ	কল্ ১৬৪	কশ্যপ	কশ্ ১৭৫	কস্তাকস্তি	কশ্ ১৭৩	কাঁকলাস	ক্ ২০০
কলস্বর	কল্ ১৬৪	কলুষিত	কল্ ১৬৪	কশ্যপনন্দন	কশ্ ১৭৩	কস্তুভ	ক্ ২৩৭	কাঁকাইল	কশ্ ১৭৩
কলহ	কল্ ১৬৬	কলেবর	কল্ ১৬৪	কষ্	কশ্ ১৭৩	কস্তুরা	কশ্ ১৭৩	কাঁকাল	কশ্ ১৭৩
কলহংস	কল্ ১৬৪	কলেশ	ক্লু ২২২	কষ	কশ্ ১৭৬	কস্তুরি(কা)	কশ্ ১৭৩	কাঁকালি	কশ্ ১৭৩
কলহপ্রিয়	কল্ ১৬৪	কলৌ	কল্ ১৬৪	কষকুটে	কশ্ ১৭৩	কস্তুরিকা	কশ্ ১৭৩	কাঁকিলা	কঙ্ক ১৩০
কলহান্তরিতা	কল্ ১৬৪	কল্ক	কল্ ১৬৪	কষণ	কশ্ ১৭৬	কস্তুরী	কশ্ ১৭৩	কাঁকুই	কঙ্ক ১৩০
কলহাস্য	কল্ ১৬৪	কল্কা	কল্ ১৬৪	কষটো	কশ্ ১৭৩	কস্মিনকালে	ক্ ২৩৭	কাঁকুড়	ক্ ২০০
কলা	কল্ ১৬৭	কল্কি	কল্ ১৭০	কষড়া	কশ্ ১৭৩	কহ	কথ্ ১৪৭	কাঁকুড়ি	ক্ ২০০
কলাই	কট্ ১৩৬	কল্প	কঌপ্ ২১৭	কষড়ি	কশ্ ১৭৩	কহত	কথ্ ১৪৭	কাঁখ	কশ্ ১৭৩
কলাই-করা	কল্ ১৬৪	কল্পক	কঌপ্ ২১৭	কষণি	কশ্ ১৭৬	কহতব্য	কথ্ ১৪৭	কাঁখতলি	কশ্ ১৭৩
কলাইকন্দ	কল্ ১৬৪	কল্পক্ষয়	কঌপ্ ২১৭	কষা	কশ্ ১৭৩	কহন	কথ্ ১৪৭	কাঁচ	কঞ্চ ১৩৫
কলাকন্দ	কল্ ১৬৪	কল্পতরু	কঌপ্ ২১৮	কষাটে	কশ্ ১৭৩	কহর	কথ্ ১৪৭	কাঁচকড়া	কঞ্চ ১৩৫
কলাতলা	কল্ ১৬৪	কল্পন	কঌপ্ ২১৭	কষানি	কশ্ ১৭৩	কহা	কথ্ ১৪৭	কাঁচকলা	কঞ্চ ১৩৫
কলাধর	কল্ ১৬৪	কল্পনা	কঌপ্ ২১৭	কষায়	কশ্ ১৭৬	কহিঁ	কথ্ ১৪৭	কাঁচড়া	কঞ্চ ১৩৫

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
কাঁচড়াদাম	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁথি	কম্ ১৫৪	কাকালি	কশ্ ১৭৩	কাচড়া	কচ্ ১৩১	কাঞ্চলি(লী)	কঞ্চ্ ১৩৪
কাঁচঢাল	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁদ	ক্রন্দ্ ২১৯	কাকিণিকা	কশ্ ১৭৩	কাচঢাল	কচ্ ১৩১	কাঞ্চা	কঞ্চ্ ১৩৪
কাঁচঢালা	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁদকেতো	ক্রন্দ্ ২১৯	কাকিণী	কশ্ ১৭৩	কাচতিয়া	কৃৎ ২১৩	কাঞ্চি(ঞ্চী)	কঞ্চ্ ১৩৪
কাঁচনি(নী)	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁদন	ক্রন্দ্ ২১৯	কাকিনী	কশ্ ১৭৩	কাচতে	কৃৎ ২১৩	কাঞ্চিক	কঞ্চ্ ১৩৪
কাঁচপোকা	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁদনা	ক্রন্দ্ ২১৯	কাকু	কক্ ১২৮	কাচন	কচ্ ১৩১	কাঞ্চুলি(লী)	কঞ্চ্ ১৩৪
কাঁচল	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁদা	ক্রন্দ্ ২১৯	কাকুতি	কক্ ১৩০	কাচমণি	কচ্ ১৩১	কাঞ্জলি	কঞ্চ্ ১৩৪
কাঁচুলি	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁদাকাটা	ক্রন্দ্ ২১৯	কাকুৎস্থ	কক্ ১২৮	কাচলবণ	কচ্ ১৩১	কাঞ্জি(ঞ্জী)ক	কঞ্চ্ ১৩৪
কাঁচা	কঞ্চ্ ১৩৫	কাঁদাকাঁটি	ক্রন্দ্ ২১৯	কাকুবাণী	কক্ ১২৮	কাচা	কচ্ ১৩৩	কাঞ্জি(ঞ্জী)কা	কঞ্চ্ ১৩৪
কাঁচাখেউড়	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁধাড়	কম্ ১৫৪	কাকুবাদ	কক্ ১২৮	কাচারি	কচ্ ১৩২	কাঞ্জিলাল	কঞ্চ্ ১৩৪
কাঁচাগোল্লা	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁধাড়ি	কম্ ১৫৪	কাকুর্ব্বাদ	কক্ ১২৮	কাচি	কৃৎ ২১৩	কাঞ্জী	কঞ্চ্ ১৩৪
কাঁচামিঠা	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁন্দ	ক্রন্দ্ ২১৯	কাকেক্ষু	কক্ ১২৮	কাচি	কচ্ ১৩১	কাট	কৃৎ ২১৩
কাঁচামিঠে	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁপ	কম্প্ ১৬০	কাকেন্দু	ক ২৩৭	কাচিম	কচ্ ১৩৩	কাট(ঠ)	কট্ ১৩৮
কাঁচারাঁড়ি	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁপটে	কন্ ১৫০	কাকেন্দু	কক্ ১২৮	কাচুরি	কঞ্চ্ ১৩৪	কাট(ঠ)কুয়া	কট্ ১৩৬
কাঁচারাণ্ডী	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁপন	কম্প্ ১৬০	কাকোড়ু(দু)ম্বর	কক্ ১২৮	কাচু-মাচু	কচ্ ১৩৩	কাটখোট্টা	কট্ ১৩৬
কাঁচাসাধ	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁপনি	কম্প্ ১৬০	কাকোদর	কক্ ১২৮	কাচ্চাবাচ্চা	কঞ্চ্ ১৩৪	কাট(ঠ)গড়া	কট্ ১৩৬
কাঁচি	কঞ্চ্ ১৩৫	কাঁপা	কম্প্ ১৬০	কাকোল	কক্ ১২৮	কাচ্চাবাচ্চা	কচ্ ১৩৩	কাটছাঁট	কৃৎ ২১৩
কাঁচুয়া	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁসর (কাঁশর)	কং ১২৮	কাক্ষ	কশ্ ১৭৩	কাছ	কচ্ ১৩৪	কাটছাট	কৃৎ ২১৩
কাঁচ্চা	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁসা	কং ১২৭	কাক্ষীবতী	কশ্ ১৭৩	কাছ	কচ্ ১৩১	কাটতি	কৃৎ ২১৩
কাঁছনি	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁসারি	কং ১২৭	কাক্ষীবান	কশ্ ১৭৩	কাছটি	কচ্ ১৩১	কাটন	কৃৎ ২১৩
কাঁজি	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁসি	কং ১২৮	কাখ	কশ্ ১৭৩	কাছা	কচ্ ১৩৪	কাটনা	কৃৎ ২১৩
কাঁজী	কঞ্চ্ ১৩৪	কাঁহা	ক ২৩৭	কাখতলি	কশ্ ১৭৩	কাছাকাছি	কচ্ ১৩৪	কাটুনি(নী)	কৃৎ ২১৩
কাঁজিলাল	কঞ্চ্ ১৩৪	কাক	কক্ ১২৯	কাগ	কক্ ১২৮	কাছুটি	কচ্ ১৩১	কাটকবুল	কৃৎ ২১৩
কাঁট	কণ্ ১৪০	কাকই	কঙ্ক্ ১৩০	কাগা	কক্ ১২৮	কাছন	কশ্ ১৭৬	কাটকুট	কৃৎ ২১৩
কাঁটা	কণ্ ১৪১	কাকতালী	কক্ ১২৮	কাগাতোয়া	কক্ ১২৮	কাছনি	কশ্ ১৭৬	কাট(ঠ)রা	কট্ ১৩৬
কাঁটাকুটা	কণ্ ১৪০	কাকতালীয়	কক্ ১২৮	কাগাবগা	কক্ ১২৮	কাছরা	কশ্ ১৭৬	কাটা	কট্ ১৩৮
কাঁটাকুটো	কণ্ ১৪০	কাকনিদ্রা	কক্ ১২৮	কাঙর	কম্ ১৫৪	কাছা	কচ্ ১৩২	কাটা	কৃৎ ২১৩
কাঁটাখোঁচা	কণ্ ১৪০	কাকপক্ষ	কক্ ১২৯	কাঙুর	কম্ ১৫৪	কাছাড়	কচ্ ১৩৪	কাটাইর(ল)	কৃৎ ২১৩
কাঁটাচামচ	কণ্ ১৪০	কাকপদ	কক্ ১২৮	কাঙলা	কং ১২৬	কাছারি	কচ্ ১৩২	কাটাও	কৃৎ ২১৩
কাঁটাঝাঁপ	কণ্ ১৪০	কাকপুচ্ছ	কক্ ১২৮	কাঙাল	কং ১২৬	কাছি	কশ্ ১৭৬	কাটাকাটি	কৃৎ ২১৩
কাঁটাঝোড়	কণ্ ১৪০	কাকপুষ্ট	কক্ ১২৮	কাঙালি(লী)	কং ১২৬	কাছিম	কচ্ ১৩৩	কাটাকাটি	কট্ ১৩৮
কাঁটাঝোপ	কণ্ ১৪০	কাকপেয়	কক্ ১২৯	কাঙুই	কং ১২৮	কাছুটি(টী)	কচ্ ১৩২	কাটাকুটি	কৃৎ ২১৩
কাঁটাল	কণ্ ১৪০	কাকবন্ধ্যা	কক্ ১২৮	কাঙ্করি	কঙ্ক্ ১৩০	কাছুয়া	কচ্ ১৩৩	কাটাছাঁটা	কট্ ১৩৮
কাঁঠাল	কণ্ ১৪০	কাকবলি	কক্ ১২৯	কাঙক্ষা	কাঙক্ষ্ ১৮৩	কাজ	কৃ ২০৫	কাটাছাঁটা	কৃৎ ২১৩
কাঁঠি	কণ্ ১৪০	কাকভীরু	কক্ ১২৮	কাঙিক্ষত	কাঙক্ষ্ ১৮৩	কাজকাম	কৃ ২০০	কাটাছাটা	কৃৎ ২১৩
কাঁড়	কণ্ ১৪৩	কাকভুশুণ্ড	কক্ ১২৯	কাঙিক্ষণী	কাঙক্ষ্ ১৮৩	কাজর	কু ১৮৫	কাটান	কৃৎ ২১৩
কাঁড়	কন্ ১৫০	কাকমাচী	কক্ ১২৮	কাঙক্ষী	কাঙক্ষ্ ১৮৩	কাজল	কু ১৮৫	কাটান	কট্ ১৩৮
কাঁড়া	কন্ ১৫০	কাকযব	কক্ ১২৮	কাঙ্গনী	ক ২৩৭	কাজলা	কু ১৮৫	কাটানো	কৃৎ ২১৩
কাঁড়া	কণ্ ১৪৩	কাকরুত	কক্ ১২৮	কাঙ্গনী	কং ১২৮	কাজলী	কু ১৮৫	কাটা-পঁইছে	কৃৎ ২১৩
কাঁড়ান	কণ্ ১৪৩	কাকরোল	কৃ ২০৩	কাঙ্গলা	কং ১২৬	কাজি	কৃ ২০০	কাটাপৈঠা	কৃৎ ২১৩
কাঁড়ার	কণ্ ১৪৩	কাকল	কক্ ১২৯	কাঙ্গা	কক্ ১২৮	কাজিয়া	কৃ ২০০	কাটাফেণি	কৃৎ ২১৩
কাঁড়ারী	কণ্ ১৪৩	কাকলি	কক্ ১২৯	কাঙ্গাল	কং ১২৬	কাজেই	কৃ ২০০	কাটার	কৃৎ ২১৩
কাঁড়ি	কণ্ ১৪৩	কাকলি	কু ১৮৫	কাঙ্গালি(লী)	কং ১২৬	কাঞ্চন	কঞ্চ্ ১৩৫	কাটারি(রী)	কৃৎ ২১৩
কাঁতি	কন্ ১৫০	কাকা	কক্ ১২৮	কাঙ্গুর	কং ১২৬	কাঞ্চনমূল্য	কঞ্চ্ ১৩৪	কাটি(টী)	কণ্ ১৪০
কাঁথ	কম্ ১৫৪	কাকাক্ষি	কক্ ১২৮	কাঙ্গুরা	কং ১২৬	কাঞ্চনসন্ধি	কঞ্চ্ ১৩৪	কাটি(টী)	কৃৎ ২১৩
কাঁথা	কম্ ১৫৪	কাকাতুয়া	কক্ ১২৮	কাচ	কচ্ ১৩৩	কাঞ্চনী	কঞ্চ্ ১৩৫	কাটিগঙ্গা	কৃৎ ২১৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
কাটি-ঘা	কৃৎ	২১৩	কাণ্ডপৃষ্ঠ	কন্	১৫৩	কাদাপাটা	কৃ	২০০	কানীন	কন্	১৫০	কাফরি	কৃ	২৩৭
কাটিয়া	কৃৎ	২১৩	কাণ্ডবান	কন্	১৫০	কাদি	কৃ	২৩৭	কানু	কর্ণ্	১৬৩	কাফি	কৃ	২৩৭
কাটিল	কৃৎ	২১৩	কাণ্ডবীণা	কন্	১৫০	কাদ্রবেয়	কথ্	১৪৭	কানুটি	কর্ণ্	১৬০	কাফুর	কৃপ্	২১৪
কাটুরকুটুর	কৃৎ	২১৩	কাণ্ডভঙ্গ	কন্	১৫০	কান	কন্	১৫০	কানেট	কর্ণ্	১৬০	কাবা	কু	১৮৫
কাটোয়া	কণ্	১৪২	কাণ্ডর্ষি	কন্	১৫৪	কান	কর্ণ্	১৬২	কা(ক্যা)নেস্তারা	কর্ণ্	১৬০	কাবাড়ি(ড়ী)	কৃ	২৩৭
কাঠ	কশ্	১৭৩	কাণ্ডসন্ধি	কন্	১৫০	কানক	কন্	১৫০	কান্ত	কম্	১৫৬	কাবাব	কৃ	২৩৭
কাঠ	কৃৎ	২১৩	কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান	কন্	১৫০	কানকথা	কর্ণ্	১৬০	কান্তা	কম্	১৫৬	কাবাবচিনি	কৃ	২৩৭
কাঠ-আমলা	কৃৎ	২১৩	কাণ্ডার	কন্	১৫০	কানকাটা	কর্ণ্	১৬২	কান্তার	কম্	১৫৭	কাবার	কু	১৮৫
কাঠ-কঠিন	কৃৎ	২১৩	কাণ্ডার	কৃ	২০০	কানকামড়ানি	কর্ণ্	১৬০	কান্তি	কম্	১৫৪	কাবেরী	কু	১৮৬
কাঠকুড়ুনী	কৃৎ	২১৩	কাণ্ডারি(রী)	কৃ	২০০	কানকুয়া	কর্ণ্	১৬০	কান্তিকর	কম্	১৫৪	কাব্য	কু	১৮৫
কাঠকুড়ানী	কৃৎ	২১৩	কাণ্ডী	কৃ	২০০	কানকো	কর্ণ্	১৬০	কান্তিদ	কম্	১৫৪	কাব্যকথা	কু	১৮৫
কাঠকোটরিয়া	কৃৎ	২১৩	কাণ্ঢার	কৃ	২০০	কানকোটারি	কর্ণ্	১৬০	কান্তিদায়ক	কম্	১৫৪	কাব্যকষ্ট	কু	১৮৫
কাঠখড়	কৃৎ	২১৩	কাণ্ব	কণ্	১৪০	কানখড়খড়ে	কর্ণ্	১৬০	কান্তিভৃৎ	কম্	১৫৪	কাব্যচৌর	কু	১৮৫
কাঠখড়ি	কৃৎ	২১৩	কাত	কিৎ	১৮৩	কানখুসকি,	কর্ণ্	১৬০	কান্তিমান	কম্	১৫৪	কাব্যপ্রকাশ	কু	১৮৫
কাঠখোলা	কৃৎ	২১৩	কাত	কৃ	২২৩	কানচটা	কর্ণ্	১৬০	কান্তিলৌহ	কম্	১৫৪	কাব্যরত্নাকর	কু	১৮৫
কাঠগড়	কৃৎ	২১৩	কাত	কৃ	২৩৭	কানচাটা	কর্ণ্	১৬০	কান্থা	কম্	১৫৪	কাব্যরস	কু	১৮৫
কাঠঝুনা	কৃৎ	২১৩	কাতন্ত্র	কৃ	২৪০	কানজুলপি	কর্ণ্	১৬০	কান্দ	কম্	১৫৪	কাব্যরসিক	কু	১৮৫
কাঠটগর	কৃৎ	২১৩	কাতর	কৃ	২৪০	কানড়	কর্ণ্	১৬০	কান্দন	ক্রন্দ্	২১৯	কাব্যলিঙ্গ	কু	১৮৫
কাঠ(ঠু)রিয়া	কৃৎ	২১৩	কাতরা	কৃ	২৩৭	কানড়	কন্	১৬০	কান্দা	ক্রন্দ্	২১৯	কাব্যশাস্ত্র	কু	১৮৫
কাঠা	কৃৎ	২১৩	কাতরানি	কৃ	২৩৭	কানড়া	কর্ণ্	১৬০	কান্দি(ন্দী)	কম্	১৫৪	কাব্যহাস্য	কু	১৮৫
কাঠাম(মো)	কৃৎ	২১৩	কাতরি(রী)	কৃৎ	২১৩	কানঝাপটা	কর্ণ্	১৬০	কান্ধি(ন্ধী)	কম্	১৫৪	কাব্যামৃতরস	কু	১৮৫
কাঠি	কৃৎ	২১৩	কাতর্য্য	কৃ	২৩৭	কানন	কর্ণ্	১৬৩	কান্না	ক্রন্দ্	২১৯	কাব্যালাপ	কু	১৮৫
কাঠি(ঠী)	কণ্	১৪০	কাতল(া)	কৃ	২৪০	কানপাটা	কর্ণ্	১৬০	কান্নাকাটি	ক্রন্দ্	২১৯	কাম	কম্	১৫৭
কাঠিন্য	কঠ্	১৩৯	কাতা	কৃ	২০০	কানপাটি	কর্ণ্	১৬০	কান্যকুব্জ	কন্	১৫১	কাম	কৃ	২০০
কাঠুরে	কৃৎ	২১৩	কাতান	কৃৎ	২১৩	কানপাতলা	কর্ণ্	১৬২	কাপ	কন্	১৫০	কামকলহ	কৃ	২০০
কাড়	কৃশ্	২১৫	কাতারি(রী)	কৃৎ	২১৩	কানপাতা	কর্ণ্	১৬২	কাপট	কন্	১৫০	কামকলহ	কম্	১৫৪
কাড়-আর	কৃশ্	২১৫	কাতি(তী)	কৃৎ	২১৩	কানফুল	কর্ণ্	১৬০	কাপটিক	কন্	১৫০	কামকলা	কম্	১৫৪
কাড়-ঘা	কৃশ্	২১৫	কাতিক	কৃৎ	২১৩	কানফাড়া	কর্ণ্	১৬০	কাপট্য	কন্	১৫০	কামকলা	কৃ	২০০
কাড়া	কৃশ্	২১৫	কাতিয়ারী	কৃৎ	২১৩	কানফুসকি	কর্ণ্	১৬২	কাপড়	কৃ	২০০	কামকাম	কৃ	২০০
কাড়াকাড়ি	কৃশ্	২১৫	কাতুকুতু	কৃ	২৩৭	কানবালা	কর্ণ্	১৬০	কাপড়-চোপড়	কৃ	২০০	কামকাম	কম্	১৫৪
কাড়ান	কৃশ্	২১৫	কাতুর	কৃ	২৩৭	কানবিঁধনী	কর্ণ্	১৬০	কাপড়ি	কৃ	২০০	কামকামী	কম্	১৫৪
কাড়ি-আনি	কৃশ্	২১৫	কাত্তিক	কৃৎ	২১৩	কানভাঙান	কর্ণ্	১৬২	কাপড়ীয়া	কৃ	২০০	কামকামী	কৃ	২০০
কাড়ার	কণ্	১৪০	কাত্যায়ন	কৃ	২৪০	কানা	কর্ণ্	১৬২	কাপড়্যা	কৃ	২০০	কামকার	কৃ	২০০
কাড়িয়া	কণ্	১৪০	কাত্যায়নী	কৃ	২৪০	কানাই	কর্ণ্	১৬২	কাপথ	কু	১৮৫	কামকার	কম্	১৫৪
কাণ	কৃ	২০০	কাত্যায়নী	নী	৬৬১	কানাকানি	কর্ণ্	১৬২	কাপাস	কৃ	২০০	কামকৃৎ	কৃ	২০০
কাণ	কর্ণ্	১৬২	কাথ	কৃ	২২৩	কানাঘুষা	কর্ণ্	১৬২	কাপাল	কৃ	২৩৭	কামকৃত	কৃ	২০০
কাণা	কর্ণ্	১৬২	কাদাচিৎক	কৃ	২৩৭	কানাচ	কর্ণ্	১৬২	কাপালি(লী)	কৃ	২৪০	কামকৃত	কম্	১৫৪
কাণা	কৃ	২০০	কাদম্ব	কথ্	১৪৮	কানাটি	কর্ণ্	১৬০	কাপালিক	কৃ	২৪০	কামকেলি	কম্	১৫৪
কাণ্টা	কন্	১৫০	কাদম্বর	কথ্	১৪৮	কানাড়া	কর্ণ্	১৬০	কাপালী	কৃ	২৩৭	কামক্রীড়া	কম্	১৫৪
কাণ্ড	কন্	১৫৩	কাদম্বরী	কথ্	১৪৮	কানমাগুর	কন্	১৫০	কাপিল	কন্	১৫০	কামক্ষুধা	কম্	১৫৪
কাণ্ডকার	কন্	১৫০	কাদম্বিনী	কথ্	১৪৮	কানাৎ	কর্ণ্	১৬০	কাপিশ	কন্	১৫০	কামক্ষুধা	কৃ	২০০
কাণ্ডজ্ঞান	কন্	১৫৩	কাদা	কৃ	২০০	কানামাছি	কর্ণ্	১৬২	কাপুড়ে	কৃ	২০০	কামগ	কৃ	২০০
কাণ্ডতিক্ত	কন্	১৫০	কাদাখেঁউড়	কৃ	২০০	কানাসি	কর্ণ্	১৬০	কাপুরুষ	কৃ	২৪০	কামগ	কম্	১৫৪
কাণ্ডপট	কন্	১৫০	কাদাখেঁড়ু	কৃ	২০০	কানি(নী)	কর্ণ্	১৬২	কাপোত	কৃ	২৩৭	কামগতি	কম্	১৫৪
কাণ্ডপটক	কন্	১৫০	কাদাখোঁচা	কৃ	২০০	কানি	কন্	১৫০	কাফির	কৃ	২৩৭	কামগতি	কৃ	২০০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
কামগন্ধ	কৃ ২০০	কামবৃত্ত	কম্ ১৫৪	কামাতুর	কৃ ২০০	কামোদ্দীপক	কম্ ১৫৪	কায়েম	চি ৩৪৬
কামগন্ধ	কম্ ১৫৪	কামভূপ	কম্ ১৫৪	কামাতুর	কম্ ১৫৪	কামোপহত	কৃ ২০০	কায়েমী	চি ৩৪৬
কামগম	কৃ ২০০	কামভূপ	কৃ ২০০	কামাত্মজ	কৃ ২০০	কামোপহত	কম্ ১৫৪	কায়েমী	কৃ ২৩৭
কামগামী	কৃ ২০০	কামভোগ	কম্ ১৫৪	কামাত্মজ	কম্ ১৫৪	কাম্প	কম্প্ ১৬০	কার?	কৃ ২৩৭
কামচর	কৃ ২০০	কামমোহিত	কম্ ১৫৪	কামাত্মা	কম্ ১৫৯	কাম্পিল্য	কম্প্ ১৬০	কার	কৃ ২০৫
কামচার	কৃ ২০০	কাময়িতা	কম্ ১৫৪	কামাত্মা	কৃ ২০০	কাম্বুজ	কম্ ১৫৪	কারক	কৃ ২০৫
কামজ	কম্ ১৫৪	কামর	কম্ ১৫৪	কামাধিষ্ঠান	কৃ ২০০	কাম্বোজ	কম্ ১৫৪	কারকিত	কৃ ২০০
কামজিৎ	কম্ ১৫৪	কামরস	কম্ ১৫৪	কামাধিষ্ঠান	কম্ ১৫৪	কাম্য	কম্ ১৫৪	কারকুন	-কৃ ২০০
কামটঙ্গি	কম্ ১৫৪	কামরসিক	কম্ ১৫৪	কামান(নো)	কৃ ২০০	কাম্যক	কম্ ১৫৯	কারখানা	কৃ ২০৬
কামড়	কম্ ১৫৪	কামরাঙা	কম্ ১৫৪	কামান	কৃ ২০০	কাম্যকর্ম্ম	কম্ ১৬০	কারচুপি	কৃ ২০৬
কামড়া	কম্ ১৫৪	কামরিপু	কম্ ১৫৪	কামানল	কৃ ২০০	কাম্যকূপ	কম্ ১৫৪	কারণ	কৃ ২০৬
কামদ	কম্ ১৫৪	কামরূপ	কম্ ১৫৮	কামানল	কম্ ১৫৪	কাম্যদান	কম্ ১৫৪	কারণকথা	কৃ ২০০
কামদশা	কম্ ১৫৪	কামরূপ	কৃ ২০০	কামানি(নী)	কৃ ২০০	কাম্যা	কম্ ১৫৪	কারণকারণ	কৃ ২০০
কামদানী	কম্ ১৫৪	কামল	কৃ ২০০	কামান্ধ	কৃ ২০০	কায(জ)	কৃ ২০০	কারণগুণ	কৃ ২০০
কামদায়	কম্ ১৫৪	কামল	কম্ ১৫৪	কামান্ধ	কম্ ১৫৪	কায়	কৃ ২৪১	কারণজল	কৃ ২০০
কামদার	কৃ ২০০	কামলা	কম্ ১৫৮	কামাবসায়	কৃ ২০০	কায় (ক)	চি ৩৪৬	কারণতোয়	কৃ ২০০
কামদুঘ	কম্ ১৫৪	কামলা	কৃ ২০০	কামাবসায়	কম্ ১৫৪	কায়ক্লেশ	চি ৩৪৬	কারণবারি	কৃ ২০০
কামদূতী	কম্ ১৫৪	কামশক্তি	কৃ ২০০	কামায়ুধ	কৃ ২০০	কায়চিকিৎসা	চি ৩৪৬	কারণমালা	কৃ ২০০
কামদেব	কম্ ১৫৭	কামশক্তি	কম্ ১৫৪	কামার	কৃ ২০০	কায়চিকিৎসা	কৃ ২৩৭	কারণশরীর	কৃ ২০০
কামদোহিনী	কম্ ১৫৪	কামশর	কৃ ২০০	কামারণ্য	কৃ ২০০	কায়জ	কৃ ২৩৭	কারণসলিল	কৃ ২০০
কামধনু	কম্ ১৫৪	কামশর	কম্ ১৫৪	কামার্ত্ত	কৃ ২০০	কায়জ	চি ৩৪৬	কারণা	কৃ ২০০
কামধুক	কম্ ১৫৪	কামশাসন	কম্ ১৫৪	কামার্ত্ত	কম্ ১৫৪	কায়দণ্ড	চি ৩৪৬	কারণাব্ধি	কৃ ২০০
কামধেনু	কম্ ১৫৮	কামশাসন	কৃ ২০০	কামাল	কৃ ২০০	কায়দণ্ড	কৃ ২৩৭	কারণার্ণব	কৃ ২০০
কামধ্বংসী	কম্ ১৫৪	কামশাস্ত্র	কৃ ২০০	কামাসক্ত	কৃ ২০০	কায়দা	কৃ ২৩৭	কারণিক	কৃ ২০০
কামনা	কম্ ১৫৭	কামশাস্ত্র	কম্ ১৫৯	কামাসক্ত	কম্ ১৫৪	কায়দা	চি ৩৪৬	কারণোত্তর	কৃ ২০০
কামন্দক	কম্ ১৫৪	কামসখ	কম্ ১৫৪	কামি	কম্ ১৫৪	কায়দাকানুন	চি ৩৪৬	কারগুব	কৃ ২০০
কামপত্নী	কম্ ১৫৪	কামসখ	কৃ ২০০	কামি	কৃ ২০০	কায়দাকানুন	কৃ ২৩৭	কারদানি(নী)	কৃ ২০০
কামপাল	কম্ ১৫৪	কামসিন্দুর	কৃ ২০০	কামিক	কম্ ১৫৪	কায়বার	কৃ ২৩৭	কারপরদাজ	কৃ ২০০
কামপাল	কৃ ২০০	কামসিন্দুর	কম্ ১৫৪	কামিক	কৃ ২০০	কায়বার	চি ৩৪৬	কারব	কৃ ২৩৭
কামপূর	কৃ ২০০	কামসু	কম্ ১৫৪	কামিক্ষা(ক্ষে,খ্যা)	কৃ ২০০	কায়ব্যূহ	চি ৩৪৬	কারবার	কৃ ২০০
কামপূর	কম্ ১৫৪	কামসু	কৃ ২০০	কামিখ্যা	কৃ ২০০	কায়ব্যূহ	কৃ ২৩৭	কারয়িতব্য	কৃ ২০০
কামপ্রদ	কম্ ১৫৪	কামসূত্র	কম্ ১৫৪	কামিত	কৃ ২০০	কায়মনোবাক্য	কৃ ২৩৭	কারসাজি(জী)	কৃ ২০০
কামপ্রদ	কৃ ২০০	কামসূত্র	কৃ ২০০	কামিত	কম্ ১৫৪	কায়মনোবাক্য	চি ৩৪৬	কারা	কৃ ২০০
কামবর	কৃ ২০০	কামহৈতুক	কৃ ২০০	কামিন	কৃ ২০০	কায়স্থ	চি ৩৪৬	কারাগার	কৃ ২০০
কামবর	কম্ ১৫৪	কামহৈতুক	কম্ ১৫৪	কামিন	কম্ ১৫৯	কায়স্থ	কৃ ২৪১	কারাগৃহ	কৃ ২০০
কামবর্ষী	কম্ ১৫৪	কামা	কৃ ২০০	কামিনা(ন্যা)	কৃ ২০০	কায়স্থিনী	কৃ ২৩৭	কারাবর	কৃ ২০০
কামবর্ষী	কৃ ২০০	কামাই	কৃ ২০০	কামিনী	কম্ ১৫৯	কায়স্থিনী	চি ৩৪৬	কারি(রী)	কৃ ২০০
কামবান	কৃ ২০০	কামাক্ষী	কৃ ২০০	কামিলা(ল্যা)	কৃ ২০০	কায়া	চি ৩৪৬	কারিকর	কৃ ২০০
কামবান	কম্ ১৫৪	কামাক্ষী	কম্ ১৫৪	কামী	কম্ ১৫৪	কায়া	কৃ ২৩৭	(কারিগর)	কৃ ২০০
কামবাসী	কম্ ১৫৪	কামাখ্যা	কম্ ১৫৪	কামুক	কম্ ১৫৪	কায়িক	কৃ ২৩৭	কারিকা	কৃ ২০০
কামবাসী	কৃ ২০০	কামাখ্যা	কৃ ২০০	কামেশ্বর	কম্ ১৫৪	কায়িক	চি ৩৪৬	কারিত	কৃ ২০০
কামবিদ্ধ	কম্ ১৫৪	কামাগ্নি	কৃ ২০০	কামেশ্বর	কৃ ২০০	কায়েত	চি ৩৪৬	কারিন্দা	কৃ ২০০
কামবীর্য্য	কম্ ১৫৪	কামাগ্নি	কম্ ১৫৪	কামোদ	কৃ ২০০	কায়েত	কৃ ২৩৭	কারী	কৃ ২০০
কামবীর্য্য	কৃ ২০০	কামাঙ্কুশ	কম্ ১৫৪	কামোদ	কম্ ১৫৪	কায়েত	কিৎ ১৮৩	কারু	কৃ ২০৬
কামবৃত্ত	কৃ ২০০	কামাঙ্কুশ	কৃ ২০০	কামোদ্দীপক	কৃ ২০০	কায়েম	কৃ ২৩৭	কারুজ	কৃ ২০০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
কালীঘাট	কল্ ১৬৪	কাসি	কশ্ ১৭৩	কিচ্ছু	ক্ ২৩৭	কিমনে	ক্ ২৩৭	কিলাস	কল্ ১৬৪
কালীন	কল্ ১৬৪	কাসিকা	কশ্ ১৭৩	কিছু	ক্ ২৪২	কিমর্থ	ক্ ২৩৭	কিলাসী	ক্লৃ ২২২
কালীবউ	কৃশ্ ২১৫	কা(খা)স্ত	কৃশ্ ২১৫	কিঞ্চ	ক্ ২৪২	কিমাকার	ক্ ২৩৭	কিলিকিলি	কল্ ১৬৪
কালীয়	কৃশ্ ২১৫	কাস্ত	কৃৎ ২১৩	কিঞ্চন	ক্ ২৪২	কিমাশ্চর্য্য	ক্ ২৩৭	কিলিবিলি	কল্ ১৬৪
কালীয়	কল্ ১৬৪	কা(খা)স্তগির	কৃশ্ ২১৫	কিঞ্চিৎ	ক্ ২৪২	কিমিন্দম	ক্ ২৩৭	কিলেস	ক্লৃ ২২২
কালীহ্রদ	কল্ ১৬৪	কাস্তে	কৃৎ ২১৩	কিঞ্চিদূন	ক্ ২৪২	কিমিয়াবিদ্যা	ক্ ২৩৭	কি(কে)ল্লা	কল্ ১৬৪
কালুকা	কল্ ১৬৪	কাহন	কৃশ্ ২১৫	কিঞ্চিন্মাত্র	ক্ ২৪২	কিম্পুরুষ	ক্ ২৪০	কিল্বিষ	কল্ ১৬৪
কালুষ্য	কল্ ১৬৪	কাহা	ক্ ২৩৭	কিঞ্চিলি(লু)ক	ক্ ২৩৭	কিম্বা	ক্ ২৩৭	কিশ(স)ল	ক্ ২৩৭
কালেয়	কল্ ১৬৪	কাহাকুহী	ক্ ২৩৭	কিঞ্চুলুক	ক্ ২৩৭	কিম্ভূত	ক্ ২৩৭	কিশ(স)লয়	ক্ ২৩৭
কালো	কৃশ্ ২১৫	কাহার?	ক্ ২৩৭	কিঞ্জল	ক্ ২৩৭	কিম্ভূতকিমাকার	ক্ ২৩৭	কিশোর	ক্ ২৩৭
কালোয়াত	কল্ ১৬৪	কাহার	কৃ ১৮৭	কিট্	কট্ ১৩৬	কিয়	ক্ ২৩৭	কিশোরা	ক্ ২৩৭
কালোয়াতী	কল্ ১৬৪	কাহারবা	কৃ ১৮৭	কিটকিটা(টে)	কট্ ১৩৬	কিয়ৎ	ক্ ২৩৭	কিষা(সা)ন	কৃশ্ ২১৫
কাল্য	কল্ ১৬৪	কাহাল	কল্ ১৬৪	কিট(টা)ন	কৃৎ ২১৩	কিয়া	ক্ ২৩৭	কিষা(সা)নী	কৃশ্ ২১৫
কাশ্	কশ্ ১৭৩	কাহি	ক্ ২৩৭	কিটা	কট্ ১৩৬	কিয়ান	ক্ ২৩৭	কিষ্কিন্ধ	ক্ ২৪২
কাশ	কশ্ ১৭৬	কাহিনী	কথ্ ১৪৭	কিট্ট	কট্ ১৩৬	কি(কে)য়ারি	ক্ ২৩৭	কিষ্কিন্ধ্যা	ক্ ২৪২
কাশ(স)ন্দি	কশ্ ১৭৩	কাহিল	ক্ ২৩৭	কিড়মিড়	কট্ ১৩৬	কিয়ে	ক্ ২৩৭	কিসে	ক্ ২৩৭
কাশমর্দ্দ	কশ্ ১৭৭	কাহু	ক্ ২৩৭	কিড়িমিড়ি	কট্ ১৩৬	কির	কৄ ২১২	কিশ্তি	ক্ ২৩৭
কাশি	কশ্ ১৭৭	কাহে	ক্ ২৩৭	কিড়িরমিড়ির	কট্ ১৩৬	কিরকির	কৄ ২১১	কিস্তি	ক্ ২৩৭
কাশিকা	কশ্ ১৭৭	কাহো	ক্ ২৩৭	কিণ	কণ্ ১৪০	কিরকিরি	কৄ ২১১	কিস্তিবন্দী	ক্ ২৩৭
কাশী	কশ্ ১৭৭	কাহেঁ	ক্ ২৩৭	কিণ্ব	কণ্ ১৪০	কিরণ	কৄ ২১২	কিস(শ)মৎ	ক্ ২৩৭
কাশীধাম	ধা ৫৯৯	কাহ্ন	কৃশ্ ২১৫	কিৎকিৎ	কিৎ ১৮৩	কিরণমালী	কৄ ২১১	কী	ক্ ২৩৭
কাশীয়া	কশ্ ১৭৩	কাহ্নু	কৃশ্ ২১৫	কিত	কিৎ ১৮৩	কিরণ্ময়ী	কৄ ২১১	কীকট	ক্ ২৩৭
কাশীশ	কশ্ ১৭৩	কাহ্নাই	কৃশ্ ২১৫	কিতনা	কিৎ ১৮৩	কিরমি	ক্রম্ ২১৯	কীচক	ক্ ২৪২
কাশ্মীর	কশ্ ১৭৩	কাহ্নাঞি	কৃশ্ ২১৫	কিতব	কিৎ ১৮৩	কিরা	ক্ ২০০	কীট	ক্ ২৩৭
কাশ্যপ	কশ্ ১৭৭	কি	ক্ ২৩৭	কিতা	কিৎ ১৮৩	কিরাট	কৄ ২১১	কীটঘ্ন	ক্ ২৩৭
কাশ্যপি	কশ্ ১৭৩	কিঅ	ক্ ২০০	কিতাব	কিৎ ১৮৩	কিরেট	কৄ ২১১	কীটজ	ক্ ২৩৭
কাশ্যপীকান্ত	কশ্ ১৭৩	কিএ	ক্ ২৩৭	কিতাবৎ	কিৎ ১৮৩	কিরাত	কৄ ২১২	কীটমণি	ক্ ২৩৭
কাশ্যপীশ	কশ্ ১৭৩	কিং	ক্ ২৪১	কিত্তন	কৃৎ ২১৩	কিরাতিনী	কৄ ২১১	কীটাণু	ক্ ২৩৭
কাশ্যপেয়	কশ্ ১৭৩	কিংকর্ত্তব্য	ক্ ২৩৭	কিন্তা	ক্ ২০০	কিরি	কৄ ২১১	কীড়া	ক্ ২৩৭
কাষ	কশ্ ১৭৩	কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়	ক্ ২৩৭	কিন্তা	ক্ ২৩৭	কিরিচ	কৄ ২১১	কীদৃশ	ক্ ২৩৭
কাষায়	কশ্ ১৭৩	কিংখাপ	ক্ ২৩৭	কিন	ক্রী ২২০	কিরীট	কৄ ২১১	কীর	ক্ ২৩৭
কাষ্ট	কশ্ ১৭৩	কিংবদন্তী	ক্ ২৪২	কিনার(া)	ক্রী ২২০	কিরীটী	কৄ ২১১	কীরিতি	কৃৎ ২১৩
কাষ্টকি	কশ্ ১৭৩	কিংবা	ক্ ২৩৭	কিনিবিকি	ক্রী ২২০	কিরে	ক্ ২০০	কীর্ণ	কৄ ২১৩
কাষ্ট(ষ্ঠ)হাসি	কশ্ ১৭৩	কিংশুক	ক্ ২৩৭	কিন্তু	ক্ ২৩৭	কির্ম্মীর	কৄ ২১৩	কীর্ত্তন	কৃৎ ২১৩
কাষ্ঠ	কশ্ ১৭৮	কিখি	ক্ ২৩৭	কিন্নর	ক্ ২৪২	কিল	কল্ ১৬৪	কীর্ত্তনি(নী)য়া	কৃৎ ২১৩
কাষ্ঠা	কশ্ ১৭৩	কিঙ্কর	ক্ ২৪২	কিন্তু	ক্ ২৩৭	কি(কী)ল	কল্ ১৬৪	কীর্ত্তনীয়	কৃৎ ২১৩
কাষ্ঠাগার	কশ্ ১৭৩	কিঙ্কিণী(নী)	ক্ ২৩৭	কিপটে	কন্ ১৫০	কিলকিঞ্চ	কল্ ১৬৪	কীর্ত্তনীয়া	কৃৎ ২১৩
কাষ্ঠাম্বুবাহিনী	কশ্ ১৭৩	কিঙ্কিণিকা	ক্ ২৩৭	কিপ্‌পিন	ক্ ২০০	কিলকিঞ্চিত	কল্ ১৬৪	কীর্ত্তি	কৃৎ ২১৪
কাষ্ঠিক	কশ্ ১৭৩	কিচ	ক্ ২০০	কিপ্রকার	ক্ ২৩৭	কিলকিল	কল্ ১৭৩	কীর্ত্তিকর	কৃৎ ২১৩
কাস্	কশ্ ১৭৩	কিচ	কচ্ ১৩১	কিবল	ক্ ২৩৭	কিলকিলা	কল্ ১৬৪	কীর্ত্তিকল্পতরু	কৃৎ ২১৩
কাস	কশ্ ১৭৩	কিচকিচ	কচ্ ১৩১	কিবা	ক্ ২৩৭	কিলকিলা-দেশ	কল্ ১৭৩	কীর্ত্তিকল্পলতা	কৃৎ ২১৩
কাসঘ্ন	কশ্ ১৭৩	কিচকিচ	ক্ ২০০	কিবে	ক্ ২৩৭	কিলবিল	কল্ ১৬৪	কীর্ত্তিত	কৃৎ ২১৩
কাসন্দি	কশ্ ১৭৩	কিচিকিচি	কচ্ ১৩১	কিম্	ক্ ২৩৭	কিলা	কল্ ১৬৪	কীর্ত্তিনাশন	কৃৎ ২১৩
কাসর	ক্ ২৩৭	কিচিরমিচির	কচ্ ১৩১	কিমত	ক্ ২৩৭	কিলাকিলি(লী)	কল্ ১৬৪	কীর্ত্তিবন্ত	কৃৎ ২১৩
কাসার	ক্ ২৩৭	কিচু	ক্ ২৪২	কিমধিক	ক্ ২৩৭	কিলাস	ক্লৃ ২২২	কীর্ত্তিবন্ত	কৃৎ ২১৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
কীর্ত্তিবাস	কৃৎ	২১৩	কুঁড়ে	কট্	১৩৬	কুক্কুট	কুক্	১৯৩	কুজ্ঝাটি	কু	১৮৫	কুটুরি	কট্	১৩৬
কীর্ত্তিময়	কৃৎ	২১৩	কুঁড়ে	কণ্	১৪৩	কুক্কুট	কু	১৮৫	কুজ্ঝাটিকা	উৎ	৮৪	কুটুরে	কট্	১৩৬
কীর্ত্তিমান	কৃৎ	২১৩	কুঁড়ো	কণ্	১৪৩	কুক্কুভ	কু	১৮৫	কুজ্ঝাটী	কু	১৮৫	কুটে	কট্	১৩৬
কীর্ত্তিশেষ	কৃৎ	২১৩	কুঁত	কন্	১৫০	কুক্কুর	কু	১৮৫	কুজ্ঝান	কু	১৮৫	কুট্ট্	কট্	১৩৬
কীর্ত্তিস্তম্ভ	কৃৎ	২১৩	কুঁতকুত	কন্	১৫০	কুক্রিয়া	কু	১৮৫	কুঝটি(টী)	কু	১৮৫	কুট্টক	কট্	১৩৬
কীল	ক্	২৩৭	কুঁথ	কন্	১৫০	কুক্ষণ	কু	১৮৫	কুঞ্চন	কুচ্	১৯৪	কুট্টমিত	কট্	১৩৬
কীলাল	ক্	২৩৭	কুঁদ	কন্	১৫০	কুক্ষি	কশ্	১৭৮	কুঞ্জ	গু	২৮৩	কুট্টিত	কট্	১৩৬
কীলিকা	ক্	২৩৭	কুঁদ	কণ্	১৪৩	কুক্ষিগত	কশ্	১৭৩	কুঞ্জকানন	গু	২৮২	কুট্টিনী	কট্	১৩৬
কীলিত	ক্	২৩৭	কুঁদ	কু	১৮৫	কুক্ষিজ	কশ্	১৭৩	কুঞ্জদার	গু	২৮২	কুট্টিম	কট্	১৩৬
কীশ (কিশ্তি)	ক্	২৩৭	কুঁদা	কণ্	১৪৩	কুক্ষিম্ভরি	কশ্	১৭৮	কুঞ্জবন	গু	২৮৩	কুট্টিমা	কট্	১৩৬
কু	কু	১৮৭	কুঁদা	কন্	১৫০	কুখা	কুক্	১৯৩	কুঞ্জবাড়ী	গু	২৮২	কুট্মল	কট্	১৩৬
কুআ	কু	১৮৫	কুঁদান	কন্	১৫০	কুখ্যাতি	কু	১৮৫	কুঞ্জর	গু	২৮৩	কুঠ	কট্	১৩৬
কুআড়া	কু	১৮৫	কুঁদারু	কন্	১৫০	কুগ্রাম	কু	১৮৫	কুঞ্জি	গু	২৮২	কুঠর	কট্	১৩৬
কুআশা	কু	১৮৫	কুঁদুল	কন্	১৫০	কুঙর	কম্	১৫৪	কুঞ্জি	কুচ্	১৯৪	কুঠরি	কট্	১৩৬
কুঁকড়া	কু	১৮৫	কুঁদুলী	কন্	১৫০	কুঙ্কুম	কম্	১৫৪	কুট্	কট্	১৩৬	কুঠার	কট্	১৩৬
কুঁকড়া	কুচ্	১৯৪	কুঁদুলে	কন্	১৫০	কুচ	কুচ্	১৯৪	কুট	কট্	১৩৮	কুঠারি	কট্	১৩৬
কুঁকড়ান	কুচ্	১৯৪	কুঁদো	কন্	১৫০	কুচ-কাওয়াজ	কুচ্	১৯৪	কুট	কশ্	১৭৩	কুঠারিকা	কট্	১৩৬
কুঁকড়িমুকড়ি	কুচ্	১৯৪	কুঁদো	কণ্	১৪৩	কুচকুচ	কুচ্	১৯৪	কুঠ	কশ্	১৭৩	কুঠারী	কট্	১৩৬
কুঁখ	কশ্	১৭৩	কুঁপো	কু	১৮৫	কুচক্র	কু	১৮৫	কুটকচালীয়া	কট্	১৩৬	কুঠি(ঠী)	কট্	১৩৬
কুঁচ	কুচ্	১৯৪	কুঁয়া	কু	১৮৫	কুচক্রী	কু	১৮৫	কুটকচালে	কট্	১৩৬	কুঠী	কশ্	১৭৩
কুঁচকা	কুচ্	১৯৪	কুঁয়া	কুপ্	১৯৫	কুচট	কু	১৮৫	কুটকুট	কট্	১৩৬	কুঠিয়াল	কট্	১৩৬
কুঁচকি	কুচ্	১৯৪	কুঁস্তি	কন্	১৫০	কুচতট	কুচ্	১৯৪	কুটঙ্ক	কট্	১৩৬	কুঠুরে	কট্	১৩৬
কুঁচনী	কুচ্	১৯৪	কুআ	কশ্	১৭৩	কুচন্দন	কু	১৮৫	কুটজ	কট্	১৩৮	কুটে	কট্	১৩৬
কুঁচবক	কুচ্	১৯৪	কুকড়া	কু	১৮৫	কুচ(চু)নী	কুচ্	১৯৪	কুটন	কট্	১৩৬	কুঠে	কট্	১৩৬
কুঁচবক	ক্	২৩৭	কুকুড়া	কু	১৮৫	কুচবিহার	কুচ্	১৯৪	কুটনো-কোটা	কট্	১৩৬	কুঠেল	কট্	১৩৬
কুঁচা	কুচ্	১৯৪	কুকড়ো	কু	১৮৫	(কোচবিহার)	কুচ্	১৯৪	কুটপাট	কট্	১৩৬	কুড়	কট্	১৩৬
কুঁচি	কুচ্	১৯৪	কুকথা	কু	১৮৭	কুচমুখ	কুচ্	১৯৪	কুটরীয়া	কট্	১৩৬	কুড়	কশ্	১৭৩
কুঁচিয়া	কুচ্	১৯৪	কুকর	কু	১৮৫	কুচর্য্যা	কু	১৮৫	কুটা	কট্	১৩৬	কুড়কুড়ে	কট্	১৩৬
কুঁচিলা	কুচ্	১৯৪	কুকর্ম্ম	কু	১৮৫	কুচলা	কুচ্	১৯৪	কুটান	কট্	১৩৬	কুড়চি	কট্	১৩৬
কুঁচে	কুচ্	১৯৪	কুকর্ম্মিত	কু	১৮৫	কুচান	কুচ্	১৯৪	কুটি	কট্	১৩৬	কুড়(ড়া)ন	কট্	১৩৬
কুঁজ	কুচ্	১৯৪	কুকর্ম্মী	কু	১৮৫	কুচাল	কু	১৮৫	কুটিকুটি	কট্	১৩৬	কুড়প	কট্	১৩৬
কুঁজ	কু	১৮৫	কুকশিমা	কুক্	১৯৩	কুচি	কুচ্	১৯৪	কুটিত	কট্	১৩৬	কুড়ব	কট্	১৩৬
কুঁজা	কু	১৮৫	কুকশিমে	কুক্	১৯৩	কুচিক	কুচ্	১৯৪	কুটিনাটি(টী)	কট্	১৩৬	কুড়(ড়ো)বা	কট্	১৩৬
কুঁজড়া	কু	১৮৫	কুকা	কুক্	১৯৩	কুচিকুচি	কুচ্	১৯৪	কুটিনী	কট্	১৩৬	কুড়া	কট্	১৩৬
কুঁ(কু)জি	কুচ্	১৯৪	কু-কাটুনি	কু	১৮৫	কুচিলা	কুচ্	১৯৪	কুটিয়াল	কট্	১৩৬	কুড়া	কশ্	১৭৩
কুঁ(কু)জী	কু	১৮৫	কুকিল	কুক্	১৯৩	কুচেল	কু	১৮৫	কুটির	কট্	১৩৯	কুড়ালি	কট্	১৩৬
কুঁড়	কণ্	১৪৩	কুকুন্দর	কু	১৮৫	কুচ্ছ	কু	১৮৫	কুটিল	কট্	১৩৯	কুড়ি	কট্	১৩৬
কুঁড়	কথ্	১৪৭	কুকুভা	কু	১৮৫	কুচ্ছা	কু	১৮৫	কুটী	কট্	১৩৬	কুড়ি	কশ্	১৭৩
কুঁড়া	কণ্	১৪৩	কুকুয়া	কুক্	১৯৩	কুচ্ছিত	কু	১৮৫	কুটী(ঠী)য়া	কট্	১৩৬	কুড়ি(ড়ী)য়া	কশ্	১৭৩
কুঁড়াজালি	কণ্	১৪৩	কুকুর	কুক্	১৯৩	কুছ	ক্	২৩৭	কুটুকুটু	কট্	১৩৬	কুড়ী	কশ্	১৭৩
কুঁড়ি(ড়ী)	কণ্	১৪৩	কুকুল	কু	১৮৫	কুছাল	কু	১৮৫	কুটুম্ব	কট্	১৩৯	কুড়ি	কশ্	১৭৩
কুঁড়ি	কন্	১৫০	কুকুলা	কু	১৮৫	কুজ	কু	১৮৭	কুটুম্বিতা	কট্	১৩৬	কুড়ি(ড়ী)য়া	কশ্	১৭৩
কুঁড়িয়া	কণ্	১৪০	কুকূল	কু	১৮৫	কুজড়া	কু	১৮৫	কুটুম্বিনী	কট্	১৩৯	কুড়ী	কশ্	১৭৩
কুঁড়িয়া	কট্	১৩৬	কুকৃত্য	কু	১৮৫	কুজা	কু	১৮৭	কুটুরকাটুর	কট্	১৩৬	কুড়োজালি	কণ্	১৪০
কুঁড়িয়া	কণ্	১৪৩	কুকো	কুক্	১৯৩	কুজুড়া	কু	১৮৫	কুটুরকুটুর	কট্	১৩৬	কুড্মল	কট্	১৩৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
কুড্য	কুল্ ১৯৭	কুতুর	কিৎ ১৮৩	কুন্দকার	কন্ ১৫০	কুবাদ	কু ১৮৫	কুমেরু	কু ১৮৫
কুঢ়া	কণ্ ১৪০	কুতুহল	কিৎ ১৮৩	কুন্দন	কন্ ১৫০	কুবাদিনী	কু ১৮৫	কুম্প	কু ১৮৫
কুণ্	কণ্ ১৪৪	কুতূহল	কিৎ ১৮৩	কুন্দরকী	কন্ ১৫০	কুবিধা	কু ১৮৫	কুম্ব	কু ১৮৫
কুণপ	কণ্ ১৪৪	কুত্তা	কুক্ ১৯৩	কুন্দল	কন্ ১৫০	কুবিন্দ	কু ১৮৫	কুম্ভ	কু ১৯০
কুণপি (পী)	কণ্ ১৪৪	কুত্র	ক ২৩৭	কুন্দা	কন্ ১৫০	কুবুজ	কু ১৮৫	কুম্ভ	ক ২৩৭
কুণি	কণ্ ১৪০	কুথ	কু ১৮৫	কুন্দার	কন্ ১৫০	কুবুদ্ধি	কু ১৮৫	কুম্ভক	কু ১৯১
কুণোবেঙ	কণ্ ১৪০	কুথলী	কু ১৮৫	কুন্দিনী	কন্ ১৫০	কুবুধ	কু ১৮৫	কুম্ভকর্ণ	কু ১৯১
কুণ্ঠ্	কণ্ ১৪০	কুথা	ক ২৩৭	কুন্দু	কন্ ১৫০	কুবৃক্ষ	কু ১৮৫	কুম্ভকার	ক ২৩৭
কুণ্ঠ	কণ্ ১৪৪	কুথুমী	কথ্ ১৪৭	কুন্দুর	কন্ ১৫০	কুবৃত্তি	কু ১৮৫	কুম্ভকার	কু ১৯১
কুণ্ঠা	কণ্ ১৪৪	কুদাঁড়া	কু ১৮৫	কুন্দুরু	কন্ ১৫০	কুবের	কু ১৮৯	কুম্ভজ	ক ২৩৭
কুণ্ঠি	ক ২৩৭	কুদার	কু ১৮৫	কুন্দুরুকী	কন্ ১৫০	কুবোধ	কু ১৮৫	কুম্ভজ	কু ১৯১
কুণ্ঠিত	কণ্ ১৪৪	কুদাল	কু ১৮৫	কুন্দুলী	কন্ ১৫০	কুব্জ	কু ১৮৯	কুম্ভজন্মা	কু ১৯১
কুণ্ড্	কণ্ ১৪০	কুদিন	কু ১৮৫	কুপ্	কুপ্ ১৯৫	কুভোজন	কু ১৮৫	কুম্ভদাসী	কু ১৮৫
কুণ্ড	কণ্ ১৪৫	কুদৃষ্ট	কু ১৮৫	কুপ	কুপ্ ১৯৫	কুমকুম	কম্ ১৫৪	কুম্ভমণ্ডুক	কু ১৮৫
কুণ্ডল	কণ্ ১৪৫	কুদৃষ্টি	কু ১৮৫	কুপট্ট	কু ১৮৫	কুমড়া	কু ১৮৫	কুম্ভমেলা	কু ১৯১
কুণ্ডলা	কণ্ ১৪৫	কুদেশ	কু ১৮৫	কুপথ্য	কু ১৮৫	কুমণ্ডল	কম্ ১৫৪	কুম্ভযোনি	কু ১৯১
কুণ্ডলি	কণ্ ১৪৫	কুদ্দার	কু ১৮৫	কুপন্থা	কু ১৮৫	কুমতি	কু ১৮৫	কুম্ভলগ্ন	কু ১৮৫
কুণ্ডলিত	কণ্ ১৪০	কুদ্দাল	কু ১৮৫	কুপা	কুপ্ ১৯৫	কুমৎলব	কু ১৮৫	কুম্ভশালা	কু ১৮৫
কুণ্ডলিনী	কণ্ ১৪৬	কুধারা	কু ১৮৫	কুপাক	কু ১৮৫	কুমন্ত্র	কু ১৮৫	কুম্ভসম্ভব	কু ১৯১
কুণ্ডলিয়া	কণ্ ১৪৬	কুধী	কু ১৮৫	কুপাণি	কু ১৮৫	কুমর	কম্ ১৫৪	কুম্ভাণ্ড	কু ১৮৫
কুণ্ডলী	কণ্ ১৪০	কুন	ক ২৩৭	কুপাত	কু ১৮৫	কুমাতা	কু ১৮৫	কুম্ভার	কু ১৮৫
কুণ্ডা	কণ্ ১৪৫	কুনকি(কী)	কু ১৮৫	কুপি	কুপ্ ১৯৫	কুমার	কু ১৯০	কুম্ভিকা	কু ১৮৫
কুণ্ডাশী	কণ্ ১৪৬	কুনকুন	কু ১৮৭	কুপিত	কুপ্ ১৯৫	কুমার	কম্ ১৫৪	কুম্ভি(ম্ভী)রিকা	কু ১৮৫
কুণ্ডিকা	কণ্ ১৪৫	কুনখ	কু ১৮৫	কুপিনী	কুপ্ ১৯৫	কুমারঘাতী	কম্ ১৫৪	কুম্ভিল	কু ১৯১
কুণ্ডিন	কণ্ ১৪৬	কুনজর	কু ১৮৫	কুপিন্দ	কু ১৮৫	কুমারব্রত	কম্ ১৫৪	কুম্ভিলক	কু ১৯১
কুণ্ডিননগরী	কণ্ ১৪৬	কুনট	কু ১৮৫	কুপুত	কু ১৮৫	কুমারব্রহ্মচারী	কম্ ১৫৪	কুম্ভী	কু ১৯২
কুণ্ডী	কণ্ ১৪৫	কুনদিকা	কু ১৮৫	কুপুত্র	কু ১৮৫	কুমারভৃত্যা	কু ১৯০	কুম্ভীনস	কু ১৯২
কুণ্ডু	কণ্ ১৪৬	কুনদী	কু ১৮৫	কুপুরুষ	কু ১৮৫	কুমারসম্ভব	কু ১৯০	কুম্ভীপাক	কু ১৮৫
কুণ্ডলি(লী)	কণ্ ১৪০	কুনা	কু ১৮৫	কুপুষ্যি	কু ১৮৫	কুমারিকা	কম্ ১৫৪	কুম্ভীর	ক ২৩৭
কুণ্ডোধ্নী	কণ্ ১৪০	কুনাথ	কু ১৮৫	কুপিল	কুপ্ ১৯৫	কুমারিয়া	কু ১৮৫	কুম্ভীর(ল)	কু ১৯২
কুৎরি	কম্ ১৫৪	কুনাম	কু ১৮৫	কুপো	কুপ্ ১৯৫	কুমারী	কম্ ১৫৪	কুম্ভীরাশ্রু	কু ১৮৫
কুৎস্	কিৎ ১৮৩	কুনি	কণ্ ১৪০	কুপোকাত	কুপ্ ১৯৫	কুমীর	কু ১৯০	কুম্ভীরিণী	কু ১৮৫
কুৎসন	কিৎ ১৮৩	কুনিকা	কু ১৮৫	কুপোষ্য	কু ১৮৫	কুমীরেপোকা	কু ১৮৫	কুম্ভীলক	ক ২৩৭
কুত	কিৎ ১৮৩	কুনীতি	কু ১৮৫	কুপ্পর	কু ১৮৫	কুমুদ	কু ১৯০	কুয়র	কম্ ১৫৪
কুতঃ	ক ২৩৭	কুনিবুনি	কু ১৮৫	কুপ্য	কুপ্ ১৯৫	কুমুদ	— ১৯৩	কুয়া	কশ্ ১৭৩
কুতকাত	কিৎ ১৮৩	কুনুকুনু	কু ১৮৫	কুপ্য	গুপ্ ২৮৮	কুমুদবতী	কু ১৯৩	কুয়া	কশ্ ১৭৩
কুত(দ)ঘাট	কিৎ ১৮৩	কুন্ত	কু ১৮৭	কুর্পর	কু ১৮৫	কুমুদবাঞ্ছা	কু ১৯৩	কুয়া	কু ১৮৫
কুতন্ত্রী	কু ১৮৫	কুন্তল	কু ১৮৮	কুপ্লব	কু ১৮৫	কুমুদাকর	কু ১৮৫	কুয়াসা	কু ১৮৫
কুতপ	কু ১৮৭	কুন্তি	কু ১৮৫	কুবঙ্গ	কু ১৮৫	কুমুদাবাস	কু ১৮৫	কুযোগ	কু ১৮৫
কুতর্ক	কু ১৮৫	কুন্তী	কু ১৮৮	কুবল	কু ১৮৫	কুমুদিনী	কু ১৯০	কুর	ক ২০০
কুতার্কিক	কু ১৮৫	কুন্থ্	কন্ ১৫০	কুবলয়	কু ১৮৮	কুমুদিনীনায়ক	কু ১৮৫	কুরকার	ক ২০০
কুতুক	কিৎ ১৮৩	কুন্থ	কন্ ১৫০	কুবলয়াপীড়	কু ১৮৮	কুমুদিনীপতি	কু ১৯৩	কুরকুটে	ক ২০০
কুতুকুতু	কিৎ ১৮৩	কুন্থন	কন্ ১৫০	কুবলয়িত	কু ১৮৫	কুমুদী	কু ১৮৫	কুরকুর	ক ২০০
কুতুরকাতুর	কিৎ ১৮৩	কুন্দ	কন্ ১৫০	কুবলাশ্ব	কু ১৮৮	কুমুদেশ	কু ১৮৫	কুরঙ্গ	কৃ ২১৩
কুতুপ	কিৎ ১৮৩	কুন্দকর	কন্ ১৫০	কুবাট	কু ১৮৫	কুমুদ্বান	কু ১৮৫	কুরঙ্গগঞ্জন	কৃ ২১১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
কুরঙ্গনয়না	কৃ ২১১	কুল্	কুল্ ১৯৭	কুলদীপ	কুল্ ১৯৭	কুলভূভৃৎ	কুল্ ১৯৭	কুলী	কুল্ ১৯৭
কুরঙ্গনাভি	কৃ ২১১	কুল	কুল্ ১৯৭	কুলদীপক	কুল্ ১৯৭	কুলভূষণ	কুল্ ১৯৭	কুলী	কু ১৮৫
কুরঙ্গনেত্রা	কৃ ২১১	কুল(লু)ইচণ্ডী	কুল্ ১৯৭	কুলদূষণ	কুল্ ১৯৭	কুলভ্রষ্ট	কুল্ ১৯৭	কুলীন	কুল্ ১৯৭
কুরঙ্গম	কৃ ২১৩	কুল-ওঝা	কুল্ ১৯৭	কুলদেবতা	কুল্ ১৯৮	কুলমজানী	কুল্ ১৯৭	কুলুকুলু	কুল্ ১৯৭
কুরঙ্গমদ	কৃ ২১১	কুলক	কুল্ ১৯৭	কুলধন	কুল্ ১৯৭	কুলমর্য্যাদা	কুল্ ১৯৭	কুলুত	কুল্ ১৯৭
কুরঙ্গলাঞ্ছন	কৃ ২১১	কুলকজ্জল	কুল্ ১৯৭	কুলধনী	কুল্ ১৯৭	কুলযোষিৎ	কুল্ ১৯৭	কুলুপ	কু ১৮৫
কুরঙ্গিণী	কৃ ২১১	কুলকণ্টক	কুল্ ১৯৭	কুলধর্ম্ম	কুল্ ১৯৮	কুললক্ষণ	কুল্ ১৯৭	কুলুপিয়া	কু ১৮৫
কুরচি(চী)	কশ্ ১৭৩	কুলকন্যকা	কুল্ ১৯৭	কুলধারক	কুল্ ১৯৭	কুলশীল	কুল্ ১৯৭	কুলুপী	কু ১৮৫
কুরচি	কট্ ১৩৬	কুলকন্যা	কুল্ ১৯৭	কুলধুরন্ধর	কুল্ ১৯৭	কুলশৈল	কুল্ ১৯৭	কুলেখাড়া	কুল্ ১৯৭
কুরচি	কুল্ ১৯৭	কুলকর	কুল্ ১৯৭	কুলধুর্য্য	কুল্ ১৯৭	কুলসংখ্যা	কুল্ ১৯৭	কুলেশ্বর	কুল্ ১৯৭
কুর(রু)ণী	ক ২০০	কুলকর্ত্তা	কুল্ ১৯৭	কুলনক্ষত্র	কুল্ ১৯৭	কুলসন্ততি	কুল্ ১৯৭	কুলোদ্ভব	কুল্ ১৯৭
কুরনি	ক ২০০	কুলকর্ম্ম	কুল্ ১৯৭	কুলনন্দন	কুল্ ১৯৭	কুলসম্ভব	কুল্ ১৯৭	কুলোদ্ভূত	কুল্ ১৯৭
কুরণ্ড	ক ২০০	কুলকলঙ্ক	কুল্ ১৯৭	কুলনায়িকা	কুল্ ১৯৭	কুলসেবক	কুল্ ১৯৭	কুলোদ্বাহ	কুল্ ১৯৭
কুরতি	ক ২০০	কুলকলঙ্কিনী	কুল্ ১৯৭	কুলনারী	কুল্ ১৯৭	কুলস্ত্রী	কুল্ ১৯৭	কুল্য	কুল্ ১৯৭
কুরতি	কুল্ ১৯৭	কুলকামিনী	কুল্ ১৯৭	কুলনাশ	কুল্ ১৯৭	কুলস্থান	কুল্ ১৯৭	কুল্ম	ক ২০০
কুর্ত্তি	ক ২০০	কুলকুচা	কুল্ ১৯৭	কুলপঞ্জী	কুল্ ১৯৭	কুলস্থিতি	কুল্ ১৯৭	কুম্লান	কণ্ ১৪০
কুরব	কৃ ২০০	কুলকুচো	কুল্ ১৯৭	কুলপতন	কুল্ ১৯৭	কুলহীন	কুল্ ১৯৭	কুল্লে	কুল্ ১৯৭
কুর(রু)বক	ক ২০০	কুলকুণ্ডলিনী	কুল্ ১৯৮	কুলপতি	কুল্ ১৯৭	কুলা	কুল্ ১৯৭	কুল্লোল	কুল্ ১৯৭
কুরবানী	ক ২০০	কুলকুণ্ডলী	কুল্ ১৯৮	কুলপর্ব্বত	কুল্ ১৯৮	কু(কূ)লা	কুল্ ১৯৭	কূল	কুল্ ১৯৭
কুরর	ক ২০০	কুলকুল	কুল্ ১৯৭	কুলপাংশন	কুল্ ১৯৭	কুলাঙ্কুর	কুল্ ১৯৭	কুশ	কশ্ ১৭৮
কুরল	ক ২০০	কুলক্রমাগত	কুল্ ১৯৭	কুলপাঁজী	কুল্ ১৯৭	কুলাঙ্গনা	কুল্ ১৯৭	কুশকতি	কশ্ ১৭৩
কুরস	ক ২০০	কুলক্রিয়া	কুল্ ১৯৭	কুল(লো)পানা	কুল্ ১৯৭	কুলাঙ্গার	কুল্ ১৯৭	কুশচীর	কশ্ ১৭৩
কুরী	ক ২০০	কুলক্ষণ	কু ১৮৫	কুলপালক	কুল্ ১৯৭	কুলাচল	কুল্ ১৯৮	কুশ(শু)ড়ি	কশ্ ১৭৩
কুরু	ক ২০৮	কুলক্ষয়	কুল্ ১৯৭	কুলপুত	কুল্ ১৯৭	কুলাচার	কুল্ ১৯৭	কুশণ্ডি	কশ্ ১৭৩
কুরুক্ষেত্র	ক ২০৮	কুলখাকী	কুল্ ১৯৭	কুলপুত্র	কুল্ ১৯৭	কুলাচার্য্য	কুল্ ১৯৭	কুশণ্ডিকা	কশ্ ১৭৩
কুরুক্ষেত্রীযোগ	ক ২০০	কুলখাগী	কুল্ ১৯৭	কুলপৈত	কুল্ ১৯৭	কুলাচি	কুল্ ১৯৭	কুশধ্বজ	কশ্ ১৭৮
কুরুচি	কৃ ২০০	কুলগিরি	কুল্ ১৯৮	কুলপৈত	কথ্ ১৪৭	কুলাদ্রি	কুল্ ১৯৮	কুশনাভ	কশ্ ১৭৯
কুরুজাঙ্গল	ক ২০৯	কুলগুরু	কুল্ ১৯৭	কুলপৈত	ক ২৩৭	কুলান(নো)	কুল্ ১৯৭	কুশপত্র	কশ্ ১৭৩
কুরুণ্ট	ক ২০০	কুলঘ্ন	কুল্ ১৯৭	কুলপ্রদীপ	কুল্ ১৯৭	কুলান্ত	কুল্ ১৯৭	কুশপুতুল	কশ্ ১৭৯
কুরুণ্টক	ক ২০০	কুল(লু)ঙ্গি	কুল্ ১৯৭	কুলপ্রশস্তি	কুল্ ১৯৭	কুলান্বয়	কুল্ ১৯৭	কুশপুত্তলিকা	কশ্ ১৭৯
কুরুণ্ডিয়া	ক ২০০	কুল(লু)ঙ্গী	কুল্ ১৯৭	কুলপ্রসূত	কুল্ ১৯৭	কুলাপীড়	কুল্ ১৯৭	কুশপা	কশ্ ১৭৩
কুরুণ্ডে	ক ২০০	কুলচূর	কুল্ ১৯৭	কুলবতী	কুল্ ১৯৭	কুলাভিমান	কুল্ ১৯৭	কুশপেয়ে	কশ্ ১৭৩
কুরুয়া	ক ২০০	কুলজ	কুল্ ১৯৭	কুলবধূ	কুল্ ১৯৭	কুলায়	কুল্ ১৯৮	কুশবটু	কশ্ ১৭৩
কুরুরাজ	ক ২০০	কুলজন	কুল্ ১৯৭	কুলবনিতা	কুল্ ১৯৭	কুলায়িকা	কুল্ ১৯৮	কুশর	কশ্ ১৭৩
কুরুরায়	ক ২০০	কুলজি(জী)	কুল্ ১৯৭	কুলবন্ত	কুল্ ১৯৭	কুলাল	কুল্ ১৯৭	কুশল	কশ্ ১৭৯
কুরূদ্বহ	ক ২০০	কুলজ্ঞী	কুল্ ১৯৭	কুলবর্দ্ধন	কুল্ ১৯৭	কুলি	কু ১৮৫	কুশলব	কশ্ ১৭৩
কুরূপ	কৃ ২০০	কুলট	কুল্ ১৯৭	কুলবহু	কুল্ ১৯৭	কুলিক	কুল্ ১৯৭	কুশলিত	কশ্ ১৭৩
কুরূপ্য	কৃ ২০০	কুলটা	কুল্ ১৯৭	কুলবান	কুল্ ১৯৭	কুলিঙ্গ	কুল্ ১৯৭	কুশলী	কশ্ ১৭৩
কুর্কুর	ক ২০০	কুলটী	কুল্ ১৯৭	কুলবালা	কুল্ ১৯৭	কুলিতা	কুল্ ১৯৭	কুশাগ্র	কশ্ ১৭৩
কুর্দ্দ	ক ২০০	কুলতন্ত্র	কুল্ ১৯৭	কুলবিদ্যা	কুল্ ১৯৭	কুলিয়ে-যাওয়া	কুল্ ১৯৭	কুশাঙ্কুর	কশ্ ১৭৩
কু(কূ)র্দ্দন	ক ২০০	কুলতি	কুল্ ১৯৭	কুলবিপ্র	কুল্ ১৯৭	কুলিয়াখাড়া	কুল্ ১৯৭	কুশাঙ্গুরী	কশ্ ১৭৩
কুর্দ্দন	ক্রীড় ২২১	কুলতিথি	কুল্ ১৯৭	কুলব্রত	কুল্ ১৯৭	কুলি(লী)র	কুল্ ১৯৭	কুশাবতী	কশ্ ১৭৩
কু(কূ)র্পর	ক ২০০	কুলতিলক	কুল্ ১৯৭	কুলভব	কুল্ ১৯৭	কুলি(লী)রক	কুল্ ১৯৭	কুশারি(রী)	কশ্ ১৭৩
কু(কূ)র্পাস	ক ২০০	কুলথ	কুল্ ১৯৭	কুলভার্য্যা	কুল্ ১৯৭	কুলি(লী)শ	কুল্ ১৯৭	কুশাসন	কশ্ ১৭৩
কু(কূ)র্পাসক	ক ২০০	কুলত্রাণ	কুল্ ১৯৭	কুলভি	কুল্ ১৯৭	কুলিশী	কুল্ ১৯৭	কুশি(শী)	কশ্ ১৭৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
কুশিক	কশ্ ১৭৩	কুসুমাঞ্জলি	কশ্ ১৭৩	কূটকারক	কট্ ১৩৬	কৃৎস্ন	কৃৎ ২১৩	কৃতান্ত	কৃ ২১০
কুশিয়ারি	কশ্ ১৭৩	কুসুমাপীড়	কশ্ ১৭৩	কূটজ	কট্ ১৩৬	কৃত	কৃ ২০৯	কৃতান্তদলনী	কৃ ২০০
কুশী	কশ্ ১৭৩	কুসুমায়ুধ	কশ্ ১৭৩	কূটতুলা	কট্ ১৩৬	কৃতক	কৃ ২০০	কৃতান্ন	কৃ ২০০
কুশী(সী)দ	কশ্ ১৭৯	কুসুমাসব	কশ্ ১৭৩	কূটপাশ	কট্ ১৩৬	কৃতকর্ম্মা	কৃ ২০০	কৃতাভিষেক	কৃ ২০০
কুশীলব	কশ্ ১৭৯	কুসুমাসার	কশ্ ১৭৩	কূটবন্ধ	কট্ ১৩৬	কৃতকাম	কৃ ২০০	কৃতার্থ	কৃ ২০০
কুশুম-কুশুম	কশ্ ১৭৯	কুসুমাস্তরণ	কশ্ ১৭৩	কূটব্যবহারী	কট্ ১৩৬	কৃতকার্য্য	কৃ ২০০	কৃতালয়	কৃ ২০০
কুশূল	কশ্ ১৭৯	কুসুমাস্ত্র	কশ্ ১৮০	কূটমান	কট্ ১৩৬	কৃতকাল	কৃ ২০০	কৃতাস্ত্র	কৃ ২০০
কুশেশয়	কশ্ ১৭৩	কুসুমি(মী)	কশ্ ১৭৩	কূটযন্ত্র	কট্ ১৩৬	কৃতকৃতার্থ	কৃ ২০০	কৃতাহ্বান	কৃ ২০০
কুশের	কশ্ ১৭৩	কুসুমিত	কশ্ ১৭৩	কূটযুদ্ধ	কট্ ১৩৬	কৃতকৃত্য	কৃ ২০৯	কৃতি	কৃ ২০০
কুশো	কশ্ ১৭৩	কুসুমেষু	কশ্ ১৭৩	কূটযোধী	কট্ ১৩৬	কৃতকৌতুকমঙ্গল	কৃ ২০০	কৃতিত্ব	কৃ ২০০
কুশোদক	কশ্ ১৭৩	কুসুম্ভ	কশ্ ১৭৩	কূটলেখ	কট্ ১৩৬	কৃতক্রিয়	কৃ ২০০	কৃতী	কৃ ২০০
কুষ্	কশ্ ১৭৩	কুসুম্ভা	কশ্ ১৭৩	কূটলেখ্য	কট্ ১৩৬	কৃতক্ষণ	কৃ ২০০	কৃতোদক	কৃ ২০০
কুষি(ষী)	কশ্ ১৭৩	কুসুরো	কু ১৮৫	কূটশাল্মলী	কট্ ১৩৬	কৃতঘ্ন	কৃ ২০৯	কৃতোদ্বাহ	কৃ ২০০
কুষ্ঠ	কশ্ ১৭৯	কুস্তি	কশ্ ১৭৩	কূটশাসন	কট্ ১৩৬	কৃতজন্মা	কৃ ২০০	কৃতোপকার	কৃ ২০০
কুষ্ঠঘ্ন	কশ্ ১৮০	কুস্তী	কশ্ ১৭৩	কূটসাক্ষী	কট্ ১৩৬	কৃতজ্ঞ	কৃ ২১০	কৃতোপভোগ	কৃ ২০০
কুষ্ঠারি	কশ্ ১৮০	কুস্থান	কু ১৮৫	কূটস্থ	কট্ ১৩৯	কৃততীর্থ	কৃ ২০০	কৃত্ত	কৃৎ ২১৪
কুষ্ঠিত	কশ্ ১৭৩	কুহ্	কু ১৮৫	কূটস্বর্ণ	কট্ ১৩৬	কৃতদার	কৃ ২০০	কৃত্তিকা	কৃৎ ২১৪
কুষ্ঠি	কশ্ ১৭৩	কুহ	কু ১৯২	কূটাক্ষ	কট্ ১৩৬	কৃতদাস	কৃ ২১০	কৃত্তিবাস	কৃৎ ২১৩
কু(কো)ষ্ঠী	কশ্ ১৭৩	কুহক	কু ১৯২	কূটাগার	কট্ ১৩৬	কৃতধী	কৃ ২০০	কৃত্তিবাসাঃ	কৃৎ ২১৩
কু(কূ)ষ্মাণ্ড	কশ্ ১৮০	কুহকজীবী	কু ১৮৫	কূটার্থ	কট্ ১৩৬	কৃতনিশ্চয়	কৃ ২০০	কৃত্য	কৃ ২০০
কুষ্মাণ্ডা	নু ৬৬০	কুহকী	কু ১৯২	কূণিকা	কণ্ ১৪০	কৃতপূর্ব্ব	কৃ ২০০	কৃত্যবিৎ(দ)	কৃ ২০০
কুসংস্কার	কু ১৮৫	কুহর	কু ১৮৫	কূপ	কুপ্ ১৯৫	কৃতবর্ম্মা	কৃ ২১০	কৃত্যা	কৃ ২০০
কুসরিৎ	কু ১৮৫	কুহরিত	কু ১৮৫	কূপ	কশ্ ১৭৩	কৃতবিদ্য	কৃ ২০০	কৃত্যাকৃত্য	কৃ ২০০
কুসিয়ার	কশ্ ১৭৩	কুহা	কু ১৮৫	কূপক	কশ্ ১৭৩	কৃতবীর্য্য	কৃ ২১০	কৃত্রিম	কৃ ২১৪
কুসীদক	কশ্ ১৭৩	কুহু(হূ)	কু ১৮৫	কূপক	কুপ্ ১৯৫	কৃতবুদ্ধি	কৃ ২০০	কৃত্রিমপুত্র	কৃ ২০০
কুসীদবৃদ্ধি	কশ্ ১৭৩	কুহুকুহরিত	কু ১৮৫	কূপকচ্ছপ	কুপ্ ১৯৫	কৃতবেতন	কৃ ২০০	কৃত্রিমবন	কৃ ২০০
কুসীদব্যবহার	কশ্ ১৭৩	কুহুড়া	কু ১৮৫	কূপদর্দ্দুর	কুপ্ ১৯৫	কৃতবেদী	কৃ ২০০	কৃদন্ত	কৃৎ ২১৩
কুসীদিক	কশ্ ১৭৩	কুহুতান	কু ১৮৫	কূপমণ্ডুক	কুপ্ ১৯৫	কৃতবেশ	কৃ ২০০	কৃন্তন	কৃৎ ২১৩
কুসুম	কশ্ ১৮০	কুহুনিশি	কু ১৮৫	কূপযন্ত্র	কুপ্ ১৯৫	কৃতমতি	কৃ ২০০	কৃপ্	কৃপ্ ২১৪
কুসুম-কুসুম	কশ্ ১৭৯	কুহুযামিনী	কু ১৮৫	কূবর	কুপ্ ১৯৫	কৃতযুগ	কৃ ২০৯	কৃপ	কৃপ্ ২১৪
কুসুমগাই	কশ্ ১৭৩	কুহুরজনী	কু ১৮৫	কূয়া	কশ্ ১৭৩	কৃতলক্ষণ	কৃ ২০০	কৃপণ	কৃপ্ ২১৫
কুসুমবড়ী	কশ্ ১৭৩	কুহুরব	কু ১৮৫	কূ(কু)রুম	কুপ্ ১৯৫	কৃতশিল্প	কৃ ২০০	কৃপা	কৃপ্ ২১৪
কুসুমবাণ	কশ্ ১৭৩	কুহুরি	কু ১৮৫	কূর্চ্চ	কৃ ২০০	কৃতশৌচ	কৃ ২০০	কৃপাণ	কৃপ্ ২১৫
কুসুমবান	কশ্ ১৭৩	কুহেড়িকা	কু ১৮৫	কূর্ম্ম	কুপ্ ১৯৫	কৃতশ্রম	কৃ ২০০	কৃপাদায়	কৃপ্ ২১৪
কুসুমবাসর	কশ্ ১৭৩	কুহেড়ী	কু ১৮৫	কূর্ম্মপৃষ্ঠ	কুপ্ ১৯৫	কৃতসংজ্ঞ	কৃ ২০০	কৃপাবলোকন	কৃপ্ ২১৪
কুসুমবিহার	কশ্ ১৭৩	কুহেলিকা	কু ১৮৫	কূর্ম্মাবতার	কুপ্ ১৯৬	কৃতসংস্কার	কৃ ২০০	কৃপমই	কৃপ্ ২১৪
কুসুমবৃষ্টি	কশ্ ১৭৩	কুহেলি	কু ১৮৫	কূল	কুল্ ১৯৯	কৃতসঙ্কল্প	কৃ ২০০	কৃপালু	কৃপ্ ২১৪
কুসুমশয়ন	কশ্ ১৭৩	কুহেলী	কু ১৮৫	কূহা	কু ১৮৫	কৃতসঙ্কেত	কৃ ২০০	কৃপিণ(ন)	কৃপ্ ২১৪
কুসুমশয্যা	কশ্ ১৭৩	কূচ	কু ১৮৫	কৃ	কৃ ২০১	কৃতহস্ত	কৃ ২০০	কৃ(ক্রি)মি	ক্রম্ ২১৯
কুসুমশর	কশ্ ১৮০	কূজ্	কৃ ১৮৫	কৃকলাস	কৃ ২৪৬	কৃতা	কৃ ২০০	কৃমিঘ্ন	ক্রম্ ২১৯
কুসুমশা(সা)য়ক	কশ্ ১৮০	কূজ	কু ১৮৫	কৃকবাকু	কৃ ২০০	কৃতাকৃত	কৃ ২০০	কৃশ্	কৃশ্ ২১৫
কুসুমশালি	কশ্ ১৭৩	কূজন	কু ১৯২	কৃচ্ছ্র	কৃ ২০৯	কৃতাঙ্ক	কৃ ২০০	কৃশ	কৃশ্ ২১৫
কুসুমসুন্দরী	কশ্ ১৭৩	কূজন	কৃ ২৩৭	কৃচ্ছিত	কৃ ২০০	কৃতাঞ্জলি	কৃ ২০০	কৃশর	কৃশ্ ২১৫
কুসুমস্তবক	কশ্ ১৭৩	কূট্	কট্ ১৩৬	কৃচ্ছ্রসাধন	কৃ ২০৯	কৃতাঞ্জলিপুট	কৃ ২০০	কৃশাঙ্গ	কৃশ্ ২১৫
কুসুমাকর	কশ্ ১৭৩	কূট	কট্ ১৩৯	কৃৎ	কৃৎ ২১৩	কৃতাত্মা	কৃ ২০০	কৃশানু(ণু)	কৃশ্ ২১৫

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
কৃশাশ্ব	কৃশ্ ২১৬	কেঁচিয়ে যাওয়া	কঞ্চ্ ১৩৫	কেতু	কিৎ ১৮৪	কেরল	কৃ ২১৭	কেশুরিয়া	কশ্ ১৭৩
কৃশোদর	কৃশ্ ২১৫	কেঁচুয়া	কৃ ২৩৭	কেতুধর্মা	কিৎ ১৮৩	কেরাঞ্চি(ঞ্চী)	কৃ ২০০	কেশুরতে	কশ্ ১৭৩
কৃষ্	কৃশ্ ২১৫	কেঁচো	কৃ ২৩৭	কেতুমতি(তী)	কিৎ ১৮৩	কেরানি	কৃ ২০০	কেষ্ট	কৃশ্ ১৭৩
কৃষক	কৃশ্ ২১৬	কেঁটকেঁটে	কট্ ১৩৬	কেতুমান	কিৎ ১৮৩	কেরামত	কৃ ২০০	কেহ	কৃ ২৩৭
কৃষাণ	কৃশ্ ২১৬	কেঁটেকেঁটে	কট্ ১৩৬	কেতুমাল	কিৎ ১৮৪	কেরায়া	কৃ ২০০	কেহন	কৃ ২৩৭
কৃষি	কৃশ্ ২১৫	কেঁড়ে	কন্ ১৫০	কেত্তা	কৃ ২৩৭	কেরাল	কৃ ২৩৭	কেহু	কৃ ২৩৭
কৃষী	কৃশ্ ২১৫	কেঁড়েলি(লী)	কণ্ ১৪০	কেদার	কৃ ২৩৭	কেরুআ(বা)ল	কৃ ২০০	কেহো	কৃ ২৩৭
কৃষীবল	কৃশ্ ২১৫	কেঁদ	কক্ ১২৮	কেদারা	কৃ ২৩৭	কেরে	ঋ ১১৩	কেহেন	কৃ ২৩৭
কৃষ্ট	কৃশ্ ২১৬	কেঁদ	কৃ ২৩৭	কেদারিকা	কৃ ২৩৭	কেরে	কৃ ২৩৭	কেহ্ন	কৃ ২৩৭
কৃষ্টি	কৃশ্ ২১৬	কেঁদু	কৃ ২৩৭	কেন	কৃ ২৪৩	কেরোয়াল	কৃ ২০০	কেহ্নে	কৃ ২৩৭
কৃষ্ণ	কৃশ্ ২১৬	কেঁদুয়া	কৃ ২০০	কেন-উপনিষদ	কৃ ২৪৩	কেল্	ক৯প্ ২১৭	কেহ্মাতে	কৃ ২৩৭
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন	কৃশ্ ২১৫	কেঁদো	কৃ ২০০	কেনমণে	কৃ ২৩৭	কেল	ক৯প্ ২১৭	কৈ	কৃ ২৩৭
কৃষ্ণল	কৃশ্ ২১৫	কেঁয়ে	কৃপ্ ২১৪	কেনমতে	কৃ ২৩৭	কেলি	ক৯প্ ২১৮	কৈকয়	কৃ ২৪৪
কৃষ্ণশা(সা)র	কৃশ্ ২১৭	কে	কিৎ ১৮৩	কেনা	ক্রী ২২০	কেলে	কৃশ্ ২১৫	কৈকসী	কৃ ২৪৪
কৃষ্ণাগুরু	কৃশ্ ২১৫	কেওড়া	কিৎ ১৮৩	কেনাকাটা	ক্রী ২২০	কেলেঙ্কার	কল্ ১৬৪	কৈকেয়	কৃ ২৪৪
কৃষ্ণাজিন	কৃশ্ ২১৫	কেওদা	কৃ ২০০	কেনাকাটি	ক্রী ২২০	কেলেদ	ক্ল ২২২	কৈকেয়ী	কৃ ২৪৪
কৃষ্ণায়স	কৃশ্ ২১৫	কেওয়া	কিৎ ১৮৩	কেনাবেচা	ক্রী ২২০	কেলেন	কৃ ২৩৭	কৈছন	কৃ ২৩৭
কৃষ্ণাশ্রিত	কৃশ্ ২১৫	কেকয়	কৃ ২৪৩	কেনারাম	ক্রী ২২০	কেলেসোনা	কৃশ্ ২১৫	কৈটভ	কৃ ২৪৪
কৃষ্ণাষ্টমী	কৃশ্ ২১৫	কেকর	কৃ ২৩৭	কেনি	কৃ ২৩৭	কেলেহাঁড়ি	কৃশ্ ২১৫	কৈতক	কিৎ ১৮৩
কৃষ্ণেক্ষু	কৃশ্ ২১৫	কেকা	কৃ ২৪৩	কেনিপাত	কৃ ২৩৭	কেল্লা	কল্ ১৬৪	কৈতব	কিৎ ১৮৪
কৃসর	কৃশ্ ২১৫	কেকী	কৃ ২৪৩	কেনুয়া	কন্ ১৫০	কেল্লাদার	কল্ ১৬৪	কৈতবিনী	কিৎ ১৮৪
কৃসর	কৃ ২০০	কেকৈ	কৃ ২৩৭	কেনে	কৃ ২৩৭	কেল্লাদারী	কল্ ১৬৪	কৈন্যা	কন্ ১৫০
কৃসান	কৃশ্ ২১৫	কেঙ	কৃ ২৩৭	কেন্দা	কৃ ২৩৭	কেশ্	কশ্ ১৮০	কৈন্থা	কম্ ১৫৪
কৄ	কৄ, ২১১	কেঙদা	কৃ ২০০	কেন্দু	কৃ ২৩৭	কেশপক্ষ	কশ্ ১৭৩	কৈবর্ত্ত	কৃ ২৪৫
ক৯প্	ক৯প্ ২১৭	কেচরা	কচ্ ১৩১	কেন্দু	কক্ ১২৮	কেশপাশ	কশ্ ১৭৩	কৈবর্ত্তিনী	কৃ ২৩৭
ক৯প্ত	ক৯প্ ২১৭	কেচা-কেচা	কচ্ ১৩১	কেন্দুক	কৃ ২৩৭	কেশব	কশ্ ১৮১	কৈবল্য	কৃ ২৪৩
কে	কৃ ২৩৭	কেচিত	কৃ ২৩৭	কেন্দ্র	কৃ ২৪৩	কেশভার	কশ্ ১৭৩	কৈবল্যধাম	কৃ ২৪৩
কেউ	কৃ ২৩৭	কেচো	কচ্ ১৩১	কেন্দ্রিত	কৃ ২৩৭	কেশ(স)র	কশ্ ১৮১	কৈরব	কৃ ২৩৭
কেউকেটা	কৃ ২৩৭	কেচ্ছা	কিৎ ১৮৩	কেন্দ্রী	কৃ ২৩৭	কেশরচনা	কশ্ ১৭৩	কৈল	ক৯প্ ২১৭
কেউটিয়া	কৃ ২৩৭	কেজো	কৃ ২০০	কেন্ন	কর্ণ্ ১৬০	কেশরঞ্জন	কশ্ ১৭৩	কৈলাস	ক৯প্ ২১৯
কেউটে	কৃ ২৩৭	কেটকেট	কট্ ১৩৬	কেন্না	কর্ণ্ ১৬০	কেশ(স)রবর	কশ্ ১৭৩	কৈশিক	কশ্ ১৭৩
কেউর	কৃ ২৩৭	কেটকেটে	কট্ ১৩৬	কেন্নাই	কর্ণ্ ১৬০	কেশ(স)র	কশ্ ১৭৩	কৈশিকার্ষণ	কশ্ ১৭৩
কেও	কৃ ২৩৭	কেটা(ডা)	কৃ ২৩৭	কেন্নু	কর্ণ্ ১৬০	কেশহস্ত	কশ্ ১৭৩	কৈশোর	কশ্ ১৭৩
কেওকেটা	কৃ ২৩৭	কেটে	কৃৎ ২১৩	কেবল	কৃ ২৪৩	কেশাকেশি	কশ্ ১৮০	কৈসন	কৃ ২৩৭
কেওট	কৃ ২৩৭	কেটে দেওয়া	কট্ ১৩৬	কেবাড়	কৃ ২৩৭	কেশান্ত	কশ্ ১৭৩	কৈসনে	কৃ ২৩৭
কেওয়ার	কৃ ২৩৭	কেটে ফেলা	কট্ ১৩৬	কেমত	কৃ ২৩৭	কেশাবতার	কশ্ ১৮১	কৈসে	কৃ ২৩৭
কেঁউকেঁউ	কৃ ২৩৭	কেটো	কট্ ১৩৬	কেমন	কৃ ২৩৭	কেশিন	কশ্ ১৮১	কো	কৃ ২৩৭
কেঁক	কৃ ২৩৭	কেঠো	কট্ ১৩৬	কেমনতর	কৃ ২৩৭	কেশিনিষূদন	কশ্ ১৮১	কো	কশ্ ১৭৩
কেঁকলাস	কৃ ২৩৭	কেত	কিৎ ১৮৩	কেমনধারা	কৃ ২৩৭	কেশিনী	কশ্ ১৮২	কোই	কৃ ২৩৭
কেঁ(কে)কলাস	কৃ ২৩৭	কেতক	কিৎ ১৮৩	কেয়স্কার	কৃ ২৩৭	কেশিমথন	কশ্ ১৭৩	কোইলী	কুক্ ১৯৩
কেঁকা	কৃ ২৩৭	কেতকী	কিৎ ১৮৩	কেয়া	কিৎ ১৮৩	কেশিমর্দ্দন	কশ্ ১৭৩	কোউ	কৃ ২৩৭
কেঁকো	কৃ ২৩৭	কেতন	কিৎ ১৮৩	কেয়াকাঁদি	কিৎ ১৮৩	কেশি(শী)য়ার	কশ্ ১৭৩	কোওয়া	কশ্ ১৭৩
কেঁকোর-কেঁকোর	কৃ ২৩৭	কেতা	কিৎ ১৮৩	কেয়ারি	কৃ ২৩৭	কেশিসূদন	কশ্ ১৭৩	কোঁআজুর	কশ্ ১৭৩
কেঁচকেঁচ	কৃ ২৩৭	কেতাব	কিৎ ১৮৩	কেয়ূর	কৃ ২৩৭	কেশী	কশ্ ১৮১	কোঁক	কশ্ ১৭৩
কেঁচান	কঞ্চ্ ১৩৫	কেতাবি(বী)	কিৎ ১৮৩	কেরআ(বা)ল	কৃ ২০০	কেশু(সু)র	কশ্ ১৭৩	কোঁক	কক্ ১২৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
কোঁকড়	কৃ ২০০	কোকিলা	কুক্ ১৯৩	কোড়	কথ্ ১৪৭	কোবিদার	কৃ ২৪৬	কোলাবেঙ	কুল্ ১৯৯
কোঁকা	কক্ ১২৮	কোকিলাক্ষ	কুক্ ১৯৩	কোড়	কন্ ১৫০	কোমটমুছি	কৃ ২৩৭	কোলাব্যাঙ	কুল্ ১৯৯
কোঁকান	কক্ ১২৮	কোঙর	কম্ ১৫৪	কোড়া	কথ্ ১৪৭	কোমর	কম্ ১৫৪	কোলাহল	কুল্ ২০০
কোঁকোঁ	কক্ ১২৮	কোঙা	কুপ্ ১৯৫	কোড়া	কট্ ১৩৬	কোমরকষণী	কম্ ১৫৪	কোলি	কুল্ ১৯৭
কোঁখ	কশ্ ১৭৩	কোঙার	কম্ ১৫৪	কোণ	কথ্ ১৪৭	কোমরপাটা	কম্ ১৫৪	কোলিখণ্ড	কুল্ ১৯৭
কোঁখশূল	কশ্ ১৭৩	কোঙ্কন	কঙ্ক্ ১৩০	কোণ	কণ্ ১৪৬	কোমরপাট্টা	কম্ ১৫৪	কোলিচূর্ণ	কুল্ ১৯৭
কোঁচ	কঞ্চ্ ১৩৪	কোচ	কচ্ ১৩১	কোণা	কণ্ ১৪০	কোমরবন্দ(ন্ধ)	কম্ ১৫৪	কোলিশুণ্ঠী	কুল্ ১৯৭
কোঁচকা	কুচ্ ১৯৪	কোচ	কুচ্ ১৯৪	কোণা	কথ্ ১৪৭	কোমরি(রী)	কম্ ১৫৪	কোলী	কুল্ ১৯৭
কোঁচকা	কঞ্চ্ ১৩৪	কোচড়া	কুচ্ ১৯৪	কোণার্ক	কথ্ ১৪৭	কোমল	কম্ ১৫৪	কোশ	কশ্ ১৮২
কোঁচকান	কঞ্চ্ ১৩৪	কোচদাদ	কুচ্ ১৯৪	কোণি	কথ্ ১৪৭	কোমলক	কম্ ১৫৪	কোশকার	কশ্ ১৭৩
কোঁচনী	কুচ্ ১৯৪	কোচবক্স	কুচ্ ১৯৪	কোতোয়াল	কট্ ১৩৬	কোমলা	কম্ ১৫৪	কোশকারক	কশ্ ১৭৩
কোঁচবক	কুচ্ ১৯৪	কোচল	কুচ্ ১৯৪	কোথলি(লী)	কশ্ ১৭৩	কোমলিনী	কম্ ১৫৪	কোশ(স)ল	কশ্ ১৮২
কোঁচবক	কঞ্চ্ ১৩৪	কোচা	কুচ্ ১৯৪	কোথা	কৃ ২৩৭	কোমষ্ঠি	কৃ ২৩৭	কোশা(ষা)	কশ্ ১৭৩
কোঁচা	কুচ্ ১৯৪	কোচোয়ান	কুচ্ ১৯৪	কোথায়	কৃ ২৩৭	কোয়া	কশ্ ১৭৩	কোশা(ষা)গার	কশ্ ১৭৩
কোঁচা	কচ্ ১৩২	কোছ	কুচ্ ১৯৪	কোদণ্ড	কু ১৮৫	কোয়াজ্বর	কশ্ ১৭৩	কোশাতক	কশ্ ১৭৩
কোঁচা	কঞ্চ্ ১৩৪	কোছা	কুচ্ ১৯৪	কোদন	ক্রীড়্ ২২১	কোয়েল	কুক্ ১৯৩	কোশা(ষা)ধ্যক্ষ	কশ্ ১৭৩
কোঁছা	কচ্ ১৩২	কোজাগর	কৃ ২৪৫	কোদা	ক্রীড়্ ২২১	কোর	কুল্ ১৯৭	কোশাম্বি(ম্বী)	কশ্ ১৭৩
কোঁট	কণ্ ১৪০	কোজাগর	জাগৃ ৩৯১	কোদল	কন্ ১৫০	কোল	কুল্ ১৯৯	কোশারি(রী)	কশ্ ১৭৩
কোঁড়	কণ্ ১৪০	কোট	কট্ ১৩৬	কোদাল	কু ১৮৫	কোলপট্টি	কুল্ ১৯৭	কোশেশ	কশ্ ১৭৩
কোঁড়	কথ্ ১৪৭	কোটওয়াল	কট্ ১৩৬	কোদো	কু ১৮৫	কোর	কুল্ ১৯৭	কোষ	কশ্ ১৮২
কোঁড়	কন্ ১৫০	কোটক	কট্ ১৩৬	কোদ্রব	কু ১৮৫	কোর	কৃ ২০০	কোষ্ট	কশ্ ১৭৩
কোঁড়	কুল্ ১৯৭	কোটনা	কট্ ১৩৬	কোধ	ক্রুধ্ ২২১	কোর	কৃৎ ২১৩	কোষ্টা	কশ্ ১৭৩
কোঁড়	কৃ ২০০	কোটর	কট্ ১৩৬	কোন	কৃ ২৩৭	কোরক	কৃ ২০০	কোষ্ঠ	কশ্ ১৭৩
কোঁড়ক	কণ্ ১৪০	কোটরা	কট্ ১৩৬	কোন	কথ্ ১৫০	কোরক	কুল্ ১৯৭	কোষ্ঠক	কশ্ ১৭৩
কোঁড়া	কন্ ১৫০	কোটয়াল	কট্ ১৩৬	কোনও	কথ্ ১৫০	কোরা	কৃ ২০০	কোষ্ঠপাল	কশ্ ১৭৩
কোঁড়া	কণ্ ১৪০	কোটা	কট্ ১৩৬	কোনটি	কৃ ২৩৭	কোরান	কৃ ২০০	কোষ্ঠশুদ্ধি	কশ্ ১৭৩
কোঁত	কন্ ১৫০	কোটা	কশ্ ১৭৩	কোনটে	কৃ ২৩৭	কোরাল	কৃ ২০০	কোষ্ঠাগার	কশ্ ১৭৩
কোঁতন	কন্ ১৫০	কোটাল	কট্ ১৩৬	কোনা	কথ্ ১৪৭	কোল	কঙ্ক্ ১৩০	কোষ্ঠী	কশ্ ১৭৩
কোঁতা	কন্ ১৫০	কোটালি(লী)	কট্ ১৩৬	কোনারক	কথ্ ১৪৭	কোল	কল্ ১৬৪	কোষ্ণ	কশ্ ১৭৩
কোঁথ	কন্ ১৫০	কোটালিয়া	কট্ ১৩৬	কোনার্ক	কথ্ ১৪৭	কোলক	কুল্ ১৯৭	কৌক্ষেয়	কশ্ ১৭৩
কোঁথন	কন্ ১৫০	কোটি(টী)	কট্ ১৩৬	কোনাঘাত	কথ্ ১৪৭	কোলগিরি	কুল্ ১৯৯	কৌক্ষেয়ক	কশ্ ১৭৩
কোঁথা	কন্ ১৫০	কোটে	কৃ ২৩৭	কোনো	কৃ ২৩৭	কোলদারোগা	কুল্ ১৯৭	কৌঙ্কুম	কম্ ১৫৪
কোঁথাজ্বর	কন্ ১৫০	কোটো	কশ্ ১৭৩	কোনো	কথ্ ১৫০	কোলদেব	কুল্ ১৯৯	কৌচ	কচ্ ১৩১
কোঁদন	কন্ ১৫০	কোটোআল	কট্ ১৩৬	কোন্দল	কন্ ১৫০	কোলপাতলা	কুল্ ১৯৭	কৌট	কট্ ১৩৬
কোঁদল	কন্ ১৫০	কোট্ট	কট্ ১৩৬	কোপ	কুপ্ ১৯৭	কোলপুচ্ছ	কুল্ ১৯৭	কৌটা	কশ্ ১৭৩
কোঁদলিয়া	কন্ ১৫০	কোট্টপাল	কট্ ১৩৬	কোপন	কুপ্ ১৯৭	কোলপুচ্ছ	কঙ্ক্ ১৩০	কৌটা	কট্ ১৩৬
কোঁদা	কন্ ১৫০	কোঠ	কশ্ ১৭৩	কোপা	কুপ্ ১৯৭	কোলম্বক	কুল্ ১৯৭	কৌটো	কট্ ১৩৬
কোঁয়র	কৃ ২৩৭	কোঠর	কট্ ১৩৬	কোপান	কুপ্ ১৯৭	কোলশ(স)রা	কুল্ ১৯৭	কৌটি(টী)	কট্ ১৩৬
কোঁয়ল	কম্ ১৫৪	কোঠরি	কট্ ১৩৬	কোপানো	কুপ্ ১৯৭	কোলা	কুল্ ১৯৯	কৌটিল্য	কট্ ১৩৬
কোঁস্তা	কন্ ১৫০	কোঠা	কট্ ১৩৬	কোপিত	কুপ্ ১৯৭	কোলাকুলি	কুল্ ২০০	কৌটুম্বিক	কট্ ১৩৬
কোক	কুক্ ১৯৪	কোঠা	কশ্ ১৭৩	কোপিল	কুপ্ ১৯৭	কোলাকোলি	কুল্ ১৯৭	কৌড়ি(ড়ী)	কট্ ১৩৬
কোকড়া	কুচ্ ১৯৪	কোঠি	কশ্ ১৭৩	কোপী	কুপ্ ১৯৭	কোলাচ	কুল্ ১৯৭	কৌণপ	কণ্ ১৪৪
কোকনদ	কুক্ ১৯৪	কোঠি	কট্ ১৩৬	কোপীন	কুপ্ ১৯৭	কোলাচল	কুল্ ১৯৯	কৌণপদন্ত	কণ্ ১৪৪
কোকিল	কুক্ ১৯৪	কোঠে	কৃ ২৩৭	কোপ্নী	কুপ্ ১৯৭	কোলানী	কুল্ ১৯৭	কৌতর	কৃ ২৩৭
কোকিলবাহিনী	কুক্ ১৯৪	কোড়	কুল্ ১৯৭	কোবিদ	কৃ ২৩৭	কোলাপোষ	কুল্ ১৯৭	কৌতরখুপী	কৃ ২৩৭

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
কৌতুক	কৃ ২৩৭	কৌসীদ্য	কশ্ ১৭৩	ক্রিয়াবিধি	কৃ ২০০	ক্রোধিত	ক্রুধ্ ২২১	ক্ষণ	ক্ষ্ ২২৩
কৌতুক	কিৎ ১৮৩	কৌসুম	কশ্ ১৭৩	ক্রিয়াবিশেষণ	কৃ ২০০	ক্রোধিনী	ক্রুধ্ ২২১	ক্ষণজন্মা	ক্ষ্ ২২৩
কৌতুকী	কিৎ ১৮৩	কৌসুম্ভ	কশ্ ১৭৩	ক্রিয়াযোগ	কৃ ২০০	ক্রোধী	ক্রুধ্ ২২১	ক্ষণদ	ক্ষ্ ২২৩
কৌতূহল	কিৎ ১৮৩	কৌস্তুভ	কশ্ ১৭৩	ক্রিয়ালোপ	কৃ ২০০	ক্রোশ	ক্রুশ্ ২২২	ক্ষণদাকর	ক্ষ্ ২২৩
কৌতূহল	কৃ ২৩৭	ক্যাচড়া	কু ১৮৫	ক্রিয়াশক্তি	কৃ ২১১	ক্রোশতাল	ক্রুশ্ ২২২	ক্ষণদাচর	ক্ষ্ ২২৩
কৌথুমী	কথ্ ১৪৭	ক্রকচ	কৃ ২০০	ক্রিয়াসমভিহার	কৃ ২০০	ক্রোশধ্বনি	ক্রুশ্ ২২২	ক্ষণদ্যুতি	ক্ষ্ ২২৩
কৌন	কৃ ২৩৭	ক্রকচব্যবহার	কৃ ২০০	ক্রিয়াসাতত্য	কৃ ২০০	ক্রোশন	ক্রুশ্ ২২২	ক্ষণধ্বংসী	ক্ষ্ ২২৩
কৌন্ত	কু ১৮৫	ক্রতু	কৃ ২১০	ক্রিয়াসিদ্ধি	কৃ ২০০	ক্রোষ্টু	ক্রুশ্২২২	ক্ষণপ্রভা	ক্ষ্ ২২৩
কৌন্তিক	কু ১৮৫	ক্রথকৈশিক	কৃ ২০০	ক্রিয়েন্দ্রিয়	কৃ ২০০	ক্রৌঞ্চ	কঞ্চ্ ১৩৫	ক্ষণবিধ্বংসী	ক্ষ্ ২২৩
কৌন্তেয়	কু ১৮৫	ক্রন্দ্	ক্রন্দ্ ২১৯	ক্রী	ক্রী ২২০	ক্রৌঞ্চগিরি	কঞ্চ্ ১৩৪	ক্ষণবিধ্বংসিক	ক্ষ্ ২২৩
কৌপ	কুপ্ ১৯৫	ক্রন্দন	ক্রন্দ্ ২১৯	ক্রীড়্	ক্রীড়্ ২২১	ক্রৌঞ্চবক	কঞ্চ্ ১৩৪	ক্ষণভঙ্গুর	ক্ষ্ ২২৩
কৌপীন	কুপ্ ১৯৫	ক্রন্দমান	ক্রন্দ্ ২১৯	ক্রীড়্	ক্ষি ২৩০	ক্রৌঞ্চরন্ধ্র	কঞ্চ্ ১৩৫	ক্ষণভূত	ক্ষ্ ২২৩
কৌপীন	কন্ ১৫০	ক্রন্দসী	ক্রন্দ্ ২১৯	ক্রীড়	ক্ষি ২৩০	ক্রৌঞ্চরিপু	কঞ্চ্ ১৩৪	ক্ষণমাত্র	ক্ষ্ ২২৩
কৌবের	কু ১৮৫	ক্রন্দিত	ক্রন্দ্ ২১৯	ক্রীড়ক	ক্রীড়্ ২২১	ক্রৌঞ্চশত্রু	কঞ্চ্ ১৩৪	ক্ষণস্থায়ী	ক্ষ্ ২২৩
কৌমার	কম্ ১৫৪	ক্রব্য	ক্রন্দ্ ২১৯	ক্রীড়নক	ক্রীড়্ ২২১	ক্রৌঞ্চসূদন	কঞ্চ্ ১৩৪	ক্ষণিক	ক্ষ্ ২২৩
কৌমার্য্য	কম্ ১৫৪	ক্রব্যাৎ(দ্)	ক্রন্দ্ ২১৯	ক্রীড়া	ক্রীড়্ ২২১	ক্রৌঞ্চারাতি	কঞ্চ্ ১৩৪	ক্ষণী	ক্ষ্ ২২৩
কৌমুদ	কু ১৮৫	ক্রম্	ক্রম্ ২১৯	ক্রীড়া (ক্ষেড়)	ক্ষি ২৩০	ক্রৌর্য্য	কৃৎ ২১৩	ক্ষণেক	ক্ষ্ ২২৩
কৌমুদিনী	কু ১৮৫	ক্রম	ক্রম্ ২২০	ক্রীড়াকৌতুক	ক্রীড়্ ২২১	ক্যাঁটক্যাঁট	কট্ ১৩৬	ক্ষত	ক্ষ্ ২২৪
কৌমুদী	কু ১৯৩	ক্রমশ	ক্রম্ ২১৯	ক্রীড়ামৃগ	ক্রীড়্ ২২১	ক্যাচড়া	কচ্ ১৩১	ক্ষতজ	ক্ষ্ ২২৩
কৌমোদকী	কু ১৮৫	ক্রমশঃ	ক্রম্ ২১৯	ক্রীত	ক্রী ২২০	ক্লম্	ক্ল্ ২২২	ক্ষতি	ক্ষ্ ২২৪
কৌরব	কৃ ২১০	ক্রমাগত	ক্রম্ ২১৯	ক্রুঞ্চ	কঞ্চ্ ১৩৪	ক্লম	ক্ল্ ২২২	ক্ষত্তা	ক্ষ্ ২২৪
কৌরবেয়	কৃ ২০০	ক্রমানুবন্ধ	ক্রম্ ২১৯	ক্রুঞ্চ	কঞ্চ্ ১৩৫	ক্লান্ত	ক্ল্ ২২২	ক্ষত্র	ক্ষ্ ২২৩
কৌরব্য	কৃ ২০০	ক্রমানুযায়ী	ক্রম্ ২১৯	ক্রুড্	কুল্ ১৯৭	ক্লান্তি	ক্ল্ ২২২	ক্ষত্ত্র	ক্ষ্ ২২৪
কৌর্ম্ম	কৃ ২৩৭	ক্রমানুসার	ক্রম্ ২১৯	ক্রুধ্	ক্রুধ্ ২২১	ক্লিদ্	ক্ল্ ২২২	ক্ষত্রধর্ম্ম	ক্ষ্ ২২৪
কৌল	কল্ ১৬৪	ক্রমান্বয়	ক্রম্ ২১৯	ক্রুদ্ধ	ক্রুধ্ ২২১	ক্লিন্ন	ক্ল্ ২২২	ক্ষত্রি	ক্ষ্ ২২৪
কৌলটিনেয়	কল্ ১৬৪	ক্রমায়াত	ক্রম্ ২১৯	ক্রূর	কৃৎ ২১৩	ক্লিশ্	ক্ল্ ২২২	ক্ষত্ত্রি	ক্ষ্ ২২৩
কৌলটেয়	কল্ ১৬৪	ক্রমি	ক্রম্ ২১৯	ক্রূরকর্ম্মা	কৃৎ ২১৩	ক্লিশিত	ক্ল্ ২২২	ক্ষত্রিয়	ক্ষ্ ২২৪
কৌলব	কল্ ১৬৪	ক্রমিক	ক্রম্ ২১৯	ক্রুশ্	ক্রুশ্ ২২২	ক্লীব্	ক্ল্ ২২২	ক্ষত্ত্রিয়	ক্ষ্ ২২৪
কৌলিক	কল্ ১৬৪	ক্রমে	ক্রম্ ২১৯	ক্রুষ্ট	ক্রুশ্ ২২২	ক্লীবলিঙ্গ	ক্ল্ ২২২	ক্ষত্রী	ক্ষ্ ২২৩
কৌলীন	কল্ ১৬৪	ক্রমেল	ক্রম্ ২১৯	ক্রেতব্য	ক্রী ২২০	ক্লেদ	ক্ল্ ২২২	ক্ষত্ত্রী	ক্ষ্ ২২৩
কৌলীন্য	কল্ ১৬৪	ক্রমেলক	ক্রম্ ২১৯	ক্রেপা	কৃপ্ ২১৪	ক্লেশ	ক্ল্ ২২৩	ক্ষন্তব্য	ক্ষম্ ২২৭
কৌলেয়	কল্ ১৬৪	ক্রয়	ক্রী ২২০	ক্রেপাণ	কৃপ্ ২১৪	ক্লৈব্য	ক্ল্ ২২২	ক্ষপ্	ক্ষিপ্ ২৩৩
কৌলেয়ক	কল্ ১৬৪	ক্রাকচিক	কৃ ২০০	ক্রেমে	ক্রম্ ২১৯	ক্লোম	ক্ল্ ২২২	ক্ষপ	ক্ষিপ্ ২৩৩
কৌল্য	কল্ ১৬৪	ক্রান্ত	ক্রম্ ২১৯	ক্রেয়	ক্রী ২২০	ক্ব	ক্ব্ ২২৩	ক্ষপণ	ক্ষিপ্ ২৩৩
কৌশ	কশ্ ১৭৩	ক্রান্তি	ক্রম্ ২১৯	ক্রোক	ক্রী ২২০	ক্বচিৎ	ক্ব্ ২২৩	ক্ষপণক	ক্ষিপ্ ২৩৩
কৌশল	কশ্ ১৭৩	ক্রিয়া	কৃ ২১১	ক্রোড়	কুল্ ১৯৭	ক্বণ্	ক্ব্ ২২৩	ক্ষম্	ক্ষম্ ২২৭
কৌশলী	কশ্ ১৭৩	ক্রিয়াভিত্তিক	কৃ ২১১	ক্রোধ	ক্রুধ্ ২২১	ক্বথ্	ক্ব্ ২২৩	ক্ষম	ক্ষম্ ২২৭
কৌশ(স)লেয়	কশ্ ১৭৩	ক্রিয়াযোগ	কৃ ২০০	ক্রোধজ	ক্রুধ্ ২২১	ক্বথন	ক্ব্ ২২৩	ক্ষমতা	ক্ষম্ ২২৭
কৌশল্য	কশ্ ১৭৩	ক্রিয়ান্তর	কৃ ২০০	ক্রোধন	ক্রুধ্ ২২১	ক্বাথ	ক্ব্ ২২৩	ক্ষমবান	ক্ষম্ ২২৭
কৌশ(স)ল্যা	কশ্ ১৮২	ক্রিয়ান্বিত	কৃ ২০০	ক্রোধনীয়	ক্রুধ্ ২২১	ক্ষ	ক্ষ্ ২২৩	ক্ষমস্ব	ক্ষম্ ২২৭
কৌশাম্বী	কশ্ ১৭৩	ক্রিয়াফল	কৃ ২০০	ক্রোধবর্দ্ধন	ক্রুধ্ ২২১	ক্ষং	ক্ষ্ ২২৩	ক্ষমা	ক্ষম্ ২২৭
কৌশি(ষি)ক	কশ্ ১৮২	ক্রিয়াবশ	কৃ ২০০	ক্রোধবশ	ক্রুধ্ ২২১	ক্ষ-কার	ক্ষ্ ২২৩	ক্ষমান্বিত	ক্ষম্ ২২৭
কৌশী(ষী)তকি	কশ্ ১৭৩	ক্রিয়াবাচক	কৃ ২০০	ক্রোধমূর্চ্ছিত	ক্রুধ্ ২২১	ক্ষচ্ (খচ্)	ক্ষ্ ২২৩	ক্ষমাপন্ন	ক্ষম্ ২২৭
কৌশীলব্য	কশ্ ১৭৩	ক্রিয়াবাদী	কৃ ২০০	ক্রোধাগার	ক্রুধ্ ২২১	ক্ষড্ (খড়্)	ক্ষ্ ২২৩	ক্ষমাপর	ক্ষম্ ২২৭
কৌশে(ষে)য়	কশ্ ১৭৩	ক্রিয়াবান	কৃ ২০০	ক্রোধালু	ক্রুধ্ ২২১	ক্ষণ্	ক্ষ্ ২২৩	ক্ষমাবান	ক্ষম্ ২২৭

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ক্ষমার্হ	অর্হ্ ৪৩	ক্ষীরসাগর	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষুল্ল	ক্ষুদ্ ২৩৫	ক্ষেমঙ্কর	ক্ষি ২৩০	খগম	খ্ ২৫২
ক্ষমিত	ক্ষম্ ২২৭	ক্ষীরসার	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষুল্লতাত	ক্ষুদ্ ২৩৫	ক্ষেমঙ্করী	ক্ষি ২২৭	খগাধিপ	খ্ ২৫২
ক্ষমিতব্য	ক্ষম্ ২২৭	ক্ষীরসিন্ধু	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষে	ক্ষি ২৩০	ক্ষেমঙ্করী	ক্ষম্ ২২৭	খগান্তক	খ্ ২৫২
ক্ষমিতা	ক্ষম্ ২২৭	ক্ষীরা	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষেউরি	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেমশূর	ক্ষি ২৩০	খগাসন	খ্ ২৫২
ক্ষমী	ক্ষম্ ২২৭	ক্ষীরাব্ধি	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষেণে	ক্ষ্ ২২৩	ক্ষেমা	ক্ষি ২৩০	খগেন্দ্র	খ্ ২৫২
ক্ষয়	ক্ষি ২৩০	ক্ষীরাব্ধিজ	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষেণেক	ক্ষ্ ২২৩	ক্ষেমা	ক্ষম্ ২২৭	খগেশ	খ্ ২৫২
ক্ষয়ঙ্কর	ক্ষি ২৩০	ক্ষীরিকা	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষেত	ক্ষ্ ২২৩	ক্ষেম্য	ক্ষম্ ২২৭	খগেশ্বর	খ্ ২৫২
ক্ষয়া	ক্ষি ২৩০	ক্ষীরী.	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষেতি	ক্ষ্ ২২৩	ক্ষেয়া	ক্ষিপ্ ২৩৩	খগোল	খ্ ২৫২
ক্ষয়াটিয়া	ক্ষি ২৩০	ক্ষীরোদ	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষেত্র	ক্ষি ২৩১	ক্ষেয়ানী	ক্ষিপ্ ২৩৩	খগ্‌গড়	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষয়াটে	ক্ষি ২৩০	ক্ষীরোদধি	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষেত্রকর্ম্ম	ক্ষি ২৩০	ক্ষেয়ারি(রী)	ক্ষিপ্ ২৩৩	খচ্	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষয়িত	ক্ষি ২৩০	ক্ষু	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেত্রকর্ম্মবিধান	ক্ষি ২৩০	ক্ষোণি(ণী)	ক্ষু ২৩৪	খচ	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষয়ী	ক্ষি ২৩০	ক্ষুঁয়া	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেত্রজ	ক্ষি ২৩০	ক্ষোদ	ক্ষুদ্ ২৩৫	খচখচ	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষর্	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষুঁয়াড়	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেত্রজ্ঞ	ক্ষি ২৩১	ক্ষোদিত	ক্ষুদ্ ২৩৫	খচড়া	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষর	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষুণ্ণ	ক্ষুদ্ ২৩৬	ক্ষেত্রতত্ত্ব	ক্ষি ২৩১	ক্ষোভ	ক্ষুভ্ ২৩৬	খচমচ	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষরণ	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষুৎ	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেত্রপতি	ক্ষি ২৩০	ক্ষোম	ক্ষু ২৩৪	খচর	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষরা	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষুৎ	ক্ষুধ্ ২৩৬	ক্ষেত্রপর্পটি	ক্ষি ২৩০	ক্ষৌণি(ণী)	ক্ষু ২৩৪	খচর	খ্ ২৫২
ক্ষল্	ক্ষল্ ২২৯	ক্ষুত	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেত্রপাল	ক্ষি ২৩০	ক্ষৌদ্র	ক্ষুদ্ ২৩৫	খচর	চর্ ৩৪০
ক্ষল	ক্ষল্ ২২৯	ক্ষুদ্	ক্ষুদ্ ২৩৫	ক্ষেত্রফল	ক্ষি ২৩০	ক্ষৌদ্রেয়	ক্ষুদ্ ২৩৫	খচরমচর	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষলন	ক্ষল্ ২২৯	ক্ষুদ	ক্ষুদ্ ২৩৫	ক্ষেত্রবসুধা	ক্ষি ২৩০	ক্ষৌম	ক্ষু ২৩৪	খচরা	খ্ ২৫২
ক্ষালন	ক্ষল্ ২২৯	ক্ষু(খু)দে	ক্ষুদ্ ২৩৫	ক্ষেত্রবিৎ(দ্)	ক্ষি ২৩০	ক্ষৌর	ক্ষু ২৩৪	খচাখচ	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষালিত	ক্ষল্ ২২৯	ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্ ২৩৬	ক্ষেত্রব্যবহার	ক্ষি ২৩০	ক্ষৌরিক	ক্ষু ২৩৪	খচারী	খ্ ২৫২
ক্ষাণিক	ক্ষ্ ২২৩	ক্ষুধ্	ক্ষুধ্ ২৩৬	ক্ষেত্রভূমি	ক্ষি ২৩০	ক্ষ্মা	ক্ষম্ ২২৭	খচিত	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষাত্র	ক্ষ্ ২২৩	ক্ষুধা	ক্ষুধ্ ২৩৬	ক্ষেত্রসন্ন্যাস	ক্ষি ২৩০	ক্ষ্যাপ	ক্ষিপ্ ২৩৩	খচ্চর	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষাত্ত্র	ক্ষ্ ২২৩	ক্ষুধার্ত্ত	ক্ষুধ্ ২৩৬	ক্ষেত্রসম্ভব	ক্ষি ২৩০	ক্ষ্বিড়্	ক্ষি ২৩০	খজল	খ্ ২৫২
ক্ষাত্রতেজ	ক্ষ্ ২২৩	ক্ষুধার্ত্তি	ক্ষুধ্ ২৩৬	ক্ষেত্রসীমা	ক্ষি ২৩০	ক্ষ্বেড়	ক্ষি ২৩০	খঞ্চাপোশ	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষান্ত	ক্ষম্ ২২৭	ক্ষুধিত	ক্ষুধ্ ২৩৬	ক্ষেত্রাজীব	ক্ষি ২৩০	ক্ষ্বেলন	ক্ষি ২৩০	খঞ্চাপোষ	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষান্তি	ক্ষম্ ২২৭	ক্ষুন্নিবৃত্তি	ক্ষুধ্ ২৩৬	ক্ষেত্রাধিপ	ক্ষি ২৩০			খঞ্চেপোশ	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষাম	ক্ষম্ ২২৭	ক্ষুপ	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেত্রামলকী	ক্ষি ২৩০	**খ**		খঞ্চেপোষ	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষাম্য	ক্ষম্ ২২৭	ক্ষুব্ধ	ক্ষুভ্ ২৩৬	ক্ষেত্রিক	ক্ষি ২৩০			খঞ্জ	খঞ্জ্ ২৪৬
ক্ষার	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষুভ্	ক্ষুভ্ ২৩৬	ক্ষেত্রিয়	ক্ষি ২৩০	খ	— ২৪৫	খঞ্জকারী	খঞ্জ্ ২৪৬
ক্ষারীনুন	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষুভ	ক্ষুভ্ ২৩৬	ক্ষেত্রী	ক্ষ্ ২২৩	খ	খন্ ২৪৮	খঞ্জন	খঞ্জ্ ২৪৬
ক্ষি	ক্ষি ২৩০	ক্ষুভিত	ক্ষুভ্ ২৩৬	ক্ষেত্ত্রী	ক্ষ্ ২২৩	খ	ক্ষি ২৩০	খঞ্জনগঞ্জন	খঞ্জ্ ২৪৬
ক্ষিত	ক্ষি ২৩০	ক্ষুমা	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেত্রিণী	ক্ষ্ ২২৩	খ	ক্ষুদ্ ২৩৫	খঞ্জনা	খঞ্জ্ ২৪৬
ক্ষিতি	ক্ষি ২৩০	ক্ষুর্	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেত্রিয়	ক্ষ্ ২২৩	খই	ক্ষ্ ২২৩	খঞ্জনি(নী)	খঞ্জ্ ২৪৬
ক্ষিতিজ	ক্ষি ২৩০	ক্ষুর	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেদ	ক্ষুদ্ ২৩৫	খইচালা	চল্ ৩৪৫	খঞ্জনিয়া	খঞ্জ্ ২৪৬
ক্ষিদে	ক্ষুধ্ ২৩৬	ক্ষুরকর্ম্ম	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেপ	ক্ষিপ্ ২৩৩	খইর	ক্ষ্ ২২৩	খঞ্জর	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষিদ্যমান	ক্ষুধ্ ২৩৬	ক্ষুরধান	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেপক	ক্ষিপ্ ২৩৩	খই(য়)রাত	ক্ষি ২৩০	খঞ্জরি(রী)	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষিপ্	ক্ষিপ্ ২৩৩	ক্ষুরধার	ক্ষু ২৩৪	ক্ষে(ক্ষ্যা)পলা	ক্ষিপ্ ২৩৩	খইল	ক্ষল্ ২২৯	খঞ্জরীট	খঞ্জ্ ২৪৬
ক্ষিপ্ত	ক্ষিপ্ ২৩০	ক্ষুরপা	ক্ষু ২৩৪	ক্ষে(ক্ষ্যা)পা	ক্ষিপ্ ২৩০	খএ	ক্ষি ২৩০	খঞ্জরীটক	খঞ্জ্ ২৪৬
ক্ষিপ্র	ক্ষিপ্ ২৩০	ক্ষুরপ্র	ক্ষু ২৩৫	ক্ষে(খে)পাম	ক্ষিপ্ ২৩০	খএর	ক্ষ্ ২২৩	খট্	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষীণ	ক্ষি ২৩০	ক্ষুরপ্রান্ত	ক্ষু ২৩৪	ক্ষে(খে)পী	ক্ষিপ্ ২৩০	খএরাত	ক্ষি ২৩০	খট	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষীর	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষুরভাণ্ড	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেপ্তা	ক্ষিপ্ ২৩০	খক্	খ্ ২৫২	খটক	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষীরনীর	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষুরি(রী)কা	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেম	ক্ষম্ ২২৭	খ-কার	খ্ ২৫২	খটকা	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষীরশর	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষু(খু)রূপ	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেম	ক্ষ্ ২২৩	খগ	খ্ ২৫২	খট(ড়)ক্কিকা	ক্ষ্ ২২৩
ক্ষীরসমুদ্র	ক্ষর্ ২২৮	ক্ষু(খু)রূপা	ক্ষু ২৩৪	ক্ষেম	ক্ষি ২২৭	খগ	খন্ ২৪৮	খড়ক্কী	ক্ষ্ ২২৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
খটখট	ক্ষ ২২৩	খড়ী	ক্ষ ২২৫	খদি	ক্ষ ২২৩	খয়রাত	ক্ষি ২৩১	খর্পাম্বর	ক্ষর্ ২২৮
খটখটীয়া	ক্ষ ২২৩	খড়িকা	ক্ষ ২২৩	খদিকা	ক্ষ ২২৩	খয়রাতী	ক্ষি ২৩১	খর্ব্ব্	ক্ষর্ ২২৮
খটখ'টে	ক্ষ ২২৩	খড়িচোঁচ	ক্ষ ২২৩	খদির	ক্ষ ২৩১	খ(খে)য়াল	ক্ষ ২২৩	খর্ব্ব	ক্ষর্ ২২৮
খটমট	ক্ষ ২২৩	খড়িমাটি	ক্ষ ২২৩	খদ্দর	ক্ষ ২২৩	খয়ের	ক্ষ ২৩১	খর্ব্বট	ক্ষর্ ২২৮
খটমটি	ক্ষ ২২৩	খড়ি(রি)শ(স)	ক্ষ ২২৩	খদ্দের	ক্ষর্ ২২৮	খয়ের-খাঁ	ক্ষ ২৩১	খল্	ক্ষল্ ২২৮
খটরখটর	ক্ষ ২২৩	খড়ী	ক্ষ ২২৩	খদ্যোৎ	খ্ ২৫৪	খর	ক্ষর্ ২২৮	খল	ক্ষল্ ২২৯
খটরমটর	ক্ষ ২২৩	খড়ু(রু)টি	ক্ষ ২২৩	খধি	ক্ষ ২২৩	খরকর	ক্ষর্ ২২৮	খ'ল	ক্ষল্ ২২৯
খটাখট	ক্ষ ২২৩	খড়্গ (ক্ষড়)	ক্ষ ২২৫	খধূপ	খ্ ২৫২	খরখর	ক্ষর্ ২২৮	খলই	ক্ষল্ ২২৯
খটাৎ	ক্ষ ২২৩	খড়্গহস্ত	ক্ষ ২২৫	খন্	খন্ ২৪৮	খরগ	ক্ষ ২২৩	খলখল	ক্ষল্ ২২৯
খ(খা)টাশ	ক্ষ ২২৩	খড়্গী	ক্ষ ২২৩	খন	খন্ ২৪৮	খরগোশ(স)	ক্ষর্ ২২৮	খলখলি	ক্ষল্ ২২৯
খ(খা)টাস	ক্ষ ২২৩	খণ	ক্ষ ২২৩	খনক	খন্ ২৪৯	খরচ	ক্ষর্ ২২৮	খলতি	ক্ষল্ ২২৯
খ(খো)টি	ক্ষ ২২৩	খণিক	ক্ষ ২২৩	খনকাল	খন্ ২৪৮	খরচা	ক্ষর্ ২২৮	খলধান	ক্ষল্ ২২৯
খটিকা	ক্ষ ২২৩	খণ্ড্	খণ্ড্ ২৪৭	খনখন	খন্ ২৪৮	খরচী	ক্ষর্ ২২৮	খলধান্য	ক্ষল্ ২২৯
খটিনী	ক্ষ ২২৩	খণ্ড	খণ্ড্ ২৪৭	খনতি	খন্ ২৪৯	খরজ	ক্ষর্ ২২৮	খলাধান	ক্ষল্ ২২৯
খটী	ক্ষ ২২৩	খণ্ডক	খণ্ড্ ২৪৭	খনতী	খন্ ২৪৯	খরতর	ক্ষর্ ২২৮	খলন	ক্ষল্ ২২৯
খট্টক	ক্ষ ২২৩	খণ্ডকথা	খণ্ড্ ২৪৭	খনন	খন্ ২৪৯	খরতাল	ক্ষর্ ২২৮	খলপূ	ক্ষল্ ২২৯
খট্টা	ক্ষ ২২৩	খণ্ডকপালিনী	খণ্ড্ ২৪৭	খনন	খিদ্ ২৫১	খরধার	ক্ষর্ ২২৮	খলবল	ক্ষল্ ২২৯
খট্টাঙ্গ	ক্ষ ২২৩	খণ্ডকাব্য	খণ্ড্ ২৪৭	খনা	খন্ ২৪৮	খরপদ	ক্ষর্ ২২৮	খল(লি)শা	ক্ষল্ ২২৯
খট্টাপদ	ক্ষ ২২৩	খণ্ডখিরিসা	খণ্ড্ ২৪৭	খনি(নী)	খন্ ২৪৮	খরপোড়	ক্ষর্ ২২৮	খলা	ক্ষল্ ২২৯
খট্টারূঢ়	ক্ষ ২২৩	খণ্ডজ	খণ্ড্ ২৪৭	খনিত	খন্ ২৪৮	খরবাদ্য	ক্ষর্ ২২৮	খ(খা)লাস	ক্ষল্ ২২৯
খট্টাশ(স)	ক্ষ ২২৩	খণ্ডন	খণ্ড্ ২৪৭	খনিতা	খন্ ২৪৮	খরমুজ	ক্ষর্ ২২৮	খলি	ক্ষল্ ২২৯
খট্টিক	ক্ষ ২২৩	খণ্ডনীয়	খণ্ড্ ২৪৭	খনিত্র	খন্ ২৪৯	খরমুজা	ক্ষর্ ২২৮	খলিত	ক্ষল্ ২২৯
খট্টিকা	ক্ষ ২২৩	খণ্ডপরশু	খণ্ড্ ২৪৭	খনিল	খন্ ২৪৮	খরযান	ক্ষর্ ২২৮	খলি(লী)ন	ক্ষল্ ২২৯
খট্বা	ক্ষ ২২৩	খণ্ডপূজা	খণ্ড্ ২৪৭	খন্তা	খন্ ২৪৯	খরশাণ(ন)	ক্ষর্ ২২৮	খলিনী	ক্ষল্ ২২৯
খট্বাঙ্গ	ক্ষ ২২৩	খণ্ডপ্রলয়	খণ্ড্ ২৪৭	খন্তিক	খন্ ২৪৮	খরসান	ক্ষর্ ২২৮	খলিপা	ক্ষল্ ২২৯
খট্বারূঢ়	ক্ষ ২২৩	খণ্ডবিখণ্ড	খণ্ড্ ২৪৭	খন্তিকা	খন্ ২৪৮	খরস্বন	ক্ষর্ ২২৮	খলিফা	ক্ষল্ ২২৯
খট্বিকা	ক্ষ ২২৩	খণ্ডবিয়নী	খণ্ড্ ২৪৭	খন্দ	খন্ ২৪৯	খরস্বান	ক্ষর্ ২২৮	খলিশ	ক্ষল্ ২২৯
খড়্	ক্ষ ২২৩	খণ্ডব্রত	খণ্ড্ ২৪৭	খন্দ	খন্ ২৪৮	খরশাল	ক্ষর্ ২২৮	খলু	ক্ষল্ ২২৯
খড়	ক্ষ ২২৩	খণ্ডমধু	খণ্ড্ ২৪৭	খন্দক	খন্ ২৪৮	খরশালা	ক্ষর্ ২২৮	খলেধানী	ক্ষল্ ২২৯
খড়কিমালা	ক্ষ ২২৩	খ(খা)ণ্ডা	খণ্ড্ ২৪৭	খন্দকার	খন্ ২৪৮	খরশু(সু)লা	ক্ষর্ ২২৮	খলেবালী	ক্ষল্ ২২৯
খড়কী	ক্ষ ২২৩	খণ্ডাতি	খণ্ড্ ২৪৭	খন্ধ	খন্ ২৪৮	খরসা	ক্ষর্ ২২৮	খলেন	ক্ষল্ ২২৯
খড়কে	ক্ষ ২২৩	খণ্ডাভ্র	খণ্ড্ ২৪৭	খপ্	ক্ষিপ্ ২৩৩	খরা	ক্ষর্ ২২৮	খলেশ	ক্ষল্ ২২৯
খড়ক্কিকা	ক্ষ ২২৩	খণ্ডিক	খণ্ড্ ২৪৭	খপ্পর	ক্ষিপ্ ২৩৩	খরাচোরা	ক্ষর্ ২২৮	খলেশয়	ক্ষল্ ২২৯
খড়ক্কী	ক্ষ ২২৩	খণ্ডিত	খণ্ড্ ২৪৭	খপখপ	ক্ষিপ্ ২৩৩	খরাপে	ক্ষর্ ২২৮	খল্ল	ক্ষল্ ২২৯
খড়খড়	ক্ষ ২২৩	খণ্ডী	খণ্ড্ ২৪৭	খপখপানি	ক্ষিপ্ ২৩৩	খরিদ	ক্ষর্ ২২৮	খল্বাট	ক্ষল্ ২২৯
খড়খড়ি	ক্ষ ২২৩	খত্	ক্ষ ২২৩	খপর	খ্ ২৫২	খরিদদার	ক্ষর্ ২২৮	খশ(স)	ক্ষ ২২৬
খড়খড়ে	ক্ষ ২২৩	খত	ক্ষ ২২৬	খবর	খ্ ২৫৪	খরিদার	ক্ষর্ ২২৮	খশখশ	ক্ষ ২২৩
খড়ম	ক্ষ ২২৩	খতখাল	ক্ষ ২২৬	খবরদার	খ্ ২৫২	খরিদা	ক্ষর্ ২২৮	খস	ক্ষ ২২৩
খড়মচরণ	ক্ষ ২২৩	খতবা (ক্ষতবহ)	ক্ষ ২২৩	খবিচারী	খ্ ২৫২	খরিদ্দার	ক্ষর্ ২২৮	খসখস	ক্ষ ২২৩
খড়মপা	ক্ষ ২২৩	খতম (ক্ষতম)	ক্ষ ২২৬	খবি(বী)শ	খ্ ২৫২	খর্জ্জ্	ক্ষর্ ২২৮	খসড়া	ক্ষ ২২৩
খড়মড়	ক্ষ ২২৩	খতান	ক্ষ ২২৬	খম	ক্ষম্ ২২৭	খর্জ্জন	ক্ষর্ ২২৮	খসতিল	ক্ষ ২২৩
খড়রমড়র	ক্ষ ২২৩	খতি (ক্ষতি)	ক্ষ ২২৩	খমক	ক্ষম্ ২২৭	খর্জ্জু	ক্ষর্ ২২৮	খসম্	ক্ষ ২২৩
খড়(র)রা	ক্ষ ২২৩	খতিয়ান	ক্ষ ২২৬	খমা	ক্ষম্ ২২৭	খর্জ্জুর	ক্ষর্ ২২৮	খা	খা ২৫০
খড়া	ক্ষ ২২৫	খ'তেন	ক্ষ ২২৬	খম্বা	ক্ষম্ ২২৭	খর্প(র্ব)চ্ছন্দ	ক্ষর্ ২২৮	খাআ	খা ২৫০
খড়ি	ক্ষ ২২৫	খতী	ক্ষ ২২৩	খয়রা	ক্ষি ২৩১	খর্পর	ক্ষর্ ২২৮	খাই	খা ২৫১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
খির	ক্ষর্ ২২৮	খুচনি	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুরপ্র	ক্ষু ২৩৪	খেঁচনি	ক্ষি ২৩০	খে(খ্যা)মটা	ক্ষম্ ২২৭
খীরসা	ক্ষর্ ২২৮	খুচ(জ)রা	ক্ষু ২৩৪	খুরভাঁড়	ক্ষু ২৩৪	খেঁচা	ক্ষি ২৩০	খেমা	ক্ষম্ ২২৭
খীরা	ক্ষর্ ২২৮	খুচুরখুচুর	ক্ষু ২৩৪	খুরমা	ক্ষর্ ২২৮	খেঁচাখেঁচি	ক্ষি ২৩০	খেমিঝাঁপি	ক্ষম্ ২২৭
খীরোলা	ক্ষর্ ২২৮	খুজ	ক্ষু ২৩৪	খুরা	ক্ষু ২৩৪	খেঁচুনি	ক্ষি ২৩০	খেমী	ক্ষম্ ২২৭
খিল	ক্ষি ২৩২	খুজলি	ক্ষর্ ২২৮	খুরালিকা	ক্ষু ২৩৪	খেঁট	ক্ষ্ ২২৭	খেয়	খন্ ২৪৮
খিলকা	ক্ষি ২৩০	খুট	ক্ষু ২৩৪	খুরি (রী)	ক্ষু ২৩৫	খেঁড়	ক্ষি ২৩০	খেয়	ক্ষিপ্ ২৩৩
খিলখিল	ক্ষি ২৩২	খুটখাট	ক্ষু ২৩৪	খুর্মা	ক্ষর্ ২২৮	খেঁড়ু	ক্ষি ২৩০	খেয়া	ক্ষিপ্ ২৩৩
খিলিখিলি	ক্ষি ২৩০	খুটখুট	ক্ষু ২৩৪	খুল	খন্ ২৪৮	খেঁড়ো	ক্ষি ২৩০	খেয়াঘাট	ক্ষিপ্ ২৩৩
খিলনি(নী)	ক্ষি ২৩০	খুঁটা	ক্ষ্ ২২৩	খুল	ক্ষু ২৩৫	খেঁ(খে)সারি	খঞ্জ্ ২৪৭	খেয়ানৎ	ক্ষি ২৩০
খিলভূমি	ক্ষি ২৩২	খুটুরখাটুর	ক্ষু ২৩৪	খুলি	ক্ষু ২৩৫	খেংরা	ক্ষ্ ২৫১	খেয়ানি(নী)	ক্ষিপ্ ২৩৩
খিলা	ক্ষি ২৩০	খুটুরখুটুর	ক্ষু ২৩৪	খুল্ল	ক্ষুদ্ ২৩৫	খেক	ক্ষ্ ২২৩	খেয়ার	ক্ষিপ্ ২৩৩
খিলাত	ক্ষি ২৩০	খুড়	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুল্লতাত	ক্ষুদ্ ২৩৫	খেঘাট	ক্ষিপ্ ২৩৩	খেয়ারি(রী)	ক্ষিপ্ ২৩৩
খিলা(লে)ন	ক্ষল্ ২২৯	খুড়তা	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুশ	ক্ষ্ ২২৩	খেঙ(ঙ্গ)রা	ক্ষ্ ২২৩	খেয়াল	ক্ষি ২৩০
খি(খে)লাপ	ক্ষল্ ২২৯	খুড়শাশুড়ি	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুশ	ক্ষু ২২৬	খেচনি(নী)	ক্ষি ২৩০	খেরাজ-জমি	ক্ষর্ ২২৯
খিলি	ক্ষল্ ২৩২	খুড়শ্বশুর	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুশখুশ	ক্ষু ২৩৪	খেচর	খ্ ২৫২	খেরো	ক্ষর্ ২২৮
খিলিকা	ক্ষল্ ২২৯	খুড়া	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুশবু	ক্ষ্ ২২৬	খেচাখেচি	ক্ষি ২৩০	খেল	ক্ষি ২৩২
খিলিখিলি	ক্ষল্ ২৩২	খুড়াখুড়া	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুশমেজাজ	ক্ষ্ ২২৩	খেজায়	খিদ্ ২৫১	খেলওয়াড়	ক্ষি ২৩০
খিলীকৃত	ক্ষল্ ২২৯	খুড়াত	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুশহাল	ক্ষ্ ২২৩	খেজুর	ক্ষর্ ২২৮	খেলন	ক্ষি ২৩০
খীণ(ন)	ক্ষি ২৩০	খুড়ী	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুশহাল	ক্ষু ২৩৪	খেট	ক্ষি ২৩২	খেলনা	ক্ষি ২৩০
খীল	ক্ষি ২৩০	খুড়ীমা	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুশা	ক্ষু ২৩৪	খেটক	ক্ষি ২৩২	খেলা	ক্ষি ২৩১
খুইয়া	ক্ষু ২৩৪	খুড়ো	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুশি (খুশী)	ক্ষ্ ২২৬	খেটে	ক্ষ্ ২২৭	খেলাঘর	ক্ষি ২৩০
খুঁচড়া	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুঞা	ক্ষু ২৩৪	খুশি (খুশী)	ক্ষু ২৩৪	খেটেল	ক্ষ্ ২২৩	খেলাড়	ক্ষি ২৩০
খুঁচা	ক্ষুদ্ ২৩৬	খুঞি	ক্ষু ২৩৪	খুশুরখুশুর	ক্ষু ২৩৪	খেড়	ক্ষ্ ২২৩	খেলুড়ে	ক্ষি ২৩০
খুঁচি	ক্ষুদ্ ২৩৬	খুদ	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুশ্(স্)ক	ক্ষু ২৩৪	খেড়া	ক্ষি ২৩০	খেলাত	ক্ষি ২৩০
খুঁজ	ক্ষু ২৩৪	খুদ্দ	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুশ্(স্)কা	ক্ষু ২৩৪	খেড়ি(ড়ী)	ক্ষি ২৩০	খেলাদুলা	ক্ষি ২৩০
খুঁট	ক্ষ্ ২২৭	খুদ্র	ক্ষুদ্ ২৩৫	খুশামোদ	ক্ষ্ ২২৬	খেণ(ন)	ক্ষ্ ২২৩	খেলাদেলা	ক্ষি ২৩০
খুঁট-আখুরে	ক্ষ্ ২২৩	খুধা	ক্ষুধ্ ২৩৬	খুসখুস	ক্ষু ২৩৪	খেত	ক্ষি ২৩০	খেলাদোলা	ক্ষি ২৩০
খুঁটা	ক্ষ্ ২২৭	খুন	ক্ষু ২৩৪	খুসি(সী)	ক্ষু ২৩৪	খেতরি	ক্ষি ২৩০	খেলাধুলো	ক্ষি ২৩০
খুঁটিনাটি	ক্ষ্ ২২৩	খুনখারাপ(ব)	ক্ষু ২৩৪	খুসুরখুসুর	ক্ষু ২৩৪	খেতি	ক্ষি ২৩০	খেলান	ক্ষি ২৩০
খুঁটিনাটি	নট্ ৬২৪	খুনাখুনি	ক্ষু ২৩৪	খে	ক্ষিপ্ ২৩৩	খেতী	ক্ষি ২৩০	খেলানীয়া	ক্ষি ২৩০
খুঁটি(টী)	ক্ষ্ ২২৭	খুনী	ক্ষু ২৩৪	খেআ	ক্ষিপ্ ২৩৩	খেদ	ক্ষি ২৩০	খেলানে	ক্ষি ২৩০
খুঁটো	ক্ষ্ ২২৩	খুন্তি	ক্ষু ২৪৯	খেআ(য়া)তি	খ্যা ২৫১	খেদ	খিদ্ ২৫১	খেলি	ক্ষি ২৩০
খুঁড়	ক্ষ্ ২৩৪	খুপরি	ক্ষিপ্ ২৩৫	খেই	ক্ষিপ্ ২৩৩	খেদা	ক্ষি ২৩০	খেলু	ক্ষি ২৩০
খুঁড়িয়ে চলা	খঞ্জ্ ২৪৬	খুপুরি	ক্ষিপ্ ২৩৫	খেউ	ক্ষিপ্ ২৩৩	খেদা	খিদ্ ২৫১	খেলুয়া	ক্ষি ২৩০
খুঁত	ক্ষ্ ২২৩	খুব	ক্ষু ২৩৪	খেউর	ক্ষু ২৩৪	খেদাড়	ক্ষি ২৩০	খেলো	ক্ষি ২৩০
খুঁতখুঁত	ক্ষ্ ২২৩	খুবসুরত	ক্ষু ২৩৪	খেউরি(রী)	ক্ষু ২৩৪	খেদিত	ক্ষি ২৩০	খেলো(ল)য়াড়	ক্ষি ২৩০
খুঁয়া	ক্ষু ২৩৪	খুবানী	ক্ষু ২৩৪	খেও	ক্ষিপ্ ২৩৩	খেদো	ক্ষি ২৩০	খেশ্	খা ২৫০
খুঁয়াড়	ক্ষু ২৩৪	খুমার	ক্ষু ২৩৪	খেওয়া	ক্ষিপ্ ২৩৩	খেতাব	ক্ষি ২৩০	খেশকো	খা ২৫০
খুঁয়েতাঁতি	ক্ষু ২৩৪	খুয়া	ক্ষু ২৩৪	খেঁ	ক্ষ্ ২২৩	খেনৎ	ক্ষি ২৩০	খেসট	ক্ষ্ ২২৩
খুক	ক্ষু ২৩৪	খুর্	ক্ষু ২৩৪	খেঁউড়	ক্ষি ২৩০	খেপ	ক্ষিপ্ ২৩৩	খেসর	খ্ ২৫৩
খুকি(কী)	ক্ষু ২৩৪	খুর	ক্ষু ২৩৫	খেংরাগুঁপো	ক্ষ্ ২২৩	খেপলা	ক্ষিপ্ ২৩৪	খেসারৎ	ক্ষ্ ২২৩
খুঙ্গি(ঙ্গী)	ক্ষু ২৩৪	খুরখুর	ক্ষু ২৩৪	খেঁকশিয়াল	ক্ষ্ ২২৩	খেপা	ক্ষিপ্ ২৩৩	খেসি	ক্ষ্ ২২৩
খুচ	ক্ষু ২৩৪	খুরখুরে	ক্ষু ২৩৪	খেঁকি	ক্ষ্ ২২৩	খেম	ক্ষম্ ২২৭	খৈ	ক্ষ্ ২২৩
খুচখাচ	ক্ষু ২৩৪	খুরপা	ক্ষু ২৩৫	খেঁচ	ক্ষি ২৩১	খেমচ	ক্ষম্ ২২৭	খৈরত	ক্ষর্ ২২৮
খুচখুচ	ক্ষু ২৩৪	খুরপি	ক্ষু ২৩৫	খেঁচড়া	ক্ষি ২৩০	খেমচা	ক্ষম্ ২২৭	খৈরত	ক্ষি ২৩০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
গজানন	গম্	২৬৮	গঁড়ে	গড়্	২৫৬	গণ্ডদেশ	গণ্	২৫৭	গতিপথ	গম্	২৬২	গন্ধনকুল	গম্	২৬২
গজারি	গম্	২৬২	গড়েন	গড়্	২৫৬	গণ্ডপিণ্ড	গণ্	২৫৭	গতিবিধি	গম্	২৬৯	গন্ধপুষ্প	গম্	২৬২
গজারোহ	গম্	২৬২	গড়্	গড়্	২৫৬	গণ্ডফলক	গণ্	২৫৭	গতিভঙ্গ	গম্	২৬২	গন্ধবণিক	গম্	২৭১
গজাল	গম্	২৬২	গড়ুই	গড়্	২৫৬	গণ্ডভিত্তি	গণ্	২৫৭	গতিশক্তি	গম্	২৬২	গন্ধবতী	গম্	২৬৯
গজাশন	গম্	২৬২	গড়ডর	গড়্	২৫৬	গণ্ডমালা	গণ্	২৫৭	গতিহীন	গম্	২৬২	গন্ধবহ	গম্	২৬২
গজাসুর	গম্	২৬২	গড়ভারি(লি)কা	গড়্	২৫৬	গণ্ডমূর্খ	গণ্	২৬০	গতে	গম্	২৬২	গন্ধবাণ্যা	গম্	২৭১
গজাস্য	গম্	২৬৮	গড়ডুক	গড়্	২৫৬	গণ্ডযোগ	গণ্	২৫৭	গত্ত	গৃ	২৯০	গন্ধবান	গম্	২৬২
গজী	গম্	২৬২	গড়্যা	গড়্	২৫৬	গণ্ডলেখা	গণ্	২৫৭	গত্যন্তর	গম্	২৬২	গন্ধবাহ	গম্	২৬২
গজেন্দ্র	গম্	২৬২	গড়্(র)ই	গড়্	২৫৬	গণ্ডশৈল	গণ্	২৫৭	গদ্	গদ্	২৬১	গন্ধবিরজা	গম্	২৬২
গজেন্দ্রগমন	গম্	২৬২	গণ	গণ্	২৫৮	গণ্ডস্থল	গণ্	২৫৭	গদ	গদ্	২৬২	গন্ধবিরাজ	গম্	২৬২
গজেন্দ্রমোক্ষণ	গম্	২৬২	গণক	গণ্	২৫৮	গণ্ডস্থলী	গণ্	২৫৭	গদগদ	গদ্	২৬১	গন্ধবেণিয়া	গম্	২৬২
গজেশ	গম্	২৬২	গণক্কার	গণ্	২৫৭	গণ্ডা	গণ্	২৬০	গদড়া	গদ্	২৬১	গন্ধবেণে	গম্	২৬২
গঞ্ঝি	গম্	২৬২	গণৎকার	গণ্	২৫৮	গণ্ডাকীয়া	গণ্	২৫৭	গদ্দড়	গদ্	২৬১	গন্ধবেনা	গম্	২৬২
গঞ্জ্	গম্	২৬২	গণতন্ত্র	গণ্	২৫৮	গণ্ডার	গণ্	২৬০	গদা	গদ্	২৬২	গন্ধভাদাল	গম্	২৬২
গঞ্জ	গম্	২৬৮	গণদেব	গণ্	২৫৭	গণ্ডি	গণ্	২৬০	গদাই-নাচ	গদ্	২৬১	গন্ধভাদুলি(লে)	গম্	২৬২
গঞ্জন	গম্	২৬৮	গণদেবতা	গণ্	২৫৯	গণ্ডী	গণ্	২৬০	গদাধর	গদ্	২৬২	গন্ধমাদন	গম্	২৭০
গঞ্জা	গম্	২৬৮	গণদ্রব্য	গণ্	২৫৭	গণ্ডু	গণ্	২৫৭	গদি	গদ্	২৬১	গন্ধমার্জ্জার	গম্	২৬২
গঞ্জিকা	গম্	২৬৮	গণন	গণ্	২৫৮	গণ্ডূষ	গণ্	২৬১	গদিত	গদ্	২৬২	গন্ধমালতী	গম্	২৬২
গঞ্জিত	গম্	২৬২	গণনা	গণ্	২৫৮	গণ্ডোপধান	গণ্	২৫৭	গদিয়ান	গদ্	২৬১	গন্ধমূলক	গম্	২৬২
গট	গম্	২৬২	গণনাথ	গণ্	২৫৭	গণ্ডোপল	গণ্	২৫৭	গদী	গদ্	২৬১	গন্ধমূলা	গম্	২৬২
গটগট	গম্	২৬৮	গণনীয়	গণ্	২৫৭	গণ্য	গণ্	২৫৭	গদ্দি	গদ্	২৬১	গন্ধমু(মূ)ষিক	গম্	২৬২
গটরা	গম্	২৬২	গণপতি	গণ্	২৫৭	গৎ	গম্	২৬২	গদ্দিনসীন	গদ্	২৬১	গন্ধমৃগ	গম্	২৬২
গটিয়া	গম্	২৬২	গণপর্ব্বত	গণ্	২৫৭	গত	গম্	২৬৮	গদী	গদ্	২৬১	গন্ধরস	গম্	২৬২
গঠ্	গঠ্	২৫৪	গণরাজ	গণ্	২৫৭	গতজ্বর	গম্	২৬২	গদ্গদ	গদ্	২৬১	গন্ধরাজ	গম্	২৬২
গঠন	গঠ্	২৫৪	গণরাত্র	গণ্	২৫৭	গতপ্রত্যাগত	গম্	২৬২	গদ্দান	গৃ	২৯০	গন্ধর্ব্ব	গম্	২৭০
গঠিত	গঠ্	২৫৪	গণরায়	গণ্	২৫৭	গতপ্রায়	গম্	২৬৮	গদ্য	গদ্	২৬২	গন্ধর্ব্বনগর	গম্	২৭১
গড়	গড়্	২৫৬	গণা	গণ্	২৫৭	গতব্যথ	গম্	২৬২	গন	গম্	২৬৯	গন্ধর্ব্ববিদ্যা	গম্	২৭১
গড়খাই	গড়্	২৫৬	গণাই	গণ্	২৫৭	গতর	গম্	২৬২	গনগন	গম্	২৬৯	গন্ধর্ব্ববিবাহ	গম্	২৭১
গড়ক	গড়্	২৫৬	গণাগণ	গণ্	২৫৭	গতরস	গম্	২৬২	গনগনি	গম্	২৬২	গন্ধর্ব্ববেদ	গম্	২৭১
গড়খাঞি	গড়্	২৫৬	গণাধিপ	গণ্	২৫৭	গতরাইয়তী	গম্	২৬২	গন-বেগন	গম্	২৬২	গন্ধর্ব্বমার	গম্	২৭১
গড়গড়	গড়্	২৫৬	গণাধিপতি	গণ্	২৫৭	গতরায়তী	গম্	২৬২	গন্তব্য	গম্	২৬৯	গন্ধর্ব্বরাজ	গম্	২৭১
গড়গড়া	গড়্	২৫৬	গণান্ন	গণ্	২৫৭	গতসঙ্গ	গম্	২৬২	গন্ধ্	গম্	২৬২	গন্ধলেপ	গম্	২৬২
গড়গড়ি	গড়্	২৫৬	গণি	গণ্	২৫৭	গতস্পৃহ	গম্	২৬২	গন্ধ	গম্	২৬৯	গন্ধশালি	গম্	২৬২
গড়গোয়ালা	গড়্	২৫৬	গণিকা	গণ্	২৫৭	গতা	গম্	২৬২	গন্ধক	গম্	২৬৯	গন্ধসার	গম্	২৬২
গড়ন	গড়্	২৫৬	গণিকারিকা	গণ্	২৫৭	গতাগত	গম্	২৬২	গন্ধকালী	গম্	২৬৯	গন্ধহস্তী	গম্	২৬২
গড়বড়	গড়্	২৫৬	গণিত	গণ্	২৫৭	গতাগতি	গম্	২৬২	গন্ধকাষ্ঠ	গম্	২৬২	গন্ধাজীব	গম্	২৭১
গড়(র)ল	গৃ	২৯০	গণেশ	গণ্	২৫৯	গতানুগত	গম্	২৬২	গন্ধকুটী	গম্	২৬২	গন্ধাঢ্য	গম্	২৬২
গড়লবণ	গড়্	২৫৬	গণেশ-আঁকড়ি	গণ্	২৫৭	গতানুগতিক	গম্	২৬২	গন্ধখড়	গম্	২৬২	গন্ধাধিবাস	গম্	২৬২
গড়া	গড়্	২৫৬	গণেশ-আঁকুড়ি	গণ্	২৫৭	গতায়াত	গম্	২৬৮	গন্ধগোকলো	গম্	২৬২	গন্ধাধিবাসন	গম্	২৬২
গড়াগড়ি	গড়্	২৫৬	গণেশান	গণ্	২৫৭	গতায়ু	গম্	২৬২	গন্ধগোকুলা	গম্	২৬২	গন্ধামোদ	গম্	২৬২
গড়ান	গড়্	২৫৬	গণেশ্বর	গণ্	২৫৭	গতায়ুষ	গম্	২৬২	গন্ধতৃণ	গম্	২৬২	গন্ধার	গম্	২৬২
গড়ি	গড়্	২৫৬	গণ্ড	গণ্	২৬০	গতার্থ	গম্	২৬২	গন্ধতেল	গম্	২৬২	গন্ধালী	গম্	২৬২
গড়িমসি(সী)	গড়্	২৫৬	গণ্ডক	গণ্	২৬০	গতাসু	গম্	২৬৮	গন্ধতৈল	গম্	২৬২	গন্ধি	গম্	২৬২
গড়িয়া	গড়্	২৫৬	গণ্ডগোল	গণ্	২৬০	গতি	গম্	২৬৯	গন্ধদারু	গম্	২৬২	গন্ধিক	গম্	২৬২
গড়িয়ান	গড়্	২৫৬	গণ্ডগ্রাম	গণ্	২৬০	গতিক	গম্	২৬৯	গন্ধদ্বিপ	গম্	২৬২	গন্ধিত	গম্	২৬২

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
গন্ধী	গম্ ২৬২	গয়ঘড়	গম্ ২৬২	গরুড়াগ্রজ	গৃ ২৯০	গর্হণ	গর্হ্ ২৭৮	গল্ল	গল্ ২৭৮
গন্ধেন্দ্রিয়	গম্ ২৬২	গয়না	গুহ্ ২৮৯	গরুৎ	গৃ ২৯০	গর্হন	গর্হ্ ২৭৮	গল্লর্ক	গল্ ২৭৮
গন্ধেশ্বরী	গম্ ২৭১	গয়নাগাঁটি	গুহ্ ২৮৯	গরুৎমন্ত	গৃ ২৯০	গর্হিত	গর্হ্ ২৭৮	গল্লা	গল্ ২৭৮
গন্ধোপজীবী	গম্ ২৭১	গয়লা	গম্ ২৬২	গরুস্থান	গৃ ২৯০	গল্	গল্ ২৭৮	গল্বর্ক	গল্ ২৭৮
গপ	গল্ ২৭৮	গয়সাল	গম্ ২৬২	গরুবে	গৃ ২৯০	গল	গল্ ২৭৮	গসগস	গল্ ২৭৮
গপগপ	গল্ ২৭৮	গয়া	গম্ ২৭২	গরুয়া	গৃ ২৯০	গলই	গল্ ২৭৮	গস্ত	গল্ ২৭৮
গপ্‌প	গল্ ২৭৮	গয়ার	গম্ ২৬২	গর্গ	গৃ ২৯৩	গলগণ্ড	গল্ ২৭৮	গস্তান	গল্ ২৭৮
গব	গম্ ২৭১	গয়ালি(লী)	গম্ ২৬২	গর্গর	গৃ ২৯৩	গলগল	গল্ ২৭৮	গস্তানি(নী)	গল্ ২৭৮
গবগব	গম্ ২৭১	গয়ের	গম্ ২৬২	গর্জ্জ্	গৃ ২৯০	গলগ্রহ	গল্ ২৭৮	গহ্	গুহ্ ২৮৯
গবয়	গম্ ২৬২	গর	গৃ ২৯১	গর্জ্জ	গৃ ২৯৩	গলগ্রাহিতা	গল্ ২৭৮	গহ্	গুহ্ ২৮৯
গবলগণ	গৃ ৩০৩	গরগর	গৃ ২৯১	গর্জ্জন	গৃ ২৯৩	গলৎ	গল্ ২৭৮	গহ্	গ্রহ্ ৩০১
গবা	গম্ ২৬২	গ'র (গইর)	গৃ ২৯০	গর্জ্জিত	গৃ ২৯০	গলৎকুষ্ঠ	গল্ ২৭৮	গহন	গুহ্ ২৮৯
গবাক্ষ	গম্ ২৭২	গরগণ্ড	গল্ ২৭৮	গর্ত্ত	গৃ ২৯৪	গলতী	গল্ ২৭৮	গহনা	গুহ্ ২৮৯
গবারাম	গম্ ২৬২	গরজ	গৃ ২৯০	গর্দ্দ	গৃ ২৯০	গলদ্	গল্ ২৭৮	গহরা	গম্ ২৬২
গবালি	গম্ ২৬২	গরজ(গর্জ্জ)	গৃ ২৯০	গর্দ্দভ	গৃ ২৯৪	গলদশ্রু	গল্ ২৭৮	গহি(হী)র	গম্ ২৬২
গবাশন	গম্ ২৬২	গরজা	গৃ ২৯০	গর্দ্দা	গৃ ২৯০	গলদ্‌ঘর্ম্ম	গল্ ২৭৮	গহি(হী)রা	গম্ ২৬২
গবাশ্ব	গম্ ২৬২	গরদ	গৃ ২৯০	গর্দ্দান	গৃ ২৯০	গলদ্ধার	গল্ ২৭৮	গহীন	গুহ্ ২৮৯
গবী	গম্ ২৬২	গর(ড়)ফুটন্ত	গৃ ২৯০	গর্দ্দানা	গৃ ২৯০	গলদ্বার	গল্ ২৭৮	গহ্বর	গুহ্ ২৮১
গবুচন্দ্র	গম্ ২৬২	গরব	গৃ ২৯০	গর্দ্ধভ	গৃ ২৯৪	গলন	গল্ ২৭৮	গা	গাহ্ ২৮০
গবেড়ু	গম্ ২৬২	গরভ	গৃ ২৯০	গর্দ্ধন	গৃ ২৯৪	গলবস্ত্র	গল্ ২৭৮	গা	গম্ ২৭৩
গবেড়ুকা	গম্ ২৬২	গরম	গৃ ২৯০	গর্ব্ব	গৃ ২৯৪	গললগ্নীকৃতবাস	গল্ ২৭৮	গাঅ	গম্ ২৬২
গবেধু	গম্ ২৬২	গরমাই	গৃ ২৯০	গর্ব্বিত	গৃ ২৯৪	গলস্তন	গল্ ২৭৮	গাঅন	গাহ্ ২৮০
গবেধুকা	গম্ ২৬২	গরমি	গৃ ২৯০	গর্ব্বী	গৃ ২৯৪	গলহস্ত	গল্ ২৭৮	গাই	গম্ ২৬২
গবেষ	গম্ ২৬২	গরমী	গৃ ২৯০	গর্ভ	গৃ ২৯৪	গলা	গল্ ২৭৯	গাইন	গাহ্ ২৯০
গবেষণ	গম্ ২৬২	গররা	গৃ ২৯০	গর্ভক	গৃ ২৯০	গলাকাটা	গল্ ২৭৮	গাইয়ে	গাহ্ ২৯০
গবেষণা	গম্ ২৭২	গরল	গৃ ২৯০	গর্ভকেশর	গৃ ২৯০	গলাখুসকি	গল্ ২৭৮	গাইল	গল্ ২৭৮
গব্য	গম্ ২৬২	গ'রশাল	গৃ ২৯০	গর্ভকোশ	গৃ ২৯০	গলাখুসখুসানি	গল্ ২৭৮	গাউনী	গাহ্ ২৮০
গব্যূতি	গম্ ২৬২	গরহাজির	গৃ ২৯১	গর্ভগৃহ	গৃ ২৯০	গলাগলি	গল্ ২৭৯	গাএ(য়ে)ন	গাহ্ ২৮০
গভর	গাহ্ ২৮০	গরাণ	গৃ ২৯০	গর্ভঘুটিক	গৃ ২৯০	গলাটিপ	গল্ ২৭৮	গাওক	গাহ্ ২৮০
গভস্তি	গাহ্ ২৮০	গরাদ	গৃ ২৯০	গর্ভথোড়	গৃ ২৯০	গলাটেপা	গল্ ২৭৮	গাওন	গাহ্ ২৮০
গভীর	গম্ ২৭২	গরাস	গ্রস্ ৩০০	গর্ভদাস	গৃ ২৯০	গলাধঃকরণ	গল্ ২৭৮	গাওয়া	গাহ্ ২৭৩
গম্	গম্ ২৭২	গরি(রী)ব	গৃ ২৯২	গর্ভভবন	গৃ ২৯০	গলাধাক্কা	গল্ ২৭৮	গাওয়া	গম্ ২৬২
গম	গম্ ২৭২	গরিমা	গৃ ২৯২	গর্ভর	গৃ ২৯০	গলান	গল্ ২৭৯	গাং	গম্ ২৬২
গমক	গম্ ২৭২	গরিষ্ঠ	গৃ ২৯২	গর্ভস্থ	গৃ ২৯০	গলাবন্দ(ন্ধ)	গল্ ২৭৮	গাঁ	গ্রস্ ৩০০
গমগম	গম্ ২৭২	গরিহণ	গর্হ্ ২৭৮	গর্ভস্নান	গৃ ২৯০	গলাবাজি(জী)	গল্ ২৭৮	গাঁই	গ্রস্ ৩০০
গমন	গম্ ২৭২	গরিহা	গর্হ্ ২৭৮	গর্ভস্রাব	গৃ ২৯০	গলাভাঙা	গল্ ২৭৮	গাঁইগুঁই	গ্রস্ ৩০০
গমনীয়	গম্ ২৬২	গরীয়	গৃ ২৯০	গর্ভাগার	গৃ ২৯০	গলাশি	গল্ ২৭৮	গাঁইট	গঠ্ ২৫৫
গমি	গম্ ২৬২	গরীয়ান	গৃ ২৯২	গর্ভাঙ্ক	গৃ ২৯০	গলি	গল্ ২৭৮	গাঁইটা	গঠ্ ২৫৪
গমিত	গম্ ২৬২	গরু	গম্ ২৬২	গর্ভাধান	গৃ ২৯০	গলিকুচা	গল্ ২৭৮	গাঁইঠা	গঠ্ ২৫৪
গম্বুজ	গু ২৮৭	গরুঅ	গৃ ২৯০	গর্ভাশয়	গৃ ২৯০	গলিঘুজি	গল্ ২৭৮	গাঁইতি	গঠ্ ২৫৪
গম্ভারী	গম্ ২৬২	গরুড়	গৃ ২৯২	গর্ভিণী	গৃ ২৯০	গলিত	গল্ ২৭৮	গাঁক-গাঁক	গম্ ২৬২
গম্ভীর	গম্ ২৬২	গরুড়ধ্বজ	গৃ ২৯০	গর্ভিত	গৃ ২৯০	গলুই	গল্ ২৭৮	গাঁ-গাঁ	গম্ ২৬২
গম্ভীরা	গম্ ২৬২	গরুড়পুরাণ	গৃ ২৯০	গর্ভোদক	গৃ ২৯০	গল্দা	গল্ ২৭৮	গাঁগদাড়া	গম্ ২৬২
গম্য	গম্ ২৬২	গরুড়ব্যূহ	গৃ ২৯০	গর্ভোপঘাতিনী	গৃ ২৯০	গল্প	গল্ ২৮০	গাঁজ	গম্ ২৬২
গয়	গম্ ২৭২	গরুড়মণি	গৃ ২৯০	গর্হ্	গর্হ্ ২৭৮	গল্‌ভ	গল্ ২৭৮	গাঁজা	গম্ ২৬৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
গাঁজাই	গম্	২৬২	গাঙ্গুলি(লী)	গম্	২৬৭	গাত্র	গম্	২৭৪	গাবলগাণি	গৃ	৩০৩	গার্জ্জেন	গৃ	২৯০
গাঁজিয়া	গম্	২৬২	গা-চাবি	গম্	২৬২	গাত্রদাহ	গম্	২৭৪	গাবান	গৃ	৩০৩	গার্হপত্য	গ্রহ্	৩০১
গাঁট	গঠ্	২৫৫	গাছ	গম্	২৭৪	গাত্র-শোঁকাশুঁকি	গম্	২৬২	গাবুর	গৃ	৩০৩	গার্হস্থ্য	গ্রহ্	৩০১
গাঁট-কাটা	গঠ্	২৫৫	গাছগাছালি	গম্	২৬২	গাথ	গঠ্	২৫৪	গাবুরয়ালি	গৃ	৩০৩	গা'ল	গল্	২৭৮
গাঁটে-গাঁটে	গঠ্	২৫৪	গাছড়া	গম্	২৬২	গাথক	গাহ্	২৮০	গাবুরাণী	গৃ	৩০৩	গাল	গল্	২৭৯
গাঁট(ঠ)-ছড়া	গঠ্	২৫৫	গাছল	গম্	২৬২	গাথন	গঠ্	২৫৪	গাবুরাল	গৃ	৩০৩	গালগল্প	গল্	২৭৮
গাঁট(ঠ)-বন্দি	গঠ্	২৫৪	গাছা	গম্	২৬২	গাথ(থু)নি	গঠ্	২৫৪	গাবুরালি(লী)	গৃ	৩০৩	গালগালাজ	গল্	২৭৮
গাঁট(ঠ)রা	গঠ্	২৫৪	গাছালি	গম্	২৬২	গাথা	গঠ্	২৫৪	গাভা	গৃ	২৯০	গালচাল্লা	গল্	২৭৮
গাঁট(ঠ)রি(রী)	গঠ্	২৫৪	গাছি	গম্	২৬২	গাথা	গাহ্	২৮১	গাভিন	গৃ	২৯০	গালন	গল্	২৭৮
গাঁট(ঠ)শূল	গঠ্	২৫৪	গাছি	গু	২৮২	গাথিকা	গাহ্	২৮০	গাভী	গম্	২৬২	গালপাটা(ট্টা)	গল্	২৭৮
গাঁটি(ঠি)	গঠ্	২৫৪	গাজ	গৃ	২৯৪	গাদ	গম্	২৬২	গাভুর	গৃ	৩০৩	গালব	গল্	২৭৯
গাঁট্টা	গঠ্	২৫৪	গাজন	গৃ	২৯৪	গাদন	গম্	২৬২	গাভুরালি(লী)	গৃ	৩০৩	গালবাদ্য	গল্	২৭৮
গাঁট্টাগোঁট্টা	গঠ্	২৫৪	গাজর	গৃ	২৯০	গাদমনি	গম্	২৬২	গাম	গ্রস্	৩০০	গালবালিশ	গল্	২৭৮
গাঁঠল	গঠ্	২৫৪	গাজা	গম্	২৬২	গাদ(দো)লা	গম্	২৬২	গামছা	গম্	২৬২	গালমুচ্চ	গল্	২৭৮
গাঁঠা	গঠ্	২৫৪	গাজী	গম্	২৯৪	গাদা	গম্	২৬২	গামার	গম্	২৬২	গালয়িতা	গল্	২৭৮
গাঁঠিছড়া	গঠ্	২৫৪	গাজুরী	গম্	২৬২	গাদ	গৃ	২৯০	গামারি	গম্	২৬২	গালসি	গল্	২৭৮
গাঁঠলি	গঠ্	২৫৪	গা-জ্বালা	গম্	২৬২	গাদালি	গম্	২৬২	গামাল	গ্রস্	৩০০	গালা	গল্	২৮০
গাঁ(গা)ঠ্যার	গঠ্	২৫৪	গাগ্রি(গ্রী)	গ্রস্	৩০০	গাদাগাদি	গম্	২৬২	গামী	গম্	২৬২	গালাগালি	গল্	২৮০
গাঁড়	গণ্	২৫৭	গাটি(ঠি)	গঠ্	২৫৪	গাদি(দী)	গম্	২৬২	গাম্ভারি(রী)	গম্	২৬২	গালাঘুষা	গল্	২৭৮
গাঁড়ি(ড়ী)য়া	গণ্	২৫৭	গাট্টা	গঠ্	২৫৪	গাধ	গাহ্	২৮১	গাম্ভীর্য্য	গম্	২৬২	গালি(লী)	গল্	২৭৯
গাঁত	গণ্	২৫৭	গাঠ	গঠ্	২৫৪	গাধা	গাহ্	২৮১	গায়	গম্	২৬২	গালিগালাজ	গল্	২৭৮
গাঁতা	গণ্	২৫৭	গাঠিত	গঠ্	২৫৪	গাধি	গাহ্	২৮১	গায়	গাহ্	২৮০	গালিত	গল্	২৭৮
গাঁতি	গণ্	২৫৭	গাঠিয়া	গঠ্	২৫৪	গাধী	গাহ্	২৮১	গায়ক	গাহ্	২৮০	গালিনী	গল্	২৭৮
গাঁথ	গঠ্	২৫৪	গাড়	গড়্	২৫৭	গাধেয়	গাহ্	২৮০	গায়কী	গাহ্	২৮০	গা-শোঁকাশুঁকি	গম্	২৬২
গাঁথন	গঠ্	২৫৪	গাড়ড়ি	গড়্	২৫৬	গান	গাহ্	২৮১	গায়ত্রী	গাহ্	২৮২	গাস	গ্রস্	৩০০
গাঁথনাকল	গঠ্	২৫৪	গাড়া	গড়্	২৫৭	গান্দিনী	গাহ্	২৭৪	গায়ত্ত্রী	গাহ্	২৮২	গাহ	গাহ্	২৮০
গাঁথা	গঠ্	২৫৪	গাড়ি(ড়ী)	গড়্	২৫৭	গান্থু	গঠ্	২৫৪	গায়ন	গাহ্	২৮২	গাহক	গাহ্	২৮০
গাঁথিল	গঠ্	২৫৪	গাড়িয়া	গণ্	২৫৭	গান্ধর্ব্ব	গম্	২৬২	গায়ন্ত	গাহ্	২৮০	গাহক	গ্রহ্	৩০১
গাঁদা	গম্	২৬২	গাড়ু	গড়্	২৫৬	গান্ধার	গম্	২৭৪	গায়িত্রী	গাহ্	২৮০	গাহন	গাহ্	২৮০
গাঁদাল	গম্	২৬২	গাড়েলা	গড়্	২৫৬	গান্ধারি	গম্	২৭৪	গায়েতা	গাহ্	২৮০	গাহনা	গাহ্	২৮০
গাঁধি	গম্	২৬২	গাড়োয়ান	গড়্	২৫৭	গান্ধারী	গম্	২৭৪	গার	গড়্	২৫৬	গাহিত	গাহ্	২৮০
গাঁধিপোকা	গম্	২৬২	গাঢ়	গাহ্	২৮১	গান্ধিক	গম্	২৬২	গারস্ত	গ্রহ্	৩০১	গিআ	গম্	২৬২
গাগর	গৃ	২৯০	গাঢ়া	গাহ্	২৮০	গান্ধিচুষা	গম্	২৬২	গারস্থ	গ্রহ্	৩০১	গিআ(য়া)ন	জ্ঞা	৪০০
গাগরা	গৃ	২৯০	গাণপত্য	গণ্	২৫৭	গান্ধী	গম্	২৭১	গারি(রী)	গল্	২৭৮	গিঁট(ঠ)	গঠ্	২৫৫
গাগরি(রী)	গৃ	২৯০	গাণ্ড	গণ্	২৬১	গাপ	গম্	২৬২	গারিহস্থ	গ্রহ্	৩০১	গিঁঠা	গঠ্	২৫৪
গাঙ(ঙ্গ)	গম্	২৬২	গাণ্ডি(ণ্ডী)	গণ্	২৬১	গাফিল	গম্	২৬২	গারা	গ্রহ্	৩০১	গিজগিজ	গম্	২৬২
গাঙতাড়া	গম্	২৬২	গাণ্ডি(ণ্ডী)ব	গণ্	২৬১	গাফিলতি	গম্	২৬২	গারুড়	গৃ	২৯০	গিজগিজ	গল্	২৭৮
গাঙদাড়া	গম্	২৬২	গাণ্ডীবধন্বা	গণ্	২৬১	গাব	গম্	২৬২	গারুড়ি	গৃ	২৯০	গিঞ্জিগিঞ্জি	গম্	২৬২
গাঙি(ঙ্গি)নী	গম্	২৬২	গাণ্ডীবী	গণ্	২৫৭	গাব	গাহ্	২৮০	গারুড়িক	গৃ	২৯০	গিট(ঠ)	গঠ্	২৫৪
গাঙুলি	গম্	২৬২	গাণ্ডু	গণ্	২৫৭	গাব	গৃ	২৯০	গারুড়িয়া	গৃ	২৯০	গিটকিরি(রী)	গঠ্	২৫৪
গাঙ্গ	গম্	২৬২	গাত	গম্	২৬২	গাব	গৃ	২৯০	গারুড়ী	গৃ	২৯০	গিড়গিড়	গড়্	২৫৬
গাঙ্গরী	গম্	২৬২	গাত	গাহ্	২৮০	গাবগুবাগুব	গাহ্	২৮০	গারুড়ীয়	গৃ	২৯০	গিড়িগিড়ি	গড়্	২৫৬
গাঙ্গি	গম্	২৬২	গাতব্য	গাহ্	২৮০	গাবড়া	গৃ	২৯০	গরুত্মত	গৃ	২৯০	গিধিনী	গৃ	২৯০
গাঙ্গেয়	গম্	২৬২	গাতর	গম্	২৬২	গাবদা	গৃ	২৯০	গারদ	গৃ	২৯০	গিন্নি	গৃ	২৯০
গাঙ্গুড়	গম্	২৬২	গাতা	গণ্	২৫৭	গাবর	গৃ	২৯০	গার্গী	গৃ	২৯৩	গিম (গীম)	গ্রস্	৩০০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
গিমা (গীমা)	গ্রস্ ৩০০	গীতি	গাহ্ ২৮২	গুজরী	গু ২৮২	গুড়ী	গু ২৮২	গুণসঙ্গ	গুণ্ ২৮৭
গির	গৄ ২৯৫	গীর	গৄ ২৯৬	গুজার	গু ২৮২	গুড়ীয়া	গু ২৮৫	গুণসমুদ্র	গুণ্ ২৮৭
গিরগিটি	গৄ ২৯০	গীর্ণ	গৄ ২৯৬	গুজুরগুজুর	গু ২৮২	গুড়ুক	গু ২৮২	গুণসম্পদ	গুণ্ ২৮৭
গিরস	গৄ ২৯০	গীর্ব্বাণ	গৄ ২৯৬	গুঞ্জ্	গু ২৮২	গুড়ুম	গু ২৮২	গুণসাগর	গুণ্ ২৮৭
গিরস্ত	গৄ ২৯০	গীষ্পতি	গৄ ২৯০	গুঞ্জ	গু ২৮৪	গুড়ে	গু ২৮২	গুণস্তুতি	গুণ্ ২৮৭
গিরস্থ্	গৄ ২৯০	গু	গু ২৮৩	গুঞ্জন	গু ২৮৪	গুণ	গুণ্ ২৮৭	গুণহীন	গুণ্ ২৮৭
গিরা	গৄ ২৯৫	গুআ(য়া)	গু ২৮২	গুঞ্জর	গু ২৮২	গুণক	গুণ্ ২৮৭	গুণা(না)	গুণ্ ২৮৭
গিরি	গৄ ২৯৫	গুইসাপ	গম্ ২৬২	গুঞ্জরণ	গু ২৮৪	গুণকথন	গুণ্ ২৮৭	গুণাকর	গুণ্ ২৮৭
গিরি	গ্রহ্ ৩০১	গুও	গু ২৮২	গুঞ্জরি(রী)	গু ২৮২	গুণকরণ	গুণ্ ২৮৭	গুণাগার	গুণ্ ২৮৭
-গিরি	গৄ ২৯০	গুওটা	গু ২৮২	গুঞ্জা	গু ২৮৪	গুণকর্ম্ম	গুণ্ ২৮৭	গুণাগীর	গুণ্ ২৮৭
গিরিকা	গৄ ২৯৫	গুঃ	গু ২৮২	গুঞ্জার	গু ২৮২	গুণকীর্ত্তন	গুণ্ ২৮৭	গুণাগুণ	গুণ্ ২৮৭
গিরিচক্রবর্ত্তী	গৄ ২৯০	গুঁজ	গু ২৮৪	গুঞ্জিকা	গু ২৮২	গুণগান	গুণ্ ২৮৭	গুণাঢ্য	গুণ্ ২৮৭
গিরিজ	গৄ ২৯৫	গুঁজি	গু ২৮৪	গুঞ্জিত	গু ২৮২	গুণগুণ	গুণ্ ২৮৭	গুণাতীত	গুণ্ ২৮৭
গিরিজা	গৄ ২৯৫	গুঁটলি	গু ২৮২	গুটা	গু ২৮৪	গুণগ্রাম	গুণ্ ২৮৭	গুণানুবাদ	গুণ্ ২৮৭
গিরিনদী	গৄ ২৯০	গুঁটি	গু ২৮২	গুটান	গু ২৮৪	গুণগ্রাহক	গুণ্ ২৮৭	গুণানুরাগ	গুণ্ ২৮৭
গিরিনিতম্ব	গৄ ২৯০	গুঁড়া	গু ২৮২	গুটি(টী)	গু ২৮৪	গুণগ্রাহী	গুণ্ ২৮৭	গুণান্তর	গুণ্ ২৮৭
গিরিদুর্গ	গৄ ২৯০	গুঁড়া	গু ২৮২	গুটিক	গু ২৮৪	গুণজ্ঞ	গুণ্ ২৮৭	গুণান্বিত	গুণ্ ২৮৭
গিরিবি	গৄ ২৯০	গুঁড়ি	গু ২৮২	গুটিকা	গু ২৮৪	গুণজ্ঞান	গুণ্ ২৮৭	গুণাবপাদ	গুণ্ ২৮৭
গিরিব্রজ	গৄ ২৯৬	গুঁড়িকচু	গু ২৮২	গুটিয়া	গু ২৮২	গুণতি	গুণ্ ২৮৭	গুণাবতার	গুণ্ ২৮৭
গিরিভূ	গৄ ২৯০	গুঁড়িগুঁড়ি	গু ২৮২	গুটিসুটি	গু ২৮৪	গুণত্রয়	গুণ্ ২৮৭	গুণাশ্রয়	গুণ্ ২৮৭
গিরিমান	গৄ ২৯০	গুঁড়িপিপড়া	গু ২৮২	গুড়	গু ২৮২	গুণধর	গুণ্ ২৮৭	গুণিআ	গুণ্ ২৮৭
গিরিয়াল	গৄ ২৯০	গুঁড়ী	গু ২৮২	গুড়	গু ২৮৫	গুণধাম	গুণ্ ২৮৭	গুণিত	গুণ্ ২৮৭
গিরিরাজ	গৄ ২৯৬	গুঁতা	গু ২৮৪	গুড়ক	গু ২৮৫	গুণন	গুণ্ ২৮৭	গুণিন	গুণ্ ২৮৭
গিরিরায়	গৄ ২৯০	গুঁতান	গু ২৮৪	গুড়গাঁঞি(ঞী)	গু ২৮২	গুণনিধি	গুণ্ ২৮৭	গুণী	গুণ্ ২৮৭
গিরিশ	গৄ ২৯০	গুখেগো	গু ২৮২	গুড়গুড়	গু ২৮৫	গুণনিধি	ধা ৬০০	গুণীভূত	গুণ্ ২৮৭
গি(গী)রিষ	গ্রস্ ৩০০	গুখোর	গু ২৮২	গুড়গুড়ি(ড়ী)	গু ২৮৫	গুণনীয়ক	গুণ্ ২৮৭	গুণেশ্বর	গুণ্ ২৮৭
গিরিসঙ্কট	গৄ ২৯০	গুগুলি	গু ২৮২	গুড়চাউলি(লী)	গু ২৮২	গুণবচন	গুণ্ ২৮৭	-গুণো	গুণ্ ২৮৭
গিরিসার	গৄ ২৯৬	গুগ্‌লি	গু ২৮২	গুড়চাকুলি	গু ২৮২	গুণবন্ত	গুণ্ ২৮৭	গুণোৎকর্ষ	গুণ্ ২৮৭
গিরিসুত	গৄ ২৯০	গুগ্‌গুল	গু ২৮২	গুড়চাকুলিয়া	গু ২৮২	গুণবাচন	গুণ্ ২৮৭	গুণোৎকীর্ত্তন	গুণ্ ২৮৭
গিরীন্দ্র	গৄ ২৯০	গুগ্‌গুলু	গু ২৮২	গুড়(ড়্)চী	গু ২৮২	গুণবাদ	গুণ্ ২৮৭	গুণোৎকৃষ্ট	গুণ্ ২৮৭
গিরীশ	গৄ ২৯০	গুচি	গু ২৮২	গুড়ত্বক	গু ২৮২	গুণবান	গুণ্ ২৮৭	গুণোত্তর	গুণ্ ২৮৭
গিরে	গৄ ২৯০	গুছি	গু ২৮২	গুড়পিঠা	গু ২৮২	গুণবাস	গুণ্ ২৮৭	গুণোপেত	গুণ্ ২৮৭
গিরেপ্তার	গৄ ২৯০	গুচ্চার	গু ২৮২	গুড়পিপুলী	গু ২৮২	গুণবৃক্ষ	গুণ্ ২৮৭	গুণ্ঠ্	গুণ্ ২৮৭
গিরো	গৄ ২৯০	গুচ্ছ	গু ২৮৪	গুড়পিষ্ট	গু ২৮২	গুণবৃক্ষক	গুণ্ ২৮৭	গুণ্ঠন	গুণ্ ২৮৮
গির্জ্জা	গৄ ২৯০	গুচ্ছা	গু ২৮৪	গুড়পুষ্প	গু ২৮২	গুণবৃত্তি	গুণ্ ২৮৭	গুণ্ঠিত	গুণ্ ২৮৮
গিল্	গল্ ২৭৮	গুচ্ছার	গু ২৮২	গুড়মুড়া	গম্ ২৬২	গুণবেদী	গুণ্ ২৮৭	গুণ্ড্	গুণ্ ২৮৮
গিল	গল্ ২৮০	গুছা	গু ২৮২	গুড়শর্করা	গু ২৮২	গুণভূপ	গুণ্ ২৮৭	গুণ্ড	গুণ্ ২৮৭
গিলন	গল্ ২৭৮	গুজ	গু ২৮৪	গুড়া	গু ২৮৫	গুণমই	গুণ্ ২৮৭	গুণ্ডা	গুণ্ ২৮৮
গিলা	গল্ ২৭৮	গুজগাজ	গু ২৮২	গুড়াকু	গু ২৮২	গুণমণি(নি)	গুণ্ ২৮৭	গুণ্ডি	গুণ্ ২৮৭
গিলিত	গল্ ২৭৮	গুজগুজ	গু ২৮৪	গুড়াকেশ	গু ২৮৫	গুণমন্ত	গুণ্ ২৮৭	গুণ্ডিচা	গুণ্ ২৮৭
গিসগিস	গল্ ২৭৮	গুজব	গু ২৮৪	গুড়াপূপ	গু ২৮২	গুণময়	গুণ্ ২৮৭	গুণ্ডিত	গুণ্ ২৮৭
গিহ্	ঘৄ ৩১৪	গুজবৎ	গু ২৮২	গুড়ি	গু ২৮২	গুণলুব্ধ	গুণ্ ২৮৭	গুণ্য	গুণ্ ২৮৭
গীঃ	গৄ ২৯০	গুজরা	গু ২৮২	গুড়িকা	গু ২৮২	গুণশীল	গুণ্ ২৮৭	গুত	গুপ্ ২৮৮
গীত	গাহ্ ২৮২	গুজরাট	গৄ ২৯০	গুড়িগুড়ি	গু ২৮২	গুণসংখ্যান	গুণ্ ২৮৭	গুতা	গু ২৮২
গীতা	গাহ্ ২৮০	গুজরান	গু ২৮২	গুড়িগুড়ি	গু ২৮২	গুণসংগ্রহ	গুণ্ ২৮৭	গুতাগুতি	গু ২৮২

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
গেণ্ডুক	গণ্ ২৫৭	গোঁড়	গম্ ২৬২	গোট	গম্ ২৭৫	গোধন	গম্ ২৬২	গোবাঘা	গম্ ২৬২
গেণ্ডুয়া	গণ্ ২৫৭	গোঁৎ	গম্ ২৬২	গোট	কট্ ২৮৫	গোধা	গু ২৮২	গোবাট	গম্ ২৬২
গেদা	গদ্ ২৬১	গোঁধলা	গম্ ২৬২	গোটা	গম্ ২৭৫	গোধিকা	গু ২৮২	গোবাস	গম্ ২৬২
গেন্দুয়া	গণ্ ২৫৭	গোঁফ(গুম্ফ)	গম্ ২৬২	গোটা	গু ২৮৫	গোধু(ধূ)ম	গম্ ২৭৫	গোবাসন	গম্ ২৬২
গেয়	গাহ্ ২৮০	গোঁয়া	গম্ ২৬২	গোটান	গু ২৭৫	গোধূলি(লী)	গম্ ২৬২	গোবিট	গম্ ২৬২
গে(আ)য়ান	জ্ঞা ৪০০	গোঁয়ার	গম্ ২৬২	গোটাগুটি	গু ২৭৫	গোধেনু	গম্ ২৬২	গোবিন্দ	গম্ ২৭৬
গেরস্থারী	গৃ ২৯০	গোঁয়ারা	গম্ ২৬২	গোঠ	গম্ ২৭৭	গোনর্দ্দ	গম্ ২৬২	গোবিন্দাই	গম্ ২৭৬
গেরস্ত	গ্রহ্ ৩০১	গোঁসা	গম্ ২৬২	গোড়	গম্ ২৬২	গোন(না)স	গম্ ২৬২	গোবিসর্গ	গম্ ২৬২
গেরস্তো	গ্রহ্ ৩০১	গোঁসাই	গম্ ২৬২	গোড়	গু ২৮২	গোনা	গু ২৮২	গোবৃত্তি	গম্ ২৬২
গেরি	গৃ ২৯০	গোঁসাঞি	গম্ ২৬২	গোড়া	গু ২৮২	গোনাথ	গম্ ২৬২	গোবৃষ	গম্ ২৬২
গেরিমাটি	গৃ ২৯০	গোকর্ণ	গম্ ২৬২	গোড়া	গম্ ২৬২	গোপ	গুপ্ ২৮৯	গোবেচারা	গম্ ২৬২
গেল	গম্ ২৬২	গোকুল	গম্ ২৬২	গোড়ালি	গম্ ২৬২	গোপকন্যা	গুপ্ ২৮৮	গোবৈদ্য	গম্ ২৬২
গেল	গল্ ২৮০	গোকূল	গম্ ২৬২	গোড়ালি	গু ২৮২	গোপত	গুপ্ ২৮৮	গোব্রজ	গম্ ২৬২
গেলন	গল্ ২৭৮	গোক্ষুর	গম্ ২৬২	গোডিম	গু ২৮২	গোপতি	গুপ্ ২৮৮	গোব্রত	গম্ ২৬২
গেলা	গল্ ২৮০	গোখরি	গম্ ২৬২	গোড়ে	গু ২৮২	গোপন	গুপ্ ২৮৯	গোভঙ্গিমা	গম্ ২৬২
গেলাস	গল্ ২৭৮	গোখুর	গম্ ২৬২	গোণী	গুণ্ ২৮৭	গোপানসী	গুপ্ ২৮৮	গোভাগাড়	গম্ ২৬২
গেলান	গল্ ২৮০	গোখুরা	গম্ ২৬২	গোগু	গুণ্ ২৮৭	গোপায়ক	গুপ্ ২৮৮	গোভৃৎ	গম্ ২৬২
গেলাপ	গল্ ২৭৮	গোগ্রন্থি	গম্ ২৬২	গোগুকরী	গুণ্ ২৮৭	গোপাল	গুপ্ ২৮৯	গোমক	গম্ ২৬২
গে(গ্যা)স	গম্ ২৬২	গোগ্রহ	গম্ ২৬২	গোগু(গুা)কিরী	গুণ্ ২৮৭	গোপাল	গম্ ২৬২	গোমক	গু ২৮২
গেহ	গ্রহ্ ৩০১	গোগ্রাস	গম্ ২৬২	গোগুগিরি	গুণ্ ২৮৭	গোপাষ্টমী	গুপ্ ২৮৮	গোমক্ষিকা	গম্ ২৬২
গৈ	গাহ্ ২৮০	গোঘৃত	গম্ ২৬২	গোতম	গম্ ২৭৬	গোপিকা	গুপ্ ২৮৮	গোমখুনি	গু ২৮২
গৈনারি	গণ্ ২৫৭	গোঘ্ন	গম্ ২৬২	গোতমী	গম্ ২৬২	গোপিত	গুপ্ ২৮৮	গোমড়ক	গম্ ২৬২
গৈড়	গড়্ ২৫৬	গোঙা	গম্ ২৬২	গোতালা	গাহ্ ২৮০	গোপিত্ত	গম্ ২৬২	গোমতী	গম্ ২৬২
গৈড়	গম্ ২৬২	গোঙান	গম্ ২৬২	গোতীর্থ	গম্ ২৬২	গোপিনী	গুপ্ ২৮৯	গোমধ্যমধ্যা	গম্ ২৬২
গৈবি	গ্ ৩০৩	গোঙানি	গম্ ২৬২	গোত্র	গম্ ২৭৬	গোপী	গুপ্ ২৮৯	গোমস্ত	গম্ ২৬২
গৈর	গ্ ৩০৩	গোঙার	গম্ ২৬২	গোত্র	ত্র ৪৮৮	গোপীনাথ	নাথ্ ৬৩৮	গোময়	গম্ ২৬২
গৈর	গম্ ২৬২	গোঙ্গা	গম্ ২৬২	গোত্রকর্ত্তা	ত্র ৪৮৮	গোপুচ্ছ	গুপ্ ২৮৮	গোমস্তা	গু ২৮২
গৈর	গড়্ ২৫৬	গোঙ্গান(নি)	গম্ ২৬২	গোত্রকার	ত্র ৪৮৮	গোপুচ্ছ	গম্ ২৬২	গোমা	গু ২৮২
গৈরিক	গৃ ২৯০	গোচ	গু ২৮২	গোত্রপ্রবর	ত্র ৪৮৮	গোপুর	গুপ্ ২৮৮	গোমাই	গম্ ২৬২
গৈরী	গৃ ২৯০	গোচর	গম্ ২৬২	গোত্রভিৎ	ত্র ৪৮৮	গোপেন্দ্র	গুপ্ ২৮৮	গোমাতা	গম্ ২৬২
গো	গম্ ২৭৫	গোচর	চর্ ৩৪০	গোত্রভিৎ	গম্ ২৬২	গোপ্তা	গুপ্ ২৮৮	গোমায়ু	গু ২৮২
গো	গু ২৮২	গোচর্ম্ম	গম্ ২৬২	গোত্রস্খলন	গম্ ২৬২	গোপ্য	গুপ্ ২৮৮	গোমী	গম্ ২৬২
-গো	গম্ ২৬২	গোচা	গু ২৮২	গোত্রা	ত্র ৪৮৮	গোপ্রচার	গম্ ২৬২	গোমুখ	গম্ ২৬২
গো (গুয়া)	গম্ ২৬২	গোচারক	গম্ ২৬২	গোদ	গু ২৮২	গোপ্রত(তা)র	গম্ ২৬২	গোমুণ্ডা	গম্ ২৬২
গোআ(য়া)ল	গম্ ২৬২	গোচারক	চর্ ২৪০	গোদ	দা ৫২৪	গোপ্রবেশ	গম্ ২৬২	গোমুড়ি	গম্ ২৬২
গোই	গুপ্ ২৮৮	গোচী	গম্ ২৬২	গোদন্তী	গম্ ২৬২	গোফা	গু ২৮৮	গোমুত্রিকা	গম্ ২৬২
গোই(য়ে)ন্দা	গুপ্ ২৮৮	গোছ	গু ২৮২	গোদা	গু ২৮২	গোফা	গুহ্ ২৮৯	গোমূর্খ	গম্ ২৬২
গোউড়	গড়্ ২৫৬	গোছা	গু ২৮৪	গোদা	দা ৫২৪	গোবদা	গৃ ৩০৩	গোমৃগ	গম্ ২৬২
গোউর	গৃ ২৯০	গোছান	গু ২৮৪	গোদাগা	গম্ ২৬২	গোবধ	গম্ ২৬২	গোমেদ	গম্ ২৬২
গোঁ	গম্ ২৬২	গোছাগুছি	গু ২৮২	গোদানা	গম্ ২৬২	গোবর	গম্ ২৬২	গোমেধ	গম্ ২৬২
গোঁআ	গম্ ২৬২	গোছাল	গু ২৮২	গোদাবরী	দা ৫২৪	গোবরকুড়	গম্ ২৬২	গোযান	গম্ ২৬২
গোঁগা(গুংগা)	গম্ ২৬২	গোচ্ছা	গু ২৮২	গোদাবরী	গম্ ২৭৬	গোবরগণেশ	গম্ ২৬২	গোয়াল	গম্ ২৬২
গোঁঙান	কক্ ১২৮	গোজননী	গম্ ২৬২	গোদারণ	গম্ ২৬২	গোবরাট	গৃ ২৯০	গোয়ালা	গম্ ২৬২
গোঁঙার	গম্ ২৬২	গোজন্ম	গম্ ২৬২	গোদুহ	গম্ ২৬২	গোবর্দ্ধন	গম্ ২৭৬	গোযুগ	গম্ ২৬২
গোঁজ	গম্ ২৮৪	গোঞা	গম্ ২৬২	গোধ	গু ২৮২	গোবলীবর্দ্দ	গম্ ২৬২	গোয়েন্দা	গুপ্ ২৮৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
গোয়েন্দাগিরি	গুপ্ ২৮৮	গোষ্ঠিক	গম্ ২৬২	গৌরাং	গৃ ২৯০	গ্রহরাজ	গ্রহ্ ৩০১	ঘগ্‌ঘগ্	ঘ্ ৩১৭
গোর	গৃ ২৯০	গোষ্ঠী	গম্ ২৭৭	গৌরাঙ	গৃ ২৯০	গ্রহশান্তি	গ্রহ্ ৩০১	ঘচঘচ	ঘ্ ৩১৭
গোর	গৃ ২৯০	গোষ্ঠীপতি	গম্ ২৭৭	গৌরাঙ্গ	গৃ ২৯৭	গ্রহস্থ	গ্রহ্ ৩০১	ঘচাঘচ	ঘ্ ৩১৭
গোরক্ষ	গম্ ২৬২	গোষ্ঠেশয়	গম্ ২৬২	গৌরিক	গৃ ২৯০	গ্লপন	গ্লৈ ৩০২	ঘট্	ঘট্ ৩০৩
গোরক্ষক	গম্ ২৬২	গোষ্ঠেশূর	গম্ ২৬২	গৌরিন	গৃ ২৯০	গ্লহ	গ্রহ্ ৩০১	ঘট	ঘট্ ৩০৩
গোরক্ষণ	গম্ ২৬২	গোষ্পদ	গম্ ২৬২	গৌরী	গৃ ২৯৮	গ্রাবা	গৃ ২৯০	ঘটক	ঘট্ ৩০৪
গোরক্ষনাথ	নাথ্ ৬৩৮	গোসংখ্য	গম্ ২৬২	গৌল্মিক	গু ২৮২	গ্রাবু	গৃ ২৯০	ঘটকর্পর	ঘট্ ৩০৪
গোরক্ষ্য	গম্ ২৬২	গোসর্প	গম্ ২৬২	গৌহাটী	গু ২৮২	গ্রাম	গ্রস্ ৩০০	ঘটকার	ঘট্ ৩০৩
গোরথ	গম্ ২৬২	গোসা	গম্ ২৬২	গ্রথন	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্রামণী	গ্রস্ ৩০০	ঘটকারক	ঘট্ ৩০৩
গোরগুনা	গম্ ২৬২	গোসাঁই	গম্ ২৭৭	গ্রন্থ্	গর্ঠ্ ২৫৬	গ্রামভাটি	গ্রস্ ৩০০	ঘটকৃৎ	ঘট্ ৩০৩
গোরস	গম্ ২৬২	গোসাঞি	গম্ ২৭৭	গ্রন্থ	গর্ঠ্ ২৫৬	গ্রামাধিকৃত	গ্রস্ ৩০০	ঘটদাসী	ঘট্ ৩০৩
গোরা	গৃ ২৯০	গোসাপ	গম্ ২৬২	গ্রন্থকার	গর্ঠ্ ২৫৬	গ্রামাধিপতি	গ্রস্ ৩০০	ঘটন	ঘট্ ৩০৩
গোরু	গম্ ২৬২	গোস্ত	গম্ ২৬২	গ্রন্থন	গর্ঠ্ ২৫৬	গ্রামাধ্যক্ষ	গ্রস্ ৩০০	ঘটনা	ঘট্ ৩০৩
গোরুত	গম্ ২৬২	গোস্তন	গম্ ২৬২	গ্রন্থনকল	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্রামান্ত	গ্রস্ ৩০০	ঘটনাচক্র	ঘট্ ৩০৪
গোরূপ	গম্ ২৬২	গোস্তাকি	গম্ ২৬২	গ্রন্থি	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্রামান্তর	গ্রস্ ৩০০	ঘটনাবলী	ঘট্ ৩০৪
গোরেণু	গম্ ২৬২	গোস্থান	গম্ ২৬২	গ্রন্থিক	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্রামিক	গ্রস্ ৩০০	ঘটপট	ঘট্ ৩০৪
গোরো	গৃ ২৯০	গোস্বামী	গম্ ২৭৭	গ্রন্থিচ্ছেদক	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্রামী	গ্রস্ ৩০০	ঘটপটিয়া	ঘট্ ৩০৪
গোরোচনা	গম্ ২৬২	গোহত্যা	গম্ ২৬২	গ্রন্থিত	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্রামীণ	গ্রস্ ৩০০	ঘটবারি	ঘট্ ৩০৪
গোল	গু ২৮০	গোহাড়	গম্ ২৬২	গ্রন্থিপর্ণ	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্রামীয়	গ্রস্ ৩০০	ঘটযোনি	ঘট্ ৩০৩
গোলক	গু ২৮৫	গোহারি	গম্ ২৬২	গ্রন্থিবন্ধন	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্রামেয়	গ্রস্ ৩০০	ঘটরঘটর	ঘট্ ৩০৩
গোলকধাঁধা	গু ২৮২	গোহাল	গম্ ২৬২	গ্রন্থিভেদ	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্রাম্য	গ্রস্ ৩০০	ঘটস্থাপন	ঘট্ ৩০৪
গোলগাল	গু ২৮৫	গোহালি	গম্ ২৬২	গ্রন্থিভেদক	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্রাম্যতা	গ্রস্ ৩০০	ঘটা	ঘট্ ৩০৫
গো(গু)লজার	গু ২৮২	গোহালিয়া	গম্ ২৬২	গ্রন্থিমান	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্রাস	গ্রস্ ৩০১	ঘটাখানা	ঘট্ ৩০৩
গোলদার	গু ২৮৫	গোহাল্যা	গম্ ২৬২	গ্রন্থিমোচক	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্রাসশল্য	গ্রস্ ৩০০	ঘটাটান	ঘট্ ৩০৩
গোলন্দাজ	গু ২৮২	গোহ্য	গুহ্ ২৮৯	গ্রন্থিল	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্রাসাচ্ছদন	গ্রস্ ৩০১	ঘটাটোপ	ঘট্ ৩০৩
গোলমাল	গু ২৮২	গৌড়	গড্ ২৫৭	গ্রন্থিহর	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্রাহ	গ্রহ্ ৩০১	ঘটারোল	ঘট্ ৩০৫
গোলযোগ	গু ২৮২	গৌড়	গু ২৮৬	গ্রন্থী	গর্ঠ্ ২৫৪	গ্লান	গ্লৈ ৩০২	ঘটি	ঘট্ ৩০৫
গোলা	গু ২৮০	গৌড়তিত্তিরি	গু ২৮৬	গ্রস্	গ্রস্ ৩০০	গ্লানি	গ্লৈ ৩০২	ঘটিকা	ঘট্ ৩০৫
গোলাঙ্গুল	গম্ ২৬২	গৌড়িয়া	গড্ ২৫৬	গ্রসন	গ্রস্ ৩০০	গ্রীক	গৃ ২৯০	ঘটিত	ঘট্ ৩০৩
গোলাট	গু ২৮২	গৌড়ীয়-ব্রাহ্মণ	গু ২৮৬	গ্রস্ত	গ্রস্ ৩০০	গ্রীবা	গৃ ২৯০	ঘটী	ঘট্ ৩০৫
গোলাধ্যায়	গু ২৮২	গৌণ	গুণ্ ২৮৭	গ্রহ্	গ্রহ্ ৩০১	গ্রীষ্ম	গ্রস্ ৩০১	ঘটোৎকচ	ঘট্ ৩০৬
গো(গু)লাপ(ব)	গু ২৮২	গৌণ	গুণ্ ২৮৭	গ্রহ	গ্রহ্ ৩০২	গ্রীষ্মসুন্দর	গ্রস্ ৩০১	ঘটোদর	ঘট্ ৩০৩
গোলাপ	গুণ্ ২৮৭	গৌণচান্দ্র	গুণ্ ২৮৭	গ্রহওঝা	গ্রহ্ ৩০১	গ্রেপ্তার	গৃ ২৯০	ঘটোধ্নী	ঘট্ ৩০৩
গোলাপী	গু ২৮২	গৌণিক	গুণ্ ২৮৭	গ্রহগ্রস্ত	গ্রহ্ ৩০১	গ্রেপ্তারি	গৃ ২৯০	ঘট্ট্	ঘট্ ৩০৩
গোলাম	গু ২৮২	গৌণী	গুণ্ ২৮৭	গ্রহচিন্তক	গ্রহ্ ৩০১	গ্রেব	গৃ ২৯০	ঘট্ট	ঘট্ ৩০৩
গোলাল	গু ২৮২	গৌতম	গম্ ২৬২	গ্রহণ	গ্রহ্ ৩০২	গ্রৈষ্ম	গ্রস্ ৩০০	ঘট্ট-ঘট্ট	ঘট্ ৩০৩
গোলী	গুণ্ ২৮৭	গৌতমী	গম্ ২৬২	গ্রহণি(ণী)	গ্রহ্ ৩০১	গ্রৈষ্মিক	গ্রস্ ৩০০	ঘট্টজীবী	ঘট্ ৩০৩
গোলোক	গম্ ২৮৬	গৌর	গৃ ২৯৭	গ্রহদেবতা	গ্রহ্ ৩০১	গ্লৈ	গ্লৈ ৩০২	ঘট্টন	ঘট্ ৩০৩
গোলোকধাম	গম্ ২৮৫	গৌরচন্দ্র	গৃ ২৯৭	গ্রহপতি	গ্রহ্ ৩০১	গ্লৌ	গ্লৈ ৩০২	ঘট্টপাল	ঘট্ ৩০৩
গোশাল	গম্ ২৬২	গৌরচন্দ্রিকা	গৃ ২৯৭	গ্রহপীড়ন	গ্রহ্ ৩০১			ঘট্টরাজ	ঘট্ ৩০৩
গোশালা	গম্ ২৬২	গৌরব	গৃ ২৯৯	গ্রহপীড়া	গ্রহ্ ৩০১	**ঘ**		ঘড়	ঘট্ ৩০৭
গোশীর্ষ	গম্ ২৬২	গৌরবচন	গৃ ২৯০	গ্রহপূজা	গ্রহ্ ৩০১			ঘড়ই	ঘট্ ৩০৩
গোষা	গম্ ২৬২	গৌরবিত	গৃ ২৯০	গ্রহবলি	গ্রহ্ ৩০১	ঘ	— ৩০৩	ঘড়ঘড়	ঘট্ ৩০৭
গোষ্ঠ	গম্ ২৭৭	গৌরবী	গৃ ২৯০	গ্রহবৈগুণ্য	গ্রহ্ ৩০১	ঘ-কার	ঘ্ ৩১৭	ঘড়রঘড়র	ঘট্ ৩০৩
গোষ্ঠবিহারী	গম্ ২৭৭	গৌরমুখ	গৃ ২৯৭	গ্রহযাগ	গ্রহ্ ৩০১	ঘগরি	ঘ্ ৩১৭	ঘড়া	ঘট্ ৩০৭

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ঘড়াঞ্চে	ঘট্ ৩০৩	ঘরবাড়ী	ঘৃ ৩১৪	ঘাঁত	ঘট্ ৩০৩	ঘিনঘিন	ঘৃ ৩১৬	ঘুণিত	ঘু ৩০৯
ঘড়ালে	ঘট্ ৩০৩	ঘরবাসী	ঘৃ ৩১৪	ঘাঁতঘোঁৎ	ঘট্ ৩০৩	ঘির	ঘৃ ৩১৫	ঘুণুঘুণু	ঘু ৩০৯
ঘড়ি	ঘট্ ৩০৭	ঘরভাঙানী	ঘৃ ৩১৪	ঘাগর	ঘ্ ৩১৭	ঘিলা	ঘৃ ৩১৪	ঘুণ্ট	ঘু ৩০৯
ঘড়িআল	ঘট্ ৩০৮	ঘরভেদী	ঘৃ ৩১৪	ঘাগরা	ঘ্ ৩১৭	ঘিলু	ঘৃ ৩১৪	ঘুণ্টক	ঘু ৩০৯
ঘড়ি(ড়ী)য়াল	ঘট্ ৩০৮	ঘরম	ঘৃ ৩১৪	ঘাগরি(রী)	ঘ্ ৩১৭	ঘী	ঘৃ ৩১৬	ঘুণ্টি	ঘু ৩০৯
ঘড়েঘড়	ঘট্ ৩০৩	ঘরমজানি	ঘৃ ৩১৪	ঘাগী(ঘী)	ঘু ৩১০	ঘীঁচি	ঘ্ ৩১৭	ঘুণ্টিকা	ঘু ৩০৯
ঘড়েল	ঘট্ ৩০৮	ঘরময়	ঘৃ ৩১৪	ঘাগু	ঘু ৩১০	ঘু	ঘু ৩০৯	ঘুৎকার	ঘু ৩০৯
ঘড়্যাল	ঘট্ ৩০৩	ঘরমুখো	ঘৃ ৩১৪	ঘাঘী	ঘু ৩১০	ঘুংঘুরু	ঘু ৩০৯	ঘুন	ঘু ৩০৯
ঘণ্ট	ঘট্ ৩০৭	ঘরসংসার	ঘৃ ৩১৪	ঘাঘু	ঘু ৩১০	ঘুঁঘুট	ঘু ৩০৯	ঘুনঘুন	ঘু ৩০৯
ঘণ্টক	ঘট্ ৩০৩	ঘরাও	ঘৃ ৩১৪	ঘাঘুরি	ঘ্ ৩১৭	ঘুঁঘুর	ঘু ৩০৯	ঘুনশি	ঘু ৩০৯
ঘণ্টকর্ণ	ঘট্ ৩০৩	ঘরানা	ঘৃ ৩১৪	ঘাঘড়	ঘ্ ৩১৭	ঘুঁজি	ঘু ৩০৯	ঘুনুঘুনু	ঘু ৩০৯
ঘণ্টা	ঘট্ ৩০৭	ঘরামি(মী)	ঘৃ ৩১৪	ঘাঘর	ঘ্ ৩১৭	ঘুঁট	ঘু ৩০৯	ঘুম	ঘূর্ণ্ ৩১৩
ঘণ্টাকর্ণ	ঘট্ ৩০৭	ঘরিণি(ণী)	ঘৃ ৩১৪	ঘাট	ঘট্ ৩০৮	ঘুঁটা	ঘু ৩০৯	ঘুমচোখ	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘণ্টাতাড়	ঘট্ ৩০৩	ঘরিনি(নী)	ঘৃ ৩১৪	ঘাটওআল	ঘট্ ৩০৩	ঘুঁটি	ঘু ৩০৯	ঘুমপাড়ানি(নী)	ঘূর্ণ্ ৩১৩
ঘণ্টানাদ	ঘট্ ৩০৩	ঘরিষণ	ঘৃ ৩১৪	ঘাটতি	ঘট্ ৩০৮	ঘুঁটে	ঘু ৩০৯	ঘুমন্ত	ঘূর্ণ্ ৩১৩
ঘণ্টাপথ	ঘট্ ৩০৩	ঘ'রো	ঘৃ ৩১৪	ঘাটা	ঘট্ ৩০৩	ঘুঁড়ী	ঘু ৩০৯	ঘুমুর	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘণ্টাপাটলি	ঘট্ ৩০৩	ঘরোয়া	ঘৃ ৩১৪	ঘাটি	ঘট্ ৩০৩	ঘুঁশঘুঁশ	ঘু ৩০৯	ঘুর	ঘূর্ণ্ ৩১৪
ঘণ্টাবাদ	ঘট্ ৩০৩	ঘর্ঘর	ঘৃ ৩১৪	ঘাটিআল	ঘট্ ৩০৮	ঘুগনি(নী)	ঘু ৩০৯	ঘুর	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘণ্টারাব	ঘট্ ৩০৩	ঘর্ঘরা	ঘৃ ৩১৪	ঘাটিয়াল	ঘট্ ৩০৮	ঘুঘরা	ঘু ৩০৯	ঘুরঘুট্টী	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘণ্টালী	ঘট্ ৩০৩	ঘর্ঘরিকা	ঘৃ ৩১৪	ঘাটী	ঘট্ ৩০৮	ঘুঘু	ঘু ৩১০	ঘুরঘুরী	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘণ্টাশব্দ	ঘট্ ৩০৩	ঘর্ঘরী	ঘৃ ৩১৪	ঘাটোয়াল	ঘট্ ৩০৮	ঘুঘুর	ঘু ৩১১	ঘুরণপাক	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘণ্টি	ঘট্ ৩০৩	ঘর্ম্ম	ঘৃ ৩১৫	ঘাড়	ঘট্ ৩০৮	ঘুঙ্ঘট	ঘু ৩০৯	ঘুরণি(ণী)য়া	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘণ্টিকা	ঘট্ ৩০৩	ঘর্ম্মিত	ঘৃ ৩১৪	ঘাণ্টিক	ঘট্ ৩০৩	ঘুঙ্ঘুট	ঘু ৩১১	ঘুরণী	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘণ্টেশ্বর	ঘট্ ৩০৩	ঘর্ষ	ঘৃ ৩১৪	ঘার্ত্তিক	ঘৃ ৩১৪	ঘুঙট	ঘু ৩০৯	ঘুরা	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘ(ঘা)বড়া	ঘ্ ৩১৭	ঘর্ষণ	ঘৃ ৩১৪	ঘাম	ঘৃ ৩১৫	ঘুঙ্গড়ি	ঘু ৩০৯	ঘুরুণি	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘর	ঘৃ ৩১৪	ঘষঘষ	ঘৃ ৩১৪	ঘামকিরণ	ঘৃ ৩১৪	ঘুঙ্গর	ঘু ৩১১	ঘুরুলী	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘর	গ্রহ্ ৩০১	ঘষটা	ঘৃ ৩১৪	ঘামতেল	ঘৃ ৩১৪	ঘুঙ্গানি	ঘু ৩০৯	ঘুরুলে	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘরকথা	ঘৃ ৩১৪	ঘষটাঘষটি	ঘৃ ৩১৪	ঘামা	ঘৃ ৩১৪	ঘুঙ্গুর	ঘু ৩১১	ঘুর্ঘুর	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘরকন্না	ঘৃ ৩১৪	ঘষটান	ঘৃ ৩১৪	ঘামাচি	ঘৃ ৩১৫	ঘুঙঘুর	ঘু ৩১১	ঘুর্ণা	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘরকরণ	ঘৃ ৩১৪	ঘষড়া	ঘৃ ৩১৪	ঘাস	অদ্ ২৫	ঘুচ	ঘু ৩০৯	ঘুল	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘরকরনা	ঘৃ ৩১৪	ঘষড়ান	ঘৃ ৩১৪	ঘাস	গ্রস্ ৩০১	ঘুট	ঘু ৩০৯	ঘুলঘুলি	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘরগারি(রী)	ঘৃ ৩১৪	ঘষা(সা)	ঘৃ ৩১৪	ঘাসকর	গ্রস্ ৩০০	ঘুটঘুট	ঘু ৩০৯	ঘুষ্	ঘুষ্ ৩১১
ঘরঘর	ঘৃ ৩১৪	ঘষাঘর্ষণী	ঘৃ ৩১৪	ঘাসজল	গ্রস্ ৩০০	ঘুটা	ঘু ৩০৯	ঘুষ (ঘুস)	ঘুষ্ ৩১১
ঘরঘেঁষা	ঘৃ ৩১৪	ঘষাড়	ঘৃ ৩১৪	ঘাসিয়াড়া	গ্রস্ ৩০০	ঘুটি	ঘু ৩০৯	ঘুষঘুষে	ঘুষ্ ৩১১
ঘরচড়া	ঘৃ ৩১৪	ঘষান	ঘৃ ৩১৪	ঘি	ঘৃ ৩১৬	ঘুটিং	ঘু ৩০৯	ঘুষি	ঘুষ্ ৩১১
ঘরচোর	ঘৃ ৩১৪	ঘষিল	ঘৃ ৩১৪	ঘিই	ঘৃ ৩১৬	ঘুটিক	ঘু ৩০৯	ঘুষিত	ঘুষ্ ৩১১
ঘরজামাই	ঘৃ ৩১৪	ঘষী	ঘৃ ৩১৪	ঘিউ	ঘৃ ৩১৬	ঘুটিকা	ঘু ৩০৯	ঘুষ্ট	ঘুষ্ ৩১১
ঘরজ্বালানী	ঘৃ ৩১৪	ঘষ্টি-ঘর্ষণা	ঘৃ ৩১৪	ঘিওর	ঘৃ ৩১৪	ঘুটিঙ্গ	ঘু ৩০৯	ঘুষ্টান্ন	ঘুষ্ ৩১১
ঘরট্ট	ঘৃ ৩১৪	ঘস্মর	ঘৃ ৩১৪	ঘিওড়	ঘৃ ৩১৪	ঘুটী	ঘু ৩০৯	ঘুস	ঘুষ্ ৩১১
ঘরণী	ঘৃ ৩১৪	ঘাঁঘর	ঘ্ ৩১৭	ঘিঁচ	ঘ্ ৩১৭	ঘুটে	ঘু ৩০৯	ঘুসকি(কী)	ঘুষ্ ৩১১
ঘরদোর	ঘৃ ৩১৪	ঘাঁট	ঘট্ ৩০৭	ঘিচাঘিচি	ঘৃ ৩১৫	ঘুড়িনী	ঘু ৩০৯	ঘুসা	ঘুষ্ ৩১১
ঘরদ্বার	ঘৃ ৩১৪	ঘাঁটা	ঘট্ ৩০৭	ঘিচিঘিচি	ঘৃ ৩১৪	ঘুড়ী	ঘু ৩০৯	ঘুসৃণ	ঘুষ্ ৩১১
ঘরপালানী	ঘৃ ৩১৪	ঘাঁটান	ঘট্ ৩০৭	ঘিজিঘিজি	ঘৃ ৩১৪	ঘুড্ডী	ঘু ৩০৯	ঘূর্ণ্	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘরপোড়া	ঘৃ ৩১৪	ঘাঁটি	ঘট্ ৩০৩	ঘিঞ্জি	ঘৃ ৩১৫	ঘুণ	ঘু ৩০৯	ঘূর্ণমান	ঘূর্ণ্ ৩১২
ঘরবসতি	ঘৃ ৩১৪	ঘাঁটু	ঘট্ ৩০৩	ঘিন	ঘৃ ৩১৪	ঘুণাক্ষর	ঘু ৩০৯	ঘূর্ণা	ঘূর্ণ্ ৩১২

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ঘৃ	ঘৃ ৩১৪	ঘোঁটা	ঘট্ ৩০৩	ঘ্রা	ঘ্রা ৩১৬	চকি	চত্ ৩৩০	চক্রাহ্ব	চক্ ৩১৯
ঘৃণা	ঘৃ ৩১৬	ঘোঁটান	ঘট্ ৩০৩	ঘ্রাণ	ঘ্রা ৩১৬	চকিত	চক্ ৩১৯	চক্রাহ্বয়	চক্ ৩১৯
ঘৃণালু	ঘৃ ৩১৪	ঘোঁড়া	ঘট্ ৩০৩	ঘ্রেণা	ঘ্রা ৩১৬	চকুয়া	চক্ ৩১৯	চক্রিক	চক্ ৩১৯
ঘৃণার্হ	অর্হ্ ৪৩	ঘোঁড়ারু	ঘট্ ৩০৩	ঘ্রেয়	ঘ্রা ৩১৬	চকেবা	চক্ ৩১৯	চক্রিকা	চক্ ৩১৯
ঘৃণি	ঘৃ ৩১৬	ঘোঁৎঘোঁৎ	ঘ্ ৩১৭	ঘ্যাঙা	ঘ্ ৩১৭	চকো	চক্ ৩১৯	চক্রী	চক্ ৩১৯
ঘৃণিত	ঘৃ ৩১৬	ঘোগ	ঘ্ ৩১৭	ঘ্যানঘেনে	ঘ্ ৩১৭	চকোআ	চক্ ৩১৯	চক্রীবান	চক্ ৩১৯
ঘৃণ্য	ঘৃ ৩১৬	ঘোঘ	ঘ্ ৩১৭			চকোর	চক্ ৩২০	চক্রু	চক্ ৩১৯
ঘৃত	ঘৃ ৩১৬	ঘোঙ্গট	ঘু ৩০৯	**চ**		চকোরিণী	চক্ ৩২০	চক্রেশ	চক্ ৩১৯
ঘৃতাচী	ঘৃ ৩১৬	ঘোঙ্গর	ঘু ৩০৯			চকোরী	চক্ ৩২০	চক্রেশ্বর	চক্ ৩১৯
ঘৃতার্চ্চিঃ	ঘৃ ৩১৪	ঘোঙ্গা	ঘু ৩০৯	চ	— ৩১৮	চক্ক(ক্কো)র	চক্ ৩২০	চক্ষ্	চক্ ৩১৯
ঘৃতোদ	ঘৃ ৩১৪	ঘোঙ্গা	ঘ্ ৩১৭	চই	চ্ ৩৫৮	চক্খু	চক্ ৩১৯	চক্ষণ	চক্ ৩১৯
ঘৃতশ্চুৎ	চ্যু ৩৫৬	ঘোঙ্ঘ	ঘ্ ৩১৭	চইচই	চ্ ৩৫৮	চক্র	চক্ ৩২০	চক্ষু	চক্ ৩২১
ঘৃষ্	ঘৃ ৩১৪	ঘোঙ্ঘ	ঘু ৩০৯	চইত	চি ৩৪৬	চক্রক	চক্ ৩১৯	চক্ষুঃ	চক্ ৩২১
ঘৃষ্ট	ঘৃ ৩১৪	ঘোঙ্ঘট	ঘু ৩০৯	চউ	চত্ ৩৩০	চক্রগতি	চক্ ৩১৯	চক্ষুদান	চক্ ৩১৯
ঘেঁচড়া	ঘৃ ৩১৪	ঘোট	ঘট্ ৩০৯	চউক(খ)	চক্ ৩১৯	চক্রগ্রহণী	চক্ ৩১৯	চক্ষুর্দান	চক্ ৩১৯
ঘেঁ(ঘে)চিকড়ি	ঘ্ ৩১৭	ঘোটক	ঘট্ ৩০৯	চউকি	চত্ ৩৩০	চক্রজীবক	চক্ ৩১৯	চক্ষুর্বিষয়	চক্ ৩১৯
ঘেঁচু	ঘ্ ৩১৭	ঘোটন	ঘট্ ৩০৯	চউতোর	চত্ ৩৩০	চক্রজীবী	চক্ ৩১৯	চক্ষুলজ্জা	চক্ ৩১৯
ঘেঁটকোল	ঘট্ ৩০৬	ঘোটনা	ঘট্ ৩০৩	চউথ	চত্ ৩৩০	চক্রতীর্থ	চক্ ৩১৯	চক্ষুষ্মতা	চক্ ৩১৯
ঘেঁটু	ঘট্ ৩০৬	ঘোটালা	ঘট্ ৬০৩	চউদ্দ	চত্ ৩৩০	চক্রদহ (চাকদা)	চক্ ৩১৯	চক্ষুষ্য	চক্ ৩১৯
ঘেঁতঘোঁত	ঘ্ ৩১৭	ঘোড়	ঘট্ ৩০৩	চউরি(রী)	চত্ ৩৩০	চক্রধর	চক্ ৩১৯	চক্ষুস্মান	চক্ ৩১৯
ঘেঁষ(স)	ঘৃ ৩১৪	ঘোড়ই	ঘট্ ৩০৯	চওকি	চম্ ৩৩৭	চক্রধারা	চক্ ৩১৯	চক্ষূরোগ	চক্ ৩১৯
ঘেঁষটা	ঘৃ ৩১৪	ঘোড়তোলা	ঘট্ ৩০৩	চওড়	চট্ ৩২৪	চক্রনেমি	চক্ ৩১৯	চখা	চক্ ৩১৯
ঘেঁষটান	ঘৃ ৩১৪	ঘোড়া	ঘট্ ৩০৯	চওড়া	চত্ ৩৩০	চক্রনায়ক	চক্ ৩১৯	চখু	চক্ ৩১৯
ঘেঁষড়া	ঘৃ ৩১৪	ঘোড়ারু	ঘট্ ৩০৩	চওড়া	চট্ ৩২৪	চক্রপাণি	চক্ ৩১৯	চঙ্ক	চম্ ৩৩৭
ঘেঁষড়ান	ঘৃ ৩১৪	ঘোড়ারোগ	ঘট্ ৩০৩	চওর	চম্ ৩৩৭	চক্রপাল	চক্ ৩১৯	চঙ্ক্রমণ	চ্ ৩৫৮
ঘেঙা(ঙ্গা)ন	ঘ্ ৩১৭	ঘোড়েল	ঘট্ ৩০৮	চক্	চক্ ৩১৯	চক্রবন্ধু	চক্ ৩১৯	চঙ্গ	চম্ ৩৩৭
ঘেচিকড়ি	ঘ্ ৩১৭	ঘোণা	ঘু ৩০৯	চক	চক্ ৩১৯	চক্রবক্র	চক্ ৩১৯	চঙ্গড়ক	চম্ ৩৩৭
ঘেঞ্চুলিকা	ঘ্ ৩১৭	ঘোনা	ঘূর্ণ্ ৩১২	চকখড়ি	চক্ ৩১৯	চক্রবর্ত্তী	চক্ ৩২০	চঞ্চরি	চম্ ৩৩৭
ঘেটেল	ঘট্ ৩০৬	ঘোপা	ঘ্ ৩১৭	চকচক	চক্ ৩১৯	চক্রবাক	চক্ ৩১৯	চঞ্চরিক	চম্ ৩৩৭
ঘেটি	ঘট্ ৩০৬	ঘোমটা	ঘু ৩০৯	চকরচকর	চক্ ৩১৯	চক্রবাড়	চক্ ৩১৯	চঞ্চরী	চম্ ৩৩৭
ঘেন্না	ঘৃ ৩১৪	ঘোর	ঘূর্ণ্ ৩১৪	চকদার	চক্ ৩১৯	চক্রবাত	চক্ ৩১৯	চঞ্চল	চম্ ৩৩৭
ঘেয়ারু	ঘৃ ৩১৪	ঘোরা	ঘূর্ণ্ ৩১৪	চকদার	চত্ ৩৩০	চক্রবান	চক্ ৩১৯	চঞ্চলিত	চম্ ৩৩৭
ঘের	ঘূর্ণ্ ৩১৫	ঘোরাল(লো)	ঘূর্ণ্ ৩১৪	চকবন্দী	চত্ ৩৩০	চক্রবান্ধব	চক্ ৩১৯	চঞ্চলা	চম্ ৩৩৭
ঘেরাটোপ	ঘূর্ণ্ ৩১৫	ঘোষ	ঘুষ্ ৩১১	চকবন্দী	চক্ ৩১৯	চক্রবাল	চক্ ৩১৯	চঞ্চলায়মান	চম্ ৩৩৭
ঘেরোয়াল	ঘূর্ণ্ ৩১২	ঘোষক	ঘুষ্ ৩১১	চকমক	চক্ ৩১৯	চক্রবিভেদিনী	চক্ ৩১৯	চঞ্চা	চম্ ৩৩৭
ঘেসাট-ঘোসাট	ঘৃ ৩১৪	ঘোষণা	ঘুষ্ ৩১১	চকমকি	চক্ ৩১৯	চক্রবৃদ্ধি	চক্ ৩১৯	চঞ্চু	চম্ ৩৩৭
ঘেসেড়া	গ্রস্ ৩০০	ঘোষবান	ঘুষ্ ৩১১	চকমকে	চক্ ৩১৯	চক্রব্যূহ	চক্ ৩১৯	চট্	চট্ ৩২৪
ঘেসেড়ানী	গ্রস্ ৩০০	ঘোষবতী	ঘুষ্ ৩১১	চকমিলান	চক্ ৩২০	চক্রমর্দ্দ	চক্ ৩১৯	চট	চট্ ৩২৪
ঘেসেড়ে	গ্রস্ ৩০০	ঘোষযাত্রা	ঘুষ্ ৩১১	চকমিলান	চত্ ৩৩০	চক্রযান	চক্ ৩১৯	চটক	চট্ ৩২৫
ঘেসুড়ে	গ্রস্ ৩০০	ঘোষয়িত্নু	ঘুষ্ ৩১১	চকা	চক্ ৩১৯	চক্রাঙ্গ	চক্ ৩১৯	চটকা	চট্ ৩২৫
ঘোঁঘর	ঘু ৩০৯	ঘোষা	ঘুষ্ ৩১২	চকাচকি	চক্ ৩১৯	চক্রান্ত	চক্ ৩১৯	চটচট	চট্ ৩২৫
ঘোঁজ	ঘু ৩০৯	ঘোষাল	ঘুষ্ ৩১১	চ-কার	চ্ ৩৫৮	চক্রাবর্ত্ত	চক্ ৩১৯	চটচটা	চট্ ৩২৪
ঘোঁট	ঘট্ ৩০৬	ঘোষী	ঘুষ্ ৩১২	চকার	চক্ ৩১৯	চক্রাবলী	চক্ ৩১৯	চটচাট	চট্ ৩২৪
ঘোঁটন	ঘট্ ৩০৬	ঘোস	ঘুষ্ ৩১১	চকার-বকার	চক্ ৩১৯	চক্রায়ুধ	চক্ ৩১৯	চটপট	চট্ ৩২৫
ঘোঁটনা	ঘট্ ৩০৬	ঘোষিত	ঘুষ্ ৩১১	চকাস্	চক্ ৩১৯	চক্রাশ্ম	চক্ ৩১৯	চটপটে	চট্ ৩২৫

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
চটা	চট্	৩২৪	চণ্ডিমা	চণ্	৩২৮	চতুর্ব্বিদ্য	চত্	৩৩০	চন্দনা	চন্দ্	৩৩৪	চন্দ্রাবলী	চন্দ্	৩৩৩
চটাচট	চট্	৩২৪	চণ্ডীমণ্ডপ	চণ্	৩২৯	চতুর্ব্বিধ	চত্	৩৩০	চন্দনাচল	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রাভাস	চন্দ্	৩৩৩
চটাং	চট্	৩২৪	চণ্ডীশ্বর	চণ্	৩২৮	চতুর্ব্বেদ	চত্	৩৩১	চন্দনাদিতৈল	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রায়ণ	চন্দ্	৩৩৩
চটাপট	চট্	৩২৪	চণ্ডু	চণ্	৩২৯	চতুর্ব্যূহ	চত্	৩৩০	চন্দনাদ্রি	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রার্দ্ধ	চন্দ্	৩৩৩
(চে)চটাল	চট্	৩২৪	চণ্ডেশ্বর	চণ্	৩২৯	চতুর্ভজ	চত্	৩৩০	চন্দনি(নী)	চন্দ্	৩৩৪	চন্দ্রিকা	চন্দ্	৩৩৩
চটি	চট্	৩২৬	চন্নামৃত	চর্	৩৪০	চতুর্ভুজ	চত্	৩৩০	চন্দনীয়া	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রিম	চন্দ্	৩৩৩
চটিত	চট্	৩২৬	চতুঃ	চত্	৩৩০	চতুর্ম্মাস	চত্	৩৩০	চন্দা	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রিমা	চন্দ্	৩৩৩
চটিতং	চট্	৩২৬	চতুঃপঞ্চাশৎ	চত্	৩৩০	চতুর্ম্মুখ	চত্	৩৩১	চন্দ্র	চন্দ্	৩৩৪	চন্নন	চন্দ্	৩৩৩
চটু	চট্	৩২৬	চতুঃশাল	চত্	৩৩০	চতুর্যুগ	চত্	৩৩২	চন্দ্রক	চন্দ্	৩৩৩	চপ	চপ্	৩৩৫
চটুল	চট্	৩২৬	চতুঃশালক	চত্	৩৩০	চতুর্হোত্র	চত্	৩৩০	চন্দ্রকলা	চন্দ্	৩৩৩	চপচপ	চপ্	৩৩৫
চট্ট	চট্	৩২৬	চতুঃশালা	চত্	৩৩০	চতুশ্চত্বারিংশৎ	চত্	৩৩০	চন্দ্রকান্ত	চন্দ্	৩৩৩	চপ(পে)ট	চপ্	৩৩৫
চট্টগ্রাম	চট্	৩২৬	চতুঃশালী	চত্	৩৩০	চতুশ্চন্দ্রবাহী	চত্	৩৩০	চন্দ্রকান্তি	চন্দ্	৩৩৩	চপটান	চপ্	৩৩৫
চট্টরাজ	চট্	৩২৬	চতুঃশ্লোকী	চত্	৩৩০	চতুষ্ক	চত্	৩৩০	চন্দ্রগুপ্ত	চন্দ্	৩৩৩	চপল	চপ্	৩৩৬
চট্টোপাধ্যায়	চট্	৩২৬	চতুঃষষ্টি	চত্	৩৩০	চতুষ্কর্ণ	চত্	৩৩০	চন্দ্রঘণ্টা	নু	৬৬০	চপলা	চপ্	৩৩৬
চড়	চট্	৩২৬	চতুঃসন	চত্	৩৩০	চতুষ্কি	চত্	৩৩০	চন্দ্রচূড়	চন্দ্	৩৩৩	চপেটা	চপ্	৩৩৫
চড়ই	চট্	৩২৫	চতুঃসপ্ততি	চত্	৩৩০	চতুষ্কোণ	চত্	৩৩০	চন্দ্রপুলী	চন্দ্	৩৩৩	চপেটিকা	চপ্	৩৩৫
চড়(ড়্)ভাতি	চট্	৩২৬	চতুঃসম	চত্	৩৩০	চতুষ্টয়	চত্	৩৩০	চন্দ্রপ্রভা	চন্দ্	৩৩৩	চপেটী	চপ্	৩৩৫
চড়ক	চট্	৩২৪	চতুঃসাগরী	চত্	৩৩০	চতুষ্পথ	চত্	৩৩০	চন্দ্রবংশ	চন্দ্	৩৩৫	চবক	চপ্	৩৩৫
চড়ক	চট্	৩২৪	চতুঃসীমা	চত্	৩৩০	চতুষ্পদ	চত্	৩৩০	চন্দ্রবল্লরী	চন্দ্	৩৩৩	চবচব	চপ্	৩৩৫
চড়কা	চট্	৩২৪	চতুর	চত্	৩৩০	চতুষ্পদী	চত্	৩৩০	চন্দ্রবল্লী	চন্দ্	৩৩৩	চবি	চপ্	৩৩৫
চড়চড়	চট্	৩২৪	চতুরং	চত্	৩৩০	চতুষ্পাঠী	চত্	৩৩০	চন্দ্রবিন্দু	চন্দ্	৩৩৩	চবিকা	চপ্	৩৩৫
চড়চড়ি	চট্	৩২৪	চতুরঙ্গ	চত্	৩৩০	চতুষ্পাদ	চত্	৩৩০	চন্দ্রবিম্ব	চন্দ্	৩৩৩	চবী	চপ্	৩৩৫
চড়তী	চট্	৩২৪	চতুরন্ত	চত্	৩৩০	চতুস্ত্রিংশৎ	চত্	৩৩০	চন্দ্রব্রত	চন্দ্	৩৩৩	চবুতরা	চত্	৩৩০
চড়ন	চট্	৩২৬	চতুরপণ	চত্	৩৩০	চতুস্বল	চত্	৩৩০	চন্দ্রভাগা	চন্দ্	৩৩৩	চব্বিশ	চত্	৩৩০
চড়া	চট্	৩২৬	চতুরশীতি	চত্	৩৩০	চত্তর	চত্	৩৩০	চন্দ্রমণি	চন্দ্	৩৩৩	চম্	চম্	৩৩৭
চড়াই	চট্	৩২৫	চতুরস্র	চত্	৩৩০	চত্বর	চত্	৩৩০	চন্দ্রমণ্ডল	চন্দ্	৩৩৩	চমক	চম্	৩৩৭
চড়াং	চট্	৩২৪	চতুরা	চত্	৩৩০	চত্বারিংশৎ	চত্	৩৩০	চন্দ্রমল্লিকা	চন্দ্	৩৩৩	চমকা	চম্	৩৩৭
চড়ান	চট্	৩২৪	চতুরাই	চত্	৩৩০	চন	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রমল্লী	চন্দ্	৩৩৩	চমকান	চম্	৩৩৭
চড়্কে	চট্	৩২৪	চতুরাক্ষ	চত্	৩৩০	চনচন	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রমা	চন্দ্	৩৩৩	চমকিত	চম্	৩৩৭
চড়োয়া	চট্	৩২৪	চতুরানন	চত্	৩৩০	চনমন	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রমাঃ	চন্দ্	৩৩৩	চমচম	চম্	৩৩৭
চড়াউ	চট্	৩২৪	চতুরালি(লী)	চত্	৩৩০	চনমনে	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রমালতী	চন্দ্	৩৩৩	চমচমা	চম্	৩৩৭
চণক	চণ্	৩২৮	চতুরাশ্রম	চত্	৩৩১	চনা	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রমুখী	চন্দ্	৩৩৩	চমচমে	চম্	৩৩৭
চণ্	চণ্	৩২৮	চতুরিম	চত্	৩৩০	চন্দ্	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রমৌলি	চন্দ্	৩৩৩	চ(চা)মচা	চম্	৩৩৭
চণ্ড	চণ্	৩২৮	চতুর্গব	চত্	৩৩০	চন্দ	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রলেখা	চন্দ্	৩৩৩	চমৎকরণ	চম্	৩৩৭
চণ্ডকৌশিক	চণ্	৩২৮	চতুর্থ	চত্	৩৩১	চন্দন	চন্দ্	৩৩৪	চন্দ্রলোক	চন্দ্	৩৩৩	চমৎকার	চম্	৩৩৭
চণ্ডনায়িকা	চণ্	৩২৮	চতুর্দন্ত	চত্	৩৩০	চন্দনকলিকা	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রশালা	চন্দ্	৩৩৩	চমৎকৃত	চম্	৩৩৭
চণ্ডবতী	চণ্	৩২৮	চতুর্দশ	চত্	৩৩০	চন্দনগিরি	চন্দ্	৩৩৪	চন্দ্রশেখর	চন্দ্	৩৩৩	চমৎকৃতি	চম্	৩৩৭
চণ্ডমুণ্ড	চণ্	৩২৮	চতুর্দশী	চত্	৩৩০	চন্দনধেনু	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রহা	চন্দ্	৩৩৩	চমর	চম্	৩৩৭
চণ্ডমুণ্ডা	চণ্	৩২৮	চতুর্দ্দিক	চত্	৩৩০	চন্দনপঙ্ক	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রহার	চন্দ্	৩৩৩	চমস	চম্	৩৩৭
চণ্ডসিদ্ধ	চণ্	৩২৮	চতুর্দ্দোল	চত্	৩৩০	চন্দনপর্ব্বত	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রহাস	চন্দ্	৩৩৩	চমু	চম্	৩৩৭
চণ্ডাংশু	চণ্	৩২৮	চতুর্নবতি	চত্	৩৩০	চন্দনপাটা	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রা	চন্দ্	৩৩৩	চমূরু	চম্	৩৩৭
চণ্ডাল	চণ্	৩২৯	চতুর্ব্বর্গ	চত্	৩৩০	চন্দনপীঁড়ি	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রাণী	চন্দ্	৩৩৩	চম্প	চম্	৩৩৮
চণ্ডালিকা	চণ্	৩২৯	চতুর্ব্বর্ণ	চত্	৩৩১	চন্দনবোড়া	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রাতপ	চন্দ্	৩৩৩	চম্পক	চম্	৩৩৮
চণ্ডি (ণ্ডী)	চণ্	৩২৯	চতুর্ব্বাহু	চত্	৩৩০	চন্দনশাল	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রানন	চন্দ্	৩৩৩	চম্পকনগর	চম্	৩৩৮
চণ্ডিকা	চণ্	৩২৯	চতুর্ব্বিংশতি	চত্	৩৩০	চন্দনসার	চন্দ্	৩৩৩	চন্দ্রাপীড়	চন্দ্	৩৩৩	চম্পকমালা	চম্	৩৩৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
চম্পকলতা	চম্ ৩৩৮	চর্ব্বণ	চর্ ৩৪৩	চলিত	চল্ ৩৪৫	চাঁদয়া	চন্দ্ ৩৩৩	চাটিগ্রাম	চট্ ৩২৬
চম্পট	চম্ ৩৩৮	চর্ব্বি	চর্ ৩৪০	চল্লিশ	চত্ ৩৩০	চাঁদা	চন্দ্ ৩৩৩	চাটিমকলা	চট্ ৩২৪
চম্পা	চম্ ৩৩৮	চর্ব্বী	চর্ ৩৪৩	চশমখোর	চক্ ৩১৯	চাঁদাড়	চন্দ্ ৩৩৩	চাটিয়াল	চট্ ৩২৪
চম্পাবতী	চম্ ৩৩৮	চর্ব্ব্য	চর্ ৩৪৩	চশমা	চক্ ৩১৯	চাঁদি(দী)	চন্দ্ ৩৩৩	চাটী	চট্ ৩২৪
চম্পারণ	চম্ ৩৩৮	চর্ব্বুট্টি	চর্ ৩৪০	চষ্	চৃ ৩৫৮	চাঁদোয়া	চন্দ্ ৩৩৩	চাট্টি	চর্ ৩২৪
চম্পূ	চম্ ৩৩৮	চর্ম্ম	চর্ ৩৪৩	চষ	চৃ ৩৫৮	চাঁন	চন্দ্ ৩৩৩	চাটু	চট্ ৩২৬
চয়	চি ৩৪৬	চর্ম্মক	চর্ ৩৪০	চষক	চৃ ৩৫৮	চাপকলি	চম্ ৩৩৭	চাটুকার	চট্ ৩২৬
চয়ন	চি ৩৪৬	চর্ম্মকার	চর্ ৩৪০	চষত	চৃ ৩৫৮	চাঁপা	চম্ ৩৩৭	চাটুজ্জে	চট্ ৩২৪
চয়নীয়	চি ৩৪৬	চর্ম্মকারক	চর্ ৩৪০	চষা	চৃ ৩৫৮	চাক	চক্ ৩১৯	চাটুতি	চট্ ৩২৭
চর্	চর্ ৩৪০	চর্ম্মকারী	চর্ ৩৪০	চষান	চৃ ৩৫৮	চাকচক্য	চক্ ৩১৯	চাট্যাতী	চট্ ৩২৭
চর	চর্ ৩৪১	চর্ম্মকীল	চর্ ৩৪০	চহ	চত্ ৩৩০	চাকচিক্য	চক্ ৩১৯	চাড়	চট্ ৩২৭
চরক	চর্ ৩৪১	চর্ম্মচক্ষু	চর্ ৩৪০	চহঁ	চত্ ৩৩০	চাকনচিকণ	চক্ ৩১৯	চাড়া	চট্ ৩২৭
চরকা	চক্ ৩১৯	চর্ম্মচটক	চর্ ৩৪০	চা	চি ৩৪৬	চাকতি	চক্ ৩১৯	চাড়া	চণ্ ৩২৮
চরখা	চক্ ৩১৯	চর্ম্মচটকা	চর্ ৩৪০	চাই	চি ৩৪৬	চাক(কু)ন্দা	চক্ ৩১৯	চাড়ান	চট্ ৩২৭
চরচা	চর্ ৩৪০	চর্ম্মচটিকা	চর্ ৩৪০	চাইট্টা	চত্ ৩৩০	চাকভাঁউরি(রী)	চক্ ৩১৯	চাড়ি	চট্ ৩২৭
চরণ	চর্ ৩৪২	চর্ম্মচটী	চর্ ৩৪০	চাইতে	চি ৩৪৬	চাকভাওরি(রী)	চক্ ৩১৯	চাড়্ডি	চর্ ৩৪০
চরণগ্রন্থি	চর্ ৩৪০	চর্ম্মণ্বতী	চর্ ৩৪৪	চাইর	চত্ ৩৩০	চাকর	চি ৩৪৭	চাড়ী	চট্ ৩২৭
চরণপর্ব্ব	চর্ ৩৪০	চর্ম্মনয়ন	চর্ ৩৪০	চাইল	চল্ ৩৪৫	চাকরি(রী)	চি ৩৪৭	চাণক্য	চণ্ ৩২৮
চরণব্যূহ	চর্ ৩৪০	চর্ম্মপ্রসেবক	চর্ ৩৪০	চাউনি	চি ৩৪৬	চাকলা	চক্ ৩১৯	চাণুর	চণ্ ৩২৮
চরণামৃত	চর্ ৩৪০	চর্ম্মপ্রসেবিকা	চর্ ৩৪০	চাউল	চল্ ৩৪৫	চাকা	চক্ ৩১৯	চাণ্ডাল	চণ্ ৩২৮
চরণাম্বুজ	চর্ ৩৪০	চর্ম্মাম্বরধর	চর্ ৩৪০	চাউল	চৃ ৩৫৮	চাকি(কী)	চক্ ৩১৯	চাতক	চত্ ৩৩২
চরণারবিন্দ	চর্ ৩৪০	চর্ম্মার	চর্ ৩৪০	চাওনি	চি ৩৪৬	চাক্‌খুসে	চক্ ৩১৯	চাতকিনী	চত্ ৩৩২
চরণায়ুধ	চর্ ৩৪০	চর্ম্মিক	চর্ ৩৪০	চাওয়া	চি ৩৪৬	চাক্র	চক্ ৩১৯	চাতর	চত্ ৩৩০
চরণোদক	চর্ ৩৪০	চর্ম্মী	চর্ ৩৪০	চাঁই	চি ৩৪৬	চাক্রিক	চক্ ৩১৯	চাতাল	চত্ ৩৩০
চরন্তী	চর্ ৩৪০	চর্য্য	চর্ ৩৪০	চাঁচ	চম্ ৩৩৭	চাক্ষুষ	চক্ ৩১৯	চাতুর	চত্ ৩৩০
চরম	চর্ ৩৪২	চল্	চল্ ৩৪৫	চাঁচ(ছ)নী	চম্ ৩৩৭	চাক্ষুষিক	চক্ ৩১৯	চাতুরাই	চত্ ৩৩০
চরস	চৃ ৩৫৮	চল	চল্ ৩৪৫	চাঁচর	চর্ ৩৪০	চাখ	চক্ ৩১৯	চাতুরালি(লী)	চত্ ৩৩০
চরা	চর্ ৩৪০	চলকা	চল্ ৩৪৫	চাঁচি(ছি)	চম্ ৩৩৭	চাখড়ি	চক্ ৩১৯	চাতুরাশ্রমিক	চত্ ৩৩০
চরাচর	চর্ ৩৪২	চলকান	চল্ ৩৪৫	চাঁছ	চম্ ৩৩৭	চাঙ	চি ৩৪৬	চাতুর্থক	চত্ ৩৩০
চরাট	চর্ ৩৪০	চলচল	চল্ ৩৪৫	চাঁছা	চম্ ৩৩৭	চাঙড়া	চি ৩৪৬	চাতুর্ব্বর্ণ্য	চত্ ৩৩০
চরিত	চর্ ৩৪২	চলচল-ছলছল	চল্ ৩৪৫	চাঁছাছোলা	চম্ ৩৬৩	চাঙারি	চি ৩৪৬	চাতুর্ব্বিদ্য	চত্ ৩৩০
চরিতার্থ	চর্ ৩৪২	চলচ্চিত্ত	চল্ ৩৪৫	চাঁছাপুঁছা	চম্ ৩৩৭	চাঙ্গ	চি ৩৪৬	চাতুর্ব্বৈদ্য	চত্ ৩৩০
চরিতার্থ	অর্থ্ ৪৩	চলতি	চল্ ৩৪৫	চাঁটি	চট্ ৩২৪	চাঙ্গড়	চি ৩৪৬	চাতুর্ম্মাস	চত্ ৩৩০
চরিত্র	চর্ ৩৪৩	চলৎফিরৎ	চল্ ৩৪৫	চাঁড়	চণ্ ৩২৮	চাঙ্গড়া	চি ৩৪৬	চাতুর্য্য	চত্ ৩৩০
চরু	চর্ ৩৪০	চলৎশক্তি	চল্ ৩৪৫	চাঁড়া	চণ্ ৩২৮	চাঙ্গদোলা	চি ৩৪৬	চাদর	চত্ ৩৩০
চর্চ্	চর্ ৩৪০	চলন	চল্ ৩৪৫	চাঁড়াল	চণ্ ৩২৮	চাঙ্গা	চি ৩৪৬	চানা	চণ্ ৩২৮
চর্চ্চ	চর্ ৩৪০	চলনবলন	চল্ ৩৪৫	চাঁদ	চন্দ্ ৩৩৩	চাঙ্গারি	চি ৩৪৬	চান্দোয়া	চন্দ্ ৩৩৩
চর্চ্চরি	চর্ ৩৪০	চলনি	চল্ ৩৪৫	চাঁদআ	চন্দ্ ৩৩৩	চাঙ্গী	চি ৩৪৬	চান	চন্দ্ ৩৩৩
চর্চ্চরিকা	চর্ ৩৪০	চলন্ত	চল্ ৩৪৫	চাঁদওয়া	চন্দ্ ৩৩৩	চাচর	চর্ ৩৪০	চানা	চন্দ্ ৩৩৩
চর্চ্চরী	চর্ ৩৪০	চলবল	চল্ ৩৪৫	চাঁদড়(র)	চন্দ্ ৩৩৩	চাচা	চৃ ৩৫৮	চানাচুর	চন্দ্ ৩৩৩
চর্চ্চা	চর্ ৩৪৩	চলবেচল	চল্ ৩৪৫	চাঁদনি(নী)	চন্দ্ ৩৩৩	চাঞ্চল্য	চম্ ৩৩৭	চান্দ	চন্দ্ ৩৩৩
চর্চ্চিকা	চর্ ৩৪০	চলল	চল্ ৩৪৫	চাঁদনী-চক	চক্ ৩২০	চাট	চট্ ৩২৬	চান্দআ(য়া)	চন্দ্ ৩৩৩
চর্চ্চিত	চর্ ৩৪৩	চলা	চল্ ৩৪৫	চাঁদবা	চন্দ্ ৩৩৩	চাটনী	চট্ ৩২৬	চান্দড়	চন্দ্ ৩৩৩
চর্পট	চৃ ৩৫৮	চলাচল	চল্ ৩৪৫	চাঁদমারী	চন্দ্ ৩৩৩	চাটি	চট্ ৩২৪	চান্দনি	চন্দ্ ৩৩৩
চর্ব্ব্	চর্ ৩৪০	চলাচলি	চল্ ৩৪৫	চাঁদমালা	চন্দ্ ৩৩৩	চাটিগাঁ	চট্ ৩২৬	চান্দনিক	চন্দ্ ৩৩৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
চান্দা	চন্দ্ ৩৩৩	চার	চত্ ৩৩০	চাষাড়ে	চ্ ৩৫৮	চিচ্ছক্তি	চি ৩৪৬	চিত্রকার	চি ৩৪৯
চান্দ্র	চন্দ্ ৩৩৩	চার	চর্ ৩৪৪	চাষাভু(ভূ)ষো	চ্ ৩৫৮	চিঞ্চা	চি ৩৪৬	চিত্রকর্ম্মী	চি ৩৪৬
চান্দ্রমস	চন্দ্ ৩৩৩	চা'র	চর্ ৩৪০	চাষী	চ্ ৩৫৮	চিট্	চি ৩৪৬	চিত্রকলা	চি ৩৪৬
চান্দ্রমাস	চন্দ্ ৩৩৩	চারক	চর্ ৩৪০	চাষীবাসী	চ্ ৩৫৮	চিট	চি ৩৪৬	চিত্রকূট	চি ৩৪৬
চান্দ্রায়ণ	চন্দ্ ৩৩৩	চারচক্ষুঃ	চর্ ৩৪০	চাহ্	চি ৩৪৬	চিটকে	চি ৩৪৬	চিত্রগ	চি ৩৪৬
চাপ	চপ্ ৩৩৬	চারণ	চর্ ৩৪৪	চাহ্ন	চি ৩৪৬	চিটা	চি ৩৪৬	চিত্রগত	চি ৩৪৬
চাপকান	চপ্ ৩৩৫	চারভট	চর্ ৩৪৪	চাহস্ত	চি ৩৪৬	চিঠা	চি ৩৪৬	চিত্রগন্ধ	চি ৩৪৬
চাপগারি	চপ্ ৩৩৫	চারা	চর্ ৩৪৪	চাহারম	চর্ ৩৪০	চিঠি(টি)	চি ৩৪৬	চিত্রগুপ্ত	চি ৩৪৯
চাপজরিপ	চপ্ ৩৩৫	চারাল	চর্ ৩৪০	চাহি	চি ৩৪৬	চিড়	চি ৩৪৬	চিত্রজল্প	চি ৩৪৯
চাপট(ড়)	চপ্ ৩৩৫	চারি	চর্ ৩৪০	চাহিদা	চি ৩৪৬	চিড়চিড়	চি ৩৪৬	চিত্রপট	চি ৩৪৬
চাপড়া	চপ্ ৩৩৫	চারিত্র্য	চর্ ৩৪০	চাহিয়া	চি ৩৪৬	চিড়চিড়া	চি ৩৪৬	চিত্রফলক	চি ৩৪৬
চাপড়াষষ্ঠী	চপ্ ৩৩৫	চারিবেদী	চর্ ৩৪০	চি	চি ৩৪৬	চিড়চিড়ে	চি ৩৪৬	চিত্রবহ	চি ৩৪৬
চাপদাড়ি	চপ্ ৩৩৫	চারী	চর্ ৩৪৪	চিআড়ি	চি ৩৪৬	চিড়বিড়	চি ৩৪৬	চিত্রবিচিত্র	চি ৩৪৬
চাপন	চপ্ ৩৩৬	চারু	চর্ ৩৪৪	চিংড়ি	চি ৩৪৬	চিড়া	চি ৩৪৬	চিত্রবিদ্যা	চি ৩৪৬
চাপরাস	চপ্ ৩৩৫	চার্ব্বাক	চর্ ৩৪৪	চিঁচিঁ	চি ৩৪৬	চিড়িক	চি ৩৪৬	চিত্রভানু	চি ৩৪৬
চাপল	চপ্ ৩৩৫	চার্ম্মণ	চর্ ৩৪০	চিঁড়া	চি ৩৪৬	চিড়িতন	চি ৩৪৬	চিত্রযোধী	চি ৩৪৬
চাপলুসি	চপ্ ৩৩৫	চাল	চল্ ৩৪৫	চিঁহি	চি ৩৪৬	চিড়িয়া	চি ৩৪৬	চিত্ররথ	চি ৩৫০
চাপল্য	চপ্ ৩৩৬	চালক	চল্ ৩৪৫	চিক	চক্ ৩২১	চিড়িয়াখানা	চি ৩৪৬	চিত্রল	চি ৩৪৬
চাপা	চপ্ ৩৩৬	চালকি	চল্ ৩৪৫	চিকচিক	চক্ ৩২১	চিত	চি ৩৪৬	চিত্রলেখ	চি ৩৪৬
চাপান	চপ্ ৩৩৬	চালকুমড়া	চল্ ৩৪৫	চিকন	চক্ ৩২১	চিত(তু)ই	চি ৩৪৬	চিত্রশাল	চি ৩৪৬
চাপানউতোর	চপ্ ৩৩৬	চালচলন	চল্ ৩৪৫	চি(চে)কনাই	চক্ ৩২১	চিতর	চি ৩৪৬	চিত্রশালিকা	চি ৩৪৬
চাপুরচুপুর	চপ্ ৩৩৫	চালচুলা(লো)	চল্ ৩৪৫	চিকনিয়া	চক্ ৩২১	চিতল	চি ৩৪৬	চিত্রশিখণ্ডী	চি ৩৪৬
চাবকান	চপ্ ৩৩৫	চালন	চল্ ৩৪৫	চিকমিক	চক্ ৩২১	চিতা	চি ৩৪৮	চিত্রসেন	চি ৩৪৬
চাবা	চপ্ ৩৩৫	চালনা	চল্ ৩৪৫	চিকা	চক্ ৩১৯	চিতি	চি ৩৪৬	চিত্রা	চি ৩৪৯
চাবান	চপ্ ৩৩৫	চালনি(নী)	চল্ ৩৪৫	চিকা	চত্ ৩৩০	চি(চী)ৎকার	চি ৩৪৭	চিত্রাঙ্গ	চি ৩৪৬
চাবাড়ি	চপ্ ৩৩৫	চালমুগরা	চল্ ৩৪৫	চিকা	চ্ ৩৫৮	চিত্ত	চি ৩৪৭	চিত্রাঙ্গদ	চি ৩৪৬
চাবালি	চপ্ ৩৩৫	চালশা	চত্ ৩৩০	চিকি	চক্ ৩২১	চিত্তচাঞ্চল্য	চি ৩৪৬	চিত্রাপূপ	চি ৩৪৬
চাবি	চপ্ ৩৩৫	চালসে	চত্ ৩৩০	চিকিচিকি	চক্ ৩১৯	চিত্তচোর	চি ৩৪৬	চিত্রারম্ভ	চি ৩৪৬
চাবুক	চপ্ ৩৩৫	চালা	চল্ ৩৪৫	চিকিৎস	চক্ ৩১৯	চিত্তজ	চি ৩৪৬	চিত্রার্পিত	চি ৩৪৬
চাম	চর্ ৩৪৩	চালাক	চল্ ৩৪৫	চিকিৎসক	চক্ ৩২২	চিত্তজ্ঞ	চি ৩৪৬	চিত্রিণী	চি ৩৪৬
চামচা	চম্ ৩৩৭	চালাঘর	চল্ ৩৪৫	চিকিৎসক	কিৎ ১৮৩	চিত্তনাশ	চি ৩৪৬	চিত্রিত	চি ৩৪৬
চামর	চম্ ৩৩৭	চালাচালি	চল্ ৩৪৫	চিকিৎসা	কিৎ ১৮৩	চিত্তপ্রসন্নতা	চি ৩৪৬	চিত্রিকরণ	চি ৩৪৬
চামরিক	চম্ ৩৩৭	চালান	চল্ ৩৪৫	চিকিৎসা	চক্ ৩২২	চিত্তপ্রসাদন	চি ৩৪৬	চিত্রোক্তি	চি ৩৪৬
চামরিণী	চম্ ৩৩৭	চালি	চল্ ৩৪৫	চিকিমিকি	চক্ ৩২১	চিত্তবিক্ষেপ	চি ৩৪৬	চিৎ	চি ৩৪৭
চামরিয়া	চম্ ৩৩৭	চালিত	চল্ ৩৪৫	চিকীর্ষক	চক্ ৩১৯	চিত্তবিভ্রম	চি ৩৪৬	চিৎস্বরূপ	চি ৩৪৬
চামরী	চম্ ৩৩৭	চালি(ল)তা	চল্ ৩৪৫	চিকুর	চক্ ৩২৩	চিত্তবৃত্তি	চি ৩৪৬	চিদংশ	চি ৩৪৬
চামসা	চর্ ৩৪০	চালিয়ে-নেওয়া	চল্ ৩৪৫	চিক্ক	চক্ ৩১৯	চিত্তবৈকল্য	চি ৩৪৬	চিদম্বর	চি ৩৪৬
চামাটি	চর্ ৩৪০	চালু	চল্ ৩৪৫	চিক্কণ	চক্ ৩২১	চিত্তর	চি ৩৪৬	চিদাকাশ	চি ৩৪৬
চামার	চর্ ৩৪০	চালুনী	চল্ ৩৪৫	চিক্কণাই	চক্ ৩১৯	চিত্তহারী	চি ৩৪৬	চিদাত্মা	চি ৩৪৬
চামীকর	চম্ ৩৩৭	চাল্লিশ	চত্ ৩৩০	চিক্কির	চক্ ৩১৯	চিত্তান্তর	চি ৩৪৬	চিদানন্দ	চি ৩৪৬
চামুণ্ডা	চণ্ ৩২৮	চাষ	চ্ ৩৫৮	চিঙ্গট	চি ৩৪৬	চিত্তাভোগ	চি ৩৪৬	চিদাভাস	চি ৩৪৬
চামেলি(লী)	চম্ ৩৩৭	চাষ-কারকিত	চ্ ৩৫৮	চিঙ্গড়	চি ৩৪৬	চিত্ত্য	চি ৩৪৬	চিদ্ঘন	চি ৩৪৬
চাম্পা	চম্ ৩৩৭	চাষবাস	চ্ ৩৫৮	চিজ (চীজ)	চি ৩৪৬	চিত্র	চি ৩৪৯	চিদ্রূপ	চি ৩৪৬
চাম্পেয়	চম্ ৩৩৭	চাষা	চ্ ৩৫৮	চিচিঙ্গা	চি ৩৪৬	চিত্রক	চি ৩৪৯	চিন	চিন্ত্ ৩৫২
চায়	চি ৩৪৬	চাষালোক	চ্ ৩৫৮	চিচ্চিড়	চি ৩৪৬	চিত্রকল্প	চি ৩৪৯	চিনচিন	চিন্ত্ ৩৫২

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
চিনা	চিন্ত্ ৩৫২	চিরণ(ণী)	চি ৩৪৬	চীনাক	চি ৩৪৬	চুন	চুর্ ৩৫৫	চুর(রু)ট	চুর্ ৩৫৩
চিনাজোঁক	চিন্ত্ ৩৫২	চিরণ্টী	চি ৩৪৬	চীবর	চি ৩৪৬	চুনট	চুর্ ৩৫৪	চু(চূ)রমার	চুর্ ৩৫৪
চিনি	চিন্ত্ ৩৫২	চিরতা	চি ৩৪৬	চীর	চি ৩৪৬	চুন(নু)রি	চুর্ ৩৫৪	চুরানব্বই	চত্ ৩৩০
চিনিচিনি	চিন্ত্ ৩৫২	চির(রা)তিক্ত	চি ৩৪৬	চীররাস	চি ৩৪৬	চুনা	চুর্ ৩৫৪	চুরাশী	চত্ ৩৩০
চিন্ত্	চিন্ত্ ৩৫২	চিরৎকার	চি ৩৪৬	চীরবাসাঃ	চি ৩৪৬	চুনায়ন্সি	চুর্ ৩৫৪	চুরি	চুর্ ৩৫৪
চিন্ত	চিন্ত্ ৩৫২	চিরথাই	চি ৩৪৬	চীরভৃৎ	চি ৩৪৬	চুনারি	চুর্ ৩৫৪	চুল	চুর্ ৩৫৫
চিন্তক	চিন্ত্ ৩৫২	চিরদিন	চি ৩৪৬	চীরা	চি ৩৪৬	চুনী	চুর্ ৩৫৪	চুলকা	চুর্ ৩৫৫
চিন্তন	চিন্ত্ ৩৫২	চিরনিদ্রা	চি ৩৪৬	চীরী	চি ৩৪৬	চুনো	চুর্ ৩৫৫	চুলবুলে	চুর্ ৩৫৫
চিন্তনীয়	চিন্ত্ ৩৫২	চিরন্তন	চি ৩৪৬	চীর্ণ	চি ৩৪৬	চুন্নী	চুর্ ৩৫৪	চু(চূ)লা	চুর্ ৩৫৫
চিন্তবেশ্ম	চিন্ত্ ৩৫২	চিরযুগ	চি ৩৪৬	চীর্ণ	চর্ ৩৪০	চুপ্	চপ্ ৩৩৫	চু(চূ)লি	চুর্ ৩৫৫
চিন্তয়িতব্য	চিন্ত্ ৩৫২	চিরশ্যামল	চি ৩৪৬	চুওয়াল	চ্ ৩৫৮	চুপ	চপ্ ৩৩৬	চু(চূ)লিক	চুর্ ৩৫৫
চিন্তা	চিন্ত্ ৩৫২	চিরস্থায়ী	চি ৩৪৬	চুংগী	চ্ ৩৫৮	চুপচাপ	চপ্ ৩৩৬	চু(চূ)লিকা	চুর্ ৩৫৫
চিন্তাভাবনা	চিন্ত্ ৩৫২	চিরহরিৎ	চি ৩৪৬	চুঁ(চু)চি	চ্ ৩৫৮	চুপ(ব)ড়ি	চপ্ ৩৩৫	চুলুক	চুর্ ৩৫৫
চিন্তামণি	চিন্ত্ ৩৫২	চি(চী)রা	চি ৩৪৬	চুঁ(চু)য়া	চ্ ৩৫৮	চুপ(ব)ড়ী	চপ্ ৩৩৫	চুল্লি	চুর্ ৩৫৫
চিন্তাযজ্ঞ	চিন্ত্ ৩৫২	চিরা	চি ৩৪৬	চুঁ(চো)য়া	চ্ ৩৫৮	চু(চো)পসা	চপ্ ৩৩৬	চুল্লী	চুর্ ৩৫৫
চিন্ময়	চিন্ত্ ৩৫২	চিরাই	চি ৩৪৬	চুক	চক্ ৩২৩	চুপিচুপি	চপ্ ৩৩৬	চু(চূ)লো	চুর্ ৩৫৫
চিপ	চপ্ ৩৩৫	চিরাউ	চি ৩৪৬	চুকচুক	চক্ ৩২৩	চুপিসাড়ে	চপ্ ৩৩৬	চু(চো)য়া	চ্ ৩৫৮
চিপটি	চপ্ ৩৩৫	চি(চে)রাগ	চি ৩৪৬	চুকচুকে	চক্ ৩১৯	চুবক	চপ্ ৩৩৫	চু(চূ)ষ	চুষ্ ৩৫৫
চিপিটক	চপ্ ৩৩৫	চিরানন্দ	চি ৩৪৬	চুকতি	চক্ ৩১৯	চুবন	চপ্ ৩৩৫	চু(চূ)স	চুষ্ ৩৫৫
চিপিটক	চি ৩৪৬	চিরানুকূল	চি ৩৪৬	চুকলি	চক্ ৩১৯	চুবান	চপ্ ৩৩৬	চু(চো)হান	চত্ ৩৩০
চিপুট	চপ্ ৩৩৫	চিরায়	চি ৩৪৬	চুকা	চক্ ৩১৯	চুবানি	চপ্ ৩৩৬	চূড়	চট্ ৩২৪
চিপ্‌প	চপ্ ৩৩৫	চিরায়ু	চি ৩৪৬	চুকান	চক্ ৩২৩	চুম্	চুম্ব্ ৩৫৩	চূড়(ড়া)ন্ত	চট্ ৩২৭
চিপ্য	চপ্ ৩৩৫	চিরায়ুঃ	চি ৩৪৬	চুকুচুকুচুকু	চক্ ৩১৯	চুম	চুম্ব্ ৩৫৩	চূড়া	চট্ ৩২৭
চিবা	চপ্ ৩৩৫	চিরায়ুষ্মতী	চি ৩৪৬	চুক্র	চক্ ৩১৯	চুমকি(কী)	চুম্ব্ ৩৫৩	চূড়াকরণ	চট্ ৩২৭
চিবুক	চপ্ ৩৩৫	চিরুনি(ণি)	চি ৩৫১	চুঙি	চক্ ৩১৯	চুমকুড়ি	চুম্ব্ ৩৫৩	চূড়াকর্ম্ম	চট্ ৩২৭
চিমটা	চম্ ৩৩৭	চিরুনিতল্লাশী	চি ৩৫১	চুঙ্গি(ঙ্গী)	চক্ ৩১৯	চুমরা	চুম্ব্ ৩৫৩	চূড়ামণি	চট্ ৩২৪
চিমটি	চম্ ৩৩৭	চির্ণ	চি ৩৪৬	চুচু(চু)ক	চক্ ৩১৯	চুমুক	চুম্ব্ ৩৫৩	চূড়ারত্ন	চট্ ৩২৪
চিমড়া	চর্ ৩৪০	চির্ভটী	চি ৩৪৬	চুক্তি	চক্ ৩২৩	চুমুর	চুম্ব্ ৩৫৩	চূড়াল	চট্ ৩২৭
চিমড়ে	চর্ ৩৪০	চি(চী)ল	চি ৩৫১	চুচুক	চক্ ৩১৯	চুমুরি	চুম্ব্ ৩৫৩	চূত	চত্ ৩৩৩
চিমনি	চ্ ৩৫৮	চিলতা	চি ৩৪৬	চুঞ্চ	চম্ ৩৩৭	চুমা	চুম্ব্ ৩৫৩	চূবা	চপ্ ৩৩৫
চিমসা	চর্ ৩৪০	চিলতে	চি ৩৪৬	চুঞ্চু	চম্ ৩৩৭	চুম্ব্	চুম্ব্ ৩৫৩	চূর্ণ্	চুর্ ৩৫৫
চিমসিয়া	চর্ ৩৪০	চিলমচী	চি ৩৪৬	চুট্	চট্ ৩২৪	চুম্ব	চুম্ব্ ৩৫৩	চূর্ণ	চুর্ ৩৫৫
চিমসে	চর্ ৩৪০	চিলা	চি ৩৪৬	চুট	চট্ ৩২৭	চুম্বক	চুম্ব্ ৩৫৩	চূর্ণক	চুর্ ৩৫৫
চিয়া	চি ৩৪৬	চিলিচিন	চি ৩৪৬	চুটকি(কী)	চট্ ৩২৭	চুম্বন	চুম্ব্ ৩৫৩	চূর্ণকার	চুর্ ৩৫৫
চিয়াড়	চি ৩৪৬	চিলু	চি ৩৪৬	চুটা	চট্ ৩২৭	চুম্বিত	চুম্ব্ ৩৫৩	চূর্ণকুন্তল	চুর্ ৩৫৩
চিয়াড়ী	চণ্ ৩২৮	চিলে	চি ৩৪৬	চুড়ি	চট্ ৩২৪	চুম্বী	চুম্ব্ ৩৫৩	চূর্ণখণ্ড	চুর্ ৩৫৫
চিয়াড়ীপাড়া	চণ্ ৩২৮	চিলেকোঠা	চি ৩৫১	চুড়িদার	চট্ ৩২৪	চুম্বুক	চুম্ব্ ৩৫৩	চূর্ণন	চুর্ ৩৫৫
চির	চি ৩৫০	চিল্ল	চি ৩৫১	চুড়িপাড়	চট্ ৩২৪	চুয়া	চণ্ ৩৩০	চূর্ণমান	চুর্ ৩৫৩
চিরকাল	চি ৩৪৬	চিল্ল(ল্লি)কা	চি ৩৪৬	চুড়েল	চট্ ৩২৪	চু(চো)য়াড়	চণ্ ৩৩০	চূর্ণী	চুর্ ৩৫৩
চিরকুট	চি ৩৪৬	চিল্ল(ল্লী)কা	চি ৩৪৬	চু(চূ)ণ	চুর্ ৩৫৫	চুয়া(হা)ত্তর	চত্ ৩৩০	চূর্ণীকৃত	চুর্ ৩৫৩
চিরকুমার	চি ৩৪৬	চিহ্ন	চিন্ত্ ৩৫৩	চুণা	চুর্ ৩৫৫	চুয়ান্ন	চত্ ৩৩০	চূষ্	চুষ্ ৩৫৫
চিরজীবী	চি ৩৫১	চী	চি ৩৪৬	চু(চূ)ণাতি	চুর্ ৩৫৪	চু(চো)য়াল	চপ্ ৩৩৫	চূষক	চুষ্ ৩৫৬
চিরঞ্জীব	চি ৩৫১	চীন	চি ৩৫২	চু(চূ)ণারী	চুর্ ৩৫৪	চুয়াল্লিশ	চত্ ৩৩০	চূষা	চুষ্ ৩৫৬
চিরঞ্জীবক	চি ৩৪৬	চীনা	চি ৩৫২	চুণী	চুর্ ৩৫৪	চুর্	চুর্ ৩৫৩	চু(চো)ষ্য	চুষ্ ৩৫৬
চিরঞ্জীবী	চি ৩৫১	চীনাংশুক	চি ৩৪৬	চুত	চত্ ৩৩০	চুর	চুর্ ৩৫৪	চেআড়	চণ্ ৩২৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
চেংড়া	চম্ ৩৩৭	চেয়	চি ৩৪৬	চোউরি	চত্ ৩৩০	চোবে	চত্ ৩৩৩	চৌখণ্ডি(ণ্ডী)	চত্ ৩৩০
চেঁ(চে)চা	চি ৩৪৬	চেয়া	চি ৩৪৬	চোওর	চম্ ৩৩৭	চোমর	চম্ ৩৩৭	চৌখণ্ডিয়া	চত্ ৩৩০
চেঁচাড়ি	চম্ ৩৩৭	চেয়াড়ি	চি ৩৪৬	চোংদার	চ্ ৩৫৮	চোয়র	চম্ ৩৩৭	চৌখান	চত্ ৩৩০
চেঁচুড়া	চম্ ৩৩৭	চেয়ে	চি ৩৪৬	চোঁ	চ্ ৩৫৮	চোয়া	চ্ ৩৩০	চৌখুপী	চত্ ৩৩০
চেঙ(ঙ্গ)ড়া	চম্ ৩৩৭	চের	চক্ ৩১৯	চোঁচ	চম্ ৩৩৭	চোয়াড়	চণ্ ৩৩০	চৌখুরি(রী)	চত্ ৩৩০
চেকিতান	চ্ ৩৫৮	চের-আট	চি ৩৪৬	চোঁতা	চত্ ৩৩০	চোয়ান	চ্ ৩৫৮	চৌগাম	চত্ ৩৩০
চেগরা	চ্ ৩৫৮	চের-বের	চক্ ৩১৯	চোঁ-বোঁ	চ্ ৩৫৮	চোর	চুর্ ৩৫৪	চৌগোঁপ্পা	চত্ ৩৩০
চেঙ	চ্ ৩৫৮	চেরয়াট	চি ৩৪৬	চোঁয়া	চ্ ৩৫৮	চোরকর্ম্ম	চুর্ ৩৫৪	চৌগোঁফা	চত্ ৩৩০
চেঙ্গ	চ্ ৩৫৮	চেরা	চি ৩৫০	চোঁয়া-পোড়া	চ্ ৩৫৮	চোরকাঁটা	চুর্ ৩৫৪	চৌঘাট	চত্ ৩৩০
চেঙ(ঙা)মুড়ী	চ্ ৩৫৮	চেরাট	চি ৩৪৬	চোক	চক্ ৩১৯	চোর(া)কুঠরী	চুর্ ৩৫৪	চৌঘুড়ি(ড়ী)	চত্ ৩৩০
চেঙ্গ	চ্ ৩৫৮	চেরান	চি ৩৪৬	চোক	চত্ ৩৩০	চোরগণেশ	চুর্ ৩৫৪	চৌঙকি	চম্ ৩৩৭
চেঙ্গদোলা	চ্ ৩৫৮	চেল	চি ৩৪৬	চোকড়া	চক্ ৩১৯	চোরা	চুর্ ৩৫৪	চৌচাপটে	চত্ ৩৩০
চেঙ্গারি	চ্ ৩৫৮	চেল	চল্ ৩৪৫	চোকলা	চক্ ৩১৯	চোরাই	চুর্ ৩৫৪	চৌচালা	চত্ ৩৩০
চেঙ্গুয়া	চ্ ৩৫৮	চেলগোজা	চল্ ৩৪৫	চোকা	চক্ ৩১৯	চোরাগর্ত্ত	চুর্ ৩৫৪	চৌচীর	চত্ ৩৩০
চেঙ্গো	চ্ ৩৫৮	চেলা	চল্ ৩৪৫	চোক্ষ	চক্ ৩১৯	চোরাগলি	চুর্ ৩৫৪	চৌট	চত্ ৩৩০
চেট	চট্ ৩২৪	চেলা(রা)কাঠ	চি ৩৪৬	চোখ	চক্ ৩১৯	চোরাগোপ্তা	চুর্ ৩৫৪	চৌড়	চট্ ৩২৪
চেটক	চট্ ৩২৪	চেলি	চল্ ৩৪৫	চোখান	চক্ ৩১৯	চোরাপকেট	চুর্ ৩৫৪	চৌড়া	চট্ ৩২৪
চেটা	চট্ ৩২৪	চেলিকা	চল্ ৩৪৫	চোখো	চক্ ৩১৯	চোরাপথ	চুর্ ৩৫৪	চৌড়া	চত্ ৩৩০
চেটাং	চট্ ৩২৪	চেল্লা	চি ৩৪৬	চোঙ	চক্ ৩১৯	চোরাবালি(লু)	চুর্ ৩৫৪	চৌড়া	চ্ ৩৫৮
চেটাস	চট্ ৩২৪	চেল্লান	চি ৩৪৬	চোঙক	চক্ ৩১৯	চোরাযুদ্ধ	চুর্ ৩৫৪	চৌড়াই	চ্ ৩৫৮
চেটিকা	চট্ ৩২৪	চেষ্ট্	চেষ্ট্ ৩৫৬	চোঙা	চক্ ৩১৯	চোরায়	চুর্ ৩৫৪	চৌড়াই	চট্ ৩২৪
চেটী	চট্ ৩২৪	চেষ্টক	চেষ্ট্ ৩৫৬	চোঙ্গ	চক্ ৩১৯	চোরি	চুর্ ৩৫৪	চৌতরা	চত্ ৩৩০
চেটো	চট্ ৩২৪	চেষ্টা	চেষ্ট্ ৩৫৬	চোঙ্গদার	চক্ ৩১৯	চোল	চুর্ ৩৫৫	চৌতারা	চত্ ৩৩০
চেটোনেটো	চট্ ৩২৪	চেষ্টিত	চেষ্ট্ ৩৫৬	চোঙ্গদার	চ্ ৩৫৮	চোল	চল্ ৩৪৫	চৌতাল	চত্ ৩৩০
চেট্টেনেট্টে	চট্ ৩২৪	চেহল	চি ৩৪৬	চোঙ্গা	চক্ ৩১৯	চোলক	চুর্ ৩৫৫	চৌতিশা	চত্ ৩৩০
চেড়	চট্ ৩২৪	চেহারা	চি ৩৪৬	চোচ	চম্ ৩৩৭	চোলাই	চুর্ ৩৫৫	চৌত্রিশ	চত্ ৩৩০
চেড়ক	চট্ ৩২৪	চৈক্কণ্য	চক্ ৩১৯	চোট	চট্ ৩২৪	চোষ	চুষ্ ৩৫৫	চৌথ	চত্ ৩৩০
চেড়িকা	চট্ ৩২৪	চৈত	চি ৩৪৬	চোটখণ্ডী	চট্ ৩২৪	চোষা	চুষ্ ৩৫৬	চৌথাই	চত্ ৩৩০
চেড়ী	চট্ ৩২৪	চৈতন	চি ৩৪৬	চোটপাট	চট্ ৩২৫	চোষান	চুষ্ ৩৫৬	চৌদন্তী	চত্ ৩৩০
চেৎ	চি ৩৪৬	চৈতন্য	চি ৩৫১	চোটা	চট্ ৩২৪	চোষ্য	চুষ্ ৩৫৬	চৌদল	চত্ ৩৩০
চেত	চি ৩৪৬	চৈতালি	চি ৩৪৬	চোটা	চত্ ৩৩০	চোস্ত	চুষ্৩৫৬	চৌদশী	চত্ ৩৩০
চেতঃ	চি ৩৪৬	চৈত্ত্য	চি ৩৪৮	চোট্টা	চট্ ৩২৪	চোহড়	চ্ ৩৫৮	চৌদানী	চত্ ৩৩০
চেতন	চি ৩৫১	চৈত্য	চি ৩৪৮	চোঠাই	চত্ ৩৩০	চৌ	চত্ ৩৩০	চৌদিক	চত্ ৩৩০
চেতনা	চি ৩৫১	চৈত্যতরু	চি ৩৪৮	চোড	চল্ ৩৪৫	চৌউরি	চত্ ৩৩০	চৌদিশ	চত্ ৩৩০
চেতরা	চি ৩৪৬	চৈত্যদ্রু	চি ৩৪৮	চোত্রা	চট্ ৩২৪	চৌক	চত্ ৩৩০	চৌদুলী	চত্ ৩৩০
চেতোজন্মা	চি ৩৪৬	চৈত্যদ্রুম	চি ৩৪৮	চোদ	চি ৩৪৬	চৌকন	চত্ ৩৩০	চৌদোল	চত্ ৩৩০
চেতোমান	চি ৩৪৬	চৈত্যবৃক্ষ	চি ৩৪৮	চোদ্দ	চত্ ৩৩০	চৌকস	চত্ ৩৩০	চৌদোলা	চত্ ৩৩০
চেদ্	চি ৩৪৬	চৈত্যপাল	চি ৩৪৮	চোনা	চুর্ ৩৫৫	চৌকা	চত্ ৩৩০	চৌদ্দ	চত্ ৩৩০
চেদি	চি ৩৪৬	চৈত্যবিহার	চি ৩৪৮	চোপ	চপ্ ৩৩৫	চৌকাঠ	চত্ ৩৩০	চৌধুরী	চত্ ৩৩৩
চেনা	চিন্ত্ ৩৫৩	চৈত্র	চি ৩৪৬	চোপ(ব)দার	চপ্ ৩৩৫	চৌকি	চত্ ৩৩০	চৌনরগোট	চত্ ৩৩০
চেনা-জানা	চিন্ত্ ৩৫৩	চৈত্ররথ	চি ৩৪৬	চোপসা	চপ্ ৩৩৬	চৌকী	চত্ ৩২০	চৌপথ	চত্ ৩৩০
চেনা-পরিচয়	চিন্ত্ ৩৫৩	চৈত্ররথ্য	চি ৩৪৬	চোপসান	চপ্ ৩৩৬	চৌকী	চক্ ৩১৯	চৌপদ	চত্ ৩৩০
চেনা-শোনা	চিন্ত্ ৩৫৩	চৈত্রিক	চি ৩৪৬	চোপা	চপ্ ৩৩৬	চৌকীয়া	চক্ ৩১৯	চৌপদী	চত্ ৩৩০
চেপটা	চপ্ ৩৩৬	চৈদ্য	চি ৩৪৬	চোপাড়	চপ্ ৩৩৫	চৌক্ষ	চক্ ৩১৯	চৌপল	চত্ ৩৩০
চেভা	চপ্ ৩৩৫	চৈল	চল্ ৩৪৫	চোবচীনী	চপ্ ৩৩৫	চৌখণ্ড	চত্ ৩৩০	চৌপা(বা)ড়ি	চত্ ৩৩০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ছানি	ছদ্ ৩৫৯	ছিদ	ছিদ্ ৩৬৭	ছেঁড়াখোড়া	ছিদ্ ৩৬৮	ছোড়ান	ছর্দ্ ৩৬৪	জগন্ময়	গম্ ২৬২
ছানুবানু	ছিদ্ ৩৬৭	ছিদ্র	ছিদ্ ৩৬৭	ছেঁড়ান	ছিদ্ ৩৬৭	ছোবল	ছো ৩৭০	জগন্মাতা	গম্ ২৬২
ছান্‌তা	ছিদ্ ৩৬৭	ছিদ্রিত	ছিদ্ ৩৬৭	ছেঁদা	ছিদ্ ৩৬৭	ছোরণ	ছর্দ্ ৩৬৪	জগবন্ধু	গম্ ২৬২
ছান্দ	ছদ্ ৩৫৯	ছিনা	ছিদ্ ৩৬৭	ছেঁদো	ছদ্ ৩৬১	ছোরা	ছর্দ্ ৩৬৪	জগমোহন	গম্ ২৬২
ছান্দন	ছদ্ ৩৫৯	ছিনাজোঁক	ছিদ্ ৩৬৭	ছেক	ছো ৩৭০	ছোল	ক্ষু ৩৬৩	জগাখিচুড়ি	গম্ ২৬২
ছান্দস	ছদ্ ৩৫৯	ছিনান	ছিদ্ ৩৬৭	ছেছে	ধা ৫৯০	ছোলা	ক্ষু ২৩৪	জঘ্ন	জ্ ৪০৩
ছান্দা	ছদ্ ৩৫৯	ছিনাল	ছিদ্ ৩৬৭	ছেত্তা	ছিদ্ ৩৬৭			জঘন্য	জ্ ৪০৩
ছান্দোগ্য	ছদ্ ৩৫৯	ছিন্ধি	ছিদ্ ৩৬৭	ছেত্রী	ক্ষ্ ২২৩			জঙ্	জন্ ৩৮১
ছাপরখাট	ছদ্ ৩৫৯	ছিন্ন	ছিদ্ ৩৬৮	ছেদ	ছিদ্ ৩৬৯	**জ**		জঙ্গম	জন্ ৩৮১
ছাপ্‌পর	ছদ্ ৩৫৯	ছিন্নভিন্ন	ছিদ্ ৩৬৮	ছেদন	ছিদ্ ৩৬৯	জ	— ৩৭২	জঙ্গম	গম্ ২৬২
ছাপোষা	ছদ্ ৩৬২	ছিন্নমস্তা	ছিদ্ ৩৬৯	ছেদ্য	ছিদ্ ৩৬৭	জ	জন্ ৩৭৮	জঙ্গল	গল্ ৩৮১
ছাবাল	ছদ্ ৩৬২	ছিপ	ছ্ ৩৭১	ছেনি	ছিদ্ ৩৬৯	জউ	জন্ ৩৭৮	জঙ্গল	জন্ ৩৭৮
ছামনি	ছদ্ ৩৫৯	ছিপি	ছ্ ৩৭১	ছেনী	ছিদ্ ৩৬৯	জং	জন্ ৩৭৮	জঙ্গাল	জন্ ৩৭৮
ছামুনি	ছদ্ ৩৫৯	ছিবড়া	ছ্ ৩৭১	ছেবড়	ছদ্ ৩৫৯	জংলি	জন্ ৩৮১	জঙ্গী	জন্ ৩৮১
ছায়নি	ছদ্ ৩৫৯	ছিবড়ে	ছ্ ৩৭১	ছেবলা	ছদ্ ৩৫৯	জ-কার	জ্ ৪০৩	জঙ্গুল	জন্ ৩৭৮
ছায়া	ছো ৩৭১	ছিম	ছ্ ৩৭১	ছেমড়া	ছদ্ ৩৫৯	জক্ষ	জ্ ৪০৩	জঙ্ঘা	জন্ ৩৮২
ছায়াভিনয়	ছো ৩৭০	ছিমছাম	ছ্ ৩৭১	ছেয়া	ছিদ্ ৩৬৭	জখম	জ্ ৪০৩	জঙ্ঘাল	জন্ ৩৮২
ছায়ামণ্ডপ	ছো ৩৭০	ছিয়া	ছিদ্ ৩৬৯	ছেয়ানি	ছিদ্ ৩৬৯	জগ	গম্ ২৬২	জঞ্জাল	জন্ ৩৮২
ছায়ালোক	ছো ৩৭০	ছিয়াকাঠ	ছিদ্ ৩৬৯	ছেলি	ছো ৩৭০	জগৎ	গম্ ২৭৭	জঞ্জির	জন্ ৩৮২
ছার	ছর্দ্ ৩৬৪	ছিরক	ছর্দ্ ৩৬৪	ছেলী	ছো ৩৭০	জগৎকর্ত্তা	গম্ ২৬২	জট্	জট্ ৩৭৩
ছার	ক্ষর্ ২২৮	ছিরকা	ছর্দ্ ৩৬৪	ছেলে	ছদ্ ৩৬২	জগৎগৌরী	গম্ ২৬২	জট	জট্ ৩৭৩
ছারখার	ক্ষর্ ২২৮	ছিরিকা	ছর্দ্ ৩৬৪	ছেলেখেলা	ছদ্ ৩৬২	জগৎপতি	গম্ ২৬২	জটলা	জট্ ৩৭৩
ছারখার	ছর্দ্ ৩৬৪	ছিল	ছদ্ ৩৬৩	ছেলেধরা	ছদ্ ৩৬২	জগৎময়	গম্ ২৬২	জটা	জট্ ৩৭৩
ছারপোকা	ছর্দ্ ৩৬৪	ছিলা	ছদ্ ৩৬৩	ছেলেপিলে	ছদ্ ৩৬২	জগৎযোনি	গম্ ২৬২	জটাচার্ব্ব	জট্ ৩৭৪
ছাল	ছদ্ ৩৬৩	ছিলিকা	ছদ্ ৩৬৩	ছেলেপুলে	ছদ্ ৩৬২	জগৎস্রষ্টা	গম্ ২৬২	জটাজুট	জট্ ৩৭৩
ছি	ছিদ্ ৩৬৭	ছুঁ	ছদ্ ৩৫৯	ছেলেবুদ্ধি	ছদ্ ৩৬২	জগৎসৃষ্টি	গম্ ২৭৭	জটাধর	জট্ ৩৭৩
ছিঃ	ছিদ্ ৩৬৭	ছুঁয়ে-দেওয়া	ছদ্ ৩৫৯	ছেলেমানুষ	ছদ্ ৩৬২	জগতী	গম্ ২৬২	জটাবান	জট্ ৩৭৩
ছিঃ	ধা ৫৯০	ছুঁচা	ছদ্ ৩৫৯	ছৈ	ছদ্ ৩৫৯	জগদন্ত	গম্ ২৬২	জটামাংসী	জট্ ৩৭৪
ছিঁচকা	ছিদ্ ৩৬৭	ছুঁচো	ছদ্ ৩৫৯	ছৈঁ	ছদ্ ৩৫৯	জগদম্বা	গম্ ২৬২	জটায়ুঃ	জট্ ৩৭৪
ছিঁচকাচোর	ছিদ্ ৩৬৭	ছুঁড়	ছর্দ্ ৩৬৭	ছৈঘর	ছদ্ ৩৫৯	জগদম্বিকা	গম্ ২৬২	জটাল	জট্ ৩৭৪
ছিঁচকাঁদুনে	ছিদ্ ৩৬৭	ছুঁড়ী	ছর্দ্ ৩৬৭	ছৈল	ছদ্ ৩৫৯	জগদাত্মা	গম্ ২৬২	জটাসুর	জট্ ৩৭৩
ছিঁড়	ছিদ্ ৩৬৭	ছুকরী	ছ্ ৩৭১	ছৈল	ছ্ ৩৭১	জগদায়ু	গম্ ২৬২	জটি	জট্ ৩৭৩
ছিছি	ধা ৫৯০	ছুছুন্দর	ছদ্ ৩৫৯	ছোঁচকা	ছ্ ৩৭১	জগদায়ুঃ	গম্ ২৬২	জটিত	জট্ ৩৭৩
ছিছি	ছিদ্ ৩৬৭	ছুট	ছর্দ্ ৩৬৬	ছোঁচা	ছ্ ৩৭১	জগদীশ	গম্ ২৬২	জটিল	জট্ ৩৭৩
ছিছিক্কার	ছিদ্ ৩৬৭	ছুটি	ছর্দ্ ৩৬৬	ছোঁড়া	ছর্দ্ ৩৬৭	জগদেকনাথ	গম্ ২৬২	জটিলা	জট্ ৩৭৩
ছিছিক্কার	ধা ৫৯০	ছুৎ	ছদ্ ৩৬৩	ছোকরা	ছো ৩৭০	জগদেকচন্দ্র	গম্ ২৬২	জটী	জট্ ৩৭৩
ছিট	ছর্দ্ ৩৬৫	ছুৎমার্গ	ছদ্ ৩৬৩	ছোট	ছর্দ্ ৩৬৬	জগদ্‌গুরু	গম্ ২৬২	জটু(ড়্)ল	জট্ ৩৭৩
ছিটকা	ছর্দ্ ৩৬৫	ছুতুক	ছদ্ ৩৫৯	ছোটকি	ছর্দ্ ৩৬৬	জগদ্‌গৌরী	গম্ ২৬২	জ'টে	জট্ ৩৭৩
ছিটকান	ছর্দ্ ৩৬৫	ছুর্	ছর্দ্ ৩৬৪	ছোটা	ছর্দ্ ৩৬৬	জগদ্ধাতা	গম্ ২৬২	জট্ট	জট্ ৩৭৩
ছিটকিনি	ছর্দ্ ৩৬৫	ছুরণ	ছর্দ্ ৩৬৪	ছোটাছুটি	ছর্দ্ ৩৬৬	জগদ্‌যোনি	গম্ ২৬২	জঠর	জন্ ৩৭৪
ছিটগ্রস্ত	ছর্দ্ ৩৬৫	ছুরি	ছর্দ্ ৩৬৪	ছোটান	ছর্দ্ ৩৬৬	জগদ্রূপ	গম্ ২৬২	জঠর	জট্ ৩৭৩
ছিটা	ছর্দ্ ৩৬৫	ছুরিকা	ছর্দ্ ৩৬৪	ছোটি	ছর্দ্ ৩৬৪	জগধি	গম্ ২৬২	জঠরাগ্নি	জট্ ৩৭৩
ছিটাফোঁটা	ছর্দ্ ৩৬৫	ছুল	ক্ষু ৩৬৩	ছোটিকা	ছর্দ্ ৩৬৪	জগন্নাথ	গম্ ২৬২	জঠরানল	জট্ ৩৭৩
ছিশু	ছিদ্ ৩৬৭	ছুলি	ক্ষু ২৩৪	ছোট্ট	ছর্দ্ ৩৬৬	জগন্নিবাস	গম্ ২৬২	জঠরাময়	জট্ ৩৭৩
ছিত্তি	ছিদ্ ৩৬৭	ছেঁড়া	ছিদ্ ৩৬৮	ছোড়	ছর্দ্ ৩৬৪	জগন্মঙ্গল	গম্ ২৬২	জঠুর	জট্ ৩৭৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
জড়	জট্ ৩৭৪	জনস্রোত	জন্ ৩৭৮	জপ্য	জপ্ ৩৮৭	জম্বাল	জম্ ৩৮৮	জরজর	জৃ ৩৯৭
জড়ওয়া	জট্ ৩৭৩	জনা	জন্ ৩৭৮	জব	জু ৩৯৬	জম্বি(ম্বী)র	জম্ ৩৯০	জরঠ	জৃ ৩৯৭
জড়তা	জট্ ৩৭৩	জনাতিগ	জন্ ৩৭৮	জবড়	জু ৩৯৭	জম্বু	জম্ ৩৯০	জরণ	জৃ ৩৯৭
জড়ভরত	জট্ ৩৭৫	জনাধিপ	জন্ ৩৭৮	জবড়ান	জু ৩৯৭	জম্বুক	জম্ ৩৯০	জরৎ	জৃ ৩৯৭
জড়সড়	জট্ ৩৭৪	জনাধিনাথ	জন্ ৩৭৮	জবন	জু ৩৯৬	জম্বুখণ্ড	জম্ ৩৯০	জরৎকার	জৃ ৩৯৭
জড়া	জট্ ৩৭৩	জনান্ত	জন্ ৩৭৮	জবজব	জু ৩৯৬	জম্বুদ্বীপ	জম্ ৩৯০	জরৎকারু	জৃ ৩৯৮
জড়াও	জট্ ৩৭৩	জনান্তিক	জন্ ৩৭৮	জবড়জঙ্	জু ৩৯৭	জম্বুনদ	জম্ ৩৮৮	জরদ	জৃ ৩৯৭
জড়াক্ষ	জট্ ৩৭৩	জনাব	জন্ ৩৭৮	জবড়জঙ্গী	জু ৩৯৭	জম্বুমালী	জম্ ৩৮৮	জরদ্গব	জৃ ৩৯৭
জড়ি	জট্ ৩৭৩	জনারণ্য	জন্ ৩৭৮	জবড়াএগ্রা	জু ৩৯৬	জম্ভু	জম্ ৩৮৮	জরা	জৃ ৩৯৮
জড়িত	জট্ ৩৭৩	জনার্দ্দন	জন্ ৩৭৮	জবনিকা	জু ৩৯৬	জম্ভ	জম্ ৩৮৮	জরাগ্রস্ত	জৃ ৩৯৭
জড়িমা	জট্ ৩৭৩	জনাশ্রয়	জন্ ৩৭৮	জবনী	জু ৩৯৬	জম্ভক	জম্ ৩৮৮	জরাজীর্ণ	জৃ ৩৯৭
জড়ীভাব	জট্ ৩৭৩	জনি	জন্ ৩৭৮	জবর	জু ৩৯৬	জম্ভন	জম্ ৩৮৮	জরাভীরু	জৃ ৩৯৭
জড়ুর(ল)	জট্ ৩৭৩	জনিত	জন্ ৩৮২	জবরদস্তি	জু ৩৯৬	জয়	জি ৩৯২	জরায়ু	জৃ ৩৯৮
জড়োয়া	জট্ ৩৭৩	জনী	জন্ ৩৭৮	জব্দ	জু ৩৯৬	জয়কার	জি ৩৯১	জরায়ুজ	জৃ ৩৯৮
জতু	জন্ ৩৭৮	জনু	জন্ ৩৭৮	জবা	জু ৩৯৭	জয়কেতু	জি ৩৯৩	জরাসন্ধ	জৃ ৩৯৯
জতুগৃহ	জন্ ৩৭৮	জনুঃ	জন্ ৩৭৮	জবাই	জু ৩৯৬	জয়ঙ্করী	জি ৩৯১	জরি(রী)	জৃ ৩৯৭
জতুধাম	জন্ ৩৭৮	জনৈক	জন্ ৩৭৮	জবান	জু ৩৯৭	জয়ঘণ্টা	জি ৩৯১	জরিত	জৃ ৩৯৭
জতুরস	জন্ ৩৭৮	জনেশ্বর	জন্ ৩৭৮	জবানবন্দী	জু ৩৯৭	জয়ঘোষ	জি ৩৯১	জরিপ	জৃ ৩৯৭
জতুক	জন্ ৩৭৮	জন্তি	জি ৩৯১	জবাব	জু ৩৯৭	জয়জয়কার	জি ৩৯১	জরিমানা	জৃ ৩৯৭
জতুকা	জন্ ৩৭৮	জন্তু	জন্ ৩৮৪	জবাবী	জু ৩৯৭	জয়জয়ন্তী	জি ৩৯১	জরীকষ	জৃ ৩৯৭
জত্রু	জন্ ৩৭৮	জন্ম	জন্ ৩৮৫	জবাল	জু ৩৯৬	জয়ট্যামটেমি	জি ৩৯১	জরু	জৃ ৩৯৭
জত্রুদেশ	জন্ ৩৭৮	জন্ম-আয়তি	জন্ ৩৭৮	জবালা	জু ৩৯৬	জয়তি	জি ৩৯১	জরুয়া	জৃ ৩৯৭
জন্	জন্ ৩৭৮	জন্ম-এয়স্ত্রী	জন্ ৩৭৮	জবী	জু ৩৯৬	জয়ত্রী	জি ৩৯১	জরুর	জৃ ৩৯৭
জন	জন্ ৩৮২	জন্ম-কুঁড়ে	জন্ ৩৭৮	জবুস্থবু	জু ৩৯৬	জয়দেব	জি ৩৯১	জর্জ্জর	জৃ ৩৯৯
জনওআর	জন্ ৩৮২	জন্মকুণ্ডলী	জন্ ৩৭৮	জম	জম্ ৩৮৮	জয়দ্রথ	জি ৩৯৩	জর্জ্জরিত	জৃ ৩৯৯
জনঃ	জন্ ৩৭৮	জন্মজন্মান্তর	জন্ ৩৭৮	জমক	জম্ ৩৮৮	জয়ন	জি ৩৯১	জল	জট্ ৩৭৫
জনক	জন্ ৩৮৩	জন্মজয়	জন্ ৩৭৮	জমকা	জম্ ৩৮৮	জয়ন্ত	জি ৩৯৩	জল-আচরণী	জট্ ৩৭৩
জনকতনয়া	জন্ ৩৭৮	জন্মান্তর	জন্ ৩৭৮	জমকাল	জম্ ৩৮৮	জয়ন্তী	জি ৩৯১	জলকণ্টক	জট্ ৩৭৬
জনকরাজা	জন্ ৩৭৮	জন্মান্তরীণ	জন্ ৩৭৮	জমজম	জম্ ৩৮৮	জয়পত্র	জি ৩৯১	জলকন্যা	জট্ ৩৭৬
জনতা	জন্ ৩৭৮	জন্মান্তরীয়	জন্ ৩৭৮	জমদগ্নি	জম্ ৩৮৯	জয়পাল	জি ৩৯১	জলকরঙ্ক	জট্ ৩৭৩
জনন	জন্ ৩৭৮	জন্মান্ধ	জন্ ৩৭৮	জমধর	জম্ ৩৮৮	জয়বিজয়	জি ৩৯৩	জলকাক	জট্ ৩৭৩
জননী	জন্ ৩৭৮	জন্মাবচ্ছিন্ন	জন্ ৩৭৮	জমল	জম্ ৩৮৮	জয়বিষহরি	জি ৩৯১	জলকান্ত	জট্ ৩৭৩
জনপদ	জন্ ৩৭৮	জন্মায়(য়ো)তি	জন্ ৩৭৮	জমা	জম্ ৩৮৯	জয়মঙ্গল	জি ৩৯১	জলকুক্কুট	জট্ ৩৭৩
জনপদবধূ	জন্ ৩৭৮	জন্মাষ্টমী	জন্ ৩৭৮	জমাখরচ	জম্ ৩৮৮	জয়া	জি ৩৯২	জলকুন্তল	জট্ ৩৭৩
জনপ্রাণী	জন্ ৩৭৮	জন্মিত	জন্ ৩৭৮	জমাট	জম্ ৩৮৯	জয়াক্ষগ্রন্থ	জি ৩৯২	জলকুমরী	জট্ ৩৭৩
জনপ্রিয়	জন্ ৩৭৮	জন্মী	জন্ ৩৭৮	জমাত	জম্ ৩৮৯	জয়াজয়	জি ৩৯১	জলকেলি	জট্ ৩৭৩
জনম	জন্ ৩৭৮	জন্মেজয়	জন্ ৩৮৩	জমাবন্দী	জম্ ৩৮৮	জয়াবতী	জি ৩৯১	জলক্রীড়া	জট্ ৩৭৩
জনমদুখিনী	জন্ ৩৭৮	জন্য	জন্ ৩৮৫	জমায়(য়ে)ত	জম্ ৩৮৯	জয়াবহ	জি ৩৯১	জলখাবার	জট্ ৩৭৩
জনমেজয়	জন্ ৩৮৩	জপ্	জপ্ ৩৮৭	জমাদানী	জম্ ৩৮৮	জয়া-বিজয়া	জি ৩৯১	জলখেংরা	জট্ ৩৭৩
জনয়িতা	জন্ ৩৭৮	জপ	জপ্ ৩৮৭	জমাদার	জম্ ৩৮৯	জয়িত্রী	জি ৩৯১	জলগদা	জট্ ৩৭৩
জনরঞ্জন	জন্ ৩৭৮	জপন	জপ্ ৩৮৭	জমানী	জম্ ৩৮৮	জয়িষ্ণু	জি ৩৯১	জলগোজা	জট্ ৩৭৩
জনরব	জন্ ৩৭৮	জপমালা	জপ্ ৩৮৭	জমি	জম্ ৩৮৯	জয়ী	জি ৩৯১	জলচর	জট্ ৩৭৩
জনলোক	জন্ ৩৭৮	জপযজ্ঞ	জপ্ ৩৮৭	জমী	জম্ ৩৮৯	জয্য	জি ৩৯১	জলচর	চর্ ৩৪০
জনশ্রুতি	জন্ ৩৭৮	জপা	জপ্ ৩৮৭	জমীন	জম্ ৩৮৯	জর	জৃ ৩৯৭	জলচল	জট্ ৩৭৩
জনস্থান	জন্ ৩৭৮	জপান	জপ্ ৩৮৭	জম্পতি	জম্ ৩৮৮	জরকশী	জৃ ৩৯৭	জলচোরা	জট্ ৩৭৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
জলচৌকি	জট্ ৩৭৩	জলপথ	জট্ ৩৭৩	জলরাক্ষসী	জট্ ৩৭৩	জলোদ্ভব	জট্ ৩৭৩	জাগান	জাগৃ ৩৯১
জলছত্র	জট্ ৩৭৩	জলপাই	জট্ ৩৭৩	জলরাজ	জট্ ৩৭৩	জলৌকস	জট্ ৩৭৩	জাগৃ	জাগৃ ৩৯১
জলছবি	জট্ ৩৭৩	জলপাত	জট্ ৩৭৩	জলরাশি	জট্ ৩৭৩	জলৌকা	জট্ ৩৭৩	জাগৃতব্য	জাগৃ ৩৯১
জলজ	জট্ ৩৭৩	জলপাত্র	জট্ ৩৭৩	জলশায়ী	জট্ ৩৭৩	জলৌকাঃ	জট্ ৩৭৩	জাগ্রৎ	জাগৃ ৩৯১
জলজ	জন্ ৩৭৮	জলপান	জট্ ৩৭৩	জলশুচি	জট্ ৩৭৩	জল্প্	জট্ ৩৭৩	জাগ্রত	জাগৃ ৩৯১
জলজলাট	জট্ ৩৭৩	জলপানি	জট্ ৩৭৩	জলশোষ	জট্ ৩৭৩	জল্প	জট্ ৩৭৬	জাঙা(ঙ্গা)ল	জন্ ৩৭৮
জলজন্ম	জট্ ৩৭৩	জলপিপি	জট্ ৩৭৩	জলশৌচ	জট্ ৩৭৩	জল্প্	জট্ ৩৭৩	জাঙি(ঙ্গি)য়া	জন্ ৩৭৮
জলজীবী	জট্ ৩৭৩	জলপিপ্পলী	জট্ ৩৭৩	জলসত্র	জট্ ৩৭৩	জল্প	জট্ ৩৭৩	জাঙ্ঘ	জন্ ৩৭৮
জলজীয়ন্ত	জট্ ৩৭৬	জলপুষ্প	জট্ ৩৭৩	জলসা	জ্ ৪০৩	জল্পন	জট্ ৩৭৩	জাঙ্গ	জন্ ৩৭৮
জলঝারা	জট্ ৩৭৩	জলপ্রদান	জট্ ৩৭৩	জলসূচি	জট্ ৩৭৩	জল্পনা	জট্ ৩৭৬	জাঙ্গড়া	জন্ ৩৭৮
জলটঙ্গী	জট্ ৩৭৩	জলপ্রপা	জট্ ৩৭৩	জলস্পর্শ	জট্ ৩৭৩	জল্লাদ	জ্ ৪০৩	জাঙ্গল	জন্ ৩৮৫
জলটুঙ্গী	জট্ ৩৭৩	জলপ্রপাত	জট্ ৩৭৩	জলহরি	জট্ ৩৭৩	জশম	জ্ ৪০৩	জাঙ্গলি	জন্ ৩৭৮
জলটল	জট্ ৩৭৩	জলপ্রলয়	জট্ ৩৭৩	জলহস্তী	জট্ ৩৭৩	জহৎস্বার্থা	জ্ ৪০৩	জাঙ্গলিক	জন্ ৩৭৮
জলতরঙ্গ	জট্ ৩৭৩	জলপ্রায়	জট্ ৩৭৩	জলহাঁস	জট্ ৩৭৩	জহদজহল্লক্ষণা	জ্ ৪০৩	জাঙ্গুলী	জন্ ৩৭৮
জলতাড়ন	জট্ ৩৭৩	জলপ্লব	জট্ ৩৭৩	জলা	জট্ ৩৭৫	জহর	জ্ ৪০৩	জাঙ্ঘিক	জন্ ৩৭৮
জলত্রাস	জট্ ৩৭৩	জলফল	জট্ ৩৭৩	জলাকাশ	জট্ ৩৭৩	জ(জৌ)হর	জ্ ৪০৩	জাজলি	জ্ ৪০৩
জলদ	জট্ ৩৭৬	জলবন্ধ	জট্ ৩৭৩	জলাগম	জট্ ৩৭৩	জহরৎ	জ্ ৪০৩	জাজিম	জ্ ৪০৩
জলদ	দা ৫২১	জলবহ	জট্ ৩৭৩	জলাচরণীয়	জট্ ৩৭৩	জহরব্রত	জ্ ৪০৩	জাজ্বল্য	জ্ ৪০৩
জলদকাল	জট্ ৩৭৩	জলবাদ্য	জট্ ৩৭৩	জলাজলি	জট্ ৩৭৩	জহল্লক্ষণা	জ্ ৪০৩	জাজ্বল্যমান	জ্ ৪০৩
জলদক্ষয়	জট্ ৩৭৩	জলবায়স	জট্ ৩৭৩	জলাঞ্জলি	জট্ ৩৭৩	জহীন	জ্ ৪০৩	জাজ্বল্যমান	জ্বল্ ৪০৩
জলদগম্ভীর	জট্ ৩৭৩	জলবায়ু	জট্ ৩৭৩	জলাত্যয়	জট্ ৩৭৩	জহুরা	জ্ ৪০৩	জাট	জট্ ৩৭৩
জলদপটল	জট্ ৩৭৩	জলবাস	জট্ ৩৭৩	জলাধার	জট্ ৩৭৩	জা	জ্ ৪০৩	জাটি	জট্ ৩৭৩
জলদল	জট্ ৩৭৩	জলবাহ	জট্ ৩৭৩	জলাধিদৈবত	জট্ ৩৭৩	জাই	জন্ ৩৭৮	জাঠর	জট্ ৩৭৩
জলদলপতি	জট্ ৩৭৩	জলবিছুটি	জট্ ৩৭৩	জলাবতার	জট্ ৩৭৩	জাইগীর	জ্ ৪০৩	জাঠা	জট্ ৩৭৩
জলদস্যু	জট্ ৩৭৩	জলবিড়াল	জট্ ৩৭৩	জলাবর্ত্ত	জট্ ৩৭৩	জাং	জন্ ৩৭৮	জাড়	জট্ ৩৭৩
জলদাগম	জট্ ৩৭৩	জলবিম্ব	জট্ ৩৭৩	জলাভূমি	জট্ ৩৭৩	জাঁওয়াতি	জন্ ৩৭৮	জাড়াও	জট্ ৩৭৩
জলদি	জ্ ৪০৩	জলবিহার	জট্ ৩৭৩	জলায়ুকা	জট্ ৩৭৫	জাঁক	জ্ ৪০৩	জাড়ি	জট্ ৩৭৩
জলদেবতা	জট্ ৩৭৩	জলবুদবুদ	জট্ ৩৭৩	জলারণ্য	জট্ ৩৭৩	জাঁকজমক	জ্ ৪০৩	জাড়িবেঙ(ঙ্গ)	জট্ ৩৭৩
জলদোষ	জট্ ৩৭৩	জলবৃশ্চিক	জট্ ৩৭৩	জলার্ক	জট্ ৩৭৩	জাঁকড়	জ্ ৪০৩	জাড্য	জট্ ৩৭৩
জলদ্রোণী	জট্ ৩৭৩	জলবেতস	জট্ ৩৭৩	জলার্দ্র	জট্ ৩৭৩	জাঁকা	জ্ ৪০৩	জাত	জন্ ৩৮২
জলধনু	জট্ ৩৭৩	জলব্যাল	জট্ ৩৭৩	জলালুক	জট্ ৩৭৩	জাঁকান	জ্ ৪০৩	জাতক	জন্ ৩৭৮
জলধার	জট্ ৩৭৩	জলব্রহ্ম	জট্ ৩৭৩	জলাশয়	জট্ ৩৭৫	জাঁকাল(লো)	জ্ ৪০৩	জাতকর্ম্ম	জন্ ৩৭৮
জলধি	জট্ ৩৭৩	জলভৃৎ	জট্ ৩৭৩	জলাশ্রয়	জট্ ৩৭৩	জাঁদরেল	জ্ ৪০৩	জাতকলাপ	জন্ ৩৭৮
জলধি	ধা ৫৯০	জলমণ্ডুক	জট্ ৩৭৩	জলিকা	জট্ ৩৭৫	জাঁয়তিপত্র	জন্ ৩৭৮	জাতকাঠ	জন্ ৩৭৮
জলনলিনী	জট্ ৩৭৩	জলমদগু	জট্ ৩৭৩	জলু(লূ)কা	জট্ ৩৭৩	জাঁহা	জ্ ৪০৩	জাতকুমড়া	জন্ ৩৭৮
জলনাড়ী	জট্ ৩৭৩	জলময়	জট্ ৩৭৩	জলুস	জ্ ৪০৩	জাঁহাপনা	জ্ ৪০৩	জাতক্রোধ	জন্ ৩৭৮
জলনালী	জট্ ৩৭৩	জলমার্গ	জট্ ৩৭৩	জলেচর	জট্ ৩৭৩	জাঁহাবাজ	জ্ ৪০৩	জাতদন্ত	জন্ ৩৭৮
জলনাথ	জট্ ৩৭৩	জলমার্জ্জার	জট্ ৩৭৩	জলেন্দ্র	জট্ ৩৭৩	জাগ	জাগৃ ৩৯১	জাতধর্ম্ম	ধৃ ৬০৬
জলনিধি	জট্ ৩৭৩	জলমূক	জট্ ৩৭৩	জলেন্ধন	জট্ ৩৭৩	জাগন্ত	জাগৃ ৩৯১	জাতপাত	জন্ ৩৭৮
জলনির্গম	জট্ ৩৭৩	জলমূর্ত্তি	জট্ ৩৭৩	জলেশ	জট্ ৩৭৩	জাগর	জাগৃ ৩৯১	জাতবিশ্বাস	জন্ ৩৭৮
জলনীলী	জট্ ৩৭৩	জলযন্ত্র	জট্ ৩৭৩	জলেশ্বর	জট্ ৩৭৩	জাগরণ	জাগৃ ৩৯১	জাতবেদাঃ	জন্ ৩৭৮
জলন্ধর	জট্ ৩৭৬	জলযাত্রা	জট্ ৩৭৩	জলেশয়	জট্ ৩৭৩	জাগরি(রী)	জাগৃ ৩৯১	জাতবোষ্টম	জন্ ৩৭৮
জলপটল	জট্ ৩৭৩	জলযান	জট্ ৩৭৩	জলো	জট্ ৩৭৩	জাগরিত	জাগৃ ৩৯১	জাতভাই	জন্ ৩৭৮
জলপড়া	জট্ ৩৭৩	জলযুদ্ধ	জট্ ৩৭৩	জলোচ্ছ্বাস	জট্ ৩৭৩	জাগরূক	জাগৃ ৩৯১	জাতমাত্র	জন্ ৩৭৮
জলপতি	জট্ ৩৭৩	জলযোগ	জট্ ৩৭৩	জলোদর	জট্ ৩৭৩	জাগা	জাগৃ ৩৯১	জাতরূপ	জন্ ৩৭৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
জাতসাপ	জন্	৩৭৮	জানা	জন্	৩৮৬	জাম্বুবান	জম্	৩৯১	জাল্ম	জট্	৩৭৭	জিন	জি	৩৯১
জাতস্পৃহ	জন্	৩৭৮	জানা	জ্ঞা	৪০০	জাম্বুনদ	জম্	৩৯১	জাশু	জ্	৪০৩	জিনা	জি	৩৯১
জাতাপত্যা	জন্	৩৭৮	জানানা	জন্	৩৮৬	জাম্বুমালী	জম্	৩৯১	জাসু	জ্	৪০৩	জিনিশ(স)	জি	৩৯৪
জাতি	জন্	৩৮২	জানালা	জন্	৩৮৬	জায়	জি	৩৮৭	জাসুস	জ্	৪০৩	জিনিসপত্র	জি	৩৯৪
জাতিকচু	জন্	৩৭৮	জানালা	জ্ঞা	৪০০	জায়জ	জি	৩৯১	জাস্তী	জ্	৪০৩	জিন্দা	জি	৩৯১
জাতিকলা	জন্	৩৭৮	জানি	জ্ঞা	৩৮৬	জায়গা	জি	৩৮৭	জাহাজ	জ্	৪০৩	জিন্দাপীর	জি	৩৯১
জাতিকোশ	জন্	৩৭৮	জানিত	জ্ঞা	৩৮৬	জায়গীর	জি	৩৯১	জাহান	জ্	৪০৩	জিব	জি	৩৯১
জাতিকোশী	জন্	৩৭৮	জানিল	জ্ঞা	৪০০	জায়দাদ	জি	৩৮৭	জাহান্নব	জ্	৪০৩	জিভ	জি	৩৯১
জাতিধর্ম্ম	ধৃ	৬০৭	জানী	জন্	৩৮৬	জায়ফল	জন্	৩৭৮	জাহান্নম	জ্	৪০৩	জিভেগজা	জি	৩৯১
জাতিপত্রী	জন্	৩৭৮	জানু	জন্	৩৮৬	জায়বেজায়	জি	৩৮৭	জাহির	জ্	৪০৩	জিম্মা	জম্	৩৮৮
জাতিফল	জন্	৩৭৮	জাপ	জপ্	৩৮৮	জায়া	জন্	৩৮৭	জাহিল	জ্	৪০৩	জিম্মিত	জি	৩৯১
জাতিব্রাহ্মণ	জন্	৩৭৮	জাপটা	জপ্	৩৮৮	জায়াজীব	জন্	৩৭৮	জি	জি	৩৯১	জিন্তগ	জি	৩৯১
জাতিবর্ণ	জন্	৩৭৮	জাপটাজাপটি	জপ্	৩৮৮	জায়াঘ্ন	জন্	৩৭৮	জি	জীব্	৩৯৪	জিয়	জীব্	৩৯৪
জাতিবাদ	জন্	৩৭৮	জাপটান	জপ্	৩৮৮	জায়ানুজীবী	জন্	৩৭৮	জিআ	জীব্	৩৯৪	জিয়ন্ত	জীব্	৩৯৪
জাতিবৈরী	জন্	৩৭৮	জাপান	জপ্	৩৮৮	জার	জৃ	৩৯৯	জিউ	জীব্	৩৯৪	জি(জী)য়া	জীব্	৩৯৪
জাতিবৈষ্ণব	জন্	৩৭৮	জাপ্য	জপ্	৩৮৭	জারক	জৃ	৩৯৭	জিওন	জীব্	৩৯৪	জিয়াদা	জ্	৪০৩
জাতিব্যবহার	জন্	৩৭৮	জাফরান	জ্	৪০৩	জারজ	জৃ	৩৯৯	জিওল	জীব্	৩৯৪	জি(জী)য়াপুত	জীব্	৩৯৪
জাতিরম্ভা	জন্	৩৭৮	জাফরি	জ্	৪০৩	জারণ	জৃ	৩৯৭	জিকি(গি)র	জি	৩৯৩	জি(জী)রা	জৃ	৩৯৭
জাতিসঙ্কর	জন্	৩৭৮	জাব	জু	৩৯৬	জারণী	জৃ	৩৯৭	জিগমিষা	জি	৩৯১	জিরান	জৃ	৩৯৭
জাতিসম্পন্ন	জন্	৩৭৮	জাবনা	জু	৩৯৬	জারা	জৃ	৩৯৭	জিগীষা	জি	৩৯১	জিলা	জি	৩৯১
জাতিসর্প	জন্	৩৭৮	জাবড়	জু	৩৯৭	জারি	জৃ	৪০০	জিঘাংসা	জি	৩৯১	জিল্লা	জ্বল্	৪০৩
জাতিস্মর	জন্	৩৭৮	জাবড়া	জু	৩৯৬	জারিজুরি	জৃ	৪০০	জিঘৃক্ষা	জি	৩৯১	জিষ্ণু	জি	৩৯১
জাতিহীন	জন্	৩৭৮	জাবড়ান	জু	৩৯৭	জারিতা	জৃ	৩৯৭	জিঘ্র	জি	৩৯১	জিহাদ	জ্	৪০৩
জাতী	জন্	৩৭৮	জাব্দা	জ্	৩৯৬	জারী	জৃ	৪০০	জিঙ্গিনী	জি	৩৯১	জিহীর্ষা	জি	৩৯১
জাতীয়	জন্	৩৭৮	জাবালা	জু	৩৯৬	জারীগান	জৃ	৪০০	জিজির	জন্	৩৭৮	জিহ্ম	জি	৩৯১
জাতুধান	জন্	৩৭৮	জাবালি	জু	৩৯৬	জারুয়া	জৃ	৩৯৭	জিজীবিষা	জি	৩৯১	জিহ্ম	জ্	৪০৩
জাতুষ	জন্	৩৭৮	জাবেদা	জু	৩৯৬	জারুল	জৃ	৩৯৭	জিজ্ঞাস	জ্ঞা	৪০০	জিহ্মগ	জ্	৪০৩
জাতেষ্টি	জন্	৩৭৮	জাম	জম্	৩৯১	জাল	জট্	৩৭৬	জিজ্ঞাসন	জ্ঞা	৪০০	জিহ্মগ	জি	৩৯১
জাত্য	জন্	৩৭৮	জাম-টাকুর	জন্	৩৭৮	জাল	জ্বল্	৪০৩	জিজ্ঞাসা	জ্ঞা	৪০১	জিহ্ন	জি	৩৯১
জাত্যংশ	জন্	৩৭৮	জামতা	জম্	৩৮৮	জালি-কারবার	জট্	৩৫৯	জিজ্ঞাসা	জি	৩৯১	জিহ্বা	জি	৩৯১
জাত্যন্ধ	জন্	৩৭৮	জামদগ্নেয়	জম্	৩৮৮	জালহস্তম	জট্	৩৫৯	জিজ্ঞাসু	জ্ঞা	৪০১	জিহ্বা	জ্	৪০৩
জাদ	জন্	৩৭৮	জামদগ্ন্য	জম্	৩৮৮	জালতী	জট্	৩৫৯	জিঞ্জলি	জন্	৩৭৮	জী	জি	৩৯১
জাদা	জন্	৩৭৮	জামদানী	জ্	৪০৩	জালন্ধর	জট্	৩৭৬	জিঞ্জির	জন্	৩৭৮	জী	জীব্	৩৯৪
জাদী	জন্	৩৭৮	জামবাটি	জ্	৪০৩	জালা	জট্	৩৭৬	জিৎ	জি	৩৯১	জীউ	জীব্	৩৯৪
জাদু	জ্	৪০৩	জামা	জ্	৩৯১	জালাক্ষ	জট্	৩৫৯	জিত	জি	৩৯১	জীত	জীব্	৩৯৪
জান	জন্	৩৮৬	জামাই	জম্	৩৯১	জালালি	জট্	৩৫৯	জিতা	জীব্	৩৯৪	জীন	জৃ	৩৯৭
জান	জ্ঞা	৪০০	জামাতৃ	জম্	৩৯১	জালি	জট্	৩৭৬	জিতাক্ষর	জি	৩৯১	জীব্	জীব্	৩৯৪
জানক	জন্	৩৭৮	জামাতা	জম্	৩৯১	জালিক	জট্	৩৭৭	জিতাত্মা	জি	৩৯১	জীব	জীব্	৩৯৪
জানত	জ্ঞা	৪০০	জামানত	জ্	৪০৩	জালিকা	জট্	৩৭৭	জিতামিত্র	জি	৩৯১	জীবক	জীব্	৩৯৪
জানপদ	জন্	৩৭৮	জামানতনামা	জ্	৪০৩	জালিনী	জট্	৩৫৯	জিতারি	জি	৩৯১	জীবৎ	জীব্	৩৯৪
জানপদী	জন্	৩৭৮	জামিত্র	জম্	৩৮৮	জালিবোট	জট্	৩৫৯	জিতাষ্টমী	জি	৩৯১	জীবদ	জীব্	৩৯৪
জানপ্রাণ	জন্	৩৮৬	জামিন	জ্	৪০৩	জালিয়া	জট্	৩৫৯	জিতেন্দ্রিয়	জি	৩৯১	জীবদশা	জীব্	৩৯৪
জানবাচ্চা	জন্	৩৭৮	জামীর	জম্	৩৮৮	জালিয়াৎ	জট্	৩৭৭	জিত্বর	জি	৩৯১	জীবদ্দশা	জীব্	৩৯৪
জানবিৎ	জন্	৩৭৮	জাম্ববান	জম্	৩৯১	জালিয়াতি	জট্	৩৭৭	জিদ	জি	৩৯১	জীবধন	জীব্	৩৯৪
জান(নো)য়ার	জন্	৩৮২	জাম্বুবতী	জম্	৩৯১	জালী	জট্	৩৭৭	জিদ্দি (জেদী)	জি	৩৯১	জীবধানী	জীব্	৩৯৪

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
জীবমাতৃকা	জীব্ ৩৯৪	জীয়ন	জীব্ ৩৯৪	জুষ্ট	জু ৩৯৬	জোড়ন	জট্ ৩৭৮	জ্ঞানবিজ্ঞান	জ্ঞা ৪০০
জীববৃত্তি	জীব্ ৩৯৪	জীয়ন্ত	জীব্ ৩৯৪	জূট	জু ৩৯৬	জোড়া	জট্ ৩৭৮	জ্ঞানবৃদ্ধ	জ্ঞা ৪০০
জীবশক্তি	জীব্ ৩৯৪	জীয়ল	জীব্ ৩৯৪	জূতি	জু ৩৯৬	জোড়ানী	জট্ ৩৭৮	জ্ঞানময়	জ্ঞা ৪০০
জীবন	জীব্ ৩৯৪	জীয়া	জীব্ ৩৯৪	জূর্	জু ৩৯৬	জোত্র	জট্ ৩৭৩	জ্ঞানযজ্ঞ	জ্ঞা ৪০০
জীবনক	জীব্ ৩৯৪	জীয়াচ	জীব্ ৩৯৪	জূর্ণ	জু ৩৯৬	জোনাই	দ্যুৎ ৫৭২	জ্ঞানযোগ	জ্ঞা ৪০০
জীবনকাঠি	জীব্ ৩৯৪	জীয়াপুত	জীব্ ৩৯৪	জুলি	জট্ ৩৭৩	জোনাক	দ্যুৎ ৫৭২	জ্ঞানলক্ষণা	জ্ঞা ৪০০
জীবনতরঙ্গ	জীব্ ৩৯৪	জীর	জৃ ৩৯৭	জূষ	জু ৩৭৩	জোনাকি	দ্যুৎ ৫৭২	জ্ঞানশক্তি	জ্ঞা ৪০০
জীবনসর্ব্বস্ব	জীব্ ৩৯৪	জীরক	জৃ ৩৯৭	জৃম্ভ্	জৃ ৩৯৭	জোবড়া	জ্ ৪০৩	জ্ঞানসাধন	জ্ঞা ৪০০
জীবনাবধি	জীব্ ৩৯৪	জীরা	জৃ ৩৯৭	জৃম্ভ	জৃ ৩৯৭	জোব্বা	জ্ ৪০৩	জ্ঞানহত	জ্ঞা ৪০০
জীবনিকা	জীব্ ৩৯৪	জীরাৎ	জৃ ৩৯৭	জৃম্ভা	জৃ ৩৯৭	জোয়ার	জ্ ৪০৩	জ্ঞানহারা	জ্ঞা ৪০০
জীবনী	জীব্ ৩৯৪	জীর্ণ	জৃ ৩৯৭	জৃ	জৃ ৩৯৭	জোয়ার-ভাটা	জ্ ৪০৩	জ্ঞানাগম	জ্ঞা ৪০০
জীবনীয়	জীব্ ৩৯৪	জৃ	জৃ ৩৯৭	জৃম্ভক	জৃ ৩৯৭	জোয়াল	জট্ ৩৭৮	জ্ঞানাঞ্জন	জ্ঞা ৪০০
জীবন্ত	জীব্ ৩৯৪	জুআ	দ্যুৎ ৫৭২	জৃম্ভন	জৃ ৩৯৭	জোর	জৃ ৩৯৭	জ্ঞানী	জ্ঞা ৪০২
জীবন্মুক্ত	জীব্ ৩৯৪	জুগুপ্সন	জু ৩৯৭	জৃম্ভিকা	জৃ ৩৯৭	জোর-জুলুম	জৃ ৩৯৭	জ্ঞানেন্দ্রিয়	জ্ঞা ৪০০
জীবন্মৃত	জীব্ ৩৯৪	জুগুপ্সা	জু ৩৯৭	জেও(ব)র	জ্ ৪০৩	জোরাল	জৃ ৩৯৭	জ্ঞাপক	জ্ঞা ৪০২
জীবন্মৃত্যু	জীব্ ৩৯৪	জুগুপ্সা	গুপ্ ২৮৮	জেদ(দী)	জি ৩৯১	জোরাবরি	জৃ ৩৯৭	জ্ঞাপন	জ্ঞা ৪০২
জীবন্যাস	জীব্ ৩৯৪	জুজু	জু ৩৯৬	জেব	জ্ ৪০৩	জোল	জট্ ৩৭৮	জ্ঞীপ্সা	জ্ঞা ৪০০
জীবপুত্রক	জীব্ ৩৯৪	জুজুবুড়ি	জু ৩৯৬	জেম্মা	জম্ ৩৮৮	জোলা	জ্ ৪০৩	জ্ঞেয়	জ্ঞা ৪০০
জীববান	জীব্ ৩৯৪	জুট	জট্ ৩৭৩	জের	জ্ ৪০৩	জোশ	জু ৩৯৬	জ্ঞেয়াতি	জ্ঞা ৪০০
জীবলীলা	জীব্ ৩৯৪	জুটক	জট্ ৩৭৩	জেরবার	জ্ ৪০৩	জোষ	জু ৩৯৬	জ্ঞেয়ান	জ্ঞা ৪০০
জীবলোক	জীব্ ৩৯৪	জুটি(টী)	জট্ ৩৭৩	জেরা	জ্ ৪০৩	জোষম	জু ৩৯৬	জ্যা	জৃ ৪০০
জীবা	জীব্ ৩৯৪	জুঠ	জু ৩৯৬	জেল	জ্ ৪০৩	জোষা	জু ৩৯৬	জ্যাঠা	জৃ ৩৯৭
জীবাতু	জীব্ ৩৯৪	জুড়	জট্ ৩৭৮	জেলা	জ্ ৪০৩	জোষিকা	জু ৩৯৬	জ্যাঠামি	জৃ ৩৯৭
জীবাত্মা	জীব্ ৩৯৪	জুড়	জট্ ৩৭৩	জেলে	জট্ ৩৭৩	জোষিৎ	জু ৩৯৬	জ্যামঘ	জৃ ৩৯৭
জীবাত্মা	অত্ ২২	জুড়নী	জট্ ৩৭৮	জেল্লা	জ্বল্ ৪০৩	জোষিতা	জু ৩৯৬	জ্যামিতি	জৃ ৪০০
জীবান্তক	জীব্ ৩৯৪	জুড়া	জট্ ৩৭৮	জেল্লাদার	জ্বল্ ৪০৩	জৌ	জন্ ৩৭৮	জ্যায়ান	জৃ ৩৯৭
জীবাপত্য	জীব্ ৩৯৪	জুড়ি(ড়ী)	জট্ ৩৭৮	জ্যেষ্ঠ	জ্ ৪০৩	জৌলুস	জ্ ৪০৩	জ্যেঠ	জৃ ৩৯৭
জীবিকা	জীব্ ৩৯৫	জুন	জ্ ৪০৩	জৈগীষব্য	জি ৩৯৪	জ্ঞ	জ্ঞা ৪০১	জ্যেষ্ঠ	জৃ ৩৯৭
জীবিত	জীব্ ৩৯৪	জুবড়া	জ্ ৪০৩	জৈন	জি ৩৯৪	জ্ঞপিত	জ্ঞা ৪০০	জ্যৈষ্ঠ	জৃ ৩৯৭
জীবিতব্য	জীব্ ৩৯৪	জুবুথুবু	জু ৩৯৬	জৈব	জীব্ ৩৯৪	জ্ঞা	জ্ঞা ৪০০	জ্যেষ্ঠতাত	জৃ ৩৯৭
জীবিতমান	জীব্ ৩৯৪	জু(জো)ব্বা	জ্ ৪০৩	জৈবাতৃক	জীব্ ৩৯৪	জ্ঞাত	জ্ঞা ৪০১	জ্যেষ্ঠা	জৃ ৩৯৭
জীবিতাপহা	জীব্ ৩৯৪	জুমলা	জ্ ৪০৩	জৈবেয়	জীব্ ৩৯৪	জ্ঞাতি	জ্ঞা ৪০১	জ্যেষ্ঠাংশ	জৃ ৩৯৭
জীবিতাশা	জীব্ ৩৯৪	জুম্মাঘর	জ্ ৪০৩	জৈমিনি	জম্ ৩৮৮	জ্ঞাতিকুল	জ্ঞা ৪০০	জ্যেষ্ঠাম্বু	জৃ ৩৯৭
জীবিতেশ	জীব্ ৩৯৪	জুয়া	দ্যুৎ ৫৭২	জৈহ্ম	জ্ ৪০৩	জ্ঞাতিগোষ্ঠী	জ্ঞা ৪০০	জ্যেষ্ঠাশ্রম	জৃ ৩৯৭
জীবী	জীব্ ৩৯৪	জুয়াখেলা	দ্যুৎ ৫৭২	জোঁক	জট্ ৩৭৩	জ্ঞাতেয়	জ্ঞা ৪০০	জ্যেষ্ঠী	জৃ ৩৯৭
জীবেন্ধন	জীব্ ৩৯৪	জুয়াচুরি	দ্যুৎ ৫৭২	জোঁকা	জট্ ৩৭৩	জ্ঞাতিত্ব	জ্ঞা ৪০০	জ্যৈষ্ঠ্য	জৃ ৩৯৭
জীবেশ	জীব্ ৩৯৪	জুয়াচোর	দ্যুৎ ৫৭২	জোচ্চুরি(রী)	দ্যুৎ ৫৭২	জ্ঞান	জ্ঞা ৪০২	জ্যৈষ্ঠমধু	জৃ ৩৯৭
জীবোৎসর্গ	জীব্ ৩৯৪	জুয়াড়ি	দ্যুৎ ৫৭২	জোছনা	দ্যুৎ ৫৭৪	জ্ঞানকাণ্ড	জ্ঞা ৪০০	জ্যৈষ্ঠিনেয়	জৃ ৩৯৭
জীবোপাধি	জীব্ ৩৯৪	জুয়ার	দ্যুৎ ৫৭২	জোট	জট্ ৩৭৩	জ্ঞানকৃত	জ্ঞা ৪০০	জ্যোতি	দ্যুৎ ৫৭৩
জীবোর্ণা	জীব্ ৩৯৪	জুলপি	জ্ ৪০৩	জোটন	জট্ ৩৭৩	জ্ঞানগম্য	জ্ঞা ৪০২	জ্যোতিঃ	দ্যুৎ ৫৭৩
জীব্য	জীব্ ৩৯৫	জুল্পি	জট্ ৩৭৮	জোটান	জট্ ৩৭৩	জ্ঞানগোচর	জ্ঞা ৪০২	জ্যোতিকণ	দ্যুৎ ৫৭৩
জীমূত	জীব্ ৩৯৬	জুলুম	জ্ ৩৭৭	জোড়	জট্ ৩৭৮	জ্ঞানচক্ষুঃ	জ্ঞা ৪০০	জ্যোতিরিঙ্গ	দ্যুৎ ৫৭৩
জীমূতবাহন	জীব্ ৩৯৬	জুলুস	জ্ ৪০৩	জোড়তাড়	জট্ ৩৭৮	জ্ঞাননিষ্ঠ	জ্ঞা ৪০০	জ্যোতিরিঙ্গণ	দ্যুৎ ৫৭৩
জীমূতবাহী	জীব্ ৩৯৪	জুষ্	জু ৩৯৬	জোড়ভাঙা	জট্ ৩৭৮	জ্ঞানদ	জ্ঞা ৪০০	জ্যোতির্ব্বিৎ	দ্যুৎ ৫৭৩
জীমূতেন্দ্র	জীব্ ৩৯৪	জুষ	জু ৩৯৬	জোড়-বিজোড়	জট্ ৩৭৮	জ্ঞানবন্ত	জ্ঞা ৪০০	জ্যোতির্ব্বিদ্যা	দ্যুৎ ৫৭৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
জ্যোতির্মণ্ডল	দ্যুৎ ৫৭২	জ্বালানে	জ্বল্ ৪০৩	ঝড়ঝঞ্ঝা	ঝট্ ৪১১	ঝরণা(না)	ঝৃ ৪১২	ঝাঁপ	ঝং ৪০৬
জ্যোতির্ম্ময়	দ্যুৎ ৫৭২	জ্বালামুখী	জ্বল্ ৪০৩	ঝড়বৃষ্টি	ঝট্ ৪১১	ঝরা	ঝৃ ৪১২	ঝাঁপতাল	ঝং ৪০৪
জ্যোতির্লোক	দ্যুৎ ৫৭২	জ্বালিত	জ্বল্ ৪০৩	ঝড়ি	ঝট্ ৪১১	ঝরিত	ঝৃ ৪১২	ঝাঁপন	ঝং ৪০৬
জ্যোতিঃশাস্ত্র	দ্যুৎ ৫৭৩	জ্বালী	জ্বল্ ৪০৩	ঝণঝ্ণিত	ঝং ৪০৪	ঝর্ঝর	ঝৃ ৪১২	ঝাঁপল	ঝং ৪০৪
জ্যোতিশ্চক্র	দ্যুৎ ৫৭২			ঝণঝণ	ঝং ৪০৪	ঝর্ঝরা	ঝৃ ৪১২	ঝাঁপা	ঝং ৪০৬
জ্যোতিষ	দ্যুৎ ৫৭৩	**ঝ**		ঝণঝণৎকারী	ঝং ৪০৪	ঝর্ঝরিত	ঝৃ ৪১২	ঝাঁপাঝাঁপি	ঝং ৪০৬
জ্যোতিষিক	দ্যুৎ ৫৭২			ঝণঝণা	ঝং ৪০৪	ঝর্ঝরী	ঝৃ ৪১২	ঝাঁপান	ঝং ৪০৬
জ্যোতিষী	দ্যুৎ ৫৭৩	ঝ	— ৪০৪	ঝণঝণায়মান	ঝং ৪০৪	ঝল	ঝ্ ৪১৩	ঝাঁপানিয়া	ঝং ৪০৬
জ্যোতিষ্ক	দ্যুৎ ৫৭৩	ঝক	ঝ্ ৪১৩	ঝণঝণায়িত	ঝং ৪০৪	ঝলক	ঝ্ ৪১৩	ঝাঁপি(পী)	ঝং ৪০৬
জ্যোতিষ্টোম	দ্যুৎ ৫৭২	ঝকঝক	ঝ্ ৪১৩	ঝণঝণীভূত	ঝং ৪০৪	ঝলকা	ঝ্ ৪১৩	ঝাক	ঝং ৪০৪
জ্যোতিষ্মান	দ্যুৎ ৫৭২	ঝকঝকে	ঝ্ ৪১৩	ঝণৎকার	ঝং ৪০৪	ঝলকিত	ঝ্ ৪১৩	ঝাকার	ঝং ৪০৪
জ্যোতিষ্মতী	দ্যুৎ ৫৭২	ঝকড়া	ঝ্ ৪১৩	ঝণ্ডা	ঝং ৪০৫	ঝলঝল	ঝ্ ৪১৩	ঝাঝর	ঝং ৪০৪
জ্যোতিপ্রিয়	দ্যুৎ ৫৭২	ঝকমক	ঝ্ ৪১৩	ঝন	ঝং ৪০৫	ঝলমল	ঝ্ ৪১৩	ঝাঝরি(রী)	ঝং ৪০৪
জ্যৌতি	দ্যুৎ ৫৭২	ঝকমারি	ঝ্ ৪১৩	ঝনক	ঝং ৪০৫	ঝলস	ঝ্ ৪১৩	ঝাট	ঝট্ ৪১১
জ্যৌতিষিক	দ্যুৎ ৫৭২	ঝগড়	ঝ্ ৪১৩	ঝনকাঠ	ঝং ৪০৪	ঝলসা	ঝ্ ৪১৩	ঝাটা	ঝট্ ৪১১
জ্যোৎস্না	দ্যুৎ ৫৭৪	ঝগড়া	ঝ্ ৪১৩	ঝনঝন	ঝং ৪০৫	ঝলসান	ঝ্ ৪১৩	ঝাটি	ঝট্ ৪১১
জ্যোৎস্নাপ্রিয়	দ্যুৎ ৫৭৪	ঝগড়াঝাঁটি	ঝ্ ৪১৩	ঝনঝনা	ঝং ৪০৫	ঝষ্	ঝ্ ৪১৩	ঝাট্যাতি	ঝট্ ৪১১
জ্যৌৎস্ন	দ্যুৎ ৫৭২	ঝগিতি	ঝ্ ৪১৩	ঝনন	ঝং ৪০৫	ঝষ	ঝ্ ৪১৩	ঝাড়	ঝট্ ৪১১
জ্বর্	জ্বর্ ৪০২	ঝ-কার	ঝ্ ৪১৩	ঝনা	ঝং ৪০৫	ঝষা	ঝ্ ৪১৩	ঝাড়-ফুঁক	ঝট্ ৪১১
জ্বর	জ্বর্ ৪০২	ঝঙ্ক	ঝং ৪০৭	ঝনাঝন	ঝং ৪০৪	ঝষোদরী	ঝ্ ৪১৩	ঝাড়ন	ঝট্ ৪১১
জ্বরঘ্ন	জ্বর্ ৪০২	ঝঙ্করু	ঝং ৪০৪	ঝনাৎ	ঝং ৪০৫	ঝাউ	ঝ্ ৪১৩	ঝাড়া	ঝট্ ৪১১
জরঘ্নী	জ্বর্ ৪০২	ঝঙ্কার	ঝং ৪০৭	ঝপ	ঝং ৪০৫	ঝাঁ	ঝং ৪০৪	ঝাড়াই	ঝট্ ৪১১
জ্বরান্তক	জ্বর্ ৪০২	ঝঙ্কারিণী	ঝং ৪০৪	ঝপক	ঝং ৪০৫	ঝাঁইট	ঝট্ ৪১১	ঝাড়াই-মাড়াই	ঝট্ ৪১১
জ্বরিত	জ্বর্ ৪০২	ঝঙ্কারিত	ঝং ৪০৪	ঝপঝপ	ঝং ৪০৫	ঝাঁক	ঝং ৪০৭	ঝাড়াঝাড়ি	ঝট্ ৪১১
জ্বরী	জ্বর্ ৪০২	ঝঙ্কৃত	ঝং ৪০৪	ঝপট	ঝং ৪০৪	ঝাঁকড়মাকড়	ঝং ৪০৪	ঝাড়াঝোড়া	ঝট্ ৪১১
জ্বরোৎপত্তি	জ্বর্ ৪০২	ঝঙ্কৃতি	ঝং ৪০৪	ঝপটা	ঝং ৪০৫	ঝাঁকড়া	ঝং ৪০৭	ঝাড়ান	ঝট্ ৪১১
জ্বল্	জ্বল্ ৪০৩	ঝঞ্ঝা	ঝং ৪০৫	ঝপাক	ঝং ৪০৫	ঝাঁকা	ঝং ৪০৭	ঝাড়ি(ড়ী)	ঝট্ ৪১১
জ্বল	জ্বল্ ৪০৩	ঝঞ্ঝাট	ঝং ৪০৫	ঝপাঝপ	ঝং ৪০৫	ঝাঁকার	ঝং ৪০৭	ঝাড়ু	ঝট্ ৪১২
জ্বল-জ্বল	জ্বল্ ৪০৩	ঝঞ্ঝানিল	ঝং ৪০৪	ঝপাৎ	ঝং ৪০৫	ঝাঁকি	ঝং ৪০৭	ঝাড়ুদার	ঝট্ ৪১২
জ্বলকা	জ্বল্ ৪০৩	ঝঞ্ঝামরুৎ	ঝং ৪০৪	ঝম	ঝং ৪০৬	ঝাঁগড়	ঝং ৪০৪	ঝাণ্ডা	ঝং ৪০৫
জ্বলজ্জ্যোতি	জ্বল্ ৪০৩	ঝঞ্ঝাবাত	ঝং ৪০৫	ঝমক	ঝং ৪০৬	ঝাঁগুড়গুড়	ঝং ৪০৪	ঝানু	ঝং ৪০৪
জ্বলদ্-অক্ষর	জ্বল্ ৪০৩	ঝট্	ঝট্ ৪১১	ঝমকঝমক	ঝং ৪০৬	ঝাঁজ	ঝং ৪০৭	ঝাপ	ঝং ৪০৫
জ্বলদগ্নি	জ্বল্ ৪০৩	ঝট	ঝট্ ৪১১	ঝমকিত	ঝং ৪০৬	ঝাঁজর	ঝং ৪০৪	ঝাপট	ঝং ৪০৬
জ্বলদর্চ্চি	জ্বল্ ৪০৩	ঝটক	ঝট্ ৪১১	ঝমঝম	ঝং ৪০৬	ঝাঁজরা	ঝং ৪০৭	ঝাপটা	ঝং ৪০৬
জ্বলন	জ্বল্ ৪০৩	ঝটকা	ঝট্ ৪১১	ঝমঝমি	ঝং ৪০৬	ঝাঁঝর	ঝং ৪০৪	ঝাপনি	ঝং ৪০৪
জ্বলনি	জ্বল্ ৪০৩	ঝটপট	ঝট্ ৪১১	ঝমরঝমর	ঝং ৪০৪	ঝাঁঝরা	ঝং ৪০৪	ঝাপসা	ঝং ৪০৬
জ্বলনাশ্মা	জ্বল্ ৪০৩	ঝটঝটি	ঝট্ ৪১১	ঝম্প	ঝং ৪০৬	ঝাঁঝরি	ঝং ৪০৭	ঝাপা	ঝং ৪০৪
জ্বলন্ত	জ্বল্ ৪০৩	ঝটাপট	ঝট্ ৪১১	ঝম্পন	ঝং ৪০৬	ঝাঁঝাঁ	ঝং ৪০৫	ঝাপান	ঝং ৪০৪
জ্বলা	জ্বল্ ৪০৩	ঝটাপটি	ঝট্ ৪১১	ঝম্পান	ঝং ৪০৬	ঝাঁঝাঁবাত	ঝং ৪০৪	ঝাবু	ঝ্ ৪১৩
জ্বলিত	জ্বল্ ৪০৩	ঝটি	ঝট্ ৪১১	ঝর	ঝ্ ৪১২	ঝাঁঝাল	ঝং ৪০৭	ঝাম	ঝং ৪০৭
জ্বাল	জ্বল্ ৪০৩	ঝটিকা	ঝট্ ৪১১	ঝর	ঝৃ ৪১২	ঝাঁঝি	ঝং ৪০৪	ঝামক	ঝং ৪০৭
জ্বালা	জ্বল্ ৪০৩	ঝটিং	ঝট্ ৪১১	ঝরঝর	ঝৃ ৪১২	ঝাঁট	ঝট্ ৪১১	ঝামটা	ঝং ৪০৭
জ্বালাতন	জ্বল্ ৪০৩	ঝটিত	ঝট্ ৪১১	ঝরঝরা	ঝৃ ৪১২	ঝাঁটা	ঝট্ ৪১১	ঝামর	ঝং ৪০৭
জ্বালান	জ্বল্ ৪০৩	ঝটিতি	ঝট্ ৪১১	ঝরঝরি	ঝৃ ৪১২	ঝাঁটান	ঝট্ ৪১১	ঝামরণ	ঝং ৪০৭
জ্বালানী	জ্বল্ ৪০৩	ঝড়	ঝট্ ৪১১	ঝরণ	ঝৃ ৪১২	ঝাঁটি	ঝট্ ৪১১	ঝামরি(রী)	ঝং ৪০৭

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
টাঙ্গ	টং	৪১৬	টালমাটাল	টল্	৪২৩	টী	টপ্	৪২১	টুসকি	ট্	৪২৩	টোটক	ট্	৪২৪
টাঙ্গন	টং	৪১৬	টালবাহানা	টল্	৪২৩	টীকটীক	টক্	৪২১	টে	ট্	৪২৩	টোটকা	ট্	৪২৪
টাঙ্গা	টং	৪১৬	টি	টপ্	৪২১	টীকলো	টক্	৪২১	টেংটা	ট্	৪২৩	টোটন	ট্	৪২৪
টাঙ্গান	টং	৪১৬	টি	টং	৪১৫	টীকা	টক্	৪২১	টেংরা	টং	৪১৮	টোটা	ট্	৪২৪
টাঙ্গি	টং	৪১৬	টিক	টক্	৪২০	টু	টং	৪১৫	টেঁক	টং	৪১৫	টো-টো	ট্	৪২৪
টাঞ্চি	টং	৪১৬	টিকটিক	টক্	৪২০	টুং	টং	৪১৫	টেঁকখোর	টং	৪১৫	টোড়ী	ট্	৪২৩
টাট	ট্	৪২৩	টিকটিকি	টক্	৪২০	টুংটাং	টং	৪১৫	টেঁকসই	টং	৪১৫	টোন	টং	৪১৫
টাটক	ট্	৪২৩	টিকর	টক্	৪১৮	টুঁই	টং	৪১৮	টেঁকশাল	টং	৪১৫	টোনা	টং	৪১৫
টাটকা	ট্	৪২৩	টিকল	টক্	৪১৮	টুঁটি	টং	৪১৫	টেক	টক্	৪১৮	টোনিয়া	টং	৪১৫
টাটা	ট্	৪২৩	টিকলি	টক্	৪১৮	টু-শব্দ	টং	৪১৫	টেকর	টক্	৪১৮	টোপ	টপ্	৪২১
টাটান	ট্	৪২৩	টিকা	টক্	৪২০	টুক	টক্	৪২০	টেকসই	টক্	৪১৮	টোপনা	টপ্	৪২১
টাটি(টী)	ট্	৪২৩	টিকান	টক্	৪১৮	টুকটাক	টক্	৪২০	টেকা	টক্	৪১৮	টোপর	টপ্	৪২১
টাটু	ট্	৪২৩	টিকারা	টক্	৪১৮	টুকটুক	টক্	৪২০	টেকাল	টক্	৪১৮	টোপলা	টপ্	৪২১
টাড়	ট্	৪৫১	টিকি	টক্	৪২০	টুকনি(নী)	টক্	৪১৮	টেকো	টক্	৪১৮	টোপসা	টপ্	৪২১
টান	টং	৪১৭	টিকিট	টক্	৪১৮	টুকরা	টক্	৪২০	টেকো	কৃৎ	২১৩	টোপাকুল	টপ্	৪২১
টান	তন্	৪৫৩	টিকিটবাবু	টক্	৪১৮	টুকরো	টক্	৪২০	টেক্কা	টক্	৪১৮	টোপান	টপ্	৪২১
টানা	তন্	৪৫৩	টি(ঠি)কির	টক্	৪১৮	টুকরি(রী)	টক্	৪২০	টেক্কা-দেওয়া	টক্	৪১৮	টোপাপানা	টপ্	৪২১
টানা	টং	৪১৭	টি(ঠি)করি	টক্	৪১৮	টুকলি	টক্	৪২০	টেঙা	টং	৪১৫	টোয়ত	ট্	৪২৩
টানকচু	টং	৪১৫	টিকে-থাকা	টক্	৪১৮	টুকা	টক্	৪১৮	টেঙ্গরা	টং	৪১৫	টোয়া	ট্	৪২৩
টান(নু)নি	টং	৪১৫	টি(টী)ট	ট্	৪২৩	টুকি	টক্	৪১৮	টেঁটন	ট্	৪২৩	টোয়ে	ট্	৪২৩
টানমান	টং	৪১৫	টিটকার	ট্	৪২৩	টুকিটাকি	টক্	৪১৮	টেঁটা	ট্	৪২৩	টোরা	ট্	৪২৩
টানল	টং	৪১৫	টিটকারি	ট্	৪২৩	টুকু	টক্	৪১৮	টেঁশটেঁশ	ট্	৪২৩	টোল	টল্	৪২৩
টানা	টং	৪১৫	টিটকিরি	ট্	৪২৩	টুকুটাকু	টক্	৪১৮	টেটারি	ট্	৪২৩	টোলা	টল্	৪২৩
টানাটানি	টং	৪১৭	টিটিপাখী	ট্	৪২৩	টুকুন	টক্	৪১৮	টেটিয়া	ট্	৪২৪	টোলি	টল্	৪২২
টানাটানি	তন্	৪৫৩	টিট্টিভ	ট্	৪২৩	টুঙি	টং	৪১৮	টেড়া	ট্	৪২৪	টোসা	ট্	৪২৩
টানাপড়েন	টং	৪১৭	টিণ্ডিশ	টং	৪১৫	টুঙ্গি(ঙ্গী)	টং	৪১৮	টেড়ি	ট্	৪২৪	টৌ	ট্	৪২৩
টানেল	টং	৪১৭	টিন	টং	৪১৫	টুট	ট্	৪২৩	টেনা	টং	৪১৭	ট্যাংটাঙে	টং	৪১৫
টাপ	টপ্	৪২১	টিপ	টপ্	৪২১	টুটা	ট্	৪২৩	টেপ	টক্	৪১৮	ট্যাঁ	টং	৪১৫
টাপটুপ	টপ্	৪২১	টিপটাপ	টপ্	৪২১	টুটা-ফাটা	ট্	৪২৩	টেপা	টক্	৪২১	ট্যাঁক	টং	৪১৫
টাপর	টপ্	৪২১	টিপটিপ	টপ্	৪২১	টুটি	ট্	৪২৩	টেপারি	টক্	৪১৮	ট্যাঁস	টং	৪১৫
টাপুরটুপুর	টপ্	৪২১	টিপনদাঁড়া	টপ্	৪২১	টুটিয়া	ট্	৪২৩	টেমাই	টং	৪১৫	ট্যাকট্যাক	টক্	৪১৮
টাপে-টোপে	টপ্	৪২১	টিপননড়ি	টপ্	৪২১	টুটিল	ট্	৪২৩	টেমি	টং	৪১৫	ট্যাকা	টক্	৪১৮
টাপসা-পেটা	টপ্	৪২১	টিপা	টপ্	৪২১	টুটুরে	ট্	৪২৩	টের	ট্	৪২৪	ট্যাঙ্গট্যাঙ্গ	টং	৪১৫
টাবা	ট্	৪২৩	টিপাই	টপ্	৪২১	টুডু	ট্	৪২৩	টেরচা	ট্	৪২৪	ট্যাঙ্গনা	টং	৪১৫
টাবুটুবু	ট্	৪২৩	টিপাটিপি	টপ্	৪২১	টুনটুন	টং	৪১৫	টেরা	ট্	৪২৪	ট্যাড়চা	ট্	৪২৩
টায়-টায়	ট্	৪১৫	টিপি	টপ্	৪২১	টুনটুনি	টং	৪১৫	টেরি (টেরী)	ট্	৪২৪	ট্যাপা	টপ্	৪২১
টায়-টায়	টপ্	৪২১	টিপিটিপি	টপ্	৪২১	টুনি	টং	৪১৫	টেটুম্বুর	ট্	৪২৩	ট্যামটেমী	টং	৪১৫
টায়-টোয়	টপ্	৪২১	টিপিশটিপিশ	টপ্	৪২১	টুপ	টপ্	৪২২	টেঁয়া	ট্	৪২৩	ট্যার	ট্	৪২৩
টায়-টোয়	ট্	৪২৩	টিপুনি(নী)	টপ্	৪২১	টুপটাপ	টপ্	৪২২	টো	ট্	৪২৪	ট্রাম	টল্	৪২২
টার	টল্	৪২২	টিপ্পনি(নী)	টপ্	৪২১	টুপটুপ	টপ্	৪২২	টোং	টং	৪১৮			
টারল	টল্	৪২২	টিম	টং	৪১৭	টুপি	টপ্	৪২২	টোকচা	টক্	৪১৮	**ঠ**		
টার্ম	টল্	৪২২	টিমটিম	টং	৪১৭	টুয়া	ট্	৪২৩	টোকর	টক্	৪১৮			
টার্ন	টল্	৪২২	টিয়া	টং	৪১৫	টুল	টল্	৪২৩	টোকলা	টক্	৪১৮	ঠ	—	৪২৫
টাল	টল্	৪২৩	টিয়ে	টং	৪১৫	টুলি	টল্	৪২৩	টোকা	টক্	৪১৮	ঠ	ঠ্	৪২৮
টালনি(নী)	টল্	৪২২	টিলা (টীলা)	টল্	৪২৩	টুলী	টল্	৪২৩	টোঙ্গ	টং	৪১৫	ঠং	ঠ্	৪২৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ঠ-কার	ঠ্ ৪২৮	ঠাকুরদালান	ঠক্ ৪২৬	ঠিকা	ঠক্ ৪২৮	ঠেসনা	ঠ্ ৪৩০	ডঙ্ক	ডং ৪৩২
ঠ(ঠো)ক্কর	ঠ্ ৪২৮	ঠাকুরদেবতা	ঠক্ ৪২৬	ঠিকাদার	ঠক্ ৪২৮	ঠেসাঠেসি	ঠ্ ৪২৮	ডঙ্কা	ডং ৪৩২
ঠক্কুর	ঠ্ ৪২৮	ঠাকুরপো	ঠক্ ৪২৬	ঠিকানা	ঠক্ ৪২৭	ঠেসান	ঠ্ ৪৩০	ডড়া	ড্ ৪৩৯
ঠক্কুর	ঠক্ ৪২৬	ঠাকুরপ্রণামী	ঠক্ ৪২৬	ঠিকারী	ঠক্ ৪২৬	ঠোঁট	ঠ্ ৪২৮	ডণ্ড	দং ৫১১
ঠক্‌কুর	ঠক্ ৪২৬	ঠাকুরবাড়ী	ঠক্ ৪২৬	ঠিলা	ঠ্ ৪২৮	ঠোঁটকাটা	ঠ্ ৪২৮	ডন	ডং ৪৩২
ঠক্	ঠক্ ৪২৬	ঠাকুরমশাই	ঠক্ ৪২৬	ঠুং	ঠ্ ৪৩০	ঠোক	ঠক্ ৪২৬	ডবকা	ড্ ৪৪৩
ঠক	ঠক্ ৪২৬	ঠাকুরমা	ঠক্ ৪২৬	ঠুংরী	ঠ্ ৪৩০	ঠোকনা	ঠক্ ৪২৬	ডবল	ড্ ৪৩৯
ঠকঠক	ঠক্ ৪২৬	ঠাকুরণদিদি	ঠক্ ৪২৬	ঠুঁটা	ঠ্ ৪৩০	ঠোকর	ঠক্ ৪২৬	ডবলা	ড্ ৪৩৯
ঠকঠকা	ঠক্ ৪২৬	ঠাকুরাইন	ঠক্ ৪২৬	ঠুঁটো	ঠ্ ৪৩০	ঠোকরা	ঠক্ ৪২৮	ডবিশ্ব	ড্ ৪৩৯
ঠকঠকি	ঠক্ ৪২৬	ঠাকুরাণি	ঠক্ ৪২৬	ঠুঁটো-জগন্নাথ	ঠ্ ৪৩০	ঠোকরান	ঠক্ ৪২৮	ডম	ডং ৪৩২
ঠকঠকে	ঠক্ ৪২৬	ঠাকুরানী	ঠক্ ৪২৬	ঠুক	ঠক্ ৪২৮	ঠোকা	ঠক্ ৪২৬	ডমক	ডং ৪৩২
ঠকঠাক	ঠক্ ৪২৬	ঠাকুরাল	ঠক্ ৪২৬	ঠু(ঠো)করা	ঠক্ ৪২৮	ঠোকাঠুকি	ঠক্ ৪২৬	ডমর	ডং ৪৩২
ঠকঠান্দি	ঠক্ ৪২৬	ঠাকুরালি(লী)	ঠক্ ৪২৬	ঠুকঠাক	ঠক্ ৪২৬	ঠোক্কর	ঠক্ ৪২৮	ডমডামর	ডং ৪৩২
ঠকরঠকর	ঠক্ ৪২৬	ঠাকুরিকলাই	ঠক্ ৪২৬	ঠুকরান	ঠক্ ৪২৮	ঠোকা	ঠক্ ৪২৬	ডমরু	ডং ৪৩২
ঠকা	ঠক্ ৪২৬	ঠাকুরুণ	ঠক্ ৪২৬	ঠুটা	ঠ্ ৪৩০	ঠোঙা	ঠ্ ৪২৮	ডমুর	ডং ৪৩২
ঠকান	ঠক্ ৪২৬	ঠাঞি	ঠ্ ৪২৯	ঠুঙি	ঠ্ ৪২৮	ঠোঙ্গা	ঠ্ ৪২৮	ডমুরু	ডং ৪৩২
ঠকাম	ঠক্ ৪২৬	ঠাট	ঠ্ ৪২৯	ঠুঙ্গি	ঠ্ ৪২৮	ঠোনা	ঠ্ ৪২৮	ডমরু	ঋ ১১৩
ঠগ	ঠ্ ৪২৮	ঠাটঠমক	ঠ্ ৪২৯	ঠুন্ট	ঠ্ ৪২৮	ঠোলা	ঠ্ ৪৩১	ডম্ফ	ডং ৪৩২
ঠণ্ঠনি	ঠ্ ৪২৮	ঠাটবাট	ঠ্ ৪২৯	ঠুন	ঠ্ ৪২৮	ঠোসা	ঠ্ ৪২৮	ডম্ব	ডং ৪৩২
ঠন	ঠ্ ৪২৮	ঠাটী	ঠ্ ৪২৯	ঠুনকা	ঠ্ ৪৩০	ঠ্যাং	ঠ্ ৪২৮	ডম্ব(ম্বু)র(রু)	ডং ৪৩২
ঠনঠন	ঠ্ ৪২৮	ঠাট্টা	ঠ্ ৪২৯	ঠুনকো	ঠ্ ৪৩০	ঠ্যাঙ	ঠ্ ৪২৮	ডম্বুর	ডং ৪৩২
ঠনঠনা	ঠ্ ৪২৮	ঠাঠ	ঠ্ ৪২৮	ঠুলি	ঠ্ ৪৩১	ঠ্যাঁটা	ঠ্ ৪২৮	ডয়ন	ডী ৪৩৭
ঠনঠনে	ঠ্ ৪২৮	ঠা-ঠা	ঠ্ ৪২৮	ঠুস	ঠ্ ৪৩০	ঠ্যাকনা	ঠ্ ৪২৮	ডয়নী	ডী ৪৩৭
ঠনঠান	ঠ্ ৪২৮	ঠাড়	ঠ্ ৪২৮	ঠুসকি	ঠ্ ৪৩০	ঠ্যাকার	ঠ্ ৪২৮	ডয়রা	ড্ ৪৩৯
ঠনাঠন	ঠ্ ৪২৬	ঠাড়মোড়	ঠ্ ৪২৮	ঠুসঠাস	ঠ্ ৪৩০	ঠ্যাঙ্গ	ঠ্ ৪২৮	ডর	ড্ ৪৩৮
ঠমক	ঠ্ ৪২৯	ঠাণ্ডা	ঠ্ ৪২৮	ঠুসাঠুসি	ঠ্ ৪২৮	ঠ্যাঙ্গা	ঠ্ ৪২৮	ডর	ডী ৪৩৭
ঠস(সো)ক	ঠ্ ৪২৮	ঠান	ঠ্ ৪২৮	ঠুসি	ঠ্ ৪৩০	ঠ্যালা	ঠ্ ৪২৮	ডরা	ড্ ৪৩৮
ঠসঠাস	ঠ্ ৪২৮	ঠানদি	ঠক্ ৪২৮	ঠে	ঠ্ ৪২৮	ঠ্যাটা	ঠ্ ৪২৮	ডল	ড্ ৪৩৯
ঠা	ঠ্ ৪২৯	ঠানদিদি	ঠক্ ৪২৮	ঠেং	ঠ্ ৪২৮			ডল(ম্ল)ক	ড্ ৪৩৯
ঠাউর	ঠ্ ৪২৯	ঠাম	ঠ্ ৪২৮	ঠেঁটা	ঠ্ ৪২৮	**ড**		ডলকা	ড্ ৪৩৯
ঠাএ	ঠ্ ৪২৮	ঠামঠমক	ঠ্ ৪২৮	ঠেঁটি	ঠ্ ৪২৮			ডহ্ডহ্	দহ্ ৫২০
ঠাওর	ঠ্ ৪২৯	ঠায়	ঠ্ ৪২৮	ঠেঁটী	ঠ্ ৪২৮	ড	— ৪৩১	ডহ্র	দহ্ ৫২০
ঠাওরা	ঠ্ ৪২৯	ঠায়ঠিকানা	ঠ্ ৪২৮	ঠেক	ঠক্ ৪২৮	ড	ডী ৪৩৭	ডহু	দহ্ ৫২০
ঠাওরালি	ঠ্ ৪২৮	ঠার	ঠ্ ৪২৯	ঠেকনা	ঠক্ ৪২৮	ড	ড্ ৪৩৯	ডাইনা	দক্ষ্ ৫০২
ঠাঁই	ঠ্ ৪২৯	ঠারেঠোরে	ঠ্ ৪২৯	ঠেকনো	ঠক্ ৪২৮	ড়	ড্ ৪৩৯	ডাংগুলি	দং ৫১০
ঠাঁয়	ঠ্ ৪২৯	ঠাস	ঠ্ ৪৩০	ঠেকা	ঠক্ ৪২৮	ডউয়া	ড্ ৪৩৯	ডাঁশ	দং ৫১০
ঠাক	ঠক্ ৪২৬	ঠাসা	ঠ্ ৪৩০	ঠেকাঠেকি	ঠক্ ৪২৮	ডংশ	দং ৫১১	ডহ্র	ড্ ৪৩৯
ঠাকরীকলাই	ঠক্ ৪২৬	ঠাসাঠাসি	ঠ্ ৪৩০	ঠেঙ	ঠ্ ৪২৮	ডক	ড্ ৪৩৪	ডা	ট্ ৪২৩
ঠাকরুণ	ঠক্ ৪২৬	ঠাহর	ঠ্ ৪২৯	ঠেঙা	ঠ্ ৪২৮	ড-কার	ড্ ৪৩৯	ডাইন	ডাক্ ৪৩৫
ঠাকুর	ঠক্ ৪২৬	ঠিক	ঠক্ ৪২৭	ঠেঙ্গ	ঠ্ ৪২৮	ডগ	ড্ ৪৪৩	ডাইনী	ডাক্ ৪৩৫
ঠাকুরঘর	ঠক্ ৪২৬	ঠিকঠাক	ঠক্ ৪২৬	ঠেঙ্গা	ঠ্ ৪২৮	ডগমগ	ড্ ৪৪৩	ডাইল	ড্ ৪৩৮
ঠাকুরজামাই	ঠক্ ৪২৬	ঠিক(কু)র	ঠক্ ৪২৭	ঠেল	ঠ্ ৪৩১	ডগমগি	ড্ ৪৪৩	ডাং	ডং ৪৩২
ঠাকুরঝি	ঠক্ ৪২৬	ঠিকরা	ঠক্ ৪২৭	ঠেলা	ঠ্ ৪৩১	ডগর	ড্ ৪৪৩	ডাংগুলি	ডং ৫১১
ঠাকুরদা	ঠক্ ৪২৬	ঠিকরান	ঠক্ ৪২৭	ঠেলাঠেলি	ঠ্ ৪৩১	ডগা	ড্ ৪৪৩	ডাংপিটে	ডং ৪৩২
ঠাকুরদাদা	ঠক্ ৪২৬	ঠিকরি(রী)	ঠক্ ৪২৭	ঠেস	ঠ্ ৪৩০	ডগি	ড্ ৪৪৩	ডাঁই	ডং ৪৩২

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ডাঁগর	ডং ৪৩২	ডাঙ্গর	ডং ৪৩২	ডাহ	দহ্ ৫২০	ডীন	ডী ৪৩৮	ডেনা	ডী ৪৩৮
ডাঁট	ডং ৪৩৩	ডাঙ্গশ(স)	ডং ৪৩২	ডাহুক	ডাক্ ৪৩৪	ডুকর	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেফল	ড্ ৪৩৯
ডাঁটা	ডং ৪৩৩	ডাঙ্গা	ডং ৪৩২	ডাহুকা	ডাক্ ৪৩৪	ডুকরা	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেবরা	ড্ ৪৩৯
ডাঁটা	ডং ৪৩২	ডাঙ্গুলি	ডং ৪৩২	ডম্বুর	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডুঁকুর	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেম	ডং ৪৩২
ডাঁড়্ক	ডং ৪৩২	ডাটি	ডং ৪৩২	ডিং	ডং ৪৩৩	ডুগডুগি	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেমাক	ডং ৪৩২
ডাঁড়্কা	ডং ৪৩২	ডাড়্কা	দং ৫১০	ডিংগি	ডং ৪৩২	ডুগী	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেরা	ড্ ৪৩৯
ডাঁটো	ডং ৪৩৩	ডাণ্ডা	ডং ৪৩৩	ডিগ	দৃ ৫৬৩	ডুণ্ডুভ	ডং ৪৩৩	ডোকরা	ডং ৪৩২
ডাঁশ	দং ৫১১	ডাণ্ডা	দং ৫১১	ডিগডিগে	দৃ ৫৬৩	ডুব	ডুব্ ৪৩৯	ডোকলা	ড্ ৪৩৯
ডাক	ডাক্ ৪৩৪	ডাণ্ডাগুলি	ডং ৪৩৩	ডিগবাজি	দৃ ৫৬৩	ডুবজল	ডুব্ ৪৩৯	ডোগা	ড্ ৪৩৯
ডাকখরচা	ডাক্ ৪৩৫	ডাণ্ডুকা	দং ৫১০	ডিগি	দৃ ৫৬৩	ডুবমারা	ডুব্ ৪৩৯	ডোগাশাল	ড্ ৪৩৯
ডাকগাড়ি	ডাক্ ৪৩৫	ডান	দক্ষ্ ৫০৮	ডিগি	ড্ ৪৩৯	ডুবা	ডুব্ ৪৩৯	ডোঙ্গা	ডং ৪৩২
ডাকঘর	ডাক্ ৪৩৫	ডান	ডাক্ ৪৩৫	ডিগিডিগি	ড্ ৪৩৯	ডুবান	ডুব্ ৪৩৯	ডোব	ডুব্ ৪৩৯
ডাকচৌকি	ডাক্ ৪৩৪	ডানকনা	দং ৫১০	ডিগিতবলা	ড্ ৪৩৯	ডুবারি(রী)	ডুব্ ৪৩৯	ডোবা	ডুব্ ৪৩৯
ডাকটিকিট	ডাক্ ৪৩৫	ডানদিক	দক্ষ্ ৫০৮	ডিঙা	ডং ৪৩৩	ডুবারু	ডুব্ ৪৩৯	ডোম	ডং ৪৩৪
ডাকনাম	ডাক্ ৪৩৫	ডানহাত	দক্ষ্ ৫০৮	ডিঙি	ডং ৪৩৩	ডুবি	ডুব্ ৪৩৯	ডোমকাক	ডং ৪৩৪
ডাকপাখী	ডাক্ ৪৩৪	ডানা	ডী ৪৩৮	ডিঙ্গ	ডং ৪৩৩	ডুবুডুবু	ডুব্ ৪৩৯	ডোমচিল	ডং ৪৩৪
ডাকপিওন	ডাক্ ৪৩৫	ডানিকোণা	দং ৫১০	ডিঙ্গয়ান	ডং ৪৩৩	ডুবুরি(রী)	ডুব্ ৪৩৯	ডোমনা	ডং ৪৩৪
ডাকবাংলা	ডাক্ ৪৩৫	ডাব	ড্ ৪৩৯	ডিঙ্গর	ডং ৪৩৩	ডুম	ডং ৪৩৪	ডোমনি(নী)	ডং ৪৩৪
ডাকমাশুল	ডাক্ ৪৩৫	ডাবর	ড্ ৪৩৯	ডিঙ্গসাই	ডং ৪৩৩	ডুমনী	ডং ৪৩৪	ডোম্ব	ডং ৪৩৪
ডাকমুনসী	ডাক্ ৪৩৫	ডাবা	ড্ ৪৩৯	ডিঙ্গা	ডং ৪৩৩	ডুমা	ডং ৪৩৪	ডোম্বী	ডং ৪৩৪
ডাকসংক্রান্তি	ডাক্ ৪৩৫	ডাবু	ড্ ৪৩৯	ডিঙ্গান	ডং ৪৩৩	ডুমিনী	ডং ৪৩৪	ডোর	ড্ ৪৩৯
ডাকসাইটে	ডাক্ ৪৩৫	ডাবুশ(ষ/স)	ড্ ৪৩৯	ডিঙ্গি	ডং ৪৩৩	ডুমুনী	ডং ৪৩৪	ডোরক	ড্ ৪৩৯
ডাকসিদ্ধা	ডাক্ ৪৩৫	ডামক	ডং ৪৩২	ডিণ্ডিম	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডুমুডুমু	ডং ৪৩৪	ডোল	ড্ ৪৩৯
ডাকসিদ্যা	ডাক্ ৪৩৫	ডামর	ডং ৪৩২	ডিণ্ডিমি	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডুমুর	ডং ৪৩৪	ডৌল	ড্ ৪৩৯
ডাকহরকরা	ডাক্ ৪৩৫	ডামাডোল	ডং ৪৩২	ডিণ্ডির	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডুমো	ডং ৪৩৪	ড্যাংড্যাং	ডং ৪৩২
ডাকহাঁক	ডাক্ ৪৩৫	ডাম্বাডো(ডৌ)ল	ডং ৪৩২	ডিণ্ডিশ	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডুম্বুর	ডং ৪৩২	ড্যাকরা	ড্ ৪৩৯
ডাকা	ডাক্ ৪৩৪	ডামার	ডং ৪৩২	ডিপো	ড্ ৪৩৯	ডুরি(রী)	ড্ ৪৩৯	ড্যানাক	ড্ ৪৩৯
ডাকাইত	ডাক্ ৪৩৫	ডায়া	দহ্ ৪৩২	ডিবা	ড্ ৪৩৯	ডুলি	ড্ ৪৩৯	ড্যাবডেবে	ড্ ৪৩৯
ডাকাডাকি	ডাক্ ৪৩৪	ডার	ডী ৪৩৮	ডিবিডিবি	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডুলি	দল্ ৫১৮		
ডাকাত	ডাক্ ৪৩৫	ডাল	ডী ৪৩৮	ডিবিয়া	ড্ ৪৩৯	ডেউয়া	ড্ ৪৩৯		
ডাকাতি	ডাক্ ৪৩৫	ডাল	ড্ ৪৩৯	ডিবে	ড্ ৪৩৯	ডেংগু	ডং ৪৩২	**ঢ**	
ডাকাতিয়া	ডাক্ ৪৩৪	ডালকুত্তা	ডী ৪৩৮	ডিম	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেংডেং	ডং ৪৩২	ঢ	— ৪৪৩
ডাকাতে	ডাক্ ৪৩৪	ডালচিনি	ডী ৪৩৮	ডিমক	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেঁইয়া	ডং ৪৩২	ঢ	ঢ় ৪৪৮
ডাকিনী	ডাক্ ৪৩৫	ডালনা	ডী ৪৩৮	ডিমডিম	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেঁপো	ডং ৪৩২	ঢ়	ঢ় ৪৪৮
ডাকিনীবিদ্যা	ডাক্ ৪৩৪	ডালনা	ড্ ৪৩৯	ডিমিকি	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেক	ড্ ৪৩৯	ঢং	ঢ় ৪৪৮
ডাকাবুকা	ডাক্ ৪৩৪	ডালা	ডী ৪৩৮	ডিমিডিমি	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেকচি(চী)	ড্ ৪৩৯	ঢক	ঢক্ ৪৪৪
ডাকু	ডাক্ ৪৩৫	ডালি	ডী ৪৩৮	ডিম্ব	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেক(গ)রা	ডং ৪৩২	ঢকঢক	ঢক্ ৪৪৪
ডাগর	ড্ ৪৩৯	ডালি-ডালি	ডী ৪৩৭	ডিম্বযুদ্ধ	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেগ	ড্ ৪৩৯	ঢ-কার	ঢক্ ৪৪৪
ডাগরডোগর	ড্ ৪৩৯	ডালিম	ড্ ৪৩৯	ডিম্বিকা	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেঙো	ডং ৪৩২	ঢক্কঢক্ক	ঢক্ ৪৪৪
ডাঙ	ডং ৪৩২	ডালিমা	ডী ৪৩৮	ডিম্বিকি	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেঙ্গর	ডং ৪৩২	ঢক্কা	ঢক্ ৪৪৪
ডাঙর	ডং ৪৩২	ডালিয়া	ডী ৪৩৮	ডিম্ভ	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেঙ্গা	ডং ৪৩২	ঢঙ	ঢ় ৪৪৮
ডাঙশ(স)	ডং ৪৩২	ডালুয়া	ডী ৪৩৮	ডিম্ভক	ডিম্ব্ ৪৩৬	ডেঙ্গু	ডং ৪৩২	ঢঙ্কিনী	ঢ় ৪৪৮
ডাঙা	ডং ৪৩২	ডালে-ডালে	ডী ৪৩৮	ডিহি	দৃ ৫৬০	ডেঙ্গো	ডং ৪৩২	ঢঙ্গ	ঢ় ৪৪৮
ডাঙ্কৃতি	ডং ৪৩২	ডাহিন	দক্ষ্ ৫০২	ডী	ডী ৪৩৮	ডেড়	ড্ ৪৩৯	ঢঙ্গ-ঢাঙ্গাতি	ঢ় ৪৪৮
ডাঙ্গ	ডং ৪৩২	ডাহিনি(নী)	ডাক্ ৪৩৫	ডীউসাঁই	ডী ৪৩৭	ডেড়ি	ড্ ৪৩৯	ঢঙ্গা	ঢ় ৪৪৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ঢঙ্গি	ঢ় ৪৪৮	ঢালাও	ঢল্ ৪৪৭	ঢেঁকি	ঢক্ ৪৪৪	ত্(ৎ)সরু	তু ৪৯৫	তজবি(বী)জ	তন্ ৪৫৩
ঢঙ্গিয়া	ঢ় ৪৪৮	ঢালাঢালি	ঢল্ ৪৪৬	ঢেঁটরা	ঢ় ৪৪৮	ত্(ৎ)স(সা)রুক	তু ৪৯৫	তঞ্চ	তন্ ৪৫৩
ঢঙ্গে	ঢ় ৪৪৮	ঢালি	ঢল্ ৪৪৭	ঢেঁড়শ	ঢ় ৪৪৮	তু	তু ৪৯৫	তট্	তট্ ৪৫১
ঢনঢন	ঢ় ৪৪৮	ঢালী	ঢল্ ৪৪৭	ঢেঁড়া	ঢ় ৪৪৮	তুই	তু ৪৯৫	তট	তট্ ৪৫১
ঢনঢনিয়া	ঢ় ৪৪৮	ঢালু	ঢল্ ৪৪৭	ঢেঁড়ি	ঢ় ৪৪৮	তুইও	তু ৪৯৫	তটস্থ	তট্ ৪৫১
ঢনঢনে	ঢ় ৪৪৮	ঢিক	ঢক্ ৪৪৪	ঢেক	ঢক্ ৪৪৪	তুইরি(রী)	তু ৪৯৫	তটস্থ	ত্র ৪৮৮
ঢপ	ঢপ্ ৪৪৫	ঢিকা	ঢক্ ৪৪৪	ঢেকা	ঢক্ ৪৪৪	তইনাতী	তন্ ৪৫৩	তটাক	তট্ ৪৫০
ঢর	ঢল্ ৪৪৬	ঢি(ঢী)ট	ঢ় ৪৪৮	ঢেঙা	ঢ় ৪৪৮	তওত	তন্ ৪৫৩	তটাঘাত	তট্ ৪৫০
ঢরক	ঢল্ ৪৪৬	ঢিঢি	ঢ় ৪৪৮	ঢেঙ্গা	ঢ় ৪৪৮	তওবা	তু ৪৯৫	তটিনী	তট্ ৪৫১
ঢল	ঢল্ ৪৪৬	ঢিপ	ঢপ্ ৪৪৬	ঢেপ	ঢপ্ ৪৪৫	তঃ	তৃ ৪৭৭	তড্	তট্ ৪৫১
ঢলক	ঢল্ ৪৪৬	ঢিপ(ব)লা	ঢপ্ ৪৪৬	ঢেপঢেপে	ঢপ্ ৪৪৫	তঃ	তু ৪৯৫	তড়	তট্ ৪৫১
ঢলঢল	ঢল্ ৪৪৬	ঢিপা	ঢপ্ ৪৪৬	ঢেপসা	ঢপ্ ৪৪৫	তুঁহ	তু ৪৯৫	তড়কা	তট্ ৪৫০
ঢলমল	ঢল্ ৪৪৬	ঢিপি(বি)	ঢপ্ ৪৪৬	ঢেপুয়া	ঢপ্ ৪৪৫	তুঁহ	ত্ব ৪৯৪	তড়তড়	তট্ ৪৫১
ঢলা	ঢল্ ৪৪৬	ঢিপেশোকা	ঢপ্ ৪৪৫	ঢেমচ	ঢ় ৪৪৮	তুঁহি	তু ৪৯৫	তড়তড়	ত্ব ৪৯৪
ঢলাঢলি	ঢল্ ৪৪৬	ঢি(ধি)মা	ঢ় ৪৪৮	ঢেমসা	ঢ় ৪৪৮	তুঁহি	ত্ব ৪৯৪	তড়বড়	তট্ ৪৫১
ঢলান	ঢল্ ৪৪৬	ঢিমে	ঢ় ৪৪৮	ঢেমন	ঢ় ৪৪৯	তুক	ত্ব ৪৯৪	তড়াক	তট্ ৪৫১
ঢলানি	ঢল্ ৪৪৬	ঢিল	ঢল্ ৪৪৭	ঢেমনা	ঢ় ৪৪৯	তক্সীম	তু ৪৯৫	তড়াক	ত্ব ৪৯৪
ঢাউস	ঢ় ৪৪৮	ঢিলা	ঢল্ ৪৪৭	ঢের	ঢল্ ৪৪৮	তকরার	তর্ক্ ৪৬৪	তড়াগ	তট্ ৪৫১
ঢাঁচা	ঢ় ৪৪৮	ঢিলাঢালা	ঢল্ ৪৪৭	ঢেরা	ঢল্ ৪৪৮	ত(তা)কিয়া	ত্য ৪৮৭	তড়াতড়	তট্ ৪৫০
ঢাঁট	ঢ় ৪৪৮	ঢিলাঢিলি	ঢল্ ৪৪৭	ঢেরাসই	ঢল্ ৪৪৮	তকেয়া	ত্য ৪৮৭	তড়াৎ	তট্ ৪৫০
ঢাক	ঢক্ ৪৪৪	ঢিলামি(মী)	ঢল্ ৪৪৭	ঢেরি	ঢল্ ৪৪৮	তক্ক	তর্ক্ ৪৬৪	তড়ি	তট্ ৪৫১
ঢাক	ছদ্ ৩৫৯	ঢিলেমি	ঢল্ ৪৪৭	ঢেলাফেলা	ঢল্ ৪৪৬	তক্কো	তর্ক্ ৪৬৪	তড়িঘড়ি	তট্ ৪৫১
ঢাকঢাক-গুড়গুড়	গুহ্ ২৯০	ঢুঁ	ঢ় ৪৪৮	ঢোঁড়	ঢ় ৪৪৮	তক্কা	তু ৪৯৫	তড়িৎ	তট্ ৪৫১
ঢাকঢাক-গুড়গুড়	ঢক্ ৪৪৫	ঢুঁ-ঢুঁ	ঢ় ৪৪৮	ঢোঁড়া	ঢ় ৪৪৮	তক্ত	তু ৪৯৫	তড়িত	তট্ ৪৫০
ঢাকন	ঢক্ ৪৪৪	ঢুঁড়	ঢ় ৪৪৮	ঢোক	ঢক্ ৪৪৫	তক্তা	তু ৪৯৫	তড়িত্বান	তট্ ৪৫০
ঢাকন	ছদ্ ৩৫৯	ঢুক	ঢক্ ৪৪৫	ঢোকা	ঢক্ ৪৪৫	তক্র	তন্ ৪৫৩	তড়িদ্গর্ভ	তট্ ৪৫০
ঢাকনা	ঢক্ ৪৪৪	ঢুকঢুক	ঢক্ ৪৪৫	ঢোকান	ঢক্ ৪৪৫	তক্ষ্	তক্ষ্ ৪৪৯	তড়িদ্দাম	তট্ ৪৫০
ঢাকনি(নী)	ঢক্ ৪৪৪	ঢুকা	ঢক্ ৪৪৫	ঢোল	ঢল্ ৪৪৬	তক্ষ	তক্ষ্ ৪৪৯	তড়িন্ময়	তট্ ৪৫০
ঢাকবাজানী	ঢক্ ৪৪৪	ঢুকান	ঢক্ ৪৪৫	ঢোলক	ঢল্ ৪৪৬	তক্ষক	তন্ ৪৫৩	তড়িল্লতা	তট্ ৪৫০
ঢাকা	ঢক্ ৪৪৫	ঢুঢু	ঢ় ৪৪৮	ঢোল-কান	ঢল্ ৪৪৬	তক্ষক	তক্ষ্ ৪৪৯	তড়িল্লেখা	তট্ ৪৫০
ঢাকা	ছদ্ ৩৫৯	ঢুণ্ঢ্	ঢ় ৪৪৮	ঢোলা	ঢল্ ৪৪৬	তক্ষশিলা	তক্ষ্ ৪৫০	তড়োয়া	তট্ ৪৫০
ঢাকাই	ঢক্ ৪৪৫	ঢুণ্ঢ	ঢ় ৪৪৮	ঢোসর	ঢ় ৪৪৮	তক্ষা	তন্ ৪৫৩	তণ্ড্	তন্ ৪৫৩
ঢাকাইয়া	ঢক্ ৪৪৫	ঢুণ্ঢন	ঢ় ৪৪৮	ঢোসকা	ঢ় ৪৪৮	তক্ষণ	তক্ষ্ ৪৪৯	তণ্ডক	তন্ ৪৫৩
ঢাকাঢাকি	ঢক্ ৪৪৫	ঢুপ	ঢপ্ ৪৪৫	ঢোসা	ঢ় ৪৪৮	তক্ষা	তক্ষ্ ৪৪৯	তণ্ডা	তন্ ৪৫৩
ঢাকী	ঢক্ ৪৪৪	ঢুঁর	ঢল্ ৪৪৬	ঢৌক	ঢক্ ৪৪৫	তঙ্ক্	তন্ ৪৫৩	তণ্ডু	তন্ ৪৫৩
ঢাকুরি	ঢক্ ৪৪৪	ঢুল	ঢল্ ৪৪৭	ঢৌকন	ঢক্ ৪৪৫	তঙ্ক	তন্ ৪৫৩	তণ্ডুল	তন্ ৪৫৩
ঢাঙ্গাইত	ঢ় ৪৪৮	ঢুলঢুল	ঢল্ ৪৪৭	ঢৌকিনী	ঢক্ ৪৪৪	তঙ্কা	তন্ ৪৫৩	তৎ	তন্ ৪৫৪
ঢাঙ্গাতি	ঢ় ৪৪৮	ঢুলা	ঢল্ ৪৪৭	ঢৌল	ঢল্ ৪৪৪	তখন	ক্ষ ২২৩	তৎকাল	তন্ ৪৫৩
ঢামালি	ঢ় ৪৪৮	ঢুলান	ঢল্ ৪৪৭	ঢ্যাপঢ্যাপে	ঢপ্ ৪৪৫	তগর	গৃ ২৯০	তৎকালীন	তন্ ৪৫৩
ঢার	ঢল্ ৪৪৬	ঢুলানি(নী)	ঢল্ ৪৪৭	ঢ্যারা	ঢল্ ৪৪৮	তগির	গৃ ২৯০	তৎক্ষণ	তন্ ৪৫৩
ঢাল	ঢল্ ৪৪৭	ঢুলি(লী)	ঢল্ ৪৪৭	ঢ্যালা-ফ্যালা	ঢল্ ৪৪৬	তচনচ	তন্ ৪৫৩	তৎক্ষণাৎ	তন্ ৪৫৩
ঢালসুমর	ঢল্ ৪৪৬	ঢুলুঢুলু	ঢল্ ৪৪৭			তচ্ছীল	তন্ ৪৫৩	তৎতুল্য	তন্ ৪৫৩
ঢালা	ঢল্ ৪৪৭	ঢুলুনি	ঢল্ ৪৪৭	**ত**		তজ্জ্ঞ	তন্ ৪৫৩	তৎপদ	তন্ ৪৫৩
ঢালাই	ঢল্ ৪৪৭	ঢুস	ঢ় ৪৪৮			তজ্জ	তন্ ৪৫৩	তৎপর	তন্ ৪৫৩
ঢালাইখানা	ঢল্ ৪৪৭	ঢেউ	ঢ় ৪৪৮	ত	— ৪৪৯	তজ(স্)দীক	তন্ ৪৫৩	তৎপরায়ণ	তন্ ৪৫৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
তৎপুরুষ	তন্	৪৫৩	তথো	তন্	৪৫৩	তনয়	তন্	৪৫৬	তন্ত্র	তন্	৪৫৭	তপনেষ্ট	তপ্	৪৫৯
তৎপূর্ব্ব	তন্	৪৫৩	তথ্য	তন্	৪৫৬	তনয়া	তন্	৪৫৬	তন্ত্রকাষ্ঠ	তন্	৪৫৩	তপনোপল	তপ্	৪৫৯
তৎপ্রথম	তন্	৪৫৩	তদ্	তন্	৪৫৪	তনিক	তন্	৪৫৬	তন্ত্রধারক	তন্	৪৫৭	তপ(ফ)শীল	তপ্	৪৬১
তত	তন্	৪৫৪	তদক্ষণ	ক্ষ	২২৩	তনিকা	তন্	৪৫৬	তন্ত্রধীর	তন্	৪৫৩	তপশ্চরণ	তপ্	৪৬০
ততঃ	তন্	৪৫৩	তদ্গত	তন্	৪৫৩	তনিমা	তন্	৪৫৬	তন্ত্রবাপ	তন্	৪৫৭	তপশ্চর্য্যা	তপ্	৪৫৯
ততক্ষণ	তন্	৪৫৩	তদ্গুণ	তন্	৪৫৩	তনিষ্ঠ	তন্	৪৫৩	তন্ত্রবায়	তন্	৪৫৭	তপসি(সী)	তপ্	৪৫৯
ততক্ষণ	ক্ষ	২২৩	তদ্ঘড়ি	তন্	৪৫৩	তনী	তন্	৪৫৩	তন্ত্রা	তন্	৪৫৩	তপসিয়া	তপ্	৪৫৯
ততহি	তন্	৪৫৩	তদনন্তর	তন্	৪৫৩	তন্বী	তন্	৪৫৩	তন্ত্রাবাপ	তন্	৪৫৩	তপসে	তপ্	৪৫৯
ততি	তন্	৪৫৩	তদনু	তন্	৪৫৩	তনু	তন্	৪৫৭	তন্ত্রি	তন্	৪৫৩	তপস্য	তপ্	৪৫৯
ততেক	তন্	৪৫৩	তদনুযায়ী	তন্	৪৫৩	তনুকূপ	তন্	৪৫৩	তন্ত্রী	তন্	৪৫৩	তপস্যা	তপ্	৪৬০
ততোধিক	তন্	৪৫৩	তদনুসরণ	তন্	৪৫৩	তনুজ	তন্	৪৫৭	তন্ত্রীপাল	তন্	৪৫৩	তপস্বী	তপ্	৪৬০
তত্র	তন্	৪৫৩	তদন্ত	তন্	৪৫৪	তনুজা	তন্	৪৫৭	তন্দুর	তন্	৪৫৩	তপস্বিনী	তপ্	৪৬০
তত্রাচ	তন্	৪৫৩	তদন্তর	তন্	৪৫৩	তনুতা	তন্	৪৫৩	তন্দুরো	তন্	৪৫৩	তপাঃ	তপ্	৪৫৯
তত্রাপি	তন্	৪৫৩	তদন্তিক	তন্	৪৫৩	তনুত্যক্(জ্)	তন্	৪৫৩	তন্দ্র্	তন্	৪৫৩	তপা(ফা)ৎ	তপ্	৪৫৯
তত্তৎ	তন্	৪৫৩	তদপেক্ষা	তন্	৪৫৩	তনুত্যাগ	তন্	৪৫৩	তন্দ্রা	তন্	৪৫৮	তপাত্যয়	তপ্	৪৫৯
তত্ত্ব	তন্	৪৫৫	তদবধি	তন্	৪৫৩	তনুত্র	তন্	৪৫৩	তন্দ্রা	দ্রা	৫৭৪	তপান্ত	তপ্	৪৫৯
তত্ত্বজ্ঞ	তন্	৪৫৩	তদর্থ	তন্	৪৫৩	তনুত্রাণ	তন্	৪৫৩	তন্দ্রালু	তন্	৪৫৩	তপাস	তপ্	৪৫৯
তত্ত্বজ্ঞান	তন্	৪৫৩	তদর্হ	তন্	৪৫৩	তনুনপাৎ	তন্	৪৫৩	তন্দ্রি	তন্	৪৫৩	তপাসি	তপ্	৪৫৯
তত্ত্বজ্ঞানী	তন্	৪৫৩	তদা	তন্	৪৫৩	তনুপত্র	তন্	৪৫৩	তন্দ্রিত	তন্	৪৫৩	তপাসিয়া	তপ্	৪৫৯
তত্ত্বতঃ	তন্	৪৫৩	তদাকারবৃত্তি	তন্	৪৫৩	তনুবল্লি	তন্	৪৫৩	তন্নতন্ন	তন্	৪৫৮	তাপা(বা)স	তপ্	৪৫৯
তত্ত্বতল্লাস	তন্	৪৫৩	তদাত্মা	তন্	৪৫৩	তনুবার	তন্	৪৫৩	তন্নিবন্ধন	তন্	৪৫৩	তপিষ্ণু	তপ্	৪৫৯
তত্ত্বতালাস	তন্	৪৫৩	তদাত্ব	তন্	৪৫৩	তনুভবা	তন্	৪৫৩	তন্নিষ্ঠ	তন্	৪৫৩	তপী	তপ্	৪৫৯
তত্ত্বন্যাস	তন্	৪৫৩	তদানীন্তন	তন্	৪৫৩	তনুভৃৎ	তন্	৪৫৩	তন্মন	তন্	৪৫৩	তপোধন	তপ্	৪৬০
তত্ত্ববিৎ	তন্	৪৫৩	তদানীম্	তন্	৪৫৩	তনুমধ্যা	তন্	৪৫৩	তন্মনা	তন্	৪৫৩	তপোনিধি	তপ্	৪৬০
তত্ত্বমসি	তন্	৪৫৫	তদাযুক্তক	তন্	৪৫৩	তনুরুট্	তন্	৪৫৩	তন্ময়	তন্	৪৫৪	তপোনিষ্ঠ	তপ্	৪৬০
তত্ত্বান্বেষ	তন্	৪৫৩	তদারুক	তন্	৪৫৩	তনুরুহ	তন্	৪৫৩	তন্মাত্র	তন্	৪৫৪	তপোবন	তপ্	৪৬০
তত্ত্বাবধান	তন্	৪৫৩	তদিতরবর্জ্জ্য	তন্	৪৫৩	তনুসুখ	তন্	৪৫৩	তন্বী	তন্	৪৫৭	তপোবন্ত	তপ্	৪৫৯
তত্ত্বাবধায়ক	তন্	৪৫৩	তদীয়	তন্	৪৫৩	তন্তি	তন্	৪৫৭	তপ্	তপ্	৪৫৯	তপোবৃদ্ধ	তপ্	৪৬০
তত্ত্বাববোধ	তন্	৪৫৩	তদেকচিত্ত	তন্	৪৫৩	তন্তিপাল	তন্	৪৫৭	তপ	তপ্	৪৫৯	তপোব্রত	তপ্	৪৬১
তত্ত্বার্থ	তন্	৪৫৩	তদেকাত্মরূপ	তন্	৪৫৩	তন্তু	তন্	৪৫৭	তপঃ	তপ্	৪৬০	তপোভৃৎ	তপ্	৪৫৯
তথা	তন্	৪৫৬	তদেব	তন্	৪৫৩	তন্তুক	তন্	৪৫৩	তপঃকর	তপ্	৪৬০	তপোময়	তপ্	৪৫৯
তথাগত	তন্	৪৫৬	তদ্দিন	তন্	৪৫৩	তন্তুকী	তন্	৪৫৩	তপঃকাল	তপ্	৪৫৯	তপোমূর্ত্তি	তপ্	৪৫৯
তথাগুণ	তন্	৪৫৩	তদ্ধর্ম্মা	তন্	৪৫৩	তন্তুকীট	তন্	৪৫৩	তপঃপ্রভাব	তপ্	৪৫৯	তপোলোক	তপ্	৪৬০
তথাচ	তন্	৪৫৩	তদ্ধিত	তন্	৪৫৩	তন্তুজ	তন্	৪৫৩	তপঃসমাধি	তপ্	৪৬০	তপ্ত	তপ্	৪৬১
তথাত্ব	তন্	৪৫৩	তদ্ধেতু	তন্	৪৫৩	তন্তুদণ্ড	তন্	৪৫৩	তপঃস্থলী	তপ্	৪৬০	তপ্তকাঞ্চন	তপ্	৪৬১
তথাপি	তন্	৪৫৬	তদ্বৎ	তন্	৪৫৩	তন্তুনাভ	তন্	৪৫৩	তপত	তপ্	৪৫৯	তপ্তকুম্ভ	তপ্	৪৫৯
তথাবিধ	তন্	৪৫৩	তদ্বাচক	তন্	৪৫৩	তন্তুপর্ব্ব	তন্	৪৫৩	তপতী	তপ্	৪৬১	তপ্তকৃচ্ছ্র	তপ্	৪৫৯
তথাভূত	তন্	৪৫৩	তদ্বান	তন্	৪৫৩	তন্তুবাপ	তন্	৪৫৭	তপন	তপ্	৪৫৯	তপ্তবালুক	তপ্	৪৫৯
তথাস্তু	তন্	৪৫৩	তদ্বিধ	তন্	৪৫৩	তন্তুবায়	তন্	৪৫৭	তপনতনয়	তপ্	৪৫৯	তপ্তমুদ্রা	তপ্	৪৫৯
তথাহি	তন্	৪৫৩	তদ্বির	তন্	৪৫৩	তন্তুব্যাপ্ত	তন্	৪৫৩	তপননন্দিনী	তপ্	৪৫৯	তম্	তম্	৪৬২
তথি	তন্	৪৫৩	তদব্যতীত	তন্	৪৫৩	তন্তুশালা	তন্	৪৫৩	তপনবংশ	তপ্	৪৫৯	তম	তম্	৪৬২
তথিপর	তন্	৪৫৩	তদ্ভাব	তন্	৪৫৩	তন্তুসন্ততি	তন্	৪৫৩	তপনমণি	তপ্	৪৫৯	তমঃ	তম্	৪৬৩
তথিমধ্যে	তন্	৪৫৩	তন্	তন্	৪৫৩	তন্তুসন্তান	তন্	৪৫৩	তপনাত্মজ	তপ্	৪৫৯	তমলুক	তম্	৪৬২
তথৈব	তন্	৪৫৩	তন্চ্	তন্	৪৫৩	তন্তুসার	তন্	৪৫৩	তপনী	তপ্	৪৫৯	তমস	তম্	৪৬৩
তথৈবচ	তন্	৪৫৩	তন	তন্	৪৫৪	তন্ত্র	তন্	৪৫৩	তপনীয়	তপ্	৪৫৯	তমসা	তম্	৪৬৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
তবল্লক	ত্	৪৯৫	তাওয়া	তপ্	৪৫৯	তাঞি	ত্	৪৯৫	তাৎকালিক	তন্	৪৫৩	তাপী	তপ্	৪৫৯
তবহি	ত্	৪৯৫	তাং	ত্	৪৯৫	তাঞ্জাম	ত্	৪৯৫	তাত্ত্বিক	তন্	৪৫৩	তাফ্‌তা	ত্	৪৯৫
তবহিঁ	ত্	৪৯৫	তাংড়া	ত্	৪৯৫	তাটক	তট্	৪৫০	তাৎপর্য্য	তন্	৪৫৩	তাবক	ত্	৪৯৫
তবহু	ত্	৪৯৫	তাঁ	ত্	৪৯৫	তাটকা	তট্	৪৫০	তাথই	ত্	৪৯৮	তাবড়	ত্	৪৯৫
তবহুঁ	ত্	৪৯৫	তাঁইস	ত্	৪৯৫	তাট(ড়)ন্ত	তট্	৪৫০	তাথে	ত্	৪৯৫	তাবৎ	ত্	৪৯৫
তবিয়ৎ	ত্	৪৯৫	তাঁউ(ড়ু)ল	তন্	৪৫৩	তাটস্থ্য	তট্	৪৫০	তাদর্থ্য	তন্	৪৫৩	তাবৎ	তন্	৪৫৩
বহাল-তবিয়ৎ	ত্	৪৯৫	তাঁত	তন্	৪৫৩	তাড়	তট্	৪৫১	তাদাত্ম্য	তন্	৪৫৩	তাবাস	তপ্	৪৫৯
তবিল	ত্	৪৯৫	তাঁতগড়	তন্	৪৫৩	তাড়(ট)কা	তট্	৪৫২	তাদৃশ	তন্	৪৫৩	তাবিজ	ত্	৪৯৫
তবিলদারী	ত্	৪৯৫	তাঁতগাড়	তন্	৪৫৩	তাড়ঙ্ক	তট্	৪৫০	তাধিঙ্গা-ধিঙ্গা	ত্	৪৯৫	তাম	তম্	৪৬৩
তবু	ত্	৪৯৫	তাঁতঘর	তন্	৪৫৩	তাড়ন	তট্	৪৫১	তাধিন	ত্	৪৯৫	তামরস	তম্	৪৬২
তভু	ত্	৪৯৫	তাঁতশাল	তন্	৪৫৩	তাড়না	তট্	৪৫১	তাধিয়া	ত্	৪৯৫	তামলি(লী)	তম্	৪৬২
তবে	ত্	৪৯৬	তাঁতি	তন্	৪৫৩	তাড়নী	তট্	৪৫১	তান	ত্	৪৯৫	তামস	তম্	৪৬২
তমু	ত্	৪৯৫	তাঁতিনী	তন্	৪৫৩	তাড়নীয়	তট্	৪৫১	তান	তন্	৪৫৮	তামসিক	তম্	৪৬২
তয়	ত্	৪৯৫	তাঁবা	ত্	৪৯৫	তাড়পত্র	তট্	৪৫০	তানা-না	ত্	৪৯৫	তামা	তম্	৪৬৩
তয়ফা	ত্	৪৯৫	তাঁবু	ত্	৪৯৫	তাড়বলয়া	তট্	৪৫০	তানপ্রধান	তন্	৪৫৩	তামাটে	তম্	৪৬২
তয়ের	ত্	৪৯৫	তাঁবে	ত্	৪৯৫	তাড়বালা	তট্	৪৫০	তানপুরা	তন্	৪৫৩	তামাক	তম্	৪৬২
তর্হি	ত্	৪৯৫	তাঁহা	ত্	৪৯৫	তাড়সে	তট্	৪৫১	তানব	তন্	৪৫৩	তামাকু	তম্	৪৬২
তলা(ল্লা)ট	ত্	৪৯৬	তাঃ	ত্	৪৯৫	তাড়া	তট্	৪৫১	তানা	তন্	৪৫৮	তামাদি	তম্	৪৬২
তলা(ল্লা)শ(স)	ত্	৪৯৬	তাইঁস	ত্	৪৯৫	তাড়া	ত্ব	৪৯৪	তানা-দেওয়া	তন্	৪৫৩	তামাম	তম্	৪৬২
তল্লাশি(শী)	ত্	৪৯৬	তাক	তর্	৪৬৪	তাড়াতাড়ি	ত্ব	৪৫১	তান্ত	তম্	৪৫৩	তামাশা	তম্	৪৬২
তসদি	ত্	৪৯৫	তাক	ত্য	৪৮৭	তাড়াতাড়ি	তট্	৪৫০	তান্তব	তন্	৪৫৩	তামিল	তম্	৪৬২
তসবি(বী)	ত্	৪৯৫	তাক(কু)ত	ত্	৪৯৫	তাড়ান	তট্	৪৫১	তান্ত্রিক	তন্	৪৫৭	তামিস্র	তম্	৪৬২
তসবীর	ত্	৪৯৫	তাকা	ত্য	৪৮৭	তাড়াহুড়া	তট্	৪৫১	তাপ	তপ্	৪৫৯	তামু	তম্	৪৬২
তসলা	ত্	৪৯৫	তাকাতি	ত্	৪৯৫	তাড়াহুড়ি	তট্	৪৫১	তাপক	তপ্	৪৫৯	তামে	তম্	৪৬২
তসু	ত্	৪৯৫	তাকান	ত্য	৪৮৭	তাড়াহুড়ো	তট্	৪৫১	তাপত্য	তপ্	৪৫৯	তামেলি	তম্	৪৬২
তস্কর	কৃ	২০০	তাকাবী	ত্	৪৯৫	তাড়ি(ড়ী)	তট্	৪৫১	তাপত্রয়	তপ্	৪৫৯	তাম্বা	তম্	৪৬২
তস্কির	ত্	৪৯৫	তাকি(গি)দ	ত্	৪৯৫	তাড়িত	তট্	৪৫১	তাপন	তপ্	৪৫৯	তাম্বু	তম্	৪৬২
তহকীব	ত্	৪৯৫	তাকিয়া	ত্য	৪৮৭	তাড়ি(ড়ী)পত্র	তট্	৪৫০	তাপনী	তপ্	৪৫৯	তাম্বুয়া	তম্	৪৬২
তহবিল	ত্	৪৯৫	তাগ	তর্	৪৬৪	তাড়িফল	তট্	৪৫০	তাপনীয়	তপ্	৪৫৯	তাম্বূল	তম্	৪৬৩
তহরী	ত্	৪৯৫	তাগা	ত্	৪৯৫	তাড়ু	তট্	৪৫১	তাপমান	তপ্	৪৫৯	তাম্বূলাধিকার	তম্	৪৬২
তহি	ত্	৪৯৫	তাগাড়	ত্	৪৯৫	তাড্য	তট্	৪৫০	তাপস	তপ্	৪৬১	তাম্বূলিক	তম্	৪৬২
তহিঁ	ত্	৪৯৫	তাগাদা	ত্	৪৯৫	তাড্যমান	তট্	৪৫০	তাপসতরু	তপ্	৪৬১	তাম্বূলিয়া	তম্	৪৬২
তহু	ত্	৪৯৫	তাঙ্গড়	ত্	৪৯৫	তাণ্ডব	তন্	৪৫৩	তাপসদ্রুম	তপ্	৪৬১	তাম্বূলী	তম্	৪৬২
তহো	ত্	৪৯৫	তাজ	ত্	৪৯৫	তাণ্ডবিত	তন্	৪৫৩	তাপসপ্রিয়	তপ্	৪৬১	তাম্র	তম্	৪৬৩
তা	তন্	৪৫৩	তাজ	তর্	৪৬৪	তাণ্ডবিনী	তন্	৪৫৩	তাপসপ্রিয়া	তপ্	৪৬১	তাম্রকর্ণী	তম্	৪৬৩
তা	তপ্	৪৫৯	তাজন	ত্	৪৯৫	তাণ্ডবী	তন্	৪৫৩	তাপসারণ্য	তপ্	৪৬১	তাম্রকার	তম্	৪৬৩
তা	ত্	৪৯৬	তাজনি	তর্	৪৬৪	তাত	তন্	৪৫৪	তাপসেন্দ্র	তপ্	৪৬১	তাম্রকুট্ট	তম্	৪৬৩
তাই	ত্	৪৯৫	তাচ্ছীল্য	তন্	৪৫৩	তাত	তপ্	৪৫৯	তাপস্য	তপ্	৪৫৯	তাম্রকূট	তম্	৪৬৩
তাই	তন্	৪৫৩	তাজফেনি	ত্	৪৯৫	তাতদানি	তপ্	৪৫৯	তাপহর	তপ্	৪৫৯	তাম্রকৃমি	তম্	৪৬৩
তাউই	ত্	৪৯৫	তাজমহল	ত্	৪৯৫	তাতল	তপ্	৪৫৯	তাপহরী	তপ্	৪৫৯	তাম্রগর্ভ	তম্	৪৬৩
তাঐ	ত্	৪৯৫	তাজা	ত্	৪৯৫	তাতা	তপ্	৪৫৯	তাপাস	তপ্	৪৫৯	তাম্রচূড়	তম্	৪৬৩
তাইদগির	ত্	৪৯৫	তাজি	ত্	৪৯৫	তাতা-থৈথৈ	ত্	৪৯৫	তাপিচ্ছ	তপ্	৪৫৯	তাম্রচূড়া	তম্	৪৬৩
তাইন	ত্	৪৯৫	তাজী	ত্	৪৯৫	তাতা-থৈথৈ	থ্	৪৯৮	তাপিঞ্ছ	তপ্	৪৫৯	তাম্রজাত	তম্	৪৬২
তাউস	ত্	৪৯৫	তাজিয়া	ত্	৪৯৫	তাতিনী	ত্	৪৯৫	তাপিত	তপ্	৪৫৯	তাম্রদ্রু	তম্	৪৬৩
তাও	ত্	৪৯৫	তাজ্জব	ত্	৪৯৫	তাতে	ত্	৪৯৫	তাপিয়া	তপ্	৪৫৯	তাম্রদ্বীপ	তম্	৪৬৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
তাম্রপট্ট	তম্ ৪৬৩	তারামৈত্রী	তৃ ৪৭৭	তালি	তল্ ৪৬৫	তিগ্মকর	তি ৪৬৭	তির	তৃ ৪৮৩
তাম্রপত্র	তম্ ৪৬৩	তারিক	ত্ ৪৯৫	তালিক	তল্ ৪৬৫	তিগ্মদ্যুতি	তি ৪৬৭	তিরণ	তৃ ৪৭৭
তাম্রফলক	তম্ ৪৬৩	তারিখ	ত্ ৪৯৫	তালিকা	ত্ ৪৯৫	তিগ্মরশ্মি	তি ৪৬৭	তিরতির	তৃ ৪৭৭
তাম্রপল্লব	তম্ ৪৬৩	তারিণী	তৃ ৪৮১	তালিম	ত্ ৪৯৫	তিগ্মাংশু	তি ৪৬৭	তিরপিত	তৃ ৪৭৭
তাম্রপুষ্প	তম্ ৪৬৩	তারিপ(ফ)	ত্ ৪৯৫	তালী	তল্ ৪৬৬	তিজ্	তি ৪৬৭	তিরপূর্ণি	ত্র ৪৮৮
তাম্রবাটী	তম্ ৪৬৩	তারী	তৃ ৪৮১	তালীপত্র	তল্ ৪৬৫	তিজল	তি ৪৬৭	তিরশূল	তৃ ৪৭৭
তাম্রলিপ্ত	তম্ ৪৬৩	তারুণ	তৃ ৪৭৭	তালীশ	তল্ ৪৬৫	তিজারত	তি ৪৬৭	তিরশ্চী	তৃ ৪৭৭
তাম্রশিখী	তম্ ৪৬৩	তারুণ্য	তৃ ৪৭৭	তালীশপত্র	তল্ ৪৬৫	তিড়বিড়	তি ৪৬৭	তিরস্ (তিরঃ)	তৃ ৪৮৩
তাম্রসার	তম্ ৪৬৩	তার্কিক	তর্ ৪৬৪	তালু	তল্ ৪৬৬	তি(তী)ত	তি ৪৬৭	তিরসপারস	তৃ ৪৭৭
তাম্রসারক	তম্ ৪৬৩	তার্ক্ষ	তৃ ৪৭৭	তালুই	ত্ ৪৯৫	তিতল	তি ৪৬৭	তিরস্কর	তৃ ৪৭৭
তাম্রাশ্ম	তম্ ৪৬৩	তার্ক্ষ্য	তৃ ৪৭৭	তালুই-মশায়	ত্ ৪৯৫	তিতা	তি ৪৬৭	তিরস্কর(রি)ণী	তৃ ৪৭৭
তাম্রী	তম্ ৪৬৩	তার্ত্তীয়	ত্র ৪৮৮	তালুক	ত্ ৪৯৫	তিতিক্ষা	তি ৪৬৭	তিরস্কার	তৃ ৪৮৩
তাম্রোষ্ঠ	তম্ ৪৬৩	তার্য্য	তৃ ৪৭৭	তালুকা	তৃ ৪৭৭	তিতিক্ষু	তি ৪৬৭	তিরস্কারী	তৃ ৪৭৭
তায়দাদ	ত্ ৪৯৫	তাল	তল্ ৪৬৬	তালেবর	ত্ ৪৯৫	তিতির	তৃ ৪৮৩	তিরস্কৃত	তৃ ৪৭৭
তার	ত্ ৪৯৫	তালই	তল্ ৪৬৫	তাসন	ত্র ৪৮৮	তিতিল	তি ৪৬৭	তিরস্কৃতি	তৃ ৪৭৭
তার	তৃ ৪৮০	তালক	তল্ ৪৬৫	তাসনী	ত্র ৪৮৮	তিত্তির	তৃ ৪৮৩	তিরস্ক্রিয়া	তৃ ৪৭৭
তারক	তৃ ৪৮০	তালকাণা	তল্ ৪৬৫	তাসা	ত্র ৪৮৮	তিত্তিরি	তৃ ৪৮৩	তিরানব্বই	ত্র ৪৮৮
তারকজিৎ	তৃ ৪৭৭	তালকেতু	তল্ ৪৬৫	তাহ	ত্ ৪৯৫	তিথি(থী)	তি ৪৬৮	তিরাশী	ত্র ৪৮৮
তারকব্রহ্ম	তৃ ৪৭৭	তালগর্ভ	তল্ ৪৬৫	তাহাঁ	ত্ ৪৯৫	তিথি	অত্ ২২	তিরি(রী)	তৃ ৪৭৭
তারকসূদন	তৃ ৪৭৭	তালচটা	তল্ ৪৬৫	তাহি	ত্ ৪৯৫	তিথিক্ষয়	তি ৪৬৮	তিরিক্থি	তৃ ৪৭৭
তারকা	তৃ ৪৮০	তালজঙ্ঘ	তল্ ৪৬৬	তাহে	ত্ ৪৯৫	তিথিপালন	তি ৪৬৮	তিরিতিরি	তৃ ৪৭৭
তারকারি	তৃ ৪৭৭	তালজটা	তল্ ৪৬৫	তাহো	ত্ ৪৯৫	তিমিত	তি ৪৬৭	তিরিশ	ত্র ৪৮৮
তারকাক্ষ	তৃ ৪৭৭	তালপ্রলম্ব	তল্ ৪৬৫	তাহ্না	ত্ ৪৯৫	তিন	ত্র ৪৮৯	তিরিষা	তৃ ৪৭৭
তারকাসুর	তৃ ৪৮১	তালদোরস্ত	তল্ ৪৬৫	তাহ্নে	ত্ ৪৯৫	তিনিশ	তি ৪৬৭	তিরোধান	তৃ ৪৮৩
তারকিত	তৃ ৪৭৭	তালধ্বজ	তল্ ৪৬৫	তি	ত্র ৪৮৮	তিন্তিড়	তি ৪৬৭	তিরোধান	ধা ৫৯৮
তারণ	তৃ ৪৮০	তালনবমী	তল্ ৪৬৫	তিঅজ	ত্র ৪৮৮	তিন্তিড়িকা	তি ৪৬৭	তিরোভাব	তৃ ৪৮৩
তারণি(ণী)	তৃ ৪৭৭	তালপত্তর	তল্ ৪৬৫	তিউ(ও)ড়ি	ত্র ৪৮৮	তিন্তিড়ী	তি ৪৬৭	তিরোহিত	তৃ ৪৮৩
তারণেয়	তৃ ৪৭৭	তালপত্র	তল্ ৪৬৫	তিওট	ত্র ৪৮৮	তিন্তিলিকা	তি ৪৬৭	তিরোভূত	তৃ ৪৭৭
তারতম	তৃ ৪৭৭	তালপাতা	তল্ ৪৬৫	তিওর	ত্র ৪৮৮	তিন্তিলী	তি ৪৬৭	তির্য্যক	তৃ ৪৮৩
তারতম্য	তৃ ৪৭৮	তালবানা	তল্ ৪৬৫	তিঁই	ত্র ৪৮৮	তিন্দু	তি ৪৬৭	তির্য্যক	অঞ্চ্ ১১
তারল	তৃ ৪৭৭	তালবৃন্ত	তল্ ৪৬৫	তিঁহ	ত্র ৪৮৮	তিন্দুক	তি ৪৬৭	তির্য্যকজ	তৃ ৪৭৭
তারল্য	তৃ ৪৭৭	তালবৃন্তক	তল্ ৪৬৫	তিঁহো	ত্র ৪৮৮	তিন্দুকী	তি ৪৬৭	তির্য্যকজন	তৃ ৪৭৭
তারা	তৃ ৪৮১	তালবেতাল	তল্ ৪৬৫	তিকাঠা	ত্র ৪৮৮	তিম্	তি ৪৬৭	তির্য্যকপাতী	তৃ ৪৭৭
তারাকান্ত	তৃ ৪৭৭	তালব্য	তল্ ৪৬৫	তিক্ত	তি ৪৬৭	তিমি	তি ৪৬৮	তির্য্যকপ্রমাণ	তৃ ৪৭৭
তারাকারা	তৃ ৪৭৭	তালভৃৎ	তল্ ৪৬৫	তিক্তক	তি ৪৬৭	তিমিঙ্গিল	তি ৪৬৭	তির্য্যকপ্রক্ষেপণ	তৃ ৪৭৭
তারাধিপ	তৃ ৪৮১	তালমর্দ্দল	তল্ ৪৬৫	তিক্তকা	তি ৪৬৭	তিমিত	তি ৪৬৮	তির্য্যকযোনি	তৃ ৪৭৭
তারানাথ	তৃ ৪৮১	তাললক্ষণ	তল্ ৪৬৫	তিক্ততণ্ডুলা	তি ৪৬৭	তিমির	তি ৪৬৮	তির্য্যকস্রোতাঃ	তৃ ৪৮৪
তারাপতি	তৃ ৪৮১	তালযন্ত্র	তল্ ৪৬৫	তিক্ততুম্বী	তি ৪৬৭	তিমিরারি	তি ৪৬৭	তিল্	তি ৪৬৭
তারাপথ	তৃ ৪৭৭	তালশাঁস	তল্ ৪৬৫	তিক্তধাতু	তি ৪৬৭	তিয়জ	ত্র ৪৮৮	তিল	তি ৪৬৮
তারাপীড়	তৃ ৪৭৭	তালা	তল্ ৪৬৬	তিক্তপত্র	তি ৪৬৭	তিপ্পান্ন	ত্র ৪৮৮	তিলক	তি ৪৬৮
তারাবলী	তৃ ৪৭৭	তালা	ত্ ৪৯৫	তিক্তপর্ব্বা	তি ৪৬৭	তিয়ড়ি	ত্র ৪৮৮	তিলকাঞ্চন	তি ৪৬৮
তারাভূষা	তৃ ৪৭৭	তালাই	তল্ ৪৬৫	তিক্তসার	তি ৪৬৭	তি(তে)য়াগ	ত্য ৪৮৭	তিলকালক	তি ৪৬৮
তারামণ্ডল	তৃ ৪৮১	তালাক	ত্ ৪৯৫	তিখ	তি ৪৬৭	তিয়াত্তর	ত্র ৪৮৮	তিলকী	তি ৪৬৭
তারামৃগ	তৃ ৪৮১	তালাশ	তল্ ৪৬৫	তিখিণী	তি ৪৬৭	তিয়াষ(স)	তৃ ৪৭৭	তিলপর্ণিকা	তি ৪৬৮
তারামৈত্রক	তৃ ৪৭৭	তালাস	তল্ ৪৯৬	তিগ্ম	তি ৪৬৭	তিয়াষা(সা)	তৃ ৪৭৭	তিলপর্ণী	তি ৪৬৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
তৃষ্ণীম	তু ৪৭১	তে	ত্ ৪৯০	তেজস্বিনী	তি ৪৬৯	তেমত	ত্ ৪৯৫	তেহি	ত্ ৪৯৫
তৃট্	তৃ ৪৭৭	তেই	ত্ ৪৯৫	তেজা	তি ৪৬৯	তেমন	ত্ ৪৯৫	তেহু	ত্ ৪৯৫
তৃণ	তৃ ৪৮৬	তেইশ	ত্র ৪৮৮	তেজারৎ	তি ৪৬৯	তেমতি	ত্ ৪৯৫	তেহো	ত্ ৪৯৫
তৃণকূট	তৃ ৪৭৭	তেউড়	ত্র ৪৮৮	তেজারতি	তি ৪৬৯	তেমতি	ত্ ৪৯৫	তেহোঁ	ত্ ৪৯৫
তৃণকুটীর	তৃ ৪৭৭	তেউড়ী	ত্র ৪৮৮	তেজাল	তি ৪৬৯	তেমহলা	ত্র ৪৮৮	তেহেন	ত্ ৪৯৫
তৃণকেতু	তৃ ৪৮৬	তেওট	ত্র ৪৮৮	তেজিত	তি ৪৬৯	তেমাথা	ত্র ৪৮৮	তৈ	তন্ ৪৫৩
তৃণচ্ছেদী	তৃ ৪৭৭	তেওড়	ত্র ৪৮৮	তেজিয়ান	তি ৪৬৯	তেমু(মো)হানা	ত্র ৪৮৮	তৈখন	তন্ ৪৫৩
তৃণজলৌকা	তৃ ৪৮৬	তেওড়া	ত্র ৪৮৮	তেজী	তি ৪৬৯	তেয়জ	ত্য ৪৮৭	তৈখনি	তন্ ৪৫৩
তৃণজাতি	তৃ ৪৭৭	তেওয়ারি(রী)	ত্র ৪৮৯	তেজীয়ান	তি ৪৬৯	তেয়াগ	ত্য ৪৮৭	তৈখনে	তন্ ৪৫৩
তৃণজীবী	তৃ ৪৮৬	তেওরা	ত্র ৪৮৮	তেজোপুঞ্জ	তি ৪৬৯	তের	ত্র ৪৮৮	তৈছন	তন্ ৪৫৩
তৃণজ্ঞান	তৃ ৪৮৬	তেঁ	ত্ ৪৯৫	তেজোবান	তি ৪৬৯	তেরচা	তৃ ৪৭৭	তৈজস	তি ৪৬৭
তৃণজ্যোতিঃ	তৃ ৪৮৬	তেঁই	ত্ ৪৯৫	তেজোবন্ত	তি ৪৬৯	তেরছা	তৃ ৪৭৭	তৈতিল	তি ৪৬৭
তৃণটাটি	তৃ ৪৭৭	তেঁঞি	ত্ ৪৯৫	তেজোবৃত্ত	তি ৪৬৯	তেরাত্তির	ত্র ৪৮৮	তৈত্তিরি	তৃ ৪৮৩
তৃণদ্রুম	তৃ ৪৮৬	তেঁতুল	ত্র ৪৮৮	তেজোমণ্ডল	তি ৪৬৯	তেরাত্রি	ত্র ৪৮৮	তৈত্তিরীয়	তৃ ৪৮৩
তৃণধান্য	তৃ ৪৮৬	তেঁতুল	তি ৪৬৭	তেজোমন্ত	তি ৪৬৯	তেরিজ	তৃ ৪৮৮	তৈনাত	তন্ ৪৫৩
তৃণধ্বজ	তৃ ৪৮৬	তেঁতুলী	তি ৪৬৭	তেজোময়	তি ৪৬৯	তেরি(ড়ি)য়া	তৃ ৪৮৮	তৈনা(নি)তী	তন্ ৪৫৩
তৃণবিন্দু	তৃ ৪৮৬	তেঁদু	তি ৪৬৭	তেজোমূর্ত্তি	তি ৪৬৯	তেরিয়ান	তৃ ৪৮৮	তৈয়ার	ত্ ৪৯৫
তৃণবুদ্ধি	তৃ ৪৮৬	তেঁদড়	তন্ ৪৫৩	তেজোরূপ	তি ৪৬৯	তেল	তি ৪৭০	তৈরি(রী)	ত্ ৪৯৫
তৃণভুক	তৃ ৪৭৭	তেঁদড়ামি	তন্ ৪৫৩	তেজ্য	তি ৪৬৯	তেলকালি	তি ৪৭০	তৈরিক	তৃ ৪৭৭
তৃণরাজ	তৃ ৪৮৬	তেঁহ্	তু ৪৯৪	তেঞি	ত্ ৪৯৫	তেলকুচকুচে	তি ৪৭০	তৈর্থিক	তৃ ৪৭৭
তৃণাগ্নি	তৃ ৪৭৭	তেঁহি	তু ৪৯৪	তেঞী	ত্ ৪৯৫	তেলচিঠা	তি ৪৭০	তৈল	তি ৪৭০
তৃণাঞ্চিত	তৃ ৪৭৭	তেঁহো	তু ৪৯৪	তেড়	তু ৪৭১	তেলতামাক	তি ৪৭০	তৈলকার	তি ৪৭০
তৃণাবর্ত্ত	তৃ ৪৭৭	তেঁহোঁ	তু ৪৯৪	তেড়	ত্র ৪৮৮	তেলধুতি	তি ৪৬৭	তৈলঙ্গ	ত্র ৪৮৮
তৃণীকৃত	তৃ ৪৭৭	তেকাট	ত্র ৪৮৮	তেড়া	তু ৪৭১	তেলপলা	তি ৪৬৭	তৈলচৌরিকা	তি ৪৭০
তৃণোল্কা	তৃ ৪৭৭	তেকাটা	ত্র ৪৮৮	তেড়া-বাঁকা	তু ৪৭১	তেলশাক	তি ৪৬৭	তৈলদ্রোণী	তি ৪৭০
তৃতীয়	ত্র ৪৮৯	তেকাঠা	ত্র ৪৮৮	তেড়ি(ড়ী)	তু ৪৭১	তেলক	তি ৪৬৭	তৈলপক্ব	তি ৪৭০
তৃতীয়া	ত্র ৪৮৯	তেকেলে	ত্র ৪৮৮	তেড়ে-ফুঁড়ে	তু ৪৭১	তেলঙ্গা	তি ৪৬৭	তৈলপর্ণী	তি ৪৭০
তৃতীয়াতৎপুরুষ	ত্র ৪৮৮	তেগা	ত্র ৪৮৮	তেত	তি ৪৬৭	তেলা	তি ৪৬৭	তৈলবট	তি ৪৭০
তৃতীয়ী	ত্র ৪৮৮	তেঘাই	ত্র ৪৮৮	তেতলা	ত্র ৪৮৮	তেলাকচু	তি ৪৭০	তৈলবাটী	তি ৪৭০
তৃদ্	তৃ ৪৭৭	তেচখ্যা	ত্র ৪৮৮	তেতালা	ত্র ৪৮৮	তেলাকচুয়া	তি ৪৭০	তৈলযন্ত্র	তি ৪৭০
তৃপ্	তৃ ৪৭৭	তেচোখো	ত্র ৪৮৮	তেতাল্লিশ	ত্র ৪৮৮	তেলাকুচা	তি ৪৭০	তৈলসেক	তি ৪৬৭
তৃপান্তর	তৃ ৪৭৭	তেচল্লিশ	ত্র ৪৮৮	তেত্রিশ	ত্র ৪৮৮	তেলা(রা)না	তি ৪৬৭	তৈলাধার	তি ৪৬৭
তৃপ্ত	তৃ ৪৮৭	তেজবরে	ত্র ৪৮৮	তেথরি(রী)	ত্র ৪৮৮	তেলানী	তি ৪৬৭	তৈলাভ্যঙ্গ	তি ৪৬৭
তৃপ্তি	তৃ ৪৮৭	তেজ	তি ৪৬৯	তেন	ত্ ৪৯৫	তেলাপোকা	তি ৪৬৭	তৈলাম্বুকা	তি ৪৬৭
তৃষ্	তৃ ৪৭৭	তেজঃ	তি ৪৬৯	তেনমত	ত্ ৪৯৫	তেলি(লী)	তি ৪৭০	তৈলাভ্র	তি ৪৬৭
তৃষট্	তৃ ৪৭৭	তেজন	তি ৪৬৯	তেনমন	ত্ ৪৯৫	তেলুগু	তি ৪৬৭	তৈলিক	তি ৪৬৭
তৃষা	তৃ ৪৭৭	তেজনী	তি ৪৬৯	তেনরি(রী)	ত্র ৪৮৮	তেলেঙ্গা	তি ৪৬৭	তৈলিত	তি ৪৬৭
তৃষাতুর	তৃ ৪৭৭	তেজপত্র	তি ৪৬৯	তেনরূপ	ত্ ৪৯৫	তেলো	তি ৪৬৭	তৈলী	তি ৪৬৭
তৃষার্ত্ত	তৃ ৪৭৭	তেজবান	তি ৪৬৯	তেনা	ত্ ৪৯৫	তেষট্টি	ত্র ৪৮৮	তৈষ	তি ৪৬৭
তৃষিত	তৃ ৪৭৭	তেজমান	তি ৪৬৯	তেপথা	ত্র ৪৮৮	তেসনি(নী)	ত্র ৪৮৮	তৈল্ম	তি ৪৬৭
তৃষ্ণা	তৃ ৪৭৭	তেজরাশি	তি ৪৬৯	তেপথি(থী)	ত্র ৪৮৮	তেসরা	ত্র ৪৮৮	তো	তু ৪৯৪
তৃষ্ণার্ত্ত	তৃ ৪৭৭	তেজস্কর	তি ৪৬৯	তেপলে	ত্র ৪৮৮	তেহ্	ত্ ৪৯৫	তো	ত্ ৪৯৪
তৃষ্ণালু	তৃ ৪৭৭	তেজস্বতী	তি ৪৬৯	তেপাটি	ত্র ৪৮৮	তেহ(হি)রা	ত্র ৪৮৮	তোঁ	তু ৪৯৪
তৃ(ত্রে)স্কার	তৃ ৪৭৭	তেজস্বান	তি ৪৬৯	তেপান্তর	তৃ ৪৭৭	তেহ(হে)রি	ত্র ৪৮৮	তোঁহৈঁ	তু ৪৯৪
তৃং	তৃ ৪৭৭	তেজস্বী	তি ৪৬৯	তেপায়া	ত্র ৪৮৮	তেহাই	ত্র ৪৮৮	তোহৈঁ	তু ৪৯৪

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
তোখোড়	তু ৪৭১	তোয়মুক	তু ৪৭১	ত্যকা	ত্য ৪৮৭	ত্রিকাটা	ত্র ৪৮৮	ত্রিনয়না	ত্র ৪৮৮
তোটক	তু ৪৭১	তোয়রাশি	তু ৪৭১	ত্যক্ত	ত্য ৪৮৭	ত্রিকাল	ত্র ৪৮৮	ত্রিনয়নী	ত্র ৪৮৮
তোটন	তু ৪৭১	তোয়াক্কা	তু ৪৭১	ত্যজ্	ত্য ৪৮৭	ত্রিকূট	ত্র ৪৯০	ত্রিনেত্র	ত্র ৪৮৮
তোড়	তু ৪৭৩	তোয়াজ	তু ৪৭১	ত্য(ত্যা)জ	ত্য ৪৮৭	ত্রিকোণ	ত্র ৪৮৮	ত্রিনেত্রা	ত্র ৪৮৮
তোড়জোড়	তু ৪৭৩	তোয়াধার	তু ৪৭১	ত্যজন	ত্য ৪৮৭	ত্রিগণ	ত্র ৪৮৮	ত্রিপঞ্চ	ত্র ৪৮৮
তোড়পাড়	তু ৪৭৩	তোয়ালে	তু ৪৭১	ত্যজ্য	ত্য ৪৮৭	ত্রিগম্ভীর	ত্র ৪৮৮	ত্রিপঞ্চাশৎ	ত্র ৪৮৮
তোড়ফোড়	তু ৪৭৩	তোরঙ্গ	তু ৪৭১	ত্যাগ	ত্য ৪৮৭	ত্রিগর্ত্ত	ত্র ৪৮৮	ত্রিপটু	ত্র ৪৮৮
তোড়ভাঙ্	তু ৪৭৩	তোরণ	তু ৪৭১	ত্যাগিতা	ত্য ৪৮৭	ত্রিগুণ	ত্র ৪৮৮	ত্রিপশু	ত্র ৪৮৮
তোড়যোড়	তু ৪৭৩	তোরপা	তু ৪৭১	ত্যাজিত	ত্য ৪৮৭	ত্রিগুণা	ত্র ৪৮৮	ত্রিপতাক	ত্র ৪৮৮
তোড়ল	তু ৪৭৩	তোরশু	তন্ ৪৫৩	ত্যাজ্য	ত্য ৪৮৭	ত্রিগুণী	ত্র ৪৮৮	ত্রিপত্র	ত্র ৪৮৮
তোড়লমল্ল	তু ৪৭৩	তোরা	তু ৪৭১	ত্যাড়া	তু ৪৭১	ত্রিচতুর	ত্র ৪৮৮	ত্রিপত্রক	ত্র ৪৮৮
তোড়া	তু ৪৭৩	তোল	তু ৪৭১	ত্যামন	তৃ ৪৯৫	ত্রিচত্বারিংশৎ	ত্র ৪৮৮	ত্রিপত্র	ত্র ৪৮৮
তোড়ানি	তু ৪৭১	তোলন	তু ৪৭১	ত্রপ্	ত্র ৪৮৮	ত্রিজগৎ	ত্র ৪৮৮	ত্রিপথ	ত্র ৪৮৮
তোড়ী	তু ৪৭৩	তোলপাড়	তু ৪৭১	ত্রপা	ত্র ৪৮৯	ত্রিজগত	ত্র ৪৮৮	ত্রিপথগ	ত্র ৪৮৮
তোতলা	তৃ ৪৯৫	তোলবোল	তু ৪৭১	ত্রপান্তর	তৃ ৪৭৭	ত্রিজট	ত্র ৪৯০	ত্রিপথগা	ত্র ৪৮৮
তোতা	তৃ ৪৯৫	তোলা	তু ৪৭১	ত্রপু	ত্র ৪৮৯	ত্রিণতা	ত্র ৪৮৮	ত্রিপথগামিণী	ত্র ৪৯২
তোত্র	তু ৪৭১	তোলাপাড়	তু ৪৭১	ত্রয়	ত্র ৪৯০	ত্রিণাচিকেত	ত্র ৪৮৮	ত্রিপদ	ত্র ৪৮৮
তোদ	তু ৪৭১	তোলো	তু ৪৭১	ত্রয়স্ত্রিংশৎ	ত্র ৪৮৮	ত্রিত	ত্র ৪৯০	ত্রিপরিক্রান্ত	ত্র ৪৮৮
তোপচীনী	তৃ ৪৯৫	তোশক	তু ৪৭১	ত্রয়োদশ	ত্র ৪৮৮	ত্রিতন্ত্রী	ত্র ৪৮৮	ত্রিপাঠী	ত্র ৪৯২
তোফা	তৃ ৪৯৫	তোশাখানা	তু ৪৭১	ত্রয়োবিংশতি	ত্র ৪৮৮	ত্রিতয়	ত্র ৪৮৮	ত্রিপাদ	ত্র ৪৯২
তোবচীন	তৃ ৪৯৫	তোষ	তু ৪৭১	ত্রস্	ত্র ৪৮৮	ত্রিতাপ	ত্র ৪৯১	ত্রিপি(বি)ষ্টপ	ত্র ৪৮৮
তোবড়া	তৃ ৪৯৫	তোষক	তু ৪৭১	ত্রস	ত্র ৪৮৯	ত্রিতালী	ত্র ৪৮৮	ত্রিপুট	ত্র ৪৮৮
তোবা	তৃ ৪৯৫	তোষণ	তু ৪৭৬	ত্রসন	ত্র ৪৮৯	ত্রিদণ্ড	ত্র ৪৮৮	ত্রিপুটা	ত্র ৪৮৮
তোমর	তৃ ৪৯৫	তোষল	তু ৪৭১	ত্রসর	ত্র ৪৮৯	ত্রিদণ্ডী	ত্র ৪৮৮	ত্রিপুণ্ড্র	ত্র ৪৮৮
তোমা	ত্ব ৪৯৪	তোষাখানা	তু ৪৭১	ত্রসরেণু	ত্র ৪৮৯	ত্রিদশ	ত্র ৪৮৮	ত্রিপুণ্ড্রক	ত্র ৪৮৮
তোয়াক্কা	তক্ষ ৪৪৯	তোষামোদ	তু ৪৭১	ত্রস্ত	ত্র ৪৮৯	ত্রিদশাধিপ	ত্র ৪৮৮	ত্রিপুর	ত্র ৪৯২
তোল	তু ৪৭৪	তোষী	তু ৪৭১	ত্রস্নু	ত্র ৪৮৮	ত্রিদশাধিপতি	ত্র ৪৮৮	ত্রিপুরী	ত্র ৪৮৮
তোপ	তু ৪৭১	তোস	তু ৪৭১	ত্রা	ত্র ৪৮৮	ত্রিদশায়ুধ	ত্র ৪৮৮	ত্রিপুরা	ত্র ৪৮৮
তোফা	তু ৪৭১	তোসক	তু ৪৭১	ত্রাণ	ত্র ৪৮৮	ত্রিদশালয়	ত্র ৪৮৮	ত্রিপুরান্তক	ত্র ৪৮৮
তোবড়া	তু ৪৭১	তোহর	ত্ব ৪৯৪	ত্রাস	ত্র ৪৮৮	ত্রিদশাবাস	ত্র ৪৮৮	ত্রিপুরান্তকর	ত্র ৪৮৮
তোমর	তম্ ৪৬২	তোহারা	ত্ব ৪৯৪	ত্রাসন	ত্র ৪৮৮	ত্রিদশেন্দ্র	ত্র ৪৮৮	ত্রিপুরারি	ত্র ৪৮৮
তোয়	তু ৪৭১	তোহারি	ত্ব ৪৯৪	ত্রাহি	ত্র ৪৮৮	ত্রিদশেশ্বর	ত্র ৪৮৮	ত্রিপুরুষ	ত্র ৪৮৮
তোয়কর্ম্ম	তু ৪৭১	তোহে	ত্ব ৪৯৪	ত্রি	ত্র ৪৯০	ত্রিদিব	ত্র ৪৯১	ত্রিপুষ্কর	ত্র ৪৮৮
তোয়কৃচ্ছ্র	তু ৪৭১	তোহোর	ত্ব ৪৯৪	ত্রিংশৎ	ত্র ৪৮৮	ত্রিদিবেশ	ত্র ৪৮৮	ত্রিপৌরুষ	ত্র ৪৮৮
তোয়ক্রীড়া	তু ৪৭১	তোহ্মা	ত্ব ৪৯৪	ত্রিঃ	ত্র ৪৯০	ত্রিদিবেন্দ্র	ত্র ৪৮৮	ত্রিফলা	ত্র ৪৮৮
তোয়চর	তু ৪৭১	তোহ্মি	ত্ব ৪৯৪	ত্রিক	ত্র ৪৮৮	ত্রিদিবেশী	ত্র ৪৮৮	ত্রিফলিয়া	ত্র ৪৮৮
তোয়দ	তু ৪৭১	তৌজি	তু ৪৭১	ত্রিককুদ	ত্র ৪৮৮	ত্রিদিবেশ্বর	ত্র ৪৮৮	ত্রিবঙ্ক	ত্র ৪৮৮
তোয়দ	দা ৫২১	তৌর্য্য	তু ৪৭১	ত্রিকচ্ছ	ত্র ৪৮৮	ত্রিদেব	ত্র ৪৮৮	ত্রিবঙ্কা	ত্র ৪৮৮
তোয়ধর	তু ৪৭১	তৌর্য্যত্রিক	তু ৪৭১	ত্রিকটু	ত্র ৪৮৮	ত্রিদোষ	ত্র ৪৮৮	ত্রিবর্গ	ত্র ৪৮৮
তোয়ধি	তু ৪৭১	তৌল	তু ৪৭১	ত্রিকড়ি	ত্র ৪৮৮	ত্রিধা	ত্র ৪৮৮	ত্রিবর্ষ	ত্র ৪৮৮
তোয়ধি	ধা ৫৯০	তৌলা	তু ৪৭১	ত্রিকণ্ট	ত্র ৪৮৮	ত্রিধাম	ত্র ৪৮৮	ত্রিবলি(লী)	ত্র ৪৮৮
তোয়নিধি	তু ৪৭১	তৌলিক	তু ৪৭১	ত্রিকণ্টক	ত্র ৪৮৮	ত্রিধামা	ত্র ৪৮৮	ত্রিবাটগামিনী	ত্র ৪৮৮
তোয়নীবী	তু ৪৭১	তৌলী	তু ৪৭১	ত্রিকণ্ঠ	ত্র ৪৮৮	ত্রিধারা	ত্র ৪৮৮	ত্রিবিক্রম	ত্র ৪৮৮
তোয়প্রসাদন	তু ৪৭১	তৌষার	তু ৪৭১	ত্রিকর্ম্ম	ত্র ৪৮৮	ত্রিনবতি	ত্র ৪৮৮	ত্রিবিদ্য	ত্র ৪৮৮
তোয়ব্যতিকর	তু ৪৭১	তৌহ্মিক	ত্ব ৪৯৪	ত্রিকা	ত্র ৪৮৮	ত্রিনয়ন	ত্র ৪৮৮	ত্রিবিধ	ত্র ৪৮৮

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
ত্রিবিষ্টপ	ত্র	৪৮৮	ত্রিশিরা	ত্র	৪৮৮	ত্র্যঞ্জল	ত্র	৪৮৮				থসথসে	থ্	৪৯৭
ত্রিবীজা	ত্র	৪৮৮	ত্রিশিরাঃ	ত্র	৪৯৪	ত্র্যবর	ত্র	৪৮৮	**থ**			থা	থ্	৪৯৭
ত্রিবৃৎ	ত্র	৪৮৮	ত্রিশীর্ষক	ত্র	৪৮৮	ত্র্যব্দ	ত্র	৪৮৮				থাই	থ্	৪৯৭
ত্রিবৃতা	ত্র	৪৮৮	ত্রিশূল	ত্র	৪৮৮	ত্র্যমৃতযোগ	ত্র	৪৮৮	থ	—	৪৯৬	থাউকা	থ্	৪৯৭
ত্রিবৃত্ত	ত্র	৪৮৮	ত্রিশৃঙ্গ	ত্র	৪৮৮	ত্র্যম্বক	ত্র	৪৮৮	থ	থ্	৪৯৭	থাক	থ্	৪৯৯
ত্রিবেণি(ণী)	ত্র	৪৯৩	ত্রিশৃঙ্গী	ত্র	৪৮৮	ত্র্যশীতি	ত্র	৪৮৮	থই	থ্	৪৯৮	থাকবস্তা	থ্	৪৯৯
ত্রিবেণু	ত্র	৪৮৮	ত্রিষষ্টি	ত্র	৪৮৮	ত্র্যস্র	ত্র	৪৮৮	থইথই	থ	৪৯৮	থাকা	থ্	৪৯৯
ত্রিবেদ	ত্র	৪৮৮	ত্রিষ্টুপ(ভ)	ত্র	৪৮৮	ত্র্যহ	ত্র	৪৮৮	থউর	থ্	৪৯৭	থাকি	থ্	৪৯৯
ত্রিভঙ্গ	ত্র	৪৮৮	ত্রিসন্ধ্য	ত্র	৪৮৮	ত্র্যহস্পর্শ	ত্র	৪৮৮	থক	থ্	৪৯৯	থাকিয়া	থ্	৪৯৯
ত্রিভঙ্গি	ত্র	৪৮৮	ত্রিসপ্ততি	ত্র	৪৮৮	ত্র্যহৈহিক	ত্র	৪৮৮	থকথক	থ্	৪৯৯	থাক্যা	থ্	৪৯৭
ত্রিভঙ্গিম	ত্র	৪৮৮	ত্রিসবন	ত্র	৪৮৮	ত্র্যায়ুধ	ত্র	৪৮৮	থকথকে	থ্	৪৯৯	থাড়(ড়ো)	থ্	৪৯৭
ত্রিভাগ	ত্র	৪৮৮	ত্রিসর্গ	ত্র	৪৮৮	ত্র্যূচ	ত্র	৪৮৮	থকিত	থ্	৪৯৭	থাতা	থ্	৪৯৭
ত্রিভুজ	ত্র	৪৮৮	ত্রিসাবিত্রী	ত্র	৪৮৮	ত্বং	ত্ব	৪৯৪	থতমত	থ্	৪৯৯	থাতি	থ্	৪৯৭
ত্রিভুবন	ত্র	৪৮৮	ত্রিসারী	ত্র	৪৮৮	ত্বক্(চ্)	ত্ব	৪৯৪	থন	থ্	৪৯৯	থান	থ্	৪৯৯
ত্রিভূম	ত্র	৪৮৮	ত্রিসীমা	ত্র	৪৮৮	ত্বক	ত্ব	৪৯৪	থপ	থ্	৪৯৯	থানইট	থ্	৪৯৯
ত্রিমণ্ডলী	ত্র	৪৮৮	ত্রিসীমানা	ত্র	৪৮৮	ত্বকসার	ত্ব	৪৯৪	থপথপ	থ্	৪৯৯	থানফাড়া-ধুতি	থ্	৪৯৭
ত্রিমদ	ত্র	৪৮৮	ত্রিস্রোতাঃ	ত্র	৪৮৮	ত্বগ্জ	ত্ব	৪৯৪	থপথপে	থ্	৪৯৯	থানকুনী	থ্	৪৯৯
ত্রিমধু	ত্র	৪৮৮	ত্রিহল্য	ত্র	৪৮৮	ত্বগ্দোষ	ত্ব	৪৯৪	থপাস-থপাস	থ্	৪৯৯	থানা	থ্	৪৯৯
ত্রিমধুর	ত্র	৪৮৮	ত্রিহায়ণ	ত্র	৪৮৮	ত্বঙ্কার	ত্ব	৪৯৪	থম	থ্	৫০০	থাপ্পড়	থ্	৪৯৯
ত্রিমাত্র	ত্র	৪৮৮	ত্রুট্	ত্র	৪৮৮	ত্বচিসার	ত্ব	৪৯৪	থমক	থ্	৫০০	থাপ	থ্	৪৯৯
ত্রিমার্গগা	ত্র	৪৮৮	ত্রুটি	ত্র	৪৮৮	ত্বত্তুল্য	ত্ব	৪৯৪	থমথম	থ্	৫০০	থাপড়	থ্	৪৯৭
ত্রিমুহানি	ত্র	৪৮৮	ত্রুটী	ত্র	৪৮৮	ত্বৎসদৃশ	ত্ব	৪৯৪	থমথমা	থ্	৫০০	থাপড়া	থ্	৪৯৯
ত্রিমূর্ত্তি	ত্র	৪৯১	ত্রে	ত্র	৪৯০	ত্বৎসম	ত্ব	৪৯৪	থমথমে	থ্	৫০০	থাপড়ান	থ্	৪৯৯
ত্রিমূর্দ্ধ	ত্র	৪৮৮	ত্রেতা	ত্র	৪৮৮	ত্বদ্	ত্ব	৪৯৪	থম্ব	থ্	৪৯৭	থাপা	থ্	৪৯৯
ত্রিযব	ত্র	৪৮৮	ত্রেধা	ত্র	৪৮৮	ত্বন্মনা	ত্ব	৪৯৪	থর	থ্	৫০০	থাপাথাপি	থ্	৪৯৯
ত্রিয়ম্বক	ত্র	৪৮৮	ত্রেপান্তরা	ত্র	৪৮৮	ত্বম	ত্ব	৪৯৪	থরকর	থ্	৪৯৭	থাব	থ্	৪৯৯
ত্রিষষ্টি	ত্র	৪৮৮	ত্রৈ	ত্র	৪৯০	ত্বর	ত্ব	৪৯৪	থরথর	থ্	৫০০	থাবড়	থ্	৪৯৭
ত্রিয়হ	ত্র	৪৮৮	ত্রৈকালিক	ত্র	৪৮৮	ত্বরত্বর	ত্ব	৪৯৪	থরথরা	থ্	৫০০	থাবড়া	থ্	৪৯৯
ত্রিযাম	ত্র	৪৮৮	ত্রৈগুণ্য	ত্র	৪৮৮	ত্বরমাণ	ত্ব	৪৯৪	থরথরী	থ্	৪৯৭	থাবা	থ্	৪৯৭
ত্রিযামা	ত্র	৪৮৮	ত্রৈবর্ণিক	ত্র	৪৮৮	ত্বরা	ত্ব	৪৯৪	থরথরে	থ্	৪৯৭	থাম	থ্	৫০০
ত্রিযুগ	ত্র	৪৮৮	ত্রৈবার্ষিক	ত্র	৪৮৮	ত্বরাত্বরি	ত্ব	৪৯৪	থরমর	থ্	৪৯৭	থাম	ক্ষম্	২২৭
ত্রিরাত্র	ত্র	৪৮৮	ত্রৈবিক্রম	ত্র	৪৮৮	ত্বরাবান	ত্ব	৪৯৪	থরহর	থ্	৫০০	থামা	থ্	৫০০
ত্রিলিঙ্গ	ত্র	৪৮৮	ত্রৈবিদ্য	ত্র	৪৮৮	ত্বরামন্ত	ত্ব	৪৯৪	থরহরি	থ্	৫০০	থামান	থ্	৫০০
ত্রিলোক	ত্র	৪৮৮	ত্রৈবেদিক	ত্র	৪৮৮	ত্বরিত	ত্ব	৪৯৪	থরেহর	থ্	৪৯৭	থামাল	থ্	৪৯৭
ত্রিলোকী	ত্র	৪৮৮	ত্রৈমাতুর	ত্র	৪৮৮	ত্বষ্ট	ত্ব	৪৯৫	থল	থ্	৫০১	থারি	থ্	৫০০
ত্রিলোকেশ	ত্র	৪৮৮	ত্রৈমাসিক	ত্র	৪৮৮	ত্বষ্টা	ত্ব	৪৯৫	থলকমল	থ্	৪৯৭	থাল	থ্	৫০১
ত্রিলোচন	ত্র	৪৮৮	ত্রৈয়ম্বক	ত্র	৪৮৮	ত্বষ্টি	ত্ব	৪৯৫	থলজলরুহ	থ্	৪৯৭	থালা	থ্	৫০১
ত্রিলোচনা	ত্র	৪৮৮	ত্রৈরাশিক	ত্র	৪৮৮	ত্বাচ	ত্ব	৪৯৪	থলথল	থ্	৫০১	থালি(লী)	থ্	৫০১
ত্রিশ	ত্র	৪৮৮	ত্রৈলোক্য	ত্র	৪৮৮	ত্বাদৃক্	ত্ব	৪৯৪	থলথলে	থ্	৪৯৭	থালিবিথালী	থ্	৫০১
ত্রিশঙ্কু	ত্র	৪৯৩	ত্রোটক	ত্র	৪৮৮	ত্বাদৃশ	ত্ব	৪৯৪	থলি	থ্	৫০১	থিক	থ্	৫০১
ত্রিশত	ত্র	৪৮৮	ত্রোটকী	ত্র	৪৮৮	ত্বাষ্ট্র	ত্ব	৪৯৪	থলিয়া	থ্	৪৯৭	থিকথিক	থ্	৫০১
ত্রিশাখ	ত্র	৪৮৮	ত্রোটি(টী)	ত্র	৪৮৮	ত্বিট্(ষ্)	ত্ব	৪৯৪	থলিয়াতি	থ্	৫০১	থিত	থ্	৪৯৭
ত্রিশাল	ত্র	৪৮৮	ত্র্যংশ	ত্র	৪৮৮	ত্বিষ্	ত্ব	৪৯৪	থলে	থ্	৪৯৭	থিতা	থ্	৪৯৭
ত্রিশালক	ত্র	৪৮৮	ত্র্যক্ষ	ত্র	৪৮৮	ত্বিষা	ত্ব	৪৯৪	থলো	থ্	৫০১	থিতি	থ্	৪৯৭
ত্রিশিখ	ত্র	৪৮৮	ত্র্যক্ষর	ত্র	৪৮৮	ত্বিষাম্পতি	ত্ব	৪৯৪	থসথস	থ্	৪৯৭	থিম	থ্	৫০০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
থিয়া	থ্ ৪৯৭	থৈয়া-থৈয়া	থ্ ৪৯৭	দ-কার	দ্ ৫৮৪	দগদ	দহ্ ৫২০	দণ্ডনীতি	দং ৫১২
থির	থ্ ৫০০	থৈলী	থ্ ৪৯৭	দক্ষ্	দক্ষ্ ৫০২	দগদগ	দহ্ ৫২০	দণ্ডনেতা	দং ৫১০
থু	থ্ ৫০১	থোঁ	থ্ ৫০১	দক্ষ	দক্ষ্ ৫০৩	দগদগি	দহ্ ৫২০	দণ্ডপ	দং ৫১০
থুঁতনী	থ্ ৪৯৭	থোঁতা	থ্ ৪৯৭	দক্ষঃ	দক্ষ্ ৫০৮	দগদগে	দহ্ ৫২০	দণ্ডপথ	দং ৫১০
থুক	থ্ ৫০১	থোক	থ্ ৪৯৭	দক্ষকন্যা	দক্ষ্ ৫০৭	দগধ	দহ্ ৫২০	দণ্ডপাখা	দং ৫১০
থুকথুক	থ্ ৪৯৭	থোকা	থ্ ৪৯৭	দক্ষজা	দক্ষ্ ৫০৭	দগ্ধ	দহ্ ৫২১	দণ্ডপাট	দং ৫১২
থুক(কু)রা	থ্ ৪৯৭	থোড়	থ্ ৪৯৭	দক্ষক্রতু	দক্ষ্ ৫০৮	দগ্ধকাক	দহ্ ৫২০	দণ্ডপাণি	দং ৫১০
থুড়	থ্ ৫০১	থোড়া	থ্ ৪৯৭	দক্ষযজ্ঞ	দক্ষ্ ৫০৮	দগ্ধরথ	দহ্ ৫২১	দণ্ডপাত	দং ৫১০
থুড়থুড়	থ্ ৫০১	থোড়াল	থ্ ৪৯৭	দক্ষবালা	দক্ষ্ ৫০২	দগ্ধেষ্টকা	দহ্ ৫২০	দণ্ডপাতন	দং ৫১০
থুড়থুড়ি	থ্ ৫০১	থোড়াথুড়ি	থ্ ৪৯৭	দক্ষসাবর্ণি	দক্ষ্ ৫০২	দগর	দ্ ৫৮৪	দণ্ডপারুষ্য	দং ৫১০
থুড়থুড়ে	থ্ ৪৯৭	থোড়াথোড়ি	থ্ ৪৯৭	দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী	দক্ষ্ ৫০২	দঙ্গ	দং ৫১০	দণ্ডপাল	দং ৫১০
থুড়া	থ্ ৫০১	থোতা	থ্ ৪৯৭	দক্ষা	দক্ষ্ ৫০৮	দঙ্গল	দং ৫১০	দণ্ডপ্রণয়ন	দং ৫১০
থুড়ি	থ্ ৫০১	থোপ	থ্ ৪৯৮	দক্ষিণ	দক্ষ্ ৫০৮	দজ্‌জাল	দা ৫২১	দণ্ডপ্রণাম	দং ৫১০
থুতনি	থ্ ৪৯৭	থোপনা	থ্ ৫০২	দক্ষিণকালিকা	দক্ষ্ ৫০২	দড়	দু ৫৪৬	দণ্ডপ্রসাদ	দং ৫১০
থুতি	থ্ ৪৯৭	থোপনি	থ্ ৫০২	দক্ষিণপন্থী	দক্ষ্ ৫০৮	দড়্	দৃ ৫৬০	দণ্ডবৎ	দং ৫১০
থুতু	থ্ ৪৯৭	থোপা	থ্ ৫০২	দক্ষিণমার্গ	দক্ষ্ ৫০২	দড়কা	তট্ ৪৫০	দণ্ডবিধি	দং ৫১০
থুৎকার	থ্ ৪৯৭	থোব	থ্ ৪৯৭	দক্ষিণস্থ	দক্ষ্ ৫০২	দড়মড়ি	দল্ ৫১৮	দণ্ডভগ্ন	দং ৫১০
থুৎকুড়ি	থ্ ৪৯৭	থোবনা	থ্ ৪৯৭	দক্ষিণহস্ত	দক্ষ্ ৫০২	দড়মসা	দৃ ৫৬০	দণ্ডভঙ্গ	দং ৫১০
থুখুড়	থ্ ৪৯৭	থোবা	থ্ ৪৯৭	দক্ষিণা	দক্ষ্ ৫১০	দড়মা	দৃ ৫৬০	দণ্ডমাণব	দং ৫১০
থুখুড়ি	থ্ ৪৯৭	থোর	থ্ ৪৯৭	দক্ষিণাগ্নি	দক্ষ্ ৫১০	দড়বড়	দৃ ৫৬০	দণ্ডযাত্রা	দং ৫১০
থুথি	থ্ ৪৯৭	থোরি	থ্ ৪৯৭	দক্ষিণাচল	দক্ষ্ ৫০২	দড়বড়ি	দৃ ৫৬০	দণ্ডশাস্ত্র	দং ৫১০
থুথুৎকার	থ্ ৪৯৭	থোল	থ্ ৪৯৭	দক্ষিণাচার	দক্ষ্ ৫০২	দড়া	দৃ ৫৬০	দণ্ডহস্ত	দং ৫১০
থুন	থ্ ৪৯৭	থোলো	থ্ ৪৯৭	দক্ষিণান্ত	দক্ষ্ ৫০২	দড়াম	দৃ ৫৬০	দণ্ডা	দং ৫১০
থুপ	থ্ ৫০২	থ্যাবড়া	থ্ ৪৯৭	দক্ষিণাপথ	দক্ষ্ ৫০৮	দড়াশদড়াশ	দৃ ৫৬০	দণ্ডাদণ্ডি	দং ৫১০
থুপি	থ্ ৫০২	থ্যাঁৎলা	থ্ ৪৯৭	দক্ষিণাপথিক	দক্ষ্ ৫০৮	দড়াসদড়াস	দৃ ৫৬০	দণ্ডাপূপন্যায়	দং ৫১০
থুব	থ্ ৪৯৭			দক্ষিণাপ্রবণ	দক্ষ্ ৫০২	দড়ি	দৃ ৫৬০	দণ্ডায়ন	দং ৫১০
থুবড়া	থ্ ৪৯৭	**দ**		দক্ষিণাবর্ত্ত	দক্ষ্ ৫০২	দড়ী	দৃ ৫৬০	দণ্ডায়মান	দং ৫১১
থুবা	থ্ ৪৯৭			দক্ষিণাবান	দক্ষ্ ৫১০	দঢ়	দৃ ৫৬০	দণ্ডিক	দং ৫১০
থুরথুরে	থ্ ৪৯৭	দ	— ৫০২	দক্ষিণাভিমুখ	দক্ষ্ ৫০২	দঢ়া	দৃ ৫৬০	দণ্ডিকা	দং ৫১০
থুত্থুরে	থ্ ৪৯৭	দ	দা ৫২১	দক্ষিণামুখ	দক্ষ্ ৫০২	দণ্ড	দং ৫১১	দণ্ডিত	দং ৫১০
থে	থ্ ৪৯৭	দ	দ্ ৫৮৪	দক্ষিণামূর্ত্তি	দক্ষ্ ৫০৮	দণ্ডক	দং ৫১২	দণ্ডিম	দং ৫১০
থেই-থেই	থ্ ৪৯৭	দআল	দয়্ ৫১৮	দক্ষিণায়ন	দক্ষ্ ৫১০	দণ্ডকলস	দং ৫১০	দণ্ডী	দং ৫১০
থেঁত	থ্ ৪৯৭	দই	দুহ্ ৫৫৬	দক্ষিণারণ্য	দক্ষ্ ৫০২	দণ্ডকাক	দং ৫১১	দণ্ডীকাব্য	দং ৫১০
থেঁতো	থ্ ৪৯৭	দইত্য	দো ৫৬৯	দক্ষিণাহি	দক্ষ্ ৫০২	দণ্ডকারণ্য	দং ৫১২	দণ্ড্য	দং ৫১০
থেঁতলা	থ্ ৪৯৭	দউ	দ্বি ৫৮০	দক্ষিণীয়	দক্ষ্ ৫০২	দণ্ডগ্রহণ	দং ৫১০	দত	দ্ ৫৮৪
থেকা	থ্ ৪৯৭	দউড়	দু ৫৪৬	দক্ষিণে-কালী	দক্ষ্ ৫০২	দণ্ডঘ্ন	দং ৫১০	দত্ত	দা ৫২১
থেকে	থ্ ৪৯৯	দং	দ্ ৫৮৪	দক্ষিণেন	দক্ষ্ ৫০২	দণ্ডচক্র	দং ৫১০	দত্তক	দা ৫২১
থেবড়া	থ্ ৪৯৭	দংশ	দং ৫১১	দক্ষিণের্ম্মা	দক্ষ্ ৫০২	দণ্ডদান	দং ৫১০	দত্তকপুত্র	দা ৫২১
থেলোহুঁকা	থ্ ৪৯৭	দংশক	দং ৫১১	দক্ষিণ্য	দক্ষ্ ৫১০	দণ্ডদাস	দং ৫১০	দত্তপূর্ব্বা	দা ৫২১
থেহ্	থ্ ৪৯৭	দংশন	দং ৫১১	দখল	দক্ষ্ ৫০২	দণ্ডধর	দং ৫১০	দত্তাত্মা	দা ৫২১
থেহা	থ্ ৪৯৭	দংশিত	দং ৫১১	দখল	ক্ষল্ ২২৯	দণ্ডধারী	দং ৫১০	দত্তাত্রেয়	দা ৫২৪
থৈ	থ্ ৪৯৮	দংষ্ট্রা	দং ৫১১	দখিন	দক্ষ্ ৫০২	দণ্ডন	দং ৫১০	দত্তানপকর্ম্ম	দা ৫২১
থৈকর	থ্ ৪৯৭	দক্‌খিন	দক্ষ্ ৫০২	দখ্‌নে	দক্ষ্ ৫০২	দণ্ডনতি	দং ৫১০	দত্তাপহারী	দা ৫২১
থৈয়াকর	থ্ ৪৯৭	দঁক	দ্ ৫৮৪	দগ	দহ্ ৫২০	দণ্ডনায়ক	দং ৫১০	দত্তাপ্রদানিক	দা ৫২১
থৈ-থৈ	থ্ ৪৯৮	দক	দ্ ৫৮৪	দগড়	দ্ ৫৮৪	দণ্ডনিপাতন	দং ৫১০	দত্তাবধান	দা ৫২১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
দত্যি	দো	৫৬৯	দন্তমল	দং	৫১০	দমনলতা	দং	৫১০	দর(রো)বস্ত	দ্রু	৫৭৫	দলনী	দল্	৫১৮
দত্রিম	দা	৫২১	দন্তমুকুল	দং	৫১০	দমবাজ	দং	৫১০	দরবান	দ্বি	৫৮০	দলপতি	দল্	৫১৮
দদস্ব	দ্	৫৮৪	দন্তমূলীয়	দং	৫১০	দমবাজী	দং	৫১০	দরবার	দৃ	৫৬০	দল-পাকানো	দল্	৫১৯
দদ্রু	দ্	৫৮৪	দন্তলেখক	দং	৫১০	দময়ন্তী	দং	৫১৩	দরবেশ	দৃ	৫৬০	দলপাখী	দল্	৫১৮
দদ্রূ	দ্	৫৮৪	দন্তশঠ	দং	৫১০	দময়িতা	দং	৫১০	দরমা	দৃ	৫৬০	দলপিপী	দল্	৫১৮
দদ্রুণ	দ্	৫৮৪	দন্তশর্করা	দং	৫১০	দমাদম	দং	৫১০	দরমাহা	দৃ	৫৬০	দলবদল	দল্	৫১৮
দধি	দুহ্	৫৫৬	দন্তস্ফুট	দং	৫১০	দমিত	দং	৫১০	দরশ	দৃশ্	৫৬৬	দলবল	দল্	৫১৯
দধিকুর্চ্চিকা	দুহ্	৫৫৬	দন্তহর্ষ	দং	৫১০	দম্প	দং	৫১৪	দরাজ	দৃ	৫৬০	দলভুক্ত	দল্	৫১৮
দধিগ্রাম	দুহ্	৫৫৭	দন্তাল	দং	৫১০	দম্পতি	দং	৫১৪	দরি(রী)	দৃ	৫৬১	দলমল	দল্	৫১৮
দধিজ	দুহ্	৫৫৬	দন্তালিকা	দং	৫১০	দম্ফ	দং	৫১০	দরিদ্র	দৃ	৫৬১	দলা	দল্	৫১৮
দধিখ	দুহ্	৫৫৬	দন্তালী	দং	৫১০	দম্বল	দং	৫১০	দরিদ্রা	দৃ	৫৬০	দলাদলি	দল্	৫১৯
দধিধর্ম্ম	দুহ্	৫৫৭	দন্তী	দং	৫১০	দম্ভ	দং	৫১৪	দরিয়া	দৃ	৫৬১	দলা-পাকানো	দল্	৫১৯
দধিপুষ্পিকা	দুহ্	৫৫৭	দন্তোদ্ভেদ	দং	৫১০	দম্ভক	দং	৫১০	দরুণ(ন)	দৃ	৫৬১	দলি	দল্	৫১৮
দধিবামন	দুহ্	৫৫৭	দন্তৌষ্ঠ	দং	৫১০	দম্ভন	দং	৫১০	দরোজা	দ্বি	৫৮০	দলিত	দল্	৫১৮
দধিবিজ্ঞান	দুহ্	৫৫৭	দন্ত্য	দং	৫১০	দম্ভাল	দং	৫১০	দর্দ্দরীক	দৃ	৫৬০	দলিল	দল্	৫১৮
দধিমঙ্গল	দুহ্	৫৫৬	দন্দশূক	দং	৫১০	দম্ভী	দং	৫১০	দর্দ্দুর	দৃ	৫৬০	দলুজ	দল্	৫১৮
দধিমণ্ড	দুহ্	৫৫৬	দন্‌ভ্	দং	৫১০	দম্য	দং	৫১০	দর্প	দৃপ্	৫৬৫	দশ	দং	৫১৫
দধিমুখ	দুহ্	৫৫৭	দন্‌শ্	দং	৫১০	দয্	দয্	৫১৮	দর্পক	দৃপ্	৫৬৫	দশই	দং	৫১০
দধিসার	দুহ্	৫৫৬	দপ্	দু	৫৪৭	দয়া	দয্	৫১৮	দর্পণ	দৃপ্	৫৬৫	দশকণ্ঠ	দং	৫১০
দধিস্নেহ	দুহ্	৫৫৬	দপ্‌দপ্	দু	৫৪৭	দয়া-দাক্ষিণ্য	দক্ষ্	৫০৩	দর্পণী	দৃপ্	৫৬৫	দশকন্ধর	দং	৫১০
দধীচ	দুহ্	৫৫৭	দপ্‌পন	দৃপ্	৫৬৫	দয়াবন্ত	দয্	৫১৮	দর্পহর	দৃপ্	৫৬৫	দশকর্ম্ম	দং	৫১০
দধীচি	দুহ্	৫৫৭	দপট	দু	৫৪৬	দয়ামই	দয্	৫১৮	দর্পহা	দৃপ্	৫৬৫	দশকর্ম্মা	দং	৫১০
দনা	দং	৫১০	দপ্তর	দ্	৫৮৪	দয়াল	দয্	৫১৮	দর্পী	দৃপ্	৫৬৫	দশগ্রামী	দং	৫১০
দনু	দং	৫১২	দফতর	দ্	৫৮৪	দয়ালু	দয্	৫১৮	দর্ব্বি	দৃ	৫৬০	দশগ্রীব	দং	৫১০
দনুকবন্ধ	দং	৫১০	দফা	দ্	৫৮৪	দয়িত	দয্	৫১৮	দর্ব্বিকা	দৃ	৫৬০	দশচক্র	দং	৫১০
দনুজ	দং	৫১০	দফাদার	দ্	৫৮৪	দ(দো)য়েল	দুহ্	৫৫৬	দর্ব্বী	দৃ	৫৬০	দশতি	দং	৫১০
দনুজারি	দং	৫১০	দফারফা	দ্	৫৮৪	দর	দৃ	৫৬০	দর্ভ	দৃ	৫৬২	দশ-দশা	দং	৫১০
দনুজেন্দ্র	দং	৫১০	দব	দু	৫৪৭	দরইজারা	দৃ	৫৬০	দর্ভক	দৃ	৫৬০	দশদিকপাল	দং	৫১৫
দন্ত	দং	৫১০	দবদব	দু	৫৪৭	দরওয়াজা	দ্বি	৫৮০	দর্শ	দৃশ্	৫৬৬	দশদিক্ষু	দং	৫১০
দন্তকচকচি	দং	৫১০	দবদবা	দু	৫৪৭	দরকার	দৃ	৫৬০	দর্শক	দৃশ্	৫৬৬	দশধা	দং	৫১০
দন্তকার	দং	৫১০	দবাগ্নি	দু	৫৪৬	দরখাস্ত	দৃ	৫৬০	দর্শন	দৃশ্	৫৬৬	দশন	দং	৫১৫
দন্তকুটা	দং	৫১০	দবানল	দু	৫৪৬	দরখাস্ত	দৃশ্	৫৬৬	দর্শনী	দৃশ্	৫৬৬	দশনাংশু	দং	৫১০
দন্তকোশ	দং	৫১০	দবিষ্ঠ	দু	৫৪৬	দরগা	দ্বি	৫৮০	দর্শনীয়	দৃশ্	৫৬৬	দশনাঙ্ক	দং	৫১০
দন্তচ্ছদ	দং	৫১০	দভ্র	দং	৫১০	দরগুআ(য়া)	দৃ	৫৬০	দর্শয়িতা	দৃশ্	৫৬৬	দশনামী	দং	৫১০
দন্তজাত	দং	৫১০	দম্	দং	৫১০	দরজা	দ্বি	৫৮০	দর্শা	দৃশ্	৫৬৬	দশনোচ্ছিষ্ট	দং	৫১০
দন্তদর্শন	দং	৫১০	দম	দং	৫১২	দরজী	দৃ	৫৬০	দর্শান	দৃশ্	৫৬৬	দশপঁচিশ	দং	৫১০
দন্তধাবন	দং	৫১০	দমক	দং	৫১২	দরদ	দৃ	৫৬০	দর্শিত	দৃশ্	৫৬৬	দশপিণ্ড	দং	৫১০
দন্তনিভ	দং	৫১০	দমকল	দং	৫১২	দরদর	দৃ	৫৬০	দর্শী	দৃশ্	৫৬৬	দশবাণ	দং	৫১০
দন্তপঙ্‌ক্তি	দং	৫১০	দমকা	দং	৫১২	দরদালান	দ্বি	৫৮০	দল্	দল্	৫১৮	দশভুজা	দং	৫১৬
দন্তপত্র	দং	৫১০	দমঘোষ	দং	৫১০	দরপত্র	দৃ	৫৬০	দল	দল্	৫১৯	দশম	দং	৫১৬
দন্তপত্রক	দং	৫১০	দমদম	দং	৫১২	দরপত্তনী	দৃ	৫৬০	দলই	দল্	৫১৮	দশমহাবিদ্যা	দং	৫১৬
দন্তপবন	দং	৫১০	দমদমা	দং	৫১০	দরপণ	দৃপ্	৫৬৫	দলকচু	দল্	৫১৮	দশমিক	দং	৫১০
দন্তপাঁতি	দং	৫১০	দমদরদ	দং	৫১০	দরপণী	দৃপ্	৫৬৫	দলঘাঁটা	দল্	৫১৮	দশমী	দং	৫১০
দন্তবক্র	দং	৫১০	দমন	দং	৫১৩	দরপেষ(স)	দৃ	৫৬০	দলদলে	দল্	৫১৮	দশমী-দশা	দং	৫১০
দন্তবেষ্ট	দং	৫১০	দমনক	দং	৫১০	দরব	দ্রু	৫৭৫	দলন	দল্	৫১৮	দশমীস্থ	দং	৫১০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
দশমূল	দং ৫১০	দহলা	দং ৫১০	দাখিলা	ক্ষল্ ২২৯	দানধর্ম্ম	দা ৫২১	দামনী	দো ৫৭০
দশরথ	দং ৫১৭	দহি(হী)	দুহ্ ৫৫৬	দাগ	দহ্ ৫২০	দানধ্যান	দা ৫২১	দামদুম	দো ৫৬৯
দশরাত্র	দং ৫১০	দহিয়াল	দুহ্ ৫৫৬	দাগরাজি	দহ্ ৫২০	দানপত্র	দা ৫২১	দামলিপ্ত	দো ৫৭০
দশলকী	দং ৫১০	দহ্যমান	দহ্ ৫২০	দাগা	দহ্ ৫২০	দানব	দা ৫২৫	দামা	দো ৫৬৯
দশশত	দং ৫১০	দহ্র	দহ্ ৫২০	দাগাদারী	দহ্ ৫২০	দানবীর	দা ৫২১	দামামা	দো ৫৭০
দশশালা	দং ৫১০	দা	দা ৫২১	দাগাবাজ	দহ্ ৫২০	দানলেখ্য	দা ৫২১	দামামি	দো ৫৬৯
দশসালা	দং ৫১০	দাই	ধা ৫৯০	দাগাবাজী	দহ্ ৫২০	দানশীল	দা ৫২১	দামাল	দো ৫৭০
দশসহস্র	দং ৫১০	দাইন	দক্ষ্ ৫০২	দাগী	দহ্ ৫২০	দানসাগর	দা ৫২১	দামিনী	দো ৫৭০
দশহরা	দং ৫১০	দাইয়ানি(নী)	ধা ৫৯০	দাঘ	দহ্ ৫২০	দানসজ্জা	দা ৫২১	দামী	দো ৫৭০
দশা	দং ৫১০	দাইল	দল্ ৫১৮	দাঙ্গা	দং ৫১০	দানা	দা ৫২১	দামুঘোষ	দো ৫৬৯
দশাঙ্গধূপ	দং ৫১০	দাইল	ড্ ৪৩৯	দাড়	দং ৫১০	দানাদার	দা ৫২১	দামুদর	দো ৫৭১
দশাঙ্গুল	দং ৫১০	দাউ-দাউ	দ্ ৫৮৪	দাড়া	দং ৫১০	দানাপানি	দা ৫২১	দামোদর	দো ৫৭১
দশানন	দং ৫১৭	দাউদ	দ্ ৫৮৪	দাড়ি	দৃ ৫৬০	দানিশমন্দ	দা ৫২১	দাম্পত্য	দং ৫১০
দশান্তর	দং ৫১০	দাউলিয়া	দা ৫২১	দাড়িম	দৃ ৫৬০	দানী	দা ৫২১	দাম্বা	দো ৫৬৯
দশাবতার	দং ৫১৭	দাও	দা ৫২১	দাড়িম্ব	দৃ ৫৬০	দানীয়	দা ৫২১	দাম্বাল	দো ৫৬৯
দশাবস্ত	দং ৫১০	দাওয়া	দা ৫২১	দাড়্কা	ডং ৪৩২	দানেশমন্দী	দা ৫২১	দাম্ভিক	দং ৫১০
দশার্ণ	দং ৫১০	দাওয়াই	দা ৫২১	দাড়োয়া	ডং ৪৩২	দান্ত	দং ৫১০	দায়	দয়্ ৫১৮
দশার্হ	দং ৫১০	দাঁ	দা ৫২১	দাঢ়া	দং ৫১০	দাপ	দু ৫৪৭	দায়	দা ৫২১
দশাশ্বমেধ	দং ৫১০	দাঁও	দা ৫২১	দাঢ়িকা	দং ৫১০	দাপ	দৃপ্ ৫৬৫	দায়ক	দা ৫২১
দশাসই	দং ৫১০	দাঁড়	দং ৫১১	দাণ্ডা	দং ৫১০	দাপট	দৃপ্ ৫৬৫	দায়ক	দয়্ ৫১৮
দশাস্য	দং ৫১০	দাঁড়কাক	দং ৫১১	দাণ্ডাজিনিক	দং ৫১০	দাপট	দু ৫৪৭	দায়কাল	দয়্ ৫১৮
দশাহ	দং ৫১০	দাঁড়া	দং ৫১১	দাতব্য	দা ৫২১	দাপদুপ	দৃপ্ ৫৬৫	দায়গ্রস্ত	দয়্ ৫১৮
দশি(শী)	দং ৫১০	দাঁড়াকবি	দং ৫১১	দাতা	দা ৫২৪	দাপন	দৃপ্ ৫৬৫	দায়দফা	দয়্ ৫১৮
দশে(সে)রক	দং ৫১০	দাঁড়া-গো-পান	দং ৫১০	দাতিনা	দা ৫২১	দাপনা	দৃপ্ ৫৬৫	দায়ধরা	দয়্ ৫১৮
দশোপচার	দং ৫১০	দাঁড়া-গুয়া-পান	দং ৫১০	দাত্যূহ	দা ৫২১	দাপনি(নী)	দৃপ্ ৫৬৫	দায়বন্ধু	দয়্ ৫১৮
দষ্ট	দং ৫১০	দাঁড়ি(ড়ী)	দং ৫১১	দাতৃ	দা ৫২৪	দাপা	দৃপ্ ৫৬৫	দায়ভাগ	দয়্ ৫১৮
দস্	দং ৫১০	দাঁড়্ক	ডং ৪৩২	দাত্র	দো ৫৬৯	দাপাদাপি	দৃপ্ ৫৬৫	দায়মাল	দয়্ ৫১৮
দস্যি	দং ৫১৭	দাঁড়্কা	ডং ৪৩২	দাদ	দ্ ৫৮৪	দাপিত	দৃপ্ ৫৬৫	দায়রা	দয়্ ৫১৮
দস্ত	দং ৫১০	দাঁত	দং ৫১০	দাদখাই	দ্ ৫৮৪	দাপুনি	দৃপ্ ৫৬৫	দায়াদ	দা ৫২১
দস্তক	দং ৫১০	দাঁতপাটি	দং ৫১০	দাদখানি	দ্ ৫৮৪	দাব	দু ৫৪৭	দায়িক	দয়্ ৫১৮
দস্তখত	দং ২২৬	দাঁতন	দং ৫১০	দাদন	দ্ ৫৮৪	দাবকি	দু ৫৪৭	দায়িত্ব	দয়্ ৫১৮
দস্তগীর	দং ৫১০	দাঁতনা	দং ৫১০	দাদরা	দ্ ৫৮৪	দাবড়	দু ৫৪৭	দায়ী	দয়্ ৫১৮
দস্তবস্ত	দং ৫১০	দাঁতনে	দং ৫১০	দাদল	দল্ ৫১৮	দাবড়ানি	দু ৫৪৭	দায়ী	দা ৫২১
দস্তা	দং ৫১০	দাঁতান	দং ৫১০	দাদা	দা ৫২১	দাবা	দু ৫৪৭	দায়ের	দয়্ ৫১৮
দস্তানা	দং ৫১০	দাঁতাল	দং ৫১০	দাদাল	দল্ ৫১৮	দাবাগ্নি	দু ৫৪৬	দার	দৃ ৫৬২
দস্তাবেজ	দং ৫১০	দাঁদাল	দল্ ৫১৮	দাদু	দা ৫২১	দাবান	দু ৫৪৭	দারক	দৃ ৫৬২
দস্তুর	দং ৫১০	দাঁদুড়	দল্ ৫১৮	দাদুর	দৃ ৫৬০	দাবানল	দু ৫৪৭	দার(রু)চিনি	দৃ ৫৬০
দস্য	দং ৫১৭	দাক্ষ	দক্ষ্ ৫০২	দাদুরী	দৃ ৫৬০	দাবি	দু ৫৪৮	দারণ	দৃ ৫৬২
দস্যু	দং ৫১৭	দাক্ষায়ণ	দক্ষ্ ৫০২	দাদূ	দা ৫২১	দাবি-দাওয়া	দু ৫৪৮	দারব	দৃ ৫৬০
দস্র	দং ৫১৭	দাক্ষায়ণী	দক্ষ্ ৫০২	দান	দা ৫২৫	দাবিড়ি	দু ৫৪৬	দারা	দৃ ৫৬২
দহ্	দহ্ ৫২০	দাক্ষিণাত্য	দক্ষ্ ৫০২	দান	ধা ৫৯০	দাবু	দু ৫৪৭	দারি	দৃ ৫৬২
দহ	দহ্ ৫১৭	দাক্ষিণ্য	দক্ষ্ ৫০৩	দানঘাট	দা ৫২১	দাবুড়ি	দু ৫৪৬	দারিত	দৃ ৫৬২
দহন	দহ্ ৫২০	দাক্ষী	দক্ষ্ ৫০২	দানচত্বর	দা ৫২১	দাম	দো ৫৭০	দারিদ্র্য	দৃ ৫৬২
দহর	দ্ ৫৮৪	দাক্ষ্য	দক্ষ্ ৫০২	দানচৌতারা	দা ৫২১	দামড়া	দো ৫৭০	দারী	দৃ ৫৬২
দহরম-মহরম	দ্ ৫৮৪	দাখিল	ক্ষল্ ২২৯	দানন্তর	দা ৫২১	দামন	দো ৫৬৯	দারু	দৃ ৫৬২

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
দারুক	দৃ ৫৬২	দাস্যাঃ	দা ৫২১	দিগম্বর	দিশ্ ৫৩৬	দিদার	দ্ ৫৮৪	দিবাকর	দিব্ ৫২৭
দারুকা	দৃ ৫৬২	দাহ	দহ্ ৫২০	দিগম্বরা	দিশ্ ৫৩৬	দিদি	দা ৫২১	দিবাকীর্ত্তি	দিব্ ৫২৭
দারুচিনী	দৃ ৫৬০	দাহক	দহ্ ৫২০	দি(দী)গর	দিশ্ ৫৩৬	দিদী	দা ৫২১	দিবাচর	দিব্ ৫২৭
দারুণ	দৃ ৫৬২	দাহকাষ্ঠ	দহ্ ৫২০	দিগাঙিঘ্র	দিশ্ ৫৩৬	দিদৃক্ষা	দৃশ্ ৫৬৬	দিবাতন	দিব্ ৫২৭
দারুণী	দৃ ৫৬২	দাহস্থল	দহ্ ৫২০	দিগাদিগ	দিশ্ ৫৩৬	দিধিষু	দ্ ৫৮৪	দিবান	দিব্ ৫২৭
দারুব্রহ্ম	দৃ ৫৬২	দাহহর	দহ্ ৫২০	দিগাম্বর	দিশ্ ৫৩৬	দিন	দো ৫৭২	দিবানা	দিব্ ৫২৭
দারুযন্ত্র	দৃ ৫৬২	দাহন	দহ্ ৫২০	দিগার	দিশ্ ৫৩৬	দিনকত	দো ৫৭২	দিবানি	দিব্ ৫২৭
দারোগা	দৃ ৫৬২	দাহাত্মক	দহ্ ৫২০	দিগীশ	দিশ্ ৫৩৬	দিনকতক	দো ৫৭২	দিবানিশ	দিব্ ৫২৭
দারোয়ান	দ্বি ৫৮৩	দাহী	দহ্ ৫২০	দিগীশ্বর	দিশ্ ৫৩৬	দিনকর	দো ৫৭২	দিবানিশি	দিব্ ৫২৭
দার্ঢ্য	দৃ ৫৬০	দাহ্য	দহ্ ৫২০	দিগ্গজ	দিশ্ ৫৩৯	দিনকর্ত্তা	দো ৫৭২	দিবান্ধ	দিব্ ৫২৭
দার্বাঘাট	দৃ ৫৬০	দি	দা ৫২১	দিগদর্শন	দিশ্ ৫৩৬	দিনকানা	দো ৫৭২	দিবাবসান	দিব্ ৫২৭
দার্শনিক	দৃশ্ ৫৬৬	দিঅ	দা ৫২১	দিগ্দিগন্ত	দিশ্ ৫৩৬	দিনকাল	দো ৫৭২	দিবাভীত	দিব্ ৫২৭
দার্ষ্টান্তিক	দৃশ্ ৫৬৬	দিআ	দা ৫২১	দিগ্দিগ(গা)ন্তর	দিশ্ ৫৩৬	দিনক্ষয়	দো ৫৭২	দিবামান	দিব্ ৫২৭
দাল	দল্ ৫১৯	দিঅঁ	দা ৫২১	দিগ্ধ	দিহ্ ৫৪৩	দিনচর্য্যা	দো ৫৭২	দিবামুখ	দিব্ ৫২৭
দাল	ড্ ৪৩৯	দিআঁ	দা ৫২১	দিগ্বধূ	দিশ্ ৫৩৬	দিননাথ	দো ৫৭২	দিবার	দিব্ ৫২৭
দালচিনি	দল্ ৫১৮	দিঁই	দা ৫২১	দিগ্বলয়	দিশ্ ৫৩৬	দিনপতি	দো ৫৭২	দিবাল	দিব্ ৫২৭
দালনা	ড্ ৪৩৯	দিউটি(টী)	দীপ্ ৫৪৫	দিগ্বসন	দিশ্ ৫৩৬	দিনপাত	দো ৫৭২	দিবাশয়	দিব্ ৫২৭
দালান	দল্ ৫১৯	দিও	দা ৫২১	দিগ্বস্ত্র	দিশ্ ৫৩৬	দিনবল	দো ৫৭২	দিবাসঞ্চর	দিব্ ৫২৭
দালাল	দল্ ৫১৯	দিক্ (দিশ্)	দিশ্ ৫৩৭	দিগ্বাণ	দিশ্ ৫৩৬	দিনভর্ত্তা	দো ৫৭২	দিবাস্বপ্ন	দিব্ ৫২৭
দালি	দল্ ৫১৯	দিক	দিশ্ ৫৩৮	দিগ্বাস	দিশ্ ৫৩৬	দিনমণি	দো ৫৭২	দিবাস্বাপ	দিব্ ৫২৭
দাশ্	দা ৫২১	দিক	দিশ্ ৫৩৯	দিগ্বাসাঃ	দিশ্ ৫৩৬	দিনমান	দো ৫৭২	দিবি	দিব্ ৫২৭
দাশ	দা ৫১৫	দিককন্যা	দিশ্ ৫৩৬	দিগ্বাহ	দিশ্ ৫৩৬	দিনমুখ	দো ৫৭২	দিবিজ	দিব্ ৫২৭
দাশ	— ৫২৫	দিককামিনী	দিশ্ ৫৩৬	দিগ্বিজয়	দিশ্ ৫৩৮	দিনযৌবন	দো ৫৭২	দিবিন্দ্র	দিব্ ৫২৭
দাশরথ	দং ৫১০	দিককরী	দিশ্ ৫৩৬	দিগ্বিদিক্(গ)	দিশ্ ৫৩৬	দিনরত্ন	দো ৫৭২	দিবিষৎ	দিব্ ৫২৭
দাশরথী	দং ৫১০	দিককুঞ্জর	দিশ্ ৫৩৬	দিগ্হস্তী	দিশ্ ৫৩৯	দিনরাজ	দো ৫৭২	দিবিষ্ঠ	দিব্ ৫২৭
দাশার্হ	দং ৫১০	দিকচক্র	দিশ্ ৫৩৬	দিঘল	দৃ ৫৬০	দিনাংশ	দো ৫৭২	দিবেশ	দিব্ ৫২৭
দাশেয়	দা ৫২১	দিকদন্তী	দিশ্ ৫৩৬	দিঘালি-পাথালি	দৃ ৫৬০	দিনাগম	দো ৫৭২	দিবোকাঃ	দিব্ ৫২৭
দাশের	দা ৫২১	দিকদাহ	দিশ্ ৫৩৬	দিঙ্নাগ	দিশ্ ৫৩৯	দিনাত্যয়	দো ৫৭২	দিবোদাস	দিব্ ৫২৯
দাশেরক	দা ৫২১	দিকদেশ	দিশ্ ৫৩৬	দিঙ্মণ্ডল	দিশ্ ৫৩৬	দিনান্ত	দো ৫৭২	দিবৌকাঃ	দিব্ ৫২৭
দাস্	দা ৫২১	দিকপতি	দিশ্ ৫৩৯	দিঙ্মাত্র	দিশ্ ৫৩৬	দিনান্তর	দো ৫৭২	দিব্ব	দিব্ ৫২৭
দাস	দা ৫২৬	দিকপদ	দিশ্ ৫৩৬	দিঙ্মুখ	দিশ্ ৫৩৬	দিনাবসান	দো ৫৭২	দিব্বি	দিব্ ৫২৭
দাসখত	দা ৫২১	দিকপাল	দিশ্ ৫৩৯	দিঙ্মূঢ	দিশ্ ৫৩৬	দিনারি	দো ৫৭২	দিব্ব্য	দিব্ ৫২৭
দাসজন	দা ৫২১	দিকবারণ	দিশ্ ৫৩৬	দিঙ্মোহ	দিশ্ ৫৩৬	দিনেমার	দো ৫৬৯	দিব্যি	দিব্ ৫২৭
দাসনন্দিনী	দা ৫২১	দিকবিজয়	দিশ্ ৫৩৮	দিছ	দা ৫২১	দিনেশ্বর	দো ৫৭২	দিব্য	দিব্ ৫৩০
দাসভাব	দা ৫২১	দিকবিদিক	দিশ্ ৫৩৬	দিএ্রা	দা ৫২১	দিনৈক	দো ৫৭২	দিব্যগন্ধর্ব্ব	দিব্ ৫২৭
দাসভাবনা	দা ৫২১	দিকভোলা	দিশ্ ৫৩৬	দিট	দৃশ্ ৫৬৬	দিব্	দিব্ ৫২৮	দিব্যগায়ন	দিব্ ৫২৭
দাসানুদাস	দা ৫২১	দিকশত	দিশ্ ৫৩৬	দিঠ	দৃশ্ ৫৬৬	দিব	দিব্ ৫২৮	দিব্যদর্শী	দিব্ ৫২৭
দাসাপরাধিক	দা ৫২১	দিকশূল	দিশ্ ৫৩৬	দিঠি	দৃশ্ ৫৬৬	দিব	দা ৫২১	দিব্যদোহদ	দিব্ ৫২৭
দাসী	দা ৫২১	দিকি	দিশ্ ৫৩৬	দিত	দো ৫৭১	দিবঁ	দা ৫২১	দিব্যননী	দিব্ ৫২৭
দাসেয়	দা ৫২১	দিকিন	দিশ্ ৫৩৬	দিতি	দো ৫৭১	দিবঙ্গম	দিব্ ৫২৭	দিব্যনারী	দিব্ ৫২৭
দাসেয়ী	দা ৫২১	দিকু	দিশ্ ৫৩৮	দিতে	দা ৫২১	দিবস	দিব্ ৫২৮	দিব্যমান	দিব্ ৫২৭
দাসের	দা ৫২১	দিক্ষু	দিশ্ ৫৩৬	দিতেছি	দা ৫২১	দিবসাত্যয়	দিব্ ৫২৭	দিব্যরত্ন	দিব্ ৫২৭
দাসেরক	দা ৫২১	দিগ	দিশ্ ৫৩৭	দিত্য	দো ৫৭১	দিবসাবসান	দিব্ ৫২৭	দিব্যরথ	দিব্ ৫২৭
দাস্ত	দা ৫২৬	দিগন্ত	দিশ্ ৫৩৮	দিৎসা	দা ৫২১	দিবস্পৃক	দিব্ ৫২৭	দিব্যরস	দিব্ ৫২৭
দাস্য	দা ৫২১	দিগন্তর	দিশ্ ৫৩৬	দিৎসিত	দা ৫২১	দিবা	দিব্ ৫২৭	দিব্যসার	দিব্ ৫২৭

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
দিব্যসরিৎ	দিব্ ৫২৭	দিস	দিশ্ ৫৩৬	দীপমালা	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘনিদ্রা	দৃ ৫৬০	দুঃখভাক্	দু ৫৪৬
দিব্যস্ত্রী	দিব্ ৫২৭	দিস্তা	দৃ ৫৮৪	দীপশত্রু	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘপ্রজ্ঞ	দৃ ৫৬০	দুঃখশীল	দু ৫৪৬
দিব্যস্নান	দিব্ ৫২৭	দিহ্	দিহ্ ৫৪৩	দীপশলাকা	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘল	দৃ ৫৬০	দুঃখসঞ্চার	দু ৫৪৬
দিব্যা	দিব্ ৫৩০	দিহ	দা ৫২১	দীপশিখা	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘসত্র	দৃ ৫৬৩	দুঃখহা	দু ৫৪৬
দিব্যাংশু	দিব্ ৫২৭	দি(দে)হালা	দিব্ ৫২৭	দীপশৃঙ্খলা	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘসূত্র	দৃ ৫৬০	দুঃখার্ত্ত	দু ৫৪৬
দিব্যাঙ্গনা	দিব্ ৫২৭	দী	দী ৫৪৪	দীপান্বিত	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘসূত্রী	দৃ ৫৬০	দুঃখিত	দু ৫৪৬
দিব্যাদিব্য	দিব্ ৫২৭	দীক্ষ্	দী ৫৪৪	দীপান্বিতা	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘা	দৃ ৫৬০	দুঃখী	দু ৫৪৬
দিব্যি	দিব্ ৫৩০	দীক্ষক	দী ৫৪৪	দীপাবলি	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘাই	দৃ ৫৬০	দুঃখোত্তর	দু ৫৪৬
দিব্যোন্মাদ	দিব্ ৫২৭	দীক্ষণ	দী ৫৪৪	দীপাবলী	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘাড়ী	দৃ ৫৬০	দুঃশকুন	দু ৫৪৬
দিমাগ	ধ্যৈ ৬১৫	দীক্ষা	দী ৫৪৪	দীপালি(লী)	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘাধ্বগ	দৃ ৫৬০	দুঃশলা	দু ৫৪৮
দিমু	দা ৫২১	দীক্ষা	দক্ষ্ ৫০৩	দীপিকা	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘায়ুঃ	দৃ ৫৬০	দুঃশাস	দু ৫৪৬
দিয়টি	দীপ্ ৫৪৫	দীক্ষিত	দী ৫৪৪	দীপিত	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘায়ুধ	দৃ ৫৬০	দুঃশাসন	দু ৫৪৯
দিয়া	দা ৫২১	দীক্ষিতা	দী ৫৪৪	দীপী	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘায়ুষ্য	দৃ ৫৬০	দুঃশীল	দু ৫৪৬
দিয়াটি	দীপ্ ৫৪৫	দীগ	দিশ্ ৫৩৬	দীপোৎসব	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘিকা	দৃ ৫৬০	দুঃসঞ্চার	দু ৫৪৬
দিয়ড়ি	দীপ্ ৫৪৫	দীগর	দিশ্ ৫৩৬	দীপ্ত	দীপ্ ৫৪৬	দীর্ণ	দৃ ৫৬০	দুঃসন্ধান	দু ৫৪৬
দিয়ড়ী	দীপ্ ৫৪৫	দীঘ	দৃ ৫৬৩	দীপ্তকিরণ	দীপ্ ৫৪৫	দীহ্ন	দা ৫২১	দুঃসন্ধেয়	দু ৫৪৬
দি(দে)য়ালা	দিব্ ৫২৭	দীঘল	দৃ ৫৬৩	দীপ্তকীর্ত্তি	দীপ্ ৫৪৫	দু	দু ৫৫৮	দুঃসহ	দু ৫৪৬
দিয়াশলাই	দিব্ ৫২৭	দীঘা	দৃ ৫৬৩	দীপ্তজিহ্বা	দীপ্ ৫৪৫	দু	দুহ্ ৫৫৬	দুঃসাধ	দু ৫৪৬
দিয়ে	দা ৫২১	দীঘি	দৃ ৫৬৩	দীপ্ততপাঃ	দীপ্ ৫৪৫	দু	দ্বি ৫৮০	দুঃসাধ্য	দু ৫৪৬
দিল	দা ৫১৯	দীঘী	দৃ ৫৬৩	দীপ্তবান	দীপ্ ৫৪৫	দুঅ	দ্বি ৫৮০	দুঃসাহস	দু ৫৪৬
দিল্	দা ৫১৯	দীঠ	দৃশ্ ৫৬৬	দীপ্তমূর্ত্তি	দীপ্ ৫৪৫	দুঅজ	দ্বি ৫৮০	দুঃস্থ	দু ৫৪৬
দিল	দৃ ৫৮৪	দীঠি	দৃশ্ ৫৬৬	দীপ্তলোহ	দীপ্ ৫৪৫	দুআওরি	দ্বি ৫৮০	দুঃস্থিত	দু ৫৪৬
দিলীপ	দা ৫২৭	দীধিতি	দী ৫৪৪	দীপ্তশক্তি	দীপ্ ৫৪৫	দু(দো)আনি	দ্বি ৫৮০	দুঃস্থিতি	দু ৫৪৬
দিলে	দা ৫২১	দীধী	দী ৫৪৪	দীপ্তা	দীপ্ ৫৪৫	দুআ(য়া)র	দ্বি ৫৮০	দুঃস্পর্শা	দু ৫৪৬
দিলেন	দা ৫২১	দীন	দী ৫৪৫	দীপ্তাংশু	দীপ্ ৫৪৫	দুআর(য়া)রপাল	দ্বি ৫৮০	দুঃস্পর্শ	দু ৫৪৬
দিল্লি	দিহ্ ৫৪৩	দীনদয়াল	দী ৫৪৪	দীপ্তাগ্নি	দীপ্ ৫৪৫	দু(দো)আরি(রী)	দ্বি ৫৮০	দুঃস্পর্শী	দু ৫৪৬
দিশ্	দিশ্ ৫১৫	দীননাথ	দী ৫৪৪	দীপ্তি	দীপ্ ৫৪৬	দুই	দ্বি ৫৮০	দুঃস্পৃষ্ট	দু ৫৪৬
দিশ্	— ৫৩৭	দীনপনা	দী ৫৪৪	দীপ্তি	তপ্ ৪৫৯	দুইবটী	দ্বি ৫৮০	দুঃস্মর	দু ৫৪৬
দিশ	দিশ্ ৫৩৮	দীনবৎসল	দী ৫৪৪	দীপ্তিমান	দীপ্ ৫৪৫	দুউও	দু ৫৪৬	দুঃস্বপ্ন	দু ৫৪৬
দিশ্	— ৫৩৯	দীনবন্ধু	দী ৫৪৪	দীপ্য	দীপ্ ৫৪৫	দুও	দু ৫৪৬	দুক্ক	দু ৫৪৬
দি(দী)শই	দিশ্ ৫৩৬	দীনহীন	দী ৫৪৫	দীপ্যমান	দীপ্ ৫৪৫	দুওয়া	দুহ্ ৫৫৮	দুক্খ	দু ৫৪৬
দিশপাশ	দিশ্ ৫৩৬	দীনা	দী ৫৪৪	দীপ্র	দীপ্ ৫৪৫	দুঁড়ে	দৃ ৫৮৪	দুক্খি	দু ৫৪৬
দিশা	দিশ্ ৫৩৭	দীনার	দী ৫৪৪	দীয়টি(টী)	দীপ্ ৫৪৫	দুঁহা	দ্বি ৫৮০	দুক্খিত	দু ৫৪৬
দিশাবিশা	দিশ্ ৫৩৬	দীপ্	দীপ্ ৫৪৬	দীয়তাং	দা ৫২১	দুঁহ	দ্বি ৫৮০	দুকাটি	দ্বি ৫৮০
দিশামিশা	দিশ্ ৫৩৬	দীপ	দীপ্ ৫৪৬	দীর্ঘ	দৃ ৫৬৩	দুঁহুঁ	দ্বি ৫৮০	দুকুল	দ্বি ৫৮০
দিশার	দিশ্ ৫৩৬	দীপক	দীপ্ ৫৪৬	দীর্ঘকণা	দৃ ৫৬৩	দুঁদে	দু ৫৪৬	দুকূল	দ্বি ৫৮০
দিশারি	দিশ্ ৫৩৬	দীপকলিকা	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘকন্দক	দৃ ৫৬০	দুঃ	দু ৫৪৮	দুক্ষ	দু ৫৪৬
দিশাহারা	দিশ্ ৫৩৬	দীপকিট্ট	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘগতি	দৃ ৫৬৩	দুঃক্ষ	দু ৫৪৬	দুখ	দু ৫৪৬
দিশি	দিশ্ ৫৩৬	দীপছায়া	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘগ্রীব	দৃ ৫৬৩	দুঃখ	দু ৫৪৮	দুখণ্ড	দ্বি ৫৮০
দিশী	দিশ্ ৫৩৬	দীপতি	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘচ্ছ(ছ)ন্দ	দৃ ৫৬০	দুঃখ	খন্ ২৪৮	দুখলি	দু ৫৪৬
দিশে	দিশ্ ৫৩৬	দীপধর	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘজঙ্ঘ	দৃ ৫৬৩	দুঃখচ্ছেদ্য	দু ৫৪৬	দুখিনী	দু ৫৪৬
দিশ্য	দিশ্ ৫৩৬	দীপন	দীপ্ ৫৪৬	দীর্ঘতপাঃ	দৃ ৫৬৩	দুঃখজাত	দু ৫৪৬	দুখী	দু ৫৪৬
দিষ্ট	দিশ্ ৫৩৬	দীপবর্ত্তী	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘতমা	দৃ ৫৬৩	দুঃখত্রয়	দু ৫৪৮	দুগ্গাভোগ	দু ৫৪৬
দিষ্টি	দিশ্ ৫৩৬	দীপবৃক্ষ	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘদর্শী	দৃ ৫৬০	দুঃখপাসরা	দু ৫৪৬	দুগুণ	দ্বি ৫৮০
দিষ্ট্যা	দিশ্ ৫৩৬	দীপভাজন	দীপ্ ৫৪৫	দীর্ঘদৃষ্টি	দৃ ৫৬০	দুঃখপ্রায়	দু ৫৪৬	দুগুলি	দ্বি ৫৮০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
দুগ্ধ	দুহ্ ৫৫৮	দুন	দ্বি ৫৮০	দু(দো)য়াদশ	দ্বি ৫৮০	দুরাচর	দু ৫৪৬	দুর্ঘট	দু ৫৪৬
দুগ্ধকুষ্মাণ্ড	দুহ্ ৫৫৬	দু(দূ)ন	দ্বি ৫৮০	দুয়ানী	দ্বি ৫৮০	দুরাচার	দু ৫৪৬	দুর্জন	দু ৫৫১
দুগ্ধচই	দুহ্ ৫৫৬	দুনলা	দ্বি ৫৮০	দুয়া-ভুয়া	দুহ্ ৫৫৬	দুরাচর	চর্ ৩৪০	দুর্জর	দু ৫৪৬
দুগ্ধচিড়া	দুহ্ ৫৫৬	দুনা	দ্বি ৫৮০	দুয়ার	দ্বি ৫৮৩	দুরাচার	চর্ ৩৪০	দুর্জাত	দু ৫৪৬
দুগ্ধতুম্বী	দুহ্ ৫৫৬	দুনিঞা	দ্ ৫৮৪	দু(দো)য়ারি(রী)	দ্বি ৫৮০	দুরাত্মা	দু ৫৪৬	দুর্জাতি	দু ৫৪৬
দুগ্ধদা	দুহ্ ৫৫৮	দুনিয়া	দ্ ৫৮৪	দুয়েম	দ্বি ৫৮০	দুরাধর্ষ	দু ৫৪৬	দুর্জ্ঞেয়	দু ৫৪৬
দুগ্ধনিভশয্যা	দুহ্ ৫৫৬	দুনী	দ্রু ৫৭৫	দুয়ো	দ্বি ৫৮০	দুরানম	দু ৫৪৬	দুর্ণয়	দু ৫৪৬
দুগ্ধপাচন	দুহ্ ৫৫৬	দুনু	দ্বি ৫৮০	দুয়ো	দু ৫৪৬	দুরাপ	দু ৫৪৬	দুর্দ্দম	দু ৫৫১
দুগ্ধপুলি	দুহ্ ৫৫৬	দুনো	দ্বি ৫৮০	দুর্	দু ৫৪৮	দুরারক্ষ	দু ৫৪৬	দুর্দ্দর্শ	দু ৫৪৬
দুগ্ধপোষ্য	দুহ্ ৫৫৬	দুন্দুভ	দ্ ৫৮৪	দুরক্ষ	দু ৫৪৬	দুরারাধ্য	দু ৫৪৬	দুর্দ্দর্শা	দু ৫৫১
দুগ্ধফেন	দুহ্ ৫৫৬	দুন্দুভি	দ্ ৫৮৪	দুরক্ষর	দু ৫৪৬	দুরারুহ	দু ৫৪৬	দুর্দ্দান্ত	দু ৫৫১
দুগ্ধবটী	দুহ্ ৫৫৬	দুন্দুমার	ধু ৬০১	দুরতিক্রম	দু ৫৪৬	দুরারোহ	দু ৫৪৬	দুর্দ্দাম	দু ৫৪৬
দুগ্ধমুখ	দুহ্ ৫৫৬	দুপদাপ	দু ৫৪৬	দুরতিক্রম	ক্রম্ ২১৯	দুরালোক	দু ৫৪৬	দুর্দ্দিন	দু ৫৪৬
দুগ্ধসমুদ্র	দুহ্ ৫৫৮	দুপদুপ	দু ৫৪৬	দুরত্যয়	দু ৫৪৬	দুরাশয়	দু ৫৪৬	দুর্দ্দিবস	দু ৫৪৬
দুগ্ধসিন্ধু	দুহ্ ৫৫৮	দুপর	দ্বি ৫৮০	দুরত্যয়	ই ৬৫	দুরাসদ	দু ৫৪৬	দুর্দ্দুর	দু ৫৪৬
দুগ্ধাব্ধি	দুহ্ ৫৫৬	দুপহর	দ্বি ৫৮০	দুরদিনমান	দু ৫৪৬	দুরাসিত	দু ৫৪৬	দুর্দ্দুরি	দু ৫৪৬
দুগ্ধিকা	দুহ্ ৫৫৮	দুপাটা	দ্বি ৫৮০	দুরদুর	দু ৫৪৬	দুরাহর	দু ৫৪৬	দুর্দ্দৃশ্য	দু ৫৪৬
দুগ্ধী	দুহ্ ৫৫৮	দুপাট্টা	দ্বি ৫৮০	দুরদৃষ্ট	দু ৫৪৬	দুরিত	দু ৫৪৬	দুর্দ্দৃষ্ট	দু ৫৪৬
দুঘড়ী	দ্বি ৫৮০	দুপাটি(টী)	দ্বি ৫৮০	দুরদৃষ্ট	দৃশ্ ৫৬৬	দুরিষ্ট	দু ৫৪৬	দুর্দ্দৈব	দু ৫৪৬
দুঙ্কার	দং ৫১০	দুপালটা	দ্বি ৫৮০	দুরধিগ	দু ৫৪৬	দুরুক্ত	দু ৫৪৬	দুর্দ্দ্যুত	দু ৫৪৬
দু(দো)চকোব্রত	দ্বি ৫৮০	দুপুর	দ্বি ৫৮০	দুরধিগ	গম্ ২৬২	দুরুক্তি	দু ৫৪৬	দুর্দ্ধর	দু ৫৫১
দুচারিণী	দ্বি ৫৮০	দুপোর	দ্বি ৫৮০	দুরধীত	ই ৬৫	দুরুচ্ছেদ	ছিদ্ ৩৬৭	দুর্দ্ধর্ষ	দু ৫৫১
দুজা	দ্বি ৫৮০	দুফাড়	দ্বি ৫৮০	দুরধীত	দু ৫৪৬	দুরুচ্ছেদ	দু ৫৪৬	দুর্দ্ধী	দু ৫৪৬
দুঞর	দ্বি ৫৮০	দুফাড়া	দ্বি ৫৮০	দুরনুপালন	দু ৫৪৬	দুরুত্তর	দু ৫৪৬	দুর্নয়	দু ৫৪৬
দুটা	দ্বি ৫৮০	দুফাল	দ্বি ৫৮০	দুরনুষ্ঠিত	দু ৫৪৬	দুরুৎসহ	দু ৫৪৬	দুর্নিগ্রহ	দু ৫৪৬
দুটানা	দ্বি ৫৮০	দুফালা	দ্বি ৫৮০	দুরন্ত	দু ৫৪৯	দুরুদাহর	দু ৫৪৬	দুর্নিবার	দু ৫৫১
দুটো	দ্বি ৫৮০	দুবর	দু ৫৪৬	দুরন্তক	দু ৫৪৬	দুরুদুরু	দু ৫৫০	দুর্নিমিত	দু ৫৪৬
দুড়দাড়	দং ৫১০	দুবল	দু ৫৪৬	দুরন্তর	দু ৫৪৬	দুরুপসর্পী	দু ৫৪৬	দুর্নিমিত্ত	দু ৫৪৬
দুড়দুড়	দং ৫১০	দুবলা	দু ৫৪৬	দুরন্বয়	দু ৫৪৬	দুরূহ	দু ৫৫০	দুর্নিরীক্ষ্য	দু ৫৪৬
দুড়দুড়ি	দং ৫১০	দুব্বা	দু ৫৪৬	দুরন্বয়	ই ৬৫	দুরূহ	উহ্ ১১২	দুর্নিশি	দু ৫৪৬
দুড়ুম	দং ৫১০	দু(দো)ভাষী	দ্বি ৫৮২	দুরপনেয়	দু ৫৪৬	দুরোদর	দু ৫৪৬	দুর্নীত	দু ৫৪৬
দুঠ	দু ৫৪৬	দুমড়া	দং ৫১০	দুরবগম	দু ৫৪৬	দুর্গ	দু ৫৫০	দুর্নীতি	দু ৫৪৬
দুঠঠ	দু ৫৪৬	দুমড়ান	দং ৫১০	দুরবগম	গম্ ২৬২	দুর্গপাল	দু ৫৪৬	দুর্ব্বচ	দু ৫৪৬
দুদ্দাড়	দং ৫১০	দুমদাম	দং ৫১০	দুরবগাহ	গাহ্ ২৮০	দুর্গ(া)টুনটুনটুনি	দু ৫৪৬	দুর্ব্বর্ণ	দু ৫৪৬
দুদ্দুড়	দং ৫১০	দুমন	দ্বি ৫৮০	দুরবগাহ	দু ৫৪৬	দুর্গত	দু ৫৫০	দুর্ব্বল	দু ৫৪৬
দুধ	দুহ্ ৫৫৬	দুমনা	দ্বি ৫৮০	দুরবগ্রহ	দু ৫৪৬	দুর্গতি	গম্ ২৬২	দুর্ব্বসতি	দু ৫৪৬
দুধকমল	দুহ্ ৫৫৬	দুমুখ	দ্বি ৫৮০	দুরবস্থ	দু ৫৪৬	দুর্গতি	দু ৫৫০	দুর্ব্বহ	দু ৫৫১
দুধকুসুম্ভা	দুহ্ ৫৫৬	দুমুঠো	দ্বি ৫৮০	দুরবস্থা	দু ৫৪৬	দুর্গন্ধ	দু ৫৪৬	দুর্ব্বাক	দু ৫৪৬
দুধথোড়	দুহ্ ৫৫৬	দুমেটীয়া	দ্বি ৫৮০	দুরবাপ	দু ৫৪৬	দুর্গপাল	দু ৫৫০	দুর্ব্বাক্য	দু ৫৪৬
দুধফেনী	দুহ্ ৫৫৬	দুমেটে	দ্বি ৫৮০	দুরবেক্ষিত	দু ৫৪৬	দুর্গম	দু ৫৫০	দুর্ব্বাচ্য	দু ৫৪৬
দধরাজ	দুহ্ ৫৫৬	দুম্ব	দ্বি ৫৮০	দু(দো)রস্ত	দ্ ৫৮৪	দুর্গা	দু ৫৫০	দুর্ব্বার	দু ৫৪৬
দুধল	দুহ্ ৫৫৬	দুম্বা	দ্বি ৫৮০	দুরাকর্ষ	দু ৫৪৬	দুর্গামণ্ডপ	দু ৫৪৬	দুর্ব্বাসনা	দু ৫৪৬
দুধে	দুহ্ ৫৫৬	দুয়জ	দ্বি ৫৮০	দুরাক্রন্দ	দু ৫৪৬	দুর্গোৎসব	দু ৫৪৬	দুর্ব্বাসাঃ	দু ৫৫২
দুধে-আলতা	দুহ্ ৫৫৬	দুয়া	দু ৫৪৬	দুরাক্ষর	দু ৫৪৬	দুর্গোমণ্ডা	দু ৫৪৬	দুর্ব্বিগাহ	দু ৫৪৬
দুধেল	দুহ্ ৫৫৬	দুয়াড়ি	দ্বি ৫৮০	দুরাগ্রহ	দু ৫৪৬	দুর্গ্রহ	দু ৫৪৬	দুর্ব্বিগাহ	গাহ্ ২৮০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
দুর্ব্বিগাহ্য	দু ৫৪৬	দুর্লেখ্য	দু ৫৪৬	দুষ্কৃতি	দু ৫৪৬	দূ	দু ৫৪৬	দৃঢ়সন্ধি	দৃ ৫৬০
দুর্ব্বিজ্ঞেয়	দু ৫৪৬	দুর্হৃৎ	দু ৫৪৬	দুষ্কৃতী	দু ৫৪৬	দূত	দু ৫৫৫	দৃঢ়সৌহৃদ্	দৃ ৫৬০
দুর্ব্বিদগ্ধ	দু ৫৪৬	দুল্	দল্ ৫১৮	দুষ্খ	দু ৫৪৬	দূতী	দু ৫৪৬	দৃঢ়হস্ত	দৃ ৫৬০
দুর্ব্বিনয়	দু ৫৪৬	দুল	দল্ ৫২০	দুষ্ট	দু ৫৫৩	দূতীগিরি	দু ৫৪৬	দৃতি	দৃ ৫৬০
দুর্ব্বিনয়	নী ৬৫৫	দুলকি	দল্ ৫২০	দুষ্টচক্র	দু ৫৪৬	দূতীপনা	দু ৫৪৬	দৃপ্	দৃপ্ ৫৬৫
দুর্ব্বিনীত	দু ৫৪৬	দুলচা	দ্ ৫৮৪	দুষ্টচারী	দু ৫৪৬	দূত্য	দু ৫৪৬	দৃপ্ত	দৃপ্ ৫৬৫
দুর্ব্বিপাক	দু ৫৪৬	দুলন	দল্ ৫২০	দুষ্টা(ষ্টু)মি	দু ৫৪৬	দূন	দু ৫৪৬	দৃভ্(ভী)	দৃ ৫৬০
দুর্ব্বিবাহ	দু ৫৪৬	দুলভ	দু ৫৪৬	দুষ্টি	দু ৫৪৬	দূর	দু ৫৫৫	দৃমি	দৃ ৫৬০
দুর্ব্বিষহ	দু ৫৪৬	দুলদুল	দল্ ৫১৮	দুষ্টু	দু ৫৫৩	দূর	ই ৬৫	দৃমিকি	দৃ ৫৬০
দুর্ব্বুদ্ধি	দু ৫৪৬	দুললিত	দল্ ৫১৮	দুষ্পচ	দু ৫৪৬	দূরগত	দু ৫৪৬	দৃশ্	দৃশ্ ৫১৫
দুর্ব্বৃত্ত	দু ৫৪৬	দুলহ	দু ৫৪৬	দুষ্পরিগ্রহ	দু ৫৪৬	দূরগামী	দু ৫৪৬	দৃশ	দৃশ্ ৫৬৭
দুর্ব্বোধ	দু ৫৪৬	দুলহা	দল্ ৫১৮	দুষ্পরিগ্রহ	গ্রহ্ ৩০১	দূরতঃ	দু ৫৪৬	দৃশ(ষ)ৎ	দৃশ্ ৫৬৬
দুর্ব্বোধ্য	দু ৫৪৬	দুলহাভাই	দল্ ৫১৮	দুষ্পরিহর	দু ৫৪৬	দূরদর্শন	দু ৫৫৫	দৃশ(ষ)দ্	দৃশ্ ৫৬৬
দুর্ব্ব্যবহার	দু ৫৪৬	দুলা	দল্ ৫২০	দুষ্পার	দু ৫৪৬	দূরদর্শিতা	ই ৬৫	দৃশি	দৃশ্ ৫৬৭
দুর্ব্ব্যাহৃত	দু ৫৪৬	দুলান	দল্ ৫২০	দুষ্পূর	দু ৫৪৬	দূরদর্শী	ই ৬৫	দৃশী	দৃশ্ ৫৬৭
দুর্ব্রজিত	দু ৫৪৬	দুলায়িত	দল্ ৫১৮	দুষ্প্রধর্ষ	দু ৫৪৬	দূরদূরান্ত	দু ৫৪৬	দৃশ্য	দৃশ্ ৫৩৭
দুর্ভগ	দু ৫৪৬	দুলাল	দল্ ৫২০	দুষ্প্রবৃত্তি	দু ৫৪৬	দূরদৃষ্টি	দু ৫৫৫	দৃশ্য	— ৫৬৭
দুর্ভগা	দু ৫৪৬	দুলালি(লী)	দল্ ৫২০	দুষ্প্রবেশ	দু ৫৪৬	দূরদৃষ্টি	ই ৬৫	দৃশ্যকাব্য	দৃশ্ ৫৬৭
দুর্ভাগা	দু ৫৪৬	দুলালিয়া	দল্ ৫১৮	দুষ্প্রসহ	দু ৫৪৬	দূরবর্ত্তী	দু ৫৫৫	দৃশ্যমান	দৃশ্ ৫৬৭
দুর্ভাগ্য	দু ৫৪৬	দুলি(লী)	দল্ ৫১৮	দুষ্প্রাপ	দু ৫৪৬	দূরবীক্ষণ	দু ৫৪৬	দৃশ্বন্	দৃশ্ ৫৬৬
দুর্ভাষী	দু ৫৪৬	দুলিচা	দ্ ৫৮৪	দুষ্প্রাপ্য	দু ৫৪৬	দূরশ্রুত	দু ৫৪৬	দৃশ্বা	দৃশ্ ৫৬৬
দুর্ভিক্ষ	দু ৫৪৬	দুলিত	দল্ ৫১৮	দুষ্প্রাপ্য	আপ্ ৫৯	দূরাদূর	দু ৫৪৬	দৃষৎ	দৃশ্ ৫৬৭
দুর্ভিদ	দু ৫৪৬	দুলুদুলু	দল্ ৫১৮	দুষ্মন্ত	দু ৫৫৩	দূরাধিরোহী	দু ৫৪৬	দৃষদ্বতী	দৃশ্ ৫৬৭
দুর্ম্মতি	দু ৫৪৬	দুলে	দল্ ৫১৮	দুসতীন	দ্বি ৫৮০	দূরান্তর	দু ৫৪৬	দৃষ্ট	দৃশ্ ৫৬৭
দুর্ম্মদ	দু ৫৪৬	দুল্লিল	দল্ ৫১৮	দুসূতি	দ্বি ৫৮০	দূরায়ত	দু ৫৪৬	দৃষ্টদোষ	দৃশ্ ৫৬৭
দুর্ম্মনঃ	দু ৫৪৬	দুল্যমান	দল্ ৫১৮	দুসূতী	দ্বি ৫৮০	দূরীকৃত	দু ৫৫৫	দৃষ্টপূর্ব্ব	দৃশ্ ৫৬৬
দুর্ম্মনায়মান	দু ৫৪৬	দুল্যা	দল্ ৫১৮	দুস্তর	দু ৫৪৬	দূর্ব্বা	দু ৫৪৬	দৃষ্টান্ত	দৃশ্ ৫৬৭
দুর্ম্মন্ত্রিত	দু ৫৪৬	দুশমন	দু ৫৫২	দুস্তর	তৃ ৪৭৭	দূর্ব্বাষ্টমী	দু ৫৪৬	দৃষ্টি	দৃশ্ ৫৬৭
দুর্ম্মর্ষণ	দু ৫৪৬	দুশ্চর	দু ৫৪৬	দুস্ত্যজ	দু ৫৪৬	দূষক	দু ৫৪৬	দৃষ্টিক্ষেপ	দৃশ্ ৫৬৭
দুর্ম্মল্লিকা	দু ৫৪৬	দুশ্চর	চর্ ৩৪০	দুস্ত্যজ্য	দু ৫৪৬	দূষি(ষী)	দু ৫৪৬	দৃষ্টিগোচর	দৃশ্ ৫৬৭
দুর্ম্মল্লী	দু ৫৪৬	দুশ্চরিত	চর্ ৩৪০	দুস্থ	দু ৫৪৬	দূষিকা	দু ৫৪৬	দৃষ্টিপথ	দৃশ্ ৫৬৭
দুর্ম্মুখ	দু ৫৪৬	দুশ্চরিত	দু ৫৪৬	দুস্থিত	দু ৫৪৬	দূষী	দু ৫৪৬	দৃষ্টিপাত	দৃশ্ ৫৬৮
দুর্ম্মুশ	দু ৫৪৬	দুশ্চরিত্র	দু ৫৪৬	দুস্থিতি	দু ৫৪৬	দূষ্য	দু ৫৪৬	দৃষ্টিপূত	দৃশ্ ৫৬৮
দুর্ম্মূল্য	দু ৫৪৬	দুশ্চর্য্যা	দু ৫৪৬	দুহ্	দুহ্ ৫৫৮	দূষ্যা	দু ৫৪৬	দৃষ্টিবিদ্যা	দৃশ্ ৫৬৮
দুর্ম্মেধাঃ	দু ৫৪৬	দুশ্চারিণী	দু ৫৪৬	দুহ	দুহ্ ৫৫৮	দৃ	দৃ ৫৪৬	দৃষ্টিবিভ্রম	দৃশ্ ৫৬৮
দর্ম্মশঃ	দু ৫৪৬	দুশ্চিকিৎসা	দু ৫৪৬	দুহা	দুহ্ ৫৫৬	দৃক্	দৃশ্ ৫৬৬	দৃষ্টিভঙ্গি	দৃশ্ ৫৬৮
দুর্যোগ	দু ৫৫২	দুশ্চ্যবন	দু ৫৪৬	দুহাতিয়া	দ্বি ৫৮০	দৃক্পাত	দৃশ্ ৫৬৬	দৃষ্টে	দৃশ্ ৫৬৬
দুর্যোধ	দু ৫৪৬	দুষ্	দু ৫৪৮	দুহাঁ	দুহ্ ৫৫৬	দৃগঞ্চল	দৃশ্ ৫৬৬	দৃহ্	দৃ ৫৬০
দুর্যোধন	দু ৫৫২	(দুস্)	দু ৫৫২	দুহাঁর	দুহ্ ৫৫৬	দৃঢ়	দৃ ৫৬০	দে	দা ৫২১
দুর্যোনি	দু ৫৪৬	দুষণ	দু ৫৫২	দুহাকার	দুহ্ ৫৫৬	দৃঢ়ধন্বা	দৃ ৫৬০	দে	দিব্ ৫২৭
দুর্লঙ্ঘ	দু ৫৪৬	দু(দূ)ষী	দু ৫৫২	দুহার	দুহ্ ৫৫৬	দৃঢ়নিশ্চয়	দৃ ৫৬০	দেঅত	দা ৫২১
দুর্লভ	দু ৫৪৬	দুষ্কর	দু ৫৪৬	দুহিতা (তৃ)	দুহ্ ৫৫৮	দৃঢ়প্রতিজ্ঞ	দৃ ৫৬০	দেআ	দা ৫২১
দুর্লভা	দু ৫৪৬	দুষ্কর্ম্ম	দু ৫৪৬	দুহ্য	দুহ্ ৫৫৬	দৃঢ়ভক্তি	দৃ ৫৬০	দেআ(য়া)ন	দিব্ ৫২৭
দুর্ললিত	দু ৫৪৬	দুষ্কুল	দু ৫৪৬	দুহ্যমান	দ্বি ৫৮০	দৃঢ়মুষ্টি	দৃ ৫৬০	দেআল	দিব্ ৫২৭
দুর্লহ	দু ৫৪৬	দুষ্কৃৎ	দু ৫৪৬	দুহ্যমান	দুহ্ ৫৫৬	দৃঢ়লোমা	দৃ ৫৬০	দেইজি	দা ৫২১

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
দেউ	দা ৫২১	দেনা	দা ৫২১	দেবদ্রোণী	দিব্ ৫২৭	দেবযজ্ঞ	দিব্ ৫৩১	দেবারণ্য	দিব্ ৫২৭
দেউ	দিব্ ৫২৭	দেনেওয়ালা	দা ৫২১	দেবধান	দিব্ ৫২৭	দেবযাত্রা	দিব্ ৫২৭	দেবারি	দিব্ ৫২৭
দেউটি(টী)	দীপ্ ৫৪৫	দেব্	দিব্ ৫২৮	দেবধান্য	দিব্ ৫২৭	দেবযান	দিব্ ৫৩২	দেবার্চ্চা	দিব্ ৫২৭
দেউড়ি(ড়ী)	দিব্ ৫২৭	দেব	দিব্ ৫৩০	দেবধূপ	দিব্ ৫২৭	দেবযানী	দিব্ ৫৩৩	দেবালয়	দিব্ ৫২৭
দেউস	দিব্ ৫৩৫	দেবঋণ	দিব্ ৫৩২	দেবন	দিব্ ৫৩০	দেবযুগ	দিব্ ৫২৭	দেবাসুর	দিব্ ৫২৭
দেউলিয়া	দিব্ ৫৩৫	দেবঋষি	দিব্ ৫২৭	দেবনদী	দিব্ ৫৩১	দেবযোনি	দিব্ ৫৩৪	দেবিতা	দিব্ ৫২৭
দেউল্যা	দিব্ ৫৩৫	দেবক	দিব্ ৫৩২	দেবনাগরী	ন্ ৬৭২	দেবযোষা	দিব্ ৫২৭	দেবী	দিব্ ৫৩০
দেএ	দা ৫২১	দেবকন্যা	দিব্ ৫৩১	দেবনাথ	নাথ্ ৬৩৮	দেবর	দিব্ ৫২৭	দেবীকোট	দিব্ ৫২৭
দেও	দা ৫২১	দেবকর্ম্মী	দিব্ ৫২৭	দেবনিকায়	দিব্ ৫২৭	দেবরথ	দিব্ ৫২৭	দেবীভাগবত	দিব্ ৫২৭
দেও	দিব্ ৫২৭	দেবকারু	দিব্ ৫২৭	দেবনিন্দক	দিব্ ৫২৭	দেবরহস্য	দিব্ ৫২৭	দেবীমাহাত্ম্য	দিব্ ৫২৭
দেওআ(য়া)ন	দিব্ ৫২৭	দেবকিরী	দিব্ ৫২৭	দেবনির্ম্মিত	দিব্ ৫২৭	দেবরাজ	দিব্ ৫২৭	দেবীসূক্ত	দিব্ ৫২৭
দেওগিরি	দিব্ ৫২৭	দেবকী	দিব্ ৫৩২	দেবপতি	দিব্ ৫২৭	দেবরাত	দিব্ ৫৩৫	দেবেন্দ্র	দিব্ ৫২৭
দেওদার	দিব্ ৫২৭	দেবকুল	দিব্ ৫২৭	দেবপথ	দিব্ ৫২৭	দেবরায়	দিব্ ৫২৭	দেবেন্দ্রাণী	দিব্ ৫২৭
দেওদার	দিব্ ৫২৭	দেবকুল্যা	দিব্ ৫৩১	দেবপশু	দিব্ ৫২৭	দেবর্ষি	দিব্ ৫৩৫	দেবেশ	দিব্ ৫২৭
দেওন	দিব্ ৫৩০	দেবকেতু	দিব্ ৫২৭	দেবপালিত	দিব্ ৫২৭	দেবল	দিব্ ৫৩৫	দেবোত্তর	দিব্ ৫২৭
দেওয়া	দা ৫৩০	দেবখাত	দিব্ ৫২৭	দেবপুরী	দিব্ ৫২৭	দেবলোক	দিব্ ৫৩১	দেবোদ্যান	দিব্ ৫২৭
দেওয়ান	দা ৫২১	দেবগণিকা	দিব্ ৫২৭	দেবপূজ্য	দিব্ ৫২৭	দেবশত্রু	দিব্ ৫২৭	দেব্যা	দিব্ ৫২৭
দেওয়ান	দিব্ ৫২৭	দেবগন্ধর্ব্ব	দিব্ ৫২৭	দেবপ্রিয়	দিব্ ৫২৭	দেবশর্ম্মা	দিব্ ৫২৭	দেয়	দা ৫২১
দেওয়ানা	দিব্ ৫২৭	দেবগায়ন	দিব্ ৫৩০	দেববধূ	দিব্ ৫২৭	দেবশিল্পী	দিব্ ৫২৭	দেয়	দয় ৫১৮
দেওয়ানী	দিব্ ৫২৭	দেবগিরি	দিব্ ৫৩১	দেববর	দিব্ ৫২৭	দেবশুনী	দিব্ ৫২৭	দেয়র	দিব্ ৫২৭
দেওয়াল	দিব্ ৫২৭	দেবগিরী	দিব্ ৫২৭	দেববর্ণিনী	দিব্ ৫৩২	দেবশ্রুত	দিব্ ৫২৭	দেয়া	দা ৫২১
দেওয়ালী	দীপ্ ৫৪৫	দেবগুরু	দিব্ ৫৩১	দেববর্ত্ম	দিব্ ৫২৭	দেবসভা	দিব্ ৫২৭	দেয়ান	দা ৫২১
দেঁতো	দং ৫১০	দেবগুহ্য	দিব্ ৫২৭	দেববর্দ্ধকি	দিব্ ৫২৭	দেবসাযুজ্য	দিব্ ৫২৭	দেয়ানসাল	দিব্ ৫২৭
দেক্	দ্ ৫৮৪	দেবগৃহ	দিব্ ৫২৭	দেববলি	দিব্ ৫২৭	দেবসেনা	দিব্ ৫৩৬	দেয়ানা	দিব্ ৫২৭
দেখ	দৃশ্ ৫৬৬	দেবচর্য্যা	দিব্ ৫২৭	দেববাণী	দিব্ ৫২৭	দেবস্থান	দিব্ ৫২৭	দেয়ানা	দ্ ৫৮৪
দেখচোর	দৃশ্ ৫৬৬	দেবচিকিৎসক	দিব্ ৫২৭	দেববাহন	দিব্ ৫২৭	দেবস্ব	দিব্ ৫৩২	দেয়াল	দ্ ৫৮৪
দেখতা	দৃশ্ ৫৬৬	দেবচ্ছন্দ	দিব্ ৫২৭	দেববিমান	দিব্ ৫২৭	দেবহূতি	দিব্ ৫৩৬	দেয়ালি(লী)	দীপ্ ৫৪৫
দেখন	দৃশ্ ৫৬৬	দেবজাত	দিব্ ৫২৭	দেববিদ্যা	দিব্ ৫২৭	দেবহেলন	দিব্ ৫২৭	দের	দু ৫৫৫
দেখনহারা	দৃশ্ ৫৬৬	দেবতরু	দিব্ ৫৩১	দেববৃক্ষ	দিব্ ৫২৭	দেবা	দিব্ ৫৩০	দেরকো	দীপ্ ৫৪৫
দেখনহাসি	দৃশ্ ৫৬৬	দেবতর্পণ	তৃ ৪৮০	দেবব্রত	দিব্ ৫৩২	দেবাকৃতি	দিব্ ৫২৭	দেরখো	দীপ্ ৫৪৫
দেখনাই	দৃশ্ ৫৬৬	দেবতর্পণ	তৃ ৫৩২	দেবব্রহ্মা	দিব্ ৫২৭	দেবাক্রীড়	দিব্ ৫২৭	দেরাজ	দ্ ৫৮৪
দেখমার	দৃশ্ ৫৬৬	দেবতা	দিব্ ৫৩২	দেবব্রাহ্মণ	দিব্ ৫২৭	দেবাগার	দিব্ ৫২৭	দেরি	দু ৫৫৫
দেখা	দৃশ্ ৫৩৭	দেবতাত	দিব্ ৫২৭	দেবভবন	দিব্ ৫২৭	দেবাঙ্গনা	দিব্ ৫৩৬	দেরী	দু ৫৫৫
দেখাদেখি	দৃশ্ ৫৬৬	দেবতাত্মা	দিব্ ৫২৭	দেবভাগ	দিব্ ৫২৭	দেবাজীব	দিব্ ৫৩৬	দেয়াশিনী	দিব্ ৫২৭
দেখাশুনা	দৃশ্ ৫৬৬	দেবতী	দিব্ ৫২৭	দেবভাষা	দিব্ ৫৩১	দেবাজীবী	দিব্ ৫৩৬	দেয়াসিনি(নী)	দিব্ ৫২৭
দেখাশোনা	দৃশ্ ৫৬৬	দেবতীর্থ	দিব্ ৫২৭	দেবভিষক	দিব্ ৫২৭	দেবাতিদেব	দিব্ ৫২৭	দেল	দ্ ৫৮৪
দেখা-সাক্ষাৎ	দৃশ্ ৫৬৬	দেবত্তর	দিব্ ৫২৭	দেবভূমি	দিব্ ৫২৭	দেবাত্মা	দিব্ ৫২৭	দেলাসা	দ্ ৫৮৪
দেড়	দ্ ৫৮৪	দেবত্য	দিব্ ৫২৭	দেবমণি	দিব্ ৫২৭	দেবাধিপ	দিব্ ৫২৭	দেশ	দিশ্ ৫৩৯
দেগারা	দং ৫১০	দেবদত্ত	দিব্ ৫২৭	দেবমাতা	দিব্ ৫২৭	দেবানী	দিব্ ৫২৭	দেশ	দিশ্ ৫৪৩
দেদার	দ্ ৫৮৪	দেবদারু	দিব্ ৫৩১	দেবমাতৃক	দিব্ ৫২৭	দেবানুচর	দিব্ ৫২৭	দেশক	দিশ্ ৫৪১
দেদীপ্যমান	দিব্ ৫২৭	দেবদাস	দিব্ ৫২৭	দেবমান	দিব্ ৫২৭	দেবান্ন	দিব্ ৫২৭	দেশকার	দিশ্ ৫৪৩
দেদীপ্যমান	দিশ্ ৫৩৬	দেবদুহিতা	দিব্ ৫৩১	দেবমায়া	দিব্ ৫২৭	দেবাবসথ	দিব্ ৫২৭	দেশকারী	দিশ্ ৫৪৩
দেধান	দিব্ ৫২৭	দেবদৃষ্টি	দিব্ ৫২৭	দেবমাস	দিব্ ৫২৭	দেবাবাস	দিব্ ৫২৭	দেশকাল	দিশ্ ৫৩৬
দেন	দা ৫২১	দেবদেব	দিব্ ৫২৭	দেবমুনি	দিব্ ৫২৭	দেবায়তন	দিব্ ৫২৭	দেশকালজ্ঞ	দিশ্ ৫৩৬
দেনমোহর	দা ৫২১	দেবদোল	দিব্ ৫২৭	দেবযজন	দিব্ ৫২৭	দেবায়ুধ	দিব্ ৫২৭	দেশকালপাত্র	দিশ্ ৫৩৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
দেশজ	দিশ্ ৫৩৬	দেহারা	দিব্ ৫২৭	দৈয়াল	দুহ্ ৫৫৬	দোলন	দল্ ৫১৮	দোখণ্ডী	দ্বি ৫৮০
দেশ-দেশান্তর	দিশ্ ৫৩৬	দেহি	দা ৫২১	দৈর্ঘ্য	দৃ ৫৩৬	দোলনা	দল্ ৫১৮	দোছটি	দ্বি ৫৮০
দেশধর্ম্ম	দিশ্ ৫৩৬	দেহিনী	দিহ্ ৫৪৩	দৈশিক	দিশ্ ৫৩৬	দোলনী	দল্ ৫১৮	দোছুটি	দ্বি ৫৮০
দেশন	দিশ্ ৫৪১	দেহী	দিহ্ ৫৪৩	দৈষ্টিক	দিশ্ ৫৩৬	দোলপীঁড়ি	দল্ ৫১৮	দোছোট	দ্বি ৫৮০
দেশপালী	দিশ্ ৫৪৩	দেহেরা	দিব্ ৫২৭	দৈহিক	দিহ্ ৫৪৩	দোলমঞ্চ	দল্ ৫১৮	দোজপক্ষ	দ্বি ৫৮০
দেশবরাড়ী	দিশ্ ৫৩৬	দৈ	দা ৫৪৩	দৈহ্য	দিহ্ ৫৪৩	দোলমান	দল্ ৫১৮	দোজবরে	দ্বি ৫৮০
দেশব্যবহার	দিশ্ ৫৩৬	দৈ	দুহ্ ৫৫৬	দো	দো ৫৮০	দোলা	দল্ ৫১৮	দোটনা	দ্বি ৫৮০
দেশভাষা	দিশ্ ৫৩৬	দৈতেয়	দো ৫৬৯	দো	দ্বি ৫৮০	দোলাই	দল্ ৫১৮	দোতরফা	দ্বি ৫৮০
দেশমল্লার	দিশ্ ৫৪৩	দৈত্য	দো ৫৭১	দোআ	দুহ্ ৫৫৬	দোলান	দল্ ৫১৮	দোতার	দ্বি ৫৮০
দেশরূপ	দিশ্ ৫৩৬	দৈত্যগুরু	দো ৫৭১	দোআঁশলা	দ্বি ৫৮০	দোলায়মান	দল্ ৫১৮	দোথরি(রী)	দ্বি ৫৮০
দেশলাই	দিব্ ৫২৭	দৈত্যমাতা	দো ৫৭১	দোআ(য়া)শ	দ্বি ৫৮০	দোলিকা	দল্ ৫১৮	দোদুল	দ্বি ৫৮০
দেশা	দিশ্ ৫৪৩	দৈত্যযুগ	দো ৫৭১	দোআ(য়া)নী	দ্বি ৫৮০	দোলী	দল্ ৫১৮	দোন	দ্বি ৫৮০
দেশাকা	দিশ্ ৫৪৩	দৈত্যসেনা	দো ৫৬৯	দোআপরি	দ্বি ৫৮০	দোলিত	দল্ ৫১৮	দোনা	দ্বি ৫৮০
দেশাখী	দিশ্ ৫৪৩	দৈত্যারি	দো ৫৬৯	দোউড়	দু ৫৪৬	দোষ	দু ৫৫৫	দোনামনা	দ্বি ৫৮০
দেশান্তর	দিশ্ ৫৩৬	দৈত্যেন্দ্র	দো ৫৬৯	দোঁহ	দ্বি ৫৮০	দোষগ্রাহী	দু ৫৪৬	দোনো	দ্বি ৫৮০
দেশান্তরী	দিশ্ ৫৩৬	দৈত্যেন্দ্রাণী	দো ৫৬৯	দোঁহু	দ্বি ৫৮০	দোষঘ্ন	দু ৫৪৬	দোনর	দ্বি ৫৮০
দেশিক	দিশ্ ৫৪২	দৈত্যেশ	দো ৫৬৯	দোঁহাকার	দ্বি ৫৮০	দোষজ্ঞ	দু ৫৪৬	দোনলা	দ্বি ৫৮০
দেশিকোত্তম	দিশ্ ৫৪২	দৈত্যেশ্বর	দো ৫৬৯	দোঁহার	দ্বি ৫৮০	দোষত্রয়	দু ৫৪৬	দোপর্দা	দ্বি ৫৮০
দেশিত	দিশ্ ৫৪২	দৈনন্দিন	দো ৫৭২	দোঁহ্	দ্বি ৫৮০	দোষদৃষ্টি	দু ৫৪৬	দোপাট	দ্বি ৫৮০
দেশিনী	দিশ্ ৫৪২	দৈন্য	দী ৫৪৫	দোঁহাকার	দ্বি ৫৮০	দোষবান	দু ৫৪৬	দোপাটা	দ্বি ৫৮০
দেশী	দিশ্ ৫৪২	দৈন্য	দো ৫৭৪	দোঁহে	দ্বি ৫৮০	দোষভাক্	দু ৫৪৬	দোপাটি	দ্বি ৫৮০
দেশীয়	দিশ্ ৫৪২	দৈব	দিব্ ৫৩৬	দোঃ	দং ৫১০	দোষল	দু ৫৪৬	দোপিলে	দ্বি ৫৮০
দেশোয়ালী	দিশ্ ৫৩৬	দৈবক	দিব্ ৫২৭	দোকান	দো ৫৮২	দোষা	দু ৫৪৬	দোফলা	দ্বি ৫৮০
দেশ্য	দিশ্ ৫৪২	দৈবকর্ম্ম	দিব্ ৫২৭	দোকানদানি	দো ৫৮২	দোষাকর	দু ৫৪৬	দোফাঁক	দ্বি ৫৮০
দেষ্য	দ্বি ৫৮০	দৈবকী	দিব্ ৫২৭	দোকানদার	দো ৫৮২	দোষাতন	দু ৫৪৬	দোফাল	দ্বি ৫৮০
দেষ্ট	দিশ্ ৫৪২	দৈবকৃত	দিব্ ৫২৭	দোখ্‌নে	দক্ষ ৫০২	দোষারোপ	দু ৫৪৬	দোফালা	দ্বি ৫৮০
দেষ্টা	দ্বি ৫৮০	দৈবচিন্তক	দিব্ ৫২৭	দোখ	দু ৫৪৬	দোষাবহ	দু ৫৪৬	দোবজা	দ্বি ৫৮০
দেহ	দিহ্ ৫৪৪	দৈবজ্ঞ	দিব্ ৫৩৬	দোগ্ধা	দুহ্ ৫৫৬	দোষী	দু ৫৪৬	দোবুজান	দ্বি ৫৮০
দেহকর্ত্তা	দিহ্ ৫৪৩	দৈবত	দিব্ ৫২৭	দোতি(তী)	দু ৫৪৬	দোস্ত	দ ৫৮৪	দোবারা	দ্বি ৫৮০
দেহকোষ	দিহ্ ৫৪৩	দৈবতন্ত্র	দিব্ ৫২৭	দোদুল	দো ৫৮২	দোহ	দুহ্ ৫৫৮	দোবে	দ্বি ৫৮০
দেহগত	দিহ্ ৫৪৩	দৈবতীর্থ	দিব্ ৫২৭	দোদুল্যমান	দো ৫৮২	দোহদ	দুহ্ ৫৫৯	দোভাজা	দ্বি ৫৮০
দেহজ	দিহ্ ৫৪৩	দৈবত্য	দিব্ ৫২৭	দোন	দ্রু ৫৭৫	দোহন	দুহ্ ৫৫৮	দোভাষী	দ্বি ৫৮০
দেহড়ী	দিব্ ৫২৭	দৈববশ	দিব্ ৫২৭	দোনা	দ্রু ৫৭৫	দোহল	দুহ্ ৫৫৬	দোমহলা	দ্বি ৫৮০
দেহতত্ত্ব	দিহ্ ৫৪৩	দৈবযজ্ঞ	দিব্ ৫২৭	দোপটে	দু ৫৪৬	দোহলা	দুহ্ ৫৫৬	দোমালা	দ্বি ৫৮০
দেহবান	দিহ্ ৫৪৩	দৈবযোগ	দিব্ ৫২৭	দোপট্টে	দু ৫৪৬	দোহা	দুহ্ ৫৫৬	দোমেটে	দ্বি ৫৮০
দেহভাক্	দিহ্ ৫৪৩	দৈবলেখক	দিব্ ৫২৭	দোমড়ান	দং ৫১০	দোহাই	দুহ্ ৫৫৮	দোয়জ	দ্বি ৫৮০
দেহন্তর	দিহ্ ৫৪৩	দৈববাণী	দিব্ ৫২৭	দোয়া	দুহ্ ৫৫৬	দোহান	দুহ্ ৫৫৬	দোয়া	দ্বি ৫৮০
দেহযাত্রা	দিহ্ ৫৪৩	দৈবাৎ	দিব্ ৫৩৬	দোয়াত	দ ৫৮৪	দোহার	দ্বি ৫৮০	দোয়াব	দ্বি ৫৮০
দেহরক্ষা	দিহ্ ৫৪৩	দৈবান্ত	দিব্ ৫২৭	দোয়াদরুদ	দুহ্ ৫৫৬	দোকতা	দ্বি ৫৮০	দোয়ার(রি)	দ্বি ৫৮০
দেহরা	দিব্ ৫২৭	দৈবাত্যয়	দিব্ ৫২৭	দোয়েল	দ ৫৮৪	দোকর	দ্বি ৫৮০	দোর	দ্বি ৫৮৩
দেহলি	দিহ্ ৫৪৩	দৈবায়ত্ত	দিব্ ৫২৭	দোরুস্ত	দ ৫৮৪	দোকলা	দ্বি ৫৮০	দোরোখা	দ্বি ৫৮০
দেহলী	দিহ্ ৫৪৩	দৈবাসুর	দিব্ ৫২৭	দোর্দণ্ড	দু ৫৪৬	দোকা	দ্বি ৫৮০	দোশালা	দ্বি ৫৮০
দেহাত্মপ্রত্যয়	দিহ্ ৫৪৩	দৈবাহোরাত্র	দিব্ ৫২৭	দোল	দল্ ৫১৮	দোকাটি	দ্বি ৫৮০	দোষর(রি)	দ্বি ৫৮০
দেহাত্মবাদ	দিহ্ ৫৪৩	দৈবিক	দিব্ ৫২৭	দোলই	দল্ ৫১৮	দোকাঠি	দ্বি ৫৮০	দোসর	দ্বি ৫৮০
দেহান্তর	দিহ্ ৫৪৩	দৈবোপহত	দিব্ ৫২৭	দোলক	দল্ ৫১৮	দোকান	দ্বি ৫৮০	দোসরি(রী)	দ্বি ৫৮০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
দোসুট	দ্বি ৫৮০	দ্যুতিকর	দ্যুৎ ৫৭২	দ্রবিড়	দ্রু ৫৭৬	দ্রোণদুঘা	দ্রু ৫৭৫	দ্বারস্থ	দ্বি ৫৮০
দোসু(সৃ)তি	দ্বি ৫৮০	দ্যুতিত	দ্যুৎ ৫৭২	দ্রবিণ	দ্রু ৫৭৫	দ্রোণাচার্য্য	দ্রু ৫৭৫	দ্বারা	দ্বি ৫৮৩
দোস্ত	দ্বি ৫৮০	দ্যুতিমান	দ্যুৎ ৫৭২	দ্রবিত	দ্রু ৫৭৫	দ্রোণায়ণ	দ্রু ৫৭৫	দ্বারাধিপ	দ্বি ৫৮০
দোহ	দ্বি ৫৮০	দ্যুনিবাস	দিব্ ৫২৭	দ্রবীকরণ	দ্রু ৫৭৫	দ্রোণায়নি	দ্রু ৫৭৫	দ্বারাধ্যক্ষ	দ্বি ৫৮০
দোহর	দ্বি ৫৮০	দ্যুনিবাসী	দিব্ ৫২৭	দ্রবীভূত	দ্রু ৫৭৫	দ্রোণি	দ্রু ৫৭৭	দ্বারাবতী	দ্বি ৫৮০
দোহরী	দ্বি ৫৮০	দ্যুমণি	দিব্ ৫২৭	দ্রব্য	দ্রু ৫৭৬	দ্রোনী	দ্রু ৫৭৭	দ্বারায়	দ্বি ৫৮০
দোহা	দুহ্ ৫৫৮	দ্যুমৎসেন	দিব্ ৫২৭	দ্রব্যক	দ্রু ৫৭৫	দ্রোহ	দ্রুহ্ ৫৮০	দ্বারিক	দ্বি ৫৮০
দোহাতিয়া	দ্বি ৫৮০	দ্যুম্ন	দিব্ ৫২৭	দ্রব্যগুণ	দ্রু ৫৭৫	দ্রোহকারী	দ্রুহ্ ৫৭৯	দ্বারিকা	দ্বি ৫৮৩
দোহার	দ্বি ৫৮০	দ্যুলোক	দিব্ ৫২৭	দ্রব্যজাত	দ্রু ৫৭৫	দ্রোহী	দ্রুহ্ ৫৮০	দ্বারিকানাথ	দ্বি ৫৮০
দোহার	দ্বি ৫৮০	দ্যুষৎ(দ্)	দিব্ ৫২৭	দ্রব্যবাচক	দ্রু ৫৭৫	দ্রৌণি	দ্রু ৫৭৫	দ্বারিকাপতি	দ্বি ৫৮০
দোহারী	দ্বি ৫৮০	দ্যুসৎ(দ্)	দিব্ ৫২৭	দ্রব্যবান	দ্রু ৫৭৫	দ্রৌপদী	দ্রু ৫৭৮	দ্বারী	দ্বি ৫৮০
দোহাল	দুহ্ ৫৫৬	দ্যূত	দিব্ ৫২৭	দ্রব্যময়	দ্রু ৫৭৬	দ্রৌপদেয়	দ্রু ৫৭৫	দ্বারুক	দ্বি ৫৮০
দোহ্য	দুহ্ ৫৫৬	দ্যূতকর	দিব্ ৫২৭	দ্রব্যশুদ্ধি	দ্রু ৫৭৫	দ্বন্দ্ব	দ্বি ৫৮২	দ্বারে	দ্বি ৫৮০
দৌ	দ্বি ৫৮০	দ্যূতকার	দিব্ ৫২৭	দ্রব্যসংস্কার	দ্রু ৫৭৬	দ্বন্দ্বচর	দ্বি ৫৮০	দ্বারেতে	দ্বি ৫৮০
দৌউত্র	দুহ্ ৫৫৬	দ্যূতকারক	দিব্ ৫২৭	দ্রম্ম	দ্ ৫৮৪	দ্বন্দ্বচারী	দ্বি ৫৮০	দ্বা(দ্বি)ষষ্টি	দ্বি ৫৮০
দৌড়	দু ৫৫৫	দ্যূতকৃৎ	দিব্ ৫২৭	দ্রষ্টব্য	দৃশ্ ৫৬৬	দ্বন্দ্বজ	দ্বি ৫৮০	দ্বা(দ্বি)সপ্ততি	দ্বি ৫৮০
দৌড়া	দু ৫৪৬	দ্যূতকিঙ্করী	দিব্ ৫২৭	দ্রষ্টা	দৃশ্ ৫৬৬	দ্বন্দ্বভূত	দ্বি ৫৮০	দ্বি	দ্বি ৫৮০
দৌড়াদৌড়ি	দু ৫৫৫	দ্যূতক্রীড়া	দিব্ ৫২৭	দ্রা	দ্রা ৫৭৪	দ্বন্দ্বাতীত	দ্বি ৫৮০	দ্বিক	দ্বি ৫৮০
দৌত্য	দু ৫৪৬	দ্যূতগৃহ	দিব্ ৫২৭	দ্রাক্	দ্রা ৫৭৪	দ্বয়	দ্বি ৫৮২	দ্বিখগ	দ্বি ৫৮০
দৌবারিক	দ্বি ৫৮০	দ্যূতপূর্ণিমা	দিব্ ৫২৭	দ্রাক্ষা	দ্রা ৫৭৪	দ্বাঃ	দ্বি ৫৮০	দ্বিগু	দ্বি ৫৮৩
দৌযাম	দ্বি ৫৮০	দ্যূতপৌর্ণমাসী	দিব্ ৫২৭	দ্রাঘিমা	দৃ ৫৬০	দ্বা(দ্বি)চত্বারিংশৎ	দ্বি ৫৮০	দ্বিগুণ	দ্বি ৫৮০
দৌরাজ্য	দু ৫৪৬	দ্যূতবীজ	দিব্ ৫২৭	দ্রাণ	দ্রা ৫৭৪	দ্বাত্রিংশৎ	দ্বি ৫৮০	দ্বিচারিণী	দ্বি ৫৮০
দৌরাত্ম্য	দু ৫৪৬	দ্যূতবৃত্তি	দিব্ ৫২৭	দ্রাব	দ্রু ৫৭৫	দ্বাত্রিংশল্লক্ষণ	দ্বি ৫৮০	দ্বিজ	দ্বি ৫৮৩
দৌর্গত্য	দু ৫৪৬	দ্যূতসভা	দিব্ ৫২৭	দ্রাবক	দ্রু ৫৭৫	দ্বাদশ	দ্বি ৫৮০	দ্বিজ	জন্ ৩৭৮
দৌর্গন্ধ্য	দু ৫৪৬	দ্যূতসমাজ	দিব্ ৫২৭	দ্রাবণ	দ্রু ৫৭৫	দ্বাদশবার্ষিক	দ্বি ৫৮০	দ্বিজকুল	দ্বি ৫৮০
দৌর্জন্য	দু ৫৪৬	দ্যো	দ্যুৎ ৫৭২	দ্রাবিকা	দ্রু ৫৭৫	দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র	দ্বি ৫৮০	দ্বিজদাস	দ্বি ৫৮০
দৌর্ব্বল্য	দু ৫৪৬	দ্যোত	দ্যুৎ ৫৭২	দ্রাবিড়	দ্রু ৫৭৬	দ্বাদশাঙ্গুল	দ্বি ৫৮০	দ্বিজদেব	দ্বি ৫৮০
দৌর্ভাগ্য	দু ৫৪৬	দ্যোতন	দ্যুৎ ৫৭২	দ্রাবিড়ী	দ্রু ৫৭৬	দ্বাদশাদিত্য	দ্বি ৫৮০	দ্বিজধর্ম্মী	দ্বি ৫৮০
দৌভ্রাত্র	দু ৫৪৬	দ্যোতনা	দ্যুৎ ৫৭২	দ্রাবিত	দ্রু ৫৭৫	দ্বা(দ্বি)নবতি	দ্বি ৫৮০	দ্বিজন্মা	দ্বি ৫৮০
দৌর্মনস্য	দু ৫৪৬	দ্যোতনিকা	দ্যুৎ ৫৭২	দ্রু	দ্রু ৫৭৫	দ্বা(দ্বি)পঞ্চাশৎ	দ্বি ৫৮০	দ্বিজপতি	দ্বি ৫৮০
দৌহার্দ	দু ৫৪৬	দ্যোতমান	দ্যুৎ ৫৭২	দ্রুঘণ(ন)	দ্রু ৫৭৫	দ্বাপর	দ্বি ৫৮৩	দ্বিজপ্রিয়া	দ্বি ৫৮০
দৌর্হৃদয়	দু ৫৪৬	দ্যোতি	দ্যুৎ ৫৭২	দ্রুণ	দ্রু ৫৭৫	দ্বাবিংশতি	দ্বি ৫৮০	দ্বিজবন্ধু	দ্বি ৫৮০
দৌলত	দিব্ ৫২৭	দ্যোতিত	দ্যুৎ ৫৭২	দ্রুত	দ্রু ৫৭৬	দ্বার	দ্বি ৫৮৩	দ্বিজবাহন	দ্বি ৫৮০
দৌশ্চর্ম্ম	দু ৫৪৬	দ্যোতী	দ্যুৎ ৫৭২	দ্রুতগতি	দ্রু ৫৭৫	দ্বারক	দ্বি ৫৮৩	দ্বিজমণি	দ্বি ৫৮০
দৌষ্মন্ত	দু ৫৪৬	দ্রংষ্ট্রা	দং ৫১০	দ্রুতপদ	দ্রু ৫৭৫	দ্বারকা	দ্বি ৫৮৩	দ্বিজরাজ	দ্বি ৫৮০
দৌহিত্র	দুহ্ ৫৫৬	দ্রকট	দ্ ৫৮৪	দ্রুপদ	দ্রু ৫৭৭	দ্বারগোপ	দ্বি ৫৮০	দ্বিজলিঙ্গা	দ্বি ৫৮০
দ্যাত্মবাদী	দ্বি ৫৮০	দ্রগড়	দ্ ৫৮৪	দ্রুম	দ্রু ৫৭৬	দ্বারনায়ক	দ্বি ৫৮০	দ্বিজলিঙ্গী	দ্বি ৫৮০
দ্যাবাক্ষমা	দিব্ ৫২৭	দ্রঢ়িমা	দৃ ৫৬০	দ্রুমময়	দ্রু ৫৭৫	দ্বারপট্ট	দ্বি ৫৮০	দ্বিজসেবক	দ্বি ৫৮০
দ্যাবাপৃথিবী	দিব্ ৫২৭	দ্রব	দ্রু ৫৭৬	দ্রুহ্	দ্রুহ্ ৫৭৯	দ্বারপাল	দ্বি ৫৮০	দ্বিজা	দ্বি ৫৮৩
দ্যাবাভূমি	দিব্ ৫২৭	দ্রবকারক	দ্রু ৫৭৫	দ্রুহিণ	দ্রুহ্ ৫৭৯	দ্বারপিণ্ডী	দ্বি ৫৮০	দ্বিজাগ্র্য	দ্বি ৫৮০
দ্যামুষ্যায়ণ	দ্বি ৫৮০	দ্রবজ	দ্রু ৫৭৫	দ্রুহ্য	দ্রুহ্ ৫৭৯	দ্বারপিধান	দ্বি ৫৮০	দ্বিজাতি	দ্বি ৫৮০
দ্যামুষ্যায়ণক	দ্বি ৫৮০	দ্রবণ	দ্রু ৫৭৬	দ্রূহ্য	দ্রুহ্ ৫৭৯	দ্বার(রা)বতী	দ্বি ৫৮৩	দ্বিজিহ্ব	দ্বি ৫৮০
দ্যু	দিব্ ৫২৭	দ্রবময়ী	দ্রু ৫৭৫	দ্রোণ	দ্রু ৫৭৭	দ্বারবান	দ্বি ৫৮৩	দ্বিজেন্দ্র	দ্বি ৫৮০
দ্যুৎ	দ্যুৎ ৫৭২	দ্রবরস	দ্রু ৫৭৫	দ্রোণকাক	দ্রু ৫৭৭	দ্বারবাহ	দ্বি ৫৮০	দ্বিজেশ	দ্বি ৫৮০
দ্যুতি	দ্যুৎ ৫৭২	দ্রবরসা	দ্রু ৫৭৫	দ্রোণক্ষীরা	দ্রু ৫৭৫	দ্বারযন্ত্র	দ্বি ৫৮০	দ্বিজেশ্বর	দ্বি ৫৮০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
দ্বিজোত্তম	দ্বি ৫৮০	দ্বিসহস্র	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যশীতি	দ্বি ৫৮০	ধনকাম	ধন্ ৫৮৭	ধনুর্দ্ধর	ধন্ ৫৮৯
দ্বিট্(ষ্)	দ্বি ৫৮০	দ্বিহায়ন	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যহ	দ্বি ৫৮০	ধনকুবের	ধন্ ৫৮৭	ধনুর্বিদ্যা	ধন্ ৫৮৭
দ্বিতয়	দ্বি ৫৮০	দ্বিহায়নী	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যহীন	দ্বি ৫৮০	ধনজাত	ধন্ ৫৮৭	ধনুর্ব্বেদ	ধন্ ৫৮৭
দ্বিতীয়	দ্বি ৫৮০	দ্বিহীন	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যাত্মক	দ্বি ৫৮০	ধনঞ্জয়	ধন্ ৫৮৭	ধনুর্ভৃৎ	ধন্ ৫৮৭
দ্বিতীয়বান	দ্বি ৫৮০	দ্বিহৃদয়া	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যেকান্তরা	দ্বি ৫৮০	ধনদ	ধন্ ৫৮৭	ধনুর্মথ	ধন্ ৫৮৭
দ্বিতীয়া	দ্বি ৫৮০	দ্বীপ	দ্বি ৫৮৪			ধনদণ্ড	ধন্ ৫৮৭	ধনুর্মধ্য	ধন্ ৫৮৭
দ্বিতীয়াশ্রম	দ্বি ৫৮০	দ্বীপবতী	দ্বি ৫৮৪	**ধ**		ধনদণ্ড	দং ৫১০	ধনুষ্টঙ্কার	ধন্ ৫৮৭
দ্বিত্র	দ্বি ৫৮০	দ্বীপিনখ	দ্বি ৫৮৪			ধনদাতা	ধন্ ৫৮৭	ধনুষ্পাণি	ধন্ ৫৮৭
দ্বিত্ব	দ্বি ৫৮০	দ্বীপী	দ্বি ৫৮৪	ধ	— ৫৮৪	ধনদৌলত	ধন্ ৫৮৭	ধনুষ্মান	ধন্ ৫৮৭
দ্বিদল	দ্বি ৫৮০	দ্বেষ	দ্বি ৫৮০	ধ	ধক্ ৫৮৫	ধনপতি	ধন্ ৫৮৮	ধনেশ	ধন্ ৫৮৭
দ্বিদশ	দ্বি ৫৮০	দ্বেষী	দ্বি ৫৮০	ধ	ধা ৫৮৫	ধনপাল	ধন্ ৫৮৭	ধনেশ্বর	ধন্ ৫৮৭
দ্বিধা	দ্বি ৫৮০	দ্বৈকালিক	দ্বি ৫৮০	ধ	ধ্যৈ ৬১৫	ধনপিশাচ	ধন্ ৫৮৭	ধনৈষী	ধন্ ৫৮৭
দ্বিধা	ধা ৬০০	দ্বৈগুণিক	দ্বি ৫৮০	ধওলা	ধু ৬০১	ধনপিশাচিকা	ধন্ ৫৮৭	ধন্দ	ধু ৬০১
দ্বিপ	দ্বি ৫৮৪	দ্বৈত	দ্বি ৫৮০	ধক্	ধক্ ৫৮৫	ধনপ্রয়োগ	ধন্ ৫৮৭	ধন্দ	দ্বি ৫৮০
দ্বিপথ	দ্বি ৫৮০	দ্বৈতবন	দ্বি ৫৮০	ধকড়িয়া	ধক্ ৫৮৫	ধনবতী	ধন্ ৫৮৭	ধন্না	ধৃ ৬০৬
দ্বিপদ	দ্বি ৫৮০	দ্বৈতবাদ	দ্বি ৫৮০	ধকধক	ধক্ ৫৮৫	ধনবন্ত	ধন্ ৫৮৭	ধন্য	ধন্ ৫৮৭
দ্বিপাদ	দ্বি ৫৮০	দ্বৈতাদ্বৈতবাদ	দ্বি ৫৮০	ধকধকি	ধক্ ৫৮৫	ধনবান	ধন্ ৫৮৭	ধন্যা	ধন্ ৫৮৭
দ্বিপায়ী	দ্বি ৫৮০	দ্বৈতী	দ্বি ৫৮০	ধকধ্বক	ধক্ ৫৮৫	ধনশ্রী	ধন্ ৫৮৭	ধন্যাক	ধা ৫৯০
দ্বিপেন্দ্র	দ্বি ৫৮০	দ্বৈতীয়ীক	দ্বি ৫৮০	ধকল	ধক্ ৫৮৫	ধনসম্পত্তি	ধন্ ৫৮৭	ধন্ব	ধন্ ৫৮৯
দ্বিবচন	দ্বি ৫৮০	দ্বৈধ	দ্বি ৫৮০	ধ-কার	ধক্ ৫৮৫	ধনস্থান	ধন্ ৫৮৭	ধন্বদুর্গ	ধন্ ৫৮৯
দ্বিবর্ষ	দ্বি ৫৮০	দ্বৈধীকৃত	দ্বি ৫৮০	ধকোধকো	ধক্ ৫৮৫	ধনাধিকারী	ধন্ ৫৮৭	ধন্বন্তরী	ধন্ ৫৮৯
দ্বিবার্ষিক	দ্বি ৫৮০	দ্বৈধীভাব	দ্বি ৫৮০	ধক্ক	ধক্ ৫৮৫	ধনাধিপ	ধন্ ৫৮৭	ধন্বন্য	ধন্ ৫৮৭
দ্বিবিধ	দ্বি ৫৮০	দ্বৈধীভূত	দ্বি ৫৮০	ধক্কধক্ক	ধক্ ৫৮৫	ধনাধিপতি	ধন্ ৫৮৭	ধন্বা	ধন্ ৫৮৯
দ্বিভুজ	দ্বি ৫৮০	দ্বৈপ	দ্বি ৫৮০	ধট	ধক্ ৫৮৫	ধনাধ্যক্ষ	ধন্ ৫৮৭	ধন্বী	ধন্ ৫৮৯
দ্বিভূম	দ্বি ৫৮০	দ্বৈপায়ন	দ্বি ৫৮৪	ধটি	ধক্ ৫৮৫	ধনাপহার	ধন্ ৫৮৭	ধপ	ধু ৬০১
দ্বিমাতৃক	দ্বি ৫৮০	দ্বৈবর্ষিক	দ্বি ৫৮০	ধটিকা	ধক্ ৫৮৫	ধনার্চ্চিত	ধন্ ৫৮৭	ধপধপ	ধু ৬০১
দ্বিমাত্র	দ্বি ৫৮০	দ্বৈবিধ্য	দ্বি ৫৮০	ধটী	ধক্ ৫৮৫	ধনার্থী	ধন্ ৫৮৭	ধপধপে	ধু ৬০১
দ্বিমুখ	দ্বি ৫৮০	দ্বৈমাতুর	দ্বি ৫৮০	ধড়	ধক্ ৫৮৫	ধনাশা	ধন্ ৫৮৭	ধপাৎ	ধু ৬০১
দ্বিমূর্দ্ধ	দ্বি ৫৮০	দ্বৈমাতৃক	দ্বি ৫৮০	ধড়ফড়	ধক্ ৫৮৫	ধনি	ধন্ ৫৮৮	ধপাস	ধু ৬০১
দ্বিরথ	দ্বি ৫৮০	দ্বৈরথ	দ্বি ৫৮০	ধড়ফড়া	ধক্ ৫৮৫	ধনিক	ধন্ ৫৮৮	ধব	ধু ৬০২
দ্বিরদ	দ্বি ৫৮০	দ্বৌ	দ্বি ৫৮০	ধড়ফড়ি	ধক্ ৫৮৫	ধনিন	ধন্ ৫৮৭	ধবধব	ধু ৬০১
দ্বিরাগমন	দ্বি ৫৮০	দ্বৌকালীনজ্বর	দ্বি ৫৮০	ধড়ফড়ে	ধক্ ৫৮৫	ধনিয়া	ধন্ ৫৮৭	ধবধবে	ধু ৬০১
দ্বিরুক্ত	দ্বি ৫৮০	দ্বৌবারিণী	দ্বি ৫৮০	ধড়মড়	ধক্ ৫৮৫	ধনিষ্ঠ	ধন্ ৫৮৮	ধবল	ধু ৬০২
দ্বিরুক্তি	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যক্ষ	দ্বি ৫৮০	ধড়া	ধক্ ৫৮৫	ধনিষ্ঠা	ধন্ ৫৮৮	ধবলা	ধু ৬০১
দ্বিরূঢ়া	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যক্ষর	দ্বি ৫৮০	ধড়াধড়	ধক্ ৫৮৫	ধনী	ধন্ ৫৮৮	ধবলিত	ধু ৬০১
দ্বিরূপ	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যঙ্গুল	দ্বি ৫৮০	ধড়াধ্বড়	ধক্ ৫৮৫	ধনীয়ক	ধন্ ৫৮৮	ধবলিম	ধু ৬০১
দ্বিরেতাঃ	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যঙ্গুলি	দ্বি ৫৮০	ধড়াশ	ধক্ ৫৮৫	ধনু	ধন্ ৫৮৯	ধবলী	ধু ৬০১
দ্বিরেফ	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যঞ্জল	দ্বি ৫৮০	ধড়াস	ধক্ ৫৮৫	ধনুঃ	ধন্ ৫৮৯	ধবলোৎপল	ধু ৬০১
দ্বিলক্ষ	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যঞ্জলি	দ্বি ৫৮০	ধড়াস-ধড়াস	ধক্ ৫৮৫	ধনুক	ধন্ ৫৮৭	ধ(ধু)বিত্র	ধু ৬০১
দ্বিলক্ষণ	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যণুক	দ্বি ৫৮০	ধড়ি(ড়ী)	ধক্ ৫৮৬	ধনুকী	ধন্ ৫৮৭	ধম	ধক্ ৫৮৫
দ্বিশত	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যর্থ	দ্বি ৫৮০	ধড়িবাজ	ধক্ ৫৮৬	ধনুকী	ধন্ ৫৮৭	ধমক	ধক্ ৫৮৬
দ্বিশফ	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যর্থ	অর্থ্ ৪৩	ধড়িবাজি	ধক্ ৫৮৬	ধনুখরা	ধন্ ৫৮৭	ধমক	ইন্ধ্ ৭৮
দ্বিষ্	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যর্থক	দ্বি ৫৮০	ধৎ	ধক্ ৫৮৫	ধনুয়া	ধন্ ৫৮৭	ধমকচমক	ধক্ ৫৮৫
দ্বিষ	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যর্থক	অর্থ্ ৪৩	ধন	ধন্ ৫৮৭	ধনুর্গ্রহ	ধন্ ৫৮৭	ধমকা	ধক্ ৫৮৬
দ্বিষ্ট	দ্বি ৫৮০	দ্ব্যর্থবোধক	অর্থ্ ৪৩	ধনকাঙ্গালি	ধন্ ৫৮৭	ধনুর্জ্যা	ধন্ ৫৮৭	ধমকান	ধক্ ৫৮৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ধমকানি	ধক্ ৫৮৬	ধর্ম্মঘট	ধৃ ৬১০	ধর্ম্মময়	ধৃ ৬০৬	ধর্ষিতা	ধৃ ৬১৩	ধাড়ী	ধাব্ ৬০১
ধমধম	ধক্ ৫৮৫	ধর্ম্মঘট	ঘট্ ৩০৪	ধর্ম্মমূল	ধৃ ৬০৬	ধর্ষী	ধৃ ৬১৩	ধাড়ী	ধা ৫৯০
ধমন	ধক্ ৫৮৫	ধর্ম্মচক্র	ধৃ ৬১০	ধর্ম্মযুগ	ধৃ ৬০৬	ধস	ধু ৬০১	ধাত	ধা ৫৯০
ধমনি(নী)	ধক্ ৫৮৫	ধর্ম্মচর্য্যা	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মরতি	ধৃ ৬০৬	ধসা	ধু ৬০১	ধাতকী	ধা ৫৯০
ধম্বল	ধক্ ৫৮৫	ধর্ম্মচারী	ধৃ ৬১০	ধর্ম্মরথ	ধৃ ৬০৬	ধস	ধু ৬০১	ধাতা	ধা ৫৯৬
ধম্মিল	ধক্ ৫৮৫	ধর্ম্মজ	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মরাজ	ধৃ ৬১২	ধসকা	ধু ৬০১	ধাতু	ধা ৫৯৭
ধম্মিল্ল	ধক্ ৫৮৫	ধর্ম্মজন্মা	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মরায়	ধৃ ৬১২	ধসধস	ধু ৬০১	ধাতুকুশল	ধা ৫৯৭
ধর	ধৃ ৬০৭	ধর্ম্মজাত	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মরোধী	ধৃ ৬০৬	ধস্তাধস্তি	ধু ৬০১	ধাতুক্ষয়	ধা ৫৯০
ধরণ	ধৃ ৬০৭	ধর্ম্মজিজ্ঞাসা	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মলক্ষণ	ধৃ ৬০৬	ধা	ধা ৫৯০	ধাতুগত	ধা ৫৯০
ধরণছাড়ন	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মজীবন	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মলোপ	ধৃ ৬০৬	ধাই	ধা ৫৯০	ধাতুঘটিত	ধা ৫৯০
ধরণধারণ	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মজ্ঞ	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মশালা	ধৃ ৬১২	ধাই	ধাব্ ৬০১	ধাতুঘ্ন	ধা ৫৯০
ধরণি	ধৃ ৬০৭	ধর্ম্মণ	ধৃ ৬১০	ধর্ম্মশাসন	ধৃ ৬১২	ধাউড়	ধাব্ ৬০১	ধাতুদ্রাবক	ধা ৫৯০
ধরণী	ধৃ ৬০৭	ধর্ম্মতলা	ধৃ ৬১০	ধর্ম্মশাস্ত্র	ধৃ ৬১২	ধাউড়ি	ধাব্ ৬০১	ধাতুনাশন	ধা ৫৯০
ধরণীকীলক	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মতাত	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মশীল	ধৃ ৬০৬	ধাউড়িয়া	ধাব্ ৬০১	ধাতুপ	ধা ৫৯০
ধরণীজ	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মদান	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মষাঁড়	ধৃ ৬১৩	ধাউত	ধা ৫৯০	ধাতুপাঠ	ধা ৫৯৭
ধরণীতল	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মদার	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মসংহিতা	ধৃ ৬০৬	ধাউতালি	ধা ৫৯০	ধাতুপুষ্টি	ধা ৫৯০
ধরণীধর	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মদ্রবী	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মসঙ্গীতি	ধৃ ৬০৬	ধাউনী	ধাব্ ৬০১	ধাতুবাদ	ধা ৫৯৭
ধরণীপতি	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মদ্রোহী	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মসভা	ধৃ ৬০৬	ধাউস	ধৃ ৬১৯	ধাতুবাদী	ধা ৫৯৭
ধরণীপুত্র	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মধ্বজ	ধৃ ৬১০	ধর্ম্মসহায়	ধৃ ৬০৬	ধাওয়া	ধাব্ ৬০১	ধাতুবৈরী	ধা ৫৯৭
ধরণীশ্বর	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মধ্বজী	ধৃ ৬১১	ধর্ম্মসাবর্ণি	ধৃ ৬০৬	ধাওয়াধাই	ধাব্ ৬০১	ধাতুময়	ধা ৫৯০
ধরণীসূত	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মনন্দন	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মসার	ধৃ ৬০৬	ধাওয়াধাঞি	ধাব্ ৬০১	ধাতুমল	ধা ৫৯০
ধরতা	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মনাশ	ধৃ ৬১১	ধর্ম্মসুত	ধৃ ৬০৬	ধাঁ	ধাব্ ৬০১	ধাতুমান	ধা ৫৯০
ধরনা	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মনিষ্ঠ	ধৃ ৬১১	ধর্ম্মসূত্র	ধৃ ৬০৬	ধাঁউধাঁউ	ধাব্ ৬০১	ধাতুমারী	ধা ৫৯৭
ধরপাকড়	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মনিষ্পত্তি	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মসেতু	ধৃ ৬০৬	ধাঁওধাঁও	ধাব্ ৬০১	ধাতুরস	ধা ৫৯০
ধরম	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মপত্নী	ধৃ ৬১১	ধর্ম্মাচার্য	ধৃ ৬০৬	ধাঁঙধাঁঙ	ধাব্ ৬০১	ধাতুশোধন	ধা ৫৯০
ধরা	ধৃ ৬০৭	ধর্ম্মপর	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মাত্মা	ধৃ ৬০৬	ধাঁচ	ধক্ ৫৮৫	ধাতুসাম্য	ধা ৫৯০
ধরাত্মজ	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মপুত্র	ধৃ ৬১১	ধর্ম্মাধিকরণ	ধৃ ৬১৩	ধাঁচা	ধক্ ৫৮৫	ধাতুহা	ধা ৫৯৭
ধরাদেব	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মপ্রবক্তা	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মাধিকার	ধৃ ৬১৩	ধাঁজ	ধক্ ৫৮৫	ধাতৃ	ধা ৫৯৬
ধরাধর	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মপ্রবচন	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মাধিষ্ঠান	ধৃ ৬১৩	ধাঁদসে	ধু ৬০১	ধাত্রিকা	ধা ৫৯০
ধরাধরি	ধৃ ৬০৭	ধর্ম্মবাণিজিক	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মাধ্যক্ষ	ধৃ ৬১৩	ধাঁদা	ধু ৬০১	ধাত্রী	ধা ৫৯০
ধরাধারক	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মবাণিজ্যিক	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মাপেত	ধৃ ৬০৬	ধাঁধাঁ	ধাব্ ৬০১	ধাত্রেয়িকা	ধা ৫৯০
ধরাবাঁধা	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মবাপ	ধৃ ৬১২	ধর্ম্মাবতার	ধৃ ৬১৩	ধাঁধা	ধু ৬০১	ধাত্রেয়ী	ধা ৫৯০
ধরামর	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মবাবা	ধৃ ৬১২	ধর্ম্মারণ্য	ধৃ ৬১৩	ধাঁধা	ধ্বি ৫৮০	ধাধস	ধু ৬০১
ধরিত্রী	ধৃ ৬০৭	ধর্ম্মবাহন	ধৃ ৬১২	ধর্ম্মাসন	ধৃ ৬১৩	ধাঁধাঁগুড়গুড়	ধু ৬০১	ধাধা	ধু ৬০১
ধরিমা	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মবিপ্লব	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মিষ্ঠ	ধৃ ৬০৬	ধাঙড়	ধৃ ৬১৯	ধান	ধা ৫৯৮
ধর্ত্তব্য	ধৃ ৬০৮	ধর্ম্মবীর	ধৃ ৬১২	ধর্ম্মী	ধৃ ৬০৬	ধাঙধাঙ	ধাব্ ৬০১	ধানক	ধা ৫৯০
ধর্ত্তা	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মবৃদ্ধ	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মেন্দ্র	ধৃ ৬১৩	ধাঙ্গড়	ধৃ ৬১৯	ধানকাটি	ধা ৫৯০
ধর্ণা	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মবৈতংসিক	ধৃ ৬১২	ধর্ম্মোত্তর	ধৃ ৬০৬	ধাঙ্গুরী	ধৃ ৬১৯	ধানভানা	ধা ৫৯০
ধর্ম্ম	ধৃ ৬০৮	ধর্ম্মব্রতা	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মোপদেশ	ধৃ ৬০৬	ধাক্কা	ধক্ ৫৮৫	ধানভানানী	ধা ৫৯০
ধর্ম্মকাম	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মভগিনী	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্ম্য	ধৃ ৬০৬	ধাগা	ধা ৫৯০	ধানা	ধা ৫৯৮
ধর্ম্মকৃৎ	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মভিক্ষুক	ধৃ ৬০৬	ধর্ষ	ধৃ ৬১৩	ধাঙসা	ধক্ ৫৮৫	ধানাইপানাই	ধা ৫৯৮
ধর্ম্মকৃত্য	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মভীরু	ধৃ ৬১২	ধর্ষক	ধৃ ৬১৩	ধাড়া	ধা ৫৯০	ধানিকা	ধা ৫৯০
ধর্ম্মকোষ	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মভৃৎ	ধৃ ৬০৬	ধর্ষণ	ধৃ ৬১৩	ধাড়া	ধাব্ ৬০১	ধানী	ধা ৫৯০
ধর্ম্মক্ষেত্র	ধৃ ৬১০	ধর্ম্মভ্রাতা	ধৃ ৬০৬	ধর্ষণী	ধৃ ৬১৩	ধাড়ি	ধা ৫৯০	ধানুকী	ধা ৫৯০
ধর্ম্মগ্রন্থ	ধৃ ৬০৬	ধর্ম্মমণি	ধৃ ৬০৬	ধর্ষিত	ধৃ ৬১৩	ধাড়ী	ধা ৫৯০	ধানুষ্ক	ধা ৫৯০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
ধান্দা	ধু ৬০১	ধায়াধাই	ধাব্ ৬০১	ধিকিধিকি	ধক্ ৫৮৬	ধীরে-সুস্থে	ধ্যৈ ৬১৬	ধুবি(বী)	ধু ৬০১
ধান্ধা	ধু ৬০১	ধার	ধৃ ৬১৩	ধিক্কার	ধক্ ৫৮৬	ধীশক্তি	ধ্যৈ ৬১৫	ধুপুস	ধু ৬০১
ধান্ন	ধা ৫৯০	ধারক	ধৃ ৬১৩	ধিক্কার	ধা ৫৯০	ধীসম্পন্ন	ধ্যৈ ৬১৫	ধুবকা	ধু ৬০১
ধান্য	ধা ৫৯৯	ধার-ধারা	ধৃ ৬১৩	ধিগ্‌দণ্ড	ধক্ ৫৮৬	ধীহারা	ধ্যৈ ৬১৫	ধুবিত্র	ধু ৬০১
ধান্যক	ধা ৫৯০	ধারণ	ধৃ ৬১৩	ধিগ্‌বাগ্‌দণ্ড	ধক্ ৫৮৬	ধু	ধু ৬০১	ধু(ধূ)ম	ধু ৬০৪
ধান্যকল্ক	ধা ৫৯০	ধারণশীল	ধৃ ৬০৬	ধিঙ্গ	ধক্ ৫৮৬	ধুআ	[illegible] ৬১৮	ধুমড়ী	ধু ৬০১
ধানকোঠা	ধা ৫৯০	ধারণা	ধৃ ৬১৩	ধিঙ্গ	দৃ ৫৬০	ধুঁক	ধু ৬০১	ধুমধড়াক্কা	ধু ৬০৪
ধান্যকোশ	ধা ৫৯০	ধারণীয়	ধৃ ৬১৩	ধিঙ্গধিঙ্গ	দৃ ৫৬০	ধুঁএল	ধু ৬০১	ধুমধাম	ধু ৬০৪
ধান্যকোষ	ধা ৫৯০	ধারয়	ধৃ ৬০৬	ধিঙ্গধিঙ্গ	ধক্ ৫৮৫	ধুঁত(থ)রা	ধু ৬০১	ধুমধুম	ধু ৬০১
ধান্যকোষ্ঠক	ধা ৫৯০	ধারয়িষ্ণু	ধৃ ৬০৬	ধিঙ্গি	দৃ ৫৬০	ধুঁদুল	ধু ৬০১	ধুমধুমি	ধু ৬০১
ধান্যক্ষেত্র	ধা ৫৯০	ধারা	ধৃ ৬১৪	ধিঙ্গী	ধক্ ৫৮৬	ধুঁধুরি	ধু ৬০১	ধুমসা	ধু ৬০১
ধান্যখল	ধা ৫৯০	ধারাকদম্ব	ধৃ ৬০৬	ধিৎকার	ধক্ ৫৮৫	ধুঁয়া	ধু ৬০১	ধুমসো	ধু ৬০১
ধান্যত্বক	ধা ৫৯০	ধারাগৃহ	ধৃ ৬০৬	ধিধি	ধ্ ৬১৯	ধুক	ধু ৬০১	ধুমুল	ধু ৬০১
ধান্যপঞ্চক	ধা ৫৯০	ধারাধর	ধৃ ৬০৬	ধিনতা	ধ্ ৬১৯	ধুকধুক	ধু ৬০১	ধুয়া	ধু ৬০১
ধান্যবর্দ্ধন	ধা ৫৯০	ধারানী	ধৃ ৬০৬	ধিনধিন	ধ্ ৬১৯	ধুকধুকি	ধু ৬০১	ধুরন্ধর	ধু ৬০৪
ধান্যবীজ	ধা ৫৯০	ধারানিপাত	ধৃ ৬০৬	ধিনিকধিনিক	ধ্ ৬১৯	ধুকনি	ধু ৬০১	ধুরন্ধর	ধৃ ৬০১
ধান্যশীর্ষক	ধা ৫৯০	ধারাপাত	ধৃ ৬১৪	ধিনিকিধিনিকি	ধ্ ৬১৯	ধুকপুক	ধু ৬০১	ধুরপদ	ধু ৬০১
ধান্যশূক	ধা ৫৯০	ধারাবর্ত	ধৃ ৬০৬	ধিনিধিনি	ধ্ ৬১৯	ধুকপুকুনি	ধু ৬০১	ধুরা	ধু ৬০১
ধান্যসার	ধা ৫৯০	ধারাবর্ষণ	ধৃ ৬০৬	ধিম্ব	ধ্ ৬১৯	ধুকুধুকু	ধু ৬০১	ধুরীণ	ধু ৬০১
ধান্যা	ধা ৫৯০	ধারাবাহিক	ধৃ ৬১৪	ধিমধিম	ধ্ ৬১৯	ধুক্ষ্	ধু ৬০১	ধুরীয়	ধু ৬০১
ধান্যাস্থি	ধা ৫৯০	ধারাযন্ত্র	ধৃ ৬০৬	ধিমা	ধ্ ৬১৯	ধুক্ষিত	ধু ৬০১	ধুর্ব্ব	ধু ৬০১
ধান্যেশ্বরী	ধা ৫৯০	ধারাল(লো)	ধৃ ৬১৪	ধিমাতাল	ধ্ ৬১৯	ধুস্তা	ধু ৬০১	ধুর্য্য	ধু ৬০১
ধাপ	ধা ৫৯৯	ধারাশ্রু	ধৃ ৬০৬	ধিমেতাল	ধ্ ৬১৯	ধুচ(চু)নি	ধু ৬০১	ধুস্তর	ধু ৬০১
ধাপ্‌পা	ধা ৫৯৯	ধারাসম্পাত	ধৃ ৬০৬	ধিয়া	ধ্ ৬১৯	ধুচয়	ধু ৬০১	ধুস্তুর	ধু ৬০১
ধাব	ধাব্ ৬০১	ধারাসার	ধৃ ৬০৬	ধিয়া	ধ্যৈ ৬১৫	ধুএল	ধু ৬০১	ধূ	ধু ৬০১
ধাবক	ধাব্ ৬০১	ধারি	ধৃ ৬১৫	ধিয়ান	ধ্যৈ ৬১৫	ধুত	ধু ৬০৩	ধূঃ	ধু ৬০১
ধাক্কা	ধাব্ ৬০১	ধারিত	ধৃ ৬১৫	ধিরজ	ধ্যৈ ৬১৫	ধুতি	ধু ৬০৩	ধূত	ধু ৬০১
ধাবকি	ধাব্ ৬০১	ধারিণী	ধৃ ৬১৫	ধিরাজ	ধ্ ৬১৯	ধুতুরা	ধু ৬০১	ধূন	ধু ৬০১
ধাবড়া	ধু ৬০১	ধারী	ধৃ ৬১৫	ধিরিধিরি	ধ্যৈ ৬১৫	ধুধু	ধু ৬০১	ধূনক	ধু ৬০১
ধাবন	ধাব্ ৬০১	ধারোষ্ণ	ধৃ ৬০৬	ধিষণ	ধৃ ৬০৬	ধুধুরী	ধু ৬০১	ধূনী	ধু ৬০১
ধাবমান	ধাব্ ৫৯০	ধার্তরাষ্ট্র	ধৃ ৬০৬	ধিষণা	ধৃ ৬০৬	ধুন	ধু ৬০৩	ধূপ	ধু ৬০৪
ধাবাড়	ধাব্ ৫৯০	ধার্ম	ধৃ ৬০৬	ধিষ্ণ্য	ধৃ ৬০৬	ধুনধুনধুন	ধু ৬০১	ধূপক	ধু ৬০১
ধাবাধাবি	ধাব্ ৫৯০	ধার্ম্মিক	ধৃ ৬০৬	ধিষ্ঠিত	ধ্ ৬১৯	ধু(ধূ)না	ধু ৬০৩	ধূপছায়া	ধু ৬০৪
ধাবিত	ধাব্ ৫৯০	ধার্ম্মিকা	ধৃ ৬০৬	ধী	ধ্যৈ ৬১৬	ধুনাইত	ধু ৬০৩	ধূপদান	ধু ৬০১
ধাম	ধা ৫৯৯	ধার্য্য	ধৃ ৬১৩	ধীগুণ	ধ্যৈ ৬১৫	ধু(ধূ)নাচি	ধু ৬০১	ধূপন	ধু ৬০৪
ধামধুম	ধক্ ৫৮৫	ধার্ষ্ট্য	ধৃ ৬০৬	ধীদা	দুহ্ ৫৫৬	ধুনান	ধু ৬০৩	ধূপপাত্র	ধু ৬০১
ধামধুমী	ধক্ ৫৮৫	ধাষ্টামি	ধৃ ৬০৬	ধীবর	ইন্ধ্ ৭৮	ধুনুচি	ধু ৬০১	ধূপবাস	ধু ৬০১
ধামনা	ধৃ ৬০৬	ধাষ্টামো	ধৃ ৬০৬	ধীবর	ধক্ ৫৮৬	ধুনারি(রী)	ধু ৬০৩	ধূপমুদ্রা	ধু ৬০১
ধামনিকা	ধৃ ৬০৬	ধিক	ধা ৫৯০	ধীমান	ধ্যৈ ৬১৫	ধুনি(নী)	ধু ৬০১	ধূপাগুরু	ধু ৬০১
ধামনী	ধৃ ৬০৬	ধিক্	ধক্ ৫৮৬	ধীর	ধ্যৈ ৬১৬	ধু(ধূ)নী	ধু ৬০১	ধূপাঙ্গ	ধু ৬০১
ধামসা	ধক্ ৫৯০	ধিক	ধক্ ৫৮৬	ধীরললিত	ধ্যৈ ৬১৫	ধুন্ধু	ধু ৬০৩	ধূপাচি	ধু ৬০১
ধামসান	ধক্ ৫৯০	ধিকধিক	ধক্ ৫৮৬	ধীরস্থির	ধ্যৈ ৬১৬	ধুন্ধুকার	ধু ৬০১	ধূপায়িত	ধু ৬০১
ধামা	ধা ৫৯৯	ধিকধিক	ধা ৫৯০	ধীরা	ধ্যৈ ৬১৫	ধুন্ধুমার	ধু ৬০৩	ধূপিত	ধু ৬০১
ধামি(মী)	ধা ৫৯০	ধিকদণ্ড	দং ৫১০	ধীরাধীরা	ধ্যৈ ৬১৫	ধুপ	ধু ৬০১	ধূম	ধু ৬০৪
ধায়	ধা ৫৯০	ধিকিধিকি	ধা ৫৯০	ধীরে-ধীরে	ধ্যৈ ৬১৬	ধুপি	ধু ৬০১	ধূমকেতু	ধু ৬০৪

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
নক্ষত্রযোগ	ন্ ৬৬৭	নগরীয়	ন্ ৬৭০	নটনারায়ণ	নট্ ৬২২	নথী	নম্ ৬৩১	নন্দা	নন্দ্ ৬২৭
নক্ষত্ররাজ	ন্ ৬৬৭	নগরোপকণ্ঠ	ন্ ৬৭০	নটনবিভোর	নট্ ৬২২	নদ্	নদ্ ৬২৬	নন্দাই	ন্ ৬৬৭
নক্ষত্রলোক	ন্ ৬৬৭	নগরোপান্ত	ন্ ৬৭০	নটনবিহার	নট্ ৬২২	নদ	নদ্ ৬২৬	নন্দি	নন্দ্ ৬২৭
নক্ষত্রশূল	ন্ ৬৬৭	নগাঙ্গি	ন্ ৬৬৭	নটনী	নট্ ৬২২	নদনদী	নদ্ ৬২৬	নন্দিক	নন্দ্ ৬২৭
নক্ষত্রামৃতযোগ	ন্ ৬৬৭	নগাধিপ	ন্ ৬৬৭	নটভূষণ	নট্ ৬২২	নদথু	নদ্ ৬২৬	নন্দিকেশ্বর	নন্দ্ ৬২৭
নক্ষত্রেশ	ন্ ৬৬৭	নগাধিপতি	ন্ ৬৬৭	নটবর	নট্ ৬২২	নদাল	নদ্ ৬২৬	নন্দিগ্রাম	নন্দ্ ৬২৯
নখ	ন্ ৬৭০	নগাধিরাজ	ন্ ৬৬৭	নটমেলক	নট্ ৬২২	নদী	নদ্ ৬২৬	নন্দিঘোষ	নন্দ্ ৬২৭
নখউধা	ন্ ৬৬৭	নগাপগা	ন্ ৬৬৭	নটরঙ্গ	নট্ ৬২২	নদীকদম্ব	নদ্ ৬২৬	নন্দিত	নন্দ্ ৬২৭
নখত	ন্ ৬৬৭	নগারি	ন্ ৬৬৭	নটরাজ	নট্ ৬২২	নদীকান্ত	নদ্ ৬২৬	নন্দিনী	নন্দ্ ৬৩০
নখতর	ন্ ৬৬৭	নগুণ	নু ৬৫৯	নটিনী	নট্ ৬২২	নদীকান্তা	নদ্ ৬২৬	নন্দিবর্দ্ধন	নন্দ্ ৬২৭
নখতা	ন্ ৬৬৭	নগেন্দ্র	ন্ ৬৬৭	নটী	নট্ ৬২২	নদীজ	নদ্ ৬২৬	নন্দী	নন্দ্ ৬২৭
নখকাটা	ন্ ৬৬৭	নগোত্তম	ন্ ৬৬৭	নটুয়া	নট্ ৬২২	নদীতরস্থান	নদ্ ৬২৬	নন্দীমুখ	নন্দ্ ৬২৭
নখখাদী	ন্ ৬৬৭	নগ্ন	নজ্ ৬২১	নটেশ্বর	নট্ ৬২২	নদীদোহ	নদ্ ৬২৬	নন্দীশ্বর	নন্দ্ ৬২৭
নখদর্পণ	ন্ ৬৭০	নগ্নক	নজ্ ৬২১	নঠ	নট্ ৬২২	নদীনালা	নদ্ ৬২৬	নন্দীসরঃ	নন্দ্ ৬২৭
নখনিকৃন্তন	ন্ ৬৬৭	নগ্নকান্তি	নজ্ ৬২১	নঠী	নট্ ৬২২	নদীবেগ	নদ্ ৬২৬	নপুংসক	ন্ ৬৬৭
নখম্পচ	ন্ ৬৬৭	নগ্নজিৎ	নজ্ ৬২১	নড়্	নট্ ৬২২	নদীমাতৃক	নদ্ ৬২৬	নপ্তা	ন্ ৬৬৭
নখর	ন্ ৬৬৭	নগ্নসৌন্দর্য্য	নজ্ ৬২১	নড়	নট্ ৬২২	নদীমুখ	নদ্ ৬২৬	নফর	ন্ ৬৬৭
নখরঞ্জনী	ন্ ৬৬৭	নগ্নত্ব	নজ্ ৬২১	নড়ক	নট্ ৬২২	নদীয়া	নু ৬৫৯	নফলা	ন্ ৬৬৭
নখরদর্পণ	ন্ ৬৬৭	নগ্না	নজ্ ৬২১	নড়চড়	নট্ ৬২২	নদীষ্ণ	নদ্ ৬২৬	নব	নু ৬৫৯
নখরায়ুধ	ন্ ৬৬৭	নগ্নিকা	নজ্ ৬২১	নড়ন	নট্ ৬২২	নদে	নু ৬৫৯	নবকর	নু ৬৫৯
নখলেখক	ন্ ৬৬৭	নচিকেতাঃ	ন্ ৬২১	নড়নচড়ন	নট্ ৬২২	নদ্ধ	নহ্ ৬৩৫	নবকুসুমিতা	নু ৬৫৯
নখশূল	ন্ ৬৬৭	নচেৎ	ন্ ৬২১	নড়নড়	নট্ ৬২২	নধর	নু ৬৫৯	নবখণ্ড	নু ৬৫৯
নখাঘাত	ন্ ৬৬৭	নচ্ছার	ন্ ৬৬২	নড়বড়	নট্ ৬২২	ননৎকার	ন্ ৬৬৭	নবগুণ	নু ৬৫৯
নখানখি	ন্ ৬৬৭	নছ(স)ব্	ন্ ৬২১	নড়া	নট্ ৬২২	ননদ	ন্ ৬৬৭	নবগ্রহ	নু ৬৫৯
নখী	ন্ ৬৬৭	নছি(সী)ব	ন্ ৬২১	নড়াচড়া	নট্ ৬২২	ননদিয়া	ন্ ৬৬৭	নবঘননীল	নু ৬৫৯
নগ	ন্ ৫৭০	নজ্	নজ্ ৬২১	নড়ান	নট্ ৬২২	ননন্দ	ন্ ৬৬৭	নবঘনশ্যাম	নু ৬৫৯
নগ	গম্ ২৬২	নজদিক(গ)	ন্ ৬২১	নড়ি(ড়ী)	নট্ ৬২২	ননন্দা	ন্ ৬৬৭	নবচত্বারিংশৎ	নু ৬৫৯
নগণ্য	ন্ ৬৬৭	নজর	ন্ ৬২১	নড়েভোলা	নট্ ৬২২	ন-নর	নু ৬৬৭	নবচ্ছিদ্র	নু ৬৫৯
নগণ্য	গণ্ ২৫৮	নজরবন্দী	ন্ ৬২১	নড়্বল	নট্ ৬২২	ননী	নু ৬৬১	নবজ্বর	নু ৬৫৯
নগদ	ন্ ৬৬৭	নজরানা	ন্ ৬২১	নত	নম্ ৬৩১	ননী	নী ৬৫৫	নবডঙ্ক	নু ৬৫৯
নগদ	গদ্ ২৬১	নজিমা	ন্ ৬২১	নতবান	নম্ ৬৩০	ননীচোরা	নু ৬৫৯	নবডঙ্কা	নু ৬৫৯
নগদ-নারায়ণ	গদ্ ৬৬৬	নজি(জী)র	ন্ ৬২১	নতমান	নম্ ৬৩০	ননু	ন্ ৬৬৭	নবত	নু ৬৫৯
নগদান	ন্ ৬৬৭	নঞ্ (ন, না)	ন্ ৬২১	নতি	নম্ ৬৩০	নন্দ্	নন্দ্ ৬২৭	নবত	ন্ ৬৬৭
নগদী	ন্ ৬৬৭	নঞণ	নী ৬৫৫	নতিমান	নম্ ৬৩০	নন্দ	নন্দ্ ৬২৯	নবতা	নু ৬৫৯
নগন	নজ্ ৬২১	নঞান	নী ৬৫৫	নতু	ন্ ৬৬৭	নন্দক	নন্দ্ ৬২৭	নবতি	নু ৬৫৯
নগর	ন্ ৬৭০	নট্	নট্ ৬২২	নতুন	নু ৬৫৯	নন্দকী	নন্দ্ ৬২৭	নবতিকা	নু ৬৫৯
নগরকীর্ত্তন	ন্ ৬৭১	নট	নট্ ৬২২	নতুবা	ন্ ৬৬৭	নন্দথু	নন্দ্ ৬২৭	নবত্রিংশৎ	নু ৬৫৯
নগরপাল	ন্ ৬৭১	নটক	নট্ ৬২২	নতোন্নত	নম্ ৬৩০	নন্দদুলাল	নন্দ্ ৬২৯	নবদণ্ড	নু ৬৫৯
নগরমার্গ	ন্ ৬৭১	নটকী	নট্ ৬২২	নৎকার	ন্ ৬৬৭	নন্দন	নন্দ্ ৬২৭	নবদণ্ডক	নু ৬৫৯
নগরাধিকৃত	ন্ ৬৭১	নটঘট	নট্ ৬২২	নত্তা	নু ৬৫৯	নন্দনকানন	নন্দ্ ৬২৭	নবদশ	নু ৬৫৯
নগরাধিপ	ন্ ৬৭১	নটচর্য্যা	নট্ ৬২২	নথ	নম্ ৬৩১	নন্দনবন	নন্দ্ ৬২৭	নবদুর্গা	নু ৬৬০
নগরাধিপতি	ন্ ৬৭১	নটচাঁদ	নট্ ৬২২	নথ-নাড়া	নম্ ৬৩১	নন্দনা	নন্দ্ ৬২৭	নবদীধিতি	নু ৬৫৯
নগরাধ্যক্ষ	ন্ ৬৭১	নটচান্দ	নট্ ৬২২	নথ(থি)নী	নম্ ৬৩১	নন্দবালা	নন্দ্ ৬২৭	নবদ্বার	নু ৬৬১
নগরি(রী)য়া	ন্ ৬৭১	নটন	নট্ ৬২২	নথি	নম্ ৬৩১	নন্দমহোৎসব	নন্দ্ ৬২৭	নবদ্বীপ	নু ৬৫৯
নগরী	ন্ ৬৭০	নটনঘটন	নট্ ৬২২	নথিপত্র	নম্ ৬৩১	নন্দলাল	নন্দ্ ৬২৯	নবধর	নু ৬৫৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
নবধা	নু	৬৫৯	নবি(বী)	ন্	৬৬৭	নমস্যা	নম্	৬৩০	নরকেশরী	নৃ	৬৬২	নর্ম্মসচিব	নৃ	৬৬২
নবনন্তা	নু	৬৫৯	নবি(বী)সিন্দা	ন্	৬৬৭	নমাজ	নম্	৬৩০	নরগণ	নৃ	৬৬৩	নর্ম্মসুহৃৎ	নৃ	৬৬২
নবনর্ত্তা	নু	৬৫৯	নবিশ	নু	৬৬২	ন(না)মিত	নম্	৬৩০	নরঙ্গ	ন্	৬৬৭	নর্ম্মী	নৃ	৬৬২
নবনবতি	নু	৬৫৯	নবিস	নু	৬৬২	নমুচি	ন্	৬৬৭	নরনাথ	নৃ	৬৬২	নল্	নট্	৬২২
নবনিধি	নু	৬৬১	নবী	নু	৬৫৯	নমুদ	ন্	৬৬৭	নরনারায়ণ	নৃ	৬৬২	নল	নট্	৬২৩
নবনী	নু	৬৬১	নবীন	নু	৬৬২	নমুনা	ন্	৬৬৭	নরপতি	নৃ	৬৬২	নলক	নট্	৬২২
নবনীত	নু	৬৬১	নবীভাব	নু	৬৫৯	নমেরু	ন্	৬৬৭	নরপশু	নৃ	৬৬২	নলকানন	নট্	৬২২
নবপঞ্চাশৎ	নু	৬৫৯	নবেতর	নু	৬৫৯	নমোবাক	নম্	৬৩০	নরম	ন্	৬৬৩	নলকিনী	নট্	৬২২
নবপত্রিকা	নু	৬৬০	নবোঢ়া	নু	৬৫৯	নম্য	নম্	৬৩১	নরম-গরম	ন্	৬৬৩	নলকুবর	নট্	৬২২
নবপত্রী	নু	৬৫৯	নবোদক	নু	৬৫৯	নম্র	নম্	৬৩১	নরমেধ	নৃ	৬৬৪	নলখড়ি	নট্	৬২২
নবপ্রসূতা	নু	৬৫৯	নবোদ্ধৃত	নু	৬৫৯	নম্রক	নম্	৬৩০	নরসানি	নৃ	৬৬২	নলখাক(গ)	নট্	৬২২
নবপ্রস্থান	নু	৬৫৯	নব্বই	নু	৬৫৯	নম্রতা	নম্	৬৩০	নরসিংহ	নৃ	৬৬৪	নলখাগড়া	নট্	৬২২
নবপ্রাশন	নু	৬৫৯	নব্য	নু	৬৫৯	নম্বর	ন্	৬৬৭	নরসুন্দর	নৃ	৬৬২	নলখাড়া	নট্	৬২২
নববধূ	নু	৬৫৯	নভ	নহ্	৬৩৬	নম্বরী	ন্	৬৬৭	নরহরি	নৃ	৬৬২	নল-চালা	নট্	৬২২
নববিংশতি	নু	৬৫৯	নভঃ	নহ্	৬৩৬	নয়	নী	৬৫৫	নরাঙ্কিতন্যায়	নৃ	৬৬২	নলচে	নট্	৬২৩
নবভাগ	নু	৬৫৯	নভঃস্থল	নহ্	৬৩৬	নয়ছয়	নী	৬৫৫	নরাধম	নৃ	৬৬২	নলদ	নট্	৬২২
নবম		৫৯	নভগ	নহ্	৬৩৬	নয়দা	নু	৬৫৯	নরাধিপ	নৃ	৬৬২	নলপট্টিকা	নট্	৬২২
নবমল্লিকা	নু	৬৫৯	নভশ্চর	নহ্	৬৩৬	নয়ন	নী	৬৫৬	নরান্তক	নৃ	৬৬২	নলপা	নট্	৬২২
নবমালিকা	নু	৬৫৯	নভস	নহ্	৬৩৫	নয়নকোণ	নী	৬৫৫	নরায়ণ	নৃ	৬৬২	নলবন	নট্	৬২২
নবযজ্ঞ	নু	৬৫৯	নভস্তল	নহ্	৬৩৫	নয়নগোচর	নী	৬৫৫	নরাশন	নৃ	৬৬২	নলমীন	নট্	৬২২
নবযুবক	নু	৬৫৯	নভস্য	নহ্	৬৩৫	নয়নচ্ছদ	নী	৬৫৫	নরী	নৃ	৬৬২	নলা	নট্	৬২২
নবযৌবন	নু	৬৫৯	নভস্বৎ	নহ্	৬৩৫	নয়নজুলি	নী	৩৭৮	নরুণ(ন)	ন্	৬৬৭	নলি	নট্	৬২৪
নবরঙ্গ	নু	৬৫৯	নভস্বত	নহ্	৬৩৫	নয়নতারা	নী	৬৫৫	নরেন	নৃ	৬৬২	নলিকা	নট্	৬২৫
নবরত্ন	নু	৬৫৯	নভস্বান	নহ্	৬৩৫	নয়নপথ	নী	৬৫৫	নরেন্দ্র	নৃ	৬৬২	নলিচা	নট্	৬২৫
নবরস	নু	৬৫৯	নভোবীথী	নহ্	৬৩৫	নয়নসুখ	নী	৬৫৫	নরেশ	নৃ	৬৬২	নলিত	নট্	৬২২
নবরাত্র	নু	৬৫৯	নভোগ	নহ্	৬৩৫	নয়না	নী	৬৫৫	নরেশ্বর	নৃ	৬৬২	নলিন	নট্	৬২৪
নবল	নু	৬৫৯	নভোগতি	নহ্	৬৩৫	নয়নাঞ্চল	নী	৬৫৫	নরোত্তম	নৃ	৬৬২	নলিনী	নট্	৬২৪
নবলক্ষণ	নু	৬৫৯	নভোমণ্ডল	নহ্	৬৩৫	নয়নাঞ্জন	নী	৬৫৫	নর্ক	নৃ	৬৬২	নলিনীদল	নট্	৬২২
নবশশী	নু	৬৫৯	নভৌকাঃ	নহ্	৬৩৫	নয়নাভিঘাত	নী	৬৫৫	নর্ত্ত	নৃত্	৬৬৭	নলী	নট্	৬২৪
নবশস্যেষ্টি	নু	৬৫৯	নম্	নম্	৬৩০	নয়নাভিরাম	নী	৬৫৫	নর্ত্তক	নৃত্	৬৬৭	নলিয়ান	নু	৬৫৯
নবশাক	নু	৬৬১	নমঃ	নম্	৬৩১	নয়নাসার	নী	৬৫৫	নর্ত্তকী	নৃত্	৬৬৭	নলে	নট্	৬২২
নবশাখ	নু	৬৬১	নমঃশূদ্র	নম্	৬৩১	নয়নী	নী	৬৫৫	নর্ত্তন	নৃত্	৬৬৭	নলেন	নু	৬৫৯
নবশায়ক	নু	৬৬১	নমন	নম্	৬৩১	নয়নোৎসব	নী	৬৫৫	নর্ত্তন-কুর্দ্দন	নৃত্	৬৬৭	নল্ব	নট্	৬২২
নবশ্রাদ্ধ	নু	৬৫৯	ন(না)মনা	নম্	৬৩০	নয়নোপান্ত	নী	৬৫৫	নর্ত্তনাগার	নৃত্	৬৬৭	নশ্	নশ্	৬৩২
নবষষ্টি	নু	৬৫৯	নমনীয়	নম্	৬৩০	নয়ল	নু	৬৫৯	নর্ত্তনাগৃহ	নৃত্	৬৬৭	নশ্যৎপ্রসূতিকা	নশ্	৬৩২
নবসপ্ততি	নু	৬৫৯	নমসিত	নম্	৬৩০	নয়(হ)লি	নু	৬৫৯	নর্ত্তিত	নৃত্	৬৬৭	নশ্বর	নশ্	৬৩২
নবসূতি	নু	৬৫৯	নমস্ক	নম্	৬৩০	নয়া	নু	৬৫৯	নর্দ্	ন্	৬৬৭	নষ্ট	নশ্	৬৩৩
নবস্ফুট	নু	৬৫৯	নমস্কর	নম্	৬৩০	নয়ান	নু	৬৫৯	নর্দ্দ্	ন্	৬৬৭	নষ্টকোষ্ঠী	নশ্	৬৩২
নবাৎ	ন্	৬৬৭	নমস্করণ	নম্	৬৩১	নয়ানজুলি	নু	৬৫৯	নর্দ্দ	ন্	৬৬৭	নষ্টচন্দ্র	নশ্	৬৩৩
নবান্ন	নু	৬৫৯	নমস্কার	নম্	৬৩১	নর	নৃ	৬৬২	নর্দ্দন	ন্	৬৬৭	নষ্টচেতন	নশ্	৬৩৩
নবাব	ন্	৬৬৭	নমস্কারি(রী)	নম্	৬৩০	নরঋষি	নৃ	৬৬২	নর্দ্দিত	ন্	৬৬৭	নষ্টচেষ্ট	নশ্	৬৩৩
নবাবজাদ(-জাত)	ন্	৬৬৭	নমস্কৃত	নম্	৬৩১	নরক	নৃ	৬৬৩	নর্দ্দী	ন্	৬৬৭	নষ্টজাতক	নশ্	৬৩২
নবাবজাদা(দী)	ন্	৬৬৭	নমস্কৃতি	নম্	৬৩০	নরককুণ্ড	নৃ	৬৬৩	নর্ম্ম	নৃ	৬৬৪	নষ্টপনা	নশ্	৬৩৩
নবাবী	ন্	৬৬৭	নমস্ক্রিয়া	নম্	৬৩০	নরকান্তক	নৃ	৬৬২	নর্ম্মদা	নৃ	৬৬৫	নষ্টস্মৃতি	নশ্	৬৩৩
নবাশীতি	নু	৬৫৯	নমস্য	নম্	৬৩১	নরকারি	নৃ	৬৬২	নর্ম্মসখা	নৃ	৬৬২	নষ্টামি	নশ্	৬৩৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
নষ্টি	নশ্ ৬৩৩	নাকচ	নশ্ ৬৩২	নাগরাজ	ন্ ৬৬৭	নাঞি	নহ্ ৬৩৫	নাতি	ন্ ৬৭১
নস্	নশ্ ৬৩২	নাকচ(চো)না	নশ্ ৬৩২	নাগরালি	ন্ ৬৭১	নাঞিক	নহ্ ৬৩৫	নাতিখর্ব্ব	ন্ ৬৬৭
নসা	নশ্ ৬৩২	নাকচর	নশ্ ৬৩২	নাগরমুথা	ন্ ৬৭১	নাঞী	নহ্ ৬৩৫	নাতিদীর্ঘ	ন্ ৬৬৭
নসীব	ন্ ৬৬৭	নাকছাবি	নশ্ ৬৩২	নাগরমুস্তা	ন্ ৬৭১	নাট	নট্ ৬২৪	নাতিদূর	ন্ ৬৬৭
নস্কর	ন্ ৬৬৭	নাকনাড়া,	নশ্ ৬৩২	নাগরা	ন্ ৬৭২	নাটক	নট্ ৬২৪	নাতিন	ন্ ৬৬৭
নস্ত	নশ্ ৬৩২	নাকপৃষ্ঠ	নশ্ ৬৩২	নাগরি(রী)	ন্ ৬৬৭	নাটকী	নট্ ৬২৪	নাতিনী	ন্ ৬৭১
নস্তা	নশ্ ৬৩২	নাকফোঁড়া	নশ্ ৬৩২	নাগরিক	ন্ ৬৭২	নাটকীয়	নট্ ৬২৪	নাতিনীচ	ন্ ৬৬৭
নস্তিত	নশ্ ৬৩২	নাকবনিতা	নশ্ ৬৩২	নাগরিমা	ন্ ৬৭২	নাটন	নট্ ৬২২	নাতিপুতি	ন্ ৬৭১
নস্তোত	নশ্ ৬৩২	নাকবিন্ধা	নশ্ ৬৩২	নাগরী	ন্ ৬৭২	নাটমন্দির	নট্ ৬২৪	নাতিমানিতা	ন্ ৬৬৭
নস্পর্শন	নশ্ ৬৩২	নাকশী(সী)র	নশ্ ৬৩২	নগর্য্যা	ন্ ৬৬৭	নাটশাল	নট্ ৬২২	নাত্যুচ্ছ্রিত	ন্ ৬৬৭
নস্য	নশ্ ৬৩২	নাকলোক	নশ্ ৬৩২	নাগলোক	ন্ ৬৭২	নাটা	নশ্ ৬৩২	নাথ্	নাথ্ ৬৩৮
নস্যা	নশ্ ৬৩২	নাকসৎ	নশ্ ৬৩২	নাগা	নজ্ ৬২১	নাটাই	নৃত্ ৬৬৭	নাথ	নাথ্ ৬৩৮
নস্যোত	নশ্ ৬৩২	নাকারদা	নশ্ ৬৩২	নাগাঙ্গনা	ন্ ৬৭২	নাটি	নট্ ৬২৪	নাথন	নাথ্ ৬৩৮
নহ্	নহ্ ৬৩৫	নাকারা	নশ্ ৬৩২	নাগাড়া(রা)	ন্ ৬৬৭	নাটিকা	নট্ ৬২৪	নাথবান	নাথ্ ৬৩৮
নহ	নহ্ ৬৩৫	নাকাল	নশ্ ৬৩৩	নাগান্তক	ন্ ৬৭২	নাটিত	নট্ ৬২২	নাথহরি	নাথ্ ৬৩৮
নহন	নহ্ ৬৩৫	নাকানি	নশ্ ৬৩২	নাগাসন	ন্ ৬৭২	নাটুয়া	নট্ ৬২২	নাথিত	নাথ্ ৬৩৮
নহবৎ	ন্ ৬৬৭	নাকানি-চোবানি	নশ্ ৬৩৩	নাগাহ্ব	ন্ ৬৭২	নাটেয়	নট্ ৬২২	নাদ	নদ্ ৬২৭
নহবৎখানা	ন্ ৬৬৭	নাকী	নশ্ ৬৩২	নাগাহ্বয়	ন্ ৬৭২	নাটের-গুরু	নট্ ৬২২	নাদবৎ	নদ্ ৬২৭
নহর	ন্ ৬৬৭	নাকুড়	নশ্ ৬৩২	নাগিনী	ন্ ৬৬৭	নাটোআ(য়া)	নট্ ৬২২	নাদব্রহ্ম	নদ্ ৬২৬
নহি	নহ্ ৬৩৫	নাকেশ্বর	নশ্ ৬৩২	নাগেন্দ্র	ন্ ৬৭২	নাট্য	নট্ ৬২৫	নাদমুদ্রা	নদ্ ৬২৬
নহুষ	নহ্ ৬৩৬	নাকেশ্বরী	নশ্ ৬৩২	নাগেশ	ন্ ৬৭২	নাট্যপ্রিয়	নট্ ৬২২	নাদরদ	ন্ ৬৬৭
না	নহ্ ৬৩৭	নাক্ষত্র	ন্ ৬৬৭	নাগোরা	ন্ ৬৬৭	নাট্যভাষা	নট্ ৬২২	নাদা	নদ্ ৬২৭
না	নু ৬৫৯	নাখিরাজ	ক্ষর্ ২২৯	নাঙ	নজ্ ৬২১	নাট্যশালা	নট্ ৬২২	নাদাপেটা	নদ্ ৬২৭
না	ন্ ৬৬৭	নাখেরাজ	ক্ষর্ ২২৯	নাঙট	নজ্ ৬২১	নাট্যশাস্ত্র	নট্ ৬২২	নাদি	নদ্ ৬২৭
নাঅ	নু ৬৫৯	নাগ	ন্ ৬৭১	নাঙ্গ	নজ্ ৬২১	নাট্যাচার্য্য	নট্ ৬২২	নাদী	নদ্ ৬২৭
নাঅর	ন্ ৬৬৭	নাগকেশর	ন্ ৬৭২	নাঙ্গ্ (নাং)	ন্ ৬৬৭	নাট্যালঙ্কার	নট্ ৬২২	নাদুর-নুদুর	নদ্ ৬২৬
নাই	ন্ ৬৬৭	নাগগর্ভ	ন্ ৬৭২	নাঙ্গা	নজ্ ৬২১	নাট্যোক্তি	নট্ ৬২২	নাদুসনুদুস	নদ্ ৬২৬
নাই	নহ্ ৬৩৭	নাগচূড়	ন্ ৬৭২	নাচ	নৃত্ ৬৬৭	নাড়	নট্ ৬২৫	নাদেয়	নদ্ ৬২৬
নাই	অস্ ৫৬	নাগদন্ত	ন্ ৬৭২	নাচন	নৃত্ ৬৬৭	নাড়া	নট্ ৬২৫	নাদেয়ী	নদ্ ৬২৬
নাই(নাপিত)	ন্ ৬৬৭	নাগনায়ক	ন্ ৬৭২	নাচন-কোদন	নৃত্ ৬৬৭	নাড়ি	নট্ ৬২৫	নানক	ন্ ৬৬৭
নাইক(কো)	ন্ ৬৬৭	নাগপঞ্চমী	ন্ ৬৭২	নাচনি(নী)	নৃত্ ৬৬৭	নাড়িকা	নট্ ৬২২	নানা	ন্ ৬৭২
নাইয়া	নু ৬৫৯	নাগবল্লরী	ন্ ৬৭২	নাচনীয়া	নৃত্ ৬৬৭	নাড়িখুড়ি	নট্ ৬২২	নানান	ন্ ৬৭২
নাউআ	ন্ ৬৬৭	নাগরাজ	ন্ ৬৭২	নাচায়ন	নৃত্ ৬৬৭	নাড়িচক্র	নট্ ৬২২	নানাবিধি	ন্ ৬৬৭
নাএক	নী ৬৫৫	নাগলতা	ন্ ৬৭২	নাচার	ন্ ৬৬৭	নাড়ি-টেপা	নট্ ৬২২	নানাস্থানী	ন্ ৬৬৭
নাএ(য়ে)ব	নী ৬৫৫	নাগদনা	ন্ ৬৭২	নাচাড়ি(ড়ী)	ন্ ৬৬৭	নাড়ি-নক্ষত্র	নট্ ৬২৫	নান্ত	ন্ ৬৬৭
নাও	নু ৬৫৯	নাগপাশ	ন্ ৬৭২	নাচি(ছি)	ন্ ৬৬৭	নাড়িস্কম	নট্ ৬২২	নান্দিকর	নন্দ্ ৬২৭
নাং (নাগাত)	ন্ ৬৬৭	নাগপুর	ন্ ৬৭২	নাচিয়ে	নৃত্ ৬৬৭	নাড়ি-ভুঁড়ি	নট্ ৬২২	নান্দিয়া	নদ্ ৬২৬
নাং	ন্ ৬২১	নাগপুষ্প	ন্ ৬৭২	নাচুনী	নৃত্ ৬৬৭	নাড়ির-টান	নট্ ৬২২	নান্দী	নন্দ্ ৬৩০
নাঙ্	ন্ ৬৬৭	নাগফট	ন্ ৬৭২	নাছ	ন্ ৬৬৭	নাড়ী	নট্ ৬২৫	নান্দীকর	নন্দ্ ৬২৭
নাক	নশ্ ৬৩৩	নাগভূষণ	ন্ ৬৭২	নাছদরজা	ন্ ৬৬৭	নাঢ়া	নট্ ৬২২	নান্দীবাদী	নন্দ্ ৬২৭
নাক	কৃ ২৩৭	নাগমাতা	ন্ ৬৭২	নাছাড়	ন্ ৬৬৭	নাণক	ন্ ৬৬৭	নান্দীমুখ	নন্দ্ ৬৩০
নাককড়াই	নশ্ ৬৩২	নাগযষ্টি	ন্ ৬৭২	নাছোড়	ন্ ৬৬৭	নাণ্ডামুণ্ডা	নট্ ৬২২	নান্দীমুখী	নন্দ্ ৬৩০
নাককাটা	নশ্ ৬৩২	নাগর	ন্ ৬৭১	নাজিম	ন্ ৬৬৭	নাতজামাই	ন্ ৬৬৭	নাপসন্দ	ন্ ৬৬৭
নাককাটা-কানকাটা	নশ্ ৬৩২	নাগরদোলা	ন্ ৬৭১	নাজি(জী)র	ন্ ৬৬৭	নাতনি(নী)	ন্ ৬৬৭	নাপাক	ন্ ৬৬৭
নাকখত	নশ্ ৬৩২	নাগরপনা	ন্ ৬৭১	নাজেহাল	ন্ ৬৬৭	নাতবউ	ন্ ৬৬৭	নাপান	ন্ ৬৬৭

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
নাপানী	ন্ ৬৬৭	নায়্যা	নু ৬৫৯	নালী	নট্ ৬২৬	নিঃশঙ্ক	নি ৬৪০	নিঁদ	নি ৬৪০
নাপিত	ন্ ৬৬৭	নার	নৃ ৬৬২	নালীক	নট্ ৬২২	নিঃশব্দ	নি ৬৪০	নিঁদা	নি ৬৪০
নাপিত	আপ্ ৬১	নার	ন্ ৬৬৭	নালীব্রণ	নট্ ৬২২	নিঃশরণ	নি ৬৪০	নিকট	নি ৬৪২
নাপিতানী	আপ্ ৬১	নারক	নৃ ৬৬২	নাশ	নশ্ ৬৩৩	নিঃশলাক	নি ৬৪০	নিকটস্থ	নি ৬৪২
নাপিতা(তি)নী	ন্ ৬৬৭	নারকিনী	নৃ ৬৬২	নাশক	নশ্ ৬৩৩	নিঃশেষ	নি ৬৪০	নিকটিক	নি ৬৪০
নাপিতী	ন্ ৬৬৭	নারকী	নৃ ৬৬২	নাশ্তা	ন্ ৬৬৭	নিঃশ্রয়(য়ি)ণী	নি ৬৪০	নিকড়ি(ড়ী)য়া	নি ৬৪০
নাব	নম্ ৬৩২	নারকীয়	নৃ ৬৬২	নাশন	নশ্ ৬৩৩	নিঃশ্রেণি	নি ৬৪০	নিকড়্যা	নি ৬৪০
নাবড়	ন্ ৬৬৭	নারঙ্গ	নৃ ৬৬২	নাশপাতী	ন্ ৬৬৭	নিঃশ্রেয়	নি ৬৪০	নিকৃতি	নৃ ৬৬২
নাব(ম)না	নম্ ৬৩২	নারদ	নৃ ৬৬৫	নাশা	নশ্ ৬৩৩	নিঃশ্রেয়স	নি ৬৪০	নিকর	নি ৬৪০
নাবা	নম্ ৬৩২	নারদীয়	নৃ ৬৬২	নাশিত	নশ্ ৬৩৩	নিঃশ্ব(শ্বা)স	নি ৬৪০	নিকর	কৃ ২০০
নাবারোহ	নু ৬৫৯	নারসিংহ	নৃ ৬৬২	নাশী	নশ্ ৬৩৩	নিঃশ্বসন	নি ৬৪০	নিকরুণ	নি ৬৪০
নাবাল	নম্ ৬৩২	নারাচ	নৃ ৬৬২	নাশ্য	নশ্ ৬৩২	নিঃসংশয়	নি ৬৪০	নিকর্তন	নি ৬৪০
নাবালক(গ)	ন্ ৬৬৭	নারাচিকা	নৃ ৬৬২	নাষ্টিক	নশ্ ৬৩২	নিঃসখা	নি ৬৪০	নিকর্ষ	নি ৬৪০
নাবাল্যত	ন্ ৬৬৭	নারাচী	নৃ ৬৬২	নাস	নশ্ ৬৩২	নিঃসঙ্গ	নি ৬৪০	নিকর্ষ	কৃশ্ ২১৫
নাবিক	নু ৬৬২	নারা	নৃ ৬৬২	নাস	নশ্ ৬৩২	নিঃসত্ত্ব	নি ৬৪০	নিকর্ষণ	নি ৬৪০
নাবী	নু ৬৬২	নারাণ	নৃ ৬৬২	নাসত্য	নশ্ ৬৩২	নিঃসত্য	নি ৬৪০	নিকল	নি ৬৪২
নাবী	নম্ ৬৩২	নারায়ণ	নৃ ৬৬২	নাসা	নশ্ ৬৩৪	নিঃসন্ততি	নি ৬৪০	নিকশ	নি ৬৪০
নাবোপজীবন	নু ৬৫৯	নারি	ন্ ৬৬৭	নাসারন্ধ্র	নশ্ ৬৩২	নিঃসন্তান	নি ৬৪০	নিকষ(স)	নি ৬৪২
নাব্য	নু ৬৬২	নারঙ্গ	ন্ ৬৬৭	নাসিকা	নশ্ ৬৩৪	নিঃসন্দ	নি ৬৪০	নিকষগ্রাবা	নি ৬৪২
নাভি	নহ্ ৬৩৭	নারাঙ্গা	ন্ ৬৬৭	নাসিক্য	নশ্ ৬৩৪	নিঃসন্ধ	নি ৬৪০	নিকষপাষাণ	নি ৬৪২
নাভিকূপ	নহ্ ৬৩৫	না(ন)রাজ	ন্ ৬৬৭	নাসীর	নশ্ ৬৩৪	নিঃসন্ধি	নি ৬৪০	নিকষকুলীন	নি ৬৪২
নাভিগয়া	নহ্ ৬৩৫	নারাঞ্জি	ন্ ৬৬৭	নাস্তানাবুদ	নশ্ ৬৩২	নিঃসপত্ন	নি ৬৪০	নিকষা(সা)	নি ৬৪২
নাভিনাড়ী	নহ্ ৬৩৫	নারিকল	ন্ ৬৬৭	নাস্তি	নশ্ ৬৩৪	নিঃসম্পাত	নি ৬৪০	নিকষাত্মজ	নি ৬৪২
নাভিনাল	নহ্ ৬৩৭	নারিকের	ন্ ৬৬৭	নাস্তি	— ৬৩৭	নিঃসম্বল	নি ৬৪০	নিকষিত	নি ৬৪২
নাভিভব	নহ্ ৬৩৭	নারিকেল	ন্ ৬৬৭	নাস্তি	অস্ ৫৬	নিঃসর	নি ৬৪০	নিকষোপল	নি ৬৪২
নাভিমূল	নহ্ ৬৩৭	নারিকেলাসব	ন্ ৬৬৭	নাস্তিক	নশ্ ৬৩৪	নিঃসরণ	নি ৬৪০	নিকষ্টিয়া	নি ৬৪২
নাভিচ্ছেদ	নহ্ ৬৩৫	নারিচপত্র	ন্ ৬৬৭	নাস্তিকতা	নশ্ ৬৩২	নিঃসলিল	নি ৬৪০	নিকসিপেড়ে	ন্ ৬৬৭
নাভিশ্বাস	নহ্ ৬৩৭	নারী	নৃ ৬৬২	নাস্য	নশ্ ৬৩২	নিঃসহ	নি ৬৪০	নিকা	ন্ ৬৬৭
নাভ্য	নহ্ ৬৩৫	নারীকলা	নৃ ৬৬২	নাহ্	নাথ্ ৬৩৮	নিঃসাড়তা	নি ৬৪০	নিকা	নি ৬৪০
নাম(মো)	নম্ ৬৩২	নারীরত্ন	নৃ ৬৬২	নাহক	ন্ ৬৬৭	নিঃসার	নি ৬৪০	নিকান	নি ৬৪০
নামডাক	ডাক্ ৪৩৪	নারে	ন্ ৬৬৭	নাহারে	ন্ ৬৬৭	নিঃসারণ	নি ৬৪০	নিকাম	নি ৬৪০
নামনা	নম্ ৬৩০	নারেঙ্গা	ন্ ৬৬৭	নাহি	নহ্ ৬৩৭	নিঃসীম	নি ৬৪০	নিকাম	কম্ ১৫৪
নামা	নম্ ৬৩২	নাল	নট্ ৬২৬	নাহি	অস্ ৫৬	নিঃসৃত	নি ৬৪০	নিকায়	চি ৩৪৬
নামান	নম্ ৬৩২	নাল	ন্ ৬৬৭	নাহিক	নহ্ ৬৩৭	নিঃস্নেহ	নি ৬৪০	নিকায়	নি ৬৪০
নামাল	নম্ ৬৩২	নালবন্দী	ন্ ৬৬৭	নাহুষ	নহ্ ৬৩৫	নিঃস্নেহা	নি ৬৪০	নিকার	নি ৬৪০
নামী	নম্ ৬৩২	নালা	নট্ ৬২৬	নি	নি ৬৪২	নিঃস্পন্দ	নি ৬৪০	নিকার	কৃ ২০০
নায়	নী ৬৫৫	নালায়েক	ন্ ৬৬৭	নিঅড়	নি ৬৪০	নিঃস্পৃহ	নি ৬৪০	নিকারি	নি ৬৪০
নায়	নু ৬৫৯	নালি	নট্ ৬২৬	নিআঁশ	নি ৬৪০	নিঃস্যন্দিত	নি ৬৪০	নিকাল	নি ৬৪২
নায়ক	নী ৬৫৬	নালিক	নট্ ৬২২	নিংড়া	নি ৬৪০	নিঃস্রব	নি ৬৪০	নিকাশ	নি ৬৪৩
নায়কী	নী ৬৫৫	নালিকা	নট্ ৬২২	নিঃক্ষত্র	নি ৬৪০	নিঃস্ব	নি ৬৪০	নিকাশ	কশ্ ১৭৩
নায়র	ন্ ৬৬৭	নালি-ঘা	নট্ ৬২২	নিঃক্ষত্রি	নি ৬৪০	নিঃস্বত্ত্ব	নি ৬৪০	নিকাশী	নি ৬৪৩
নায়রী	ন্ ৬৬৭	নালিতা	নট্ ৬২২	নিঃক্ষত্রিয়	নি ৬৪০	নিঃস্বন	নি ৬৪০	নিকাষ	নি ৬৪০
নায়িকা	নী ৬৫৬	নালিম	নট্ ৬২২	নিঃক্ষিপ্ত	নি ৬৪০	নিঃস্বাদু	নি ৬৪০	নিকাস	নি ৬৪০
নায়েক	নী ৬৫৬	নালিশ	ন্ ৬৬৭	নিঃক্ষিপ্ত	ক্ষিপ্ ২৩৩	নিঃস্বার্থ	নি ৬৪০	নিকুচি	কুচ্ ১৯৪
নায়েব	ন্ ৬৬৭	নালিশবন্দ	ন্ ৬৬৭	নিঃশক্তি	নি ৬৪০	নিঃস্বার্থ	অর্থ্ ৪৩	নিকুঞ্চক	নি ৬৪০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
নিকুঞ্জ	নি ৬৪৩	নিগর	গৃ ২৯০	নিছন	নি ৬৪০	নিত্ত	নি ৬৪০	নিদ্দাম	নি ৬৪০
নিকুঞ্জবিহারী	নি ৬৪৩	নিগাড়	নি ৬৪০	নিছনি	নি ৬৪০	নিত্তানি	নি ৬৪০	নিদ্যাটী	নি ৬৪০
নিকুটিয়া	নি ৬৪০	নিগাদ	নি ৬৪০	নিছনী	নি ৬৪০	নিত্য	নি ৬৪৫	নিদ্রা	নি ৬৪৬
নিকুম্ভ	নি ৬৪৩	নিগার	নি ৬৪০	নিছুনী	নি ৬৪০	নিত্য	ন্ ৬৬৭	নিদ্রা	দ্রা ৫৭৪
নিকুম্ভিলা	নি ৬৪৩	নিগাল	নি ৬৪০	নিজ্	নি ৬৪০	নিত্যক	নি ৬৪০	নিদ্রাআলী	নি ৬৪০
নিকুরম্ব	নি ৬৪০	নিগীর্ণ	নি ৬৪০	নিজ	নি ৬৪৪	নিত্যকর্ম্ম	কৃ ২০৪	নিদ্রাউলি	নি ৬৪০
নিকৃত	নি ৬৪০	নিগীর্ণ	গৃ ২৯০	নিজ	জন্ ৩৭৮	নিত্যকৃত্য	নি ৬৪০	নিদ্রাগত	নি ৬৪০
নিকৃতি	নি ৬৪০	নিগুঢ	নি ৬৪০	নিজনা	নি ৬৪০	নিত্যগতি	নি ৬৪০	নিদ্রাগম	নি ৬৪০
নিকৃন্তন	নি ৬৪০	নিগূঢ়	নি ৬৪০	নিজাম	নি ৬৪০	নিত্যনৈমিত্তিক	নি ৬৪৫	নিদ্রাণ	নি ৬৪০
নিকৃষ্ট	নি ৬৪৪	নিগূঢ়	গুহ্ ২৮৯	নিজস্ব	নি ৬৪৪	নিত্যবদ্ধ	নি ৬৪৫	নিদ্রাভিভূত	নি ৬৪০
নিকৃষ্ট	কৃশ্ ২১৫	নিগৃহীত	গ্রহ্ ৩০১	নিজে	নি ৬৪০	নিত্যমুক্ত	নি ৬৪৫	নিদ্রালস	নি ৬৪০
নিকে	ন্ ৬৬৭	নিগৃহীত	নি ৬৪৪	নিজেকে	নি ৬৪০	নিত্যযৌবনা	নি ৬৪৫	নিদ্রালি	নি ৬৪০
নিকেত	নি ৬৪০	নিগ্রহ	নি ৬৪৪	নিজের	নি ৬৪০	নিত্যশঃ	নি ৬৪০	নিদ্রালিক	নি ৬৪০
নিকেত	কিৎ ১৮৩	নিগ্রহ	গ্রহ্ ৩০১	নিজেরে	নি ৬৪০	নিত্যসমাস	নি ৬৪০	নিদ্রালী	নি ৬৪০
নিকেশ	নি ৬৪৪	নিগ্রহণ	নি ৬৪০	নিজ্জ(জ্)স	নি ৬৪০	নিত্যহোম	নি ৬৪০	নিদ্রালু	নি ৬৪০
নিকোচন	নি ৬৪০	নিগ্রাহ্য	নি ৬৪০	নিজ্ঝুম	নি ৬৪০	নিত্যা	নি ৬৪০	নিদ্রিত	নি ৬৪০
নিক্কণ	নি ৬৪০	নিঘ	নি ৬৪০	নিঝুম	নি ৬৪০	নিত্যানি	নি ৬৪০	নিধন	নি ৬৪৬
নিক্কাণ	নি ৬৪০	নিঘণ্টু	নি ৬৪০	নিঝর	নি ৬৪০	নিত্যানধ্যায়	নি ৬৪০	নিধনকারী	নি ৬৪০
নিক্ষত্র	নি ৬৪০	নিঘর্ষ	নি ৬৪০	নিট্	নি ৬৪০	নিত্যানন্দ	নি ৬৪৫	নিধনক্রিয়া	নি ৬৪০
নিক্ষিপ	নি ৬৪০	নিঘর্ষণ	নি ৬৪০	নিটনকাত	নি ৬৪০	নিথর	নি ৬৪০	নিধনিয়া	নি ৬৪০
নিক্ষিপ্ত	নি ৬৪০	নিঘস	নি ৬৪০	নিটনকালি	নি ৬৪০	নি(নী)দ	নি ৬৪০	নিধান	নি ৫৯৮
নিক্ষিপ্ত	ক্ষিপ্ ২৩৩	নিঘস	অদ্ ২৫	নিটোল	টল্ ৪২৩	নিদয়	নি ৬৪০	নিধান	ধা ৫৯০
নিক্ষেপ	নি ৬৪০	নিঘাত	নি ৬৪০	নিঠুর	নি ৬৪০	নিদয়া	নি ৬৪০	নিধাননাথ	নি ৬৪০
নিক্ষেপক	নি ৬৪০	নিঘাতি	নি ৬৪০	নিঠুরপনা	নি ৬৪০	নিদর্শক	নি ৬৪০	নিধানপ	নি ৬৪০
নিক্ষেপণ	নি ৬৪০	নিঘাবানা	নি ৬৪০	নিড়বিড়া	নি ৬৪০	নিদর্শন	নি ৬৪৫	নিধানপাল	নি ৬৪০
নিক্ষেত্রী	নি ৬৪০	নিঘ্ন	নি ৬৪০	নিড়বিড়ে	নি ৬৪০	নিদর্শনা	নি ৬৪০	নিধানপ্রাপ্ত	নি ৬৪০
নিখণ্ড	নি ৬৪০	নিঙাড়	নি ৬৪০	নিড়া	নি ৬৪০	নিদা	নি ৬৪০	নিধানি(নী)	নি ৬৪০
নিখনন	নি ৬৪০	নিঙ্গড়	নি ৬৪০	নিডীন	নি ৬৪০	নিদাঘ	নি ৬৪০	নিধি	নি ৬৪৬
নিখনন	খন্ ২৪৮	নিঙ্গড়া	নি ৬৪০	নিত	নি ৬৪০	নিদাঘ	দহ্ ৫২০	নিধি	ধা ৬০০
নিখর্ব্ব	নি ৬৪০	নিঙ্গাড়	নি ৬৪০	নিতকলঙ্কে	নি ৬৪০	নিদাঘার্ত্ত	নি ৬৪০	নিধুবন	নি ৬৪৭
নিখাত	নি ৬৪০	নিঙ্গুড়	নি ৬৪০	নিতম্ব	নি ৬৪০	নিদাটি(টী)	নি ৬৪০	নিধুবনক্রীড়া	নি ৬৪০
নিখাদ	নি ৬৪০	নিচয়	নি ৬৪০	নিতম্ব	তম্ ৪৬২	নিদান	নি ৬৪৫	নিধুবনলীলা	নি ৬৪০
নিখিল	নি ৬৪৪	নিচয়	চি ৩৪৬	নিতম্ববতী	নি ৬৪০	নিদান	দা ৫২৭	নিন	নি ৬৪০
নিখিল	ক্ষি ২৩০	নিচল	নি ৬৪০	নিতম্বভূমি	নি ৬৪০	নিদানকাল	নি ৬৪০	নিনড়	নি ৬৪০
নিখুঁত	নি ৬৪০	নিচিত	নি ৬৪০	নিতম্বিনী	নি ৬৪০	নিদারুণ	নি ৬৪০	নিনদ	নি ৬৪০
নিখুঁতি	নি ৬৪০	নিচিন্তে	নি ৬৪০	নিতম্বিনী	তম্ ৪৬২	নিদালি	নি ৬৪০	নিনাদ	নি ৬৪০
নিগড়	নি ৬৪৪	নিচিয়া	নি ৬৪০	নিতম্বী	নি ৬৪০	নিদিগ্ধ	নি ৬৪০	নিনাদ	নদ্ ৬২৭
নিগড়ি	নি ৬৪০	নিচুপে	নি ৬৪০	নিতরাম	নি ৬৪০	নিদিগ্ধা	নি ৬৪০	নিনাদন	নি ৬৪০
নিগদ	গদ্ ২৬১	নিচুল	নি ৬৪০	নিতল	নি ৬৪০	নিদিধ্যাস	নি ৬৪০	নিনাদিত	নি ৬৪০
নিগদ	নি ৬৪৪	নিচোড়	নি ৬৪০	নিতা	নি ৬৪০	নিদিধ্যাসন	নি ৬৪০	নিনাদী	নি ৬৪০
নিগদিত	নি ৬৪৪	নিচোর	নি ৬৪০	নিতাই	নি ৬৪৫	নিদুটি(টী)	নি ৬৪০	নিনু	নি ৬৪০
নিগম	নি ৬৪০	নিচোলা	নি ৬৪০	নিতানি	নি ৬৪০	নিদুস্নি	নি ৬৪০	নিন্দ্	নি ৬৪০
নিগম	গম্ ২৬২	নিচ্চ(চ্ছ)য়	নি ৬৪০	নিতান্ত	নি ৬৪৫	নিদেন	নি ৬৪৫	নিন্দ	নি ৬৪৭
নিগমন	নি ৬৪০	নিছ	নি ৬৪০	নিতান্ত	তম্ ৪৬২	নিদেশ	নি ৬৪০	নিন্দক	নি ৬৪৭
নিগর	নি ৬৪০	নিছক	নি ৬৪৪	নিতি	নি ৬৪৫	নিদেশিনী	নি ৬৪০	নিন্দন	নি ৬৪৭

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
নিন্দনীয়	নি ৬৪৭	নিবসথ	নি ৬৪০	নিমজ্জন	নি ৬৪০	নিয়ম	নি ৬৪০	নিরন্বয়	নি ৬৪০
নিন্দা	নি ৬৪৭	নিবসন	নি ৬৪০	নিমজ্জিত	নি ৬৪০	নিয়মন	নি ৬৪০	নিরপত্রপ	নি ৬৪০
নিন্দা(ন্দ্যা)টী	নি ৬৪০	নিবহ্	নি ৬৪০	নিমন্তন্ন	নি ৬৪০	নিয়মনিষ্ঠা	নি ৬৪০	নিরপরাধ	নি ৬৪০
নিন্দাস্তুতি	নি ৬৪৭	নিবা	নি ৬৪০	নিমন্ত্র	নি ৬৪০	নিয়মবিধি	নি ৬৪০	নিরপরাধী	নি ৬৪০
নিন্দি	নি ৬৪০	নিবাত	নি ৬৪৮	নিমন্ত্রণ	নি ৬৪০	নিয়মিত	নি ৬৪০	নিরপেক্ষ	নি ৬৪০
নিন্দিত	নি ৬৪৭	নিবাতকবচ	নি ৬৪৮	নিমন্ত্রিত	নি ৬৪০	নিয়র	নি ৬৪০	নিরপেক্ষ	ঈক্ষ্ ৮০
নিন্দুক	নি ৬৪৭	নিবাপ	নি ৬৪০	নিময়	নি ৬৪০	নিয়াই	নি ৬৪০	নিরপেক্ষতা	নি ৬৪০
নিন্দুয়া	নি ৬৪০	নিবার	নি ৬৪০	নিমরাজি	নি ৬৪০	নিয়াম	নি ৬৪০	নিরপেক্ষী	নি ৬৪০
নিপট	নি ৬৪০	নিবারণ	নি ৬৪০	নিমর্ম্ম	নি ৬৪০	নিয়ামক	নি ৬৪০	নিরপেখি	নি ৬৪০
নিপট্টবাহ্য	নি ৬৪০	নিবারিণী	নি ৬৪০	নিমা	নি ৬৪০	নিয়ামৎ	নি ৬৪০	নিরবকাশ	নি ৬৪০
নিপঠ	নি ৬৪০	নিবারিত	নি ৬৪০	নিমাই(ঞি)	নি ৬৪৯	নিযুক্ত	নি ৬৪০	নিরবকাশ	কশ্ ১৭৩
নিপাঠ	নি ৬৪৮	নিবাস	নি ৬৪০	নিমাঞা	নি ৬৪০	নিযুক্তি	নি ৬৪০	নিরবগ্রহ	নি ৬৪০
নিপতন	নি ৬৪০	নিবিড়	নি ৬৪০	নিমান	নি ৬৪০	নিযুত	নি ৬৪০	নিরবচ্ছিন্ন	নি ৬৪০
নিপতিত	নি ৬৪০	নিবিরীস	নি ৬৪০	নিমানন্দী	নি ৬৪০	নিযুদ্ধ	নি ৬৪০	নিরবচ্ছিন্ন	ছিদ্ ৩৬৭
নিপাত	নি ৬৪০	নিবিষ্ট	নি ৬৪০	নিমাল(লি)	নি ৬৪০	নিয়ে-নেয়	নী ৬৫৫	নিরবদ্য	নি ৬৪০
নিপাতন	নি ৬৪৮	নিবীত	নি ৬৪০	নিমি	নি ৬৪৯	নিযোক্তা	নি ৬৪০	নিরবধি	নি ৬৪০
নিপাতিত	নি ৬৪৮	নিবীতী	নি ৬৪০	নিমিখ	নি ৬৪০	নিয়োগ	নি ৬৪০	নিরবয়ব	নি ৬৪০
নিপান	নি ৬৪৮	নিবৃত	নি ৬৪০	নিমিত	নি ৬৪০	নিয়োগপত্র	নি ৬৪০	নিরবলম্ব	নি ৬৪০
নিপীত	নি ৬৪০	নিবৃত্ত	নি ৬৪০	নিমিত্ত	নি ৬৫০	নিয়োগী	নি ৬৪০	নিরবশেষ	নি ৬৪০
নিপীড়ন	নি ৬৪০	নিবৃন্ত	নি ৬৪০	নিমিত্তকারণ	নি ৬৫০	নিয়োজ	নি ৬৪০	নিরবসিত	নি ৬৪০
নিপীড়িত	নি ৬৪০	নিবেদ	নি ৬৪০	নিমিত্তজ্ঞ	নি ৬৫০	নিয়োজন	নি ৬৪০	নিরবস্তার	নি ৬৪০
নিপুণ	নি ৬৪৮	নিবেদক	নি ৬৪০	নিমিত্তমাত্র	নি ৬৫০	নিযোজ্য	নি ৬৪০	নিরভিমান	নি ৬৪০
নিপ্রত্যাশী	নি ৬৪০	নিবেদন	নি ৬৪৯	নিমিত্তী	নি ৬৪০	নির্	নি ৬৪০	নিরভ্র	নি ৬৪০
নিব	নি ৬৪০	নিবেদনমিতি	নি ৬৪০	নিমি(মে)ষ	নি ৬৫১	নিরংশ	নি ৬৪০	নিরম	নি ৬৪০
নিব	ন্ ৬৬৭	নিবেদিত	নি ৬৪০	নিমীলন	নি ৬৪০	নিরংশু	নি ৬৪০	নিরমঞ্চ(ঞ্ছ)	নি ৬৪০
নিব-নিব	নি ৬৪০	নিবেদী	নি ৬৪০	নিমীলিত	নি ৬৪০	নিরক্ষ	নি ৬৪০	নিরমঞ্ছন	নি ৬৪০
নিবড়	নি ৬৪০	নিবেদ্য	নি ৬৪০	নিমীলনয়ন	নি ৬৪০	নিরক্ষরেখা	নি ৬৪০	নিরমদ	নি ৬৪০
নিবন্ধ	নি ৬৪০	নিবেশ	নি ৬৪৯	নিমেয়	নি ৬৪০	নিরখ	নি ৬৪০	নিরমল	নি ৬৪০
নিবন্ধন	নি ৬৪০	নিবেশন	নি ৬৪০	নিমেষ	নি ৬৪০	নিরখিয়া	নি ৬৪০	নিরমা	নি ৬৪০
নিবন্ধনী	নি ৬৪০	নিবেশী	নি ৬৪০	নিম্ন	নি ৬৫২	নিরগ্নি	নি ৬৪০	নিরমাণ	নি ৬৪০
নিবন্ধী	নি ৬৪০	নিবেশ্য	নি ৬৪০	নিম্নগ	নি ৬৫২	নিরঙ্কুশ	নি ৬৪০	নিরম্বু	নি ৬৪০
নিবপন	নি ৬৪০	নিবোধত	নি ৬৪০	নিম্নগা	নি ৬৫২	নিরঞ্জন	নি ৬৪০	নিরয়	নি ৬৪০
নিবর্ত্ত	নি ৬৪০	নিভ	নি ৬৪০	নিম্ব	নি ৬৪৯	নিরঞ্জনা	নি ৬৪০	নিরর্গল	নি ৬৪০
নিবর্ত্তন	নি ৬৪০	নিভা	নি ৬৪০	নিম্বু	নি ৬৪৯	নিরঞ্জনী	নি ৬৪০	নিরর্থ	নি ৬৪০
নিবর্ত্তনা	নি ৬৪০	নিভঞ্জন	নি ৬৪০	নিম্বুক	নি ৬৪৯	নিরত	নি ৬৪০	নিরর্থক	নি ৬৪০
নিবর্ত্তনীয়	নি ৬৪০	নিভাঁজ	নি ৬৪০	নিম্লোচ	নি ৬৪০	নিরতি	নি ৬৪০	নিরল	নি ৬৪০
নিবর্ত্তা	নি ৬৪০	নিভা	নি ৬৪০	নিম্লোচন	নি ৬৪০	নিরতিশয়	নি ৬৪০	নিরলস	নি ৬৪০
নিবর্ত্তিত	নি ৬৪০	নিভান	নি ৬৪০	নিয়ড়	নি ৬৪০	নিরত্যয়	নি ৬৪০	নিরশন	নি ৬৪০
নিবর্ত্তিনী	নি ৬৪০	নিভালন	নি ৬৪০	নিয়ত	নি ৬৫২	নিরনুনাসিক	নি ৬৪০	নিরস	নি ৬৪০
নিবর্ত্তী	নি ৬৪০	নিভৃত	নি ৬৪০	নিয়তি	নি ৬৫২	নিরন্ত	নি ৬৪০	নিরস	অস্ ৫৬
নিবর্হন	নি ৬৪০	নিম	নি ৬৪৯	নিয়তঃ	নি ৬৪০	নিরন্তক	নি ৬৪০	নিরসন	অস্ ৫৬
নিবর্হিত	নি ৬৪০	নি(নে)মক	নি ৬৪০	নিয়ন্তব্য	নি ৬৪০	নিরন্তর	নি ৬৪০	নিরসন	নি ৬৪০
নিবস	নি ৬৪০	নিমকি(কী)	নি ৬৪০	নিয়ন্তা	নি ৬৪০	নিরন্ন	নি ৬৪০	নিরস্ত	নি ৬৪০
নিবসতি	নি ৬৪০	নিমগ্ন	নি ৬৪০	নিয়ন্ত্রণ	নি ৬৪০	নিরন্ন	অদ্ ২৫	নিরস্ত	অস্ ৫৬
নিবস্তব্য	নি ৬৪০	নিমজ্জথু	নি ৬৪০	নিয়ন্ত্রিত	নি ৬৪০	নিরন্তর	অম্ ৩৬	নিরস্ত্র	নি ৬৪০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
নিরস্থি	নি ৬৪০	নিরাহার	নি ৬৪০	নিরূপিত	নি ৬৪০	নির্ণয়	নি ৬৪০	নির্বন্ধন	নি ৬৪০
নিরহঙ্কার	নি ৬৪০	নিরাহারী	নি ৬৪০	নিরূহ	নি ৬৪০	নির্ণয়	নী ৬৫৫	নির্বন্ধিত	নি ৬৪০
নিরহঙ্কৃত	নি ৬৪০	নিরাহিত	নি ৬৪০	নিরূহণ	নি ৬৪০	নির্ণয়ন	নি ৬৪০	নির্বপণ	নি ৬৪০
নিরাকরণ	নি ৬৪০	নিরিখ	নি ৬৪০	নির্ঋণী	নি ৬৪০	নির্ণায়ক	নি ৬৪০	নির্বর্ণন	নি ৬৪০
নিরাকরণ	কৃ ২০০	নিরিন্দ্রিয়	নি ৬৪০	নির্ঋতি	নি ৬৪০	নির্ণিক্ত	নি ৬৪০	নির্বর্ণনীয়	নি ৬৪০
নিরাকর্ত্তা	নি ৬৪০	নিরিবিল	নি ৬৪০	নিরেট	নি ৬৪০	নির্ণিক্তি	নি ৬৪০	নির্বর্ত্তক	নি ৬৪০
নিরাকার	নি ৬৪০	নিরিবিলি	নি ৬৪০	নিরেস	নি ৬৪০	নির্ণীত	নি ৬৪০	নির্বর্ত্তী	নি ৬৪০
নিরাকার	কৃ ২০০	নিরীক্ষ	নি ৬৪০	নিরোগী	নি ৬৪০	নির্ণীত	নী ৬৫৫	নির্বল	নি ৬৪০
নিরাকাশ	নি ৬৪০	নিরীক্ষক	নি ৬৪০	নিরোদ্ধব্য	নি ৬৪০	নির্ণেক	নি ৬৪০	নির্বলী	নি ৬৪০
নিরাকুল	নি ৬৪০	নিরীক্ষক	ঈক্ষ্ ৮০	নিরোধ	নি ৬৪০	নির্ণেজক	নি ৬৪০	নির্বহ	নি ৬৪০
নিরাকৃত	নি ৬৪০	নিরীক্ষণ	নি ৬৪০	নিরোধন	নি ৬৪০	নির্ণেতা	নি ৬৪০	নির্বহণ	নি ৬৪০
নিরাকৃতি	নি ৬৪০	নিরীক্ষণ	ঈক্ষ্ ৮০	নিরোদ্ধার	নি ৬৪০	নির্ণেয়	নি ৬৪০	নির্বাক	নি ৬৪০
নিরাগ	নি ৬৪০	নিরীক্ষা	ঈক্ষ্ ৮০	নির্গত	নি ৬৪০	নির্দ্দংশু	নি ৬৪০	নির্বাচ	নি ৬৪০
নিরাগস	নি ৬৪০	নিরীক্ষা	নি ৬৪০	নির্গত	গম্ ২৬২	নির্দ্দম	নি ৬৪০	নির্বাচক	নি ৬৪০
নিরা(রে)ট	নি ৬৪০	নিরীক্ষ্য	নি ৬৪০	নির্গন্ধ	নি ৬৪০	নির্দ্দয়	নি ৬৪০	নির্বাচন	নি ৬৫৪
নিরেট-বাঁজা	নি ৬৪০	নিবাখ	নি ৬৪০	নির্গন্ধন	নি ৬৪০	নির্দ্দর	নি ৬৪০	নির্বাচনী	নি ৬৪০
নিরাতঙ্ক	নি ৬৪০	নিরীখ	ঈক্ষ্ ৮০	নির্গম	নি ৬৪০	নির্দ্দশ	নি ৬৪০	নির্বাচিত	নি ৬৪০
নিরাদিষ্ট	নি ৬৪০	নিরীতি	নি ৬৪০	নির্গম	গম্ ২৬২	নির্দ্দহন	নি ৬৪০	নির্বাণ	নি ৬৫৪
নিরাধার	নি ৬৪০	নিরীশ্বর	নি ৬৪০	নির্গমন	গম্ ২৬২	নির্দ্দাতা	নি ৬৪০	নির্বাত	নি ৬৪০
নিরানন্দ	নি ৬৪০	নিরীহ	নি ৬৫৩	নির্গুণ	নি ৬৫৩	নির্দ্দায়	নি ৬৪০	নির্বাদ	নি ৬৪০
নিরানব্বই	নু ৬৫৯	নিরীহ	ঈহ্ ৮২	নির্গূঢ়	নি ৬৪০	নির্দ্দারিত	নি ৬৪০	নির্বাপ	নি ৬৪০
নিরাপদ	নি ৬৪০	নিরুক্ত	নি ৬৫৩	নির্গ্রন্থ	নি ৬৪০	নির্দ্দিষ্ট	নি ৬৪০	নির্বাপণ	নি ৬৪০
নিরাবাধ	নি ৬৪০	নিরুক্তি	নি ৬৪০	নির্গ্রন্থক	নি ৬৪০	নির্দ্দিষ্ট	দিশ্ ৫৪২	নির্বাপক	নি ৬৪০
নিরাবিল	নি ৬৪০	নিরুৎসব	নি ৬৪০	নির্গ্রন্থিক	নি ৬৪০	নির্দ্দেশ	নি ৬৪০	নির্বাপয়িতা	নি ৬৪০
নিরাময়	নি ৬৪০	নিরুৎসাহ	নি ৬৪০	নির্গ্রাহ্য	নি ৬৪০	নির্দ্দেশ	দিশ্ ৫৩৮	নির্বাপিত	নি ৬৪০
নিরামিষ	নি ৬৪০	নিরুৎসুক	নি ৬৪০	নির্ঘণ্ট	নি ৬৪০	নির্দ্দেশক	নি ৬৪০	নির্বারিত	নি ৬৪০
নিরামিষাশী	নি ৬৪০	নিরুদক	নি ৬৪০	নির্ঘণ্ট	ঘট্ ৩০৭	নির্দ্দেশন	নি ৬৪০	নির্বাস	নি ৬৪০
নিরামিষ্য	নি ৬৪০	নিরুদ্দিষ্ট	নি ৬৪০	নির্ঘাত	নি ৬৪০	নির্দ্দেশনা	নি ৬৪০	নির্বাসন	নি ৬৪০
নিরামিষ্‌ষি	নি ৬৪০	নিরুদ্দিষ্ট	দিশ্ ৫৩৬	নির্ঘাতন	নি ৬৪০	নির্দ্দোষ	নি ৬৪০	নির্বাসিত	নি ৬৪০
নিরায়	নি ৬৪০	নিরুদ্দেশ	নি ৫৪২	নির্ঘৃণ	নি ৬৪০	নির্দ্দোষী	নি ৬৪০	নির্বাহ	নি ৬৪০
নিরায়ত	নি ৬৪০	নিরুদ্দেশ	দিশ্ ৫৩৮	নির্ঘোষ	নি ৬৪০	নির্দ্ধ(র্ধ)ন	নি ৬৪০	নির্বাহণ	নি ৬৪০
নিরালম্ব	নি ৬৪০	নিরুদ্ধ	নি ৬৪০	নির্জন	নি ৬৪০	নির্ধনী	নি ৬৪০	নির্বাহিত	নি ৬৪০
নিরালয়	নি ৬৪০	নিরুদ্যম	নি ৬৪০	নির্জর	নি ৬৪০	নির্দ্ধার	নি ৬৪০	নির্বাহী	নি ৬৪০
নিরালা	নি ৬৪০	নিরুদ্বেগ	নি ৬৪০	নির্জরা	নি ৬৪০	নির্দ্ধারক	নি ৬৪০	নির্ব্বিকল্প	নি ৬৪০
নিরালোক	নি ৬৪০	নিরুপদ্রব	নি ৬৪০	নির্জল	নি ৬৪০	নির্দ্ধারণ	নি ৬৪০	নির্ব্বিকল্পক	নি ৬৪০
নিরাশ	নি ৬৪০	নিরুপপত্তি	নি ৬৪০	নির্জল্পা	নি ৬৪০	নির্দ্ধারিত	নি ৬৪০	নির্ব্বিকার	নি ৬৪০
নিরাশ	অশ্ ৪৬	নিরুপম	নি ৬৪০	নির্জ্জান	নি ৬৪০	নির্দ্বন্দ্ব	নি ৬৪০	নির্ব্বিকার	কৃ ২০০
নিরাশা	অশ্ ৪৬	নিরুপাধি	নি ৬৪০	নির্জিত	নি ৬৪০	নির্ধূত	নি ৬৪০	নির্ব্বিচার	চর্ ৩৪০
নিরাশা	নি ৬৪০	নিরুপাধিক	নি ৬৪০	নির্জিত	জি ৩৯১	নির্ধৌত	নি ৬৪০	নির্ব্বিচার	নি ৬৪০
নিরাশীঃ	নি ৬৪০	নিরুপাম	নি ৬৪০	নির্জীব	জীব্ ৩৯৪	নির্নাভি	নি ৬৪০	নির্ব্বিচেষ্ট	নি ৬৪০
নিরাশ্রয়	নি ৬৪০	নিরূঢ়	নি ৬৪০	নির্জীব	নি ৬৪০	নির্নিমেষ	নি ৬৪০	নির্ব্বিঘ্ন	নি ৬৪০
নিরাশ্রিত	নি ৬৪০	নিরূঢ়া	নি ৬৪০	নির্ঝর	নি ৬৪০	নির্বংশ	নি ৬৪০	নির্ব্বিনোদ	নি ৬৪০
নিরাস	নি ৬৪০	নিরূঢ়ি	নি ৬৪০	নির্ঝরিণী	নি ৬৪০	নির্বচ	নি ৬৪০	নির্ব্বিন্ধ্যা	নি ৬৪০
নিরাস	অস্ ৫৬	নিরূপক	নি ৬৪০	নির্ঝরী	নি ৬৪০	নির্বচন	নি ৬৫৪	নির্ব্বিবর	নি ৬৪০
নিরাসক্ত	নি ৬৪০	নিরূপণ	নি ৬৪০	নির্ণত	নি ৬৪০	নির্বন্ধ	নি ৬৪০	নির্ব্বিবেক	নি ৬৪০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
নির্ব্বিবেকী	নি ৬৪০	নির্ম্মাণ	নি ৬৪০	নিলয়ন	নি ৬৪০	নিশিকান্ত	নশ্ ৬৩২	নিষধ	নি ৬৫৪
নির্ব্বিরোধ	নি ৬৪০	নির্ম্মায়িণী	নি ৬৪০	নি(নী)লাম	নি ৬৪০	নিশিকুটুম্ব	নশ্ ৬৩২	নিষাদ	নি ৬৫৪
নির্ব্বিরোধী	নি ৬৪০	নির্ম্মায়ী	নি ৬৪০	নিলামজারি	নি ৬৪০	নিশিগন্ধা	নশ্ ৬৩২	নিষাদিত	নি ৬৪০
নির্ব্বিশঙ্ক	নি ৬৪০	নির্ম্মালি	নি ৬৪০	নিলামডাক	নি ৬৪০	নিশিত	নি ৬৪০	নিষাদী	নি ৬৪০
নির্ব্বিশেষ	নি ৬৪০	নির্ম্মাল্য	নি ৬৪০	নিলিম্প	নি ৬৪০	নিশিদিশি(সি)	নশ্ ৬৩৪	নিষিক্ত	নি ৬৪০
নির্ব্বিষ	নি ৬৪০	নির্ম্মিত	নি ৬৪০	নিলীন	নি ৬৪০	নিশিনাথ	নশ্ ৬৩২	নিষিঞ্চন	নি ৬৪০
নির্ব্বিষয়	নি ৬৪০	নির্ম্মিতি	নি ৬৪০	নিশ্	নি ৬৪০	নিশিপতি	নশ্ ৬৩২	নিষিদ্ধ	নি ৬৪০
নির্ব্বিষ্ট	নি ৬৪০	নির্ম্মুক্ত	নি ৬৪০	নিশঙ্ক	নি ৬৪০	নিশিভাগ	নশ্ ৬৩২	নিষুতি	নি ৬৪০
নির্ব্বীজ	নি ৬৪০	নির্ম্মুক্তি	নি ৬৪০	নিশঙ্কিনী	নি ৬৪০	নিশিভোর	নশ্ ৬৩২	নিষুপ্ত	নি ৬৪০
নির্ব্বীর	নি ৬৪০	নির্ম্মূল	নি ৬৪০	নিশপিশ	ইষ্ ৭৮	নিশিমুখ	নশ্ ৬৩২	নিষূদক	নি ৬৪০
নির্ব্বীরা	নি ৬৪০	নির্ম্মূলন	নি ৬৪০	নিশব্দ	নি ৬৪০	নিশী	নশ্ ৬৩২	নিষূদন	নি ৬৪০
নির্ব্বৃত	নি ৬৪০	নির্ম্মোক	নি ৬৪০	নিশমন	নি ৬৪০	নিশীথ	নশ্ ৬৩৫	নিষেক	নি ৬৪০
নির্ব্বৃত্ত	নি ৬৪০	নির্ম্মোক্ষ	নি ৬৪০	নিশস	নি ৬৪০	নিশীথবতী	নশ্ ৬৩২	নিষেচন	নি ৬৪০
নির্ব্বৃত্তি	নি ৬৪০	নির্ম্মোচন	নি ৬৪০	নিশা	নশ্ ৬৩৪	নিশীথিনী	নশ্ ৬৩৫	নিষেধ	নি ৬৪০
নির্ব্বৃষ্টি	নি ৬৪০	নির্ম্মোহ	নি ৬৪০	নিশাকর	নশ্ ৬৩২	নিশীশ্বর	নশ্ ৬৩২	নিষেধক	নি ৬৪০
নির্ব্বেদ	নি ৬৪০	নির্যশস্ক	নি ৬৪০	নিশাকান্ত	নশ্ ৬৩২	নিশু(ষু)তি	নশ্ ৬৩২	নিষেধন	নি ৬৪০
নির্ব্বেশ	নি ৬৪০	নির্যাণ	নি ৬৪০	নিশাকাল	নশ্ ৬৩২	নিশুম্ভ	নি ৬৪০	নিষেধাজ্ঞা	নি ৬৪০
নির্ব্বেশনীয়	নি ৬৪০	নির্যাপণ	নি ৬৪০	নিশাচর	নশ্ ৬৩৫	নিশুম্ভমর্দ্দিনী	নি ৬৪০	নিষেধবিধি	নি ৬৪০
নির্ব্বৈর	নি ৬৪০	নির্যাতন	নি ৬৪০	নিশাচর	চর্ ৩৪০	নিশোয়াস	নি ৬৪০	নিষেধী	নি ৬৪০
নির্ব্যথন	নি ৬৪০	নির্যা(য্যা)স	নি ৬৪০	নিশাচরী	নশ্ ৬৩৫	নিশ্চই	নি ৬৪০	নিষেবণ	নি ৬৪০
নির্ব্যপেক্ষ	নি ৬৪০	নির্যূষ	নি ৬৪০	নিশাত	নি ৬৪০	নিশ্চএ	নি ৬৪০	নিষেবিত	নি ৬৪০
নির্ব্যূঢ়	নি ৬৪০	নির্যূহ	নি ৬৪০	নিশাত্যয়	নশ্ ৬৩২	নিশ্চয়	নি ৬৪০	নিষেবিতব্য	নি ৬৪০
নির্ভয়	নি ৬৪০	নির্যোল	নি ৬৪০	নিশাদান	নশ্ ৬৩২	নিশ্চয়	চি ৩৪৬	নিষেবী	নি ৬৪০
নির্ভর	নি ৬৪০	নির্লজ্জ	নি ৬৪০	নিশান	নি ৬৪০	নিশ্চয়তা	নি ৬৪০	নিষেবিনী	নি ৬৪০
নির্ভর্ৎসন	নি ৬৪০	নির্লজ্জিত	নি ৬৪০	নিশানদার	নি ৬৪০	নিশ্চিত	নি ৬৪০	নিষ্ক	নি ৬৪০
নির্ভাত	নি ৬৪০	নির্লিপ্ত	নি ৬৪০	নিশানদিহি	নি ৬৪০	নিশ্চিতি	নি ৬৪০	নিষ্কণ্টক	নি ৬৪০
নির্ভিন্ন	নি ৬৪০	নির্লেখন	নি ৬৪০	নিশানা	নি ৬৪০	নিশ্চল	নি ৬৪০	নিষ্কন্দিনী	নি ৬৪০
নির্ভীক	নি ৬৪০	নির্লেপ	নি ৬৪০	নিশানাথ	নশ্ ৬৩২	নিশ্চল	চল্ ৩৪৫	নিষ্কপট	নি ৬৪০
নির্ভীত	নি ৬৪০	নির্লোড়িত	নি ৬৪০	নিশানি	নি ৬৪০	নিশ্চলতা	নি ৬৪০	নিষ্কম্প	নি ৬৪০
নির্ভেদ	নি ৬৪০	নির্লোভ	নি ৬৪০	নিশানী	নি ৬৪০	নিশ্চলা	নি ৬৪০	নিষ্করুণ	নি ৬৪০
নির্ম্ম	নি ৬৪০	নির্লোভী	নি ৬৪০	নিশান্ত	নশ্ ৬৩২	নিশ্চিন্ত	নি ৬৪০	নিষ্কর্ম্মা	নি ৬৪০
নির্মক্ষিক	নি ৬৪০	নির্লোম	নি ৬৪০	নিশান্ধ	নশ্ ৬৩২	নিশ্চিন্ত	চিন্ত্ ৩৫২	নিষ্কর্ষ	নি ৬৪০
নির্মগমন	নি ৬৪০	নির্লোমা	নি ৬৪০	নিশাপতি	নশ্ ৬৩২	নিশ্চেতন	নি ৬৪০	নিষ্কর্ষ	কৃশ্ ২১৫
নির্ম্মঞ্চন	নি ৬৪০	নির্হরণ	নি ৬৪০	নিশাপালা	নশ্ ৬৩২	নিশ্চেষ্ট	নি ৬৪০	নিষ্কর্ষণ	নি ৬৪০
নির্ম্মঞ্জু	নি ৬৪০	নির্হার	নি ৬৪০	নিশাপুষ্প	নশ্ ৬৩২	নিশ্ছন্দঃ	নি ৬৪০	নিষ্কল	নি ৬৪০
নির্ম্মঞ্জন	নি ৬৪০	নির্হারক	নি ৬৪০	নিশাবিহার	নশ্ ৬৩২	নিশ্ছিদ্র	নি ৬৪০	নিষ্কল	কল্ ১৬৪
নির্ম্মৎসর	নি ৬৪০	নির্হারী	নি ৬৪০	নিশাবেদী	নশ্ ৬৩২	নিশ্রুত	নি ৬৪০	নিষ্কলা	নি ৬৪০
নির্ম্মথন	নি ৬৪০	নির্হেতু	নি ৬৪০	নিশাভাগ	নশ্ ৬৩২	নিশ্বস	নি ৬৪০	নিষ্কলী	নি ৬৪০
নির্ম্মদ	নি ৬৪০	নির্হেতুক	নি ৬৪০	নিশামন	নশ্ ৬৩২	নিশ্বসিত	নি ৬৪০	নিষ্কষায়	নি ৬৪০
নির্ম্মন্থন	নি ৬৪০	নির্হৃত	নি ৬৪০	নিশামুখ	নশ্ ৬৩২	নিশ্বাস	নি ৬৪০	নিষ্কাম	নি ৬৪০
নির্ম্মম	নি ৬৪০	নির্হৃতি	নি ৬৪০	নিশারত্ন	নশ্ ৬৩২	নিষক্ত	নি ৬৪০	নিষ্কাম	কম্ ১৫৪
নির্ম্মর্য্যাদ	নি ৬৪০	নির্হ্রাদ	নি ৬৪০	নিশারাতি	নশ্ ৬৩২	নিষঙ্গ	নি ৬৪০	নিষ্কামী	নি ৬৪০
নির্ম্মল	নি ৬৪০	নিল(লা)জ	নি ৬৪০	নিশারাত্র(ত্রি)	নশ্ ৬৩২	নিষঙ্গী	নি ৬৪০	নিষ্কারণ	নি ৬৪০
নির্ম্মলী	নি ৬৪০	নিলাজিনী	নি ৬৪০	নিশাস	নি ৬৪০	নিষণ্ণ	নি ৬৫৪	নিষ্কারণ	কৃ ২০০
নির্ম্মা	নি ৬৪০	নিলয়	নি ৬৪০	নিশি(শী)	নশ্ ৬৩২	নিষদ্যা	নি ৬৫৪	নিষ্কাশ(স)	নি ৬৪০

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
নিষ্কাশন	নি ৬৪০	নিষ্পবন	নি ৬৪০	নিস্তব্ধ	নি ৬৪০	নীচৈঃ	নী ৬৫৫	নীলকান্ত	নী ৬৫৫
নিষ্কাশন	কশ্ ১৭৩	নিষ্পরিগ্রহ	নি ৬৪০	নিস্তমস্ক	নি ৬৪০	নীঝর	নী ৬৫৫	নীলকুঠি	নী ৬৫৫
নিষ্কাশিত	নি ৬৪০	নিষ্পাণ্ডব	নি ৬৪০	নিস্তরঙ্গ	নি ৬৪০	নীড়	নী ৬৫৫	নীলক্রৌঞ্চ	নী ৬৫৫
নিষ্কিঞ্চন	নি ৬৪০	নিষ্পাদক	নি ৬৪০	নিস্তরণ	নি ৬৪০	নীত	নী ৬৫৬	নীলগাই	নী ৬৫৫
নিষ্কুট	নি ৬৪০	নিষ্পাদন	নি ৬৪০	নিস্তল	নি ৬৪০	নী(নি)তবর	নী ৬৫৬	নীলগাউ	নী ৬৫৫
নিষ্কুটি(টী)	নি ৬৪০	নিষ্পাদিত	নি ৬৪০	নিস্তলা	নি ৬৪০	নীতি	নী ৬৫৬	নীলগিরি	নী ৬৫৫
নিষ্কুল	নি ৬৪০	নিষ্পাদ্য	নি ৬৪০	নিস্তার	নি ৬৪০	নীতিকুশল	নী ৬৫৫	নীলগ্রীব	নী ৬৫৫
নিষ্কুলীন	নি ৬৪০	নিষ্পাপী	নি ৬৪০	নিস্তার	তৃ ৪৭৭	নীতিজ্ঞ	নী ৬৫৫	নীলতাল	নী ৬৫৫
নিষ্কুষিত	নি ৬৪০	নিষ্পাব	নি ৬৪০	নিস্তারিণী	নি ৬৪০	নীতিবিদ্যা	নী ৬৫৫	নীলধ্বজ	নী ৬৫৫
নিষ্কুহ্	নি ৬৪০	নিষ্পাবী	নি ৬৪০	নিস্তুষ	নি ৬৪০	নীতিশাস্ত্র	নী ৬৫৫	নীলপটল	নী ৬৫৫
নিষ্কুজ	নি ৬৪০	নিষ্পীড়	নি ৬৪০	নিস্তেজ	তি ৪৬৭	নীতিবিশারদ	নী ৬৫৫	নীলপদ্ম	নী ৬৫৫
নিষ্কৃত	নি ৬৪০	নিষ্পীড়িত	নি ৬৪০	নিস্তেজাঃ	নি ৬৪০	নীতিসন্ধি	নী ৬৫৫	নীলবর্ণ	নী ৬৫৫
নিষ্কৃত	কৃ ২০০	নিষ্পুলাক	নি ৬৪০	নিস্ত্রিংশ	নি ৬৪০	নীধ্র	নি ৬৪০	নীলবসন	নী ৬৫৫
নিষ্কৃতি	নি ৬৪০	নিষ্পেষ	নি ৬৪০	নিস্ত্রৈগুণ্য	নি ৬৪০	নীন	নি ৬৪০	নীলবাসাঃ	নী ৬৫৫
নিষ্কৃষ্ট	নি ৬৪০	নিষ্পেষণ	নি ৬৪০	নিস্পন্দ	নি ৬৪০	নীপ	নী ৬৫৫	নীলবৃষ	নী ৬৫৫
নিষ্কোষ	নি ৬৪০	নিষ্প্রচার	নি ৬৪০	নিস্পৃহ	নি ৬৪০	নীবাক	নি ৬৪০	নীলমক্ষিকা	নী ৬৫৫
নিষ্কোষণ	নি ৬৪০	নিষ্প্রতিঘ	নি ৬৪০	নিস্যন্দ	নি ৬৪০	নীবার	নি ৬৪০	নীলমণি	নী ৬৫৫
নিষ্ক্রম	ক্রম্ ২২০	নিষ্প্রতিভ	নি ৬৪০	নিস্রব	নি ৬৪০	নীবি	নি ৬৪০	নীলমাধব	নী ৬৫৫
নিষ্ক্রমণ	নি ৬৪০	নিষ্প্রবাণি	নি ৬৪০	নিস্রাব	নি ৬৪০	নীবিবন্ধ	নি ৬৪০	নীলরতন	নী ৬৫৫
নিষ্ক্রমণ	ক্রম্ ২২০	নিষ্প্রভ	নি ৬৪০	নিস্বন	নি ৬৪০	নীবিনিবন্ধ	নি ৬৪০	নীলরত্ন	নী ৬৫৫
নিষ্ক্রয়	নি ৬৪০	নিষ্প্রয়োজন	নি ৬৪০	নিস্বান	নি ৬৪০	নীবী	নি ৬৪০	নীলরাজি	নী ৬৫৫
নিষ্ক্রান্ত	নি ৬৪০	নিষ্প্লুষ্ট	নি ৬৪০	নিহড়ি	নি ৬৪০	নীর	নী ৬৫৬	নীললোহিত	নী ৬৫৫
নিষ্ক্রান্ত	ক্রম্ ২২০	নিষ্ফল	নি ৬৪০	নিহত	নি ৬৪০	নীরক্ত	নি ৬৪০	নীলসার	নী ৬৫৫
নিষ্ক্রামণ	নি ৬৪০	নিষ্ফলা	নি ৬৪০	নিহন্তা	নি ৬৪০	নীরজ	নী ৬৫৬	নীলা	নী ৬৫৫
নিষ্ক্রিয়	নি ৬৪০	নিষ্ফলী	নি ৬৪০	নিহনন	নি ৬৪০	নীরজস্ক	নি ৬৪০	নীলাঙ্গ	নী ৬৫৫
নিষ্ক্রিয়	কৃ ২০০	নিষ্য(স্য)ন্দ	নি ৬৪০	নিহাই	নি ৬৪০	নীরজাঃ	নি ৬৪০	নীলাঙ্গিনী	নী ৬৫৫
নিষ্ঠ	নি ৬৪০	নিষ্যন্দিনী	নি ৬৪০	নিহাত	নি ৬৪০	নীরদ	নী ৬৫৬	নীলাঙ্গী	নী ৬৫৫
নিষ্ঠা	নি ৬৪০	নিষ্য(স্য)ন্দী	নি ৬৪০	নিহার	নি ৬৪০	নীরধর	নী ৬৫৫	নীলাচল	নী ৬৫৫
নিষ্ঠাবান	নি ৬৪০	নিস্	নি ৬৪০	নিহাল	নি ৬৪০	নীরধি	নী ৬৫৫	নীলাঞ্জন	নী ৬৫৫
নিষ্ঠাকাষ্ঠা	নি ৬৪০	নিসর্গ	নি ৬৪০	নিহালী	নি ৬৪০	নীরনিধি	নী ৬৫৫	নীলাঞ্জনা	নী ৬৫৫
নিষ্ঠান	নি ৬৪০	নিসর্গজ	নি ৬৪০	নিহিংসন	নি ৬৪০	নীরন্ধ্র	নি ৬৪০	নীলাদ্রি	নী ৬৫৫
নিষ্ঠিত	নি ৬৪০	নিসর্গসিদ্ধ	নি ৬৪০	নিহিত	নি ৬৪৬	নীরব	নি ৬৪০	নীলাব্জ	নী ৬৫৫
নিষ্ঠীব	নি ৬৪০	নিসাড়	নি ৬৪০	নিহিত	ধা ৬০০	নীরস	নি ৬৪০	নীলাম্বর	নী ৬৫৫
নিষ্ঠীবন	নি ৬৪০	নিসান	নি ৬৪০	নিহ্নব	নি ৬৪০	নীরাজন	নি ৬৪০	নীলাম্বরী	নী ৬৫৫
নিষ্ঠুর	নি ৬৪০	নিসানী	নি ৬৪০	নিহ্রাদ	নি ৬৪০	নীরাজনা	নি ৬৪০	নীলাম্বু	নী ৬৫৫
নিষ্ঠেব	নি ৬৪০	নিসিন্দা	নি ৬৪০	নী	নী ৬৫৫	নীরুক	নি ৬৪০	নীলাশ্মা	নী ৬৫৫
নিষ্ঠেবন	নি ৬৪০	নিসিন্ধু	নি ৬৪০	নীকাশ	নী ৬৫৫	নীরুজ	নি ৬৪০	নীলিম	নী ৬৫৫
নিষ্ঠ্যূত	নি ৬৪০	নিসূদক	নি ৬৪০	নীচ	নী ৬৫৫	নীরূপ	নি ৬৪০	নীলিমা	নী ৬৫৮
নিষ্ণ	নি ৬৪০	নিসূদন	নি ৬৪০	নীচ	নী ৬৫৫	নীরেন্দ্র	নী ৬৫৬	নীলী	নী ৬৫৫
নিষ্ণাত	নি ৬৪০	নিসৃষ্ট	নি ৬৪০	নীচক	নী ৬৫৫	নীরোগ	নি ৬৪০	নীলোৎপল	নী ৬৫৫
নিষ্পতিপুত্রা	নি ৬৪০	নিসৃষ্টার্থ	নি ৬৪০	নীচকৈঃ	নী ৬৫৫	নীল	নী ৬৫৭	নীলোপল	নী ৬৫৫
নিষ্পত্তি	নি ৬৪০	নিস্‌কড়ি	নি ৬৪০	নীচগ	নী ৬৫৫	নীলক	নী ৬৫৫	নীহার	নি ৬৪০
নিষ্পত্র	নি ৬৪০	নিস্তন্তু	নি ৬৪০	নীচগা	নী ৬৫৫	নীলকণ্ঠ	নী ৬৫৮	নীহারিকা	নি ৬৪০
নিষ্পন্দ	নি ৬৪০	নিস্তন্দ্র	নি ৬৪০	নীচযোনি(নী)	নী ৬৫৫	নীলকমল	নী ৬৫৫	নু	নু ৬৫৯
নিষ্পন্ন	নি ৬৪০	নিস্তন্দ্রি	নি ৬৪০	নীচু	নী ৬৫৫	নীলকর	নী ৬৫৫	নু(নো)ঙা	নু ৬৫৯

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কোন পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
নুঙা	নম্ ৬৩০	নৃত্ত	নৃত্ ৬৬৭	নেউট	নি ৬৪০	নেড়িকুকুর	নট্ ৬২২	নেমি	নী ৬৫৫
নুঙান	নম্ ৬৩০	নৃত্য	নৃত্ ৬৬৭	নেউল	ন্ ৬৬৭	নেড়িয়া	নট্ ৬২২	নেয়	নী ৬৫৫
নুটি	নট্ ৬২২	নৃত্যক	নৃত্ ৬৬৭	নেওতা	নি ৬৫৫	নেড়ে	নট্ ৬২২	নেয়া	নী ৬৫৫
নুঠ	নট্ ৬২২	নৃত্যকী	নৃত্ ৬৬৭	নেওয়া	নী ৬৫৫	নেত	নী ৬৫৮	নেয়া	নু ৬৫৯
নুড়নুড়	নট্ ৬২২	নৃত্যগীত	নৃত্ ৬৬৭	নেওয়াজ	ন্ ৬৬৭	নেতপাট	নী ৬৫৮	নেয়া	ন্ ৬৬৭
নুম্রড়	নট্ ৬২২	নৃত্যপ্রিয়	নৃত্ ৬৬৭	নেং	নি ৬৪০	নেতব্য	নী ৬৫৫	নেয়াই	নি ৬৪০
নুম্মুড়	নট্ ৬২২	নৃত্যশালা	নৃত্ ৬৬৭	নেংগা	নজ্ ৬২১	নেতা	নী ৬৫৮	নেয়াপাতি	ন্ ৬৬৭
নুম্মুড়ী	নট্ ৬২২	নৃত্যস্থান	নৃত্ ৬৬৭	নেংটা	নজ্ ৬২১	নেতাকানি	নী ৬৫৮	নেয়ামৎ	নি ৬৪০
নুড়া	নট্ ৬২২	নৃত্য	নৃত্ ৬৬৭	নেংটি	নজ্ ৬২১	নেতান	নী ৬৫৮	নেলা	নি ৬৪০
নুড়ি	নট্ ৬২২	নৃদুর্গ	নৃ ৬৫৯	নেংটী	নজ্ ৬২১	নেতি	ন্ ৬৬৭	নেলাক্ষেপা	নি ৬৪০
নুড়ো	নট্ ৬২২	নৃদেব	নৃ ৬৫৯	নেংটো	নজ্ ৬২১	নেতুড়	নী ৬৫৫	নেশা	নশ্ ৬৩৫
নু(নো)য়া	নু ৬৫৯	নৃপ	নৃ ৬৬৭	নেংড়া	নি ৬৪০	নেত্র	নী ৬৫৮	নেশাখোর	নশ্ ৬৩৫
নুত	নু ৬৫৯	নৃপতি	নৃ ৬৬৭	নেকটানেকটি	নি ৬৪০	নেত্রকোষ	নী ৬৫৫	নেষ্টা	নী ৬৫৫
নুত্ত	নু ৬৫৯	নৃপবল্লভ	নৃ ৬৬২	নেকড়িয়া	ন্ ৬৬৭	নেত্রগোচর	নী ৬৫৫	নেষ্ট	ন্ ৬৬৭
নুদি	নু ৬৫৯	নৃপমণি	নৃ ৬৬২	নেকড়ে	ন্ ৬৬৭	নেত্রচ্ছদ	নী ৬৫৫	নেহাই	নি ৬৪০
নুদুরনাদুর	নু ৬৫৯	নৃপশু	নৃ ৬৬২	নেকনজর	ন্ ৬৬৭	নেত্রজল	নী ৬৫৫	নেহাত	নি ৬৪০
নুনি(নী)	নু ৬৫৯	নৃপাঙ্গন	নৃ ৬৬২	নেকনাম	ন্ ৬৬৭	নেত্রবন্ধ	নী ৬৫৫	নেহানী	নি ৬৪০
নুন্ন	নু ৬৫৯	নৃপাত্মজ	নৃ ৬৬২	নেক(খ)রা	নি ৬৪০	নেত্রমল	নী ৬৫৫	নেহার	নি ৬৪০
নুয়া	নু ৬৫৯	নৃপাল	নৃ ৬৬২	নেকা	নি ৬৪০	নেত্রযোনি	নী ৬৫৫	নেহারণি	নি ৬৪০
নুয়ান	নু ৬৫৯	নৃপাসন	নৃ ৬৬২	নেকামি	নি ৬৪০	নেত্ররঞ্জন	নী ৬৫৫	নেহারনি	নি ৬৪০
নুয়ান	নম্ ৬৩০	নৃপেন্দ্র	নৃ ৬৬২	নে(ন্যা)কার	নি ৬৪০	নেত্ররোগ	নী ৬৫৫	নেহাল	নি ৬৪০
নুর	নু ৬৫৯	নৃবরাহ	নৃ ৬৬২	নেকি	নি ৬৪০	নেত্রানন্দ	নী ৬৫৫	নেহাল	ন্ ৬৬৭
নুরি	নু ৬৫৯	নৃভুক	নৃ ৬৬২	নেকী	নি ৬৪০	নেত্রান্ত	নী ৬৫৫	নেহালি	ন্ ৬৬৭
নুরী	নু ৬৫৯	নৃমণি	নৃ ৬৬২	নেকী	ন্ ৬৬৭	নেত্রাভিষ্য(স্য)ন্দ	নী ৬৫৫	নেহালি	নু ৬৫৯
নুল	ন্ ৬৬৭	নৃমিথুন	নৃ ৬৬২	নেখরা	নি ৬৪০	নেত্রাম্বু	নী ৬৫৫	নেহোরা	ন্ ৬৬৭
নুলা	ন্ ৬৬৭	নৃমুণ্ড	নৃ ৬৬২	নেগা	ন্ ৬৬৭	নেত্রী	নী ৬৫৫	নৈ	নু ৬৫৯
নুলো	ন্ ৬৬৭	নৃমুণ্ডমালিনী	নৃ ৬৬২	নেঙ	নি ৬৪০	নেত্রোৎসব	নী ৬৫৫	নৈ	নদ্ ৬২৬
নূতন	তন্ ৪৫৬	নৃমেধ	নৃ ৬৬৪	নেঙ(ঙ্গ)টা	নজ্ ৬২১	নেত্রৌষধ	নী ৬৫৫	নৈ	নি ৬৪০
নূতন	নু ৬৫৯	নৃমেধযজ্ঞ	নৃ ৬৬২	নেঙ(ঙ্গ)ড়া	নি ৬৪০	নেন-দেন	নী ৬৫৫	নৈঋত	নি ৬৪০
নূত্ন	নু ৬৫৯	নৃলোক	নৃ ৬৬২	নেঙসা	নি ৬৪০	নেপথ্য	নী ৬৫৫	নৈঃশ্রেয়স	নি ৬৪০
নূন	নু ৬৫৯	নৃশংস	নৃ ৬৬৭	নেঙ্গট	নজ্ ৬২১	নেপাল	নী ৬৫৯	নৈকটিক	নি ৬৪০
নূনম্	নু ৬৫৯	নৃশৃঙ্গ	নৃ ৬৫৯	নেঙ্গটি	নজ্ ৬২১	নেপাল	নৃ ৬৬২	নৈকট্য	নি ৬৪০
নূপুর	নু ৬৬৮	নৃসিংহ	নৃ ৬৫৯	নেজ	নজ্ ৬২১	নেপালকম্বল	নৃ ৬৬২	নৈকধা	নি ৬৪০
নূর	নু ৬৫৯	নৃসিংহ-অবতার	নৃ ৬৬৪	নেজক	নজ্ ৬২১	নেপালিকা	নৃ ৬৬২	নৈকষেয়	নি ৬৪২
নূরি	নু ৬৫৯	নৃসেনা	নৃ ৬৫৯	নেজন	নজ্ ৬২১	নেপালী	নৃ ৬৬২	নৈকষ্য	নি ৬৪২
নূরী	নু ৬৫৯	নৃহরি	নৃ ৬৫৯	নেজনা	নজ্ ৬২১	নেপুর	নু ৬৫৯	নৈকষ্যকুলীন	নি ৬৪২
নৃ	নী ৬৫৫	নে	নি ৬৪০	নেজা	নজ্ ৬২১	নেপো	ন্ ৬৭১	নৈকৃতিক	নি ৬৪০
নৃ	নৃ ৬৬২	নে	ন্ ৬৬৭	নেজামত	ন্ ৬৬৭	নেবা	নি ৬৪০	নৈগম	নি ৬৪০
নৃকপাল	নৃ ৬৬২	নেআলী	ন্ ৬৬৭	নেজুড়	নজ্ ৬২১	নেবু	নি ৬৪০	নৈজ	নি ৬৪০
নৃকান্ত	নৃ ৬৬২	নেআলী	নু ৬৫৯	নেঞা	ন্ ৬৬৭	নেবু	নি ৬৪০	নৈত্যক	নি ৬৪০
নৃকেশরী	নৃ ৬৬২	নেই	নি ৬৪০	নেটা	নি ৬৪০	নে(নি)মক	নি ৬৪০	নৈত্যিক	নি ৬৪০
নৃগ	নৃ ৬৬২	নেই	নি ৬৪০	নেঠা	নি ৬৪০	নেমকহারাম	নি ৬৪০	নৈদাঘ	নি ৬৪০
নৃজঙ্ঘ	নৃ ৬৬২	নেই	অস্ ৫৬	নেড়	নট্ ৬২২	নেমকহারামী	নি ৬৪০	নৈদে	নু ৬৫৯
নৃৎ	নৃত্ ৬৬৭	নেউগী	নি ৬৪০	নেড়া	নট্ ৬২২	নেমন্তন্ন	নি ৬৪০	নৈধন	নি ৬৪০
নৃতি	নৃত্ ৬৬৭	নেউজ	নু ৬৫৯	নেড়ি	নট্ ৬২২	নেমাজ	নম্ ৬৩০	নৈধ্রুব	নি ৬৪০

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
নৈপুণ	নি	৬৪০	নোদন	নু	৬৫৯	ন্যাবা	নি	৬৪০	পর্য্যটন	অট্	২০	প্রণয়	নী	৬৫৫
নৈপুণ্য	নি	৬৪৮	নোদয়িতা	নু	৬৫৯	ন্যায়	নি	৬৫৪	পশ্চাদ্ধাবন	ধাব্	৬০১	প্রণয়ন	নী	৬৫৫
নৈবিদ্ধ	নি	৬৪০	নোধা	নু	৬৫৯	ন্যায়	ই	৬৫	পিতৃদায়	দয়্	৫১৮	প্রণয়ী	নী	৬৫৫
নৈবিদ্ধি	নি	৬৪০	নোয়া	নম্	৬৩০	ন্যায়তঃ	নি	৬৪০	পিশাচ	অশ্	৪৬	প্রণাম	নম্	৬৩০
নৈবেদ্য	নি	৬৪০	নোয়ান	নম্	৬৩০	ন্যায়দণ্ড	নি	৬৪০	পুরীধাম	ধা	৫৯০	প্রণালী	নট্	৬২২
নৈবেশিক	নি	৬৪০	নোয়ান	নু	৬৫৯	ন্যায়পথ	নি	৬৫৪	প্রকট	কট্	১৩৬	প্রণিধান	ধা	৫৯০
নৈমিত্তিক	নি	৬৪০	নৌ	নু	৬৫৯	ন্যায়পর	নি	৬৪০	প্রকম্প	কম্প্	১৬০	প্রণীত	নী	৬৫৫
নৈমিষ	নি	৬৫১	নৌকা	নু	৬৫৯	ন্যায়পরায়ণ	নি	৬৪০	প্রকরণ	কৃ	২০০	প্রতান	তন্	৪৫৩
নৈমিষারণ্য	নি	৬৫১	নৌকাখণ্ড	নু	৬৫৯	ন্যায়বর্ত্তী	নি	৬৪০	প্রকর্ষ	কৃশ্	২১৫	প্রতাপ	তপ্	৪৫৯
নৈয়গ্রোধ	নি	৬৪০	নৌকাডুবি	নু	৬৫৯	ন্যায়বাগীশ	নি	৬৪০	প্রকল্প	কৢপ্	২১৭	প্রতারক	তৃ	৪৭৭
নৈরঞ্জনা	নি	৬৪০	নৌঘর	নু	৬৫৯	ন্যায়বাদী	নি	৬৫৪	প্রকৃষ্ট	কৃশ্	২১৫	প্রতিকার	কৃ	২০০
নৈরন্তর্য্য	নি	৬৪০	নৌতুন	নু	৬৫৯	ন্যায়বৃত্ত	নি	৬৪০	প্রকাণ্ড	কন্	১৫০	প্রতিকূল	কুল্	১৯৭
নৈরাকার	নি	৬৪০	নৌজীবক	নু	৬৫৯	ন্যায়রত্ন	নি	৬৪০	প্রকার	কৃ	২০০	প্রতিকৃতি	কৃ	২০০
নৈরাশ	নি	৬৪০	নৌতার্য্য	নু	৬৫৯	ন্যায্য	নি	৬৫৪	প্রকাশ	কশ্	১৭৩	প্রতিক্রিয়া	কৃ	২০০
নৈরাশ্য	নি	৬৪০	নৌদণ্ড	নু	৬৫৯	ন্যালা	নি	৬৪০	প্রকুপিত	কুপ্	১৯৫	প্রতিনিয়ত	নি	৬৪০
নৈরুক্ত	নি	৬৪০	নৌবত	ন্	৬৬৭	ন্যালাক্ষেপা	নি	৬৪০	প্রকৃত	কৃ	২০০	প্রতিবেশী	নি	৬৪০
নৈর্ঋত	নি	৬৪০	নৌবতখানা	ন্	৬৬৭	ন্যাস	নি	৬৪০	প্রকৃতি	কৃ	২০০	প্রতীক্ষা	ঈক্ষ্	৮০
নৈর্ঋতী	নি	৬৪০	নৌবলাধ্যক্ষ	নু	৬৫৯	ন্যাস	অস্	৫৬	প্রকৃতিস্থ	কৃ	২০০	প্রতীক্ষিত	ঈক্ষ	৮০
নৈর্গুণ্য	নি	৬৪০	নৌবাটক	নু	৬৫৯	ন্যাসিবর	নি	৬৪০	প্রকোপ	কুপ্	১৯৫	প্রতিজ্ঞা	জ্ঞা	৪০০
নৈশ	নি	৬৪০	নৌবাহ	নু	৬৫৯	ন্যাসিমণি	নি	৬৪০	প্রকোষ্ঠ	কশ্	১৭৩	প্রতিদান	দা	৫২১
নৈষধ	নি	৬৪০	নৌবিদ্যা	নু	৬৫৯	ন্যাসিশিরোমণি	নি	৬৪০	প্রক্রিয়া	কৃ	২০০	প্রতিনিধি	ধা	৫৯০
নৈষাদি	নি	৬৪০	নৌভঙ্গ	নু	৬৫৯	ন্যাসী	নি	৬৪০	প্রক্ষালন	ক্ষল্	২২৯	প্রতিবিধান	ধা	৫৯০
নৈষ্কর্ম্য	নি	৬৪০	নৌযান	নু	৬৫৯	ন্যুঙ্খ	নি	৬৪০	প্রক্ষিপ্ত	ক্ষিপ্	২৩৩	প্রতীত	ই	৬৫
নৈষ্কৃতিক	নি	৬৪০	নৌরাজা	ন্	৬৬৭	ন্যুব্জ	নি	৬৪০	প্রখ্যাত	খ্যা	২৫১	প্রতীতি	ই	৬৫
নৈষ্ঠিক	নি	৬৪০	নৌল	ন্	৬৬৭	ন্যূন	নি	৬৫৫	প্রগল্ভ	গল্	২৭৮	প্রতীয়মান	ই	৬৫
নৈষ্ঠুর্য্য	নি	৬৪০	নৌসাধন	নু	৬৫৯	ন্যূন	ঊন্	১১২	প্রগাঢ়	গাহ্	২৮০	প্রতুল	তু	৪৭১
নৈসর্গিক	নি	৬৪০	নৌসেনা	নু	৬৫৯	ন্যূনতা	নি	৬৪০	প্রচণ্ড	চণ্	৩২৮	প্রত্যক্ষ	ঈক্ষ	৮০
নো	নি	৬৪০	ন্য	নি	৬৪০	ন্যূনপঞ্চাশদ্ভাব	নি	৬৪০	প্রচয়	চি	৩৪৬	প্রত্যঙ্গ	অম্	৩৬
নোআ	নি	৬৪০	ন্যক্	নি	৬৪০	ন্যূনাধিক	নি	৬৫৫	প্রচর	চর্	৩৪০	প্রত্যন্ত	অম্	৩৬
নোংরা	নি	৬৪০	ন্যক্কার	ন্	৬৬৭				প্রচল	চল্	৩৪৫	প্রত্যয়	ই	৬৫
নোঙরা	নি	৬৪০	ন্যগ্রোধ	নি	৬৪০				প্রচলন	চল্	৩৪৫	প্রত্যাখ্যাত	খ্যা	২৫১
নো	নি	৬৪০	ন্যঙ্কু	নি	৬৪০	**প**			প্রচার	চর্	৩৪০	প্রত্যাখ্যান	খ্যা	২৫১
নোআ	নি	৬৪০	ন্যঙ্গ	নি	৬৪০				প্রচুর	চুর্	৩৫৪	প্রত্যাশা	অশ্	৪৬
নোংরা	নি	৬৪০	ন্যঙ্গতা	নি	৬৪০	পদার্থ	অর্থ্	৪৩	প্রচ্ছদ	ছদ্	৩৫৯	প্রত্যুত্তর	তৃ	৪৭৭
নোকর	নু	৬৫৯	ন্যচ্ছ	নি	৬৪০	পদার্থবিদ্যা	অর্থ্	৪৩	প্রচ্ছন্ন	ছদ্	৩৫৯	প্রত্যুপকার	কৃ	২০০
নোকসান	ন্	৬৬৭	ন্যস্ত	নি	৬৪০	পরমার্থ	অর্থ্	৪৩	প্রচ্ছাদন	ছদ্	৩৫৯	প্রত্যুষ	উষ্	১০৯
নোকতা	ন্	৬৬৭	ন্যস্ত	অস্	৫৬	পরহিতার্থ	অর্থ্	৪৩	প্রজনন	জন্	৩২৮	প্রদত্ত	দা	৫২১
নোঙরা	নি	৬৪০	ন্যাংটি	নজ্	৬২১	পরাক্রম	ক্রম্	২১৯	প্রজা	জন্	৩৭৮	প্রদর্শক	দৃশ্	৫৬৬
নোঙা	নম্	৬৩০	ন্যাকা	নি	৬৪০	পরান্ন	অদ্	২৫	প্রজাপতি	জন্	৩৭৮	প্রদর্শনী	দৃশ্	৫৬৬
নোঞা	নম্	৬৩০	ন্যাকি	নি	৬৪০	পরান্নভোজী	অদ্	২৫	প্রজ্ঞ	জ্ঞা	৪০০	প্রদান	দা	৫২১
নোট	নট্	৬২২	ন্যাঙ্গা	নি	৬৪০	পরার্থ	অর্থ্	২৫	প্রজ্ঞা	জ্ঞা	৪০০	প্রদীপ	দীপ্	৫৪৫
নোটন	নট্	৬২২	ন্যাঙ্গা	নজ্	৬২১	পরিকল্পনা	কৢপ্	২১৭	প্রজ্ঞাত	জ্ঞা	৪০০	প্রদীপ্ত	দীপ্	৫৪৫
নোটা	নট্	৬২২	ন্যাটা	নি	৬৪০	পরিচয়	চি	৩৪৬	প্রজ্ঞাবান	জ্ঞা	৪০০	প্রদেয়	দা	৫২১
নোড়	নট্	৬২২	ন্যাড়	নট্	৬২২	পরীক্ষক	ঈক্ষ্	৮০	প্রণত	নম্	৬৩০	প্রদেশ	দিশ্	৫৩৬
নোড়া(ঢ়া)	নট্	৬২২	ন্যাড়া	নট্	৬২২	পরীক্ষণ	ঈক্ষ্	৮০	প্রণম্য	নম্	৬৩০	প্রদোষ	দু	৫৪৬

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
প্রদ্যোত	দ্যুৎ	৫৭২
প্রধান	ধা	৫৯০
প্রবেশ	নি	৬৪০
প্রমুখ	খন্	২৪৮
প্রশংসা	নৃ	৬৬২
প্রাক	অঞ্চ	৯
প্রাকার	কৃ	২০০
প্রাকৃত	কৃ	২০০
প্রাকৃতিক	কৃ	২০০
প্রাক্কাল	অঞ্চ	৯
প্রাক্তন	অঞ্চ	৯
প্রাগুক্ত	অঞ্চ	৯
প্রাগ্জ্যোতিষ	অঞ্চ	৯
প্রাঙ্গণ	অঙ্গ্	৬
প্রাঙ্মুখ	অঞ্চ	৯
প্রাচ	অঞ্চ	৯
প্রাচী	অঞ্চ	৯
প্রাচীন	অঞ্চ	৯
প্রাচীনবর্হিঃ	অঞ্চ	৯
প্রাচীর	চি	৩৪৬
প্রাচুর্য্য	চুর্	৩৫৪
প্রাচ্য	অঞ্চ	৯
প্রাজ্ঞ	জ্ঞা	৪০০
প্রাঞ্জল	অঞ্জ্	১১
প্রাণ	অন্	২৮
প্রাণন	অন্	২৮
প্রাণপণ	অন্	২৮
প্রাণময়	অন্	২৮
প্রাণায়াম	অন্	২৮
প্রাণী	অন্	২৮
প্রাণেশ্বর	অন্	২৮
প্রাদেশিক	দিশ্	৫৩৬
প্রান্ত	অম্	৩৬
প্রান্তর	অম্	৩৬
প্রাপ্ত	আপ্	৫৯
প্রাপ্য	আপ্	৫৯
প্রাপ্তি	আপ্	৫৯
প্রায়	ই	৬৫
প্রায়শ্চিত্ত	ই	৬৫
প্রার্থনা	অর্থ্	৪৩
প্রার্থী	অর্থ্	৪৩
প্রেক্ষক	ঈক্ষ্	৮০
প্রেক্ষণ	ঈক্ষ্	৮০
প্রেক্ষা	ঈক্ষ্	৮০
প্রেক্ষাগার	ঈক্ষ্	৮০

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
প্রেক্ষিত	ঈক্ষ্	৮০
প্রেত	ই	৬৫
প্রেতপতি	ই	৬৫
প্রেতিনী	ই	৬৫
প্রেতলোক	ই	৬৫
প্রেরণ	ঈর্	৮০
ফ		
ফুৎকার	কৃ	২০০
ফুৎকৃত	কৃ	২০০
ৰ, ব		
বই (বৈ)	ই	৬৫
বজ্রদন্তী	দং	৫১০
বধদণ্ড	দং	৫১০
বরিষ্ঠ	উর্	১০৩
বরীয়স	উর্	১০৩
বরীয়ান	উর্	১০৩
বর্হি	অর্হ্	৪৩
বর্হিষৎ	অর্হ্	৪৩
বানের-তোড়	তু	৪৭১
বিকচ	কচ্	১৩১
বিকট	কট্	১৩৬
বিকম্প	কম্প্	১৬০
বিকর্ষণ	কৃশ্	২১৫
বিকল	কল্	১৬৪
বিকল্প	কঌপ্	২১৭
বিকার	কৃ	২০০
বিকাশ	কশ্	১৭৩
বিকিরণ	কৃ	২০০
বিকুণ্ঠ	কণ্	১৪০
বিকৃত	কৃ	২০০
বিকৃতি	কৃ	২০০
বিক্রম	ক্রম্	২১৯
বিক্রয়	ক্রী	২২০
বিক্রি	ক্রী	২২০
বিক্রীত	ক্রী	২২০
বিক্রিয়া	কৃ	২০০
বিক্ষিপ্ত	ক্ষিপ্	২৩৩
বিক্ষুব্ধ	ক্ষুভ্	২৩৬
বিক্ষোভ	ক্ষুভ্	২৩৬
বিখ্যাত	খ্যা	২৫১
বিগলিত	গল্	২৭৮

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
বিগত	গম্	২৬২
বিগাড়	ঘট্	৩০৩
বিগ্রহ	গ্রহ্	৩০১
বিঘটন	ঘট্	৩০৩
বিচক্ষণ	চক্	৩১৯
বিচার	চর্	৩৪০
বিচ্ছেদ	ছিদ্	৩৬৭
বিচ্যুত	চ্যু	৩৫৬
বিজন	জন্	৩৭৮
বিজয়া	জি	৩৯১
বিজয়ী	জি	৩৯১
বিজল্প	জ্	৪০৩
বিজাতীয়	জন্	৩৭৮
বিজিগীষা	জি	৩৯১
বিজিত	জি	৩৯১
বিজেতা	জি	৩৯১
বিজ্ঞ	জ্ঞা	৪০০
বিজ্ঞপ্তি	জ্ঞা	৪০০
বিজ্ঞাপন	জ্ঞা	৪০০
বিড়ম্বনা	ডং	৪৩২
বিতণ্ডা	তন্	৪৫৩
বিতণ্ডা	তম্	৪৬২
বিতরণ	তৃ	৪৭৭
বিতর্ক	তর্	৪৬৪
বিতান	তন্	৪৫৩
বিদগ্ধ	দহ্	৫২০
বিদারিত	দৃ	৫৬০
বিদিশা	দিশ্	৫৩৬
বিদীর্ণ	দৃ	৫৬০
বিদূষক	দু	৫৪৬
বিদেশ	দিশ্	৫৩৬
বিদ্যার্থী	অর্থ	৪৩
বিদ্যুৎ	দ্যুৎ	৫৭২
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট	দ্যুৎ	৫৭২
বিদ্যুদ্গর্ভ	দ্যুৎ	৫৭২
বিদ্রবণ	দ্রু	৫৭৫
বিদ্রূপ	দ্রু	৫৭৫
বিদ্রোহ	দ্রুহ্	৫৭৯
বিদ্রোহী	দ্রুহ্	৫৭৯
বিধবা	ধু	৬০১
বিধর্মী	ধৃ	৬০৬
বিধা	ধা	৫৯০
বিধাতা	ধা	৫৯০
বিধান	ধা	৫৯০
বিধায়ক	ধা	৫৯০

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
বিধি	ধা	৫৯০
বিধৃত	ধৃ	৬০৬
বিধেয়	ধা	৫৯০
বিধৌত	ধু	৬০১
বিধ্বংস	ধ্ব্	৬১৯
বিধ্বংসী	ধ্ব্	৬১৯
বিনত	নম্	৬৩০
বিনয়	নী	৬৫৫
বিনয়ী	নী	৬৫৫
বিনষ্ট	নশ্	৬৩২
বিনষ্টি	নশ্	৬৩২
বিনায়ক	নী	৬৫৫
বিনাশ	নশ্	৬৩২
বিনাশী	নশ্	৬৩২
বিনিগ্রহ	গ্রহ্	৩০১
বিনির্গত	গম্	২৬২
বিনির্ণয়	নী	৬৫৫
বিনিশ্চয়	চি	৩৪৬
বিনীত	নী	৬৫৫
বিনোদ	নু	৬৫৯
বিনোদন	নু	৬৫৯
বিনোদিনী	নু	৬৫৯
বিন্ধ	ধ্যৈ	৬১৫
বিন্ধ্য	ধ্যৈ	৬১৫
বিন্ধ্যপর্ব্বত	ধ্যৈ	৬১৭
বিন্যস্ত	অস্	৫৬
বিন্যাস	অস্	৫৬
বিপর্য্যয়	ই	৬৫
বিপর্য্যস্ত	অস্	৫৬
বিপ্রকর্ষ	কৃশ্	২১৫
বিপ্রকার	কৃ	২০০
বিবিধ	ধা	৫৯০
বিমুখ	খন্	২৪৮
বিমুখী	খন্	২৪৮
বিয়নী	জন্	৩৭৮
বিশৃঙ্খল	ক্ষল্	২২৯
বিশ্বানর	নৃ	৬৬২
বিসদৃশ	দৃশ্	৫৬৬
বিহগ	গম্	২৬২
বিহঙ্গ	গম্	২৬২
বিহঙ্গম	গম্	২৬২
বিহিত	ধা	৫৯০
বীক্ষণ	ঈক্ষ্	৮০
বীজ	জন্	৩৭৮
বীত	ই	৬৫

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
বীতরাগ	ই	৬৫
বৃষধ্বজ	ধ্ব্	৬১৯
বেগতিক	গম্	২৬২
বেদম	দং	৫১০
বৈকাল	কল্	১৬৪
বৈকুণ্ঠ	কণ্	১৪০
বৈকুণ্ঠপুরী	কণ্	১৪০
বৈকৃত	কৃ	২০০
বৈজয়ন্তী	জি	৩৯১
বৈতরণী	তৃ	৪৭৭
বৈদগ্ধ	দহ্	৫২০
বৈধ	ধা	৫৯০
ব্যক্ত	অঞ্জ্	১১
ব্যক্তি	অঞ্জ্	১১
ব্যঙ্গ্য	অঞ্জ্	১১
ব্যঞ্জক	অঞ্জ্	১১
ব্যঞ্জন	অঞ্জ্	১১
ব্যঞ্জনা	অঞ্জ্	১১
ব্যতিক্রম	ক্রম্	২১৯
ব্যতীত	ই	৬৫
ব্যত্যয়	ই	৬৫
ব্যবচ্ছিন্ন	ছিদ্	৩৬৭
ব্যবচ্ছেদ	ছিদ্	৩৬৭
ব্যবধান	ধা	৫৯০
ব্যভিচার	চর্	৩৪০
ব্যয়	ই	৬৫
ব্যর্থ	অর্থ্	৪৩
ব্যসন	অস্	৫৬
ব্যস্ত	অস্	৫৬
ব্যস্তবাগীশ	অস্	৫৬
ব্যাকরণ	কৃ	২০০
ব্যাকুল	কুল্	১৯৭
ব্যাকুলি	কুল্	১৯৭
ব্যাকুলিত	কুল্	১৯৭
ব্যাখ্যা	খ্যা	২৫১
ব্যাঘ্র	ঘ্রা	৩১৬
ব্যাঘ্রপদ	ঘ্রা	৩১৬
ব্যাধি	ধা	৫৯০
ব্যান	অন্	২৮
ব্যাস	অস্	৫৬
বৈয়াঘ্রপদ্য	ঘ্রা	৩১৬
ভ		
ভিক্ষার্থী	অর্থ্	৪৩

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

F-10b

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল	পৃষ্ঠা
সত্ত্ব	অস্	৫৬	সন্নিকর্ষ	কৃশ্	২১৫	সমাধি	ধা	৫৯০	সম্যগদৃষ্টি	অঞ্চ্	৯	সামঞ্জস্য	অঞ্জ্	৯
সত্বর	ত্বৃ	৪৯৪	সন্নিধান	ধা	৫৯০	সমান	অন্	২৮	সরোজ	জন্	৩৭৮	সাময়িক	ই	৬৫
সদক্ষিণ	দক্ষ্	৫০২	সন্নিহিত	ধা	৫৯০	সমানাধিকরণ	কৃ	২০০	সরোজিনী	জন্	৩৭৮	সামর্থ্য	ঋ	১১৩
সদন্ত	দং	৫১০	সন্ন্যাস	অস্	৫৬	সমান্তর	অন্	২৮	সহকার	কৃ	২০০	সামান্য	অন্	২৮
সদয়	দয়্	৫১৮	সন্ন্যাসী	অস্	৫৬	সমাপক	আপ্	৫৯	সহকারী	কৃ	২০০	সাম্প্রদায়িক	দা	৫২১
সদর্প	দৃপ্	৫৬৫	সপরিজন	জন্	৩৭৮	সমাপন	আপ্	৫৯	সহচর	চর্	৩৪০	সাম্মুখ্য	খন্	২৪৮
সদাগম	গম্	২৬২	সপ্রণয়	নী	৬৫৫	সমাপ্ত	আপ্	৫৯	সহচারিণী	চর্	৩৪০	সার্থক	অর্থ্	৪৩
সদাচার	চর্	৩৪০	সপ্রত্যয়	ই	৬৫	সমাস	অস্	৫৬	সহজ	জন্	৩৭৮	সাশ্রু	অশ্	৪৬
সদাত্মা	অত্	২২	সপ্রাণ	অন্	২৮	সমাসীন	আস্	৬২	সহজাত	জন্	৩৭৮	সাষ্টাঙ্গ	অঙ্	৬
সদাদান	দা	৫২১	সবিকল্প	কঌপ্	২১৭	সমাহিত	ধা	৫৯০	সহজিয়া	জন্	৩৭৮	সাহচর্য্য	চর্	৩৪০
সদানন্দ	নন্দ্	৬২৭	সবিকার	কৃ	২০০	সমিত	ই	৬৫	সহজে	জন্	৩৭৮	সাহজিক	জন্	৩৭৮
সদার	দৃ	৫৬০	সবিগ্রহ	গ্রহ্	৩০১	সমিতি	ই	৬৫	সহধর্ম্ম	ধৃ	৬০৬	সাহায্য	ই	৬৫
সদৃশ	দৃশ্	৫৬৬	সবিনয়	নী	৬৫৫	সমীকরণ	কৃ	২০০	সহধর্ম্মিণী	ধৃ	৬০৬	সিদ্ধার্থ	অর্থ্	৪৩
সদোষ	দু	৫৪৬	সমগ্র	অঙ্	৬	সমীক্ষক	ঈক্ষ্	৮০	সহায়	ই	৬৫	সুকল্পিত	কঌপ্	২১৭
সধর্ম্ম	ধৃ	৬০৬	সমঙ্গা	অঙ্	৬	সমীক্ষা	ঈক্ষ্	৮০	সহায়তা	ই	৬৫	সুকৃৎ	কৃ	২০০
সধবা	ধু	৬০১	সমঞ্জস	অঞ্জ্	৯	সমীপ	আপ্	৫৯	সহিত	ধা	৫৯০	সুকৃত	কৃ	২০০
সন্তত	তন্	৪৫৩	সমতুল	তু	৪৭১	সমীপ্সিত	আপ্	৫৯	সহোদর	ঋ	১১৩	সুকৃতি	কৃ	২০০
সন্ততি	তন্	৪৫৩	সমদর্শন	দৃশ্	৫৬৬	সমীর	ঈর্	৮০	সাইৎ	অস্	৫৬	সুকোমল	কম্	১৫৪
সন্তপ্ত	তপ্	৪৫৯	সমধর্ম্মা	ধৃ	৬০৬	সমীরণ	ঈর্	৮০	সাইত	অস্	৫৬	সুক্ষেত্র	ক্ষি	২৩০
সন্তরণ	তৃ	৪৭৭	সমন্বয়	ই	৬৫	সমীহ	ঈহ্	৮২	সাংখ্য	খ্যা	২৫১	সুখ্যাতি	খ্যা	২৫১
সন্তান	তন্	৪৫৩	সমবধান	ধা	৫৯০	সমুখ	খন্	২৪৮	সাকল্য	কল্	১৬৪	সুগত	গম্	২৬২
সন্তানসন্ততি	তন্	৪৫৩	সমবায়	ই	৬৫	সমুচিত	উচ্	৮২	সাকার	কৃ	২০০	সুগতি	গম্	২৬২
সন্তাপ	তপ্	৪৫৯	সমবায়ী	ই	৬৫	সমুচ্চয়	চি	৩৪৬	সাকেত	কিৎ	১৮৩	সুগন্ধ	গম্	২৬২
সন্তুষ্ট	তু	৪৭১	সমবেত	ই	৬৫	সমুচ্চিত	চি	৩৪৬	সাক্ষাৎ	অশ্	৪৬	সুগন্ধি	গম্	২৬২
সন্তোষ	তু	৪৭১	সময়	ই	৬৫	সমুচ্ছিন্ন	ছিদ্	৩৬৭	সাক্ষাৎকার	অশ্	৪৬	সুগম	গম্	২৬২
সন্ত্রস্ত	ত্র	৪৮৮	সময়ানুবর্ত্তী	ই	৬৫	সমুজ্জ্বল	জ্বল্	৪০৩	সাক্ষী	অশ্	৪৬	সুচরিত	চর্	৩৪০
সন্ত্রাস	ত্র	৪৮৮	সময়োচিত	ই	৬৫	সমুদয়	ই	৬৫	সাক্ষ্য	অশ্	৪৬	সুচিন্তিত	চিন্ত্	৩৫২
সন্দর্শন	দৃশ্	৫৬৬	সমর	ঋ	১১৩	সমুদায়	ই	৬৫	সাগর	গৃ	২৯০	সুজয়	জি	৩৯১
সন্দর্ভ	দৃ	৫৬০	সমরাঙ্গণ	ঋ	১১৩	সমুদিত	ই	৬৫	সাগরগামী	গৃ	২৯০	সুজাত	জন্	৩৭৮
সন্দিগ্ধ	দিহ্	৫৪৩	সমর্থ	অর্থ্	৪৩	সমুদগত	গম্	২৬২	সাগরসঙ্গম	গৃ	২৯০	সুজাতা	জন্	৩৭৮
সন্দিহান	দিহ্	৫৪৩	সমর্থ	ঋ	১১৩	সমুদগরণ	গৃ	২৯০	সাঙ্কেতিক	কিৎ	১৮৩	সুতনু	তন্	৪৫৩
সন্দীপক	দীপ্	৫৪৫	সমর্থক	ঋ	১১৩	সমুদ্দিষ্ট	দিশ্	৫৩৬	সাঙ্গ	অঙ্	৬	সুতপ্ত	তপ্	৪৫৯
সন্দীপন	দীপ্	৫৪৫	সমর্থন	অর্থ্	৪৩	সমুদ্র	উন্দ্	১০২	সাঙ্গোপাঙ্গ	অঙ্	.৬	সুতীর্থ	তৃ	৪৭৭
সন্দেশ	দিশ্	৫৩৬	সমর্থন	ঋ	১১৩	সমুদ্রচুলুক	চুর্	৩৫৪	সাজাত্য	জন্	৩৭৮	সুদর্শ	দৃশ্	৫৬৬
সন্দেহ	দিহ্	৫৪৩	সমর্থিত	ঋ	১১৩	সমুন্নত	নম্	৬৩০	সাধারণ	ধা	৫৯০	সুদর্শন	দৃশ্	৫৬৬
সন্ধ	ধা	৫৯০	সমর্পণ	ঋ	১১৩	সমুপানয়ন	নী	৬৫৫	সাধারণতন্ত্র	ধা	৫৯০	সুদান্ত	দং	৫১০
সন্ধা	ধা	৫৯০	সমর্পিত	ঋ	১১৩	সমুপার্জ্জন	অর্জ্	৪২	সানন্দ	নন্দ্	৬২৭	সুদামা	দো	৫৬৯
সন্ধান	ধা	৫৯০	সমষ্টি	অশ্	৪৬	সমুপেত	ই	৬৫	সান্ধ্য	ধা	৫৯০	সুদায়	দা	৫২১
সন্ধানী	ধা	৫৯০	সমস্ত	অস্	৫৬	সমূহ	ঊহ্	১১০	সান্নিধ্য	ধা	৫৯০	সুদুর	ই	৬৫
সন্ধি	ধা	৫৯০	সমস্যা	অস্	৫৬	সমৃদ্ধ	ঋধ্	১২১	সাপেক্ষ	ঈক্ষ্	৮০	সুদৃশ্য	দৃশ্	৫৬৬
সন্ধিৎসু	ধা	৫৯০	সমাকীর্ণ	কৄ	২১১	সমৃদ্ধি	ঋধ্	১২১	সাবকাশ	কশ্	১৭৩	সুধা	ধ্যৈ	৬১৫
সন্ধ্যা	ধ্যৈ	৬১৫	সমাচরণ	চর্	৩৪০	সম্প্রদান	দা	৫২১	সাবধান	ধা	৫৯০	সুধাংশু	ধ্যৈ	৬১৫
সন্ধ্যাকালীন	ধ্যৈ	৬১৫	সমাচার	চর্	৩৪০	সম্প্রদায়	দা	৫২১	সাবধি	ধা	৫৯০	সুধাকর	ধ্যৈ	৬১৫
সন্নত	নম্	৬৩০	সমাদর	দৃ	৫৬০	সম্মুখ	খন্	২৪৮	সাভিপ্রায়	ই	৬৫	সুধাময়	ধ্যৈ	৬১৫
সন্নদ্ধ	নহ্	৬৩৫	সমাধান	ধা	৫৯০	সম্যক	অঞ্চ্	৯	সামগ্রী	অঙ্	৬	সুধী	ধ্যৈ	৬১৫

কোন শব্দকে কোন ক্রিয়ামূলের পরিবারে এবং কত পৃষ্ঠায় পাবেন তার তালিকা

শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা	শব্দ	ক্রিয়ামূল পৃষ্ঠা
সুধীর	ধ্যৈ ৬১৫	স্তোম	ক্ষল্ ২২৯	হাঁসলি	অংশ্ ৩	হিতাশংসা	ধা ৫৯০		
সুনয়ন	নী ৬৫৫	স্যাৎ	অস্ ৫৬	হাঁসলী	অংশ্ ৩	হিতাশী	ধা ৫৯০		
সুনয়নী	নী ৬৫৫	স্যাদবাদ	অস্ ৫৬	হাঁসুলী	অংশ্ ৩	হিতাহিত	ধা ৫৯০		
সুনিশ্চয়	চি ৩৪৬	স্যাদবাদী	অস্ ৫৬	হাঁসহাঁস	অত্ ২২	হিতাহিতীয়	ধা ৫৯০		
সুন্দর	উন্দ্ ১০২	স্বর্গ	ঋজ্ ১২১	হাকলবিকল	আ ৬৪	হিতেচ্ছা	ধা ৫৯০		
সুন্দরী	উন্দ্ ১০২	স্বস্তি	অস্ ৫৬	হাকুলি	আ ৬৪	হিতেচ্ছু	ধা ৫৯০		
সুপ্রকাশ	কশ্ ১৭৩	স্বস্তিক	অস্ ৫৬	হাকুলিবিকুলি	আ ৬৪	হিতৈষণ	ধা ৫৯০		
সুপ্রজ	জন্ ৩৭৮	স্বস্তিবাচন	অস্ ৫৬	হাকুলিব্যাকুলি	আ ৬৪	হিতৈষণা	ধা ৫৯০		
সুপ্রজ্ঞ	জ্ঞা ৪০০	স্বল্প	অল্ ৪৪	হাক্রন্দন	ক্রন্দ্ ২১৯	হিতৈষা	ধা ৫৯০		
সুপ্রতীক	ই ৬৫	স্বল্পায়ু	অল্ ৪৪	হাট	অট্ ২০	হিতৈষিতা	ধা ৫৯০		
সুপ্রতীত	ই ৬৫	স্বল্পাহার	অল্ ৪৪	হাটা	অট্ ২০	হিতৈষিণী	ধা ৫৯০		
সুপ্রতুল	তু ৪৭১	স্বল্পাহারী	অল্ ৪৪	হাটান	অট্ ২০	হিতৈষী	ধা ৫৯০		
সুবিধা	ধা ৫৯০	স্বাক্ষর	অশ্ ৪৬	হাটি	ঘট্ ৩০৩	হিতোক্তি	ধা ৫৯০		
সুবিনীত	নী ৬৫৫	স্বাগত	গম্ ২৬২	হাটিতে-বসিতে	অট্ ২০	হিতোপদেশ	ধা ৫৯০		
সুবিহিত	ধা ৫৯০	স্বাগতম	গম্ ২৬২	হাটু	অট্ ২০	হিতোপদেষ্টা	ধা ৫৯০		
সুমুখ	খন্ ২৪৮	স্বাধিকারপ্রমত্তঃ	ধা ৫৯০	হাহাকার	কৃ ২০০	হিসাব-নিকাষ	নি ৬৪০		
সুযশাঃ	অশ্ ৪৬	স্বার্থ	অর্থ্ ৪৩	হি	ই ৬৫	হীনার্থ	অর্থ্ ৪৩		
সুরাজীব	জীব্ ৩৯৪	স্বার্থপর	অর্থ্ ৪৩	হিঁঅই	ই ৬৫	হৃদয়বিদারী	দৃ ৫৬০		
সুরেশ	ঈশ্ ৮১	স্বার্থসিদ্ধি	অর্থ্ ৪৩	হিঁচড়	ঘৃ ৩১৪	হেঁচড়া	ঘৃ ৩১৪		
সুসংগৃহীত	গ্রহ্ ৩০১	স্বীকরণ	কৃ ২০০	হিঁছড়	ঘৃ ৩১৪	হেঁচড়ান	ঘৃ ৩১৪		
সুসংস্কৃত	কৃ ২০০	স্বীকার	কৃ ২০০	হিঁচড়ান	ঘৃ ৩১৪	হেঁচড়া-হেঁচড়ি	ঘৃ ৩১৪		
সুসমাপ্ত	আপ্ ৫৯	স্বীকার্য্য	কৃ ২০০	হিঁচড়া-হিঁচড়ি	ঘৃ ৩১৪	হেঁসুয়া	অংশ্ ৩		
সুহিত	ধা ৫৯০	স্বীকৃত	কৃ ২০০	হিঁড়োর	ই ৬৫	হেঁসো	অংশ্ ৩		
সোজা	জন্ ৩৭৮	স্বীকৃতি	কৃ ২০০	হিচড়	ঘৃ ৩১৪	হেঁসোহার	অংশ্ ৩		
সোজাসুজি	জন্ ৩৭৮			হিছড়	ঘৃ ৩১৪	হেদা	খিদ্ ২৫১		
সোদর	ঋ ১১৩	**হ**		হিচড়া	ঘৃ ৩১৪				
সোপান	নহ্ ৬৩৫			হিছড়া	ঘৃ ৩১৪				
সোপানাবলী	নহ্ ৬৩৫	হ	ধা ৫৯০	হিত	ধা ৫৯০				
সৌগত	গম্ ২৬২	হতাশ	অশ্ ৪৬	হিতকর	ধা ৫৯০				
সৌগন্ধ	গম্ ২৬২	হতাশা	অশ্ ৪৬	হিতকাম	ধা ৫৯০				
সৌজন্য	জন্ ৩৭৮	হরিদ্রা	দ্রা ৫৭৪	হিতকাম্যা	ধা ৫৯০				
সৌদামিনী	দো ৫৬৯	হাঁট	অট্ ২০	হিতকারক	ধা ৫৯০				
সৌধ	ধা ৫৯০	হাঁটকা	অট্ ২০	হিতকারী	ধা ৫৯০				
সৌন্দর্য্য	উন্দ্ ১০২	হাঁটন	অট্ ২০	হিতপ্রণী	ধা ৫৯০				
স্কন্ধ	ধা ৫৯০	হাঁটা	অট্ ২০	হিতপ্রেপ্সু	ধা ৫৯০				
স্খল্	ক্ষল্ ২২৯	হাঁটান	অট্ ২০	হিতবচন	ধা ৫৯০				
স্খল	ক্ষল্ ২২৯	হাঁটাহাঁটি	অট্ ২০	হিতবাক্য	ধা ৫৯০				
স্খলন	ক্ষল্ ২২৯	হাঁটু	অট্ ২০	হিতবুদ্ধি	ধা ৫৯০				
স্খলিত	ক্ষল্ ২২৯	হাঁটুকাদা	অট্ ২০	হিতবাদী	ধা ৫৯০				
স্খলিতগতি	ক্ষল্ ২২৯	হাঁটুজল	অট্ ২০	হিতবান(বৎ)	ধা ৫৯০				
স্খলিতবীর্য্য	ক্ষল্ ২২৯	হাঁটুপানি	অট্ ২০	হিতাকাঙ্ক্ষী	কাঙ্ক্ষ্ ১৮৩				
স্খলিতসুভগ	ক্ষল্ ২২৯	হাঁটুভাঙা	অট্ ২০	হিতাধ্যায়ী	ধা ৫৯০				
স্খলিতা	ক্ষল্ ২২৯	হাঁঠু	অট্ ২০	হিতানুবন্ধী	ধা ৫৯০				
স্তম্ভ	ক্ষম্ ২২৭	হাঁৎহাঁৎ	অত্ ২২	হিতার্থ	ধা ৫৯০				
স্তল	তল্ ৪৬৫	হাঁসুয়া	অংশ্ ৩	হিতার্থী	ধা ৫৯০				

বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ

(ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান)

প্রথম খণ্ড

কিভাবে এই শব্দার্থকোষ পড়তে হবে, 'ভূ-১' পৃষ্ঠায় তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে 'বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ-এর পাঠপদ্ধতি' শীর্ষক বয়ানে। সূচিপত্রেও পাবেন। এখানে সংক্ষেপে সেকথা পুনরায় জানান হল : —

এই গ্রন্থে শব্দের অর্থ প্রকাশ করার জন্য মোট ছয়টি উপায় গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দের পরেই সর্বাগ্রে ১. সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে শব্দটির ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ শব্দটির উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে, তার বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য এবং তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেওয়া হয়েছে বঙ্গীয় শব্দকোষ (ব.শ.) থেকে। অন্য কোনো অভিধান থেকে নেওয়া হয়ে থাকলে পাশে সেকথার উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। ২. সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে শব্দটির ক্রিয়ামূল থেকে জাত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ, যা আমাদের নিজস্ব অনুসন্ধানের ফল। এটি সবসময়ই দেওয়া হয়েছে বাঁকা হরফে। অন্য কোনো সূত্রে শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ পাওয়া গেলে, '/' চিহ্নের পরে সে-অর্থও সরবরাহ করা হয়েছে, অবশ্যই উৎস উল্লেখ করে। ৩. সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে শব্দটির প্রতীকী অর্থ, প্রচলিত অভিধান ও শব্দকোষগুলিতে যা পাওয়া যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষের ক্ষেত্রে (ব.শ.), ছাত্রবোধ অভিধানের ক্ষেত্রে (ছা.অ.), ঢাকার বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের ক্ষেত্রে (ব্য.বা.অ.ঢাকা) এবং পৌরাণিক-অভিধানের ক্ষেত্রে (পৌ.অ.) প্রভৃতি লিখে উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। ৪. সংখ্যায় আমরা দেখিয়েছি, শব্দটি বর্তমানে কী অর্থে প্রচলিত রয়েছে। আদৌ প্রচলিত না থাকলে 'অপ্রচলিত' (অপ্র.) লেখা হয়েছে। ৫. সংখ্যায় আমরা শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছি, দেখিয়েছি কেমন করে তা প্রতীকী অর্থগুলিতে পরিণত হল। যা কিছু প্রাসঙ্গিক কথা, তার অধিকাংশই দেওয়া হয়েছে এইখানে। ৬. সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে পশ্চিমের ভাষায় শব্দটির স্বরূপ কী, তার সংবাদ। বয়ানের ভেতরে যেখানেই মোটা হরফ রয়েছে, বুঝতে হবে সেটির অর্থ তার নিজস্ব ভুক্তিতে অবশ্যই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ, যদি কোনো বিবরণের ভিতরে মোটা হরফে **অজয়** লেখা থাকে, বুঝতে হবে, এই শব্দার্থকোষে যেখানে **অজয়** শব্দটিকে পাওয়ার কথা, সেখানে তার বিস্তারিত অর্থ অবশ্যই পাওয়া যাবে। যেখানে '??' চিহ্ন রয়েছে, বুঝতে হবে সেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি এখনও অস্পষ্ট, অথবা এমন স্পষ্টতায় বোঝা সম্ভব হয়নি, যা পাঠক-সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করা যায়।

আর, সমগ্র কোষগ্রন্থটি লেখা হয়েছে এইভাবে — প্রথমে আমরা বর্গের নাম লিখেছি এবং তার অর্থ ব্যাখ্যা করেছি। যেমন অ-বর্গের শুরুতে দেওয়া হয়েছে 'অ'-এর মানে। তারপর সেই বর্গ থেকে যে শব্দবংশগুলির জন্ম হয়েছে সেগুলির নাম লিখেছি। দেখিয়েছি, সেই বর্গ থেকে মোট কতগুলি শব্দবংশের বা শব্দ-পরিবারের সূত্রপাত হয়েছে। এর পর বর্ণানুক্রমিকভাবে শব্দবংশের নামগুলি লিখেছি। তারপর প্রথম শব্দবংশটির নাম লিখে, সেই শব্দবংশে কী কী শব্দের জন্ম হয়েছে, অর্থাৎ সেই শব্দপরিবারের সকল সদস্যদের নাম বর্ণানুক্রমিক ভাবে লিখেছি। অতঃপর বর্ণানুক্রমিকভাবে সেই শব্দবংশে জাত শব্দগুলির অর্থ নির্ণয় করতে শুরু করেছি। সবার আগে বংশকর্তার নামের অর্থনির্ণয় করা হয়েছে। তারপর তার থেকে জাত শব্দসমূহের অর্থ দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমরা নির্বাচনের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি। সব শব্দের অর্থ দিইনি। কারণ, শব্দবংশের কর্তার মানে জেনে নেওয়ার পর পাঠক বহু ক্ষেত্রে নিজেই সদস্য শব্দদের অর্থ বুঝে নিতে পারবেন। শব্দার্থকোষের অবয়বের কথা ভেবেও এই নীতি গ্রহণের প্রয়োজন ছিল।

অ

অ বর্ণের অর্থ : ১. ✓অব্ + অ (ড) - ক। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের আধার মাত্র যে; যে অস্তিত্বকে ধরে রাখে বা বহন করে।* / যে রক্ষা করে। (ব.শ.)। ৩. বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব, বায়ু, বৈশ্বানর, ব্রহ্ম। (ব.শ.)। ৪. নঞ্-অর্থে প্রচলিত, যথা — ন (no) + ব্রাহ্মণ = অব্রাহ্মণ। এইরূপ অলোভ, অহিংসা, অকর্ম্মণ্য ইত্যাদি। সম্বোধনেও ব্যবহৃত হয়, যথা — অ রামলোচন, কোথা যাও! স্বীকৃতি বোঝাতেও 'অ, তাই বুঝি!' ব্যবহৃত হয়। মোট কথা অ-বর্ণের বহু ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে আজও। ৫. 'অ'-কে বহন করে যে, তাকে বলে অব। অর্থাৎ, রক্ষকের বা আধারের (অস্তিত্বের) নিম্নতম রূপকে 'অ'-স্বরে বা 'অ'-বর্ণে চিহ্নিত করা হয়। দ্র. **অংরূপিণী**। এর ব্যক্ত রূপ হল অং এবং অঃ। **অং** রহস্যরূপী অসীম শক্তির আধার-আধেয়, **অঃ** সাধারণরূপী সসীম শক্তির আধার-আধেয়। **অঃ** আর **অস্** একই কথা। অস্তিত্বের অবয়বটি অ-এর দ্বারা এবং সসীম তেজ বা শক্তি রূপটিকে স্-এর দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। তেজ যখন অসীম রহস্যরূপী সজীব তখন সে **ং-রূপিণী**, যখন বার্ধক্যে উপনীত তখন স্ বা **ঃ-রূপিণী**। যতদূর বোঝা যায়, অস্তিত্ব মাত্রেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত প্রবাহ থেকে 'অব-তীর্ণ' এক 'ক্ষণিকের অতিথি'। তার আগে ও পরে শুধু চলা। যখন দাঁড়ায় (একেবারে থ হয়ে দাঁড়ায় না, চলে, তবে নিয়মনিষ্ঠ নিজস্ব গতিতে, বা ধীরগতিতে) তখনই অস্তিত্ব বা স্থিতি ('অ'কার = বিষ্ণু, দ্র. **ওম্**)। তাই চলন্‌কে (চল্ + **অন্** বা on কে) 'ন' (no) করলেই 'অ' হয় বা অস্তিত্ব হয়। আবার, অস্তিত্বমাত্রকেই 'ন' (no = negate) করে দিলে সে পুনরায় গতিশীল হয়ে যায়, অর্থাৎ যে প্রবাহে ছিল সেই প্রবাহে চলতে থাকে নবীকৃত-গতিতে। 'অ' তাই আধারের একক। এখান থেকেই গণনার সূত্রপাত। সেই কারণেই ইংরেজিতে A বর্ণটি 'একটি' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বস্তুত ং, সংস্কৃতে যাকে লেখা হয় বিন্দু (·) রূপে, তা হল এই বিশ্বের সমস্ত শব্দের বিন্দু ও সিন্ধু রূপ। কিন্তু সে নিজে পৃথকভাবে উচ্চারিত হতে পারে না, তার জন্য তাকে অ-ই-উ এবং তাদের যোগফল 'ও' প্রভৃতির সাহায্য নিতে হয়। সেই বিচারে ং হল একটি অব্যক্ত ধ্বনি বা বর্ণ। বিন্দুরূপিণীর প্রথম সাহায্যকারী (আগম) রূপে 'অ'-এর আবির্ভাব। তাদের সাহায্যে ভাষার দুনিয়ায় আধা-অব্যক্ত আধা-ব্যক্ত রূপেই বিন্দুরূপিণীকে ছয়-চারে চব্বিশ ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকতে দেখা যায় —

অঙ্	অঞ্	অণ্	অন্	অম্	অঁ
ইঙ্	ইঞ্	ইণ্	ইন্	ইম্	ইঁ
উঙ্	উঞ্	উণ্	উন্	উম্	উঁ
ওঙ্	ওঞ্	ওণ্	ওন্	ওম্	ওঁ

এর মধ্যে **অন্** (on), **ইন্** (in) রয়েছে বহু ভাষাতেই। ইঞ্-এর প্রাবল্য রয়েছে ভারতের সাঁওতালদের ভাষায়, ন্-এর প্রাবল্য রয়েছে চীনা ভাষায়, ণ্-এর প্রাবল্য রয়েছে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাগুলিতে, অঁ, ইঁ, উঁ, ওঁ প্রভৃতি ধ্বনির প্রাবল্য রয়েছে ফরাসীদের ভাষায় এবং গ্রামবাংলার বাংলাভাষীদের উচ্চারণে। যেহেতু ন্ হল বিন্দুরূপিণীর সবচেয়ে ক্ষীণ ও অবয়ব-সম্বল স্থিতিপ্রধান রূপ, এবং চন্দ্রবিন্দু ( ) হল বিন্দুরূপিণীর গতিপ্রধান তেজময় রূপ (দ্র. **ঝম্প**), সেই কারণে, একটি জাতির ভাষা ব্যবহার থেকে তার স্বভাবের খবরও সুস্পষ্ট রূপে বেরিয়ে আসে। বিন্দুর ং (· = ঙ্ = ঙ্ + গ্) রূপটি ইংরেজিতে হয়েছে ng। এটি বিন্দুরূপিণীর দ্বৈতাদ্বৈত ব্যক্তরূপ। 'ই' যেহেতু চলমানতার আধার মূলক ধ্বনি এবং সেকারণেই ই-বর্গের মূল ধ্বনি, তাই ই-মানেই গতি বা চলমানতা। (ই-বর্গে ই-র অর্থ দ্রষ্টব্য।) ইংরেজি ভাষায় সেকারণেই ing যুক্ত হয় চলমানতা বোঝাতে। অন্যদিকে জার্মান ভাষায় রয়েছে (ung) উঙ্-এর প্রাবল্য। তাছাড়া, **অঃ** বা **অস্**-এর ভেতরে **অ** যেন অস্তিত্বমাত্রেরই ব্যক্তকারী এবং **স্** যেন তার শক্তির প্রতিনিধি — এভাবেও **অ**-কে প্রকাশিত হতে দেখি। যেন একটি জলবিন্দুর ভিতরে প্রাণের অস্তিত্ব বিপ্ বিপ্ করে প্রাণের অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটাচ্ছে।

তাহলে 'অ'-এর মানে সাধারণভাবে আমরা কী বুঝব? 'ক্' মানে 'করণ', কিন্তু 'করণ'কে দেখা যায় না, যদি তার আধার না থাকে। তাই 'ক্' + 'অ' = 'ক'। এই 'ক' মানে 'করে যে' বা 'কারী'। এই নিয়মে যে কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'অ' যুক্ত থাকলে, বুঝতে হবে, একটি আধারের কথা 'হসন্তহীন বর্ণ'টির ভিতর বলা হচ্ছে। এইভাবে (গ্ + অ) 'গ' মানে 'যায় যে'; (প্ + অ) 'প' মানে 'পালন বা পান করে যে', (ব্ + অ) 'ব' মানে 'বহন করে যে' ইত্যাদি। অতএব, এককথায় **অ**-এর মানে দাঁড়ায় — 'অস্তিত্বকে অবয়ব দেয় যে।' এ হল শুধুমাত্র ধরে রাখা। কিন্তু যাকে ধারণ করা হয়, তাকে লালন-পালন ও তার বিকাশসাধন করলে সে আধারের রূপ বদলে হয়ে যায় 'ই' (ক্ < ক < কি)। আর, তার অত্যন্ত বিকাশসাধন করে তাকে পরবর্তী নবরূপে উত্তীর্ণ করে দেয় যে, সে হল 'উ' (ক্ < ক < কি < কু)। বলে রাখা যাক, আদিম মানুষ (অ) ধ্বনি পেরিয়ে যখন কেবলমাত্র অ-ই-উ উচ্চারণের যোগ্যতা অর্জন করেছিল এবং সুরে ডুবিয়ে এই তিনটি স্বরের সাহায্যেই তার সমস্ত বক্তব্য প্রকাশের কাজ চালাত, তখন একটি অ-বর্ণই তার বক্তব্যের এক-তৃতীয়াংশকে ধারণ করত। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে 'বাংলাভাষা ও ভাষার উৎপত্তি রহস্য' নিবন্ধে। দ্র. **গ্রন্থ** (খ)। অতএব সংক্ষেপে **অ** = আছে যে; অস্তিত্ববান যে (which exists); [ন-কারী (চল > **অ**চল), ব্যঞ্জনস্বরের অন্ত্যবর্ণ রূপে ব্যবহৃত। (ক্ + **অ** = ক = করে যে, চাল**ক**)]। 'অ'-র সাহায্যে অনেক সময় সমগ্র অস্তিত্বকে না বুঝিয়ে অস্তিত্বের কাঠামোকে বোঝানো হয়। অস্তিত্বের যে দুটি ভাগ করা হয় — আধার (form) ও আধেয় (content), তার মধ্যে 'অ' প্রধানত আধেয়কেই বোঝায় এবং আ প্রধানত আধারকেই বোঝায়। দ্র. **ঈ**। ইংরেজিতেও আধার অর্থে এই অ বা a-র অজস্র ব্যবহার (alive, alight, asleep, align) রয়েছে।

অ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : অংশ, অঙ্ক (অনক্), অঞ্চ (অনচ্), অঞ্জ (অনজ্), অঙ্গ (অনগ্, অম্), অট্, অণ্, অত্, অদ্,

অন্ (অন্ধ্, অন্ধ), অব্, অম্ (অন্‌গ্, অন্ত্), অর্চ্ (অৰ্চ্চ্, ঋচ্), অর্জ্ (অর্জ্জ্, ঋজ্), অর্থ্, অর্হ্, অল্, অশ্, অস্, অ = ১৯ + ১

'অংশ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অংশ, অংশক, অংশকল্পনা, অংশগত, অংশগ্রাহী, অংশন, অংশনীয়, অংশবিবর্ত্তী, অংশভাক্, অংশভাগী, অংশমান, অংশল, অংশহর, অংশহারী, অংশা-অংশী, অংশাংশ, অংশাংশি, অংশাংশী, অংশাবতরণ, অংশাবতার, অংশিত, অংশী, অংশীদার, অংশানো, অংস, অংসকূট, অংসত্র, অংসপৃষ্ঠ, অংসফলক, অংসবান, অংসভারিক, অংসল, অংসারূঢ়, অনংশ, হাঁসুয়া (অংশক, অংসক), হাঁসলি(লী), হাঁসুলী, হেঁসুয়া, হেঁসো (অংসক), হেঁসোহার।

অংশ্ = অস্তিত্বের রহস্যরূপের (**অংরূপিণী**র বা তেজের) শ্-অন (শক্তি রূপে বিচ্ছুরণ)। **অংশ** = **অংরূপিণী** শক্তিরূপে প্রকাশমান যাহাতে। (ansa, once, ounce)।

অংশ : অস্তিত্বের রহস্যরূপের শয়ন। শব্দটির প্রকৃত রূপ হল 'ংশ'। কিন্তু উচ্চারণের সুবিধের জন্য যেমন 'অ'-এর আগম হয়, বাস্তবেও তেমনি তেজ মাত্রেরই আধার লাগে। যে তেজকে নিয়ে (**তেজ** দ্র.) বাস্তবের কারবার, তার চেহারা না থাকলে তাকে নিয়ে কিছুতেই কোনো কাজ-কারবার চলে না। তাই 'ংশ'-এর সামনে আসে 'অ'। এর প্রাথমিক অর্থ হল — *অস্তিত্বের রহস্যরূপ (**অংরূপিণী** বা তেজ) শায়িত থাকে যাহাতে।*

অংশ শব্দটি সম্পর্কে শব্দকোষকারগণের অভিমত এইরূপ যে, এর ভিতরে বিভাজন বা পৃথকীকরণ ক্রিয়াটি রয়েছে। ইংরেজিতে একে division করা বা separate করা বলে। কিন্তু যাকে বিভাজন বা **অংশন্** করা হয়, সেটি ধানচালের মতো কঠিন, দুধের মতো তরল, সুগন্ধীর মতো বায়বীয় হতে পারে; কিংবা তাপ বা আলোর উৎস, এমনকি **ক্ষমতার** কেন্দ্রও হতে পারে। পাঁচ জনে বসে যে আগুন পোহায়, তারা প্রত্যেকেই সেই আগুনের তাপের **অংশী**। পাঁচজন বিভাগীয় কমিশনার যে রেলব্যবস্থা চালান, তাঁরা প্রত্যেকে ওই রেল-পরিচালন ক্ষমতার 'অংশী' বা 'অংশাবতার'। এই বিবেচনায় **'অংশ্'** ক্রিয়াটিকে তার অতি-সীমিত দৃশ্যরূপ থেকে অপরিমেয় অদৃশ্যরূপ পর্যন্ত বিস্তারিত করে সর্বক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে হয়। এই বিচারে 'অংশন্ করা' তাই বহুরূপী। তবে কিনা, বহুরূপী মাত্রেই একই সঙ্গে তার বহুরূপ দেখায় না, এক এক সময় এক এক রূপ দেখায়। **'অংশ্'**-এরও সেরকম। বাক্যে প্রযুক্ত প্রেক্ষিতের বিবেচনায় ঠিক হয়, **'অংশ্'** শব্দটি বাক্যে কথিত হয়ে তার কোন রূপটিকে দেখাচ্ছে। যতদূর বোঝা যায়, এই **'অংশ্'** শব্দ-পরিবারের পশ্চিমী উত্তরাধিকার রয়েছে ল্যাটিন ansa এবং ইংরেজি once বা ounce প্রভৃতি শব্দগুলিতে, যা যথাক্রমে স্থান, কাল, ও পাত্রের **অংশ**কে বোঝায়।

উপরোক্ত **'অংশ-বংশের'** সদস্য শব্দগুলি এই **'অংশ'** ক্রিয়া থেকে প্রসূত হয়েছে। যে নিয়মে প্রসূত এই শব্দগুলি প্রস্তুত হয়েছে এবং যাদের বোঝাতে শব্দগুলির ব্যবহার চলে, এখানে তার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

অংশ : ১. ং < ংশ < অংশ্ < অংশ। / ✓অংশ্ + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. অং *(গতির/শক্তির অণু) শায়িত (আছে) যাহাতে। কিংবা, অংশনের আধার অর্থাৎ যাহা (অখণ্ড বা পূর্ণকে) বিভাজন ক'রে বা অংশন ক'রে (উপলব্ধ বা বর্তমান রূপে স্থিত হয়েছে) আছে।*// যাহাকে বিভাজন করা যায় বা বিভাজন করে পাওয়া যায় (ব.শ.)। ৩. ভাগ, বিভক্ত দ্রব্য, বস্তুর একদেশ, খণ্ড, টুকরো। (ব.শ.)। কশ্যপ ও অদিতির পুত্র 'অংশ', ইনি দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম। অংশ চাক্ষুষ মন্বন্তরে তুষিত নামে খ্যাত এবং বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিত্য নামে খ্যাত ছিলেন। (পৌ.অ.)। ৪. টুকরো বা share অর্থে প্রচলিত। ৫. **কশ্যপ** ও **অদিতি**র থেকে (বা আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিচালক ও পরিচালিতদের থেকে) অংশের জন্ম হয়। পরবর্তী কালে যৌথ সামাজিক সম্পত্তি ও তার দেখভাল-কারী গোষ্ঠীর যে বারোটি বিভাজন ঘটে বা যে-দ্বাদশ **আদিত্যের** উদ্ভব ঘটে, **অংশ** তাদের একটি। শাস্ত্রানুসারে এ পর্যন্ত ছয়টি যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে এবং বর্তমানে সপ্তম যুগটি চলছে। সাত যুগে সাতরকম **মনু** বা মানুষ জগতে বাস করেছে। সপ্তম কালটি হল বর্তমান কাল। এখন 'আইনবোঝা মানুষদের কাল' (নাগরিক মানুষদের কাল) বা **বৈবস্বত মন্বন্তর**। ('এখন বৈবস্বত মন্বন্তর চলিতেছে' — পঞ্জিকা দ্র.); কদর্থে বর্তমান যুগ হল 'আইনবাজ মানুষদের যুগ'। এর আগে ছিল ষষ্ঠ যুগ অর্থাৎ **চাক্ষুষ মন্বন্তর**, বা এমন মানুষদের যুগ, যারা আর্থ-সামাজিক সম্পর্কগুলিকে প্রথম চাক্ষুষ করতে শিখেছিল। তখন যা দিয়ে বিভিন্ন সমাজসদস্য বা গোষ্ঠীকে **'তুষ্ট'** করা হত তাই ছিল **'তুষিত'** বা অংশ। একালের 'রুরাল ডেভেল-পমেন্ট ব্যাঙ্ক' ও তার সমস্ত কর্মচারীরা যেমন রাষ্ট্রীয় পুঁজির অংশ তেমনি সেকালে যে সামাজিক গোষ্ঠী যৌথ সম্পত্তির একটি বিশেষ ভাগের দেখভাল করত তাদেরও অংশ বলা হত। আরও উল্লেখ্য যে, 'অং' বা 'অম্' (দ্র. **অংরূপিণী**) বা তেজ (বা গতি) যার ভিতরে শক্তিরূপে শায়িত নেই তাকে অংশ বলা যায় না। দ্র. **আদিত্য**।

অংশক : ১. ✓অংশ্ + অক (ণ্বুল্) - ক। (ব.শ.)। ২. *যে বিভাজন করে বা অংশন করে।* ৩. বিভাজক, বণ্টক। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এই অংশক শব্দ থেকেই হংস শব্দটি প্রসূত হয়েছে বলে মনে হয়। অংশক মানে যে কেটে বা অন্য কোনোভাবে অংশ অংশ করতে পারে। হংস বা হাঁস জল দুধ আলাদা করতে পারে বলে জনশ্রুতি আছে। হাঁসুয়া একপ্রকার কাটারি, যা দিয়ে কেটে অংশ অংশ করা যায় বা টুকরো করা যায়। সেই বিচারে সেটিও অংশক। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির স্বাভাবিক রীতি মেনে হংস শব্দের ক্ষেত্রে হন্ ক্রিয়ার কথাই বলা হয়, ক্রিয়ার ফলটির কথা নয়। কিন্তু অংশক শব্দে ক্রিয়াটির ফলের কথা বলা হয়। ক্রিয়ার ফল দিয়ে বিষয়টিকে বলবার এরকম রীতিকেই আদিতে ব্যঞ্জনা বলা হত। দ্র. **ব্যঞ্জনা, ক্ষিপ্ত, রিক্ত, সিক্ত** প্রভৃতি।

অংশকল্পনা : ২. *বিভাজন করার বা অংশন করার কল্পনা থাকে যাহাতে।* ৩. ভাগ দেওয়া, অংশপ্রদান। (ব.শ.)।

অংশগত : ২. *যাহা অংশে গত হইয়াছে।*

অংশগ্রাহী : ২. *অংশ গ্রহণ করে যে।*

অংশন : ২. ***অংশ্*** *অন্ করা (অবস্থায়) থাকে যাহাতে।* ৩. বিভাজন, বিভাগ, বণ্টন। (ব.শ.)। ৫. এই '**অংশ্** অন্' করা কথাটি কিন্তু নতুন নয়। আমরা যেমন চলন (চল্ + অন্), বলন (বল্ + অন্) বা সমর্থন (সম্ + অর্থন্ = সম্ + অর্থ্ + অন্) বলি, সেইরকম অংশন্। চলন-এ যেমন চল্ ক্রিয়াটি **অন্** (on) করা থাকে, অংশন্-এ তেমনি **অংশ্** ক্রিয়াটি **অন্** (on) করা থাকে। মনে রাখা ভাল, বাংলাভাষার **অন্** ও ইংরেজি ভাষার on একই আদিভাষার নিজ নিজ উত্তরাধিকার।

অংশবিবর্ত্তী : ২. *যে বা যাহারা **অংশ** বিবর্ত্তিত করে গ্রহণ করে।* ৫. দ্র. **বিবর্ত্তন**। অংশের পরবর্তী বিকাশ সাধন করে গ্রহণ করাই হল বিবর্ত্তন করে গ্রহণ করা। ভাগে একটি জমি পেয়ে তাতে চাষবাস করে যে, তাকে তাই 'অংশবিবর্ত্তী' বলা যায়।

অংশভাক্ : ২. ***অংশ*** *উপভোগ (ভাক্) করে যে।*

অংশভাগী : ২. ***অংশ****-এর ভাগ পায় যে।*

অংশল : ১. ✓অংশ + > লা অ (ক) - ক। (ব.শ.)। ২. ***অংশ*** *লয় যে কিংবা অংশ লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে।* / অংশ গ্রহণ করে যে (ব.শ.)। ৩. অংশগ্রাহী, ভাগগ্রাহক। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. শব্দটি 'আঁশলা' বা 'দোআঁশলা' রূপে এখনও প্রচলিত আছে। দ্র. **আঁশলা**। সংস্কৃত থেকে বাংলায় শব্দটি আরও বেশি অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

অংশহর : ১. ✓অংশ + > হৃ + অ (অচ্) - ক। (ব.শ.)। ২. ***অংশ*** *হর হ'য়ে থাকে যাহাতে।* / অংশ হরণ করে যে। (ব.শ.)। ৩. অংশহারক, ভাগগ্রাহী, উত্তরাধিকারী। (ব.শ.)। ৪. অপ্র. ৫. **অংশ**কে সুরক্ষিত রাখে যে, তাকে অংশহর বলা যায়। কিন্তু প্রায়শই হর শব্দটির অর্থ যে 'হরণ' রূপে বোঝা হয়, তার মধ্যে চুরির বা জোর করে নিয়ে নেওয়ার একটা বোধ কাজ করে। হর কিন্তু একেবারেই তা নয়। হওয়ন রহে যাহাতে, সেই হর। কোনো একটি বিষয় বা বস্তু যেমন আছে তেমন রক্ষা করে যে, সে তো হরই। দ্র. **হর**।

অংশা-অংশী : ৫. দ্র. **কচকচি**।

অংশাংশ : ২. ***অংশ****-এর* ***অংশ*** *থাকে যাহাতে।* ৩. ভাগের ভাগ, কলা। (ব.শ.)।

অংশাংশি : ২. ***অংশ****-এর* ***অংশ*** *করণ চলে যাহাতে (যে ক্রিয়ায়)।*

অংশাংশী : ২. ***অংশ****-এর* ***অংশ*** *পায় যে।*

অংশাবতার : ২. *যিনি (কোনো বিষয়ের)* ***অংশ*** *নিয়ে অবতীর্ণ হন।* / অংশের অবতার। (ব.শ.)। ৩. ঈশ্বরের অংশরূপে অবতার — মৎস্যকূর্ম্মাদি। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **অবতার** ও **দশাবতার** এবং **কূর্ম্ম** ও **নারায়ণ** ... প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

অংশিত : ২. *যাহার **অংশন** করা হইয়াছে।*

অংশী : ২. ***অংশন্-ই*** *প্রকৃতি যাহার।* / অংশ যাহার আছে। (ব.শ.)। ৩. ভাগী, বিভাজক, অংশের আশ্রয়, অবতারী, কৃষ্ণ। (ব.শ.)। ৪. 'ভাগীদার' অর্থে প্রচলিত। ৫. অংশন ক্রিয়ার বিকাশ যাহাতে, তাকে বলে 'অংশি'; সেই ক্রিয়ার আধার-প্রকৃতি যে, তাকে বলে **অংশী**। কোনো সত্তার বিশেষ অংশ নিয়ে বা অংশ রূপে যে অবতীর্ণ হয়, তাকেও সেকারণে **অংশী** বলে। মনে হয়, **শ্রীকৃষ্ণ** (নগদ-) নারায়ণের অংশরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বলেই তাঁকে **অংশী** বলেছেন বঙ্গীয় শব্দকোষ।

অংশীদার : ২. ***অংশী****র দার (দান করার ক্ষমতা রহে) যাহাতে।* / যাহার অংশ আছে। (ব.শ.)। ৩. (অংশী + দার) ভাগী, partner। (ব.শ.)। ৪. 'ভাগীদার' অর্থে প্রচলিত। ৫. এই শব্দটি মধ্যযুগের বাংলাভাষীর সৃষ্টি। তখন ফারসী ভাষার প্রভাব বাংলায় পড়েছে। এই শব্দটির ক্ষেত্রে বলা হয় 'অংশী' আদি বাংলা, এবং 'দার' ফারসী ভাষার প্রভাবজাত। কীভাবে সেই প্রভাব কাজ করেছে, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সৈয়দ মুজতবা আলীর 'ভাষা' ও 'মামদোর পুনর্জন্ম' নিবন্ধে। তাই বলে 'দার' শব্দটিকে আমরা বিদেশী ভাষার শব্দ বলছি না। কারণ তা 'দ্' বর্গের 'দা' শব্দ-পরিবারের সদস্য। সেকালের বাংলাভাষীদের কাছে 'দার' শব্দটি তাই অনাত্মীয় মনে হয়নি; সেজন্যেই শব্দটিকে তাঁরা ঘরের ছেলের মতোই আপন করে নিয়ে প্রত্যয় রূপে ব্যবহার করেছিলেন।

অংশানো : ২. *অংশনের প্রচেষ্টা থাকে যাহাতে।* ৫. শব্দটি অংশান ও অংশানো দুরকম বানানেই পাওয়া সম্ভব। এর অর্থ অভিধানাদিতে 'বর্তানো' বা 'উত্তরাধিকার সূত্রে অংশ-পাওয়া' লিখে রাখা হয়েছে। অবশ্য বাস্তবে গ্রামবাংলায় অন্যরকম অর্থও প্রচলিত রয়েছে। সাধারণত শুকনো পাতা বা খড়ের আগুনের শিখা নিভে যাওয়ার পর যে অঙ্গার ছাই রূপে পড়ে থাকে তাকে 'লুকটী' (ছোট সরু লাঠি, দ্র. **লুকটী**) দিয়ে নাড়িয়ে অংশে অংশে ভাগ করার চেষ্টা করলে, ভেতরে যে জ্বলন্ত অঙ্গার তখনও থাকে, তা দেখতে পাওয়া যায়। তাতে শুকনো কিছু ফেলে দিলে পুনরায় আগুন জ্বলে ওঠে। এই যে অংশ অংশ করে আগুন বের করা, একেই বলে অংশান বা অংশানো। উভয় ক্ষেত্রে অবশ্য 'অংশ-আনয়ন' ক্রিয়াটি রয়েছে। তাই দুটো অর্থই সঠিক বলে মনে হয়।

অংস : ১. ✓অংস্ + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। ২. ***অংরূপিণী****র কণা রূপ যাহাতে।* / যাহা ভারাদি কর্ত্তৃক সমাহত হয়। (ব.শ.)। ৩. ভুজশিরঃ, স্কন্ধ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. 'স' অংরূপিণীর বা শক্তিরূপিণীর দমিত রূপ। এর ওপর ভার বা বোঝা চাপান হয়। একে বঙ্গীয় শব্দকোষ বলেছেন 'স্কন্ধ'। সেই সুবাদে বলতে হয় '*অং যাহাতে সমাহত হয়*' তাকে অংস বলে। ৬. onus।

অংসকূট : দ্র. **অংস** ও **কূট**।

অংসত্র : ১. অংস্ + ✓ত্রৈ + অ (ক) - ক। (ব.শ.)। ২. অংসকে

ত্রাণ করে যে। / যাহা অংস ত্রাণ করে। (ব.শ.)। ৩. স্কন্ধরক্ষক কবচ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৬. ইংরেজি ancestor শব্দটি এই অর্থেও প্রযুক্ত হতে পারে, যদি 'অংস'কে পূর্বপুরুষের নিকট থেকে প্রাপ্ত বোঝা বলে মনে করা হয়। তাছাড়া, মানুষ যা কিছু জমায় সবই তো বোঝা পদবাচ্য — 'তুমি যত ভার দিয়াছ সে ভার করিয়া দিয়াছ সোজা, আমি যত ভার জমায়ে তুলেছি সকলই হয়েছে বোঝা।' এই বিচারে ancestor শব্দের অর্থ হল 'যে পূর্বপুরুষের বোঝা বয়'।

অংসল : ৫. দ্র. **অংশল**।

অনংশ : ২. *যাহার অংশ নাই*। দ্র. **অংশ**।

হাঁসুয়া, হেঁসুয়া, হেঁসো : দ্র. **অংশক**।

হাঁসুলী, হেঁসোহার : ৫. অংশক-কারী হাঁসুয়া দেখতে যেরকম, গলায় পরার এই হারটি প্রায় সেরকম দেখতে। এটি সাধারণত রুপো দিয়ে তৈরি হয়, এবং বাংলার গ্রামের আদিবাসী রমণীগণ অলঙ্কার রূপে পরিধান করেন।

'অঙ্ক্' (অন্‌ক্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা: অঙ্ক্ (অন্‌ক্), অঙ্ক, অঙ্ককরণ, অঙ্কগত, অঙ্কতন্ত্র, অঙ্কধারণ, অঙ্কন, অঙ্কনৃত্য, অঙ্কপরিবর্ত্ত, অঙ্কপাত, অঙ্কপাশ, অঙ্কপূরণ, অঙ্কবাচক, অঙ্কবিদ, অঙ্কবিদ্যা, অঙ্কমুখ, অঙ্কলক্ষ্মী, অঙ্কশাস্ত্র, অঙ্কস্থ, অঙ্কস্থিত, অঙ্কাগত, অঙ্কাবতার, অঙ্কিত, অঙ্কিনী, অঙ্কী, অঙ্কুর, অঙ্কুরণ, অঙ্কুরপর্ব্বত, অঙ্কুরি, অঙ্কুরী, অঙ্কুরিত, অঙ্কুরোদ্‌গম, অঙ্কুশ, অঙ্কুশগ্রহ, অঙ্কুশদুর্দ্ধর, অঙ্কুশমুদ্রা, অঙ্কুশি, অঙ্কুশিত, অঙ্কুস, অঙ্কোট, অঙ্কোঠ, অঙ্কোল, অঙ্ক্য, অঙ্ঘার, অত্যঙ্কুশ, অনঙ্কুশ, আঁক, আঁকা, আঁকশি, আঁকাগন্ধ, আঁকাজোকা, আঁকাবাঁকা, আঁকুর, আঁকুশ, আঁকুশি, আকুসি, আঙ্কুড়ী, আঙ্কুর, আঙ্কুশিক।

অঙ্ক্ (অন্‌ক্) = অস্তিত্বের রহস্যরূপ (= অং) ক্-অন (করণাদি); অন্ কে (সত্তাকে) অন্ (on) করণ। **অঙ্ক** = যার দ্বারা (কোনো) সত্তাকে **অন** করা হয়। দ্র. **অন্**। (English – anchor, anker, ankle, ancle; Greek – agkas, ogkos; Latin – uncus)।

অঙ্ক্ (অন্‌ক্) : ৫. অস্তিত্বের রহস্যরূপের ক্-অন (করণ)। বঙ্গীয় শব্দকোষে অঙ্ক্, অঞ্চ্, অঞ্জ্ প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলির ক্ষেত্রে যথাক্রমে **অন্‌ক্, অন্‌চ্, অন্‌জ্** বানানও লেখা রয়েছে। আমরা জেনেছি, ঙ্-এর বদলে ন্ লিখলে তদ্ধারিত বিষয় আরও ব্যক্ত হয়। ং বর্ণের পরে ক্, খ্, গ্, ঘ্ থাকলে ং-রূপিণী ঙ্ রূপ ধারণ করে ঠিকই, কিন্তু তাতেও তার রহস্যরূপের রহস্য মোচন হয় না। কিন্তু ন্ রূপে তার রহস্যরূপ অনেকটা ব্যক্ত হয়। সেই হিসেবে অং-করণ বা অঙ্-করণকে অর্থাৎ **অন্** (on) করণকে **অন্‌ক্** বলা যায়। সেই সুবাদে, যে চলে গেছে, মরে গেছে, হারিয়ে গেছে, কিংবা যাকে গুছিয়ে অন্যত্র রাখা হয়েছে, তাদের **অস্তিত্বকে** দেয়ালে বা মাটিতে এবং (পরের যুগে) কাদার টালিতে এবং বর্তমানে কাগজে দাগের মাধ্যমে লিখে রেখে দিতে পারলে তারা পরবর্তীকালেও অন হয়ে থাকতে পারে। তাহলে তো এ-ক্রিয়াকে **অন্‌ক্** বলা যেতেই পারে। **অর্থাৎ অঙ্ক্** শব্দের প্রাথমিক অর্থ হল, *অস্তিত্বের রহস্যরূপ চিহ্নিত করে যে*। এই শব্দ-পরিবারের পশ্চিমী উত্তরাধিকার সম্ভবত **anker,** ankle (ancle) প্রভৃতি শব্দের মাধ্যমে প্রবাহিত। পায়ের যে **অংশটি** মাটিতে দাগ বা **অঙ্ক** (আঁক) অর্থাৎ চিহ্ন রেখে রেখে যায়, **তাকে** ankle বলাই স্বাভাবিক। ৬. গ্রীক agkas, ogkos; ল্যাটিন **uncus**। (ব.শ.)।

অঙ্ক : ১. ✓অঙ্ক্ + অ (অচ্) - ণ; ✓অঙ্ক্ + অ (অচ্) - ক। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের রহস্যরূপ (=* **অং***) কৃত যাহাতে; যার দ্বারা (কোনো সত্তাকে)* **অন্** *(on) করে রাখা হয়।* / যাহা দ্বারা চিহ্নীকৃত হয়; যাহা বক্র যায়। (ব.শ.)। ৩. লক্ষণ, চিহ্ন, দাগ, পশুগাত্রে কৃতচিহ্ন, অপরাধীর গাত্রে কৃত রাজদণ্ডসূচক দূষণচিহ্ন, কলঙ্ক, রেখা, আঁক, মান, আঁকড়া, বক্রভাব, বাঁক, ... (ব.শ.)। ৪. mathematics অর্থে প্রচলিত। ৫. কোনো সত্তাকে বা অস্তিত্বকে 'অন্ (on) করে রাখে' বলে চিহ্ন, দাগ, রেখা, নাটকের অঙ্ক, আঁক, এবং ছোটদের যে কোলে রাখা হয় — এসব কিছুকেই **অঙ্ক** বলে। নাটকের এক একটি অধ্যায় নাটকের বিষয়কে কোলে রাখার মতো অন্ করে রাখে বলেই তাদের **অঙ্ক** বলে। অঙ্কিত বললে আমরা বুঝি, যা 'অঙ্কন' করা বা 'আঁকা' হয়েছে। তার মানে 'অঙ্ক-অন্' করা হল আসলে দাগ দিয়ে দিয়ে চলা; আর তাতে হিসেব বা গণনাও হয়ে যায়। তাই **অঙ্ক**। নিরক্ষর মানুষেরা এভাবেই এক এক ক্ষেপ মাল এনে ফেলেন, আর দেয়ালে দাগ দেন। এতে তাঁদের কাজের **অঙ্ক** কষাও হয়ে যায়। সেকালে এভাবেই আঁকার মাধ্যমে গণনার উদ্ভব হয়েছিল বলেই mathematics-কে অঙ্ক বলে। এই অঙ্ক ও গণিতের মধ্যে স্বভাবতই একটা পার্থক্য আছে। দ্র. **গণিত**। ৬. ইংরেজি anchor, ল্যাটিন uncus।

অঙ্কন : ২. *যার দ্বারা অঙ্ক্-কে অন্ করা হয়।* দ্র. **অঙ্ক**।

অঙ্কমুখ : ২. নাটকের যে অঙ্কে অন্যান্য অঙ্কের নিবন্ধনীয় বস্তুসমূহের মূল বিষয়ের সূচনা থাকে। (ব.শ.)। ৫. নাটকের বদলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও শব্দটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যথায় শব্দটি 'স্থিরীকৃত' হয়ে 'প্রতীকী' অর্থধারী হয়ে যায়।

অঙ্কলক্ষ্মী : ২. *যে লক্ষ্মীকে* **অঙ্কে** *ধারণ করে রাখা হয়েছে।* ৩. সমীপস্থ বা অধীনস্থ সম্পদ, হাতের লক্ষ্মী, পত্নী। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **অঙ্ক, লক্ষ্মী**।

অঙ্কিত : ২. *যাহা* **অঙ্কন** *করা হইয়াছে।* দ্র. **অঙ্ক**।

অঙ্কিনী : ২. *অঙ্ক (কোল, দাগ) আছে যাহার।* ৩. অঙ্কযুক্তা, অপরাধ হেতু দণ্ডচিহ্নযুক্ত স্ত্রী। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। দ্র. **অঙ্ক**।

অঙ্কী : ২. *গতিশীল* **অঙ্কের** *আধার যে।* / অঙ্ক যাহার স্থান রূপে আছে। (ব.শ.)। ৩. অঙ্কবিশিষ্ট, চিহ্নিত, প্রশস্তক্রোড়বিশিষ্ট, কলঙ্কযুক্ত, কলঙ্কী, ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক বাদনীয় মৃদঙ্গাদি। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এই শব্দটি দুদিক থেকে সক্রিয়। বড় কোল যার এবং কোলে

বসে রয়েছে যে। দুদিক থেকে এরকম অর্থ করা যাচ্ছে যে কারণে, সেটি এরকম হতে পারে বলে মনে হয় — অঙ্ক-এর বিকাশসাধন করাকে বলা যেতে পারে 'অঙ্কি'; সেই 'অঙ্কি'কে যে ধারণ করে রেখেছে তাকে বলা যায় 'অঙ্কী'। ই-কার ও ঈ-কারের এরকমই অর্থ হওয়ার কথা। সেটি ঠিক কীভাবে প্রযুক্ত হয়ে অর্থগুলি হল, তা আরও গবেষণা সাপেক্ষ।

অঙ্কুর : ১. ✓অঙ্ক + উর্ - ক। (ব.শ.)। ২. *অন্-কৃত সত্তার নব রূপে উত্তীর্ণ অস্তিত্ব রহে যাহাতে।* / যাহা বীজ হইতে উদগত হয়। (ব.শ.)। ৩. বীজজাত নব উদ্ভিদ, কলা, বৃক্ষতৃণাদির নতুন প্ররোহ, শলাকা, লোম, আব, শিশুসন্তান, জল, রুধির, কুচোদগম, প্রারম্ভ। (ব.শ.)। ৫. 'অঙ্ক-উ' — (সত্তাকে) অন্ করে নব রূপে উত্তীর্ণ করে; তা রহে যাহাতে, তাকে **অঙ্কুর** বলে।

অঙ্কুরণ : ২. ***অঙ্কুর*** *অন্ হয়ে থাকে যাহাতে।* দ্র. **অঙ্কুর**।

অঙ্কুরপর্ব্বত : ২. *যে পর্ব্বতে (বা পর্ব্বে পর্ব্বে বিন্যস্ত ব্যবস্থায়) সত্তাসমূহের* ***অঙ্কুরণ*** *হয়।* দ্র. **পর্ব্বত**।

অঙ্কুরিত : ২. যাহার অঙ্কুর হইয়াছে। (ব.শ.)।

অঙ্কুশ : ১. ✓অঙ্ক + উশ - ক। (ব.শ.)। ২. *অন্-কৃত সত্তার নব রূপে উত্তীর্ণ অস্তিত্ব শক্তি রূপে শায়িত থাকে যাহাতে।* / যাহা হস্তীর মর্ম্মস্থানে যায়। (ব.শ.)। ৩. লৌহময় বক্রাগ্র হস্তিচালনাস্ত্র, শৃণি, ডাঙশ। (ব.শ.)। ৪. প্রায় অপ্র.। ৫. যে কু-শক্তি (কুশ) অন্ হয়ে রয়েছে, তাকেও **অঙ্কুশ** বলা যায়। সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে, শব্দটির গঠন হয়েছে এভাবে — অং + কুশ। আমাদের একালের সমাজে এরকম কত **অঙ্কুশ** যে রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ৬. ইংরেজি onkus, oncus।

অঙ্কুশগ্রহ : ২. যে অঙ্কুশ গ্রহণ করে। (ব.শ.)। ৩. নিষাদী, মাহুত। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **অঙ্কুশ** হাতে নিয়ে হস্তীর পিঠে চড়ে যারা তাকে চালায়, তারা প্রত্যেকেই 'অঙ্কুশগ্রহ'। **হস্তী** শব্দের অর্থ থেকে বোঝা যায়, একালে 'অঙ্কুশগ্রহ' কাদের বলা যায়। দ্র. **হস্তী**।

অঙ্কুশি : দ্র. **আঁকশি**।

অঙ্কুশিত : ২. ***অঙ্কুশ*** *দ্বারা আহত যে।*

আঁক, আঁকা : ৫. দ্র. **অঙ্ক, অঙ্ক**।

আঁকশি : ৫. **অঙ্কুশ** সক্রিয় বা বিকশিত হতে থাকে যাতে, তাকে অঙ্কুশী বা আঁকশি বলা যায়। 'অঙ্কুশ' আকর্ষণ করে, তবে তার আগেই আকৃষ্ট বস্তুকে গেঁথে দিয়ে রক্তাক্ত করে। কিন্তু সে সব না করে শুধু যদি আকর্ষণ করত, সেক্ষেত্রে একে আমরা বলতাম 'আকষী' বা 'আকর্ষী'। ৬. আকষী > action।

আঁকাজোকা : ৫. দ্র. **অঙ্ক, অঙ্ক**। জোকা, জোখা ও যোঁকা, এই শব্দগুলিকে যথাক্রমে আঁকা ও লেখার সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। দ্র. **আঁকাবাঁকা, জোকা**।

আঁকাবাঁকা : ৫. দ্র. **অঙ্ক, অঙ্ক**। আঁকার সঙ্গে বাঁকা কেন? অর্থাৎ অঙ্ক-এর সঙ্গে বঙ্ক কেন? এই **ব** হল 'উত্থ', উন্নীত করে অন্ করা বা ব্-অন করা। অর্থাৎ, অস্তিত্ব যেমন আছে তেমন লিখে রাখা হল **অঙ্কন** করা বা আঁকা; সেই অস্তিত্বের উন্নীত রূপটিকে ধারণ করে অন্ করাই **বঙ্ক** করা বা বাঁকান। শিল্পীরা বাস্তবকে **অঙ্কন** করার সাথে সাথে তার **বঙ্কনও** করেন! তাই তাঁরা শিল্পস্রষ্টা। দ্র. **বঙ্কিম**।

'অঙ্গ' (অন্‌গ্, অম্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অঙ্গ্, অঙ্গ, অঙ্গক, অঙ্গকর্ম্ম, অঙ্গক্রিয়া, অঙ্গগ্রহ, অঙ্গ গ্লানি, অঙ্গজ, অঙ্গজনু, অঙ্গজনুঃ, অঙ্গজা, অঙ্গণ, অঙ্গত্রাণ, অঙ্গদ, অঙ্গদা, অঙ্গন, অঙ্গনা, অঙ্গনাজন, অঙ্গনাথ, অঙ্গনাপ্রিয়, অঙ্গন্যাস, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত, অঙ্গবিকল, অঙ্গবিকার, অঙ্গবিকৃতি, অঙ্গ বিক্ষেপ, অঙ্গবিদ্যা, অঙ্গবিধি, অঙ্গবৈকৃত, অঙ্গবৈগুণ্য, অঙ্গভঙ্গ, অঙ্গ ভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গী, অঙ্গভূ, অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গমর্দ্দক, অঙ্গমর্দ্দী, অঙ্গমোড়া, অঙ্গযজ্ঞ, অঙ্গযষ্টি, অঙ্গযাগ, অঙ্গরক্ষক, অঙ্গরক্ষণী, অঙ্গরক্ষিণী, অঙ্গ রাখি, অঙ্গরাখী, অঙ্গরাগ, অঙ্গরাজ, অঙ্গরুহ, অঙ্গলেপ, অঙ্গলোক, অঙ্গশুদ্ধি, অঙ্গসংস্কার, অঙ্গসংস্ক্রিয়া, অঙ্গসংহতি, অঙ্গসঙ্গ, অঙ্গ-সেবক, অঙ্গসেবা, অঙ্গসৌষ্ঠব, অঙ্গহানি, অঙ্গহার, অঙ্গহীন, অঙ্গা, অঙ্গাঙ্গী, অঙ্গাঙ্গিত্ব, অঙ্গাধিপ, অঙ্গাধীশ, অঙ্গাধীশ্বর, অঙ্গাঙ্গিভাব, অঙ্গার (আঙরা?), অঙ্গারক, অঙ্গারকারক, অঙ্গারকারী, অঙ্গারধানিকা, অঙ্গারধানী, অঙ্গারপর্ণ, অঙ্গারপাত্রী, অঙ্গারশকটী, অঙ্গারিকা, অঙ্গির, অঙ্গিরাঃ, অঙ্গী, অঙ্গীকর, অঙ্গীকরণ, অঙ্গীকার, অঙ্গীকার্য্য, অঙ্গীকৃত, অঙ্গীভূত, অঙ্গুটী, অঙ্গুরি, অঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়, অঙ্গুরীয়ক, অঙ্গুল, অঙ্গুলি, অঙ্গুলী, অঙ্গুলিচালন, অঙ্গুলিত্র, অঙ্গুলিত্রাণ, অঙ্গুলিধ্বনি, অঙ্গুলিপঞ্চক, অঙ্গুলিপর্ব্ব, অঙ্গুলিপীড়িত, অঙ্গুলিমুখ, অঙ্গুলিমুদ্রা, অঙ্গুলিমোটন, অঙ্গুলিসংজ্ঞা, অঙ্গুলিসন্দেশ, অঙ্গুলিস্ফোটন, অঙ্গুলী, অঙ্গুলীপঞ্চক, অঙ্গুলীয়, অঙ্গুলীয়ক, অঙ্গুষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠপুরুষ, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, অঙ্গুষ্ঠমাত্র, অঙ্গুষ্ঠমাত্রক, অঙ্গুষ্ঠমূল, অঙ্গোত্তম, অঙ্গোপাঙ্গ, অঙ্ঘ, অঙ্ঘ, অঙ্ঘঃ, অঙ্ঘ্রি, অঙ্ঘ্রিকমল, অঙ্ঘ্রিজা, অঙ্ঘ্রিপ, অঙ্ঘ্রিপঙ্কজ, অঙ্ঘ্রিপঞ্জর, অঙ্ঘ্রিপদ্ম, অগু, অগুজ, অনঙ্গ, অনঙ্গতপ্ত, অনঙ্গমোহন, অনঙ্গমোহিনী, অনঙ্গলেখ, অনঙ্গসমর, অপাঙ্গ, আংটা, আংটি, আংঠি, আংরাখা, আঁগ, আঁগন, আঁগিনা, আঁগুলি, আগিনা, আঙট, আঙটা, আঙটি, আঙন, আঙনা, আঙিনা, আঙুল, আঙ্গ, আঙ্গটা, আঙ্গটিয়া, আঙ্গন, আঙ্গরাখা, আঙ্গারখি, আঙ্গি, আঙ্গিক, আঙ্গিনা, আঙ্গিরস, আঙ্গুল, আঙ্গুলহাড়া, আঙ্গস্তানা, আঙ্গোছা, উপাঙ্গ, এঙ্গাপেঙ্গা, প্রাঙ্গণ, শতাঙ্গ, ষড়ঙ্গ, ষষ্টাঙ্গ, সমগ্র, সমঙ্গা, সামগ্রী, সাঙ্গ, সাঙ্গোপাঙ্গ, সাষ্টাঙ্গ।

অঙ্গ্ (অন্‌গ্) = অং-এর (অস্তিত্বের রহস্যরূপের) গমন; অন্-এর গমন (চলা, বেঁচে থাকা)। **অঙ্গ** = যার দ্বারা অস্তিত্বের রহস্যরূপ (= অং) গমন করে (চলে)। (angle, angel)।

অঙ্গ্ (অন্‌গ্) : ৫. শব্দটির প্রাথমিক অর্থ হল, *অস্তিত্বের রহস্যরূপের গমন, সে গমনের আধারই অঙ্গ।* তার মানে কোনো একটি বস্তু বা

বিষয়, যা কিনা অন (on) হয়ে রয়েছে, সেই অন (on) গমন করে যার দ্বারা, সেটিই তার অঙ্গ। অর্থাৎ এই গমন মানে শুধুই চলা নয়, 'সংসার চলা' বললে যে চলা বোঝায়, এ চলা সেরকমও বটে। তার মানে, যে-খাঁচায় অস্তিত্বের জীবন চলে সেটিই তার অঙ্গ, অবয়ব, গা, দেহ ইত্যাদি। মানবসমাজের ক্ষেত্রে এ তার সামাজিক পরিকাঠামো। মোটকথা, যে আধারে অস্তিত্ব থাকে, বাড়ে, ক্ষয় পায়, লয়প্রাপ্ত হয়, সেটিই তার **অঙ্গ**। অঙ্গের অংশ অঙ্গের সঙ্গে লেগে থাকলে, তাকেও অঙ্গই বলে। **৬.** on-go।

অঙ্গ : ১. ✓অম্ + গ (গন্); ✓অঙ্গ + অ (অচ্) - ক। (ব.শ.)। ২. *অম্ (অংরূপিণী) গমন করে যার দ্বারা*। / যাহা শীতাদি হেতু চালিত হয়। (ব.শ.)। **৩.** ইনি বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। এর রাজ্যের নামও ছিল অঙ্গ (বর্তমান বিহার প্রদেশ)। জন্মান্ধ মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে বলিরাজের মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র হয়। মহাভারত মতে জন্মান্ধ মহর্ষি দীর্ঘতমা পত্নী প্রদ্বেষীর গর্ভে কয়েকটি সন্তান উৎপাদন করেন। ইনি স্বামীর প্রতি বিরূপ হন। তখন দীর্ঘতমা নিয়ম করেন যে, জীবিত বা মৃত স্বামীর প্রতি অসম্মান দেখিয়ে কোনো নারী যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করে তবে সে পতিতা হবে। ক্রুদ্ধ প্রদ্বেষীর নির্দেশে তার পুত্রেরা দীর্ঘতমাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। তিনি ভাসতে ভাসতে বলিরাজের কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি প্রথমে সুদেষ্ণা প্রেরিত ধাত্রীকন্যার গর্ভে ১১ জন ঋষির জন্ম দেন এবং পরে সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ প্রমুখের জন্ম দেন। দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গদেশের অধিপতি করেছিলেন। (পৌ.অ.)। অঙ্গী, দেহী, দেশবিশেষ। হরকোপানলে দগ্ধ মদন এই স্থানে অঙ্গ ত্যাগ করেন। মতান্তরে অঙ্গের রাজ্য বলিয়া অঙ্গ নামে খ্যাত। ইহা গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। পূর্বে লোমপাদ এই দেশের রাজা ছিলেন। ইহার রাজধানী 'চম্পা', 'লোমপাদপুরী', 'কর্ণপুরী', 'অঙ্গপুরী', ও 'মালিনী'। (ব.শ.)। **৪.** শরীর, গাত্র, দেহ ইত্যাদি। বিহার প্রদেশকে এখনও কেউ কেউ অঙ্গ বলে থাকেন, তবে সেটা সাধারণত বলা হয় 'বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা'র পরিবর্তে 'অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ' এইভাবে, একত্রে। **৫.** দ্র. **বঙ্গ, চম্পকনগর**। তেজ তার নিজস্ব রক্ষণ ও বিকাশের জন্য যে স্বাভাবিক আকার গ্রহণ করে সেটিই তার **অঙ্গ**। সেই সুবাদে, জাতির স্বাভাবিক উত্তরাধিকার যে সামাজিক পরিকাঠামো ধারণ করতে পারে, তেমন পরিকাঠামো গড়ে নিয়ে সেভাবে যে চলে, সে দেশই **অঙ্গ** দেশ। ভারতের বিহারকে সেকালে সেকারণেই অঙ্গদেশ বলা হয়ে থাকবে। মহাভারতে এই দেশের 'সেকেলেপনা'র জন্য অনেক কটুকথা ও নিন্দাবাদ আছে।

সম্ভবত সেই বিহারেই সর্বপ্রথম কর্মীজনগণের কর্মপ্রেম (মদন) ভস্ম করে, 'আসবে, কাজ করবে, দাম নেবে, চলে যাবে, উৎপন্নের কী হল না-হল ভাবতে হবে না, সেকথা ভাববে যে কাজের দাম দিচ্ছে সে', এই নীতি ঘোষিত হয়। স্মর্তব্য যে, দক্ষের জন্মস্থান বিহারের লাগোয়া '**কনখল**' নামক স্থানে, যা এখন উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। অযোধ্যাও এই উত্তরপ্রদেশেই। পরবর্তীকালে, জমিতে ট্যাক্স প্রচলিত হবার পর ভারতের পূর্বাংশকে পাঁচটি প্রদেশে (**অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-পুণ্ড্র-সুহ্ম**) ভাগ করা হয়। এই পাঁচটি প্রদেশের শাসনব্যবস্থার জন্ম হয় ট্যাক্স-ব্যবস্থার আধাররূপী জনগোষ্ঠীর (**সুদেষ্ণার**) ভিতর থেকে এবং পূর্ববর্তী দীর্ঘসূত্রী অন্ধ ক্লেদাক্ত সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) ব্যবস্থার (**দীর্ঘতমার**) ক্ষয়িষ্ণু তাত্ত্বিক ভিত্তিতে (ঔরসে)। মানুষের ইতিহাসে চিনির আবিষ্কার ঘটিয়েছিলেন এই অঞ্চলের অধিবাসীরাই (প্রায় ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে, যখন কিনা ইয়োরোপ তা করতে শিখেছিল ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে)। দ্র. **বঙ্গ, কলিঙ্গ**। **৬.** on-go।

অঙ্গদ : ১. অঙ্গ + ✓দো (অবখণ্ডন) + অ (ক) - ক। ২. *যিনি অঙ্গ (কোন সমাজশরীরকে নতুন শরীর) দেন*। / যিনি যুদ্ধে শত্রুকে অবখণ্ডিত করেন; যাহা প্রগণ্ডরূপ অঙ্গ শোধন করে। (ব.শ.)। **৩.** (ক) কিষ্কিন্ধ্যার বানর-রাজ বালির ঔরসে ও তারার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। সুগ্রীবের রাজত্বকালে ইনি যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হন। বানরসেনার অধিনায়ক রূপে ইনি রামের সপক্ষে যুদ্ধ করেন। সুগ্রীবের মৃত্যুর পর ইনি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হন। (খ) লক্ষ্মণের পুত্র এবং হিমালয়ের নিকট আঙ্গদীর রাজা। (গ) গদ ও বৃহতীর পুত্র। (পৌ.অ.)। কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীর পুত্র ইত্যাদি। ইনি বৃহস্পতির অবতার এবং বাকপটু ছিলেন। বাহুভূষণবিশেষ, বলয়, কেয়ুর। (ব.শ.)। **৪.** বর্তমানে কেবল বাহুভূষণবিশেষ রূপে অঙ্গদ শব্দের প্রচলন আছে। **৫.** ক্ষমতাসীন আমলা (**বালী**) ও কেরানিশ্রেণীর (**তারার**) মিলনে এঁদের জন্ম। সম্ভবত এরা কেরানি-শিক্ষানবিশ, ক্লারিক্যাল-অ্যাপ্রেনটিস। বিরুদ্ধমতের আমলা (**সুগ্রীব**) ক্ষমতাসীন হলে এই অ্যাপ্রেনটিসদের মর্যাদা বাড়ে। এরা লঙ্কাকাণ্ডে (ভারতের বুকে পৃথিবীর আদি শিল্পবিপ্লবকালে ক্ষমতার কেন্দ্র ধ্বংস করার কর্মকাণ্ডে) রামের (নগদ-নারায়ণ-পুঁজির ও তার ধারক জনগোষ্ঠীর) সহায়ক ছিল।

অঙ্গার : ১. অঙ্গার + অ; ✓অঙ্ + আর (আরন্) - ক। (ব.শ.)। ২. *অম্ গমন রহিত হয়ে রয়েছে যাতে*। / যাহা মলিনত্ব প্রাপ্ত হয়। (ব.শ.)। **৩.** অলাত, উল্মুক, আঙরা, কয়লা। মালিন্যজনক, কলঙ্ককর, অধম। মঙ্গলগ্রহ। ... (ব.শ.)। **৪.** আঙরা অর্থে প্রচলিত। **৫.** তেজের আধার মানুষও। কিন্তু যে একসময় জ্ঞানের অগ্নিশিখা বহন করত, জ্ঞানকর্মের যোগসাধন করে কর্মযজ্ঞের অগ্নিহোত্র করত, সে যখন সেই কাজ ত্যাগ করে, এবং যখন তার আগুন নিভে যায়, তখন সে **অঙ্গার**। **শিখা** নিভে যাওয়া সত্ত্বেও এরকম আগুন যে সত্তার ভিতরে থেকে যায়, তাকে অঙ্গিরস বা অঙ্গিরাঃ বলে। তার সাহায্যে পুনরায় আগুন জ্বালিয়ে নেওয়া যায়। **৬.** anger, angary, hunger।

অঙ্গারপর্ণ : ১. অঙ্গার, পৃ = পরিপূরণ। ২. *যে পাতায় অঙ্গার আছে; যাহার পাতায় অঙ্গার আছে*। **৩.** কুবেরের সখা ও গন্ধর্বরাজ। অন্যনাম চিত্ররথ ও দগ্ধরথ। ইনি অর্জুনকে চাক্ষুষীবিদ্যা দান করেন। (পৌ.অ.)। 'অঙ্গারপর্ণ' নামক বনের স্বামী চিত্ররথ গন্ধর্ব। (ব.শ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** কারেন্সি নোট বা তত্তুল্য কাগজের পাতা বা অন্য কোনো পাতা, সম্পদ-ধারক ডকুমেন্টকে 'অঙ্গারপর্ণ' বলা যায়; যে

পাতায় আগুন আছে। **অর্জ্জুন** (= সাদা টাকার মালিক) এই পাতায় তার অর্জ্জিত বিত্ত (white money)-র মূল্য চাক্ষুষ করতে পারে।

অঙ্গিরা : ১. অঙ্গ, ইরা। ২. *অঙ্গার গতিশীল রহে যাহাতে*। ৩. ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং তাঁরই মুখ হতে নিঃসৃত। ইনি কর্দ্দম ঋষির কন্যা শ্রদ্ধাকে বিবাহ করেন। এঁর দুই পুত্রের নাম উতথ্য ও বৃহস্পতি। মতান্তরে, দক্ষের কন্যা স্মৃতিকে ইনি বিবাহ করেন। সপ্তর্ষি ও দশজন প্রজাপতির মধ্যে ইনি একজন। ইনি ঋগ্বেদের বহু শ্লোকের রচয়িতা। (পৌ.অ.)। (ক) প্রজাপতি আত্মশুক্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, অগ্নিজ্বালা হইতে ভৃগু এবং জ্বালাহীন অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা উৎপন্ন হন। (খ) অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মার ক্ষরিত শুক্র হইতে অঙ্গিরার জন্ম হয়। (গ) অঙ্গিরা অগ্নির পুত্র ও বৃহস্পতির পিতা। (ঘ) অঙ্গিরা দশ প্রজাপতির একতম, কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মা ইঁহার সৃষ্টি করেন। হবিষ্মন্ত ইঁহার সন্তানগণ। (ঙ) ব্রহ্মার মুখ হইতে অঙ্গিরা নির্গত হন, ইনি ব্রহ্মার দশ পুত্রের একতম। কর্দ্দমসুতা শ্রদ্ধা ইহার পত্নী, উতথ্য ইঁহার পুত্র এবং সিনিবালী রাকা কুহূ অনুমতি ইঁহার কন্যা। ইনি মনুপ্রভৃতি সংহিতাকারের অন্যতম, অঙ্গিরঃ-সংহিতা ইঁহার স্মৃতি। ইনি জ্যোতিষগ্রন্থেরও প্রণেতা। ইঁহার গোত্র, কেবলাঙ্গিরস গৌতমাঙ্গিরস ও ভরদ্বাজাঙ্গিরস — এই তিন শাখায় বিভক্ত। অগ্নি তপস্যায় নিরত হইলে অঙ্গিরাই অগ্নি হইয়াছিলেন। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. উপরোক্ত বর্ণনাগুলি থেকে বোঝা যায়, ঘটনা একটাই, কিন্তু নানা সময়ে নানা জনে তা নানা ভাবে ব্যক্ত করেছেন। ঘটনাটি হল ভারতে জ্ঞানজীবীদের, বিশেষত যাঁরা শিক্ষকতা করেন, বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে উপদেশদাতার ভূমিকা পালন করেন, তাদের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল কীভাবে, তার বর্ণনা। সমাজদেহ মানবদেহ জীবদেহ জড়দেহ — যে দেহতত্ত্বই হোক না কেন, তা আসলে অঙ্গতত্ত্ব এবং সে তত্ত্ব যাঁরা ধারণ করে রাখতেন তাঁদের বলা হত **অঙ্গিরা**। সাধারণত যাঁরা কর্মযজ্ঞে সরাসরি যুক্ত তাঁদের বলা হত সাগ্নিক, জ্ঞানের অগ্নিশিখা বহনকারী, তত্ত্ব ও প্রয়োগের যোগসাধনকারী যোগী, আর যোগীশ্রেষ্ঠদের বলা হত শিব। সেকালের জ্ঞানকর্মের অগ্নিশিখাধারী ব্রাহ্মণেরা এই মহত্তম ভূমিকা পালন করতেন। কিন্তু কর্মযজ্ঞ থেকে অবসর নিলে অগ্নির আর শিখা থাকে না, তারা অঙ্গারে পরিণত হয়। তবে যতক্ষণ আগুন ভিতরে থাকে, ততক্ষণ অঙ্গির। তার ছাত্রকে বলে অঙ্গিরা। দক্ষযজ্ঞের পর অগ্নিরূপী শিবেরা যতি ধর্ম গ্রহণ করলে অঙ্গিরাই কর্মযজ্ঞের দায় নেন। বলতে গেলে এখনও শিবহীন যজ্ঞের এই ধারা কমবেশি চলছে।

অঙ্গিরসগণ : ২. অঙ্গিরার গোত্রাপত্যগণ। ৪. অপ্র.। ৫. অঙ্গিরার শিষ্য বা ছাত্রগণ।

অঙ্গীকার, অঙ্গীভূত : ১. অঙ্গী + ✓কৃ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহার দ্বারা অঙ্গী (অঙ্গধারী, কোনো কিছু) স্বীকার (স্ব-অধিকারভুক্ত) করে; অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় যাহাতে*। ৩. স্বীকার, গ্রহণ, ধারণ। প্রতিশ্রুতি। অবয়বীভূত, অঙ্গস্বরূপ। (ব.শ.)। ৪. যথাক্রমে স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তি অর্থে প্রচলিত। ৫. অঙ্গের অর্ন্তভুক্ত করার মানে হল, শরীরের ভেতরে নেওয়া, ঘরের মধ্যে নেওয়া, দলের মধ্যে নেওয়া, দেশের মধ্যে নেওয়া ইত্যাদি। মোট কথা যাকে যাকে অঙ্গ বলা হয়, তাদের ভেতরে কোনো কিছু গ্রহণ করাই হল **অঙ্গীকার**। সে কাজটি হয়ে গেলে, যাকে অঙ্গীকার করা হল, সে হয়ে যায় **অঙ্গীভূত**।

অঙ্গুল, অঙ্গুলি, অঙ্গুলী : ১. ✓অঙ্গ্ + উলি - ক। ২. *যে-অঙ্গ (বা অঙ্গের অংশ কোনো কিছু) লইতে যায়*। / যাহা গ্রহণার্থ যায়। (ব.শ.)। ৩. হস্তপদ-শাখা। বাৎস্যায়ন মুনি। ... (ব.শ.)। ৪. আঙুল অর্থে প্রচলিত। ৫. সমাজশরীরের যে অঙ্গ (কালেক্টর) ট্যাক্স ইত্যাদি গ্রহণ করতে যায়, তারাও **অঙ্গুলি**। হাতের আঙুল থাকে। সেকালে সমাজের হাতকে **হস্তী**ও বলা হত। এরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজস্ব ইত্যাদি বিভাগের আমলা বা দিক রক্ষাকারী হস্তী। দ্রষ্টব্য **অষ্টদিগগজ**। এদের দ্বারা নিযুক্ত কেরানি বা তৎসমতুল কর্মচারীরা কর আদায় ইত্যাদি করতেন। তাই করতে গিয়ে এরা অনেক ধনরত্নের মালিক হয়ে যেত। তখন **আমলাটি** সম্পর্কে বলা হত, লোকটি তো ফুলে ফেঁপে গেছেই, এমনকি তার এখন 'আঙুল ফুলে কলাগাছ'। 'আঙুল বাঁকিয়ে ঘি তোলা' মানে এই কর্মচারীদের মাধ্যমে ধমকে, মেরে-ধরে আদায় করা। নিরুক্ত অঙ্গুলীর যে সাত রকম ক্রিয়ার কথা বলেছেন (পৃষ্ঠা ৩৭৩-৩৭৪) তা সবই এই সব ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। দ্র. **হস্ত**। ৬. ইংরেজি angel, angle, Angle, Angul, গ্রীক angelos, ল্যাটিন angelus।

অঙ্ঘঃ, অঙ্ঘস্ : ১. ✓অঙ্ঘ্ + অস্ (অসুন্) - ণ। (ব.শ.)। ২. *তেজের রহস্যরূপ ঘোরে যাহাতে*। / যাহা দ্বারা নরকে যায়। (ব.শ.)। ৩. পাপ। ৪. অপ্র.। ৫. যা করলে সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়ে নিষ্কর্মা হয়ে বেকার হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হত, তাই অঙ্ঘ্ করা। কিংবা, যা বানালে তা মাথায় নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে বিক্রির জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হত, তাই **অঙ্ঘ** করা। সেকালের চোখে এ হল নরকগামিতার সমান।

অঙ্ঘ্রি : ১. ✓অঙ্ঘ্ + রি (ক্রিন্) - ণ। (ব.শ.)। ২. *যার দ্বারা (সংসারযাত্রা) চলে*। / যাহা দ্বারা যায়। (ব.শ.)। ৩. পাদ, চরণ। বৃক্ষমূল, শিকড়। ... (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সেকালে ভারতসমাজ যাকে পাপকাজ বলত (যথা পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়) এবং তাই করে যারা দিন কাটাত, সেই অঙ্ঘ্ ক্রিয়া থেকেই অঙ্ঘ্রি শব্দটি প্রসূত। কিন্তু সেই করেই তো সংসারযাত্রা চলত! তাই সেই কাজই ছিল কিছু জনগোষ্ঠীর পা বা চরণ, যার দ্বারা তারা চলতে পারত।

অঙ্ঘ্রিজা : ১. অঙ্ঘ্রি + ✓জন্ + অ (ড) - ক + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *অঙ্ঘ্রি (পা বা পাপকাজ) হইতে জন্ম যাহার*। / পাদ হইতে জাতা। (ব.শ.)। ৩. বিষ্ণুপদজাতা গঙ্গা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এইখানে পৌঁছে প্রতীকী শব্দার্থবিধিতে অভ্যস্ত আমাদের মন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না, যে গঙ্গা সর্বপাপবিনাশিনী, সেই গঙ্গার জন্ম কিভাবে পাপকাজ থেকে হয়? তাছাড়া, বিষ্ণুর পা কি

পাপকর্মকারী? না, আদৌ তা নয়। শব্দার্থের, উৎপাদনের, সমাজের, এবং বিভিন্ন যুগের মানুষের মনের ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ধারা যেভাবে পরস্পরের সমান্তরালে চলে, সেই সমান্তরাল ধারাটিকে না বুঝতে পারলে এই সমস্যা দেখা দেয়। আমরা 'পাপ' শব্দের অর্থ সেকালের মতো 'পালকের পালয়িতা' না বুঝে একালের স্বভাব মতো sin বুঝে ফেলি; ফল হয় এই যে, একালে বসে একালের চোখে একালের প্রেক্ষিতে সেকালকে বোঝার অপচেষ্টা নিজের অজান্তেই হয়ে যায়। তাই কোনো কিছুই আর ঠিকঠাক মেলে না, সব পরস্পরবিরোধী হয়ে জড়িয়ে যায়। তাছাড়া, বিষ্ণুর পা কেন গলে গিয়ে গঙ্গায় পরিণত হয়েছিল, সে তথ্য ও তত্ত্বও তো আমাদের মনে নেই! তো, এসব বিষয়ে ভুল বোঝার হাত থেকে বাঁচা বেশ মুশকিল। অতএব, যে ঘটনা যেকালে ঘটেছিল, যে ভাষায় সেই ঘটনা বলা হয়েছিল, সেই ভাষাবোধের মন নিয়ে সেকালের প্রেক্ষিতে তাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই দেখা যাবে, কোনো অসঙ্গতি কোথাও নেই। বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে রবি চক্রবর্তীর 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা' নিবন্ধ থেকে, যা প্রকাশিত হয়েছে (খ) গ্রন্থে।

অনঙ্গ : ১. ন অঙ্গ। ২. *নেই অঙ্গ যাহার*। ৩. কাম (বা মদন) পূর্বে শরীরী ছিলেন। সমাধিমগ্ন শিবের শরীরে স্মরবিকার উৎপাদন করিয়া হরকোপানলে ভস্মীভূত এবং তদবধি 'অনঙ্গ' নামে অভিহিত হন। আকাশ। মানস। অঙ্গ নেই এমন বস্তু। (ব.শ.)। ৪. নামরূপে এখনও প্রচলিত। ৫. কামনা করা কোনো অপরাধ ছিল না। যারা কামনা করত, কাম সেই সকল শরীরে বাস করত। তখন **কাম** দিত, কামই নিত। রামের শরীরে থেকে কাম চাইত শ্যামের গরুটা, শ্যামের শরীরে থেকে কাম রামের ঘোড়াটা চাইত। আমরা বলতাম রাম আর শ্যাম গরু-ঘোড়া বিনিময় করল। কিন্তু একসময় কামনা করা নিষিদ্ধ হয়। যারা কাম প্রকাশ করেছিল, তাদের চরম নিন্দা (ভস্ = নিন্দা) করা হয়। (**মদনভস্ম** দ্রষ্টব্য)। তারপর থেকে ভারতবর্ষে কেউই আর তার কাম প্রকাশ্যে জাহির করে না। তাই এমন মানুষ ভূভারতে নাই, যে বলে সে কামুক। ফলে, কাম অশরীরী হয়েই থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে কাম তাই অনঙ্গ।

আঙ্গিরস : ২. দ্র. **অঙ্গিরা**। ৩. অঙ্গিরাসম্বন্ধী, অঙ্গিরোবংশীয়। অঙ্গিরা কর্তৃক কৃত ও ব্যাখ্যাত। ... অঙ্গিরার অপত্য — পুত্র পৌত্রাদি। অঙ্গিরঃপুত্র বৃহস্পতি। বৃহস্পতিগ্রহ। অথর্ব্ববেদের সূক্তবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **অঙ্গিরা**।

আঙ্গিরসগণ : ২. অঙ্গিরার অপত্য, পুত্র, পৌত্রাদি। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. অঙ্গিরার ছাত্রের ছাত্রগণ, তস্য ছাত্রগণ, এবং এভাবে ক্রমান্বয় পরম্পরাগত ছাত্রগণ। এর ফলে জেরক্সের জেরক্সের জেরক্সের ... জেরক্স হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী আঙ্গিরসগণের বিদ্যা অপাঠ্য, অকার্যকরী, অনর্থক হয়ে যায়।

'অঞ্চ্' (অন্‌চ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা: অঞ্চ্, অঞ্চ, অঞ্চল, অঞ্চলপ্রভাব, অঞ্চিত, অর্ব্বাক, অর্ব্বাককাল, অর্ব্বাককালিক, অর্ব্বাককূল, অর্ব্বাকতন, অর্ব্বাকস্রোতাঃ, অর্ব্বাচীন, আঁচ, আঁচল, আঁচা, আঁচাআঁচি, আঁচি, আঁচিল, আঁচীল-পাঁচীল, উদক, উদকদান, উদঙ্ক, উদচ, উদঞ্চ ন, উদীচী, তির্য্যক, প্রাক, প্রাক্কাল, প্রাক্তন, প্রাগ্জ্যোতিষ, প্রাগুক্ত, প্রাঙ্মুখ, প্রাচ, প্রাচী, প্রাচীন, প্রাচীনবর্হিঃ, প্রাচ্য, সম্যক, রোমাঞ্চ, সম্যগদৃষ্টি।

অঞ্চ্ (অন্‌চ্) = অং-এর (অস্তিত্বের রহস্যরূপের) চ্-অন (চয়ন-চরণ-চলন ইত্যাদি); অন্-এর চ্-অন যাহাতে। **অঞ্চ** = সত্তা চয়ন-চরণ-চলনাদি করে যাহাতে। (br-anch)।

অঞ্চ্ (অন্‌চ্) : দ্র. **অঙ্ক্**। ৫. অস্তিত্বের রহস্যরূপের চ্-অন (চয়ন)। চ্ হল চক্ষণ, চরণ, চলন, চিন্তন প্রভৃতি সর্ব প্রকারের চ্-অনের পুঞ্জীভূত অব্যক্ত রূপ। অস্তিত্ব অন্ হয়ে নিজের তিন-দিগন্তিক (থ্রি-ডাইমেনশনাল) পরিধি (বন্যপশুর ক্ষেত্রে সে যতদূর পর্যন্ত চরে বেড়ায়, মানুষের ক্ষেত্রে সে যতদূর পর্যন্ত মানসিক ও শারীরিক ভাবে ঘোরাঘুরি করে) পর্যন্ত এগিয়ে যায়, সেটিই তার অন্‌চ্-করা। অর্থাৎ *অস্তিত্বের রহস্যরূপের চ-অন রহে যাহাতে*, তাকে অঞ্চ্ বলে। একালে এই ক্রিয়াকে লোকে 'আঁচ-করা' বলে থাকেন।

অঞ্চ : ১. ✓অঞ্চ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অং-এর (অস্তিত্বের রহস্যরূপের) চ্-অন (চয়ন-চরণ-চলন ইত্যাদি) যাহাতে।* ৩. উদ্গম, ঊর্দ্ধগমন, শিখা, আভা, আঁচ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পৃথকভাবে আজ আর শব্দটির প্রচলন নেই, রয়েছে 'আঁচ' রূপে। যুক্তভাবেও রয়েছে, যেমন রোমাঞ্চ (রোম + অঞ্চ)। দ্র. **আঁচ, রোমাঞ্চ**। ৬. ইংরেজি (rom)ance, (fin)ance, (reson)ance, (br)anch, (perform)ance, (domin)ance, ... ইত্যাদি।

অঞ্চল : ১. ✓অঞ্চ্ + অল (অলচ্) - ক। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের চ্-অন (আঁচ) যে-পর্যন্ত গিয়ে তার পরিধিতে লয় প্রাপ্ত হয়।* / যাহা প্রান্ত প্রাপ্ত হয়। (ব.শ.)। ৩. বস্ত্রান্ত, আঁচল, দেশ, প্রদেশ, ভূভাগ। (ব.শ.)। ৪. এলাকা অর্থে প্রচলিত। ৫. অস্তিত্ব যে-পর্যন্ত ঘোরাফেরা করে, সেই পর্যন্ত তার বৃত্তের (বা আবর্ত্তন-কর্মময় অস্তিত্বের পরিধি বা) শেষ সীমা। সেই সীমার পরিধির বাইরে থেকে দেখলে, এই অঞ্চ হল আঁচ, যা শিখা বা আভা রূপে নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে তাপ প্রকটনে সক্রিয় থাকে। একজন স্ত্রীলোকের অস্তিত্বের শেষ সীমা হল তার আঁচল, যেখানে ধরতে পারলে তার 'অঞ্চল' বা বস্ত্রান্তে টান পড়ে। একজন রাজা বা জমিদারের অস্তিত্বের শেষ সীমা হল তার রাজ্যের প্রান্তসীমা। সেখানে হাত দিলে রাজার অঞ্চলে হাত পড়ে। রাঢ়-অঞ্চল কথাটির মানে তাই রাঢ়গণের অস্তিত্ব যে পর্যন্ত প্রসারিত রয়েছে। অর্থাৎ কেন্দ্রে একটি সক্রিয় অস্তিত্ব রয়েছে, তার সক্রিয়তার এলাকা যে পর্যন্ত বিস্তৃত সেই পর্যন্ত তার অঞ্চল। গ্রামাঞ্চল, বনাঞ্চল, শহরাঞ্চল, অঞ্চলপ্রধান প্রভৃতি শব্দগুলি এরই নানাপ্রকার সিদ্ধ-অসিদ্ধ প্রয়োগ।

অঞ্চিত : ১. ✓অঞ্চ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে; স্ত্রীলিঙ্গে অঞ্চিতা। (ব.শ.)। ২. **অঞ্চ** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* ৩. পূজিত, অর্চ্চিত, সম্মানিত, চারু, সুন্দর, শোভন, আকুঞ্চিত, বক্রীকৃত, গত, ব্যাপ্ত, গুম্ফিত, গ্রথিত। (ব.শ.)। ৪. স্ত্রীলোকের নাম রূপে (অঞ্চিতা) কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. যে-অস্তিত্বের অন্-চঅন তার সর্বোচ্চ পৌঁছেছে, সে অঞ্চিত পদবাচ্য। কিন্তু এ হল তাকে তার ভেতর থেকে দেখা। যদি তাকে বাইরের কোনো সত্তা দেখে, তবে সেই 'অঞ্চিত'-কে পূজিত, অর্চ্চিত ... ইত্যাদি বলা হয়।

অর্ব্বাক : ১. অবর + ✓অঞ্চ + কিন্ (০) - ক। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের যে-গতিবাহকেরা সর্বাগ্রে আছে।* ৩. অবরকালগত, পরবর্ত্তী, অবরকালে, পরে, মধ্যকালে, পূর্ব্বে (কালে, দেশে), সমীপে, নিকটে, বিপর্যস্ত, অধোগামী। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. অস্তিত্বের গতিশীলতা বহনকারী সত্তাকে বলা হয় অর্ব্বা। অর্ব্বা যখন অন্চ্ করে তখন তাকে বলা হয় অর্ব্বাচ্ বা অর্ব্বাক্। ক্ ও চ্-এর পরস্পরে স্থানবদল ইংরেজি বাংলা উভয়ের উত্তরাধিকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা 'অর্ব্বাচ্'কে ঠিকঠাক চিনতে পারি না, পারি যখন সেই 'অর্ব্বাচ্'-এর থেকে জনিত হয়ে একটি সত্তা দেখা দেয় 'অর্ব্বাচীন' রূপে। অর্ব্বাচীনেরাই প্রাচীনের উত্তরাধিকার বহন করে। তাই, তাদেরকে পূর্ব্বতন সত্তার 'ধর্ম্মাদিত্রিবর্গনিরত' 'অর্ব্বাকস্রোতাঃ' বলে। (অবর শব্দটির মূল সম্ভবত 'অবতর', বলেছেন বঙ্গীয় শব্দকোষকার এবং শব্দটির অর্থ দিয়েছেন 'অশ্রেষ্ঠ'। আর অন্চ্ ক্রিয়াটির কোনো অর্থ তিনি দেননি। মনে হয় 'অবর' শব্দটির অর্থ হবে 'অবরণীয়'। কিন্তু শব্দটিকে অন্যভাবেও ভাঙা যেতে পারত — ঋ + বাচ্ বা বাক্ = অর্ব্বাচ্ বা অর্ব্বাক্। সেক্ষেত্রে এর মানে দাঁড়ায় 'গতিশীল কথা বলা' বা 'নতুন কথা বলা', যদিও প্রাচীনদের চোখে সেটা 'অর্ব্বাচীন' কথা।) ৬. অর্ব্ব - orb, বাচ্ - bachelor, batch।

অর্ব্বাকতন : ৫. পুরাতন-এর বিপরীত অর্ব্বাকতন। এখন তার বদলে কেবল 'নূতন' বা 'নতুন' প্রচলিত। নূতন-এর নূ আর new একই কথা। দ্র. **তন, নূতন**।

অর্ব্বাকস্রোতাঃ : দ্র. **অর্ব্বাক, স্রোতঃ**। ২. *যে স্রোত (প্রচলিতের চোখে) অর্ব্বাচীন বা নিকৃষ্ট হয়।* ৩. ধর্ম্মাদিত্রিবর্গনিরত, ইন্দ্রিয়প্রসক্ত। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. প্রচলিত স্রোতধারার থেকে বেরোনো নতুন ধারা, প্রচলিতের চোখে যা নিন্দিত বা নিকৃষ্ট ধারা। পরের যুগের ব্যক্তিমালিকানাবাদী মানুষদের সম্পর্কে এইরূপ শব্দ পুরাণাদিতে রয়েছে। কেবল তাই নয়, যৌথমানবসমাজের নিজস্ব উৎপাদন-বণ্টনের যে স্বাভাবিক ধারা সেকালে প্রচলিত ছিল, তার পাশাপাশি এবং তার থেকে যে ব্যক্তিগত পণ্যের ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করল, তাও হয়ে গেল অর্ব্বাকস্রোত। যে জনগোষ্ঠীগুলি সেই অর্ব্বাকস্রোতের ধারক (ক্রেতা-বিক্রেতা) হয়ে উঠল, তারা হয়ে গেল অর্ব্বাকস্রোতাঃ। দ্র. **অর্ব্বা, গন্ধর্ব্ব**।

অর্ব্বাচীন : দ্র. **অর্ব্বাক**।

আঁচ : ৫. দ্র. **অঞ্চ, অঞ্চ**। বঙ্গীয় শব্দকোষ জানিয়েছেন, অর্চ্চিঃ শব্দই কালপ্রবাহে আঁচ-এ পরিণত হয়েছে। হতে পারে। উনুন অর্থে কেউ কেউ আঁচ শব্দের ব্যবহার করে থাকেন। 'আগুন ফেলে আঁচ' কথাটি সেভাবেই ব্যবহৃত। কিন্তু প্রকৃত প্রয়োগে উনুনের তাপকেই আঁচ বলা হয়ে থাকে। সেই তাপ যে পর্যন্ত এসে গায়ে লাগে, আঁচ-এর এলাকা ততদূর। সেই সুবাদে অঞ্চ-ই আঁচ হয়েছে বলে মনে হয়। এর পক্ষে সাক্ষী হয়ে দেখা দেয় 'আন্দাজ' অর্থে 'আঁচ' শব্দের ব্যবহার। মন যতদূর আঁচ বা 'অঞ্চ' করতে পারে, মনের 'অঞ্চল' ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

আঁচল : দ্র. **অঞ্চল**।

আঁচা : ৫. আঁচ-ক্রিয়া চালানকে আঁচান বা আঁচা বলে। এ-কাজ সামান্য ছিপ দিয়ে যেমন করা যেতে পারে, তেমনি সরকার বা রাজা তাঁর পুলিশ কিংবা সৈন্যবাহিনী দিয়ে অথবা চর পাঠিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত 'আঁচা'তে পারেন। আবার, কেউ খেতে ডাকলে, খেয়ে হাত ধোয়া পর্যন্ত 'অঞ্চ' বা অন্চ্ সক্রিয় থাকে। তাই, 'না আঁচালে বিশ্বাস' করা কঠিন হয় কারো কারো ক্ষেত্রে। কিন্তু বঙ্গীয় শব্দকোষ বলেছেন, এই আঁচা আসলে 'আচমন' শব্দের একটি রূপ। হতে পারে। তবে আমাদের মনে হয়েছে, 'আঁচান' আসলে 'অঞ্চ' পরিবারেরই সদস্য, 'চম্' পরিবারের নয়। সিদ্ধান্তের সুযোগ থাক উত্তরসূরিদের হাতে। দ্র. **আচমন, আঁচাআঁচি**। (কথাটি আঁচড়, আঁচর প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; এরাও যথাক্রমে চট্ ও চর্ পরিবারের সদস্য নয় এবং 'অঞ্চ' পরিবারের সদস্য বলেই মনে হয়।)।

আঁচাআঁচি : দ্র. **কচাকচি** (শব্দের পুরুষ-প্রকৃতি)।

আঁচি : ২. *অঞ্চ-এর বিকাশন থাকে যাহাতে।* ৩. নারিকেলের কঠিন আবরণ, আঁচিঘর। (ব.শ.)। ৫. নারিকেলের অঞ্চ তার খোল পর্যন্ত প্রসারিত, তাই তাকে আঁচি বলাই যথার্থ। আর গৃহস্থের বংশের অগ্রগতি বা 'অঞ্চ' ঘটে প্রসবঘরে, সেই সুবাদে তাকে 'আঁচিঘর' বলা যেতেই পারে। তবে 'আঁচিঘর' বানানটি ঠিক থাকলেও নারকেলের 'আঁচী' বানানটিই যথার্থ হবে বলে মনে হয়।

আঁচিল : ৫. শরীরের ভেতর থেকে দেখলে, আঁচিলেই তার অঞ্চ লয় প্রাপ্ত হয়। সেই হিসেবে ফোঁড়া-জাতীয় যে-কোনো দৈহিক স্ফীতিকে আঁচিল বলা যায়। তবে বানানটি 'আঁচীল' হলেই যথার্থ হবে বলে মনে হয়।

আঁচীল-পাঁচীল : ৫. সমস্ত স্ফীত, বিস্তৃত বা প্রসারিত অংশ নিয়ে গৃহের যে অংশ, তাকে আঁচীল এবং তাদের পালনকারী বহিঃপ্রাঙ্গণ ঘিরে যে আঁচীল তাকে পাঁচীল বলে। অর্থাৎ পাঁচীল ও প্রাচীরে ভেদ নেই, যদিও শব্দ দুটি ভিন্ন দুটি পরিবারের সদস্য। তবে, প্রচলিত অভিধান ও শব্দকোষগুলিতে 'অনুশব্দ' নামে শব্দের যে একটি অসম্ভব প্রজাতির কথা বলা হয়েছে (আঁচীলকে যেমন 'অনুশব্দ' বলা হয়েছে কোনো কোনো অভিধানে), সেটি ত্রুটিপূর্ণ বলেই আমাদের মনে হয়। অর্থহীন সেরকম কোনো 'অনুশব্দ' শব্দ হয় না।

উদক (উদচ্) : ১. উদ্ + ✓অন্চ্ + ক্বিন্ (০) - ক। (ব.শ.)। ২. *উত্তীর্ণ আঁচ যেদিকে যায়।* ৩. উর্দ্ধগত, উর্দ্ধগামী, উত্তর, উত্তরাভিমুখ, উত্তরদেশ, উত্তরকাল, উত্তরদিক্‌সম্বন্ধী, অনন্তর, পরবর্ত্তী। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। দ্র. **উদ্**।

উদীচী : ২. *উদচ্-এর আধার যে।* ৩. উত্তর দিক। (ব.শ.)।

তির্য্যক : ১. তিরস্ + ✓অন্চ্ + ক্বিন্ (০) - ক। (ব.শ.)। ৫. আঁচ সোজা না গিয়ে প্রোত দিকে চললে, তাকে তির্য্যক বলে। কিন্তু তির্য্যক কী বুঝতে হলে আমাদের জানতে হয় 'ওতপ্রোত'-এর কথা। দ্র. তৃ, **ওতপ্রোত**।

প্রাক্ (প্রাচ্) : ১. প্র + ✓অন্চ্ + ক্বিন্ (০) - ক। (ব.শ.)। ২. *প্রকৃষ্ট অন্চ্ করা থাকে যাহাতে।* ৩. পূর্ব্ব — দিক, দেশ, কাল। (ব.শ.)। ৫. প্রাক্ + তন। পূর্ব্বতন আঁচ থাকে যে স্থান-কাল-পাত্রে, তাদের প্রত্যেককে 'প্রাক্' বলা হয়। সেই হেতু শব্দটি পূর্ব্বদেশ, পূর্ব্বকাল, পূর্ব্বদিক বা পূর্ব্বপুরুষকে বোঝাতে পারে। দ্র. **প্র**। ৬. prac(tice)। পূর্ব্বকাল থেকে যে কর্মরীতি চলে আসছে।

প্রাক্তন : ৫. তন শব্দের যোগে পুরাতন, পূর্ব্বতন, অর্ব্বাকতন, নূতন, প্রাক্তন প্রভৃতি শব্দগুলি প্রসূত হয়েছে। দ্র. **তন**, **প্রাক্**।

প্রাগজ্যোতিষ, প্রাগজ্যোতিষপুর : ৩. পূর্ব্বে ব্রহ্মা যে স্থানে থাকিয়া নক্ষত্র সৃষ্টি করেন (কালিকাপুরাণ); কামরূপ, প্রাগজ্যোতিষরাজ, কামরূপবাসীগণ, (রামায়ণে, ইহার প্রতিষ্ঠাপক অমূর্ত্তরজাঃ; ভাগবতে ইহা নরকাসুরের পুরী।)। ৪. অপ্র.। ৫. জ্যোতিষ শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ — 'যাতে তেজ-জনকদের সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আছে'। তেজ জনন করে দু-দল নক্ষত্র, এক দল থাকে বাস্তবের আকাশে, আর এক দল থাকে মনোলোকের আকাশে (আজকাল তাদের ঝিলিক-দারগুলিকে মিনি-স্টার, ফিল্ম-স্টার ইত্যাদি বলা হয়)।... এই সুবাদে যে দেশের অধিবাসীদের অর্থনীতি-বিষয়ক জ্ঞান রয়েছে, অর্থাৎ যাঁরা চাক্ষুষ মন্বন্তর অতিক্রম করেছেন, তাঁরা জ্যোতিষপুরের বাসিন্দা। আর যাঁদের সে-জ্ঞান তখনও হয়নি, তাঁরা প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের বাসিন্দা। ভারতের আসাম অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল প্রাগজ্যোতিষপুর। শব্দার্থ অনুসারে সনাতন ব্যবস্থায় জীবনযাত্রা চালানোর যে নীতি ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল আগেই ত্যাগ করে তথাকথিত অর্থনীতি-ভিত্তিক জীবনযাত্রা চালানোর কামড়াকামড়ির নীতি গ্রহণ করেছিল, প্রাগজ্যোতিষপুরের অধিবাসীরা তা গ্রহণ করেছিলেন বহু কাল পরে; সম্ভবত ভারতে ইংরাজ শাসনের শেষ পর্যায়ে। টাকা-পয়সা দেখেননি, তার হিসাব জানেন না, তা দিয়ে লেন-দেন করবার কথা ভাবতে পারেন না, আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১৯৬০-৭০ সালেও এমন মানুষের দেখা পাওয়া যেত। দ্র. **নরক**।

প্রাচীন : ১. প্রাচ্ + ঈন (খ)। (ব.শ.)। ২. *যাহা প্রাক্ দেশ-কাল-পাত্র হইতে আগত।* ৩. পূর্ব্বদিগ্‌ভব, পূর্ব্বকালভব, পূর্ব্বজন্মভব, পুরাতন, পূর্ব্বদেশভব। বিপ. অর্ব্বাচীন। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **অর্ব্বাক**, **প্রাক্**।

প্রাচীনবর্হিঃ (-বর্হিস্) : ২. *বর্হিঃ বা বর্হিস্ (জ্ঞান-অর্থ-বল-এর গৌরবচিহ্নবাহক পতাকাদি) প্রাচীন যাহার।* / যাহার কুশসংস্তর পূর্ব্বাগ্র। (ব.শ.)। ৩. ইন্দ্র। মহারাজবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পুরাণাদিতে এই শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। উত্তরাধিকারসূত্রে জ্ঞানী বা ধনী এবং সেকারণে বলবান সত্তাকে বোঝাতে এই শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। হরিচরণ একে 'কুশসংস্তর' বলে শব্দটির অর্থের সঠিক দিশাই দিয়েছেন। 'কুশ' শব্দটির সঙ্গে কুশীদ বা সুদের ঘনিষ্ঠতা। কুশসংস্তর কথাটির অর্থ — সম্পদের স্তরে স্তরে জমে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সম্পদবানের মনে মালিকানার বোধের, অধিকারের (তদ্বিষয়ক কাগজপত্রের) যে স্তর জমে, সেটিই 'কুশসংস্তর'।

প্রাচ্য : ২. *প্রাক্ বা প্রাচ্ (অর্থাৎ প্রাচীনতা) থাকে যাহাতে।* / পূর্ব্ব দিকে দেশে বা কালে ভব। (ব.শ.)। ৩. পূর্ব্বদেশীয়, পৌর্ব্বকালিক, পুরাণ, প্রাচীন, প্রাচ্যদেশ, প্রাগ্‌দেশ, প্রাচীনগণ, প্রাগ্‌দেশবাসীগণ, পূর্ব্বদেশীয়গণ। (ব.শ.)। ৪. এশিয়া অর্থে প্রচলিত। ৫. দেশ, কাল, পাত্র — এই তিনের গুণাগুণ যে 'প্রাক্' বা 'প্রাচ্' শব্দটি প্রকাশ করে, তাকে কেবল মাত্র দেশের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বলে ভাবলে, বাকি দুটি ক্ষেত্রে তার যে অস্তিত্ব তা হারিয়ে যায়। প্রাচ্য মানে এখন তাই 'East'-দেশ মাত্র। এভাবে ভাবার ফলে, যে-দেশে সবার আগে (পূর্ব্বকালে) মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ ঘটেছিল, প্রকৃষ্ট অন্চ্ করে ফেলা গিয়েছিল, মানুষের প্রাচীন অস্তিত্বের সেই (প্রাচ্য) দেশের কথা হারিয়ে যায়। এভাবেই বহু কিছুই আমরা হারিয়েছি। অথচ, এরকম বহু-অর্থবাচক বাক্য রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এইভাবে — 'দেখিয়াছি, ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় সূর্য তখন পূর্ব দিকে ওঠে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গেই উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমেও আলো ছড়াইয়া পড়ে।' এই বাক্যে প্রাচ্যদেশ ও প্রাচ্যকাল তাদের পার্থিব ও অপার্থিব উভয়রূপে একাকার হয়ে আছে।

রোমাঞ্চ : ২. *যাহাতে রোম অঞ্চিত হয়।* / রোমের অঞ্চ (উদ্‌গম)। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. যা ঘটলে রোম খাড়া হয়ে ওঠে, (রোমের অন্ চয়িত হয়ে তার পরিধিতে পৌঁছায়) তাকে রোমাঞ্চ বলে। দ্র. **রোম**। ৬. romance। শব্দটি Rome (শহর) ও Roman (সভ্যতা-সংস্কৃতি-ভাষা প্রভৃতি) নাম থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়। Rome নামক কেন্দ্রের অঞ্চ (অন্চ্) যতদূর বিস্তৃত সবটাই Rome + অঞ্চ বা romance-এর এলাকা। কিন্তু Rome নামের ভিতর যে নিহিত তাৎপর্য, তার পরিণামেই রোমাঞ্চ এবং romance অর্থের দিক থেকে এত কাছাকাছি।

'অঞ্চ্' (অন্জ্, অন্গ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অউনিঞা, অক্ত, অগ্‌গদানী, অগ্নি, অগ্নি-অবতার, অগ্নিকর্ম্ম, অগ্নিকলা, অগ্নিকল্প, অগ্নিকাণ্ড, অগ্নিকার্য্য, অগ্নিকাষ্ঠ, অগ্নিকুণ্ড, অগ্নিকুমার, অগ্নিকোণ, অগ্নিক্রিয়া, অগ্নিক্রীড়া, অগ্নিগর্ভ, অগ্নিগৃহ, অগ্নিচয়ন, অগ্নিচিৎ, অগ্নিচূর্ণ, অগ্নিজ, অগ্নিজন্মা, অগ্নিজিহ্ব, অগ্নিতুল্য, অগ্নিত্রয়, অগ্নিত্রেতা, অগ্নিদগ্ধ, অগ্নিদাতা, অগ্নিদিক,

অগ্নিদীপন, অগ্নিদেব, অগ্নিধারণ, অগ্নিনক্ষত্র, অগ্নিনয়ন, অগ্নিপক্ব, অগ্নিপরিক্রিয়া, অগ্নিপরিচ্ছদ, অগ্নিপরিশুদ্ধি, অগ্নিপরীক্ষা, অগ্নিপুরাণ, অগ্নিপ্রণয়ন, অগ্নিপ্রবেশন, অগ্নিপ্রবেশ, অগ্নিপ্রস্তর, অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধন, অগ্নিবাণ, অগ্নিবাহ, অগ্নিবাহন, অগ্নিবিন্দু, অগ্নিবিসর্প, অগ্নিবীজ, অগ্নিবীর্য্য, অগ্নিবৃদ্ধি, অগ্নিবৃষ্টি, অগ্নিবেশ, অগ্নিভূ, অগ্নিভূতি, অগ্নিমণি, অগ্নিমন্থন, অগ্নিময়, অগ্নিমান, অগ্নিমান্দ্য, অগ্নিমুখ, অগ্নিমূর্ত্তি, অগ্নিমূল্য, অগ্নিরক্ষণ, অগ্নিরেতঃ, অগ্নিলোক, অগ্নিশরণ, অগ্নিশালা, অগ্নিশিখ, অগ্নিশিখা, অগ্নিশুদ্ধি, অগ্নিশুশ্রূষা, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিষ্বাত্ত, অগ্নিসংস্কার, অগ্নিসখ, অগ্নিসঙ্কাশ, অগ্নিসৎকার, অগ্নিসন্দীপন, অগ্নিসম্ভব, অগ্নিসহায়, অগ্নিসাক্ষিক, অগ্নিসাক্ষী, অগ্নিসাদ, অগ্নিস্তম্ভন, অগ্নিহোত্র, অগ্নিহোত্রী, অগ্নীধ্র, অগ্নীন্ধন, অগ্নীয়, অগ্নীষোম, অগ্ন্যাগার, অগ্ন্যস্ত্র, অগ্ন্যাত্মক, অগ্ন্যাধান, অগ্ন্যালয়, অগ্ন্যাহিত, অগ্ন্যুৎপাত, অগ্ন্যুদ্গম, অগ্ন্যুদ্গার, অগ্ন্যুদ্গিরণ, অগ্ন্যুদ্ধার, অগ্র, অগ্রকর, অগ্রকায়, অগ্রগ, অগ্রগণী, অগ্রগণ্য, অগ্রগামী, অগ্রজ, অগ্রজন্মা, অগ্রজা, অগ্রজাত, অগ্রজাতি, অগ্রজিহ্বা, অগ্রণী, অগ্রত, অগ্রতঃ, অগ্রদানী, অগ্রদানীয়, অগ্রপাণি, অগ্রপাতী, অগ্রপাদ, অগ্রপূজা, অগ্রবীজ, অগ্রবীর, অগ্রভাগ, অগ্রভূমি, অগ্রমহিষী, অগ্রমাংস, অগ্রমাস, অগ্রযান, অগ্রযায়ী, অগ্রযোধী, অগ্রসংখ্যা, অগ্রসন্ধ্যা, অগ্রসর, অগ্রসারী, অগ্রসূচী, অগ্রহস্ত, অগ্রহায়ণ, অগ্রহার, অগ্রাক্ষি, অগ্রাণ, অঘান, অঘ্রাণ, অগ্রাণীক, অগ্রানীক, অগ্রাসন, অগ্রিম, অগ্রিয়, অগ্রীয়, অগ্রে, অগ্রেদিধিষু, অগ্রেসর, অগ্র্য, অঘ্রান, অঞ্জ্ (অন্‌জ্, অন্‌জ্), অঞ্জ, অঞ্জন, অঞ্জনশলাকা, অঞ্জনা, অঞ্জনাগিরি, অঞ্জনাদ্রি, অঞ্জনাহৃদয়নন্দন, অঞ্জনিকা, অঞ্জনিত, অঞ্জলি, অঞ্জলিকর্ম্ম, অঞ্জলিপুট, অঞ্জলিবন্ধন, অঞ্জস, অঞ্জসা, অঞ্জিত, অঞ্জীর, অনগ্নি, অনঞ্জন, অব্যগ্র, অব্যঙ্গ, অব্যঙ্গ্য, অব্যঞ্জন, অভিব্যঞ্জন, অভিব্যঞ্জক, অভিব্যক্ত, অভিব্যক্তি, অসমঞ্জ, অসমঞ্জস্, অসমঞ্জাঃ, আউগাও (অগ্রসর হও), আউনিএগ্রা, আঁজলা, আঁজি, আঁজিনা, আঁজিলা, আঁজুল, আক্ত, আগ, আগআন, আগণি, আগনি, আগরি, আগরী, আগলদিঘল, আগলসুক্য, আগলা, আগলি, আগা, আগাও, আগাড়, আগাড়ি, আগারে, আগালে, আগি, আগিলা, আগু, আগুড়ি, আগুন, আগুদল, আগুয়ান, আগুল, আগুলি, আগুসর, আগে, আগেকার, আগোর, আগোরি, আগ্নিক, আগ্নিমারুত, আগ্নীধ্র, আগ্নেয়, আগ্নেয়কীট, আগ্নেয়গিরি, আগ্নেয়পুরাণ, আগ্নেয়াস্ত্র, আগ্রয়ণ, আগ্রহায়ণ, আগ্রহারিক, আঙরা, আঙ্গারি, আজ্য, আজ্যধানী, আজ্যপ, আজ্যপাত্র, আজ্যভুক, আঞ্জন, আঞ্জনেয়, আঞ্জল, আঞ্জলী, এগোও, প্রাঞ্জল, ব্যক্ত, ব্যক্তি, ব্যঙ্গ্য, ব্যঞ্জক, ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জনা, সমঞ্জস, সামঞ্জস্য।

অঞ্জ্ (অন্‌জ্) = অস্তিত্বের রহস্যরূপের জ্-অন; অন্ জনন থাকে যাহাতে। **অঞ্জ** = অস্তিত্বের রহস্যরূপ জনন করে যে। (anjina)।

অঞ্জ্ (অন্‌জ্, অন্‌গ্) : দ্র. **অঙ্ক্**, **অঙ্ঘ্**। ৫. অস্তিত্বের রহস্যরূপের জ্-অন (জনন)। জ্ হল জনন, জপন, জম্ভন প্রভৃতি সর্ব প্রকারের জ্-অনের পুঞ্জীভূত অব্যক্ত রূপ। অস্তিত্ব অন্ হয়ে নিজের বাইরে যে অব্যক্ত জ্-অন ক্রিয়া করে, সেই ক্রিয়াই অন্‌জ্ ক্রিয়া। অর্থাৎ *অস্তিত্বের রহস্যরূপ জ্-অন করে যাহাতে*, সেটিই অঞ্জ্ ক্রিয়া। তবে তার এই যে **নিজের বাইরে যাওয়া** বা গমন করা (গ্), তা একই সঙ্গে 'অন্‌গ্'ও **বটে, বাহিরের সঙ্গে মিশ্রণও** বটে। এই ক্রিয়াটির উল্লেখ করেছেন **হরিচরণ তাঁর 'অগ্র'** শব্দের গোড়ার উৎসে। যাই হোক না কেন, অন্-এর সঙ্গে ক্, গ্, চ্, জ্ প্রভৃতি ক্রিয়ার যোগে যা ঘটে (অঙ্ক্, অন্‌গ্, অঞ্চ্, অঞ্জ্), তা সবই আত্মপ্রকাশের এক-একটি প্রচেষ্টা সন্দেহ নেই। তাদের সঙ্গে অন্যান্য বর্ণ (ক্রিয়া) যুক্ত হয়ে তাদের প্রত্যেককে ব্যক্ত করে তোলে। তেমনি এই 'অঞ্জ্'-এর সঙ্গেও অন্যান্য বর্ণ যুক্ত হয়ে তাকে ব্যক্ত করে তোলে; তেমন বহুব্যবহৃত উদাহরণ হল — **'অঞ্জলি', 'ব্যক্ত', 'ব্যক্তি', 'ব্যগ্র', 'সামঞ্জস্য'**। ৬. Av. anj - to pollute, L. ung-o (ব.শ.)।

অগ্নি : ১. ✓অগ্ বক্রগতি + নি - ক (অমরকোষ); অগ্র + ✓নী (প্রণয়ন) + **ক্বিপ্ (নিরুক্ত)**। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের গমন-নয়নের গতিশীলতা থাকে যাহাতে।* / 'যাহা যজ্ঞে প্রথমে প্রণীত হয়', 'সর্ব বিষয়ে যে আপনাকে অগ্রত্ব পাওয়ায়'। (ব.শ.)। 'যাহা বক্র গমন করে'। (ব.শ.)। ৩. ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য দেব। ঋগবেদ-সংহিতায় অগ্নি সম্বন্ধে যতগুলি সূক্ত আছে, ইন্দ্র ভিন্ন অন্য কোনো দেব সম্বন্ধে ততগুলি নাই। অগ্নির তিন মূর্তি — আকাশে সূর্য্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ, পৃথিবীতে অগ্নি। অগ্নি দেবতাদের হব্যবাহক। অগ্নি **উনপঞ্চাশ** রকমের। অগ্নি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও দক্ষকন্যা স্বাহার স্বামী। তাদের ৩টি পুত্র ও ৪৫টি পৌত্র — মোট ৪৯।(পৌ.অ.)। ইনি ত্রিলোকদর্শক ও ত্রৈলোক্যবাসী জীবগণের কর্ম্মসাক্ষী। দেবতারা অগ্নিমুখে হুতদ্রব্য ভক্ষণ ও অগ্নিজিহ্বায় যজ্ঞহবি আস্বাদন করেন। অগ্নি তিন প্রকার — গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহ্বনীয়। 'আহুয়' শব্দের অর্থ — 'পণপূর্ব্বক পক্ষিমেষাদি প্রাণী দ্বারা যুদ্ধপ্রবর্তনরূপ দ্যূতবিশেষ'। মনুসংহিতা মতে ইহা অষ্টাদশ ব্যবহারপদের একতম। (অগ্নির শুক্রজাত) স্বর্ণকেও অগ্নি বলা হয়। তন্ত্র মতে 'র' বীজাক্ষরই অগ্নি। (ব.শ.)। ৪. প্রধানত fire অর্থেই প্রচলিত। ৫. অস্তিত্বের গমন মাঝপথেই যদি নঞর্থক ভাব নিয়ে নবরূপ ধারণ করে, তবে তা হয় 'অগ্ন' (ভগ্ন, রুগ্ন স্মর্তব্য); তার 'ই'কার বা গতিশীলতা ঘটলে সেটি হয় 'অগ্নি'। অগ্ বা অগ্র (= আগু, যেমন আগুপিছু) শব্দ এর মূলে রয়েছে বলেই একে আগুন বলা হয়। বাস্তব প্রেক্ষিতে সেই ক্রিয়াই আরও বিকশিত ও ব্যক্ত হয়ে নানা রূপ গ্রহণ করে। যাস্ক, অমরকোষ অগ্নির সেই 'আরও ব্যক্ত' রূপের বয়ান দিয়েছেন তাঁদের প্রদত্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে। আমাদের দেওয়া ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে আমরা চেষ্টা করেছি, অগ্নির প্রথম ব্যক্ত রূপটিকে ধরতে, যাতে তার পরবর্তী সমস্ত ব্যক্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থগুলিই তার অন্তর্ভুক্ত (যাস্ক ও অমরকোষের দেওয়া অর্থও যার অন্তর্ভুক্ত) হয়ে ধরা দেয়।

কার্যত অস্তিত্বের মূল ও আদি রূপই হল অগ্নি। একে তেজ বা energy-ও বলা হয়। এই অগ্নি (তেজ বা শক্তি), তার আত্মোপলব্ধি (identity) ও তার ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তিই সমস্ত জগতের মূলে। অস্তিত্বের তেজই অগ্নি, তার আত্মোপলব্ধিই **ইন্দ্র** এবং তার ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তিই **মিত্র-বরুণ** — প্রাচীন ধারণার গোড়াতে এই তিনের অস্তিত্ব। বেদে তাই মূলত এই তিন দেবতার জিকির। অগ্নি-বিষয়ক এই ধারণাই পরে **শিব, মহেশ্বর** (শ্রমজীবী) প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এবং এই অগ্নির

আত্মোপলব্ধির ধারণাই পরে **বিষ্ণু, নারায়ণ** (পণ্যজীবী) প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এবং এই অগ্নির ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তির ধারণাই পরে **ব্রহ্মা, ভৃগু, শুক্রাচার্য, বৃহস্পতি,** (জ্ঞানজীবী) প্রভৃতি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। মূলত এ হল 'রাত্রি' (= বরুণ) ও 'দিবস'-এর (= মিত্রের) ধারণা, যেকারণে মিত্রকে বলা হয় 'অহরভিমানী'। সমাজ যত এগিয়েছে, যত বিকশিত হয়েছে, এই বিভাজনের সংখ্যা তত বৃদ্ধি পেয়েছে। আর, এই সবকিছুর মূলে কিন্তু ঐ অগ্নি (তেজকণা বা অংরূপিণী)। পরবর্তী কালে সাংখ্যকারেরা এসে পুরুষ-প্রকৃতির অঙ্কে পুরো ব্যাপারটিকে পুনরায় নতুন করে সাজান। আজকের বিজ্ঞানীরাও সেই একই ধারণাকে তাঁদের মতো করে সাজাচ্ছেন। তাঁরা অগ্নিকে নাম দিয়েছেন mc^2, অগ্নির আত্মোপলব্ধিকে নাম দিয়েছেন 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য', এবং অগ্নির ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তি নাম দিয়েছেন transparency ও patent law। একে যতবেশি সুসংহত সুবিন্যস্ত করে সাজানো যাবে, ততই 'ধারণাটি বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে' বলা যাবে।

ঘরে ঘরে যে অগ্নি (আগুন, জ্ঞানাগ্নি, শ্রম ও সম্পদ) পালিত হয় তাকে গার্হপত্য অগ্নি বলে। যে অগ্নি (আগুন, জ্ঞানাগ্নি, শ্রম ও সম্পদ) দক্ষিণা দেওয়া হয় তাকে দক্ষিণাগ্নি বলে। আর, যে অগ্নিকে 'আহ্বয়' করা যায়, দ্যূতক্রীড়ার (পাশা খেলার, এ'পাশ' থেকে ও'পাশে' দেওয়া-নেওয়ার বা বিনিময় করার খেলার) সাহায্যে রোজগার করে আনা যায় তাকে 'আহ্বনীয়'-অগ্নি বলে। আগুনের আধারকেও অগ্নি বলে। জ্ঞানের অগ্নিশিখা বহনকারীকে শিব (শিখাধারী ব্রাহ্মণ) বলে, এবং শ্রমের আধার শ্রমিককেও অগ্নি (**বিশ্বানর**) বলে। আর সম্পদ বা টাকাপয়সাকে যে আগুন বলে সেকথা টাকার ছ্যাঁকা খেয়ে স্বয়ং রামকৃষ্ণ বলে গেছেন। তাছাড়া 'টাকার গরম'-এর কথা কে না-জানে!

উৎপন্নের দুনিয়ায় (**আকাশে**) যৌথসম্পদ বা রাষ্ট্রীয় সম্পদই (বা **সূর্য্যই**) অগ্নির মূর্তি। পণ্যের দুনিয়ায় (**অন্তরীক্ষে**) পুঁজিই (**বিদ্যুৎই**) অগ্নির মূর্তি। এবং বৈদিক রাষ্ট্রের ভিতরে (পৃথিবীতে) আগুন-জ্ঞান-শ্রম-সম্পদই (অগ্নিই) অগ্নির মূর্তি। পুরাণাদিতে লোক বা sphere কে মোট ৪৯ ভাগে ভাগ করে বোঝা হয়েছে। সেই ৪৯ লোকে ৪৯ বায়ুর (মিডিয়ার) মতো ৪৯ অগ্নিও (আগুনও) রয়েছে। পুরাণাদিতে বিশেষ কোনো ঘটনার বর্ণনাকালে উপরোক্ত অগ্নির ধারক বাহকদেরও অগ্নি শব্দে উল্লেখ করা হয়। 'রহে যাহাতে' তাকে 'র' বলে। এ হল 'ঋ'-এর স্থিতিরূপ; এ রক্ষক এবং রাক্ষসও বটে, কারণ রক্ষক ভক্ষক হলেই রাক্ষস পদবাচ্য হয়। অগ্নিই সৃজনকারী থেকে রক্ষাকারী; আবার অগ্নিই রাক্ষসের মতো সব গ্রাস করে। তাই 'র'-ই অগ্নির বীজাক্ষর। ইংরেজিতে আজকাল আবিষ্কারক বা অগ্নিধারক মনকে তাই 'minds of fire' বলে।

পৃথিবীর আদি গ্রন্থ **ঋগ্বেদ**, একথা সবাই স্বীকার করেন। তার প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দ অগ্নি। সম্পূর্ণ ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় রচিত ব'লে শ্লোকটি প্রেক্ষিত অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যদিও একালের প্রতীকী মন তাকে চেষ্টা করে একার্থবাচক করে ছাড়ে। বাংলা অনুবাদও করা হয় একার্থবাচক ক'রে। শ্লোকটি হল — 'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্। হোতারং রত্নধাতমম্।।' অগ্নির (উপরোক্ত নানারকম অগ্নির) ঈড়ে (প্রশংসাপূর্বক আলোচনা করি), পুরোহিতং (পুরের অর্থাৎ দেহপুর, নগরপুর, পুরুষের পুর, জ্ঞানপুর ইত্যাদির হিতের জন্য), (কেননা তা) যজ্ঞস্য (উৎপাদন কর্মযজ্ঞের) দেবমৃত্বিজম্ (উৎপন্নের জনন ও বিকাশ সাধন করে), রত্নধাতমম্ (কর্মরত বিত্তসমূহকে বা কাঁচামাল ইত্যাদিকে) হোতারং (রূপান্তরের জন্য গ্রহণ করে)। দ্র. **অং**। **৬.** Latin – Ignis; Slav – ogni; French – ignis; Spanish, Italian – ignes, English – anger। (ব.শ.)।

অগ্নিকলা : ১. অগ্নি + কলা। ২. *অগ্নির কলন থাকে যাহাতে*। দ্র. **কলা**। ৩. অগ্নির অবয়ব — ধূম্রার্চ্চিঃ উষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী সুশ্রী সুরূপা কপিলা হব্যবহা কব্যবহা — এই দশবিধ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পাশ্চাত্য জ্ঞানে অগ্নির বিভিন্ন শরীরের এভাবে পৃথক নামকরণ বিন্যস্ত করা নেই। আমাদের আছে — ধূমায়িত আগুন (= ধূম্রার্চ্চিঃ), উত্থানকামী তাপ (উষ্মা = anger), যে জ্বলে (= জ্বলিনী), যে জ্বালায় (= জ্বালিনী), যার থেকে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে (= বিস্ফুলিঙ্গিনী), যা শ্রীযুক্ত (= সুশ্রী), যার রূপ সুন্দর (= সুরূপা), কপি (= কারক-পালনের গতিদানকারী) কর্তৃক লালিত বা লয়প্রাপ্ত (= শ্রমাগ্নি = কপিলা)। এবং **হব্যবহা** ও **কব্যবহা**। দ্র. **অং**।

অগ্নিকুমার : ১. অগ্নি, কম্ = অভিলাষ। ২. *যে কুমার অগ্নি হইতে জাত*। দ্র. **কুমার**। ৩. অগ্নিদেব একবার বশিষ্ঠ, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরীচি প্রমুখ সপ্তর্ষিদের অরুন্ধতী ... প্রভৃতি স্ত্রীদের সৌন্দর্যে মোহিত হন। অগ্নির স্ত্রী স্বাহা স্বামীর চিত্তবিকার বুঝতে পেরে অরুন্ধতী ছাড়া বাকি ছয় জন ঋষিপত্নীর রূপ ধারণ করে তাঁর সঙ্গে ছয় বার বিহার করেন। বিহারের পর এক স্বর্ণকুণ্ডে অগ্নির রেতঃপাত রক্ষিত হয়। সেই তেজোময় রেতঃ হতে কার্তিকের জন্ম হয়। সেজন্য তিনি অগ্নিকুমার নামে খ্যাত। (পৌ.অ.)। অগ্নি সুরতরত উমামহেশ্বরের সম্ভোগগৃহে প্রবেশ করিলে অন্তর্যামী শিব তাহা জানিয়া লজ্জিত ও কেলিবিরত হন ও তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হয়। শিব সেই বীর্য্য অগ্নিমুখে নিহিত করিলে, তেজোধারণে অসমর্থ অগ্নি তাহা গঙ্গাজলে পরিত্যাগ করেন এবং গঙ্গাজল হইতে উহা ষট্‌কৃত্তিকায় সংক্রমিত হইয়া গর্ভরূপ ধারণ করিলে, কৃত্তিকাগণ পীড়িত হইয়া ঐ গর্ভ শরবনে নিক্ষেপ করেন। শরবনে ক্ষিপ্ত সেই গর্ভই 'কার্ত্তিকেয়', তজ্জন্য ইঁহার নাম 'শরজন্মা'। অগ্নির বীর্য্যধারণ হেতু ইনি 'অগ্নিকুমার', 'অগ্নিভূ' ইত্যাদি নামে খ্যাত। গঙ্গার স্তন্যপান হেতু ইঁহার নাম 'গাঙ্গ'। রামায়ণে, অগ্নি শিবতেজোধারণে অসমর্থ হইলে, গঙ্গা উহা গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনিও তেজোময় গর্ভভূত শিববীর্য্যে পীড়িত হইয়া, উহা হিমালয় পার্শ্বে নিক্ষেপ করেন। কৃত্তিকাগণ সেই বীর্য্যজাত শিশুকে স্তন্যপান করান, তজ্জন্য ঐ কুমার 'কার্ত্তিকেয়' নামে খ্যাত। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. আগুনের ছেলেপুলে হতে পারে, এমন কথা আধুনিক পাশ্চাত্যের কল্পনাতেও স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়; কিন্তু ভারতের সেরকম কাহিনী রয়েছে। তা যে আদৌ অবিশ্বাস্য নয়, 'অগ্নিকুমার'ই তার প্রমাণ। কিন্তু এতকাল তার মানে আমরা জানতাম না। এখন কমবেশি জানি। এককথায় 'অগ্নিকুমার'

শব্দের অনুবাদ একালের প্রতীকী ভাষায় করলে তা হবে — 'পুলিশ-মিলিটারি'। সেই শক্তির জন্ম ভারত সমাজে কীভাবে হয়েছিল, তার তিনরকম বয়ান রয়েছে; প্রথমটি অগ্নি-স্বাহার কাহিনীতে, দ্বিতীয়টি শিব-অগ্নির কাহিনীতে, এবং তৃতীয়টি শিব-গঙ্গার কাহিনীতে। পরবর্তী কালে সরকারের পুলিশ-মিলিটারিকে কার্তিক ও কেরানীবাহিনীকে গণেশ বলা হয়েছে প্রায় সমস্ত পুরাণাদি গ্রন্থে।

ভারতে **কার্তিক** ঠাকুরের পূজাও হয়। বঙ্গদেশে, রাতের অন্ধকারে কোনো হিন্দুর বাড়ির সামনে লোকে কার্তিক ঠাকুর রেখে যায়, গৃহকর্তা সকালে উঠে সেই কার্তিক ঠাকুর দেখতে পেলে তার পূজানুষ্ঠান করতে বাধ্য হন — এইরূপ প্রচলন আছে। অতি সুন্দর ফুলবাবু বিবাহযোগ্য যুবককে 'কাঁচা কার্তিক' বলা হয়ে থাকে। এছাড়া দুর্গাপূজার সময় দুর্গামূর্তির সঙ্গে **দুর্গা**র দুই পুত্র কার্তিক **গণেশে**র মূর্তিরও পূজা হয়ে থাকে। কার্তিক ঠাকুরের বাহন **ময়ূর**। ... **ব্রহ্মা** (জ্ঞানজীবী), **বিষ্ণু** (পণ্যজীবী) ও **মহেশ্বর** (শ্রমজীবী) — বৈদিক যুগের সময় থেকে মানুষের এই তিনপ্রকার মৌল বিভাজন। শ্রমজীবীদের ভিতর থেকেই একসময় সৈন্যবাহিনীর জন্ম হয়। কিন্তু সেটা হয় কীভাবে — সেকথাই অগ্নিকুমারের জন্মবৃত্তান্তে বলা হয়েছে। আদিতে শ্রমজীবী জনসাধারণের ভিতরে সৈন্যের ধারণা নিক্ষিপ্ত হয়। তার মাস্তানি তেজ ধারণ করে 'মার্কেট-ফ্রো' বা গঙ্গা। তখন 'গায়ের জোর' বিক্রির সূত্রপাত হয়। পরে কৃত্তিকাগণ (??) তার পালনপোষণ করেন। পরবর্তী কালে যখন সমাজ আরও অনেক বিকশিত হয়ে যায়, সৈন্যবাহিনী যখন আর সমাজের চোখে নতুন কিছু নয়, তখন এর ব্যাখ্যাও বদলে যায়। তখন সাধারণভাবে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দুর্গা বলা হত। তার থেকেই সৈন্যবাহিনী (কার্তিক) ও কেরানিবাহিনীর (গণেশের) জন্ম হয়ে থাকে।

অগ্নিজিহ্ : ১. অগ্নি, লিহ্ = লেহন। ২. অগ্নি যাহার জিহ্বা-তুল্য, যার দ্বারা হুতদ্রব্যের আস্বাদন সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ৩. যাঁরা অগ্নিরূপ জিহ্বার দ্বারা দ্রব্যের আস্বাদন বা ভোজন করেন —দেবতা। বরাহমূর্তি ধারণকালে বিষ্ণু অগ্নিজিহ্ হয়েছিলেন বলে বিষ্ণুকে অগ্নিজিহ্ বলে। অগ্নির জিহ্বা সাত রকম — করালী, ধামিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, পদ্মরাগা, সুবর্ণা। (পৌ.অ.)। 'অগ্নিজিহ্' শব্দের মানে দেবতা। বরাহরূপী বিষ্ণু। অগ্নির সপ্তজিহ্বা — করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, সুবর্ণা, পদ্মরাগা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. অগ্নির 'আত্মোপলব্ধি'র একটি রূপ হল বিষ্ণু (ইন্দ্র) বা নারায়ণ। সেই (নগদ) নারায়ণের তৃতীয় রূপ বরাহ-অবতার। মানুষের সমাজে নিয়োগ-বিনিয়োগের সূত্রপাতের এই অধ্যায়কে সেকালের ভাষায় বিষ্ণুর বরাহ-রূপ গ্রহণ বলা হয়ে থাকে; একালের ভাষায় একে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ও সক্রিয়তা বলতে পারি। এই সময়, প্রজাসাধারণ রাষ্ট্রের কর্মচারীদের যে-সকল রূপ দেখেছিল, তাদের নামকরণ করা হয়েছিল 'করালী, ধামিনী ... ইত্যাদি' নামে। এগুলিই অগ্নির সপ্তজিহ্বা।

অগ্নিপরীক্ষা : ২. *অগ্নির মাধ্যমে যে পরীক্ষা করা হয়।* ৩. অগ্নিদ্বারা অপরাধীর দোষনিরূপণ, অগ্নিবিশুদ্ধি, অগ্নিপরিশুদ্ধি, কঠোর পরীক্ষা মাত্র। (ব.শ.)। **সীতা** বহুকাল **রাক্ষস** রাবণের দখলে ছিলেন বলে তার সতীত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়। এই অপমানের জন্য সীতা অগ্নিতে প্রবেশ করেন। **অগ্নিদেব** সীতাকে নিজ হস্তে ধারণ করে অগ্নির মধ্য থেকে উঠে তাঁকে রামের হাতে অর্পণ করেন। এই অগ্নিপরীক্ষায় সীতার সতীত্ব প্রমাণিত হয়। ... পুরাকালে ভারতবর্ষে অগ্নিপরীক্ষার আর একটি প্রথা ছিল। কোনো নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হলে, তার পবিত্রতা সম্বন্ধে সংশয় দূর করবার জন্য লাঙলের অগ্নিতপ্ত লৌহশলা তাকে লেহন করতে হত। জিহ্বা দগ্ধ না হলে সেই নারী যে যথার্থই সতী তা প্রমাণ হয়ে যেত। (পৌ.অ.)। ৪. শব্দটি চালু থাকলেও বাস্তবে অগ্নিপরীক্ষার তেমন কোনো মানে এখন আর নেই। স্কুল কলেজে বা কোর্ট কাচারিতে কোথাও এর প্রচলন নেই। যদিও বাংলার গ্রামেগঞ্জে এখনও লোকে বলে, 'তুই আগুন ছুঁয়ে বল, এটা তুই করেছিস কি না।' ৫. মানুষ সৎ থাকলে আগুন তাকে গ্রাস করবে না, এমন ধারণা সমাজে প্রচলিত হতে পারল কেমন করে? খুব সম্ভব দুটি কারণ থেকে এমন ধারণার উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে হয়। এক) চড়কের ভক্তরা বেশ ক'দিন জল না-খেয়ে গা শুকিয়ে নেন, তারপর আগুনের উপর দিয়ে হাঁটেন; হাত-পা পোড়ে না। এর থেকে মনে হয়, আগুনের ব্যবহার শেখার আগে মানুষ দাবানলের সঙ্গে যুদ্ধ করে বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'প্রকৃতির সঙ্গে সত্য ব্যবহার', তা তারা তখনই হয়তো বুঝে থাকবে। দুই) পরবর্তী কালে সমাজপরিচালকদের শাসনশক্তিকেও আগুন বলা হত। যে অপরাধী নয়, তাকে এই শক্তি গ্রাস করত না। তার কারণেও অগ্নিপরীক্ষার ধারণাটি এসে থাকতে পারে। তাছাড়া, অগ্নিকে উত্তীর্ণ হওয়া আর কোনো 'জ্ঞানের অগ্নিশিখাবহনকারী'কে পেরিয়ে যাওয়া অর্থাৎ তার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া তো একই ব্যাপার। সেদিক দিয়েও অগ্নিপরীক্ষা কথাটির প্রচলন হয়ে থাকতে পারে। দ্র. **পরীক্ষা**।

অগ্নিবাহন (অগ্নিবাহ) : ১. অগ্নি + ✓বহ্ + অ (অণ্) - ক। (ব.শ.)। ২. যে অগ্নিকে বহন করে। (ব.শ.)। ৩. ছাগ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ছাগলে আগুন বহন করে, এমন কথা আমরা ভাবতেই পারি না। অথচ হরিচরণ তাঁর শব্দকোষে কথাটি স্পষ্ট করেই লিখে রেখে গেছেন। 'যে অগ্নিকে বহন করে', তাকে 'অগ্নিবাহন' বলে, এবং এই অগ্নিবাহন-কারী সত্তাটির একটি নাম 'ছাগ'। পাশ্চাত্যের ইতিহাসে অগ্নিবহনকারীর নাম প্রমিথিউস। ভারতের ইতিহাসে দৃশ্যত ছাগলের আগুন বহনের কোনো কাহিনী নেই। তাহলে হরিচরণ এমন কথা লিখে গেলেন কেন?

কারণ, দৃশ্যত এরকম কাহিনী না থাকলেও প্রকৃতপক্ষে আছে। তাছাড়া, হরিচরণ অতশত দেখতে যাননি; তিনি তাঁর পূর্ববর্তী আচার্য্যগণের লেখা থেকে যা জেনেছেন, তা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে লিখে রেখে গেছেন। পূর্ববর্তী আচার্য্যগণ লিখে গেছেন — দুর্গা যেমন সিংহবাহিনী, সরস্বতী যেমন হংসবাহিনী, অগ্নি তেমনি ছাগবাহন। কেন এরকম, তার উত্তর পাওয়া যায় **ছাগ** শব্দের অর্থ এবং ভারতের দেবদেবীদের **বাহন** বিষয়ক যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে, তার পর্যালোচনা থেকে।

অগ্নিবেশ : ২. যাহার বেশ অগ্নিবেশতুল্য উজ্জ্বল। (ব.শ.)। ৩. মহর্ষি আত্রেয়র শিষ্য অগ্নিবেশ আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অগ্নিবেশ-সংহিতা প্রণয়ন করেন। এই সংহিতা লুপ্তপ্রায় হলে মহর্ষি চরক ইহার সংস্কার করেন। তখন তার নাম হয় চরকসংহিতা। (পৌ.অ.)। আগ্নেয়াস্ত্রবিৎ মুনিবিশেষ। ইনি অগ্নির পুত্র ও দ্রোণের পিতা ভরদ্বাজের শিষ্য। ভরদ্বাজ ইঁহাকে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করেন। ইনিই দ্রোণাচার্যের অস্ত্রগুরু। (ব.শ.)। ৪. নামরূপে ছাড়া এই শব্দের অন্যরূপ প্রচলন এখন আর নেই। ৫. ব্রাহ্মণ শ্রেণীর একটি বিশেষ গোষ্ঠী। দ্র. **চরক**।

অগ্নিষ্টোম : ১. অগ্নি, স্তু = স্তুতি। ২. *অগ্নির স্তুতিবাহক কথাবার্তা থাকে যাতে।* / যাহাতে অগ্নির স্তব আছে। (ব.শ.)। ৩. যাগবিশেষ। ইহা পঞ্চদিবসসাধ্য, বসন্তকাল ইহার সময়, বেদবিৎ সাগ্নিক ইহার অধিকারী, স্বর্গলাভ ইহার ফল, সোমরস ইহার হবিঃ, ইন্দ্র-বায়ু প্রভৃতি ইহার দেবতা। ইহার ষোড়শ ঋত্বিক — হোতা প্রশাস্তা অচ্ছাবাক গ্রাবস্তোতা এই চার হোতৃগণ, অধ্বর্য্যু প্রতিপ্রস্থাতা নেষ্টা উন্নেতা এই চার অধ্বর্য্যুগণ, ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাচ্ছংসী অগ্নীধ্র পোতা এই চার ব্রহ্মাগণ, এবং উদগাতা প্রস্তোতা প্রতিহর্ত্তা সুব্রহ্মণ্য এই চার উদগাতৃগণ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সেকালে সামাজিক কর্মযজ্ঞ চার শ্রেণীর পরিচালকেরা পরিচালনা করতেন — **হোতৃগণ, অধ্বর্য্যুগণ, ব্রহ্মাগণ, ও উদগাতৃগণ**। এদের প্রত্যেকের আবার চারটি করে ভাগ ছিল — হোতা (মূল পরিকল্পনাকারী, ঋগ্বেদে পারদর্শী), প্রশাস্তা (প্রশাসক), অচ্ছাবাক (দ্র. **অচ্ছাবাক**), ও গ্রাবস্তোতা (কর্মযজ্ঞ-পরিচালনকারী সংগঠনের প্রশংসক) এই চার হোতৃগণ, অধ্বর্য্যু (বীজ, খোরাকী প্রভৃতি বিনিয়োগের ধারক, যজুর্বেদজ্ঞ, **পুরোডাশ** বা উৎপন্ন প্রস্তুত করার জন্য শ্রম ইত্যাদি বিনিয়োগের মুখ্য কর্মাধ্যক্ষ), প্রতিপ্রস্থাতা (কালেক্টার??), নেষ্টা (প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, বিষয়, বস্তু আনয়নকারী,), উন্নেতা (কলাকৌশলবিদ) এই চার অধ্বর্য্যুগণ, ব্রহ্মা (প্রয়োজনীয় জ্ঞান-সরবরাহকারী, ত্রিবেদজ্ঞ, সকলের কর্ম পরিদর্শন করেন, ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে দেন), ব্রাহ্মণাচ্ছংসী (??), **অগ্নীধ্র** (সুপারভাইজারের বা লেবার সর্দারের আদি রূপ??), পোতা (সমগ্র কর্মক্ষেত্রের সংরক্ষক) এই চার ব্রহ্মাগণ, এবং উদগাতা (কর্মযজ্ঞে আহ্বায়ক, সামবেদজ্ঞ, বণ্টনের সমস্ত দায় তাঁর), প্রস্তোতা (??), প্রতিহর্ত্তা (??), সুব্রহ্মণ্য (??) এই চার উদগাতৃগণ। (আদিকালের এই পরিচালকদের বুঝবার জন্য আরও চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া দরকার। এখানে খানিকটা যুক্তি, কিছুটা বর্তমান থেকে পিছিয়ে পিছিয়ে গিয়ে বোঝার ও বোঝানর চেষ্টা করা হল। এতে ভুল হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।)

বলা হয়েছে, অগ্নিষ্টোম একধরনের **কর্মযজ্ঞ**। বসন্তকালে পাঁচদিন ধরে এই কর্মযজ্ঞ চালানো হত। আগুন-জ্ঞান-শ্রম-সম্পদের অধিকারী বেদবাদীরা এই কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করতেন। এই কর্মযজ্ঞ থেকে সুখস্বর্গে থাকার মতো উৎপন্ন পাওয়া যেত। এর জন্য পরিচালিতদের দৈহিক সুরা ও মানসিক সুরা পরিবেশন করা হত। প্রভুত্ববাদিতা (ইন্দ্র) ও ব্যাপকতা (বায়ু) এর আরাধ্য ছিল। এর ষোলো প্রকার পরিচালক ছিলেন। প্রথম প্রকারের পরিচালকেরা হলেন হোতৃগণ (পরিকল্পনাকারী), দ্বিতীয় প্রকারের পরিচালকেরা হলেন অধ্বর্যুগণ (কর্মযজ্ঞের বিনিয়োগ-প্রযুক্তি-নীতি-পদ্ধতি বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষ), তৃতীয় প্রকারের পরিচালকেরা হলেন ব্রহ্মাগণ (ত্রিবেদজ্ঞ বলে এঁরা সার্বিক সুপারভাইজার), এবং চতুর্থ প্রকারের পরিচালকেরা হলেন উদগাতৃগণ (কর্মফল বিতরণকারীগণ)। বিশেষত্ব এই যে, অগ্নিষ্টোম করা কিন্তু সরাসরি কর্মযজ্ঞে লিপ্ত থাকা।

অগ্নিসাক্ষী : ১. অগ্নি, অক্ষি। ২. অগ্নি যাহার সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। (ব.শ.)। ৩. অগ্নি ত্রিলোকদর্শক ও ত্রৈলোক্যবাসী জীবগণের কর্ম্মসাক্ষী। (ব.শ.)। ভৃগু পুলোমাকে বিবাহ করেন। পুলোমা নামক এক রাক্ষস ভৃগুপত্নী পুলোমাকে নিজ পত্নী বলে দাবি করে। ভৃগু তা অস্বীকার করেন। তখন রাক্ষস-পুলোমা অগ্নিকে সাক্ষী মানে। অগ্নি রাক্ষস-পুলোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন। তখন সেই রাক্ষস ভৃগুপত্নী পুলোমাকে নিয়ে যেতে চাইলে গর্ভবতী পুলোমার গর্ভচ্যুত হয়ে চ্যবনের জন্ম হয়। তার তেজে রাক্ষস পুলোমার মৃত্যু হয়। এই চ্যবনই রামায়ণকার বাল্মীকির পিতা। ৪. সেই অর্থে অগ্নিসাক্ষী কথাটি প্রচলিত না থাকলেও, এখনও 'আগুন ছুঁয়ে বলো' জাতীয় শপথ কোথাও কোথাও কমবেশি প্রচলিত আছে। ৫. ভারতে দু'তিন রকম সাক্ষীর চল আছে — অগ্নিসাক্ষী, সূর্য্যসাক্ষী, ধর্মসাক্ষী ইত্যাদি। দলিল রেজিস্ট্রি করতে গেলে স্ট্যাম্প পেপারে লিখতে হয়। সেই স্ট্যাম্প পেপারের দাম জমা পড়ে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতে। পরিবর্তে সেই দলিলের চুক্তির ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় পুঁজি সাক্ষী থাকে। এটিই সূর্য্যসাক্ষীর আধুনিক রূপ। বিচারব্যবস্থা যদি কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় তবে সেই সাক্ষ্যকে ধর্মসাক্ষী বলে। সেই সুবাদে অগ্নিধারণকারী কোনো মানুষ (শিখাবহনকারী শিব, ব্রহ্মগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ) যদি সাক্ষ্য দেন, তবে তাকে অগ্নিসাক্ষী বলা যেতে পারে। এমনকি ইংরেজ আমলেও সমাজের জ্ঞানীগুণী মানুষকে সাক্ষী হিসেবে মান্য করা হত। এখন এই প্রথা বিলুপ্ত। সম্ভবত একালের ধর্ম্মরাজ (বিচারব্যবস্থা) মনে করে যে, জ্ঞানীগুণী ও সৎ মানুষ একালে জন্মায় না।

কিন্তু সেকালে জন্মাত। তাঁরাই ভৃগুর বিপরীতে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কেননা, তখনকার কালের রীতি অনুসারে পুলোমার স্ত্রী হওয়ার কথা ছিল পুলোমারই (যেমন জরৎকারু মুনির পত্নীও ছিলেন জরৎকারু বা মনসা)। আর, এই দানবের নাম ও তার স্ত্রীর নাম উভয়ই ছিল পুলোমা। কিন্তু ভৃগু তাকে **স্বতন্ত্র** করে নিয়ে আসেন, যা ছিল সেকালের নিয়মবিরুদ্ধ। সেকালের জ্ঞানের অগ্নিবাহকেরা মিথ্যা বলতে রাজি হননি, তাঁরা যথার্থ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। আর তখন থেকেই 'অগ্নিসাক্ষী' কথাটির প্রচলন হয়ে থাকবে। বলে রাখা ভাল, এই ভৃগু-পুলোমাদি সত্তাগুলি কিন্তু একালের মতো কোনো ব্যক্তিবিশেষ (ইনডিভিজুয়াল) নয়। দ্র. **চ্যবন, পুলোমা**।

অগ্নিস্বাত্ত : ১. অগ্নি, স্বাত্ত। (দ্র. **স্বাত্ত**)। ২. অগ্নি কর্তৃক সম্যক আত্ত (গৃহীত); যাঁহারা শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অগ্নি কর্ত্তৃক ভক্ষিত, শ্রাদ্ধীয় বিপ্রকররূপ অনল হইতে যাঁহাদের সম্যক গ্রহণ। (ব.শ.)। ৩. দিব্যপিতৃগণবিশেষ। ইঁহারা মরীচির পুত্র, দেবগণের ও বিপ্রগণের পিতৃগণ এবং সপ্ত পিতৃগণের প্রথমগণ। মাধবাচার্যের মতে মনুষ্যজন্মে যাঁহারা অগ্নিষ্টোমাদি করেন নাই, কেবল স্মার্ত্ত কর্ম্ম করিয়াছেন,

তাঁহারাই মৃত্যুর পরে অগ্নিস্বাত্তপিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পিতার অস্তিত্ব থেকে যায় পুত্রের ভিতর, তার অস্তিত্ব থেকে যায় তার পুত্রের ভিতর। এইভাবে পুত্রপরম্পরায় যে মানুষেরা থেকে যান, তাঁরাই **পিতৃগণ**। এই পিতৃগণকে খাওয়ানোর অর্থ হল নিজেদের শরীরটিকে বাঁচানো। যাঁরা অগ্নিষ্টোম করতেন, তাঁরা সরাসরি কর্মযজ্ঞে লিপ্ত থেকে জীবিকার্জন করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালের দেবগণ, যাঁরা দানের পরিবর্তে প্রতিদান গ্রহণ শুরু করে দেন, এবং 'বিপ্র'গণ (যাঁরা বিশেষভাবে প্রয়োজন পূর্ণ করেন), তাঁরা কর্ম ত্যাগ করে যথাক্রমে বিনিময়জীবিতা ও জ্ঞানজীবিতা থেকে জীবিকার্জন শুরু করেন। একেই শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত বা শ্রাদ্ধীয় 'বিপ্রকররূপ অনল হইতে' গ্রহণ বলে। একেই শ্রুতি-স্মৃতি বেচে পেট চালানো বা 'শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অগ্নি কর্তৃক ভক্ষিত' বলা হয়েছে। দ্র. **দেবতা, বিপ্র**।

অগ্নিহোত্র : ১. অগ্নি, হু = প্রক্ষেপন। ২. যে কর্ম্মে অগ্নিরক্ষার নিমিত্ত হোম আছে। (ব.শ.)। ৩. অগ্ন্যাধানপূর্ব্বক অগ্নিরক্ষার্থ করণীয় হোমরূপ যাগবিশেষ। যজ্ঞাগ্নিসঞ্চয়, অগ্নিরক্ষণ, অগ্ন্যাধান। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অগ্নি। অগ্নিরক্ষণস্থান, অগ্নিকুণ্ড। ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. বর্তমানে কেবল ব্রাহ্মণের পদবী রূপে 'অগ্নিহোত্রী' শব্দের প্রচলন রয়েছে। এর অর্থ, যাঁরা অগ্নিহোত্র করতেন, এঁরা তাঁদের উত্তরসূরি। ৫. আদিতে সম্ভবত যৌথসমাজের উৎপাদন কর্মযজ্ঞের কোনো বিভাজন ছিল না। পরে তা মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে 'পঞ্চযজ্ঞ' বা 'পঞ্চমহাযজ্ঞ' নাম পায়, যথা — **ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ,** ও **ভূতযজ্ঞ**। তবে কেবলমাত্র দেবযজ্ঞেই হোম করা হত। হোম করার অর্থ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে অগ্নি-শ্রম-সম্পদের সুনির্দিষ্ট বিনিয়োগ। এই যজ্ঞ থেকে উৎপাদিত উৎপন্নকে ভোগ করার জন্য খরচ করা হত না, অগ্নি-শ্রম-সম্পদের রক্ষণ ও বিকাশের (maintenance and development-এর) জন্য খরচ করা হত। পরে পরে এইরূপ উৎপন্নকে প্রতিদানহীন-দানের জন্য খরচ করা হত। আরও পরে এই যজ্ঞের ফলকেই প্রতিদানভিত্তিক-দানের বা বিনিময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। যাঁরা এইরূপ যজ্ঞের পরিচালক ছিলেন, তাঁদের উত্তরসূরিরাই এখন 'অগ্নিহোত্রী' ব্রাহ্মণ। দ্র. **বীতিহোত্র**।

অগ্নীধ্র : ১. অগ্নি + ✓ধৃ + অ (ক) - ক। (ব.শ.)। ২. যিনি অগ্নি আধান (স্থাপন) করেন। (ব.শ.)। ৩. জম্বুদ্বীপের রাজা প্রিয়ব্রতের জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্নীধ্র। পরে তিনিই জম্বুদ্বীপের রাজা হন। তাঁর পুত্র ছিল না। তাই পুত্রকামনায় মন্দার পর্বতে তপস্যায় রত হন। তখন ব্রহ্মা পূর্বচিত্তি নাম্নী অপ্সরাকে তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। তার গর্ভে অগ্নীধ্রের নয়টি পুত্র হয়। (পৌ.অ.)। (ক) অগ্ন্যাধানকারক ঋত্বিকবিশেষ। অগ্নিরক্ষণ ইঁহার কার্য্য। ইনি ষোড়শ ঋত্বিকের ব্রহ্মগণের একতম (দ্র. অগ্নিষ্টোম)। (খ) জম্বুদ্বীপপতি প্রিয়ব্রতের পুত্র রাজবিশেষ। ইঁহার নাভি প্রভৃতি নয়টি পুত্র। এই পুত্রগণের নামানুসারে জম্বুদ্বীপ নয় বর্ষে বিভক্ত। (এরই একটির নাম ভারতবর্ষ।)। (গ) স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র রাজবিশেষ। (ব.শ)। ৪. অপ্র.। ৫. নতুন রকমের কর্মযজ্ঞের প্রতিষ্ঠাকারী একটি পরিচালকগোষ্ঠী। সমাজবিকাশের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে পরিচালকদের বিকাশের একই ইতিহাসকে দুইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হল **উত্তানপাদ-প্রিয়ব্রত**র ইতিহাস। সেখানেও অগ্নীধ্র বিদ্যমান। আর একটি হল মন্বন্তর বর্ণনের ইতিহাস। সেখানেও **অগ্নীধ্র** বিদ্যমান। মোটকথা, কর্মযজ্ঞে যে-চার রকমের, চার-চারে ষোলো রকম ঋত্বিকের কথা '**অগ্নিষ্টোম**'-এ বলা হয়, তাঁদের ভিতর এঁরা ব্রহ্মাগণের (তাত্ত্বিক বিষয়গুলি যাঁরা দেখেন) একতম।

অগ্র : ১. ✓অনৃগ্ + র (রন্) - ক। (ব.শ.)। ২. অন্ (*দ্র.* **অন্**) *গমন রহে যাহাতে।* ৩. প্রথম, আদ্য, প্রধান, শ্রেষ্ঠ, উত্তম, অধিক, উপরিস্থ, উপরিভাগ, উর্দ্ধভাগ, শেষভাগ, সূক্ষ্মশেষাংশ, আগা, ডগা, শিখর, চূড়া, ... (ব.শ.)। ৪. 'সামনে' অর্থে প্রচলিত। ৫. কেউ আগে আগে চলেছে, এমন দেখলে আমরা বলি অগ্রগামী। কিন্তু সেকালে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে কাউকে দেখার যেন কোনো রেওয়াজই ছিল না। যে এগিয়ে চলেছে, সে কোন 'সমগ্রের', জাতির বা গাছের সামনের অংশ, সেই সমগ্রকে, অর্থাৎ জাতি বা গাছটিকেও দেখা হত। তাই আগা, ডগা, উপরিভাগ, উর্দ্ধভাগ ... ইত্যাদি ধারণা। এই ধারণা আরও স্পষ্ট হয় **অগ্রবীজ** শব্দে। ৬. agri(culture)।

অগ্রজ (অগ্রজন্মা, অগ্রজাত, অগ্রজাতি) : ১. অগ্র + ✓জন্ + অ (ড) - ক। ... ইত্যাদি। ২. যে অগ্রে জন্মে, অগ্রে জন্ম যাহার, (অগ্রে জাত যে), যাহার জন্ম শ্রেষ্ঠ বা পূর্ব্ববর্তী। (ব.শ.)। ৩. পূর্ব্বজাত, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, চতুর্ব্বর্ণের অগ্রজাত ব্রাহ্মণ, দেবগণের অগ্রজাত ব্রহ্মা। (ব.শ.)। ৪. জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. যে আগে জন্মেছে সে-ই অগ্রজ, অগ্রজন্মা ইত্যাদি। কিন্তু প্রশ্ন হল ব্রাহ্মণ সবার আগে জন্মেছে — একথার মানে কী? একথার মানে সত্যিই মানুষের আদি যৌথসমাজে সবার আগে ব্রাহ্মণই জন্মেছে। তার আগে কেউই জন্মায়নি, তা নয়। সকলের থেকে নিজেকে পৃথক করেছে সবার আগে **ব্রাহ্মণ**। একালে যেমন আমাদের শেখানো হয়, সমাজকে এককালেই **ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র** করে ভাগ করা হয়েছে, এবং তা যেন ঘটেছে একই সময়ে সবাই মিলে মিটিং করে। কার্যত তা নয়। সমাজ নিজের গতিতেই একসময় জ্ঞানজীবীকে পৃথক করে দিয়ে প্রথমে সমাজটিকে দুভাগ করে। পরে বাকিদের ভিতর থেকে আরও দুটি শ্রেণী বেরিয়ে আসে। দ্র. **নিষাদ, পৃথু**। বাকীরা হয়ে যায় শূদ্র। কিন্তু সে প্রায় নেচারাল ডেভলপমেন্ট। স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে যাওয়া এই চারি ভাগকে 'বর্ণাশ্রম প্রথা' বলে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় কূর্ম্মাবতারের কালে এবং বলতে গেলে অত্যন্ত শুভ উদ্দেশ্যেই তা করা হয়েছিল। কূর্ম্মাবতারের সমুদ্রমন্থনের সময় সেই চারটি ভাগকে অফিসিয়াল স্বীকৃতি দেওয়া হয় ও সচেতনভাবে এই চতুষ্পাদ-নির্ভর সমাজকাঠামো গড়ে তোলা হয়। বৌদ্ধ যুগে এই কাঠামো ভেঙে পড়ে। হিন্দু যুগ (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে যার সূত্রপাত) আবার তার পুনর্বহাল ঘটায়। ব্রিটিশ যুগ তাতে পুনরায় আঘাত করে। স্বাধীন ভারত তাকে প্রকাশ্যে ভাঙে এবং গোপনে রক্ষা করে।

অগ্রবীজ : **১.** অগ্র + বীজ। **২.** *(বৃক্ষের) যে অগ্র ভাগ বীজ রূপে সক্রিয় হয়।* / যাহার অগ্র (শাখাগ্র) বীজ (উৎপাদক)। (ব.শ.)। **৩.** যে বৃক্ষের শাখাগ্র কাটিয়া পুঁতিলে বা অন্য বৃক্ষে বসাইলে জীবিত থাকে ও গাছ হয়। অগ্রবীজবৃক্ষমাত্র; কচের বা কলমের গাছ (viviparous plant)। **৪.** কদাচিৎ ব্যবহৃত। **৫.** অগ্র (বা গমন অন যাহাতে, অস্তিত্বের আগুয়ান অংশ) যখন বীজ রূপে সক্রিয় হয়, তাই অগ্রবীজ। আর বীজ হল জননসাধন (যাহার দ্বারা জনন সাধিত হয়) ...। সেকালে একে 'কচ'ও বলা হত। (দ্র. **কচ**)। কচকে কলমও বলা হয়। কলম হল 'সমজাতি চারা গাছের সহিত বড় গাছের সরু ডাল, ছাল চাঁছিয়া ও বাঁধিয়া জোড় লাগাইলে, যে নূতন গাছ হয়, তাহা 'কলম' বা 'জোড়কলম' [graft]। কথাটি কলম কাটা ... কলম করা — কলম বাঁধা। কলম বসান, লাগান — কলম পোঁতা, ইত্যাকার অর্থেও প্রচলিত। সেই সূত্রে একটি জাতির কিছু মানুষ অন্য জাতির মধ্যে থেকে নিজ জাতীয় চরিত্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও তার বিকাশ সাধন করলে, সেই মানুষেরাও তাঁদের জাতির অগ্রবীজ হন।

অগ্রসর : **১.** অন্‌গ্‌ = ?, সৃ = সরণ। *('যার পরে আর গমন নাই', এই অর্থে অগ; অগ রহে যাহাতে = অগ্র।)* / অগ্র + ✓সৃ + অ (ট) - ক। (ব.শ.)। **২.** *যে আগে আগে সরে।* / যে অগ্রে যায়। (ব.শ.)। **৩.** অগ্রগামী, পুরঃসর, পুরোগামী। (ব.শ.)। **৪.** এগোনো অর্থে প্রচলিত। **৫.** ইংরেজি aggressor শব্দটি অগ্রসর শব্দের সহোদর বলেই মনে হয়। পার্থক্য কেবল এই যে, অগ্রসর-এর দর্শক থাকে অগ্রসর-এর পেছনে; আর aggressor-এর দর্শক থাকে aggressor-এর সামনে। আগ্রাসন ও aggression সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। **৬.** aggressor।

অগ্রহার : **১.** অগ্র, হৃ = হরণ। / অগ্র + ✓হৃ + অ (অণ্) - ক। (ব.শ.)। **২.** যে অগ্র গ্রহণ করে। (ব.শ.)। **৩.** অগ্রহারক। অগ্রার্থ হার (পৃথককৃত ক্ষেত্রাদি)। ব্রাহ্মণভোজনার্থ রাজধন হইতে পৃথককৃত ক্ষেত্রাদি। ব্রাহ্মণজীবিকার্থ রাজদত্ত ক্ষেত্র বা গ্রাম। শাসন। ব্রহ্মোত্তরভূমি। ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য হইতে উদ্ধৃত ও ব্রাহ্মণোদ্দেশে স্থাপ্য ধান্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** অগ্র.। **৫.** সবার আগে যা হরণ হয়ে যায়। উৎপাদনের যে প্রথম অংশটি ব্রাহ্মণদের নিকট চলে যেত, সেই অংশ। মনে রাখা ভালো, ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করা ভারতের রাজধর্মই শুধু ছিল না, প্রজাদেরও সেটাই ধর্ম ছিল। অন্যকে ভরণ করাই যে দেশের একমাত্র কর্তব্য, তাকে সেকারণেই ভারত বলা হত। অগ্রহার ছিল সেই ভরণের নাম। বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ভারতের অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে এই 'অগ্রহার' ব্যবস্থা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

অঙ্ : **৫.** 'অঙ্' শব্দের থেকে আমরা জেনেছি, 'অঙ্'-এর সঙ্গে অন্যান্য বর্ণ যুক্ত হয়ে তাকে ব্যক্ত করে তোলে; এবং তেমন বহুব্যবহৃত উদাহরণ হল — **'ব্যক্ত'**, **'অঞ্জলি'**, 'সামঞ্জস্য' ইত্যাদি। অমরকোষ উল্লেখ করে হরিচরণ জানিয়েছেন যে, 'অঞ্জস্' হল সেইরূপ আচার, যা 'উচিত' (উচ্ + ইত)। আমরা জেনেছি, অন্‌চ্- এরই এক পরবর্তী পর্যায় হল 'উচ্'। অতএব, সেই হিসেবে অস্তিত্বের যে-ক্রিয়াগুলি তার স্বাভাবিক উৎ-গামিতা বা আত্মপ্রকাশ রূপে চলে, সেগুলি সবই অঞ্জ। সেই 'অঞ্জ'-এর সমাপ্তি পর্যন্ত যত রূপ, তাদের সমষ্টি হল 'অঞ্জঃ' বা 'অঞ্জস্'।

অঞ্জন : **১.** অঞ্জ্ = ব্যক্তন, প্রকাশন, মাখানো। / ✓অঞ্জ্ + অন - কর্তৃবাচ্যে। **২.** *'অন্ (on) জনককে জনন করে যে'। (এই 'অন্' চলন্-এর 'অন্')* / যে রব দ্বারা শুভাশুভ ব্যক্ত করে; যাহা দ্বারা চক্ষু লিপ্ত হয়। (ব.শ.)। **৩.** অঞ্জনবান, পশ্চিমদিকের দিগগজ। পর্ব্বতবিশেষ, নীলগিরি। জ্যেষ্ঠীবিশেষ, আঁজনি। গতি, ম্রক্ষণ, অভ্যঞ্জন। লেপন, অলঙ্করণ। মিশ্রীকরণ। ব্যক্তিকরণ, প্রকটন, প্রকাশন। অঞ্জন ষড়বিধ (সপ্তবিধ?) — সৌবীর জাম্বল তুথ ময়ুর শ্রীকর দর্ব্বিকা নীলমেঘ। কাজল। (ব.শ.)। **৪.** নাম রূপে ব্যবহার ছাড়া এই শব্দের অন্যরূপ প্রচলন এখন আর নেই। **৫.** সেকালের পণ্ডিতেরা মনে করতেন অস্তিত্বের (মানুষের, সমাজের) আটটি দিক রয়েছে, সেই আটদিকের রক্ষা করে আটটি সংগঠন (পর্ব্বত)। সমাজের সেই অষ্টদিকের পশ্চিম (ভবিষ্যৎ) দিকটি যাঁরা রক্ষা করেন, তাঁদের বলা হত অঞ্জন। এদিকটি যাঁরা দেখাশোনা করেন, তাঁরা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। সেকালে সমাজ পরিচালক শিবগুণসম্পন্ন মহর্ষিরা, অম্বিয়ারা (তাপসরা), saint-রা সমাজকে সামনের সেই ভবিষ্যৎ বিষয়ে পথ দেখাতেন। সেই স্বপ্ন কদাচিৎ অ্যাডভেনচারিস্ট বা মৌলবাদীও হয়ে থাকে। তখন সেগুলি সমাজের রোগলক্ষণ, অঞ্জনী বা আঁজনি। আজকের বিচারে, কট্টর ভবিষ্যৎ-কাঙ্ক্ষী মৌলবাদ পরিচালিত রাষ্ট্রগুলি আঁজনিতে ভুগছে। দ্র. **অষ্ট**। ব্যক্তির ক্ষেত্রে অঞ্জন হল ভবিষ্যতের প্রকল্প, কাজল, যা আমাদের কীভাবে কখন কী করতে হবে সে-বিষয়ে সচেতন করে। আমাদের স্কুল-কলেজগুলি সেই জ্ঞানাঞ্জনশলাকা বা কাজলপাতির কাজটি করে। কিন্তু সেই কর্মজ্ঞান 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তিমূলক' গড্ডালিকায় পরিণত হয়ে গেলে, তা কখনো কখনো চোখের রোগে পরিণত হয়, তখন তার নাম আঁজনি। কোনো ভৌগোলিক পর্ব্বত যখন কখনও কোনো দেশের পশ্চিমদিককে রক্ষার কাজ করেছে, তখন তার নামও হয়েছে পশ্চিমদিকের দিগগজ। যেমন উড়িষ্যার নীলগিরি কিংবা মাদ্রাজের নীলগিরি। সৌবিরাদি অঞ্জন (?)। চোখে মাখানো এই অঞ্জন ধারণার উত্তরাধিকার রয়েছে ইংরেজি 'anoint' শব্দে যার মূলে ল্যাটিন unguere বা অনজ্।

তবে প্রদীপশিখার কালি দিয়ে কাজলদানিতে কালি তুলে শিশুদের চোখে লাগানোর যে প্রথাটি গ্রামবাংলায় আজও প্রচলিত রয়েছে, তার কথাটি যাঁরা শিশুশিক্ষা-বিশেষজ্ঞ তাঁরা ভেবে দেখতে পারেন। এখানে একটি সমান্তরাল সত্য রয়েছে, যে সমান্তরাল সত্যের বিষয়ে আরও জানার জন্য আমাদের পূর্বপ্রকাশিত (জ) গ্রন্থের 'ঝর্নাধারা থেকে সৃষ্টিধারা' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। এখানে সেইরূপ সমান্তরাল সত্য হল, সেকালে জ্ঞানের অগ্নিশিখা বহনকারী ছিলেন সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞে কর্মরত শিবস্বরূপ মানুষেরা। তাঁদের অভিজ্ঞতা (জ্ঞানের অগ্নিশিখার কালি) পরবর্তী প্রজন্মকে শেখানো হত সেই অভিজ্ঞতার গল্প-কাহিনী-রূপকথার সাহায্যে। এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মের

জগদ্দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার থাকত। সমান্তরাল ভাবে প্রদীপের অগ্নিশিখার কালি সংগ্রহ করা হত কাজলদানিতে, এবং তা লাগিয়ে দেওয়া হত শিশুর চোখে। তারও চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার থাকত। এই সমান্তরাল বোধ কীভাবে সেকালের মানুষ অর্জন করেছিলেন, ভাবতে অবাক লাগে! **৬.** anoint, unguere।

অঞ্জনা : ১. অঞ্জন + আ। ২. *যে অঞ্জনের আধারশক্তিরূপে ক্রিয়া করে; যে (প্রকৃতি) কাজল পরেছে।* ৩. (ক) অঞ্জনবর্ণযুক্তা, ঈশানদিকের দিককরিণী। (খ) কেসরীর পত্নী, হনুমানের জননী, বানরীবিশেষ। ইনি পূর্বজন্মে পুঞ্জিকস্থলা নামে অপ্সরা ছিলেন। ঋষিশাপে বানররাজ কুঞ্জরের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। মারুত (বায়ু) যোনিসম্বন্ধ বিনা ইঁহার গর্ভে যে বীর্য্য নিহিত করেন, তাহা হইতেই মহাবল মহাসত্ত্ব মহাতেজা বুদ্ধিমান হনুমানের জন্ম হয়। (ব.শ.)। ৪. বর্তমানে নাম রূপে ছাড়া এই শব্দ ব্যবহার হয় না। ৫. একালে সাধারণভাবে অঞ্জনাকে 'কাজলি মেয়ে' বলা যেতে পারে। কিন্তু আদিতে অঞ্জনা তেমন সাধারণ প্রকৃতিকে বোঝাত বলে মনে হয় না। আদি পুঁজির ধারক-বাহক জনগোষ্ঠীকে **পুঞ্জিকস্থলা** বলা হত। পুঁজিবিরোধী (সমাজতন্ত্রবাদী) মহর্ষিদের শাপে তারা বিনাশপ্রাপ্ত হলেও, পরে তারা কুঞ্জরের অংশে উদ্ভূত হয় ও বিকাশ লাভ করে। যে সমাজ-সংগঠনের ভিতরে ব্যক্তিমালিকানা বেড়ে ওঠার অবকাশ স্বরূপ গোপন গহ্বরাদি ('pores of the society' – Marx) থাকে তাকে **কুঞ্জর** বলে। (দ্র. **কুঞ্জ** = 'পর্ব্বতাদির লতাপল্লবাদিতে সমাচ্ছন্নগর্ভ গহ্বরাদি দেশ'। ব.শ.) পরে, আমলাকেরানি (**বানর**) সম্প্রদায়ের আধার (প্রকৃতি) রূপে তারাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্জনকারী মহাপণ্ডিতদের (**হনুমানের**) জন্ম দেয়। এর জন্য অবশ্য আদি মিডিয়ার (বা **বায়ু**র) মাধ্যমে যথেষ্ট জ্ঞান (information) সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল, তাই বায়ুর সঙ্গে সেই অঞ্জনার (জনগোষ্ঠীর) সম্পর্কের কথা বলা হয়। এর সঙ্গে রামের সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায় '**পঞ্চঝুঁটি**'র কারণে। জিনিসটি অঞ্জনার ছিল রামেরও ছিল। দ্র. **পঞ্চশিখ**। **৬.** en-gineer।

অঞ্জলি : ১. অঞ্জ, অল্ = নিবারণ, অলঙ্করণ। ২. *অন্ (on) জনক অলম্ কৃত যাহাতে। / যাহা দ্বারা বিনয় প্রকাশিত হয়।* (ব.শ.)। ৩. কুব্জীকৃত ও মিলিত করতলদ্বয় ... করপুট, আঁজলা। (ব.শ.)। ৪. নামরূপে ও পূজার অঞ্জলি রূপে প্রচলিত। ৫. কাজ করে হাত। হাতই অন্-জনক। তাকে কাজ বন্ধ রেখে জড়ো করে তুললে তা অলম্ কৃত হল, অলঙ্কৃতও হল। নিষেধাত্মক অলম্ শব্দটি এইভাবে সৌন্দর্যবোধক হয়ে যায়। তার ওপর হাতের মালিক ধরা যাক সুগন্ধী ধান থেকে চাল বানাচ্ছিলেন, আপনি গিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর কাজ গেল থেমে, এক আঁজলা চাল তুলে ধরলেন আপনার দিকে। এতক্ষণ হাত আনয়ন কর্মে (আয়ে) ব্যস্ত ছিল, এবার সে 'বিনয়ন' কর্মে (দেওয়ায়) নিয়োজিত হল। সমাজের রীতি হয়ে গিয়ে সেটিই অতএব 'বিনয়' প্রকাশকও হয়ে যায়। দ্র. **অলঙ্কার**।

অঞ্জস : দ্র. **অঞ্জ**।

অঞ্জসা : ৫. শব্দটি ব.শ.-তে নেই, নেই প্রচলিত অভিধানগুলিতেও। কিন্তু অমরকোষে রয়েছে। অর্থ দেওয়া আছে দুটি — 'তত্ত্ব' ও 'দ্রুততার নাম' (যেমন ঝটিতি)। কেন এরকম অর্থ, তার কারণ বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে '**অঞ্জ**' শব্দে। দ্র. **অঞ্জ**।

অব্যগ্র : ১. অ + বি - ✓অন্গ্ + র - ক। দ্র. **অগ্র**। ২. *নয় ব্যগ্র যে।* দ্র. **ব্যগ্র**। ৩. অনাকুল, অব্যস্ত, অব্যাপৃত, অবহিত। (ব.শ.)। ৪. কম প্রচলিত।

অব্যঙ্গ : ১. অ + বি - ✓অন্জ্ + অ। ২. *যে অঞ্জন অবিকৃত আছে।* ৩. অবিকলাঙ্গ, অবিকল। (ব.শ.)। ৪. কম প্রচলিত।

অব্যঙ্গ্য : ১. অ + বি - ✓অন্জ্ + য। (ব.শ.)। ২. *অব্যঙ্গ থাকে যাহাতে।* / যে কাব্যে ব্যঙ্গ্য নাই। (ব.শ.)। ৩. ব্যঙ্গ্যার্থরহিত, ব্যঞ্জনাশূন্য। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.।

অব্যঞ্জন : ১. অ + বি - ✓অন্জ্ + অন - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নেই ব্যঞ্জনা যাহাতে।* ৩. লক্ষণশূন্য, সুলক্ষণহীন, অব্যক্ত, অব্যক্তজাতিগতলক্ষণ, ব্যঞ্জনারহিত। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.।

অভিব্যক্ত : দ্র. **অভি, ব্যক্ত**।

অভিব্যক্তি : দ্র. **অভি, ব্যক্তি**।

অসমঞ্জ, অসমঞ্জাঃ, অসমঞ্জস্ : ১. অঞ্জ্ = প্রকাশন, স্ফুটীকরণ। ২. *যাহাতে সম্যক 'অঞ্জসা' নাই।* ৩. সগররাজের পুত্র। অযুক্ত, অন্যায়, অসঙ্গত। অসমগ্র, অস্পষ্ট, অস্ফুট। অসম্বদ্ধ, অসম্ভব। অসঙ্গতি, বৈষম্য, ভেদ। (ব.শ.)। সগররাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র। সগর রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী বিদর্ভরাজ কন্যা কেশিনী এবং কনিষ্ঠা মহিষী কশ্যপের কন্যা ও গরুড়ের ভগিনী সুমতি। ... ভৃগুর বরে কেশিনীর গর্ভে অসমঞ্জ এবং সুমতির গর্ভে ষাটহাজার পুত্র হয়। কালক্রমে অসমঞ্জ অত্যন্ত পাপাচারী ও দুরাত্মা হয়ে উঠলে পিতা তাঁকে নির্বাসিত করেন। সগরের যজ্ঞাশ্বের অন্বেষণে তাঁর ষাট হাজার পুত্র যখন কপিলমুনির ক্রোধে ভস্ম হয়, তখন অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান কপিলমুনিকে সন্তুষ্ট করে যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে আনেন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ। (পৌ.অ.)। ৪. অসমঞ্জ শব্দটি প্রচলিত না থাকলেও 'অসামঞ্জস্য' শব্দটি বহুল প্রচলিত। ৫. 'বিরোধের উপর সামঞ্জস্যের চাদর বিছিয়ে চলা'ই সমাজ পরিচালনার সহজ রীতি। এর অর্থ প্রতিটি পক্ষের সবকথা স্পষ্ট না-করা, **কাজল** (**অঞ্জন**) লাগিয়ে ঢেকে দেওয়া। তাতে বিরোধ কমে আসে, সামঞ্জস্য হয়। কিন্তু কাজল না লাগালে? না-লাগালে প্রত্যেক পক্ষের সবকথা স্পষ্ট হয়ে সামনে আসে এবং তাতে বিরোধ বাড়ে। অসমঞ্জ এই কাজল বিরোধী-সত্তা। দ্র. **অঞ্জন**।

আঁজলা, আঁজি, আঁজিনা, আঁজিলা, আঁজুল : দ্র. **অঞ্জলি**।

আগ, আগরী, আগলদিঘল, আগলসুক্য, আগলা, আগলি, আগা, আগাও, আগাড়, আগাড়ি, আগারে, আগালে, আগি, আগিলা,

আগু, আগুয়ান, আগে, আগেকার, আগোর, আগোরি : দ্র. **অগ্র**।

আগুন : দ্র. **অগ্নি, অগ্রসর, আগুয়ান, আগুসার (আগুন)**।

আগ্নিমাঠর : ১. অগ্নি, মঠ্ = নিবাস, মর্দ্দন। ২. *যাহা অগ্নিমঠে (তেজকেন্দ্রে) থাকে*। ৩. মাঠর = সূর্যসমীপবাসী। (ব.শ.)। মহর্ষি বাস্কল ঋগবেদের প্রথম চার শাখাকে চার ভাগে বিভক্ত করে বৌধ্য, আগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর নামে নিজের চারজন শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. অর্থ ও শাসনক্ষমতার কেন্দ্রে যারা থাকে।??

আগ্নীধ্র : ২. *অগ্নি ধারক হইতে জাত*। / যাহাকে ধন দ্বারা বরণ করতে হয়। (ব.শ.)। ৩. অগ্নিপ্রজ্বালয়িতার শরণ (গৃহ) বা হোতৃগৃহ। অগ্নিধ্র। সাগ্নিক দ্বিজ। সাগ্নিক দ্বিজ-যজমান। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. উৎপাদন কর্মযজ্ঞের হোতাদের একজন অগ্নিধ্র। তার থেকে এসেছে যে, সে হল আগ্নিধ্র। এটা কাদের বোঝাতো, তা অনুমানসাপেক্ষ। — এর আরও একধরনের অর্থ হতে পারে। যতদূর বোঝা যায়, একটা যুগ ছিল, যখন সব মানুষের কাছে আগুন থাকত না। আগুন সম্পর্কিত জ্ঞানকেই বিশাল জ্ঞান বলে মনে করা হত। স্বভাবতই আগুন পোষাও একটা গুরুত্বপূর্ণ আচার ছিল এবং বাহ্যিক আগুন সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাবে সবাই তা করতে সাহস পেত না, করত না, কিংবা ভয় পেত; যেভাবে গরু-ছাগল আগুনকে ভয় পায়। তখন আগুন নিয়ে নাড়াচাড়া করত মুষ্টিমেয় কিছু 'জ্ঞানী' মানুষ। আগুন জ্বালাতে গেলেই তাদের কাউকে ডাকতে হত, বা তার কাছ থেকে আগুন নিতে হত। এই জ্ঞানীরা ছিলেন 'সাগ্নিক ব্রাহ্মণ'।

আরও একটা গভীর অর্থ এই হতে পারে যে, কর্মযজ্ঞের বিদ্যাবুদ্ধিও তো **অগ্নি**, এবং সে অগ্নিও সকলের কাছে থাকত না। থাকত একমাত্র জ্ঞানের অগ্নিশিখাবহনকারীদের হাতে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের হাতে, সেকালের স্পেশালিস্টদের হাতে। যাঁরা কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন, তাঁরা স্বাভাবিক কারণেই সেই সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের ডাকতেন, বরণ করে নিতেন, ধন দিয়ে। হয়তো তাঁরাই কর্মযজ্ঞের অগ্নিধ্র হতেন। দ্র. **প্রিয়ব্রত, বরাহ**।

আগ্নেয় : ১. অগ্নি + এয়। ২. *যাহা অগ্নির সম্বন্ধে সম্পর্কিত থাকে*। ৩. ক) দেবসেনাপতি কার্তিকেয় অগ্নিসম্ভূত বলে অগ্নিজ ও আগ্নেয় নামে অভিহিত হতেন। খ) অগ্নিসম্ভূত অঙ্গিরাগণ আগ্নেয় নামে খ্যাত ছিলেন। (পৌ.অ.)। অগ্নিসম্বন্ধী, ... কার্ত্তিকেয়। আগ্নেয়গিরি। অগ্ন্যুপাসক। অগস্ত্যমুনি। অগ্ন্যাধিষ্ঠিত মাহিষ্মতীপুরীবিশিষ্ট দক্ষিণাপথস্থিত দেশবিশেষ। ... (ব.শ.)। ৪. অগ্নিসম্বন্ধী অর্থে প্রচলিত। ৫. আগুন-শ্রম-জ্ঞান-সম্পদ ইত্যাদি (শক্তি/এনার্জি) সম্পর্কিত।

আগ্নেয়াস্ত্র : ১. অগ্নি, অস্ত্র। ২. *যে অস্ত্র (বাহ্যিক বা মানসিক কিংবা উভয় প্রকার) অগ্নি দ্বারা নির্মিত*। / যে অস্ত্র অগ্নি দ্বারা চালিত। (ব.শ.)। ৩. অগ্নির পুত্র অগ্নিবেশ্যকে ভরদ্বাজ প্রদত্ত অস্ত্র। অগ্নিবেশ্য এই অস্ত্র দ্রোণকে দিয়েছিলেন এবং দ্রোণের কাছ থেকে অর্জুন এই অস্ত্র লাভ করেন। (পৌ.অ.)। নালিকাস্ত্র — কামান বন্দুক ইত্যাদি। অগ্নিদেবতাক অস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মশিরঃ-পাশুপতাদি অস্ত্র। ঔর্ব্বমুনি কর্ত্তৃক সগররাজকে প্রদত্ত অস্ত্রবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. কামান বন্দুক অর্থে প্রচলিত। ৫. যতদূর বোঝা যায়, এই সকল অস্ত্রের একটিও তথাকথিত হাতিয়ার নয়, কামান বন্দুক তো নয়ই। অগ্নির যে মানসরূপ, জ্ঞান-শ্রম-সম্পদ, এই তিনের কোনো একটি, দুটি বা তিনটিই শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। তারই কোনো রকমফের **ভরদ্বাজ** অগ্নিবেশ্যকে, অগ্নিবেশ্য **দ্রোণ**কে দিয়েছিলেন এবং **ঔর্ব্ব**মুনি **সগর**রাজাকে দিয়েছিলেন। সেই অস্ত্রের জোরেই সগররাজা ভারতসমাজের অধিকাংশ মানুষকে (শক, যবন, কম্বোজ, পারদ, পহ্নব, বঙ্গ, কেরল, কোলসব্য, মহিষ, দার্ব্ব, চোল, খশ, তুখার, চীন, মদ্র, কিষ্কিন্ধক, কৌন্তল, শাল্ব, কোঙ্কণ) 'বেদবহিষ্কৃত ক্ষত্রিয়' বলে ঘোষণা করে '**ম্লেচ্ছ**' করে দিতে পেরেছিলেন। আর তা পেরেছিলেন কেবল এই আগ্নেয়াস্ত্রের জোরে। এটি যে কামান বন্দুক নয়, তা চিনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে, 'রাজশাসনে' নয়, 'ধর্মের শাসনে' এই কাণ্ড ঘটানো হয়েছিল। ধর্ম হল সেকালের ভাষায় আইন, যার ভিত্তিতে রয়েছে বিশ্বাস ও ভক্তি। তাই দিয়ে এই আইন-অস্ত্রটি তৈরি করা হয়েছিল। এই আগ্নেয়াস্ত্র সগররাজা পেয়েছিলেন ঔর্ব্ব ঋষির কাছ থেকে। দ্র. **ঔর্ব্ব, ইন্দ্রধনু, ধনু**।

ব্যক্ত : ১. বি + ✓অন্জ্ + ত। (ব.শ.)। ২. *যাহা বিশেষ ভাবে অঞ্জিত বা প্রকাশিত*। ৩. প্রকাশিত, ব্যক্তিমান, জ্ঞানবিষয়তাপন্ন, দৃষ্টিগোচর, ইন্দ্রিয়বিষয়ীভূত, কার্য্যরূপ, স্ফুট, স্পষ্ট, প্রাজ্ঞ, বিষ্ণু, পণ্ডিত, (ব্যক্তগণিত = পাটিগণিত; ব্যক্তদৃষ্টার্থ = সাক্ষী; ব্যক্তরাশি = জ্ঞাতসংখ্যা বা known quantity; ব্যক্তরূপ = বিষ্ণু; ব্যক্তলবণ = অধিকলবণ; ব্যক্তবাক্ = স্ফুটবাক্য-মনুষ্যাদি; ব্যক্তবিক্রম = প্রকটিতশৌর্য্য।) (ব.শ.)। ৪. প্রকাশিত বা expressed অর্থে প্রচলিত। ৫. যা দেখা বা বোঝা যাচ্ছে, তাই প্রকাশ করাকে বলে 'অক্ত' করা। কিন্তু প্রকাশের সেই সোজা পথ ছেড়ে বিপথ বা বিশেষ পথ ধরলে যেরকম প্রকাশ ঘটে, তাকেই 'বি-অক্ত' বা ব্যক্ত বলে। এর ভাল আছে, মন্দও আছে। ভাল রয়েছে অন্তর্নিহিত সত্য প্রকাশে, মন্দ রয়েছে প্রকাশকে বিশেষ উদ্দেশ্যে বিকৃত করায়, সত্যগোপনে। মানুষ কখনই 'অক্ত' করতে পারে না, যাই করুক সেটা মানুষের প্রকাশের বিশেষ পথ; অন্য জীবের কাছে যা বোধ্য নয়। তাই 'অক্ত' কথাটির প্রচলন নেই। দ্র. **বি**।

ব্যক্তি : ১. বি + ✓অন্জ্ + তি। (ব.শ.)। ২. *'ব্যক্ত' যাহাতে গতিলাভ করে; যে আপনাকে (নিজের কথাকে) ব্যক্ত করে। /* যাহার দ্বারা ব্যঞ্জন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. প্রকাশন, প্রকটীভাব, প্রভব, কার্য্যাকার, স্পষ্টতা, স্থাবরজঙ্গমলক্ষণ সর্ব্ব, প্রকাশ, অবয়ব বিশিষ্ট দ্রব্যমাত্র, বিভক্তি, লোক, জন। (ব.শ.)। ৪. individual man অর্থে প্রচলিত। ৫. ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি জানা থাকলে বোঝা যায়, শব্দটির অতগুলি প্রতীকী অর্থ নিতান্ত বাজে কথা নয়; সবগুলিই ঠিক। এবং হরিচরণ যথার্থ কাজই করে গেছেন।

ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জনা : ১. বি + ✓অন্জ্ + অন; বি + ✓অন্জ্ + ই + অন্ - ভা + স্ত্রী আ। (ব.শ.)। ২. *বিপরীত বা বিশেষ অঞ্জ অন থাকে যাহাতে; ব্যঞ্জন-এর আধার যে।* ৩. প্রকাশন, ভঙ্গিভাষণ, লক্ষণ, স্ত্রীপুংসচিহ্ন, স্ত্রীপুরুষের স্তনশ্মশ্রু প্রভৃতি লিঙ্গসূচক চিহ্ন, অবয়ব, যৌবনচিহ্ন, ছত্রচামরাদি উপকরণ, রোগলক্ষণ, চিহ্ন, উপস্কর, বিবরণ, প্রকাশক, স্মারকলিপি, (ব্যঞ্জনকার = রান্না করে যে), বক্রোক্তি, (অভিধা লক্ষণা ও তাৎপর্য্য স্ব স্ব অর্থ প্রকাশপূর্ব্বক বিরত হইলে, শব্দের যে শক্তি দ্বারা অভিধাদিভিন্ন অন্য অর্থ বুঝায়, তাহা 'ব্যঞ্জনা'। (ব.শ.)। ৪. consonant, well-expressed, ও 'তরকারি' অর্থে প্রচলিত। ৫. ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে নির্ভর করলে দেখা যায়, হরিচরণ প্রদত্ত সব অর্থগুলিই যথার্থ।

সমঞ্জস, সামঞ্জস্য : ২. যাহাতে সম্যক্ অঞ্জসা (তত্ত্ব) আছে; উচিত হইতে অচলন যাহাতে। (ব.শ.)।

'অট্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অট্, অট, অট-অট, অটন, অটনী, অটবি, অটবী, অট্ট, অট্ট, অট্ট-অট্ট, অট্টট্ট, অট্টহসিত, অট্টহাস, অট্টহাসি, অট্টহাস্য, অট্টাল, অট্টালক, অট্টালিকা, অট্টালিকাকার, অট্টালী, অনটন, অনাটন, আঁট, আঁটসাঁট, আঁটা, আঁটি, আঁটু, আঁটুনি, আঁঠি, আটন, আটপ, আটব, আটবিক, আটবী, আটলা, আটা, আটা-আটি, আটাকাঠি, আটা-নেবড়ান, আটাল, আটি, আঠাল, এঁটুলি, এঁটে, এঁটেল, পর্য্যটন, হাঁট, হাঁটকা, হাঁটন, হাঁটা, হাঁটান, হাঁটাহাঁটি, হাঁটু (হাঁঠু), হাঁটুকাদা, হাঁটুজল, হাঁটুপানি, হাঁটুভাঙা, হাট, হাটা, হাটান, হাটিতে-বসিতে, হাটু,

অট্ = অস্তিত্বের টঙ্কারণ। **অট** = অস্তিত্ব টঙ্কারিত হয় যাহাতে। (at-, auto-, Atlas)।

অট্ : ৫. অস্তিত্বের টঙ্কারণ। অস্তিত্ব যেন এক বৃত্ত, তার কেন্দ্র থেকে অস্তিত্বের প্রাণ বা আত্মা যেন তার পরিধিতে গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে, একেই অস্তিত্বের টঙ্কারণ বলা হচ্ছে।

অট : ১. ✓অট্ + অ (অচ্) - ক। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্ব টঙ্কারিত হয় যাহাতে*। ৩. ভ্রমণকারী, যাও। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. অস্তিত্ব যখন নড়ে চড়ে, তখনই তা টঙ্কারিত হয়। মানুষের সোল্লাস বেঁচে থাকার মধ্যে, হাসি-মস্করার মধ্যেও এই অস্তিত্বের **টঙ্কার** থাকে। এমনকি, যে-খাটে সে শুয়ে থাকে, যে গৃহে সে বাস করে, যে পরিবারে-গোষ্ঠীতে-প্রতিষ্ঠানে সে থাকে, যে মানসলোকে সে বিহার করে, সেই সব ক্ষেত্রেই তার টঙ্কার থাকতে পারে এবং থাকেও। অনটন, অট্টালিকা প্রভৃতি শব্দে আমরা তার নিদর্শন পাব। বঙ্গীয় শব্দকোষ রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন কোনো কোনো মানুষ 'অট-অট হাসে, কটমট ভাষে'। এই **'কটমট'** শব্দটি **'খটমট'** রূপেও প্রচলিত আছে। লোকে কটমট করে তাকায়, খটমটে ভাষায় কথা বলে। দ্র. **কটমট, খটমট**। ৬. auto।

অটন, অনটন : ১. ✓অট্ + অন - ভা। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের টঙ্কার অন থাকে যাহাতে*। ৩. গতি, পর্য্যটন, পরিক্রমণ। (ব.শ.)। ৪. পরি + অটন = **পর্য্যটন**; ন + অটন = অনটন; এভাবে উপসর্গাদির যোগে প্রচলন থাকলেও শব্দটি এখন স্বরূপে অপ্রচলিত। ৫. বঙ্গীয় শব্দকোষ দেখিয়েছেন, অটন শব্দটি 'ভিক্ষাটন', 'বিপিন-অটন' ইত্যাকার রূপে সেকালে ব্যবহৃত হত। এখন হয় না। কিন্তু অনটন শব্দটি আমাদের দেখিয়ে দেয়, এই অটন কেবল দৈহিক চলা নয়, সংসার চলা ও মানসিক চলার কথাও বোঝায়। ৬. aut-, auto-যুক্ত অজস্র ইংরেজি শব্দে এর উত্তরাধিকার রয়েছে।

অটনি, অটনী : ১. ✓অট্ + অনি - ক। ২. *অট্ অন করে যে, তাহার আধার*। / যাহা জ্যা প্রাপ্ত হয়। (ব.শ.)। ৩. চাপাগ্র, ধনুষ্কোটি, ধনুকের হুল। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ধনুকের ছিলা টেনে ধনুকে টঙ্কার তোলা হয়। সেই সুবাদে ছিলাই অটনি করে, সেকারণে ছিলাই 'অটনী' পদবাচ্য। তার দ্বারাই জ্যাধ্বনি বা ধনুষ্টঙ্কার করা যায়। ৬. দ্র. **অট**।

অটবি, অটবী : ১. ✓অট্ + অবি। স্ত্রী ঈ। (ব.শ.)। ২. *অট্ বহনের বিকাশ যাহাতে, তাহার আধার*। / মৃগয়ার্থে যেখানে যায়; বার্দ্ধক্যে যেখানে যায়। (ব.শ.)। ৩. অরণ্য, বিপিন, বন। (ব.শ.)। ৪. কম প্রচলিত। ৫. অট্ বহনের বিকাশ যাহাতে, তাহার আধার প্রতিষ্ঠানও হয়। সেকালে প্রতিষ্ঠান মাত্রকেই বৃক্ষ বলা হত। সেই সুবাদে বৃক্ষসমূহের আধার বা বনকেও অটবী বলা হত। মহাভারতে একে বলা হয়েছে 'সংসার-অরণ্য'। ৬. দ্র. **অট**।

অট্ট, অট্টালিকা : ১. ✓অট্ট্ + অ (অচ্) - ক। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের টঙ্কার টঙ্কারিত হয় যাহাতে*। / যাহা অতিক্রম করে; যাহা অন্য গৃহ অতিক্রম করে; যে স্থানে বিক্রয়ার্থ পশুবধ হয়। (ব.শ.)। ৩. অট্টালিকা, প্রাসাদের উপরিস্থিত গৃহ, প্রাকারাগ্রস্থিত রণগৃহ, প্রাকারমণ্ডপোপরি-শালা, উচ্চস্থানে নির্ম্মিত ভূমিকা, গৃহবিশেষ, দুর্গপ্রাকার, ক্ষৌমবস্ত্র, হিংসা, অতিশয়, বিপণি, আপণ, হাট, বাজার। (ব.শ.)। ৪. কেবলমাত্র অট্টহাসি ও অট্টালিকা শব্দে 'অট্ট' শব্দের ব্যবহার এখনও প্রচলিত। ৫. হাসির ভিতরে, গৃহের ভিতরে অট স্বভাবতই বিদ্যমান। তাই হাসি মাত্রেই অট-হাসি (ভারতচন্দ্র যাকে বলেছেন 'অট-অট হাসি') এবং গৃহ মাত্রেই অট-গৃহ। কিন্তু যে হাসিতে অস্তিত্বের টঙ্কার টঙ্কারিত হয়, সে হল অট্টহাসি; এবং যে গৃহে তা হয় সে হল অট্ট-গৃহ বা অট্টালিকা। ৬. দ্র. **অট**।

আঁট, আঁটা : ১. ✓অট্ (?)। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের টঙ্কার আবদ্ধ যাহাতে; তাহার আধার*। ৩. দৃঢ়বদ্ধ, দৃঢ়সন্ধিযুক্ত, কষা, যুক্তিযুক্ততা, নির্ভীকভাব, আসক্তি, শক্ত বা দৃঢ় হওয়া, সমান হওয়া, পূর্ণতাহেতু টান হওয়া, গণনায় মিলা, সমর্থ হওয়া, পারা, সমস্পর্দ্ধী হওয়া, টানিয়া বাঁধা, শাসন করা, ভয় দেখান, টানা, পীড়ন করা, বন্ধ করা, রোধ করা, পর্য্যাপ্ত হওয়া, কুলান, ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. সুপ্রচলিত। ৫. হরিচরণ ঠিকই ধরেছিলেন, কিন্তু তাঁর সন্দেহ থেকে গিয়েছিল।

তাই তিনি শব্দটির মূলে 'অট্' ক্রিয়াকে শনাক্ত করেও জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়েছিলেন। সেই সন্দেহের কারণেই তিনি শব্দটিকে দুটি পৃথক ভুক্তিতে তাঁর শব্দকোষের অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন। দুটি বিষয়ে তিনি গুরুত্ব দেননি বলেই হয়তো তাঁর এই সন্দেহ। প্রথমত, বানানে চন্দ্রবিন্দু, যা কিনা স্বভাবতই রহস্যময়ী অংরূপিণী বলে তার বহু রূপের সম্ভাবনা থাকে; তাই 'আঁটা' শব্দটি এমন বহু অর্থবাচক হতে পেরেছে। দ্বিতীয়ত, অস্তিত্বের টঙ্কারণ ক্রিয়াটিকে দেখবার নিরিখ। ক্রিয়াটিকে কোন দিক থেকে দেখা হচ্ছে, তার উপর তার অর্থ যাচ্ছে বদলে। যে দিক থেকে অস্তিত্বের টঙ্কারণ ঘটছে, সেদিক থেকে দেখলে আঁটা হয়ে যায় এঁটে ওঠা, কুলান ইত্যাদি; কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে হয়ে যায় টঙ্কারণকে রোধ করা, কষে বাঁধা, টানা, পীড়ন করা ইত্যাদি। সব অর্থগুলিই তখন মিলে যায়। দ্র. **নদ্ধ**।

আঁটসাঁট, আঁটোসাঁটো : ৫. 'আলাপ-সালাপ' শব্দের ক্ষেত্রে 'স'-এর যে ভূমিকা, এক্ষেত্রেও 'স'-এর সেই ভূমিকা। দ্র. **নদ্ধ**।

হাঁট, হাঁটকা, হাঁটা, হাঁটু : ৫. হরিচরণ এক্ষেত্রেও সন্দেহ করেছেন, শব্দটি 'অট্' পরিবারের সদস্য কিনা। আমাদের মনে হয়, হঁ-এর সঙ্গে অট্-এর যোগেই শব্দটি প্রসূত হয়েছে।??

'অণ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অণ্, অণি, অণিমা, অণী, অণীমাণ্ডব্য, অণীয়ান, অণু, অণুবাদ, অণুবীক্ষণ, অণুমাত্র, অণুমাত্রিক, অণুরেণু, অণ্ড, অণ্ডক, অণ্ডকটাহ, অণ্ডকোশ, অণ্ডকোষ, অণ্ডকোষক, অণ্ডজ, অণ্ডজেশ্বর, অণ্ডবর্দ্ধন, অণ্ডবৃদ্ধি, অণ্ডাকার, অণ্ডাকার, অণ্ডকাটা, আঁড়রা, আণব, আণবিক, আণ্ডা, আণ্ডিয়া, আণ্ডির, আণ্ডীর, আণ্ড্রা, আণ্ড্রাকাটা, এঁড়ে।
অণ্ = অস্তিত্বের সূত্রায়ন (বোধন)। **অণ** = অস্তিত্ব সূত্রায়িত হয় যাহাতে। (an)।

অণ্ : ৫. অস্তিত্বের ব্যক্ত রূপ গ্রহণ। বঙ্গীয় শব্দকোষে অণ্-এর অর্থ দেওয়া আছে 'শব্দ'। অমরকোষচন্দ্রিকায় অতি নিকৃষ্ট বস্তুকে বোঝাতে 'অণক' শব্দের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অণি বা অণী শব্দ যে সূচ্যগ্র শূলাগ্রবাচক, অমরকোষের মতোই হরিচরণও দেখিয়ে গেছেন। এসবই সম্ভব হয়েছে 'অণ্' শব্দের অর্থে উক্ত সূচ্যগ্রাদি ধারণার মূল নিহিত থাকায়। আমাদের মতে সেই মূলটি হল — অস্তিত্বের রহস্যরূপ (অং) যেখানে প্রথম ব্যক্তরূপে (অণ্-রূপে) দেখা দেয়, যদিও তার আত্মোপলব্ধি তখনও ঘটেনি (যে কারণে 'ণ' বর্ণ দিয়ে কোনো শব্দ শুরু করা যায় না)। অস্তিত্বের এই যে প্রথম ব্যক্তরূপ, যা স্থান-কাল-পাত্রের ক্ষেত্রে ক্রমে অণু রূপে দেখা দেয়, তারই সূত্রপাত হয় 'অণ্'-এ। (দ্র. **গুণ**)। অন-এর সঙ্গে অণ-এর পার্থক্য হল, অন-এর ভেতরে শক্তিরূপিণীর অস্তিত্ব তুলনায় কম, অণ-এ বেশি (যেনবা ণ মানসিক শক্তির আধার, ন দৈহিক শক্তির) ; বিপরীতে অণ-এর আত্মোপলব্ধি নেই বললেই চলে, কিন্তু অন-এর আত্মোপলব্ধি বিদ্যমান।

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, *অস্তিত্বের ব্যক্তরূপ লাভকরণকে (সূত্রায়নকে) অণ্ বলে। অর্থাৎ অস্তিত্বের রহস্যরূপের প্রথম ব্যক্ত রূপ (প্রকটন) থাকে যাহাতে, তাই অণ পদবাচ্য*। তবে এই রূপ প্রথম ব্যক্তরূপ বলে খানিকটা অব্যক্তও বটে। তাই একে সূত্ররূপও বলা হয়। এর ইংরেজি উত্তরাধিকার রয়েছে any শব্দে।

অণি, অণী : ১. ✓অণ্ শব্দ + ই - ক। (ব.শ.)। ২. *অণ্ গতিশীল থাকে যাহাতে; অণির আধার*। ৩. অক্ষকীল, রোধখিল, সূচ্যগ্র, শূলাগ্র, কোণ। দ্র. **অণীমাণ্ডব্য**। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় কোথাও কোথাও গরুগাড়ির চাকার খিল অর্থে এখনও 'অণি' বা 'আণি' ব্যবহৃত হয়।

অণিমা (অণিমন্) : ১. অণু + ইমন। (ব.শ.)। ২. *অণুকে যে রূপে মনন করা হইয়াছে*। ৩. অণুভাব, অণুত্ব, সূক্ষ্মতা। অষ্ট-ঐশ্বর্য্যের একতম। ... ইহার প্রভাবে সিদ্ধগণ অণুতুল্য সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া অলক্ষিতভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারেন। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এটি শিবের **অষ্ট ঐশ্বর্যের** একটি ঐশ্বর্য। **ব্রহ্মগুণ**সম্পন্ন আবিষ্কারক স্রষ্টা মানুষেরা 'অণুতুল্য সূক্ষ্মরূপ ধারণ' করে সর্বত্র বিচরণ করতে পারেন। এটিকে তাঁদের 'অণিমা' ঐশ্বর্য বলা হয়। কিন্তু সেটা পারেন কীভাবে? আদৌ পারেন কি? যদি পারেন, তবে তার স্বরূপ কী? এর বড়জোর একটিই মাত্র অর্থ হতে পারে — মানুষের সমস্ত আবিষ্কার বা সৃষ্টি মানবসমাজের মনোলোকের আকাশে বায়ুপ্রবাহের মতো **ঋষিপ্রবাহে** প্রবাহিত হয়ে থাকে, একথা আমরা জানি। এই প্রবাহে প্রবাহিত থাকে আবিষ্কারক শিবের আবিষ্কার, আইনস্টাইনের $E = mc^2$, কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'সীমার মাঝে অসীম তুমি'। আবিষ্কারকের সৃষ্টির ভিতরেই তো তিনি সূক্ষ্ম রূপে বিরাজ করে থাকেন। সেখানেই তো তাঁর প্রকৃত অমরত্ব। সেটিই শিবের সূক্ষ্ম রূপ, তাঁর 'অণিমা' নামক ঐশ্বর্য। তবে এসবই অণিমার বিষয়ে মানুষের উচ্চতর মানসিক বোধমাত্র। এর বাহ্যিক রূপের দেখা পাওয়া যায় 'অণিমাল' (animal) শব্দে। কিন্তু শব্দটি বাংলায় নেই, রয়েছে ইংরেজিতে। দ্র. **ঋণ**। ৬. animal।

অণু : ১. ✓অণ্ (শব্দ) + উ - ক। (ব.শ.)। ২. *অণ্ ব্যক্তরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে*। ৩. সূক্ষ্ম, লব, লেশ, কণ, অতি সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ (atom)। (বিপরীত শব্দ — স্থূল, মহৎ।) মাত্রার ('যাহার দ্বারা পরিমাণ সাধিত হয়', unit, তাহার) চতুর্থাংশ। মুহূর্তের (৪৮ মিনিটের) ৫,৪৬,৭৫,০০০ তম অংশ। শিব। যযাতির পুত্র। (ব.শ.)। বৈশেষিক মতবাদের ভিত্তি। ৪. অণু, কণা বা অ্যাটম অর্থেই এই শব্দের ব্যবহার এখনও হয়ে থাকে। ৫. কালের, মাত্রার, অস্তিত্বের স্থান-কাল-পাত্রের সর্বকনিষ্ঠ রূপ। অণু শব্দের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারি, অণ্ শব্দ তার খানিকটা অব্যক্ত রূপ থেকে সম্পূর্ণ ব্যক্ত রূপ পায় 'উ'-কার লাভ করে 'অণু'তে পৌঁছে। দ্র. **অংরূপিণী**।

অণ্ড : ১. ✓অম্ গতি + ড - ণ। ২. *অণ্ ডয়িত হয় যাহাতে*। (দ্র. **ড্ বর্ণের অর্থ**।) / যাহা দ্বারা অবয়ব সংযোগপ্রাপ্ত হয়; যাহা হইতে শাবক নির্গত হয়'। (ব.শ.)। ৩. পক্ষিডিম্ব, ডিম্বমাত্র, পেশী,

পেশীকোষ, (অণ্ড শব্দ পরে থাকিলে কুক্কুটী প্রভৃতির পুংবদ্ভাব হয়। যথা কুক্কুটীর অণ্ড, কুক্কুটাণ্ড ইত্যাদি।) বীচি, সৃষ্টিপ্রারম্ভে কারণসলিলে আরোপিত অণ্ডাকার ব্রহ্মবীজ। বীর্য্য, বীজ, (সাদৃশ্যে) মৃগনাভি, (ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ) শিব। (ব.শ.)। ৪. egg অর্থে প্রচলিত। হিন্দি ভাষায় 'অণ্ড' শব্দটি 'আন্ডা' রূপে বহুল প্রচলিত। ৫. মুরগি > অণ্ড > মুরগি। মুরগির অস্তিত্ব তার অণ্ডের ভিতর দিয়ে 'ডয়িত' (উড্ডীন) হয় পরবর্তী অস্তিত্বের দিকে। মুরগি থেকে অণ্ড, তার থেকে পুনরায় মুরগি। অর্থাৎ মা-মুরগি ও সন্তান-মুরগির মধ্যবর্তী পর্যায়টির নাম অণ্ড। এই অণ্ডের মাধ্যমেই দুটি 'অবয়ব সংযোগপ্রাপ্ত হয়'। (তাই ইংরেজিতে and, আর জার্মান ভাষায় und দুটি অবয়বের সংযোগকারী 'ও' অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা 'রাম ও শ্যাম' = Ram *and* Shyam) তবে মজা হল, মা-মুরগির তুলনায় যদি সন্তান মুরগি উন্নত মানের না হয়, তাতে অম্‌-এর উড্ডয়ন না থাকে, তবে মাঝের ঐ অণ্ডটিকে অণ্ড বলা যাবে না, বলতে হবে ডিম্ব। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পর বিপ্লব, তারপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পর প্রতিবিপ্লব, তারপর সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা — এমন হলে, মাঝের বিপ্লবটির চরিত্র একেবারেই আলাদা হয়ে যায়। অর্থাৎ কিনা, দুই ব্যবস্থার মধ্যবর্তী বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ঘটনাটি যদি আরও বিকাশশীল হয়, তবে সেটি অণ্ড। আর যদি প্রতিক্রিয়াশীল হয়, তবে সেটি **ডিম্ব**। (দ্র. dim, diminish ইত্যাদি)। পুরাণাদিতে আদি বিপ্লবকে 'ব্রহ্মা অণ্ডরূপে **কারণ** জলে ছিলেন'-জাতীয় বাক্যবন্ধের দ্বারা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। তার ওপর জগৎসৃষ্টির তত্ত্বে সমগ্র সৃষ্টিকে **জরায়ুজ, অণ্ডজ** ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দ্র. **জগৎসৃষ্টি**। ৬. and।

অণ্ডজ : ১. অণ্ড + √জন + অ (ড) ক। (ব.শ.)। ২. অণ্ড হইতে জাত। (ব.শ.)। ৩. অণ্ডজাত প্রাণীমাত্র, পক্ষী, সর্প, নক্র, মৎস্য, কচ্ছপ, কৃকলাস; 'সৃষ্টিপ্রারম্ভে কারণসলিলে আরোপিত অণ্ডাকার ব্রহ্মবীজ' হইতে জাত। (ব.শ.)। ৪. egg থেকে জন্মেছে এই অর্থে প্রচলিত। ৫. অণ্ড থেকে জাত ও ডিম্ব থেকে জাত জীবকে বোঝাতে অণ্ডজ ও ডিম্বজ শব্দদুটি এখনও কমবেশি ব্যবহার হয়ে থাকে; যদিও অণ্ড ও ডিম্ব শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমটির ক্ষেত্রে উত্তরসূরির মধ্যে উচ্চতর গুণাগুণ থাকে, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে সমান বা নিম্নতর গুণাগুণ থাকে। সমাজের ক্ষেত্রে বিপ্লবজাত নতুন সমাজ হল অণ্ডজ এবং প্রতিবিপ্লব-জাত নতুন সমাজ হল ডিম্বজ। বলে রাখা ভাল, আবিষ্কারমূলক শৈব সৃষ্টিকে অণ্ডজ এবং একই কর্মের পুনরাবৃত্তিমূলক দক্ষ সৃষ্টিকে ডিম্বজ বলা যেতে পারে। জগৎসৃষ্টির তত্ত্বে সমগ্র সৃষ্টিকে **জরায়ুজ**, অণ্ডজ, **স্বেদজ** ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দ্র. **জগৎসৃষ্টি**।

আণ্ডির (আণ্ডীর) : ১. অণ্ড + ঈর (ঈরচ্‌) অস্ত্যর্থে + অ (অণ্‌) স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. অণ্ডের *গতিশীলতা রহে যাহাতে।* ৩. বলবান; অণ্ডযুক্ত, সডিম্ব, বৃষণযুক্ত, সমুষ্ক (বৃষাদি)। মানিক গাঙ্গলীর ধর্ম্মমঙ্গলে ১১৩ পৃষ্ঠে এই অশ্বের উৎপত্তি এইরূপ আছে — উচ্চৈঃশ্রবার বীর্য্য গঙ্গাজলে চ্যুত ও দৈববলে অণ্ডাকৃতি হইলে, গৌড়েশ্বরের '**ভদ্রা' অশ্বা ইহা জলের সহিত পান করে এবং সেই অণ্ড হইতে ইহার জন্ম হয়। ইহাতে বোধ হয়, 'আণ্ডির' শব্দের মূল 'অণ্ড' এবং তদনুসারে উহার অর্থ 'অণ্ডজাত'** হইতে পারে। অশ্বের সপ্ত উৎপত্তিস্থানের মধ্যে 'অণ্ড'ও একতম। (ব.শ.)। ৪. অগ্র। ৫. বঙ্গীয় শব্দকোষে উদ্ধৃত মানিক গাঙ্গুলীর উপরোক্ত বয়ান আমাদের জানিয়ে দেয়, এমনকি ১৬০০ খ্রিস্টাব্দেও বাংলাভাষী জ্ঞানীরা জানতেন **উচ্চৈঃশ্রবার বীর্য্য** কী বস্তু, গঙ্গাজলে তার চ্যুতিই বা কী ব্যাপারকে বোঝায়, গৌড়েশ্বরের ভদ্রা অশ্বা কাকে বলে এবং জলের সহিত অণ্ডাকার বীর্য্য পান করার মানেই বা কী। ... এখন এগুলো সবই বাংলাভাষীরা ভুলে গেছেন। দ্র. **অশ্ব**।

আন্ড্রাকাটা, আঁড্রাকাটা : ৫. শব্দটি কোনো অভিধান বা শব্দকোষে পাওয়া যায় না। মেদিনীপুরের বাংলাভাষীরা শব্দটির ব্যবহার করেন সেই সমস্ত বলদদের বোঝাতে, যাদের অণ্ডকোষ ছিন্ন করা হয় সাবালক হয়ে যাওয়ার পরে। বিস্তারিত তত্ত্ব ও তথ্যের জন্য (গ) গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। ৬. andro-যুক্ত অধিকাংশ ইংরেজি শব্দ।

এঁড়ে, এঁড়্যে : ১. অণ্ড > আঁড় > এঁড়ে। (ব.শ.)। ২. অণ্ডের *দ্বারা বা কারণে দিশাগ্রস্ত যে।* ৩. অণ্ডকোষযুক্ত পুরুষজাতীয় (গরু, বাছুর, মহিষ, শূয়ার ইত্যাদি), ষণ্ড, ষাঁড়, তেজস্বী নির্ব্বদ্ধশীল পুরুষ, একরোকা বা একগুঁয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক। ৪. যথার্থে প্রচলিত।

'অত্‌' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অত্‌, অত, অতএ, অতএব, অতয়ে, অতঃ, অতঃপর, অতসী, অতি, অতি উপসর্গ যুক্ত সমস্ত শব্দ (নির্দিষ্ট কয়েকটি — *অতিপ্রাকৃত* ইত্যাদি ছাড়া তাদের আর পৃথকভাবে উল্লেখ করা হল না), অতিথি, অতিপ্রাকৃত, অতিবাহিত, অতীত, অতীব, অতেব, অত্যতিবৃদ্ধপ্রপৌত্র, অত্যন্ত, অত্যাচার, অনাত্মবর্গ, অনাত্মবান, অনাত্মবেদী, অনাত্মা, অনাত্মীয়, আঁতুআঁতু-পুঁতুপুঁতু, আঁতুপুঁতু, আতিথেয়, আতিথ্য, আতিথ্যসৎকার, আতিথ্যসৎক্রিয়া, আতু-আতু, আতুপুতু, আত্ত, আত্তমা, আত্ম, আত্মক, আত্মকর্ম্ম, আত্মকার্য্য, আত্মকাম, আত্মকীয়, আত্মকুল, আত্মকৃত, আত্মগত, আত্মগতি, আত্মগরিমা, আত্মগুণ, আত্মগ্রাহী, আত্মগ্লানি, আত্মঘাত, আত্মঘাতী, আত্মঘোষ, আত্মজ, আত্মজন্মা, আত্মজয়, আত্মজাত, আত্মজীবনী, আত্মজ্ঞ, আত্মজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব, আত্মতন্ত্র, আত্মতা, আত্মতুষ্ট, আত্মতুষ্টি, আত্মতৃপ্ত, আত্মত্যাগ, আত্মত্রাণ, আত্মদর্শ, আত্মদর্শন, আত্মদান, আত্মদেবতা, আত্মদেশ, আত্মদ্রোহী, আত্মনিত্য, আত্মনিন্দা, আত্মনিবেদন, আত্মনিষ্ঠ, আত্মনীন, আত্মনিয়োগ, আত্মনির্ভর, আত্মনির্ভরশীল, আত্মনেপদ, আত্মপক্ষ, আত্মপরিত্যাগ, আত্মপরায়ন, আত্মপীড়ন, আত্মপূজা, আত্মপ্রকাশ, আত্মপ্রতিকৃতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মপ্রভ, আত্মপ্রশংসক, আত্মপ্রশংসা, আত্মপ্রসাদ, আত্মবঞ্চক, আত্মবৎ, আত্মবত্তা, আত্মবধ, আত্মবধী, আত্মবধ্যা, আত্মবন্ধু, আত্মবর্গ, আত্মবশ, আত্মবান, আত্মবান্ধব, আত্মবিক্রয়, আত্মবিচ্ছেদ, আত্মবিদ্‌, আত্মবিদ্যা, আত্মবিধিৎসা, আত্মবিনিগ্রহ, আত্মবিশুদ্ধি, আত্মবিশ্বাস, আত্মবিসর্জন, আত্মবিস্মরণ, আত্মবিস্মরিত, আত্মবিস্মৃতি, আত্মবিহারী, আত্মবিহ্বল,

আত্মবুদ্ধি, আত্মবৃত্ত, আত্মবোধ, আত্মভব, আত্মভর্ৎসন, আত্মভাব, **আত্মভূ**, আত্মভূত, আত্মমগ্ন, আত্মমতি, আত্মময়, আত্মমানী, **আত্মমূর্তি**, আত্মম্ভরি, আত্মযাজী, আত্মযোনি, আত্মরক্ষক, আত্মরক্ষা, **আত্মরতি**, আত্মরূপ, আত্মলাভ, আত্মশক্তি, আত্মশুদ্ধি, আত্মশ্লাঘা, **আত্মসংবরণ**, আত্মসংযম, আত্মসংস্কৃতি, আত্মসংস্থ, আত্মসন্তুষ্ট, **আত্মসন্দেহ**, আত্মসম, আত্মসমর্পণ, আত্মসমালোচনা, আত্মসম্পন্ন, **আত্মসম্ভব**, আত্মসম্ভাবনা, আত্মসম্মিত, আত্মসহায়তা, আত্মসাৎ, **আত্মসাৎকৃত**, আত্মসুখ, আত্মস্তব, আত্মস্থ, আত্মস্বরূপ, আত্মহত্যা, **আত্মহনন**, আত্মহা, আত্মহারা, আত্মা, আত্মাধিক, আত্মাধীন, আত্মানন্দ, আত্মানুগমন, আত্মানুরূপ, আত্মানুশাসন, আত্মানুসন্ধান, আত্মাপরাধ, আত্মাপহার, আত্মপুরুষ, আত্মাবমাননা, আত্মাভিমানী, আত্মাভূ, আত্মারাম, আত্মার্থ, আত্মাশ্রয়, আত্মাহুতি, আত্মীয়, আত্মেশ্বর, আত্মোৎসর্গ, আত্মোদয়, আত্মোদ্ভব, আত্মোন্নতি, আত্মোপজীবী, আত্মোপম, আত্মৌপম্য, উ, কিরাত, জীবাত্মা, তিথি, তিসি, মহাত্মা, সদাত্মা, হাঁৎহাঁৎ (আত্মন্-আত্মন্), হাঁসহাঁস।
অত্ = অস্তিত্বের তারণ। **অত** = অস্তিত্ব তারিত হয় যাহাতে। (at, at-)।

অত্, অত : **৫.** অস্তিত্বের ত্-অন (তারণ)। অস্তিত্বের এই যে নিজের বাইরে চলা, এই চলা উড্ডয়ন বা আবর্তিত হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলা নয়, এ চলা লতিয়ে লতিয়ে চলা, লতার মতো, মানুষের সাঁতার দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো। (দ্র. **ট্ বর্ণের অর্থ**)। এ হল অস্তিত্বের নিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে উপচে পড়া। যেনবা অস্তিত্বের কলসি পূর্ণ হয়ে নিজের পরিধিতে গিয়ে টঙ্কারিত (ট) হচ্ছিল, সেই পরিধি থেকে বেরিয়ে উড়ে (ড়, ড়্) যাওয়ার চেষ্টা করছিল, এখন সে উড়ে না গিয়ে (লতার মতো) তারিত (ত্) হয়ে বিশেষ দিকে উপচে পড়ে যাচ্ছে। তারণ ক্রিয়া এখানে অবিরাম। সেই কারণেই 'অত' (অতো) বললে আমরা বুঝি 'অনেক বেশি'। ব.শ. বলেছেন 'প্রবৃত্ত ক্রিয়ার অবিরাম'। ইংরেজিতে এই অত্-এর উত্তরাধিকার মেলে at শব্দে।

অতএব, অতঃ, অতঃপর : **১.** অত এব। (ব.শ.)। **২.** *অত্-এর দিশানুসারে বহন থাকে যাহাতে; অত্-এর শেষ হয়েছে যেখানে, সেই 'নির্য্যাসত্যাগ' পর্যন্ত; অতঃ-র পালন রহে যাহাতে।* **৩.** এই হেতুই, এই নিমিত্ত; এই কারণে, ইহা হইতে, ইহা অপেক্ষা, এই স্থান দেশ বা কাল হইতে; ইহার পরে। (ব.শ.)। **৪.** বহুল প্রচলিত। **৫.** যে অস্তিত্ব তার এতাবৎ বিকাশ সম্পন্ন করে তারিত হয়ে বিশেষ দিকে এগিয়ে এসেছে, তা হল অত। তার অগ্রগামী অংশের শেষ পর্যন্ত ধরলে, তা অতঃ। এর পরে যা হবে, তা হল 'অতঃপর'। 'অত'-এর এই অগ্রগতির দিশা যেদিকে, সেইদিকেই তা 'অতঃপর' বাহিত হলে তাকে বলতে হয় 'অতএব'।

অতসী : **১.** ✓অত্ + অস - ক + স্ত্রী ঈ। (ব.শ.)। **২.** *অতঃ-এর (= অতস্-এর) আধার যে।* **৩.** **নীলপুষ্প** ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, নীলপুষ্পিকা, মসিনা গাছ, তিসি, **শণবৃক্ষ** (hemp), পীতপুষ্পের বৃক্ষবিশেষ ও তাহার পুষ্প। **৪.** মেয়ের নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** যে গাছ জন্মাল, বড় হয়ে গায়ে গতরে হল, এবং সেখানেই তার শেষ; তার ফল-ফুল যেনবা অপ্রয়োজনীয়, তাকেই বলে অতসী। তারপর তার আর কোনো বিকাশের দরকার নেই, তেমন গাছ হল শণ ও পাট গাছ। এদের গায়ের ছাল দিয়েই মানুষের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এদের অতসী বলা যায়। তিসি গাছকে অতসী বলার এরকম কোনো কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আমরা তা জানি না।

অতি : **১.** ✓অত্ + ই। (ব.শ.)। **২.** *অত্-এর 'গতিশীলতা বা বিকাশ ও বাড়বৃদ্ধি' (= ই) যাহাতে।* **৩.** প্রকর্ষ, অতীব, অধিক, উৎকৃষ্ট, প্রশংসা, অতিক্রম, লঙ্ঘন, অত্যয়, অযোগ্যতা, বহুতর, অসম্ভাবন, সম্পূর্ণ। ... (ব.শ.)। **৪.** much, many অর্থে প্রচলিত। **৫.** 'গত' 'গত' নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যোগ করলে যেমন 'গতি'কে দেখতে পাওয়া যায়, সেইরকম 'অত' 'অত' যোগ করলে 'অতি'কে দেখতে পাওয়া যায়। প্রতিটি বিষয় ও বস্তুর যেহেতু 'অতি' সম্ভব হয়, সেই কারণে এই শব্দটির বিপুল ব্যবহার হয়। সেই ব্যবহারকে 'উপসর্গ' রূপে ব্যবহার বলা হয়ে থাকে।

অতিথি : **১.** ✓অত্ + ইথি (ইথিন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *যার অত্ গতি (ক্ষণকালের জন্য) থেমে গেছে।* / যাহার তিথি নাই; যাহার স্থিতি নাই; যে যায়, থাকে না; অনিত্যাবস্থান হেতু যাহার তিথি বা দিন নাই। (ব.শ.)। **৩.** আবেশিক, অভ্যাগত, গৃহাগত, আগন্তুক। একরাত্র পরগৃহবাসী ব্রাহ্মণ। মিতাক্ষরা মতে পথিক, শ্রোত্রিয় ও বেদপারগ, এই তিন অতিথি। রামচন্দ্রের পৌত্র ও কুশের পুত্র। (ব.শ.)। **৪.** শব্দটি এখনও 'আমন্ত্রিত-অভ্যাগত' অর্থে বহুল প্রচলিত। **৫.** সম্ভবত, তিথি অর্থে সেকালের গোষ্ঠীর বা যৌথপরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে (যারা স্থিতি করে) এবং অতিথি অর্থে (যারা স্থিতি করে না) এমন সমাজের পরিদর্শক গোষ্ঠীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে বোঝাত। অত্রি (পরিদর্শক) প্রজাপতির কালে, তখনও রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়নি, অথচ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছোট ছোট বিভাজন ঘটে গেছে, তখন গৃহকর্তার দায়িত্ব ছিল অতিথি সৎকার। আর অতিথির দায়িত্ব ছিল ঘুরে ঘুরে পরবর্তী উৎপাদন কর্মযজ্ঞ কীভাবে চালাতে হবে, প্রত্যেকটি যৌথপরিবার বা গোষ্ঠীকে তার পরামর্শ দেওয়া। এঁরা এক বাড়িতে তেরাত্তিরের বেশি কাটাতেন না। **আচার**টি বহু পরেও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বহুদিন ধরে কমবেশি প্রচলিত ছিল। দ্র. **তিথি**।

অতিপ্রাকৃত : **২.** যাহা প্রাকৃতকে অতিক্রম করিয়াছে। (ব.শ.)। **৩.** অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক, অলৌকিক। (ব.শ.)। **৪.** কম প্রচলিত। **৫.** যাহা প্রকৃষ্টরূপে কৃত তাই প্রকৃত। যেন একটি কেন্দ্র থেকে প্রকৃত সৃষ্টিরা উৎসারিত হয়ে (আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো) ঊর্ধ্বে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্র স্বভাবতই বৃত্তাকার। সেই বৃত্তাকার এলাকাই প্রাকৃতের এলাকা। কিন্তু যা সেই এলাকার বাইরে গিয়ে পড়ছে, সেগুলি নিঃসন্দেহে অতিপ্রাকৃত। প্রাকৃতের এলাকাটা আমাদের চেনাজানা; অতিপ্রাকৃতের এলাকাটা আমাদের

চেনাজানার বাইরে। তাই তা অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক, অলৌকিক বলে আমাদের মনে হয়।

অতিবাহ, অতিবাহক, অতিবাহিত : ১. অতিবাহ = ✓অত্ + ই + ✓বহ্ + অ (ঘঞ্) - ভা। ২. (যথাক্রমে) *অতি-বহন আছে যাহাতে; অতি-বহন করে যে; যাহাকে অতি-বহন করা হইয়াছে।* / যাহাতে স্থানান্তর প্রাপ্ত হয়; যে এক দেহ অতিক্রম করিয়া অন্য দেহে লিঙ্গশরীর-জীবকে বহন করে; অতিক্রমিত। (ব.শ.)। ৩. অতিযাপন, অতিরিক্তভারবহন; লিঙ্গদেহের দেহান্তরপ্রাপক, অর্চ্চিরাদ্যভিমানিনী দেবতা (ইঁহারা লিঙ্গ-শরীরাবচ্ছিন্ন জীবকে দেবযান ও পিতৃযান দ্বারা যথাক্রমে ব্রহ্মলোকে ও চন্দ্রলোকে লইয়া যান।); অতিক্রমিত, যাপিত, নীত (কাল)। (ব.শ.)। ৪. এই তিনটি শব্দের ভিতরে কেবলমাত্র 'অতিবাহিত' শব্দটি এখনও প্রচলিত এবং তাও ইংরেজি over অর্থে। ৫. বহন ক'রে স্থান-কালের যত দূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কথা, তা পেরিয়ে আরও দূরে চলে গেলে সেই হল 'অতিবহন'। সেই অতিবহন ক্রিয়াটি যাতে থাকে, তাকে বলে অতিবাহ। অতিবাহ অন হতে থাকলে তাকে বলতে হবে অতিবাহন। যে সত্তাকে অতিবাহন করা হয়েছে, তাকে বলা হয় অতিবাহিত। আর, সেই অতিবাহন করে যে তাকে বলা হয় অতিবাহক। এর মধ্যে ক-স্থান থেকে তারই এলাকা পেরিয়ে খ-স্থানে, ক-কাল থেকে ক-কালের এলাকা পেরিয়ে খ-কালে বহন করার কাজটি ঘটলে সে সবই অতিবাহ কিংবা অতিবাহিত। সেই কারণে কালের এক একটি অধ্যায় অতিবাহিত হয়ে যায়, যৌবন অতিবাহিত হয়, দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়। কিন্তু অতিবাহক? সে হল অর্চ্চিরাদ্যভিমানিনী দেবতা, যে কিনা লিঙ্গদেহের দেহান্তরপ্রাপক। শ্রীধর টীকা উল্লেখ করে বঙ্গীয় শব্দকোষ জানাচ্ছেন, এই দেবতারা লিঙ্গ-শরীরাবচ্ছিন্ন জীবকে দেবযান ও পিতৃযান দ্বারা যথাক্রমে ব্রহ্মলোকে ও চন্দ্রলোকে লইয়া যান। এই অর্থেও এক দেহ থেকে শুরু করে সেই দেহের এলাকা পেরিয়ে অন্য দেহে পৌঁছে যাওয়ার কথা আছে। কিন্তু বিষয়টি ঠিক কী, তা বোঝা একটু কঠিন। বুঝতে হলে **দেবযান, পিতৃযান, ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক** প্রভৃতি শব্দের অর্থ জানতে হয়। অতি সংক্ষেপে এই অতিবাহক হল সেই সত্তা, যে তত্ত্বকে (লিঙ্গদেহ বা লিঙ্গশরীরকে) প্রয়োগে রূপান্তরিত করে (দেহান্তরে নিয়ে যায়)। এটি আদিম সমাজতান্ত্রিক পথে ঘটলে পিতৃযান অনুসৃত হয়ে ব্রহ্মলোকে পৌঁছনো যায়, আর পুঁজিতান্ত্রিক পথে ঘটলে দেবযান অনুসৃত হয়ে চন্দ্রলোকে পৌঁছনো যায়। দ্র. **যান**।

অতীত : ১. অতি + ✓ই + ত (ক্ত) - ক। (ব.শ.)। ২. *যাহা ইতকে অতিক্রম করিয়াছে।* / যে অতিক্রম করিয়াছে। (ব.শ.)। ৩. গত, অপগত, উত্তীর্ণ, উপরত, পূর্ব্ব, বিগত, ভূত। (পাণিনি মতে — অদ্যতন, অনদ্যতন, অনদ্যতনপরোক্ষ ভেদে অতীত ত্রিবিধ)। (ব.শ.)। ৪. past অর্থে প্রচলিত। ৫. গত গত গত গত অবিরাম হতে থাকলে গতিকে দেখতে পাওয়া যায়। এই 'গতি'র অর্থ 'চলিতেছে'। এর থেকে 'চল'কে বাদ দিয়ে দিলে যেটি থাকে তা হল 'ইতেছে'। সেই 'ইতেছে' যখন থামল, তখন সে হল ইত, যাতে ই তারিত হয়ে গেছে। যে এই 'ইত'কে অতিক্রম করে গেছে আগেই, সে হল অতীত। মনে রাখা ভাল, যে দরজার বাইরের দিকে রয়েছে অজানা ভবিষ্যৎ এবং ভেতরে রয়েছে জানা কিংবা ভুলে যাওয়া অতীত, সেই দরজাটিকেই বর্তমান বলে। দরজাটি প্রতি মুহূর্তে সরে সরে চলেছে, আর ভবিষ্যৎ-বাবু দরজা (বর্তমান) পেরিয়ে অতীত হয়ে যাচ্ছেন। সবার শেষে, এইমাত্র, দরজাটি যে পেরোল, তাকে বলে 'ইত'; তার আগে যারা পেরিয়েছে, তাদের সবাইকে বলে 'অতীত'। দ্র. **অধুনা**।

অত্যন্ত : ২. *অতির অন্ত যাহাতে।* / যাহা সীমা অতিক্রম করিয়াছে; যাহা নাশ অতিক্রম করিয়াছে। (ব.শ.)। ৩. অতিশয়, অধিক, একান্ত, পরম, ভূয়ান্, ভূরি, নাশরহিত, অনন্ত, নিয়ত, সর্ব্বোত্তম, নির্বিশেষ, পুনঃপ্রাপ্তিরহিত, ত্রিকালব্যাপী, অবিচ্ছিন্ন, নিরন্তর, সাতিশয়, যাবজ্জীবন, নিত্য, সম্পূর্ণভাবে, নিবৃত্ত দুঃখের পুনর্ব্বার অনুৎপত্তি। (ব.শ.)। ৪. very much বা 'খুব বেশী' অর্থে প্রচলিত। ৫. অস্তিত্বের তারণ চলছে, অত অত অত অত হচ্ছে; অর্থাৎ অতি হচ্ছে। সেই অতি অন হয়ে রয়েছে, অর্থাৎ চলছেই। সেই অন যদি তারিত হয়ে কোথায় থেমে যায়, তাহলেই অতি অন্তকে পেয়ে গেল। তার পরে আর তার এগোনোর কোনো উপায় নেই। এটাই 'অতি'র বাড়বৃদ্ধির শেষ সীমা। অতি যেখানে সেই সীমাতে পৌঁছে যায়, যার পরে তার আর যাওয়ার অবকাশ নেই, সেই অবস্থানই অতির অন্ত বা অত্যন্ত।

অত্যাচার : ১. অতি-আ + ✓চর্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *আচার অতিক্রান্ত যাহাতে।* / যে আচার (প্রথা) অতিক্রম করিয়াছে। (ব.শ.)। ৩. আচারভ্রষ্ট, উৎকট আচার, অনুচিতাচরণ, অবৈধ অনুষ্ঠান, অন্যায় ব্যবহার, উপদ্রব, দৌরাত্ম্য। (ব.শ.)। ৪. oppression বা দৌরাত্ম্য অর্থে প্রচলিত। ৫. সমাজে মানুষ যেসকল আচার-আচরণের মাধ্যমে অন্য মানুষের সঙ্গে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়ে বেঁচে বর্তে থাকে, সেগুলিই তার **আচার**। কেউ যখন সেই আচারসমূহের যে এলাকা রয়েছে তা অতিক্রম করে যায়, তখন সে অতি-আচার করে। তার সেই অতি-আচার প্রচলিত আচারের এলাকার আচার নয়, যা কিনা সকলের পক্ষে সহনীয়, সবাই যাতে অভ্যস্ত। সেই কারণে সেই অতি-আচার অন্যদের পক্ষে কষ্টকর ও দুঃখের কারণ হয়ে দেখা দেয়। আর, সেজন্যই অতি-আচার বা অত্যাচার নিন্দনীয় হয়ে যায়। আপনি শ্রদ্ধাভক্তিতে, ভালবাসায়, কিংবা কোনো কিছুর বিনিময়ে অন্যকে আপন সম্পদের অংশ দিয়ে থাকেন। তোলাবাজ আপনার এই আচারকে অতিক্রম করে আপনার সম্পদে ভাগ বসায়। তাই আপনার মনে হয়, সে আপনার উপর অতি-আচার বা অত্যাচার করছে।

আঁতুপুঁতু : ১. আত্মা ও পুত্র দ্রষ্টব্য। ২. *ইহা আমার আঁতে (আত্মায়) উত্তীর্ণ, ইহা আমার পোতে (পুত্রতে) উত্তীর্ণ — এই রহস্যময় আকুতি যাহাতে।* ৩. স্বীয় পুত্রের ন্যায় অতিপ্রিয় বস্তু, অতিপ্রিয় বস্তু মনে করা। (ব.শ.)। ৪. অ্যাকাডেমিতে অপ্রচলিত, গ্রামবাংলায় সুপ্রচলিত।

আত্ম, আত্মন্, আত্মা : ১. ✓অত্ + মন্ - ক। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের তারণ পরিমাপ করে যে।* / যাহা ব্যাপ্ত করে বা সঞ্চরণ করে। (ব.শ.)। ৩. শরীরাধিদৈবত, ক্ষেত্রজ্ঞ, পুরুষ, স্ব, আপনি (oneself)। ... মহত্তত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব, অহঙ্কার, মন, চিত্ত, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, অজ্ঞান, চৈতন্য, ... সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি। ভার্য্যা। ... (ব.শ.)। ৪. 'স্ব' অর্থে প্রচলিত। যথা আত্মশক্তি, আত্মশুদ্ধি, আত্মসংযম ইত্যাদি। ৫. শরীর (ক্ষেত্র) বিশেষের 'আমিবোধ'কেই আত্মা (ক্ষেত্রজ্ঞ) বলে। তেজের আত্মোপলব্ধিরই এটি একটি স্বরূপ। (দ্র. **অংরূপিণী**)। মানবশরীরের ক্ষেত্রে 'আমি' বোধ, খণ্ডসমাজশরীরের (জাতির) ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ, সমগ্র মানবসমাজশরীরের ক্ষেত্রে মানবতাবোধ, সমগ্র জীবজগৎ-শরীরের ক্ষেত্রে মহান-আত্মাবোধ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডশরীরের ক্ষেত্রে পরম-আত্মাবোধ, এগুলিকেই প্রত্যেক শরীরের নিজ নিজ চোখে আত্মন্ বা আত্মা বলে। এসবই তেজের আত্মোপলব্ধির ক্রমোন্নত স্তরভেদ। এই 'আমি' বা আত্মা যে শরীরে বিরাজ করে সে সেই শরীরেরই পরিচালক (পুরুষ) হয়, সেই শরীরে থেকেও সে সদা সর্বদা সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে পারে, সবকিছুর উপর নজর রাখতে পারে। অন্যের বাড়বৃদ্ধি মেপে নিতে পারে। একালের ভাষায় বলা হয় — 'অমুকের দৌড় আমি জানি, তাকে আমার মাপা হয়ে গেছে।' নিজের চারপাশের সবকিছুকে নিজের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সবসময় মাপতে থাকা, এই কাজটি প্রতিটি মানুষের মনের সবসময়ের কাজ। আর সেই কাজটি যে চালায় তাকেই আত্মা বলে। একে 'আমিবোধ'ও বলা যায়। যেহেতু শরীর লোকাল-স্বভাবের এবং মন নন-লোকাল-স্বভাবের, আর আত্মা বা 'আমিবোধ' যেহেতু মনের কাঁধে ভর করে চলে, তাই শরীরে অবস্থান করেও তার পক্ষে সর্বত্র ঘুরে বেড়ানো সম্ভব হয়। খণ্ডসমাজশরীরের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ একই কাজ করে থাকে। অন্য ক্ষেত্রগুলিতেও সেই সেই শরীরের আত্মা একই কাজ করলেও আমরা সবসময় তা বুঝতে পারি না। মোট কথা, ঘরে যেমন মানুষ, গুহায় যেমন বাঘ, তেমনি শরীরের ভিতরের আমিবোধই আত্মা। বিষয়টির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে (খ) গ্রন্থের 'বাংলাভাষার সমস্যা ...' নামক প্রবন্ধে। দ্র. **অধ্যাত্ম**। ৬. (se)auton, aut(omatic)।

আত্মসমালোচনা : ১. আত্ম + সমালোচনা। ৩. নিজের বিরুদ্ধে নিজে কিছু বলা (self-criticism), নিজের কৃতকর্ম সম্পর্কে নিজের ত্রুটি স্বীকার করা, নিজের কৃতকর্মের কুফল থেকে আত্মরক্ষার জন্য আত্মশোধনের মিথ্যাচার করা, কৃতকর্মদোষস্খালন জন্য বাকবিস্তার। ৪. self-criticism অর্থে শব্দটি সম্প্রতি বহুল প্রচলিত। ৫. বাংলায় একটি শব্দ ছিল **প্রায়শ্চিত্ত**। আধুনিক অ্যাকাডেমিক বাংলাভাষা শব্দটিকে ফেলে দিয়েছে। তার বদলে ইংরেজি self-criticism শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রূপে **আত্মসমালোচনা** শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে সম্প্রতিকালে। সেই কারণে কোনো বাংলা অভিধান বা শব্দকোষে শব্দটি পাওয়া যায় না। **আত্ম** শব্দটি প্রাচীন বাংলার ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ হলেও এখানে তাকে সম্পূর্ণ প্রতীকী 'নিজ' বা 'স্ব' অর্থে প্রয়োগ করা হয়। আর, **সমালোচনা** শব্দটি ব.শ. কিংবা ছাত্রবোধ অভিধানে নাই, তবে কলকাতার সাম্প্রতিক সংসদ অভিধানে ও ঢাকার ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে থাকলেও, তার অর্থ মূলত গৃহীত হয়েছে ইংরেজি criticism শব্দের অর্থ থেকে। ব.শব্দকোষ **সমালোকন** শব্দটিকে স্থান দিয়েছেন এবং তার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের দিকেই জোর দিয়েছেন, কিন্তু **সমালোচনা** শব্দ দেননি। এর বড় কারণ এই যে, ১৯০০ সালের আগে এই বাংলা শব্দটির অস্তিত্ব ছিল না। এটি অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত তথাকথিত 'মার্কসবাদী' বাংলাভাষীর হাতে ইংরেজি self-criticism শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে এবং সম্পূর্ণতই প্রতীকী শব্দ রূপে সৃষ্ট হয়েছে বলেই মনে হয়।

ইংরেজি শব্দের ছন্নছাড়া উত্তরাধিকার থাকলেও তার নিজস্ব গৌরব ছিল। উৎসের যে উত্তরাধিকার তাদের দেখা যায়, তাতে criticism শব্দটি গ্রীক kritikos শব্দের থেকে এসেছে, যার মানে to judge; অর্থাৎ বিচার-বিবেচনা করা। আমাদের মনে হয়েছে, এই kritikos আর আমাদের 'কৃতকঃ' শব্দের আদিরূপ একই, যার অর্থ 'কৃতকর্মের পুনর্বিচার'-এর দিকে আঙুল দেখায়। পাশ্চাত্যের মনোভূমিতে একসময় সাহিত্যের criticism যথার্থেই উচ্চমার্গের 'পুনর্বিচার' হয়ে উঠতে পেরেছিল। আদিযুগের মার্কসবাদীরা সেই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে self-criticism শব্দটির সৃষ্টি করলেও, বাংলায় তা অনুদিত হয়ে ফলিত প্রয়োগের পর শব্দটি সর্বার্থেই 'কৃতকর্মদোষ-গোপনকারী-আত্মকথন' বা 'কৃতকর্মদোষস্খালন জন্য বাকবিস্তার'-এ পরিণত হয়েছে। দোষ করলে এবং তা বুঝতে পারলে দোষীরা **প্রায়শ্চিত্ত** করবে, এই ছিল আমাদের বাংলার **দণ্ডনীতি**র নিয়ম। তার জন্য গলায় গামছা দিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘোরা, খালি পায়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে বেড়ানো ... ইত্যাদি নানা প্রকারের **প্রায়শ্চিত্ত** বিধি ছিল। **আত্মসমালোচনা**য় সেরকম কিছুই নেই; রয়েছে বিশুদ্ধ চাতুরী।

'অদ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অত্তব্য, অত্তা, অত্র, অত্রত্য, অত্রভবান, অত্রযোগ, অত্রস্থ, অত্রি, অত্রিজ, অত্রিজাত, অত্রিনেত্রজ, অত্রিনেত্রপ্রভব, অত্রিনেত্রপ্রসূত, অত্রিনেত্রভব, অত্রিসংহিতা, অদ্, অদন, অদ্য, অদ্রি, অদ্রিকা, অদ্রিজ, অদ্রিজা, অদ্রিনাথ, অদ্রিপতি, অধ্বগ, অধ্বর, অধ্বর্য্যু, অধ্বা, অধ্বা (অধ্বন), অন্ন, অন্নকষ্ট, অন্নকূট, অন্নকোষ্ঠ্যা, অন্নক্ষেত্তর, অন্নচিন্তা, অন্নছত্র, অন্নজল, অন্নজীবী, অন্নদ, অন্নদাতা, অন্নদান, অন্নদায়, অন্নদাস, অন্নদোষ, অন্নধ্বংস, অন্ননালী, অন্নপক্তি, অন্নপাক, অন্নপাত, অন্নপান, অন্নপানি, অন্নপানী, অন্নপূর্ণ, অন্নপূর্ণা, অন্নপ্রাশন, অন্নবিকার, অন্নব্রহ্ম, অন্নময়, অন্নমল, অন্নমেরু, অন্নরস, অন্নলোভাতুর, অন্নসংস্কার, অন্নসংস্থান, অন্নসত্র, অন্নহীন, অন্নহুড়, অন্নহুড়ো, অন্নাদ্য, অন্নাভাব, অন্নায়ুঃ, অন্নার্থী, অন্নাশন, আঘাসা, আজ, আজকাল, আজি, আজিকালি, আজিকে, আজু, আজুক, আজুকা, আজুকাইল, আজুকার, আত্রেয়, আত্রেয়ী, আনাজ, ঘাস, নিঘস, নিরন্ন, পরান্ন, পরান্নভোজী। অদ্ = অস্তিত্বের দান। অদ = অস্তিত্বের দান যাহাতে। (add)।

অদ্ : ৫. 'অস্তিত্বের (আত্ম) দান'। অস্তিত্ব রূপ 'অ' এখানে 'দ্'-

এর উচ্চারণ-সহায়ক আগম। প্রকৃতপক্ষে 'দ্' হল এমন এক ক্রিয়া যাতে দুটি পক্ষ থাকে — দাতা ও গ্রহীতা। যে দেয় ও নেয়, এই দুই দিক থেকে বিষয়টিকে দেখা হয়। নেওয়ার দিক থেকে দেখলে দ্ হয়ে যায় অদ্ ও আদান। দেওয়ার দিক থেকে দেখলে হয়ে যায় দায় ও প্রদান। অদ্ তাই গ্রহণ বা গ্রাসকরণ পদবাচ্য। হরিচরণ এই 'অদ্'-এর অর্থ দিয়েছেন ভক্ষণ, সংহার, উপশমন, মোঘীকরণ। এর কারণ হল, দ্রষ্টার অবস্থান পরিবর্তন। ক্রিয়াভিত্তিক বিধিতে বহু শব্দের ক্ষেত্রেই এই নিয়মটি দেখতে পাওয়া যায়। 'অদ্'-এর 'দ্' বা দান ক্রিয়াটিকে দাতার দিক থেকে দেখলে সেটি 'দিয়ে দেওয়া' বটে, কিন্তু গ্রহীতার দিক থেকে দেখলে সেটি ভক্ষণ, সংহার, উপশমন, মোঘীকরণ প্রভৃতি হয়ে যায়। তৃতীয় বা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এই 'অদ্' একটি বস্তু বা বিষয়কে অপর একটি বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখে। সেকারণেই, ইংরেজিতে অদ্ শব্দটি add হয়ে গেছে। আসলে অস্তিত্বের তরণ যখন উৎস থেকে বিযুক্ত হয়ে যায় এবং ফলে কোথাও পড়ে যায় বা নিক্ষিপ্ত হয়, তখন সেটি অস্তিত্বের দ-অন বা 'অদ্'। যেখানে পড়ছে বা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, সেদিক থেকে দেখলে, একে অদ্ বলতে হয়। 'অদ'কে উল্টে নিলেই দা হয়। দা দান ও দায় পদবাচ্য। হয়তো সেকারণেই ক্রিয়াটির নামই দেওয়া হয়েছে **'দা'**, দন্ নয়।

অত্তব্য, অত্তা : ১. ✓অদ্ + তব্য; ✓অদ্ + তৃ - ক। (ব.শ.)। ২. *অত্তব্য = যে-দত্ত গ্রহণ করতে হয়; অত্তা = দত্তকে গ্রহণ করে যে।* ৩. ভক্ষণীয়, ভোক্তব্য; ভক্ষয়িতা, ভক্ষিতা, উপভোক্তা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.।

অত্র, অত্রস্থ : ১. ✓এতদ্ + ত্র। (ব.শ.)। ২. *অদ্ তারিত হয় যেখানে; অদ্ তারিত হয়ে যেখানে থাকে।* ৩. এই স্থানে, এখানে, এই বিষয়ে, ইহাতে, এই প্রস্তাবে, এই প্রসঙ্গে ...। (ব.শ.)। ৪. কম প্রচলিত। ৫. হরিচরণ পাণিনিকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন, এতদ্ থেকে অত্র শব্দ জাত হয়েছে। আমাদের মনে হয়েছে সেটা ঘুর-পথ। তাছাড়া অদ্ কথাটি 'এতদ্'-এর ভিতরেও রয়েছে। আমরা আমাদের বিবেচনা মতো ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ করলাম। ৬. attr(act), attr(ahent)।

অত্রি, অত্ত্রি : ১. ✓অদ্ + ত্রি - ক। (ব.শ.)। ২. *অদ্ তারণের গতিশীলতা যাহাতে।* ৩. ইনি ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের কতিপয় সূক্তের ঋষি। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজক মুনিগণের ইনি অন্যতম। ইঁহার স্মৃতিগ্রন্থের নাম 'অত্রিসংহিতা'। মহাভারত মতে, ধ্যানমগ্ন ব্রহ্মার নেত্র হইতে ইঁহার উৎপত্তি। ইনি ব্রহ্মার দশ পুত্রের অন্যতম। কর্দ্দম-সুতা অনসূয়া ইঁহার পত্নী; বিষ্ণু অংশে দত্ত (দত্তাত্রেয়), রুদ্রাংশে দুর্ব্বাসা, ও ব্রহ্মাংশে সোম ইঁহার পুত্র। মনুসংহিতা মতে, ইনি মনুর সৃষ্ট দশ প্রজাপতির একতম। ইঁহার পুত্রগণ 'বর্হির্ষদ্' দৈত্যদানবাদির পিতৃগণ। হরিবংশ মতে, ইনি স্বয়ম্ভুর (ব্রহ্মার) সপ্ত মানসপুত্রের একতম ও স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের সপ্তর্ষির ঋষিবিশেষ। ইঁহার নেত্রনীর হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়। রামায়ণ মতে, রামচন্দ্র বনবাসকালে ইঁহার আশ্রমে গমন করিলে ইঁহার পত্নী পতিব্রতা অনসূয়া সীতাকে বস্ত্রাদি দান করিয়া সতীধর্ম্মের মহত্ত্ব কীর্ত্তন করেন। (ব.শ)। ৪. অপ্র.। ৫. বস্তুত আদি জ্ঞানজীবীদের ভিতর থেকে কেমন করে পরিদর্শক-শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল, অত্রির কাহিনী তারই ইতিহাস। সেই ইতিহাস পুরাণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, হরিবংশ, যে যার নিজের মতো লিখেছে। পুরাণাদিতে বলা হয়, ছাগমুণ্ডি দক্ষকেই অত্রি বলা হয়। দ্র. **অজমুখ**। সর্বতন্ত্রের আদিতন্ত্র প্রজাপতিতন্ত্রের ইনিই কার্যত প্রথম সর্বজনস্বীকৃত **প্রজাপতি**। (তখনও রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়নি)। এঁর পর থেকেই সমাজের চোখ (অর্থনীতির জ্ঞানচোখ) ফোটে। যতদূর বোঝা যায়, অত্রির অগ্রণী দক্ষগণই সনাতন মহান-সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রথম প্রশ্ন তুলেছিলেন — একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করলে যদি বিপুল সম্পদের সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, তাহলে প্রত্যেকটি পরবর্তী কর্মই নতুন ও আবিষ্কারমূলক করতেই হবে কেন? এঁরা পরিদর্শক রূপে সমাজের রাষ্ট্রপূর্ব-তন্ত্রের প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন। বলা হয়, দক্ষের (বা ছাগমুণ্ডি দক্ষের বা অত্রির) সময় থেকে বিবাহ (contract/ চুক্তি) প্রথার প্রচলন হয়েছে। পরিচালক-পরিচালিতের মধ্যে এর আগে ছিল প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কর্মযজ্ঞে লিপ্ত হওয়ার প্রথা। আবার, অত্রির ঠিক পরে **বেণ** প্রজাপতির সময় থেকে একজন মানুষ আর একজন মানুষকে নিয়োগ করতে পারবে, এমন প্রথার প্রচলন হয়, এখন যাকে বলে appointment letter দেওয়া। তবে পূর্ববর্তী মহান সভ্যতাকে পর্যুদস্ত করে **প্রজাপতিতন্ত্রের** সূত্রপাত হয়েছিল বলে, অত্রির ভূমিকা ছিল প্রাথমিক ভাবে খুবই বৈপ্লবিক। কোন কোন পরিচালকের সঙ্গে কারা কারা সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞে লিপ্ত হবে, সেটা তাঁরাই ঠিক করে দিতেন। শুককীট থেকে জাত, ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ানো পতঙ্গ যেমন পরাগমিলনের সহায়ক, এই সামাজিক শুককীট-জাত, সমাজ-আকাশে উড়ে বেড়ানো 'পতঙ্গ'গণও সেকালের মহর্ষি পরিচালিত সম্প্রদায়ের **অতিথি** হয়ে সেকালের উপযোগী 'প্রোডাকসন ম্যানেজমেন্টের' কাজটা করে দিতেন এবং সেকারণেই 'প্রজাগণের পতি' বা প্রজাপতি রূপে তাঁরা সর্বত্র প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন। এঁরা নিজেরা সম্পদ সঞ্চয় করে জমাতেন না, মৌমাছির মতো। কাউকে হুল ফোটানোও এঁদের স্বভাববিরোধী ছিল। একই স্বভাবচরিত্রের কারণে সমচরিত্রের পতঙ্গকেও (সেকালের ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার স্বাভাবিক নিয়মে) লোকে প্রজাপতি নাম দিয়ে দেয়। যদিও ইতিহাস-হারা আজকের ভারতবাসী প্রকৃত প্রজাপতিদের কথা ভুলে গিয়ে এখন কেবলমাত্র পতঙ্গরূপ প্রজাহীন-প্রজাপতিকেই বোঝে, বিয়েবাড়িতে সেই প্রজাপতির ছবিই আঁকে, প্রজাপতি অফিসে দৌড়য়। দ্র. **প্রজাপতি**। **মদনভস্ম**। **রতিবিলাপ**। স্মর্তব্য যে, এঁদের রচিত 'অত্রিসংহিতা' আমাদের হেরিটেজ। ৬. attrite।

অদ্য : ১. ইদম্ + দ্য, নিপাতিত, পাণিনি। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের দ্-অন থাকে যাহাতে।* ৩. এই দিনে, আজ, ইদানীং, অধুনা, বর্তমান দিবস। (ব.শ.)। ৪. today বা 'আজ' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্য শব্দের অর্থ 'দান থাকে যাহাতে'। ইদম্ কথাটির মানে হল, ইৎ-অম্ অর্থাৎ 'রহস্যপূর্ণ' (= অম্) উপস্থিতরকম 'এই যে চলছে' (= ইৎ)। এর

'দান থাকে যাহাতে', তাই হল অদ্য। কার্যত স্থান-কাল-পাত্রের **প্রতিটি** অধ্যায়ে কিছু না কিছু দত্ত / গৃহীত বা যুক্ত হয়। দাতার দিক থেকে দেখলে সেটি দত্ত, গ্রহীতার দিক থেকে দেখলে তা গৃহীত এবং তৃতীয় দৃষ্টিতে দেখলে তা যুক্ত বা অদ্ (add) হয়। স্থানের নিরিখে বর্তমান স্থান, কালের নিরিখে বর্তমান সময় (আজকের দিন), এবং পাত্রের নিরিখে বর্তমান পাত্র তাই 'অদ্য' পদবাচ্য। ৬. ল্যাটিন - hodie, জার্মান - heute (হয়টে)।

অদ্রি : ১. অদ্ = ভক্ষণ। ২. *অদ্ রক্ষণ গতিশীল যাহাতে। (দ্র. অদ্য)* / যে বৃষ্টিজল পান (ধারণ) করে। (ব.শ.)। ৩. পর্ব্বত, পর্ব্বতমূষিক, সাত (সংখ্যা), পরিমাণবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সমাজে যা কিছু উৎপাদিত হয়, তার একটি অংশ যৌথঅর্থনীতির পরিচালকদের কাছে চলে যায়, অথবা পরে বিনিময়জীবীদের হাতে চলে যায়। একেই সেকালে বলা হত সূর্য্যের তাপে মেঘে পরিণত হওয়া বা চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় মোহগ্রস্ত হয়ে মেঘে পরিণত হওয়া। তার থেকে যে বৃষ্টিপাত বা ডিস্ট্রিবিউশন হত, তার বড় অংশ পেত সামাজিক সংগঠনগুলি (রাষ্ট্রীয় সংগঠনগুলি)। সেগুলিকেই পর্ব্বত বলা হত। এই পর্ব্বতকেই তার একটি ক্রিয়ার ভিত্তিতে বোঝাতে 'যে বৃষ্টিজল পান করে' বা 'অদ্রি' শব্দটি প্রয়োগ করা হত। কথাটি অতএব সামাজিক পর্ব্বত ও পার্থিব পর্ব্বত উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্য।

অদ্রিকা : ১. অদ্ = ভক্ষণ। ২. *অদ্রি করে যে, তাহার আধার।* ৩. চেদিরাজ উপরিচর বসুর স্খলিত বীর্য্য সমুদ্রে পতিত হইলে ব্রহ্মশাপভ্রষ্টা মৎস্যরূপা অদ্রিকা অপ্সরা তা ভক্ষণ করে এবং তার গর্ভেই ব্যাসমাতা সত্যবতীর জন্ম হয়। ৪. অপ্র.। ৫. **সত্যবতীই মৎস্যগন্ধ্যা**। তাঁর মা অদ্রিকা। **উপরিচর বসুর** বিশেষত্ব এই যে যৌথসমাজে সর্বপ্রথম যখন ব্যক্তিমালিকানার আদিতম রূপের প্রশ্ন ওঠে এবং সমাজপরিচালকেরা 'দেব-ব্রাহ্মণ' বা 'দেব ও অসুর' এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন, তখন উপরিচর বসু দেবপক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর তাত্ত্বিক যুক্তি যে-জনগোষ্ঠি গ্রহণ করেছিল, তাদের বলা হত অদ্রিকা। ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজ সংগঠনের এটিই আদি রূপ বলে মনে হয়।

অদ্রিজ, অদ্রিজা : ১. অদ্রি, জন্ = জনন। ২. *অদ্রি হইতে জাত, জাতা*। ৩. অদ্রিজাত, শিলাজতু, গৈরিক, গিরিমাটি, গিরিজা, পার্ব্বতী। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. একালে যাকে public enterprise বলে, তদ্রূপ সংগঠনের আদিরূপকে সেকালে গিরি, পর্ব্বত ইত্যাদি বলা হত। তার সংস্পর্শে যে জনগোষ্ঠী বিকশিত হয়, তাদের গিরিজা বা পার্ব্বতী বলে। এই সত্তা একালের সরকারী-বেসরকারী কর্মীদের ছেলেমেয়েদের যৌথসত্তার আদিরূপ। এদের অন্য নাম **উমা** (= **তপস্যা** বা শ্রম করিও না), যার মানে — যারা শ্রম করে না, লেখাপড়া করে। স্মর্তব্য যে উপরিচর বস্ **কোলাহল** পর্ব্বতের কন্যা **গিরিকাকে** মহিষী করেছিলেন। পর্ব্বত বা তৎসংক্রান্ত চরিত্রগুলিই উপরিচরের সমসাময়িক বিশেষত্ব। ৬. adriatic। দ্র. **বণিক**।

অধ্বর : ১. অধ্বন্ + ✓রা দান + অ (ক) - ক। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের ধারণ-বাহক রহে যাহাতে। / 'যাহা সৎপথ দেয়।'* (ব.শ.)। ৩. যজ্ঞ, যাগ, অষ্টবসুর দ্বিতীয় বসু। ৪. অপ্র.। ৫. **দেবতা** ও **অসুর** আদিতে একই সত্তা, যারা সমাজের শিশু-কিশোর-স্ত্রী-বৃদ্ধকে দান করে যেটুকু বাঁচে তাই খেয়ে জীবন অতিবাহিত করে। পরে অসুর হয়ে যায় মৌলবাদী-বেদবাদী, এবং দেবতা হয়ে যায় দানকারী কিন্তু বিপরীতে প্রতিদান গ্রহণকারী, অর্থাৎ বিনিময়জীবী। সেই বিনিময়জীবী বিক্রেতার একটি প্রাচীন রূপ হল অধ্বর, যখন প্রতিদান-গ্রহণ তেমন স্পষ্ট হয়নি। দ্র. **অধ্বর্য্যু**।

অধ্বর্য্যু : ১. অধ্বর, যু = মিশ্রণ (যোগ করা)। ২. যিনি অধ্বরের নেতা; যিনি যজ্ঞ শেষ করেন। (ব.শ.)। ৩. ঋত্বিগবিশেষ। দ্র. **অগ্নিষ্টোম**। ইনি যজুর্বেদবিৎ, যজুর্বেদবিধানে যজ্ঞকরণে সমর্থ। নারায়ণের মুখ হইতে ইঁহার উৎপত্তি। যজ্ঞভূমির পরিমাণ, বেদিনির্ম্মাণ, যজ্ঞপাত্রনির্ম্মাণ, জলকাষ্ঠানয়ন, অগ্নিপ্রজ্জ্বালন, পশু-আনয়ন, এবং বলিদান ইঁহার কার্য্য। (ব.শ.)। নিরুক্ত মতে, "ধ্বর শব্দের অর্থ — 'যে কার্য্যে বধ বা হিংসা করা হয়'। অধ্বর (ন ধ্বরঃ) তাহার প্রতিষেধ বা বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট। এই পক্ষে 'তৎপ্রতিরোধঃ', ইহার অর্থ 'তাহার প্রতিষেধ বা বিপরীতধর্ম্মবিশিষ্ট' (তস্য প্রতিষেধঃ)। যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হউক, হিংসার অভাব আছে বলিয়াই অধ্বরের অধ্বরত্ব, ইহাই প্রতিপাদিত হইল। প্রশ্ন হইতে পারে, অধ্বরে (যজ্ঞে) হিংসার অভাব কোথায়? যজ্ঞে তো পশু বধ করা হয়, তৃণ বৃক্ষাদি ছেদন করা হয়। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দ্বেষপূর্বক প্রাণবিনাশই হিংসা, যেখানে দ্বেষ নাই সেখানে হিংসা নাই। বেদ স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে ঘোষিত হইয়াছে যে, যজ্ঞে হিংসা নাই, যজ্ঞে যে পশু তৃণ বৃক্ষ প্রভৃতির প্রাণনাশ করা হয়, তাহা দ্বারা তাহাদিগকে হিংসা করা হয় না, তাহাদের উপকারই করা হয়। কারণ যজ্ঞার্থে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা স্বর্গে চলিয়া যায়, তাহাদের উন্নতগতি লাভ হয়, তাহাদের **অভ্যুদয়** হয়।" (পৃষ্ঠা ৯২-৯৩)। ৪. অপ্র.। ৫. এঁরা কর্মযজ্ঞের বিনিয়োগের (**যজুর্ব্বেদ = যোগ**বিদ্যা) দিকটি দেখেন, কর্মী অর্থ কাঁচামাল সবই বোধহয় এঁদের দায়িত্বে থাকত। এঁরা সমগ্র কর্মের দেহের দিকটা দেখতেন। একালের ভাষায় এদের কর্মাধ্যক্ষ বা production manager বলে। সেকালের ভাষায় এঁদের বলা হত 'অধ্বর্য্যু **পুরোডাশ** (পিঠা / উৎপাদিত বস্তু, পরে যার নাম হয় পণ্য) প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিয়া আহুতি দান পর্যন্ত সমস্ত **কার্য্য** করেন — তিনিই যেন যজ্ঞের দেহনির্ম্মাতা। সমস্ত কার্য্যই মুখ্যতঃ তাঁহাকে যজুর্মন্ত্র সাহায্যে করিতে হয়। তিনি যজুর্ব্বেদে অভিজ্ঞ।' (নিরুক্ত, ১ম খণ্ড : পৃষ্ঠা ৮৫) এই অধ্বর্য্যুগণ চার ভাগে বিভক্ত — অধ্বর্য্যু, প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা। নিরুক্ত থেকে জানা যায়, মানুষকে গাছপালাকে কর্মযজ্ঞে ব্যবহার করা উচিত কি না, তা নিয়ে সেকালে কত আলোচনাই না পেরিয়ে আসতে হয়েছে আমাদের পূর্বপুরুষকে। আজ আমরা যে কোনো লোককে কাজে নিয়োগ করে ফেলি, দুটো গাছ কেটে ফেলি। তখন সেকথা ভাবাও খুব সহজ ছিল না। গ্রামবাংলায় আমরা দেখেছি, একটি বড় গাছে কুড়ুল ঠেকাতে গাছটিকে কত প্রণাম করে কাঠুরে। সেকালের মানুষ তো

প্রকৃতিকে প্রাণহীন জড় ভাবতেন না, প্রকৃতির সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করতে তাঁদের সংশয়ের অন্ত ছিল না। শেষমেষ ভেবেছেন, কাঠটা যজ্ঞে বধ হয়ে টেবিলে পরিণত হলে তার **অভ্যুদয়** হয়। এই ভেবে তাঁরা তাঁদের তৎকালীন বিরোধীদের মোকাবিলা করেছেন। দ্র. **অগ্নিষ্টোম**।

অন্ন : ১. ✓অদ্-নিষ্পন্ন; ✓অন্ + ন (নন্) - কর্ম্মবাচ্যে; ✓অন্ + ন - ণ। (ব.শ.)। ২. *অদ্-এর (প্রদত্তের) না-করণ (নিঃশেষীকরণ) থাকে যাহাতে।* / যাহা দ্বারা বাঁচে; যাহা ভূতেরা ভক্ষণ করে। (ব.শ.)। ৩. ভক্ষিত, খাদিত, ভুক্ত, গ্রস্ত, স্বিন্ন তণ্ডুল, ওদন, ভক্ত, ভাত (অন্ন অষ্টবিধ — ভোজ্য, পেয়, চুষ্য, লেহ্য, খাদ্য, চর্ব্বণ, নিষ্পেয়, ভক্ষ্য।), শস্য, ভক্ষদ্রব্যমাত্র, দৈব ও পিত্র্য অন্ন, হব্য-কব্য, ভাত তরকারি প্রভৃতি সিদ্ধ খাদ্য, ধান্য, বিষ্ণু, পৃথিবী, অন্নতুল্য ভোগ্যবিষয়, আকাঙ্ক্ষাপূরক বিষয়। (ব.শ.)। ৪. boiled rice বা 'ভাত' অর্থে প্রচলিত। ৫. আমার সামনে একটি থালায় অন্ন রয়েছে। মাঝে রয়েছে ভাত, চারিদিকে তরিতরকারি বা ব্যঞ্জনাদি। ভাতগুলি মায়ের বা অন্য কারও 'প্রদান', আমার '**আদান**' এবং ভাতের চারদিকে সাজানো তরিতরকারি সেই আদানের উপ-আদান বা **উপাদান**। সব মিলিয়ে এই যে অন্নের থালাটি আমার সামনে দেওয়া হয়েছে, এটি আমার আগ্রহে আমাকে দেওয়া হয়েছে; আমি এগুলিকে আমার শরীরের ভেতরে গ্রহণ করব। এই থালায় দেওয়া বস্তুগুলি হল অদ্। (দ্র. **অদ্**)। আমি তাকে গ্রহণ করে নিষ্পন্ন করব, সেই সুবাদে বস্তুগুলি হয়ে যাবে অদ্-নিষ্পন্ন বা অন্ন।

আত্রেয় : ২. অত্রির অপত্য। (ব.শ.)। ৩. দত্ত, দত্তাত্রেয়, চন্দ্র, দুর্ব্বাসা, (দুর্ব্বাসার রূপে) শিব, দেহস্থ রসবিশেষ, অত্রির পৌত্রাদি। ৪. অপ্র.। ৫. অত্রি হইতে জাত সত্তা বা সত্তাগুলিকেই আত্রেয় বলে। দ্র. **অত্রি**।

আত্রেয়ী : ২. *আত্রেয়র আধারস্বরূপ প্রকৃতি*। ৩. অত্রিকন্যা প্রভৃতি, অত্রিগোত্রা নারী, অত্রিসম্বন্ধিনী নারী, অত্রিপত্নী তাপসী অনসূয়া, ব্রাহ্মণী, ঋতুমতী, ঋতুস্নাতা। (ব.শ.)। ঋষিকন্যা। মহাকবি বাল্মীকির শিষ্যা। ইনি বাল্মীকির কাছে বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতি পাঠ করেন। কিন্তু পরে যখন বাল্মীকি সীতা দেবীর পুত্র লবকুশের শিক্ষাদানে সবসময় কাটাতে লাগলেন, তখন জ্ঞানলাভের আর সুযোগ না পেয়ে আত্রেয়ী বাল্মীকির আশ্রম ত্যাগ করে ... অগস্ত্যের কাছে গিয়ে তাঁর শিষ্যা হলেন। ...পরে আত্রেয়ী অদ্বিতীয়া বিদুষীরূপে খ্যাতিলাভ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. কদাচিৎ নাম রূপে প্রচলিত। ৫. আদিতে **অত্রি** অনুসারী পুরুষশক্তি ও প্রকৃতিশক্তিকে আত্রেয় ও আত্রেয়ী বলা হয়ে থাকলেও, পরে পরে এই অভিধা বদলে যায়। সমাজের পরিচালকের আসন থেকে অত্রিগণের অপসারণের পরেও অত্রিপন্থী যে জনগোষ্ঠী আরও বহুযুগ থেকে যায়, **বাল্মীকি**র আমলে (৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের পরে) তাদেরই সম্ভবত আত্রেয় বা আত্রেয়ী বলা হত।

'অন্' (অন্ধ্, অন্ব্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আঁধার, আঁধিয়ার, অন্, অন, অনড় (অন্-অড়), অনত, অন্-তর (এন্তার), অনন্য, অনন্যকর্ম্মা, অনন্যকায়, অনন্যগতি, অনন্যগতিক, অনন্যচিত্ত, অনন্যচেতা, অনন্যদৃষ্টি, অনন্যপর, অনন্যপরায়ণ, অনন্যপীরিতি, অনন্যপূর্ব্ব, অনন্যবিষয়, অনন্যবৃত্তি, অনন্যভাক্, অনন্যভাব, অনন্যমনা, অনন্যমানস, অনন্যশরণ, অনন্যশরণ্য, অনন্যসদৃশ, অনন্যসাধারণ, অনন্যসামান্য, অন্বয়, অন্বিত, অনল, অনলপ্রিয়া, অনলভাবিনী, অনি, অনিল, অনীক, অনীকিনী, অনু, অনুকথন, অনুকম্পক, অনুকম্পন, অনুকম্পনীয়, অনুকম্পা, অনুকম্পিত, অনুকম্পী, অনুকম্প্য, অনুকর, অনুকরণীয়, অনুকর্ত্তা, অনুকর্ষ, অনুকর্ষণ, অনুকল্প, অনুকাঙ্ক্ষী, অনুকাম, অনুকার, অনুকারী, অনুকার্য্য, অনুকাল, অনুকীর্ত্তন, অনুকূলগলহস্ত, অনুকূলনায়ক, অনুক্ত, অনুক্রমণ, অনুক্রমণিকা, অনুক্রমণী, অনুক্রমী, অনুক্রমে, অনুক্রোশ, অনুক্ষণ, অনুখন, অনুগ, অনুগচ্ছ, অনুগতি, অনুগন্তব্য, অনুগম, অনুগমন, অনুগামী, অনুগর্জ্জিত, অনুগীত, অনুগুণ, অনুগৃহীত, অনুগ্রহ, অনুগ্রহণ, অনুগ্রাহক, অনুগ্রাহ্য, অনুচরিত, অনুচারী, অনুচিকীর্ষা, অনুচিত, অনুচিন্তন, অনুচ্ছিষ্ট, অনুজন্মা, অনুজা, অনুজাত, অনুজাতা, অনুজীবী, অনুজীব্য, অনুজোগমনে, অনুজ্ঞা, অনুজ্ঞাত, অনুজ্ঞান, অনুজ্যেষ্ঠ, অনুতপ্ত, অনুতর, অনুতাপ, অনুতাপন, অনুদর্শন, অনুদাস, অনুদিন, অনুদিবস, অনুদেশ, অনুদ্যুত, অনুদ্রুত, অনুধাবন, অন্যধ্যাত, অনুধ্যায়ী, অনুনাদ, অনুনাদিত, অনুনাদী, অনুনায়িকা, অনুনাসিক, অনুনির্দ্দেশ, অনুনীত, অনুপঠিত, অনুপদ, অনুপদী, অনুপদীন, অনুপদীনা, অনুপল, অনুপাতক, অনুপান, অনুপার্শ্ব, অনুপাল্য, অনুপূর্ব্ব, অনুপ্রদান, অনুপ্রপন্ন, অনুপ্রয়াত, অনুপ্রসাদন, অনুপ্রসূত, অনুপ্রাণন, অনুপ্রাপ্ত, অনুপ্রাস, অনুপ্লব, অনুবংশ, অনুবচন, অনুবদ্ধ, অনুবধি, অনুবন্ধ, অনুবর্ত্তন, অনুবল, অনুবশ, অনুবাক, অনুবাচন, অনুবাত, অনুবাদক, অনুবাদিত, অনুবাদী, অনুবাদ্য, অনুবাস, অনুবিদ্ধ, অনুবিধাতব্য, অনুবৃত্ত, অনুবেদন, অনুবেধ, অনুবেশ্য, অনুবোধ, অনুবোধন, অনুবোল, অনুব্যাধ, অনুব্যাহরণ, অনুব্যাহার, অনুব্রজ, অনুব্রজন, অনুব্রত, অনুভই, অনুভব, অনুভাগ, অনুভাব, অনুভাবক, অনুভাবন, অনুভাবী, অনুভাষণ, অনুভূত, অনুমত, অনুমনন, অনুমরণ, অনুমাতা, অনুমান, অনুমাপক, অনুমিত, অনুমৃত, অনুমেয়, অনুমোদ, অনুমোদন, অনুযাত, অনুযাতব্য, অনুযাতা, অনুযান, অনুযাত্র, অনুযুগ, অনুযোগ, অনুরণন, অনুরত, অনুরথ, অনুরথ্যা, অনুরস্ত, অনুরস, অনুরসিত, অনুরাগিণী, অনুরাগিনী, অনুরূপ, অনুরোধ, অনুরোল, অনুলগ্ন, অনুলিপ্ত, অনুলেপ, অনুলেপন, অনুলেপিত, অনুলেহ, অনুলোম, অনুশয়, অনুশয়ী, অনুশস্ত্র, অনুশায়ী, অনুশাসন, অনুশাসনীয়, অনুশাসিতা, অনুশাস্তা, অনুশিষ্ট, অনুশিষ্য, অনুশীঘ্র, অনুশীলন, অনুশীলনী, অনুশীলিত, অনুশোচ, অনুশোচক, অনুশোচন, অনুশোচনা, অনুশোচনীয়, অনুশোচিত, অনুষক্ত, অনুষিক্ত, অনুষ্টুপ, অনুষ্টুভ, অনুষ্ঠাতব্য, অনুষ্ঠাতা, অনুষ্ঠিত, অনুষ্ঠেয়, অনুসংবীত, অনুসংহিত, অনুসঙ্গী, অনুসন্ততি, অনুসন্ধানী, অসন্ধিৎসু, অনুসন্ধেয়, অনুসম্প্রাপ্ত, অনুসর, অনুসার, অনুসারণা, অনুসারী, অনুসূয়ে, অনুসূচক, অনুসেবী, অনুস্মরণ, অনুস্যুত, অনুস্বান, অনুস্বার, অনুহরণ, অনুহারক, অনুহার্য্য,

অনুত্থাদ, অনুত্থাদ, অনূচান, অনূদিত, অনূদ্দেশ, অনূপ, অন্ধ, অন্ধক, অন্ধকঘাতী, অন্ধকরিপু, অন্ধকশত্রু, অন্ধকান্তক, অন্ধকার, অন্ধকারিত, অন্ধকুণ্ড, অন্ধকূপ, অন্ধগজন্যায়, অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়, অন্ধতম, অন্ধতমঃ, অন্ধতমস, অন্ধতামসী, অন্ধতামিস্র, অন্ধদর্পণন্যায়, অন্ধনী, অন্ধপঙ্গুন্যায়, অন্ধপরম্পরান্যায়, অন্ধপূতনা, অন্ধবেগ, অন্ধরাজ, অন্ধা, অন্ধার, অন্ধিয়ার, অন্ধিসন্ধি, অন্ধীকৃত, অন্ধু, অন্য, অন্যকাম, অন্যক্ষেত্র, অন্যগ, অন্যগামী, অন্যতঃ, অন্যতম, অন্যতর, অন্যত্তর, অন্যত্তরে, অন্যত্র, অন্যথা, অন্যথাকরণ, অন্যথাকার, অন্যথাকৃত, অন্যথাত্ব, অন্যথাবাদী, অন্যথাবৃত্তি, অন্যথাভাব, অন্যথাসিদ্ধ, অন্যদা, অন্যদীয়, অন্যনাভি, অন্যন্তরে, অন্যপুষ্ট, অন্যপূর্ব্বা, অন্যবিধ, অন্যভৃৎ, অন্যমনস্ক, অন্যমনা, অন্যরূপ, অন্যসংক্রান্ত, অন্যসাধারণ, অন্যস্ত্রী, অন্যাদৃশ, অন্যান্তর, অন্যান্য, অন্যার্থ, অন্যাসন, অন্যোন্য, অন্যোঢ়া, অন্যোদর্য্য, অন্যোন্যসদৃশ, অন্যোন্যধ্যাস, অন্যোন্যাভাব, অন্যোন্যাশ্রয়, অন্যোন্যোক্তি, অন্বয়, অন্বর্থ, অন্বহ, অপান, আঁদিসাঁদি, আঁধ, আঁধল, আঁধা, আঁধার, আঁধারি, আঁধারিয়া, আঁধিয়ার, আঁধুনি, আঁধুয়া, আঁধোল, আণ, আন, আনক, আনকদুন্দুভি, আনচান, আনন, আনবেশ, আন-মন, আন-মনস্ক, আন-মনা, আনল, আনহি, আনাড়ি, আনু, আনুকল্পিক, আনুকূল্য, আনুগত্য, আনুগুণ্য, আনুপাম, আনুপূর্ব্ব, আনুপূর্ব্বক, আনুপূর্ব্বিক, আনুবেশ্য, আনুমানিক, আনুযাত্রিক, আনুরক্তি, আনুরূপ্য, আনুলৌমিক, আনুশাসনিক, আনুশ্রবিক, আনুষঙ্গ, আনুষঙ্গিক, আনুসূয়, আনূপ, আন্দারিয়া, আন্ধ, আন্ধল, আন্ধার, আন্ধারি, আন্ধারিয়া, আন্ধিআরী, আন্ধুয়া, আন্ধ্র, আন্বয়িক, আন্বাহিক, উদান, এঁদো, এঁধো, এঁশে, এন্তার, প্রাণ, প্রাণন, প্রাণপণ, প্রাণময়, প্রাণায়াম, প্রাণী, প্রাণেশ্বর, ব্যান, ষড়ানন, সপ্রাণ, সমান, সমান্তর, সামান্য।

অন্ = অস্তিত্বের ন্-অন (না-করণাদি, negation)। **অন** = অস্তিত্বের ন-কার বা ন্ (অন্তের দিকে যাত্রা) থাকে যাহাতে। (অন্ বা on হতে থাকলে, শেষে তার অন্ত হয়।)। (on)।

অন্, অন : ২. *অস্তিত্বের ন্-অন্ যাহাতে; অস্তিত্বের নাকরণ যাহাতে; যে অস্তিত্ব আপনার অন্তের দিকে চলিয়াছে।* ৩. অনভগ্ন, জীবন, বাঁচা। ৪. চলন (চল-অন্), বলন (বল-অন্) এইসব শব্দে অর্থপূর্ণভাবেই প্রচলিত যদিও তা প্রায়শই সনাক্ত হয় না। ৫. ইংরেজি on শব্দটি adverb রূপে যখন ব্যবহৃত হয়, তখন এই একই অর্থ ধারণ করে। আমরা যখন বলি 'সুইচটা on করে দাও' তখন on শব্দটি যে অর্থে প্রযুক্ত হয়, বাংলা অন্ শব্দটিও সেই অর্থেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। চলন্, বলন্, এই শব্দগুলিতে অন্ একই অর্থে প্রযুক্ত। তবে মনে রাখা দরকার, কোনো সত্তা অন্ (on) হলে একদিন না একদিন সে অপ্ (অ-পালন) বা অফ্ (off) হয়ে যাবে। তাই অন্ করলেই অস্তিত্ব যদি সক্রিয় হয়, তৎক্ষণাৎ তার সক্রিয় হওয়ার শক্তি কমতে শুরু করে অর্থাৎ অস্তিত্বের নাকরণ শুরু হয়ে যায়। তাই অন্-করণ বা হ্যাঁ-করণ মানেই না-করণও বটে। দ্র. ন।

[১]এই অন-এর ব্যবহার বাংলা, আরবি-ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় প্রায় একভাবেই হয়ে থাকে। যেমন **খ্রিস্ট** (নীতি/সংস্কৃতি) অন যাহাতে = খ্রিস্টান (Christian); অনুরূপভাবে **মুসলমান** (**মহম্মদ**-নীতিসংস্কৃতি অন যাহাতে = Mohammedan), **ইন্ডিয়ান**, রুমানিয়ান, ককেসিয়ান, আলবেনিয়ান, হিমালয়ান, রাশিয়ান, আমেরিকান ... ইত্যাদি। **ইম, ইশ, ইষ্ট** শব্দেরও এইরকম সম-উত্তরাধিকার বিদ্যমান। দ্র. **অ**। ৬. on।

অনল, অনিল, অনীক : ১. ✓অন্ + অল (কলচ্) - ণ; ✓অন্ + ইল (ইলচ্) - ণ; ✓অন্ + ঈক (ঈকন্) - ণ। (ব.শ.)। ২. **অনল** = *অন্-এর লালন-লোপন করে যে;* **অনিল** = *অন্-এর গতি লালিত-লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে;* **অনীক** = *অন্-এর গতিশীলতাধারীর করণ যাহাতে।* / অনল, অনিল, অনীক = যাহা দ্বারা বাঁচে। (তিনটি শব্দের এইরূপ একই ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়েছেন ব. শব্দকোষ)। ৩. **অনল** = আগুন, দেবতা অগ্নি, জঠরানল, পিত্তধাতু, অগ্নিদেবতাকা কৃত্তিকা নক্ষত্র, অগ্নিবীজ, ৩ সংখ্যা, চিত্রকবৃক্ষ বা চিতা, রক্তচিত্রক, লালচিতা, ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলা, বসুবিশেষ, পিতৃদেবতাবিশেষ, বৃহস্পতিগ্রহের ষষ্টিবর্ষান্তর্গত পঞ্চাশতম বর্ষ, বায়ু, জীবাত্মা, জীব, বাসুদেব, বিষ্ণু, ব্রহ্ম। **অনিল** = বায়ু, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুদেবতা, পবনদেব, অষ্টবসুর একতম, লোকপালবিশেষ, শরীরধাতুবিশেষ, শরীরস্থ প্রাণাদিবায়ু, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুর একতম, ৪৯ সংখ্যা, বায়ুবীজ 'য', অনিলদেবতাকা স্বাতী নক্ষত্র, বাত রোগ, বিষ্ণু। **অনীক** = সৈন্য, সেনা, বৃন্দ, সমূহ, নিচয়, শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি, যুদ্ধ, অগ্র। (ব.শ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. অন্ অল (দ্র. **অল্ল**) যাহাতে সেটা আগুন। বেদ-এর দেবতা অগ্নি বা তেজ থেকে ব্রহ্মাগ্নি বা জ্ঞানাগ্নি পর্যন্ত সব অগ্নিই লালন-লোপন করে, তাই তারা প্রত্যেকেই অনল পদবাচ্য। আবার, অন্ ইল যাহাতে সেটা বায়ু। সে বায়ু পার্থিব বায়ুপ্রবাহ থেকে সংবাদের বায়ুপ্রবাহ পর্যন্ত প্রসারিত; তাই তারা প্রত্যেকেই অনিল পদবাচ্য। আর, অন্ ঈক যাহাতে সেটা সৈন্য। কার্যত অন্-এর গতিশীলতাধারীর করণ থাকে দলবদ্ধ মানুষে। অনীক তাই বহু মানুষের সমাহার।

অনসূয়া : ২. *নেই অসূয়া যাহার।* / যাহার অসূয়া (গুণে দোষাবিষ্কার) নাই। (ব.শ.)। ৩. অত্রিমুনির পত্নী। ইনি কর্দ্দমমুনির কন্যা। বনগমন সময়ে ইনি সীতাকে সতীধর্ম্মের উপদেশ দিয়া অম্লান মাল্য দিব্যবস্ত্র আভরণ অঙ্গরাগ ও সুগন্ধি অনুলেপন প্রদান করেন। ইঁহার তপোবলে ইঁহার সখীর প্রতি মাণ্ডব্য ঋষির বৈধব্যশাপ ব্যর্থ হয়। শকুন্তলার সখীবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. যে জনগোষ্ঠী একই জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি করে, নতুন জ্ঞান আহরণে গুরুত্ব দেয় না। নতুন আবিষ্কারে যদি নতুন কিছু ঘটেও, তাতে তার কোনো ঈর্ষা হয় না; সে তার নিজের স্বামীর (ছাগমুণ্ডি দক্ষের বা অত্রির) পথেই একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি মান্য করে চলতে থাকে। তাই সে সতী অনসূয়া। এই সত্তাই কার্যত একই পরিচালকের (স্বামীর) প্রতি বিশ্বস্ত জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীর সন্তান রূপে বিষ্ণু অংশে দত্ত (দত্তাত্রেয়), রুদ্রাংশে দুর্ব্বাসা, ও ব্রহ্মাংশে সোম ইঁহার পুত্র। দ্রষ্টব্য **অত্রি**, **দত্তাত্রেয়**।

অনু : ২. *অন্ (on) নবরূপে উত্তীর্ণ (উ) যাহাতে।* ৩. পশ্চাৎ, অনন্তর, পরে, সাদৃশ্য, সাম্য, যথার্থ, লক্ষণ, চিহ্ন, বীপ্সা, বিষয়বিষয়িভাব, ভাগ, হীন, সহার্থ, সম্বন্ধ, আয়াম ... ইত্যাদি; শর্মিষ্ঠার গর্ভে যযাতির পুত্র। যযাতির শাপে অনু পুরান্বিত হন, ও তাঁর সন্তান যৌবনলাভেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তিনি অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াহীন হন। (পৌ. অ.)। ৪. কেবলমাত্র উপসর্গ রূপে প্রচলিত। ৫. নাকরণ বা অবক্ষয়ই অন্-এর স্বভাব, অন্ হতে হতে ক্রমশ ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যাওয়া। কিন্তু সে-পথে না গিয়ে সে যদি অন্য পথ ধরে, নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায়? যদি কারও পেছনে পেছনে যেতে থাকে, তখন তাকে অনু বলে। ... 'যেমন চলছে তেমন চলুক', এই নীতি যযাতিপুত্র অনুর সেকারণেই ভাল লাগেনি। স্বভাবতই সে তার পূর্বসূরী **'যযাতি'**কে (যেমন চলছে তেমন চলুক মানসিকতাকে /status quo বজায় রাখাকে) গ্রহণ করতে রাজি হয় না।

অনুকম্পা : ১. অনু + ✓কম্প্ + অ-ভা + স্ত্রী আ। (ব.শ.)। ২. *যাহাতে অল্প কম্পন আছে।* ৩. কৃপা, দয়া, অনুক্রোশ। ... (ব.শ.)। ৪. kindness অর্থে প্রচলিত। ৫. যার দ্বারা ভয় দেখানো হয়, কিন্তু ভয়ে মরে যাবে, পালিয়ে যাবে এত বেশি ভয় দেখানো হয় না। 'একটুখানি কাঁপিয়ে ছেড়ে দেওয়া', কিন্তু তার বেশি নয়। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে সর্বস্বান্ত না করে, যদি কেবল কিছু টাকা নিয়ে বা অন্য কিছু নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে অনুকম্পা করা হয়।

অনুকল্প : ১. অনু + ✓কল্পি + অ (অচ্) কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কল্পের অনুসারী যে। /* যাহা গৌণভাবে বিহিত। (ব.শ.)। ৩. মুখ্য কল্প হইতে হীন কল্প; গৌণকল্প, অধমবিধি; প্রতিনিধি; ... বিহিত মুখ্যদ্রব্যাভাবে তৎপ্রতিনিধিভূত সুসদৃশ দ্রব্যান্তর; যেমন যবাদির অভাবে গোধুম, মধুর অভাবে গুড়। ... (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. (কল্প্ = কল্ পালন, তাহার গতি বা বিকাশসাধন = কল্পি)। ইংরেজিতে যাকে project বলে, বাংলাভাষার কোনো এক যথার্থ জ্ঞানী মানুষ তার অনুবাদ করে রেখেছিলেন 'প্রকল্প'। শব্দটি এখন খুবই প্রচলিত, অবশ্যই project অর্থে। বস্তুত স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে মহাবিশ্বের মহাসামঞ্জস্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে যে পরবর্তী কার্যক্রম কল্পনা করা হয়, তাকেই **কল্প** বলে। কিন্তু যে পরবর্তী কার্যক্রম দক্ষতার দিশাগ্রস্ত বুদ্ধিতে প্রকৃষ্ট রূপে কল্পিত হয়, তাকে **প্রকল্প** বলে। আগের কালে কল্পের পেছন পেছন **অনুকল্প** থাকত, একালেও প্রকল্পের পিছু পিছু কখনো কখনো কিছু অনুকল্প থাকে। **অনুকরণ, অনুগ্রহ, অনুরূপ** প্রভৃতি শব্দ প্রায় এরকমই। দ্র. **কল্প**।

অনুগ্রহ : ১. অনু + ✓গ্রহ্ + অ (অপ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহাতে অল্প গ্রহণ আছে।* ৩. প্রসাদ, কৃপা, আনুকূল্য, দরিদ্রাদিপোষণ, পালন, পোষণ, রক্ষণ। (ব.শ.)। ৪. kindness অর্থে প্রচলিত। ৫. ভারতের মন্দিরকেন্দ্রিক সভ্যতায় চাষের জমি ছিল মন্দিরের। চাষী চাষ করে মন্দিরের পাওনা ধানচাল নিয়ে মন্দিরে পৌঁছলে এবং অনাবৃষ্টি ইত্যাদির কথা বললে, পুরোহিত যদি পাওনা পুরো বস্তা ধানচাল না-নিয়ে, প্রতীক রূপে প্রতি বস্তা থেকে দু'মুঠো করে গ্রহণ করে বলতেন — **নিয়ে যা, বউছেলেমেয়ে** নিয়ে ভালো করে চাষবাস কর্, তবে **তিনি 'অনুগ্রহ' করতেন**। দ্র. **অগ্রহার, অবগ্রহ**।

অনুদ্যূত : ১. অনু + ✓দিব্ + ত (ক্ত) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। (দিব্ = জিগীষা, ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয় করা।) ২. *যাহাতে দেবন-এর অনুবর্তন থাকে।* ৩. **পশ্চাৎ (পুনর্ব্বার)** পাশকক্রীড়া, পুনর্দেবন। অনুদ্যূতপর্ব্ব। ... (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. 'দিব' 'দিব' যারা বলে বা **পরিকূজন** করে, সেই দেবনকারী দেবতারাই 'এ-পাশ থেকে ও-পাশে' পণ্য বিনিময় করে, **'পাশা'** খেলে। একে দ্যূতক্রীড়াও বলা হয়। কিনে বেচে দেওয়া, যে কিনল সে আবার বেচে দিল, এইভাবে চলতে থাকাকে বলে অনুদ্যূত। এর ফলে উৎপন্ন বা পণ্য বিক্রীত বস্তু রূপে হাতবদল হতে হতে শেষ পর্যন্ত কার হাতে গিয়ে পৌঁছবে তার আর বিন্দুমাত্র নিশ্চয়তা থাকে না, সবই 'দৈব'নির্ভর হয়ে যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষ জানাচ্ছেন — **নীলকণ্ঠ** মহাভারত উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, দৈবই যুধিষ্ঠিরাদিকে অনুদ্যূতে প্রবৃত্ত করেছিল।

অনুধাবন : ১. অনু + ✓ধাব্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। (ধাব্ = শীঘ্রগমন। ধাওয়া-বহন)। ২. *যাহাতে পশ্চাৎ ধাবন (পেছনে পেছনে দৌড়ানো) আছে।* ৩. পশ্চাৎ গতি, অনুগমন, তত্ত্বনির্ণয়ার্থ কোনো বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান, গবেষণা, অনুচিন্তন, প্রক্ষালন, শোধন। (ব.শ.)। ৪. 'বুঝতে পারা' অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দটির প্রচলিত অর্থ 'বুঝতে পারা', কিন্তু সে তো বিষয়ের পেছনে পেছনে দৌড়ানোই বটে! ৬. ইংরেজিতে সমান অর্থধারক শব্দ না থাকলেও ধারণাটি রয়েছে, রয়েছে তাদের 'follow my argument' জাতীয় শব্দবন্ধে।

অনুভব : ১. অনু + ✓ভূ + অ (অপ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। (ভূ = বিদ্যমান হওয়া। হওয়ন।) ২. *(বাহ্য) হওয়নের পশ্চাৎ (মানুষের মনোলোকে) যে হওয়ন ঘটে।* / বিষয়ের অনুরূপ ভবন যাহাতে। (ব.শ.)। ৩. বিষয়াকারে বুদ্ধিবৃত্তির পরিণতিরূপ বৃত্তি, স্মৃতিভিন্নজ্ঞান, উপলব্ধি, বহুদর্শিতাজন্য জ্ঞান, বুদ্ধি, পরিণাম, অনুভবসিদ্ধ বিষয়, রহস্য, তত্ত্ব। প্রত্যক্ষ অনুমান শব্দ উপমান অর্থাপত্তি অনুপলব্ধি সম্ভব ঐতিহ্য — এই অষ্টবিধ অনুভব। ইহাদের মধ্যে ক্রমান্বয়ে চার্ব্বাক একটি, কণাদ বৌদ্ধ দুইটি, সাংখ্য পাতঞ্জল তিনটি, নৈয়ায়িক চারিটি, প্রভাকর পাঁচটি, বেদান্তী মীমাংসক ছয়টি, ও পৌরাণিক আটটি অনুভব স্বীকার করেন। (ব.শ.)। ৪. শুধুমাত্র feel করা অর্থে শব্দটি বর্তমানে প্রচলিত। ৫. ভব মানেই হওয়া বা অস্তিত্ব লাভ করা, আর ভব তো সারা বিশ্বই। সেই বিশ্বের চেয়েও বড়ো যে বিশাল দুনিয়া মানুষের অধিকারে রয়েছে তা হল তার মন, তার বুদ্ধি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বিশ্বকে বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে আঁটিতে পারে, মানুষের অসীম ব্যক্তিত্বের এই বিশেষত্ব।' বঙ্গীয় শব্দকোষ জানাচ্ছেন, সেই বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়াকারে পরিণতিরূপ বৃত্তি হল অনুভব। অর্থাৎ, ভুস্ করে একটি 'ভব' তো 'হয়ে গেল' বা অস্তিত্বলাভ করল; কিন্তু সেটা হল কী করে, কী ভাবে? যেভাবে কিংবা যা করে সেই ভব অস্তিত্বলাভ করল, ভবের পেছনে পেছনে সেই ভাব মানবমনের বুদ্ধিবৃত্তিতে

স্থান করে নেয়। একেই অনুভব বলে। বঙ্গীয় শব্দকোষ একেই বলেছেন বুদ্ধির বিষয়াকারে পরিণতিরূপ বৃত্তি। মানুষের সমস্ত পুরনো জ্ঞানের বিচার-বিবেচনা ও সমস্ত নতুন জ্ঞানের অর্জ্জন ঘটে এই অনুভবের মাধ্যমে। (এই সুবাদে, অনুভব নাই যার তাকে মৌলবাদী বলা যায়।) দ্র. **অনুভাব, ভব**।

এখানে উপরোক্ত বয়ান থেকে চার্ব্বাক, কণাদ প্রমুখ ভারতীয় পণ্ডিতদের একটি ঐতিহাসিক কালানুক্রমিক অবস্থান টের পাওয়া যায়। আমাদের সমাজের বিকাশের ইতিহাসে নিশ্চিতভাবেই সর্বাগ্রে চার্ব্বাক এবং সবশেষে পৌরাণিকগণ সক্রিয় হয়েছিলেন। তাই বিশ্বজগৎকে অনুভব করার আটটি উপায়ের ক্রমান্বয় বাড়বৃদ্ধি ঘটেছে পরবর্তী অনুভবকারীদের। বঙ্গীয় শব্দকোষের উল্লেখ করা অষ্ট অনুভব বিষয়ক এই প্রসঙ্গটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অনুভাব, অনুভাবন : ১. অনু + ✓ভাবি + অ (অচ্) - ণ; অনু + ✓ভাবি + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অনুভব হইতে জাত; অনুভব-জাত অন যাহাতে।* / যাহা দ্বারা উদ্বোধিত হয়; যাহা দ্বারা রত্যাদি প্রকাশিত হয়। (ব.শ.)। ৩. তেজঃ, মহিমা, মহত্ত্ব, মতিনিশ্চয়, সামর্থ্য, নিশ্চয়, অভিপ্রায়নিশ্চয়, অবশ্যম্ভাবিতা, পশ্চাৎ-জাত। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. নিঃসন্দেহে মানুষের দুনিয়ায় সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হল তার জ্ঞান; কিন্তু যদি তা জগতের কোনো কাজে না লাগে, তা একেবারেই মূল্যহীন, ফালতু। আর অনুভবলব্ধ জ্ঞান যখন কাজে পরিণত হতে শুরু করে, তখনই তা অগ্নিরূপে ক্রিয়া করতে শুরু করে। সেই কারণে তাকে তেজ, মহিমা ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।

অনুযোগ : ১. অনু + ✓যুজ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে আচরণের দ্বারা পশ্চাতে কিঞ্চিৎ যোগ করা হয়।* ৩. প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। মতের আবিষ্করণ, মতপ্রকাশ, নিন্দা, তিরস্কার, পরীবাদ, উদ্যম, প্রযত্ন, প্রার্থনা, যাচনা, সমাধি ...। (ব.শ.)। ৪. mild protest বা ঈষৎ আপত্তি অর্থে প্রচলিত। ৫. মূল বক্তার বক্তব্যের সঙ্গে কিছু যোগ করাকে বলে অনুযোগ। কিন্তু সেটা যেভাবে করা হয়, তাতে প্রায়শ মনে হয়, যেন বা অনুযোগকারী মূল বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলছেন। অনু যুক্ত বেশির ভাগ শব্দের ক্ষেত্রে এভাবেই মানে প্রায়শই বদলে গেছে। যেমন অনুরোধ। এই শব্দের মধ্যে অল্প বিরুদ্ধাচরণ আছে। যাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, তাকে আসলে *ঠেকানো* হচ্ছে। সে যেটা করতে চলেছে, অনুরোধকারীর পক্ষে তা অশুভ ব'লে। তাই তার অনুরোধ। 'গৃহকর্তা পুলিসকে ঘরে না ঢোকার জন্য অনুরোধ করল।' পরে মানেটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে কোনো কাজ করার জন্য প্ররোচিত করায়। যেমন, মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জনসাধারণকে *অনুরোধ* করছি, তাঁরা যেন বন্যাপীড়িতদের জন্য মুক্তহস্তে দান করেন।'

অনুরোধ : দ্র. **অনুযোগ**।

অনূপ : ১. অনু + অপ্ > উপ। (ব.শ.)। ২. যে স্থানে জল অনুগত। (ব.শ.)। ৩. অনুগতোদক, জলপ্রায়, জলবহুল, প্রায় জলময়, জলপ্রায় দেশ, জলবহুল স্থান, নদীতীর, দেশবিশেষ, (অনূপবাসী) মহিষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. উপনিবেশ। কলোনি। যেখানে জনগণ অনুগত। অর্থাৎ সেকালে কোনো জাতিকে পরাজিত করে শাসন করলে গোটা জাতি ও সেই দেশটিকে অনূপদেশ বলা হত। আধুনিক বাংলা এই শব্দটির অর্থ ভুলে গিয়ে ইংরেজি colony শব্দের পরিবর্ত শব্দ বানিয়েছে 'উপনিবেশ', যা একটি অর্বাচীন বাংলা শব্দ।

অনূরু, অনুরু : ২. যাহার উরু নাই। (ব.শ.)। ৩. বিনতার জ্যেষ্ঠপুত্র গরুড়ের অগ্রজ অরুণ। অকালে ডিম্বভঙ্গ হেতু ইঁহার উরুপ্রভৃতি অধস্তন দেহভাগ অপরিপুষ্ট ও বিকৃত হয়। সেই হেতু ইঁহার নাম 'অনূরু'। জন্মের পরেই আকাশে উঠিয়া ইনি সূর্য্যরথে আসন গ্রহণপূর্ব্বক সারথ্য স্বীকার করেন। এই হেতু সূর্য্য 'অনূরুসারথি'। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **উরু** শব্দটি **বৈশ্য**কেও বোঝায়। আদি যৌথঅর্থনীতির সারথিদের বৈশ্য অংশটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। দ্র. **উরু, ঊরু, ঊর্ব্ব, বেণ, নিষাদ, কিরাত**।

অন্ধ (অন্ধকার) : ১. ✓অন্ধ্ + অ (অচ্) - ক; ✓অন্ধি + অ (অচ্) - ক। (ব.শ.)। ২. **অন্ধ** = *যে (চক্ষুষ্মানের দর্শনেচ্ছা বা) অন্ ধৃত হয়ে রয়েছে।* / **অন্ধকার** = যাহা অন্ধ করে। (ব.শ.)। ৩. **অন্ধ** = নেত্রদ্বয়হীন, চক্ষুঃসত্ত্বেও দর্শনসহকারী আলোকাদির কার্য্যকারিত্বের অভাবে দৃষ্টিশক্তিহীন, শ্রুতিস্মৃতিরূপ নয়নহীন, সদসদ্‌বিচারহীন, বস্তুবিচারমূঢ়, দৃষ্টিপাতহীন; অতি গাঢ়, নিবিড়, সান্দ্র, ঘন, মলিন, অস্বচ্ছ, তিমিরময়, পরিব্রাজকবিশেষ, পরিভাষিত রাশিবিশেষ, অন্ধকার, তিমির, অজ্ঞান, জল, নিবিড় তমোময় নরকবিশেষ। **অন্ধকার** = তমঃ, তিমির, অপ্রফুল্লভাব, বিষণ্ণ। (ব.শ.)। ৪. কানা বা blind অর্থে প্রচলিত। ৫. মানুষের মন অন (on) হয়ে থাকে তার চোখের মাধ্যমে। চোখকে তাই মনের জানালা বলে। কখনো কখনো সেই জানালা থাকা সত্ত্বেও মানুষের মন অন হতে পারে না, যদি তার পাল্লা দুটি বন্ধ করে রাখা হয়; অর্থাৎ (মনের) 'অনকে ধরে রাখা হয়', অন হতে দেওয়া হয় না। তখন সেই 'বন্ধ-পাল্লাওয়ালা চোখের অধিকারী'কে বলা হয় অন্ধ। বঙ্গীয় শব্দকোষ সেকারণেই বলেছেন — 'চক্ষুঃসত্ত্বেও দর্শনসহকারী আলোকাদির কার্য্যকারিত্বের অভাবে দৃষ্টিশক্তিহীন' ব্যক্তিকেই অন্ধ বলে। তার মানে, **অন্ধ** হতে বাধ্য করে যে পরিস্থিতি তাকে **অন্ধকার** বলে। দ্র. **অক্ষি**।

অন্ধক : ১. অন্ধ + ক (কন্) স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. *অন্ধ করে যে।* / যে (নিজেকে) অন্ধ করে। ৩. অন্ধজন। যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়বিশেষ। হরিবংশ পুরাণ (৩৭তম অধ্যায়) মতে ইঁহার পিতা সত্ত্বান ও জননী কৌশল্যা। কুকুরবংশ প্রবর্ত্তক কুকুর ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। [শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল এই কুকুর বংশে] আবার ১৪৪-১৪৫ অধ্যায় অনুসারে ইনি অসুরবিশেষ। ইঁহার পিতা কশ্যপ, মাতা দিতি। ইহার সহস্র বাহু ও মস্তক এবং দ্বিসহস্র চক্ষু ও চরণ। অহঙ্কারে অন্ধতা হেতু নাম 'অন্ধক'। শিবসৃষ্ট পারিজাত বন উৎপাটন করিতে উদ্যত হইলে মহেশ্বর মহাশূলে ইঁহাকে ভস্মসাৎ করেন। রামায়ণ মতে ইনি অন্ধ মুনিবিশেষ; ইঁহার কোনো নাম নাই, ইঁহার পুত্র 'যজ্ঞদত্ত'। মহাভারত মতে ইঁহার পিতা উতথ্য ও মাতা মমতা। জন্মান্ধতা হেতু ইনি

দীর্ঘতমা নামে অভিহিত। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. নিজেকেই করুক আর অপর কাউকেই করুক, 'অন্ধ করে যে' তাকে অন্ধক বলে। এবং লোকে জান্তে বা অজান্তে কাজটি করে থাকে। আর, এই অন্ধ করে দেওয়া কেবল দৈহিক ভাবেই নয়, মানসিক ভাবেও করা যায়। ভারত সমাজের ইতিহাসের স্রোতধারায় এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল। সম্ভবত সেই একটি ঘটনাকেই হরিবংশ পুরাণ, রামায়ণ, ও মহাভারত তিনভাবে লিখে গেছে। বঙ্গীয় শব্দকোষ সে-কথা একত্রিত করে উল্লেখ করে গেছেন।

পুরাণের এই অংশটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় সকল পুরাণাদি গ্রন্থে এর উল্লেখ রয়েছে নানাভাবে। তবে মহাভারতে যে ভাষায় বলা হয়েছে, এখানে আমরা তারই অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করব। বৃহস্পতির দাদা উতথ্য। বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেন চন্দ্র। তাদের পুত্র বুধ। বুধের পুত্র পুরুরবা। ওদিকে পুরূরবাই চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ। (দ্র. **যযাতি, পুরু, শর্মিষ্ঠা, দেবযানী**)। তারকাময় সংগ্রাম হয় তারাকে উদ্ধার করার জন্য। যুদ্ধ অন্তে প্রশ্ন ওঠে কে তারার পুত্রকে ভরণ করবে। চন্দ্রের ঔরসে তারার গর্ভজাত সন্তানকে গ্রহণ ও ভরণ করতে বৃহস্পতি অস্বীকার করে। এদিকে বৃহস্পতি নিজে দাদার পত্নীতে গমন করার চেষ্টা করলে গর্ভস্থ ভ্রূণ তাতে বাধা দেয়। বৃহস্পতির শুক্র ভূমিতে পতিত হয়ে জন্ম হয় ভরদ্বাজের। বৃহস্পতি তখন গর্ভস্থ ভ্রূণ-শিশুকে অভিশাপ দেন। সেই ভ্রূণই পরে অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমা বা অন্ধক, যে কিনা উতথ্যের ঔরসজাত। আর বৃহস্পতির ঔরসজাত **ভরদ্বাজ**। তাকে **মমতা** বা বৃহস্পতি কেউই গ্রহণ-ভরণ করতে রাজি না হওয়ায় প্রথমে **মরুদ্‌গণ** তাকে পালন করেন। পরে **দুষ্মন্ত**পুত্র রাজা **ভরত** তার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। ভরদ্বাজের অন্য নাম **বিতথ**। ওদিকে **বৃহস্পতি**র দাদার নাম **উতথ্য**। এই ভরদ্বাজের পুত্র **দ্রোণাচার্য**। এইখানে সমাজ বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস অন্তর্নিহিত রয়েছে। দ্র. **কুকুর**।

অন্ধতামিস্র : ১. অন্ধ + তমিস্রা + অ। ২. *যাহাতে অন্ধতাজনক তমঃ রহে*। / যে স্থানে নিবিড় তামিস্র (অন্ধকার)। (ব.শ.)। ৩. গাঢ় তমিস্রা, নিবিড় তিমির। অবিদ্যাবৃত্তির একতম — দেহনাশে আমিত্ব নষ্ট হইল, এইরূপ বুদ্ধি বা অজ্ঞান। ... মরণত্রাস। গাঢ় তমোময় নরকবিশেষ বা লোকবিশেষ। মনুমতে বকব্রতী ও বিড়ালব্রতী ব্রাহ্মণেরা, যাজ্ঞবল্ক্যমতে মহাপাতক ও উপপাতকের পাপীরা এবং বাজসনেয় সংহিতোপনিষদের মতে আত্মঘাতীরা এই নরক ভোগ করে। ... (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. মহাধার্মিক বকের মতো একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকা আর সুযোগ পেলেই আমিষ মাছটিকে গপ করে গিলে ফেলা, তারপর আবার যে কে সেই, যেন কিছুই জানে না — এই বৃত্তি মনুমতে ঘোরতর পাপকাজ। আর, বিড়ালব্রতী ব্রাহ্মণ, যে ভাজামাছটি উলটে খেতে জানে না, কিন্তু প্রথম সুযোগেই 'খেয়ে নিয়ে মুখ মুছে ফেলে' (= **মার্জার**), কেউ যাতে বুঝতে না পারে, তার সম্পর্কেও মনুর এই মত। কিন্তু প্রশ্ন হল, ঐ **নরকটি** কোথায়? দেহনাশ হলে আমিত্ব নষ্ট হয় — এইরূপ অজ্ঞানতা একালের নাস্তিকদের রয়েছে। তাতে **পিতৃপ্রবাহে, দেবপ্রবাহে,** ও **ঋষিপ্রবাহে** মানুষের আমিটা যে বেঁচে থেকে যায়, তা তারা জানতে পারে না। **এর ফলে তারা যে-অজ্ঞানান্ধকারে থাকে, তা নিজের শেষ হয়ে যাওয়ার বোধের কারণ হয় ও নরকযন্ত্রণা বলে মনে হয়। হয়তো সেজন্যই একে অন্ধতামিস্র-নরকের বাসিন্দা বলা হয়েছে। নইলে ভালোমানুষ কিন্তু নাস্তিক শিবনারায়ণ রায়ের মতো মানুষের পক্ষে শেষ বয়সে মৃত্যুর কথা ভাবতে গিয়ে মনের গভীরে শিহরণ জাগবে কেন, কেনই-বা তিনি জীবনের অন্তিমকালে 'মৃত্যু' নিয়ে বিশাল প্রবন্ধ লিখতে বসবেন।**

অন্য : ১. ✓অন্ + য। (ব.শ.)। ২. *অন থাকে যাহাতে*। ৩. ভিন্ন, তদ্‌ভিন্ন, অপর, পর, অধিক, আরও, অসদৃশ, এক, পরকীয়। (ব.শ.)। ৪. other বা 'ভিন্ন' অর্থে প্রচলিত। ৫. দুনিয়ায় কোটি কোটি বস্তু রয়েছে, যে যার নিজের মতো। তারা প্রত্যেকেই বদলায়, বদলে আর একটা বস্তুতে রূপ পায়। এই বদল হওয়াকে 'অন্ হওয়া' বলে। 'অন্' হতে হতে হতে হতে যেখানে বা যে রূপে, অর্থাৎ যাতে গিয়ে পৌঁছায় সেটিই 'অন্য'। সেই সুবাদে যে বস্তু বা বিষয়ের কথা বলা হবে, সেটি বাদে বাকি সবই 'অন্য' পদবাচ্য। ৬. আবেস্তা anya; ইংরেজি any, any-other, ano(ther) এই 'অন্য' শব্দেরই ইংরেজি উত্তরাধিকার। জাপানী ভাষায় শব্দটি ano-রূপে (যার মানে — ওই, সে, উনি, তাহারা, ওগুলি ইত্যাদি) বিদ্যমান।

আনন : ১. আ + ✓অন্ + অন (ল্যুট্) - ণ। (ব.শ.)। ২. *আন্ অন থাকে যাহাতে*। / যাহা দ্বারা (পানাহার করিয়া) বাঁচে। (ব.শ.)। ৩. তুণ্ড, মুখ (mouth), মুখমণ্ডল। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. আ-অন্ বা আন্ অন থাকে যাহাতে, সেটিই হল আমাদের আনন। 'মুখ উজ্জ্বল হওয়া', 'মুখ দেখানো', 'মুখ লাল হওয়া', 'মুখ বাঁচানো' (face saving) প্রভৃতি শব্দবন্ধে যে মুখের কথা বলা হয়, আনন তাকেই বোঝায়। সেই হিসেবে কোনো সত্তার যে অংশটি বাইরের সঙ্গে যোগসাধন করে, যার মাধ্যমে নিজের আন্ অন রাখে, খাদ্যাদি গ্রহণ করে, সেই সমগ্র মুখমণ্ডলটি তার আনন। তবে সকলের আনন একধরনের নয়। দ্র. **কানন, গজানন, দশানন**।

এন্তার : ২. *অন-এর তারণ (চলমান) যাহাতে*। ৩. অবিরত, সর্ব্বদা, ক্রমাগত, প্রচুর। (ব.শ.)। ৪. 'প্রচুর' অর্থে প্রচলিত। ৫. সগোত্রীয় মনে হওয়ায় বাংলাভাষী শব্দটিকে আপন করে নিয়েছে। ৬. Entaro - Portuguese, entire - English।

'অব্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অ, অব্, অব, অবকর, অবকর্ত্ত, অবকর্ত্তন, অবকর্ত্রী, অবকীলক, অবকৃষ্ট, অবক্রম, অবক্ষেপ, অবক্ষেপণ, অবক্ষেপণী, অবক্ষুত, অবখশুন, অবগণন, অবগণ্ড, অবগন্তব্য, অবগম, অবগমন, অবগর, অবগলিত, অবগাই, অবগাঢ়, অবগাঢ়ি, অবগান, অবগাহ, অবগাহক, অবগাহন, অবগাহিত, অবগাহ্য, অবগীত, অবগুণ, অবগুণ্ঠন, অবগুণ্ঠনবতী, অবগুণ্ঠনমুদ্রা, অবগুণ্ঠবতী, অবগুণ্ঠিকা, অবগুণ্ঠিত, অবগ্রহ, অবগ্রহণ, অবগ্রাহ, অবঘট্টন, অবঘর্ষণ, অবঘাটন, অবঘৃষ্ট, অবচয়, অবচারণ,

অবচূড়, অবচূর্ণন, অবচূর্ণিত, অবচূল, অবচ্ছদ, অবচ্ছিন্ন, অবচ্ছেদ, অবচ্ছেদক, অবচ্ছেদন, অবছায়া, অবজয়, অবজান, অবজিত, অবজিতি, অবজ্ঞা, অবজ্ঞাত, অবজ্ঞান, অবজ্ঞেয়, অবট, অবটি, অবটী, অবটু, অবতংস, অবতংসক, অবতংসিত, অবতত, অবতমস, অবতরণিকা, অবতরণী, অবতান, অবতার, অবতারক, অবতারণ, অবতারণা, অবতারবীজ, অবতারিত, অবতারী, অবতু, অবদংশ, অবদাত, অবদান, অবদারক, অবদারণ, অবদারিত, অবদীর্ণ, অবধাতব্য, অবধানী, অবধার, অবধারক, অবধারণ, অবধারণীয়, অবধারিত, অবধার্য্য, অবধারল, অবধিয়া, অবুধিয়া, অবোধিয়া, অবধীর, অবধীরণ, অবধীরণা, অবধীরিত, অবধীরী, অবধূতচন্দ্র, অবধূতবেশ, অবধূতরায়, অবধূতী, অবধূনন, অবধূপিত, অবধৃত, অবধেয়, অবধৌত, অবধ্যাত, অবধ্বস্ত, অবন, অবনদ্ধ, অবনমিত, অবনম্র, অবনয়, অবনাম, অবনামক, অবনামী, অবনাহ, অবনি, অবনিকণ্টক, অবনিচর, অবনিদেব, অবনিনাথ, অবনিপতি, অবনিপাল, অবনী, অবনী-অমর, অবনীধ্র, অবনীমুখ, অবনীশ, অবনীশ্বর, অবনেজন, অবন্তি, অবন্তিকা, অবন্তী, অবপতন, অবপন্ন, অবপাত, অবপাতন, অবপাদ, অবপাশিত, অবপীড়, অবপীড়ন, অবপীড়না, অবপীড়িত, অবপ্লুত, অববাদ, অববুদ্ধ, অববোদ্ধব্য, অববোধ, অববোধক, অববোধন, অবভগ্ন, অবভঙ্গ, অবভঞ্জন, অবভর্জ্জন, অবভাসক, অবভাসন, অবভাসিত, অবভাসী, অবভুগ্ন, অবভৃথ, অবভৃথাপ্লুত, অবম, অবমত, অবমতি, অবমন্তব্য, অবমন্তা, অবমষ্ট, অবমর্দ্দ, অবমর্দ্দন, অবমর্দ্দিত, অবমর্দ্দী, অবমর্শ, অবমর্ষ, অবমর্ষণ, অবমর্ষিত, অবমান, অবমানন, অবমাননা, অবমাননীয়, অবমানিত, অবমানী, অবমান্য, অবমার্জ্জন, অবমূর্দ্ধশয়, অবমূর্দ্ধা, অবমোচন, অবয়বধর্ম্ম, অবয়বার্থ, অবয়বী, অবর, অবরুগ্ণ, অবরুদ্ধি, অবরোধক, অবরোধন, অবরোধিক, অবরোধী, অবরোপণ, অবরোহক, অবরোহী, অবলগিত, অবলগ্ন, অবলম্ব, অবলম্বিত, অবলম্বিতব্য, অবলম্বী, অবলিপ্ত, অবলীঢ়, অবলীন, অবলীলা, অবলুণ্ঠন, অবলেখ, অবলেখন, অবলেখনী, অবলেখা, অবলেপ, অবলেহ, অবলেহন, অবলেহিকা, অবলেহ্য, অবলোক, অবলোকক, অবলোকন, অবলোকনীয়, অবলোকয়িতা, অবলোকিত, অবলোকী, অবলোক্য, অবশর্দ্ধয়িতা, অবশাতন, অবশীর্ণ, অবশীর্ষ, অবশীর্ষক, অবশ্যায়, অবশ্যাস, অবশ্রয়ণ, অবষ্টব্ধ, অবষ্টম্ভ, অবষ্টম্ভন, অবসক্ত, অবসক্থিকা, অবসঞ্জন, অবসথ, অবসর্গ, অবসর্জ্জন, অবসর্জ্জিত, অবসাদ, অবসাদক, অবসাদন, অবসাদিত, অবসাদী, অবসায়, অবসিক্ত, অবসিত, অবসৃত, অবসৃষ্ট, অবসেক, অবসেয়, অবস্কন্দ, অবস্কন্দন, অবস্কন্দিত, অবস্কন্দী, অবস্কন্ন, অবস্তরণ, অবস্থাচতুষ্টয়, অবস্থাত্রয়, অবস্থাদশক, অবস্থাদ্বয়, অবস্থান্তর, অবস্থাপন, অবস্থাপন্ন, অবস্থাপিত, অবস্থায়ী, অবস্থাষটক, অবস্ফূর্জ্জিত, অবস্যন্দন, অবস্রংসন, অবস্রংসিত, অবসংস্রস্ত, অবহৃত, অবহৃতি, অবহনন, অবহসন, অবহার, অবহারক, অবহার্য্য, অবহাস, অবহাস্য, অবহিত, অবহিত্থ, অবহু, অবহৃত, অবহেল, অবহেলন, অবহেলা, অবহেলিত, অবাক, অবাকশিরাঃ, অবাকশীর্ষ, অবাগ্গতি, অবান্তর, অবাপিত, অবাপ্ত, অবাপ্তব্য, অবাপ্তি, অবাপ্য, অবার, অবার্য্য, অবি, অবিতা, অবে, আবছা, আবছায়া, আবস্তু, আবর, আবরা, আবান্তর, আবিক, উয়াড়, ওম, ওয়াড়, ওলন।

অব্ = অস্তিত্বের বহন। **অব** = অস্তিত্বের বহন থাকে যাহাতে। (ab, ob)।

অব্ : ১. ✓অব্, অবতি। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের বহন।* ৩. রক্ষণ; তর্পণ, প্রীণন; স্পৃহা গতি শ্রুতি প্রাপ্তি আলিঙ্গন যাচ্ঞা বধ প্রবেশ ইত্যাদি, তৃপ্তি, দ্যুতি, সত্তা, বৃদ্ধি, শক্তি। (ব.শ.)। ৪. 'অব্' স্বরূপে অপ্রচলিত; অব উপসর্গ রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **অব**।

অব : ১. অব্ + অ। ২. *অস্তিত্বের বহন থাকে যাহাতে।* ৩. নিশ্চয়, অসাকল্য, ঈষদার্থ, অনাদর, আশ্রয়, আলম্বন, ব্যাপ্তি, নিম্নতা, বিয়োগ, জ্ঞান, শুদ্ধি, পরাভব, সমন্তাৎ, উপরি, প্রাপ্ত, শব্দন, সন্তত, ব্যাপ্ত। (ব.শ.)। ৪. উপসর্গরূপে সুপ্রচলিত। ৫. অস্তিত্বের ভিতরে একটি নঞ্ রয়েছে। এক স্রোত থেকে ন্-করে তার জন্ম, শুরু হয় নতুন ন্-এর দিকে চলা এবং একসময় তাতেই তার মৃত্যু হয় অর্থাৎ পুনরায় পূর্বস্রোতের বা অন্য কোনো অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। দ্র. **অ**। **অব** কথাটির মধ্যে স্বভাবতই অস্তিত্বের 'যেমন-আছে-তেমন' বহন করে নিয়ে চলার কথা রয়েছে। এর ফলে, অস্তিত্বের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে গিয়ে সেটি তার অস্তের (সূর্যাস্ত) দিকে এগোয়। তখন **অব** কথাটির মানে দাঁড়িয়ে যায় 'নেই বহন যাহাতে'। তাই উপসর্গরূপে **অব** কথাটি নিম্নতাসূচক। তাছাড়া, অস্তিত্বের স্বাভাবিক গতি যে লক্ষ্যের দিকে, ঠিক সেই দিশায় চলতে থাকলে সে হল স্বগতি বা সুগতি। কিন্তু চলার দিশা যদি তার থেকে নীচের দিকে হয়ে যায়, তবে সে হল **অবগতি**; ডাইনে বা বাঁয়ে হয়ে গেলে সে হল **অপগতি**; অন্যকে অধীন করতে গেলে সে হল **অধিগতি**; এবং সর্ব গতির উপরে অভিভাবকসুলভ গতি হলে (যেন একটি মোটা পাইপ, যা সামনের দিকে বেড়ে চলেছে এবং অন্য গতিগুলি তার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে), সে হবে **অভিগতি**। দ্র. **অপ, অধি, অভি**। ৬. ইংরেজিতে শব্দটি ab, ob, of, off বহুল প্রচলিত, যথা — *ab*ate, *ab*dicate, *ab*duct ইত্যাদি অজস্র শব্দ এবং *ob*ject, *ob*lige, *ob*tain ইত্যাদি অনেক শব্দ। হিন্দি-উর্দু প্রভৃতিতে শব্দটি 'অস্তিত্ব যে পর্যন্ত বাহিত হয়ে এসেছে সেই পর্যন্ত' অর্থাৎ 'অব্' (= এখন) বহুল প্রচলিত।

অবগাঢ়, অবগাহ, অবগাহন : ১. অব + ✓গাহ্ + ত (ক্ত) - ক; অব + ✓গাহ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে; অব + ✓গাহ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। (গাহ্ = প্রবেশ করা, নিমজ্জিত হওয়া; গাহ > গা = গান করা)। ২. *অব (নিম্ন মানের) গাহন (নিমজ্জন) যাহাতে; অব (বিপরীত) গান যাহাতে।* ৩. অন্তঃপ্রবিষ্ট, নিম্ন, নিবিড়, কৃতাবগাহন, সান্দ্র, ঘন; শিরঃস্নান, নিমজ্জন, প্রবেশ, অধিগম; স্নান করা, নিমগ্ন হওয়া, প্রবেশ করা, তত্ত্বত বিচার করা, ভিতরে ঢুকা, তলান; ডুব দিয়া নাওয়া। (ব.শ.)। ৪. কম প্রচলিত, তাও 'ডুবে স্নান করা' অর্থে। ৫. বৈষ্ণব সাহিত্যে শব্দটি 'অবগান' রূপেও লিখিত দেখা যায়। সম্ভবত এইজন্য যে, 'গাহ' মানে 'গান করা'ও বোঝায়।

(ব.শ.-তে 'গাহ' দেখুন।) তাছাড়া গাহনে নিমজ্জিত থাকার মতো গানেও 'ডুবে থাকার' ব্যাপার রয়েছে। সবাই জানেন — গঙ্গায় 'অবগাহন' (বা অবগান) করলে সব পাপ ধুয়ে যায়, বদলে পাওয়া যায় পুণ্য। (কত পাপ ধুয়ে যায়, আর কত পুণ্য হয়, তার বিশাল হিসাব দেওয়া আছে কৃত্তিবাসের রামায়ণে।) সুতরাং জানা দরকার, অবগাহন করা বা অবগান করা জিনিসটি আসলে কী? গঙ্গার স্রোতধারায় ডুব দিয়ে শরীরের সব ময়লা যদি ধোয়া হয়ে চলে যায় এবং পরিবর্তে যদি কিছুই আপনি না পান, তবে বুঝবেন ওটি গাহন হল, অবগাহন হল না। অবগাহন হতে গেলে বদলে কিছু পেতে হবে। কিংবা গানে ডুবে থেকে যদি কিছু না পান বুঝবেন ওটা গানই হল, অবগান হল না। উলটো গান গাইতে শুরু করুন। এ সমাজের প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের সোজা গান হল খালি 'দাও-দাও, আমায় দাও, আমায় দাও' গাইতে থাকা। উলটা গান হল — 'নাও-নাও, নিন বাবু নিন, একেবারে টাটকা' ইত্যাদি। এরকম গাইতে থাকলে কী হয়? আপনার ঘরে যত পাপ (পালকের পালয়িতা / পণ্য) জমেছিল, তা সব চলে যায় গান যে শোনে তার কাছে, পরিবর্তে পাওয়া যায় পুণ্য বা 'পবিত্রতা-সম্পাদক-পদার্থ'। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত অনুসারে 'সর্বাপেক্ষা অধিক পবিত্রতা-সম্পাদক-পদার্থ হল সুবর্ণ'। কথাটি বেঠিক নয়, তা একালের সব 'পুণ্যবান' মানুষেরাই বোঝেন। সুতরাং 'মার্কেট ফ্লো' বা গঙ্গায় অব-গাহন করলে তো পাপ (পণ্য) চলে যাবেই, এবং পরিবর্তে পাওয়া যাবে পুণ্যই। তাই গঙ্গার তীর্থে তীর্থে (বাজারে বাজারে) অবগাহন করতে হয়, অবগান গাইতে হয়। আর এইসব গানের জন্ম ও বিকাশ সাধন করে গেছেন গন্ধর্বরা। (দ্র. **অপ্সরা**)। কিন্তু অবগান গাওয়া তো অবগীত হল?

অবগীত : ১. অব + ✓গৈ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অবগান যাহাতে থাকে*। ৩. গর্হিত, নিন্দিত, দুষ্ট, মুহুর্দৃষ্ট, অসাধুগীত, জনাপবাদ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ভারতসমাজের ইতিহাসে ভগীরথের **গঙ্গা** আনয়নের আগে বা হাট বাজার প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে পণ্যবিনিময় ঘোরতর নিন্দাজনক কাজ বলে ঘোষিত ছিল। তাই অবগান গাওয়া বা অবগীত অত্যন্ত নিন্দিত কাজ ছিল।

অবগ্রহ, অবগ্রহণ, অবগ্রাহ : ১. অব + ✓গ্রহ্ + অ (অপ্) - ভাববাচ্যে; অব + ✓গ্রহ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে; অব + ✓গ্রহ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অব (নিম্ন মানের) গ্রহণ যাহাতে থাকে; অপ্রাপ্য প্রাপণ যাহাতে থাকে*। / যাহা দ্বারা হস্তী নিগৃহীত হয়। (ব.শ.)। (অবগ্রহ-এর বিপরীত শব্দ 'অনুগ্রহ')। ৩. বর্ষপ্রতিবন্ধ, বর্ষবিঘাত, অনাবৃষ্টি, নিগ্রহ, শাসন, অঙ্কুশ, প্রতিরোধ, গজসমূহ, প্রতিবন্ধ, বিচ্ছেদ, অভিভব, শাপ, অবান্তরপদসংজ্ঞা-সূচনার্থ পাঠকালে কিঞ্চিৎকাল অবসান, (উপচারে) বিরামকাল, বিচ্ছেদপূর্ব্বক পঠিত পদ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কোনো একটি স্রোতধারার মাঝ থেকে খানিকটা কেটে নেওয়া, গ্রহণ করা, বাদ দেওয়া, ইত্যাদিকে বলে অবগ্রহ। সমাজের নিয়মে যে গ্রহণ বিধিসম্মত নয় বা নিষিদ্ধ, তেমন গ্রহণকে অবগ্রহণ বলে। অবগ্রহণের ঘটনাকে অবগ্রাহ বলে।

রাষ্ট্রের তরফে জনসাধারণকে যা কিছু দেওয়া হয় সেকালে তাকে বলা হত বৃষ্টি। (বেদে এই বৃষ্টির অজস্র গল্প রয়েছে।) দেওয়া হত সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমেই। সেই কর্মচারীকে বলা হত হস্তী (আমলা)। সেই থাকত সামাজিক সম্পদ বর্ষণ করার দায়িত্বে। অনেক সময় সেই সম্পদ সে খানিকটা আত্মসাৎ করত। তখন সেটি হত 'অবগ্রহণ'।

অবচ্ছিন্ন : ১. অব + ✓ছিদ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অব (নিম্ন মানের) বিচ্ছিন্নতা যাহাতে থাকে*। ৩. কৃত্ত, খণ্ডিত, ছিন্ন। বিভক্ত, বিশ্লিষ্ট, বিযুক্ত, সীমাবদ্ধ, পরিচ্ছিন্ন, উপাধি দ্বারা বিশেষিত। (ব.শ.)। ৪. বিযুক্ত বা disconnected অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. শব্দটির প্রয়োগ থেকে দেখা যায়, এ যেন তরল-সমগ্র বা বায়বীয়-সমগ্র কিংবা মানস-সমগ্র থেকে 'ছিঁড়ে' আলাদা করা হয়েছে, এমন জিনিসকে বোঝাচ্ছে। অনেক বড় পাথরের টুকরো থেকে ভেঙে একটি টুকরো নিলে, সেটি অবচ্ছিন্ন নয়; সেটিকে বড় জোর অবখণ্ডিত বলা যায়। কিন্তু অবচ্ছিন্ন তেমন খণ্ডকে বোঝায় না। যেমন 'নর শব্দের অর্থ হল, **অবিদ্যার** দ্বারা **অবচ্ছিন্ন** চৈতন্যবিশিষ্ট জীব', বলছেন নীলকণ্ঠ। এখানে সমগ্র যৌথমানবিক চৈতন্য থেকে ছিঁড়ে নেওয়া টুকরো-চৈতন্যবিশিষ্ট জীব হল মানুষ। দ্র. **নারায়ণ**।

অবতার : ১. তৄ = তরণ। ২. *যিনি অবতীর্ণ (উত্তীর্ণের বিপরীত) হন*। / যিনি অবতরণ করেন। (ব.শ.)। ৩. যে রূপে দেবতাদি পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, পৃথিবীতে দেবতাদির নরাদি রূপে আবির্ভাব। বিষ্ণুর দশ অবতার প্রসিদ্ধ। ভাগবতে ২২ জন অবতারের উল্লেখ আছে এবং তদ্ভিন্ন ঋষিগণ মনুগণ মনুপুত্রগণ দেবগণ ও কলাবতারের উল্লেখ আছে। চৈতন্যচরিতামৃতে 'পুরুষাবতার' প্রভৃতি ষড়্বিধ অবতার কথিত হইয়াছে। (ব.শ.)। দ্রষ্টব্য **মৎস্যাবতার, কূর্ম্মাবতার, বরাহাবতার, নৃসিংহাবতার, বামনাবতার, পরশুরামাবতার, রামাবতার, কৃষ্ণাবতার, বুদ্ধাবতার, কল্কি-অবতার**। ৪. ঠাকুর অর্থে প্রচলিত। ৫. 'লোকটি দয়ার অবতার' — এরকম বাক্য আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এই দয়া যেন এক অদৃশ্য দৈব সত্তা, সম্মুখস্থ দয়ালু মানুষটি যেন তাঁর অংশ পেয়েছেন; পেয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই 'দয়ার অবতার'।

কার্যত, যে সকল শক্তি চাক্ষুষ না হয়ে জগতে সক্রিয় থাকে, তাদের অংশ কোনো কোনো শরীরে রূপ নিয়ে চাক্ষুষ হলে তাকে অংশ-অবতার বা অংশাবতার বলা হয়ে থাকে। একেই সাধারণ ভাবে অবতার বলা হয়; অবতীর্ণ সত্তাটি যে তার নিজ পূর্ণ স্বরূপের অংশ, সেকথা এখন আর বলা হয় না। কার্যত, সব তো থাকে উর্ধ্বলোকে (দ্র. **উদ্**), চোখে দেখা যায় না, যখন মর্ত্যচোখে দেখা দেয়, তখন সে মর্ত্যলোকে অবতরণ করে বলেই তাকে দেখতে পাওয়া যায়। তাই অবতার। তাই প্রাচীনেরা মনে করতেন, দেবতাদের অধিষ্ঠান উর্ধ্বলোকে। ধরা যাক, নগদ-নারায়ণের কথা। এর প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে হয়, দেখা যায় না। কিন্তু যখন সে 'মালিকানা' রূপে আবির্ভূত হয়, তখন খানিকটা দেখা যায়। তখন তার নাম 'মৎস্যাবতার'। সম্পদ বা পুঁজি বা ক্যাপিটালের যত রূপ হয়, তা সবই নগদ-নারায়ণের রূপ। তবে এর বিকাশ তো একদিনে সম্পূর্ণ

হয়নি। প্রথমে এসেছে জ্ঞানের মালিকানা, তারপর কর্মবিভাজন (কূর্ম) হয়েছে, বিনিয়োগ (বরাহ) শুরু হয়েছে, এসেছে পণ্য উৎপাদনশীল (আক্রমণাত্মক) ব্যবসায়ী-পুঁজি (নৃসিংহ), এসেছে গিল্ড-জাতীয় উৎপাদন সংগঠন (বামন), সুদখোরী পুঁজি (পরশুরাম), ক্রীড়াকারী পুঁজি (রামচন্দ্র / finance capital), কালো টাকা (শ্রীকৃষ্ণ, black-hole), এবং মেসিন প্রযুক্তি (কল্কি) ইত্যাদি। সম্পদের এইভাবে নানারূপে সমাজে আবির্ভূত হওয়াই নগদ নারায়ণের বিভিন্ন অবতার হওয়ার কাহিনী। তবে এই স্থূল সম্পদের বোধ, 'নারায়ণ' উপলব্ধির একেবারে শুরু বা প্রথম ধাপ। এর অজস্র ধাপ পেরিয়ে নারায়ণের ব্রহ্মরূপের সাক্ষাৎ পেতে হয়। বৈষ্ণব পদকর্তাগণ সেই ধাপগুলি অতিক্রম করেছিলেন বলেই মনে হয়। এই পথে সবচেয়ে সফল ছিলেন বাংলাভাষীদের শ্রেষ্ঠপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। যতদূর বোঝা যায়, তাঁর উপলব্ধিতে (সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের) স্থিতি সংক্রান্ত সমগ্র সত্তাই ধরা দিয়েছিল, যা কিনা তেজের আত্মোপলব্ধির (identity-র) সঙ্গে জড়িত। সেই আত্মোপলব্ধির একটি অত্যন্ত নিম্নমানের স্থূল রূপই ধনসম্পদ বা টাকাপয়সা। মনে রাখা ভালো, সভ্যযুগের সূত্রপাতের আগে মানবসমাজে 'মালিকানাহীন সম্পদ' হত, এখন হয় না, তা সে জ্ঞানসম্পদ বা পণ্যসম্পদ, যাই হোক।

অবতারের আরও কিছু রূপ রয়েছে। হরিবংশ পুরাণের 'দেবগণের অংশাবতরণ' বিষয়ে জানান হয়েছে, যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের, অর্জ্জুন ইন্দ্রের, ভীমসেন বায়ুর, নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমার যুগলের, কর্ণ সূর্য্যের, দ্রোণাচার্য্য বৃহস্পতির, অষ্টম বসু ভীষ্ম বসুগণের, বিদুর যমের, দুর্যোধন কলির, অভিমন্যু চন্দ্রমার, ভূরিশ্রবা শুক্রের, শ্রুতায়ুধ বরুণের, অশ্বত্থামা মহাদেবের, কণিক মিত্রের, ধৃতরাষ্ট্র কুবেরের এবং দেবক, অশ্বসেন ও দুঃশাসন সকলে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।'

অবলম্ব, অবলম্বন : ১. অব + ✓লম্ব্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে; অব + ✓লম্ব্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *লম্বিত হওয়ার অব উপায়।* / যাহা লম্বিত হয়; জীবিকার্জ্জনের উপায় (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. আশ্রয়, আধার, আশ্রয়ার্থ দণ্ডাদি, বৃত্তি, চাকুরী। (ব.শ.)। ৪. 'জীবিকার্জ্জনের উপায়' অর্থে প্রচলিত। ৫. স্খলিত বটে, কিন্তু পড়ে না গিয়ে ঝুলে থাকাকে অবলম্ব বলে। এই ক্রিয়াটি লম্বন বা স্রংসন নয়, অবলম্বন। একে দণ্ড দিয়ে আশ্রয় লাভ করাও বলা হয়। এই বিচারে জীবনসময় বন্ধক দিয়ে (চাকরী করে) প্রতিষ্ঠানবিশেষে ঝুলে থাকা, পতিত না হওয়াকে যথার্থেই অবলম্ব বা অবলম্বন বলা চলে। ৬. oblong।

অবলোক, অবলোকন : ১. অব + ✓লোক্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে; অব + ✓লোক্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অব (নিম্ন মানের) লোকন যাহাতে।* / যাহার দ্বারা দর্শন সাধিত হয় (গবাক্ষ প্রভৃতি)। (ব.শ.)। ৩. দর্শন, অপাঙ্গদর্শন, কটাক্ষ, ... দৃষ্টিপাত; গবাক্ষ, আলোক, নেত্র। (ব.শ.)। ৪. 'দেখা' অর্থে প্রচলিত। ৫. কোনো বস্তুর ফর্মকে দেখা এবং কন্টেন্টকে না দেখা। ঠিকভাবে দেখাকে বলে 'আলোকন'। আর বাঁকা চোখে দেখা বা নিম্ন মানের দর্শনকে বলে 'অবলোকন'। ব.শ. মতে 'অবক্ষিপ্ত' মানেই 'নিম্নে ক্ষিপ্ত'। অবেক্ষণও (অব-ঈক্ষণও) তাই, যে অবেক্ষক সে বিষয় দেখে না, বিষয়ের ফাঁক দেখে বা ছিদ্রসন্ধান করে। বলতে গেলে 'অব'যুক্ত সমস্ত শব্দের এই দশা।

অবশিষ্ট, অবশেষ : ১. অব + ✓শিষ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে - ক; অব + ✓শিষ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *শেষে (খেয়ে বা ভাগ করে শেষ করার পরে) নিম্নে যা থেকে যায়; অব (নিম্ন মানের) শিষ্ (মেরে বা খেয়ে শেষ করা বা অন্ত করা) যাহাতে থাকে।* ৩. পরিশেষীকৃত, অবশেষযুক্ত, পরিশিষ্ট, অতিরিক্ত, অধিক, উদ্বৃত্ত; অন্ত, অবসান, শেষ, অবশিষ্টতা, সমাপ্তি। (ব.শ.)। ৪. remainder অর্থে, অর্থাৎ ভোগের বা ভাগের শেষে পড়ে থাকা অর্থে প্রচলিত। ৫. শেষ হয়েও শেষ নয় যা, তাকেই অবশেষ বলে। সেকালে ভাগাভাগির শেষে যে-'অবশেষ' বা উদ্বৃত্ত থেকে যেত, তা ভোগ করা নিষিদ্ধ ছিল এবং তা আবর্জ্জনারূপে ফেলে দেওয়া হত। দ্র. **কিরাত**। কিন্তু পরে অনেকেই ঐ অবশেষ ভোগ করতে শুরু করে। ইংরেজি abscess (= পুঁজ) কথাটি এই 'অবশেষ' শব্দের পশ্চিমী উত্তরাধিকার। কেননা এই 'অবশেষ' থেকেই সমাজদেহে একসময় পুঁজ জমে, পুঁজির জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যে গল্প 'শেষ হয়ে হইল না শেষ', সেই তো যত জ্বালার মূল, যত সৃষ্টির গোড়া। ৬. abscess।

অবস্থা, অবস্থান, অবস্থিত, অবস্থিতি : ১. **অবস্থা** = অব + ✓স্থা + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। **অবস্থান** = অব + ✓স্থা + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। **অবস্থিত** = অব + ✓স্থা + ত (ক্ত) - ক; **অবস্থিতি** = অব + ✓স্থা + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***অবস্থা** = অব (নিম্ন মানের) স্থিতি যাহাতে। **অবস্থান** = **অবস্থা** অন যাহাতে। **অবস্থিত** = **অবস্থা** গতিশীল হয়ে তারিত যাহাতে। **অবস্থিতি** = **অবস্থিত** গতিশীল যাহাতে।* ৩. স্থিতি, বিরতি, নিবৃত্তি, দশা, দেহে যৌবনাদি ভাববিকার বিশেষ, ভাব, আকার, বিত্তাদিবিষয়ে সাংসারিক দশা, দুর্দ্দশা, দুর্গতি, নরকভোগরূপ দর্দ্দশা, বাহ্যভাব; থাকা, বসতি, দাঁড়ান, প্রতিষ্ঠা, শরীরসংস্থান, বাসভূমি, স্থিতিকাল; কৃতাবস্থান, বিদ্যমান, স্থিরসঙ্কল্প, বর্ত্তমান, আস্থিত, নিষ্ঠিত, অধিকাররূপে স্থিত, অধিকৃত, ব্যবস্থিত, অবস্থানযুক্ত; স্থিতি, বাস, বসতি, অনুসরণ, অভ্যাস। (ব.শ.)। ৪. condition বা পরিস্থিতি অর্থে প্রচলিত। ৫. যে স্থিতি **অব** বা নিম্ন, সেই স্থিতিতে থাকাই **অবস্থা** শব্দের অর্থ। ইংরেজিতে condition শব্দটি এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। আজকাল 'conditioned হয়ে থাকা' মন্দ কথা রূপে ক্রমশ খ্যাতিলাভ করছে। **অবস্থাদি** শব্দ বহু প্রাচীনকাল থেকেই ঐরূপ conditioned অর্থেও প্রচলিত। দ্র. **দশা, বিমুগ্ধ**। ৬. abstain। (মূল থেকে অব-স্থানে যাওয়া)।

অবহিত : ১. অব + ✓ধা + ত (ক্ত) - ক। (ব.শ.)। ২. *অব (নিম্ন মানের) ধারণ কৃত যাহাতে।* ৩. কৃতাবধান, সাবধান, মনোযোগী, প্রমাদহীন, অপ্রমত্ত, নিহিত, বিজ্ঞাত। (ব.শ.)। ৪. known বা বিজ্ঞাত

অর্থে প্রচলিত। ৫. কোনো কিছুকে ধারণ করা আর অবধারণ করার মধ্যে যে পার্থক্য, হিত হওয়া আর অবহিত হওয়ার মধ্যে সেই পার্থক্য। তাই অবহিত হলে হিত হয় না। ইংরাজিতে একে understanding বলে, standing বলে না। যদিও কোনো ব্যাপারে কার কী stand সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।

ওম্, ওঙ্কার : ১. ✓অব্ + ম (মন্) - কর্তৃবাচ্যে; ওম্ + কার। (ব.শ.)। ২. যে (ধ্যাতাকে) রক্ষা করে। (ব.শ.)। ৩. ক) প্রণব। 'অ', 'উ' এবং 'ম্' এই বর্ণত্রয়ে 'ওম্' হয়। ইহা ত্রিপাদ ও ত্রিমাত্র। জাগ্রৎস্থান 'অ'কার প্রথম মাত্রা, স্বপ্নস্থান 'উ'কার দ্বিতীয় মাত্রা, সুষুপ্তিস্থান 'ম্'কার তৃতীয় মাত্রা। মাত্রাত্রয়হীন 'ওঙ্কার' চতুর্থ বা তুরীয় আত্মা ব্রহ্ম। পুরাণে অকার বিষ্ণু, উকার মহেশ্বর ও ম্-কার ব্রহ্মা। খ) ব্রহ্ম। অঙ্গীকার, স্বীকার, উপক্রম, অনুমতি, অপাকরণ, মঙ্গল, প্রশ্ন, রোধ। ওম্-স্বরূপ। তাপ, ঈষৎ তাপ। (ব.শ.)। অ (বিষ্ণু) + উ (মহেশ্বর) + ম্ (ব্রহ্মা)। ইহা বেদের সনাতন বীজ। ... কোনো প্রার্থনার প্রারম্ভে, পূজা-অর্চনার প্রারম্ভে কিংবা কোনো পুস্তকের প্রথমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ((পৌ.অ.)। ৪. warmness অর্থে প্রচলিত। ৫ 'ওম' শীতের সময় তাপ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তবে এর মূল অর্থ অ-উ-ম্ বা ওম্। দ্র. **অংরূপিনী**।

'অম্' (অন্‌গ্, অন্‌ত্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অং (এং), অংরূপিণী, অংস্বরূপা, অণ্ড, অণ্ডক, অণ্ডকটাহ, অণ্ডকোশ, অণ্ডকোষ, অণ্ডকোষক, অণ্ডজ, অণ্ডজেশ্বর, অণ্ডবর্দ্ধন, অণ্ডবৃদ্ধি, অণ্ডাকর্ষণ, অণ্ডাকার, অণ্ডাকৃতি, অত্যন্ত, অত্যন্তকোপন, অত্যন্তগত, অত্যন্তনিবৃত্তি, অত্যন্তবিমুখ, অত্যন্তশিশু, অত্যন্তাভাব, অত্যম্ল, অনন্ত, অনন্তচতুর্দ্দশী, অনন্ততৃতীয়া, অনন্তদেব, অনন্তপার, অনন্তবিজয়, অনন্তব্রত, অনন্তমূল, অনন্তর, অনন্তরজ, অনন্তরজাত, অনন্তরিত, অনন্তরূপ, অনন্তশয়ন, অনন্তশয্যা, অনন্তা, অনম্বর, অন্ত, অন্তঃকরণ, অন্তঃকলি, অন্তঃপট, অন্তঃপাত, অন্তঃপাতী, অন্তঃপাল, অন্তঃপুর, অন্তঃপুরচর, অন্তঃপুরচারিণী, অন্তঃপুরাধ্যক্ষ, অন্তঃপুরিক, অন্তঃপুরিকা, অন্তঃপ্রকৃতি, অন্তঃপ্রবিষ্ট, অন্তঃপ্রসুপ্ত, অন্তঃশরীর, অন্তঃশল্য, অন্তঃশিলে, অন্তঃশীলা, অন্তঃশীলে, অন্তঃশুদ্ধ, অন্তঃশূন্য, অন্তঃসংজ্ঞ, অন্তঃসত্ত্ব, অন্তঃসত্ত্বা, অন্তঃসলিল, অন্তঃসলিলা, অন্তঃসার, অন্তঃস্থ, অন্তঃস্থল, অন্তকর, অন্তকরণ, অন্তকনগর, অন্তকসদন, অন্তকারী, অন্তকাল, অন্তকৃৎ, অন্তগ, অন্তগত, অন্তচর, অন্তজ, অন্তত, অন্ততঃ, অন্তদন্ত, অন্তপাল, অন্তবান, অন্তবাসী, অন্তবেলা, অন্তযমক, অন্তর, অন্তরঈশ্বর, অন্তরকাঁপ, অন্তরঙ্গ, অন্তরচক্র, অন্তরজ্ঞ, অন্তরটিপনি, অন্তরটিপুনি, অন্তরটিপ্পনি, অন্তরপাষণ্ড, অন্তরপুরুষ, অন্তরপ্রভব, অন্তরবয়ব, অন্তরযামিনী, অন্তরস্থ, অন্তরহিয়া, অন্তরা, অন্তরাকাশ, অন্তরাগার, অন্তরাত্মা, অন্তরাপত্য, অন্তরায়, অন্তরারাম, অন্তরাল, অন্তরিক্ষ, অন্তরিত, অন্তরিন্দ্রীয়, অন্তরীক্ষ, অন্তরীক্ষগ, অন্তরীক্ষচর, অন্তরীক্ষবাণী, অন্তরীণ, অন্তরীপ, অন্তরীয়, অন্তরে, অন্তর্গত, অন্তর্গর্ভ, অন্তর্গূঢ়, অন্তর্ঘাত, অন্তর্জগৎ, অন্তর্জ্জল, অন্তর্জ্জলী, অন্তর্জ্যোতিঃ, অন্তর্দ্দশা, অন্তর্দাহ, অন্তর্দুষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, অন্তর্দ্ধান, অন্তর্নিবিষ্ট, অন্তর্নিহিত, অন্তর্ব্বর্ণ, অন্তর্ব্বর্ত্তী, অন্তর্ব্বর্ত্তি, অন্তর্ব্বস্ত্র, অন্তর্ব্বাষ্প, অন্তর্ব্বাসঃ, অন্তর্ব্বাসিক, অন্তর্বিপ্লব, অন্তর্ব্বৃত্তি, অন্তর্বেদনা, অন্তর্ভাব, অন্তর্ভাবিত, অন্তর্ভূত, অন্তর্ভুক্ত, অন্তর্ভেদ, অন্তর্ভেদী, অন্তর্ভৌম, অন্তর্মনা, অন্তর্মনাঃ, অন্তর্মাতৃকা, অন্তর্মুখী, অন্তর্মৃত, অন্তর্যামিনী, অন্তর্যামী, অন্তর্লীন, অন্তর্লোম, অন্তর্হাস, অন্তর্হিত, অন্তর্হৃদয়, অন্তশয্যা, অন্তশ্চর, অন্তস্তল, অন্তস্তাপ, অন্তস্তোয়, অন্তস্থ, অন্তস্‌পট, অন্তস্‌পুর, অন্তাবশায়ী, অন্তি, অন্তিক, অন্তিম, অন্তজ, অন্তেবাসী, অন্ত্য, অন্ত্যকর্ম্ম, অন্ত্যক্রিয়া, অন্ত্যজ, অন্ত্যজাতি, অন্ত্যযমক, অন্তযোনি, অন্ত্যানুপ্রাস, অন্ত্যাবশায়ী, অন্ত্যাশ্রম, অন্ত্যেষ্টি, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অন্ত্র, অন্ত্রবৃদ্ধি, অন্ত্রাপত্য, অন্ত্রে, অবান্তর, অভ্যন্তর, অম্ (অং, এং), অম, অমত্র, অমা, অমাবসী, অমাবসু, অমাবস্যা, অমাবাসী, অমাবাস্যা, অমাত্য, অমিত্তি, অমুক, অমুকনামা, অমুকশর্ম্মা, অমুত্র, অমুত্রত্য, অমুত্রার্থ, অম্ব্, অম্ব, অম্বক, অম্বর, অম্বরগ, অম্বরচর, অম্বরপুষ্প, অম্বরযুগ, অম্বরলেখী, অম্বরিষ, অম্বরীষ, অম্বরৌকাঃ, অম্বল, অম্বষ্ঠ, অম্বা, অম্বালিকা, অম্বিকা, অম্বিকানগর, অম্বিকানন্দন, অম্বিকাপতি, অম্বিকাসম্ভব, অম্বিকাসুত, অম্বু, অম্বুক্রিয়া, অম্বুঘন, অম্বুচর, অম্বুচারী, অম্বুজ, অম্বুজনাভ, অম্বুজাসন, অম্বুজাসনা, অম্বুদ, অম্বুদানীক, অম্বুধর, অম্বুনাথ, অম্বুনিধি, অম্বুপ, অম্বুপাত, অম্বুপায়ী, অম্বুপ্রসাদ, অম্বুবাচী, অম্বুবাহ, অম্বুবাহিনী, অম্বুবাহী, অম্বুবিম্ব, অম্বুভৃৎ, অম্বুমুক্, অম্বুরাশি, অম্বুরাশিপতি, অম্বুরশনা, অম্বুরি, অম্বুরী, অম্বুরুট্, অম্বুরুহ, অম্বুরুহা, অম্বুরুহিণী, অম্বুরোহিণী, অম্বুসেচনী, অম্বুকৃত, অম্ভ, অম্ভঃ (ম্ভস্), (দ্র. স্বেদাম্ভঃ), অম্ভঃকণ, অম্ভঃপতি, অম্ভসাংনিধি, অম্ভোজ, অম্ভোজন্ম, অম্ভোজন্মজনি, অম্ভোজযোনি, অম্ভোজষণ্ড, অম্ভোজিনী, অম্ভোদ, অম্ভোধর, অম্ভোধি, অম্ভোনিধি, অম্ভোরুট্, অম্ভোরুহ, অম্র, অম্রেত, অম্ল, অম্লক, অম্লচুক্রিকা, অম্লচূড়া, অম্লজম্বীর, অম্লনায়ক, অম্লপঞ্চক, অম্লপঞ্চফল, অম্লপনস, অম্লপিত্ত, অম্লপুর, অম্লফল, অম্লবর্গ, অম্লবাস্তুক, অম্লবীজ, অম্লবৃক্ষ, অম্লবেতস, অম্লমধু, অম্লমধুর, অম্লমেহ, অম্ললোণিকা, অম্ললোণী, অম্ললোনিকা, অম্ললোনী, অম্লশাক, অম্লসার, অম্লহরিদ্রা, অম্লিকা, অম্লোদগার, আঁইষ, আঁওলা, আঁত, আঁতড়ি, আঁতড়ি, আঁতড়ী (অ্যাঁতড়ি), আঁতর, আতর, আঁতি, আঁতুড়, আঁতুড়ঘর, আঁতর, আঁব, আঁব-আদা, আঁবসন্দেশ, আঁবহলদি, আঁবুই, আঁবর, আঁ'ষ, আঁষটিয়া, আঁষটে, আঙলা, আতুর, আত্যন্তিক, আনন্তর্য্য, আনন্ত্য, আন্তঃপুরিক, আন্তর, আন্তরতম্য, আন্তরিক, আন্তরীক্ষ, আন্ত্র, আন্ত্রিক, আম, আমগন্ধী, আমগর্ভ, আমজুর, আমট, আমড়া, আম্বড়া, আমতা, আমতা-আমতা, আমতেল, আমতৈল, আমদরবার, আমদানি, আমবাত, আমমহল, আমমোক্তার, আময়, আমরক্ত, আমরস, আমরা, আমরান, আমল, আমলক, আমলকী, আমলনামা, আমলা, আমলাফয়লা, আমলি, আমশী, আমসী, আমশূল, আমশ্রাদ্ধ, আমসত্ত্ব, আমা, আমাতিসার, আমানত, আমানি, আমান্ন, আমাবস্যা, অম্হার (আমার), আমাশয়, আমাশা, অম্হি (আমি), আমি, আমিন, আমিনি, আমির, আমিষ, আমিষগন্ধী, আমিষাশী, আমিষ্য, আমীর, আমেজ, আম্বতী, আম্বল, আম্বা, আম্বিকেয়, আম্বুয়ানগর, আম্র, আম্রকাসুন্দী, আম্রকূট, আম্রখণ্ড, আম্রপেশী, আম্রবণ, আম্রসার, আম্রাতক, আম্রাবর্ত্ত, আম্ল, আম্লা, আম্লী, আষ্ঠানি, এং (এ্যাং), এঁড়, এঁড়ে, এঁড়্যে, এঁড়েল, এঁষানি,

এঁসানি, নিরন্তর, প্রত্যঙ্গ, প্রত্যন্ত, প্রান্ত, প্রান্তর, লোকান্তর। **অম্** = অস্তিত্বের সীমায়ন। **অম** = অস্তিত্ব সীমায়িত যাহাতে। (am-)।

অম্ : ৫. অস্তিত্বের সীমায়ন। এটি অংরূপিণীর সর্বশেষ ব্যক্ত রূপ। যে পথে 'ং' তার অসীম ও রহস্যরূপ ত্যাগ করতে করতে এগোয় সে হল ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ও ম্। ণ্-তে তার আধার ব্যক্ত, কিন্তু অর্থ ব্যক্ত নয়। ন্-তে আধার ও অর্থ দুই-ই ব্যক্ত বটে, কিন্তু ং-রূপিণীর শক্তি তার অন্তরের দিকে ধাবিত। ম্-এ ং-রূপিণী সম্পূর্ণ ব্যক্ত এবং তার শক্তিও সীমিত, সংক্ষিপ্ত। সেই কারণে এই অম্ থেকেই আম, আময় প্রভৃতি শব্দ নিষ্পন্ন। **অম্** = অস্তিত্বের সীমায়ন। **অম** = অস্তিত্ব সীমায়িত যাহাতে। ইংরেজিতে am-যুক্ত বহু শব্দই (যথা, amateur, ambit, ambition ইত্যাদি) এই পরিবারের সন্তান।

অংরূপিণী : ১. অংরূপ + ইন্ (ইনি) অস্ত্যর্থে + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। (ব.শ.)। ২. *'ং' (·)-রূপ বা বিন্দুরূপ যে প্রকৃতির*। ৩. বিন্দুরূপা, অণুরূপা, অম্ (সূক্ষ্ম) রূপযুক্তা, যোগমায়া। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সংস্কৃতে 'ং' লেখা হত (·) বিন্দু রূপে। প্রাচীন ভাষায় অবয়বের (বা আধারাধেয়র বা পুরুষ-প্রকৃতির), **শিব**শক্তির (বা তেজবাহকের বা এনার্জিবাহকের) ও কালের একককে (unit-কে) 'বিন্দু' বলা হত। শ্রাব্য ভাষায় তার প্রতিনিধিত্বকারী আওয়াজ ছিল 'ং' (ng = bang ধ্বনি থেকে ba ধ্বনি বাদ দিলে যে ধ্বনি থাকে, খানিকটা সেইরকম) ধ্বনি অর্থাৎ বং ধ্বনি থেকে ব বাদ দিলে যে ধ্বনি থাকে, সেই ধ্বনি। একে 'মাত্রাত্রয়হীন ব্রহ্ম'ও বলে। (দ্র. **ওম্**)। লেখ্য ভাষায় তার প্রতিনিধিত্বকারী ছিল point (·) বা বিন্দু। আকারবিজ্ঞান বা জ্যামিতিতেও বিন্দুই (·) সূত্রপাতের প্রতিনিধিত্বকারী আকার। এটি **পুরুষ-প্রকৃতি**র **'অভেদ'**রূপ বা **'অদ্বৈত'** রূপ। পরবর্তী কালে, এর **দ্বৈতাদ্বৈত** রূপটিকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় এবং তাকেই এনলার্জ করেই চীনের 'Tao' চিহ্নটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

'ং'-কে উচ্চারণ করে বলার জন্য অ যোগ করে 'অং' বলা হয়। একে 'অ'-এর আগম বলে। *সর্ব অস্তিত্ব থাকে যাতে, অথবা তার মূলাধার থাকে যাতে* তাকে ং বলা যায়। বঙ্গীয় শব্দকোষে শব্দটি পৃথকভাবে 'অং' আকারে নেই। রয়েছে 'অংরূপিণী'। এই অনুস্বর 'অযোগবাহ', ং বর্ণটি ক, চ, ট, ত, প বর্গের সঙ্গে যোগ হবার কালে যথাক্রমে ঙ্ (অঙ্ক), ঞ্ (অঞ্চল), ণ্ (অণ্ড), ন্ (অন্ত), ম্ (অম্বা) রূপ ধারণ করে। অন্য ক্ষেত্রে সে 'ং'-ই থাকে, কদাচিৎ চন্দ্রবিন্দুতে (ঁ) পরিবর্তিত হয় (দ্র. **ঝম্প**)। এই বিচারে **'অং'** শব্দাংশটি অঙ্ অঞ্ অণ্ অন্ অম্ অং অঁ এই সাতটি রূপে সক্রিয় হয়।

এই বিন্দু (.) বা অণু (বা atom) থেকেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (universe) প্রসূত হয়েছে। শব্দের দুনিয়ায় তারই সমান্তরাল প্রতিধ্বনি রয়েছে 'ং' ধ্বনি থেকে শুরু করে মহাবিস্ফোরণ পর্যন্ত সমস্ত ধ্বনিতে। মানুষ তারই শাব্দিক পুনঃসৃজন ক'রে, সেই ধ্বনিসৃষ্টিকারী ঘটনা ও ঘটকদের নির্দেশ ক'রে পরস্পরকে সেগুলি সম্বন্ধে অবহিত করে থাকে, এবং নিজেদের মধ্যে মানসিক যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে। তাই মানুষের ভাষাতে 'বিশ্বের শাব্দিক রূপ'-এর সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি বিদ্যমান। 'ং' ধ্বনিটি দিয়ে তার (সর্গের বা সৃষ্টির) সূত্রপাত এবং ঃ (বিসর্গ বা সৃষ্টিশেষ) ধ্বনিতে তার সমাপ্তি। (কোনো কিছুর 'বিন্দু-বিসর্গ' জানা নেই মানে, তার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিছুই জানা নেই।) শব্দসমূহের সূত্রপাতের এই 'ং' ধ্বনিটি তাই সর্বশব্দের মূল। সেজন্যই এর উচ্চারণ হয় (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনরূপের একীভূত ধ্বনি) 'ওঁ'-রূপে, যার ভিতরে 'ং' থেকে 'ঃ' পর্যন্ত সমস্ত ধ্বনিই ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। সমস্ত বর্ণই এখান থেকে প্রসূত হয়েছে। বিশ্বজগতে যেমন সমস্ত অস্তিত্বই তেজের উপর ভিত্তি করে অস্তিত্ববান, শব্দজগতে তেমনি প্রতিটি বর্ণই তেজের (বা 'ং'-এর) উপর ভিত্তি করে বিদ্যমান। আবার তেজের কিছু সরাসরি স্থূল খণ্ড রূপ যেমন বাস্তবে বিদ্যমান, তেমনি বর্ণমালাতেও 'ং'-এর কিছু সরাসরি স্থূল খণ্ড রূপ বিদ্যমান — ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ঁ, প্রভৃতি বর্গশেষের প্রান্তিক বর্ণগুলিতেই তার প্রকাশ।

বিন্দু থেকে সিন্ধু পর্যন্ত যে বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তার ক্ষুদ্রতম (micro) রূপটিকে এভাবেই প্রাচীন ভারতে চিহ্নিত করা হয়েছিল। (কথিত হয়ে থাকে, পৃথিবী নিজের ও সূর্যের চারদিকে লাট্টুর মতো যে ঘুরে চলেছে, তারও নাকি একটি আওয়াজ হয় এবং সেটিও নাকি 'ং' ধ্বনি।) পাশাপাশি 'সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড', 'সমগ্র জীবজগৎ' কিংবা 'সমগ্র জনসাধারণ' বোঝাতে **'মহামায়া'**, **'শক্তিরূপিণী'** **'পরমাপ্রকৃতি'** প্রভৃতি শব্দের প্রচলন হয়। বস্তুত একই ধারণার বৃহত্তম (macro) রূপটিকে বোঝাতে ঐ শব্দগুলির প্রচলন। তাই ঐগুলিকেও অংরূপিণীরই অন্যতর রূপ বলা হয়। মূলত কাল, শক্তি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির মূলে সূক্ষ্মতম একমাত্র একক রূপে অংরূপিণীর ধারণা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যদি একটি বিশাল বৃক্ষ ভাবা হয়, তবে তার মূলের সর্বনিম্ন অংশটির নাম অংরূপিণী এবং সমগ্র বৃক্ষটির নাম মহামায়া। বিন্দুই (·) বা 'ং'-ই বিকশিত হয়ে হয়ে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হয়েছে। সুতরাং 'অংরূপিণী' শব্দের মানে আমরা বুঝব ক্ষুদ্রতম এককের **অভিধা** বা নির্দেশক আওয়াজ-চিহ্ন (sound-code)। এই বিচারে 'মহামায়া' শব্দে 'সমগ্র জনসাধারণ' বোঝালে, 'অংরূপিণী' শব্দটি বোঝাবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে। আবার, 'মহামায়া' বলতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বোঝালে 'অংরূপিণী' বোঝাবে পরমাণুকে, বিশ্বের সমগ্র শক্তিকে বোঝালে 'অংরূপিণী' বোঝাবে শক্তির একককে, কিংবা মহাকালকে বোঝালে 'অংরূপিণী' বোঝাবে সময়ের একককে।

বস্তুত অংরূপিণী হল তেজকণা ও তার আধার বিষয়ক উপলব্ধি। এই তেজ (শক্তি), তেজের আত্মোপলব্ধি (identity) ও তার ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তিই সমস্ত জগতের মূলে। তেজই অগ্নি, তার আত্মোপলব্ধিই **ইন্দ্র** এবং তার ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তিই **মিত্র-বরুণ** — প্রাচীন ধারণার গোড়াতে এই তিনের অস্তিত্ব। বেদে তাই মূলত এই তিন দেবতার জিকির। তেজ বিষয়ক এই ধারণাই পরে **শিব, মহেশ্বর** (শ্রমজীবী) প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এবং এই তেজের আত্মোপলব্ধির ধারণাই পরে **বিষ্ণু, নারায়ণ** (পণ্যজীবী) প্রভৃতি শব্দের দ্বারা এবং এই তেজের ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তির ধারণাই পরে **ব্রহ্মা, ভৃগু, শুক্রাচার্য, বৃহস্পতি,**

(জ্ঞানজীবী) প্রভৃতি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। সমাজ যত এগিয়েছে, যত বিকশিত হয়েছে, এই বিভাজনের সংখ্যা তত বৃদ্ধি পেয়েছে। আর, এই সবকিছুর মূলে কিন্তু ঐ তেজকণা বা অংরূপিণী। পরবর্তী কালে সাংখ্যকারেরা এসে পুরুষ-প্রকৃতির অঙ্কে পুরো ব্যাপারটিকে পুনরায় নতুন করে সাজান। আজকের বিজ্ঞানীরাও সেই একই ধারণাকে তাঁদের মতো করে সাজাচ্ছেন। তাঁরা তেজকে নাম দিয়েছেন mc^2, তেজের আত্মোপলব্ধিকে নাম দিয়েছেন 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য', এবং তেজের ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তি নাম দিয়েছেন transparency ও patent law। একে যতবেশি সুসংহত সুবিন্যস্ত করে সাজানো যাবে, ততই 'ধারণাটি বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে' বলা যাবে। সর্বোপরি, যেহেতু রহস্যরূপিণী মহামায়ার প্রতিনিধিত্বকারী বর্ণ হল ং, যেকোনো বর্ণের পরে ং থাকলে তার অর্থ বহু বিচিত্র হতে পারে। ৬. (i)ng।

অনন্ত, অনন্তনাগ : ১. অম্, গম্ = গমন। ২. *নেই অন্ত যার; যে নাগের অন্ত নেই।* ৩. কল্পান্তেও স্থায়ী। নাগরাজ অনন্ত। শেষনাগ। ইনি সহস্রমুখ এবং প্রলয়সলিলে বিষ্ণুর শয্যা। চতুর্দ্দশ ভুবন ইঁহার ফণায় অবস্থিত। ইনি কদ্রুর সন্তান এবং নাগগণের অধিপতি। বলরাম ইঁহার অবতার। কাশীদাসী মহাভারতে 'শেষ' শব্দ 'বাসুকি' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (ব.শ.)। ৪. 'অনন্ত' শব্দটি এখনও প্রচলিত, নামরূপে এবং তার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থেও। ৫. ব্যাঙ্কের মালিক বহু নাগরিক। তাই ব্যাঙ্কের অনেক মাথা; সহস্র মাথা। রাষ্ট্রপরিচালকদের বদল ঘটে গেলেও, কল্পান্ত হয়ে গেলেও, এই **নাগ** টিকে থাকে। **নগদ নারায়ণ** জনসাধারণের ভিতরে (সমুদ্রে) শয়ান হলে, এই নাগই তাঁর শয্যা। অর্থাৎ তখন পুঁজি ছড়িয়ে থেকে যায় জনসাধারণের মধ্যে। ৬. অন্ত শব্দটি গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, গথিক, সুইডিস, ও ইংরেজি ভাষায় যথাক্রমে anti, ante, ende, andis, anda, end রূপে প্রচলিত। (ব.শ.)।

অন্ত, অন্তঃ : ১. ✓অম্ (গতি) + ত (তন্) - ক। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের সীমায়ন (= অম্) তারিত হয় যাহাতে (যেখানে)।* ৩. সমীপবর্তী, রম্য, অবসিত, জঘন্য, চরম, অধ্যবসিত, অপকৃষ্ট, অধম, কনিষ্ঠ, নাশ, ক্ষয়, লয়, মরণ, সংহার, নির্ণয়, অবসান, সমাপ্তি, অবধি, পার, প্রান্ত, শেষ, সান্নিধ্য, ব্যাকরণে অজন্ত কৃদন্ত তদ্ধিতান্ত তিঙন্ত হলন্ত হসন্ত, সমাসান্ত। ৪. end অর্থে প্রচলিত। ৫. যা-কিছুই 'অন্' (on) হয়ে রয়েছে বা চলতে আছে, সেই 'চলতে থাকা'রও যে একসময় ছুটির প্রয়োজন পড়ে, এমন কথা আমরা নিজের বেলা ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে ভাবতে পারি না, কিন্তু আমাদের ভাষাবিধায়ক পূর্বপুরুষেরা ভাবতে পেরেছিলেন — এটাই অতি বিস্ময়ের ব্যাপার। আর, অন্ বা চলতে থাকা যেখানে তরে যায়, বেঁচে যায়, অন্‌কে আর অন্ থাকতে হয় না, সেখানেই তো শেষ! অতএব অন্ত মানেই শেষ! তবে এই 'অন্ত'কে তাঁরা পজিটিভলি দেখেছিলেন বলেই 'অন্ত' নাম দিতে পেরেছিলেন; আমরা নেগেটিভলি দেখি বলেই 'অন্ত'-এর ভিতরে কারও মুক্তি দেখি না, শুভ দেখি না; ক্ষতি দেখি, শেষ দেখি, অবসান দেখি। ৬. অন্তঃ শব্দটি আবেস্তা, গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, ও ইংরেজিতে **যথাক্রমে** aantare, entos, inter, undar, under রূপে প্রচলিত। **(ব.শ.)**।

অন্তঃকরণ : ১. অন্তঃ + করণ। ২. *যে করণ অন্তর্গত (শরীরের ভেতরে মন রূপে সক্রিয়) থাকে।* (অন্তর্গত করণ — ব. শ.)। ৩. মধ্যস্থ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, **অহঙ্কার**; বেদান্তসার মতে, বৃত্তিভেদে 'অন্তঃকরণ' বুদ্ধি ও মন নামে অভিহিত হয়; বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা, মন সংকল্পবিকল্পাত্মিকা বৃত্তি; চিত্ত অহঙ্কার ইহাদের অন্তর্ভূত; চিত্ত অনুসন্ধানাত্মিকা, অহঙ্কার অভিমানাত্মিকা বৃত্তি; সাংখ্য মতে অন্তঃকরণ ত্রিবিধ — বুদ্ধি অহঙ্কার মন। (ব.শ.)। ৪. mind অর্থে প্রচলিত। ৫. 'করণ' শব্দের মানে হল 'যার দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদিত হয়', অর্থাৎ কারক বা কারী। অন্তরে বা ভেতরে যে কারী সক্রিয় থাকে তাকে বলে অন্তঃকরণ। সে কে? কার ভেতরে থাকে?

মানবশরীর ও সমাজশরীর উভয়ের ক্ষেত্রে কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য। ধরে নেওয়া হয়েছে, মানবশরীরের পরিচালক মননশীলতা যতভাবে বিভক্ত সমাজশরীরের মননশীলতাও ততভাগে বিভক্ত, যদিও আমরা জানি সেই ভাগাভাগির কোনো স্পষ্ট বিভাজন রেখা নেই। সাংখ্য তুলনায় প্রাচীন ব'লে তাতে অন্তঃকরণের মাত্র তিনটি বিভাজন, কেননা সমাজপরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট বিভাজন তখনও হয়নি। বেদান্তসার তুলনায় অর্বাচীন ব'লে তাতে এর বিভাজন অনেক স্পষ্ট, প্রায় একালের মতোই। দেখা যাচ্ছে, বেদান্তসার মতে সমাজস্বীকৃত নিশ্চয়াত্মক সাংবিধানিক নিয়মে যারা সামাজিক প্রকল্প চালায়, তাদের বলে **বুদ্ধি**। এটি পুরুষগুণসম্পন্ন। আর সংকল্প বিকল্প উভয়বিধ সম্ভাবনাগুলি নিয়ে যারা কাজ চালাতে চায় তাদের বলে **মন**। এটি প্রকৃতিগুণসম্পন্ন। এই বুদ্ধি ও মন উভয়েরই আবার দুটি করে বিভাজন রয়েছে — বুদ্ধির-**চিত্ত**, বুদ্ধির **অহঙ্কাব** এবং মনের **চিত্ত**, ও মনের **অহঙ্কার**। চিত্তের কাজ অনুসন্ধান চালানো, রিসার্চ। আর অহঙ্কারের কাজ 'আমি এটা করে দেখেছি', 'এই জিনিসটি আমি বানিয়েছি' এইরূপ অভিমান; যার থেকে মালিকানা, অধিকারবোধ ইত্যাদি আসে। (বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে আমাদের 'ঘ' গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠায়)। ধরে নেওয়া হয়েছে যে মানবমনেরও এই কর্মবিভাজন। দ্র. **কর্ম্ম, চিত্ত, নাথ**।

অন্তর : ১. অন্ত + ✓রা (গ্রহণ) + অ (ক) - ক। (রা ক্রিয়াটির অর্থ 'দান'ও হয়। দ্র. **অধ্বর**।)। ২. *অম্ বা অন্ তারিত হয়ে রক্ষিত হয় যেখানে। / যে মধ্য গ্রহণ করে।* (ব.শ.)। ৩. মধ্যবর্ত্তী, অন্তর্গত, আত্মীয়, স্বীয়, আসন্ন, নিকট, বিনা, ব্যতিরিক্ত, অন্য, ভিন্ন, বাহ্য, ... (৩৩টি অর্থ রয়েছে)। (ব.শ.)। ৪. inter বা inter-space অর্থে ও মন বা mind অর্থে প্রচলিত। ৫. মধ্যাঞ্চল দখলকারী। (অন্তর > inter, inter-space)। সেই সুবাদে মন। লোকে একে 'হৃদয়' শব্দেও চিহ্নিত করে থাকেন। সেই সুবাদে অন্য দুইয়ের অন্তর বা মধ্যাঞ্চলও হতে পারে। যেমন মধ্যস্বত্ব। ৬. inter-(space)।

অন্তরায় : ১. অন্তর + ✓অয় > অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অন্তর গতিশীল বা বিকাশশীল থাকে যাহতে।* ৩. অন্তরগত,

মধ্যগত, ব্যবধানস্থিত, বিঘ্ন, প্রত্যূহ, আচ্ছাদন, বেদান্তমতে নির্বিকল্প সমাধির বিঘ্ন — লয় বিক্ষেপ কষায় ও রসাস্বাদ। ... (ব.শ.)। ৪. obstacle বা 'বাধা' অর্থে প্রচলিত। ৫. এখন আমরা অন্তরায় বলতে obstacle বুঝি। শব্দটি কিন্তু তার চেয়ে অনেক গভীর অর্থ নিয়ে প্রস্তুত হয়েছিল। অন (on) হতে হতে যেখানে তা শেষ হয়, অর্থাৎ 'অন তারিত যেখানে', তাকে 'অন্ত' বলে। এরকম অন্ত যাদের রয়েছে, তেমন দুই বা ততোধিক সত্তা পাশাপাশি হল, কিন্তু তাদের একজনের অন্ত অন্য জনের অন্তের সংস্পর্শে এল না; দুই সত্তার অন্তের মাঝে ফাঁক থেকে গেল। যেনবা দুটি রাস্তা দু দিক থেকে এসে একটি নদীর দুই পাড়ে শেষ হয়েছে, মাঝে নদী। একে বলে অন্তর। কারণ এর ফলে দুটি সত্তারই অন্ত অন্তররূপেই থেকে যেতে পারল, পরস্পরের সঙ্গে মিলে গিয়ে অন্তহীন হয়ে যেতে পারল না। হয়ে যেতে পারত, যদি ব্রিজ থাকত। সেই কারণে 'অন্ত রহে যাহাতে' তাকে বলে 'অন্তর' বা ফাঁক, ফোঁকর, পার্থক্য ইত্যাদি। অনেক সময় এই ফোঁকর বা অন্তরটিই প্রধান কথা হয়ে দাঁড়ায়, সত্তাসমূহের অন্তগুলি যে অন্তরের চারপাশে রয়েছে, তার কোনো প্রসঙ্গই থাকে না। তখন সত্তাসমূহের মাঝের ফাঁক বা অন্তর যেন-বা অন্দরমহল, হৃদয়কন্দর, গুহা; যেখানে সমস্ত দিকের সত্তাগুলির অন্ত মাঝের কন্দরের বা অন্তরের কারণে পরস্পরের সঙ্গে মিলে যেতে পারছে না। এই অন্তর যদি গতিশীল (অয়) হয়, বিকাশশীল হয়, তবে সেই অন্তর তাকে ঘিরে থাকা সংশ্লিষ্ট সত্তাসমূহের পক্ষে হয়ে যায় অন্তরায়। অন্তর বা পার্থক্য গতিশীল থাকায় দুই বা ততোধিক সত্তাসমূহের অন্তগুলির কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ আরও কমতে থাকে। ফলে সত্তাসমূহের মিলন হওয়ার আর কোনো উপায়ই থাকে না। একে সত্তাসমূহের মিলনের পথের অন্তরায় বলে। ৬. ইংরেজি antar, inter; ল্যাটিন antrum, inter; গ্রীক antron।

অন্তরাল : ১. অন্তর + আ - ✓লা (গ্রহণ) + অ (ক) - ক। (ব.শ.)। ২. *অন্তর (মধ্যাঞ্চল, ফারাক) আল রূপে সক্রিয় যাহাতে। (আল = আড়াল, আড়-আল, আলি, জমির বিভাজন বাঁধ)* / যে অন্তর গ্রহণ করে। (ব.শ.)। ৩. দিগ্দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ, দিঙ্মণ্ডল-মধ্য, মধ্যকাল, অবকাশকাল, মধ্য, অভ্যন্তরভাগ, পথিমধ্য, সঙ্কীর্ণজাতি, ব্যবধান, আড়াল। (ব.শ.)। ৪. camouflage বা আড়াল অর্থে প্রচলিত। ৫. দুই নদীর, বনের, দেশের, রাষ্ট্রের, রাজনীতির, অর্থনীতির, চিন্তার, মধ্যবর্তী অঞ্চলে থাকা অস্তিত্বগুলি, যা সংশ্লিষ্ট কোনো সত্তাকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে।

অন্তরিক্ষ, অন্তরীক্ষ : ১. অন্তর, ঈক্ষ্ = দর্শন। ২. *অন্তরে ঈক্ষণ করলে (দেখলে) যাকে দেখা যায়।* / যাহা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে দৃষ্ট হয়। (ব.শ.)। ৩. আকাশ, বায়ুমণ্ডল, (স্বচ্ছতাসাদৃশ্যে) অভ্র। (ব.শ.)। ক) ভুবর্লোক, স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান। গন্ধর্ব, অপ্সরা ও যক্ষদের বাসস্থান। যযাতি স্বর্গ হতে পতিত হয়ে এই স্থানে অবস্থান করতেন। খ) বৈবস্বত মন্বন্তরে দ্বাপর যুগে যাঁরা বেদবিভাজন করেন, সেই ২৮ জন ব্যাসের ভিতর ১৩ তম ব্যাসের নাম অন্তরীক্ষ। বাকি ২৭ জনের নাম স্বয়ম্ভু, প্রজাপতি, উশনাঃ, বৃহস্পতি, সবিতা, মৃত্যু, ইন্দ্র, বশিষ্ঠ, সারস্বত, ত্রিধামা, ত্রিবৃষা, ভরদ্বাজ, বপ্র, ত্রয্যারুণ, ধনঞ্জয়, কৃতঞ্জয়, ঋণ, গোতম, উত্তম, বেণ (রাজশ্রবা), তৃণবিন্দু, ঋক্ষ (বাল্মীকি), শক্তি , পরাশর, জরৎকারু, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। (পৌ.অ.)। ৪. 'যে স্থান দেখা যায় না' এবং আকাশ বা sky অর্থে প্রচলিত। ৫. মধ্যবর্তী অঞ্চলে দেখলে যাকে দেখা যায়। এর একটা মানে হয়, মনের গভীরে উঁকি মেরে যাকে দেখা যায়, সে-ই অন্তরীক্ষ। আর একটি মানে হয় — পণ্যের অভ্যন্তরস্থ নিষিক্ত শ্রম, পণ্যমূল্য, মধ্যস্বত্ব, দালাল ও দালালির কমিশন, কাট্-মানি, লাভ ইত্যাদি। স্মর্তব্য: 'অন্তরীক্ষের দেবতা ইন্দ্র', অর্থাৎ 'আমি-বোধ'ই এই অন্তরীক্ষের প্রধান শক্তি।

অন্তর্দ্ধান : ১. অন্তর + ✓ধা + অন (ল্যুট্) - ভা। ২. *অন্তর ধারণ করে যাহাকে।* ৩. অদৃশ্যস্থানে স্থিতি, তিরোধান, অদৃশ্যত্ব, মুনিপ্রভৃতির দেহত্যাগ, তিরোভাব, অন্তর্হিত। (ব.শ.)। ৪. vanished বা 'অতি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাওয়া' অর্থে প্রচলিত। ৫. মধ্যাবকাশ যাকে ধারণ করে রাখে, তেমন ব্যক্তি বস্তু বা বিষয়। যেমন পুরাণাদির সাক্ষ্য অনুসারে '**কুবেরের** (ব্যাঙ্কের) শক্তি অন্তর্দ্ধান'।

অন্তর্যামী : ১. অন্তর্ + ✓যমি + ইন্ (ণিনি) - ক। (ব.শ.)। ২. *অন্তরকে সংযমন করেন যিনি।* / যিনি মধ্যে থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করেন। (ব.শ.)। ৩. অন্তঃকরণ-নিয়ামক, অন্তর্গতভাববিৎ, মনোগতজ্ঞ, আত্মা, জীব, পুরুষ, ঈশ্বর, সত্ত্বপ্রধান জ্ঞানময় চৈতন্য। (ব.শ.)। ৪. যিনি অন্তরে বা মনের ভিতরে বাস করেন, ভগবান — এই অর্থে প্রচলিত। ৫. মানবশরীরের ক্ষেত্রে মনের কর্মচারীদের (চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক) এবং সমাজশরীরের ক্ষেত্রে সমাজমনের কর্মচারীদের (একালের ভাষায় ইনফরমেশনের এলাকাতে কাজ করেন এমন কর্মচারীদের) যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই অন্তর্যামী। মানবশরীরের ক্ষেত্রে 'আমি' এবং সমাজশরীরের ক্ষেত্রে যাঁরা 'অহং রাষ্ট্রী' বলেন, যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ রাষ্ট্রনায়কগণ — এঁরাও অন্তর্যামী।

অম : দ্র. শব্দবংশের প্রথম অর্থ।

অমাবসু : ১. অমা, বসু। (মা = মাননির্ণয়, বস্ = বাসা, বাস করানো)। ২. *অম্-এর আধার যে বসু।* ৩. উর্বশীর গর্ভজাত পুরূরবার পুত্র। এরা সাত ভাই — আয়ু, অমাবসু, বিশ্বায়ু, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বনায়ু, এবং শতায়ু। ৪. অপ্র.। ৫. সম্ভবত এরাই বসুদেবগণের উত্তরসূরী। ??

অম্বর : ১. অম্ব + ✓রা (গ্রহণ) + অ (ক) - ক। ২. *'অম্ বাহক' (তেজধারক / শব্দ / পণ্য) রক্ষিত হয় যেখানে।* / যাহা শব্দ গ্রহণ করে। (ব.শ.)। ৩. শব্দাশ্রয়, আকাশ, শূন্য, মর্ম্মরশব্দযুক্ত বস্ত্র, বস্ত্রমাত্র, আবরণমাত্র, কার্পাস, অভ্রধাতু, (দন্তাবরণ) ওষ্ঠ, (মালিন্যসাম্যে) পাপ, সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ, দশম নক্ষত্র 'মঘা', পরিধি, সীমা, দেশবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **আকাশ**। ৬. আরবি অন্‌বর, হিন্দি অংবর, ফরাসী ambre এবং ইংরেজি Amber। (ব.শ.)। ল্যাটিন umbra

(= ছায়া, shadow), penumbra (= প্রচ্ছায়া), ইংরেজি umbrella প্রভৃতি শব্দের উৎস একই। স্মর্তব্য যে, সূর্য্যের পত্নীর নাম ছায়া।

অম্বা : ১. ✓অম্ব্ + অ (অঙ্) - কর্ম্মবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। ২. *অম্ বহনকারীকে ধারণ করে যে*। ৩. মাতা, পূজ্যা ও প্রাচীনা নারী, দুর্গা, অপ্সরাবিশেষ, কাশীরাজের কন্যা। (ব.শ.)। কাশীরাজের তিন কন্যা — অম্বা, অম্বিকা, ও অম্বালিকা। স্বয়ম্বর সভা থেকে ভীষ্ম বৈমাত্রেয় ভাই বিচিত্রবীর্যের বিবাহের জন্য তিন কন্যাকেই হরণ করে আনেন। অম্বা ভীষ্মের কাছে নিবেদন করেন যে, তিনি পূর্বেই শাল্বরাজকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছেন। ভীষ্ম দ্বিরুক্তি না করে অম্বাকে শাল্বের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু অপহৃতা হওয়ার কারণে শাল্ব তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। অম্বা তখন ভীষ্মের বাল্যগুরু পরশুরামের শরণ নিলেন। গুরুর কথা অমান্য করাতে গুরু শিষ্যে যুদ্ধ হল এবং পরশুরাম পরাজিত হলেন। তখন অম্বা ভীষ্মবধের জন্য মহাদেবের তপস্যা করেন। প্রীত হয়ে মহাদেব বর দিলেন যে, 'তুমি জন্মান্তরে দ্রুপদ গৃহে ক্লীবরূপে জন্মগ্রহণ করে ভীষ্মবধের কারণ হবে।' পরজন্মে অম্বা শিখণ্ডী হন এবং ভীষ্মবধের কারণ হন। (পৌ.অ.)। (অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা, তিনটি শব্দেরই একটি অর্থ মাতা।) ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. **কাশী**র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন **শিব**। এ হল **বারাণসী**, যা 'পৃথিবীর বাইরে'। এখানে ব্যবসা চলে, কিন্তু পৃথিবীতে বা আদি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এলাকার ভিতরে চলে না। এই কাশীর রাজার তিন জনগোষ্ঠী — কৃষিপণ্য উৎপাদক, কারুপণ্য উৎপাদক, এবং ঐ দুইয়ের উদ্বৃত্তের বিনিময়কারী। কৃষিপণ্যের উৎপাদকেরাই ভীষ্মের (প্ল্যানিং কমিশনের আদি রূপের) মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভীষ্মের পুনর্জন্ম হয়েছে 'ভারতের প্ল্যানিং কমিশন' নামে। দ্র. **অম্বালিকা**। ৬. ইংরেজি womb।

অম্বিকা : ১. অম্বা + ক (কন্) স্বার্থে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *অম্ বহনের গতিশীলতাকে ধারণ করে যে*। ৩. মাতা, পূজ্যা, দুর্গা, পার্ব্বতী, ওষধিবিশেষ, কটুকী, অম্বষ্ঠা, কাশীরাজের মধ্যমা কন্যা। (ব.শ.)। ক) অম্বিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহ হলেও, সন্তান উৎপাদনের আগেই তার মৃত্যু হয়। তখন শাশুড়ী সত্যবতীর আদেশে ব্যাসের ঔরসে তার জন্মান্ধ পুত্র হয়, তার নাম ধৃতরাষ্ট্র। খ) আদ্যাশক্তি ভগবতীর এক নাম অম্বিকা। ইনি শিবের স্ত্রী। এই নামে ইনি শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই ভীষণ দৈত্যকে বধ করেন। এই যুদ্ধের ব্যাপারই চণ্ডী বা 'দেবীমাহাত্ম্য'-এ বর্ণিত হয়েছে। (পৌ.অ)। ৪. কেবল নামরূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **অম্বালিকা**।

অম্বালিকা : ১. অম্বালা + ক (কন্) স্বার্থে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *অম্ বহনকারীকে আনয়ন ও তার গতিশীলতাকে ধারণ করে যে*। ৩. মাতা, কাঁশীরাজের কনিষ্ঠা কন্যা, বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী ও পাণ্ডুর জননী। (ব.শ.)। শাশুড়ীর আদেশে ব্যাসের ঔরসে এঁর গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ভারত ইতিহাসে যে বিকাশের ধারার বর্ণনা রয়েছে, তাতে যৌথ অর্থনীতি ও একক অর্থনীতির অর্থাৎ **সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিতান্ত্রিক** অর্থনীতির যে দ্বন্দ্বমূলক বিকাশ ঘটেছে, তার বিবরণের একটি অধ্যায়ে এই তিন রকম জনসাধারণের কথা বারংবার এসেছে। রামায়ণের কাহিনীতে এঁরাই কৌশল্যা (কারুশিল্পে নিযুক্ত), কৈকেয়ী (কৃষিকাজে নিযুক্ত), ও সুমিত্রা (বিনিময়ে নিযুক্ত); মহাভারতের প্রথম যুগে এঁরাই যথাক্রমে অম্বিকা, অম্বা, ও অম্বালিকা; এবং শেষ যুগে এঁরাই কুন্তী, গান্ধারী, ও মাদ্রী। পুরুষ শক্তিরও পরিণতি ঘটেছে যুগে যুগে। রামায়ণে তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে দশরথ নামে, মহাভারতের আদিকল্পে তাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে ভীষ্ম, ব্যাসদেব ও বিচিত্রবীর্য নামে এবং শেষে তাকেই চিহ্নিত করা হয়েছে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, ও সূর্য, ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামে।

অম্ল (অম্লমধুর) : দ্র. **টক**।

আম : ১. আ + ✓অম্ (গতি) + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *সীমায়িত গতির আশ্রয় যাহাতে*। / যাহা পীড়িত করে। (ব.শ.)। ৩. ঈষৎ অগ্নিপ্রাপ্ত বা পক্ব; অপক্ব, অসিদ্ধ, কাঁচা। বিপরীত শব্দ 'পক্ব'। অপক্ব, অপরিণত (ফল)। অদগ্ধ (ঘটাদি)। অজীর্ণ (খাদ্য)। অজীর্ণ রোগ। মলবৈষম্যরোগ। আমভাব। ... (ব.শ.)। ৪. 'mango' আর 'সাধারণ' ('আম'জনতা) এই দুটি অর্থে এবং কদাচিৎ 'মলবৈষম্য' রোগ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ৫. প্রাচীনকালে শব্দটি 'সীমায়িত গতি যাহাতে' এমন সবকিছুকেই বোঝাতো। এর মধ্যে গাছের আম বা mango যেমন ছিল, কিংবা মানবশরীরের শারীরিক আম (**আমাশয়** দ্র.) যেমন ছিল, তেমনি মানসিক আমও ছিল। ব্যক্তিমালিকানার বোধকে মানসিক আম বলে। এটি যার ভিতরে হয়, সে 'আমি' 'আমি' বলে। ইংরেজিতে শব্দটি '**am I**'-তে পরিণত হয়েছে। যার অর্থ 'আমি (একজন ব্যক্তিমালিক) হই'। বিস্তারিত বিবরণের জন্য (ঋ) গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

আমলক, আমলকী : ১. আ + ✓মল্ (ধারণ) + অক (ক্বুন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *আম লালন-লোপন করে যে; আমলকের গতিশীলতা ধারণ করে যে*। / যাহা ভৈষজ্যার্থ ধৃত হয়। সমার্থক ছান্দস শব্দ 'আমলা'। (ব.শ.)। ৩. বাসকবৃক্ষ, আমলকীবিকার, আমলকী ফল, ধাত্রীবৃক্ষ। (ব.শ.)। ৪. কেবলমাত্র আমলকী ফল বা তার গাছ অর্থে প্রচলিত। ৫. 'আমলা' শব্দটি বহুল প্রচলিত। একালের ভাষাবিশেষজ্ঞরা অবশ্য মনে করেন, 'আমলা' শব্দটি আরবী ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে, যার অর্থ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, মুহুরি, কেরানি ইত্যাদি। আমরা কিন্তু দেখছি শব্দটি বেদে রয়েছে 'আমলা' রূপেই। কোনো কোনো প্রাচীন অভিধানে 'আমলা' অর্থে 'বানর' এবং 'বানর' অর্থে 'আমলা' লেখা রয়েছে। কেবল তাই নয়, মানবশরীরের ক্ষেত্রে আমলকী বৃক্ষের যেরূপ ধাত্রীর ভূমিকা, সমাজশরীরের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রেরও সেই ভূমিকা। বর্তমান সমাজ আমলার মন্দ গুণটি এত প্রচার করেছে, যে তার ভালো দিকটি লোকে প্রায় ভুলেই গেছে। **অশ্ব, হস্তী** শব্দ থেকে সেকথা আমরা জানতে পারি।

আমলা : ১. সংস্কৃত - আমলক > প্রাকৃত - আমলঅ > বাংলা - আমলা। (ব.শ.)। ২. *আম লালন-লোপন করে যে, তাহার আধার*। ৩. আমলকী গাছ ও তাহার ফল, কর্ম্মচারী, মুহুরি, কেরানি প্রভৃতি। ৪. শব্দটি বর্তমানে bureaucrat অর্থে প্রচলিত। ৫. বেদে শব্দটি 'আমলা' রূপেই রয়েছে। নিশ্চয় বৈদিক শাস্ত্রকাররা আরবী ভাষা থেকে শব্দটি গ্রহণ করেননি। এমনকি অত্যন্ত পুরানো বাংলা অভিধানেও শব্দটিকে বিদ্যমান দেখা যায় এবং সেখানে এর অর্থ বলা হয়েছে 'বানর'। তবে আধুনিক অভিধানকারদের এটা পছন্দ হয়নি। তাই তাঁরা তাঁদের অভিধান থেকে হয় শব্দটি বাদ দিয়েছেন, এবং এটিকে আরব থেকে আমদানি দেখিয়ে এর বর্তমানে প্রচলিত অর্থটিই দিয়েছেন। এই আমলার জন্মরহস্য জানতে হয় বালী সুগ্রীবের জনক ঋক্ষরজার কাহিনী থেকে। ইয়োরোপের ইতিহাসে কি আমলাদের জন্মরহস্য বলে কিছু আছে? মনে হয় নেই। দ্র. **ঋক্ষরজা**।

আমি : ১. আম + ই। ২. *আম (সীমায়িত গতির আশ্রয় যাহাতে) -এর গতিশীলতা যাহাতে (সেই সত্তা বা **ব্যক্তি**)*। ৩. অহঙ্কারের বা কর্ত্তৃত্বাদির আধার ভৌতিক দেহ, অহংবোধের আশ্রয়, আত্মা, জীব, অহং জ্ঞান, অহঙ্কার, পরমপ্রকৃতি, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা। (ব.শ.)। ৪. I am অর্থে প্রচলিত। ৫. অং বা তেজের একটি রূপ হল আম। সেই আম-এর যখন আত্মোপলব্ধি ঘটে, সে তার প্রকাশ ঘটায় 'আমি' ব'লে, আত্মস্বরূপের এই 'ব্যক্ততার' কারণে সে ব্যক্তি। ইংরেজি ভাষায় সেই কথাটিই হল am-I (= উচ্চারণ 'আমি')। এটিকে অহঙ্কার বা 'আমি করেছি' — এই বোধ বলে মনে হলেও, খেয়াল রাখা দরকার, অহঙ্কার দুরকম। একটি লক্ষ্মীগুণসম্পন্ন ও অপরটি কুবেরগুণসম্পন্ন। বিষয়টি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা দিয়েছিল। এখানে লক্ষ্মীগুণসম্পন্ন অহঙ্কারের কথা বলা হয়েছে। বাংলা ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ভাষাতেও এর নানারকম উত্তরাধিকার রয়েছে। প্রাচীন 'মহ' (যৌথসমাজের একক) বা মহান কথাটি হিন্দিতে গেছে 'হম' (আমরা) রূপে, ইংরেজিতে গেছে homo রূপে। তাছাড়া এই 'আমি'কে ইন্দ্র বলা হত বলে 'ইন্দ্র'-এর উত্তরাধিকারও নানা ভাবে রয়েছে। ৬. অম-জাত আমি শব্দটি নানা পথ পেরিয়ে অর্থের সামান্য অদলবদল ঘটিয়ে (যেমন আম-ই, আম-ইতি, আম-উর, আম-ওর, আমি-অবল, আমি-কবল ... ইত্যাদি) বিভিন্ন ভাষায় নানা রূপে বিদ্যমান রয়েছে। যথা ইংরেজিতে am I, amity, amiable, amicable; ফরাসিতে ami (= 'আমি' = বন্ধু), amie (= 'আমী' = বান্ধবী), amour (= 'আমুর' = ভালবাসা); ল্যাটিনে amor (= 'আমোর' = ভালবাসা)।

আমিষ : ১. ✓অম্ + ইষ (টিষচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *সীমায়িত গতির ইচ্ছা/প্রাপ্তি/অভিলাষ যাহাতে*। ৩. ঋগ্বেদ অনুসারে অপক্ক মাংস; মনু মতে পিশিত, মাংস; ভোগ্যবস্তু, উপভোগদ্রব্য, মৎস্যাদির খাদ্য মাংসখণ্ডাদি, (মাছের) চার, উৎকোচ, উপঢৌকন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, বিষয়, বিষয়াভিলাষ, কামগুণ, সুন্দর আকৃতি রূপ প্রভৃতি; লোভনীয় বিষয়, লাভ, ভোজন, জম্বীরফল। (ব.শ.)। ৪. ইংরেজিতে 'আমিষ' শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই। তারা একে non-veg. ব'লে কাজ চালায়। বাংলায় মাছ, মাংস ইত্যাদি অর্থে শব্দটি প্রচলিত। ৫. উৎকোচ বা উপঢৌকনকে আমিষ বলা হত কেন, এই প্রশ্নের উত্তর থেকে 'আমিষ' শব্দটি ঠিক কী বোঝাতো তার অনেকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। যে বিষয়ে 'আমি' 'আমি' গন্ধ রয়েছে বা আমিত্বের বা মালিকানার গন্ধ রয়েছে, তেমন সমস্ত বিষয়ই সেকালে 'আমিষ'পদবাচ্য ছিল। দ্র. **নিমিষ, মৎস্যগন্ধা**।

'অর্চ্' (অর্চ্চ, ঋচ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা: অর্ক, অর্কজ, অর্কজা, অর্কতনয়, অর্কনন্দন, অর্কপক্ক, অর্কপ্রকাশ, অর্কফলা, অর্কবংশ, অর্কবন্ধু, অর্কবল্লভ, অর্কবান্ধব, অর্কবিবাহ, অর্কবৃক্ষ, অর্কব্রত, অর্কসুত, অর্কসুনু, অর্কোপল, অর্চ্চ্, অর্চ্চ, অর্চ্চক, অর্চ্চন, অর্চ্চনা, অর্চ্চনীয়, অর্চ্চা, অর্চ্চার্হ, অর্চ্চি, অর্চ্চিঃ (বর্চ্চঃ), অর্চ্চিত, অর্চ্চিষ্মান, অর্চ্চ্য, আঁচ, আঁচ-পাঁচ, আঁচ-মন, আক, আর্ক, আর্কফলা, আকা।

অর্চ্চ্ (অর্চ্) = অস্তিত্বরক্ষণের (উপায়ের) পুনঃপুনঃ চয়ন। **অর্চ্চ** = অস্তিত্বরক্ষণের উপায় পুনঃপুনঃ চয়িত হয় যাহাতে। (arch-যুক্ত প্রায় সমস্ত ইংরেজি শব্দ)।

অর্ক : ১. ✓অর্চ্চ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অর্চ্চ্ কৃত যাহাতে*। / যাহার অর্চ্চনা করা যায় বা উচিত। (ব.শ.)। ৩. সূর্য্য, রবিবার, অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, তাম্র, স্ফটিক, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পণ্ডিত, আকন্দগাছ, সূর্য্যদেবতাকা উত্তরফাল্গুনীনক্ষত্র, সপ্তমী তিথি, সূর্য্যের সংখ্যানুসারে ১২ সংখ্যা, ক্বাথবিশেষ (আরক), যজ্ঞবিশেষ; রেফযুক্ত ক (র্ক > অর্ক, উচ্চারণে অ আগম), শিখা, চৈতন। (ব.শ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ঋচ্**। করণের আদিতম রূপ এই অর্ক। পুরনো বা নতুন জ্ঞান নিয়ে সকলের শীর্ষে থেকে কাজ করে যে সত্তা সুপ্রাচীনকালে তাকে অর্ক বলা হত। তার সঙ্গে কর্মরত হওয়া ছিল ভক্তির লক্ষণ। সম্ভবত তখনও প্রধানত চয়নভিত্তিক অর্থনীতিই প্রচলিত ছিল। সম্ভবত সেই চয়ন থেকেই যে অংশ বয়স্কদের দেওয়া হত, অর্ক ছিল তাই। সেই অর্ক বয়স্কদের চেষ্টায় সঞ্চিত হয়ে পরিমাণে যথেষ্ট হয়ে গেলে, সেটিই সমাজের প্রথম সম্পদভাণ্ডার বা আদি যৌথসম্পদ হয়ে যায় এবং সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ামক সত্তা রূপে দেখা দেয়। সম্ভবত সর্বাগ্রে তাকেই বলা হত 'অর্ক'। সেই সম্পদই পরে রাষ্ট্র ও তার রাজকোষ রূপে দেখা দেয়। দ্র. **অর্কব্রত, অর্কবৃক্ষ**। ৬. ফারসিতে 'অর্ক'কে পাচ্ছি 'আকা' (= প্রভু, মালিক) রূপে। দ্র. **অক্কা**। তবে এই শব্দটির উত্তরাধিকার পশ্চিমের ভাষাগুলির বেশ ভাল পরিমাণেই রয়েছে। গ্রীক ভাষায় archos (= 'আর্কস' = মুখ্য বা প্রধান) থেকে ইংরেজিতে পাচ্ছি mon*arch*, *arch*bishop, *arch*angel, *arch*-villain; তাছাড়াও পাচ্ছি arch (= 'খিলান') এবং ল্যাটিন arcus (= 'অর্কুস' = ধনুক, খিলান)। মনে রাখা ভাল, ধনুক ও খিলান দেখতে একই রকম এবং archer হল ধনুর্দ্ধর। এবং এসবই 'অর্চ্চন' থেকে জাত।

অর্কজ, অর্কনন্দন : ১. অর্ক + ✓জন্ + অ (ড) - ক। (ব.শ.)। ২. যিনি অর্ক হইতে জাত। (ব.শ.)। ৩. সূর্য্যপুত্র, কর্ণ, যম, শনি, বৈবস্বত মনু, সাবর্ণি মনু, সুগ্রীব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যমুনা, তপতী, তাপ্তী নদী। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যৌথসম্পদ (যৌথশাসন) থেকে জাত সন্তাসমূহ। যথা আদি দোকানদার (কর্ণ), আদি বিচারক সম্প্রদায় (যম), আদি সংগ্রাহক (শনি/ একালের সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদি সত্তার আদিরূপ), আইনবোদ্ধা মানুষ (**বৈবস্বত মন**), ধনতন্ত্র সমর্থক আমলা (**সুগ্রীব**) ... সরকারি রেশন ব্যবস্থা (**যমুনা**), ... প্রভৃতি সামাজিক সত্তাগণ।

অর্কব্রত : ২. *অর্ক বিষয়ে যে ব্রত (বহন-রক্ষক তারিত যাহাতে) আচরণ করা হয়*। ৩. সূর্য্যসম্বন্ধী ব্রতবিশেষ। মাঘের শুক্লসপ্তমী হইতে বৎসরপর্য্যন্ত প্রতি শুক্লসপ্তমীতে সূর্য্যারাধনার্থ কর্ত্তব্য ব্রত। আরোগ্য সপ্তমীব্রত। অগ্রহায়ণাদি অষ্টমাস সূর্য্যের অল্প তাপে অল্প অল্প রসাকর্ষণের ন্যায়, রাজার পীড়ন বিনা রাষ্ট্র হইতে শাস্ত্রীয়-করগ্রহণ। (ব.শ.)। ৪. সাধারণভাবে অপ্র.। ৫. রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর করসংগ্রহের এই আদি রীতিটি সুনির্দিষ্ট রূপ পায় এবং সম্ভবত অগ্রহায়ণ থেকে পরবর্তী সাত মাস প্রতি শুক্লসপ্তমী তিথিতে এই কর দান করা হত এবং গ্রহীতাগণ তা গ্রহণ করতেন। দ্র. **ব্রতব্রত, সত্যব্রত, দেবব্রত**।

অর্কবৃক্ষ : ১. অর্ক, ব্রশ্চ্ = ছেদন। ২. *অর্ক বিষয়ক বৃক্ষ (করপত্র ধারক)*। ৩. ব.শ.-তে এই শব্দটি পৃথকভাবে নাই। তবে বৃক্ষ শব্দের মূলে যে ব্রশ্চ্ ধাতু তার 'ব্রশ্চন্' অর্থে 'করপত্র' শব্দটি রয়েছে। ৪. অপ্র.। ৫. যতদূর বোঝা যায়, আদি মানসিক ও দৈহিক উৎপাদন, বণ্টন, করসংগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে যে ব্যবস্থা, তাকে অর্কবৃক্ষ বলা হত। এর অপর নাম দেওয়া হয়েছিল **সূর্য্য** ও **আদিত্য**। তখনও শ্রমবিভাজন হয়ে আজকালকার সামাজিক সংগঠনসমূহের মতো বহু পদ ও পদাধিকারী (**পত্র**) সম্পন্ন পর্ব্বতের (আমলাতন্ত্রের) প্রচলন হয়নি। পরে পরে সেগুলিকে **পর্ব্বত** বলার প্রচলন হয়। দ্র. **অশ্বত্থ**।

'অর্জ্' (অর্জ্জ্, ঋজ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনর্গল, অনার্জ্জব, অর্গল, অর্গলা, অর্গলিকা, অর্গলিত, অর্গলী, অর্জ্জ্, অর্জ্জক, অর্জ্জন, অর্জ্জনীয়, অর্জ্জিত, অর্জ্জুন, আগড়, আগুল, আগুলি, আগুলী, আর্জনীয়া, আর্জ্জব (উব্জ), আর্জ্জুনি, উপার্জ্জক, উপার্জ্জন, সমুপার্জ্জন।

অর্জ্জ্, অর্জ্জ : *অর্জ্জ্ (অর্জ্) = অস্তিত্বরক্ষণের (উপায়ের) পুনঃপুনঃ জনন। অর্জ্জ = অস্তিত্বরক্ষণের উপায় পুনঃপুনঃ জনিত হয় যাহাতে।* urge।

অর্জ্জন, অর্জন : ১. ✓অর্জ্জ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অর্জ্জ্ অন যাহাতে*। ৩. অলব্ধলাভ, উপার্জ্জন, লাভ, আদান, গ্রহণ। (ব.শ.)। ৪. অর্জন শব্দটি এখন achievement অর্থে প্রচলিত। ৫. আয় আর অর্জ্জন, **দুটো শব্দ আমাদের ছিল। অর্থ ছিল যা কিছু** আসে, তাই 'আয়'; **আর যা কিছু অর্থকরী বস্তু জনন করা হয়**, যার পেছনে আমাদের **চেষ্টা কাজ করে, তাই 'অর্জ্জন'**; তা সে দৈহিক বা মানসিক যে কোনো **ধরনের অর্থকরী বস্তুই হোক না** কেন, এবং এক অর্থে তাও **অর্থ আনে তা সে টাকা-অর্থ হোক আর মানে-অর্থই** হোক। তাই সেটিও **একধরনের** আয় এবং তা চেষ্টার্জ্জিত। কিন্তু আয় ও অর্জ্জনকে **এক করে দিলে** 'অনুভবের জগৎ' ছোট হয়ে যায়। দ্র. **আয়, উপার্জ্জন**।

অর্জ্জুন, অর্জুন : ১. ✓**অর্জ্জ্** + উন (উনন) - ক; ✓ঋজ্ + উন - ক। (ব.শ.)। ২. *যিনি শুক্র কর্ম করেন (দ্র. **অর্থ**); যিনি সমাজস্বীকৃত অলব্ধলাভ করেন*। ৩. শ্বেতবর্ণ, বৃক্ষবিশেষ, তৃণবিশেষ, জুন (অর্জ্জুন) ঘাস, ময়ূর, মাতার একমাত্র পুত্র, চর্ম্মরোগবিশেষ, ধবলকুষ্ঠ, দেশবিশেষ, করবীর, স্বর্ণ, রৌপ্য, কুন্তীপুত্র তৃতীয় পাণ্ডব। 'করোমি কর্ম্ম শুক্লঞ্চ তস্মান মামর্জ্জুনং বিদুঃ'। দ্রোণ ইঁহার ধনুর্ব্বেদাচার্য্য। ইঁহার জীবনের প্রধান ঘটনাবলী — দ্রোণের নিকট ব্রহ্মশির অস্ত্রলাভ, পঞ্চালে লক্ষ্যভেদ ও দ্রৌপদীলাভ, দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যপালন, উলুপীর ও চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ, প্রভাসে সুভদ্রাপরিণয়, খাণ্ডবদাহ, অগ্নির নিকট গাণ্ডীব, অক্ষয়তূণ ও কপিধ্বজ রথপ্রাপ্তি, ময়দানব কর্ত্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে সভানির্মাণ, বনবাসকালে কিরাত-শঙ্কর হইতে পাশুপত অস্ত্রলাভ, নিবাতকবচবধ ও ইন্দ্রের নিকটে কবচ, মালা, দেবদত্ত শঙ্খ, কিরীট প্রভৃতি লাভ, বিরাটের গোগৃহরক্ষা, কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির বিনাশ এবং মণিপুরে বভ্রুবাহনের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ ও সঞ্জীবনমণি প্রভাবে জীবনলাভ। অভিমন্যু ইঁহার পুত্র। পূর্ব্বজন্মে ইনি নারায়ণ ঋষি ছিলেন। কৃষ্ণ ইঁহার পরম সখা। ইনি ভগবদ্‌গীতার প্রশ্নকর্ত্তা। কৃষ্ণের দেহাবসানে যুধিষ্ঠিরাদির সহিত ইনি মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহন করেন। অর্জ্জুন ফাল্গুনী জিষ্ণু কিরীটী শ্বেতবাহন বীভৎসু বিজয় কৃষ্ণ সব্যসাচী ধনঞ্জয় — ইঁহার এই দশ নাম। অর্জ্জুনী = গবী, কুট্টনী, বাহুদানদী, করতোয়া, অনিরুদ্ধপত্নী উষা, (দ্বি ও বহু বচনে) ফাল্গুনীনক্ষত্র। (ব.শ.)। ৪. 'অর্জুন' নামরূপে প্রচলিত। ৫. সেকালে অর্জন মাত্রেই সার্বজনীন ছিল, তা সে জ্ঞানসম্পদ হোক আর বাহ্যসম্পদই হোক। এখনও জ্ঞানসম্পদ শেষ বিচারে সার্বজনীন, (যদিও ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট নিয়ে বহু অস্বাভাবিক কারবার চলছে) কিন্তু বাহ্যসম্পদ এখন আর সার্বজনীন নয়। এ বিষয়ে সমাজ একটা ছাড় দেয়। সেই ছাড় না-পাওয়া বাহ্যসম্পদকে কৃষ্ণ এবং ছাড়-পাওয়া বাহ্যসম্পদকে অর্জ্জুন বলে। (কথাটি যথাক্রমে সমাজনিন্দিত-জ্ঞান এবং সমাজস্বীকৃত-জ্ঞানের ক্ষেত্রেও খাটে।)

তা সে যাই হোক, দশ টাকার জিনিস বারো টাকায় বেচলে যে দু'টাকা পাওয়া যায়, আদিম যৌথসমাজের চোখে তা ছিল 'অলব্ধলাভ'। পরে বিনিময়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হয়ে যাওয়ার পর সেটা সমাজস্বীকৃত হয়ে যায় এবং ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে। একালের ভাষায় বলতে গেলে, কোম্পানি সমূহের যে আইনসম্মত পুঁজি ও আইনসম্মত মালিকানাভিত্তিক কাজকর্ম তারই আদি রূপকে অর্জ্জুন বলা হত। তখন নগদ নারায়ণের কৃষ্ণবতার (বা কালো টাকা) রূপটি সমাজে আবির্ভূত এবং অর্জ্জুনের **সখা** (যারা একসঙ্গে

খায়) রূপে প্রতিষ্ঠিত। নারায়ণ, ইন্দ্রাদির সঙ্গে তাই অর্জ্জুনের এত ঘনিষ্ঠতা। সেকালের ভারতে (খুব সম্ভব ৫০০ খ্রি. পূর্বাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিতে সমাজস্বীকৃত পুঁজি যে সকল ক্রিয়া করেছিল, অর্জ্জুনের কাহিনীতেই তার সমস্ত ইতিহাস রয়েছে। একালেও, ব্যবসায়ী সংগঠন সমূহের রথের সারথি থাকে কৃষ্ণই, এবং রথী থাকে অর্জ্জুনই। কালো টাকা আগে ভাগেই চারিয়ে দেওয়া হয় যথাবিহিত চেয়ারগুলিতে, তারপর সাদা টাকা দিয়ে সরকারি রসিদ, লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। অন্যথায় মাথা খুঁড়েও পারমিট-আদি পাওয়া শক্ত হয়ে ওঠে; কালো টাকা বা সাদা টাকা একা একা কোনো কাজই শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারে না। অর্জ্জুন সম্পর্কিত এইরকম অর্থবোধের সুবিধা এই যে, এইরূপ অর্থ সামগ্রিকভাবে অন্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক শব্দের অর্থের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। তাছাড়া অর্জ্জন-এ উ-কারের প্রয়োগ বলে দেয় (দ্র. উ) যে, তা সর্বজনীনতা থেকে আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে ঘুরে গেছে।

অন্যভাবেও ভাবা যেতে পারে — অর্জ্জুন = denotation, কৃষ্ণ = connotation, যেমন কিনা, নর = denotation, নারায়ণ = connotation। অর্জ্জুন = ঋজু, কৃষ্ণ = বঙ্কিম। আরও বড় প্রেক্ষাপটে ভাবলে, অর্জ্জুন = আকার, কৃষ্ণ = নিরাকার। স্মর্তব্য রবীন্দ্রনাথ — 'সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না।' ('আমার জগৎ' / সাধনা)।

'অর্থ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অত্যর্থ, অনর্থ, অনর্থক, অনর্থকর, অনর্থপাত, অনর্থী, অনথ, অপদার্থ, অব্যর্থ, অভ্যর্থনা, অর্থ, অর্থ, অর্থকর, অর্থকরী, অর্থকাম, অর্থকার্শ্য, অর্থকৃচ্ছ্র, অর্থকৃৎ, অর্থকৃত, অর্থকৃত্য, অর্থকৃত্যা, অর্থকোবিদ, অর্থগৃহ, অর্থগৌরব, অর্থঘ্ন, অর্থচিন্তক, অর্থজ, অর্থজাত, অর্থজ্ঞ, অর্থতঃ, অর্থতত্ত্ব, অর্থতন্ত্র, অর্থদ, অর্থদণ্ড, অর্থদর্শন, অর্থদূষণ, অর্থনা, অর্থনাশ, অর্থনিবন্ধন, অর্থনিশ্চয়, অর্থন্যূন, অর্থপতি, অর্থপর, অর্থপরিগ্রহ, অর্থপিশাচ, অর্থপূর্ণ, অর্থপ্রয়োগ, অর্থপ্রাপ্তি, অর্থবদ্ধ, অর্থবাদ, অর্থবান, অর্থবিজ্ঞান, অর্থবিদ, অর্থবিত্ত, অর্থবিদ্যা, অর্থবিপত্তি, অর্থবৈকল্য, অর্থব্যক্তি, অর্থভাণ্ডার, অর্থমাত্র, অর্থযুক্ত, অর্থলাভ, অর্থশালী, অর্থশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্রকার, অর্থশাস্ত্রব্যবহারী, অর্থশৌচ, অর্থশ্লেষ, অর্থশ্লোক, অর্থসংকট, অর্থসংগ্রহ, অর্থসংস্থান, অর্থসঞ্চয়, অর্থসম্পদ, অর্থসম্পাদন, অর্থসম্বন্ধী, অর্থসাধক, অর্থসার, অর্থসিদ্ধ, অর্থহর, অর্থহীন, অর্থাগম, অর্থাৎ, অর্থাধিকার, অর্থান্তর, অর্থান্তরন্যাস, অর্থাপত্তি, অর্থারি, অর্থার্থ, অর্থার্থী, অর্থালঙ্কার, অর্থিক, অর্থিজন, অর্থিত, অর্থিতা, অর্থী, অর্থীয়, অর্থে, অর্থোপক্ষেপক, অর্থোপমা, অর্থোষ্মা, অর্থ্য, আর্থ, আর্থিক, অসমর্থ, চরিতার্থ, দ্ব্যর্থ, দ্ব্যর্থক, দ্ব্যর্থবোধক, নিঃস্বার্থ, পদার্থ, পদার্থবিদ্যা, পরমার্থ, পরহিতার্থ, পরার্থ, প্রার্থনা, প্রার্থী, বিদ্যার্থী, ব্যর্থ, ভিক্ষার্থী, লোকহিতার্থ, সমর্থ, সমর্থন, সার্থক, সিদ্ধার্থ, স্বার্থ, স্বার্থপর, স্বার্থসিদ্ধি, হীনার্থ।

অর্থ্ = অস্তিত্বের রক্ষণ থাকন (স্থিতকরণ)। **অর্থ** = অস্তিত্বের রক্ষণ থাকে (স্থিতকৃত) যাহাতে। (or-, earth)।

অর্থ : ১. ✓অর্থি + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে; ✓ঋ + থ (থন্)। (ব.শ.)। ২. *ঋ বা অর্ (or) থাকে যাহাতে; যাহাতে (সংকল্পজ বা বিকল্পজ) গতি থাকে।* ৩. যাচন, প্রার্থনা, অভিলাষ, ইচ্ছা, ধন, বিত্ত। [শুক্ল শবল কৃষ্ণ ভেদে অর্থ ত্রিবিধ। স্ববৃত্তি দ্বারা অর্জ্জিত ধন শুক্ল, অনন্তরবৃত্তি (ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াদি বৃত্তি) দ্বারা লব্ধ ধন শবল, এবং দ্যূতচৌর্য্যাদিপ্রাপ্ত ধন কৃষ্ণ।] লাভের টাকা; শব্দশক্তি দ্বারা বোধগম্য পদার্থ, অভিধেয়, মানে; অভীষ্ট বিষয়, বস্তু, দ্রব্য, বিষয়, ঘটনা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়, জ্ঞেয়বস্তু, বস্তুস্বভাব, তত্ত্ব, প্রয়োজন; স্বপররাষ্ট্রচিন্তন, ধর্ম্ম, প্রজারক্ষণ, নিমিত্ত, কারণ, কাম্যফল, চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের একতম; ফল, প্রকার, ব্যবহার, বিষ্ণু, ধনস্থান, ধর্ম্মের পুত্র। (ব.শ.)। ৪. meaning ও money অর্থাৎ 'মানে' ও 'টাকা' অর্থে প্রচলিত। ৫. বঙ্গীয় শব্দকোষে উপরোক্ত তিনটি ক্রিয়ার কথাই রয়েছে। মনে হয়, 'ঋ থাকে যাতে' তাই 'অর্থ'। নিরুক্তে বলা হয়েছে " 'ঋ' ধাতুর অর্ + 'স্থা' ধাতুর থ" — এভাবে শব্দটির সাধন করিতে হইবে। এই 'অর্' ও ইংরেজির or একই, অন্ ও on-এর মতো। তাছাড়া, ঋ বা গতি বলতে মানসগতি ও দৈহিক গতি, দুটোই হতে পারে। তাই 'অর্থ' জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ দুটোই হতে পারে।

সম্পদে গতি তো থাকেই, বিকল্পও থাকে। শব্দার্থের ক্ষেত্রেও তাই। কেবল তাই নয়, ধন-অর্থের যেমন তিন রূপ **শুক্ল-শবল-কৃষ্ণ**, তেমনি শব্দার্থের ক্ষেত্রেও তিন রূপ — **অভিধা, লক্ষণা, ও ব্যঞ্জনা**। এমনকি তাহাদের মূল ক্রিয়াও সমধর্মী। ('ঙ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। আদিতে যেমন সম্পদ একরকমই ছিল, তেমনি শব্দার্থের ক্ষেত্রেও আদিতে মানে একরকমই ছিল, এবং সে ছিল ক্রিয়াটিই। [তাই 'অর্থজ্ঞ' মানে 'কার্য্যতত্ত্বজ্ঞ', 'অর্থতন্ত্র' মানে 'যাহার কর্ম্ম মুখ্য', 'অর্থদর্শন' মানে 'কার্য্যজ্ঞান' ... ইত্যাদি। (ব.শ.)।] সমাজে নানা বিভাজন ও বিধিনিষেধ আরোপিত হবার পরই 'অর্থশৌচ'-এর বা 'অন্যায়ধন-গ্রহণপরিহার পূর্ব্বক ধনার্জ্জনচেষ্টা'র প্রাদুর্ভাব হয় এবং তা শুক্ল-শবল-কৃষ্ণ রূপ গ্রহণ করে। শব্দের অর্থও বিশেষীকৃত হয়ে তার অভিধা-লক্ষণা-ব্যঞ্জনা রূপ গ্রহণ করে।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'অর্থ' শব্দের মানে দেওয়া আছে 'জনপদ অধ্যুষিত ভূভাগ'। অর্থাৎ একটা যুগ ছিল, যখন যে মানুষেরা যে মাটিকে ভিত্তি করে তাদের জীবন কাটাত, তাদেরকে সেই মাটি বাদ দিয়ে চিন্তা পর্যন্ত করা হত না। আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত বোকারা মানুষের সঙ্গে তার মাটির এই সম্পর্কটা দেখতেই পায় না এবং মানুষকে অনায়াসে উদ্বাস্তু করে নানা প্রকল্প বানায়। তারা জানেই না যে, তাঁদের আরাধ্য ইংরেজি ভাষা কিন্তু 'অর্থ' শব্দের এই 'মাটি' অংশটিকেই আজও ধরে রেখেছে তাদের earth শব্দে। ৬. ল্যাটিন ordo (= proper arrangement) থেকে এসেছে ইংরেজি order, গ্রীক ortho (= straight, upright, right) এবং doxa (= opinion, দ্র. **দক্ষ**) থেকে ইংরেজিতে পাচ্ছি orthodoxy, orthopaedics ইত্যাদি। তাছাড়া ইংরেজির worth, earth তো রয়েছেই।

'অর্হ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনর্ঘ, অনর্ঘ্য, অনর্হ, অর্ঘ, অর্ঘবলাবল, অর্ঘবিৎ, অর্ঘভাক্, অর্ঘসংস্থাপন,

অর্ঘ্য, অর্হ্, অর্হ, অর্হণ, অর্হণা, অর্হণীয়, অর্হৎ, অর্হন্, অর্হা, অর্হিত, অর্হনীয়, অর্হ্য, আর্হত, ক্ষমার্হ, ঘৃণার্হ, বর্হি, বর্হিষৎ।
অর্হ্ = অস্তিত্বের রক্ষণ হওয়ন। **অর্হ** = অস্তিত্বের রক্ষণ হয় যাহাতে। (or-)।

অর্ঘ : ১. ✓অর্ঘ্ + অ (ঘঞ্) - করণবাচ্যে; ✓অর্হ্ + অ, নক্কাদি। (ব.শ.)। ২. *যাহার দ্বারা ক্রয় সাধিত হয়।* ৩. ক্রয়সাধন, পণ্যার্থ দেয় রজতাদিদ্রব্য, মূল্য; পূজাবিধি, পূজার উপচার — দূর্বাক্ষতাদি; পূজ্য ... অর্ঘবলাবল = মূল্যে বৃদ্ধি ও হ্রাস। অর্ঘবিৎ = পণ্যের মূল্যবেত্তা। অর্ঘসংস্থাপন = মূল্যব্যবস্থা, মূল্যনির্ণয়। (ব.শ.)। ৪. 'পূজার উপচার' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **অর্ঘ্য, পূজা**। এমন হতেই পারে, যে, যখন বিনিময়মুদ্রার প্রচলন হয়নি, তখন কাজ করে, শ্রদ্ধা-ভক্তির ফুলফলাদি দিয়ে বা পূজার উপচার দিয়ে সম্পদবানের বা যৌথসমাজের বিতরণকারীর কাছে কাম্য বস্তু চাওয়া হত। হয়তো সেকারণেই পরবর্তীকালে ব্যাপারটি মূল্যব্যবস্থার অর্থধারক হওয়া সত্ত্বেও তাকে ব্যবহার করা হয়নি, কেবল বাহ্যিক পূজার উপচার অর্থেই প্রয়োগ করা চলছে। ৬. গ্রীক শব্দ ergon (= work) শব্দটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। অর্থাৎ অর্ঘ শব্দের 'কাম্যবস্তু পাওয়ার জন্য কাজ করা' অর্থটি গ্রীক শব্দ ধরে রেখেছে। তাহলে তো আরও একটি কথা আমরা বুঝে নিতে পারি — প্রাচীন কালে ইংরেজি work শব্দের অর্থ ছিল 'কাম্যবস্তু পাওয়ার জন্য কাজ করা' যা কিনা আমাদের অর্ঘ শব্দেরও অর্থ ছিল।

অর্ঘ্য : ১. অর্ঘ + য (যৎ) যোগ্য অর্থে; স্ত্রী - অর্ঘ্যা। (ব.শ.)। ২. *অর্ঘ থাকে যাহাতে বা অর্ঘ যোগ করা থাকে যাহাতে।* ৩. অর্ঘযোগ্য, পূজার্হ, পূজ্য, মধুপর্ক দ্বারা সম্পূজ্য, মূল্যবান, দামী, পূজার্থ দেয় জলকুসুমাদি উপচার, পূজার্থ দ্রব্য, অর্ঘার্থ জল, পূজার উপচারমাত্র, বহুমূল্য মধুবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. 'পূজার উপচার' অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দ আসলে দুটি — অর্ঘ ও অর্ঘ্য। ঋ(অর্)-গ্-হ্-অ = অর্ঘ। ঋ-এর গমন হওয়ন যে আধারে বা যাহাতে; অর্থাৎ যা দিয়ে কোনো গতিশীলকে স্থির রূপে আনা যায়, তাকে বলে অর্ঘ। এটিকে দাম বা cost বলা যায়; ব.শ. বলেছেন 'ক্রয়সাধন'। পণ্যধারায় প্রবাহিত গতিশীল পণ্যকে দাম দিয়ে স্রোতধারা থেকে তুলে নিয়ে স্থির করা হয়। যা দিয়ে সে কাজ করা হয় নিঃসন্দেহে তা রজতাদিদ্রব্য, যাহার দ্বারা ক্রয় সাধিত হয় অর্থাৎ 'অর্ঘ'। আমরা তাকে একালের ভাষায় এবং এককথায় 'বাহ্যসম্পদ' (টাকা) বলতে পারি। সেই বাহ্যসম্পদ বা অর্ঘ যখন জলকুসুমাদির সঙ্গে একত্রে পূজার উপচারে থাকে, থাকে উপঢৌকনে, তখন তাকে বলে অর্ঘ্য। বানানের সামান্য ফারাক ও কালের প্রকোপ, বিভিন্ন যুগের লিখিত পুঁথির ভুল বানান শব্দ দুটিকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে রেখেছে। ব.শ. অত বিচার না করে যেরূপ তথ্য পেয়েছেন, সেরকমই লিখে রেখে গেছেন।

অর্হৎ : ১. ✓অর্হ্ + অৎ (শতৃ) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে বা যাহারা অর্হ হইতে আগত বা তারিত।* ৩. প্রশস্ত, পূজ্য, মান্য, সন্, সাধু, স্তুত। অর্হন্ = **জৈনদেব, জিন**। **অর্হিত** = সম্মানিত, পূজিত। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। **৫. পুরাণাদিতে অর্হৎ শব্দটি** বৌদ্ধ ও জৈনদের উল্লেখ করতে ব্যবহার **করা হয়েছে। দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে,** অসুরেরা (আদিম **সমাজতন্ত্রবাদী** বৈদিকেরা) বৃহস্পতির (ধনতন্ত্রের পরামর্শদাতাদের) **কুচক্রান্তে পড়ে 'অর্হৎ' বা বৌদ্ধ হয়ে যায়। এই** তথ্য থেকে বোঝা যায়, **প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে যে অসুর ও** দেবতাদের অত রমরমা, তারাই **পরবর্তীকালে একসময় বৌদ্ধ হয়ে** গিয়েছিল। তাই বৈদিক যুগের পর বৌদ্ধ যুগের সূত্রপাত হয়। বিষয়টি 'আর্য্যশাস্ত্র' (১৩৭২) প্রণীত বিষ্ণুপুরাণের ১৭শ-১৮শ অধ্যায়ের তৃতীয়াংশে ২৩৬-২৩৭ পৃষ্ঠাতেও রয়েছে। বলে রাখা ভাল, পরবর্তীকালে সাধারণত মানী অভিজাত সম্পদবান বৌদ্ধদেরই 'অর্হৎ' বলা হত। ৬. worth, worship।

'অল্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অত্যল্প, অনলঙ্করণ, অনল্প, অব্যলীক, অল্, অল, অলক, অলককুন্তল, অলকতিলক, অলকনন্দা, অলকমেঘ, অলকা, অলকাতিলক, অলকাতিলকা, অলকাধিপ, অলকানন্দা, অলকাপতি, অলকেশ্বর, অলগর্দ্দ (আলাদ), অলঙ্করণ, অলঙ্করিষ্ণু, অলঙ্কর্ত্তা, অলঙ্কার, অলঙ্কারক, অলঙ্কৃত, অলঙ্কৃতি, অলন্থি,য়া, অলম্বুম (আলান্দ), অলপ, অলপ্পেয়ে, অলম্, অলর্ক, অলি, অলি-অছি, অলিকদম্বক, অলিকুল, অলিকেশ, অলিগলি, অলিজিহ্বা, অলিজিহ্বিকা, অলিঞ্জর, অলিন, অলিনী, অলিন্দ, অলিবিরাব, অলিবিরুত, অলী, অলীক, অলোপ্পেয়ে, অল্প, অল্পক, অল্পকার্য্য, অল্পক্রীত, অল্পগন্ধ, অল্পচ্ছদ, অল্পজ্ঞান, অল্পতা, অল্পদক্ষিণ, অল্পদর্শন, অল্পদৃষ্টি, অল্পধী, অল্পপুণ্য, অল্পপ্রাণ, অল্পবাধ, অল্পবিদ্য, অল্পবিদ্যা, অল্পবিষয়, অল্পবুদ্ধি, অল্পমতি, অল্পভাগ্য, অল্পমাত্র, অল্পমেধাঃ, অল্পশঃ, অল্পশরীর, অল্পসরঃ, অল্পসার, অল্পাই, অল্পস্বল্প, অল্পায়ু, অল্পায়ে, অল্পাল্প, অল্পাসু, অল্পাহারী, অল্পিত, অল্পিষ্ঠ, অল্পেতর, অল্পেয়ে, আল, আলকুশি, আলগুছি, আলগোছ, আলগোছা, আলগোছি, আলগোছে, আলঙ্কারিক, আলটপকা, আলবাল, আলর্ক, আলাদ, আলান্দ, আলান্ধ, আলি, স্বল্প, স্বল্পায়ু, স্বল্পাহার, স্বল্পাহারী।
অল্ = অস্তিত্বের ল-অন (লওয়া, লয় হওয়া, লালন, লুপ্ত হওয়া ইত্যাদি)। **অল** = অস্তিত্বের লালন-লোপনাদি হয় যাহাতে। (ইংরেজি al-যুক্ত বেশ কিছু শব্দ।)

অলক, অলকা : ১. ✓অল্ + অক্ (কুন্)। — স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *অল্ করে যে। / যাহা মুখ ভূষিত করে।* (ব.শ.)। ৩. ভঙ্গুরকুন্তল, কুটিলকেশ, কুটিলকুন্তল, চূর্ণকুন্তল, কর্পূরাদিযুক্ত কেশ, চিকুর, শোভাকর, ক্ষিপ্ত কুকুর। অলকা = মেরুশিখরস্থ কুবেরপুরী। (ব.শ.)। হিমালয় পর্বতের উপর অলকনন্দা নদীর তীরে কুবেরের রাজধানী। গন্ধর্বদের বাসস্থান। (পৌ.অ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. অল করে যে, সে হল অলক বা অলকা। কাজটি লালন থেকে লোপন পর্যন্ত বিস্তারিত। অত্যন্ত লালনে লালিতের স্বপালন-ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার বিলোপ অবধারিত হয়। এরকম কাজকে

তাই সমাজ 'অলম্' ('করিও না', আলিফ-লাম-মিম্ — কোরানের প্রথম শব্দবন্ধ। দ্র. **অলঙ্করণ**।) বলে চিহ্নিত করে দেয়। কিন্তু তবু সেই কাজ করার পক্ষে পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় এবং অনেকে তেমন কাজ করতে শুরু করে বা করতে বাধ্য হয়। ফলে, অতীতপন্থীরা নিন্দা করলেও নবীনপন্থীরা তার সুনাম করতে শুরু করে। তখন অলক নিন্দিতও হয়, নন্দিতও হয়; অলকনন্দা গৌরবজনক হয়ে যায়।

এই পর্যন্ত বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা মানুষের আচরণের সমান্তরাল প্রতিক্রিয়াগুলির দিকে তাকাই, ঘটনাগুলি আর কোনো যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। সম্পদসঞ্চয় করে ব্যক্তিমালিকে পরিণত হলে কেন যে তার কেশচর্চা বদলে যায়, তা আমরা জানি না। কিন্তু সেকালের শব্দসৃষ্টিকারী অনুভবী মানুষেরা তা জানতেন। তাঁরা সামাজিক অলক-অলকা এবং মানুষের দৈহিক অলক-অলকাকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেন। তাঁদের কেশ, কুন্তল, চিকুর, ও অলক-অলকা প্রভৃতি শব্দের ভিতরে সেই কথা বিদ্যমান রয়েছে। অলকই তো কেশ বা ব্যক্তিমালিকানা। তাই যক্ষরাজ কুবেরের বাড়ির নাম যে 'অলকা' হবে, সেটিই স্বাভাবিক। এককালে ব্যক্তিমালিকানা নিষিদ্ধ ছিল, অথচ তাই করতে শুরু করে অনেকে। সেই নিবারিত কাজ করাই অলক হয়। সেই অলকই **কুবেরের** বাসস্থান। আবার এধরনের কাজ যে করে, সে 'ক্ষিপ্ত কুকুর'ও বটে। দ্র. **কুকুর**।

অলকনন্দা : ২. *যে অলকের প্রশংসা করে।* / অলক দ্বারা নন্দয়িত্রী। (ব.শ.)। ৩. আট থেকে দশ বছর বয়সের মেয়ে। কুমারী। ভারতবর্ষীয়া গঙ্গা। ইহা গঙ্গার সপ্তধারার, মতান্তরে চারিধারার একতমা। আকাশগঙ্গা, স্বর্গগঙ্গা, দেবলোকে প্রবাহিতা গঙ্গা। 'গঙ্গা আকাশগামিনী হইয়া দেবলোকে অলকনন্দা নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। — কালীপ্রসন্ন সিংহ।' হিমালয়জাতা শ্রীনগরের অদূরে গঙ্গার সহিত মিলিতা নদী। (ব.শ.)। গঙ্গোত্রীর কাছে, গঙ্গার চার ধারার মধ্যে একটি। অন্য তিনটি ধারার নাম সীতা, চক্ষু, ও ভদ্রা। অলকানন্দা ভারতের দক্ষিণ দিকপ্রবাহিণী ও সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. commodity-flow-কে বলা হত **গঙ্গা**। সমাজে যখন বাজার হাট প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখন জোর করে, নানারকম বুদ্ধি খাটিয়ে তবে পণ্যধারা প্রবাহ শুরু করা গিয়েছিল। গঙ্গা নদীটিও প্রাকৃতিক নয়, মানুষের দ্বারা খনিত। সেই কারণে দুটো প্রক্রিয়ার একই নাম। যে পণ্যধারাপ্রবাহ সুখস্বর্গবাসীদের (দেবতাদের) মহলে প্রচলিত ছিল, যেখানে আদি ব্যাঙ্কের (কুবেরের) অস্তিত্ব ছিল, সেই পণ্যধারাপ্রবাহকে **আকাশগঙ্গা বা স্বর্গগঙ্গা** বলা হত। যেহেতু সে ব্যক্তিমালিকানার (কেশের/ অলকের) প্রশংসা করত, তাই তার ঐরূপ নাম। মনে রাখা দরকার, গঙ্গা প্রথমে ছিলেন স্বর্গলোকে, সম্প্রদায়গুলির শিখরে শিখরে যে মহর্ষিরা ছিলেন, পণ্যপ্রবাহ প্রথমে শুরু হয় সেই শীর্ষে শীর্ষে। গঙ্গার সেই প্রথম রূপ। তাই সে কুমারী বটে। (খ) গ্রন্থে রবি চক্রবর্ত্তীর 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

অলঙ্করণ, অলঙ্কার : ১. অলম্ + ✓কৃ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে; অলম্ + ✓কৃ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে করণ (কাজ করা) অলম্ (নিষিদ্ধ); নিষেধ সত্ত্বেও যাহা করা হইয়াছে।* / যার দ্বারা মণ্ডন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. অলঙ্করণ, প্রসাধন, শোভাজনক বস্তুমাত্র, ভূষাসাদৃশ্যে শব্দের ও অর্থের শোভাকর, রসাদির উৎকর্ষজনক অনুপ্রাসাদি (শব্দভূষণ) ও উপমাদি (অর্থভূষণ); কাব্যশোভাকর ধর্ম্ম, অলঙ্কারশাস্ত্র বা কাব্যের গুণদোষ-প্রতিপাদক শাস্ত্র, যুবতীর সাত্ত্বিক হাবভাবাদি অষ্টাবিংশতি অনুভাব, ভূষণ, ... (ব.শ.)। ৪. যথাক্রমে decorating ও jewellery অর্থে প্রচলিত। ৫. অলম্ শব্দের অর্থ 'করিও না'। দ্র. **অলক**। অহঙ্কার, অলঙ্কার, সত্যঙ্কার, 'কার' যুক্ত এই তিনটি শব্দই যৌথসমাজের উদ্বৃত্ত সম্পদকে ব্যক্তিগত করার প্রাচীন চেষ্টার নিদর্শন। প্রজাপতিতন্ত্রেরও আগে, উদ্বৃত্ত জমানো নিষিদ্ধ ছিল, ফেলে দেওয়া হত **আবর্জ্জনা** রূপে, আর 'যে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ স্থানে যেত' তাকে নিন্দা করা হত 'কিরাত' বলে। কারণ সামাজিক উৎপাদনের **'অবশেষ'** থেকেই সমাজদেহে পুঁজ (abscess) জমতে পারে। এই উদ্বৃত্ত তাই ছিল ভূষা পদবাচ্য, যা খাদ্যাদির ছোবড়ার সঙ্গেই ফেলে দেওয়া হত। ভূষা কথাটি একালেও খুব ভালো কথা নয়। গহনাদি তাই ভূষা পদবাচ্য হয়ে যায়। পরে সমাজে সম্পদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হলে, অলঙ্কারের মর্যাদা বাড়ে। যদিও ভারতসমাজে **'অহঙ্কার'**-এর (আমার দ্বারা কৃত, অতএব এটি আমার) মর্যাদা তেমন প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং নিন্দিতই রয়ে গেছে। আর **'সত্যঙ্কার'** গেছে হারিয়ে।

আর একটি দিক থেকেও ব্যাপারটি দেখা যেতে পারে। 'অল' মানেই 'নিবারণ' ও 'ভূষণ'। ভূষণের দ্বারা নিজেকে গোপন করেই তো শত্রুনিবারণ করা যায়। তা নইলে 'অল' শব্দের আরেকটি মানে কেন 'শত্রুনিবারক' হতে যাবে। অন্যথায় প্রকৃষ্টরূপ সাধন বা প্রসাধনের সঙ্গে ভূষণের সম্পর্ক থাকত না।

অল্প : ১. ✓অল্ + প - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. অল্ *(নিষেধ) পালিত হয় যাহাতে।* / যাহা বারণ করিবার যোগ্য। (বারণযোগ্য - ব.শ.)। ৩. স্তোক, ঈষৎ, কিঞ্চিৎ (পরিমাণে), পরিমিতবিষয়ক, অকিঞ্চিৎকর, লঘু, সামান্য, ... পরিমিত। (ব.শ.)। ৪. less বা 'কম' অর্থে প্রচলিত। ৫. সীমায়িত বস্তু বা ব্যাপার। যার বৃদ্ধি বা বাড়াবাড়ি নিষিদ্ধ আছে, বারণ করা আছে। তাই, **অল্প** মানে ঈষৎ বা কম। বহু কারখানারই ইচ্ছাখুশি উৎপাদন করার অধিকার নেই। কত উৎপাদন করা হবে, সরকারের কাছে তার অনুমতি নিতে হয়। ফলে তাদের উৎপাদন 'অল্প', একালের ভাষায় 'sanctioned' বা 'সীমিত' পরিমাণ। এরকম বিষয়কেই সেকালে 'অল্প' বলা হত; পরে তা প্রাসঙ্গিক বিষয় ছাড়িয়ে অপ্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। বলে রাখা ভাল, অল্প কিন্তু কম নয়, কম-এর চেয়ে বেশি। দ্র. **কম**। ৬. alp = অনতি-উচ্চ পর্বত বা 'অল্প-পর্বত'। হিমালয়ের তুলনায় সুইজারল্যান্ডের পাহাড় অনতিউচ্চ বা 'অল্প'। সেজন্যই তাকে Alpes বলা হয়েছে ল্যাটিনে, এবং Alps বলা হয়েছে ইংরেজিতে। হতে পারে অতি প্রাচীনকালে হিমালয়-দ্রষ্টা ভারতের কেউ সুইজারল্যান্ডে গিয়ে পর্বতটিকে ঐ নাম দিয়েছে

অথবা সুইজারল্যান্ডের কেউ ভারতে এসে হিমালয় দেখে ফিরে যাওয়ার পর পর্বতটিকে ঐ নাম দিয়ে থাকবে।

'অশ্' ক্রিয়াপদের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অংশু, অংশুক, অংশুজাল, অংশুধর, অংশুপট্ট, অংশুপতি, অংশুভর্ত্তা, অংশুমান, অংশুমালা, অংশুমালী, অংশুল, অংশুহস্ত, অক্ষ, অক্ষকিতব, অক্ষকুশল, অক্ষকোবিদ, অক্ষক্রীড়া, অক্ষগ্রহ, অক্ষজ, অক্ষণ, অক্ষণিক, অক্ষতত্ত্ব, অক্ষদেবন, অক্ষদ্যূত, অক্ষদেবী, অক্ষধর, অক্ষধুঃ, অক্ষধূর্ত্ত, অক্ষপটল, অক্ষপাটি, অক্ষপাত, অক্ষপাতন, অক্ষপাদ, অক্ষবতী, অক্ষবাট, অক্ষবাপ, অক্ষবিদ, অক্ষবিদ্যা, অক্ষবেত্তা, অক্ষবৃত্ত, অক্ষভার, অক্ষভূমি, অক্ষমদ, অক্ষমালা, অক্ষমালিকা, অক্ষমালী, অক্ষর, অক্ষরচুঞ্চু, অক্ষরচ্ছন্দঃ, অক্ষরজননী, অক্ষরজীবী, অক্ষরতুলিকা, অক্ষরন্যাস, অক্ষরবিন্যাস, অক্ষরব্যক্তি, অক্ষরভূমিকা, অক্ষরমুষ্টিকাকথন, অক্ষরসংস্থান, অক্ষরসমাম্নায়, অক্ষরার্থ, অক্ষরেখা, অক্ষশলাকা, অক্ষসূত্র, অক্ষহৃদয়, অক্ষাংশ, অক্ষাগ্রকীল, অক্ষাবলী, অক্ষি, অক্ষিকম্প, অক্ষিকূট, অক্ষিকোটর, অক্ষিগত, অক্ষিগোচর, অক্ষিগোলক, অক্ষিপক্ষ্ম, অক্ষিপটল, অক্ষিপাক, অক্ষিলোম, অক্ষৌহিণী, অতিযশাঃ, অত্যশন, অধ্যক্ষ, অনক্ষর, অনশন, অনশ্ব, অভীশু, অযশ, অযশঃ, অযশস্কর, অযশস্য, অযশাঃ, অয়শোভী, অশ্, অশকুন, অশন, অশনা, অশনায়া, অশনায়িত, অশনি, অশবার (সওয়ার, সোআর, সোআরি, আরোহী, অশ্বারোহী), অশিত, অশিতা, অশীতি, অশীতিক, অশীতিকাবর, অশীতিপর, অশীতিবর্ষ, অশ্ম, অশ্মক, অশ্মকুট্ট, অশ্মকুট্টক, অশ্মগুড়, অশ্মগুড়ক, অশ্মজ, অশ্মন্ত, অশ্মন্তক, অশ্মপ্লব, অশ্মবর্ষ, অশ্মবৃষ্টি, অশ্মময়, অশ্মরী, অশ্মসার, অশ্মা, অশ্মান্তক, অশ্র, অশ্রি, অশ্রী, অশ্রু, অশ্রুপরিপূর্ণ, অশ্রুপরিপ্লুত, অশ্রুপাত, অশ্রুপূর্ণ, অশ্রুবারি, অশ্রুসলিল, অশ্রুময়, অশ্রুমুখ, অশ্রুলেশ, অশ্রুলোচন, অশ্ব, অশ্বকন্দা, অশ্বকর্ণ, অশ্বকর্ণক, অশ্বকুটী, অশ্বকোবিদ, অশ্বক্রান্ত, অশ্বক্ষুর, অশ্বগন্ধা, অশ্বঘাস, অশ্বচক্র, অশ্বচেষ্টিত, অশ্বডিম্ব, অশ্বতর, অশ্বতরী, অশ্বত্থ, অশ্বত্থামা, অশ্বদ, অশ্বপ, অশ্বপতি, অশ্বপাল, অশ্বপালক, অশ্ববক্ত্র, অশ্ববদন, অশ্ববন্ধ, অশ্ববন্ধক, অশ্ববহ, অশ্ববার, অশ্ববারক, অশ্ববাহ, অশ্ববাহক, অশ্ববাল, অশ্ববিৎ, অশ্ববিদ্, অশ্ববৈদ্য, অশ্বমার, অশ্বমারক, অশ্বমুখ, অশ্বমুখী, অশ্বমেধ, অশ্বমেধিক, অশ্বমেধীয়, অশ্বযুক্, অশ্বযুজ্, অশ্বরক্ষ, অশ্বরক্ষক, অশ্বরত্ন, অশ্বরাজ, অশ্বশক্তি, অশ্বশঙ্কু, অশ্বশাখোট, অশ্বশাল, অশ্বশালা, অশ্বশাস্ত্র, অশ্বশিরঃ, অশ্বসাদ, অশ্বসাদী, অশ্বসারথ্য, অশ্বসূত্র, অশ্বস্থান, অশ্বহন্তা, অশ্বহর্ত্তা, অশ্বহারক, অশ্বহৃদয়, অশ্বাধ্যক্ষ, অশ্বায়ুর্ব্বেদ, অশ্বারূঢ়, অশ্বারোহ, অশ্বারোহন, অশ্বারোহী, অশ্বিনী, অশ্বিনীকুমার, অশ্বিনীপুত্র, অশ্বিনীসুত, অশ্বী, অশ্বীয়, অষাঢ়, অষ্ট, অষ্ট-আঁখি, অষ্টআশী, অষ্টাশী, অষ্টঐশ্বর্য্য, অষ্টক, অষ্টকর্ণ, অষ্টকলাই, অষ্টকালীয়, অষ্টকুলাচল, অষ্টকুষ্ঠি, অষ্টগুণ, অষ্টচণ্ডী, অষ্টচত্বারিংশৎ, অষ্টচল্লিশ, অষ্টতারিণী, অষ্টত্রিংশৎ, অষ্টদল, অষ্টদিক, অষ্টদিকপাল, অষ্টদিগগ্জ, অষ্টদ্রব্য, অষ্টধা, অষ্টধাতু, অষ্টনই, অষ্টনব্বুই, অষ্টনবতি, অষ্টনাগ, অষ্টনায়িকা, অষ্টনিধি, অষ্টপঞ্চাশ, অষ্টপঞ্চাশৎ, অষ্টপদিকা, অষ্টপর, অষ্টপাদ, অষ্টপ্রহর, অষ্টপ্রহরীয়, অষ্টবজ্র, অষ্টবর্গ, অষ্টবসু, অষ্টবিধ, অষ্টভুজা, অষ্টভৈরব, অষ্টম, অষ্টমক, অষ্টমঙ্গল, অষ্টমঙ্গলা, অষ্টমান, অষ্টমিকা, অষ্টমী, অষ্টমূর্ত্তি, অষ্টমূর্ত্তিধর, অষ্টযোগিনী, অষ্টরম্ভা, অষ্টরস, অষ্টলোকপাল, অষ্টলৌহ, অষ্টশত, অষ্টশতক, অষ্টশিব, অষ্টশ্রবণ, অষ্টশ্রবাঃ, অষ্টষষ্টি, অষ্টসপ্ততি, অষ্টসিদ্ধি, অষ্টাঙ্গ, অষ্টাঙ্গধূপ, অষ্টাঙ্গ মৈথুন, অষ্টাঙ্গযোগ, অষ্টাঙ্গহৃদয়, অষ্টাঙ্গার্ঘ্য, অষ্টাদশ, অষ্টাদশধান্য, অষ্টাদশপুরাণ, অষ্টাদশবিদ্যা, অষ্টাদশবিবাদপদ, অষ্টাদশভুজা, অষ্টাদশোপপুরাণ, অষ্টাপদ, অষ্টাপাদ্য, অষ্টাবক্র, অষ্টাবিংশতি, অষ্টার্চ্চা, অষ্টাশীতি, অষ্টাশ্রি, অষ্টাস্রি, অষ্টাষষ্টি, অষ্টাসপ্ততি, অষ্টাহ, অষ্টেপৃষ্ঠে, অষ্টোত্তর, আউশ, আওসা, আঁকশলা, আঁকশলী, আঁকসলি, আঁখ, আঁখর, আঁখরিয়া, আঁখি, আঁখি-আড়, আঁখিঠার, আঁখিমল, আঁশ, আঁশটে, আঁশবঁটি, আঁশা, আঁশান, আঁশাল, আঁশাল, আঁষ, আঁষটে, আঁষল, আকছার, আকসার, আক্ষদ্যূতিক, আক্ষপাটিক, আক্ষপাদ, আক্ষি, আক্ষিক, আখ, আখর, আখরিয়া, আখড়া, আখড়াই, আখি, আঁট, আট, আটই, আটক, আটকড়াইয়া, আটকড়ায়ে, আটকা, আটকিয়া, আটকে, আটকুড়া, আটকুড়ি, আটকৌড়ীয়া, আটকৌড়ে, আটখান, আটখানা, আটঘাট, আটচল্লিশ, আটচাল, আটচালা, আটত্রিশ, আটদিক, আঁটনি, আটপৌরে, আটপিঠে, আটবাহু, আটভাজা, আটশিরা, আটষট্টি, আটাইশ, আটাশ, আটাত্তর, আটানব্বই, আটান্ন, আটাশী, আটাশে, আটেকাটে, আটেপীঠে, আঠার, আশ, আশআর, আশকারা, আ'শধান, আশপর্শি, আশপাশ, আশমান (আশমাঁ), আশমানী, আশা, আশাওল, আশাগজ, আশাচক্রবাল, আশাজনক, আশাজনন, আশাতন্তু, আশাতীত, আশান্বিত, আশাপতি, আশাপাল, আশাপাশ, আশাপিশাচিকা, আশাবন্ধ, আশাবাদী, আশাবান, আশাবাসাঃ, আশাবিভিন্ন, আশাভঙ্গ, আশাভরসা, আশাসোঁটা, আশাহত, আশাহীন, আশিত, আশিতঙ্গবীন, আশী, আশীবিষ, আশু, আশুকারী, আশুগ, আশুগতি, আশুগামী, আশুতোষ, আশুশুক্ষণি, আশেপাশে, আশোয়ার, আশ্চর্য্য, আশ্ব, আশ্বত্থ, আশ্বমেধিক, আশ্বযুজ, আশ্বলায়ন, আশ্বিন, আশ্বিনেয়, আষ্ট, আষ্টেপৃষ্ঠে, এঁকো, এঁখো, একো, এখো, একাক্ষ, নিরাশ, নিরাশা, পিশাচ, প্রত্যাশা, যশ, যশঃ, যশগাথা, যশদ, যশস্কর, যশস্কাম, যশস্য, যশস্যা, যশস্বান (যশস্বৎ), যশস্বিনী, যশস্বী, যশুরে, যশোগান, যশোঘ্ন, যশোদ, যশোদা, যশোদ্বার, যশোধন, যশোধর, যশোধরা, যশোধা, যশোধাম, যশোনিধি, যশোভাগী, যশোভৃৎ, যশোমতি, যশোহর, যশোহা, রশনা, রশনাকলাপ, রশনাগুণ, রশনাপদ, রশা, রশি (রসি, রজ্জু, সৃজ্), রশুন (রসুন, লশুন), রশুনতৈল, রশ্মি, রশ্মিকলাপ, রশ্মিবান্, রশ্মিমণ্ডল, রশ্মিমান্, রশ্মিমালী, রশ্মিমুচ, রাশ, রাশগুচ্ছ, রাশটানা, রাশদই, রাশদড়ি, রাশধান, রাশনাম, রাশপাতলা, রাশভারী, রাশহালকা, রাশি (তিলরাশি, ধনরাশি), রাশিকৃত, রাশিকরণ, রাশিকৃত, রাশিগত, রাশিচক্র, রাশিত্রয়, রাশিনাম, রাশিপ, রাশিপ্রবিভাগ, রাশিব্যবহার, রাশিভাগ, রাশিভৃত, রাশিভোগ, রাশিসন্দেশ, রাশিস্থ, শতাক্ষ, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ষাষ্টাঙ্গ, সমষ্টি, সাক্ষাৎ, সাক্ষাৎকার, সাক্ষী, সাক্ষ্য, সাশ্রু, সুযশাঃ, স্বাক্ষর, হতাশ, হতাশা।

অশ্ = অস্তিত্বের শ্-অন (শয়ন, শক্তিবিচ্ছুরণ)। **অশ** = অস্তিত্বের শক্তি বিচ্ছুরিত থাকে যাহাতে। (ash, ass)। (সূর্যকিরণ যেভাবে

সর্বদিকে বিচ্ছুরিত হয়, এই অশ্ সেইরকম। কিন্তু সেই বিচ্ছুরণ কেবল একদিকে যদি টর্চের আলোর মতো বিচ্ছুরিত হয়, তবে সে অষ্ পদবাচ্য; আর যদি সূর্যকিরণের এক-একটি রেখাকে পৃথকভাবে দেখি, তবে সেই রেখায় যে শক্তি থাকে তা অস্ পদবাচ্য।)

অংশু : ১. ✓অশ্ + উ - ক। (ব.শ.)। ২. *অংশের অত্যন্ত বিকাশসাধন করে যে।* / যাহা ব্যাপ্ত করে। (ব.শ.)। ৩. কিরণ, কর, প্রভা, দীপ্তি, সূত্র, সুতা, সূত্রাদির সূক্ষ্মাংশ, আঁশ, লেশ, অণু, কণ, সূর্য্য, প্রকাশ, বেগ। (ব.শ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. অস্তিত্বের (ধরা যাক সূর্য্যের) সর্বদিক-গামী কিরণরেখাগুলিকে অংশু বলা হয়, পূর্ণের অংশ তাতে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত, বিকশিত। একে অস্তিত্বের রহস্যরূপের (অং-এর) অতি বিকাশ (শু) বলা যেতে পারে। কিন্তু 'ং'-কে বাদ দিয়ে দিলে সূর্য্য বাদ পড়ে যায়, শুধু কিরণরেখাগুলি থেকে যায়। সেক্ষেত্রে সেই সূর্য্যবিহীন শুধুমাত্র কিরণরেখাগুলিকে বলতে হত অশু। অমরকোষ তা সঠিক বলে মনে করেননি। কার্যত কিরণরেখাগুলি সূর্য্যের (পূর্ণের) অংশমাত্র। তাই অশ্ ক্রিয়াটিকে মূল ধরলেও তা দিয়ে নিষ্পন্ন শব্দটিকে অংশু বলাই যুক্তিসঙ্গত মনে করেছেন অমরকোষ। দ্র. **অংশুধর**। ৬. ল্যাটিন uncio (= উন্‌কিয়া বা উনসিয়া = অংশীয়) যার মানে 'এক-দ্বাদশাংশ'।

অংশুক : ১. অংশু + ক (কন্); অথবা, অংশু + > কাশ্ + অ (ড) - ক। (ব.শ.)। ২. *অংশু দ্বারা কৃত যে।* / অংশু দ্বারা নিবৃত্ত; অংশুদ্বারা প্রকাশ পায়। (ব.শ.)। ৩. বস্ত্র, বসন, সূক্ষ্মবস্ত্র, উত্তরীয়, উড়ানি, শুক্লবস্ত্র, পরিধেয় বস্ত্র, পত্র, তেজপাত্, কিরণ, অল্পপ্রভা, মৃদুদ্যুতি। (ব.শ.)। ৪. চীনাংশুক শব্দের মাধ্যমে 'অংশু' কমবেশি প্রচলিত থাকলেও স্বতন্ত্রভাবে অপ্রচলিত। ৫. কিরণরেখার মতো সুতো দিয়ে বা অংশু দিয়ে প্রস্তুত বলে বস্ত্রকে বলা হত অংশুক।

অংশুধর, অংশুপতি, অংশুভর্ত্তা, অংশুমালী : ১. -ধর, -পতি, -ভর্ত্তা, -মালী = ধৃ, পা, ভৃ, লা = ধারণ, পালন, ভরণ, অভিষ্টদান। ২. *যিনি অংশু (কিরণ) সমূহকে ধারণ করেন, যিনি অংশুর (কিরণসমূহের) অধিপতি, যিনি অংশুর (কিরণের) ভর্ত্তা, যাহার অংশুমালা (কিরণমালা) আছে।* ৩. কিরণসমূহের ধারক, কিরণের অধিপতি, সূর্য্য, (সূর্য্যের সংখ্যা অনুসারে) ১২ সংখ্যা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. মাকড়সার জালের কেন্দ্র যেমন, সেইরকম সম্পর্কসমূহের বা সূত্রসমূহের কেন্দ্রীয় নির্দেশক বা Central Command। যৌথ, সরকারি বা রাষ্ট্রীয় সম্পর্কসূত্রসমূহের কেন্দ্রীয় নির্দেশকের আসনটি এইরূপ চরিত্রের। রাজকোষ পরিচালকও এইরকম। রাজনীতি ও অর্থনীতির কেন্দ্রীয় নির্দেশকও হতে পারে। সেই সুবাদে একে সূর্য্যও বলা হয়েছে।

অংশুমান : ১. অংশু + মৎ (মতুপ) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। ২. *অংশনের (দ্র. **অংশন**) অতিবিকাশের শক্তি (আবর্ত্তমান) আছে যাহাতে।* / যাহার অংশু আছে। (ব.শ.)। ৩. কিরণযুক্ত, প্রভান্বিত, সূত্রসূক্ষ্মাংশযুক্ত, আঁশাল। (ব.শ.)। সূর্যবংশীয় সগর রাজার পৌত্র। ইনি কপিল মুনির নিকট থেকে জানতে পারেন, গঙ্গাকে আনতে পারলে সগরপুত্রগণ উদ্ধার লাভ করবেন। তাই গঙ্গাকে আনবার জন্য ইনি তপস্যায় রত হন এবং মারা যান। তাঁর পৌত্র ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেন। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. সূর্য্যের মতো সর্বদিকে কিরণ বা প্রভাব প্রেরণ করতে থাকে যে, সেইরূপ সত্তাকে অংশুমান বলে। সেই সুবাদে (যে পণ্যসমূহ উৎপাদকের কাছ থেকে বেরিয়ে উৎপাদকের সর্বদিকে সূর্য্যকিরণের মতো ছড়িয়ে পড়ে, তেমন) পণ্য উৎপাদকেরাও অংশুমান পদবাচ্য। ভারতের ইতিহাসে এইরকম এক সত্তার (অংশুমান রাজার) কথা আছে। ভারতের ইতিহাস **সূর্যবংশ** ও **চন্দ্রবংশ** — মূলত এই দুটি ধারার মানুষের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। আদিম সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি-রাজনীতি-দর্শনের ধারাটিকে সূর্যবংশ ও আদিম ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি-রাজনীতি-দর্শনের ধারাটিকে চন্দ্রবংশ বলা হত। সগর রাজার আগে হৈহয় **ক্ষত্রিয়**রা **ভার্গব**দের সর্বনাশ করে ছাড়ে, ফলে আদিম সমাজতন্ত্র-বাদীদের পরাজয় ঘটে ও আদিম ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি-রাজনীতির জয়জয়কার হয়। **সগর** রাজার আমলে প্রতিশোধাত্মক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি-রাজনীতির পুনরুত্থান ঘটে, একালের ভাষায় সে ছিল একধরনের 'কাউন্টার রেভলিউশন'। কিন্তু সমাজ ইতিপূর্বেই পণ্যবাহিতার স্বভাবের দ্বারা যথেষ্ট 'ক্লেদাক্ত' হয়ে যাওয়ায় সগরের সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দু'ভাবে কলুষিত হয়। প্রথমত 'ইন্‌কামবেন্সি ফ্যাক্টর' এবং দ্বিতীয়ত সমাজতন্ত্রের পরিচালকদের ভিতরেই অনেকে পণ্যবান হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিগত পণ্যের বাড়বাড়ন্ত হয়। (কিন্তু তখনও বিনিময়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হয়নি, কেউই তার পণ্য বেচতে পারত না প্রকাশ্যে।) স্বভাবতই সগরের শাসনব্যবস্থা বিদ্রোহীদের (সাংখ্যকার **কপিল** মুনির) কোপে পড়ে। একমাত্র উপায় ছিল 'বাজারের পত্তন' বা **গঙ্গা** আনয়ন বা 'market-flow-র' প্রবর্তন করা অর্থাৎ বিনিময়ের মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি-রাজনীতির ভিতরে জাত অংশুমান বা কিরণবান বা পণ্যবান মানুষেরা সেই চেষ্টা চালান, ঠিক যেভাবে একালের চিন বা রাশিয়া বা পশ্চিমবঙ্গের সমাজতন্ত্রবাদীরা বাজার অর্থনীতির প্রচলন ঘটাচ্ছেন, খানিকটা সেইরকম। তবে তাদের সে চেষ্টা সফল হয় অনেক পরে, **ভগীরথের** বা 'উৎপাদনের-উপায় উৎপাদনকারী'দের (সেকালের যন্ত্র উৎপাদনকারী, যে যন্ত্র অন্য কোনো কিছু উৎপাদনের কাজে ব্যবহার হত; যেমন তাঁতযন্ত্র-উৎপাদনকারী; তাদের) একান্ত চেষ্টায়।

অক্ষ : ১. ✓অক্ষ্ + অ - কর্তৃবাচ্যে; ✓অশ্ (দেবন) + স - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *করণের পুনরাবৃত্তি থাকে যাহাতে; যাহা হইতে শক্তিবিচ্ছুরণ ঘটে।* / যাহা ব্যাপ্ত করে; যাহা দ্বারা দেবন হয়; যাহা চক্রের নাভিচ্ছিদ্র ব্যাপ্ত করে; যাহা বিষয় ব্যাপ্ত করে। (ব.শ.)। ৩. পাশক, দ্যূতাঙ্গ, পাষ্টি, পাশা, রথাঙ্গ, চক্রধারণ, ধুরা, ইন্দ্রিয়; পাশকক্রীড়া, দ্যূত, দেবন, দ্যূতভেদ, পাশার ঘুঁটি, রথ, শকট, ঘুরা, চক্র, চাকা, তুলাদণ্ড, আধার, রাশিচক্রাবয়ব, ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণ ব্যবহার, কর্ষ, ষোল মাষা, পরিমাণবিশেষ, রুদ্রাক্ষ, ইন্দ্রাক্ষ, সর্প, বিভীতক, তিনিশবৃক্ষ, নিম্ববৃক্ষ, রন্ধ্র, ছিদ্র, আত্মা, আত্মজ্ঞান, জ্ঞাতার্থ,

জন্মান্ধ, কর্ণনেত্রের মধ্যস্থ শঙ্খের অধোভাগ, শিব, রাবণপুত্র, গরুড়, (ইন্দ্রিয়সংখ্যানুসারে) '৫' সংখ্যা, চক্ষু, তুঁতে, সৌবর্চ্চলবণ, সোরা। (ব.শ.)। ৪. স্বতন্ত্রভাবে অপ্রচলিত। ৫. ক্রিয়া কার্যত একটি (ক্-ষ্-অ), কিন্তু আসলে তা দুটি ক্রিয়ার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে। করণ ও তার পুনরাবৃত্তি। সেই কারণে তার থেকে এত বেশি অর্থের উদ্ভব ঘটছে মিশ্র ক্রিয়াটির বিশেষ চরিত্রের জন্য। ক্রিয়াটি হল, একটি অস্তিত্বের ভিতরে আত্ম-মন্থন বা ঘুরে চলা, করণের পুনরাবৃত্তি, আর তার ফলে অস্তিত্বের বাইরে বেরিয়ে আসছে সেই ঘূর্ণনের ফল; তার শক্তিবিচ্ছুরণ। নানা দিক থেকে এই ঘটনাকে দেখে নানাভাবে তার নামকরণ করা হচ্ছে বলেই শব্দটি এত বিচিত্র ক্রিয়াকারীদের শনাক্ত করছে, রেফার করছে। আর, যাদের শনাক্ত করছে, সেই সত্তাগুলি কোনো না কোনো ভাবে সেই ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। ক্রিয়াটিকে যদি মানুষের আত্ম-মন্থন ভাবেন, তবে সেই মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি বর্হিজগতের দিকে বিস্তারিত; ক্রিয়াটিকে যদি সমাজের আত্ম-মন্থন ভাবেন, তবে ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণ ব্যবহার ফলরূপে বিস্তারিত। কেবল তাই নয়, একে একটি চাকার ঘুরে চলা থেকে পৃথিবীর ঘুরে চলা, বিশ্বজগতের ঘুরে চলা, এমনকি 'চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ'-ও ভাবতে পারেন। এই কারণে শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। দ্র. **অক্ষক্রীড়া**। ৬. গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, লিথুয়ানিয়ান, ইংরেজি ভাষায় যথাক্রমে Axon, axis, ahsa/achse, assis, Axel/axis। (ব.শ.)। ইংরেজি access শব্দটিও অক্ষের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি।

অক্ষক্রীড়া : ১. অক্ষ + ক্রীড়া। ২. *'যাহা ব্যাপ্ত করে' এমন ক্রীড়া; 'যাহা বিষয় ব্যাপ্ত করে' এমন ক্রীড়া; 'যাহা দ্বারা দেবন হয়' এমন ক্রীড়া; 'ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণ ব্যবহার'-রূপ ক্রীড়া।* ৩. পাশা খেলা। ভারতে নিষিদ্ধ খেলা। মনুসংহিতা অনুসারে রাজা নিজ রাজ্য হতে দ্যূত ও সমাহ্বয় ক্রীড়া নিবারণ করবেন। এই দুই খেলা রাজ্যনাশের কারণ। ব্রহ্মপুরাণ মতে মহাদেব এই খেলার সৃষ্টি করেন। (পৌ.অ.)। ৪. পাশা খেলা। ৫. অক্ষন্ > auction। দেব, দেবতা, দিবস, দ্যূত, দেবন প্রভৃতি শব্দের মূলে রয়েছে 'দিব্' ক্রিয়া। এর অর্থ 'দান করিবার ইচ্ছা বহন করা'। প্রাচীন ভারতে বিক্রয়কে প্রায়শই 'দান' শব্দের দ্বারা উল্লেখ করা হত। আদিতম সমাজব্যবস্থা (বা সনাতন ব্যবস্থা) অর্থাৎ আদিম সাম্যবাদী ব্যবস্থায় শক্ত সমর্থ মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল অসমর্থদের দান করা। তখন দানের কোনোরকম প্রতিদান ছিল না, এমনকি সেরকম ধারণাও ছিল না। দানকারীদের তখন **দেবতা** (দেবো দেবো বলে যে) ও **অসুর** (অসু বা প্রাণ রক্ষা করে যে, স্মর্তব্য গতাসু = বিগতপ্রাণ) দুটি শব্দ দিয়েই বোঝানো হত। একসময় সেই সনাতন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার (বা বৈদিক ব্যবস্থার) পত্তন হয়। কিন্তু তার পরেও প্রতিদানহীন দানের সেই অভ্যাস বেশ কিছুকাল চলতে থাকে। পরে পরে দানের প্রতিদানে পরিবর্তের প্রচলন হয় একটু একটু করে। ক্রমে 'আনঅফিসিয়ালি' বিনিময়ের সূত্রপাত হয়ে যায় আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা বৈদিক ব্যবস্থার ভিতরেই।

অতঃপর একসময় 'পণ' দেওয়া নেওয়া করে পণ্যবাহী সমাজের সূত্রপাত হয়ে যায় ভালোভাবেই। সেকালের **'আপণ'**গুলিতে বা আদি দোকানগুলিতে 'এই বস্তু দিলে আমি এই বস্তু দিব এইরূপ পণ করা হত' বা **'সত্যঙ্কার'** করা হত। প্রকৃতপক্ষে এ হল — দিলাম-নিলাম, দাও দাও-লও লও, সম আহ্বান বা **সমাহ্বয়** বা **দ্যূতক্রীড়া**; অর্থাৎ এপাশ থেকে ওপাশে কিংবা ওপাশ থেকে এপাশে pass on করার **পাশা** খেলা। তাই এর অর্থ 'জিগীষা, ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয়, ইচ্ছা, গতি, স্তুতি' ইত্যাদি। কেনাবেচায় কেউ জেতে কেউ হারে, তাই এর অন্যান্য অর্থের ভিতর 'দীপ্তি, হর্ষ, পীড়ন' প্রভৃতি শব্দও রয়েছে। এ একধরনের যুদ্ধ অথচ যুদ্ধ নয়, কেনাবেচার এই খেলাকে তাই **মল্লযুদ্ধ**ও বলা হত, যার অর্থ 'মাল কাড়াকাড়ির যুদ্ধ', বা 'মল্লরা বা **মাল্যবানেরা** (বা পণ্যবানেরা) যে যুদ্ধ করত', একালের ভাষায় যাকে বলে market competition। একে 'দেবন' করাও বলা হত এবং যারা তা করত বা করার পরিকল্পনা করত, তাদের দেবতা বলা হত। ভারতে তেত্রিশ কোটি মানুষই ব্যক্তিমালিক হয়ে লেনদেন শুরু করলে, ভারত 'তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ' হয়ে যায়। একালের বিশ্বপরিচালকগণের তথাকথিত 'বিশ্বায়ন' তো সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকেই দেবতা বানানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে — হয় মল্লযোদ্ধা হও, নয় জাহান্নমে যাও!

মোট কথা 'দিব্' ক্রিয়া যুক্ত সমস্ত শব্দই ধনতন্ত্রের প্যারাডাইমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সে কারণেই লক্ষ্মীপূর্ণিমাকে (সম্পত্তিবান জনসাধারণের পূর্ণিমাকে) দ্যূতপৌর্ণমাসী বলে। এ-রাত্রে পাশা খেলা পালনীয় আচার। **বেণ** প্রজাপতির আমলে ভারতে সর্বপ্রথম 'বিনিময়ের মর্যাদা' ('অধর্মের মর্য্যাদা') প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয়েছিল এবং তা কঠোর ভাবে দমন করে ব্যবসাকে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় ঘোষণা করা হয়েছিল। পরে অবশ্য তা নানারকমের আবরণের আড়ালে চলতে শুরু করে। গঙ্গা আনয়নের পরে তা 'অফিসিয়াল' চরিত্র পেয়ে সম্পূর্ণ রূপে এবং প্রকাশ্যে প্রচলিত হয়ে যায়। বৌদ্ধ যুগের শ্রেষ্ঠ সময়ে অক্ষক্রীড়ার বা ব্যবসায়ের সর্বোচ্চ বাড়বাড়ন্ত হয়। সেই কারণে মানী বৌদ্ধদের অর্হৎ বলা হত। (দ্র. **অর্ঘ, অর্ঘ্য, অর্হৎ**)। কিন্তু হিন্দু যুগের সূত্রপাতের কালে (৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পর) পুনরায় ব্যবসায়ের মর্যাদা নাশ করা হয়, যদিও অতঃপর বিনিময়কে আর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও বিলুপ্ত করা যায়নি। তাই ভারতবর্ষে অক্ষক্রীড়া নিন্দিত হয়েও প্রচলিত থেকে যায়। মোগল যখন ভারতে আসে তখন সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন সম্মানীয় কোনো ভারতবাসী ব্যবসা করতেন না, করত নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা, অপাঙ্‌ক্তেয়রা। ইসলাম ধর্মে যেহেতু সুদ নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু ব্যবসা নিষিদ্ধ ছিল না, তাই মোগলযুগের তিনশো বছর ধরে ব্যবসার মর্যাদা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও হিন্দুসমাজে তা তখনও নিন্দনীয় ছিল। ইংরেজ এসে ব্যবসার মর্যাদা পুনরায় সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। বর্তমানে সারা পৃথিবীই অক্ষক্রীড়ায় প্রমত্ত হয়ে আত্মবিলোপের পথে এগিয়ে চলেছে। ৬. অক্ষন্ > auction।

অক্ষপাদ : ১. অক্ষ + পাদ। ২. *নির্ভরতার সত্তা চোখ যাহার। /* যাহার অক্ষ পাদে (পায়ে)। (ব.শ.)। ৩. যিনি পাদদ্বারা নেত্রকার্য করিয়াছিলেন; ন্যায়সূত্রকার গৌতমমুনি। ন্যায়শাস্ত্রের নিন্দায় কুপিত

হইয়া গৌতম ব্যাসের মুখদর্শন করেন নাই। পরে ব্যাসের অনুনয়ে প্রসন্ন হইয়া, প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে যোগবলে পাদদেশে চক্ষু প্রকাশ করিয়া তাঁহার মুখদর্শন করেন। তদবধি গৌতম 'অক্ষপাদ' নামে খ্যাত। ... তার্কিক, নৈয়ায়িক। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পা দিয়ে অনায়াসে দেখা যায়, কাজও চালানো যায়, যদি পা বলতে কর্মচারীদের বোঝায়, যাদের উপর নির্ভর করে সামাজিক সংগঠনটি চলে। কত বিগ বস্ তো দেখাই করেন না, করেন তাঁদের অধঃস্তন কর্মচারীরা। তাতে কি কাজ চালানো যায় না! তাছাড়া পুরাণাদিতে পা বলতে সাধারণত নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদেরই তো বলা হয়েছে। ব্রহ্মার পা থেকেই তো শূদ্রের জন্ম। সমাজদেহের পা তো শূদ্রই! উপরোক্ত গৌতমের কাহিনী থেকে বোঝা যায়, কোনো এক সময় ন্যায়বাদী বা মৌলবাদী গৌতমেরা অধস্তনদের মাধ্যমে ব্যাসদের সঙ্গে কথাবার্তা সারতেন, সরাসরি কথাবার্তা বলতেন না।

অক্ষবাট : ১. অক্ষ + বাট। ২. *অক্ষের বাট (বাটিকা, বাড়ি) যে; যেখানে অক্ষক্রীড়া করা হয়।* ৩. পাশাখেলার স্থান, দ্যুতস্থান, অক্ষফলক, পাশার ছক, কুস্তির আখড়া, মল্লভূমি, নিযুদ্ধভূ। ৪. অপ্র.। ৫. নিযুদ্ধভূ শব্দের অর্থ, যে ভূমিতে যুদ্ধ হয় অথচ হয় না। (দ্র. **অরণ্য**, যেখানে রণ হয় অথচ হয় না। দ্র. **'অযোধ্যা'** — 'অবিদ্যমান যুদ্ধ' যেখানে) উপরে বর্ণিত খেলাগুলিতেও যুদ্ধ হয় অথচ হয় না, মার্কেট কমপিটিশনেও যুদ্ধ হয় অথচ হয় না। যে স্থানে 'অবিদ্যমান যুদ্ধ' চলে সেটি আসলে বাজার। marketing sphere। একালে অক্ষবাটের বিপুল বিকাশ ঘটেছে। লোকাল সুপারমার্কেট থেকে শুরু করে মুম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ হয়ে তা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার অবধি প্রসারিত। একালের সর্বোচ্চ অক্ষবাটের নাম ডব্লু টি ও (World Trade Organisation)। এগুলিতে একালের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়েরা অক্ষক্রীড়া করে থাকেন। তবে, বাস্তবে সেগুলিকে এখন 'অক্ষবাট' বলা হয় না, বলা হয় 'আখড়া'। কারণ, 'অক্ষবাট' শব্দটি কালের স্রোত বেয়ে এখন 'আখড়া'য় পরিণত হয়েছে। দ্র. **আখড়া**।

অক্ষর : ১. ✓অশ্ + সর - ক; ন-ক্ষর। (ব.শ.)। ২. *অশ্ (জ্ঞানসার = ash) সরে সরে যায় যার দ্বারা; ক্ষরণ নেই যাহার; /* যাহা বেদাদি ব্যাপ্ত করে; যাহা ক্ষরিত বা নষ্ট হয় না। (ব.শ.)। ৩. অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণ, স্বরবর্ণ, স্বর বা স্বরসহিতব্যঞ্জন, বর্ণনির্ম্মাণ, সীসার বর্ণপ্রতিরূপ, টাইপ; স্থির, ধ্রুব, ক্রিয়াশূন্য, কূটস্থ, নিত্য আত্মা, জীব, পরমাত্মা, শিব, বিষ্ণু, অসি, পরমব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, মূল কারণ, প্রণব, তপস্যা, ধর্ম্ম, মোক্ষ, অধ্বর, যজ্ঞ, গগন, আকাশ, অপামার্গ, আপাঙ্গাছ, বেদ, নিত্যতা, অনশ্বরতা, কালপরিমাণভেদ, কাষ্ঠার পঞ্চমাংশ। (ব.শ.)। ৪. letter বা 'বর্ণ' অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দটি দুভাবে তৈরি — **অক্ষ-র** = অক্ষ রহে যাহাতে; এবং **অ-ক্ষর** = ক্ষরণ নেই যার। তাই তার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থও দুই প্রকার। আর সেই কারণে তা দুরকম সত্তাদের শনাক্ত করে থাকে। এখানে প্রথম দলে রয়েছে সেই অক্ষর সমূহ, যারা মানুষের জ্ঞানকে বহন করে নিয়ে চলে, বেদাদি ব্যাপ্ত করে। আর দ্বিতীয় দলে রয়েছে সেই অক্ষরসমূহ, যাদের ক্ষয় নেই, ক্ষরণ নেই, যারা নিত্য ও অনশ্বর। ক্ষরণহীন **আত্মা, শিব, বিষ্ণু** প্রমুখ অক্ষরের মর্যাদা নিয়ে কোনো ব.শ. সেকারণেই শব্দটির ভুক্তি ঘটিয়েছেন দু'বার। প্রথম বার **অ-ক্ষর** রূপে এবং দ্বিতীয় বার **অক্ষ-র** রূপে।

তা সে যাই হোক, আজকের পৃথিবীর অন্য ভাষায় যাই হোক, সংস্কৃত ও বাংলাভাষায় অক্ষর জড় চিহ্নমাত্র নয়। **যাস্ক** রচিত নিরুক্তের নির্দেশের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে — 'শব্দের অর্থসাধন করা নিরুক্তের কার্য্য। যদি দেখা যায় ব্যাকরণানুমত প্রণালী অবলম্বন করিয়া কোনও শব্দবিশেষের অর্থ সাধন করা যায় না, তাহা হইলে সম্প্রসারণরূপ প্রণালী অবলম্বন করিবে; অর্থাৎ দেখিতে হইবে ... ... সম্প্রসারণযোগ্য বর্ণের সম্প্রসারণ করিয়া অর্থ নিষ্পত্তি করা যায় কি না। ... যদি ইহাতেও অর্থসাধন অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বর্ণসামান্যের ও অক্ষরসামান্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।' (নিরুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯১)। অর্থাৎ সংস্কৃত ও বাংলাভাষায় অক্ষর অর্থধারণ করে, মনোভাবকে ব্যাপ্ত করে। তার ভেতরে অর্থ রয়েছে, সেই অর্থ সে ব্যাপ্ত করে। চালক, কারক ... প্রভৃতি শব্দে অন্ত্য-'ক' মানে 'করে যে'। এই 'ক' অর্থহীন বর্ণমাত্র নয়। সে বেদ বা জ্ঞান ব্যক্ত করার যোগ্যতা ধরে। তাই সে **অক্ষর**।

অক্ষরমুষ্টিকাকথন : ১. অক্ষর + মুষ্টিকা + কথন। ২. অক্ষরসূচক মুষ্টিকাদ্বারা অর্থাৎ অঙ্গুলির ও করপত্রের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানদ্বারা বর্ণপ্রকাশপূর্ব্বক কথা বলা (finger speech) যাহাতে। (ব.শ.)। ৩. ইহা চতুঃষষ্টি কলার একতম। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. শব্দ উচ্চারণ না করে আঙুলের সাহায্যে কথাবার্তা চালানোর এই কোড বৈদিকগণ আবিষ্কার করেছিলেন এবং ব্যবহার করতেন। এর বিপরীতে তান্ত্রিকগণ যে কোড ব্যবহার করতেন, তার নাম **'ম্লেচ্ছিতবিকল্প'**। দ্র. **চতুষষ্টিকলা**, বাৎস্যায়নের কামসূত্র।

অক্ষি : ১. ✓অশ্ + সি (ক্সি) - ক; ✓অক্ষ্ + ই। (ব.শ.)। ২. *(দ্রষ্টাকে) ব্যাপ্ত করে যে; (অক্ষিমানকে বিষয় পর্যন্ত) নিয়ে যায় যে। /* যাহা (বিষয়) ব্যাপ্ত করে। (ব.শ.)। ৩. নয়ন, নেত্র, চক্ষুঃ; সমাসে 'অক্ষি'-শব্দস্থানে 'অক্ষ' হয়, যথা প্রত্যক্ষ, সমক্ষ, বিশালাক্ষ ইত্যাদি। ... চক্ষুর্গোলক, বাঁশের চোখ, একো, ইন্দ্রিয়মাত্র। (ব.শ.)। ৪. চোখ অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. মানুষের ও তার সমাজের দর্শনেন্দ্রিয়টির যত কাজ, তত নাম। সেই নিয়মে একে অক্ষি, **চক্ষু, নেত্র, নয়ন, লোচন** ইত্যাদি বলে। যখন অনেক দূরের কোনো জিনিসকে দেখার জন্য দর্শনেন্দ্রিয়টি চলে যায়, তখন তাকে অক্ষি বলে; যখন সেই জিনিসের কাছে গিয়ে তাকে চাখে, চেখে দেখে, তখন দর্শনেন্দ্রিয়টিকে বলে চক্ষু বা চোখ; যখন তাকে মানসলোকে নিয়ে আসে, তখন তার নাম নয়ন; এইভাবে যে কোনো দূরের বস্তুকে মনের কাছে নিয়ে আসার সমস্যা থেকে সে আমাদের ত্রাণ করে, তখন তার নাম নেত্র; আর যখন আলোচনার সুবিধার জন্য মানসলোকে অবস্থানকারী এক বা একাধিক বস্তুকে চয়ন করে সে আনে, তখন তাকে বলে লোচন।

পুরাণাদিতে বহু স্থানে অর্থনীতি বোঝাতে চক্ষুঃ বা অক্ষি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কার্যত মানুষের যে ইন্দ্রিয় (ইন্দ্রের বা 'আমি'র

যে অনুচরটি) সবার আগে এগিয়ে চলে গিয়ে দ্রষ্টব্য বস্তুকে চোখে দেখে, চেখে দেখে, সেই হল তার 'চক্ষু' বা চোখ। সমাজদেহের চোখ হল তার অর্থনীতি বিষয়ক চেতনা। চোখই প্রথম বস্তুকে ব্যক্তির নিকট আনয়ন করে, তাই তার নাম 'নয়ন'। তবে কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে ব্যক্তির নিকট আনয়নের সমস্যা থাকে। সমাজদেহের নেত্র বা নেতাগণ মানুষকে সেই আনয়নের সমস্যা থেকে ত্রাণ করতে পারেন বলেই নেত্র বা নেতা পদবাচ্য। অত্রি শব্দটির সঙ্গেও চোখের সম্বন্ধ আছে। **চন্দ্র** বা চাঁদিকেও (টাকা) 'অত্রিজ' বলা হয়। ইত্যাদি। ৬. আবেস্তা, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, লিথুয়ানিয়ান, টিউটনিক, রাশিয়ান-স্লাভোনিয়ান, ও অ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষায় শব্দটি যথাক্রমে Ashi; Osse, okos, okkos; Oculus; Auge; aki-s; Augo; oko; aegh। (ব.শ.)।

অশন : ১. ✓অশ্ + অন (ল্যুট্) - ক; ✓অশ্ + অন - ভাববাচ্যে; - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অশ্ (আশার মূল) অন্ (চলমান) যাহাতে*। ৩. দূরব্যাপী, পীতসালবৃক্ষ; ভোজন, আহার; আস্বাদন, উপভোগ; ব্যাপ্তি; ভোজ্য, খাদ্য, অন্নাদি; ... অশিত = ভক্ষিত, খাদিত; অশিতা, অশিতৃ = ভোক্তা। (ব.শ.)। ৪. eating অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. মানুষের অশ্ বা 'অস্তিত্বের শ-অন (শক্তিবিচ্ছুরণ)' মানুষের ইচ্ছাকে ব্যাপ্ত করে, বহন ক'রে দূরে নিয়ে যায়। যতদূর নিয়ে যায়, ততদূর পর্যন্ত তার 'অশ্' ব্যাপ্ত হয়। এই যে অশ্ অন (on) হতে থাকা বা অশন করা, এ যখন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়াদিকে (অশ্-বাহী 'অক্ষি'কে বা 'চোখ'কে) ব্যাপ্ত করে, তখন পর্যন্ত সর্বাধিক যা ঘটে তা হল, দ্রষ্টব্যকে 'চেখে' দেখা। কিন্তু অশ্ যখন ইন্দ্রিয়ধর-মানুষটিকেই ব্যাপ্ত করে, তখন দ্রষ্টব্য ঢুকে যায় মানুষটির গ্রাসে। তখন অশন মানে হয়ে যায় ভক্ষণ, অশিত হয়ে যায় ভক্ষিত। কিন্তু পীতসালবৃক্ষকে কেন অশন বলে, তা আমরা এখনও জানি না। যাঁরা পীতসালবৃক্ষের স্বভাব বিস্তারিত জানেন, তারা হয়তো বলতে পারবেন অশন ক্রিয়াটি বৃক্ষটিতে কীভাবে রয়েছে। ৬. ইংরেজি assert, assault।

অশ্ব : ১. ✓অশ্ + ব (ক্বন্) - ক। (ব.শ.)। ২. *অশ্ (ব্যাপ্তকরণ শক্তি) বহন করে যে। / যে পথ ব্যাপ্ত করে*। (ব.শ.)। ৩. ঘোটক। ইহার সপ্ত উৎপত্তিস্থান — অমৃত বাষ্প বহ্নি বেদ অণ্ড গর্ভ এবং সাম। দ্র. '**আশ্বির**'। সূর্য্যের সপ্তাশ্বানুসারে বা অশ্বের জন্মস্থান অনুসারে সাত (৭) সংখ্যা। চারিজাতি পুরুষের চতুর্থ জাতি। চতুরঙ্গ ক্রীড়ার উপকরণ বিশেষ। অশ্বারূঢ় ধনু রাশি। (ব.শ.)। ৪. horse বা 'ঘোড়া' অর্থে প্রচলিত। ৫. অশ্ বহন করে যে, সেই হল অশ্ব। এই অশ্ হল 'অস্তিত্বের শক্তিবিচ্ছুরণ' বা ব্যাপ্তকরণশক্তি। কারণ অশ্ হল ash বা ছাই, জগতের ছাই, যে ছাই মাখেন **শিব**। এ ছাই হল সর্বজ্ঞানকর্মফলের সার। অশ্বেরা এটি মাখে না, বহন করে, তাই তাদের 'অশ্ব' বলা হয়। সর্ব প্রকারের 'ঘট' বা ঘটনা ঘটাতে পারে বলে এরাই 'ঘোটক' পদবাচ্য। সেই সুবাদে সমাজসংগঠনের স্পেশালিস্টরা প্রত্যেকেই সমাজবনের অশ্ব। স্বভাব-সাদৃশ্যের কারণে জীবজগতের horse-কেও অশ্ব বলা হয়। তার মানে, একালের ভাষায় যাদের এক্সিকিউটিভ বলে, তাদের আদি পুরুষদেরই প্রকৃতপক্ষে অশ্ব বলা হত। এঁরা যে **জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার**, প্রযুক্তিকৌশলাদি **বহন করেন**, সেই যোগ্যতার বিচারে এঁদের নাম অশ্ব। আর, এরা কেন্দ্রীয় পরিচালকের / মালিকের জন্য যে আম বহন করে এনে দেয়, তার জন্য এদের '**আমলা**'ও বলা হয়, তবে এরা হস্তী-আমলা নয়। এরা নিজেদের গৌরব হারিয়ে হুকুমের চাকরে বা 'বাহক নর'-এ পরিণত হলে, এদের নাম '**বানর**' হয়ে যায়। অশ্বেরা যে সাতটি উৎস থেকে জন্মায়, তার বিস্তারিত বিবরণ দেখুন। এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবাঃ। অশ্ বা ছাই বহনের এই উত্তরাধিকার অর্থাৎ 'ছাই ও ঘোড়া'র এই উত্তরাধিকার ইউরোপেরও রয়েছে। দ্র. Ash Wednesday, Ash-Tree. Yggdrasil = the ash-tree binding together heaven, earth, and hell, and extending its branches over the whole world and above the heavens. Yggr, a surname of Odin, and drasil, horse. (Chambers English Dictionary)। দ্র. **অশ্বত্থ**। (খ) গ্রন্থের 'ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত ও প্রকল্পিত আর্য-আগমন তত্ত্ব' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। ৬. আবেস্তা, গ্রীক, ল্যাটিন, টিউটনিক, লিথুয়ানিয়ান, ফরাসী, আইসল্যান্ডীয়, ও ইংরেজি ভাষায় শব্দটি যথাক্রমে aspa, Hippos, Equus, Ehu, Aszva, rosse, horss, horse। ফারসি 'অস্প্'। (ব.শ.)। আমাদের মতে ইংরেজি ass, ash, আবেস্তান aspa, লিথুনিয়ান aszva শব্দটি 'অশ্ব' শব্দের ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি। আরও কহতব্য এই যে, 'হ্রেষা' শব্দের ইংরেজি জ্ঞাতিই horse এবং সংস্কৃত 'ঈক্ষ' (যদর্থ 'যে দেখবার জন্য দ্রুতগতিতে যায়') শব্দের জ্ঞাতি ল্যাটিনের equus, ফারসির 'য়ক্কার', হিন্দির 'এক্কা' (এক্কাগাড়ি)।

অশ্বচালনা : ১. অশ্ব + চালনা। ২. *অশ্বকে বা অশ্বদিগকে পরিচালনা করা*। ৩. ঘোড়সওয়ারি। ৪. ঘোড়সওয়ারি। ৫. আমলাদের পরিচালনার বিদ্যাও অশ্বচালনা বিদ্যা। নল রাজা এই বিদ্যা ভালোই জানতেন, কিন্তু অক্ষক্রীড়া ভালো জানতেন না। **অক্ষক্রীড়া** হল একালের ভাষায় 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট'। সর্বস্ব হারিয়ে অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের কাছে গিয়ে তিনি **ঋতুপর্ণ**কে অশ্বচালনা শেখান এবং পরিবর্তে ঋতুপর্ণের নিকট থেকে অক্ষক্রীড়া শেখেন। ... তারপর হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

অশ্বত্থ : ১. অশ্ব + ✓স্থা + অ (ক) - ক। ২. *অশ্ব থাকে যাহাতে। / 'যাহা শ্বথ (অল্পকালস্থায়ী) নহে।'* (ব.শ.)। ৩. বৃক্ষবিশেষ, পিপ্পল, সংসারবৃক্ষ, অশ্বিনীনক্ষত্রযুক্ত কাল, অশ্বিনীনক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী, অশ্বত্থফল, অশ্বত্থফলের সময়, গর্দ্দভাণ্ডবৃক্ষ, নন্দীবৃক্ষ। (ব.শ.)। ৪. The holy fig tree বা 'আশুথ' গাছ অর্থে প্রচলিত। ৫. আদিম সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে অশ্বত্থ ও আদিম ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে বটবৃক্ষ বলাই সেকালের সমাজতত্ত্ব ব্যাখ্যার টারমিনোলজির অঙ্গ ছিল। এই ব্যবস্থার শাখায় শাখায় স্পেশালিষ্টরা থাকেন। তাই অশ্বত্থের বিষয়ে বলতে গিয়ে 'অশ্বাস্তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্' বলতে (অর্থাৎ 'অশ্বেরা এই গাছে থাকে' বলতে) অমরকোষের জিভে আটকায়নি। এই অশ্বত্থবৃক্ষকেই **অর্কবৃক্ষ, আদিত্য, সূর্য্য, সংসারবৃক্ষ** ... ইত্যাদিও বলা হত। অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় ঘোড়া

রাখা, তার শাখায় সুতা বাঁধা — এসব এখনও একটু-আধটু প্রচলিত আছে। এ হল আমলাতন্ত্রের কাছে গিয়ে দরখাস্ত দিয়ে আসার কোড। কেবল তাই নয়, ব্যবস্থা দুটির স্বভাবের সঙ্গে বৃক্ষ দুটির সমান্তরাল মিলও দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে অশ্বত্থ ও বট-এর বদলে, **ব্রহ্মপুত্র** ও **সিন্ধু**, **হিমালয় পর্ব্বত** ও **বিন্ধ্যপর্ব্বত** ইত্যাদি বলারও চল হয়। এর কারণ সম্ভবত এই যে, ব্যবস্থা দুটি ততদিনে যথেষ্ট বিকশিত হয়ে বিশাল দেহ ধারণ করে। তখন সেগুলিকে কেবল 'শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত' বললেই চলছিল না, 'পর্ব্বে পর্ব্বে বিন্যস্ত' বলারও দরকার ছিল। এই ব্যবস্থা ছিল আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্তরসূরী। এতে যৌথ শাসন ছিল। সতীনাথ ভাদুড়ীর *ঢোঁড়াই চরিতমানস* গ্রন্থে রয়েছে, 'তাৎমাটুলির বড় রাস্তার ধারে আছে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ। তার নিচে একটি উঁচু মাটির ঢিবি বেশ করে সিঁদুর মাখানো। ইনি হচ্ছেন তাৎমাদের "গোঁসাই"। (তাৎমারা সূর্যদেবকেও "গোঁসাই" বলে; আবার ঐ অশখতলায় সিঁদুর মাখানো যিনি আছেন, তাঁকেও গোঁসাই বলে।)' ... "পীপর" (অশ্বত্থ) গাছের আওতায় মানুষ হয়ে, ছেলেটা কী করে "পঞ্চ"-এর কথার খেলাপ যেতে পারল।' অর্থাৎ অশ্বত্থের উত্তরাধিকার বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় ১৯৫০ সালেও ছিল। — দ্র. **অশ্ব**, **অর্কবৃক্ষ**, **আদিত্য**, **গজাশন**, **বিধাতা**। ৬. Ash Tree। দ্র. **অশ্ব**।

অশ্বত্থামা : ১. অশ্ব, স্থা = স্থিতি। ২. অশ্বের ন্যায় স্থাম (শৌর্য্যাদি) যাহার। (ব.শ.)। ৩. কৃপীগর্ভজাত দ্রোণপুত্র। ইনি জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় রব করিয়াছিলেন এবং ইঁহার বল দিগ্বিদিক ব্যাপ্ত করিয়াছিল, এই হেতু ইঁহার নাম 'অশ্বত্থামা'। ইনি কুরুপক্ষীয় যোদ্ধা ছিলেন। ইঁহার প্রধান কার্য্য — অভিমন্যুবধ, রাত্রিতে সুপ্ত পাণ্ডবশিবিরে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নাদির বিনাশ, ব্যাসাশ্রমে পাণ্ডববধার্থ ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্রত্যাগ, সেই অস্ত্রে পাণ্ডবের পরিবর্তে উত্তরার গর্ভনাশ এবং স্বীয় শিরোমণি প্রদানপূর্ব্বক পাণ্ডবের নিকটে প্রাণপ্রতিদান। ইনি চিরজীবী ও মহারথী। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সমাজের ঠিক কোন সত্তাকে সেকালে 'অশ্বত্থামা' বলা হত, তা এখনও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল, সত্তাটি বুঝিবা 'টেকনোক্র্যাট'দের বোঝায়। পরে বুঝি, তা ঠিক নয়। সম্ভবত এটি সেকালের সরকারী আমলা-শিক্ষণব্যবস্থায় (একালের দেরাদুনের আই-এ-এস ট্রেনিং ব্যবস্থার মতো শিক্ষাব্যবস্থায়) শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের বোঝাত। এই অশ্বত্থামাকে চিরজীবী বলা হয়। অর্থাৎ সত্তাটি এখনও জীবিত। একালের 'আই এ এস পাশ-করা সেরা ছাত্রদের' আদিপুরুষদের যদি অশ্বত্থামা বলে মনে করা হয়, মানতেই হবে, সত্তাটি এখনও জীবিত বটে।

অশ্বমেধ : ১. অশ্ব + মেধ। ২. *যে (কর্ম্ম) যজ্ঞে (সমাজবনের) অশ্বদের মেধা নিঃশেষে বিনিয়োগ করা হয়। /* যে যজ্ঞে অশ্বহিংসা আছে। (ব.শ.)। ৩. ক) এই যজ্ঞে বিশেষলক্ষণসম্পন্ন অশ্বের কপালে জয়পত্র বাঁধিয়া অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া, রক্ষার্থ সসৈন্য রক্ষক নিযুক্ত করিতে হয়। রক্ষক সসৈন্যে অবাধগতি অশ্বের অনুসরণ করেন এবং প্রতিকূল রাজা অশ্ব বদ্ধ করিলে, তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অশ্বের উদ্ধার করেন। এইরূপ সংবৎসর পর্য্যটন করিলে অশ্ব নিহত করিয়া যথাবিধি যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিতে হয়। খ) ব্রহ্মহত্যাপাপক্ষয় স্বর্গ ও মোক্ষ ইহার ফল। ইহা সার্ব্বভৌমের অনুষ্ঠেয়। বৈদিক যুগে অপত্যকাম রাজাগণ ইঁহার অনুষ্ঠান করিতেন। গ) শত অশ্বমেধের ফল ইন্দ্রত্বলাভ। এই হেতু ইন্দ্র, দিলীপ ও সগররাজের শততম অশ্বমেধের অশ্ব হরণ করিয়াছিলেন। (ব.শ.)। ... শত অশ্বমেধকারী রাজা ইন্দ্রত্বলাভ করতেন। সেই জন্যে ইন্দ্রের এক নাম শতক্রতু। রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির দুই জনেই অশ্বমেধযজ্ঞ করেছিলেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ঘোড়া ছেড়ে এরকম হত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও থাকতে পারে। তবে, ঘোড়া ছেড়ে বা না-ছেড়েও এটা করা হয়, করা হত। কার্যত এটি হল — একটি বা কয়েকটি নীতির একটি প্যাকেজ ঘোষণা করে একবছর তা ট্রায়ালে রাখা হত। যাঁদের মাধ্যমে এই ট্রায়াল চলত, তারা তো অশ্-বহনকারী অশ্বই, আর যারা এর বিরোধিতা করত তারাও কিন্তু অশ্ব; বিপরীত-নীতি-বহনকারী অশ্ব। যাই হোক, সেই ট্রায়ালে রাখা নীতি কেউ অমান্য করলে, তাকে প্রমাণ করতে হত, তার নীতিটি ঠিক। অন্যথায় একবছর পরে ঐ ট্রায়াল-নীতিটি স্বীকৃত নীতি রূপে প্রচলিত হয়ে যেত। এতে অশ্-বহনকারীদের ভিতরে চলত অত্যন্ত উথালপাথাল, তাই অশ্বমেধ যজ্ঞ। একালেও তাই করা হয়ে থাকে, তবে এখন ভাষা ও আচারাদি বদলে গেছে বলে তাকে আর 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' বলা হয় না। বলা হয় — 'সংবিধান সংশোধন', 'পাইলট-প্রজেক্ট' ইত্যাদি। এছাড়া মেধ শব্দের অর্থ সঙ্গম ধরলে, অশ্বমেধের আরও একপ্রকার প্রসঙ্গ দেখা যায়। একদিকে অশ্বটিকে মেরে ফেলার আগে 'মহারানী ও অশ্বলিঙ্গ' সম্পর্কাদি বিষয়ক প্রসঙ্গ, যার মূল অর্থ দেশের সেরা একজিকিউটিভদের সঙ্গে তাঁদের পরামর্শানুসারে কর্মযজ্ঞে নিযুক্ত জনগোষ্ঠীর (প্রকৃতির) সঙ্গম-সম্পর্ক। অপরদিকে নজরে পড়ে ইউরোপীয় উত্তরাধিকার — দ্র. G. S. Fraser রচিত Golden Bough, যা বারংবার উদ্ধৃত হয়েছে T. S. Eliot-এর রচনায়।

অশ্বিনী : ২. *যিনি অশ্বকে (আধেয় রূপে) ধারণ করেন*। ৩. ক) 'অশ্বমুখাকৃতি'। সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের প্রথম নক্ষত্র। ইহা অশ্বমুখতুল্য ও নক্ষত্রত্রয়াত্মক। ইহার দেবতা অশ্বারূঢ় পুরুষ। ইহাতে জন্মিলে নর দেবকার্য্যপরায়ণ বিনীত সত্ত্বান্বিত সম্পত্তিশালী যোষানুরক্ত অলঙ্কারপ্রিয় ও পুত্রবৎসল হয়। খ) বিশ্বকর্ম্মাদুহিতা অশ্বাকৃতি সংজ্ঞা। দ্র. **বড়বা**। (ব.শ.)। দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও চন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী। অশ্বমস্তকাকৃতি। এই নক্ষত্র যে মাসের পূর্ণিমাতে অবস্থান করে, সেই মাসের নাম আশ্বিন। (পৌ.অ.)। ৪. কদাচিৎ 'মাদি ঘোড়া' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৫. অশ্বিনী বিষয়ক তথ্যগুলি প্রধানত জ্যোতিষশাস্ত্রের। প্রাচীন ভারতীয় **জ্যোতিষশাস্ত্র** আসলে একটি two-in-one discipline বা অদ্বৈত বিষয়, যাতে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র ও সমাজের গ্রহ-নক্ষত্রদের (ইংরেজিতে এখন star player কথাটি তো খুবই প্রচলিত) চালচলন ক্রিয়াকর্ম এক বয়ানেই বর্ণিত হয়েছে। সেই বর্ণনা তাই উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর ভিতর কেবল আকাশের গ্রহনক্ষত্রদের বিষয়টিকে নিয়ে বিকশিত হয়েছে একালের astronomy, এবং সমাজের গ্রহনক্ষত্রের বিষয়টিকে নিয়ে বিকশিত

হয়েছে একালের socio-economics, আর এই উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে বা আকাশেরটির সাহায্যে সমাজের গ্রহনক্ষত্রদের চালচলনকে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারটিকে নিয়ে রচিত হয়েছে astrology। এখন কথা হল, আকাশের গ্রহনক্ষত্র ও সমাজের গ্রহনক্ষত্রদের চালচলন সমান বা সমান্তরাল কিনা, তা নিয়ে অজস্র তর্ক চলতে পারে। কেননা প্রাচীন শাস্ত্রকাররা বহু ক্ষেত্রেই ব্যাপার দুটিকে মেলাতে পারেননি। কেবল তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে মনেই হবে যে, তাঁরা প্রধানত সমাজের গ্রহনক্ষত্রদের কথাই বলছেন, আকাশের গ্রহনক্ষত্র তাঁরা নির্দিষ্ট করছেন বা নাম দিচ্ছেন সমাজের গ্রহনক্ষত্রের স্বভাব চালচলন দেখে; আকাশের গ্রহনক্ষত্রকে দেখে নয়। অর্থাৎ সাদৃশ্য অনুসৃত হয়েছে অদৃশ্য সত্তা থেকে দৃশ্য সত্তার দিকে, উলটো ভাবে নয়। তবে উভয় বিষয়ের সমান্তরাল ব্যবহার নিয়ে আমাদের প্রাচীন চিন্তাবিদদের মনে কোনোরকম সংশয় ছিল বলে মনে হয় না।

যাই হোক, দক্ষের (স্পেশালাইজেশনের) থেকে যে সাতাশ প্রকার আধারশক্তিরূপিণী জনগোষ্ঠীর (দক্ষকন্যার) জন্ম হয়, তারা সবাই চন্দ্রের স্ত্রী (বা পুঁজিবাদী প্যারাডাইমের অন্তর্ভুক্ত), এবং বাকি দক্ষকন্যারা সব কশ্যপের ও অন্যান্য সত্তার স্ত্রী। (দ্র. **অসিক্লী**)। এসব কথা প্রায় সমস্ত পুরাণাদি গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। মোট কথা, **কশ্যপ** ও তার স্ত্রীদের এবং **চন্দ্র** ও তার স্ত্রীদের নামগুলির ভিতরেই আদি যৌথসমাজের দ্বিখণ্ডিত রূপটির (আদিম সমাজতান্ত্রিক ও আদিম ধনতান্ত্রিক এই দুই রূপের) প্রায় সব গোষ্ঠীর কথা বলা আছে। **দক্ষ** দ্র.। তাছাড়া লক্ষণীয় যে, অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হলে মানুষের স্বভাব যেমন হবে বলে মন্তব্য করা হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিই পুঁজিবাদী প্যারাডাইমের অন্তর্ভুক্ত।

অশ্বিনীকুমার : ৩. অশ্বিনীর পুত্রদ্বয়। দ্র. **বড়বা**। ইঁহারা স্বর্গবৈদ্য এবং পরম রূপবান। সংস্কৃতকাব্যে রূপবর্ণনায় উপমানরূপে ইঁহাদের উল্লেখ আছে। নকুল সহদেব ইঁহাদের পুত্র। (ব.শ.)। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার বিবাহ হয় সূর্যের সঙ্গে। সূর্যের তেজ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে তিনি নিজ শরীর থেকে ছায়া নামক এক নারীকে নির্গত করে স্বামীর কাছে রেখে পিতৃগৃহে চলে যান। পিতার ভর্ৎসনায় তিনি স্বামীগৃহে ফিরে না গিয়ে অশ্বিনীরূপ ধারণ করে উত্তর-কুরুবর্ষে ভ্রমণ করতে লাগলেন। সংবাদ পেয়ে সূর্য অশ্বরূপে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। এর ফলে সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে অশ্বিনী ও রেবন্ত নামে দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। এঁরাই অশ্বিনীকুমার। নকুল সহদেব ইঁহাদের পুত্র। এঁরা একই রকম দেখতে এবং সর্বদা একসঙ্গে থাকতেন। এঁরা চিকিৎসা-সারতন্ত্র নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রকৃত বিবরণ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ আছে। নিরুক্তকার যাস্কের মতে এঁরা ইন্দ্র ও সূর্য, বেদে এঁরা পৃথিবী ও স্বর্গ, দিবা ও রাত্রি, সূর্য ও চন্দ্র, বিবস্বান ও কারণ্যুর যমজ পুত্র, আকাশের পুত্র, সিন্ধুগর্ভসম্ভূত, দক্ষসম্ভূত, সূর্য্যাত্মজার স্বামী বলে উক্ত হয়েছেন। এঁরা সুবর্ণরথে দিনে তিনবার এবং রাত্রে তিনবার জগৎ ভ্রমণ করেন। (পৌ.অ.)। ... 'তখন সূর্য্যদেব সমাধিবলে অবলীলাক্রমে তুরগরূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার পত্নী সংজ্ঞা তপোনুষ্ঠান বলে সর্ব্বজীবের অনভিগম্য হইয়া অকুতোভয়ে অশ্বিনীবেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে তুরগরূপধারী ভগবান আদিত্যদেব অশ্বিনীবেশধারিণী সংজ্ঞার মুখে সঙ্গত হইলেন। বড়বারূপিণী সংজ্ঞা পরপুরুষ শঙ্কায় সঙ্গমে অনিচ্ছা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ... তদনন্তর সংজ্ঞা আদিত্যদেবের শুক্র নাসারন্ধ্র দ্বারা উদগীরণ করিলে, তাহা হইতে ভিষকপ্রধান অশ্বিনীকুমার যুগলের উৎপত্তি হইল। উঁহাদের একের নাম নাসত্য, দ্বিতীয়ের নাম দস্র। ... অষ্টম প্রজাপতি মার্তণ্ড ঐ উভয়েরই পিতা এবং তুরগীবেশধারিণী সংজ্ঞা উভয়েরই মাতা।' (হরিবংশ)। ৪. দেবতার নাম রূপে কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। ৫. বোঝাই যাচ্ছে, **সূর্য সংজ্ঞা** অশ্বিনীকুমার নিয়ে পুরাণকারগণই যথেষ্ট ধন্দের মধ্যে ছিলেন। আমরাও আছি। তবে কাজের কথা এই যে, অশ্বিনীকুমারের শিষ্যই **ধন্বন্তরি**, এবং তাঁর শিষ্যরাই এখনও পর্যন্ত আয়ুর্বেদশাস্ত্রটির প্রায়োগিক দিকগুলি সামাল দিয়ে চলেছেন। কেবল তাই নয়, **নকুল** ও **সহদেব** যে দুটি দিক সামাল দিতেন, তারও উত্তরাধিকার এখনও ভারতে রয়েছে। যতদূর বোঝা যায়, অষ্টম **মার্তণ্ড** হলেন যৌথ অর্থনীতির দুর্বলরূপ, যখন সবাই যৌথসম্পদ আত্মসাৎ করছে, ফলে কেন্দ্রে জমছে কম। আর সংজ্ঞা হলেন সেই মার্তণ্ড-নীতি বা তদ্রূপ আইনমান্যকারী জনগোষ্ঠী। এমন হতে পারে যে, এই সামাজিক পরিস্থিতিতে যৌথ অর্থনীতির (সূর্য্যের) কাজ-কারবার যে 'কর্মচারী'দের মাধ্যমে চালানো হত, তারা সেই নীতি রূপায়িত করতে অত্যন্ত অসুবিধার মুখোমুখি হত; তাই তারা চলে যায় জনসমুদ্রের মধ্যে। যৌথ-অর্থনীতির পুরুষশক্তি তাদের সঙ্গে মিলিত হলে আদি আয়ুর্বেদশাস্ত্রীদের জন্ম হয়। তাই বলা হয়েছে, সূর্য্য ও সংজ্ঞার অশ্বরূপে মিলন হয় এবং তখন যে নতুন নীতিকারদের জন্ম হয়, তাঁরাই অশ্বিনীকুমার। দ্র. **অশ্ব, ঊর্ব্ব, দস্র**।

অষ্ট : ১. ✓অশ্ + অন্ (কনিন্) - ক। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের দিশাগ্রস্ত টঙ্কারণ যাহাতে।* ৩. অষ্ট, আট। ৪. আট অর্থে প্রচলিত। ৫. সূর্যকিরণের মতো সর্বদিকের ব্যাপ্তি যদি **ঊর্ধ্ব** ও অধঃ বাদ দিয়ে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বায়ু অগ্নি ঈশান নৈর্ঋত এই আট দিকে দিশাগ্রস্ত হয়ে যায়, তখন তা অষ্ট পদবাচ্য হয়। দিশাগ্রস্ত ও পুনরাবৃত্তি জনিত ব্যাপ্তি টঙ্কারিত হতে থাকলে তাকে অষ্ট বলে। সেটি সর্বদিক ত্যাগ করে যে যে দিকে হতে থাকে সেগুলিই অষ্ট পদবাচ্য হয়ে যায়। কিন্তু ঠিক কী ভাবে ও কী করে এমন ধারণা সেকালের মানুষ অর্জ্জন করেছিলেন, তা এখনও বোধগম্য নয়। ৬. আবেস্তা, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, গথ, লিথুয়ানিয়ান, স্লাভ, রাশিয়ান, অ্যাংলো-স্যাক্সন, ও ইংরেজি ভাষায় শব্দটি যথাক্রমে ashtan, okto, octo, acht, ahtau, asztuni, osmj, osm, eahta, eight। (ব.শ.)।

অষ্টক, অষ্টকা : ১. অষ্টন্ + ক (কন্) স্বার্থে; ✓অশ্ + তক (তকন্) - অধিকরণে। (ব.শ.)। ২. *আট ভাগ করা হয় যাহাতে; আট ভাগ করা হয় যাহাতে, তাহার আধার।* / অষ্ট (কপর্দ্দকাদি) দ্বারা ক্রীত; যে তিথিতে পিতৃগণ শ্রাদ্ধ ভক্ষণ করেন। (ব.শ.)। ৩. অষ্ট সংখ্যক, অষ্ট পরিমাণ (সঙ্ঘ, সূত্র), পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর

অধ্যেতা, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্র, আট সংখ্যা, ঋগ্বেদের বিভাগ বিশেষ, অষ্ট বিভাগ যুক্ত গ্রন্থ; গৌণচান্দ্র পৌষ মাঘ ফাল্গুনের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। ... (ব.শ.)। মহারাজ যযাতির এক দৌহিত্রের নাম অষ্টক। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও যযাতিকন্যা মাধবীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়। ... ইন্দ্র কর্তৃক স্বর্গভ্রষ্ট যযাতি স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে পতিত হবার সময় তাঁর দৌহিত্র অষ্টক, অষ্টকের বন্ধু প্রতর্দন, বসুমান, ও শিবির সঙ্গে দেখা হয়। অষ্টক যযাতিকে অন্তরীক্ষের বা দিব্যের যে কোনো স্থান দিতে চাইলেন, প্রতর্দন অন্তরীক্ষের বা স্বর্গের যে কোনো স্থান দিতে চাইলেন, বসুমান ও শিবিও অনুরূপ বললেন। কিন্তু যযাতি বললেন, 'তোমাদের ত্যাগ করে আমি একলা স্বর্গে যাব না, কর্মফলে আমরা স্বর্গ জয় করেছি।' এইরূপে অষ্টক, প্রতর্দন, বসুমান ও শিবির সহিত যযাতি স্বর্গে গেলেন। ৪. অপ্র.। ৫. এই কাহিনীকে সম্পূর্ণ বুঝতে হলে **বিশ্বামিত্র, যযাতি, মাধবী ... শিবি** প্রভৃতি শব্দের ও সত্তাগুলির বিষয়ে জানা দরকার। এখানে কেবল এইটুকু বলে রাখা যেতে পারে যে, বর্তমানে টাকাকড়ি বা coin বলতে যে সত্তাকে বোঝানো হয়, সেকালে তারই একটি আদিরূপকে **অষ্টক** বলা হত। তবে তার বিষয়ে পুরাণাদিতে বিস্তারিত বর্ণনা নাই। সেকারণে বিষয়টি খুব নিশ্চিতরূপে বোঝা যায় না।

অষ্ট ঐশ্বর্য্য, অষ্টসিদ্ধি : ৩. শিবের অষ্ট ঐশ্বর্য্য — অণিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব কামবসায়িতা। (ব.শ.)। ৪. 'ঐশ্বর্য' শব্দটি টাকাপয়সা সম্পদ অর্থে প্রচলিত হলেও 'অষ্টঐশ্বর্য্য', 'অষ্টসিদ্ধি' শব্দদুটি অপ্রচলিত। ৫. মানুষের সমাজে আবিষ্কারক, সৃজনশীল, স্রষ্টা, ও ব্রহ্মগুণসম্পন্ন মানুষের যে সম্পদ থাকে, বা তাঁরা যে সম্পদ অর্জন করে যথার্থে সম্পদবান হন ও সেকারণে সমাজের চোখে শ্রেষ্ঠ মানুষ হন, সেই 'শিব' মানুষদের অর্জিত গুণাগুণগুলিকে আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীরা এই আটটি ভাগে ভাগ করে সেগুলির উপরোক্ত নামকরণ করেছিলেন। আরও বলা যায়, সমাজে যাঁরা জ্ঞানকর্মের যোগসাধন করেন অর্থাৎ থিয়োরি ও প্র্যাকটিসের সমন্বয় ঘটান এবং তার ফলে 'জ্ঞানকর্মের অগ্নিশিখা-বহনকারী' (= শিব) হয়ে ওঠেন, সেইসব সিদ্ধপুরুষেরা উপরোক্ত আটরকম মানসিক ঐশ্বর্যের (মানসসম্পদের, ছান্দস ভাষায় ঈশ্বরীভাবের) অধিকারী হন। কেবল তাই নয়, এঁরা **অষ্টপাশ** থেকে মুক্ত থাকেন। দ্র. **দিগ্‌গজ**।

অষ্টচণ্ডী : ১. অষ্ট + চণ্ডী। ২. *চণ্ডী যে আট রূপে আবির্ভূত হন।* ৩. চণ্ডীর অষ্টমূর্ত্তি — মঙ্গলা বিমলা সর্ব্বমঙ্গলা কালী রাত্রিকালিকা বিকটা কামাখ্যা ও ভবানী। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. বিদ্রোহী বা বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীর স্বভাব অধ্যয়ন করে তাদের এই আটপ্রকার রূপের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন প্রাচীন পণ্ডিতেরা। উপরোক্ত মঙ্গলা ... প্রভৃতি আটটি শব্দের অর্থের ভিতরে চণ্ডীর সেই স্বভাবের কথা বলা আছে। চণ্ডীর আরাধনা করে বর লাভ করার অর্থ এইরূপ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের সাহায্যে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করা। দ্র. **দিগ্‌গজ**।

অষ্টতারিণী : ১. অষ্ট + তারিণী। ২. *তারিণী (ত্রাণকারিণী) যে আট রূপে দেখা দেন।* ৩. তারা উগ্রা মহোগ্রা বলা কালী সরস্বতী কামেশ্বরী চামুণ্ডা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. বিপদ থেকে তারণ করেন, জনগোষ্ঠীর বা প্রজাসাধারণের এমন আটটি রূপকে এই নামগুলির সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়েছিল। দ্র. **অষ্টচণ্ডী**।

অষ্টদিক্‌পাল : ১. অষ্ট + দিক্‌পাল। ২. *সমাজের আটটি দিক যে দিকপালগণ রক্ষা করেন।* ৩. ইন্দ্র পূর্বদিকের, অগ্নি অগ্নিকোণের, যম দক্ষিণ দিকের, নিঋতি নৈর্ঋত কোণের, বরুণ পশ্চিম দিকের, মরুৎ বায়ুকোণের, কুবের উত্তর দিকের, এবং ঈশ ঈশান কোণের অধিকারী। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. অস্তিত্বের আট দিকে ব্যাপ্তি হয় এবং সেই আট দিক থেকে সে আক্রান্তও হতে পারে, এরকম ধারণা **অষ্ট** শব্দটির ভিতরেই বিধৃত। এরকম ধারণা এখন আর প্রচলিত নেই। এখন সমাজের দিকগুলিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার, কৃষি ইত্যাদি বলে। এই যে দিকগুলি সমাজের থাকে, সেই সেই দিকের রক্ষাকারী সর্বোচ্চ আমলাদের সেকালে দিকপাল বলা হত। এখনও **দিকপাল** শব্দটি প্রচলিত থাকলেও, তার সেই অর্থ আর নেই। যাই হোক, উর্ধ্ব ও অধো দিকে সমাজের কোনো অগ্রগতি নেই, কিংবা এই দুই দিক থেকে কোনো আক্রমণ আসে না ধরে নিয়ে অষ্ট দিক ধরা হয়েছে, এবং সেই অষ্টদিকের দিকরক্ষক ও পালন করার কাজ সেকালে যাঁরা করতেন, তাঁদের অষ্ট দিকপাল বলা হত। **আটঘাট জানা, আটঘাট ঘোরা** — এসব কথা সম্ভবত এই অষ্টদিক-এর বিবর্ত্তিত রূপ মাত্র। দ্র. **দিগ্‌গজ**।

অষ্টদিগ্‌গজ, অষ্টদিগ্‌বাহ : ১. অষ্ট + দিগ্‌গজ, দিগ্‌বাহ। ২. *সমাজের আটটি দিক যে দিগগজগণ রক্ষা বা বহন করেন।* ৩. অষ্ট দিকের রক্ষক আটটি হস্তী। ইহাদের নাম — ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম, সুপ্রতীক। (পৌ.অ.)। ৪. দিগ্‌গজ শব্দটি খানিকটা ঠাট্টার ছলে 'মহাপণ্ডিত' অর্থে প্রচলিত। তবে হিন্দি ভাষায় 'বড়ি হস্তি' শব্দটি প্রায়শই যথার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৫. কৃষি দপ্তরের সর্বোচ্চ পদে যে দিগগজ আসীন থাকেন, তিনিই তো সমাজের ঐ দিকটি সামাল দেন। সেইরকম আটদিকে থাকে আটজন দিগগজ। এই পদমর্যাদা লাভের জন্য এঁদের যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করতে হয়। তাই দিগগজ শব্দটির প্রচলিত অর্থ 'মহাপণ্ডিত'। এদের নামগুলির অর্থ থেকে এদের চেনার চেষ্টা করা যেতে পারে। এদের করী, করিন, দিগপাল, দিগবাহ ইত্যাদিও বলা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী আমলাদের উল্লেখ করতেই শব্দটির ব্যবহার হত। দ্র. **আশাপাল, অষ্টদিগপাল, দিগ্‌গজ**।

অষ্টনাগ : ১. অষ্ট + নাগ। (ন-গামী = নগ = পর্ব্বত, বৃক্ষ ইত্যাদি = প্রতিষ্ঠানাদি। তাহাতে আশ্রিত বা জাত = **নাগ**)। ২. *যে আট প্রকারের নাগরিকরা নগের (প্রতিষ্ঠানের) আশ্রয়পুষ্ট।* ৩. অনন্ত বাসুকি পদ্ম মহাপদ্ম তক্ষক কুলীর কর্কট শঙ্খ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. স্মর্তব্য যে নাগগণের অধিপতি বাসুকি আর সর্পগণের অধিপতি তক্ষক। এর কারণ হল, আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিষয় বিষের (সম্পদের) সঞ্চয়কারীগণ বাসুকি আর আদি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়

বিষয় বিষের সঞ্চয়কারীগণ তক্ষক। এবং চিন্তাটি এরকম যে, সমাজের অষ্ট দিক যেমন আছে, সেই আট দিকে আট রকম **নাগ**ও আছে। এদের নামগুলির অর্থ থেকে এদের চিনতে হবে। দ্র. **দিগ্‌গজ**।

অষ্টনায়িকা : ১. অষ্ট + নায়িকা। (নী + আনয়ন)। ২. অষ্ট *সংখ্যক আনয়নকারীগণ*। ৩. দুর্গার অষ্ট শক্তি — উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা অতিচণ্ডা চামুণ্ডা চণ্ডা চণ্ডাবতী। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. অষ্ট দিগগজ, অষ্টনাগের মতো আটরকম জনগণও রয়েছে। তারা সমাজ পরিচালকদের জন্য সম্পদ আনয়ন করেন বা সৃজন করেন, আবার বিদ্রোহও করেন। তবে এঁদের যে নামগুলি উপরে দেওয়া হয়েছে, তার থেকে তাঁদের স্বভাবের ভিন্নতাকে চিহ্নিত করা যায়। বাংলাভাষী মাত্রেই জানেন, ক্ষেপে যাওয়া মানুষদের **চণ্ড** বা **চণ্ডী** বলা হয়ে থাকে।

অষ্টনিধি : ১. অষ্ট + নিধি। (ধা = ধারণ।) ২. *যে অষ্ট সত্তা নির্গত বা নিহিতকে ধারণ করে।* ৩. কুবেরের অষ্ট রত্ন। কোথাও বা নবনিধির কথা বলা হয়েছে। পদ্ম মহাপদ্ম মকর কচ্ছপ মুকুন্দ নীল নন্দ শঙ্খ। নবনিধির বেলায় নন্দ স্থানে কুন্দ ও খর্ব্ব-এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। (ব.শ.)। ৪. নিধি শব্দের প্রচলন তেমন না থাকলেও, প্রতিনিধি শব্দটি অত্যন্ত প্রচলিত। হিন্দিতে শব্দটি আজও জীবিত রয়েছে। ৫. যাস্ক মতে **নিধি** হল 'সুখের আকর'। কার্যত সমাজের নির্গত বা নিহিত সম্পদ ধারণ করে রাখে ব্যাঙ্ক বা কুবের। তার আটটি বিভাগ বা দিক আছে বলে মনে করা হত এবং সেই আট দিক যে অষ্ট সত্তা সামাল দিত, তাদের বলা হত **অষ্টনিধি**। এদের উপরোক্ত নামগুলি থেকে এদের প্রকৃত চরিত্র অনুধাবন করা যেতে পারে।

অষ্টপাশ, অষ্টবন্ধন : ১. অষ্ট + পাশ। (পশ্ = গ্রন্থন, পীড়ন, স্পর্শন; বন্ধ্ = বন্ধন।) ২. *আট প্রকার গ্রন্থন বা বন্ধন যাহাতে।* ৩. ঘৃণা লজ্জা ভয় সন্দেহ মান অপমান জাতি ও শীল। ৪. অপ্র.। ৫. মানুষের সমাজ কীভাবে চললে তা মানুষের পক্ষে ও বিশ্বের বাকি সমস্ত অস্তিত্বের পক্ষে শুভ হবে? সেরকম কি কোনো পন্থা আছে? এ প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করেছিলেন মানুষের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা। তাঁরা দেখেছিলেন, নেচার বা প্রকৃতি স্বয়ং সে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সেগুলিকে চিনে নিয়ে সেগুলির সুস্পষ্ট নামকরণ করেছিলেন তাঁরা। উপরোক্ত ঘৃণা-লজ্জাদি অষ্টপাশ হল সেই অষ্ট বন্ধন, যা দিয়ে মানুষ তার সমাজকে গ্রন্থিত করে রাখলে তা সব দিক থেকে শুভ হয়। এর ফলে একদিকে যেমন সর্বদা সমাজের আভ্যন্তরীণ শুদ্ধি চলতে থাকে, তেমনি অপরদিকে নতুন নিয়ম আবিষ্কার করে নতুন বন্ধনে উত্তীর্ণও হওয়া যায়। সবচেয়ে বড় কথা, এই পাশগুলির কোনো 'পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া' নেই, অর্থাৎ এগুলি কাউন্টার-প্রোডাক্টিভ নয়।

বলা হয়ে থাকে যে শিব এই অষ্টপাশ থেকে মুক্ত থাকেন। তার মানে, জ্ঞানের অগ্নিশিখা বহনকারী আবিষ্কারক সৃজনশীল মানুষেরা সত্যকথনের ও তদনুযায়ী কর্ম করার জন্য উপরোক্ত আটরকম বাধা মানেন না। এই অষ্টপাশ থেকে মুক্ত ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। যাঁরা শিবশক্তিসম্পন্ন নন, তাঁরা এই বাধাতেই আটকে যান, এবং সেটিই শুভ। এই অষ্টপাশই সমাজের মূলধারার মানুষের উপর প্রাকৃতিক সেনসর ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে। এর শক্তি অসীম। মানুষের 'প্রাকৃতিক অপরাধ'কে এই **অষ্টপাশ** 'প্রতিক্রিয়াহীনভাবে' নিরাময় করে। বিপরীতে আধুনিক সমাজব্যবস্থা তার শাস্তি ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের অপরাধ আরও বাড়িয়ে দেয়। কারাগারকে সংশোধনাগার নাম দিলেও অপরাধ কমে না, ক্রমশ বাড়তে থাকে। দ্র. **লজ্জা**।

অষ্টাঙ্গ : ১. অষ্ট + অঙ্গ। ২. *যাহার অষ্ট অঙ্গ আছে।* ৩. অষ্টাবয়ব, অষ্টভাগযুক্ত, অষ্টবিধ। ক) জানু পদ পাণি বক্ষ বুদ্ধি শিরঃ বাক্য দৃষ্টি — প্রণামের এই অষ্ট অঙ্গ। খ) রথ হস্তী অশ্ব যোধ পত্তি কর্ম্মকারক চর দৈশিকমুখ্য (দেশের প্রধান ব্যক্তি) — সেনার এই অষ্ট অঙ্গ। গ) যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান সমাধি — যোগের অষ্ট অঙ্গ। ঘ) জল ক্ষীর কুশাগ্র দধি ঘৃত আতপতণ্ডুল যব শ্বেতসর্ষপ (মতান্তরে মধু রক্তকরবীর রক্তচন্দন) — পূজার এই অষ্ট উপচার। ঘ) ব্যবহারশাস্ত্র বিচারক সভ্য লেখক জ্যোতির্ব্বিৎ স্বর্ণ অগ্নি জল — বিচারালয়ের এই অষ্ট অঙ্গ। ঙ) শল্য শলাকা কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা কৌমারভৃত্য অগদতন্ত্র রসায়নতন্ত্র বাজীকরণ — আয়ুর্ব্বেদের এই অষ্ট অঙ্গ। চ) স্মরণ কীর্ত্তন কেলি প্রেক্ষণ গুহ্যভাষণ সঙ্কল্প অধ্যবসায় ক্রিয়ানিষ্পত্তি — এই অষ্টাঙ্গ রতিকে অষ্টমৈথুন বলে। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কর্মজগতের, আয়ুর্বেদের, বিচারালয়ের, পূজার, যোগের, সৈন্যবাহিনীর, প্রণামের — এদের সমগ্র ক্রিয়াকলাপকে আট ভাগে বিভক্ত করে যেভাবে বোঝা হয়েছিল, তাকে আপডেট করা হয়নি। করা দরকার। এগুলো আমাদের পূর্বপুরুষের 'অনুভবের এলাকা'। দ্র. **অনুভব**। এগুলোকে আপডেট করতে পারলে, পাশ্চাত্যের দেহবাদী শিক্ষার ক্ষুদ্রতাকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব।

অষ্টাদশ শস্য : ১. অষ্ট, শস্ = হিংসা, বধ। ২. *যে অষ্টাদশ সত্তাকে শাসনাধীন করা গেছে।* ৩. যব গোধুম ধান্য তিল কঙ্গু কুলত্থ মাষ মুদগ মসুর নিষ্পাব শ্যামাক সর্ষপ গবেধুক নীবার আঢ়কী সতীনক চণক চীনক — এই অষ্টাদশ শস্য। (ব.শ.)। ৪. ফসল অর্থে ব্যবহৃত। ৫. এই আঠারোটি ছাড়া আর কি কোনো শস্য ছিল না? ছিল, নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সেগুলিকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা হিসেবের মধ্যে ধরেননি। কেন ধরেননি, তা নিয়ে চাইলে গবেষণা করা যেতে পারে। তবে আমরা যেকথাটি এক্ষেত্রে স্মরণ করতে পারি, তা হল, চাষা আমাদের ভারতীয়দের বিচারে দুরকম, ভূমিচাষা ও মনচাষা। সেই সুবাদে দুরকম ফসল হওয়ার কথা, ভূমিচাষের ফসল ও মনচাষের ফসল। এবং লক্ষ্যণীয় এই যে, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষরা উভয় ক্ষেত্রের ফসলকে অষ্টাদশ ভাগেই দেখেছিলেন। তাই ভূমিচাষের ফসল যেমন আঠারো রকম, তেমনি মনচাষের ফসলও আঠারো রকম। দ্র. **অষ্টাদশ বিদ্যা, অষ্টাদশ পুরাণ**।

অষ্টাদশ পুরাণ : ২. *পুরা বিষয়ক জ্ঞানসম্পদ যাহাতে, এমন অষ্টাদশ গ্রন্থ।* ৩. ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি,

ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড — এই অষ্টাদশ পুরাণ। (পৌ.অ.)। ৪. পুরাণাদি গ্রন্থ। ৫. পুরাণ কিন্তু আরও রয়েছে, এবং তাদের হিসেব করা হয়নি। তবে কিনা, প্রধান পুরাণগুলি সবই উপরোক্ত পুরাণগুলির মধ্যে ধরা হয়েছে। এবং আঠারোর হিসাব মেলানোর জন্য কয়েকটি অপ্রধান পুরাণকেও এই গুনতিতে ধরে নেওয়া হয়েছে। যথা — ভবিষ্যপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, গরুড়পুরাণ ইত্যাদি।

অষ্টাদশ বিদ্যা : ১. অষ্ট, বিদ্ = বিদিত হওয়া ২. যার দ্বারা বিদিত হওয়া যায়, এমন অষ্টাদশ জ্ঞানশাখা। ৩. ষড়ঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, মীমাংসা ইত্যাদি ৬) বেদচতুষ্টয় (৪) মীমাংসা ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণ আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্ববেদ অর্থশাস্ত্র — এই অষ্টাদশ শাস্ত্র। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এক্ষেত্রেও অষ্টাদশ ভজানো হয়েছে। কিছু বাদ রয়েছে।

অষ্টাপদ : ১. অষ্ট, পদ্ = গতি, প্রাপ্তি। (পদ্ = প্রতিপালন দান)। ২. অষ্ট পদ যাহার। (ব.শ.)। ৩. শরভ, মর্কট, মাকড়সা, ক্রিমি। চন্দ্রমল্লী। (অষ্টসিদ্ধিযুক্ত) কৈলাসপর্ব্বত। কীলক। দ্যূতফলক, শারীফলক। ধুস্তূর। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ইংরেজি octo (আট) pus (পদ) এর একটি মানে 'a person or organisation with widespread influence' = অষ্টসিদ্ধিযুক্ত **কৈলাসপর্ব্বত**, যেখানে **শিব** ও **কুবেরের** বাস। দ্র. **অষ্টপাশ**। ৬. octopus।

অষ্টাবক্র : ১. অষ্ট, বন্চ্ = বঞ্চনা করা। ২. অষ্ট স্থানে বক্র (যাহার)। (ব.শ.)। ৩. বিখ্যাত মহর্ষি ও সংহিতাকার। উদ্দালক কন্যা সুমতি (সুজাতা) ও উদ্দালক শিষ্য কহোড়ের পুত্র। মাতৃগর্ভস্থ বালক শ্রুতি দ্বারা সর্ববেদজ্ঞ হয়ে ওঠে এবং একদিন পিতা কহোড়ের বেদপাঠ 'অশুদ্ধ' বলায় কহোড় ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্রকে অভিশাপ দেন যে, ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই যখন তার স্বভাব এত বক্র, তখন ভূমিষ্ঠ হলে তার দেহের অষ্টস্থান বক্র হবে। যথাসময়ে বিকলাঙ্গ শিশু জন্মালে তার নাম হয় অষ্টাবক্র। অবশ্য তার জন্মের পূর্বেই অর্থাভাবে কহোড় জনকরাজার কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। সেখানে বরুণপুত্র সভাপণ্ডিত বন্দীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে কহোড় সর্তানুযায়ী জলে বন্দীকর্তৃক নিমজ্জিত হন। বারো বৎসর বয়সে অষ্টাবক্র সুজাতার নিকট পিতার দুরবস্থার কথা শুনে মাতুল শ্বেতকেতুর সঙ্গে রাজসভায় গিয়ে তর্কে বন্দীকে পরাস্ত করেন এবং পিতাকে উদ্ধার করেন। তখন কহোড় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সমঙ্গা নদীতে স্নান করতে বলেন। অষ্টাবক্র স্বাভাবিক দেহ লাভ করেন এবং নদীর নাম হয় সমঙ্গা। বদান্য ঋষির কন্যা সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করলে ... উত্তরদিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বৃদ্ধারূপে অষ্টাবক্রের জিতেন্দ্রিয়তার পরীক্ষা করেন। তখন সুপ্রভার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি জনকরাজাকে মোক্ষজনক যে উপদেশ সমূহ দেন, তার নামই 'অষ্টাবক্র সংহিতা'। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এ ঘটনাবলী ভারতসমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ের, যখন মানুষ মানুষকে নিয়োগ করবার উপায় বের করে ফেলেছে। আরও দেখা যাচ্ছে, তখনই একদিকে **শ্বেতকেতু** নারীর বহুগামিতা নিষিদ্ধ করছেন। তখন অষ্টাবক্র মুনির জন্ম। জানা দরকার কেন **সমঙ্গা** নদীতে ডুব দিলে তাঁর অষ্টবক্রতা স্বাভাবিক হয়ে যায়। জনকরাজাকে তিনি মোক্ষলাভের যে পথ বলেন, সেটিই অষ্টাবক্র সংহিতা। এই অষ্টাবক্রের শাপ বরে পরিণত হয়েছিল ভগীরথের জীবনে। গঙ্গা আনয়ন বা ভারত সমাজে হাট-বাজার বসানোর আগের এই কঠিন সময়। সন্দেহ নেই, এই সময় ও এই ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে সেসময়ের সমগ্র ঘটনাবলী ধরে রেখেছে। দ্র. **কহোড়, দেবল, শ্বেতকেতু**।

আঁশ, আঁশলা, আঁশবঁটি : ১. অংশু > আঁশ। ২. *অস্তিত্বের রহস্যরূপ হইতে জাত যে; আঁশ রূপ অভীষ্ট লালন করে যে।* ৩. সূর্য্যকর, আম্রাদি ফলের সূত্রবৎ পদার্থ, কাঠ পাট শণ বৃক্ষত্বক প্রভৃতির সূত্রবৎ পদার্থ, কাপাস শিমূল আকন্দ প্রভৃতির তূলার সূক্ষ্ম রেখাবৎ অংশ, বাঁশ তাল প্রভৃতির চোঁচ, অত্যল্প পরিমাণ। (ব.শ.)। ৪. fibre ও scale অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দটি নিজেই দো-আঁশলা পেরিয়ে তে-আঁশলা হয়ে রয়েছে। অংশ্ ক্রিয়া ও অশ্ ক্রিয়া দুটিই এতে মিশ্রিত। অস্তিত্বের অংশ অতি-বিকশিত হয়ে অস্তিত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে বাইরে চলে গেলে সেটি ব্যাপ্তি-ক্রিয়ার চরিত্র লাভ করে, তাই অশ্ ক্রিয়াতে 'অংশু'-কে রাখা হয়। কিন্তু মাছের আঁষ জাতীয় কিছু বিষয় রয়েছে, যা অস্তিত্ব থেকে পুরো পৃথক হয়নি, অথচ অস্তিত্বের অন্তর্ভুক্তও নয়। 'আঁশবঁটি' শব্দটি আমাদের জানায়, আঁশ-এর ভেতরে আমিষগন্ধও ঢুকে গিয়ে আঁশ শব্দটিকে তে-আঁশলা করে দিয়েছে। দ্র. **আঁষ, অংশু, অশ**।

আঁষ, আঁষটিয়া, আঁষটে : ১. অংশ > আঁশ > আঁষ; আমিষ > আঁষ, আঁষটিয়া, আঁষটে। ২. *অংশ বা আমিষ আছে যাহাতে; অংশ বা আমিষ টঙ্কারিত যাহাতে।* ৩. আমিষতাসম্বন্ধী, মৎস্যসম্বন্ধী, মাছের, মাছের গন্ধ, মাছের মত গন্ধ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে সুপ্রচলিত। ৫. মাছের গায়ে যে অংশ খানিকটা পৃথক হয়ে আছে, তাকেই আঁষ বলে। এতে মাছের আমিষত্ব টঙ্কারিত হয়, এবং তা 'আঁষটে' শব্দে কথিত হয়। 'মৎস্য'-এর যেমন 'আঁষ' থাকে, ব্যক্তিমালিকেরও তেমনি 'আমিত্বভাব' থাকে; মাছের যেমন সর্বঅস্তিত্বে আঁষটে গন্ধ থাকে, ব্যক্তিমালিকেরও তেমনি সবকিছুতে 'আমি-আমি' গন্ধ থাকে। তবে মাছ দুরকম, আঁশযুক্ত ও আঁশহীন। আমিত্বও দুরকম, মালিকানাযুক্ত ও মালিকানাহীন। ভারতে আমিষভক্ষণ নিষেধ যে কতরকম প্রথায় এখনও বলবৎ রেখেছে, তা দেখলে অবাক হতে হয়। এমন অনেক পারিবারিক প্রথা রয়েছে, যাতে সবরকম আমিষভক্ষণ নিষিদ্ধ (ব্যক্তিমালিকানা নিষিদ্ধ)। এমন প্রথাও আছে যাতে কেবল আঁশহীন মাছ খাওয়া চলে, বাকি সব নিষিদ্ধ। এমন অনেকে আছেন, যাঁরা আঁশযুক্ত মাছ খাওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন, কিন্তু আঁশহীন মাছ কিছুতেই খেতে রাজি হন না। ব্যক্তিমালিকানার সঙ্গে মাছের সম্পর্ক যে কতভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছে তা বলে শেষ করা যাবে না। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের (গ) গ্রন্থটির ১ম ও ৩য় নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

আখড়া : ১. আখড়া < অক্ষবাট। ২. দ্র. **অক্ষবাট**। ৩. যাত্রা-

থিয়েটার সম্প্রদায়ের অভিনয়শিক্ষার স্থান। মল্লবিদ্যাভ্যাসের স্থান। মল্লরঙ্গ। মঠ, আড্ডা। ... ভজনাদির স্থান। (ব.শ.)। ৪. মল্লরঙ্গ, বাবাজীদের কর্মস্থল রূপে প্রচলিত। ৫. যতদূর বোঝা যায়, হাট-বাজারের আদি নাম ছিল 'অক্ষবাট', যা থেকে আখড়া শব্দটি এসেছে। এর থেকে দুটি সম্ভাবনার কথা মনে হয়। প্রথমত, বাস্তব কর্মযজ্ঞের বাৎসরিক পরিকল্পনা যেমন রাজপুরোহিতের যজ্ঞচর্যায় প্রকাশ করা হত (দ্র. **তর্পণ**), তেমনি বাস্তব মালকাড়াকাড়ির যুদ্ধের বা হাটবাজারের প্রতীকী আচরণের ক্ষেত্র ছিল আখড়া। দ্বিতীয়ত, এমন হতেই পারে যে, হাটবাজারের আদি কাঠামোটিকেই আখড়া এখনও ধরে রেখেছে। হাটবাজারের স্বভাব অনেক বদলে যাওয়ায়, আখড়ার কাঠামো আর তাকে ধারণ করতে পারেনি বা করেনি। তার জন্য হাটবাজারকে নতুন কাঠামো বানিয়ে নিতে হয় বা নতুন দেহ ধারণ করতে হয়। আদি হাটবাজারের আদি দেহ মৃতদেহ হয়ে প্রচলিত থেকে যায়। **অক্ষবাট** আখড়া রূপে তাই আজও রয়েছে।

আশা : ১. আ + ✓অশ্ + অ (অচ্) - ক + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *আশ্-এর (অশ্-জাতর আধার যে, তার) আধার যে; অস্তিত্বের ইচ্ছা-বিচ্ছুরণ থাকে যাহাতে বা যে পর্যন্ত।* / যাহা সমন্তাৎ ব্যাপ্ত করে। (ব.শ.)। ৩. আয়তা তৃষ্ণা, দীর্ঘাকাঙক্ষা, অতিতৃষ্ণা; অপ্রাপ্ত-প্রাপ্তীচ্ছা, অলব্ধলিপ্সা; দিক্। ... যোগী সন্ন্যাসী ও ফকিরের লাঠি ... (ব.শ.)। ৪. hope অর্থে প্রচলিত। ৫. 'আশা' জিনিসটি খুবই বড় জিনিস। অস্তিত্বের ইচ্ছা-শক্তিবিচ্ছুরণের বা 'অশ্'-এর আধার সে। তাকে গ্রহণেচ্ছা বা ভক্ষণেচ্ছার আধার মনে হলেও, ব্যাপারটি তার চেয়ে একটু বেশি। মানুষের মন যতদূর পর্যন্ত যেতে পারে, যতদূরের বস্তু বা বিষয়কে ছুঁতে পারে, ততদূর পর্যন্ত ইচ্ছা, তার আকাঙক্ষা পৌঁছে যায়; ততদূর পর্যন্ত তার আশার এলাকা। একালের মানুষ মাত্রেই 'আশাবাদী'। আদিম যুগে মানুষের নাকি 'আশা' ছিল না, তাই তাদের 'আশাবাদী' হওয়ার প্রশ্নও ছিল না। পুরাণাদি অনুসারে একসময় 'অসৎ হইতে সৎ' জন্মানোর পর মানুষের মনে 'আশা'র জন্ম হয়, তার থেকে 'উত্তানপাদের' জন্ম হয়, তারপর '**উত্তানপাদ** হইতে দিকের জন্ম হইল' ... তারপর অহংকারের জন্ম হয়। তারপর ব্যক্তিমালিকের জন্ম হয় ... ইত্যাদি। ঋগ্বেদে 'আশা'র জন্ম কবে হল, কীভাবে হল, তা বলা হয়েছে 'তদাশা অজায়ত তদুত্তানপদস্পরি' ইত্যাদি শ্লোকে। দ্র. **আশ্চর্য, দিক, দিকপাল, আশাপতি, আশাপাল**।

আশাপতি, আশাপাল : ১. আশা + পতি, পাল। ২. *আশার পতি যে; আশা (দিক) পালন করে যে।* ৩. দিকরক্ষক, দিকপাল, ইন্দ্রাদি; অযুত গ্রামের রাজস্বগ্রাহক রাজপুরুষ; স্বরাট্। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. অশ্ হল একটি অস্তিত্বের শক্তিবিচ্ছুরণ, তার ইচ্ছার ব্যাপ্তিকরণ। তার থেকে আশ — মনে মনে পৌঁছোনোর বা পাওয়ার ইচ্ছা। সেই আশের আশ্রয় যাহাতে, সেটিই আশা। কিন্তু সে আশাকারী যদি মানুষ না হয়ে তার সমাজ হয়? তখন সমাজের আশার পালক রূপে দেখা যায় অষ্ট দিকপালদের। দ্র. **আশেপাশে, অষ্টদিগগজ, অষ্টদিকপাল**।

আশেপাশে, আশপাশ : ২. *যাকে আশা করা যায় ও যাকে স্পর্শ করা যায়।* ৩. **পার্শ্বদেশ ও তৎসন্নিহিত স্থান**, চারিধার ও চারিদিক। ... (ব.শ.)। ৪. around **অর্থে প্রচলিত**। ৫. আশেপাশে শব্দের প্রকৃত অর্থ ছিল, একটি **মানুষকে** ঘিরে যা রয়েছে সেই বস্তু ও বিষয়গুলি। কিন্তু মানুষটি তো **শরীরসম্বল** নয়। মানুষ মাত্রেই একটি মন ও সেই মন-অধিষ্ঠিত শরীরের **মালিক**। তাকে ঘিরে থাকা মানে তার শরীরকে ঘিরে থাকা এবং তার **মনকেও** ঘিরে থাকা। তাই 'আশেপাশে' শব্দটি তৈরি করা হয়েছিল এইভাবে — যাকে যাকে শরীর (হাত) দিয়ে 'স্পর্শ' করা যায়, তা সবই হল 'পার্শ্বে' বা পাশে; আর যাকে যাকে আশা করা যায় (মন দিয়ে স্পর্শ করা যায়) সেগুলি হল 'আশে'।

আশ্চর্য্য : ১. আ + ✓চর্ + য (যৎ), 'অনিত্য' অর্থে 'স্' (সুট্) আগম। (ব.শ.)। ২. *আশা (মূলক) আচরণ যাহাতে।* ৩. অনিত্য, অদ্ভুত, বিস্ময়কর, অপূর্ব্ব; অদ্ভুত, চিত্র, বিস্ময়; অদৃষ্টপূর্ব্ব, অকস্মাৎ দৃশ্যমান; অদ্ভুত দৃশ্য, অপূর্ব্ব বস্তু। (ব.শ.)। ৪. wonderful বা 'বিস্ময়কর' অর্থে প্রচলিত। ৫. সনাতন যুগের (আদি যৌথসমাজের) মানুষের চোখে 'আশার' আচরণ করা ছিল তাজ্জব করার মতো ব্যাপার। সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ ক'রে আহৃত বা উৎপাদিত বস্তুর বিশেষ অংশটি (যেটি সে হয়তো তার বিশেষ সক্ষমতা বা কৃতিত্বের দ্বারা করতে পেরেছে) একজন কী করে পৃথকভাবে আশা করতে পারে! কেউ যখন সেরূপ আশা করত, সেটাই ছিল সেকালের সমাজের চোখে 'আশ্ চর্য্য' ঘটনা। কোনো কোনো মানুষের এই 'আশ্ চর্য্য' (আশামূলক আচরণ) দেখে অন্যেরা 'তাজ্জব' হয়ে যেত। সেই কারণে পরে পরে সেই 'আশ্ চর্য্য' বিষয়ক ধারণাটি 'তাজ্জব ব্যাপার' অর্থে প্রচলিত হয়ে যায়। আরও পরে যে কোনো 'তাজ্জব ব্যাপার'ই 'আশ্চর্য্য' বলে প্রতীয়মান হতে থাকে। ৬. as(tonish)। — আশ্ তন্ ঈষ?

'অস্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অছ, অতিব্যস্ত, অথবেথে, অথব্যথে, অনভ্যাস, অনাস্তিক, অনুপন্যস্ত, অন্বাসন, অন্বাসিত, অন্বাসীন, অবিপর্য্যাসিত, অব্যসন, অব্যসনী, অব্যস্ত, অভ্যসন, অভ্যস্ত, অভ্যাস, অষ্টি, অষ্ঠি, অষ্ঠিলা, অসংন্যস্ত, অস্, অসন, অসি, অসিগণ্ড, অসিচর্য্যা, অসিধাব, অসিধাবক, অসিধারা, অসিধারাব্রত, অসিধেনু, অসিধেনুকা, অসিপুত্রিকা, অসিপুত্রী, অসিপত্র, অসিপত্রব্রত, অসিলতা, অসী, অসু, অসুমান, অসুর, অসুরগুরু, অসুরদ্বিট্, অসুরসূদন, অসুরা, অসুরাচার্য্য, অসুরারি, অসুরী, অস্ত, অস্তগ, অস্তগত, অস্তগমন, অস্তব্যস্ত, অস্তব্যস্তে, অস্তব্যাস্ত (অস্তেব্যস্তে, অস্থেব্যস্থে), অস্তম, অস্তমন, অস্তময়, অস্তমান, অস্তমিত, অস্তর, অস্তশিখর, অস্তসংখ্যা, অস্তাচল, অস্তাদ্রি, অস্তি, অস্তিত্ব, অস্ত্র, অস্ত্র, অস্ত্রকার, অস্ত্রকারক, অস্ত্রকারী, অস্ত্রগড়, অস্ত্রগুরু, অস্ত্রচিকিৎসক, অস্ত্রজীব, অস্ত্রজীবী, অস্ত্রধারী, অস্ত্রপাণি, অস্ত্রবিৎ, অস্ত্রবিদ্, অস্ত্রবিদ্যা, অস্ত্রবৃষ্টি, অস্ত্রমন্ত্র, অস্ত্রমার্গ, অস্ত্রমার্জ্জ, অস্ত্রমার্জ্জক, অস্ত্রলাঘব, অস্ত্রলেখা, অস্ত্রশস্ত্র, অস্ত্রশিক্ষা, অস্ত্রসন্ধি, অস্ত্রহীন, অস্ত্রাগার,

অস্ত্রাঘাত, অস্ত্রাবচারণীয়, অস্ত্রী, অস্থি, অস্থিচর্ম্মশেষ, অস্থিচর্ম্মসার, অস্থিচর্ম্মী, অস্থিপঞ্জর, অস্থিপ্রক্ষেপ, অস্থিভঙ্গ, অস্থিভেদ, অস্থিমাত্রসার, অস্থিমান, অস্থিমালা, অস্থিশৃঙ্খলা, অস্থিসংহার, অস্থিসঞ্চয়, অস্থিসঞ্চয়ন, অস্থিসঞ্চারিণী, অস্থিসন্ধি, অস্থিসমর্পণ, অস্থিসম্ভব, অস্থিসার, অস্থিস্থূণ, অস্মদ্, অস্মদাদি, অস্মদীয়, অস্মদ্বিধ, অস্মাকম, অস্মাদৃশ, অস্মি, অস্র, অস্রি, অস্রু, আছ, আছে, আছি, আতর, আতিবিতি, আথিবিথি, আথেব্যথে, আথেব্যাথে, আমি, আমরা, আমাকে, আমার, আমাদের, আমাদেরকে, আস, আসল, আসশাওড়া (আস্যশাখোট), আসিক, আসিধার, আসুর, আসুরিক, আস্ত, আস্তব্যস্ত, আস্তিক, আস্তীক, আস্তে (অস্তব্যস্ত), আস্তেব্যস্তে, আস্য, আস্যশাখোট, আস্র, আস্মা, আস্মি (আমি, অম্), উপন্যাস, উপন্যস্ত, নাই, নাস্তি, নাহি, নেই, নিরস, নিরসন, নিরস্ত, নিরাস, ন্যস্ত, ন্যাস, বিন্যস্ত, বিন্যাস, বিপর্য্যস্ত, ব্যসন, ব্যস্ত, ব্যস্তবাগীশ, ব্যাস, সৎ, সতী, সতীচ্ছদ, সতীত্ব, সতীধর্ম, সতীপণা, সতীলক্ষ্মী, সতীসাধ্বী, সতীসাবিত্রী, সত্তা, সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী, সমস্ত, সমস্যা, সমাস, সাইৎ, সাইত, স্বস্তি, স্বস্তিক, স্বস্তিবাচন, স্যাৎ, স্যাদবাদ, স্যাদবাদী,

অস্ = অস্তিত্বের স-অন (স্-মাত্র অন)। **অস** = অস্তিত্বের শক্তি (অনুশক্তির সক্রিয়তা) থাকে যাহাতে।

অসি : ১. ✓অস্ + ই (ইন্) - কর্ম্মবাচ্যে; ✓অস্ + ই - ক। (ব.শ.)। ২. যে পাপ নাশ করে। (ব.শ.)। ৩. কৃপাণ, খড়্গ, করবাল। কাশীর দক্ষিণস্থ নদীবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. তরোয়াল। ৫. কেবল এইটুকু বোঝা যায়, অসি এমন এক সত্তা 'যে পণ্যবানকে পণ্যের বোঝা থেকে নিষ্কৃতি দেয়'। এটি গঙ্গাধারার মতো কেনাবেচার স্রোত বা মুদ্রাও হতে পারে। যাই হোক না কেন, ব.শ. স্পষ্ট জানিয়েছেন এটি 'পাপনাশিনী'। **বারাণসী** দ্রষ্টব্য।

অসিক্নী : ১. অসি, ক্নী = বিকলন। ২. *পাপনাশিনী বিকল যাহাতে; যাহাতে মুদ্রার সাহায্যে কোনো কাজ হয় না।* ৩. বীরণ প্রজাপতির কন্যা ও দক্ষের স্ত্রী। এঁর অন্য নাম বৈরণী। প্রজাসৃষ্টির জন্য দক্ষ অসিক্নীর গর্ভে প্রথমে হর্যশ্ব নামে পাঁচ হাজার পুত্রের জন্মদান করেন। কিন্তু তারা সকলেই নারদের উপদেশে সন্ন্যাসী হন। দ্বিতীয়বারে তাঁর গর্ভে শবলাশ্ব প্রভৃতি নামে এক হাজার পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পুনরায় তারাও নারদের উপদেশে সন্ন্যাসী হন। তৃতীয়বারে তাঁর গর্ভে ৬০টি কন্যা জন্মে। তাদের মধ্যে ধর্ম ১০টি, কশ্যপ ১৩টি, চন্দ্র ২৭টি, অরিষ্টনেমি ৪টি, বহুপুত্র ২টি, অঙ্গিরস ২টি, কৃশাশ্ব ২টিকে বিবাহ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. অসিক্নী এমন এক ধরণের জনগোষ্ঠী, যাদের ভিতর পণ্য-উৎপাদন (**পাপ**) বিরোধিতার মানসিকতা বিকল হয়ে গেছে, যে মানসিকতা তৎপূর্ববর্তী সকল মানুষের ছিল। তাই অসিক্নীর প্রথম দুই দফার সন্তানেরা পাপ উৎপাদনে সম্মত হয়নি। হয়েছে শেষ বারে। ভাববার কথা।

অসুর : ১. ✓অস্ + উর (উরন্) - ক। (ব.শ.)। ২. অসু *(প্রাণ) রহে যাহাতে।* / যে দেবের ক্ষেপণ করে। যাহাদের সম্বন্ধে সুরাধিদেবতা বারুণী নাই। (ব.শ.)। ৩. **সুরশত্রু**, দৈত্য। **ঋগ্বেদে** 'অসুর' শব্দের অর্থ 'শত্রুগণের নিরসিতা' '**প্রাণবান**' '**বলবান**' **এবং** ইহা পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তির সমর্থক। ... অবেস্তায় '**অহুর**' **শব্দের অর্থ** 'The Life giver and the Omniscient', God. তুলনীয়: '**অসুরঃ** সর্ব্বেষাং প্রাণদঃ' / ঋগ্বেদ, তুলনীয়: 'অসিত', 'সিত'। ... (ব.শ.)। বেদের প্রাচীনতম অংশে অসুর অর্থে দেবতা; তুলনা পারসীক আবেস্তার 'আহুর'। দেবতা হিসাবে ইন্দ্র অগ্নি এবং বরুণকে অসুর বলা হত। পরে এর অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয় — যারা দেবতার সহিত বিরোধ করে, যারা সমুদ্রমন্থনে উত্থিত সুধা পায় নাই, তাদেরই অসুর বলে। বেদের পরবর্তী অংশে অর্থাৎ ঋকবেদের শেষে এবং অথর্ববেদে যারা দেবতাবিরোধী, যাদের সুধা নাই — এই অর্থেই এখন ব্যবহার হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে, প্রজাপতির নিঃশ্বাস একবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, সেই প্রাণবন্ত নিঃশ্বাস হতে অসুরদের সৃষ্টি হয়। শতপথ ব্রাহ্মণেও অসুরদের জন্ম সম্বন্ধে একই কথা লেখা আছে। বিষ্ণুপুরাণ মতে ব্রহ্মার জঙ্ঘা হতে অসুরদের জন্ম। দেবশত্রুদের এই নামে অভিহিত করা হয়। এরা পূজা ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ধ্বংস করত। অসুরদের তিনটি ইন্দ্র ছিল — হিরণ্যকশিপু, বলি, ও প্রহ্লাদ। এরা রাত্রি ও অন্ধকারের প্রতীক এবং তামসে পরিপূর্ণ। যে সব অসুর দেবতাদের সহিত যুদ্ধে নিহত হত, তারা পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করে নানাপ্রকার বিপদ সৃষ্টি করত। এই শ্রেণীতে পড়ে দৈত্য, দানব, এবং কশ্যপের বংশধরেরা; কিন্তু পুলস্ত্যের বংশধর রাক্ষসদের বোঝায় না। (পৌ.অ.)। ৪. দেববিরোধী দৈত্য বা রাক্ষসদের বোঝাতে এই শব্দের ব্যবহার আজও প্রচলিত। ৫. গতাসু শব্দটি থেকে আমরা জানতে পারি, অসু মানে প্রাণও বটে। যাঁরা প্রাণ রক্ষা করতেন তাঁরা অসুর। তারপর দেবতা শব্দটি থেকে জানতে পারি 'দেওয়া' বা দানই তাঁদের মূল ক্রিয়া। সমগ্র ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা গেছে, প্রকৃতপক্ষে অসুর দু'রকমের। আদি অসুরেরা ছিলেন সাম্যবাদী (**মহান /মহৎ**), **সনাতন** ব্যবস্থার ঘোরতর সমর্থক, এককথায় অতি ভালো। যতদূর বুঝেছি, সেই আদি অসুরদেরই অপর নাম ছিল দেবতা। দক্ষযজ্ঞের পরে সেই সনাতন সমাজ ভেঙে পড়ে। অসুরেরা কেউ কেউ পালায়, কেউ যতি ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে সমাজপরিচালনার থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। আবেস্তায় এঁদের কথাই বেশি করে বলা হয়েছে। (এঁরাই পরবর্তীকালে ভিক্ষুকে পরিণত হন, যাঁদের কেউ কেউ চোখ রাঙিয়ে ভিক্ষা চাইত। **দুর্বাসা** দ্র.) নতুন ক্ষমতাধর অসুরেরা ছিলেন আদিম সমাজতন্ত্রবাদী (বেদবাদী), বৈদিক ব্যবস্থার সমর্থক। এঁরাও প্রথম দিকে আদৌ খারাপ ছিলেন না। আদি অসুরদের সঙ্গে এঁদের পার্থক্য ছিল যে, এঁরা জ্ঞানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার মানে হল, এঁদের আমলে সমাজে মানুষের সমমর্যাদা আর ছিল না, উঁচু নীচুর প্রচলন হয়েছিল, যাঁরা জ্ঞানী, তাঁদের মর্যাদা বেশি ছিল। আর কোনো পার্থক্য কার্যত ছিল না। পরে পরে এঁদের স্বভাব আরও খারাপ হয়ে যায়। বলতে গেলে, ফোর্থ-ফিফ্থ জেনারেশন অসুরেরা অনেকখানি অধঃপতিত। অর্থাৎ কালক্রমে (আদিকাল থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়ে) সেই আদি সমাজতন্ত্রবাদী অসুররা ক্রমশ অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়, ঠিক যেভাবে রাশিয়ার বিপ্লবের

বিশ/ত্রিশ বছর পরে সোভিয়েত সমূহের পরিচালক জ্ঞানীদের স্বভাব খারাপ হয়ে গিয়েছিল, খানিকটা সেই রকম। কীভাবে সেই ভালো (বেদবাদী) অসুরেরা ক্রমশ খারাপ হয়ে যায়, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে মহাভারতের ২২৬-২২৭ অধ্যায়ে। আজকালকার তথাকথিত ফলিত সমাজতন্ত্রের পরিচালকদের মতোই ফিফ্‌থ জেনারেশনের অসুররা ছিল করাপ্‌টেড, অথচ ধনতন্ত্রের (বা দেবতাদের) উত্থানকে সর্বপ্রকারে রুখে রাখার চেষ্টা করত। আগেকার অসুর-কাম-দেবতাদের সঙ্গে পরবর্তী কালের এই দেবতাদের পার্থক্য ছিল, 'দেওয়া' বা দান করা এঁদেরও মূল ধর্মও বটে, তবে কিনা এঁরা দানের প্রতিদান নেন, বিনিময়ে বিশ্বাস করেন, তাই বিনিময়জীবী হয়ে ধনতন্ত্রের হোতা হয়ে যান। তবুও নানান কারণে ভারতসমাজ অসুরবিরোধী হয়ে ওঠে। (দ্র. **দেবী**)। এর ফলে দেবতাদের সাময়িক বিজয় কখনো কখনো হয়ে থাকলেও, ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পর তাদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে এবং তারা মহাপ্রস্থান করে, বিদেশে পালায়। এই দেবশক্তি মক্কা-কর্ডোভা হয়ে ইউরোপ পৌঁছেছিল বলেই সেখানে শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়। আফ্রিকা বা অস্ট্রেলিয়ায় হয়নি।

সুতরাং আদি অসুর ও আদি দেবতা একই মানুষ। সে-মানুষ সকলকে দিয়ে-থুয়ে যা বাঁচত, খেত বলে দেবতা। সকলের প্রাণ (অসু) তারই আচরণে বাঁচে বলে সেই দেবতাই অসুর। পরে দেবতা গুণটি অধঃপতিত হয়ে পণ্যজীবী ধনতান্ত্রিক হয়ে যায়, এবং অসুর গুণটি অধঃপতিত হয়ে মৌলবাদী সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) হয়ে যায়। সেই একই শক্তি একদিকে আজকের ধনতন্ত্রবাদী পুঁজিবাদী কর্পোরেট, অপরদিকে মৌলবাদী-ধর্মব্যবসায়ী ও সমাজতান্ত্রিক-রাজনীতি-ব্যবসায়ীতে রূপান্তরিত। একালের দেবতারা বাহ্যবস্তু মেধাবস্তু যা পান তাই বিক্রি করেন, একালের অসুরেরা বিক্রয় করেন নানারকমের জীবননীতি।

ইংরেজি বানানে যে প্রাচীন রাজ্যকে গ্রীক বানানের অনুসরণে বলা হয়েছে Assyria, তার উচ্চারণ ছিল 'অসুরীয়'। এমন মনে করার অনেক কারণ আছে। এই রাজ্যের ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র ছিল বর্তমান ইরাক দেশের উত্তরাংশে অবস্থিত Ashur। এদের প্রধান দেবতার নাম ছিল Ashur। এদের পরাক্রান্ত রাজাদের নাম ছিল Ashurnasirpal (শাসনকাল খ্রিস্টপূর্ব ৮৮৩ থেকে ৮৫৯) এবং Ashurbanipal (শাসনকাল খ্রিস্টপূর্ব ৬৬৮ থেকে ৬২২)। শৌর্য, নিষ্ঠুরতা, এবং স্থাপত্যরীতির (বিশেষত Nineveh-র) জন্য এরা ইতিহাসবিখ্যাত। পণ্যবাহিতায় বিশ্বাসী মোজেসপন্থী ইহুদিদের গ্রন্থে (বাইবেল-এর Old Testament অংশে) স্বভাবত Assyrian-রা ধিকৃত হয়েছে। অহুর-উপাসক প্রাচীন পারসীকরা এই Assyrian-দের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী।

অস্ত : ১. ✓অস্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে; ✓অস্ + ত - ক; ✓অস্ + ত - অধিকরণে; ✓অস্ + ত - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্ব তারিত যাহাতে।* ৩. ক্ষিপ্ত, নিরস্ত, ত্যক্ত, অবসানপ্রাপ্ত, অবসিত, পশ্চিমাচল, ক্ষেপণ, সূর্যাস্তগমন, অদর্শন, নাশ, ক্ষয়, মৃত্যু, সূর্য্যের সহিত যোগজন্য গ্রহের অদর্শন, লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান। (ব.শ.)। ৪. সূর্য্যের পশ্চিমাচলে যাওয়া অর্থে প্রচলিত। কদাচিৎ শেষ হয়ে যাওয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ৫. সূর্য্যের শক্তিবিচ্ছুরণের একটি মাত্র রেখায় যে শক্তি থাকে, তাই 'স্' পদবাচ্য। উচ্চারণের সুবিধার জন্য 'অ' বা কোনো এক অস্তিত্বকে ধরে নেওয়া হয়; তাই 'অস্'। এই স্ তারিত হয়ে কোথাও না কোথাও পৌঁছালে, তার এই তারিত রূপটিকে বলে অস্ত। এতে স্বভাবতই অস্তিত্বের সূত্রপাত থেকে বিলয় পর্যন্ত এলাকাটির একটা সুপ্ত সংবাদ থাকে। ৬. ইংরেজি, জারমান, গ্রীক, ল্যাটিন ভাষায় এই পরিবারের সদস্যরা যথাক্রমে west, west, hesperos, vesper রূপে প্রচলিত।

অস্ত্র : ১. ✓অস্ + ত্র (ষ্ট্রন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহার দ্বারা অস্তিত্ব ত্রাণ পায়।* ৩. ক্ষেপণযোগ্য বাণাদি। ... চাপ, অসি, করবাল, খড়্গ, অস্ত্রসামান্য; ছুতারের হাতিয়ার, ছেদনসাধনদ্রব্যমাত্র। (ব.শ.)। ৪. হাতিয়ার, তরোয়াল প্রভৃতি। ৫. নিজে দূরে থেকে যা ছুঁড়ে মারা যায়, তাকেই অস্ত্র বলে। শত্রু কাছে এসে হাজির হবার আগেই যা ছুঁড়ে শত্রুকে আঘাত করে নিজেকে বাঁচানো যায়। দ্র. **শস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, শাস্ত্র** ইত্যাদি। ৬. গ্রীক ভাষায় astrape শব্দের অর্থ বজ্র এবং বিদ্যুৎ হলেও, সে কিন্তু 'অস্ত্র'-এরই জ্ঞাতি। বজ্র তো আকাশ থেকে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রই বটে।

আস্ত : ২. *অস্ত যাহাতে আশ্রিত।* ৩. অখণ্ডিত, সমস্ত, গোটা, সম্পূর্ণাঙ্গ, পুরা, অভগ্ন, সম্পূর্ণ, অটুট। ৪. whole, total বা 'গোটা' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **অস্ত**। অস্তিত্বের শুরু থেকে শেষ যাতে থাকে, সেটিই অস্তিত্বের সম্পূর্ণ রূপ। তাকেই সমগ্র স্ত বা **সমস্ত** বলে। তাকেই অন্য ভাবে বলা হয় 'আস্ত'।

আস্তিক, আস্তীক : ১. অস্তি + ইক (ঠক্)। (ব.শ.)। ২. *(ব্রহ্মের / নিয়মের / বা অন্যকিছুর) অস্তিত্বে যিনি বিশ্বাস করেন।* / অস্তি, অর্থাৎ পরলোক আছে, ইহা যাহার মতি। (ব.শ.)। ৩. ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, বেদপ্রামাণ্যবাদী, শ্রদ্ধালু; বিশ্বাসবান, শ্রদ্ধাবান। ... (ব.শ.)। ... জরৎকারু মুনি ও তাঁর পত্নী নাগরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর বা মনসাদেবীর সন্তান। ... জরৎকারু মুনির নিদ্রাভঙ্গ করে অপ্রিয় হওয়ায় তিনি তাঁর গর্ভবতী পত্নীকে ত্যাগ করে যাবার সময় গর্ভস্থ সন্তানকে লক্ষ করে বলেছিলেন, 'অস্ত্যয়ং সুভগে গর্ভস্তব,' ইত্যাদি। 'অস্তি' পদাদি বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, সেই জন্য এঁর নাম আস্তিক। অর্জুনের পৌত্র ... পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে তক্ষক দংশনে মারা গেলে, তাঁর পুত্র জনমেজয় সর্পসত্র করে নাগবংশ নির্মূল করতে চান। বাসুকি এই ঘটনা ভগ্নীর সাহায্যে আস্তিককে জানান। আস্তিক যজ্ঞস্থানে গিয়ে জনমেজয়কে সন্তুষ্ট করে মাতৃশাপে বিলুপ্তপ্রায় সর্পকুলকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করেন। আস্তিকের নাম স্মরণ করলে সর্পভয় দূর হয়। (পৌ.অ.)। ৪. 'ঈশ্বরবিশ্বাসী' অর্থে প্রচলিত। ৫. 'আছে' এই বিশ্বাস যার, তাঁকে **আস্তিক** বলা হয়ে থাকে। কী 'আছে'? এর উত্তর হল 'কোনো একটা কিছু আছে'। তথাকথিত ধর্মনিষ্ঠ ধর্মভীরু মানুষেরা বলতে পারেন, 'ঈশ্বর'। যুক্তিবাদীরা এসব কথাকে বাজে কথা বলে মনে করেন। কিন্তু আমরা দেখেছি, 'আছে' এই 'বিশ্বাস' না থাকলে মানুষ তো বটেই, কোনো

জীবই বেঁচে থাকতে পারে কি না সন্দেহ। গাছের তলা দিয়ে যাওয়ার সময় গাছটি ঘাড়ের উপর ভেঙে পড়বে না কিংবা রাস্তাটি যে হঠাৎ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আমাকে গিলে ফেলবে না, আগন্তুক গাড়িটি যে হঠাৎ ফুটপাথে উঠে আমাকে চিঁড়ে চ্যাপটা করে দেবে না, পাশের গুমটিতে বসে থাকা ছোকরাগুলো যে হঠাৎ দৌড়ে এসে আমার জামাকাপড় কেড়ে নিয়ে আমাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে চলে যাবে না — যথাক্রমে এই প্রাকৃতিক, যান্ত্রিক, সামাজিক নিয়ম আমাদের ঘিরে বলবৎ 'আছে'। এই 'আছে'তে 'বিশ্বাস' না থাকলে আমরা কি একদিনও বাঁচতাম! তাই, ভেবে দেখলে জীবমাত্রেই আস্তিক। এমন একটি মানুষও নেই যে **আস্তিক** নয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের 'খ' গ্রন্থের ৮৫-৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এখন ভারতের ইতিহাসে **আস্তিক** নামক একটি সত্তা যে ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়েছিল, তার বিষয়ে যাওয়া যাক। উপরোক্ত বয়ানে লক্ষণীয় যে জরৎকারু মুনির পত্নীর নামও **জরৎকারু**; যেমন পুলোমা রাক্ষসের পত্নীর নামও পুলোমা। এই জরৎকারুদেরই পুত্র আস্তীক। ইনি **জনমেজয়ের** সর্পসত্র বিফল করে দিয়েছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এর পরই হিন্দুযুগের সূত্রপাত হয়। অশোকের সময়ে বৌদ্ধদের হাতে জরাগ্রস্ত বৈদিক চিন্তার বিপর্যয় ঘটলে এবং পরে (৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে) বৌদ্ধদের আচরণে জরা দেখা দিলে পুনরায় নবরূপে বৈদিক চিন্তার উদ্ভব ঘটে। সেই চিন্তার অনুসারী জনগোষ্ঠীর থেকে যে পুরোহিতগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল ৭৫০-৮০০ খ্রিস্টাব্দে আচার্য্য শঙ্করের সময়ে, আস্তীক তাঁরাই। কাশীরাম দাসের মহাভারতে এদের **'জটাচার্ব্ব বংশ'** এবং **'যাযাবর** বংশ' বলা হয়েছে। অর্থাৎ এঁরা **জটা** চিবিয়ে বেঁচে থাকেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে ঘর বেঁধে থাকেন না। **জটা** হল সেই রকম মালিকানা, যার জোরে সাগরমেলার পুণ্যার্থীদের দেওয়া কোটি কোটি টাকা দক্ষিণা হিসেবে নিয়ে যায় গুজরাটের (উত্তরপ্রদেশের?) একটি ব্রাহ্মণ বংশ। **কেশ** বা **চুল** বা মালিকানা কত জটিল হলেই না জটা হয়! **৬.** খুব সম্ভব গ্রীক aisthetikos (যার থেকে ইংরেজি aesthetic শব্দটি তৈরি হয়েছে) শব্দটি 'আস্তিক'-এরই জ্ঞাতিভাই। দ্র. **জরৎকারু, যাযাবর, জনমেজয়**।

অ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অই, অইসন, অংহ, অংহসংঘ, অংহহর, অ-কার, অত্র, অত্রত্য, অত্রভবান, অত্রযোগ, অদ্য, অদ্যকার, অদ্যকালে, অদ্যতন, অদ্যপ্রসূত, অদ্যভক্ষ্য, অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ, অদ্যাপি, অদ্যাবধি, অনভ্র, অনভ্রবৃষ্টি, অনা, অভ্র্, অভ্র, অভ্রক, অভ্রঘন, অভ্রচ্ছায়া, অভ্রপটল, অভ্রবৃন্দ, অভ্রভেদী, অভ্রাবকাশ, অভ্রাবকাশিক, অভ্রাবকাশী, অভ্রিত, অমুষ্যায়ণ, অর্জ্জি, অর্দ্দ, অর্দ্দন, অর্ব্বুদ, অর্ব্বুদ-খর্ব্বট, অহ, অহন, অহিহন (অইহন), আইজ, আজ, আভ, আভনক, আমুষ্যায়ণ, আবড়োখাবড়ো, আবীর, আবুড়াখাবুড়া, আম্রেড়ন, আর্দ্র, আর্দ্রক, আর্দ্রপাদ, আর্দ্রপৃষ্ঠ, আর্দ্রভাব, আর্দ্রমাংস, আর্দ্রমূর্ত্তি, আষাঢ়, আষাঢ়িয়া, আহ্নিক, এবড়োখেবড়ো,

আ

আ বর্ণের অর্থ = অ-এর আধার যে।

আ : ২. *অস্তিত্বের আশ্রয় যাহাতে*। **৫.** দুটি 'অ' জুড়ে 'আ' হয়। মূলত এটিকে অস্তিত্বের আধার বা আধারস্য আধারও ভাবা যেতে পারে, বলা যেতে পারে 'অস্তিত্বধারী'। দ্র. **ঈ**। কিন্তু 'আ' যখন উপসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় **শুধুমাত্র** আধার, কাউকে ধারণ করার জন্য যে অপেক্ষা করছে খালি পাত্রের মতো। তখন সে যে ক্রিয়ার আধার রূপে ব্যবহৃত হয়, তাকে তার স্বরূপে ধারণ করে, কোনো বিশেষ দিকে চালিত করে না। যথা — আকাশ, আচার, আতাপ, আদেশ, আবেশ ... ইত্যাদি। এগুলিকেই বিশেষ দিকে চালিত করে প্র ও পরা উপসর্গ। যথা — প্রকাশ, প্রচার, প্রতাপ, প্রদেশ, প্রবেশ ... ইত্যাদি, কিংবা পরাকাষ্ঠা, পরাক্রম, পরাগত, পরাজয়, পরাভব, পরামর্শ ... প্রভৃতি। সেকারণে নিরুক্তকার যাস্ক জানিয়েছেন, আ-এর বিপরীতার্থক উপসর্গ হল প্র, পরা।

আ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : আপ্, আস্, আ = ২ + ১

'আপ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিব্যাপক, অতিব্যাপ্ত, অতিসমীপ, অনাপ্ত, অনীপ্সিত, অপ, অপকরুণ, অপকর্ম্মা, অপকর্ষ, অপকর্ষক, অপকর্ষণ, অপকলঙ্ক, অপকারক, অপকারী, অপকীর্ত্তি, অপকৃষ্ট, অপক্রম, অপক্রান্ত, অপক্ষেপ, অপগম, অপগর্জ্জিত, অপগা, অপগামী, অপগুণ, অপঘন, অপঘাতক, অপঘাতমৃত্যু, অপঘাতী, অপচরিত, অপচার, অপচারী, অপচিকীর্ষা, অপচিত, অপচেষ্টা, অপচ্ছত্র, অপচ্ছায়, অপজান, অপজ্ঞান, অপদেবতা, অপদেশ, অপদোষ, অপদ্রব্য, অপদ্রাবক, অপধূম, অপধ্যান, অপধ্বংস, অপধ্বংসজ, অপধ্বংসী, অপধ্বস্ত, অপনস, অপনুত্তি, অপনেতা, অপনোদন, অপন্যায়, অপপাঠ, অপপ্রয়োগ, অপবর্গ, অপবর্জ্জন, অপবর্ত্তন, অপবাদক, অপবাদী, অপবারণ, অপবারিত, অপবারিতক, অপবাহ, অপবাহন, অপবাহ্য, অপবিঘ্ন, অপবিদ্ধ, অপবিদ্যা, অপবৃত্ত, অপবেধ, অপভয়, অপভাষ, অপভাষণ, অপভাষা, অপমান, অপমানিত, অপমানী, অপমার্জ্জন, অপমৃত্যু, অপযশঃ, অপযাত, অপরক্ত, অপরত, অপরাগ, অপরাদ্ধ, অপরুদ্ধ, অপরুব, অপলপন, অপলপিত, অপলাপদণ্ড, অপলাপী, অপশকুন, অপশঙ্ক, অপকৃষ্ট, অপশীর্ষ, অপশোক, অপশ্রী, অপসদ, অপসব্য, অপসর, অপসর্জ্জন, অপসর্প, অপসার, অপসারণ, অপসারিত, অপসিদ্ধান্ত, অপস্কর, অপস্নাত, অপস্মার, অপহ, অপহত, অপহতি, অপহনন, অপহন্তা, অপহর, অপহরণ, অপহরণীয়, অপহর্ত্তা, অপহসিত, অপহারক, অপহারণ, অপহারিত, অপহাস, অপহ্নব, অপাংপতি, অপাকরণ, অপাকীর্ণ, অপাকৃত, অপাঙ্গদর্শন, অপাঙ্গদৃষ্টি, অপাঙ্গবীক্ষণ, অপাঙ্গমোক্ষ, অপানৃত, অপাবরণ, অপাবর্ত্তন, অপাবৃত, অপাবৃতি, অপাবৃত্ত, অপাবৃত্তি, অপামার্গ, অপামার্জ্জন, অপায়ন,

অপায়ী, অপার্থ, অপার্থক, অপাশ্রয়, অপাসন, অপি, অপিচ, অপিতু, অপেক্ষণ, অপেক্ষণীয়, অপেক্ষা, অপেক্ষাবুদ্ধি, অপেক্ষী, অপোঢ়, অপোহ, অপোহন, অপোহনীয়, অপোহ্য, অপ্চ, অপ্চর, অপ্ছরা, অব্দ, অপ্পতি, অপ্যয়, অপ্রাপ্ত, অপ্রাপ্তকাল, অপ্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তবয়াঃ, অপ্রাপ্তবয়স, অপ্রাপ্তব্যবহার, অপ্রাপ্তাবসর, অপ্রাপ্তি, অপ্রাপ্য, অপ্সর, অপ্সরা, অপ্সরাঃ, অপ্সরী, অব্যাপক, অব্যাপী, অব্যাপ্য, অব্যাপ্ত, অব্যাপ্তি, অম্ময়, অসমাপিকা, অসমাপ্ত, আত্ত, আত্তিসো, আপ্, আপ (up), আপন, আপন-ওয়ালী, আপনকার, আপনঘাতী, আপনহারা, আপনা, আপনাপন, আপনাবিস্মৃত, আপনার, আপনারই, আপনারে, আপনি, আপনে, আপস্তম্ব, আপস্তম্ভ, আপ্ত, আপ্তকাম, আপ্তকারী, আপ্তকার্য্য, আপ্তখুদী, আপ্তগণ, আপ্তগরজী, আপ্তগ্রাসী, আপ্ততা, আপ্তদক্ষিণ, আপ্তদূতী, আপ্তবচন, আপ্তবধী, আপ্তবাক্, আপ্তবাক্য, আপ্তবিক্রয়পত্র, আপ্তব্য, আপ্তভাব, আপ্তশ্রুতি, আপ্তসহায়ক, আপ্তসার, আপ্তসুখী, আপ্তি, আপ্তবান, আপ্য, আপ্যায় (ই), আপ্যায়ন, আপ্যায়না, আপ্যায়িত, আপ্সিক, ঈপ্সা, ঈপ্সিত, ঈপ্সু, দুষ্প্রাপ্য, নাপিত, নাপিতানী, প্রাপ্ত, প্রাপ্য, প্রাপ্তি, বীপ্সা, ব্যাপক, ব্যাপী, ব্যাপ্ত, ব্যাপ্তি, ব্যাপ্য, যথাপ্রাপ্ত, সমাপক, সমাপন, সমাপ্ত, সমীপ্, সমীপ্সিত, সুসমাপ্ত। **আপ্** = অস্তিত্বধারীর (আধেয় সহিত আধারের) পালন বা পান। **আপ** = অস্তিত্বধারীর পালন বা পান থাকে যাহাতে।

আপ : ৫. 'অস্তিত্বধারীর পালন বা পান' চলে যাহাতে, সে স্বভাবতই 'আপ' (up) হয়ে রয়েছে, 'অন' (on) হয়ে থাকার মতো। দ্র. **অন**। আপ্-অন (upon) বা আপন তাহলে তো পালন-পানের দিকে অন হয়ে থাকা। অন (on) যেমন অস্তিত্বকে তার অন্তের দিকে নিয়ে যায়, আপ হয়ে থাকাও তো অস্তিত্বকে তার সর্বোচ্চ-পান বা পালিত হওয়ার লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়! এই কারণে ইংরেজিতে up ও on শব্দদুটি অনেক সময় সমার্থক। দ্র. **আপন**। ৬. ইংরেজি up, জারমান auf।

অপ্, অপ : ১. ন + প = অপ। / ✓আপ্ + ক্বিপ্ (০) - ক। (ব.শ.)। ২. *নেই পালন-পান যাহাতে; অস্তিত্ব পালিত হয় যাহাতে।* / যাহা ব্যাপ্ত করে। (ব.শ.)। ৩. জল; উপসর্গবিশেষ — বিয়োগ, অপগমন, অপকর্ষ, বিপরীত ইত্যাদি। ৪. bad বা খারাপ অর্থে প্রচলিত। ৫. যাকে পালন বা বহন করা হয়, তার 'স্ব'-ভাব বা প্রকৃতি নষ্ট হয়ে যায়। শেষ বিচারে তা পালিত বা বাহিতের পক্ষে অশুভই হয়। তাই এক বিচারে — অপ্ = ন-প্ = ন-পালন / ন-পান = অ-পালন / অ-পান। তখন স্বভাবতই অপ কথাটির মানে দাঁড়িয়ে যায় 'নেই পালন বা পান যাহাতে'। সেটি তখন উপসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমরা জেনেছি, নঞর্থকতার ফলে অস্তিত্ব স্বরূপ লাভ করে। (দ্র. **অ**)। সেই অস্তিত্বকে একই অবস্থায় পালন করলে সে অপ এবং তদ্রূপ অবস্থায় বহন করলে সে অব হয়ে যায়। বাংলাভাষী মাত্রেই জানেন অপ ও অব শব্দদুটি ভাল কথা নয়। **উপসর্গ** রূপে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা নঞর্থক দিকে তার অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। তখন পালিতকে যথার্থ লক্ষ্যের দিকে নিয়ে না গিয়ে দক্ষিণে বা বামে নিয়ে যায়। দ্র. **অব**। কারণ, অস্তিত্বের ইত্যাকার পালন ও বহন সবসময় প্রচলিতের থেকে নিম্নমানের দিকে যায়। কিন্তু তাহলে 'অপ' মানে জল কেন? এর কারণ হল, এই জলার্থক 'অপ্' শব্দটি 'ন-প্' থেকে জাত নয়; আপ-ক্বিপ হয়ে জাত। এই অপ অস্তিত্বকে 'আপ'-এর দিকে নিয়ে যায়, এই অপ তাই সর্বজীবের পালক জল। সমস্ত অস্তিত্বই জলে পালিত হয়; জলই জীবন। সেই 'অপ থেকে জাত' = আপ বা অপসমূহই হল জলরাশি। দ্র. **আপ্**। ৬. ল্যাটিন ob- (= নীচের দিকে)।

অপকৃষ্ট : ১. অপ ✓কৃষ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. যাহা নিম্ন মানে (নিম্ন মানের পদ্ধতিতে বা উপায়ে বা অকালে) কর্ষিত হইয়াছে। ৩. অপনীত, আকৃষ্ট, বিহিত কালের পূর্ব্বে কৃত (সপিণ্ডন), পরসূত্র হইতে অন্বয়ার্থ পূর্ব্বসূত্রে আকৃষ্ট (পদ), হীন, নীচ, অধম, জাতিতে বা বৃত্তিতে নিকৃষ্ট। (ব.শ.)। ৪. 'বিহিত কালের পূর্ব্বে কৃত' বা অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি কর্ম অর্থে 'অপকর্ষ' শব্দটি এখনও প্রচলিত আছে। ধর্মপ্রাণ বাংলাভাষী-হিন্দুরা শব্দটির ব্যবহার আজও করে থাকেন। ৫. একালে বহু কাজই অপকৃষ্ট, অর্থাৎ নিম্ন মানে কর্ষণ করে সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু তাকে 'অপকৃষ্ট' বলা হয় না, কারণ শব্দটি তো আধুনিক বাংলাভাষীরা ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে তো নিম্ন মানের কাজ আছেই! তো সে কাজকে কী বলা হবে? আমরা, আধুনিক শিক্ষিত বাংলাভাষীরা তাকে বলি sub-standard।

অপগম, অপগামী : ১. অপ ✓গম্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. অপ গমন যাহাতে; যে অপ গমন করে। ৩. অপযান, পলায়ন, অপসরণ, তিরোধান, অভাব, বিপ্রয়োগ, বিচ্ছেদ, পতন, ভ্রংশ, অত্যয়, অবসান, ভঙ্গ, রাহিত্য, প্রয়াণ, মরণ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **দক্ষ** বা স্পেশালিস্ট কেন অপগামী, সেকথা বুঝতে প্রচলিত ধারণায় একটু অসুবিধে হয়। **শিব** তো আবিষ্কারক। প্রকৃতির দেওয়া অব্যক্ত জ্ঞানের চেক ব্যক্ত জ্ঞানে এনক্যাশ করে সে খালাস। কিন্তু সেই ব্যক্ত জ্ঞানকে ধারণ করে নিয়ে চলে দক্ষ। এইখানে তার গৌরব। তার নীতি হল, আবিষ্কৃত জ্ঞানকর্মের সে পুনরাবৃত্তি করে চলে। কিন্তু এভাবে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করলে লোকে চাষি, তাঁতি, কামার, কুমার, বিজ্ঞানী, ডাক্তার, গাইনি, সাইকিয়াট্রিস্ট — জ্ঞানের একটি মাত্র শাখায় কিংবা শাখার শাখায় তস্য প্রশাখায় অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং তার ফলে সমগ্রের '**কাণ্ড**'জ্ঞান হারায়। অপরদিকে, একই কর্মের পুনরাবৃত্তি তাকে ক্রমশ গড্ডলিকার স্রোতে ভাসায় এবং মৌলবাদী করে ছাড়ে। ফলত, সে হয়ে পড়ে **অপগামী**। দ্র. **অজ**। ৬. apogamy = a form of reproduction without sexual act or with an abnormal sexual act। ছাগরতি = abnormal sexual act।

অপবর্গ, অপবর্জ্জন, অপসর্জ্জন : ১. অপ + ✓বৃজ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে; অপ + ✓বৃজ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে; অপ + ✓সৃজ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে বর্গ অপ; যে*

বর্জ্জন অপ; যে সর্জ্জন অপ। / যাহাতে দুঃখ অপবর্জ্জিত হয়। (ব.শ.)। **৩.** বিতরণ, উৎসর্জ্জন, দান। ত্যাগ। মোক্ষ, ক্ষেপ। (ত্যাগের হেতুভূত) সমাপ্তি, অবসান। ফলপ্রাপ্তি। ফলপ্রাপ্তিহেতু কর্ম্মসমাপন। ক্রিয়াবসান সাফল্য, কর্ম্মফল। মোক্ষ, নির্ব্বাণ। উপহার। পরিহার। দত্ত, অর্পিত। ... ছিন্ন, কৃত্ত। পরিশোধিত (ঋণ)। (ব.শ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** **'অবশেষ'** (উদ্বৃত্ত উৎপাদন) দুঃখের কারণ, তাই অবশেষ থাকলেই বর্জ্জন দরকার পড়ে। যে বর্জ্জনে আসক্তি নেই, তা **আবর্জ্জনা**। আর, যে বর্জ্জনে আসক্তি থাকে, কিছু প্রাপ্তি থাকে, প্রতিদান থাকে, সে বর্জ্জন হল অপ-বর্জ্জন। অপ-সৃজন বা অপসর্জ্জনেও তাই। অনেকের ক্ষেত্রে অবশ্য অপসর্জ্জনে বা অপবর্জ্জনেই মোক্ষ থাকে, নির্ব্বাণ থাকে। যেমন কমার্সিয়াল শিল্পীর সর্জ্জনে, পণ্যজীবী বা সুদখোরের বর্জ্জনে। তাঁরা যা বর্জ্জন করেন, তার অনেক বেশি ফেরত আসে। সেকালে, ভারতে যখন পণ্য-উৎপাদন হয়নি, বা নিষিদ্ধ ছিল, তখন এইসব সর্জ্জন-বর্জ্জন অপসর্জ্জন-অপবর্জ্জন বলে ঘোষিত ছিল।

অপেক্ষণ, অপেক্ষা : **১.** অপ + ✓ঈক্ষ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে; অপ + ✓ঈক্ষ্ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *অপ ঈক্ষণ যাহাতে; অপ ঈক্ষণের আধার যে।* **৩.** আকাঙক্ষা, প্রতীক্ষা, (অবেক্ষণ, রক্ষণ, তত্ত্বাবধান, রক্ষা, দর্শন, রোধ, বারণ প্রভৃতি শব্দগুলি অপেক্ষণ-এর অর্থ হিসেবে এখন আর প্রচলিত নেই। — ব.শ.)। আশা, শাব্দবোধজনক আকাঙক্ষা, স্পৃহা, লিপ্সা, অবধান, অনুরোধ, পর্য্যালোচনা, বিচারণা, সম্বন্ধ, আনুরূপ্য, প্রযত্ন, সমাদর, অন্বেষণার্থ স্থিতি, বিলম্ব, দেরি, তুলনার্থক 'হইতে' 'চেয়ে'। (ব.শ.)। **৪.** অপেক্ষা শব্দটি wait করা অর্থে এবং তুলনার্থক 'হইতে', 'থেকে' ও 'চেয়ে' অর্থে সুপ্রচলিত। **৫.** ঈক্ষ্ শব্দের অর্থ হল 'গতিশীল কোনো বস্তু বা বিষয়' (= ঈ) কে দর্শন করা বা দেখা। দ্র. **ঈক্ষ, ঈক্ষা**। কিন্তু দেখার জন্য আপনি সময়, অর্থ, নিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যয় করে চলেছেন, কিন্তু যাকে দেখতে চান তার দেখা পাচ্ছেন না, এরকম ঈক্ষাকে বলে অপ-ঈক্ষা বা অপেক্ষা। বিশেষ ব্যক্তি বা ঘটনার অনিশ্চিত আগমনের জন্য **'প্রতীক্ষা'** বা wait করতে বাধ্য হতে হলে বোঝা যায় 'অপেক্ষা' কাজটি কতখানি অপ-কর্ম। কারণ তাতে ঈক্ষিত উপস্থিত নেই, অথচ ঈক্ষণের বাকি সমস্ত উপাদানগুলি খরচ হয়ে যাচ্ছে। এমন ঘটনা বিরল নয়, যেখানে অপেক্ষাকারী অপেক্ষা করার চেয়ে আত্মহত্যাকে শ্রেয় ভেবেছে।

সেই অপ-ঈক্ষা বা অপেক্ষা ক্রমে একদিন তুলনাত্মক হয়ে গেল। 'রামের অপেক্ষায় (তুলনায়) শ্যাম শ্রেষ্ঠ' এইজন্য যে, রামের যখন দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন যে-শ্যামকে পাওয়া যাচ্ছে সেই ভাল। এইভাবে অপেক্ষা শব্দটি ক্রমে তুলনাত্মক হয়ে যায়। কিন্তু সেই তুলনা কেমন করে 'হইতে', 'থেকে' বা 'চেয়ে' হয়ে গেল! 'রাম অপেক্ষা (হইতে, থেকে) শ্যাম শ্রেষ্ঠ', 'রামের চেয়ে শ্যাম শ্রেষ্ঠ' হয়ে গেল? দ্রষ্টব্য — **হইতে, থেকে, চেয়ে।**

অপ্‌সরা, অপ্‌সরাঃ : দ্র. **দেবাঙ্গনা**।

আপন (আপনা, আপনি) : **১.** আপ্ + অন। **২.** *অস্তিত্বধারীর পালনকার্য অন যাহাতে*। **৩.** স্বকীয়, নিজ, স্বপক্ষীয়, আত্মীয়, সহোদর, আত্মীয় জন, স্বজন, দরদী, আত্মসম্বন্ধী, আত্মা, স্ব, আত্মতত্ত্ব, আত্মমান। (ব.শ.)। **৪.** বহুল প্রচলিত। **৫.** আপন তাকেই বলা যায়, যা অস্তিত্বধারীর (দেহ-মনের) পালনকার্য অন করে রাখে। এ হল আপ-এর দিকে চলা। আপ-এর দিকে অন থাকা বা চলতে থাকাই আপন। অন্য ভাবে বললে up-এর দিকে on থাকাই upon। এই আপন যখন তার আধার প্রাপ্ত হয়, আমরা বলি 'আপনা' ('আপনা বুঝিয়া, সুজন দেখিয়া, পীরিতি করিব তায়' — ব.শ.)। আর, আপন যখন গতিশীল সত্তা রূপে সামনে এসে দাঁড়ায়, আমরা বলি 'আপনি' অর্থাৎ অস্তিত্বধারী 'নিজেই'। **৬.** upon।

আপ্ত : **১.** ✓আপ্ + ত (ক্ত) - ক, কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *অস্তিত্বধারীর পালন (= আপ্) তারিত যাহাতে।* **৩.** প্রাপ্ত, লব্ধ, অধিগত, উৎপাদিত, গত, বিশ্বস্ত, প্রত্যয়িত, হিত, অবিসংবাদক, যথার্থদৃষ্টার্থবাদী, কুশল, ভ্রমপ্রমাদাদিরহিত, ক্ষীণদোষ, প্রচুর, সত্য, স্বীয়, সন্নিকৃষ্ট, যুক্ত, সম্বন্ধ, অভিযুক্ত, নিযুক্ত, প্রামাণিক, ন্যায্য, নিজ, আপন, শক্ত, উপধাযুক্ত (যে ঘুষ খায় না), ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) — এই দোষচতুষ্টয়হীন পুরুষ, অর্হৎ, জিন। (ব.শ.)। **৪.** শাস্ত্রাদির বা ঋষিবাক্যের প্রমাণ হিসেবে 'আপ্তবাক্য' এখনও কমবেশি ব্যবহৃত হয়; তবে আধুনিক বাংলায় personal secretary শব্দের বাংলা অনুবাদ রূপে 'আপ্ত-সহায়ক' শব্দটি সম্প্রতি প্রচলিত হয়েছে। **৫.** অস্তিত্বধারী যদি একজন মন্ত্রী হন, তাঁর আপনত্ব বা নিজত্ব তারিত হয়ে যদি তাঁর সহকারীর কাছে চলে যায়, সেই সহকারী যদি মন্ত্রীর যা-কিছুতে 'পালন' হয়, হিত হয়, তা যথার্থভাবে সাধন করেন, তবে সেই সহকারীকে বলে মন্ত্রীর-আপ্ত সহায়ক। অনুবাদটি যথার্থ। বলতে কি, আপ্ত-যুক্ত সমস্ত শব্দের ভিতরেই অস্তিত্বধারীর আপনত্ব বলবৎ থাকে; সে শব্দটি *আপ্তকাম, আপ্তকারী, আপ্তখুদী, আপ্তগণ, আপ্তগরজী, আপ্তগ্রাসী, আপ্তভাব ... আপ্তি*, যাই হোক না কেন। দ্র. **সমাপ্ত**। **৬.** ল্যাটিন aptus, ইংরেজি apt, aptitude, adapt একই 'আপ্' ক্রিয়ামূলের পরিবারে জন্মলাভ করেছে।

নাপিত : **১.** ন + ✓আপ্ + ত (ক্ত)। (ব.শ.)। **২.** *আপন-অন্তর্ভুক্তি নেই যাহাতে।* **৩.** সঙ্কীর্ণজাতি নবশায়কবিশেষ। ইঁহারা ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রা-গর্ভে জাত। ইহাদের বৃত্তি ক্ষুরকর্ম্ম। ইঁহারা ভোজ্যান্ন। (ব.শ.)। **৪.** barber অর্থে প্রচলিত। **৫.** নয় আপ্ত যে, সে হল নাপিত। তাকে আপন-এর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অর্থাৎ, যে কারও আপন হয় না এমনকি নিজেরও নয়। তার মানে, যে স্বশাসিত নয়; অন্যের দ্বারা চালিত। যাদের বিরুদ্ধে চালিত তাদের আপন হওয়ার তো প্রশ্নই নেই, চালকও কিন্তু তাদের আপন ভাবে না। ভারতসমাজের বিশেষ যুগের পরিচালকেরা যে নয়টি জাতির মানুষকে অন্য শক্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করতেন, **নবশায়ক** নামক সেই নয় জাতির একটি জাতি হল নাপিত। দ্র. **চণ্ডাল**।

প্রাপ্ত : **১.** প্র + ✓আপ্ + ত (ক্ত) - ক, কর্ম্মবাচ্যে। **২.**

প্রকৃষ্টরূপে আপ্ত যে; কিংবা, প্রকৃষ্টরূপে আপন-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যে। ৩. লব্ধ, আসাদিত, গত, আপন্ন, আগত, উপস্থিত, সংপ্রাপ্ত, উৎপন্ন, যোগ্য, প্রণিহিত। (ব.শ.)। ৪. received অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **আপ্ত**।

ব্যাপ্ত, ব্যাপ্তি : ১. বি + ✓আপ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে; বি + ✓আপ্ + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *বিস্তারিত আপ্তি যাহাতে; ব্যাপ্ত গতিশীল যাহাতে।* ৩. নিচিত, আচ্ছন্ন, পূরিত, ব্যাপ্তিযুক্ত, নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট, সমাক্রান্ত, খ্যাত, স্থাপিত; (ব্যাপক —>) বিস্তারপ্রাপ্ত, প্রসারিত; ব্যাপন, সমাক্রমণ, লম্ভন, লক্ষ্যপ্রাপ্তি, ব্যাপ্যের নিয়তসম্বন্ধ, ব্যভিচারাভাব, অবিনাভাব (invariable concomitance)। (ব.শ.)। ৪. circulated ও spreading in all direction অর্থে প্রচলিত। ৫. আপ্ত শব্দ থেকে আমরা জেনেছি, তা সবকিছুকে নিজ কেন্দ্রের দিকে টানে, আপনত্বকে সবকিছুতে আরোপ করে, সবকিছুকে আপন করে নেয়। বি-আপ্ত বা ব্যাপ্ত উলটো চরিত্রের। সে সবকিছুকে পরিধির দিকে বিস্তারিত করে।

তবে এখানে তিনটি বিষয় ভেবে দেখার মতো। প্রথমত, আপ শব্দে অস্তিত্বধারীর পালন ও পান দুটিই হয়। সংস্কৃতকারগণ গুরুত্ব দিয়েছেন পান অর্থে। কেন্দ্রে পানেচ্ছার উদ্ভব ঘটলে সে তার পরিধির দিকে হাত বাড়াবেই। এটি নিত্যসম্বন্ধ। একেই তাঁরা বলেছেন অবিনাভাব, ব.শ. তার ইংরেজি অনুবাদ দিয়েছেন invariable concomitance। বাংলাভাষায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 'আপ' (up) হয়ে থাকার দিকে, কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে, লক্ষ্যের দিকে অন হয়ে থাকার দিকে। তৃতীয় বিষয়টি হল, এর ইংরেজি circulated অর্থটি ক্রিয়াভিত্তিক রূপে আজও টিকে রয়েছে, যদিও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতীকী পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যখন circular-কে circulate করেন, তখন তা বৃত্তের বা circle-এর অভ্যন্তরের সদস্যদের মধ্যেই করেন। আজকাল কিন্তু সেই circular-কে প্রায়শই প্রতীকী 'বিজ্ঞপ্তি' অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যে কেউ যা দেখতে বা পড়তে পারেন, যেনবা circle-এর সঙ্গে circular-এর কোনো সম্বন্ধ নেই।

'আস্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আস্, আস, আসন, আসন-অঙ্গুরী, আসনবন্ধ, আসনমন্ত্র, আসনা, আসন্দী, আসর, আসা, আসিত, আসিয়া, আসিলাম, আসীন, ইতিহাস, উদাস, উদাসী, উদাসীন, উপাসক, উপাসনা, ঔদাসীন্য, সমাসীন।

আস্ = অস্তিত্বধারীর (আধেয় সহিত আধারের) অস্তিত্বন (অস্তিত্ব থাকা)। **আস** = অস্তিত্বধারীর (আধেয় সহিত আধারের) অস্তিত্ব থাকে যাহাতে। (as)।

আসন : ১. ✓আস্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *আস্ (অস্তিত্বধারীর অস্তিত্ব) অন্ (on) থাকে যাহাতে*। ৩. উপবেশন। ... স্থিতি, অবস্থান; 'আমি এক্ষণে যুদ্ধ করিতে অসমর্থ' — এই বলিয়া কালাদিপ্রতীক্ষায় বিজিগীষুর স্থিতি; বিগ্রহাদিনিবৃত্তি। ... বিপরীত শব্দ 'যান'। ... (যোগশাস্ত্রে) যমাদি অষ্টাঙ্গের তৃতীয় অঙ্গ; যোগাসন। ... (ব.শ.)। ৪. 'বসবার স্থান' বা seat অর্থে প্রচলিত। ৫. বসবার জায়গাকে আসন বলে। কিন্তু সে তার বাহ্য অর্থ। তাতেও 'অস্তিত্বধারীর অস্তিত্ব অন' হয়ে থাকে, সন্দেহ নেই। তবে সে তার ক্ষুদ্র অর্থ। তার উচ্চতর প্রয়োগ থাকে মানুষের সামাজিক বিন্যাসে। মানুষ, মানুষের সংগঠন (প্রতিষ্ঠানাদি) যে যে বিন্যাসের (set up-এর) মাঝখানে স্থিত (আসিত) থেকে বাইরের বা অন্তরের পরিস্থিতির সঙ্গে লড়ে যায়, সেই বিন্যাসেও তার আসন থাকে। সেই আসন হল মানুষের পেশা। যুদ্ধকালে একটি সৈন্যবাহিনী যেমন বিভিন্ন আসন (set-up) গ্রহণ করে, তেমনি কর্মক্ষেত্রেও বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন বিভিন্ন প্রকারের আসন গ্রহণ করে থাকে। সমাজের তো উচ্চ থেকে নীচ পর্যন্ত বিরাট সিঁড়ি, আর তাতে অজস্র সোপান বা ধাপ। যে যেখানে যে ধাপে দাঁড়িয়ে, সেটিই তার আসন। কেউ চাষী, কেউ কুলি, কেউ ডাক্তার, কেউ মাস্টার। এর পরেও আছে। সে হল আসনের উচ্চতম প্রয়োগ, আর তা থাকে মানুষের মানসিক বিন্যাসে। যে দর্শন, তত্ত্ব বা জীবননীতিতে বিশ্বাস করে মানুষ একটি বিশেষ অবস্থান গ্রহণ করে, সেও তার আসন। সেক্ষেত্রে জীবননীতিটি হল যান। (যেমন হীনযান, মহাযান, **দেবযান** প্রভৃতি)। এই ধরনের যানের ভিতরেও থাকে বিভিন্ন রকমের আসন। আপনি গান্ধীযানে বা মার্কসযানে আরোহন করে (বিশ্বাস করে) বিশেষ একটি আসন গ্রহণ করতে পারেন; গান্ধীবাদী-গ্রামসেবকের আসনে বসে কিংবা মার্কসবাদী-শ্রমিকনেতার আসনে বসে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারেন। বিচার আপনার। দ্র. **উপাসনা, উপবীত**।

আসর : ১. আস্ + ঋ (র); আ + ✓সৃ (সর) + অ। ২. *অস্তিত্বধারীর অস্তিত্ব (গতিশীল কিন্তু অব্যক্ত) রহে যাহাতে; সর-এর আশ্রয় যাহাতে।* ৩. সভা, মজলিস, পালাগান গায়কের বা যাত্রা-সম্প্রদায়ের সভা, সভাস্থ শ্রোতৃবর্গ। (ব.শ.)। ৪. 'রসিকদের সম্মিলন' অর্থে প্রচলিত। ৫. এটি একটি আদর্শ বাংলা শব্দ। আস্ ও সৃ, এই দুই ক্রিয়া বংশে পৃথকভাবে এর জন্ম হলেও সেকথা ভুলে তাদের একই শব্দ বলে মনে করা হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে 'আসর' হল সেই স্থান যেখানে মানুষের মানসিক উড়ান চলে, যাদের দেখে মনে হয় যেন রসে ডুবে আছে মোহগ্রস্তের মতো (প্রথম ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি দেখুন)। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার অর্থ হল, যেখানে সৃজনশীল গায়ক-নায়কেরা তাদের দোহন করে আনা দুগ্ধ-সর উপস্থিত করেছেন সকলের জন্য (দ্বিতীয় ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি দেখুন)। কিন্তু এই শব্দ তো সংস্কৃতকারদের হাতে তৈরি হয়নি; হয়েছে মধ্যযুগে, বাংলাভাষার স্বর্ণযুগে। ফলে আস্ ও সৃ দুটো পরিবার থেকেই সে বিতাড়িত, ঠিক শ্রীকৃষ্ণের মতো; বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত, মামার উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত। কারণ, সম্পদের মাতৃতান্ত্রিক অধিকার তখন পিতৃতান্ত্রিক অধিকারে রূপান্তরিত হচ্ছিল; আর শ্রীকৃষ্ণ পড়ে গিয়েছিলেন মধ্যবর্তী 'ট্রান্জিশনাল পিরিয়ডে'। বাংলাভাষায় কথা বলে যে বাঙালি মুসলমান, তার অবস্থা আর 'আসর'-এর মতো আদর্শ বাংলা শব্দের অবস্থা অনেকটাই সেরকম। তাই অনেকে

অবলীলায় বলে দেন — 'আসর' এসেছে আরবের 'অশ্‌র' শব্দ থেকে; ও আমাদের বাংলার জলহাওয়ার সদস্য নয়। আজ যখন শব্দের বর্গ ও বংশ আবিষ্কৃত, আমরা দেখতে পাই, কেউই আকাশ থেকে পড়েনি। কোনো না কোনো বংশ থেকেই তাদের জন্ম হয়েছে, কেউই পিতৃমাতৃহীন অনাথ বা ভুঁইফোড় নয়।

আসা (আসিয়া, আসিলাম) : **১.** ✓আস্ + আ। (ব.শ.)। **২.** *আস্ (অস্তিত্বধারীর অস্তিত্ব) আধারিত থাকে যাহাতে।* **৩.** আগমন, জন্মগ্রহণ। (ব.শ.)। **৪.** coming অর্থে প্রচলিত। **৫.** এই শব্দটিও আস্ শব্দ-বংশের সন্তান এবং নিষ্কলুষ বাংলা শব্দ, যার জন্ম হয়েছে বাংলাভাষার স্বর্ণযুগে অর্থাৎ মধ্যযুগে। আপনি কারও 'আসা'র বা আগমনের অপেক্ষায় আছেন, সে সামনে 'এসে' দাঁড়ালে বা 'আসলে' অস্তিত্বধারীর অস্তিত্ব সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখা যায়। একেই বলে আসা। নানা বিভক্তি যুক্ত হয়ে শব্দটি নানা রূপ গ্রহণ করে বাংলাভাষায় অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা — আসিয়া, আসুন, আসছি, আসবেন, এসে, আসিলে, আসিলাম, আসিয়াছি ... ইত্যাদি। তাছাড়া অদাদিগণীয় 'অস্' (= to be, to exist) এর লিট্-এ প্রথম পুরুষ-এ আস-আসতুঃ-আসুঃ হয়, যদিও রূপগুলি নাকি বিরল। আস-এর মানে ছিল 'ছিল' বা existed, 'আস্তে'র মানে ছিল 'আছে'। এসবই উপরোক্ত 'অস্তিত্বধারীর অস্তিত্ব সম্মুখে দণ্ডায়মান' বোঝায়।

আরও কথা এই যে, 'আসন' শব্দের অর্থে আমরা জেনেছি, আস্ (অস্তিত্বধারীর অস্তিত্ব) অন্ (on) থাকে যাহাতে, তাই হল আসন। কিন্তু 'চলন্' 'বলন্'-এর মতো শব্দটিকে আধারহীন হসন্ত-যুক্ত 'আসন্' করে নিলেই তা আগমন-এর সমার্থক হয়ে যায়। মধ্যযুগে এই 'আসন্' শব্দের ব্যবহার ছিল বলে জানিয়েছেন ব.শ.। উদাহরণ স্বরূপ, 'আপনার আসনের (আগমনের) অপেক্ষায় আমি বসে আছি'। গ্রামবাংলায় এখনও এভাবে শব্দটির ব্যবহার হয়।

ইতিহাস : **১.** ইতিহ + আস। (ব.শ.)। **২.** *গত-এর (গত বিষয়ের) যে স্থিতিশীল রূপ (আমাদের অধিকারে) আসিয়াছে।* / যাহা উপদেশ পরম্পরা রূপে আছে। (ব.শ.)। **৩.** উপদেশপরম্পরার আধার, লোকক্রমাগত কথা, পূর্ব্ববৃত্তান্ত, প্রাচীন কথা, পৌরাণিক বিষয় বা উপাখ্যান, পুরাবৃত্ত উপনিবদ্ধপ্রায় গ্রন্থ, পুরাবৃত্ত, মহাভারতাদি, বৃত্তান্ত, বিবরণ। (ব.শ.)। **৪.** history অর্থে প্রচলিত। **৫.** ইত শব্দের অর্থ গত। তার গতিশীলতাকে অর্থাৎ ইত ইত করে তার চলতে থাকলে, তাকে বলে ইতি। সেই ইতি যখন একটি স্থিতিশীল রূপ নেয়, তখন তা ইতিহ। অমরকোষ টীকার উল্লেখ করে ব.শ. জানিয়েছেন — 'ইতি হ (এবং কিল) আস্তে', এই হল ইতিহাস। পাশ্চাত্যের history শব্দের অভ্যন্তরস্থ ধারণার থেকে এই ইতিহাসের এলাকা বেশ খানিকটা বড় বলেই মনে হয়। তাছাড়া, যাতে 'ইতিহ' থাকে, তাকেই ঐতিহ্য বলে, যা কিনা ইতিহাসের একটি স্থির রূপ। 'ইতিহাস' শব্দটিকে আমাদের পণ্ডিতেরা এভাবেই জানতেন, এবং সেসব ইতিহাস তাঁরা লিখেও রেখে গেছেন। তা সত্ত্বেও একালের ঐতিহাসিকেরা মনে করেন 'ভারতের কোনো ইতিহাস নাই, অন্তত লিখিত কোনো ইতিহাস'। অর্থাৎ মহাভারতাদি গ্রন্থগুলিকে তাঁরা ইতিহাস বলে মনে করেন না। কারণ পশ্চিমী ব্রিটিশ পণ্ডিতেরা ওগুলিকে ইতিহাস বলে মানতে রাজি হননি। দোষ তাঁদেরও নয়। কারণ মহাভারতাদিতে লিখিত বয়ানের মানে কী, তা তাঁদেরকে বোঝানো যায়নি। তার কারণ, সেগুলির মানে কীভাবে বুঝতে হয়, সেকথা ভারতীয়রাই ভুলে গিয়েছেন। সেই স্মৃতি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্যই এই শব্দকোষ সংকলন করা হয়েছে।

উদাস, উদাসী, উদাসীন : **১.** উদ্ + ✓আস্ + অ (অচ্) - ক; উদ্ + ✓আস্ + ইন্ (ণিনি) - ক; উদ্ + ✓আস্ + আন (শানচ্) - ক। (ব.শ.)। **২.** *উদাস = উদ্‌লোকে নিবদ্ধ (মানসিক) অস্তিত্ব যাহার; উদাসী = উদ্‌লোকে নিবদ্ধ (মানসিক) অস্তিত্বের গতিশীল আধার যে; উদাসীন = উদ্‌লোকের দিকে তাকিয়ে আসীন (নিজের আসনে বসে আছে) যে (এবং ডাইনে-বাঁয়ে বা অন্যত্র দেখছে না)।* / উদাসীন = বিবদমান পক্ষদ্বয়ের কোনো পক্ষই যে আশ্রয় করে না; যে-রাজা, মিত্র রাজার পরবর্ত্তী এবং উপকারী বা অপকারী নহে; যে রাজা, অরি, বিজিগীষু ও মধ্যম রাজার প্রত্যেকের নিগ্রহে সমর্থ। (ব.শ.)। **৩.** বিষয়বিতৃষ্ণ, গৃহত্যাগী, আসক্তিহীন, লক্ষ্মীছাড়া, সম্বন্ধরহিত, নিরাশ, আত্মহারা, সংসারবিরাগী, বান্ধবহীন, দৃক্‌পাতহীন, রিক্ত ... ইত্যাদি; বিরক্ত, গৃহশূন্য, কুলত্যাগী, নিরাকুল, অধীর, সন্ন্যাসী, বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসী, ... ইত্যাদি; উপেক্ষক, নির্লিপ্ত, মান-অপমানে সমবৃত্ত, কূটস্থ, নিস্পৃহ, নিরাশ্রয়, নিঃসম্পর্ক, পক্ষপাতশূন্য জন, মিত্র রাজার পরবর্তী রাজা। (ব.শ.)। **৪.** careless বা apathetic অর্থে প্রচলিত। **৫.** শব্দ তিনটির আরও অনেক অর্থ দিয়েছেন ব.শ.। এখানে প্রথম অর্থগুলি নেওয়া হল। প্রতিটি অর্থই শব্দটির (আমাদের দেওয়া) ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। প্রথম অর্থ অবশ্যই সংসারবিরাগী-বিষয়বিরাগীদের বোঝায়, যাঁরা বসে থাকেন দৃশ্য পৃথিবীতে, কিন্তু তাঁদের মন এখানে থাকে না; সে গিয়ে বসে থাকে উদ্‌লোকে। আর, দ্বিতীয় অর্থ হল — '... প্রত্যেকের নিগ্রহসাধনে সমর্থ' যে-রাজা, সে তো খুবই বিপজ্জনক! অথচ মেধাতিথিকে উদ্ধৃত করে বঙ্গীয় শব্দকোষ জানাচ্ছেন, তেমন রাজাই উদাসীন। তার মানে প্রাচীন ভারতে 'উদাসীন' খুব একটা নিরামিষ শব্দ ছিল না, এখন যতটা মনে হয়। কেননা, উদাসীন রাজা চাইলে যেকোনো সময় নিগ্রহ করতে পারে, কিন্তু যেহেতু নিগ্রহ করা তার পক্ষে অতি সহজ কাজ, তাই সে চুপচাপ দ্যাখে, এমনভাবে যেন সে কিছুই দেখছে না। সিংহও অনেক সময় এইরকম আচরণ করে থাকে। কিন্তু এরকম ভাবকে উদাসীন বলা হয় কেন? বলা হয় এইজন্য যে, সে তো উদ্ লোকে আসীন, এমনিতেই উপরে বসে আছে; চাইলেই সরোষে নেমে এসে আছড়ে পড়তে পারে যাকে নিগ্রহ করা দরকার তার ওপর। কারণ, সে উদ্-আসীন, উপরে আসীন।

উপাসক, উপাসনা : **১.** উপ + ✓আস্ + অক (ণ্বুল) - ক; উপ + ✓আস্ + অন (যুচ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *উপ (উপ্‌রি) আসন করে যে; উপ (উপ্‌রি) আসন করা যাহাতে।* **৩.** পূজক, সেবক, ভৃত্য, শূদ্র, বুদ্ধের সাধারণ উপাসনাকারক; সগুণব্রহ্ম বিষয়ক মানসব্যাপার-বিশেষ, শাণ্ডিল্যবিদ্যাদি, সেবা,

পরিচর্য্যা, ছন্দানুবৃত্তি, সাধ্যসাধনা, খোসামোদ। (ব.শ.)। ৪. prayer বা 'ঈশ্বরের বা ঠাকুর-দেবতার আরাধনা' অর্থে প্রচলিত। ৫. ব.শ. জানিয়েছেন, উপাসক শব্দের বিপরীত শব্দ হল 'ভিক্ষু'। প্রাথমিক ভাবে মনে হতে পারে, যেহেতু বুদ্ধের উপাসনাকারীদের দুটি ভাগ ছিল — 'সাধারণ উপাসনাকারক' ও 'ভিক্ষু', সেই কারণে ব.শ. এইরূপ উল্লেখ করে গেছেন। তাছাড়া, উপ মানে সান্নিধ্য, সামীপ্য হলে, যারা বুদ্ধের কাছাকাছি আসীন বা থাকছে, ঘোরাফেরা করছে, তারা উপাসক-পদবাচ্য হয়; আর যারা দূরে দূরে চলে যাচ্ছে, 'শ্রমণ' হিসেবে নানা মানুষের মধ্যে এবং তাদের দেওয়া ভিক্ষার ওপর নির্ভরশীল হয়ে দিনাতিপাত করছে, তারা 'ভিক্ষু' পদবাচ্য হয়। সেভাবেও 'উপাসক'-এর বিপরীত শব্দ 'ভিক্ষু' হতে পারে। **উঞ্ছশিল** ও যতি শব্দ থেকে আমরা জানতে পারি, সেকালে ভিক্ষাবৃত্তি কিন্তু আদৌ 'ওঁছা' ব্যাপার ছিল না, অত্যন্ত মহৎ শব্দ ছিল।

তবে যে মুহূর্তে জানা যাবে, বুদ্ধের যুগেও প্রচলিত ভাষার চরিত্র তখনও অনেকটাই ক্রিয়াভিত্তিক ছিল, আজকের মতো সম্পূর্ণ প্রতীকী হয়ে যায়নি, তখনই প্রশ্ন দেখা দেবে — উপাসনা শব্দের ভিতরে কী এমন ব্যাপার রয়েছে যে, তার বিপরীত শব্দ রূপে 'ভিক্ষু' শব্দটি সসম্মানে সেকালে প্রচলিত হতে পারল? তখন জানা যাবে, সেকালের মানুষের শরীর বাঁচানোর তিনটি সমাজস্বীকৃত পন্থা ছিল — আসন করা, উপাসনা করা, ও ভিক্ষাবৃত্তি করা। যে আসন করে খায় না, উপাসনা করেও খায় না, সে ভিক্ষাবৃত্তি করে খায়। আসন করা কীরূপ ব্যাপার আগেই বলা হয়েছে (দ্র. **আসন**), ভিক্ষাবৃত্তি কাকে বলে সবাই কমবেশি জানেন। কিন্তু উপাসনা কেমন ব্যাপার তা বেশ রহস্যপূর্ণ। **'উপ'** উপসর্গটির অর্থ থেকে জানা যায়, যে কোনো মুখ্য ক্রিয়ার সঙ্গে যদি উপ্‌রি কোনো ক্রিয়া চলে, তাকেই 'উপ' উপসর্গটি শনাক্ত করে, যা কিনা মূল ক্রিয়ার সান্নিধ্যে বা সামীপ্যেই ঘটে। সেই সুবাদে প্রতিটি সমাজস্বীকৃত পেশাই আসন করে খাওয়া। আর, সেই পেশার সঙ্গে উপরি যে কাজ করা হয়, সেগুলিই হল উপ-আসন করে বা উপাসনা করে খাওয়া। যেমন কেউ শিক্ষকতার পাশাপাশি সবজিবাগান করতে পারেন, শিক্ষকতা তাঁর আসনা, সবজিবাগান চাষ করা তাঁর উপাসনা। কেরানির নির্ধারিত কাজের বাইরে ঘুষ খেয়ে কাজ করাও উপাসনা। দিনের বেলা কিছু একটা করা এবং রাতে চুরি-চামারি করাও একধরনের উপাসনা। মোট কথা, মূল পেশাকে আসনা এবং উপ্‌রি পেশাকে উপাসনা বলে।

আ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : আ, আ-কার, আনাচ-কানাচ, আবিঃ, আবির্ভবন, আবিষ্করণ, আবিষ্কার, আবিষ্কর্ত্তা, আবিষ্কারক, আবিষ্কৃত, আবিষ্কৃতি, আবিষ্ক্রিয়া, ওতপ্রোত, হাকলবিকল (আকুলব্যাকুল), হাকুলি, হাকুলিবিকুলি, হাকুলিব্যাকুলি।

আ : উপসর্গ রূপে আ-এর ব্যবহার বহু। আকার, আকাশ, আচার ইত্যাদি থেকে আসমুদ্রহিমাচল পর্যন্ত অনেক শব্দই এর অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই উপসর্গযুক্ত শব্দগুলিকে তাদের মূল ক্রিয়ার বংশেই রাখলাম। এখানে উদাহরণ স্বরূপ একটি মাত্র শব্দকে রাখা হল, যা একটু বিশেষ ধরনের — **ওতপ্রোত**। নীচে দেখুন।

আবির্ভবন (আবির্ভাব) : ১. আবিস্ + ✓ভূ + অন (ল্যুট) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *সত্তার বিশেষত্ব রহে যে হওয়নে।* ৩. প্রকাশ, দৃষ্টিগোচরতা, দেবাদির নরাদিরূপে প্রকাশ, অবতার, উপস্থিত, প্রকটিত, অভিব্যক্ত, উৎপন্ন, উদ্ভূত, অবতীর্ণ। বিপরীত শব্দ 'তিরোভাব'। (ব.শ.)। ৪. sudden appearance অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **অনুভব**। তিনটি শব্দ — আবিস্, পুরস্, তিরস্। আবিস্-এর অর্থ হল সত্তার বিশেষ অস্তিত্বন্; আর তিরস্ অর্থ হল তারণ-গতি রহে যে অস্তিত্বে। দুটো শব্দের ভিতরেই '*হঠাৎ*'-বোধ রয়েছে। আবিস্-এর ক্ষেত্রে *হঠাৎ*-আসা এবং তিরস্-এর ক্ষেত্রে *হঠাৎ*-যাওয়ার একটা বোধ কাজ করে। এরা যদিও উপসর্গের মতোই প্রযুক্ত হয়, এদের 'উপসর্গ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়নি। তার কারণ সম্ভবত শব্দদুটির সীমাবদ্ধতা। আমরা দেখেছি, 'করা' ও 'হওয়া' ভিন্ন অন্য ক্রিয়ার সঙ্গে এদের প্রয়োগ দেখা যায় না বললেই চলে। (তিরোধান ও তিরোভাব প্রায় একই কথা, রইল বাকি তির্য্যক।)। সেই কারণে আবিস্ শব্দটিকে আমরা নিপাতে রেখেছি। তা সে যাই হোক, এর অর্থ হল, অস্তিত্বধারীর (আ) বিশেষ (বি) রূপলাভ (স্)। আর্বিভাব অতএব এমন একটি ভবনের বা হওয়নের হওয়ন-ব্যাপার (ভাব) যে, তাতে সেই সত্তার বিশেষত্ব সামনে উপস্থিত হয়েছে। দ্র. **তিরস্**।

আবিষ্করণ (আবিষ্কার) : ১. আবিস্ + ✓কৃ + অন (ল্যুট) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *সত্তার বিশেষত্বকে রূপায়িত করা হয় যাহাতে* / যাহার দ্বারা প্রকাশ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. প্রকাশন, প্রকটন, গোচরীকরণ, প্রদর্শন। (ব.শ.)। ৪. discovery অর্থে প্রচলিত। ৫. একটি সত্তার অস্তিত্বের নানা দিক রয়েছে। তার বিশেস দিককে উদঘাটিত করে রূপায়িত করে ফেললে, সেটিই হয় আবিষ্কার। বারুদের নানা দিক আছে, কিন্তু তার ঘর্ষণজনিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সম্ভাবনার দিকটিকে উদঘাটিত করে রূপায়িত করে ফেললে, তাতেই আগুন সৃষ্টি করে ফেলা যায়। তবে আবিষ্কারের এ হল অতি ক্ষুদ্র বাহ্যিক দিক। এর মহৎ মানসিক দিক রয়েছে।

প্রচলিত জ্ঞান ও কর্মের একটি এলাকা থাকে, বৃত্ত থাকে। সেই বৃত্ত দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু বাড়ে কীভাবে? বাড়ে সমাজেরই কিছু মানুষ সেই পরিধির উর্ধ্বসীমালঙ্ঘন করে নতুন এলাকায় পা রাখেন, খানিকটা অজানা এলাকাকে জানা এলাকার পরিধির মধ্যে নিয়ে আসেন; কিংবা বলা ভাল পরিধির রেখাটিকে তাঁদের নতুন জানা এলাকার ওপারে ঠেলে দেন। এভাবেই মানুষের সমাজের জ্ঞানের এলাকা বাড়ে। তবে এই যে জ্ঞানের এলাকা বৃদ্ধির কাজ, তার একটি দিক দৈহিক ও অপরটি মানসিক। দৈহিক দিকটির উর্ধ্বসীমালঙ্ঘনকে আবিষ্কার (discovery) বলা হয়, এবং মানসিক দিকটির উর্ধ্বসীমালঙ্ঘনকে উদ্ভাবন (invention) বলে। আর, এই দুটি কাজই যিনি করেন, বাংলাভাষায় তিনি 'ব্রহ্মলাভ' করেন, **ব্রাহ্মণ** হয়ে যান। তারপর সেই জ্ঞানকে কর্মের সঙ্গে যোগ করে দিতে পারলে তিনি হয়ে যান জ্ঞানকর্মের অগ্নিশিখাবহনকারী **শিব**। সেই

কারণে বাংলাভাষায় আবিষ্কারক বা উদ্ভাবক মাত্রেই শিব-পদবাচ্য, ব্রহ্মাণ্ডগুণসম্পন্ন-ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। দ্র. **তিরস্**।

ওতপ্রোত : ১. ওত + প্রোত। ওত = আ + ✓বে + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে; প্রোত = প্র + ✓বে + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যা টানায় (হরাইজন্টাল) এবং পোড়েনে (ভার্টিকালে) গাঁথা।* / যাহা উর্দ্ধ তন্তুতে (তানার সুতায়) গ্রথিত ও তির্য্যক তন্তুতে (প'ড়নের সুতায়) পটবৎ সংমিশ্রিত। (ব.শ.)। ৩. পটতন্তুর ন্যায় তির্য্যগ-উর্দ্ধভাবে অনুস্যূত, পরস্পর অনুস্যূত বা অন্তর্ব্যাপ্ত (মেশামেশি)। (ব.শ.)। ৪. মেশামেশি অর্থে প্রচলিত। ৫. বাংলা ভাষা কী ছিল, আর কী হয়েছে, তার সাক্ষাৎ উদাহরণ 'ওতপ্রোত' শব্দটি। যা হরাইজন্টালি ও ভার্টিকালি সেলাই করে রাখা আছে, তাই হল ওতপ্রোত। আমরা এখন হরাইজন্টাল বুঝি, তানায় (বা টানায়) বুঝি না; ভার্টিকালি বুঝি, প'ড়ন বুঝি না; এমনকি উর্দ্ধতন্তু ও তির্য্যক তন্তুও বুঝি না। অথচ ওত মানেই ছিল 'উর্দ্ধতন্তুতে গ্রথিত'; এবং প্রোত মানে ছিল 'তির্য্যক তন্তুতে গ্রথিত'। এখনও আমরা 'ওতপ্রোত' শব্দটি ব্যবহার করি, কিন্তু তার মানে করি মেশামেশি। আর তাছাড়া এভাবে নিজেদের মূল্যবান শব্দসকল হারিয়ে ফেলায় এখন 'হরাইজন্টাল' (তানা/টানা/তির্য্যক/প্রোত) ও 'ভার্টিক্যাল' (প'ড়ন/পোড়েন/উর্দ্ধ/ওত) শব্দের ঠিকঠাক বাংলা অনুবাদও করতে পারি না, যদিও চার রকমে মানে করার মতো শব্দ আমাদের ছিল।

ই

ই বর্ণের অর্থ = অস্তিত্বের বিকাশসাধন করে যে; গতিশীল করে যে; এগিয়ে চলা বা বিকাশন বা গতিশীল করা অর্থাৎ চলমানতা। ইংরেজির ing-এর i ওই ই-এর উত্তরাধিকার, যা তাদের ক্রিয়ার চলমানতা বোঝাতে সর্বদা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ই : অ-এর অর্থে জলবিন্দুর ভিতরে প্রাণের অস্তিত্বের কথা আমরা আগেই জেনেছি — জলবিন্দুর ভিতরে জোনাকির আলো জ্বলছে নিভছে। সেটিই 'অ'। এবার ভাবুন, একটি জলবিন্দুর ভিতরে জোনাকির আলো জ্বলে উঠেই নিভে গেল। আর তৎক্ষণাৎ ঠিক তার পাশে আর একটি জলবিন্দুতে ফুটে উঠল জোনাকির আলো, এবং তখনই নিভেও গেল। এভাবে যদি এক সারিতে সাজানো জলবিন্দুতে পর পর আলোর জ্বলা ও নেভা চলতে থাকে, তাহলে আমরা আলোর একটি গতি দেখতে পাব। প্রথম জলবিন্দু থেকে শেষ জলবিন্দু পর্যন্ত যা মুহূর্তে পৌঁছে যাচ্ছে। একেই বলে 'ই'। এই কারণে 'ই' বর্ণের অর্থে 'যাওয়া' বোঝানো হয়ে থাকে। দ্র. **ঈ**।

ই বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : ই, ইন্দ্ *(ইঙ্গ্)*, ইন্ধ্, ইষ্ = ৪ + ০

'ই' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতীত, অতীতবেদী, অত্যয়, অতিদূর, অতিব্যয়, অতিরেক, অদূর, অদূরদর্শী, অদূরবর্ত্তী, অধীত, অধ্যয়ন, অধ্যাপক, অধ্যাপনা, অধ্যায়, অনতীতবাল্য, অনধীত, অনধ্যয়ন, অনধ্যায়, অনপায়, অনপায়ী, অনপেত, অনভিপ্রেত, অনায়স, অনায়ুষ্য, অনুপেত, অনেক, অনেকচিত্ত, অনেকজ, অনেকপ, অনেকমুখ, অনেকশফ, অনেকাশ্রিত, অনৈক্য, অন্যায়, অন্যায্য, অন্ববায়, অন্বয়, অন্বয়ব্যতিরেক, অন্বয়ব্যাপ্তি, অন্বয়মুখ, অন্বয়াগত, অন্বিত, অপব্যয়, অপয়া, অপায়, অপেত, অপ্রতীক, অপ্রতীত, অপ্রত্যয়, অব্যয়, অব্যয়ীভাব, অভিপ্রায়, অভিপ্রেত, অভ্যুদয়, অভ্যুদিত, অয়্, অয়, অয়ং, অয়ঃ, অয়ঃকণ, অয়ঃকণপ, অয়ঃপান, অয়ঃপিণ্ড, অয়ঃপ্রতিমা, অয়ঃশঙ্কু, অয়ঃশূল, অয়ন, অয়নকাল, অয়নবৃত্ত, অয়নভাগ, অয়নাংশ, অয়নান্ত, অয়নান্তবৃত্ত, অয়স, অয়স্কান্ত, অয়স্কুম্ভ, অয়স্কৃতি, অয়ান্বিত, অয়ি, অয়ে, অয়োগুড়, অয়োগুল, অয়োঘন, অয়োজাল, অয়োধাতু, অয়োময়, অয়োমল, অয়োমুখ, অয়োহৃদয়, অসহায়, আউ, আগঃ, আগস, আতিরৈক্য, আত্যয়িক, আপায়, আয়, আয়স, আয়স্থান, আয়ান, আয়ু, আয়ুঃ, আয়ুর্দ্রব্য, আয়ুর্ব্বল, আয়ুর্বৃদ্ধি, আয়ুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদিক, আয়ুষ্কর, আয়ুষ্কাম, আয়ুষ্কাল, আয়ুষ্টোম, আয়ুষ্মত্তা, আয়ুষ্য, আয়ুদ্ধার, আয়ুষ্মান, আয়োদধৌম্য, ই, ইঃ (ইস্, এঃ), ইক, ইকড়ি, ইকড়ি-মিকড়ি, ই-কার, ইন্ধ্, ইঙ্গ, ইড়া, ইত, ইতঃ, ইতঃপর, ইতঃপূর্ব্বে, ইতবার, ইতর, ইতরতঃ, ইতরবিশেষ, ইতরাম, ইতরামি, ইতরেতর, ইতলা (ইতি-ইলা, এত্তেলা), ইতস্তত, ইতস্ততঃ, ইতি, ইতিউতি, ইতিকথ, ইতিকথা, ইতিকরণীয়, ইতিকর্ত্তব্য, ইতিকার্য্য, ইতিকৃত্য, ইতিবৃত্ত, ইতিমধ্যে, ইতিমাত্র, ইতিহ, ইতিহাস, ইতু, ইতে, ইতোমধ্যে, ইত্যবকাশে, ইত্যবসরে, ইত্যাকার, ইত্যাকারক, ইত্যাদি, ইত্বর, ইথম্, ইথি, ইথিউথি, ইথে, ইদং, ইদম, ইদানীং, ইদানীন্তন, ইন (ইনতিজার, ইনকাম), ইনি, ইব (ইব্‌নে), ইভ, ইভাবলি, ইভেন্দ্র, ইভ্য, ইম, ইমন, ইমু, ইমো, ইয়ান, ইয়ৎ, ইয়ত্তা (এত্তা), ইরম্মদ, ইরা, ইরাক, ইরাকী, ইরাণ, ইরাণী, ইরাবত, ইরাবতী, ইরাবান, ইল, ইলবিলা, ইলা (অয়লান), ইলাকা (এলাকা), ইলাবৃত, ইলাহী (এলাহি), ইলিবিলি, ইলিমিলি, ইলিশ, ইল্লত, ইল্লিশ, ইল্বল, ইলশেগুঁড়ি, ইশ্, ইস্, ইস্তক, ইহ, ইহকাল, ইহজীবন, ইহলোক, ইহলৌকিক, ইহা, ইহাউহাতাহা (এ-ও-তা), ই-উ-সে (এ-ও-সে), ইহামুত্র, ইহার, উদয়, উদয়ন, উদয়াস্ত, উদিত, উপাধ্যায়, উপায়, উপেত, এই, এইক্ষণ, এইখানি, এইখানে, এইজন, এইটা, এইটি, এইবার, এইমত, এইস্থান (এখান), এইস্থানে, এও, এক, এক-আড়া, এক-আনী, এক-আন্দাজ, একই, এক-ঐক্য, একক, এককাট্টা, এককাটি, এককাঠি, এককান, এককার্য্য, এককাল, এককালিক, এককালীন, একক্ষণ, একক্ষীর, একখান, একখানা, একখানি, একখুর, একগলা, একগাছ, একগাছা, একগাড়, একগাল, একগুঁয়ে, একগুটি, একগুরু, একগোটা, একগ্রামীণ, একগ্রামীয়, একগ্রাসী, একঘর, একঘেয়ে, একঘ্নী, একচক্র, একচক্রবর্তী, একচক্ষু, একচত্বারিংশৎ, একচর, একচল্লিশ, একচাপ, একচারী, একচালা, একচিত্ত, একচিন্তন, একচুল, একচেটিয়া, একচেটে, একচেতাঃ, একচোখো, একচোট, একচ্ছত্র, একচ্ছায়, একছত্র, একছিলিম, একছুট, একচ্ছত্র, একজ, একজটা, একজাই, একজাতি,

এই শব্দার্থকোষ কীভাবে পড়তে হয়, তা জানার জন্য 'ভূ-১' পৃষ্ঠা দেখুন। সংক্ষিপ্ত আকারে তা ১ পৃষ্ঠাতেও পাওয়া যাবে।

একজাতীয়, একজায়, একজুট, একজুটি, একজোট, একজ্বরী, একট, একড়, একটা, একটানা, একটি, একটু, একটুক, একটুকু, একঠাঁই, একডৌল, একঢাল, একতঃ, একতন, একতন-যেকতন, একতন্ত্রী, একতর, একতরফ, একতলা, একতালা, একতা, একতান, একতারা, একতাল, একতালা, একতালী, একতীর্থী, একত্তর, একত্রিংশৎ, একত্রিত, একত্রিশ, একত্রে, একত্রেতে, একত্ব, একদংষ্ট্র, একদন্ত, একদম, একদা, একদৃক, একদৃশ, একদৃষ্টি, একদেশ, একদেহ, একধর্ম্মা, একধর্ম্মী, একধা, একধার, একনবতি, একনাথ, একনরাধিপ, একনিশ্চয়, একনিষ্ঠ, একনীড়, একপক্ষ, একপঙ্‌ক্তিক, একপঞ্চাশৎ, একপতিকা, একপত্নীব্রত, একপত্নীব্রতী, একপদ, একপাটা, একপার্থিব, একপিঙ্গ, একপিণ্ড, একপুরুষ, একপ্রস্থ, একফল, একফাল, একফালি, একফুট, একবচন, একবয়সী, একবর্ণ, একবস্ত্র, একবাক্য, একবাদ, একবার, একবাল, একবাস, একবিংশতি, একবিধ, একবীর, একবেণি, একবেণী, একবেলি, একবেশ্ম, একব্যবসায়ী, একব্যূহ, একভক্ত, একভাব, একভার্য্যা, একভিত, একভূত, একভূম, একভূমিক, একভোজন, একমত, একমতি, একমন, একমনাঃ, একমাত্র, একমাত্রিক, একমিশ, একমুখ, একমুঠা, একমুঠো, একমেটে, একমেবাদ্বিতীয়ং, একমেলি, একযষ্ঠি, একযষ্টিকা, একযাই, একযূথ, একযোক্ত, একযোগ, একযোনি, একরকম, একরঙা, একরঙ্গ, একরত্তি, একরস, একরাজ, একরাত্র, একরাশ, একরূপ, একরোখা, একল, একলপ্ত, একলষেঁড়ে, একলা, একলাই, এক-লাগাড়, একলি, একলী (অকেলী), একশ, একশত, একশফ, একশয়ন, একশরী, একশিঙা, একশিরা, একশৃঙ্গ, একশেষ (excess), একশ্রুতধর, একশ্রুতি, একশ্বর, একষট্টি, একষষ্ঠি, একসংশ্রয়, একসংস্থ, একসপ্ততি, একসর, একসা, একসাঁজ, একসাট, একসূত, একস্থ, একস্থান, একসুর, একস্বর, একস্বান্ত, একহায়ন, একহারা, একহৃদতা, একা, একাএক, একাএকী, একাএকেশ্বরী, একাংশ, একাকার, একাকী, একাকিনী, একাক্ষ, একাক্ষর, একাগ্র, একাঘ্নী, একাঙ্গ, একাজ্বর, একাতপত্র, একাত্তর, একাত্মবাদী, একাত্মা, একাদশ, একাদশদ্বার, একাদশী, একাদিক্রমে, একাধিপতি, একানব্বই, একানীয়া, একান্ত, একান্তর, একান্তিক, একান্তী, একান্দাজ, একান্ন, একান্ন, একাবলি, একাম্রকানন, একাম্রকবন, একায়ন, একার্ণব, একার্থ, একাশী, একাশীতি, একাশ্রয়, একাহ, একাহার, একিদা (অকঈদহ), একীকরণ, একু, একুই, একুইতি, একুশা, একুন, একুনে, একুশ, একে, একেক, একেবারে, একেলা, একেলে (ই-কেলে), একেশ্বর, একৈক, একোদক, একোদর, একোদ্দিষ্ট, একোন, একোনপঞ্চাশৎ, একোহি, এক্কা, এক্কে, এখনে, এখান, এখুনি, এগ, এগার, এঙ্কার (ইনকার), এজন, এজন্য, এটা, এটি, এণ, এত (এত্তা), এত, এতক, এতটুকু, এতৎ, এতৎকালীন, এতৎপরিমাণ, এতদ্, এতদর্থ, এতদবস্থ, এতদ্দেশ, এতদ্রূপ, এতনি, এতন্মধ্যে, এতবার, এতবার (ইতইবার), এতমম, এতমাম (ইহতিমাম), এত্তেলা (ইত-ত-ইলা), এতহি, এতহুঁ, এতা, এতাদৃক, এতাদৃশ, এতাধিক, এতানি, এতাবতা, এতবান, এতে, এতেক, এথা, এথাকার, এথাতে, এথায়, এথেক, এদানী, এদিক, এনঃ, এনা, এনারা, এন্তকাল (অন্তকাল, ইন্তকাল), এব, এবং, এবং, এবঞ্চ, এবমস্তু, এবম্প্রকার, এবম্বিধ, এবম্ভূত, এবার, এবিধ, এবে, এমত, এমতন, এমতি, এমন, এমনই, এমনি, এমন্ত, এর, এরপর, এরূপ, এরে, এলাকা (ইলাকা), এলাকাড়ি, এহ, এহন, এহনা, এহা, এহি, এহেন, এহো, এহোঁ, এহ্মান, ঐকতান, ঐকপত্য, ঐকমত্য, ঐকাগ্র্য, ঐকাত্ম্য, ঐকান্ত, ঐকান্তিক, ঐ-কার, ঐকাহিক, ঐক্য, ঐক্যতা, ঐছন, ঐছে, ঐণ, ঐণেয়, ঐতরেয়, ঐতিহাসিক, ঐতিহ্য, ঐমত, ঐমনি, ঐরাবণ, ঐরাবত, ঐল, ঐসন, ঐহলৌকিক, ঐহিক, ওঠে, ওথা, ওথায়, ছয়লাপ (স-ইলাব), দুরত্যয়, দুরধীত, দুরন্বয়, দূর, দূরদর্শিতা, দূরদর্শী, দূরদৃষ্টি, ন্যায়, প্রতীক, প্রতীত, প্রতীতি, প্রতীয়মান, প্রত্যয়, প্রায়, প্রায়শ্চিত্ত, প্রেত, প্রেতপতি, প্রেতিনী, প্রেতলোক, বই (বৈ, ব্যতীত), বিপরীত, বিপর্য্যয়, বীত, বীতরাগ, ব্যতীত, ব্যত্যয়, ব্যয়, শতায়ুঃ, সপ্রত্যয়, সমন্বয়, সমবায়, সমবায়ী, সমবেত, সময়, সময়ানুবর্ত্তী, সময়োচিত, সমিত, সমিতি, সমুদয়, সমুদায়, সমুদিত, সমুপেত, সহায়, সহায়তা, সাভিপ্রায়, সাময়িক, সাহায্য, সুদুর, সুপ্রতীক, সুপ্রতীত, হি, হিঁঅই, হিঁড়োর।

ই = (ক্রিয়ার) গতিদান (গত্-ই = গতি, এভাবেই বলি, করি, ধরি, মারি ইত্যাদি) = অয় = অস্তিত্বের ইঅ (যাওয়া, চলা) যাহাতে। (-i-ng)।

ই : ১. অস্তিত্বের বিকাশসাধন। ২. ই = অস্তিত্বের বিকাশশীলতা; (ক্রিয়ার) গতিদান (গত্-ই = গতি, এভাবেই বলি, করি, ধরি ইত্যাদি) = অয় = অস্তিত্বের ইঅ (যাওয়া, চলা) যাহাতে। *অ হল কেবল থাকা, আর ই হল 'বাড়তে থাকা'।* ৩. 'যাওয়া' ক্রিয়া। ৪. (গত্ + ই) গতি, (বল্ + ই) বলি, (কর্ + ই) করি, কিংবা সে-ই, তুমি-ই, — এই সমস্ত ই-গুলির ভিতরে যে গমনশীলতা রয়েছে, তাকে বোঝাতে এখনও এই ই সর্বদা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৫. 'ই' হল আদি একাক্ষরী ক্রিয়াপদ। যদিও 'ই'-র অর্থ 'যাওয়া' বলা হয়ে থাকে। সম্ভবত আদিতে, যখন মানুষ অ-ই-উ (অং, ইং, উং — ধ্বনিটি খানিকটা অঁ-অঁ ইঁ-ইঁ উঁ-উঁ ধ্বনির মতো) ছাড়া আর কিছুই উচ্চারণ করতে পারত না, স্বরের বিশেষ বিকাশই হয়নি, তখন নানা সুরে ও উচ্চ-অনুচ্চ উচ্চারণের নানারকম বদলের দ্বারা একটি মাত্র 'ই' ধ্বনির সাহায্যেই নানারকম ক্রিয়াকে বোঝানো হত। পরবর্তীকালে 'ই'-র অর্থ কেবলমাত্র 'ধারণ করে বিকাশসাধন করা বা গতিশীল করা' বোঝাতেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ক্-তে অ জুড়লে যে 'ক' হয়, এবং তার মানে হয়, 'করে যে'। এক্ষেত্রে 'অ' হল ক্-ক্রিয়াটির কেবলমাত্র ধারক। কিন্তু ক্-তে 'ই' জুড়লে হওয়ার কথা 'কি' এবং তার অর্থ হওয়ার কথা 'করণের ধারণ ও বিকাশসাধন করে যে'। এটি আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, যখন 'গতি', 'বলি', 'করি', প্রভৃতি শব্দগুলির সাহায্যে সেই ক্রিয়াটির চলমানতা বা কনটিনিউয়েশনকে বোঝাই। ক্রমান্বয়ে গত হতে থাকাই গতি, ক্রমান্বয়ে বলা হতে থাকাই বলি ... ইত্যাদি। এই যে **ই** বা গতি, এর পাশাপাশি রয়েছে আরও দুটি কথা — **গ** (গমন) ও **য** (যাওয়া)। এগুলিকে বোঝার জন্য মানুষের হাঁটার বিজ্ঞানটি ভাল করে অনুধাবন করা চাই। আমাদের হেঁটে চলার সময় এক-পা যখন গতিশীল (ই-তে) থাকে, অন্য পা তখন স্থিত (অ-তে) থাকে। এই **ই** + **অ** জুড়ে হয় **য** (যাওয়া)। তার মানে **ই** = গতিমাত্র; **গমন** = ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দু পর্যন্ত

বিরতিহীন গতি; **যাওয়া** = প্রতি পদে গতি ও স্থিতির মাধ্যমে ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দু পর্যন্ত গমন। তিনটি ক্ষেত্রেই ই-ক্রিয়াটি বিদ্যমান থাকে। ৬. ইংরেজির ing এর মধ্যে যে চলমানতা রয়েছে, তার রহস্যরূপটি ng, কিন্তু চলাটি i-এর মধ্যে ধৃত। দ্র. **ইঙ্গিত**।

অতীত : দ্র. **অত্**।

অধ্যাপক, অধ্যাপনা : দ্র. **অধি, ধা**।

অধ্যায় : ১. অধি + ✓ই + অ (ঘঞ্) ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অধি চলে যাহাতে; অথবা মনে মনে যাওয়া (অধিগমন) চলে যাহাতে।* ৩. অধ্যয়ন, পাঠ, আবৃত্তি, অধ্যয়নবিধি। বেদ। বিষয়বিশেষের পাঠযুক্ত গ্রন্থাংশ, পরিচ্ছেদ। পাঠক, অধ্যেতা। (ব.শ.)। ৪. chapter বা 'পরিচ্ছেদ' অর্থে প্রচলিত। ৫. এখানে একটি মাত্র ব্যুৎপত্তি দেখানো হয়েছে, ব.শ. চার রকম ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন এবং উপরোক্ত অর্থগুলি করেছেন। আমরা কিন্তু দেখছি, শব্দটির উল্লিখিত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি পাঠ-পাঠক-পাঠাংশ সবগুলিকেই বোঝাতে পারে। দ্র. **অধি, উপাধ্যায়**।

অন্যায় : ১. অ + নি + ✓ই + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। ২. *ন্যায় (যে যাওয়া পূর্বে ঘটেছে = পূর্বের মতো) নাই যাহাতে। / নেই* ন্যায় ('উচিত হইতে অচলন') যাহাতে। (ব.শ.)। ৩. ন্যায়হীন, অনুচিত, বিচারহীন, অসঙ্গত, প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়ববহীন, ন্যায়াভাব, অবিচার, অনৌচিত্য, ন্যায়হীন কার্য্য, ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন, অপরাধ, দোষ। (ব.শ.)। ৪. unjustified বা অনুচিত অর্থে প্রচলিত। ৫. আগে যেমন হয়েছে তার ন্যায় করাকেই **ন্যায়** বলে। ন্যায়শাস্ত্র আসলে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়, বস্তু, ক্রিয়ার **ন্যায়** বা অনুরূপ কাজ করার ঔচিত্যবাদী শাস্ত্র। সেই সুবাদে বিশেষ কালে বিশেষ সমাজে যে মত প্রতিষ্ঠিত, তার বাইরের যে কোনো মতই সেই সমাজের চোখে **অ-ন্যায়**। এই নিয়মে 'আবিষ্কার' বা '**সীমালঙ্ঘন**' মাত্রেই প্রচলিত সমাজের চোখে অন্যায়। যেহেতু আবিষ্কার মাত্রেই নতুন, কারও **ন্যায়** নয়, সেজন্যই তা আবিষ্কার; আর সেকারণেই তা **অন্যায়**। আর অন্যায় বলেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থা তাকে মেরে ফেলতে চায়। প্রত্যেক আবিষ্কারকে সেই কারণে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনেক লড়তে হয়। কারণ, আবিষ্কার 'ন্যায়ধর্ম্মসম্মত' নয়, **অ-ন্যায়**। আর সীমালঙ্ঘন ঘটে দুভাবে। আবিষ্কারের জন্য প্রচলিতের সীমালঙ্ঘন করতে হয়। একে **উর্ধ্বসীমালঙ্ঘন** বলে। আবার যে-যুগ ফেলে চলে আসা হয়েছে, সেই যুগে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রচলিতের সীমালঙ্ঘন করে কেউ কেউ। একে **নিম্নসীমালঙ্ঘন** বলে। দুটোই অন্যায় হলেও, নিম্নসীমালঙ্ঘন সর্বদা পরিত্যাজ্য। কেননা তা মানুষকে বর্তমান থেকে পেছন দিকে হাঁটতে বলে। দ্র. **গৌরী**।

অব্যয় : ১. অ + বি + ✓ই (অচ্) - ক। (ব.শ.)। ২. *যাহার 'ব্যয়' (= বিপরীত দিকে যাওয়া) নাই*। (দ্র. **আয়**)। ৩. ব্যয়হীন, **অপক্ষয়রহিত, ক্ষয়শূন্য**, অবিনাশী, নিত্য, **শাশ্বত**, বিকারশূন্য, কৃপণ, **ন্যূনতাহীন**, অক্ষয়, বিষ্ণু, শিব; লিঙ্গে বচনে বিভক্তিতে অবিকৃত **শব্দবিশেষ**। (ব.শ.)। ৪. indeclinables অর্থে অ্যাকাডেমিক বাংলায় প্রচলিত। ৫. যার ব্যয় বা ক্ষয় নেই, বিষ্ণু বা শিব সেরকরম হতেও পারেন, কিন্তু যাকে আমরা ভুলে যাই, আমাদের ভাষার সেই শব্দেবাও 'অব্যয়', যাদের কোনো বদল হয় না, ব্যয় হয় না, বহু প্রাচীনকাল থেকে যা প্রায় অবিকল চলে আসছে। তাই ব্যাকরণে বলা হয় — 'তিন লিঙ্গে, সকল বিভক্তিতে, সকল বচনে কিছুতেই যাহার কোনো পরিবর্তন হয় না, তাহাই অব্যয়।' যেমন — ***অথচ, অথবা, অতীব, অজস্র, অকস্মাৎ, অধুনা, অন্যত্র, অন্যথা, অবশ্য, ইতস্ততঃ, ইতি, ইদানীং, ঈষৎ, উপরি, একত্র, একদা, কিঞ্চিৎ, কিন্তু, কেবল, কচিৎ, ঝটিতি, তথাপি, ধিক, নানা, নাম, পৃথক, প্রাক্, প্রায়, যথা, যাবৎ, যুগপৎ; বা, বিনা, বৃথা, সদা, সদ্য, সম্প্রতি, সহসা, সাক্ষাৎ*** ... ইত্যাদি। বাংলাভাষী এই শব্দগুলি এত অনায়াসে ব্যবহার করে থাকেন যে, তিনি যে সংস্কৃতে কথা বলছেন একথা তাঁকে বিশ্বাস করানো কঠিন। এই অব্যয় শব্দগুলি বলে দেয়, সংস্কৃত ভাষাকে প্রাচীন বাংলা বললে এতটুকু অত্যুক্তি হয় না। (দ্র. **অথচ, অথবা**)। এ বিষয়ে আমাদের রচিত (খ) গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

অভ্যুদয়, অভ্যুদিত : ১. অভি - উদ্ + ✓ই + অ (অচ্) - ক; অভি - উদ্ + ✓ই + ত (ক্ত) - ক। (ব.শ.)। ২. *অভিতে (স্বস্থিত উচ্চ অবস্থান) থেকে উদ্‌লোকে গমন করে যে।* / অভ্যুদিত = যে ব্রহ্মচারী নিদ্রিত থাকিতে সূর্য্যোদয় হয়। (ব.শ.)। ৩. উদীয়মান, প্রকাশমান, অভীষ্টকার্য্যের প্রাদুর্ভাব, উদয়, উদ্ভব, উৎপত্তি, বৃদ্ধি, সৌভাগ্যসঞ্চার, উৎসব, বৃদ্ধিনিমিত্ত শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক, চূড়াদি সংস্কার, অভ্যুদয়সাধন ইষ্টলাভ, বীর্য্য। সমুদিত, প্রকাশিত, যুগপদ্ উৎপন্ন, সম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ, সূর্য্যোদয় হেতু দোষযুক্ত (ব্রহ্মচারী) ...। (ব.শ.)। ৪. outcome বা আবির্ভাব অর্থে প্রচলিত। ৫. যে উদলোকে যায়, সে উদিত হয়, কিংবা তার উদয় হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে সে নীচে থেকে উপরে যায়। সেক্ষেত্রে সে যেন ছোটলোকের রাজসভায় প্রবেশের মতো। কিন্তু সেরকম না হয়ে কেউ যদি রাজার মতোই রাজসভায়, সকলের সামনে উদয় হয়, তবে সে হল অভ্যুদয়। এরকম হয় কেউ সসম্মানে উদিত হলে, তখন তার 'অভ্যুদয়' ঘটে। যেমন '... ওষধি, পশু, বৃক্ষ, তির্য্যক এবং পক্ষী যজ্ঞার্থ নিধন প্রাপ্ত হইলে উন্নত গতি অর্থাৎ পূর্ব্বজন্ম অপেক্ষা ভাল জন্ম লাভ করে।' (নিরুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫১)। এই নবজন্ম লাভ করা হল নিরুক্ত মতে 'অভ্যুদয়'। কাঠ এভাবে কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে টেবিলে পরিণত হলে, তার 'অভ্যুদয়' ঘটে। যাঁরা ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছেন, তাঁদের অনেকে জানেন 'আভ্যুদয়িক' আচার সমূহের কথা। সেকালের নিয়মে সেইসব আচারের পর সামাজিক-অর্থনৈতিক জগতে ব্রাহ্মণসন্তানের অভ্যুদয় হত। দ্র. **অধ্বর্য্যু**।

আয় : ১. আ + ✓ই + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে; অথবা, ✓অয় + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে; অথবা, অ + ✓ই + অ - ক কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহা (অস্তিত্বধারীর কাছে) আসে।* / যাহা স্বামীকে প্রাপ্ত হয়; স্বামী যাহা পান। (ব.শ.)। ৩. আগমন, প্রাপ্তি, লাভ, ধনাগম (বিপরীত শব্দ ব্যয়), গ্রামাদি হইতে স্বামীগ্রাহ্য লাভ, কর, স্বায়ত্ত হিরণ্য পশু ধান্য প্রভৃতি; লগ্ন হইতে একাদশ স্থান, আয়স্থান,

অন্তঃপুররক্ষক। (ব.শ.)। ৪. in-come অর্থে প্রচলিত। উল্টে নিলে come-in, যার মানে 'আয়', কাউকে আসতে বললে আমরা যে শব্দটি বলি। ৫. মানুষ যতদিন বাঁচে, ততদিন 'গ্রহণ' করে বা করতে বাধ্য হয়। আর তার গ্রহণের জন্য 'যাহা আসে' সেগুলিই আয়। এই শব্দে স্বভাবতই দৈহিক মানসিক সর্বপ্রকার আয়ই বোঝাতে পারে। বাংলার গ্রামে এখনও বড় চাষির ধান ঝাড়া হয়ে যাওয়ার পর, গোধূলিবেলায় সেগুলি সাফসুফ ও একত্রিত করে পিরামিডের মতো জমা করা হয়। তারপর একজন বয়স্ক মুনিষ হাত-পা ধুয়ে মাথায় গামছা বেঁধে নমস্কার ইত্যাদি করে 'পালি' (বেতের তৈরি ১০/১২ কেজি ধান ধরে, এমন চওড়া অগভীর ধামা) নিয়ে মাপতে বসে। সমস্ত ধান এভাবে মাপা ও গণনা করা হয় এবং হামার বা মরাইয়ে সেই মাপা-ধান তুলে রাখা হয়। এই মাপের কাজটি এমন ভাবে করা হয়, যেন কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছে। একটা শান্ত পবিত্র নিঃশব্দ ভাব আনা হয়। ধানকে, পালিকে প্রণাম জানিয়ে মাপা যখন শুরু হয়, তখন কথাবার্তা নিষিদ্ধ হয়। ছোটদের বলা হয়, 'চুপ, আয় চলছে।' এই ধান মাপার পুরো অনুষ্ঠানটিকে বলা হয় 'আয়'। দ্র. **উপায়, উপার্জ্জন**।

আয়ু, আয়ুঃ (আয়ুস্, আয়ুষ্কাল) : ১. ✓ই + উ (উণ্) - ক; ✓ই + উস্ (উসি) - ক। (ব.শ.)। ২. *আয় নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; আয় নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া স্থির যাহাতে।* দ্র. **আয়**। ৩. জীবিতকাল, প্রাণ, জীবন, পুরূরবার জ্যেষ্ঠপুত্র; প্রাণশক্তি, খাদ্য, ঘৃত, আয়ুষ্টোম যজ্ঞ। চন্দ্রবংশের রাজা। পিতা পুরূরবা, মাতা উর্ব্বশী। ইনি চ্যবন ঋষির আশ্রমে প্রতিপালিত হন। এঁর নহুষ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র হয়। রাজকন্যা প্রভাকে ইনি বিবাহ করেন। (পৌ.অ.)। দ্র. **মণ্ডুকরাজ।** ৪. lifetime বা জীবৎকাল অর্থে প্রচলিত। ৫. ই ক্রিয়া থেকে অয় হয়, তার থেকে আয়। এই আয়, যা কিছু অস্তিত্বধারীর কাছে আসে সেই সবকিছুকেই বোঝায়; তা সে জল, হাওয়া, অক্সিজেন, খাদ্যাদি যাই হোক। আসার পর সেগুলি আর স্বরূপে থাকে না, নবরূপে উত্তীর্ণ হয় — আয় হয়ে যায় আয়ু। আয় পরিণত হয় অস্তিত্বধারীর বেঁচে থাকায়, তার জীবযন্ত্রের চলমানতায়। যেন-বা আয় হল তেল, অস্তিত্বধারী সেই তেলে চলা যন্ত্র। এই যন্ত্রের চলা আর অস্তিত্বধারীর বেঁচে থাকা একই কথা। আয় যখন এই যন্ত্রের বেঁচে থাকায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তখন তাকে বলে আয়ু। তাকে যখন স্থির রূপে বলি তখন তার নাম হয় 'আয়ুঃ'। সেই আয়ুর সমগ্র সময়টিকে বলে আয়ুষ্কাল। তবে পুরূরবার জ্যেষ্ঠপুত্রকে কেন 'আয়ু' নামে শনাক্ত করা হয়েছিল, তা এখনও যথার্থে বোধগম্য হয়নি। ৬. ল্যাটিন aevum (= আইভুম্ = আয়ুষ্কাল), aeon (= আইঅন্ = যুগ) এবং গ্রীক aion (= আইঅন্ = যুগ) এই একই শব্দ পরিবারের সদস্য।

আয়ুর্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ : ১. আয়ুঃ + বেদ। ২. *যাহার দ্বারা আয়ুর বিষয়ে বিদিত হওয়া যায়।* / আয়ুর বেদ, অর্থাৎ যে শাস্ত্রের দ্বারা লাভ বা জ্ঞান সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. চিকিৎসাশাস্ত্র। অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত চিকিৎসাশাস্ত্র। চরণব্যূহমতে, ইহা ঋগ্বেদের এবং শস্ত্রশাস্ত্র অথর্ব্ববেদের উপবেদ। প্রজাপতি চারি বেদ হইতে পঞ্চমবেদ আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিয়া সূর্য্যকে প্রদান করেন। সূর্য্য তাহা হইতে স্বতন্ত্র সংহিতা করিয়া **ধন্বন্তরি** প্রভৃতি ষোড়শ শিষ্যকে অধ্যয়ন করান। ইঁহারা প্রত্যেকে আবার এক এক খানি চিকিৎসাশাস্ত্র রচনা করেন। পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা এই তন্ত্রসিন্ধু **মন্থন** করিয়া নানা জ্ঞানরত্ন উদ্ধার করেন। শল্য, শলাকা, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণতন্ত্র — এই আট ভাগে আয়ুর্ব্বেদ বিভক্ত। (ব.শ.)। ৪. ভারতের দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র অর্থে প্রচলিত। ৫. আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা এখনও এদেশে প্রচলিত রয়েছে। বহু আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী আছেন, তাঁদের চিকিৎসাকেন্দ্র আছে, বইপত্র আছে, পাঠকেন্দ্র আছে, **শিক্ষাপদ্ধতি** আছে। এগুলি যে উপরোক্ত বয়ান অনুসারে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, তার অজস্র লিখিত অলিখিত দলিল রয়েছে। এর থেকে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে — ধন্বন্তরি, অশ্বিনীকুমার, সূর্য্য, প্রজাপতি, এঁরা সক্রিয় সামাজিক সত্তা ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কারা, তা বোঝার জন্য ঐ শব্দগুলির অর্থ জানা দরকার। দ্র. **ধন্বন্তরি, সূর্য্য, সংজ্ঞা, প্রজাপতি**। আপাতত এটুকু বলে রাখা যাক, উপরে বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রদত্ত তথ্যানুসারে 'প্রজাপতি চারি বেদ হইতে পঞ্চমবেদ আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করিয়া সূর্য্যকে প্রদান করেন' কথাটির অর্থ হল — তৎকালের সমাজ-পরিচালক শক্তি উৎপাদন-কর্মযজ্ঞ পরিচালনকারী শক্তিকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রয়োগের নিমিত্ত দিয়েছিলেন।

ইক : ৫. ইক্ = ই (গমন) ক্ (করণ); ইক = যায় যে। (দ্র. **ই, ক**)। ইক কথাটি বাংলায় সরাসরি প্রচলিত নেই। কিন্তু নৈতিক (নীতি + ইক), ধার্ম্মিক (ধর্ম্ম + ইক), সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক — ইত্যাদি অজস্র শব্দে প্রত্যয় রূপে যুক্ত হয়ে প্রচলিত আছে। এই 'ইক'-এর অর্থ হল '— অনুযায়ী গমন করে যে'। যেমন নৈতিক = নীতি অনুযায়ী গমন করে যে। কিন্তু 'করে যে' সে যদি নিজে তা উপলব্ধি করে নিজেই বলে, তবে সে তো ইন্দ্র বা আমিত্বও বটে! এই 'ই' অতএব ইন্দ্রের 'ই'ও হতে পারে। 'ইক'-এর এই দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োগ বাংলায় নেই, কিন্তু পাশ্চাত্যের দুনিয়ায়, বিশেষত ইংরেজি ভাষার বহু শব্দে 'ইক' (-ic, -ich) একই অর্থে দুরকম ভাবে প্রচলিত রয়েছে। প্রথমত স্বতন্ত্রভাবে, যথা ic বা -ich এবং পরবর্তীকালে তা থেকে I (আই বা আমি) শব্দটি প্রসূত হয়েছে; আর দ্বিতীয়ত log*ic*, econom*ic*, histor*ic* ... প্রভৃতি যার ব্যবহার হুবহু বাংলার উপরোক্ত 'নৈতিক'-এর মতো।

ইকড়ি, ইকড়ি-মিকড়ি : দ্র. **কাঁড়, কুঁড়, কুণ্ড**।

ইড়া : দ্র. **ইরা**।

ইত, ইতঃ, (ইতস্ততঃ) : ১. ✓ই + ত (ক্ত) - ক; ইদম্ + তস্ (তসিল্); ইতঃ + ততঃ। (ব.শ.)। ২. *(এই) যে ক্রিয়াটি (সম্মুখে) তারিত হইয়াছে; এই যে দান তারিত হইয়া আসিয়াছে; (যাহা সামনের দিকে এবং দক্ষিণে-বামে তারিত হইয়াছে)।* ৩. গত, প্রাপ্ত, প্রত্যাগত, অন্বিত। ইহা দ্বারা, এই পথ দিয়া, ইহা হইতে, এই স্থান বা জন বা পৃথিবী হইতে, এই হেতু বা কারণে, এই সময় বা দিন হইতে, এই সূত্র হইতে, ইহাতে, এদিকে, এবিষয়ে। কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য বিচারণা,

সঙ্কল্প-বিকল্প-ভাব, দ্বৈধ; এদিকে-সেদিকে, দ্বৈধ করা। (ব.শ.)। ৪. কেবলমাত্র ইতস্ততঃ শব্দটি hesitate বা 'করব কি করব না' এই দ্বিধা অর্থে প্রচলিত। ৫. এই শব্দটি খুবই প্রাচীন, যথার্থে বোধ্য নয়, অনেকখানিই অব্যক্ত। যতটুকু বোঝা যায়, করিত (কর্ + ইত) চলিত গৃহীত প্রভৃতি শব্দে যে ইত-কে পাওয়া যায়, এ সেই। মনে হয়, মানুষ যখন অ-ই-উ স্বরবর্ণের ব্যবহারের পর প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার করতে পারছিল, এই শব্দটি উদ্ভব হয়েছিল সেই সময়। তখন করিত বা বলিত না বলে বলা হত 'ইত'। পশ্চিমে এই শব্দটির উত্তরাধিকারই হয়তো it। এর অর্থ 'এই যে' ঢিলটি সামনে ফেললাম, সেটি ইত; আর যে ঢিলটি দক্ষিণে বা বামে ফেললাম, সেটি তত। সামনে যাওয়া ইত, দক্ষিণে বা বামে যাওয়া তত। ইত-কে নিঃশেষে বোঝালে ইতঃ, তত-কে নিঃশেষে বোঝালে ততঃ। ৬. ল্যাটিন id (= ইদ্ = ইহা), ইংরেজি it, it-is একই শব্দ পরিবারের সদস্য। দ্র. **দাতা**।

ইতর : ১. ✓ই + তর (তরক্) - ক; অথবা, ইত + ✓রা (গ্রহণ) + অ (ক) - ক। (ব.শ.)। ২. *ই-তর অর্থাৎ যাহারা তর-বিকাশশীল (কম-বিকাশশীল) বা কম-প্রগতিশীল, তম-বিকাশশীল বা অতি-প্রগতিশীল নয়*। / যে প্রাপ্ত গ্রহণ করে। (ব.শ.)। ৩. ভেদাশ্রয়, অন্য, অপর, নীচ, পামর, বর্ব্বর, কাতর, অবশিষ্ট, ত্যক্ত, বর্জ্জিত, তদ্ভিন্ন, তদ্বিপরীত, সামান্য, সাধারণ, হেয়; তদ্ভিন্ন জন, প্রাকৃত, অবিবেকী, নীচজন, অনুলোমপ্রতিলোমজাত জাতি, ভদ্রেতর জাতি, ছোটলোক, অশিক্ষিত, সাধারণ লোক। (ব.শ.)। ৪. 'ছোটলোক' অর্থে প্রচলিত। ৫. তর, তম, বিশেষ্য ক্রিয়া সবরকম শব্দের সঙ্গেই যুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ রথীতর, রথীতম। সেই সুবাদে গতিশীলতর ও গতিশীলতমও হতে দোষ নেই। তাই গোতম যদি হয়, গোতরও হতে পারে। সেইভাবে ইতর (গতিতর) ইতমও হওয়া সম্ভব। মনে হয় সেই নিয়মে সমাজ-পরিচালকদের অনুসরণকারী বা পশ্চাদগামী (পশ্চাদপদ) মানুষদের বোঝাতে শব্দটির প্রচলন হয়েছিল। সবার আগে যান পরিচালকেরা, এরা যায় তাদের পিছু পিছু। তাঁরা যা করেন, এরাও তারই পুনরাবৃত্তি করে। এরা স্বভাবতই পরিচালকদের কর্মের পুনরাবৃত্তিকারী। তাই ইতর। 'মিষ্টান্নম্ ইতরে জনা' সেকারণেই দোষাবহ কথা নয়। বর্তমানে শব্দটি অমর্যাদাকর হলেও আদিতে শব্দটি আদৌ অমর্যাদাকর ছিল না; বরং যথেষ্ট শ্রদ্ধেয় ছিল। কেননা, এই সৎভাবে অনুসরণকারী পথপ্রদর্শক গণনেতাদের কর্মের পুনরাবৃত্তিকারী জনসাধারণকেই **সতী** বলা হত। ৬. Latin - iterum (= পুনরায়), Hebrew - iter। (ব.শ.)। তাছাড়া ইংরেজি re*iterat*e শব্দটি তো 'ইতর'কে বুকের ভেতরে ধারণ করে রেখেছেই!

ইতি : ১. ✓ই + তি (ক্তিন্)। ২. *ই (গমন) তরণ গতিশীল থাকে যাহাতে*। ৩. হেতু, শব্দস্বরূপ দ্যোতকতা, বাক্যার্থ প্রকাশক, প্রকাশ, নিদর্শন, প্রকার, প্রকরণ, আদি, বক্ষ্যমানপ্রকারে, স্বরূপ, ব্যবস্থা, অনুকর্ষ, সমাপ্তি, পরামর্শ, মত, এবং, অবধারণ, প্রত্যক্ষ, প্রকর্ষ, উপক্রম, মান। (ব.শ.)। ৪. end বা '**শেষ**' অর্থে প্রচলিত। ৫. গ্ মানে যাওয়া, ই মানেও যাওয়া। গত-গত-গত ... এরকম টানা গতন (গমন) হতে থাকলে আমরা যেমন গতিকে দেখতে পাই, তেমনি ইত-ইত-ইত ... এরকম টানা ইতন হতে থাকলে ইতিকে দেখতে পাওয়া যায়। এ-ও একরকম যাওয়া, তবে প্রধানত মানসিক যাওয়াই এর প্রকাশিতব্য বিষয়। কোনো বিবরণ, ব্যাখ্যা, প্রকাশ ইত্যাদির গতি যেখানে শেষ হয়, তার শেষে তাই ইতি লেখা হয়; যদর্থ, ইত (মানসগমন) এইভাবে গতিশীল থাকল অর্থাৎ এইখানে ইতি হল। তার মানে ঘটনার ইতন বা গমন যেমন চলছিল, এর পরেও হয়তো চলবে; কিন্তু তার বর্ণনা এখানে শেষ করা হল। ৬. ইংরেজির -ity যুক্ত সমস্ত শব্দ, যথা charity, humanity, humility ... ইত্যাদি, যারা 'ইতি'র জ্ঞাতিভাই সন্দেহ নেই।

ইতিবৃত্ত : ১. ইতি + বৃত্ত। ২. *ইতি-কথা (অর্থাৎ ঘটনার গতিবিধির-কথা) শেষ হয়েছে যে বৃত্তে*। ৩. প্রত্যক্ষ সংঘটিত বিষয়, দৃষ্টঘটনাবলী, চরিত, বৃত্তান্ত, বিবরণ। ইতিবৃত্ত বিষয়ক পুরাণাদি, ইতিহাস। ... (ব.শ.)। ৪. history অর্থে প্রচলিত। ৫. কীভাবে জানি সেকালের শাস্ত্রকারদের ধারণা হয়েছিল যে, ঘটনা যেখান থেকে শুরু হয়, সেইখানে এসে শেষ হয়। উদ্ভব ও বিলয়ের বিন্দুটি যেন এক। অতি বৃদ্ধ মানুষকে আমরা শিশুর মতো আচরণ করতে দেখি। মাঝের যে পথটি সেটি সম্ভবত সেই কারণেই বৃত্তাকার বলে তাঁদের মনে হয়ে থাকবে। তাই কাহিনীমাত্রেই তাঁদের কাছে ইতিবৃত্ত বা **বৃত্তান্ত**। রবীন্দ্রনাথও মানবজীবনের শুরু ও শেষের মধ্যে এই বৃত্তান্তের ধারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। দ্র. ততঃ *কিম্*, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড।

ইতিহ : ১. হন্ = গতি। (হনন)। ২. *ইতি হয় যেরূপে অর্থাৎ ই (গমন) তারিত হয়ে যেখানে দাঁড়ায়*। / যাহা এইরূপে যায়। যা লোকপরম্পরায় চলে। (ব.শ.)। ৩. এবং কিল অর্থাৎ এইরূপ বার্তা। পরম্পরাগত লোকপ্রবাদ। উপদেশপরম্পরা। প্রবাদপরম্পরা, ঐতিহ্য। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. আজকাল আমরা যাকে বলি '(মোটকথা) এই হল ব্যাপার', তাকেই সেকালে 'ইতিহ' বলা হত। এর থেকেই বাংলার নিজস্ব প্রাচীন ধারা অনুসারে সম্ভাব্য শব্দ 'ইতিলা' জন্মলাভ করতে পারে, যা কিনা মধ্যযুগে 'ইত্তিলা' বা 'এত্তেলা'য় পরিণত হয়। হত না, যদি মধ্যযুগে আগত আরবী ভাষার 'ইত্ত্তিলা' শব্দটি আপন অর্থ প্রকাশ করে সেকালের বাংলাভাষীর সামনে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে দিত, সে আর কেউ নয়, 'ইতি'রই স্বজন। দ্র. **ইতি**।

ইতিহাস : দ্র. **আস্**।

ইম, ইমু, ইমো (ইমন) : ২. *(তদ্) গতি সীমায়িত যাহাতে; তদগতির সীমায়ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; তদগতির সীমায়নের সর্বরূপ যাহাতে; তদগতির সীমায়ন অন যাহাতে*। ৩. কর্ত্তৃবাচ্যে ভবিষ্যৎকালে উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি। ইমন ও ইমনকল্যাণ রাগ — ইহার সময় রাত্রি প্রথম প্রহর, ঠাট কড়ি ম, জাতি সম্পূর্ণ ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. বিভক্তি রূপে প্রচলিত, যথা খণ্ডাইম, লইম, করিমু, কাটিমু, বঞ্চিমো ইত্যাদি। এছাড়াও তনিমা (তন্ + ইমন), নীলিমা প্রভৃতি শব্দে বিভক্তি রূপে প্রচলিত। সঙ্গীতজগতে ইমন ও

ইমনকল্যাণ রাগের নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** যেকথা বা যার কথা বলা হচ্ছে, তার স্বভাব, নীতি, ভাব সীমায়িত যাতে সেই হল বিভক্তিরূপী ইম। এই ইম-এর উত্তরাধিকার কেবল বাংলায় নেই, আরবি-ফারসি এবং ইংরেজিতেও রয়েছে। আরবি-ফারসি মুসলিম (মুস্‌লিমান, মুসলিমুন) শব্দেই রয়েছে ইম-এর উত্তরাধিকার। আর ইংরেজির im-যুক্ত প্রায় সমস্ত শব্দই (imprint, immigrant, immersion) এই একই উত্তরাধিকার বহন করে। তবে তার অর্থ নানাভাবে বদলে গেছে, এমনকি বিপরীতার্থকও হয়ে গেছে (impossible)। **৬.** ??

ইরা, ইড়া (ইল, ইলা) : **১.** ✓ই + র (রন্‌) - ক + স্ত্রী আ (টাপ্‌); ✓ইল্‌ + অ (ক) - ক + স্ত্রী আ (টাপ্‌)। (ব.শ.)। **২.** *গতিশীলতা (বিকাশশীলতা) রহে যাহাতে তাহার আধার; আবর্তমান গতিশীল সত্তার আধার যে (ইলা = গতিশীল বা বিকাশশীল লালন-লোপনের আধার যে)।* / যাহা যায়; যে সত্তা গতিশীলা। (ব.শ.)। **৩.** ইরা = পৃথিবী, বাক্য, বাগ্‌দেবী, সরস্বতী, সুরা, জল, কশ্যপপত্নী ও বৃক্ষলতাদির জননী। (ইরাক, ইরাণ, ইরাবৎ, ইরাবতী)। (ব.শ.)। দক্ষের ষাট কন্যার মধ্যে ইরা প্রভৃতি তিনজন কশ্যপের স্ত্রী ছিলেন। ইরা তৃণ, বৃক্ষলতা ও গুল্ম প্রভৃতি প্রসব করেন। (পৌ.অ.)। ইলা = ভূমি, মনুর কন্যা, বুধের পত্নী ও পুরূরবার জননী; মেরুদণ্ডের বামভাগস্থিত নাড়ীবিশেষ। (ইলাকা > এলাকা)। (ব.শ.)। ক) মনু প্রজাসৃষ্টির মানসে এক পাকযজ্ঞ তৈরি করেন। তিনি যজ্ঞের জন্য ঘি, মাখন ও আমিক্ষা জলে নিক্ষেপ করেন এবং এর ফলে এক বৎসরের মধ্যে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বালিকা জল হতে উত্থিত হলে পর, মিত্র-বরুণ তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কে? এর উত্তরে কন্যা বলেন, আমি মনুর কন্যা। তখন মিত্র-বরুণ বলেন, তুমি আমার। কন্যা কোনো উত্তর না দিয়ে মনুর কাছে যান, ... বলেন, আমি আপনার কন্যা, আপনার ঘি, মাখন ও আমিক্ষা হইতে আমার জন্ম। আমাকে যজ্ঞে অর্পণ করুণ। মনু তাকে দিয়ে কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। খ) বৈবস্বত মনুর কন্যা, বুধের পত্নী ও পুরুরবার মাতা। মনু মিত্রাবরুণের উপাসনা করে একটি সন্তান প্রার্থনা করেন; কিন্তু আরাধনার ত্রুটিবশত পুত্রের পরিবর্তে কন্যা হয়। এই কন্যার নাম ইলা। ইনি পরে বিষ্ণুর বরে পুরুষত্ব লাভ করে 'সুদ্যুম্ন' নামে খ্যাত হন। (দ্র. **ইন্দ্রদ্যুম্ন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন**)। পরে মহাদেবের অভিশপ্ত কুমার বনে প্রবেশ করে আবার স্ত্রীভাবাপন্ন হন। এঁর পুরোহিত বশিষ্ঠ শিবের উপাসনা করলে ইনি একমাস স্ত্রী ও একমাস পুরুষ হয়ে থাকবার বর পান। গ) বাহ্লীক দেশের কর্দম প্রজাপতির পুত্র। ইনি একদা মৃগয়ায় বহু পশু বধ করতে করতে কার্ত্তিকেয়র জন্মস্থান ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই স্থানে মহাদেব ও উমাকে ক্রীড়ারত দেখতে পান। দেবীর মনোরঞ্জনের জন্য মহাদেব তখন স্ত্রীরূপে খেলা করছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছাক্রমে অরণ্যের সমস্ত পুরুষ জন্তু বা পুংবাচক বৃক্ষ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং রাজা ইলও এখানে এসে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। ... মহাদেব ... ও পার্ব্বতীর বরে রাজা ইল একমাস পুরুষ ও একমাস স্ত্রীরূপে থাকেন। ... স্ত্রীরূপে ইল একদিন ভ্রমণ করতে করতে চন্দ্রের পুত্র তপস্যারত বুধের সঙ্গে মিলিত হন। ... বুধের ঔরসে নারীরূপী ইলের গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। ... পরে চ্যবন ও বশিষ্ঠ ঋষির দ্বারা মহাদেবের তুষ্টিসাধনে সক্ষম হন ... ও স্ত্রীরূপ হতে নিষ্কৃতি পান। ইলের পুরুষ অবস্থার পুত্র শশবিন্দু। (পৌ.অ.)। (দ্র. **তৃণবিন্দু**)। **৪.** 'ইরা' ও 'ইলা' শব্দ নামরূপে প্রচলিত। **৫.** প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা এই শব্দ কয়টির ভিতরে প্রবহমান। ঐতিহাসিকেরা যাকে বলেন transitional period, যতদূর বোঝা যায়, এটি সেইরকম ঐতিহাসিক অধ্যায়ের কথা এবং এর সময়কাল বেশ দীর্ঘ, হয়তো চার-পাঁচশ বছর। যেহেতু ঘটনাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, পুরাণাদিতে একে নানাভাবে প্রকাশ করা হয়েছে — কখনও দক্ষ-কশ্যপের বিকাশধারার দিক থেকে, কখনও মনু-মিত্রাবরুণের বিকাশধারার দিক থেকে, কখনও বা কর্দম প্রজাপতির দিক থেকে। যতদূর বোঝা যায়, ইড়া, ইরা, ইলা সেইরূপ ভূমি ও জলের এলাকা দখলকারী মানুষদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, (স্মরণ রাখা দরকার যে, সেকালে মানুষকে তার ভূমি থেকে পৃথকভাবে ভাবার চল ছিল না। দ্র. **অর্থ**।) যারা সেকালের প্রচলিত ব্যবস্থার চোখে অর্বাচীন, নতুন ধরনের আচার-আচরণকারী যা কিনা প্রচলিতের চোখে ত্রুটিপূর্ণ এবং মন্দ, যদিও সেই অর্বাচীনদের চোখে তারা সেযুগের 'প্রগতিশীল' বা advanced। অর্থাৎ সমাজবিকাশের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তারা সেকালের অগ্রণী জনগোষ্ঠী। তার মানে ইরা বা ইলা হচ্ছে সেইরূপ সত্তা যা প্রচলিতের বাইরে নতুন কর্মযজ্ঞের কথা বলে, নতুন জীবনযাত্রা-পদ্ধতির কথা বলে। কারও চোখে তা প্রচারযোগ্য (সমীর - সম + ঈর - অ + ইর - ir, air - বায়ু - মিডিয়া ...), কারও চোখে তা মন্দ (ইল - ill, civ-il, ev-il)। তাও কোনো কোনো জনগোষ্ঠী সেই আদি ধনতান্ত্রিক মানসিকতার বীজের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এরই সন্তান হয় **পুরূরবা** যে আদি-ধনতন্ত্রের বীজের পক্ষে উচ্চ রব করেছিল। এই পুরূরবা তৎপূর্ববর্তী 'মহ'রব-এর উত্তরসূরী বলেই মনে হয়। এই মহরব বা হমরব শব্দটির ইয়োরোপীয় উত্তরাধিকার খানিকটা রয়েছে রাজা 'হামুরাবি'তে যাকে 'হমরব'কারী (homorabi) বলেই মনে হয়। মহরব বা হমরব আদি যৌথসমাজের জয়গান গায়, আর পুরূরবা আদি বিভাজিত সমাজের পক্ষে সওয়াল করে। যে সময়ের এই ঘটনাবলী, সে সময় তখনও পর্যন্ত আদিম মানবসমাজ পরস্পরের ঘনিষ্ট ছিল, বিভাজন দূরত্ব তৈরি করেনি। হয়তো সেই কারণেই পশ্চিমের 'হামুরাবি', 'ইরাক', 'ইরাণ', পাঞ্জাবের 'ইরাবতী' শব্দগুলির মধ্যে সেই উত্তরাধিকার কিছু কিছু থেকে গেছে। কিন্তু একথাও মানতে হবে, সেই অধ্যায়কে খুব স্পষ্টভাবে এখনও বোঝা সম্ভব হয়নি। তবে উপরোক্ত ইলারাজার কাহিনীর বিস্তারিত অর্থবোধ থেকে ভবিষ্যতে হয়তো ক্রমশ তা বোধ্য হয়ে উঠবে। (কৃত্তিবাসী রামায়ণ দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া ইংরেজিতে *irr*-igation যেমন 'জলের গমন এষণা'র কথা বলে, তেমনি err প্রচলিত পথ ত্যাগ করে নতুন, প্রচলিতের চোখে ভুল, পথের কথাও বলে। এই 'ইর' (err, to err is human এবং *irr*-igation) ও 'ইল' (ill) শব্দ দুটি এই একই শব্দবংশের সন্তান বলেই মনে হয়। **৬.** ইংরেজি err, error, erratic, errand, irrigation; ল্যাটিন errare (= বিপথে যাওয়া); জারমান irren (= বিপথে যাওয়া); ইংরেজি elate, ill, illation এবং গ্রীক

Ilion — সবাই 'ইরা' ও 'ইলা'র ভাই-বেরাদর, জ্ঞাতি।

ইরাবৎ (ইরাবান), ইরাবতী : ১. ইরা + বৎ (বতুপ্); ইরাবৎ + স্ত্রী (ঙীপ্)। (ব.শ.)। ২. *যাহাতে ইরা থাকে*। ৩. 'জলযুক্ত', সমুদ্র, মেঘ, 'ভূমিমান' রাজা, উলুপীর গর্ভজাত অর্জ্জুনপুত্র। 'জলবতী', পাঞ্জাবের নদীবিশেষ (Ravi)। (ব.শ.)। অর্জ্জুনের এক পুত্র। ... (একদা) ঐরাবত কুলজাত কৌরব্য নামক নাগের কন্যা উলুপী অর্জ্জুনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। অর্জ্জুন ও উলুপীর পুত্র ইরাবান। মতান্তরে, অর্জ্জুনের ঔরসে নাগরাজ ঐরাবতের বিধবা কন্যার গর্ভে ইরাবানের জন্ম হয়। ঐরাবত-কন্যার পূর্বপতি গরুড় কর্ত্তৃক নিহত হন। তখন নাগরাজ বিধবা কন্যাকে অর্জ্জুনের হস্তে সমর্পণ করেন। ... জন্মের পর ইরাবান জননী কর্ত্তৃক নাগলোকে পালিত হন। অর্জ্জুনের প্রতি বিদ্বেষবশত এঁর পিতৃব্য অশ্বসেন উলুপীকে ত্যাগ করেন। ... সুরলোকে অস্ত্রশিক্ষা কালে ইরাবান অর্জ্জুনের কাছে গিয়ে আত্মপরিচয় দান করেন। ... কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টম দিনে ইরাবান শকুনির ছয় ভ্রাতা গজ, গবাক্ষ, বৃষক, চর্ম্মবান, আজক ও শুককে হত্যা করেন। কৌরব পক্ষের অলম্বুষ নামে এক রাক্ষসের হাতে ইরাবানের মৃত্যু হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. শব্দটি বহু স্থানে সমুদ্র বা মেঘ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এই কারণে যে, তাতে ইরা বা জল থাকে। যতদূর বোঝা যায়, বিশাল ভূ-এলাকা যাদের দখলে ছিল, এমন কোনো দেশের সঙ্গে অর্জ্জুনের সম্পর্কের ফলে যে নতুন প্রজন্মের মানুষের জন্ম হয়েছিল, এঁরা সম্ভবত তারাই। ৬. ইংরেজি ravine, *irr*igation।

ইল: দ্র. **ইরা**।

ইলবিলা : ১. ইল, বিল্ = ভেদন, আচ্ছাদন। ২. *ইল ধারণ করে যে বিল*। ৩. তৃণবিন্দু ও অপ্সরা অলম্বুষার কন্যা। যক্ষরাজ কুবেরের মাতা ও বিশ্রবা মুনির স্ত্রী। এঁর সন্তান বলে কুবেরের অন্য নাম ঐলবিল। কোথাও তাঁকে পুলস্ত্যের স্ত্রী ও বিশ্রবার মাতা বলে উল্লেখ আছে। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. মার্কস সাহেব পুঁজির প্রথম উদ্ভবস্থলকে বলেছেন Pores of society; যতদূর বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতীয়রা তাকে বলতেন **বিল** বা **বিবর** অর্থাৎ **গর্ত্ত** বা **রন্ধ্র** এবং **দ্বীপ**। যে জনগোষ্ঠী ইলের আধার ছিল, তাদেরকে বলা হত ইলবিলা।

ইলাবৃত : ২. *ইলা দ্বারা আবৃত*। ৩. ক) স্থানের নাম। এখানে অভিশপ্ত স্ত্রী-রূপী ইল (অর্থাৎ ইলা) বুধের সঙ্গে বাস করতেন, সেইজন্য এই স্থানের নাম ইলাবৃত। ইহা কৈলাসের নিকটবর্তী। খ) জম্বুদ্বীপের নববর্ষের চতুর্থ বর্ষ। এর উত্তরে নীল পর্ব্বত, দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত, পশ্চিমে মাল্যবান পর্ব্বত, ও পূর্ব্বে গন্ধমাদন পর্ব্বত। ইহা মেরু পর্ব্বত (সুমেরু) বেষ্টন করে আছে। ... জম্বুদ্বীপের রাজা অগ্নীধ্রের নাভি, কিম্পুরুষ, হরিবর্ষ, ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল নামে নয় পুত্র জন্মে। পরে তিনি জম্বুদ্বীপকে নয় ভাগ করে ঐ নয় পুত্রকে দান করেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **ঋষভ**। এই কাহিনীটি প্রায় সমস্ত পুরাণেই কমবেশি এইভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এর মূল ধারণাটি এইরকম — 'ভুবনকমলের' সাতটি দ্বীপ রয়েছে, যাদের নাম **জম্বু শাক কুশ ক্রৌঞ্চ শাল্মলী প্লক্ষ পুষ্কর**। জম্বুদ্বীপ রয়েছে মাঝে, আর বাকি ছয়টি দ্বীপ রয়েছে তাকে ঘিরে। জম্বুদ্বীপের নয়টি ভাগ — কেন্দ্রে ইলাবৃতবর্ষ (নাভিবর্ষ বা মেরুবর্ষ), উত্তরে রম্যকবর্ষ হিরণ্ময়বর্ষ ও কুরুবর্ষ, দক্ষিণে হরিবর্ষ কিম্পুরুষবর্ষ ও ভারতবর্ষ, পূর্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ। এরপর রয়েছে প্রতিটি দ্বীপের নদী পর্ব্বত ও সমুদ্রের বিবরণ। এই কাহিনীগুলি একত্রিত করে প্রাচীন পৃথিবীর নক্সা এঁকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন পরমশ্রদ্ধেয় স্বর্গত দুর্গাদাস লাহিড়ী। একাজে তাঁর তিরিশ বছরের একনিষ্ঠ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে কোনো একনিষ্ঠ চেষ্টার ব্যর্থতাই কার্যত ব্যর্থ নয়; কারণ পরবর্তী কালের সাফল্য সেই ব্যর্থতার উপর নির্ভর করেই সম্ভব হয়। তিনি যদি তিরিশ বছর খরচ করে না রাখতেন, বিষয়টি বুঝতে আমাদের আরও তিরিশ বছরের পরিশ্রম লাগত। তাই তিনি আমাদের চিরপ্রণম্য।

প্রকৃতপক্ষে সেকালে অদৃশ্য জগৎকে ব্যাখ্যা করাই ছিল পণ্ডিতগণের কাজ। দৃশ্য জগৎ তো চোখের সামনে রয়েছেই। তাই উপরোক্ত বিবরণগুলি ছিল আসলে অদৃশ্য মানসজগতের বিবরণ। চিন্তাধারা, জ্ঞানধারা, পণ্যধারা ইত্যাদি ধারাগুলি ছিল **নদী**; সামাজিক সংগঠনসমূহ ছিল **পর্ব্বত**, তাদের সক্রিয়তার এলাকাগুলি ছিল **দ্বীপ**। এই মানস-ভূগোল ধরে পার্থিব-ভূগোলের নক্সা বানাতে গিয়েই যত গোল বেধেছে, কিছুতেই মেলানো যায়নি। আমাদের (জ) গ্রন্থের 'ঝর্নাধারা থেকে সৃষ্টিধারা' নিবন্ধে এর কিছু ব্যাখ্যা আছে।

এক : ১. ✓ই + ক (কন্)। (ব.শ.)। ২. *ই বা চল্ (আরম্ভ) করে যে*। ৩. মুখ্য, প্রধান, শ্রেষ্ঠ, কেবল, অদ্বিতীয়, অন্য, অপর, অসহায়, অল্প, প্রথম, সাধারণ, সমান, অপৃথক, অন্যথাভাবহীন, অখণ্ড, সত্য, সজাতীয়াদিভেদত্রয়হীন, অনির্দ্দিষ্ট, মিলিত, যুক্ত; সঙ্কলিত, ঈষদূন, বিশেষ, কোনো, আদি সংখ্যা, '১' এই সংখ্যা। (ব.শ.)। ৪. one অর্থে প্রচলিত। ৫. অস্তিত্বমাত্রেই অ, তার আধার সহ সে হল আ। কিন্তু তাতে চলার, অস্তিত্বের গ্রহণ-বর্জনের, ক্ষয়-বৃদ্ধির সূত্রপাত হওয়া মানেই হল 'ই'। এই প্রকারে 'ই করে যে', সে হল **ইক**। সেই ইক-এর পুনরাবৃত্তিতে শুরু হয় চলা এবং তা দিশাগ্রস্ত না হয়ে পারে না। এই চলার প্রথম পদক্ষেপটি স্বভাবতই হয়ে যায় **এক**। সেই সুবাদে অস্তিত্বমাত্রই এক। কিন্তু পরে পরে এই 'এক' শব্দটি আর ক্রিয়াভিত্তিক থাকে না। যে সকল ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ সর্বাগ্রে প্রতীকী ব্যবহারের স্বভাব গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে সংখ্যাবাচক শব্দগুলি অন্যতম এবং 'এক' তাদের অগ্রণী। দ্র. **দুই, তিন, চতুর**। ৬. আবেস্তা, ফারসি, প্রাকৃত, হিন্দি, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় শব্দটিকে যথাক্রমে aeva, যক্, এক্ক, এক, ois, aequu-s রূপে দেখতে পাওয়া যায়। (ব.শ.)।

একচক্র, একচক্রা : ১. চক্ = তৃপ্তি, ব্যাঘাত, ভ্রান্তি। ২. *যেখানে একচক্রের (একই তৃপ্তি ও ভ্রান্তি দানকারী নীতির) শাসন চলে। /* যাহার এক চক্র; যাহাতে একেরই (এক রাজারই) চক্র বা সৈন্য থাকে। (ব.শ.)। ৩. একচক্রযুক্ত, সূর্য্যরথ, একরাজ-শাসিত, একগণ,

সম্মিলিত, একমত, হরিগৃহ, শুম্ভপুরী। একচক্রা = নগরীবিশেষ। ভীম এইস্থানে বকাসুর নিহত করেন। (ব.শ.)। জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবরা মাতা কুন্তীর সঙ্গে একচক্রা নগরে আশ্রয় নেন। এই স্থানেই ভীমের হাতে বকাসুর নিহত হয়। ইহার বর্তমান নাম আরা নগর। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. চক্র শব্দটি আজকাল 'চক্কর' রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন, 'কী চক্করে পড়েছি ভায়া?' এরকম বাক্যে 'চক্কর' শব্দের অর্থ এমন এক ঘোরের মধ্যে ঘুরে চলা বোঝায়, যেখানে কোনো তৃপ্তি এবং/বা ভ্রান্তির দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ঘুরে চলেছে। এরকম হয় তখনই যখন কোনো জনগোষ্ঠী একটি মাত্র বিশেষ (বিকল্পহীন) দার্শনিক (রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক) চিন্তাশৃঙ্খলার দ্বারা পরিচালিত বা শাসিত হয়। সেভাবে কোনো বিশেষ নগরের বিশেষ জনগোষ্ঠী যখন শাসিত-পরিচালিত হন, মহাভারতের ভাষায় তখন সেই নগরকে একচক্রা নগর বলা হত। আজকের মানবসভ্যতার দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, আধুনিকতাবাদীদের সময় থেকে গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একচক্রা নগরের বাসিন্দা করার যারপরনাই চেষ্টা চালানো হচ্ছিল; সাম্প্রতিক কালের বিশ্বায়নবাদীরা তাকে সম্পূর্ণ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। সারা পৃথিবীই একচক্রা নগরে পরিণত হয়ে চলেছে। এই একচক্রা নগরের নাম দেওয়া হয়েছে 'গ্লোবাল ভিলেজ'।

একজটা : ১. জট্ = সঙ্ঘাত, সংহতি। ২. *যাদের একজটা (এক-মালিকানা) আছে।* / যাহার এক জটা। (ব.শ.)। ৩. তারিণীমূর্ত্তি-বিশেষ। উগ্রতারা। শুম্ভনিশুম্ভপীড়িত দেবগণের ত্রাণার্থ ইনি হিমাচলে মাতঙ্গীর কায়কোষ হইতে উদ্ভূতা হন। ইনি কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্ভুজা, মুণ্ডমালাভূষিতা। ইঁহার দক্ষিণ করদ্বয়ে খড়্গ ও পদ্ম, বাম করদ্বয়ে কর্ত্রী ও খর্পর, শিরে উর্দ্ধগত একজটা। (ব.শ.)। উগ্রতারার অন্য নাম। ... এঁর অষ্টযোগিনী আছে। শুম্ভ-নিশুম্ভ নির্যাতিত দেবতাদের প্রাণরক্ষার জন্য হিমালয়ে মাতঙ্গীর কায়কোষ হতে উদ্ভূতা হন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যৌথমালিকানাধীন সমাজের জনগোষ্ঠী। দ্র. **উগ্রতারা**।

একদন্ত, একদ্রংষ্ট্র, একরদ : ১. দম্, দন্‌শ্, রদ্ = দমন, দংশন, উৎখনন। ২. এক দ্রংষ্ট্র / দন্ত / রদ যাহার। (ব.শ.)। ৩. একদশন, গণেশ। শিবশিবার দ্বারপাল রূপে অবস্থিত গণেশের সহিত পরশুরামের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে গণেশের এক দন্ত ভগ্ন হয়। তদবধি গণেশ 'একদ্রংষ্ট্র' 'একদন্ত' নামে অভিহিত হন। (ব.শ.)। ক) ... যুদ্ধকালে পরশুরাম কুঠারাঘাতে গণেশের একটি দন্ত ভগ্ন করেন। ... খ) পাশা খেলার জন্য পার্ষির প্রয়োজন হওয়ায় রাবণ গণেশের এক দন্ত উৎপাটিত করেন। ... গ) ... কৈলাসে শিবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গণেশ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে রাবণ গণেশের একটি দন্ত খণ্ডিত করেন। ... ঙ) কার্ত্তিকের সঙ্গে যুদ্ধক্রীড়ায় গণেশের একটি দন্ত চূর্ণিত হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যে ভাবেই হোক না কেন, গণেশের একটি দাঁত গেছে। কেরানিকুলকে গণেশ বলে। শিক্ষিত জনসাধারণ বা পার্ব্বতী থেকে এদের জন্ম হয় বলে এরা 'পার্ব্বতীসুত'। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায়, পরশুরাম, রাবণ, কিংবা কার্ত্তিকের কারণে কেরানিকুলের এতাদৃশ ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ক্ষতিটি প্রকৃতপক্ষে কী, কোনটিই বা তাদের বিগত দন্ত, আর কোনটিই বা এখনো রয়েছে? না, এখনও তা নিশ্চিতরূপে বোঝা যাচ্ছে না।

একপটলা : ১. পট্ = দীপ্তি, ছেদন, বেষ্টন। ২. *এক পটল (খাদ্য) যাহার।* ৩. মেনকার গর্ভজাত হিমালয় কন্যা অপর্ণার সহোদরা। ইনি জৈগীষব্যের স্ত্রী। একটিমাত্র পটলাপুষ্প (পারুল) ভক্ষণ করে তপস্যা করার জন্য এঁর এই নাম হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **পটল, একপর্ণা**।

একপর্ণা : ২. *এক পর্ণ (খাদ্য) যাহার।* ৩. শৈলরাজ হিমালয় ও মেনকার কন্যা। এই কন্যা একটি মাত্র পর্ণ (পাতা বা পান) খেয়ে কঠোর তপস্যা করতেন। ... ইনি অসিতদেবলের স্ত্রী। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এখানে এতটুকু বোঝা যায় যে, **হিমালয়-মেনকা**র তিন কন্যা — একপটলা, একপর্ণা, ও **অপর্ণা**। অপর্ণাকে আমরা চিনি, ইনিই **উমা**। কিন্তু একপটলা ও একপর্ণাকে আমরা চিনি না। দেখা যাচ্ছে, এঁরা যথাক্রমে **জৈগীষব্য** ও **অসিতদেবলের** স্ত্রী।

একপাৎ, একপাদ : ১. পদ্ = গতি। (পা ফেলে যাওয়া)। ২. এক পাদ যাহাতে; যাহাতে এক (অসহায়) পদ। (ব.শ.)। ৩. একের গমনযোগ্য পথ। সঙ্কীর্ণ পথ। একপাদযুক্ত, একচরণ। বিষ্ণু। শিব। ... (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. শিবগুণের একটি বিশেষত্ব হল, সে 'একলা চলো রে' নীতি গ্রহণ করতে পিছপা হয় না। যেহেতু আবিষ্কারক বা শিবসত্তা নতুন কথা বলেন, তাই প্রচলিত ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত মানুষেরা প্রথম প্রথম তাঁর বিরোধিতা করে থাকেন। তখন সেই আবিষ্কারক অনন্যোপায় একাই চলার সিদ্ধান্ত নেন। শিবের এই রূপটিকে তাই একপাৎ বা একপাদ বলে।

একলব্য : ১. লূ = ছেদন। ২. *একই কর্মের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে অভীষ্ট লাভ করে যে।* / এক লব্য যাহার। (ব.শ.)। ৩. নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র ও দ্রোণাচার্যের শিষ্য। ... নীচজাতি বলে দ্রোণ তার অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন। ... দ্রোণের মৃন্ময় মূর্ত্তি নির্মাণ করে এবং তাঁকেই গুরুরূপে কল্পনা করে যোগবলে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। ... একলব্য অর্জ্জুনকে অতিক্রম করেছে জেনে দ্রোণ একলব্যের কাছে গমন করেন এবং তার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী গুরুদক্ষিণা স্বরূপ যাচ্ঞা করেন। ... একলব্য ... উক্ত অঙ্গুলী ছেদন করে দ্রোণকে উপহার দেন। ... অর্জ্জুন তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এবং দ্রোণাচার্য আর্য-শ্রেষ্ঠত্বের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য অনার্য একলব্যের প্রতিভার বিনাশ সাধন করেছিলেন। (পৌ.অ.)। ৪. নামরূপে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. উদ্ভাবক-আবিষ্কারক **শিব** আবিষ্কার করেন, কিন্তু সেই আবিষ্কার বহন করেন না; সে কাজটি করে **দক্ষ**। তাকে অগত্যা একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করে অভীষ্ট লাভ করে সংসার চালাতে হয়। কিন্তু এর ফলে একদিকে দক্ষ যেমন বিপুল শক্তি ও সম্পদের অধিকারী হয়, অপরদিকে সমগ্র জ্ঞান থেকে অবচ্ছিন্নচৈতন্য বিশিষ্ট হয়ে সে দিশাগ্রস্ত বা একটেরে হয়ে যায়। দক্ষনীতি গ্রহণ

করলে এটাই অনিবার্য ভবিতব্য। পণ্যজীবী নিষাদ সমাজ এই কারণে একটেরে। হয়তো এজন্যই একলব্য দ্রোণাচার্য্যের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। বর্ণভেদের ব্যাপারটি মানতে হয়, যদি একলব্য বলতে একটি মানুষ মাত্র বুঝি। একলব্য, দ্রোণাচার্যরা যে সেরকম ব্যক্তিমাত্র নয়, সেকথা এখন স্পষ্ট বোঝা গেছে। আর তার আঙুল গ্রহণকে একালে finger কেটে নেওয়া ভাবা হয়। সেটি ঠিক নয়। নয় যে, তার প্রমাণ অঙ্গুলী শব্দের অর্থ। দ্র. **অঙ্গুলী**।

একাক্ষ : ১. অক্ষি। ২. এক অক্ষি যাহার। (ব.শ.)। ৩. কাক। ... ললাটে জ্ঞানচক্ষুহেতু শিব। (ব.শ.)। বনবাসকালে চিত্রকূট পর্ব্বতে একদা জয়ন্ত নামে একটি কাক চঞ্চুপুট দ্বারা নিদ্রিতা সীতার কুচদেশে আঘাত করলে রাম ইষীকাস্ত্র দ্বারা কাকের চোখ দুইটি উৎপাটিত করেন। প্রাণভয়ে কাক নানা দেবতার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে ... অবশেষে রামেরই শরণাগত হয়। কাকের দুরবস্থা দেখে ... রাম একে একটি মাত্র চক্ষু দান করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পার্থিব বনের পশুপাখি ও সমাজবনের পশুপাখিদের রেখাদুটি পরস্পরের সমান্তরাল। কেন সমান্তরাল, তা আমরা জানি না। প্রাচীন ভারতীয় ভাষাবিদেরা সেটি দেখেছিলেন। উপরোক্ত কাকটির নাম **জয়ন্ত** কাক। ইনি ইন্দ্রপুত্র। ছিঁচকে চোর, ছিনতাইকারী প্রভৃতি গুণের আধার যে সামাজিক সত্তা, তাকে সমাজবনের **কাক** বলে। জয়ন্ত সেই সত্তারই এক নাম। জন করে (মজুর লাগিয়ে) পাইকারী হারে চাষের যখন প্রথম সূত্রপাত হল, তখন যারা সেই ফসল চুরি করত, তাদের বলা হয় জয়ন্ত কাক। সেকালের ঐপ্রকার উৎপাদনের যাঁরা মূল হোতা, তাঁরা এদের একচক্ষু নষ্ট করে দেন। দ্র. **চক্ষু**।

একাদশতনু : ১. তন্‌ = প্রসারণ। ২. *একাদশ তনু যাহার*। ৩. যিনি একাদশবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিলেন; মহাদেব। তাই তাঁকে একাদশতনু বা একাদশ রুদ্র বলা হয়। ... যথা অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর, ঈশ্বর। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. শিবসত্তার লক্ষ্য হচ্ছে অষ্টসিদ্ধি, আর সেই অষ্টসিদ্ধি লাভের জন্য যে যে ভাবে চেষ্টা চালানো হয়, সেগুলি মোট এগারো রকম। তাই শিবসত্তা যে যে একাদশ রূপে সক্রিয় হন বা সমাজে ক্রিয়া করেন, তারই উল্লেখ রয়েছে একাদশতনুর একাদশ নামে। স্মর্তব্য যে, রবীন্দ্রনাথের ভিতরে শিবসত্তা সক্রিয় ছিল। উপরোক্ত এগার প্রকার রূপের কোনো কোনো রূপ তিনিও গ্রহণ করেছিলেন।

একার্ণব : ২. *এক অর্ণব যাহাতে*। ৩. একমাত্র সমুদ্র; সর্ব্বব্যাপী প্লাবন; প্রলয়পয়োধি। ... মহাপ্লাবন। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণে পৃথক পৃথক জনগোষ্ঠীকে বলা হয়েছে 'পৃথক পৃথক জল'। কোনো ভাবে সেই সমস্ত জনগোষ্ঠী যখন একত্রিত হয়ে যায়, তাকে বলা হয়েছে একার্ণব। যেন পুকুর সরোবর হ্রদ সমূহের মাঝে আর কোনো বাঁধ নেই। একালে Globalised Society বলতে যা বুঝি, এ অনেকটা তারই প্রাচীন রূপ। বিভিন্ন পুরাণে আরো একটি তত্ত্ব নানা সময়ে নানা স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। তা হল — **একার্ণব, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি**, একার্ণব, সত্য, ত্রেতা ... জগতের কালচক্র নাকি এইরকম। তার মানে, যা কিছুর উদ্ভব বিকাশ বৈপ্লবিক-পরিবর্তন হয়, তাদের অগ্রগতি ঘটে এই কালচক্রের নিয়মে।

ঐতরেয় : ২. *ইতর বা ইতরা হইতে জাত*। ৩. ক) মহিদাস্‌। ইতরা কোনো ঋষির অন্যতমা পত্নী। ঋষি পত্নীকে ও মহিদাসকে ভালোবাসিতেন না। একদা কোনো যজ্ঞসভায় ইতরা, মহিদাসকে স্বামীর অবজ্ঞাপাত্র দেখিয়া, কুলদেবতা ভূমির স্মরণ করেন। ভূমি, স্মরণমাত্র আবির্ভূতা হইয়া মহিদাসকে সিংহাসনে স্থাপন করেন এবং পাণ্ডিত্য ও ব্রাহ্মণপ্রতিভাসনরূপ বরদান করেন। মহীর বরে ব্রাহ্মণগ্রন্থ মহিদাসের জ্ঞানগোচর হয় ও 'ঐতরেয়' ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হয়। খ) ঐতরেয়প্রোক্ত ব্রাহ্মণ। ইহা ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ এবং চল্লিশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ প্রায় যজ্ঞবিবরণে পূর্ণ। ইহার শেষ দশ অধ্যায়ে উপাখ্যান ও ঐতিহাসিক ঘটনা আছে। এই অংশে হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান আছে। হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান; সন্তান হইলে বরুণদেবের নিকট বলি দিবেন, স্বীকার করেন। পরে, পুত্র রোহিতকে বলি দিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, রাজা পীড়িত হন এবং অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেফকে বলি দিবেন, স্থির করেন। শুনঃশেফ বরুণের স্তব করিয়া মুক্তিলাভ করেন, রাজাও রোগমুক্ত হন। বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। পুরাণে বা ধর্ম্মমঙ্গলে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানের সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই। ব্রাহ্মণের অরণ্যে পাঠ্য অংশ 'আরণ্যক'। ঐতরেয় আরণ্যক পাঁচভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয় আরণ্যকের চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ অধ্যায়কে 'ঐতরেয় উপনিষৎ' কহে। (ব.শ.)। ঋগ্‌বেদের শাখা বিশেষ। মহিদাস ঐতরেয় নামক এক ঋষি এই শাখার প্রবর্ত্তক। ইতরার পুত্র বলে এই ঋষির নাম ঐতরেয়। ... ঐতরেয় শাখায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক ও ঐতরেয় উপনিষৎ পাওয়া যায়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সেকালের সমস্ত গ্রন্থই রচিত হয়েছিল কোনো না কোনো মহর্ষির দ্বারা। মহর্ষি বলতে একাধিক ঋষির একটি গোষ্ঠীকে বোঝায়। এই মহর্ষিরা ছিলেন নিজ নিজ সম্প্রদায়ের, যাঁরা ইতর-পদবাচ্য তাঁদের পরিচালক। কিন্তু ঐতরেয় শাখার গ্রন্থ সেই মহর্ষিদের কারও দ্বারা লিখিত নয়। যতদূর বোঝা যায়, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ রচিত হয়েছিল সেকালের পরিচালিত মানুষদের একটি গোষ্ঠীর দ্বারা। এঁরা কোনো মহর্ষির দ্বারা পরিচালিত হলেও, মহর্ষি তাঁদের যথোচিত সম্মান না-দেওয়ায় এঁরা নিজেরাই কর্মযজ্ঞের বিষয়, নিয়মাদি নিজেরাই লিখে ফেলেছিলেন। উপরোক্ত কাহিনী সে কথাই বলে।

ঐতিহ্য : ১. ইতিহ + য (ষ্যঞ্) স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. *ইতিহ থাকে যাহাতে*। ৩. ইতিহ, অর্থাৎ পরম্পরাগত উপদেশ (প্রবাদ); যাহার নির্দ্দিষ্ট বক্তা নাই, তাদৃশ উপদেশ (প্রবাদ)। (এই বৃক্ষে যক্ষ বাস করে — বৃদ্ধেরা ইহা বলেন, ইহার কেহ নির্দ্দিষ্ট বক্তা নাই, অর্থাৎ কেহ ইহা দেখিয়া বলে নাই, লোকপরম্পরায় শুনা যায় মাত্র; সুতরাং ইহাতে সংশয় হয়। পৌরাণিকের মতে, ঐতিহ্য অষ্টবিধ প্রমাণের একতম, কিন্তু সংশয় হেতু সাংখ্যমতে প্রমাণ নহে। তবে, ইহা আপ্তবাক্য হইলে, আগমরূপ প্রমাণ হয়।) (ব.শ.)। ৪. tradition অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **আপ্ত**, **ইতিহাস**।

'ইন্দ' (ইঙ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতীন্দ্রিয়, ইঙ্, ইঙ্গন, ইঙ্গলা, ইঙ্গিত, ইঙ্গিতকোবিদ, ইঙ্গিতাকার, ইঙ্গুদ, ইঙ্গুদী, ইঙ্গুল, ইঙ্গুলী, ইঁদকাঠ, ইন্দ্, ইন্দিবর, ইন্দিরা, ইন্দু, ইন্দুকক্ষা, ইন্দুকলা, ইন্দুকলিকা, ইন্দুকান্ত, ইন্দুকিরীট, ইন্দুকুন্দসোমবর্ণ, ইন্দুক্ষয়, ইন্দুজ, ইন্দুজনক, ইন্দুদল, ইন্দুনিভ, ইন্দুবদন, ইন্দুবাসর, ইন্দুবিন্দুবান, ইন্দুবিম্ব, ইন্দুব্রত, ইন্দুভৃৎ, ইন্দুমণি, ইন্দুমণ্ডল, ইন্দুমুখ, ইন্দুমৌলী, ইন্দুরেখা, ইন্দুলেখা, ইন্দুলোক, ইন্দুলৌহ, ইন্দুশেখর, ইন্দুসুত, ইন্দুসুনু, ইন্দ্র, ইন্দ্রকর্ম্মা, ইন্দ্রকীল, ইন্দ্রকৃষ্ট, ইন্দ্রকোশ, ইন্দ্রগোপ, ইন্দ্রচাপ, ইন্দ্রজাল, ইন্দ্রজালিক, ইন্দ্রজালী, ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রতুল, ইন্দ্রতুলক, ইন্দ্রত্ব, ইন্দ্রদারু, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ইন্দ্রদ্রু, ইন্দ্রদ্রুম, ইন্দ্রধনু, ইন্দ্রধনুক, ইন্দ্রধনুঃ, ইন্দ্রধ্বজ, ইন্দ্রনীল, ইন্দ্রপর্ব্বত, ইন্দ্রপাত, ইন্দ্রপুষ্পা, ইন্দ্রপুষ্পিকা, ইন্দ্রপুষ্পী, ইন্দ্রপ্রস্থ, ইন্দ্রবজ্রা, ইন্দ্রবল্লরী, ইন্দ্রবল্লী, ইন্দ্রবস্তি, ইন্দ্রবারুণিকা, ইন্দ্রবারুণী, ইন্দ্রবীজ, ইন্দ্রব্রত, ইন্দ্রমথ, ইন্দ্রমহ, ইন্দ্রমিঠা, ইন্দ্ররাজ, ইন্দ্রলুপ্ত, ইন্দ্রলুপ্তক, ইন্দ্রলোক, ইন্দ্রশক্র, ইন্দ্রশৈল, ইন্দ্রসাবর্ণি, ইন্দ্রসুত, ইন্দ্রসুনু, ইন্দ্রাণী, ইন্দ্রানুজ, ইন্দ্রাবরজ, ইন্দ্রায়ুধ, ইন্দ্রারি, ইন্দ্রাসন, ইন্দ্রি, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়গ্রাম, ইন্দ্রিয়গোচর, ইন্দ্রিয়ঘাত, ইন্দ্রিয়দোষ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, ইন্দ্রিয়পরবশ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ইন্দ্রিয়বধ, ইন্দ্রিয়বর্গ, ইন্দ্রিয়বিপ্রতিপত্তি, ইন্দ্রিয়বিষয়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি, ইন্দ্রিয়বোধন, ইন্দ্রিয়রাজ, ইন্দ্রিয়সংযম, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ, ইন্দ্রিয়সুখ, ইন্দ্রিয়সেবন, ইন্দ্রিয়সেবা, ইন্দ্রিয়স্বাপ, ইন্দ্রিয়াদি, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা, ইন্দ্রিয়ায়তন, ইন্দ্রিয়ারাম, ইন্দ্রিয়ার্থ, ইন্দ্রিয়াসঙ্গ, ইন্দ্রিয়েশ, ইন্দ্রিয়েশ্বর, ইন্দ্রেন্দ্রাণী, ইন্দ্রেশ্বর, ইন্দ্রোৎসব, ঐন্দব, ঐন্দ্র, ঐন্দ্রজালিক, ঐন্দ্রি, ঐন্দ্রিয়, ঐন্দ্রিয়িক।

ইন্দ্ = গতিশীলতার ন্-অন (নাকরণ, negation) দান। **ইন্দ** = গতিশীলতার নাকরণ (দ্র. **অন্**) দেয় যে। ('অধীন'-এর ইন, তার দান)। (in-)।

ইঙ্গন, ইঙ্গিত : ১. ✓ইঙ্ > অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে; ✓ইঙ্ > ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাওনের রহস্যরূপ অন যাহাতে; যাওনের রহস্যরূপের গতিশীলতা তারিত যাহাতে।* ৩. গমন, চলন, কম্পন, জ্ঞান; হৃদ্গত ভাববোধক চেষ্টা বিশেষ, হৃদগত বিকার, ভয়াদির লক্ষণভূত চেষ্টা, সংজ্ঞা, সংকেত, ইশারা, উপহাস সূচক ভাবপ্রকাশ, ব্যঙ্গ। (ব.শ.)। ৪. ইঙ্গন অপ্র.। ইঙ্গিত 'ইশারা' অর্থে প্রচলিত। ৫. ইংরেজিতে এই 'ইঙ্' শব্দের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে ing রূপে, বাংলায় রয়েছে কেবল ইঙ্গিত রূপে। কার্যত ইঙ্-অন বা ing-কে on করাই 'ইঙ্গন'। ইন ও in-এর মতো এরাও সমার্থক। আর, গমন থেকে যেমন গত হয়, প্রায় সেরকম ভাবেই ইঙ্গন থেকেই ইঙ্গিত হয়। ইঙ্ অন করে করে যা গত হয়ে গেছে, তাই ইঙ্গিত। শব্দটি প্রতীকী হওয়ার পর মূলের থেকে খুবই বিযুক্ত হয়ে গেছে। ৬. ing, on।

ইন্, ইন্দ্ : ১. ✓ই + ন (নক্) - কর্তৃবাচ্যে; ইন্দ্ = প্রভুত্ব করা। (ব.শ.)। ২. *গতিশীলতার ন্-অন (নাকরণ) থাকে যাহাতে; গতিশীলতার নাকরণ দান।* দ্র. **অন্**। ৩. সূর্য্য, নৃপ, স্বামী, প্রভু, হস্তানক্ষত্র। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. 'অন্' যেমন অস্তিত্বকে তার অন্তের দিকে চলতে দেয়, 'ইন্' তদ্রূপ অস্তিত্বের চলাকে কখনও আপন অভ্যন্তরের দিকে, কখনও অপরের অভ্যন্তরের দিকে ন-অন্ করে থাকে। এরূপ 'ইন'-কারক জগৎশরীরের ক্ষেত্রে সূর্য্য, সমাজশরীরের ক্ষেত্রে শাসক বা নৃপ, পরিবারের ক্ষেত্রে স্বামী বা প্রভু, এবং মানবশরীরের ক্ষেত্রে আত্মা বা 'আমি' — যিনি তাঁর অস্তিত্বের গতিশীলতা চালাতে থাকেন, এদের প্রত্যেককেই বোঝায়। (ইন্-ই বা 'ইনি' তাই সম্মানীয়। এই 'ইন্'ই কালক্রমে প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হতে থাকে।) মনে রাখা ভালো, বিকাশের গতিশীলতা যদি সাময়িকভাবে থামানো না যায়, বিকশিত বস্তুটিকে লাভ করা যায় না। একটা পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিতেই হয়, 'আপাতত এইরকম ভাবেই কাজটি শেষ হোক। পরবর্তী পর্যায়ে আরও বিকাশসাধন করা যাবে।' আপাতত যতটা নতুন এলাকায় 'ইন্' (in) করা গেছে, যতটা জ্ঞান বা কর্মের নতুন এলাকা করায়ত্ত হয়েছে ততটা পোষমানা-এলাকার অন্তর্ভুক্ত (in) করা হোক। মনের ভিতরে যিনি এই কাজটি করেন, তিনি মনের প্রভু। একেই 'তেজের আত্মোপলব্ধি' (বা **ইন্দ্র** /দ্র. **অংরূপিণী**) বলা যায়। মানবশরীরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে ক্ষমতা, সেটাই ইন্দ্ বা প্রভুত্ব করা বা ঐশ্বর্য্য। আর 'ইন্দ্ রহে যাহাতে', সেই সত্তাকেই ইন্দ্র বলে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন ভারতের পরিচালকেরা একসময় এই ভূমিকা এত ব্যাপকভাবে পালন করেছিলেন যে, গ্রীস সভ্যতার প্রাচীন জ্ঞানী মানুষেরা এই দেশকে ইন্দ্ (ইন্ড্) বা 'প্রভুর দেশ' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। ভারতবর্ষের নাম 'ইন্ডিয়া' হওয়ার মূলে রয়েছে এই ইন্দ। দ্র. **ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়, ইষ্ট**। ৬. in, India। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম প্রাচীন ভাষা কেচুআ (Quechua)-তে 'ইন্‌কা' শব্দের অর্থ শাসক বা রাজা। সেই সূত্রে পেরুর প্রাচীন সভ্যতা 'ইনকা (Inca) সভ্যতা' নামে খ্যাত হয়েছে।

ইন্দিবর, ইন্দীবর : ১. ইন্দি + বর। ২. *ইন্দ-ই বরণীয় যাহার।* ৩. লক্ষ্মীর ইষ্ট, নীলোৎপল, নীলকুমুদ, উৎপল, কুবলয়, পদ্ম। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. চারিদিকে পদে পদে পারিষদবর্গ, মাঝে পল, এমন রাষ্ট্রকাঠামো কিসের জন্য? ঐশ্বর্যের জন্য, গৌরবের জন্য, লক্ষ্মীর জন্যই তো!

ইন্দিরা : ১. ✓ইন্দ্ + ইর্ (কিরচ্) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *ইন্দ্-এর ঈরণ করে যে; অথবা, ইন্দি (প্রভুত্বের গতিশীলতা) রহে যাহাতে।* ৩. লক্ষ্মী, শ্রী। (ব.শ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. **ইন্দ্**-এর বা 'আমি'ত্বের অস্তিত্ব বা প্রসারণ রহে যাহাতে, তাকেই ইন্দিরা বলে।

ইন্দু : ১. ✓ইন্দ্ + উ। (ব.শ.)। ২. *ইন্ দান নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। /* যে (সুধায়) সিক্ত করে। (ব.শ.)। প্রভুত্ব করার (আত্মোপলব্ধির /দ্র. **অংরূপিণী**) ঘোরে (কদর্থে নেশায়) উত্তীর্ণ করে যে। ৩. সোমলতা, চন্দ্র, ক্ষয়বৃদ্ধিযুক্ত চন্দ্র; এক (১) এই সংখ্যা, চন্দ্রদেবতাক মৃগশিরাঃ নক্ষত্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান। ... (ব.শ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. ইন্ বোঝায় সূর্য্যকে, যে তার তেজদ্বারা

সর্বদিকে অন্য অন্য অস্তিত্বের ভিতরে প্রবেশ করে, কর বা কিরণ দেয়। এই শক্তিতে সে সকলের উপর প্রভুত্ব করে। সেই ইন্দ্ যখন নবরূপে উত্তীর্ণ, তখন সে ইন্দু; তখন সে তাপ দেয় না, জ্যোতির স্নিগ্ধতা দিয়ে স্নান করিয়ে দেয়, জ্যোৎস্না দেয়। এই ইন্দু বোঝায় চন্দ্রকে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে, যৌথ-অর্থনৈতিক (সাম্যবাদী / সমাজতান্ত্রিক) শাসন হল ইন্দ্ পদবাচ্য; এবং ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক লক্ষ্মীসাধক ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক শাসন হল ইন্দু পদবাচ্য। এর সঙ্গে একালের কুবেরসাধক-ধনতান্ত্রিক শাসন মেলে না।

ইন্দুমতী : ১. ইন্দু + মৎ (মতুপ্) অস্ত্যর্থে + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। (ব.শ.)। ২. *ইন্দুমৎ-এর আধার যে*। ৩. '*পূর্ণেন্দুযুক্তা*'। পৌর্ণমাসী, পূর্ণিমা। ভোজরাজভগিনী অজরাজপত্নী ও দশরথজননী। ইনি তৃণবিন্দুশাপে ভ্রষ্টা হরিণীনামা সুরাঙ্গনা। (ব.শ.)। বিদর্ভের রাজা ভোজের কন্যা এবং সূর্য্যবংশের রাজা রঘুর পুত্র অজের স্ত্রী। ... এই ইন্দুমতীর গর্ভেই রাজা দশরথের জন্ম হয়। ... উদ্যানে ভ্রমণকালে শূন্যপথগামী নারদের বীণাচ্যুত পারিজাত মাল্য তাঁর দেহের উপর পতিত হলে ... তিনি প্রাণত্যাগ ক'রে অপ্সরার মূর্ত্তি ধারণ করে স্বর্গে প্রস্থান করেন। পুরাকালে তৃণবিন্দু নামে এক ঋষির কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে ইন্দ্র হরিণী নামে এক অপ্সরাকে তাঁর তপোভঙ্গ করতে পাঠান। ... সেই মুনির কোপে পড়ে মনুষ্য-যোনিতে ... ইন্দুমতী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ... অনুনয়ে তুষ্ট মুনি বলেছিলেন, স্বর্গীয় কুসুম স্পর্শনে তার শাপমুক্তি ঘটবে। (পৌ.অ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. মনে হয়, ফিন্যান্স ক্যাপিটাল (বা রাম) রূপে নগদ নারায়ণের আবির্ভাবের আগে যে সকল ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়ে ব্যক্তিপুঁজির বিকাশ হচ্ছিল, উপরোক্ত ঘটনা সেগুলিরই একটি ঘটনা। যৌথসমাজের গর্ভে যে আদি ফেরিওয়ালাদের (অপ্সরাদের) জন্ম, তারাই নানাভাবে ইন্দুমতী বা চন্দ্রমতী (চাঁদির অধিকারী) হতে থাকেন। ইন্দুমতী হওয়ার বা চাঁদনী হওয়ার পথ ধরেই জন্মায় দশদিক সামলানোর মতো দশ-রথী শক্তি, পরবর্তীকালে যে কিনা নগদ নারায়ণের নবরূপে উদ্ভূত হওয়ার পথ করে দিতে পারে।

ইন্দ্র : ১. ✓ইন্দ্ + র (রন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যিনি ইন্দ্‌কে রক্ষণ-ভক্ষণ করেন (তেজের আত্মোপলব্ধি / দ্র. অংরূপিণী)*। / যিনি প্রভুত্ব করেন। (ব.শ.)। ৩. দেবরাজ। পুরাণে ইন্দ্র একতম আদিত্য। ইঁহার মাতা অদিতি, পিতা কশ্যপ, কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্র (বামন)। 'বুদ্ধ', 'জিন' ইত্যাদির ন্যায় 'ইন্দ্র' উপাধিবাচক। স্বর্গের অধিপতিমাত্রই 'ইন্দ্র'। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র। বর্তমান মন্বন্তরের 'ইন্দ্র' — পুরন্দর। ইনি পূর্ব্বদিকপাল। ... ইনি পর্ব্বতের পক্ষচ্ছেদন করেন বলে 'গোত্রভিদ' ও শতযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন বলে 'শতক্রতু' নামে খ্যাত হন। ... (ব.শ.)। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা। তাঁর বর্ণনা ঋগ্বেদের এক চতুর্থাংশেরও বেশি অংশ (৩০০ টি সুক্ত) জুড়ে আছে। কিন্তু পুরাণে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন শক্তির তিনি অধীন। অপর সকল দেবতাদের উপর ইনি কর্ত্তৃত্ব করেন বলে ইনি দেবরাজ নামে বিখ্যাত। ইনি স্বয়ম্ভু নন। ঋগ্বেদ অনুসারে তিনি মাতৃগর্ভ থেকেই মাতার পার্শ্ব ভেদ করে জন্মাবার চেষ্টা করেন। জন্মগ্রহণ করেই তিনি আকাশকে উজ্জ্বল করেন। জন্মাবধিই তিনি যোদ্ধা, শত্রুদমনকারী ও অজেয়। ... তাঁর মাতা অদিতি। ... পুরুষসুক্তে ইন্দ্র ও অগ্নি পুরুষের মুখ হতে উৎপন্ন বলা হয়েছে। তিনি দ্যাবাপৃথিবীর পুত্র ও জনক দুই-ই। তাঁর পিতা দ্যো ও ত্বষ্টা। অগ্নি ও পূষা তাঁর ভ্রাতা। তাঁর স্ত্রীর নাম ইন্দ্রাণী ও শচী। রামায়ণ মতে ... অসুরজননী দিতির গর্ভস্থ সন্তানকে বজ্রাঘাতে সপ্ত খণ্ড করেন, তারাই সপ্তলোকে বিচরণকারী সপ্তমারুত। ... ইন্দ্রের বর্ণ কেশ শ্মশ্রু অশ্ব রথ সবই হরিৎ বা পিঙ্গলবর্ণ। ... ইনি জন্মিয়াই মাতা অদিতির স্তনে সোম দর্শন করেন। ... ইন্দ্রের উদর সোমরসের হ্রদ। ... সোম হতেই ইন্দ্রের উৎপত্তি। ... তিনি বহুভোজী ও চিরযুবা। ... তিনি অন্তরীক্ষের প্রধান দেবতা। ... জলরোধকারী বৃত্রকে তিনি বজ্রে বিচ্ছিন্ন করেন। ... ইন্দ্রের শত্রু — রাক্ষস, অসুর, দৈত্য, অহি, বৃত্র, উরণ, বিশ্বরূপ, অর্ব্বুদ, বল প্রভৃতি দানব। ... পাছে কেউ ইন্দ্রত্বলাভ করে এই ভয়ে ইন্দ্র তপস্বীদের তপস্যা ও সাধনায় নানা বিঘ্ন সৃষ্টি করতেন। ... তিলোত্তমাকে দেখে তিনি সহস্রনয়ন হন। ... গৌতম মুনির স্ত্রী অহল্যার সতীত্ব নাশ করেন। গৌতমের শাপে সহস্রাক্ষ হন। ... ইন্দ্রাণীর পিতা পুলোমাকে হত্যা করেন। ... ইন্দ্রের পুত্রের নাম জয়ন্ত ... এবং বালী ও অর্জ্জুন। কন্যা জয়ন্তী। ইন্দ্রের নগরীর নাম অমরাবতী, উদ্যান নন্দন, প্রমোদপুরী বৈজয়ন্ত, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তী ঐরাবত, রথ বিসান, সারথি মাতলি, তরবারি পারন্ধ, ধনু ইন্দ্রচাপ, অস্ত্র বজ্র। এইরূপ মত প্রচলিত আছে যে স্বর্গরাজ্যের যিনি অধিপতি হতেন, তিনিই 'ইন্দ্র' উপাধি লাভ করতেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. জগৎশরীরের আত্মোপলব্ধি, সমাজশরীরের আত্মোপলব্ধি, মানবশরীরের আত্মোপলব্ধি, সর্বপ্রকার তেজের আত্মোপলব্ধিই 'ইন্দ্র' পদবাচ্য। ইন্দ্রের কীর্তিরূপে উপরোক্ত ঘটনাসমূহ ভারতসমাজের আত্মোপলব্ধির নানা স্তরের নানা কীর্তিই বটে। একালের ভাষায় সর্বপ্রকারের সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, উগ্র-জাতীয়তাবাদ, এসবই সামাজিক-ইন্দ্রের চূড়ান্ত রূপ। ব্যক্তিমানুষের ভিতরে যখন ইন্দ্রসত্তা সক্রিয় হয় তখন সেও প্রসারণশীল হয়। যারা তার সেই সত্তার সহায়তা করে তাদের সেকারণেই ইন্দ্রিয় বলে। সেকালের সামাজিক ইন্দ্র-সত্তাই বিভিন্ন বীরের কার্য্যাবলীর মাধ্যমে প্রকাশিত। যুগে যুগে এই সত্তার বিকাশ ঘটেছে। বেদের যুগে এর রমরমা ছিল বলেই ঋগ্বেদে অগ্নির পরেই ইন্দ্রের স্থান, শ্লোকসংখ্যায় দ্বিতীয়। ইন্দ্রধ্বজের বা শক্রোৎসবে এবং আদিবাসীদের 'ইন্দ-কুড়ি'তে এর উত্তরাধিকার বিদ্যমান। বেদের পরবর্তী কালে, পুরাণাদিতে তেজের সমগ্র সত্তা মহেশ্বর, তেজের আত্মোপলব্ধির সমগ্র সত্তাই বিষ্ণু, এবং তার ব্যাপ্তি-অব্যাপ্তির সমগ্র সত্তাই ব্রহ্মা রূপে চিহ্নিত হয়েছে। কালে কালে ইন্দ্র বিষ্ণুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। সংক্ষেপে, আমিত্বের সম্প্রসারণশীল দখলদারী রূপকে ইন্দ্র বলে। সে আমির রক্ষক বটে, অতি-রক্ষণের কারণে কখনো কখনো ভক্ষকও বটে।

বৈদিক যুগে তখনও সমাজ যথেষ্ট বিকশিত হয়নি বলে, সামাজিক তেজের আত্মোপলব্ধিকে সেকালের শাস্ত্রকারগণ ইন্দ্ররূপে অনুভব করেছিলেন। তাঁরা আদিম সাম্যবাদী সমাজের জনগোষ্ঠীকেই (অদিতিকেই) এর মাতা, এবং তার (জ্ঞানসুরা-পালনকারী বা কশ্যপ) পরিচালকদেরই এর পিতা রূপে শনাক্ত করেন। তবে এসবই

সামাজিক ইন্দ্রের কথা। বৌদ্ধযুগের প্রাক্কালে (সম্ভবত ১০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে) এই সত্তাই প্রাচীন ভারতের বাঁধগুলি ভেঙে দিয়ে বিশাল কৃষিক্ষেত্রকে হলের অযোগ্য (অহল্যা) ভূমিতে পরিণত করে। তার আগে সেই সত্তাই তলে তলে ঐ কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের পণ্য উৎপাদনে প্ররোচিত করেছিল (বা অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করেছিল)। তার অন্যতম কারণ হল, ঐ বাঁধ-ভিত্তিক আদিম সমাজতান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার পরিচালকশ্রেণী (গৌতমেরা) মৌলবাদিতার এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যখন অটলের (stablity-র) সঙ্গে অচলের (stagnation-এর) আর কোনো পার্থক্য ছিল না। দ্র. যাস্কের 'নিরুক্ত', ১ম খণ্ড, ২৮৩, ৩১৯।

কার্যত অস্তিত্বের ভিতরে 'আমি' বোধের উদ্ভবই ইন্দ্র পদবাচ্য। কিন্তু যতক্ষণ সে 'স্ব-তন্ত্র' হবার বা 'স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠা'র চেষ্টা করে ('আমি কী করব না-করব, সেটা আমিই ঠিক করব'), ততক্ষণ তাকে চেনা যায় না। চেনা যায় তখনই, যখন সে তার স্বশাসনের এলাকা ক্রমশ প্রসারিত করে অন্যের আমিত্বের এলাকায় ঢুকে পড়ে বা অন্যের আমিত্ব নাশ করতে লাগে। আদি যুগে সবটাকেই ইন্দ্র বলা হত। (প্রতীকী ভাষাবোধের সাহায্যে যাঁরা বেদাদি পাঠ করেছেন, তাঁরা সেকারণেই ইন্দ্রকে 'সর্দার' জাতীয় গোষ্ঠীনেতা বলে ঠাউরেছেন। সেটি সর্বাংশে ত্রুটিপূর্ণ নয় এই জন্য যে, জাতীয়-আমিত্ব বা জাতীয়তাবোধও ইন্দ্র-পদবাচ্য।) পরবর্তীকালে 'আমি'র উদ্ভব থেকে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এলাকাকে বিষ্ণুর এলাকা রূপে চিহ্নিত করা হয়। কখনও বা সম্পূর্ণ এলাকাকেই বিষ্ণুর অন্তর্ভুক্ত করে উল্লেখ করা হয়। তবে পরবর্তী কালের পুরাণাদিতে নিজের এলাকা পার হয়ে অন্যের এলাকায় ঢুকে পড়াকে চিহ্নিত করা হয় ইন্দ্ররূপে। অন্যের এলাকায় ঢোকে বলেই সবসময় তার ভয়, এই বুঝি তার ইন্দ্রত্ব চলে যায়। সেই কারণে জর্জ বুশ সম্ভাব্য আক্রমণকে ভয় পায়, আফগানিস্তানকে ভয় পায়, ইরাককে ভয় পায়, 'অ্যাক্সিস অফ ইভিল'কে ভয় পায়। অপরদিকে অন্যের এলাকায় ঢোকে না বলে কর্পোরেট-নারায়ণ আগাম ভয় পায় না। যখন সেরকম সে করবে, তখন সেও আগাম ভয় পাবে। লক্ষণীয় হল, বিপরীত ঘটনার বেলায় বা ইন্দ্রলুপ্তির বেলায় বিষ্ণুর এলাকাও কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায়, থাকে শুধু 'আমি'র 'কৃচ্ছ্রজীবন' বা তক্ষ। অস্তিত্বের 'আমি'টা তখন কোনোভাবে টিকে থাকে। আরও লক্ষণীয় যে, পৃথিবীর নানা ভাষায় 'ইন্দ্র'-র 'ই', 'ইন্', 'ইঞ্', 'ইন্দ্' ইত্যাদি 'আমি' অর্থে এখনও টিকে রয়েছে। দ্র. **অংরূপিণী, আতঙ্ক**।

ইন্দ্রজাল : ১. ইন্দ্র + জাল। ২. *যার দ্বারা (ব্যক্তি বা সামাজিক) ইন্দ্র জনসাধারণকে (জলকে) আচ্ছাদিত করে।* / ইন্দ্রের জাল; ইন্দ্রিয়ের জালবৎ ('আচ্ছাদয়িতা'-বৎ) আবরক। (ব.শ.)। ৩. পরমেশ্বরের জাল, মায়াতুল্য। কুহক, মায়া, বাজি, ভেলকি। মায়ারূপ জাল। প্রতারণা। বঞ্চনা। অর্জ্জুনের অস্ত্রবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. 'magic' অর্থে প্রচলিত। ৫. জলে **জাল** ফেলে মাছ ধরা হয়। গণ-জলে জাল ফেলে মৎস্য লাভ করা ('আমার' 'আমার'— এই বোধের অধিকার লাভ করা) হয়। যাঁরা অন্যকে অধিকার করতে যান, তাঁরা যেসব মিথ্যা মায়ার ছলনায় ভুলিয়ে অন্যকে অধিকার করেন, তাকেই ইন্দ্রজাল বলে। এ **হল শক্তিমান-আমির বিছানো জাল**। দ্র. **জাল, মায়া**।

ইন্দ্রধনু : ১. ইন্দ্র + ধনু। ২. ইন্দ্রের ধনু। (ব.শ.)। দ্র. **ধনু**। ৩. ইন্দ্রস্বামিক মেঘসম্বন্ধী ধনু, ইন্দ্রচাপ। (ব.শ.)। বনবাসকালে এই ধনু মহর্ষি অগস্ত্য রামকে উপহার প্রদান করেন। ... রাম-রাবণ যুদ্ধকালে মাতলি দ্বারা ইন্দ্র এক ইন্দ্রধনু পাঠিয়ে দেন। (পৌ.অ.)। ৪. Rainbow অর্থে 'ইন্দ্রধনুষ' শব্দটি হিন্দিতে প্রচলিত, বাংলায় রামধনু। ৫. একালে যাকে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের নীতির জয়গান' বলা হয়, সেকালে তাকেই বলা হত 'ইন্দ্রধনু'; এবং একালে 'বিনিয়োগ নীতির জয়গান' যাকে বলা হয়, সেকালে তাকেই বলা হত 'রামধনু'। কীভাবে?

ইন্দ্রধনু শব্দে বিশ্বজাগতিক ইন্দ্র প্রাধান্য পেয়েছে, সামাজিক বা মানবিক ইন্দ্র নয়। এই শব্দের ব.শ. প্রদত্ত অর্থ থেকে জানা যায়, মেঘ দুরকম হয় — ইন্দ্রস্বামিক ও অসুরস্বামিক। আর **ধনু** শব্দের অর্থ থেকে জানা যায়, এ হল আইনের কার্যকরী থাকার এলাকা। পুঁজিতান্ত্রিক আইনের এলাকা হল ইন্দ্রধনু বা রামধনু, এবং অসুরতান্ত্রিক বা আদিম সমাজতান্ত্রিক আইনের এলাকা হল অসুরধনু বা **হরধনু**। এই ধনু **পরশুরাম** (পূর্বতন মহর্ষি) জনক রাজাকে দিয়েছিলেন এবং **রামচন্দ্র** এই ধনু ভেঙে দেন। অর্থাৎ রামচন্দ্র পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক আইনের এলাকার নীতি ভঙ্গ করে দেন। দ্র. **মেঘ, দেবযান**।

ইন্দ্রপ্রমিতি (ইন্দ্রপ্রমতি) : ২. *যাঁরা ইন্দ্রকে পরিমিত বা সীমিত করেন*। ৩. বশিষ্ঠ হতে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে কপিঞ্জল জন্মগ্রহণ করে। এই কপিঞ্জলের অন্য নাম ত্রিমূর্ত্তি ও ইন্দ্রপ্রমিতি। পৃথু-কন্যা হতে ইন্দ্রপ্রমিতির ভদ্র নামে এক পুত্র হয়। (পৌ.অ.)। ঋগ্‌বেদের একজন আচার্য্য, ইনি ঋষি পৈলের ছাত্র। পৈল ঋগ্‌বেদকে দুই ভাগ করে এক অংশ ইন্দ্রপ্রমতিকে অধ্যয়ন করান। ইন্দ্রপ্রমতি তাঁর সংহিতার এক অংশ নিজের পুত্র মাণ্ডুকেয়কে অধ্যয়ন করান। মাণ্ডুকেয়র পুত্র মাণ্ডুক্য। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. শতপথব্রাহ্মণের মতে ইন্দ্র নীতিলঙ্ঘন করে অগ্নি হইতে উত্থিত বৃত্র নামক 'পুরুষ'কে বধ করেন। তখন তাঁর কাটা স্কন্ধের উত্থিত রক্ত থেকে **কঙ্ক, কলবিঙ্ক,** ও **কপিঞ্জল** নামক তিনশ্রেণীর পক্ষীর উদ্ভব হয়। যতদূর বোঝা যায়, আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন যথেষ্ট পরিণত, তখন সেই ব্যবস্থাকে ইন্দ্র একবার ধ্বংস করেন। তাতে কৃষিশ্রমিক (**কঙ্ক**), কারুশিল্প-শ্রমিক (**কলবিঙ্ক**), ও কেরানিকুলের (**কপিঞ্জল**-এর) মুক্তিলাভ ঘটেছিল। এই কপিঞ্জলদের মধ্যে আদি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু গুণাগুণ ছিল। এদের তিত্তিরিও বলা হত। **যাজ্ঞবল্ক্য** আদিম সমাজতন্ত্রবাদী ব্যাসরচিত বেদ বমি করে দিয়ে সূর্য্যের কাছে সরাসরি বেদশিক্ষা করেন এবং **শুক্ল যজুর্ব্বেদ** রচনা করেন। আর তাঁর পরিত্যক্ত বমি-করা বেদ ভক্ষণ করে তার থেকে **কৃষ্ণযর্জুর্ব্বেদ** তৈত্তিরীয় সংহিতা লিখেছিলেন এই **তিত্তিরি**রা। এঁরা ইন্দ্রবিরোধী। তাই এদের অন্য নাম ইন্দ্রপ্রমিতি। অনেকেই জানেন না, যজুর্ব্বেদ তাই দু'রকম। শুক্ল যজুর্ব্বেদ ধনতান্ত্রিক আদর্শে রচিত এবং কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ আদিম সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রচিত। দ্র. **যাজ্ঞবল্ক্য**।

ইন্দ্রপ্রস্থ : ২. *ইন্দ্রত্ব যেখানে প্রকৃষ্টভাবে স্থিত।* / ইন্দ্রের (পর্ব্বতরাজ মন্দরের) প্রস্থতুল্য প্রস্থ (‘প্রকৃষ্ট স্থিতিযুক্ত’) যাহার। (ব.শ.)। ৩. যুধিষ্ঠিরের নির্ম্মিত নগরবিশেষ। দিল্লী। ... ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্যপ্রদানপূর্ব্বক খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে অনুমতি দিলে, পাণ্ডবেরা তথায় গমন করিয়া এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। (ব.শ.)। ... যুধিষ্ঠিরের রাজধানী। বর্তমান দিল্লিতে ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। পাণ্ডবরা দ্রৌপদীকে লাভ করে হস্তিনাপুরে আসবার পর ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের অর্ধরাজ্য দিয়ে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করতে বলেন। পাণ্ডবেরা সম্মত হয়ে খাণ্ডবপ্রস্থকে বাসোপযোগী করে বিরাট শহরে পরিণত করেন। ... এই শহর ইন্দ্রপ্রস্থ নামে খ্যাত। মতান্তরে, খাণ্ডবারণ্যের মধ্যে একটি নগরের নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। কথিত আছে দেবতারা ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপনা করেছিলেন। এই স্থানে পূর্ব্বকালে ইন্দ্র বিষ্ণুর পূজা করতেন, সেই থেকে এর নাম ইন্দ্রপ্রস্থ। ... (পৌ.অ.)। ৪. নামরূপে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. All roads lead to Rome — ‘সকল পথই রোমে যায়’, কথাটির কী মানে? ব্যাস রচিত মহাভারতে (অনুবাদ কালীপ্রসন্ন সিংহ) সেই ইন্দ্রপ্রস্থের গৌরব বর্ণনা করতে গিয়ে মহাভারতকার জানাচ্ছেন, ‘আগে সব পথ হস্তিনাপুর দিয়া যাইত, এক্ষণে সব পথ ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিতে লাগিল।’ মহাভারতের এই বিবরণ থেকে আমাদের মনে স্বভাবতই অনেকগুলি প্রশ্ন ভিড় করে আসে। ক) সব পথ রোমে যাক আর হস্তিনাপুর বা ইন্দ্রপ্রস্থেই যাক, দুটি বাক্যের মধ্যে যে একই ‘কনসেপ্ট’ ঢোকানো আছে, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে? খ) কী সেই ধারণা? গ)সেই ধারণা বা কনসেপ্টটি কোন জাতি আগে অর্জন করেছিল? ভারতীয়রা নাকি রোমবাসীরা? ঘ) ধারণাটি একদেশ থেকে অন্য দেশে গেছে, নাকি, যে-যার স্বাধীনভাবে অর্জন করেছিল, নাকি একই উৎস থেকে ভারতে ও রোমে দুদিকেই প্রবাহিত হয়েছিল? ঙ) এ-ধারণাটি বর্তমানে আমাদের কোনো কাজে লাগবে কী? ...

আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার (বৈদিক ব্যবস্থার) যে উত্তরাধিকার আমরা মহাভারতে পাই, তাতে রাষ্ট্রের আমলাদের দুটি শ্রেণী ছিল। একটিকে বলা হত অশ্ব এবং অন্যটিকে বলা হত হস্তী বা গজ। অশ্বরা ছিলেন একালের ভাষায় স্পেশালিস্ট এবং হস্তীরা ছিলেন একালের ভাষায় বুরোক্র্যাট। এই হস্তীরা যখন কৌরবদের রাজধানীতে জাঁকিয়ে বসেন, তখন সে-রাজধানীর নাম হয় হস্তিনাপুর। অর্থাৎ এক কথায়, হস্তিনাপুর কথাটির মানে হল ‘প্রাচীন আমলাদের বাসস্থল’। এটি আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শেষযুগের রাজধানী।

এই ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন পাণ্ডবেরা। তাঁরা আদি পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁদের রাজধানী স্বভাবতই হয় ‘ইন্দ্রপ্রস্থ’। ধৃতরাষ্ট্রের সময়ে একবার উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার মতো পরিবেশ আসে, একালের সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের পাশাপাশি চলার মতো। তখন দেখা দেয় দুই রাজত্ব, দুই রাজধানী। তাই হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ।

রাজধানী হল দেশের কেন্দ্র। তার সবচেয়ে বড় গুণ হল, দেশের সেরা জ্ঞান, জ্ঞানফল, শ্রমফল, পরিষেবা — যা কিছু অন্যকে দিয়ে দেওয়া যায়, সে-সবকিছুকে সে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। আপনি সেরা যা-কিছু বানাবেন, যা কিছু অর্জন করবেন, তা নিয়ে রাজধানীতে যাবেন, এটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ দেশের সমস্ত দিকে যেন অজস্র পথ রয়েছে এবং সে-পথগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছে রাজধানীতে। সেই পথগুলি ধরে মানুষ রাজধানীতে নিয়ে আসে তার অর্জন। কারণ সেখানেই সে তার অর্জনটির সবচেয়ে বেশি মর্যাদা পেতে পারে। দেশের সমস্ত জ্ঞানীগুণী মানুষ, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তাঁদের বিদ্যা, পণ্য পরিষেবা, গান বাজনা সবই তাই রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হয়। হস্তিনাপুর যখন রাজধানী ছিল, তখন সব সামাজিক অর্জনই ধাবিত হত হস্তিনাপুরের দিকে, ইন্দ্রপ্রস্থ যখন রাজধানী তখন সব সামাজিক অর্জনই ধাবিত হত ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে। রোমেও তাই হয়েছিল। দ্র. **খাণ্ডব, খাণ্ডবপ্রস্থ, খাণ্ডদাহন**।

ইন্দ্রলুপ্ত : ১. ইন্দ্র, লুপ্ = বিমোহন, আকুলীভাব, বিনাশন। ২. *যাহা হইতে ইন্দ্র (আমিত্ব) লুপ্ত হইয়াছে।* / যাহার দ্বারা ইন্দ্রের (কৃষ্ণবর্ণ কেশের) লোপ হয়। (ব.শ.)। ৩. কেশনাশক রোগবিশেষ। খালত্য। টাকরোগ। (ব.শ.)। ৪. bald বা ‘টাক’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ৫. মানুষের ‘আমি’-বোধ অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হলে তার মাথার চুল উঠে যায়। দেশের ‘আমি’বোধ (জাতীয়তাবোধ) অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হলে দেশের ইন্ডাস্ট্রি বিলুপ্ত হয়। দ্র. **ইন্দ্র, আতঙ্ক, টাক**।

ইন্দ্রিয় : ১. ইন্দ্র + ঈয় (য), ‘তাহার লিঙ্গ’ অর্থে। (ব.শ.)। ২. ***ইন্দ্রের** (= আমিত্বের) যে সত্তাগুলি লীন হওয়ার জন্য গমন করে।* / ইন্দ্রের লিঙ্গ। ৩. আত্মার লিঙ্গ। (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় করণ, দর্শনাদি কর্ম্ম, আত্মা কর্ত্তা — এইরূপে অনুমাপক।) জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধন চক্ষুরাদি ও হস্ত প্রভৃতি। ... সুশ্রুত মতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় — চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক; পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় — বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ; চারিটি অন্তরিন্দ্রিয় — মনঃ বুদ্ধি অহংকার চিত্ত। ... মনুসংহিতা ও সাংখ্য মতে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিদেবতা যথাক্রমে সূর্য্য দিক্ অশ্বিনীকুমার বরুণ ও বায়ু; বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধিদেবতা যথাক্রমে বহ্নি ইন্দ্র বিষ্ণু মিত্র ও প্রজাপতি; এবং চন্দ্র চতুর্ম্মুখ শঙ্কর অচ্যুত যথাক্রমে মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তের অধিদেবতা। ... (ব.শ.)। ৪. চোখ কান নাক জিভ ত্বক এই পাঁচটিকে এখন ইন্দ্রিয় বলা হয়ে থাকে। ৫. দল থেকে যেমন দলীয়, মানব থেকে মানবীয়, তেমনি **ইন্দ্র** থেকে **ইন্দ্রিয়**। মানবশরীরের ভিতরে যে ‘আত্মোপলব্ধি’ থাকে, সেই তার ইন্দ্র। একে ‘আমিত্ববোধ’ বা ‘আমি’ এবং ‘আত্মা’ও বলা হয়। তার এগারো জন অনুচরই মানবশরীরের এগারোটি ইন্দ্রিয়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং মন। কেউ কেউ মনকে আরও চার ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম পাঁচটি মূলত ইনফরমেশন এজেন্সি, দ্বিতীয় পাঁচটি মূলত কাউন্টার-অ্যাকশন এজেন্সি, এবং তৃতীয়টি দু'দিক সামলানোর সুপারভাইজিং এজেন্সি বা মাস্টার কন্ট্রোল। এদের ওপরে সেন্ট্রাল কমান্ড — ‘আমি’-বোধ বা ইন্দ্র। ইন্দ্রের হয়ে কাজ করে বলেই এদের সবাইকে ইন্দ্রিয় বলে। সেকালের চিন্তাপদ্ধতি অনুসারে ধরে নেওয়া হত যে, বস্তুদেহ জীবদেহ মানবদেহ সমাজদেহ সমস্ত দেহের ক্ষেত্রেই ভেতরের মেকানিজম এইরকম। দেহের পরিচালন-ব্যবস্থা সম্পর্কে এইরূপ ধারণা ঠিক কি বেঠিক, সেটি কথা নয়। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা

তাঁদের বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে এইরকম বুঝেছিলেন, সেটাই কথা। আর, তাঁদের ইত্যাকার অর্জন কতখানি মূল্যবান কিংবা আদৌ মূল্যবান কি না, সেকথা আরও ভাল করে বোঝা যাবে যেদিন আমরা এই ইন্দ্রিয়সমূহের অধিদেবতা বিষয়ক তথ্যগুলি সুনির্দিষ্ট ভাবে বুঝতে পারব।

'ইন্ধ্' ক্রিয়াপদের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ইদ্ধ, ইধ্ম, ইন্ধ্ (ইনসাফ্, ইনভয়েস), ইন্ধন.

ইন্ধ্ = গতিশীলতার ন্-অন (ন্-করণ, negation) ধারণ। **ইন্ধ** = গতিশীলতার ন্-অন (দ্র. **অন্**) ধারণ করে যে।

ইন্ধন : ১. ✓ইন্ধ্ + অন - করণবাচ্যে; অথবা, ✓ইন্ধি + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে; অথবা ✓ইন্ধি + অন - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গতিশীলতা ধারক অন থাকে যাহাতে।* / যাহার দ্বারা দীপ্তি সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. দ্যোতন, দীপন, অগ্নিদীপন কাষ্ঠ, দাহ্য, জ্বালানী কাঠ, দ্যুতি, দীপ্তি, দ্রব্যের নির্ম্মাণ উপকরণ কাষ্ঠ। (ব.শ.)। ৪. to heat বা 'আঁচ দেওয়া' অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. 'গতিশীলতা ধারক' আগুন হলে, তা দিয়ে যেমন কোনো বস্তুকে গতিশীল বা গরম করে দেওয়া যায়; তেমনি 'গতিশীলতা ধারক' উত্তেজনাকর মন্ত্রণা হলে তা দিয়ে কোনো ব্যক্তিকে গতিশীল বা গরম করে দেওয়া যায়। তাই উনুনে চড়ানো হাঁড়িতে যেমন ইন্ধন দেওয়া যায়, তেমনি কুকর্মে লিপ্ত মানুষকেও ইন্ধন দেওয়া যায়।

'ইষ্' ক্রিয়াপদের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনিক্ষু, অনিচ্ছা, অনিচ্ছু, অনিচ্ছুক, অনিষ্ট, অন্বিষ্ট, অন্বেষ, অন্বেষক, অন্বেষণ, অন্বেষিত, অন্বেষী, অন্বেষ্টব্য, অন্বেষ্টা, অন্বেষ্য, অভীষঙ্গ, অভীষ্ট, অভীষ্টিত, অভীষু, আক, আখ, ইক্ষু, ইক্ষুকাণ্ড, ইক্ষুচ্ছায়, ইক্ষুদণ্ড, ইক্ষুনেত্র, ইক্ষুপাক, ইক্ষুবণ, ইক্ষুবাটিকা, ইক্ষুবাটী, ইক্ষুবারি, ইক্ষুসমুদ্র, ইক্ষুবিকার, ইক্ষুমতি, ইক্ষুমার, ইক্ষুমূল, ইক্ষুমেহ, ইক্ষুযন্ত্র, ইক্ষ্বাকু, ইচ্ছ, ইচ্ছা, ইচ্ছাবান, ইচ্ছামতী, ইচ্ছাময়, ইচ্ছাময়ী, ইচ্ছামৃত্যু, ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছাসম্পৎ, ইচ্ছাসুখে, ইচ্ছিত, ইচ্ছু, ইচ্ছুক, ইট, ইটা, ইটাল, ইৎসা, ইশরমূল, ইষরমূল, ইশ্চা, ইশতাহার (ইশ্চাৎ-হার), ইশপিশ, ইষ্, ইষ, ইষপিষ, ইষারমূল, ইষিকা, ইষু, ইষুধি, ইষুপ্রয়োগ, ইষুমান, ইষুমার্গ, ইষেরমূল, ইষ্ট, ইষ্টং-প (stamp), ইষ্টক, ইষ্টকচিত, ইষ্টকারী, ইষ্টকা, ইষ্টকামধুক, ইষ্টগন্ধ, ইষ্টগোষ্ঠী, ইষ্টজন, ইষ্টদেব, ইষ্টদেবতা, ইষ্টনিষ্ঠা, ইষ্টপ্রয়োগ, ইষ্টস্থান (ইষ্ট-এষণ, station), ইষ্টানিষ্ট, ইষ্টাপত্তি, ইষ্টাপূর্ত্ত, ইষ্টার্থ, ইষ্টি, ইষ্টিক, ইষ্টিকবচ, ইষ্টিকা, ইষ্টিঠাকুর, ইষ্টিদেবতা, ইষ্টিং (steam), ইষ্টীন্, ইষ্বসন, ইষ্বস্ত্র, ইষ্বাস, ঈষিকা, এষণ, এষণা, ঐক্ষব, ঐক্ষ্বাক, ঐচ্ছিক, যথেচ্ছ, যথেষ্ট, নিশপিশ।

ইষ্ = গতিশীলতার পুনরাবৃত্তি। **ইষ** = গতিশীলতার পুনরাবৃত্তি থাকে যাহাতে। (wish)।

ইক্ষু : ১. ✓ইষ্ + সু (ক্সু) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ইষ্-এর বা গতিশীলতার পুনরাবৃত্তির (ইচ্ছার) করণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. মিষ্টরস শরজাতি তৃণবিশেষ, আকগাছ, ইক্ষুদণ্ড, কোকিলাক্ষবৃক্ষ। (ব.শ.)। ৪. sugarcane বা আখদণ্ড অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. ই + ষ্ + ক্ + উ — এই বর্ণসমবায় থেকে যে অর্থ বেরোয়, উপরের (২) ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কেন এবং কীভাবে সেই অর্থটি একই সঙ্গে 'আকগাছ'কেও বোঝায়, তা বুঝে উঠতে বেশ বেগ পেতে হয়। আসলে শব্দটি 'ইক্-ষ্' না 'ইষ্-ক্'; 'ই + ক্ + ষ্' নাকি 'ই + ষ্ + ক্', অর্থাৎ 'গতিশীল করণের পুনরাবৃত্তি' নাকি 'গতিশীলতার পুনরাবৃত্তিকরণ' — এই হল সমস্যার মূল। সত্যিই তো, আখ বা চিনি দেখে আমাদের খেতে ইচ্ছে হয়, নাকি, আমাদের ইচ্ছে গিয়ে জিনিসটিকে খেয়ে দেখেছে বলেই আজ সেটি দেখেই আমাদের খেতে ইচ্ছে হয়! কেবল তাই নয়, আমাদের সেই ইচ্ছা আখকে আখ থাকতে দেয়নি, তাকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে 'চিনি'তে রূপান্তরিত করে দিয়েছে; তৃণাদি জাতীয় 'শর' থেকে 'করা' বলে যার নাম হয়েছে '**শর্করা**'। আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা তাই দু-দিক থেকেই বিষয়টিকে মর্যাদা দিয়ে গেছেন। তাঁরা ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের বেলায় মানেন ষ্ আগে ক্ পরে, কিন্তু উচ্চারণের বেলায় মানেন ক্ আগে ষ পরে। অর্থাৎ বোঝার বেলায় মানুষের ইচ্ছাটি (ইষ্) আগে, করণ পরে; কিন্তু বলার বেলায় করণ আগে, ইচ্ছা পরে।

তবে মানুষের ইচ্ছা তো কেবল আখকে চিনিতে রূপান্তরিত করেই ছাড়েনি, জগতের যে সমস্ত বিষয় ও বস্তুর সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঘটে তাদের অনেককেই সে ইচ্ছানুরূপ বদলে দেয়। এবং বদলে দিয়ে সম্পদে রূপান্তরিত করে দেয়। তাই *'গতিশীলতার পুনরাবৃত্তির করণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে'*, (= ইক্ষু) কেবল সম্পদরূপী আখ বা চিনিই নয়, মানুষের সমস্ত বাহ্যিক ও মানসিক সম্পদও ইক্ষু পদবাচ্য। কালে কালে অর্থটি সংকুচিত হয়ে কেবল আখদণ্ড বা sugarcane-এ পরিণত হয়েছে। ৬. ecu।

ইক্ষ্বাকু : ১. ইক্ষু + ✓অক্ (ব্যাপ্তি) + উ (উণ্) সংজ্ঞার্থে। (ব.শ.)। ২. *ইক্ষুর ব্যাপ্তিকরণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. বৈবস্বত মনুর পুত্র সূর্য্যবংশীয় আদি রাজা। (ব.শ.)। সূর্য্যবংশীয় রাজাদের আদিপুরুষ। বৈবস্বত মনুর পুত্র এবং হাঁচবার সময় (অর্থাৎ ক্ষুৎ) মনুর নাসিকা থেকে উৎপন্ন। ইনি অযোধ্যার রাজা। ইনি বিকুক্ষি, নিমি, দণ্ডক ইত্যাদি একশত পুত্রের পিতা। ... এঁর নাম হতে এই বংশের নাম হয় ইক্ষ্বাকু বংশ। সূর্য্যবংশের ইনি স্থাপয়িতা। ... ইক্ষ্বাকু বংশেই রামচন্দ্রের জন্ম হয়। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. একই কর্মের পুনরাবৃত্তিজনিত দক্ষনীতি গ্রহণের ফলে আদিম সাম্যবাদী (মহান) সমাজের শেষযুগে সমাজ-পরিচালকদের মনে যে অভিভবেচ্ছার জন্ম হয়, সেই সত্তাটি ইক্ষ্বাকু। মানুষ যখন প্রথম আইনবোদ্ধা মানুষ (আজকের ভাষায় civilised বা নাগরিক) রূপে পরিণত হল বা বৈবস্বত মনু হল, তখন তার থেকেই এই সত্তার জন্ম। এই সত্তাই আদি 'পাবলিক সেকটর'-এর বা আদিম সমাজতান্ত্রিক যৌথব্যবস্থার প্রথম প্রবর্ত্তক বা সূর্য্যবংশের আদি রাজা।

যতদূর বোঝা যায়, নাগরিক মানুষদের সত্যগোপন-চেষ্টার (হাঁচির) ফলস্বরূপ এই সত্তার জন্ম হয়েছিল। নাসিকা থেকে জন্ম হয়েছিল সূর্য্যতনয় অশ্বিনীকুমার নাসত্যের প্রায় একই ভাবে, একই যুগে। সম্ভবত একই ঐতিহাসিক ঘটনা দু'ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে ইক্ষ্বাকু ও নাসত্যের জন্মবৃত্তান্তে। দ্র. **ইন্দ্রিয়, অশ্বিনীকুমার, নাসত্য, সংজ্ঞা**।

ইচ্ছা : ১. ✓ইষ্ + অ (শ) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *যে যাওনে চয়ন (বিশেষ কিছুর কামনা) ছাদিত থাকে, অথবা, চয়নযাত্রী ছাদিত থাকে যাহাতে।* ৩. কামনা, অভিলাষ, মনোরথ, পীঠশক্তিবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. wish বা 'বাসনা' অর্থে প্রচলিত। ৫. জীব সৃষ্টি করে পরমাপ্রকৃতি তো আমাদের ছেড়ে দিলেন, কিন্তু প্রত্যেককে ছাড়লেন অপূর্ণ করে। এবার নিজেকে পূর্ণ করো, তৃপ্তি লাভ করো, আনন্দ লাভ করো! অতএব নিজেকে পূর্ণ করার বাসনা জীবের নিজের ভেতরেই তাকে তাড়া দিতে থাকে। ফলত জীবের মন বা আমিত্ব (ইন্দ্রত্ব) বেরোয় উপায় খুঁজতে। তার অনুচরদের (ইন্দ্রিয়দের) ঘাড়ে ভর দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করার উপায় সে এদিক-সেদিক খোঁজ করতে শুরু করে। মনের এই উদ্দেশ্যময় গমনকে বলে ইচ্ছা। (দ্র. ছ বর্ণের অর্থ।) ৬. ইংরেজি wish।

ইট : ১. ✓ই + ট। ২. *যাওনের টঙ্কার থাকে যাহাতে।* / যাহাতে জিগীষুর যাত্রা আছে। (ব.শ. / দ্র. **ইষ্**)। ৩. ইষ্টক, ইষ্টকখণ্ড। (ব.শ.)। ৪. brick বা 'ইঁট' অর্থে প্রচলিত। ৫. ইট শব্দটি এসেছে দু দিক থেকে। প্রথমটি আদি ইট, যার অর্থ উপরে (২) দেওয়া আছে; আর দ্বিতীয়টি এসেছে 'ইষ্টক' থেকে। তার অর্থ উপরোক্ত আদি 'ইট' থেকে আলাদা। সেকারণেই তার উচ্চারণ প্রায়শই 'ইঁট' হয়ে থাকে। তখন তার অর্থ দাঁড়ায় 'যাওনের রহস্যরূপের টঙ্কার যাহাতে'।

ইষ, ইষু (ইষিকা, ইষীকা, ইষুধি) : ১. ✓ইষ্ + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে; ✓ইষ্ + উ (কু) - ক। (ব.শ.)। ২. *যাওনের দিশাগ্রস্ত শক্তির পুনরাবৃত্তি থাকে যাহাতে; যাওনের দিশাগ্রস্ত শক্তির পুনরাবৃত্তি নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* / যাহাতে ইট্ (জিগীষুর যাত্রা) আছে; যাহা শত্রু হননার্থ যায়। (ব.শ.)। ৩. ইচ্ছা, প্রাপ্তি, অন্বেষণ, অভিলাষ, নিরূপণ, প্রার্থনা, উদ্যোগ, অতিযত্নে দর্শন, আশ্বিনমাস। বাণ, শর, কামশরের সংখ্যানুসারে ৫ সংখ্যা, সামবেদবিহিত যজ্ঞবিশেষ, বৃত্তক্ষেত্রান্তর্গত সরলরেখাবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. উপরোক্ত ইষ শব্দের অর্থ (২) থেকে বোঝা যায়, **ইচ্ছা** তারই কিয়দংশ ধারণ করে। সেই কারণে ইষ শব্দটি 'ইচ্ছা' রূপে প্রচলিত হতে পেরেছে। হয়তো সেজন্যই ইষ শব্দটি বাংলায় স্বরূপে এখন আর ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু ইষ শব্দের যে বিশাল ব্যাপ্তি **ইচ্ছা** শব্দটি তাকে সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে পারে না। আর ইষু শব্দটি তো এখন একেবারেই অপ্রচলিত। সে তুলনায় ইংরেজি issue (= ইষু) শব্দটি অনেক ব্যাপকতা নিয়ে সমার্থে আজও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রায় সমার্থে সংস্কৃতের **ইষিকা (ইষীকা)** শব্দটি প্রচলিত ছিল। পুরাণাদিতে শব্দটিকে বারংবার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পার্থক্য এই যে, একালে যাকে দূর থেকে 'কাঠি করা', 'কাঠি দেওয়া' বলে, ইষিকা ছিল সেইরূপ ব্যাপার, আর ইষু ছিল সরাসরি কিছু করা। যে কারণে ইষুধি শব্দের অর্থ হয় 'যাহাতে ইষু নিহিত' (ব.শ.) থাকে, অর্থাৎ 'বাণাধার'। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এগুলি 'শর' ও 'শর রাখার আধার' বটে, কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক দৃষ্টিতে তা সর্বপ্রকারের ইষু ও তার আধারই বটে। ৬. ইংরেজি issue।

ইষ্ট : ১. ✓ইষ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ইষ্ বা ইচ্ছা (wish) বা 'জিগীষুর যাত্রা'র টঙ্কার থাকে যাহাতে* / যাহাতে অভিপ্রায় থাকে। (ব.শ.)। ৩. অভিলষিত, অভীপ্সিত, বাঞ্ছিত, প্রিয়, ইচ্ছাপূর্ব্বক কল্পিত, অর্চ্চিত, সম্মানিত, যজ্ঞে পূজিত, কৃত, বিষ্ণু, যজ্ঞ, এরণ্ডবৃক্ষ, শ্রৌতকর্ম্ম, যজ্ঞাদি, বৈধানুষ্ঠান, ধর্ম্মকর্ম্ম, অগ্নিহোত্রতপস্যাদি, ইচ্ছা, অভিলাষ, ইষ্টদেবতা, ইষ্টিঠাকুর। (ব.শ.)। ৪. 'শুভ' অর্থে প্রচলিত। ৫. অস্তিত্বের সহজাত হল ই-করার, গতিলাভের বা বিকাশের চেষ্টা, পুরাণের ভাষায় যাকে **মিত্র** দেবতা বলা হয়। এই বিকাশের সহায়ক যা কিছু, তাতে জিগীষু-অস্তিত্বের বা ইচ্ছাকারীর যাত্রা থাকে, তাই তা সবই অস্তিত্বের পক্ষে শুভ বা ভাল। তাই তাকে 'ইষ্ট' বলে। ৬. ল্যাটিন aestas ('আইস্টাস্') = গ্রীষ্মকাল, যার থেকে এসেছে aestivate, estivate। এই aestivate হল জেগে ওঠা, hibernate-এর বিপরীত শব্দ। শীতের দেশে গ্রীষ্মকালের ধারণা ছিল জেগে ওঠার সময়, শুভ বা ইষ্ট। যেমন কিনা আমাদের **দক্ষিণায়ন** হল শস্যহীনতার সময় বা প্রকৃতির বা দেবতাদের শুয়ে থাকার সময়, বিপরীতে উত্তরায়ণ হল চাষবাসের সময়, প্রকৃতির পুষ্পবতী হওয়ার সময় বা দেবতাদের জেগে ওঠার সময়। ফলত, প্রাচীন ইয়োরোপের কাছে এই ইষ্ট বা east দেশই হয়ে যায় পূর্ব্বদেশ, সূর্য ওঠার দেশ, শুভ দেশ। এমনকি প্রাক্-খ্রিস্টীয় Easter উৎসব, যাকে ইয়োরোপে যিশু খ্রিস্টের ক্রুশারোহণ ও পুনরুত্থান উৎসবের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই Easter-এর মধ্যেও একই অনুষঙ্গ কাজ করেছিল।

আবার প্রত্যয় রূপেও এই ইষ্ট-এর উত্তরাধিকার বাংলার (যথেষ্ট = যথা + ইষ্ট) মতো ইয়োরোপেরও রয়েছে। যেমন বুদ্ধ যাহার ইষ্ট = Buddhist; কমিউন যাহার ইষ্ট = Communist; এভাবেই leftist, rightist, humanist ... ইত্যাদি। একই কথা বলা যায় ইশ্ ও ইষ্-এর উত্তরাধিকার বিষয়েও। বাংলার মনীষাদির মতোই ইংরেজির রয়েছে Chinese, Japanese, Burmese, British, English ইত্যাদি রয়েছে।

এষণ, এষণা, এষণী : ১. ✓ইষ্ + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓ইষ্ + অন (যুচ্) - ভাববাচ্যে, স্ত্রী আ; ✓ইষ্ + অন - করণবাচ্যে + স্ত্রী ঈ। (ব.শ.)। ২. *এষণ = ইষ্ (ইচ্ছা) অন করে (রাখে) যে; এষণা = এষণের আধার যে; এষণী = এষণের গতিশীলতার আধার যে।* / এষণী = যাহার দ্বারা পরিমাণজ্ঞান সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ৩. লৌহময় বাণ, অনুসন্ধান, অন্বেষণ, ব্রণবিদারণব্যাপার, অভ্যন্তরে শস্ত্রপ্রবেশন দ্বারা পূযাদির অপসারণ; প্রেরণা, কাম, কামনা; মান-সাধনী তুলা, নিক্তি, 'ব্রণমার্গানুসারিণী', ব্রণস্ফোটনার্থ অস্ত্রবিশেষ, বেল্‌কার্। (ব.শ.)। ৪. স্বতন্ত্রভাবে অপ্রচলিত কিন্তু সন্ধিযুক্ত হয়ে

প্রচলিত, যথা 'গবেষণা' (গো + এষণা)। ৫. এষণ ও এষণা শব্দের ব.শ. প্রদত্ত উপরোক্ত অর্থগুলি বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কেননা, সেগুলির প্রত্যেকটির ভিতর কোনো না কোনোভাবে ইষ্ বা ইচ্ছা রয়েছে। কিন্তু এষণীর অর্থে, অর্থাৎ পরিমাণ-জ্ঞানসাধনে বা তুলাদণ্ডে তার স্থান খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়। কিন্তু আমাদের দেওয়া এর (২) অর্থটির প্রয়োগ করতে গেলেই বোঝা যাবে, ইচ্ছিত বস্তুর পরিমাণ নির্ণয় তুলাদণ্ডই তো করে! দ্র. **গবেষণা**।

ঈ

ঈ বর্ণের অর্থ : ঈ = ই-র আধার যে। ১. ই + ই = ঈ। ২. *বিকাশসাধকের আধার বা গতিশীলতার আধার।* ৩. লক্ষ্মী, কামদেব; কান্তি, গতি, ব্যাপ্তি, ক্ষেপণ, ভোজন, প্রজন; ... (ব.শ.)। ৫. দুটি 'ই' যোগ করে 'ঈ' হয়। ই হল 'যাওয়া', 'যে যায়' সে হল ঈ। অর্থাৎ ঈ মানেই 'গতিশীল বিষয় বা বস্তু'। নদ যদি 'বিত্তদান করে যে' হয়, তবে নদা হবে 'বিত্তদানকারীর আধার', নদি হবে 'বিত্তদানের গতিশীল বা বিকাশশীল থাকা' অর্থাৎ জলধারা; আর নদী হবে 'গতিশীল বা বিকাশশীল বিত্তদানের আধার যে' অর্থাৎ জলধারা বাহক খাতবিশিষ্ট উৎস থেকে মোহনা পর্যন্ত সমগ্র নদী। আমাদের river-গুলি কি 'গতিশীল বা বিকাশশীল বিত্তদান' করে থাকে? কথাটি ঠিক কি না তা নিয়ে সন্দেহ হতে পারে, কিন্তু যে মুহূর্তে পার্থিব জলধারাকে বাদ দিয়ে জ্ঞানধারা, পণ্যধারা প্রভৃতি অদৃশ্য কিন্তু বাস্তব ধারার কথা ভাবা হয়, দেখা যায় কথাটি একশো ভাগ ঠিক। তখন আবার সেই পুরনো কথাটিই ফিরে আসে — দৃশ্য বস্তুকে দেখানোর জন্য নয়, অদৃশ্য কিন্তু বাস্তব বস্তু ও বিষয়কে বোঝানোর জন্যই মানুষকে শব্দ সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

আরও আছে। যে ধারা 'কুল কুল' করে বয়ে যায়, তাকে আমরা বলি 'তির তির করে বয়ে যাচ্ছে'। সেই 'তির তির' ধারাকে ধারণ করে যে-দুই পাড়, তাদের আমরা বলি 'তীর'; ঠিক যেমন সেই 'কুল কুল' ধারাকে ধারণ করে যে-দুই পাড়, তাকে আমরা বলি 'কূল'। তার মানে, অ-কার ই-কার উ-কার ঋ-কার বোঝায় স্ব স্ব ভাবের আধেয়কে; এবং আ-কার ঈ-কার ঊ-কার ৠ-কার বোঝায় তাদের স্ব স্ব আধারকে।

অতএব ঈ বা ঈ-কার আদৌ উপক্ষেণীয় নয়। অধিকাংশ 'ঈ'-কারান্ত বাংলা শব্দগুলিকে এইভাবে দেখলে তার সঠিক অর্থও পাওয়া যায়। আজকাল বানান সংশোধনকারীরা যে 'ঈ'-কারান্ত শব্দকে 'ই'-কারান্ত করে দেন, তাতে এই গতিশীলতার আধারের কথাটি বাদ পড়ে যায়। প্রতীকী বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে তা চলতে পারে বটে, কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক শব্দের ক্ষেত্রে এই বানান বদল অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হয়।

ঈ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : ঈক্ষ্ *(ঈক্ষ্), ঈর্, ঈর্ষ্য্, ঈষ্,* ঈশ্, ঈহ্ = ৬ + ০

'ঈক্ষ্' (ঈক্ষ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনপেক্ষ, **অনপেক্ষা, অনপেক্ষিত, অনপেক্ষী,** অনবেক্ষক, অন্বেক্ষা, **অন্বীক্ষণ, অন্বীক্ষা, অপরীক্ষিত, অপরোক্ষ,** অপেক্ষা, অপেক্ষাকৃত, **অপেক্ষিত, অপ্রত্যক্ষ, অবীক্ষিত, অবেক্ষক,** অবেক্ষণ, অবেক্ষণীয়, **অবেক্ষা, অবেক্ষিতা, অবেক্ষী,** অবেক্ষ্য, অবেক্ষিত, অব্যপেক্ষ, **অমিখ, অসাক্ষাৎ,** অসাক্ষিক, **আন্বীক্ষিকী,** আপেক্ষিক, **ঈক্ষ্, ঈক্ষ, ঈক্ষক, ঈক্ষণিক, উৎপ্রেক্ষা, উপেক্ষক, উপেক্ষা, নিরীক্ষণ, নিরীক্ষা, নিরীখ, নিরপেক্ষ, নিরীক্ষক, পরীক্ষক, পরীক্ষণ, প্রতীক্ষা, প্রতীক্ষিত, প্রত্যক্ষ, প্রেক্ষক, প্রেক্ষণ, প্রেক্ষা, প্রেক্ষাগার, প্রেক্ষিত, বীক্ষণ, সমীক্ষক, সমীক্ষা, সাপেক্ষ।**

ঈক্ষ্ = গতিশীলতাধারীর **ক্ষ্**-অন। (দ্র. **ক্ষ**)। **ঈক্ষ** = গতিশীলতা-ধারীর ক্ষ্-অন **থাকে** যাহাতে। (Greek - oikos)।

ঈক্ষ, ঈক্ষা : ১. ✓ঈক্ষ্ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. **ঈক্ষ** = *গতিশীল অস্তিত্বের* ***ক্ষ্-অন*** *থাকে যাহাতে; ঈক্ষা = ঈক্ষের আধার যে।* ৩. দর্শন, দৃষ্টি, পর্য্যালোচনা, বিচারণা, নেত্র। (ব.শ.)। ৪. স্বতন্ত্রভাবে অপ্রচলিত। ৫. গতির আধারকে ঈ বলা হয়। সেই সুবাদে প্রতিটি গতিশীল সত্তাই 'ঈ' পদবাচ্য। তাকে ক্ষ করে আনে আমাদের চোখ, আমাদের লোচন। (দ্র. **অক্ষি**)। তাই ঈক্ষ শব্দের প্রকৃত অর্থ — কোনো গতিশীল বস্তু বা বিষয়কে চোখের মাধ্যমে, চিন্তার মাধ্যমে, মনশ্চক্ষুর মাধ্যমে, মনের ভিতরে নিয়ে এসে দেখা, বিচার করা, পর্য্যালোচনা করা। এই ক্রিয়াকে 'ঈক্ষ' বলে। যে আধারে এই ক্রিয়াটি আশ্রয় পায়, তাকে বলে 'ঈক্ষা'। পরীক্ষা, অন্বীক্ষা, অপেক্ষা, সমীক্ষা, নিরীক্ষা, প্রতীক্ষা, প্রেক্ষা, বীক্ষা প্রভৃতি শব্দগুলি এই ঈক্ষা শব্দের সঙ্গে উপসর্গাদির যোগে বানানো হয়। স্বভাবতই উপসর্গগুলি নিজ নিজ স্বভাব দিয়ে ঈক্ষাকে বিশেষ বিশেষ দিকে চালিত করে ঈক্ষা শব্দের অর্থের বিপুল বদল ঘটিয়ে দেয়। দ্র. **অপেক্ষা**। ৬. গ্রীক eikon, ল্যাটিন icon।

'ঈর্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ইড়কি, ইড়িক, ঈড়া, ঈর্, ঈরণ, ঈর্ম্, ঈর্শাৎ (ইরশাদ, এরসাদ), প্রেরণ, সমীর, সমীরণ।

ঈর্ = গতিশীলতাধারীর রক্ষণ। **ঈর** = গতিশীলতাধারীর রক্ষণ থাকে যাহাতে। (ঈর = (উল্টে নিলে) অ + ঈর্ = a-ir, সম-ঈর = সমীর)।

ঈরণ : ১. ✓ঈর্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ঈর্ (= গতিশীলের রহন বা রক্ষণ) অন থাকে যাহাতে।* ৩. গতি, কম্পন, সঞ্চালন, প্রেরণ। (ব.শ.)। ৪. স্বতন্ত্রভাবে অপ্রচলিত। শব্দটির ব্যবহার আছে সমীর বা সমীরণ শব্দের সঙ্গে জোটবদ্ধ ভাবে। ৫. ঈর্ অন থাকে **সমীরণ**-এ। সম-ঈরণ — অর্থাৎ গতিশীল হয়ে সর্বত্র সমানভাবে বিরাজ করার জন্য প্রবাহিত হতে থাকে বলে এর নাম

সমীরণ। কোনো বস্তু বা বিষয়ের ভিতরে এই ঈরণ-কর্ম থাকলে, তাকে আমরা 'ঈর' প্রত্যয়ের যোগে পাই। যেমন **ক্ষীর, উশীর, জম্বীর, শরীর, গভীর** ইত্যাদি। দ্র. **সমীর**। ৬. ইংরেজি err, errand, erratic, error, air।

'ঈর্ষ্য্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ঈর্ষ্যা, ঈর্ষ্যালু, ঈর্ষ্যিত, ঈর্ষ্য্, ঈর্ষ্যী।
ঈর্ষ্য্ = গতিশীলতাধারীর রক্ষণের পুনরাবৃত্তিধারণ। **ঈর্ষ্য** = গতিশীলতাধারীর রক্ষণের পুনরাবৃত্তি ধারণ করে যে।

ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা : ১. ✓ঈর্ষ্য্ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *গতিশীল রহনের পুনরাবৃত্তি থাকে যাহাতে।* ৩. অক্ষমা, পরসম্পত্তি অসহন, পরশ্রীকাতরতা, অন্যগুণ অসহিষ্ণুতা, পতির অন্যপ্রিয়াসঙ্গাদি হেতু পত্নীর মানবিশেষ। (ব.শ.)। দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের ত্রয়োদশ স্ত্রীর অন্যতমা। (পৌ.অ.)। ৪. jealousy বা 'অপরের সমৃদ্ধি দেখে গা জ্বলা' অর্থে প্রচলিত। ৫. রামের পূর্বপুরুষ ধানচাষ করতেন, রাম সেই কাজের বিদ্যাবুদ্ধি স্বভাবতই ভাল জানে এবং সেকারণে সে ধানচাষই করে। অন্য কে কী করল না-করল সেদিকে তাকায় না। এর ফলে রামের সংসারে *গতিশীল রহনের পুনরাবৃত্তি থাকে*। কিন্তু তখন যদি সে দেখে, প্রতিবেশী চাষীটি বাজারমুখী সবজি চাষ করে খুব রোজগার করছে এবং পাকাবাড়ি বানাচ্ছে, তাহলে তার গা জ্বলতে পারে, অসূয়া হতে পারে। এরকম গা জ্বলা সত্ত্বেও নিজের *গতিশীল রহনের পুনরাবৃত্তি* যদি সে না ছাড়ে, তখন তাকে বলে ঈর্ষা। আর প্রতিবেশীর পাকাবাড়ি দেখেও যদি তার গা না জ্বলে, যদি তখনও সে তার *গতিশীল রহনের পুনরাবৃত্তি* দ্বিধাহীন ভাবে চালাতে থাকে, তবে সে **সতী অনসূয়া**। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই মূল কর্মটি *গতিশীল রহনের পুনরাবৃত্তি*, অথচ তা দিয়ে চিহ্নিতকরণ হচ্ছে না; সত্তার চিহ্নিতকরণ হচ্ছে তার কর্মের পারিপার্শ্ব দিয়ে। তার মানে, শব্দার্থের নিয়মে যাকে 'ঈর্ষা' বলার কথা, প্রয়োগের বেলায় তাকে ঈর্ষা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে তার ফলাফলকে। এরকম আরও কিছু কিছু শব্দের ক্ষেত্রে ঘটে।

সমাজ একই কর্মের পুনরাবৃত্তিজনক দক্ষনীতি গ্রহণ করায়, জনসাধারণের তেরো রকম বিভাজন ঘটে। তার মধ্যে একটি গোষ্ঠীর নাম দেওয়া হয়েছিল ঈর্ষা। **কশ্যপ** এঁদের পরিচালক নিযুক্ত হন। নিঃসন্দেহে তারা কশ্যপ-নির্দেশিত পুনরাবৃত্তিমূলক সামাজিক কর্মযজ্ঞ চালাত এবং কখনও অন্য নীতিতে চলতে রাজি হত না; কিন্তু অন্যের সমৃদ্ধিও সহ্য করতে পারত না। ৬. ল্যাটিন irrisio, ইংরেজি irritate।

'ঈশ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনীশ, অনীশ্বর, ঈশ্, ঈশ, ঈশলং (ইসলাম), ঈশর, ঈশসখ, ঈশসখা, ঈশসখি, ঈশা, ঈশাদণ্ড, ঈশাদন্ত, ঈশান, ঈশানী, ঈশিতা, ঈশী, ঈশীত্ব, ঈশ্বর, ঈশ্বরনিষ্ঠ, ঈশ্বরপ্রণিধান, ঈশ্বরপ্রাপ্তি, ঈশ্বরবাদ, ঈশ্বরবিভূতি, ঈশ্বরবৃত্তি, ঈশ্বরভাব, ঈশ্বরসাক্ষী, ঈশ্বরসাযুজ্য, ঈশ্বরাধীন, ঐশ, ঐশান, ঐশিক, ঐশ্বর, ঐশ্বরিক, ঐশ্বর্য্য, সুরেশ।
ঈশ্ = গতিশীলতাধারীর শক্তি বিচ্ছুরণ। **ঈশ** = গতিশীলতাধারীর শক্তি বিচ্ছুরিত থাকে যাহাতে।

ঈশ, ঈশা : ১. ✓ঈশ্ + অ (ক) - ক; ✓ঈশ্ + অ (ঘঞর্থে ক) -ণ, স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *গতিশীলের (অস্তিত্বের) শক্তি বিচ্ছুরিত যাহাতে। / যাহা দ্বারা প্রভুত্ব করে।* (ব.শ.)। ৩. প্রভু, সমর্থ, শক্ত, নিয়ন্তা, নিয়ন্ত্রয়িতা, বশীকারক, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, স্বামী, অধিপতি, রাজা, পতি, ভর্ত্তা, ঈশান, শিব, ঈশানকোণাধিপতি দিকপালবিশেষ, রুদ্র, ঈশ্বর, রুদ্রসংখ্যানুসারে ১১ সংখ্যা, আর্দ্রানক্ষত্র, স্রষ্টা; লাঙলদণ্ড, ঈষা। সমর্থা, দুর্গা, ঐশ্বর্য্যান্বিতা নারী, ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব। (ব.শ.)। ৪. স্বতন্ত্রভাবে অপ্রচলিত। ৫. জগদীশ, ভবেশ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে সন্ধি হয়ে প্রচলিত এই শব্দটি অনেক প্রাচীন। ইংরেজিতেও একে সন্ধি হয়ে প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। ৬. ইংরেজি -ish, গ্রীক -ismos (> ইংরেজি ism), ইংরেজি bliss।

ঈশসখ (ঈশসখা) : ১. ঈশ + সখ। ২. ঈশ সখা যাহার। (ব.শ.)। ৩. শিবের সখা, শিব যাঁহার সখা; কুবের। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সখা = সহচর। সখা = যারা একসঙ্গে খায়, বা একথালায় খায় (সহ খাদক)। সহচর = যারা একসঙ্গে চরে। কদর্থে, আমেরিকা ও ইংলন্ড হাতধরাধরি করে ইরাকের তেলসম্পদ গ্রাস করল, এরা তাই পরস্পরের সখা। স্মর্তব্য যে **শিব** (inventor & innovator) ও **কুবের** (Banker) দুজনের বাসই কৈলাসে বা অপত্যের-আশে। দ্র. **কৈলাস**। দুজনই চায় নতুন সৃজন — শিবের চাই জ্ঞানের অপত্য 'উদ্ভাবন'; কুবেরের চাই টাকার অপত্য 'সুদ'। দুজনের খাওয়া তাই একসঙ্গে, কুবের তাই ঈশসখা।

ঈশিত্ব : ১. ঈশিন্ + ত্ব, তদ্ভাবার্থে। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের গতিশীল শক্তি-তারণ বহন করে যে। / ঈশভাব যাহাতে।* (ব.শ.)। ৩. ঈশিভাব, প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য্য, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের একতম স্বামীত্বরূপ ঐশ্বর্য্য। ঈশিত্ব দ্বারা স্থাবর জঙ্গম সকল ভূত আদেশকারী হয়। ইহা দ্বারা ভূতভৌতিকগণের উৎপত্তি বিনাশ ও অবয়বসংস্থান অনায়াসেই করা যায়। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কোনো বস্তু আগে কীরূপে ছিল (সেগুন গাছ), এখন কীরূপে আছে (তক্তা) এবং ভবিষ্যতে কীরূপে (টেবিলে) পরিণত হবে, যিনি বস্তুর এই ত্রিকাল দর্শন করতে পারেন, সেই ত্রিকালজ্ঞই ঈশিত্বের অধিকারী হতে পারেন। শিব বা আবিষ্কারকেরা যে আটটি বিশেষ গুণের অধিকারী হন, ঈশিত্ব তারই একটি। দ্র. **অষ্টঐশ্বর্য্য**।

ঈশ্বর : ১. ✓ঈশ্ + বর (বরচ্) - ক; ✓অশ্ (ব্যাপ্তি) + বর (বরট্) - ক। (ব.শ.)। ২. *ঈশ (গতিশীলের শক্তিবিচ্ছুরণ) কে বরণ করে যে।* ৩. প্রভু, সমর্থ, স্বকার্যকরণক্ষম, আঢ্য, ধনী, প্রভু, স্বতন্ত্র,

ঈশনশীল, রাজা, শিব, রুদ্রবিশেষ, কন্দর্প, পতি, ভর্ত্তা। বেদান্তমতে বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য। শঙ্কর মতে ঈশনশীল নারায়ণ। অবিদ্যাদি কর্ত্তৃক অসম্বন্ধ পুরুষবিশেষ। পরমেশ্বর। দেহাদিসঙ্ঘাতস্বামী জীব, জীবাত্মা, দেহী। শ্রীহরি। ... (ব.শ.)। ৪. God বা 'ভগবান' অর্থে প্রচলিত। ৫. ঈশ্বর শব্দের অর্থ 'ভগবান' — এমন কথা বঙ্গীয় শব্দকোষে লেখা নেই। তার মানে, ইংরেজরা যাকে God বলেন, ঈশ্বর সেরকম কোনো সত্তা নয়। এমনকি ভগবান বলতে আজকাল বাংলা ভাষায় যাকে বোঝানো হয়, সেও ঈশ্বর নয়। এ হল 'ঈশকে বরণ করে যে' সেই সত্তা। তিনি কোনো রাজা হতে পারেন, যিনি কিনা গতিশীলের শক্তিকে বরণ (borrow?) করে নেন; কোম্পানির মালিক হতে পারেন; মজুর খাটিয়ে চাষাবাদ করেন এমন বড়চাষিও হতে পারেন; জাতিসংঘও হতে পারে। কেবল তাই নয়, মানবশরীরের অভ্যন্তরস্থ আমিত্ববোধক উপলব্ধি বা ইন্দ্র বা আত্মাও হতে পারে যে একাদশ ইন্দ্রিয়কে কর্মে নিয়োগ করে থাকে। মোটকথা যিনি গতিশীলের শক্তিবিচ্ছুরণকে খাতির করে বরণ করে নিজের কাজে লাগান, তিনিই ঈশ্বর।

'ঈষ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনিষ্ট, ঈষ, ঈষৎ, ঈষদসমাপ্ত, ঈষদুষ্ণ, ঈষদূন, ঈষদ্বিবৃত, ঈষদ্রক্ত, ঈষা, ঈষাদণ্ড, ঈষাদন্ত, ঈষিকা, ঐষীক।

ঈষ্ = গতিশীলতাধারীর পুনরাবৃত্তি। **ঈষ** = গতিশীলতাধারীর পুনরাবৃত্তি থাকে যাহাতে। (wish)।

ঈষৎ : ১. ✓ঈষ্ + অৎ (অতি)। (ব.শ.)। ২. *গতিশীলের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ থেকে জাত যে।* ৩. অল্প, কিঞ্চিৎ, কিছু, একটু, অকৃচ্ছ্র, অল্পায়াস। (ব.শ.)। ৪. less বা 'কম' অর্থে প্রচলিত। ৫. আপনি ঠিক করলেন, কেবল স্টার মার্কস পাওয়া ছাত্রদের দান করবেন। আপনার দান দিশাগ্রস্ত হয়ে গেল। রাম স্টার মার্কস পেয়েছিল, সেই সুবাদে সে আপনার দানের (টর্চের আলো) থেকে একটু খানি (আলো) পেল। সে যেটা পেল, সেটিই ঈষৎ।

'ঈহ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনীহ, অনীহা, ঈহ, ঈহা, ঈহামৃগ, ঈহিনী, নিরীহ, সমীহ।

ঈহ্ = গতিশীলতাধারীর হওয়ন। **ঈহ** = গতিশীলতাধারীর হওয়ন থাকে যাহাতে।

ঈহা, ঈহামৃগ (অনীহ, অনীহা, নিরীহ, সমীহ) : ১. ✓ঈহ্ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ঈহা + মৃগ। ২. *ঈহা = গতিশীলের (গতিশীল অস্তিত্বের) হওয়নের আধার যে; ঈহা-রূপ মৃগ যে, অথবা, যে প্রকল্পের ভিতরে গতিশীল (নতুন) অর্জ্জন (theoretical achievement)* আছে। ৩. চেষ্টা, উদ্যম, ইচ্ছা, অর্জ্জনেচ্ছা, লিপ্সা, ক্রিয়া, উৎসাহ। **ঈহাপ্রধান** মৃগ, কুক্কুর-প্রমাণ, কপিলবর্ণ ব্যাঘ্রবিশেষ, বৃক, কোক, ঘোগ বা নেকড়েবাঘ, 'চেষ্টাকৃত মৃগ', কৃত্রিম মৃগ, মিশ্রবৃত্ত চতুরঙ্গ নাটক-বিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. অজানা কার পেছনে জানি ছেলেটা পাগলের মতো দিনরাত পড়ে আছে দেখে আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা যখন তাকে বোঝাচ্ছিল, 'ওরে ছাড় ছাড়, এই আলেয়ার পেছনে ছোটা বন্ধ কর', তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই বন্ধুদের বলেছিলেন — 'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই ...', তখন তিনি এই ঈহামৃগের কথাই বলছিলেন; আমরা বুঝতে পারিনি। এটিকে চেষ্টা (chaseটা) করে ধরতে হয়। এই 'চেষ্টাকৃত মৃগ'কে তাত্ত্বিক অর্জ্জন বা theoritical achievement-ও বলা হয়ে থাকে। নতুন তত্ত্ব অর্জ্জনের চেষ্টাই যার নেই, সে হল **অনীহ**। তার **অনীহা**র কারণেই সে ক্রমে ঈহাহীন বা **নিরীহ** হয়ে থেকে যেতে বাধ্য হয়। আর, যার যথেষ্ট ঈহা থাকে, লোকে তাকে **সমীহ** করে চলে। দ্র. **অর্জ্জন, উদ্যম, চেষ্টা**।

উ

উ বর্ণের অর্থ = উল্লম্ফন-করে যে; যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়; নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে দেখা দেয়, অত্যন্ত-অতিক্রান্ত-গত, উলটো, আমূল পরিবর্তনকারী, অস্তিত্বের পরিধির বাইরে, ঊর্ধ্বে।

উ : ১. বৈপ্লবিক পরিবর্তন, উৎকৃষ্ট বিকাশ। ৫. দ্র. **ই, ঈ ও উ বর্ণের অর্থ**। অ-এ অস্তিত্ব, প্রাণের অস্তিত্বের আলো জ্বলছে; ই-তে আলোর দপ দপ ক্রমশ এগিয়ে গতিশীলতা প্রকাশ করছে; উ-এ তা গতিপথ বদলে উপরে উঠে একটুখানি বঁড়শির কাঁটার মতো ঘুরে নীচের দিকে মুখ করে থাকছে। তাই, 'অ-ই-উ'-কারের ভিতর তিনরকম চরিত্রের আধার একত্রে সক্রিয় বলা যায় — অস্তিত্বন, গমন, বৈপ্লবিক পরিবর্তন; অর্থাৎ ধারণ, বিকাশসাধন, ও ঊর্ধ্বসীমা-লঙ্ঘনমূলক পরিবর্তন। সেই কারণে বলা হয় 'উ-কারস্তু মহেশ্বরঃ'। সহজ উদাহরণ দিয়ে বলতে হলে বলা যায় — বন্ধন ভাল নয়, কিন্তু যখন তা 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের বন্ধনে' বা 'বন্ধু'ত্বে উন্নীত হয়, তখন তা মুক্তির পথ দেখায়। 'বন্ধু' তাই বন্ধনের উলটো। একইভাবে 'শত', 'রপ' প্রভৃতি শব্দের অর্থ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর নয়; কিন্তু যখনই তা 'উ-কার'-যুক্ত হয় 'শত্রু' কিংবা 'রিপু' হয়ে যায়, তখনই তারা মানুষের দুষমন হয়ে যায়। ...

ইংরেজিতে এই 'উ'-এর উত্তরাধিকার রয়েছে woo শব্দে।

উ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : *উচ্, উজ্ (ওজ্, বজ্), উৎ (উদ্), উর্, উল্, উন্দ্, উষ্, উহ্,* উ = ৮ + ১

'উচ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অত্যুগ্র, অনুচিত, অনোচিত, অনৌচিত্য, আগরি, আগরী, উক (বচ্), উকিল, উগ্র, উগ্রকণ্ঠ, উগ্রকর্ম্মা, উগ্রক্ষত্রিয়, উগ্রগন্ধ, উগ্রচণ্ড, উগ্রজাতি,

উগ্রতপ, উগ্রতপা, উগ্রতা, উগ্রতারা, উগ্রদেব, উগ্রধন্বা, উগ্রবীর্য্য, উগ্রস্পশ্য, উগ্রশেখরা, উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রসেন, উগ্রসেবিত, উগ্রায়ুধ, উগ্রেশ, উচ্, উচ, উচল, উচা, উচিত, উচু, উচোট, উচ্চলিত, ওঁচলা, ওক, ওকঃ, ওকালতি, ওকালতনামা, ওকিল (বকিল), ওগয়রহ, ওগরা (উগ্র), ওগা (ডগা), ওঘ, ওঘবতী, ওচ-খোচ, ওচনেচ, ঔগ্রসেনি, ঔগ্র্য, ঔচিত্য, সমুচিত।

উচ্ = **উর্ধ্বে** চ্-অন। **উচ** = **উর্ধ্বে** চ্-অন করে যে।

উগ্র : ১. ✓উচ্ (সঙ্গম) + র (রন্) - ক। (ব.শ.)। ২. *উগ্ (উৎগমন / শিবত্ব) রহে যাহাতে।* ৩. উৎকট, ভয়ঙ্কর, অশক্যস্পর্শ, দুষ্কর, কটু, দীর্ঘ, দুঃসহ, কোপন, কুপিত, কঠোর, হিংস্র, অবশ্যপালনীয়, দারুণকর্ম্মা, তীক্ষ্ণবীর্য্য (খাদ্য), সর্ব্বকার্য্যে উদ্যত, উৎকৃষ্ট, বৃহৎ, মহাবেগ, অতিশয়িত, প্রচণ্ড, দারুণ, বায়ুমূর্ত্তি শিব, মহাদেব, রুদ্র, বিষ্ণু, বায়ু, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রবিশেষ, ক্ষত্রিয় হইতে পরিণীতা শূদ্রকন্যার গর্ভজাত সঙ্কীর্ণ জাতিবিশেষ (উগ্রক্ষত্রিয়), উগ্রফলহেতু পূর্ব্বফাল্গুনী পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ মঘা ভরণী এই পঞ্চনক্ষত্রগণ, (উগ্রগুণ হেতু) শজিনাগাছ, কেরলদেশ, হিংস্রজন্তু, বৎসনাভ বিষ (The root of Acoitum Ferox), রোষ। (ব.শ.)। ক) শিবের অষ্টমূর্ত্তির বায়ুমূর্ত্তি বা মরুৎমূর্ত্তি। ... খ) বরাহ কল্পের একাদশ দ্বাপরে মহাদেব গঙ্গাদ্বারে উগ্র নামে অবতীর্ণ হন এবং লম্বোদর, লম্বাক্ষ, লম্বদেশ ও প্রলম্বক নামে তাঁর চার পুত্র জন্মে। ... গ) দেবাসুর যুদ্ধে স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে বৃত হলে, মাতৃকা জটাধরা তার সাহায্যার্থে উগ্র প্রভৃতি সহচরকে প্রেরণ করেছিলেন। ঘ) মহিষাসুরের একজন সেনাপতি। ঙ) ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম। (পৌ.অ.)। বসালিপ্ত তৃণকেও যে 'আমার' বলে রুদ্রশিব তাঁকে ধ্বংস করেন, সেই কারণে তাঁকে উগ্র বলে। (শিবপুরাণ / বায়বীয় সংহিতা)। ৪. terrible, fierce, hot, strong ইত্যাদি অর্থে প্রচলিত। ৫. নিজের এলাকার সীমা বা পরিধি ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়া এবং স্বভাবত অন্যের এলাকার সীমা ফাটিয়ে ঢুকে পড়া — এই ক্রিয়াকে উৎগমন বা সঙ্গমন বলা যায়। এই ক্রিয়াটির বর্তমান নাম '**উর্ধ্বসীমালঙ্ঘন**' এবং প্রাচীন নাম 'উগ্রতা'। যে এই ক্রিয়া ধারণ করে, সে উগ্র। এই ক্রিয়ার সঙ্গে, ব.শ. প্রদত্ত উপরোক্ত (৩) অর্থে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের কোনো না কোনো সম্পর্ক রয়েছে; তার সব কথা আমরা জানি আর নাই জানি। ৬. আবেস্তায় ughra। (ব.শ.)। ইংরেজি eager, acrimony।

উগ্রচণ্ডা, উগ্রচণ্ডী : ২. *যে আধারশক্তি উগ্র ও চণ্ডকে ধারণ করে।* ৩. ভীষণা কোপনস্ত্রী। অষ্টাদশভুজা দুর্গামূর্ত্তিবিশেষ। এই মূর্ত্তিতে মহিষাসুর নিহত ও দক্ষযজ্ঞ বিনাশিত হয়। ... (ব.শ.)। ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষ। এঁর অষ্টাদশ হস্ত। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমীতে কোটি-যোগিনীর সঙ্গে এই দেবী প্রথমে আবির্ভূত হয়ে মহিষাসুরের প্রথম মূর্ত্তি বিনষ্ট করেন। এই মূর্ত্তি ধারণ করে সতী নিজের পিতা দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করেছিলেন। দক্ষযজ্ঞে যখন পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে সতী রাগে অপমানে দেহত্যাগ করেন, তখন শিব তাঁর সমস্ত অনুচর সহ দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করতে আসেন। দেহত্যাগ করে সতী উগ্রচণ্ডার রূপ নিয়ে কোটি যোগিনীসহ শিবের সঙ্গে মিলিত হন ও দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করেন। (পৌ.অ.)। ৪. 'অতিকোপনা স্ত্রী' অর্থে প্রচলিত। ৫. প্রচলিত সবকিছু দেখে দেখে যে ধারণা চয়িত বা রাশীকৃত হয়, তা যদি কেউ প্রকাশ করে এবং যদি সেই প্রকাশ শ্রোতার পক্ষে বিপজ্জনক হয়, তবে সেই প্রকাশককে চণ্ডা বা চণ্ডী বলে। বিক্ষুব্ধ 'প্রজা' বা জনসাধারণ কখনও কখনও এইরূপ করেন। তাই তাঁদের চণ্ডী বা চণ্ডা বলে। অর্থাৎ চণ্ডা বা চণ্ডী শব্দের অর্থ ক্রুদ্ধ জনগোষ্ঠী, একালের ভাষায় বিদ্রোহী জনতা, যারা এককালে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করেছিল। অন্য একসময়ে এরাই মহিষাসুরকে বধ করেছিল। স্মর্তব্য যে সমগ্র জনসাধারণকে মহামায়া বলে, আর তার অংশগুলির রয়েছে ক্রিয়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন নাম। এক্ষেত্রে যেমন ক্রুদ্ধ জনতার নাম চণ্ডী। দ্র. **মহামায়া, অষ্টচণ্ডী**।

উগ্রতারা : ২. *যে উগ্রশক্তি আপদ হইতে ত্রাণ করেন।* / যিনি উগ্র আপদ হইতে তারণ করেন। (ব.শ.)। ৩. তারারূপা দেবী। (ব.শ.)। ভগবতীর মূর্ত্তিভেদ। অন্য নাম মাতঙ্গী। শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যদ্বয়ের উৎপাতে দেবতারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে হিমালয়ের পাদদেশে মাতঙ্গমুনির আশ্রমে এসে ভগবতীর আরাধনা আরম্ভ করেন। আরাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী মাতঙ্গমুনির স্ত্রী মাতঙ্গীর রূপ ধারণ করে দেবতাদের কাছে এলেন এবং তাঁদের স্তবে তুষ্ট হয়ে মুনিপত্নীর শরীর হতে এক দিব্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করলেন। এই মূর্ত্তির চার হাত ও গলায় মুণ্ডমালা। এই মূর্ত্তিই উগ্রতারা। মাতঙ্গীর শরীর হতে উৎপন্ন বলে ভগবতীর এই উগ্রতারা মূর্ত্তিকে মাতঙ্গী বলা হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. উগ্ররূপী জনগোষ্ঠী। মত্ত জনতা। মহামায়া এই মূর্ত্তিতে শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেছিলেন। দ্র. **একজটা, মহামায়া, অষ্টতারিণী**।

উগ্রশ্রবাঃ, উগ্রশ্রবস্ : ২. উগ্র শ্রবঃ যাহার। (ব.শ.)। ৩. ক) যাহার উৎকৃষ্ট (শ্রুতিধর) কর্ণ। খ) লোমহর্ষণপুত্র, সৌতি। বাস্তবিক ইহা নাম নহে, বিশেষণ শব্দ। ইহার অর্থ 'অধিগত উপনিষদ রহস্য'। গ) ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. তার মানে, যাঁরা উপনিষদের রহস্য বুঝতে পারতেন, তাঁরা উগ্রকে শুনতে পারেন বা শুনতে পান, তাই তাঁদেরকে উগ্রশ্রবাঃ বলা হত। উপনিষদ জানা কি তাহলে খুব একটা ভালো কাজ ছিল না? যতদূর জানা যায়, ছিল না। বর্তমান সংকলকদ্বয়ের মতে আজকের পৃথিবীর সমস্ত ধর্মকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা যায়, ধর্মানুষ্ঠান বা কর্মকাণ্ডপ্রধান বেদমূলক ও জ্ঞান বা ভক্তিপ্রধান উপনিষদমূলক, যেমন 'মনুবাদী'-হিন্দু ধর্ম, ইহুদি ধর্ম, মহাযানবাদী বৌদ্ধধর্ম, ক্যাথলিকবাদী খ্রিস্ট ধর্ম, শিয়াবাদী ইসলাম ধর্ম ... প্রভৃতি ধর্মগুলি মূলত বেদবাদী, এবং বৈষ্ণববাদী হিন্দুধর্ম, হীনযানবাদী বৌদ্ধধর্ম, প্রোটেস্টান্টবাদী খ্রিস্ট ধর্ম, সুন্নিবাদী ইসলাম ধর্ম ... প্রভৃতি ধর্মগুলি মূলত উপনিষদবাদী। অবশ্য আদি 'সনাতন ধর্ম' এই বেদবাদী-উপনিষদবাদী উভয় প্রকার চিন্তাভাবনারই উর্ধ্বে। সংকলকদ্বয়ের আরও অভিমত এই যে, গান্ধিজী ছিলেন মূলত বেদবাদী এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত উপনিষদবাদী। তবে কিনা, যে কোনো ধর্ম বা মতবাদের নিজস্ব স্বভাবধর্মই হল সূত্রপাতে বৈপ্লবিক, সৃজনশীল, উর্ধ্বসীমালঙ্ঘনকারী রূপে আবির্ভূত হওয়া,

তারপর সিংহাসনে আরোহনের পর বা থিতিয়ে যাওয়ার পর ক্রমশ মৌলবাদী হতে থাকা। একথা বৈদিক ধর্ম থেকে শুরু করে একালের গান্ধী-ধর্ম বা গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রেই সত্য, এমন কি আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ক্ষেত্রেও সত্য। সর্বক্ষেত্রেই প্রচলিতের উর্ধ্বসীমালঙ্ঘনের ডাক যে শুনতে পায় সে-ই উগ্রশ্রবাঃ। সেই সুবাদে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উগ্রশ্রবাঃ।

উচিত : ১. ✓উচ্ + ত - ক। (ব.শ.)। ২. *(পরিপূরক পক্ষের সমান উচ্চতায়) উত্থিত যে।* ৩. যুক্ত, ন্যায্য, ঠিক, যোগ্য, অনুরূপ, প্রশস্ত, গ্রাহ্য, সমঞ্জস, ... (ব.শ.)। ৪. প্রায় সর্বার্থেই প্রচলিত। ৫. বচ্ + ত = উক্ত, কিন্তু উচ্ + ত = উচিত। উক্তের বেলায় মুখ থেকে কথা ঠিকরে বেরোয়, বাইরের কোনো কিছুর সঙ্গে তার বেরোনোর সম্পর্ক অবান্তর। কিন্তু উচিত-এর বেলায় তা হয় না। বাইরের পরিস্থিতি যা দাবি করছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সমান উচ্চতার, সমান দক্ষতার, সমান আঘাতের প্রত্যুত্তর হল 'উচিত'। সে উর্ধ্বে ততটাই চয়নকৃত, যতটা বিপরীত বা পরিপূরক প্রেক্ষিত দাবি করছে। ভেবে দেখলে বোঝা যায়, যাঁরা 'উচিত' শব্দটির প্রচলন প্রথম করেছিলেন, তাঁদের কী প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল! এটি বাংলা শব্দের ভাণ্ডারে একটি মহামূল্যবান রত্ন। ৬. ইংরেজি ought।

'উজ্' (ওজ্, বজ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অজুহাত, উজ্, উজড়, উজর, উজাড়, ওজঃ, ওজন (উজ-অন্), ওজর (উজ্-র), ওজস, ওজু, ওজুনামা, ওজস্বান, ওজস্বিনী, ওজস্বী। **উজ্ = উর্ধ্বে** জ-অন (জনন)। **উজ = উর্ধ্বে** জনন করে যে। (ooze)।

উজড়, উজাড় : ১. উদ্ + ✓ছর্দ্ > উজড়; ✓উচ্চাট বা ✓উজাড়। (ব.শ.)। ২. *উর্ধ্ব-জনিতের আবর্তন যাহাতে; যে প্রক্রিয়ার দ্বারা উজড় করা হয়। /* উজাড় = যে স্থান হইতে বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইয়াছে। (ব.শ.)। ৩. উজড় = বমন করা। উজাড় = শূন্য, বিধ্বস্ত, খালি, জনশূন্য, উন্মূলিত করা, শূন্য করা, খালি করা। (ব.শ.)। ৪. to vacate বা 'খালি করা' অর্থে প্রচলিত। ৫. ড় বর্ণের অর্থ আবর্তিত হতে হতে বা গড়িয়ে গড়িয়ে যাওয়া। অস্তিত্বের পরিধির বাইরে যাকে ফেলে দেওয়া হয়, সে আবর্তিত হতে হতে চলে যায়। একেই উজড় বলে। মহামারীতে বা অন্য কোনো কারণে একটি গ্রামের মানুষেরা যদি চলে যেতে থাকে, তবে সে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। আলুর বস্তা থেকে আলু ঢেলে নিয়ে খালি বস্তা কাউকে দিতে হলে গ্রামবাংলায় তাকে বলা হয় 'বস্তা আজাড় করে দেওয়া' বা 'বস্তা উজাড় করে দেওয়া'।

ওজঃ (ওজস্), ওজস্বী (ওজস্বিনী) : ১. ✓উজ্ + অস্ (অসুন্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে শক্তি উর্ধ্বে (বা আপন পরিধির বা সীমার বাইরে) জনিত হয়, তাহার আধার; ওজস্ বহন করে যে।* ৩. প্রাণবল, ইন্দ্রিয়শক্তি, শস্ত্রাদিকৌশল, তেজঃ, বল, শক্তি, শুক্র, বীর্য্য, অযুগ্ম রাশি, কাব্যগুণবিশেষ, ওজোগুণ, ওজোব্যঞ্জক গৌড়ী রীতি। (ব.শ.)। ৪. **ওজস্বী শব্দটি** কমবেশি প্রচলিত থাকলেও, ওজঃ শব্দটি প্রায় অপ্রচলিত। ৫. **আপন পরিধির উর্ধ্বে বা বাইরে** আপন শক্তির, বীর্যের, বলের যে জনন ঘটানো হয়, তাকে বাইরের দর্শকের চোখে তাকে 'উজ' বলে। এই শব্দটি বাংলায় প্রচলিত নাই, কিন্তু ইংরেজিতে রয়েছে ooze রূপে। এই 'উজ্'-এর আধারকে বলে ওজঃ বা ওজস্। সেই ওজস্ যে বহন করে, তাকে বলে ওজস্বী। এর স্ত্রীলিঙ্গে হয় ওজস্বিনী। আধুনিক যুগেও ভাল বক্তৃতাকে ওজস্বিনী বলার চল্ ছিল। ৬. ooze।

'উৎ' (উদ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনুত্তম, অনুত্তর, অনুত্তরঙ্গ, অনুৎপাদ, অনুৎসেক, অনুদক, অনুদয়, অনুদর, অনুদাত্ত, অনুদার, অনুদিত, অনুদঘাত, অনুদঘাতিনী, অনুদ্দেশ, অনুদ্ধত, অনুদ্ধার, অনুদ্ধৃত, অনুদ্যোগ, অনুদ্বেগ, অনূন, অনৌদ্ধত্য, উঁচু, উঁচকপালী, উঁচা, উঁচান, উক, উকট, উকশা, উকস, উকা, উকান, উকাড়, উকি, উকিল, উকিঝুকি, উকুন, উখড়, উখর, উখাড়, উখুন, উগ, উগর, উগার, উগাল, উগালসামাল, উগালা, উগি, উগিলন, উঘাড়, উচক, উচক্ক, উচক্কা, উচঙ্গ, উচট, উচাট, উচাটন, উচ্চ, উচ্চকৈঃ, উচ্চক্ষুঃ, উচ্চটিত, উচ্চণ্ড, উচ্চতর, উচ্চতম, উচ্চনীচ, উচ্চবাচ্য, উচ্চয়, উচ্চরণ, উচ্চরায়, উচ্চল, উচ্চললাটা, উচ্চললাটিকা, উচ্চাট, উচ্চাবচ, উচ্চার, উচ্চারক, উচ্চারণ, উচ্চারণীয়, উচ্চারিত, উচ্চার্য্য, উচ্চিংড়া, উচ্চিঙ্গট, উচ্চিত, উচ্চিত্র, উচ্চূড়, উচ্চূল, উচ্চৈ, উচ্চৈঃ, উচ্চৈঃপদ, উচ্চৈঃশিরা, উচ্চৈঃশ্রবা, উচ্চৈঃশ্রবাঃ, উচ্চৈঃস্থান, উচ্ছন্ন, উচ্ছব, উচ্ছর্গন, উচ্ছল, উচ্ছাদন, উচ্ছাল, উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তী, উচ্ছিগ, উচ্ছিঙ্ঘন, উচ্ছিত্তি, উচ্ছিরাঃ, উচ্ছিলীন্ধ্র, উচ্ছিষ্ট, উচ্ছিষ্টভোজন, উচ্ছিষ্টভোজী, উচ্ছিষ্টলেপ, উচ্ছিষ্টিত, উচ্ছীর্ষক, উচ্ছূন, উচ্ছৃঙ্খল, উচ্ছে, উচ্ছেত্তা, উচ্ছেষ, উচ্ছোষণ, উচ্ছ্রয়, উচ্ছ্রায়, উচ্ছ্রিত, উচ্ছ্রিতি, উচ্ছ্বস, উচ্ছ্বসন, উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বাসিত, উচ্ছ্বাসী, উচ্পিচা, উছ, উছগ্গ, উছট, উছর, উছল, উছলপাছল, ডছলিত, উছস, উজা, উজাগর, উজান, উজানি, উজালা, উজোর (উজ্), উজ্জয়িনী, উজ্জাগর, উজ্জাপন, উজ্জীবন, উয্যুগ, উজ্জৃম্ভ, উজ্জ্বল, উজ্ঝ, উজ্ঝটিকা, উঝট, উঝল, উঝার, উঝাল, উঝ্ঝল, উঠ (ওঠ), উঠতি, উঠনা, উঠনো, উঠন্ত, উঠা, উঠাউঠি, উঠান, উঠানি, উঠিত, উঠাউঠি, উঠাবসা, উঠুডুবু, উঠোধান, উড়, উড়কি, উড়কুড়, উড়তি, উড়ন, উড়নচড়ে, উড়নচণ্ডী, উড়নপেকে, উড়নি, উড়নী, উড়নীয়া, উড়পাক, উড়পেকে, উড়শি (কুরচি), উড়স, উড়ুষ, ডড়া, উড়াও, উড়াতাড়া, উড়ান, উড়ানি, উড়ানিয়া, উড়ানী, উড়ানীয়া, উড়াপাক, উড়ামালা, উড়ি, উড়িয়া, উড়িল, উড়িষ্যা, উড়ু, উড়ুউড়ু, উড়ুক্কু, উড়ুনী, উড়ুপ, উড়ুপতি, উড়ুপুড়ু, উড়ুম্বর, উড়ুষ (উড়ে) উড়ডম্বর, উড্ডয়ন, উড়পড়া, উড়্ভিটা, উৎ, উৎক, উৎকচ, উৎকঞ্চুক, উৎকট, উৎকণ্ঠ, উৎকণ্ঠা, উৎকন্ধর, উৎকম্প, উৎকর, উৎকর্শ, উৎকর্ত্তন, উৎকর্ষ, উৎকল (উড়ে), উৎকলাপ, উৎকলিক, উৎকলিকা, উৎকলিকাকুল, উৎকলিত, উৎকষণ, উৎকার, উৎকারিকা, উৎকাস,

উৎকাসন, উৎকির, উৎকীর্ত্তন, উৎকুণ, উৎকুল, উৎকূজ, উৎকুর্দ্দন, উৎকূল, উৎকৃত্ত, উৎকৃষ্ট, উৎকোচ, উৎক্রম, উৎক্রান্তিদা, উৎক্রামণ, উৎক্রুষ্ট, উৎক্লেদ, উৎক্লেশ, উৎক্ষিপ্ত, উৎক্ষেপ, উৎক্ষেপক, উৎক্ষেপণ, উৎক্ষেপণী, উৎক্ষেপী, উৎক্ষোভিত, উৎখচিত, উৎখাত, উৎখাতকেলি, উৎখ্যাত, উৎপক্ষ্ম, উৎপচিষ্ণু, উৎপতন, উৎপতাক, উৎপতি, উৎপত্তি, উৎপত্তিক্রম, উৎপত্তিবাক্য, উৎপত্তিব্যুৎক্রম, উৎপৎস্যমান, উৎপথ, উৎপথগামী, উৎপথপ্রতিপন্ন, উৎপথস্থ, উৎপন, উৎপন্ন, উৎপবন, উৎপল, উৎপলাক্ষ, উৎপলিনী, উৎপাট, উৎপাত, উৎপাদ, উৎপাদন, উৎপিঞ্জর, উৎপিৎসু, উৎপিষ্ট, উৎপীড়, উৎপুচ্ছ, উৎপুট, উৎপুলক, উৎপেতে, উৎপ্রবন্ধ, উৎপ্রাস, উৎপ্রেক্ষণ, উৎপ্লব, উৎফাল, উৎফুল্ল, উত্যাক্ত, উত্র, উত্রী, উৎস, উৎসঙ্গ, উৎসঙ্গিত, উৎসঙ্গী, উৎসঞ্জন, উৎসন্ন, উৎসব, উৎসবসঙ্কেত, উৎসর্গ, উৎসর্গন, উৎসর্জ্জন, উৎসর্প, উৎসাদ, উৎসাদন, উৎসারক, উৎসাহ, উৎসিক্ত, উৎসুক, উৎসূত্র, উৎসুর, উৎসূর্য্য, উৎসৃজ্য, উৎসৃষ্ট, উৎসেক, উৎসেধ, উৎস্নাত, উৎস্ময়, উৎস্বন, উৎস্বপ্ন, উৎস্বপ্নায়িত, উত, উতঙ্ক (উতং-ক, উদঙ্ক), উতঙ্ক (উৎ-অঙ্গ), উতপত, উতপতি, উতর, উতরল, উতরালি, উতরোল, উতল, উতলা, উতা, উতাপ, উতার (উদ্ থেকে তার), উতাল, উতালি, উতাহো, উতাহোস্বিৎ, উত্তংস, উত্তট, উত্তপ্ত, উত্তম, উত্তমঃশ্লোক, উত্তমপুরুষ, উত্তমমধ্যম, উত্তমর্ণ, উত্তমর্ণিক, উত্তমশ্লোক, উত্তমসাহস, উত্তমাঃ, উত্তমাঙ্গ, উত্তমাধ্যমধ্যম, উত্তমান্তঃ, উত্তমার্দ্ধ, উত্তমাশা, উত্তমাহ, উত্তমৌজাঃ, উত্তম্ভ, উত্তম্ভন, উত্তর, উত্তরকাণ্ড, উত্তরকায়, উত্তরকাল, উত্তরকালীন, উত্তরকুরু, উত্তরকোশল, উত্তরক্রিয়া, উত্তরঙ্গ, উত্তরচ্ছদ, উত্তরণ, উত্তরতঃ, উত্তরত্র, উত্তরদায়ক, উত্তরদিকপাল, উত্তরদিগীশ, উত্তরপক্ষ, উত্তরপট, উত্তরপথ, উত্তরপদ, উত্তরপশ্চিম, উত্তরপাদ, উত্তরপুরুষ, উত্তরপূর্ব্ব, উত্তরপ্রচ্ছদ, উত্তরপ্রত্যুত্তর, উত্তরফাল্গুনী, উত্তরবয়স, উত্তরবস্তি, উত্তরবস্ত্র, উত্তরবাসঃ, উত্তরবাদী, উত্তরবাহিনী, উত্তরবেদী, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদা, উত্তরভারতী, উত্তরমীমাংসা, উত্তরমেরু, উত্তররাড়ী, উত্তররাঢ়ী, উত্তররামচরিত, উত্তরলী, উত্তরশিয়র, উত্তরশিয়রী, উত্তরসাক্ষী, উত্তরসাধক, উত্তরা, উত্তরাংস, উত্তরাকাণ্ড, উত্তরাধর, উত্তরাধিকার, উত্তরাপথ, উত্তরাভাস, উত্তরায়ণ, উত্তরায়ণি, উত্তরার্দ্ধ, উত্তরাশা, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরাসঙ্গ, উত্তরাস্য, উত্তরাহ, উত্তরাহি, উত্তরী, উত্তরীয়, উত্তরেণ, উত্তরোত্তর, উত্তরোল, উত্তরোষ্ঠ, উত্তর্জ্জন, উত্তান, উত্তানপাণি, উত্তানপাদ, উত্তানশয়, উত্তানহস্ত, উত্তানিত, উত্তাপ, উত্তার, উত্তাল, উত্তিষ্ঠ, উত্তিষ্ঠমান, উত্তীর্ণ, উত্তুঙ্গ, উত্তেজক, উত্তোরণ, উত্তোলন, উত্ত্যক্ত, উত্‌ত্রস্ত, উত্থ, উত্থান, উত্থানথালা, উত্থানৈকাদশী, উত্থাপক, উত্থায়ী, উত্থাল, উত্থিত, উথ, উথল, উথলপাথল, উথলিত, উথাল, উদ্, উদ, উদক্ (উন্দ্ আর উদ্ প্রায় এক বলেই একে উৎ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হল, দ্র. উদক্-অঞ্চ্), উদকন্দ, উদকন্দাতা, উদকন্দান, উদকদায়ী, উদকপরীক্ষা, উদকবাদ্য, উদকমেহ, উদকশান্তি, উদকহার, উদকান্ত, উদকার্থী, উদকুম্ভ, উদক্য, উদগ, উদগত, উদগয়ন, উদগাবৃত্তি, উদগ্‌দিক, উদগ্র, উদঙ্ক, উদঙ্মুখ, উদজ, উদধি, উদন্ত, উদন্যা, উদন্বান, উদপাত্র, উদপান, উদবাস, উদবাহ, উদবাহন, উদমাদা, উদয়, উদয়কাল, উদয়গিরি, উদয়ন, উদয়পর্ব্বত, উদয়পুর, উদয়বান, উদয়বেলা, উদয়মান, উদয়রাশি, উদয়শিখরী, উদয়শৈল, উদয়াচল, উদয়াদ্রি, উদয়ান, উদয়াস্তগিরি, উদয়ী, উদয়োন্মুখ, উদর, উদরমরা, উদরম্ভরি, উদরশয়, উদরসর্ব্বস্ব, উদরসাৎ, উদরাধ্মান, উদরাময়, উদরাবর্ত্ত, উদরিক, উদরী, উদর্ক, উদর্চ্চিঃ, উদলা, উদশ্রু, উদস্র, উদশ্বিৎ, উদসন, উদস, উদস্ত, উদস্র, উদহার, উদাত্ত, উদান, উদাপ্লুত, উদাবর্ত্ত, উদাম, উদায়ুধ, উদার, উদারতা, উদারদর্শন, উদারধী, উদারমতি, উদারমনাঃ, উদাররমণীয়, উদারসত্ত্ব, উদারা, উদাস, উদাসিতা, উদাসিনী, উদাসী, উদাসীন, উদাসীনী, উদাহরণ, উদি, উদিআন, উদিত, উদীক্ষণ, উদীক্ষা, উদীচী (দ্র. অঞ্চ্), উদীয়মান, উদীরণ, উদীর্ণ, উদুখল, উদুম্বর, উদূখল, উদূঢ়, উদেজয়, উদো, উদোম, উদগত, উদগন্ধি, উদগম, উদগমনীয়, উদগলিত, উদগাঢ়, উদগাতা, উদগার, উদ্‌গিরিত, উদ্‌গীত, উদ্‌গীর, উদ্‌গীরণ, উদগীরিত, উদগীর্ণ, উদ্‌গূর্ণ, উদ্‌গ্রথিত, উদ্‌গ্রহণ, উদ্‌গ্রীব, উদঘটিত, উদঘট্টন, উদঘন, উদঘর্ষণ, উদঘাট, উদঘাটন, উদঘাত, উদ্‌ঘুষিত, উদ্‌ঘূর্ণ, উদ্দংশ, উদ্দণ্ড, উদ্দান, উদ্দাম, উদ্দাল, উদ্দালক, উদ্দিষ্ট, উদ্দীপ, উদ্দীপ্ত, উদ্দেশ, উদ্দেশ্য, উদ্দ্যোত, উদ্‌দ্রাব, উদ্ধত, উদ্ধব, উদ্ধম, উদ্ধয়, উদ্ধরণ, উদ্ধর্ষ, উদ্ধান, উদ্ধার, উদ্ধুর, উদ্ধূত, উদ্ধূপন, উদ্ধূলন, উদ্ধৃত, উদ্ধৃতি, উদ্‌ধ্মান, উদ্বদ্ধ, উদ্বন্ধ, উদ্বপন, উদ্বমন, উদ্বর্ত্ত, উদ্বর্ত্তন, উদ্বস্তি, উদ্বহ, উদ্বান্ত, উদ্বাপ, উদ্বাষ্প, উদ্বাস, উদ্বাস্তু, উদ্বাহ, উদ্বাহু, উদ্বিগ্ন, উদ্বিড়াল, উদ্বিদ্ধ, উদ্বিল, উদ্বীক্ষণ, উদ্বুদ্ধ, উদ্বৃত্ত, উদ্বৃদ্ধ, উদ্বেগ, উদ্বেজক, উদ্বেদি, উদ্বেল, উদ্বেষ্ট, উদ্বোঢ়া, উদ্বোধ, উদ্ভট, উদ্ভট্ট, উদ্ভব, উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিদ, উদ্ভিত্ত্ব, উদ্ভূত, উদ্ভেদ, উদ্‌ভ্রম, উদ্যত, উদ্যাত, উদ্যাপন, উদ্যুক্ত, উদ্যোগ (উজ্জুগ, হুজুগ, হুজুক), উদ্রশ্মি, উদ্রিক্ত, উধঃ, উধসল, উধসু, উধা, উধাউ, উধাও, উধার, উধিয়া, উধিপোকা, উধে, উধো, উন (উর্দ্ধ থেকে ন), উনকোটি, উনন, উননমুখী, উনপাঁজুরে, উনমত, উনমাদ, উনান, উনিশ, উনুন (oon), উন্নত, উন্নদ্ধ, উন্নমন, উন্নয়, উন্নয়ন, উন্নয়নপঙ্‌ক্তি, উন্নয়নপাত, উন্নস, উন্নহন, উন্নাদ, উন্নাহ, উন্নিদ্র, উন্নীত, উন্মগ্ন, উন্মতি, উন্মত্ত, উন্মথন, উন্মদ, উন্মনা, উন্মনাঃ, উন্মস্থ, উন্ময়ুখ, উন্মর্দ্দন, উন্মাথ, উন্মাদ, উন্মান, উন্মার্গ, উন্মার্জ্জন, উন্মিশ্র, উন্মিষ, উন্মীল, উন্মুক্ত, উন্মুখ, উন্মুগ্ধ, উন্মুদিত, উন্মুদ্র, উন্মূর্দ্ধা, উন্মূল, উন্মৃষ্ট, উন্মেয়, উন্মেষ, উন্মোচন, উন্‌যল, উপ, উপকণ্ঠ, উপকথা, উপকনিষ্ঠিকা, উপকরণ, উপকল্প, উপকান্তা, উপকার, উপকীচক, উপকুবর্বাণ, উপকুর্ব্বাণক, উপকুশ, উপকূজিত, উপকূপ, উপকূল, উপকৃত, উপক্‌ঌপ্ত, উপকোণ, উপক্রন্তা, উপক্রম, উপক্রমণ, উপক্রমণিকা, উপক্রমণী, উপক্রমণীয়, উপক্রমিতব্য, উপক্রমিতা, উপক্রম্য, উপক্রান্ত, উপক্রিয়া, উপক্রীড়া, উপক্রুষ্ট, উপক্লেশ, উপক্বণ, উপক্বাণ, উপক্ষয়, উপক্ষেপ, উপথ, উপগ, উপগা, উপগাতা, উপগার, উপগির, উপগীত, উপগীতি, উপগুপ্ত, উপগুরু, উপগুহ্য, উপগৃহীত, উপঘাত, উপঘুষ্ট, উপঘ্রাত, উপচ, উপচক্র, উপচক্ষুঃ, উপচঙ্ক, উপচতুর, উপচয়, উপচরিত, উপচার, উপচারচ্ছল, উপচিকীর্ষা, উপচিত, উপচিতি, উপচিত্র, উপচূড়ন, উপচূলন, উপচেয়, উপচ্ছদ, উপচ্ছন্দ, উপচ্ছন্ন, উপচ্ছায়া, উপছ, উপজ, উপজন, উপজপ্য, উপজল্পিত, উপজা, উপজাত, উপজাতি, উপজাপ, উপজায়া, উপজিগমিষু, উপজিত, উপজিহীর্ষা, উপজিহ্বা, উপজিহ্বিকা, উপজীবক, উপজুষ্ট, উপজ্ঞা, উপড়, উপড়া, উপডাল, উপঢৌকন, উপতন্ত্র, উপতপন, উপতীর্থ,

উপত্যকা, উপদংশ, উপদর্শক, উপদা, উপদিক, উপদিগ্ধ, উপদিষ্ট, উপদীকা, উপদীকৃত, উপদেব, উপদেবতা, উপদেশ, উপদেহ, উপদোহ, উপদোহন, উপদ্রব, উপদ্রষ্টা, উপদ্রুত, উপদ্বার, উপদ্বীপ, উপধর্ম্ম, উপধা, উপধাতু, উপধান, উপধাবন, উপধি, উপধূপিত, উপধ্মান, উপনক্ষত্র, উপনখ, উপনগর, উপনত, উপনদ, উপনদী, উপনন্দ, উপনয়, উপনহ, উপনহন, উপনিক্ষেপ, উপনিধাতা, উপনিপাত, উপনিবদ্ধ, উপনিবিষ্ট, উপনিষদ, উপনিষাদী, উপনিষ্ক্রমণ, উপনিহিত, উপনীত, উপনৃত্ত, উপনেতব্য, উপনেতা, উপন্যস্ত, উপপতি, উপপত্তি, উপপত্নী, উপপথ, উপপদ, উপপন্ন, উপপর্ব্বত, উপপাত, উপপাতক, উপপাদ, উপপাপ, উপপার্শ্ব, উপপীড়ন, উপপুর, উপপুরাণ, উপপ্রদান, উপপ্রলোভন, উপপ্রাপ্ত, উপপ্রেক্ষণ, উপপ্লব, উপবক্তা, উপবঞ্চিত, উপবন, উপবন্ধ, উপবর্ণ, উপবর্ণন, উপবর্ত্তন, উপবর্হ, উপবর্হণ, উপবসথ, উপবাহী, উপবিদ্যা, উপবিষ, উপবিষ্ট, উপবীত (দ্র. বীত, পবিত্র), উপবৃংহণ, উপবৃক্ষ, উপবেদ, উপবেশ, উপব্রাহ্মণ, উপভাষা, উপভুক্ত, উপভূষণ, উপভৃত, উপম, উপমন্ত্রণ, উপমন্ত্রী, উপমন্যু, উপমর্দ্দ, উপমা, উপমাতা, উপমিঅ, উপযন্তা, উপযন্ত্রিত, উপযাচক, উপযাত, উপযুক্ত, উপযোগিতা, উপর, উপরক্ত, উপরক্ষণ, উপরচিত, উপরত, উপরত্ন, উপরন্ত, উপরন্তু, উপরম, উপরস, উপরাগ, উপরাজ, উপরাণী, উপরি, উপরিচর, উপরিতন, উপরিভাগ, উপরিয়া, উপরিষ্টাৎ, উপরুদ্ধ, উপরূঢ়, উপরূপক, উপরে, উপরোক্ত, উপরোধ, উপর্য্যধো, উপর্য্যুপরি, উপল, উপলক্ষ, উপলক্ষক, উপলক্ষণ, উপলব্ধ, উপলব্ধি, উপলভ্য, উপলেপ, উপশম, উপশয়, উপশল্য, উপশাখা, উপশান্ত, উপশান্তি, উপশায়, উপশায়ী, উপশিক্ষণ, উপশিরা, উপশিষ্য, উপশোভন, উপশোষণ, উপশ্রয়, উপশ্রুত, উপশ্লিষ্ট, উপসংক্রমণ, উপসংক্ষেপ, উপসংক্ষেপ, উপসংখ্যান, উপসংগ্রহ, উপসংঘাত, উপসংবাদ, উপসংব্যান, উপসংযম, উপসংস্কৃত, উপসংহার, উপসঙ্গত, উপসত্তি, উপসন, উপসন্ন, উপসন্ন্যাস, উপসম্পত্তি, উপসম্প্রাপ্ত, উপসম্ভাষা, উপসর, উপসর্গ, উপসর্জ্জন, উপসর্প, উপসর্য্যা, উপসাগর, উপসান্ত্বন, উপসুন্দ, উপসূর্য্যক, উপসৃষ্ট, উপসেক, উপসেবক, উপস্কর, উপস্তম্ভ, উপস্তরণ, উপস্ত্রী, উপস্থ, উপস্থিত, উপস্নেহ, উপস্পর্শ, উপস্মৃতি, উপস্বত্ব, উপস্বেদ, উপহত, উপহব, উপহরণ, উপহসিত, উপহস্তিকা, উপহিত, উপহূত, উপহূতি, উপহৃত, উপহ্বর, উপা, উপাঅ, উপাংশু, উপাকরণ, উপাখ্য, উপাগত, উপাগ্র, উপাঙ্গ, উপাচার্য্য, উপাঞ্জন, উপাড়, উপাত্ত,, উপাত্যয়, উপাদান, উপাদানলক্ষণা, উপাদেয়, উপাধান, উপাধি, উপাধিক, উপাধেয়, উপাধ্যা, উপাধ্যায়, উপান, উপানৎ, উপানদ, উপানহ, উপানহী, উপান্ত, উপান্তিক, উপান্তিম, উপান্ত্য, উপাবর্ত্তন, উপাম, উপায়, উপায়ধি, উপায়ন, উপায়াত, উপারত, উপারম, উপারম্ভ, উপারূঢ়, উপার্জ্জক, উপালব্ধ, উপাশ্রয়, উপাষ, উপাস, উপাসক, উপাসনা, উপাসঙ্গ, উপাসী, উপাস্ত্র, উপাহিত, উপাহৃত, উপুড় (উপ-উড়), উপুর, উপে, উপেক্ষ, উপেক্ষক, উপেক্ষা, উপেখ, উপেত, উপেন্দ্র, উপোঢ়, উপোত্তম, উপোদিকা, উপোদঘাত, উপোষ, উপোস, উপোষণ, উফড়, উফরধাফর, উফরিফাঁফরি, উফাড়, উব, উবজ, উবটন, উবড়া, উবর, উবা, উবু, উবুড়, উজ্জ, উমড়, উমত, উমদা, উমান, উম্বর, উয়, উয়ল, উয়া, উলমতি, উলস, উলসিত, উলূক (উলুক), উলূপী (উলুপী), উল্কি, উল্লঙ্ঘন, **উল্লম্ফ**, **উল্লম্ফন**, **উল্লস**, **উল্লসন**, উল্লাপ, উল্লাল, উল্লাস, উল্লিখিত, উল্লীঢ়, **উল্লুক**, **উল্লুঞ্চন**, **উল্লুণ্ঠন**, উল্মুক, উল্লোল, উল্বণ, উশকা, উশখুশ, উশ্‌তাদ্ **(ওস্তাদ)**, উশনা, উশীনর, উশীর, (লঘুলয়), উশুল, উশকখুশক, **উসকোখুসকো**, উসর, উসস, উসিমুসি, **উব**, **উফর**, ওস্তাদ, ওস্তাদি, **উগ্র**, **উর্দ্ধ**, **উর্দ্ধ**, এঁটো, এঁঠো (উৎসৃষ্ট), ওঝা, ওট, ওঠ, ওঠা, ওড়, ওড়, ওড়কচু, ওড়ন, **ওড়নষষ্ঠী**, ওড়নি, ওড়নী, ওড়ব, ওড়া, ওড়িকা, ওড্র, ওতপ্রোত, ওদর, ওপর, ওলাহন, ওশ, ঔজ্জ্বল্য, ঔডুম্বর, ঔড্র, ঔৎকণ্ঠ্য, ঔৎকর্ষ, ঔৎকর্ষ্য, ঔত্তরেয়, ঔৎপাতিক, ঔৎসর্গিক, ঔৎসুক্য, ঔদক, ঔদনিক, ঔদরিক, ঔদার্য্য, ঔদাসীন্য, ঔদাস্য, ঔদুম্বর, ঔদ্দালক, ঔদ্ধত্য, ঔদ্ভিদ, ঔদ্বাহিক, ঔধস, ঔন্নত্য, ঔপচারিক, ঔপদেশিক, ঔপনায়নিক, ঔপনিষদ, ঔপন্যাসিক, ঔপম্য, ঔপয়িক, ঔপল, ঔপসর্গ, ঔপসর্গিক, ঔপাধিক, ঔপায়িক, ঔশনস, ঔশীর, **কুজ্ঝটিকা**।

উৎ = উর্দ্ধে তারণ। **উত** = উর্দ্ধে তারণ করে যে।

উৎ, উদ্ : **৫.** উ (নবরূপে উত্তরণ, ধারণ, বিকাশসাধন, অত্যন্ত পরিবর্তন)-কে তারণ বা দান। কার্যত তারণ দানে পরিণত হয় নেওয়ার কেউ থাকলে। তাই সন্ধিকালে উৎ উপসর্গটি উদ্ হয়। সাধারণত মানুষের যা কিছু উচ্চারণ, উৎপাদন, সবই উৎ-ক্রিয়া। সামগ্রিকভাবে এটি উৎ-লোক সৃজনকারী। এটি সেকারণেই সাধারণত **উর্ধ্ব** অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই উদ্ ইংরেজিতে wood হয়ে রয়েছে, যদর্থ যা উপর দিকে ওঠে। নিরুক্তকার যাস্ক জানিয়েছেন — 'উৎ' যখন উপসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয় তখন তা 'নি' ও 'অব' উপসর্গের বিপরীত অর্থ ব্যক্ত করে। **৬.** ইংরেজি out, utter, utmost।

উচ্চ : **১.** উদ্ + ✓চি + অ (ড) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *উদ্‌লোকে (বা উর্দ্ধে) চয়িত (আছে) যে।* **৩.** **উর্দ্ধগত**, উচ্ছ্রিত, উন্নত, সৎ, মহান, তার (স্বর), উৎসর্পী, অতট, খাড়া, প্রাংশু, অট্ট, অত্যন্ত, উদার, বিশিষ্ট, কটু, উন্নত। (ব.শ.)। **৪.** high অর্থে সুপ্রচলিত। **৫.** 'উপরে তুলে এনে রাখা হয়েছে যাকে', সেই হল 'উচ্চ'। শব্দটি প্রস্তুত হয়েছে এইভাবে। তাই ব.শ. এর প্রথম অর্থ দিয়েছেন **উর্ধ্বগত**। ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই তা বিভিন্ন প্রতীকী শব্দের জন্ম দিয়েছে; যেগুলির মূলে (২)-এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি কোনো না কোনোভাবে বিরাজ করছে।

উচ্চার, উচ্চারণ : **১.** উদ্ + ✓চারি + অ - ভাববাচ্যে; উদ্ + ✓চারি + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *যাহা উদ্‌লোকে চারিত (বিচরণ করার জন্য ছেড়ে দেওয়া) হয়।* **৩.** কথন, উৎসর্জ্জন, পুরীষ, মল, কণ্ঠাদিস্থানে জিহ্বাগ্রাদির অভিঘাত হেতু শব্দজনক ব্যাপার, বিঘোষণ, বলা, পাঠ করা, পড়া। (ব.শ.)। **৪.** utter অর্থে প্রচলিত। **৫.** উত্তর আর utter একই কথা। উত্তর দিতে গেলে তো উচ্চারণ করতেই হয়। তা সে যাই হোক, উচ্চারণ গোচারণের মতোই। শব্দগুণসম্পন্ন আকাশে আমরা মুখনিঃসৃত শব্দ চারিয়ে দিই, তাকেই উচ্চারণ বলে। **৬.** ইংরেজি utter।

উচ্চৈঃশ্রবাঃ, উচ্চৈঃশ্রবস্ : ১. দ্র. **উচ্চ** ও **শ্রবস্**। ২. *যে উঁচু শোনে এবং (বা) শোনায়।* / যাহার কীর্ত্তি বিপুল; যাহার উন্নত কর্ণ। (ব.শ.)। ৩. মহাযশাঃ, দীর্ঘকর্ণ, ইন্দ্রের অশ্ব। ইহা **সমুদ্রমন্থনজাত** চতুর্দ্দশ রত্নের অন্যতম। (ব.শ.)। দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন কালে সমুদ্র হতে শ্বেত অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা উদ্ভূত হয়। এই শ্বেতবর্ণ অশ্ব ইন্দ্রের অশ্ব। এই অশ্ব অমৃত পান করত এবং অশ্বদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কানে কালা যে, তাকে 'উঁচু শোনে' বলা হয় কেন? সমাজসংগঠনের যে সকল এক্সিকিউটিভরা উন্নত (বা উঁচু) মানের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে নির্দেশাদি **ঊর্ধ্বতন** কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শোনেন, শুনতে পান, বুঝতে পারেন এবং তদনুযায়ী সবাইকে সেই নির্দেশাদি শোনান এবং তাঁদের কাজকর্ম চালান, সেকালে তাঁদেরকে বলা হত উচ্চৈঃশ্রবাঃ। একালের চিফ এক্সিকিউটিভদের তাঁরাই আদি পুরুষ। কিন্তু তাঁরা জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের সাংসারিক ছোটখাটো বিষয়গুলির দিকে তেমন কান দেন না। তাই নির্দেশক সামাজিক ইন্দ্রের চোখে তাঁরা উচ্চৈঃশ্রবাঃ বা উন্নত মানের চিন্তাভাবনা বুঝবার ও অন্যকে নির্দেশ দিয়ে করানোর যোগ্য বটে; কিন্তু জনসাধারণের চোখে তাঁরা কানে কালা, উঁচু শোনেন। উঁচু শোনার মানেটি এভাবেই নিন্দনীয় হয়ে গেছে। আবার উঁচু শোনার আর একটা মানে রয়েছে বলে মনে করা হয়। মানেটি হল, প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি ঠিক শুনতে পায়, অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি শুনতে পায় না। কেউ কেউ এদের 'সেয়ানা কালা' বলেন। দ্র. **বিশ্রবা, বৈশ্রবণ**।

উচ্ছিষ্ট : দ্র. **উৎসৃষ্ট**।

উচ্ছৃঙ্খল : ১. উৎ + শৃঙ্খল। ২. *শৃঙ্খল হইতে ঊর্দ্ধে গত।* / শৃঙ্খল হইতে উদগত। (ব.শ.)। ৩. বন্ধনরহিত, উদ্দাম, অপ্রতিবন্ধ, অনর্গল, নিয়ন্ত্রণরহিত, সঙ্গতিরহিত, শৃঙ্খলারহিত, এলোমেলো, পরিপাটিহীন, ক্রমশূন্য, স্বেচ্ছাচারী, উন্মার্গগামী, উৎপথপ্রস্থিত, কুপথগামী। (ব.শ.)। ৪. indisciplined অর্থে প্রচলিত। ৫. শৃঙ্খল কথাটির সূত্রপাত হয়েছিল শিঞ্জিন (নুপুর জাতীয় বস্তু) থেকে স্খলিত বা খসে পড়া মিষ্টি আওয়াজের থেকে। সেই আওয়াজে যে-ক্রম থাকে, বিন্যাস থাকে, সঙ্গতি থাকে, পরিপাটি ভাব থাকে, সেসব যার থেকে মেলে তাকে স্বভাবতই **শৃঙ্খল** বলা যায়। সেই শৃঙ্খলের আধার হল শৃঙ্খলা। আর সে-**শৃঙ্খল** যে কেবল সংগীতের বা বাদ্যের সুরসঙ্গতিতেই থাকে এমন নয়; আরও বহু কিছুতে থাকে — জীবনে থাকে, সামাজিক সম্পর্কে থাকে, প্রকৃতির নিয়মে থাকে, শেকলেও থাকে। সেই শৃঙ্খলের বিপরীত বা বিশেষ শৃঙ্খলায় যে চলে যায়, যার সঙ্গে প্রচলিত শৃঙ্খলের মিল নেই, সে যেমন বিশৃঙ্খল হয়ে যায়, তেমনি যে ব্যক্তি প্রচলিত শৃঙ্খল থেকে উর্দ্ধে চলে বা যে উৎপথগামী হয়, সে হয় উৎ-**শৃঙ্খল** বা উচ্ছৃঙ্খল। '**বিশৃঙ্খল**' শৃঙ্খলাকে নষ্ট করে, নিজের বিশেষ শৃঙ্খলা দিয়ে। কিন্তু **উচ্ছৃঙ্খল** উচ্চ মানের শৃঙ্খলা গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারে। আর সেজন্যেই প্রচলিতের শৃঙ্খলাকে টপকে সে উচ্ছৃঙ্খল নাম পেয়েছে। দুটো একেবারেই আলাদা ব্যাপার; যদিও এখন আমরা দুটো ব্যাপারেরই মানে বুঝি ইংরেজি disorder অর্থে। আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ, আবেদন-নিবেদন, উৎপীড়ন-নিপীড়ন, উৎকট-বিকট, আদেশ-নির্দেশ, আয়-উপায়, অর্জন-উপার্জন, শাপ-অভিশাপ, তাপ-উত্তাপ, উন্নতি-উন্নয়ন ... **উচ্ছৃঙ্খল**-বিশৃঙ্খলের মতো এরকম অনেক বাংলা শব্দই এখন ইংরেজির পরিবর্ত হতে গিয়ে একার্থবাচক হয়ে গেছে।

উচ্ছে (উচ্ছ্রিত) : ১. 'উচ্চত্বক' — মূল (?); উদ্ + ✓শ্রি + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উদলোকে (আপন পরিধির বাইরে) গতিশীলতা বিচ্ছুরিত যাহার।* ৩. উন্নত, উচ্চ, তুঙ্গ, প্রবৃদ্ধ, উদগত, উত্থিত, উপচিত, সমৃদ্ধিমান, দৃপ্ত, গর্ব্বিত, অতিশয়িত। (ব.শ.)। ৪. তিক্তস্বাদ সব্জিবিশেষের নাম 'উচ্ছে' বা 'উচ্ছা' রূপে শব্দটি প্রচলিত থাকলেও শব্দটি যে 'উচ্ছ্রিত' থেকে জাত হয়েছে, তা বিস্মৃত। ৫. ব.শ. যথার্থই অনুমান করেছিলেন যে, বস্তুটির নামকরণের মূলে 'উচ্চতক'-এর ধারণাটি কাজ করে থাকবে। কিন্তু কোন শব্দ থেকে সেটি এসেছে, তা নিয়ে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। আমাদের মনে হয়েছে, শব্দটি এসেছে 'উচ্ছ্রিত' থেকে।

উজান : ১. উদ্ + ✓জু + অন। (ব.শ.)। ২. *উদ্লোকের দিকে গতি বা বেগ যাহার।* ৩. **ঊর্ধ্ব**গামী, উচ্চদিগ্গামী, স্রোতের প্রতিকূলগামী, উপরদিকে, বিপরীত দিকে ...। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **উজ্জয়িনী**।

উজ্জয়িনী (উজ্জয়নী, উজানী) : ১. উদ্ + ✓জি + অন্ (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উদলোক জয় করা অন (চালু) থাকে যাহাতে।* / উদ্ (অতিশয়িত) জয়িনী যে। (ব.শ.)। ৩. বিশালা, বিক্রমাদিত্যের রাজধানী, অবন্তী। ইহা সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীর একতমা। উজানী = গৌড়স্থিত অজয়ের তীরবর্তী ধনপতি সদাগরের বাসস্থান। কবিকঙ্কণে 'উজ্জয়িনী', 'উজাবনী', 'উজানী' এই তিন পাঠ আছে। তিনটিই দেশের নাম, বোধ হয়, 'উজ্জয়িনী' মূল। মনসার ভাসানে 'উজানি' পাঠ আছে। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. নামকরণের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, আদিতে নাম হত সত্তার ক্রিয়া ধরে, তা সে মানুষ হোক আর গ্রাম বা নগরই হোক। অর্থহীন নামকরণের সূত্রপাত হয় আধুনিক যুগে। সেকালে যে নগর বা দেশ থেকে মেধা-পণ্য-শক্তি বিচ্ছুরিত হত, সেই নগর বা দেশ ছিল 'উজ্জয়নী' বা 'উজানী' পদবাচ্য, তা সে গৌড়স্থিত উজানী হোক, আর বিশালা-অবন্তীর উজ্জয়নীই হোক।

উঠা, উঠান : ১. উদ্ + ✓স্থা। ২. উঠান = উদ্ *পূর্ব্বক স্থিত হওয়া অন হয় যাহাতে বা যেখানে।* ৩. উত্থিত হওয়া, উদিত হওয়া, শয্যা ত্যাগ করা, গাত্রোত্থান করা ... ... ইত্যাদি। ৪. যথার্থে বহুল প্রচলিত। ৫. মধ্যযুগে বাংলাভাষার যে বিপুল বিকাশ হয়, সেই বিকাশের ফসল এই ধরনের শব্দ। বাংলাভাষী এর কি ব্যাপক প্রয়োগ করে থাকেন, ব.শ. তার প্রচুর নিদর্শন দিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য এটুকু যে, এ-শব্দের গভীরে উদ্ পূর্ব্বক স্থা ক্রিয়াটির অস্তিত্ব রয়েছে। তাকে বাদ দিয়ে যাঁরা 'উঠ' শব্দটি বুঝতে যাবেন, তাঁরা শব্দটির ওই পরিমাণ ব্যাপক অর্থের কোনো দিগ্দিশা খুঁজে পাবেন না।

উড় (উড়ন, উড়নি, উড়নী) : ১. উদ্ + ✓ডী। (ব.শ.)। ২. *উদ্ পূর্ব্বক আবর্ত্তন যাহাতে।* ৩. পক্ষীর আকাশে গমন, উড়ার মতো দ্রুত যাওয়া ... ...। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। ৫. **উঠ**-এর মতো এই শব্দটিও মধ্যযুগের বাংলাভাষীর সৃষ্টি। যে উদ্‌লোকের দিকে গড়ায় বা ডয়ন করে, সেই হল উড়।

উড়িয়া, উড়িষ্যা (উড়্‌ষ, উড়ে, উড্র, উড্রবাসীগণ, উৎকল, ওড্র, ঔড্র) : ২. *যাঁরা উড়ে এসেছেন, এসে যে স্থানে বসবাস করছেন।* দ্র. **উন্দ্**। ৩. উড্রদেশবাসীগণ, উৎকলবাসী, উৎকল দেশ। ৪. উড়িষ্যা রাজ্য ও সেই রাজ্যবাসীদের বোঝাতে যথাক্রমে উড়িষ্যা ও উড়িয়া শব্দদুটির ব্যবহার হয়ে থাকে। ৫. কলিঙ্গ দেশের অধিবাসী জনসাধারণকে উড়িয়া বলা হয়। শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ আমাদের জানায়, যাঁরা অন্য কোনো স্থান থেকে উঠে এসে, বিতাড়িত বা পলাতক হয়ে এসেছিলেন, তাঁরাই 'উড়িয়া' পদবাচ্য। যে দেশে তাঁরা বসবাস করতে শুরু করেন, তার নাম স্বভাবতই হয়ে যায় উড়িষ্যা। এঁদের উৎকলিঙ্গবাসীও বলা হয়। সেকালে ত্রিকলিঙ্গ বলতে উড়িষ্যা-অন্ধ্রপ্রদেশ সহ বিশাল এলাকাকে বোঝানো হত। বাংলাভাষীরা এঁদের বলতেন 'তেলেঙ্গী'। মনে রাখা ভাল, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ বা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এই তিন অঞ্চলের জনসাধারণ ভারতসমাজের সবচেয়ে বিদ্রোহী তিন ভাই। জনমেজয়ের বেদবিরোধী যুদ্ধে এঁরা একত্রিত হয়ে বিজয়লাভ করেছিলেন; যদিও পরে ক্রমে ক্রমে তাঁরা তাঁদের বিজয়কে ধরে রাখতে পারেননি। বর্তমানকালে উৎকলবাসীরা নিজেদের পরিচয়ে 'উড়িয়া' শব্দের বদলে 'ওড়িয়া' শব্দটি ব্যবহার করেন। সেটি সম্ভবত বাংলাভাষীর মুখে 'উড়িয়া' শব্দটি অবজ্ঞার সঙ্গে ব্যবহার হত, তারই প্রতিক্রিয়া।

উতঙ্ক : ২. *যে প্রিয়বিরহজাত তাপের আমূল পরিবর্তন ঘটায়।* ৩. ক) আয়োদধৌম্যের শিষ্য। খ) গৌতমশিষ্য। (ব.শ.) মহর্ষি আয়োদধৌমের এক শিষ্য বেদ, তার শিষ্য উতঙ্ক। ... ইনি গুরুপত্নীর অসঙ্গত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ... গুরুদক্ষিণা দেওয়ার জন্য ক্ষত্রিয়পত্নীর কুণ্ডল আনতে যান। ... নাগরাজ তক্ষকও ঐ কুণ্ডল দুটির প্রার্থী ছিলেন। ... পথে স্নান করবার সময় ... নাগরাজ তক্ষক এক নগ্ন ক্ষপণক (দিগম্বর সন্ন্যাসী) এর রূপ ধারণ করে সেই দুটি নিয়ে পলায়ন করে। ... অবশেষে নাগলোক থেকে বহু শ্রমে তিনি সেই কুণ্ডল উদ্ধার করেন ও যথাসময়ে দক্ষিণা দেন। ... অতঃপর উতঙ্ক হস্তিনাপুর গিয়ে রাজা জনমেজয়কে তক্ষকের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করতে পরামর্শ দেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **নাগ**দের বা নাগরিকদের (মার্কসের মতে যারা বুর্জোয়াদের আদিপুরুষ, burgher), তাদের ধ্বংস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন উতঙ্ক। ইনি আবার বেদবাদীদের শেষ প্রজন্ম গৌতমের শিষ্য 'বেদ' নামক ঋষির শিষ্য। ভাববার কথা। দ্র. **কুবলাশ্ব, আতঙ্ক**।

উতথ্য : ২. *তথ্যের আমূল পরিবর্তন করে যে, অথবা, যাহাতে সংশয়ের আধার থাকে।* ৩. অঙ্গিরার পুত্র, বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা। (ব.শ.)। ... এঁর পিতা অঙ্গিরা, মাতা শ্রদ্ধা। ইনি ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাচীন ঋষি। এঁর স্ত্রীর নাম **মমতা**। এবং **কনিষ্ঠভ্রাতা** দেবগুরু বৃহস্পতি। মমতার গর্ভজাত **সন্তান দীর্ঘতমা ঋষি** পিতৃব্য বৃহস্পতির শাপে জন্মান্ধ হন। (পৌ.অ.)। ৪. **অপ্র.**। ৫. তথ্য এই যে, বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠভ্রাতা উতথ্যের **স্ত্রী মমতার সঙ্গে সঙ্গমেচ্ছা** করেন। উতথ্যের সন্তান **দীর্ঘতমা** তখন মমতার গর্ভে! দীর্ঘতমা আপত্তি করেন। বৃহস্পতি তাকেই শাপ দেন। কেন? কেনই বা উতথ্য দেবগুরু হলেন না, হলেন ছোটভাই বৃহস্পতি? দু'জনই তো অঙ্গিরার পুত্র! **শ্রদ্ধা, মমতা**, এগুলি আসলে কী বোঝাতে চায়? **অঙ্গিরা** + শ্রদ্ধা > উতথ্য, **বৃহস্পতি**। উতথ্য + মমতা > দীর্ঘতমা। এই নামগুলি যে-সকল সত্তাকে বোঝাতো, তাদের আরও স্পষ্ট করে শনাক্ত করার চেষ্টা করা দরকার। এটুকু বোঝা যায় যে, উতথ্য তথ্যবিকাশ, আহরণ, উদ্ধার ইত্যাদি হলেও সে তো তথ্যই। শুধু তথ্য থেকে অন্ধত্ব জন্মায়, এবং **দীর্ঘতমা অন্ধ ছিলেন**। বিপরীতে বৃহৎ হওয়া ইত্যাদিকে যে বুদ্ধি পালন করে, তাকে বৃহস্পতি বলা যায়। অঙ্গিরা-শ্রদ্ধা-উতথ্য-বৃহস্পতি-মমতা-দীর্ঘতমা প্রভৃতি সত্তার কাহিনী আসলে ভারতের ইতিহাসে, সমাজের অগ্রগতির একটি জটিল পর্য্যায়ের কথা ব্যাখ্যা করতে লেখা হয়েছিল। সেই সত্তাগুলির প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করতে না পারলে সেই ঘটনাগুলিকে কিছুতেই বোঝা যাবে না। দ্র. **দীর্ঘতমা, দ্রোণ**।

উৎকচ : ১. কচ্ = শোভা। ২. যাহার কচ উদগত। (ব.শ.)। ৩. কেশহীন, উন্নতকেশ, উদ্বন্ধন, বিকশিত, বিকচ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. উৎকচ বলতে বিকচ বা নেড়াকে বোঝায়, যার মাথায় কেশ নেই। এই শব্দটিকে পাওয়া যায় সন্ধিকৃত অবস্থায় 'ঘটোৎকচ' (ঘট + উৎকচ) শব্দে। এর অর্থ 'যে ঘটের কেশ নাই', উবে গেছে। 'ঘট' বলতে যেটি ঘটানো হয়। যে কোনো কারুশিল্পজাত পণ্য বোঝাতে যেমন **ঘট** শব্দটির ব্যবহার হত তেমনি মানুষের মাথাকেও ঘট (ঘটে বুদ্ধি নেই!) বলা হত। এমনকি, যে কোনো ঘটনার কথা বা 'গল্প' বোঝাতেও শব্দটির ব্যবহার হত। যে গল্পের বা ঘটের কোনো রকম মালিকানা নেই তাকে **ঘটোৎকচ** বা **গুজব** বলে। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে এই গুজব-রটনাকারীদেরকেও ঘটোৎকচ বলে। জানা ভাল, মহাভারতের চরিত্র ঘটোৎকচের মাথায় একটিও চুল ছিল না।

উৎকট : দ্র. **কট**।

উৎকণ্ঠা (উৎকণ্ঠ) : ১. উৎকণ্ঠা = উদ্ + ✓কণ্ঠ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। ২. / উৎকণ্ঠ = উদগত কণ্ঠ যাহার। উৎকণ্ঠা = প্রিয়াভিলাষ হেতু উন্মনস্কতা (যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. উৎকলিকা, ইষ্টলাভে কালক্ষেপ অসহিষ্ণুতা, উৎসুকভাবে দয়িত স্মরণ, কামাদিজাতস্মৃতি, ঔৎসুক্য, উদ্বেগ, বেদনা, সঞ্জাতবেদন। (ব.শ.) । ৪. anxiety বা 'উদ্বেগ' অর্থে প্রচলিত। ৫. বাংলার গ্রামাঞ্চলে মায়েদের মুখে এরকম বাক্য এখনও শুনতে পাওয়া যায় — 'মাঠের দিকে একটু গলা বাড়িয়ে দেখ্ না, বাছাটা আমার এল কি না!' এই 'গলা বাড়িয়ে' বা গলা উঁচু করে দেখাকেই ব.শ. বলেছেন, 'উদগত কণ্ঠ যাহার'। এভাবে যে উৎকণ্ঠ হয়, তার আবেগকে উৎকণ্ঠা বলে।

উৎকৃষ্ট (উৎকর্ষ) : **১.** উদ্ + ✓কৃষ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *যাকে কর্ষণ করে উর্ধ্বে আনা হয়েছে।* **৩.** উর্ধ্বে আকৃষ্ট, উদ্ধৃত, উন্নীত, গৃহীত, গুণবান, উত্তম, বিশিষ্ট, উচ্চবর্ণ, উচ্চজাতীয়, উচ্চপাদারূঢ়, কুলাচারাদিসম্পন্ন, প্রধান, উচ্চতর, মহান, প্রশস্ত, বরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, অতিশয়িত, তিরস্কৃত, কৃতকর্ষণ, চষা, কৃষ্ট। (ব.শ.)। **৪.** best অর্থে প্রচলিত। **৫.** চাষ, তা সে মনোভূমি চাষ হোক, আর পার্থিব জমি চাষই হোক, তা যত রকমের হয়ে থাকে সেগুলিকে বাংলাভাষা স্বভাব অনুসারে বিভক্ত করেছে এই ভাবে — প্রচলিত প্রক্রিয়ায় চাষ হলে **প্রকৃষ্ট,** তার চেয়ে নিম্ন মানের হলে **অপকৃষ্ট** বা **নিকৃষ্ট**, কিন্তু প্রচলিত প্রক্রিয়ার চেয়ে আরও উচ্চতর প্রক্রিয়ায় হলে **উৎকৃষ্ট**। তখন সে স্বভাবতই গুণবান, **উত্তম, মহান, প্রশস্ত** ইত্যাদি হবেই। সেকারণেই শব্দগুলি উৎকৃষ্ট শব্দের প্রতীকী অর্থে (৩) খ্যাত হয়েছে।

উৎকোচ : **১.** উদ্ + ✓কুচ্ + অক (ণ্বুল) - ক। (ব.শ.)। **২.** *যাহাতে কারক উদ্‌লোকের দিকে উচিত হয়। /* উদগত কোচ যাহা দ্বারা; যাহা দ্বারা কৌটিল্য যায়; যে ধনার্থ কুটিল হয়। (ব.শ.)। **৩.** কার্য্যপ্রতিবন্ধ দূরীকরণার্থে অধিকৃত পুরুষকে বাদী বা প্রতিবাদী কর্ত্তৃক দত্ত ধন; ঢৌকন, অপপ্রদান, ঘুস (উৎকোচক = ঘুসখোর), তীর্থবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** bribe বা 'ঘুস' অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** কোঁচকানো যদি ভেতর দিকে হয়, তবে সেটি 'সঙ্কোচ' হয়; আর বাইরের দিকে হলে হয় 'উৎকোচ'। সঙ্কোচে গ্রহণেচ্ছা থাকলেও অষ্টপাশের দুটি পাশ কাজ করে — ভয় আর লজ্জা। তখন সেই সঙ্কোচগ্রস্তকে কেউ যদি বলে, 'নিন, নিন! সঙ্কোচ করবেন না, এ তো স্যার আপনার প্রাপ্যই!' তখন কথাটি যে বলে, সে উৎকোচগ্রস্ত। উৎকোচগ্রস্ত নিজ অস্তিত্বের পরিধিকে উপর দিকে ঠেলছে, বিপরীতে সঙ্কোচগ্রস্ত নিজ অস্তিত্বের পরিধিকে ভেতর দিকে সম পরিমাণে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। তাই একদিকে উৎকোচ এবং অন্যদিকে সঙ্কোচ। দ্র. **কুচ**। সমাজ পরিচালকদের লাল চোখই এই উৎকোচ ও সঙ্কোচ-এর কারণ।

আরও আছে। ইনজেকশন দেওয়ার সময় রুগিকে ডাক্তার বলেন, 'পেশী কোঁচকাবেন না, ছাড়ুন ছাড়ুন', নইলে সুঁচ ঢোকে না। উৎকোচ করলে বা দিলে কেবল শরীরের পেশীই সুঁচকে পথ ছেড়ে দেয় না, রাজদ্বারের দারোয়ানও পথ ছেড়ে দেয়। দ্র. **কুচ, সঙ্কোচ, আমিষ**।

উত্তম : **১.** উদ্ + তম (তমপ্)। (ব.শ.)। **২.** *যাহাতে তম (তমোগুণ) উদগত হয়; অথবা উৎ-এর চরম যাহাতে।* **৩.** উৎকৃষ্ট, প্রধান, প্রমুখ, মুখ্য, শ্রেষ্ঠ, সত্তম, বিদ্যাচারজন্মাদি হেতু উৎকৃষ্ট, গুণসম্পন্ন, বিশিষ্ট, ইতরেতর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অপেক্ষাকৃত ভাল, স্বর্গাদি উপভোগযোগ্য। ... 'উত্তম' শব্দের বিপরীত শব্দ 'হীন', 'নীচ', 'পূর্ব্ব', 'প্রথম'। ... উত্তানপাদের পুত্র, ধ্রুবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। প্রিয়ব্রতরাজের পুত্র তৃতীয় মনু। (ব.শ.)। রাজা উত্তানপাদ ও রানী সুরুচির পুত্র। অন্য রানী সুনীতির পুত্র ধ্রুব। ... একদিন মৃগয়াকালে উত্তম বনমধ্যে যক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হন। উত্তমের মা সুরুচিরও পুত্রের অনুসন্ধানকালে অরণ্যের অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু ঘটে। ((পৌ.অ.)। **৪.** good বা 'ভাল' অর্থে প্রচলিত। **৫.** এমনি এমনি উত্তম নয়, ব.শ. জানিয়েছেন, 'বিদ্যাচার জন্মাদি হেতু উত্তম'। প্রশ্ন হল, তম গুণের উদগমন হলে সেটা ভাল হয় কেমন করে? হয়। যদি তার আগেকার মানুষদের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হয়ে যায়। তখন এই নতুন মানুষেরা, যারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খায়, বিদ্যাচার করে, তারা মানুষের চোখে 'অপেক্ষাকৃত ভাল' হয়। কারুশিল্পের (উত্তানপাদের) আবির্ভাবের পর সুরুচিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী থেকে উত্তম মানুষদের বা বিদ্যাচার জানা লেখাপড়া-জানা মানুষদের এবং সুনীতিসম্পন্ন জনগোষ্ঠী থেকে ধ্রুবসত্যেবিশ্বাসী মানুষদের জন্ম হয়। পুরাণাদি অনুসারে এই উত্তম মানুষেরাই স্বর্গাদি ভোগ করবার যোগ্য। দ্র. **স্বর্গ**।

উত্তর : **১.** উদ্ + তর (তরপ্) দুই এর মধ্যে একাতিশয্যে; উদ্ + ✓তৃ + অ (অপ্) - কর্ম্মবাচ্যে; উদ্ + ✓তৃ + অ - ভাববাচ্যে; উদ্ + ✓তৃ + অ - ণ। (ব.শ.)। **২.** *যাহা উদ্‌লোকে তারিত করে বা উত্তরণ ঘটায়। /* যাহা দ্বারা প্রকৃত অভিযোগ উত্তীর্ণ হয়। (ব.শ.)। **৩.** উর্দ্ধতর (বিপরীত শব্দ 'অধর'), উদীচ্য (north, বিপরীত শব্দ 'দক্ষিণ'), শ্রেষ্ঠ, অনন্তর (অনন্তর দেশ কাল বা উত্তর দেশ কাল), পরবর্ত্তী, উপরিতন (দ্র. **অধুনাতন**), বিশিষ্ট, অন্তিম, বাম, উল্লঙ্ঘনীয়, প্রবণ, বিষ্ণু, শিব, বিরাটরাজপুত্র (*ইঁহার* অন্য নাম ভূমিঞ্জয়। ইনি উত্তর-গোগৃহে কুরুযুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথ্য করিয়াছিলেন।), প্রতিবচন, জবাব, (ন্যায়ে) পূর্ব্বপক্ষপ্রতিষেধ, (ব্যবহারে) রাজসমীপে বাদিকৃত অভিযোগের অপনোদনকারক বাক্য, (মীমাংসায়) পঞ্চাঙ্গ অধিকরণের অন্যতম পূর্ব্বপক্ষের প্রতিবাদ, দোষনিরাকরণার্থ বাক্য, উত্তরচ্ছদ, (গণিতে) ফল। (ব.শ.)। ইনি মৎস্যরাজ বিরাটের কনিষ্ঠ পুত্র। অন্য নাম ভূমিঞ্জয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শঙ্খ। ... পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে অর্জ্জুন বৃহন্নলারূপে ইঁহার সারথ্য করেন। ... (পৌ.অ.)। **৪.** answer এবং north এই দুটি অর্থে প্রচলিত। **৫.** সেকালে যেকথা বলে প্রকৃত অভিযোগের হাত থেকে বাঁচা যেত, সেই বলাকে **উত্তর** বলা হত। অন্য ধরনের কথাকে উত্তর বলা হত না। একালে যেকোনো জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে যাই বলা হয়, সবই **উত্তর** পদবাচ্য। এর ইংরেজি উত্তরাধিকার utter। (দ্র. **উচ্চারণ**)। প্রাচীনকালে যে দিকটিতে এগোলে সমাজের তৎকালীন সমস্যা থেকে উত্তরণ মিলত, সেই দিকটিকে উত্তর দিক বলা হত। এটি ছিল মানসিক, সামাজিক। এদিকের অধিকারী ছিলেন **কুবের** (আদি ব্যাঙ্ক)। (দ্র. **দিকপাল**)। এর **নিধি, নাগ, নায়িকা** ইত্যাদিও ছিল। আর, বাহ্যিকভাবে **উত্তর** দিক ছিল, যেদিকে উঁচু বলে **উত্তীর্ণ** হতে হয়; অর্থাৎ ভারতের north দিকটি। এটি মানসিক বা সামাজিক উত্তর দিক নয়, ভারতের উত্তর দিক, earth-এর উত্তর দিক।

উত্তরায়ন : দ্র. **দক্ষিণায়ন**।

উত্তান, উত্তানপাদ : **১.** উদ্ + তান; উত্তান + পাদ। **২.** *উদ্‌লোকে বা উপরদিকে তান যাহার; যাহার পায়ের বিস্তার উপরদিকে। /* উদগত তান (বিস্তার) যাহার বা যাহার বিস্তার উপরদিকে। ... (ব.শ.)। **৩.** ভূমিলগ্নপৃষ্ঠ উর্দ্ধদিকে স্থিত, চিত, উর্দ্ধতল, অনিম্ন, অগবীর, অতিবিস্তার, অগম্ভীর, সরল, উন্মীলিত; উর্দ্ধচরণ (ভ্রূণ),

প্রসূতচরণ। নৃপবিশেষ। ... (ব.শ.)। উত্তানপাদ = স্বয়ম্ভুব মনু ও শতরূপার পুত্র। ইনি ধ্রুবের পিতা। এঁর দুই স্ত্রী — সুরুচি ও সুনীতি। সুনীতির গর্ভে ধ্রুব, কীর্তিমান, আয়ুষ্মান ও বসু এবং সুরুচির গর্ভে উত্তম জন্মগ্রহণ করে। রাজা সুরুচির অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁরই প্ররোচনায় তিনি সুনীতি ও ধ্রুবকে বনবাসে পাঠান। কিন্তু পরে অনুতপ্ত হয়ে ধ্রুবের হাতে সমূহ রাজ্যভার দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. প্রাচীন মানুষ অপত্য বা উৎপন্নকে বুঝেছিলেন দু'ভাবে — এক, পুরুষ প্রকৃতিতে (জমিতে বা নারীতে) গর্ভ নিষেক করে, প্রকৃতি সেই গর্ভ বমন করে, যেমন কৃষিজাত ফসল। এতে উৎপন্ন ফসল বা সন্তান বেরিয়ে আসার পর প্রকৃতি যথাপূর্বং থেকে যায়। দুই, পুরুষ প্রকৃতিতে গর্ভ নিষেক করে, প্রকৃতি সেই গর্ভসহ ফসলরূপে উত্থিত হয়, যেমন মাটির হাঁড়ি, কাঠের আসবাবপত্র ইত্যাদি। এতে যে প্রকৃতিতে (মাটিতে বা কাঠে) শ্রম নিষেক করা হয়, সেই প্রকৃতিও উৎপন্নের সঙ্গে থাকে। এ যেন প্রকৃতি নারীটি তার অপত্যসহ বিদ্যমান। তাই, **স্বায়ম্ভুব মনু**র দুই সন্তান — **প্রিয়ব্রত** ও উত্তানপাদ। অর্থাৎ প্রথম প্রকারের ফসলকে (বা তদ্বিষয়ক ধারণা ও তার তাত্ত্বিক ধারকদের) তাঁরা নাম দিয়েছিলেন প্রিয়ব্রত, আর দ্বিতীয় প্রকারের ফসলকে (বা তদ্বিষয়ক ধারণা ও তার তাত্ত্বিক ধারকদের) তাঁরা নাম দিয়েছিলেন উত্তানপাদ। এরই অপর নাম **উৎপাদন**। হরপ্পার সিলমোহরে এর একটি প্রতিকৃতি রয়েছে। তাতে দেখা যায়, একটি নারীমূর্তি (বা প্রকৃতি) যার পা দুটি উপর দিকে এবং তার যোনিদেশ থেকে একটি গাছ বেরিয়ে আকাশ ছেয়েছে। গাছের মূলটি যোনির ভিতরে অন্তর্হিত। (দ্র. **মূল্য**)। সহজ করে বললে, কৃষিজাত ফসলকে বলা হত প্রিয়ব্রত এবং কারুশিল্পজাত ফসলকে বলা হত উত্তানপাদ। উপর দিকে পা তুললে বা 'উৎ-পাদন' করলে তাকে ফসল বোঝায় কেন, এই প্রশ্ন নিয়ে এগোলেও আমরা এই রহস্যের কিনারা করতে পারি।

যাই হোক, ইতিহাস অনুসারে প্রথম যুগের মানুষেরা নেচার থেকে উদ্ভূত স্বয়ম্ভুব মানুষ, তাদের দু'রকম বিভাজন ঘটে — কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী ও কারুজীবী জনগোষ্ঠি। কারুজীবী জনগোষ্ঠীর 'পুরুষ' দিকটিকে উত্তানপাদ বলে এবং 'প্রকৃতি' দিকটিকে সুরুচি ও সুনীতি বলে। এদের থেকেই **স্বারোচিষ** (আপন আপন রুচি মতো চলবার ইচ্ছা যে মানুষদের) মন্বন্তরের সূত্রপাত হয়।

প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে, উৎ-পাদনের পাশাপাশি আরও একটি শব্দ প্রাচীন ভারতে সম্ভবত প্রচলিত ছিল, তা হল 'উৎজ'। এর অর্থ হল, যাকে নিজের/গ্রামের/গোষ্ঠীর/দেশের পরিধির বাইরে জনন করা হয়েছে। এটির প্রতীকী অর্থ লোহা, প্রাচীন ভারত সর্বাগ্রে যা আবিষ্কার করে ব্যবহার করতে ও রপ্তানি করতে শুরু করেছিল। পাশ্চাত্যবাসীগণ যাকে মনে রেখেছেন wootz রূপে, যদর্থ ancient iron of India।

উৎপত্তি : দ্র. **উৎপাদন, উত্তানপাদ**।

উৎপল : ১. উদ্ ✓পল্ (গতি) + অ (অচ্) - ক। (ব.শ.)। ২. *যে প্রতিপালক উর্দ্ধে স্থিত।* / উদগত পল যাহা হইতে; যাহা জলের উপরে যায়। (ব.শ.)। ৩. কুমুদমাত্র, কুবলয়, না'ল, পদ্ম, নীলকমল, জলজপুষ্পমাত্র, **পদ্মকুসুমাদি, পুষ্প, কুষ্ঠনামক** ওষধি, কুড়। (ব.শ.)। ৪. কদাচিৎ lotus **অর্থে প্রচলিত। ৫.** এই 'পল'কে এখন আমরা চিনি না, **এখন একে বলা হয় পুষ্পাক্ষ**, গর্ভমুণ্ড, ডিম্বাশয়, গর্ভকেশর ইত্যাদি। **পদ্মফুলের কেন্দ্রে এগুলি থাকে**, চারদিকে থাকে তার পাপড়ি। **আসলে উৎপল হল 'জলজপুষ্পমাত্র'**। যাকে খাজনা ইত্যাদি দিয়ে পালন করা হয় এবং সেই পালনের বিপরীতে যে প্রজাদের প্রতিপালন করে, সেই রাজা (পল, পালক) জনগণের বা জলের উপরে স্থিত থাকে। সেই রাজাকে ঘিরে থাকে তার পারিষদবর্গ, অজস্র পাপড়িতে বা পদে পদে বসে থাকে তারা (**পদ্ম**), রাজাকে ঘিরে থাকা সেই পদে পদে বসে থাকা পারিষদবর্গ রাজার চোখে তার শোভা বৃদ্ধি করে (**কুবলয়**) কিন্তু প্রজাদের চোখে তা মন্দ, **কুবলয়**। সেই কুবলয় যখন প্রজাদের পীড়ণের কারণ হয়, তখন সে অসুর **কুবলয়াপীড়**।

উৎপাদন (উৎপত্তি) : ১. উদ্ + ✓পদ্ + অন - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উপর দিকে পা অন থাকে যাহাতে*। ৩. জনন, উৎপত্তিকরণ, রেতোনিষেকপূর্ব্বক জনন, অর্জ্জন, লাভ। (ব.শ.)। ৪. produce অর্থে প্রচলিত। ৫. পাদ অন বা পাদন কথাটির অর্থ হল পা তোলা, পা চালানো। সেকারণেই উৎ-পাদন মানে উপর দিকে পা তোলা বোঝায়। কিন্তু তাহলে তা দিয়ে আমরা production বুঝি কেন? বুঝি, কারণ আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা উৎপাদনকে এভাবেই বুঝবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। দ্র. **উত্তানপাদ**। তাঁরা বুঝেছিলেন, উৎপন্ন দু'রকম। এক) যে উৎপন্ন শ্রমক্ষেত্র থেকে পৃথক হয়ে ফসল রূপে উঠে আসে, যথা শস্যাদি (= কৃষিজাত = প্রিয়ব্রত); দুই) যে উৎপন্ন শ্রমক্ষেত্রসহ উঠে আসে, যথা মাটির হাঁড়ি কলসি ইত্যাদি (= কারুশিল্পজাত = উত্তানপাদ)। দ্বিতীয়টিকে তাঁরা বুঝেছিলেন এমন উৎপন্ন, যার শ্রমনিষেকক্ষেত্র উৎপন্নের সঙ্গে উঠে আসে; যেন মা তার পা দুটি উপর দিকে তুলে রয়েছে। এটিকেই তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'উত্তানপাদ' বা 'উৎ-পাদন'। পরে পরে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রকারের শ্রমফলকেই 'উৎপাদন' বলার চল হয়ে যায় এবং 'উৎপাদন' নামকরণের কার্যকারণও আমরা ভুলে যাই। ভারতে ইংরেজ আসার পর আমরা 'উৎপাদন' শব্দের নিজস্ব (উৎ ও পাদন) অর্থ সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে 'উৎপাদন'কে production-এর প্রতিশব্দ করে নিই।

উৎপীড়, উৎপীড়ন : ১. উদ্ + ✓পীড়ি + অ (অচ্) - ক; উদ্ + ✓পীড়ি + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে পীড়া (দেহাংশকে) উদ্‌লোকে (দেহ-সীমার বাইরে) ঠেলে দেয়; উৎপীড় অন থাকে যাহাতে।* ৩. পুঞ্জ, ফেন, উৎস; উন্মথন, আঘাত, আহত স্থান, ক্ষতস্থান, উপদ্রব, প্রবৃত্তি, সংক্লেশন, সংমর্দ্দন। (ব.শ.)। ৪. 'অত্যাচার করা' বা oppression অর্থে প্রচলিত। ৫. যে **পীড়া** আপন অবয়বের ভেতর থেকে কিছু দেহকোষকে তাড়িয়ে মথিত করে ফুলিয়ে অবয়বের বাইরে বেরোতে বাধ্য করে, সেই পীড়নকে বলে উৎপীড়ন। তরলের ক্ষেত্রে সে হল ফেনা, মানবশরীরের ক্ষেত্রে সে হল ফোঁড়া, এবং সমাজশরীরের ক্ষেত্রে সে হল দলবদ্ধ গোষ্ঠীর

দেশের সীমান্তে পলায়ন। ... বাংলাভাষায় যে সকল জোড়শব্দ রয়েছে, যেমন আপদ-বিপদ, আয়-উপায়, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ ইত্যাদি, 'উৎপীড়ন-নিপীড়ন' সেরকমই একটি জোড়। ইংরেজির প্রভাবে এই জোড় শব্দগুলির একটির অর্থ যেমন ফেলে দেওয়া হয়েছে (যথা, আপদ-বিপদ = danger; আয়-উপায় = income; আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ = invitation) একই ভাবে 'উৎপীড়ন-নিপীড়ন' শব্দ দুটির মধ্যে উৎপীড়ন শব্দের অর্থ ফেলে দিয়ে তাকে নিপীড়নের সমার্থক oppression-এর প্রতিশব্দ করে নেওয়া হয়েছে।

উৎস : ১. উদ্‌ + স - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উত্থিত (বস্তু /বিষয় ইত্যাদি) যেখানে (প্রথম) স্বরূপ পায়। / যে স্থান ক্ষরিত জলে সিক্ত হয়; যেখানে জল ক্ষরিত হইয়া প্রবাহিত হয় বা হয় না।* (ব.শ.)। ৩. নির্ঝর। (ব.শ.)। ৪. source অর্থে প্রচলিত। ৫. হরিচরণ শব্দটিকে উন্দ্‌ শব্দবংশের সন্তান বলে মনে করেছেন। তাকে সঠিক বলে মেনে নিলে, শব্দটির মানে দাঁড়ায় — 'নবরূপে উত্তীর্ণ নাকরণ অস্তিত্ব লাভ করে যাহাতে'। সেক্ষেত্রেও আমাদের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটির সঙ্গে তার বিরোধ থাকে না। তবে উদ্‌ + ✓সিচ্‌ বা উৎসেক থেকে শব্দটি এসেছে কি না, তা নিয়ে ভাবা দরকার। আমরা এখনও নিশ্চিত নই।

উৎসব : ১. উদ্‌ + ✓সু + অ (অপ্‌) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উৎ (উদ্‌লোকের জন্য) সবন (পিঠাদির-প্রসবন) করা হয় যাহাতে। / যে সুখ প্রসব করে।* (ব.শ.)। ৩. আনন্দজনক ব্যাপার, বিবাহাদি, ক্ষণ, আনন্দ, প্রীতি, উৎসেক, উদ্রেক, ইচ্ছার উৎপত্তি, ইচ্ছাপ্রসব, হর্ষণ, উদগম। (ব.শ.)। ৪. festival বা 'পার্ব্বন' অর্থে প্রচলিত। ৫. এখন যে কোনো ফেস্টিভ্যালকেই উৎসব বলা হয়ে থাকলেও, আদিতে তা ছিল না। যাতে উৎ-গামী বস্তু বা বিষয় চোয়ানো (সবন) হত বা প্রস্তুত করা হত কেবলমাত্র তাকেই 'উৎসব' বলা হত; তা সে বাইরের লোকেদের জন্য হোক, অতিথি-অভ্যাগত-ঠাকুর-দেবতার জন্য হোক, কিংবা হাট-বাজারের উদ্দেশ্যে প্রেরণের জন্যই হোক। এমনকি আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও নবান্ন উৎসবে মা-কাকিমা-জেঠিমারা পরিবারের বাইরের কতজনের জন্য কত কী যে বানাতেন, তার হিসেব দেওয়া মুশকিল। এমনকি কাকপক্ষীর জন্যও পিঠা প্রস্তুত হত। দ্র. **কাকবলি**। পরে পরে 'উৎ-গামী' বস্তু বা বিষয় প্রসব করার কথাটি গুরুত্ব হারায় এবং যে কোনো ফেস্টিভ্যালকেই উৎসব বলার চল হয়ে যায়।

উৎসর্গ : ১. উদ্‌ + ✓সৃজ্‌ + অ (ঘঞ্‌) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উদ্‌লোকের জন্য সৃজন; যে সৃজন উদ্‌লোকে যায়।* ৩. ত্যাগ, পরিহার, দান, বিতরণ, মোচন, বর্ষণ, বন্ধনমোচন, অপানব্যাপার, মলাদিত্যাগ, দেব ও ব্রাহ্মণকে প্রতিশ্রুত বস্তুর দান, দেবোদ্দেশে নৈবেদ্যাদি নিবেদন। (ব.শ.)। ৪. sacrifice বা রহস্যমূলক দান অর্থে প্রচলিত। ৫. সর্গ আর উৎসর্গের মধ্যে বোধ্য পার্থক্য এই যে, সর্গ হল ধান চাষ করার মতো ব্যাপার, যার ফসল ফললে চাষী তা ভোগ করতে পারেন, ফেলে দিতে পারেন, জমিয়ে রাখতে পারেন, যা-খুশি করতে পারেন; কী করবেন সে-ব্যাপারে 'সর্গ' শব্দটির ভিতরে কিছু বলা নেই। কিন্তু 'উৎসর্গ' শব্দটির ভিতরে বলা আছে। 'উৎসর্গ' হল সেই ফসল, যা বাজারে যেতে পারে, বাবুর বাড়িতে যেতে পারে, মন্দিরে যেতে পারে, কিন্তু কিছুতেই চাষির ভোগে লাগবে না। উদ্‌লোকে পাঠানোর উদ্দেশ্যে এই প্রকার সৃজন কর্মকে উৎসর্গ বলে। একালে মানেটা দাঁড়িয়েছে sacrifice বা dedicate।

উৎসাহ : ১. উৎ + ✓সহ্‌ + অ (ঘঞ্‌) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *সাহের (সহনসীমার) উদ্‌লোক (উচ্চতর সহনসীমা) থাকে যাহাতে; অথবা, (বর্ত্তমান) সহনসীমা অতিক্রম করে উচ্চতর সহনসীমায় যাওয়ার প্ররোচনা থাকে যাহাতে।* ৩. উদ্যম, উদ্যোগ, পুরুষার্থসাধন কর্ম্মারম্ভে অধ্যবসায়, বলবতী বিক্রমচেষ্টা, বিক্রমবল, সামর্থ্য, বীররসের স্থায়ীভাববিশেষ, কল্যাণ, সুখ। (ব.শ.)। ৪. inspiration বা 'সাহস যোগানো' অর্থে প্রচলিত। ৫. 'সহ' শব্দটি ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কারণ শব্দটির ভেতরের লক্ষণাত্মক গুণটি গুরুত্বপূর্ণ। আমি (কিছু) হওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছি। পারিপার্শ্বিক আমার পক্ষেও আছে, বিপক্ষেও আছে। পক্ষের সঙ্গে আমার 'সহন' (সহায়তার) সম্পর্ক, বিপক্ষের সঙ্গেও আমার 'সহন' (সহ্য করার) সম্পর্ক। এই হাঁসূচক ও নাসূচক দুরকম 'সহন' সম্পর্কের মধ্যে আমি হই, হয়ে উঠি। এর জন্য আমাকে আমার 'সহন' বা সয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়াতে হয়, নাসূচক বিরুদ্ধতাকে ক্ষমা করতে হয়। একে বলে সহ্য করার ক্ষমতা বা 'সাহ'। এই সাহ-তে শক্তি যুক্ত হলে, তাকে বলে 'সাহস'। তবে কিনা, প্রত্যেকেরই এইরূপ 'সাহ'-র একটা বৃত্ত থাকে, পরিধি থাকে, সীমা থাকে। সেই সীমা পেরিয়ে যাওয়ার, সীমা বা পরিধি পেরিয়ে উদ্‌লোকে যাওয়ার যে প্ররোচনা, তাকে বলে উৎসাহ। দ্র. **সহ, সাহ, সাহস**।

উৎসৃষ্ট (উচ্ছিষ্ট, এঁটো, এঁঠো) : ১. উৎ + ✓সৃজ্‌ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে সৃষ্ট (বস্তু বা বিষয়) উদ্‌লোকে যায়।* ৩. পরিত্যক্ত, দত্ত, বিতীর্ণ, যথাবিধি দেবোদ্দেশে ত্যক্ত, প্রসারিত, উৎপাদিত, মুক্ত, উপেক্ষিত, বৃষ্ট, উচ্ছিষ্ট। (ব.শ.)। ৪. শব্দটি এখন এঁটো বা এঁঠো রূপে প্রচলিত। বাংলা তথা ভারতের বাইরে শব্দটির কোনোরকম প্রচলনই নেই বলেই মনে হয়। কারণ, শব্দটির ভিতরে যে 'ধারণা'টি ধরে রাখা আছে, সেই 'চেতনাসত্তা' (conceptual phenomenon) ভারতের বাইরে কোনো জাতিরই নেই। ৫. ব্যক্তির /পরিবারের / গোষ্ঠীর / গ্রামের / দেশের বৃত্তের পরিধির বাইরে কাউকে দেওয়ার জন্য যে সকল বস্তু বা বিষয় সৃজন করা হয়, সেইগুলি সবই উৎসৃষ্ট পদবাচ্য। খাওয়ার পরে পাত্রের চারদিকে যা পড়ে থাকে তা যেমন গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি-বিড়াল-কুকুরের জন্য 'উৎসৃষ্ট' পদবাচ্য হয়ে যায়, তেমনি উৎপাদন কর্মযজ্ঞের মূল উৎপন্নের যে অংশ প্রাচীনকালে সমাজপরিচালক মহর্ষিকে দেওয়ার জন্য প্রজাসম্প্রদায় সৃষ্টি করতেন, তাও 'উৎসৃষ্ট' হয়ে যায়। পরবর্তী কালে দেবগণের (বিনিময়জীবী পাইকারদের, দ্র. **দেব**।) দেওয়ার জন্য যা সৃষ্ট হত তাও 'উৎসৃষ্ট' পদবাচ্য ছিল। কিন্তু ভারতসমাজ অজস্র ঘোর কোলাহল সংগ্রামের দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে বিনিময়জীবীদের নিষিদ্ধ

করে রাখে; ঘৃণিত হয়ে যায় কেনাবেচা। ফলে 'উৎসৃষ্ট'ও হয়ে যায় অস্পৃশ্য। ভারতসমাজের লোকাচারের পরতে পরতে সেই পুঁজিবাদ-বিরোধের ছায়া থেকে যায়। এমনকি খাওয়ার সময় পাত্রের উৎসৃষ্টও ঘৃণিত হয়ে যায়; হয়ে যায় এঁটো বা **ঝুটা**। বলে রাখা ভাল, শব্দটি কালের ধারায় প্রবাহিত হয়ে উৎসৃষ্ট থেকে উচ্ছিষ্ট পেরিয়ে বর্তমানে এঁটো বা এঁঠো-তে পরিণত হয়েছে। মূলে বিনিময়-বিরোধী হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোনো ধর্ম্মে এই 'এঁটো'র ধারণা নেই।

উদাত্ত : ১. উদ্-আ + ✓দা + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে; উদাত্ত + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। ২. *উদ্‌লোকের নিমিত্ত দান তারিত হয় যাহাতে।* / যাহা উচ্চে গৃহীত হয়; যাহা উচ্চৈঃ উচ্চারিত হয় (ব.শ.)। ৩. মহান, দয়াত্যাগাদি-সম্পন্ন, দাতা, বিপুলচিত্ত, মহাত্মা, উদার, বিশাল, দীর্ঘ, উচ্চ, গুণসম্পন্ন, অতিশয়িত, সমর্থ, উদাত্ত স্বরযুক্ত, তালু-প্রভৃতি স্থানে ঊর্দ্ধভাগনিষ্পন্ন (স্বরবর্ণ), উচ্চস্বর, তারস্বর। (ব.শ.)। ৪. 'গলা খুলে' গান করা বা ঐরকম সজোরে আওয়াজ করা অর্থে শব্দটি এখনও প্রচলিত। ৫. কিন্তু প্রশ্ন হল, **উদাত্ত** শুধু যদি আওয়াজের বা স্বরের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা বোঝানোর উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে তার মানে মহান, মহাত্মা, দাতা ইত্যাদি বোঝায় কেন? এর কারণ রয়েছে 'স্বর' শব্দটির ভিতরেই। স্ব রহে যাহাতে সেটাই স্বর। মনুষ্যসৃষ্ট কথা, শব্দ, অপত্য, উৎপন্ন, পণ্য সব কিছুতেই স্রষ্টার স্ব থাকে। তাই সেগুলি সবই স্বর পদবাচ্য। আর সেই স্বরসমূহকে যিনি উদ্‌লোকের নিমিত্ত প্রবলশক্তিতে ত্যাগ করেন, তিনিই **উদাত্ত**। তা তিনি ধনত্যাগ, জ্ঞানত্যাগ, শব্দত্যাগ, যাই ত্যাগ করুন। সেকারণেই উদাত্ত মানেই মহাত্মা, উচ্চ, ইত্যাদি। দ্র. **স্বর্গ, নাক, অমরাবতী**।

উদান : ১. উদ্ + ✓অন্ + অ (ঘঞ্) - ণ। (ব.শ.)। ২. *উদ্‌লোকে অন (on) থাকে যে।* / যাহা দ্বারা উর্দ্ধভাগে লোক বাঁচে। (ব.শ.)। ৩. কণ্ঠদেশস্থ উর্দ্ধগামী প্রাণবৃত্তিবিশেষ বায়ু, প্রাণাদি বায়ুর একতম, পক্ষ, নাভি, সর্পবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. প্রাণ অপান উদান ব্যান সমান — এই পঞ্চপ্রাণবায়ু। তবে সে বায়ু কেবল মানবশরীরের ভিতরের বায়ুকে বোঝায় না, সমাজশরীর ও জগৎশরীরের ভিতরের বায়ুকেও বোঝায়। দ্র. **বায়ু**। এই ত্রি-শরীরেরই উপরের দিকটি যে বায়ুর দ্বারা বাঁচে, তার নাম উদান। আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীরা এক বয়ানে ত্রি-শরীরের উদানবায়ু বিষয়ে তাঁদের বক্তব্যসমূহ লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। আলাদা করে বলার দরকার মনে করেননি। অতএব, সমাজশরীরের ভিতরেও যে বায়ুপ্রবাহ উদ্‌লোকের দিকে যায়, সেই বায়ু হল উদান বায়ু। একে শাসকদের বা জ্ঞানজীবীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত মিডিয়ার বক্তব্য হতে পারে, কিংবা ধনীদের বা শাসকদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পণ্যপ্রবাহও হতে পারে। সহজ কথায় চাষি ও কারুশিল্পীদের উৎপন্নকে যে-পাইকারেরা বাজারে নিয়ে যায়, তারাই সমাজশরীরের উদান বায়ু। ৬. স্ক্যান্ডিনেভীয় পুরাণের দেবতা Odin (= জারমানিক Woden, যার থেকে Wednesday), যিনি আদিতে ঝড়ের দেবতা, এবং যাঁকে অতীতেই সমসত্ত ধরা হয়েছিল রোমক দেবতা Mercury-র সঙ্গে। Mercury = বুধ, যিনি বাণিজ্যে প্রেরণা দেন এবং **চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ**।

উদাসীন : দ্রষ্টব্য **আস্**।

উদাহরণ : ১. উদ্-আ + ✓হৃ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহাতে উদ্‌লোক হইতে আহরণ থাকে।* / যে বাক্যে তুল্যার্থযুক্ত বাক্য দ্বারা বক্তার অভিমত অর্থ বিজ্ঞাপিত হয়; (ন্যায় মতে) যাহা দ্বারা ব্যাপ্তি ও পঞ্চধর্ম্ম উদাহৃত হয়। (ব.শ.)। ৩. উক্তি, কথন; অবস্থানুরূপ বিবরণ, বর্ণনা, উল্লেখ, কথাপ্রসঙ্গ, কথিত বিষয়, আখ্যান, প্রবন্ধবিশেষ, স্তুতিগাথা। ... (ব.শ.)। ৪. example অর্থে প্রচলিত। ৫. মানুষের অভিজ্ঞতা বা অর্জ্জিত ধারণা মাত্রই শব্দরূপে উত্থিত হয়, উদ্‌লোকে যায়, মাথায় গিয়ে আশ্রয় নেয়, স্বর্গলোকে যায়, যাদের এককথায় বলা হয় উদ্‌লোক বা 'উদ্'। সেখানেই জমা হয়, জমা হয় মানুষের সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত ধারণা, শব্দরূপে, কথারূপে, কাহিনীরূপে, শব্দভাণ্ডার রূপে। example দিতে হলে সেখান থেকেই আহরণ করতে হয়। একেই বলে 'উদ্ থেকে আহরণ' বা উদাহরণ। সেই কারণে 'তুল্যবাক্য' মাত্রই উদাহরণ।

উদ্‌ঘাটন : দ্র. **ঘাট**।

উদ্দালক : দ্র. **শ্বেতকেতু**

উদ্দেশ, উদ্দেশ্য : ১. উদ্ + ✓দিশ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে; উদ্ + ✓দিশ্ + য (ণ্যৎ) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উদ্দেশ = উদ্‌লোকে থাকে যে দেশ (দ্র. **দেশ**); উদ্দেশ্য = উদ্দেশ থাকে যাহাতে।* / উদ্দেশ্য = যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বিষয়ের প্রবৃত্তি হয়; কোনো বাক্যের কর্তৃপদ যাহার বিষয় পরবর্তী বাক্যাংশে (বিধেয়ে) বিশেষ করিয়া বলা হয়। (ব.শ.)। ৩. লক্ষ্যীকরণ, অন্বেষণ, অনুসন্ধান, উপদেশ, নিরূপণ, (ন্যায়ে) নাম দ্বারা নির্দ্দেশ, নির্দ্দেশ, সমাসকথন, দেশভাগ, ... অনুসন্ধেয় বিষয়, প্রয়োজন, অর্থ, নিমিত্ত, অভিপ্রেত বিষয়, লক্ষ্য, স্থল, প্রদেশ, ৪. target বা 'লক্ষ্য' অর্থে প্রচলিত। ৫. উদ্দেশ, উদ্দেশে, উদ্দেশ্য, আর উদ্দেশ্যের বানান নিয়ে অনেকেই ভারি মুশকিলে পড়েন। 'আধুনিক' ভাষাবিধায়কেরা বিধান দেন — 'খোঁজ' বোঝালে 'উদ্দেশ', 'দিকে' বা 'প্রতি' বোঝালে 'উদ্দেশে' ('উদ্দেশ্যে' হবে না), এবং 'লক্ষ্য' ও 'অভীষ্ট' বোঝালে 'উদ্দেশ্য'; এইরকম বানান লিখতে হয়। কেন এরকম লিখতে হয়? এটা বিধান, আকাডেমি-বিধির বিধান! তেমন বিধানই বা কেন? না, তার কোনো উত্তর নেই। কিন্তু কর্মজগৎ তো কারও লাল চোখের তোয়াক্কা করে না, প্রুফরিডারের সামনে ছাপাছাপির কাজের প্রুফটা সঙীন উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে — -শ, -শে, -শ্য, কে কোথায় বসবে ঠিক করে দাও। বেচারা প্রুফরিডার মুখস্তবিদ্যার শরণ নেয়, 'খোঁজ' দেখিলে 'শ' রাখিবে, 'প্রতি' দেখিলে 'শে' করিবে, 'লক্ষ্য' দেখিলে 'শ্য' লিখিবে।

শব্দার্থবিধি কিন্তু এরকম অন্ধ নয়, অর্থহীন বিধান তো নয়ই। জগতের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসারী সে। তাই দেখা যায়, 'বিশেষ দিশায় যে চলেছে' তাকে বলে দেশ; সেই দেশ মানুষের মনের উদ্‌লোকে থাকে, তাই 'উদ্দেশ'। আর, সেই 'উদ্দেশ' থাকে যাতে, তাকে বলে 'উদ্দেশ্য'। এই অর্থের ফারাক যদি বুঝতে পারা না যায়, 'উদ্দেশ' না লিখে সবক্ষেত্রে বরং 'উদ্দেশ্য'ই লেখা যেতে

পারে; কারণ 'উদ্দেশ্য'-র গলি দিয়ে 'উদ্দেশ'ও অনায়াসে গলে যেতে পারবে।

উদ্ধত : ১. উদ্ + ✓হন্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যার দ্বারা উদ্‌লোক (ঊর্দ্ধলোক) আহত হয়।* ৩. উৎকীর্ণ, উৎক্ষিপ্ত, উত্থাপিত, অত্যন্তহত, অত্যন্তনাশিত, দৃপ্ত, গর্ব্বিত, উদগত, উত্থিত, উন্মত্ত, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট, প্রচণ্ড, প্রগল্‌ভ, দুঃসহ, নিষ্ঠুর, কঠোর, পাষাণাদিতে আঘাত, উদ্‌ঘাত, ঠোকর লাগা। (ব.শ.)। ৪. rude অর্থে প্রচলিত। ৫. যেন মনে হয়, একদল বসে আছেন ঊর্ধ্বলোকে, অন্যেরা রয়েছে নীচে। নীচের লোকেদের কেউ যদি উপর দিকে বাড়তে বাড়তে অবশেষে গিয়ে ঊর্ধ্বলোকের তলায় আঘাত করে, উদ্‌ঘাত করে বসে, ঠোকর মারে, সে উদ্ধত। আপনি বলতে পারেন, কাউকে কোনো আঘাত না দিয়েও তো মানুষ 'উদ্ধত' আচরণ করে; যে ব্যক্তি কারও কথাই শোনে না, গোঁয়ার্তুমি করে নিজের মতো চলে, কারও ক্ষতি করুক না-করুক, সেও উদ্ধত? হ্যাঁ, সেও উদ্ধত। আঘাত সে বাস্তবে করছে না, কিন্তু মনে আঘাত করছে। তাও হিসেবে ধরেছিলেন আমাদের প্রাচীন শব্দকারগণ। মোট কথা, তাঁরা শব্দটি বানিয়েছিলেন 'আঘাত করা' বা 'হন্' ক্রিয়া দিয়ে। তাঁদের বোধে সেটিই ঠিক মনে হয়েছিল।

উদ্ধার : ১. উদ্ + ✓হৃ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উদ্‌লোক (ঊর্দ্ধলোক) হইতে (অথবা উদ্‌লোকের উদ্দেশে) হরণ রহে যাহাতে।* / যাহা গৃহীত হয়। (ব.শ.)। ৩. উন্নয়ন, অপনয়ন, অপকর্ষণ, মুক্তি, মোক্ষ, সংগ্রহ, ঋণশোধন, পরিত্যাগ, উদ্ধার্য্য দ্রব্য, বর্জ্জনীয় বা নিষিদ্ধবিক্রয় পণ্য, মনু মতে, অবিভক্ত সাধারণ ধন হইতে উদ্ধৃত জ্যেষ্ঠাদির বিংশাদিভাগ কিংবা যুদ্ধে জিত ধন হইতে উদ্ধৃত রাজাকে দেয় স্বর্ণরৌপ্যভূম্যাদি উৎকৃষ্ট ধন, উদ্ধৃত বা সঙ্কলিত শ্লোকাদি ... পাপমুক্ত করা, ত্রাণ করা, বন্ধনাদি হইতে মুক্ত করা, ছাড়ানো। (ব.শ.)। ৪. rescue বা recover করা অর্থে প্রচলিত। ৫. উদ্ বা ঊর্দ্ধলোক থেকে আহরণ করে আনাই উদ্ধার। ঊর্দ্ধলোকের চোখে এটা তাই অপকর্ম। সেইজন্যই উপরোক্ত অপনয়ন, অপকর্ষণ ইত্যাদি প্রতিশব্দ। কিন্তু যারা হরণ করে আনে, তাদের চোখে এটা বন্ধনাদি থেকে মুক্ত করা, মুক্তি। কেননা ঊর্দ্ধলোক তো সেটা আগেই হরণ করেছিল। কিন্তু সেকথা শুনছে কে? তাই ঊর্দ্ধলোকের চোখে উদ্ধার মানে অপনয়ন, আর অধোলোকের চোখে সেটাই উন্নয়ন, মুক্তি, মোক্ষ, বন্ধনমুক্ত করে আনা বা ছাড়ানো।

উদ্বৃত্ত : ১. উদ্ + ✓বৃৎ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহা উদ্-বৃত্ত বা ঊর্দ্ধলোকের বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত; যাহা বৃত্তের ঊর্দ্ধে উঠে বৃত্তের বাইরে চলে যায় বা পড়ে যায়।* / বৃত্ত হইতে উদগত। (ব.শ.)। ৩. অধিক, প্রবৃদ্ধ, অপরিমিত, ক্ষুভিত, উদগত, উন্নত, উন্নত ও বৃত্তাকার, উন্মার্গবর্ত্তী, মত্ত, অতিশয়িত, অতিরিক্ত, বিঘূর্ণিত। (ব.শ.)। ৪. excess বা 'বাড়তি' অর্থে প্রচলিত। ৫. বৃত্তের থেকে উছলে পড়া অংশকে উদ্বৃত্ত বলা যায়। এই বৃত্ত বাহ্য-অবয়বগত, ব্যক্তিগত, পরিবারগত, গোষ্ঠীগত, সমাজগত অনেক রকমের হতে পারে। এই বৃত্তের ধারণাটি না থাকলে 'উদ্-বৃত্তে'র কোনো অর্থই থাকে না। এমনকি ইংরেজি excess শব্দটিতেও এই বৃত্তের ধারণাটি এককালে ছিল, যখন তা আমাদের 'একশেষম্' (excessum - Latin) শব্দের লিপ্যন্তরমাত্র ছিল। তখন 'এক'টি ছিল বৃত্ত, এবং 'শেষম্'টি ছিল বাড়তি বা উদ্বৃত্ত।

উদ্বোধন : ১. উদ্ + ✓বুধ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। ২. যাহার দ্বারা 'স্মৃতিজননার্থ সংস্কারোদ্দীপন (ব.শ.)' হয়। ৩. কিঞ্চিৎ বোধন, বিস্মৃত বিষয়ের স্মরণ, জাগরণ, উদ্দীপন, জাগান, স্মৃতিজনন। (ব.শ.)। ৪. inauguration বা opening ceremony অর্থে প্রচলিত। ৫. যা কিছু অভিজ্ঞতা বা অর্জ্জিত জ্ঞান, সে সবই 'কথা' আকারে উদ্‌লোকে সঞ্চিত হয়। সেই ঊর্দ্ধলোক থেকে তাকে পুনরায় স্মৃতিতে ফিরিয়ে আনাই 'উদ্বোধন'; কিংবা সত্তার সুপ্ত বোধকে জাগিয়ে উদ্‌লোকে নিয়ে যাওয়াই 'উদ্বোধন'। উৎসবের ভিতরে উদ্বোধন থাকে, বিস্মৃত বিষয়ের স্মরণ বা সংস্কার-উদ্দীপনের চেষ্টা থাকে। স্মৃতি না থাকলে বোধন হবে কিসের? অর্থাৎ, এখন যে অর্থে উদ্বোধন শব্দটি প্রচলিত, তার প্রাচীন অর্থ একেবারেই তা ছিল না।

উদ্ভট : ১. উদ্ + ✓ভট্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *(ভটের পরিধির) ঊর্দ্ধে 'ভট' করে যে।* ৩. মহাশয়, মহাত্মা, উদার; দুর্ম্মদ, দুর্দ্ধর্ষ; শ্রেষ্ঠ, অনুত্তম, উৎকৃষ্ট; অদ্ভুত, অসম্ভব, বিস্ময়কর; উৎকট, অতিপ্রবল; শূর্প, (সাদৃশ্যে) কচ্ছপ, গ্রন্থবহির্ভূত লোকপ্রসিদ্ধ অজ্ঞাত কবিকর্তৃক শ্লোক। ... (ব.শ.)। ৪. odd অর্থে প্রচলিত। ৫. উদ্ভট শব্দটি বর্তমানে যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন নয়। অথচ দেখা যাচ্ছে, অতীতে শব্দটি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ছিল, নিন্দনীয়ও ছিল। এমন কেন? এর কারণ রয়েছে **'ভট'** ও **'ভট্ট'** শব্দের ভিতরে। 'ভ্'-এর অর্থ **ভরণ ও ভক্ষণ** — নিজের বা নিজগোষ্ঠীর ভরণ করা এবং অন্যদের ভক্ষণ করা। এই নীতি যে ঘোষণা করে বা পালন করে, সে 'ভট' পদবাচ্য। গোষ্ঠীপরিচালক ব্রাহ্মণ, যাঁরা উপরোক্ত নীতি পালন করেন, তাঁরা সেকারণেই 'ভট' পদবাচ্য হয়ে যান। আবার সেই ভটের পক্ষে যিনি সওয়াল করেন বা ভটের স্তুতি করেন, তিনিই ভট্ট। (দ্র. **ভট্টাচার্য্য**)। কিন্তু এর পর যদি কেউ আরো ভালো আরো উন্নত মানের ভরণ-ভক্ষণের নতুন নীতির আবিষ্কার করেন ও সে বিষয় ঘোষণা করেন, তাহলে কী হবে? নিশ্চয়ই তা প্রচলিত ভট ও ভট্টদের চোখে বা স্ট্যাটাস-কো রক্ষাকারী-ভটদের চোখে অন্যায়, অস্বস্তিকর হবেই। তখন স্বভাবতই তাঁরা বলবেন — ওই (নতুন) ব্যাটা(রা) 'ভাট' বকছে, উদ্ভট কথাবার্তা বলছে। কিন্তু কালে কালে অনেকসময় সেই 'উদ্ভটেরা'ই একদিন ক্ষমতা লাভ করে। তখন উদ্ভট হয়ে যায় মহাত্মা, মহাশয় ইত্যাদি। সেই উদ্ভট আবার পরবর্তী নতুনদের একই ভাবে 'উদ্ভট' বলে গালি পাড়ে। সমাজ-পরিচালনার ক্ষেত্রে এ এক চিরন্তন নিয়ম। **ভাটপাড়া** থেকে Vatican City, একই শব্দের উত্তরাধিকার। (দ্র) গ্রন্থের 'ভাটপাড়া থেকে ভাটিক্যান সিটি, সর্বত্রই ভাট কেন?' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য। ৬. ল্যাটিন শব্দ vates ('ভাটিস্') = ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা; দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি।

উদ্যম (উদ্যত) : ১. উদ্ + ✓যম্ + অ (ঘঞ্) - বৃদ্ধি-অভাব। (ব.শ.)। ২. *উদ্ যম যাহাতে; উচ্চ মানের সংযম যাহাতে*। ৩. উদ্যোগ, প্রয়াস, প্রযত্ন, প্রচেষ্টা, উদ্যমন, উত্তোলন, উন্নয়ন, উন্নমন, হস্তী অশ্বাদি যুদ্ধাদি শিক্ষাভ্যাস, সব্যাপার, স্বতঃপ্রাপন, স্বয়ং আগমন। (ব.শ.)। ৪. enterprise বা 'উৎসাহ', 'অধ্যবসায়', 'চেষ্টা' অর্থে প্রচলিত। ৫. গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে ব্রেক কষতে শেখাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। কখন কোথায় কীভাবে থামতে হয়, এটা যে যত ভালোভাবে রপ্ত করতে পারে, সেই তত নির্বিঘ্নে তত দ্রুত এবং সর্বাগ্রে গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। তাই সংযম বা যম অর্থাৎ 'যোগের সীমায়ন' যে যত উঁচু মানের করতে পারে, সেই তত অগ্রণী হতে পারে। সেই কারণে, যার মধ্যে যমের মান যত বেশি উঁচু থাকে অর্থাৎ যত বেশি 'উদ্ যম' থাকে, সে তত ভালোভাবে করণীয় কার্য্য করতে পারে। সৈন্যবাহিনীর ভিতরে যাতে সেই উচ্চ মানের **যম** থাকে, সেই উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝেই **ব্যায়াম** (বি - আ + যাম) (military exercise) করানো হয়। লক্ষণীয় যে, যম্ ক্রিয়া দিয়েই ব্যায়াম শব্দটি তৈরি হয়েছে। আজকাল 'উদ্যম' শব্দের এই 'উচ্চ মানের যম' অর্থটি ফেলে দিয়ে শব্দটিকে ইংরেজি enterprise শব্দের প্রতিশব্দ করে ফেলা হয়েছে।

উদ্যান : ১. উদ্ + ✓যা + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। ২. *যাহা উদ্-লোকের যান*। ৩. উদগতি, উদয়, নিঃসরণ, নির্গম, গ্রহণ, গ্রথনসূত্র; রাজার সর্ব্বজনোপভোগ্য উপবন, উপবন, ফলপ্রধানবন, ক্রীড়ার্থ পুষ্পবাটিকা, কেলিবন, প্রমদবন, বাটিকা, আর্য্যাবর্ত্তস্থিত দেশবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. garden বা 'বাগান' অর্থে প্রচলিত। ৫. বাগানকে 'উদ্লোকের **যান**' বা উদ্যান বলে এইজন্য যে, এ বাগান তো কেবল ফলফুলের বিশাল বাগান নয়, এ হল মানুষের যা কিছু সেরা সৃজন, উচ্চারণ, উৎপাদন, তা সব যেখানে সমবেত, মানসলোকের সেই উচ্চ স্থান, জ্ঞানবৃক্ষের উদ্যান। সেকালের জ্ঞানীদের বাহ্যিক উদ্যান ও মানসিক উদ্যানের সমান্তরাল বোধের কারণে, বাহ্যিক উদ্যানে বসেই সেকালের পণ্ডিতেরা জ্ঞানলোকের উদ্যানে বিচরণ করতেন। মানুষের প্রাচীনতম জ্ঞানী মানুষদের সেই উত্তরাধিকার পশ্চিমের পণ্ডিতদেরও ছিল। তাঁরাও এইরকম বাগানে বসেই জ্ঞানচর্চা করতেন। এখন যে 'Academy'-র এত রমরমা, আদিতে সেটি ছিল প্লেটোর বাগানের নাম। [বিস্তারিত বিবরণের জন্য (গ) গ্রন্থের 'উত্তরপ্রজন্মের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।] শান্তিনিকেতন কিংবা খড়্গপুর আই আই টি, গাছে গাছে জঙ্গল কেন? অতীত-অভ্যাসের বিস্মৃত ফল্গুধারা জ্ঞানী মানুষদের মনোলোকে সকলের অজ্ঞাতসারে আজও প্রবাহিত বলেই বড় বড় শিক্ষানিকেতনে আজও গাছপালার প্রাবল্য। দ্র. **দেবযান**।

এই উচ্চ স্থানের আরও একটি রূপ আছে। তা হল নন্দনকানন। সুখস্বর্গ। ইউরোপীয়রা একে চেনে 'ইডেন উদ্যান' নামে। আদিম যৌথসমাজের মানুষেরা প্রাচুর্যের সেই অবস্থানে থাকাকেই বলতেন নন্দনকাননে থাকা। 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল' খেয়ে বা 'বিদ্যাচার জন্মাদি হেতু **উত্তম** মনু'র আবির্ভাবের পর সেই সুখস্বর্গ থেকে মানুষের অধঃপতন ঘটে। সেই আদি উদ্যান বা সুখস্বর্গ কয়েক হাজার বছর ধরে বিবর্তিত হয়ে হয়ে পরিণত হয়েছে আজকের 'সব পেয়েছির দেশ' — অতি উচ্চ মার্গের সুপারমার্কেটে; যেখানে রবীন্দ্রকথিত 'উপকরণবহুল সভ্যতার' নাভিশ্বাস শুনতে পাওয়া যায়।

উন্নত, উন্নতি : ১. উদ্ + ✓নম্ + ত (ক্ত) - ক; উদ্ + ✓নম্ + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উদ্লোক থেকে (অন্যকে) নমন করে (নমনীয় করে বা নামিয়ে দেয়) যে; উদ্লোক থেকে (অন্যদের) নামিয়ে দেওয়ার কাজ চলে যাহাতে।* ৩. উচ্চ, উদগত, উচ্চলিত, মহান, উদার, প্রাংশু, বিপুল, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অহঙ্কৃত, তুঙ্গ, চাক্ষুষ মন্বন্তরে ঋষিবিশেষ। উন্নতভাব, উচ্চতা, উৎকর্ষ, অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি, ঊর্দ্ধগতি, উত্থান, বৃদ্ধি, উদয়, প্রকাশ, মহত্ত্ব, গরুড়ভার্য্যা, দক্ষকন্যা ও ধর্ম্মপত্নী। (ব.শ.)। ৪. improved ও improvement (development) অর্থে প্রচলিত। ৫. নম্ ক্রিয়াটির বোধ্য অর্থ হল নমনীয় করা, নামানো, নমস্কার করা ইত্যাদি। উন্নত-উন্নতি শব্দ এই নম্ ক্রিয়া দিয়ে বানানো হল কেন? কারণ, উঁচু দুভাবে হওয়া যায়। এক, নিজেকে উপরের দিকে বাড়িয়ে এবং দুই, অন্যদের নামিয়ে ছোট করে দিয়ে। এই দ্বিতীয় প্রকারের উঁচু হওয়াকে বলে 'উন্নত' হওয়া। যে এই প্রকারে উঁচুতে ওঠে, সে 'উন্নত'-পদবাচ্য। তার মানে, অন্যকে ছোট করে দিলে যেভাবে নিজের উচ্চতা সিদ্ধ হয়, তাকেই বলে উন্নতি। এরকম উন্নতি করতে হলে নিজেকে বাড়ানোর চেষ্টা করতে হয় না, অন্যদের ছোট করে দেওয়ার কাজ চালাতে হয়; আর তাকেই বলে 'উদ্ নমন করা' বা উন্নতি করা।

উন্নেতা : ২. *যিনি উন্নীত করেন*। ৩. ষোড়শ ঋত্বিকের অষ্টম ঋত্বিক। ইনি একজন অধ্বর্য্যু এবং যজুর্ব্বেদজ্ঞ। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **অগ্নিষ্টোম**।

উন্নয়ন (উন্নীত) : ১. উদ্ + ✓নী + অন্ (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহাতে ঊর্দ্ধে আনয়ন থাকে*। ৩. ঊর্দ্ধনয়ন, উত্তোলন। (মল্লযুদ্ধে) হস্ত দ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক নয়ন (নিয়ে যাওয়া); বিতর্ক, অনুমান, আকর্ষণ, নিঃসারণ। (ব.শ.)। ৪. improvement বা development অর্থে প্রচলিত। ৫. উন্নয়ন শব্দটি তৈরি করা হয়েছে নী বা আনয়ন ক্রিয়া দিয়ে। সেই কারণে নিজেকে উপরে তুলে নিয়ে যাওয়াকে বলে উন্নয়ন করা, আর অন্যকে নীচে নামিয়ে দিলে যে নিজের উচ্চতা বেড়ে যায়, তাকে বলে উন্নতি। উন্নয়ন আর উন্নতির এই ফারাক। আজকাল যদিও কথা দুটি একই development অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৬. ??

উপ : ৫. সর্বত্র শব্দটিকে উপসর্গ বলা হয়েছে। আমরা দেখেছি, অপ, আপ, উপ, উপর প্রভৃতি একই ক্রিয়ার সামান্য হেরফের থেকে জাত হয়েছে। ইংরেজিতে ap (op), up, upper প্রভৃতি শব্দ তাদেরই পাশ্চাত্য উত্তরসূরী। অর্থের বিচারে অপ হল পালনের নিম্ন প্রক্রিয়া, আপ তার থেকেই জাত, এবং উপ হল বৈপ্লবিক-পরিবর্তনকে পালন করে যে। ফলত, যার সঙ্গে 'উপ' কথাটি যুক্ত হবে, তার পরিবর্তন ঘটিয়ে নতুন রূপের কথাই 'উপ' শব্দের দ্বারা নির্দেশিত

হবে। নিরুক্ত মতে, 'উপ' উপসর্গটি 'উপজনন করে', অর্থাৎ জনন যা হবার সে তো মূল শব্দটি করছেই, বাড়তি যে জনন সেটি করে 'উপ' উপসর্গটি। সেই কারণে 'উপ' শব্দের সাধারণ ব্যবহার চলে 'উপরি' হিসেবে, যেমন 'উপপতি', 'উপায়', 'উপপ্রধান' ... ইত্যাদি এবং সর্বোপরি খোদ 'উপসর্গ'ই। পতি থাকতে উপরি আর একজন (= উপপতি), আয় থাকতে উপরি আরও আয় (= উপায়), প্রধান থাকতে উপরি আর একজন প্রধান (= উপপ্রধান), ... এবং সর্গ থাকতে উপরি আর এক সর্গ (= উপসর্গ) — এইরকম। তাহলে তো, এই ক্রিয়া উৎ-লোক থেকে সক্রিয় হয়। যেহেতু, 'উপ'র ভিতরে অন্য কোনো ক্রিয়া সেভাবে দেখানো নাই, আমরা আপাতত 'উপ' শব্দটিকে 'উৎ' শব্দ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সদস্য হিসেবে গণ্য করেছি, এবং সেভাবেই 'উপ'যুক্ত সমস্ত শব্দকে 'উৎ' শব্দের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি।

উপকীচক : ১. উপ + **কীচক**। ২. *কীচকের ('যাহাকে বায়ু স্পর্শ করে' /ব.শ.) উপ যে।* ৩. কীচকসদৃশ। ... ইহারা সুতপুত্র এবং (বায়ুপুত্র) ভীম কর্ত্তৃক নিহত হয়। (ব.শ.)। মৎস্যরাজ বিরাটের শ্যালক ও সেনাপতি কীচকের ভ্রাতা। এরা সংখ্যায় একশো পাঁচ জন। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার জন্য কীচক ভীমের হাতে নিহত হলে এরা কীচকের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার সময় দ্রৌপদীকে দেখতে পেয়ে তাঁকেও কীচকের সঙ্গে দাহ করবার জন্য বন্ধন করে নিয়ে যায়। দ্রৌপদীর আর্তনাদে ভীম শ্মশানে গিয়ে এক বৃক্ষ উৎপাটন করে একশো পাঁচ জন উপকীচককে নিহত করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. রাজা তো সরাসরি চরেদের সঙ্গে কথাবার্তা চালান না, চালায় তাঁর এক্সিকিউটিভদের কোনো একজন। সেইরকম যাকে রাজার চরেরা সরাসরি সমস্ত সংবাদ দিত, সেকালে তাকে কীচক বলা হত। কীচকের সহকারীদের বলা হত উপকীচক। উপ শব্দটি উপরি বা সহকারী (assistant বা sub-) অর্থে প্রযুক্ত হয়। বিরাট রাজার অন্তঃপুরে আত্মগোপন করে থাকার সময় এই 'চর' বা কীচক সত্তার সঙ্গে পাণ্ডবদের বিরোধ ছিল স্বাভাবিক। ফলে কীচকহত্যা অবশ্যম্ভাবী ছিল। দ্র. **কীচক**।

উপকরণ, উপকার : ১. উপ + ✓কৃ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে; উপ + ✓কৃ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে-করণ মূল করণের উপ বা সহায়ক; যে-কার মূল কার-এর উপ বা সহায়ক।* ৩. সাহায্যকরণ, প্রধান অঙ্গীভূত উপকারসাধনদ্রব্য, নৃপাদির ছত্রচামরাদি, নির্মাণসামগ্রী, অঙ্গ, কার্য্যসাধন অস্ত্রযন্ত্রাদি, গৌণ বা অপ্রধান অঙ্গ, জীবিকা, উপায়মাত্র, সহায়ক। আনুগুণ্যসাধন (বিপরীত - অপকার), হিতসাধন, ভোগ, প্রসাধন, মহাদেব। (ব.শ.)। ৪. help বা 'সাহায্যকরণ' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কর**।

উপচার : ১. উপ + ✓চর্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহা চর হইতে জাত, তাহার উপরি থাকে যাহাতে।* ৩. সেবা, অভ্যুত্থানাদি কার্য্য, অন্যের মনোরঞ্জনার্থ অসত্যভাষণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, প্রার্থনা, ব্যবহার, লক্ষণা দ্বারা শক্যার্থত্যাগপূর্ব্বক অন্যার্থবোধন, সম্মাননা, চিকিৎসা, বিধি, জীবনোপায়, ইতিকর্তব্যতা, ধর্ম্মকর্ম্ম, রাজনীতিযুক্ত মার্গ, পূজাসাধনদ্রব্যবিশেষ (উপচার প্রধানত তিনপ্রকার — পঞ্চোপচার, দশোপচার, ষোড়শোপচার। এতদ্ভিন্ন অষ্টাদশবিধ ও চতুঃষষ্টিপ্রকার উপচার আছে।), মণ্ডনসাধনদ্রব্য, রাজোপকরণ, গৃহসজ্জা, উপকরণ (জলস্থলাদি), উৎকোচ (ঘুশ), (ব্যাকরণে) সন্ধিবিশেষ (বিসর্গস্থানে স্), সজ্জা। (ব.শ.)। ৪. পূজার সহযোগী কাজকর্ম বোঝাতে শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত আছে। ৫. দ্র. **আচার**। কেউ যদি ইস্কুলে শিক্ষকতা করে বেতন নিয়ে জীবন কাটান, তবে সেটা তাঁর 'আচার'। আর যদি শিক্ষকতার পাশাপাশি উপ-শিক্ষকতা করেন, যেমন টিউশনি কিংবা ঐরকম কিছু, তবে সেরকম রোজগারটি তাঁর উপচার। পুলিশের ক্ষেত্রে চোর ধরা যদি তার আচার হয়, তবে তোলা আদায় তার উপচার। চাষীর ক্ষেত্রে মাঠে চাষ করা যদি তাঁর আচার হয়, তবে চাষের জমির কোণায় চৌব্বাচ্চা থেকে মাছ ধরা তাঁর উপচার। অর্থাৎ মানুষ যেভাবে চরে, চরে খায়, সেটা তার আচার। আর, সেই চরার পাশাপাশি বাড়তি আচরণটি উপচার। মনে রাখা ভালো, উপচারেও চর্ ক্রিয়াটি আছে। আচার যদি প্রধান ধান্দা হয়, তবে উপচারে থাকে উপ-ধান্দা। বিনা ধান্দায় উপচার হয় না। 'উপ' শব্দযুক্ত প্রায় সমস্ত শব্দের এই প্রকারেই অর্থ নিষ্কাশন হয়ে থাকে।

উপজীবিকা, উপজীব্য, উপজীব্যতা : দ্র. **জীবিকা**।

উপত্যকা : দ্র. তাক।

উপদেশ (উপদিষ্ট) : ১. উপ + ✓দিশ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দেশ-এর উপ বা সহকারী যে। (দ্র. **দেশ**)।* ৩. অনুশাসন, হিতকথন, মন্ত্রমাত্রকথন, (ব্যাকরণে) পরার্থ প্রয়োগ, আদ্যোচ্চারণ, প্রবর্ত্তনবাক্য, বিবরণ। (ব.শ.)। ৪. advice বা 'হিতকথন' অর্থে প্রচলিত। ৫. একালে আমরা দেশ মানে country, এবং উপদেশ মানে advice বুঝি। প্রকৃতপক্ষে দেশ শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ আমরা এখন ভুলে গিয়েছি। তবে সবাই সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছেন, সেকথা বলা যাবে না। এমনকি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত বাণী বসুর লেখা 'মৈত্রেয়জাতক' উপন্যাসে একদল বৌদ্ধকে বলতে শোনা যাচ্ছে — চলো, আমরা বুদ্ধের 'দেশনা' শুনতে যাই। সংসদ অভিধানেও কথাটি প্রতীকার্থে আছে। অর্থাৎ বৌদ্ধযুগেও **দেশ** শব্দটি সজীব ছিল। আসলে 'চিন্তাধারা' মাত্রেই, তা সে বৌদ্ধ, হিন্দু, ইসলাম, মার্কস প্রভৃতি যে ধর্ম্মের বা দর্শনের চিন্তাধারাই হোক না কেন, মানুষকে তা বিশেষ দিশার দিকে নিয়ে যায়, তাদের দিশাগ্রস্ত করে তোলে। এরূপ বিশেষ চিন্তালোককে যেমন **দেশ** বলে, তেমনি তদ্রূপ চিন্তালোকের অধিবাসীগণ যে বিশেষ 'জনপদ অধ্যুষিত ভূভাগ'-এ বাস করেন তাকেও **দেশ** বলে। এই দেশ-এর সহকারী চিন্তা বা কথনকে তাই উপদেশ বলে। দ্র. **দেশ**।

উপদ্রব : ১. উপ + ✓দ্রু + অ (অপ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দ্রবের উপ বা অগ্রগামী যে।* ৩. আকস্মিক দুর্দৈব, উৎপাত (দুর্ভিক্ষ মারি গ্রহণ ইত্যাদি দৈববিপদ), ধাতুবৈষম্যজন্য বিকার, উপসর্গ, বিকার, বৈক্লব্য, অবসাদ, অত্যাচার, দস্যুচৌরাদি-ভয়, বিপত্তি, ক্লেশ,

পীড়া, রাষ্ট্রবিপ্লব, বিদ্রোহ, দুর্জাত, অনিষ্টাপাত, অশুভ। (ব.শ.)। ৪. disturbance বা 'অত্যাচারমূলক ঝামেলা' অর্থে প্রচলিত। ৫. 'দ্রব' মানে তো তরল, তাহলে উপদ্রব মানে 'অত্যাচার' কেন? হ্যাঁ, মূল ক্রিয়া হল 'দ্রব'। সে যখন আসবে, তখন আমার অস্তিত্বকে দ্রবীভূত করে দেবে, গলিয়ে দেবে। ঘরবাড়ি, ভূসম্পত্তি, নৈমিত্তিক রুজি-রোজগার — এসবের যে একটা 'সলিড' ব্যবস্থা করে পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে বর্তে আছি, তা সব গলে যাবে; সব দ্রবীভূত বা লিকুইডেটেড হয়ে যাবে, আমি পরিবার নিয়ে তরলের নিম্নগামিতা মেনে নামতে নামতে কোথায় গিয়ে পৌঁছাব, জানি না। তবে সেই 'দ্রব' এখনও আসেনি, এসেছে উপদ্রব। সে আমাকে দ্রবীভূত করার চেষ্টা করছে, গলিয়ে তরলে পরিণত করবার চেষ্টা করছে, তরলে পরিণত করার ভয় দেখাচ্ছে, কখনো-বা সে কাজে খানিকটা সফলও হচ্ছে। আমার আর্থিক, মানসিক, পারিবারিক ক্ষতি হচ্ছে। এই আগন্তুকটি হল 'উপদ্রব'।

উপনয়ন (উপনীত) : ১. উপ + ✓নী + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নয়নের (আনয়নের) উপ বা সহকারী যে।* / যাহা দ্বারা বালক বেদাধ্যয়নার্থ গুরুসমীপে নীত হয়। (ব.শ.)। ৩. সমীপে নয়ন, আনয়ন। (ব.শ.)। ৪. 'পৈতে দেওয়া' অর্থে ব্রাহ্মণ বংশজগণের মধ্যে প্রচলিত। ৫. নয়ন মানেই নিয়ে আসা। চোখ সবার আগে বস্তুর চেহারাটি নিয়ে আসে, তাই তাকে নয়ন বলে। আবার, জমির মালিকানার দলিলও মালিকের হাতে ফসল এনে দেয়। এককালে পৌরোহিত্যে ব্রাহ্মণকে অনেক কিছু এনে দিত। সেই পৌরোহিত্যের প্রমাণস্বরূপ **উপবীত** সেই আনয়নে সহায়তা করে। সেই কারণে একে উপনয়ন বলে।

আমরা দেখেছি, **উপ** শব্দের অর্থ হল নবরূপে উত্তরণ বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন পালন করে যে। নী ক্রিয়া থেকে নিষ্পন্ন নয়ন-এর প্রথম অর্থ নিকটে আনা বা নিকটে আসা। ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য গুরুগৃহে উপনীত বা উপস্থিত হওয়াকে স্বভাবতই উপনয়ন বলা যাবে। উপনয়ন হলেই ব্রাহ্মণ বালকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হল, সে দ্বিজ হল। এখন থেকে সে যজ্ঞফল আনয়নের অধিকারী। দ্র. **দধিমঙ্গল**।

উপনিষদ : ১. উপ-নি + ✓সদ্ + ক্বিপ্ (০) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহা নিষদের সহকারী বা উপ।* / যাহা সহেতুক সংসারের অত্যন্ত অবসাদন করে; যাহা সংসারকারণের সমূল বিনাশ করে। (ব.শ.)। ৩. (উপ-নিষদ। 'নিষদ্যা = পণ্যবিক্রয়শালা, দোকান, হাট। নিষাদ = পাপের আধার।')। ক) শঙ্কর মতে, (উপচারে) ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ। খ) শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে উপনিষৎ বেদের শিরোভাগ। চারিবেদের সর্ব্বসুদ্ধ ১১৮০ খানি উপনিষৎ আছে। তন্মধ্যে ঋগ্বেদের ২১, যজুর্ব্বেদের ১০৯, সামবেদের ১০০০, এবং অথর্ব্ববেদের ৫০ খানি উপনিষৎ। মুক্তিকোপনিষদে ঈশ কঠ কেন প্রভৃতি ১০৮ খানি উপনিষদের নাম আছে। গ) বেদান্তশাস্ত্র। ঘ) ধর্ম্মগ্রন্থ। ঙ) গুহ্যবিদ্যা। চ) ধর্ম্ম, যোগ, তত্ত্ব, মন্ত্র, বীজ। দ্বিজাতির কর্ত্তব্য বেদব্রতবিশেষ। নিভৃত স্থান। (ব.শ.)। বেদের শিরোভাগ। এইজন্য এর নাম বেদান্ত। উপনিষদ বিভিন্ন ঋষি কর্তৃক কথিত হয়েছে। এদের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে কৌশীতকী, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, কেন, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি বারোখানি প্রাচীন ও প্রামাণ্য বলে গণ্য। এদের মধ্যেও পরস্পর মতভেদ আছে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণভাগ নিয়ে কর্মকাণ্ড; আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে জ্ঞানকাণ্ড। এতে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নিয়ে গভীর তত্ত্বকথা আছে। প্রধান ১২ খানি উপনিষদের নাম এইরূপঃ ঋগবেদীয় — ঐতরেয়, কৌশীতকী; সামবেদীয় — ছান্দোগ্য, কেন; কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় — তৈত্তিরীয়, কঠ, শ্বেতাশ্বতর; শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় — বৃহদারণ্যক, ঈশ, প্রশ্ন, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য। অবশিষ্ট সবই অথর্ব্ববেদীয়। (পৌ.অ.)। ৪. বেদপরবর্তী উপরোক্ত প্রাচীন গ্রন্থসমূহকে বোঝায়। ৫. **পাপ** মানে যদি পণ্য বোঝায়, তাহলে 'পাপের আধার' নিষাদ বা পণ্যজীবী হতে দোষ কোথায়, যখন কিনা 'নিষদ্যা' মানে 'পণ্যবিক্রয়শালা, দোকান, হাট' ইত্যাদি। তাহলে তো উপনিষদ নিষদের সহকারী, বিনিময়ের তাত্ত্বিক ভিত্তির জোগানদার। তাই উপনিষদ হল দোকানদারির আদি দর্শন বা আদি ধনতান্ত্রিক দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ। যেহেতু বেদ পণ্যজীবিতার বিরোধী বা দোকানদারির বিরোধী এবং স্বভাবতই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধী, আর উপনিষদ ঠিক তার উলটো, তাই উপনিষদ মূলত বেদবিরোধী। কার্যত পৃথিবীতে যত প্রকার মতবাদ, দর্শন (ধর্ম্ম) আছে, সেগুলি মূলত দুই জাতির — বেদবাদী (সমাজতন্ত্রবাদী) ও উপনিষদবাদী (পুঁজিবাদী)। যেমন বৈদিক ধর্ম, ইহুদি ধর্ম, মনুবাদী হিন্দু ধর্ম, ক্যাথলিক-খ্রিস্টধর্ম, মহাযান-বৌদ্ধধর্ম, শিয়া-ইসলাম ধর্ম ... প্রভৃতি মূলত বেদবাদী; এবং বৈষ্ণববাদী-হিন্দুধর্ম, হীনযান-বৌদ্ধধর্ম, প্রোটেস্টান্ট-খ্রিস্টানধর্ম, সুন্নি-ইসলামধর্ম ... প্রভৃতি মূলত উপনিষদবাদী। যেমন মহাত্মা গান্ধী মূলত বেদবাদী এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত উপনিষদবাদী। দ্র. **উগ্রশ্রবাঃ**। তবে মনে রাখা ভালো যে, একদিকে সনাতন বেদ (= বৈদিক যুগের আগেকার অবিভাজিত বেদ) যেমন এই বাদবিসম্বাদের ঊর্দ্ধে, তেমনি উপনিষদ-গ্রন্থগুলির বেশির ভাগকেই বেদবাদীরা কুক্ষীকরণ করে সেগুলির অনেকাংশকে 'বেদায়িত' করে ফেলেছিলেন। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল, আদি সনাতন বেদের কথাগুলিকেই পথম দিকের কয়েকটি উপনিষদ সবার উপরে স্থান দিয়েছিল। অর্থাৎ কিনা, উপনিষদ আবির্ভূত হয়েছিল দাদার (বিভাজিত বেদের) বিরুদ্ধে পিতার (সনাতন বেদের) বিদ্যাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে। সেই ঔপনিষদিক নীতিকেই রবীন্দ্রনাথ নিজের মতো করে আপডেট করে অনুসরণ করে গেছেন। সেই বিচারে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবিদ্যা মানুষের আদি অধ্যাত্মবিদ্যার উত্তরাধিকার।

উপবীত : ১. উপ + ✓বী + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *'যাহার দ্বারা বিশেষগতি সাধিত হয়' (= বীত /ব.শ.) তাহার উপ বা সহকারী যে।* ৩. বামস্কন্ধে স্থাপিত ও দক্ষিণ কক্ষে অবলম্বিত সূত্র, যজ্ঞসূত্র, পৈতা। মেধাতিথি অনুসারে, উপবীত — বাসবিন্যাস-বিশেষ, (তদ্ধর্ম্মতা হেতু) যজ্ঞসূত্র। মনু মতে, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মে দুই গ্রন্থি উপবীত এবং উত্তরীয় অভাবে এক গ্রন্থিধারণের বিধি আছে। বিপ্রের কার্পাসসূত্রের, ক্ষত্রিয়ের শণসূত্রের ও বৈশ্যের

মেষলোমের উপবীত বিহিত। উপবীতসদৃশ নিবেশিত বস্তু। উপবীত রূপে ধৃত বস্তুমাত্র (মুক্তা, সর্প)। (ব.শ.)। ৪. পৈতা অর্থে প্রচলিত। ৫. দক্ষযজ্ঞের প্রবর্ত্তনের পর কালে কালে সমাজে তো অতি উচ্চ থেকে অতি নীচ পর্যন্ত বহু সোপান হয়ে যায় এবং সমাজসদস্যেরা বিভিন্ন সোপানে দাঁড়িয়ে যে যার সামাজিক অবস্থান থেকে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কে কোন সোপানে আছে, সেটা জানা যাবে কেমন করে? কার কোন 'বিশেষগতি' লাভের অধিকার আছে, সেটা জানার উপায় কী হবে? গলার সূত্র বা পৈতা হল সেই উপায়। সেই পৈতার দৈর্ঘ্য, সূত্রের সংখ্যা, তার গ্রন্থন, উপকরণ, এইসব দেখে ঠিক হত, কে কোন ধরনের যজ্ঞভাগ লাভের অধিকারী। পরবর্তী কালে এই স্থানে 'তিলক' বা 'কপালের লিখন' আসে। তিলক হরাইজন্টাল না ভার্টিক্যাল, কয়টি তার সারি, ইত্যাদি দেখে বোঝা যেত তিলকধারী কীরূপ যজ্ঞভাগের অধিকারী। এভাবে কপাল হয়ে যায় ভাগ্য। তারও অনেক পরে আসে উপাধি, শংসাপত্র, সার্টিফিকেট, মিলিটারির তিনতারা চারতারা ইত্যাদি, এবং দলিল প্রভৃতি আধুনিক উপবীত। আজকাল অবশ্য কেউ কেউ প্রাচীন উপবীত দিয়ে মশারি বাঁধেন বটে, তবে সেই নাস্তিকদের উপেক্ষা করে এখনও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সেই উপবীত কিছুটা হলেও উপবীতধারীর 'বিশেষগতি' সাধনে সহায়তা করে থাকে। এই উপবীতের আপডেটেড আধুনিকায়ন ঘটেছে গ্রীনকার্ড, দ্বি-নাগরিকত্ব-কার্ড ইত্যাদি নানা উত্তর-আধুনিক উপবীতে।

উপমা : ১. উপ + ✓মা + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *পরিমিতের উপ (ন্যায়) যে।* / যাহা দ্বারা উপমিত হয়। (ব.শ.)। ৩. তুলনা, অর্থালঙ্কারবিশেষ, গবাদিসাদৃশ্য-জ্ঞানরূপ অনুভব, দৃষ্টান্ত। (ব.শ.)। ৪. similarity বা 'সাদৃশ্য', 'তুলনা' অর্থে প্রচলিত। ৫. 'গোলাপের মতো' কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর একটি ফুল দেখে এসেছেন, ধরা যাক তার নাম 'ক'। এই 'ক' হল 'মা', গোলাপ হল 'উপমা'। এরকম কেন?

কারণ, গোলাপ হল ইতোপূর্বে অনেকের দেখা একটি ফুল, যার সম্পর্কে সকলের ধারণা একটি পরিমিত রূপ পেয়ে গেছে। তাই গোলাপ হল 'মিত' বা 'পরিমিত সত্তা', যার একটা 'মান' সাধারণ্যে নির্ণীত হয়ে রয়েছে অর্থাৎ তা 'মাপিত' হয়ে গেছে, তাই 'মা'। আমাদের দেখা ও চেনা এবং স্বভাবত-মাপা সমস্ত বস্তুই 'মা' পদবাচ্য। এখন নতুন দেখা এই 'ক' বস্তুটিকেও মেপে নিয়ে 'মাপিত বস্তু' বা 'মা'-এ পরিণত করে নিতে হবে। তার জন্য ইতোপূর্বে 'মা'-কৃত গোলাপকে আনতে হল। এই গোলাপ হল উপমা, এবং 'ক' বস্তুটি সেই উপমার সাহায্যে মাপিত হয়ে নতুন 'মা'-এ পরিণত হয়ে ঢুকে গেল আমাদের হাজার হাজার চেনা ও মাপা 'মা'দের দলে। তার মানে, যাকে বোঝানোর জন্য আপনি 'মা'দের দুনিয়া থেকে উদাহরণ খুঁজে আনছেন, সেই উদাহরণটি সেই মুহূর্তে হয়ে যাচ্ছে 'উপমা', এবং যে নতুন সত্তাকে মাপার জন্য তাকে আনছেন, সেই মুহূর্তে সেই নতুন সত্তাটি পরিণত হচ্ছে 'মা'-এ। বাংলাভাষায় এই নতুন 'মা'-কে বাদ দিয়ে 'উপমা'-র কোনো মানেই হয় না। দ্র. **মা, প্রতিমা**।

উপযুক্ত : ১. উপ + ✓যুজ্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যুক্তের উপ যে, অর্থাৎ প্রায় যুক্ত যে।* ৩. উচিত, আবশ্যক, অনুরূপ, যোগ্য, সৌষ্ঠবসম্পন্ন, যথাযথ। (ব.শ.)। ৪. eligible বা 'যোগ্য' অর্থে প্রচলিত। ৫. যাকে কোনোকিছুর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে, সে তার যোগ্য। আর যাকে যোগ করা হয়েছে, সে যুক্ত। আর যে যোগ্য কিন্তু এখনও 'যুক্ত নয়, অথচ যুক্ত'ও বটে, সে উপযুক্ত। চাষীরা কাঁধে জোয়াল চাপানো হালের বলদ দুটির একপাশে যে দামড়া বাছুরকে বেঁধে কিন্তু তার কাঁধে জোয়াল না চাপিয়ে বলদের পাশে পাশে হাঁটান, সে হল উপযুক্ত। একালের ভাষায় একে apprentice বলে।

উপর (উপরি, উপ্‌রি, উপরে, ওপর) : ১. উপ + র। ২. *উদ্‌লোকে পালন রহে যাহার; উপ (উপ্‌রি) রহে যাহাতে।* ৩. যানবাহনের উচ্চভাগ, অবয়বের উচ্চতর ভাগ, ঊর্দ্ধভাগে, পর, অধিকতর, সম্বন্ধে, বহির্ভাগ, উপরিভাগে; নির্দিষ্টের অতিরিক্ত, বাড়তি, ভূতাদি উপরিচর অপদেবতা, সর্বোচ্চ স্থানে। (ব.শ.)। ৪. over, on, above বা 'ঊর্দ্ধ' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **উপ**। এই উপ ও উপর শব্দটিই ইংরেজিতে যেন up ও upper হয়ে রয়েছে। আমাদের মতে, *উদ্‌লোকে পালন রহে যার*, তাকেই উপর বলা যায়। ৬. আবেস্তা, জার্মান, ল্যাটিন, ও ইংরেজিতে শব্দটি যথাক্রমে upairi, uber, super, over প্রভৃতি রূপে বিদ্যমান। (ব.শ.)। গ্রীক hypo, hyper।

উপরিচর বসু : ১. উপ, চর্ = ভ্রমণ, চরে বেড়ানো; বস্ = উপবেশন, বসা। (বসের আধার। চর্ব্বি)। ২. *যে **বসু** উপরে উপরে চরে।* ৩. ক) ঊর্দ্ধচর, আকাশচর (বিহঙ্গাদি)। খ) চেদিরাজ্যের রাজা বসু। দ্র. **ইন্দ্রধ্বজ, বসুধারা**। ইঁহার বীর্য্যে ব্রহ্মশাপভ্রষ্টা মৎস্যরূপা অদ্রিকা অপ্সরার গর্ভে ব্যাসমাতা সত্যবতীর জন্ম হয়। (ব.শ.)। পুরুবংশজাত চেদি দেশের রাজা। ইন্দ্রবংশীয় কৃতি রাজার পুত্র। ইন্দ্র ... এঁকে স্ফটিকময় বিমান, বৈজয়ন্ত মালা এবং যষ্টি উপহার দিয়েছিলেন। ... আকাশে বিচরণ করতেন বলে এঁর নাম উপরিচর। ... ইনি কোলাহল পর্ব্বত বিদীর্ণ করলে শক্তিমতী নদী সেই বিদীর্ণ পথ দিয়ে প্রবাহিত হয়। ... কোলাহল পর্ব্বতের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। উপরিচর সেই পুত্রকে সেনাপতি ও কন্যা গিরিকাকে মহিষী করেন। ... একদিন মৃগয়াকালে কামাবিষ্ট রাজার শুক্র স্খলিত হয় এবং তা শ্যেনপক্ষীর দ্বারা মহিষীর নিকট প্রেরণ করেন। পথে অন্য এক শ্যেনের আক্রমণে সেই শুক্র যমুনার জলে পতিত হয়। ব্রহ্মশাপে মৎসী-রূপিণী অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা সেই শুক্র গ্রহণ করে গর্ভিণী হয় এবং দশ মাস পরে এক ধীবরের জালে ধৃত হয়। তার উদরে এক পুত্র ও কন্যা পেয়ে ধীবর রাজার কাছে যায়। পুত্রের নাম হয় মৎস্যরাজ। ... কন্যার নাম সত্যবতী। কিন্তু মৎস্যজীবীদের কাছে থাকার জন্য তার নাম হয় 'মৎস্যগন্ধ্যা'। ... ইনিই ব্যাসমাতা ও বিচিত্রবীর্যের জননী। (পৌ.অ.)। ৪. বাংলায় অপ্রচলিত। তবে ইংরেজিতে aperture শব্দটিকে এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের কাছাকাছি পাওয়া যায়। ৫. জলের উপরে যেমন জলবিম্ব

(বুজকুড়ি) থাকে এবং তা জলের উপরে চরতে থাকে, সেইরকম আদিম সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপরে বিচরণরত যে আদি সম্পদ-পদবাচ্য (কিন্তু সম্পদ নয়, যেমন 'প্রজাপতি-পদবাচ্য কিন্তু প্রজাপতি নহে', সেইরকম) সত্তার বিচরণ ছিল, সম্ভবত তাকেই উপরিচর বসু বলা হয়েছে। যতদূর বোঝা যায়, ব্যক্তিগত সম্পদের উদ্ভবের বহু আগে জন্মেছিল ব্যক্তিগত জ্ঞান এবং তা জন্মেছিল সম্প্রদায়সমূহের ফাঁকে ফাঁকে, দ্বীপে, **কৃষ্ণদ্বৈপায়ন** ব্যাস রূপে; তারও আগে এই উপরিচর বসুর জন্ম হয়েছিল এবং তারই ঔরসজাত কন্যা সত্যবতীর গর্ভে জন্মেছিলেন ব্যাস। মার্কস সম্পদের আদি উদ্ভবের কথা বলতে গিয়ে যে 'pores of society'-র কথা বলেছেন, তা উপরোক্ত দ্বীপ কিংবা তার পরের ঘটনা, যাকে **গহ্বর, গর্ত্ত, কুঞ্জ, কুণ্ড, বিল** ইত্যাদি বলা হয়েছে। দ্র. **অদ্রিকা, অদ্রিজ, বসু, ইন্দ্রধ্বজ**। ৬. aperture।

উপল (উপলা) : ১. উপ + ✓লা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***উপল*** *= উপ আনয়ন থাকে যাহাতে।* ***উপলা*** *=* ***উপল****-এর আধার যে।* ৩. পাষাণ, মণি, প্রক্ষেপ্য গোলক, জগন্নাথের উপভোগ। **উপলা** = পেষণযন্ত্রের (জাঁতার) দৃষদের উপরিস্থ ক্ষুদ্রতর প্রস্তরখণ্ড, শর্করা। (ব.শ.)। ৪. আধুনিক সাহিত্যে এখনও 'প্রস্তরখণ্ড' অর্থে কমবেশি ব্যবহৃত হয়। ৫. দ্র. **নিকষ, নিকষোপল**। গ্রামবাংলায় আজও **লও** (= নাও, নিয়ে নাও, নিন), **লিয়ে লে** (= নিয়ে নে), **লা** (= নিয়ে আয়) ... ইত্যাদি রূপে **লা** ক্রিয়াটির ব্যবহার চলে। আনয়নের প্রধান কাজের পাশে যদি কোনো উপ বা সহকারী আনয়ন কর্ম্ম চলে, তবে সেই কাজটি যে করে, তাকে **উপল** বলে। জাঁতার উপরের পাথরটি উপ-আনয়নের আধার বলে তাকে **উপলা** বলা হয়। সমুদ্রের মূল আনয়নের বিষয় মণিমুক্তাদি, আর উপ-আনয়নের বিষয় সুন্দর সুন্দর পাথরের টুকরো, ইংরেজিতে এদের gravel বলে। ৬. Greek - oplos, Latin - opalus। (ব.শ.)।

উপলক্ষ (উপলক্ষ্য) : ১. উপ + লক্ষ্য। (দ্র. **লক্ষ, লক্ষ্য**)। ২. ***লক্ষ্য****-এর উপ বা সহকারী যে।* ৩. আশ্রয়, অবলম্বন, প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, ব্যপদেশ, ছল, ছুতা। (ব.শ.)। ৪. occassion বা 'আয়োজন' অর্থে প্রচলিত। ৫. **উদ্দেশ** ও **উদ্দেশ্য** শব্দের মতো এই **লক্ষ, লক্ষ্য, উপলক্ষ, উপলক্ষ্য** শব্দ নিয়েও একই সমস্যা। আর, সে সমস্যার সূত্রপাত অনেককাল আগে থেকেই। ফলে প্রচলিত অভিধানগুলি নানা সমস্যায় পড়েছেন। প্রকৃতপক্ষে 'চক্ষু বা মনশ্চক্ষুর দ্বারা কোনো বস্তু বা বিষয়কে আপনার মধ্যে নেওয়া বা লওয়ার (ল) কাজটি দিশাগ্রস্ত (ক + ষ) থাকে যাহাতে (অ)', তাকে বলে 'লক্ষ'। এই লক্ষ যাহাতে থাকে সেটিই 'লক্ষ্য'। খুব কাছাকাছি ব্যাপার হলেও এদের মধ্যে ভেদ রয়েছে। বাংলায় দর্শন করাকে খানিকটা পরিবর্তিত করে 'দেখা' করে নেওয়া হয়েছে যে যুক্তিতে, একই যুক্তিতে লক্ষ করাকে 'লখ' বা 'লখি' করে নেওয়া হয়েছে। এই 'খ' আসলে 'ক্ষ'-এর একটি রূপ। দর্শন দিশাগ্রস্ত হয়ে গেলে তাকে 'দেক্ষা' বা 'দেখা' বলাই যুক্তিসঙ্গত। সেই সুবাদে চক্ষু বা মনশ্চক্ষু মারফত নিয়ে আসা হল 'লক্ষ'; এবং সেই লক্ষ করা বস্তু বা বিষয়টি বাস্তবে যেখানে রয়েছে, সেটি 'লক্ষ্য'। স্বভাবতই উপলক্ষ ও উপলক্ষ্য দুরকম অর্থের কথা বলে। প্রথমটি লক্ষ-এর সহকারী এবং দ্বিতীয়টি লক্ষ্য-এর সহকারী। লক্ষ্য থাকলেই উপলক্ষ্য থাকতে পারে, কিন্তু লক্ষ থাকলে উপলক্ষ থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। সেই কারণে 'উপলক্ষ' শব্দটির প্রয়োগ প্রায়শই ত্রুটিপূর্ণ। বাংলাভাষীগণ শব্দটির যেভাবে প্রয়োগ করেন, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দটি আসলে 'উপলক্ষ্য'কেই বোঝায়; ভুল বানানের কারণে সেগুলি 'য'-ফলাহীন হয়ে রয়েছে।

উপলব্ধ (উপলব্ধি) : ১. উপ + ✓লভ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *লাভের উপ্‌রি হিসেবে যা পাওয়া গেছে।* ৩. প্রাপ্ত, অধিগত, বিদিত, পরিজ্ঞাত, অনুভূত, অর্জ্জিত, বুদ্ধ, গৃহীত, অভ্যস্ত, শিক্ষিত। প্রাপ্তি, লাভ, জ্ঞান, বোধ। (ব.শ.)। ৪. received বা 'পাওয়া গেছে' অর্থে প্রচলিত। ৫. **যোগ্য** ও **উপযুক্ত** শব্দ দুটিকে যেমন আধুনিক বাংলায় সমার্থক (eligible) বানিয়ে ফেলা হয়েছে, সেইরকম লব্ধ ও উপলব্ধ (লব্ধি ও উপলব্ধি) শব্দ দুটিকেও সমার্থক (received) বানিয়ে ফেলা হয়েছে। উপলব্ধ শব্দটি কিন্তু আদৌ লব্ধ-কে বোঝায় না, বোঝায় লব্ধ-এর অনুষঙ্গে উপ্‌রি হিসেবে যা পাওয়া যায় তাকে। সাধারণ বাংলাভাষী একে বলেন 'ফাউ'। এক কিলো বেগুন কিনলেন, বিক্রেতা একটি বেগুন বাড়তি দিল; এই এক কিলো বেগুন হল লব্ধ, আর বাড়তি একটি বেগুন হল উপলব্ধ বা ফাউ। আজকালকার বিগ্‌বাজারে 'তিনটি কিনলে একটি ফ্রি' বলে যে কেনাকাটা চলছে, তাতে লিপ্ত হলে তিনটি হবে লব্ধ এবং একটি হবে উপলব্ধ। কিংবা সেমিনারে লেকচার শুনতে গেছেন, বক্তার বক্তব্য থেকে যে জ্ঞান পেলেন, সেটি লব্ধি; আর সেমিনারের শুরুতে বা শেষে যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলেন কিংবা চা-বিস্কুট খেলেন সেগুলি উপলব্ধি। যে ঘটনায় আমাদের লব্ধি ঘটে, তাতে কিছু না কিছু উপলব্ধি ঘটেই; বাড়তি কিছুই না পেলেও উপলব্ধি ঘটে। যেমন, গ্রামের বাড়িতে পুকুরঘাটে হাত-পা ধুতে নামছিলেন, খেলেন আছাড়; এটি লব্ধি, আর এর অভিজ্ঞতাটি উপলব্ধি। পুকুরঘাটে কেমন করে নামতে হয়, সে সম্পর্কে আপনার একটা ধারণা হয়ে গেল। দ্র. **লব্ধ**।

উপশম : ১. উপ + ✓শম্ + ই (ণিচ্) - অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্বের শক্তিবিচ্ছুরণ সীমিত যাহাতে তাহার উপ বা সহায়তাকারী যে। /* যে কর্ম্ম (রোগাদি) উপশম করে। (ব.শ.)। ৩. নিবারক, শান্তি, নিবৃত্তি, অনুদ্বেগ, রোগোপদ্রবশান্তি, তৃষ্ণাক্ষয়, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সংযম, পুণ্য। (ব.শ.)। ৪. cure বা 'নিরাময়' অর্থে প্রচলিত। ৫. তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা প্রভৃতি হল শায়ীর বা অস্তিত্বের শক্তিবিচ্ছুরণের বিভিন্ন রূপ। এর কারণে অস্তিত্বের বিপরীতে অনেক ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে, যা অস্তিত্বের পক্ষে শুভ নয়। তাই অস্তিত্বের উপরোক্ত শক্তিবিচ্ছুরণকে সীমিত করে নিতে হয়। তাকেই **শম** বলে। তাতে প্রতিক্রিয়া কমে এবং তার হাত থেকে বাঁচা যায়। অর্থাৎ, নিজের তৃষ্ণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে শান্ত করে নেওয়াকে বলে 'শম' করা। যে সেই কাজে সহায়তা করে, তাকে বলে 'উপশম'।

উপসংহার, উপহার : ১. উপ-সম্ + ✓হৃ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে; উপ + ✓হৃ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *সংহারের উপ যে; হারের সহায়তা (উপ) থাকে যাহাতে।* / যাহা উপহৃত হয়। (ব.শ.)। ৩. গ্রন্থের বা বিষয়বিশেষের বস্তুসংক্ষেপ, সমাহার, সমাপ্তি, প্রত্যবহার, অন্ত, নিয়ন্ত্রণ, নিগ্রহ, সংশ্লেষবিশেষ, আক্রমণ, একত্র শ্রুত অর্থের অন্বয়ার্থ অন্যত্র উপক্ষেপ, সঙ্কোচন, নিরাকরণ। উপঢৌকনদ্রব্য, ভেট, দেবতার পূজাদ্রব্য, বলি — পশু প্রভৃতি, ধনাদিদান দ্বারা কৃত সন্ধিবিশেষ, পরিবেশনার্থ খাদ্য, সমর্পণ, হারের সমীপস্থ শোভাজনক দ্রব্য। (ব.শ.)। ৪. উপসংহার কথাটি conclusion বা 'সমাপ্তি' অর্থে প্রচলিত এবং উপহার কথাটি presentation বা 'যৌতুক' অর্থে প্রচলিত। ৫. 'হওয়ন রহে যাহাতে' তাকে **হর** বলে। সেই হর থেকে জাত যে, তাকে **হার** বলে। তার থেকে আহার-বিহার-উপাহার-উপসংহারাদি শব্দের উন্মেষ হয়। কিন্তু একেবারে প্রথমেই 'না-হওয়ন থেকে হওয়ায় বা স্থিতাবস্থায় পৌঁছায় যে' তাকে আমরা 'হর' বলছি। ব.শ. জানিয়েছেন, এই হর শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল 'দেশান্তরপ্রাপণ'। (আমরা জানি, প্রকারান্তরে কাল এবং পাত্রও দেশ পদবাচ্য হতে পারে।) তার মানে, যাকে এক দেশ-কাল-পাত্র থেকে অন্য দেশ-কাল-পাত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে 'হর' পদবাচ্য। ক্রিয়াটির প্রতিক্রিয়া স্বভাবতই দুই দেশে দুরকম হয়। বিষয়টিকে সাজালে এইরকম দাঁড়ায় :

১ম দেশ-কাল-পাত্র		**২য় দেশ-কাল-পাত্র**
হৃত, হার	———>	হর, হরণ
অপহৃত	———>	অপহরণ
বহু হার	———>	আহরণ, আহার
উপহার	———>	উপহরণ
প্রহার	———>	প্রহরণ, প্রহরা
সংহার	———>	সংহর, সংহরণ
উপসংহার	———>	উপসংহরণ
সমাহৃত	———>	সমাহরণ, সমাহার
		নীহার, বিহর, বিহরণ
		বিহার,

একালে হরণ কথাটি কেবলমাত্র নিন্দনীয় চুরি অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। আদিতে তা ছিল না। তখন কেবলমাত্র 'অপহরণ' শব্দটি নিন্দনীয় ছিল এবং তা কেবল চুরি অর্থেই নিন্দনীয় ছিল না; সমস্তরকম নিম্নমানের হরণই (যথা চুরি, ঠকানো, মোহগ্রস্ত করে নিয়ে নেওয়া, জোর করে নিয়ে নেওয়া, ডাকাতি ইত্যাদি) 'অপহরণ' পদবাচ্য ছিল। কেননা, আদিতে অস্তিত্বমাত্রই হর পদবাচ্য ছিল। একটি হর মানেই হর-এক বা হরেক। নিকৃষ্ট অস্তিত্ব থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ অস্তিত্ব, সবই হর পদবাচ্য। হর অন থাকলে হরণ হয়, যাকে বলে এক দেশ-কাল-পাত্র থেকে অন্য দেশ-কাল-পাত্রে গিয়ে স্থির হওয়া বা দেশান্তরে পাওয়া। যে দেশ-কাল-পাত্র থেকে হরণ হয়, তারা হারায়, হারে, তাদের কপালে হার জোটে। একই ক্রিয়া প্রথম দেশের দিক থেকে অপহৃত, দ্বিতীয় দেশের দিক থেকে অপহরণ। একই ভাবে এক দেশে যা উপহার, দ্বিতীয় দেশের দিক থেকে তাই-ই উপহরণ; উপহরণেচ্ছা না থাকলে কেউ কি কাউকে উপহার দিতে পারে? অন্যদিকে এই হার-এর আশ্রয় যাহাতে, তাকে বলে **আহার**। উলটো দিক থেকে দেখলে বহু সত্তার হারের ফলেই ঘটে এক সত্তার আহার। যাতে এই হার প্রকৃষ্ট রূপে থাকে, তাকে বলে **প্রহার**। অন্যদিকে তখন থাকে **প্রহরণ** বা প্রহরা। এই হার যখন বিপরীতগামী, তখন তা **বিহার**।

উপসর্গ : ১. উপ + ✓সৃজ্ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। (দ্র. **উপ**)। ২. *সৃষ্টির (সর্গের) সঙ্গে ও তার পিছু পিছু (সহযাত্রীর মতো) অনুজপ্রতিম রূপে সৃষ্টি হয়েছে যে; অথবা, সৃষ্টির (সর্গের) অনুষঙ্গে উপজনিত (by-product) সর্গ যে।* / যাহা গতিসংজ্ঞা বা কর্ম্মপ্রবচনীয়তা হেতু অন্য পদের সহিত উপসৃষ্ট (প্রযুক্ত) হয়। (ব.শ.)। ৩. প্রাণীর শুভাশুভসূচক মহাভূতবিকার ভূকম্পাদি, আকস্মিক উৎপাত, রোগভেদ, রোগজন্য মস্তিষ্কের বিকৃতি, বিঘ্ন, অন্তরায়, বিপদ, রোগের আনুষঙ্গিক রোগ, মৃত্যুসূচক লক্ষণ, ভূতাদির আবেশ, উপরাগ, ক্রিয়ার সহিত যুক্ত প্র-প্রভৃতি অব্যয়। [***প্র পরা অপ সম্ অনু অব নিস্ নির্ দুস্ দুর্ বি আ (আঙ্) নি অধি অপি অতি সু উদ্ অভি প্রতি পরি উপ*** — দ্বাবিংশতি (২২টি) উপসর্গ।] উপসর্গ ধাতুর পূর্বে ... পরে, অন্য পদের ব্যবধানে প্রযুক্ত হয়। (ব.শ.)। ৪. 'লক্ষণ' অর্থে শব্দটি প্রচলিত। তাছাড়া ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে শব্দের সঙ্গেও **উপসর্গ** নামক শব্দগুলি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। ৫. জগৎশরীরে, মানবশরীরে, ভাষাশরীরে যা কিছু সৃষ্টি হয়, তার অনুষঙ্গে কিছু কিছু উপসৃষ্টিও হয়ে থাকে। সেগুলিকে **উপসর্গ** বলে। ইংরেজিতে একে বলা হয় by-product। উপরোক্ত 'প্রাণীর শুভাশুভসূচক মহাভূতবিকার ভূকম্পাদি'কে জগৎশরীরের উপসর্গ, 'রোগের আনুষঙ্গিক রোগ'সমূহকে মানবশরীরের উপসর্গ, এবং 'প্র-প্রভৃতি অব্যয়'কে (২২টি) ভাষাশরীরের **উপসর্গ** বলে। (দ্র. **অব, অপ, অধি, অভি, দুঃ**)।

অনেকে মনে করেন, **উপসর্গের** কোনো অর্থ হয় না। এ ধারণা ঠিক নয়। অর্থ আছে, গভীর অর্থ আছে। যাস্ক কিছু কিছু অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন। আমরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কয়েকটি উপসর্গের অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই বিষয়টি বিশাল। তার জন্য পৃথক প্রচেষ্টা দরকার। রবীন্দ্রনাথ এই উপসর্গের পথে হাঁটতে হাঁটতেই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর উপসর্গ-বিষয়ক আলোচনাও রয়েছে। তাই উপসর্গ বিষয়ে এই গ্রন্থের শুরুতেই বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত : ১. উপ + ✓স্থা + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ৩. সমীপস্থিত, সন্নিহিত, সমীপাগত, সমাগত, সঙ্গত, উপসন্ন, স্বতঃপ্রাপ্ত, উপনত, আবির্ভূত, আপতিত, প্রাপ্ত, অবৈদিক, চিত্তে উপগত, বর্ত্তমান, সেবিত, অন্বিত, পূজিত, উপস্থান। (ব.শ.)। ৪. present বা 'হাজির' অর্থে প্রচলিত। ৫. দুরন্ত গতিতে যে ছুটে বা ঘুরে চলেছে, তাকে আমরা দেখতে পাই না। স্-এর (= অস্তিত্বের) থা-এর (= থাকার) বা 'সত্তার অস্তিত্বলাভ-প্রক্রিয়া'র গতি থামলে সেই 'স্-থা' বা 'স্থা' ক্রিয়াটি 'স্থিত' হয়ে যায়; তখনই আমরা তাকে

সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখতে পাই। কিন্তু যাদের অস্তিত্বলাভ-প্রক্রিয়ার গতি এখনও থামেনি, এখনও প্রবল বেগে ছুটে বা ঘুরে চলেছে, তারা 'স্থিত' হয়নি; তারা 'অস্থিত'; আমরা তাদের দেখতে পাই না। তবে যাদের অস্তিত্বলাভ-প্রক্রিয়ার গতি প্রায় থেমে এসেছে, যদিও সম্পূর্ণ থেমে যায়নি, কিন্তু তাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, চেনা যাচ্ছে, এইবার 'স্থিত' হল ব'লে; তাদের বলে 'উপস্থিত'। এরা এখনও পূর্ণ 'স্থিত' নয়, কিন্তু 'অস্থিত'ও নয়; এরাই 'উপস্থিত'। 'অস্থিত'-এর জগৎ থেকে 'স্থিত'-এর জগতে পৌঁছনোর সর্বশেষ সোপানে যারা পৌঁছেছে, তাদের 'উপস্থিত' বলে।

কিন্তু শব্দটির ব্যবহার এর পরেও এগিয়েছে। শাসকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গ্রামপ্রধান, সে 'স্থিত'। তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে আরও কিছু গ্রামবাসী, তারা 'উপস্থিত'; যারা আসেনি তারা 'অস্থিত'। আবার শিক্ষাসদনে গুরু স্বয়ং 'স্থিত', তাঁর সামনে যে ছাত্ররা এসেছে তারা 'উপস্থিত', আরও যাদের আসার কথা ছিল (খাতায় নাম আছে) কিন্তু আসেনি তারা 'অনুপস্থিত', এবং যাদের খাতায় নাম নেই এবং আসেনি তারা 'অস্থিত'। ৬. state, estate।

উপহাস : ১. উপ + ✓হস্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *হাসাহাসির ('দোষোদ্দেশপূর্ব্বক হসন'-এর) সহকারী যে।* ৩. পরিহাস, ঠাট্টা, নিন্দাসূচক হাস্য, নিন্দার্থবাক্যাদি, কৌতুক, নর্ম্ম। (ব.শ.)। ৪. taunt বা 'ঠাট্টা' অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. ব.শ.-তে হস্ ক্রিয়াটির প্রথম অর্থই দেওয়া আছে 'দোষোদ্দেশপূর্ব্বক হসন'। তাহলে কি ভাষাজগতে মলহীন অমল বা নির্মল হাসির অনুপ্রবেশ ঘটেছে পরে? হতে পারে। যাই হোক, কাউকে নিয়ে মজা করে হাসাহাসি করছেন করুন, কিন্তু দয়া করে সেই হাসির সঙ্গে নিন্দাসূচক বাক্য ও হাস্যের ফোড়ন দিয়ে উপহাস করবেন না যেন। এই ফোড়ন হাসি নয়, উপহাসি। বিপরীত পক্ষে এই উপহাসি এতই প্রতিক্রিয়া ঘটায় যে, পরনারীদোষ যার বিন্দুমাত্র ছিল না, সেই দুর্যোধনও ইন্দ্রপ্রস্থে দ্রৌপদীর উপহাসের প্রতিক্রিয়ায় তাকে সর্বজনসমক্ষে বিবস্ত্রা করতে পিছপা হয় না। দ্র. **হাসি, হস্ত, হস্তী**।

উপাদান : ১. উপ-আ + ✓দা + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে; উপ-আ + ✓দা + অন - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *আদানের উপ বা উপরি থাকে যাহাতে; অথবা, আদানের সহযোগী বা উপ যে।* (দ্র. **অদ্, অন্ন**)। / যাহা কার্য্য জননার্থ গৃহীত হয়। (ব.শ.)। ৩. গ্রহণ, আদান, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহের আকর্ষণ, আক্ষেপ, নির্দ্দেশ; কারণ, সমবায়ী কারণ, হেতু, উপকরণ, নির্ম্মাণসামগ্রী, উৎকোচ, অসহকৃত কারণ, প্রবৃত্তিজনক জ্ঞান, লক্ষণাবিশেষ (যে বৃত্তি দ্বারা বাক্যার্থে অন্বয়বোধের নিমিত্ত মুখ্যার্থ দ্বারা তদ্ভিন্ন অর্থের প্রতীতি হয়, তাদৃশ লক্ষণা), প্রাপ্তি, লাভ। (ব.শ.)। ৪. factor অর্থে শুধুমাত্র অ্যাকাডেমির বাংলাচর্চায় প্রচলিত। ৫. দানের (দেওয়ার) আশ্রয় যাহাতে, তাকে বলে 'আদান'। 'আদানপ্রদান'-এ 'নেওয়া-দেওয়া' চলে। এক পক্ষ দান করে, দেয়, যা দেয় সেটিই 'দেয়', দায় তার কর্তব্য; অন্য পক্ষ আদায় করে, নেয়, যা নেয় সেটিই 'আদেয়', আদায় তার কর্তব্য; তাতেই এই আদান-প্রদান ক্রিয়াটি বাস্তবায়িত হয়। শুধু 'আদান' বললে 'প্রদান' সক্রিয় থাকলেও উহ্য থেকে যায়। তাই আদান করাকে বলা হয় 'আদায়', যথা 'খাজনা আদায়'। এই আদান প্রসূত হয় একাধিক ছোট ছোট অংশ জুড়ে। আদানের এই ছোট ছোট অংশকে বলে উপ-আদান বা উপাদান। দ্র. **অন্ন**। ঘট বা মাটির হাঁড়ির উপাদান হল তাতে ব্যবহৃত মাটি, কাপড়ের উপাদান হল তার সুতো; কিংবা ভাতের সঙ্গে যে ব্যঞ্জনাদি থাকে সেগুলি তার উপ-আদান বা উপাদান।

উপাদেয় : ১. উপ-আ + ✓দা + য (যৎ) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে উপ-আদেয় আদায়কারীকে তৃপ্তি দেয়।* ৩. গ্রহণযোগ্য, গ্রাহ্য, বিধেয়, উৎকৃষ্ট, উত্তম। (ব.শ.)। ৪. tasteful বা 'উত্তম স্বাদিষ্ট' অর্থে প্রচলিত। ৫. 'দা' ক্রিয়াটির প্রকৃত অর্থ 'দেওয়া', donation-মূলক দান নয়। যা দেওয়া হয়, সেগুলি 'দেয়'। যে নেয়, সে পায় 'আদেয়'। আদেয়র সঙ্গে অনুষঙ্গ রূপে যা পাওয়া যায়, সেগুলি 'উপ-আদেয়'। অনেক সময় আদেয়র চেয়ে উপাদেয় আদায়কারীর কাছে বেশি তৃপ্তিদায়ক মনে হয়। যেমন ভাতের তুলনায় ব্যঞ্জনাদি, নাটকের তুলনায় অভিনেতার অভিনয়, গানের তুলনায় সুরের বাহার, মূলের তুলনায় সুদ, স্ত্রীর তুলনায় শ্যালিকা। তখনই 'উপাদেয়' শব্দের অর্থ হয়ে যায় উৎকৃষ্ট, উত্তম ইত্যাদি।

উপাধি : ১. উপ-আ + ✓ধা + ই (কি) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উপ-আধি, অর্থাৎ আধির উপ বা অনুসারী যে।* দ্র. **আধি**। ৩. কুটুম্বভরণ, কুটুম্বব্যাপৃত (পরিবার পালনে ব্যাপৃত) জন, এক বস্তুর অন্যরূপ প্রকাশ, ছল, কপট, বস্তুধর্ম্ম, নামের সহিত প্রযোজ্য বিশেষণ, নামচিহ্ন, উপনাম (— শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভট্টাচার্য্য, মিশ্র, উপাধ্যায়, পণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায়, ন্যায়রত্ন, বি এ, এম এ, ডাক্তার, স্যার ইত্যাদি), ধর্ম্ম, হেতু, লোভ ভয় ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. title বা 'পদবী' অর্থে প্রচলিত। ৫. মানুষের মনকে যা অধিকার করে থাকে, সে তার **আধি**। এই আধি দুই প্রকারের হয় — আনন্দদায়ক ও দুঃখদায়ক। দুঃখদায়ক হয়ে গেলে তাকে ব্যাধির সগোত্র (আধিব্যাধি) ভাবা হয়। সেই কারণে আধি শব্দটি পরে মন্দার্থক হয়ে যায়। কিন্তু এমন তো বহু মানুষ আছেন, যাঁরা পরিবার-পরিজনের জন্য দিনরাত চিন্তা করতে ও তদনুযায়ী কাজকর্ম করতে ভালবাসেন। তাঁদের মনকে পরিবারচিন্তাই অধিকার করে থাকে। তাঁদের আধি আনন্দদায়ক। সেই আধির অনুষঙ্গে যা আসে তাকে শুভ অর্থে **উপাধি** বলে। এটি রাজার দেওয়া, সমাজের দেওয়া, শিক্ষাব্যবস্থার দেওয়া উপাধিও হতে পারে। অবশ্য কখনো কখনো এই উপাধিও মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তখন তার অর্থ হয়ে যায় ছল, কপট ইত্যাদি।

উপাধ্যায় : ১. উপ-অধি + ✓ই + অ (ঘঞ্) - অপাদানে। (ব.শ.)। ২. ***অধ্যায়ের*** *উপ যে।* / যাঁহার নিকট আসিয়া পড়ে; যিনি বৃত্তির নিমিত্ত বেদের একদেশ (মন্ত্র, ব্রাহ্মণ) ও বেদাঙ্গ অধ্যাপন করেন। (ব.শ.)। ৩. বেদাদির পাঠয়িতা, জীবিকার্থ বৈদেকদেশ ও বেদাঙ্গের অধ্যাপক, ব্রাহ্মণের উপাধি, রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণের কৌলিন্যসূচক উপাধি। (ব.শ.)। ৪. ব্রাহ্মণের 'পদবী' অর্থেই প্রচলিত

এবং কদাচিৎ teacher বা 'অধ্যাপক' অর্থে প্রচলিত। ৫. স্বতন্ত্রভাবে **উপাধ্যায়** শব্দটির প্রচলন খুবই কম। কিন্তু সন্ধিযুক্ত শব্দ হিসেবে শব্দটির ব্যবহার অনেক বেশি, যথা — বন্দ্য + উপাধ্যায় = বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্ট + উপাধ্যায় = চট্টোপাধ্যায়, মুখ + উপাধ্যায় = মুখোপাধ্যায়, গঙ্গা + উপাধ্যায় = গঙ্গোপাধ্যায়। শব্দার্থ অনুসারে এই উপাধ্যায়গণ মূলত তাঁরাই, শিক্ষকতাই যাঁদের পেশা ছিল। উপাধ্যায় শব্দটি পরে ওঝা হয়ে যায়। আরও পরে মুখ-উপাধ্যায় হয়ে যান মুখোঝ্যে বা মুখুজ্যে। ইংরেজ আসার পর এঁরা মুখার্জি, ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি ইত্যাদি হয়ে যান। দ্র. **পদবী**।

উপার্জ্জন, উপায় : ১. উপ + ✓অর্জ্জ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। ২. *যাহা অর্জ্জনের উপ বা সহযোগী; যাহা আয়ের উপ বা সহযোগী।* / যাহা দ্বারা অভিপ্রেত লাভ করা যায় বা প্রাপ্তি সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ৩. অর্জ্জন, লাভ, প্রাপ্তি, উৎপাদন, জন্মান, আজ্জান। সমীপগমন, উপক্রম, কার্য্যসিদ্ধির সহজ পথ, কৌশল, রাজার শত্রুনিরাকরণহেতু — সাম দান ভেদ দণ্ড, প্রযুক্তধনপ্রাপ্তির সাধন — ধর্ম্ম ব্যবহার ছল ইত্যাদি, প্রতিকারসাধনমাত্র, বৃত্তি, পেশা, ধনার্জ্জন, আয়হেতু বাণিজ্যাদি, উপার্জ্জিত ধনাদি। (ব.শ.)। ৪. উপার্জ্জন 'রোজগার' অর্থে এবং উপায় ways and means অর্থে প্রচলিত। ৫. পাত্রের খোঁজখবর নিতে গিয়ে বঙ্গভাষী আজও বলেন — 'ছেলেটির আয়-উপায় কীরকম?' অর্থাৎ, শব্দ দুটি যে আলাদা কাজ-কারবারকে বোঝায়, বঙ্গভাষী উত্তরাধিকারসূত্রে তা জানেন। বস্তুত 'অর্জ্জন' বা আয় হল সমাজস্বীকৃত পথে রোজগার। white money-কে তাই 'অর্জ্জুন' ও black money-কে তাই কৃষ্ণ বলে। আর উপার্জ্জন বা উপায় হল যথাক্রমে উপ-অর্জ্জন ও উপ-আয়। চাকরির পাশাপাশি টিউশন, ঘুষ, ইত্যাদি। এইরকম রোজগার হল উপ্‌রি-আয়, তা সে সমাজস্বীকৃত হতেও পারে নাও হতে পারে। ইংরেজি শিক্ষার চাপে এখন আমরা আয় উপায় অর্জ্জন উপার্জ্জন চারটি শব্দকেই income করে নিয়েছি। চারটি শব্দের মানে হয়ে গেছে একটি। (income কোথায়! লাভ দূরের কথা, বিনিয়োগেরই ৭৫ শতাংশ হাওয়া! এ তো বলতে গেলে পুরাই loss!) মাঝ থেকে আমাদের 'অনুভবের জগৎ' বা conceptual world টি ছোট হয়ে গেছে। এভাবেই আধুনিক বাঙালি মনের দিক থেকে ছোট হয়ে গেছেন।

উপাসক, উপাসনা : দ্র. **আস্**।

উপেক্ষ, উপেক্ষক, উপেক্ষা : ৫. দ্র. **অপেক্ষা**। উপ-ঈক্ষা বা উপ-দর্শন। দেখার জন্য যে সময় নিষ্ঠা শ্রম ব্যয় করতে হয়, তা ব্যয় হয় অথচ দেখা হয় না, তাকে বলে অপেক্ষা। আর, দেখার জন্য যথাযথ সময় নিষ্ঠা শ্রম ব্যয় না করা, দেখার বস্তু বা বিষয়কে না দেখে তার আনুষঙ্গিক বস্তু বা বিষয়কে দেখা, একে বলে উপ-ঈক্ষা বা উপেক্ষা। উভয় ক্ষেত্রেই যথাযথ 'দেখা' বা 'ঈক্ষা' হচ্ছে না; হচ্ছে 'অপ-ঈক্ষা' কিংবা 'উপ-ঈক্ষা'। অপেক্ষার বেলায় যাকে দেখার কথা সে নাই, তাই দেখা হচ্ছে না। কিন্তু উপেক্ষার বেলায় যাকে দেখার কথা সে আছে, কিন্তু তাকে দেখা হচ্ছে না; তাকে না দেখে তার পাশাপাশি অনুষঙ্গগুলিকে দেখা হচ্ছে। অর্থাৎ যাকে দেখার কথা সে কেন্দ্রে থাকা সত্ত্বেও তার চারদিকে চোখ চারিয়ে গৌণ অনুষঙ্গগুলিকে দেখে ফিরে যাচ্ছে দর্শক, মুখ্য দর্শনীয়কে দেখেও দেখছে না। একে বলে উপ-ঈক্ষা বা উপেক্ষা। একজন মানুষকে যখন অন্য মানুষ এভাবে উপ-ঈক্ষা বা উপেক্ষা করে, দেখেও দেখে না, তখন সে বিরক্ত এবং কখনো কখনো ক্রুদ্ধও হয়।

উর্দ্ধ, উর্দ্ধ : উর্ (উর্) ক্রিয়ামূলের শব্দ-পরিবার বা বংশ দ্রষ্টব্য।

উলূক, উলুক : ১. উদ্ + ✓লোক্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উদ্ (উর্দ্ধলোক) লোকন করে যে।* ৩. পেচক, হুতোমপেঁচা। ঋগ্বেদ অনুসারে উলূকের রব অশোভন, উলূক যম সহচর। ইন্দ্র। শকুনির পুত্র। বৈশেষিক দর্শনকার কণাদমুনি। তুলনীয়: ঔলূক্যদর্শন। হিমালয়সন্নিহিত দেশবিশেষ। উলূকদেশ-বাসীগণ, উলূকরাজগণ। ... (ব.শ.)। দুর্যোধনের মাতুল শকুনির পুত্র। ... দুর্যোধন তাঁকে দূতরূপে পাণ্ডব শিবিরে প্রেরণ করেন। ... কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে উলূক সহদেবের ভল্লের আঘাতে নিহত হন। (পৌ.অ.)। ৪. পেঁচা অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. পেঁচা যম-সহচর বটে, আবার লক্ষ্মীরও বাহন। উদ্‌লোক হল স্বর্গলোক। এ লোক কেবল জ্ঞানসম্পদ নয়, ধনসম্পদেরও আধার। কণাদ মানুষেরা, যাঁরা বিন্দুতে সিন্ধু দেখেন, তাঁরা ঐ জ্ঞানসম্পদের উদ্‌লোক দেখে ফেলেছিলেন। আর, পেঁচা বা পেঁচার মতো মানুষেরা, যারা ধনসম্পদের (লক্ষ্মীর) বাহন, তাঁরাও এই উদ্‌লোক দেখতে পান। ঋগ্বেদের যুগে সম্পত্তি সঞ্চয় করা নিষিদ্ধ ছিল। কেউ সম্পত্তি সঞ্চয় করলে এইরকম মানুষেরা সেটা দেখতে পেত এবং গিয়ে সেকালের বিচারক (যম) সম্প্রদায়কে খবরটি দিত। পরে তারাই সম্পদবান হয়, লক্ষ্মীর **বাহন** হয়। দ্র. **পেচক**।

উলূপী : ১. উদ্ + ✓লুপ্ + ইন্ (ইনি) অস্তর্থে + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। ২. *উদ্‌লোকে লুপ (স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক প্রতিহত) করে যে;* অথবা, *উদ্‌লোকে লুপ্ত (গুপ্ত) করে যে।* ৩. অর্জ্জুনের স্ত্রী নাগকন্যাবিশেষ। ... (ব.শ.)। ঐরাবত-কুলজাত কৌরব্য নাগের কন্যা। ... অর্জ্জুনের ঔরসে উলূপীর গর্ভে ইরাবানের জন্ম হয়। ... উলূপীর মায়ার অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পুত্র বভ্রুবাহনের হস্তে শরাঘাতে অচেতন হন। তখন উলূপী নাগলোক থেকে সঞ্জীবন-মণি এনে বভ্রুবাহনকে সেটি অর্জ্জুনের বক্ষে রাখতে বলেন এবং তারই প্রভাবে অর্জ্জুন নবজীবন লাভ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এটি এমন এক সত্তা যাকে এখনও সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। হয়তো **ঐরাবত, কৌরব্য, নাগ, ইরাবান, চিত্রাঙ্গদা, বভ্রুবাহন** প্রভৃতি শব্দের অর্থ ঠিকঠাক বুঝে নিয়ে কাহিনীটি অনুধাবন করতে পারলে বিষয়টি বোঝা যাবে। ৬. elope।

উল্লঙ্ঘন : ১. উদ্ + ✓লঙ্ঘ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উদ্‌লোকে লঙ্ঘন (ঘটে) যাহাতে।* / উর্দ্ধগতি দ্বারা অতিক্রমণ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. উৎপ্লবন, ডিঙানো, অতিক্রম, মর্য্যাদাতিক্রম, অপরাধ, অবজ্ঞান। (ব.শ.)। ৪. cross করা বা

'ডিঙানো' অর্থে প্রচলিত। **৫.** লঙঘন করা শব্দটি সাধারণত 'অমান্য করা', 'পাশ কাটিয়ে যাওয়া' ইত্যাদি অর্থেও প্রযুক্ত হয়। 'লঙঘন'-এ স্পষ্ট করে বলা নেই, যাকে লঙঘন করা হচ্ছে তাকে কীভাবে লঙঘন করা হচ্ছে; তার ডান দিক দিয়ে নাকি বাঁ দিক দিয়ে, নাকি উপর বা নীচ দিয়ে, কোন দিক দিয়ে তাকে অতিক্রম করা হচ্ছে? 'লঙঘন'-এর মতো এরকম অনেক বাংলা শব্দই রয়েছে, যেখানে মূল ক্রিয়া দিয়ে কাজটিকে স্পষ্টরূপে বোঝান যায় না, উপসর্গের সহায়তা নিতে হয়। (যেমন লাপ। একে আমরা সংলাপ, প্রলাপ, বিলাপ, আলাপ প্রভৃতি উপসর্গযুক্ত-শব্দ রূপে স্পষ্ট বুঝতে পারি।) লঙঘনের ক্ষেত্রে 'উদ্' উপসর্গের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। যে কারণে ব.শ. উল্লঙঘন শব্দের অর্থ দিয়েছেন, 'ঊর্দ্ধগতি দ্বারা অতিক্রমণ'; এবং আমরা বলেছি, 'উদ্‌লোকে লঙঘন ঘটে যাহাতে'। অর্থাৎ, উপরে লাফ দিয়ে সম্মুখস্থ লঙঘনীয়কে টপকে যাওয়া। বাস্তবে এরকম হতে পারে কেবল গর্ত, খাল, সরু নদী পেরোনোর ক্ষেত্রে; হনুমানের সমুদ্র পেরোনোকেও আমরা উল্লঙঘন বলতে পারি; যদিও সেরকম বলার চল নেই। আর, ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে তো উপর দিয়ে লঙঘন প্রায় অসম্ভব। যাকে লঙঘন করি, সে আমাদের আগে আগে হাঁটুক আর বিপরীত দিক থেকেই আসুক, আমাদের সামনে পড়ে গেলেই আমরা তার মাথার উপর দিয়ে লাফ দিয়ে তাকে টপকে যাই না। তাসত্ত্বেও কেন ব.শ. এবং আমরা ঊর্দ্ধলোকে অতিক্রমের কথা বললাম। কারণ 'উল্লঙঘন' শব্দটি ডিঙানো বোঝায় ঠিকই, তবে ডিঙানো দুরকম — দৃশ্য এবং অদৃশ্য। অদৃশ্যভাবে ডিঙানো মানে উদ্‌লোকে ডিঙোনো, মানসলোকে ডিঙোনো, ধনসম্পদ অর্জ্জনে অন্যকে লঙঘন করা, জ্ঞানসম্পদ অর্জ্জনে টপকে যাওয়া, মর্যাদার ক্ষেত্রে কাউকে অতিক্রম করা। এরকম ডিঙোনো বা লঙঘন ঘটে মানসজগতে, উদ্‌লোকে; বাহ্যজগতে ঘটে না, তাই বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যায় না। 'উল্লঙঘন' কার্যত এরকম উদ্‌লোকের অদৃশ্য লঙঘনকেই বোঝায়। মর্যাদাবানদের চোখে এটা তাই অপরাধ, অবজ্ঞান।

এঁটো, এঁঠো : দ্র. **উৎসৃষ্ট**।

উশীনর : ১. উশী + নর। ২. *যে নর উদ্‌লোকে শক্তিবিচ্ছুরণ করে।* **৩.** ক) চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ইঁহার পুত্র শিবি। ইনি শ্যেনরূপী ইন্দ্রকে নিজদেহমাংস দিয়া কপোতরূপী অগ্নিকে রক্ষা করিয়া ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। খ) দেশবিশেষ, গান্ধার। উশীনরদেশবাসীগণ। (ব.শ.)। চন্দ্রবংশীয় রাজা। মহারাজ উশীনর যযাতি-কন্যা মাধবীর গর্ভে শিবি নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ... ইন্দ্র ও অগ্নি যথাক্রমে শ্যেন ও কপোত রূপ ধারণ করে মহারাজ উশীনরের দয়াধর্মের পরীক্ষা নেন। ... কপোতের সমান ওজনের মাংস স্বশরীর থেকে দিতে দিতে তিনি নিজেই তুলাদণ্ডে উঠে বসেন। ... ইন্দ্র ও অগ্নি পক্ষীবেশ ত্যাগ করে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। (পৌ.অ.)। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের বনপর্বের ১৩১ অধ্যায়ে উশীনরের কথা, আর ১৯৬ অধ্যায়ে রয়েছে উশীনরপুত্র শিবির কথা। উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে একই শ্যেন-কপোত কাহিনী। পার্থক্য এই যে, ১৩১ অধ্যায়ে গায়ের মাংস কেটে দাঁড়িপাল্লায় চাপাচ্ছেন উশীনর, আর ১৯৬ অধ্যায়ে সেটা করছেন শিবি। **৪.** অপ্র.। **৫.** শ্যেনযাগ কথাটির অর্থ লুঠতরাজ, ছিনতাই করা, (সাধারণত অন্য সম্প্রদায়ের) জনসাধারণের উৎপন্নাদি জোরপূর্ব্বক বা অসতর্কতার সুযোগে অপহরণ করা। আদি যুগের সামাজিক ইন্দ্র, বৈদিক ব্যবস্থা খানিকটা অধঃপতিত হয়ে যাবার পর এবং পণ্যজীবীতা যথেষ্ট পরিমাণে শুরু হবার আগে, লুঠতরাজ চালাতেন। লুণ্ঠিত হত জনসাধারণের কপোত-অগ্নি। যে মানুষেরা নতুন নতুন উৎপাদনের উপায় বের করতেন (= **উশীনর, শিবি**), তাঁরা এই লুণ্ঠনের মূল্য দিয়েছিলেন নিজেদের চরম ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে।

বস্তুত আদি যৌথমানবসমাজের 'অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য' (**নারায়ণ** দ্রষ্টব্য) অবচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর যে '**নর**'-এর জন্ম হয়, তারা ক্রমে অনেক রূপে বিকশিত হয় — নর (সমাজসম্পদের রক্ষক-ভক্ষক), **কিন্নর** (শাসনব্যবস্থার অনুচর), উশীনর (আদি পণ্য-উৎপাদনকারী), **বিশ্বানর** (শ্রমিক), **বানর** (আমলা-কেরানি)।

'উন্দ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিসুন্দর, আসমুদ্র, ইঁদুর, ইন্দুর, উদ্র, উৎস, উদ্র, উর্দ্র, উনা, উন্দ্, উন্দরু, উন্দুর, উন্ন, ওড্র, ওদন, ওল, সমুদ্র, সুন্দর, সুন্দরী, সৌন্দর্য্য, **উন্দ্** = উদ্‌লোক ন্-অন (নাকরণ) দান। **উন্দ** = উদ্‌লোককে নাকরণ দেয় যে। অর্থাৎ উদ্‌লোককে উপর দিকে উঠতে না দিয়ে উদ্‌লোকের অবতরণ-প্রসারণ বা সমোচ্চশীলতা দেয় যে, সেই হল 'উন্দ'। একে গলে জল হয়ে যাওয়া, তরলতা, ক্রেদন, আর্দ্রীভাব, আর্দ্রতা, বা আর্দ্রীকরণ ইত্যাদিও বলা হয়ে থাকে।

অতিসুন্দর (সুন্দর, সুন্দরী, সৌন্দর্য্য) : দ্র. **অতি, সুন্দর**। **৫.** সুন্দরী শব্দটির অর্থ, '*যে সত্তা সমোচ্চশীলতায় (আপন) উদ্‌লোকের নাকরণ (অবতরণকে-প্রসারণকে) নবরূপে উত্তীর্ণ করে, তাহার আধার।*' অর্থাৎ যে সত্তা তরল বস্তুর মতো সমতলে বৃত্তাকারে সর্বদিকে সমান ভাবে প্রসারিত হয়। সু-উন্দরের বা সুন্দরের এই ধর্ম। এ হল তরলের ধর্ম, আর্দ্রতার ধর্ম, সাম্যের ধর্ম। নিজেকে কারও চেয়ে সে বড় মনে করে না। আমাদের প্রাচীন ভাষাজ্ঞানীরা এইরূপ ক্রিয়া যে করে, তাকেই সুন্দর নাম দিয়েছিলেন। সুন্দরী নিজেকে সমতলে নিজের সর্বদিকে প্রসারিত করে সবকিছুকে আর্দ্র করে, ভিজিয়ে নরম করে দেয়, শান্তি দেয়; তার চারদিকের অস্তিত্বগুলিকে আর্দ্র করে দেয়। তাই সে 'সুন্দরী'। আমাদের মা-জেঠিমা-দিদিমারা অতিসুন্দরী ছিলেন, কারণ তাঁরা তাঁদের চারদিকে যে ছেলেমেয়ে ও মানুষজনেরা থাকত, তাদের মনকে সর্বদা আর্দ্র করে রাখতেন। কিছু হলেই তারা মা-জেঠিমা-দিদিমার শরণাপন্ন হত এবং সেখানে নিশ্চিত সমাধান ও শান্তি পেত। সুন্দরী মানে সেই আর্দ্রীকরণ সত্তা। সুন্দরী মানে beautiful কথাটি আমরা শিখেছি পশ্চিমের কাছ থেকে। কলকাতার 'অপর' পত্রিকার জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০০৮ সংখ্যায় 'সাম্য থেকে সামঞ্জস্যে : সুন্দরসমাজ' নিবন্ধে বিষয়টি বিস্তারিত করা হয়েছে। দ্র. **সামঞ্জস্য**।

আসমুদ্র : ১. আ-সম্ + ✓উন্দ্ + র (রক্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *সমুদ্রের আশ্রয় যাহাতে।* দ্র. **সমুদ্র**। ৩. সমুদ্র পর্যন্ত, সাগর অবধি। (ব.শ.)। ৪. কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. উন্ দান বা উচ্চতাকে নামিয়ে সর্বদিকে দান করা বা সমোচ্চশীলতাই (বা সাম্যই) সমুদ্রের মূল ধর্ম। নিজের কোনো উচ্চতা সে রাখে না। উচ্চতাকে নামিয়ে সমানভাবে প্রসারিত করে সে। তাই সে সমুদ্র। মনে হয় এই কারণে হিন্দিতে সমুদ্রকে বলা হয় 'সমুন্দর' (সম্-উন্দ্-অর)। উন্দ্ ক্রিয়াটি তাতে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়।

উন্দুর (উন্দরু, উন্দুরু, উন্দুরূ, ইঁদুর) : ১. ✓উন্দ্ + উর, - রু (উরূ) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উদ্‌লোকের নাকরণ-দান (= অবতরণ-প্রসারণ অর্থাৎ সমোচ্চশীলতা) নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে রহে যাহাতে।* ৩. মূষিক, ইঁদুর। ৪. **'ইঁদুর'** mouse অর্থে প্রচলিত, বাকি সব শব্দগুলিই অপ্রচলিত। ৫. পাহাড়ের (বা দেওয়ালের) ভিতরের কিছু কিছু অংশ কেটে নিয়ে তাকে ভিতরে ভিতরে ফোঁপরা বা ফাঁকা করে দেয়ে ইঁদুর। একে লুণ্ঠন করা বলা যেতে পারে। ইঁদুরের এরকম কাজের ফলে, সত্তাটি যদি নরম হত, তাহলে তা ক্রমশ নীচের দিকে নেমে **ওল**-এর চেহারা নিত, যা গোল বটে, কিন্তু তার বৃত্তটি টানায় (হরাইজন্টালি) প্রসারিত। উদলোককে এভাবে উপরে উঠতে না দিয়ে, নামিয়ে ('উন্দর' বা under করে) সমতলে সর্বদিকে প্রসারিত করে যে, তাকে বলে উন্দুর বা ইঁদুর। কার্যত, একটি সত্তাকে কী নামে ডাকা হবে, তা ঠিক হয় সে কী করে তাই দিয়ে। দু-তিনটি কাজ করলে দু-তিনটি নাম হয়। তো, mouse জীবটির একটি নাম মূষিক, আর একটি নাম ইঁদুর। মূষিকের কথা **মুষিক** ভুক্তিতে বলা হয়েছে, যার মানে, 'লুণ্ঠন করে যে'। তার মানে, সমগ্রের তরফ থেকে দেখলে যে কাজটির জন্য জীবটিকে ইঁদুর বলা হয়, জীবটির তাৎক্ষণিক ক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে তাকেই মূষিক বলা হয়। ৬. under।

ওদন : ১. ✓উন্দ্ + অন (যুচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উন্ দেওয়া বা উচ্চতাকে নামিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলে যাহাতে।* ৩. অন্ন, দুগ্ধাদিতে পক্ব শস্যচূর্ণ, মণ্ড, ভোজ্য। (ব.শ.)। ৪. শব্দটি মধ্যযুগে খুবই প্রচলিত ছিল, এখনও হয়তো গ্রামবাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে শব্দটির দেখা মিলতে পারে। ৫. শহরের মানুষেরা এখন প্রকৃতি থেকে এতই দূরে যে, একজন মানুষ এক কিলোগ্রাম চালের ভাত খেতে পারে, এমন কথাতেই অনেকে হতবাক হয়ে যান। কিন্তু যত প্রাচীন কালের দিকে ও গ্রামাঞ্চলের দিকে যাওয়া যায়, ততই দেখা যায়, না আছে খাওয়ার সময়ের ঠিক-ঠিকানা, না আছে পরিমাণের। কিছুদিন আগেও কোনো কোনো অঞ্চলের রীতি ছিল দিনে একবার আহার, তাও যে কোনো সময়। অনেক মানুষই দু-পাঁচ কিলো চালের ভাত খেয়ে নিত। আর, সে ভাত দেওয়া হত বড় থালায় পিরামিডের মতো করে। সেই পিরামিডের গোড়া থেকে মুঠো মুঠো করে ভাত উঠে যেত খাদকের মুখে, আর পিরামিড নেমে আসত সমতলে। এই ক্রিয়াটিকে বলা হত ওদন। পিরামিডের খাত অংশটি তাই 'উন্দ'। একে ইংরেজিতে wound বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যেখানে রুটিকে ভোজন বলে, সেখানে ওদন হয় না। বাংলাভাষীর ব্যবহারে অবশ্য শব্দটি তার অন্তর্নিহিত অর্থেই সীমিত থাকেনি। তবে, সে তো কোনো শব্দই থাকেনি। ৬. ইংরেজি wound, জারমান wunde।

ওল : ১. আ + ✓উন্দ্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উন্দ্-এর আশ্রয় যাহাতে।* ৩. আর্দ্র কন্দবিশেষ, শূরণ। (ব.শ.)। ৪. arum বা 'ওল-কন্দ' অর্থে প্রচলিত। ৫. সাপুড়েরা সাপ রাখার জন্য যে পেটিকা ব্যবহার করে, ওলের চেহারা খানিকটা সেইরকম। যেন নরম পিরামিড ধীরে ধীরে সমতল হওয়ার চেষ্টা করেছে। এই কারণে প্রাচীন ভাষাজ্ঞানীরা তাকে উন্দ্-ক্রিয়াজাত বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

'উর্' (উর্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনূরু, অনূর্দ্ধ, অনূর্দ্ধসমান, অনৌরস, আওরৎ, উর, উরঃ, উরগ, উরঙ্গ, উরজ, উরণা, উরত, উরথ, উরশ্ছদ, উরস, উরসি, উরস্ত্রাণ, উরস্য, উরস্বান, উরাত, উরুত, উরুথ, উরোগম, উরোঘাত, উরোজ, উরোভূ, উরোহস্ত, উব, উরস্, উর্ণনাভ, উর্ণনাভি, উর্ণা, উর্দ্দি, উর্দ্দু, উর্ব্ব, উর্ব্বর, উর্ব্বরা, উর্ব্বরিত, উর্ব্বশী, উর্ব্বী, উর্ষ, উরব্য, উরাত, উরুত, উরু, উরুগ্রাহ, উরুজ, উরুজন্মা, উরুপর্ব্ব, উরুপর্ব্বা, উরুফলক, উরুমাত্র, উরুস্তম্ভ, উর্জ্জ্ (urge), উর্জ্জ (উরজা, urge, সার), উর্জ্জঃ, উর্জ্জস্কর, উর্জ্জস্বল, উর্জ্জস্বান, উর্জ্জস্বী, উর্জ্জিত (urgent), উর্ণায়ু, উর্দ্ধ, উর্দ্ধ, উর্দ্ধগ, উর্দ্ধগতি, উর্দ্ধগপুর, উর্দ্ধগমন, উর্দ্ধতিলক, উর্দ্ধদৃষ্টি, উর্দ্ধদেহ, উর্দ্ধপর্থ, উর্দ্ধপুণ্ড, উর্দ্ধপুণ্ডক, উর্দ্ধফণ, উর্দ্ধবর্ত্ম, উর্দ্ধবাট, উর্দ্ধবাত, উর্দ্ধবায়, উর্দ্ধবায়ে, উর্দ্ধবাহু, উর্দ্ধবৃত, উর্দ্ধমন্থী, উর্দ্ধমান, উর্দ্ধমুখ, উর্দ্ধমুখীন, উর্দ্ধরাও, উর্দ্ধরাজি, উর্দ্ধরেখা, উর্দ্ধরেতা, উর্দ্ধরেতাঃ, উর্দ্ধলিঙ্গ, উর্দ্ধলোক, উর্দ্ধশায়ী, উর্দ্ধশ্বাস, উর্দ্ধস্রোতাঃ, ঔরৎ, ঔরস, ঔরস্য ঔর্ণ, ঔর্দ্ধদেহ, ঔর্দ্ধদেহিক, ঔর্ব্ব, ঔর্ব্বর, ঔর্ব্বশেয়, বরিষ্ঠ, বরীয়স, বরীয়ান।

উর্ = উপরে রহন। **উর** = উপরে রহে যে। **উর্** = উপরের উপর রহন। **উর্** = উপরের উপর রহে যে। (সন্দেহ হতে পারে, **উর্** বুঝিবা সর্বোচ্চ। আসলে **উর্**-র আধার হল **উর্**, **উর্** রাখা হয় যেখানে সেটি **উর্**।)

উরঃ, উরস্ : ১. ✓ঋ + অস্ (অসুন্) - কর্তৃবাচ্যে। ২. *উপরে রহে (বা তুলে রাখে) যে (শক্তি)।* ৩. শ্রেষ্ঠ, প্রধান, বক্ষঃস্থল। ... (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. বাংলাভাষায় যে সমস্ত শব্দের অর্থ নিয়ে মুশকিলে পড়তে হয়, সেগুলির একটি হল এই 'উর'। ব.শ. একে দুরকম বানানেই লিখেছেন — উর, **উর**। যে সত্তা উপরে রহে, বা অস্তিত্বের যে সত্তা নিজেকে উপরে তুলে রাখে বা রাখতে সাহায্য করে, তাকেই 'উর' বলে, সন্দেহ নেই। সেই কারণে উর শব্দের অর্থে 'বল' বা 'শক্তি'র কথা আসে। আর, যে-বল 'উর'-কথিত বলের আধার, তাকে বলতে হয় **'উর'**। দ্র. **উর্ব্ব**।

উরু : ১. ✓**উর্ণু** (আচ্ছাদন) + উ (কু) - কর্তৃবাচ্যে; রর + উরু (?), তুলনীয় উরু > বর, পাণিনি। (ব.শ.)। ২. *উর্ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. বিস্তীর্ণ, দূরপ্রসৃত, বিশাল, বিপুল, মহান, পৃথু, ব্যাপক, উদার, বহু, অত্যধিক, অত্যন্ত, সর্ব্বাতিরিক্ত, অতিশয়, নানা, তীক্ষ্ণ, প্রবল, প্রচণ্ড, উত্তম, সুন্দর, কান্ত, প্রচুর, প্রভৃত। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এই 'উরু' শব্দের অর্থে কখনোই জানুর কথা আসছে না, আসছে কেবল বিপুল শক্তির কথা। সরাসরি 'উর' থেকে এই শব্দটি তৈরি হয়নি। হয়েছে, সেই 'উর্' থেকে জাত '**উর্ণু**' ক্রিয়া দিয়ে, যার মানে ব.শ. দিয়েছেন 'আচ্ছাদন করা' বা ঢেকে রাখা বা গোপন করা। এরকম করা হয়েছে এই জন্য যে, 'উর্'কে সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে তাকে রহস্যরূপী (ণ) করে কোথাও রেখে দেওয়া দরকার, সত্যগোপন করা দরকার; কেননা, সত্যগোপনই সমস্ত সামাজিক শক্তির উৎস। তখন উর্ কার্যত হয়ে যায় উর্ণ। সেই উর্ণ নবরূপে উত্তীর্ণ হয় **উর্ণু**-তে। সেই কারণেই উরু শব্দের মূলে '**উর্ণু**'কে রাখা হয়েছে। ব.শ. নিশ্চয়ই পূর্ব্বসূরীদের রচনায় এরকম নিদর্শন পেয়েছেন বলেই লিখেছেন। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা উরু শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে (২) আমাদের সিদ্ধান্তই দিয়েছি। আমরা আরও দেখেছি, ইংরেজি ur-যুক্ত অনেক শব্দই, যথা urge, uria, urbane (r-ural) ইত্যাদি সবই ঐ উর শব্দের সহোদর। দ্র. **উর্ব্ব, উর্ব্বর**। ৬. আবেস্তায় শব্দটির রূপ হল uru, vouru। (ব.শ.)।

উর্জ্জ, উর্জ্জ, উর্জ্জঃ, উর্জ্জস্ : ১. ✓উর্জ্জ্ + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **উর্** *(শক্তি) জননের জনক যে।* ৩. বল, প্রাণন, জীবন, উৎসাহ, বীর্য্য, তেজঃ, শ্বাস, স্বারোচিষ মনুর পুত্র, উৎসাহবান, কার্ত্তিক মাস। **উর্জ্জা** = খাদ্য, বল, শক্তি, উৎসাহ, অন্নপশুপ্রভৃতি। (ব.শ.)। ৪. বাংলায় শব্দটির ব্যবহার চোখে পড়ে না, কিন্তু হিন্দিতে 'উর্জা' শব্দটি '**শক্তি**' অর্থে এখনও প্রচলিত। ইংরেজির urge শব্দটি এরই সহোদর বলেই মনে হয়। ৫. ইংরেজিতে একে energy (en-urgy) বলে। উর্জ্জই আমাদের শক্তিরূপিণী **অংরূপিণী**র একটি বাহ্য রূপ। ৬. ইংরেজি urge, energy; গ্রীক ergon।

উর্ব্ব (উর্ব্ব, ঔর্ব্ব্য) : ১. উরু + অ। ২. *উরু (উর্ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; প্রবল শক্তি) বহনের বাহক যে।* ৩. **উর্ব্ব** কিংবা উর্ব্ব কোনো শব্দই ব. শব্দকোষের ভুক্তিতে নেই, রয়েছে উর্ব্বী ও ঔর্ব্ব; যদিও 'ঔর্ব্ব' শব্দের ব্যাখ্যায় **উর্ব্ব** শব্দটি রয়েছে। পুরাণাদিতে **উর্ব্ব, উর্ব্ব, উর্ব্বী, ঔর্ব, ঔর্ব্ব, ঔর্ব্ব্য** ইত্যাদি বিভিন্ন বানানে শব্দটি রয়েছে এবং সেগুলি সবই এক ঋষিসম্পর্কিত বিবরণ। ব.শ.-তে ঔর্ব্ব শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে এইভাবে — ক) উর্ব্বীভব, পৃথিবীজাত, উর্ব্বীসম্বন্ধী, পার্থিব। খ) ঔর্ব্বসম্বন্ধী। ... **উর্ব্ব** ঋষির গোত্রাপত্য; যিনি **উরু** ভেদ করিয়া উৎপন্ন হন; বিপ্রর্ষিবিশেষ। ... পুরাণে, ইনি ভৃগুবংশীয় ঋষিবিশেষ। ইঁহার জননী আরুষী এবং জনক চ্যবন। আরুষী দুর্বৃত্ত কৃতবীর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে **উরু**দেশে গর্ভ ধারণ করেন। ক্ষত্রিয়গণ তাহা জানিতে পারিয়া গর্ভনাশে উদ্যত হইলে, ঔর্ব্ব ক্রোধে **উরু** ভেদ করিয়া নির্গত হন এবং তাঁহার দেহপ্রভায় ক্ষত্রিয়েরা অন্ধ হইয়া যায়। অনন্তর ঔর্ব্বের ক্রোধানল ত্রিলোকনাশে উদ্যত হইলে, ঔর্ব্ব পিতৃগণের অনুরোধে ক্রোধবহ্নি সংহার ও সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। এই কোপানলই হয়শিরোমূর্ত্তি হেতু 'বাড়বানল' নামে প্রসিদ্ধ। গ) মতান্তরে উর্ব্ব ঋষি অযোনিজ পুত্র হেতু বহ্নি লইয়া নিজ বক্ষোদেশ মন্থন করেন। ইহাতে জ্বালাময় পুরুষ উৎপন্ন হয়; ইহার আধার সমুদ্র। ... ঘ) বড়বানল, বাড়ব। ... (ব.শ.)। আর, পৌরাণিক অভিধানে রয়েছে উর্ব, **উর্ব**, এবং ঔর্ব ঋষির কথা। সেটি দেওয়া হয়েছে এইভাবে — ক) উর্ব = পাণ্ডববংশীয় পুরঞ্জয়ের পুত্র। মহর্ষি উর্ব্ব কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং ব্রহ্মার সমান গুণযুক্ত ও তেজস্বী ছিলেন। একবার তিনি তাঁর **উরু**তে হুতাশন প্রবিষ্ট করে তপস্যায় নিবিষ্ট ছিলেন। তখন হঠাৎ তাঁর **উরু** ভেদ করে এক অনল উত্থিত হয়। এর নাম **উর্ব্ব**-অনল। ব্রহ্মা এই অনলকে সমুদ্রে স্থাপন করেন। খ) **উর্ব** = ... দেবতারা তার বংশলোপ হবে এই আশঙ্কা করে তাঁকে বিবাহ করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বিবাহ না করেই অগ্নিতে **উরু**-মন্থন করত ঔর্ব নামে এক পুত্রের জন্মদান করেন। গ) ঔর্ব = ভৃগুবংশীয় ঋষি। পুরাকালে কৃতবীর্য (দ্র. **কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন**) নামে এক রাজা তাঁর ভৃগুবংশীয় পুরোহিতদের প্রচুর ধন দান করেন। মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর-ক্ষত্রিয়দের অর্থাভাব হওয়ায় তাঁরা ভার্গবদের কাছে অর্থ-প্রার্থী হন। ভার্গবরা কেউ ভূগর্ভে ধন লুকিয়ে রাখলেন, কেউ ব্রাহ্মণদের দান করলেন, কেউ ক্ষত্রিয়দেরও দিলেন। একজন ক্ষত্রিয় ভার্গবদের গৃহ খনন করে ধন দেখতে পাওয়ায় সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে ভার্গবদের বধ করলেন। ভার্গবনারীরা ভয়ে হিমালয়ে আশ্রয় নিলেন এবং তাঁদের মধ্যে এক ব্রাহ্মণী তাঁর **উরু**দেশের গর্ভ গোপন করলেন। ক্ষত্রিয়রা জানতে পেরে সেই গর্ভ নষ্ট করতে এলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণীর **উরু** ভেদ করে এক দীপ্তিমান পুত্র জন্মগ্রহণ করল। তাঁর তেজে ক্ষত্রিয়গণ অন্ধ হয়ে গেলেন। তখন অনুগ্রহপ্রার্থী ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণী বললেন যে, তোমরা আমার **উরু**জাত পুত্র ঔর্বকে প্রসন্ন কর। ক্ষত্রিয়দের প্রার্থনায় ঔর্ব তাঁদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তারপর পিতৃগণের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি ঘোর তপস্যা করতে লাগলেন। ... পরে পিতৃগণের অনুরোধে ঔর্ব সমুদ্রে তাঁর ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করেন। সেই ক্রোধ ঘোটকীর মস্তকরূপে (বড়বা) অগ্নি উদ্গার করে সমুদ্রজল পান করে। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ভারতের ইতিহাসে উর্ব্ব (**উর্ব্ব**) ঋষির ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত। তার আগের পরিস্থিতি হল, আদিম সমাজতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার (বা বৈদিক ব্যবস্থার) পরিচালক মহর্ষিরা কালে কালে অত্যন্ত অধঃপতিত হয়ে পড়েন। যেহেতু বৈদিক ব্যবস্থার স্বর্ণযুগে সমাজপরিচালক ব্রাহ্মণেরা রাষ্ট্রের (ক্ষত্রিয়ের) কাছ থেকে blank cheque নিয়ে রেখেছিলেন, যে, ক্ষত্রিয়েরাই সমাজশাসনের কাজ চালাবে বটে, তবে ব্রাহ্মণ যখন খুশি যা খুশি চাইতে পারে, সমাজশাসক ক্ষত্রিয় তা দিতে বাধ্য থাকবে। ক্ষত্রিয় তা মেনে নিতে কুণ্ঠিত হয়নি এই জন্য যে, সেকালের ব্রাহ্মণেরা ছিলেন জ্ঞানসম্পদের সাধক, জ্ঞানপিপাসু, জ্ঞানচর্চাকারী, বাহ্যসম্পদের প্রতি তাঁদের কোনো আকর্ষণই ছিল না। নেহাত খুবই অসুবিধায় না পড়লে তাঁরা কখনই ধনসম্পদের দিকে তাকাতেন

না। কিন্তু পরবর্তীকালের অধঃপতিত ব্রাহ্মণেরা এই blank cheque-**এর সুযোগে** লাগামছাড়া দাবি নিয়ে হাজির হতে থাকেন এবং **ক্ষত্রিয়েরা** সেই ব্রাহ্মণদের খাঁই মেটাতে মেটাতে দেউলিয়া হয়ে **যায়**। শেষমেষ একসময় ক্ষত্রিয়েরা বিদ্রোহ করে ও ব্রাহ্মণদের বাধ্য **করে** তাঁদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে। **ব্রহ্মহত্যাও** হতে থাকে। সম্পত্তি ভূগর্ভে লুকিয়ে রাখার সূত্রপাত হয়, সুইস ব্যাঙ্ক নামক আধুনিক ভূগর্ভ তখন ছিল না। রাষ্ট্র মাটি খুঁড়ে সেসকল ধন গ্রহণ করে, সিবিআই-এর রেড করার মতো। অগত্যা রাষ্ট্রের হাত থেকে বাঁচার জন্য ব্রাহ্মণেরা একটি উপায় বের করেন — বৈশ্যদের বা ব্যবসায়ীদের টাকা ধার দিয়ে দেওয়া। (মানুষের সমাজে Interest bearing capital-এর বা সুদপুঁজির প্রথম উদ্ভব এভাবেই ঘটেছিল, যার ইতিহাস মার্কসসাহেব জানতেন না।) এর ফলে, শক্তিরূপী **উর্ব্ব** আধারশক্তি যুক্ত হয়ে **উর্ব্ব** হয়ে গেল। বুঝতে পেরে রাষ্ট্র বা **ক্ষত্রিয়েরা** যখন সেই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে গেল, এবং ফলত **ক্ষত্রিয়দেরকে** মুখোমুখি হতে হল গণরোষের। সেই গণরোষ পরবর্তীকালে সগর রাজার মাধ্যমে উপরোক্ত ব্রাহ্মণবিরোধীদের কী দুর্গতি করে ছেড়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে **সগর** রাজার কাহিনীতে — অজস্র ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব কেড়ে নিয়ে তাদের 'ক্রিয়াদি লোপ' করে দিয়ে তাদেরকে শূদ্র ঘোষণা করে দেওয়ার ঘটনায়। মাঝ থেকে সমাজ একটা নতুন বিষয়ের সাক্ষাৎ পায় — **উর্ব্ব-অনল, বাড়বাগ্নি** বা সুদ। জনসাধারণ (সমুদ্র) বাড়বানলের আশ্রয় হয়। এর আগেই অবশ্য বাড়বার (বাড় বা সুদ খাওয়ার) জন্ম হয়েছিল (দ্র. **অশ্বিনীকুমার**), তবে তা রুগ্নকে (রুগ্ন মানুষ, রুগ্ন কর্মযজ্ঞ, শিল্পাদি) সুস্থ সবল করে তুলত কিন্তু এখন তা বাড়বাগ্নিতে (সুদপুঁজিতে) পরিণত হয়ে গেল। (দ্র. **বশিষ্ঠ, বাড়িখোর**)। মোট কথা, ঔর্ব্বের বিশেষত্ব হল — ভারত-সমাজে একসময় যখন ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়রা অত্যন্ত নিপীড়ন করে প্রায় লুকিয়ে থাকতে বাধ্য করেছিল, সেই সময় পাল্টা শক্তি সৃজিত হয় এই **উর্ব্বের** হাতেই। তাঁর থেকেই একসময় আসেন পরশুরাম এবং ক্ষত্রিয় নিধন করে (একুশবার) ব্রাহ্মণের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। [এই ঘটনাবলী থেকে উর্ব্ব (বুক) কেমন করে **উর্ব্ব** (জানু) হল, তার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।] দ্র. **জঙ্ঘা**।

আরও কহতব্য এই যে, এই উর্ব্ব সেকালের মন্দিরকেন্দ্রিক সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে অর্থাৎ তখনকার বর্দ্ধিষ্ণু অঞ্চলে সক্রিয় ছিল, বিপরীতে গ্রামাঞ্চলে সক্রিয় ছিল চ্যবনপুত্র **রুরু**। সেই সুবাদে তথাকথিত নগরাঞ্চল উর্ব্বের এলাকা এবং গ্রামাঞ্চল রুরুর এলাকা হয়ে যায়। কিন্তু যে কারণেই হোক না কেন, শব্দের এই উত্তরাধিকার আমাদের নেই, রয়েছে ইংরেজির তাদের urban ও rural শব্দে। **৬.** ল্যাটিন urbs (= শহর), যার থেকে ইংরেজি urban, suburban এবং ল্যাটিন ruris (= গ্রামাঞ্চল), যার থেকে ইংরেজি rural।

উর্ব্বর (উর্ব্বরা) : **১.** উর্ব্বর = উরু + ✓ঋ + অ। **২.** উর্ *(শক্তি) বহন বাহিত রহে যাহাতে; অথবা, উর্ব্ব রহে যাহাতে।* উর্ব্বরা = উর্ব্বর-এর আধার যে। **৩. উৎপাদনশক্তি-বিশিষ্ট,** প্রচুর শস্যাদিজনক, প্রচুরশস্যাদিপ্রাপক, ভূমিমাত্র, **অপ্সরাবিশেষ**। (ব.শ.) । **৪.** fertile বা 'প্রচুর শস্যউৎপাদক-শক্তি' অর্থে প্রচলিত। **৫.** বাংলাভাষী কেবলমাত্র জমির বিশেষণ হিসেবেই শব্দটি ব্যবহার করেন না, মস্তিষ্কের বিশেষণ রূপেও শব্দটির ব্যবহার করেন। কারণ, শব্দটির ভিতরে উর্-বাহক বা শস্যউৎপাদক শক্তি রয়েছে, যে কোনো জমিতেই তা প্রযুক্ত হয়ে প্রচুর ফসল ফলাতে পারে; তা সে পৃথিবীর জমি হোক আর মানবজমিই হোক।

উর্ব্বশী, উর্ব্বশী : **১.** উরু (উরু) + ✓বশ্ + অ (অচ্) - স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। **২.** *উরুকে (প্রবল শক্তিকে) বা উরুকে (সম্পদবানকে) বশ করে যে আধার।* / যিনি উরুকে (মহাপুরুষকে) বশ করেন। (ব.শ.)। **৩.** স্বর্গবেশ্যাবিশেষ। নারায়ণ ঋষি, তপোবিঘ্নার্থ ইন্দ্রপ্রেরিত কামাদির মোহনার্থ যোগবলে দিব্যরমণীগণ সৃষ্টি করেন: উর্ব্বশী ইঁহাদের অন্যতমা। মতান্তরে, নারায়ণের **উরু** হইতে ইঁহার জন্ম, এইজন্য **উর্ব্বশী**। ঋগ্বেদে **উর্ব্বশীর** উল্লেখ আছে। ইঁহার রূপদর্শনে মুগ্ধ মিত্রবরুণের স্খলিত বীর্য্য হইতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম হয়। ইনি মিত্র বরুণের শাপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পুরূরবার সহিত দীর্ঘকাল বাস করেন। অর্জ্জুন বিরাটগৃহে বাসকালে ইঁহার শাপে একবৎসর ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হন। ... **উর্ব্বশীতীর্থ**। নদীবিশেষ। (ব.শ.) । অপরূপ লাবণ্যময়ী স্বর্গের অপ্সরা। ... নারায়ণের **উরু** ভেদ করে বহির্গত হন, তাই তাঁর নাম উর্ব্বশী। ... সমুদ্রমন্থন থেকে উত্থিত অপ্সরাদের মধ্যে উর্ব্বশী অন্যতম। ... উর্ব্বশী সাতজন মনুর সৃষ্টি ...। ইন্দ্রশাপে উর্ব্বশী মর্ত্যে পুরূরবার স্ত্রীরূপে ছিলেন। ... নগ্ন পুরূরবাকে দেখে তিনি শাপমুক্ত হন। ... তাদের ৫/৭টি পুত্র হয়। ... আদিত্যযজ্ঞে আমন্ত্রিত মিত্রাবরুণ উর্ব্বশীকে দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁদের রেতঃপাত হয়। সেই রেতের যে ভাগ কুম্ভে পড়ে সেই ভাগ হতে বশিষ্ঠের জন্ম হয়। ... এতে মিত্রাবরুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উর্ব্বশীকে অভিশাপ দেন যে, তাঁকে পৃথিবীতে নির্বাসিতা হতে হবে। এখানে এসে উর্ব্বশী পুরূরবার স্ত্রী হন। ... ইন্দ্রের অনুজ্ঞায় উর্ব্বশী অর্জ্জুনের সঙ্গকামনা করেন এবং প্রত্যাখ্যাত হয়ে অভিশাপ দেন। সেই অভিশাপের কারণে অজ্ঞাতবাসকালে অর্জ্জুন বৃহন্নলারূপে অতিবাহিত করেন। ... বিক্রমোর্ব্বশী নাটকে কেশী দৈত্য উর্ব্বশীকে হরণ করলে পুরূরবা তাঁকে উদ্ধার করেন। ... অভিশপ্ত হয়ে পুরূরবার সঙ্গে মর্ত্যবাস করেন এবং পুত্রমুখ দর্শন করে মুক্তিলাভ করেন। ... কামদেব অপ্সরাদের **উরু** থেকে উর্ব্বশীকে সৃষ্টি করেন। ... উর্ব্বশী বিষ্ণুর তপোভঙ্গ করতে পারায় ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে গ্রহণ করতে চাইলেন। উর্ব্বশী সম্মত হলেন। কিন্তু পরে মিত্র ও বরুণ তাঁকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় উর্ব্বশী প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ওঁদের অভিশাপে উর্ব্বশী মনুষ্যভোগ্যা হয়ে পুরূরবার স্ত্রী হন। (পৌ.অ.)। **৪.** সুন্দরী রমণী, নামমাত্র, ইত্যাদি অর্থে প্রচলিত। **৫. উরুর** প্রসঙ্গ যখনই এল, তখনই এসে গেল আচ্ছাদন বা গোপনতার প্রসঙ্গ। তখনই এসে যাবে **উর্ণু** ক্রিয়ার কথা। তখন বানানে আসবে **'উ'**। তা সে যাই হোক, 'উর্ব্ব' যে দুটি শব্দের ভিতরে থাকে — উর্ব্বর, উর্ব্বশী — দুটিই নিজের ভিতরে শক্তি ধারণ করে। পার্থিব ভূমির ক্ষেত্রে সে শক্তি যদি 'সার' হয়, মানবশরীরের ক্ষেত্রে সে যদি 'মেধা' পদবাচ্য হয়, সমাজশরীরের ক্ষেত্রে তা নিশ্চয়ই পুঁজির সুদ-শক্তি। আগেই

আমরা দেখেছি, **ঔর্ব্ব্য** ঋষির সঙ্গে লাভখোর বা সুদখোর পুঁজির ও বৈশ্যদের সম্পর্ক রয়েছে। বৈশ্যরা যখন যৌথসমাজের হিসেবরক্ষক ও বিতরণকারী মাত্র (বৈশ্যের যে রূপটিকে গান্ধী বুঝেছিলেন সামাজিক সম্পদের 'ট্রাস্টি' রূপে), তখন তাদের ভেতর থেকে যে আদি দোকানদারদের (ফেরিওয়ালার) জন্ম হয়, তারা স্বভাবতই 'উর্ব্বশী' পদবাচ্য; আর বৈশ্যরা যখন ব্যক্তিমালিক হয়ে গেছেন, তখন তাদের ভেতর থেকে যে দোকানদারদের (পরবর্তীযুগের ফেরিওয়ালাদের) জন্ম হয়েছিল, তাঁরা হয়ে যান '**উর্ব্বশী**' পদবাচ্য। তবে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁরা নারায়ণের উরু থেকে জন্মানো উর্ব্বশী কিংবা নারায়ণের উরু থেকে জন্মানো **উর্ব্বশী**ই বটে। যাই হোক না কেন, বৈদিক সমাজের শেষ অধ্যায়ের দিকে যে সকল আদি ফেরিওয়ালা বা দোকানদের উদ্ভব ঘটেছিল যৌথব্যবস্থার মধ্যেই, উর্ব্বশী তাদেরই বোঝাত, পরবর্তীকালে এদেরই উদ্ভব ঘটে **উর্ব্বশী** রূপে। যৌথ সামাজিক সম্পদের বিতরণের ক্ষেত্রে 'মাধ্যম' রূপে যে অপ্সরাদের জন্ম হয়েছিল, তেমন জনগোষ্ঠীকেই উর্ব্বশী বা উর্ব্বশী বলা হত। এদের প্রাচীন রূপকে 'উর্ব্বশী' এবং অর্বাচীন রূপকে '**উর্ব্বশী**' বলা হত। অতএব দুটো বানানই ঠিক। যতদূর বোঝা যায়, মেসোপটেমিয়ার 'হামুরাবি' আর আমাদের 'পুরূরবা' মনে হয় সমসাময়িক ও একই উৎসজাত। দ্র. **দেবাঙ্গনা**।

উরু : ১. ✓উর্ণু + উ (কু) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহাকে (যে শক্তিধারীকে) আচ্ছাদিত করে রাখা হয়*। ৩. জানুর উপরিভাগ, সক্‌থি, উরুত। (ব.শ.)। ৪. thigh অর্থে প্রচলিত। ৫. (পশুপাখির থেকে) কর্মক্ষেত্রকে (কৃষিক্ষেত্রকে) ঘিরে রাখার বিচার মানুষের মনে ও সমাজে আবির্ভূত হবার পর মানুষ নিজ শরীরের কর্মক্ষেত্রকে ঘিরে রাখার যুক্তি খুঁজে পায়। পরে পরে কর্মক্ষেত্র ও তার ফলাফল হয়ে যায় সমাজের সম্পদ। এরপর শুরু হয় সম্পদগোপন। আদি বর্ণবিভাজনে সকলের সাহায্য নিয়ে উৎপাদন বিষয়ক পরিকল্পনা করা ও তা রূপায়ণের জন্য উপদেশাদি দেওয়ার (= ম্যানেজারিয়াল) কাজ যারা করত, তাদের বলা হত ব্রাহ্মণ। আদি শূদ্রের সাহায্য নিয়ে উৎপাদন ক্ষেত্র পাহারা দেওয়ার (= সিকিউরিটি) কাজ যারা করত, তাদের বলা হত ক্ষত্রিয়, আদি শূদ্রের সাহায্য নিয়ে সেই কর্মক্ষেত্রজাত ফসলকে বিতরণ করার (= ডিস্ট্রিবিউশন) কাজ যারা করত, তাদের বলা হত বৈশ্য। তখন শূদ্র আদৌ অমর্যাদাজনক শব্দ ছিল না, এবং ব্যক্তিমালিকানারও কোনো চিহ্নই ছিল না। কাজের সুবিধার জন্যই আদি যৌথসমাজ (সনাতনসমাজ) বৈদিক যুগের আগেই এই বিভাজন করেছিল। যতদূর বোঝা যায়, ম্যানেজারিয়াল, সিকিউরিটি, ও ডিস্ট্রিবিউশন — এই তিনটি কাজের দায়িত্বে থাকত ৫ + ৫ + ৫ = ১৫% মানুষ, বাকি ৮৫% তাদের নেতৃত্বে চাষাবাদ করত। পরে পরে সমগ্র ব্যবস্থাই ক্রমশ কলুষিত হতে থাকে। কর্মক্ষেত্রকে ঢেকে রাখতে রাখতে তার ফসলকেও গোপন করার সূত্রপাত হয়। সত্যগোপন না-করে, আচ্ছাদন না-করে সম্পদ সঞ্চয় প্রাচীন ভারতে একেবারেই অসম্ভব ছিল। একসময় শুরু হয়ে যায় গোপন বিনিময়। পরে পরে আসে প্রকাশ্য বিনিময়। অবশ্য ভারতসমাজে প্রকাশ্য বিনিময় কোনোদিনই তেমন মর্যাদা পায়নি। তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে হতেও হয়নি। যাই হোক, পরে পরে বৈশ্য মানেই হয়ে যায় বিনিময়জীবী, ব্যবসাদার। তার মানে, মানবদেহের **উরু** হল thigh, আর সমাজদেহের **উরু** হল যারা সম্পদ গোপন করে — সুদখোর, মজুতদার, বৈশ্য বা ব্যবসাদার।

তার মানে, সমাজশরীরের চার ভাগ — ব্রাহ্মণ (মাথা), বক্ষ (ক্ষত্রিয়), জানু (বৈশ্য), ও পা (শূদ্র)। মানবশরীরের বক্ষঃস্থলই শক্তির কেন্দ্র; সমাজশরীরের ক্ষেত্রে অতএব ক্ষত্রিয়ই বক্ষ। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, শক্তি গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে জানুতে; **উর্ব্ব** ঋষি গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন বৈশ্যদের মধ্যে, তার উত্তরসূরী সগর ব্রাহ্মণবিরোধী-ক্ষত্রিয়দের ধ্বংস করার ব্যবস্থা করছেন। তখন উর হয়ে গেল '**উর্ণু**' ক্রিয়াজাত শব্দ '**উরু**' — উর যেখানে আচ্ছাদিত বা গোপন করে রাখা হয়। **উরু** হয়ে গেল বুক, **উরু** হয়ে গেল জানু। **উরগ, উরোগম, উরোগামী** হয়ে গেল 'বুকে হেঁটে চলে যে'। **উরোজ, উরোভূ** হয়ে গেল 'বুকে যে জন্মায়' অর্থাৎ স্তন। এমনকি **উরত** যখন আরবি ভাষাতে '**আওরত**' হয়ে গেল, তখনও সংস্কৃতে তা থেকে গেল **উরাত, উরাথ, উরুত** বা জানু হয়ে। অতএব বুকবাচক শব্দে 'উ' এবং জানুবাচক শব্দে 'উ' লেখাই যুক্তিযুক্ত হয়ে গেল। ব.শ. সেই নীতিই কমবেশি অনুসরণ করেছেন, এমনকি উর্ব্বশীকে তিনি উ-ঊ দুরকম বানানেই লিখেছেন এবং এখন আমরা দেখছি যথার্থই লিখেছেন।

উর্দ্ধ, উর্দ্ধ : ১. উর্দ্ধ = উদ্ + ✓হা + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। উর্দ্ধ = উদ্ + ✓ধ্বন্ + অ — (উর্ + ধ্ব) > উর্ধ্ব; - র্দ্ধ (ব-কারযুক্ত)। (ব.শ.)। ২. *উর্ ধারিত-বাহিত হয় যাহাতে।* (দ্র. **উর্**)। ৩. উদগত, তুঙ্গ, উচ্চ, উৎসর্পী, উপরিস্থিত, উচ্চাভিমুখ, অনুপবিষ্ট, দণ্ডবৎ, খাড়া, উচ্চৈঃ, তার (স্বর), উন্নতাগ্র, শ্রেষ্ঠ, অধিক, পরে, পরবর্তীকালে, দেহান্তে, মৃত্যুর পরে, উচ্চদিকে, শূন্যাভিমুখ, ...। (ব.শ.)। ৪. up বা 'উচ্চ' অর্থে প্রচলিত। ৫. মানুষের মনের উদলোক, বিভিন্ন বস্তুর উদলোক, জগতের উদলোক, এই সমস্ত উদলোকের (ধারণার) স্থিতিকে যে-স্থানে রাখা হয় এবং সেই স্থান তাকে গ্রহণ করে বহন করে নিয়ে চলে, সেই চৈতন্যলোককে বলে 'উর্দ্ধ' বা 'উর্দ্ধ'। আজকাল এটিকে লেখা হয় '**উর্ধ্ব**' রূপে। কেন এইরকম বানানবদল তার কোনো কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় না।

'অবহিত হউন' কিংবা 'অবধান করুন' কথা দুটি থেকে বোঝা যায়, হি ও ধা সম অর্থ ধারণ করে। কেননা, শব্দ দুটির মূলে রয়েছে ✓ধা ক্রিয়াটি। 'ধ' কখনো কখনো 'হ' হয়ে যায়। উপরে (১) দুই প্রকার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের বিশেষত্ব হল, দ্বিতীয়টি প্রাচীন, প্রথমটি অর্বাচীন। দ্বিতীয়টিতে ধরা হয়েছিল — '*উদলোকধারীর (উ-এর) দান-ধারণ বহন করে যে*' সেটিই **উর্দ্ধ**। আর, প্রথমটিতে ধরা হয়েছিল '*উদলোকধারীর (উ-এর) দান ধারণ করে যে*', সেটিই উর্দ্ধ। এতে ব-কার বাদ দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ 'বহন' ক্রিয়াটিকে বাদ দেওয়া হয়েছিল; কারণ, সম্ভবত ধরে নেওয়া হয়েছিল, (কাঁধে) ধরলে বইতেই হবে, এটাই স্বাভাবিক; অতএব পৃথকভাবে 'বহন'-এর উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। সেই কারণে পরবর্তীকালের পণ্ডিতেরা র্দ্ধ-এর ব-ফলা বাদ দিয়েছিলেন, এভাবে '**উর্দ্ধ**' কথাটির প্রচলন হয়ে যায়।

কিন্তু শব্দ দুটির ভিতরে 'র্' (রেফ) কেন এল, তার কোনো কারণ কোথাও পাওয়া যায় না। তবুও **'উৰ্দ্ধ'ই** প্রচলিত হয়ে চলে আসছিল। সম্প্রতি শব্দটিকে **'উর্ধ্ব'** করে দেওয়া হয়েছে। ফলে অর্থটি দাঁড়িয়েছে — **উব্** *ধারণ-বহন করে যে*; অর্থাৎ **'উর্ধ্ব'**। বিষয়টি অমরকোষই বলে গিয়েছিলেন এবং ব.শ. তার উল্লেখও করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব.শ. ও অমরকোষ কেন যে **'উৰ্দ্ধ'ই** ব্যবহার করেছিলেন, তা এখনও বোধগম্য নয়। কিন্তু **'উর্ধ্ব'** শব্দটি যে বানান ও অর্থ উভয় দিক থেকেই সঠিক, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। এর অর্থ থেকে অনায়াসে উদ্-লোক, **উর্ধ্বলোক**, স্বরলোক, স্বর্লোক, স্বর্গলোক বা মানসলোক, সর্বত্র যাওয়া যায়। দ্র. **অধঃ**।

উর্দ্ধরেতা, উৰ্দ্ধরেতা : ১. উর্দ্ধ রী = শ্রবণ, ক্ষরণ। ২. *যাহার রেতঃ (গতিশক্তির অস্তিত্ব যাহাতে) উর্দ্ধে থাকে, অর্থাৎ পতিত হয় না।* ৩. ক) বশিত্ব হেতু স্বভাবত অস্খলিতবীর্য্য, অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্য। খ) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। গ) শিব — দেবগণের প্রার্থনায় ইনি রেতোনিগ্রহ করেন। ঘ) ভীষ্ম। ... মহাভারতে ৮৮০০০ **উৰ্দ্ধরেতা** ঋষির উল্লেখ আছে। ... (ব.শ.)। ক) যার বীর্য **উর্ধ্বগত** হয়েছে, অথবা যার কখনও রেতঃস্খলন হয় না, যার রেতঃ **উর্ধ্ব** অর্থাৎ অধঃপতিত হয় না। আস্খলিত বীর্য। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। খ) মহাদেব, শিব। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে মহাদেব রেতঃ **উর্ধ্বগত** করেন এবং **উর্ধ্বরেতা** নাম প্রাপ্ত হন। গ) ... ভীষ্ম চিরকুমার ব্রহ্মচারী হওয়াতে **উর্ধ্বরেতা** বলে বিখ্যাত হন। ঘ) মুনিবিশেষ — সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ। ঙ) মহাভারতে অষ্টাশীতি সহস্র **উর্ধ্বরেতা** ঋষির উল্লেখ আছে। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পুরুষ (আবিষ্কারক, জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ) যদি কোনো প্রকৃতিশক্তির (জনগোষ্ঠীর) সঙ্গে কর্মরত হয়, তাদের রতিতে পুরুষের যে জ্ঞান প্রকৃতির সঙ্গে মিশে সৃষ্টিতে বা উৎপন্নে পরিণত হয়, তাকে বলে **'রেতঃ'** বা 'রেতস্', যদর্থ গতিশক্তিকে উত্তীর্ণকারী শক্তি। ভারতের ইতিহাস অনুসারে দক্ষযজ্ঞের পর পূর্ব্বতন সমাজপরিচালকেরা **'যতি'** ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন; অর্থাৎ 'দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন'। এঁরা আর নিজেদের অভিজ্ঞতাদি দিয়ে জনসাধারণকে পরিচালিত করতেন না, চাষাবাদের বুদ্ধি দিতেন না। এঁরা তাই **উৰ্দ্ধরেতা**। কাহিনী অনুসারে সনকাদি ঋষিগণ (আদিম যৌথসমাজের পরিচালকেরা) সেই যতিধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। শিবও (আবিষ্কারকেরাও) করেছিলেন। করেছিলেন ভীষ্মও (একালের 'প্ল্যানিং কমিশন'-এর আদিপুরুষ সেকালের সমাজের মূল পরিকল্পনাকারীরাও)।

উর্ম্মিলা (উর্মিলা) : ১. উর্ম্মি = ✓ঋ + মি - কর্তৃবাচ্যে; উর্ম্মিলা = উর্ম্মি + ✓লা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *উর্ম্মিলা = উর্ম্মি (তরঙ্গ, ঢেউ) কর্তৃক আনিত যে। /* উর্ম্মি = উর্দ্ধে গমন করে যে। (ব.শ.)। ৩. জনককন্যা, সীতার কনিষ্ঠা, লক্ষ্মণের পত্নী এবং অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুর জননী। (ব.শ.) । মিথিলার রাজা জনকের কনিষ্ঠা কন্যা ও সীতার ভগিনী। লক্ষ্মণের সহিত এঁর বিবাহ হয়। ... ইনি **জনকের ঔরসজাত** কন্যা। (পৌ.অ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. তরঙ্গ বা ঢেউ যাকে আনে সে হল ফেনা। তা **উর্ম্মিলা** পদবাচ্য হতে পারে, সন্দেহ নেই। কিন্তু সে তো পার্থিব সমুদ্রের ঢেউয়ের ফেনা। সমাজের অর্থনৈতিক (জ্ঞান-অর্থ ও টাকা-অর্থ উভয় অর্থনৈতিক) সমুদ্রের ঢেউয়ের **উর্ম্মিলা** কী? অর্থাৎ, জ্ঞানসম্পদ-সমুদ্রের ঢেউয়ের ফেনা কী বস্তু; ধনসম্পদ-সমুদ্রের ফেনাই বা কেমন বস্তু? খরিফ শস্যের মরসুম, রবিশস্যের মরসুম, এমনি বিভিন্ন বাৎসরিক কালবিশেষ ধরে ধরে উৎপাদন কর্মযজ্ঞ থেকে উত্থিত হত উৎপন্নের তরঙ্গ বা ঢেউ। তাতে উঠে আসত সমাজের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন, পণ্য রূপে, ফেনা রূপে। যে জনগোষ্ঠী এই সামাজিক ফেনা নিয়ে আসত, তা বহন করত, তারাও তো **উর্ম্মিলা**। বস্তুত রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, **উর্ম্মিলা** হল দেশীয় উদ্বৃত্ত উৎপাদন নিয়ে বিক্রিবাটা করত যে জনগোষ্ঠী, তারা। দ্র. **লক্ষ্মণ, সুমিত্রা, মিত্র, সুমিত্র, বিশ্বামিত্র**।

ঔরস : ১. উরস্ + অ; তৎসম্বন্ধার্থে, তত্র ভব অর্থে, অথবা তাহা দ্বারা নির্ম্মিত অর্থে। (ব.শ.)। ২. *উরস্ হইতে জাত।* / উরঃ দ্বারা নির্ম্মিত। দ্র. **উরস্**। ৩. উরঃসম্বন্ধী, বক্ষসম্বন্ধী, উরোভব, হৃদয়স্থিত, শারীরিক, স্ত্রীতে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র বা কন্যা; স্বীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ কন্যাবস্থায় পরিণীতা সবর্ণা ভার্য্যায় স্বয়ং উৎপাদিত. পুত্র, ধর্ম্মপত্নীজাত পুত্র, বীর্য্য, বীজ। (ব.শ.)। ৪. semen-সংক্রান্ত অর্থে প্রচলিত। ৫. অস্তিত্বের যে সত্তা নিজেকে উপরে তুলে রাখে বা রাখতে সাহায্য করে, তাকে বলে উর। মানুষের আপন অস্তিত্বের যে মূল শক্তি তাই তার উর। সেই উর থেকে জন্মায় তার ঔরস। সেই ঔরস সে রাখে তার স্ত্রীগর্ভে। সে তখন ঔরস-পুত্র রূপে দেখা দেয়। বাহ্যিক ক্ষেত্রে এই ঔরসের দ্বারা মানুষের পিতৃপরম্পরার প্রাণসম্পদের **পিতৃপ্রবাহ** প্রবাহিত হয়। মানসিক ক্ষেত্রে জ্ঞানসম্পদের ঔরসের ধারা **ঋষিপ্রবাহে,** এবং বাহ্যিক-মানসিক ক্ষেত্রে ধনসম্পদের ঔরসের ধারাও **দেবপ্রবাহে** প্রবাহিত হয়। তবে জ্ঞানজ ঔরস ও ধনজ ঔরস শব্দ দুটি প্রচলিত নেই; আছে কেবল বাহ্যিক প্রাণজ ঔরস।

'উল্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আউওল, আউগাও, আউড়ে, আউঢাউ, আউদড়, আউনি-বাউনি, আউনিএগ্রা, আউরা, আউল, আউলঝাউল, আউল-বাউল, আউলা, আউলান, আউলিয়া, আউলী, আউতিয়া, আউতন, আউলা, আএল, আও, আওত, আওল, আওলাত, আওলাদ, আদুড়, আদুল, আলা (আউলা = exhausted), আলাভোলা (আউলাভোলা), আলু, আলুথালু, আলুদল, আলুয়া, আলো, উক, উকা, উখলি, উদলা (এলো), উলু, উলকা, উলঙ্গ, উলঙ্গিনী, উলঙ্গী, উলট, উলট, উলটকম্বল, উলটপালট, উলটা, উলটাপালটা, উলটি, উলটিপালটি, উলপ, উলম, উলা, উলাট, উলাড়, উলান, উলাল, উলি, উলিপালি, উলুপ (কুলুপ), উলুপী, উলু, উলুই, উলুউলু, উলুখল, উল্কা, উল্লা, উল্ব, এউঢেউ, এউলা, এলনা, এলা, এলাচ, এলাচি, এলো, এলোচুল, এলোথেলো, এলোবিলি, এলোমেলো, ওড়, ওলটপালট, ওলা, ওলাউঠা, ওলান, ওলাবিবি।

উল্ = উদ্‌লোক লালন-লয়ন। **উল** = উদ্‌লোক লালিত-লুপ্ত হয়

যাহাতে। (ul, wool, ultimate, ultra)।

উল (উদলা, উলান) : **৫.** গা খোলা থাকা সভ্য সমাজের রীতিবিরোধী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আবরণ' নিবন্ধে দেখিয়েছেন, আমাদের শরীরের যে যে অংশ খোলা থাকে, যেমন হাত-পায়ের চেটো, মুখের চামড়া, এগুলো দেহের বাকি অংশের তুলনায় অনেক বেশি 'শিক্ষিত'। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-কাঁটা-খোঁচাকে এরা অনেক বেশি সইতে পারে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের মতে, এগুলি খোলা থাকে বলেই এরা এত বেশি স্বাভাবিকভাবে বিকশিত ও 'শিক্ষিত' হতে পারে। জামাজুতো সেকারণেই মানুষের শরীরের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিকূল। অনাবৃত থাকলে মানুষের দেহ যথাযথভাবে লালিত-পালিত হতে পারে। সেকারণেই উক্ত নিবন্ধে তিনি মানবশিশুকে কমপক্ষে ছ-সাত বছর বয়স পর্যন্ত জামাকাপড় পরানোর বিরোধিতা করে গেছেন। মানুষের শরীরের সমগ্র উদ্‌লোক খোলা থাকলেই তা ভালভাবে লালিত-পালিত হতে পারে। উল্ শব্দের মানে তাই 'উদলোকের লালন' যাহাতে। তবে কিনা, তাতে কখনো-সখনো চরম ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে, বিলুপ্তিও ঘটে যেতে পারে। সেকারণেই কথাটা 'লালন-লোপন'। তাই 'উল' শব্দের অর্থ হল 'উদ্‌লোকের লালন-লোপন যাহাতে', যাকে **উদলা** বা 'উদোম গা'-ও বলা হয়। ভাত সেদ্ধ হতে হতে উছলে পড়লে গ্রামবাংলায় আজও তাকে 'উলান', 'উবলান', 'উদলান' বা 'উগরে-পড়া' বলে। 'উলান' কথাটিকে ব.শ. **নাবা (নামা)** শব্দের অর্থ রূপে উল্লেখ করে গেছেন। এই **উল** বা **উলান** কথাটি আধুনিক অ্যাকাডেমিক বাংলাভাষায় প্রচলিত নেই, যা রয়েছে গ্রামবাংলার মানুষের মুখে; রয়েছে ইংরেজিতে wool রূপে, যা জীবশরীরের 'উদ্‌লোক লালন করে'।

আউল, আউলবাউল, আউলা (আউলিয়া > আউঅল > আওল > আউলো > আলো > এলো > এলোথেলো > এলোমেলো): **১.** আ + উল। **২.** আউল = *উল-এর আধার যে; যে অস্তিত্বধারী নিজেকে খুলে ধরেন।* আউলা = *আউল-এর আশ্রয় যাহাতে (আউলানো)।* বাউল = *বাহক আউল বা আউলত্বকে বহন করে যে।* **৩.** আউল = আকুল, প্রেমোন্মত্ত; ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ ... সিদ্ধপুরুষ, আকুলতাজনক বিষয়। আউলা = স্খলিত হওয়া, খসা (খুলে পড়া), আলুলায়িত হওয়া, ব্যাকুল হওয়া, ভাবাবেশে শিথিল হওয়া। ... (ব.শ.)। **৪.** বাউল প্রচলিত থাকলেও, আউল শব্দটি প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **উল, উলঙ্গ**। সংস্কৃত 'আকুল-বাতুল' শব্দ থেকে 'আউল-বাউল' শব্দের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু **উল** শব্দের অর্থ থেকে বোঝা যায়, আউল-বাউল নিজেরাই স্বার্থে (আপন আপন অর্থে) স্বপ্রকাশ; কারও অপভ্রংশ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই শব্দ দুটির। এমনকি এই আউল শব্দই আরবিতে আউলিয়া, আওলিয়া, এবং আওয়ল (প্রথম, সবার আগে) যথার্থে প্রচলিত রয়েছে। তাছাড়া, যারা নিজেদের খুলে ধরে, সেই আউল-আউলিয়ারা তো নিষ্পাপ হয়ে সর্বাগ্রগামী হবেনই। এককালে আউলিয়া-আম্বিয়ারা থাকতেন সবার আগে, তাদের অনুসরণ করতেন রাজা-বাদশারা, তাঁদের পেছনে রাজপুরুষ ও জনসাধারণ। আউয়ল নম্বর তো এক নম্বর হবেই। কারণ তাঁরা ছিলেন উল-এর আশ্রয় আউলিয়া, অনাবৃত, খোলা, স্বচ্ছতার (transparency-র) জীবন্ত প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অচলায়তন' গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়'।

উলঙ্গ : **১.** উল্ + অঙ্গ। **২.** *উল্ (উদোম) অঙ্গ যাহার।* **৩.** নগ্ন, বস্ত্রহীন, আভরণহীন, আবরণহীন, ঘৃণালজ্জাদির আবরণহীন, বাক্যালঙ্কারহীন, বুদ্ধিমত্তার আবরণহীন, মুক্ত, কপটতার আবরণহীন। (ব.শ.)। **৪.** naked বা 'নগ্ন' অর্থে প্রচলিত। উল শব্দের শুভ দিকটির কারণেই হয়তো ইংরেজির naked কথাটি যথেষ্ট শ্লীল যখন তা 'naked truth' রূপে ব্যবহৃত হয়। **৫.** দ্র. **উল**। এখানে বাড়তি যেটুকু বলার তা হল, মানুষের উলঙ্গতা দুরকম — দৈহিক ও মানসিক। জামাকাপড় না পরলে মানুষ দৈহিক উলঙ্গ হয়; স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিম কোনোরকম কোনো আদর্শ, রীতিনীতি আচার-আচরণ না মানলে মানুষ মানসিক উলঙ্গ হয়। অর্থাৎ দেহের আভরণের মতো মনের আভরণও আছে। কট্টর দেহবাদী ইউরোপীয় রীতিনীতি মান্য করা আর কোর্টপ্যান্ট পরা একই ব্যাপার। সেই কারণে বলা হয় 'আইন মানুষের আভরণ'। বলে রাখা ভাল, শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপ মানসিকভাবে উলঙ্গ হতে শুরু করেছিল। বিশ্বায়নের নামে সেই রোগ আজ সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছে। আজকের সভ্যতা উলঙ্গতার সাধক। **৬.** wool।

উলট, উলটপালট (উলটি, ওলটপালট) : **১.** উল + ট, পাল + ট। **২.** *উলট = **উল** টঙ্কারিত যাহাতে; পালট = **পাল** টঙ্কারিত যাহাতে।* **৩.** বিপর্যস্ত, অধোমুখ, নিম্নাগ্রভাগ **উর্দ্ধমূল** (বৃক্ষ), অধোমুখ হওয়া, পাশ ফিরা, প্রত্যাবর্ত্তন করা, স্বপক্ষ পরিবর্ত্তন করা, ভগ্নক্রম হওয়া, বিমুখ হওয়া; অদলবদল, অস্তব্যস্ত, এলোমেলো, নাড়িয়া-চাড়িয়া। (ব.শ.)। **৪.** opposite বা বিপরীত অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **লালনপালন**। লালিতকে লোল দেওয়া হয়, loose দেওয়া হয়, লেলিয়ে দেওয়া হয়, পালিতকে সামলে রাখা হয়, বাইরের আঘাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। উলট-পালট সেরকমই। উলটে দেওয়া মানে অস্তিত্বকে খুলে ধরা, পালটে দেওয়া মানে তাকে খানিকটা ঢেকে দেওয়া। উলটে দিলে 'খোলা-অস্তিত্ব (উল) টঙ্কারিত (ট)' হতে থাকে, তাই উলট; আর, পালটে দিলে 'পালিত-অস্তিত্ব ঢাকা পড়ে' যায়, তাই পালট। একে নেড়ে-চেড়ে দেওয়া বা 'নাড়িয়া-চাড়িয়া' দেওয়াও বলে। নাড়ানো মানে পালটানো, চাড়ানো মানে উলটানো।

উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত এক নদীর পূর্বপাড়ে একজন ব্যক্তি নামাজ পড়ছিলেন। তিনি যখন 'সিজদা' করছিলেন, একটি নবকিশোর তাঁকে উলটে দেয়, ফলে তিনি ডিগবাজি খেয়ে নদীতে পড়ে যান। কিশোরটিকে পাকড়াও করে জানতে চাওয়া হয়, সে এই কাজ করল কেন। উত্তরে কাঁদ কাঁদ স্বরে সে জানাল, 'ও উলটি উলটি করছিল, কিন্তু উলটাতে (ডিগবাজি দিতে) পারছিল না। তাই ...' সে উলটাতে সাহায্য করেছে। কিন্তু নদীপাড়ে লুঙি-পরা

মানুষ উলটালে তার শরীর তো উল-অঙ্গ হয়ে যাবে এবং সে নদীতে পড়ে যাবে। কিশোর সেকথা ভাবেনি। 'উলটি উলটি করা' এবং উলটাতে না-পারার কষ্ট তাকে প্ররোচিত করেছিল উলটে দিতে। কারণ সে নিজেও তো উলটি উলটি ক'রে উলটায়, ডিগবাজি খায়; ঠিকঠাক উলটাতে না-পারলে তার তো কষ্ট হয়। বলে রাখা ভাল, হিন্দি ভাষায় এই শব্দটি হসন্ত সহযোগে (উল্‌টি) বমি অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু 'উলটি' শব্দের অর্থকে তার সর্বোচ্চ ব্যাপকতায় ('উল্‌টিবৎ' বা 'উল্‌টিমৎ') ধরে রেখেছে সম্ভবত ইংরেজি তার ulti-mate রূপে। ৬. ল্যাটিন ultimus, যার থেকে ইংরেজি ulti-mate।

উলাড় : দ্র. **দাবু**

উলু : ১. উল্ + উ। ২. *উল্ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. উলুধ্বনি, বিবাহাদি উৎসবে স্ত্রীলোকের করণীয় মঙ্গলধ্বনিবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. 'উলুলুলু' ধ্বনি করা অর্থে প্রচলিত। ৫. নিজেদের কোনো সাফল্য প্রকাশ করার জন্য যে ধ্বনি করা হয়, সেটি 'উলু'ধ্বনি নাম পেয়েছে সম্ভবত এই জন্য যে, যখন মানুষের ভাষার যথেষ্ট বিকাশ ঘটেনি, তখনই নিজেদের 'খুলেমেলে ধরা'র বা প্রকাশ করার প্রতীক রূপে এই 'উলু'ধ্বনির প্রচলন হয়; যে কারণে আমাদের বঙ্গীয় সমাজের মতো পশ্চিম এশিয়ার কোনো কোনো সম্প্রদায়ের কুলাচারে বা কালচারেও 'উলু'ধ্বনির দেখা মেলে। ৬. হিব্রু ভাষার Hallelujah / Halleluiah (হালেলুইয়া) = ঈশ্বরের উদ্দেশে সমবেত জয়ধ্বনি। মনে হয় এই হিব্রু শব্দটি 'উলু'রই জ্ঞাতি।

'উষ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অত্যুষ্ণ, অনুষ্ণ, উক, উকা, উট, উটক, উটজ, উটপাখী, উমাবড়ি, উমামুড়ি, উল্কা, উল্মুক, উষ্, উষ (উস), উষঃ, উষঃকাল, উষণ, উষত, উষর্বুধ, উষসী, উষা, উষিত, উষিপিষি, উষিমিষি, উষ্ট্র, উষ্ণ, উষ্ণক, উষ্ণা, উষ্ণাংশু, উষ্ণাগম, উষ্ণাভিগম, উষ্ণালু, উষ্ণিক্, উষ্ণিকা, উষ্ণীষ, উষ্ণীষী, উষ্ণোদক, উষ্ম, উষ্মা, উসখুস, উকি, উরু, উষ, উষঃ, উষক, উষর, উষা, উষী, উষ্ম, উষ্মপ, উষ্মবর্ণ, উষ্মা, উহ্, উহ, উহাপোহ, উহিনী, ওষ, ওষধি, ওষধিজ, ওষধিপতি, ওষধীশ, ওষধিপ্রস্থ, ওষুধ, ওষ্ঠ, ওষ্ঠ্য, ঔখধ, ঔষধ, ঔষধীয়, ঔষ্ট্র, ঔষ্ট্রক, ঔষ্ঠ্য, ঔষ্ণ্য, ঔষ্ম্য, প্রত্যুষ।

উষ্ = উদ্‌লোকে দিশাগ্রস্ত (পুনরাবৃত্তিমূলক) শক্তিবিচ্ছুরণ। **উষ** = উদ্‌লোকে দিশাগ্রস্ত (পুনরাবৃত্তিমূলক) শক্তিবিচ্ছুরিত যাহাতে।

উষঃ (উষস্) : ১. √উষ্ + অস্ (অসি) - কর্তৃবাচ্যে; ২. *উদলোকে দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ করে যে।* ৩. উষা, প্রত্যুষ, কর্ণচ্ছিদ্র, মলয়পর্বতশ্রেণী। উষাঃ = প্রাতঃসন্ধ্যা, ব্রাহ্মমুহূর্ত, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রুদ্রপত্নীবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. উষা, প্রত্যূষ, গণ্ডূষ প্রভৃতি শব্দে উষ্-কে প্রত্যক্ষ দেখা গেলেও, কর্ণচ্ছিদ্রে বা মলয়পর্বতশ্রেণীতে 'উষ্' কীভাবে সক্রিয় তা সহজে বোঝা যায় না। তবে অপমানে যখন কান গরম হয়ে যায়, তখন হয়তো বোঝা সম্ভব, উদ্‌লোকের (মাথার) উষ্-মা কান দিয়ে টর্চের আলোর মতো নিষ্ক্রান্ত হয়ে থাকে। আর মলয়পর্ব্বতশ্রেণীতে (ব্যক্তিগত মালিকানাধীন উৎপাদন সংগঠনসমূহে) উষ্ সক্রিয় হয় কীভাবে, তা এখনও গবেষণা সাপেক্ষ। তবে ব.শ. জানিয়ে দিয়েছেন 'উষ' শব্দটি প্রাচীন, 'উষ' অর্বাচীন। আমাদেরও তাই মনে হয়। ৬. গ্রীক eos (= উষাকাল), ল্যাটিন usus, ইংরেজি use।

উষা, ঊষা : ১. √উষ্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *উদ্‌লোকে দিশাগ্রস্ত শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটে যাহাতে। / যে অন্ধকার নাশ করে।* (ব.শ.)। ৩. নক্ষত্রের তেজোহানিকাল হইতে ভানুর অর্দ্ধোদয় পর্যন্ত কাল, প্রভাত, রাত্রি, সন্ধ্যা, স্ত্রীগবী, রন্ধনপাত্র, বাণরাজের কন্যা অনিরুদ্ধ পত্নী, রাত্রিশেষ, প্রাতঃকাল। (ব.শ.)। ক) ঋগ্‌বেদের কুড়িটি সুক্তে ইনি স্তুতিলাভ করেছেন। ইনি জ্যোতির্বসনা, স্বর্ণকন্যা ও আদিত্যদেবের ভগিনী। ... প্রাতঃকালের দেবতা। বেদোক্ত উষা প্রজাপতির কন্যা। প্রজাপতি সোমের (চন্দ্রের) সহিত কন্যার বিবাহ দিবার সংকল্প করেন। ... শুনে অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও উষার পাণিপ্রার্থী হন। প্রজাপতিগণ ঘোষণা করেন, অনন্ত আকাশপথ অনুধাবনে যিনি কৃতকার্য হবেন এবং যিনি সঙ্গে সঙ্গে যত বেশী স্বরচিত বেদসূক্ত উচ্চারণ করতে পারবেন, তাঁরই হাতে উষাকে সমর্পণ করা হবে। ... অশ্বিনীদ্বয় সফল হন। খ) প্রহ্লাদের পৌত্র শোণিতপুরের রাজা বাণাসুরের রূপবতী কন্যা ছিলেন উষা। ইনি পার্ব্বতীর শাপভ্রষ্টা পারিপার্শ্বিকা। ... পার্ব্বতী বর দেন, স্বপ্নাবস্থায় যে ব্যক্তি তোমাকে সম্ভোগ করবে, সেই তোমার স্বামী হবে। ... স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ ... চিনতে পেরে উষা তাঁকে দ্বারকা থেকে নিদ্রিতাবস্থায় হরণ করে নিজপ্রাসাদে আনয়ন করেন। ... বাণাসুর তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেন। ... কৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধকে সাহায্য করতে এলে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ... বাণের পক্ষে ছিলেন মহাদেব ও সুন্দ। তবুও বাণ পরাজিত হয়। অনিরুদ্ধ উষার সহিত দ্বারকায় নীত হন। (পৌ.অ.)। ৪. early morning বা 'ভোর' অর্থে প্রচলিত। ৫. ভোরবেলা যে আলো ফোটে, তাকে উষা বলার কারণটি কমবেশি বোঝা গেলেও, স্ত্রীগবী ও রন্ধনপাত্রাদিকে কেন উষা বলে তা এখনও বোঝা যায়নি। ৬. গ্রীক eos।

উষ্ট্র : ১. √উষ্ + ট্র (ষ্ট্রন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উদ্‌লোকের দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণের টঙ্কার রহে যাহাতে। / যে মরুতাপে দগ্ধ হয়।* (অমরকোষ টীকা — ব.শ.)। ৩. উট, উষ্ট্রবাহ্য শকট। (ব.শ.)। ৪. camel বা 'উট' অর্থে কদাচিত প্রচলিত। ৫. উষ্-এর টঙ্কার বা যথেষ্ট উষ্ণতা সহে-রহে যে থাকতে পারে, সে উষ্ট্র-পদবাচ্য সন্দেহ নাই। এবং নিঃসন্দেহে অমরকোষ টীকা থেকে ব.শ. সঠিক অর্থই দিয়েছেন। ৬. ফারসীতে 'উশ্‌তর, উশ্‌তুর' এবং আবেস্তায় ustara রূপে প্রচলিত। (ব.শ.)।

উষ্ণ : ১. √উষ্ + ন (নক্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উদ্‌লোকের দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণকে যাহাতে নাকরণ (আটক) করা হয়। / দাহ করে যে।* (ব.শ.)। ৩. উত্তপ্ত, গরম, উগ্র, তীক্ষ্ণ, কড়া, ক্রোধন,

কোপন, রাগী, আলস্যরহিত, দক্ষ, পটু; গ্রীষ্ম, নিদাঘ, অগ্নি, আতপ, পলাণ্ডু; তাপ, উত্তাপ, দীর্ঘনিঃশ্বাস, আতপ তণ্ডুল। (ব.শ.)। ৪. hot বা 'গরম' অর্থে প্রচলিত। ৫. **অগ্নি** শব্দের অর্থ থেকে পাঠক জেনেছেন, আগুন কত রকম এবং কোথায় কোথায় থাকে। আর, যেখানে আগুন থাকবে, সেখানে উষ্ণতা তো থাকবেই। তা সে উগ্র, তীক্ষ্ণ, কড়া, ক্রোধন ... ইত্যাদি যাই হোক। এমনকি উত্তাপের উষ, আতপ বা পলাণ্ডুর (পেঁয়াজের) উষ, দক্ষতা বা পটুত্বের উষ, সব উষ-ই কিন্তু কমবেশি useful।

তবে উষ্ণ শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আজকাল (মানুষের মাপে) মৃদু তাপ বোঝাতে উষ্ণ, মাঝারি তাপ বোঝাতে তপ্ত বা গরম এবং অতি তাপ বোঝাতে উত্তপ্ত শব্দের ব্যবহার চলে। ইংরেজিতে মৃদু তাপ বোঝাতে warm শব্দের ব্যবহার হয় এবং অধিক তাপ বোঝাতে hot শব্দের ব্যবহার চলে। 'সুখস্বর্গ' অবশ্যই warm হয় যখন তা শীতের দেশের মানুষের 'স্বর্গ' হয়; আর যদি তা গ্রীষ্মের দেশের মানুষের স্বর্গলোক হয়, তবে সেখানে শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়ে স্বর্গবাসীর প্রাণ জুড়ায়। ৬. use।

উষ্ণীষ : ১. উষ্ণ + ✓ঈষ্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উষ্ণতার গতিশীল আধারের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ যাহা হইতে। /* তাপ নাশ করে যে। (ব.শ.)। ৩. শিরোবেষ্ট, পাগড়ি, কিরীট, রাজমুকুট। (ব.শ.)। ৪. turban বা 'পাগড়ি' অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. প্রাথমিক ভাবে মনে হতে পারে, উষ্ণীষ বুঝিবা তাপ নাশ করে বলেই তার নাম উষ্ণীষ হয়েছে। কিন্তু **ঈষ** ও **ঈষৎ** শব্দ থেকে আমরা জেনেছি, তাতে দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ থাকার কথা। সেই কথাটিকে গুরুত্ব দিলে বোঝা যায়, উষ্ণীষ একটি বিশেষ চিন্তাশৃঙ্খলার দিশাগ্রস্ত প্রকাশ ঘটাতে থাকে। রাজা যে উষ্ণীষ মাথায় দেয়, তা বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক চিন্তাশৃঙ্খলাকে মাথায় ধারণ করে রাখে ও তারই প্রকাশ ঘটাতে থাকে, হতে পারে সে দর্শন কোনো জ্ঞানীর বা জ্ঞানীগোষ্ঠীর, মুনি-ঋষির, আউলিয়া-আম্বিয়ার, বা অ্যারিস্টটল-প্লেটোর। সেই কারণে, এই উষ্ণীষ ধারণ পরবর্তীকালে **টুপি**-পরানোর ধারণায় রূপান্তরিত হতে পেরেছে। মানুষের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক দর্শনকে সরিয়ে বিশেষ দর্শনকে তার মাথায় চাপানোর অর্থই হল উষ্ণীষ ধারণ বা **টুপি** পরানো, যাতে সেই টুপিধারক নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। সেকারণেই বাংলাভাষীদের মধ্যে একটি কথা প্রচলিত হতে পেরেছে যে, গান্ধী নিজে টুপি পরেননি, কিন্তু তাঁর অনুসারীদের সবাইকে টুপি পরিয়েছেন। দ্র. **টুপি**।

উষ্মা, উষ্মা : ১. ✓উষ্ + ম (মক্) - কর্তৃবাচ্যে; উষ্ম + স্ত্রী আ (টাপ্), অথবা, ✓উষ্ + মন্ (মনিন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উষ্ সীমায়িত যাহাতে তাহার আধার। /* দাহ করে যে। (ব.শ.)। ৩. উত্তপ্ত, ক্রুদ্ধ, গ্রীষ্মকাল, বসন্তকাল, ঘর্ম্ম, ক্রোধ, কোপ, অশ্রু, উৎসাহ। প্রভা, কিরণ; বাষ্প, জঠরাগ্নি, মনস্তাপ, সন্তাপ, তেজঃ, পিত্তজ তাপ, স্মরজ্বর, রোষ, আগ্রহ, উষ্মবর্ণ। (ব.শ.)। ৪. anger বা 'অল্প ক্রোধ' অর্থে প্রচলিত। ৫. উপরোক্ত প্রতীকী অর্থগুলির মধ্যে উষ্ কোনো না কোনোভাবে রয়েছে, কিন্তু অশ্রু, উৎসাহ, আগ্রহ, এই তিনটি অর্থের ভিতরে কীভাবে তা রয়েছে, তা এখনও ঠিকঠাক বোধগম্য হয়নি।

ওষ : দ্র. **ওষ্ঠ**।

ওষধি (ওষুধ, ঔষধ) : ১. ওষ + ✓ধা + ই - ধি। (ব.শ.)। ২. *উষ্‌ধারীকে গতিশীলরূপে ধারণ করে যে। /* যাহাতে দীপ্তি ধৃত হয়। (ব.শ.)। যাহাদের ফল পাকিলে মরিয়া যায়। (মনুসংহিতা)। ৩. ধান্য, যব, কদলী ইত্যাদি। ৪. medicine অর্থে প্রচলিত। ৫. আমাদের খাদ্যগুলি সবই 'উষ' ধারণ করে। (এই 'উষ'কে পশ্চিমের পণ্ডিতেরা মেপে ফেলেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন ক্যালরি, calorie। এখানেই তাঁদের গৌরব। অখণ্ডতায় তাঁদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা থাকলেও, খণ্ডতায় তাঁদের সাফল্য অতুলনীয়।) সেই কারণে সেগুলিকে ওষধি বলা হয়। পরে পরে ওষধি শব্দের অর্থ সীমিত হতে হতে medicine-এ গিয়ে ঠেকেছে। তবে পুরাণাদিতে যে ওষধি শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়, তার অর্থ সবধরনের খাদ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। মনুসংহিতার জগৎসৃষ্টি অধ্যায়ে ওষধির বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য আছে। তার মতে 'ফল পাকিলে যাদের মৃত্যু হয়' সেই সমস্ত সত্তাগুলিই ওষধি পদবাচ্য। এখন কে কে 'ফল পাকিলে' মরে, তার খোঁজখবর করতে গেলে অবাক বিস্ময়ে দেখা যায়, তা ধান-গম-মুগ-মসুর ইত্যাদি পেরিয়ে অনায়াসে 'কার্য্য পরিসমাপ্তির পর যে শরীরের (সামাজিক সংগঠনের) মৃত্যু ঘটে' তাকেও বোঝাচ্ছে। তার মানে, মরসুমী মীন-ধরা, কাঠ-কাটা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা সাময়িক কোম্পানিগুলিও 'ওষধি' পদবাচ্য। দ্র. **গন্ধমাদন**।

ওষ্ঠ : ১. ✓উষ্ + থ (থন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উষ্ থাকে যাহাতে। /* যাহা খাদ্যে উষ্ণ হয়। ৩. উপর ও নীচের ঠোঁট। (ব.শ.)। ৪. lips বা 'ঠোঁট' অর্থে প্রচলিত। ৫. ঠোঁট খাদ্যে উষ্ণ হয় বলে তাকে 'ওষ্ঠ' বলে নাকি শরীরের উষ্ণতার 'উষ্' (দ্র. **ওষধি**) পরিমাণ ঠোঁটে থাকে বলে তাকে 'ওষ্ঠ' বলে, তা ভাববার বিষয়। আমাদের ধারণা, দ্বিতীয়টিই ঠিক। ৬. আবেস্তায় aosta, প্রুশিয়ান ভাষায় mouth অর্থে austa, Old Saxon-এ mouth অর্থে usta প্রচলিত। (ব.শ.)।

'উহ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : উহ্, উহ, উহা, উহান, উহি, উহু, উঁহু, উহুঁ, উঁহুঁ, উহ্যমান, উহ্য, ওন, ওনা, ওনাদের, ওহ, ওহা, ওহে, ওহো।

উহ্ = উদ্‌লোকে হওয়ন। **উহ** = উদ্‌লোকে হওয়ন থাকে যাহাতে।

উহা : ১. ✓উহ্ + অ, স্ত্রী আ। ২. *উদ্‌লোকে হওয়ন ধারিত থাকে যাহাতে।* ৩. তাহা, ঐ বিষয় বা বস্তু, সে, ও। (ব.শ.)। ৪. that বা 'ঐ' অর্থে প্রচলিত। ৫. অস্তিত্বের ত্রৈমাত্রিক বৃত্তের বাইরে কোনো কিছু থাকলে, সেটি উহ। সেই উহ যে আধারে রয়েছে, তাকে বলে উহা। তাকে আমরা হাত উঁচুতে তুলে দূরে দেখাই। তাই উহা।

উহ্য : ১. ✓উহ্ + য। ২. *উদ্‌লোকধারীর ভবন থাকে যাহাতে।* ৩. শব্দটি ব.শ.-তে নেই, রয়েছে 'উহ্যমান' এবং দেখানো হয়েছে যে, এই শব্দটি 'বহ্' ক্রিয়াবংশের সন্তান। অন্য অভিধানে উহ্য থাকলেও তা 'উহ্য' রূপে লিখিত। অর্থ দেওয়া হয়েছে অনুক্ত, অনুমেয়, (সংসদ অভিধান); এবং অপ্রকটিত, অনুল্লিখিত, অব্যক্ত, অনুচ্চারিত, অনুক্ত, অনুমেয় (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা)। ৪. untold বা 'অনুচ্চারিত' অর্থে প্রচলিত। ৫. উহা ও উহ্য একই ক্রিয়ার দুটি দিকের কথা বলে। প্রথমটিতে কোনো কিছুকে 'উল্লেখ করে দেখানো' হয়, দ্বিতীয়টিতে তা উল্লেখ করা হয় কিন্তু দেখানো হয় না। ফলে তার প্রকাশে নানা জটিলতা তৈরি হয়েছে।

উ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : উ (উমা), উঃ, উঁ, উ-কার, উঁকি, উঁকিঝুঁকি, উক্ষ্, উক্ষ, উক্ষতর, উখা, উগ্র, উগ্রি, উঞ্ছ্, উঞ্ছ, উঞ্ছধর্ম্মা, উঞ্ছবৃত্তি, উঞ্ছশিল, উঞ্ছোপজীবী, উণাদি, উতথ্য, উনি, উভ, উভয়, উভয়চর, উভয়ত, উভয়তঃ, উভয়ত্র, উভয়থা, উভয়পক্ষ, উভয়পদী, উভয়বিধ, উভয়বেতন, উভয়সঙ্কট, উভয়স্নাতক, উভয়াত্মক, উভার, উমঙ্গ, উমা, উমেশ, ও-কার, ওঁকার, ওঁচা, ওঁছা (উঞ্ছ), ওক, ওঙ্কার, ওনা, ওনাকে, ওনাদের, কুম্ভ, কুম্ভকার, কুম্ভজ, কুম্ভীলক, কুম্ভীর।

/

উঞ্ছ (ওঁচা, ওঁছা) : ১. ✓উঞ্ছ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। ২. *উদ্‌লোকে (আনয়নের) রহস্যরূপ আচ্ছাদিত থাকে যাহাতে।* / (যে ক্রিয়ার মাধ্যমে) ক্ষেত্রাদিতে পতিত ধান্যাদির কণশঃ আদান (করা হয়), অর্থাৎ ধান্যাদি একটি একটি করিয়া খুঁটিয়া লওয়া হয়। (ব.শ.)। ৩. ক্ষেত্রপতিত ধান্যাদিগ্রহণ; উদ্ধৃত শস্যের শেষাহরণ, প্রকীর্ণোদ্ধৃত ধান্য, অর্থাৎ ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত ও পশ্চাৎ খুঁটিয়া লওয়া ধান্যাদি; উঞ্ছ সদৃশ হেয় বস্তু। ৪. শব্দটি বর্তমানে 'ওঁচা' বা 'ওঁছা' রূপে প্রচলিত রয়েছে। ৫. ধান কাটা, তার আঁটি বেঁধে, জড়ো করে, সেই সমস্ত ফসল বাঁকে, মাথায়, বা গরুগাড়িতে করে 'খামার'-এ নিয়ে আসা — এইটি হল মূল কাজ। এ-কাজে যে নিরত থাকে সে হল **তপশীল**। আনুষঙ্গিক 'ফালতু' কাজ হল জমিতে পড়ে থাকা সেই ধানের শিষ আহরণ করা। এতেও কিছু ফসল, যৎসামান্য হলেও, ঘরে আসতে পারে। কিন্তু তপশীল-চাষিরা এই শিষ আহরণ করেন না; অর্থাৎ এ কাজকে তাঁরা আদৌ গুরুত্ব দেন না। গ্রামের দরিদ্র বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বা শিশুকিশোরেরা এ কাজ করে থাকে। এই শিষ-কুড়োনোকে বলা হয় 'উঞ্ছ'। দ্র. **উঞ্ছশিল**।

উঞ্ছশিল (উঞ্ছধর্ম্মা, উঞ্ছবৃত্তি) : ১. উঞ্ছ ও শিল। ২. *উঞ্ছজীবী = যে উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। দ্র. **উঞ্ছ**। শিলজীবী = যে শিলবৃত্তির (পাকা ধানের শিষ চয়ন বৃত্তির) দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। উঞ্ছধর্ম্মা = উঞ্ছ কার্য যাহার ধর্ম্ম, বৃত্তি।* ৩. উঞ্ছজীবী, উঞ্ছাজীব, উঞ্ছরূপ জীবিকা, হেয় জীবনোপায়, জঘন্য কার্য্য, নীচবৃত্তি। (ব.শ.)। ৪. 'উঞ্ছবৃত্তি' শব্দটি এখনও প্রচলিত আছে, তবে হেয় কাজ অর্থে। ৫. 'উঞ্ছশিলবৃত্তি' হল ব্রাহ্মণের স্মৃতিবিহিত বৃত্তি। এ কেমন বৃত্তি? কেমন করেই বা সেই সমাজস্বীকৃত ধর্ম্মসম্মত সম্মানীয় বৃত্তি আজ 'ওঁছা' বৃত্তিতে পরিণত হল? আদিতে দুরকম কাজের তথ্য পাওয়া যায়। এক, **শিলবৃত্তি**। এর অর্থ, বিভিন্ন জমি থেকে পাকা ধানের শিষ সংগ্রহ করা। সেটা ছিল কৃষির পরামর্শদাতা রূপে আদি ব্রাহ্মণের তরফে ধানের নমুনা সংগ্রহ। পরে যৌথ সামাজিক ব্যবস্থা অধঃপতিত হয়ে গেলে, সেটা অধঃপতিত এবং অনন্যোপায় ব্রাহ্মণের জীবনোপায় হয়ে যায়। দুই, উঞ্ছবৃত্তি। এর অর্থ, যারা চাষ করেছে তারা ধান কেটে নিয়ে চলে যাবার পর মাঠে যে শিষের টুকরো পড়ে থাকে, তা সংগ্রহ করা। (১৯৫০-৬০ সাল পর্যন্ত বাংলার গ্রামাঞ্চলে এই বৃত্তি ক্ষীণরূপে প্রচলিত ছিল, দেখেছি।) অবশ্য ততদিনে এই বৃত্তি অত্যন্ত হেয় হয়ে গেছে। আদিতে এই বৃত্তি মোটেই হেয় ছিল না, বরং যথেষ্ট মর্যাদার ছিল। দ্র. **তপশীল**।

উমা : ১. ✓উ + ম (মক্) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *সীমায়িত উন্নয়ন যাহাদের; অথবা যারা কাজ করতে যায় না, লেখাপড়া করে।* / যাহা শব্দ করে। (ব.শ.)। ৩. 'উ' (শিব) তাহার 'মা' (লক্ষ্মী) — উমা। 'উ' শব্দে বুঝহ 'শিব', 'মা' শব্দে 'স্ত্রী' তাঁর। উ (ভোঃ) মা (তপ করিও না) — উমা। ... মেনকাগর্ভজাতা হিমালয়কন্যা, হৈমবতী, পার্ব্বতী। শিবপত্নী দুর্গা। অতসী, ক্ষুমা, তিসি, মসিনা, শণ, হরিদ্রা, কান্তি, রাত্রি, শান্তি, কীর্ত্তি। (ব.শ.)। মহাদেবের স্ত্রী। হিমালয় ও সুমেরুদুহিতা মেনকার বা মেনার কন্যা। অন্য নাম পার্ব্বতী। ... মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করেন। ... অপর্ণা সেজে শিবসাধনা করতে থাকেন। উমার কঠোর তপস্যা দেখে তাঁর মা কন্যাকে বলেছিলেন, উ (হে পার্ব্বতী) মা (না) — তপস্যা কোরো না। এই জন্যই এঁর নাম উমা। ... দেবতাদের কৌশলে হরপার্ব্বতীর মিলন হয়, এবং কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করে তারকাসুর বধ করেন ... বিহাররত হরপার্ব্বতীকে দেখে কুবের ... একাক্ষি-পিঙ্গল হয়ে যান। ... রাজা ইল ... ইলা হয়ে যান। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. পুরাণ অনুসারে, মা = করিও না, উ = তপস্যা। অর্থাৎ 'মা উ' কথাটির মানে 'তপস্যা করিও না'। যাকে সেই কথাটি বলা হয়েছিল, তারই নাম হয় উমা। সংস্কৃতে বেশ কিছু শব্দ এইভাবে তৈরি হয়েছে। যথা 'হিংসা করে যে' = **সিংহ**। যাই হোক, তপস্যা শব্দের অর্থ আমরা জানি শ্রম করা, কাজকর্ম করা। ভারতের স্বাধীনতা লাভের আগে পরে, যাঁরা ভারতগঠনে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের আমরা বলতে শুনেছি — 'না না, এই বয়সে মাঠে যাবে কি, লেখাপড়া করতে পাঠাও।' তার মানে 'শ্রম কোরো না, তপস্যা কোরো না, লেখাপড়া করো।' আদি বেদবাদী জ্ঞানজীবী কর্ম্মযজ্ঞের বাইরে গাছতলায় বসে সমাজের শিশুদের উদ্দেশে এই আহ্বান জানিয়েছিল — তপস্যা করিও না, কাজ কোরো না, লেখাপড়া করো। যারা লেখাপড়া করতে লাগল তাদের নাম হয়ে যায় উমা। এইভাবে জ্ঞানবিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের (বা জ্ঞানবৃক্ষের) জন্ম হয়। সেকালের আদি বেদবিরোধীরা এর ঘোর বিরোধী ছিল। সমাজের এই নতুন শ্রেণীটির অপর একটি নাম '**ব্রহ্মচারিণী**'। কারণ এঁরা **ব্রহ্মচর্য্য** পালন করেন। দ্র. **বর্ণাশ্রম, নবদুর্গা**।

উ

উ বর্ণের অর্থ = উ-এর আধার যে। **উ** : উ + উ = **উ**। উ-র অর্থ যখন নবরূপে উত্তরণ, **উ**-এর অর্থ তখন 'নবরূপে উত্তীর্ণ'। উ ও তার আধার মিলে **উ**। উদাহরণ স্বরূপ — যে-ধারা তির তির করে বয়ে যায়, তাকে আমরা বলি 'কুল কুল করে বয়ে যাচ্ছে'। কিন্তু সেই কুলকুল-ধারাকে ধারণ করে ধারার যে দুই পাড় তার বয়ে যাওয়ার আধার রূপে সক্রিয় থাকে, তাকে আমরা বলি 'কূল'; ঠিক যেভাবে 'তির তির ধারা'র পাড়-দুটিকে আমরা বলি 'তীর'। ই-কার ও ঈ-কার এবং উ-কার ও **উ**-কার-এর এই পার্থক্য।

উ বর্গে জাত শব্দসমূহের তালিকা : উন্ = ১ + ০

'উন্' (উহ্) ক্রিয়াপদের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অন্যূন, উন্, উন, উনআশী, উনকোটি, উনচল্লিশ, উনত্রিশ, উননব্বই, উনপঞ্চাশ, উনপাঁজুরে, উনবিংশ, উনবিংশতি, উনমৌলিক, উনলক্ষ, উনশত, উনষষ্টি, উনষাট, উনসত্তর, উনা, উনিশ, উহ্, উহ, উহন, উহনী, উহনীয়, উহা, উহিত, উহাপোহ, উহিনী, দুরূহ, ন্যূন, সমূহ।
উন্ = উর্ধ্বচারীর ন-অন। **উন** : উর্ধ্বচারীর নাকরণ থাকে যাহাতে।
উহ্ = উর্ধ্বাচারীর হওয়ন।

উন : ১. ✓উন্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *উর্ধ্বচারীর নাকরণ (এক-কম) থাকে যাহাতে।* ৩. হীন, ন্যূন, কম, কিঞ্চিদূন, অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত, অল্প, কিঞ্চিদবশেষ, একোন, এক-কম, অবর, হীন, ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল। (ব.শ.)। ৪. যুক্তভাবে — **উনত্রিশ, উনচল্লিশ** এইভাবে প্রচলিত, বর্তমানে স্বতন্ত্রভাবে প্রচলন নেই বললেই চলে। ৫. আধুনিক বাংলায় শব্দটিকে সংখ্যার ক্ষেত্রে ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার করা হয় না। তবে এর অর্থটিকে **উনপাঁজুরে**, উনমৌলিক, **উনা**, **ন্যূন** প্রভৃতি শব্দগুলি এখনও ধরে রেখেছে। ৬. ইংরেজি un-, জারমান un-।

উনপাঁজুরে : ২. যে গোরুর পাঁজরের অস্থি একখান কম। (ব.শ.)। ৩. দুষ্ট, দুর্বৃত্ত। (ব.শ.)।

উহ (উহন, উহনী, উহা, উহিত, উহিনী, উহ্য, সমূহ) : ১. উহ = ✓উহ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **উহ** = *উর্ধ্বাচারীর হওয়ন যাহাতে। উহন* = **উহ্** *অন যাহাতে। উহনী* = **উহন**-*এর গতিশীল আধার যে।* **উহা** = **উহ্**-*এর আধার যে। উহিত* = **উহ্** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* **উহিনী** = **উহ্**-*গতিশীলভাবে নাকরণ হয় যাহাতে। উহ্য* = **উহ্** *থাকে যাহাতে। সমূহ* = *সমান* **উহ** *থাকে যাহাতে।* / উহনী = যাহার দ্বারা মলাদির অপনয়ন সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ৩. **উহ** = **বিতর্ক**, বিচারণা, সংশয়, ন্যূনপূরণার্থ **অধিকোপাদান**, **আগমাবিরোধী** ন্যায় দ্বারা আগমার্থ-পরীক্ষণ, তর্ক, **মনন**, **সিদ্ধান্ত**, **সমূহ**। **উহন** = বিতর্ক, বিচার, অধ্যাহার। উহনী = **সম্মার্জ্জনী**, **ঝাঁটা**। **উহনীয়** = বিতর্ক্য, বিচার্য্য, অধ্যাহার্য্য, **উহ্য**, **অনুমেয়**। **উহা** = **বিতর্ক**, সংশয়, অধ্যাহার। **উহিত** = বিচারিত, **তর্কিত**, **সংশয়িত**, **অধ্যাহৃত**, **অনুমিত**। **উহ্য** = **উহনীয়**, উদ্ভাবনীয়। সমূহ = **নিকর**, **সমুদয়**, **স্তূপ**, রাশি, সকলপ্রকার, নানা, বহু, প্রচুর, সকল, **মিলিত**, **বিষম**, **অত্যন্ত**। (ব.শ.)। ৪. all অর্থে **সমূহ** খুবই প্রচলিত। **একমাত্র উহ্য** শব্দটি অ্যাকাডেমিতে ব্যবহৃত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। **বাকি** সবই অপ্রচলিত। ৫. কৃষিকর্ম, কারুশিল্প, কিংবা চিন্তাপূর্বক কোনো **প্রবন্ধ** রচনাই হোক, প্রতিটি কর্ম সম্পন্ন হওয়ার সময় অনেক উপাদান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। মূল কর্মের ফলে কিংবা তার **পাশাপাশি** এই প্রকার উৎপাদিত হয়ে বা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়াকে **বলে উহ**। তার মধ্যে কোনো **কিছুকে** আলাদা করে তুলে রাখলে তাকে **বলে উহ্য**। আর, কর্মের সমস্ত **উহ**-কে একত্রে বলে **সমূহ**। এই শব্দটিকে আমরা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখি total বোঝাতে। দ্র. **দুরূহ**।

দুরূহ : দ্র. দুঃ।

ন্যূন : ১. নি + ✓**উন্** (পরিহাণ) + অ (অচ্) - **কর্ম্মবাচ্যে**। ২. *যার পরে আর* **উন** *নাই।* ৩. পরিহীণ, বিরহিত, **উন**, কম, গর্হ্য, নিন্দনীয়, অধম, অবর। (ব.শ.)। ৪. at least বা 'অন্ততপক্ষে' অর্থে প্রচলিত। ৬. গ্রীক ভাষায় nanos (= **ক্ষুদ্রাকৃতি**), যার থেকে এসেছে nanotechnology প্রভৃতি ইংরেজি শব্দ।

ঋ

ঋ বর্ণের অর্থ = এই বর্ণটির অর্থ অধিকাংশই অব্যক্ত। যতটুকু অনুমান করা যায়, তাতে মনে হয় ঘূর্ণায়মানতার বা পুনরাবৃত্তিকরণের বা চক্রগতির ধারকই **ঋ**-পদবাচ্য। অর্থাৎ অ = অস্তিত্বলাভ, ই = অস্তিত্বের চলা বা গতিশীলতা, উ = অস্তিত্বের উল্লম্ফন বা নবরূপে উত্তরণ বা উদ্‌লোকে উঠে পড়া, এবং **ঋ** = অস্তিত্বের নবরূপটিকে পুনরায় ঘুরিয়ে দিয়ে নতুন অধ্যায়ের বা পর্য্যায়ের সূচনা করা, যেখান থেকে পুনরায় অ-ই-উ পেরিয়ে অস্তিত্ব এগোতে পারে। এভাবেই অস্তিত্বের বিকাশ হয়। কিন্তু এ তো ঘূর্ণন, আবর্তন বা পুনরাবৃত্তিকরণ! **ঋ**-এর এই পুনরাবৃত্তিকরণ অর্থটি ল্যাটিন, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় 're' অর্থে ধরে রাখা আছে। সেই সুবাদে **ঋ** হল যথেষ্ট গতিমূলক ও 'উগ্র-তেজ'-এর আধার। এই **ঋ** অধঃপতিত হলে র (পুনরাবৃত্তিকারী) হয়। এর আরেকটি রূপ হল রেফ (নিকৃষ্ট — অমরকোষ)। অধঃপতিত র যখন শীর্ষে সক্রিয় হয় তখন তা রেফ হয়ে যায়। ইংরেজিতে এই '**ঋ**'-র একটি অবমানিত রূপ হল re (re-make, re-turn ইত্যাদি)। অতএব, সংক্ষেপে **ঋ** বর্ণের অর্থ হল — পরবর্তী অধ্যায়ে উত্তরণ বা ঘূর্ণন অর্থাৎ অস্তিত্বের বিকাশ সাধন। ... **ঋ**-কার সংস্কৃতে ছিল, বাংলায় নেই। কিন্তু একেবারে নেই

ভেবে নিলে ভারী মুশকিলে পড়তে হয়। কেননা, এমন অনেক ক্রিয়াপদ রয়েছে যেগুলি ঋৃ-কার দিয়ে তৈরি — যেমন তৃ। তার অর্থ জানতে গেলে শুধু ঋ-কার-এর অর্থ জানলেই চলবে না, ঋৃ-কার-এর অর্থ লাগবে। সেটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঈ-বর্ণের অর্থে।

ঋ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : *ঋ, ঋচ্, ঋজ্ (উর্জ্জ্, উজ্জ্), ঋধ্, ঋষ্ (ঋশ্)* = ৫ + ০

'ঋ' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অঋণী, অনর্পণ, অনার্ত্তব, অনার্য্য, অনুর্ব্বর, অনৃণ, অনৃণী, অনৃত, অনৃতী, অনৃতু, অর, অরগুণ, অরঘট্ট, অরঘট্টক, অরণ, অরণি, অরণ্য, অরতি, অরবিন্দ, অরবিন্দদলপ্রভ, অরবিন্দনাভ, অরবিন্দবন্ধু, অরবিন্দাক্ষ, অরবিন্দিনী, অরর, অররু, অরহর, অরাল, অরালকেশী, অরালপক্ষ্মা, অরি, অরিত্র, অরিনন্দন, অরিন্দম, অরিভদ্র, অরিভুক, অরিমণ্ডল, অরিমর্দ্দ, অরিমর্দ্দন, অরিমিত্র, অরিষড়্‌বর্গ, অরিহ, অরিহর, অরুণ, অরুণকঞ্জ, অরুণনন্দন, অরুণপ্রিয়া, অরুণা, অরুণাত্মজ, অরুণারুণ, অরুণিত, অরুণিম, অরুণিমা, অরুণীকৃত, অরুণোদয়, অরুন্তুদ, অরে, অরেরে, অর্ণঃ, অর্ণব, অর্ণবনেমি, অর্ণবপোত, অর্ণবোপম, অর্ণবযান, অর্পণ, অর্পণীয়, অর্পয়িতা, অর্পিত, অর্প্য, অর্ব্বন্, অর্ব্বা, অর্ভ, অর্ভক, অর্ভকলীলা, অর্ভকহার্য্য, অর্য্য, অর্য্যমা, অর্য্যা, অর্য্যাণী, অর্য্যী, অর্শ, অর্শঃ, অর্শা, অর্শান (বর্ত্ত), অর্শায়, অর্শে, অর্শী, অর্শোঘ্ন, অলগর্দ্দ, অলগর্দ্ধ, অলা, অলে, অলেলে, অলো, আই, আইডাহি, আইঢাই (আইমা-ধাইমা, আর্য্যিকা-ধাতৃকা), আজা, আজী, আঞি, আটুপাটু, আদা, আদাকাসুন্দি, আনৃণ্য, আবর্জ্জনা, আবার (অব-আর), আর (সহস্রার), আর (ঔর), আরত, আরতিল, আরবার, আরভট, আরশুলা, আরা, আরাকর, আরাৎ, আরুণি, আরুণ্য, আরে, আরেক, আরেরে, আরো, আর্ত্ত, আর্ত্তব, আর্ত্তি, আর্ত্তিকা, আর্ত্তিপ্রশমন, আর্ত্তিহর, আর্ত্তিহা, আর্ত্তিজীন, আদরক, আর্দ্র, আর্দ্রক, আর্য্য, আর্য্যক, আর্য্যগৃহ্য, আর্য্যচেতাঃ, আর্য্যপথ, আর্য্যপুত্র, আর্য্যপ্রায়, আর্য্যবাক, আর্য্যবৃত্ত, আর্য্যব্রত, আর্য্যভট্ট, আর্য্যভাব, আর্য্যমিশ্র, আর্য্যরূপ, আর্য্যলিঙ্গী, আর্য্যশীল, আর্য্যা, আর্য্যাগম, আর্য্যাবর্ত্ত, আর্য্যি, আর্য্যিকা, আল, আলো, আয়ি, আয়ী, ইরিণ, উদর, উদীর্ণ, উরঃ, উরণ, উর্ম্মি, উর্ম্মিকা, উর্ম্মিমান, উর্ম্মিমালী, উর্ম্মিলা, ওলো,ঔদরেয়, ঔর, ঔর্ম্মিলেয়, ঋ, ঋং (ring), ঋ-কার, ঋণ, ঋণলেখ্য, ঋণশেষ, ঋণাদান, ঋণাপনয়ন, ঋণাপনোদন, ঋণাপাকরণ, ঋণার্ণ, ঋণিক, ঋণী, ঋণোদ্ধার, ঋত, ঋতধামা, ঋতম্ভর, ঋতি, ঋতু, ঋতুকাল, ঋতুগামী, ঋতুচর্য্যা, ঋতুদান, ঋতুনাথ, ঋতুপতি, ঋতুপর্ণ, ঋতুপর্য্যয়, ঋতুপ্রাপ্ত, ঋতুবতী, ঋতুবেলা, ঋতুমঙ্গল, ঋতুমতী, ঋতুমুখ, ঋতুযাজী, ঋতুরক্ষা, ঋতুরাজ, ঋতুলিঙ্গ, ঋতুসংহার, ঋতুসন্ধি, ঋতুসময়, ঋতুসেব্য, ঋতুস্নাতা, ঋতুস্নান, ঋতুহরীতকী, ঋতে, ঋত্বিক, ঋভু, ঋভুক্ষ, ঐরি, ঐরী, কচুরি, কচোরী, কর্চ্চরিকা, কেরে, ডমরু, ব্যর্থ, যথার্থ, যদর্থ, রত্নি, রি (re, re-make), রিতু, সমর, সমরাঙ্গণ, সমর্থ, সমর্থক, সমর্থন, সমর্থিত, সমর্পণ, সমর্পিত, সহোদর, সামর্থ্য, সোদর।

ঋ = পুনরাবৃত্তিকরণ ঘূর্ণনের কারণে বিকাশ চলে যাহাতে (যে সূত্রে, নিয়মে, নিয়মধারী লোকে)।

ঋ : ৫. স্বরবর্ণগুলির মধ্যে ঋ অনেকটাই অব্যক্ত। যতদূর বোঝা সম্ভব হয়, তা সংক্ষেপে এইরূপ : অ-ই-উ, এই তিন সত্তা এবং জ-গ-ৎ [বা জ্ (= জনন) গ্ (= গমন) ৎ (= উল্লম্ফন)] এই তিন সত্তা কার্যত একই বিষয়ের যথাক্রমে আধার ও আধেয়র প্রকাশ। অ হল জন্মের ঠিক পরের থেকে যে অবস্থা; ই হল সেই জাত সত্তার চলতে থাকা বা বিকাশ হতে থাকা বা বাড়তে থাকা; এবং উ হল বাড়তে বাড়তে তার উদ্‌লোকে উত্তরণ বা উল্লম্ফন (= বৈপ্লবিক পরিবর্তন)। এতে সত্তার অস্তিত্বের একটি অধ্যায় সম্পূর্ণ হয়। তার পরেই শুরু হয় তার পরবর্তী অধ্যায়ের সূত্রপাত, যা যথাপূর্বং অ-ই-উ বা জগৎ-রূপে এগিয়ে চলে। আমরা আগেই জেনেছি, উ-তে বা উদ্‌লোকের উত্তীর্ণতে পৌঁছে সত্তা দৃশ্যত উলটো বা বিপরীতমুখী হয়ে যায়। সেই অবস্থা থেকে পুনরায় তাকে তার বিকাশের অভিমুখে ঘুরিয়ে দিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা হয়ে থাকে। এভাবে উত্তীর্ণকে 'পরবর্তী অধ্যায়ে গতিশীল করে যে', তাকেই বলা হয় 'ঋ'। অর্থাৎ ঋ বর্ণের অর্থ হল 'পুনরাবৃত্তিকরণ' বা 'ঘূর্ণন'। অতএব একে 'পরবর্তী অধ্যায়ের গতিদানকারী' কিংবা 'আবর্ত্তনমূলক গতিদানকারী' হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। যেহেতু প্রতিটি অধ্যায়ই একটি অ-ই-উ বা জগৎ, তাই এককথায় ঋ-র আর একটি অর্থ হল জগৎকরণ। কিন্তু এ তো একধরনের পুনরাবৃত্তি! ঘুরে ঘুরে চলা! সেই কারণে ঋ-করণের আর একটি অর্থ পুনরাবর্ত্তিত হওয়া, পাণিনি যার উল্লেখ করেছেন 'রিং' বা 'রীং' রূপে। এই 'পুনরায়' অর্থটির উত্তরাধিকার ল্যাটিন, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় বিশেষভাবে রয়েছে 're' রূপে, এবং এর আবর্ত্তমান রহস্যরূপটি রয়েছে 'রিং' (ring) রূপে। এছাড়াও এর আরও অনেকগুলি রূপ রয়েছে। ঋ থেকে জাত শব্দগুলির অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে তা যথাসাধ্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হবে। মনে হয়, মানুষ চাকা আবিষ্কার করার পরই 'ঋ' ধারণায় পৌঁছাতে পেরেছিল কিংবা 'ঋ' ধারণায় পৌঁছে তবে চাকা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। ৬. re- (re-turn), ring।

অর, অরগুণ : ১. ✓ঋ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। অর + **গুণ**। ২. *আবর্তন রহে যাহাতে; অর গুণ যাহার*। ৩. অর = শৈবাল, কোণ, পর্পট, ক্ষেতপাপড়ী, কালচক্রের দ্বাদশাংশ, অষ্টাদশ তীর্থঙ্কর, চক্রের নাভি (কেন্দ্র) ও নেমির (পরিধির) মধ্যস্থ তির্য্যক কাষ্ঠখণ্ড, চক্রশলাকা, চাকার পাখি (spoke), কালচক্র উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণীর অবয়ব। অরগুণ = সদ্‌গুণ, ভাল গুণ। ঢাকা অঞ্চলে শব্দটির ব্যবহার — 'আরগুণ নাই ছারগুণ আছে'; চব্বিশপরগণা অঞ্চলে — 'অরগুণ নাই বরগুণ আছে'। অথবা, ভারতচন্দ্র কর্তৃক ব্যবহৃত — 'হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই'। কিংবা কালীপ্রসন্ন সিংহের ব্যবহারে — 'সহরে বড় মানুষদের মধ্যে অনেকের অরগুণ নাই বরগুণ আছে। ভাল কত্তে পারবো না, মন্দ করবো, কি দিবি তা দে!' (ব.শ.)। ৪. 'অরগুণ' প্রচলিত। 'অর' স্বতন্ত্রভাবে অপ্রচলিত

হলেও অর-জাত বহু শব্দ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। **আর, আরা** প্রভৃতি শব্দগুলি সবই অর থেকে জাত। **৫.** শব্দটি 'ঋ' ক্রিয়া থেকে জাত। এর 'পরবর্তী অধ্যায়ে গতিদান করে যে' বা 'আবর্ত্তন রহে যাহাতে' অর্থটি নানাভাবে বোঝা যেতে পারে, আর সেজন্যই শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। প্রথমত, একটি গরুরগাড়ির চাকার কথা ভাবুন; তার রয়েছে দুটো বৃত্ত, একটি ছোট, আর একটি বড়। দুটো বৃত্তেরই কেন্দ্রবিন্দু এক এবং সেটি একটি ছিদ্র বা ফুটো। সেই ফুটোতে গলিয়ে দেওয়া হয় গাড়ির ধুরি। ফলে কেন্দ্রটি গাড়ির ধুরির সঙ্গে সংলগ্ন থেকে ঘোরে। সেই ঘূর্ণমান কেন্দ্র-সংলগ্ন ছোট বৃত্ত থেকে বড় বৃত্তের বা চাকার পরিধি বা ring (ঋং)-টি অনেক দূরে। সেই পরিধিতে কেন্দ্রের ঘূর্ণমানতার গতি পাঠানো হয় ব্যাসার্ধের মতো যে যোগসাধনকারী কাঠগুলি থাকে, তাদের মাধ্যমে। আবার উলটোভাবে পরিধির গতি কেন্দ্রে পাঠানো হয় সেই একই কাঠগুলির মাধ্যমে। এই যোগসাধনকারী কাঠের টুকরোগুলিকে 'অর' বলে। গ্রামবাংলায় একে 'আরা'ও বলা হয়ে থাকে। ইংরেজিতে একে spoke বলা হয়। কুয়ায় জলতোলার যন্ত্রটিও এই নিয়মে তৈরি। এতে অরের মাধ্যমে কর্মশক্তির গমন ঘটে বলে একে 'অরঘট্ট' বলে। অতএব এককথায় কেন্দ্রের (বা অস্তিত্বের) বাইরের দিকে ব্যাসার্ধের মতো অজস্র গতির প্রকাশরেখা বেরিয়ে থাকে যাতে, সেগুলিই 'অর' পদবাচ্য। তবে গরুগাড়ি বা ফুলের বেলায় এই অরগুলি দৃশ্যত দ্বিমাত্রিক (টু-ডায়মেনশনাল), কিন্তু সূর্যের মতো বস্তুগুলির বেলায় অরগুলি সর্বদিক গামী বা বহুমাত্রিক। যার অরগুণ আছে, সে এভাবে কেন্দ্রের গতিশক্তিকে পরিধিতে এবং পরিধির গমনকে কেন্দ্রে পাঠাতে সক্ষম হয়। অস্তিত্বের পক্ষে অরগুলি শুভ বটে, অশুভও বটে। এদের ভারসাম্য অস্তিত্বকে নিশ্চয়তা দেয়। **৬.** or।

অরণ : **১.** ✓ঋ + অন (ল্যুট্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *ঋ (পুনঃপুনঃকরণ) বা অর্ (আবর্ত্তনশীল অস্তিত্ব) অন যাহাতে। /* যে যুদ্ধ বিদ্যমান নহে। (ব.শ.)। **৩.** রণশূন্য, শরণ, আশ্রয়। (ব.শ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** 'অর্ অন যাহাতে' কথাটির অর্থ বুঝতে হলে একটি গোল লোহার বলের কথা ভাবুন, যার সব দিকে শজারুর কাঁটার মতো অরসমূহ বেরিয়ে রয়েছে। এই কাঁটা বেরিয়ে থাকা মানে '**অর** অন থাকা'। বলটি যে কোনো কাঁটার উপর নির্ভর করতে পারে, তাই অরণকে শরণ বা আশ্রয় বলা যায়। তবে অন্যভাবেও শব্দটির অর্থ করা যায়, তখন শব্দটিকে বুঝতে হয় 'অ-রণ' বা 'রণহীন' রূপে। হরিচরণ তাই করেছেন এবং লিখেছেন 'অরণ' মানে 'রণশূন্য', লিখেছেন 'অবিদ্যমানযুদ্ধ'। কিন্তু সেরূপ অর্থ তাঁরই দেওয়া ব্যুৎপত্তির সঙ্গে মেলে না। শুধু তাই নয়, শব্দটির ঐরূপ অর্থ অর-যুক্ত অন্যান্য (অরণ্য, অরবিন্দ, অরুণ প্রভৃতি) শব্দগুলির সঙ্গেও মেলে না। কিন্তু যে মুহূর্তে 'অর' শব্দের অর্থ উপরোক্ত 'অর্ অন যাহাতে' বলে বুঝে নেওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ সবকিছুর সঙ্গেই তা কমবেশি মিলে যায়। জগতের ক্ষেত্রে এই অরণ হল পৃথিবী নামক গোলকের পরিধি বা মাটি ফুঁড়ে বেরোনো তালগাছ-আমগাছের মতো অরগুলি; সমাজের ক্ষেত্রে এই অর হল পরিবার, ধর্মপ্রচারক দল, জাতি, গোষ্ঠী, রাজ্য বা দেশ প্রভৃতি সামাজিক সংগঠন বা 'নিয়মবদ্ধ জনসমষ্টি', যা সমাজের মাটি ভেদ করে মাথা তুলে থাকে; এবং মানুষের ক্ষেত্রে এই অরগুলি হল মানুষের মনের মাটি ভেদ করে বেরোনো আমিত্বের বা ইন্দ্রত্বের কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্য প্রভৃতি খোঁচাগুলি, যার কারণে আধুনিক মানুষ শজারুর মতো পরস্পর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখে, অন্যথায় রক্তারক্তি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। **৬.** ইংরেজি earn, yearn।

অরণি : **১.** ✓ঋ + অনি - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***অরণ*** *গতিশীল যাহাতে। /* যাহা অগ্নি জনন করে (অগ্নিজননার্থ যে কাষ্ঠ কাষ্ঠান্তর দ্বারা ঘৃষ্ট হয়)। (ব.শ.)। **৩.** অধরারণি ও উত্তরারণি ('অরণি'র নামান্তর 'অধরারণি'। যে কাষ্ঠের ঘর্ষণে অরণিতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, তাহা 'উত্তরারণি'।), সূর্য্য, অগ্নি, অগ্নিমন্থবৃক্ষ, মাতা, মার্গ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** যে কাঠের ঘষায় আগুন জ্বলে, সেই কাঠটির গায়ের উপরে বেরিয়ে থাকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম **অর**। এরকম দুটি কাঠকে পরস্পরের উপর ঘষাঘষি করলে অরগুলির কারণে আগুন জন্মায়। সূর্য্য বা অগ্নি থেকে স্ফুরিত অরগুলিই কিরণ রূপে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাতা ও মার্গ শব্দের ক্ষেত্রেও নিশ্চিত কোনো অর সক্রিয় থাকে, তবে এখনও আমরা তাকে চিহ্নিত করতে পারিনি।

অরণ্য : **১.** ✓ঋ + অন্য - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***অরণ*** *থাকে যাহাতে। /* যাহা রম্য নহে (যে স্থানে শেষ বয়সে যায় অথবা শ্বাপদেরা যেখানে যায়)। (ব.শ.)। **৩.** বিপিন, কানন, বন, টকফল, বৃক্ষ, শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মচারী পরিব্রাজকের দশ উপাধির একতম। (ব.শ.)। **৪.** forest বা 'বন' অর্থে প্রচলিত। **৫.** অরণ্য বলতে আজকাল সবাই forest-ই বুঝে থাকেন। এই ধারণা মাথায় গেড়ে বসে থাকার ফলে পুরাণাদিতে কথিত 'অরণ্য' শব্দের মানে আর কিছুতেই বোঝা যায় না। একে বুঝতে হলে ভাবা যাক, পৃথিবীটা একটি গোলক, বলের মতো। তার ভেতর থেকে তার গা ফুটে শজারুর কাঁটার মতো বেরিয়ে আসছে কিছু অর। সেগুলিই তো গাছ! যে অঞ্চলে সেই অরগুলি দলবদ্ধ ভাবে রয়েছে, সেই স্থানগুলি অতএব 'অরণ্য'ই বটে।

তার পরেও প্রশ্ন থেকে যায়। তাই যদি হবে, তাহলে শব্দটির অর্থ দিতে গিয়ে ব.শ. 'যাহা রম্য নহে', 'শ্বাপদেরা যেখানে যায়' ইত্যাদি অর্থ দিতে গেলেন কেন? তার কারণ হল, অরণ্য কেবল পার্থিব হয় না; সামাজিক এবং মানসিক অরণ্যও হয়। সামাজিক অরণ্য বিষয়ে বিস্তারিত বলে গেছেন স্বয়ং মহাভারতকার বেদব্যাস। তাঁর মহাভারতে 'অরণ্য' নামে একটি পৃথক অধ্যায় রয়েছে, রামায়ণে রয়েছে 'অরণ্যকাণ্ড'। এগুলি যে নানারকম সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জঙ্গলস্বরূপ 'সংসার-অরণ্য'ই বটে, এই অরণ্যতেই যে 'শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস' ঘটেছিল, ব্যাস-বাল্মীকি-কৃত্তিবাস-কাশিরামের রচনা যথার্থে অনুধাবন করলে তা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। আর, মানসিক অরণ্য হল মনের মাটি ফুঁড়ে বেরোনো দিশাগ্রস্ত ইচ্ছাসমূহ, একালে যার অতিসংক্ষিপ্ত নাম হল 'মতবাদ', বা 'মতবাদ সম্বলিত পত্রপত্রিকা, গ্রন্থ, পুঁথি ও তজ্জাত প্রচার ইত্যাদি'। সেই মতবাদের জঙ্গলে মানুষের কী দুর্গতি হয়, তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ

তাঁর 'আবরণ' প্রবন্ধে। তাঁর ভাষায়, 'মানুষের মনের চারিদিকে এই-যে অতিনিবিড় পুঁথির অরণ্যে বুলির বোল ধরিয়াছে, ইহার মোদো গন্ধে আমাদিগকে মাতাল করিতেছে ... ... উপকরণবহুল সভ্যতার ইহাই ব্যাধি।' দ্র. **অযোধ্যা, পরিব্রাজক**।

অরবিন্দ (অরবিন্দিনী) : **১.** অর + ✓বিদ্ + অ (শ) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *অর (বিন্দু রূপে) বিদ্যমান যাহাতে।* / যাহার চক্রের অরের (আরার) ন্যায় দল (পাপড়ি) লাভ করে। (ব.শ.)। **৩.** পদ্ম, রক্তপদ্ম, কোকনদ, নীলপদ্ম, ইন্দীবর, শ্রেষ্ঠার্থ, তাম্র। (ব.শ.)। **৪.** বর্তমানে কেবলমাত্র অর্থহীন নামরূপে শব্দটি প্রচলিত। কিন্তু এমনকি মাইকেলের যুগেও শব্দটির অর্থ অনেকেই জানতেন। ব.শ. দীনবন্ধু মিত্রের একটি পদ উদ্ধৃতি দিয়েছেন — 'উড়িষ্যার অরবিন্দ কটকনগর।' **৫.** জ্যামিতির পাঠ নেওয়ার সময় পেনসিল-কম্পাস দিয়ে বৃত্ত এঁকে, তাকে আটটি ব্যাসার্ধের দ্বারা সমভাগে ভাগ করে পদ্মফুল আঁকার খেলা বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই খেলেছেন। এই যে পদ্মফুল, এ হল সমাজব্যবস্থার একটি অতি সংক্ষিপ্ত রূপ। **অষ্টদিকগজ, অষ্টকুলাচল, অষ্টনাগ** প্রভৃতি শব্দে এই আটটি 'অর'-এর কথা আছে। তবে এর সর্বোচ্চ প্রয়োগ রয়েছে 'বিষ্ণুর নাভিপদ্ম' ধারণায়, যে পদ্মে বিরাজ করেন ব্রহ্মা। (দ্র. **পদ্ম**)। একালের ভাষায় বুঝতে হলে সর্বাগ্রে একটি রাষ্ট্রের সমস্ত প্রশাসনিক পদগুলিকে ক্রমানুসার বিন্যাসে সাজাতে হয়। সাজালেই দেখা যায়, দেশের প্রধানমন্ত্রীর সচিবদের থেকে শুরু করে থানার দারোগা পর্যন্ত পদসমূহের বিভিন্ন স্তর পদ্মের বা গাঁদা ফুলের পাপড়ির মতো সাজানো হয়ে গেছে। গোটা দেশের প্রচলিত প্রশাসনব্যবস্থার এই যে বিন্দুরূপ, একেই বলে অরবিন্দ। তবে দারোগা-নির্ভর সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা হল তার বাহ্যিক অপকৃষ্ট উদাহরণ। এর উৎকৃষ্ট প্রয়োগ রয়েছে বিশ্বব্যবস্থার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক বিন্যাসে। সেটিকে যাঁরা অনুভব করতে পেরেছিলেন, তাঁরাই লিখে গেছেন — বিষ্ণুর অনন্তশয়নের কথা, যেখানে নাভিপদ্মের উপর ব্রহ্মার অধিষ্ঠান। একই 'অর-বিদ্যমানতা' সামাজিক অরবিন্দের (বিষ্ণুর নাভিপদ্মের) যেমন রয়েছে, তেমনি বাহ্যিক অরবিন্দেরও (lotus নামক ফুলেরও) রয়েছে। তাই পদ্মফুল বা lotus-কেও অরবিন্দ বলে। তবে কিনা, বাহ্যিক অরবিন্দকেই এখন লোকে চিনতে পারে; সামাজিক অরবিন্দকে এখন আর কেউ চিনতেই পারে না।

অরি (অরিত্র, অরিন্দম) : **১.** ✓ঋ + ই (ইন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *অর গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* / যে হননার্থ যায়। (ব.শ.)। **৩.** অরযুক্ত, চক্র; অমিত্র, রিপু, শত্রু, বৈরী, বিজিগীষু রাজার অব্যবহিত-পরবর্ত্তী রাজা, কামক্রোধাদি ষড়বর্গ, ছয় সংখ্যা, লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থান, বিট্‌খদির, মন্ত্রবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** enemy বা 'শত্রু' অর্থে প্রচলিত। **৫.** একটি অস্তিত্ব থেকে বেরিয়ে রয়েছে তার **অব**। সেই অরটি জলকে আঘাত করে করে যখন অস্তিত্বটিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে, তখন অরটি হল **অরিত্র**; কিন্তু যাকে সে আঘাত করছে, সে তাকে দেখছে অরি (শত্রু) রূপে। এই অরিকে দমন করে যে, সে হল **অরিন্দম**। জ্যোতিষবিদ্যা জানলে নিশ্চয় জানা যাবে, 'লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থান' কেন 'অরি' পদবাচ্য। তবে 'বিট্‌খদির' ও 'মন্ত্রবিশেষ' কেন 'অরি' পদবাচ্য, তা এখনও বোধগম্য নয়।

অরুণ : **১.** ঋ + উন (উনন্)। / অরুণ + অ (অচ্) অস্তর্থে। (ব.শ.)। **২.** *অর (ঋ) উন যাহাতে।* / যে আকাশে যায়। (ব.শ.)। **৩.** অরুণবর্ণবান, কৃষ্ণলোহিত, কপিল, বালসন্ধ্যাভ, কপোতবর্ণযুক্ত, ধূসর, লোহিত, নিঃশব্দ, অনুরাগরঞ্জিত, রাগযুক্ত, সূর্য্যসারথি (ইনি বিনতার পুত্র ও গরুড়ের অগ্রজ। অকালে জননীকৃত ডিম্বভঙ্গ হেতু ইঁহার কটির নিম্নভাগ পরিপুষ্ট হয় নাই। সেই জন্য ইঁহার নাম 'অনূরু'। ইনি লোহিতবর্ণ ... সূর্য্যের তেজ-আচ্ছাদনার্থ গরুড় ইঁহাকে সূর্য্যরথে স্থাপন করেন। অব্যক্তরাগ, ঈষদরক্তবর্ণ। কপিলবর্ণ। কুষ্ঠবিশেষ। পুন্নাগবৃক্ষ, গুড়। সূর্য্য। অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। বালসূর্য্য, কঙ্কুম, সিন্দুর, পদ্মরাগমণি। অরুণা = গুঞ্জা, মঞ্জিষ্ঠা, অতিবিষা, ত্রিবৃতা, ইন্দ্রবারুণী, শ্যামাকা লতা। অরুণী = ঊষা, অরুণবর্ণা গবী। (ব.শ.)। মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও বিনতার গর্ভে ডিম্বরূপে এঁর জন্ম হয়। ... বিনতা অকালেই উক্ত ডিম বিদীর্ণ করেন। এই ডিম হতে ঊরুহীন অবস্থায় অরুণ জন্মগ্রহণ করেন। ... রামায়ণের মতে অরুণের পত্নী শ্যেনীর সম্পাতি ও জটায়ু নামে দুই পুত্র হয়। (পৌ.অ.)। **৪.** নামরূপে প্রচলিত। **৫.** ভাবুন, ত্রি-দিগন্তিকা বা থ্রি-ডাইমেনশনাল একটি ক্ষুদ্র গোলক (সূর্য) রয়েছে একটি বিশালাকায় মহাগোলকের (ব্রহ্মাণ্ডের) কেন্দ্রে। ক্ষুদ্র গোলকটির ভিতরের ব্যাসার্ধগুলি দুরকম হতে পারে। এক, নিজ কেন্দ্রবিন্দু থেকে বেরিয়ে নিজের পরিধিতে গিয়ে শেষ হয়ে যাওয়া; দুই, নিজের পরিধি পেরিয়ে মহাগোলকের পরিধিতে গিয়ে পৌঁছানো। প্রথম ক্ষেত্রে গোলকটি তার কিরণকে ব্রহ্মাণ্ডের (ব্রহ্মাণ্ডও তো গোল, তাই সে অণ্ড-পদবাচ্য) পরিধিতে পাঠাতে পারল না। তাই সে অসম্পূর্ণ বা **উন**। অর্থাৎ এর অরগুলি বা কিরণরেখাগুলি **উন** হয়ে রয়েছে। (ত্রিশের বা চল্লিশের চেয়ে কম যেমন **উন**ত্রিশ বা **উন**চল্লিশ, সেরকম)। এইজন্য একে 'বালসূর্য্য' বলা হয়। এই কারণে অরুণ হল ঈষৎরক্তবর্ণ, অব্যক্তবর্ণ, ধূসর, অনুরাগরঞ্জিত, কপিলবর্ণ ইত্যাদি। একই কারণ লুকিয়ে রয়েছে শব্দটির অন্যান্য প্রতীকী অর্থগুলিতে।

মানুষের সমাজবিবর্তনের ইতিহাসে এই 'অর-**উন**' সত্তার আবির্ভাব ও সক্রিয়তার একটি বড় ঘটনাক্রম রয়েছে। ভারতীয় পুরাণাদিতে সেই ঘটনাক্রমের বর্ণনা সারা হয়েছে এইভাবে : — অরুণ আর **গরুড়** দুই ভাই। জন্মস্থান সেই আদি বংশকর্ত্তা কশ্যপ আর মাতা বিনতা। একজন (অরুণ) আদি যৌথঅর্থনীতির বা আদি সমাজতান্ত্রিক পুঁজির (একালের ভাষায় 'আদি রাষ্ট্রীয় পুঁজির') বাহক, আর অপরজন (গরুড়) ধনতান্ত্রিক পুঁজির (নারায়ণের) বাহন। অরুণ আবার ঠিক বাহন নয়, সূর্য্যের রথকে যে সাতটি **অশ্ব** (সাত শ্রেণীর বিশেষজ্ঞরা) টেনে নিয়ে চলে, ইনি তাদের চালনা করেন, অর্থাৎ সারথি। আবার, গরুড় যেমন হিংসাপূর্ণ, গর উড়, উড়ন্ত বিষ, অরুণ ততটা নয়। সে কালো-লাল মেশানো কমলা রঙের, অরুণবর্ণ, খানিকটা অসিত-এর মতো। দ্র. **অসিতদেবল**।

অর্ণঃ (অর্ণস্), অর্ণব : ১. ✓ঋ + অস্ (অসুন্) - কর্তৃবাচ্যে; অর্ণস্ + অ অস্তর্থে। (ব.শ.)। ২. *অর-সমূহের অস্তিত্ব থাকে যাহাতে; অর-সমূহ বাহিত হয় যাহাতে।* ৩. জল। 'জলবান' সমুদ্র, বিপুল দুস্তর বিষয়মাত্র, রাশি, সমূহ, চার সংখ্যা, ছন্দোবিশেষ, সাগরতুল্য বিশালনদী। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. অস্তিত্বমাত্রেই অরবান। সমোচ্চশীলতাধর্মী তরলের স্বভাবই হল, তার সমস্ত অস্তিত্বটাই সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সুবাদে জল ভূমিতে থাকলেই তা অর্ণব হয়ে যায়। এর সর্বনিম্ন রূপ হল জলবিন্দু এবং সর্বোচ্চ রূপ হল সমুদ্র। যে পর্যন্ত এই অর্ণবের পরিধি বিস্তারিত হয়, তাকে তাই অর্ণবনেমি বলে। দ্র. **সমুদ্র, সুন্দরী, ইন্দুর**। অর্ণব শব্দের আরও একটি অর্থ হয় — অর্ণ (টাকাকড়ি) বহন করে যে। যাঁরা রাজকোষ-এর দেখাশোনার কাজ করেন। দ্র. **ব্যাঘ্র**। ৬. ইটালি দেশের ফ্লোরেন্স শহরের গা দিয়ে বয়ে চলেছে যে নদী, তার নাম Arno।

অর্পণ, অর্পিত : ১. ✓ঋ + পণ / ✓ঋ + ই (ণিচ্) = অর্পি। ✓অর্পি + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অর্-পালন অন থাকে যাহাতে; অর্-পালন তারিত হইয়াছে যাহাতে।* ৩. অর্পয়িতা, প্রতিপাদক, প্রাপক, স্বত্বত্যাগানুকূল-ব্যাপার, বিতরণ, দান, প্রতিদান, প্রত্যর্পণ, নিবেশন, ন্যাস, স্থাপন, পদের মুখ্যার্থ পরিহার, মুখ্যার্থ ভিন্ন অর্থবোধ দ্বারা উপযোগীকরণ, নিক্ষেপ, তুণ্ডাদির স্পর্শ বা আঘাত, অগ্নিতে হবিরর্পণ সুবাদি; জুহূ-প্রভৃতি মন্ত্রাদি, হবিরাদি ত্যাজ্য দ্রব্য। (ব.শ.)। ৪. hand-over বা 'অন্যের হাতে তুলে দেওয়া' অর্থে প্রচলিত। ৫. অস্তিত্বের কেন্দ্র থেকে বাইরে যা বেরিয়ে যায় তাই অর বটে, কিন্তু তা যদি তার কেন্দ্রের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং যেখানে যায় সেখানে তা পালিত হতে থাকে তবেই সেটি **অর্পণ** পদবাচ্য। ব.শ. একে বলেছেন 'স্বত্বত্যাগানুকূল ব্যাপার', অর্থাৎ অস্তিত্ব তার এই অর-কে প্রেরণ করে দিচ্ছে চিরতরে; তাই 'অর্-পণ' বা **অর্পণ**। অর্পণ ইত হয়ে গেলে তখন তা অর্পিত। অর্পণ শব্দের এই অর্থটিকে মূল ধরলে, দেখা যায়, অন্য অর্থগুলি তারই বিভিন্ন প্রতীকী রূপ মাত্র। দ্র. **ইত, অতীত**।

অর্ব্বা (অর্ব্বন্) : ১. ✓ঋ + বন্ (বনিপ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অর-বহনের বাহক অন থাকে যাহাতে।* ৩. ঘোটক, ইন্দ্র। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **অর্পণ**। কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন অরকে বহন করে পরিধি পর্যন্ত নিয়ে যায় যে, সেই হল অর্ব্বা, যে কিনা (orbit পর্যন্ত) অর্ব্বন করে। যতদূর অনুমান করা যায়, এই সত্তাই আদিযুগের প্রথম পণ্যবাহক সত্তা। এর মধ্যে ঘটনা ঘটানোর ব্যাপার ছিল বলেই একে 'ঘোটক', এবং এর মধ্যে আমিত্ব ছিল বলে ব.শ. একে 'ইন্দ্র' বলা হয়েছে। ৬. orbit। শব্দটি সম্ভবত 'অর্ব্ব-ইতি'র পাশ্চাত্য উত্তরাধিকার।

আর (আরও, আরো) : ১. আ + ✓ঋ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *আশ্রিত অর যাহাতে।* / যে প্রতিকূলে যায়; যে মন্দ মন্দ গমন করে। (ব.শ.)। ৩. মঙ্গলগ্রহ, শনৈশ্চর, শনিগ্রহ, দূর, মধুরাম্রফল, বৃক্ষভেদ, পিত্তল, প্রান্তভাগ, মুণ্ডলৌহ, কোণ, চক্রাঙ্গ কাষ্ঠবিশেষ, আরা। **অপর, ভিন্ন, অন্যজাতীয়,** ইহা ছাড়া, দ্বিতীয়, দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ ইত্যাদি ক্রমিক, কোনো-এক, পরবর্ত্তী, অন্য, অধিক, বেশি, ইহার অধিক, অবশিষ্ট, পূর্ব্ব, অব্যবহিতের পূর্ব্ব বা পর, অন্যরূপ, অন্যভাব, ...। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে বহুল প্রচলিত। ৫. শব্দটি বাংলাভাষার নিজস্ব সৃষ্টি এবং নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির মধ্যে একটি। এক তো **বর্ত্তমান** (যা ঘুরে চলেছে, যা ক্রমবিকশিত হয়ে হয়ে চলেছে) অস্তিত্ব মাত্রেই ঋ বা অর পদবাচ্য; তার ওপর, বৃত্তের কেন্দ্র থেকে যত ব্যাসার্ধ টানা সম্ভব, সবই অর। বৃত্তটি গোলক হলে অর-এর সংখ্যা অপরিমেয়। একটি অরকে ধরে যখন বিবেচনা চলছে, তখন বাকি সমস্ত অরগুলি 'আর' পদবাচ্য। বিষয়টিকে অন্য এক ভাবেও বুঝে নেওয়া যেতে পারে। অস্তিত্ব থেকে কত যে অর বেরোয়, তার কোনো পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। সূর্য্যের কিরণরেখার সংখ্যা কত, ভাবলেই বিষয়টি সহজে বোধগম্য হয়ে যায়। অতএব এই দৃষ্টিতে, অস্তিত্ব মাত্রেই অজস্র অর-জননকারী এবং এই অরগুলি যত দূরে যায় ততই 'মন্দগামী' হতে থাকে। আপনি যা নিয়ে ভাবছেন, তা বাদে বাকি সবই তাই 'আর' পদবাচ্য। আরও, আরো ইত্যাদি সেই আর-এর প্রসারিত রূপ মাত্র। ৬. or-এর বেলায় আলোচ্য অরকে ছেড়ে অন্য একটি অরকে ধরা হয়; কিন্তু 'আর'-এর বেলায় আলোচ্য অরকে না ছেড়ে অন্য একটি অরকে ধরা হয়।

আর্ত্ত, আর্ত্তব, আর্ত্তি : দ্র. **ঋত**।

আর্য্য, আর্য : ১. ✓ঋ + য (ণ্যৎ) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নতুন বা পরবর্তী অধ্যায়ে আবর্ত্তনশীল বা গতিশীল (চিন্তা ও কর্ম) -এর আশ্রয় যাহাতে।* / উপজীব্যতা হেতু উপগম্য। (ব.শ.)। ৩. বিদ্বান, অনুষ্ঠাতা, মহাকুল, কুলীন, সভ্য, মান্য, পূজ্য, সাধু, শ্রেষ্ঠ, উৎপথধাবনবিমুখ, কর্ত্তব্যাচারী অকর্ত্তব্যত্যাগী ও আচারবান, প্রাপ্তব্য, শান্তচিত্ত, উদারচরিত, সঙ্গত, উচিত, কুলশীলাদিসম্পন্ন, তত্ত্বাবলম্বী, তত্ত্বদর্শী, বুদ্ধ, জ্ঞানী, আর্য্যাবর্ত্তবাসী বেদোক্ত প্রাচীন জাতিবিশেষ [... ইরানের (প্রাচীন পারস্যের) অধিবাসীরাও আপনাদিগকে 'আর্য্য' (Avesta – Airya) নামে অভিহিত করিতেন; ইঁহাদের বাসস্থান 'ইরান'ই (Avesta – Airyana) তাহার পরিচায়ক। আর্য্যগণের মধ্যে প্রথম বর্ণবিভাগ ছিল না, পরে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ে তাঁহারা বিভক্ত হন এবং শূদ্র চতুর্থ বর্ণ হয়।], ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়, দ্বিজাতি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কর্ত্তব্যাচারী আচারনিষ্ঠ জন, সদ্‌বৃত্ত জন, ধার্ম্মিক, সুহৃৎ, গুরু, আচার্য্য, শ্বশুর, স্বামী, প্রভু, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ... সম্মানসূচক শব্দ, পিতামহ, বুদ্ধদেব। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. আদিতে শব্দটি সমাজের সেইসব গতিশীল মানুষদের বোঝাতো, যাঁরা নতুন চিন্তা ও কর্মের আশ্রয় ছিলেন; এবং সেকারণেই যাঁরা সমাজকে নতুন দিগন্ত দেখাতে পারতেন। (একালে এইরূপ মানুষকে 'Minds of Fire' বলার নতুন একটা রেওয়াজ শুরু হয়েছে।) পরে, এই প্রকার শিবনীতি ত্যাগ করে দক্ষনীতি অনুসরণের কারণে তাঁরা একই কর্মের-চিন্তাভাবনার-উত্তরাধিকারের-স্ত্রীর-বংশপরম্পরার পুনরাবৃত্তিকারী হয়ে যান এবং দীর্ঘকাল সমাজ-পরিচালকের আসনে থাকার ফলে তাঁরা ক্রমেই মৌলবাদী হয়ে পড়েন। তখন আয়ের

পাশাপাশি উপ-আয়ের (**উপায়েব**) মতো, চাকরির পাশাপাশি টিউশনি বা ঘুষের মতো, সমাজে **জীবিকার** পাশাপাশি উপজীবিকারও প্রচলন হয়ে যায়। তখন আর্য্য শব্দের অর্থ হয়ে যায় 'উপজীব্যতা হেতু উপগম্য' অর্থাৎ, জীবিকার স্বাভাবিক পথ ছেড়ে **উপজীব্য**তার জন্য যাঁদের কাছে উপগমন করতে হত, তাঁরাই আর্য্যপদবাচ্য হয়ে যান। পরে পরে আর যতরকম অর্থে শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত হয়, তার প্রায় সবগুলির উল্লেখ ব.শ. করেছেন, যা উপরে ৩ নম্বর সারণিতে দেওয়া হয়েছে। ৬. Avesta – Airya; Greek – Areia, Aria; Latin – Arianus; German – era, Ehre; Irish – Erin। (ব.শ.)।

আর্য্যাবর্ত্ত, আর্যাবর্ত : ১. আর্য্য + আবর্ত্ত। ২. *যেখানে আর্য্যগণের আবর্ত্ত চলে। /* আর্য্যগণের আবর্ত্ত, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উদ্ভবের স্থান। — কুল্লুক ভট্ট। (ব.শ.)। ৩. পূর্ব্বসমুদ্র, পশ্চিমসমুদ্র, হিমালয় ও বিন্ধ্য এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ। উত্তরাপথ, পুণ্যভূমি। (ব.শ.)। ৪. কদাচিৎ উপরোক্ত ভূভাগ অর্থে প্রচলিত। ৫. নতুন চিন্তার লোকেরা সমাজের উপরিভাগে মাথা তোলার চেষ্টা করলেই, তাদের পিটিয়ে দমিয়ে দেওয়া, তাড়িয়ে দেওয়া — এটি একটি স্বাভাবিক রীতি। ভারতবর্ষে দক্ষোৎপত্তিকেও (বা আর্য্যোৎপত্তিকেও) বারংবার লাঞ্ছিত করা হয়েছিল, বিতাড়িত করা হয়েছিল। সম্ভবত বিতাড়িতরাই প্রাচীন পারস্যের বা ইরানের আর্য্য। তবে শেষ পর্যন্ত সমাজের তৎকালীন পরিচালকেরা বিফল হন এবং আর্য্যোৎপত্তি ঠেকানো যায়নি। যে অঞ্চলে আর্য্যোৎপত্তি সম্ভব হয়েছিল, সেই অঞ্চল আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত হয়। ভারতের এই অঞ্চলকে আজকাল অনেকে 'গোবলয়' বলে থাকেন। 'আর্য্যরা বহিরাগত' — এই তত্ত্বটি ভারতীয় আর্য্যগণের গ্রন্থাদি বা পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে কোথাও নেই, এমনকি তার আভাস পর্যন্ত নাই। বরং তাঁরা যে এই সমাজের ভিতর থেকেই উত্থিত, তার অজস্র নিদর্শন রয়েছে। তাঁরা সমাজের পরিচালকের আসনে উত্থিত হয়ে যে পর্যন্ত তাঁদের প্রবর্ত্তিত রীতিনীতি গণগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন, ততটাই আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত হয়েছিল। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য সংকলকদ্বয়ের 'খ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

ঋণ : ১. ✓ঋ + ত - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *আবর্ত্তনমূলক গতির রহস্যরূপ যাহাতে। /* যাহা বৃদ্ধি পায়; যাহা অবশ্যই ফেরত দিতে হয়। (ব.শ.)। ৩. উপকারাদি হেতু কৃতজ্ঞতারূপ বন্ধন; (স্মৃতিতে) পিতৃগণ, ঋষিগণ ও দেবগণের ঋণ; মানুষ জন্মমাত্র তিন ঋণে বদ্ধ হয়, পিতৃগণের ঋণ, সন্তান ও শ্রাদ্ধ দ্বারা, ঋষিগণের ঋণ, ব্রহ্মচর্য্য বেদপাঠ ও তপস্যা দ্বারা, এবং দেবগণের ঋণ যজ্ঞ পূজা উপবাস ও ব্রত দ্বারা পরিশোধ করিয়া লোক ঋণমুক্ত হয় (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-পুরাণ); জল, দুর্গভূমি। (ব.শ.)। ৪. loan অর্থে প্রচলিত। ৫. ঋণ বলতে এখন আমরা টাকা ধার নেওয়া বা loan বুঝি, যা কিনা ফেরত দিতে হয়, সুদসহ কিংবা বিনা সুদে। অনেক সময় টাকা ধার দিয়ে অধমর্ণকে নিয়ন্ত্রণও করা হয়। ঋণের সেই অর্থটি ধরা রয়েছে ইংরেজি ভাষার rein শব্দে। কিন্তু এ সবই ঋণ শব্দের সঙ্কুচিত ও কিয়ৎ পরিমাণে প্রতীকী রূপ। তার আবর্ত্তণমূলক গতিদানের চরিত্রটির একটুখানি রয়েছে ঋণের 'টাকা ফেরত দেওয়ার নিয়ম'-এর মধ্যে। তবে, 'ঋণ'-এর যথার্থ ও ব্যাপক রূপটিকে দেখা যায় শাস্ত্রানুসার ঋণ শব্দের প্রকৃত প্রয়োগে। শাস্ত্রানুসারে ঋণ তিন প্রকার, পিতৃঋণ দেবঋণ ও ঋষিঋণ। এই তিন প্রকার ঋণ যথাক্রমে পিতৃতর্পণ, দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণের দ্বারা শোধ করতে হয়। সাধারণভাবে পৃথিবীর সব জাতির সব মানুষেরাই সেই কাজগুলি করে থাকেন, ভারতবর্ষ যে কাজগুলিকে 'পিতৃতর্পণ, দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ' নামে চিহ্নিত করেছিল। সংক্ষেপে বিষয়টি বলে নেওয়া যাক।

আসলে মানুষ জন্মায় তিন উত্তরাধিকার নিয়ে — পিতার শরীরের উত্তরাধিকার বা পিতৃঋণ; পূর্বতন প্রজন্ম পর্যন্ত সমাজের উৎপাদিত বাহ্যসম্পদের উত্তরাধিকার (ঘটিবাটি থেকে ইন্টারনেট, পূর্বতন সমাজ যা বানিয়ে রেখেছে, যার মাঝখানে সে জন্মায়) বা দেবঋণ; এবং পূর্বতন প্রজন্ম পর্যন্ত মানুষের অর্জিত জ্ঞানের উত্তরাধিকার (সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার) বা ঋষিঋণ। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের সাহায্যে পিতার দেওয়া নিজদেহের সেবা করে ও সন্তান উৎপাদন করে পিতৃপ্রবাহ অব্যাহত রেখে আমরা পিতৃঋণ শোধ করে থাকি; একেই সেকালের কোডে পিতৃতর্পণ বলা হত। নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্য কর্মের সাহায্যে পূর্বতন প্রজন্ম পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে আসা উৎপন্ন-সম্ভারের ভোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধি ঘটিয়ে বাহ্যসম্পদের প্রবাহ বা দেবপ্রবাহ অব্যাহত রেখে আমরা দেবঋণ শোধ করে থাকি; একেই সেকালের কোডে দেবতর্পণ বলা হত। আর শুধুমাত্র কাম্য কর্মের সাহায্যে পূর্বতন প্রজন্ম পর্যন্ত আগত জ্ঞানসম্ভারের উপভোগ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন জ্ঞান অর্জন করে নতুন সাংস্কৃতিক উৎপাদনের মাধ্যমে তার বৃদ্ধি ঘটিয়ে ঋষিপ্রবাহ অব্যাহত রেখে আমরা ঋষিঋণ শোধ করে থাকি; একেই ঋষিতর্পণ বলা হত। এই ঋষিপ্রবাহ বা জ্ঞানপ্রবাহের কথা এবং দেবপ্রবাহের কথা রবীন্দ্রনাথও জানতেন এবং বুঝতেন। তাই তিনি বলেছেন, '... আমার যতটুকু সাধ্য, এই প্রবাহের পথকে আগে ঠেলিয়া দিতে হইবে। ইহার জ্ঞানের ভাণ্ডারে আমার সাধ্যমত জ্ঞান, ইহার কর্মের চক্রে আমার সাধ্যমত বেগ সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে।' (ততঃ কিম্)। ঋণ শব্দের এই প্রকার অর্থে 'পরবর্তী অধ্যায়ে গতিদান' করার সম্পূর্ণ ক্রিয়াটিই রয়েছে। দ্র. **অপৌরুষেয়**। আরও বিস্তারিত জানার জন্য সংকলকদ্বয়ের 'গ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। ৬. rein।

ঋত, ঋতব্রত : ১. ✓ঋ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ঋত + ব্রত। ২. *ঋ (বিকাশ, পরবর্তী অধ্যায়ে উত্তরণ, ঘূর্ণন) তারিত যাহাতে; ঋত ব্রত যাহার*। ৩. গত, পূজিত, সত্য, অবিতথ, দীপ্ত, (সায়ণ মতে 'ঋত' শব্দের অর্থ 'সূর্য্য', 'যজ্ঞ', 'জল'। ...) সূর্য্য, যজ্ঞ, সত্য, যাথাতথ্য, ব্রাহ্মণের স্মৃতিবিহিত বৃত্তি — **উঞ্ছশিল**, ধর্ম্মপত্নী শ্রদ্ধার পুত্র দেববিশেষ, কর্ম্মফল, সুপ্রিয় বাক্য, মানসাদি সত্য, ধর্ম্মবিষয়ক ধ্রুব বা অপরিবর্তনীয় নিয়ম, মোক্ষ, বিষ্ণু, পরব্রহ্ম, সত্যাচার। (ব.শ.)। ৪. সুখার্ত্ত (সুখ + ঋত), দুঃখার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত, শোকার্ত্ত, কামার্ত্ত, বন্যার্ত্ত — এভাবে শব্দটি সন্ধিযুক্ত হয়ে প্রচলিত থাকলেও স্বতন্ত্রভাবে অপ্রচলিত। ৫. বৃত্তির রকমফের থেকে আমরা জানতে পারি, **উঞ্ছশীল** ব্যক্তি উৎপাদনের জন্য শ্রম করেন না, বিপরীতে

তপশীল ব্যক্তি উৎপাদনের জন্য শ্রম করেন, **তপস্যা** করেন। কিন্তু সাধারণভাবে লোকে রাতারাতি উঞ্ছশীল কিংবা তপশীল হয়ে যায় না; সভ্যতার-বংশের-উত্তরাধিকারের স্রোতের একটি বিশেষ বিন্দুতে বা ক্ষেত্রে মানুষ জন্মায়। ফলে, উত্তরাধিকারসূত্রে মানুষ উঞ্ছশীলতা কিংবা তপশীলতা বা অন্য কোনো শীলতা পায়। তবে যাই পাক না কেন, সেটিই তার '**ঋ**' বা অর, যা বিবর্তনরূপে প্রাপ্ত বলে তাকে অর্‌ত বা ঋত বলে। এবং সেই ঋত ধারণ করার কারণে মানুষ 'আর্ত্ত' হয়। সুখ ঋত রূপে পেলে সুখার্ত্ত, দুঃখ ঋত রূপে পেলে দুঃখার্ত্ত। কিন্তু সুখ নয়, দুঃখও নয়, শুধুমাত্র ঋ পেলে তাকে নিয়েই যত সমস্যা। কেননা, এ হল একপ্রকারের ঋত, চক্রের গতিটি যেখানে আগের অর থেকে পরের অর-এ পৌঁছে গেছে; অর্থাৎ যা পূর্বসূরী থেকে তারিত হয়ে উত্তরসূরীর হাতে এসেছে। এ হল ঋণ — পিতৃঋণ, দেবঋণ, ও ঋষিঋণ; একালের ব্যাঙ্কের লোন নয়। (দ্র. **ঋণ**)। সায়ণাচার্য্য ঠিকই বুঝেছিলেন — এ হল পিতৃপরম্পরা বা জনসাধারণ অর্থাৎ জল; এ হল বাহ্যসম্পদের পরম্পরা বা যজ্ঞ অর্থাৎ মানুষের বিশাল কর্মজগৎ; এবং ঋষিপরম্পরা বা সূর্য্য অর্থাৎ জ্ঞানকর্মের সমগ্র তেজপুঞ্জ। এই সবটাই ঋতের এলাকা। তা দিয়েই মানবসমাজের '**রীতি**' তৈরি হয়ে থাকে। তাই **ঋতব্রত** মানুষেরাই **সত্যব্রত, তপোব্রত**। এঁরাই মোক্ষের সাধক; এঁরা **অর্কব্রত** বা **দেবব্রত** নন। এই ঋত-র আধার যে হয়, সে হয়ে যায় আর্ত্ত। সুখ-রূপ ঋ তারিত যাহাতে, সে হয় সুখার্ত্ত; ক্ষুধা-রূপ ঋ তারিত যাহাতে সে হয় ক্ষুধার্ত্ত; বন্যারূপ ঋ তারিত যাহাতে সে হয় বন্যার্ত্ত। একালের বানানে অবশ্য 'আর্ত্ত'কে 'আর্ত' করে ফেলা হয়েছে। ফলে, শব্দটির বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি করণ বাদ পড়ে গেছে। আর্ত্ত বা 'আর্ তারণ তারিত যাহাতে' বললে দুটি করণের যোগফল বোঝায়; কিন্তু আর্ত বা 'আর্ তারিত যাহাতে' বললে মাত্র একটি করণের কথা বলা হয়। বাস্তবে কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি করণই লাগে। ৬. ল্যাটিন ritus, ইংরেজি rite, ritual।

ঋতধামা : ১. ঋত + **ধামা**। ২. ঋত *জাত দ্রব্যের ধারক সীমায়িত যাহাতে* / ঋত ধাম যাহার। (ব.শ.)। ৩. সত্যধামা, বিষ্ণু, দ্বাদশমন্বন্তরীয় ইন্দ্র। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পুরাণাদিতে ঋতধামা বা সত্যধামা, সত্যভামা প্রভৃতি সত্তাগুলির কাহিনী রয়েছে। যতদূর বোঝা যায়, এই ঋতধামা হলেন সেই সত্তা, যিনি পূর্বসূরীদের থেকে প্রাপ্ত সম্পদের গৃহরক্ষী ছিলেন। হয়তো একই গুণ বিষ্ণু ও দ্বাদশমন্বন্তরীয় ইন্দ্রের থেকে থাকবে, সেকারণে তাঁদেরকেও ঋতধামা বলা হত। ঋতধামা বা সত্যধামার পৌরাণিক কাহিনীটি সম্পূর্ণরূপে বুঝে নিতে পারলে এই সত্তাকে নিশ্চিতরূপে চিনে নিতে পারা যাবে বলেই মনে হয়। ৬. rite, dome।

ঋতু (ঋতুমতী) : ১. ✓ঋ + তু (তুক্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ঋত বা ঋ-তারণ পরবর্তী অধ্যায়ে (পর্য্যায়ে) বা নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে।* / পর্য্যায় গমন করে যে। (ব.শ.)। ৩. গ্রীষ্মাদি কাল (বৌদ্ধযুগে রচিত অমরকোষ মতে অগ্রহায়ণ হইতে দুই দুই মাসে যথাক্রমে শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হিম — বৎসরে এই ছয় ঋতু। ... ঋগ্বেদে বসন্ত গ্রীষ্ম শরৎ, এই তিন ঋতু। শতপথব্রাহ্মণে তিন পাঁচ ও ছয় ঋতুর উল্লেখ আছে।), স্ত্রীকুসুম, স্ত্রীরজোদর্শন, ঋতুকাল, গর্ভধারণযোগ্য কাল, ঋতুকার্য্য, ঋতুকালে স্ত্রীগমন, ঋতুর সংখ্যানুসারে ছয় (৬) সংখ্যা, যোগ্যকাল-মাত্র, মাস, দীপ্তি, তদভিমানী দেব, বিষ্ণু, শিব। (ঋতু দান করা — ঋতুকালে পুরুষসংসর্গ করা)। (ব.শ.)। ৪. একালের শহুরে বাংলাভাষায় শব্দটির ব্যবহার হয় না বললেই চলে। ৫. চক্রের নেমিতে (পরিধিতে) একটি অরের থেকে পরবর্তী অরের মাঝে যে ফাঁকটুকু থাকে, তা পেরোতে চক্রের গতির যে সময়টুকু লাগে তাকে ঋতুকাল বলে। পৃথিবীর কালচক্র, নারীর সৃষ্টিকাল-চক্র, গাড়ির বা রথের চক্র — যে কোনো চক্রের গতি তার নিজের যে অরে স্থিত বা ঋত, তার থেকে পরবর্তী অরে পৌঁছনোকে বলে ঋতু। ঋতুকাল সেই পর্য্যায় বা ফাঁকটুকু অতিক্রম করার সময়কে বোঝায়। তার মানে, পর্য্যায় বা কিস্তি পূর্ণ হয় যাহাতে তাকে ঋতু বলে। এর পরে আসে পরবর্তী পর্য্যায়। পুষ্পবতী নারীর জীবনের পাঁচ দিন ছেড়ে পঁচিশ দিন করে যে ফাঁক, 'যে সময় ঋতু দান করা বা পুরুষসংসর্গ করা' বিধেয়, সেই সময়কেও সেকারণেই 'ঋতুকাল' বলে। যে নারীর জীবনচক্র এই পাঁচ-পঁচিশের চক্রে ঘূর্ণমান, তাকে সেকারণেই ঋতুমতী বলে।

ঋতুপর্ণ : ১. ঋতু + পর্ণ। ২. ঋতু *('পর্য্যায়গমন') পর্ণ (পরিপূরক) যাহার*। ৩. সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যার রাজা। ইনি নলের নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা লইয়া, নলকে অক্ষবিদ্যা ও অঙ্কবিদ্যাবিশেষ দান করেন। (ব.শ.)। ইনি সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যারাজ অযুতাশ্বের পুত্র। অক্ষক্রীড়া ও গণনাবিদ্যায় এঁর অসাধারাণ কৃতিত্ব ছিল। কলির কোপে রাজ্য হারিয়ে কলিগ্রস্ত নলরাজা 'বাহুক' পরিচয়ে সারথিরূপে এঁর আশ্রয়ে ছিলেন। ... ইনি নলরাজাকে অক্ষহৃদয় (পাশাখেলার বিদ্যা) ও গণনাবিদ্যা দেন। ... বিদর্ভে নলদময়ন্তীর মিলন হয়। সেই বিদ্যার প্রভাবেই নল কলির হাত থেকে মুক্তি ও পুষ্করের হাত থেকে রাজ্যোদ্ধার করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে গমন বা কিস্তিতে কিস্তিতে পেমেন্ট করা — এই ধরনের আচরণ যে সত্তার অস্তিত্বের পরিপূরক, তাকে ঋতুপর্ণ বলে। বিশেষত্ব এই যে ইনি মার্কেট কমপিটিশনে বা অক্ষক্রীড়ায় অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। যে ক্ষত্রিয়রা নলের মতো প্রজাদের উৎপন্ন বিক্রয় করার ব্যবস্থা করে দিত, তারা তখনও ভালরকম মার্কেটিং বা অক্ষক্রীড়া জানত না। ঋতুপর্ণের কাছে সেই শিক্ষা নিয়ে তারা তাদের রাজত্ব পুনরুদ্ধার করে। হয়তো ঋতুপর্ণের কাছ থেকে তারা শিখেছিল, শাসক মৌলবাদী বেদবাদীদের দাবি তৎক্ষণাৎ পূর্ণ না করে কিস্তিতে কিস্তিতে মেটাতে। তাতে তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সক্ষম হয়। তার মানে, ভারতসমাজ ইনস্টলমেন্টে পেমেন্ট-টা নল-দময়ন্তীর যুগেই শিখে ফেলেছিল। বিস্তারিত জানার জন্য 'গ' গ্রন্থের 'বিদর্ভের কথা ...' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

ঋভু : ১. ঋ + ✓ভূ + উ (ডু) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ঋ-ভবনকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে।* ৩. ক) স্বর্গে জাত বা অদিতি হইতে জাত; দেব। দেবগণের দেবতা। দেবগণবিশেষ। ... হরিবংশ

মতে ইঁহারা পঞ্চদেবগণের একতম। ... খ) বৈবস্বত মন্বন্তরে দেবগণবিশেষ। গ) সুধন্বার পুত্রগণরূপ দেবগণবিশেষ। ঋগ্বেদ অনুসারে — সুধন্বা অঙ্গিরোবংশজাত। ঋভু তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র। তদীয় নামানুসারে সুধন্বার তিন পুত্রই 'ঋভু' নামে খ্যাত। ইঁহারা বিশেষ শিল্পকুশল; ইন্দ্রের অশ্ব, অশ্বিনীকুমারের রথ, বৃহস্পতির গাভী ইঁহাদের শিল্পকলার পরিচায়ক। এইরূপ ও অন্যান্য কার্য্যে ইঁহাদের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইলে, দেবতারা ইঁহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বী ত্বষ্টার কৃত একটি চষক দিয়া, তাহাতে চারিটি চষক প্রস্তুত করিতে বলেন। সুচারুরূপে ঐ কার্য্য সম্পাদিত হইলে, ইঁহারা দেবতারূপে পরিগণিত ও যজ্ঞাংশভাগী হন। (ব.শ.)। ক) দেবগণবিশেষ। সতীর দেহত্যাগের পর প্রমথগণ দক্ষের যজ্ঞ নষ্ট করলে, দক্ষের পুরোহিত ভৃগু মন্ত্রবলে অগ্নিকুণ্ড হতে ঋভু নামক সৈন্যদের সৃষ্টি করেন। এরা সতীর অনুচরদের বিতাড়িত করে। ঋভুগণ বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতা। খ) ঋগ্‌বেদে ঋভুগণ অত্যন্ত কর্মকুশল। এরা ইন্দ্রের রথ ও অশ্বদের শোভান্বিত করত। এই জন্য ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে এদের পিতামাতাদের পুনর্যৌবন দেন। ম্যাক্সমুলার বৈদিক ঋভুর সঙ্গে গ্রীকদের প্রাচীন দেবতা অর্ফিয়ুসের (Orpheus) তুলনা করেছেন। গ) পুরাণ মতে ঋভু ব্রহ্মার পুত্র। ইনি তপোবলে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ করেছিলেন। পুলস্ত্য-পুত্র নিদাঘ এঁর শিষ্য। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. উত্তরাধিকার রূপে প্রাপ্ত গতিকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে সত্তা, তাকে ঋভু বলে সন্দেহ নেই। কিন্তু কে সে? বাহ্যজগতে কিংবা মনোজগতে কাকে আমরা ঋভু বলে চিনব? কোনো কারণে অধিকাংশ পরিচালক যদি অনুপস্থিত হন, পরিচালিতের মধ্যেকার কিছু লোকই সাময়িক ভাবে কর্মযজ্ঞ চালিয়ে নেয়। কারণ, পূর্বাগত জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদ সবই তখন তাঁদের করায়ত্ত থাকে। একালে এঁদের কারুশিল্পী, কারিগর, বা skilled-labour বলে। দক্ষযজ্ঞে দুই মতের পরিচালকদের মধ্যে মহাসংগ্রাম হয়ে যাওয়ায় উৎপাদন-কর্মযজ্ঞ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সেই সময় উৎপাদন-যজ্ঞ চালাতে শুরু করেন এই ঋভুরাই। বলা হয়, বৈবস্বত মন্বন্তরে বা আইনবোঝা মানুষদের যুগে (অর্থাৎ বর্তমান যুগে) এঁরা একশ্রেণীর দেবগণ। বটেই তো। একালের কারুশিল্পী বা skilled কর্মনিপুণ শ্রমদানকারীরাও দানই করেন। সম্প্রতি এঁদের নতুন একটি প্রজাতির জন্ম হয়েছে — 'সাইবার কর্মী'। ৬. স্লাভ ভাষায় rab-u, অ্যাংলো-স্যাকসন ভাষায় earfoo, এবং ল্যাটিন ভাষায় labor রূপে প্রচলিত। (ব.শ.)। ইংরেজি reeve শব্দে ঋভুর উত্তরাধিকার বিদ্যমান।

'ঋচ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ঋক, ঋক্‌ছন্দঃ, ঋক্‌থ, ঋক্‌থী, ঋক্‌সংহিতা, ঋক্‌সাম, ঋগ, ঋগ্‌গাথা, ঋগ্বেদ, ঋগ্‌যজুষ, ঋচীক (ঋচীক), ঋচীষ — দ্র. রিচ্।

ঋচ্ = ঋ (পরবর্তী পর্য্যায়ে উত্তরণ, ঘূর্ণন বা বিকাশ) চয়ন; **ঋচ** = ঋ (বিকাশ) চয়নকৃত (চয়িত) যাহাতে।

ঋক্ (ঋচ্, ঋক্-বেদ, ঋগ্‌বেদ, ঋগ্বেদ) : ১. ✓ঋচ্ (স্তব) + ক্বিপ্ (০); ✓ঋচ্ (স্তব) + ক্বিপ্ - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ঋক *(ঋচ্) = আবর্ত্তন করণ (চয়ন) থাকে যাহাতে। ঋক্-বেদ (ঋগ্‌বেদ, ঋগ্বেদ) = যাহা হইতে বা যাহার দ্বারা ঋ-করণ (ঋক্‌মন্ত্রসমূহ) বিদিত হওয়া যায়।* / যার দ্বারা প্রশংসা সাধিত হয়; যাহা দ্বারা দেববিশেষকে, ক্রিয়াবিশেষকে, অথবা ক্রিয়ার সাধনবিশেষকে অর্চ্চনা বা প্রশংসা করা যায়। (সায়ণ / নিরুক্ত : পৃষ্ঠা ৮৭)। (ব.শ.)। যা দিয়ে দেবগণের স্তুতি করা হয়। (পৌ.অ.)। ৩. ঋগ্‌রূপ বা মন্ত্রাত্মক বেদভাগ। ... মনু মতে, ব্রহ্মা, অগ্নি বায়ু রবি হইতে ঋক্ যজুঃ সাম দোহন করেন। ব্রহ্মা পুত্র মরীচি-প্রভৃতিকে চারিবেদ উপদেশ করেন। ... দ্বাপরান্তে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে অবতীর্ণ হইয়া ঋক যজুঃ সাম অথর্ব্ব মন্ত্রসমূহ উদ্ধার এবং ঋক্‌সংহিতাদি চারি সংহিতায় বিভক্ত করিয়া স্বশিষ্য পৈল বৈশম্পায়ন জৈমিনি ও সমন্তকে যথাক্রমে ঋগাদি সংহিতা উপদেশ করেন। ... এক্ষণে যে ঋগ্বেদ প্রচলিত আছে তাহা শাকলদিগের শাখা ... (ব.শ.)। চারিটি বেদের প্রাচীনতম বেদ; ইহা জগতের প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ। ... অপর নাম শ্রুতি। এতে ১০,৫৮০টি ঋক্ আছে। বর্তমানে ১৬৮টি ঋক্ লোপ পেয়েছে। ... পাঁচটি শাখা — শাকল, বাস্কল, অশ্বলায়ন, শঙ্খায়ন, মাণ্ডুক। ... ঋগ্‌বেদ যতবারই নতুন ঋষির দ্বারা চর্চিত হয়েছে, ততবারই নতুন শাখার উদ্ভব হয়েছে। ... এর মন্ত্রগুলি অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, ঊষা, অশ্বিনীদ্বয়, পৃথিবী, মরুৎ, রুদ্র, যম ও সোম — প্রভৃতিদের স্তবস্তুতিতে পরিপূর্ণ। ... (পৌ.অ.)। ৪. ঋগ্বেদ নামক গ্রন্থের ভিতরে লিখিত 'ঋক' নামক মন্ত্র (শ্লোক) রূপে শব্দটির প্রতীকী প্রচলন রয়েছে তথাকথিত শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে; অন্যথায় অপ্রচলিত। ৫. ঋচ্ বা ঋ-চয়ন করার অর্থ হল — যে চেষ্টার দ্বারা অস্তিত্ব এমন নতুন কিছু চয়ন করে, যাতে তার আবর্ত্তনশীলতা (বিকাশ, পরবর্তী অধ্যায়ে উত্তরণ, ঘূর্ণন) সম্ভব হয়; অর্থাৎ যার দ্বারা আপন আবর্ত্তন সাধন করা যায়। কিন্তু এ তো শেষমেষ আবর্ত্তিত-করণ বা ঋ-করণ বা পুনরাবৃত্তি হয়ে গেল! হ্যাঁ, সেকারণেই ঋচ্ কার্যক্ষেত্রে হয়ে যায় ঋক্, এবং সেভাবে চলা হয়ে যায় ঋগ্। এই ঋচ্ বা ঋক্ বা ঋগ্ অতএব আমাদেরকে আত্মবিকাশের, নিজেকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছনোর, আত্ম-আবর্ত্তনের শক্তি যোগায়; আমাদের শক্তিশালী করে। যা স্বভাবত করতে পারি না, ঋচ্ বা ঋক্-এর সাহায্যে আমরা তা করতে সক্ষম হই। তাই শাস্ত্রমতে ঋক্‌মন্ত্র দোহন করা হয়েছিল অগ্নি থেকে। জ্ঞানকর্মের সেই অগ্নিশিখা যে বহন করত, তাকে বলা হত 'শিব'। **শিবই** আদি **ব্রাহ্মণ**। একালের শিবদের বলা হয় Minds of Fire. একালের ভাষায় শিবদের এই ঋক্‌মন্ত্রকে বলা হয় 'তাত্ত্বিক জ্ঞান' বা 'থিয়োরিটিক্যাল নলেজ' বা 'থিয়োরিটিক্যাল অ্যাচিভমেন্ট'। এই বিচারে আইনস্টাইনের $E = mc^2$ হল সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত ঋক্‌মন্ত্রসমূহের অন্যতম ঋক্‌মন্ত্র। মানবসভ্যতার বিকাশের মূলে প্রকৃত শক্তিরূপে সক্রিয় রয়েছে এই ধরনের অজস্র তাত্ত্বিক অর্জন বা ঋক্‌সমূহ। এগুলির পুনরাবৃত্তি করেই মানবসমাজ এগিয়ে চলে, চলেছে। এই কারণেই এগুলিকে ঋক্ বলা হয়। কিন্তু 'ঋক্‌মন্ত্র' বা 'ঋক্-বেদ' ছাড়া বাংলাভাষায় অন্য কোনো ভাবে ঋক্ শব্দটির প্রচলন এখন আর নেই। কিন্তু ইংরেজি উত্তরাধিকারে শব্দটি আজও রয়েছে

rich, reach, right রূপে, যদিও তাদের অর্থ খানিকটা প্রতীকী হয়ে গেছে। সেই সুবাদে শব্দটির সবচেয়ে নিকৃষ্ট অর্থ একালে যা দাঁড়িয়েছে তা হল 'business-mantra' এবং সেভাবে দেখলে **'ঋগ্বেদ'** শব্দের তখন একটাই মানে দাঁড়ায় — 'economics-এর বই'।

একালের কিছু 'অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত' মানুষ আছেন, যাঁরা আপত্তি করেন — ঋগ্বেদে আছেটা কী? কেবল 'হে ইন্দ্র, আমাদের গরু দাও, ধন দাও, সুখাদ্য দাও, মধু দাও, মদ দাও, সুভগা স্ত্রী দাও! এই তো!' বর্বরযুগের বর্বর সর্দারের কাছে নিরীহ মুনিঋষিদের বা সাধারণ মানুষের কাতর প্রার্থনা ছাড়া এসব আর কী? ঋগ্বেদ নিয়ে এরকম আত্মপ্রবঞ্চনার কোনো মানে হয় না। প্রাচীন ঐতিহ্য আর গ্রন্থাদি নিয়ে আদিখ্যেতা! এসব হল বিজেপি-ওয়ালাদের রাজনৈতিক ধান্ধাবাজি; রহস্যময় অতীত বেচে ভোট পাওয়ার চক্রান্ত।

আমাদের বিচারে, দক্ষিণমেরু-উত্তরমেরু (ডানমেরু-বামমেরু) পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। অতিশাসক ও শাসনবিরোধী (বা সমাজবিরোধী) পরস্পরের অস্তিত্বের কারণ ও ভিত্তি যোগায়। তথাকথিত 'অ্যাকা-শিক্ষিত'দের অতীত বিষয়ে অবহেলাই অতীতকে রহস্যময় করে রেখেছে এবং সেই সুযোগে কারও কারও পক্ষে রহস্যময় অতীত বিক্রি করবার সুযোগ করে দিয়েছে। অর্থাৎ, অতীত-বিষয়ে অবহেলাকারী 'অ্যা-শিক্ষিত' মূর্খই অতীত-বিষয়ে আগ্রহী অশিক্ষিত মূর্খের (বা ভোটাকাঙ্ক্ষী মূর্খের) জন্ম দিয়েছে। এই অ্যা-শিক্ষিতেরা ঋগ্বেদের একটি শব্দের মানে না জেনেই তার সম্পর্কে একেবারেই আজেবাজে কথা বলে থাকেন। অন্য দিকে তাঁদের বিরোধীরাও ঋগ্বেদের কোনো শব্দেরই মানে জানেন না, কিন্তু স্বার্থরক্ষাকারী রহস্যময় অর্থ প্রতিষ্ঠা করে সবাইকে বোকা বানান এবং বোকা বনেন। মূর্খের এই দুটি বিপরীতমুখী দলের সবাই ঋগ্বেদ নিয়ে গালাগালি কিংবা মিথ্যাস্তুতি করার সময় 'ঋক্, ইন্দ্র, মুনি, ঋষি ... প্রভৃতি' শব্দের ব্যবহার করেন, কিন্তু তাঁদের কেউই এই শব্দগুলির একটিরও মানে জানেন না, এমনকি জানতেও চান না।

মৌলবাদের উৎপত্তিরহস্য থেকে আমরা জেনেছি ('ঘ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য), যে ব্যক্তি নিজে আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করেননি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নিজের মাথাকে খাটিয়ে' জ্ঞান অর্জন করেননি, অন্যের কাছে প্রার্থনা করে, দাম দিয়ে কিনে, ভিক্ষা করে, দান রূপে গ্রহণ করে, ধার করে, চুরি করে জ্ঞান অর্জন করেছেন; তেমন ব্যক্তি যতই সৎ ও ভালোমানুষ হোন না কেন, তাঁর চিন্তাভাবনার রাস্তাটা হয়ে যায় 'ওয়ান-ওয়ে' বা মৌলবাদী। এক দিকে দিশাগ্রস্ত হয়ে চলা ছাড়া গতি থাকে না তাঁর। এমতাবস্থায় স্বাভাবিক চিন্তাভাবনার রাস্তাটায় যেতে হলে তাঁকে কোনো-না কোনোভাবে অ্যাকাডেমির ট্রাফিক পুলিশদের অমান্য করতেই হয়, প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে। সব অ্যা-শিক্ষিতরা সেটি পারেন না, কেউ কেউ পারেন। যাঁরা পারেন, তাঁরা অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত হয়েও অ্যা-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত থাকেন না; হয়ে যান 'স্বশিক্ষিত' অর্থাৎ 'সুশিক্ষিত' বা 'সুশিক্ষিতের বন্ধু' — স্যার আশুতোষ যেমন ছিলেন (তিনি বিভিন্ন ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে সসম্মানে আমন্ত্রণ জানাতেন)। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলায় এইরকম মানুষের অভাব ঘটেছে। ...

যাই হোক, আমাদের বক্তব্য এই যে, ঋগ্বেদ একটি গ্রন্থ। অঙ্কের বইয়ের মতো জ্ঞানবাহক গ্রন্থ মাত্রেই যতখানি পবিত্র বা অপবিত্র, এটিও ততখানি পবিত্র বা অপবিত্র। এতে রয়েছে সেকালের মানুষের অর্জিত জ্ঞানের কথা, তত্ত্ব ও প্রয়োগের কথা। কিন্তু তা সবই লেখা রয়েছে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মানুসারে। ফলে, তার অনুবাদ করা যায়নি। মন্ত্রগুলির যে-অনুবাদ এখন পাওয়া যায়, সেগুলি সবই প্রতীকী অনুবাদ। তাতে 'পার্ব্বতীসুত লম্বোদর' এর অর্থ হয়ে গেছে 'পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর্', কিংবা 'দেয়ার ওয়াজ এ ব্রাউন ক্রো'র অর্থ করা হয়েছে 'দরওয়াজা বনধ্ করো'। এইরূপ ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদ মন্ত্রগুলির অর্থকে কেবল বরবাদই করেনি, ভুল অর্থ ক'রে সেগুলিকে ব্যর্থ করে দিয়ে বিপুল পরিমাণ অনর্থের কারণ ঘটিয়েছে। সেই সুযোগে একদল উত্তরমেরুবাদী আমাদের প্রাচীন গ্রন্থগুলিকে 'ফালতু' বলে ফেলে দেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন, দক্ষিণমেরুবাদী অন্যদল সেগুলিকে অন্যদের জন্য 'অনর্থকারী অনর্থক' এবং নিজেদের জন্য 'অর্থকরী সার্থক' করে ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করে চলেছেন। এখন সময় এসেছে সেই প্রাচীন গ্রন্থগুলিকে যথার্থে বুঝে নেওয়ার ও অনুবাদ করার। ৬. ইংরেজি rich, riches, reach, right; জারমান Reich।

ঋক্থ (ঋক্থী) : ১. ✓ঋচ্ + থ (থক্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ঋচ্ (rich) থাকে যাহাতে।* ৩. দ্রব্য, বিত্ত, ধন, স্বর্গ, স্মৃতিতে দায়রূপ ধন অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধনাদি। ৪. অপ্র.। ৫. যতদূর বোঝা যায়, এই শব্দটি একমাত্র 'উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধনাদি' অর্থে প্রচলিত ছিল এবং প্রধানত বাহ্যিক ধনকেই বোঝাত। 'ঋক্থী' শব্দটির অর্থই ছিল 'উত্তরাধিকারী'। তবে, এর মধ্যে আরও একটি বিষয় লুকিয়ে রয়েছে। তা হল — ডান হাতে দেওয়া-নেওয়ার বহুকালক্রমাগত একটি প্রথা যা ভারতীয় উপমহাদেশে আজও প্রচলিত। বাঙালি সংস্কৃতিতে বাঁ-হাতে দেওয়া বা নেওয়া নিন্দনীয়। নিমরাজি চাঁদবেনে মা-মনসাকে শেষ পর্যন্ত বাঁ-হাতে ফুল দিয়েছিলেন, যে-হাত দিয়ে তিনি শিবের পুজো করতেন সেই ডান হাত দিয়ে নয়। বিপরীতে যা-কিছু ঘৃণ্য কাজ, অস্পৃশ্যকে ছোঁয়া, সরানো কিংবা মলত্যাগের পর ধোয়াধুয়ির কাজ — এসব সাধারণত বাঁ-হাতে করতে হয় এবং কখনই ডান হাতে নয়। অর্থাৎ পূজা, দান, গ্রহণ ইত্যাদি প্রশংসনীয় কাজের বেলায় ডান হাত এবং ঘৃণ্য কাজের বেলায় বাঁ-হাত ব্যবহারই বিধিসম্মত প্রথা। কিন্তু প্রশ্ন হল, এরকম প্রথা কেন? তার এমন বিশ্বজোড়া বিস্তারই বা কেন? না, এর সন্তোষজনক কারণ এখনও আমরা জানি না, কিন্তু এটুকু নিশ্চিত যে, 'উত্তর-অধিকার' পূর্ববর্তী জন (পূর্বসূরী) থেকে পরবর্তী জনের (উত্তরসূরীর) হাতে যায় এবং তা ডান হাতের মাধ্যমেই যায়। সেই কারণে ঋক্থ হল ডান হাতে পাওয়া ধন। সেটিই তো ঠিক। পূর্বসূরী তো চিরকাল থাকবেন না, তিনি চলে গেলে তাঁর ধন যাবে কোথায়; উত্তরসূরীই তা গ্রহণ করবেন এবং বহন করে নিয়ে চলবেন পরবর্তী জনের হাতে দেওয়ার জন্য। সেটিই তো স্বাভাবিক, অর্থাৎ 'ঠিক'। সেভাবেই তো সভ্যতার প্রবাহ চলে (দ্র. **ঋণ**), অন্যথায় মানুষের অর্জনের স্রোতধারা স্তব্ধ হয়ে যেত। অন্যভাবে বললে, মানুষের ডানহাতই উত্তর-অধিকারের অধিকারী। ডানহাতের এই

'সঠিক' ও 'অধিকার' অর্থটি বাংলাভাষায় প্রচলিত নেই, রয়েছে ইংরেজিতে। ইংরেজি ভাষা তার right (= ঋক্থ) শব্দের মাধ্যমে অর্থ দুটিকে আজও বহন করে নিয়ে চলেছে। ৬. right।

ঋচীক : ১. ঋচ্ + ঈক। ২. *যিনি আবর্ত্তনগতি-চয়নের বিকাশসাধন করেন।* ৩. ভৃগুবংশীয় ঋষিবিশেষ। ইনি ঔর্ব্বের পুত্র এবং জমদগ্নির পিতা। গাধিসুতা সত্যবতী ইঁহার পত্নী। হরিবংশমতে ইনি ভৃগুর পুত্র। (ব.শ.)। ভৃগুমুনির পুত্র। পাঠান্তরে ঔর্ব ঋষির পুত্র বলেও কথিত। সত্যবতীর তিন পুত্র হয় — জমদগ্নি, শুনঃশেফ, শুনঃপুচ্ছ। ... ঋচীক ক্ষত্রিয়দের বিনাশ করবার জন্য অলৌকিক উপায়ে সমস্ত ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। ... নিজের স্ত্রী ও শাশুড়ীর পুত্র হবার জন্য ইনি ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্র দুইপ্রকার যজ্ঞের পায়স তৈরি করেন। ... পায়সবদল হয়ে যাওয়ায় স্ত্রীর ক্ষত্রিয়পুত্র এবং শাশুড়ির ব্রাহ্মণপুত্র লাভ হয়। ... জানতে পেরে সত্যবতী স্বামীর কাছে বর চান যেন তাঁর পুত্র ক্ষত্রিয়ত্ব না পেয়ে পৌত্র পায়। ... তাই জমদগ্নির পুত্র হন পরশুরাম। আর গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. বৈদিক যুগের সূত্রপাত হয় যে 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি' মান্য করার ফলে, তার তাত্ত্বিক দিকটির নেতৃস্থানীয়রা ভৃগু নামে, আর প্রায়োগিক দিকটির নেতৃস্থানীয়রা দক্ষ নামে চিহ্নিত। বৈদিক সমাজের সূত্রপাতের কালে সেই ভৃগুর উত্তরসূরি ভার্গবদের যে মহত্ত্ব ছিল, ক্রমশ কালে কালে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলস্বরূপ ক্ষত্রিয় হয়ে যায় তুলনায় ক্ষমতাবান এবং ভার্গবেরা লাঞ্ছিত। ভার্গবের উত্তরসূরী ঔর্ব্বের সময় থেকে শুরু হয় প্রত্যাঘাতের পালা। দু'তিন প্রজন্মের মধ্যেই এমন পরিস্থিতির সাক্ষাৎ আমরা পাচ্ছি, যখন ব্রাহ্মণ বাহুবলেও শ্রেষ্ঠতার দাবি করছে পরশুরামের মাধ্যমে। বিপরীতে এক ক্ষত্রিয়সন্তান ব্রাহ্মণের জ্ঞানসম্পদে নিজেকে বলীয়ান করার কথা ভাবছে বিশ্বামিত্র হয়ে। একালের আদিবাসী বা অন্যান্য প্রান্তিক সমাজগুলিতে আমরা দেখতে পাই, তাঁদের শিক্ষিতরা একদিকে স্বীকৃতির দাবিতে উগ্রপন্থা (ক্ষত্রিয়ত্ব) গ্রহণ করছে, অন্যদিকে উচ্চ চাকুরি দখল করে আধুনিক ক্ষমতাধরদের জীবনযাত্রাপদ্ধতির বা কালচারের (ব্রাহ্মণত্বের) নকল করছে ব্যক্তিজীবনে। তার মানে, সেকালের ঋচীক আর একালের প্রান্তিক, এরা হল সমাজের সেই সত্তা, যে, নিজ সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পাঠায়। দুটোই আসলে একই সত্তা। তবে এই সত্তার হাতে সত্যবতী ও তার মায়ের গর্ভে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়ার আরও একপ্রকার ব্যাখ্যা হতে পারে। দ্র. **দুষ্মন্ত**।

'ঋজ্' (উর্জ্জ্, উর্জ্জ) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনৃজু, উর্জ্জ, উর্জ্জিত, **উর্জ্জ, ঋজু**, ঋজুকরণ, ঋজ্বায়ত, ঋজ্বী — দ্র. রিজ্, অর্জ্জ,

ঋজ্ = ঋ (বিকাশ, পরবর্তী অধ্যায়ে উত্তরণ, ঘূর্ণন) জনন। **ঋজ** = ঋ-জনিত হয় যাহাতে।

ঋজু : ১. ✓ঋজ্ + উ। ২. *ঋ-জনন নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে। /* যাহা গুণ অর্জ্জন করে। (ব.শ.)। ৩. অবক্র, সরল, সোজা (রেখাদণ্ডাদি), অকপট, অক্রুর, বিলাসরহিত, ভাবশূন্য, অনুকূল, হিতকর, সাধু, সৎ, সহজগম্য, প্রগুণ। (ব.শ.)। ৪. straight বা 'সোজা' অর্থে প্রচলিত। ৫. একটি চাকা বন বন করে ঘুরছে। একে বলে ঋ (re)। কিন্তু চাকাটির তলায় যদি ভূমি সংলগ্ন হয়ে যায়, তখন চাকাটি শুধু ঘুরবে না; ভূমির সমান্তরাল রেখায় সবেগে দৌড় দেবে। তেমন হলে ঋজ্ বা ঋ-জনন তখন আর ঋজ্ থাকল না, ঋজ্ তখন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে ঋজু হয়ে গেল; 'সরলরেখায়-দৌড়'-এ পরিণত হয়ে গেল। একেই বলে ঋজু। তবে কিনা, একালে ঋজুর সমগ্র অর্থটি না-বুঝে শুধুমাত্র তার সরলরেখায় দৌড়োনো গতিটিকে 'সরল' বা 'সোজা' অর্থে বোঝা বা বোঝানো হয়ে থাকে। ৬. Avesta – ereju, Greek – oregw, Latin – rectus। (ব.শ.)। regency, regent, regal, regular, rector প্রভৃতি ইংরেজি শব্দ এই একই শব্দের বংশে জন্মেছে।

'ঋধ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অদ্দ, অদ্দেক, অদ্ধেক, অর্দ্ধ, অর্দ্ধক, অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায়, অর্দ্ধকৈশিক, অর্দ্ধগুঞ্জা, অদ্ধচতুর্থ, অর্দ্ধচন্দ্র, অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়, অর্দ্ধতৃতীয়, অর্দ্ধত্রয়োদশ, অর্দ্ধদিবস, অর্দ্ধদৃষ্টি, অর্দ্ধধার, অর্দ্ধনারাচ, অর্দ্ধনারীশ, অর্দ্ধনারীশ্বর, অর্দ্ধপঞ্চম, অর্দ্ধপঞ্চাশৎ, অর্দ্ধপণ, অর্দ্ধপথ, অর্দ্ধবীক্ষণ, অর্দ্ধভাগ, অর্দ্ধমাত্রক, অর্দ্ধমার্গ, অর্দ্ধমাস, অর্দ্ধরথ, অর্দ্ধরাত্র, অর্দ্ধলিখিত, অর্দ্ধশত, অর্দ্ধসপ্তশত, অর্দ্ধসীরী, অর্দ্ধহর, অর্দ্ধা-অর্দ্ধি, অর্দ্ধাংশ, অর্দ্ধাচিত, অর্দ্ধার্দ্ধ, অর্দ্ধাবলীঢ়, অর্দ্ধাবশিষ্ট, অর্দ্ধাবশেষ, অর্দ্ধাসন, অর্দ্ধিক, অর্দ্ধেক, অর্দ্ধেন্দু, অর্দ্ধোক্ত, অর্দ্ধোদয়, অর্দ্ধোদিত, অধেক, আটকপালিয়া, আটকপালে, আধ, আধকপালে, আধকপালী, আদ, আদ্ধা, আদ্ধি, আধবয়সী, আধ, আধ-আধ, আধই, আধক, আধকড়ে, আধখেঁচড়া, আধপাকা, আধপাগলা, আধবুড়ো, আধমুচকি, আধলা, আধশশী, আধা, আধা-আধি, আধুলি, আধেক, আধো-আধো, ঋদ্ধ, ঋদ্ধিত, ঋদ্ধিমান, ঋধ্, রিধ্, রিধি, সমৃদ্ধ, সমৃদ্ধি। — দ্র. রিধ্, রাধ্।

ঋধ্ = ঋ (বিকাশ, পরবর্তী অধ্যায়ে উত্তরণ, ঘূর্ণন) ধারণ। **ঋধ** = ঋ (বিকাশ, পরবর্তী অধ্যায়ে উত্তরণ, ঘূর্ণন) ধারণ করে যে।

অর্দ্ধ, অর্ধ : ১. অর্দ্ধ্ + অ (অচ্) অস্তর্থে; ✓ঋধ্ + অ (ঘঞ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অর্ দান ধারিত থাকে যাহাতে। /* যাহা দ্বারা সমুদায় বাড়ে। (ব.শ.)। ৩. অংশযুক্ত, খণ্ডিত, সমাংশযুক্ত, অসম্পূর্ণ, সমখণ্ড, ঠিক অর্দ্ধেক, রূপকার্দ্ধ, আধুলি। (ব.শ.)। ৪. half বা 'আধখানা' অর্থে প্রচলিত। তবে, আগে শব্দটি লেখা হত 'অর্দ্ধ' রূপে, একালে লেখা হয় 'অর্ধ'। ৫. অর্ দান ধারিত থাকে পরিধিতে এবং পরিধি মাত্রেই পূর্ণ গোল বস্তুর 'ঠিক অর্দ্ধেক'। কীভাবে এটি হয়, এখন সেকথাই বলি।

গরুগাড়ি বা সাইকেলের চাকার কথা ভাবুন। চাকার আবর্ত্তনগতি রক্ষিত হয় তার অরে। প্রতি পর্য্যায়ে অর সেই গতিকে দান করে দেয় চাকার নেমি বা পরিধির হাতে, তখন পরিধি সেই প্রাপ্তগতিকে

ধারণ করে। তার মানে, আবর্ত্তন-রক্ষণ-দান-ধারণ করে যে, সে হল চাকার নেমি বা পরিধি; কিন্তু সে তো একই সঙ্গে 'অৰ্দ্ধ' বা আধখানাও বটে! তা কেমন করে হয়? হ্যাঁ, হয়। ঠিক এটিই হয়। একটি গোল পাতিলেবুর মাঝখান দিয়ে একটি শিঁক চালিয়ে দিন। লেবুটি শিঁকের ফুটোকে কেন্দ্র করে ঘুরবে। এবার তাতে ভূমি সংলগ্ন করুন। দেখুন সে তার পরিধির উপর ঘুরছে। এই পরিধিটিকে পাবেন লেবুটিকে আধখানা করলে; ব.শ. যাকে বলেছেন 'ঠিক অৰ্দ্ধেক'। অন্য কোনোরকম ভাবেই আপনি ঘূর্ণমান লেবুর বৃত্তের পরিধিটিকে পাবেন না; যা পাবেন তা নিশ্চয় তার চেয়ে ছোট এবং কিছুতেই লেবুটির আধখানা নয়। তার মানে একটি সম্পূর্ণ গোল অবয়বের আধখানা করলেই আমরা 'আবর্ত্তন-রক্ষণ-দান-ধারণ করে যে' তাকে (অর্থাৎ পরিধিকে) পেতে পারি। অতএব, একে 'অৰ্দ্ধ' লেখাই বিধেয়। একালে যে অর্ধ লেখা হয়, তা কিন্তু এই অৰ্দ্ধ অর্থের সমার্থক নয়। অর্ধ মানে 'আবর্ত্তন-রক্ষণ ধারণ করে যে'। তার মানে অৰ্দ্ধ-এর বদলে অর্ধ লিখলে দান-ক্রিয়াটি বাদ পড়ে যায়, এবং তা নেমি ছাড়া অন্য সত্তাকেও বোঝাতে পারে। তবুও জনসাধারণ্যে এরকম প্রয়োগ চলে আসছে। এরকম আরও বহু শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন বৰ্দ্ধন-বর্ধন, সংবৰ্দ্ধনা-সংবর্ধনা ইত্যাদি। বানান নিয়ে পৃথকভাবে কাজ করার সময় এগুলিকে সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারবে।

ঋদ্ধ, ঋদ্ধি (ঋদ্ধিমান) : ১. ✓ঋধ্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে; ✓ঋধ্ + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ঋ-দান ধারণ তারিত যাহাতে।* ৩. ঋদ্ধ = ঋদ্ধিযুক্ত, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সমৃদ্ধিযুক্ত, বৈভবশালী, সমৃদ্ধ, সম্পন্ন, প্রাচুর্য্যযুক্ত, সম্পন্নধান্য, পরিপক্ব-মর্দ্দিত ধান্য, রাশীকৃত ধান্য, সিদ্ধান্ত, বৃদ্ধি, বিষ্ণু, দেববিশেষ। ঋদ্ধি = বৃদ্ধি, অতিশয়, উৎকর্ষ, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, বিভব, ধনসম্পত্তি, সম্ভার, অণিমাদি অষ্ট সমৃদ্ধি বা সিদ্ধি, তপস্যাদি সমৃদ্ধি, সিদ্ধি, অলৌকিক তেজঃ, ঐশ্বর্য্য, কুবের পত্নী, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, দেববিশেষ, অষ্টবর্গান্তর্গত ওষধিবিশেষ, অভ্যুদয়। (ব.শ.)। ৪. wise বা 'জ্ঞানসম্পন্ন' অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. গত ও গতি শব্দদুটির মধ্যে যে সম্পর্ক, ঋদ্ধ ও ঋদ্ধি শব্দদুটির মধ্যে সেই সম্পর্ক। গতি চলতে চলতে যখন শেষ হয়, তখনই গতিশীল হয়ে যায় গত; তেমনি ঋ (re) দান ধারণ করতে করতে যখন শেষ হয়, তখনই ঋদ্ধিশীল হয়ে যায় ঋদ্ধ। যেহেতু ঋ মানেই আবর্ত্তনশীল-বিকাশশীল, অনেক বিকাশশীলতা ধারণ মানেই হয়ে যায় সম্পদশালী, তা সে জ্ঞানসম্পদ বা ধনসম্পদ যাই হোক। সেকারণেই শব্দটির অর্থে সম্পদের-প্রাচুর্য্যের-ঐশ্বর্য্যের এবং তার ধারকদের সম্পর্কে এত কথা।

***'ঋষ্' (ঋশ্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনার্ষ, আর্ষ, আর্ষভ, আর্ষেয়, ঋক্ষ, ঋক্ষনাথ, ঋক্ষপতি, ঋক্ষরজা, ঋক্ষরাজ, ঋক্ষেষ্টি, ঋশ্, ঋশ্য, ঋষ, ঋষভ, ঋষি, ঋষিকল্প, ঋষিকুল্য, ঋষিকেশ, ঋষিতর্পণ, ঋষিপ্রবাহ, ঋষিশ্রাদ্ধ, ঋষিসর্গ, ঋষ্টি, ঋষ্য, ঋষ্যমূক, ঋষ্যশৃঙ্গ। — দ্র. **রিষ**।

ঋষ্ (ঋশ্) = ঋ-কে (আবর্ত্তনাদিকে) দিশাগ্রস্ত করণ (যা অতীত হারায়)। ঋষ = **ঋ-কে দিশাগ্রস্ত করা হয় যাহাতে।**

ঋক্ষ : ১. ✓ঋষ্ + স - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দিশাগ্রস্ত আবর্ত্তন করে যে কিংবা যে এক দিশায় বিকশিত হয়ে চলেছে।* ৩. ভল্লুক, শ্রেষ্ঠার্থবাচক, কুলাচলবিশেষ, শোনাকবৃক্ষ, ভল্লাতক বৃক্ষ বা ভেলাগাছ, পুরুবংশীয় অজমীঢ়ের পুত্র, নক্ষত্র, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল, মেষাদি রাশি। (ব.শ.)। পর্ব্বতবিশেষ। এই পর্ব্বতের মধ্য দিয়া নর্মদা নদী প্রবাহিত হয়েছে। বর্তমান বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণ-পর্বাংশ পুরাকালে 'ঋক্ষ' ও 'ঋক্ষবান' নামে অভিহিত হত। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ঋ-করণ (অর্থাৎ ঘূর্ণন-বিকাশন বা re-করণ) দিশাগ্রস্ত যাহাতে, তাকে বলে ঋক্ষ। এই ঋক্ষ সত্তাটির যে সকল ধারকের নাম উপরে (৩) উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে একমাত্র ভল্লুক, ভেলাগাছ, নক্ষত্র ও সপ্তর্ষিমণ্ডলকে আমরা একটু-আধটু চিনি। কিন্তু এদের স্বভাবে 'এক দিশায় বিকশিত হয়ে চলা'র গুণটি রয়েছে কি না, থাকলে ঠিক কীভাবে রয়েছে, তা আমরা জানি না। তবে মানবসমাজের ইতিহাসে এই ঋক্ষকে কমবেশি চিনতে পারা যায়। দক্ষের (নতুন কর্মজ্ঞান, পরে সেই কর্মের পুনরাবৃত্তির) আবির্ভাবের পর জনসাধারণের মধ্যে নানা ধরনের গোষ্ঠীর (দক্ষকন্যা নক্ষত্রদের) আবির্ভাব হয়, অন্যধরনের সমাজসংগঠনের (পর্ব্বতের) আবির্ভাব হয়। এগুলিকে ঋক্ষ বলে। তবে ভল্লুককে ঋক্ষ বলে কেন, তা জানতে হলে ভল্লুক জন্তুটির স্বভাবের সঙ্গে 'ঋষ্' ক্রিয়ার মিল কোথায়, তা জানা দরকার। এই মুহূর্তে আমরা তা জানি না। ব্যাঘ্রের ক্ষেত্রে সে অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল। কিন্তু ভল্লুক বিষয়ে আমাদের জ্ঞান স্বল্প। তাই তা আমাদের অজ্ঞাত থেকে গেল। অগত্যা, শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটিই তার নানান প্রতীকী অর্থে পরিণত হয়েছে, এই সাধারণ নিয়ম এক্ষেত্রেও সত্য বলে আমরা ধরে নেব। তার মানে, উপরোক্ত ভল্লুকাদি চরিত্রগুলিও ঋক্ষ সত্তার ধারক বলে আমরা বুঝে নেব। কেননা, ভল্লুকাদির স্বভাব বিষয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক বেশি জানতেন, এরকম ধারণায় বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ৬. Greek – a'rktos, Latin – ursus। (ব.শ.)। ইংরেজি risk, risque।

ঋক্ষনাথ, ঋক্ষপতি, ঋক্ষরাজ : ২. ঋক্ষগণের নাথ বা পতি বা রাজা। (ব.শ.)। ৩. নক্ষত্রপতি চন্দ্র, ভল্লুকরাজ, জাম্ববান। (ব.শ.)। ভল্লুকরাজ জাম্ববান; শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী জাম্ববতীর পিতা। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. 'যজ্ঞই ভুবনের নাভি' — ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির। তার মানে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ যেমনভাবে চলবে, সমগ্র মানবসমাজ চলবে সেভাবেই। আদিম সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) ব্যবস্থায় সমাজ বনে দেখা পাওয়া গিয়েছিল সিংহ ও ব্যাঘ্রের। বেণ প্রজাপতির আবির্ভাবের পর থেকে বেনিয়াবৃত্তি কমবেশি প্রচলিত হওয়ার পর থেকে সমাজবনে ভল্লুকের দেখা পাওয়া যেতে লাগল। পাওয়া গেল ভল্লুকরাজকেও। ইনি ঋক্ষেশ বা ঋক্ষপতি অর্থাৎ নক্ষত্ররাজ বা চন্দ্র; একালের ভাষায় চাঁদি। সন্দেহ নেই, নক্ষত্র মাত্রেই বিশেষ দিশায় চলে, নক্ষত্রপতি চন্দ্র তো অবশ্যই

দিশাগ্রস্ত। সুতরাং তার ঋক্ষনাথ হওয়ায় দোষের কিছু নেই। ৬. সপ্তর্ষিমণ্ডল, যাকে ইংরেজিতে বলা হয়েছে Great Bear, তাকেই ল্যাটিনে বলা হয় Ursa Major। এই Ursa ঋক্ষের স্বজন।

ঋক্ষরজা : ২. *যে-ঋক্ষ 'বর্ণান্তরপ্রাপ্ত' হয়েছে*। ৩. বালী ও সুগ্রীবের জনক। সুমেরুপর্বতের মধ্যম শৃঙ্গে ব্রহ্মার শত যোজন বিস্তৃত দিব্য-সভা বসত। এখানে একদিন যোগাভ্যাসের সময় তাঁর নেত্র হতে যে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়, তা থেকে ঋক্ষরজা নামে এক বানরের জন্ম হয়। ... সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর শিখরে অবস্থিত নির্মল সরোবরে ঝাঁপ দিলে সে সুন্দরী নারীতে রূপান্তরিত হয়। ... ইন্দ্র ঐ রূপসীর চিকুরে রেতঃপাত করলে তা থেকে বালীর জন্ম হয়। ... সূর্য্য তাঁর গ্রীবায় রেতঃপাত করলে তা থেকে সুগ্রীবের জন্ম হয়। পরদিন বানররূপ ফিরে পেয়ে ঋক্ষরজা তার দুই পুত্র নিয়ে ব্রহ্মার কাছে যায়। ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে এক দেবদূতের সাহায্যে তাদের কিষ্কিন্ধ্যায় রাজপদে অভিষিক্ত করবার জন্য পাঠিয়ে দেন। ব্রহ্মার আজ্ঞায় ঋক্ষরজা পৃথিবীর সমস্ত বানরকুলের অধিপতি হন। এই ঋক্ষরজা একাধারে বালী ও সুগ্রীবের পিতা ও জননী। ((পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ভারতের নামে একটি অভিযোগ এইরূপ যে, 'ভারতের কোনো ইতিহাস নেই, অন্তত জানা কোনো ইতিহাস।' আজ আমরা জেনেছি, অভিযোগটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমাদের ইতিহাস কেবল আছে তাই নয়, অন্য সকলের তুলনায় অনেক বেশি ও স্পষ্টভাবে রয়েছে; দুঃখের জায়গাটি শুধু এইখানে যে, আমরা সে ইতিহাসের মানে বুঝবার কৌশলটা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু মানে বুঝতে পারলে সে ইতিহাস এত ভালভাবে রয়েছে যে, সেসব কথা জানতে পারলে অবাক হতে হয়। আমলাতন্ত্রের ইতিহাসের কথাটাই ধরা যাক না কেন। আমলাতন্ত্রের উদ্ভবের কোনো ইতিহাস পৃথিবীর কোনো জাতির কাছে আছে, এমন কথা আমরা শুনিনি। আমাদের কিন্তু আছে। উপরোক্ত ঋক্ষরজার কাহিনী হল সেই আমলাতন্ত্রের উদ্ভবের কাহিনী। তবে কিনা, এই কাহিনী বুঝতে হলে উপরোক্ত (৩) কাহিনীটির প্রতিটি শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থগুলি জেনে নিয়ে কাহিনীটি পড়তে হয়। তাহলেই আমলাতন্ত্রের উদ্ভবের ইতিহাসটি জানা যায়। মনে রাখা ভাল, মানুষের সমাজে বিশেষ একটি সত্তার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বলেই সে জন্মেছিল, বিশেষ একটি সময়ে যখন সত্তাটির প্রয়োজন আর থাকবে না, তখনই তার মৃত্যু ঘটবে। 'আমলাতন্ত্র মুর্দাবাদ' স্লোগান দিলেই আমলাদের মৃত্যু ঘটবে না।

ঋষভ : ১. ✓ঋষ্ + অভ (অভচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ঋষ্-এর ভরণ (বা ভক্ষণ) করে যে*। ৩. বৃষভ, ষাঁড়, স্বরসপ্তকের দ্বিতীয় স্বর, শ্রেষ্ঠার্থবাচক, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, পালক, ভগবদবতারবিশেষ (ইনি নাভির পুত্র। সন্ন্যাসপ্রদর্শন ইঁহার উদ্দেশ্য। ইঁহার শতপুত্রের মধ্যে মহাযোগী ভরত জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ।), মন্বন্তরাবতার বিশেষ, আদিজিন, মুনিবিশেষ, রাজকর্ত্তব্য যাগবিশেষ (ইহার দক্ষিণা সহস্র ঋষভ এবং ইহা একাহসাধ্য।), বৃষশৃঙ্গবৎ ওষধিবিশেষ (কন্দুস্থান), কুম্ভীরপুচ্ছ, বরাহপুচ্ছ, ছন্দোবিশেষ, পর্ব্বতবিশেষ, কর্ণরন্ধ্র। ঋষভী = বৃষভী, গবী, নরাকৃতি (শ্মশ্রু প্রভৃতিযুক্তা) স্ত্রী, বিধবা, শূকশিম্বী, শিরালা বৃক্ষ। (ব.শ.)। ক) হিমালয়ের উত্তরে কৈলাসের নিকট এক পর্ব্বতবিশেষ। তৎকালের লোকের বিশ্বাস ছিল যে, এখানে বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী, সন্ধিনী, সুবর্ণকরণী ইত্যাদি ওষধি পাওয়া যেত। খ) অগ্নিধ্রের পুত্র নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে মহাত্মা ঋষভের জন্ম হয়। ইনি পরমহংস ব্রতের পথপ্রদর্শক। এঁর এক শত পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে একাশী জন বৈরাগ্য অবলম্বন করেন ও অবশিষ্ট পুত্র ভরত প্রমুখ নয়জন ভারতের নয়টি দ্বীপের অধীশ্বর হন। (পৌ.অ.)। দ্র. **ইলাবৃত**। ৪. ষাঁড় অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. বৃষভ আর ঋষভ, দুটি শব্দই একই 'ষাঁড়'কে বোঝায়। শব্দ দুটির মূলে রয়েছে 'সৃজনশীলতা' বা আবিষ্কারমূলক সৃষ্টিশক্তি, যা ষাঁড়েদের থাকে (দ্র. **বৃষ**)। তবে কিনা ষাঁড় হয় দুই প্রকারের। যে ষাঁড় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, অত্যন্ত শক্তিধর, যাকে খাওয়ালে পুণ্য হয় বলে গ্রামবাংলার আজও বিশ্বাস, যে মালিকহীন, সে হল ঋষভ। আর, যে ষাঁড় প্রায় বলদে পরিণত হয়েছে, যদিও তার মুষ্কচ্ছেদন করা হয়নি কিন্তু চাষির গোয়ালে বাঁধা থাকে, গাভীর প্রয়োজনে যাকে পাল দিতে ব্যবহার করা হয়, তাকে বৃষভ বলে। আজকাল ঋষভ তো দেখাই যায় না, কদাচিৎ দেখা গেলেও বিশেষ কয়েকজনের নিয়মিত দয়ার দানে সে টিকে থাকে অথবা প্রায়শই গণ্ডগোল পাকায়। আর, বৃষভ এখন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী। সত্তাটি পরিণত হয়েছে পশুচিকিৎসকের ইনজেকশনের সিরিঞ্জে, যে-ইনজেকশন দিলে গাইয়ের বাছুর হয়।

তা হোক; কিন্তু সামাজিক ঋষভ-বৃষভদের সংবাদ কী? আমরা জানি, প্রাচীন ভারতে সামাজিক ঋষভেরা উৎপাদনের মূল শক্তি ছিলেন এবং গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ঘুরে ঘুরে নতুন নতুন কর্ম্মকৌশল, প্রযুক্তির নিদান দিতেন। এঁরা ছিলেন শিবের ষাঁড়, শিবশক্তির আধার, সৃজনশীল আবিষ্কারমূলক শক্তির ধারক-বাহক। বৈদিক যুগের প্রতিষ্ঠার পর সেই সামাজিক ঋষভদের অধিকাংশই সামাজিক বৃষভে পরিণত হতে থাকেন। প্রায় হাজার দুয়েক বছর ধরে এই পরিস্থিতি তবু যাহোক চলছিল, 'বিশ্বাগু-ছিন্ন' ক'রে হিন্দুযুগের সূত্রপাতের (৭৫০ খ্রিস্টাব্দের) পর থেকে সামাজিক ঋষভ-বৃষভদের সম্পূর্ণরূপে বল দানকারী বলদে পরিণত করে ফেলা হয়। এতে যাদের খুবই অসুবিধা হয়, তারা মহাপ্রস্থান করে। তাই মার্কস ও রবীন্দ্রনাথের মতে হিন্দুযুগের পর থেকে ভারতসমাজ 'অচল জড় উদ্ভিদসুলভ জীবন' কাটাতে থাকে। মোগল ও ব্রিটিশের আবির্ভাবের পর এই শৃঙ্খল খানিকটা ছিঁড়ে যায়। এখনকার ভারতসমাজ এই শৃঙ্খল থেকে খানিকটা মুক্ত হলেও সমাজের যে-যে ক্ষেত্রে নানা রঙের মৌলবাদিতা কঠোরভাবে অনুসৃত হয়, সেই সেই ক্ষেত্রে ঋষভ-বৃষভেরা বলদে রূপান্তরিত না-হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। পালায়। এই পলাতকদের একটি শ্রেণীকে আজকাল মার্কিনীরা 'বিগ-বেঙ্গলি' বলে। বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে বর্তমান লেখকদ্বয়ের 'গ' গ্রন্থের পরিশিষ্ট-তে।

ঋষি : ১. ✓ঋষ্ + ই (ইন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ঋষ্ (আবর্তনমূলক কর্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তির দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ)-কে গতিশীল করে যে; যিনি প্রচলিত জ্ঞানকর্মের এলাকা পেরিয়ে যেতে পারেন।* / যিনি জ্ঞান ও সংসারের পারে যান। (ব.শ.)। ৩. ক)

মরীচি-প্রভৃতি সপ্তর্ষি। ঋষি সপ্তবিধ — ব্রহ্মর্ষি বসিষ্ঠাদি, দেবর্ষি নারদাদি, মহর্ষি ব্যাসাদি, পরমর্ষি ভেলাদি, কাণ্ডর্ষি জৈমিন্যাদি, শ্রুতর্ষি সুশ্রুতাদি, রাজর্ষি জনকাদি। খ) তাপসমাত্র, মুনি, সাধু। ... গ) তন্ত্রোক্ত মন্ত্রের উপাসনায় সিদ্ধ। ... (ব.শ.)। কবি ও মন্ত্রদ্রষ্টা মুনি। পরমার্থ তত্ত্বে যিনি সম্যক দৃষ্টি রাখেন, তিনিই ঋষি। যিনি জ্ঞানমার্গে গমন করে সংসার অতিক্রম করেছেন, তিনিই ঋষি। পুরাণ মতে যা থেকে বিদ্যা, সত্য, তপঃ, শ্রুতি সম্যক রূপে নিরূপিত হয়, তিনিই ঋষি। এঁরা ঈশ্বর আদিষ্ট; এঁদের কাছে বেদ প্রকাশিত হয়েছিল। এঁরা সাত জন ঋষি, সপ্তর্ষি বা প্রজাপতি নামে খ্যাত। এঁরা ব্রহ্মার মানসপুত্রও। শতপথব্রাহ্মণ অনুসারে এঁদের নাম — গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, কশ্যপ ও অত্রি। মহাভারত মতে — মরীচি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, অত্রি, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ। বায়ুপুরাণে ভৃগুর নাম যুক্ত হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে যোগ করা হয়েছে ভৃগু ও দক্ষকে। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে গৌতম, কণ্ব, বাল্মীকি, ব্যাস, মনু, বিভাণ্ডক নামক ঋষি হিসাবে এঁদের আখ্যাত করা হয়েছে। প্রথমোক্ত সপ্তর্ষি আকাশে সাতটি তারকারূপে অবস্থিত আছেন। ... (Great Bear) ... ঋষি সাতপ্রকার — শ্রুতর্ষি যেমন সুশ্রুত; কাণ্ডর্ষি যেমন জৈমিনি; পরমর্ষি যেমন পৈল; মহর্ষি যেমন ব্যাস; রাজর্ষি যেমন বিশ্বামিত্র ও জনক; ব্রহ্মর্ষি যেমন বশিষ্ঠ; দেবর্ষি যেমন নারদ, অত্রি, মরীচি, ভরদ্বাজ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, প্রচেতা, ভরত, তুম্বুরু, কনকাদি। প্রত্যেক মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদের নাম আছে। ... আরও বিশপ্রকার ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন — বৈখানস, বালখিল্য, মরীচি, সংপ্রক্ষাল, অশ্মকুট্ট, আকাশনিলয়, অনবকাশিক, দন্তোলুখল, অশয্যা, পত্রাহার, উন্মজ্জক, গাত্রশয্যা, বায়ুভক্ষ, জলাহার, আর্দ্রপট্টবাস, স্থণ্ডিলশায়ী, উর্ধ্ববাস, তপোনিষ্ঠ, পঞ্চতপান্বিত, সর্ষপ। মহাভারতেও এইপ্রকার ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা ফলাহারী, মূলাহারী, ঘৃতপায়ী, সোমপায়ব্য প্রভৃতি। (পৌ.অ.)। ৪. আজকাল লোকে 'ঋষি' বলতে 'বৃক্ষতলে উপবিষ্ট ধ্যানকারী জটাধারী মানুষ'কে বোঝে। তবে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে এবং বর্তমান বাংলাদেশের কোথাও কোথাও এখনও 'ঋষিপাড়া' শব্দটি প্রচলিত রয়েছে এবং শব্দটি চাষিপাড়া, মুচিপাড়া, চণ্ডালপাড়াকে বোঝায়। ৫. প্রকৃতপক্ষে যাঁরা চাষ করতেন, সেটি পার্থিবভূমি চাষ হতে পারে, মনোভূমি চাষও হতে পারে; তাঁদেরই ঋষি বলা হত। এঁরা জ্ঞান ও সংসারের পারে যেতে পারতেন, অর্থাৎ প্রচলিতের পরিধির বাইরে দেখতে ও যেতে পারতেন; অতএব **পারদর্শী** ছিলেন। কিন্তু চাষ করার ক্ষেত্র বলতে সেকালের মানুষেরা কেবল পার্থিব জমি-জায়গা বুঝতেন না, মানবজমিনও বুঝতেন; কিংবা, বলা ভালো, মানবজমিনটাই বেশি করে বুঝতেন। স্বাভাবিক কারণেই ঋষি শব্দটি ছিল খুবই মহৎ শব্দ। সেকালের think-tank বা মানস-সরোবরের নিকটস্থ সরোবর তো ঋষিদেরই তৈরি। (দ্র. ঋষিকুল্য, ঋষিলোক, ঋষিসর্গ ইত্যাদি)। পরে পরে নানান ঐতিহাসিক অধ্যায়ে নানান কারণে সেই ঋষিদের সামাজিক মর্যাদার অধঃপতন ঘটতে থাকে ('অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে ...' শ্লোকটি স্মর্তব্য।) এবং বিদ্রোহী ঋষিদেরকে মৌলবাদী ব্রাহ্মণ্যসভ্যতা শূদ্র বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করে না। ফলত শেষমেষ ঋষিপাড়া পরিণত হয় চাষিপাড়ায় বা মুচিপাড়ায়। যারা পালকি বহন করত (কাহার), মরা গরুর চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করত, দুই বাংলার গ্রামে এখনও তাঁদের ঋষি বলে। দ্র. বাংলাদেশী গল্পকার শেখ লুৎফর রচিত গল্প 'যাতায়াত' (জামশেদপুর থেকে প্রকাশিত 'কৌরব' পত্রিকার ৯৫ সংখ্যা)।

যতদূর বোঝা যায়, এই 'ঋষি' বা 'ঋষ' শব্দটি থেকেই পরবর্তী কালে 'রস' শব্দটি তৈরি হয়েছে। এর আধুনিক অর্থ 'সংস্কৃতি'। আসলে কিন্তু রস-সংস্কৃতি দুটোই জন্মায় 'কৃতি' থেকে। শব্দ দুটির উত্তরাধিকার পৃথিবীর সব জাতির কমবেশি রয়েছে। আমাদের 'রসাধিপতি' স্বয়ং শিব এবং 'রসরাজ' শ্রীকৃষ্ণ। রস রয়েছে আমাদের 'রসনা'য়, জীবনে, কাব্যে। আরবের 'রসদ' ও 'রসুল' (হজরত মহম্মদ) সেই একই আদিভাষার মধ্যপ্রাচ্যের নিজস্ব উত্তরাধিকার। ইয়োরোপের উত্তরাধিকার রয়েছে তাদের ration, rationality, reason প্রভৃতি শব্দে। চাইলে, এ বিষয়ে আরও অনেক উদাহরণ হাজির করা যেতে পারে। ... দ্র. **কৃষক, সপ্তর্ষি, পুরুষকার**। ৬. Avesta – ereshi, Hebrew – arsan, arrach। (ব.শ.)। ইংরেজি reason, ration, rationality, real; ল্যাটিন res।

ঋষিতর্পণ : দ্র. **তর্পণ**।

ঋষ্য : ১. ✓ঋষ্ + য (ক্যপ্) - কর্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ঋষ্ (আবর্তনমূলক কর্মশক্তি ও জ্ঞানশক্তির দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ) থাকে যাহাতে।* ৩. কৃষ্ণসার মৃগবিশেষ, মৃগ। দ্র. **ঋষ্যশৃঙ্গ**। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. প্রশ্ন হল, যে সামাজিক সত্তা ঋষ্-এর আধার, তাদের কৃষ্ণসার মৃগ বলা হত কেন? কেনই বা 'কৃষ্ণসার মৃগের বিচরণের এলাকা'কে আর্য্যদেশ বলা হত এবং বাকি সমগ্র পৃথিবীকে অনার্য্যদেশ বলা হত? যতদূর বোঝা যায়, শিবশক্তির আধার ব্রাহ্মণ ভারত সমাজকে দিয়েছে অনেক, সেকথা ঠিক। কিন্তু অধঃপতিত মৌলবাদী ব্রাহ্মণ নেহাত কম হরণ নেয়নি। যারা হরণ করত, তাদের বলা হত **হরিণ**। হরিণ পাঁচরকম — ঋষ্য, খড়্গ, রুরু ইত্যাদি। এর ভিতরে 'ঋষ্য' হরিণের বিশেষত্ব হল, কৃষ্ণধনই এদের অস্তিত্বের সার। পার্থিব ঋষ্য হল গায়ে কালো কালো ছোপওয়ালা হরিণ, deer। আমরা কিন্তু প্রধানত সামাজিক হরিণের কথাই এখন ভাবছি। যতদূর বোঝা যায়, বৈদিক (আদিম সমাজতান্ত্রিক) ব্যবস্থা অত্যন্ত কলুষিত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এঁরা সেই ব্যবস্থাই টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন এবং নিজেরা অত্যন্ত অধঃপতিত হয়ে নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে (মন্ত্রণাদাতা, পুরোহিত, সরকারি শিক্ষক, উপদেষ্টা, সরকারি আমলা ইত্যাদিতে পরিণত হয়ে) তার সুবিধাগুলি ভোগ করতেন। যে সকল সামাজিক অধিকার, সুযোগ, সুবিধা, কাজ সাধারণ প্রজাদের জন্য নিষিদ্ধ (= কৃষ্ণ) ছিল, সেগুলিই তাঁদের অস্তিত্বের সার ছিল। দ্র. **ঋষ্যমূক**।

ঋষ্যমূক : ২. যেখানে ঋষ্য (মৃগ) মূক (বদ্ধবাক্), অর্থাৎ শান্ত। (ব.শ.)। ৩. পম্পানিকটস্থ পর্বতবিশেষ। বালী মতঙ্গমুনির শাপে এই পর্ব্বতে আসিতে পারিতেন না, এইজন্য বালীর ভয়ে সুগ্রীব এই পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে রামের সহিত সুগ্রীবের দর্শন ও মিত্রতা হয়। (ব.শ.)। ঋষ্য (মৃগ) যেখানে মূক (নীরব)। যেখানে

হরিণ নির্ভয়ে বিচরণ করে। দক্ষিণদেশীয় পর্ব্বত। পূর্বঘাট ও নীলগিরি পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যস্থিত পর্ব্বত। পম্পা সরোবর ও কাবেরী নদী এইস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে মাতঙ্গমুনির আশ্রম ছিল। সুগ্রীব বালীর ভয়ে এই পর্ব্বতে বাস করতেন। ... কবন্ধ দানব রাম লক্ষ্মণকে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে গিয়ে বানরদের সাহায্য গ্রহণ করতে বলেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অগ্র.। ৫. যে সামাজিক সংগঠনগুলির (পর্ব্বতগুলির) উপর সরকারী আমলাদের হুকুম চলে না, তেমন পর্ব্বতই ঋষ্যমূক পর্ব্বত।

ঋষ্যশৃঙ্গ : ২. ঋষ্যের শৃঙ্গের ন্যায় যাহার শৃঙ্গ। (ব.শ.)। ৩. ক) কাশ্যপ বিভাণ্ডকের সুত ঋষিবিশেষ। দীর্ঘকাল হ্রদে তপশ্চরণের সময়ে উর্ব্বশীকে দেখিয়া বিভাণ্ডকের যে রেতঃস্খলন হয়, এক তৃষিতা হরিণী জলের সহিত তাহা পান করে। এই বীর্য্যেই ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হয়। হরিণের ন্যায় শৃঙ্গোদগম হেতু ইঁহার নাম 'ঋষ্যশৃঙ্গ'। অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টি নিবারণের নিমিত্ত অঙ্গরাজ লোমপাদ, বেশ্যাদ্বারা প্রলোভিত করিয়া, ইঁহাকে স্বরাজ্যে আনয়ন এবং কন্যা শান্তাকে সম্প্রদান করেন। ইঁহার অনুষ্ঠিত পুত্রেষ্টি-প্রভাবে দশরথ রামাদি পুত্রচতুষ্টয় লাভ করেন। খ) সাবর্ণিক মন্বন্তরে সপ্তর্ষির একতম। (ব.শ.)। কশ্যপতনয় বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ও দশরথের জামাতা। বিভাণ্ডকের ঔরসে দ্বাদশাদিত্যের অন্যতম ভগের কন্যা মৃগরূপিণী স্বর্ণমুখীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির জন্ম হয়। ... উর্ব্বশীকে দেখে স্নানরত বিভাণ্ডক মুনির জলে রেতঃপাত হলে শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা হরিণী তা পান করে গর্ভবতী হয় ও ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রসব করে। হরিণীর গর্ভজাত বলে এই মুনির মস্তকে একটি শৃঙ্গ ছিল। ... দশরথের বন্ধু অঙ্গরাজ লোমপাদ ... রাজ্যে বৃষ্টিপাত ঘটাবার জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করেন। ... বৃষ্টিপাত হয়। দশরথের ঔরসকন্যা ও লোমপাদের পালিতা কন্যা শান্তার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ... দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে ঋষ্যশৃঙ্গ প্রধান পুরোহিত পদে বৃত হন। (পৌ.অ.)। ৪. অগ্র.। ৫. শৃঙ্গ হল সেই বস্তু, যার দ্বারা হিংসা সাধিত হয়। শান্তিবাদী ঋষ্যদের যদি শিং গজায়, তারা হয়ে যায় ঋষ্যশৃঙ্গ। সেই সুবাদে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি হলেন এমন এক সামাজিক সত্তা, যিনি কৃষ্ণকে সার বলে বুঝেছেন বটে কিন্তু মস্তিষ্কে তার হিংসার উপায় (শৃঙ্গ) রয়েছে। তার মানে, ঋষ্য সত্তাটি (মন্ত্রণাদাতা, পুরোহিত, সরকারি শিক্ষক, উপদেষ্টা, সরকারি আমলা প্রমুখেরা) যখন হিংসা-বুদ্ধি পরায়ণ হয়ে যায়, তখনই তারা হয়ে যায় ঋষ্যশৃঙ্গ। আর, তাঁর জনক বিভাণ্ডক হলেন হলেন সেই সত্তা, ভাণ্ডে বা ভাঁড়ারে থাকা যৌথসম্পদকে যিনি পাওনা অনুসারে সবাইকে ভাগ করে দেন বা বিতরণ করেন। আদি যুগের ফেরিওয়ালা-পাইকার-দোকানদারদের (উর্ব্বশীকে) দেখে তাঁর রেতঃপাত হয়। হবেই তো! তখন তো হাটবাজারের প্রতিষ্ঠাই ভাল রকম হয়নি। ফলে কালোবাজারীর পথও তৈরি হয়নি। তো, ঐ অবস্থায় যৌথভাঁড়ারের উদ্বৃত্ত বা সরিয়ে রাখা মাল কিনবে কে? এই উর্ব্বশী ছাড়া। সে না চাইলেও তার দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভাঁড়ার থেকে মাল বেরিয়ে যায়। বিভাণ্ডক মুনির রেতঃপাত হয়ে যায়। কিন্তু তা গ্রহণ করার জন্য উর্ব্বশী আগ্রহী নন, নিন্দামন্দের পুলিশি ব্যবস্থা তো ছিলই। মাঝ থেকে যে হরণকারী হরিণেরা আশেপাশে ছিল, তারাই সেই রেতঃ গ্রহণ করে এবং গর্ভবতী হয়। এই গর্ভ থেকে জন্ম হয় ঋষ্যশৃঙ্গের; বিভাণ্ডকের রেতঃসমৃদ্ধ নতুন এক সামাজিক গোষ্ঠীর। স্বভাবতই এর ঝোঁক ব্যক্তিপুঁজির দিকে। ইনি যখন একটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞের পরামর্শদাতা হন, তখন সেই যজ্ঞফলের পণ্যে পরিণতি ঠেকানো কঠিন। সেকারণেই এই ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফলেই অযোধ্যায় নগদ নারায়ণ রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন এই চার রূপে অবতীর্ণ হতে পারেন।

ক

ক্ বর্ণের অর্থ: ক্ বর্ণটি একটি ক্রিয়ার ধারক। ক্রিয়াটি হল 'ক-অন'। একটি অস্তিত্ব যদি অন্য অস্তিত্বের কোনো বদল ঘটায়, তবে প্রথম অস্তিত্বের এই কাজকে ক-অন বলে। এ যেন ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দুতে সক্রিয় হওয়া। সকল ব্যঞ্জনবর্ণই এইরূপ এক একটি ক্রিয়ার আধার। ইংরেজিতে create (সংস্কৃতে 'ক্রিয়েৎ') শব্দের শুরুতে যে 'ক্রি' বা 'ক্', সেটিও এই 'ক্'-এর সঙ্গে 'ঋ' (আবর্ত্তন-গতিদান) জুড়েই তৈরি হয়েছে। ইংরেজিতে 'cre' যুক্ত শব্দগুলিতে এই 'ক্'-এর উত্তরাধিকার আছে। তবে আদিতে 'ক্' বর্ণটি অন্তত তিন চার রকমের ছিল। দুনিয়ার অন্যান্য ভাষায় তার কিছু কিছু উত্তরাধিকার রয়েছে। সংস্কৃতকারগণ তুলনায় অগ্রণী ভাষাবিদ ছিলেন। তাঁরা এলোমেলো 'ক্'-গুলির উত্তরাধিকার রাখেননি। সেগুলিকে সংস্কার করে একটি মাত্র 'ক্'-এ সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। এই ক্-কে অ যোগ করে তাঁরা যে উচ্চারণযোগ্য ক বানিয়েছিলেন, তার অনেকগুলি অধ্যায় এবং তদনুযায়ী অর্থ হয়। সেসব কথা আমরা নীচে ক অর্থে বলছি।

তবে তাঁদের সংস্কৃত বয়ানগুলির ভেতর অতীতের উত্তরাধিকার হিসেবে আরও অন্তত একটি ক্-কে (ক্ব) আজও পাওয়া যায়। পাওয়া যায় ক্বচিৎ, ক্বণ, ক্বথন, ক্বাথ, ক্বিপ — এরকম কয়েকটি শব্দে। সম্ভবত বাংলা 'কোয়া' শব্দটিও এসেছে এই ক্ব থেকে। অর্থের বিচারে এই 'ক্ব'ও করণেরই ধারক বটে, তবে তার একজন সহকারী সবসময় তার সঙ্গে থাকে। এই 'ক্ব' যেন আগের যুগের নায়কের মতো যার চিরসাথী একজন কমেডিয়ান চাকর। যতদূর বোঝা যায়, ইংরেজিতে এই 'ক্ব'-এর উত্তরাধিকার রয়েছে qu বর্ণে, এবং আরবীতে রয়েছে 'বড়ি-কাফ্' বর্ণে।

ক : ১. ক্ + অ = ক = করণের বুনিয়াদি আধার বা কারক বা কারী = করণের প্রযুক্তির আধার, করণের তেজের আধার, করণের মালিকানার আধার ইত্যাদি। ২. *করে যে* (= কারী)। ৩. ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অগ্নি, বায়ু, রুদ্র, সূর্য্য, যম, মদন, দক্ষ প্রজাপতি, কশ্যপ, আত্মা, মন, শরীর, রাজা, মস্তক, জল, সুখ। (ব.শ)। ৪. পৃথকভাবে শব্দটি অপ্রচলিত। কিন্তু পালক, চালক, কৃষক প্রভৃতি শব্দের শেষে যে 'ক' রয়েছে, তা যথাক্রমে পালন 'করে যে', চালন 'করে যে', কৃষণ 'করে যে' — এইভাবে প্রচলিত রয়েছে। ৫. ক্ বর্ণটি উচ্চারণ করা যায় না, উচ্চারণ করতে হলে সামনে বা পেছনে স্বরবর্ণ, প্রধানত

'অ', যোগ করতে হয়। তখন ক্ হয়ে যায় 'অক্' (অ + ক্) বা 'ক' (ক্ + অ)। এর ফলে অর্থেও ভেদ ঘটে যায়। শুধু ক্-এ করণবাচকতা থাকে, কিন্তু 'অক্'-এর মানে দাঁড়ায় — 'যে অস্তিত্ব করে' (= কারী) এবং 'ক'-এর মানে দাঁড়ায় — 'করে যে' (= কারী)। এই যে অ, যা কিনা ক্ বা করণকে কারীতে উত্তীর্ণ করে, তার এই বিশেষত্ব বা বিশেষ্য রূপ পেতে অনেক ছোট ছোট অধ্যায় পেরোতে হয়। একেবারে প্রথমে ক্-এর সঙ্গে যে অ যুক্ত হয়, তা উচ্চারণ সহযোগী মাত্র। তারপরের অধ্যায়গুলিতে তা ক্রমে আরও বিশেষত্ব লাভ করে।

ক্ + অ (উচ্চারণ সহযোগী মাত্র) = কারী;
ক্ + অ (করণের উদ্দেশ্য) = কারী;
ক্ + অ (করণের স্থির রূপ) = কারী;
ক্ + অ (করণের বিদ্যা বা বুদ্ধি) = কারী;
ক্ + অ (করণ হাতিয়ার) = কারী;
ক্ + অ (করণের শক্তি বা তেজ) = কারী;
ক্ + অ (করণের প্রযুক্ত রূপ) = কারী;
ক্ + অ (কৃত বা কর্ম্মফল) = কারী;
ক্ + অ (করণের শেষ ফল) = কারী;
ক্ + অ (করণের মোট ফলাফল) = কারী;

স্বভাবতই এই কারী কিন্তু শুধুমাত্র কোনো ব্যক্তিকে বোঝায় না। আগম থেকে কর্ম্মফল পর্যন্ত নানা সত্তাকে 'ক' শব্দ বোঝাতে পারে। কাকে কখন বোঝাচ্ছে, তা নির্ভর করবে প্রেক্ষিতের উপর। কারী বা কারক ছাড়া কোনো ক্রিয়া বাস্তবায়িত হতে পারে না বলেই এক কাল্পনিক কারীকে আগম রূপে আনা হয়। পরে পরে সেই অবাস্তব আগম সত্তা একটু একটু করে বাস্তবের দিকে এগোতে থাকে এবং সবশেষে সম্পূর্ণতই বাস্তব সত্তা উপরোক্ত 'অ' বর্ণের অর্থের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আর, এ-নিয়ম কেবল ক্ বর্ণের ক্ষেত্রেই সক্রিয়, এমন নয়; সকল ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম সার্বিকভাবে সক্রিয়। অতএব ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই কারী কাল্পনিক কারী থেকে শুরু করে অতিবাস্তব কারী পর্যন্ত সকল প্রকার কারীর যেকোনো এক বা একাধিক কারীকে বোঝাতে পারে। মোট কথা, 'করে যে', সেই হল কারী। কিন্তু প্রশ্ন হল কী করে?

'পালন করে যে' = 'পালক'; 'ধারণ করে যে' = 'ধারক' — এই ধরনের বহু শব্দই হতে পারে। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, 'ক' মানে 'করে যে'। কী করে? কাজ করে, পড়া করে, জ্ঞানার্জন করে, ভাল করে, মন্দ করে, রোজগার করে, খরচ করে, আয় করে, খুশি করে, দুঃখ করে, রাজি করে, বিরক্ত করে, শনাক্ত করে, কেনাকাটা করে, ভ্রমণ করে, গমন করে, খেলা করে ... এবং কী করে না! ইংরেজিতে কিন্তু এরকম ধারণাই নেই। doing income, doing sad, doing pleasure, doing play ... এধরনের বাক্যবন্ধ ইংরেজিতে দু'একটা বলা গেলেও খুব বেশি বলাই যায় না। কিন্তু বাংলায় রীতিমতো বলা যায়। অতএব 'ক' মানে '(যে-কোনো বস্তু বা বিষয়) করে যে'। অর্থাৎ, 'ক' = 'কারী'।

সমাজের ইতিহাসে যে যুগে যাকে সব কিছুর কর্তা মনে হয়েছে, তাকেই 'ক' বর্ণের সাহায্যে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, 'ক' বর্ণে '**দক্ষ**' জানিবে। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ নিষ্কাশনকালে 'ক' বর্ণটি যে শব্দের ভিতরেই থাকুক না কেন, 'করণের আধার' বা 'কারী' অর্থ গ্রহণ করলেই অর্থটি পাঠককে সঠিক দিকে নিয়ে যায়। এই কারীকে সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নাম দিয়ে চিহ্নিত করা সম্ভব নাও হতে পারে। কান যখন 'কট' 'কট' করে, যে কারী (ক) কানের ভিতরে টঙ্কারিত (ট) হয়, তাকে অজানা এক কারী-রূপেই চিহ্নিত করতে হয়। এরকম বহু জানা-অজানা কারী 'ক'-এর সাহায্যে প্রকটিত হয়ে থাকে। অতএব শব্দার্থ নিষ্কাশনের কাজ চালানোর জন্য আমরা খুব নমনীয় একটা সিদ্ধান্ত এভাবে করতে পারি — **ক** = ক্-অন্ *(on) করে যে = কারী; ক-এর আধার যে = কা; ক গতিশীল যাহাতে = কি; কি-এর আধার যে = কী; ক নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে = কু; কু-এর আধার যে = কূ; ক আবর্তিত যাহাতে = কৃ; কৃ-র আধার যে = কৄ; ক দিশাগ্রস্ত যাহাতে = কে; কে-র আধার যে = কৈ; ক-এর সর্বরূপ যাহাতে = কো; কো-র আধার যে = কৌ।*

ক বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : কং, কক্, কঙ্ক্, কচ্, কঞ্চ্, কট্ *(কুট্, কূট্, কোট্), কঠ্, কণ্ (কণ্ট্, কুণ্, কুণ্ঠ্, কুণ্ড্), কথ্, কন্, কম্, কম্প্, কর্ণ্, কল্ (কলি), কশ্ (কষ্, কস্, কাশ্, কাস্, কুশ্ কুষ্, কুস্), কাঙক্ষ্, কিৎ, কু (কূ) কুক্, কুচ্ (কুঞ্চ্), কুপ্ (কৃপ্), কুল্, কৃ, কৃৎ, কৃপ্, কৃশ্ (কৃষ্, কৃস্), কৄ, কৢপ্ (কেল্), ক্রন্দ্, ক্রম্, ক্রী, ক্রীড়্, ক্রুধ্, ক্রুশ্, ক্ল (ক্লম্, ক্লিদ্, ক্লিশ্, ক্লীব্), ক্ষ, ক্ষ (ক্ষং, ক্ষণ্, ক্ষদ্), ক্ষম্, ক্ষর্, ক্ষল্ (খল্, স্খল্), ক্ষি, ক্ষিপ্ (ক্ষপ্), ক্ষু, ক্ষুদ্, ক্ষুধ্, ক্ষুভ্, ক্ (কা, কি, কে, কো) = ৪৬ + ১*

'কং' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : কংস, কংসকার, কংসবতী, কংসাবতী, কংসারাতি, কংসারি, কঙ্গু, কঙ্গুনী, কঙ্গুরা, কাংস্য, কাঁসর (কাঁশর), কাঁসা, কাঁসারি, কাঁসি, কাঙলা, কাঙাল, কাঙালি(লী), কাঙুই, কাঙ্গনী, কাঙ্গলা, কাঙ্গাল, কাঙ্গালি(লী), কাঙ্গুর, কাঙ্গুরা, কাসর।

কং = কারীর (দ্র. **ক**) অসীমায়িত রহস্যরূপ থাকে যাহাতে।

কং (কঙ্, কঞ্, কণ্, কন্, কম্) : ১. ক্ + ং (অংরূপিণী)। অংরূপিণী ছয়টি রূপ — ং, ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্। তাই এই শব্দকে উপরোক্ত ছয় রূপেই পাওয়া যায়। ২. *(যথাক্রমে) করণের রহস্যরূপ, করণের ক্রিয়ামুখী রহস্যরূপ, করণের আনুষঙ্গিক-ক্রিয়ামুখী রহস্যরূপ, করণের প্রকাশমুখী রহস্যরূপ, করণের পার্থিব রহস্যরূপ, করণের রক্ষণমুখী রহস্যরূপ।* অতএব কং = *কারীর (অসীমায়িত) রহস্যরূপ যাহাতে।* দ্রষ্টব্য **অংরূপিণী**। ৩. কং = অন্য কোনো শব্দকোষে এই শব্দের পৃথক কোনো অর্থ নেই। ৪. শব্দাংশ রূপে প্রচলিত। যথা কং-কাল, কিং-কর ইত্যাদি। ৫. **কং** কথাটিই পরে ক খ গ ঘ থাকলে কঙ্, পরে চ-বর্গ থাকলে কঞ্, পরে ট-বর্গ থাকলে কণ্, পরে ত-

বর্গ থাকলে কন্‌, প-বর্গ থাকলে কম্‌, এবং অন্য কিছু থাকলে কং-ই থেকে যায়। এই পরিবর্তন কেবল উচ্চারণজাত কারণে ঘটে না, ক্রিয়ার পরিবর্তনও তার কারণ। যেমন ং-এর পরে প-বর্গ থাকলে ং-কে সীমায়িত করে নিতে হয়, তখন ং পরিণত হয় ম্‌-এ। কিন্তু যেহেতু মূলে ং, তাই কং কঙ্‌ কঞ্‌ কণ্‌ কন্‌ কম্‌ মূলত একই ক্রিয়ার নানা রূপের কথা বলে। যে আদিভাষায় এই শব্দগুলি প্রথম প্রচলিত হয়েছিল, তাতে এই শব্দের স্বভাবতই বহু রূপ ছিল; এবং ইংরেজি ভাষাও তার সেই উত্তরাধিকার ধরে রেখেছে। তাই আমাদের **কঙ্ক, কঞ্চ, কণ্ট, কন্ত, কম্প** (প্রতিটি বর্গের শুরুর উদাহরণটুকু দিলাম) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণগত সাদৃশ্যে যে-সকল ইংরেজি শব্দ পাওয়া যায়, তাদের অর্থের মূলেও কিছু কিছু সাদৃশ্য আজও দেখতে পাওয়া যায়। যেমন concise, confess প্রভৃতি। **৬.** con-যুক্ত কোনো কোনো ইংরেজি শব্দ।

কংস (কাঁসা) : **১.** ✓কংস্‌ (শাসন) + অ (অচ্‌) - কর্তৃবাচ্যে; ✓কম্‌ + স - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. কংস** = *কারীর রহস্যরূপের অস্তিত্ব থাকে যাহাতে; কারীর সীমায়ন থাকে যাহাতে।* **৩. কংস** = স্বর্ণরজতাদি নির্ম্মিত পাত্র, মদ্যাদিপানপাত্র, তৈজসপাত্র, কাংস্যপাত্র, পরিমাণপাত্র, বর্ত্তুলাকার যজ্ঞপাত্রবিশেষ, কাঁসা, কাংসনির্ম্মিত বাদ্যবিশেষ। ভোজবংশীয় নৃপতি বিশেষ। ইনি উগ্রসেনের পুত্র, দেবকীর ভ্রাতা। কৃষ্ণের মাতুল ও জরাসন্ধের জামাতা। দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র প্রাণনাশক হইবে, দৈববাণীতে ইহা জানিয়া, কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করেন। দেবকীর অষ্টম পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, গোকুলে নন্দগৃহে রক্ষিত পালিত ও বর্দ্ধিত হন এবং ধনুর্যাগদর্শনে মথুরায় আগমনপূর্বক কংসকে নিহত করেন। (ব.শ.)। ... ইনি মথুরার রাজা উগ্রসেনের ক্ষেত্রজপুত্র ও মগধরাজ জরাসন্ধের জামাতা। হরিবংশ অনুসারে উগ্রসেনের ঋতুস্নাতা স্ত্রীকে দেখে সৌভপতি দ্রুমিল কামাতুর হয়ে পড়েন এবং উগ্রসেনের মূর্তি ধারণ করে তাঁর সঙ্গে সঙ্গম করেন। কিন্তু উগ্রসেনের স্ত্রীর সন্দেহ হওয়ায় 'কস্য ত্বং' বলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। প্রকৃত পরিচয় পেয়ে দ্রুমিলকে তীব্র তিরস্কার করলে দ্রুমিল উত্তরে বলেন যে, অনেক মানব-স্ত্রী ব্যাভিচার করেই দেবসদৃশ পুত্র উৎপাদন করেছেন, অতএব এতে কোনো দোষ হতে পারে না। এরপর দ্রুমিল আরো বলেন যে, তুমি আমাকে 'কস্য ত্বং' (তুমি কার?) বলে প্রশ্ন করেছিলে, সে কারণে তোমার 'কংস' নামে এক শত্রুবিজয়ী পুত্র হবে। কংস মগধরাজ জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে বিবাহ করেন। জরাসন্ধের সহায়তায় উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে ইনি নিজে রাজা হন। ... ... ইনি ভগিনী দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হন। (পৌ.অ.)। **৪.** কাঁসা অর্থে প্রচলিত। **৫.** এখানে দুরকম কংস বা কাঁসাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি — এক কংস থাকে আমাদের রান্নাঘরে ও মন্দিরে যথাক্রমে ঘটিবাটি ও বাদ্যযন্ত্র হিসেবে; আর এক কংস দেখা দিয়েছিলেন সমাজশাসনের শীর্ষে, কংসরাজা রূপে। দুই কংসেই ক্বরীর রহস্যরূপের অস্তিত্ব থাকার কথা, দুই কংসই তৈজস এবং মিশ্র ধাতুও (কংসরাজার জন্মকাহিনী দেখুন) বটে। কাঁসার তৈজসপত্র থালাবাটি কিংবা কাঁসরঘণ্টা কী বস্তু, তা আমরা সবাই কমবেশি জানি; কিন্তু সামাজিক তৈজস কংসকে চেনা একটু কঠিন। মনে হয় 'দ্রুমিল', 'অস্তি ও প্রাপ্তি', এবং 'কস্য ত্বং' থেকে 'কংস' হওয়ার গল্পের ভিতরে এই শব্দের মূল রহস্য নিহিত রয়েছে; 'মা-উ' থেকে যেমন 'উমা' হয়েছে, সেইরকম।

কাঁসা-পিতলের ঘটি-বাটি বানানো হয় মাটির ছাঁচ তৈরি করে মাঝে ধাতুর গুঁড়ো ও টুকরো গুঁজে দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে। সেকালে এই কাঁসা-পিতল ছিল এক অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার। কাঁসার ঘটি-বাটি তৈরি করার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মনে হয়েছে, হাঁড়ি-কলসী জাতীয় কিছু বানাতে গিয়ে কাঁসা আবিষ্কারের ঘটনা ঘটেছিল 'অঘটন' রূপে এবং যাদের সামনে সেই ঘটনা ঘটেছিল, তারা অবাক বিস্ময়ে জানতে চেয়েছিল — এ বস্তুটি কার? অর্থাৎ 'কস্য ত্বং', 'তুমি কার?' যৌথব্যবস্থার (একালের ভাষায় সাম্যবাদী পাবলিক সেকটরের) নাকি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী-ব্যবস্থার (একালের ভাষায় ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক প্রাইভেট সেকটরের)? বোধ হয় একই রকম ঘটনা ঘটেছিল ভোজবংশীয় (যারা ভোজন বা ভোগ করে, বিক্রি করে না) কংস রাজার আবির্ভাবে। লোকে বুঝতে পারছিল না, সে যৌথমালিকানার পক্ষে নাকি ব্যক্তিমালিকানার পক্ষে। কিংবা তার এত আওয়াজই-বা (কাংস্য-ঝঙ্কার) কেন! স্মর্তব্য যে, উচ্চরব করত **রাবণ**; আর, কাংস্যঝঙ্কার হয় কংস থেকে। মানুষের সমাজে এই কাংস্যঝঙ্কার শোনা যায় কোনো কোনো শাসকের কথাবার্তায়। পরিস্থিতি পক্ষে থাকলে এদের গলা কাংস্যঝঙ্কারে বেজে ওঠে; কেউ তাদের আঘাত করলে তো কথাই নেই। চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দেয়। পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকলে এরা করতে পারে না, হেন দুষ্কর্ম নেই; আর অনুকূলে থাকলে এরা হাতে মাথা নিতে দ্বিধা করে না। শোনা যায়, সেকালের ডাকাতেরা বড় গৃহস্থবাড়িতে ডাকাতির সময় ঘেরাও হয়ে গেলে রান্নাঘরে ঢুকে কাঁসার থালা নিয়ে ছাদে উঠে যেত এবং থালাগুলি হাঁটুর আঘাতে ভেঙে ছুঁড়ত, যা ধারালো অস্ত্রের মতো সাঁই সাঁই বেগে ধাওয়া করত জনতাকে। অর্থাৎ কিনা, কংসের অনেক প্রকার কীর্তি আছে। একালে এই কংসবৎ আচরণকে সামগ্রিকভাবে বোঝানোর জন্য কোনো শব্দ নেই, তবে এর আংশিক বা অত্যাচারমূলক আচরণকে আজকাল 'ফ্যাসিবাদ' শব্দে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

কংসকার (কাঁসারি) : **১.** কংস্‌ + ✓কৃ + অ (অণ্‌) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** / যে কাঁসার কাজ করে; যে কাঁসার পণ্য প্রস্তুত করে। (ব.শ.)। **৩.** বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ, কাঁসারি, কাংস্যপাত্র ব্যবসায়ী হিন্দুজাতিবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** কংসকার অপ্রচলিত, কিন্তু কাঁসারি যথার্থে প্রচলিত।

কংসনদী (কংসাবতী, কাঁসাই) : **১.** কংস + বৎ। **২.** *কংসের মতো প্রবাহিত যে।* **৩.** মেদিনীপুর জেলার একটি নদীর নাম। **৪.** কংসনদী অপ্রচলিত, কিন্তু 'কংসাবতী' ও 'কাঁসাই' উক্ত নদীটির নামরূপে প্রচলিত। **৫.** এই নদীটির বিশেষত্ব হল, বর্ষাকালে যখন তা পূর্ণযৌবনা (ভাদ্রমাসের ভরা নদী), তখন তার গর্জন সমুদ্রের গর্জনকেও হার মানায়। এ সময় বাঁধ ভেঙে এদিক সেদিক ঢুকে

পড়া, বানবন্যায় দেশগ্রাম ডুবিয়ে সর্বনাশ করা তার বাৎসরিক স্বভাব। কিন্তু ক্রমে সেই ভয়ানক নদীই শুকোয়, প্রবাহ বন্ধ হয়, এবং গ্রীষ্মকালে একেবারে ধূ ধূ বালি! তখন নদীর বুকের বালি খুঁড়ে খুঁড়ে জল বের করতে হয়। তাও সব জায়গায় মেলে না, এমনি দুর্গতি হয় তার। মোটকথা, নদীটি কংস স্বভাবের কিংবা বলা চলে সম্পূর্ণতই ফ্যাসিবাদী চরিত্রের। ক্ষমতা থাকলে হাতে মাথা নেয়, না থাকলে নেতিয়ে পড়ে, দয়া ভিক্ষা করে।

কঙ্গু (কঙ্গুকা, কঙ্গুনী, কঙ্গূ, কাঙ্গনী, কাঙুই) : ১. কং + গ (গামী) - উ। ২. **কঙ্গু** = *কারীর রহস্যরূপী গমন নবরূপে উত্তীর্ণ* যাহাতে। ৩. **কঙ্গু** = তৃণধান্যবিশেষ, চীনক, চীনাধান, কাঙ্গনী ধান। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ধানচাষ যেভাবে হয়, সেভাবে এর চাষ হয় না। সাধারণত জমির আলের পাশে, ধানগাছের ফাঁকে-ফুঁকে দু-চার গাছি কঙ্গু ধান নিজে থেকেই হয়ে যায়। সার্বিকভাবে এর পরিমাণ অত্যন্ত কম। হয়তো কম পরিমাণে জন্মায় বলেই এর নাম **কঙ্গু**। সন্দেহ হয়, বিদেশী (আফ্রিকার কঙ্গো নদী) 'কঙ্গো' শব্দটি এরই সহোদর কি না।

কাংস্য (কাংস্যকার) : ১. কংস + ঈয় (ছ) 'তদর্থে হিত' অর্থে — কংসীয়। কংসীয় + য (যঞ্) বিকারার্থে, 'ঈয়' লোপ। (ব.শ.)। ২. ***কাংস্য*** = *কংস আশ্রিত রূপে বিদ্যমান থাকে যাহাতে।* ৩. কংসীয়ের বিকার, কাংস্যনির্মিত (পাত্রাদি), পানপাত্র, বাদ্যবিশেষ, কাঁসি, পরিমাণবিশেষ, কাঁসারি (গন্ধবণিক হইতে শঙ্খবণিকের স্ত্রীতে কাংস্যকারের উৎপত্তি।) (ব.শ.)। ৪. প্রায় অপ্রচলিত। ৫. কংস থাকে যাতে, সেটিই 'কাংস্য' পদবাচ্য। তা সে কাংস্যঝঙ্কার (যে-ঝঙ্কারের ভিতরে কংস তার বিশেষ ধরনের শব্দ বা আওয়াজ রূপে বিদ্যমান থাকে) হতে পারে, আবার কংসীয় সৈন্যবাহিনী বা কাংস্যবাহিনীও (যে-বাহিনীর আচরণে কংসরাজা ইচ্ছা রূপে বিদ্যমান থাকেন) হতে পারে।

কাঁশর (কাঁসর, কাঁসি, কাসর) : ২. ***কাঁশর*** = *কংসজাতকে রক্ষা করে বা রাখে যে।* ৩. কাংস্যনির্মিত বাদ্যবিশেষ, ঝাঁঝ, যান্ত্রিক পীড়াবিশেষ। ৪. বাদ্যযন্ত্র রূপে কমবেশি প্রচলিত। তুলনায়, কাঁসি শব্দটি অধিক প্রচলিত।

'কক্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ককান, ককুৎস্থ, ককুদ, ককুদ্মান, ককুদ্মৎ, ককুভ্, ককুভ, কঙ্কোল, কাউ, কাউআ, কাউয়া, কাক, কাকতালী, কাকতালীয়, কাকনিদ্রা, কাকপক্ষ, কাকপদ, কাকপুচ্ছ, কাকপুষ্ট, কাকপেয়, কাকবন্ধ্যা, কাকবলি, কাকভীরু, কাকভুশুণ্ড, কাকমাচী, কাকযব, কাকরুত, কাকল, কাকলি, কাকা, কাকাক্ষি, কাকাতুয়া, কাকু, কাকুতি, কাকুৎস্থ, কাকুবাণী, কাকুবাদ, কাকুর্বাদ, কাকেক্ষু, কাকেন্দু, কাকোড়ু(দু)ম্বর, কাকোদর, কাকোল, কাগ, কাগা, কাগাতোয়া, কাগাবগা, কাঙ্গা, কেঁদ, কেন্দু, কোঁক, কোঁকা, কোঁকান, কোঁকোঁ, গগা, গগান, গোঁঙান।

কক্ = কারীর করণ। **কক** = কারীর করণ থাকে যাহাতে।

ককুৎস্থ : ১. ককুৎ = ক (মুখ) + ✓কু শব্দ + ক্বিপ - ক। ককুৎস্থ = ককুদ্ + ✓স্থা + অ (ক) - ক। (ব.শ.)। ২. *যে-সত্তা কুঁজে থাকে*। দ্রষ্টব্য **ককুদ্মান**। / যে ককুদে থাকে (ব.শ.)। ৩. ককুদারূঢ়, পৃষ্ঠাসীন। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে সূর্যবংশীয় শশাদের পুত্র পুরঞ্জয়রাজ, মতান্তরে ভগীরথের পুত্র। পুরঞ্জয় বৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদে থাকিয়া দেবাসুর যুদ্ধে অসুরবল নিহত করেন। তদবধি তিনি 'ককুৎস্থ' 'ইন্দ্রবাহ' ও 'পুরঞ্জয়' এই তিন নামে অভিহিত হন। (ব.শ.)। ... বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে যে, ত্রেতাযুগে যখন দেবাসুরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, দেবতারা অসুরদের দ্বারা পরাজিত হয়ে বিষ্ণুর সাহায্যপ্রার্থী হন। বিষ্ণু পুরঞ্জয়ের সাহায্য গ্রহণ করতে বলেন। দেবতারা পুরঞ্জয়ের কাছে গেলে, তিনি বলেন যে, যদি দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বাহন হন, তবেই তিনি দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হবেন। প্রথমে ইন্দ্র লজ্জায় এ প্রস্তাবে অসম্মত হন। কিন্তু পরে বিষ্ণুর অনুরোধে সম্মত হন। রাজা তখন মহাবৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদে (ষাঁড়ের ঝুঁটিতে) আরোহণ করে যুদ্ধে গমন করেন, এবং অসুরদের বিনাশ করে দেবতাদের রক্ষা করেন। সেই থেকে পুরঞ্জয় রাজার নাম হয় ককুৎস্থ, আর দৈত্যপুরী জয় করেছিলেন বলে নাম হয় পুরঞ্জয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ককুদ কথাটির একটি অর্থ 'কুঁজ' বা 'কুব্জ'। এই কুব্জ কী বস্তু তা জানা যাবে '**কন্যাকুব্জ**' শব্দের অর্থ থেকে। এই ককুৎস্থ যদি ভগীরথপুত্র হন, তবে তার অন্য নাম **সৌদাস, কল্মাষপাদ**। দ্র. **কাকুৎস্থ**।

ককুদ্মান, ককুদ্মৎ : ১. ককুদ্ + মৎ। (ব.শ.)। ২. *ককুদ আছে যার*। ৩. ককুদযুক্ত, উন্নতককুদবিশিষ্ট, মহাককুদ, বৃষভ, শিখরবান, পর্ব্বত, ঋষভ নামক ওষধি। **ককুদ্মতী** = শ্রোণি, কটি। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সামাজিক সংগঠনের সর্বোচ্চ আসন বা কেন্দ্র থাকে, যেমন রাষ্ট্রের সিংহাসন, কোম্পানির পরিচালকের আসন ইত্যাদি। জৈব সংগঠনেরও থাকে, যেমন মানুষের মাথা। কিন্তু যে সংগঠনের বুদ্ধিকেন্দ্র ও শক্তিকেন্দ্র আলাদা, তেমন সংগঠনকে কী নামে ডাকা হবে? তাছাড়া, শক্তিকেন্দ্রবান সংগঠনের নাম কী হবে? আমাদের প্রাচীন পুরুষরা 'শক্তিকেন্দ্রবান সামাজিক সংগঠন'কে '**ককুদ্মান্**' বলা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেছিলেন। অর্থাৎ সেকালে শক্তিকেন্দ্র-সম্পন্ন সমাজগোষ্ঠীকে ককুদ্মান্ বলা হত। এর আর একটি অর্থ হল, একদল মানুষ থাকলে যে তার একটি শক্তিকেন্দ্রও থাকতে পারে, এ-ধারণা সম্ভবত তখন মানুষের মধ্যে সবে তৈরি হচ্ছে, সমাজে ক্ষত্রিয়ের জোট জন্মাচ্ছে। একালে আমরা কেন্দ্রিকৃত সমাজসংগঠন দেখে দেখে এতই অভ্যস্ত (কনডিশনড) যে, আমরা বুদ্ধিকেন্দ্রহীন বা মাথাহীন ও বুদ্ধিকেন্দ্রসম্পন্ন বা মাথাসম্পন্ন দুরকম সমাজ সংগঠনের কথা ভাবতেই পারি না; শক্তিকেন্দ্রহীন বা শক্তিকেন্দ্রবান সমাজগোষ্ঠীর কথা ভাবা তো প্রায় অসম্ভব। দ্র. **ককুৎস্থ**। তবে ঋষভ নামক **ওষধি** বলতে ঠিক কী বোঝায়, এখনও বোঝা যায়নি। দ্র. **ঋষভ**।

কাক : ১. ✓কৈ (শব্দ করা) + ক (কন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.) । ২. *'(কা কৃত্য) কী করেছ (বানিয়েছ)' এই কথা বলে যে।* / যে 'কা-কা' শব্দ করে। (ব.শ.)। ৩. বায়স, অতিধৃষ্ট, পীঠসর্পী, খঞ্জ, শিরোবক্ষালন অর্থাৎ কাকতুল্য কেবল মাথা ডুবাইয়া স্নান করা, পরিমাণবিশেষ, বৃক্ষবিশেষ, কাকপদতুল্য তিলকভেদ, কাকপ্রধান দ্বীপভেদ, কড়ার চতুর্থাংশ, সুরতবন্ধবিশেষ, ঈষৎ জল, কাকনামা লতা, কাকোলী, কাকজঙ্ঘা, ... কাকমাচী বৃক্ষ। (ব.শ.)। ৪. কেবল crow অর্থে প্রচলিত। ৫. মনে হয়, 'কই? কী বানিয়েছ? দাও!' এইরকম বলে যে, তাকেই কাক বলা হয়। তবে এ-কাক পাখিদের সমাজে যেমন আছে, তেমনি মানবসমাজেও আছে। কাক এক রকমের **পক্ষী**। পক্ষীদের (ক্রেতাপক্ষ বিক্রেতাপক্ষ, কিংবা আসামীপক্ষ বাদীপক্ষ, এরকম দুটো করে) পক্ষ থাকে। জনসমাজে ছিঁচকে চোরদের কাক বলা হত। মনে হয়, এরা 'কাকুতি-মিনতি' করে বা '**কাকবলি**' নিয়ে যে-বস্তু পেত, সেটিই অন্যত্র 'কাকুতি-মিনতি' করে বিক্রি করত বা বিনিময় করত। সেইজন্যই তাদের 'বায়স' বলা হয় (দ্র. **বায়ু**)। সেই সুবাদে হয়তো এরাই পৃথিবীর আদি ফেরিওয়ালা বা দোকানদার। তার পরে ক্রমান্বয়ে মানুষের সমাজে বহু রকমের 'পক্ষী'র বা দোকানদারের আবির্ভাব ঘটে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য কলিম খান-এর 'পক্ষীপুরাণের মক্‌শো' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য, যা প্রকাশিত হয়েছে 'খনন' পত্রিকার ২০ বর্ষ ২২ সংকলনে (অক্টোবর, ২০০৫)। আরও দ্রষ্টব্য **কেকা**। ৬. ইংরেজি caw, kaw।

কাকবলি : ১. কাক + বলি। ২. *কাককে দেয় (দিতে হয় যে-) বলি।* ৩. কাককে দেয় অন্নাদি, কাককে দেয় নবান্নের অংশ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সম্ভবত আগের যুগে দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞাকারী ফেরিওয়ালাকে কিছু পরিমাণে উৎপন্ন দিয়ে দিতে হত। হয়তো দাম নিয়েই অথবা এমনিই। সেই প্রদত্ত উৎপন্নকে বলা হত 'কাকবলি'। এই 'কাকবলি' না দিলে চুরি ঠেকানো কঠিন হত। (শৈশবে দেখেছি, আমাদের গ্রামে একজন চোর ছিল। সে গ্রামে চুরি করত না। পরিবর্তে যখনই সে আসত, 'বউদি, আমার সিধা দাও' বলে দাওয়ায় বসত, মা তাকে কিছু চাল ডাল তরিতরকারি এবং দু-পাঁচ টাকা দিয়ে দিতেন। বাবা কিছু বললে, মা তর্ক করতেন, 'ও আছে বলেই তো ভিনগাঁয়ের চোরও আসে না।' তাছাড়া গ্রামে কারও বাড়িতে চুরি হলে তাকে অনুযোগ করা হত এবং দেখা যেত কয়েকদিনের মধ্যে বাইরের চোরটিকে সে পাকড়াও করে চোরাই মালের কিছু কিছু উদ্ধার করে এনেছে। হয়তো সে-কারণেই 'কাকবলি' তার পাওনা ছিল। — কলিম খান) তাছাড়া, ভারতসমাজের সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ ও বণ্টনের নিয়মগুলি যাতে সাধারণ মানুষের আচারের মধ্যে থাকে, তার জন্য যে অখণ্ড বুদ্ধিতে সবকিছুকে আচারে পরিণত করা হত, (দ্র. **অঞ্জন, কাজল**) সেই নিয়মে গ্রামাঞ্চলে কাকের উদ্দেশে রুটি পিঠা গাছের ডালে ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে আসা বছরের একটি বিশেষ দিনের আচার ছিল। বাচ্চারা নানারকম ছড়ার গান গেয়ে, কাককে ওই খাদ্যবস্তু খেতে ডাকত। সে ছিল বাচ্চাদের বড় মজার দিন। একেও 'কাকবলি' বলা হত। বয়স্ক মানুষেরা এখনও কেউ কেউ সেই স্মৃতির কথা বলতে পারেন। বর্তমানে এই আচারটি আর কাউকে পালন করতে দেখা যায় না। কাককে ডাকার ছড়াটিও আর শোনা যায় না।

কাকপক্ষ : ১. কাক + পক্ষ। ২. কাকের পক্ষ। (ব.শ.)। ৩. (ভরতমতে) কাকের পক্ষের মতো ক্ষত্রিয়কুমারের শিখাপঞ্চক; (অমরকোষ টীকা মতে) শিখাত্রয়; (ব.শ. মতে) মস্তকের পার্শ্বদ্বয়ে কেশরচনাবিশেষ; কানপাটা, জুলপি। ৪. অপ্র.। ৫. বস্তুর মালিকানার সঙ্গে মানুষের কেশের সম্পর্ক কতখানি গভীর তা জানা যায় **কেশ** শব্দ থেকে। তবে পক্ষ শব্দটি কীভাবে এই অর্থে সংযুক্ত হল, তা এখনও দুর্বোধ্য। দ্র. **অঞ্জনা, পুঞ্জিকস্থলা, পঞ্চশিখ**।

কাকপেয় : ১. কাক + পেয়। ২. কাক কর্তৃক পেয়। (ব.শ.)। ৩. জলপূর্ণতাহেতু কাকে তীরে বসিয়া যে নদীর জল পান করিতে পারে অর্থাৎ পূর্ণতোয় (নদী); (নিন্দাপক্ষে) অল্প জল হেতু কাকে যাহার জল পান করিয়া নিঃশেষ করিতে পারে, অর্থাৎ স্বল্পতোয় (নদী)। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. 'কাকপেয়' শব্দের অর্থ থেকে দেখা যাচ্ছে কাকপেয় ব্যক্তি অতি ধনী কিংবা অতি দরিদ্র দুই হতে পারে।

কাকভুশুণ্ড, কাকভুশুণ্ডি, কাকভুষুণ্ড, ভুশুণ্ডির কাক : ১. কাক + ভুষুণ্ড। ২. *যে কাকের ভুষুণ্ড আছে।* ৩. পুরাণপ্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী অমর কাক, ভূষণ্ডী কাক। ইনি ব্রাহ্মণ, লোমশ মুনির শাপে কাক হন। ইনি রামভক্ত ছিলেন। কথিত আছে, ইঁহার প্রণীত 'ভুশুণ্ডি-রামায়ণ' আছে। গৌণার্থে দীর্ঘজীবী বহুদর্শী ব্যক্তি। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এই কাকভুষুণ্ড যে-সে কাক নয়, ইনি রামায়ণ রচয়িতা। সুতরাং এ যে crow-মাত্র নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। তাহলে কাকভুশুণ্ড ব্যক্তিটি বা গোষ্ঠীটি কে বা কারা? সে দীর্ঘজীবী বহুদর্শী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের গোষ্ঠী হতে পারে। তবে সে যে আদি দোকানদার শ্রেণীও হতে পারে, সেকথা ভাববার অবকাশ থেকে যায়। মোট কথা জ্ঞানকর্মের ভূষির রহস্যরূপ নিয়ে সে উড়ে বেড়ায়, ঘুরে বেড়ায়। না হলে ভারতের ইতিহাসে পুঁজিবাদী বিপ্লবের প্রথম চেষ্টা ও ব্যর্থতার কথা তাঁরা রামায়ণে লিখে গেলেন কীভাবে?

কাকল : ১. কা + কল। ২. যাহার 'কা' কল (শব্দ)। (ব.শ.)। ৩. দ্রোণকাক; দাঁড়কাক, গ্রীবাস্থ উন্নতস্থান, টুটি, কণ্ঠমণি। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যার 'কা' 'কা' কল (call)। অর্থাৎ যে সত্তা থেকে 'কা কা কা' ধ্বনি পরম্পরায় বেরিয়ে আসে সেই হল কাকল। একে দ্রোণকাক ভেবে নিলে অর্থটি স্থির হয়ে প্রতীকী হয়ে যায়। কার্যত, কল যার 'কা কা ...' সেই হল কাকল, সে **দ্রোণকাক** হতে পারে, অন্য কেউও হতে পারে; যদি সেও 'কা কা' কলন (call on) করে।

কাকলি, কাকলী : ১. কাকল + ই। ২. *কাকলের গতিশীলতা যাহাতে।* ৩. অব্যক্তমধুর ধ্বনি, গৃহস্থ জাগিয়া আছে কি না, জানিবার জন্য তস্করের মৃদুধ্বনি বাদ্যবিশেষ, চোরের সিটি, গুঞ্জালতা, রতিকূজিত, শীৎকার। (ব.শ.)। ৪. মেয়েদের নাম হিসেবে প্রচলিত। ৫. অধর-ওষ্ঠকে সংকুচিত করে সিটি বাজালে যে মধুর আওয়াজ

হয়, সেই আওয়াজ ধীরে ধীরে, গানের সুরে অনেকেই বাজাতে পারে। কেউ কেউ মুখে আঙুল ঢুকিয়ে সেই আওয়াজেরই একটা তীক্ষ্ণ তীব্র রূপ প্রকাশ করতে পারে। কৈশোরে সেই সব সিটি বাজাতে শেখার আপ্রাণ চেষ্টা করে কিশোরেরা। মা-বাবা নিষেধ করেন, বিশেষত রাতের বেলায় সেরকম সিটি বাজানোর চেষ্টা করলে। কারণ এই কাকলি নিন্দনীয়। এ-যে 'গৃহস্থ জাগিয়া আছে কি না, জানিবার জন্য তস্করের মৃদুধ্বনি বাদ্যবিশেষ' অর্থাৎ চোরের সিটি। ভালমানুষ তা বাজাবে কেন!

কাকুতি : ১. কা + আকুতি। ২. *কা-কা রূপ আকুতি*। ৩. কাকুযুক্ত বাক্য, কাতর বচন, দীনবাক্য, কাতর প্রার্থনা। (ব.শ.)। ৪. 'কাকুতি-মিনতি' — এভাবেই শব্দটি প্রচলিত। ৫. উপরোক্ত ছিঁচকে চোর বা ফেরিওয়ালার কাতর বচনই কাকুতি অর্থে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। পরে তা সাধারণভাবে প্রযুক্ত হওয়ার প্রচলন হয়েছে। দ্র. **মিনতি**।

কাকুৎস্থ : ২. ককুৎস্থের অপত্য-সামান্য বা বংশজাতমাত্র। (ব.শ.)। ৩. ককুৎস্থের পুত্র ও রঘুর পিতা, অজ, দশরথ, রাম, লক্ষ্ণ, রাম ও লক্ষ্মণ, পুরঞ্জয়। (ব.শ.)। দ্র. **কল্মাষপাদ, সৌদাস**। ৪. অপ্র.। ৫. ভৃগু থেকে যেমন ভার্গব, তেমনি ককুৎস্থ থেকে তার বংশজদের নাম হয় কাকুৎস্থ। ভগীরথের পুত্র সৌদাস হলে, বিষয়টি অন্য একটি মাত্রা পায়। কেননা ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেছিলেন। সৌদাস তারই উত্তরাধিকার। তবে দুটি একই ধরনের ঘটনা হতে পারে; প্রথমটি আগের যুগের, পরেরটি ভগীরথ-পরবর্তী কালের। তার কারণ হল, যেহেতু চরিত্রগুলির ক্রিয়াশীলতা এক ধরণের তাই একই নাম দিয়ে তাদের উল্লেখ করতে গিয়ে এরকম হয়ে থাকতে পারে। এরকমই হয়েছে **দময়ন্তীর** পিতা বিদর্ভরাজ ভীমের নামকরণে।

'কঙ্ক্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : কঙ্ক, কঙ্কই, কঙ্কট, কঙ্কটক, কঙ্কণ, কঙ্কত, কঙ্কতি, কঙ্কত্রোট, কঙ্কত্রোটি, কঙ্কপত্র, কঙ্কবদন, কঙ্কমুখ, কঙ্কর (কংকর - হিন্দি), কঙ্করোল, কঙ্কা, কঙ্কাল, কঙ্কালী, কাঁক, কাঁকই, কাঁকশ, কাঁকিলা, কাঁকুই, কাকই, কাঙ্করি, কোঙ্কন, কোল, কোলপুচ্ছ।

কঙ্ক্ = কারীর রহস্যরূপের রূপায়ণ। **কঙ্ক** = কারীর রহস্যরূপের রূপায়ণ থাকে যাহাতে, অর্থাৎ, কঙ্ করে যে।

কঙ্ক : ১. ✓কঙ্ক্ (গতি) + অ (অচ্) - ক। (ব.শ.)। ২. *কারীর রহস্যরূপের রূপায়ণ থাকে যাহাতে; কং (করণের প্রযুক্তির রূপায়ণ) করে যে*। ৩. পক্ষীবিশেষ, কাঁকপাখি, হাড়গিলা, ছদ্মবেশধর দ্বিজ, ছদ্মদ্বিজবেশধর যুধিষ্ঠির, ক্ষত্রিয়, যম, আম্রবিশেষ, মহারাজচ্যুত, উগ্রসেনসুত ও কংসভ্রাতা, শাল্মলী দ্বীপের সীমান্ত পর্ব্বত, জাতিবিশেষ। (ব.শ.)। (ক) যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা দুর্যোধনের সঙ্গে অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে সুদীর্ঘ বারো বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে বাধ্য হন। ... অজ্ঞাতবাসকালে যুধিষ্ঠির কঙ্ক নাম গ্রহণ করেন। ... **কঙ্ক শব্দের অর্থ ছদ্মবেশী** ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ; সুতরাং উক্ত নাম গ্রহণে তিনি সত্যকথাই বলেছেন। ... (খ) উগ্রসেনের চতুর্থ পুত্র ও কংসের সহোদর। ইনি একজন বিখ্যাত মহারথী ছিলেন। কংস নিহত হলে এবং জরাসন্ধ মথুরা অবরোধ করলে, ইনি অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দেন। ইনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে এবং অশ্বমেধে নিমন্ত্রিত হন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কংক = কঙ্ক। দ্রষ্টব্য **কং**। করণের ইচ্ছা, ধারণা, বুদ্ধি, করণকৌশল, মোট কথা করণ বিষয়ক মূল শক্তিটিকে কাজে রূপায়িত করে বা করার ক্ষমতা ধরে যে, সেই **কঙ্ক**। পাখিদের সমাজে এ হল কাঁকপাখি, মানুষের সমাজে ছদ্মবেশী ক্ষত্রিয়। দ্রষ্টব্য **কঙ্কাল**। তথ্য এইরূপ যে, ইন্দ্র ত্রিশিরাকে বধ করলে তার প্রথম কাটা-গলা থেকে **কঙ্ক** পক্ষী (চাতকপক্ষীদল বা কৃষিজীবী), দ্বিতীয় কাটা-গলা থেকে **কলবিঙ্ক** পক্ষী (শ্যেনপক্ষীদল বা শিকারজীবী বা কারুজীবী) ও তৃতীয় কাটা-গলা থেকে **কপিঞ্জল** পক্ষীরা (তিত্তিরপক্ষীদল বা লেখজীবী-কেরানিরা) বহির্গত হয়। তন্মধ্যে এই তিত্তিরি পক্ষীরা পরে যাজ্ঞবল্ক্যের উগরে দেওয়া যজুর্বেদ ভক্ষণ করেছিল এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা লিখেছিল। এই বমি-করা বেদই কৃষ্ণ-যজুর্বেদ। পরে যাজ্ঞবল্ক্য যে-বেদ লেখেন, তার নাম শুক্ল-যজুর্বেদ। দ্রষ্টব্য **ত্রিশিরা**।

কঙ্কণ : ১. কম্ (সুখ) + ✓কণ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কারীর রহস্যরূপের কথা অন থাকে যাহাতে; করণ-প্রযুক্তির রূপায়ণকারীর (হাতের, ঋষির, রাজার) গৌরব ঘোষণা থাকে যাহাতে*। ৩. করভূষণবিশেষ, কাঁকন, ভূষণমাত্র, হস্তীর পদভূষণ বিশেষ, বিবাহে বদ্ধ হস্তসূত্র, শেখর, শিরোভূষণ, জলকণ, শ্রেষ্ঠার্থক। (ব.শ.)। ৪. করভুষণ কাঁকন অর্থে প্রচলিত। ৫. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর নাম থেকে বোঝা যায়, কঙ্কণ শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি মুকুন্দরামের যুগেও সবাই জানতেন, তাই সেই পদবী তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। যে-শব্দের অর্থ দাতা গ্রহীতা কেউই জানে না, সেই শব্দের ব্যবহার চলা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক নয়। এই কবির কবিতায় রাজার গৌরব-কলঙ্কের **কঙ্কণ**ধ্বনি বা ঘোষণা ছিল বলেই তিনি কবিকঙ্কণ।

কঙ্কত (কঙ্কতি) : ১. ✓কঙ্ক্ (গতি) + অত - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কঙ্ককে ত্রাণ করে যে*। ৩. কেশমার্জ্জন, কাঁকই, চিরুনি। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. শিরে চিরুনি চালালে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সঞ্চলনে নাকি সহায়তা হয়। মাথায় থাকে ধারণা, কাজ করার বুদ্ধি বা **কঙ্ক**। তাকে অন (on) হতে সাহায্য করে চিরুনি। হয়তো সেই সুবাদে একে কঙ্কত বা কঙ্কতি বলে।

কঙ্কাল : ১. ✓কঙ্ক্ + আল (আলচ্) - ণ। (ব.শ.)। ২. *কঙ্ক-রূপ অভীষ্ট দান করে যে*। ৩. শরীরাস্থি, অস্থিপঞ্জর। (ব.শ.)। ৪. অস্থিপঞ্জর বা skeleton অর্থে প্রচলিত। ৫. ভয় > ভয়াল, কর > করাল, তেমনি **কঙ্ক** থেকে কঙ্কাল। করালের ভিতরে কর সক্রিয় থাকে, ভয়ালের ভিতরে ভয় সক্রিয় থাকে, কঙ্কালের ভিতরে **কঙ্ক** (করণকারী

শক্তি, দ্র. **কঙ্ক**) সক্রিয় থাকে। মানবশরীরের ক্ষেত্রে এ যদি মানুষের শরীর-খাঁচাটিকে বোঝায়, তবে সমাজশরীরের ক্ষেত্রে এটি বোঝাবে প্রজাসাধারণকে নিয়ে গড়ে ওঠা সামাজিক খাঁচাটিকে (একালে যাকে social structure, superstructure বলা হয়), যার ভেতরে সামাজিক **কঙ্ক** (পরিচালক গোষ্ঠী) সক্রিয় হয়। হয়তো সেকারণেই কঙ্কালী বলতে দেবী কালীকে বোঝায়। দ্রষ্টব্য **কালী**।

কঙ্কালী (লিন্) : ১. কঙ্কাল + ইন। ২. *কঙ্কালের আধারশক্তি।* ৩. যক্ষবিশেষ, দুর্গার মূর্তিবিশেষ, কালী, বীরভূমে শক্তিপীঠবিশেষ ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবী। ৪. দেবী কালী অর্থে প্রচলিত। ৫. প্রজাসাধারণকে নিয়ে গড়ে ওঠা সামাজিক কাঠামো। এরা শ্রমজীবী জনসাধারণ। নিজেরা চলে না, সমাজ পরিচালকেরা যেমন চালায় তেমন চলে। সেই অর্থে কর্মীজনগণ বা **কালী** অর্থে শব্দটি প্রচলিত ছিল।

'কচ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : কচ, কচকচি, কচকা, কচগ্রহ, কচড়া, কচপক্ষ, কচপাশ, কচভার, কচহস্ত, কচমচ, কচরকচর, কচরমচর, কচরচনা, কচলা, কচহরি, কচা, কচাকচ, কচাক্কচ, কচাকচি, কচাৎ, কচান, কচাল, কচি, কচু, কচুপোড়া, কচ্ছ, কচ্ছপ, কচ্ছা, কাচ, কাচড়া, কাচঢাল, কাচন, কাচমণি, কাচলবণ, কাচা, কাচারি, কাচি, কাচিম, কাচু-মাচু, কাচ্চাবাচ্চা, কাছ, কাছটি, কাছা, কাছাকাছি, কাছাড়, কাছারি, কাছিম, কাছুটি(টী), কাছুয়া, কিচ, কিচকিচ, কিচিকিচি, কিচিরমিচির, কেচরা, কেচা-কেচা, কেচো, কোঁচা, কোঁছা (কচ্ছ), কোচ, কোচল, কোচোয়ান, কৌচ, বিকচ।

কচ্ = কারীর (দ্র. **ক**) চয়ন; **কচ** = কারীর চয়ন থাকে যাহাতে; কারীর (সত্তার) সার (বীজ, মূলস্বরূপ) সঞ্চিত হয় যাহাতে; করণের (মালিকানাবোধ সহ কর্মকৌশলজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিষয়ক সমস্ত প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ আধার) আধার সঞ্চিত থাকে যাহাতে।

কচ (কচি) : ১. ✓কচ্ (শোভা) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *(উপরে 'কচ্' শব্দমূলের অর্থ দ্রষ্টব্য।)* / যাহা মস্তকে শোভা পায়। (ব.শ.)। ৩. কেশ, মেঘ, শুষ্কব্রণ, বস্ত্রপ্রান্ত, বন্ধ, শোভা; কচিপাতা, কোনাচভাব, অঙ্কুর যুক্ত ছিন্ন শাখা, ধারাল অস্ত্রে নরম দ্রব্য অনায়াসে কাটার শব্দ, ... ধন্যাত্মক 'কচকচ' শব্দ; বৃহস্পতির পুত্র (ইনি দেবগণের মঙ্গলার্থ, শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া শুক্রাচার্য্যের নিকটে সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করেন।)। (ব.শ.)। সঞ্জীবনী-বিদ্যা অর্জন করতে তিনি দেবগণ কর্তৃক শুক্রাচার্যের নিকট প্রেরিত হন এবং তার কন্যা দেবযানীকে সন্তুষ্ট করে শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব লাভ করেন। ঘটনাচক্রে দেবযানী ক্রমে কচের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। অসুররা কচের অভিসন্ধি জানতে পেরে গোচারণকালে কচের দেহ খণ্ড খণ্ড করে সারমেয়দের খাইয়ে দেয়। দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ করে কচকে জীবিত করেন। এরপর দানবরা কচকে ভস্ম করে সেই ভস্মমিশ্রিত 'সুরা' শুক্রাচার্যকে পান করায়। দেবযানী পুনরায় কচের জীবন প্রার্থনা করলে, অনন্যোপায় শুক্রাচার্য উদরস্থ কচকে সঞ্জীবনী-বিদ্যা দান করে বললেন যে, তুমি পুত্ররূপে আমার উদর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আমাকে সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত করো। কচ শুক্রের দেহ ভেদ করে নির্গত হলে শুক্রাচার্য মারা যান এবং কচ নবলব্ধ সঞ্জীবনী-বিদ্যার প্রভাবে শুক্রাচার্যকে পুনর্জীবিত করেন। এরপর কচ দেবলোকে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করলে দেবযানী তাঁকে প্রেম নিবেদন করে বিবাহ করতে চান। কচ বললেন, তোমার যেখানে উৎপত্তি, শুক্রাচার্যের সেই দেহের মধ্যে আমিও বাস করেছি, ধর্মতঃ তুমি আমার ভগিনী, সে জন্য এ বিবাহ অসম্ভব। দেবযানী ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন যে, কচের লব্ধ সঞ্জীবনী-বিদ্যা ফলবতী হবে না। কচও বিপরীতে দেবযানীকে অভিশাপ দেন যে, কোনো ব্রাহ্মণ ঋষিপুত্র তোমাকে বিবাহ করবে না। তবে তোমার অভিশাপে আমার পক্ষে এই বিদ্যা নিষ্ফল হলেও আমি যাকে এই বিদ্যা দান করব, তার বিদ্যা ফলবতী হবে। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত, তবে বাংলা 'কচকচি' ও হিন্দি 'কচহরি' (কাচারি) রূপে শব্দটি আংশিক প্রচলিত। ৫. যাতে কারীর চয়ন থাকে, সেই হল **কচ**। এই কারী বা 'ক' একটি ধারাল অস্ত্র হতে পারে যা দিয়ে কচু গাছ কাটা হচ্ছে; একটি কলম (অগ্রবীজ) হতে পারে যে মূল গাছের থেকে পুরো অস্তিত্বকে সংক্ষিপ্ত আকারে কেটে নিচ্ছে; আবার এমন একজন ব্যক্তিমানুষও হতে পারে যে কর্মের সারকচু (মানকচুর মতো বিশেষ ধরনের কচু) কেটে নিচ্ছে। অতএব এই 'কচ' কাকে বোঝাবে, তা নির্ভর করবে বাক্যের প্রেক্ষিতের উপর। পুরাণকাহিনীর **কচ** কর্মের সার জানতেই শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব নিয়েছিল। এ হল **দেবতরুর** শাখা **অশ্বত্থ** বৃক্ষে বসিয়ে কলম বা **কচ** (দ্র. **অগ্রবীজ**) করে নেওয়া। তবে প্রযুক্তি যার, সেই পরে মালিক হয়। মালিকানাও সেই অর্থে 'কচ' শব্দের অন্তর্ভুক্ত। **কচ** বা কেশ ধরে টান মারলেই সবটা চলে আসে। ইংরেজিতে এই 'কচ' শব্দটির একটি অর্থ 'high catch' শব্দের মধ্যে পাওয়া যায়। **কচকচি**, চুলোচুলি, **কেশাকেশি** সেই মালিকানা নিয়ে বাদবিবাদ বা ঝগড়াঝাঁটিকে বোঝায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য (ঙ) গ্রন্থের 'বেণীসংহার বৃত্তান্ত' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

কারীর বা অস্তিত্বের সার চলে যায় তার উত্তরসূরীর অস্তিত্বে। সেই কারণে সেও **কচ**। সে যখন বিকশিত বা গতিশীল হয়, তখনই সে 'কচি'। শিশুদের বোঝাতে গ্রামবাংলায় (মেদিনীপুর অঞ্চলে) শব্দটি খুবই ব্যবহৃত হয়। 'কচিপাতা' সর্বজনীন বাংলা শব্দ। আবার জানালা-দরজার চৌকো চেহারার মূল নিয়ন্ত্রণ থাকে তার কোনাচে। সেই কোনাচ অচ (দ্র. **অচ্ছ**) না হয়ে কচ হয়ে গেলে, সেই কচ ভেঙে দিতে হয়; নইলে চৌকোটির সমকোণগুলি ঠিক থাকে না। দ্র. **কচহরি, দেবযানী**। ৬. ইংরেজি cache, catch।

কচকচি, কচাকচি : ২. কচে কচে ধরিয়া প্রবৃত্ত যুদ্ধ (ব.শ.)। ৩. কেশাকেশি, চুলাচুলি। (ব.শ.)। ৪. ঝগড়াঝাঁটি অর্থে প্রচলিত। ৫. কচ নিয়ে কচাকচি, কেশ নিয়ে কেশাকেশি, চুল নিয়ে চুলোচুলি — এসবই আসলে মালিকানা নিয়ে টানাটানি অর্থে প্রচলিত ছিল। এই ক্রিয়াটিতে পুরুষ-প্রকৃতি সম্পর্ক ঘটে বলে শব্দগুলি মারামারি, হাতাহাতি, কানাকানি জাতীয়। সংস্কৃতের এই গুণ তুলনায় কম। (পাণিনি 'কচাকচি' শব্দ স্বীকার করেছেন চুলোচুলি অর্থেই। তবে

এরকম শব্দ সংস্কৃতে বেশি নেই।) বাংলায় পুরুষ-প্রকৃতি ধারণাটি এভাবে অনেক বিস্তারিত হতে পেরেছে। বলতে গেলে পুরুষ-প্রকৃতি বিষয়ক সনাতন ধ্যানধারণাকে আত্মসাৎ করে নিয়ে বাংলাভাষা তাকে আরও উচ্চভাবে প্রয়োগ করেছে তার অজস্র 'মারামারি' জাতীয় দ্বৈতাদ্বৈত চরিত্রের শব্দে। এই ধরনের শব্দের ভিতরে যে ক্রিয়া থাকে, তার কারক সবসময় দুই বা ততোধিক হয়, কিন্তু ক যখন মারে (অতএব পুরুষ) খ তখন মার খায় (অতএব প্রকৃতি), আবার পরক্ষণেই খ মারে (অতএব পুরুষ) এবং ক মার খায় (অতএব প্রকৃতি)। কেবল তাই নয়, প্রথম পদটি (মারা) অসীমগুণসম্পন্ন ব'লে পুরুষ পদবাচ্য এবং শেষ পদটি (মারি) সীমাগুণসম্পন্ন বলে প্রকৃতি পদবাচ্য। দ্বিমুখী এই ধরনের ক্রিয়াকে বুঝবার এ অতি উচ্চমানের চেতনা। একই কথা এই ধরণের সমস্ত দ্বৈতাদ্বৈত শব্দের ক্ষেত্রে বলা যায়। বাংলাভাষায় সমস্ত ক্রিয়ামূলক শব্দকে, এমনকি কিছু বিশেষ্য শব্দকেও এই নিয়মে প্রয়োগ করা যায়, ফলে শব্দসংখ্যা বিপুল সংখ্যায় বেড়ে যায়। যথা — **ধরাধরি, কাড়াকাড়ি, নাড়ানাড়ি, ঝুলাঝুলি, হাতাহাতি, মাখামাখি, কানাকানি, লাগালাগি, ভাগাভাগি, সাধাসাধি** ... ইত্যাদি অজস্র। এবং মনে হয়, অন্য কোনো ভাষায় এইরূপ ভাষা-জননকৌশল (ইঞ্জিনিয়ারিং) নেই।

কচগ্রহ : ২. *কচ গ্রহণ করে যে*। ৩. কেশগ্রহণ, কেশাকর্ষণ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কথাটি মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল। তখন কারও মালিকানা ধরে টান মারত যে, তাকেই কচগ্রহ বলা হত।

কচলা (কচলানো, কচা, কচাল) : ১. কচ + লা (লওয়া)। ২. *যার (যে ক্রিয়ার) মাধ্যমে (কারও) কচ-রূপ অভীষ্টের আনয়ন করা হয়।* ৩. মর্দ্দন করা, মুছা, রগড়ান, চাপিয়া ধরা, প্রক্ষালন করা, ধোওয়া, নিষ্পেষণ করা, চটকান, অত্যন্ত পীড়ন বা ধরা-বাঁধা করা। (ব.শ.)। ৪. রগড়ান অর্থে প্রচলিত। ৫. **কচ** পাওয়া যায় যে ক্রিয়ার দ্বারা, তাকে কচলানো বলে। কচ বা কারীর চয়ন হল সেই বস্তু, মূল বিষয়টিকে কচলে আপনি যেটি বের করতে চান। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কচের স্থানবদল হয়, কুমীর-শেয়ালের চাষের ফসল ভাগাভাগির গল্পের মতো। ধান চাষে ফসল মাটির ওপরে, আলু চাষে ফসল মাটির নীচে। কাউকে কচলে যেটি বেরিয়ে আসে সেটিই কচা, যা থেকে যায় সেটি মল। আবার কাউকে কচলে যেটি থেকে যায় সেটিই কচা, যা বেরিয়ে যায় সেটি মল। আপনি খানিকটা ধান নিয়ে কচলান, খানিক পরেই দেখবেন কিছু কিছু ধানের কচা বেরিয়ে পড়েছে আর আপনার হাতে থেকে গেছে মলস্বরূপ কুঁড়া। এই ধানের কচা হল 'চাউল প্রভৃতির অর্দ্ধচূর্ণ কণা বা মোটা গুঁড়া'; আর কুঁড়া হল কুণ্ডিত ধানের ছাল ও অন্যান্য ময়লা। বিপরীতে, জলে নেমে পচানো পাটের আঁটি নিয়ে কচলাতে শুরু করুন, খানিক পরেই 'বিকচিত' হয়ে হাতে চলে আসবে কচস্বরূপ ধোওয়া ঝকঝকে রুপোলী পাট, পাটকাঠি ও ময়লা থেকে যাবে পৃথক হয়ে। কিন্তু যার এরকম কচ বেরোনোর উপায় নেই, তাকে কচলানো বৃথা। গ্রাম-বাংলার মায়েরা বলেন, 'ছেলের বউয়ের নামে অত নিন্দে করিসনি বাছা, লেবু কচলালে তিতো হয়; ওকে নিয়েই তো ঘর করতে হবে।' ৬. ইংরেজি quash, squash।

কচহরি (কাচারি, কাছারি) : ১. কচ + হরী। (ব.শ.)। ২. *যে স্থানে (প্রজাদের) কচ (মালিকানা) হরণ করা হয়। /* বাদ বিবাদ হরণ করা হয় যেখানে। (ব.শ.)। ৩. বিচারালয়, আদালত, দফতর, কার্য্যালয়; রাজসভা, দরবার। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. শব্দটি হিন্দি ভাষাতে এখনও প্রায় অবিকল 'কচহরি' রূপে প্রচলিত থাকলেও বাংলায় অবিকল নেই। বাংলায় তা পরিণত হয়েছে কাচারি ও কাছারি-তে। বিগত শতাব্দীর গল্প-উপন্যাসে শব্দটি খুবই ছিল, কারণ জমিদার ছিল, তাদের কাছারি ছিল; এখন তা নেই, ফলে শব্দটি অপ্রচলিত।

কচু: ১. ✓কচ্ + উ (উন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **কচ্** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে*। ৩. কচু নামক কন্দবিশেষ, কচুর গাছ, শূন্যতা, ফাঁকি, হেয়তা। (ব.শ.)। ৪. প্রধানত Arum Colocasia বা 'কচু' নামক কন্দ অর্থে এবং প্রায়শই ব্যঞ্জনার্থেও প্রচলিত রয়েছে। ৫. 'উ'-কারটি শব্দের অর্থকে উৎকর্ষ দান করতে করতে তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে একেবারে উলটো অবস্থানে নিয়ে গিয়ে হাজির করে দেয়, একথা আমরা আগেই (দ্র. **উ**) জেনেছি। কচুর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কচ-এ সঞ্চিত হয় কারীর বা অগ্নিগুণের (পুরুষগুণের) সারাংশ। 'কচি' তার বিকাশসাধন করে বা কচকে গতিশীল করে। আর 'কচু' তাকে উত্তীর্ণ করে এমন এক চূড়ান্তে, যেখানে কচ-এর এই অগ্নিগুণই আর থাকে না; বিপরীত আর্দ্রগুণ দেখা দেয়। সেকালের মানুষ যে কন্দবিশেষকে এরকম আর্দ্রগুণ (প্রকৃতিগুণ) সম্পন্ন দেখেছিল (কচুপোড়া খাওয়া, কচু হওয়া, কচু করা, কচু-ঘেঁচুর মতো ফালতু হওয়া, এবং যাকে অনায়াসে কচুকাটা করা যায়), তাকে স্বাভাবিকভাবেই 'কচু' নামে চিহ্নিত করেছিল। পরে অর্থটি তার অসহায়তার অর্থে যথেষ্ট ব্যাপকতা পেয়ে যায়।

কচ্ছ (কাছা, কাছাড়, কাছুটি, কাছুটী, কোঁচা, কোঁছা) : ১. ক + ✓ছো (পরিচ্ছেদ) + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **কচ্ছ** = *কারীকে আচ্ছাদিত রাখে যে; যার দ্বারা কচ (কারীর চয়ন বা করণের প্রযুক্তি, তেজ, মালিকানা ইত্যাদি) ঢেকে রাখা হয়। /* যাহা জলকে পরিচ্ছিন্ন করে। (ব.শ)। ৩. জলবহুল দেশ, অনূপ, কাছাড় (আসামের প্রান্তবর্তী ভূভাগ), তীর, বেলা, জলা, নদী-সরোবরের প্রান্তভাগ, জলাশয়ের প্রান্তদেশ, নদীপর্ব্বতাদির সমীপ, তুঁতগাছ, নৌকার অঙ্গবিশেষ, পরিধান বস্ত্রের প্রান্ত, কোঁচা, ধুতির কাছা, জলপ্রায় কচ্ছদেশ, মুখসম্পুট, কূর্ম্মের কর্পর বা কটাহ (খোলা)। (ব.শ.)। ৪. ভারতের গুজরাত প্রদেশের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে 'কচ্ছ' নামে একটি ভূভাগ, এবং আসামের 'কাছাড়' এখনও দেশের নাম অর্থে প্রচলিত। তবে কদাচিৎ ধুতির কাছা (মুক্তকচ্ছ) অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৫. **ছো** ক্রিয়াটির অর্থ আচ্ছাদন করা বা ঢেকে রাখা। কারীকে বা ক-চয়নকারীকে ঢেকে রাখে যে, সেই হল কচ্ছ। আমরা দেখছি, এই কচ্ছ একই সঙ্গে ধুতির কাছা কিংবা কচ্ছপের পিঠের খোল থেকে শুরু করে কচ্ছ দেশ বা কাছাড় দেশ পর্যন্ত

সবাইকে চিহ্নিত করছে। যে কারণে তা সম্ভব হচ্ছে, তা হল, তাদের প্রত্যেকের স্বভাবে 'ক'-কে বা 'কচ'কে আচ্ছাদন করার বা ঢেকে রাখার ক্রিয়াটি রয়েছে। শাড়ি বা ধুতির কাছা ঢেকে রাখে মানবদেহের 'ক' বা কারীকে (লিঙ্গ, যোনি ও গুহ্যদ্বারকে, ইংরেজরা এগুলিকে বলেন private parts, যা কিনা private property থেকে দূরে নয়।); কচ্ছপের খোল ঢেকে রাখে কচ্ছপ প্রাণীটিকেই; তীর-বেলাভূমি-নদীসরোবরের প্রান্তভাগ বা জলাভূমি দিয়েই ঘেরা থাকে সমুদ্র, নদী, সরোবর ইত্যাদি; আর ভারতের কচ্ছদেশ তো সমুদ্রের জলাভূমিই বটে। কিন্তু অনূপদেশ বা কাছাড় ঠিক একশোভাগ জলাভূমি নয়। **অনূপ**দেশ হল সেই দেশ, একালের ভাষায় যাকে বলা হয় 'উপনিবেশ', 'যেখানে জনসাধারণ অনুগত'। এরূপ দেশের মূল অধিবাসী-মালিক বা 'কারী' ঢাকা পড়ে যায় বহিরাগত শাসকের দৌরাত্ম্যে। তবে কিনা 'অনূপ' হল সংস্কৃতকারদের লালিত-পালিত শব্দ, তুলনায় 'কাছাড়' একেবারেই বঙ্গসন্তান। এ হল সেই দেশ, যে দেশকে কারও (শাসকের, পাহাড়ের?) কাছার আড়ে বা আবডালে রাখা হয়েছে। ঠিক কী কারণে, কার কাছার আড়ালে থাকার জন্য কাছাড়ের অমন নামকরণ, যথেষ্ট ইতিহাস জ্ঞানের অভাবে আমরা তা জানি না। তদুপরি আছাড়ের সঙ্গেও কাছাড়ের একটা সম্পর্ক রয়েছে। দ্র. **কাছা, কাছাড়**। তবে 'তুঁতগাছ' কিংবা 'নৌকার অঙ্গ বিশেষ' কেন কচ্ছ-পদবাচ্য, তা আমরা এখনও জানতে পারিনি। দ্র. **কচ্ছপ, কৃচ্ছ্রসাধন**।

কচ্ছপ (কচ্ছপী, কাচিম, কাছিম, কাছুয়া) : ১. কচ্ছ + ✓পা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে কাছা দ্বারা আপনাকে পালন করে। /* যে কচ্ছ অর্থাৎ খোলা দ্বারা আপনাকে রক্ষা করে; অথবা যে জলপ্রায়দেশে আপনাকে রক্ষা করে। (ব.শ)। ৩. কুবেরের নিধিবিশেষ, মল্লের বন্ধবিশেষ, প্যাঁচ, সুরসন্ধান-যন্ত্রবিশেষ, নন্দীবৃক্ষ, দেশবিশেষ, কচ্ছদেশ। কচ্ছপী — কূর্ম্মী, কমঠী, বীণাবিশেষ, কাছুয়া, সরস্বতীর বীণা, চর্ম্মরোগবিশেষ, কচ্ছপিকা। (ব.শ.)। ৪. শুধুমাত্র tortoise অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কূর্ম্ম**। যে সত্তা লুকোছাপা করে বেঁচে থাকে তাকে 'কচ্ছপ' বলা যায়। কচ্ছপ হাত-পা-মুখ এই বের করে তো এই লুকিয়ে ফেলে। যে ব্যক্তি এমন ভাবে কাছা দিয়ে রাখে, যার থেকে ইচ্ছেমতো কখনো একটুখানি দেখবার সুযোগ দেওয়া হয়, কখনো বা পুরোই ঢেকে রাখা হয় তেমন সত্তাই কচ্ছপ পদবাচ্য। সরস্বতীর বীণাকে **কচ্ছপী** বীণা বা **লুকোছাপা** বীণা বলার কারণ হল, 'লেখাপড়া জানা মানুষেরা' (= সরস্বতী) বিশেষত ডাক্তার মাস্টার উকিল প্রমুখ শিক্ষিত লোকেরা যে উপায়ে রুজি-রোজগার করেন, তাকে কচ্ছপী বীণা বাজিয়ে রোজগার করা বলা চলে। কেননা, মানুষের যে-সমস্যাটির জন্য মানুষ তাদের কাছে যায়, সেটি ডাক্তার-মাস্টার-উকিলদের বিশেষ বিদ্যা। সেই বিদ্যাটি তাঁরা সোজাসুজি মানুষকে ডেকে দিয়ে দেয় না, জানায় যে — এসো, আমার কাছে এসো, তুমি যে-সমস্যায় পড়েছ, তার থেকে বেরোনোর উপায় আমি জানি; অর্থাৎ তোমার যে বিদ্যাটি দরকার সেটুকু পৃথকভাবে আমি তোমাকে দিতে পারি, যদি কিছু মূল্য দাও, টাকা দাও; না-দিলে ও-বিদ্যা আমার কাছে নেই। এই হল কচ্ছপী বীণা বাজানোর কসরত।

কাচ (কাচা, কাচু-মাচু) : ১. ✓কচ্ (বন্ধন) + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে; ✓কাচ + আ। (ব.শ.)। ২. **কাচ** = *যার দ্বারা কচ নিষ্কাশিত হয়;* **কাচা** = *কাচ-এর আশ্রয় যাহাতে।* ৩. মৃত্তিকাবিশেষ, ক্ষার, বালুকা ও ক্ষারের মিশ্রণে জাত ভঙ্গপ্রবণ স্বচ্ছ বস্তুবিশেষ, কাঁচ, পরকলা, শিক্য, ছিকা, কাছি, নেত্ররোগবিশেষ, ক্ষারলবণ, সিক্থ, মোম, বন্ধন, কাচের চুড়ী; প্রক্ষালন, ক্ষারযোগে পরিষ্কার করা, সাফ করা, পচা পাট শণ প্রভৃতি প্রক্ষালন করা, ধোওয়া, কাচান। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **কর** থেকে যেমন **কার** (উপকার, পুরস্কার, বিকার, কারণ ইত্যাদি) হয়, তেমনি **কচ** থেকে **কাচ** হয়। কোনো বস্তু বা বিষয়কে কচলে কচলে (দ্র. **কচলা**) যে কাজ করা হয়, তাকেই **কাচা** বলে। এর ফলে কচলানো বস্তুটি থেকে কচ বেরিয়ে যায় কিংবা বেরিয়ে আসে। এভাবেই বেরিয়ে আসে 'বালুকা ও ক্ষারের মিশ্রণে জাত ভঙ্গপ্রবণ স্বচ্ছ বস্তুবিশেষ'; আর সেকারণেই তাকেও কাচ (glass) বলে। তবে এর 'কাঁচ' বানানটি ঠিক নয়। কাঁচ এসেছে **কাঞ্চন** থেকে, যার প্রতীকী অর্থ সোনা। সেই হিসেবে কাচ (glass) আর কাঁচ (gold) সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু।

কিন্তু যে কচলানোর পর বা কাচাকাচি শেষ করার পরেও কচ থেকে গেছে, তাকে কী বলা হবে? স্বাভাবিক বিকাশের স্বাভাবিক চেহারায় পৌঁছোনোর পরও একটুখানি **কচ** বেরিয়ে থেকে গেছে, তাকে কী বলা হবে? একে বলতে হবে **কাচু**। কাচ এখানে তার স্বাভাবিক পথ বেয়ে শেষ সীমায় পৌঁছে নবরূপে উত্তীর্ণ হয়েছে, যা কিনা একেবারেই বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গেছে। একে বলে **কাচু**। আর, এর বিপরীত ব্যবহার হল **মাচু**; অর্থ হল, 'সীমায়িত চয়ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে'। এই কারণে কেউ যখন **কাচু-মাচু** মুখ করে এসে দাঁড়ায়, তার দুটি মানে হয় — এক, আদিষ্ট কাজ সে এমন ত্রুটিপূর্ণ ভাবে করেছে যে তা না-করার সমান বা অসম্পূর্ণ অর্থাৎ **কাচু**; দুই, আদিষ্ট কাজ সে করতে করতে এমনভাবে অকস্মাৎ ত্যাগ করেছে (= মোচন করেছে) যে তাও না-করার সমান বা অসম্পূর্ণ অর্থাৎ **মাচু**। অনেকে '**কাচুমাচু**' শব্দের অর্থ করেন 'কাকুতি-মিনতি'; সেটি ঠিক নয়। সেটি হল **কাচুমাচু** শব্দের ব্যঞ্জনামূলক বিস্তার। শব্দটি কোনো অভিধানেই দেখতে পাওয়া যায় না।

কাচ্চাবাচ্চা (কাচ্ছাবাচ্ছা) : ২. *কচ্ চয়নের আশ্রয় ও বৎ চয়নের আশ্রয় যাহাতে।* ৩. ছোট ছেলে মেয়ে, কচি-কাঁচা। হিন্দিতে কচ্চাবচ্চা বা কচ্চেবচ্চে বলা হয়। (ব.শ.)। ৪. children বা ছোট ছেলে মেয়ে অর্থে প্রচলিত। ৫. **কচা** শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে ব. শব্দকোষ জানিয়েছেন, 'যে গাছের ডাল কাটিয়া পুঁতিলে অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ গাছ — জিওল, বাগভেরেণ্ডা ইত্যাদি' গাছের ডালকে 'কচাগাছের ডাল' বলে। তার মানে, কচা হল 'কচযুক্ত বা অঙ্কুরিত', যাতে 'কচি' (বৎস, পুত্র) আশ্রিত আছে। এরূপ কচ্ চয়নের আশ্রয় যে, তাকে 'কচ্চা' বলা যেতেই পারে। অন্যদিকে কোনো কিছুর মতো-কে বলা হয় '-বৎ'। পিতার মতো হলে 'পিতৃবৎ'। আপন অস্তিত্বের মতো যে অস্তিত্ব, সে হল আপনবৎ অস্তিত্ব। অস্তিত্বকে 'স' বলা হয়। সেই সুবাদে আপন'বৎ-অস্তিত্ব'ই হল আপনের **বৎস**। তার মানে, কোনো একজনের মতো অস্তিত্বকে বা 'বৎ-অস্তিত্ব'কে বলে বৎস। এই বৎ

চয়নের আশ্রয় যাহাতে, তাকে বৎচা বা বচ্চা বলা যেতেই পারে। এই ভাবেই তৈরি হয়েছে কচ্চাবচ্চা বা কচ্চেবচ্চে শব্দটি। বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ গুণে সেই শব্দটিই হয়ে গেছে কাচ্চাবাচ্চা। বাংলাভাষীর জিহ্বার মতো হিন্দিভাষীর জিহ্বাও, দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতির নিয়ম মেনেই কাচ্চাবাচ্চা, কচ্চাবচ্চা শব্দ সৃষ্টি করেছে।

কাছ (কাছা, কাছাকাছি, কাছে, কচ্ছ) : ২. কচ *ছাদিত যাহাতে।* ৩. কক্ষ, কাঁখ, সমীপ, সাহচর্য্য, সঙ্গ, অদূর, পার্শ্ব, দিক, ভিত, বেষ, সাজ, বন্ধন করা, কষিয়া বাঁধা, কাছা বা মালকোঁচা দিয়া পরা, পরিধান করা, ধারণ করা, বাঁধা; বস্ত্রের যে অঞ্চল দুই পায়ের মধ্য দিয়া গলাইয়া পশ্চাদ্‌ভাগে গুঁজিয়া রাখা যায়; পরস্পর নিকটবর্ত্তী, সন্নিহিত, লাগালাগি, গায়-গায়-লাগা; নিকটে, নাতিদূরে, সমীপে, সঙ্গে, কক্ষে, কোলে, বিচারে। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. মুক্তকচ্ছ শব্দটি বহু প্রাচীন। 'মুক্তকচ্ছ-মানুষ' মানে 'কাছাখোলা-লোক'। সবাই জানেন, ধুতির কাছা ঢেকে রাখে মানবদেহের 'ক' বা কারীকে (লিঙ্গ, যোনি ও গুহ্যদ্বারকে। গ্রামবাংলায় 'লিঙ্গ'কে ঠাট্টাছলে 'বাপকেলে সম্পত্তি' বলার চল্ আছে। ইংরেজরা এগুলিকে বলেন private parts, যা কিনা private property থেকে দূরে নয়।)। এই প্রাইভেট পার্টস বা প্রাইভেট প্রপার্টি মেরে নেওয়া আর টাকাপয়সা ধনসম্পত্তি **'মারা'** বা অপহরণ করা একই ব্যাপার। সব ক্ষেত্রেই বাংলাভাষী 'মারা' কথাটি ব্যবহার করেন এবং 'পোঁদ-মারা' শব্দটি উভয়ার্থে খুবই ব্যবহৃত হয়। আর, কাছাখোলা থাকলে এইসব 'মেরে-নেওয়া'র নানা দুষ্কর্ম তো ঘটতেই পারে! এর থেকে বোঝা যায়, ব্যক্তিগত মালিকানা ও তাকে আচ্ছাদিত করে রাখা, এবং ব্যক্তিগত লিঙ্গ-যোনি-গুহ্যদ্বার ও তাদের ঢেকে রাখা; দৃষ্টের ও অদৃষ্টের দুনিয়ার এ এক সমান্তরাল ব্যাপার। এমনকি ধারণাটি পশ্চিমের মানুষেরও কমবেশি আছে। স্বভাবতই এসবের সঙ্গে কচ্ছ বা কাছার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয় জগতে। কিন্তু ক-কে আচ্ছাদন করে রাখা বা কাছা দেওয়া তো দূর থেকে সম্ভব হয় না। সত্তার একেবারে private parts-এর বা private property-র নিকটে যেতে হয়। তাই কচ্ছ 'কাছ' বা 'কাছে'ও বটে; অর্থাৎ নিকটেও বটে। কাছাকাছি (দ্র. **কচাকচি**) থাকা মানে, যার কাছাকাছি থাকা হচ্ছে, তার private parts-এর নিকটে থাকা কিংবা তার private property-র নিকটে বা সমীপে থাকা। একে অতএব কেবলমাত্র বাহ্যিক সন্নিকট বোঝায় না, মানসলোকের সন্নিকটও বোঝায়।

কাছাড় : দ্র. **কচ্ছ**। ৩. সমুদ্রের বা নদীর তীরের নিকটস্থ জলপ্রায়ভূমি (জলা জমি), আসামের প্রান্তবর্তী ভূভাগ, কাছাড় দেশ, পশ্চাৎভাগে পতন, চিৎ হইয়া পড়া, চিৎপাত, আছাড়, উত্তোলনপূর্ব্বক শিলা প্রভৃতিতে আঘাত। (ব.শ.)। ৪. আসামের প্রান্তভাগের দেশ 'কাছাড়' তো নাম রূপে প্রচলিত রয়েছেই, তদুপরি গ্রামবাংলায় 'আছাড়-খাওয়া' ও 'কাছাড়-খাওয়া' শব্দদুটির প্রচলনও দেখা যায়। ৫. আছাড় হল 'ছাড় থাকে যাহাতে'; তার মানে কাউকে উপরে ধরে রাখা অবস্থা থেকে ছেড়ে দিলে যা হয়, সেই ব্যাপার। এতে আছাড়দাতার যথেষ্ট সক্রিয়তা নেই, সে কেবল ছেড়ে দেয়। বিপরীতে, কাছাড় হল কাউকে মাথায় বা ঘাড়ে ধরে অধোমুখে নীচে কাঠের গুঁড়িতে বা শিলায় সজোরে পেটানো, যেভাবে ধানঝাড়া-মজুরেরা ধানের আঁটিকে কিংবা ধোপা তার কাপড়কে পাটার উপরে পেটায়। এতে কাছাড়দাতার যথেষ্ট সক্রিয়তা থাকে। এইসব কারণে সাধারণত পা পিছলে চিৎ হয়ে পড়ে যাওয়াকে আছাড়-খাওয়া এবং হোঁচট খেয়ে উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়াকে কাছাড়-খাওয়া বলে।

'কঞ্চ' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকিঞ্চন, অকিঞ্চিৎকর, কঞ্চট, কঞ্চি, কঞ্চী, কঞ্চু, কঞ্চুক, কঞ্চুকী, কঞ্চুলিকা, কঞ্চুলী, কাঁচ, কাঁচকড়া, কাঁচকলা, কাঁচড়া, কাঁচড়াদাম, কাঁচঢাল, কাঁচঢালা, কাঁচনি(নী), কাঁচপোকা, কাঁচল, কাঁচুলি, কাঁচা, কাঁচাখেউড়, কাঁচাগোল্লা, কাঁচামিঠা, কাঁচামিঠে, কাঁচারাঁড়ি, কাঁচারাণ্ডী, কাঁচাসাধ, কাঁচি (পাকি), কাঁচুয়া, কাঁচ্চা, কাঁছনি, কাঁজি, কাঁজী, কাঁজিলাল, কেঁচান, কেঁচিয়ে যাওয়া, কাচুরি, কাঞ্চন, কাঞ্চনমূল্য, কাঞ্চনসন্ধি, কাঞ্চনী, কাঞ্চলি(লী), কাঞ্চা, কাঞ্চি(ঞ্চী), কাঞ্চিক, কাঞ্চুলি(লী), কাঞ্জলি, কাঞ্জি(ঞ্জী)ক, কাঞ্জি(ঞ্জী)কা, কাঞ্জিলাল, কাঞ্জী, কোঁচ, কোঁচা, কোঁচকা, কোঁচকান, কোঁচবক, ক্রুঞ্চ্, ক্রুঞ্চ, ক্রৌঞ্চ, ক্রৌঞ্চগিরি, ক্রৌঞ্চবক, ক্রৌঞ্চরন্ধ্র, ক্রৌঞ্চরিপু, ক্রৌঞ্চশত্রু, ক্রৌঞ্চসূদন, ক্রৌঞ্চারাতি।
কঞ্চ্ = কারীর রহস্যরূপ চয়ন; **কঞ্চ** = কারীর রহস্যরূপ চয়িত (সঞ্চিত) থাকে যাহাতে।

কঞ্চি (কঞ্চী) : ১. কম্ + চি। ২. *কারীর রহস্যরূপের চয়ন গতিশীল যাহাতে।* ৩. বাঁশের ডাল, বেণুশাখা (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত; কদাচিৎ ব্যঞ্জনার্থে ব্যবহৃত হয়। যথা 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়' অর্থাৎ মালিকের চেয়ে তার চাকরের হম্বিতম্বি বেশি। ৫. কারী যদি বাঁশ হয়, তার রহস্যরূপ নানা রকমের হতে পারে। তার মধ্যে একটি হল আপন স্বরূপকে সরু সরু ডালের আকারে সীমিত করে আপন শাখা রূপে বাড়াতে থাকা। সেটিকেই তার **কঞ্চি** বলা হয়। আর কারী যদি কোনো মানুষ হয়, তার ছেলেই তার আত্মস্বরূপের সীমায়িত রূপ বা কঞ্চ। নেপালি ভাষায় ছেলেকে **কঞ্চা** (কান্‌চা) এবং মেয়েকে **কঞ্চি** (কান্‌চি) বলা হয়ে থাকে।

কঞ্চুক, কঞ্চুলী (কঞ্চুলিকা, কাঁচুলি, কাঁচুলী) : ১. ✓কঞ্চ্ (বন্ধন) + উক (উকন্) - কর্ম্মবাচ্যে; ✓কঞ্চ্ (দীপ্তি) + উল (উলচ্) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী ঈ (ঙীষ্)। (ব.শ.)। ২. *কঞ্চু (কারীর রহস্যরূপের চয়ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে) করে যে।* / যাহা শরীরে বদ্ধ হয়। (ব.শ)। ৩. সন্নাহ, বর্ম্ম, কঞ্চুলিকা, কাঁচুলি, পরিচ্ছদ, আঙরাখা (অঙ্গরক্ষা), জামা, নির্ম্মোক, সাপের খোলষ, বস্ত্রমাত্র, ধান্যত্বক, তুষ; কূর্পাসক, কাঁচুলি। (ব.শ.)। ৪. bra বা 'কাঁচুলি' অর্থে প্রচলিত। ৫. আত্মস্বরূপকে অন্যত্র সীমায়িত রূপে সঞ্চয় করাকে বলে কঞ্চ, তার বিকাশ বা গতিশীলতাকে বলে কঞ্চি; আর তার গতিশীলতা যখন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে বিপরীতমুখী হয়ে যায়, তখন তাকে বলে কঞ্চু। সেই সুবাদে কঞ্চু মানবীশরীরের স্তন, রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর, শহরের প্রাচুর্য্যপূর্ণ মহল্লা — এই সবকিছুকেই বোঝাতে

পারে। তবে, আজকাল কঞ্চুলী, কঞ্চুলিকা বা কাঁচুলি প্রভৃতি শব্দ কেবলমাত্র মানবীশরীরের স্তনলালনী বস্ত্রখণ্ডকেই বোঝায়। ৬. চীনীয় 'কোয়াৰ্চ্চু', তিব্বতী 'কেছৰ্চে', ত্রিপুরা 'কামচুই', গুজরাটি 'কাংচলী', মৈথিলী 'চোলী' শব্দগুলি লক্ষণীয়।

কঞ্চুকী : ১. কঞ্চুক + ইনি (ইন্) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। ২. *কঞ্চুকের আধারশক্তি (রক্ষক) যে।* ৩. অন্তঃপুরাধ্যক্ষ, মহল্লরক্ষক, সর্প, যব, চণক, জার, লম্পট, দ্বারপাল। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. উপরোক্ত (৩) প্রদত্ত অর্থ থেকে বোঝা যায়, এরা কেউ কেউ কঞ্চুক-এর রক্ষক। কিন্তু যব, চণক, জার — এরা কীভাবে কঞ্চুকের রক্ষক, এখনও বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি।

কাঁচ, কাঁচা, কাঁচি : ১. কম্ + চ। (দ্র. **কঞ্চি**)। ২. *কারীর সীমিত চয়ন থাকে যাহাতে; — তাহার আধার; — তাহার গতিশীলতা বা বিকাশসাধন চলে যাহাতে।* / যাহা পোড়া-ভাজা-সিদ্ধ-শুষ্ক নহে; যাহা ব্যঞ্জনের সহিত পাক-করা নহে; যাহা অধিক দিন থাকে না, শীঘ্র নষ্ট হয়; যাহা অধিক দিন টিকে না; যাহাতে ভুলচুক বা খুঁত আছে; যাহা কাট-ছাঁট করা যায়; যাহার নড়চড় হয়; যাহা পূর্ণমাত্রায় নহে; যাহা অভ্যাসসিদ্ধ নহে বা কাজ করিতে করিতে কাজে নিপুণ হয় নাই। (ব.শ.)। ৩. **কাঁচ** = অপক্ক, বিশুদ্ধ, খাঁটি; অকুশল হওয়া, পুনর্ব্বার অল্পবয়স্ক হওয়া বা বয়স কমান, নষ্ট হওয়া, পণ্ড হওয়া, গরমজবুত করা, প্রমাণের অযোগ্য করা, কোনো বিষয় পুনর্ব্বার গোড়া হইতে আরম্ভ করা (= কেঁচে গণ্ডূষ করা); **কাঁচা** = কন্যাবয়স্ক, অল্পবয়স্ক, অপরিণত, তরুণ, অপুষ্ট, কচি, অপ্রস্ফুটিত, অফুটন্ত, আপোড়া (হাঁড়ি-কলসি), আম, অসিদ্ধ, আভাজা, অশুষ্ক, টাটকা, তাজা, অসংশোধিত ...; **কাঁচি** = প্রামাণিক মাপ অপেক্ষা কিছু কম (ওজন), গুঞ্জা, কুঁচ। কাঁইচি, কান্তিয়া, কাস্তে। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে সুপ্রচলিত। ৫. এটি একটি যথার্থ বাংলা শব্দ। এর প্রয়োগও বিপুল। বাংলাভাষার স্বর্ণযুগে অর্থাৎ মধ্যযুগে এই শব্দের সৃষ্টি হয়েছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যে এর বিপুল ব্যবহার দেখা যায়। এর প্রকৃত অর্থ হল — অস্তিত্বের গতিশীলতা বা বিকাশ, যদর্থ, বাইরের অন্য সত্তাকে দখল করে নিজের মধ্যে আনয়ন করে নিজের বৃদ্ধিসাধন করা। এইরূপ আনয়ন করাকে বলে চয়ন বা 'চ'। প্রত্যেক সত্তার ক্ষেত্রেই এই চয়ন ক্রিয়ার বা 'চ'-ক্রিয়ার শুরু আছে এবং শেষ আছে। তবে সেই চয়ন যদি যথেষ্ট না হয়ে অনেক কম হয়, সীমিত পরিমাণ হয়, তবে অস্তিত্বের সেই বৃদ্ধিসাধন কম হয়ে যায়। একেই কম্-চ, কঞ্চ বা **কাঁচ** বলে। এর আধারকে **কাঁচা** বলে। কাঁচ গতিশীল হলে তাকে **কাঁচি** বলে। যা পূর্ণে পরিণত হতে চলেছে কিন্তু পূর্ণ হয়নি, এখনও অসম্পূর্ণ, তেমন সমস্ত বস্তু বা বিষয়কে তাই '**কাঁচি**' শব্দে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সেই কারণে দেখা যায়, কাঁচ, কাঁচা, কাঁচি শব্দের যত রকম প্রয়োগ হয়, তা সবই এই অর্থের সঙ্গে মেলে। এমনকি যে গরুর পূর্ণবয়স্ক হতে আর দু'চার মাস মাত্র বাকি, তাকে **কাঁচি** (**কাঁচি**-গরু) বলে।

আগেই বলা হয়েছে, **কং** (কঙ্, কঞ্, কণ্, কন্, কম্) একটি **জটিল** রহস্যময় ক্রিয়া। সেই রহস্যরূপকে নানা স্পষ্টতায় প্রকাশ করার চেষ্টাও থাকে উপরোক্ত কং-এর নানা রূপে। তার সীমায়িত রূপটিকে বলা হয় 'কম্'। তা দিয়ে যেমন আত্মস্বরূপের বৃদ্ধি চলে, তেমনি আত্মস্বরূপের প্রতিমাও তৈরি করা হয়, যাকে **বৎস** বা **কচি** বলে। তার মানে নিজের জন্য কম-চয়ন যেমন কঞ্চ-পদবাচ্য, তেমনি নিজের সন্তানের জন্য কম-চয়নও কঞ্চ-পদবাচ্য। এমনকি কম কম চয়ন করতে পারে বলেই scissors-কেও **কাঁচি** বলে। তালরসের জন্য তালের ভোঁড়া কাটার **কাঁচি** এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে কেউ কেউ মনে করেন, এই কাঁচি শব্দটি এসেছে তুর্কি ভাষা থেকে। তা আসুক। তুর্কি 'কইচি' আর এই কম-জাত কাঁচি যে পরস্পরের জ্ঞাতিভাই, তা নিয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই।

কেঁচান, কেঁচানো (কেঁচিয়ে যাওয়া, কেঁচে গণ্ডূষ করা) : ৫. কম-চয়নের (দ্র. **কাঁচা**) গোড়ায় ফিরে যাওয়াকে বলে কেঁচিয়ে যাওয়া বা কেঁচানো। হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসা এবং ক্রমে খাওয়া শেষ করা — এইভাবে চলতে চলতে কেউ যদি পুনরায় গোড়া থেকে শুরু করতে চায় এবং সেজন্য পুনরায় খেতে বসার জন্য আবার হাতমুখ ধোয়, তাকে বলে 'কেঁচে গণ্ডূষ করা'।

কাঞ্চন, কাঞ্চনী : ১. ✓কাঞ্চ্ (দীপ্তি) + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কাঞ্চ (কঞ্চ হইতে জাত) অন থাকে যাহাতে।* ৩. **কাঞ্চন** = কাঞ্চনবিকার, হৈম, স্বর্ণময়, পীত, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, চম্পকবৃক্ষ, যজ্ঞডুমুর গাছ, ধুস্তুর, নাগকেশর বৃক্ষ, সন্ধিবিশেষ, স্বর্ণ, পদ্মকেশর, নাগকেশরপুষ্প, কাঞ্চনপুষ্প, হরিতাল, দীপ্তি, বন্ধন। কাঞ্চনকদলী = সুবর্ণকদলী; কাঞ্চনকান্তি = স্বর্ণপ্রভ; কাঞ্চনকান্তি = স্বর্ণচ্ছায়া, হেমপ্রভা; কাঞ্চনগিরি = স্বর্ণপ্রধান পর্ব্বত, সুমেরু, দানার্থ কৃত স্বর্ণময় পর্ব্বত; কাঞ্চনগৌর = স্বর্ণবৎ পীত, হেম-পিঙ্গল; কাঞ্চনজঙ্ঘা = হিমালয়ের শৃঙ্গবিশেষ; কাঞ্চনমূল্য = কাঞ্চনের (মোহরের) মূল্য, স্বর্ণমুদ্রার মূল্যস্বরূপ দক্ষিণা; কাঞ্চনসন্ধি = কাঞ্চনসদৃশ শ্রেষ্ঠ সন্ধিবিশেষ, সঙ্গত সন্ধি। **কাঞ্চনী** = হরিদ্রা, গোরোচনা, স্বর্ণক্ষীরী বৃক্ষ। (ব.শ.)। ৪. অর্থহীন নামশব্দ রূপে প্রচলিত। ৫. এই শব্দটি আমাদের বিস্মৃতির একটি অদ্ভুত উদাহরণ। একে এখন কেবলমাত্র সোনা হিসেবে বুঝে থাকেন কেউ কেউ। কিন্তু কেন সেকালে বিচিত্র বহু বস্তু ও বিষয়কে 'কাঞ্চন' শব্দে চিহ্নিত করা হত, তার অধিকাংশ কথা এখন আমরা ভুলে গেছি। প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ চয়ন যেখানে, সমস্ত উৎপাদনের সার যাহাতে, বৎসরূপ সেই কম্-চ বা কঞ্চ থেকে জাত যে সম্পদ, তাই ছিল কাঞ্চ। এই কাঞ্চ অন (on) যাহাতে, তাকেই কাঞ্চন বলে। এ বস্তু স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ সম্পদের আসনে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্য বলেই তা পরে পরে বিনিময়ের মাধ্যম রূপে gold-money-তে পরিণত হতে পারে।

ক্রুঞ্চ, ক্রৌঞ্চ, ক্রৌঞ্চরন্ধ্র, ক্রৌঞ্চদারণ : ১. ✓ক্রুঞ্চ্ + অ - ক; ✓ক্রুঞ্চ্ + অ (অণ্)। (ব.শ.)। ২. *কর্মফল (উৎপাদনের অভিজ্ঞতা এবং / বা উৎপন্নের মূল্য) চয়ন করে যে = ক্রুঞ্চ। ক্রুঞ্চ হইতে জাত = ক্রৌঞ্চ।* ৩. বকবিশেষ, কোঁচবক, কুররপক্ষী, পর্ব্বতবিশেষ

(ক্রৌঞ্চ হিমালয়ের পুত্র, মতান্তরে হিমালয়ের পৌত্র), সপ্তদ্বীপের একতম, ময়দানবপুত্র, অর্হদগণের (বৌদ্ধদের) ধ্বজ, পৌরাণিক অস্ত্রবিশেষ, বিষভেদ। **ক্রৌঞ্চদারণ** = যিনি ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে বিদারণ করেন, কার্ত্তিকেয়। বলির পুত্র বাণাসুর ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া দেবগণকে নিপীড়িত করিলে, কার্ত্তিকেয় শক্তিদ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ ও সসৈন্য বাণকে নিহত করেন। এইজন্য কার্ত্তিকেয় 'ক্রৌঞ্চদারণ' নামে খ্যাত। **ক্রৌঞ্চরন্ধ্র** = ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের রন্ধ্র, ক্রৌঞ্চবিল। কার্ত্তিকেয় শক্তিদ্বারা এই পর্ব্বত ভিন্ন করেন। এই ভিন্ন স্থান 'ক্রৌঞ্চরন্ধ্র'। হংসগণ এই পথে মেরুপর্ব্বতে ও মানসসরোবরে যায়, এইজন্য ইহার নাম '**হংসদ্বার**'। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. প্রথমে নিসর্গের দিক থেকে দেখা যাক। হিমালয় পর্বতের পুত্র বা পৌত্র হল ক্রৌঞ্চপর্বত। তাতে থাকত ক্রুঞ্চ পক্ষীরা। সেকালের বিচারে যে সাতরকম পর্ব্বত ছিল, তাদের একটি হল এই পর্ব্বত। এই পর্ব্বতে বলির পুত্র বাণাসুর আশ্রয় নিয়ে দেবগণকে নিপীড়ন করতেন বলে **কার্ত্তিকেয়** এই পর্ব্বত বিদারণ করে বাণাসুরকে নিহত করেন। এখানে ক্রৌঞ্চবিল রয়েছে। হংসগণ এই পথে মেরুপর্ব্বতে ও মানসসরোবরে যায়।

এবার সমাজের দিক থেকে দেখা যাক। বৈদিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার (হিমালয়ের) মতোই তার উত্তরসূরি রূপে আর একটি ব্যবস্থার জন্ম হয়, যার নাম **ক্রৌঞ্চ**। সেখানে **বকধার্মিক**দের একটি প্রজাতির লোকেরা (কোঁচবকেরা) থাকত। সেকালের বিচারে যে সাত রকম সমাজ পরিচালনব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, এই **ক্রৌঞ্চ** ব্যবস্থাটি তাদের একতম। বলির বা taxation-এর পুত্র বাণাসুর (যে ban করে তেমন সমাজপরিচালক-গোষ্ঠী) এই ব্যবস্থার মধ্যে থেকে পণ্যজীবীদের নিপীড়ন করত। সেই কারণে সৈন্যবাহিনী এই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে। এর ফলে যে সম্পদ জমে, তার নাম ক্রৌঞ্চবিল। যে ব্রাহ্মণেরা সমাজের শিখরে যান ও জ্ঞানসাধনা করেন, তাঁরা এখান থেকে প্রয়োজনীয় রসদ পান।

বাল্মীকির রামায়ণ রচিত হয়েছিল এই **ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চী**র উপর আক্রমণের পীড়া দেখে। পণ্যজীবীদের উপর আক্রমণের এই কাহিনীই বিস্তারিত হয় রামায়ণে, যা বাস্তবায়িত হয়েছিল বৌদ্ধযুগে। **ক্রৌঞ্চ** তাই অর্হদগণের বা বৌদ্ধদের পতাকা। ৬. ইংরেজি crunch।

'কট্' (কুট্, কূট, কোট্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকটবিকট, অকাট্য, অকোটি, অত্যুৎকট, অপ্রকট, আক্‌কুটে, আক্‌খুটে (আকৃতি-বিকৃতি), আকটবিকট, আকাট, আকাটা, আখটি, আখুটি, কএত, কএথ (কয়েত বেল), কট্, কট, কটক, কটকট, কটকটা, কটকটিয়া, কটক'টে, কটকবালা, কটকার, কটকিনা, কটকী, কটকেনা, কটপূতন, কটফল, কটভী, কটমট, কটরকটর, কটরমটর, কটরা, কটলেট, কটস্থল, কটা, কটাকট, কটাক্ষ, কটাগ্নি, কটাৎ, কটান্ত, কটার, কটাল, কটাশ, কটাশীয়া, কটাশে, কটাহ, কটি, ক'টি, কটিকূপ, কটিতট, কটিত্র, কটিপট্টসূত্রভোরী, কটিবন্দ, কটিবন্ধ, কটিবসন, কটিবাত, কটিবাস, কটিভূষণ, কটিয়া, কটিশূল, কটিশৃঙ্খলা, কটিসূত্র, কটীধরা, কটু, কটুআ(য়া), কটুক, কটুকন্দ, কটুতা, কটুতৈল, কটুত্রয়, কটুপাক, কটুপ্রায়, কটুফল, কটুবিপাক, কটুল, কটূত্তর, কটোর, কটোরা, ক'টে, কড়, কড়ক, কড়কড়, কড়কড়ান, কড়কড়ানি, কড়কা, কড়কান, কড়খা, কড়ঙ্কর, কড়ঙ্কস্য, কড়চা, কড়তা, কড়মড়, কড়রমড়র, কড়সি, কড়সী, কড়া, কড়াই, কড়াকড়, কড়াকড়ি, কড়াকীয়া, কড়াকের, কড়াটিকের, কড়াক্কড়, কড়াঙ্কীয়া, কড়াঙ্কে, কড়াৎ, কড়া(রা)র, কড়ি, কড়িবউলি, কড়ি(ড়ী)ফটকা, কড়িবৌলি, কড়িয়াল, কড়িয়ালি, কড়িহার, কড়ী (হাতকড়ী), কড়ুয়া, কড়ুই, ক'ড়ে (কড়ীয়া), কতোয়াল, কলাই, কাট(ঠ), কাট(ঠ)কুয়া, কাটখোট্টা, কাট(ঠ)গড়া, কাট(ঠ)রা, কাটা, কিট্, কিটকিটা(টে), কিটা, কিট্ট, কিড়মিড়, কিড়িমিড়ি, কিড়িরমিড়ির, কুঁড়িয়া, কুঁড়ে, কুট্, কুট, কুটকচালীয়া, কুটকচালে, কুটকুট, কুটঙ্ক, কুটজ, কুটন, কুটনো-কোটা, কুটপাট, কুটরীয়া, কুটা, কুটান, কুটি, কুটী, কুটিকুটি, কুটিত, কুটিনাটি(টী), কুটিনী, কুটিয়াল, কুটির, কুটিল, কুটী, কুটী(ঠী)য়া, কুটুকুটু, কুটুম্ব, কুটুম্বিতা, কুটুম্বিনী, কুটুরকাটুর, কুটুরকুটুর, কুটুরি, কুটুরে, কুটে, কুট্ট্, কুট্টক, কুট্টমিত, কুট্টিত, কুট্টিনী, কুট্টিম, কুট্টিমা, কুট্মল, কুঠ, কুঠর, কুঠরি, কুঠার, কুঠারি, কুঠারিকা, কুঠারী, কুঠি(ঠী), কুঠিয়াল, কুঠুরে, কুটে, কুঠে, কুঠেল, কুড়, কুড়কুড়ে, কুড়চি, কুড়(ড়া)ন, কুড়প, কুড়ব, কুড়(ড়ো)বা, কুড়া, কুড়ালি, কুড়ি, কুড্মল, কুরচি, কূট্, কূট, কূটকারক, কূটজ, কূটতুলা, কূটপাশ, কূটবন্ধ, কূটব্যবহারী, কূটমান, কূটযন্ত্র, কূটযুদ্ধ, কূটযোধী, কূটলেখ, কূটলেখ্য, কূটশাল্মলী, কূটশাসন, কূটসাক্ষী, কূটস্থ, কূটস্বর্ণ, কূটাক্ষ, কূটাগার, কূটার্থ, কেঁটকেঁটে, কেঁটেকেঁটে, কেটকেট, কেটকেটে, কেটে দেওয়া, কেটে ফেলা, কেটো, কেঠো, কোট, কোটওয়াল, কোটক, কোটনা, কোটর, কোটরা, কোটয়াল, কোটা, কোটাল, কোটালি(লী), কোটালিয়া, কোটি(টী), কোটোআল, কোট্ট, কোট্টপাল, কোঠর, কোঠরি, কোঠা, কোঠি, কোড়া, কোতোয়াল, কৌট, কৌটা, কৌটো, কৌটি(টী), কৌটিল্য, কৌটুম্বিক, কৌড়ি(ড়ী), ক্যাটক্যাট, গোট, প্রকট, বিকট, সঙ্কট।

কট্ (কুট্, কূট্, কোট্) = কারীর টঙ্কারণ। **কুট** = কারীর অস্বাভাবিক টঙ্কার থাকে যাহাতে। **কূট** = কারীর অস্বাভাবিকতার টঙ্কার থাকে যাহাতে। **কোট** = সর্বপ্রকার কারীর আধারের টঙ্কার থাকে যাহাতে। [অস্বাভাবিক = **নবরূপে উত্তীর্ণ** (সূত্রায়ন, বোধন = ণ, গুণ); যা পরিধির ভিতরে নয়, তাই স্বাভাবিক নয়; যা পরিধির উর্দ্ধসীমা লঙঘনকারী বলে শুভ হতে পারে, নিম্নসীমা লঙঘনকারী বলে অশুভও হতে পারে।]

অকাট্য, আকাট, আকাটা : দ্র. কাট।

কট (অকট, আকট, উৎকট, নিকট, প্রকট, বিকট, সঙ্কট, সন্নিকট) : ১. ✓কট্ + অ - ক। (ব.শ.)। ২. *কারী টঙ্কারিত হয় যাহাতে*। ৩. মদবর্ষণকারী হস্তিগণ্ড, হস্তিকপোল, গণ্ডমাত্র, তৃণবিশেষ, নল, পাতি, তৃণমাত্র, উশীরাদি, তৃণনির্মিত আসন বা শয্যা বা মাদুর, দরমা, আবরক, চাঁছা কাঠ, তক্তা, কপাট, কাশাদি-রচিত রজ্জু, মরাই-এর দড়ি, রড়, তৃণরচিত টাটি বা ঝাঁপ, কুসুল, মরাই, শরতৃণ, শর, বাণ, শ্রোণীফলক, কটিদেশ, কোমর, কটিপার্শ্ব, শব, শবরথ, খাটিয়া, শবদাহস্থান, শ্মশান, সময়, আচার, অতিশয়, দ্যুতক্রীড়াসাধন

দ্রব্যবিশেষ, ওষধিবিশেষ, পিপ্‌পলী, কটুকী, কটকী। তার-প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য অস্ত্রে বা দাঁতে কাটার শব্দ, দড়ি ছেঁড়ার শব্দ, কঠিন কথা মুখের বলার ভাব, দাঁতে কাটার তীব্র ভাব। (ব.শ.)। ৪. খাটিয়া, মাদুর অর্থে কদাচিৎ ব্যবহৃত। ৫. যাতে কারীর কীর্তির কথা প্রকটিত হয়, তাই-ই কট-পদবাচ্য। কে এই 'কারী' (= **ক**), পাঠক সেকথা জানেন **ক**-এর অর্থ থেকে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এই 'কারী'র ভূমিকায় নানা সত্তাকে দেখা যায় এবং তাদের অনেককেই আমরা চিনি না। কান কটকট করলে যে কারী (= ক) টঙ্কারিত (= ট) হয়, সে আমাদের অজানা। তাই নানা জ্ঞাত-অজ্ঞাত সত্তাকে 'কট' শব্দে চিহ্নিত করা হয়েছে। কীভাবে তাদের প্রত্যেকের ভিতর 'কারী টঙ্কারিত হয়', তা প্রতিটি সত্তাকে পৃথকভাবে বিচার করে বুঝতে হবে। কট-শব্দের যে সকল প্রতীকী অর্থ উপরে (৩) ব.শ. জানিয়েছেন, তাদের প্রতিটিকে পৃথকভাবে অধ্যয়ন করলে জানা যায়, তাদের প্রত্যেকের ভিতরে কারী কোনো না কোনোভাবে টঙ্কারিত। তাই তারা প্রত্যেকেই 'কট' পদবাচ্য। যদিও স্বতন্ত্রভাবে **কট** শব্দের ব্যবহার এখন আর হয় না বললেই চলে। তবে **কট**-এর মতো কিছু বাংলা মূল শব্দ রয়েছে, যাদের ব্যাপক প্রয়োগ হয় উপসর্গ-যোগে; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে তেমন প্রয়োগ নেই। যেমন **কাশ**। এও সেই রকম। উপসর্গযোগে এই শব্দকে আমরা পাই **অকট, আকট, উৎকট, নিকট, প্রকট, বিকট, সঙ্কট, সন্নিকট** প্রভৃতি শব্দে। কারীর টঙ্কার নেই যাহাতে, সেটি **অকট**। কটের আশ্রয় যাহাতে সেটি **আকট**। উদলোকে যে-কট টঙ্কারিত হয়, সে হল **উৎকট**। যে-কট সমীপে আগত, সে হল **নিকট**। প্রকৃষ্ট কট যাহাতে, সেটি **প্রকট**। যে-কট বিশেষ বা বিপরীত স্বভাবের তা হল **বিকট**। কারীর টঙ্কার সমে এসে ঠেকেছে যাতে, সেটি **সঙ্কট**। আর, সম্যক নিকটে যে, সে হল **সন্নিকট**। ৬. ইংরেজি cottage, cot, cut।

কটক : ১. ✓কট্ + অক - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **কট** *করে যে*। / যাহা বৃক্ষাদি দ্বারা আবৃত; যাহা দ্বারা আবৃত বা বেষ্টিত হয়। (ব.শ)। ৩. অদ্রিনিতম্ব, গিরিমধ্যভাগ, পর্ব্বতস্থ সমভূমি, তট, সানু, প্রস্থ, রাজধানী, নগরী, হস্তভূষণবিশেষ, বলয়, বালা, কটিবন্ধ, মেখলা, শৃঙ্খল, চক্র, সৈন্যসমূহ, সেনানিবেশ, সামুদ্রিক লবণ, ওড়িষ্যার শহর, কট (cot), মাদুর, দরমা। (ব.শ.)। ৪. বর্তমান ওড়িষ্যা (উড়িষ্যা) প্রদেশের প্রাচীন শহরের নাম 'কটক', এই অর্থেই প্রচলিত। ৫. কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতে সৈন্য অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার রয়েছে বহুবার। রাজধানী, নগরী, বলয় — এসবের মাধ্যমে কারীর টঙ্কার প্রকটিত হয় বলেই এদের **কটক** বলা হত। **কটক** শহর রাজধানী হওয়ার সূত্রে তারও ওই নাম হয়ে যায়। তাছাড়া, সেকালে সমাজসংগঠনকে (রাষ্ট্রকে) বৃক্ষও বলা হত। সেই বৃক্ষকে ঘিরে রাখত তার কটক। সেই সুবাদে সৈন্যবাহিনীকে বোঝাতে কটক শব্দের ব্যবহার স্বাভাবিক ছিল। কারণ শাসকের টঙ্কার তার সৈন্যের মাধ্যমেই **প্রকটিত** হত। তবে মনে হয়, সেরকম হত কেবল তখনই, যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটত।

কটমট : ৫. লোকে 'অট-অট হাসে, কটমট ভাষে', বলেছেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। এই 'কটমট' শব্দটি 'খটমট' রূপেও প্রচলিত আছে। লোকে কটমট করে তাকায়, খটমটে ভাষায় কথা বলে। আমরা আরও জানি, কট করে কাটা হয়, মট করে ভাঙে। কাটার সময় 'কট' কেন, ভাঙার সময় 'মট' কেন? কেউ কেউ বলেন, 'কী খ্যাট-ম্যাটে ভাষা! কিছুই বোঝা যায় না!' আর একটু এগোলে জানা যায়, কেউ কেউ 'খট্টা-মিঠা' ভাষণ দিয়ে থাকেন। সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় — হাসি হয় অট-অট (দ্র. **অট**), তাকান হয় কটমট; কিন্তু ভাষণ হয় — কটমটে, খটমটে, খ্যাটম্যাটে, খট্টামিঠা। এরকম কেন?

এরকম সম্ভবত এইজন্য যে, কট-এ কর্ত্তিতের বিস্ফারিত টঙ্কারে টঙ্কারিত হয় বহিরাগত কর্ত্তনকারী; আর মট-এ ভগ্ন নিজেই টঙ্কারিত হয় (আঙুল মটকায়), বহিরাগত সত্তার উপস্থিতি অবান্তর। প্রথম ক্ষেত্রে ডালের ওপর কাটারির আঘাত 'কট' শব্দের জনক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ডালটির নিজস্ব ভঙ্গপ্রবণতা 'মট' শব্দের জনক (কারণ যে মট করে ভাঙল, সে খানিকটা ত্যাগ করে বা না-করে সীমায়িত হয়ে গেল, তাই 'ম'); বহিরাগত কেউ থাকলে সে নিমিত্ত মাত্র। দর্শকের চোখে পড়ে বিস্ময় সৃষ্টি করে যে, সেই আউটসাইডার দর্শকের কটকট করে তাকিয়ে থাকায় টঙ্কারিত হয়। আর, দর্শকের ইচ্ছা ইশারা হয়ে প্রকটিত হয় তার চোখ মটকানোয়। তার মানে, বহিরাগত কারী টঙ্কারিত হয় যাহাতে, সে হল কট; আর সত্তা (= সীমিত অস্তিত্ব = ম) স্বয়ং টঙ্কারিত হয় যাহাতে, সে হল মট। ৬. ইংরেজি smart।

কটাক্ষ : ১. কট, অক্ষি। ২. *যে-চোখে (যে-চোখের দৃষ্টিতে) কারক টঙ্কারিত হয়*। / কট (অসদৃশ) অক্ষি যাহাতে, যাহাতে চক্ষু অসদৃশ অর্থাৎ বক্র। (ব.শ)। ৩. প্রতিকূল দৃষ্টি, কোপ নজর, ব্যঙ্গ, পরিহাস। (ব.শ.)। ৪. বাঁকা চোখে দেখা অর্থেই প্রচলিত। ৫. যে বাঁকা চোখে দেখে, তার অন্তরের টঙ্কার সেই বাঁকা-চোখের ঝিলিকের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সেই কারণে ঐরূপ তাকানোকে কটাক্ষ বলে। যে জাতি তার সৈন্যবাহিনী দেখিয়ে অন্য জাতিকে আক্রমণের ভয় দেখায়, সেও কটাক্ষ করে।

কটি, কটী : ১. ✓কট্ + ই (ইন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কটি = কারকের (করণের প্রযুক্তির, মালিকানার, তেজের, শক্তির) টঙ্কারের বিকাশসাধন করে যে; কট গতিশীল যাহাতে। কটী = কট গতিশীল যাহাতে, তাহার আধার*। / যাহা আবৃত হয়। (ব.শ)। ৩. শ্রোণিদেশ, কাঁকাল, নিতম্বফলক, পাছা। ৪. পাছা বা কোমর অর্থে প্রচলিত। ৫. পাছা দোলানোয় কী টঙ্কার সৃষ্টি হয়, সেকালের সাহিত্যিকরা অনেকেই তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত পর্যন্ত সাক্ষী দিয়েছেন যে, ওই **কটি**-দোলনে দ্রষ্টার পাঁজর পর্যন্ত ভেঙে যায়। এই কটি মানুষের ক্ষেত্রে যেমন কোমর বা পাছা, তেমনি সমাজের ক্ষেত্রে তার মূল সক্রিয় শক্তিরূপ সৈন্যবাহিনী বা পুলিশবাহিনী ও আমলাতন্ত্র বোঝাতে পারে। বিষয়টিকে আরও সহজ ভাবে বোঝা যায় যখন আমরা 'কোমর ভেঙে দেওয়া' কথাটি বলি। সেইটি ভেঙে দিলে, সত্তাটি আর উঠে দাঁড়াতে পারে না। তা সেটি মানুষের কোমর হোক, আর সমাজব্যবস্থার কোমরই হোক। কারণ যে কট

রক্ষা করে, সেই কট সক্রিয় থাকে এই কোমরে। সেকারণেই এটি 'কটি' পদবাচ্য।

কাট (অকাট্য, আকাট, আকাটা, কাটা, কাটাকাটি, কাটাছাঁটা, কাটান) : ১. ✓কৃৎ > কট্ > কাট। ২. **কট** = *কারী টঙ্কারিত যাহাতে; কাট = কট হইতে জাত; কাট্য = যাহাকে কাটা যায় বা কাটা হয়; অকাট্য = যাহাকে কাটা যায় না; আকাট = যাহার কোনো অংশই কাটা হয় নাই (অর্থাৎ অবিকল বা সম্পূর্ণ আছে); কাটাকাটি* = দ্র. **কচাকচি**; *কাটাছাঁটা = যার প্রয়োজনীয় অংশ কাটা এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ ছাঁটা (ছেঁটে বাদ দেওয়া) হয়েছে; কাটান = কাটা অন থাকে যাহাতে।* / অকাট্য = যাহা কাটা অর্থাৎ খণ্ডন বা অবহেলা করা যায় না; আকাটা = যাহা কাটাকুটা যায় না; কাটাছাঁটা = আবশ্যকমত যে গাছের শাখা ছিন্ন ও অতিরিক্ত ক্ষুদ্র শাখাপল্লবাদি ছাঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। (ব.শ.)। ৩. ছিন্ন করা, দংশন করা, ছেদন করা, ... ইত্যাদি; অখণ্ডনীয়, যুক্তিযুক্ত, ন্যায্য; কাষ্ঠবৎ নীরস, বিদ্যারসহীন, মূর্খ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, জড়; অখণ্ডনীয়, বিনাশীন, অমর, অব্যর্থ; ছিন্ন, খণ্ডিত, ছেদক, নাশক ... ইত্যাদি; পরস্পরকে কাটা, হানাহানি; কর্ত্তিত ও অতিরিক্ত বর্জ্জিত, মাপসই। (ব.শ.)। ৪. ব্যাপকভাবে বহু অর্থে প্রচলিত। ৫. প্রচলিত ভাষা সংস্কার করে যখন ভাষার সংস্কৃত পাঠ প্রস্তুত করা হয়, তখনও সমাজে 'ত' বর্ণ ও 'ট' বর্ণের খুব স্পষ্ট বিভাজন ও প্রচলন হয়নি। যে কারণে সংস্কৃতে ট-বর্গে শব্দসংখ্যা খুবই কম। কর্ত্তন তখনও চলছে, চলছে কর্ত্তরিকা ইত্যাদি; **কাটা** ও **কাটারি**র প্রচলন তখনও তেমনভাবে হয়নি। যদিও ত ও ট-এর এই উৎসারণ প্রক্রিয়ার ধারাটি তখন সবে মাত্র দুটি ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। সেই কারণে **কাট, কাটা, আকাটা** প্রভৃতি শব্দের বাহুল্য আমরা দেখছি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এবং তার পরবর্তীকালে। ... ইংরেজিতে অবশ্য 'ত' বর্গই নেই, তাদের সবটাই 'ট'বর্গে। ভাষা থেকে ত-বর্গ ও তজ্জাত শব্দসম্ভারকে হারিয়ে ফেলা পশ্চিমের বা পাশ্চাত্যের বা পশ্চাতে আগমনকারীর একটি বড় ও নিশ্চিত প্রমাণ। বাংলার ত-বর্গের উত্তরাধিকার তো আছেই, ট-বর্গের নতুন বিকাশও প্রবলভাবে রয়েছে।

উপরোক্ত **কাট, কাটা, অকাট্য** প্রভৃতি শব্দগুলির প্রদত্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থই শব্দগুলিকে বোধগম্য করে দেয়। কিন্তু **আকাট** শব্দটি বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। আসলে *'যাহার কোনো অংশই কাটা হয় নাই (অর্থাৎ অবিকল বা সম্পূর্ণ আছে)'* তাকেই **আকাট** বলা হয়। তাই 'আকাট মূর্খ' কথাটির মানে সম্পূর্ণ মূর্খ বা অবিকল মূর্খ; যার মূর্খতা যেন স্বভাবজ একটি পূর্ণ-সত্তা। মানুষ যখন যখন যতখানি জ্ঞানার্জন করে, তার মূর্খতার 'পূর্ণ-সত্তা'টি তখন তখন ততখানি কাটা পড়ে। তার মানে যতখানি আমরা জ্ঞানার্জন করি, আমাদের মূর্খতার সত্তাটি ততখানি কাটা পড়ে। এই সুবাদে জ্ঞানী মানে কাট-মূর্খ, অজ্ঞানী মানে আকাট-মূর্খ। ৬. ইংরেজি cut।

কটু : ১. ✓কট্ + উ - ক। (ব.শ.)। ২. *কট নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কট যাহাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়।* / যাহা কণ্ঠ আবৃত করে। (ব.শ)। ৩. অপ্রিয়, পরুষ, কড়া, তীক্ষ্ণ, খর, উগ্র, প্রচণ্ড, অকার্য্য, অকরণীয়, **দূষণ, দুর্গন্ধ, উগ্রগন্ধ, সুরভি**, সুগন্ধি, মৎসর, রসবিশেষ **(ইহা ষড়বিধ রসের — মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত —** একতম), **চম্পকবৃক্ষ, পটোল, পলতা, চীনকর্পূর, কটুরোহিণী, কট্‌কী,** রাজিকা, **রাজসর্ষপ, কুক্রিয়া, প্রিয়ঙ্গুলতা। ৪. অপ্রিয় অর্থে প্রচলিত। ৫. কারীর টঙ্কার থাকে কট-এ; সেই কটই গতিশীল হয় কটি-তে। কিন্তু সেই গতিশীলতা পেরিয়ে সে যখন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে কারীর টঙ্কারের চূড়ান্তে পৌঁছে যায়, তখন সে 'কটু' হয়ে যায়। তখন তা আমাদের বিরোধী হয়ে যায়। কারীর টঙ্কার আমরা চাই, নইলে পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে আমরা সতর্ক বা আগ্রহী হতে পারি না; কিন্তু অতিটঙ্কার চাই না। দ্র. কট। কারীর এই অতিটঙ্কারই 'কটু' পদবাচ্য। যে সকল সত্তার মধ্যে এই অতিটঙ্কার থাকে, তাদের প্রত্যেককে তাই আমরা 'কটু' বলে থাকি।**

কুট : ১. ✓কুট্ + অ (ক্) - ক। (ব.শ.)। ২. *কু (করণের উৎ ও নি) টঙ্কারিত হয় যেখানে, যেখানে কুটন করা হয়।* (দ্র. **কু**)। ৩. দুর্গ, কোট, গড়, গৃহ, **পর্ব্বত, বৃক্ষ,** শিলাকুট্ট, পাথরভাঙা হাতুড়ি, কলস, তৃণখণ্ড, ঘাস, খড়, ছেদন করা, খণ্ড খণ্ড করা, চূর্ণ করা, নিস্তুষ করা, আঘাতে ছিন্ন করা, মর্ম্মচ্ছেদনপূর্ব্বক তীব্র তিরস্কার করা বা গালি দেওয়া, ... টুকরা করা, গুঁড়া করা ...। (ব.শ.)। ৪. প্রাচীন বাংলায় ও গ্রাম্য বাংলায় প্রচলিত। যথা 'ধান কুটতে হল বেলা'। ৫. এই কু দ্ব্যর্থক। প্রচলিত করণের পরিধির উপরে ঊর্ধ্বসীমায় এবং পরিধির নীচে নিম্নসীমায় যে সীমালঙ্ঘনকারী টঙ্কার বেজে ওঠে, এবং তা বাইরে থেকে শ্রুত হয়, সেই ব্যাপারটিকে **কুট** বলে। কোনো বস্তুকে গুঁড়ো করতে গেলেই এই টঙ্কার শোনা যায়, তাই একে **কুটন** বলে। অবশ্য এই কুটন কমপক্ষে দুরকম হয় — বাহ্যিক, মানসিক। বাহ্যিক কুটন আমরা কুটনো কোটা থেকে খড়কুট পর্যন্ত অনেক কিছুতে দেখতে পাই; কিন্তু মানসিক কুটন দেখতে হলে যেতে হবে মধ্যযুগের দুর্গে, কোটে, গড়ে (= সামরিক শাসনাধীন এলাকায়), পর্ব্বতে (= ইনস্টিটিউশনে), বৃক্ষে (= সামাজিক সংগঠনে)। যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক কুমন্ত্রণা দিয়ে পরিবারের বধূ বা কন্যাকে পরপুরুষের সঙ্গে মেলায়, এবং এভাবেই আমাদের পারিবারিক 'সলিড ব্যবস্থা'কে কুটে দেয়, তাকে সেকারণেই কুটনা (কোটনা) বা কুটনী বলে। দ্রষ্টব্য **কুটিল, কুটীর**। ৬. ইংরেজি acute, cut।

কুটজ : ১. কুট + ✓জন্ + অ (ড) - ক। (ব.শ.)। ২. *কুটে জন্ম হয় যাহার।* / গিরিতে জাত। (ব.শ.)। ৩. গিরিমল্লিকা, কুরচি গাছ (Wrightea antidysenterica), কুম্ভজাত, অগস্ত্যমুনি, দ্রোণাচার্য্য। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. 'গিরিতে জাত' বললে বোঝায় কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যে জন্মেছে। (দ্র. **গিরি**)। সেও একপ্রকার গৃহ। আজকাল বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তো নিজেদের 'পরিবার' বলতে শুরু করেছে। যে সামাজিক গোষ্ঠীতে এরকম প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে যারা জন্মায় তাদের কুটজ বলে। বাহ্যিক ও মানসিক উভয় লোকের গিরিতে বা কুটে যারা জন্মায় তারা সবাই কুটজ পদবাচ্য। ফলে mountain-এ জন্মেছে যে গিরিমল্লিকা, সেও যেমন কুটজ, তেমনি সামাজিক সংগঠনে জন্মেছে যে 'ছোট ছোট পণ্য বা

মালের মালিকগণ বা মল্লিকা', তারাও গিরিমল্লিকা। আর, কেন কুম্ভজাত অগস্ত্য ও দ্রোণাচার্য্য মুনিরাও কুটজ-পদবাচ্য, তা জানা যাবে **কূট, কুম্ভ, অগস্ত্য** ও **দ্রোণাচার্য্য** শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যায়। **৬.** ইংরেজি cottage।

কুটির (কুটীর) : **১.** ✓কুট্ + ইর - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** কু-টঙ্কারের ঈরণ (সংবাদ) ছড়ায় যেখান থেকে। (দ্র. **কু, ঈর, সমীর, ক্ষীর, উশীর**)। **৩.** হ্রস্ব কুটী, ক্ষুদ্র গৃহ, কুড়ে, কেবল, সুরত। (ব.শ.)। **৪.** সাধু বাংলায় প্রচলিত। **৫.** কুট-এর খবর ছড়ায় যেখান থেকে সেটিই কুটীর সন্দেহ নেই। কিন্তু কী খবর ছড়ায়, কেন ছড়ায়, বোঝা যায় না। **কুট** যদি যৌথব্যবস্থার বিরোধী বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে ব্যাপারটি খানিকটা মেলে। সেক্ষেত্রে মেনে নিতে হয় যে, যৌথ বাসস্থান ত্যাগ করে কেউ কেউ পৃথক কুটীর নির্মাণ করে অন্যত্র একা একাও থাকত। কিন্তু সম্বন্ধ ছাড়া মানুষ বাঁচে না। যৌথসমাজের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক হত, তাতে কুটীরের টঙ্কার থাকার কথা। মানসিক ও বাহ্যিক লেনদেনের কাটাকাটি থাকার কথা। হয়তো সেজন্যেই **কুটীর**। ৬. ইংরেজি cottage।

কুটিল : **১.** ✓কুট্ + ইল - ক। (ব.শ.)। **২.** *কুট ইল (বাঁকা) যাহাতে*। **৩.** বক্র, বক্রগতি, কপট, শঠ, ক্রুর, অস্নিগ্ধ, রূক্ষ, কুঞ্চিত, উর্ম্মিমান, কোঁকড়া, ভীষণ, বৃত্তাকার। তগরবৃক্ষ, বঙ্গ, টিন, ছন্দোবিশেষ। কুটিলা — সরস্বতী নদী, সৃক্কা নামক গন্ধদ্রব্য, রাধিকার ননন্দা জটিলার কন্যা। (ব.শ.)। **৪.** পেঁচালো অর্থে প্রচলিত। **৫.** যা অন্যের যুক্তিকে কেটে দেয়, সে হল **কুট** (acute) বুদ্ধি। সেই কুটের সঙ্গে ইল (ill) যুক্ত হলে সে হয়ে যায় বদ এবং ক্ষতিকর। বিশ্বাস হতে চায় না যে, এভাবে প্রাচীন শব্দের উত্তরাধিকার একই সঙ্গে বাংলা ও ইংরেজি শব্দের ভিতর এত সরাসরিও আছে!

কুটুম্ব (কুটুম্বিনী) : **১.** ✓কুটুম্বি + অ - কর্ম্মবাচ্যে। কুটুম্বিন + স্ত্রী ঈ। (ব.শ.)। **২.** *কুট উম্ব বহন করে যে*। **৩.** পোষ্যবর্গ, গৃহ, পশ্বাদি ধন, পত্নী, বান্ধব, জ্ঞাতি, সন্ততি, নাম, রক্ষণীয়। শ্যালক, আত্মীয়, বিবাহসম্বন্ধে বন্ধু, শ্বশুর, সখা। পতিপুত্রাদিমতী গৃহকর্ত্রী স্ত্রী, পুরন্ধ্রী, গৃহিণী, কুলরমণী, পত্নী, নারীমাত্র, কুটুম্বসমূহ, পোষ্যবর্গ, পরিবারগণ, ক্ষুপবিশেষ, ক্ষীরিণী। (ব.শ.)। **৪.** গ্রামবাংলায় 'কুটুম্ব' কথাটি এখনও relative অর্থে প্রচলিত। **৫.** শব্দদুটির দ্বারা সেকালে পরিবারের পোষ্যবর্গ বোঝাত। যৌথব্যবস্থায় এমন পরিবার নিম্নগামী হতে থাকে, যখন পরিবারের লোকেরা ঠিকঠাক কাজকর্ম করত না। সেই পোষ্যবর্গ সম্পর্কে বলতে গিয়ে **'কুটুম্বিনী'** শব্দটির প্রয়োগ করেছেন হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, তাঁর অনূদিত মহাভারতে — 'তাহাদের গৃহে ধান্যাদি শস্য বিকীর্ণ থাকে এবং তাহা কাক ও মুষিকগণ ভক্ষণ করে ... সমস্ত উপকরণ বিক্ষিপ্ত থাকে; কিন্তু কুটুম্বিনীরা সেদিকে দৃষ্টিপাত করে না।' (মহাভারত ২২৬ অধ্যায়)।

কূট : **১.** ✓কূট্ + অ (অচ্) - অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। **২.** *যাহাতে স্থিতিশীল কু-টঙ্কার থাকে (বা যথার্থ টঙ্কার থাকে না, হয় বেশি, কম, বা অন্যতর টঙ্কার থাকে)। /* যাহা রবিতাপে ও দাবানলে দগ্ধ হয়। (অবিকৃত আকাশাদি, কৃত্রিমপণ্য — অমরকোষ টীকা)। (ব.শ.)। **৩.** মিথ্যাভূত, অসত্য, কৈতবযুক্ত, কপট, কুটিল, অন্যথাকারদর্শনযুক্ত অর্থাৎ বাহিরে একপ্রকার, ভিতরে অন্যপ্রকার, অন্যায়, অবৈধ, জাল, তুলাদণ্ডাদিবিষয়ে ন্যূন বা অধিক, নিশ্চল, স্থির, তুচ্ছ, দুর্ব্বোধ, দৃশ্যমানগুণ অন্তর্দোষ (বস্তু), অনৃত, অসত্য, অলীক। অগস্ত্যমুনি, গৃহ, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষ। মায়া, অন্যথাকারদর্শন, কৈতব, কুটিলতা, দুর্ব্বোধত্ব, অস্পষ্টতা, পর্ব্বত, অগ্রভাগমাত্র, উচ্চপ্রদেশ, পুরদ্বার, তোরণ, রাশি, পুঞ্জ, সমূহ, লৌহমুদগর, তুলামান-মুদ্রাদি বিষয়ে ন্যূনতা বা আধিক্য, তাম্রাদিগর্ভমুদ্রা, জলাধার, জালা, সীরাঙ্গ, ফালাধার, যন্ত্র, পাশ, ফাঁদ, কাষ্ঠাদিকোষে গুপ্ত অস্ত্র, গুপ্তি। (ব.শ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** সত্য থেকে সরে গিয়ে মানুষ বহু জায়গাতেই ঠকে। সেই কারণে বহু 'অন্যথাকারদর্শন' সত্তাকে কূট শব্দে শনাক্ত করা হয়। উপরে সেসবের নাম উল্লেখ করেছেন বঙ্গীয় শব্দকোষ। এর মধ্যে দুটি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ — **অগস্ত্যমুনি** ও ভগ্নশৃঙ্গ বৃষ। কূটজ শব্দের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় শব্দকোষ জানাচ্ছেন, কূটজ ও কুটজ সমার্থক। **কুটজ**তে আমরা **অগস্ত্যমুনি, দ্রোণাচার্য**কে পেয়েছি। **কুম্ভজ**তে পেয়েছি এই দুজনের সঙ্গে বশিষ্ঠকে। এখানে কূট শব্দের ব্যুৎপত্তিতে কিছু বদল দেখিয়ে তার অর্থ অগস্ত্যমুনি দেখানো হয়েছে। কর্ম্মবাচ্যে তারই অর্থ করা হয়েছে 'ভগ্নশৃঙ্গ বৃষ'। এরকম সম্ভবত এইজন্য হয়েছে যে, **কুম্ভজ**দের মধ্যে যে **দ্বিধা**, সেই দ্বিধার কারণ রয়েছে কূটজ শব্দের 'ভগ্নশৃঙ্গ বৃষ' শব্দের ভিতরে। বৃষের শৃঙ্গটি এখানে ভাঙা। তার শিবশক্তি দমিত। ফলে এরা প্রত্যাশার চেয়ে কম ক্রিয়া করে। তাই এরা কূট। যে নীতি শিবশক্তিকে এভাবে দমিয়ে দেয়, শিবশক্তির শিং ভেঙে দেয়, তাকে কূটনীতি বলা খুবই সঙ্গত। রাষ্ট্রের সুমেরু পর্ব্বতে (সুখের ক্ষমতাশীর্ষে) বিরাজমান কূটনৈতিক ব্যক্তিরা তাঁদের ভাঙা শিং নিয়ে যে বাকযুদ্ধ চালান, তাকেই 'কূটনৈতিক তৎপরতা' বলে।

কূটস্থ : **১.** কূট ✓স্থা + অ - ক। (ব.শ.)। **২.** *যাহা কূটে স্থিত বা থাকে*। / মায়ায় বা মায়াপ্রপঞ্চে স্থিত। (ব.শ.)। **৩.** অহঙ্কারে স্থিত, কূটবৎ নির্ব্বিকারভাবে স্থিত, অপ্রকম্প্য, বিকারশূন্য, অবিক্রিয়, রাশিবৎ বা অনেকমায়াদিপ্রকারে স্থিত, একরূপভাবে সর্ব্বকালব্যাপী (আত্মা আকাশ প্রভৃতি — অমরকোষ টীকা), কদম্বস্থ, সমূহস্থিত, শৃঙ্গস্থিত, চূড়াস্থ, কুলপ্রশস্তিতে সর্ব্বাগ্রস্থিত, আদিম, নির্ব্বিকার পরমাত্মা, আকাশাদি, বাঘনখ নামক গন্ধদ্রব্য। (ব.শ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** তিনভাবে এই **কূটস্থ** শব্দটিকে দেখা হয়েছে। প্রথমত ব্যক্তিমানুষের মনোলোকের কূটে যে থাকে; দ্বিতীয়ত মানবসমাজের মনোলোকের কূটে যে থাকে এবং তৃতীয়ত ভূলোকের কূটে যে থাকে। এই তিন শ্রেণীর কূটস্থকে এখানে শনাক্ত করা হয়েছে।

'কঠ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : কঠ্, কঠ, কঠিন, কঠিল্ল, কঠিল্লক, কঠোপনিষদ, কঠোর, কড়ি, কাঠিন্য। কঠ্ = কারীর টঙ্কারের (স্থির) হওয়ন। **কঠ** = কারীর টঙ্কার স্থির (চুপচাপ) থাকে যাহাতে।

কঠ (কঠোপনিষৎ) : ১. কঠ = কৃচ্ছ্রজীবন। (ব.শ.)। ২. *যাহাতে ক-এর টঙ্কার শায়িত থাকে*। ৩. মুনিবিশেষ। ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য। ইঁহার নামানুসারে যজুর্বেদের শাখাবিশেষ 'কঠ' বা 'কঠশাখা' নামে অভিহিত। (ব.শ.) ঈশ্বর সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক পূর্ণ এই উপনিষদ দুই অধ্যায়ে সমাপ্ত। প্রথম অধ্যায়ে নচিকেতা ও তাঁর পিতা বিশ্বজিৎ সংবাদ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে যম ও নচিকেতা সংবাদ। এই উপনিষদে পিতৃসত্য রক্ষার জন্য নচিকেতার যমালয়ে গমন, যমের নিকট আত্মজ্ঞান শ্রবণ প্রার্থনা, যমের আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা, চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, আত্মার একত্ব, পরমাত্মার সর্বব্যাপকতা, যোগবিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। (পৌ.অ.)। ৪. বইয়ের নামরূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কঠিন**।

কঠিন : ১. ✓কঠ্ (কৃচ্ছ্রজীবন) + ইন (ইনচ্) - ক। (ব.শ.)। ২. *যাহা কঠ-এর (কৃচ্ছ্রজীবন) নীতি অনুসারে চলমান*। ৩. নিষ্ঠুর, নিষ্করুণ, নির্দ্দয়, কঠোর, দৃঢ়, শক্ত, কর্কশ, স্তব্ধ, পরুষ, কটু, দুঃসহ, দৃঢ়বদ্ধ, রসহীন, শুষ্ক, সান্দ্র, নিবিড়, মূর্ত্ত, দুর্ব্বোধ, দুরূহ, বিষম, কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ, প্রগাঢ়, সুগম্ভীর, গুরুলঘুবিচারশূন্য, কষ্টকর, দুষ্কর, দুঃসাধ্য, স্থালী, ভাজন, খনিত্র। (ব.শ.)। ৪. hard অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কৃচ্ছ্রসাধন**। যা আয়-উপায় হবে, উৎপাদিত হবে, তা সব লুকিয়ে গুছিয়ে রেখে, না-খেয়ে বা শুকনো রুটি খেয়ে কষ্ট করে দিন কাটানোকেই 'কঠ' অনুসৃত নীতিতে দিন কাটানো বা 'কঠিন' বলে। সুযোগ পায়নি তাই উপ-আয় করেনি, ঘুষ নেয়নি — এরকম সৎ মানুষের আর গৌরব কী! যে ব্যক্তি অজস্র সুযোগ পেয়েও 'উপায়' করেনি, মাছ-মাংস-ব্যাঙ্কব্যালান্স থাকা সত্ত্বেও শুকনো রুটি খেয়ে দিন গুজরান করেছে, সেই তো মহাপুরুষ! তার কাজটাই 'কঠিন'। এরূপ জীবননীতি অনুসারে যা প্রকটিত, তা সত্য নয়। সত্য লুক্কায়িত, ভিতরে শায়িত। শব্দটি পরে বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই 'কঠ' থেকেই 'কাঠ' হয়, যা শুকনো। শক্তি তার ভিতরে শায়িত। কত শক্তি, কাঠে আগুন লাগালেই সেটা টের পাওয়া যায়!

কঠোর : ১. কঠ্ + ওর (ওরন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কারীর শান্ত টঙ্কার সম্পূর্ণত (শায়িত কিন্তু সক্রিয়) থাকে যাহাতে*। ৩. কঠিন, দৃঢ়, শক্ত, ক্রুর, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, কর্কশ, কটু, কড়া, তীক্ষ্ণ, নিশিত, ধারাল, তীব্র, প্রচণ্ড, জ্বালাময়, দারুণ, মর্ম্মস্পর্শী (বাক্য), পূর্ণ, সকল, পূর্ণবিম্ব, পূর্ণকায়, পরিণতিপ্রাপ্ত, উত্তাপবহুল, ক্লেশকর, প্রবৃদ্ধ, পরিপুষ্ট। (ব.শ.)। ৪. hard বা 'নির্ম্মম' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কঠ, কঠিন**।

'কণ্' (কণ্ট্, কুণ্, কুণ্ঠ্, কুণ্ড্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকণ্টক, অকণ্টবিদ্ধ, অকণ্ডিত, অকুণ্ঠ, অকুণ্ঠিত, অকুণ্ডল, আকণ্ঠ, কড়া, কণ্, কণ, কণকণ, কণাটুক, কণাটুকু, কণাদ, কণামাত্র, কণি, কণিক, কণিকার, কণিশ, কণীয়ান, কণ্ট্, কণ্ট, কণ্টক, কণ্টকদ্রুম, কণ্টকনগর, কণ্টকফল, কণ্টকবিশোধন, কণ্টকশোধন, কণ্টকারিকা, কণ্টকারী, কণ্টকাশন, কণ্টকিত, কণ্টকিফল, **কণ্টকী, কণ্টকীফল, কণ্টকোদ্ধরণ**, কণ্ঠ, কণ্ঠগ, কণ্ঠগত, কণ্ঠগ্রহ, **কণ্ঠতট, কণ্ঠদঘ্ন, কণ্ঠনাল, কণ্ঠপাশক**, কণ্ঠবন্ধ, কণ্ঠবর্ত্তী, কণ্ঠবিদার, **কণ্ঠভূষণ, কণ্ঠভূষা, কণ্ঠমণি**, কণ্ঠমালা, কণ্ঠমূল, কণ্ঠরোধ, কণ্ঠলগ্ন, কণ্ঠলতা, কণ্ঠশোষ, কণ্ঠশ্বাস, কণ্ঠসূত্র, কণ্ঠস্থ, কণ্ঠহার, কণ্ঠা, কণ্ঠাগত, কণ্ঠাগ্র, **কণ্ঠাবলী**, কণ্ঠাবসক্ত, কণ্ঠাভরণ, কণ্ঠশ্লেষ, কণ্ঠি, কণ্ঠিকা, কণ্ঠী, **কণ্ঠীধারী**, কণ্ঠীবদল, কণ্ঠীরব, কণ্ঠৌষ্ঠ, কণ্ঠ্য, কণ্ঠৌষ্ঠ্য, কণ্ড্, কণ্ডন, **কণ্ডু, কণ্ডূ**, কণ্ডূতি, কণ্ডূয়ন, কণ্ডূয়নক, কণ্ডূরসা, কণ্ডুল, কণ্ডোল, কণ্যান, **কণ্ব**, কাঁট, কাঁটা, কাঁটাকুটা, কাঁটাকুটো, কাঁটাখোঁচা, কাঁটাচামচ, **কাঁটাঝাঁপ**, কাঁটাঝোড়, কাঁটাঝোপ, কাঁটাল, কাঁঠাল, কাঁঠি, কাঁড়, কাঁড়া, কাঁড়ান, কাঁড়ার, কাঁড়ারী, কাঁড়ি, কাটি(টী), কাঠি(ঠী), কাড়ার, কাড়িয়া, কাণ্টা, কাণ্ব, কিণ, কিণ্ব, কুঁড়, কুঁড়া, কুঁড়াজালি, কুঁড়ি(ড়ী), কুঁড়িয়া, কুঁড়ে, কুঁড়ো, কুঁদ, কুঁদা, কুঁদো, কুড়িয়া, কুড়োজালি, কুঢ়া, কুণ্, কুণোবেঙ, কুণ্ঠ্, কুণ্ঠ, কুণ্ঠা, কুণ্ঠিত, কুণ্ড্, -কুণ্ড, কুণ্ডল, কুণ্ডলা, কুণ্ডলি, কুণ্ডলিত, কুণ্ডলিনী, কুণ্ডলিয়া, কুণ্ডলী, কুণ্ডাশী, কুণ্ডিকা, কুণ্ডিন, কুণ্ডী, কুণ্ডু, কুণ্ডুলি(লী), কুণ্ডোধ্নী, কুনি, কুন্নান, কুণিকা, কেঁড়েলি(লী), কোঁট, কোঁড়, কোঁড়ক, কোঁড়া, কোণ, কোণা, কৌণপ, কৌণপদন্ত, বিকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠপুরী।

কণ্ (কণ্ট্, কুণ্, কুণ্ঠ্, কুণ্ড্) = কারীর রহস্যরূপের বোধের সূত্রায়ন। **কণ** = কারীর রহস্যরূপের বোধ সূত্রায়িত যাহাতে। **কণ্ট্** = কণ্-এর টঙ্কারণ। **কুণ্** = কারীর অস্বাভাবিক রহস্যরূপের বোধের সূত্রায়ন। **কুণ্ঠ্** = কারীর অস্বাভাবিক রহস্যরূপের বোধের সূত্রায়নের টঙ্কার যেখানে স্থির (চুপচাপ) থাকন। **কুণ্ড্** = কারীর অস্বাভাবিক রহস্যরূপের বোধের সূত্রায়নের উড্ডয়ন।

কণ : ১. ✓কণ্ (নিমীলন) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কারীর রহস্যরূপের বোধ সীমায়িত যাহাতে*। ৩. কণা, খুদ, তিল-কণা, অতিসূক্ষ্ম-বস্তু, অতিক্ষুদ্রাংশ, অণু, লেশ, গুঁড়া, বিন্দু, ফোঁটা, স্ফুলিঙ্গ, ফুলকি, অত্যল্প, কিঞ্চিৎ, লব। (ব.শ.)। ৪. atom অর্থে প্রচলিত। ৫. 'স্বাভাবিক' = পরিধির মধ্যে; 'অস্বাভাবিক' = পরিধির বাইরে। উ-কার মানেই পরিধির বাইরে। ং এর পরে ট-বর্গ বা ত-বর্গ থাকলে তা যথাক্রমে ণ-তে ও ন-তে পরিণত হয়। কার্যত কং কথাটিই পরে ক খ গ ঘ থাকলে কঙ্, পরে চ-বর্গ থাকলে কঞ্, পরে ট-বর্গ থাকলে কণ্, পরে ত-বর্গ থাকলে কন্, প-বর্গ থাকলে কম্, এবং অন্য কিছু থাকলে ং-ই থেকে যায়। এই পরিবর্তন কেবল উচ্চারণজাত কারণে ঘটে না, ক্রিয়ার পরিবর্তনও তার কারণ। যেমন ং-এর পরে প-বর্গ থাকলে ং-কে সীমায়িত করে নিতে হয়, তাই ং পরিণত হয় ম্-এ। কিন্তু যেহেতু মূলে ং, তাই কং কঙ্ কঞ্ কণ্ কন্ কম্ মূলত একই ক্রিয়ার নানা রূপের কথা বলে। যে আদিভাষায় এই শব্দগুলি প্রথম প্রচলিত হয়েছিল, তাতে এই শব্দের স্বভাবতই বহু রূপ ছিল; এবং ইংরেজি ভাষাও তার সেই উত্তরাধিকার ধরে রেখেছে। তাই আমাদের কঙ্ক, কঞ্চ, কণ্ট, কন্ত, কম্প (প্রতিটি বর্গের শুরুর উদাহরণটুকু দিলাম) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণগত সাদৃশ্যে যে-সকল ইংরেজি শব্দ পাওয়া যায়, তাদের অর্থের মূলেও কিছু কিছু সাদৃশ্য আজও দেখতে পাওয়া যায়।

এখানে কণ্‌-এর পরে কিছু নেই বলে মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু কার্যত তা নয়। এই কণ্ কেবল ট-বর্গের সামনে বসা কং-এর একটি রূপ। তাই এর অর্থ আমরা করতে পারি 'করণের রহস্যরূপের প্রকাশ যাহাতে।' এ হল কারীর সূক্ষ্ম রূপের বোধ। এই বোধ রহস্যরূপী হলেও, এর টঙ্কার-যোগ্যতা রয়েছে, **কন**-এর যা নেই। এই 'কণ্'-এর আধারকে কণা বলে। (দ্র. **তনয়**)।

কণা : ১. ✓কণ্ (নিমীলন) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কারীর রহস্যরূপ যাহাতে; কণ-এর আশ্রয় যাহাতে।* ৩. তিল প্রভৃতি শস্যের ক্ষুদ্রাংশ বা কণা, অতিসূক্ষ্ম বস্তু, অতিক্ষুদ্রাংশ, অণু, বিন্দু, ফোঁটা, স্ফুলিঙ্গ, ফুলকি, অত্যল্প, কিঞ্চিৎ, ক্ষুদ্রাংশ, লব, তণ্ডুলকণ, জীরক, পিপ্পলী, কুম্ভীরমক্ষিকা। ... (ব.শ.)। ৪. particle বা 'অণু' অর্থে প্রচলিত। ৫. আমাদের প্রাচীন শব্দবোদ্ধাগণ নিশ্চিতভাবেই একালের কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার পরমাণুতত্ত্ব জানতেন না। কিন্তু পদ-অর্থবিদ্যাটি স্বাভাবিকভাবে অর্জন করেছিলেন। সেই পদ-অর্থবিদ্যা অনুসারে প্রতিটি বস্তুর অণুরূপে তাঁরা দেখেছিলেন **অংরূপিণী**কে বস্তুটির কারী রূপে। সেই কারণে তাঁরা অণুমাত্রকে 'কারীর রহস্যরূপ যাহাতে' বলে শনাক্ত করেছিলেন। তাতে যদি একালের কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার মূল কথা (পরমাণুর ভিতরে প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদির সংখ্যানুসারে বস্তুটির গঠনাদির কথা) বলা হয়ে গিয়ে থাকে, সে তাঁদের জ্ঞাতসারে ঘটেনি; তাঁরা পদ-অর্থের নিয়ম ধরে এগিয়ে বস্তুর ক্ষুদ্রাংশকে **কণ** বা **কণা** নাম দিয়েছিলেন মাত্র।

কণাদ : ১. কণ ✓অদ্ + অ (অণ্) - ক, অথবা কণ্ + আ + ✓দা + অ (ক)- ক। (ব.শ.)। ২. ***কণা** (বিষয়ক জ্ঞান) দান করেন যিনি।* / যিনি কণ ভক্ষণ করেন, অথবা যিনি কণ্, অর্থাৎ অণু-বাদ (বিশেষ-বাদ) গ্রহণ করেন। (ব.শ.)। ৩. বৈশেষিক দর্শনকার মুনিবিশেষ। স্বর্ণাদির কণগ্রাহক, স্বর্ণকার। (ব.শ.)। বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মুনি। এঁর অপর নাম উলুক। এইজন্য বৈশেষিক দর্শনের অপর নাম ঔলুক্য দর্শন। ইনি তণ্ডুল কণা খেয়ে জীবনধারণ করতেন বলে কণাদ নামে পরিচিত। ইনি পরমাণুবাদী। এঁর মতে জীবনের কঠোরতাই ঋষিদের আধ্যাত্মিক উন্নতির মূলসূত্র। মহর্ষি কণাদ 'বিশেষ' নামে এক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেছেন, এইজন্য তাঁর দর্শনের নাম 'বৈশেষিক'। কণাদের মতে ছয়টি ভাব-পদার্থ (দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, ও সমবায়) আর চারটি অভাব-পদার্থ (প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যভাব, ও অত্যন্তাভাব) — মোট দশটি। কণাদই সর্বপ্রথম পরমাণুবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন, একমাত্র পরমাণু সৎস্বরূপ নিত্যপদার্থ, তার আর কারণ নেই। সমস্ত জড়পদার্থই পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে, বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে, তারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন বলে প্রতীতি হয়। তিনি প্রথমে দেখান তেজ ও আলোক — একই মূল পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা। অনেকের মতে কণাদই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম পরমাণুবাদ প্রচার করেন। কণাদ-দর্শনে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় না, সেইজন্য অনেকে কণাদকে নাস্তিক বলে থাকেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা বা উলুক। এদের হাতেই ধনসম্পদ সঞ্চিত হয়। কণাদ দর্শন এই ঔলুক্য দর্শন। এ-তো 'কঠিন' হবেই। দ্র. **কঠিন**।

কণ্ট (কণ্টক, কাঁটা) : ১. ✓কণ্ট্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓কণ্ট্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *করণের রহস্যরূপ টঙ্কারিত বা বাধাপ্রাপ্ত যাহাতে; কণ্ট করে যে, অর্থাৎ যাহাতে কারকের রহস্যরূপ টঙ্কারিত হয় তাহা উপস্থাপিত করে যে।* ৩. কাঁটা, গ্রামসীমা; কণ্টকবৎ অঙ্কুর, সূচাগ্র, বৃশ্চিকাদির হুল, শজারুর কাঁটা, মাছের কাঁটা, নখ, ক্ষুদ্রশত্রু, চৌর-সাহসিক-প্রভৃতি, লোকবঞ্চক, রোমাঞ্চ, পুলক, দোষোক্তি, বিঘ্ন, কাঁটা-নাবিক, লোকপীড়ক, লোকোপদ্রবকারক, রাজদ্রোহী, রাজশত্রু, রোগজন্য জিহ্বার কর্কশভাব বা খরস্পর্শ, তীর মর্মচ্ছেদক বেদনারূপ রোগ লক্ষণ, কঠোর ভাষা, জ্যোতিষের কণ্টক, দোষ, বেণু, মকর, কর্ম্মস্থান (workshop), গ্রামান্ত, কাঁটাগাছ। ৪. thorn বা 'কাঁটা' এবং 'দাঁড়িপাল্লা' অর্থে প্রচলিত। ৫. 'নেই জনন যাহাতে' = **অজ**। এই 'অজ'-র মতোই কণ্ট শব্দটিকেও দুদিক থেকে বোঝা সম্ভব। টঙ্কার শব্দের ক্ষেত্রে যেমন 'টঙ্কার থাকে যাহাতে' মানে, যে টঙ্কার করে, সেও যেমন এর উদ্দিষ্ট, তেমনি যে বস্তু টঙ্কারিত হয় সেও এর উদ্দিষ্ট।

বাহ্যিক দৃশ্য বস্তু যার অগ্রভাগ সুঁচের মতো ফোটে, তাকেই কণ্টক বা কাঁটা বলে সন্দেহ নেই। তবে, শব্দটি অনেক বেশি ব্যবহৃত হয় অদৃশ্য লোকে, মূলত 'বিঘ্ন' অর্থে 'পথের কাঁটা' রূপে যার ব্যাপক ব্যবহার হয়। তাছাড়া 'কাঁটাপাল্লা', 'কাঁটা-করা' (বঞ্চনামূলক ওজন করা) প্রভৃতি কথা বাংলায় এখনও বহুল প্রচলিত। কাঁটা-করা মানে ওজন করা। তবে, সাধারণত শত শত বস্তা ধান চাল মাপতে দশ-পনেরো হাত উঁচু থেকে টাঙানো খুব বড় যে দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করা হয়, তাকেই কাঁটাপাল্লা বা কাঁটা বলে। এতে ওজন করাকে বলা হয় 'কাঁটা-করা'। আজকাল মালভর্ত্তি ট্রাক, লরি ওজন করার জন্য যে যান্ত্রিক ওজনব্যবস্থা হয়েছে, সেগুলিকেও কাঁটাঘর বলে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এরকম ওজনব্যবস্থাকে 'কাঁটা-করা' বলা হয় কেন? এতে সুঁচের মতো ফোটার কী আছে?

রাজাকে বা জমিদারকে দেয় চাষির ধানকে রাজার বা জমিদারের কাছে পৌঁছতে হত এই 'দাঁড়িপাল্লা' (কাঁটাপাল্লা) পেরিয়ে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'কাঁটাদার' রাজকর্মচারী চাষির ধানচালের ওজনের হিসেবে কুড়িকে দশ, দশকে পাঁচ করে ছেড়ে দিত। চাষি বুঝত ওজন করার দাঁড়িপাল্লা কী বস্তু, এবং কেমন 'কাঁটা'র পাল্লায় সে পড়েছে! এই পাল্লার ওজনব্যবস্থা তার মনে ফুটে তার মনকে রক্তাক্ত করে দিত। একে 'কাঁটাপাল্লা' ছাড়া আর কী নামই বা সে দিতে পারত! 'কাঁটা' শব্দের উপরোক্ত (২) আদি ক্রিয়াভিত্তিক অর্থই বাংলাভাষীর ইত্যাকার বোধের কারণ। মনুসংহিতার অনুবাদে রাষ্ট্রশরীরে বা সমাজশরীরে বাইরে থেকে যে-সকল লুঠেরা, চোর, ডাকাত আসে তাদেরকেও 'কণ্টক' শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। এদের ক্ষেত্রে কাঁটা বাইরে থেকে ফোটে। আর সজারুর দেহের মতো যে-কাঁটা ভেতর থেকে বাইরের দিকে মুখ করে বেরিয়ে থাকে সেও কণ্টক। তবে সেটি সীমান্তপ্রদেশের ব্যাপার, গ্রামান্তের ব্যাপার; যে কাঁটা ছিল **কণ্টকনগর**-এর গায়ে। ৬. ইংরেজি kent, quant।

কণ্টকনগর (কাটোয়া) : ১. কণ্টক + নগর। ২. *যে-নগর কণ্টকরূপে দেখা (বাধা) দেয়।* ৩. বর্তমান কাটোয়া। বর্ধমান জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। ৪. কাটোয়ার প্রাচীন নাম। অনেকেই এই নাম জানেন না। তাই সেভাবে দেখলে শব্দটি বর্তমানে অপ্রচলিত। ৫. শহরটি (প্রায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলে এমন অবস্থানে বিরাজিত ছিল যে, বিভিন্ন যুগে শহরটি বর্গী, মোগল, ইংরেজের অভিযানের পথের **কাঁটা** রূপে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সে **কণ্টকনগর** এখন নেই। তার সেই ত্রিবেণীসঙ্গম বিচ্ছিন্ন হয়ে কাটোয়া থেকে এখন বহু দূরে সরে গেছে; এমনকি কণ্টকনগর নামটিও লোকে ভুলে গেছে। তবে কাটোয়ার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থগুলি থেকে মধ্যযুগের কাটোয়ার সেই কণ্টকসুলভ আচরণের কথা এখনও জানতে পারা যায়।

কণ্টকবিশোধন : ১. কণ্টক, বিশোধন। ২. *যার দ্বারা (পথের) কাঁটা সরিয়ে ফেলা হয় বা কণ্টককে শোধিত করে পক্ষে আনা হয়।* ৩. ক্ষুদ্রশত্রুবিনাশ, চৌরাদিশাসন, বিদ্রোহীদমন। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এই ধরনের শব্দ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা ঐ জাতীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বহুবার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তাতে কণ্টক শব্দটি সমাজদেহে যা কিছু বাইরে থেকে কাঁটার মতো ফোটে, বহিরাগত লুঠেরা, চোর, ডাকাত, যারা চুরি করে বা লুঠ করে পালায়, তাদের সবাইকে বোঝানো হয়েছে। মনুসংহিতায় জগৎসৃষ্টি অধ্যায়ে মশক (মশা), দংশ (ডাঁশ) প্রভৃতি শব্দের সাহায্যেও সেই পথের কাঁটাগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। এককালে এদের 'রাজদ্রোহী' বলা হত। একালে সমাজদেহে যে সকল কাঁটা ফোটে, তাদের নতুন নাম দেওয়া হয়েছে — 'সমাজবিরোধী'। তবে শব্দদূষণের পাল্লায় পড়ে শব্দটি দূষিত হয়ে গেছে। একালের শাসকেরা সমাজের কাঁটার কথা বাদ দিয়ে শাসকের নিজের পথের কাঁটাকেই 'সমাজবিরোধী' বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন।

কণ্টকাশন : ১. কণ্টক, অশন। ২. *কণ্টক অশন যাহার।* ৩. উট। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সমাজদেহের চলার পথের কাঁটাও অনেকের খাদ্য। এইরকম খাদ্যরসিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য — সিবিআই, এনকোয়ারি কমিশন বা ঐ জাতীয় বহু সংস্থা। আমেরিকা এইরকম বহু সংস্থা পোষে বলে শুনেছি। সেই কাঁটাখোর সংস্থাগুলিও সেই সুবাদে উট-পদবাচ্য।

কণ্ঠ (উপকণ্ঠ) : ১. ✓কণ্ (শব্দ) + ঠ - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কণ (আওয়াজ) টঙ্কারিত হয় যে পথে; যেখানে কণ্ট-এর হওয়ন।* / যাহা শব্দ করে। (ব.শ.)। ৩. গ্রীবার পুরোভাগ, গলা, গলবিল, গলপথ, গলধ্বনি, স্বর, সমীপ, নিকট, প্রান্ত, সীমা, হোমকুণ্ডের বহিঃস্থিত অঙ্গুলিমিত স্থান, কুম্ভাদির গলদেশ, গর্ভাশয়ের দ্বার, মদনবৃক্ষ। (ব.শ.)। ৪. neck বা 'গলা' অর্থে প্রচলিত। ৫. কারকের রহস্যরূপের টঙ্কার যে পথে বহির্গত হয়, সেটিই সেই কারকের কণ্ঠ। কণ যখন মানুষের বাক্যের আওয়াজ, তখন 'গলপথ' হল কণ্ঠ; কণ যখন একটি গ্রামের মানুষের, পোষ্যবর্গের, উৎপন্নের বর্হির্দেশ গমন, তখন গ্রামের **বাইরে বেরোনোর পথ** (মুখপাত) হল কণ্ঠ এবং তার কাছাকাছি হল **উপকণ্ঠ**।

কণ্ড (কণ্ডন, কণ্ডনী) : ১. ✓কণ্ড্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কারীর রহস্যরূপের উড্ডয়ন যে-কর্মে; কণ্ড্ ক্রিয়া অন যাহাতে।* / যাহাতে মুষলাদি দ্বারা তণ্ডুলাদির নিস্তুষীকরণ (হয়)। (ব.শ.)। ৩. মুষলাদি দ্বারা তণ্ডুলাদির নিস্তুষীকরণ, কাঁড়ান, তণ্ডুলাদির কণ্ডনসাধ্য দ্রব্য, কুঁড়া, তুষ। **কণ্ডনী** = যাহার দ্বারা কণ্ডন সাধিত হয়, উদূখল, মুষল। (ব.শ.)। ৪. 'কাঁড়া' (চাল *কাঁড়তে* হল বেলা) রূপে প্রচলিত। ৫. নতুন নতুন বিষয় বা বস্তু হাতে আসছে, সেগুলির খোসা ছাড়িয়ে ভেতরটিকে প্রকাশ করে দিচ্ছেন, আবিষ্কারের এই আনন্দই তো মানুষকে মত্ত করে। কিন্তু এই কাজটি যখন একই কর্মের পুনরাবৃত্তি হয়ে দাঁড়ায়, তখন কর্মটি অত্যন্ত ক্লান্তিকর। তাই এই ভেদন-নিস্তুষীকরণ-কাঁড়া কর্মে মদ্-হর্ষও (ব.শ. মতে কণ্ড্ = মদ, হর্ষ) হয়। ধান থেকে এইভাবে চাল বানিয়ে রাখা হয় বলেই সম্ভবত কবিকল্পদ্রুম গ্রন্থের রচয়িতা একে 'রক্ষণ' বলেও উল্লেখ করেছেন। তবে মনে রাখা ভালো, এই কণ্ড্ থেকে প্রচুর শব্দ তৈরি করা হয়েছে — **কণ্ডন, কণ্ডুয়ন, কুণ্ড, কুণ্ডু, কুণ্ডল, কণ্ডোল কাণ্ডবীণা**। ৬. ইংরেজি candle, incandescent, ল্যাটিন candere (কান্দেরে = দীপ্ত হওয়া, কিরণ দেওয়া)।

কণ্ডু (কণ্ডুয়ন) : ১. ✓কণ্ড্ + উ (কু) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহা দ্বারা কণের উড্ডয়ন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়।* / যাহা দ্বারা মত্ত হয়। (ব.শ.)। দ্র. **কুণ্ডু**। ৩. কণ্ডুয়নজনক রোগ, চুলকানি, খোস, কণ্ডুজন্য গাত্রবিঘর্ষণ, গা চুলকানো, মহর্ষি কণ্বের পুত্র। (ইনি গোমতীর তীরে কঠোর তপস্যায় রত হলে, ইন্দ্র ভীত হয়ে প্রম্লোচা নামে এক সুন্দরী অপ্সরাকে তাঁর তপোভঙ্গ করবার জন্য প্রেরণ করেন। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে কণ্ডু তার সঙ্গে বহুকাল বাস করেন। প্রায় শতবর্ষ অতীত হবার পর মুনি একদিন সন্ধ্যাবন্দনার উদ্যোগ করলে প্রম্লোচা তাঁকে পরিহাস করে শতবর্ষ পরে সন্ধ্যাবন্দনার কথা উল্লেখ করেন। তখন নিজের অধোগতির কথা চিন্তা করে স্ত্রীকে গর্ভাবস্থায় ত্যাগ করে আবার তপস্যায় রত হন। এদিকে প্রম্লোচা সেই গর্ভ বৃক্ষোপরি মোচন করেন। তা হতে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বৃক্ষদের রাজা সোম সেই প্রসূত কন্যা মারিষাকে প্রতিপালন করে প্রচেতা নামে দশ ভ্রাতার সঙ্গে বিবাহ দেন।) (পৌ.অ.)। ৪. 'কণ্ডুয়ন' কথাটি চুলকানি অর্থে প্রচলিত। ৫. এই শব্দটির বাহ্যিক দিকটি প্রচলিত থাকলেও মানসিক দিকটি এখন অপ্রচলিত। অর্থাৎ 'মনোলোকের চুলকানি' অর্থে কথাটি আর ব্যবহৃত হয় না। অথচ মহাভারতের ২২৬ অধ্যায়ের হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ-কৃত অনুবাদে 'মনোলোকের চুলকানি' অর্থে শব্দটির প্রয়োগ রয়েছে। তাতে দেখানো হয়েছে যে, আদি অসুরেরা অত্যন্ত সৎ ছিল, কিন্তু পরে তাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়। '... ক্রমে অসুরেরা দুই হস্ত দ্বারাই মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে আরম্ভ করিল।' এই দু-হাতে মাথা চুলকানোর অর্থ 'দু-হাতে লুঠ করা'। (দ্র. 'ভ' গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪।)।

কণ বহন করে যে, তেমন মহর্ষিরা **কণ্ব**। তাদের উত্তরসূরি

কণ্ডু। এঁরা কেবল **কণ** বহন করেন না, তার এত অধিক পরিমাণ আহরণ করেন যে, কণ-ডয়ন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এই অত্যধিক আহরণের তপস্যা তৎকালীন গোষ্ঠীবোধের (ইন্দ্রের) অস্বস্তির কারণ হয়। তখন সেই কর্মীজনগণকে তার সংস্পর্শে আনা হয় যারা সেই আহৃত কণ খেয়ে শেষ করে দেয়। এঁদের পরবর্তী উত্তরসূরি মারিষা। তবে বিষ্ণুপুরাণে কাহিনী একটু ভিন্ন। দ্র. **মারিষা**। ৬. ইংরেজি **conduce, conduct?**

কণ্ব : ১. ✓কণ্ + ব (বন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কারকের রহস্যরূপ (রহস্যবিষয়ক জ্ঞান) বহন করে যে*। ৩. সুরাবীজ, বধির, কালা, প্রসিদ্ধ ঋষিবিশেষ। ক) ইনি ঋগ্বেদের বহু সুক্তের ঋষি। ইনি ঘোরের পুত্র এবং অঙ্গিরা বংশজাত। শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাণ্বশাখা ইঁহারই নামে অভিহিত। মহাভারতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কাশ্যপ কণ্বের উপাখ্যান আছে। মালিনী নদীর তীরে ইঁহার আশ্রম ছিল। দুষ্মন্তমহিষী ভরতজননী শকুন্তলা ইঁহার পালিতা কন্যা। খ) পুরুবংশীয় নৃপতিবিশেষ। (ব.শ.)। গ) ইনি একজন প্রাচীন ঋষি, পুরুবংশীয় অপ্রতিরথের পুত্র এবং মেধাতিথির পিতা। ইনি কণ্বগোত্রীয়গণের আদিপুরুষ, শুক্ল যজুর্বেদের স্মৃতিকার এবং শুক্ল যজুর্বেদীয় কাণ্বশাখা প্রণয়ন করেন। মালিনী নদীর তীরে এঁর আশ্রম ছিল। ইনি অপ্সরা মেনকার গর্ভজাত পরিত্যক্তা কন্যা শকুন্তলার পালকপিতা। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **কণাদ, কণ্ব, কপিল**, এঁরা সবাই যৌথব্যবস্থার ভিতরে এমন সক্রিয় মহর্ষি গোষ্ঠী, যাঁরা যৌথব্যবস্থার মৌলবাদিতা বা কট্টরতা পছন্দ করেন না; সৎ ও নিষ্ঠাবান গোষ্ঠী-পরিচালক রূপে সক্রিয়। ফলত, তাঁদেরকে যৌথব্যবস্থার প্রচলিত রীতিনীতির কট্টরতা থেকে বাঁচতে ও নিজ নিজ সম্প্রদায়কে বাঁচাতে খানিকটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে হয়। সেই স্বাতন্ত্র্যের সুযোগে ব্যক্তি-মালিকানার বোধ (পরে যা পণ্যজীবিতায় পরিণত হয়) তাঁদের মধ্যেই সক্রিয় হয়ে ওঠে, যদিও তা তাঁদের কাম্য ছিল বলে মনে হয় না।

আমরা জেনেছি, সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ কীভাবে চালাতে হয়, তারই নির্দেশাবলী রয়েছে যজুর্বেদে। কিন্তু ঋক, সাম ও অথর্ব এই তিন বেদ একপ্রকার হলেও **যজুর্বেদ** দুই প্রকার। **কৃষ্ণ-যজুর্বেদ** ও **শুক্ল-যজুর্বেদ**। শুক্ল-যজুর্বেদ সম্পূর্ণ রূপে যাজ্ঞবল্ক্যের রচনা। ইনি বেদজীবী সমাজের বিপরীতে পণ্যজীবী সমাজের মূলনীতির প্রতিষ্ঠাতা। এঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়, ব্যাসের রচিত বেদ ফিরিয়ে দিতে। ইনি তা বমি করে দেন। দ্র. **কঙ্ক, কলবিঙ্ক, ত্রিশিরা**। তারপর সরাসরি সূর্যের নিকট বেদ অধ্যয়ন করে নতুন বেদ লেখেন। সেই বেদের নাম শুক্ল-যজুর্বেদ। এই যজুর্বেদের উত্তরাধিকার যাঁরাই বহন করেন, তাঁরা পণ্যজীবী সমাজের সমর্থন করেন, জেনে বা না-জেনে। **কণ্ব** তাঁদেরই একজন। তবে যেহেতু ভারতসমাজের আদিতে পণ্যজীবীরা অধঃপতিত যৌথব্যবস্থার দ্বারা প্রায়শই নিপীড়িত ছিলেন, তাদের কাহিনীগুলির মধ্যে নিরীহ ভাব দেখা যায়।

কাঁড় (কাঁড়া, কাঁড়ান, কাঁড়ার, কাঁড়ারী, কাঁড়ি, কুঁড়, কুঁড়া, কুঁড়াজালি, কুঁড়ি, কুঁড়ী, কুঁড়িয়া, কুঁড়ে, কুঁড়ো, কুঁদ, কুঁদা, কুঁদো) : ৫. দ্র. **কুণ্ড**। বাংলাভাষী **অন্ততপক্ষে কণ্ডন, কাণ্ড, কুণ্ড, কর্ণধারণ, আকর্ষণ** ... এই সমস্ত শব্দকে একটিমাত্র 'কাঁড়' শব্দে বদলে নিয়ে ব্যবহার করে থাকেন। ফলে ঐ সমস্ত শব্দের সব অর্থগুলিই 'কাঁড়' শব্দের অর্থ হয়ে যায়। তীরধনুককে 'তীরকাঁড়' বলা হয়। এই 'কাঁড়' বাঁশের কাণ্ড বটে; তার একটি সামাজিক অর্থও রয়েছে। সেই সামাজিক অর্থের কারণে 'কাণ্ডার', 'কাণ্ডধারী' বা 'কাণ্ডারী' হয়ে যায় 'কাঁড়ার' বা 'কাঁড়ারী'। আবার ধানের খোসা ছাড়িয়ে চাল বের করাকে কুণ্ডন করা ('চাল কাঁড়তে বা কুঁড়তে হল বেলা') বা কাঁড়া (কোঁড়া) বলে। এভাবে ছাড়ানো খোসাগুলি কুণ্ডনের ফল রূপে নিষ্কাশিত হয় বলে তাদের 'কুণ্ডা' বা 'কুঁড়া'ও বলে। এই 'কুঁড়া' গরুমোষের প্রাত্যহিক খাদ্য। আবার, 'ভিক্ষার চাল, তার আবার কাঁড়া-আকাঁড়া' বাক্যবন্ধে চালের কুঁড়া 'কাঁড়া' হয়েছে বা সাফ করা হয়েছে, নাকি হয়নি, তাই নিয়ে আদিখ্যেতা করতে নিষেধ করা আছে। তাছাড়া, যেখানেই কুণ্ডন করা হোক না কেন, সে স্থানটিকে কুণ্ড বা কুঁড় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে সবক্ষেত্রেই, তা সে সিদ্ধি ঘোঁটার কুণ্ড বা কুঁড় হোক আর বিশাল কর্মযজ্ঞের (একালের ভাষায় কারখানার) হলদিয়া-কুণ্ডই হোক। সব কুণ্ডই দেখতে মালসার মতো, তা সে মহাসরোবরের মতো হোক আর চায়ের খুরির মতোই হোক। এইসব কুণ্ডে কুণ্ডিত করে যা বেরোয়, তা দুরকম। প্রয়োজনীয় অংশটিকে গ্রহণ করা হয়, রাখা হয় যজ্ঞকুণ্ডে, চাপানো হয় অগ্নিকুণ্ডে — এই কুণ্ড খুব বড় হলে সেকালে তা বোঝাতো গঞ্জ (সেকালের বিনিময় কেন্দ্র বা হাটবাজার থাকত যেখানে), বর্দ্ধিষ্ণু-কেন্দ্রীয় গ্রামকে, যথা — রাণীকুণ্ড, মহাকুণ্ড, গোকুণ্ড ইত্যাদি; আর খুব ছোট হলে বলা হত কুণ্ডী বা কুঁড়ি (হাঁড়ি-কুঁড়ি)। অপ্রয়োজনীয় অংশ ফেলে দেওয়া হয় কুণ্ডে বা কুঁড়ে; তা সে ছাই-পাঁশ ফেলার পাঁশকুঁড় (পাঁশকুঁড়-এর আধার = পাঁশকুড়া) হোক, আর গোময়-গোমূত্র মাখানো খড়কুটো ইত্যাদি 'ক্ষত্' (ক্ষদ, ক্ষাদ) ফেলার 'খতকুঁড়'ই হোক। কিন্তু গোয়াল থেকে এইসব 'ক্ষত্' তো আর এমনি এমনি বেরোয় না, প্রত্যহ সকালে রীতিমত গোয়াল থেকে গরু বের করে দিয়ে গোয়াল সাফ করতে হয় — 'গোয়াল কাঁড়তে' হয়। চাল কাঁড়া আর গোয়াল কাঁড়া পৃথক কাজ হলেও, তার ভিতরের মূল ক্রিয়াটি এক চরিত্রের। এই কাঁড়া একপ্রকার আঁচড়ে আকর্ষণ করা, যাতে কোনো বস্তুর ছাল ছড়ে যায়, তা ধানের ছাল হোক আর গোয়ালের উপরিতলই হোক। গোয়ালের ক্ষেত্রে খড়কুটো গোময়-গোমূত্র সব কোদাল দিয়ে টেনে এনে একত্র জমা করা হয়। চিরুনির মতো দাঁতাল কোদাল-জাতীয় কোনো কিছু আঁচড়ে টেনে একাজ করা হয়, তাই 'গোয়াল কাঁড়া' বলা হয়। কাঁড় গতিশীল হলে তাকে বলে 'কাঁড়ি'। সেই কারণে কাঁড়লে যা জমে ওঠে তার বিপুল পরিমাণকে বলা হয় 'কাঁড়ি-কাঁড়ি'। তবে কেন যে গোয়ালে থাকা মহিষকে 'কাঁড়া' বলে, তা এখনও বোধগম্য হয়নি।

তবে এই 'কাঁড়' ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দের যথার্থ ব্যবহার রয়েছে শিশুদের 'ইকড়ি-মিকড়ি' ছড়ায়। যাঁরা মনে করেন, ছন্দ মিলিয়ে এই ছড়ায় প্রচুর অর্থহীন ধ্বন্যাত্মক শব্দ রয়েছে, তাঁদের ধারণা একেবারেই ভুল। একবার ছড়াটি স্মরণ করার চেষ্টা করুন —

ইকড়ি	গতিশীলভাবে কর্মফল সংগ্রহ করি,
মিকড়ি	সীমায়িত কর্মফল সংগ্রহ করি,

চাম-	(আমাদের) চরে বেড়ানোর বা রুজি-রোজগারের এলাকায় (= চাম)
চিকড়ি,	(ঘুরে ঘুরে) কর্মফল চয়ন করে আনি।
চামের কাঁটা মজুমদার।	সেই এলাকায় (পথের) কাঁটা (হয়ে দেখা দেয়) রাজকর্মচারী (মজুমদার)।
ধেয়ে এল দামোদর	(তার ওপর) ফড়ে-পাইকার (দামোদর) ধেয়ে আসে।
দামোদরের হাঁড়ি-কুঁড়ি।	ধেয়ে আসে তাদের (হাঁ করে গিলে খাওয়ার) ভাণ্ড (হাঁড়ি) ও কুণ্ড (কুঁড়ি)।
দাওয়ায় বসে	(তার থেকে বেঁচে-বাঁচিয়ে) ঘরের দাওয়ায় (বা দরজার সামনে) বসে
চাল কাঁড়ি।	(ধান থেকে) চাল কুণ্ডন করে বের করি।
চাল কাঁড়তে হল বেলা,	(এত সব করে) চাল কুণ্ডন করতে বেলা হয়ে যায়।
ভাত খাওগে দুপুরবেলা।	(অতএব প্রথম প্রহরে আর খাওয়া নয়, একেবারে) দ্বিপ্রহরে খেয়ো।
ভাতে	(কিন্তু খাবে কী করে! ডাকাত পড়ার মতো) সেই অন্নে
পড়ল মাছি,	পড়েছে ছিঁচকে চোর (= মাছি)।
কোদাল দিয়ে চাঁছি।	থানা-পুলিশ (= কোদাল) করে তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করি (= চাঁছি)।
কোদাল হল ভোঁতা,	(কিন্তু) থানা-পুলিশে (কোদাল) কাজ করে না (= ভোঁতা)।
খা কামারের মাথা।	(অতএব) থানা-পুলিশ সৃষ্টিকারীদের (= কামারের) পাণ্ডাদের (= মাথা) খাও!

এরকম আরও অনেক ছড়া আছে, যথা — চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে (দ্র. **কদম্ব**); আঁটুল-বাঁটুল শামলা-সাঁটুল; আইকম-বাইকম তাড়া-তুড়ি; আগডুম-বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে ... ... এগুলি সবই অত্যন্ত অর্থবহ ছড়া। মনে রাখা ভাল, জ্ঞান যখন পরিশীলিত হতে হতে দুধ থেকে মাখন হয়ে ঘি-তে পৌঁছে একেবারে গন্ধে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তখনই তা তার চূড়ান্তে (জনশ্রুতির অমৃতলোকে) পৌঁছে যায়; কেবল তখনই তা দিয়ে চিরন্তন সর্বজনীন ছড়া বা গান লেখা সম্ভব হয়। ঘি পর্যন্ত জ্ঞানের মালিকানা থাকে। কিন্তু এই ছড়ানো গন্ধের বা ছড়ার আর কোনো মালিক হয় না। যথার্থ শব্দজ্ঞান ও ক্রিয়াভিত্তিক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি এককালে বাংলাভাষীর ছিল বলেই এরকম ছড়া বানানো সম্ভব হয়েছিল। এখন সেই জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলায় এরকম ছড়া বা গান আজকাল আর তৈরি হয় না, যা জনশ্রুতিতে বদলে যাওয়ার যোগ্যতা ধরে।

কুণ : ২. *কারীর নবরূপে উত্তীর্ণ রহস্যময়তা যাহাতে*। ৩. শব্দটি কোনো অভিধান বা শব্দকোষে নাই। ৪. অপ্র.। ৫. গণ থেকে যেমন গুণ শব্দে যাওয়া যায়, তেমনি কণ থেকে কুণ শব্দে যাওয়া যায়। 'গণ' যেমন গামীর রহস্যময়তা এবং 'গুণ' নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর রহস্যময়তা, তেমনি কণ হল কারীর রহস্যময়তা এবং কুণ হল কারীর নবরূপে উত্তীর্ণ রহস্যময়তা। এই কুণ হল কু-বোধ, যা অস্তিত্বের স্বভাবের মধ্যে থাকতে অসুবিধা বোধ করে; হয় তার চেয়ে নিম্নমানের কিংবা উচ্চমানের স্বভাব তার পছন্দ। (দ্র. **কু**)। অন্যত্র এই কু-কে আমরা সেকারণেই নিম্নসীমালঙ্ঘনকারী কু অথবা উচ্চসীমালঙ্ঘনকারী কু রূপে শনাক্ত করেছি। মোট কথা প্রচলিতের ভিতরে সে থাকতে অস্বস্তিবোধ করে। সেকারণে সে প্রচলিতের চোখে অতি মন্দ অথবা অতি ভাল। এভাবে ভেবে নিলে সুবিধা হয় কুণপ, কুণ্ঠ, কুণ্ড প্রভৃতি শব্দকে বুঝতে। ৬. cunning।

কুণপ (কুণপী, কুনপি, কোণপ, কোণপদন্ত, কৌণপ, কৌণপদন্ত) : ১. কুণপ + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। ২. *কুণ পান (পালন বা পোষণ) করে যে*। ৩. মৃতদেহ, শব, শববৎ জড় শরীর, পূতিগন্ধ, পচাগন্ধ, অস্ত্রভেদ, বর্শা, রোগবিশেষ। কুণপী = বিট্‌শারিকা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কারী যদি একটি জীব হয়, তবে তার প্রাণহীন অবস্থা নিশ্চিতভাবেই কারীর নবরূপে উত্তীর্ণ রহস্যময় অস্তিত্ব। যতদিন সে জীবিত ছিল, কুণ তার ভেতরে থাকলেও কুণ তার স্বাভাবিকতা পাচ্ছিল না। সেই কুণ এখন স্বভাবতই পালিত হয় তার শবে। তাই কুণপ শব্দের অর্থ হয় 'শব'। মোটকথা, কুণ শব্দটি 'কু (দ্র. **কু**) গুণসম্পন্ন রহস্যময়তা'; যাতে অস্তিত্ব নতুন অবস্থানে পৌঁছে আগের অবস্থানের চোখে মন্দ বলে প্রতীয়মান হয়। সেকারণে কুণ পূতিগন্ধ বা পচাগন্ধকেও বোঝায়। বর্শা বা রোগবিশেষেও সেই গুণ থাকতে পারে। এই কুণপ-এর আশ্রয়কে কোণপ বলে এবং 'কোণপ দন্ত যাহার' তাকে 'কোণপদন্ত' বলে। সেই কোণপদন্ত থেকে জাত সন্তাকে বলে কৌণপদন্ত।

মৃতদেহ অর্থবাচক কুণপ-এর আধার হল কুণপী। কুণপী যাদব নামে একটি জাতি আছে বিহারে। এরা জাতিতে চণ্ডাল। মানুষের শব নিয়ে এদের কারবার। কুণপী আবার বিটশারিকা বা 'গুয়ে-শালিক' পাখিকেও বলা হয়। এরা শবের পচা মাংস বা সেই মাংসে লেগে থাকা পোকা খায়। (বিষয়টি কলিম খান-এর 'পক্ষীপুরাণের মকশো' নিবন্ধে বিস্তারিত করা হয়েছে। দ্র. **কাক**।) শব্দার্থ নিষ্কাশনের নিয়ম অনুসারে এই 'কুণপের আধার'কে কোণপ বলা যায়। আর, তার থেকে ক্রমে জন্মায় কৌণপদন্ত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ভীষ্মকে **কৌণপদন্ত** নামে শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাঁর শিক্ষার কথা বারংবার উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু কেন যে ভীষ্মকে কৌণপদন্ত নামে নির্দেশ করা হয়, তা বোধগম্য হয় না। সে কি রাষ্ট্রের হাতে সমাজ থেকে আহরণ করা বা সম্পদের স্রোতধারা থেকে তুলে আনা মৃত সম্পদকেই দন্ত রূপে ব্যবহার করে বলেই তার ঐরকম নাম? এখনও সঠিক জানি না। তবে সামাজিক সত্তারূপে ভীষ্ম যে একালের যোজনা কমিশনের আদি রূপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দ্র. **কোণ, ভীষ্ম**।

কুণ্ঠ (কুণ্ঠা, কুণ্ঠিত) : ১. ✓কুণ্ঠ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কুণ (কু-রহস্যময়তা) টঙ্কারিত হতে গিয়ে (যেতে যেতে) থেমে যায় যাহাতে*। ৩. কর্মে মন্দ, অলস, অকর্মণ্য, মন্দ, বিকল, প্রতিহত, প্রতিবন্ধ, প্রতিহতগতি, ধারাহীন, অতীক্ষ্ণ, ভোঁতা, মূঢ়, দূষিতকর। কাতর, সঙ্কুচিত, মূর্খ। (ব.শ.)। ৪. 'ইতস্তত বা দ্বিধাগ্রস্ত

ভাব' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **বৈকুণ্ঠপুরী**। 'কু-এর টঙ্কারিত হতে গিয়ে থেমে যাওয়া' বা 'কু-ক্রিয়ার ঠেকে যাওয়া'কে বলে কুণ্ঠ। আর, 'কু-ক্রিয়া ঠেকে যায় যে ব্যবহারে', তাকে বলে **কুণ্ঠা**। আপনি যাঁর মুখোমুখি, তাঁকে এমন কিছু বলতে চান, যা তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর। আপনার সেই কথা আপনার মুখ দিয়ে বেরোতে গিয়ে (টঙ্কারিত হতে গিয়ে) যদি আটকে যায় বা থেমে যায়, তাহলেই সেটি **কুণ্ঠা** বা 'কুণ্ঠের আধার'। এই কারণে কুণ্ঠ শব্দটির অর্থ দ্বিধা বা লাজ-লজ্জা, এবং কুণ্ঠিত মানে দ্বিধাগ্রস্ত বা লজ্জিত। তাই 'অকুণ্ঠচিত্তে' কথাটির আমরা মানে করি 'দ্বিধাহীনভাবে'। তবে **কুণ্ঠিত** শব্দের যথার্থ প্রয়োগ বোঝাতে ব.শ. ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক প্রবন্ধ থেকে যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছেন, তা 'কুণ্ঠিত' শব্দটির আদর্শ প্রয়োগ। উদ্ধৃতিটি হল — 'যে দেশে রাজায় এবং সমাজে ভিন্ন ভাব ... সেখানে সমাজশাসনের বল কুণ্ঠিত হইয়া থাকে।' কারণ, সমাজশাসনের বল রাজনির্দেশে এগোতে গিয়ে সমাজের অস্বস্তি দেখতে পায় এবং টঙ্কারিত হতে গিয়ে থেমে যায়।

কুণ্ড (কুণ্ডা, কুণ্ডিকা, কুণ্ডিন, কুণ্ডী, কুণ্ডু) : ১. কুণ্ড > কুঁড় = ✓কুণ্ড্ + অ (ঘঞ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহা দ্বারা কুণের উড্ডয়ন সম্ভব হয়*। / যাহা দ্বারা কুল দগ্ধ হয়; স্বামী থাকিতে জারজ পুত্র। (ব.শ.)। ৩. হোমাগ্নিস্থান, বৃত্তাকার পাত্রবিশেষ, কুঁড়, ঘট, জলাধারবিশেষ, চৌবাচ্চা, দেবজলাশয়, মানভেদ, পরিমাণ-পাত্রবিশেষ, স্থালী, উখা, হাঁড়ি, কুণ্ডপরিমিত পানদ্রব্য, গর্ত্তমাত্র, খাদ। কুণ্ডা = দাহ, 'রক্ষিত্রী', দুর্গা, সধবার জারতাত কন্যা। কুণ্ডী = অমত্র, পাত্র, কমণ্ডলু, মালশা; কুণ্ডযুক্ত, কমণ্ডলুধারী, 'কুণ্ডাকারযুক্ত', স্থালী, জারজপুত্র, শিব। (ব.শ.)। ৪. কুণ্ড শব্দটি কমবেশি প্রচলিত থাকলেও কুণ্ডা, কুণ্ডী শব্দদুটি অপ্রচলিতপ্রায়; আর, কুণ্ডু শব্দটি 'তিলি জাতির উপাধি' রূপে প্রচলিত। তবে এই শব্দগুলির পরবর্তীকালের রূপ হল কুঁড়, কুঁড়া, কুঁড়ি, কুঁড়ো ইত্যাদি। এগুলি খুবই প্রচলিত। ৫. দ্র. **কাঁড়**। **কুণ** যে স্থানে রাখা হয়, যেখান থেকে তা বিতরণ করা বা অন্য কিছু করা যেতে পারে, সেই মালসা জাতীয় আধারকে কুণ্ড বলে। (দ্র. **কাঁড়**)। কুণ্ড শব্দটির প্রাপ্ত অর্থ 'দেবজলাশয়', 'স্বামী থাকিতে জারজ পুত্র', 'সধবার জারজাত কন্যা', — এসব থেকে বোঝা যায়, এই শব্দটি এমন ক্রিয়াকে বোঝায়, যা প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে থেকে তার বাইরের কোনো কিছুকে আশ্রয় দেয়, জন্ম দেয়। গ্রামবাংলায় 'গুড় খেয়ে কুণ্ডা (কুন্দা) ফেলে দেওয়া' কথাটি 'যুবতী নারীর সঙ্গে সহবাস করে তাকে অস্বীকার করা' বোঝায়। আর, সেই গুড় রাখার হাঁড়ি, যা দেখতে উঁচু গভীর বুক-বড়ো কলসির মতো, তাকে কুণ্ডা (কুন্দা) এবং ছোট ভাঁড়কে কুণ্ডী (-কুঁড়ি, হাঁড়িকুঁড়ি) বলে। কুণ্ড যখন গতিশীল তখন তাকে কুণ্ডি বলে। 'কুণ্ডি করে যে', সে হল কুণ্ডিক, তার আধার হল কুণ্ডিকা। এই কুণ্ডিকা শব্দটি দুরকম অর্থে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। এক, কুঁড়ি যা কিনা ফুলের কোরক (সংস্কৃত কুড্মল), দুই, কুঁড়িয়া বা কুঁড়ে ঘর। অনেকের ধারণা, কুটীর শব্দটিই 'কুঁড়িয়া' বা 'কুঁড়েঘর' হয়ে গেছে। আমাদের তা মনে হয় না। পণ্যের প্রাথমিক রূপের যে সকল নিন্দাজনক বর্ণনা আমাদের সেকালের সমাজে ছিল, তাতে সমাজের এলাকার বাইরে আদি কুণ্ডুদের কুণ্ডিকাই পরে কুঁড়িয়া শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে বলে মনে হয়। (তাছাড়া, বাংলার গণ্ডগ্রামে বসতির বাইরে শ্মশান-মশানের কাছে যেখানে মরসুমী তাড়ি বিক্রি হয় সেই ঘরটিকে 'পাশির কুঁড়িয়া' বলার চল আছে। পাশি হল সেই পেশাদার, যে গ্রামের চাষিদের তাল-খেজুর গাছ ভাড়া নিয়ে রস চুঁইয়ে গুড় বানিয়ে বিক্রি করে, এবং অবশ্যই তাড়িও বিক্রি করে। যারা তাড়ি খেতে সেখানে যায়, তারা সবাই জানে, তারা নিষিদ্ধ না হোক অবশ্যই নিন্দনীয় কাজ করতে যাচ্ছে। এই অপরাধবোধ গুপ্ত রয়েছে কুণ্ডে বা কুঁড়িয়ায়।) তা না থাকলে কুণ্ডা, কুণ্ডী প্রভৃতি শব্দ এমন নিন্দনীয় 'সধবার জারজাতকন্যা', 'জারজপুত্র' — এদের বোঝাবে কেন? কেনই বা কুণ্ডাশী বলতে 'যে কুণ্ডের অন্ন খায়', 'জারজান্নভোজী', 'ভগভক্ষ', 'কোটনা' প্রভৃতি নিন্দনীয় সত্তাকে বোঝাবে?

তা সে যাই হোক, 'কুণ্ড নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে' সে হল কুণ্ডু, যা কিনা কোনো কোনো বঙ্গবাসীর পদবীও বটে। মৌলবাদী পণ্যবিরোধী বেদবাদী সমাজের রোষে নষ্ট অযৌথ উৎপন্নকে সেই **কুণ্ডু** নিজে হীনতা স্বীকার করেও বাঁচায়; সেই উৎপন্নকে পণ্যস্রোতে প্রবাহিত করে দেয়। সেই অপরাধে কট্টর-বেদবাদী সমাজ **কুণ্ডু**দের মর্যাদা কেড়ে নেয়। দ্র. **কাঁড়**। ৬. ইংরেজি squander।

কুণ্ডল (কুণ্ডলা, কুণ্ডলী) : ১. ✓কুণ্ড্ + অল্ (কলচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কুণ্ড-রূপ অভীষ্ট দান করে যে*। / শোভা রক্ষা করে যে; কুণ্ড আকার যাহার। (ব.শ.)। ৩. বলয়, পাশাস্ত্র, আবেষ্টন, মণ্ডল, পেঁচ, কুণ্ডলাকারে বেষ্টন, রেখাবলয়। (ব.শ.)। ৪. গ্রাম বাংলায় চারাগাছকে ঘিরে রাখার জন্য তৈরি বলয়াকার 'আবেষ্টন'কে কুণ্ডল বলে। প্রাচীন ভাষায় এটি ছিল মহাভারতের কাহিনীর এক সত্তা দানবীর কর্ণের কানে। ৫. আম, কাঁঠাল, লিচু প্রভৃতি গাছের চারার প্রত্যেকটিকে বাঁশের তৈরি একপ্রকার গোল বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়, যাতে গরুছাগলে সেই চারাটি খেতে না পারে অথচ রোদ বৃষ্টি পেতে চারাটির অসুবিধা না হয়। একে **কুণ্ডল** বলে। এটি দেখতে অনেকটা কানের ঝুমকোর মতো। কর্ণের কবচ-কুণ্ডলও **কর্ণ**কে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রীয় পুঁজি বা **সূর্য্য** কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিল। **কবচ** তার ট্যাক্স রসিদ এবং **কুণ্ডল** তার মালফেরির ব্যবসা করার অনুমতিপত্র। মনে রাখা ভাল, আদি ফেরিওয়ালাদের যখন এই অনুমতিপত্র দেওয়া হয়েছিল, তখন সমাজে বেচাকেনা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেনি। এই **কুণ্ডল** তাই কী বস্তু, কেমন বস্তু, একালে বসে তা অনুধাবন করা বেশ কঠিন। তবে ব্রিটিশ আমলে কাবুলিওয়ালারা এইরকম **কুণ্ডল** পেয়েছিল। ইংরেজ সরকার আফগান সরকারকে অনুমতি দিয়েছিল সারা ভারতে আফগানরা যাতে ঋণের ব্যবসা করতে পারে। যে-কারণে কাবুলিওয়ালার টাকা মেরে দেওয়া বেআইনি। ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে স্বাধীন ভারত-সরকারকে, আফগানকে দেওয়া ইংরেজ সরকারের ঐ অনুমতিপত্রের দায় রক্ষা করার অঙ্গীকার করতে হয়। যে-কারণে আজও কাবুলিওয়ালারা ভারতে ঋণের ব্যবসা করতে পারে। কর্ণের **কুণ্ডল** এই কাবুলিওয়ালার কুণ্ডলের আদি রূপ, এবং একালের ভারতের কাবুলিওয়ালারা এখনও এই কুণ্ডলের সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

কুণ্ডলিনী : ১. কুণ্ডলীন্ + স্ত্রী ঈ। (ব.শ.)। ২. *যে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। (মাঝে থাকে তার ডিম বা সৃষ্টি)*। ৩. সর্পী, কুণ্ডলিনী শক্তি, ময়ূরী, গুড়ূচী, কপিকচ্ছু, পক্বান্নবিশেষ, জিলিপি (?), কুণ্ডলযুক্ত, কুণ্ডলাকার বেষ্টনযুক্ত, সর্প, কুণ্ডলবান (পাশাস্ত্র), বরুণ, কুণ্ডলাকৃতি-চন্দ্রকবান, ময়ূর, চিত্রমৃগ, বিষ্ণু, শিব। (ব.শ.)। ৪. তন্ত্রের 'কুণ্ডলিনী' শক্তি রূপে ও সাপ অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. সাপের ডিম থাকে মাঝে, আর তাকে সে ঘিরে রাখে নিজ শরীরকে কুণ্ডলাকার করে। সম্পদের ক্ষেত্রেও, বিশেষত যে পণ্যসম্পদ বাইরে পাঠানোর জন্য সৃষ্ট, তাকেও নানান আইনী **কুণ্ডল** দ্বারা যারা ঘিরে রাখেন, তাঁদের কুণ্ডলিনী বলা হয়ে থাকবে। বলে রাখা ভালো, **কুণ্ড** বা কুণ্ডিকা শব্দের একটি অর্থ হল **কমণ্ডলু**। দ্র. **কুণ্ড, কমণ্ডলু**।

কুণ্ডলিয়া : ১. কুণ্ডল + ইয়া। (ব.শ.)। ২. *নিজের সম্পদ ঘিরে রাখে যে*। / যাহা কুণ্ডল পাকাইয়া থাকে। কুণ্ডলের ন্যায় আকার যাহার। (ব.শ.)। ৩. কুণ্ডলাকার। (ব.শ.)। ৪. পদবী রূপে প্রচলিত। যথা রমেশ কুণ্ডলিয়া। ৫. মনে হয়, সেকালে যাঁরা সরকারি আইনের জোরে বা অন্য কোনো ভাবে ব্যক্তিপুঁজির বা ব্যক্তিগত পণ্যের সংরক্ষণ করতেন, তাঁদের কুণ্ডলিয়া বলা হত। দ্র. **কুণ্ডু**।

কুণ্ডাশী : ১. কুণ্ড + ✓অশ্ + ইন্ (ণিনি) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. যে কুণ্ডের অন্ন খায়। (ব.শ.)। ৩. জারজান্নভোজী, ভগভক্ষ, কোট্না। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ভগ কথাটির একটি অর্থ হল উৎপাদনের উপায়; জৈবক্ষেত্রে তা স্ত্রীলোকের জননাঙ্গ হতে পারে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে হতে পারে তাঁত কিংবা অন্যান্য 'means of production'। সেই তাঁতে নিজে বা লোক লাগিয়ে কাপড় বুনে যাঁরা বিক্রি করতেন, তাঁরা তো ভগভক্ষই হলেন। (পরে পরে এই ভগভক্ষই তো বেশ্যাপতি কোট্না বা কুটনা।) বৈদিক যুগের সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে এ তো জারজান্নভোজীও বটে। পণ্যজীবিতার প্রতি ভারতসমাজের কতখানি বিরাগ ছিল, এই সব শব্দগুলি তার স্পষ্ট সাক্ষী।

কুণ্ডিন (কুণ্ডীন, কুণ্ডিননগরী) : ১. কুণ্ড + ইন্। (ব.শ.)। ২. *কুণ্ড আছে যার*। ৩. মুনিবিশেষ। কুণ্ডিনের অপত্যগণ। বিদর্ভরাজধানী। বিদর্ভনগর। কুণ্ডযুক্ত, কমণ্ডলুধারী ...। ৪. অপ্র.। ৫. এই শব্দগুলি সবই পণ্যজীবিতার কারণে নিন্দিত। একই কারণে যে দেশে **দর্ভ** নাশ করে দেওয়া হয়েছিল, সেই **বিদর্ভে**র রাজধানী কুণ্ডিননগর। সবই নিন্দিত দেশ। বিস্তারিত ব্যাখার জন্য (গ) গ্রন্থের 'বিদর্ভের কথা : মহাভারতের অমৃতকথার কণিকা মাত্র' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। দ্র. **নল, বিদর্ভ**।

কুণ্ডু : ২. *কুণ্ডের বিকাশপূর্বক রূপান্তর ঘটায় যে*। ৩. কুণ্ড, পাত্রবিশেষ, তিলি জাতির উপাধি বিশেষ। (ব.শ.)। ৪. পদবী রূপে প্রচলিত। ৫. গ্রামবাংলায় তিলি বা তেলি সম্প্রদায়ের মানুষেরা ভূষিমাল দোকান (grocery shop), ঘানিতে তেল মাড়াই, এই ধরনের পেশায় থাকেন। এখন এঁদের দোকান দেখে বোঝা যায় না, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও তার রূপ কেমন ছিল। একটি অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘর, **টিমটিম** করে একটা কেরোসিন লণ্ঠন জ্বলছে। দোকানের মালপত্র দেখাই যায় না, বললে বের করে দেয়। যেন সে দোকানদারি করছে না, একটা বাধ্যতামূলক আচার পালন করছে। একটি সমাজ একটি পেশাকে নিন্দিত করে দিলেও, প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখে সেই সম্প্রদায়ের মানুষ কত নিন্দা ও অত্যাচার সয়ে কীভাবে বেঁচে ছিলেন, আজ তা ভাবাই যায় না।

কোণ : ১. ✓কুণ্ (শব্দ) + অ (ঘঞ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহা দ্বারা কুণ আড়াল বা অবলম্বন পায়*। ৩. বীণা বাজানোর ধনুরাকৃতি কাষ্ঠ বা ছড়ি, ভেরী প্রভৃতির বাদনদণ্ড, লাঠি, মঙ্গলগ্রহ, শনিগ্রহ, বিভিন্নমুখ রেখাদ্বয়ের সম্পাতে জাত তদন্তর্গত স্থান (angle), অশ্রি, দিগন্তরাল, গৃহাদির একদেশ, অস্ত্রের অগ্রভাগ, অন্তঃপুর, অন্দর, অন্তরাল, আড়াল। ৪. angle অর্থে প্রচলিত। ৫. উল্লিখিত 'কুণ্' ক্রিয়া যার অর্থ ব.শ. বলেছেন 'শব্দ', তার থেকে কেমন করে angle-অর্থবাচক **কোণ** শব্দটি প্রসূত হয়, তা সহজে বোঝা যায় না। এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ থেকে বোঝা যায়, কোণের ভিতরে কুণ লুকিয়ে থাকতে পারে। এবং **কুণ** থাকতে পারে বলেই স্থানটি 'কোণ' পদবাচ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, কুণ বা কু-বোধ কোণের ভিতরে অবলম্বন পায় কীভাবে?

আমাদের রান্নাঘরের অধিকাংশ পাত্রই গোল। গোল পাত্রে আধেয় রূপে যাই রাখা যাক, তাকে গোলা যায়, মিশ্রিত করা যায়; রান্নার সময় পাত্রের বস্তুর সার্বিক মিশ্রণ অনায়াস হয়। কিন্তু আয়তাকার বা বর্গাকার পাত্রে তা করা আয়াসসাধ্য। প্রাচীন যুগ থেকে হাঁড়ি-কড়াইয়ের এই বিদ্যা আজও প্রবহমান। কদাচিৎ বর্গাকার চায়ের কাপ দেখতে পাওয়া যায়। তাতে তরল-চা সমান ভাবে ঘোরে না, নাড়িয়ে ঠাণ্ডা করা যায় না, নাড়াতে গেলে উপচে পড়ে, কোণে কোণে ময়লা জমবার সুযোগ হয়। কাণ্ডজ্ঞানের অভাব থেকেই এধরনের নতুন 'ডিজাইন'-এর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। অচিরে এ ধরনের অস্বাভাবিক 'ডিজাইন' লুপ্ত হবে সন্দেহ নেই।

একালে মাছের ডিম ফোটানোর জন্য এক ধরনের গোলাকার পুকুর তৈরি করা হয়, যার একদিক থেকে মোটা নলের সাহায্যে সেই পুকুরে জল ঢোকানো হয় ঠিক ৪৫ ডিগ্রি কোণে। ফল হয় এই যে, গোটা পুকুরের জল গোলাকার গতিতে ঘুরতে থাকে। এই জলে কোনো **কোণা** নেই, থাকে না। অস্তিত্বের পুনর্জননের পক্ষে এইরূপ **কোণ**হীন অবয়বই সবচেয়ে শুভ। অস্তিত্বকে নীচের দিকে বা উপর দিকে লঙ্ঘন করতে পারে, এমন **কুণ** এরকম ত্রিমাত্রিক গোল অবয়বে লুকিয়ে থাকার আড়াল পায় না। কোণহীন পাত্রে বিরাজিত অস্তিত্বের কণাদের স্বভাব তাই একরকমের বা সমসত্ত্ব (uniform)। 'কুণ' সত্তা কণার স্বভাব-পরিধির উপরে বা নীচে থাকে, এইরকম গোল আধারে সে টিকতে পারে না। তার মানে, গোল অবয়বে কুণ থাকতে পারে না, তাই তাতে কোনো **কোণ** নেই।

তবে এ হল বাহ্যিক **কোণ**। মানসিক **কোণ** আরও গুরুত্বপূর্ণ। জনসমাজে মানসিক কোণ না থাকলে কোণপদস্থ থাকত কোথায়? বিশেষ ধারণা, রীতি, প্রথা, নীতি, ধর্ম, মতবাদ, আইন — এসবের ধারকেরা যদি তাঁদের ধারণায় স্থির কট্টর মৌলবাদী হয়ে সমাজের

কোণায় কোণায় আশ্রয় না নেন, তাহলে তাঁরা সমাজে টিকতেই পারেন না। **কোণ** থেকে শক্তি সঞ্চয় করেই তো তাঁরা অনেক সময় সমাজশাসকের ভূমিকায় উঠে আসেন। তার মানে জনসমাজের মানসিক কোণে প্রচলিতের নিম্নসীমালঙ্ঘনকারী যেমন আশ্রয় পায়, তেমনি প্রচলিতের **উর্ধ্বসীমালঙ্ঘনকারী**ও আশ্রয় পায়। দ্র. **কুণপ**। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলে রাখা যেতে পারে। যাঁরা angle-বাচক 'কোণা' শব্দের বানান 'কোনা' লেখেন, তার ত্রুটি কোথায়, আশা করা যায়, এবার তাঁরা তা বুঝে নিতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই জানা দরকার, **কোন** কিংবা **কোনো** শব্দের অর্থ কী? 'কোণ'-এর ধারণা ইংরেজেরও রয়েছে একটু অন্যভাবে। তাঁদের 'square peg in a round hole' অথবা 'round peg in a square hole' বাক্যবন্ধটি তারই প্রমাণ। **৬.** গ্রীক gonia, ইংরেজি cone, conic, এবং -gon প্রত্যয়যুক্ত শব্দ, যথা trigon, hexagon ইত্যাদি।

'কথ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকথন, অকত্থন, অকথিত, অকথ্য, অকথ্য-কথন, অতিকথা, অবিকত্থ, অবিকত্থন, আকথা, আকত্থন, উপকথা, ক (কথি), কত্থ্, কত্থন, কথ্, কথ, কথক, কথঞ্চন, কথঞ্চিৎ, কথঞ্চিত, কথক, কথন, কথম্প্রভাব, কথা, কথাক্রম, কথাচ্ছল, কথানক, কথানুকথন, কথান্তর, কথাপুরুষ, কথাপ্রবন্ধ, কথাবার্ত্তা, কথামাত্র, কথামুখ, কথারম্ভ, কথালাপ, কথাশেষ, কথাসরিৎসাগর, কথিত, কথিতপদতা, কথীকৃত, কথোপকথন, কথোপকথা, কথ্য, কদ্ (কটবেল, কৎবেল, কদবেল), কদক্ষর, কদগ্নি, কদত্তন, কদন, কদন্ন, কদম, কদমা, কদম্ব, কদম্বা, কদম্বানিল, কদর্থ, কদর্থন, কদর্থীকৃত, কদর, কদল, কদলক, কদলি, কদা, কদাকার, কদু, কদুক্তি, কদুত্তর, কদুষ্ণ, কদ্রু, কদ্রূ, কব, কবক, কবহি, কবহু, কবহুঁ, কবামাত্র, কবালী (কাওয়ালী), কবুল (কওয়ল), কবুলিয়ত, কবুতর (কওয়া তারণ), কয়, কয়া, কয়াধু, কয়াধূ, কয়াল, কহ, কহত, কহতব্য, কহন, কহর, কহা, কহিঁ, কহি, কহিনী, কহিয়ে, কহিল, কহু, কাদম্ব, কাদম্বর, কাদম্বিনী (মেঘমালা), কাদ্রবেয়, কাহিনী, কুঁড় (মাথা কুঁড়া), কুথুমী, কুলপৈত, কোঁড়, কোড়, কোড়া, কোনাঘাত, কোণার্ক, কোনা, কোনারক, কোনার্ক, কোণি, কৌথুমী।
কথ্ = কারীর থাকন। **কথ** = কারী থাকে যাহাতে।

উপকথা : ১. উপ + কথা। ২. *যাহাতে মূল কথার উপরি (সংশ্লিষ্ট) কথা থাকে।* / কথার অন্তর্গত যে কথা। (ব.শ.)। ৩. সংক্ষিপ্ত কথা, কল্পিত আখ্যান, উপন্যাস, গল্প। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিতপ্রায়। ৫. দ্র. **কথোপকথন**।

কথক : ১. ✓কথ্ + অক (ণ্বুল্) - ক। (ব.শ.)। ২. *কারীর থাকন প্রকাশ করে যে, অথবা কথা (উপস্থাপিত) করে যে, কিংবা কথা বলে যে।* ৩. বাচক, বক্তা, ব্যাখ্যাতা, বর্ণয়িতা। নাটকবর্ণনকর্তা, প্রস্তাবনাপাঠক, একনট, তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদরূপ কথার বক্তা, পুরাণকথার বক্তা অর্থাৎ যিনি ব্যাসাসনে বসিয়া পুরাণের কথা বলেন, কথোপজীবী, কথক ঠাকুর। (ব.শ.)। ৪. বক্তা অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. কথা হল সেই বস্তু যার ভেতরে কারী থাকে, করণের যাবতীয় ঘটনার বর্ণনা থাকে। সেভাবে বললে, করণ থাকে যাহাতে তাকেই কথা বলে; আর সেই কথা যিনি বলেন, তাকে কথক বলে। তার মানে উক্ত (spoken) মাত্রেই কথা নয়। যে ভাষণের ভিতরে মানুষের ক্রিয়াকর্মের খবর নেই, তাকে আর যাই বলা যাক, 'কথা' বলা যায় না; বড়জোর 'বাজে কথা' বলা যেতে পারে। আমাদের সমাজে বিশেষ যুগে একটি বিশেষ ধরনের কথা যাঁরা বলতেন তাঁদেরকেই কথক নামে নির্দেশ করা হত। এঁরা '**ব্যাস**'-এর আসনে বসে মানুষের বর্তমান কোথা থেকে কী কী করে করে কীভাবে এখানে এসে পৌঁছেছে, সেইসব পুরাণকথা বলতেন। একালে আধুনিক সাহিত্যিকরা অনেক সময় গল্পকারকে কথাকার বলে থাকেন। সেটি প্রাচীন অর্থ থেকে যথেষ্ট বিচ্যুত। কেননা, প্রাচীন কথকগণ গল্প বানাতেন না, সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর বিবরণ দিতেন, **ইতিহাস** বলতেন। তাতে 'বাজে কথা'র অবকাশ ছিল না। দ্র. **ব্যাস**।

কথা : ১. ✓কথ্ + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *করণের আধার বা কারী থাকে যাহাতে।* ৩. উক্তি, বচন, উচ্চারণ, সম্ভাষা, সংবাদ, কথোপকথন, বক্তব্য বস্তু, বিষয়, বার্ত্তা, বাক্য, ... (ব.শ.)। ৪. যথার্থে (এবং কদাচিত অযথার্থে) বহুল প্রচলিত। ৫. **থা**-এর অর্থ 'থাকে যাহাতে', আর **ক**-এর করণের আধার বা কারী। এই আধার উচ্চারণ-সহায়ক আগমমাত্র থেকে জগৎসৃষ্টিকারী পর্যন্ত যে-কোনো কারীই হতে পারে।

বঙ্গীয় শব্দকোষ **কথা** শব্দের প্রায় পঞ্চাশটি অর্থ দিয়েছেন, যার কিছু নিদর্শন রয়েছে উপরোক্ত ৩.-এ প্রদত্ত শব্দগুলিতে। কেবল তাই নয়, কথা আটকান, কথা আদায় করা, কথা উঠা, কথা কাটা, কথা গাঁথা, কথা দেওয়া, কথা নড়া, কথা পাড়া, কথা ফাঁশ করা, কথা ভাঙা, কথা শোনানো ... ইত্যাকার আরও প্রায় পঞ্চাশ রকম প্রয়োগ দেখিয়েছেন ব.শ.। প্রশ্ন উঠতে পারে, 'কথা' শব্দটি নিয়ে এত খেলা বাংলাভাষী খেলতে পারল কী করে? এর কারণ লুকিয়ে রয়েছে 'করা' শব্দের ভিতরে। করা থেকে ভব ও ভাব দুটো জিনিস জন্মায়। ভব গিয়ে হাজির হয় মানুষের লক্ষ-কোটি উপকরণে, আর ভাব গিয়ে জমা হয় মানুষের সমস্ত **কথা**য়। বলতে কি, মানুষের জীবন ঘিরে রয়েছে তার **করণ** আর **কথা**; তার হাতের ভাষণ ও মুখের ভাষণ। হাতের ভাষণ প্রকটিত হয় তার কৃতবস্তুতে, মুখের ভাষণ প্রকটিত হয় তার কৃতবস্তু সম্পর্কিত **কথা**য়, উপ**কথা**য়, **কথা**বার্তায়, **কথো**পক**থ**নে। স্বভাবতই মানুষের পার্থিব সম্পদের পরিমাণের সঙ্গে তার মানসিক সম্পদের পরিমাণের সমান্তরাল সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্বাস না হলে, যে কোনো অভিধান বা শব্দকোষই দেখুন না কেন; দেখবেন, 'কর্' ও 'কথ্' এর জন্যই সবচেয়ে বেশি পৃষ্ঠা খরচ হয়ে গেছে।

কথোপকথন : ৫. কথন ও উপকথন থাকে যে উচ্চারণে, তাকে কথোপকথন বলা হয়। **কথন** হল করণ-সংক্রান্ত বর্ণনা এবং **উপকথন** হল তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপরি কথন বা বাড়তি কথন।

রামকথা হয়, রামচরিতকথা হয়; কিন্তু রাম-উপকথা হয় না। অন্যদিকে সাবিত্রীর উপাখ্যান বা উপকথা হয়, সাবিত্রীর কথা হয় না; অন্তত সেরকম প্রচলন নেই। দ্র. **উপকথা**।

কদম্ব (কদমগাছ) : ১. ✓কদি + অম্ব (অম্বচ্) - ক। (ব.শ.)। ২. *কদ অম্ বহন করে যে।* / যাহা বিরহীকে দুঃখিত করে। (ব.শ.)। ৩. কদম গাছ, সর্ষপ, কদম্বপুষ্প, সমূহ, বৃন্দ, নিচয়। ৪. কদম গাছ অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কাদম্বিনী**। **কু**-এর সঙ্গে অ যোগ করলে কদ হয়, যেমন কু অন্ন = কদন্ন। **কদ** তাই দ্রষ্টার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তা অতি খারাপ বা অতি ভাল; দ্রষ্টার গ্রহণযোগ্যতার বৃত্তের বাইরে। কদ অম্ বহন করে যে, তেমন **কদম্ব** তাই দ্রষ্টার পক্ষে অতি ভাল কিংবা অতি মন্দ। বাহ্যিক কদমগাছ হল সেই বৃক্ষ, যাতে কদমফুল ফোটে, যে-ফুল বাহ্য-প্রয়োজন মেটায় না, ভোগে লাগে না। সামাজিক **কদমগাছ** হল সেইরকম যৌথ-পারিবারব্যবস্থা যা ভোগের জন্য উৎপাদন করে না, শুধুমাত্র পণ্যরূপে রপ্তানির জন্য বিশেষ ধরনের পণ্য উৎপাদন করে। সেরকম পণ্যধারা প্রবাহিত থাকলে এই কদমগাছ খুবই সফল, কিন্তু সেরকম ধারা না থাকলে এই গাছ ও তার ফুল মোহগ্রস্ত করে মাত্র। মনে রাখা ভাল, কদমগাছের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের অনুষঙ্গ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। দ্র. **কাদম্বিনী**।

কাদম্ব (কাদম্বা) : ১. কদম্ব + অ (অণ্)। (ব.শ.)। ২. *কদম্ব হইতে জাত।* / যাহারা সমূহে (দলে) থাকে। (ব.শ.)। ৩. কলহংস, বালিহাঁস, কদম্ববিকার, কদম্ববৃক্ষ, বাণ, ইক্ষু, কদম্বকুসুম। **কাদম্বা** = কলহংসী, কদম্বপুষ্পীবৃক্ষ, দুর্গা (?)। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **কাদম্বিনী**।

কাদম্বর (কাদম্বরী) : ১. কাদম্ব + ✓রা (গ্রহণ) + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কাদম্ব রহে যাহাতে।* / যাহা কাদম্ব (কদম্বরসবৎ রস) গ্রহণ করে। (ব.শ.)। ৩. দধিসর, দইয়ের সর, দধ্যগ্র, কদম্বকুসুম-জাত মদ্য, কাদম্বরী, দধিসার, ইক্ষুজাত গুড়াদি, শীধু, মদ্য। কাদম্বরী = মদ্য, সুরা, কোকিলা, শারিকা, সরস্বতী, মদবারি, বাণভট্ট রচিত আখ্যায়িকাবিশেষ, কাদম্বরীকথার নায়িকা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **কাদম্বিনী**।

কাদম্বিনী : ১. কাদম্ব + ইন্ - স্ত্রী। (ব.শ.)। ২. কাদম্ব যাহার অনুগামীরূপে, অথবা কদম্বকুসুম বিকাশ যাহার কার্য্য রূপে আছে। (ব.শ.)। ৩. মেঘমালা, মেঘপঙ্ক্তি, নব মেঘ। (ব.শ.)। ৪. কেবলমাত্র নামরূপে প্রচলিত। ৫. ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির মূল নিয়মটি স্মরণ করুন — 'নেই জনন যাহাতে' সেই হল 'অজ'। এই **অজ** শব্দ অতএব তাদের প্রত্যেককেই শনাক্ত করতে পারে, যাদের ভেতরে 'জনন' নেই। ঠিক সেইভাবে 'কদ অম বহন করে যে', সে হল 'কদম্ব'। এই **কদম্ব** শব্দ অতএব তাদের প্রত্যেককেই শনাক্ত করতে পারে, যারা প্রত্যেকেই অম বহন করে। সেই **কদম্ব** থেকে **কাদম্ব, কাদম্বর, কাদম্বরী, কাদম্বিনী** প্রভৃতি শব্দ প্রসূত হয়। এখন প্রশ্ন হল কদ অম বহন করে কে?

বহু শব্দের ক্ষেত্রেই ঠিক এখানেই সমস্যায় পড়েছিলেন আমাদের প্রাচীন শব্দশাস্ত্রীরা। তাঁদের শব্দানুসন্ধানের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তা'কে চিহ্নিত করা এবং সাধারণকে তা বুঝিয়ে দেওয়া। নিজেরা তো চিনে ফেলেছেন সত্তাটিকে, কিন্তু সাধারণকে চেনাবেন কেমন করে? তার জন্য বাহ্যিক বস্তুর উদাহরণ দেওয়া ছাড়া পথ ছিল না তাঁদের। (দ্র. **নারায়ণ**।) বাস্তবে পণ্যউৎপাদনকারী সামাজিক ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপকে 'কদ অম বহনকারী' রূপে তাঁরা তো চিনে ফেলেছেন, কিন্তু জনসাধারণকে বোঝাবেন কীভাবে? ফলে তাঁরা বাস্তব কদম্বের সন্ধান করেছেন এবং যেখানে সম্ভব সেখানেই সম্ভাব্য কদম্বগুণসম্পন্ন বাহ্যবস্তুকে **কদম্ব** বলে চিহ্নিত করেছেন। সেই কারণে তাঁদের **কদম্ব** নামে চিহ্নিত বস্তুসমূহের মধ্যে তেমন সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁরা জানিয়েছেন —

কদম্ব = কদমফুল, সর্ষে;
কাদম্ব = কদমফুল, কদমবিকার, ইক্ষু (আখ);
কাদম্বর = কদমফুলের মদ, আখের মদ, দধিসার;
কাদম্বিনী = কদমফুল-বিকাশিকা, মেঘমালা।

এতগুলিকে একসঙ্গে না ধরে আমরা বরং যে-কোনো একটি ধরে এগোব। প্রথমে ধরা যাক, যে কদ অম বহন করে, সেই কদরসের মূল হল আখ। এই কদম্ব থেকে জাত যে, সে হল কাদম্ব, ধরা যাক আখগুড়। কাদম্ব রহে যাহাতে সে হল কাদম্বর বা কাদম্বরী, ধরা যাক আখগুড়ের মদ। এই কাদম্বকে সক্রিয়ভাবে ধারণ করে যে, সে হল কাদম্বিনী, ধরা যাক মদ চুঁইয়ে বেচে যে নারী।

আমরা দেখছি, কাদম্বিনী বা **মেঘমালা** শব্দের অনুষঙ্গে রয়েছে দধিসার বা দধিকূর্চিকা অর্থাৎ **আমিক্ষা** বা **ছানা**। এই ছানা থেকে পাওয়া রসগোল্লা, যা বাংলাভাষীর বিশেষ অর্জন। এর তিনরকম পর্যায়ক্রম — এক) দুধ-ছানা-রসগোল্লা, পড়ে থাকে বিস্বাদ ছানার জল। দুই) দুধ-দধিসর-মাখন, পড়ে থাকে ঘোল এবং দধিসার। তিন) দুধ-দই। এই তিন পর্যায়ের প্রত্যেকটি পর্যায়েই কদ-অম নানাভাবে রয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত তথ্যে (৩) আমরা দেখছি, কেবলমাত্র কাদম্বরকে দই বা দধিসার বলা হচ্ছে। আবার আখ-এর বেলায় কেবল মাত্র দুটি পর্যায়ে আখের উল্লেখ পাওয়া যায়, বাকি দুটির ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না।

আখ চিবিয়ে খেলে নেশা হয় না, কিন্তু তার থেকে গুড় বানিয়ে অধিক পরিমাণে খেলে একরকম নেশাভাব আসে। আর, সেই গুড় থেকে মদ (শীধু) চুঁইয়ে খেলে সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্ত হওয়া যায়। তো, আখের মতো, গুড়ের মতো, শীধু-মদের মতো বেশ কিছু বাহ্যবস্তু ও মানসবিষয় রয়েছে। এই বাহ্যিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রে যা যা থেকে এইরকম শারীরিক মদ ও মানসিক মদ তৈরি করা যায়, তাদের আদিরূপকে **কদম্ব**, মধ্যরূপকে **কাদম্ব**, এবং অন্তরূপকে **কাদম্বর (কাদম্বরী)** বলে। সেই কারণে শব্দটির অর্থে দই থেকে মদ, কলহংস বা সরস্বতী থেকে কাব্যকথা পর্যন্ত এসে যায়। বলে রাখা ভাল, বঙ্কিমচন্দ্রের সময়েও বাংলাভাষীরা জানতেন তত্ত্বতথ্যের দুধ বাসি হয়ে টক না হলে জ্ঞানের দই হয় না, এবং সেকারণেই বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তকে দিয়ে দইয়ের গপ্পো বলতে পেরেছেন। এ বিষয়ে কলিম খান-এর 'রসকথার কথকতা ...' নিবন্ধটিতে আরও তথ্য পাওয়া যাবে। নিবন্ধটি এখনও সংকলিত হয়নি, তবে *মীজানুর*

রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার ৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

ব.শ. জানিয়েছেন কদ শব্দটি কু > কৎ > কদ — এভাবে প্রসূত হয়েছে। এই কদ শব্দটি সাধারণত মন্দ, কুৎসিত অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা কদক্ষর, কদন্ন, কদ্‌বেল বা কতবেল ইত্যাদি। যদিও আমরা দেখছি কদি-অম্ব বা কদম্ব অর্থাৎ কদম প্রধানত কদমগাছ ও তার ফুলকে বোঝায়। **কাদম্ব, কাদম্বর, কাদম্বরী, কাদম্বিনী** শব্দ থেকে আমরা জানতে পারি, কদম্ব শব্দটি বাহ্যিক ও মানসিক উভয় প্রকার মদের মূলে যে মিষ্টরস রয়েছে, তাকে বোঝায়। আবার শ্রীফল বা বিল্ব হল সর্বপ্রকার ফলের মধ্যে সবচেয়ে অধিক প্রোটিনযুক্ত ফল, যার সঙ্গে রয়েছে শিবের (উদ্ভাবকের) গভীর সম্পর্ক। অন্য দিকে কদবেল গাছের সঙ্গে রয়েছে **কপি** বা বানরের সম্পর্ক, যে কারণে একে কপিত্থ বৃক্ষও বলে। তাছাড়া **কদমা**র কথা সবাই কমবেশি জানেনও। অন্যদিকে আমরা জানি, পুষ্প কথাটি 'পণ্য' শব্দের সঙ্গে জড়িত। আর ব.শ. বলছেন, 'কদম গাছ বিরহীকে দুঃখিত করে'। সে তো করবেই। যেহেতু কু-শব্দ থেকে **কদ** শব্দটি প্রসূত হয়েছে, আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি যে, এই কদ-অম অতি ভাল এবং অতি মন্দ দুরকম অর্থেই প্রযুক্ত হতে পারে। কিন্তু সেটি হয় কীভাবে?

'চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে কদমতলায় কে!' — ছড়াটি প্রবাদের মতো প্রচলিত। তথ্যানুসারে **কদম** গাছ তিন প্রকার — নীপকদম্ব, মহাকদম্ব, ধারাকদম্ব (গিরিকদম্ব, কেলিকদম্ব)। আরও তথ্য এই যে, 'কদম্বগোলকের সর্ব্বাবয়বে যুগপদ্ কুসুমোদগম হয়। এইরূপ সর্ব্বপ্রদেশে কোনো বিষয়ের সমকালে প্রসারে কদম্বগোলকন্যায়, কদম্বকোরকন্যায়, কদম্বমুকুলন্যায় এই তিন ন্যায়ের প্রবৃত্তি।' তাছাড়া কদমগাছের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। আর, কদম ফুল নিয়ে আমাদের আকুলতা এবং গানে তার স্থান ইত্যাদি থেকে বোঝা যায়, তা বাংলাভাষীর প্রিয়ও বটে।

বাংলাভাষার স্বর্ণযুগে বা মধ্যযুগে এগুলি খুবই সহজবোধ্য ছিল, যখন কদমগাছে চড়ে বা তার তলায় শ্রীকৃষ্ণ লীলা করতেন এবং সেসব কথা জনসাধারণ বুঝতেও পারতেন। অন্যথায় শ্রীকৃষ্ণলীলা জনপ্রিয় হতেই পারত না। আমরা জানি, ছড়ার ভিতরে থাকে জ্ঞানের সর্বোচ্চ রূপ (দ্র. **কাঁড়**)। সেই কথা মনে রেখে আমরা যদি সর্বাগ্রে 'চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, কদমতলায় কে? / হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে, রামছাগলের বে।' ছড়াটির অর্থ বুঝে নিই, তাহলে কদম্ব-সংক্রান্ত বাকি কথাগুলির মানে বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

চাঁদ উঠেছে,	সমাজের শীর্ষে পণ্যজীবীদের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উঠে পড়েছে
ফুল ফুটেছে,	পণ্য উৎপাদিত হয়ে ছেয়ে ফেলেছে গোটা সমাজকে,
কদমতলায় কে?	এখন এই পণ্যউৎপাদক-ব্যবস্থার (= কদমগাছের) তলায় সক্রিয় রয়েছে কারা?
হাতি নাচছে,	(কদমতলায় এখন) বুরোক্র্যাটরা (= হাতি) নাচছে,
ঘোড়া নাচছে,	প্রোডাকসন-ম্যানেজার-স্পেশালিস্টরা (= ঘোড়া) নাচছে,
রামছাগলের	এবং একই কর্মের পুনরাবৃত্তিকারী মহাদক্ষের
বে।	নতুন নতুন কন্ট্রাক্ট বা চুক্তি (= বিবাহ = বে) হচ্ছে।

বাহ্যিক ও মানসিক উৎপন্নসম্ভার (ঘটিবাটি-কথাগান) যখন সমাজের প্রতিটি মানুষের হাতে পণ্য রূপে ফুটে উঠছে, তখন মানতে হয়, একদিকে ঐরকম উৎপন্ন সমাজের চোখে 'কদ অম্ব' অর্থাৎ নিন্দনীয়, কিন্তু সেই উৎপন্ন পাওয়ার বিরহে যারা বিরহী (ক্রেতা বা ভোক্তা পদবাচ্য), তারা ওই উৎপন্ন সম্ভার দ্যাখে, কিন্তু পায় না, তাই দুঃখও পায়। এরকম 'টকমিষ্টি' ব্যাপার আরও আছে — যার নিন্দে করি, তাকেই চাই, তারেই ভালবাসি। 'নিন্দের ছলে কৃষ্ণভজনা' আজকের ব্যাপার নয়। দ্র. **টক, টকমিষ্টি**।

কদর : দ্র. **আদর, দর**।

কদ্রু (কদ্রূ) : ১. √কদ্ + রু - ক। (ব.শ.)। ২. *কদ রক্ষণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; তাহার আধার।* ৩. নাগমাতা, ইনি দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের পত্নী। সহস্রনাগ ইঁহার পুত্র। ইনি সপত্নী বিনতাকে দাসীরূপে আবদ্ধ করিলে গরুড় স্বর্গ হইতে সুধা আনিয়া জননীকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করেন। তদবধি গরুড় নাগগণের মহাশত্রু। (ব.শ.) ... কশ্যপ তাঁদের (তাঁর পত্নীদের) বর দিতে চাইলে কদ্রু বলশালী সহস্র নাগ এবং বিনতা কদ্রুপুত্র অপেক্ষা বলশালী ও তেজস্বী দুই পুত্র প্রার্থনা করলেন। যথাকালে কদ্রু সহস্র ডিম্ব এবং বিনতা দুইটি ডিম্ব প্রসব করলেন। কদ্রুর প্রত্যেক ডিম্ব হতে নাগপুত্ররা নির্গত হল; কিন্তু বিনতার ডিম্ব থেকে কিছু না হওয়ায় তিনি একটি ডিম্ব অসময়ে ভেঙে দেখলেন যে, দেহের ঊর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণ ও নিম্নভাগ অসম্পূর্ণ এক সন্তান রয়েছে। সেই সন্তান অসম্পূর্ণ অঙ্গের জন্য বিনতাকে দায়ী করে বললেন যে, এজন্য তোমাকে পাঁচশত বৎসর কদ্রুর দাসী হয়ে থাকতে হবে। অন্য ডিম্বটি অসময়ে না ভাঙলে তার থেকে নির্গত সন্তান তোমার দাসীত্ব মোচন করবে — এই বলে সেই সন্তান আকাশে উঠে অরুণ রূপে সূর্যের সারথী হল। একদিন উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণ নিয়ে কদ্রু ও বিনতার মধ্যে তর্ক হয়। বিনতা বললেন, অশ্বের পুচ্ছ শ্বেত; কদ্রু বললেন, অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণ। স্থির হল, পরদিন তাঁরা অশ্বটিকে ভালো করে দেখবেন এবং যার কথা মিথ্যা হবে, তিনি সপত্নীর দাসী হবেন। কদ্রু তাঁর সর্প পুত্রদের ডেকে উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছলগ্ন হতে বললেন, যাতে অশ্বের পুচ্ছলোম কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। যে-সকল সর্প মাতার কথায় অসম্মত হয়েছিল, কদ্রু তাদের জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হবার অভিশাপ দেন। পরদিন দূর হতে উভয়ে অশ্ব দেখতে গেলেন। অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ দেখে বিনতা কদ্রুর দাসীত্ব গ্রহণ করলেন। এই সময়ে বিনতার দ্বিতীয় ডিম্ব হতে গরুড়ের জন্ম হল। কদ্রুর আদেশে গরুড় সর্পদের পিঠে বহন করতে বাধ্য হলে একদিন মাতাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারেন যে, কপট উপায়ে বিনতা দাসী হতে বাধ্য হয়েছেন। তখন গরুড় সর্পদের কাছে মাতার মুক্তির উপায় জানতে চাইলে তারা বলল যে, যদি নিজের শক্তিবলে সে অমৃত আনতে পারে, তবে তার মা মুক্তি পাবে। গরুড় অমৃত আনয়নের জন্য যাত্রা করলেন। মাতার পরামর্শ অনুযায়ী পথের ভক্ষ্য হিসাবে সমুদ্রপ্রান্তের নিষাদদের ভক্ষণ করলেন। তাতেও তৃপ্ত না হয়ে পিতা কশ্যপের পরামর্শ মতো গজ-কচ্ছপরূপী বিভাবসু ও সুপ্রতীক নামে আত্মকলহরত দুই ভ্রাতাকে ভক্ষণ করে দেবলোকে উপস্থিত হলেন এবং দেবগণকে পরাজিত করে অমৃত হরণ করলেন। কিন্তু নিজে অমৃত পানের লোভ সংবরণ করায় তিনি অজর অমর ও বিষ্ণুর

রথধ্বজে অধিষ্ঠান করেন। ... মাতার মুক্তি হল। কুশের উপর গরুড় অমৃত রাখেন। সর্পগণ স্নানান্তে অমৃত ভক্ষণ করতে গিয়ে দেখেন অমৃত নাই, ইন্দ্র তা হরণ করে নিয়ে গেছেন। সর্পগণ অমৃত না পেয়ে কুশ লেহন করতে লাগল। এর ফলে তাদের জিহ্বা দ্বিধাবিভক্ত হল। (পৌ.অ.) দ্রষ্টব্য **অরুণ**। ৪. অপ্র.। ৫. এটি কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর (কদ্রুর) ও কারুজীবী জনগোষ্ঠীর (বিনতার) কলহের কাহিনী। যতদূর বোঝা যায়, উভয় গোষ্ঠীই দক্ষতার নীতি গ্রহণ করেছিল, তাই তারা দক্ষকন্যা। আদি মহর্ষিরা তাদের পরিচালক ছিল, তাই তারা কশ্যপের পত্নী। কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর থেকে যে সম্পদবানেরা জন্মেছিল, তারাই **নাগ**, পরবর্তীকালে যাদের নাগরিক বলা হয় অর্থাৎ 'burgher'; যার থেকে পরে 'বুর্জোয়া'র জন্ম। কারুজীবী জনগোষ্ঠী ভারতের ইতিহাসে বারংবার পর্যুদস্ত হয়েছে। অকালবোধনও হয়েছে তাদের বিপ্লবচেষ্টার, সেজন্যই বোধ হয় অরুণের অকালে জন্ম ও খঞ্জ হয়ে যাওয়া। গরুড়ের বেলায় সে সফল হলেও কাহিনীটি এখনও যথার্থ ভাবে বোঝা যায়নি।

কোন (কোনো, কোনও) : ৩. কে, কি, কি অর্থাৎ নিন্দিত, কি অর্থাৎ তুচ্ছ, কি বেশী অর্থাৎ দোষের তুলনায় কি গুরুতর, কে অর্থাৎ কেহই না, কি অর্থাৎ অত্যন্ত, অনির্দিষ্ট অর্থাৎ যে-কোন, বহুর মধ্যে কোন, তাৎপর্য্যার্থে 'কেন-না', একটিও, বিশেষ-বিশেষ, কোন স্থানে। (ব.শ.)। ৪. which-one, any-one অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কেন**।

কন্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকন্যা, অকাণ্ড, আকন্দ, আকপিল, ক'ড়কে, কড়পা, কড়ম্ব, কড়ম্বী, কড়া, ক'ড়ে আঙুল, কড়েরাড়ী, কড়ি, কঢ়া, কণআ, কনক, কনকন, কনকনানি, কনকনি, কনক'নে, কনকপিঙ্গল, কনকপেচুয়া, কনকপ্রসবা, কনকময়, কনকমহেশ, কনকরস, কনকরেখা, কনকলেখা, কনকলতা, কনকসাঁপুড়া, কনকসূত্র, কনকস্থলী, কনকাঙ্গদ, কনকাচল, কনকাঞ্জলি, কনকানটিয়া, কনকনটে, কনকারাঙা, কনয়, কনয়া, কনি, কনিষ্ঠ, কনীনিকা, কনীয়ান, কনে, কনেচন্দন, কনেচয়ন, কনেঠ, কনেবউ, কনেবৌ, কনেযাত্র, কনেযাত্রী, কনস্টেবল (কন-স্থা-বল, constable), কনে, কনেরাঁড়ী, কন্দ, কন্দ, কন্দমূল, কন্দল, কন্দলি, কন্দলিত, কন্দলিয়া, কন্দলীয়া, কন্দাশন, কন্দু, কন্দুআ, কন্দুপক, কন্দুল, কন্দোট, কন্না, কন্যকা, কন্যা, কন্যাকর্ত্তা, কন্যাকাল, কন্যাকুব্জ, কন্যাকুমারী, কন্যাগর্ভ, কন্যাতী, কন্যাদূষী, কন্যাযাত্র, কন্যাযাত্রী, কন্যারত্ন, কন্যারাশি, কন্যাশুল্ক, কন্যাসন্তান, কন্যাহরণ, কন্‌প্, কপ্ (chop), কপচা, কপট, কপট, কপটলেখ্য, কপটিয়া, কপটিনী, কপটী, কপি, কপি (copy), কপিকল, কপিঞ্জল, কপিত্থ, কপিন, কপীন, কপ্‌নি, কপ্‌নী, কপিনাশ, কপীনাস, কপিবক্ত্র, কপিল, কপিলভোগ, কপিলা, কপিলাভোগ, কপিলারাই, কপিশ, কপিশা, কপীন্দ্র, কপোল, কপোলকল্পিত, কবিত্থ, কবিনাস, কাঁড়, কাঁড়া, কাঁড়ান, কাঁড়ার, কাঁড়ারী, কাঁড়ি, কাঁতি, কাঁপটে, কাণ্ড, কাণ্ডকার, কাণ্ডজ্ঞান, কাণ্ডতিক্ত, কাণ্ডপট, কাণ্ডপটক, কাণ্ডপৃষ্ঠ, কাণ্ডবান, কাণ্ডবীণা, কাণ্ডভঙ্গ, কাণ্ডর্ষি, কাণ্ডসন্ধি, **কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান, কাণ্ডার**, কান, কানক, কানড়, কানমাগুর, কানি, কানীন, **কান্যকুব্জ, কাপ, কাপট, কাপটিক**, কাপট্য, কাপিল, কাপিশ, কিপটে, কুঁড়ি, **কুঁত, কুঁতকুত, কুঁথ**, কুঁদ, কুঁদা, কুঁদান, কুঁদারু, কুঁদুল, **কুঁদুলী, কুঁদুলে, কুঁদো, কুঁস্তি, কুহু, কুহূ, কুহন**, কুন্দ, কুন্দকর, কুন্দকার, **কুন্দন, কুন্দরকী, কুন্দল**, কুন্দা, কুন্দার, কুন্দিনী, কুন্দু, কুন্দুর, **কুন্দুরু, কুন্দুরুকী, কুন্দুলী**, কেঁড়ে, কেনুয়া, কৈন্যা, কোঁড়, কোঁড়, **কোঁড়া, কোঁত**, কোঁতন, কোঁতা, কোঁথ, কোঁথন, কোঁথা, কোঁথাজ্বর, **কোঁদন, কোঁদল**, কোঁদলিয়া, কোঁদা, কোঁস্তা, কোড়, কোদল, **কোন্দল, কৌপীন, প্রকাণ্ড**।

কন্ = কারীর ন্-অন (নাকরণ)। **কন** = কারীর নাকরণ (negation) হয় যাহাতে।

কন (কনকন) : ২. *কন = কারীর নাকরণ যাহাতে; কনকন = কারীর নাকরণ উপর্য্যুপরি হয় যাহাতে।* ৩. তীব্র শৈত্য হেতু তীক্ষ্ণ বেদনার অনুভব, শিঙ্গী প্রভৃতি মাছের কাঁটার আঘাতে তীব্র বেদনার অনুভব, দন্তশূলজন্য তীব্র বেদনার অনুভব। (ব.শ.)। ৪. কন স্বতন্ত্রভাবে অপ্রচলিত, কিন্তু 'কনকন' রূপে pain অর্থে প্রচলিত। ৫. কারী যখন অতিসূক্ষ্ম রহস্যরূপী, আলোর কণা, তাপের কণা, শীতের কণা, ব্যথার কণা — এইরকম সূক্ষ্ম রূপে সক্রিয়, তখনই কন। মোটকথা অস্তিত্বের অতিসূক্ষ্ম রূপই (যেন-বা sperm) **কন্** পদবাচ্য। **কন্** কথাটি বুঝতে একটু কষ্ট হয় ঠিকই, কিন্তু 'কনকন' করা কথাটি আমরা বেশ বুঝি। কারী যদি মানবশরীর হয়, কনকনে তার অস্তিত্বকে নাকরণ (negate) করে। বহু মানুষ আছেন, যাঁরা শীতের কনকনে ভাব খুবই পছন্দ করেন। তার মানে, কন শব্দের মধ্যে একটি **টকমিষ্টি** ভাব আছে।

এখান থেকে আমরা কন শব্দের প্রকৃত স্বরূপকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি। এর অন্তত তিনটি স্পষ্ট রূপ হয়। কন যখন স্পর্শরূপে আঘাত করে, তখন আমাদের দেহ বিন্দু বিন্দু আঘাতে সঙ্কুচিত হয়; এ হল 'শৈত্যকণা'। কন যখন রসরূপে আঘাত করে, তখন আমাদের জিহ্বা-গলা বিন্দু বিন্দু আঘাতে ব্যথিত হয়; এ হল কচু-ওল-রসুন প্রভৃতির 'রসকণা'। কন যখন রূপ-হিসেবে আঘাত করে, তখন আমাদের চোখ-মন বিন্দু বিন্দু আঘাতে ব্যথিত হয়; এ হল সোনা ও কন্যা প্রভৃতির 'তেজকণা'।

কনক : ১. ✓কন + অক (বুন্) - ক। (ব.শ.)। ২. *করণের তেজাদির বাহ্য রূপায়ণ করে যে* অথবা *কর্মফল অন করে যে*। দ্র. **কং**। / যাহা দীপ্তি পায়। (ব.শ.)। ৩. স্বর্ণ, স্বর্ণমুদ্রা, মোহর, পলাশবৃক্ষ, নাগকেশর, ধুস্তুর, কনকধুতুরা, চম্পকবৃক্ষ, কাশমর্দ্দ, কণগুগ্‌গুলু, লাক্ষাতরু, শিব। (ব.শ.)। ৪. কেবল নাম রূপে প্রচলিত। ৫. গাছপালা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানগম্যি এত কম যে, কোন গাছের কী গুণ বা স্বভাব তার প্রায় কিছুই আমরা জানি না। সেই কারণে আমাদের শব্দশাস্ত্রী পূর্বপুরুষেরা যে 'কন' গুণটি সোনায় দেখেছিলেন, কীভাবে সেই একই গুণ পলাশ, নাগকেশর, ধুস্তুর, চাঁপা, কাশমল্লা, লাক্ষা গাছে দেখতে পেয়েছিলেন, তা আমরা জানি না। হতে পারে, তাদের

প্রত্যেকের ভিতরেই 'কন' রয়েছে। তবে শিব (আবিষ্কারক) যে কর্ম্মফল **অন** করে রাখেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহমাত্র নেই।

কনখল : ২. *কে খল নহে*। ৩. কুরুক্ষেত্রের উত্তরস্থিত গঙ্গাদ্বারবর্ত্তী তীর্থবিশেষ, পর্ব্বতমালা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দক্ষের জন্মস্থান। 'কৌ ন খল' অর্থাৎ 'কে খল নহে', (সব্বাই খল, ধান্দাবাজ), অতএব আমিও খল হইব না কেন? — এই যুক্তির ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে দক্ষও খল হয়ে যায়। তাই এই যুক্তির দেশটির নাম হয়ে যায় 'কনখল'। একালেও অনেকে এইরূপ যুক্তি দেখান — 'কেউ কথা রাখেনি', অতএব আমি কথা রাখব কেন? আমিও কথা রাখব না।

তা সে যাই হোক, মানস-ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের দেশে পার্থিব-ভূগোলেও স্থানের নামকরণ করার রীতি রয়েছে। সেই রীতিতেই এই নামকরণ। এই 'কনখল' স্থানটি বর্তমান উত্তরাঞ্চলে। আসলে ভারতের মনোলোকের ভৌগোলিক স্থান ও বাস্তবের ভৌগোলিক স্থান মিলিয়ে লেখার রীতিই এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়েছে। দ্র. **বিদর্ভ**। পৌরাণিক স্থান-নামগুলি প্রায় সবই এইরকমের।

কন্দ : ১. ✓কন্দ্ (অন্বেষণ) + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। অথবা, ✓কন্দ্ + অ (অচ্) - ক; ✓কম্ + দ। (ব.শ.)। ২. *কন দান করে যে*। / যাহাকে অন্বেষণ করে; যাহা কাঁদায়। (ব.শ.)। ৩. শূরণ, ওল, শস্যমাত্রের মূল, গৃঞ্জন, গাজর, লশুন, রসুন, মূলবিশেষ, শূরণাকৃতি মূল, লকুচাকৃতি যোনিরোগবিশেষ, মেঘ, মূল, আদি, কারণ, কুচমূল। (ব.শ.)। ৪. মাটির নীচে থেকে পাওয়া শস্যমূল বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ৫. অস্তিত্বের সংক্ষিপ্ততম মূলরূপ বা আদি বীজরূপ, যাকে কং-এর পার্থিব রূপ বা **কন** বলে, তা পাওয়া যায় যাহাতে, সেটিই কন্দ। তা শস্যমাত্রের মূল হতে পারে, জলকণাদাতা মেঘও হতে পারে। হয়তো এদের খোঁজে মানুষের কষ্টের অন্ত ছিল না। তবে রসুন, ওল প্রভৃতি শস্যের মূল আমাদের জিহ্বা ও গলায় যে কন স্পর্শ ঘটায়, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মোট কথা এরা কন স্বরূপ টকমিষ্টি ব্যথাসুখ দেয় বলেই এরা কন্দ পদবাচ্য।

কন্দল : ১. ✓কন্দি (বিবশীকরণ) + অল (অলচ্) - কর্তৃবাচ্যে; অথবা, ✓কন্দ্ (বিবশ) + অলচ্ - ক। (ব.শ.)। ২. ***কন্দ**-এর লালন-লোপন রহে যাহাতে।* / যাহা বায়ুতে বিবশ হয়। (ব.শ.)। ৩. কপাল, কলধ্বনি, নবাঙ্কুর, উপরাগ, দুর্নিমিত্ত উৎপাত, কলাপ, সমূহ, অপবাদ, নিন্দা, যুদ্ধ, বাগযুদ্ধ, কোঁদল, ঝগড়া, স্বর্ণ, কন্দলীপুষ্প। কন্দলী = কদলীতরু, ভূমিকন্দলী, গুল্মবিশেষ, হরিণবিশেষ, পতাকা, পদ্মবীজ। ৪. quarrel বা ঝগড়া অর্থে প্রচলিত। ৫. কন্দ-এর মধ্যে দুই বিপরীতের অস্তিত্ব রয়েছে — ব্যথা ও সুখ। তবে শব্দটির ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যথার দিকটিতে জোর পড়েছে বেশি। যেকারণে ব্যথামূলক অর্থেই এর অধিক ব্যবহার। ব.শ. শব্দটির বিবশতার দিকটিই বেশি করে দেখতে পেয়েছেন।

কন্যকা, কন্যা : ১. কন্যকা = ✓কন্যা + ক (কন্) স্বার্থে + স্ত্রী আ (টাপ্)। কন্যা = ✓কন্ + য (যৎ) - ক, কর্ম্মবাচ্যে + ক + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***কন**-ধারণকারীর আধার যে; **কন** বা ঝিলিকের সাহায্যে মনে ব্যথাসুখ দেয় যে, তাহার আধার।* / যে দীপ্তি পায়; যে (সকলের) কাম্যা। (ব.শ.)। ৩. তনয়া, মেয়ে, বিভাযোগ্য কন্যা, দশবর্ষবয়স্কা স্ত্রী, অপ্রাপ্তপুংযোগাবস্থা নারী, অনূঢ়া স্ত্রী, কুমারী, স্ত্রীমাত্র, স্ত্রীলোক, নারী, পশুজাতির স্ত্রী, দুর্গা, কন্যারাশি (জ্যোতিষে), ঘৃতকুমারী, স্থূলৈলা, বড় এলাচ, বারাহীকন্দ, বন্ধ্যা কর্কোটকী, তিতকাঁকড়ী, তীর্থবিশেষ, বিবাহিতা যুবতী স্ত্রী, বিবাহযোগ্যা পাত্রী, সদ্যোবিবাহিতা স্ত্রী, যুবতী। ৪. daughter অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কন**। কন ঘৃতকুমারী, স্থূলৈলা, বড় এলাচ, বারাহীকন্দ ইত্যাদিতে রয়েছে বটে, তবে তা রূপবাচক তেজকণা নয়, স্পর্শবাচক বা রসবাচক হতে পারে। হয়তো-বা মানবাস্তিত্বের **কন**-ও হতে পারে। এই **কন** থাকে যাহাতে, সে হল কন্য। কন্য-এর আধার যে, সে হল **কন্যা**। অন্যদিক থেকে ভাবলে, অস্তিত্বের সূক্ষ্মতম **কন** থাকে যাতে, সেই তো কন্যা বা কন্যকা নাম পেতে পারে। মানবপ্রজাতির অস্তিত্ব তো কন্যাতেই দীপ্তি পায়। দ্র. **তনয়া**।

কন্যাকুব্জ, কান্যকুব্জ : ২. কন্যা কুব্জা যেখানে; অথবা, কান্য (কন্যাসমূহ) কুব্জ যেখানে। (ব.শ.)। ৩. কান্যকুব্জ দেশ, কনৌজ। ইহা গঙ্গার অদূরে কাশীনদীতটে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহার আধুনিক নাম 'কুশস্থল'। কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহ (জয়াদিত্য) আদিশূরের প্রার্থনায় বঙ্গদেশে বেদপারগ পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করেন। (ব.শ.)। ক) ঘৃতাচীর গর্ভে রাজর্ষি কুশনাভের শতকন্যার জন্ম হয়। বায়ু রূপযৌবনসম্পন্না সেই কন্যাগণের পাণিগ্রহণে অভিলাষ করিলে, কন্যাগণ তাদৃশ অবৈধ কার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তখন বায়ু কুপিত হইয়া কন্যাগণের দেহে প্রবেশপূর্ব্বক সকলকেই কুব্জাকৃতি করেন। তদবধি কুশনাভের রাজ্য 'মহোদয়' ও 'কান্যকুব্জ' নামে খ্যাত। মতান্তরে, জমদগ্নি শাপ দিয়া রাজকন্যাগণকে কুব্জা করিয়াছিলেন। (ব.শ.)। খ) কুশ নামে এক ধর্মাত্মা রাজার কুশনাভ নামে এক পুত্র ছিল। কুশনাভের স্ত্রী ঘৃতাচীর গর্ভে একশত কন্যা জন্মগ্রহণ করে। একদিন উদ্যানে এই কন্যাদের নৃত্যগীতকালে বায়ু এঁদের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে বলেন যে, তোমরা আমার স্ত্রী হও। কন্যারা অবজ্ঞাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বায়ু ক্রুদ্ধ হয়ে এঁদের সর্বাঙ্গ ভগ্ন করে দেন এবং তারই ফলে এঁরা কুব্জা হন। কুশনাভ তখন কম্পিল্যা নগরীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে এই একশত কন্যার বিবাহ দেন। ব্রহ্মদত্ত কন্যাদের পাণিস্পর্শ করতেই তাঁদের কুব্জতা দূর হয়, তাঁরা পূর্বরূপ ফিরে পান। এই কন্যাদের স্থাপিত নগরীর নাম কান্যকুব্জ। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। তবে 'কনৌজ' নামটি আজও প্রচলিত। তাছাড়া কনৌজী-ব্রাহ্মণ তো রয়েছেনই। ৫. **কুশ** কথাটির একটি অর্থ হল সুদ। কুশ নাভিতে যাহার, সেই কুশনাভ। একালে একে 'finance capital' বলে। এ-টাকা দেওয়া হয় ব্যবসা করতে বা উৎপাদন করতে, পরিবর্তে নেওয়া হয় সুদ। যে-জনগোষ্ঠী এই শর্ত মেনে নিয়ে টাকা নেয়, তারা কুশনাভের **কন্যা**। দ্র. **দক্ষকন্যা**। মিডিয়া বা বায়ু (এক্ষেত্রে মার্কেটিং-এর খবর) এই কন্যাদের পাণিপ্রার্থনা করে, পণ্যের সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু সেকালে বিক্রিবাটা রীতিমতো নিষিদ্ধ ছিল। তাই তারা অসম্মত হয়। ফলে তারা **কুব্জ** অর্থাৎ

উৎপাদন করছে, তা জমেও যাচ্ছে কিন্তু বেচতে পারছে না — এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মতান্তরে **জমদগ্নি** (জমৎ অগ্নি = জমানো উৎপন্ন, পণ্য, টাকা) বা বেদবাদীদের মজুতদারগণ, যারা অসময়ের জন্য মজুত করত এবং কদাচ বিক্রিবাটা করত না, তাদের চোখে এই জনগোষ্ঠী ঘোর পাপী হয়ে ওঠে; কেননা উদ্বৃত্ত উৎপন্ন তারা জমদগ্নিকে না দিয়ে নিজেদের কাছে রাখছে। তাই জমদগ্নির শাপ। তা সে যাই হোক, **কাম্পিল্য**নগরীর (পাঞ্চালদেশের নগরী, দ্রৌপদীর দেশের নগরী, যেখানে বিক্রিবাটার প্রথা প্রচলিত ছিল) রাজা সেই জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় তাদের কুঁজ সেরে যায়। কোষকারদ্বয়ের (গ) গ্রন্থের 'বিদর্ভের কথা : ভারত-ইতিহাসের অমৃতকথার কণিকামাত্র' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। দ্র. **কুশনাভ**।

কপট : ১. ✓কপ্ + অট্ (অটন্)। (ব.শ.)। ২. *কারী-পালনকারী অস্তিত্ব টঙ্কারিত (বাধাপ্রাপ্ত) হয় যাহাতে*। / ক (ব্রহ্মা), তাঁহারও পট (ব্যাপক, আবরক)। (ব.শ.)। ৩. অযথার্থ ব্যবহার, ব্যাজ, কৈতব, ছল, মায়া, কুহক, ললাট, কপটযুক্ত, ছলপূর্ণ, প্রতারক, বঞ্চক। ৪. 'ঠগ' অর্থে প্রচলিত। ৫. যে কারক আবৃত বা ঢাকা, সে কপট। কিংবা 'ক-পালক টঙ্কারিত হয় যেখানে', এভাবেও শব্দটির অর্থ করা যেতে পারে। তার মানে, কপট-এ ক বা কারক লুকিয়ে থাকায় মানুষ প্রতারিত হয়, তাই কপট কথাটি 'যথার্থ ব্যবহার' নয়, যথার্থের বাইরে। আবার, ক-পালক যে বাধায় টঙ্কারিত সেও কপ-কে আটকায়, তাই কপট। তবে বাংলাভাষায় শুধুমাত্র 'কপ' শব্দটির উত্তরাধিকার রয়েছে কেবলমাত্র 'কপকপ করা' শব্দবন্ধে। ইংরেজিতে এর অনেক উত্তরাধিকার রয়েছে। ৬. *cap*able, *cap*acity, *cap*ture, *chop* প্রভৃতি ইংরেজি শব্দ।

কপি : ১. কন্প্ + ই - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক-পালনের বিকাশসাধন করে যে*। / যে বৃক্ষান্তরে যায়। (ব.শ.)। ৩. বানর, নারায়ণ, সিহ্লক, সিলারস, করঞ্জবিশেষ, আমলকী, বরাহ, রক্তচন্দন, পিঙ্গলবর্ণ। ৪. অপ্র.। ৫. কপ-কে গতিশীল বা বিকাশশীল করে যে, সে হল **কপি**। এ হল একই কর্মের পুনরাবৃত্তিকারী বা copy-কারী। বানরের মধ্যে নকল করার এই গুণটি রয়েছে বলে তাকেও **কপি** বলা হয়। এর ফলে একই বস্তুর পাইকারী উৎপাদন করা সম্ভব হয়। সেকারণে সমস্ত দক্ষদের **কপি** অর্থাৎ বানর বলা হয়। ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম রূপে যে সকল বিধান ছিল, তার অন্যতম ছিল কর্মযজ্ঞ চালানো; যাতে ব্রাহ্মণের দ্বারা নির্ধারিত বিশেষ কর্মের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সমাজের বাৎসরিক উৎপাদন ঠিকঠাক হয়। সেই সুবাদে যে-সকল ক্ষত্রিয়কে সমাজের বিভিন্ন শাখায় নিয়োগ করা হত, তাদের **কপি** বলা হত। দ্র. **অশ্ব, বানর**। ৬. ইংরেজি copious, copy।

কপিঞ্জল : ২. *যে কপি জলে (জনসাধারণের মধ্যে) থাকে*। / কপির ন্যায় ঈষৎ পিঙ্গল যে। (ব.শ.)। ৩. চাতক পক্ষী, তিত্তিরি, গৌড়তিত্তিরি। (ব.শ.)। অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে ও বশিষ্ঠের ঔরসে এঁর জন্ম হয়। ইনি ত্রিমূর্তি ও **ইন্দ্রপ্রমতি (ইন্দ্রপ্রমিতি)** নামে অভিহিত হন। ইনি পৈলের শিষ্য ও বাস্কলীর সতীর্থ। পৈল ঋক্‌বেদ দুই ভাগে বিভক্ত করে **ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কলীকে শ্রবণ করান**। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **কপিঞ্জলকেই তিত্তিরি বলে**। এরা কপি (copy) করতে ওস্তাদ, তাই এদের **কপিও বলে**। আদি কেরানির নাম ছিল **কপিঞ্জল**। **ত্রিশিরা** বধ করলে তার তিনটি স্কন্ধ থেকে যথাক্রমে **কঙ্ক, কলবিঙ্ক,** ও **কপিঞ্জলের** জন্ম হয়। দ্রষ্টব্য **কঙ্ক, ত্রিশিরা**। এরা সেকালের কেরানিকুল। এরা যাজ্ঞবল্ক্যের বমি-করা বেদ ভক্ষণ করেছিল এবং কৃষ্ণযজুর্বেদের সংহিতা তৈত্তিরীয় সংহিতা সংকলন করেছিল।

কপিত্থ : ১. কপি + ✓স্থা + অ (ক)। (ব.শ.)। ২. *যে গাছে কপি থাকে*। (ব.শ.)। ৩. কৎবেল গাছ। ৪. অপ্র.। ৫. **অশ্বত্থ** বা **বট**বৃক্ষের বেলায় আমরা যেমন নেচারের অশ্বত্থ-বটকে চিনি আবার সমাজের অশ্বত্থ-বটকেও চিনি, কপিত্থ গাছের বেলায় নেচারের কৎবেল গাছকে চেনা গেলেও সমাজের কপিত্থ গাছকে চেনা যাচ্ছে না, যদিও বেল গাছকে কমবেশি চেনা যায়। বেলগাছ শিবশক্তির আধার, কৎবেল গাছ দক্ষশক্তির আধার। বলে রাখা ভাল, **কপিত্থ**বৃক্ষকেই 'দধিত্থ' বলে। দ্র. **দধিত্থ, বিল্ব**।

কপিল : ১. কপি + ল (লচ্) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। ২. *কপি-র লালন-লোপন থাকে যাহাতে*। / যাহাতে কপি বর্ণ যুক্ত থাকে। (ব.শ.)। ৩. ক) কপিবর্ণযুক্ত, পিঙ্গলবর্ণ, সাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্তক মুনিবিশেষ, অগ্নি, কুক্কুর, সিহ্লক, সিলারস, মহাদেব, বিষ্ণু, সূর্য্য। (ব.শ.) খ) ইনি ভগবানের পঞ্চম অবতার। কর্দ্দম ইঁহার জনক, দেবহূতি ইঁহার জননী। ইনি সাংখ্যশাস্ত্রপ্রণেতা, আসুরি ইঁহার প্রথম শিষ্য। সগরসন্তানগণ ইঁহার শাপে ভস্মাবশেষ হয়। পাতালে (অর্থাৎ গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে) ইঁহার আশ্রম ছিল। অগ্নিবংশবর্ণনে ইনি অগ্নির অবতার রূপে অভিহিত হয়েছেন। (ব.শ.)। গ) ... ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করা হয়েছে যে দর্শনে, ইনি সেই সাংখ্যদর্শনপ্রণেতা। ... ইনি মাতাকে সাংখ্যতত্ত্ব, পুরুষ ও প্রকৃতির প্রভেদ, অষ্টাঙ্গযোগ, ভক্তিযোগ, কলা, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি শিক্ষা দেন। একাগ্রচিত্তে তপস্যার জন্য কপিল পৃথিবীর নিম্নভাগ পাতালে আশ্রম স্থাপন করেন। ... ইন্দ্র সগর রাজার অশ্বমেধের ঘোড়া হরণ করে এখানে রেখে যান। ... সগরের ষাট হাজার সন্তান যজ্ঞাশ্ব অন্বেষণে সেখানে পৌঁছে অশ্ব দেখে কপিলকে অপহরণকারী মনে করে আক্রমণ করে এবং কপিলের শাপে ভস্ম হন। ... সগর-পৌত্র অংশুমান মুনিকে সন্তুষ্ট করেন। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের পর জাহ্নবীর জলস্পর্শে সগরসন্তানদের উদ্ধার হয়। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্রষ্টব্য **কর্দ্দম**। সাংখ্যকার **কপিল** এমন এক মহর্ষিগোষ্ঠী, যাঁরা লেখালেখির দুনিয়ায় নিজেদের কাজকর্ম শুরু করেন (পাতা-ল লোকে আশ্রম স্থাপন করেন)। এঁদের শিক্ষা এমন কপিদের যথেষ্ট পরিমাণে জন্ম দিয়েছিল বলে মনে হয়, যারা লেখালেখি করতে পারে। তাই এঁদের নাম কপিল। এঁরা শুক্ল বা সাদা নয়, কৃষ্ণ বা কালোও নয়, এঁরা পিঙ্গল (**শবল**) ধূসর। বানরের গায়ের রঙের মতো। একালে টাকার বা ধান্ধারও তিনরকম রঙের ধারণার চল হয়েছে — white, grey, black। কপিলও তাই; সে সাদা নয়, কালোও নয়, ধূসর; মধ্যপন্থী। স্বভাববশতই কেরানি-আমলারা যৌথতাবাদী সমাজতান্ত্রিক বা বেদবাদী নয়,

স্বাতন্ত্র্যবাদী পুঁজিবাদীও বৌদ্ধও নয়; তাঁরা মধ্যপন্থী, **কপিল**। আসলে, বেদবাদিতার থেকে বেরিয়ে সাংখ্যবাদী কপিলের আশ্রম পেরিয়েই পণ্যবাদিতায় পৌঁছতে হয়।

কপিলা (কপিলাবস্তু) : ১. কপিল + আ। ২. *কপিলের শক্তি যাহাতে থাকে*। ৩. পুরাণোক্ত কপিলবর্ণ গবী, কপিলা গাই, পীতবর্ণা গবী, জলৌকাবিশেষ, পিপীলিকাবিশেষ, শিংশপা, গন্ধদ্রব্যবিশেষ, রেণুকা, ঘৃতকুমারী, রাজরীতি, পিত্তলবিশেষ। দক্ষ প্রজাপতির ষাট জন কন্যার অন্যতমা। মহর্ষি কশ্যপের সঙ্গে এঁর বিবাহ হয়। ইনি তিলোত্তমা, রম্ভা প্রভৃতি কন্যা ও অতিবাহু, হাহা, হুহু, গো ও গন্ধর্ব প্রভৃতি বহুজনের জননী। (পৌ.অ.)। অন্যত্র এঁকে 'গোজননী'ও বলা হয়েছে। ৪. অপ্র.। ৫. **কপিল** মহর্ষি পরিচালিত জনগোষ্ঠীকে **কপিলা** বলে। এই জনগোষ্ঠী থেকে নানা শ্রেণীর স্বতন্ত্রবাদী বিনিময়জীবীদের উদ্ভব হয়েছিল, যথা — তিলোত্তমা, রম্ভা, অতিবাহু, হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব। সেই কারণে **কপিলা**কে গোজননী বলা হয়। 'যারা যায়', ইনি তাদের জননী। স্বভাবতই এর সন্তানসন্ততিরা কেবল cow নয়, আদি স্বতন্ত্রবাদীও বটে। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে, এঁরা একালের পণ্যজীবীদের মতো আগাগোড়া বিনিময়জীবী ছিলেন না। যৌথসমাজের বাসিন্দার বহু গুণাগুণ তখনও তাঁদের স্বভাবে ছিল, তাই তাঁরা কপিলা। এঁরা যৌথতায় থাকেননি, কিন্তু পুরোপুরি পণ্যজীবিতায় উত্তীর্ণ হননি। এঁদের হাতে যে বস্তু ছিল, তা যৌথতাজাত নয়, আবার স্বতন্ত্রতাজাতও নয়, তা মধ্যপন্থায় জাত; তাই সেগুলি ছিল কপিলাবস্তু। গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল সেই কপিলাবস্তুতে।

কাণ্ড : ১. ✓কন্ (দীপ্তি) + ড - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কণ্ড হইতে জাত*। ৩. বংশ-বেত্রশর প্রভৃতির এক গ্রন্থি হইতে অন্য গ্রন্থি পর্যন্ত অংশ, পর্ব্ব, পাঁব, বৃক্ষের মূল হইতে শাখাদি ভাগ, প্রকাণ্ড, স্কন্ধ, গুঁড়ি, বিটপ, শাখা, দণ্ড, নাল, ডাঁটা, নাড়া, নাড়ী, স্তম্ব, গুল্মভেদ, তৃণাদিগুচ্ছ, শরতৃণ, শর, বাণ, হস্তপদের অস্থিখণ্ড, যোড়শহস্তপ্রমাণ, গ্রন্থপরিচ্ছেদ, অধ্যায়, তদ্প্রতিপাদক গ্রন্থ, তৎপ্রকরণভাগ, কদম্ব, সমূহ, সমবায়, জল, নির্জ্জন, নিভৃত, অবসর, প্রস্তাব, যোগ্যকাল, শাখা, চাটুবাদ, স্তুতি, কুৎসিত, অধম, অক্ষোঠবৃক্ষ। বাংলায় — ব্যাপার, ঘটনা, ব্যাপার ও আয়োজন, মহাসমারোহ, বহৎ ব্যাপার, ঘটনাবলী, ক্রিয়াকলাপ, অচিন্তনীয় ঘটনা, অদ্ভুত ব্যাপার। (ব.শ.)। ৪. অনেকগুলি অর্থে প্রচলিত, তবে সবগুলি নয়। ৫. এই শব্দের প্রতীকী অর্থ বহু। নিশ্চিতভাবেই এই শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি বিশেষ রকমের ছিল, তাই এই বহুত্ব। কিন্তু কোথাও শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের কোনো উল্লেখ পেলাম না আমরা।

যদি ধরে নেওয়া হয় যে, 'কণ্ড' থেকে 'কাণ্ড' হয়েছে, তাহলে কণ্ড শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটির কথায় আসতে হয়। আগেই জানা গেছে, কণ্ড শব্দের অর্থ হল 'কারীর রহস্যরূপের উড্ডয়ন যে কর্মে'। কিন্তু তাতেও বিষয়টি কিছুতেই পরিষ্কার হয় না। কিন্তু আম জাম প্রভৃতি ফলের বীজের থেকে বেরোনো চারা এবং পরে বৃক্ষে পরিণতির মতো যদি ধরে নেওয়া হয়, কণ যেখানে প্রসারিত হতে পেরেছে, সেই অংশটি কাণ্ড, তাহলে দেখা যায়, অন্তত বইয়ের কাণ্ড (অধ্যায়) এবং গাছের কাণ্ড (বৃক্ষের মূল হইতে শাখাদির আগে পর্যন্ত যে ভাগ) দু-ধরনের বিষয়কেই কথাটি শনাক্ত করতে পারছে। সবাই জানেন, রামায়ণ সাত কাণ্ডে এবং মহাভারত আঠারো পর্ব্বে বিভক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'কাণ্ড' শব্দের প্রদত্ত (৩) অন্যান্য অর্থগুলি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। তবে কাণ্ডকে যখন ধনু বলে জানি, তখন বুঝতে পারি একটি সমাজে যতগুলি ব্যবস্থা আছে, কৃষিব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ... এর প্রত্যেকটিই এক একটি অধ্যায়; এবং এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ নিয়ম বা আইন আছে। তখন কাণ্ড শব্দের অর্থ আরও ব্যাপক হয়ে যায়।

কাণ্ডজ্ঞান : ১. কাণ্ড + জ্ঞান। ২. *কাণ্ড বিষয়ে জ্ঞান থাকে যাহাতে*। ৩. কাণ্ডের বোধ, প্রকরণজ্ঞান, বিষয়বোধ, দেশকালপাত্রানুসারে বিষয়বিশেষের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বোধ। (ব.শ.)। ৪. common sense অর্থে প্রচলিত। ৫. **কাণ্ড** শব্দের একটি অর্থ বঙ্গীয় শব্দকোষ দিয়েছেন বাণ, কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখেছি, সেটি বাণ নয়, **ধনু** অর্থে প্রচলিত। এই ধনু হল সমাজের সমস্ত রীতিনীতি বা আইনের (ধর্ম্মের) ব্যবস্থা। তাকে জানলে সব জানা যায়, মানুষের কাণ্ডজ্ঞান হয়। যে কারণে আইনের পেশাকে বলা হয় 'most learned profession'।

অন্যভাবেও বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। বস্তুত গাছের কাণ্ডটি (দৈত্যের মতো) হাত দিয়ে মুঠো করে ধরতে পারলে তার শাখা-প্রশাখা সবই অধিকারীর এখতিয়ারে চলে আসে। এর আরেক অর্থ হল — 'অখণ্ড জ্ঞান'-এর অধিকারী হলেই সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করার যোগ্যতা জন্মায়, খণ্ডজ্ঞানের অধিকারী কেবলমাত্র শাখা বা প্রশাখার বিষয়ে ভাবতে পারে বলেই তার অনেক সময় ত্রুটি হয়ে যায়। তখন তাকে বলা হয়, তার 'কাণ্ডজ্ঞান' নেই। বস্তুত প্রশাখার জ্ঞানও মানুষের কাজে লাগে। তাকেই স্পেশালাইজেশন বলে। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান না থাকলে সেই প্রশাখা-জ্ঞানও অনেক সময় কোনো কাজে লাগে না; উলটে বিপদ ঘটায়। তাই কাণ্ডজ্ঞানের মান তুলনায় বেশি। প্রাচ্যের বৈদগ্ধ্য কাণ্ডজ্ঞানকে চিরকালই বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছে, পাশ্চাত্যের বৈদগ্ধ্য সম্মান দিয়েছে প্রশাখা-জ্ঞানকে। অথচ দুটোই চাই এবং আমাদের বিচারে সেই দুইয়ের যৌথ কার্যক্ষেত্রে সিদ্ধান্তকারীর ভূমিকায় কাণ্ডজ্ঞানের মর্যাদা থাকাই বাঞ্ছনীয়।

কাণ্ডপৃষ্ঠ : ১. কাণ্ড + পৃষ্ঠ। ২. যাহার পৃষ্ঠে কাণ্ড, অথবা যাহার পৃষ্ঠ কাণ্ডতুল্য স্থূল। (ব.শ.)। ৩. কাণ্ডাধার, তূণ, শস্ত্রাজীব, আয়ুধিক, ধানুকী, স্বধর্ম্মত্যাগী (মহাবীরচরিতে শতানন্দ জামদগ্ন্যকে 'কাণ্ডপৃষ্ঠ' অর্থাৎ 'শস্ত্রাজীব ব্রাহ্মণ' সুতরাং 'স্বধর্ম্মত্যাগী' এই তিরস্কারবাক্যে সম্বোধন করিয়াছেন।), বেশ্যাপতি, দত্তক পুত্র, ঔরসব্যতীত একাদশ পুত্র, কর্ণের ধনুঃ, কামচাপ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. গ্রামবাংলায় তীরধনুক শব্দের পরিবর্তে 'তীরকাঁড়' শব্দটি অধিক প্রচলিত, বিশেষত মেদিনীপুরের কোনো কোনো অঞ্চলে। এতে ধনুককে কাঁড় বলা হয়। এই কাঁড় আর কাণ্ড একই কথা। সেই কাঁড়ে হাত গলিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে গ্রামের শিকারী আদিবাসীরা কখনও-সখনও ঘোরাফেরা করেন। কাণ্ডপৃষ্ঠ তাঁদের বললে একেবারেই ঠিক বলা হয়। জামদগ্ন্য

পরশুরামকে একই কারণে সেকথা বলা হয়ে থাকবে। কিন্তু আমরা জানি ধনুক শব্দটি এইরূপ বাহ্যিক কাঁড় মাত্র নয়। হরধনু, শিবধনু — এসব অন্য অর্থ ধারণ করে। পরশুরাম হরধনু বহন করতেন। সেই ধনু রামচন্দ্র ভেঙে দেন। এর অর্থ হল, পরশুরাম যে সামাজিক ন্যায়নীতি (ধর্ম্মাচার) মানতেন, যা কিনা একসময় আবিষ্কারকেরাই আবিষ্কার করে সেগুলির প্রচলন ঘটিয়েছিলেন; এবং পরশুরাম তা অনুসরণ করতেন; রামের সময়ে পৌঁছে তা সেকেলে হয়ে গিয়েছিল। তাই সে-আইন রামচন্দ্র ভেঙে দেন। তার মানে কাণ্ড বা ধনু জিনিসটি কেবলমাত্র 'কাঁড়' নয়, আরও বড় কিছু। ধনু থেকে তীর বা বাণ নিক্ষেপ করা হয়। এই বাণকে আমরা চিনেছি 'নিষেধ' বা ban রূপে। তার মানে ধনু বা কাণ্ড হল সমগ্র আইনের শাসনব্যবস্থা, যার থেকে নিষেধ বেরিয়ে আসে আইনঅমান্যকারীর উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ **ধনুর্ভঙ্গ-পণ** কথাটির মানে হল 'আইন অমান্য আন্দোলন'।

কাণ্ডর্ষি : ১. কাণ্ড + ঋষি। ২. *কাণ্ড বিষয়ে জানেন যে ঋষি*। ৩. বেদভাগ বিশেষের মীমাংসক ঋষি। বৈদিক তত্তৎ প্রকরণের বিচারক — মীমাংসায় কর্ম্মকাণ্ডমীমাংসক জৈমিনি, বেদান্তে জ্ঞানকাণ্ডের বিচারক ব্যাস, ভক্তিকাণ্ডের বিচারক শাণ্ডিল্য। একজাতীয় ক্রিয়াসমূহের বিচারক। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. একটি বৃক্ষের কাণ্ড যিনি জানেন, সমগ্র বৃক্ষ বিষয়ে তাঁর ধারণা কমবেশি ঠিক হয়। সেই সুবাদে সেকালে জ্ঞানের এক একটি বিষয়কে এক একটি বৃক্ষের কাণ্ড মনে করা হত এবং যিনি তা জানতেন তিনি কাণ্ডর্ষি। একালেও এরকম কাণ্ডর্ষি রয়েছেন, তবে তাঁদের সে-নামে এখন আর ডাকা হয় না।

'কম্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকাম, অকামিক, অকুমার, অকুমারী, অকুমারীব্রত, আকাঁড়া, আকাঁড়ি, আকুমার, কইলে (কৈলে), কঙর, কঙল, কঞ্জ, কঞ্জুস, কঞ্জেক্ষণ, কন্থ, কন্থু, কন্থা, কন্দর, কন্দর্প, কন্দুক, কন্ধর, কম্, কম, কমঠ, কমতি, কমন, কমনীয়, কমন্তর, কমপোক্ত, কমবক্তা, কমর, কমরপটী, কমরবন্ধ, কমল, কমলকুমারী, কমলখণ্ড, কমলগর্ভ, কমলঙ্গ, কমলাকর, কমলকান্ত, কমলরমণ, কমলাক্ষ, কমলাগুড়ি, কমলাপতি, কমলাবিলাস, কমলারি, কমলালয়, কমলাসন, কমলিনী, কম্বল, কম্বলী, কম্বু, কম্বুকঙ্কণ, কম্বুকণ্ঠ, কম্বুগ্রীব, কম্বুবলয়, কম্বুরাজ, কম্বোজ, কম্র, কমলে, কাঁউর, কাঁও(ঙ)ল (কামল), কাঁথ, কাঁথা, কাঁথি (নদীর খোর), কাঁধাড়, কাঁধাড়ি, কাঙর, কাঙুর, কান্ত, কান্তার, কান্তি, কান্তিকর, কান্তিদ, কান্তিদায়ক, কান্তিভৃৎ, কান্তিমান, কান্তিলৌহ, কান্থা, কান্দ, কান্দি(ন্দী), কান্ধি(ন্ধী), কাম, কামকলহ, কামকলা, কামকাম, কামকামী, কামকার, কামকৃত, কামকেলি, কামক্রীড়া, কামক্ষুধা, কামগ, কামগতি, কামগন্ধ, কামজ, কামজিৎ, কামটঙ্গি, কামড়, কামড়া, কামদ, কামদশা, কামদানী (জামদানী), কামদায়, কামদুঘ, কামদূতী, কামদেব, কামদোহিনী, কামধনু, কামধুক, কামধেনু, কামধ্বংসী, কামনা, কামন্দক, কামপত্নী, কামপাল, কামপুর, কামপ্রদ, কামবর, কামবর্ষী, কামবান, কামবাসী, কামবিদ্ধ, কামবীর্য্য, কামবৃত্ত, কামভূপ, কামভোগ, কামমোহিত, কাময়িতা, কামর, কামরস, কামরসিক, কামরাঙা, কামরিপু, কামরূপ, কামল, কামলা, কামশক্তি, কামশর, কামশাসন, কামশাস্ত্র, কামসখ, কামসিন্দুর, কামসু, কামসূত্র, কামহৈতুক, কামাক্ষী, কামাখ্যা, কামাগ্নি, কামাঙ্কুশ, কামাতুর, কামাত্মজ, কামাত্মা, কামাধিষ্ঠান, কামানল, কামান্ধ, কামাবসায়, কামার্ত্ত, কামাসক্ত, কামি, কামিক, কামিত, কামিনী, কামী, কামুক, কামেশ্বর, কামোদ, কামোদ্দীপক, কামোপহত, কাম্বুজ, কাম্বোজ, কাম্য, কাম্যক, কাম্যকূপ, কাম্যদান, কাম্যা, কুঙর, কুঙ্কুম, কুণ্ডরি, কুমকুম, কুমণ্ডল, কুমর, কুমার, কুমারঘাতী, কুমারব্রত, কুমারব্রহ্মচারী, কুমারভৃত্যা, কুমারসম্ভব, কুমারিকা, কুমারী, কুয়র, কৈন্থা, কোঁয়ল, কোঙর, কোঙার, কোমর, কোমরকষণী, কোমরপাটা, কোমরপাট্টা, কোমরবন্দ(ন্ধ), কোমরি(রী), কোমল, কোমলক, কোমলা, কোমলিনী, কৌঙ্কুম, কৌমার, কৌমার্য্য, নিকাম, নিষ্কাম, সুকোমল।

কম্ = কারীর সীমায়ন। **কম** = কারী সীমায়িত যাহাতে।

কম : ২. *কারী সীমায়িত বা সংক্ষিপ্ত যাহাতে*। ৩. কম্ = স্পৃহা, অভিলাষ, সহবাসার্থ অভিলাষ। কম = সুন্দর, মনোহর। অল্প, অল্পতর, ন্যূন, অপটু, অত্যল্পসংখ্যক, সামান্য, কদাচিৎ, ক্বচিৎ। কম করা = অল্প বা হ্রাস করা, বাকি রাখা ... (ব.শ.)। ৪. less অর্থে প্রচলিত। ৫. **কম** শব্দটিকে ফারসি ভাষা থেকে আগত বলে মনে করা হয়। বস্তুত তা নয়। আদি 'কম্' শব্দের অর্থ ছিল 'কারী (= ক) সীমায়িত (= ম) যাহাতে'। কিন্তু কারীর এই সীমায়ন জিনিসটি অভিনব। এতে মনে করা হয়, কারী নিজেই প্রসারিত হয়ে সমগ্র সত্তায় পরিণত হয়েছে। ক-এর ইন্দ্র বা কেন্দ্ররূপে সে বসে থাকে প্রতিটি সত্তার কেন্দ্রে, বাকি অংশে থাকে তার নানা মাপের উপ-ইন্দ্র বা উপেন্দ্র রূপগুলি। সেই কারণে কারী সীমায়িত হতে চাইলে সমগ্র সত্তা সঙ্কুচিত হয়ে তার কেন্দ্রে ফিরে আসবে, এমনটাই স্বাভাবিক। অতএব কারী (ক) যদি সীমায়িত (ম) হতে চায়, তাকে সঙ্কুচিত হতে হয়; প্রসারিত অংশকে বা উপেন্দ্রগুলিকে ঘরে ফেরার ডাক দিতে হয়, বলতে হয় — ঘরে ফিরে আসো, কমো, কম হও, কম্-অন্; কাছে এসো, আমি তোমাকে চাই! সত্তার কেন্দ্রের এই ডাকই তার স্পৃহা, অভিলাষ, ও কাম বা কামনা প্রকাশ করে। তাহলে তো কারীর সীমায়ন মানেই প্রসারিত অংশের ফিরে আসা বা কম্-অন্, ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ যাকে 'কম্-অন্' না-বলে বলত 'কামেন' (comen) এবং পাঁচশো বছর আগেও বলত 'কামে' (come), আজ যাকে সে বলে 'কাম' (come)। অতএব, কম মানে কোনো সত্তার সঙ্কুচিত রূপ, কম মানে সত্তার যে-কোনো অংশের একটুখানি নয়। আবার, সঙ্কুচিত হয়ে কেন্দ্রে ফিরে আসার পর ক-এর ইন্দ্র ও উপেন্দ্র সবাই সমান হয়ে যায়। ফলে 'কম' হয়ে যায় 'সম'। স্বভাবতই 'অল্প'-এর সঙ্গে এই 'কম'-এর পার্থক্য রয়েছে। সে পার্থক্য হল — সত্তার আর বৃদ্ধি পাওয়াকে '**অল্প**' নিষিদ্ধ করে দেয়; অন্য দিকে 'কম' কিন্তু সত্তার বাড়-বৃদ্ধির প্রসঙ্গেই যায় না, যতখানি বেড়েছে তাকে সঙ্কুচিত করে কেন্দ্রে ফিরে আসতে বলে। অর্থাৎ কিনা অল্প হল কম-এর চেয়ে যথেষ্ট বেশি। এই সব অভিনবত্ব থাকার কারণে,

'কম' শব্দটির উত্তরাধিকার নানা ভাষায় নানা ভাবে রয়েছে। ফারসি তাকে সত্তার যে-কোনো অংশের 'একটুখানি' অর্থে 'কম' করে নেয়, ল্যাটিন নেয় com-, con, cum-রূপে; আর, গ্রীক নেয় sym-, syn-, syl-রূপে। ল্যাটিন গ্রীক উভয় ভাষা থেকেই ইংরেজি ঐ উত্তরাধিকার নেয়। ফলে, ইংরেজি ঐ মূল 'কম' শব্দ ও শব্দার্থ থেকে আরও দূরবর্তী হয়ে পড়ে। তবে একথা সত্য যে, অভিনব এই ধারণাটির উত্তরাধিকার সকলেরই নানা রূপে রয়েছে। ৬. ইংরেজি com-, sym- প্রভৃতি।

কঞ্জ : ১. কম্ + ✓জন্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কারীর সীমায়িত (সংক্ষিপ্ত) রূপ জনন করে যে।* / যাহা জলে জাত, যাহা মস্তকে জাত। (ব.শ)। ৩. ব্রহ্মা (জলে আরোপিত পরমাত্মার বীজরূপ স্বর্ণাণ্ড হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়।), কেশ, কমল, পদ্ম, রক্তপদ্ম, কোকনদ, অমৃত। কঞ্জ-কামিনী = পদ্মস্থিতা নারী, চণ্ডীদেবী, কমলে-কামিনী। কঞ্জনাভ = পদ্মনাভ, বিষ্ণু। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. মানুষের বাহ্যিক মাথায় বা শিরে যে 'কম্' জন্মায় তাকে বলে কেশ (= কঞ্জ); মানুষের মানসিক মাথায় বা মগজে যে 'কম্' জন্মায় তাকে বলে ব্রহ্মজ্ঞান (= কঞ্জ, এর নিম্নরূপকে মালিকানাবোধ বলে।), যার আধারকে ব্রহ্মা বলে। আর, বাহ্যিক জলে যে 'কম্' জন্মায় তাকে কমল (= কঞ্জ); এবং মানসিক জলে (জনসাধারণ্যে) যে 'কম্' জন্মায় তাকে বলে পদ্ম (= কঞ্জ, বহু পদ বা পাপড়িযুক্ত আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা)। সর্বোপরি, মানসিক জনসমুদ্রে যে 'কম্' জন্মায় তার নাম দেওয়া হয়েছে অমৃত (= কঞ্জ); কিন্তু বাহ্যিক সমুদ্রে তেমন কিছু জন্মানোর কথা পৃথকভাবে বলা হয়নি। তবে নিঃসন্দেহে সমুদ্রে জন্মায় এমন অনেক রত্নই আছে, নইলে তার নাম রত্নাকর হতে যাবে কেন।

কঞ্জুস (কঞ্জুঃ) : ২. *কঞ্জ নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে অন্ত রূপ নেয় যাহাতে।* / যে কণা চোষে, অর্থাৎ কণামাত্রও ছাড়ে না; যে খায় না বা খাওয়ায় না। (ব.শ)। ৩. কৃপণ। (ব.শ.)। ৪. miser বা 'কৃপণ' অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দটি নাকি হিন্দি থেকে এসেছে। তার মূলে নাকি কণ্ চুষ শব্দ রয়েছে। হতে পারে। তবে কঞ্জ-উস্ বা কঞ্জুঃ রূপে বুঝলেও একই অর্থ পাওয়া যায়। তাতে কঞ্জ নবরূপে উত্তীর্ণ (হতে পারে মুদ্রায় উত্তীর্ণ) হয়ে স্থির রূপ নেয়; কিছুতেই পুনরায় অস্থির তরল (লিকুইডেটেড) রূপে ফিরে যেতে চায় না। সেজন্যই এই সত্তাকে কৃপণ বলে।

কন্দর : ১. ✓কম্ + দৃ + অ (অপ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কম বিদারণ রহে যাহাতে (অনেকখানি কিংবা সম্পূর্ণ বিদারণ থাকে না যাহাতে)।* / যাহাকে জল বিদীর্ণ করে; যাহা দ্বারা হস্তিশির বিদীর্ণ হয়। (ব.শ.)। ৩. কৃত্রিম বা অকৃত্রিম পর্বতবিবর, দরী, কৃত্রিম বা অকৃত্রিম সজল বা নির্জ্জল গুহাকার পর্ব্বতনিতম্বদেশ, গুহা, গহ্বর, অঙ্কুশ, আর্দ্রক। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যাকে বেশি বিদারণ করা হয়নি, কম করা হয়েছে, তাকে বলে কন্দর। হাতির মাথায় যা দিয়ে আঘাত করা হয়, সেও অধিক বিদারণ করে না; সেকারণেই তাকেও কন্দর বলা হয়ে থাকবে। কিন্তু আদাকে কেন কন্দর বলা হয়, তা বোঝা কঠিন। সে কি খানিকটা আর্দ্র করে বলে? আমরা এখনও জানি না। দ্র. **কুঞ্জর**।

কন্দর্প : *যার দর্প কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।* / কম্ (কুৎসিত) দর্প যাহার; ব্রহ্মায় দৃপ্তবান যে, অথবা কে না দর্প করে। (ব.শ.)। ৩. কামদেব, ধ্রুববিশেষ। (ব.শ.)। কামদেবের অন্যনাম। ইনি প্রেম ও কামের দেবতা। এঁর জন্ম সম্বন্ধে নানা মত আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে ইনি ধর্ম্মের পুত্র। হরিবংশ অনুসারে ইনি লক্ষ্মীর পুত্র। অন্যমতে ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। কারও মতে ইনি জল থেকে উৎপন্ন বলে এঁর নাম ইবজা। অন্য কারও মতে ইনি আত্মভূ, সেইজন্য এঁকে অজ বলা হয়। পুরাণ মতে এঁর স্ত্রীর নাম রতি। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে, মহাদেব গভীর তপস্যায় মগ্ন হন। অপর দিকে হিমালয় গৃহে সতী পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করে মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করবার জন্য কঠোর তপস্যায় রত হন। দেবতাদের অনুরোধে কন্দর্প মহাদেবের মনে কামের ভাব উদ্রেকের জন্য বাণ নিক্ষেপ করে তপোভঙ্গের চেষ্টা করেন। এতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর তৃতীয় নেত্রের অগ্নিবর্ষণে কন্দর্পকে ভস্ম করেন। পরে দেবতাদের প্রার্থনায় মহাদেব বর দেন যে, কন্দর্প অশরীরী হয়েও পূর্বের মতো মানবদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবেন। মতান্তরে, স্বামীবিয়োগের পর স্ত্রী রতি মহাদেবের শরণাপন্ন হলে, তিনি বর দেন যে, বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করলে তাঁর ঔরসে কন্দর্পের পুনর্জন্ম হবে। সে কারণ, কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে ইনি আবার জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রদ্যুম্ন নামে পরিচিত হন। স্বর্গের অপ্সরাদের ইনি অধিপতি। মানবের অন্তঃকরণে কামভাবের উদ্রেক করাই কন্দর্পের কাজ। এইজন্য এঁর নাম মনোজ ও ভবজ। মহাদেব এঁকে ভস্ম করাতে এঁর নাম হয় অনঙ্গ। সুন্দর রূপের জন্য ইনি অভিরূপ। ব্রহ্মাকে সন্দীপিত করেছিলেন বলে কন্দর্প। কন্দর্পের অস্ত্র তীরধনুকের নাম কুসুমায়ুধ। পুষ্পশোভিত ধনু বলে এর নাম পুষ্পবাণ বা পুষ্পশর। এঁর পুষ্পরচিত পঞ্চশরের নাম — সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন। ইনি ত্রিলোকের মন মন্থন করেন বলে এঁর নাম মন্মথ। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এই সামাজিক সত্তাটি অনেকগুলি কাজ করত বলেই এর অনেকগুলি নাম। শঙ্করের সহায়তায় এর দর্প কমিয়ে, **মদনভস্ম** করে একে অশরীরী করে দেওয়া হয়। বলা হয়, ব্রহ্মাকে (বা জ্ঞানজীবীদের) সন্দীপিত বা সম্যক রূপে 'দীপিত' করেছিল বলে এর নাম কন্দর্প। কং বা কন দর্প যাহার তাকে কন্দর্প বলা যায়। সেক্ষেত্রে বুঝতে হয়, কর্ম জ্ঞানের দর্পই তো জ্ঞানজীবীর দর্প। তাই মদন বা কর্মপ্রেমকে কন্দর্প বলা হত। এই সত্তা মানুষের মনের ভিতরে থেকে তাকে এটা-সেটা কামনা করার জন্য প্ররোচনা দেয়, তাই এর নাম কামদেব। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে সেকালের সামাজিক ন্যায়নীতির থেকেই এই সত্তার জন্ম হয়েছিল। হরিবংশ অনুসারে এর জন্ম হয়েছিল সম্পদবানদের থেকে। অন্যমতে ব্রহ্মার বা জ্ঞানজীবীদের মন থেকেই এই কামনার জন্ম। কারও মতে জনসাধারণের (জলের) থেকে উৎপন্ন বলে এঁর নাম ইবজা। অন্য কারও মতে এই কামনা আত্মভূ, নিজে থেকেই জন্মেছিল, সেইজন্য

এঁকে অজ বলা হয়। পুরাণ মতে এঁর স্ত্রীর নাম রতি। আমরা জানি 'কর্মরত' থাকাকে রতি বলে। কিন্তু কামনা না থাকলে কর্মরত হওয়ার প্রশ্নই থাকে না। তাই কাম হল পুরুষ, রতি হল সেই একই ভাবের আধার, তাই কামের পত্নী রতি।

মহাদেবের কন্দর্পকে ভস্ম করে পরে পুনরায় বর দেওয়া ... ইত্যাদির অর্থ হল, আবিষ্কারক সত্তা (শিব) তাঁর অসম্মানের কারণে পুনরায় কর্মযজ্ঞের দায়িত্ব নিতে না চাইলে, তাঁর মনে কাম সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু এতে মহাদেব বিরক্ত হয়ে মদনকে ভস্ম করে দেন। শুরু হয় রতিবিলাপ। অর্থাৎ এরপর থেকে আসবে যাবে, কাজ করবে, কাজের দাম নেবে, কিন্তু কাম (কামনা) থাকবে না উৎপন্নের প্রতি, কাজের প্রতিও। আগের মতো 'কাজ ভাল লাগে বলে করবার রীতি' এখন থেকে আর চলবে না। চলবে নিষ্কাম প্রেম অর্থাৎ ভালবাসাহীন রতিক্রিয়া। অতএব জব স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে না, থাকবে কেবল রতিবিলাপ — tragos song (ode)-এর tragedy। এইরূপ ঘটনা না ঘটাতে পারলে ভারতসমাজে পণ্য উৎপাদন কোনোদিনই সম্ভব হত না। এবং বলে রাখা ভাল, সারা পৃথিবীর পণ্য উৎপাদনের সূত্রপাত এই ঘটনার পর থেকেই। দ্র. **অনঙ্গ**।

কম : কম্ ক্রিয়ামূলের অর্থ দ্রষ্টব্য।

কমণ্ডলু : ১. ক (জল) + ✓মণ্ড্ + অলু - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক-এর (দ্বারা সৃষ্ট বা সংগৃহীত) মণ্ড থাকে যাহাতে।* / যাহা জল দ্বারা মণ্ডিত হয়। (ব.শ.)। ৩. সন্ন্যাসীর বা ব্রহ্মচারীর মাটির বা কাঠের জলপাত্রবিশেষ, করঙ্ক, প্লক্ষবৃক্ষ, চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। ৪. অপ্র.। ৫. 'কারীর কর্মফলের নির্যাস থাকে যাতে' — 'কমণ্ডলু' শব্দটির এমন অর্থও করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে মানুষের অর্জিত জ্ঞানফলের আধার ও কর্মফলের আধার 'কমণ্ডলু' পদবাচ্য। তবে কর্মফলের আধার অর্থেই এর প্রয়োগ দেখা যায়। একালের ভাষায় 'ব্যক্তিগত-মানিব্যাগ' বা 'পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট'কে 'কমণ্ডলু' বলা যেতে পারে। সেকালে একে কুণ্ড, কুণ্ডিকা, **কুসুম্ভ**ও বলা হত। দ্র. **কুণ্ড, কুণ্ডলিনী, কুণ্ডীন**।

কমল : ১. কমল + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে। অথবা, ✓কম্ + অল (কলচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কম-এর লালন-লোপন থাকে যাহাতে।* / কমল যাহার উৎপত্তিস্থান রূপে আছে। (ব.শ.)। ৩. কমলযোনি, ব্রহ্মা, সারসপক্ষী, মৃগবিশেষ, ধ্রুবপদবিশেষ, ধুয়া, পদ্ম, রক্তপদ্ম, জল, তাম্র, ক্লোম (the bladder), ঔষধ। ৪. lotus অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কম, কঞ্জ, পদ**। পদ্ম (বা lotus) কে কমল বলে। তার কারণ হল, পদ্মে যেমন সাজানো পাপড়ি অঙ্কের নিয়মে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত থাকে, সমাজে জ্ঞানজীবীদের পদগুলিও সেইরূপ অঙ্কের নিয়মে বিন্যস্ত থাকে; অন্তত বৈদিক যুগের মধ্যাহ্নে নিশ্চয় সেরকম ছিল। সেই পদগুলিতে বসলেই বিশেষ বিশেষ মাপের অভীষ্ট লাভ করা যেত, এখনও কমবেশি লাভ করা যায়। এর ফলে **কম**-এর লালন হত। নগদ নারায়ণের নাভিপদ্মের এই পাপড়িগুলি না থাকলে জ্ঞানজীবীরা বসতেন কোথায়, তাঁদের অভীষ্টলাভ হত কীভাবে? সেই জন্যেই বলা হয় জ্ঞানজীবীরা (= ব্রহ্মা) হলেন কমলযোনি; আর কমল হল সেই পদসমূহের সুবিন্যস্ত রূপ।

কমলা : ১. কমল + আ। ২. *কমলের আধারশক্তি।* ৩. কমলাসনা লক্ষ্মী, বরাঙ্গনা, বরনারী, গঙ্গা, জম্বীরবিশেষ, কমলালেবু, ছন্দোবিশেষ। **কমলী** = হরিণী। (ব.শ.)। সমুদ্রমন্থনে অপ্সরাদের উদ্ভব হবার পর চতুর্দিক আলোকিত করে বিদ্যুৎমালার মতো দেবী কমলা সমুদ্রগর্ভ হতে উত্থিত হন। ইন্দ্র তাঁকে অভ্যর্থনা করে উৎকৃষ্ট আসনে বসান। পৃথিবী তাঁকে অভিষেকোপযোগী সর্বপ্রকার ওষধি দান করেন। অতঃপর ঋষিরা এঁকে অভিষেক করেন এবং দেবী কমলা গন্ধর্ব, সিদ্ধ, অসুর, যক্ষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে নিজের অনুরূপ আশ্রয় না পেয়ে দেবশ্রেষ্ঠ মুকুন্দকেই বরণ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. কমলের আধারশক্তি বা সমাজের rank and file নানা সময়ে নানা জনের হাতে থেকেছে। কখনো সে সমাজের ধনী মানুষের দায়িত্বে চলেছে, তখন **কমলা** ছিলেন লক্ষ্মী; আবার কখনো তা সমাজের বিদ্রোহী নতুন শ্রেণীর হাতে চলে গেছে, তখন **কমলা** হয়েছেন **চণ্ডী**।

কান্ত (কান্তা) : ১. ✓কম্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***কাম*** *তারিত হয় যাহাতে (যাহার প্রতি)।* / (যাহা) কামিত (হয়)। (ব.শ.)। ৩. অভীষ্ট, বাঞ্ছিত, মনোজ্ঞ, তর্পণ, প্রীতিকর, চিত্তশ্রুতি-সুখকর ও রসযুক্ত, রমণীয়, পতি, স্বামী, প্রিয়, দয়িত, মাধব, চন্দ্র, বসন্ত, হিজ্জলবৃক্ষ, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিকেয়, মণি, অধিপতি, রাজা, কুঙ্কুম, লৌহ, কান্তিলোহা। কান্তা = কান্তিমতী স্ত্রী, সুন্দরী, পত্নী, পৃথিবী, গঙ্গা, প্রিয়ঙ্গু, বড়এলাচ, নাগরমুস্তা, রেণুকা ওষধি। (ব.শ.)। ৪. নাম ও নামের মধ্যবর্তী পদ হিসেবে প্রচলিত এখনও কমবেশি প্রচলিত, অন্যথায় অপ্রচলিত। ৫. কম্ থেকে কান্ত বা কান্তার শব্দটি তৈরি হয় একটি ধাপ পেরিয়ে। ব.শ. ঠিকই বলেছেন — যাহা 'কামিত' হয়, সেই কান্ত; তা সে অভীষ্ট থেকে শুরু করে রেণুকা ওষধি পর্যন্ত যে কেউ হতে পারে। অর্থাৎ যাকে কাছে পাওয়ার ইচ্ছা (**কম**) হয়, তাকেই **কান্ত** বলে। তবে আধুনিক বাংলাভাষা পুরনো 'কান্ত' শব্দটিকে অবহেলা করতে গিয়ে এমনই এক মুশকিলে পড়েছে যে, তার সামনে একটি মাত্র পথ খোলা থেকেছে। তা হল — 'মানুষের নাম শব্দের কোনো মানে নেই', এই সিদ্ধান্ত সজোরে ঘোষণা করা এবং তাই মেনে চলা।

আমাদের পূর্বপুরুষরা নাম রাখতেন 'রজনীকান্ত সেন', 'রমাকান্ত দাস' ইত্যাদি। ইয়োরোপ এসে বলল, এসব কী! নাম হবে তিন খণ্ড John Stuart Mill, Thomas Babington Macaulay, Percy Bysshe Shelley (P. B. Shelly)। দেখাদেখি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়রাও লিখলেন বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, B.C.Chatterjee। রবীন্দ্রনাথ এই পাশ্চাত্যগামিতায় রাজি হননি। তাতে কী! বাকি প্রায় সব আধুনিকতাবাদীই নিজ নিজ নামকে ত্রিধা-বিভক্ত করে ত্রিখণ্ডী হয়ে গেলেন। ফল যা হবার তাই হল। রজনীকান্ত-এর মানে ছিল 'রজনী কর্তৃক অভিলষিত' অর্থাৎ চাঁদ। কিন্তু তাকে রজনী কান্ত করে দিতে রজনীর সঙ্গে কান্তের সম্পর্ক থাকল না; যেন-বা দুটো নাম — রজনী সেন এবং কান্ত সেন। এই অর্থহীনতা কিছুদিন পরে

নিজেদেরই সহ্য হল না। তখন কান্তটিকে বাদই দিয়ে দেওয়া হল। রজনীকান্ত সেন হয়ে গেল রজনী সেন। বাবা-মা নাম রেখেছিলেন 'অন্ধকার কর্তৃক অভিলষিত আলোময় চন্দ্র' অর্থে। ইয়োরোপের প্রভাবে আমরা তাকে দাঁড় করালাম 'অন্ধকার সেন'-এ। কোনো কোনো মান্য এবং সৎ কিন্তু কট্টর মৌলবাদী-আধুনিকতাবাদী, এর মধ্যে অশীন দাশগুপ্তর বাবার মতো ভালমানুষও ছিলেন, মনে করতেন, নামের আবার মানে থাকবে কেন? নাম হতে হবে অর্থহীন একটি চিহ্নমাত্র। আওয়াজের ভিতরে মানে রাখার বহুকালক্রমাগত স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মের উত্তরাধিকার যে দুনিয়ার সব জাতির ভাষাতেই রয়েছে, সেই সত্যই তাঁরা তাঁদের পাশ্চাত্যগামিতার কারণে ভুলে গিয়েছিলেন। নিজের ছেলের নাম রাখতে গিয়ে অনেক ভেবে ভেবে রেখেছিলেন 'অশীন'। তাঁর ধারণা ছিল, 'অশীন' কথাটার কোনো মানে হয় না। এর মধ্যে কোথাকার এক সংস্কৃতপড়ুয়া খুঁজে খুঁজে 'দেশ' পত্রিকায় লিখে দিলেন, 'অশীন' কথাটা অর্থহীন নয়, তারও মানে আছে। অশীনবাবুর বাবা ভারি বিরক্ত হলেন। তাঁর সাধের অর্থহীন চিহ্নের ভিতরেও তাহলে অর্থ রয়েছে! বাংলাভাষাটা আচ্ছা বেআক্কেলে! এর ডাল কেটে সাধের বাগানে শুকনো বেড়া দেওয়া যায় না, বেড়ার যে-অংশ মাটিতে ঠেকে থাকে, তাতেই শিকড় গজিয়ে সেই বেড়াটাও গাছের সারিতে পরিণত হয়ে যায়। এ ভাষা অবশ্যই পরিত্যাজ্য!

কান্তার : ১. কান্ত + ✓ঋ গতি + অ - ক। (ব.শ.)। ২. *কান্তাসমূহ (যাকে কামনা করা হয়, তাহার আধারসমূহ) রহে যাহাতে।* / যাহা সুখের অন্তকে প্রাপ্ত হয়। (ব.শ.)। ৩. মহারণ্য, অরণ্যানী, গহনত্ব হেতু দুষ্প্রবেশ, দুর্গম বর্ত্ম, চৌরকণ্টকাদি-হেতু বিপদসঙ্কুল মার্গ, বিল, গর্ত্ত, ইক্ষুবিশেষ, বাঁশ, কোবিদার বৃক্ষ, উপসর্গ, রোগলক্ষণ, পদ্মবিশেষ। ৪. অপ্র.। ৫. **কান্তার** শব্দটি বুঝিবা সম্পূর্ণ অপ্রচলিত হয়ে যেত যদি নজরুল 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' কবিতাটি না লিখতেন। এর মানে ছিল আমাদের 'কাঙ্ক্ষিত বিষয় ও বস্তুগুলি যেখানে থাকে', তা সে গিরিগুহা হোক আর মহারণ্যই হোক।

কাম (কামনা, কামনা-বাসনা) : ১. ✓কম্ + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **কম** *(কাছে পাওয়ার ইচ্ছা) থাকে যাহাতে।* / যে ইচ্ছা করে; যে সুরতেচ্ছা উৎপাদন করে। (ব.শ.)। ৩. ইচ্ছু, অভিলাষী, ইচ্ছা, অভিলাষ, তৃষ্ণা, ভোগেচ্ছা, মাল্যচন্দনাদির স্পর্শে ও স্বর্ণাদির লাভে উপজাত প্রীতি, কাম্য, কামনার বিষয়, ইন্দ্রিয়ার্থ, ভোগ্যমাত্র, ইপ্সিত, অনুরাগবিশেষ, সুরতেচ্ছা, শ্রোত্রাদির স্ব স্ব বিষয়ে অনুকূল প্রবৃত্তিরূপ পুরুষার্থবিশেষ, মদন, বিষ্ণু, মহাদেব, বলদেব, রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন, আম্রবিশেষ, মহারাজচূত, বীজবিশেষ, অভীষ্ট দ্রব্য, রেতঃ, বীর্য্য, তীর্থবিশেষ। **কামা** = ইচ্ছা, তৃষ্ণা। (ব.শ.)। দ্র. **কম**, **কামদেব**। ৪. sexual desire অর্থে প্রচলিত। ৫. কম্ শব্দ-পরিবারে 'কামনা' শব্দটি বাংলাভাষার নিজস্ব সৃষ্টি। এর অর্থ হল, **কাম** অন থাকে যাহাতে, তাই **কামনা**। অন্যে কাছে আসুক, এসে আমার সঙ্গে মিশে যাক, এই ইচ্ছা অন থাকলে তাকে **কামনা** বলে। কিন্তু অন্যের কাছে যাওয়ার এবং গিয়ে তার ভিতরে থাকার ইচ্ছাকে কামনা বলে না, বলে বাসনা। দ্র. **বাসনা**। ৬. ইংরেজি come, জারমান Kommen।

কামদেব : ১. কাম + দেব। ২. *(মানুষের মনে) কাম দেন যে সত্তা।* ৩. দেবতা কাম, মদন, কাম্যদেব বিষ্ণু, শিব। (ব.শ.)। প্রেমের দেবতা। কামের জন্ম সম্বন্ধে অথর্ববেদে দেখা যায় যে, সেখানে কাম অর্থে যৌনাকাঙ্ক্ষা নহে — সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই কাম। কাম সেখানে শ্রেষ্ঠ দেবতা বা স্রষ্টা বলে পূজিত হয়েছেন। বিভিন্ন পুরাণে কাম সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণে আছে, ব্রহ্মার হৃদয় হতে কামদেবের জন্ম। ব্রহ্মা নিজে তাঁর শরে জর্জরিত হয়ে নিজ কন্যা শতরূপাকে গ্রহণ করেন। এইজন্য ব্রহ্মা কামদেবের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেন যে, তিনি মহাদেব কর্তৃক ভস্মীভূত হবেন। পরে কামদেবের কাতর প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে ব্রহ্মা বলেন যে, কাম প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে ও পরে ভরতবংশে জন্মগ্রহণ করবেন। তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণে কাম ধর্ম ও শ্রদ্ধার পুত্র এবং হরিবংশে লক্ষ্মীর পুত্র মায়ী বলে উল্লিখিত (মায়া সূত শ্রীনন্দন)। শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সতীর দেহত্যাগ, উমা রূপে জন্ম ও মহাদেবের তপোভঙ্গের উদ্দেশ্যে কামদেবের মদনরূপে বাণ নিক্ষেপ প্রভৃতি বর্ণনা রয়েছে। ... মহাদেবের বরে তিনি প্রদ্যুম্নরূপে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধ ও কন্যা তৃষ্ণা। রতি অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার দেবী কামদেবের স্ত্রী। কামদেবের নাসিকা সুচারু, উরু, কটি ও জঙ্ঘা সুবৃত্ত; কেশ নীল ও কুঞ্চিত। বক্ষ সুবিশাল, এবং চক্ষু, মুখ, পদতল ও নখ আরক্তবর্ণ; গাত্রে বকুলের সৌরভ। মকর এঁর বাহন, ইনি পুষ্পময় পঞ্চশর ও কুসুম-কার্মুকে শোভিত। কামদেবের নামের নামের বিবরণ এইরূপ — ব্রহ্মা ও অন্যান্য মুনিদের চিত্ত মথিত করিতেছিলেন বলে এঁর নাম 'মন্মথ'। জগতের সমস্ত লোককে মত্ত করতেন বলে ইনি 'মদন' নামে অভিহিত। মহাদেবের দর্প চূর্ণ করেছিলেন বলে এঁর অপর নাম 'কন্দর্প'। মহাদেব কর্তৃক ভস্মে পরিণত হওয়ায় এঁর নাম 'অনঙ্গ'। ইনি 'অভিরূপ' অর্থাৎ সুন্দর। অন্য নাম 'কলকেলী', কারণ তিনি উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক, শৃঙ্গারযোনি। পতাকাহেতু এঁর নাম হয়েছে 'মকরকেতু'। হস্তে পুষ্প আছে বলে এঁর নাম 'পুষ্পকেতন'। এতদ্ব্যতীত এঁর আরো নাম আছে, যথা — আজ, অনন্যজ, ইধ্ম, কঞ্জন, কিঙ্কিন, মদ, রম, রমণ, স্মর, মনোজ, দর্পক, দীপক, মার, মধুদীপ। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পরমাপ্রকৃতি জীবের জন্ম দিলেন বটে কিন্তু তাকে পূর্ণতা দিলেন না, পূর্ণ হওয়ার ইচ্ছা দিয়ে ছেড়ে দিলেন — বাছারা, যতটা পারলাম করলাম, বাকিটা তোমরা যে যার করে নিয়ো! ব্যস! এবার জীবমাত্রই ছুটে মরে! নিজেকে পূর্ণ করার জন্য যা যা প্রয়োজন সেগুলিকে চাই, তাদের আয়ত্ত করা চাই, দখল করা চাই, অঙ্গীভূত করা চাই। জীবমাত্রের এই যে ইচ্ছা, একে **কাম** বলে। কিন্তু এ তো গেল জাগতিক কাম। মানুষ তো 'আপনি আর কপ্‌নি' সম্বল নয়, তার একটা সমাজ আছে, সে যে জন্মসূত্রেই ঝাঁক জানোয়ার। অতএব, সব মানুষের ইচ্ছা বা সামাজিক **কাম** বলেও একটা কথা হয়। যে কাম সত্তা মানুষকে, মানুষের সমাজের প্রতিটি সদস্যকে তাদের ইচ্ছানুরূপ অভীষ্ট দেন, সেই কামদেবেরও জন্ম হতে হল।

মানুষের ইতিহাস অনুসারে এই কামদেবের জন্ম মানবসমাজে নিয়োগপ্রথার উদ্ভবের আগেই। মানুষ তখন কর্মে রত হত আবেগে, প্রেমে। কর্মপ্রেমকে তখন বলা হত **কাম** বা মদন এবং কর্মরত হওয়াকে বলা হত **রতি**। কর্মপ্রেমকে ভস্মীভূত করে বা মদনভস্ম করে নিয়োগপ্রথার সূত্রপাত হয় — 'আসবে, যেমন নির্দেশ দেওয়া হবে তদনুসারে কাজ করবে, সেই শ্রমের দাম নিয়ে চলে যাবে; কর্মফলে তোমার কোনো অধিকার নেই'। এর ফলে কর্মের প্রতি কর্মীজনগণের প্রেম থাকে না, চলতে থাকে ক্লান্তিকর রতিবিলাপ। এই কামদেবকে আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা মানুষের সমাজে 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' এক অতি শক্তিশালী সত্তা রূপে শনাক্ত করেছিলেন। মানুষ কাঙ্ক্ষিত বিষয় বা বস্তুর জন্য নানা কিছু করত, কিন্তু সেই সব মানুষকে হিসেবে ধরতেন না আমাদের প্রাচীন জ্ঞানী মানুষেরা। তাঁরা সেই সত্তাটিকে হিসেবে ধরে তার কথাই বলতেন, যে 'কাম' সত্তাটি সব মানুষকে দিয়ে ঐ সব কর্মকাণ্ড ঘটাচ্ছে। সেই জন্য আমাদের ইতিহাসে কামদেবের অত নাম, অত কাহিনী। পাশ্চাত্যের ইতিহাস বর্ণনায় ব্যক্তিকে কর্মকাণ্ডের কারক ধরে তার সম্পর্কে নানা কথা লেখা হয়। আমাদের তেমন প্রথা ছিল না। আমাদের ইতিহাস বর্ণনায় ব্যক্তির ও ব্যক্তিসমূহের অভ্যন্তরে স্থিত, অদৃশ্য, কিন্তু সক্রিয় সত্তাটিকেই কর্মকাণ্ডের কারক ধরে তার তার সম্পর্কে নানা কথা লেখা হয়েছে। উপরোক্ত কামদেবের কাহিনী সেই ইতিহাসই বটে। দ্র. **কন্দর্প**।

কামধেনু : ১. কাম + ধেনু। ২. *যে ধেনু (জনগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়) কাম (তাদের পরিচালক মহর্ষির কামনা) অনুসারে দুধ (নির্দেশিত বস্তু উৎপাদন করে) দেয়। /* যে ধেনু কাম প্রদান করে। (ব.শ.)। যে গাভী ইচ্ছাপূরণ করে। তার কাছে যা প্রার্থনা করা যায়, তাই পাওয়া যায়। (পৌ.অ.)। ৩. কামপ্রদা ধেনু, অভীষ্টদাত্রী স্বর্গধেনু, সুরভিসুতা রোহিণীর কন্যা ধেনু (শূরসেন ইহার পিতা ও শিববাহন বৃষ ইহার পুত্র), সুরভিসুতা বশিষ্ঠ-ধেনু নন্দিনী বা শবলা, কামধেনুতুল্যা অভীষ্টদাত্রীমাত্র, দানার্থ স্বর্ণময়ী অভীষ্টপ্রদা ধেনু। (ব.শ.)। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা সুরভির গর্ভের রোহিণীর জন্ম হয়। শূরসেন হতে রোহিণীর ক্ষেত্রে কামধেনুর উৎপত্তি। বশিষ্ঠের 'সবলা' কামধেনু ছিল। রাজা বিশ্বামিত্র একে গ্রহণ করবার চেষ্টা করে অবশেষে পরাজিত হন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ইতিহাসে দুরকম ব্যবস্থার কথা জানতে পারা যায়, যার কাছে ইচ্ছাখুশি প্রার্থিত বস্তু লাভ করা যেতে পারত — **কল্পতরু** ও **কামধেনু**। কল্পতরু হল ব্যবস্থা, বৃক্ষ বা গাছ। কিন্তু কামধেনু হল জীব, গাভী। তবে এ-ও কামনা-মতো বস্তু প্রদান করতে পারত। এ হল সম্প্রদায়, এক জনগোষ্ঠী, যারা নিজেরা নিজেদের তিনটে অধিকারই (জগতের উপর অধিকার, সমাজের উপর অধিকার, নিজের উপর অধিকার) মহর্ষিকে 'সম্প্রদান' করে দিয়েছিল এবং নিজেরা পরিণত হয়েছিল 'সম্প্রদায়'-এ। এঁরা অতঃপর তাঁদের পরিচালক মহর্ষির অভিলাষ মতো বস্তু উৎপাদন করে দিতেন, পরিবর্তে মহর্ষি তাঁদের সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতেন। বলতে গেলে, এই সামাজিক ব্যবস্থার শুরুতে, মহর্ষিরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য প্রাণ দিতেও দ্বিধা করতেন না। সেই কারণে এই সম্প্রদায়গুলিও নিজ নিজ মহর্ষির জন্য করত না হেন কাজ ছিল না। দ্র. **নন্দিনী**।

কামরূপ : ১. কাম + রূপ। ২. যাহার কাম অনুসারে রূপ; যাহার রূপ কমনীয়; যাহার বিগ্রহ (তাহার) ইচ্ছার অধীন। (ব.শ.)। ৩. সুরূপ, সুদর্শন, যথেচ্ছরূপধারী, দেশবিশেষ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (ইহা আসামের পশ্চিমে অবস্থিত। এইখানে কামগিরিতে যোনিপীঠ আছে; রক্তপাষাণরূপিণী কামাখ্যা দেবী ইহার অধিদেবতা, ভৈরব উমানন্দ, ইহা একান্নপীঠের একতম; এই স্থানে সতীর যোনিমণ্ডল পতিত।), কামরূপবাসীগণ, দেবতা, ইচ্ছাধীন রূপ, বিশ্বামিত্রের অস্ত্রবিশেষ। কামরূপিণী = অতি শোভন, সুন্দর, স্বেচ্ছাকৃত রূপধারী, নানামূর্ত্তিধর। কামরূপী = বিদ্যাধর, গন্ধমার্জ্জার, বিড়াল। (ব.শ.)। ৪. আসামস্থ একটি স্থাননাম রূপে প্রচলিত। ৫. **ধর্ম্মারণ্য, প্রাগজ্যোতিষপুর, কামরূপ** — তিনটিই আসাম প্রদেশটির প্রাচীন নাম। এই কামরূপ শব্দের অর্থ — কামানুসার রূপ যাহার, এবং কমনীয় রূপ যাহার। প্রথম অর্থটি সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভালো কিন্তু বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গিতে খারাপ। তাই সনাতনবাদীরা এঁদের 'ইচ্ছাধীনবিগ্রহ', 'সুরূপ', 'সুদর্শন' ইত্যাদি বলে প্রশংসা করেন, আর বেদবাদীরা এঁদের 'যথেচ্ছরূপধারী', 'অতিলোভন', 'যথেচ্ছাকার' ব'লে নিন্দা করেন। কারণ, এই মানুষেরা 'সর্ব্বলিঙ্গী'; যে-কাজ ক'রে জীবন নির্বাহ করা উচিত মনে করেন সে-কাজই তাঁরা করে থাকেন; তাঁরা বেদবিহিত 'ধর্ম্মপথে' হাঁটে না, বেদবিধিতে যার যেরূপ 'নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম'-এর বিধান দেওয়া হয়েছে তা মান্য করেন না। এঁরা স্বভাবতই 'তির্য্যকস্রোতাঃ' অর্থাৎ 'ইহাদের আহার-সঞ্চার তির্য্যক', বেদবিহিত সোজা (?) পথটি ধরে এঁরা হাঁটেন না। তাই এঁরা নিজ নিজ ইচ্ছাধীন, যে-কাজ জোটে, ইচ্ছা হলে তাঁরা তাই করে থাকেন, অর্থাৎ এঁরা 'সর্ব্বলিঙ্গী' বা 'পাষণ্ড' পদবাচ্য। মনে রাখা ভালো বেদবাদীদের সঙ্গে সনাতন-পন্থীদের শেষ যে-বিরোধ ঘটেছিল, তাতে বেদবাদীরা সনাতনপন্থীদের এইরূপ 'পাষণ্ড' হয়ে থাকার অভিশাপ দিয়েছিলেন। ভাগবত তার সাক্ষী। এই সেই কারণ যার জন্য কারও চোখে 'কামরূপ' ভালো, কারও চোখে মন্দ।

কিন্তু আজ তো আর বেদবাদীদের সেই 'সোজা পথ'টি ধরে নিজেদের হাঁটার এবং অন্যদেরকে হাঁটানোর দিন নেই। তাঁদের অবস্থা এতই খারাপ যে, মধ্যপ্রদেশের 'কাশ্যপ'রা কিছুদিন আগেই আন্দোলন করেছিলেন, ভারত সরকার যেন তাঁদের ওবিসি করে দেন। বলতে গেলে এখন সবাই 'তির্য্যকস্রোতাঃ', কেউই বেদবিহিত চাকরি করে জীবন কাটানোর স্বপ্ন পর্যন্ত দেখেন না, যে যা কাজ পান, তার ভেতর থেকে নিজের ইচ্ছাখুশি কাজ নির্বাচন ক'রে তাই করেই প্রাণ বাঁচান। এখন সবাই কামরূপী, কিংবা কামরূপী হতে চান, তবে কিনা যা দিনকাল পড়েছে কামানুসার রূপই খুঁজে পাওয়া যায় না; জীবিকার আজ বড়োই আকাল! দ্র. **পীঠ**।

কামলা : ১. কাম + লা। ২. *কাম (কর্ম্ম) রূপ অভীষ্ট দেয় যে।* / যে কারুকর্ম্ম করে। (ব.শ.)। ৩. শিল্পী, পাণ্ডুরোগ, ন্যাবা। মজুর। (ব.শ.)। ৪. labour বা সাধারণ কর্মচারী অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত।

৫. সাধারণ কর্মীদের কামলা ও তাদের ওপর দেখভাল করার কর্মচারীদের আমলা বলা হত; অর্থাৎ কথাটি ছিল 'আমলা ও কামলা'। জমিদারেরা আমলা ও কামলাদের নিয়োগ করতেন।

কামসূত্র, কামশাস্ত্র : ১. কাম + সূত্র, শাস্ত্র। ২. *যে গ্রন্থে কামকাজের (বা কাম্য কর্ম্মের) সূত্র লিপিবদ্ধ আছে।* ৩. কামসম্বন্ধী সূত্র, কামব্যাপারবিষয়ক সংক্ষেপ গ্রন্থ, মন্মথেচ্ছার সূচক, কামশাস্ত্র। প্রজাপতি প্রজার স্থিতির নিমিত্ত লক্ষাধ্যায়ে বিভক্ত ত্রিবর্গ-সাধন শাস্ত্র প্রকাশ করেন। নন্দী সহস্রাধ্যায়ে বিভক্ত পৃথক কামসূত্র প্রণয়ন করেন। শ্বেতকেতু পঞ্চ শত অধ্যায়ে ঐ কামসূত্রের সংক্ষেপ করিলে, পাঞ্চাল বাভ্রব সপ্তাধিকরণে সার্দ্ধ শত অধ্যায়ে উহারই পুনঃ সংক্ষেপ করেন। পরে ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য খণ্ডে খণ্ডে কামসূত্র প্রণয়ন করিলে, বাৎস্যায়ন সকলের সারসঙ্কলনপূর্ব্বক কামসূত্র রচনা করেন। (ব.শ.)। ৪. a book of sexology অর্থে 'কামসূত্র' বা 'কামশাস্ত্র' কথা দুটি প্রচলিত। ৫. যে-গ্রন্থে সব রকমের কাম্য কর্ম্মের বা কামকাজের সূত্র রয়েছে, তাকে কেবল মাত্র sexual activity সংক্রান্ত গ্রন্থ বলে দিলে, যে-ক্ষতি হতে পারে এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বস্তুত বাৎস্যায়ন ছিলেন সেকালের Productivity Council-এর পরিচালকেরা এবং তাঁদের রচিত 'কামশাস্ত্র' ছিল প্রাচীন ভারতে ম্যানেজমেন্টের একখানি গ্রন্থ। তাতে এমনকি কর্মীদের কতখানি বিদ্যা বা কলাকৌশল জানা থাকা উচিত তারও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। বিষয়টির ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে (ঙ) গ্রন্থের 'ভাষায় ঔপনিবেশিকতা : প্রাচীন ভারতে ম্যানেজমেন্ট ও বাৎস্যায়নের কামসূত্র' নিবন্ধটিতে। দ্র. **কলা**।

কামাত্মা (কামাত্মন্) : ১. কাম + আত্মা, আত্মন। ২. কাম বা কামে আত্মা যাহার। (ব.শ.)। ৩. যাহার মন কামপ্রধান, কামনাপরায়ণ, কামনাকুলচিত্ত, কামাসক্ত, কামার্ত্ত, বিষয়াভিলাষী, কামময়, কর্ম্মফলাভিলাষশীল। (ব.শ.)। ৪. কেবলমাত্র lustful অর্থে কদাচিত প্রচলিত। ৫. satisfaction কথাটির অর্থ তৃপ্তি। তৃপ্তি মানুষের তখনই হয় যখন তার ক্ষুধা থাকে। ক্ষুধা না থাকলে তৃপ্তি হতে পারে না, হয় না। job-satisfaction-ও তখনই হতে পারে যখন কর্মক্ষুধা থাকে। পাশ্চাত্য এই কর্মক্ষুধাকে চেনে না, যদিও job-satisfaction-কে চেনে। প্রাচীন ভারত 'কর্মক্ষুধা'কে সম্পূর্ণভাবে চিনেছিল। আর, সে-ক্ষুধা কেবল sexual-কর্মক্ষুধা নয়, সর্বপ্রকারের কর্মক্ষুধাই, এবং বলতে গেলে প্রাচীন ভারতের বিচারবুদ্ধিতে sexual-কর্মক্ষুধা ছিল তুলনায় নগণ্য। অথচ একালে সেই sexual-কর্মক্ষুধাই একমাত্র কর্মক্ষুধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বাকি সবরকমের non-sexual-কর্মক্ষুধাকে 'অ্যাকাডেমিক'-মনোলোকের এলাকা থেকে সম্পূর্ণ রূপে বর্জন করে দেওয়া হয়েছে; যদিও বাস্তবে সেই non-sexual-কর্মক্ষুধা, তার জ্বালা, তার আগুন সবই অত্যন্ত সক্রিয়, তা আদৌ লুপ্ত হয়ে যায়নি। তবে কিনা সেই সকল non-sexual-কর্মক্ষুধার মর্যাদা গেছে কমে। তাই, একালে সেরকম non-sexual-কর্মক্ষুধার্ত মানুষকে লোকে 'কাজপাগলা', 'ভোলানাথ' ইত্যাদি বলে থাকে। অবশ্য তেমন মানুষকে এখনও কেউ কেউ 'কাজের মানুষ', 'কর্মবীর', 'কর্মনিষ্ঠ' ইত্যাদিও বলে থাকেন। বলতে গেলে এখনও তাঁদের কাঁধে ভর দিয়েই মানুষের সমাজ চলছে। তবে, বঙ্গীয় শব্দকোষকারকে আমাদের আবারও ধন্যবাদ জানানো উচিত। এই কামাত্মারা যে lustful নয়, তাঁরা সামাজিক উৎপাদন কর্মের প্রতি আসক্ত — একথার প্রমাণস্বরূপ কামাত্মা শব্দটির তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ দিয়ে গেছেন — 'বিষয়াভিলাষী' ও 'কর্ম্মফলাভিলাষশীল'। এই দ্বিতীয় অর্থটি তিনি দিয়েছেন মনুসংহিতা থেকে। মনে রাখা ভালো, মনুসংহিতাকে সামাজিক রীতিনীতি নিয়ে কাজ করতে হত। তার যা-খুশি তাই লেখার উপায় ছিল না। যে ব্যক্তি ভালোবেসে কাজটি করছে, তেমন কামাত্মা ব্যক্তি তো কর্ম্মফলাভিলাষশীল হবেই। তাকে ঠেকাতে বা আটকাতে না-পারলে কর্ম্মফলে সে ভাগ চাইতে পারে। তাই, তেমন কর্ম্মাভিলাষশীলদের সেই কর্ম্মাভিলাষকে বা **মদন**কে ভস্ম করে দিতে হয়, ঘোষণা করে দিতে হয় — 'আসবে, যেমন নির্দেশ দিচ্ছি তেমন কাজ করবে, পরিশ্রমের দাম নেবে, চলে যাবে, কর্ম্মফলে তোমার কোনো অধিকার নেই! কর্ম্মফলাভিলাষী হওয়া বা কামাত্মা হওয়া ভালো নয়।' ব্রাহ্মণ যখন 'সমুদয় সম্পত্তি পাইবার যোগ্য', 'পৃথিবীর মালিক', তখন যাদের নিয়োগ করা হচ্ছে তাদের কর্ম্মফলাভিলাষ সেকারণেই নিয়োগকর্তাদের পক্ষে ক্ষতিকর ছিল। অগত্যা মদনভস্ম করতে হয়, কেবল রতিবিলাপ চলতে দেওয়া হয়। 'পণ্য' উৎপাদন প্রথার উদ্ভবের রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যায়। স্বভাবতই, মদনভস্মের পরবর্তীকালে কামাত্মা শব্দটি তাই নিন্দনীয় হয়ে যায়। বলে রাখা ভাল, মার্কস সাহেব যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উপর নির্ভর করে তাঁর মার্কসবাদ প্রস্তুত করেছিলেন, তার গোড়ায় 'অ্যাকিলিস হিল' বা 'দুর্যোধনের উরু' রূপে থেকে গিয়েছিল উপরোক্ত মদনভস্ম বিষয়ে অজ্ঞতা। মদনভস্ম বা কর্মীর কামনাকে ভস্ম করে দিতে পারার পরই যে মানুষের সমাজে commodity production-এর সূচনা করা গিয়েছিল, তা তিনি জানতেন না। প্রাচীন ভারত দুনিয়ার সকল জাতির চেয়ে আগেই এই মদনভস্ম করে দিয়ে পণ্য উৎপাদন করতে পেরেছিল। যদিও তার ফল খুব ভাল হয়েছে, তেমন কথা বলা মুশকিল।

কামিন, কামিনী : ২. *কাম-এর (কর্ম্মের) আধার যে শক্তিরূপিনী; কামকাজ করার জন্য যে-নারীকে নিয়োগ করা হয়।* ৩. কামাতিশয়-যুক্তা, অনুরাগিনী স্ত্রী, সুন্দরী, ভীরু স্ত্রী, স্ত্রীমাত্র, দারুহরিদ্রা, সুরা, মদিরা, বন্দা, পরগাছা, চক্রবাকী, পারাবতী, চটকা, সারসী। পত্নী, দয়িতা, প্রিয়া, নায়িকা, পশুর স্ত্রীজাতি, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. 'কামিন' কথাটি স্ত্রী-মজুর অর্থে গ্রামবাংলায় এখনও প্রচলিত। 'কামিনী' কথাটি 'পুষ্পবৃক্ষবিশেষ' অর্থে প্রচলিত এবং কদাচিৎ 'সুন্দরী স্ত্রীলোক' অর্থে প্রচলিত। ৫. কামিন বা কামিনী শব্দটির এখন যে-ব্যবহার বাংলাভাষায় প্রচলিত, তাতে কর্মের সঙ্গে শব্দটির সম্পর্ক অনেক বেশি, lust-এর সঙ্গে শব্দটির সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

কাম্যক : ১. কাম্য + ক। (ব.শ.)। ২. *কামনা পূর্ব্বক (উৎপন্ন) করা হয় যাহাকে।* ৩. ফলকামনাপূর্ব্বক বিহিত করণীয়, ফলাসক্তি-পূর্ব্বক কৃত কর্ম্ম, ফলোদ্দেশে কৃত যজ্ঞজপাদি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সরস্বতী-তীরস্থিত কমনীয় বনবিশেষ। (ব.শ.)। কাম্যক বনের রাক্ষস ছিল

কির্ম্মীর ও বক। ভীমসেন তাদের হত্যা করেন। (পৌ.অ.)। দ্র. **কির্ম্মীর, বক**। ৪. অপ্র.। ৫. বন শব্দের অর্থ সংসার অরণ্য। দ্র. **অরণ্য**। বৈদিক যুগের সূত্রপাতের কিছুকাল পরে, ফলাসক্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম করা বেদবিহিত ছিল না, কারণ 'মা-ফলেসু কদাচন' ততদিনে ঘোষিত হয়ে গেছে, মদনভস্ম হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও যদি কামনা করে উৎপাদন করা হয়, সে-সংসার বা সেরকম উপবন হয়ে গেল **কাম্যক**বন এবং তা ঠিক ঠিক শুক্ল (white) হল না, কৃষ্ণ (black) -ও হল না, হয়ে গেল শবল (gray)। এই gray-money-কে কিছুদিন আগেও চিনতে অসুবিধে হত, কিন্তু কর্পোরেট ক্যাপিটাল সম্প্রতি তা আমাদের চাক্ষুষ করিয়েছে। ভারতে কিন্তু শবল-অর্থের আবির্ভাব বহু প্রাচীন কালেই। আর, তা যারা উপার্জ্জন করত তারা রাক্ষস নামে নিন্দিত ছিল। তাই কাম্যক বনে কির্ম্মির রাক্ষস, বক রাক্ষসের আধিপত্য।

কাম্যকর্ম্ম : দ্র. **কর্ম্ম**।

'কম্প্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকম্প, অকম্পন, অকম্পিত, অবিকম্প, আকম্প, আকম্পন, আকম্পিত, আকম্প্য, আকম্প্র, কম্প্, কম্প, কম্পমান, কম্পায়মান, কম্পিত, কম্পিল, কম্পিল্য, কম্পিল্ল, কম্পীল, কম্পী, কম্প্য, কম্প্র, কাঁপ, কাঁপন, কাঁপনি, কাঁপা, কাম্প, কাম্পিল্য, প্রকম্প, বিকম্প, সকম্প।
কম্প্ = কম্ পালন। **কম্প = কম্** পালন (থাকে) যাহাতে।

অকম্প (অকম্পন) : ২. *যে অভিলাষ (কম্) পালন করে না।* ৩. রাবণের সেনাপতি ও মাতুল। পিতা সুমালী (মাল্যবান) ও মাতা কেতুমালী। দুই বোন কুম্ভীনসী ও কৈকসী বা নিকষা। নিকষা রাবণের মাতা। রামকে মোহগ্রস্ত করে সীতাকে হরণ করবার প্ররোচনা ইনিই দেন। লঙ্কাকাণ্ডে অকম্পন হনুমান নিক্ষিপ্ত বৃহৎ বৃক্ষের আঘাতে নিহত হন। (পৌ.অ.)। ৪. প্রায় অপ্রচলিত। ৫. **কম** শব্দটির অর্থ ইচ্ছা, **অভিলাষ**, স্পৃহা ইত্যাদি। সেই **কম**কে পালন করে যে, সে হল **কম্প**। কেন্দ্র থেকে পরিধির উপর সঙ্কোচনের টান পড়লে যে ভাব হয়, এ হল সেই ভাব। অত্যধিক শীত বোধ করলে আমরা একই ভাব অনুভব করতে পারি। তবে সে হল ব্যক্তিগত ও চিরন্তন কম্পের কথা। সামাজিক কম্প কেমন, তার অকম্পনই বা কেমন, মানুষের ইতিহাসে সে কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, অকম্পনের কাহিনীতে সেকথাই রয়েছে। এই অকম্পনের পিতা মাতা ভগিনী সবাই মালপত্রের (পণ্যের) দুনিয়ার সত্তা — **সুমালী, কেতুমালী, কুম্ভীনসী (কুম্ভ, কুম্ভীর** দ্র.), **কৈকসী**। কিন্তু রাবণরাজ্যে এদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত নয়। ফলে এই সত্তাগুলির প্রত্যেকটিই রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত পণ্য-উৎপাদক সত্তা। সেই কারণে 'যে অভিলাষ পালন করে না' এই অর্থ উপরোক্ত রামায়ণবর্ণিত অকম্পন চরিত্রটির সঙ্গে সার্থক ভাবে খাপ খেয়ে যায়। **কাম, কাম**-যুক্ত সমস্ত শব্দ, **কাম্পিল্যনগর** প্রভৃতি শব্দের অর্থের সঙ্গেও এই অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কম্প : ১. ✓কম্প্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে; অথবা, ✓কম্পি + অন্ (ল্যুট্) - ক। (ব.শ.)। ২. *যাহাতে অভিলাষ (কম্) পালিত হয়।* ৩. চলন, কম্পন, **স্বরকম্পন**, সাত্ত্বিক-ভাববিশেষ, কম্পশীল, কম্প্র, চলনশীল, কম্পধর্মী, শিশিরঋতু, অস্ত্রবিশেষ, সান্নিপাতিক জ্বরবিশেষ। ৪. 'কেঁপে যাওয়া' অর্থেই প্রচলিত। ৫. দ্র. **অকম্পন, অনুকম্পা**।

কাম্পিল্য (কাম্পিল্যা) : ২. **কম্প** *দ্বারা যে-দেশবাসীকে অধীনস্থ করা হয়েছিল, সেই দেশ।* ৩. দেশবিশেষ, পঞ্চালদেশের পুরীবিশেষ। (ব.শ.)। কাম্পিল্য নগরের রাজা ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে একশত কুব্জা কন্যার বিবাহ হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **কম্প, অনুকম্পা, কন্যাকুব্জ, কান্যকুব্জ, পবন**। পাঞ্চালদেশের ইতিহাসের মধ্যে উপরোক্ত শব্দগুলির অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। ৬. compell।

'কর্ণ' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকর্ণ, আকর্ণ, আনাচ-কানাচ, কন্ন, কন্য, কন্ব, কর্ণ্, কর্ণ, কর্ণকণ্ডু, কর্ণকষায়, কর্ণকীটা, কর্ণকীটী, কর্ণগূথ, কর্ণগোচর, কর্ণগ্রাহ, কর্ণ(র্ণে)জপ, কর্ণজাপ, কর্ণজ্বর, কর্ণতাড়, কর্ণতাল, কর্ণদর্পণ, কর্ণদুন্দুভি, কর্ণধার, কর্ণনাদ, কর্ণপত্রক, কর্ণপত্রভঙ্গ, কর্ণপথ, কর্ণপরম্পরা, কর্ণপর্ব্ব, কর্ণপাক, কর্ণপালি, কর্ণপালী, কর্ণপাশ, কর্ণপুট, কর্ণপুর, কর্ণপেয়, কর্ণফুল, কর্ণবালা, কর্ণবিট, কর্ণবিষ, কর্ণবেধ, কর্ণবেধনিকা, কর্ণবেধনী, কর্ণবেষ্ট, কর্ণবেষ্টক, কর্ণমদ্গুর, কর্ণমল, কর্ণমূল, কর্ণরসায়ন, কর্ণশূল, কর্ণাকর্ণি, কর্ণাটি, কর্ণান্তিক, কর্ণাবতংস, কর্ণাভরণ, কর্ণামৃত, কর্ণাল, কর্ণাস্ফাল, কর্ণিক, কর্ণিকার, কর্ণী, কর্ণীরথ, কর্ণোপকর্ণিকা, কান, কানকথা, কানকাটা, কানকামড়ানি, কানকুয়া, কানকো, কানকোটারি, কানখড়খড়ে, কানখুসকি, কানচটা, কানচাটা, কানজুলপি, কানড়, কানড়া, কানঝাপটা, কানন, কানপাটা, কানপাটি, কানপাতলা, কানপাতা, কানফুল, কানফাড়া, কানফুসকি, কানবালা, কানবিঁধনী, কানভাঙান, কানা, কানাই, কানাকানি, কানাঘুষা, কানাচ, কানাটি, কানাড়া, কানাৎ, কানামাছি, কানাসি, কানি(নী), কানু, কানুটি, কানেট, কা(ক্যা)নেস্তারা, কেন্ন, কেন্না, কেন্নাই, কেন্নু।
কর্ণ্ = কারী-রহনের সূত্রায়ন (প্রকটন)। **কর্ণ** = কারী-রহন সূত্রায়িত হয় (প্রকটিত হয়ে পৌঁছায়) যেখানে।

কর্ণ : ১. ✓কৃ + ন (নন্) - কর্তৃবাচ্যে; অথবা, ✓কর্ণ + অট্ (অচ্) - ণ; অথবা, ✓কৃ + নন্ - ধি। (ব.শ.)। (ব.শ.)। ২. *কর্ণ = কারীর আবর্তন হয় যে আধারে; অর্থাৎ, কর্ (কর্ম্মফল ইত্যাদির রক্ষণ বা আবর্তন) হয় যে আধারে (বা নীতিতে বা আইনে)।* / যাহা শব্দের জ্ঞান করায়; যাহার দ্বারা শ্রবণ সাধিত হয়; যেখানে শব্দ বিক্ষেপিত হয়; যাহার দ্বারা জলবিক্ষেপ কর্ম সাধন করা যায়। (ব.শ.)। ৩. ক) শ্রোত্র, শ্রবণ, কান, নৌকার ক্ষেপণীবিশেষ, ত্রিভুজের সংযোজকরেখা, বৃত্তের ব্যাস, সোনালীগাছ, নালাস্ত্রে অগ্নিচূর্ণ (বারুদ) দেওয়ার ঘর, কুন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কুন্তীর কন্যাকালে সূর্য্যের

ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। কুন্তী লোকাপবাদভয়ে ইঁহাকে জলে ত্যাগ করিলে, অধিরথ ও তৎপত্নী রাধা ইঁহাকে প্রতিপালন করেন। ইনি সহজাত কবচ-কুণ্ডলাদি হেতু 'বসুষেণ' এবং রাধার পালন হেতু 'রাধেয়' নামে প্রসিদ্ধ। ইনি বিপ্ররূপী ইন্দ্রের প্রার্থনায় স্বীয় সহজ কবচ ছেদনপূর্বক ইন্দ্রকে দান করেন। তদবধি ইনি 'কর্ণ' ও 'বৈকর্ত্তন' নামে খ্যাত। ইনি দানবীর। জৈমিনি ভারতের বৃষকেতুর উপাখ্যান ও কবচদান ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইনি দুর্যোধনের সখা ও অঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। ভারতসমরে কুরুসৈন্যের সেনাপতি হইয়া, দ্বিতীয় দিবসে অর্জ্জুনের হস্তে ইনি নিহত হন। পরশুরাম ইঁহার অস্ত্রগুরু। (ব.শ.)। খ) ইনি যদুশ্রেষ্ঠ শূরের কন্যা এবং পিসতুতো ভাই কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা পৃথা বা কুন্তীর পুত্র। এঁর আদি নাম বসুষেণ। পরে ইনি নিজের অঙ্গ কর্তন করে ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল দান করায় কর্ণ নামে খ্যাত হন। দুর্বাসাবরে কুন্তী সূর্যকে আহ্বান করলে তার কানীন পুত্ররূপে কবচকুণ্ডলধারী বসুষেণের জন্ম হয়। কলঙ্কের ভয়ে কুন্তী একটি পাত্রের মধ্যে পুত্রকে রেখে জলে ভাসিয়ে দেন। সূতবংশীয় অধিরথ ও তাঁর স্ত্রী রাধা সেই শিশুকে উদ্ধার করে বসুষেণ নাম দিয়ে পালন করেন। দ্রোণাচার্যের শিষ্য। দুর্যোধন তাঁকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংম্বর সভায় কর্ণ দ্রৌপদীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হন। ব্রাহ্মণ-পরিচয়ে পরশুরামের কাছে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগের কৌশল শেখেন। ... কর্ণের প্রকৃত পরিচয়) জানতে পেরে (পরশুরাম) তাঁকে অভিশাপ দেন যে, কার্য্যকালে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা তিনি বিস্মৃত হবেন। অন্য এক ব্রাহ্মণ তাঁর হোমধেনু হত্যার কারণে কর্ণকে শাপ দেন — যুদ্ধকালে তাঁর মহাভয় উপস্থিত হবে এবং রথচক্র পৃথিবী গ্রাস করবে, আর যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি পরাজিত করতে সচেষ্ট হবেন তাঁরই হস্তে কর্ণের মৃত্যু হবে। জরাসন্ধ সন্তুষ্ট হয়ে কর্ণকে মালিনী নগর দান করেন। দুর্যোধনের একজন প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন কর্ণ। কর্ণের স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। কৃষ্ণসেন, বৃষকেতু, চিত্রসেন প্রভৃতি তাঁর পুত্র। ... কর্ণের দানশীলতা পরীক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপে কর্ণের পুত্র বৃষকেতুর মাংস ভক্ষণ করতে চান। কর্ণ অম্লানবদনে নিজ পুত্রকে বধ করে তাঁকে আহার করতে দেন। এই দানশীলতার পরিচয় পেয়ে কৃষ্ণ বৃষকেতুকে পুনর্জীবন দান করেন। (পৌ.অ.)। গ) দু-কান ধরে ওঠানো-নামানো যায় বলে, দরজা-জানালার কাঠের ফ্রেমের উপরের কাঠটির দুদিকে বেরিয়ে থাকা অংশটিকেও কর্ণ বলে। ৪. এর অনেকগুলি অর্থই এখনও প্রচলিত। ৫. কাঠে পেরেক পোঁতার জন্য হাতুড়ি নিয়ে ঠুকতে শুরু করলে, তার প্রতিটি আঘাতের ফল যেখানে গিয়ে পৌঁছয়, সেটি সেই কর্মকারী মানুষের 'কর্ণ' বা 'কান'। এর ভিতরে একটি করে ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রে মানুষের 'কর্' বা 'কর্মফল বা আওয়াজ' গিয়ে ঢোকে, তাই তাকে কর্ণ বলে। সমাজদেহের মাথাতেও দুটো কর্ণ বা কান থাকে; তাতে সমাজের উৎপাদিত কর্মফল বা পণ্য এক কান দিয়ে ঢোকে এবং অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। সমাজদেহের এই দুই কানের দেখাশোনা করে যে, তাকে সেকারণেই **দোকানদার** বলে।

কর্ণ মানুষের মাথার দুই দিকে থাকে। ঠিক একই ভাবে কাঠের দরজা-জানালার উপর দিকে যে কাঠটি থাকে, তা দরজা-জানালার মাপের থেকে দুই দিকে একটুখানি বেরিয়ে থাকে, কানের মতো। তাকেও কর্ণ বলে। সেই কর্ণের সাহায্যে দরজা-জানলাকে দেওয়ালে আটকে রাখা যায়, ধরা যায়। একই কারণে নৌকার ক্ষেপণীকেও কর্ণ বলে। তবে ত্রিভুজের সংযোজকরেখা কিংবা বৃত্তের ব্যাসকে কর্ণ বলা হয় আরও গভীরতর কারণে। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা জ্যামিতিকে জড় হিসাবে দেখতেন না। একটি বৃত্তের মাঝে যে ব্যাস, তাকে মনে করা হত বহুবিন্দুর যোগফলে গঠিত একটি রেখা, যা কেন্দ্রের উপর ভিত্তি করে বনবন করে ঘুরে চলেছে। বৃত্ত এই ব্যাসের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। বৃত্তের যা-কিছু সারমর্ম্ম, তা স্বভাবতই ব্যাসের মাধ্যমে উঠে আসত কেন্দ্রে। বন্ধুবৃত্তের বা বন্ধুচক্রের, পণ্ডিতচক্রের, যোদ্ধচক্রের ব্যাসের মাধ্যমে চক্রের বা বৃত্তের কর্ম্মফল রক্ষিত হতে পারত চক্রের কেন্দ্রে। সেই কারণে **ব্যাস** ছিল বৃত্তটির কর্ণ। একই নিয়মে ত্রিভুজের সংযোগকারী রেখাকেও কর্ণ বলা হত। তবে বৃত্ত বা ত্রিভুজকে ত্রিমাত্রিকভাবে বুঝলে এবং তার ভেতরের কর্ণ-রেখাটিকে একটু খানি বিস্তারিত করে নিলেই বৃত্ত বা ত্রিভুজকে (দরজা-জানালার কর্ণের মতো) দু-দিক থেকে ধরবার কর্ণ পাওয়া যায়। নৌকার নিয়ন্ত্রক হালকেও তাই কর্ণ বলা হত। আবার নালাস্ত্রে অগ্নিচূর্ণ (বারুদ) দেওয়ার ফুটো বা ঘরকেও কর্ণ বলা হত। পরবর্তীকালে ছিদ্র বা ফুটো এবং ফুটো করে দেওয়াকেও কর্ণ বা কান বলা হয়েছে। দ্র. **কানা**। তবে সোনালী গাছকে কেন কর্ণ বলা হত, গাছটির বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণা না থাকায় আমরা জানি না।

এবার ভারতের ইতিহাসের কর্ণের কথাতে আসা যাক। যতদূর বোঝা গেছে, আদি যৌথসমাজের শেষ অধ্যায়ে যে আদি ফেরিওয়ালাদের জন্ম হয়, সেই সত্তাই কর্ণ পদবাচ্য। মানুষের উদ্বৃত্ত কর্ম্মফল এই কর্ণে নিক্ষিপ্ত বা রক্ষিত হত। যৌথপুঁজি বা সূর্যই এই কর্ণের জনক। এর সুরক্ষার জন্য জন্মলগ্নেই একে **কবচ** ও **কুণ্ডল** দেওয়া হয়, নইলে যে সমাজে বিক্রিবাটা বস্তুটিই তখনও অজানা, সেই সমাজের সদস্যরা এই ফেরিওয়ালাদের আস্ত রাখত না। যে-জনগোষ্ঠী 'কুন' তারিত করতে পারত (দ্র. **কুন্ত, কুন্তল, কুন্তী, শকুন্ত, শকুন্তলা**), তাদের ভেতর থেকেই এই কর্ণের জন্মদান করা হয়, তাও **পাণ্ডু**-গ্রস্ত পুঁজির সঙ্গে সেই জনগোষ্ঠীর বিবাহের আগেই। যৌথব্যবস্থার থেকে জন্ম বলেই শেষ বিচারে এই কর্ণকে দুর্যোধনের পক্ষ গ্রহণ করতে হয়। পুঁজির এই আদি রূপটি আত্মস্বরূপ রক্ষার জন্যই সেকালের হিসেবে প্রগতিশীল পুঁজির (পাণ্ডবদের) বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হয়, ঢেঁকির মালিক যেমন ধানকলের বিরুদ্ধাচরণ করে সেইরকম।

কর্ণধার : ১. কর্ণ + ✓ধৃ + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. কর্ণ ধারণ করে যে। (ব.শ.)। ৩. নাবিক, মাঝি, কাণ্ডারী। ৪. 'সর্বোচ্চ পরিচালক' অর্থে প্রচলিত। ৫. সোজা কথায় কান ধরে যে, সেই হল কর্ণধার। কিন্তু কান তো নানা সত্তার নানা রকম। সেই কারণে কর্ণধারও নানারকম। প্রথম কর্ণধার হল নৌকোর বড়ো-মাঝি, যে-হাল ধরে নৌকাটিকে লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়, তাকে 'কর্ণধার' বলা হত; কেননা হালকে বলা হত **কর্ণ**। পরে পরে যে কোনো সামাজিক

সংগঠনের সর্বোচ্চ পরিচালককেই কর্ণধার বলার রেওয়াজ হয়। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রের মতো বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানের পরিচালককেও 'কর্ণধার' বলার রেওয়াজ প্রচলিত হয়ে যায়; যদিও এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ণ দেখা যায় না এবং কর্ণধার সেই কর্ণ ধারণ করেন কীভাবে তাও বোঝা যায় না। অথচ যে ছাত্রের কর্ণ স্পষ্ট দেখা যায়, দেখা যায় সেই কর্ণ ধরে আছেন তার শিক্ষকমশাই, সেই শিক্ষককে কিন্তু **কর্ণধার** বলা হয় না! যদিও, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থে শিক্ষকমশাই বোঝাতে **কর্ণধার** শব্দই প্রয়োগ করেছেন। আরও তথ্য এই যে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ভাষণদানকালে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ী স্পিকারকে যখন বলেছিলেন, "স্পিকার মহাশয়, এ বিষয় শোনার জন্য আমি আপনার কর্ণাকর্ষণ করছি ('দৃষ্টি আকর্ষণ করছি'-র পরিবর্তে)" বলায়, তাঁর এই বাক্যটি বিধানসভার রেকর্ড থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

কান (কাণ), কানকাটা, কানপাতলা, কানপাতা, কানফুসকি, কানভাঙান, কানা (কাণা), কানাকানি, কানাঘুষা, কানাচ (আনাচ-কানাচ), কানামাছি, কানি (কানী) : ২. *(কণ, কন = কারী অন যাহাতে) কান = **কন** হইতে জাত (কাণ = **কণ** হইতে জাত)। কানকাটা = **কান** কাটা যাহার। কানপাতলা = **কান** পাতলা যাহার। কানপাতা = **কান** পাতন যাহাতে। কানফুসকি = **কান**-এ ফুস করণ গতিশীল যাহাতে। কানভাঙান = **কান** ভাঙা অন থাকে যাহাতে। কানা = **কান**-এর আধার যে (কাণা = **কাণ**-এর আধার যে)। কানাকানি = **কানা** ও **কানি** (দ্র. **কেশাকেশি**)। কানাঘুষা = **কান**-এ ঘোষণা করা হয় যাহাতে। কানাচ = **কান** অঞ্চিত যেখানে (আনাচ-কানাচ = অস্তিত্বের আঁচ থাকে যেখানে এবং কৃতের আঁচ থাকে যেখানে। দ্র. **অঞ্চ, আঁচ, আঁচল**)। কানামাছি = **কানা** যে মাছি। কানি = **কান** গতিশীল যাহাতে। কাণি = **কাণ** গতিশীল যাহাতে।* ... / কাণ = নিমীলন যুক্ত যাহাতে। কাণকাটা = যে কান কাটে। কানপাতলা (কাণপাতলা) = যাহার কান পাতলা, অর্থাৎ, যে, যাহা শুনে, তাহাই নির্বিচারে কর্ণে স্থান দেয়; সত্যাসত্য পরীক্ষা না করিয়া যে নির্বিচারে কোনো কথা শুনিয়াই সত্য বলিয়া মনে করে। কাণভাঙান = যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক অন্যের বিরুদ্ধে কুপরামর্শ দেয়। (ব.শ.)। **৩.** কান (কাণ) = একচক্ষুহীন, কাণা, অন্ধ, দৃষ্টিশক্তিহীন, কৃষ্ণ, কানাই, গায়ক, সঙ্গীতব্যবসায়ীর উপাধিবিশেষ (মধু কান-এর ঢপ গান)। কাণ = 'নিমীলনযুক্ত', একচক্ষুবিহীন, একচক্ষু, কাণা, শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইএর একে অনভিজ্ঞা, দৃষ্টিশক্তিহীন, কাণা (চক্ষুঃ), একচ্ছিদ্রযুক্ত, সচ্ছিদ্র, কাণা (কড়ি), একচক্ষুবিহীন জন, কাক; শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণাকৃতি স্বর্ণালঙ্কার, শ্রবণশক্তি, সেতার-প্রভৃতি যন্ত্রের দণ্ডের ছিদ্রে লগ্ন কাষ্ঠখণ্ড, খাতার বা নদীর কোণ, আলনার স্তম্ভে সংলগ্ন কাঠের বা ধাতুর কীলক, নদী প্রভৃতির কূল। কানকাটা (কাণকাটা) = ছিন্নকর্ণ, কুকর্ম্ম হেতু ছিন্নকর্ম্ম, শিশুর ভয়জনক কল্পিত জুজুবিশেষ, সচ্ছিদ্রকর্ণ যোগিবিশেষ। কানপাতা (কাণপাতা) = কর্ণপাত করা। কানফুসকি (কাণফুসকি) = কানে ফুস ফুস করিয়া কুমন্ত্রণা দেওয়া, চুপে চুপে কথাবার্তা। কানভাঙান (কাণভাঙান) = কুমন্ত্রণা দেওয়া, কুমন্ত্রণা দিয়া স্বমতে আনয়ন। কানা (কাণা) = একচক্ষুহীন, দৃষ্টিশক্তিহীন, চক্ষুর্দ্বয়হীন, অন্ধ, বিচারজ্ঞানহীন, দিশাহারা, সচ্ছিদ্র, একছিদ্রযুক্ত, পোকায় কাটা; কলসী-প্রভৃতির ঊর্দ্ধকপাল বা উপরিস্থ অর্দ্ধাংশ, কলসী-প্রভৃতির মুখ, নদী-প্রভৃতির তীরের উচ্চ শেষ ভাগ বা কিনারার মাথা, কাঠের বা বাঁশের খুঁটির কানের মত উচ্চ অগ্রভাগ, খুঁটির কানা। কানাকানি (কাণাকাণি) = কানে কানে বলাবলি। কানাঘুষা (কাণাঘুষা) = কানে কানে ঘুনঘুন (মৃদু) শব্দে বলা বা ঘোষণা করা, চুপে চুপে বলাবলি, কানাকানি। কানাচ (আনাচ-কানাচ) = তাঁবুর চারিদিকের বাহিরের পর্দা, গৃহের পশ্চাদভাগ, ছাঁচতলা, গৃহের পশ্চাদভাগের চাল বা ছাঁচ। (আনাচ-কানাচ = কানাচ ও তৎসদৃশ স্থান, গৃহের পশ্চাদভাগ ও পার্শ্ববর্তী গোপনস্থান।) কানামাছি = বালকদিগের খেলাবিশেষ (এই খেলায় একটি বালকের চোখ কাপড়ে বাঁধিয়া দেয়, সেই 'কানামাছি' হয়। অন্য বালকেরা ইহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। কানামাছি ইহাদের যাহাকে ছোঁয়, সেই আবার কানামাছি হয়।) কানি (কাণি) = ধুতি প্রভৃতির প্রান্ত, বস্ত্রখণ্ড, চীর, নেকড়া, টেনা; ঘুড়ির দুই পাশের কিনারা, বস্ত্রাদির পাড়, ... কনিষ্ঠাঙ্গুলি, পূর্ববঙ্গে জমির পরিমাণবিশেষ, ... ৫৮৮০ বর্গহাত। কানী (কাণী) = একচক্ষুহীনা নারী; (**কানি** দ্রষ্টব্য)। ৪. ব্যাপকভাবে যথার্থে প্রচলিত। **৫.** বঙ্গীয় শব্দকোষকার যে-শব্দ নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিচলিত হয়েছেন, সেটি হল এই **কাণ** ও **কান**। তাঁর এই বিচলিত ভাবটি **কাণ** ও **কান** শব্দের ভুক্তিতে ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি পরিষ্কার উপলব্ধি করেছেন, বেশ কিছু **কাণ**-যুক্ত বা **কান**-যুক্ত শব্দ বিবর্তিত হয়ে এসেছে **কর্ণ** থেকে, আবার কিছু এসেছে **কণ** থেকে এবং বাকিগুলি এসেছে **কন** থেকে। অর্থও তদনুযায়ী আলাদা আলাদা হয়ে গেছে। অথচ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গ্রন্থাদিতে উভয়প্রকার বানানই এমনভাবে মিলেমিশে রয়েছে, যে, তাদের যথাযথভাবে বিন্যস্ত করা খুবই শ্রমসাধ্য কাজ। তবুও তিনি **কর্ণ, কণ** ও **কন**-জাত শব্দগুলিকে সাধ্যমতো পৃথক করার চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু তাসত্ত্বেও বলতে হবে, কাজটি খুবই অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। ফলে, বানানের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে।

তার মানে এই নয় যে, পরবর্তীকালের অভিধানকারগণ এসব সমস্যার সমাধান করে গেছেন। কি কলকাতার সংসদ অভিধান, কি ঢাকার ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, কেউই সমস্যাটির ধারকাছ দিয়ে যাননি। তাঁরা সমস্যাটিকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সহজ উপায় আবিষ্কার করে নিয়েছেন। তাঁরা **কাণ**-যুক্ত সমস্ত শব্দই বাদ দিয়ে ল্যাঠা চুকিয়ে দিয়েছেন — না রহেগা বাঁশ, না বজেগি বাঁশরী! অর্থাৎ, বাঁশের ঝাড়টিই তাঁরা মুড়িয়ে দিয়েছেন। বাঁশই যদি না জন্মায় **কাণা** বাঁশিই পাবে না, কোন বাঁশি বাজিয়ে সে তাঁদের প্রতীকী শব্দার্থের সাজানো সোনার (?) সংসার বিগড়োবে!

আমাদের বিচারে কাজটি করা সম্ভব, কিন্তু এতই শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ যে, আমাদের পক্ষে সেকাজে হাত দেওয়ার সময় একেবারেই নেই। আমরা কেবল সমস্যাটি উল্লেখ করে তার সমাধানের পথ সাধ্যমতো বলে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

আমাদের কাছে বিষয়টি এরকম — প্রতিটি শব্দের ভিতরের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটিই নিয়ন্ত্রণ করে শব্দটি কাকে কাকে শনাক্ত করবে, অর্থাৎ কিনা শব্দটির প্রতীকী অর্থ কী কী হবে। সেভাবেই আমরা

শব্দের মূল ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের থেকে কেমন করে প্রতীকী অর্থগুলি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, এক এক করে সেসব উদ্ধার করেছি, করছি। তো, যে **কাণ, কাণা** বা **কান, কানা** শব্দ একই সঙ্গে এত বিচিত্র বিষয় ও বস্তুসমূহকে বোঝাতে পারে, তার মূলে কী ক্রিয়া রয়েছে, এটাই ছিল আমাদের প্রশ্ন। আমরা দেখলাম, এদের মূলে **কর্ণ**-শব্দের বিবর্তিত রূপ যেমন আছে, তেমনি **কণ** ও **কন**-ও রয়েছে। আমরা আরও দেখলাম, শব্দসংক্ষেপকরণের সাধারণ প্রক্রিয়ায় **ক-র্-ণ** এর **র্** বাদ দিয়ে তাকে **কণ** করে নেওয়া সম্ভব। অন্যত্র আমরা এই সহজ উদাহরণটি দিয়েছি যে, শৈশব থেকে মা শিশুকে 'হাত ধুয়ে খেতে বসো' বলেন এবং শিশুটি হাত ধুয়ে খেতে বসে। কিন্তু একটু বয়স হলে পরে দেখা যায় মা শুধুমাত্র 'খেতে বসো' বলছেন এবং তাসত্ত্বেও কিশোরটি হাত ধুয়েই খেতে বসছে। ঠিক সেভাবেই, ক্রিয়াটি একই থেকে যায়, কিন্তু তার প্রকাশের ক্ষেত্রে সংক্ষেপকরণ ঘটে যায়। শব্দের বিবর্তনের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে। **কর্ণ** সেভাবেই মূলে **কণ** হয়ে যেতে পারছে। সেই কারণেই **কর্ণ** থেকে **কাণ** হওয়ায় কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু সেক্ষেত্রেও **কণ** ও **কন** এই দুই শব্দ খুব দূরের অর্থবাচক শব্দ নয়, এরা মূলত **কং**-এরই দুই সন্তান এবং স্বভাবতই এই **কং** বা 'কারীর রহস্যরূপ' যাদের থাকে, তারা শব্দ বা আওয়াজ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চভূতের যে-কেউ হতে পারে। দ্র. **কণ, কন**।

এবার যে কাজটিকে বোঝাতে গিয়ে এই শব্দগুলির উদ্ভব, সেই ক্রিয়াটির প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। **কর্ণ** শব্দের অর্থে করণ কোথায় গিয়ে স্থিত হয়, তা সব আমরা দেখেছি। কিন্তু তাকে যখন **কাণ** বা **কান** বলছি, তখন শব্দসৃজনের নিয়মে স্বভাবতই তা 'কণ হইতে জাত' ও 'কন হইতে জাত' বোঝায়; যখন কিনা **কণ** ও **কন** দুটো শব্দেরই মানে 'কারী অন যাহাতে'। **ণ** ও **ন** মূলত অব্যক্ত রহস্যরূপিণী, তাদের পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায় না। বড়জোর এইটুকু বলা যায় যে, **ণ** হল রহস্যরূপিণীর টঙ্কারী রূপ; আর **ন** হল রহস্যরূপিণীর অতিসূক্ষ্ম **ন**-কারী রূপ; যেন-বা মানুষের sperm, যা কিনা মানুষের অতিসূক্ষ্ম রূপই বটে।

তা সে যাই হোক, আমরা বিষয়টিকে সহজ করে বুঝে নেবার চেষ্টা করব। বাংলাভাষীর যেসকল মূল্যবান রহস্যময় অর্জন রয়েছে, 'এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া'র ধারণা তার মধ্যে একটি অন্যতম অর্জন। কেউ কি পৃথিবীতে দেখেছে, মানুষ কান দিয়ে কথা বলে? অথচ বাংলাভাষী তার সৃজনশীল বুদ্ধিতে এমন ধারণার অধিকারী হয় যে, তার 'অন্য কান' দিয়ে কথা বেরিয়ে যায়? এরকম উদ্ভট ধারণার মূলে রয়েছে সমাজদেহের দোকানদারির ক্রিয়াকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করবার যোগ্যতা। দোকানদার তো একদিকে কেনে, অপরদিকে বিক্রি করে। ফলে তার পণ্য এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরোয়। পার্থক্য এইযে মানবদেহের কোনো কানেই থানা বসিয়ে টোল নেওয়া হয় না, সমাজদেহের দু-কানেই নেওয়া হয়। তাকেই দোকানদারের লাভ বলা হয়। তো, 'কারী অন চলছে' বলে এই স্থানটির নাম **কর্ণ, কাণ, কান**। এই মূল ধারণাটি যদি ঠিক থাকে, তাহলে দেখা যায়, **কাণ** ও **কান** যুক্ত শব্দগুলি নিয়ে আমাদের সংশয় আর থাকছে না। এবার তাহলে এক-একটি শব্দ ধরে ধরে এগোনো যাক —

কাণ = এর অর্থ '**কণ** হইতে জাত'। এর যে সকল প্রতীকী অর্থ হয়, তার মধ্যে প্রথম হল **কর্ণ** বা ear। এতে কারীর আবর্তন হয়, এক ear দিয়ে ঢুকে আর-এক ear দিয়ে বেরিয়ে যায়। এটি মানুষের ear, সমাজের ear, যে-কোনো ear-ই হতে পারে। আবার এই সত্তাটি **কণ** হইতে জাত, কিংবা **কন** হইতে জাতও হতে পারে। **কণ** যদি অর্থময় শব্দকণ কিংবা অর্থময় বস্তুকণ বা শ্রমমেধাদির কণাস্বরূপ পণ্যাদি হয়, সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শব্দগুলি সবই **কাণ** বানানে লিখতে হবে। আর, **কন** যদি দীপ্তি মাত্র বা ঐরকম কোনো সূক্ষ্ম বিষয় হয়, তখন নিম্নলিখিত শব্দগুলি লিখতে হবে **কান** বানানে। যথা; কানকাটা, কানপাতলা, কানপাতা, কানফুসকি, কানভাঙান, কানা (কাণা), কানাকানি, কানাঘুষা, কানাচ (আনাচ-কানাচ), কানামাছি, কানি (কানী) ... ইত্যাদি।

কানন : ১. ✓কানি (দীপন) + অন্ (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কারীর আনন যাহাতে*। / যাহা পর্ব্বতাদি দীপিত করে। (ব.শ.)। **৩.** অরণ্য, বন, উপবন, বৃক্ষবাটিকা, দুর্গম বনভাগ, সমূহ, গৃহ, ব্রহ্মার মুখ। (ব.শ.)। **৪.** garden অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। **৫.** ব.শ. ঠিকই জানিয়েছেন, **পর্ব্বত** (বা সামাজিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ institution) ইত্যাদিকে দীপিত বা উজ্জ্বল ক'রে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা দেয় যে, সেই হল কানন। যে পর্ব্বতের উপত্যকায় যত ভাল গাছপালা-বনাঞ্চল থাকে, তার গৌরব তত বেশি। একালের ভাষায় একে বলা হয় 'উইনডো ড্রেসিং'। তার মানে, ক-এর বা কারীর **আনন** বলতে কেবল ব্রহ্মার মুখই বোঝায় না, আরও অনেকের 'ফেস'কেই বোঝায়, তাদেরকেও 'উইনডো ড্রেসিং' করতে হয়, 'ফেস সেভিং'-এর ব্যবস্থা করতে হয়। আজকাল প্রায় সব ব্যবস্থার (সংস্থার বা পর্ব্বতের) ক্ষেত্রেই নিজেদের গৌরব ঘোষণার জন্য প্রতিনিধিত্ব-মূলক 'ডিসপ্লে' করার ব্যবস্থা রাখতে হয়। একেই কানন বলে। সংস্থার **আনন** ঠিকঠাক না রাখতে পারলে, তার **ইন-কাম** বা আনাআনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কানাই, কানু : ২. *(কান = কন বা তেজ হইতে জাত।) কানাই = **কান**-এর আধার গতিশীল যাহাতে। কানু = **কান** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **৫.** কানাই শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ থেকে **কানাই**কে কমবেশি বোঝা যায়, কিন্তু **কানু**কে বুঝতে একটু বেগ পেতে হয়। এ হল মানুষের জ্ঞানরসের সর্বোচ্চ সুধাভাণ্ড যা গান রূপে ছড়িয়ে পড়ত সারা মানবসমাজে। তবে তাকে সশরীরে চেনার যেটুকু তথ্য আমাদের হাতে এসেছে, তা হল **কানু**র ধ্বংসাবশেষের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র। সেটি কীরূপ তা বলছি।

মানবশরীর বা সমাজশরীরের আমরা দুটো করে কান দেখেছি। তবে সমাজশরীরের একটি কানের পৃথক মালিক হতেই পারে। একটি দোকানের দুটো ভাগ — পারচেজ ডিভিসন, আর সেলস ডিভিসন। এখন এক-একটি ডিভিসনের মালিক বা পরিচালককে পৃথকভাবে দেখলে তাকে তো দোকানদার বলা যাবে না; বলতে হবে কানদার

বা এক-কানদার। তবে কিনা, কান দিয়ে তো কেবল উৎপন্নের বা পণ্যের বিলিবণ্টন-বিক্রিবাটাই হয় না, কান দিয়ে শব্দের-কথার-গানের-দর্শনের-ধর্ম্মকথারও বিলিবণ্টন হয়। যাঁরা সেরকম গান বিলিবণ্টনের দায়িত্বে থাকতেন, তাঁদের নিশ্চয় **কান** বলা হত। বলা যে হতই তার একটি প্রমাণ আমরা পাই বাংলাভাষীদের সমাজে **কানু**র আবির্ভাবের প্রায় চারশো পরে। **রাম**দের যেমন আমরা বর্তমানে কাঁশিরাম, জগজীবনরাম, চরতরাম, ভরতরাম প্রভৃতি **রাম** পদবীধারীদের সাহায্যে খানিকটা চিনতে পারি, **কান**দেরও তেমনি আমরা **কান** পদবীধারীদের সাহায্যে চিনতে পারি। এরকমই একজন **কান** ছিলেন মধু কান, ইনি ঢপ গাইতেন। যাঁরা নিধুবাবুর টপ্পা বিষয়ে জানেন, তাঁরা অনেকেই মধু কানকেও জানেন।

'কল্' (কলি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা: অকলঙ্ক, অকলঙ্কী, অকল্ক, অকল্মষ, অকল্য, অকল্যাণ, অকাল, অকালকুষ্মাণ্ড, অকালকুসুম, অকালজ, অকালজলোদয়, অকালজাত, অকালজ্ঞ, অকালবোধন, অকালমেঘোদয়, অকালসন্ধ্যা, অকালসহ, অতিকল্য, অতিকাল, অনাকাল, অবিকল, অসকল, অসকাল, আকল, আকলন, আকাল, আকালি, আকালিক, উৎকল, উৎকলিকা, কড়াই, কল্, কল, কলকণ্ঠ, কলকল, কলকলি, কলকে, কলক্কল, কলঘোষ, কলঙ, কলঙ্ক, কলঙ্ককর, কলঙ্কিত, কলঙ্কিনী, কলঙ্কী, কলত্র, কলধৌত, কলধ্বনি, কলন, কলন্তর, কলন্দর, কলপ, কলবল, কলবিঙ্ক, কলভ, কলভাষণ, কলম, কলমকসুর, কলমদান, কলমপেশা, কলমা, কলিম, কলিমা, কলমী, কলম্ব, কলম্বা, কলম্বিকা, কলম্বোগ, কলরব, কলরোল, কলল, কলশ, কলশি, কলস, কলসি, কলস্বন, কলস্বর, কলহ, কলহংস, কলহপ্রিয়, কলহান্তরিতা, কলহাস্য, কলা, কলাই-করা, কলাইকন্দ, কলাকন্দ, কলাতলা, কলাধর, কলাধর, কলানাথ, কলানিধি, কলান্তর, কলাপ, কলাপাত, কলাপাতা, কলাপী, কলাপূর্ণ, কলাবউ, কলাবড়া, কলাবত, কলাবান, কলাবিলাস, কলাভৃৎ, কলায়, কলায়ত (কালোয়াত), কলালাপ, কলাহক, কলি, কলিকা, কলিকাতা, কলিঙ্গ, কলিজা (কালেয়), কলিত, কলিদ্রুম, কলিন্দ, কলিপ্রিয়, কলিযুগ, কলিল, কলু, কলুষ (কল্মষ), কলুষিত, কলেবর, কলৌ, কল্ক, কল্কা, কল্কি (কলকে), কল্মষ, কল্মাষ, কল্মাষপাদ, কল্য, কল্যবর্ত্ত, কল্যাণ, কল্যাণকর, কল্যাণকার, কল্যাণকারক, কল্যাণকারী, কল্যাণী, কল্যাণীয়, কল্যাণীয়া, কল্লোল, কল্লোলিত, কল্লোলিনী, কাইল, কারোয়ান, কাল, কালক, কালকণ্ঠ, কালকূট, কালকৃত, কালকেতু, কালকেয়, কালগু, কালঘাম, কালঘুম, কালচক্র, কালচিন্তক, কালচিহ্ন, কালজ্ঞ, কালজ্যেষ্ঠ, কালঞ্জর, কালত্রয়, কালদণ্ড, কালদূত, কালধর্ম্ম, কালনাগিনী, কালনিদ্রা, কালনিয়োগ, কালনিশা, কালনেমি, কালপক্ক, কালপর্য্যয়, কালপাশ, কালপিষ্ঠ, কালপু(পৃ)ত, কালপুরুষ, কালপৃষ্ঠ, কালপেঁচা, কালপ্রবোধক, কালপ্রাপ্ত, কালবত, (কালবাত, কালোয়াত), কালব(উ)স, কালবসু, কালবাহন, কালবিৎ(দ), কালবিপ্রকর্ষ, কালবিভক্তি, কালবিভাগ, কালবৃদ্ধি, কালবেলা, কালবৈশাখী, কালব্যাজ, কালব্যাল, কালভৈরব, কালভৈরবী, কালমুখী, কালমেঘ, কালযবন, কালযাপ, কালরাতি, কালরাত্তির, কালরাত্র, কালরাত্রি, কালরুদ্র, কালশুদ্ধি, কালসংগ্রহ, কালসংরোধ, কালসম্পন্ন, কালসর্প, কালসাঁজি, কালসাপ, কালসার, কালসূত্র, কালসূর্য্য, কালহর, কালহরণ, কালহানি, কালহার, কালহুতাশন, কালা, কালাকাল, কালাকৃষ্ট, কালাগ্নি, কালাঞ্জন, কালাতিক্রম, কালাতিপাত, কালাতীত, কালাত্যয়, কালানল, কালানুসারী, কালান্ত, কালান্তক, কালান্তকযম, কালান্তকাল, কালান্তযম, কালান্তর, কালাপ, কালাপহার, কালাবৎ, কালাভ্র, কালামুখ, কালামুখী, কালাশুদ্ধি, কালাশৌচ, কালি, কালিক, কালিকার, কালকের, কালিঙ্গ, কালি(লী)দহ, কালিদাস, কালীন, কালিনী, কালিন্দী, কালিমা, কালিয়, কালিয়দমন, কালী, কালীঘাট, কালীয়, কালীহ্রদ, কালুকা, কালুষ্য, কালেয়, কালোয়াত, কালোয়াতী (কলাবতী, কবাড়ি), কাল্য, কাহাল, কিল, কি(কী)ল, কিলকিঞ্চ, কিলকিঞ্চিত, কিলকিল, কিলকিলা, কিলকিলা-দেশ, কিলবিল, কিলা, কিলাকিলি(লী), কিলাস, কিলিকিলি, কিলিবিলি, কি(কে)ল্লা, কিল্বিষ, কেলেঙ্কার, কেল্লা, কেল্লাদার, কেল্লাদারী, কোল, কৌল, কৌলটিনেয়, কৌলটেয়, কৌলব, কৌলিক, কৌলীন, কৌলীন্য, কৌলেয়, কৌলেয়ক, কৌল্য, নিষ্কল, বিকল, বৈকাল, সকল, সঙ্কলন, সাকল্য। **কল্ (কলি)** = কারীর লালন-লয়ন। **কল** = কারীর লালন-লয়ন যাহাতে।

অকালকুষ্মাণ্ড : ১. অকাল + কুষ্মাণ্ড। ২. দ্র. **কুষ্মাণ্ড, অণ্ড**। / যে কুষ্মাণ্ড অসময়ে জন্মায়। (ব.শ.)। ৩. বৃথাজাত, অকর্ম্মণ্য জন। (অকালের কুমড়া বলিদানাদি দেবকার্যে লাগে না, সুতরাং ব্যর্থ।)। কাণ্ডজ্ঞানহীন। ... (ব.শ.)। ৪. অকর্ম্মণ্য অর্থে প্রচলিত। দ্র. **কুষ্মাণ্ড**। ৫. অসময়ের কুমড়ো প্রায়শই পচে যায়। কিন্তু আজকাল হাইব্রিডের কল্যাণে অসময়েও কুমড়ো হয়। এটি উদ্ভিদ জগতের কুষ্মাণ্ডের কথা। সমাজের ব্যর্থ উদ্যোগী, ব্যর্থ বিপ্লবী, ব্যর্থ স্রষ্টাদের বোঝাতেও এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কারণ তাঁদের ভেতরে 'কু' (সদর্থে কিংবা নঞর্থে) **উষ্মা** থাকে। কিন্তু নিজেদের শক্তির **অকালবোধন**-এর বা অযথার্থ বোধনের কারণে তারা সফল হতে পারে না। দ্রষ্টব্য **কুষ্মাণ্ড**।

অকালবোধন : ১. অকাল + **বোধন**। ২. *অসময়ে প্রবোধন বা জাগানো হয় যে আচারে; অকালে 'স্মৃতিজননার্থ সংস্কারোদ্দীপন' বা বোধন করা হয় যে আচারে।* ৩. অসময়ে দেবীর জাগরণার্থ বিহিত অনুষ্ঠান বিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অর্থহীন প্রথাবাচক শব্দরূপে প্রচলিত। ৫. যে আচারের ভিতর কাঁচা ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা থাকে, তাকে বলে অকালবোধন। যে আচারের মাধ্যমে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে ওঠার আগেই বিপ্লবের ডাক দেওয়া হয়, তাকেও অকালবোধন বলা হত। দেবীকে জাগানোর অর্থ, সেই 'দেবী' শব্দে যে-জনসাধারণ (দ্র. **মহামায়া**) কে বোঝায়, তাঁদের জাগানোর চেষ্টা। রাশিয়ার নারদ্নিকরা, পশ্চিমবাংলার নকশালরা অকালবোধন করেছিলেন এবং ব্যর্থ হয়েছিলেন। **রামচন্দ্র**ও অকালবোধন করেছিলেন, প্রাথমিকভাবে সফল হলেও (বৌদ্ধবিপ্লব সম্পন্ন হলেও) পরে ব্যর্থ হন। এখন যে দেবী **দুর্গা**কে 'অকালবোধন' করে পূজা করা হয়,

সেটি রামচন্দ্রের অকালবোধনের প্রথামাত্র; তার সঙ্গে রামচন্দ্রের সময়ের বাস্তব সামাজিক অর্থটির এখন আর কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ একালে কেউ জনসাধারণকে জাগিয়ে তাদের বোধবুদ্ধি ঘটিয়ে কোনো দশ-ডিপার্টমেন্টওয়ালা সরকারকে (**দশানন**কে) উৎখাত করতে যায় না। দ্র. **বোধন, উদ্বোধন**।

কল (কলন) : ১. ✓কড় (মদ) + অ (অচ্) ক। (ব.শ.)। ২. *ক-এর লালন-লয়ন যাহাতে*। / যাহা মত্ত করে। (ব.শ.)। ৩. মধুর, শ্রুতিসুখ, অব্যক্ত, অস্পষ্ট, মৃদু, কোমল, অবাক্, মূক, অজীর্ণ, কাতর, মধুর অস্ফুট ধ্বনি, কূজন, গুঞ্জন, চারিমাত্রা পরিমিত কাল, শালবৃক্ষ, কোলিবৃক্ষ, কুলগাছ। সহজে কার্য্যসিদ্ধির উপায়, যন্ত্র (machine, mill), ইঞ্জিন, উপায়, কৌশল, ফিকির, ছল, ছুতা, শরীরের সন্ধিস্থল, যুক্তি, মন্ত্রণা, পরামর্শ, নির্মাণকৌশল, কারিগরী, বন্দুকের ঘোড়া, ফাঁদ, পেঁচ। (ব.শ)। ৪. অনেকগুলি অর্থই প্রচলিত, তবে সব নয়। ৫. কল শব্দটির ব্যাপ্তি খুব বেশি। সেই কারণে তাকে বুঝতে গেলে প্রায়শই পরস্পরবিরোধী অবস্থানে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা ধীরে ধীরে এগোব।

প্রথমত, কোনো উৎস থেকে কল-কল করে কেউ যখন বেরিয়ে আসে, তা সে জলধারা হোক আর অন্য কোনো বস্তুর ধারাই হোক, তার স্বভাবের মধ্যে **কারী** (= কৃত বা কর্ম্মফল) লালিত হয়ে ধারায় লয় প্রাপ্ত হয়। এবং তা হয় ধাপে ধাপে; তাই তার কল-কল ধ্বনি। এই ধ্বনি তার একই আওয়াজ-কণার পরম্পরার কারণে স্বভাবতই মধুর। আবার, মানুষ যখন 'রে রে রে রে' শব্দে ডাক দেয়, সেও তো কল-অন বা **কলন** হতে থাকা। এই কল-এরও স্বভাবতই কলধ্বনি বা কলরবে পরিণত হতে অসুবিধা নেই।

দ্বিতীয়ত এই **কল** থাকে যাহাতে, তা হয়ে যায় কল্য বা কাল। কালের ধারা দিন-দিন, দিনের পর দিন রূপে প্রবাহিত হয় বলে প্রতিটি দিনেই কল থাকে। তার মানে, দিনগুলির মাধ্যমে পার্থিব সময় কল-কল ধারায় প্রবাহিত হয়। আমরা তাকে আগামীকল্য (আগামীকাল), গতকল্য (গতকাল), সেকাল, একাল, সকাল, বিকাল ইত্যাদি নানা রূপে ব্যবহার করে থাকি।

তৃতীয়ত, **কল** বললে আমরা অনায়াসে বুঝে ফেলি, এ হল যন্ত্র বা 'মেসিন'। সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি আড্ডামূলক 'গাঙ্গুলী মশাই'য়ের গল্পে (দ্র. *ভাষার জমাখরচ*) তিনি এইরকম মেসিনের কথা বলেছেন — 'কলের একদিক দিয়ে গোরু ঢোকানো হচ্ছে, অন্য দিক দিয়ে ... বুট বেরিয়ে আসছে, টারালাপ্ টারালাপ্ করে...।' খক্ খক্ করে কাসলেও এই একই ব্যাপারের সাক্ষাৎ মেলে। এই যে একটা একটা করে, একটার পর একটা অজস্র চামড়ার নতুন জুতো বেরিয়ে আসছে, এটিই কল-কল প্রবাহ। হ্যাঁ, কল এরকমই জিনিস। জলের ধারা যেমন কল-কল ধ্বনি করে প্রবাহিত হয়, মেসিনেও তেমনি উৎপন্নের ধারা কল-কল (আধুনিক মতে, টারালাপ্ টারালাপ্) করে প্রবাহিত হয়ে আসে। (দ্র. **কাশ**)। সেই কারণে মেসিনকে **কল** বলে। সেকালের বাংলাভাষীরা **কলকে ঠিক** এভাবেই বুঝতেন। অর্থাৎ কিনা, কল-কল ধারায় উৎপন্নের বেরিয়ে আসার কারণে মেসিনকে **কল** বলে। কিন্তু পরে পরে **কল** শব্দটি মেসিনের এই উৎপাদন-শীলতার অর্থে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা সহজে কার্য্যসিদ্ধির উপায়, যন্ত্র, ইঞ্জিন, উপায়, কৌশল, ফিকির, ছল, ছুতা, শরীরের সন্ধিস্থল, যুক্তি, মন্ত্রণা, পরামর্শ, নির্মাণকৌশল, কারিগরী, বন্দুকের ঘোড়া, ফাঁদ, পেঁচ, কলকাঠি, কলের পুতুল ইত্যাদি ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। তার ওপর, এই কল-অন যখন একদিকে তার স্বরূপ দেখিয়ে আমাদের মত্ত করে (ব.শ. যাকে বলেছেন কল = 'যাহা মত্ত করে') তখন লোকে কাজের মহিমায় পাগল (কাজপাগলা) হয়, কর্মময়ী-অবিদ্যার চৌষট্টি **কলা**র সাক্ষাৎ পায়।

মোট কথা, প্রতিটি আওয়াজের ভিতরে আওয়াজকারীর অস্তিত্ব থাকেই। কল বা ডাক মাত্রেই (দ্র. **কাকল**) এমন 'শব্দমাত্র' যার ভিতরে আওয়াজ-**কারী**র ইচ্ছা লয় হয়ে রয়েছে। তাহলে তো সেই আওয়াজ এক-দুই-তিন-চার ... এরকম কলন বা (অস্ফুট স্বরে) গণনা করা হতে পারে (সংকলন, আকলন,ব্যবকলন ইত্যাদি), কল্লোলিনীর কল-কল কলস্বর হতে পারে, কুলুকুলু কলকল ধ্বনি বা কলগীত হতে পারে, আবার কলের খটাখট খটাখট ধ্বনিও হতে পারে; এমনকি দিনের পর দিন জুড়ে জুড়ে (কল জুড়ে জুড়ে) কালের প্রবাহও হতে পারে। কিংবা যখন 'কল-কোলাহল' কথাটি বলি, তখন প্রথমত কলের আওয়াজের মতো মৃদুমন্দ খুটখাট কথাবার্তা এবং দ্বিতীয়ত কোলাহলের হৈহৈ চিৎকার হতে পারে। পরে পরে এই কলই ব্যাপক ভাবে প্রযুক্ত হয়ে খানিকটা প্রতীকী স্থির অর্থ ধারণ করে তার অর্থের এলাকা বাড়িয়েছে 'কল করা', 'কলকাঠি নাড়া', 'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে', প্রভৃতি এলাকায়। ৬. cal-যুক্ত অনেক ইংরেজি শব্দই এই 'কল্'-পরিবারের সদস্য। এর মধ্যে সরাসরি কল-এর ভ্রাতৃসম হল — calculate, calculus, calibre ... ইত্যাদি; এবং কাল-এর ভ্রাতৃসম হল — calamity, calendar ... ইত্যাদি। তবে call শব্দটির সূত্র একটু অন্য — '**কল্ল**' বা 'কল্-লালিত হয় যাহাতে'। বাংলায় এর উত্তরাধিকার নাই, রয়েছে ফারসিতে '**কল্লা**' রূপে, যার অর্থ 'যেখান থেকে কল্ বহির্গত হয়' অর্থাৎ 'মাথা'। আর, Old Norse শব্দটিকে রেখেছিল kalla রূপে, যার থেকে ইংরেজিতে সেটি call হয়েছে।

কলঙ্ক : ১. ক (আত্মা) + ✓রঙ্কি হীনীকরণ + অ (অন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কল-এর* **অঙ্ক** *থাকে যাহাতে*। / যাহা আপনাকে রঙ্ক (হীন) করে। (ব.শ.)। ৩. দাগ, চিহ্ন, অপবাদ, দোষকীর্তন, নিন্দা, মালিন্য, লৌহমল, তাম্রাদিতে অম্লাদিযোগে জাত চিহ্ন। (ব.শ.)। ৪. অপবাদ অর্থে প্রচলিত। ৫. কল-কল করে কোনো সত্তা প্রবাহিত হয়ে চলে গেছে, কিন্তু তার **অঙ্ক** বা দাগ থেকে গেছে; এই দাগই কলঙ্ক। কিন্তু শব্দটির অর্থ এইখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। পরবর্তীকালে এসেছে যন্ত্র বা কল। এবং ভারতের ইতিহাসে সে কল বারংবার নিন্দিত হয়েছে। ফলে যন্ত্রজাত দাগ বা কলঙ্ক হয়ে গেছে নিন্দনীয়। পরে পরে যে কোনো নিন্দাজনক দাগকেই কলঙ্ক হিসেবে উল্লেখ করার চল হয়েছে; এবং জলধারা বা অন্য কোনো ধারা প্রবাহের দাগকে কলঙ্ক বলার রীতি বিলুপ্ত হয়েছে।

কলত্র : ১. ✓গড় (সেচন) + অত্র (অত্রন্) - ক। (ব.শ.)। ২. *যার*

দ্বারা কলন সাধিত হয়। / যে প্রণয়ে সিক্ত করে। (ব.শ.)। ৩. ভার্য্যা, শ্রোণি, নিতম্বফলক, নৃপগণের দুর্গস্থান, রাজদুর্গ। ৪. অপ্র.। ৫. রাজদুর্গ নিশ্চয়ই প্রণয়ে সিক্ত করে না। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, রাজদুর্গ ও নৃপগণের দুর্গস্থানের সাহায্যে রাজা বা নৃপ জনগণকে প্রণয়ে সিক্ত করেন, তাহলে শ্রোণি ও নিতম্বফলক কীভাবে তা করে? এর উত্তর পাওয়া যায় একমাত্র 'যার দ্বারা কলন সাধিত হয়' — এই ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে। **পিতৃ প্রবাহ** বা সন্তান পরম্পরার ধারাও কলন পদবাচ্য। সেও কল-কল করে উৎসারিত হয়ে প্রবাহিত হয় এবং সে কাজে তারণকারী ভার্য্যাই **কলত্র** বটে। একই রকম ধারা প্রবাহিত হয় শ্রোণী, নিতম্ব, নৃপগণের দুর্গস্থান, রাজদুর্গ প্রভৃতি স্থান থেকে। শ্রোণী বা নিতম্ব হল সেই স্থান, যার মাঝখান থেকে প্রস্রাবাদি কল-কল করে বেরিয়ে আসে; এবং রাজদুর্গাদি হল সেই স্থান যার ভেতর থেকে সৈন্যেরা কল-কল করে বেরিয়ে আসে। তাই তারাও **কলত্র** পদবাচ্য।

কলবিঙ্ক : ১. কল + বিঙ্ক (রব?)। (ব.শ.)। ২. *কল-এর গতিশীল বহন করে যে।* ৩. চটক পক্ষী, চড়া পাখি। ৪. অপ্র.। ৫. ইন্দ্র ত্রিশিরাকে বধ করলে তার প্রথম কাটা-গলা থেকে **কঙ্ক** পক্ষী (কৃষিজীবী), দ্বিতীয় কাটা-গলা থেকে **কলবিঙ্ক** পক্ষী (কারুজীবী) ও তৃতীয় কাটা-গলা থেকে **কপিঞ্জল** বা **তিত্তিরি** পক্ষীরা (লেখজীবী-কেরানিরা) বহির্গত হয়। এই **ত্রিশিরাঃ** আসলে প্রাচীন ভারতের এমন একটি যৌথ সামাজিক ব্যবস্থা (অধঃপতিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা) যা তিনটি শির বা মাথার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। এই তিনটি শির ছিল যথাক্রমে কৃষিজীবী, কারুশিল্পজীবী ও লেখজীবীরা। তন্মধ্যে এই তিত্তিরি পক্ষীরা পরে যাজ্ঞবল্ক্যের উগরে দেওয়া যজুর্বেদ ভক্ষণ করেছিল এবং তৈত্তিরীয় সংহিতা লিখেছিল। এই বমি-করা বেদই কৃষ্ণ-যজুর্বেদ। পরে যাজ্ঞবল্ক্য যে-বেদ লেখেন, তার নাম শুক্ল-যজুর্বেদ। দ্র. **কঙ্ক**।

কলম (কলম্ব) : ১. ✓কল্ + অম - ণ। (ব.শ.)। ২. *কল সীমায়িত হয় যাহাতে; কলের সীমায়ন বহন করে যে।* ৩. লেখনী, শালিধান্য, প্রচুর জলোৎপন্ন ধান্য, চৌর, লিখিত বিষয়, বেলোয়ারি ঝাড়ের কলম। ৪. লেখনী অর্থে প্রচলিত। ৫. কল-কল করে মানুষ কথা বলে যায়। কিন্তু সেই কলকাকলির ধারাকে সীমায়িত করে লিখে রাখে যে, সে হল কলম্ব বা কলম।

বঙ্গীয় শব্দকোষ-এর সংকলক মহাত্মা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব ক্ষেত্রে নিশ্চিত বুঝেছিলেন বিশ্বের অধিকাংশ ভাষা এক আদি ভাষা থেকে জন্মেছে, তার সুস্পষ্ট নিদর্শন 'কলম' শব্দ বিষয়ে তাঁর ব্যাখ্যা। তিনি দেখিয়েছেন, উণাদি সূত্রেই 'কলম' কথাটি রয়েছে, যে উণাদি সূত্র পাণিনিরও আগে লিখিত হয়েছিল। অমরকোষ, যা কিনা বৌদ্ধযুগে লিখিত, তাতেও 'কলম' শব্দটি রয়েছে। এবং 'লেখনী' অর্থে 'কলম' শব্দটি রয়েছে শব্দরত্নাকর, মেদিনীকোষ, বৈজয়ন্তী, বিশ্বপ্রকাশ, ত্রিকাণ্ডশেষ, অভিধানচিন্তামণি ইত্যাদি গ্রন্থে। কলম শব্দের বিভিন্ন অর্থ লেখার আগেই হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ব্যাখ্যা জুড়েছেন (যা সাধারণভাবে অন্য শব্দের ক্ষেত্রে করেননি) — "অমরকোষধৃত **'কলম্ব' — শাকনালিকা (ডাঁটা)**; বোধ হয়, আরবী শব্দের মূল **'কলম্ব'; মুসলমানশাসন কালে প্রথমে** আদালতে, পরে কথ্যভাষায় **'কলম' শব্দ প্রচলিত ও পরে পরবর্ত্তী** সংস্কৃতকোষে ধৃত হইয়াছে, সংস্কৃত সাহিত্যে **ইহার প্রয়োগ হয় নাই। পূর্ব্বকালে** লেখার নিমিত্ত ব্যবহৃত **'শর' 'খাক' 'কঞ্চির কলম'** সবই নালিকাবিশেষ। গ্রীক kalamos এবং ল্যাটিন calamus শব্দেরও মৌলিক অর্থ 'নল' 'বেত্র' (reed, cane) এবং গৌণার্থে 'নলের কলম' (reed-pen)।"

যাই হোক, কলম শব্দটি থেকে আমরা বুঝতে পারি, এক কালে খাগের কাঠি, যা কিনা একধরনের নালিকাবিশেষ, তাই দিয়েই লেখালেখির সূত্রপাত হয়। কথাটি পৃথিবীর অন্যান্য জাতিও আদি-সংস্কৃতপূর্ব-মহাভাষা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। তাই গ্রীক kalamus এবং ল্যাটিন calamus শব্দেরও মৌলিক অর্থ 'নল' 'বেত্র' এবং গৌণার্থে 'নলের কলম'। আরব জাতি ভারতে আসায় তাদের 'কলম' শব্দটিও আসে। আমরা 'কলম্ব'-এর কথা ভুলে ভাবতে শুরু করি আরবি থেকেই 'কলম' শব্দটি এসেছে। তারা না-এলেও একদিন আমাদের 'কলম্ব' শব্দটিই 'কলম' শব্দে পরিণত হতে পারত, যে-নিয়মে 'দাড়িম্ব' 'ডালিম' শব্দে পরিণত হয়েছে। তবে শব্দটি কেন চৌর-অর্থেও ব্যবহৃত হত, তা বোঝা যায় না। হয়তো 'কলম্ব' শব্দের মূলে যে ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি রয়েছে, সেটি ঠিকঠিক বুঝতে পারলে সেটি বোঝা যাবে। ৬. গ্রীক kalamus এবং ল্যাটিন calamus, ইংরেজি column। 'সে পত্রিকায় কলম লেখে।'

কলশ (কলশি, কলশী) : ১. কল + ✓শু (গতি) + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহা দ্বারা কল অশ (ব্যাপ্ত) হয়। /* যাহা (জলপূরণকালে) 'কল' শব্দ করে। (ব.শ.)। ৩. ঘট, কুম্ভ, মন্থনপাত্র, পরিমাণবিশেষ, দ্রোণ, চার আঢ়ক, মন্দির চৈত্য স্তূপ প্রভৃতির কলশাকৃতি চূড়া, পঞ্চম নামক গহনার উপরে রূপার কলশাকৃতি অংশ। ৪. pitcher অর্থে প্রচলিত। ৫. যা কল-কল করে বেরোয়, এক হিসেবে তাকে কল বলা যায়। তাকে তুলে নিয়ে অন্যত্র যাওয়া যায় বা অশ্ করা (ব্যাপ্ত করা) যায় জলপূর্ণ কলশ-এর দ্বারা। (জলপূর্ণ না থাকলে, তাকে **কলস** বলা যেতে পারে, অন্যথায় কলশ বানানই যথার্থ। এই কল-এর অশন গতিশীল হলে, তাকে কলশি বলা যেতে পারে; এবং সেই কলশির আধারকে **কলশী** বলা যায়।) তবে পরে পরে কলশ শব্দটির অর্থের ব্যাপ্তি ঘটেছে। যা কিছু কলশের মতো দেখতে তাদের অনেককে বোঝানোর জন্য কলশ শব্দের ব্যবহার হয়েছে। দ্র. **কুম্ভ**। ৬. ইংরেজি calash।

কলহ : ১. কল + ✓হন্ + অ (ড) - ক। (ব.শ.)। ২. ***কলকে** হনন করে যে। /* যাহা মধুর ধ্বনি হনন করে। (ব.শ.)। ৩. বিগ্রহ, যুদ্ধ, বিবাদ, ঝগড়া, লাঠালাঠি, খড়্গাকোষ, পথ, ভণ্ডন, বঞ্চনা। ৪. ঝগড়া অর্থে প্রচলিত। ৫. 'ছেলেপুলেরা কলকল করে কথা বলছে' — এরকম বাক্য বুঝতে বাংলাভাষীর অসুবিধা হয় না। পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষার মানুষের কথা বলার নিজস্ব একটা ছন্দ আছে, থাকে। আর বাস্তবত সে ছন্দ নানা রূপের ঐ কল-কল ছন্দই বটে। এখন, ভাষার নিজস্ব নিয়মে, 'কল-কল করে বেরিয়ে আসে যে' তাকে কল বলে।

কিন্তু কোনো কারণে সেই কল-এর স্বাভাবিক ছন্দ যদি নষ্ট হয়, তখন সেই কলধ্বনি আর কলধ্বনি থাকে না। ঝগড়াঝাঁটি, তর্কাতর্কির সময় এরকমই হয়। তখন মানুষের মুখ দিয়ে কথাগুলি আর কল-কল ছন্দে বেরোয় না। একেই **কলহ** বলে। অবশ্য আজকালকার 'ব্যবসায়িক', 'আধুনিক', 'অ্যাকাডেমিক', 'রাজনৈতিক' কিংবা 'ডিপ্লোম্যাটিক' কথাবার্তাতেও কোনোরকম ছন্দ থাকে না, মানুষের স্বাভাবিক কলধ্বনি থাকে না। সেই সুবাদে এগুলিকেও **কলহ** বলা যেতে পারে।

কলা (কলা-দেখানো) : ১. ✓কলি + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কল-এর আশ্রয় যাহাতে*। ৩. চন্দ্রাংশ, কিরণ, কণ, কালপরিমাণবিশেষ, ডিগ্রির ভাগ। সূর্য্যের বারো ভাগের (তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী, ক্ষমা) এক ভাগ। অগ্নির দশ ভাগের (ধূম্রা, অর্চ্চিঃ, উষ্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা, হব্যকব্যবহা) এক ভাগ, শরীরের অংশবিশেষ — মাংসধরা রক্তধরা মেদোধরা শ্লেষ্মাধরা অন্নধরা অগ্নিধরা রেতোধরা, রাশির ১৮০০তম ভাগ, অংশাংশ, অণু, বিদ্যামাত্র, কপট, ছল, নৌকা, স্ত্রীরজঃ, জিহ্বা, মূলধনবৃদ্ধি, সুদ, বর্ণমাত্র, ক্রিয়া, কার্য্য, শিব, চিত্রকলা, কান্তি, সুন্দরী নারী, চৌষট্টি কলা। [চৌষট্টি কলা বা বিদ্যার নাম —১. গীত, ২. বাদ্য, ৩. নৃত্য, ৪. নাট্য, ৫. আলেখ্য, ৬. বিশেষকচ্ছেদ্য (তিলকের নানাবিধ রচনা), ৭. তণ্ডুলকুসুমাবলিবিকার (পূজার উপহার চাল ও ফুলের বিবিধ রচনা), ৮. পুষ্পাস্তরণ (ফুল দিয়ে বিছানা করা), ৯. দশবসনাঙ্গরাগ (বিবিধ রং দিয়ে দন্ত-বস্ত্র-দেহ রাঙানো), ১০. মণিভূমিকাকর্ম্ম (ময়নির্মিত পাণ্ডবসভাবৎ মণিবদ্ধভূমিকরণ), ১১. শয়নরচনা (খাট-পালঙ্ক বানানো), ১২. উদকবাদ্য (জলভরা কলসি বাজানো) ও উদকঘাত (জলস্তম্ভবিদ্যা), ১৩. চিত্রযোগ (নানা অদ্ভুতদর্শনের উপায়), ১৪. মাল্যগ্রথনবিকল্প (মালা গাঁথা), ১৫. শেখরাপীড়যোজন (চুলে ফুল বা মুকুট সাজানো), ১৬. নেপথ্যযোগ (নটশালানির্মাণ), ১৭. কর্ণপত্রভঙ্গ (কানের গহনা বানানো), ১৮. গন্ধযুক্তি (নানা সুগন্ধী বানানো), ১৯. ভূষণযোজন (গহনা পরানো), ২০. ঐন্দ্রজাল (বিবিধ মায়াপ্রদর্শন), ২১. কৌচুমারযোগ (কুচুমার কর্তৃক প্রকাশিত স্বদেহে নানারূপ ব্যঞ্জনা), ২২. হস্তলাঘব (হাতের কৌশলে চমৎকার বস্তু দেখানো), ২৩. চিত্রশাকাপূপভক্ষ্যধিকার-ক্রিয়া (নানা শাকাদিরন্ধনক্রিয়া), ২৪. পানকরসরাগাসবযোজন (নানারকম শরবত ইত্যাদি বানানো), ২৫. সূচীবায়কর্ম্ম (সেলাইয়ের কাজ), ২৬. সূত্রক্রীড়া (সুতোর কাজ ও পুতুল বানানো), ২৭. বীণাডমরুকবাদ্যাদি, ২৮. প্রহেলিকা (হেঁয়ালি), ২৯. প্রতিমালা (বস্তুর প্রতিকৃতিনির্মাণ), ৩০. দুর্ব্বাচকযোগ (দুরূহ পদের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ), ৩১. পুস্তকবাচন (শীঘ্র অবিদ্যমান বর্ণযোজনা করিয়া পাঠ), ৩২. নাটকাখ্যায়িকাদর্শন (পটে নাটকস্থ কথার প্রদর্শন), ৩৩. কাব্যসমস্যা-পূরণ (কাব্যে অবিদ্যমান শ্লোকের পূরণ), ৩৪. পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প (নেয়ার, বেতের আসন, শরপুঙ্খ বানানো), ৩৫. তর্কু-কর্ম্ম (টেকোয় সূতা কাটা), ৩৬. তক্ষণ (ছুতোরের কাজ) , ৩৭. বাস্তুবিদ্যা (গৃহনির্মাণবিদ্যা), ৩৮. রূপ্যরত্নপরীক্ষণ (সোনা রূপা ও রত্নের বিশুদ্ধি পরীক্ষা), ৩৯. ধাতুবাদ (Mineralogy), ৪০. মণিরাগজ্ঞান (রত্ন চেনা), ৪১. আকরজ্ঞান (Mining), ৪২. বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ (বৃক্ষের জীবনকাল, চিকিৎসা ইত্যাদির জ্ঞান), ৪৩. মেষকুক্কুটশাবক-যুদ্ধবিধি, ৪৪. শুকসারিকাপ্রপালন (তোতা ময়না পড়ানো), ৪৫. উৎসাদন (মন্ত্রাদি দ্বারা পরস্পরের বিশ্লেষণ), ৪৬. কেশমার্জ্জনকৌশল, ৪৭. অক্ষরমুষ্টিকাকথন (পরদৃষ্ট অক্ষর ও মুষ্টিস্থিত পদার্থ নির্ণয়), ৪৮. ম্লেচ্ছিতবিকল্প (বিবিধ ম্লেচ্ছভাষা-জ্ঞান), ৪৯. দেশভাষাজ্ঞান (দেশের কথ্যভাষাজ্ঞান), ৫০. পুষ্পশকটিকা-নিমিত্ত-জ্ঞান (ফুল দিয়ে গাড়ি সাজানো ও নিমিত্ত দ্বারা ভাবী বিষয়ের জ্ঞান), ৫১. যন্ত্রমাতৃকা-ধারণমাতৃকা (পূজার্থ ও ধারণার্থ মাতৃকাবর্ণে যন্ত্রনির্মাণ), ৫২. সম্পাট্য (হীরকাদির দ্বৈধীকরণবিদ্যা), ৫৩. মানসী কাব্যক্রিয়া (পরের মনস্থিত বিষয়ের শ্লোকরচনা), ৫৪. অভিধানকোশ, ৫৫. ছন্দোজ্ঞান, ৫৬. ক্রিয়াবিকল্প (এক এক ক্রিয়ার বিবিধ উপায়ে নিষ্পাদন), ৫৭. ছলিতকযোগ (পরবঞ্চনোপায়), ৫৮. বস্ত্রগোপন (সুতোর কাপড়কে পাটের কাপড় রূপে দেখানো), ৫৯. দ্যূতবিশেষ (বিবিধ দ্যূতক্রীড়া), ৬০. আকর্ষক্রীড়া (দূরস্থ ক্রীড়াদ্রব্য নিকটে আকর্ষণ করার কৌশল), ৬১. বালকক্রীড়নক সমূহ, ৬২. বৈনায়িকী বিদ্যা, ৬৩. বৈজয়িকী বিদ্যা, ৬৪. বৈতালিকী বিদ্যা।] (ব.শ.)। এছাড়াও কলা শব্দের আরও অর্থ রয়েছে। যথা **কদলক, কলা, কলাগাছ, কদলীফল, বৃদ্ধাঙ্গুলি, কলা দেখানো** ইত্যাদি। কিন্তু ব.শ. সেগুলিকে পৃথক কদলক শব্দ থেকে জাত বলে মনে করেছেন এবং সেই কারণে তার আলাদা ভুক্তি করেছেন। এছাড়াও রয়েছে পৌরাণিক **কলা**। সেগুলি হল — (ক) ভাগবত অনুসারে মহর্ষি মরীচির স্ত্রী। মহর্ষি কর্দমের ঔরসে মনু-কন্যা দেবহুতির গর্ভে এঁর জন্ম। ইনি মহর্ষি কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। (খ) বিভীষণের কন্যা। (গ) একজন অপ্সরা। (পৌ.অ.)। ৪. art ও banana অর্থে প্রচলিত। ৫. 'কলা' শব্দের উপরোক্ত অর্থগুলির বিশেষত্ব হল, এগুলির প্রায় প্রতিটিই 'কল'-এর আশ্রয় বা আধার। সেকালের কামসূত্রে (কাজকর্মের সম্পর্কের নিয়মাবলীতে) সেইরকম কন্যাকে (কর্মীকে) বিবাহ (বিশেষ বন্ধনে আবদ্ধ করার বা কন্ট্রাক্ট) করার কথা বলা হয়েছে, যে-কন্যা উপরোক্ত চৌষট্টি **কলা** জানে। এই **কন্যা** যে কিছুতেই bride হতে পারে না (দ্র. **দক্ষকন্যা, কন্যাকুব্জ**), সেকথা সহজেই বোঝা যায়। তবে ব্রহ্মার পুত্র কর্দ্দম, তার কন্যা **কলা**, যে কিনা মরীচির স্ত্রী হয়ে মহর্ষি কশ্যপকে জন্ম দেন; তার কথা বুঝতে গেলে একটু সমস্যা হয়। জ্ঞানজীবী ব্রহ্মার পরে কর্দ্দমের সময় থেকে সমাজ কর্দমাক্ত পথে পা বাড়িয়েছিল এবং তারই কন্যা **কলা**। সে আবার মরীচির ঔরসে পৃথিবীর আদি 'ব্যক্তিমালিকানা (= কশ্য) পালনকারী (= প)' কশ্যপের জননী। আর, **কদলক** বা banana-কলা কিন্তু কল্ থেকে জন্মায়নি। ব.শ. শব্দকোষ এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু তার মানে, কলা-দেখানো জাতীয় কথায় যে **কলা** রয়েছে, তা banana-কলা থেকে আসেনি; এসেছে উপরোক্ত চৌষট্টি **কলা** থেকেই। দক্ষের হাতে ছিল ঐ চৌষট্টি **কলা**। দক্ষকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠও বলা হত। দক্ষযজ্ঞের মহাসংগ্রামের পর সমাজের অধিকাংশ মানুষকে দক্ষ বা স্পেশালিস্টরা ঐ চৌষট্টি **কলা**র বা কলাকৌশলের (টেকনোলজির) গৌরব দেখিয়ে

নিজের পক্ষভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। মানুষ কিছুদিনের মধ্যেই অনুভব করেছিল, বাস্তবে তারা কিন্তু ঠকে গেছে। যৌথসমাজের কর্মজগতে মানুষ কর্মের যে অধিকার, কর্মফল, কর্মানন্দ (job-satisfaction) ভোগ করত, দক্ষদের (বা স্পেশালিস্টদের বা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শনকারীদের) দ্বারা পরিচালিত সমাজে আর তারা সেই অধিকার পাচ্ছে না; তার থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে গেছে। ফলে ভারতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর মানে হয়ে যায় **কলা** দেখানো বা ঠকানো। [একালে যেমন বায়ু (= মিডিয়া) যাহার বাহন (দ্র. **জানালা**), সেই 'বায়ুবাহন'-এর **কলা** বা Information Technology দেখিয়ে নিত্যনতুন ঠগবাজি চলছে, অনেকটা সেইরকম।] আর, যারা সেই মহাসংগ্রামে বিতাড়িত হয়েছিল, তারা বুঝেছিল, যারা বুড়ো আঙুল দেখায়, thumbs up করে, তারাই বিজয়ী। ফলে, তাদের কাছে সেটি বিজয়ের ইঙ্গিতবাহী আচরণ হয়ে যায়।

কলাপ : ১. কলা + ✓আপ্ অথবা ✓পা + অ (অণ্, ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কলা (কল-কল ধারার একটি মাত্র কল-এর আধার) পালিত হয় যাহাতে; (চৌষট্টি) কলা পালিত হয় যাহাতে।* / যাহা কলা (অংশ) প্রাপ্ত হয়। (ব.শ.)। ৩. সমূহ, নিকর, গুচ্ছ, চন্দ্র, 'চন্দ্রকযুক্ত' ময়ূরপুচ্ছ, শরসমূহের আধার বা তূণ, শরপূর্ণ তূণ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার বাণ, বাণ, কাঞ্চী, কটিভূষণ, চন্দ্রহার, অলঙ্কার, হস্তীর গলবন্ধন-রজ্জু, কার্ত্তিকেয়ময়ূর কলাপের নামে খ্যাত, বিদগ্ধ, পণ্ডিত, সম্প্রদায়সূচক তিলক। ৪. অর্থহীন suffix রূপে প্রচলিত। ৫. অন্য শব্দের অনুসর্গ হিসেবে প্রচলিত হলেও কিন্তু অর্থহীন শব্দ রূপেই প্রচলিত। যথা 'কার্য্য**কলাপ**'। কার্য্য শব্দের মানে সবাই জানে, কিন্তু কলাপ শব্দের মানে প্রায় কেউই জানেন না। তবে উপরোক্ত 'কলা পালক' অর্থটি ধরে এগোলে আর বিশেষ অসুবিধা হয় না। তখন সমূহ-নিকর-গুচ্ছকেও যেমন 'কলাপ' রূপে বোঝা যায়, তেমনি বিদগ্ধ-পণ্ডিত প্রভৃতি কেন **কলাপ**-পদবাচ্য, তাও বোঝা যায়। এমনকি, 'কলাপ ব্যাকরণ' নামে যে গ্রন্থটি সেকালে লেখা হয়েছিল, তার অর্থও বোঝা যেতে পারে।

কলি : ১. ✓কল্ + ই (ইন্) - অধিকরণে। (ব.শ.)। ২. **কল্**কে *গতিশীল করে (বাড়ায়) যে।* ৩. সমর, যুদ্ধ, কলহ, বিবাদ, চতুর্থযুগ বা কলিযুগ (৩১০২ খ্রিস্ট পূর্ব্বাব্দে ইহার আরম্ভ হইয়াছে), কলির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (ভাগবত মতে কলি ক্রোধ ও হিংসার পুত্র।), অজ্ঞান আলস্য প্রভৃতি হেতু নিরুদ্যম রাজা, পাশার যে-পাশে এক বিন্দু থাকে সেই পাশ, (কলির আশ্রয় হেতু) বিভীতক বৃক্ষ, শূর, বীর, বাণ, শিব। কোরক, ফুলের কুঁড়ি ... গানের পদ, শ্লোকের চরণ, ... (ব.শ.)। যুগপ্রবর্তক দেবতা। এঁর নামানুসারে বর্তমান যুগের নাম **কলিযুগ**। ৪,৩২,০০০ বৎসর পর্যন্ত পৃথিবী এই দেবতার অধিকারে থাকবে। এই যুগের শেষে ভগবান বিষ্ণু কল্কীরূপে আবির্ভূত হবেন। দ্বাপরের অবসানে ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হতে অধর্মের সৃষ্টি হয়। অধর্মের স্ত্রীর নাম মিথ্যা। মিথ্যার গর্ভে ও অধর্মের ঔরসে দম্ভ নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দম্ভ নিজ ভগিনী মায়াকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের লোভ নামে এক পুত্র জন্মে। লোভ নিজের ভগিনী নিবৃতিকে বিবাহ করেন এবং তাঁদের ক্রোধ নামে এক পুত্র ও হিংসা নামে এক কন্যা হয়। ক্রোধ নিজ ভগিনী হিংসাকে বিবাহ করেন। তাঁদের কলি নামে এক পুত্র হয়। ইনি অতি কৃষ্ণবর্ণ তৈলাভিসিক্ত, বিকটবদন, লোলজিহ্বা, পূতিগন্ধাশব পূর্ণ। কলি নিজের ভগিনী দ্বিরুক্তিকে বিবাহ করে ভয় নামে এক পুত্র ও মৃত্যু নামে এক কন্যার জন্ম দেন। কলির অত্যাচারে নিষাদরাজ (নিষধরাজ) নল রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে স্ত্রী দময়ন্তীসহ অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. 'কলি দেবতা' ও 'কলিযুগ' অর্থে এখনও প্রচলিত। ৫. জোয়াল, যা কিনা বলদের কাঁধে চাপানো হয়, তাকে **যুগ**ও বলে। সমাজরথের জোয়াল যখন কলির কাঁধে, তখনই **কলি** যুগ। অর্থাৎ 'কলই যখন সমাজরথের যুগ (জোয়াল) বহন করে' সেই সময়টি হল **কলিযুগ**। একালের ভাষায় যাকে আমরা 'মেসিন এজ' বলি, পৌরাণিক ভাষায় তাকেই 'কলিযুগ' বলা হয়।

এই কলির জন্মের যে কাহিনী উপরে বর্ণিত হয়েছে, এই বর্ণনা আজ আর আমরা বুঝতে পারি না। অধর্ম, মিথ্যা, দম্ভ, মায়া, লোভ, নিবৃতি, ক্রোধ, হিংসা, দ্বিরুক্তি, ভয়, মৃত্যু — এরা সব মানুষের মতো জন্মেছে, বিবাহাদি করেছে এবং তাদের সন্তানসন্ততি হয়েছে। এদের দুজন পৌরাণিক চরিত্র। শুরুতে ব্রহ্মা, যার পিঠ থেকে অধর্মের জন্ম হয়েছিল এবং শেষের আগের অধ্যায়ে আর এক চরিত্র **কলি**, যার এক পুত্র ভয় এবং এক কন্যা মৃত্যু। এই মৃত্যুতেই কলির যেন শেষ। — না, এদের আজ আমরা বুঝতে পারি না, বুঝতে গেলে সমস্যায় পড়ি। কিন্তু যখন ইয়োরোপের মধ্যযুগের Morality নাটকে Knowledge, Mercy, Pleasure, Beauty, Kinship — প্রভৃতি চরিত্রের সংলাপ শুনি, তখন অবাক হয়ে ভাবি — এ কী রে বাবা! আমাদের **কাম, অগ্নি; ধর্ম, অধর্ম, মিথ্যা, দম্ভ, মায়া, লোভ, নিবৃতি, ক্রোধ, হিংসা** প্রভৃতির মতো abstract চরিত্রের এমন বিস্ময়কর প্রয়োগ তাহলে ইউরোপেরও ছিল?! তাদের কাহিনীতেও **বুধ** (Knowledge), **ক্ষমা** (Mercy) প্রভৃতি বিমূর্ত্ত চরিত্র থাকত এবং তারা মানুষের মতো কথা বলত এবং আচরণ করত! কিন্তু তাতে কী! আমরা যেমন আমাদের **কামদেব** বা **ধর্মরাজ**কে ভুলেছি, শিল্পবিপ্লবোত্তর ইয়োরোপও তাদের সেই Morality-র যুগের অধিকাংশ অর্জনকেই ভুলে মেরে দিয়েছে কিংবা ফেলে দিয়েছে। সেই স্মৃতিহারা ইয়োরোপের থেকে লেখাপড়া শিখে একালে যাঁরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন, ইংরেজের খোয়ানো পৈতৃক সম্পত্তি বিষয়ে তাঁরা প্রায় কিছুই জানেন না; আর সেটাই স্বাভাবিক।

ভুলেছি আমরা অনেক কিছুই। যেমন পুরাণাদিতে বৎসরের হিসাব। এটি যে কী নিয়মে করা হয়েছিল, জানি না। তবে কোনো কোনো ভারতীয় পণ্ডিত নিশ্চয় জানেন। নইলে **কলিযুগ** শেষ হয়ে গেল বলে ২০০০ সালে কলকাতায় 'ব্রহ্মকুমারীরা' অত উৎসব করলেন কেন। ওদিকে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা ঘোষণা করে দিয়েছেন 'মেসিন এজ' শেষ হয়ে এখন 'ইনফর্মেশন এজ' শুরু হয়েছে। (ঙ) গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

কলিকাতা : ১. কল, কর্ত্তা > কলিকাতা। ২. *কল-ই (কলি) কর্ত্তা যেখানে।* ৩. গঙ্গাতীরস্থ বঙ্গদেশের প্রধান নগরী। কলকাতা। ৪.

বর্তমানে শব্দটি **'কলকাতা'** রূপে প্রচলিত। **৫.** 'কলই কর্তা যেখানে' কথাটির অর্থ হল যে-দেশে মেসিন সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞের নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে। ভাগীরথী সংলগ্ন ওই অঞ্চল, ব্রিটিশের আগমনের বহু আগে থেকেই, নানারকম হস্তশিল্পের ও বিপণনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ... তাছাড়া, **কালীক্ষেত্র** ছিল কলিকাতা এবং ভারতের কালীকট বন্দর। প্রাচীনকালে কর্মীজনগণকে **কালী** বলা হত। দক্ষযজ্ঞের সামাজিক বিস্ফোরণে সেই কর্মীজনগণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের ৫১টি কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই ৫১টি কেন্দ্রকে 'একান্নপীঠ' বলা হয়। **কলিকাতা** তাদের একটি। পরবর্তী কালে কল-ই কর্তা হয়ে যাওয়ার ফলে সমগ্র অঞ্চলটিতে কারুশিল্পী কারিগর শ্রেণীর বাড়বাড়ন্ত হয় এবং কথাটি গিয়ে দাঁড়ায় 'কালী-কলকত্তাওয়ালী'তে। দ্র. **কিরাত, কিলকিলা প্রদেশ**। ... বিস্তারিত বিবরণের জন্য (চ) গ্রন্থের 'বাঙালি মনমরা কেন' নিবন্ধের প্রথম অংশ 'কলকাতার বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকার ...' দ্রষ্টব্য।

কলিঙ্গ : **১.** কল, অঙ্গ > কলিঙ্গ। / কলি + √গম্ + অ - ক। (ব.শ.)। **২.** *কল-ই অঙ্গ যাহার*। **৩.** পূতিকরঞ্জবৃক্ষ, কুটজবৃক্ষ, প্লক্ষবৃক্ষ, শিরীষবৃক্ষ। ধূম্যাটপক্ষী, ফিঙা, দেশবিশেষ, কলিঙ্গবাসীগণ, কলিঙ্গদেশের রাজগণ। বলিরাজের পুত্র কলিঙ্গের নামানুসারে তদীয় শাসিত দেশ 'কলিঙ্গ' নামে খ্যাত। 'কলিঙ্গ' উৎকলদেশের পৌরাণিক নাম। সুবর্ণরেখা হইতে কর্ণাটদেশের উত্তরসীমা পর্যন্ত পূর্বকালে 'কলিঙ্গ' নামে বিখ্যাত ছিল। এই দেশ তিন ভাগে বিভক্ত বিধায় ত্রিকলিঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইত, উত্তর বা উৎকলিঙ্গ উক্ত দেশের উত্তর ভাগের নাম ছিল। 'উৎকল' শব্দ এই 'উৎকলিঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ, এমত সম্ভব। অপর তৈলঙ্গ বা তেলিঙ্গা শব্দও ত্রিকলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ, এমত প্রতীত হয়। (ব.শ.)। বলিরাজের ক্ষেত্রজ পুত্র। ইনি বলিরাজের স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে ও মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর অধিকৃত রাজ্য কলিঙ্গ নামে খ্যাত। উড়িষ্যার দক্ষিণ হতে দ্রাবিড়ের উত্তর পর্যন্ত উপকূল ভূভাগ কলিঙ্গ নামে অভিহিত। (পৌ.অ.)। **৪.** উড়িষ্যা রাজ্যটিকে বোঝাতে 'কলিঙ্গ' শব্দটি কদাচিৎ প্রচলিত। **৫.** বিহার-বাংলা-উড়িষ্যা প্রদেশকে একত্রে যথাক্রমে **অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ** বলার রীতি বাংলায় বহুল প্রচলিত। (ত্রিকলিঙ্গ যেমন তেলেঙ্গানা। এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের বঙ্গভাষীরা তেলেঙ্গী বলতেন।) এই তিনটি দেশের বহু বিশেষত্ব আছে।

জমিতে ট্যাক্স (যা কিনা একপ্রকার **সুদই** বটে) প্রচলিত হবার পর ভারতের পূর্বাংশকে পাঁচটি প্রদেশে **(অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-পুণ্ড্র-সুহ্ম)** ভাগ করা হয়। এই পাঁচটি প্রদেশের শাসনব্যবস্থার জন্ম হয় 'ট্যাক্স-ব্যবস্থার আধাররূপী জনগোষ্ঠী'র (**সুদেষ্ণার**) ভিতর থেকে এবং পূর্ববর্তী দীর্ঘসূত্রী অন্ধ ক্লেদাক্ত সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) ব্যবস্থার (**দীর্ঘতমার**) ক্ষয়িষ্ণু তাত্ত্বিক ভিত্তিতে (**ঔরসে**)। ...

সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এই যে, বেদবিরোধী যুদ্ধে এই তিনটি দেশ সাময়িক ভাবে বিজয় লাভ করেছিল। বিষয়টি জানা যায় **জনমেজয়ের** সর্পসত্রের কাহিনী থেকে। **কাশীরাম দাস** অনুসারে **নাগ**বংশকে ধ্বংস করার জন্য আয়োজিত সর্পসত্রের বাধা রূপে ব্রাহ্মণ দেখা দিলে, **জনমেজয়** ঘোষণা করেন — 'আপনার চিত্তে আমি করিনু বিচার। / দ্বিজ বিনা শত্রু মোর কেহ নাহি আর॥... মোর রাজ্যে বসিয়া এতেক অহঙ্কার। / দ্বিজের কুরীতি অঙ্গে সহ্য নহে আর॥... পূর্ব্বে কার্ত্তবীর্য করিলেন দ্বিজধ্বংস। / উদর চিরিয়া মারিলেন ভৃগুবংশ॥ / সেইমত দ্বিজ সব করিব সংহার। / যাহা হৌক এই সত্য বচন আমার॥' শতপথ ব্রাহ্মণ মতে এই যুদ্ধে প্রাথমিক ভাবে **অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ** দেশে **জনমেজয়** বিজয় লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই দেশগুলিতেও জনমেজয়ের পরাজয় ঘটে। ফলস্বরূপ এই তিনটি দেশকে সর্ব্বৈ ম্লেচ্ছদেশ বলে ঘোষণা করা হয়। এই তিন অঞ্চলের অধিবাসী ব্রাহ্মণদেরও ব্রাহ্মণত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। যে কারণে এই ব্রাহ্মণদের 'বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ' (যাদের 'বারণ' করা হইয়াছে) এবং 'রাঢ়ী ব্রাহ্মণ' (যারা বেদবাদীদের বিরুদ্ধে রঢ় বা লড়াই করেছিল) বলে।

এই দেশগুলির আরও একটি বিশেষত্ব হল, ভারতীয় সমাজ যে আইন অর্জন করতে পেরেছিল, যা কিনা ইয়োরোপীয় আইনের তুলনায় অনেক উচ্চ মানের বলে ব্রিটিশ পণ্ডিতদের অভিমত, সেই ভারতীয় আইনের দুটি ধারা — **মিতাক্ষরা** ও **দায়ভাগ**। এর মধ্যে মিতাক্ষরার সঙ্গে পাশ্চাত্যের এবং ইসলামী আইনের খানিকটা মিল আছে। কিন্তু **দায়ভাগ** অনুসৃত হয় একমাত্র অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে। বাকি ভারতে অনুসৃত হয় মিতাক্ষরা। বোঝা যায়, বেদবিরোধী ব্রাহ্মণেরা নিজেদের সামাজিক অগ্রগতির (পণ্যবাহিতার দিকে ঝোঁকের) সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন আইন (দায়ভাগ) নিজেদের এলাকায় প্রবর্তন করেছিলেন। দ্র. **অঙ্গ, গৌরাঙ্গ, বঙ্গ, দীর্ঘতমা**।

কলিযুগ : **১.** কল + যুগ। **২.** *কল যখন সমাজের যুগ (জোয়াল) বহন করে*। **৩.** কলিনামক চতুর্থ যুগ। ইহাতে অবতার কল্কি, পুণ্য একপাদ, পাপ ত্রিপাদ, তীর্থ গঙ্গা, ব্রাহ্মণ নিরগ্নি, প্রাণ অন্নগত, মানবদেহ সাড়ে তিনহাত-পরিমিত, আয়ু ১০৮ বৎসর, রাজা যুধিষ্ঠিরাদি। (ব.শ.)। চারিযুগের শেষ যুগ। কলি এর অধিষ্ঠাতা। ১২০০ দিব্য বৎসর অর্থাৎ ১২০০ × ৩৬০ = ৪,৩২,০০০ বৎসর এর পরিমাণ। ৩১০১ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে এই যুগের আরম্ভ হয়েছে। কলিযুগ অধর্মের যুগ। এই যুগে ধর্ম মাত্র একচতুর্থাংশ থাকবে। এই যুগে ত্রিপাদ পাপ ও একপাদ পুণ্য। এই যুগের শেষে ভগবান বিষ্ণু কল্কীরূপে জন্মগ্রহণ করে দুষ্কৃতের বিনাশ করে ধর্মরাজ্য স্থাপন করবেন। তারপর সত্যযুগের আরম্ভ হবে। (পৌ.অ.)। **৪.** বর্তমান যুগটিকে মন্দ যুগ বোঝাতে শব্দটি প্রচলিত রয়েছে। **৫.** বর্তমান যুগে নাকি অবতার **কল্কি**। প্রাচীন কালে (সত্যযুগে বা কৃতযুগে) মানুষ বাহ্যসম্পদ সংগ্রহ করে বা উৎপাদন করে জমাতো না, সবই ছিল 'কৃতকৃত্য'। তাই তখন কোনো **পাপ** (বাড়তি উৎপন্ন বা পণ্য) ছিল না। বর্তমান কলের যুগে তিনভাগ উৎপন্নই পাপ বা পণ্যপদবাচ্য, মাত্র একভাগ উৎপন্নই কৃতকৃত্য বা পুণ্যপদবাচ্য। স্বাভাবিক কারণেই চারিদিকে প্রবাহিত কমোডিটি ফ্লো বা **গঙ্গাই** আমাদের 'তরণের উপায় করে' প্রয়োজন মেটায় বলে তীর্থপদবাচ্য। এসময় ব্রাহ্মণ নিরগ্নি অর্থাৎ ব্রহ্মগুণসম্পন্ন মানুষদের উত্তরসূরিরা তেজহীন, প্রাণ অন্নগত অর্থাৎ অন্নের দিকেই মানুষের দৃষ্টি পড়ে থাকে, মানবদেহ

সাড়ে তিনহাত লম্বা, আয়ু ১০৮ বৎসর, রাজা যুধিষ্ঠিরাদি (পুঁজিবাদী ধর্মাচারীরা)। বোঝা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষেরা খুব একটা খারাপ ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন না। তবে যুগের সময়ের যে হিসাব উপরে দেওয়া হয়েছে, তা বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন রকম। কোনো কোনো পুরাণে সত্যযুগ ৪০০০ বছর, ত্রেতাযুগ ৩০০০ বছর, দ্বাপর যুগ ২০০০ বছর এবং কলিযুগ ১০০০ বছর, এবং এই যুগগুলির সন্ধ্যাংশ বা মধ্যবর্তী কাল ৫০০ বছর করে মোট ২০০০ বছর; সব মিলিয়ে ১২০০০ বছর। এই ১২০০০ বছরে একটি পূর্ণ যুগ হয়। এই হিসাবটি ঠিক বলেই মনে হয় আমাদের। সেই হিসেবে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ১২০০০ বছর শেষ হয় এবং একাকারের যুগের সূত্রপাত হয়। এখন যে বিশ্বায়ন চলছে, তা সেই হিসেবে একাকারের যুগের সূত্রপাত। এবং বিশ্বায়ন তো একাকারই বটে।

কল্কি (কল্কী) : ১. কল্ক + ই। ২. যাঁহার পাপ হার্য্যরূপে আছে। (ব.শ.)। ৩. বিষ্ণুর দশম অবতার, কল্কযুক্ত, পাপী, পঙ্কিল, আবিল, মলিন। কল্কী বৈশাখী শুক্লদ্বাদশীতে ম্লেচ্ছনিধনার্থ আবির্ভূত হইবেন। ইঁহার পিতা বিষ্ণুযশাঃ নামে ব্রাহ্মণ এবং মাতা সুমতি। ইনি দ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ পূর্বক অসিঘাতে ম্লেচ্ছগণকে নিহত করিবেন। (ব.শ.)। কল্কীপুরাণ অনুসারে বিষ্ণুর দশ অবতারের শেষ অবতার। বর্তমান কলিযুগের শেষে বিষ্ণু কল্কীরূপে জন্মগ্রহণ করে কলিকে বিনাশ করলে আবার সত্যযুগের আবির্ভাব হবে। কল্কী আগমন করবেন দুই পক্ষযুক্ত শ্বেতবর্ণের অশ্বে আরোহণ করে এবং জ্বলন্ত ধূমকেতুর মতো এক হাতে তলোয়ার আর অন্য হাতে চক্র নিয়ে। তারপর ইনি বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থাপনে বদ্ধপরিকর হয়ে, ম্লেচ্ছ ও বিধর্মীদের অসি হস্তে নির্মূল করবেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করে দক্ষিণাস্বরূপ সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণদের দান করবেন। তখন পৃথিবী ধ্বংস হবে ও ইনি অন্তর্ধান করবেন। পুরাণ মতে ইনি শম্ভলগ্রাম নিবাসী বিষ্ণুযশা নামে ব্রাহ্মণের গৃহে সুমতির গর্ভে পুত্ররূপে চৈত্র মাসে শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করবেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. অপহরণ শব্দটি একালে নিন্দনীয় 'চুরি' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু আহরণ শব্দটি সেরকম নয়, 'হরণের আশ্রয় যাহাতে' তাই আহরণ। এই হরণ সমাজের রীতিনীতিসম্মত। যে যে বিষয় বা বস্তুসমূহকে এই রীতিনীতি-সম্মত উপায়ে হরণ করা হয়, সেগুলি হার্য্য। পাপ বা পণ্যও হার্য্য। কল যার থাকে, তার দ্বারা যে কল্ক বানিয়ে রাখে ও তার বিকাশসাধন করে, সেই মেসিনের শিল্পের মালিকের পণ্য তো অন্যদের হার্য্যরূপেই থাকে। রীতিনীতিসম্মত উপায়ে, যথাবিহিত দাম দিয়ে তা আহরণ করে আনতে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে কল্কি হলেন শিল্পপতি, নগদ নারায়ণের শেষ অবতার।

তবে পুরাণ যখন লেখা হচ্ছে তখনও **কল্কি** অবতার জন্মাননি, জন্মাবেন। পৌরাণিক পণ্ডিতেরা ভেবেচিন্তে আন্দাজ করে কল্কির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী লিখেছেন। স্বভাবতই তাঁদের প্রযুক্ত শব্দগুলিকে, যথা 'বিষ্ণুযশা' 'সুমতি' 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি শব্দগুলিকে কালের প্রেক্ষিতে বিচার করে বুঝতে হবে — এগুলি একালে ঠিক কাদের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হতে পারে।

কল্মাষপাদ : ১. কল্মাষ + পাদ। ২. *পায়ে (কিংবা পায়ে পায়ে) কল্মাষ (কল-জাত মলিনতা) যাহার*। ৩. সূর্যবংশীয় রাজা সৌদাস। ইঁহার পিতা সুদাস, পত্নী দময়ন্তী। শাপজল পাদে পতিত হওয়ায় দগ্ধপাদ হেতু 'কল্মাষপাদ' নামে অভিহিত হন। (ব.শ.)। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। সুদাস রাজার পুত্র বলে এঁর অপর নাম সৌদাস। মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে এই মৃগয়াসক্ত রাজা একদিন মৃগয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বশিষ্ঠ মুনির পুত্র শক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ও তিনি শক্তিকে পথ ছেড়ে দিতে বলেন। বশিষ্ঠপুত্র রাজাকে পথ ছেড়ে দিতে অস্বীকার করে বলেন যে, ব্রাহ্মণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই রাজাদের সনাতন ধর্ম। এই কথা শুনে রাজা তাঁকে কষাঘাত করেন। তখন শক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে নরমাংসভোজী রাক্ষস হবার অভিসম্পাত দেন। রাজা রাক্ষসে পরিণত হয়ে বনে গমন করেন এবং একদিন শক্তিকে দেখা মাত্রই বধ করে ভক্ষণ করেন। পরিশেষে বশিষ্ঠের শতপুত্রের সকলকেই তিনি ভক্ষণ করে ফেলেন। একদিন পথিমধ্যে কল্মাষপাদ বশিষ্ঠকে দেখে তাঁকেও আহার করতে গেলে, বশিষ্ঠ কল্মাষপাদের গায়ে মন্ত্রপূত জলসিঞ্চন করে তাঁকে শাপমুক্ত করেন এবং ফিরে গিয়ে রাজ্যশাসন করতে বলেন এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণদের অপমান করতেও নিষেধ করেন। কল্মাষপাদ তখন পিতৃঋণ থেকে মুক্ত হবার জন্য বশিষ্ঠের নিকট এক পুত্র কামনা করেন। অতঃপর রাজা অযোধ্যাপুরীতে ফিরে আসেন। বশিষ্ঠের সঙ্গে সংগমের ফলে রাজমহিষী গর্ভবতী হন। কিন্তু দ্বাদশ বৎসরেও যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না, তখন মহিষী পাষাণখণ্ড দ্বারা নিজের উদর বিদীর্ণ করে এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রের নাম অশ্মক।

বিষ্ণুপুরাণ মতে রাজা সৌদাস মৃগয়া করতে গিয়ে এক রাক্ষস বধ করেন। উক্ত রাক্ষসের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাক্ষসের ভ্রাতা নিজরূপ পরিবর্তন-পূর্বক রাজা সৌদাসের পাচক হয়। একদিন বশিষ্ঠ রাজার প্রাসাদে অতিথি হলে, পাচকরূপী রাক্ষস মুনিকে নরমাংস রন্ধন করে আহার করতে দেয়। দিব্যজ্ঞানে তা জ্ঞাত হয়ে, বশিষ্ঠ রাজাকে রাক্ষস হবার অভিসম্পাত প্রদান করেন। বিনাদোষে এইরূপে অভিশপ্ত হওয়ায় রাজাও বশিষ্ঠকে অভিসম্পাত দেবার জন্য জলগ্রহণ করেন, কিন্তু রাণী দময়ন্তী এসে রাজাকে এই অভিসম্পাত দানে নিষেধ করেন। তখন রাজা মন্ত্রপূত জল নিজের পায়ের উপর নিক্ষেপ করেন। এই জলের স্পর্শে তাঁর পদদ্বয় কল্মষ (মলিন বা কৃষ্ণবর্ণ) হয়ে যায়। সেই থেকে এঁর নাম হয় কল্মাষপাদ। বশিষ্ঠ পরে নিজের ভ্রম উপলব্ধি করে, তাঁর অভিশাপ বারো বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী করেন। রাজা রাক্ষসভাবাপন্ন হয়ে প্রতিদিন বনে মনুষ্য ভক্ষণ করে দিনাতিপাত করতে থাকেন। একদিন এক ব্রাহ্মণ যখন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে রতিক্রিয়ায় রত ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে ভক্ষণ করে ফেলেন। এই কারণে, ব্রাহ্মণের স্ত্রী রাক্ষসরূপী রাজাকে শাপ দেন যে, যখনই সে স্ত্রীর সঙ্গে রতিকর্মে রত হবে, তখনই তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বারো বৎসর পরে বশিষ্ঠের শাপ হতে মুক্ত হয়ে তিনি তাঁর স্ত্রী দময়ন্তীর কাছে ফিরে যান বটে, কিন্তু পূর্ব-অভিশাপ স্মরণ করে স্ত্রী-সহবাসে বিরত থাকেন। কিছুকাল পরে বশিষ্ঠ রাজা সৌদাসের অনুমতিক্রমে রাণীর গর্ভসঞ্চার করেন। তিনি সাত বৎসর গর্ভধারণ করে থাকেন। যথাসময়ে সন্তান প্রসব না-হওয়ায়, বশিষ্ঠ

এক অশ্ম (পাথর) দিয়ে গর্ভে আঘাত করার ফলে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই জন্যই এই পুত্রের নাম হয় অশ্মক। (পৌ.অ.)। অন্য কোনো মতে এই সৌদাস আসলে ভগীরথের পুত্র, যার অন্য নাম **ককুৎস্থ**। ৪. অপ্র.। ৫. **বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, দ্রোণাচার্য্য** — এঁরা মিত্রাবরুণের অংশে জাত। সেই সুবাদে এঁরা থাকেন আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বা বৈদিক ব্যবস্থায়, কিন্তু সাহায্য করেন ধনতন্ত্রের বিকাশে। তবে বৈদিক ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়বে এমন কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এঁরা বৈদিক ব্যবস্থারই সহায়তা করে থাকেন। উপরোক্ত ঘটনাটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের বিরোধের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার। সেই ঘটনাকে বেদবাদীরা লিখেছেন মহাভারতে। বিষ্ণুপুরাণে খানিকটা অন্য ধরনের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে, যেন-বা এতে পুঁজিবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির খানিকটা রয়েছে বলে মনে হয়। এ বিষয়ে আরও জানার জন্য (গ) গ্রন্থের 'বিদর্ভের কথা : ভারত-ইতিহাসের অমৃতকথার কণিকামাত্র' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

কল্য : ১. কল + য। ২. *কল্ থাকে যাহাতে*। / যাহা চেষ্টাকে পাওয়ায়। (ব.শ.)। ৩. সজ্জ, সমর্থ, দক্ষ, নীরোগ, শ্রুতিবর্জিত (কালা), বাগবর্জিত (বোবা), কল্যাণকর, উপায়কর, উদ্যুক্ত, উপদেশপ্রদ, আগামী বা পর দিন, গত দিবস, মধু, মদ্য, শুভবার্ত্তা। কল্যা = শুভ বাণী, হরীতকী, সুরা। (ব.শ.)। ৫. কল-কল-এর **কল** থাকে যাহাতে, সেটিই কল্য-পদবাচ্য। এই কল-কল যখন হিসেবের **কলা**, তখন কল্য হয়ে যায় সজ্জ, সমর্থ, দক্ষ ইত্যাদি; আর তা যখন কথনের **কলা** হয়, তখন কল্য হয়ে যায় বাগ-শ্রুতিবর্জিত। আবার, তা যখন সময়ের **কলা** হয়, তখন কল্য হয়ে যায় আগামীকাল-গতকাল ইত্যাদি। দ্র. **কল, কাল**।

কাল : ১. ✓কল্ (গণনা) + অ - ণ; অথবা ✓কলি (গণনা) বা ✓কালি (প্রেরণ) + অ - ক। (ব.শ.)। ২. যাহা দ্বারা ক্ষণদণ্ডাদি গণিত হয়, যাহা ভূতগণকে সঙ্কলিত প্রেরিত বা গণিত করে। (কালো অর্থে —) যাহা ঈষৎ ভূষয়িত করে। (ব.শ.)। দ্র. **কল**। ৩. সময়, সময়বিভাগবিশেষ — ক্ষণদণ্ডমুহূর্ত্তাদি, ঋতু, বয়ঃক্রম, অবস্থাভেদ, যোগ্য সময়, দিন, দিবসের ষোড়শ ভাগ, নব দ্রব্যের একতম, মাত্রাপরিমিত সময়, যম, মৃত্যু, মরণকাল, জীবিতকাল, জন্মমরণাদি-রূপ কালব্যবস্থা, ভগবান ঈশ্বর, মহাকাল, দৈব, যুগ, কাসমর্দ্দ, কাসুন্দাগাছ, রক্তচিত্রক, কালসদৃশ পরম শত্রু, সর্ব্বনাশকর। ৪. কয়েকটি অর্থ প্রচলিত। ৫. কাল শব্দটি তৈরি হয়েছে 'কল-জাত' রূপে। এই **কল** যেহেতু বহু অর্থবাচক, **কাল**ও বহু অর্থবাচক না হয়ে পারেনি। মুহূর্তমাত্র সময় থেকে সর্বনাশকর মহাকাল পর্যন্ত তার বিস্তার। দ্র. **কল, কল্য, কৃষ্ণ** এবং **দেশ**।

কালকা : ২. *যিনি কালক-এর (কাল বা সর্বনাশ করে যে, তার) আধারশক্তি।* ৩. কালকেয়গণের মাতা দক্ষকন্যা। (ব.শ.)। কশ্যপের স্ত্রী। রামায়ণ ও মহাভারত মতে ইনি দক্ষের কন্যা, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ মতে ইনি ওঁর ভগিনী এবং পুলোমা দানব বৈশ্বানরের কন্যা। কশ্যপের সঙ্গে এঁদের দুই জনেরই বিবাহ হয় এবং ফলে এঁদের ৬০,০০০ দানবপুত্র জন্মগ্রহণ করে, এই পুত্রদের বলা হত পৌলম এবং কালঞ্জয়। এরা অত্যন্ত শক্তিশালী ও দুর্দান্ত ছিল। মহাভারত মতে কঠিন তপস্যা ও পূজার জন্য কালকা দেবতার এই বরলাভ করেন যে, কোনো প্রকার গর্ভযন্ত্রণা না পেয়েই এর সন্তান প্রসব হবে। তাঁর এই সন্তানদের বলা হত **কালকেয়**। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **অগ্নিসাক্ষী**। আদি যৌথসমাজের এক সত্তার নাম পুলোমা। এদের উত্তরসূরী কালঞ্জয়। এরা পুঁজিবাদের উদ্ভবকালে পণ্যজীবীদের বিরোধী ছিল। দ্র. **নিবাতকবচ**।

কালকেয় : ২. *কালকা হইতে জাত*। ৩. কালকার অপত্যগণ। বিনাশনাদি দানবগণ। ইহাদের জনক কশ্যপ, মাতা কালকা। বৃত্রবধের পর ইহারা সাগরে আশ্রয় গ্রহণ করে। দেবতার প্রার্থনায় অগস্ত্য সাগর শুষ্ক করিলে, ইন্দ্রাদি ইহাদিগকে নিহত করেন। (ব.শ.)। কালকেয় নামক দানবগণ। এরা বৃত্রাসুরের অনুচর। কশ্যপ ও কালকার সন্তান। ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করবার পর, তার অনুচর কালকেয়রা প্রাণভয়ে সমুদ্রের তলদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু রাত্রিকালে মধ্যে মধ্যে উত্থিত হয়ে আশ্রমে এসে আশ্রমবাসীদের বিনাশ করত। তখন দেবতারা এই উৎপীড়নের প্রতিকার কল্পে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের শরণাপন্ন হন। নারায়ণের পরামর্শে দেবতারা মহর্ষি অগস্ত্যের কাছে এসে তাঁকে সমুদ্র পান করতে অনুরোধ করেন। অগস্ত্য সমুদ্র পান করার পর দেবতারা অনায়াসে কালকেয়দের বিনাশ করতে সমর্থ হন।

মহাভারতে উল্লিখিত আছে, কালকা নামে এক মহাসুরী বহু সহস্র বৎসর তপস্যা করবার পর ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করে যে, তার কালকেয় নামক পুত্রগণ দেব-রাক্ষস-নাগদের অবধ্য হবে এবং ব্রহ্মা-নির্মিত হিরণ্যপুর নামে দিব্যনগরে বাস করবে। দেবলোকে অস্ত্রশিক্ষার পর ইন্দ্রের অনুরোধে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ অর্জুন রৌদ্র নামে খ্যাত পাশুপত অস্ত্রের প্রয়োগে এই অসুরদের বিনাশ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে (দ্র. **কণ্ডুয়ন**) সৃষ্টির আদি থেকে অসুরদের রাজত্ব ছিল এবং তাঁদের স্বভাব ভালো ছিল, সেজন্যই লক্ষ্মী তাদের কাছেই থাকতেন। সেই অসুরদের (আদি সমাজতন্ত্রবাদীদের বা বেদবাদীদের) শেষ ভালো অসুরের নাম বৃত্রাসুর। এঁরই অপর নাম **ত্রিশিরা**। এঁকে হত্যা করেই ইন্দ্রকে পাতকী হতে হয়েছিল। এঁর সমর্থক ছিল কালকেয়গণ। বৃত্রের মৃত্যুর পর এরা জনসমুদ্রে আত্মগোপন করে, যাকে একালের ভাষায় বলা হয়, বিশেষত মার্কসবাদীরা বলেন, 'আন্ডার-গ্রাউন্ডে' চলে যাওয়া। দ্র. **নিবাতকবচ**।

কালপুরুষ : ৩. যমের অনুচর, যমকিঙ্কর, কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, কালচক্ররূপ পুরুষ, জ্যোতিঃশাস্ত্র, পুরুষরূপী কাল, মুনিবেশী যম। রামের অবতারকাল পূর্ণ হইলে, ইনি ব্রহ্মার আদেশে মুনিবেশে অযোধ্যায় আসিয়া নিভৃতে ব্রহ্মার নিবেদন জ্ঞাপন করেন। (ব.শ.)। ইনি ব্রহ্মার পৌত্র ও সূর্যের পুত্র। যমের অন্য নাম। একদিন ইনি তাপস বেশে রামের নিকট উপস্থিত হন এবং নিভৃতস্থানে নিজমূর্তি ধারণ করে রামকে বৈকুণ্ঠে প্রত্যাগমনের জন্য ব্রহ্মার অনুরোধ জানান। নিভৃতে

কথা বলার সময় তিনি রামকে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান যে, তাঁদের আলাপের সময় সম্মুখে যে উপস্থিত হবে, তাকেই রাম বর্জন করবেন। উক্ত সময় লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন; এমন সময় দুর্বাসা রামের সহিত সাক্ষাৎ করতে আসেন। দুর্বাসার শাপের ভয়ে লক্ষ্মণ রামকে দুর্বাসার আগমন সংবাদ দেন। কালপুরুষের সঙ্গে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাম লক্ষ্মণকে বর্জন করতে বাধ্য হন। লক্ষ্মণ সরযূ নদীর তীরে যোগাবলম্বনপূর্বক দীর্ঘদিন স্থির হয়ে থাকেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সাধনায় মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট হয়ে, লক্ষ্মণকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যান। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **পুরুষ**।

কালভৈরব : ২. যাহা হইতে কালের ভীরুতা। (ব.শ.)। ৩. যমের ভীতিকর কাশীস্থ শিবাংশজাত ভৈরববিশেষ। শিবের কোপ হইতে ইহার উৎপত্তি। গর্ব্বপ্রকাশ হেতু ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ইনি শিবাদেশে বাম হস্তের অঙ্গুলিনখে ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপ মোচনার্থ ব্রহ্মকপাল ধারণপূর্ব্বক কাপালিকব্রত গ্রহণ করেন। তদবধি ব্রহ্মার চারি মুখ। (ব.শ.)। শিবের একজন অনুচর। মহাদেব আপনার অংশ হতে কালভৈরবকে সৃষ্টি করে কাশীধাম রক্ষার ভার এর উপর ন্যস্ত করেন। দুষ্টমতি লোকেদের শাস্তি দেওয়াই এর একমাত্র কাজ ছিল। ব্রহ্মা নিজ কন্যাভিগমন পাপ করার জন্য কাশীতে শিবতত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য আসেন। মহাদেবের আদেশে কালভৈরব ব্রহ্মার এক মুখ ছেদন করেন। সেই হতে ব্রহ্মা চতুর্মুখ। কাশীর যে স্থানে এই মুণ্ড পতিত হয়েছিল, সেই স্থানের নাম কপালমোচন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **ভৈরব**।

কালযবন : ৩. কৃষ্ণবর্ণ যবনরাজবিশেষ। ইনি শাপভ্রষ্টা অপ্সরার গর্ভজাত গার্গ্যপুত্র। রাজা যবনের পালিত পুত্র বলিয়া ইনি 'কালযবন' নামে খ্যাত। ইনি শ্রীকৃষ্ণের শত্রু ছিলেন এবং তাঁহারই কৌশলে মুচুকুন্দের কোপানলে ভস্মীভূত হন। (ব.শ.)। ... ইনি মহর্ষি গার্গ্যের (দ্র. **গার্গ্য**) ঔরসে ও গোপালী নাম্নী শাপভ্রষ্টা এক অপ্সরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ... জন্মের পর এক অপুত্রক যবনরাজ এঁকে পালন করেন এবং উক্ত সেই যবনরাজের মৃত্যুর পর কালযবন রাজা হন; মগধরাজ জরাসন্ধ পরাক্রান্ত রাজা কালযবনকে যাদবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োগ করেন। যাদবরা জরাসন্ধ ও কালযবনের ভয়ে ভীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে মথুরা ত্যাগ করে দ্বারকায় গমন করেন। কৃষ্ণ জানতেন যে, যাদবরা যুদ্ধে কালযবনকে পরাস্ত করতে সমর্থ হবে না। তাই কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য কৃষ্ণ নিজেই মথুরায় উপস্থিত হন। কালযবন কৃষ্ণের সম্মুখীন হলে, কৃষ্ণ পলায়নের ছল করে হিমালয়ের গুহায় নিদ্রিত রাজা মুচুকুন্দের কাছে উপস্থিত হন। কালযবন কৃষ্ণকে অনুসরণ করে সেই গুহায় উপস্থিত হয়ে ভুলক্রমে নিদ্রিত মুচুকুন্দকেই কৃষ্ণ মনে করে পদাঘাত করেন। পদাঘাতে নিদ্রাভঙ্গ হওয়া মাত্র মুচুকুন্দ কালযবনের দিকে দৃষ্টিপাত করার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভস্ম হয়ে যায়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **যবন**।

কালিদাস (কালীদাস) : ১. কালী + দাস। ২. *যিনি (নিজেকে) কালীর (দ্র. **মহামায়া**) দাস (মনে করতেন)। / কালীর দাস।* (ব.শ.)। ৩. ভারতীয় বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। ইঁহার আবির্ভাবকাল খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ ৫৬। মতান্তরে, ষষ্ঠ শতাব্দী। ইনি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম। রঘুবংশ কুমারসম্ভব মেঘদূত শকুন্তলা প্রভৃতি ইঁহার কাব্য। ইনি ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি। (ব.শ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. সেকালে সত্তার ক্রিয়াকারী চরিত্র অনুসারে মানুষের নাম হত, তাও বৌদ্ধযুগের সূত্রপাতের পর (অশোকের কাল) থেকে এবং তা প্রথমে শুরু হয় জ্ঞানী ও ধনীদের মধ্যে। নিম্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে ব্যক্তিনামের সম্পূর্ণ প্রচলন হতে ভারতবাসীকে ইংরাজ শাসন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কবি কালীদাস ছিলেন ৫০০ খ্রিস্টাব্দের মানুষ। তখনও পদবীর সূত্রপাত হয়নি, শুধু নামমাত্র এবং তা তাঁর ক্রিয়াকারী সত্তা যেরকম, নামও সেইরকম। এটাই তখনকার রীতি ছিল। সেই সুবাদে বোঝা যায়, তিনি ছিলেন একাধারে সরস্বতীর বরপুত্র ও কালীর দাস। অর্থাৎ সেকালের অ্যাকাডেমি যাঁকে পণ্ডিত বলে 'বরণ' করে নিয়েছিল (যেমন রবীন্দ্রনাথকেও অ্যাকাডেমি বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিল, যদিও তাঁর অ্যাকাডেমিক বিদ্যা ছিল শূন্য), যে কারণে তিনি সরস্বতীর বরপুত্র এবং শ্রমজীবীমানুষদের সেবা করাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল, তাই কালীর (শ্রমজীবী জনগণের) দাস। (দ্র. **মহামায়া**)। রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব কাব্যদুটি শ্রমজীবী জনসাধারণের পক্ষে রচিত তাঁর অমর কাব্য। এর মানে করতে পারে না বলে একালের অ্যাকাডেমি এগুলিতে ইয়োরোপের রোমান্স খোঁজে। যজ্ঞে গোময় গোমূত্রের বিধানের মানে না বুঝে পুরোহিত যেমন ভারতের জনগণকে cow-এর পায়খানা ও পেচ্ছাব খাইয়েছে, আমাদের অ্যাকাডেমিগুলিও তেমনি কালীদাসের কাব্যের মানে বুঝতে না পেরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীকে রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের রোমান্স খাইয়েছে।

কালিয় (কালীয়) : ৩. কালিয় নামক সর্পবিশেষ। যমুনাহ্রদে, অর্থাৎ কালিয়দহে ইহার বাস ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে দমন করেন এবং তাঁহারই আদেশে কালিয় যমুনা হ্রদ ত্যাগ করিয়া, সমুদ্রে বাস করে। (ব.শ.)। বিষধর সর্পরাজ। গরুড়ের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ও গরুড়ের ভয়ে সমুদ্র ত্যাগ করে কালীয় হ্রদে আশ্রয় নেয়। গরুড় কালীয়র প্রতীক্ষায় তীরে অপেক্ষারত থাকত ও ক্ষুধার্ত হলে মৎস্য শিকার করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তীরস্থ সৌভরি ঋষির শাপে ঐ জল বিষাক্ত হয়ে ওঠে ও গরুড়ের অপেয় হয়। অন্যদিকে এই কালীয়র ভয়ে কেহ এই হ্রদে স্নান করতে সক্ষম হত না। তার মুখ থেকে ক্রমাগত অগ্নি ও ধুম নির্গত হত। তীরবর্তী সমূহ দেশ তার ভয়ে জনশূন্য হয়ে যায়। একদিন তৃষ্ণার্ত রাখালরা ও তাদের গাভীগুলি এই হ্রদের জলপান করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণ এই কালীয় হ্রদে ঝাঁপ দেন। সহস্র ফণায় কালীয় তাঁকে বেষ্টন করলে শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে তার ফণার উপরে উঠে দাঁড়ান এবং সে তখন রক্ত বমন করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রাণভিক্ষা করতে থাকে। কৃষ্ণ কালীয়কে হ্রদ ত্যাগ করে সমুদ্রে যেতে আদেশ দেন এবং বলেন যে, তোমার মাথার উপর আমার পদচিহ্ন দেখলে গরুড় আর তোমাকে আক্রমণ করবে না। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫.

সামাজিক উৎপাদন **কর্মযজ্ঞ** থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়, তা দুটি স্রোতোধারার মাধ্যমে জনসাধারণের ভোগের নিমিত্ত পৌঁছোয় — গঙ্গাধারা বা পণ্যজীবীদের হাটবাজারের মাধ্যমে, আর যমুনাধারা বা সরকারি বিলিবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে। এই যমুনাধারায় কালসাপ বাস করে সর্বস্ব হরণ করে সেই ধারার জল অপেয় করে তোলে। কথাটি সত্যি কিনা, রেশনিং ব্যবস্থার গভীরে ঢুকলে তা টের পাওয়া যায়। ভারতের ইতিহাসে সম্ভবত বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে সেই কালিয়দের দমনের ঘটনাবলী এখানে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

কালী (কালিকা) : **৩.** কালশক্তি, কালের পত্নী, শিবপত্নী, হিমালয়কন্যা উমা, দুর্গামূর্তিবিশেষ, মাতৃবিশেষ, আদ্যা মহাবিদ্যা, কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী, ভীমসেন-পত্নী, শান্তনুপত্নী সত্যবতী (গন্ধকালী), রাত্রি, কালরাত্রি, যমভগিনী, অগ্নির শিখাবিশেষ বা জিহ্বাবিশেষ, কৃষ্ণবর্ণ, মলিনতা, মসী, পরীবাদ বা কলঙ্ক, নবমেঘসমূহ, কালাঞ্জনী, তুবরী, কৃষ্ণতুলসী, ত্রিবৃৎ, তেউড়ী, বৃশ্চিকালী বা কালো বিছুটি, ক্ষীরকীট বা দুধের পোকা, পাশার কালো ঘুঁটি, যমুনা, কালিয়সর্প, কালনাগিনী, মালিন্য। (ব.শ.)। দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম মহাবিদ্যা। শক্তি উপাসকেরা কালীকে আদ্যাশক্তি বলে উপাসনা করেন। এঁর চারিটি হাত আছে। দুই দক্ষিণ হস্তে খট্টাঙ্গ ও চন্দ্রহাস, আর দুই বাম হস্তে চর্ম ও পাশ। গলায় নরমুণ্ড, দেহ ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। দীর্ঘদন্তী, রক্তচক্ষু, বিস্তৃত মুখ ও স্থূল কর্ণ। এঁর বাহন কবন্ধ (মস্তকবিহীন শব)।

দেবাসুরের যুদ্ধে, বিশেষত শুম্ভ নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে, দেবতারা পরাজিত হয়ে স্বর্গ হতে বিতাড়িত হন ও দেবী আদ্যাশক্তি ভগবতীর স্তব করতে থাকেন। তখন দেবীর শরীরকোষ হতে অপর এক দেবী আবির্ভূতা হন। সেই দেবী কৌষিকী নামে খ্যাত। দেবী কৌষিকী শরীর হতে নিষ্ক্রান্ত হলে ভগবতী দেবী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেন এবং সেই থেকে ইনি কালিকা বা কালী নামে পরিচিতা। এরপরে দেবী পুনরায় মনোহর রূপ ধারণ করেন। ... শুম্ভ-নিশুম্ভের সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে নিহত করেছিলেন বলে এঁর নাম চামুণ্ডা। সেই দেবী চণ্ড-মুণ্ডের ছিন্ন মস্তক কৌষিকী দেবীকে উপহার দিয়ে, তাঁকে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করতে বলেন। দেবী কালী (পার্বতী) ও চণ্ডিকা (কৌষিকী) শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ... (পৌ.অ.)। **৪.** ঠাকুরের নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** ভারতে ছিল বেদবাদী ও পরবর্তীকালে কিছু কিছু বেদবিরোধী **মহর্ষি** (এক বা একাধিক মহান মানুষ), আর সেই মহর্ষিদের দ্বারা পরিচালিত **সম্প্রদায়**। সেই সম্প্রদায় কালে কালে দরিদ্র কামিন মজুরে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ওই মহর্ষিগণ জনসাধারণকে সমগ্রভাবে বুঝবার যোগ্যতা ধারণ করতেন। দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে তাঁরা একত্রে বলতেন **মহামায়া**। সেই মহামায়ার নানা বিভাজন। যে জনগোষ্ঠী সম্পদ নিয়ে থাকেন, তাঁদের তাঁরা বলতেন **লক্ষ্মী**, শিক্ষিত জনসাধারণকে তাঁরা বলতেন **সরস্বতী**, মধ্যবিত্ত নাগরিক জন-সাধারণকে তাঁরা বলতেন **দুর্গা**, শ্রমজীবী জনসাধারণকে তাঁরা বলতেন **কালী**, কৃষিমজুরদের তাঁরা বলতেন **শ্যামা**। এঁরা সবাই মহামায়ার কন্যা, অর্থাৎ সমগ্র জনসাধারণের অংশ।

ইয়োরোপ যাকে শ্রমিকশ্রেণী ও **কৃষকশ্রেণী** রূপে চিহ্নিত করে থাকে, ভারতে তারই আদি রূপ **কালী** ও **শ্যামা**। এঁদের বিদ্রোহী মারমুখী রূপটিকে বলা হত **চণ্ডী**, চণ্ডালিকা। কীভাবে তারা প্রথম প্রথম বেদবাদীদের পক্ষে এবং পরবর্তীকালে তাদের বিপক্ষে যুগে যুগে ব্যবহৃত হয়েছে, কালীর কাহিনীগুলিতে তারই বিবরণ কখনো কালীপক্ষীয় লেখকের হাতে, কখনো-বা কালীবিরোধী লেখকের হাতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এগুলির মধ্যে কালিকাপুরাণ, শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রভৃতি রচিত হয়েছে পৌরাণিকদের হাতে।

তবে, এগুলি হল বোধ্য স্তরে দেবী কালীর বা কালিকার বাহ্যিক রূপ। এর অনেক উচ্চতর রূপও রয়েছে। তাকে অনুভব করা এতটা সহজসাধ্য নয়, তবে চেষ্টা করা যেতে পারে। **কৃষ্ণ** ও **গৌরী** শব্দে সে চেষ্টা আমরা করেছি। ... দ্র. **মহামায়া, চণ্ডী, ছিন্নমস্তা**।

কিলকিল (কিলকিলা-প্রদেশ) : ২. *কিচিরমিচির বা ঘুষোঘুষি (মল্লযুদ্ধ) চলে যেখানে*। **৩.** পক্ষীর মৃদু অব্যক্ত ধ্বনি বা কলকল। (ব.শ.) কিচিরমিচির, ঘুষোঘুষি। **৪.** অপ্র.। **৫.** দ্র. **কিরাত**। সবচেয়ে প্রাচীন যে গ্রন্থে কলিকাতার উল্লেখ পাওয়া যায়, তার নাম শারদাতিলক। এই গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে, সমুদ্রসংলগ্ন ভাগীরথীর দুই তীরে একটি অঞ্চল ছিল যার নাম **কিলকিলা** প্রদেশ। এটি বর্তমান **কলিকাতার** আদি পৌরাণিক নাম। এখানে পক্ষীরা **কূজন** করিত। অর্থাৎ এটি ছিল কারুজীবী দোকানদারদের আদি নিবাস। বিস্তারিত বিবরণের জন্য (চ) গ্রন্থের 'বাঙালি মনমরা কেন' নিবন্ধের প্রথম অংশ 'কলকাতার বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকার ...' দ্রষ্টব্য। **৬.** ইংরেজি kill।

'কশ্' (কষ্, কস্, কাশ্, কাস্, কুশ, কুষ, কুস) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকষ্ট, অকষ্টবদ্ধ, অকুশল, অতিকশ, অভ্রঙ্কষ, অতিপ্রকাশ, অনবকাশ, অনাকাশ, অপ্রকাশ, অপ্রকাশিত, অপ্রকাশ্য, অবকাশ, আকক্ষ, আকষ, আকাঠা, আকাশ, আকাশবাণী, আকাশকক্ষা, আকাশকথা, আকাশকুসুম, আকাশগ, আকাশগঙ্গা, আকাশচারী, আকাশজননী, আকাশদিউটি, আকাশদীপ, আকাশপ্রদীপ, আকাশদুহিতা, আকাশনন্দিনী, আকাশপথ, আকাশবচন, আকাশবন্যা, আকাশবর্ত্ম, আকাশভারতী, আকাশমণ্ডল, আকাশযান, আকাশরক্ষী, আকাশশয়ন, আকাশশায়ী, আকাশসম্ভব, আকাশসলিল, আকাশস্থ, আকুক্ষি, আখাতলি, কক্ষ, কক্ষপট্টি, কক্ষান্তর, কক্ষাপট, কক্ষাপাত, কক্ষাবন্ধ, কক্ষাবেক্ষক, কক্ষ্য, কচি (কষি), কচ্চ, কচ্ছটি, কচ্ছ(চ্ছা)টিকা, কচ্ছু, কচ্ছুটিয়া, কচ্ছুরা, কচ্ছূ, কয়ড়া, কশকশ, কশা, কশাকশি, কশাড়বন, কশি, কশে(সে)রু, কশ্মল, কশ্মীর, কশ্যপ, কশ্যপনন্দন, কষ্, কষ, কষকুটে, কষণ, কষটো, কষড়া, কষড়ি, কষণি, কষা, কষাটে, কষানি, কষায়, কষায়ণ, কষায়িত, কষায়ী, কষি (কসি), কষিত, কষিল, কষ্ট, কষ্টশ্রোত্রিয়, কষ্টি, কষ্টিপাথর, কষ্টেসৃষ্টে, কস, কসকস, কসটি, কসতা (খুদকস্তা-পাইকস্তা, দ্র. পাইকস্তা), কসন, কসনি, কসবহ, কসবা, কসবি, কসবী, কসরৎ, কসরত (মেহনত), কসা, কসাই, কসাকস, কসাকসি, কসামাজা, কসি (কষি), কসিত, কসিল, কস্তাকস্তি, কস্তুরা, কস্তুরি(কা), কস্তুরিকা, কস্তুরী, কাঁকাইল,

কাঁকাল, কাঁকালি, কাঁখ, কাঁখতলি, কাকালি, কাকিণিকা, কাকিণী, কাকিনী, কাক্ষ, কাখ, কাখতলি, কাছন, কাছনি, কাছরা, কাছি, কাঠ, কাশ্, কাশ, কাশ(স)ন্দি, কাশমর্দ্দ, কাশি, কাশিকা, কাশী, কাশীয়া, কাশীশ, কাশ্মীর, কাশ্যপ, কাশ্যপি, কাশ্যপীকান্ত, কাশ্যপীশ, কাশ্যপেয়, কাষ, কাষায়, কাষ্ট, কাষ্টকি (coustic), কাষ্ট(ষ্ঠ)হাসি, কাষ্ঠ, কাষ্ঠা, কাষ্ঠাগার, কাষ্ঠাম্বুবাহিনী, কাষ্ঠিক, কাস্, কাস, কাসঘ্ন, কাসন্দি, কাসি, কাসিকা, কুঁখ, কুআ, কুক্ষি, কুক্ষিগত, কুক্ষিজ, কুক্ষিম্ভরি, কুট, কুঠ, কুঠী, কুড়, কুড়া, কুড়ি, কুড়ি(ড়ী)য়া, কুড়ী, কুয়া, কুরচি(চী) (কুষ্ঠী, কুলজি), কুশ, কুশকতি, কুশচীর, কুশ(শু)ড়ি, কুশণ্ডি, কুশণ্ডিকা, কুশধ্বজ, কুশপত্র, কুশপুতুল, কুশপুত্তলিকা, কুশপা, কুশপেয়ে, কুশবটু, কুশর, কুশল, কুশলব, কুশলিত, কুশলী, কুশাগ্র, কুশাঙ্কুর, কুশাঙ্গুরী, কুশাবতী, কুশারি (রী), কুশাসন, কুশি(শী), কুশিক, কুসিয়ার, কুশিয়ারি, কুশী, কুশী(সী)দ, কুশীলব, কুশুম-কুশুম (কুসুম-কুসুম), কুশূল, কুশেশয়, কুশের, কুশো, কুশোদক, কুষ্, কুষি(ষী), কূপ, কূপক, কূয়া, কোথলি(লী), কোশাম্বি(ম্বী), কোশারি(রী), কুষ্ঠ, কুষ্ঠঘ্ন, কুষ্ঠারি, কুষ্ঠিত, কুষ্ঠি, কু(কো)ষ্ঠী, কু(কূ)ষ্মাণ্ড, কুসীদক, কুসীদবৃদ্ধি, কুসীদব্যবহার, কুসীদিক, কুসুম, কুসুম-কুসুম, কুসুমগাই, কুসুমবড়ী, কুসুমবাণ, কুসুমবান, কুসুমবাসর, কুসুমবিহার, কুসুমবৃষ্টি, কুসুমশয়ন, কুসুমশয্যা, কুসুমশর, কুসুমশা(সা)য়ক, কুসুমশালি, কুসুমসুন্দরী, কুসুমস্তবক, কুসুমাকর, কুসুমাঞ্জলি, কুসুমাপীড়, কুসুমায়ুধ, কুসুমাসব, কুসুমাসার, কুসুমাস্তরণ, কুসুমাস্ত্র, কুসুমি(মী), কুসুমিত, কুসুমেষু, কুসুম্ভ, কুসুম্ভা, কুস্তি, কুস্তী, কুয়া, কেশু(সু)র, কেশ্, কেশ, কেশপক্ষ, কেশপাশ, কেশব, কেশভার, কেশ(স)র, কেশরচনা, কেশরঞ্জন, কেশ(স)রবর, কেশ(স)রী, কেশহস্ত, কেশাকেশি, কেশান্ত, কেশাবতার, কেশিন, কেশিনিষূদন, কেশিমথন, কেশিমর্দ্দন, কেশি(শী)য়ার (cashier), কেশিসূদন, কেশী, কেশুরিয়া, কেশুরতে, কৈশিক, কৈশিকার্ষণ, কৈশোর, কো, কোওয়া, কোঁআজুর, কোঁক, কোঁখ, কোঁখশূল, কোক, কোটা, কোটো, কোঠ, কোঠা, কোঠি, কোয়া, কোয়াজুর, কোশ, কোশকার, কোশকারক, কোশ(স)ল, কোশা(ষা), কোশা(ষা)গার, কোশাতক, কোশা(ষা)ধ্যক্ষ, কোশেশ (কোশিশ্), কোষ, কোষ্ট, কোষ্টা, কোষ্ঠ, কোষ্ঠক, কোষ্ঠপাল, কোষ্ঠশুদ্ধি, কোষ্ঠাগার, কোষ্ঠী, কোষ্ণ, কৌক্ষেয়, কৌক্ষেয়ক, কৌটা, কৌশ, কৌশল, কৌশলী, কৌশ(স)লেয়, কৌশল্য, কৌশ(স)ল্যা, কৌশাম্বী, কৌশি(ষি)ক, কৌশী(ষী)তকি, কৌশীলব্য, কৌশে(ষে)য়, কৌসীদ্য, কৌসুম, কৌসুম্ভ, কৌস্তুভ, নিকাশ, নিরবকাশ, নিষ্কাশন, প্রকাশ, প্রকোষ্ঠ, বিকাশ, সকাশ, সঙ্কাশ, সাবকাশ, সুপ্রকাশ।

কশ্ (কষ্, কস্, কাশ্, কাস্, কুশ্ কুষ্, কুস্) = কারীর সার্বিক বিচ্ছুরণ। **কশ** = কারীর সার্বিক বিচ্ছুরণ যাহাতে। **কষ্** = কারীর দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণ। **কষ** = কারী দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে। **কস্** = কারীর একরৈখিক বিচ্ছুরণ। **কস** = কারী একরৈখিকতায় বিচ্ছুরিত যাহাতে। **কাশ্** = কশ হইতে জাত। **কাস্** = কস হইতে জাত। **কুশ** = নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর সার্বিক শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে। **কুষ** = নবরূপে উত্তীর্ণ কারী দিশাগ্রস্তভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে। **কুস** = নবরূপে উত্তীর্ণ কারী একরৈখিকভাবে বিচ্ছুরিত যাহাতে।

অবকাশ : ১. অব + ✓**কাশ্** + অ (ঘঞ্) - অধিকরণে। (ব.শ.)। ২. অব *(নিম্ন বা হীন)* ***কাশ*** *(দীপ্তি) যাহাতে*। ৩. ব্যাপ্তিরহিত স্থান, ফাঁক। নিবাসস্থান। মধ্যবর্তী স্থান, অন্তর। সময়, অবসর, সুযোগ। ব্যবহিত কাল। রন্ধ্র, ছিদ্র, প্রসর, প্রবেশ। অরণ্যাদিপ্রদেশ। অবস্থান। (ব.শ.)। ৪. সময়, সুযোগ, ফাঁক অর্থে প্রচলিত। ৫. পুরাণাদিতে উল্লেখ রয়েছে যে, নারায়ণ কাউকে কাউকে 'অবকাশে হত্যা' করছেন। এই অবকাশ জায়গাটা কীরূপ? যেখানে দীপ্তি যথেষ্ট, ব্যাপ্তি যথেষ্ট, সে স্থানটি নয়। যেখানে দীপ্তি যথেষ্ট নয়, ব্যাপ্তি পৌঁছায়নি, সেইরকম স্থান। কাশে কাশে আকীর্ণ স্থানটিকে আমরা **আকাশ** বলি, কিন্তু যে স্থানটিতে কাশ থাকলেও তা নিম্নমানের, হীন, যেন আকাশের মাঝে মাঝে একটা করে অনালোকিত কালো জায়গা, ছিদ্রের মতো, সেই রকম স্থান। প্রকৃতপক্ষে এ হল স্থান কাল ও পাত্র সমূহের যে অংশটি অনালোকিত, অব্যবহৃত, অসহযোগী, পার্থিব দেশের ও মানসিক দেশের এবং সমাজের সেইরকম স্থান কাল ও পাত্রকে অবকাশ বলে। মার্ক্সীয় ভাষায় এইরকম স্থানকে pores of society বলে, যে স্থানটিতে নাকি পুঁজির আদি জন্ম হয়েছিল। অন্য সব জায়গায় পুঁজির উদ্ভবকে ঠেকানো গেলেও এইরকম স্থানগুলিতে পুঁজিই উলটে ঠেকানোদার শক্তিগুলিকে পরাস্ত করেছিল। বোঝা গেল, এইরকম স্থানে বা অবকাশে নগদ নারায়ণ তুলনায় বলবান থাকেন। অর্থাৎ স্বচ্ছতা নয়, গোপনীয়তাই (transparency নয়, secrecy-ই) পুঁজির উদ্ভবের গোড়ায় সহায়ক রূপে থাকে। দ্র. **প্রকাশ, কাশী, কাশ্যপ, কুশ** ইত্যাদি। ৬. ইংরেজি dis*cuss*ion, con*cuss*ion, *quash*।

আকাশ : ১. কাশ্ = দীপ্তি, প্রকাশ। ২. ***কাশ****-এর আশ্রয় যাহাতে*। / যেখানে চারিদিকে সূর্য্যাদি প্রকাশ পায়। (ব.শ.)। ৩. অম্বর, গগন। বৈশেষিক মতে আকাশ নববিধ দ্রব্যের একতম। ... বেদান্ত অনুসারে আকাশ জন্য (জনন থাকে যাহাতে)। ইহা মহাকাশ ঘটাকাশ জলাকাশ অভ্রখ (মেঘাকাশ) এই চতুর্ব্বিধ। আদিভূত ব্যোম। ব্রহ্ম। শূন্য স্থান। বিবিক্তদেশ। ছিদ্র, রন্ধ্র। ... (ব.শ.)। ৪. sky অর্থে প্রচলিত। ৫. **অবকাশ, কাশ, কাশী, নিকাশ, প্রকাশ** দ্র.। মার্কস সাহেব বলে গেছেন, মানুষের দৈহিক জীবন কাটে তার হস্তপ্রসূত উৎপন্নের তলায়, আর তার মানসিক জীবন কাটে তার মস্তিষ্কপ্রসূত উৎপন্নের তলায়। অর্থাৎ মার্কসের মতে মাথার উপরে যে আকাশটা দেখা যায়, তা বাদে রয়েছে আরো দুটো আকাশ — অর্থনৈতিক আকাশ, আর সাংস্কৃতিক আকাশ। কিন্তু আমরা দেখছি, বেদান্তমতে চারটে আকাশ বিদ্যমান। উপরোক্ত মহাকাশ প্রভৃতি শব্দের ভিতরে সেই সব আকাশের খবর রয়েছে। এই আকাশ আবার ছিদ্রযুক্ত এবং শব্দগুণ-সম্পন্ন। শব্দগুণসম্পন্ন ব'লে একে অম্বর বলে। আর ছিদ্রগুলিকে **অবকাশ** বলে। সাংস্কৃতিক আকাশ বা ঘটাকাশ বাংলাভাষীর চিন্তার গভীরে বদ্ধমূল ধারণা রূপে আজও সক্রিয় রয়েছে বলে লোকে এখনও '**আকাশ** থেকে পড়ে', কিংবা তাদের 'মাথায় **আকাশ** ভেঙে পড়ে'। কারণ বাংলাভাষীর মনের গভীরে এখনও এই ধারণা সক্রিয় যে, নিজ নিজ মানসিক আকাশের তলাতেই তার বাস; যে মানসিক **আকাশ**টি গড়ে উঠেছে সমাজের প্রচলিত দর্শন ও সংস্কৃতি থেকে। তার থেকেই তার সমস্ত জ্ঞানবুদ্ধি বিচার-বিবেচনা। বাংলাভাষীর

'ঘটে (ঘটাকাশে) বুদ্ধি থাকে' এজন্যই। কিন্তু যখন সে একেবারে নতুন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে যায়, যে পরিস্থিতির কথা তার ঘটাকাশের কোথাও নেই, তখন তার 'ঘটের বুদ্ধি'তে আর কুলোয় না, সে 'আকাশ থেকে পড়ে', কিংবা তার 'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে'; নতুন মানসিক আকাশ গড়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করে সে। বলে রাখা যেতে পারে, স্বভাবগতভাবেই ১৮০০ সালে বাংলাভাষীর মানসিক আকাশ ও ইংরেজের মানসিক আকাশ একেবারেই আলাদা ছিল। মাথায় sky ভেঙে পড়ার কথা তারা ভাবতেই পারে না। একালের বাংলাভাষী দু'রকম আকাশেই কমবেশি অভ্যস্ত। ৬. ইংরেজি (dis)cussion।

আকাশগঙ্গা : ২. *যে গঙ্গা আকাশে প্রবাহিত হয়*। ৩. আকাশবাহিনী গঙ্গা। মন্দাকিনী। স্বর্গগঙ্গা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যে কোনো উৎপাদিত বস্তুসমূহ (**কাশ**), তা সে হাতের তৈরি পণ্য হোক আর মুখের উচ্চারিত (ভাষার) শব্দই হোক, যে সত্তায় তা গিয়ে রাশীকৃত হয়, তাকে যদি আকাশ বলা হয়, তবে সেই সত্তার ভিতরে নদীর ন্যায় যে প্রবাহ সৃষ্টি হয়, তাকে আকাশগঙ্গা বলে। সেকালে, যখন সম্প্রদায়ের ভেতরে ব্যক্তিগত বিনিময় প্রথার প্রচলন তখনও হয়নি, বিনিময় শুরু হয়েছে কেবলমাত্র এক যৌথ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য যৌথ-সম্প্রদায়ের, তখন এক সম্প্রদায়-পরিচালক মহর্ষিদের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়-পরিচালক মহর্ষিদের মধ্যে যে জ্ঞানসম্পদ ও পণ্যসম্পদের ধারা প্রবাহিত ছিল, তাকে বলা হত আকাশগঙ্গা। তাই গঙ্গা (commodity flow) সম্পর্কে বলা হয়, আদিতে সে প্রবাহিত হত কেবল স্বর্গলোকে। পরে ভগীরথ মর্তে গঙ্গা আনয়ন করেন, অর্থাৎ হাট-বাজারের প্রতিষ্ঠা হয় এবং সাধারণ্যে পণ্যবিনিময় শুরু হয়। দ্র. **গঙ্গা**। **ভগীরথ**। **ত্রিপথগামিণী**।

কক্ষ : ১. ✓কষ্ + স - অধিকরণে; অথবা কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কারীর (এমন) জ্ঞান-কর্ম (যা পূর্ব-জ্ঞানকর্মের বিলোপ ঘটায় তা) সংরক্ষিত হয় যেখানে*। ৩. নিভৃতপ্রদেশ, গূঢ়স্থান, বন, শুষ্কবন, তৃণাদি, শুষ্কতৃণ বা কাষ্ঠ, শুষ্কবন, গুল্ম, রাজান্তঃপুর, অবরোধ, প্রকোষ্ঠক, অন্তর্গৃহ, গৃহভিত্তি, গিরিগহ্বর, বাহুমূল, কাঁখ, বগল, পার্শ্বভাগ, প্রান্ত, পাপ, কাঞ্চী, মেখলা, স্ত্রীকটিবন্ধ, নৌকাঙ্গবিশেষ, জলপ্রায়দেশ, কচ্ছ, মহিষ, দ্বার, গ্রহের পরিভ্রমণ পথ, কক্ষরোগবিশেষ, কাঁখবিরালি, কটিদেশ, মধ্যভাগ, পরিকর, হস্তিবন্ধনরজ্জু, রজ্জু, পল্যাণের অঞ্চলপল্লব, পতাকাঞ্চল, পট্টবস্ত্র, প্রাচীর, প্রকোষ্ঠ, গৃহ, ঘর, অন্তঃপুর, রথভাগ, রথপ্রকোষ্ঠবিশেষ, প্রাকারদ্বার, নেমি, পরিধি, অন্তরীয় পশ্চিমাঞ্চল, সাম্য, তুলাদণ্ড, তুলাদ্রব্যবিশেষ, রক্তিকা, বতি, স্পর্দ্ধাপদ, প্রতিস্পর্দ্ধা, আড়ি, পূর্বপক্ষ, বাদ, মণিবন্ধ, উদ্যোগ, প্রতিজ্ঞা। (ব.শ.)। ৪. room, orbit অর্থে বর্তমানে প্রচলিত। **৫** এটি একটি আদর্শ ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ। তাই এর বহু অর্থ এবং অধিকাংশ অর্থই ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে শব্দটি তৈরি হয়েছিল, সে-তথ্য কোথাও যথাযথভাবে মেলে না। আমরা যেটুকু বুঝতে পারছি, তা **ইক্ষু** শব্দে বর্ণিত হয়েছে। সেই সুবাদে কারীর খুবলানো অংশ যেখানে থাকে, তাকে কক্ষ বলা যায়। দ্র. **ইক্ষু**, **কুক্ষি**।

কশ্যপ : ১. কশ্য + ✓পা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কশ্য ('আমি জেনেছি' বা 'আমি করেছি', এই 'পারা' বা শক্য) পালন করে যে*। ৩. মদ্যপান হেতু ইঁহার নাম 'কশ্যপ'। মুনিবিশেষ, মৃগবিশেষ, মৎস্যবিশেষ, কচ্ছপ। ইনি ব্রহ্মার পৌত্র, মরীচির পুত্র। অদিতি-দিতি-দনু প্রভৃতি দক্ষকন্যা ইঁহার পত্নী এবং আদিত্য-দৈত্য-দানবাদি ইঁহার পুত্র। পরশুরাম ইঁহাকে যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ পৃথিবী অর্পণ করিয়াছিলেন। এইজন্য ইনি 'পার্থিব'। মতান্তরে, দক্ষের সপ্তদশ কন্যা ইঁহার পত্নী। (ব.শ.)। ইনি বিখ্যাত প্রজাপতি ঋষি। দেবদৈত্য প্রভৃতির জনক। শুক্ল যজুর্বেদ প্রভৃতি বৈদিক সংহিতা মতে ইনি হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্মা হতে জন্মলাভ করেন। লিঙ্গপুরাণ মতে ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। অন্যান্য পুরাণ অনুসারে ইনি মরীচির তপোবলে সমুৎপন্ন ও ব্রহ্মার মানসপুত্র। শ্রীমদ্ভাগবত মতে এঁর জন্ম মরীচির ঔরসে ও স্ত্রী কলার গর্ভে। ইনি দক্ষ প্রজাপতির তেরোটি কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যারাই সমস্ত লোকের জননী; কারণ এঁরাই এই জগৎ প্রসব করেছিলেন। জগৎপ্রসবিনী এই কন্যাদের নাম — অদিতি, দিতি, দনু, কাষ্ঠা, অরিষ্ঠা, সুরসা, ইলা, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, সুরভি, সরমা ও তিমি। অদিতি থেকে দেবগণ, দিতি থেকে দৈত্যগণ, দনু থেকে দানবগণ, কাষ্ঠা থেকে অশ্বাদি পশুগণ, অরিষ্ঠা থেকে গন্ধর্বগণ, সুরসা থেকে রাক্ষসকুল, ইলা থেকে বৃক্ষ-উদ্ভিদ সমূহ, মুনি থেকে অপ্সরাগণ, ক্রোধবশা থেকে পিশাচকুল, তাম্রা থেকে পক্ষীসমূহ, সুরভি থেকে গো-মহিষাদি চতুষ্পদ জন্তু, সরমা থেকে শ্বাপদসমূহ, এবং তিমি থেকে জলজন্তুসমূহ প্রসূত হন। বিভিন্ন পুরাণে এ বিষয়ে মতান্তর আছে।

রামায়ণ মতে ইনি ব্রহ্মপুত্র মরীচির তনয়। এঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু বামনরূপে এঁর পুত্রত্ব স্বীকার করেন। ইনি প্রজাপতি দক্ষের ৮ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাদের নাম — অদিতি, দিতি, দনু, কলকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অলকা। বিবাহের পর কশ্যপ স্ত্রীদের বলেন, এখন তোমরা আমার তুল্য ত্রিলোকের প্রজাপতি পুত্র প্রসব কর। অদিতি, দিতি, দনু ও কালকা এতে সম্মত হন। অদিতি অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও যুগল অশ্বিনীকুমার, মোট ৩৩টি দেবতা প্রসব করেন। দিতি দৈত্যসকলকে, দনু অশ্বগ্রীবকে এবং কালকা নরক ও কালককে প্রসব করেন। যে চারজন স্ত্রী পুত্র প্রসবে সম্মত হল না, তাঁরা এই সকল প্রাণীর জননী — ক্রোধী, ভাষা, পুতনা, ধৃতরাষ্ট্র, সুকী, মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভী, সুরসা, কদ্রু, মনুষ্য, পবিত্র ফল সকল। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কশ্য বা মদ্য পান করেন যিনি তিনি কশ্যপ — এইরকম একটি অর্থ করা হয়েছে। খেয়াল করা হয়নি, জ্ঞান বা বেদকে সুরা বা মদও বলা হত। এর গোড়ায় ছিল 'আমি এটা জেনেছি বা করেছি' এই শক্যতার অভিমান। শক্য থেকে কশ্য; যেমন হিংসা থেকে সিংহ। সেই সুবাদে বেদজ্ঞানী-ব্রাহ্মণদের কশ্যপ বলা হত। পৃথুর এলাকা অর্থাৎ প্রথম রাষ্ট্রের শাসনাধীন এলাকা এই ব্রাহ্মণদের দান করে দেওয়া হয়। তাঁরাই 'পৃথিবী'র মালিক। ভারতে নিজের উপর, সমাজের উপর ও জগতের উপর মানুষের যে অধিকার তা দিয়ে দেওয়া হয় 'মহর্ষি'দের; দিয়ে বাকি মানুষেরা 'সম্প্রদায়ে' পরিণত হয়ে যায় বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে তার অনেকটাই ক্ষত্রিয়দের

বিরোধের কারণে অন্য সম্প্রদায়ের হাতে চলে যায়। অতঃপর বহু হাঙ্গামার শেষে যুদ্ধপারদর্শী ব্রাহ্মণেরা বা পরশুরাম সেই 'পৃথিবী' উদ্ধার করে তা এই বেদবাদীদের বা কশ্যপকে দান করে দেন। তাই ভারতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোনো মানুষই জমির অধিকারী ছিলেন না। কৃষিকাজে নিযুক্ত বাংলাভাষী যখন — 'বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর' — প্রবাদটি উচ্চারণ করেন তখন ব্রাহ্মণের সেই মালিকানার কথাটি আজও বলা হয়ে যায়।

এ তো গেল একটি দিক। অপর দিকটি হল, গোটা প্রাচীন ইতিহাসকে পরবর্তীকালের পুরাণকারগণ যখন সাজাতে বসেছেন, তখন আদি যুগটাকে তাঁরা সাজিয়েছেন খানিকটা অঙ্ক কষে কষে। ঠিক যা ঘটেছিল, তার চেয়ে জোর পড়ে যায় ঠিক যা ঘটতে পারত তার ওপরে। তাছাড়া যিনি অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন তিনি তাঁর অবস্থান থেকে দেখছিলেন। কোনো পুরাণকার চন্দ্রবংশের (আদি ধনতন্ত্রের) সমর্থক তো কেউ বা সূর্যবংশের (আদি সমাজতন্ত্রের) সমর্থক। ফলে তাঁদের বিবরণে কিছু কিছু পার্থক্য ঘটে যায়। সেই পার্থক্যের কথা রয়েছে পৌরাণিক অভিধানের উপরোক্ত বিভিন্ন প্রকার বয়ানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই কাহিনীগুলির ভিতরে বিধৃত মূল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি প্রায় অক্ষতই আছে। দ্র. **অদিতি**।

কষ (কষা, কশা, কস) : ১. কষ = ✓কষ্ + অ (ঘ) - অধিকরণে সংজ্ঞার্থে। (ব.শ.)। ২. *কষ = কারী দিশাগ্রস্ত যাহাতে। /* যাহাতে পরীক্ষার্থ স্বর্ণাদি ঘৃষ্ট হয়। (ব.শ.)। ৩. নিকষ, কষ্টিপাথর, মাড়ি, কষের প্রান্তস্থ গালের দুই প্রান্ত, গালাসি, হরীতকী প্রভৃতির রস, tannin, কষা দাগ (ছোপ), ক্বাথ। পরীক্ষার্থে কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করা, পরীক্ষা করা, তাড়না করা, অল্প ভাজা, টানিয়া বাঁধা, অঙ্কপাত করা, আক্ষিপ্ত করা, যথাশক্তি চেষ্টা করা, সজোরে আঘাত করা। (ব.শ.)। ৪. অনেকগুলি অর্থই প্রচলিত। ৫. দ্র. **শ বর্ণের অর্থ**। তাতে যে অর্থ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে কারী পূর্ণ শক্তি রূপে প্রকাশিত যাহাতে, তাকে কশ, দিশাগ্রস্ত যাহাতে তাকে কষ, এবং শক্তির কণা রূপে প্রকাশিত যাহাতে তাকে কস বলা যায়। উপরোক্ত অর্থগুলি এরই কোনো একটি রূপের অনুষঙ্গে প্রসূত। এর মধ্যে **কশ** মানুষকে বিকশিত হতে সহায়তা করতে পারে, **কষ** মানুষকে দিশাগ্রস্ত করে টিপে বা কষে ধরে অর্থাৎ বাঁধে এবং সন্দেহ নেই বন্ধনই কষ্টের কারণ, তাই **কষ** মানুষকে কষ্ট দেয়।

কষণ, কষণি, কষণী, কষ্ট, কষ্টিপাথর : ১. কষ্ট = ✓কষ্ + ত (ক্ত) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***কষণ** = **কষ** অন যাহাতে। **কষণি** = **কষণ** গতিশীল যাহাতে। **কষণী** = **কষণির** আধার যে। **কষ্ট** = **কষ** (তারিত হইয়া) টঙ্কারিত হয় যাহাতে। **কষ্টিপাথর** = **কষ্ট** গতিশীল যে পাথরে।* ৩. **কষণ, কসন** = আকর্ষণ, টানা, টানিয়া বাঁধার ডোর বা দড়ি, হস্তপদাদির আক্ষেপ, খিঁচানো, নিকষে পরীক্ষার্থ স্বর্ণাদি ঘর্ষণ। **কষণি, কষণী** = বন্ধনরজ্জু, কষিয়া বাঁধার ডোর বা দড়ি (belt)। **কষ্ট** = কষ্টকারণভূত, পীড়াযুক্ত, ক্লেশকর, দুঃখদ, দুরবগাহ, দুরারোহ ... ইত্যাদি। **কষ্টিপাথর** = নিকষপাথর। (দ্র. **নিকষ**)। (ব.শ.)। ৪. pain অর্থে 'কষ্ট' শব্দটি এবং 'মোটা দড়ি' অর্থে 'কষণ' শব্দটি প্রচলিত। অন্য শব্দগুলি প্রায় অপ্রচলিত। ৫. কারী (ক) দিশাগ্রস্ত (ষ) হয়ে গেলেই সমগ্র সত্তা একদিশায় চলতে বাধ্য হয়। একে কষা বা কষে ধরা বলে। যা দিয়ে কষা হয়, তাকে বলে **কষণ**-দড়ি বা **কষণী**। একে বন্ধনরজ্জুও বলা হয়। তাই **কষণি** দিয়ে বাঁধলে মানুষের যে-পীড়া হয়, তাকে **কষ্ট** বলে। সবাই জানেন, মানুষের দুঃখকষ্টের মূলে থাকে নানা ধরনের কষণীর বন্ধন। মানুষের বাহ্য শরীরকে কষে বাঁধা হয় বাহ্য দড়ি দিয়ে; তাতে তার বাহ্যশরীরের **কষ্ট** হয়। আর, মানুষের মানসদেহকে কষে বাঁধা হয় মানসদড়ি (নীতি, আইন, ধর্ম ইত্যাদি) দিয়ে; তাতে তার মানসিক **কষ্ট** হয়। আবার বিভিন্ন রকম নিয়মে হিসেবে পদ্ধতিতে কাজ করার যে রাষ্ট্রীয় 'কারীর দিশাগ্রস্ত করণ পদ্ধতি' বা রাষ্ট্রীয় **দন্ত**-এর **কষ** রয়েছে, **কষ্টিপাথর** রয়েছে, সেগুলি পেরোতে গেলে যে কষাকষির টঙ্কার হয়, তাও **কষ্ট** পদবাচ্য। বলতে গেলে, আজকের দিনে রাষ্ট্রের **কষ্টিপাথর** পেরিয়ে যাওয়া সবচেয়ে **কষ্টকর**। দ্র. **নিকষ**। মোটকথা, মানুষের **কষ্টের** মূলে রয়েছে কষে বাঁধা **কষণ** দড়ির পীড়া; তা সে বাহ্যিক **কষ্ট** হোক আর মানসিক **কষ্টই** হোক।

কষায় : ২. *কষায় = **কষ**-এর যাওয়া থাকে যাহাতে। /* কষায় = যাহা কণ্ঠকে হিংসা করে। (ব.শ.)। ৩. কষায় রসযুক্ত, রক্ত, লোহিত, রক্তপীত, সুরভি, সুগন্ধি, অপটু, শ্রবণসুখকর, ক্বাথ, নির্য্যাস, রস, বিলেপন, অঙ্গরাগ, রাগ, রাগদ্রব্য, রক্তপীতমিশ্রবর্ণ, সৌরভ, রাগদ্বেষাদিদোষ, কামাদি মল, নির্বিকল্প সমাধির বিঘ্নবিশেষ, কলিযুগ, শোন্যাকবৃক্ষ, ধববৃক্ষ। ৪. কয়েকটি অর্থ প্রচলিত। ৫. যাতে কারীর বিকাশ বা অগ্রগতি একটি বিশেষ দিশায় চলেছে, টর্চের আলোর মতো, তাকে **কষায়** বলে। তা কষায় রসযুক্ত হতে পারে, কলিযুগও হতে পারে।

কাছন (কাছনি, কাছরা, কাছি, কষণ) : ১. কক্ষ, কক্ষা, কচ — (ব.শ.)। ২. দ্র. **কষ, কাছ**। ৩. সমীপ, সঙ্গ, অদূর, পার্শ্ব, নিকটে, বিচারে, বন্ধন করা, কষিয়া বাঁধা, পরিধান করা, ধারণ করা, সাজ, সজ্জা, কাছির মত স্থূল দড়ি। (ব.শ.)। ৪. নানার্থে সুপ্রচলিত। ৫. near বা 'কাছে' এবং মোটা দড়ি অর্থে প্রচলিত। এই দড়িকে 'কষণ দড়ি'ও বলে। ব.শ. এই শব্দগুলিকে কষ্ থেকে জাত বলে মনে করেছেন। আমাদের মনে হয়েছে, কাছি শব্দটি কষ্ থেকে জাত হলেও অন্যগুলি কচ্ শব্দ-পরিবারের সদস্য। দ্র. **কচ্ছপ, কাছ**।

কাশ : ১. ✓কাশ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে; ✓কাশ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***কশ** থাকে যাহাতে।* ৩. দীপ্তি, প্রকাশ, আবির্ভাব, কাশরোগ, কাসি (কাসিয়া তোলা কফ বা শ্লেষ্মা), গলশব্দ করা, তৃণবিশেষ, কাশপুষ্প। (ব.শ.)। ৪. Saccharum Spontaneum বা 'কাশ' অর্থে ও to cough বা 'গলশব্দ করা' — এই দুই অর্থে শব্দটি প্রচলিত। ৫. প্রকাশ শব্দটির অর্থ আমরা বুঝতে পারি। এ হল প্রকৃষ্ট **কাশ**। অর্থাৎ প্র বাদ দিয়ে যে **কাশ**, তাকে আমরা স্বতন্ত্রভাবে খানিকটা পাই 'কাশফুল', 'নিকাশ', 'কাশি' ও 'কাশী'তে। এর কারণ হল, যা কাশিত হয়, তা কীভাবে হয়, তা না বলে দিলে ব্যাপারটি

স্পষ্ট হয় না। প্রকৃষ্টভাবে **কাশ** হলে **প্রকাশ**, নির্গত **কাশ** হলে **নিকাশ**, বিশেষভাবে **কাশ** হলে **বিকাশ**, সর্বদিকে **কাশ** হলে **আকাশ**, কারও সম-এ **কাশ** হলে **সম্কাশ**। **নিকাশী** ব্যবস্থা কথাটি সবাই জানেন। শহরের ঘরবাড়ির যে 'খক্ খক্ কাশ', সে সবই এই **নিকাশী** ব্যবস্থার দ্বারা শহর থেকে নিষ্কাশিত হয়। এর আরও একরকম রূপ দেখতে পাওয়া যায় কশ-এর স্বরূপে।

কশ শব্দটির খোঁজ পাওয়া যায় 'কশ্যপ' শব্দের গোড়ায়। এই কশ্য মদ্য পদবাচ্য; অর্থাৎ কিনা **কশ** যাহাতে থাকে সেটি মদ্য, যাহা মত্ত করে। কিন্তু **কশ** তো আর মদ্য নয়, সে হল করণের (শক্তির, পদ্ধতির, মালিকানার) শক্তিপ্রয়োগ যাতে থাকে। আমরা জানি তত্ত্বাবিষ্কারের পর তা কাজে রূপান্তরিত করবার মধ্যে 'আনন্দ' আছে, এবং এই আনন্দকে 'মানসিক মদ্য' বলা যায়, যে-কারণে 'আনন্দ' শব্দের একটি অর্থ 'মদ্য'। এই **কশ** থেকে জাত হয় **কাশ**, **কুশ**। এই কাশ কেমন করে উৎপন্ন হয়, তার একটি বর্ণনা পাওয়া যায় সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি আড্ডামূলক 'গাঙ্গুলী মশাই'য়ের গল্পে। (দ্র. *ভাষার জমাখরচ*)। 'কলের একদিক দিয়ে গোরু ঢোকানো হচ্ছে, অন্য দিক দিয়ে ... বুট বেরিয়ে আসছে, টারালাপ্ টারালাপ্ করে...।' খক্ খক্ করে কাশলেও এই একই ব্যাপারের সাক্ষাৎ মেলে। (দ্র. **কল**)। বাক্যের শব্দ ও বাজারের পণ্য উৎপাদিত হয় এই একই নিয়মে। 'প্রকৃষ্ট'রূপে সে-ব্যাপার ঘটলে আমরা তাকে 'প্রকাশ' বলি, বিশেষ রূপে ঘটলে বলি 'বিকাশ'; এবং 'কাশ'টিকেই ভুলে যাই। দ্র. **আকাশ, কট**। ৬. quash।

কাশমর্দ : ১. কাশ + ✓মৃদ + অ - ক। (ব.শ.)। ২. *যাহা কাশকে মর্দ্দন করে। /* যাহা কাশরোগ নাশ করে। (ব.শ.)। ৩. কালকাসন্দা গাছ, কাসারি (Cassia sophora), বেশবারকল্কাদি মিশ্রিত ভক্ষ্যবিশেষ, কাশুন্দী, পিষ্টজলমিশ্রিত বস্ত্রগালিত বেসবার। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কাশের উদ্ভব নাকি 'আমি' বা 'আম'ই-র জন্ম দেয়, মানুষ ইগোবাদী হয়ে ওঠে; এদিকে আবার দেখছি আম-এর কাশুন্দীই সেই **কাশ**রোগকে নির্মূল করে। আমরা কি একবার মানসিক 'কাশুন্দী' বানানোর চেষ্টা করে দেখব! ৬. ইংরেজি Cassia sophora।

কাশি, কাশিকা, কাশী : ১. ✓কাশ্ + ই (ইন্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓কাশি বা কাশী + ক (কন্) স্ত্রী আ; **কাশি** + স্ত্রী ঈ। (ব.শ.)। ২. *কাশি = কাশ গতিশীল বা বিকাশশীল যাহাতে; কাশিকা = কাশি কারীর আধার; কাশী = কাশির আধার যে। /* যাহা প্রকাশ পায়। (ব.শ.)। ৩. শিবপুরী, বারাণসী, শ্লেষ্মাজন্য গলশব্দবিশেষ, কাশীপুরী, সূর্য্য, প্রকাশ, দীপ্তি, কাশিনগরোপলক্ষিত দেশবিশেষ, কাশরোগ, কাশতৃণ, কবি কাশীরাম দাস, কাশীসম্বন্ধী অংশ, কাশীমাহাত্ম্যবিষয়ক স্কন্দপুরাণ-অন্তর্গত অংশবিশেষ, কাশীরূপ ভূখণ্ড, কাশীক্ষেত্র। ৪. 'কাশী' নামক স্থানটিকে বোঝানোর জন্য প্রচলিত। ৫. **কাশ**, তা সে খকখক কাশ হোক আর টারালাপ-টারালাপ **কাশই** হোক কিংবা বকবক কাশই হোক, যে স্থান-কাল-পাত্র তার বিকাশের আধার, তারা প্রত্যেকেই **কাশী** পদবাচ্য। এককালে নিশ্চয় এখানে শব্দশাস্ত্রের বা পণ্যউৎপাদনের রমরমা ছিল। মনে রাখা ভাল, **কাশী** স্থানটিকেই বারাণসী বলে। এই স্থানটি অধঃপতিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বা পৃথু পরিচালিত পৃথিবীর বাইরে ছিল। তথ্য এই যে, ভারতে অনেকগুলি বারাণসী ছিল এবং সেগুলি প্রত্যেকটিই 'পৃথিবীর বাইরে' অবস্থিত ছিল। এখানে পণ্য উৎপাদন নিষিদ্ধ ছিল না। দ্র. **বারাণসী**।

কাশীরাজ, কাশিরাজ : ২. *যিনি কাশীর (কাশী নামক দেশের) রাজা।* ৩. কাশীনাথ, শিব, কাশীরাজ, দিবোদাস। (ব.শ.)। চন্দ্রবংশীয় রাজা কাশের অন্যতম পুত্র কাশীরাজের দীর্ঘতমা নামে পুত্র হয়। দীর্ঘতমার পুত্র ধন্বন্তরী। কাশিরাজের কন্যা গন্ধিনীকে যদু বংশের রাজা শ্বফল্ক বিবাহ করেন। গন্ধিনীর গর্ভে অক্রুরের জন্ম। কাশিরাজ তাঁর বন্ধু পৌণ্ড্রিক বাসুদেবকে সাহায্য করতে গিয়ে কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **দিবোদাস**।

কাশ্যপ : ২. *কশ্যপ হইতে জাত*। ৩. কশ্যপের গোত্রাপত্য, কশ্যপের পৌত্রাদি, কণাদমুনি, কণ্বমুনি, বিভাণ্ডক মুনি, গোত্রবিশেষ, কশ্যপগোত্রজাতমাত্র, বিষবিদ্যাকুশল ঋষিবিশেষ, বিষ্ণু, অরুণ, মৃগবিশেষ, মীন। (ব.শ.)। ক) মহারাজ দশরথের অন্যতম ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। খ) জনৈক মুনি, এঁর পুত্র বিভাণ্ডক, বিভাণ্ডকের পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। গ) কশ্যপের পুত্র মহর্ষি কাশ্যপ একজন যোগপরায়ণ ঋষি ছিলেন। ঘ) বিষবিদ্যায় পারদর্শী এক ব্রাহ্মণ চিকিৎসক। অভিমন্যু-উত্তরার পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ একদিন মৃগয়া করতে গিয়ে বাণবিদ্ধ মৃগকে অনুসরণ করতে করতে মৌনব্রতধারী শমীক মুনিকে দেখতে পান। তাঁকে মৃগ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে কোনো উত্তর না পাওয়ায় ক্রুদ্ধ রাজা মুনির গলায় এক মৃত সর্প স্থাপন করে প্রাসাদে ফিরে আসেন। তপোরত মুনির পুত্র শৃঙ্গী পিতার এই অপমানের জন্য অভিশাপ দেন যে, সাত রাত্রির মধ্যে তক্ষক নাগ কর্তৃক দংশিত হয়ে রাজার মৃত্যু হবে। শমীক মুনি একথা শুনে পুত্রকে ভর্ৎসনা করেন, কারণ পরীক্ষিৎ মুনির মৌনব্রতের কথা জানতেন না। পুত্র তাঁর শাপ প্রত্যাহার না করে পরীক্ষিৎকে তাঁর আসন্ন বিপদের কথা বলে আত্মরক্ষা করতে বললেন। সপ্তম দিবসে কাশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণ পরীক্ষিতের বিষ-চিকিৎসার জন্য রাজার নিকট যাচ্ছিলেন। পথে ব্রাহ্মণবেশধারী তক্ষকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। কাশ্যপকে পরীক্ষা করবার জন্য তক্ষক এক বটবৃক্ষকে দংশন করে কাশ্যপকে সেই বৃক্ষ রক্ষা করতে বলেন। তক্ষক-দংশনে সঙ্গে সঙ্গে বটবৃক্ষ দগ্ধ হলেও, কাশ্যপের মন্ত্রবলে সে আবার সজীবত্ব লাভ করে। কাশ্যপের এই অসাধারণ শক্তি দর্শনে তক্ষক তাঁকে বললেন যে, রাজার নিকট হতে যে ঐশ্বর্য তিনি আশা করেন, তা অপেক্ষা অধিক ধনৈশ্বর্য আমি দান করব, আপনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন। কাশ্যপ ধ্যানযোগে জ্ঞাত হন যে, পরীক্ষিতের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। তাই তক্ষকের কাছ থেকে অভীষ্ট ধন গ্রহণ করে তিনি অগত্যা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। (পৌ.অ.)। ৪. হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণের অনেকে নিজেদের 'কাশ্যপ' গোত্র বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এভাবেই শব্দটির প্রচলন রয়েছে। অন্য কোনোভাবে নেই। ৫. উত্তরপ্রদেশের 'কাশ্যপ' গোত্রভুক্ত ব্রাহ্মণেরা ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে এই দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন যে, তাঁদের যেন ভারতীয় সংবিধানে 'সিডিউলড্ কাস্ট' ও 'সিডিউলড্

ট্রাইব'দের মতো বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করে কিছু সুবিধাভোগের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। যে-কাশ্যপকে পরশুরাম 'পৃথিবী' দান করে দিয়েছিলেন, ফলে যাঁরা এককালে 'পৃথিবীর মালিক' ছিলেন, তাঁদের এ-দুর্গতি ভাবা যায় না! ভাবা যাবে কী করে? তাঁরা নিজেরাই তো ভুলে গেছেন তাঁরা কারা, কী মহান কর্তব্যের দায় ছিল তাঁদের। অন্যের আর দোষ কী!

কাষ্ঠ : ১. ✓কাশ + থ (কথন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. যাহা দীপ্ত হয়। (ব.শ.)। ৩. রান্নার কাঠ, খদিরাদিসম্ভূত সারবান দারুবিশেষ, ভূমিপরিমাণার্থ দণ্ড, কাষ্ঠবৎ নীরস বা কঠোর বাক্য। (ব.শ.)। ৪. timber অর্থে প্রচলিত। ৫. কাশ (প্রকাশ) যেখানে স্থির জড় হয়ে রয়েছে, যাকে অগ্নিসংযোগ করে প্রকাশে আনতে হয়, দীপ্ত করতে হয়, তাকে **কাষ্ঠ** বলে।

কুক্ষি : ১. ✓কুষ্ + সি (ক্সি) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর খুবলে নেওয়া গতিশীল থাকে যেখানে।* / যাহা আহারের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়। (ব.শ.)। ৩. জঠর, উদর, গর্ভাশয়, গর্ভ, অভ্যন্তর, মধ্য, গর্ত্ত, বিল, গুহা, অন্তর্ভাগমাত্র, উদরের বাম পার্শ্ব বা দক্ষিণ পার্শ্ব, অসিকোষ, বলিপুত্র দানববিশেষ। (ব.শ.)। ৪. ownership অর্থে প্রচলিত। ৫. নবরূপে উত্তীর্ণ কারী যা খুবলে নেয়, তাকে **কুক্ষ** বলা যায়। সেই কুক্ষ গতিশীল বা বিকাশশীল হলে, তাকে **কুক্ষি** বলা যায়। কেউ কিছু কুক্ষিগত করলে আমরা খুশি হই না, কিন্তু যে কুক্ষিগত করে, সে নিশ্চয় খুশি হয়। নইলে করবে কেন! দ্র. **কক্ষ**।

কুক্ষিম্ভরি : ১. কুক্ষি ✓ভৃ + ই (ইন্), ম্ (মুম্) নিপাতিত। (ব.শ.)। ২. যে কুক্ষি ভরণ করে। (ব.শ.)। ৩. স্ব-উদর পূরক, অর্থাৎ যে পোষ্যবর্গের ভরণ না করিয়া স্বোদরমাত্র পূর্ণ করে, আত্মম্ভরি, স্বার্থপর, অন্তর্ভাগপূরক। (ব.শ.)। এদের উদরম্ভরিও বলা হত। ৪. অপ্র.। ৫. **কুক্ষি** ভরে যে, তার কাছে সেটা ভালো কাজ হতে পারে, কিন্তু আমাদের সমাজমনের মাটি কাজটিকে আজও মন্দ কাজ বলেই মনে করে।

কুশ : ১. কু + ✓শী + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. কু *(নবরূপে উত্তীর্ণ কারী, যা অতি ভাল ও অতি মন্দ) শায়িত থাকে যাহাতে।* / যে কুৎসিত কার্য্যে থাকে। (ব.শ.)। ৩. রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। (বাল্মীকি কুশগুচ্ছের অগ্রভাগ ও অধোভাগ দ্বারা রচিত রক্ষাবন্ধনে সদ্যোজাত শিশুদ্বয়কে বালঘাতক পূতনাদির উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, জ্যেষ্ঠের নাম 'কুশ' ও কনিষ্ঠের নাম 'লব'। মতান্তরে, বাল্মীকি কুশ ও লব বা গোপুচ্ছ দ্বারা গর্ভোপদ্রব দূর করিয়াছিলেন, এইজন্য ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে। রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে কুশলব রামায়ণ গান করিয়া, রামের পুত্র বলিয়া পরিচিত হন। রাম, কুশকে কোশল রাজ্যের এবং লবকে উত্তর কোশলের আধিপত্য প্রদান করেন।)। (কুশময়) যোক্ত্র। কুশদ্বীপ। ... কুশস্থল = কুশপ্রধান স্থান, কান্যকুব্জ দেশ। কুশস্থলী = রৈবত-নৃপতি-রচিতা **দ্বারকাপুরী**। (ব.শ.)। ... রামচন্দ্রের যমজ পুত্র। লোকাপবাদভয়ে রাম **বাল্মীকির** আশ্রমে সীতাকে গর্ভাবস্থায় নির্বাসিতা করলে, এই দুই যমজপুত্র তপোবনে জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি বাল্মীকি কুশগুচ্ছের অগ্রভাগ ও অধোভাগ দ্বারা রচিত রক্ষা-বন্ধনে সদ্যোজাত দুই শিশুকে শিশুঘাতক পূতনাদির হস্ত হতে রক্ষা করেছিলেন বলে জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব। বাল্মীকি এই দুই ভ্রাতাকে নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিত করেন ও এঁদের সুর-তান-লয় সহযোগে রামায়ণ গানে সুশিক্ষিত করেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞসভায় বাল্মীকি এই দুই ভ্রাতার সহিত উপস্থিত হন। রাম নিজের পুত্রদের চিনতে পেরে সীতাকে সেখানে আনয়ন করেন। যজ্ঞসভায় সীতা অন্তর্হিতা হলে রাম কুশকে কুশাবতী নগরী ও লবকে শ্রাবস্তী নগরীর রাজা করেন। ... পরে কুশ অযোধ্যার সিংহাসন অধিরোহণ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. 'কুশ' ঘাস হিসেবে কমবেশি প্রচলিত। ৫. **কুশ** কেবল ঘাস নয়, সে কুশীদজীবীর অভীষ্ট **কুশ**, সে আবার ব্রাহ্মণের পথের **কাঁটা** হয়ে দেখা দেয়। এখানে বলা হল — কুশময় দেশ হল **কান্যকুব্জ** দেশ, বর্তমান কনৌজ; আর দ্বারকাপুরী হল কুশস্থলী। আমরা জানি, কুশহীন দেশ হল বিদর্ভ। চাণক্য তো **কুশ** ছিঁড়তে ছিঁড়তেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে দিয়ে নতুন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করে বসলেন।

নারায়ণকে যদি তাঁর সূক্ষ্ম পরমাত্মা রূপে বুঝি, তাহলে তাঁর যে সকল মানস চেহারা হয়, তার একটি হল নতুন (আবিষ্কৃত) শুভ শক্তি-বিষয়ক ব্রহ্মজ্ঞান (রাম) যার প্রয়োগজাত অভিজ্ঞতা হল আবিষ্কারের ত্রুটি সংশোধন অর্থাৎ **কুশ** এবং আবিষ্কারের সঙ্গে যোগ করার মতো নতুন কিছু অর্থাৎ **লব**। আর, সেই নারায়ণকে যদি তাঁর স্থূল নগদ নারায়ণ রূপে দেখি, তাহলে তাঁর যে সকল বাহ্য চেহারা হয়, তার একটি হল ক্রীড়াকারী পুঁজি বা ফিনান্স ক্যাপিটাল বা রাম। এ জিনিস ব্যবসায়ে ক্রীড়া করলে তার যমজ সন্তান রূপে জন্মায় লাভ ও সুদ অর্থাৎ লব ও কুশ। এই কুশের আধারকে **কোশ** বলে। দ্র. **পূতনা, কন্যাকুব্জ, বিদর্ভ, দশাবতার**।

কুশধ্বজ : ১. কুশ + ধ্বজ। ২. *কুশ ধ্বজা যাহার*। ৩. রাজর্ষি জনকের সহোদর ভ্রাতা, হ্রস্বরোমার পুত্র এবং মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির পিতা। মিথির পুত্র। (ব.শ.)। (ক) ইনি মিথিলার রাজা জনকের ভ্রাতা এবং সীতার খুল্লতাত। কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি যথাক্রমে দশরথ-পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্নকে বিবাহ করেন। সাংকাশ্য রাজ্যের রাজা সুধন্বা যুদ্ধে জনকরাজা কর্তৃক নিহত হলে কুশধ্বজ সেই রাজ্যের রাজা হন। কুশধ্বজের পূর্বপুরুষ নিমি; নিমির পুত্র মিথি। এই মিথি হতে তাঁর অধিকৃত রাজ্যের নাম মিথিলা। মিথির পুত্র জনক হতে পরবর্তী সমস্ত রাজাই জনক নামে অভিহিত হন। (খ) দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কুশধ্বজ। কুশধ্বজের কন্যা বেদবতী। বেদবতীকে রাবণ অপমান করলে তিনি তাঁকে শাপ দিয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করেন। কুশধ্বজকে শুম্ভদৈত্য রাত্রিকালে বধ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **কুশ** যখন জ্ঞানের কুশ, তখন সে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কুশধ্বজ, যার কন্যা বেদবতী। আর কুশ যখন কর্মের **কুশ**, তখন সে সুদ, তখন সে মিথির পুত্র, জনকের ভ্রাতা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির পিতা। দ্র. **নিমি**।

কুশনাভ, কুশিক : ১. কুশ + নাভ। ২. *কুশ নাভিতে যাহার*। ৩. কুশনৃপতির পুত্র, গাধির পিতা ও বিশ্বামিত্রের পিতামহ রাজবিশেষ। শালবৃক্ষ। বিভীতক বৃক্ষ। অশ্বকর্ণ বৃক্ষ। তৈলশেষ, কল্ক, কাইট। ... (ব.শ.)। মহারাজা কুশের পুত্র এবং বিশ্বামিত্রের পিতামহ। প্রাচীনকালে প্রজাপতি ব্রহ্মার কুশ নামে এক পরাক্রান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কুশের ঔরসে রাণী বৈদর্ভীর গর্ভজাত চার পুত্রের মধ্যে কুশনাভ অন্যতম। কুশনাভ মহোদয় নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা কুশনাভের ঘৃতাচী নামে এক অপ্সরার গর্ভে একশত পরম লাবণ্যবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই কন্যাদের রূপে মুগ্ধ হয়ে একদিন পবনদেব এঁদের পাণি প্রার্থনা করেন। কিন্তু পিতার অমতে কন্যারা স্বয়ংবরা হতে অসম্মত হওয়ায় ক্রুদ্ধ পবনদেব তাঁদের সর্বাঙ্গ ভগ্ন ও বিকৃত করে দেন। পরিশেষে কন্যাদের অনুনয়ে পবনদেব তুষ্ট হয়ে বলেন যে, যদি কাম্পিল্য নগরের রাজা ব্রহ্মদত্তের সঙ্গে এই শত কন্যার বিবাহ হয়, তবেই কন্যারা পূর্বরূপ প্রাপ্ত হবে। ধর্মপরায়ণ রাজা ব্রহ্মদত্ত রাজকন্যাদের শাপবৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়ে তাঁদের বিবাহ করেন। ব্রহ্মদত্তের স্পর্শে কন্যারা পূর্বরূপ ফিরে পান। যে স্থানে কন্যারা পবনের শাপে কুব্জ হয়েছিলেন, সেই স্থানের নাম হয় **কান্যকুব্জ** — বর্তমান কনৌজ। ... মহর্ষি বিশ্বামিত্র ও গাধিরাজের পিতা। গাধির পুত্র বিশ্বামিত্রে ব্রাহ্মণত্ব সঞ্চারিত হয়েছিল। একবার বিখ্যাত চ্যবন ঋষি জানতে পারেন যে, কুশিক হতে তাঁর বংশে ক্ষত্রিয়ত্ব সঞ্চারিত হবে। এই ক্ষত্রিয়ত্ব নিজের বংশে সঞ্চারিত হওয়া উচিত নয় মনে করে তিনি রাজা কুশিকের বংশ নাশ করতে সচেষ্ট হন, কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গাধিরাজ কন্যাকে চ্যবনবংশীয় ঋচীক মুনির সঙ্গে বিবাহ দেন। এই বিবাহের ফলে ঋচীকের জমদগ্নি নামে পুত্র হয়। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **কন্যাকুব্জ**।

কুশপুতুল, কুশপুত্তল, কুশপুত্তলিকা : ১. কুশ + পুত্তলিকা। ২. *কুশ দিয়ে তৈরি হয় যে পুতুল*। ৩. কুশতৃণে বা শরপত্রে রচিত পুত্তলিকা। যাহার দাহ হয় নাই বা মুখাগ্নি পর্যন্ত হয় নাই এবং যাহার অস্থি পাওয়া যায় নাই, তাহার দাহকার্য্যার্থ পর্ণনর বা কুশপুত্তলিকা দাহ করিতে হয়। (ব.শ.)। ৪. 'কুশপুত্তলিকা' শব্দটি রাজনীতির জগতে এখনও প্রচলিত আছে। ৫. এখন যাঁরা রাজনীতির দুনিয়ায় কুশপুতুল পোড়ান, তাঁরা যেমন জানেন না, এটি প্রাচীন মানুষের নিদান; তেমনি এখন যাঁরা লাল রংকে প্রতিবাদের রং বলে মনে করেন, তাঁরাও জানেন না, সেটিও প্রাচীন মানুষেরই নিদান। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নিদানের কথাটি তো এখানে উত্তরাধিকারসূত্রে বঙ্গীয় শব্দকোষ বলেই গেছেন, **যতি** শব্দে গিয়ে আমরা জানতে পারব, লাল রঙের কথাটি এসেছে প্রতিবাদী শিবের হাত থেকে।

কুশল : ১. কুশ + ল (লচ্) অস্ত্যর্থে; **কুশ** + ✓লা (গ্রহণ) + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কুশ (নতুন ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োগজাত অভিজ্ঞতা) রূপ অভীষ্ট থাকে যাহাতে*। ৩. কুশযুক্ত, কুশতৃণবান, কুশগ্রাহক, দক্ষ, নিপুণ, শিক্ষিত, কৃত, কল্যাণযুক্ত, মঙ্গল, শুভ, ক্ষেমবান, কুশলী, সুখকর, উত্তম, ভদ্র, পুণ্য, ধর্ম্মকার্য্য, পর্য্যাপ্তি, নৈপুণ্য, দক্ষতা, চাতুর্য্য। (ব.শ.)। ৪. skilled ও well অর্থে প্রচলিত। ৫. এককালে শব্দটি বহু অর্থে প্রচলিত ছিল। তার মধ্যে ঘাস-কুশ যেমন ছিল, তেমনি মানুষের বাহ্যিক লাভের দুনিয়ার সুদও ছিল, ছিল মানসক্ষেত্রের নতুন অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বোধও। কুশলেব ভিতরে এই বোধ এখনও জীবিত।

কুশিক : দ্র. **কুশনাভ**।

কুশীদ, কুসীদ : ১. ✓কুস্ (শ্লেষণ) + ঈদ্। (ব.শ.)। ২. *বিকাশশীল **কুশ** দান করে যে*। / যাহা দ্বারা কু সদন (গতি) হয়। (ব.শ.)। ৩. বৃদ্ধিজীবিকা, বৃদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত জীবিকা, বৃদ্ধ্যর্থ অর্থপ্রয়োগ, সুদে টাকা ধার দেওয়া, বৃদ্ধি, সুদ, বৃদ্ধ্যর্থ দ্রব্য, রক্তচন্দন। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. জ্ঞান বা কর্মের বিনিয়োগের পর যে জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ ফেরত আসে, তার বাড়তি অংশটিকে **কুশ** বলে। সেই কুশ লাভের উদ্দেশ্যে পুনরায় সেই জ্ঞানসম্পদ ও কর্মসম্পদকে কেবলমাত্র সময়ের প্রেক্ষিতে বিনিয়োগ করাকে বলা হয় **কুশীদ**।

কুশীলব : ১. কুশীল + ব অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। ২. *কু (অতি ভাল ও অতি মন্দ) শীল বহন করে যে*। / কুশীলযুক্ত যে। (ব.শ.)। ৩. নর্ত্তনবৃত্তি নটাদি, দেশান্তরে কীর্ত্তিপ্রচারক নট, চারণ, গায়ক, সর্ব্ববেশধর নট, নটমাত্র, অভিনেতা, নটবিশেষ, বাল্মীকি। (ব.শ.)। ৪. actor-actress অর্থে প্রচলিত। ৫. প্রচলিত শীল-এর পরিধির ঊর্ধ্বসীমা লঙঘন করে যারা চলে, তারা **কুশীল** বহনকারীই বটে। প্রাচীন কালে যাঁরা দেশদেশান্তরে চারণ-গায়কের কাজ করতেন, তাঁরা প্রচলিতের বাইরে নতুন জ্ঞান-কর্মের কথা বলতেন; সেই কারণে তাঁদের 'কুশীল বহনকারী' **কুশীলব** বলা হত। এখন যে অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তাতে স্পষ্ট হয়, শব্দটির অর্থের সীমা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে গেছে।

কুশুম-কুশুম, কুসুম-কুসুম : ১. কুশ + উম, কুস + উম। (দ্র. **কুসুম**) ২. *কুশ বা কুস জননের যে তাপ*। ৩. কুসুম-কুসুম গরম। / ঈষৎ উষ্ণ, একটু গরম, ঈষদুষ্ণ। (ব.শ.)। ৪. tepid অর্থে প্রচলিত। ৫. গ্রামবাংলায় 'কুসুম-কুসুম গরম' কথাটি এখনও অবিকল প্রচলিত। জননে বা শ্লেষণে পার্শ্বফল রূপে তাপ জন্মায়, তবে তা এত মৃদু যে উপলব্ধি করা কঠিন। সুদ জননেও জন্মায়, ফুল জননেও জন্মায়। সেই জন্যই বোধহয়, শব্দটি দুরকম বানানেই পাওয়া যায়।

কুশূল, কুসূল : ১. ✓কুশ্, কুস্ (সংশ্লেষ) + উল। (ব.শ.)। ২. *কুশ, কুস রূপ অভীষ্ট রাখা হয় যেখানে*। ৩. তুষানল, ইষ্টকাদিনির্ম্মিত ধান্যাদি-স্থান, ব্রীহ্যাধার, গোলা, হামার, মরাই। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **কুশ** ও **কুস** শব্দ দুটি এমন ভাবে গায়ে গায়ে জড়িয়ে রয়েছে, যে, তাদের কিছুতেই যেন পৃথক করা যায় না। তবে ধানের গোলাকে কুশূল ও কুসূল বলে, এই তথ্যটি বলে দেয়, কুশ-কুস দুটো শব্দই দৈহিক পুঁজি ও মানসিক পুঁজি উভয়ের সঙ্গে জড়িত।

কুষ্ঠ : ১. ✓কুষ্ + থ - ক। (ব.শ.)। ২. *কুষ্ (নিষ্কোষণ) থাকে যাহাতে*। / যাহা রোগ নিষ্কাশিত করে। (ব.শ.)। ৩. রোগবিশেষ, শ্বেতকুষ্ঠ, শ্বিত্র, (সপ্ত মহাকুষ্ঠ ও একাদশ ক্ষুদ্র কুষ্ঠ, সর্ব্বসুদ্ধ অষ্টাদশ

কুষ্ঠ।), উৎপল, বিষভেদ। (ব.শ.)। ৪. 'কুষ্ঠ'রোগ অর্থে প্রচলিত। ৫. কুষ্ঠ রোগ মানুষের শরীরের কোষগুলিকে যেমন নষ্ট করে পচিয়ে শুকিয়ে বের করে দেয় বা নিষ্কোষ করে দেয়; তেমনি 'কুষ্ (**কুশ**) থাকে যাহাতে' সেই ব্যক্তিমালিকানাও সমাজশরীরের কোষস্বরূপ মানুষকে যৌথসমাজের অংশ রূপে আর সক্রিয় থাকতে দেয় না। মানবশরীরে সমাজশরীরে ক্ষতি করে সে। উৎপলকে কেন কুষ্ঠ বলা হত, সেই প্রশ্ন নিয়ে এগোলে সন্দেহ হয়, সেকালের সমাজ কি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে 'কুষ্ঠ' রূপে শনাক্ত করেছিল? আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে, পাশ্চাত্যের প্রাচীন কাহিনীগুলিতে কুষ্ঠরোগগ্রস্তদের সমাজ থেকে তাড়িয়ে দূরে পাহাড়ঘেরা পৃথক দেশে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দ্র. **ঘোষা, চিত্র**।

কুষ্ঠঘ্ন, কুষ্ঠারি : ১. কুষ্ঠ ✓হন্ + অ (টক্) - কর্তৃবাচ্যে; কুষ্ঠ + অরি। (ব.শ.)। ২. *কুষ্ঠ হনন করে যে।* / কুষ্ঠের শত্রু। (ব.শ.)। ৩. বাকুচী, কাকোদুম্বরিকা, ডুমুর। বিট্‌খদির, পটোললতা, অর্কপত্র, খদিরমাত্র, গন্ধক। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. মানবশরীরের কুষ্ঠ নিবারণের জন্য অব্যক্ত (tacit) জ্ঞানের সাহায্যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বুঝেছিলেন বাকুচী-ডুমুর ইত্যাদির কথা। সমাজশরীরের ক্ষেত্রে কাকে তাঁরা বাকুচী-ডুমুর ইত্যাদি বলতেন, তা আজ আমরা জানি না। ব্যক্ত (explicit) জ্ঞানের সাহায্যে সেগুলি বুঝে নেওয়া আমাদের কাজ ছিল। কাজটা এখনও বাকি আছে।

কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ডা : ১. কু + উষ্মা + অণ্ড। ২. কু উষ্মা অণ্ডে যাহার; যাহার বীজে ঈষৎ তাপ আছে। (ব.শ.)। ৩. শিবের গণদেবতাবিশেষ বা পারিষদবিশেষ, ভ্রূণবিশেষ, উমা, দুর্গা, যাগক্রিয়া-বিশেষ। (ব.শ.)। ৪. কুমড়ো অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. এটিই ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের বিশেষ গৌরবের অর্জন। তাঁরা অনুভব করতে পেরেছিলেন, কুমড়োর বীজের মধ্যে যেমন ঈষৎ তাপ আছে, যার জন্য কুমড়ো গুরুপাক বস্তু বলে বয়স্করা আজও বলেন, তেমনি তাঁরা জানতেন নতুন পাশ করা যুবক ছেলেদের ভেতরেও তাপ থাকে। কিন্তু অকালের কুমড়ো যেমন কাজে লাগে না, পচে যায়, তেমনি কালের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে যে যুবক এগোতে পারে না, সেও ব্যর্থ হয়। তাই তাকে তাঁরা বলতেন 'অকালকুষ্মাণ্ড'। কেবল তাই নয়, শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'কুষ্মাণ্ডা'। জনসাধারণের (**মহামায়া**র) যে **নবদুর্গা** (নয় রকম দুর্গা) রূপ, তার একটির নাম সেকারণেই তাঁরা দিয়েছিলেন 'কুষ্মাণ্ডা'।

কুসুম : ১. ✓কুস্ (শ্লেষণ) + উম - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. কু *(-জনক) অস্তিত্বের তাপের সীমায়ন যাহাতে*। ৩. প্রসূন, পুষ্প, ফল, স্ত্রীরজঃ, ঋতু, নেত্ররোগবিশেষ (ব.শ.)। ৪. ফুল ও ডিমের কুসুম, এই দুটি অর্থে প্রচলিত। ৫. বর্তমানকে ছাড়িয়ে যে এগিয়ে যায়, তাকে যদি 'কু' (ভালমন্দ জননকারী) অস্তিত্বের সীমায়ন বলা হয়, তবে এই কাজটি গাছের ফুল যেমন করে, তেমনি স্ত্রীরজঃও করে, করে আর একটি বস্তু — পণ্য। আদি যৌথসমাজের উৎপাদন ব্যবস্থাগুলি উৎপন্ন তৈরি করত, কিন্তু পণ্য করত না। সেই ব্যবস্থাগুলিকে সেকারণেই বলা হত '**পুষ্পহীন বৃক্ষ**'। অর্থাৎ পণ্যকে পুষ্পও বলা হত। **পুষ্পিতা** বা পুষ্পিনী হওয়া মানে রজঃস্বলা হওয়া। তার মানে ফুল-স্ত্রীরজঃ-পণ্য, এগুলি যে সন্তানের বোঝায়, তারা আরও একটি ক্রিয়া করে, যা কুসুমও করে; তাই কুসুম বললে তাদের দিকেও আঙুল তুলে দেখানো হয়। সেই ক্রিয়াটির কথাই উপরের (২.) ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে বলা হয়েছে।

কুসুমশর (কুসুমশায়ক, কুসুমসায়ক, কুসুমায়ুধ, কুসুমাস্ত্র) : ১. কুসুম + শর, শায়ক, আয়ুধ, অস্ত্র। ২. *কুসুম শর / শায়ক / আয়ুধ / অস্ত্র যাহার*। ৩. কামদেব, পুষ্পরূপ বাণ, পুষ্পবাণ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. বাস্তবে যদি **কুসুম** থাকে, কুসুমগ্রাহক থাকে, তাহলে এই শব্দগুলি থাকুক বা না থাকুক, তার ক্রিয়াটি বাস্তবে থাকবেই। এবং আছেও। আছে শুধু নয়, বিপুল পরিমাণে আছে, আমাদের জীবন ব্যতিব্যস্ত করে আছে। দিকে দিকে হোর্ডিং, পাতায় পাতায় বিজ্ঞাপন, রেডিয়ো টিভি পেরিয়ে ট্রেনের ঘোষণাতেও পর্যন্ত সাবান শ্যাম্পু নিয়ে কামদেবের বাণ ছুটছে চারিদিকে, আছড়ে পড়ছে আপনার মনের দরজায়, কড়া নাড়ছে, কলিং বেল বাজাচ্ছে, আপনার ঘরে শুয়ে থাকা কামনাকে যদি জাগানো যায়! সে জেগে উঠে বায়না ধরবে — কিনে দাও কিনে দাও! আপনি যাবেন কোথায়? এই যে কান চোখ দুটোর সমস্ত ফাঁক বুজিয়ে দেওয়ার মতো সবসময় ঝালাপালা-করা আছড়ে-পড়া যাচনা — এগুলিই হল একালের **কুসুমশর, কুসুমশায়ক, কুসুমাস্ত্র**। কিন্তু আজ আমরা এই কুসুম-শরগুলিকে চিনবার যোগ্যতা হারিয়েছি। একে আমরা বলি বিজ্ঞাপন। পণ্যের বিজ্ঞাপন। এ আমাদের তপস্যা ভঙ্গ করবে কী, আমাদের চারদিকে দাঁড়িয়ে এমন উদোম নৃত্য করছে, যে, প্রাণ বাঁচানো দায় হয়ে উঠেছে।

কেশ (কেশাকেশি) : ১. কে (মস্তকে) + ✓শী + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। কেশাকেশি = কেশকেশ + ই (ইচ্) কর্ম্মব্যতীহারে, দীর্ঘ, পাণিনি। (ব.শ.)। ২. *দিশাগ্রস্ত গতিশীল কারক (মালিকানা) শায়িত থাকে যাহাতে*। / যাহা মস্তকে থাকে; ব্রহ্মার ঈশ (থাকে যাহাতে। (কেশাকেশি) = কেশে কেশে গ্রহণপূর্ব্বক যে যুদ্ধ বা মারামারি করা হয়। (ব.শ.)। ৩. চিকুর, কুন্তল, কচ, চুল, লোম, কেশর, বরুণ, বিষ্ণু, কেশী দৈত্য, সূর্যাগ্নি প্রভৃতির রশ্মি, পরব্রহ্মশক্তি, গন্ধদ্রব্য — হ্রীবের, মৌলিস্থ কেশগুচ্ছ, শিখা, চূড়া, নীলবৃক্ষ, ভূতকেশী বৃক্ষ। কেশাকেশি = চুলোচুলি। পরস্পর কেশগ্রহণপূর্ব্বক ক্রীড়া। (ব.শ.)। ৪. hair অর্থে প্রচলিত। ৫. চীন দেশে অদ্ভুত এক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেখানকার বহিরাগত রাজা — দেশী মানুষদের সবাইকে মাথা নেড়া করতে হবে, তবে মাঝে থাকবে বেশ মোটা একগুচ্ছ চুল, যা দিয়ে মানুষটিকে ধরা যায়, সহজে মারধোর করা যায়। চুলের মুঠি ধরে পেটাই করার এই ধারণাটি গ্রামবাংলায় আজও আছে। মানুষের শরীরের ক্ষেত্রে এই চুলের যে ভূমিকা, মানুষের মনের ক্ষেত্রে 'মালিকানা'রও সেই ভূমিকা। কেশ-এর ভেতরে কে-রূপ মানবাত্মাটি শয়ন করে থাকে। সেকারণেই চুলোচুলি, কেশাকেশি কেবল শারীরিকভাবে হয় না, মালিকানা নিয়ে মানসিকভাবেও হয়।

এমনকি মানুষের মাথার চুল বড়-ছোট করার ইতিহাস তার মালিকানার ইতিহাসের বিবর্তনের সমান্তরালও বটে। (ঙ) গ্রন্থের 'বেণীসংহারবৃত্তান্ত' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

কেশাকেশি শব্দটি আমাদের বাংলাভাষার একটি মহত্তম শক্তির কথা জানায়। ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো ভাষাতেই এই শক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এর সূত্র ছিল সংস্কৃতে, বাংলা তার ব্যাপক ব্যবহার করেছে এবং এখনও করে, আর তা অব্যয় বাদে প্রায় সব পদ নিয়েই করা হয়ে থাকে। যথা — **হাতাহাতি, লাথালাথি, কানাকানি, মারামারি, ধরাধরি, সরাসরি, গলাগলি, কোলাকুলি, মাতামাতি, গোটাগুটি, হাসাহাসি, চেল্লাচিল্লি ...** এরকম অজস্র। এর ফলে ভাষার মূল শব্দসংখ্যার কোনো বৃদ্ধি না ঘটিয়েই ব্যবহার-যোগ্য শব্দসংখ্যা অনায়াসে বিপুল সংখ্যায় বাড়িয়ে নেওয়া যায়। শব্দ ব্যবহারের এই কৌশল শব্দের অর্থকে অত্যন্ত ব্যাপকতা দিয়ে থাকে, অধরাকে সহজে ধারণার অন্তর্ভুক্ত করে ধরবার আশাতীত যোগ্যতা দিয়ে থাকে। এতে প্রথম শব্দটিকে পুরুষরূপে (কেশা) এবং দ্বিতীয় শব্দটিকে প্রকৃতিরূপে (কেশি) ব্যবহার করা হয়। (কেশাতে আছে অশেষের অসীমের গুণ, কেশিতে আছে শেষের সীমিতের গুণ।) দ্বৈতাদ্বৈতবোধ কোন স্তরে থাকলে মানুষ এভাবে শব্দে তার ব্যবহার করতে পারে, তা ভেবে অবাক লাগে। বলে রাখা ভালো, বাংলা শব্দের এই উদ্ভাবনশীল বিকাশ সাধিত হয়েছিল মধ্যযুগের বাংলাভাষীদের হাতে। সংস্কৃত ভাষাও তার এই গুণটিকে খুব বেশি ব্যবহার করতে পারেনি, কিন্তু মধ্যযুগের বাংলাভাষী তার চূড়ান্ত প্রয়োগ করে গেছেন। একালের বাংলাভাষাও তা উত্তরাধিকার-সূত্রে সাফল্যের সঙ্গে বহন করে নিয়ে চলেছে। **৬.** ইংরেজি case, cash।

কেশব (কেশাবতার, কেশিনিসূদন, কেশিন, কেশী) : ১. কেশ + ব; কেশ + ✓বা (হিংসা) + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *কে-র 'শব' (= আধারশক্তি বহন করে যে), অথবা কেশ বহন করে যে*। / যিনি সুকেশ, কেশী দৈত্যের হিংসক বা প্রলয়সলিলে শবতুল্য। (ব.শ.)। **৩.** বাসুদেব সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বর, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, পরমেশ্বর, পুন্নাগবৃক্ষ। কেশাবতার = কেশের অবতার; কেশের (ব্রহ্মার ঈশ্বরের) অবতার; ভগবদবতার। কেশিনিসূদন = কেশী দৈত্যের হিংসক, শ্রীকৃষ্ণ। কেশিন্, কেশী = কেশবান, বিষ্ণু, কেশব। কংসের অনুচর দৈত্যবিশেষ। কৃষ্ণ ইহার মুখে স্বীয় বাহু প্রবিষ্ট করিয়া প্রাণবায়ুরোধপূর্ব্বক ইহাকে নিহত করেন। সিংহ, অশ্ব। (ব.শ.)। কেশী নামক দানবকে বধ করেছিলেন বলে শ্রীকৃষ্ণ কেশব নামে বিখ্যাত হন। কংসের অনুচর কেশী দানব। শ্রীকৃষ্ণকে বিনাশ করবার জন্য কংস একে বৃন্দাবনে পাঠালে সে অশ্বরূপ ধারণ করে গোপগণের উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করে। তাদের গাভীদের বধ করে মাংস ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণ তার কাছে গেলে সে কৃষ্ণকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। তখন কৃষ্ণ তার মুখের মধ্যে বিশাল বাহু প্রবেশ করিয়ে, শ্বাসরোধ করে কেশীকে হত্যা করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** একজন হাড়কেপ্পন সুদখোর মানুষের কথা ভাবুন। তিনি কৃচ্ছ্রসাধন করেন, টাকা সুদে খাটান, যেন শরৎচন্দ্রের একাদশী বৈরাগী। usurer capital দিয়ে তার পুঁজির সুদখোরী চরিত্র আপনি ব্যাখ্যা করে দিলেন, কিন্তু তাঁর আর্থিক আচরণ যে-জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেই জ্ঞানকে কী বলবেন? পাশ্চাত্য সমাজবিদ্যার সমস্যাটি এখানে। তাতে সুদখোর মানুষের আর্থিক আচরণের সঙ্গে যে সেই মানুষটির **আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক-আধিদৈবিক** অস্তিত্ব অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংযুক্ত রয়েছে, তা দেখা হয় না। ফলে বাহ্যিক সম্পদের ব্যক্তি-মালিকদের চেনা গেলেও মানসিক সম্পদের বা জ্ঞানের ব্যক্তি-মালিকদের একেবারেই হিসেবে ধরা হয় না। অথচ, সবাই বুঝতে পারেন, একটি মানুষের ভেতরে থাকা মানসিক সম্পদের ব্যক্তি-মালিকটিই তার বাহ্যিক সম্পদের ব্যক্তি-মালিকটিকে চালনা করছে। সেই মানসসম্পদ-মালিকটিকে বাদ দিয়ে ভাবার অর্থ হল নৌকার মাঝিটিকে বাদ দিয়ে নৌকার চলাচল বা আচরণ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা। প্রাচীন ভারত সেই মানসিক সম্পদের মালিকটিকে গুরুত্ব দিয়েছিল বেশি করে। তারই নাম দেওয়া হয়েছিল **কেশব**। সেই কেশবই নিয়ন্ত্রণ করে বাহ্যসম্পদের মালিকটিকে। ইয়োরোপ যে ক্যাপিটালকে চিনেছিল, তার যান্ত্রিক দিকটিই তারা বিচার করেছিল এবং করেছিল নিখুঁতভাবে। কিন্তু সেই ক্যাপিটালের পরিচালকের আসনে যে মানসসম্পদ-মালিকটি সক্রিয় থাকে, তাকে তারা গুরুত্বই দেয়নি। এই দিকটি ঠিকভাবে দেখতে শুরু করলেই আমরা **লক্ষ্মী, কুবের, নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ** প্রমুখ সত্তাদের দেখতে পাই। একমাত্র তখনই মানুষের মানসসম্পদ ও বাহ্যসম্পদকে তাদের সার্বিকতায় উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। তখন, একমাত্র তখনই, শ্রীকৃষ্ণলীলার মর্মার্থ বুঝবার যোগ্যতা অর্জন করা যায়; সম্পদের সার্বিক রূপকে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। দ্র. **নারায়ণ**। **৬.** ইংরেজি case, cash।

কেশর (কেশরী, কেসর, কেসরী) : ১. কে + শর। / কে (জলে) শর বা সর। (ব.শ.)। **২.** *কে-র শক্তি রহে যাহাতে; কেশর আছে যার*। / যাহা জলে শীর্ণ হয় বা যায়। (ব.শ.)। **৩.** পদ্মাদি পুষ্পের মধ্যস্থ কেশসদৃশ পদার্থ, কিঞ্জল্ক, সিংহাদির স্কন্ধস্থিত সটা বা দীর্ঘরোমরাজি, স্কন্ধবাল, জটা, বকুলবৃক্ষ, নাগকেশর বৃক্ষ, পুন্নাগবৃক্ষ, হিঙ্গুবৃক্ষ, অংশু, কুঙ্কুম, বকুলকুসুম, নাগকেশর পুষ্প, হিঙ্গু, স্বর্ণ, কাসীস, হীরাকস্। কেশরযুক্ত, উৎপন্নকেশর, যুবা, উচ্ছ্রিতসট, সিংহ, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, ঘোটক, পুন্নাগবৃক্ষ, নাগকেশরবৃক্ষ, বীজপূরকবৃক্ষ, হনুমানের পিতা বানরবিশেষ, শাণ্ডিল্যগোত্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের উপাধি। (ব.শ.)। বানররাজ। পুঞ্জিকাস্থলী নামে অপ্সরা এর রূপে মোহিত হয়ে একে বিবাহ করে। ঐ অপ্সরা কোনো ঋষির শাপে বানরীরূপ প্রাপ্ত হয়েছিল এবং কেশরীর সঙ্গে বিবাহ হবার পর এর নাম হয় **অঞ্জনা**। কেশরীর ক্ষেত্রে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়। ... (পৌ.অ.)। **৪.** mane অর্থে প্রচলিত। **৫.** যে হিংসা করে সেই সত্তাকে **সিংহ** বলে, তা সে ফরেস্টের সিংহ হতে পারে, সংসারবনের সিংহও হতে পারে। তাদের **কেশর** থাকে। সেই কেশরের সাক্ষাৎ পেতে চাইলে চিড়িয়াখানায় সিংহের খাঁচার সামনে গিয়ে তাকে বিরক্ত করুন, **কেশর** ফোলানো কাকে বলে টের পেয়ে যাবেন। তারপর সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে এবার সংসারবনের সিংহের কেশরের সাক্ষাৎলাভের চেষ্টা করুন। তার জন্য কোনো

ধনপতির সঙ্গে শত্রুতা করে ফেলুন; দেখবেন, পুলিশ থেকে শুরু করে নানা সামাজিক শক্তি আপনাকে গ্রাস করার জন্য ভয়ানক আওয়াজ করে আপনাকে ঘিরে ফেলেছে। সমাজসিংহের **কেশব** ফুললে কেমন লাগে, আপনি মুহূর্তে টের পেয়ে যাবেন। একে 'সাপের লেজে পা দেওয়া'ও বলে। দ্র. **নাগ**। কেশর বা কে-র শক্তি কোথায় রক্ষিত থাকে, কীভাবে থাকে, তখন মনে হয় তা আর বলে দিতে হবে না। ৬. ইংরেজি case, cash।

কেশাকেশি : দ্র. **কেশ**।

কেশিনী : ১. কেশ + ইন্, স্ত্রী। (ব.শ.)। ২. *যে প্রকৃতিশক্তির কেশ আছে*। ৩. কেশিনী = সুকেশী নারী, জটামাংসী, চোরপুষ্পী, পার্ব্বতীসহচরীভেদ, বিদর্ভরাজকন্যা সগররাজপত্নী, রাবণ-কুম্ভকর্ণ জননী, দময়ন্তী-দূতী। (ব.শ.)। (ক) সগররাজার অন্যতমা স্ত্রী। ইনি বিদর্ভরাজের কন্যা। এঁর গর্ভে অসমঞ্জের জন্ম হয়। (খ) নলরাজার স্ত্রী দময়ন্তীর পরিচারিকা। এর সাহায্যে দীর্ঘ বনবাসের পর নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন হয়। (গ) কশ্যপের অন্যতমা কন্যা। দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের স্ত্রী কপিলার গর্ভে এঁর জন্ম হয়। (ঘ) বিশ্রবা মুনির অন্যতমা স্ত্রী কেশিনীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভীষণ জন্মগ্রহণ করেন। ((পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. প্রসঙ্গগুলি থেকে বোঝা যায়, সেকালের সমাজের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু কেশবান জনগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছিল। বৈদিক ব্যবস্থার ভেতরেই এই ব্যক্তি-মালিকানার বিকাশ ঘটেছিল। তবে প্রতিটি ঘটনার ইতিহাস পৃথকভাবে উদ্ধার করতে পারলে তবেই এর যাথার্থ্য স্পষ্ট বোঝা যাবে। তার জন্য পুরাণাদিতে প্রাপ্ত এতদ্সংক্রান্ত বয়ানের প্রতিটি শব্দ ধরে ধরে এগোতে হবে। সেকাজ **সগর, বিদর্ভ, নল, দময়ন্তী, কশ্যপ, কপিলা, বিশ্রবা, রাবণ** প্রভৃতি শব্দে কমবেশি করা হয়েছে।

কোশ, কোষ : ১. ✓কুশ্, ✓কুষ্ + অ - অধিকরণে; ✓কুষ্ নিষ্ক্রমণ + অ - অপাদানে। (ব.শ.)। ২. যাহাতে ফলোৎপাদক দ্রব্য নিষ্কৃষ্ট হয়; যাহা হইতে ফল বা শাবক নিষ্ক্রান্ত হয়। (ব.শ.)। ৩. অণ্ড, ডিম্ব, খড়্গাপিধান, খাপ, আবরণ, খোল, পাত্র, ভাণ্ড, পেটক, মঞ্জুষা, শিম্বা, কোয়া, বীজাধারমাত্র, গোলা, রেশমগুটি, মুষ্কাবরণ, বাদামাদির খোলা, গর্ভাশয়, জাতীকোষ, জায়ফল, জয়িত্রী, ভাণ্ডাগার, ধনাদিগৃহ, অর্থরাশি, বিত্ত, কৃতাকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য, আশ্রয়, আধার, বেদান্ত অনুসারে অন্নময়াদি পঞ্চকোষ, শব্দাদিসংগ্রহ — কোষগ্রন্থ, পুটাকৃতি পাণি বা অঞ্জলি, ...। (ব.শ.)। ৪. অণ্ডকোষ, কোষগ্রন্থ, রাজকোষ, কোশা(ষা)গার, আমের কুশি, ইত্যাকার কয়েকটি শব্দজোড় হয়ে প্রচলিত থাকলেও স্বতন্ত্রভাবে শব্দটিকে অপ্রচলিত বলা যায়। ৫. **কু** শায়িত থাকে যাতে, তাই হল কুশ; সেই কুশের আশ্রয় হল কোশ। এই কোশ ও কোষ-এর বানান ও অর্থের পার্থক্যের বিষয়ে **কৌশিক** ও **কষ** দ্রষ্টব্য।

কোশল, কৌশল্যা : ১. ✓কুশ্ (দীপ্তি) + অল (কল) - কর্তৃবাচ্যে = কোশল; কোশল + য = কৌশল্যা। (ব.শ.)। ২. *কুশলতা (কারুজীবিতা) যে দেশের (মানুষের) সাধারণ বৃত্তি = কোশল। যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে **কুশলতা** আছে = কৌশল্যা।* ৩. সরযূতীরস্থ জনপদবিশেষ। **কোশলদেশ দুই** ভাগে **বিভক্ত** — **উত্তর** কোশল ও পূর্ব্বকোশল। উভয় **কোশলের রাজধানী** অযোধ্যা বা কোশলা। অযোধ্যার রাজা দশরথের **মহিষী** ও **রামচন্দ্রের জননীর** নাম কৌশল্যা। ধৃতরাষ্ট্রের জননী অম্বিকাকেও কৌশল্যা বলা হত। (ব.শ.)। কাশীর উত্তরে অযোধ্যা প্রদেশের সন্নিহিত সমস্ত ভূভাগ। কোশল রাজ্য 'উত্তর' ও 'দক্ষিণ' নামে দুই ভাগে বিভক্ত। রামের রাজধানী অযোধ্যার নাম দক্ষিণ কোশল এবং অযোধ্যার উত্তর প্রদেশের নাম উত্তর কোশল। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজার রাজ্য। কৌশল্যা অযোধ্যার রাজা দশরথের প্রধানা স্ত্রী, রামের জননী। ইনি কোশলাধিপতির কন্যা। ... তিনি চিরনম্র, মধুরস্বভাবা ও স্নেহশীলা ছিলেন। তাঁর ধৈর্যের চরম পরীক্ষা হয় পুত্র রামের বনবাসকালে। তিনি প্রথমে পুত্রকে বনগমনে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পিতৃসত্যপালনে নিষ্ঠা ও অপূর্ব ধর্মপ্রাণতা দর্শনে তিনি পুত্রবিরহ-দুঃখ তুচ্ছ করে রামকে সম্মতি দেন ও আশীর্বাদ করেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পুরাণাদিতে কথিত ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, রাজাদের প্রথমে ছিল একটি করে রাণী, যখন জনসাধারণ কেবলমাত্র কৃষিকর্ম করতেন। জনসাধারণ যখন কৃষিজীবী ও কারুজীবী দুই ভাগে বিভক্ত হলেন, তখন দেখা গেল রাজাদের দুই রাণী। পরে যখন উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্য ও কারুপণ্য নিয়ে কিছু মানুষ বিনিময়জীবীর জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে লাগলেন, দেখা গেল রাজাদের তিন বা চার রাণী। **রাম-লক্ষ্মণা**দির জন্ম ইতিহাসের মধ্যে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বোঝানো হয়েছে। দেশের শাসনব্যবস্থা যখন দশ (বহু) ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত দশরথ ব্যবস্থায় পর্যবসিত, তখন কারুজীবী জনগোষ্ঠী ছিলেন কৌশল্যা, কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী ছিলেন **কৈকেয়ী**, এবং উভয়ের উদ্বৃত্ত নিয়ে বিনিময়জীবী জনগোষ্ঠী ছিলেন **সুমিত্রা**। রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নের জন্মের (একটি আম কৌশল্যাকে, একটি কৈকেয়ীকে, এবং সেই দুটি আমের ছাল সুমিত্রাকে দেওয়ার) কাহিনীর মধ্যে সেই ইতিহাস বিধৃত আছে।

কৌশিক, কৌষিক : ১. কোশ, কোষ + ইক। (ব.শ.)। ২. *কোশ বা কোষ হইতে জাত যে; কোষ রক্ষা করে যে*। ৩. কোশভব, কৃমিকোষজাত, কোশজ, গুগ্গুলু, (কোশতুল্য কোটরাদিবাসী) উলুক, (সর্পসম্পুটকোষ হেতু) সাপুড়ে, (গর্ত্ত-কোষবাসী) নকুল, (অন্নময়-কোষজাত) শৃঙ্গাররস, (অস্থিকোষজাত) মজ্জা, কোশকার বা কোষকার, অভিধানপ্রণেতা, কোষাধ্যক্ষ, অশ্বকর্ণবৃক্ষ। কুশিকসম্বন্ধী, কুশিকের গোত্রাপত্য, কুশিকপৌত্র বা কুশবংশভব গাধিসুত বিশ্বামিত্র। ইন্দ্র। কুশিকরাজ ইন্দ্রতুল্য পুত্রের জন্য কঠোর তপস্যায় সহস্র বৎসর যাপন করিলে, স্বয়ং ইন্দ্রই তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রই **গাধি** নামে খ্যাত। (ব.শ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. শ, ষ, স — অর্থের নিরিখে এই তিনটি বর্ণের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, সর্বাগ্রে তা জেনে নেওয়া দরকার। দ্র. **শ, শ বর্ণের অর্থ**। বলতে গেলে শ-এর 'কর্মে রূপায়িত বাস্তব রূপ'টিই দিশাগ্রস্ত স্থির হয়ে যায় বলে তাকে ষ বলা যায়। সেই বিচারে বাস্তবে রূপ পেলেই কোশ কোষে পরিণত হয়ে যায়। অতএব বাস্তবের যেকোনো কোষ থেকে

যে বেরোয় কিংবা সেই কোষের দেখাশোনা রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেই কৌষিক পদবাচ্য; তা সে উলুক, নকুল, সাপুড়ে, মজ্জা, এমনকি শব্দকোষকার, যে-ই হোক। সেই সুবাদে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি এই শব্দের ক্ষেত্রে এখনও সম্যক প্রযুক্ত হয়ে চলেছে।

'কাঙক্ষ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনাকাঙিক্ষত, আকাঙক্ষা, কাঙক্ষা, কাঙিক্ষত, কাঙিক্ষণী, কাঙক্ষী, শুভাকাঙক্ষী, হিতাকাঙক্ষী।

কাঙক্ষ্ = **কাম্** ক্ষ-অন্ (খাবলে নেওয়ার ইচ্ছা) থাকা। **কাঙক্ষ** = কাম ক্ষ-অন (খাবলে নেওয়ার ইচ্ছা) থাকে যাহাতে।

কাঙক্ষা (কাঙিক্ষত, কাঙক্ষী) : ১. ✓কাঙক্ষ্ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***কাম** ক্ষ-অন (খাবলে নেওয়ার ইচ্ছা) থাকে যাহাতে, তাহার আধার।* ৩. ইচ্ছা, অভিলাষ; অভিলষিত, বাঞ্ছিত, ইষ্ট, প্রিয়; অভিলাষী, ইচ্ছুক। (ব.শ.)। ৪. কম প্রচলিত। ৫. **কম** বা সংকুচিত হয়ে ফিরে আসার যে ধারণা, তার থেকে কাম কথাটি জাত হয়েছে। সেই কামানুসারে একই দিকে একই ভাবে খুবলে নেওয়ার যে ভাব, তাকে বলে **কাঙক্ষা**। এটি যে কোনো রকম ইচ্ছামাত্র নয়। **ক্ষ**-এর অর্থগুলি এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

'কিৎ' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকৈতব (বঞ্চ), অনিকেত, আঁকুপাঁকু, আকুত, আকুতি, আকৃত, কউতুক, কতুক, কাইত, কাত (চিৎ), কায়েত, কিৎকিৎ, কিত, কিতনা, কিতব, কিতা (কাত), কিতাব, কিতাবৎ, কুৎস্, কুৎসন, কুত, কুতকাত, কুতঘাট (কুদঘাট), কুতুক, কুতুকুতু, কুতুরকাতুর, কুতুপ, কুতুর (কুতুর কুতুর ময়না ...), কুতুহল, কুতূহল, কে, কেওড়া, কেওয়া, কেচ্ছা (কেস্সা, কিস্সা), কেত, কেতক, কেতকী, কেতন, কেতা, কেতাব, কেতাবি, কেতাবী, কেতু, কেতুধর্মা, কেতুমতি(তী), কেতুমান, কেতুমাল, কেয়া, কেয়াকাঁদি, কৈতক, কৈতব, কৈতবিনী, কৌতুক, কৌতুকী, কৌতুহল, চিকিৎসক, চিকিৎসা, নিকেত, সঙ্কেত, সঙ্কেতিত, সাকেত, সাঙ্কেতিক।

কিৎ = গতিশীল কারীর উল্লম্ফন যাহাতে। (কি = গতিশীল কারী, ৎ = উল্লম্ফন। তার মানে, গতিশীল কারী তারিত হওয়ার জন্য বা কাউকে ছোঁয়ার জন্য যে লাফ দেয়, তাকে **কিৎ** বলে। গ্রামবাংলায় আজও ছেলেরা 'কিৎ-কিৎ' খেলে; 'বউমারী' বা 'হাডুডু' খেলার সময় 'কিৎ-কিৎ' শব্দ এক নিঃশ্বাসে একাদিক্রমে উচ্চারণ করে। সম্ভবত ইংরেজির quit শব্দটি এই কিৎ-এর রকমফের।)

আকুতি (আকূতি) : ২. *যাহা দ্বারা আগ্রহ (গ্রহণেচ্ছা) প্রকাশ পায়।* ৩. আগ্রহ, ঐকান্তিকতা, অনুরাগ, অভিপ্রায়, অভিলাষ, চিত্তের আকুলতা, আবেগ, প্রযত্ন, চেষ্টা। (ব.শ.)। মনু হইতে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র এবং আকুতি ও প্রসূতি নামে দুই কন্যা জন্মে। মহর্ষি রুচির স্ত্রী আকুতি দক্ষিণা নামে এক কন্যা, যজ্ঞ নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। (পৌ.অ.)। ৪. চিত্তের আকুলতা অর্থে প্রচলিত। ৫. Morality নাটকের চরিত্রাদি বিষয়ে **কলি**-তে প্রদত্ত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। রুচি, আকুতি, দক্ষিণা, যজ্ঞ — এসবই বিমূর্ত চরিত্র। ... স্বায়ম্ভুব মনুর বা 'স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ভাবে উদ্ভূত মানুষ'-এর শত শত রূপিণী (তখন বহুগামিতা স্বাভাবিক ছিল) স্ত্রীদের গর্ভে এই কন্যার (আধার স্বভাব নরনারীদের) জন্ম হয়। **স্বারোচিষ** মনুর অর্থাৎ 'স্ব স্ব রুচি অনুসারে চলা মানুষ'দের কালে তাদের থেকেই দক্ষিণা (বা দক্ষতার বিশেষ মূল্য) ও উৎপাদন কর্মযজ্ঞের জন্ম হয়। তার আগে **স্বায়ম্ভুব মনু**র কালে অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণতই চয়নভিত্তিক।

কুৎসা (কুৎস, কুৎসন) : ১. কুৎস্ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***কুৎসা** = **কু**-তারণের অস্তিত্ব থাকে যাহাতে। /* **কুৎসন** = যাহার দ্বারা কুৎসা সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. নিন্দন, অবক্ষেপ, অবজ্ঞা, অপবাদ। (ব.শ.)। কুৎস একজন গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। ইনি অনেক ঋক্ মন্ত্রের রচয়িতা। ইনি ইন্দ্র কর্তৃক নানা প্রকারে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু একবার কুৎস তাঁর শত্রু শুষ্ণ কর্তৃক কূপে নিপাতিত হয়েছিলেন। এই সময়ে কুৎসের স্তবে ইন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে শুষ্ণকে বিনাশ করে এঁকে উদ্ধার করেন। ইন্দ্র এঁকে একবার তাঁর প্রাসাদে নিয়ে যান এবং এঁদের দুই জনের মধ্যে চেহারার এমন সাদৃশ্য ছিল যে, ইন্দ্রের স্ত্রী শচী তাঁর স্বামীকে চিনতে পারেননি। (পৌ.অ.)। ৪. কুৎসা কথাটি 'মিথ্যা প্রচার' অর্থে প্রচলিত। ৫. যে আচরণে (বস্তুর দান, শব্দের দান প্রভৃতি আচরণে) **কু** (অতি ভাল বা অতি মন্দ) এর তারণ থাকে, তাই কুৎস। তার আধারকে কুৎসা বলে।

কেত (কেতন, কেতা, কিতব, কিতা, কিতাব, কেতাব) : ১. ✓কিৎ + অ - অধিকরণে। (ব.শ.)। ২. *দিশাগ্রস্ত গতিশীল কারক তারিত হয় যাহা হইতে =* ***কেত****। কেত অন (on) যাহাতে =* ***কেতন****।* ৩. নিবাস, আশ্রয়, শরণ, কেতন, ধ্বজ, চিহ্ন, বাস, অবস্থিতি, গৃহ, স্থান, ভূমি, আধার, শরীর, আবাস, নিমন্ত্রণ, কেতু, উপনিমন্ত্রণ অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রণ, কার্য্য, কৃত্য। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দেহ মাত্রেই খণ্ডিত ও দিশাগ্রস্ত বলে, দেহীমাত্রেই বাধ্য হয় দেহের শাসন মেনে নিতে, এক বিশেষ কেতায় চলতে; আর তখনই শুরু হয় তার একদিশাগ্রস্ত হওয়ার সূচনা। অস্তিত্বের আধার, নিবাস, আশ্রয়, শরণ ... প্রভৃতি কেতনের এই স্বভাব সেই দেহীর পক্ষে সাময়িক শুভ বলে মনে হলেও, অন্যদের পক্ষে প্রায়শই শুভ হয় না। গৃহহীন, কেতনহীন, আদর্শহীন, আবাসহীন যেমন বেদিশায় পড়ে নিজের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে, তেমনি একদিশাগ্রস্ত হয়ে পড়াও কেতনবানকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষাবিধি' নিবন্ধে বলেছেন, "স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে 'জাতীয়' বলিতে পারিব না; তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির

পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।" তাই এই **কেত** ও **কেতন** মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে সাময়িক কল্যাণকারী মনে হলেও, কার্যত তা মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে 'সাংঘাতিক'। বঙ্গীয় শব্দকোষ মতে 'কিতা', 'কেতা' ও 'কেতাব' প্রভৃতি শব্দ এসেছে আরবি ভাষা থেকে। আমরা জানি, ও আসলে একই উৎস থেকে জাত। এসব শব্দের মূলে রয়েছে 'কিৎ' ক্রিয়া, যার অর্থ হল — গতিশীল কারক তারিত যাহাতে। তা দিশাগ্রস্ত হয়ে গেলে **কেত** হয়। এক কেতার ভাবনাচিন্তা বহন করে যে গ্রন্থাদি লিখিত হয়, তাদেরই কেতাব বা কিতাব বলে। এই 'কিৎ' থেকেই 'কিতব' যার অর্থ 'বঞ্চনা করে যে' বা জুয়াড়ি। দ্র. **চিকিৎসক, কৈতব**। ৬. আরবি - কিতাব; ইংরেজি cheat, cadence; ল্যাটিন cadere।

কেতু (কেতুমাল) : ১. ✓কিৎ + উ। / ✓চায় (পূজা) + তু (তুন্) - কর্ম্মবাচ্যে। ✓চায় > কি। (ব.শ.)। ২. *দিশাগ্রস্ত গতিশীল কারকের তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; কট্টরবাদের (দেহবাদের) চূড়ান্ত বিকাশ যাহাতে*। ৩. সূর্য্যরশ্মি, পূজ্য, গ্রহবিশেষ, উৎপাতরূপ শিখাবান জ্যোতিঃপদার্থ, উৎপাতবিশেষ, ধূমকেতু, দীপ্তি, রোগ, ধ্বজ, পতাকা, ধ্বজদণ্ড, কেতুবৎ ব্যাবর্ত্তক, চিহ্ন, লক্ষণ, শ্রেষ্ঠ, প্রধান। কেতু রাহুদৈত্যের শিরোহীন দেহ। সমুদ্রমন্থনের পরে, রাহু দেবমূর্ত্তিতে দেবদলে বসিয়া যখন সুধা পান করিতেছিল, তখন মোহিনীরূপী বিষ্ণু, চন্দ্র ও সূর্য্যের নিকটে তাহা জানিয়া, সুদর্শনে দৈত্যের মস্তক ছেদন করেন। এইরূপে সুধাপানে অমর দৈত্যের মস্তক 'রাহু' এবং দেহ 'কেতু' নামে অভিহিত হয়। কেতুমাল, ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিমে স্থিত জম্বুদ্বীপস্থ নববর্ষের একতম বর্ষ। (ব.শ.)। এক দানব। বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও সিংহিকার গর্ভে এর জন্ম। এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রাহু। সমুদ্রমন্থনকালে দেবতার ছদ্মবেশে এই দানব অন্যান্য দেবতাদের সহিত অমৃতপানে প্রবৃত্ত হয়। কণ্ঠে অমৃত পৌঁছবার পূর্বেই সূর্য ও চন্দ্র একে দানব বলে চিনতে পেরে এর উপস্থিতি অন্যান্য দেবতাদের জ্ঞাত করান। তখন বিষ্ণু চক্রদ্বারা কেতুর দুই বাহু ও মস্তক ছেদন করেন; কিন্তু সামান্যমাত্র অমৃত পান করায় এই দানব অমর হয় এবং ছিন্ন-মস্তক হয়েও বিনষ্ট হয় না। এই দানবের মস্তকভাগের নাম রাহু ও দেহভাগের নাম কেতু বলে অভিহিত হয়। চন্দ্র ও সূর্যের প্রতি ক্রোধবশত গ্রহণের সময় রাহু চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে। হিন্দু-জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু ও কেতু গ্রহমধ্যে পরিগণিত। উভয়েই অশুভ গ্রহ। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. 'রাহুগ্রাসের হাত থেকে তার মুক্তি নেই' — ক্রিয়াভিত্তিক বাংলাভাষায় ইতিহাস, অ্যাস্ট্রোনমি, ইকনমিকস এই তিন শাস্ত্রের কথা এরকম এক বাক্যে বলে ফেলা যায়। যখন ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বাক্যটিকে বুঝি, তখন সমুদ্রমন্থন-অমৃতভক্ষণ ইত্যাদির ভিতরে রাহুকে দেখতে পাওয়া যায়। যখন অ্যাস্ট্রোনমির প্রেক্ষিতে দেখি, তখন eclipse-কে বুঝতে পারা যায়। আবার যখন ইকনমিকসের প্রেক্ষিতে দেখি, তখন ক্যাপিটালের সুপ্রিমেসি কেমন করে সর্বগ্রাসী রাজতন্ত্রের উপর আঘাত হানে, তা দেখতে পাই। কিন্তু একালের মানুষ ত্রিলোকের সত্য এমনতরো একবাক্যে বুঝবেন কীভাবে। মুশকিল সেখানেই।

আমরা ইতিহাসের দিকটি এখানে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি; পাঠককে কষ্ট করে বাকি **অর্থগুলি কাহিনীর** ভিতরের শব্দ ধরে ধরে বের করে নিতে হবে। **কাছাকাছি** ১০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দের কালে ভারতসমাজে এসেছিল **এক স্বর্ণযুগ**। ঘটেছিল আদি শ্রমবিভাজন, আদি সমাজতন্ত্রবাদী (বেদবাদী) ও আদি ধনতন্ত্রবাদী হাতে হাত মিলিয়ে করেছিল জনসমুদ্রমন্থন। তাতে যে বিপুল সম্পদের উদ্ভব ঘটেছিল। ধনতন্ত্রবাদীরা সেই সম্পদ আত্মসাৎ করেন। বেদবাদীরা দানবহনকারী **দানব** হলেও ততদিনে খানিকটা অধঃপতিত। তাঁদের নেতৃস্থানীয় **ব্রাহ্মণেরা** তখন 'বিপ্রচিত্তি' নামে অভিহিত। তাঁদের আধারশক্তি তখন হিংসাকারিণী 'সিংহিকা'। তাঁদের সন্তানেরা জনসমুদ্রমন্থনজাত সম্পদ গ্রহণ করতে গেলে, তাদের পরিচালক-শক্তিকে (মাথাকে), ও বাহু বা army-কে তাঁদের অনুসারী বাকি সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। ফল হয় এই যে, পরিচালকহীন প্রজারা হয়ে যায় মাথাহীন এক সমাজশরীর মাত্র। মোটকথা **কেতু** হল এমন এক জনগোষ্ঠী যারা সর্বার্থে শরীরসম্বল, আদর্শের নামসম্বল, পতাকাসম্বল, আচারসম্বল এবং প্রচণ্ডভাবে শারীরিক প্রয়োজন মেটানোর তাড়নায় ছটফট করে। একালের কট্টর দেহবাদী বা বস্তুবাদী মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি ও ভোগবাদমত্ত কোনো কোনো সমাজগোষ্ঠী অনেকটা এইরকম দেখতে। এই সত্তারই নানা রূপকে দেখতে পাওয়া যায় **কেতুধর্মা, কেতুমতী, কেতুমান, কেতুমাল** প্রভৃতি সত্তায়। দ্র. **কবন্ধ, জয়কেতু**।

কেতুধর্মা : ১. কেতু + ধর্মা। ২. *কেতুই ধর্ম যাহার*। ৩. ত্রিগর্তদেশীয় রাজকুমার। ... জ্যেষ্ঠভ্রাতা সূর্যধর্মার আদেশে কেতুধর্মা যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের সমস্ত অশ্বকে আবদ্ধ করেন। এর ফলে যে যুদ্ধ হয়, তাতে অর্জুনের হস্তে দুই ভ্রাতাই নিহত হন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **ত্রিগর্ত্ত** দেশটির কথা পুরাণাদিতে বারংবার এসেছে। একে বুঝতে হলে প্রথমে **গর্ত, কুঞ্জ, কুণ্ড, বিল** প্রভৃতি শব্দের অর্থ বুঝতে হয়। মার্কস পণ্যের আদি উদ্ভব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যে 'pores of society'-র কথা বলেছেন, এ হল সেই **গর্ত**। **ত্রিগর্ত্ত** হল তিনভাবে যেখানে সম্পদ সৃষ্টি হয় — যৌথ কৃষিউৎপন্ন ও যৌথ কারুজ উৎপন্ন থেকে অসদাচারী হয়ে এবং **অধর্ম্মের** মাধ্যমে। সেকালের ভাষায় বললে, এই তিন গর্ত্তে **আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক** — এই ত্রিতাপের পাপ জমে। সেই পাপের কারণেই এই গর্ত্তবাসীদের প্রতি শাস্ত্রকারদের নানা আপত্তির কথা শোনা যায়। এসবই পণ্যবাহীসমাজের উদ্ভবের আগের রূপ। এই এলাকা 'সিন্ধু' ('স্যন্দনস্বভাবাৎ অভিমানী দেবগণ') নদের এলাকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শতদ্রু বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী। **কেকয়** দেশ এ অঞ্চলেই। এই সত্তা যেমন একদিকে পুরনো বৈদিক ব্যবস্থার বিরোধী, তেমনি উদীয়মান সুস্পষ্ট পণ্যবাহী সমাজেরও বিরোধী। **সূর্যধর্মা** এর অগ্রজ অর্থাৎ বৈদিক যৌথ অর্থনীতিই এর অগ্রজ। দ্র. **সূর্য্য**। আর কেতুধর্মা কেবল পূর্বতন অর্থনীতির আদর্শের নামটুকু, গৌরবটুকু, পতাকাটুকু ধারণ করে তাই নিয়ে গর্ব করে। স্বভাবতই এর সঙ্গে তুলনায় অগ্রণী পণ্যবাহিতার সমর্থক পাণ্ডবদের বিরোধ বাধে।

কৈতব (কৈতবিনী) : ১. কিতব + অ। (ব.শ.)। ২. ***কিতব***

হইতে জাত। ৩. কিতবসম্বন্ধী, কপট, কিতবভাব, শাঠ্য, ছল, দ্যূত, জুয়াখেলা, কিতব হইতে আহর্ত্তব্য ধন, দ্যূতপণ, বৈদূর্য্যমণি, দ্যূতকার, জুয়াড়ি, ধূর্ত্ত, ধুস্তুরবৃক্ষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কিছুদিন আগেও কৈতববাদ শব্দটি শিক্ষিত মানুষেরা 'মোসাহেবী' অর্থে ব্যবহার করতেন। এর অর্থ ছিল মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে প্রবঞ্চনা করা। এখন শব্দটি শিক্ষিত বাংলাভাষীরাও ব্যবহার করেন না। তবে চিকিৎসক শব্দটির মধ্যে এই কিতবের **কিত্** এখনও থেকে গেছে।

চিকিৎসক : দ্র. **চক্**।

'কৃ' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আকুত, আকুতি, আকৃত, আকৃতি, ককুদ, কচ্চর (ক্যাচড়া), কজলবাস, কজলবাশ, কজরী, কজ্জল, কদর্য্য, কব, কবচ, কবচী, কবজ, কবর (কু-অর, কবর), কবরী, কবরেজ, কবি, কবিকঙ্কণ, কবিকণ্ঠহার, কবিকল্পিত, কবিগুরু, কবিজ্যেষ্ঠ, কবিতা, কবিতাই, কবিত্ব, কবিন্দ্র, কবিপনা, কবিবর, কবিরত্ন, কবিরাজ, কবিরাট্, কবিরায়, কবিসময়খ্যাত, কবিপ্রসিদ্ধি, কবীন্দু, কবীন্দ্র, কবীশ্বর, কবোষ্ণ, কব্য, কব্যবাহ, কব্যবাহন, কাওরা, কাকলি, কাজর, কাজল, কাজলা, কাজলী, কাপথ, কাবা (কব), কাবার (কবর), কাবেরী (কুবের), কাব্য, কাব্যকথা, কাব্যকষ্ট, কাব্যচৌর, কাব্যপ্রকাশ, কাব্যরত্নাকর, কাব্যরস, কাব্যরসিক, কাব্যলিঙ্গ, কাব্যশাস্ত্র, কাব্যহাস্য, কাব্যামৃতরস, কাব্যালাপ, কা(কো)লাপোষ, কাহার (ক-বরা, কাওরা), কাহারবা, কু, কুআ, কুআড়া, কুআশা, কুঁকড়া, কুঁজ, কুঁজা, কুঁজড়া, কুঁ(কু)জী, কুঁদ, কুঁপো, কুঁয়া, কুকড়া, কুকড়ো, কুকথা, কুকর, কুকর্ম্ম, কুকর্ম্মিত, কুকর্ম্মী, কুকুড়া, কুজড়া, কুজুড়া, কু-কাটুনি, কুকুন্দর, কুকুভা, কুকুল, কুকুলা, কুকূল, কুকৃত্য, কুক্কুট, কুক্কুভ, কুক্কুর, কুক্রিয়া, কুক্ষণ, কুখ্যাতি, কুগ্রাম, কুচক্র, কুচক্রী, কুচট, কুচন্দন, কুচর্য্যা, কুচাল, কুচেল, কুচ্ছ, কুচ্ছা, কুচ্ছিত, কুছাল, কুজ, কুজ্ঝটি, কুজ্ঝটী, কুজ্ঞান, কুঝটি(টী), কুতন্ত্রী, কুতপ, কুতর্ক, কুতার্কিক, কুথ, কুথলী, কুদাঁড়া, কুদার, কুদাল, কুদিন, কুদৃষ্ট, কুদৃষ্টি, কুদেশ, কুদ্দার, কুদ্দাল, কুধারা, কুধী, কুনকি(কী), কুনকুন, কুনখ, কুনজর, কুনট, কুনদিকা, কুনদী, কুনা, কুনাথ, কুনাম, কুনিকা (কুন্নু), কুনীতি, কুনিবুনি, কুনুকুনু, কুন্ত, কুন্তল, কুন্তি, কুন্তী, কুপট্ট, কুপথ্য, কুপন্থা, কুপাক, কুপাণি, কুপাত, কুপিন্দ, কুপুত, কুপুত্র, কুপুরুষ, কুপুষ্যি, কুপোষ্য, কুপ্পর, কুর্পর, কুপ্লব, কুবঙ্গ, কুবল, কুবলয়, কুবলয়াপীড়, কুবলয়িত, কুবাট, কুবাদ, কুবাদিনী, কুবিধা, কুবিন্দ, কুবুজ, কুবুদ্ধি, কুবুধ, কুবৃক্ষ, কুবৃত্তি, কুবের, কুবোধ, কুব্জ, কুভোজন, কুমড়া, কুমতি, কুমৎলব, কুমন্ত্র, কুমাতা, কুমার, কুমারসম্ভব, কুমারিয়া, কুমীর, কুমীরেপোকা, কুমুদ, কুমুদবতী, কুমুদবান্ধব, কুমুদাকর, কুমুদাবাস, কুমুদিনী, কুমুদিনীনায়ক, কুমুদিনীপতি, কুমুদী, কুমুদেশ, কুমুদ্বান, কুমেরু, কুম্প, কুম্ব, কুম্ভ, কুম্ভক, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভজ, কুম্ভজন্মা, কুম্ভদাসী, কুম্ভমণ্ডুক, কুম্ভযোনি, কুম্ভলগ্ন, কুম্ভশালা, কুম্ভসম্ভব, কুম্ভাণ্ড, কুম্ভার, কুম্ভিকা, কুম্ভি(ম্ভী) রিকা, কুম্ভিল, কুম্ভিলক, কুম্ভী, কুম্ভীনস, কুম্ভীপাক, কুম্ভীর(ল), কুম্ভীরাশ্রু, কুম্ভীরিণী, কুয়া, কুয়াসা, কুযোগ, কুহেলিকা, কুরব, কুরুচি, কুরূপ, কুরূপ্য, কুলক্ষণ, কুলি, কুলী, কুলুপ, কুলুপিয়া, কুলুপী, কুসংস্কার, কুসরিৎ, কুসুরো, কুস্থান, কুহ, কুহক, কুহকজীবী, কুহকী, কুহর, কুহরিত, কুহা, কুহু(হূ), কুহুকুহরিত, কুহুড়া, কুহুতান, কুহুনিশি, কুহুযামিনী, কুহুরজনী, কুহুরব, কুহুরি, কুহেড়িকা, কুহেড়ী, কুহেলিকা, কুহেলি, কুহেলী, কূচ, কূজ, কূজন, কূহা, কোদণ্ড, কোদাল, কোদো, কোদ্রব, কৌন্ত, কৌন্তিক, কৌন্তেয়, কৌবের, কৌমুদ, কৌমুদিনী, কৌমুদী, কৌমোদকী।

কৃ (কৃ) = অ-সাধারণ (নবরূপে উত্তীর্ণ) কারী। **কৃ** = অসাধারণ (নবরূপে উত্তীর্ণ) কারীর আধার যে।

কজ্জল (কাজল) : ১. ✓কজ্ + অল - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কজ্জ বা কাজ রূপ অভীষ্ট দেয় যে।* / কুৎসিত জল যাহা হেতু, যাহা অশ্রুকে কুৎসিত অর্থাৎ অসিত করে, যাহা চক্ষুকে ব্যথিত করে। (ব.শ)। ৩. অঞ্জন, কাজল, মসী, কালি, কলঙ্ক, সৌবীর (antimony), মেঘ, মৎস্যবিশেষ। কজ্জলী — মিশ্রিতরসগন্ধক, রসকজ্জলী (sulphuret of mercury)। (ব.শ.)। ৪. প্রধানত 'কাজল' অর্থে প্রচলিত। ৫. **কজ্** = ক-এর জনন (cause), 'কাজ' শব্দের মূল। চোখে নতুন ভবিষ্যতের (কাজের) স্বপ্ন থাকলে তা **অঞ্জন**। সেই স্বপ্ন স্থির সুনির্দিষ্ট মৌলবাদী হয়ে গেলে তা অঞ্জনী বা আঁজনী রোগ। ইতোপূর্বে আবিষ্কৃত কর্মকৌশল বিষয়ক জ্ঞান বা দক্ষ-জ্ঞানের শিক্ষা নিয়ে নিলে কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, সে-বিষয়ে চোখ পরিষ্কার হয়ে যায়। এইরূপ জ্ঞানলাভকে **কাজল** লাগানো বলে। তাই শিশুদের চোখে **কাজল** দিতে হয়। এই কাজল 'কাজ-রূপ অভীষ্ট দান করে'। কিন্তু এই জ্ঞান 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি'র মৌলবাদী প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হলে তা আর চোখের নজর বাড়ায় না। তখন 'চোখের নজর কম হলে আর কাজল দিয়ে কী হবে?' তখন তা 'কুৎসিত জল'ই বটে। সরকারি কর্মীদের অধিকাংশই কি তাদের চোখে এরকম কুৎসিত জল বা **কাজল** লাগিয়ে বসে থাকে না? কেউ কোনো কাজ নিয়ে বিড়ম্বিত হলে, সেকেলে বাঙালিরা এখনও বলে থাকেন — 'তোমারই তো সাধের কাজল, এখন তুমিই বোঝো!' যে-'সাধের কাজল' মানুষকে এমন মোহগ্রস্ত করে রাখে যে, মানুষ তার মায়া কিছুতেই ত্যাগ করতে পারে না; তাকে তাই **মায়াকাজল** বলে। দ্র. **অঞ্জন**। ৬. ইংরেজি cause, cudgel।

কবচ : ১. ✓কু (শব্দ) + অচ - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক-বাহক চয়ন করে যে; যাহা রাষ্ট্রশরীরে গত হয়।* / যাহা শব্দ করে; যাহা কায়গত হয়। (ব.শ.)। ৩. যোদ্ধার গাত্রাবরণ। সন্নাহ, বর্ম্ম, সাঁজোয়া, দেহরক্ষার্থ ভূর্জ্জে লিখিত বীজ বা তৎসদৃশ অলৌকিকশক্তি সম্পন্ন মন্ত্র, পটহবাদ্য, ভূম্যাধিকারী বা তদীয় কর্মচারীর নিকটে প্রাপ্য খাজনার রসিদ, টাকার প্রাপ্তি-স্বীকার-পত্রী রসিদ, অঙ্গাকারপত্র, খত, অধিকার-দখল। ৪. অপ্র.। ৫. খাজনার রসিদই তো আপনার **কবচ** — আপনি যে জমিটি এখন চাষ করছেন সেটি যে আপনার, সেকথা সে প্রমাণ করে; এবং আপনার সেই খাজনা-রূপী অর্থ এখন রাষ্ট্রশরীরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এখন রাষ্ট্রই আপনার হয়ে সাক্ষী

দেবে যে, এ জমি আপনার। তাই ওই রসিদটিই আপনার **কবচ**। কর্ণ (আদি ফেরিওয়ালা-দোকানদার) যে **কবচ** ও **কুণ্ডল** নিয়ে জন্মেছিলেন, তার কবচটিও ছিল রাষ্ট্রীয় পুঁজিকে প্রদত্ত ট্যাক্সের রসিদ। আর, তার কুণ্ডলটি কী, তা জানা যাবে **কুণ্ডল** শব্দের অর্থে।

কবর (কবরা, কবরী) : ১. ✓কু (শব্দ) + অর (অরন্) - কর্তৃবাচ্যে। ২. *ক-বহন রহে যাহাতে অথবা ক-কে বরণ করে যে কিংবা* **ক** *যাকে বরণ করে।* / ক (মস্তক), তাহার বর (আবরক)। (ব.শ.)। ৩. চিত্রবর্ণযুক্ত, বিচিত্র, শবল, খচিত, ভূষিত, সম্পৃক্ত, পাঠক, কেশপাশ, লবণ, অম্ল, খরপুষ্প, বাবুই তুলসী, কেশবেশ, কেশের মার্জনা ও বন্ধবিশেষ। ৪. অপ্র., কেবল 'কবরী' শব্দটি বিনুনি অর্থে প্রচলিত। ৫. **কবরী** হল **ক**-এর বা কারীর অর্থাৎ মাথার ঢাকনা। কারীর ঢাকনা বলতে যে **কবর** শব্দটি প্রচলিত, তাকে আরবী শব্দ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মূলে দুটি শব্দই একই উৎসসঞ্জাত। ৬. ইংরেজি cover।

কবি : ১. ✓কব্ (বর্ণন) + ই (ইন্) - কর্তৃবাচ্যে; অথবা, ✓কু (শব্দ) + ই + কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে বক বক ক'রে বর্ণনা করে; যে কু শব্দ করে।* ৩. সর্ব্বজ্ঞ, ক্রান্তদর্শী, বিদ্বান, নিপুণ, কুশল, বাগ্মী, চিন্তাশীল, ভাবুক, বর্ণয়িতা, রচয়িতা, গাতা, ব্রহ্মা, শুক্রাচার্য্য, মেধাবী, বিবেকী, স্মৃতিকার, পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ, বিষ্ণু, সূর্য্য, বাল্মীকি, চৌরযোদ্ধা, ভৃগুসুত ও শুক্রাচার্য্যের পিতা, ভৃগু, কবিগান। (ব.শ.)। ৪. কেবলমাত্র poet অর্থে প্রচলিত। ৫. কবি দুই প্রকার — আবিষ্কৃত ও প্রচলিতকে ধারণ করে এবং তার পুনরাবৃত্তি করে; এঁরা বকবককারী কবি। সমাজে এঁদেরও প্রয়োজন রয়েছে, এবং বলতে গেলে এইরকম কবিরই অধিক প্রয়োজন; কারণ এক হিসেবে এঁরা 'বেটার হাফ' বা জ্ঞানচর্চার বা জ্ঞানপ্রবাহের প্রকৃতিশক্তি। আর, নতুন জ্ঞান আহরণকারী আবিষ্কার-গুণসম্পন্ন কবি; এঁরা কু-শব্দকারী কবি। এঁরা জ্ঞানচর্চার পুরুষশক্তি। এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে (খ) গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধে।

কবিকঙ্কণ : ১. কবি + কঙ্কণ। ২. *যে-কবি কঙ্কণের সঙ্গে তুলনীয়।* ৩. শ্রেষ্ঠকবি, মহাকবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। ৪. 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম' — এভাবেই শব্দটি এখনও প্রচলিত। ৫. রাজার রাজকার্য-পরিচালনার নৈপুণ্যের গৌরব ঘোষণা করে যে — এই অর্থেই মুকুন্দরামকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তখনও পর্যন্ত **কঙ্কণ** শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ কবি ও শিক্ষিত মহলে প্রচলিত ছিল। দ্র. **কঙ্কণ**।

কবিকা : ৩. খলিন, খলিনী, কইমাছ, ঘোড়ার লাগাম। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. শব্দটি সরাসরি ব.শ.-তে নেই, রয়েছে খলিন বা খলীন শব্দের অর্থে। গতিশীল কব-কব-কারীর প্রকৃতি বা আধারকে কবিকা বলে। এটি কই মাছ হতে পারে, আবার ঘোড়ার মুখের ভেতরে ঢোকানো লাগামের দড়ি হতে পারে, যে কিনা ঘোড়ার কব কব করার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত। একই ক্রিয়াভিত্তিতে একালের ছোটখাট ইলেকট্রনিক স্পিকার, ফোন বা মোবাইলকে **কবিকা** বলা যেতেই পারে। কিন্তু কী আর করা যাবে, শব্দটিই তো এখন অপ্রচলিত হয়ে গেছে। তবে চালিয়ে দিলে, বাংলাভাষীর বুঝতে অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

কব্য : ১. ✓কব্য + য (যৎ) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কব থাকে যাহাতে।* / যাহা তৃপ্তিকারণ রূপে বর্ণনীয়। (ব.শ.)। ৩. পিতৃগণের তৃপ্ত্যর্থ দেয় অন্নাদি। ৪. অপ্র.। ৫. ক (মস্তিষ্ক) যা বহন করে, সেটিই **কব**। সেই কব-এর বিকাশ সাধন করে কবিরাই। এই হিসেবে কব হল আসলে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের বাহক বা জ্ঞানধারা। সেই কব যাতে থাকে, সে তো **কব্য** বটেই। এই কব্য থেকেই কাব্য কথাটি তৈরি করা যায়।

কব্যবহ, কব্যবাহ (দ্র. **অগ্নিকলা, হব্যবহ, হব্যবাহ**) : ১. কব্য + ✓বহ্ + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. যে কব্য বহন করে। (ব.শ.)। ৩. কব্যের বাহক, অগ্নি। ৪. অপ্র.। ৫. কব্য যে বহন করে নিয়ে যায় সেও অগ্নি; হব্য যে বহন করে নিয়ে যায় সেও অগ্নি। দুটোই তেজ। একটি মানসিক তেজ বা মেধা, অপরটি দৈহিক তেজ বা শ্রম করবার শক্তি। কর্মযজ্ঞে এই দুটি জিনিসই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — জ্ঞানফল ও কর্মফল। অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানফলের বাহক হল কব্যবাহক কবি; আর কর্মফলের বাহক হল হব্যবাহক হবি বা ঘৃত। এই ঘৃত উৎপন্নসম্ভারও বটে। বেদের অগ্নিস্তুতিতে এই **কব্যবাহ** ও হব্যবাহের বিষয়ে অনেক কথাই রয়েছে।

কাবেরী : ১. কা + বের - ঈ। ২. *যে-দেহীর নতুনত্ব নেই বা যার দেহের কোনো পরিবর্তন হয় না।* / কুৎসিত দেহ যাহার। (ব.শ.)। ৩. দাক্ষিণাত্যের পুণ্যতোয়া নদীবিশেষ। কাবেরী যুবনাশ্বের কন্যা। পিতৃশাপে গঙ্গার অর্দ্ধাঙ্গ হইতে ইহার জন্ম হয়, এইজন্য ইহার নাম 'অর্দ্ধগঙ্গা', 'অর্দ্ধজাহ্নবী'। বেশ্যা, হরিদ্রা। (ব.শ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. কু বের যাহার, তিনি **কুবের**। তদনুযায়ী কা বের যাহার, তিনি কাবের; সেই কাবের-এর আধাররূপিণীকে বলে কাবেরী। এই সত্তার অন্তত পাঁচটি রূপকে আমাদের শব্দার্থজ্ঞানী পূর্বপুরুষগণ চিনতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। উদ্ভিদজগতে সেই সত্তা রয়েছে হরিদ্রার ভিতরে, মানবজগতে রয়েছে বেশ্যার মধ্যে, ভৌগোলিক জগতে রয়েছে কাবেরী নদীর মধ্যে, পণ্যজগতে রয়েছে সম্ভবত বাধ্যতামূলক মজুতের কারণে নষ্ট পণ্যসম্পদের মধ্যে এবং মানসজগতে রয়েছে গতানুগতিক জ্ঞানের পচন ও বিস্মৃতির এক চলমান ধারার মধ্যে। কাবেরীর 'অর্দ্ধগঙ্গা' 'অর্দ্ধজাহ্নবী' প্রভৃতি নাম থেকেই বোঝা যায়, পণ্যের জগতের সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। মোট কথা, যে সত্তাকে 'কাবেরী' নাম দেওয়া হয়েছে, তা অন্তত পাঁচটি ক্ষেত্রে সক্রিয়। তার কিছু দৃশ্য, কিছু অদৃশ্য। আমরা এক এক করে এগোই।

হলুদের ব্যবহার, সমাজে বেশ্যার অস্তিত্ব প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে ভাবলে একধরনের সত্যের দেখা মেলে। প্রাচীন কালে লোকে যা পেত, খাওয়ার যোগ্য মনে হলে তাই খেত। কিন্তু 'সভ্য' হওয়ার পর একই ধরনের খাদ্যাদি ভোজনের রীতি অনুসৃত হতে লাগল।

এর ফলে শরীরে যে ক্ষতিকর ক্লেদ জন্মায়, তাকে তাড়াবে কে? **কাঁচা হলুদ** খেয়ে বা মেখে তাকে দূর করা হয়। তাই এই হলুদ হল **'কাবেরী'** সত্তার একটি রূপ। এবার মানবসমাজের দিকে দেখা যাক। আদিতে মানুষ ছিল স্বভাবতই বহুগামী। মানুষ 'সভ্য' হওয়ার পর, সমাজে একগামিতার নীতি অনুসরণের ফলে যে ক্লেদ জমে, বেশ্যার অস্তিত্ব সেই ক্লেদের নিরসন ঘটায়; সমাজে বেশ্যা না থাকলে একগামিতার নীতিটাই টিকতে পারবে না, ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই বেশ্যা হল কাবেরী সত্তার আর একটি রূপ। হয়তো কাবেরী নদী সেরকম কোনো বিশেষ ক্লেদ থেকে দক্ষিণ ভারতকে মুক্ত করে থাকে, তাই সে কাবেরী পদবাচ্য। পণ্যজগতে নষ্ট, আধা-নষ্ট, উচ্ছিষ্ট, ও পচা মাল বিক্রির যে সকল ধারা রয়েছে সেগুলিকে কাবেরী বলা যেতে পারে এবং মানসজগতে একই কর্মের ও একই চিন্তার পুনরাবৃত্তির ফলে যে ক্লেদ জন্মায় তাকে দূর করার যে প্রক্রিয়া প্রচলিত রয়েছে তাকে খুঁজে বের করতে পারলেই আমরা জ্ঞানজগতে **কাবেরী**র সাক্ষাৎ পেয়ে যাব।

কাহার, কাহারবা : ৩. শিবিকাদিবাহক হিন্দুজাতি-বিশেষ, বেহারা, কাওরা, জলবাহক পশ্চিমদেশীয় হিন্দুজাতি। কাহারবা = রওআনী কাহার প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা যে চতুর্মাত্রিক ছন্দে সচরাচর গান করে, সেই ছন্দের নাম 'কাহারবা'। পশ্চিমে কাহারের বাদ্য 'কাহারবা'; তদনুসারে তালের নামকরণ। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় শব্দটি এখনও প্রচলিত, যদিও পাল্কী বিলুপ্ত। কাহারবা সঙ্গীতজগতে আজও বিদ্যমান।

কু (কুকথা) : ১. কু = ✓কু (শব্দ) + উ - ক। (ব.শ.)। কু + কথা। ২. *কু = **কারী** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে (অতি উৎকৃষ্ট ও অতি নিকৃষ্ট থাকে যাহাতে)। কুকথা = যাহাতে **কু**বাক্য থাকে।* ৩. পৃথিবী, ভূমিভাগ, পাপ, কুৎসিত, নিন্দিত, ঈষৎ, নিবারিত, অহিত, পীড়াকর, দুষ্ট, অশুভ, অশ্লীল, অসৎ, অনভিজ্ঞ, নীতিবিগর্হিত ... ইত্যাদি। কুৎসিত বাক্য, অপ্রিয় কথা, কটুবাক্য, পৃথিবীর কথা, লোকহিতকর বাক্য। (ব.শ.)। ৪. bad অর্থে প্রচলিত। ৫. অতি উৎকৃষ্ট সেই, যে বর্তমানের পরিধির উপরদিকের সীমা পেরিয়ে গেছে; আর অতি নিকৃষ্ট সেই যে বর্তমানের পরিধির নীচের দিকের সীমা পেরিয়ে গেছে। বর্তমানের রক্ষণকামীরা অতি উৎকৃষ্টকে বা নতুনের আবিষ্কারককে সেকারণেই নিন্দা করেন 'কু' বলে। আর অতি নিকৃষ্টকেও সেই একই কারণে নিন্দা করা হয়ে থাকে। ফলত 'কু' শব্দটি একই সঙ্গে অতি ভাল ও অতি মন্দ বোঝায়। কারণ দুটোই প্রচলিতের সীমালঙ্ঘনকারী। এই **কু**-কে অতএব অস্তিত্বের স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে উচ্চ বা নিম্ন, মোটা বা সরু, উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল, উৎকুচিত বা সঙ্কুচিত ... অবস্থা রূপে বুঝতে হয়। তাহলেই **কু**-শব্দের যথার্থ মানে বোঝা যায়। একই উচ্চারণে বিশ্বের সব ভাষায় তার কিছু না কিছু মিল পাওয়া যাবেই।

তবে যে-সীমালঙ্ঘনকারী **উর্ধ্বসীমালঙ্ঘন** করেন, তিনিই শিব পদবাচ্য। আমাদের দেশ এই শিবঠাকুরের দেশ। নতুন জ্ঞানের আনয়নকারী শিবের মতো বর পাওয়া আমাদের দেশের মেয়েদের কাম্য। বাঙালির কালচারে সেই অঙ্ক থেকেই অতি প্রিয়কে নিন্দার ছলে ভজনা করা হয়। মিষ্টির চেয়ে টকমিষ্টি তাই বাঙালি রমণীদের খুবই প্রিয়। প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর আরও ব্যাপকতা ঘটেছে। **কু**-এর অধিকারী যে, তার বিচারে সেটি নিশ্চয় তার নিজের পক্ষে শুভ কিন্তু সেই **কু** যাদের উপর বর্ষিত হয়, তাদের পক্ষে তা নিশ্চয় মন্দ। তাই **কুশ কুবলয়** প্রভৃতি কারও পক্ষে ভালো, কারও পক্ষে মন্দ। অতএব **কু**-এর কথা হল অতি ভাল কথা, পৃথিবীর (পৃথুশাসিত যৌথসমাজের) কথা, এবং 'লোকহিতকর বাক্য'ই বটে, আবার 'কুৎসিত বাক্য'ও বটে। কোনটি ঠিক, তা বলে দেয় কথাটি যে প্রেক্ষিতে বলা হয়, সেই প্রেক্ষিত। তবে, উ-কারের প্রয়োগের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ ব্যাপার থাকে। তা হল, উ-কারযুক্ত সত্তা, এখানে যেমন **কু**, তার দ্রষ্টা থাকে খ-বিন্দুতে (দ্র. **ক-বর্ণের অর্থ**) এবং **কু**-কে সে দেখে বহিরাগত হিসেবে। সত্তার পরিধির বাইরে থেকে পরিধির উদ্দেশ্যেই **কু**-ডাক শোনা যায়।

কুজ (কুজা) : ১. কু + ✓জন্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কু জনন করে যে। / কু (পৃথিবী) হইতে জাত;* বৃক্ষ (নবপত্রিকা) যাঁহার আশ্রয়ভাবে আছে। (ব.শ.)। ৩. পৃথিবীজাত, মঙ্গলগ্রহ, মহীরুহ, বৃক্ষ, নরকাসুর। **কুজা** = ভূসুতা, সীতা, দুর্গা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কুঁজ আর পুঁজ। উন্নীত বা অবনতভাবে করা জিনিস জমে গেলে কুঁজ হয়, আর সেই কুঁজ থেকে **পুঁজ** ও **পুঁজি** হয়! দ্র. **কন্যাকুব্জ**।

কুতপ : ১. কু (মন্দ) তপ; ✓তপ্ + অচ্ - ক। (ব.শ.)। ২. কু *(অতি ভাল এবং অতি মন্দ) তপ (শ্রম) যাহাতে*। দ্র. **কু**। ৩. মন্দতাপ কালবিশেষ, অর্থাৎ যখন রবির তাপ মন্দ হয়। সূর্য্য, অগ্নি, দ্বিজাতি, অতিথি, দৌহিত্র, ভাগিনেয়, কুশতৃণ, তিল, বৃষ, নেপালকম্বল, বাদ্যবিশেষ। (দৌহিত্র, নেপালকম্বল, তিল, দর্ভ, শ্রাদ্ধে প্রশস্ত বলিয়া 'কুতপ'; অন্য অর্থেও এইরূপ সম্বন্ধ আছে, বোধ হয়।)। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. তপ বা তপস্যা কথাটির মানে হল কর্ম্মমূলক (দ্র. **কর্ম্ম**) শ্রম করে কিছু উৎপাদন করা। এর মধ্যে কিছু কিছু ধরনের উৎপাদন করা ছিল মন্দ তপস্যা বা খারাপ। সেকালে শ্রদ্ধার সঙ্গে কাউকে কিছু দিলে তাতে **দৌহিত্র, নেপালকম্বল, তিল, দর্ভ** দেওয়াই উচিত বলে মনে করা হত। এবং আশ্চর্য, এগুলিকেই আবার 'কুতপ' বলা হত।

কুনকুন, কুনকুনে : দ্রঃ **ধানকুনী**।

কুন্ত : ১. কুং + ত। ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর রহস্যরূপ তারিত যাহাতে। / কু (কুৎসিত, অপ্রতিক্রিয়) অন্ত যাহা হইতে।* (ব.শ.)। ৩. প্রাসাস্ত্র, বর্শা, উকুন (উৎকুণ), গবেধুকা, গড়গড়াধান্য, প্রচণ্ডভাব। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কণ বা কারীর বোধ যখন বাস্তবায়িত হয়, তাকে কন বলা যায়। তা নবরূপে উত্তীর্ণ হলে 'কুন' হয়। এই কুন তারিত যাহাতে তাকে বলে কুন্ত। এ হল কণা পরিমাণ বা অতি **অল্প** বাহ্যসম্পদের মালিকানা। তাই তা গবেধুকা, গড়গড়াধান্য, এমনকি উৎকুণকেও বোঝাতে পারে। কিন্তু প্রাসাস্ত্রাদিকে (প্রাস = ক্ষেপনীয় অস্ত্রবিশেষ) কেন বোঝায়, তা এখনও বোধগম্য হয়নি। তবে, এর

গ্রীক-ল্যাটিন-জার্মান উত্তরাধিকারও উপরোক্ত অর্থের পক্ষে সায় দেয়। হতে পারে, ছুঁড়ে দেওয়া যায় যে সকল বস্তু, সেগুলিতে কারীর রহস্যরূপ তারিত হয়ে থাকে। ৬. kontos (গ্রীক), contous (ল্যাটিন), contus (জার্মান)। (ব.শ.)।

কুন্তল : ১. কুন্ত + ✓লা + অ - ক। (ব.শ.)। ২. *কুন্ত-এর লালন-লয়ন থাকে যাহাতে।* / যাহা কুন্তাকার গ্রহণ করে। (ব.শ.)। ৩. স্ত্রীলোকের কেশ, কেশগুচ্ছ, অলক, কেশ, (কুন্তাকার ফালযোগ হেতু) লাঙ্গল, (কুন্তবৎ শূকযোগ হেতু) যব, (কুন্তসাদৃশ্যে?) চষক, পানপাত্র, ধ্রুবকবিশেষ, ধুয়া, দেশবিশেষ, তদ্দেশবাসীগণ। লোম, কেশর, মস্তক। (ব.শ.)। ৪. hair অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. একটা বিষয় বোঝা যাচ্ছে যে, বস্তুর থেকে সূচের মতো যা বেরিয়ে থাকে তাকে কুন্তল বলে। এই বিচারে অন্তত যব, লাঙ্গল, কেশবতী নারী একই জাতের বস্তু। তাছাড়া, **কেশ** শব্দের অর্থে আমরা আগেই জেনেছি, মালিকানার সঙ্গে কেশের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। সেই সুবাদে তাকে কুন্তল বলা যেতেই পারে। তবে কুন্ত শব্দের অর্থ থেকে আমরা বুঝতে পারি, এই মালিকানা অত্যন্ত ক্ষুদ্র মালিকানা।

কুন্তী : ১. কুন্তি + অ (অঞ্) তদপত্যার্থে প্রত্যয়লোপ + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। (ব.শ.)। ২. *কুন্তের গতিশীলতার আধার যে।* ৩. পাণ্ডবদের জননী। যদুবংশীয় রাজা শূরের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগ্নী। এঁর প্রকৃত নাম পৃথা। রাজা শূর তাঁর পিতৃস্বসার পুত্র নিঃসন্তান কুন্তিভোজকে এই কন্যা দান করেন। পালক-পিতার নামানুসারে এঁর অপর নাম হয় কুন্তী। এক সময়ে মহর্ষি দুর্বাসা অতিথিরূপে গৃহে এলে কুন্তী তাঁকে পরিচর্যায় সন্তুষ্ট করেন। তখন দুর্বাসা তাঁকে একটি অমোঘ মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বলেন যে, এই মন্ত্রের প্রভাবে কুন্তী যে দেবতাকে স্মরণ করবেন, সেই দেবতাই তাঁর সমীপস্থ হবেন এবং তাঁর প্রসাদে কুন্তীর পুত্রলাভ হবে। কৌতূহলবশে কুন্তী সূর্যকে আহ্বান করেন এবং তাঁর সঙ্গে মিলনের ফলে দেবকুমারের ন্যায় এক পুত্রলাভ করেন এবং সূর্যের বরে কুমারীই থেকে যান। এই পুত্রই সহজাত কবচ-কুণ্ডলধারী কর্ণ। ... পরে পাণ্ডুর সঙ্গে কুন্তীর বিবাহ হয়।

মৃগয়া করতে গিয়ে বনমধ্যে রতিক্রীড়ারত মৃগরূপী ব্রাহ্মণ কিমিন্দমকে হত্যা করার জন্য কিমিন্দম মুনি পাণ্ডুকে অভিশাপ দিয়ে বলেন যে, কিমিন্দম যে ব্রাহ্মণ পাণ্ডু তা জানতেন না, সে কারণ ব্রহ্মহত্যার পাপ হতে তিনি পরিত্রাণ পাবেন, কিন্তু স্ত্রী-সংগমকালেই তাঁর মৃত্যু হবে। এই অভিশাপের ফলে পাণ্ডু পুত্র উৎপাদন করতে অক্ষম ছিলেন। ... কুন্তীকে তিনি অন্য উপায়ে পুত্রলাভে চেষ্টিত হতে বলেন। কুন্তী উপমা প্রদর্শন পূর্বক বলেন যে, রাজা ব্যুষিতাশ্ব যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করলে তাঁর মহিষী ভদ্রা মৃত পতি-সংগমে পুত্রবতী হয়েছিলেন। পাণ্ডুও তপঃপ্রভাবে কুন্তীর গর্ভে মানসপুত্র উৎপাদন করতে পারেন। পাণ্ডু তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে কুন্তীকে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করতে অনুনয় করেন। ... তখন পাণ্ডুকে দুর্বাসার বরের কথা বলে কুন্তী প্রথমে ধর্মকে আহ্বান করেন এবং শতশৃঙ্গ পর্বতে ধর্মের সহিত কুন্তীর সংগমের ফলে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। পরে পাণ্ডুর ইচ্ছানুক্রমে কুন্তী বায়ু ও ইন্দ্রকে আহ্বান করে ভীম ও অর্জুনকে লাভ করেন। মাদ্রী স্বয়ং কুন্তীকে কিছু বলতে সাহস করতেন না। তিনি পাণ্ডুকে দিয়ে অনুরোধ করিয়ে কুন্তীর কাছ থেকে পুত্রলাভের মন্ত্রলাভ করেন ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করে নকুল ও সহদেব নামে যমজ পুত্রের জননী হন। কুন্তী মাদ্রীকে কোনো এক দেবতাকে স্মরণ করতে বলেন, কিন্তু মাদ্রী যুগল দেবতা আহ্বান করায় কুন্তী নিজেকে প্রতারিত মনে করেন এবং পাণ্ডুর অনুরোধেও মাদ্রীকে পুনর্বার মন্ত্র দিতে অস্বীকার করেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. অত্যন্ত ক্ষুদ্র বাহ্যসম্পদের অনন্ত মালিকানা রয়েছে যার, তাকে **কুন্তী** বলে। এ হল বেদবাদীদের অধঃপতিত যৌথসমাজের নিগড় থেকে বেরিয়ে আসা জনগোষ্ঠী, যারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহ্যসম্পদের মালিক হয়েছিল, সেই সমগ্র জনগোষ্ঠীকে **কুন্তী** বলে। যতদূর বোঝা যায়, ১০০ খ্রিস্টাব্দের আগেই এই প্রকার জনগোষ্ঠী ভারতসমাজে জন্মলাভ করে গিয়েছিল। দ্র. **পৃথা**। ৬. ইংরেজি cunt।

কুবলয় (কুবলয়াপীড়) : ১. কু + বলয় + আপীড়। ২. *খারাপ বা মন্দ যে চক্র পীড়ন করে।* / কুবলয় আপীড় যাহার। (ব.শ.)। ৩. কুবলয় = পৃথিবীর বলয়তুল্য (শোভাকর), উৎপল, পদ্ম, নীলোৎপল, পৃথিবীর মণ্ডল, ভূমণ্ডল। কুবলয়াপীড় = কুবলয় যাহার ভূষণ, নীলোৎপল-ভূষণ (জন), কংসের অনুচর হস্তিরূপ অসুরবিশেষ। কংসের ধনুর্যজ্ঞে মল্লভূমিতে প্রবেশকালে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক এই অসুর রঙ্গদ্বারদেশে নিহত হয়। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পৃথিবীর (earth-এর) চারদিকে শোভা বৃদ্ধিকারী বলয় থাকে, উৎপল বা পদ্মের চারদিকে পাপড়ি থাকে, মাঝে থাকে 'পল', যে প্রতিপালন দান করে, তাকে ঘিরে থাকে **কুবলয়**, ভূমণ্ডল। একালের ভাষায় আমরা তাকে coterie বলে থাকি। ব্যস! ওই পর্যন্ত পাশ্চাত্যের বিদ্যা। কিন্তু ভারতের বিদ্যা সমগ্র নিয়ে — প্রথমে জনগণ = জল, তার থেকে উপরে জেগে ওঠা রাষ্ট্রপতি ও তার ব্যবস্থা = উৎপল, তার ভেতরে রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী = পল, তাকে ঘিরে পদে পদে বসে থাকা পারিষদবর্গ = পাপকারী পাপড়ী বা ফুলের দল (= যা উৎপাদন কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করে বিপুল পণ্য বা পাপ সৃজনের জন্য এবং সমাজের শত্রুদের বিদীর্ণ করবার জন্য তৈরি হলেও পল মৌলবাদী হয়ে গেলে সেই দলই জনসাধারণকে দলিত বা নিপীড়িত করে)। এই **কুবলয়** রাজার চোখে তাঁর শোভা বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু জনসাধারণের চোখে অনেক সময়ই তা খারাপ বলয়। সেই **কুবলয়** যখন পীড়নের কারণ হয়ে যায় তখন 'কুবলয়াপীড়'। সে অসুর। শ্রীকৃষ্ণের সময়ে রাজার চারদিকে ঘিরে থাকা এই কুবলয়কে ধ্বংস না করে শ্রীকৃষ্ণের উপায় ছিল না।

কুবলাশ্ব : ১. কুবল + অশ্ব। ২. *কুবল অশ্ব যাহার।* ৩. ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বৃহদশ্বের পুত্র। বৃহদশ্ব বনগমনে ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহর্ষি উতঙ্ক তাঁকে নিরত করে বলেন যে, তাঁর আশ্রমের কাছে মরুপ্রদেশে উজ্জালক নামে এক বালু-সমুদ্রের মধ্যে মধুকৈটভের পুত্র ধুন্ধু বাস করে। বালুমধ্যে নিদ্রিত দানব বৎসরান্তে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে সপ্তাহকাল ভূমিকম্প হয়, সূর্যের মার্গ পর্যন্ত ধূলি ওড়ে, স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হয়। এই দানবকে হত্যা করলে রাজার

অক্ষয়কীর্তি লাভ হবে। বৃহদশ্ব তাঁর পুত্রকে এই কার্যের জন্য নির্দেশ দিয়ে বনগমন করেন। ধুন্ধু তপস্যার ফলে ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, যম, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসের অবধ্য হয়। সে বালুকার মধ্যে লুকিয়ে থেকে আশ্রমে এসে উপদ্রব করত। উতঙ্কের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে পূর্বে বিষ্ণু তাঁকে বর দিয়েছিলেন যে, তাঁর যোগবল অবলম্বনপূর্বক কুবলাশ্ব ধুন্ধুকে বধ করবেন। পরে ধুন্ধুর উপদ্রবে অতীষ্ঠ হয়ে, উতঙ্কের অনুরোধে বিষ্ণু কুবলাশ্বের দেহে প্রবেশ করেন এবং কুবলাশ্ব একুশ হাজার পুত্র ও সৈন্য নিয়ে ধুন্ধু-বধে যাত্রা করেন। সপ্তাহকাল বালুকা-সমুদ্রের চতুর্দিক খনন করবার পর নিদ্রিত দানবকে দেখা যায়। সে উঠে মুখনিসৃত অগ্নিতে কুবলাশ্বের পুত্রদের দগ্ধ করে। কুবলাশ্ব যোগশক্তির প্রভাবে ধুন্ধুর মুখাগ্নি নির্বাপিত করে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে তাকে বধ করে ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হন। (খ) শত্রুজিৎ রাজার পুত্র; প্রকৃত নাম ঋতধ্বজ। কুবলয় নামে অশ্বে আরোহণ করে ভ্রমণ করতেন বলে এঁর নাম হয় কুবলাশ্ব। ইনি গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসাকে পাতাল হতে এনে বিবাহ করেন এবং দানব পাতালকেতুর ভ্রাতা তালকেতু ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ নেবার জন্য তপস্বীবেশে রাজধানীর নিকট এসে বাস করতে থাকে। একদিন সে চাতুরী করে প্রাসাদে রটনা করে যে, কুবলাশ্ব শিকার করতে গিয়ে মারা গিয়েছেন। এই সংবাদ শ্রবণান্তে মদালসা শোকে প্রাণত্যাগ করেন। কুবলাশ্ব কিছুদিন পরে ফিরে এসে মদালসার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এদিকে মদালসা পাতালে এক নাগ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে কুবলাশ্ব পাতালে উপস্থিত হয়ে বিরহিণী মদালসার সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কুবলাশ্বের এই কাহিনীতে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা রয়েছে, এবং একই ঘটনা দুভাবে লিখিত হয়েছে। এই ঘটনাকে বোঝার জন্য **ইক্ষ্বাকু, বৃহদশ্ব, উতঙ্ক, বিষ্ণু, ধুন্ধু (ইন্দ্রগোপকীট), বালুকা, অশ্ব, কুবল, মদালসা, পাতালকেতু, তালকেতু** প্রভৃতি শব্দের অর্থ জানা দরকার।

কুবের : ১. কু + বের। ২. কু বের (শরীর) যাহার। (ব.শ.) ৩. ধনাধিপতি যক্ষরাজ। ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যের পৌত্র এবং পৌলস্ত্য বা বিশ্রবার ও ভরদ্বাজ-কন্যা দেববর্ণিনীর পুত্র এবং রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই। বিশ্রবার পুত্র বলে এঁর আর এক নাম বৈশ্রবণ। ব্রহ্মার বরে তিনি উত্তর দিগন্তের দিকপাল এবং ধনাধিপতি হন। দেবতাদের সমান মর্যাদা দিয়ে ব্রহ্মা এঁকে একটি পুষ্পক রথ দান করেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁর আবাসস্থান নির্দেশ না-করায় নিজ পিতাকে তিনি বাসস্থান নির্দেশ করতে বলেন। বিশ্রবা বিশ্বকর্মা নির্মিত লঙ্কাপুরীতে কুবেরের বাসস্থান স্থির করে দেন। রাবণ লঙ্কাপুরী অধিকার করতে চাইলে কুবের পিতৃ-উপদেশে লঙ্কা ত্যাগ করে কৈলাসে প্রস্থান করেন। ... দেবী রুদ্রাণীকে দর্শন করার ফলে তাঁর দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ ও বাম চক্ষু ধূলিকলুষিত ও পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করে। ... এজন্য তাঁর নাম হয় একপিঙ্গল। রাবণ কুবেরের পুষ্পক রথ হরণ করেন। ... কুবের সমস্ত ধনের প্রদাতা ও অধ্যক্ষ। তিনি **যক্ষ** ও **কিন্নর**গণের অধিপতি ও দশ দিকপালের অন্যতম। এঁর দেহের গঠন অতি কুৎসিত ছিল বলে এঁর নাম হয় কুবের। এঁর তিনটি পা ও আটটি দাঁত ছিল। কুবেরের স্ত্রীর নাম আহুতি। এঁর দুই পুত্র নলকুবের ও মণিগ্রীব এবং এক কন্যা মীনাক্ষী। ইনি বিভিন্ন নামে পরিচিত — **ধনপতি, যক্ষরাজ, বৈশ্রবণ, রাক্ষসেন্দ্র, রত্নগর্ভ, কিন্নরেশ, পৌলস্ত্য, দিকপাল**। কুবেরের উদ্যান **চৈত্ররথ**; বাসস্থান **কৈলাস**; পুরী **অলকা**; রথ **পুষ্পক**। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ব.শ. বলছেন — কু বের (শরীর) যাহার, সেই হল **কুবের**। আবার **কাবেরী** সম্পর্কে জানিয়েছেন, সে 'কুৎসিতদেহা'। কুবেরকে তিনি বলেছেন 'কুৎসিতশরীর'। **কাবেরী**র সঙ্গে কুবেরের তাহলে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য 'আ'কার ও 'উ'কারে। আকার হল আধারশক্তি, উকার হল অতিবিকাশ-জনন শক্তি। যেহেতু দুটোই দেহের ব্যাপার, দুটোই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নিন্দনীয়। কুবেরের কাহিনীর প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে বুঝতে পারলে আমরা বুঝতে পারব, ব্যাঙ্কের আদিরূপকে প্রাচীন ভারত এভাবেই চিনেছিল। কেবল তাই নয়, প্রাচীন ভারত দেখেছিল ধনরত্ন দুজনের কাছে জমে, **কুবের** আর **লক্ষ্মী**। এর মধ্যে কুবের নিন্দনীয় অথচ লক্ষ্মী মাননীয়া কেন, প্রাচীন ভারত তাও জানত। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি না জেনেই কেবল উপলব্ধির জোরে রবীন্দ্রনাথ এই **কুবের** ও **লক্ষ্মী**র মধ্যে পার্থক্যটি স্পষ্ট করে গেছেন। দ্র. 'শিক্ষার মিলন' / *কালান্তর*। দ্র. ধ। ৬. ইংরেজি cybernetics শব্দটির মূলে আছে গ্রীক ভাষার Kubernetes শব্দ (যার অর্থ পরিচালক বা শাসক)। Kubernetes এসেছে Kubernan (= পরিচালনা করা) শব্দ থেকে। এই Kubernan থেকে আসছে ইংরেজি govern শব্দ। তার মানে যে শব্দবংশের সন্তান রূপে আমরা 'কুবের'কে পেয়েছি, সেই বংশ থেকে তারই ভাইকে ইংরেজি পেয়েছে cybernetics ও govern রূপে।

কুব্জ, কুব্জা : ১. কু + উব্জ, স্ত্রী আ। ২. *কু-বহন জনন করে যে*। / কু (ঈষৎ) উব্জ (আর্জ্জব) যাহার। (ব.শ.)। ৩. ঈষৎ ঋজু, বায়ুকোপ হেতু উন্নতহৃদয় বা উন্নতপৃষ্ঠ, কুঁজো, বক্র, কুটিল, বিকলদেহ, ভগ্নাঙ্গ, পৃষ্ঠস্থ মাংসপিণ্ড, ককুদ, কুঁজ, (hump), খড়্গা, অপামার্গ, কৈকেয়ীর পরিচারিকা মন্থরা। কংসের দাসী। ইহার অপর নাম ত্রিবক্রা। অঙ্গরাগদান হেতু কৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া ইহার কুব্জতা অপনীত করেন। (ব.শ.)। মথুরা রাজবংশের পরিচারিকা (অনুলেপন-বাহিকা)। কৃষ্ণ ও বলরাম যখন অক্রুরের সহিত কংসের ধনুর্যজ্ঞ উপলক্ষে মথুরায় গমন করেন, তখন পথিমধ্যে কুব্জার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। তখন কৃষ্ণ অনুলেপন চাইলে কুব্জা কৃষ্ণকে অনুলেপন দেন। কুব্জার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে কৃষ্ণ কুরূপা কুব্জার বক্র পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপনপূর্বক তাঁকে অচিরাৎ স্বাভাবিক ঋজু ও সুরূপা করে দেন। (পৌ.অ.)। কুব্জক = শ্বেতগোলাপ। ৪. অপ্র.। ৫. সমাজদেহের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর পিঠে জমে যাওয়া পণ্যের বোঝা হল এই কুঁজ। দ্র. **কন্যাকুব্জ**। সেই কুঁজকে গতিশীলভাবে বহন করে যে, সে হল কুঁজি। আর সে পণ্য বিক্রি হয়ে হয়ে যদি অনেক সম্পদ জমে যায়, সে হল পুঁজ। সেই পুঁজ গতিশীল হলে, তাকে বলে পুঁজি। এই কুঁজ ও পুঁজ সম্বলিত মানবসমাজ আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা শুতে পারে না। গ্রামবাংলায় প্রবাদ আছে, 'কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোয়ার শখ কেন!' তেমন শখ তার পক্ষে বিপর্যয় আনে।

কুমার : ১. ✓কম্ + আর (আরন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কু-কে (প্রচলিতের রক্ষণশীলতাকে) মারে যে।* / যে ক্রীড়া করে। (ব.শ.)। ৩. সুন্দর, পঞ্চবর্ষীয় বালক, ষোড়শ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক, তরুণবয়স্ক পুত্র, সদ্যোজাত শিশু, পুত্র, রাজপুত্র, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্র, অবিবাহিত অবস্থা, সদাবাল্যত্ব হেতু কুমার — কার্ত্তিকেয়, আবাল্য ব্রহ্মচারী সনকসনাতনসনৎসনন্দবালখিল্যাদি, পৃথিবীপুত্র মঙ্গলগ্রহ, বালঘাতক গ্রহবিশেষ, স্কন্দ, অর্হদুপাসকবিশেষ, অশ্ববারক, সহিস, শুকপক্ষী, অগ্নি, সিন্ধুনদ, বরুণবৃক্ষ। কুমারী = দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা, (আগমে) অজাতপুষ্পা ষোড়শবর্ষপর্যন্তবয়স্কা বালিকা, অনূঢ়া কন্যা, পার্ব্বতী, সীতা, নবমল্লিকা, ঘৃতকুমারী, অপরাজিতা, শ্যামাপক্ষী, স্থূলৈলা, বড় এলাচ, জম্বুদ্বীপ, তরুণীপুষ্প, কুমারিকা অন্তরীপ, শাকদ্বীপস্থ নদীবিশেষ। (ব.শ.)। দ্র. **কার্তিকেয়**। ৪. অপ্র.। ৫. 'রক্ষঃ' শব্দটির অর্থ রক্ষক ও রাক্ষস দুইই হয়। কার্যত, রক্ষা করতে করতে একই কর্মের পুনরাবৃত্তিজনিত কারণে একধরনের জরা (মৌলবাদিতা, রক্ষণকামিতা) দেখা দেয়। ফলত রক্ষকই রক্ষিতকে একধরনের গড্ডলিকাপ্রবাহে এগিয়ে দিয়ে ধ্বংসের দিকে চলে যাওয়ার পথ করে দেয়। তখন রক্ষকই রক্ষিতের মৃত্যুর কারণ হয়ে রাক্ষস হয়ে যায়। রক্ষকের স্বভাবে এই যে একই কর্মের পুনরাবৃত্তিজনিত **কু**, পরবর্তী প্রজন্ম এই কু-কে মেরে ফেলে। তাই তাকে কুমার বলে। পুরনোপন্থী পাশ্চাত্যবিদেরা রক্ষকের এই দোষটিকে চিহ্নিত করেছেন incumbency factor বলে। সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আরও একটু এগিয়ে একে নাম দিয়েছেন paradox। তাঁদের মতে, 'The paradox of aging is that every generation perceives itself as justifiably different from its predecessor but plays as if its successor generation will be the same as them.'। ভারতবর্ষ এই নতুনের জন্মকে স্বাগত জানাত রাজকুমারকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে। একালের ভাষায় outcome of a revolutionary state (military force) বলতে যা বোঝায়, সেকালে তাকেই **কার্ত্তিকেয়** বলা হত। দ্র. **কুমারসম্ভব**। আমাদের এখন জানা দরকার ঘৃতকুমারী বা ধৃতকুমারী, অপরাজিতা, বড় এলাচ — এসব প্রচলিতের রক্ষণশীলতাকে ধ্বংস করে কি না? আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রীরা বলতে পারবেন। তাহলে বোঝা যাবে, কুমারের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি একশো ভাগ ঠিক কি না। তবে শব্দটি যে প্রচলিতের রক্ষণকামিতা ধ্বংসকারী বহু সত্তাকে 'কুমার' ক্রিয়ার কারক হিসেবে শনাক্ত করত, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।

কুমারভৃত্যা, দ্র. **কৌমারভৃত্য**

কুমারসম্ভব : ২. *কুমার সম্ভব হয় (জন্মায়) যেভাবে।* ৩. কার্ত্তিকেয়র উৎপত্তি, স্কন্দজনন। কার্ত্তিকেয় জন্মবিষয়ক কালিদাসকৃত কাব্যবিশেষ। ৪. অপ্র.। ৫. ভারতে সৈন্যবাহিনীর জন্মকথাই হল কার্ত্তিকেয়র জন্মকথা। পুরাণাদিতে সেই কাহিনী নানাভাবে রয়েছে। মহাকবি কালিদাস সেই কাহিনীর নবরূপায়ণ করেছিলেন তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে। তাঁর এই গ্রন্থটিকে এখন আমরা 'Emergence of a Revolutionary Force' বা 'বিপ্লবীর জন্মকথা' বলে একালের ভাষায় অনুবাদ করে ফেলতে পারি। দ্র. **কুমার**।

কুমীর : দ্র. **কুম্ভীর**।

কুমুদ, কুমুদা, কুমুদিনী : ১. কু ✓মুদ। ২. *কু-দ্বারা আমোদিত করে যে।* / কুতে (পৃথিবীতে) মুদ। (ব.শ.)। ৩. কৈরব, শ্বেতোৎপল, রক্তপদ্ম, পদ্ম, রৌপ্য, নৈর্ঋত কোণের দিগ্‌গজ, রামচন্দ্রের সেনাপতি বানরবিশেষ, নাগবিশেষ, (সাদৃশ্যে) কর্পূর, ধ্রুবক, বিষ্ণু, বিষ্ণুপার্ষদ-বিশেষ, শাল্মলীদ্বীপস্থ পর্ব্বত, দৈত্যবিশেষ, জলচরপক্ষিবিশেষ, গুগ্‌গুলুবিশেষ। **কুমুদা** = দুর্গা, কুম্ভিকা, পানা, গাম্ভারীবৃক্ষ, ধাতকীবৃক্ষ, শালপর্ণী, কট্‌ফল। **কুমুদিনী** = কুমুদযুক্ত দেশ, কুমুদময় স্থান। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কুমুদ ও পদ্ম, এক বস্তু মনে হলেও পার্থক্য আছে। **কু** (অতি ভাল বা অতি মন্দ) মোদন পাওয়া যায় যার থেকে সে হল কুমুদ। এই কুমুদ বিষ্ণু ও চন্দ্রের অধিকারে, পদ্ম ব্রহ্মার অধিকারে। কুমুদের উপরোক্ত প্রতীকী অর্থগুলি নিশ্চয় কোনো না কোনো ভাবে কু-মোদন দেয় বা দিত, সেকারণেই তাদের ঐ নাম। দ্র. **কৌমুদী, উৎপল, কুবলয়**। দ্র. পৃষ্ঠা ১৯৩।

কুম্ভ : ১. কু + ✓উনভ্ (পুরণ) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কুং (কুম্) কে ভরণ-ভক্ষণ করে যে।* ৩. শকন্ধাদি (শক দেশীয় কুপ?), বৃহদ্‌ভাণ্ড, ঘট, কলস, (সাদৃশ্যে) হস্তিশিরঃস্থ মাংসপিণ্ডদ্বয়, পরিমাণবিশেষ (চৌষট্টি সের), কুম্ভক, (জ্যোতিষে) একাদশ রাশি, কুম্ভকর্ণের পুত্র, প্রহ্লাদপুত্র, বিষ্ণু, বেশ্যাপতি, হৃদরোগবিশেষ, পল্লীর অর্দ্ধ বা অংশ, গুগ্‌গুলু, ত্রিবৃৎ, তেউড়ি, কুম্ভবৃক্ষ-ফল। কুম্ভা = বেশ্যা। (ব.শ.)। ৪. কদাচিৎ কলসি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ৫. **কুম্ভ** বলতে যদি হস্তিশিরস্থ মাংসপিণ্ড বা বিষ্ণু বোঝায়, তাহলে এর সঙ্গে একটি কথারই সামঞ্জস্য মেলে। তা হল, যার ভেতরে ধনসম্পদ রক্ষিত হয়, তেমন ভাণ্ড বা **কলসি**। শব্দটির অনুসঙ্গ ও ব্যবহার দেখে মনে হয়, এর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাণ্ড, মানিব্যাগ, পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, নিজস্ব ভ্যানিটিব্যাগ ইত্যাদির মিল বেশি। এ যেন privatization-এর কেন্দ্রবিন্দু। অন্তত **কুম্ভীর** বা 'টাকার কুমীর' তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আসলে এই কুম্ভ পার্থিব ভূমির মাটি দিয়ে যেমন তৈরি হয় (কলসি), তেমনি মনোভূমির মাটি দিয়েও তৈরি হয় (ব্যক্তিমালিকানার বোধ)। দুটোকে একত্রে বলে দেওয়ায় প্রদত্ত অর্থগুলির মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য দেখা যায় না। কিন্তু ক্রিয়ার ভিত্তিতে এগোলে সুস্পষ্ট সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন কুম্ভার্থে বেশ্যা শব্দটি সেকালে ঠিক ছিল, এখন ভুল। কারণ সেকালে যে কোনো বৈশ্যবৃত্তিধারী দোকানদারকে বেশ্যা বলা যেতে পারত, কেননা কেবলমাত্র দেহব্যবসায়িনীকে শব্দটি বোঝাতো না। এখন শব্দটি প্রতীকী হয়ে গিয়ে কেবলমাত্র দেহব্যবসায়িনীকেই বোঝায়। এরকম প্রতীকায়নে আপনার সন্দেহ হলে, আপনি কলকাতার ইনডোর স্টেডিয়ামের পাশে চলে যান। সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বহুতল বাড়ি আছে, যে বাড়িতে 'গোপন' সরকারি কাজকর্ম হয়। বাড়িটিতে স্বভাবতই সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। বাড়িটির সামনে বড় বড় সাইনবোর্ডে সেকারণেই লেখা ছিল 'নিষিদ্ধ এলাকা', 'Prohibited Place'। কিন্তু বাংলাভাষায় 'নিষিদ্ধ-এলাকা' শব্দটি বর্তমান সময়ের পত্রপত্রিকার দৌলতে বারংবার 'বেশ্যাদের জন্য

নির্দিষ্ট এলাকা' অর্থে ব্যবহৃত হতে হতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতীকী হয়ে গেছে। ফলে সরকারী ওই বাড়িটির 'নিষিদ্ধ এলাকা' সাইনবোর্ডের কদর্থ হতে থাকে। অগত্যা সরকারি কর্তারা বাড়িটির সাইনবোর্ডে বাংলা কথাটি বদলে ফেলেন, 'নিষিদ্ধ এলাকা' মুছে দিয়ে লেখা হয় 'বৰ্জ্জিত এলাকা'। ইংরেজি কথাটি কিন্তু যথাপূর্বং থেকে যায়। তার ফলে সরকারি ওই বাড়িটি 'বেশ্যাবাড়ী' হওয়ার কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেলেও, বাংলা-ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রে গুরুতর ফারাক ঘটে গেছে। সাইনবোর্ড দেখে কারও কারও মনে হতে পারে বুঝিবা 'বৰ্জ্জিত এলাকা' মানে 'Prohibited Place'। সম্ভবত একই ঘটনা ঘটেছিল প্রাচীনকালেও। বেশ্যা শব্দটি কেবলমাত্র 'prostitute' অর্থে বারংবার ব্যবহারের কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ায় বাকি বৈশ্যদের তার থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার নানা উপায় অবলম্বন করা হয়। ... ৬. Greek - Kumbe, Latin - cymba। (ব.শ.)।

কুম্ভক : ১. কুম্ভ + ক (কন্) স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. *কুম্ভ করা হয় যাহাতে*। ৩. ত্রিবিধ প্রাণায়াম অঙ্গের একতম, পূরিত বায়ুর স্তম্ভনরূপ প্রাণায়ামাঙ্গ। (ব.শ.)। ৪. যাঁরা দৈহিক যোগ-এর সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের মধ্যে প্রচলিত। ৫. প্রাণায়াম তিনরকম। তার মধ্যে একটি হল কুম্ভক। এতে যত বেশিক্ষণ সম্ভব শ্বাসকার্য স্তব্ধ রাখার চেষ্টা হয়। মানবশরীরের আগম নিগম বন্ধ রাখা হয়। সমাজশরীর বা দেশের ক্ষেত্রে এটি আমদানি রপ্তানি না করে দেশ চালানো বোঝায়। যোগসাধনা থেকে ভারত এই শিক্ষা লাভ করে 'গ্রামসমাজ' বানিয়েছিল। দ্র. **কূর্ম্মপৃষ্ঠ**।

কুম্ভকর্ণ : ১. কুম্ভ + কর্ণ। ২. *কুম্ভই কর্ণ যাহার*। / যাহার কর্ণ কুম্ভতুল্য। (ব.শ.) ২. রাবণের ভ্রাতা। বিশ্রবা মুনির ঔরসে সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসীর (নিকষা) গর্ভে এঁর জন্ম হয়। জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পরেই সে ক্ষুধার্ত হয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সহস্র প্রজা ভক্ষণ করে ফেলায় ইন্দ্র এঁকে বজ্রাঘাত করেন। ভ্রাতাদের সঙ্গে কুম্ভকর্ণও গোকর্ণ আশ্রমে উগ্র তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে অমরত্ব বর যাচ্ঞা করেন। ... তাঁকে 'অনন্ত জীবনের পরিবর্তে অনন্ত নিদ্রা'র বর দেন। ... অবশেষে 'ছয় মাসান্তে একদিন নিদ্রাভঙ্গের' বর পান। তবে অকালে নিদ্রাভঙ্গ হলে মৃত্যু হবার ভয় থেকে যায়। ... রাম রাবণের যুদ্ধে লঙ্কা বীরশূন্য হয়ে পড়লে ... রাবণ অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করেন। ... যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ রাম কর্তৃক নিহত হন। তিনি দৈত্যরাজ বলির দৌহিত্রী বজ্রমালাকে বিবাহ করেন। বজ্রমালার গর্ভে কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামে এঁর দুই পুত্র হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. বিশ্রবা, সুমালী, কৈকসী (নিকষা) প্রভৃতি শব্দের অর্থ থেকে বোঝা যায়, এঁর কর্ণ (শব্দগ্রাহক, পণ্যগ্রাহক) বিশাল ছিল। ইনি **নিকুম্ভিলা** যজ্ঞ (deprivatization) করেছিলেন। যেহেতু মাল বা পণ্যের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক, তাই এঁর **শ্বশুর সমালা, মাল্যবান,** মা **নিকষা** (হিসাব-নিকাষ), স্ত্রী বজ্র**মালা**। পুত্র **কুম্ভ** ও **নিকুম্ভ**। ধনতন্ত্রের কারণে যে মালিকানা (= কুম্ভ), তা যেমন এঁর ছিল, তেমনি deprivatization-এর ফলে যে-অর্থাগম (= **নিকুম্ভ**), তাও এঁর ছিল।

কুম্ভকার : ১. কুম্ভ + ✓কৃ + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কুম্ভ করে যে*। ৩. কুম্ভকারক, জাতিবিশেষ, কুলাল, কুমার, 'কুম্ভ' এইরূপ রবকারক, কুক্কুভপক্ষী, কুকোপাখী। 'বৈশ্যায়াং বিপ্রতশ্চৌর্য্যাৎ কুম্ভকারঃ স উচ্যতে। — উশনা। [এ বিষয়ে মতভেদ আছে।] (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. চলতি বাংলায় কুম্ভকারকে কুমার বলে। এই **কুমার** আর উত্তরপ্রজন্ম-বাচক **কুমার** আলাদা শব্দ। তবে উশনা লিখিত মন্তব্যটির ব্যাখ্যা এবং সে বিষয়ে মতভেদের কারণটি অকথিত থেকে গেছে। সে কারণটি হল, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে 'কুম্ভ করে যে' তাকেই **কুম্ভকার** বলে ঠিকই; কিন্তু **কুম্ভ** যে দুরকম! দৃশ্যকুম্ভ ও অদৃশ্যকুম্ভ! দৃশ্যকুম্ভ হল মাটির কলসি যা আমরা বাহ্য দৃষ্টিতে দেখতে পাই; আর অদৃশ্যকুম্ভ হল ব্যক্তিগত মালিকানা-রূপ ভাণ্ড যা আমরা মানসিক দৃষ্টিতে দেখতে পাই। এই বিচারে, মাটির হাঁড়ি বানায় যে, সে যেমন **কুম্ভকার** তেমনি ব্যক্তিমালিক মাত্রেই **কুম্ভকার**। কিন্তু এই কুম্ভকারিতা তো একপ্রকার চৌর্য্যই বটে! সে কথাটি উশনা লিখে গেলেও পরবর্তীকালের প্রতীকী ভাষায় অভ্যস্ত বুদ্ধিতে তা ধরা পড়েনি। তাই, **কুম্ভকার** শব্দের আমরা দুটো অর্থ বুঝব — যে পার্থিব ভূমির মাটি দিয়ে কুম্ভ তৈরি করে, আর, যে মনোভূমির মাটি দিয়ে কুম্ভ (ব্যক্তিগত মালিকানার বোধ) তৈরি করে।

কুম্ভজ (কুম্ভজন্মা, কুম্ভযোনি, কুম্ভসম্ভব) : ১. কুম্ভ + ✓জন্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কুম্ভে জাত যে*। / যাঁহার কুম্ভে জন্ম। (ব.শ.)। ৩. অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, দ্রোণাচার্য্য। (ব.শ.)। কুম্ভ মহর্ষি অগস্ত্যের অন্য নাম। অপ্সরা উর্বশীকে দর্শনপূর্বক বরুণ কুম্ভ-মধ্যে রেতঃপাত করেন। পরে সেই কুম্ভে মিত্রও রেতঃপাত করেন। সেই রেতঃ হতে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। কুম্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে অগস্ত্য কুম্ভযোনি নামে অভিহিত হন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এই **কুম্ভজ**দের একটি সাধারণ চরিত্র এই যে, এঁরা **মিত্রাবরুণের** সন্তান বলে একধরণের দ্বিধায় থাকেন। প্রকাশিত হবো, নাকি যেমন আছি তেমন থাকব — এই দ্বিধা; যা সর্ব অস্তিত্বের মধ্যে থাকে। **কুম্ভজ** অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, দ্রোণাচার্য, এই সামাজিক সত্তাগুলি আদি সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) ব্যবস্থা ও আসন্ন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাঝের সক্রিয় ঐতিহাসিক সত্তা। এঁরা চিরকাল দ্বিধায় থেকেছেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বেড়ে ওঠার বুদ্ধি দিয়েছেন, কিন্তু দুই ব্যবস্থার বিরোধের কালে প্রায়শই প্রাচীনের পক্ষে রায় দিয়েছেন বা দিতে বাধ্য হয়েছেন। দ্র. **অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, দ্রোণাচার্য্য**।

কুম্ভমেলা : দ্র. **ত্রিবেণী, নাড়িনক্ষত্র**।

কুম্ভিল, কুম্ভিলক, কুম্ভীলক : ২. যে অন্যের শ্লোকার্থ আপনার বলে (plagiarist)। (ব.শ.)। ৩. চৌর, শ্লোকার্থ চৌর, শ্যালক, শালমৎস্য। (ব.শ.)। ৪. কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। ৫. ধনরত্ন বা টাকাকড়ি চুরি করাকে কুম্ভীলকবৃত্তি বলে না, কারও মানসিক অর্জন চুরি করাকে বলে। এর কারণ হল, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে যে কোনো প্রকার অর্জন আত্মসাৎ করাকে 'কুম্ভীলক' বৃত্তি বলা হত। পরে পরে কেবলমাত্র মানসিক অর্জন চুরির ক্ষেত্রে **কুম্ভীলক** শব্দটি প্রতীকী

হয়ে যায়; যেমন কিনা, যে-কোনো ধরনের অর্জিত সম্পদের মজুতদারই ছিল কুম্ভীর পদবাচ্য, কিন্তু কালক্রমে শব্দটি কেবল crocodile-বাচক কুম্ভীর অর্থেই প্রতীকী ও স্থির হয়ে যায়। আর, শ্যালককে কেন কুম্ভীলক বলা হয়, তার রহস্য **শ্যালক** শব্দটির ভিতরেই রয়েছে। সে ভগিনীপতির সম্পত্তির মালিক নয়, কিন্তু মালিকানার পুরো সুবিধা নেয়, শোষণ করে। শালমাছও হয়তো তাই করে। আমরা এখন প্রকৃতি থেকে এত দূরে, যে, সেকথা অনুভব করার যোগ্যতাই এখন আমাদের নেই; আমাদের পূর্বপুরুষদের ছিল। তাই তাঁরা সেকথা লিখে রেখে গেছেন। আমরা কিংবা আমাদের উত্তরসূরিরা যদি কোনোদিন আবার প্রকৃতির দেওয়া স্বভাবকে পুনরায় অর্জন করতে পারি, নিশ্চয় তখন আমরাও তা অনুভব করতে পারব।

কুম্ভীর (কুম্ভী, কুম্ভিন্, কুম্ভীর, কুম্ভীল, কুমির, কুমীর) : ১. কুম্ভিন্ ✓ঈরি + অ (অন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যার কুম্ভের খবর (সমানভাবে চারিদিকে) ছড়ায়।* / কুম্ভ আছে যার, 'কুম্ভবান'। (ব.শ.)। ৩. হস্তী, (কুম্ভাকার মুখ হেতু) কুম্ভীর (alligator), গুগ্‌গুলু, বিষকীটবিশেষ; ক্ষুদ্র কুম্ভ, জলপানপাত্রবিশেষ, বারিপর্ণী, পানা, কট্‌ফল, দন্তীবৃক্ষ, ধান্যাধারবিশেষ; নক্র। (ব.শ.)। ৪. ধান্যাধার ও alligator অর্থে প্রচলিত। ৫. অপরিমিত টাকার মালিককে আমরা বলি 'লোকটা টাকার কুমীর', অথবা 'লোকটা ঘোড়েল লোক'। ঘোড়েল হল ঘড়িয়াল, এক জাতের ছোট কুমীর। বলা হয় এইজন্য যে, কুম্ভীর মাত্রেই 'কুম্ভের ঈরণ বা খবর ছড়ায়'; সে জনসমাজের কুমীর হতে পারে, জলজপ্রাণী-সমাজেরও হতে পারে। তবে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন বলে, আমরা একালের শহুরে মানুষেরা জানি না জলের কুমীর 'কুম্ভের ঈরণ' কীভাবে ছড়ায়। আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাঁরা জানতেন। তাই তাকেও তাঁরা 'কুম্ভী' বা 'কুম্ভীর' নাম দিয়েছিলেন। এখনও জলের সঙ্গে যাঁদের জীবন জড়িত তাঁরা হয়তো বলতে পারবেন, জলের কুমীর কীভাবে 'কুম্ভের ঈরণ' ছড়ায়। তবে মানবসমাজের টাকার কুমীরের সঙ্গে জলের কুমীরের এক জায়গায় খুব মিল দেখতে পাওয়া যায়। জলের কুমীর যেমন মাছ খেয়ে জীবনধারণ করে, তেমনি মানবসমাজের টাকার কুমীরও ছোট ছোট সম্পত্তিবানদের সম্পত্তি গ্রাস করে থাকে। আর সম্পত্তিবান মানেই তো মৎস্য। দ্র. **মৎস্য**।

কুম্ভীনস (কুম্ভীনসী) : ২. কুম্ভীতুল্য নাসিকা যাহার। (ব.শ.)। ৩. কুম্ভীতুল্য নাসিকা যুক্ত, ক্রূরসর্পবিশেষ, বিষকীটবিশেষ, রাবণের মাতৃস্বসার কন্যা, মধুদৈত্যের পত্নী, লবণ দৈত্যের মাতা। কুম্ভীনসী রাবণের মাতামহ মাল্যবানের কন্যা। রাবণের দিগ্বিজয়কালে মধুদৈত্য কুম্ভীনসীকে হরণ করে। (ব.শ.)। (ক) রাক্ষসবিশেষ। রাক্ষস সুমালী ও গন্ধর্বী কেতুমতীর কন্যা ও রাবণ-মাতা কৈকসীর ভগিনী। (খ) রাক্ষস মাল্যবানের কন্যা অনলা এবং বিশ্বাবসুর কন্যা কুম্ভীনসী সম্পর্কে রাবণের ভগিনী। রাবণ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করলে নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ ও তপস্যারত বিভীষণের অনুপস্থিতির সুযোগে মধু দৈত্য এঁকে হরণ করে নিয়ে যায়। রাবণ মধু দৈত্যকে শাস্তি দিতে গেলে কুম্ভীনসী তাঁর চরণে পতিত হয়ে আপন স্বামীকে হত্যা করতে নিরস্ত করেন ও তাঁর মধ্যস্থতায় রাবণ ও মধু দৈত্যের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। কুম্ভীনসীর গর্ভে লবণাসুরের জন্ম হয়। শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণাসুর নিহত হয়। (গ) গন্ধর্বরাজ অঙ্গারপর্ণের স্ত্রী। অঙ্গারপর্ণ চিত্ররথ নামে বিখ্যাত। একচক্রা নগরী থেকে পাঞ্চাল যাত্রার পথে গঙ্গাস্নানরত অঙ্গারপর্ণের সহিত অর্জুনের কলহ ও যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী গন্ধর্বরাজের মুক্তির জন্য কুম্ভীনসী যুধিষ্ঠিরকে অনুনয় করে স্বামীকে উদ্ধার করেন। চিত্ররথ সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে মায়াযুদ্ধ শিক্ষা দেন। অর্জুনের নিকট পরাজিত হলে চিত্ররথ তাঁর বিচিত্র রথখানি দগ্ধ করে নিজের নাম পরিবর্তন করে দগ্ধরথ রাখেন। (পৌ.অ.)। দ্র. **পুষ্পোৎকটা**। ৪. অপ্র.। ৫. অধঃপতিত সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) রাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতরে থাকা একটি জনগোষ্ঠীকে **কুম্ভীনসী** বলা হত। জনসাধারণের সম্পত্তি 'রক্ষা করব' বলে যারা খেয়ে ফেলে, এই গোষ্ঠী সেই **রাক্ষস** শ্রেণীর হলেও এরা বিপুল পরিমাণে সম্পদের অধিকারী হয়ে যায়। এই জনগোষ্ঠীর উদ্ভব নিয়ে নানা ধরনের ধারণা ছিল সেকালের লেখকদের মধ্যে, সেগুলিই উপরোক্ত বয়ানে বলা হয়েছে। তবে (গ) চিহ্নিত বয়ানে যে কুম্ভীনসীর কথা বলা হল, তার সম্পর্ক রাক্ষস শ্রেণীতে নয়; সে সরাসরি **গন্ধর্ব** শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত। মোটকথা বৈদিক ব্যবস্থার ভেতরে সম্পদ-আগ্রাসী একটি গোষ্ঠী হল কুম্ভীনস বা কুম্ভীনসী।

কুহ : ১. ✓কুহি (বিস্মায়ন) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কু হয় বা রহে যাহাতে।* / বিস্ময় করে যে। (ব.শ.)। ৩. মায়া, কপট, মোহ, ঘোর, কুবের। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যে বস্তু তার সম্ভাবনার সুনির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে থাকে না, তার বাইরেও অহরহ চলে যায়, সে 'কু' পদবাচ্য। এর ফলে বস্তুটিকে সুনির্দিষ্টতায় পাওয়া যায় না, কখনো সে তার চেয়ে বেশি, কখনও বা কম। ফলে সে **মায়া, কপট** ইত্যাদি। বহুলতাই যার নীতি সেও কখনও আগের পরিধির মধ্যে থাকে না, কেবলই যার অবয়বের বৃদ্ধি ঘটে, সেই **কুবের**ও তাই কুহ। অর্থাৎ কু যার অস্তিত্বের ভেতরে থাকে সেই হল **কুহ**।

কুহক (কুহকী, কুহকিন্) : ১. ✓কুহি + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কুহ করে যে।* / বিস্ময়াপন্ন করে যে। (ব.শ.)। ৩. বঞ্চক, শঠ, ধূর্ত, মায়াবী, নর্তয়িতা, মোহকর, বিমোহন, ইন্দ্রজাল, মায়া, ভেলকী, কপট, বিভ্রম। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যা সম্ভব, তা উপস্থাপন না করে যে সত্তা সম্ভবের অধিক বা সম্ভবের কম কোনো কিছু উপস্থাপন করে, তাকে **কুহক** বলে।

কূজন : ১. ✓কূজ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহাতে কু-এর উচ্চারণ জনিত হতে থাকে।* ৩. অব্যক্ত শব্দ, অস্ফুটধ্বনি, ডাক, পক্ষিরব, রতিকালে কণ্ঠরব, শীৎকার, চক্রশব্দ, গান, গীতি। (ব.শ.) ৪. অপ্র.। ৫. কূজন ব্যাপারটি একরকম আওয়াজ। সেই আওয়াজ ঠিক কীরকম, তা জানতে হলে দুটি স্থানে যেতে হয়। এক) এমন একটি বাড়িতে ভোর বেলা উপস্থিত থাকতে হবে, যার থেকে পাঁচ-সাতশো মিটার দূরে বহু বড় বড় গাছ

আছে এবং ভোরবেলা যে গাছে প্রচুর পাখি একত্রে কিচিরমিচির করে। ওই বাড়িতে বসে সেই আওয়াজ যেমন শোনায়, তার রেকর্ড করে নিতে হবে। দুই) ভোরবেলা বড় হাট বসে এমন কোনো জায়গার থেকে সমদূরত্বের কোনো বাড়িতে বসে সেই হাটের আওয়াজ শোনা ও রেকর্ড করা। দেখা যাবে, আওয়াজ দুটি একেবারেই একরকম। দুটি আওয়াজকে কিছুতেই আলাদা করে বোঝা যায় না। পক্ষীদের কিচিরমিচির ও হাটের মানুষদের মাল লেনদেনের কিচিরমিচির একেবারেই একরকমের। এই দুটিই হল কূজন। এটি আমাদের পরীক্ষিত সত্য। দ্র. **পক্ষী**।

কুমুদ (কুমুদবতী, কুমুদবাঞ্ছা, কুমুদিনীপতি) : ১. কু + মুদ্ + অন - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. **কু** *(অতিভাল বা অতিমন্দ) উদ্দেশ্যে মুদ (চোখ বুজিয়ে দেয়) যে। /* কুতে (পৃথিবীতে) মুদ। (ব.শ.)। ৩. রক্তপদ্ম, পদ্ম, রৌপ্য, নৈর্ঋত কোণের দিগ্‌গজ, রামচন্দ্রের সেনাপতি বানরবিশেষ, নাগবিশেষ, কর্পূর, ধ্রুবক (ধুয়া)-বিশেষ, বিষ্ণু, বিষ্ণুপার্ষদবিশেষ, শাল্মলীদ্বীপস্থ পর্ব্বত, দৈত্যবিশেষ, জলচর-পক্ষিবিশেষ, গুগ্‌গুলুবিশেষ। কুমুদা = দুর্গা, কুম্ভিকা, পানা, গাম্ভারী-বৃক্ষ, ধাতকীবৃক্ষ, শালপর্ণী, কট্‌ফল। কুমুদবতী = কুমুদযুক্তস্থান, কুমুদিনী, কুমুদসমূহ। কুমুদবাঞ্ছা = কুমুদের বাঞ্ছিত বিষয়, কুমুদপ্রিয় বা চন্দ্র। কুমুদিনীপতি = চন্দ্র। (ব.শ.)। ৪. আধুনিক সাহিত্যে lotus অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. বাহ্যজগতে রূপো, কর্পূর ইত্যাদি, উদ্ভিদজগতে পদ্ম, কচুরিপানা, ধাইফুল ইত্যাদি, জীবজগতে জলচর এক পাখি, সমাজে শাল্মলীদ্বীপস্থ সামাজিক সংস্থা; মানসলোকে বিশেষ নাগ বা দৈত্য এবং সর্বোপরি নৈঋত দিকের দিগ্‌গজ ইত্যাদি রূপে কুমুদকে আমাদের আদিপুরুষেরা চিনতে পেরেছিলেন। এদের সঙ্গে বিষ্ণুর ও চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল বলে তারা জানিয়েছেন। কিন্তু এত কিছু বলে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা কিছুতেই সত্তাটিকে এখনও ঠিকঠাক চিনতে পারছি না। তবে **কৌমুদী** শব্দে ব.শ. এমন কিছু তথ্য দিয়ে গেছেন, যার থেকে আমরা এই কুমুদকে শনাক্ত করার আর একটা চেষ্টা চালাতে পারি।

কৌমুদী : ১. কুমুদ + অ (অণ্) তৎসম্বন্ধার্থে + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। (ব.শ.)। ২. *যাহাতে কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়*। ৩. (কুমুদের প্রকাশত্ব হেতু) জ্যোৎস্না, চন্দ্রিকা, কৌমুদীতুল্য নেত্রপ্রীতিকর বিষয়মাত্র, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, কার্ত্তিকপূর্ণিমাতে কর্ত্তব্য উৎসববিশেষ, দীপোৎসবতিথি, আশ্বিনপূর্ণিমা, উৎসব, কুমুদ্বতী, কুমুদিনী। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সূর্য্য তার তপ্ত কিরণের মাধ্যমে তাপ দিয়ে জলের (জনসাধারণের) রস শুষে নেয়। দ্র. **কিরণ**। তারপর সেই রস নিয়ে সেই কিরণেরা গর্জনকারী মেঘে পরিণত হয়। এই রসসংগ্রাহক মেঘ তারাই, যাঁরা পাবলিক সেকটরের (সেকালের ভাষায়, বৈদিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার) ক্ষমতা ও অর্থধারী শক্তি। চন্দ্রের আলো জ্যোৎস্না, তাও জলের (জনসাধারণের) রস শোষণ করে। কিন্তু তার কিরণ তপ্ত নয়, সে কিরণে মন হৃষ্ট হয়, চোখ বন্ধ বা নিমীলিত হয়ে আসে, মুদে আসে। চন্দ্রকিরণের সংস্পর্শে যাদের এইরূপ অতিভাল ও অতিমন্দ আমোদন হয়, তারাই কুমুদ। তথ্যানুসারে এই কুমুদ নৈর্ঋত দিকের দিগগজ; অর্থাৎ যে দিকে বিকশিত হওয়ার রীতি প্রচলিত নেই, সেদিকে যারা যায়, তাদের প্রতিভূরাই এই কুমুদ। সেই কুমুদকে কুমুদ হয়ে উঠতে সহায়তা করে যে, সে হল কৌমুদী। সেই কৌমুদীর নাম বাহ্যজগতে চন্দ্র এবং মানসজগতে ধনতান্ত্রিক-পুঁজি। চন্দ্রের কিরণে কুমুদ হৃষ্ট হয়, ফোটে; ধনতান্ত্রিক-পুঁজির কিরণে নতুন নতুন পণ্যের উৎপাদকেরা হৃষ্ট হয়, বিকশিত হয়। দ্র. **কোক, কোকনদ, চকোর**।

'কুক্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : কুকশিমা, কুকশিমে, কুকা, কুকিল, কুকুয়া, কুকুর, কুকো, কুক্কুট, কুখা, কুত্তা, কোইলী, কোক, কোকনদ, কোকিল, কোকিলবাহিনী, কোকিলা, কোকিলাক্ষ, কোয়েল।

কুক্ = **কু**-এর করণ। **কুক** = কু করে যে।

কুকুর : ১. ✓কুক্ (আদান) + উর (উরচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কুক্-এর নবরূপে উত্তীর্ণ সত্তা রহে যাহাতে। /* যে খাদ্য গ্রহণ করে (দেয় না)। (ব.শ.)। ৩. সারমেয়, যদুবংশীয় অন্ধকরাজের পুত্র, কুকুরের অপত্যগণ, কুকুরবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ, দশার্হ দেশ, দশার্হবাসী যাদবগণ, গ্রন্থিপর্ণী-বৃক্ষ, হেয়ব্যক্তি, নরাধম। (ব.শ.)। ৪. dog অর্থে প্রচলিত। ৫. মানুষের বংশকে যে এভাবে 'কুকুরবংশ' বলা যেতে পারে, প্রথমে আমাদের তা বিশ্বাসই হয়নি। তারপর মহাভারত ও হরিবংশপুরাণে কথাটি লেখা রয়েছে দেখে চক্ষু সার্থক হল। ব.শ. জানিয়েছেন, এই সত্তার স্বভাব হল, সে নিজে খায় এবং অন্যকে দেয় না। কথাটি একশো ভাগ ঠিক। সবাই জানেন, স্বভাবটি dog-এর যেমন রয়েছে, কোনো কোনো মানুষেরও রয়েছে। আমরা দেখছি, একটি বস্তু যে অবস্থায় রয়েছে, তাকে তার চেয়ে উপরে বা নীচে আনার প্রক্রিয়াই হল কুক্ করা (cook), যার একটি মানে হল 'রান্না করা'; তা সে বাহ্যিক রান্না হোক আর পণ্যাদি বা কাব্য-দর্শনাদি রান্নাই হোক। কিন্তু সেকালের সামাজিক নিয়মে তা করা হত সকলের জন্য। কিন্তু কাউকে না দিয়ে কেউ যদি নিজেই খায়, তাকে বলে কুকুর। ব.শ. অতএব কুকুর শব্দের অর্থটি সঠিক ভাবেই নিষ্কাশন করেছেন। কিন্তু সকলে মিলে বা সকলের জন্য যে সত্তা কুক্ করে, কিন্তু নিজে খায়, কাউকে দেয় না; তাকে তার নিজের স্বজাতীয়রাই সহ্য করতে রাজি হবে না; বিজাতীয়রা তো তার শত্রু হবেই। যে কারণে কুকুর মাত্রেই খাদ্যের ব্যাপারে অন্য কুকুরকে সহ্য করতে পারে না, শকুন শেয়ালের তো কথাই নেই। একালে এমনকি মানুষের মধ্যেও তেমন চরিত্রের দেখা মেলে! তবে এরকম স্বভাবের কারণে আজকের সমাজে এমন ঝগড়া হামেশাই দেখা যায়, যেখানে পুরুষ-প্রকৃতি দু-পক্ষের কেউ কাউকে ছাড়ে না। খাদ্য বা আহার, যা নিয়ে ঝগড়া, তা পড়ে থাকে; পক্ষ দুটি পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়েই তাদের চব্বিশ ঘণ্টা খরচ করে দেয়। এই **গজকচ্ছপ** জড়াজড়ির পরিস্থিতি এতই নির্মম যে, চাইলেও তার থেকে পক্ষ দুটির মুক্তি মেলে না। একজন একটু

ছাড়লে পাছে অন্যজন সুযোগ নিয়ে তাকে বেকায়দায় ফেলে দেয়, তাই কেউ কাউকে একটুও ছাড়তে পারে না। একালের রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি তথাকথিত 'প্রতিযোগিতার' ক্ষেত্রগুলিতে এর সাক্ষাৎ মেলে হামেশাই। এরই প্রাকৃতিক স্বরূপ দেখা যায় কুকুরের সঙ্গমে। তারা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরবিরোধী ক্রিয়ায় দীর্ঘকাল এমনভাবে আবদ্ধ (inter-locked) হয়ে থাকে, যে, তার থেকে তাদের মুক্তি মেলে কেবলমাত্র সময়ের কৃপায়। দ্র. **অন্ধক**। ৬. ইংরেজি cook।

কোক : ১. ✓কুক্ (গ্রহণ) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **কুক্**-*এর আশ্রয় যাহাতে।* / যে বিচ্ছেদ গ্রহণ করে। (ব.শ.)। ৩. চক্রবাক, বৃক, নেকড়ে বাঘ, ভেক, জ্যেষ্ঠী, খর্জ্জুরী বৃক্ষ, বিষ্ণু, কুঁখ। কোকবন্ধু = সূর্য্য। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. চক্রবাক পাখি বিচ্ছেদ গ্রহণ করে, এমন কথা ভাবাই কঠিন। চকাচকির কথা যাঁরা জানেন না, তাঁরা সতীনাথ ভাদুড়ীর 'চকাচকি' গল্পটি পড়ে নিতে পারেন। অন্যথায় পক্ষিবিশারদের দ্বারস্থ হোন, love-bird সম্পর্কে খবর নিন। জানতে পারবেন, এত গভীর, সমমর্যাদাসম্পন্ন প্রেম চক্রবাক বা চকাচকি পাখি ছাড়া অন্য কারও মধ্যে দেখা যায় না। তবে কি বৃক, ঈহামৃগ, নেকড়ে বাঘ — এদেরই কোক বলে? তারা কি বিচ্ছেদ গ্রহণ করে? কিংবা ভেক? নাহ্! এভাবে কিছুই বোঝা যায় না। আমরা বরং জানি কাকের কথা, যে আমাদের কাছ থেকে **কাকবলি** গ্রহণ করে। সেই 'বলি' তো আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন জিনিস। সুতরাং কাক 'বিচ্ছেদ গ্রহণ করে' বললেও না হয় একটা মানে বোঝা যেতে পারত। কিন্তু কোক? এরা 'কু-করণ' করে — একথা যদি বলি, তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয়, কীভাবে সেটি তারা করে। **কোক** বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আমাদের হাতে নেই। তাই সেকথা আমরা জানি না। (দ্র. **চকোর**)। যদিও 'কোক' শব্দের ভেতরের 'কুক্' ক্রিয়াটির বর্ণ দুটি সেই 'কু'-করণের কথাই বলছে। সুতরাং এখানে থেমে না থেকে বরং **কোকনদ** ও **কোকিল**-এর খবর নেওয়া যাক। সেখান থেকে যদি কোক-কে উদ্ধার করা যায়!

কোকনদ : ১. কোক + ✓নদ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. দ্র. **কঞ্জ**। যাহা কোককে শব্দ করায়। (ব.শ.)। ৩. রক্তোৎপল, লালপদ্ম, রক্তকুমুদ, ৪. অপ্র.। ৫. এই নদ কিন্তু river বোঝায় না, এটি নাদ শব্দের মূল। সেকারণেই বঙ্গীয় শব্দকোষ জানাচ্ছেন, **কোকনদ** হল সেই সত্তা 'যাহা কোককে শব্দ (নাদ) করায়'। সেটি 'রক্তোৎপল' হলে (দ্র. **উৎপল**) বুঝতে হয়, কোক আসলে 'কু'-কৃত ফলসমূহ, যার গৌরব ঘোষণা করে রাষ্ট্রের **কুবলয়**। যে নিয়মে 'কুক্' থেকে 'কোক' হয়, সেই একই নিয়মে কুচ্ থেকে কোচ, কুট্ থেকে কোট, কুল থেকে কোল হয়। এমনকি ইংরেজি ভাষাতেও আমরা দেখি, কুল্ (cool) দানকারী কোল্-দ্ (cold) হয়ে গেছে। আসলে, কুক্ (cook) বা 'কু-করণ' আর 'পাকিয়ে তোলা' মূলত একই কর্ম; কেবল তাদের দেখা হয় দুদিক থেকে। **কর্ম্মফের** ও **কর্ম্মবিপাক** শব্দে বিষয়টিকে আমরা আগেই জেনেছি। স্বভাবতই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, **কোক** হল আসলে **কুবলয়**-এর হাতে উৎপাদিত সম্পদ, যার গৌরব ঘোষণাই **কোকনদ**। সূত্রপাতের কালে সেই **কোক সমাজের 'চক্রবাক'** ('যারা কথার চক্র বা প্যাঁচ মারে' দ্র. *খনন* পত্রিকায় প্রকাশিত **'পক্ষীপুরাণের মকশো'** / কলিম খান) কিংবা বৃক ইত্যাদি লোলুপ লোকেরা হলেও, পরে তা সরকারি ক্ষমতাধরদের হাতে চলে যায়। তখন সেই **কোক** পরিণত হয় **কোকনদে**। অতঃপর যখন কোনো ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠী সেই কোকের গৌরবগাথা গাইতে লেগে যায়, তখন তাকেই **কোকিল** বলে।

কোকিল (কোকিলবাহিনী) : ১. ✓কুক্ (গ্রহণ) + ইল (ইলচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***কোক** রূপ ইল দেয় যে।* ৩. পক্ষিবিশেষ, পিক, অঙ্গার, কয়লা, ছন্দোবিশেষ। কোকিলবাহিনী = কোকিল বাহী (বাহক) যাঁহার। কোকিলারূঢ়া সরস্বতী। কোকিলের পঞ্চম স্বর প্রসিদ্ধ ও মধুর। ইহাই কি মূল? ইহা নূতন কল্পনা। (ব.শ.)। ৪. cuckoo অর্থে প্রচলিত। ৫. ফেন-এর সঙ্গে ইল যোগ করলে যেমন ফেনিল হয়, তেমনি **কোক**-এর সঙ্গে ইল যোগ করলে কোকিল হয়। অর্থাৎ ফেনময় যেমন ফেনিল, তেমনি **কোকময়** হল কোকিল। এ যেমন bird cuckoo-কে বোঝায় তেমনি সমাজবনের **কোকিল**কেও বোঝায়। সে কোকের গুণগান করে। দ্র. **কোকনদ**। ৬. cuckoo।

'কুচ্' (কুঞ্চ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অসঙ্কুচিত, আকুঞ্চন, আকুট, আকোট, কুঁকড়া, কুঁকড়ান, কুঁকড়িমুকড়ি, কুঁচ, কুঁচকা, কুঁচকি, কুঁচনী, কুঁচবক, কুঁচা, কুঁচি, কুঁচিয়া, কুঁচিলা, কুঁচে, কুঁজ, কুঁ(কু)জি, কুচ, কুচ-কাওয়াজ, কুচকুচ, কুচতট, কুচনী, কুচুনী, কুচবিহার (কোচবিহার), কুচমুখ, কুচলা, কুচান, কুচি, কুচিক, কুচিকুচি, কুচিলা, কুঞ্চন, কুঞ্জি, কোঁচকা, কোঁচনী, কোঁচবক, কোঁচা, কোকড়া, কোচ, কোচড়া, কোচদাদ, কোচবক্স, কোচা, কোচোয়ান, কোছ, কোছা, নিকুচি, সঙ্কুচিত, সঙ্কোচ, সঙ্কোচক, সঙ্কোচন।

কুচ্ (কুঞ্চ্) = **কু**-এর চয়ন। **কুচ** = কু চয়িত (সঞ্চিত) যাহাতে। **কুঞ্চ** = কু-এর রহস্যরূপ চয়ন। **কুঞ্চ** = কু-এর রহস্যরূপ চয়িত (সঞ্চিত) যাহাতে।

কুচ (কুচকুচে, কুচকাওয়াজ, কুচবিহার, কুচকুচ করে কাটা, কুচিকুচি করা, কুচান, নিকুচি করা) : ১. ✓কুচ্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***কু** চয়ন থাকে যাহাতে।* / যাহা সঙ্কুচিত হয়। (ব.শ.)। ৩. স্ত্রীস্তন, পয়োধর, সৈন্যদিগের একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা, রওনা, ধারাল অস্ত্রে কোমল দ্রব্য অনায়াসে কাটার মৃদু শব্দ। ... (ব.শ.)। ৪. যথার্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. **কুচ** কথাটি পৃথক ভাবে তেমন ব্যবহৃত হয় না। 'কুচিত' শব্দটি কে-ই বা জানে! তবে সঙ্কুচিত (সম + কুচিত) কথাটি সবাই জানেন। সঙ্কুচিত শব্দের অর্থ করা হয়, যা তার স্বাভাবিক অস্তিত্ব থেকে আপন কেন্দ্রের দিকে ছোট হয়ে গেছে। বিপরীত হলে হয় **উৎকোচ**। কার্যত, **কু** কখনোই স্বাভাবিক অস্তিত্বে থাকে না, থাকে স্বাভাবিক অস্তিত্বের পরিধির বাইরে কিংবা সেই পরিধির ভেতরে; হয় ঊর্ধ্বে কিংবা নিম্নে কু-এর অবস্থান। সেই **কু**-কে চয়ন করার অর্থ হল স্বাভাবিক অস্তিত্বের

চেয়ে বড় হয়ে যাওয়া কিংবা স্বাভাবিক অস্তিত্বের চেয়ে ছোট হয়ে যাওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই কু চয়িত হচ্ছে। নারীর স্তনের এই গুণটি রয়েছে। তা কখনো বড় হয়ে যায়, কখনো ছোট হয়ে পড়ে। সেই কারণে তাকে **কুচ** বলে। 'কুচকুচে' কালো যখন বলি, তখন তার অর্থ হল — কালো রং আপন অভ্যন্তরের দিকে **কুচিত** হয়ে ছোট হয়ে আরও ঘন হয়ে গেছে; যেকারণে কালোর চেয়ে 'কুচকুচে কালো' অনেক বেশি কালো। তবে **কু**-কে চয়ন করে আনার জন্য যদি চয়িতব্যকে কেটে নিয়ে আসা হয়, তাকে বলে **কুচ** করে কাটা। এ ধরনের কু-চয়ন গতিশীল হলে আমরা বলি **কুচি**, বা কুচি কুচি করা, কুচান বা কুচানো। কুচি কুচি করে নির্গত বা নিঃসারিত করাই **নিকুচি** করা।

অনেকের ধারণা ফারসি ভাষার কুচ থেকে কুচকাওয়াজ শব্দটি বাংলায় এসেছে। আমরা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি, ফারসির 'কুচ', যার মানে 'সৈন্যদিগের একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা' আসলে অস্তিত্বের স্বাভাবিক অবস্থা নয় — প্রসারণ; কু যাতে পরিধির বাইরে চয়িত হয়েছে। অতএব তা 'কুচ'ই বটে। সেই কুচের আওয়াজই **কুচ**-কা-আওয়াজ। তা সত্ত্বেও কারও যদি একথায় আপত্তি থাকে, তিনি **কুচ**বিহারের আদি ইতিহাস ঘাঁটুন। বিহারের মানুষেরাই প্রসারিত হয়ে **কুচ**বিহারে (বা কোচবিহারে) এসেছেন কিনা, নিজেরাই দেখতে পাবেন। ৬. হাঙ্গেরির মাগিয়ার ভাষার শব্দ থেকে আসা ফরাসি coche, এবং ইংরেজি coach। (জ্ঞানের প্রসারণ, জাতির প্রসারণ, স্থানান্তরে গমনের জন্য ব্যবহৃত যান।)

'কুপ্' (*কূপ্*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : কুঁয়া, কুপ্, কুপ, কুপা (কূপা), কুপি(পী), কুপিত, কুপিনী, কুপিল, কুপো, কুপোকাত, কুপ্য, কূপ, কূপক, কূপকচ্ছপ, কূপদর্দুর, কূপমণ্ডুক, কূপযন্ত্র, কূবর, কূ(কু)রুম, কূর্ম, কোঙা, কোপ, কোপা, কোপান, কোপানো, কোপিত, কোপিল, কোপী, কোপীন, কোপ্‌নী, কৌপ, কৌপীন, প্রকুপিত, প্রকোপ।

কুপ্ (কূপ্) = কু-এর পালন / পান। **কুপ** = কু পালন / পান করে যে। **কূপ্** = কূ-ধারীর পালন / পান। **কূপ** = কূ-ধারী পালিত হয় যাহাতে।

কুপ : ১. ✓কুপ্ (কূপা) > ✓লি, > কোপ। (ব.শ.)। ২. *স্বাভাবিক আচরণের (পালন-পানের) চেয়ে অধিক বা কম প্রত্যাশা করে যে।* ৩. কুপিত হওয়া, কোপ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. লোকে কুপিত হয় তখনই, যখন সে তার প্রত্যাশা মতো ব্যবহার পায় না। আর, প্রত্যাশা মতো ব্যবহার না পাওয়ার কারণ হল, সে বিপরীত পক্ষের কাছে অধিক বা কম প্রত্যাশা করে, বিপরীত পক্ষের কাছে যা স্বাভাবিক, তা প্রত্যাশা করে না। এই অধিক বা কম প্রত্যাশার কারণ হল, সে কু-পালন (কু-পান) করে। ৬. ফরাসি এবং ইংরেজি coup।

কূপ : ১. ✓কূ (শব্দ) + প - অধিকরণে; কু (ঈষৎ) + অপ্ (?)। (ব.শ.)। ২. *কূ পালিত হয় যেখানে; কূ-ধারী পালিত হয় যেখানে।* / যাহাতে ভেক শব্দ করে। (ব.শ.)। ৩. গর্ত্তজলাশয়বিশেষ, কুয়া, গর্ত্ত, রন্ধ্র, চর্ম্মময় তৈলপাত্র, নদীমধ্যস্থ বৃক্ষ বা পর্ব্বত, গুণবৃক্ষ, মাস্তুল, মৃন্ময় পরিমাণপাত্রবিশেষ, কাচের বা টিনের কেরোসিন তৈলের দীপবিশেষ, টেমি, ডিবা (কূপা, কূপী), উদর, পেট। (ব.শ.)। ৪. well বা 'কুয়া' অর্থে প্রচলিত। ৫. **কূ**-এর আধারকে **কূ** বলে। সেই সুবাদে কূপ শব্দের মানে দাঁড়ায় — কূ-ধারী পালিত হয় যাহাতে। উপরোক্ত অর্থগুলির প্রত্যেকটিতেই কূ পালিত হয় বলে, তাদের 'কূপ' শব্দে উল্লেখ করার রীতি আজও প্রচলিত। ভেক তো ভীত-সন্ত্রস্ত সত্তা, যা স্বাভাবিক থেকে যথেষ্ট অধঃপতিত। সে স্বভাবতই বাহ্যিক কুয়া বা মানসিক কুয়াতে বসবাস করে শব্দ করবেই। বাহ্যিক কুয়ায় বা পার্থিব **অন্ধকূপ**-এ ফেলে ইংরেজদের হত্যা করেছিলেন সিরাজউদ্দৌল্লা। মানসিক কুয়ায় বা অদৃশ্য কিন্তু বাস্তব **অন্ধকূপ**-এ ফেলে একালের মানুষকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছে দর্শনহীন একালের রাষ্ট্রনীতিগুলি। ... তবে এর মধ্যে মাস্তুলে কূ পালিত হয় কীভাবে, তা সহজবোধ্য নয়, অন্বেষণসাপেক্ষ। দ্র. **নরক**। ৬. ফরাসি ও ইংরেজি coup।

কূর্ম : ২. *কূ-রক্ষণের (ঋ-র) সীমায়ন সীমায়িত যাহাতে।* / কে (জলে) উর্ম্মি (বেগ) যাহার। (ব.শ.)। ৩. কচ্ছপ, কাছিম, কূর্ম্মাকার মুদ্রাবিশেষ, কূর্ম্মমুদ্রা, যোগীর আসনবিশেষ, কূর্ম্মাসন, বাহ্যবায়ুবিশেষ, কূর্ম্মাবতার — বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। (ব.শ.)। ৪. tortoise অর্থে কদাচিত প্রচলিত। ৫. আগেও অনেকবার বলা হয়েছে, এখন পুনরায় বলছি যে, প্রাচীন শব্দবিশারদগণ 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তা'কে বোঝাতেই শব্দ তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। **কূর্ম** শব্দটি তাঁরা সেভাবেই তৈরি করেছিলেন, tortoise-কে দেখে তাকে বোঝানোর জন্য তাঁরা কূর্ম শব্দটি তৈরি করেননি। মানুষের সমাজে একটি সত্তা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, যাকে বোঝানোর জন্য তাঁরা **কূর্ম** শব্দটি তৈরি করেছিলেন। সেই সত্তাটির রূপ-লক্ষণ-স্বভাবের সঙ্গে tortoise-এর মিল থাকায়, তাকেও তাঁরা **কূর্ম** শব্দে চিহ্নিত করেন। এখন প্রশ্ন হল, কী সেই সত্তা যার রূপ-লক্ষণ-স্বভাব 'কূর্ম' শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়? সেই সত্তা হল 'কূ-রক্ষণের সীমায়ন সীমায়িত যাহাতে'। **কূ** ও **কূপ** শব্দেই আমরা দেখেছি, গর্ত্তাদিতে কূ থাকতে পারে, সে গর্ত্ত বাহ্যিক, সামাজিক, মানসিক যাই হোক না কেন। তার কারণ, স্থানটি প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। সেই বিচ্ছিন্ন স্থানে পালিত কূ-কে পুনরায় যদি সীমায়িত করা হয়, তবে হয়ে যায় আরও বিচ্ছিন্ন। বাইরের সঙ্গে তার যোগ থাকে না আর। এর ফলে, সে নিজের স্বভাব নিয়ে যেমন টিকে থাকতে পারে, তেমনি একটানা একই স্বভাবের ও কর্ম্মের পুনরাবৃত্তির কারণে তার অবক্ষয় ও ক্রমান্বয়ে শেষ হয়ে যাওয়া ঠেকানো কঠিন। এরকম স্বভাবের সমাজব্যবস্থা যেমন হয়, এরকম স্বভাবের জীবব্যবস্থাও হয়। কূর্ম শব্দটি এই সত্তাকে নির্দেশিত করে। মনে রাখা ভাল, জীবজগতে সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণী হল tortoise বা কূর্ম। মানুষের সমাজে এই কূর্ম হল 'গ্রামসমাজ-ব্যবস্থা'। দ্র. **কূর্ম্মাবতার**।

কূর্ম্মপৃষ্ঠ দ্র. **কুম্ভক**।

কূর্ম্মাবতার : ১. কূর্ম্ম + অবতার। ২. *কূর্ম্ম রূপে যিনি অবতরণ করেছিলেন*। ৩. বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। বিষ্ণু এই অবতারে সমুদ্রমন্থনে মন্দর ও কল্পারম্ভে পৃথিবী পৃষ্ঠে ধারণ করেন। ইনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন। (ব.শ.)। ভগবান বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। দেব ও অসুররা অমৃতলাভের আশায় মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড করে ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করেন, কিন্তু ঐ পর্বত নিরাধার হওয়ায় জলমগ্ন হয়। তখন বিষ্ণু কূর্ম্মরূপে মন্দার পর্বতকে পৃষ্ঠোপরি ধারণ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **কূর্ম্ম** বলতে এখন আমরা tortoise বুঝি। তাকে আবার বিষ্ণুর অবতার ভাবতে আমাদের একটু লজ্জা-লজ্জা করে। মানুষ হয়ে শেষে কিনা tortoise-এর সামনে মাথা নোয়ানো! প্রকৃত অর্থ জানলে এই হীনম্মন্যতার কোনোই কারণ থাকে না, বরং আত্ম-সম্মানবোধ বাড়ে। দ্র. **দশাবতার**। কার্যত আমাদের দেবতারা থাকেন তিন লোকে — ব্রহ্মলোকে, স্বর্গলোকে, মর্ত্যলোকে। মর্ত্যলোকে কূর্ম্মের রূপটি সহজে চেনা যায়; তা হল তাঁর বাহ্যরূপ — tortoise। স্বর্গলোকে তার রূপটি হল ক্যাপিটাল বা পুঁজির বা নগদ নারায়ণের দ্বিতীয় অবতার রূপ, অর্থাৎ পাঁচভাগে বিভাজিত প্রাচীন গ্রামসমাজ ও তার অর্থব্যবস্থা। এর ক্রিয়া ও মানসচেহারার কথা **কূর্ম্ম** শব্দের ভিতরেই বলা হয়েছে। সমাজে নারায়ণের এই কূর্ম্ম রূপের আগেই ক্যাপিটাল বা নগদ-নারায়ণ 'আমার' বা 'মৎস্য' বা individual ownership রূপে মানবসমাজে এসে গেছেন। ক্যাপিটালের এই আদিরূপটিকে মার্কস থেকে শুরু করে কোনো অর্থনীতিবিদই শনাক্ত করেননি। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় পূর্বপুরুষেরা দেখেছিলেন নগদ নারায়ণ বা ক্যাপিটাল প্রথমে মৎস্য রূপে এবং তার পরে **কূর্ম্ম** রূপে মানুষের সমাজে আবির্ভূত হয়েছে। তাঁরা বুঝেছিলেন, মানবদেহের গ্রহণ-বর্জনই সমাজদেহের আমদানি ও রপ্তানি। অভাবের বস্তুগুলিকে বাইরে থেকে আনা এবং উৎপন্নের উদ্বৃত্তকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া সমাজশরীরের গহণ-বর্জন। এটির পরিমাণ যত কমানো যাবে, সমাজশরীরের কাঠামোটি ততই দীর্ঘজীবী হবে; এই ছিল তাঁদের ধারণা। অর্থাৎ, আমদানি-রপ্তানি করার প্রয়োজন যত কম হবে তত দীর্ঘজীবী হবে একটি সমাজকাঠামো। তার মানে, এমন সমাজকাঠামো গড়ে তোলা দরকার, যে বাইরের উপর নির্ভর করবে না, স্বনির্ভরতাই হবে যে-সমাজের বিশেষত্ব। তাহলে তো এমনভাবে সামাজিক-উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চালাতে হবে যাতে উদ্বৃত্ত না হয়, অভাবও না হয়; যাতে সমাজদেহের গ্রহণ-বর্জনের একটা বিশেষ মাত্রা থাকবে। কিন্তু এই সামাজিক অধ্যাত্মবিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজদেহের শারীরিক গঠন কাঠামোটি গড়ে তোলা যাবে কেমন করে?

বাস্তবে তার রূপায়ণ তাঁরা করেছিলেন দু-ভাবে। একদিকে সেই মহাপ্লাবনের সাগরজলে খাড়া করা হয়েছিল চার পা-ওয়ালা চতুর্বর্ণ-ভিত্তিক গ্রামসমাজের কাঠামো বা কূর্ম্মাবতারকে, আর তদ্রূপ অসংখ্য গ্রামসমাজের উপর দাঁড় করানো হয়েছিল দেশের প্রশাসনিক আমলাতান্ত্রিক (মন্দগতিসম্পন্ন) ব্যবস্থা স্বরূপ **মন্দর** পর্বতকে। অপরদিকে চিরশত্রু দেবাসুর বা আদি প্রাইভেট-সেকটর ও আদি পাবলিক-সেকটরকে হাত ধরাধরি করে জনসমুদ্র-মন্থনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল; আর মন্থনরজ্জু রূপে ব্যবহারের জন্য তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল সেকালের পুঁজির আধার 'সমাজের দুধ-সর পালক' সর্পকে। ফল হয়েছিল এই যে, ভারতসমাজকে প্রলয়ের তোড়ে ভেসে যেতে হয়নি।

কূর্ম্মাবতার অবতীর্ণ হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতের যে ইতিহাস, তাতে দেখা যায় সমাজে সম্প্রদায়-নেতা হিসেবে ব্রাহ্মণের জন্ম হয়ে গেছে; ব্রাহ্মণে-ব্রাহ্মণে বিরোধে জন্ম হয়ে গেছে ক্ষত্রিয়েরও। বৈশ্য ও শূদ্রের আদিপুরুষ হিসেবে অত্যন্ত অল্প সংখ্যায় নিষাদ ও পাষণ্ডেরও জন্ম হয়ে গেছে; যদিও মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তখনও বলতে গেলে খুবই কম; কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের উচ্চ মর্যাদা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যদিও অর্থসঞ্চয় করে ধনী হওয়াকে সেই **ব্রাহ্মণ** যারপরনাই ঘৃণা করে; যে-কারণে তাকে সম্প্রদায়ের নেতা করে দিতে সম্প্রদায়গুলি স্বভাবতই আগ্রহী ছিল। অতএব সম্প্রদায়কে চার ভাগে ভাগ করার জন্য যে-পূর্বশর্তের প্রয়োজন ছিল, মঞ্চে সেই চারটি চরিত্রই কমবেশি হাজির ছিল। কেবলমাত্র তাকে 'অফিসিয়ালি' ঘোষণা করতেই বাকি ছিল। **কূর্ম্মাবতারে** সেই ঘোষণাই করে দেওয়া হয়। যতদূর বোঝা যায়, ভারতসমাজ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগেই; অর্থাৎ, হিন্দুধর্মের জন্ম হওয়ার প্রায় ১৫০০ বছর আগেই।

বৈদিকযুগের সূত্রপাতের যে-সমাজকাঠামো — অজস্র সম্প্রদায়ে সমাজটি বিভক্ত ছিল এবং এক বা একাধিক মহর্ষি এক-একটি সম্প্রদায়কে চালাতেন — আগের প্রলয়ে ইতোমধ্যেই তা প্রায় ভেঙে পড়েছিল; তাই সমাজের পুনর্গঠন না-করে উপায় ছিল না। অতএব, এই নতুন কাঠামোয় গোটা সমাজকে পুনর্গঠন করে নেওয়ার প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। অত্যন্ত উৎসাহ ও উন্মাদনার সঙ্গে সম্প্রদায়গুলি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে এইভাবে সেকালের মহর্ষিদের এই গ্রামসমাজের নীতি অনুসরণ করে ভাঙা আধ-ভাঙা সম্প্রদায়-গুলিকে পুনর্গঠিত করে নিল। এবং নিঃসন্দেহে এ-ছিল এক বিরাট সামাজিক বিপ্লব। এর ফলে, উদ্ভবকালের সম্প্রদায়ভিত্তিক-মন্দির-কেন্দ্রিক বৈদিক সভ্যতা অতঃপর গ্রামসমাজভিত্তিক-মন্দিরকেন্দ্রিক বৈদিক সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। বৈদিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ শুরু হল।

পরিকল্পনাটি ছিল চমৎকার! প্রতিটি গ্রামসমাজ হবে পুরোপুরি কচ্ছপের মতো। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র হবে তার চার পা, মাথাটিতে থাকবে পরিকল্পনাকারী ব্যাসেরা এবং যখন প্রয়োজন সবই অন্তর্হিত হবে খোলসের ভেতরে। শ্বাসপ্রশ্বাস সে চালাবে খুবই কম, অর্থাৎ আমদানি-রপ্তানি সে করবেই না, করলেও অত্যন্ত কম। গ্রামে যা উৎপন্ন হবে, তা গ্রামের সদস্যদের প্রয়োজনের অনুপাতেই উৎপাদিত হবে এবং সেই প্রয়োজন মেটাতেই খরচ হয়ে যাবে। তাঁতি-মুচি-কামার-কুমোর-তেলি-তামলি-বদ্যিরা গ্রামের প্রয়োজন মেটাবে, পরিবর্তে তাদের প্রয়োজনও মিটিয়ে দেবে গ্রামেরই জেলে-কৈবর্ত হেলে-কৈবর্তরা, ক্ষত্রিয় ও পুরোহিতেরা। মনে রাখা ভাল, সে সময়ের প্রতি পেশার মানুষ, তা সে তাঁতি-মুচি-চাষা-জেলে-ক্ষত্রিয়-পুরোহিত যেই হোক, তার কাজকে ধর্ম বলে মনে করত এবং তার বিচ্যুতি করতে কিছুতেই রাজি হত না। গ্রামসমাজ ও তার বাসিন্দাকে

রক্ষা করতে না পারলে, কি ক্ষত্রিয় কি পুরোহিত, নিজেকে ঘোরতর অপরাধী বলে মনে করত। পরিবারের প্রতিপালন ভিন্ন ধনের আকাঙক্ষা করাকে 'বৃথা মাংস ভক্ষণ' বলে মনে করত প্রত্যেকেই এবং আদৌ কেউ যদি তা সত্ত্বেও ধনাকাঙক্ষা করত, সবাই তাকে ঘৃণা করত।

কচ্ছপকে উপর থেকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেও তার কোনো ক্ষতি হয় না। জলে সে যেমন অপ্রতিরোধ্য, তেমনি ডাঙাতেও। কেবল তাকে কোনোভাবে চিৎ করে দিলেই সে অক্ষম হয়ে পড়ে। তবে জীবনে চলার ক্ষেত্রে 'কর্ম্ম বিভাজন' করে চার পায়ের সাহায্যে এবং মাথাটি বের করে দেখে সে চলে বলেই তার নাম 'কূর্ম্ম'।

মানুষের আদিম যৌথসমাজ পরবর্তী যুগের পণ্যভিত্তিক সমাজে পরিণত হল কেমন করে? এই প্রশ্ন নিয়ে মার্কস সাহেব বড় বিপদে পড়েছিলেন। তিনি জেনে গিয়েছিলেন, পণ্য উৎপাদন শ্রম বিভাজন ঘটায় ও বাড়ায়, শ্রম বিভাজন পণ্য উৎপাদন ঘটায়। আবার পণ্য প্রবাহিত হয়ে কোনো যৌথসমাজে পৌঁছলে, সেই সমাজ ভেঙে গিয়ে পণ্যভিত্তিক সমাজে পরিণতও হয়ে যায়। তিনি দেখেছিলেন প্রাচীন ইয়োরোপের সমাজগুলিকে পণ্যভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় পণ্য ইয়োরোপে পৌঁছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে সব দেশের আগে পণ্য উৎপাদিত হল কীভাবে? সেখানে পণ্য উৎপাদন আগে হয়েছিল, নাকি শ্রম বিভাজন আগে হয়েছিল। গাছ আগে না ফল আগে? তিনি যেভাবে হোক জেনেছিলেন, 'Primitive Indian community made division of labour before production of commodity,' কিন্তু কীভাবে সেই division of labour করেছিল, তা তিনি জানতে পারেননি। আজ আমরা মার্কসবাদীদের জানিয়ে দিতে পারি, ভারত **কূর্ম্ম** মডেল গ্রহণ করে সেই শ্রম বিভাজন ঘটিয়েছিল।

কোপ (কোপন) : ১. ✓কুপ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কুপের (কু পালনের) আশ্রয় যাহাতে।* / যে হঠাৎ রাগে। (ব.শ.)। ৩. রোষ, ক্রোধ, প্রণয়কোপ, ধাতুদোষ, কোপশীল, ক্রোধন, কোপজনক। অস্ত্রের আঘাত, সাঙঘাতিক বা মর্ম্মান্তিক আঘাত, কোপ মারা। (ব.শ.)। ৪. anger অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দটির বাহ্যিক রূপ নাই, এটি কেবলমাত্র মানসলোকে সত্য। মানসলোকের কূপ, চিন্তাভাবনা অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ যেখানে, সেই মানসকূপের আধারকে কোপ বলে। এই কোপন যার থাকে, সে নিজেই কেবল ক্ষুদ্র-চিন্তার ঘেরাটোপে বা কূপে থাকে না, অন্যের মানসলোকেও সেইরকম **কূপ** প্রত্যাশা করে এবং কূপ না দেখতে পেলে কুপিত হয়। কখনো বা অন্যের মানসলোকে সে রকম কূপ খননে উদ্যোগী হয়। একে বলে **কোপ** মারা। কোপ, রোষ বা ক্রোধ এক কথা নয়, কোনো বস্তুকে 'এক কোপে কেটে ফেলা' যায়, কিন্তু 'এক রোষে বা এক ক্রোধে কেটে ফেলা' যায় না। দ্র. **চট (চোট)**।

'কুল্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকুল, অকুলন, অকুলান, অকুলীন, **অকূল**, **অনাকুল**, অনুকূল, আকুল, আউড়ে, আউদড়, আউদর, আউদল, আউল, আউলঝাউল, আউলা, আউলান, আউলিয়া, আউলী, আউলে, আউলা, আকুলতা, আকুলি, আকুলিত, আকুলিব্যাকুলি, আকুলীকরণ, কড়, কুড্য, কুরচি, কুরতি, কুল্, কুল, কল(লু)ইচণ্ডী, কুল-ওঝা, কুলক, কুলকজ্জল, কুলকণ্টক, কুলকন্যকা, কুলকন্যা, কুলকর, কুলকর্ত্তা, কুলকর্ম্ম, কুলকলঙ্ক, কুলকলঙ্কিনী, কুলকামিনী, কুলকুচা, কুলকুচো, কুলকুণ্ডলিনী, কুলকুণ্ডলী, কুলকুল, কুলক্রমাগত, কুলক্রিয়া, কুলক্ষয়, কুলখাকী, কুলখাগী, কুলগিরি, কুলগুরু, কুলঘ্ন, কুল(লু)ঙ্গি, কুল(লু)ঙ্গী, কুলচুর, কুলজ, কুলজন, কুলজি(জী), কুলঞ্জী, কুলট, কুলটা, কুলটী, কুলতন্তু, কুলতি (কুরচি, কুরতি), কুলতিথি, কুলতিলক, কুলত্থ, কুলত্রাণ, কুলদীপ, কুলদীপক, কুলদূষণ, কুলদেবতা, কুলধন, কুলধনী, কুলধর্ম্ম, কুলধারক, কুলধুরন্ধর, কুলধুর্য্য, কুলনক্ষত্র, কুলনন্দন, কুলনায়িকা, কুলনারী, কুলনাশ, কুলপঞ্জী, কুলপতন, কুলপতি, কুলপর্ব্বত, কুলপাংশন, কুলপাঁজী, কুল(লো)পানা, কুলপালক, কুলপৈত, কুলপুত, কুলপুত্র, কুলপ্রদীপ, কুলপ্রশস্তি, কুলপ্রসূত, কুলবতী, কুলবধূ, কুলবনিতা, কুলবন্ত, কুলবর্দ্ধন, কুলবহু, কুলবান, কুলবালা, কুলবিদ্যা, কুলবিপ্র, কুলব্রত, কুলভব, কুলভার্য্যা, কুলভি, কুলভূভৃৎ, কুলভূষণ, কুলভ্রষ্ট, কুলমজানী, কুলমর্য্যাদা, কুলযোষিৎ, কুললক্ষণ, কুলশীল, কুলশৈল, কুলসংখ্যা, কুলসন্ততি, কুলসম্ভব, কুলসেবক, কুলস্ত্রী, কুলস্থান, কুলস্থিতি, কুলহীন, কুলা, কু(কু)লা, কুলাঙ্কুর, কুলাঙ্গনা, কুলাঙ্গার, কুলাচল, কুলাচার, কুলাচার্য্য, কুলাচি, কুলাদ্রি, কুলান(নো), কুলান্ত, কুলান্বয়, কুলাপীড়, কুলাভিমান, কুলায়, কুলাল, কুলিক, কুলিঙ্গ, কুলিতা, কুলিয়ে-যাওয়া, কুলিয়াখাড়া, কুলি(লী)র, কুলি(লী)রক, কুলি(লী)শ, কুলিশী, কুলী, কুলীন, কুলুকুলু, কুলুত, কুলেখাড়া, কুলেশ্বর, কুলোদ্ভব, কুলোদ্ভূত, কুলোদ্বাহ, কুল্য, কুল্লে, কুল্লোল, কূল, কোঁড়, কোড়, কোর, কোল, কোলপট্টি, কোর, কোরক, কোলী, কোল, কোলক, কোলগিরি, কোলদারোগা, কোলদেব, কোলপাতলা, কোলপুচ্ছ (কঙ্ক), কোলম্বক, কোলশ(স)রা, কোলা, কোলাকুলি, কোলাকোলি, কোলাচ, কোলাচল, কোলানী, কোলাপোষ, কোলাবেঙ, কোলাব্যাঙ, কোলাহল, কোলি, কোলিখণ্ড, কোলিচূর্ণ, কোলিগুষ্ঠী, কোলী, ক্রুড়, ক্রোড়, প্রতিকূল, ব্যাকুল, ব্যাকুলি, ব্যাকুলিত, সকুল, সকুল্য, সঙ্কুল, সঙ্কুলান।

কুল্ = **কু**-এর লালন-লয়ন। **কুল** = **কু**-এর লালন-লয়ন যাহাতে।

কুল : ১. ✓কুল্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। কোলয়তি সংহতীভবতি — অমরকোষ টীকা। (ব.শ.)। ২. কুল্ = *কু-এর লালন-লয়ন। কুল = কু-এর লালন-লয়ন যাহাতে। (ভাল ও মন্দ) কু রূপ অভীষ্ট দান করে যে (-ক্রিয়া)।* ৩. অন্বয়, গোত্র, বংশ, সদ্‌বংশ, আচারাদি নবগুণান্বিত বংশ, কুলমর্যাদা, জাতি, রাশীকরণ, সংঘাত, সজাতীয়গণ, জনপদ, দেশ, গৃহ, ভবন, ষড়গবাকৃষ্টহলদ্বয়ে যত ভূমি কৃষ্ট হয় তাবদ্‌ভূমি, দেহ, অগ্র, নীলপ্রস্তর ... (ব.শ.)। ৪. 'বংশ' অর্থে কমবেশি প্রচলিত এবং **আকুল, ব্যাকুল, প্রতিকূল, সঙ্কুল,** এইরূপ উপসর্গ যোগে বহুল প্রচলিত। ৫. কোলয়তি শব্দটি বাংলায় হয়েছে কোলাকুলি। এই কোলাকুলি করা ও অতি ঘনিষ্ঠতার মাধ্যমে আরও

আরও সংহত হয়ে যাওয়া যার স্বভাবগত ক্রিয়া, সেই হচ্ছে কুল (cool)। জড়ো হওয়া বা জড়সড় হওয়া, শীতের যা লক্ষণ (দ্র. **শীত**), বহিরাক্রমণের ক্ষেত্রে আক্রান্তের স্বভাবে যা হয়, সেটাই সংহতি ক্রিয়া। এটি অস্তিত্বের **বরুণ**গুণ (কু)। আর তার বিপরীত ক্রিয়া হল কোলাকুলির অতি ঘনিষ্ঠতাজাত সংঘাত। তার থেকে প্রকাশিত হয় **উষ্মা**, যা বাইরে বেরোতে চায়, প্রকাশিত হতে চায়; যা সংহতির বিপরীত। এটি অস্তিত্বের **মিত্র**গুণ (কু)। যে ক্রিয়াকর্ম্ম থেকে এই দুই 'কু' গুণ জন্মায়, তাকেই বলে **কুল**। একদিকে বহিঃপ্রকাশের চেষ্টা ও অপরদিকে সংহত হওয়ার চেষ্টা, এই দুই গুণ নিয়ে **কুলকুল** করে যে বয়ে চলে। তার এই বয়ে চলাকে দুই দিক দিয়ে ঠেকিয়ে রাখে, বাইরে বেরিয়ে যেতে দেয় না যে **তীর**, তাকে সেকারণেই **কূল** বলে। আর, দুই বিপরীত গুণ নিয়ে তার সেই বয়ে চলার ক্রিয়াকর্ম্মকে বলে **কুলাচার**। এই কুল স্বভাবতই একটি প্রবাহ, বংশধারা, স্থির অচঞ্চল জড় নয়। এই **কুল** শব্দটিই ইংরেজিতে cool এবং cul(ture) হয়ে গেছে। মানুষের সমাজে সর্বাগ্রে যে কুলাচার প্রচলিত হয়েছিল, তাকেই অগ্রকুলাচার বলা যায়। শব্দটি সংস্কৃত বা বাংলায় নেই, রয়েছে ইংরেজিতে agriculture রূপে। ল্যাটিনে agere (= 'আগেরে' = সামনে থাকা, lead করা) শব্দটি এই অগ্রি-র ল্যাটিনায়িত রূপ।

স্বভাবতই কুল মানুষের বংশধারা, গোত্রধারা, জাতিধারা প্রভৃতিকে বোঝায়। তার থেকেই এসে যায় কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলগুরু, কৌলীন্য, কুলানো, কুলুইচণ্ডী, কুলওঝা, কুলপুরোহিত, কুলকর্ম্ম, কুলাঙ্গার, কুলকলঙ্ক ... প্রভৃতি অজস্র শব্দ। এমনকি কুলকুচা শব্দটিও কুল ও **কুচ**-এর যথার্থ ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ ধারণ করে। ৬. cool, cul(ture)।

কুলকুণ্ডলিনী, কুলকুণ্ডলী : ১. কুল + কুণ্ডলিনী। ২. *কুলের যে শক্তি কুণ্ডলী পাকিয়ে (জীবশরীরের ভিতরে 'জাগ্রত' বা 'শায়িত' অর্থাৎ সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়) থাকে*। ৩. কুলে (মূলাধারচক্রে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টনপূর্ব্বক) স্থিতা (অতএব) কুণ্ডলা-কৃতি শিবশক্তি। ৪. অপ্র.। ৫. মনে করা হয়, মানুষের শরীরের ভিতরে এরকম 'শিবশক্তি' শায়িত রয়েছে, তাকে জাগানো দরকার। জাগাতে পারলে মানুষ অনেক কিছু করবার যোগ্য হয়ে ওঠে। এরকম একটি বিশ্বাস তন্ত্রে সার্বিকভাবে বিদ্যমান। তন্ত্রসাধকেরা এই কাজে বিস্তর পরিশ্রম করেছেন এবং বহু অর্জন তাঁদের রয়েছে। সেই অর্জন নিয়ে আজকাল নানারকম ব্যবসা যেমন হয়, তেমনি নানারকম নোংরামিও হয়। কিন্তু তাই বলে সেরকম শক্তি মানুষের মধ্যে নেই, তা নয়। আছে। কিন্তু তাকে চেনাই এখন বেশ কঠিন, জাগানো তো বহু দূরের কথা। রবীন্দ্রনাথ তাকে চিনেছিলেন ও নিজের ভিতরে তাকে জাগাতে পেরেছিলেন বলেই মনে হয়। তাঁর 'বসন্তযাপন' প্রবন্ধের শুরুতে কথাটি তিনি এইভাবে বলেছেন — 'অভিব্যক্তির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়াতে মানুষের মধ্যে অনেক ভাগ ঘটিয়াছে। জড়ভাগ, উদ্ভিদ্‌ভাগ, পশুভাগ, বর্বরভাগ, সভ্যভাগ, দেবভাগ ইত্যাদি।' অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'মানুষ পৃথিবীর চেয়ে বড়, এমনকি ব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও বড়।' যাই হোক, এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে যতটুকু বোঝা গেছে তাহল, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে সুবিশাল শরীর (স্ট্রাকচার) ও প্রাণ ও মনন শক্তি (এনার্জি), তার অতি সংক্ষিপ্ত অণু রূপ হল মানুষ। সমুদ্রের এক বিন্দু জল যেমন সমুদ্রের প্রায় সমস্ত সংবাদের একক, অভিব্যক্তির শেষ কোঠার জীব বলে মানুষও তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃষ্ট একক। অসীম শক্তির বিন্দুরূপ রয়েছে তার শরীরে ও মনে। তাকে জাগানো সম্ভব, সক্রিয় করা সম্ভব। তবে তার জন্য শরীর ও মনের ভেতরে কোথায় কী রয়েছে, সেসব জেনেবুঝে তাকে জাগানোর কৌশল শেখা দরকার বা ষট্‌চক্র ভেদ করবার বিদ্যা অর্জন করা দরকার। দ্র. **ষট্‌চক্র**।

কুলগিরি (কুলপর্ব্বত, কুলাচল, কুলাদ্রি) : ১. কুল্ + গিরি, পর্ব্বত, ভূভৃৎ, শৈল। ২. *কুলের (তরফে অন্যদের নিকট থেকে) গ্রহণের ব্যবস্থা; কুলের (পর্ব্বে পর্ব্বে বিন্যস্ত) প্রশাসনব্যবস্থা*। ৩. কুলনামক শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত — মহেন্দ্র, মলয় প্রভৃতি। (জম্বুদ্বীপে — **মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিপাত্র**, এই সাতটি কুলপর্ব্বত আছে।) প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, ও শাকদ্বীপে এইরূপ সপ্ত সপ্ত (৪ × ৭ = ২৮টি) কুলপর্ব্বত আছে; পুষ্করদ্বীপে একটি মাত্র আছে। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পর্ব্বত সমুদ্র দ্বীপ নিয়ে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছিলেন আমাদের অগ্রজ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী দুর্গাদাস লাহিড়ী। তিনি সাতটি সমুদ্র ধরে নিয়ে তার মাঝে সপ্তদ্বীপ এবং প্রতিটি দ্বীপে সাতটি করে পর্ব্বত ধরে নিয়ে একটি মানচিত্র আঁকার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তা কিছুতেই বাস্তব পৃথিবীর মানচিত্রের সঙ্গে মেলেনি। ফলে, শেষমেষ তা পরিত্যক্ত হয়। কারণ এই পুরাণকথিত সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত এগুলি সবই মানসলোকের। তার সঙ্গে কিছু কিছু মিল রেখে ভারতের বিভিন্ন স্থানের নামকরণ হলেও, দুটো লোক সম্পূর্ণ সমান বা সমান্তরাল নয়। কিন্তু তাই বলে এই সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বতগুলি ছিল না বা নেই, এমন নয়। আছে, মানসলোকে ছিল, এখনও কিছু কিছু আছে। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সামাজিক সংগঠন বিলুপ্ত হয়েছে বলে কিছু কিছু কুলপর্ব্বত অর্থাৎ বিশাল বিশাল বংশ বা পরিবার এখন আর নেই। এর মধ্যে মহেন্দ্র হল যৌথসামাজিক সংগঠন, মলয় হল ধনতন্ত্রের সামাজিক সংগঠন। এগুলি এখনও অন্য অন্য নানা রূপে বিদ্যমান রয়েছে। দ্র. **মহেন্দ্র, মলয়, বিন্ধ্য**।

কুলদেবতা, কুলধর্ম্ম : দ্র. **কুল, দেবতা, ধর্ম্ম**।

কুলায় (কুলায়িকা) : ১. কুল + **আয়**। ২. কুলের আয় যাহাতে; যাহাতে সন্তানের বৃদ্ধি হয়। (ব.শ.)। ৩. নীড়, পাখীর বাসা, আশ্রয়স্থান, স্থানমাত্র, দেহ। কুলায়িকা = কুলায়বান, পক্ষিশালা, চিড়িয়াখানা। কুলায়নিলায় = নীড়ে উপবেশন, ডিমে তা দেওয়া। (ব.শ.)। ৪. nest অর্থে অল্পবিস্তর প্রচলিত। ৫. কুলের **আয়** বা বংশধরগণের আগমন বা বংশবৃদ্ধি কেবল পক্ষীকুলের হয় না, সর্বজীবেরই হয়। তন্মধ্যে পক্ষীর বিশেষত্ব এই যে, তার বাসা প্রধানত ও মূলত ডিম পাড়া ও ডিমে তা দিয়ে তার থেকে সন্তান লাভের জন্য নির্মীত হয়; এবং প্রায়শই বসবাসের জন্য নির্মীত হয় না। সেই কারণে তার বাসাকে **কুলায়** বলে। কেবল তাই নয়, পক্ষিশালা বা

চিড়িয়াখানাতে বহু কুলায় থাকে বলে তাকে কুলায়িকা বলা হয়। এবং কুলায়-এ বসে ডিমে তা দেওয়াকে বলে কুলায়নিলায়।

কূল : ১. ✓কূল্ (আবরণ) + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর আধারের লালন থাকে যাহাতে।* দ্র. **কুল** / যাহা জলপ্রবাহকে আবরিত করে। (ব.শ.)। ৩. নদী প্রভৃতির তীর, তট, প্রান্ত, সীমা, প্রবণভূমি, স্তূপ, রাশি, সৈন্যপৃষ্ঠ, তড়াগ, সরসী, অভীষ্টের পার। (ব.শ.)। ৪. bank of river অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কুল**। যার মাঝ দিয়ে **কুল** বা বংশধারা প্রবাহিত হয়ে থাকে তাকে **কূল** বলে। দ্র. **তীর**। ৬. collis (= high ground – Latin), cul (= custody, guard – Hebrew)।

কোল (কোলগিরি, কোলাচল) : ১. ✓কুল্ (সংঘাত) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কুলের আশ্রয় যাহাতে। (দ্র. **কুল**)।* / যে সংহত বা মিলিত থাকে। (ব.শ.)। ৩. প্লব, ভেলা, ক্রোড়, অঙ্ক, আলিঙ্গন, আশ্লেষ, বক্ষঃস্থল, নেটধীবর কন্যায় জাত সঙ্করজাতি-বিশেষ, শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ (ইহাদের নামান্তর 'চোল'), শনিগ্রহ, অস্ত্রবিশেষ, চিত্রক বৃক্ষ, পুরুবংশীয় কোলরাজের রাজ্য, কোলীবিকার, বদরী, কুল, শৃগালকোলি, শিয়াকুল, কোলিবৃক্ষ, পিপ্পলী, কুলগাছ, বদরীফল, বয়ের। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সমাজব্যবস্থা দেখা যায় না, সে অদৃশ্য কিন্তু অত্যন্ত সক্রিয়, তাকে বুঝতে হয়। তবে সত্তাটি কেবল মানুষের সমাজেই থাকে না, উদ্ভিদজগতেও থাকে। সে জগৎ দৃশ্য। প্রাচীন ভারতীয়গণ সামাজিক সত্তাগুলিকে চিনে নিয়ে উদ্ভিদজগতে সমজাতীয় সত্তাগুলির একই রকম নামকরণ করে দেন। তাতে সামাজিক সত্তাগুলিকে বোঝার উপায় হয়ে যায়।

কুল শব্দের বিশেষত্ব এই যে, তা অতিঘনিষ্ঠতার কারণে তপ্ত, বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয়ে শীতার্ত। ফলে কোল বহিরাক্রমণের ভয়ে সংহত বটে, অন্তর্কলহে তপ্ত এবং আভ্যন্তরীণ চিৎকারে অসংহতও বটে। আদিম যৌথসামাজিক সংগঠনকে বলা হত অশ্বত্থবৃক্ষ। সেটিই আদি কোলী। কিন্তু পরে পরে কোলীবিকার ঘটে। যৌথসমাজের নীতিতেই পৃথকভাবে থাকতে শুরু করে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী। সেগুলিকে তাদের চরিত্র অনুসারে শৃগালকোলি বা শিয়াকুল, কাঁটাঝোপওয়ালা বদরি (বয়ের) বা কুলগাছ ইত্যাদি নামে শনাক্ত করে মূলধারার সমাজ। কাউকে কাউকে এমনকি কপিকচ্ছু বা আলকুশির মতো ভয়ানক মনে করা হয়েছিল। মোট কথা সমাজেতিহাসের নিরিখে 'কোল' হল এক-পরিবার রূপে থাকার বা যৌথ থাকার নীতি মেনেচলা গণ-অস্তিত্ব মাত্র। তদ্রূপে থাকার জন্য যে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়, তাকেই সেকালে 'কোলগিরি' বা 'কোলাচল' বলা হত। আবার, কুলের যে বংশধারাটি শিশুরূপে দৃশ্যমান, সে যেখানে আশ্রয় পায়, তাকেও কোল বলা হয়। তার মানে সমগ্র কুল যেখানে আশ্রয় পায়, সেটি কোলগিরি; আর কুলের সর্বাগ্রগামী কুঁড়িটি যেখানে আশ্রয় পায়, সেটি মায়ের কোল। প্রতীকী অর্থে দাক্ষিণাত্যের পর্বতবিশেষকে কোলগিরি নামে চিহ্নিত করা হয়। ৬. ল্যাটিন colonia, ইংরেজি colony।

কোলদেব দ্র. **বরাহাবতার**।

কোলা (কোলাবেঙ, কোলাব্যাঙ) : ২. *(বড়) কুলে জাত যে; (যে ব্যাঙ বড় কুলে জন্ম লাভ করেছে)।* ৩. গর্তবাসী একপ্রকার বড় ভেক, কোলাবেঙ, খোলবেঙ। ৪. frog অর্থে প্রচলিত। ৫. ব্যাঙ সাধারণত দুরকমের — কোলাব্যাঙ ও কুনোব্যাঙ। যে প্রজাতির সদস্যরা এক-একটি বড় বড় বংশে বা পরিবারে থাকে, অর্থাৎ বড় কুলের সদস্য, তাদের কোলা বলে; তা সে মানুষের কুল হোক আর ব্যাঙের কুলই হোক। ১৯৬০-৬৫ সালেও বাংলাভাষীদের মধ্যে অনেক বড় বড় পরিবার ছিল, যাদের সদস্য সংখ্যা শতাধিক। এইরূপ পরিবারের সদস্যকে কোলা বলে। আজকাল এইরকম পরিবারের সংখ্যা খুবই কম। কোলাব্যাঙ এইরকম বড় ব্যাঙবংশের বা ব্যাঙকুলের অর্থাৎ বড় ব্যাঙ-পরিবারের সদস্য বলেই তাদের কোলাব্যাঙ বলা হয়ে থাকে। প্রথম বর্ষায় এরা দল বেঁধে গান গাইতে শুরু করে। এদের গায়ের রং কুল অনুসারে বিচিত্র বর্ণের। যখন গলা ফুলিয়ে গান গাইতে থাকে, তখন গলার নিম্নাংশ বেলুনের মতো ফুলে ওঠে। তাতেও নানা সুদৃশ্য রং থাকে। ব্যাঙ প্রজাতির মধ্যে এদের কৌলীন্য সর্বাধিক। মানুষের খাদ্য হিসেবে এই ব্যাঙের বা frog-এর কদরও খুব বেশি।

বড় কুল বা বংশের অর্থাৎ বড় পরিবারের সুবিধা যেমন আছে, অসুবিধাও রয়েছে। সুবিধার দিকটি হল নিরাপত্তার দিক, আর অসুবিধার দিকটি হল এক স্থানে তিন-চারপুরুষ কাটানোর পর পরিবারের সদস্যরা বাহ্যিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে ক্রমশ ছোট হয়ে যায়। যে কারণে বংশচাষী বা বাঁশচাষীরা তাঁদের বাঁশঝাড়ের দু-তিন প্রজন্মের পরই বাঁশমুড়া তুলে নতুন জায়গায় রোপন করেন। কারণ একই ঝাড়ে তিন প্রজন্ম হয়ে গেলে বাঁশগুলি আকারে ক্রমশ ছোট হয়ে যায়; প্রথম প্রজন্মের বাঁশের মতো অত বড় হয় না আর। মানুষের ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। তিন-চার পুরুষ একই ভিটেতে রয়েছে, এরকম যে কোনো বড় পরিবারের সদস্যদের বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করুন, দেখবেন, মানুষগুলো যেন কুয়োর ব্যাঙ হয়ে গেছে। তাদের চিন্তাভাবনা সেই পরিবারের চিন্তাভাবনা-কালচারের দ্বারা এমনভাবে সীমায়িত হয়ে গেছে যে, তাকে কেবলমাত্র একটি কুয়ার সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। ব্যাঙের বেলায় এই 'কোলা' এখনও প্রচলিত থাকলেও মানুষের বেলায় এই কোলা শব্দটির প্রচলন এখন আর নেই বললেই চলে। তবে মধ্যযুগে, ১৫০০-১৭০০ খ্রিস্টাব্দে, বাংলাভাষীদের সমাজে মানুষের সন্তানকেও কোলাব্যাঙ বলে বোঝানোর চল ছিল, বিশেষত বড় যৌথ পরিবারের সদস্যদের ঠাট্টা করে কোলাব্যাঙ বলা হত। অন্তত পক্ষে বাংলাভাষীর ছড়ায় তার স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। গ্রামসমাজের (দ্র. **কূর্মাবতার**) যৌথতার নীতি অমান্য করে যে তাঁতি বিক্রির উদ্দেশ্যে কাপড় বোনে, তার বাড়িতে এই বড় পরিবারের ছেলে গিয়ে থাকে, কাজ করে। আপন সুখ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। গ্রামসমাজের মানুষ তাকে ঠাট্টা করে বলে — 'তাঁতির বাড়ি / ব্যাঙের বাসা / কোলাব্যাঙের ছা / খায় দায় গান গায় / তাইরে নাইরে না।' (অর্থাৎ ছোট স্বপ্নের অধিকারী বড় পরিবারের ছেলে এখন তাঁতির বাড়িতে গিয়ে থাকে। সেখানে সে

কেবল নিজের পেট ভরিয়ে নিজের দৈহিক সুখ নিয়ে থাকে, আপন পরিবারের কথা ভাবে না। যা চলছে তাকেই ঠেলে নিয়ে চলে, যা চলে না তাকে চালায় না, এবং এভাবে সে সমাজে-পরিবারে-ইতিহাসে কিছুই যোগ করে না।) এরকম আরও আছে। যেমন — 'খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে / ছিপ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে।' (অর্থাৎ পরিবারের রোজগারে খায় যে ছেলে, সে গেল সমাজসংসারের দুধ-সর-ক্ষীর যে ধারায় প্রবাহিত হয়, সেই ধারা থেকে কিছু ব্যক্তিমালিকানা দখল করে আনতে। কিন্তু তার জন্য তো কিছুটা লুকোনো-চুরোনোর বিদ্যা থাকা দরকার, ছুপাছুপি কারবারের কৌশল ব্যবহার করা দরকার অর্থাৎ ছিপ দরকার। তার সেই **ছিপ** কেড়ে নিয়ে চলে যায় বড় পরিবারের ছোট-স্বপ্নদেখা সদস্য কোলাব্যাঙ; আর যেটুকু ব্যক্তিমালিকানা বা মাছ ধরা গিয়েছিল, তা নিয়ে যায় **চিল** বা hawk, যে চিল্লিয়ে তার পণ্য বিক্রি করে বা হকার-(hawker)-ই করে।

কোলাকুলি : ১. কোলা + কুলি। ২. *যে ক্রিয়ায় পুরুষ প্রকৃতি পরস্পরকে কোলে টেনে নেয়; যাহাতে কোলে আনয়ন ও কুলের বৃদ্ধিসাধন করা হয়।* ৩. পরস্পরের কোলে-কোলে বা বুকে-বুকে সংশ্লেষ, পরস্পরের আলিঙ্গন। (ব.শ.)। ৪. শুধুমাত্র দৈহিকভাবে কিন্তু যথার্থে প্রচলিত। ৫. সংস্কৃত ধারণার উপর নির্ভর করে নিজেদের অসীম সৃজনীশক্তির সাহায্যে কোলাকুলি (হলাহলি, গলাগলি) শব্দটি সৃষ্টি করেছিলেন মধ্যযুগের কবি-পদকর্তারা। কোলাকুলি, গলাগলি শব্দের মানে একালের বাংলাভাষীরাও এমনিতেই বুঝতে পারেন, বলে দিতে হয় না। কিন্তু '**হলাহলি**' এখন আর বুঝতে পারেন না, তাই তা এখন অপ্রচলিত হয়ে গেছে। তবে শব্দটির খানিকটা অর্থ রয়েছে **কোলাহল** শব্দে। দ্র. **কেশাকেশি**।

কোলাহল (ঘোর-কোলাহল সংগ্রাম) : ১. কোল (সংঘাত) + আ - ✓হল্‌ + অচ্‌। (ব.শ.)। ২. *যাহাতে কোলে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ থাকে।* ৩. দূরগামী মিলিত বহুবিধ অব্যক্ত ধ্বনি; কলকল, গণ্ডগোল, শোরগোল। (ব.শ.)। ৪. hue and cry অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **অদ্রিকা**। সংহত মিলিত দলবদ্ধ থাকলে বহিরাক্রমণ (বা শীত) থেকে যেমন সুরক্ষা মেলে, তেমনি ঘেঁষাঘেঁষির কারণে কখনো কখনো সংঘাতও (উষ্ণতাও) হয়। পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ থেকে এই সংঘাত বাড়ে, চিৎকার-চেঁচামেচিতে পর্যবসিত হয়। তখন তাকে কোলাহল বলে। কিন্তু আকর্ষণ-বিকর্ষণ যখন অম্লমধুর পর্যায়ে থাকে, যাকে বলা হয় 'চুলকানির আরাম', তখন তাকে বলে হলাহলি। মানবসমাজে পারস্পরিক 'প্রতিযোগিতা'র পক্ষে আজকাল যে খুব জোরালো সওয়াল করা হয়, সেই প্রতিযোগিতা এই হলাহলির অংশবিশেষ। এই হলাহলি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলেই তা অস্তিত্বের বিদারণকারী 'হল সদৃশ বিদারক (আহল)' বা 'হলাহল' রূপে দেখা দেয়। তখন যে চিৎকার, সেটিই কোলাহল। দ্র. **গিরিকা**।

'কৃ' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকর, অকরণ, অকরণী, অকরণীয়, অকর্ণ, অকর্ত্তব্য, অকর্ত্তা, অকর্ম্ম, অকর্ম্মক, অকর্ম্মকৃৎ, অকর্ম্মণ্য, অকর্ম্মা, অকাজ, অকার, অকারণ, অকারান্ত, অকারিয়া, অকার্য্য, অকার্য্যকারী, অকিঞ্চিৎকর, অকৃত, অকৃতকর্ম্মা, অকৃতজ্ঞ, অকৃতদার, অকৃতধী, অকৃতবুদ্ধি, অকৃতা, অকৃতাত্মা, অকৃতার্থ, অকৃতাস্ত্র, অকৃতি, অকৃতী, অকৃতোদ্বাহ, অকৃত্ত, অকৃত্য, অকৃত্রিম, অকেজো, অক্রিয়, অক্রূর, অঙ্গীকরণ, অঙ্গীকার, অঙ্গীকার্য্য, অঙ্গীকৃত, অতিকৃচ্ছ্র, অতিকৃত, অতিপ্রকৃত, অতিপ্রাকৃত, অধঃকরণ, অধঃকৃত, অধিকরণ, অধিকার, অধিকারী, অধিকৃত, অনধিকার, অনপকরণ, অনপক্রিয়া, অনপাকরণ, অনপাকর্ম্ম, অনহঙ্কার, অনাবিষ্কৃত, অনুকরণ, অনুকৃত, অনুপকর্ত্তা, অনুপকারী, অনুপস্কৃত, অনুপাকৃত, অপকরণ, অপকর্ত্তা, অপকার, অপকৃত, অপকৃত্য, অপক্রিয়া, অপ্রকৃত, অপ্রকৃতি, অপ্রতিকার, অপ্রাকরণিক, অপ্রাকৃত, অবশ্যকর্ত্তব্য, অবস্কর, অবিকার, অবিকারী, অবিকার্য্য, অবিকৃত, অবিকৃতি, অবিক্রিয়, অবিক্রিয়া, অব্যতিকর, অব্যাকৃত, অভিসংস্কার, অয়স্কার, অসংস্কার, অসকৃৎ, অস্বীকার, অহঙ্কার, আকর, আকরজ, আকরবিক্রয়, আকরিক, আকরী, আকরোদ্ভব, আকর্ণ, আকর্ণন, আকার, আকারগুপ্তি, আকারণ, আকারপ্রকার, আকারসদৃশ, আকারিত, আকারেঙ্গিত, আকৃতি, আক্রেতি, আবিষ্কার, আগর, আগল, উপকরণ, উপকার, উপকৃত, কইল, কংসকার, কড়া(রা)র, কণ্ণ, কত্ত্র, কত্তাল, কম্ম, কর, কর (গর) , করক, করকচ, করকচি, করকঞ্জ, করকটে, করকমল, করকর, করকলিত, করকিসলয়, করকুষ্ঠি, করকোষ, করকোষ্ঠী, করগ, করগ্রহ, করগ্রহণ, করঘাত, করঙ্ক, করঙ্গ, করচা, করজ, করজোড়, করঞ্চ, করঞ্জ, করঞ্জক, করঞ্জা, করট, করড়া, করড়ী, করড়ীয়া, করণ, করণ-কারণ, করণাধিপ, করণাপাটব, করণী, করণীক, করণীয়, করণ্ড, করণ্ডক, করত, করতব, করতল, করতলামলক, করতা, করতার, করতাল, করত্তালিকা, করতালী, করতোয়া, করত্রাণ, করদ, করদন্ত, করদায়, করদীকৃত, করধা, করধৃত, করন্দা, করন্যাস, করপত্র, কর্‌পল্লব, করপাল, করপীড়ন, করপুট, করপুটাঞ্জলি, করপৃষ্ঠ, করপ্রণী, করপ্রদ, করপ্রাপ্ত, করবদর, করবাত, করবাল, করবালিনী, করবী, করবীর, করভ, করভূ, করভোরূ, করম, করমচা, করমজা, করমর্দ্দ, করমর্দ্দক, করমালা, করযুক্ত, করম্ব, কররুহ, করলা, করশাখা, করশীকর, করশুদ্ধি, করসাদ, করসান, করসূত্র, করস্ফোট, করস্বন, করহীন, করা, করাকরি, করাগ্র, করাত, করার, করাল, করাস্ফোট, করি-অরি, করিকর, করিকা, করিতকর্ম্মা, করি(রী)ম, করিয়া, করি(রী)র, করী, করীন্দ্র, করীশ্বর, করেণু, করোয়া, করোয়াত, কর্ক, কর্কট, কর্কটক, কর্কটক্রান্তি, কর্কটশৃঙ্গি কা, কর্কটশৃঙ্গী, কর্কটি, কর্কটিকা, কর্কটিমাটি, কর্কন্ধু, কর্কর, কর্‌কর্‌, কর্কশ, কর্কোট, কর্কোটক (কাকরোল), কর্চ্চরিকা, কর্জ্জ, কর্জ্জল, কর্ণ, কর্ণধার (ফুটো ধরে যে), কর্ত্তব্য, কর্ত্তা, কর্ত্তাভজন, কর্ত্তাভজা, কর্ত্তুম, কর্ত্তৃক, কর্ত্তৃকা, কর্ত্তৃত্ব, কর্ত্তৃবাচ্য, কর্দ্দম, কর্দ্দমিত, কর্পট, কর্পটি, কর্পটিক, কর্পটী, কর্পাস (corpus), কর্ব্বুর, কর্ম্ম, কর্ম্মকর, কর্ম্মকর্ত্তা, কর্ম্মকাণ্ড, কর্ম্মকার, কর্ম্মকারী, কর্ম্মকৃৎ, কর্ম্মক্ষম, কর্ম্মক্ষেত্র, কর্ম্মগতি, কর্ম্মচণ্ডাল, কর্ম্মচাণ্ডাল, কর্ম্মচারী, কর্ম্মচেষ্টা, কর্ম্মজ, কর্ম্মজন্য, কর্ম্মজ্ঞ, কর্ম্মঠ, কর্ম্মণ্য, কর্ম্মদুষ্ট, কর্ম্মদোষ, কর্ম্মধারয়, কর্ম্মধ্বংস, কর্ম্মনাশা, কর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ম্মন্যাস, কর্ম্মপথ, কর্ম্মপাক, কর্ম্মপাশ, কর্ম্মফল, কর্ম্মফের, কর্ম্মবন্ধ, কর্ম্মবশ, কর্ম্মবিধি, কর্ম্মবিপর্য্যয়, কর্ম্মবিপাক, কর্ম্মবিশেষ, কর্ম্মব্যতিহার,

কর্ম্মভূ, কর্ম্মভূমি, কর্ম্মমার্গ, কর্ম্মমাস কর্ম্মমীমাংসা, কর্ম্মযোগ, কর্ম্মরঙ্গ, কর্ম্মশাল, কর্ম্মশালা, কর্ম্মশীল, কর্ম্মশূর, কর্ম্মশৌচ, কর্ম্মসংন্যাস, কর্ম্মসঙ্গ, কর্ম্মসচিব, কর্ম্মসন্ন্যাস, কর্ম্মসম্ভব, কর্ম্মসাক্ষী, কর্ম্মসাধন, কর্ম্মসূত্র, কর্ম্মস্থান, কর্ম্মাঙ্গ, কর্ম্মাজীব, কর্ম্মাধ্যক্ষ, কর্ম্মানুবন্ধ, কর্ম্মানুরূপ, কর্ম্মান্ত, কর্ম্মান্তর, কর্ম্মান্তিক, কর্ম্মার, কর্ম্মার্হ, কর্ম্মিষ্ঠ, কর্ম্মী, কর্ম্মেন্দ্রিয়, কল্মষ (কলুষ), কাঁকড়া, কাঁকড়ি, কাঁকর, কাঁকরোল, কাঁকলাস, কাঁকুড়, কাঁকুড়ি, কাকরোল (কর্কোটক), কাজ, (cause) কাজকাম, কাজি, কাজিয়া, কাজেই, কাণ, কাণা, কাণ্ডার, কাণ্ডারি(রী), কাণ্ডী, কাণ্ঢার, কাতা, কাদা, কাদাখেঁউড়, কাদাখেঁড়ু, কাদাখোঁচা, কাদাপাটা (সরদাল), কাপড় (কর্পট), কাপড়-চোপড়, কাপড়ি, কাপড়ীয়া, কাপুড়ে, কাপড্যা, কাপাস, কাম, কামকলহ, কামকলা, কামকাম, কামকামী, কামকার, কামকৃৎ, কামকৃত, কামক্ষুধা, কামগ, কামগতি, কামগন্ধ, কামগম, কামগামী, কামচর, কামচার, কামদার, কামপাল, কামপূর, কামপ্রদ, কামবর, কামবর্ষী, কামবান, কামবাসী, কামবীর্য্য, কামবৃত্ত, কামভূপ, কামরূপ, কামল, কামলা, কামশক্তি, কামশর, কামশাসন, কামশাস্ত্র, কামসখ, কামসিন্দুর, কামসু, কামসূত্র, কামহৈতুক, কামা, কামাই, কামাক্ষী, কামাখ্যা, কামাগ্নি, কামাঙ্কুশ, কামাতুর, কামাত্মজ, কামাত্মা, কামাধিষ্ঠান, কামান(নো), কামান (কামানল), কামানল, কামানি(নী), কামান্ধ, কামাবসায়, কামায়ুধ, কারক, কামার, কামারণ্য, কামার্ত্ত (বেকার), কামাল, কামাসক্ত, কামি, কামিক, কামিক্ষা(ক্ষে,খ্যা)কামিত, কামিন, কামিনা(ন্যা), কামিলা(ল্যা), কামেশ্বর, কামোদ, কামোদ্দীপক, কামোপহত, কায(জ), কার, কারক, কারকিত, কারকুন, কারখানা, কারচুপি, কারণ, কারণকথা, কারণকারণ, কারণগুণ, কারণজল, কারণতোয়, কারণবারি, কারণমালা, কারণশরীর, কারণসলিল, কারণা, কারণাব্ধি, কারণাব্ধি, কারণার্ণব, কারণিক, কারণোত্তর, কারণ্ডব, কারদানি(নী), কারপরদাজ, কারবার, কারয়িতব্য, কারসাজি(জী), কারা, কারাগার, কারাগৃহ, কারাবর, কারি(রী), কারিকর (কারিগর), কারিকা, কারিত, কারিন্দা, কারী, কারু, কারুজ, কার্কশ্য, কার্ত্তবীর্য্য, কার্ত্তস্বর, কার্পট, কার্পাস, কার্পাসাস্থি, কার্পাসিক, কার্ম্মণ, কার্ম্মার, কার্ম্মিক, কার্ম্মুক, কার্য্য, কার্য্যকর, কার্য্যকরী, কার্য্যকারণ, কার্য্যকাল, কার্য্যকুশল, কার্য্যক্রম, কার্য্যক্ষম, কার্য্যগৌরব, কার্য্যঞ্চ, কার্য্যতঃ, কার্য্যদর্শন, কার্য্যদর্শী, কার্য্যনির্ণয়, কার্য্যনির্ব্বাহ, কার্য্যনিষ্পত্তি, কার্য্যনিবৃত্তি, কার্য্যপরম্পরা, কার্য্যপরিচ্ছেদ, কার্য্যবশ, কার্য্যবশতঃ, কার্য্যবান, কার্য্যবিনিময়, কার্য্যবিনির্ণয়, কার্য্যবিপত্তি, কার্য্যব্যসন, কার্য্যশেষ, কার্য্যসমাধা, কার্য্যসমাধান, কার্য্যসাধক, কার্য্যসাধন, কার্য্যসিদ্ধি, কার্য্যস্থান, কার্য্যহন্তা, কার্য্যহানি, কার্য্যাকার্য্য, কার্য্যাতিপাত, কার্য্যাধিপ, কার্য্যানুরোধ, কার্য্যান্ত, কার্য্যান্তর, কার্য্যার্থ, কার্য্যিক, কার্য্যী, কার্য্যেক্ষণ, কার্য্যোদ্ধার, কার্য্যোদ্যোগ, কার্য্যোপেক্ষা, কিঅ, কিচ, কিচকিচ, কিন্তু, কিপ্পিন, কিয়া, কিরা, কিরে, কুর, কুরকার, কুরকুটে (গুরগুটে), কুরকুর, কুর(রু)শী, কুরনি, কুরগু, কুরতি, কুর্ত্তি, কুর(রু)বক, কুরবানী (কুর্ব্বন্), কুরর, কুরল, কুরস, কুরী, কুরু, কুরুক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্রীযোগ, কুরুজাঙ্গল, কুরুন্ট, কুরুন্টক, কুরুণ্ডিয়া, কুরুণ্ডে, কুরুয়া, কুরুরাজ, কুরুরায়, কুরূদ্বহ, কুর্কুর, কুর্দ্দ, কু(কৃ)র্দ্দন, কুর্পর, (কূর্পর), কু(কৃ)র্পাস, কু(কৃ)র্পাসক, কুল্ম, কূর্চ্চ, কৃ, কৃকলাস, কৃকবাকু, কৃচ্ছ্র, কৃচ্ছিত, কৃত, কৃতক, কৃতকর্ম্মা, কৃতকাম, কৃতকার্য্য, কৃতকাল, কৃতকৃতার্থ, কৃতকৃত্য, কৃতকৌতুকমঙ্গল, কৃতক্রিয়, কৃতক্ষণ, কৃতঘ্ন, কৃতজন্মা, কৃতজ্ঞ, কৃতবীর্য, কৃতদার, কৃতদাস, কৃতধী, কৃতনিশ্চয়, কৃতপূর্ব্ব, কৃতবর্ম্মা, কৃতবিদ্য, কৃতবীর্য্য, কৃতবুদ্ধি, কৃতবেতন, কৃতবেদী, কৃতবেশ, কৃতমতি, কৃতযুগ, কৃতলক্ষণ, কৃতশিল্প, কৃতশৌচ, কৃতশ্রম, কৃতসংজ্ঞ, কৃতসংস্কার, কৃতসঙ্কল্প, কৃতসঙ্কেত, কৃতহস্ত, কৃতা, কৃতাকৃত, কৃতাঙ্ক, কৃতাঞ্জলি, কৃতাঞ্জলিপুট, কৃতাত্মা, কৃতান্ত, কৃতান্তদলনী, কৃতান্ন, কৃতাভিষেক, কৃতার্থ, কৃতালয়, কৃতাস্ত্র, কৃতাহ্বান, কৃতি (কট, দ্র. আকখুটে), কৃতিত্ব, কৃতী, কৃতোদক, কৃতোদ্বাহ, কৃতোপকার, কৃতোপভোগ, কৃত্য, কৃত্যবিৎ(দ), কৃত্যা, কৃত্যাকৃত্য, কৃত্রিম, কৃত্রিমপুত্র, কৃত্রিমবন, কৃসর, ক্রতু, ক্রিয়া, ক্রিয়াযোগ, কেঁ(কে)কলাস, কেঁদুয়া (কেওদা), কেঁদো, কেওদা, কেণ্ডা, কেজো, কেরআ(বা)ল, কেরুআ(বা)ল, কেরোয়াল, কেরল, কেরাঞ্চি(ঞ্চী) (কার্য্য, carrier), কেরানি, কেরামত (কৃ-মতি), কেরায়া (carriage), কোঁকড়, কোঁকড়, কোঁড়, কোর, কোরক, কোরা, কোরান, কোরাল, কৌরব, কৌরবেয়, কৌরব্য, ক্রকচ, ক্রকচব্যবহার, ক্রতু, ক্রথকৈশিক, ক্রাকচিক, ক্রিয়া, ক্রিয়ান্তর, ক্রিয়ান্বিত, ক্রিয়াফল, ক্রিয়াবশ, ক্রিয়াবাচক, ক্রিয়াবাদী, ক্রিয়াবান, ক্রিয়াবিধি, ক্রিয়াবিশেষণ, ক্রিয়াযোগ, ক্রিয়ালোপ, ক্রিয়াশক্তি, ক্রিয়াসমভিহার, ক্রিয়াসাতত্য, ক্রিয়াসিদ্ধি, ক্রিয়েন্দ্রিয়, খিচড়ি, খিচুড়ি, গুরগুটে, তস্কর, নিকর, নিকার, নিরাকরণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিষ্কারণ, নিষ্কৃত, নিষ্ক্রিয়, প্রকরণ, প্রকার, প্রকৃত, প্রকৃতি, প্রকৃতিস্থ, প্রক্রিয়া, প্রতিকার, প্রতিকৃতি, প্রতিক্রিয়া, প্রত্যুপকার, প্রাকার, প্রাকৃত, প্রাকৃতিক, ফুৎকার, ফুৎকৃত, বিকার, বিকিরণ, বিকৃত, বিকৃতি, বিক্রিয়া, বিপ্রকার, বৈকৃত, ব্যাকরণ, মকর, মকরন্দ, মকরালয়, মকরিকা, ষট্‌কর্ম্ম, সংস্করণ, সংস্কার, সংস্কারক, সংস্কৃত, সংস্কৃতি, সকর্ম্মক, সকারণ, সৎকার, সবিকার, সমানাধিকরণ, সমীকরণ, সহকার, সহকারী, সাকার, সুকর, সুকর্ম্ম, সুকৃৎ, সুকৃত, সুকৃতি, সুসংস্কৃত, স্বীকরণ, স্বীকার, স্বীকার্য্য, স্বীকৃত, স্বীকৃতি, হাহাকার।

কৃ = (জগৎ) করণ, (জগৎ) কারী। (দ্র. ঋ। চোখে ধূলিকণা পড়লে আমরা বলি 'চোখ করকর করছে'। এই কর শব্দের অর্থটিকে সঠিক ভাবে অনুভব করতে পারলে কৃ ক্রিয়াটির মূলে যাওয়া যায়। এতে একটি ধূলিকণা বা বালুকণা রয়েছে, যে কিনা চোখের একটি বিশেষ বিন্দুতে ঘুরছে। কৃ ঠিক তাই। তাতে একটি উপকরণ আবর্তিত হতে থাকে। কিন্তু সে নিজে থেকে আবর্তিত হচ্ছে না বা ঘুরছে না, কেউ তাকে ঘোরাচ্ছে। যে শক্তি তাকে ঘোরাচ্ছে, সে হল ক; আর সেই শক্তি-প্রযুক্ত ঘূর্ণমান ধূলিকণা হল কৃ। তাকেই আমরা বলি 'করকর' করছে। অর্থাৎ কৃ-র সরল রূপ হল কর। এই করই প্রসারিত বিস্তারিত হতে হতে করণ, করা, কার, কারণ, কারখানা, ক্রিয়া, কর্তা, কারুশিল্প ইত্যাদি সর্বপ্রকারের কর-যুক্ত শব্দে পরিণত হয়েছে।)

কৃ : ১. ক + ঋ। ২. *শক্তিযোগে উপকরণ আবর্তিত যাহাতে।* ৩. করণ, নির্ম্মাণ, সৃষ্টি, উৎপাদন, জনন, প্রণয়ন, রচনা, পালন, অনুবর্ত্তন, গ্রহণ, ধারণ, নিয়োজন, শব্দোচ্চারণ, ধর্ষণ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র। ৫. এই 'কৃ' ক্রিয়া সম্ভবত পৃথিবীর সব ভাষাতেই রয়েছে। ইংরেজিতে এটি রয়েছে cre(ate) রূপে। বাংলায় এই কৃ থেকে কার হয় এবং

সেই শব্দটি উপসর্গাদি যোগে অজস্র শব্দের সৃষ্টি করে। যথা — **অধিকার, অপকার, আকার, প্রকার, উপকার, নিরাকার, পরিষ্কার, পুরস্কার, তিরস্কার, আবিষ্কার, বিকার, সংস্কার; অধিকরণ, প্রকরণ, অপকরণ, নিরাকরণ, পুরস্করণ, সংস্করণ** ... ইত্যাদি। **৬.** ইংরেজি create, আরবি - কারামত (বাংলা - কেরামতি), ফারসি - কারওবার (বাংলা - কারবার)।

অকরণ : ২. করণ নেই যাহাতে। / যাহার করণ (দেহেন্দ্রিয়াদি) নাই; যাহার নির্ম্মাণ নাই। (ব.শ.)। ৩. সর্ব্বকরণহীন, নিরাকার, অকৃত্রিম, স্বাভাবিক। ... (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. করার উপায় (হাতিয়ার) নেই যে সত্তাগুলির, সেগুলিকে যেমন এই শব্দের দ্বারা শনাক্ত করা যায়; তেমনি যে সত্তাগুলিকে তৈরি বা বানানো যায় না, সেগুলিকেও এই শব্দের দ্বারা বোঝানো যায়। সেই কারণে এই শব্দের অর্থে 'সর্ব্বকরণহীন'কে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় অকৃত্রিমকেও। এ শব্দ **'অজ'** শব্দের মতো।

অহঙ্কার : দ্র. **অন্তঃকরণ**

কর : ১. ✓কৃ + অ (ট) - কর্তৃবাচ্যে; ✓কৃ + অ (অপ্) - কর্ম্মবাচ্যে; ✓কৃ + অ - করণবাচ্যে; ক + ✓রা (দান) + ক (অ) - কর্তৃবাচ্যে; (ব.শ.)। ২. *কারী (বা করণের শক্তি, প্রযুক্তি, মালিকানা, কারণ বা cause কজ > কাজ ইত্যাদি) রহে যাহাতে।* / যাহা দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়। (ব.শ.)। ৩. কারক, জনক, বর্দ্ধক, কিরণ, বর্ষোপল, করকা, বাহু, হস্ত বা হাত, মণিবন্ধ হইতে হস্তের শেষাংশ, পাণি, অঙ্গ লিপবর্ব্ব, হস্তিশুণ্ড, পাঞ্জা, ২৪-আঙুল পরিমাণ, হস্তানক্ষত্র, রাজস্ব, খাজনা, শুল্ক, করা। ৪. প্রায় অবিকল প্রচলিত। ৫. উপরোক্ত প্রচলিত অর্থগুলির প্রত্যেকটিতে 'কারী' থাকে বলে তারা প্রত্যেকেই 'কর' পদবাচ্য। এই 'কর' এমন একটি শব্দ, যার কোনো অর্থই পরিত্যক্ত হয়নি, প্রায় সমস্ত অর্থগুলিই এখন তাদের প্রতীকী রূপে বহাল আছে, এবং সেই বিচারে এই শব্দটি তার আদি রূপেই আজও প্রচলিত রয়েছে। তাছাড়া, অধিকাংশ উপসর্গ কর ও করজাত সমস্ত শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রচুর শব্দ সৃষ্টি করে থাকে। উপসর্গ ২২ টি তো রয়েছেই, আর কর ও করজাত শব্দও অনেকগুলি যথা — **কর, কার, কৃত, করণ, কৃতি, ক্রিয়া** ... ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকের সঙ্গে উপরোক্ত ২২টির অধিকাংশ যুক্ত হয়ে প্রচুর শব্দ সৃজিত হয়ে থাকে। অর্থও বদলে যায় প্রতি পদে। ৬. Latin - cre, caerimonia; French - crecr; German - karawan (to prepare), gar (prepared); Hebrew - caraim (I prepare, সংস্কৃত 'করোমি')। (ব.শ.)। create শব্দটি 'কর'-এর সংস্কৃত রূপ 'ক্রিয়েৎ'-এর স্বজন।

করণ, করণী : ১. ✓কৃ + অন্ (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓কৃ + অন্ - ভাববাচ্যে; ✓কৃ + অন্ - কর্ম্মবাচ্যে; ✓কৃ + অন্ - করণবাচ্যে; ✓কৃ + অন্ - অধিকরণে; ✓কৃ + অণ্ + স্ত্রী - ঈ (ঙীপ্)। (ব.শ.)। ২. *কর-এর রহস্যরূপ থাকে যাহাতে।* / যাহা দ্বারা করা যায়; যার দ্বারা ক্রিয়া সাধিত হয়; যাহার বর্গমূলাদি নিষ্কাশিত করা যায় না। (ব.শ.)। **৩. ক)** কারক, সম্পাদক, জনক, উৎপাদক, বিধায়ক, স্রষ্টা, নির্মাতা, লেখনকারক, লিপিলেখন-বৃত্তি জাতি, কায়স্থ, লেখক, লিপিকর; **খ) অনুষ্ঠান,** সাধন, সম্পাদন, বন্ধ, বন্ধন, অভিনয়, তদ্রূপে পরিবর্তন, বৈধ **কর্ম্মের অনুষ্ঠান,** আচরণ, বিধান, পরিপালন, আহুতিদান, হোম, নির্মাণ, উচ্চারণ, তালব্যবস্থাপক তাড়নবিশেষ, প্রকাশ, ক্রিয়া, ব্যাপারমাত্র, ক্রিয়াবিশেষ, স্ত্রীসহবাস; গ) কর্ম্ম, কার্য্য, ধর্ম্মকর্ম্ম, ব্যবসায়, বাণিজ্য, নৃত্যগীতপ্রভেদ, যোগীর আসনবিশেষ, পদ্মাসনাদি, লেখ্য, দলিল, হস্তলেপ; ঘ) কার্য্যানুষ্ঠানের অনুকূল দ্রব্যাদি, কারকবিশেষ, হেতু, ইন্দ্রিয়, বর্ণের উচ্চারণস্থান, অভিচারমন্ত্র, অন্তঃকরণ, রতিবন্ধবিশেষ, কায়স্থসংহতি, জাতিগত বৃত্তি, আদিকারণ বিষ্ণু; ঙ) গাত্র, শরীর, তিথ্যর্দ্ধপরিমিত বব-বালব-প্রভৃতি একাদশ কালবিশেষ, কৃতাদি যুগ, বিবাহের পূর্বে বরেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের করণীয় অনুষ্ঠানবিশেষ; চ) করণজাতি, গণিতের রাশিবিশেষ (surd) । সমকোণ সমবাহু চতুর্ভুজের বাহু, অঙ্গুলিসমূহের সংস্থানবিশেষ। ৪. এই শব্দের অধিকাংশ অর্থই জনসমাজে প্রচলিত বটে, কিন্তু অ্যাকাডেমিতে অধিকাংশ অর্থই পরিত্যক্ত। **৫. করণ** আর **উপকরণ** দুটো কথা। ইংরেজি ধারণায় instrument, ingredient এদের দুই-ই বলে। করণের জন্য তাদের পৃথক কোনো শব্দ আছে বলে মনে হয় না। আমাদের বাংলাভাষীদের কাজ-কারবার একটু আলাদা। আগে কর্তাটি কে এবং সে কী কাজ করছে, তার উপরে নির্ভর করবে আমাদের করণ কী, আর উপকরণই বা কী। কর্তা যদি মানবশরীরের 'আমি' হয়, **করণ** তবে তার ইন্দ্রিয়গুলি এবং **উপকরণ** তার, রান্নাবান্নার ক্ষেত্রে, চাল-ডাল-তরকারি ও খুন্তি-হাতা ইত্যাদি; অন্য ক্ষেত্রে অন্যরকম। আবার কর্তা যদি দেশের রাজা হয়, তবে **করণ** তার কর্মচারীরা, কর্মচারীদের অবস্থানকেন্দ্র (**মহাকরণ**) এবং **উপকরণ** তাদের কর্মের সমস্ত 'উপ' স্থানীয় বিষয় ও বস্তুগুলি।

আসলে, কর যেহেতু বহু কিছুকে বোঝায়, কর-এর রহস্যরূপও সেকারণে উপরোক্ত সমস্ত অর্থগুলিকেই শনাক্ত করার যোগ্যতা ধরে। কেননা, ক-এর রহস্যরূপ কারকাদির ভিতরে যেমন থাকে, তেমনি অনুষ্ঠানাদি, কর্ম্মাদি, কার্য্যানুষ্ঠানের অনুকূল দ্রব্যাদি ... এসবের মধ্যেও থাকে। তবে মনে রাখা দরকার, যে-রাশির বর্গমূলাদি নিষ্কাশন করা যায় না, তেমন গাণিতিক রাশিকে যেমন 'করণী' বলে, তেমনি যে-জাতির মূল জানা যায় না, সেরূপ জাতিকে 'করণজাতি' বলে। দ্র. **কায়স্থ**।

করদ : ১. কর + ✓দা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কর দেয় যে।* / যে ত্রাণার্থ কর বা হস্ত (helping hand) দেয়। (ব.শ.)। ৩. করদাতা, রাজস্বদায়ক, অধীনতা স্বীকার করিয়া যে অন্য রাজাকে কর দেয়, অধীন করদাতা (রাজা)। সাহায্যকারক। ৪. কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. যে কর বাড়িয়ে দেয়, সে সাহায্যকারী হতে পারে; আবার খাজনাদানকারীও হতে পারে। ইংরেজ আমল পর্যন্ত আমাদের দেশে করদ রাজার সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। আবার এযুগে মিস্ত্রিদের ভাষায় যাকে helper বা 'ফালতু' বলা হয়, তাকেও করদ বলা যায়। যে সাহায্যের (বাধ্যবাধকতার) হাত বাড়িয়ে দেয়, সেই **করদ**। এই দিক থেকে দেখলে, এখনকার রাজনৈতিক-

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে করদের সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে না।

করাল (করালা, করালী) : ২. *করা লয় পায় যাহাতে।* ৩. ভীষণ, ভয়ঙ্কর, বিকৃত, বিকট, বিশাল, বিপুল, বিস্তীর্ণ, বিষম, দেঁতো, তুঙ্গ, উচ্চ, কর্কশ, কর্ণকটু, কুৎসিত, তেলধুনা, দন্তরোগবিশেষ, কস্তুরী মৃগ, কৃষ্ণ তুলসী, দুর্গামূর্তিবিশেষ, অনন্তমূল, অগ্নির জিহ্বাবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. frightening অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. ভয় > ভয়াল > ভয়ং-কর; রস > রসাল > রসং-কর। তেমনি কর > করাল > করং-কর? ভয়, রস প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে যেমন হয়, সেরকম হচ্ছে না কেন? করাল মানে করংকর অর্থাৎ ভয়ংকর, এমন কথা মেনে নিতে বাধে। কিন্তু যদি ভাবি ভয়-বিষয়টি যার ভিতরে থাকে সেটি ভয়াল, রস-বিষয়টি যার ভিতরে থাকে সেটি রসাল, দাঁত-বিষয়টি যার ভিতরে থাকে সেটি দাঁতাল — তাহলে কর-বিষয়টি যার ভিতরে থাকে সেটি করাল হতেই পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, সে করাল শব্দের অর্থ আমরা 'ভয়ঙ্কর' ভাবি কেন? তাহলে কি যে-করে তার দিক থেকে না-দেখে, যার উপরে করা হয় তার দিক থেকে দেখলে করা-ব্যাপারটি ভয়ানক? ঠিক তাই। করার ভিতরে তো আসলে 'তেজ' বা অগ্নি বিদ্যমান। অগ্নির সেই জিহ্বা অগ্নির ব্যবহারকারীর কাছে শুভ হলেও বাইরের চোখে সেই তেজ-রূপায়ণকারী 'করা' কিন্তু রীতিমতো ভয়ানক। তাই করাল-করালা-করালী যাদের উপর করা বর্তায়, তাদের পক্ষে এক ভয়ানক সত্তা।

করী (করিন) : ১. কর + ইন্ (ইনি) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। ২. *গতিশীল কর ধারণ করে যে। (হস্ত বা হাত আছে যার = হস্তী বা হাতি।)।* ৩. 'শুণ্ডবান', হস্তী, নাগকেশর, দিককরীসংখ্যানুসারে আট। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **অষ্টদিকপাল, অষ্টদিগগজ**।

করূষ (কারূষ) : ২. *কারুজীবী জনগণ যেখানে থাকে।* ৩. রামায়ণে 'মলদ' ও 'কারূষ' (করূষ) এই দুটি জনপদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে যক্ষী তাড়কা বাস করত এবং এই দুই জনপদের অধিবাসীদের উপর উপদ্রব করত। রামলক্ষ্মণ এই তাড়কা রাক্ষসীকে বধ করেন। দ্র. **তাড়কা, দন্তবক্র**। ৪. অপ্র.। ৫. শব্দটি বঙ্গীয় শব্দকোষে নাই। মল (উৎপাদিত মাল) দান করে যে জনপদ, সেটি মলদ। এই উৎপাদিত মালপত্রের চরিত্র হল, শ্রমক্ষেত্র শ্রমোৎপন্নের থেকে পৃথক থেকে যায়; অর্থাৎ এগুলিতে শ্রমের আধার উৎপাদিত মালপত্রের সঙ্গে উঠে আসেনি, যেমন ধান গম প্রভৃতি ভূমিতে জন্মায়, ভূমি সেই উৎপন্নের সঙ্গে লেগে থাকে না। এগুলি মল। আর মাটির হাঁড়িকুড়ি, কাঠের আসবাবপত্রে মাটি ও কাঠ লেগে থেকে যায়। এগুলি কারু। এই মলদ ও কারূষ নামক জনপদ সুদখোর (যক্ষ) ও তার লেঠেলদের (তাড়কার) রাজত্ব ছিল।

কর্কট : ১. ✓কর্ক্ (হাস) + অট্ (অটন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কাটে যে-কর, তা আছে যার।* ৩. **কুলীর**, কাঁকড়া, কর্কটরাশি, পক্ষীবিশেষ, পদ্মমূল, অলাবুলতা, **কর্কটশৃঙ্গাকার** তুলাদণ্ডের বক্রপ্রান্তভাগ, রতিবন্ধবিশেষ, কণ্টক, **ক্ষুদ্র** আমলক। কর্কটী = কর্কটশৃঙ্গী, কাঁকুড়গাছ, **শাল্মলী, শাল্মলীফল, সর্প**। ৪. **ক্যানসার** রোগ ও কর্কটরাশি অর্থে প্রচলিত। ৫. **কুলীর বা কাঁকড়া কামড়ায়** আমরা জানি, কিন্তু কর্কটরাশি কাটে কি না সেকথা **জ্যোতির্বিশারদেরা** বলতে পারবেন। দাঁড়িপাল্লার দুই মাথায় **আঁকড়ে ধরার মতো কাঁটা** থাকে; কর্কটশৃঙ্গীতে, কাঁকুড়গাছে, শিমুলগাছে **কাঁটা আছে, এবং** সাপ অবশ্যই কামড়ায়। অর্থাৎ 'কামড়ানোর **মতো ব্যবস্থা যার** আছে' এমন সত্তাকে বলা হত 'কর্কট', তা সে সামান্য **কাঁটা হোক** আর খুদে আমলাই হোক কিংবা ক্যানসার রোগই **হোক**।

কর্কোটক (কর্কটক, কাকরোল) : ২. *কর্কট দ্বারা কাটে যে।* ৩. ক) বিষবৃক্ষ, ফললতাবিশেষ, কাকরোল গাছ, ইক্ষু, নাগবিশেষ। কর্কোটক অষ্টনামের একতম। ইহার দংশনে নল রাজার দেহে আশ্রিত কলি বিষে জর্জরিত হইয়া নলদেহে বাস করে। (ব.শ.)। খ) মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ও কদ্রুর গর্ভে এক হাজার নাগ জন্মগ্রহণ করে। তার মধ্যে কর্কোটক একটি প্রধান সর্প। একদা কর্কোটক দেবর্ষি নারদকে বঞ্চনা করে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে নারদ শাপ দেন যে, যে-পর্যন্ত না রাজা নল এসে অন্যত্র নিয়ে যান, সে পর্যন্ত তাকে অরণ্যে বাস করতে হবে। রাজা নল কলির কোপে পড়ে রাজত্ব হারান এবং নানা স্থানে ঘুরতে ঘুরতে এই বনে এসে উপস্থিত হন। তখন সেই বন অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিল। অগ্নির মধ্য হতে কর্কোটকের চীৎকার শুনতে পেয়ে নল তাকে উদ্ধার করলেন। শাপমুক্ত কর্কোটক নলকে দংশন করে তাঁকে কলির প্রভাব থেকে মুক্ত করেন, তারপর তাঁকে অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের আশ্রয়ে থাকতে অনুরোধ ক'রে ঋতুপর্ণের কাছে অক্ষক্রীড়া শিখতে বললেন। কারণ, অক্ষক্রীড়া পারদর্শী হলে কলি দূরে পলায়ন করে। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. উপরোক্ত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি, কর্কোটক নাগের বিষ কলির প্রভাব নষ্ট করে। তার মানে, কর্কোটক বা কাকরোলের ভিতর একপ্রকার তিতো থাকে যা মানুষের শরীরের পক্ষে ভাল, শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিষ নাশ করে। সেকালে (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০-৮০০) ধনীদের আটটি ভাগে ভাগ করে বলা হত অষ্ট **নাগ**। এদেরই একভাগের নাম **কর্কোটক**। সংস্কৃতে একে '**কর্কট**' বলা হয়েছে। এর সঙ্গে আসন্ন পাইকারি-উৎপাদন ব্যবস্থার আধার কলির ঘোর বিরোধ ছিল; ঢেঁকিওয়ালাদের সঙ্গে যেমন ধানকলওয়ালার বিরোধ থাকে। সেই কারণে নলের দেহ থেকে কলিকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করে **কর্কোটক**।

কর্ত্তা (কর্তা) : ১. ✓কৃ + তৃ (তৃচ্) - কর্তৃবাচ্যে; অথবা, ✓কৃৎ + তৃচ্ - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *করণকে তারিত করে যে।* / যে করে। যে ছেদন বা কর্ত্তন করে। (ব.শ.)। ৩. কারক, কার্য্যকারক, সম্পাদক, নির্ম্মাতা, স্রষ্টা, প্রণেতা, উৎপাদক, অলঙ্কারনির্মাতা, প্রবর্ত্তয়িতা, পালনকর্ত্তা, রচয়িতা, লেখক, ছেদক, কর্তক, **করণশীল**, ছেদনশীল, বিশ্বের স্রষ্টা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, **ক্রিয়ানিবর্ত্তক**, ক্রিয়াসম্পাদক, কর্ত্তার প্রযোজক, হেতু, পুরোহিত, **প্রধান ব্যক্তি**, স্বামী, জমিদার, পিতৃ-পিতামহাদির **পূর্বপুরুষ, বাপ-দাদা, গৃহস্বামী**, সম্মানসূচক — মহাশয়, সরকার, মুরুব্বি। ৪. **'কর্তা' বানানে কমবেশি** প্রচলিত। ৫. আধুনিক বাংলাভাষার **পণ্ডিতেরা বানানে দ্বিত্ব বর্জন**

করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই মতে 'কর্ত্তা' শব্দটি লেখা হয় 'কর্তা' রূপে। প্রতীকী শব্দার্থবিধি অনুসারে এতে কোনো ক্ষতি হয় না বলে মনে করা হয় এবং লাভই হয়, অকারণ দু-বার ত্-ত লিখতে হয় না। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক বিধিতে এর ফলে একটি ক্ষতি হয়ে যায়। তা হল, বর্ণের ভেতরে যে অর্থ রাখা ছিল, সেই অর্থ থেকে শব্দটি সরে গিয়ে অর্থসংকোচ ঘটায় বা অর্থ হারিয়ে ফেলে। শব্দটি ছিল কর্ত্তা — কর্, ত্ত্, া, — কর্, তরণের তরণ, আধার। এই তিনটি সত্তা নিয়ে কর্ত্তা। আধারটিকে একজন ব্যক্তি হিসেবে বুঝলে, তার কাজ হচ্ছে তরণ করা; কিন্তু কী বা কাকে তরণ করে সে? তরণ করে কর্-তরণকারীদের বা কর্মচারীদের। অর্থাৎ কর্ত্তা হল সেই সত্তা, যে নিজে কর-তরণ করে না; কর-তরণ করে যে, তাকে তরণ করে। কিন্তু কর্তা লিখলে মানে দাঁড়ায়, 'যে কর্ তরণ করে' অর্থাৎ নিজে কাজটি করে অর্থাৎ কর্মচারী। বলে রাখা ভাল, বাংলার গ্রামে বড় চাষিকে তার মুনিষেরা সর্বদাই 'কর্ত্তা' বা 'কর্ত্তা-বাবা' বলে সম্বোধন করে থাকেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর পৌত্রেরা কর্ত্তা-দাদা বলতেন। কেবল তাই নয়, কোনো কোনো পরিবারে কর্ত্তার কাজটি করতেন গিন্নি-মা (হয়তো বা তিনি বিধবাই), এবং তাঁর আমলা-কামলারা তাঁকে 'কর্ত্তা-মা' বলেই সম্বোধন করত। মোট কথা, 'কর্ত্তা-মা' শব্দের অস্তিত্বই প্রমাণ করে, সংসারে যিনি সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব করেন, কর্তাদের পরিচালনা করেন, তিনিই কর্ত্তা; তিনি বাবা, দাদা হতে পারেন, মাও হতে পারেন। ৬. creator।

কর্দ্দম (কর্দম) : ১. ✓কর্দ্ (কুৎসিত রব) + অম - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কর দানকে দমন করে যে; কৃত (উৎপাদিত) বস্তু দেওয়ার (বিক্রয় করার) চেষ্টাকে সীমিত করে যে*। ৩. ক) পঙ্ক, কাদা, মল, ময়লা, পাপ, নাগবিশেষ, প্রজাপতিবিশেষ। ইঁহার পিতা ব্রহ্মা, মাতা ছায়া, পত্নী মনুকন্যা দেবহূতি এবং পুত্র সাংখ্যকার কপিল। (ব.শ.) খ) শ্রীমদ্‌ভাগবত মতে ইনি একজন প্রজাপতি। ব্রহ্মার পুত্র। দীর্ঘ তপস্যায় শ্রীহরির বরে ইনি স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহুতিকে বিবাহ করেন। এঁর গর্ভে অতি বিখ্যাত **কপিল** মুনি নামক পুত্র এবং কলা, অরুন্ধতী প্রভৃতি নয়টি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। লিঙ্গ পুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও হরিবংশ মতে ইনি পুলকের ঔরসে ক্ষমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে অঙ্গিরার কন্যা সিনিবালিকে বিবাহ করেন। কিন্তু সিনিবালি পরে সোম বা চন্দ্রকে দেখে মুগ্ধ হয়ে স্বামী কর্দমকে ত্যাগ করে চন্দ্রের ভজনা করেন। এইজন্য কর্দম অত্রিকন্যা শ্রুতিকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে শঙ্খপাদ নামে এক পুত্র ও কাম্যা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত কাম্যাকে বিবাহ করেন। (পৌ.অ.)। মেধাতিথির মতে ইনিই **করন্ত**। ৪. 'কাদা' অর্থে প্রচলিত। ৫. যতদূর বোঝা যায়, আদিযুগে সমাজবিকাশের কোনো এক পর্যায়ে, 'করা'র কৌশল বা বিদ্যা দান করা নিষিদ্ধ করেছিল কোনো সম্প্রদায়-পরিচালক (প্রজাপতি)। ফলে, যা কিনা জনশ্রুতির বায়ুবেগে ধূলিকণার মতো সকলের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা, সেই জ্ঞান জমে কর্দ্দমাক্ত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জুতা-আবিষ্কার' কবিতায় লিখে গেছেন, 'ধূলারে মারি করিয়া দিল কাদা', এ হল সেই কাদা। মানবসভ্যতার ইতিহাসে কর্দ্দম প্রজাপতির কাহিনীটি তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লেখা হয়েছে সেই কারণে। প্রত্যেক গ্রন্থকার ওই বিশেষ কাহিনীটিকে যে যার নিজের অবস্থান থেকে দেখেছেন এবং তাঁদের কাছে কাহিনীটি একটু অন্যরকম মনে হয়েছে।

আমরা বুঝতে পারি, **কর্দ্দম** বা কর দমন করলে hand-shake হওয়ার কথা। তা না হয়ে সে 'কাদা' হয়ে গেছে। এবং বঙ্গসমাজে কাদা কথাটি খুব একটা সম্মানীয়ও নয়। কাদা ওড়ানো বা ছিটানো মানেই ছিল কুৎসিত বিষয় রটনা করা। উপরোক্ত কাহিনী থেকে দেখা যায়, স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহুতিকে ইনি শ্রীহরির বরে বিবাহ করেন এবং এর পুত্র কপিল। অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে বিকশিত সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে ইনি দেবহুতি নামক সত্তার পরিচালক হন। দেবন কর্মের (দানের বা আদি বিনিময়ের) বা '**দৈব**'-র সেই সূত্রপাত। কিন্তু এটি কোনো বাহ্যসম্পদ দান বলে মনে হয় না, এটি হতে পারে জ্ঞান দান বা বেদবিক্রয়ের সূত্রপাত। এর বহু পরে আসে বাহ্যসম্পদ বিক্রয়ের যুগ। কিন্তু জ্ঞানদানই দমিত হয়েছিল প্রথম যুগে। যারা তা করেছিল, তারা ছিল কট্টরপন্থী। পরে তারাই তা অতিমাত্রায় আগ্রহী হয়ে করতে শুরু করে। কারণ কট্টরপন্থার স্বভাবই এরকম যে, যেদিকে তার যাওয়া উচিত বলে সে সিদ্ধান্ত করে, সেদিকেই সে অন্ধভাবে এবং তীব্রভাবে যেতে শুরু করে, তা সে আগেকার তীব্র গতির একেবারে বিপরীত দিকে হলেও। এই মানসিকতাকে বাংলাভাষী একটি প্রবাদের মাধ্যমে ধরে রেখেছে — 'বামুন যখন গরু খায়, মুসলমানকে ছাড়িয়ে যায়'। পশ্চিমবাংলার বামপন্থীদের আচরণে এর বিস্তর প্রমাণ মেলে। **কর্দ্দম** সত্তাটি ছিল এই স্বভাবের। ৬. ইংরেজি cardamom।

কর্ম্ম (কর্ম্মন্, কাম্যকর্ম্ম, নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক-কর্ম্ম) : ১. ✓কৃ + মন্ (মনিন্) কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *সীমায়িত মন কারিত হয় যাহাতে; অথবা, সীমায়িত মনকে (মনের পরিকল্পনাকে) করণে রূপায়িত করে যে; অর্থাৎ কর্ মিতি মিত যাহাতে।* (দ্র. **ধর্ম্ম**)। ৩. কার্য্য, ক্রিয়া, কর্ত্তব্য বিষয়, নিয়োগ, অধিকার, নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য — ত্রিবিধ ধর্ম্মকার্য্য, যজ্ঞাদি শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান, প্রাক্তনজন্ম-কর্ম্ম, ভববীজভূত বা জন্মান্তরমূলক কার্য্য (বিপরীত — জ্ঞান), প্রতিষিদ্ধাচরণ, ব্যবহার, বৃত্তি, জাতিগত স্বাভাবিক কার্য্যবিশেষ, পরিণাম; উৎক্ষেপণ অপক্ষেপণ আকুঞ্চন প্রসারণ গমন — এই পঞ্চ কর্ম্ম; কারকবিশেষ, লগ্ন হইতে দশম স্থান, প্রয়োগ, শ্রম। ৪. 'কাজ' অর্থে প্রচলিত। ৫. আপনি একটি টেবিল বানাবেন। আপনার মনে নিশ্চয়ই একটি টেবিলের নকশা আছে, পরিকল্পনা আছে। (অর্থাৎ এ বিষয়ে আপনার মন একটি নির্দিষ্ট '**টেবিল-প্রকল্প**' স্থির করে নিয়েছে। তার মানে, টেবিল বিষয়ে আপনার মানসিকতা সীমাবদ্ধ স্থির রূপ নিয়ে ফেলেছে। একে বলা হয়েছে 'সীমায়িত মন'।) এবার সেই নকশা অনুসারে কাঠকুঠ যোগাড় করে করাত ইত্যাদি হাতিয়ার নিয়ে টেবিল বানাতে লাগালেন। মনের নকশাটি এবার কাজের মাধ্যমে টেবিলে রূপ পেতে লাগল। একেই **কর্ম্ম** বলে। সেকালের ভাষায় একে 'ভববীজভূত বা জন্মান্তরমূলক কার্য' বলা হত। কারণ এতে কাঠ-ইত্যাদির জন্মান্তর ঘটে। মার্কস-এঙ্গেলস এটিকেই 'লেবার'

বলেছেন। **বিশেষ উদ্দেশ্য থাকবে মনে, সামনে থাকবে কাঁচামাল, হাতে থাকবে হাতিয়ার, তাহলেই মনন রূপান্তরিত হবে টেবিলে। এরকম হলেই তাকে বলে কর্ম্ম।** বানর গাছের ডাল ভেঙে সেই ডালের সাহায্যে ফল পাড়তে পারে না, তাই বানর কখনো কোনো কর্ম্ম করতে পারে না। অর্থাৎ বিশেষ উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে হাতিয়ারের সাহায্যে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারলে তবেই 'কর্ম্ম' হয়। কর্ম্ম শব্দের নিহিত অর্থ এই। দ্র. **অন্তঃকরণ**।

কিন্তু কালে কালে তার প্রয়োগ ব্যাপ্ত হয়েছে। মানুষের জীবনের সমস্ত কর্ম্মকে তিন ভাগে ভাগ করে দেখা হয়েছে — **নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক কর্ম্ম, ও কাম্য কর্ম্ম**। নিত্যকর্ম্ম হল, যে সমস্ত কাজ মানুষকে নিত্য নিত্য করতে হয়, যেমন গ্রহণ-বর্জ্জনাদি। **নৈমিত্তিক কর্ম্ম হল**, যে কাজ কারও নিমিত্ত বা জন্য করতে হয়, যেমন চাকরি করা ইত্যাদি। **কাম্য কর্ম্ম** হল, যে কাজ আপন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য করতে হয়; যথা দেশসেবা, ঈশ্বর-আরাধনা, তথাকথিত কাব্য বা শিল্পের চর্চা ইত্যাদি। দ্র. **ঋণ**। এমনকি বিশ্বের সমস্ত ক্রিয়া বা কর্ম্মের মূলে যে গতির পাঁচ প্রকার (উপরোক্ত উৎক্ষেপন ইত্যাদি) রূপ ছাড়া আর কিছুই নেই, এমন সারার্থও 'কর্ম্ম' শব্দের নির্দেশিত সত্তা হয়ে গেছে।

কর্ম্মকর (কর্ম্মকার) : ১. কর্ম্মন্ ✓কৃ + অ (ট) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. যে বেতন লইয়া কর্ম্ম করে। (কর্ম্মকার = যে কর্ম্ম করে; যে বেতন বিনা কর্ম্ম করে)। (ব.শ.)। ৩. ভৃতক, বৈতনিক, বেতনোপজীবী, পরিচারক, দাস, বেতনোপজীবী কারিকর, মজুর, কর্ম্মকরণশীল, যম। **কর্ম্মকরী** = পরিচারিকা, দাসী, বিম্বিকা, তেলাকুচা লতা, মুর্ব্বা লতা। **কর্ম্মকার** = বেতন বিনা কার্য্যকারক, বেগার, বর্ণসঙ্করবিশেষ, লৌহকার, কামার (ইহাদের পিতা বিশ্বকর্ম্মা, জননী শূদ্রা), কার্য্যকারণমাত্র, শিল্পী, কারু, (কৃষিকর্ম্মকারক) বৃষ; কার্য্যকারক, কর্ম্মসম্পাদক। ৪. অপ্র.। ৫. এখানে ভাববার কথা দুটো। প্রথম হল, **কর্ম্মকর**কে বেতন নিয়ে কাজ করা লোক বলা হয় কেন? অথচ **কর্ম্মকার** অর্থে বলা হয়, যে বেতন না নিয়ে কাজ করে! কেন এরকম? দ্বিতীয় হল, কী কারণে যম, বিম্বিকা, তেলাকুচা লতা, ও মুর্ব্বা লতা **কর্ম্মকর** বা **কর্ম্মকরী** পদবাচ্য হয়ে গেল। নিশ্চয়ই যম-বিম্বিকাদির মধ্যে **কর্ম্মকব**-জাতীয় কোনো ক্রিয়া থেকে থাকবে। কিন্তু নেচারের এই সকল সন্তানদের বিষয়ে আমরা এত কম জানি যে, সেই ক্রিয়াটিকে এখন আমরা চিহ্নিত করতে পারি না। হয়তো আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রীরা পারবেন। দ্র. **কায়স্থ, পদবী**।

কর্ম্মচারী : ১. কর্ম্মন্ + ✓চর + ইন্ (ণিনি) তাচ্ছীল্যে - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কর্ম্ম আচরণ যাহার*। ৩. কর্ম্মকার, নিযুক্ত পুরুষ। ৪. employee অর্থে প্রচলিত। **৫. দ্র. কর্ম্ম, কিরণ, চরণ।**

কর্ম্মজ : ১. কর্ম্মন্ + ✓জন্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. কর্ম্ম হইতে যাহা জন্মে। (ব.শ.)। ৩. কায়িক-বাচিক-মানসিক কর্ম্ম-জাত, ক্রিয়ামাত্রজাত, **কর্ম্মহেতুক**, **অদৃষ্টজন্য** (রোগাদি), **কর্ম্মজাত** (পাপাদি), কর্ম্মজন্য স্থাবরাদিজঙ্গম, ক্রিয়াজন্য ফল — সংযোগ, বিয়োগ ইত্যাদি, **ধর্ম্মাধর্ম্মগুণ, সংস্কার, বাসনা, স্বর্গ, নরক**, বটবৃক্ষ, কলিযুগ। ৪. অপ্র.। **৫. কর্ম্ম থেকে পাপ (= পণ্য) জন্মালে**, ধর্ম্মাধর্ম্মগুণ, সংস্কার, বাসনা, স্বর্গ, নরক **প্রভৃতি তো জন্মাবেই**; এবং সেই পাপ বিক্রির জন্য পণ্যবাহী ব্যবস্থা **(বটবৃক্ষ banian tree)** জন্মাবে, সেটাই স্বাভাবিক। এমনকি তার থেকে **একদিন কলের** যুগ বা কলিযুগ বা 'মেসিন এজ'ও জন্মাবে। আমাদের **পূর্বপুরুষগণ** এত দূর পর্যন্ত ভেবে নিতে পেরেছিলেন, বিশ্বাস হতে চায় না! অথচ বাস্তবে তাই দেখা যাচ্ছে!

কর্ম্মফের, কর্ম্মবিপাক : ১. কর্ম্ম + ফের, বিপাক। ২. *যাহাতে কর্ম্মফল (বা কর্ম্মের প্রতিক্রিয়া) ফিরে ফিরে আসে, কিংবা বিশেষভাবে বা বিপরীতভাবে পাক খেয়ে আসে*। ৩. প্রাক্তন কর্ম্মের আবর্ত্তন বা পরিণাম, দৈবদুর্ব্বিপাক, দুরদৃষ্ট; প্রাক্তন কর্ম্মের শুভাশুভ ফল, কর্ম্মফল। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি প্রচলিত। **৫. কর্ম্মবিপাক** শব্দটি প্রাচীন, কিন্তু কর্ম্মফের শব্দটি মধ্যযুগের বাংলাভাষার নিজস্ব সৃষ্টি। এর ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হল, সনাতন ও বৈদিক যুগে মানুষ যে কর্ম করত তার ফল ছিল প্রত্যক্ষ। তাতে কোনো **বিপাক** (বিপরীত পাক) বা **ফের** ছিল না। কিন্তু কর্মফল পণ্যে পরিণত হলেই কর্মকারী তার প্রত্যক্ষ ফল থেকে বঞ্চিত হয়। উৎপন্ন চলে যায় পণ্যের পাক খেতে খেতে চলতে থাকা চক্রে। এর ফল প্রায়শই খারাপ হয় বলে সেকালের মানুষের মনে হয়েছিল। তাই এর তিনটি নাম দিয়েছিলেন তাঁরা — **কর্ম্মফের, কর্ম্মবিপাক**, ও **দৈবদুর্ব্বিপাক**। দ্র. **দৈব**।

কাজ : দ্র. **কার্য্য**।

কার : ১. ✓কৃ + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓কৃ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে; ✓কৃ + অ - কর্ম্মবাচ্যে; ✓কৃ + অ - করণবাচ্যে; ✓কৃ + অ (অণ্) - স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. *কর হইতে জাত; অথবা, করণ থাকে যাহাতে*। ৩. কারক, কর্ত্তা, অনুষ্ঠাতা, নির্ম্মাতা, রচয়িতা, প্রণেতা, লেখক, পাচক, জনক, উৎপাদক; ক্রিয়াকরণ, যত্ন, চেষ্টা, উচ্চারণ, হিংসা, নিশ্চয়; বধ্য পশু, বলি, উচ্চার্য্য বর্ণ অর্থাৎ তদ্বর্ণবাচক; শক্তি, বল; রাজগ্রাহ্যভাগ, কর, পতি, যতি, হিমালয়, করকাজাত জল, শিলার জল, রতি, তপস্যা। (ব.শ.)। ৪. আধুনিক বাংলাভাষায় স্বতন্ত্রভাবে **কার** শব্দটির প্রচলন নাই, রয়েছে সেকেলে বাংলাভাষীদের মধ্যে এবং গ্রামবাংলায়। তবে উপসর্গ যোগে শব্দটির ব্যাপক **প্রচলন** রয়েছে। যথা — **অপকার, আকার, উপকার, প্রকার, বিকার, অধিকার, অনধিকার, ধিক্কার, পরিষ্কার, পুরস্কার, তিরস্কার, আবিষ্কার, সংস্কার** ... ইত্যাদি। ৫. দ্র. **কর, উপকার, অহঙ্কার**।

কারক : ১. ✓কৃ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কার্য করে যে*। ৩. কর্ত্তা, সম্পাদয়িতা, অনুষ্ঠাতা, **নির্ম্মাতা, স্রষ্টা, সাধক**, অনুষ্ঠাতা, হেতুভূত, জনক, উৎপাদক, (ব্যাকরণে) **ক্রিয়ার সহিত** অন্বিত ক্রিয়ানিষ্পাদকাদি কর্ত্তৃ প্রভৃতি। **কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান**, অপাদান, অধিকরণ — **এই ষড়বিধ কারক**। ... (ব.শ.)। ৪. জনসাধারণ্যে শব্দটি **কদাচিৎ performer অর্থে** এবং বাংলাভাষায়

এই শব্দার্থকোষ কীভাবে পড়তে হয়, তা জানার জন্য 'ভূ-১' পৃষ্ঠা দেখুন। সংক্ষিপ্ত আকারে তা ১ পৃষ্ঠাতেও পাওয়া যাবে।

লেখাপড়ার জগতে ব্যাকরণের একটি সত্তা রূপে ব্যবহৃত হয়। ৫. জগৎসংসারের মূলে রয়েছে দুজনের এক দ্বৈতাদ্বৈত সত্তা — ক্রিয়া (action) ও কারক (actor)। সমস্ত ক্রিয়ার সঙ্গে মাত্রা রূপে রয়েছে নানা প্রকারের কারক। সবাই জানেন, বাহ্যবস্তুসমূহের রয়েছে তিনটি মাত্রা — দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা। অস্তিত্ব মাত্রের আর একটি মাত্রা হল সময়। ক্রিয়ার কিন্তু কমপক্ষে চারটি মাত্রা হয় — এক) ক্রিয়াটি নিজে থেকে হয় না, কেউ একজন করে (কর্ত্তৃকারক)। দুই) ক্রিয়াটি শূন্যে হয় না, কোনো না কোনো ক্ষেত্রের উপর ক্রিয়াটি করা হয় (কর্ম্মকারক)। তিন) ক্রিয়াটি প্রায়শই করা হয় কোনো কিছুর সাহায্যে (করণকারক)। এবং চার) ক্রিয়াটি অনন্ত সময় ধরে কিংবা শূন্য সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে পারে না, তার খানিকটা সময় লাগে (অধিকরণকারক)। ক্রিয়ার এই চতুর্থ মাত্রা হল তার স্থান ও কাল। আমাদের ব্যাকরণকারগণ ক্রিয়ার এই চারমাত্রাকে আরও বিস্তারিত করে ছয়টি কারকের কথা বলে গেছেন। দ্র. **ঘণ্টা, নির্ঘণ্ট**।

কারখানা : ৩. কার্য্যের গৃহ, কর্ম্মশালা (workshop, factory), ব্যাপার, ঘটনা, কাণ্ড, কাজ। (ব.শ.)। ৪. workshop, factory অর্থে প্রচলিত। ৫. নিজস্ব উত্তরাধিকার হিসেবে আমাদের 'কার' ছিল, খণ্ড বা খান-ও ছিল। কিন্তু সে-শব্দ দুটিকে জুড়ে আমরা 'কারখানা' বানাইনি। ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের পর পাঠানের হাত ধরে ফারসি ভাষার 'কার্‌খ়ানহ্' এল আমাদের দেশে। আমাদের তৎকালীন পূর্বপুরুষেরা চিনতে পারলেন, এ তো আমাদেরই লোক। অতএব তৎক্ষণাৎ ফারসি 'কার্‌খ়ানহ্' হয়ে গেল বাংলাভাষীর ঘরের ছেলে — কারখানা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের (গ) গ্রন্থের 'উত্তরপ্রজন্মের লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষা' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

কারচুপি (কারচুবি) : ৩. কাপড়ে সূচীকর্ম্ম — ফুলতোলা, লতাপাতা কাটা ইত্যাদি, জরির কারুকার্য্য, রেশমী কাপড়ে বা ভেলভেটে জরির সূচীশিল্প, গুলকারী; গৌণার্থে — কৌশল, ফিকির, চালাকী, ছল। (ব.শ.)। ৪. 'চালাকী' অর্থে প্রচলিত। ৫. এ শব্দটিও অনেকটাই 'কারখানা' শব্দের মতো, তবে এর নিজেরই কিছু 'কারচুপি' আছে। যে কোনো বাংলাভাষীকে জিজ্ঞেস করুন, শব্দটির মানে কী? উত্তরে তিনি বলতেই পারেন, 'চুপি চুপি কিছু করার ব্যাপার আছে যাতে' সেটাই কারচুপি। এর কারণ হল, 'কার' ও 'চুপি' দুটো শব্দই বাংলায় ছিল কিন্তু তাদের যুক্ত করে 'কারচুপি' শব্দটি ছিল না; তৈরি হয়েছে ফারসি 'কার্‌চোবী' এদেশে আসার পরে। যে কারণে শব্দটিকে ফারসি থেকে আগত বলে দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো বাংলাভাষীকে যদি বলা হয় 'কারচুপি' শব্দের মানে 'লুকোছাপা করা একধরনের সূচীকর্ম্ম', সে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। কারণ সে তো 'কারচোবী'র কোনো মানেই বোঝে না, সে যার মানে বোঝে, তা হল 'কার' আর 'চুপি'। এই **কারচুপি**কে তার ঘরের ছেলেই মনে হয়।

কারণ : ১. ✓কৃ + ই (ণিচ্) + অন - ক। (ব.শ.)। ২. কর্ অন *(on) যাহা হইতে; ক্রিয়ার মূলে যে সক্রিয় থাকে।* / যে করায়। (ব.শ.)। যাহা হইতে কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহা; যাহার যত্নে কার্য্যনির্ব্বাহ হয় সে; যাহার সহযোগ ভিন্ন কার্য্যনির্ব্বাহ হয় না সে; যাহা হইতে কোনো বিষয়ের ঘটনা বা উদ্ভব হয় তাহা। (ছা.অ.)। ৩. ক্রিয়া-নিষ্পাদক, নির্ব্বর্ত্তক, উদ্দেশ্য, উৎপাদক, প্রকৃতি, জগৎকারণ — সত্ত্ব রজঃ তমঃ, বিষ্ণু, শিব, আদি, প্রমাণ, বীজ, নিমিত্ত, অর্থ, বিষয়, কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব, সৃষ্টির মূলভূত আদিদেব, উপায়, মূলবস্তু, কাব্যের কথা, কর্ম্ম, কার্য্য, ইন্দ্রিয়, দেহ, কায়স্থ, বাদ্যবিশেষ, উত্তরবিশেষ, বধ, হিংসা, তান্ত্রিক সাধনার হেতুভূত মদ্য, জন্য। (ব.শ.)। (৩০টি অর্থ)। ৪. কেবলমাত্র because অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কার্য্য**। ব.শ. কারণ শব্দের প্রায় ৩০টি অর্থ দিয়েছেন। 'কারণ' মানে কী ছিল আর কী হয়েছে! ছিল ৩০টি, হয়েছে একটি — because। যাই হোক, এখন আমরা জানতে পারছি, জগতে যা কিছু ক্রিয়া ঘটছে, আকার প্রকার বিকার উপকার তিরস্কার পুরস্কার ... ইত্যাদির ভিত্তি যে **কার** রয়েছে, সেই **কার** অন (on) হয়ে থাকার মূলে যা ছিল তাদের সবাইকে **কারণ** বলাই ছিল সেকালের রীতি। তাই **কারণ** শব্দের নির্দেশকতার বা রেফারেন্সের এলাকা ছিল বিশাল! জগতের কারণ, জীবসৃষ্টির কারণ, সমাজের স্বভাবের কারণ, রাষ্ট্রের কার্য্য-কারণ, মানুষের কার্য্য-কারণ — সবই এই 'কারণ'-এর আওতায় ছিল। সেই কারণে এর এত অর্থ ছিল। ইংরেজের সংস্পর্শে আধুনিক হতে গিয়ে অন্য সব ক্ষেত্রে আমরা যেমন আমাদের নিজেদের অর্জনের অর্থমূল্যকে সঙ্কুচিত করে দরিদ্র হয়ে গেছি, শব্দসম্পদের অর্থের ক্ষেত্রেও সেভাবেই দরিদ্র হয়ে গেছি। কত দরিদ্র হয়েছি, **কারণ**-এর অর্থ তার একটা বড় প্রমাণ। দ্র. **জন্য, নিমিত্ত, হেতু**।

কারু, কারুশিল্প : দ্র. **দারু**।

কার্ত্তবীর্য্য (কার্তবীর্য, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন) : ১. কার্ত্ত + বীর্য্য। ২. *যে বীর্য্য কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জাত; কৃতবীর্য্য হইতে জাত।* / যাহা কর্ত্তৃক বীর্য্য কৃত (লব্ধ) (তাহা হইতে জাত)। (ব.শ.)। ৩. বীর্য্যান্বিত, শূর, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের জনক নৃপবিশেষ। চন্দ্রবংশীয় কৃতবীর্য্যরাজের পুত্র। ...মাহিষ্মতী ইঁহার রাজধানী। **দত্তাত্রেয়**-র প্রসাদে ইনি সহস্রবাহুপ্রভাব কাঞ্চনবিমান ইত্যাদি লাভ করেন। পরশুরামের সহিত যুদ্ধে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি দিগ্‌বিজয়ী রাবণকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করেন। খ) জৈনরাজচক্রবর্তীবিশেষ। (ব.শ.)। ... ইনি নর্মদা-তীরবর্তী হৈহয়রাজ্যের রাজা। এঁর আর একটি নাম অর্জুন। মাহিষ্মতী নগরী হৈহয়রাজ্যের রাজধানী ছিল। পিতা কৃতবীর্যের নামানুসারে এঁর নাম হয় কার্তবীর্য এবং কার্তবীর্যার্জুন (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন) নামেই ইনি সমধিক পরিচিত। **দত্তাত্রেয়** মুনির বরে কার্তবীর্য সহস্র বাহু লাভ করেন। একবার দিগ্বিজয়কালে রাবণ হৈহয় রাজধানীতে উপস্থিত হলে নর্মদাতীরে শিবপূজায় রত হন। অদূরে জলক্রীড়ারত কার্তবীর্যার্জুন সহস্র বাহু দিয়ে নর্মদার জল রুদ্ধ করায় রাবণের পূজায় ব্যাঘাত হয়। তখন ক্রুদ্ধ রাবণ কার্তবীর্যকে আক্রমণ করেন বটে, কিন্তু তাঁর হস্তে রাবণ পরাজিত ও বন্দী হন। রাবণের পিতামহ স্বর্গস্থ পুলস্ত্যের অনুরোধে কার্তবীর্য রাবণকে মুক্তি প্রদানপূর্বক তার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেন।

একবার মৃগয়াকালে ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত কার্তবীর্য জমদগ্নি ঋষির

আশ্রমে উপস্থিত হন। **জমদগ্নি** তাঁর দৈবশক্তিসম্পন্না কপিলা নামে কামধেনুর প্রভাবে কার্তবীর্যের সমস্ত সৈন্যদের প্রচুর আহার্য বস্তু দিয়ে পরিতৃপ্ত করেন। কার্তবীর্য জমদগ্নির কাছে কামধেনু প্রার্থনা করলে, ঋষি এই গাভী দান করতে অসম্মত হন। তখন রাজা বলপূর্বক সেই কামধেনু হরণ করতে গেলে কপিলা দৈবশক্তিপ্রভাবে প্রভূত সৈন্য ও অস্ত্র সৃষ্টি করে সসৈন্যে কার্তবীর্যকে পরাস্ত করে। পরাজিত কার্তবীর্য রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে আবার কার্তবীর্যের আক্রমণে জমদগ্নি নিহত হন। কপিলাও যুদ্ধক্ষেত্র হতে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করে। উক্ত সময় জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম গৃহে অনুপস্থিত ছিলেন। পরশুরাম গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পিতার মৃত্যুর কারণ শুনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, কার্তবীর্যকে তিনি নিহত করবেন। দত্তাত্রেয়র বরে সহস্র বাহুর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরশুরামের কুঠারে নিহত হন ও তাঁর সহস্র বাহু কুঠারাঘাতে ছিন্ন হয়। এর পর পরশুরাম একবিংশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. বৈদিক সভ্যতার ভেতর থেকেই ক্ষত্রিয়দের দ্বারা পরিচালিত যে-সকল বেদবিরোধী সংগ্রাম হয়েছে, তার মধ্যে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বেদবিরোধী সংগ্রাম সবচেয়ে ভয়ানক ছিল। এই সংগ্রাম ব্রাহ্মণের 'সুপ্রিমেসি'কে প্রায় নিঃশেষ করে এনেছিল। পরশুরাম এরই বিপরীতে ক্ষত্রিয়নিধন যজ্ঞ করেছিলেন, ২১ বার পৃথিবীটাকেই (আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে) 'নিঃক্ষত্রিয়' (মিলিটারিহীন) করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এই ঘটনাবলীর বিবরণ পুরাণাদিতে তেমন বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়নি। অন্তত অন্যান্য ঘটনাবলীর বর্ণনার তুলনায় অনেক কম। তবে রয়েছে। যতদূর জানা যায়, হৈহয় ক্ষত্রিয়দের ভয়ে এইসময় মহর্ষিরা তাঁদের ধনরত্ন ভূগর্ভে লুকিয়ে রাখতেন। দ্র. **জমদগ্নি, দত্তাত্রেয়, ঔর্ব্ব, সগর**।

কার্ত্তিকেয় (কার্তিকেয়) : ১. কৃত্তিকা + এয়। (ব.শ.)। ২. *কৃত্তিকাগণ হইতে জাত*। ৩. কৃত্তিকাগণের (পালন হেতু) অপত্য। দ্র. **অগ্নিকুমার**। (ব.শ.)। (ক) মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র। দেবতাদের সহিত যুদ্ধে দানবেরা সর্বদা জয়ী হয় দেখে ইন্দ্র একজন উপযুক্ত সেনাপতির অনুসন্ধান করতে থাকেন। একদিন মানস পর্বতে স্ত্রীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে নিকটে গিয়ে ইন্দ্র দেখেন যে, কেশী দানব প্রজাপতির কন্যা দেবসেনাকে হরণ করতে চেষ্টা করছে। ইন্দ্র উক্ত দানবের হাত হতে তাঁকে রক্ষা করে ব্রহ্মার কাছে নিয়ে যান। ব্রহ্মা তাঁকে দেখে বলেন যে, এক মহা-বিক্রমশালী পুরুষ এই কন্যার পতি হবেন, আর তিনিই হবেন দেবসেনাপতি। (খ) মহাভারত অনুসারে দক্ষকন্যা স্বাহা অগ্নিকে কামনা করতেন। একদিন অগ্নি সপ্তর্ষিদের পত্নীগণকে দেখে কামাতুর হয়ে পড়েন। স্বাহা মহর্ষি অঙ্গিরার স্ত্রী শিবার রূপ ধারণপূর্বক অগ্নির কাছে এসে সহবাস করেন এবং অগ্নির শুক্র নিয়ে গরুড়পক্ষিনী হয়ে এক কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। এতেও তৃপ্ত না হয়ে তিনি সপ্তর্ষিদের প্রত্যেকের স্ত্রীর রূপ ধারণ করে পূর্বের মতো অগ্নির সঙ্গে মিলিত হন। কেবলমাত্র বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতীর তপস্যার প্রভাবে স্বাহা তাঁর রূপ ধারণ করতে অক্ষম হন। এইভাবে স্বাহা ষষ্ঠ বার কাঞ্চনকুণ্ডে অগ্নির শুক্র নিক্ষেপ করেন। সেই সম্মিলিত শুক্র থেকে স্কন্দ বা কার্তিকেয়র জন্ম হয়। তাঁর ছয়টি মস্তক, একটি গ্রীবা এবং একটি উদর হয়। কার্তিকেয়র জন্মের পর সপ্তর্ষিরা তাঁদের স্ত্রীদের ত্যাগ করেন। তাঁরা ভাবলেন যে, তাঁদের স্ত্রীরাই স্কন্দের জননী। কিন্তু স্বাহা বারংবার বললেন যে, স্কন্দ তাঁরই পুত্র। মহামুনি বিশ্বামিত্র প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু সপ্তর্ষিরা তাঁর কথা বিশ্বাস করলেন না। স্কন্দের বৃত্তান্ত শ্রবণান্তে দেবতারা এঁকে বধ করবার জন্য ইন্দ্রকে বললেন। কারণ, এঁর অমিত বল তাঁদের অসহ্য। কিন্তু ইন্দ্র এই কার্যে সাহসী হলেন না। তখন দেবতারা এঁকে মারবার জন্য লোকমাতাদের (শিবের অনুচরী — মাতৃকা) প্রেরণ করলেন। কিন্তু তাঁরা গিয়ে বালককে নিজেদের পুত্রজ্ঞান করে তাঁদের স্তন্যপান করালেন। পরে স্কন্দকে পরাজিত করবার জন্য ইন্দ্র সদলবলে অগ্রসর হলেন। কিন্তু অগ্নিপুত্র স্কন্দ মুখ-নির্গত অগ্নিশিখায় দেবসৈন্যদের দগ্ধ করে ফেললেন। তখন ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করলে, কার্তিকেয়র দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হয়ে বিশাখ নামে (কার্তিকেয়র অপর নাম) এক কাঞ্চনবর্ণ যুবার আবির্ভাব হল। তখন দেবরাজ ভীত হয়ে কার্তিকেয়কে দেবসেনপতি পদে বরণ করলেন। রুদ্রকে অগ্নি বলা হয়, সেজন্য কার্তিকেয় মহাদেবের পুত্র। মহাদেব অগ্নির শরীরে প্রবেশ করে এই পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। স্কন্দ দেবসেনাপতি পদে নিযুক্ত হবার পর ইন্দ্র এঁর হাতে সকল দেবসেনাকে সমর্পণ করেন। তারপর দেবাসুরের যুদ্ধে কার্তিক সেনাপতি রূপে যুদ্ধে অগ্রসর হন। প্রায় সমস্ত দানবই তাঁর শরাঘাতে বিনষ্ট হয়। যুদ্ধশেষে সমস্ত দানবকে নিহত করে তিনি দেবতাদের রক্ষা করেন। (গ) ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কার্তিকেয়র জন্ম সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, কার্তিকেয় মহাদেবের তেজে জন্মগ্রহণ করেন। পার্বতীর সহিত বিহারকালে মহাদেবের তেজ পৃথিবীতে পতিত হয়। পৃথিবী এই তেজ ধারণ করতে না পেরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি ভয়ে এই তেজ শরবনে ত্যাগ করেন। শরবনে পতিত এই বীর্য একটি সুন্দর বালকের সৃষ্টি করে। কৃত্তিকারা এই বালককে দেখে স্তন্যপান করিয়ে লালন-পালন করেন। পার্বতী দেবতাদের কাছ থেকে এই বিষয় জ্ঞাত হয়ে কার্তিকেয়কে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ভারতের ইতিহাসে সৈন্যবাহিনীর উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসে 'কার্ত্তিকেয়' একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্তা। বেণ-প্রজাপতির সঙ্গে মহর্ষিদের সংঘর্ষে আদি সৈন্যবাহিনীর উদ্ভব হলেও, সে ছিল সৈন্যবাহিনীর একেবারেই আদি-স্তর। কেননা, সমাজে তখনও রাষ্ট্র জন্মায়নি। তেমনভাবে পণ্যেরও উদ্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে, যখন সমাজে পণ্যজীবিতা যথেষ্ট প্রচলিত হয়ে গেছে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, তখন পণ্যজীবীদের অনুরক্ত যে-সৈন্যবাহিনী গড়ে ওঠে, তার ইতিহাস পাওয়া যায় কার্ত্তিকেয়র কাহিনীতে। উপরোক্ত পৌরাণিক বর্ণনার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ করে নিয়ে সে-বিষয়ে অবগত হতে হয়। এতে দেখা যায়, এই সামরিক-শক্তির জন্ম হয়েছে আবিষ্কারক শক্তির (মহাদেবের) ঔরসে ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের (পার্ব্বতীর) গর্ভে, কিন্তু সে-সামরিক শক্তির লালন-পালন জুটেছে পণ্য-উৎপাদনকারীদের (কৃত্তিকাদের) স্তন্য পান করে। দ্র. **কিম্পুরুষ, ময়ূর**।

কার্য্য (কাজ) : ১. ✓কৃ + য (ণ্যৎ) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহা করা হয় বা করা যায়; কজ (= cause, **কারী** জনন করে যে) থেকে*

জাত বা থাকে যাহাতে। ৩. কৃতিসাধ্য, করণীয়, কর্ত্তব্য, অবশ্যকর্ত্তব্য, তদ্রূপে গ্রহণীয়, বিধেয়, লেখনীয়, উৎপাদ্য, অনুষ্ঠেয়, নিয়োজ্য, কর্ম্ম, **কাজ**, কর্ত্তব্যবিষয়, রাজকার্য্য, ধর্ম্মকর্ম্ম, পরিণাম, ঋণাদি-বিবাদ, ব্যবহারদর্শনাদি, অধিকার, ব্যবহার, যাগাদিসাধ্য অপূর্ব্ব, উদ্দেশ্য, হেতু, আরোগ্য, অভিনেয়ার্থ, আদিশ্যমান বর্ণাদি, জন্মলগ্নাবধি দশম স্থান, ব্যাপার, ক্রিয়া, করণ। কাজ = কর্ম্ম, ক্রিয়া, ব্যাপার, ব্যবসায়, বৃত্তি, পেশা, কর্তব্য বিষয়, চাকরি, উপায়, কৌশল, ফিকির, প্রয়োজন, ফল, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, আবশ্যক, পরিণাম, ব্যবহার, আচরণ, বিহার, সহবাস, বিবাহাদি উৎসব। কৃতিসাধ্য, করণীয়, বিধেয়, অনুষ্ঠেয়, অবশ্যকর্তব্য, দাতব্য, লেখনীয়, অঙ্কনীয়, উৎপাদ্য, জননীয়, সাধনীয়, নিযোজ্য, ধর্ম্মকর্ম্ম, নিয়োগ, হেতু, অভিনেয়ার্থ, করণ ... ইত্যাদি। এছাড়া কার্য্যকর, কার্য্যকুশল, কার্য্যক্ষম, কার্য্যতঃ, কার্য্যদর্শন, কার্য্যনির্ণয়, কার্য্যনির্ব্বাহ, কার্য্যনিষ্পত্তি, কার্য্যসাধন ... এরকম অজস্র। রয়েছে — কাজ চলা, কাজ দেখা, কাজ চালান, কাজে আসা, কাজে মন দেওয়া, কাজ দেখান, কাজ পাওয়া, কাজ হারান ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. work অর্থে প্রচলিত। ৫. করার আধার = কার, সেই কার যাহাতে থাকে = কার্য, সেই কার্য যাহাতে থাকে = কার্য্য। এইভাবেই শব্দটি তৈরি হয়েছে। কার্য্য, **কর্ম্ম, ক্রিয়া** ও কাজ-এর পার্থক্য রয়েছে। এদের অর্থ-প্রাচুর্য্যের কারণ হল, মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে যে কয়টি শব্দ অত্যন্ত জড়িত, এগুলি তাদের অন্যতম। জগতের সবকিছুকে বোঝানোর জন্য যত শব্দ, **ক্রিয়া** তাদের মূল। তাই এদের প্রয়োগবৈচিত্র্য অত্যন্ত বেশি। সেই সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। এখানে কেবল দেখিয়ে রাখা চাই, কার্য্য-কর্ম্ম-ক্রিয়া-কাজ এই চারের মধ্যেকার তফাৎ কোথায়।

কার্য্য, কর্ম্ম, ক্রিয়া, কাজ। এর মধ্যে **কর্ম্ম** কথাটির ব্যাখ্যা আগেই করা হয়েছে; মাথায় থাকবে কল্প, সামনে থাকবে ক্ষেত্র, হাতে থাকবে হাতিয়ার — এর পর ক্ষেত্রের উপর হাতিয়ারের সাহায্যে কল্পকে বাস্তবায়িত করা হল **কর্ম্ম**। কর্ম্ম একটি সম্পূর্ণ ব্যাপার। **কার্য্য** কিন্তু তা নয়। এতে কল্প রয়েছে অন্যের হাতে, হয়তো ক্ষেত্র বা হাতিয়ার দুটোই তারই, সেই কল্প-ক্ষেত্র-হাতিয়ারের মালিক নির্দেশ বা পরামর্শ দিচ্ছে, সেই পরামর্শ অনুসারে অন্য একজন তা বাস্তবায়িত করছে। অর্থাৎ কার্য্য শব্দে কর্ম্মের কিছু বা সব উপাদানগুলি নাও থাকতে পারে। কর্ম্মের অংশ হল **কার্য্য**। আর **ক্রিয়া** হল 'কৃ-র যাওয়া', অর্থাৎ, **ক্রিয়া** হল কর্ম্মের আত্মাটুকু — করণের আধেয় (action) মাত্র। সবশেষে হল **কাজ**। এর মূলে রয়েছে 'কারীর জনন' বা **কজ** (cause) অর্থাৎ কারণ। কারণ বা **কজ** না থাকলে কার্য্য বা **কাজ** হয় না। কিন্তু কজ শব্দটির উত্তরাধিকার সরাসরি আমাদের নাই, রয়েছে **কাজ**। এর উত্তরাধিকার রয়েছে ইংরেজির। অনেকে মনে করেন, কার্য্য শব্দটি থেকেই **কাজ** শব্দটি প্রসূত হয়েছে। আমাদের সেরকম মনে হয়নি। আমাদের মনে হয়েছে, **কজ শব্দটি** স্বতন্ত্র; এর অর্থ হল '**কারী** জনন করে যে'। তার থেকেই **কাজ** শব্দটি তৈরি হয়েছে। ৬. carry out the contract বললে carry out-এর যে মানে দাঁড়ায়, তার থেকে মনে হয়, কার্য্য শব্দের ওই carry-রূপটিই আদি ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় এসেছে।

কুরু : ১. ✓কৃ + উ (কু) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **কু** *রহন বা রক্ষণ নবরূপে* ***উত্তীর্ণ যাহাতে; উচিত কাজ করে যে, করিব বলে যে, করো বলে যে।*** ৩. **চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ**, (সংবরণ ও তপতীর পুত্র ... ইঁহারই **তপস্যাহেতু সমন্তপঞ্চক** 'কুরুক্ষেত্র' নামে অভিহিত হইয়াছে।), **অগ্নীধ্ররাজের পুত্র কুরুবর্ষপতি, জম্বু**দ্বীপের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ (উত্তরকুরু), '**কুরু' নামক জনসমূহ, কুরু**গণের নিবাস জনপদবিশেষ (ইহা পাঞ্চালের সন্নিহিত ছিল), **কুরুরাজগণ**, কুরুর অপত্যগণ, ভীষ্মাদি কুরুবংশীয়গণ। ... (ব.শ.)। চন্দ্রবংশীয় রাজা। ইনি মহারাজ সংবরণ ও সূর্যকন্যা তপতীর পুত্র। কুরু অত্যন্ত ধর্মপরায়ন রাজা ছিলেন এবং বহু বৎসর কুরুজাঙ্গল নামক স্থানে কঠোর তপস্যা করেন। এইজন্য উক্ত স্থান কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হয়। কুরুর নামানুসারেই এই বংশের নাম হয় কৌরব বংশ। কুরুর পাঁচ পুত্র — অবিক্ষিত, অবিষ্যৎ, চৈত্ররথ, মুনি ও জন্মেজয়। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু দুজনেই কুরুবংশজাত এবং কৌরব হিসাবে খ্যাত। সাধারণত দুর্যোধনাদিকে কৌরব এবং তাদের পক্ষকে কুরুপক্ষ বলা হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. স্থানটি মানসলোকের একটি স্থান। সেই স্থানটি হল 'কী করা উচিত', এই মানসিক অবস্থান। দ্র. **কুরুক্ষেত্র, কনখল**। অনেকে জানেন, নাচ আর গান সহযোগে বিনোদনের যোগান দেওয়ার জন্য গ্রীক নাটকে Chorus-কে রাখা হয়নি। আমাদের '**কুরু**' শব্দের সঙ্গে গ্রীক Chorus-এর সমত্ব (পুরু-র সঙ্গে Porus-এর যেমন সমত্ব) যখন নজরে আসে, তখন এক ঝলকে বুঝে যাওয়া যায়, গ্রীক নাটকে Chorus-এর প্রকৃত ভূমিকা। আমাদের দেশে যুদ্ধের ক্ষেত্র বলা হয়েছে কুরুক্ষেত্রকে। কেননা, সেখানেই 'কী করা উচিত' (মা কুরু = করিয়ো না, করা উচিত নয়) অর্থাৎ কর্তব্য কী তার নিরূপণ হয়। একথা জানা থাকলে বোঝা যায়, Chorus কেন কর্তব্য আর অকর্তব্যের তর্কটাকে নাটকের আগাগোড়া জীইয়ে রাখে। এ হল ইয়োরোপের হাতে 'কুরু' শব্দের নিজস্ব উত্তরাধিকার। [বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের (গ) গ্রন্থের *'মাতৃভাষা রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে'* নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।] অপরদিকে এ শব্দের নিজস্ব উত্তরাধিকার মধ্যপ্রাচ্যেরও আছে। 'কুর্ আন' বা কোরান শব্দটির অর্থ 'করণীয়' অর্থাৎ 'কী করা উচিত'। একই 'কুরু' এখানে আরবি-ফারসির স্রোতে নিজ রূপে প্রবহমান। একই আদি মহাভাষা বহু ধারায় বিচূর্ণীভূত হয়ে প্রবাহিত হয়ে আজকের দুনিয়ার ভাষা-স্রোতসমূহে পরিণত হয়েছে, এই ধারণার পক্ষে এই 'কুরু' শব্দ স্পষ্ট সাক্ষী দেয়। ৬. ইংরেজি chorus।

কুরুক্ষেত্র : ১. কুরু + ক্ষেত্র। ২. কুরুরাজ কর্তৃক কৃষ্ট ক্ষেত্র। (ব.শ.)। ৩. কুরুদেশান্তর্গত (নীলকণ্ঠ), তীর্থবিশেষ। ইহার আদি নাম 'সমন্তপঞ্চক'। 'এই স্থানে মৃত ব্যক্তি পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে' এই অভিপ্রায়ে কুরুরাজ উগ্র তপস্যায় এই ক্ষেত্র কর্ষণ এবং ইন্দ্র হইতে ঐ প্রকার বর লাভ করেন। তদবধি ঐ স্থান '**কুরুক্ষেত্র**' নামে প্রসিদ্ধ। কুরুর তপস্যা ও মৃতের পুণ্যলোকপ্রাপ্তি হেতু, কুরুক্ষেত্র 'ধর্ম্মক্ষেত্র'। (মনু মতে) ইহা ব্রহ্মর্ষিদেশের অন্তর্গত। ... (ব.শ.)। কুরুজাঙ্গল, দ্র. **কুরু**। কুরুপাণ্ডবের রণভূমি। এই স্থান থানেশ্বরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। কুরুক্ষেত্র চিরকালই 'ধর্মক্ষেত্র' হিসাবে খ্যাত। 'জাবাল উপনিষদ' ও 'শতপথ ব্রাহ্মণ' গ্রন্থে ইহা দেবতাদের যজ্ঞস্থান বলে

উল্লিখিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্রের প্রাচীন নাম সমন্তপঞ্চক। পরশুরাম একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে এই স্থানে পিতৃ-তর্পণ করেছিলেন। দুর্যোধনাদির পূর্বপুরুষ বিখ্যাত কুরুরাজ এই স্থানে হল চালন করে এই বরলাভ করেন যে, যে ব্যক্তি এই স্থলে তপস্যা করবে অথবা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করবে, সে স্বর্গে গমন করবে। তদবধি এই স্থানের নাম হয় কুরুক্ষেত্র। মহাভারতে বর্ণিত আছে, পুরাকালে রাজর্ষি কুরু এই স্থান সর্বদা কর্ষণ করেন দেখে ইন্দ্র একদিন এর কারণ সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করেন। উত্তরে কুরু বলেন, এই ক্ষেত্রে যে মারা যাবে সে পাপবিমুক্ত হয়ে পুণ্যলোকে গমন করবে। তখন একদিন দেবতারা ইন্দ্রকে বলেন যে, তিনি রাজর্ষি কুরুকে বর দিয়ে এই কাজ থেকে নিবৃত্ত করুন। কারণ, মানুষ যদি কুরুক্ষেত্রে মারা গেলেই স্বর্গে যেতে পারে, তবে দেবতারা আর যজ্ঞভাগ পাবেন না। ইন্দ্র তখন কুরুর কাছে গিয়ে তাঁকে আর পরিশ্রম করতে নিষেধ করে এই কথাই বলেন যে, যে লোক এখানে উপবাস করে প্রাণত্যাগ করবে বা যুদ্ধে নিহত হবে, সেই লোকই স্বর্গগমন করবে। কুরু তখন তাতেই সম্মত হন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. আসল কথাটি লুকিয়ে রয়েছে উপরোক্ত এই বাক্যে — 'মানুষ যদি মারা গেলেই স্বর্গে যেতে পারে, তবে দেবতারা আর যজ্ঞভাগ পাবেন না'। তার মানে ঐ স্থানের মানুষ মারা যাক বা না-যাক, স্বর্গে যেতে পারলে দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞভাগ পেতেন। তাছাড়া 'যে ব্যক্তি এই স্থলে তপস্যা করবে অথবা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করবে, সে স্বর্গে গমন করবে', একথাটিরই বা মানে কী? **তপস্যা** শব্দের অর্থ শ্রম করা, উৎপাদন করা। **স্বর্গ** বলতে সুখস্বর্গ, অনেক সম্পদের মালিক হওয়া, রাজধানীতে থাকা, প্রাসাদে (দ্র. **প্রসাদ**) থাকা। তাহলে ব্যাপারটি এই দাঁড়ায় যে, কুরুক্ষেত্রে 'যা করা উচিত' তার একটা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা করেছিলেন কুরুরাজ এবং সেই বিধিবদ্ধ ব্যবস্থায় (ধর্ম্মে) যথেষ্ট তপস্যা বা উৎপাদন করতে পারলে মানুষ সুখস্বর্গে যেতে পারত। তাই তা 'ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র' হয়ে যায়। আবার উচিত বিচারে কাজ করাটাই মানুষের ধর্ম, সুতরাং কুরুক্ষেত্র আর ধর্মক্ষেত্র অভিন্ন। যেটি কুরুক্ষেত্র সেটিই ধর্মক্ষেত্র। তবে যখন বিধিবদ্ধ আইন ছিল না, ধর্ম্ম তেমন কার্যকরী ছিল না, তখন ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র হয়নি, তখন ছিল **কুরুজাঙ্গল**।

কুরুজাঙ্গল : ১. কুরু + জাঙ্গল। ২. *জাঙ্গল (জঙ্গলের নীতি) চলে যে কুরু নামক অবস্থানে*। ৩. কুরুর নামে বিখ্যাত জাঙ্গলদেশ। কুরুক্ষেত্র। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **জঙ্গল, জাঙ্গল**।

কৃ : শুরুতে ক্রিয়ামূলের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

কৃচ্ছ্র (কৃচ্ছ্রসাধন) : ২. *কৃৎ (কৃত বস্তু বা বিষয়) চয়ন করে লুকিয়ে রাখা হয় যে সাধনায়*। ৩. কষ্টকর, কষ্টসাধ্য, পাপ, কষ্টসাধ্য ব্রত, সান্তপনাদি ব্রত, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ, ব্যসনপ্রাপ্ত। (ব.শ.)। ৪. কষ্টকর অর্থে প্রচলিত। ৫. আদিকালে, যখন ব্যক্তিমালিকানা নিষিদ্ধ ছিল, তখন নিজের পরিশ্রম করে উৎপাদিত ফসলাদি লুকিয়ে রেখে কষ্ট করে দিন কাটানোকে বোঝাত **কৃচ্ছ্রসাধনা**। বছর পঞ্চাশ আগেও ডাকাতির ভয়ে গ্রামের ধনী মানুষেরা কেউ কেউ এরকম কৃচ্ছ্রসাধনা করতেন। সেই বিচারে একালে ব্যাঙ্কে টাকা রেখে শুকনো রুটি খেয়ে কাটানোকে বলতে হবে কৃচ্ছ্রসাধনা। কেননা কৃচ্ছ্র শব্দটির ভেতরে কৃৎ-কে নিয়ে এসে লুকিয়ে রাখার কথা স্পষ্ট বলা আছে। যদিও এখন কষ্টকরে দিনাতিপাত করাকেই লোকে কৃচ্ছ্রসাধনা বলে থাকে। দ্র. **কঠ, কঠিন**।

কৃত (কৃতকৃত্য, কৃতযুগ) : ১. ✓কৃ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *করণ তারিত যাহাতে; যাহা করা হইয়াছে = কৃত। কৃত করণীয় যাহাতে = কৃতকৃত্য।* / সম্পাদিত (যাহা সম্পাদন করা হইয়াছে) = কৃত; যে কার্য্য করিয়াছে = কৃতকৃত্য। (ব.শ.)। ৩. সম্পাদিত, নির্ম্মিত, গৃহীত, বিহিত, জনিত, কল্পিত, অভ্যস্ত, সাধিত, উপ্তশস্য, সংস্কৃত, পর্য্যাপ্ত, প্রতিষ্ঠাপিত, লব্ধ, ঘটিত, ক্রিয়া, কর্ম্ম, সৎকার্য্য, ফল, সত্যযুগ (এই যুগে সকলই কৃতকৃত্য, এইজন্য ইহার নাম কৃতযুগ।), পাশার যে পিঠে চারিটি বিন্দু থাকে, সে পিঠ। নিষ্পাদিতকর্ম্মা, কৃতকার্য্য, কৃতার্থ, কৃত-প্রতিজ্ঞাত বিষয়, চরিতার্থ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যা ইতিপূর্বে ঘটেনি, তা সত্য নয়। যা ঘটে গেছে, তাই সত্য। সত্য অতীত বলেই সে বাস্তব এবং 'পূর্ববিধান'-এ পরিণত হবার যোগ্যতা ধরে। পূর্বের 'ন্যায়' করবার যে বিধান, তাই 'পূর্ববিধান'। সেইহেতু পূর্ববিধান সবসময় 'ন্যায়'-সম্মত। ন্যায় ও সত্যের জোর থাকে অতীত ঘটনায়। যা আগে ঘটেনি, তা কোনো কিছুর 'ন্যায়' নয় বলেই 'অ-ন্যায়'। তাই আবিষ্কার বা উদ্ভাবন মাত্রেই অন্যায়। **কৃত**ও অতীত। সে হল, করা হয়ে গেছে, এমন কোনো কাজ বা কর্ম্মফল। তার 'ন্যায়' করণীয়ই হল **কৃতকৃত্য**। যেমন 'প্রাতে করণীয়' হল 'প্রাতঃকৃত্য', সেইরকম 'কৃতের ন্যায় করণীয়' হল **কৃতকৃত্য**। একই কর্মের পুনরাবৃত্তিকারী দক্ষ **কৃতকৃত্য** কর্ম্মের নীতিতে বিশ্বাসী। সেই নীতিতে সে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান করত বলেই শিব ছিলেন দক্ষের ঘোর বিরোধী। এই দক্ষের মাধ্যমেই সত্যযুগের বা কৃতযুগের সূত্রপাত ঘটেছিল। তার আগে পর্যন্ত ছিল জ্ঞানের অগ্নিশিখাবহনকারী শিবের যুগ। তাকে একাকারের যুগ বা মহান-এর যুগও বলা যায়। একালের ভাষায় তাকে 'মহান-জ-দারু' বা মহেঞ্জদড়ো সভ্যতার কাল হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। দক্ষ একাকারের যুগকে কৃতযুগে বা সত্যযুগে অধঃপতিত করে। তারপর অধঃপতন আর ঠেকানো যায় না, তা ত্রেতা-দ্বাপর পেরিয়ে কলিযুগে অধঃপতিত হয়ে যায়। সম্প্রতি আমরা নাকি সেই কলের যুগ পেরিয়ে পুনরায় উন্নততর একাকারের যুগে প্রবেশ করছি! হবেও বা।

কৃতঘ্ন : ১. কৃত ✓হন্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কৃতকে হনন করে যে*। / যে কৃত উপকার হত করে, অর্থাৎ মানে না। (ব.শ.)। ৩. উপকারকের অপকারক, অকৃতজ্ঞ, নিমক্‌হারাম। (ব.শ.)। ৪. ungrateful অর্থে প্রচলিত। (ব.শ.)। ৫. কৃত কর্ম ও কর্মফল বহু রকমের হয়। সমাজে তাকে হত্যা করাও বহুরকম ভাবে হয়ে থাকে। যৌথসমাজে কৃত ছিল একরকম, তাকে হত্যা করা হত নানা ভাবে। পরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সমাজে কৃত হয়েছে অন্যরকম, তাকেও নানা ভাবে হত্যা করা হয়ে থাকে। তাই কৃতঘ্ন বহু প্রকারের

হয়। স্কন্দপুরাণে সেই **কৃতঘ্নদের কথা** যেমন আছে, কীভাবে তারা **প্রায়শ্চিত্ত করবে** তার বিধানও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু **কৃতঘ্ন** শব্দের সেই প্রেক্ষাপট ও অর্থগুলি আজ বিলুপ্ত।

কৃতজ্ঞ : ১. কৃত ✓জ্ঞা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে কৃত-কে জানে।* / যে কৃত উপকার জানে; যে বহু অপকার উপেক্ষা করিয়া একটি উপকারকেই বহু মনে করে। (ব.শ.)। ৩. কৃতোপকার-জ্ঞাতা, উপকারকের প্রত্যুপকারক, সাধুবৃত্ত। (ব.শ.)। ৪. grateful অর্থে প্রচলিত। ৫. যা করা হয়েছে, তাকে যে জানে, সেই **কৃতজ্ঞ**। কিন্তু পরে পরে সামাজিক ব্যবহারে শব্দটি উপকারকের উপকারটির ব্যাপারে জ্ঞাতাকেই শনাক্ত করেছে। তার অন্য অর্থগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে।

কৃতদাস : ২. *যাহাকে দাস করা হইয়াছে।* / কৃত নিয়ম দাস; 'আমি এতাবৎকাল দাস' এই নিয়ম করিয়া যে দাস হয়। (ব.শ.)। ৩. পঞ্চদশ দাসের একতম। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যাকে সামাজিক নিয়ম, নীতি, ধর্ম্ম, আইনের সাহায্যে দাস বা slave করা হয়েছে, সেই হল **কৃতদাস**। এই কৃতদাসকে কেউ যখন ক্রয় করে নিয়ে আসে, তখন সেই দাসকে **ক্রীতদাস** বলে। ভারতের ইতিহাস সুস্পষ্ট রূপে জানায়, মানুষকে **কৃতদাসে** পরিণত করতে না পারলে কিছুতেই **ক্রীতদাসে** পরিণত করা যেত না। ইয়োরোপ আমাদের যে ক্রীতদাসের গল্প শোনায়, সেটি অতীতহারা ইতিহাস। দ্র. **দাস**।

কৃতবর্মা (কৃতবর্ম্মা, কৃতবর্ম্মন্) : ১. কৃত + বর্ম্মা (বর্ম্মন্)। ২. *বর্ম্ম (দেহাবরক) বানিয়ে (তার ভিতরে) থাকে যে।* ৩. যদুবংশীয় ক্ষত্রিয়বিশেষ। ইনি হৃদিকের পুত্র, দুর্যোধনের পক্ষীয় যোদ্ধা। সৌপ্তিক পর্ব্বে অশ্বত্থামা পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করিলে, ইনি কৃপের সহিত দ্বার রক্ষা করেন। প্রভাসে সাত্যকির হস্তে ইঁহার মৃত্যু হয়। (ব.শ.)। ভোজবংশীয় কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধা। ইনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধশেষে কৌরবপক্ষীয় অবশিষ্ট বীরদের অন্যতম। পাণ্ডব-শিবিরে নিদ্রিত পাণ্ডব বীরদের যখন অশ্বত্থামা হত্যা করেন, তখন কৃপাচার্যের সহিত কৃতবর্মা শিবিরের দ্বার রক্ষা করেন। ইনি অভিমন্যুবধের সপ্তরথীর অন্যতম। যদুবংশ ধ্বংসের সময় সাত্যকি কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ক্রিয়াভিত্তিক বিচারে শামুক, গুগলি, কচ্ছপ, প্রভৃতিকে **কৃতবর্ম্মা** বলা চলে। কুরুপাণ্ডবের সময়ে যে সত্তা এই প্রকার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছিল, **কৃতবর্ম্মা** ছিল তারই নাম। কিন্তু সে কে, তা এখনও আমরা বুঝে উঠতে পারিনি।

কৃতবীর্য্য (কৃতবীর্য) : ১. কৃত + বীর্য্য। ২. যাহা কর্ত্তৃক বীর্য্য কৃত (লব্ধ)। (ব.শ.)। ৩. কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের জনক নৃপবিশেষ। (ব.শ.)। চন্দ্রবংশের রাজা কণকের পুত্র। কণকের চার পুত্র — কৃতবীর্য, কৃতমৌজা, কৃতবর্ম, কৃতাগ্নি। কৃতবীর্য অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। ইনি মহর্ষি জমদগ্নিকে নিহত করেন। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম কতবীর্যের পুত্র কার্তবীর্যার্জুনকে পরাস্ত করে ও হৈহয়বংশের বহুজনকে বধ করে শেষে **কার্তবীর্যার্জুনকে** নিহত করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **নামগুলি ভাববার** — কৃতবীর্য্য, কৃতমৌজা, কৃতবর্ম্ম, কৃতাগ্নি। কণক যেই হোন না কেন, তাঁর দ্বারা যে চারটি পুত্রের জন্ম হয় তারা হল — **কৃত উদ্যোগ, কৃত ওজঃ (শক্তি)**, কৃত সুরক্ষা, কৃত পণ্য। এই উদ্যোগপতির **পুত্র** সাদা টাকার প্রবল শক্তি হয়ে উঠতেই পারে। হয়েছিল বলেই সে আদিম সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) ব্যবস্থার শীর্ষে অধিষ্ঠিত মহর্ষিদের বিরোধী হয়ে উঠেছিল। বিশেষত, তাঁদের মধ্যে যাদের অগ্নি (উৎপন্ন, পণ্য, অর্থসম্পদ) জমে গিয়েছিল, সেই জমৎ-অগ্নিদের (মজুতদারদের?) বিরুদ্ধাচরণ সে যে করবেই, তাতে আর আশ্চর্য কী! দ্র. **কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন**।

কৃতযুগ দ্র. **কৃত**।

কৃতান্ত : ১. কৃত + অন্ত। ২. কৃত অন্ত যাহা কর্ত্তৃক; যে নাশ করে; যে শাস্ত্রে কর্ম্মের অন্ত হয়; যাহা দ্বারা বিপর্য্যয় হয়; যাহা দ্বারা কার্য্যপরিচ্ছেদ হয়। (ব.শ.)। ৩. সর্ব্বলোকনাশকর, যম, প্রাক্তন কর্ম্ম, দৈব, ভাগ্য, ফলোন্মুখ, অকুশলকর্ম্ম, পাপকর্ম্ম, সিদ্ধান্ত, শনি, শনিবার, যমদৈবত্য ভরণীনক্ষত্র। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যা কিছু কৃত হয়েছে, সবই মানুষের মেধা ও শ্রমের ফল। তার অন্ত করে যে, সে মানুষের বিরোধী। স্বভাবতই সে অত্যন্ত মন্দ। অতএব তার 'সর্ব্বলোকনাশকর', 'প্রাক্তন কর্ম্ম', 'সিদ্ধান্ত (সিদ্ধ-র অন্ত)' বলে প্রতীয়মান হতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু তা 'যম' ও 'যমদৈবত্য' হয় 'সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ' অর্থে; 'দৈব্য' ও 'পাপকর্ম্ম' হয় 'পণ্যে পরিণত হয়ে যাওয়া' অর্থে; 'ভাগ্য' ও 'ভরণীনক্ষত্র' হয় 'কৃত বস্তুর ভাগ হয়ে ভাগীদারদের হাতে চলে যাওয়া' অর্থে; 'শনি' ও 'শনিবার' হয় সরকারি নজরদারদের (ইনকাম ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স প্রভৃতি বিভাগের শনি-) দৃষ্টিতে পড়ে নষ্ট হওয়া অর্থে; এবং 'ফলোন্মুখ' ও 'অকুশলকর্ম্ম' হয় 'উপকরণগুলিকে যথার্থ কৃত-তে পরিণত না-করে নষ্ট করে ফেলা' অর্থে।

কৌরব : ১. কুরু + অ (অণ্)। (ব.শ.)। ২. ***কুরবকারী-সম্বন্ধীয়** বস্তু ও বিষয়সমূহ কিংবা কুরবকারীর অপত্যগণ; উচিত করণ করে যাহারা, তাহাদের সম্বন্ধীয়।* ৩. কুরুসম্বন্ধী, কুরুদেশজাত, কুরুর অপত্য অর্থাৎ পুত্রপৌত্রাদি; কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়মাত্র; দুর্যোধনাদি। (ব.শ.)। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু — এই দুজনই কুরুবংশজাত, সেইজন্য এই দুজনই কৌরব। কিন্তু সাধারণত দুর্যোধনদের বংশকেই কৌরব এবং তাদের পক্ষকে কুরুপক্ষ বলা হয়ে থাকে। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. কৌরবের কাহিনী যে-সময়ের, সে সময় কিন্তু কৌরবরাই ছিলেন প্রচলিতের দ্বারা সমর্থিত। তাঁরা ঔরস পুত্র। সমাজের প্রচলিত নীতি অনুসারে যা করা উচিত, তাই তাঁরা করতেন। তাই তাঁরা কৌরব। কিন্তু এই '**কু**' কালানুক্রমে ততোমধ্যেই মৌলবাদী হয়ে গিয়েছিল। ফলে, পূর্ববর্তীকালের শুভ-কু পরবর্তীকালে অশুভ-কু তে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বিপরীতে, পাণ্ডবেরা নতুন নীতির সমর্থক ছিলেন। দ্র. **কুরু, কুরুক্ষেত্র**।

ক্রতু : ১. ✓কৃ + অতু (কতু) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২.

(সর্বজনীন) প্রকল্পকে যিনি বাস্তবায়িত করেন। **৩.** যূপসহিত সোমসাধ্য যজ্ঞ, শ্রৌতকর্ম্ম-ভেদ, দেবতাধ্যানরূপ সঙ্কল্প, যজ্ঞ, অশ্বমেধ, বিষ্ণু, ব্রহ্মার মানসপুত্রবিশেষ (ইঁহার পত্নী ক্রিয়া, পুত্র বালখিল্যগণ), সপ্তর্ষির একতম, বিশ্বদেববিশেষ, প্রজ্ঞা, কাম্যবিষয়ে রুচির আতিশয্য, বল, শক্তি। (ব.শ.)। একজন প্রজাপতি। ইনি একজন মহর্ষি এবং ব্রহ্মার মানসপুত্র বলে সর্বত্র পূজিত। এঁর স্ত্রী দক্ষকন্যা সন্নতি। কয়েকটি পুরাণ মতে ইনি ব্রহ্মার কোনো-না-কোনো অঙ্গ হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন। মহাভারত মতে এঁর স্ত্রী সন্নতি বালখিল্য নামে ষাট হাজার পুত্রের জন্ম দেন। মহর্ষি ক্রতু যজ্ঞাদি কাজে ও বিষম বিপদের সময় অন্যান্য ঋষিদের সঙ্গে উপস্থিত হতেন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** সপ্তর্ষি নামে যে সাতটি সত্তার কথা 'সপ্তচিরজীবী' রূপে প্রচলিত আছে, তাদেরই একটি সত্তার আদি নাম **ক্রতু**। এ সত্তা আজও বিদ্যমান। একালে এদের সরকারি প্রকল্পের রাষ্ট্রনিযুক্ত পরিচালক বলে। তার মানে, একালের সরকারি প্রকল্পের চিফ প্রোডাকসন ম্যানেজারের আদিপুরুষকে সেকালে **ক্রতু** বলা হত। দ্র. **সপ্তর্ষি**। **৬.** Avesta - Khratu, Greek - kratos। (ব.শ.)। ইংরেজি -crat।

ক্রিয়া (ক্রিয়াশক্তি, ক্রিয়াভিত্তিক) : **১.** ✓কৃ + অ (শ) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *কৃ-র গতির যাওয়া (থাকে) যাহাতে; যাহা দ্বারা করণ (ক্ষেত্রে) যায়; [ক্রিয়াশক্তি = যে শক্তির দ্বারা করণ (লক্ষ্যে) ন্যস্ত হয়; ক্রিয়াভিত্তিক = ক্রিয়া ভিত্তিতে যাহার।]*। **৩.** কৃতি, আরম্ভ, সাধন, পূজন, সম্প্রধারণ, শিক্ষা, নিষ্কৃতি, চিকিৎসা, চেষ্টা, গমন-ভোজনাদি, কার্য্যসাধনানুকূল ব্যাপার, প্রয়োগ, উৎপাদন, পাঠ, শারীরিক শ্রম, কর্ম্ম, ক্রতু, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ, অন্ত্যেষ্টি, সংযোগ ও বিভাগের কারণ, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য, কারণ, সংস্কার, শৌচ, দিব্যবিশেষ বা কিরা, উপায়, কার্য্যসাধনবস্তু যন্ত্রাদি, বৈবাহিক কার্য্য বা সম্বন্ধ। (ব.শ.)। **৪.** action, verb, doing ইত্যাদি অর্থে প্রচলিত। **৫.** 'কৃ-র গমনশক্তি স্থিত থাকে যাতে', সেটিই ক্রিয়া। এই ক্রিয়া **কর্ম্ম, কার্য্য,** ও **কাজের** মূলে সক্রিয় থাকে। সেই সুবাদে ক্রিয়া হল কর্ম্ম-কার্য্য-কাজের প্রাণ।

এই বিশ্বজগতের মূলে একটি দ্বৈতাদ্বৈত (দ্বৈত অথচ অদ্বৈত) অস্তিত্ব রয়েছে। সেটি হল ক্রিয়া (action) ও ক্রিয়াকারীর (actor) এমন এক রূপ, যা দৃশ্যত এক কিন্তু আসলে দুই; যারা এমনভাবে মিলেমিশে রয়েছে যে, একজনকে ছেড়ে আর একজনকে চিহ্নিত ধরার কোনো উপায় নেই। কার্য্যত, এ বিশ্বজগৎ হল অগণ্য ক্রিয়া ও ক্রিয়াকারীর এক আশ্চর্য্য ও বিশাল সম্মিলন। ব্যাখ্যার জন্য (ছ) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ক্রিয়া মানবাস্তিত্বেরও প্রধান আচরণ। এই আচরণের মাধ্যমেই সে জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়। এর বাহ্য ফল ফলে, এর দ্বারা জগৎ পরিবর্তিত হয়। তাই এই 'ক্রিয়া' শব্দের ধারণক্ষমতা বিশাল। জগতের সবকিছুকে বোঝানর জন্য যত শব্দ, ক্রিয়াই তাদের মূল; কারণ ক্রিয়াই জগতের মূল। ক্রিয়া ছাড়া জগতে একটি শব্দের (sound ও word-এর) উদ্ভব হয় না, হতে পারে না; হবেও না কোনোদিন। **৬.** ইংরেজি creation।

'কৃ' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকরুণ, আকীর্ণ, আকেকর, করষি, করি(রী)র, করীষ (করষি), করুণ, করুণবেদী, করুণা, করুণাত্মা, কারুণিক, কারুণ্য, কির, কিরকির, কিরকিরি, কিরণ, কিরণমালী, কিরণময়ী, কিরাট, কিরেট, কিরাত, কিরাতিনী, কিরি, কিরিচ, কিরীট, কিরীটী, কির্মীর, কীর্ণ, কুরঙ্গ, কুরঙ্গগঞ্জন, কুরঙ্গনয়না, কুরঙ্গনাভি, কুরঙ্গনেত্রা, কুরঙ্গম, কুরঙ্গমদ, কুরঙ্গলাঞ্ছন, কুরঙ্গিণী, কৃ, বিপ্রকীর্ণ, সঙ্কর, সঙ্কীর্ণ, সমাকীর্ণ।

কৃ = (জগৎ) কারীর ধারী। (দ্র. কৃ। যে শক্তি উপকরণকে ঘোরায়, সে হল ক; সেই শক্তি-প্রযুক্ত ঘূর্ণমান উপকরণ হল কৃ। তাকে ধারণ করে যে, সে হল কৃ। অর্থাৎ কৃ থাকে যাহাতে, তাকে কৃ বলে।)

করীষ (করষি) : **১.** ✓কৃ + ঈষ (ঈষন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *যে কর ঈষ দেয়।* **৩.** মৃগাদির বিষ্ঠা, গোময়, শুষ্কগোময়, ঘষী, ঘুঁটে, পশুর পুরীষমাত্র। করীষাগ্নি = শুষ্কগোময়কৃত অগ্নি, ঘুঁটের আগুন। (ব.শ.)। **৪.** মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে গোময় চটকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রায় শিল্পচর্চার মতো করে প্রস্তুত ঘুঁটেকে 'করষি' বলা হয়। **৫.** [এ ভারি অদ্ভুত ব্যাপার যে, যে 'করীষ' শব্দটি *শতপথব্রাহ্মণ* নামক সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়, সংস্কৃত *রামায়ণে* পাওয়া যায় (দ্র. ব.শ.), সেই শব্দের উত্তরাধিকার অ্যাকাডেমির তো নেইই, সাধারণ বাংলা-ভাষীরও নেই; রয়েছে কিনা মেদিনীপুরের গণ্ডগ্রামের খেঁড়ে-মুসলিমদের বাংলা-ফারসি-আরবি-উর্দু-হিন্দি মিশ্রিত 'খেঁড়ে-হিন্দি' ভাষায়! ভাষাটিতে এরকম উত্তরাধিকার আরও কিছু শব্দের রয়েছে, যথা — অধ্বন, কুণ্ডল, কাতি (কর্ত্তরিকা), কটোরা (কটোর), থালী (স্থালী)... ইত্যাদি অজস্র। বলে রাখা ভাল, এ ভাষাটির লিপি পর্যন্ত নেই এবং বর্তমানে ভাষাটি অবলুপ্তির পথে। — কলিম খান।]

করুণ : **১.** কৃ + ✓উন্ (উনন্) - কর্তৃবাচ্যে; অথবা, করুণা + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। **২.** *যাহাতে করা (কর্ম) উন বা কম বা এলোমেলো।* / যাহা চিত্ত বিক্ষেপ করে, যাহা শোক উদ্দীপন করে। (ব.শ.)। **৩.** দীন, করুণাযুক্ত, শোকব্যঞ্জক, প্রিয়বিয়োগনিবন্ধন, ইষ্টনাশ, শোক, করুণরস, পরমেশ্বর, বুদ্ধবিশেষ, বৃক্ষবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** very sad বা 'দুঃখজনক' অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **শূদ্র। করুণা।** বস্তুত বেকার বা অর্ধ-বেকারের অবস্থাই 'করুণ' অবস্থা। কারণ তাদের 'করা'র পরিবেশটাই উন, ফলে 'উৎপন্ন' নাই, হয় না। কিংবা, কাঁচামাল রয়েছে, হাতিয়ার রয়েছে, কিন্তু কেমন করে কী করতে হবে জানা নেই, যিনি দেখিয়ে দেবেন তিনি নেই, ফলে কাজ হচ্ছে না। তখন যে-দুরবস্থা সেটিই 'করুণ'। যদিও আজকাল যে-কোনো দুঃখকর অবস্থাকেই 'করুণ' বলা হয়ে থাকে।

করুণা : **১.** করুণ + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *করুণ-এর আধার যে।* / পরের দুঃখ হরণের যে-ইচ্ছা। (ব.শ.)। **৩.** দয়া, কৃপা, সদয়ভাব। ... (ব.শ.)। **৪.** kindness অর্থে প্রচলিত। **৫.** এটি 'অনুগ্রহ' জাতীয় শব্দ, যার অর্থ 'খানিকটা নিয়ে নেওয়া'। কিন্তু মানেটা দাঁড়িয়েছে 'দয়া করা'। কারণ, পুরোটা তো নেয়নি, অথচ চাইলে নিতে পারত। ঠিক তেমনি, যে-পরিস্থিতিতে মানুষের অবস্থা

করুণ হয়, সেই পরিস্থিতিকে বলা হত 'করুণা', কারণ তা 'করুণ-এর আধার'। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে-পড়া মানুষটিকে সাহায্য করে উদ্ধার করাই উচিত কাজ। লোকে তাই করতও। ক্রমান্বয়ে একদিন 'করুণা'র মানে করুণাকে ছাড়িয়ে যায়, করুণার বা 'করুণ পরিস্থিতি'র চেয়ে সেই পরিস্থিতিতে করণীয় কাজটিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। ফলে, করুণা হয়ে যায় 'পরদুঃখহরণেচ্ছা' বা দয়া। করুণ অবস্থাই বটে!

কির : ১. ✓কৃ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গতিশীল কারী রহে যাহাতে।* / যে মৃত্তিকা বিক্ষেপন করে। (ব.শ.)। ৩. শূকরশাবক, লেখক। কিরী = শূকরী। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কৃ শব্দের অর্থ থেকে বোঝা যায়, শক্তিযোগে উপকরণের আবর্তনকে 'কর্' বলে। সেই শক্তি যদি গতিশীল হয়ে যায়, তবে তা কির-পদবাচ্য। তার মানে ডেকে আনতে বললে যে বেঁধে নিয়ে আসে কিংবা চাইলে বেঁধে আনতে পারে, সেই সত্তাকে কির বলা চলে। কিন্তু সেই কির শব্দ একই সঙ্গে শূকরশাবক ও লেখক দুই সত্তাকে কেন বোঝাতো, তা সহসা বোধগম্য হতে চায় না। তবে 'বর', 'বরাহ', 'বারাহ' শব্দ থেকে বোঝা যায়, যাদেরকে নিয়োগ করা হত তারা বর, বরাহ, বারাহ পদবাচ্য ছিল। তেমন খাজনা-আদায়কারী সরকারি কর্মচারী কেরানিরাও বারাহ-পদবাচ্য বা শূকরশাবক। এককালে এঁরা অত্যন্ত সম্মানীয় 'কির' বা রাষ্ট্রীয় (জাতীয়) কর্ম্মচারী ছিলেন বলেই বরাহ শব্দটি ভারতে মানুষের নাম রূপে আজও প্রচলিত। বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। কিন্তু কির-এর অতি সক্রিয়তার কারণে (ডেকে আনতে বললে মারধর করে বেঁধে আনার কারণে) মধ্যযুগের বাংলায় বরাহ ও শূকর শব্দটি নিন্দনীয় হয়ে যায়। মধ্যযুগে (কবিকঙ্কণের কালে) কির বা লেখক-রা (কেরানিরা) প্রজাদের উপর খাজনাদি ব্যাপারে অত্যন্ত অত্যাচার করত। সেই কারণেই শূকরশাবক ও লেখক শব্দদুটি সমার্থক হয়ে যায় এবং 'শুয়োরের বাচ্চা' শব্দটি বাংলা ভাষায় নিন্দা করার বা গালাগালি দেওয়ার শব্দ রূপে পরিণত হয়ে যায়।

কিরণ : ১. ✓কৃ + অন (ক্যন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কির (= শক্তিকণাসমূহ বা সরকারি কর্মচারীগণ) অন (on) থাকে যাহাতে।* / যে তিমির বিনাশ করে। (ব.শ.)। ৩. সূর্য্যরশ্মি, রৌদ্র, চন্দ্ররশ্মি, কৌমুদী, জ্যোৎস্না, প্রভা, দীপ্তি, সূর্য্য। (ব.শ.)। ৪. ray বা 'রশ্মি' অর্থে প্রচলিত। ৫. যে সত্তায় কির বা শক্তিকণাসমূহ অন হয়ে থাকে, সে হল সূর্য্যের কিরণ। তা সে বাহ্যিক সূর্য্য হতে পারে, মানুষের মনোলোকের সামাজিক সূর্য্যও হতে পারে। বাহ্যিক সূর্য্যের কিরণ যেমন 'প্রাচীরের গায়ে এক নামগোত্রহীন' 'ছোটফুল'কে 'ভাল আছ ভাই' বলে সম্বোধন করে, তেমনি সামাজিক সূর্য্যের কিরণ গণ্ডগ্রামের গণ্ডমূর্খ বাংলাভাষীর দরজাতেও হাজির হয় বিভুঁইয়ে থাকা তার ছেলের চিঠি নিয়ে। আমরা বুঝতে পারি, একটি সরকারি কর্মচারী গ্রামে চিঠি বা মিনিকিট বিলি করতে যাচ্ছে মানে সূর্য্যের একটি কিরণ চলেছে গণ্ডগ্রামেও আলো দিতে; আর একটি সরকারি কর্মচারী গ্রামে চলেছে খাজনা আদায় করতে মানে সূর্য্যের তাপের একটি কিরণ চলেছে জল (জনসাধারণ) থেকে বাষ্প নিয়ে আসতে। দ্র. সূর্য্য, কৌমুদী। এখন সূর্য্য বলতে আমরা শুধুই sun বুঝি। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি ও শব্দার্থবোধ হারানোর ফলে মনোলোকের সূর্য্য ও তার কিরণের বিষয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের সমস্ত অর্জনই আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। দ্র. চরণ।

কিরাত : ২. *গতিশীল কারীর তারণ যাহাতে।* / যে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ স্থানে যায়; কিলকিল শব্দ করিতে করিতে যে যায়। (ব.শ.)। ৩. কিরাতজাতীয় পুরুষ, দেশবিশেষ, কিরাতবেশী মহাদেব, অশ্বরক্ষক সহিস, বামন, ভূনিম্ব, চিরতা, মৎস্যবিশেষ। মহাভারত অনুসারে ইহারা সাগরকুক্ষিবাসী ম্লেচ্ছ, ফলমূলাশী, চর্ম্মবসনধারী, ক্রূরশস্ত্রধারী ও ক্রূরকর্ম্মা। মনুর মতে ইহারা ক্রিয়াদিলোপ হেতু শূদ্রত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়। কুমারসম্ভবে ইহারা পর্বতবাসী মৃগয়াজীবী বলিয়া বর্ণিত। কিরাতী = কিরাতের স্ত্রীজাতি, কিরাতবেশধারিণী দুর্গা, চামরধারিণী, কুট্টিনী, গঙ্গা, স্বর্গগঙ্গা। (ব.শ.)। ক) ভারতের পূর্বদিকস্থ পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলের অধিবাসী অনার্য জাতি। রামায়ণে বর্ণিত আছে, এরা দ্বীপবাসী, অদগ্ধ মাংস ভক্ষণ করে। পর্বতগুহাভ্যন্তরে ও পর্বতগাত্রে এদের বাসস্থান ছিল। খ) শিবের রূপান্তর। পাণ্ডুপুত্র অর্জুনকে পরীক্ষা করবার জন্য কিরাত মূর্তি ধারণ করে শিব অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ((পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কিরাতেরা 'আবর্জ্জনা নিক্ষেপ স্থানে' যেত কেন? কারণ প্রাচীন যৌথসমাজে উৎপন্নকে ভাগবাঁটোয়ারা করে ভোগ করে নেওয়া হত। কিন্তু কোনো কারণে সেই উৎপন্ন যদি উদ্বৃত্ত হয়ে যেত, তাকে বর্জ্জন করা হত; যেখানে বর্জ্জন করা হত বা ফেলে দেওয়া হত, তাকে বলা হত 'আবর্জ্জনা নিক্ষেপ স্থান'। সেকালে উদ্বৃত্ত উৎপন্ন করা ও ভোগ করাকে অনুচিত বলে সিদ্ধান্ত করেছিল মানুষের প্রাচীন সমাজ। বলা হয়েছিল — এ হল 'বৃথা মাংস ভক্ষণ'। সঞ্চয় করার তো প্রশ্নই ছিল না। কিরাতেরা বেদবাদীদের এই নীতি মানতে রাজি হয়নি। তারা সেই 'আবর্জ্জনা নিক্ষেপ স্থানে'ই যেত এবং প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করত। তার মধ্যে যা ভোগ করার তা তারা নিশ্চয় ভোগ করত, কিন্তু বাড়তি বস্তুগুলি কাউকে দিতে হত। আর তখনই তাদেরকে 'কিল কিল শব্দ করিতে করিতে' যেতে হত, উপরে যার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন ব.শ.। কিন্তু কিল কিল শব্দ করতে করতে যাওয়া কীরূপ ব্যাপার?

যে প্রাচীন গ্রন্থে 'কলিকাতা' স্থানটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় (সম্ভবত দশম শতাব্দীতে লিখিত) সেই গ্রন্থের নাম 'শারদাতিলক'। এতে ভাগীরথীর তীর বরাবর যে বাণিজ্য অঞ্চল প্রাচীন কালে গড়ে উঠেছিল, তার উল্লেখ করে বলা হয়েছে — এই অঞ্চলকে 'কিলকিলা প্রদেশ' বলা হত এবং এখানে 'পক্ষীরা কূজন' করিত। কিলকিলা শব্দের মানে থেকে আমরা জানতে পারি, এখানে মল্লযুদ্ধ বা মাল-কাড়াকাড়ির যুদ্ধ হত। কূজন ও পক্ষী শব্দের অর্থ থেকে জানতে পারি, এখানে বণিকেরা কেনাকাটা করত; কলিকাতার কালীক্ষেত্র কালীঘাট, শাঁখারিটোলা, কলুটোলা ইত্যাদি প্রাচীন নামগুলি আজও তার সাক্ষী। অতএব সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, কিরাতেরা কেবলমাত্র আবর্জ্জনা নিক্ষেপস্থানেই যেত না, নিজেদের ভোগের পর যা উদ্বৃত্ত হয়ে যেত, তা অন্যদের সঙ্গে বিনিময় করে নিত। ... মোটকথা কিরাতের কাহিনীতে বেদবিরোধীদের প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে

রামায়ণের যুগ পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাস সংকলিত রয়েছে। দ্র. **কাক, কাকবলি**। এ বিষয়ে নাগপুর থেকে প্রকাশিত *খনন* পত্রিকায় কলিম খান-এর 'পক্ষীপুরাণের মক্শো' নিবন্ধটিও দ্রষ্টব্য। দ্র. **কাক**।

কির্ম্মির, কির্ম্মীর : ৩. শবল, বিচিত্রবর্ণ, চিত্রবর্ণ, নাগবিশেষ, নারাঙ্গী গাছ, রাক্ষসবিশেষ। বনবাসকালে কাম্যকবনে কির্ম্মীর ভীম কর্তৃক নিহত হয়। ইহার ভ্রাতা বক। (ব.শ.)। বকরাক্ষসের ভ্রাতা এবং হিড়িম্বের বন্ধু। এই রাক্ষস কাম্যক বনে বসবাস করত। দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবরা এই বনে বাস করবার জন্য প্রবেশ করলে, কির্মীর মায়া বিস্তার করে এঁদের পথ রোধ করে, কিন্তু ভীম ভীষণ যুদ্ধ করে এই রাক্ষসকে নিহত করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **কাম্যক**।

কীর্ণ : ১. ✓কৃ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গতিশীল ক্রিয়াধারীর বোধ (দ্র. **কণ**) যাহাতে।* ৩. বিক্ষিপ্ত, ব্যাপ্ত, আচ্ছন্ন, আবৃত, হিংসিত। (ব.শ.)। ৪. স্বতন্ত্রভাবে শব্দটির প্রচলন নেই বললেই চলে, কিন্তু উপসর্গ যোগে ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। যথা — আকীর্ণ, প্রকীর্ণ, বিকীর্ণ, সঙ্কীর্ণ ইত্যাদি। ৫. কীর্ণ শব্দটি কাশ শব্দের মতো। একা একা তার কদর নেই, অর্থও যেনবা নেই; কিন্তু উপসর্গ-যোগে তার অভিজাত চাল — আকাশ, প্রকাশ, বিকাশ, সঙ্কাশ। বেশ কয়েকটি ঢিল কীর্ণ হয়ে এসে পড়ল চারপাশে। সেটি উৎকীর্ণ (উপর দিকে ফোয়ারার জলবিন্দুসমূহের মতো) হতে পারে, বিকীর্ণ (বিশেষ দিকে পিচকিরির মতো) হতে পারে, কিংবা আকীর্ণ (সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া) হতে পারে। কোনো বিশেষত্ব নেই, এমনভাবে কীর্ণ হওয়া বেশ মুশকিল।

কুরঙ্গ, কুরঙ্গম : ১. ✓কু > অঙ্গ - ক। ২. *যে **কু** রঙ্গ করে।* ৩. ঈষৎ তাম্র (তামাটে রঙের) হরিণবিশেষ, হরিণ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পাশ্চাত্যের পশুরা animal-মাত্র, আমাদের তো তা নয়। আমাদের **পশু** forest-এ থাকে, সমাজেও থাকে। দ্র. **সিংহ**। **হরিণ**ও আমাদের দুরকম, স্বভাব বা ক্রিয়া এক বলে উভয়কে একই শব্দে সম্বোধন করা হয় — কুরঙ্গ। এরা কু রঙ্গ করে। কেন করে? কারণ সে তার 'আপন গন্ধে' পাগল হয়ে বনে বনে ফেরে। সে গন্ধ কস্তুরীর, যা তার নাভিতে জমে, জমে পুঞ্জ হয়, পুঞ্জি হয়, গন্ধ ছড়ায়, সে গন্ধ তাকেই পাগল করে তোলে; অন্যদেরও করে। তাই সে কুরঙ্গ, কুরঙ্গম, সে কস্তুরীমৃগ। animal কুরঙ্গের কস্তুরীতে পার্থিব গন্ধ ছড়ায়, মানুষ-কুরঙ্গের কস্তুরীতে মানসিক গন্ধ ছড়ায়। animal কুরঙ্গের **কস্তুরী** নাকি তিন জাতের, সামাজিক কুরঙ্গের কস্তুরীও তিন জাতের — যৌবনসম্পদ, বাহ্যসম্পদ ও মেধাসম্পদ। এই সম্পদগুলি **'যোজনগন্ধ'** ছড়ায় — যোগ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে চাই, যোগ্য এসে আমার সঙ্গে যুক্ত হোক, এই তার বাণী। বাতাসে সেই যৌবনের গন্ধ, টাকার গন্ধ, মেধার গন্ধ ছড়ায়, মানুষ সে গন্ধ পায়, শোনে, আমিষগন্ধে পাগল হয়। লোকে দৌড়য়, সুন্দর সুন্দরীর পেছনে, সুন্দরী সুন্দরের পেছনে; টাকা পণ্যের পেছনে, পণ্য টাকার পেছনে; রসিক যায় দুই সমুদ্রপারের অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ে, তিন সমুদ্রপারের তুসুক বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেই বিদ্যালয়গুলিও তাকে ডাকে, এসো, পাবে! — এসবই **কস্তুরী**, এবং এর সবেতেই মানুষের নেশা হয়, মানুষ পাগল হয়। কুরঙ্গ সেই কস্তুরীর নেশায় মত্ত বলে তাকে কুরঙ্গ বলে। কুরঙ্গগঞ্জন, কুরঙ্গলাঞ্ছন, কুরঙ্গলক্ষণ প্রভৃতি শব্দ এ বিষয় বুঝতে বাড়তি সাহায্য করবে।

'কৃৎ' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকাট্য, অকীর্ত্তি, অকৃত্ত, অক্রুর, অক্রৌর্য্য, অতিক্রূর, আনকোরা, উৎকর্ত্তন, উৎকীর্ত্তন, কট্ট, কট্টমট, কট্টার, কর্ত্ত, কর্ত্তন, কর্ত্তরিকা, কর্ত্তিত, কর্ত্তুকা, কর্ত্ত্য, কত্‌র্ত্রিকা, কাচতিয়া, কাচতে, কাচি, কাট, কাটছাঁট, কাটছাট, কাটতি, কাটন, কাটনা, কাটুনি(নী), কাটকবুল, কাটকুট, কাটা, কাটাইর(ল), কাটাও, কাটাকাটি, কাটাকুটি, কাটাছাঁটা, কাটাছাটা, কাটান, কাটানো, কাটা-পঁইছে, কাটাপৈঠা, কাটাফেণি, কাটার, কাটারি(রী), কাটি(টী), কাটিগঙ্গা, কাটি-ঘা, কাটিয়া, কাটিল, কাটুরকুটুর, কাঠ, কাঠ-আমলা, কাঠ-কঠিন, কাঠকুড়ুনী, কাঠকুড়ানী, কাঠকোটরিয়া, কাঠখড়, কাঠখড়ি, কাঠখোলা, কাঠগড়, কাঠঝুনা, কাঠটগর, কাঠ(ঠু)রিয়া, কাঠা, কাঠাম(মো), কাঠি, কাঠুরে, কাতরি(রী), কাতান, কাতারি(রী), কাতি(তী), কাতিক, কাতিয়ারী, কাত্তিক, কার্ত্তিক, কার্ত্তিকেয়, কার্ৎস্ন্য, কাস্ত, কাস্তে, কিট(টা)ন, কিত্তন, কীরিতি, কীর্ত্তন, কীর্ত্তনি(নী)য়া, কীর্ত্তনীয়, কীর্ত্তনীয়া, কীর্ত্তি, কীর্ত্তিকর, কীর্ত্তিকল্পতরু, কীর্ত্তিকল্পলতা, কীর্ত্তিত, কীর্ত্তিনাশন, কীর্ত্তিবন্ত, কীর্ত্তিবন্ত, কীর্ত্তিবাস, কীর্ত্তিময়, কীর্ত্তিমান, কীর্ত্তিশেষ, কীর্ত্তিস্তম্ভ, কৃৎ, কৃত্ত, কৃত্তিকা, কৃত্তিবাস, কৃত্তিবাসাঃ, কৃৎস্ন, কৃদন্ত, কৃন্তন, কেটে, কোর, ক্রুর, কীর্ত্তন, ক্রুর, ক্রূরকর্ম্মা, ক্রৌর্য্য, টেকো, তর্কু, তর্কুলাসক, সঙ্কীর্ত্তন।
কৃৎ = (জগৎ) করণের তারণ (উল্লম্ফন)।

কর্ত্তরিকা (কাতী) : ২. যাহা দ্বারা কাটে। (ব.শ.)। ৩. কাটারি বা কাতারী, কাতুর, কাতান (কাত্যায়নী?), ছুরিকা, কাঁচি। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **করীষ**। বাংলাভাষায় এই শব্দটির সরাসরি প্রচলন নেই। কিন্তু এর থেকে জাত শব্দ 'কাতারী বা কাটারি', 'কাতান', 'কাতী'র ভালই প্রচলন রয়েছে গ্রামবাংলায়। কাটারি বা কাতান দিয়ে বাঁশ ইত্যাদি কাটা হয়। গ্রামের মানুষের রোজকার কাজের হাতিয়ার এই কাতান বা কাটারি। আর, কাতি হল কাস্তের মতো দেখতে অতি ধারাল একটি অস্ত্রের নাম, যা দিয়ে তালের মোচা বা খেজুর গাছের মাথায় অতি সূক্ষ্মভাবে কেটে যথাক্রমে তালরস ও খেজুররস চোয়ানো হয়। দ্র. **কাত্যায়নী**।

কীর্ত্তন : ১. ✓কীর্ত্তি + অন্ (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহাতে কীর্ত্তি অন্ করা হয়।* ৩. গুণকথন, স্তবন, ইষ্ট দেবতার গুণকথনরূপ বা নামগানরূপ ভক্তির লক্ষণবিশেষ, কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সঙ্গীতবিশেষ, সঙ্কীর্ত্তন। (ব.শ.)। ৪. **'কীর্তন'** নামক গান রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কীর্ত্তি**।

কীর্ত্তি : ১. ✓কৃৎ + ই (ণিচ্) — কীর্ত্তি; ✓কীর্ত্তি + তি (ক্তিন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কীর্ (= কৃতের ভাবরক্ষণ) এর তারণ গতিশীল থাকে যাহাতে।* ৩. সংশব্দন, কথন; সমজ্ঞা, যশঃ, খ্যাতি, দানাদিজ্জাত খ্যাতিবিশেষ, মৃতের খ্যাতি, মাতৃকাবিশেষ; কীর্ত্তন, কথন, শব্দ, প্রসাদ, বিস্তার, দীপ্তি, কর্ম্ম, কাজ (নিন্দার্থে)। (ব.শ.)। ৪. 'সুকর্মের সুনাম' অর্থে কদাচিত প্রচলিত হলেও 'কুকর্মের দুর্নাম' অর্থে যথেষ্ট প্রচলিত। ৫. কীর্ত্তিকে সমজ্ঞা বলে। কারণ, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের ঘটনার সম্পূর্ণ যে চক্র, তার জ্ঞান থাকে সমজ্ঞায়। মোট কথা, যা করা হল তার ভবফল থাকে 'কৃত্য'তে; আর তার ভাবফল থাকে 'কীর্ত্ত'তে। সেই কীর্ত্ত গতিশীল থাকে 'কীর্ত্তি'তে। সেই কীর্ত্ত অন (on) থাকে কীর্ত্তন-এ। এই কীর্ত্তন 'পদাবলী কীর্ত্তন' রূপে বাংলাভাষীর নিজস্ব অর্জন এবং তার শ্রেষ্ঠ অর্জনগুলির অন্যতম।

কৃত্তিকা : ১. ✓কৃৎ + তিক (তিকন্) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *ছিন্ন করে যে আধারশক্তি।* ৩. (জ্যোতিষে) সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত তৃতীয় নক্ষত্র (Pleiads। ইহা ষট্তারকাযুক্ত। ইহার আকার অগ্নিশিখাতুল্য বা ক্ষুরসদৃশ, দেবতা অগ্নি। পুরাণে ষট্কৃত্তিকা কার্ত্তিকেয়ের পালয়িত্রী জননী।), কার্ত্তিকেয়জননী ষট্কৃত্তিকা। (ব.শ.)। (ক) সপ্তর্ষির মধ্যে বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী ভিন্ন অবশিষ্ট ছয়জন ঋষির স্ত্রীকে 'কৃত্তিকা' বলা হয়। কৃত্তিকারা একদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে অগ্নি সেবন করেন। সেই অগ্নির তেজে তাঁরা গর্ভবতী হন। পরে তাঁরা সকলেই সেই তেজ হিমালয়ের শিখরে পরিত্যাগ করেন। সেই মিলিত তেজঃপুঞ্জ হতে কুমারের (কার্তিকেয়র) জন্ম হয়। (খ) দক্ষের ৬০ জন কন্যার মধ্যে কৃত্তিকা প্রভৃতি ২৭ জন চন্দ্রের স্ত্রী ছিলেন। চন্দ্র যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত ছিলেন বলে তাঁদের গর্ভে কোনো সন্তান হয় নাই। (গ) ব্রহ্মার ঔরসে সাবিত্রীর গর্ভে কৃত্তিকা প্রভৃতি ছয়জন জন্মগ্রহণ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **অগ্নিকুমার, শরজন্মা, কার্ত্তিকেয়।**

কৃত্য : ১. ✓কৃ + য (ক্যপ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কৃত থাকে যাহাতে; যা করতে হয়।* ৩. করণীয়; শত্রু কর্তৃক ধনাদি দ্বারা ভেদ, অর্থাৎ স্বপক্ষ করণীয়; বিদ্বিষ্ট; করণীয় বিষয়; কার্য্য; প্রয়োজন; ক্রিয়াকরণ; আভিচারিক ক্রিয়া; দেবতা, যজ্ঞদেবতাবিশেষ; মায়া, ছল, কপটতা। (ব.শ.)। ৪. 'প্রাতঃকৃত্য' প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে জুড়ে এখনও কমবেশি প্রচলিত। পৃথকভাবে প্রচলন নেই। ৫. দ্র. **কৃতকৃত্য**। কৃত্য শব্দের অর্থ হল 'যা করতে হয়'। একালে কোন মানুষের করণীয় বা কৃত্য কী, তার কোনো সুনির্দিষ্ট বিধান নেই বলে মনে হয়। কিন্তু একেবারেই নেই, তা বলা যায় না। কেউ চাইলেই ইস্কুলে গিয়ে মাস্টারি করতে পারে না, কিংবা থানায় গিয়ে দারোগাগিরি। অর্থাৎ একালেও কৃত্যের একটা কমবেশি সুনির্দিষ্ট তালিকা আছে, প্রত্যেক মানুষের। সেকালের ভারতে কোন মানুষের 'কৃত্য' কী হবে বা হওয়া উচিত তা-সব বিবেচনা করে সমাজপরিচালক ব্রাহ্মণকে নানা রকম বিধান দিয়ে রাখতে হয়েছিল। সেই বিধান থেকে প্রত্যেকেই জানতে পারত কার কৃত্য কী। লোকে সেই অনুযায়ী নিজ নিজ কৃত্য কমবেশি করতও।

কৃত্রিম : ১. ✓কৃ + ত্রি (ক্ত্রি), ম (মপ্) প্রত্যয়; ✓কৃ + ত্রিম (ত্রিমক্) 'তজ্জাত' অর্থে। (ব.শ.)। ২. ক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত বা নিষ্পন্ন (হয়েছে যে); যাহা আন্তরিক নহে। (ব.শ.)। ৩. অবাস্তব, অযথার্থ, মিথ্যা, কার্য্যহেতুক, কার্য্যজন্য, অপকার বা উপকার হেতু জাত, স্বয়ংকৃত (পুত্র), বিমিশ্র, অবিশুদ্ধ, ভেজাল, জাল, ছদ্মবেশী, ভেকধারী, ভণ্ড, লোক-দেখান, মৌখিক, দ্বাদশবিধ পুত্রের একতম, তুরুষ্ক নামক গন্ধদ্রব্য। (ব.শ.)। ৪. unnatural অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ 'যা বানানো হয়েছে', নিজে থেকে জন্মায়নি; অর্থাৎ যার সম্পর্কে শব্দটি প্রয়োগ করা হচ্ছে সে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নয়। শব্দটি একটি বিশেষণ পদ, অন্য কোনো বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে সে এই খবরটি দেয় যে, তারা স্বয়ম্ভূ নয়, কেউ না কেউ তাদের বানিয়েছে। অথচ, শব্দটি প্রয়োগের সময় উদ্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুটির 'কৃত্রিমতা' যত না গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় তার আপ্রাকৃতিকতা। ফলে 'কৃত্রিম' শব্দটি তার শব্দগত অর্থ হারিয়ে এখন অবাস্তব, মিথ্যা, ছদ্মবেশী, ভেকধারী, লোকদেখানো, মৌখিক ... ইত্যাদিতে পরিণত হয়েছে।

'কৃপ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকৃপ, অকৃপণ, কপ্পুর, কর্পর, কর্পূর, কার্পণ্য, কৃপ্, কৃপ, কৃপণ, কৃপা, কৃপাণ, কৃপাদায়, কৃপাবলোকন, কৃপামই, কৃপালু, কৃপিণ(ন), কাফুর, কেঁয়ে, ক্রেপা, ক্রেপাণ, সকৃপণ।

কৃপ্ = কৃ-র পালন-পান। **কৃপ** = কৃ-র পালন-পান যাহাতে।

কৃপ (কৃপা) : ১. ✓কৃপ্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (✓কৃপ্ + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)।) (ব.শ.)। ২. *কৃপ্ = কৃ পালন-পান। কৃপ = কৃ পালন-পান যাহাতে। কৃ পান বা পালন করে যে।* ৩. গৌতমসুত শরদ্বানের পুত্র। ইঁহার মাতা অপ্সরা জানপদী। শান্তনরাজ ইঁহাকে ও ইঁহার সহোদরা কৃপীকে কৃপাপরবশ হইয়া অপত্যবৎ পালন করেন; তজ্জন্য ইঁহারা 'কৃপ' ও 'কৃপী' নামে খ্যাত। কৃপ ধনুর্ব্বেদে নিপুণ ছিলেন ও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুরুপক্ষ অবলম্বন করেন। ইনি সপ্ত চিরজীবীর একতম। (ব.শ.)। ঋষি গৌতমের পুত্র। গৌতমের শরদ্বান নামে এক পুত্র ছিল। ... ধনুর্বিদ্যায় শরদ্বানের অসাধারণ অনুরাগ ও কৃতিত্ব দেখে ইন্দ্র ভয়ে ভীত হয়ে জানপদী নামে এক অপ্সরাকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে শরদ্বানের হস্ত হতে ধনুর্বাণ চ্যুত হয় এবং কামবশে রেতঃপাত ঘটে। সেই রেতঃ একটি শরস্তম্বে পতিত হয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং তা থেকেই একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। রাজা শান্তনু এঁদের দেখতে পেয়ে কৃপা করে সন্তানের মত পালন করতে থাকেন এবং সেই জন্যই পুত্রের নাম হয় কৃপ ও কন্যার নাম হয় কৃপী। শরদ্বান তপোবলে এঁদের জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়ে রাজভবনে আসেন এবং কৃপকে শিক্ষা দ্বারা ধনুর্বেদে পারদর্শী করেন। ... পরে কৃপ কুরুপাণ্ডবদের অস্ত্রশিক্ষা দিতে থাকেন এবং কৃপাচার্য নামে পরিচিত হলেন। ... ইনি অভিমন্যুবধের সপ্তরথীর একজন। ...

পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানকালে কৃপ পরীক্ষিতের শিক্ষক নিযুক্ত হন। কৃপ চিরজীবীদের অন্যতম। ... দ্রোণাচার্য কৃপীকে বিবাহ করেন। দ্রোণের ঔরসে ও কৃপীর গর্ভে অশ্বত্থামা জন্মগ্রহণ করেন। (পৌ.অ.)। দয়া, অনুকম্পা, করুণা, স্নেহ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পুরাণের এই চরিত্রটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল, ইনি সপ্ত-চিরজীবীর একজন অর্থাৎ এখনও বেঁচে আছেন। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় এই চিরজীবী সত্তাটি কে? আমাদের মনে হয়েছে, সম্ভবত ইনি সেই 'পরিচালক' সত্তা, আজকের রাষ্ট্র-পরিচালকেরা যাকে বিভিন্ন উৎপাদন-কর্মযজ্ঞের দায়িত্বে বসিয়েছেন। ইনি **কৃ**-পালন করেন, যে বা যারা তার দ্বারা পালিত হয় তারা আসলে তাঁর মারফতে **কৃ**-পান করে। তাই পালিত হয়। এই কৃপ থাকে যাহাতে, তাকেই কৃপা বলে। তাহলে কৃপণ শব্দের অর্থ **কঞ্জুস** কেন? এবং কৃপাণ শব্দের অর্থ খড়্গ কেন? দ্র. **কৃপণ, কৃপাণ, সপ্ত-চিরজীবী**। ৬. ইংরেজি creeper।

কৃপণ : ১. ✓কৃপ্ + অন (ক্যুন্) লত্বাভাব। (ব.শ.)। ২. কৃ *(করণ) যাহার পণ*। / যে নিন্দার যোগ্য। (ব.শ.)। ৩. অদাতা, কদর্য্য, ব্যয়কুণ্ঠ, দীন, মন্দ, অবিবেক, কুৎসিত, ক্ষুদ্র, অনুদার, নীচ, অনুকম্পনীয়, শরণাগত, কাতর, দীন, করুণ, দুর্মেধাঃ, হীনমতি, বিচারমূঢ়, দরিদ্র, লোভী, লুব্ধ, কৃমি, কৃপাপাত্র, দৈন্য। (ব.শ.)। ৪. miser অর্থে প্রচলিত। ৫. 'তুমি এই কাজ করলে তবেই আমি তোমাকে এই বস্তু দিব' — সেকালে যারা এরকম কথা বলত, তাদেরকেই **কৃপণ** বলা হত। তো, প্রাচীন যৌথসমাজে এরকম ব্যক্তি অবশ্যই 'নিন্দার যোগ্য' ছিল। পরে পরে যে-কোনো 'ব্যয়কুণ্ঠ' অর্থবান মানুষকেই 'কৃপণ' বলার চল হয়ে যায়।

কৃপাণ : ১. ✓কৃপ্ + আন (আনক্)। (ব.শ.)। ২. যাহা ছেদনে সমর্থ। (ব.শ.)। ৩. খড়্গ, অসি, করবাল। কৃপাণিকা = কর্ত্তরিকা, ছুরিকা। কৃপাণী = কর্ত্তরী, কাটারী। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. শব্দটি কীভাবে প্রস্তুত হয়েছিল, ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে না। **কৃপণ** যে নীতি গ্রহণ করেছিল, সেটি কৃপাণ হতে পারে। কিন্তু তার সমর্থনে কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের মনে হয়, যৌথসমাজের কোনো সদস্যকে কোনো **কৃপণ** যখন 'তুমি এই কাজ করে দিলে আমি এই বস্তু দিব' এইরূপ 'মজুরি' দেওয়ার পণ করত এবং তার ফলে সেই সদস্য যৌথসমাজের কাজ ছেড়ে সেই কৃপণের কাজ করতে লেগে যেত, তখন 'মজুরি' স্বরূপ বস্তুকে **কৃপাণ** বলা হত। ফলত যৌথসমাজ থেকে সেই সদস্য ছিন্ন হয়ে যেত। সেই কারণে, 'যাহা ছেদনে সমর্থ' তাকে **কৃপাণ** বলা হত। পরে এই অদৃশ্য কৃপাণের বাহ্যিক উদাহরণ হয়ে যায় খড়গ বা কাটারী।

'কৃশ্' (কৃষ্, কৃস্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকৃষ্ট, অকৃষ্টপচ্য, অকৃষ্ণ, অনাকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, আঁকড়, আঁকড়দড়ি, আঁকড়ষি, আঁকড়া, আঁকড়া-আঁকড়ি, আঁকড়ান, আঁকুড়ি, আকর্ষ, আকর্ষক, আকর্ষণ, আকর্ষিণী, আকর্ষিত, আকর্ষী, আকৃষ্ট, উৎকর্ষ, উৎকৃষ্ট, কর্শন, কর্ষ, কর্ষক, কর্ষণ, কর্ষাপণ, কর্ষিত, কর্ষী, কাড়, কাড়-আর, কাড়-ঘা (কর্ষ > ঘর্ষ > ঘাড়), কাড়া, কাড়াকাড়ি, কাড়ান, কাড়ি-আনি, কার্শ্য, কার্ষাপণ, কার্ষিক, কার্ষ্ণ, কার্ষ্ণায়স, কার্ষ্ণি, কার্ষ্ণ্য, কল(কল্য), কাল(লো), কালচা, কালচে, কালমুষা, কালমেঘ, কাললবণ, কাললোহ, কালশাক, কালশিরা, কালসর্প, কালসাঁজি, কালসাপ, কালসার, কালা (black), কালা (blacked out), কালাকড়া, কালাকেষ্ট, কালাগুরু, কালাজিন, কালাঞ্জন, কালানীর, কালাপানি(নী), কালাপাহাড়, কালাপেড়ে, কালাভ্র, কালামুখ, কালায়স, কালালোক, কালি, কালিক, কালিদহ, কালিমা, কালিয়া, কালী, কালীবউ, কালীয়, কালো, কা(খা)স্ত, কা(খা)স্তগির, কাহন, কাহ্ন, কাহ্নু, কাহ্নাই, কাহ্নাঞি, কিষা(সা)ন, কিষা(সা)নী, কৃশ্, কৃশ, কৃশর, কৃশাঙ্গ, কৃশানু(ণু), কৃশাশ্ব, কৃশোদর, কৃষ্, কৃষক, কৃষাণ, কৃষি, কৃষী, কৃষীবল, কৃষ্ট, কৃষ্টি, কৃষ্ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কৃষ্ণল, কৃষ্ণশা(সা)র, কৃষ্ণাগুরু, কৃষ্ণাজিন, কৃষ্ণায়স, কৃষ্ণাশ্রিত, কৃষ্ণাষ্টমী, কৃষ্ণেক্ষু, কৃসর, কৃসান, কেলে, কেলেসোনা, কেলেহাঁড়ি, কেষ্ট, নিকর্ষ, নিকৃষ্ট, নিষ্কর্ষ, প্রকর্ষ, প্রকৃষ্ট, প্রকোষ্ঠ, বিকর্ষণ, বিপ্রকর্ষ, সঙ্কর্ষণ, সন্নিকর্ষ।

কৃশ্ (কৃষ্, কৃস্) = (জগৎ) করণের (শক্তিরূপে) বিচ্ছুরণ। **কৃশ** = করণের শক্তিরূপে বিচ্ছুরণ যাহাতে। **কৃষ** = করণের দিশাগ্রস্ত শক্তিরূপে বিচ্ছুরণ যাহাতে। **কৃস** = করণের অণুশক্তি রূপে বিচ্ছুরণ যাহাতে।

কর্ষক (কর্ষণ) : ১. ✓কৃষ্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। কর্ষণ = ✓কৃষ্ + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে; অথবা, ✓কৃষ্ + অন - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে কর্ষণ করে।* ৩. আকর্ষণকারক, আকর্ষক, বিলেখক, ক্ষেত্রকর্ষক, কৃষিকারক, কৃষিজীবী, চাষা, প্রতিকর্ষক, পীড়ক, আকর্ষণ, বিলেখন, আঁচড়ানো, হলবিলেখন, চষা, কৃষিকর্ম্ম, শোষণ। কর্ষণী = ক্ষীরিণী বৃক্ষ। ৪. অপ্র.। ৫. কোনো বস্তুকে ক্ষেত্রের উপর দিয়ে ঘষটে ঘষটে টেনে আনাকে বলে **কর্ষণ** করা, হতে পারে সেটি লাঙলের ফাল, হতে পারে সেটি কলমের ডগা, অন্য কিছুও হতে পারে। কিন্তু এরূপ কর্ষণ মাত্র একবার করলেই কর্ষণকারীকে কর্ষক বলা যায়, কিন্তু কৃষক বলা যায় না। বিশেষ উদ্দেশ্যে সমগ্র ক্ষেত্র জুড়ে বারংবার বিশেষ নিয়মে ও পর্য্যায়ক্রমে কর্ষণ করে যে, তাকে **কৃষক** বলে। উপরোক্ত প্রতীকী অর্থে কৃষক ও কর্ষক (কৃষণ ও কর্ষণ) শব্দ দুটিকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। কাজটি হলধর (চাষী / লেখক দুজনেই) করলেও, তার 'ঘষটে টেনে আনা'র কাজটিকেই মাত্র যখন বোঝানো হয়, তখন সে **কর্ষক**। কিন্তু যখন বিশেষ দক্ষনীতিতে চাষ (বা লেখাকে) বোঝানো হয়, তখন কর্ষক নয়, সে **কৃষক**; হতে পারে সে-কৃষক পার্থিব ভূমির চাষী অথবা মনোভূমির চাষী। যাই হোক, এই কর্ষণ কর্ষণকারীর অভিমুখে ঘটলে একে আকর্ষণ বলে; এবং বিপরীত-মুখে ঘটলে তাকে বিকর্ষণ বলে। আর যারা সেই আকর্ষণ-বিকর্ষণ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদের যথাক্রমে আকর্ষক ও বিকর্ষক বলে। ৬. ইংরেজি course, cursor; ল্যাটিন cursus।

কৃশ : ১. ✓কৃশ্ + ত। (ব.শ.)। ২. কৃ *(করণে রূপান্তরিত) শক্তি*

যাহার। / তনুকৃত। (ব.শ.)। ৩. সূক্ষ্ম, ক্ষয়প্রাপ্ত, শীর্ণ, রোগা, ক্ষীণ, নিঃশেষ, অল্প, কৃশধন, নির্ধন, হীনবল। (ব.শ.)। ৪. রোগা অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. করণশক্তি যার বিচ্ছুরিত হয়ে গেছে বা খরচ হয়ে গেছে, তাকেই **কৃশ** বলে। কিন্তু তার শক্তি (অর্থ, বল) খরচ হয়ে যাওয়াটার দিকে নজর না দিয়ে, খরচ হওয়ার পরিণতিটির দিকেই নজর দেওয়া হয়। সর্বস্ব দান করে এক ব্যক্তি কপর্দকশূন্য হয়ে গেছেন; তিনি মহাদানী বটে, হতদরিদ্রও বটে। তাঁকে মহাদানী না-বলে হতদরিদ্র বলার মধ্যে যে একদেশদর্শিতা দোষ হয়, **কৃশ** শব্দের অর্থ 'রোগা', 'শীর্ণ', 'নির্ধন', 'হীনবল' ইত্যাদি বললে সেই দোষ হয়। অথচ সেগুলিই এখন 'কৃশ' শব্দের অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৃশাশ্ব : ১. কৃশ + অশ্ব। ২. ***কৃশ** যে অশ্ব।* / কৃশ অশ্ব যাহার। (ব.শ.)। ৩. দক্ষজামাতা ঋষিবিশেষ। ইনি দক্ষকন্যা জয়া ও সুপ্রভার পাণিগ্রহণ করেন। উভয়েরই একশত পুত্র। (ব.শ.)। রাজর্ষি কৃশাশ্ব দক্ষের জয়া ও সুপ্রভা নামে দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। ... জয়া মহাতেজস্বী মন্ত্ররূপ পঞ্চাশটি পুত্র প্রসব করেন এবং সুপ্রভার গর্ভে সংহার নামে শাস্ত্ররূপ পঞ্চাশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এরা জৃম্ভকাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যার এগজিকিউটিভরা অতি পরিশ্রমের কারণে রোগা হয়ে গেছে, কিংবা যে এগিজিকিউটিভরা অতি শ্রমে হীনবল হয়ে গেছেন, তাঁদেরকে জয়া ও সুপ্রভা নামে দুটি জনগোষ্ঠীকে পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ কি তবে অঙ্গার, যার আগুন নিভে গেছে, এবং সে যে ছাত্রগোষ্ঠীকে পরিচালনা করছিল, তারা মন্ত্ররূপ ও শাস্ত্ররূপ মোট একশোটি বিষয়ের জন্ম দিয়েছিল? ভাববার কথা!

কৃষক, কৃষাণ : ১. ✓কৃষ্ + অক (কুন্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓কৃষ্ + আন (আনক্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***কৃষক** = **কৃষ** করে যে। **কৃষাণ** = **কৃষ**-এর আধার অন থাকে যাহাতে।* / যে ভূমি কর্ষণ করে। (ব.শ.)। ৩. কর্ষক, কৃষাণ, চাষা, ফাল, বৃষ, শস্যার্থ ভূমিকর্ষণ, বৈশ্যবৃত্তি, কৃষিফল, শস্য, সত্তামাত্র; কর্ষক, কৃষিকারক, কৃষক, চাষা। কৃষাণী = কৃষাণের কার্য্য, কৃষাণী হেতু ভাগের ধান্যাদি। (ব.শ.)। ৪. tiller অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কর্ষক**। বিশেষ উদ্দেশ্যে সমগ্র ক্ষেত্র জুড়ে বারংবার বিশেষ নিয়মে ও পর্য্যায়ক্রমে কর্ষণ করে যে, তাকে **কৃষক** বলে। এবং ঐরূপে কর্ষণ অন থাকে যে সত্তায়, তাকে যেমন **কৃষাণ** বলা যায়, তেমনি কর্ষণের ফল আনে যে, তাকেও কৃষাণ বলা চলে। তবে শব্দ দুটির আরও ব্যাপ্তি রয়েছে। দ্র. **কৃষ্ণ**।

কৃষ্ করা বা কর্ষণ করার অর্থ হল, এমন জ্ঞানকর্মের প্রয়োগ করে কাজ করা, যার ফলে পূর্বতন পরিস্থিতির বিলোপ (বিস্মৃতি) ঘটে; তা সেটা পার্থিব ভূমিতে করাই হোক, আর মনোভূমিতে করাই হোক। যে সত্তা এইরূপ 'কৃষ-অন করে', তাকে কৃষক বলে। মহাভারতে স্পষ্ট বলা হয়েছে 'ক বর্ণে দক্ষ জানিবে'। তার মানে মানুষের সমাজে যখন দক্ষের জন্ম হয়নি, তখন এই কাজকে 'ক্-ঋষ্' না বলে শুধু 'ঋষ্' বলা হত এবং যাঁরা সেকাজ করতেন তাঁদের **ঋষি** বলা হত। তার বহু পরে শুরু হয় একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতিতে ক্-ঋষ্ বা কৃষ্। দ্র. **ঋষি**।

কৃষ্ট (কৃষ্টি) : ১. ✓**কৃষ্** + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহা কর্ষিত হইয়াছে।* / **যাহাকে আকর্ষণ করা হইয়াছে।** (ব.শ.)। ৩. কৃতকর্ষণ, চষা, অর্জ্জিত, প্রাপ্ত, পণ্ডিত, বিদ্যাশিক্ষা। (ব.শ.)। ৪. কৃষ্ট শব্দটি প্রায় অচল, তবে কৃষ্টি শব্দটি এখনও culture অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. গমন হয়ে গেলে 'গত' হয়। এরকম ক্রমান্বয়ে 'গত' হতে থাকলে 'গতি' হয়। তেমনি 'কৃষ্ট' হতে থাকলে 'কৃষ্টি' হয়। পার্থিব ভূমিতে কর্ষণ হোক, আর মনোভূমিতে কর্ষণ হোক, উভয় ক্ষেত্রে কৃষ্ট হতে হতে যে কৃষ্টি চলে, সেই **কৃষ্টিই** কৃষিকর্মে লিপ্ত মানুষের মনোলোক ব্যাপ্ত করে রাখে। কৃতির সমান প্রতিরূপ (ভাবরূপ) বলে, একে সংস্কৃতিও বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কৃষ্ট হল কর্ষণকর্ম্মের ভবরূপ, **কৃষ্টি** হল তার ভাবরূপ। কৃষ্টকে বাদ দিয়ে কৃষ্টি হয় না। যদি হয়, তবে তা নিতান্তই কৃত্রিম ও তুচ্ছ।

কৃষ্ণ : (এখানে কেবল 'কৃষ্ণ' শব্দটির মূল শব্দগত অর্থ দেওয়া হচ্ছে। শব্দটির অন্যান্য অর্থ, বিশেষত আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক ও নারায়ণ সংশ্লিষ্ট অর্থ পাওয়া যাবে **গৌরী** ও **নারায়ণ** শব্দে।) ১. ✓কৃষ্ + ন (নক্) কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কৃ দিশাগ্রস্ত হয়ে নিঃশেষিত (বা কেন্দ্রীভূত) যাহাতে; কর্ষণজাত-র রহস্যরূপ থাকে যাহাতে*। / যিনি প্রলয়ে বিশ্ব আপনাতে আকর্ষণ করেন। (ব.শ.)। ৩. অসিত, কালো, কৃষ্ণবর্ণ। ... (ব.শ.)। ৪. black অর্থে প্রচলিত। ৫. ক্ ও ষ্ বর্ণের অর্থ যোগ করলে আমরা যে ক্রিয়াকারীকে দেখতে পাই, তার স্বরূপ অনেকটা টর্চের আলোর বিপরীত স্বভাবের। টর্চের আলো ত্রিমাত্রিক শঙ্কু আকৃতির, যা টর্চ থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে প্রসারিত। কিন্তু ঠিক বিপরীত যদি হয় তাহলে, প্রসারিত আলো বিপরীত মুখে ধাবিত হয়ে এসে টর্চে প্রবেশ করে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, সত্তার প্রসারিত অংশ যদি তার নিজের কেন্দ্রের দিকে বিপ্রসারিত বা আকৃষ্ট হয়ে না-কৃত হতে হতে কেন্দ্রে বিলীন হয়ে যায় তাকে **কৃষ্ণ** বলে। তার মানে দাঁড়ায়, কৃষ্-এর নাকরণ যাহাতে, তাকে কৃষ্ণ বলে। আর, সেটিই তো সত্য। কালো মানেই তো, যা সঙ্কুচিত হতে হতে বিন্দুতে পৌঁছে স্বরূপকে অনালোকিত করে ফেলেছে। নিঃসন্দেহে এটিই আধুনিক বিজ্ঞান কর্তৃক চিহ্নিত ব্ল্যাক হোল। ব.শ. সাক্ষ্য দিচ্ছেন, 'যিনি প্রলয়ে বিশ্ব আপনাতে আকর্ষণ করেন', তিনিই **কৃষ্ণ**; অর্থাৎ **কাল**; অর্থাৎ black। এই কাল-এর ভেতরে স্থান-কাল-পাত্রের কল-কল (দ্র. **কল**) পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, তাই সে কাল বা মহাকাল, তাই সে কাল বা কালো; তাই সে **কৃষ্ণ**। তার থেকেই এই মহাবিশ্ব উৎসারিত। রূপের চোখে এই কৃষ্ণই নিরাকার, তার থেকেই আকারবিশিষ্ট বিশ্বজগতের উদ্ভব। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না।' (*আমার জগৎ*)। এই কালোই বাংলাভাষীর কাছে 'কালো, গুণে আলো'। পশ্চিমের ধারণাজগতে কালো বা black মাত্রেই মন্দ। কারণ, কালীকৃষ্ণ-শ্যাম-গৌর এই তিনের মধ্যে তাঁরা কালোর শুভ উত্তরাধিকার হারিয়েছেন; তাঁদের কাছে কালোর 'অজানা জগৎ', 'অচেনা জগৎ' অর্থটি বিপজ্জনক অর্থে থেকে গেছে। তাঁদের Devil বা শয়তান কালো। শেকসপীয়রের যুগের নাট্যকার ওয়েবস্টারের

White Devil নেহাতই ব্যতিক্রম। আর, আমাদের কবি যখন 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন' লেখেন, শ্রোতা-বাঙালীর কথাটি অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কারণ, 'কালোই যে জগতের আলো', সেকথা তাঁরা জন্মসূত্রে জেনে বুঝে বিশ্বাস করে থাকেন। দ্র. **গোবিন্দ, গৌরী, চেতন, শ্যাম, নারায়ণ**।

কৃষ্ণশার, কৃষ্ণসার : ১. কৃষ্ণ + শার (শবল)। (ব.শ.)। ২. কৃষ্ণ সার (মজ্জা) যাহার। (ব.শ.)। ৩. মৃগবিশেষ, কালসার, (spotted antelope)। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এমনিতে এই শব্দটিতে কোনো রহস্য নেই বলেই মনে হয়। কালো কালো ছোপওয়ালা হরিণ, অনেকেই দেখেছেন। কিন্তু যখনই জানবেন, 'যে এলাকায় কৃষ্ণসারমৃগ বিচরণ করে কেবলমাত্র সেই এলাকাটিই আর্যদের এলাকা, বাকি সব শূদ্রদেশ'; তখনই সমস্যা! এরপর যদি দেহবাদী-প্রতীকী বিদ্যাতে বিশ্বাস করে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে spotted antelope ঘুরে বেড়ায় তা খুঁজতে যান, পড়ে যাবেন আরও সমস্যায়। ভারতসন্ধানী বহু পণ্ডিতই এই পাকে পড়ে নাস্তানাবুদ হয়েছেন। কেননা, এতকাল যে-দেশকে আপনি আর্যাবর্ত্ত বলে জানতেন, দেখবেন, সেই 'সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী দেশ'-এর মধ্যে এবং বাইরেও ওই মৃগ দেদার ঘুরে বেড়ায় এবং তা ভৌগোলিকভাবে এত কম জায়গায় যে, সবগুলোকে জুড়েও ভারতের একটি জেলার সমান করা যায় না। আপনি অবাক হয়ে ভাববেন — আর্যাবর্ত্ত এতটুকু জায়গা?! ভেবে কূলকিনারা পাবেন না। বাঁচার পথ পাবেন 'কৃষ্ণ সার যাহার', ব.শ.-এর এই ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে বিশ্বাস ন্যস্ত করলে। তখন দেখবেন, যে-ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানের পুঁজি নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান, তাঁর বিচরণের এলাকাই আর্যাবর্ত্ত। তখন বোঝা যাবে, হরিণ কেবল animal-ই হয় না, সমাজের সদস্যও হয়। তখন একদিন কস্তুরী-মৃগেরও সাক্ষাৎ পেয়ে যেতে পারেন, যার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং গেয়ে উঠেছিলেন — 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম, কস্তুরীমৃগ সম।'

কেরল : ২. *কের বা কৃতের লালন-লয়ন যাহাতে।* ৩. (রাজকৃত = রায়কের, অস্মৎকৃত = অম্মাকের বা আমাদের।) কেরলবাসীগণ, কেরলদেশের রাজগণ বা রাজা; বেদযাগবহিষ্কৃত শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছবিশেষ; ইঁহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন, সগররাজ কর্ত্তৃক বেদ-বহিষ্কৃত হইয়া ম্লেচ্ছনামে প্রসিদ্ধ হন। দাক্ষিণাত্যস্থিত মলবার দেশ। ইহা পুরুবংশীয় কেরলের রাজ্য, তজ্জন্য নাম কেরল। (ব.শ.)। '... মহামনা সগর এইরূপে শক যবন কম্বোজ পারদ পহ্লব কোলসব্য মহিষ দার্ব্ব চোল **কেরল** খশ তুখার চীন মদ্র কিষ্কিন্ধক কৌন্তল বঙ্গ শাল্ব কোঙ্কণদিগকে পরাজিত করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছিলেন।' (হরিবংশ পুরাণ)। ৪. 'কেরল' ভারতরাষ্ট্রের প্রদেশ রূপে এবং 'কেরলের অধিবাসী' অর্থে প্রচলিত। কিন্তু তার মূল অর্থ বিস্মৃত। ৫. কেন তাদের কেরল নাম হয়েছিল, কী সেই বেদবিরোধী কাজ, আজ কেউ জানে না। তবে, সবাই সব কথা ভুললেও মাটি ভোলে না। সেকারণেই ম্লেচ্ছ নামে নিন্দিত এই কেরলবাসী (বঙ্গবাসীও) আত্মসম্মান উদ্ধার করতে গিয়ে একদিন তান্ত্রিক হয়, ইসলামকে দেখে মুসলমান হয়, মার্কসকে দেখে কমিউনিস্ট হয়। মাটির ব্যথা এভাবেই ভোল পাল্টাতে থাকে। ব্যথা তাও থেকেই যায়। ... তা সে যাই হোক, কেরল শব্দটির অর্থ হল 'কৃতের লালন-লয়ন করে যে'। এর একটিই মানে দাঁড়ায়। তা হল, বেদবাদীদের অধঃপতিত সমাজতান্ত্রিক যৌথতায় যেখানে কৃতের লালন করা (পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় করা) নিষিদ্ধ ছিল, সেখানে এই দেশের অধিবাসীরা সেই নিষেধ মানেননি। অতএব এদেরকে পরাজিত করে ধর্ম্মভ্রষ্ট (যে যা করে, তা থেকে তাকে ভ্রষ্ট) করা বেদবাদীদের কর্তব্য ছিল। সে কর্তব্য তাঁরা পালনও করেছিলেন। দ্র. **কোল**।

'ক৯প্' (কেল্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকল্প, অকল্পিত, অনুকল্প, অবিকল্প, অসঙ্কল্পিত, আকল্প, ক্৯প্, ক্৯প্ত, **কল্প, কল্পক, কল্পক্ষয়, কল্পতরু, কল্পন, কল্পসূত্র, কল্পাদি, কল্পান্ত, কল্পি, কল্পিত**, কেল্, কেল, কেলি, কৈল, কৈলাস, **প্রকল্প, বিকল্প, সঙ্কল্প, সঙ্কল্পজ, সঙ্কল্পন, সঙ্কল্পিত, সবিকল্প, সুকল্পিত**।

ক্৯প্ (কেল্) = করণের পর্য্যায়সমূহের পালন। **ক৯প্** : করণের পর্য্যায়সমূহের পালন থাকে যাহাতে। **কেল** : কারীর (ধারক-বিকাশক-পরিবর্তক এই ত্রিরূপের) লালন-লয়ন যাহাতে।

কল্প (কল্পনা, পরিকল্পনা) : ১. ✓ক্৯প্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓কল্পি + অ (অচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *করণের (পর্যায়সমূহের) গতিবিধি পালিত হয় যাহাতে; যে-কর্ম্ম সামগ্রিকভাবে মনে মনে কল্পনা করা হয়। (পরিকল্পনা)* / যাহাতে যাগপ্রয়োগ কল্পিত হয়। (ব.শ.)। ৩. সমর্থ, শক্ত, দক্ষ, নিপুণ, যোগ্য, উপযুক্ত, জননাশে সমর্থ, প্রলয়, ক্ষয়, ফলজননে সমর্থ, যাগাদির অঙ্গভূত বৈদিক বিধান, ব্রতপ্রয়োগ, ব্রতানুষ্ঠান, যাচিতদ্রব্য দানে সমর্থ, **কল্পবৃক্ষ**, পক্ষ, **বিকল্প**, অনুক্রম, গৌণবিধি, ন্যায়, বেদাঙ্গ শাস্ত্রবিশেষ, কল্পশাস্ত্র, ব্রহ্মা যে সময়ে সৃষ্টি করেন, ব্রহ্মার দিন, রচন, ব্যাকরণে 'ঈষদসমাপ্তি' বা 'ঈষদূন' অর্থে বিহিত তদ্ধিত প্রত্যয়। কল্পলতা = নন্দনস্থিতা অভীষ্টপ্রদা লতাবিশেষ, স্বর্ণরচিত লতাকৃতি মহাদানবিশেষ। কল্পবাস = মাঘমাসে প্রয়াগে নদীত্রয়সঙ্গমে বিধিপূর্বক বসতি। কল্পনা করা, চিন্তা করা, প্রদান করা, দেওয়া। (ব.শ.) পুরাণ মতে আমাদের ৪৩২ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র। ৪,৩২০,০০০,০০০ বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন ও এই পরিমাণ কালে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়। দিনে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় ও বিদ্যমান থাকে এবং রাত্রিতে তা লয় প্রাপ্ত হয়। এই সৃষ্টি ও লয়কে কল্প বলা হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কল্ (কল-কল) পালিত হয় যাহাতে তাকে **কল্প** বলে। আমরা ভাবলাম আপনার সঙ্গে ঐখানে গিয়ে এইভাবে পৌঁছে সেইভাবে দেখা করব, এই ভাবনা আমাদের **কল্প**। ভগবান ভাবলেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ক'রে, তাকে বড়ো ক'রে, বুড়ো ক'রে, একদিন তার লয় ঘটাবেন — এই ভাবনা তাঁর **কল্প**। তার মানে কল্পের বিন্দু রূপ থেকে সিন্ধু পর্যন্ত কোটি কোটি রূপ রয়েছে। 'কল্প অন (on) থাকে যাহাতে' সেই আধারকে বলে **কল্পনা**। এ কল্পনা আদৌ fancy নয়।

(দ্র. **চিত্রজল্প, জল্পনা।**) গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পর্যায়গুলি হিসেব করে যে **কল্পনা** করা হয়, তাকে প্রকৃষ্ট কল্পনা বা প্রকল্পন বা **প্রকল্প** বলে। মানবসমাজের সামাজিক প্রকল্পকে একালে 'পরিকল্পনা' বলে। যে **'পরিকল্পনা'** পাঁচ বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত করে শেষ করে ফেলা যাবে বলে হিসেব করা হয়, তাকে একালে 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' বলা হয়। কিন্তু প্রায়শই এই পরিকল্পনা বিশ-তিরিশ বছরেও শেষ হয় না। ফলে 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'র মানে দাঁড়িয়ে যায় — যে কাজ বহুবছর ধরে চলতে থাকে, চলতেই থাকে, শেষ আর হয় না। প্রাচীন কালে এই ধরণের পরিকল্পনাকে বলা হত 'দীর্ঘকালীন-যজ্ঞ' বা 'ভূরিদক্ষিণ-যজ্ঞ'। এইসব পরিকল্পনা রূপায়ণের নামে যৌথসমাজের পরিকল্পনা-রূপায়ণকারীরা (একালের ভাষায় স্পেশালিস্ট ব্যুরোক্র্যাট, টেকনোক্র্যাট ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারীরা) ভূরি ভূরি দক্ষিণা (লক্ষ কোটি টাকা বেতন স্বরূপ) নিয়ে নিতেন বলেই এদের 'ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ' বলা হত।

অবশ্য সেকালে যে কোনো পরিকল্পনাকে **'কল্প'** বলা হত, তা সে সমাজের বাৎসরিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞের **কল্প** বা **পরিকল্পনা** (যাগাদির অঙ্গভূত বৈদিক বিধান) হোক, কিংবা **'কল্পবৃক্ষ'** হোক আর 'কল্পবাস'ই হোক। তবে পৌরাণিক অভিধান **'কল্প'** বিষয়ে যে-বর্ণনা দিয়েছে, তা সামাজিক **'কল্প'** নয়, জাগতিক **'কল্প'**। সম্ভবত পুরাণকারদের ধারণা হয়েছিল, সমাজের ইত্যাকার বিন্যাস যদি মানুষের বিভিন্ন কল্পের ফল হয়, তাহলে জগতেরও একটা 'কল্প' থেকে থাকবে। সেই 'কল্প' কীরূপ হতে পারে, তার একটা সম্ভাব্য হিসাব করেছেন তাঁরা ব্রহ্মার 'কল্প' কল্পনা করে। এর বৎসরের হিসেব আমাদের হিসেবে তাই কিছুতেই মিলবে না। দ্র. **অনুকল্প**। ৬. অপ্রচলিত ইংরেজি শব্দ clepe, cleep।

কল্পতরু : ১. কল্প + তরু। ২. *যে তরু (ব্যবস্থা) পরিকল্পনা করে বানানো হয়েছে। (দ্র. তরু)।* ৩. বাঞ্ছিতবস্তুপ্রদ নন্দনস্থিত দেবতরুবিশেষ, কল্পবৃক্ষ, সর্ব্ব-পুরুষার্থোপায়, প্রার্থিতবস্তুদাতা, তত্তদ্বিষয়ের আকর বা নিলয়, অতিবদান্য, কল্পতরুর ন্যায় সম্পদসমৃদ্ধ, দানে পটু কল্পতরুর ন্যায় ক্রিয়ামাত্রে নিপুণ। (ব.শ.)। কল্পান্তস্থায়ী তরু। সমুদ্রমন্থন হতে উত্থিত এই বৃক্ষ কল্পান্ত হলে পুনরায় সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়। এই জন্য এর নাম কল্পতরু। অভীষ্টদায়ক বৃক্ষ। কল্পতরুর নিকট কোনো কিছু প্রার্থনা করলেই তাতে অভীষ্ট লাভ হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. তরুর একটি অর্থ হল সরকারি ব্যবস্থা, যার শাখা-প্রশাখা রয়েছে, যেখানে গিয়ে 'অ্যাপ্লিকেশন' করে প্রার্থনা করতে হয়; করলে প্রার্থিত বস্তু বা বিষয় পাওয়া যায়। এরই প্রতীকী আচরণ করা হয় অশ্বত্থবৃক্ষে ও বটবৃক্ষে সুতো বেঁধে, যে-রীতি এখনও গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। মনে রাখা ভালো সমাজতান্ত্রিক সরকারি ব্যবস্থাকে অশ্বত্থবৃক্ষ ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বটবৃক্ষ বলে। একালের ভাষায় যাকে 'প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান' বলে, সেকালে তাকেই 'কল্পতরু' বলা হত। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভেবেচিন্তে (পরি)কল্পনা করে বানানো হয় বলেই এগুলিকে **কল্পতরু** বলে।

কল্পসূত্র : ১. কল্প + সূত্র। ২. *যাহাতে পরিকল্পনা করার সূত্রগুলি রয়েছে।* ৩. বৈদিক কর্ম্মবিধিসম্বন্ধী সূত্রগ্রন্থবিশেষ। ইহা শ্রৌত গৃহ্য ও ধর্ম্ম ভেদে ত্রিবিধ। শ্রৌতসূত্রে শ্রুতিবিহিত যজ্ঞাদিবিষয়ক সূত্রসমূহ নিবদ্ধ আছে; গৃহস্থের অগ্নিসাধ্য অবশ্যকরণীয় নিত্যকর্ম্ম যজ্ঞাদি গৃহিকার্য্য গৃহ্যসূত্রের বিষয়; অন্যান্য পারমার্থিক রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্তব্য বিষয় লইয়া ধর্ম্মসূত্র বিরচিত। কল্পসূত্র বেদাঙ্গ বিশেষ, কাহারও মতে মন্বাদির স্মৃতিগ্রন্থ ধর্ম্মসূত্র। (ব.শ.)। বেদান্ত গ্রন্থ। বৈদিক যজ্ঞকর্ম সামাজিক জীবন ও লোকব্যবহার ক্রমে ক্রমে এমনই জটিল ও বহুবিস্তৃত হয়ে ওঠে যে, এই সকল ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থাগুলিকে ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থ হতে সংক্ষিপ্ত করে একত্র করবার প্রয়োজন হয় এবং সূত্রাকারে রচিত হয়। এই সংক্ষিপ্তসারকে কল্পসূত্র বলা হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সমাজ কীভাবে চালানো হবে, সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞগুলি কীভাবে চালানো হবে, তার বন্টনাদি কেমন হবে — এসব বিষয়ে আমাদের পূর্বপুরুষদের যা কিছু অর্জন, তা সব যেসব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে রাখা আছে, সেগুলিকে **কল্পসূত্র** বলে। শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র এমনকি বেদান্ত গ্রন্থও কার্যত তাই। এই গ্রন্থগুলিকে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে পড়লে আমরা সেকথা স্পষ্ট বুঝতে পারব।

কল্পান্ত : ১. কল্প + অন্ত। ২. *কল্পের অন্ত যাহাতে।* ৩. ব্রহ্মার দিনের অবসান, প্রলয়, কল্পশেষ। (ব.শ.)। ৪. রবীন্দ্রনাথ শব্দটি ব্যবহার করেছেন 'নারী' নিবন্ধে — 'একটিমাত্র বড়ো আশ্বাসের কথা এই যে, কল্পান্তের ভূমিকায় নূতন সভ্যতা গড়বার কাজে মেয়েরা এসে দাঁড়িয়েছে — প্রস্তুত হচ্ছে তারা পৃথিবীর সর্বত্রই।' অন্যথায় অপ্র.। ৫. একধরনের পরিকল্পনা করে সামাজিক প্রকল্প বা প্রকল্পগুলির প্রচলন ঘটানো হয়। সেই প্রকল্প শেষ হলেই কল্পান্ত। তবে এ হল সামাজিক **কল্প** ও তার **কল্পান্ত**। সেই বিচারে রাজতন্ত্রের **কল্পান্ত** হয়ে গিয়েছে, সমাজতন্ত্রের কল্পান্তও হচ্ছে বা হয়ে গিয়েছে। এখন প্রচলিত গণতন্ত্রের কল্পান্ত হওয়ার কথা। হয়তো নতুন কোনো তন্ত্র (লোকতন্ত্র?) বা **কল্প** শুরু হবে তার পর।

কেলি : ১. ✓কেল্ + ই (ইন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কে-র (দিশাগ্রস্ত কারীর) লালন-লয়ন যাহাতে।* ৩. ক্রীড়া, খেলা, পরীহাস, নর্ম্ম, লীলা, বিহারে কান্তের সহিত ক্রীড়া, বিলাসক্রীড়া, বিহারক্রীড়া-রূপ যৌবনজ অলঙ্কার। কেলিবিদ্যা = রতিবিদ্যা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কেলি, **লীলা, সুরত** বা সুরতি শব্দের বিপুল ব্যবহার রয়েছে। ক্রিয়া একটিই, কিন্তু তাকে তিন দিক দিয়ে দেখা যায়। স্বভাবতই তার বর্ণনাও তখন তিন ভাবে বদলে যায়। যখন **পুরুষ-প্রকৃতি** পরস্পরের সঙ্গে লেনদেনে কর্মরত হয়, তখন তা **রতি**; সেটি ভাল রতি হলে সুরত; যখন পুরুষ-প্রকৃতি পরস্পরের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়, তখন তা **লীলা**; আবার যখন পুরুষ-প্রকৃতি পরস্পরের 'কে'-কে (আপনি 'কে'? এই 'কে'-র অর্থ ব্যক্তিসত্তা।) স্বাদরে গ্রহণ করতে চেষ্টা করে, তখন তা **কেলি**। এর ফল হয় কৈল বা উৎপাদন বৃদ্ধি। দ্র. কৈলাস।

কৈলাস : ১. কৈল + আস। (ব.শ.)। ২. *যে মানসিক অবস্থানে নবাগতের আশায় পুরুষ-প্রকৃতির যোজনা করা হয়।* / কেলিপ্রয়োজক স্থান। (ব.শ.)। ৩. শিব ও কুবেরের স্থান পর্ব্বতবিশেষ। ইহা মেরুর দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। (ব.শ.)। এটি একটি পর্বত। মহাদেব ও কুবেরের বাসস্থান। মানস সরোবরের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত হিমালয়ের চূড়া। (পৌ.অ.)। ৪. হিমালয় পাহাড়ের একটি স্থানের নাম রূপে প্রচলিত। এর অন্য কোনো অর্থ এখন আর নেই। ৫. **কৈলাসের** অর্থ জানার আগে ভারতে স্থাননামের মাহাত্ম্য বিষয়ে অবগত হওয়া জরুরি। তাতে অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় মানসলোকের স্থানকে তার ক্রিয়ানুসারে যে নাম দেওয়া হয়, সমগুণসম্পন্ন ভৌগোলিক স্থানের তদ্রূপ নামকরণ করা হয়। উত্তম-অধিকারীরা মানসলোক ও বাহ্যলোক, উভয়লোকের সেই নামিত সত্তাটিকে নাম শুনেই চিনতে পারেন; নিম্ন-অধিকারীরা কমপক্ষে বাহ্যলোকটির ঐ নামিত সত্তাটিকে চিনতে পারেন। ...

কৈলাসও তদ্রূপ এক মানসলোকের অবস্থান ক্ষেত্র, যেখানে মানুষ থাকলে সে কেলিপ্রয়োজক হতে ভালবাসে। তার উদ্দেশ্য নতুন আসুক। নতুন দু'জাতের। সমস্ত নতুন জ্ঞান, নতুন আবিষ্কার তো নতুনই, বর্তমান জ্ঞানের আলোকের সঙ্গে তা যোগ করে তার প্রয়োগ করে মানুষ সেই নতুন জগৎ সৃজন করে। মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি হয়। এরকম মানুষ শিবগুণসম্পন্ন। তাই শিবের আবাস স্থল এই কৈলাস। আর একজন আছেন, তিনি চান তাঁর টাকার বাচ্চা হোক, নতুন বাচ্চা আসুক। যে টাকা তাঁর আছে, তার বাচ্চার আশায়, সুদের আশায় তাঁর দিন কাটে। তিনি কুবের, ব্যাঙ্ক। সে টাকা বিনিয়োজিত হলে তার থেকে উৎপাদন বাড়বে, লাভ হবে, সুদ আসবে। কর্মপরিচালক ও কর্মপরিচালিতেরা পরস্পরে **কেলিতে** মত্ত হোক। সুদ আসুক। তাই তিনিও কৈলাসের বাসিন্দা। আজকের কৈলাসের পুরোটাই যেন কুবেরের দখলে, শিব কোণঠাসা।

'ক্রন্দ' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অকান্দনে, আক্রন্দ, কন্দ, কাঁদ, কাঁদকেতো, কাঁদন, কাঁদনা, কাঁদা, কাঁদাকাটা, কাঁদাকাঁটি, কাঁন্দ, কান্দন, কান্দা, কান্না, ক্রন্দ্, ক্রন্দন, ক্রন্দমান, ক্রন্দসী, ক্রন্দিত, ক্রব্য, ক্রব্যাৎ(দ্), সংক্রন্দ, হাক্রন্দন।

ক্রন্দ্ = ক্র-এর অন (on) দান। **ক্রন্দ** = ক্র-এর অন দেয় যে। [**ক্র** = ক্ + র = ক্র = করণ (বা action) রক্ষিত যাহাতে। আমরা আগেই দেখেছি, কৃ হল শক্তিপ্রযুক্ত উপকরণের ঘূর্ণন। এই ঘূর্ণন ঘুরতে ঘুরতে চলাও বটে, চলন্ত গাড়ির চাকার মতো; যার পরিধির এক একটি অর ভূমিকে ছুঁয়ে সরে যাচ্ছে। এই ক্র (crawling) পর পর চলতে থাকলে, অর-এর পর অর ভূমিকে ছুঁয়ে সরে যেতে থাকলে একসময় চাকাটি পুরোই ঘুরে যায়। (দ্র. **চক্র**)। তবে, এই ক্র-কে আমরা তখনই দেখতে পাই, যখন চক্রের ঘূর্ণন অত্যন্ত শ্লথগতিতে ঘটে। একই স্বভাব রয়েছে করাতের, তাই তাকে **ক্রকচ** বলে। দ্র. **ক্ষ**।]

ক্রন্দ (ক্রন্দন, ক্রন্দসী, কাঁদা, কান্দা, কান্না, কান্নাকাটি) : ১. ✓ক্রন্দ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক্র (ঘূর্ণমান ব্যথা) অন্ (on) করে দেয় যে; বা ক্রন্-এর দান থাকে যাহাতে।* ৩. শোকাদি হেতু অশ্রুপাত ব্যাপার, রোদন, আর্ত্তনাদপূর্ব্বক রোদন, রুদিতারাব, রোদনধ্বনি, আহ্বান, স্পর্দ্ধা, যোধসংরাব, আর্ত্তনাদ। (ব.শ.)। ৪. ক্রন্দ ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলির সব কয়টি কমবেশি প্রচলিত। ৫. খাওয়া কয় প্রকার নির্ণয় করতে গিয়ে সুকুমার রায় 'চর্ব চোষ্য থেকে ঘাবড়িয়ে ঘোল খাওয়া পেরিয়ে একেবারে কচুপোড়া খাওয়া' পর্যন্ত অজস্র উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর 'খাইখাই' কবিতায়। কিন্তু কান্না কয় প্রকার, তার তেমন জুৎসই হিসাব আমরা কোনো কবির লেখায় পাইনি। কবিরা হয়তো ভেবেছেন, দুঃখের কথা পাঁচকাহন করে বলার কী আছে! কিন্তু শব্দশাস্ত্রীদের তো উপায় নেই। তাঁদেরকে ক্রিয়া অনুসারে প্রতিটি আচরণের নামকরণ করতে হয়। একরকম কান্নায় শুধু চোখের জল পড়ে, কোনো আওয়াজ বেরোয় না; একে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন **রোদন**। অতিসন্ত্রস্ত মানুষ ভয়ে আওয়াজ না করে গোপনে অশ্রুপাত (রোদন) করে। আর-একরকম কান্না আছে, যাতে অশ্রু ঝরে, আওয়াজও বেরোয়। একে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন **ক্রন্দন**। এই ক্রন্দনকে আমরা এখন কান্না, কাঁদা ইত্যাদি শব্দে সরল করে নিয়েছি।

কৃ শব্দের অর্থে আমরা জেনেছি, চোখে পড়া ধূলিকণার মতো উপকরণ শক্তিপ্রযুক্ত হয়ে ঘুরতে থাকলে তাকে বলা হয় **কৃ**। একই বিন্দুতে এই ঘূর্ণন চলতে থাকলে তাকে **ক্র** বলা যায়। এই **ক্র** অন (on) হলে বা বিকাশশীল বা প্রকাশিত হলে তাকে **ক্রন্** বলে। সেই ক্রন্ প্রকাশিত হয়ে অন্যের নিকট পৌঁছলে তাকে **ক্রন্দ** বলে। এখন ক্র-এর ভেতরের উপকরণ যদি মনোব্যথা হয়, এবং তা যদি অন হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে আওয়াজের মাধ্যমে, তখন তাকে **ক্রন্দ** বলে। ক্রন্দ অন হতে থাকলে তাকে **ক্রন্দন** বা কাঁদন বা কান্না বলে। যখন প্রবল বজ্রবিদ্যুতের গর্জন সহ অঝোর ধারায় বৃষ্টি হয়, তখন আকাশ-পৃথিবীর মনোব্যথার প্রকাশ ঘটে বলে তাদের **ক্রন্দসী** বলে। ৬. ইংরেজিতে এই ক্র-এর উত্তরাধিকার অনেক বেশি পরিমাণে রয়েছে। যথা *crawl, crow, crunch* ... ইত্যাদি।

'ক্রম্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিক্রম, অতিক্রমণ, অতিক্রমণীয়, অতিক্রমী, অতিক্রান্ত, অনতিক্রমণীয়, অনুক্রম, আক্রম, আক্রমণ, আক্রমণীয়, আক্রান্ত, আক্রান্তি, উপক্রম, উপক্রমণিকা, কিরমি, কৃ(ক্রি)মি, কৃমিঘ্ন, ক্রম্, ক্রম, ক্রমশ, ক্রমশঃ, ক্রমাগত, ক্রমানুবন্ধ, ক্রমানুযায়ী, ক্রমানুসার, ক্রমান্বয়, ক্রমায়াত, ক্রমি, ক্রমিক, ক্রমে, ক্রমেল, ক্রমেলক, ক্রান্ত, ক্রান্তি, ক্রেমে, দুরতিক্রম, নক্র, নিষ্ক্রমণ, নিষ্ক্রান্ত, পরাক্রম, বিক্রম, ব্যতিক্রম, সংক্রম, সংক্রমণ, সংক্রামক, সংক্রামিত, সংক্রান্ত।

ক্রম্ = ক্র-এর সীমায়ন। **ক্রম** = ক্র সীমায়িত যাহাতে। (দ্র. **ক্রন্দ**। **ক্ষ**-এর অর্থে আমরা আরও একটি বিষয় দেখেছি, যে, তার একটি অর থেকে অপর অরটির মধ্যে একটি পর্যায় রয়েছে। পর্যায়ে পর্যায়ে সে ঘোরে। ক্রম্ হল ক্র-করে ঘোরা সীমিত হয় যে পর্যায়ে।

এক-একটি **পর্য্যায় এক-একটি** ক্রম। মনে রাখা দরকার, বাংলার তুলনায় ক্র-এর **উত্তরাধিকার** ইংরেজিতে অনেক বেশিই রয়েছে। তাদের **cr-যুক্ত অধিকাংশ শব্দই** এই শব্দ-বংশের আত্মীয়।)

অতিক্রম (আক্রম, আক্রমণ, আক্রান্ত, উপক্রম, উপক্রমণিকা, নিষ্ক্রম, নিষ্ক্রমণ, নিষ্ক্রান্ত, পরাক্রম, পরাক্রান্ত, বিক্রম, ব্যতিক্রম, সংক্রমণ, সংক্রান্ত, সংক্রান্তি) : ৫. দ্র. **ক্রম**। অতি শব্দের অর্থ **হল অত** বা অস্তিত্বের তারণ বা সত্তার অগ্রগতি চলে যাহাতে। সেই **অতি** বা চলে যাওয়া বা পেরিয়ে যাওয়ার যে এলাকা, তা যদি **পর্যায়ে** পর্য্যায়ে ভাগ করা থাকে, তবে অতি পেরিয়ে যায় ক্রমকে। **একে অতিক্রম** বলে। অর্থাৎ ক্রম বা পর্য্যায় পার হওয়া থাকে **যাহাতে**, সে হল অতিক্রম বা ক্রান্ত। ক্রমের পর ক্রম, পর্য্যায়ের পর পর্য্যায়, দিনের পর দিন, এলাকার পর এলাকা, একের পর এক — এভাবে স্থান-কাল-পাত্রের ক্রমসমূহের আশ্রয় যাহাতে, তাকে বলে আক্রম। আক্রম অন (on) যাহাতে, তাকে বলে **আক্রমণ**। সেই আক্রমণ তারিত যাহাতে অর্থাৎ যার উপরে আক্রমণ হয়েছে, সে **আক্রান্ত**। যার পরে (চেয়ে) অধিক আক্রম আর হয় না, তাকে বলে **পরাক্রম**। পরাক্রম তারিত হয় যাহার মাধ্যমে, তাকে বলে **পরাক্রান্ত**। ক্রমের উপ যে, সে হল **উপক্রম**। প্রধান কাজটি যদি ক্রম হয়, তবে তার আগের প্রাথমিক যে কাজ, সেটি উপক্রম। গ্রন্থের উপক্রমের আধার যে, সে হল **উপক্রমণিকা**। যে ক্রম কোনো উৎস থেকে একের পর এক বেরোয়, সে হল নিষ্ক্রম; সেই নিষ্ক্রম অন হতে থাকলে, সে হল **নিষ্ক্রমণ**। এই নিষ্ক্রমণ যার মাধ্যমে তারিত হচ্ছে, সে হল **নিষ্ক্রান্ত**। বিশেষ ধরনের ক্রমকে বলে **বিক্রম**, সে বিপরীত ক্রমও হতে পারে। কিন্তু যে ক্রম অন্যের সমান, সেই সম ক্রমকে বলে সংক্রম। সংক্রম অন হতে থাকলে, সে হল **সংক্রমণ**। সংক্রমণ তারিত যাহাতে, সে হল **সংক্রান্ত**। সংক্রান্ত গতিশীল যাহাতে, তাকে বলে **সংক্রান্তি**। ৬. দ্র. **ক্রম**।

ক্রম : ১. ✓ক্রম্‌ + অ - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক্রম্‌ = ক্র-এর সীমায়ন। ক্রম = ক্র সীমায়িত যাহাতে; ক্র (crawling) করা সীমায়িত হয় যেখানে।* ৩. পাদবিক্ষেপ, পাদচার, গতি, চলন, পরম্পরা, পর্য্যায়, সম্প্রদায়, গুরুপারম্পর্য্য, অনুক্রম, পারিপাটি, অত্যয়, অতিক্রম, উত্তরোত্তরভাব, আক্রমণ, শ্বাপদের আক্রমণার্থ অবস্থানবিশেষ, শ্রেণীবদ্ধভাব, প্রবৃত্তি, চেষ্টা, বিন্যাস, যাগাদির বৈদিক বিধান, কল্প, শক্তি, বল। (ব.শ.)। ৪. স্বতন্ত্রভাবে কদাচিৎ প্রচলিত, কিন্তু উপসর্গযোগে (যথা অতিক্রম, উপক্রম, ব্যতিক্রম, পরিক্রমা, নিষ্ক্রমণ) খুবই প্রচলিত। ৫. ক্র-এর এক একটি পর্য্যায়কে **ক্রম** বলে। চাকার দুটি পাশাপাশি থাকা অরের মধ্যে যে ফাঁক, তাকেই ক্রম বলে। চাকাটি ভূমিকে স্পর্শ করে একটি অর থেকে আর একটি অর পর্যন্ত গেলে, সে একটি ক্রম পেরোয় বা **অতিক্রম** করে।

একালের জটিলতা তত্ত্বের তাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন, মানুষ যখন হাঁটে, কত জটিল যান্ত্রিক ব্যাপার চলে। তাতে একটি 'পাদবিক্ষেপ'-এর পর আর একটি 'পাদবিক্ষেপ' ঘটার মাঝে গতি ও স্থিতির কীরূপ লীলা চলে। এর ইংরেজি নাম step by step। কিন্তু তাতে আসল ক্রিয়াটির নাম নেই। 'ক্রম' শব্দটিতে সেই ক্রিয়ার কথাটি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। একটি চাকার একটি অর থেকে পরবর্তী অর পর্যন্ত যে গমন, সেটিই তার ক্রম। ক্রমান্বয়ে চাকাটি ঘুরলে, এক একটি ক্রম পেরিয়ে তার অগ্রগতি ঘটে। মানুষের মাথাকে চাকাটির কেন্দ্র এবং পা দুটিকে সেই চাকার পরিধিতে ঠেকে যাওয়া পাশাপাশি দুটি অর হিসেবে দেখলেই এই **ক্রম** কেন পাদবিক্ষেপ হয়, তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ৬. গ্রীক chronos (= সময়, কাল), ইংরেজি cronicle, chronology, chronometer। গ্রীকের আদিদেব Chronos। আমাদের আদিদেব মহাকাল বা মহাদেব। বাংলায় ক্রম থেকে ক্রান্ত হয়, গ্রীক ও ইংরেজিতে সেই ক্রান্তকে ভিত্তি করা হয়েছে বলে মনে হয়।

'ক্রী' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অক্রেয়, অবক্রয়, অবক্রীত, অবিক্রী, অবিক্রীত, আক্‌কারা, আক্রা, কিন, কিনার(া), কিনিবিকি, কেনা, কেনাকাটা, কেনাকাটি, কেনাবেচা, কেনারাম, ক্রয়, ক্রী, ক্রীত, ক্রেতব্য, ক্রেয়, ক্রোক, বিক্রয়, বিক্রি, বিক্রীত।

ক্রী = ক্র-র গতিশীল আধার যে (ক্রয় থাকে যাহাতে)।

অবক্রয় : ১. অব + ✓ক্রী + অ (অচ্‌) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহা দ্বারা নিম্নমানের ক্রয় হয়।* / যাহা দ্বারা ক্রীত হয়। (ব.শ.)। ৩. মূল্য, ভাড়া, বাণিজ্যার্থ রাজাকে দেয় **শুল্ক** বা মাশুল, রাজগ্রাহ্য দ্রব্য। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. ক্রয়বিক্রয় চালানোর জন্য যে সকল নিম্নমানের ক্রয়কর্ম করতে হয় সেগুলিকে **অবক্রয়** বলে। যথা লাইসেন্স কেনা, পারমিট কেনা, ট্যাক্স দেওয়া ইত্যাদি। এইসব ক্রয়কর্মের দৃশ্যত কোনো 'রিটার্ন' নাই, সেকারণে এগুলিকে **অবক্রয়** বলে।

ক্রয় : ১. ✓ক্রী + অ (অচ্‌) - ভাববাচ্যে; ✓ক্রী + অন (ল্যুট্‌) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গতিশীলতাধারী ক্র-এর (crawling-এর) স্থিতি যাহাতে; ক্র একবার চলে থামে যাহাতে।* / যাহার দ্বারা ক্রয় সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. মূল্যদানপূর্ব্বক পণ্যগ্রহণ, কেনা, দ্রব্যবিনিময়, শুল্ক, পণ, ধন। (ব.শ.)। ৪. purchase অর্থে প্রচলিত। ৫. **ক্রতু**র হাতে যজ্ঞক্রিয়ার মাধ্যমে **কৈল** বা বৎস জন্মায়, ক্রন্দন করে, ক্র (crawling) করে করে এগোয়, এই বৎসের অপর নাম উৎপন্ন। সেই উৎপন্ন অতঃপর গতিশীল হয়ে (অন্যের হাতে গিয়ে) স্থির হয় যে ক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে বলে **ক্রয়**। তার মানে, ক্রয় শব্দে ঘটনাটিকে দেখছে ক্রয়-নিরপেক্ষ তৃতীয় কেউ। স্বভাবতই এটিতে দ্বিপাক্ষিক দ্বিমুখী (পরস্পরের বিপরীতমুখী) ক্রিয়া রয়েছে। দুজনই দিচ্ছে, দুজনই নিচ্ছে। এরকম সমমর্যাদার সম্ভাবনাপূর্ণ ক্রিয়া মানুষের ভাষায় খুব সংখ্যায় কম রয়েছে।

'ক্রীড়্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আক্রীড়, আক্রীড়ন, আক্রীড়ভূমি, কোদন, কোদা, কন্দন, কুর্দ্দন, ক্রীড়্, ক্রীড়ক, ক্রীড়নক, ক্রীড়া, ক্রীড়াকৌতুক, ক্রীড়ামৃগ।
ক্রীড় = গতিশীলতাধারী ক্র আবর্তিত হয় (গড়ায়) যাহাতে।

ক্রীড়া : ১. ✓ক্রীড়্ + অ - ভাববাচ্যে, স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *ক্র-র গতিশীলতাধারীর উড্ডয়ন থাকে যাহাতে।* ৩. খেলা, লীলা, পরীহাস, কেলি, রতি। (ব.শ.)। ৪. games অর্থে প্রচলিত। ৫. করণ তার ক্ষেত্রে চলে গেলে হয় 'ক্রিয়া', না-গেলে কিংবা যাবো-যাবো বলে আগাগোড়া মহৎ-ভান করলে হয় 'ক্রীড়া'। মহৎ-ভান এই জন্য যে, **ক্রীড়ার** ভিতরে অখণ্ড-অসীমের অজানার গুণ ঢোকানো থাকে। যেকারণে ক্রিয়ার জগৎকে সামগ্রিকতায় বুঝতে পারলে তবেই **ক্রীড়া** সৃষ্টি করা যায়। সেকালের অখণ্ড মানসিকতার মানুষেরা অনেক ক্রীড়ার জন্ম দিয়ে গেছেন, যা আমরা আজও উপভোগ করি। আধুনিক যুগ অত্যন্ত খণ্ডিত হয়ে পড়ায় **ক্রীড়ার** জন্ম দিতে ব্যর্থ। ফুটবল ক্রিকেট ছাড়া আধুনিক যুগ কোনো ক্রীড়ার জন্মই দিতে পারেনি। এখন আবার সেই ক্রীড়াকেও সে নষ্ট করে ফেলেছে। তুলনায় প্রাচীন যুগের মানুষ অনেক বেশি ক্রীড়ার জন্ম দিতে পেরেছিলেন। গেমস নিয়ে ব্যবসাদার টিভি চ্যানেলগুলি যে সকল নতুন খেলার জন্ম দেয় বা দিয়েছে, সেগুলি সীমাগুণসম্পন্ন হওয়ায় কিছুতেই ক্রীড়ায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। মানবসমাজ যদি আর ক্রীড়ার জন্ম দিতে কিছুতেই না পারে, সে মানবজগৎ থেকে ক্রমশ জীবজগতে অধঃপতিত হবেই, যার সূত্রপাত এখনই হয়ে গেছে। তারপর তার বিলুপ্তি ঠেকানো একেবারেই অসম্ভব।

ক্রিয়ার বাস্তব ও মানস দুরকম ফল হয়, **ক্রীড়ার** কেবলমাত্র মানসফল ফলে। সেই কারণে 'কর্মরত হওয়া'র বা 'রতি'র দুরকম নাম ছিল — **রতিক্রিয়া, রতিক্রীড়া**। রতিক্রিয়ার যে ফল ফলত, তাতে শরীর বাঁচত, মনও বাঁচত এবং রতিক্রীড়ার ফলে মন 'আনন্দ' (ব্রহ্মানন্দ) লাভ করত। একালে দুটোকেই কলুষিত করে তোলা হয়েছে। অভাবে, ফললোভে আকৃষ্ট হয়ে, কিংবা একই কর্মের পুনরাবৃত্তিমূলক পাপজনক বাধ্যবাধকতায় এখন যে রতিক্রিয়া চলে, তাতে প্রকৃতির দিন কাটে রতিবিলাপ ক'রে ক'রে; ফল যা ফলে, প্রকৃতিশক্তি তার ভাগ পায় না। সব ফলের অধিকারী পুরুষশক্তিও **তৃপ্তি** বা **আনন্দ** পায় না। অন্যদিকে রতিক্রীড়াকেও আস্ত রাখা হয়নি। তাকে ফললোলুপ করে তুলে তার তৃপ্তিও নষ্ট করে ফেলা হয়েছে; আনন্দ কিংবা ব্রহ্মানন্দের তো প্রশ্নই নেই। দ্র. **কেলি**। রতিক্রিয়া ও রতিক্রীড়ার মিলিত অভেদ রূপকে **লীলা** বলে।

'ক্রুধ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অক্রোধ, অক্রোধন, অক্রোধী, কোধ, ক্রুধ্, ক্রুদ্ধ, ক্রোধ, ক্রোধজ, ক্রোধন, ক্রোধনীয়, ক্রোধবর্দ্ধন, ক্রোধবশ, ক্রোধমূর্চ্ছিত, ক্রোধাগার, ক্রোধালু, ক্রোধিত, ক্রোধিনী, ক্রোধী।
ক্রুধ্ = নবরূপে উত্তীর্ণ ক্র-এর ধারণ। **ক্রুধ** = নবরূপে উত্তীর্ণ ক্র ধারিত যাহাতে।

ক্রোধ : ১. ✓ক্রুধ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ ক্র সামগ্রিকতায় ধারিত যাহাতে।* ৩. কোপ, রোষ, রৌদ্ররসের স্থায়ীভাব, ষড়রিপুর একতম, লোভ ও নিকৃতির পুত্র। (ব.শ.) ভাগবত মতে ইনি লোভের পুত্র। ইনি নিজের ভগিনী হিংসাকে বিবাহ করেন। পুত্রের নাম কলি ও কন্যার নাম দ্বিরুক্তি। (পৌ.অ.)। 'সত্যযুগ গত হইবার সময়ে কোনো কোনো ব্যক্তি ধনাদির অতি গ্রহণ জন্য সাম্পন্নিক হওয়ায় তাহাদের শরীরের গুরুত্ব হইয়াছিল। শরীরের গুরুত্ববশত শ্রান্তি, শ্রান্তিবোধ হইতে আলস্য, আলস্য হইতে ধনসঞ্চয়ে আকাঙ্ক্ষা, সঞ্চয়েচ্ছা হইতে প্রতিগ্রহ এবং প্রতিগ্রহ হইতে লোভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তৎপরে ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইলে লোভ হইতে জিঘাংসা, জিঘাংসা হইতে মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা হইতে কাম **ক্রোধ** অভিমান দ্বেষ পরুষতা অভিঘাত ভয় তাপ শোক চিন্তা ও উদ্বেগাদির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।' (চরকসংহিতা)। ৪. anger অর্থে প্রচলিত। ৫. নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোনো কিছু করবার অত্যন্ত ইচ্ছা, যা কিনা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া অতি তীব্র আকার নিয়েছে, তাকে **ক্রোধ** বলে।

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পণ্ডিতগণ অনেকেই বলেন যে, **কাম, ক্রোধ** ... ইত্যাদি মানুষের সহজাত। আজ আমরা জানি যে, মানুষ সম্পর্কে এসব একেবারেই ভুল ধারণা। পরমাপ্রকৃতি মানুষকে **কামুক** বা **ক্রোধ** সম্পন্ন করে জন্ম দেন না, দেননি। যুগের পর যুগ একের পর এক স্বখাত-প্রতিক্রিয়াশীল পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসতে আসতে মানুষ এই সকল 'অমানবিক গুণ'-এর স্বীকার হয়েছে, সেগুলি অর্জন করেছে। বস্তুত **আদিম মানুষের শ্রান্তি, আলস্য, সঞ্চয়েচ্ছা, প্রতিগ্রহ** (কিছু দিয়ে কিছু নেওয়া), **লোভ, জিঘাংসা, মিথ্যাকথা, কাম, ক্রোধ, অভিমান, দ্বেষ, পরুষতা, অভিঘাত, ভয়, তাপ, শোক, চিন্তা, উদ্বেগ** প্রভৃতি মনোরোগগুলির একটিও ছিল না। এ-সবই জন্মেছে দক্ষযজ্ঞের পরবর্তী কাল থেকে। **ক্রোধ** তাদেরই একটি। মানুষ যখন মানুষের কাজে বাধা দেয়, তখনই এ মনোভাব জন্মায়। তবে তার আগে **শ্রান্তি** থেকে **কাম** পর্যন্ত আটটি রোগের কারণে মানুষের মনোলোকের পরিবেশ যথেষ্ট দূষিত হয়ে যাওয়া চাই। সেরকমই হয়েছিল। আমাদের সে ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, যদিও কিছুকালের জন্য সে ইতিহাস পড়তে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম; ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি আমাদের সেই ইতিহাস পড়বার যোগ্য করে দেয়। পাশ্চাত্যের এই ইতিহাসটিই নেই, সেকারণে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই মনে করেন, মানুষ জন্মসূত্রেই কাম ক্রোধ লোভ দ্বেষ হিংসা ... ইত্যাদি স্বভাব নিয়েই জন্মায়। ...

ক্রোধবশ, ক্রোধবশা : ১. ক্রোধ + বশ, বশা। ২. *যে ক্রোধের বশ বা অধীন থাকে।* ৩. রোষ-অধীন, কোপান্বিত, ক্রোধের অধীনতা, রোষপরতন্ত্রতা। (ব.শ.)। দক্ষের কন্যা, প্রজাপতি কশ্যপের স্ত্রী। ক্রোধবশার গর্ভে ও কশ্যপের ঔরসে ক্রোধবশ নামে পুত্রগণ ও জলচর মাংসাশী পক্ষী প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করে। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. জনসাধারণের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, এমন পণ্যজীবীদেরও 'জলচর মাংসাশী পক্ষী' বলা যায়।

'ক্রুশ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আক্রুষ্ট, আক্রোশ, আক্রোশক, আক্রোশন, আক্রোষ্টা, ক্রুশ্, ক্রুষ্ট, ক্রোশ, ক্রোশতাল, ক্রোশধ্বনি, ক্রোশন, ক্রোষ্টু।

ক্রুশ্ = নবরূপে উত্তীর্ণ ক্র-এর শক্তিবিচ্ছুরণ। **ক্রুশ্** = নবরূপে উত্তীর্ণ ক্র-এর **শক্তিবিচ্ছুরণ** যাহাতে। [ক্র শক্তিরূপে বিদ্যমান যাহাতে, সেটি হল ক্রশ। চক্রের মাঝ-বরাবর পরস্পরের বিপরীত দুটি ব্যাস আঁকলে বা যোগ চিহ্ন আঁকলে এই ক্রশকে দেখতে পাওয়া যায়। এই **ক্রশ** ভূমির উপর দিয়ে এক পাক খেলেই পরবর্তী অধ্যায়ে পৌঁছানো যায়। শব্দটি বাংলায় নেই, রয়েছে ইংরেজিতে (cross রূপে) 'পরবর্তী অধ্যায়ে পৌঁছনো' অর্থে বা পার হওয়া অর্থে। ক্র গতিশীল হলে হয় **ক্রি**; নবরূপে উত্তীর্ণ হলে হয় **ক্রু**। এই ক্রু থেকেই ক্রুশ্ হয়। ইংরেজির cruel, crucify, crude, crux, cross প্রভৃতি শব্দগুলি এই শব্দ-পরিবারের সদস্য।]

আক্রোশ (আক্রুষ্ট, আক্রোষ্টা) : ১. আ + ✓ক্রুশ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ ক্র-এর শক্তিবিচ্ছুরণের আশ্রয় যাহাতে।* ৩. রোদন, ভর্ৎসন, কুৎসন, নিন্দাকরণ, শাপ, অভিশাপ, বিরুদ্ধচিন্তন, উচ্চৈঃ শব্দ, আহ্বান, অপবাদ, নিন্দা, দূষণ, দোষারোপণ, রোষ, কোপ, বিদ্বেষ, হিংসা। (ব.শ.)। ৪. 'বিরুদ্ধচিন্তন' অর্থে প্রচলিত। ৫. আমার ব্যবহার দেখেশুনে আপনার গা কর্‌কর্ করছে। আপনার এই ক্র যদি আমার সর্বনাশ করার জন্য কোনো উপায় চিন্তা করে, তাহলেই আপনি **আক্রুষ্ট**। কারণ আপনার মনে আমার বিরুদ্ধে **আক্রোশের** ভাব জন্মেছে। আপনি যদি সেই আক্রোশের আধার হয়েই বিরাজ করতে থাকেন, তাহলে আপনি **আক্রোষ্টা**।

ক্রোশ : ১. ✓ক্রুশ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *সর্বপ্রকার ক্রুশের আশ্রয় যাহাতে।* ৩. রোদন, আহ্বান, রব, ধ্বনি, চীৎকার, পথের দূরত্ব-পরিমাণবিশেষ, সহস্রধনুঃ, অর্থাৎ চারিসহস্র হস্ত-পরিমাণ। ক্রোশ বিষয়ে মতভেদ — মনুর মতে চারি সহস্র হস্তে, প্রজাপতির মতে পাঁচ সহস্র হস্তে এবং লীলাবতীর মতে আট সহস্র হস্তে ক্রোশ হয়। শব্দের মৌলিক অর্থ 'আহ্বান, চীৎকার, উচ্চরব'; ইহা হইতে তাদৃশ শব্দগম্য 'দূর বা পথপরিমাণ', গৌণার্থে 'ক্রোশ'বাচক হইয়াছে, বোধ হয়। 'ক্রোশধ্বনি' শব্দে 'ক্রোশব্যাপী ধ্বনি' হেতু 'চক্কা'কে বুঝায়; ইহাতেও ঐরূপ অনুমান সমর্থিত হয়। (ব.শ.)। ৪. কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. **ক্রুশ** থেকে **ক্রোশ** হয়। ক্রোশের আধারকে আক্রোশ বলে। মানুষের মনে আক্রোশ জন্মালে সে যে হুঙ্কার ছাড়ে, সেই হুঙ্কার-ধ্বনি বা ক্রোশ খোলা মাঠে যে সীমা পর্যন্ত শোনা যায়, ধ্বনির উৎস থেকে সেই সীমার দূরত্বের পরিমাণ হল 'এক ক্রোশ'। মানুষের হুঙ্কার ছাড়ার ক্ষমতাদি নানা বিচারে বদলায়। সেই কারণে ক্রোশের পরিমাণও যুগে যুগে বদলেছে। ১৯৫০-৬০ সালেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখানো হত, দু-মাইলে **এক ক্রোশ** হয়। এখন এই পরিমাপ বদলে গেছে কিলোমিটারে।

'ক্ল' (ক্লম্, ক্লিদ্, ক্লিশ্, ক্লীব্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : **অক্লিষ্ট, অক্লিষ্টকর্ম্মা**, অক্লিষ্টকারী, অক্লেশ, আক্লেদ, কলেশ, কিলাস, কিলাসী (সিধ্মল), কিলেস, কেলেদ, ক্লম্, ক্লম, ক্লান্ত, ক্লান্তি, ক্লিদ্, ক্লিন্ন, ক্লিশ্, ক্লিশিত, ক্লীব্, ক্লীবলিঙ্গ, ক্লেদ, ক্লেশ, ক্লৈব্য, ক্লোম।

ক্ল (ক্লম্, ক্লিদ্, ক্লিশ্, ক্লীব্) = করণের লালন-লয়ন। **ক্লম** = করণের লালন-লয়ন সীমায়িত যাহাতে। **ক্লিদ** = করণের লালন-লয়নের গতিশীলতা দেয় যে। **ক্লিশ** = করণের লালন-লয়নের গতিশীলতা শায়িত যাহাতে। **ক্লীব** = করণের লালন-লয়নের গতিধারী বাহিত যাহাতে। (ক্ল = ক্ + ল্ + অ। এর সরল অর্থ হল করণ লয় যে বা করণ লয়প্রাপ্ত যাহাতে। ক্র-তে যেমন করণ ও রক্ষণ মিলেমিশে রয়েছে, ক্ল-তেও তেমনি করণ ও লালন-লয়ন মিলেমিশে রয়েছে। ক্র-এর মতো ক্ল-এর উত্তরাধিকারও অনেক বেশি পরিমাণে রয়েছে ইংরেজি ভাষায়। অধিকাংশ cl-যুক্ত ইংরেজি শব্দ এই ক্ল-বংশের আত্মীয়। তবে বাংলায় যেখানে লয়নের দিকটি বেশি ধরা আছে, ইংরেজিতে লালনের দিকটি বেশি ধরা আছে। অন্তত এখন পর্যন্ত আমাদের এরকমই মনে হয়েছে। ইংরেজি claw, clay, clap, claim, clan প্রভৃতি শব্দে ক্ল-এর লালন স্বভাব অধিক গৃহীত।)

ক্লান্ত (ক্লান্তি) : ১. ✓ক্লম্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক্লম তারিত যাহাতে।* ৩. শ্রমকাতর, শ্রান্ত, ক্লিষ্ট, অবসাদগ্রস্ত, সন্তপ্ত, গমনে অশক্ত, পীড়িত, ম্লান; আয়াস, ক্লেশ, শ্রম। (ব.শ.)। ৪. tired অর্থে প্রচলিত। ৫. ক্ল সীমায়িত যাহাতে, সেটিই ক্লম। অর্থাৎ যার করণের শক্তি লয় পেয়ে পেয়ে বা খরচ হয়ে হয়ে কমে গেছে, সীমিত হয়ে গেছে, সেই হল **ক্লম**। ক্লম তারিত যাহাতে, সেই হল **ক্লান্ত**।

ক্লীব : ১. ✓ক্লীব্ (বৈকল্য) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক্লী বহন করে যে।* ৩. পুংস্ত্বহীন, নিষ্পৌরুষ (impotent), বিক্রমহীন, অলস, কাতর, দীন, সভয়, কর্ত্তব্যকর্ম্মে নিরুৎসাহ, ভীরুচিত, নপুংসকলিঙ্গ, অধীর। (ব.শ.)। ৪. নিষ্পৌরুষ অর্থটি কমবেশি প্রচলিত থাকলেও 'বিক্রমহীন' অর্থেই অধিক প্রচলিত। ৫. যার করণশক্তি সম্পূর্ণ খরচ হয়ে গেছে, সে হল **ক্লী**। সেই ক্লীর বাহক যে তাকে **ক্লীব** বলে।

ক্লেদ (ক্লেদন) : ১. ✓ক্লিদ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক্লি-র (গতিশীল করণ-লয়ের বা করণ ব্যয়ের) দান থাকে যাহাতে।* / যাহা আর্দ্র করে। (ব.শ.)। ৩. আর্দ্রীভাব, আর্দ্রতা, উপদ্রব, সদ্যোজাত শিশুর গাত্রলগ্ন লালাদি, বাষ্পোদক, ক্ষতনির্গত পূযাদি, পূতিভাব; পচা-ভাব, মল, মালিন্য। (ব.শ.)। ৪. ঘাম বা ময়লা অর্থে প্রচলিত। ৫. কাজ করলে ঘাম ঝরে। অর্থাৎ করণ ব্যয় করলে বিপরীতে ঘাম ঝরে। সম্ভবত এই অর্থেই আদিতে শব্দটির প্রচলন ঘটেছিল। পরে তা সব রকমের ময়লাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এর অন্য রকম অর্থও থাকতে পারে।

ক্লেশ (ক্লিষ্ট) : ১. ✓ক্লিশ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক্লি-র (গতিশীল করণ-লয়ের) দিশাগ্রস্ত শক্তি-প্রকাশ থাকে যাহাতে।* / উপতাপ করে যে। (ব.শ.)। ৩. উপতাপ, বাধা, পীড়া, কোপ, ব্যবসায়, সাংসারিক ক্রিয়া, দুঃখজনক অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ। (ব.শ.)। ৪. 'বাধা' অর্থে প্রচলিত। ৫. কাজ করতে গিয়ে যে সকল বাধার মুখোমুখি হতে হয়, সেই বাধার কারণে কারক যে দুঃখ বা কষ্ট পায়, তাকেই **ক্লেশ** বলে।

'ক্ব' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : কত, কথ, কাই, কাইট (কিট্ট), কাত, কাথ, কুণপ, ক্ব, ক্বচিৎ, ক্বণ্, ক্বথ্, ক্বথন, ক্বাথ।

ক্ব = করণ-বহনের আধার যে। (করণ-বাহক থাকে যাহাতে। একে ক্ব বা কে বলে। 'কে আপনি?' কিংবা 'কে সে?' প্রভৃতি বাক্যে যার কথা বলা হয়, তার সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় 'এই করণবাহক বা কারীটির পরিচয় কী?')

ক্বচিৎ : ১. ক্ব + চিৎ অনিশ্চয়ার্থে। (ব.শ.)। ২. *করণবাহীর গতিশীল চয়নের তরণ যাহাতে।* ৩. কোনো স্থানে, কোথাও, কোনো সময়ে, কখনও। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. আমাদের ভাষার কে, কোন, কাহার, কোথায় প্রভৃতি শব্দগুলির মূলে রয়েছে এই শব্দটি। কিন্তু তার উত্তরণের পথটি বেশ দীর্ঘ এবং গবেষণা সাপেক্ষ বলেই আমাদের মনে হয়েছে। ??

'ক্ষ্' (ক্ষং, ক্ষণ্, ক্ষদ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অক্ষণিক, অক্ষত, অক্ষতযোনি, অক্ষত্র, অক্ষান্তি, অনুক্ষণ, অখন, অখেদ, অবিক্ষত, উশখুশ, একক্ষণ, এক্ষণ, এখন, এতক্ষণ, কতক্ষণ, ক্ষ, ক্ষং, ক্ষ-কার, ক্ষচ্ (খচ্), ক্ষড্ (খড্), ক্ষণ্, ক্ষণ, ক্ষণজন্মা, ক্ষণদ, ক্ষণদাকর, ক্ষণদাচর, ক্ষণদ্যুতি, ক্ষণধ্বংসী, ক্ষণপ্রভা, ক্ষণবিধ্বংসী, ক্ষণবিধ্বংসিক, ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণভূত, ক্ষণমাত্র, ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণিক, ক্ষণী, ক্ষণেক, ক্ষত, ক্ষতজ, ক্ষতি, ক্ষত্তা, ক্ষত্র, ক্ষত্ত্র, ক্ষত্রি, ক্ষত্ত্রি, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্ত্রিয়, ক্ষত্রী, ক্ষত্ত্রী, ক্ষাণিক, ক্ষাত্র, ক্ষাত্ত্র, ক্ষাত্রতেজ, ক্ষেণে, ক্ষেণেক, ক্ষেত, ক্ষেতি, ক্ষেত্রী, ক্ষেত্ত্রী, ক্ষেত্রিণী, ক্ষেত্রিয়, ক্ষেম, খই, খইর, খএর, খগ্‌গড়, খচ্, খচ, খচখচ, খচড়া, খচমচ, খচর, খচরমচর, খচাখচ, খচিত, খচ্চর, খঞ্চাপোশ, খঞ্চাপোষ, খঞ্চেপোশ, খঞ্চেপোষ, খঞ্জর, খঞ্জরি(রী), খট্, খট, খটক, খটকা, খট(ড়)ক্কিকা, খড়ক্কী, খটখট, খটখটীয়া, খটখ'টে, খটমট, খটমটি, খটরখটর, খটরমটর, খটাখট, খটাৎ, খ(খা)টাশ, খ(খা)টাস, খ(খো)টি, খটিকা, খটিনী, খটী, খট্টক, খট্টা, খট্টাঙ্গ, খট্টাপদ, খট্টারূঢ়, খট্টাশ(স), খট্টিক, খট্টিকা, খট্বা, খট্বাঙ্গ, খট্বারূঢ়, খট্বিকা, খড়্, খড়, খড়কিমালা, খড়কী, খড়কে, খড়ক্কিকা, খড়ক্কী, খড়খড়, খড়খড়ি, খড়খড়ে, খড়ম, খড়মচরণ, খড়মপা, খড়মড়, খড়রমড়র, খড়(র)রা, খড়া, খড়ি, খড়ী, খড়িকা, খড়িচোঁচ, খড়িমাটি, খড়িশ, (খড়িস, খরিশ, খরিস), খড়ী, খড়্(রু)টি, খড়্গ (ক্ষড্), খড়্গহস্ত, খড়্গী, খণ, খণিক, খত্, খত, খতবা (ক্ষতবহ), খতম (ক্ষতম), খতান, খতি (ক্ষতি), খতিয়ান, খ'তেন, খতী, খদি, খদিকা, খদির, খদ্দর, খধি, খ(খে)য়াল, খয়ের, খয়ের-খাঁ, খরগ, খশ(স), খশখশ, খস, খসখস, খসড়া, খসতিল, খসম্, খাঁড়া, খাট, খাটনি, খাটা, খাটাগুণ্ডা, খাটাখাটনি, খাটান, খাটাল, খাটি, খাটিয়া, খাটুয়া, খাটুলি, খাটো, খাট্টা, খাড়, খাড়ব, খাড়া, খাড়ি(ড়ী), খাদির, খাপ, খাবল, খাবলা, খাস (আম), খাসা, খাসিয়া, খাসী, খাস্ত, খাস্তা, খিড়কা, খিড়কি, খিড়ক্কিকা, খুঁট, খুঁট-আখুরে, খুঁটা, খুঁটিনাটি, খুঁটি(টী), খুঁটো, খুঁড়, খুঁত, খুঁতখুঁত, খোঁট, খোঁটা, খোঁড়া, খুটা, খুঙ্গি(ঙ্গী), খুশ, খুশবু, খুশি, খুশী, খুশমেজাজ, খুশহাল, খুশামোদ, খেংরা, খেংরাগুঁপো, খেঁ, খেঁকশিয়াল, খেঁকি, খেঁট, খেক, খেঙ(ঙ্গ)রা, খেটে, খেটেল, খেড়, খেণ(ন), খেসট, খেসারৎ, খেসি, খৈ, খোই, খোনকার, খোনা (ক্ষং-না), খোন্দকার (ক্ষংদকার), ছন, ছত্রিয়, ছত্রী, ছন, ছাতি, ছাতিয়া, ছেত্রী, তখন, ততক্ষণ, তদ্‌ক্ষণ, সক্ষণ।

ক্ষ (ক্ষং, ক্ষণ্, ক্ষদ্) = ক্ষ্ = দিশাগ্রস্ত করণ। **ক্ষং** = ক্ষ্-করণের রহস্যরূপ যাহাতে। **ক্ষণ** = ক্ষয় অন যাহাতে। **ক্ষদ** = ক্ষ দেয় যে।

ক্ষ : ১. ক্ + ষ্ + অ। ২. *করণ, দিশাগ্রস্ত চিন্তন, আধার।* ৩. (ক্ষয় > বা ✓ক্ষ, ✓খ) ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, খসিয়া পড়া, ক্ষয় করা, নষ্ট করা। (ব.শ.)। ৪. স্বতন্ত্রভাবে অপ্রচলিত। ৫. কোনো করণ (ক্) যদি পুনরাবৃত্ত হতে থাকে, তখন নিঃসন্দেহে সে করণ দিশাগ্রস্ত শক্তিপ্রয়োগে (ষ্) পরিণত হয়। আর, দিশাগ্রস্ত একটানা করণ মাত্রেই একধরণের গড্ডলিকা স্রোতের মতো। তা একদিকে যেমন নিজের গড্ডলিকার স্বভাববশতই ক্রমক্ষীয়মান হয়, অন্যদিকে তেমনি পূর্বতন করণপ্রক্রিয়াকে ভুলে যেতে বাধ্য করে। তাই ক্ষ মানেই ক্ষয়ণ ও গোপন, অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া বা করা ও গোপন করা। এই ক্ষয়ণ ক্রিয়াটির ভিতরে স্বভাবতই আরও দুটি ক্রিয়া শায়িত থাকে। এক — নিজ দেহ থেকে খানিকটা করে ত্যাগ করা; এবং দুই — অন্য অবয়ব থেকে একটু একটু করে কেটে নেওয়া। একে ক্ষ-করা বা খাবলে (খুবলে) নেওয়া এবং ক্ষসানো বা খসানো রূপেও উল্লেখ করা চলে। এই ক্ষ-এর আধারকে ক্ষা, ক্ষ-এর গ্রহণচেষ্টা বা ত্যাগচেষ্টাকে ক্ষি, ক্ষ-করা অংশকে ক্ষু বলে। দ্র. **শ**।

ক্ষণ : ১. ✓ক্ষণ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক্ষয় অন যাহাতে।* ৩. হিংসাকারক, কালের অংশবিশেষ, ত্রিংশৎকলা, নিমেষের চতুর্থাংশ, চার মিনিট, নিমেষত্রয় পরিমিতকাল, জ্যোতিষে আটচল্লিশ মিনিট, অত্যল্পকাল, প্রশস্ত মুহূর্ত, সময়, কাল, অবসর, নির্ব্ব্যাপার-স্থিতি, উৎসব, উৎসবকাল, পর্ব্ব, মধ্য, পরাধীনতা। (ব.শ.)। ৪. moment বা point of time অর্থে প্রচলিত। তবে এই 'ক্ষণ' শব্দের অন্য রূপগুলি, যথা 'খন', 'এখন' (এইক্ষণে, এক্ষণ), 'তখন' (তৎক্ষণাৎ, ততক্ষণে), 'যখন' (যতক্ষণ, যেই ক্ষণে) প্রভৃতি অনেক বেশি প্রচলিত। ৫. বস্তুত অনন্ত মহাকাল রয়েছে আমাদের সামনে। তারই একটু একটু অংশকে কেটে কেটে আমাদের বর্তমান সময়

এগোতে থাকে। মহাকালের ওই কাটা অংশগুলি ক্ষণ পদবাচ্য, কেননা তারা মহাকালকে একটু একটু করে ক্ষ করে করে বা খুবলে খুবলে পেছন দিকে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

ক্ষত (ক্ষতি) : ১. ✓ক্ষণ্ + ত (ক্ত) কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে অংশ কেটে নেওয়া হয়েছে*। ৩. হিংসিত, বিদারিত, ছিন্ন, বিদ্ধ, নাশিত, নিহত, হত, বিরুদ্ধ, ভগ্ন, লূন, দষ্ট, দূরীকৃত, খণ্ডিত, আহত, কৃষ্ট, কৃতকর্ষণ, পীড়িত, ধর্ষিত, দূষিত, হীন, ধ্বস্ত, উপদ্রব। নাশ, অপচয়, ক্ষয়, উৎখনন, খোঁড়া, আঘাত, প্রশমন, অভাব, বাধা, প্রতিবন্ধ। (ব.শ.)। ৪. wound অর্থে প্রচলিত। ৫. ক্ষণ-এর মহাকালের অংশ কেটে নেওয়ার ধারণাটি এক্ষেত্রে অন্যান্য অবয়বের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে। যার যে অংশটি কেটে নেওয়া হচ্ছে, সেই অংশটি সেই অবয়বের ক্ষত। গত গত যোগ করে যেমন গতি হয়, তেমনি ক্ষত ক্ষত যোগ করে ক্ষতি হয়। অবয়বের দিক থেকে দেখলে, এটি অবয়বের ক্ষতিই বটে।

ক্ষত্রিয় (ক্ষত্তা, ক্ষত্তৃ, ক্ষত্র, ক্ষত্‌ত্র, ক্ষত্‌ত্রিয়) : ১. ✓ক্ষদ্ সংবরণ + ত্র - কর্তৃবাচ্যে; ✓ক্ষদ্ সংবরণ + তৃ (তৃচ্) - কর্তৃবাচ্যে; ক্ষৎ + ✓ত্রৈ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে; ক্ষত্ত্র + ইয়। (ব.শ.)। ২. *ক্ষত থেকে ত্রাণ করে যে; বহিঃশত্রুর খুবলে নেওয়া থেকে স্ব-অবয়বকে রক্ষা করে যে। /* যে (অশ্ব) সংবরণ করে; যে সংবরণ বা ক্ষত হইতে রক্ষা করে; যিনি রণস্থলে সর্ব্বসমক্ষে যুদ্ধারম্ভেই ধন্বীদিগকে আহত ও পরাজিত করেন, তাদৃশ ব্রাহ্মণ; ক্ষত্‌ত্রের অপত্য। (ব.শ.)। ৩. সারথি, দ্বারপাল, শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়াজাত বর্ণসঙ্করবিশেষ, দাসীপুত্র, বিদুর, ব্রহ্মা, মৎস্য, নিযুক্ত, রাজপুরুষ। ক্ষত্রিয়জাতি পুরুষ, তগরপুষ্প, দেহ। ক্ষত্রজাতি, ক্ষত্রে (রাষ্ট্রে) সাধু, দ্বিতীয় বর্ণ। (ব.শ.)। ৪. বংশধারা বোঝাতে শব্দটি কদাচিত প্রচলিত। ৫. প্রথম চারটি শব্দের (ক্ষত্তা, ক্ষত্তৃ, ক্ষত্র, ক্ষত্‌ত্র) মূলে রয়েছে 'সংবরণ'; জানিয়েছেন বঙ্গীয় শব্দকোষ। নিশ্চয়ই কোনো না কোনো পূর্বসূরির লেখা গ্রন্থ থেকে এটি তিনি পেয়ে থাকবেন। আমরা জেনেছি, এই 'সংবরণ' বা 'গোপন' রয়েছে 'ষ' বর্ণটির ভিতরেই। অতএব, সেই সুবাদে এর মানে দাঁড়ায় — (সত্য) সংবরণকারীকে (বা ক্ষত্তা ও ক্ষত্তৃকে তাদের সত্যগোপনের দায় থেকে) ত্রাণ করে যে, সেই হল 'ক্ষত্র' বা 'ক্ষত্‌ত্র'। আর 'ক্ষত্রের অপত্য' বা ওইরূপ ত্রাণকারীদের সহযোগীরা হল ক্ষত্রিয়। এর সঙ্গে উপরোক্ত সমস্ত তথ্য মিলিয়ে বিচার করলে বোঝা যায়, ক্ষত্র হল প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র এবং ক্ষত্রিয় হল সেই রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বা কর্মচারী। স্মর্তব্য যে, জগতের আদিরাষ্ট্র বা আদিক্ষত্রিয়ের নাম পৃথু। রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে একালের অ্যাকাডেমি যা জানে, পৃথুর ইতিহাস প্রমাণ করে, তা আগাগোড়া ভুল। পৃথুই আদিক্ষত্রিয়, এবং তার জন্য মহর্ষিদের তৈরি করা ধর্ম্মই ক্ষত্রধর্ম্ম। পরে পরে সেই ক্ষত্রধর্ম্ম বীরত্বের ধর্ম্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং ক্ষত্রিয় বলতে যোদ্ধা জাতি বোঝানো হতে থাকে; তার অন্তর্নিহিত অর্থটি ক্রমে শব্দটির ভেতরে শায়িত হয়ে থেকে যায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য (চ) গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ক্ষত্রধর্ম্ম : ২. *ক্ষত্রিয়গণ যে ধর্ম্ম পালন করেন*। ৩. ক্ষত্রিয়ের স্মৃতিবিহিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম, ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্য — প্রজাপালন, যাজন, অধ্যয়ন, দান ইত্যাদি; যুদ্ধে অপলায়ন। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. প্রজাপতি বেণ-এর দক্ষিণবাহু মন্থন করে (দ্র. পৃথু, বেণ) যে আদি ক্ষত্রিয়ের জন্ম দিয়েছিলেন মহর্ষিরা, তার জন্য তাঁরা প্রজাশাসন (প্রজাপালন), দান, বিষয়ে অনাসক্তি, যজ্ঞ, ও অধ্যয়ন — এই পঞ্চকর্ম্মের নির্দেশ দিয়েছিলেন। **প্রজাশাসন** : প্রজাদের উৎপন্নে ভাগ বসানো। গরুর উৎপন্ন হল দুধ। সেই দুধে ভাগ বসানোর জন্য যেমন গোশাসন, গোপালন ইত্যাদি করতে হয়, তেমনি ব্যাপার। সেইকারণে ক্ষত্রিয়ের এই ধর্মটিকে প্রজাপালনও বলে। **দান** : প্রজাদের উৎপন্নে বসানো সেই ভাগ বহন করে নিয়ে এসে অকর্মক শাসকদের (সেকালে বেদজীবী ব্রাহ্মণদের, একালে আধুনিক আঙ্গিরসদের বোঝায়, জাতিতে ব্রাহ্মণদের বোঝায় না) মুখে তুলে দেওয়া। **বিষয়ে অনাসক্তি** : ওই ভাগ আনতে আনতে খেয়ে সাবাড় করে না দেওয়া। (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ ওঠে যে, সে জ্ঞানজীবী-শিক্ষকদের ঠিকমতো বেতন দিতে পারে না; সংগৃহীত রাজস্ব নিজেই খেয়ে সাবাড় করে দেয়। গুরুর কথা চণ্ডালটার মনে থাকে না।) **যজ্ঞ** : সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ ঠিকমতো চলছে কি না দেখা, সেই কর্মযজ্ঞ চালানো, যাতে প্রজারা বেশি বেশি উৎপাদন করতে পারে; নইলে ভাগ বসানো যাবে কোথায়? (উৎপাদন কী করে বাড়ানো যায়, সরকারের সেকারণেই সর্বদা মাথাব্যথা। সেকালে এই বিষয়টিকে বলা হত — রাজার পুত্র নাই, পুত্র চাই, অতএব যজ্ঞ করতে হবে ... ইত্যাদি।) **অধ্যয়ন** : অকর্মক শাসকদের নিকট উপরোক্ত প্রজাশাসন, দান, বিষয়ে অনাসক্তি, যজ্ঞ — এই চারটি বিষয়ে ট্রেনিং নেওয়া। সেকালে এই ট্রেনিং দিতেন বেদজীবীরা, একালে দেন এক শ্রেণীর নিষ্কর্মা জ্ঞানজীবী। বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে (চ) গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায়।

খচিত : ১. ✓খচ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহাতে ক্ষ-কৃত বা খুদে আনা বস্তু বিন্যস্ত করে রাখা হয়*। ৩. বন্ধনসংযুক্ত, সম্পৃক্ত, বিন্যস্ত, বিনিবেশিত, ব্যাপ্ত, নিচিত, রূষিত, ছুরিত, ভূষিত। (ব.শ.)। ৪. arranged অর্থে প্রচলিত। ৫. অবয়বের টুকরো কেটে কেটে আনাই তো ক্ষ-কৃত বস্তু। তাকে সাজিয়ে রাখলে হয় 'ক্ষচিত'। কথাটি বাংলায় খচিত হয়ে গেছে। ৬. ইংরেজি sketch।

খট, খটক, খটকা : ১. ✓খট্ (আকাঙ্ক্ষা) + অ (ঘঞর্থে ক) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *খট = ক্ষ টঙ্কারিত হয় যাহাতে। খটক = ক্ষট করে যে। খটকা = খটকের আধার যে। /* খটকা = যাহা কার্য্য-সাধনে অভিমুখ বুদ্ধিতে খট করিয়া আঘাত করে বা প্রতিবন্ধক জন্মায়। (ব.শ.)। ৩. তৃণ, লাঙ্গল, টঙ্কাস্ত্র, শস্ত্রবিশেষ, কফ; ছয় রাগের মিশ্রণে জাত রাগবিশেষ (প্রবাদ, ষড়াননের মুখ হইতে ইহার উৎপত্তি); কঠিন দ্রব্যদ্বয়ের পরস্পর আঘাত জন্য কঠোর ধ্বনি। ঘটক, কুব্জিত পাণি। সন্দেহ, সংশয়, দ্বৈধ, ভয়, ডর, পাখি তাড়াইবার নিমিত্ত ফলের গাছে বদ্ধ মাথা-চেরা খট্‌খট্ শব্দজনক বংশদণ্ড। (ব.শ.)। ৪. 'খট্' ধ্বনি অর্থে খট শব্দ এবং 'সন্দেহ' অর্থে

খটকা শব্দটি বহুল প্রচলিত। ৫. নিজের একটু খানি অংশ (ক্ষয়) ফেলে দিলে সে যেমন ক্ষট বা **খট**, তেমনি অন্য অবয়ব থেকে ক্ষ করলে বা খাবলে নিলে যে শব্দ হয় তাও ক্ষট বা খট। তাই খট মানে কফ হয়, টঙ্কাত্রও খট। যে ক্ষট করে, সেই যদি **খটক** হয়, তবে তার আধারকে বলতে হবে **খটকা**।

খটমট : ২. *খ (ক্ষ) টঙ্কারিত ও ম (সীমায়ন) টঙ্কারিত যাহাতে।* ৩. (ধন্যাত্মক) খটখট, হঠাৎ জোরে হাসির শব্দ, সকোপ দৃষ্টিপাতের ভাব বা কঠোর দৃষ্টিপাতের ভাব। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **অট, কটমট**। কোনো কিছুকে ক্ষ করলে বা খাবলে নিলে যে টঙ্কার হয় (আদৌ যদি তা হয়) তবে তাকে খট বলে। এবং কোনো কিছু সেই ক্ষ-চেষ্টায় ভেঙে গেলে বা নিজের খানিকটা অংশ ত্যাগ করে সীমায়িত হয়ে গেলে যে শব্দ হয়, তাকে মট বলে। লোকে অট-অট হাসে, কটমট তাকায়, খটমটে ভাষায় কথা বলে।

খটাশ (খট্টাশ, খট্টাস) : ১. খট্ট + অশ। (ব.শ.)। ২. *খট খট খুবলে যে খায়।* / যে সংবৃত হইয়া খায়। (ব.শ.)। ৩. বন্যজন্তুবিশেষ, গন্ধমার্জ্জার, গন্ধগোকুলা, ভাম, (Viverra Zibetha)। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় জন্তুটিকে বোঝাতে প্রচলিত। ৫. ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে এ শব্দটিও একটি ক্রিয়ার কারককে অর্থাৎ একটি সত্তার স্বভাবকে বোঝায়; যদিও আমরা এখন কেবল একটি জীবকেই এই শব্দে চিনে থাকি। যে জীবটিকে 'খটাশ' বলে, অনেকেই তাকে চেনেন। কিন্তু তার স্বভাবটি যে তার নামের মধ্যেই রয়েছে, সেকথা শহুরে অ্যাকাডেমি শিক্ষিত বাংলাভাষীরা জানেন না। সেকারণে সেই স্বভাবের লোককে তাঁরা **খটাশ** বলে শনাক্ত করতে পারেন না। কিন্তু গ্রামবাংলার বাংলাভাষীরা তো এখনও অতীত উত্তরাধিকার কমবেশি বহন করেন। তাঁরা জানেন, কাকে **খটাশ** বলে গালাগালি দেওয়া যায়। (এবং জন্তুটিকে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে শব্দটির প্রয়োগ আজকাল হয় না বললেই চলে, কারণ জন্তুটিই এখন বিরল; তবে গালাগালি বা নিন্দা করার জন্য শব্দটির প্রয়োগ এখনও তাঁরা হামেশাই করে থাকেন।) যাকে সেভাবে গালাগালি দেওয়া যায়, তার যে সত্তা, এই জন্তুটিরও সেই সত্তা। সে খুবলে খায়, গন্ধ ছড়িয়ে খায়, গোপনে খায়।

খড় (খড়খড়ি, খড়খড়ে) : ১. **খড়** = ✓খড় (ভেদ) + অ (ঘঞর্থে ক) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **খড়** = *যাহাতে অবয়ব-বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রাংশের আবর্তন থাকে; অথবা খ (আকাশ) এর দিকে আবর্তন (ড়) আছে যার।* / **খড়খড়ি** = যাহা খড়খড় শব্দ করে; **খড়খড়ে** = যে অতিমৃদু কথাও শুনিতে পায়। (ব.শ.)। ৩. তৃণ, ঘাস, লঘুতৃণ, শুষ্কধান্যতৃণ, বিচালি, তৃণবিশেষ, উলু; জানালা দরজার কাঠের শিথিল আবরণবিশেষ, ঝিলমিলি, কঠিন দ্রব্যের পরস্পর আঘাতের জন্য শব্দ; প্রখর, তীক্ষ্ণশ্রবণশক্তি-যুক্ত (কান)। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. গড়ান আর উড়ান-এর মধ্যে মিল আর পার্থক্য হল, দুটোতেই আবর্তন বা রোলিং আছে; তবে একটি মাটিতে আবর্তিত হয়, অন্যটি শূন্যে আবর্তিত হয়। ড় এই আবর্তন বা রোলিংকে বোঝায়। ক্ষ করে কিছু নিলে বা দিলে, যা আসে বা যায়, তা সে অতি অল্পপ্রমাণ অবয়বাংশ কিংবা তার শব্দ বা গন্ধ যাই হোক, সে হচ্ছে ক্ষড় বা খড়। তা আবর্তিত হতে হতে এগোয়। তা যদি শব্দমাত্র হয় তবে তাকে **'খড়খড়' ধ্বনি বলা যায়।** ৬. ইংরেজি scud। ইরাকের সাদ্দাম হোসেন তাঁদের মিসাইলের এই নাম রেখেছিলেন।

খড়া (খড্ডা, খোড়াখাড়া) : ১. খড় + আ। ২. *যাহার অবয়ব-বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রাংশ বা ক্ষাত অংশ আবর্তিত হয়ে চলে গেছে, (ফলে, স্থানটি শূন্য পড়ে আছে)।* ৩. গাঁথনির ইঁট পাথর প্রভৃতির জোড়ের মুখে ফাঁক বা খাঁজ, দেওয়ালের ফাটল, তৈলাদি মাপের নিমিত্ত পাত্রের গায়ে কৃত চিহ্ন, মাপপাত্রের গায়ের দাগ। (ব.শ.)। ৪. রাজমিস্ত্রিদের মুখে 'খড়া' শব্দটি, হিন্দিপ্রভাবিত বাঙালির মুখে 'খড্ডা' শব্দটি, এবং গ্রামবাংলায় 'খোড়াখাড়া' শব্দটি 'শূন্যস্থান' অর্থে প্রচলিত। ৫. গাঁথনির শূন্যস্থান পূরণ করাকে রাজমিস্ত্রিরা বলেন 'খড়া মারা'। কিন্তু 'খড়া' শব্দের ভিতরে 'শূন্যস্থান' কথাটি নেই, রয়েছে সেখানকার অবয়ব-অংশ খাত হয়ে চলে যাওয়ার কথা। তাহলে এরকম অর্থ আমরা বুঝি কেন? কারণ, ক্ষিপ্ত শব্দের বেলায় যেমন আমরা দেখি, এক্ষেত্রেও সেইরকম ব্যাপার ঘটে — ক্ষাত বা খাত অংশ চলে গেছে, স্থানটি শূন্য পড়ে আছে; এরকম অবস্থায় সেই খাত অংশটিকে **খড়া** বা খোড়াখাড়া বলা হচ্ছে। স্বভাবতই কাজের মানুষ বুঝছেন, স্থানটি শূন্য হয়ে রয়েছে। অর্থাৎ শব্দটির মধ্যে যে মানে রয়েছে, তার পরবর্তী অধ্যায়টিকে আমরা তার অর্থ রূপে বুঝছি। শব্দের ব্যঞ্জনা অর্থের অধিকাংশই এরকম। তবে 'মাপপাত্রের গায়ের দাগ' শব্দটি কিন্তু এইপথে আসেনি, এসেছে খড়ির পথে। দ্র. **খড়ি**।

খড়ি (খড়ী, খটিকা) : ১. খড় + ই। ২. *যাহা হইতে ক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রাংশ আবর্তিত হয়ে (অন্যত্র) যায়।* ৩. লেখনার্থ শ্বেত প্রস্তরবিশেষ, কঠিনী, খড়ি দ্বারা গণনা, তৈলহীন শরীরে খড়ির মতো শাদা শুষ্ক চর্ম্ম বা খুস্কি; খটী, খড়ী, বীরণমূল, বেণারমূল; নলজাতীয় তৃণবিশেষ, খড়ির কলম, লেখনী, কলম, রন্ধনার্থ শুষ্ক তৃণ প্রভৃতি, দণ্ড, দণ্ডের আঘাত, ইক্ষুবিশেষ, খড়ি-আক, কাষ্ঠসদৃশ শুষ্ক নীরস দ্রব্য। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **খড়ি** স্ব-অবয়বের কিয়দংশ ক্ষয় করে অন্য অবয়বে যায় বলেই তাতে লেখা যায়।

খড়্গ (খড়্গনাসা, খড়্গপাণি, খড়্গহস্ত) : ১. **খড়্গ** = ✓খড় (ভেদ) + গ (গন্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***খড়্গ** = অবয়বের ক্ষুদ্রাংশ খুবলে বা খাত করে আনার জন্য যে গমন করে।* / **খড়্গনাসা** = যে নারীর নাক খড়্গাগ্রতুল্য সূক্ষ্মাগ্র ও বক্র; **খড়্গপাণি** বা **খড়্গহস্ত** = খড়্গ পাণিতে (হস্তে) যাহার। (ব.শ.)। ৩. প্রসিদ্ধ প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ, খাঁড়া, অসি, (সাদৃশ্যে) গণ্ডকশৃঙ্গ, গণ্ডার, বুদ্ধবিশেষ, চোরনামক গন্ধদ্রব্য, লৌহ। ৪. কম প্রচলিত। ৫. একালের মানুষের অনেকেই খড়্গ দেখেননি। দেখে থাকলেও ঠাকুরের হাতেই দেখে থাকবেন। নগণ্য সংখ্যক মানুষের বাড়িতে খড়্গ থাকে। কিন্তু

মুখে 'খড়্গহস্ত' শব্দটি এখনও আকছার ব্যবহৃত হয়। যদিও কারো হাতেই খড়্গ থাকে না, তবুও কাউকে 'অতিক্রুদ্ধ' বা 'মারমূর্ত্তি'তে দেখলে লোকে বলে — 'আপনার মতের বিপরীত কথা শুনিলে সে তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া উঠে। (ব.শ.)।'

খত (দস্তখত, খতখাল, খতডোবা, খতী) : ১. ক্ষত > খত; খত + খাল। ২. **খত** = **ক্ষ** *(ছিন্ন ক্ষুদ্রাংশ) তারিত হয়েছে যেখান থেকে;* ***(দস্ত)খত*** = **ক্ষ** *(ছিন্ন ক্ষুদ্রাংশ) তারিত করা হয়েছে যেখানে;* ***খতখাল, খতডোবা*** = *যে খালে বা ডোবায় খত (গো-ত্যক্ত গোবর-গোমূত্রাদি) ফেলে রাখা হয়।* / **খতী** = খত দিয়া গৃহীত (যাহা)। (ব.শ.)। ৩. দোষ হেতু মৃত্তিকায় নাসিকাঘর্ষণ-জন্য ক্ষতচিহ্ন বা ক্ষতরেখা, ক্ষত, ক্ষতস্থান, ঘা, আঘাত; ঋণগ্রহণার্থ স্বহস্তলিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র, ঋণলেখ্য, তমসুক, পত্র, চিঠি, প্রতিজ্ঞাপত্র; খতী কর্জ্জা = (দস্ত)খত দিয়া গৃহীত ঋণ। (ব.শ.)। ৪. শব্দ কয়টি গ্রামবাংলায় যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. আবেস্তার মতো আরবি-ফারসি শব্দের সঙ্গেও বাংলা শব্দের বেরাদরি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। খত (চিঠি) ও দস্তখত (সহি), উভয় শব্দের ক্ষেত্রে পাত্রের ক্ষিপ্ত ছিন্নাংশ বা ক্ষত লিপ্ত হয় পত্রে। তাই তা 'খত' ও 'দস্তখত' পদবাচ্য হয়েছে। উল্টো দিক থেকে দেখলে, এই খ (ক্ষ) করা অংশই খাত, যা জমে হয় খাদ। দ্র. **খনন, খাই, খাদ্য**।

খতম (খতান, খতিয়ান, খতেন) : ১. খত্ (ক্ষত) + অম; খতি + আন। ২. ***খতম (ক্ষতং)*** *= খাত হতে হতে সমগ্র অবয়ব নিঃশেষ হয় যাহাতে;* ***খতিয়ান*** *= ক্ষত-এর যাতায়াত (লিখিত) থাকে যাহাতে।* ৩. সমাপ্তি, শেষ, আয়-ব্যয়, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়ের খাতায়-খাতায় দৈনিক হিসাব লেখা, বিষয়মাত্রেরই ভাগে ভাগে হিসাব করা, (খতাইয়া, খতিয়ে দেখা — ভাগে ভাগে হিসাব করিয়া বুঝা); যে কাগজে প্রজার চিঠার দাগ-জমিপরিমাণ-খাজনাপরিমাণ ইত্যাদি লেখা থাকে, প্রজার নামীয় জমিজমা ও খাজনা-উশুলবাকী প্রভৃতির পৃথক হিসাব, যে কাগজে ক্রেতার বা বিক্রেতার দেনা-পাওনার হিসাব নামোল্লেখপূর্ব্বক পৃথক লিখিত হয় ... (ledger-book)। ৪. কম প্রচলিত। ৫. জমিদারী ও মহাজনীতে এই শব্দের প্রচলন হয়েছিল মধ্যযুগে। ইংরেজ আমলেও এগুলি যথারীতি ছিল; স্বাধীনতা-উত্তরকালে ইংরেজির অত্যন্ত প্রভাবের কারণে এবং জমিদারী সরকারে অর্পিত ও মহাজনী ব্যাঙ্কে অর্পিত হওয়ার কারণে এই শব্দগুলির ব্যবহার এখন কমে গেছে। পরিবর্তে এসেছে ইংরেজি শব্দ। কিন্তু 'খতম' থেকে গেছে 'শেষ হয়ে যাওয়া' বা মৃত্যু রূপে। বলা হয়, শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসেছে। আমরা দেখছি, শব্দটি মূলত '**ক্ষ**' পরিবারের সদস্য, যার অধিকার সর্বভাষিক। দ্র. **খাতেমা**।

খশ (খস, খসা, খোস, খোসা) : ১. (ক্ষশ্, ক্ষস্) খশ্, খস্ + অ, আ। ২. *খাত (ত্যক্ত বা ছেদিত) শক্তি থাকে যাহাতে।* ৩. **খশ** = **দেশবিশেষ,** বর্ত্তমান গাড়োয়াল ও তাহার উত্তর প্রান্ত, খলদেশবাসীগণ, **ইহারা ক্ষত্রিয়।** ক্রিয়াদিলোপ হেতু শূদ্রত্বপ্রাপ্ত এবং ম্লেচ্ছনামে **অভিহিত। খস** = **স্খলিত** হওয়া, শিথিলবদ্ধ হওয়া, ঝরা, পড়া, পতিত হওয়া, বৃষ্ট হওয়া, দূর হওয়া, দ্রুত ধাবিত হওয়া, সঞ্চিত অর্থ ব্যয়িত হওয়া, গর্ভস্রাব হওয়া, ভাঙিয়া পড়া, ধসা, সরিয়া পড়া, ভাগা। (ব.শ.)। **খসা = কশ্যপের** অন্যতমা স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা। খসা হতে যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করে। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সত্তা নিজে যখন নিজের অংশকে খাত করে ত্যাগ করে তখনই তা ক্ষশ্ বা ক্ষস্। সত্তার দিক থেকে দেখলে এটি পতিত করে দেওয়া, খসিয়ে বা ঝরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি; কিন্তু যে ঝরে গেল, তার দিক থেকে দেখলে এটি তার স্খলন বা স্থানচ্যুতি। সেকালে সমাজের যে অংশ বেদবিরোধী ভূমিকা নিয়েছিল, বিভিন্ন সময়ে সেই অংশের মানুষজনকে তাদের ক্রিয়াদিলোপ করে দিয়ে শূদ্র বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল। গাড়োয়ালবাসীরা সেভাবেই **খশ,** হয়তো সেভাবেই উত্তর-পূর্ব ভারতে খাস বা **খাসিয়ার** উদ্ভব। খসে যাওয়া বা স্খলিত হওয়ার ঘটনা তো নেহাত কম ঘটেনি। সমাজে যাঁরা যৌথ সম্পদের দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই নানাসময়ে স্খলন ঘটেছে। সেই স্খলন যাদের স্বভাব ছিল, তেমন জনগোষ্ঠীকেও বলা হয়েছে 'খসা'। সেই জনগোষ্ঠীর পরিচালক নিযুক্ত হন কশ্যপ। এর ফলে যে-সত্তার জন্ম হয়, পরবর্তী কালে তারাই যক্ষ ও রাক্ষসে পরিণত হয়।

এ তো গেল সমাজদেহের কথা। মানবদেহেও এই সত্তার দেখা মেলে। তখন আমরা তাকে বলি 'খোস-পাঁচড়া'। চামড়ার কিছু কিছু অংশ তখন পচে শুকিয়ে স্খলিত হয়ে যায়। ফলমূলাদির ক্ষেত্রে এইরকম যে-বহির্ভাগ থাকে, ফলটি পেকে গেলে প্রায়শই যা ফল থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাকে সেকারণেই **খোসা** বলে।

খুশ, খুশবু, খুশি, খুশী, উশখুশ (খুশমেজাজ, খুশামোদ, খুশহাল) : ২. ***খুশ*** *= খ (ক্ষ) নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে শক্তিময় প্রকাশ রূপে দেখা দেয় যাহাতে।* ***খুশবু*** *= খুশ বহন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে (অথবা যে নবরূপে উত্তীর্ণ বাহক খুশ করে বা প্রসন্ন করে)।* ***খুশি*** *= খুশ গতিশীল যাহাতে।* ***খুশী*** *= খুশির আধার যে।* ***উশখুশ*** *= উদলোকে গমনাকাঙ্ক্ষী শক্তি থাকে যাহাতে এবং খুশ।* ***খুশমেজাজ*** *= খুশ মেজাজ যাহার।* ***খুশামোদ*** *= খুশ করার জন্য আমোদ করা হয় যে আচরণে।* ***খুশহাল*** *= খুশ হালে বা অবস্থায় থাকে যে।* ৩. প্রীতি, হৃষ্ট, প্রসন্ন। (সুগন্ধ)। সুখ, আনন্দ, হর্ষ, ইচ্ছা। ... (ব.শ.)। ৪. খুশী (খুশি), উশখুশ (উসখুস), খুশমেজাজ (খোসমেজাজ) খুশামোদ (খোসামোদ) প্রভৃতি শব্দগুলি দুরকম বানানে প্রচলিত। ৫. এগুলিকে সাধারণভাবে ফারসি শব্দ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা দেখছি, মূলত এরা '**ক্ষ**' শব্দ-পরিবারের সদস্য। সেকারণেই মধ্যযুগের বাংলাভাষী শব্দগুলিকে আপন করে নিয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, শব্দগুলিকে তাঁদের মতো করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছিলেন।

খাড়া (খাড়ি) : ১. খড় > খাড়া। ২. ***খড়****-এর আশ্রয় যাহাতে।* ৩. স্থানুবৎ স্থিত, দণ্ডায়মান, উর্দ্ধোধোভাবে স্থিত, লম্বভাবে উত্থিত, গতিহীন, স্থির, সন্নদ্ধ, শীঘ্র ...। (ব.শ.)। ৪. upright অর্থে প্রচলিত। ৫. বঙ্গীয় শব্দকোষ 'খাড়া ফসল' শব্দ ব্যবহারের উদাহরণ দিয়েছেন — 'যে ফসল পাকিয়াছে ও ক্ষেতে খাড়া আছে'। খ-এর বা আকাশের

দিকে মুখ করে আত্মক্ষেত্রে আবর্ত্তমান অস্তিত্বকেই আমরা চিনেছি 'খড়' বলে। দ্রষ্টার চোখে সে 'খাড়া'। সেকারণেই শব্দটির বিপুল বিস্তার। মানুষের খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা তো রয়েছেই; খাড়াবন্দি, খাড়াহুণ্ডি, ঘর খাড়া করা, তাঁবু খাড়া করা, ব্যাঙ্ক খাড়া থাকা, মামলা খাড়া করা এরকম উদাহরণ দিয়ে গেছেন বঙ্গীয় শব্দকোষ। এমনকি নদীর খাড়ি যে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, পাহাড়ি নদীতে তার উপলব্ধি ঘটে।

খুঁট (খুঁটা, খুঁটি, খোঁটা) : ২. *(নবরূপে উত্তীর্ণ খ বা খু-এর রহস্যরূপ হল খুঁ।) খুঁ (ক্ষুং) টঙ্কারিত হয় যাহাতে; খুঁটের আশ্রয় যাহাতে; যে খুঁট থেকে খুঁটার সূত্রপাত হয়, সেই খুঁট-ই খুঁটি; খুঁট চলতে থাকে যাহাতে, তাই খোঁটা।* ৩. কোণ, ধুতি-প্রভৃতির কোণ, প্রান্ত, শেষভাগ, কাপড়ের পাড়; খণ্ডিত বা ভাঙা-চুরা পুরাতন কাঁসা; বিদীর্ণ করা, ছিন্ন করা, নখ দিয়া মৃদু আঘাত করা, খোঁটা; ক্ষুদ্র বস্তু একটি একটি বা কণা কণা করিয়া তুলিয়া লওয়া বা কুড়ানো, চঞ্চু দ্বারা তুলিয়া লওয়া, সংগ্রহ করা, যোগাড় করা, প্রত্যেকটি বিশেষভাবে ধরা বা গ্রহণ করা; খুঁটিয়ে দেখা; গো-প্রভৃতির বন্ধনার্থ ভূমিনিখাত কীলক, গোঁজ বা কাষ্ঠখণ্ড, বেড়ার আধার, খাম্বা, খুঁড়িয়া পোঁতা দণ্ডমাত্র, লগী, খাটের পায়া, স্থূণা, ছোট খোঁটা, খুঁটো। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. অবয়বের যে অংশে বাইরের কেউ প্রথম খোঁটে, সেই অংশকেও **খুঁট** বলে। তাই বস্ত্রপ্রান্তও খুঁট পদবাচ্য। যে খুঁটি পোঁতা হয়, তাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে pole ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। কিন্তু **খুঁটি** পুঁতে পুঁতে যারা এগোয়, তারা জানে, এক একটি খুঁটি মানেই হল একটু একটু করে এগোনো, একটু একটু করে খুঁটে নেওয়া। শব্দটির বিস্তার অনেক। এই **খুঁটি খোঁটা** পেরিয়ে 'খোঁটা-দেওয়া' পর্যন্ত অনায়াসে চলাচল করতে পারে। আপনার ভাবনা-চিন্তার বা কৃতকর্মের যে স্থানটি আপনার চিন্তাশৃঙ্খলার সামগ্রিকতায় আবদ্ধ নয়, বস্ত্রখণ্ডের মতো একটুখানি বাইরে বেরিয়ে গেছে, অর্থাৎ কিনা যেখানে আপনার চিন্তার বা কাজকর্মের ত্রুটি থেকে গেছে, সেই স্থানে কেউ **খুঁটে** দিলে, তাকে বলে **খোঁটা** দেওয়া। তবে **খুঁটিনাটি**র খুঁটি আর নাটিকে পাওয়া যাবে **নাটি**তে।

খেঁট (খেট, খ্যাট) : ১. খেঁ (ক্ষেং) / ✓খেট্। (ব.শ.)। ২. *ক্ষিং-এর দিশাগ্রস্ত টঙ্কার হয় যাহাতে।* (দ্র. **খাঁই**)। ৩. ভক্ষণ করা, খাওয়া, ভোজন (খেটন)। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় এখনও প্রচলিত। ৫. 'খাটতে খেঁটতে যৌবন গেল' ইত্যাকার বাক্য এখনও কোথাও কোথাও শোনা যায়।

'ক্ষম' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অক্ষেম, অক্ষম, অক্ষমা, আক্ষমা, **ক্ষন্তব্য, ক্ষম্, ক্ষম, ক্ষমতা**, ক্ষমবান, ক্ষমস্ব, ক্ষমা, ক্ষমান্বিত, ক্ষমাপন্ন, ক্ষমাপর, **ক্ষমাবান**, ক্ষমিত, ক্ষমিতব্য, ক্ষমিতা, ক্ষমী, ক্ষান্ত, ক্ষান্তি, **ক্ষাম, ক্ষাম্য**, ক্ষেম, ক্ষেমঙ্করী, ক্ষেমা, ক্ষেম্য, ক্ষ্মা, খম, খমক, খমা, **খম্বা, খাম (খাম্বা)**, খাম (ক্ষম), খামকা(খা), খামখেয়াল, খামচা, **খামচি**, খামাটি, খামার, খামি, খামী(স্বী)রা, **খাম্বা, খাম্ভা (স্তম্ভ, থাম), খাম্ভরা, খাম্সরা, খাম্বি**, খিমচি, খেম, খেমচ, খেমচা, খে(খ্যা)মটা, **খেমা, খেমিখাঁপি**, খেমী, ঝাঁই, থাম, সক্ষম, স্তম্ভ।

ক্ষম্ = ক্ষ-এর (খাবলানোর) সীমায়ন। **ক্ষম = ক্ষ সীমায়িত** যাহাতে। (ক্ + ষ্ + অ = ক্ষ, **এই বর্ণটি তিনটি বর্ণের যোগফল।** দুটো ক্রিয়া ক্ ও ষ্, এবং তাদের আধার অ। **অর্থাৎ ক্ ও ষ্** ক্রিয়ার অবস্থান যে সত্তায়, সে-ই হল ক্ষ। ক্ = করণ এবং ষ = বিশেষ ধারণা বা জ্ঞান যা পূর্ববর্তী পরিস্থিতি বদলে দেয় বা দিতে পারে। দ্র. **ক্ষ**। এই ক্ষ-এর যে রহস্যরূপ সেই হল ক্ষং বা **ক্ষম**।)

অক্ষম (ক্ষমতা) : ১. ন + ক্ষম। ২. *নেই ক্ষম যাহার।* / যাহার ক্ষমা নাই। (ব.শ.)। ৩. 'ক্ষমভিন্ন', অসমর্থ, অশক্ত, সহন অসমর্থ, অসহিষ্ণু, অকুশল, অযোগ্য, ক্ষমারহিত, ক্ষান্তিহীন। (ব.শ.)। ৪. unable অর্থে প্রচলিত। ৫. ক্ষ-এর রহস্যরূপকে ক্ষং বা ক্ষম্ বলে। (দ্র. **দক্ষ, যক্ষ, রক্ষ**)। এর অর্থ হল, **ক্ষ** সীমায়িত যাহাতে, অর্থাৎ, 'যাও, তোমাকে আর **ক্ষ** করব না, তোমার ক্ষয় করব না, তোমার থেকে খাবলে-খুবলে আর নেব না, ছেড়ে দিলাম।' এই হল **ক্ষম** করা বা **ক্ষমা**। কারণ, 'তোমাদের **ক্ষ** করে করে আমার বেশ কিছু খাত-বস্তুবিষয় জমে গেছে, তাই এরকম অনেক **ক্ষম** আমি এখন করতে পারি।' স্বভাবতই এই ক্ষম হল ক্ষমতাবান। এখন সে মারতে পারে, ছেড়েও দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র ক্ষমতাবানই পারে ক্ষমা করতে। ক্ষম তাই দুটো অর্থ ধারণ করত। 'ক্ষম তারিত যাহাতে' অর্থাৎ 'ক্ষমতা' যার আছে, এবং যে ক্ষমা করতে পারে। স্বভাবতই 'অক্ষম' দুজনকেই বোঝাতো — 'যে (কিছু করবার) ক্ষমতা ধরে না' এবং 'যে ক্ষমা করতে পারে না।' কালে কালে শব্দটি তার দ্বিতীয় অর্থটি হারিয়েছে। ফলে যে ক্ষমা করতে পারে না, তাকে আমরা আর অক্ষম বলি না।

ক্ষমা : ১. ✓ক্ষম্ + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে, স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *ক্ষ-সীমায়নের আধার যে।* ৩. ক্ষান্তি, তিতিক্ষা, অপকারসহন, পরিভবাদিবিষয়ে ক্রোধপ্রতিবন্ধ, সর্ব্বসহনশীলা, দুর্গা, রাত্রি, খদির, বিরাম, বিরতি। (ব.শ.)। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। দক্ষের চব্বিশটি কন্যার মধ্যে ইনি একটি। ইনি প্রজাপতি পুলহের স্ত্রী। এঁর গর্ভে ও পুলহের ঔরসে কর্দম, চার্বিবীর ও সহিষ্ণু নামা তিন পুত্র হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **অক্ষম**।

ক্ষেম (ক্ষেমঙ্কর, ক্ষেমঙ্করী) : ১. ✓ক্ষেম্ + অ (অচ্) অস্তর্থে; ✓ক্ষি + ম (মন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দিশাগ্রস্ত-ক্ষি সীমায়িত যাহাতে।* / যাহা অশুভ ক্ষয় করে। (ব.শ.)। ৩. **ক্ষেমবান, কুশলী**, হিত, শুভকর, সমৃদ্ধ, নিরাপদ, নির্বিঘ্ন, কুশল, **শুভ, মঙ্গল, লব্ধবস্তুর** রক্ষণ, পালন, মোক্ষ, নির্ব্বাণ। ক্ষেমঙ্কর, **ক্ষেমঙ্করী = ক্ষেম করে** যে বা যিনি। দেবীবিশেষ, দুর্গা, কালী, **শঙ্খচিল। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.।** ৫. বিশেষ দিকে ক্ষি (মাছ ধরার জন্য জাল ঘুরিয়ে ছুঁড়ে জলে ফেলা = জাল ক্ষি দেওয়া) করাকে বলা হয় **ক্ষে**। একটু একটু ক্ষি করে

করে একটি সমগ্র পরিকল্পনায় সেই ক্ষে-কে সীমায়িত করে নিলে, সে হয়ে গেল ক্ষেম। কিন্তু তার মানে কী? না, এই ক্ষেম শব্দটি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এবং এখনকার পূজাসংস্কৃতিতে বহুল পরিমাণে প্রচলিত থাকলেও, এর অর্থ বাংলাভাষীরা ভুলে গেছেন। যখন কিনা, এর ইয়োরোপীয় উত্তরাধিকারে শব্দটি প্রায় যথার্থে প্রচলিত রয়েছে। শব্দটি হল scheme। যাঁরা সেই ক্ষেম বা scheme কার্যে পরিণত করেন, তাঁরাই ক্ষেমঙ্কর বা ক্ষেমঙ্করী। এই ক্ষেমঙ্করী দুর্গা ও কালীকে একালে যথাক্রমে 'শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী' ও 'শ্রমিকশ্রেণী' বলে। ৬. ইংরেজি scheme।

'ক্ষর্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অক্ষর, অক্ষারলবণ, অখর্ব্ব, অতিখর, আক্ষার, আক্ষারণ, আক্ষারণা, আক্ষারিত, ক্ষর্, ক্ষর, ক্ষরণ, ক্ষরা, ক্ষার, ক্ষারীনুন, ক্ষীর, ক্ষীরনীর, ক্ষীরশর, ক্ষীরসমুদ্র, ক্ষীরসাগর, ক্ষীরসার, ক্ষীরসিন্ধু, ক্ষীরা, ক্ষীরাব্ধি, ক্ষীরাব্ধিজ, ক্ষীরিকা, ক্ষীরী, ক্ষীরোদ, ক্ষীরোদধি, খদ্দের, খর, খরকর, খরখর, খরগোশ(স), খরচ, খরচা, খরচী, খরজ খরতর, খরতাল, খরধার, খরপদ, খরপোড়, খরবাদ্য, খরমুজ, খরমুজা, খরযান, খরশাণ(ন), খরসান, খরস্বন, খরস্বান, খরশাল, খরশালা, খরশুলা, খরসুলা, খরসা, খরা, খরাচোরা, খরাপে, খরিদ, খরিদদার, খরিদার, খরিদা, খরিদ্দার, খাউজ, খাজা, খাজুয়া, খাজুর, খাপড়(র), খাপরেল, খাবর, খাবরি(রী), খার, খার (রাগ), খারা, খারাখারি, খারাণী, খারানী, খারাপ, খারা-বন্দি, খারি, খারিকা, খারিজ, খারী, খা(খে)রুয়া, খির, খিরকিচ, খিরসা, খি(খে)রাজ (না-খিরাজ, নাখেরাজ, লাখেরাজ), খিরি, খিরিণী, খিরে(রো)লা, খির, খীরসা, খীরা, খীরোলা, খুজলি, খুরমা, খেজুর, খেরো, খৈরত, খর্জ্জ, খর্জ্জন, খর্জ্জু, খর্জ্জুর, খর্প(র্ব) ছন্দ, খর্পর, খর্পাস্বর, খর্ব্ব, খর্ব্ব, খর্ব্বট, খুর্ম্মা, খোর্ম্মা, ছরকট, ছরকুটি (ভ্রূকুটি), ছার, ছারখার, ঝর, ভ্রূকুটি, লাখেরাজ।

ক্ষর্ = ক্ষ-এর (খাবলানোর) রহন। (খর)। **ক্ষর** = ক্ষ রহে যাহাতে।

ক্ষার : ১. ✓ক্ষর + অ (ণ) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক্ষরণ হইতে জাত; অথবা, অন্য সত্তার ক্ষরণ ঘটায় যে।* ৩. ক্ষরণশীল, রসান্তর, লবণরস, গুড়, লবণ, ভস্ম, কাচ, টঙ্কণ, সোহাগা, সাজিমাটি, ধূর্ত্ত, ক্ষারময় দ্রব্য, খরমূত্রসহিত চূর্ণ, বিড়লবণ, যবনালজাত লবণ, ... (ব.শ.)। ৪. 'সোডা' অর্থে প্রচলিত। ৫. ক্রিয়া একটিই — ক্ষরণ; সেটি সত্তার নিজের ক্ষয় থেকে ক্ষরণ হতে পারে, অন্যের থেকে ক্ষরণ হতে পারে। সাজিমাটি, লবণ, ধূর্ত্ত ইত্যাদি ক্ষার অন্য সত্তাকে ক্ষরণ করতে বাধ্য করে; ভস্ম, কাচ, গুড় নিজেই ক্ষরিত হয়ে ক্ষার-এ পরিণত হয়। কাপড়কাচা সোডাকে ক্ষার বলা হয়, সে কাপড়-চোপড়ের ময়লা ক্ষরিয়ে বের করে দেয়। ৬. ইংরেজি sour।

খর : ১. খ + ✓রা (গ্রহণ) + অ (ক)। (ব.শ.)। ২. *খ (ক্ষ) রহে যাহাতে; অথবা, অন্য অবয়বকে ক্ষয় করার (খুবলে নেওয়ার) স্বভাব বা শক্তি থাকে যাহাতে।* / যাহার অতিশয় মুখবিবর। (ব.শ.)। ৩. তীক্ষ্ণ, নিশিত, উগ্র, কর্কশ, নিষ্ঠুর, প্রবল, প্রচণ্ড, কঠিন, ঘোর, প্রদীপ্ত, উন্নত, উচ্চ, দুঃস্পর্শ, দৃঢ়, অধিক, তেজাল, শীঘ্র, স্রোতোযুক্ত, গর্দ্দভ, অশ্বতর, কঙ্কপক্ষী, কুরর, কাক, দৈত্যবিশেষ, রাক্ষসবিশেষ (খর রাকার গর্ভজাত রাবণের বৈমাত্রেয় অনুজ ভ্রাতা। পঞ্চবটীতে রামের সহিত যুদ্ধে ইহার মৃত্যু হয়।), সূর্য্যানুচরবিশেষ, ঘর্ম্ম, তাপ, গরম, পশ্চিমদ্বার গৃহ, বৎসরবিশেষ, কণ্টকিবৃক্ষবিশেষ। খরগৃহ = গাধার আস্তাবল। (ব.শ.)। এক রাক্ষস। এর অন্য ভ্রাতার নাম দূষণ। এরা রাবণের বৈমাত্রেয় ভাই। সুমালী রাক্ষসের কন্যা রাকার সহিত বিশ্রবার বিবাহ হয়। রাকার গর্ভে খরের জন্ম হয়। খরের পুত্রের নাম মকরাক্ষ। ... রাবণের বিধবা ভগিণী শূর্পনখাকে খরের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। রাবণের আদেশে খর চোদ্দো হাজার রাক্ষসের প্রভু এবং শূর্পনখার রক্ষক ও আজ্ঞাবহ হয়ে দণ্ডকারণ্যে বাস করতে থাকে। ... শূর্পনখার দুর্দশায় ক্রুদ্ধ হয়ে খর তার সেনাপতি দূষণের অধীনে এক রাক্ষসবাহিনী পাঠান রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ করতে। যুদ্ধে রামের হাতে সসৈন্য দূষণ এবং ... খরও নিহত হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. শব্দ 'খর'-এর ভিতরে কী ক্রিয়া রয়েছে, এবং তা কাকে বোঝায়, তা উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে বোঝা গেলেও, রামায়ণ কাহিনীতে 'খর' সেই সত্তা কিনা, তা এখনও অবোধ্য। আমরা অনুমান করতে পারি, খর ছিল বৈদিক রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার একটি অংশের প্রশাসক। কিন্তু ঠিক কে বা কারা সেই সত্তা, এখনও তা স্পষ্ট বোঝা যায়নি।

খরা : ১. খর + আ। ২. *খর-এর আশ্রয় যাহাতে; যাহাতে (যে অবস্থায়) দেহীর নিয়মিত ক্ষয় হয়।* ৩. রৌদ্র, অনাবৃষ্টি, শুখা, আতপ, কিরণ; আতপে অধিক শুষ্ক হওয়া, ভাঁটায় অধিক পোড় হওয়া, অধিক ভাজা হওয়া। ৪. draught অর্থে শহরে ও অ্যাকাডেমিতে প্রচলিত, এবং প্রায় সর্ব অর্থে গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. কড়া রোদে সবই শুকায়। শুকনো হওয়া মানে দেহীর ক্ষয় হওয়া। অবয়বের বাইরের কেউ যখন সেই ক্ষয় অংশগুলি নিয়ে নেয়, সে খর। সেই খর যখন তার প্রাপ্তব্য 'ক্ষয়'গুলিকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে রাক্ষসের মতো খায়, সে খরা।

খর্ব্ব : ১. খর্ব্ব + অ - ক। (ব.শ.)। ২. *খর্ব্ = ক্ষয় (শক্তি, অর্থ, কোষ প্রভৃতি দেহাংশ) রহন বহন। খর্ব্ব = যাহা হইতে খর্ব্ প্রবাহিত হয় বা হয়ে গেছে।* / যাহা পুরুষপ্রমাণ হইতে ন্যূনতাপ্রাপ্ত হয়। (ব.শ.)। ৩. গতি, দর্প; হ্রস্ব, বামন, নীচ, বেঁটে, বিকৃত, বিকল, ছোটো, খাট, সংখ্যাবিশেষ, সহস্র মহাপদ্ম, কুবেরের নিধিবিশেষ, বিত্ত, ধন। (ব.শ.)। ৪. weak ও dwarf অর্থে প্রচলিত। ৫. খর্ব কথাটির মানে খানিকটা **অজয়**-এর মতো। যে কাউকে ক্ষরণ করে নিতে পারে, কিংবা যাকে কেউ চাইলে ক্ষরণ করে নিতে পারে, এরা উভয়েই খর্ব্ব পদবাচ্য। মোট কথা, খর্ব্ব হল সেই সত্তা, যার খানিকটা অংশ ক্ষয় হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে 'কুবেরের নিধি খর্ব্ব' কথাটিও এসেছে। এর মানে একালের ভাষায় বললে বলতে হয় — ব্যাঙ্কের যে কাউন্টার থেকে পেমেন্ট হয়, সেটিই 'খর্ব্ব'।

খারাপ (খারাব) : ২. *খর-জনিতের আধারকে পালন বা বহন করে যে।* ৩. বিধ্বস্ত, নষ্ট, হত, অসৎ, দুষ্ট, দুঃশীল, হীন, মন্দ, দীন, কর্কশ, কঠোর, নিন্দিত, গর্হিত, কটু, অশ্লীল, কলুষিত, পাপ, বদ, বিকৃত, অপ্রকৃতিস্থ, গরম, কোপান্বিত, মলিন, বিবর্ণ, শুষ্ক, লাবণ্যহীন, বিশ্রী, নিষ্প্রভ, ম্লান, মেড়মেড়ে, অপরিষ্কৃত, নোংরা, অপকৃষ্ট, নিরেস, খেলো, কুটিল, ক্রুর, উগ্র, রাগী, সন্দিগ্ধ, পীড়িত, ব্যথিত, সন্তপ্ত, অশুভ, কাঁচা, অসার, দুর্দশাপন্ন, উৎসন্ন, নাশপ্রাপ্ত, দূষিত, নিস্তেজ, দোষান্বিত, মর্য্যাদাহীন, পতিত, অভদ্র, অশিষ্টোচিত, অজীর্ণাক্রান্ত, পচা, সড়া, দৃষ্টিশক্তিহীন, অস্বাস্থ্যকর, রোগজনক, অপ্রতিবিধেয়, দুশ্চিকিৎস্য, ...। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে বহুল প্রচলিত। ৫. খারাপ শব্দটির এত বিপুল ব্যবহার এই জন্য যে, এর মূল ক্রিয়াটি (ক্ষ > ক্ষর > খর) বাংলাভাষীদের মনের গভীরে এখনও সক্রিয়; আর সে ক্রিয়াটির কথাই উপরের (২-এর) ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে অনেকেই মনে করেন, এ শব্দ বাঙালির নিজস্ব নয়, আরবি ভাষার 'খ্রাবহ্' শব্দ থেকে বাঙালি এই 'খারাপ'কে পেয়েছে। কথাটি ঠিক বলে মেনে নিলেও আমরা জানি, সেই 'খ্রাবহ্'-এর ভেতরে যে 'খর' ছিল, সে তো বাঙালির অচেনা কেউ নয়; সেই খর তো আদি 'ক্ষর' বংশেরই সন্তান। তার উত্তরাধিকারী আরবে যেমন জন্মেছিল, তেমনি বাংলাতেও জন্মেছিল — খরা, খর্ব্ব, খর্ব্বট তো সেই বংশেরই উত্তরসূরি। মধ্যযুগে ইসলামের হাত ধরে আরবি 'খ্রাবহ্' যদি বাংলায় এসেই থাকে, আর বাংলা যদি তাকে স্ববংশের লোক বলে চিনে ফেলে এবং ঘরের লোক করে নেয়; তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

খিরাজ (খেরাজ-জমি), না-খিরাজ, নাখেরাজ, (লাখেরাজ-জমি) : ২. *রাজা যে (জমির ফসল হইতে) খি (ক্ষি) গ্রহণ করেন (= খিরাজ), এবং যে (জমির ফসল হইতে) খি (ক্ষি) গ্রহণ করেন না (= না-খিরাজ বা লাখেরাজ)।* ৩. খিরাজী জমি — যে জমির খাজনা দিতে হয়; মালের জমি। বিপরীত 'লাখিরাজ' বা 'লাখেরাজ' জমি। (ব.শ.)। ৪. অপ্র. ৫. ক্ষি-র (বা খি-এর) উত্তরাধিকার আরবি ভাষারও ছিল, এই শব্দ তার সাক্ষী দেয়।

'ক্ষল্' (খল্, স্খল্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অখলা, অস্খলিত, আখায়িল, আক্ষালিত, ক্ষল্, ক্ষল, ক্ষলন, ক্ষালন, ক্ষালিত, প্রক্ষালন, **খইল, খল্**, খল, খ'ল, খলই, খলখল, খলখলি, খলতি, খলধান, খলধান্য, খলাধান, খলন, খলপু, খলবল, খলশা (খলিশা), খলা, খ(খা)লাস, **খলি**, খলিত, খলি(লী)ন, খলিনী, খলিপা, খলিফা, খলিশ, **খলু**, খলেধানী, খলেবালী, খলেন, খলেশ, খলেশয়, **খল্ল, খল্বাট, খাল**, খালা (স্খলিতা), খালাস, খালি(লী), **খালু**, খালুই, **খাল**-জোল, খালে-জোলে (জলাভূমি), খিলা(লে)ন, খি(খে)লাপ, **খিলি**, খিলিকা, খিলিখিলি, খিলীকৃত, দখল, দাখিল, দাখিলা, খৈল, **বিশৃঙ্খল**, শৃঙ্খল, শৃঙ্খলা, শৃঙ্খলিত, স্খল্, স্খল (school), **স্খলন**, স্খলিত, স্খলিতগতি, স্খলিতবীর্য্য, স্খলিতসুভগ, স্খলিতা, স্তোম।

ক্ষল্ (খল্, স্খল্) = ক্ষ-এর লালন-লয়ন। ক্ষল = ক্ষ-এর লালন-লয়ন থাকে যাহাতে।

খল (খলুই, খালুই) : ১. ✓খল্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে অন্য সত্তাকে ক্ষালন করে; যে অন্যের শক্তি (সম্পদ বা পকেট) খালি করে দেয়। (সন্দেহ হয় এর মূলে 'স্খলন' শব্দটি রয়েছে কি না)।* / ধর্ম্ম হইতে চলিত। (ব.শ.)। ৩. নীচ, অধম, ক্রুর, দুর্ব্বৃত্ত, নৃশংস, ঘাতুক, দুর্জন, দুরাত্মা, হিংস্র, সূর্য্য, তমালবৃক্ষ, ধুস্তুরবৃক্ষ, পানদ্রব্যবিশেষ, পৃথিবী, ভূমি, স্থান, খলাধান অর্থাৎ ধান্যাদি মাড়িবার স্থান, খামার, খ'লেন, তৈলাদির অসারাংশ, কল্ক, খইল, ঔষধমাড়ার পাথরের খল; স্খলিত করা, ঝরা, স্খলিতপদ হওয়া, পড়া, শিথিলবন্ধ হওয়া, খুলিয়া যাওয়া। (ব.শ.)। ৪. wicked অর্থে প্রচলিত। ৫. যে পকেট খালি করে দেয়, সে খল; এমন কথায় আমাদের আপত্তি হয় না। কিন্তু তাহলে মানতে হবে, খলতি কথাটি এসেছে ক্ষালন থেকে। হ্যাঁ, সেরকম মানুষ ধর্ম্মপথ থেকে স্খলিত, সন্দেহ নেই। সেই সুবাদে সেই স্খলিত মানুষও খলই বটে। তবে সব দিক দেখে যা তথ্য পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় ক্ষালন ক্রিয়াটিই রয়েছে 'খল' শব্দের মূলে। তাছাড়া এখনও কমবেশি প্রচলিত খলাধান, উদূখল, ঔষধ মাড়াই করার খল প্রভৃতি শব্দ বলেই দেয় যে, সেখানে ধান থেকে তুষ বা কুঁড়া 'ক্ষালন' করা হয়। এমনকি পুকুর নদী ক্ষালন করে যে মাছ পাওয়া যায়, তা রাখা হয় যে মুখসরু ঝুড়িতে, তাকেও খালুই বা খলুই বলে। পরে আমরা দেখব, এই ক্ষালন থেকে 'খালি' শব্দটি এসেছে। দ্র. **ছাল**।

খলিন (খলীন, খলিনী) : ১. খল্ + ইন। ২. ***খলিন, খলীন*** *= যাহা খ-তে লীন হয়ে থাকে;* ***খলিনী*** *= ক্ষালনের আধারসমূহের আশ্রয় যাহাতে।* / **খলীন** = খে (মুখগহ্বরে) লীন (যাহা); যাহা অশ্বের মুখমধ্যে থাকে। (ব.শ.)। ৩. কবিকা, লাগাম, কড়িয়ালি; খলসমূহ, খামার-সকল। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এই শব্দ দেখিয়ে দেয় (প্রায় একই ধরনের শব্দ দুটির — খলিন ও খলিনীর), একটি শব্দের খ এসেছে ক্ ও হ্ যোগ করে; অন্য শব্দটির খ এসেছে ক্ষ থেকে বিবর্তিত হয়ে। আরও একটি কথা এখানে জেনে রাখা ভাল। খ মানে যে শূন্যতা বা আকাশ, তা যেমন মহাকাশ হতে পারে, তেমনি ঘোড়ার মুখের ফাঁক জায়গাটিও হতে পারে। খে শব্দের অর্থ 'মুখগহ্বর' করে গেছেন স্বয়ং হরিচরণ। বিষয়টি আমাদের ভাবনায় থাকা চাই। তো, **খলিন** বা **খলিনী** শব্দের অর্থ সেই ক্রিয়াকারীদের বোঝাচ্ছে যেখানে ক্ষালন করা হয়; আবার সে ক্রিয়াকারীদেরও বোঝাচ্ছে, যেখানে শূন্যতায় লীন হওয়ার ব্যাপার রয়েছে।

খাল (খালি) : ২. *খা (ক্ষা) এর লালন-লয়ন হয় যেখানে; যে-অংশ খেয়ে নেওয়া হয়েছে; যেখানে* ***খাল*** *কাটা হয়েছে, যে অংশ খাত হইয়াছে।* / যাহার উপর কিছু বা কেহ নাই। (ব.শ.)। ৩. গর্ত্ত, দীর্ঘ খাত, খাই; রিক্ত, শূন্য, ভুক্তদ্রব্যহীন, লোকশূন্য, অনাবৃত, ভূষণহীন, অর্থশূন্য, ... কার্য্যের অবকাশপ্রাপ্ত হস্ত। (ব.শ.)। ৪.

যথার্থে প্রচলিত। ৫. খাল ও খালি শব্দ অ্যাকাডেমিতে সাধারণত **মাত্র দুটি অর্থে (canal ও vacant** অর্থে) প্রচলিত থাকলেও, **সাধারণ বাংলাভাষী শব্দ দুটিকে** ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করে থাকেন। **কারণ, শব্দ দুটির** মূল ক্রিয়া বা ভাব সম্পর্কে সাধারণ বাংলাভাষীর **মনের গভীরে যথার্থ** ধারণাটি এখনও জীবন্ত রয়েছে। বাংলায় 'খাল **খিঁচে নেওয়া'** অর্থাৎ 'ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া' বলে যে-ধারণাটি **প্রচলিত** আছে, তা এসেছে 'ক্ষাল' থেকেই। যে নিয়মে লক্ষ্মী বাংলায় লখ্‌খী ও হিন্দিতে লছমি হয়, সেই একই নিয়মে 'ক্ষাল' হয়ে গেছে খাল ও ছাল। দুটিই রয়েছে বাংলায়। কোনো ধারাটিই শুকোয়নি। সে যাই হোক, কেউ কেউ মনে করেন, **খালি** শব্দটি আরবি থেকে আগত। আমরা দেখছি, কথাটি সর্বৈব সত্যি নয়। তারা আসলে ভাই-বেরাদর। দ্র. **খারাপ**। ৬. ইংরেজি skull।

'ক্ষি' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অক্ষয়, অক্ষয়তৃণ, অক্ষয়তৃতীয়া, অক্ষয়বট, অক্ষয়লোক, অক্ষয্য, অক্ষয্যোদক, অক্ষেত্র, অক্ষেত্রজ্ঞ, অক্ষেত্রবিৎ, অক্ষেত্রী, অবক্ষয়, অখিল, অখিলাত্মা, অতিক্ষীণ, উপক্ষয়, ক্রীড়্, ক্রীড়, ক্রীড়া (ক্ষেড়), ক্ষয়, ক্ষয়ঙ্কর, ক্ষয়া, ক্ষয়াটিয়া, ক্ষয়াটে, ক্ষয়িত, ক্ষয়ী, ক্ষি, ক্ষিত, ক্ষিতি, ক্ষিতিজ, ক্ষীণ, ক্ষে, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রকর্ম্ম, ক্ষেত্রকর্ম্মবিধান, ক্ষেত্রজ, ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ক্ষেত্রপতি, ক্ষেত্রপর্পট, ক্ষেত্রপাল, ক্ষেত্রফল, ক্ষেত্রবসুধা, ক্ষেত্রবিৎ, ক্ষেত্রবিদ্, ক্ষেত্রব্যবহার, ক্ষেত্রভূমি, ক্ষেত্রসন্ন্যাস, ক্ষেত্রসম্ভব, ক্ষেত্রসীমা, ক্ষেত্রাজীব, ক্ষেত্রাধিপ, ক্ষেত্রামলকী, ক্ষেত্রিক, ক্ষেত্রিয়, ক্ষেম, ক্ষেমঙ্কর, ক্ষেমঙ্করী, ক্ষেমশূর, ক্ষেমা, ক্ষ্বিড়্, ক্ষ্বেড়, ক্ষ্বেলন, খ, খএ, খই(য়)রাত, খএরাত, খয়রা, খয়রাত, খয়রাতী, খিঁচ, খিঁচা, খেঁচ, খেঁচড়া, খেঁচনি, খেঁচা, খেঁচাখেঁচি, খেঁচুনি, খেঁড়, খেঁড়ো, খ্যাঁচ, খিচ, খিচা, খিকখিক, খিখি (কিখি, কিষ্কিন্ধ্যা), খিখির, খিচ, খিচখিচ, খিচন, খিচনি(নী), খিচিখিচি, খিচিমিচি, খিচিরমিচির, খিটকাল, খিটকেল, খিটখিট, খিটিখিটি, খিটমিট, খিটিমিটি, খিটিরখিটির, খিটিরমিটির, খিটমিটে, খিড়কা, খিড়কি, খিতাব, খিতি, খিনি(নী), খিয়ল, খিয়ানৎ, খিয়াল, খিল, খিলভূমি, খিলকা, খিলখিল, খিলিখিলি, খিলনি(নী), খিলা, খিলাত, খীণ(ন), খীল, খেঁউড়, খেঁড়ু, খেচনি, খেচনী, খেচাখেচি (কচাকচির কাছাকাছি), খেট, খেটক, খেড়া, খেড়ি(ড়ী), খেত, খেতরি, খেতি, খেতী, খেদ, খেদা, খেদাড়, খেদিত, খেদো, খেতাব, খেনৎ, খেয়ানৎ, খেয়াল, খেল, খেলওয়াড়, খেলন, খেলনা, খেলা, খেলাঘর, খেলাড়, খেলুড়ে, খেলাত, খেলাদুলা, খেলাদেলা, খেলাদোলা, খেলাধুলো, খেলান, খেলানীয়া, খেলানে, খেলি, খেলু, খেলুয়া, খেলো, খেলো(লে)য়াড়, খৈরত, খেরী, খো, খোঁখর, খোয়নু, খোয়ল, খোয়লি, খোয়া, খোয়ানো, নিখিল, সুক্ষেত্র। **ক্ষি** = ক্ষ গতিশীল হয় যাহাতে।

অক্ষেত্রজ্ঞ (অক্ষেত্রবিৎ) : ১. ক্ষি (= ক্ষয়) + জ্ঞ, বিদ্। ২. *ক্ষেত্র (দেহতত্ত্ব)-কে জানে না যে; ক্ষেত্র বিষয়ে বিদিত নয় যে।* ৩. **দেহতত্ত্ব** অনভিজ্ঞ, দেহাভিমানী (জীব)। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. 'ক্ষেত্রাজ্ঞাধিষ্ঠিত **প্রকৃতির গুণবৈষম্যহেতু মহান** প্রাদুর্ভূত হন।' (বিষ্ণুপুরাণ)। এইভাবে, **পুরাণাদিতে 'ক্ষেত্রজ্ঞ'** শব্দটি বহুস্থানে বারংবার ব্যবহৃত **হয়েছে। এই মহানই প্রথম** সমাজ পরিচালকদের নাম। তখনও **পরিচালক ও পরিচালিতে সমাজটা** তেমন করে দ্বিধাবিভক্ত হয়নি। **সমাজে সবে নেতা জন্মাচ্ছে**। এদের উৎপত্তির কারণ স্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞদিগের **নেতৃস্থানীয়দের** ভিতরে গুণবৈষম্যের কথা বলা হয়েছে, প্রায় সব **পুরাণেই। যাঁরা** যে যে স্থানে শ্রমশক্তি নিয়োগ করা যায়, যথা নারী **(সন্তান উৎপাদনক্ষেত্র), জমি** (শস্য উৎপাদনক্ষেত্র) , কাদা (হাঁড়ি কড়াই উৎপাদনক্ষেত্র), কাঠের তক্তা (আসবাব উৎপাদনক্ষেত্র) ইত্যাদি **ক্ষেত্র** বিষয়ে যথেষ্ট **অভিজ্ঞ** তাঁদের ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হত। আর যাঁরা তা জানেন না, তাঁদের অক্ষেত্রজ্ঞ বলা হত।

অখিল : ১. ন + খিল। ২. *নেই খিল যাহার।* / যাহার খিল (অবশিষ্ট) নাই; যাহা অকৃষ্ট নহে। (ব.শ.)। ৩. অশেষ, নিঃশেষ, নিখিল, বিশ্ব, সমগ্র, সমস্ত, চষা ভূমি, পৃথিবী, ত্রৈলোক্য। (ব.শ.)। ৪. সমগ্র অর্থে কদাচিত প্রচলিত। ৫. এখন 'অখিল' আর **'নিখিল'** একই মানে দাঁড়িয়েছে। কার্যত দুটো আলাদা ব্যাপার। অখিলের কোনো খিলই নেই, ছিল না, থাকে না, চির মুক্ত এক অনন্ত অসীম ব্যাপার। আর নিখিল হল, যার খিল ছিল, থাকে, কিন্তু খুলে দেওয়া হয়। খুলে দিলে নিখিল অখিলের মতোই হয়তো হয়ে যায়, কিন্তু তাহলেও দুটো একই ক্রিয়া বোঝায় না। বুনো গরু আর গোয়ালের দরজার খিল খুলে ছাড়া গরু, এই দুইরকম গরু কি স্বভাবে এক হয়! আবার চির-আবদ্ধ যখন মুক্তি পায়, তার আনন্দ আলাদা। চিরমুক্ত মুক্তির স্বাদ যতটুকু বোঝে হয়তো তার চেয়ে এই নবমুক্তরা আরও বেশি বোঝে। দ্র. **খিল**। ৬. skill।

ক্ষিতি (ক্ষিপ্ত, খ্যাপা, ক্ষিপ্র, ক্ষীণ) : ১. ✓ক্ষি + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক্ষিত গতিশীল থাকে যাহাতে।* ৩. নিবাস, ক্ষয়, পৃথিবী, ভূমিতল, স্থান, প্রলয়কাল, '১' এই সংখ্যা, ক্ষিতির গন্ধগুণ হেতু রোচনানাশক গন্ধদ্রব্য, দেশ, ক্ষেত্র, খেত। (ব.শ.)। ৪. কম প্রচলিত। ৫. **ক্ষি** শব্দের প্রকৃত অর্থ হল 'খিমচে নেওয়া, খুদে বা খুবলে নেওয়া'। খিঁচা, খুঁচা বা খোঁচানো, খুঁড়া বা (মাটি) খোঁড়া, খুঁতখুঁত করা, খুঁটে নেওয়া, খুলা বা (গর্ত) খোলা, খেঁটা (খাওয়া), খোঁদা বা খুঁদিঘর (গুহার মতো বাসস্থল), খাঁদা (ক্ষুদ্র) প্রভৃতি শব্দের বিবর্তন ঘটেছে **'ক্ষি' ও 'ক্ষু'** থেকে। যে খুদে (খিমচে বা কেটে) নেয়, তার ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি তাকে ধনী করে; যার খুবলে নেওয়া হয়, তার ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি তার ক্ষতিসাধন করে। সেই কারণে বঙ্গীয় শব্দকোষ ক্ষি শব্দটির অর্থ দিয়েছেন — 'ঐশ্বর্য্য, ক্ষয়'। ক্ষয়, ক্ষর, ক্ষীণ প্রভৃতি শব্দগুলির মূলে এই একই ক্রিয়া। ক্রিয়াটিকে কোনদিক থেকে দেখা হচ্ছে, তার ওপরই নির্ভর করছে, অর্থটি কেমন হবে। স্বভাবতই যে ক্ষিত কর্মের ফল পাচ্ছে, সে একে তার অর্জন বলে মনে করবে এবং যার ক্ষিত হয়, সে একে 'হিংসিত' বা 'নাশিত' বলে মনে করবে। বঙ্গীয় শব্দকোষ তাই ক্ষিত শব্দের সেরকম 'হিংসিত, নাশিত' দুটো অর্থই দিয়েছেন। সেই ক্ষিত ক্ষিত যোগ করে হয় ক্ষিতি, যেমন গত গত জুড়ে হয় গতি। মানুষের দিক

থেকে সেই ক্ষিতি স্বভাবতই তার 'নিবাস', দখল করা 'ভূমিতল', 'স্থান', 'দেশ' ইত্যাদি। বিপরীতে যার ক্ষিত হয়েছে, সে তাকে বোঝে 'ক্ষয়' বলে, 'প্রলয়কাল' বলে। এমতাবস্থায়, যার ক্ষিত হয়েছে এবং ক্ষিত-অংশ বিপরীত দিকে চলে গিয়ে পালিত হচ্ছে, সে তো **ক্ষিপ্ত** বা **খ্যাপা** হবেই। ধানের বোঝা ভরা সোনার তরী থেকে একটা করে ধানের আঁটি অন্য তরীতে ফেলে দিলে, সে আঁটিই কেবল ক্ষিপ্ত (= ফেলে দেওয়া) হয় না, সোনার তরীর মালিকও ক্ষিপ্ত (= রাগান্বিত) হয়ে ওঠে। কেননা, তার অবয়ব ক্ষিত হতে হতে, খুবলে নেওয়া হতে হতে ক্রমশ ছোট দুর্বল বা **ক্ষীণ** (= যে অবয়ব ক্ষিত হয়েছে) হয়ে পড়ছে। বিপরীতে খুবলানো অংশ টুক টুক করে তুলে নিয়ে পালন করছে যে; কিংবা ক্ষি-র পালন (অর্থাৎ ক্ষিপ্) যার মধ্যে রক্ষিত আছে, সে হয়ে যাচ্ছে **ক্ষিপ্র**। কারণ ক্ষিপ্ত অংশকে সে রক্ষা করছে। তাই সে ক্ষিপ্র। ৬. ইংরেজি skip।

ক্ষেত্র (ক্ষেত্রতত্ত্ব, ক্ষেত্রজ্ঞ) : ১. ✓ক্ষি + ত্র (ষ্ট্রন্) - অধিকরণে। (ব.শ.)। ২. ***ক্ষি**-র দিশাগ্রস্ত তারণ হয় যেখান থেকে। / যে স্থান* থেকে শস্যাদি উৎপন্ন হয়। (ব.শ.)। ৩. কেদার, ভূমি, উৎপত্তিস্থান, ভূসম্পত্তি, কলত্র, নারী, কর্ম্মবীজপ্ররোহস্থান শরীর, ইচ্ছা-দ্বেষ-সুখ-দুঃখাদি, সিদ্ধস্থান, তীর্থস্থান, স্থান, আলয়, গৃহ, নগর, রেখাবেষ্টিত ত্রিভুজাদি চিত্র, মেষাদি রাশি, অন্তঃকরণ, আস্পদ, ভাজন, পাত্র, পুরুষোত্তমতীর্থ, শ্রীক্ষেত্র, অবস্থা, অধিকার। (ব.শ.)। ৪. land ও condition অর্থে প্রচলিত। ৫. শক্তি খরচ করে মাটি কোপালাম, ক্ষি করা হল। কিন্তু সে ক্ষি ত্রাণ পেয়ে আমাদের প্রয়োজনে উত্তীর্ণ হতে পারে, যদি তাতে ধান বুনে দেওয়া হয়। শস্যরূপে সে তখন আমাদের প্রয়োজনে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। একাজ মানুষ কেবল পার্থিব ভূমির উপরে করে না, স্ত্রীক্ষেত্রেও করে; করে আরও নানা ক্ষেত্রে। যেখান থেকে এই ভাবে ক্ষি তারিত হয়, সেই স্থানকে তাই ক্ষেত্র বলে। এরকম ক্ষেত্র জগতে নানাভাবে রয়েছে। যিনি সেই সব ক্ষেত্রের মূল নীতিগুলি জানেন, তিনি ক্ষেত্রতত্ত্ব জানেন। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞও বটে। তবে এই ক্ষেত্রের এলাকা অসীম বলে ক্ষেত্রজ্ঞও অসীম গুণসম্পন্ন হয়ে থাকেন। সেকালে 'ক্ষেত্রাজ্ঞাধিষ্ঠিত প্রকৃতির গুণবৈষম্য হেতু মহান প্রাদুর্ভূত হয়েছিলেন।' দ্র. **অক্ষেত্রজ্ঞ, মহান**।

খয়রা (খয়রাত, খয়রাতি, খয়ের (খদির), খয়ের-খাঁ) : ১. ক্ষয় + র, আ। ২. *(সত্তার) খয় (ক্ষয়) রহে যাহাতে (মুষ্টিভিক্ষা, টাকাপয়সা ইত্যাদি, সত্তা যা নিজ অবয়ব থেকে ছেদন করে বাইরের কাউকে দেয়); খয়রা তারিত হয় যাহাতে; **খয়রাত** গ্রহণ করে যে, অথবা যে স্থান হইতে খয়রাত দেওয়া হয়; খ-দান রহে যাহাতে; খয়ের খায় যে।* ৩. জাতিবিশেষ, পক্ষিবিশেষ, মৎস্যবিশেষ, তালবিশেষ (বঙ্গীয় শব্দকোষের এই অর্থগুলি দেওয়ার সময় সংশয় হয়েছে বারংবার, জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে সেকথা তিনি জানিয়ে গেছেন বারংবার); ভিক্ষা, দান, বিতরণ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. খয়রা মাছ অনেকেই দেখেছেন। খয়রা জাতি, খয়রা পাখির কথাও শুনছি। এগুলি কেন যে খয়রা, কোথায় কেন কীভাবে সে খয় (ক্ষয়) রাখে, প্রকৃতি থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমরা আজ তা বুঝতে পারি না। আমাদের পূর্বপুরুষরা বুঝতেন বলেই তাদের ওরকম নামকরণ করেছিলেন। তবে লোককে ভিক্ষা দেওয়াকে যে 'খয়রাত' দেওয়া বলে, তা আমরা জানি। দান-খয়রাত কথাটি খুবই প্রচলিত। ভিখারিকে 'খয়রাতি' বলার চল আছে গ্রামবাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে। charitable dispensary-কে 'খয়রাতি চিকিৎসালয়' বলার রীতিও প্রচলিত দেখা যায়। অ্যাকাডেমিতে 'খয়রা অধ্যাপক' কথাটি প্রচলিত আছে একেবারেই অন্য অর্থে। ব্রিটিশ আমলে খয়রা ছিল একটি দেশীয় রাজ্যের নাম। সেই রাজ্যের রাজার নামে যে endowment হয়েছিল, তার সুদের টাকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অধ্যাপকের মাইনে দেওয়া হত, তাকে বলা হত 'খয়রা অধ্যাপক'।

খিঁচ (খিঁচা, খেঁচ) : ২. *যাহাতে খিঁ (ক্ষিং) চয়ন থাকে।* দ্র. **খাঁই, ক্ষিতি**। ৩. আক্ষেপ, টানা, কষা, বড়শীতে মাছ ধরিলে, মাছের মুখে বড়শী বিঁধানর নিমিত্ত জোরে ছিপে টেরচা টান দেওয়া, আকর্ষণ করা, জোরে টানা; নিন্দা করা, মুখ খিচান ...। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ক্ষি করা মানেই হল অন্য অবয়ব থেকে খানিকটা অংশ কেটে নেওয়া। তার জন্য ছেদনচেষ্টা চালাতে হয়। তাতে একপ্রকার টান বা আকর্ষণের ব্যাপার স্বভাবতই থাকে। তাকেই বলে ক্ষিং। যার দ্বারা এই ক্ষিং চয়ন করা হয়, তাই **খিঁচ**।

খিচিখিচি (খিচিমিচি, খিচিরমিচির) : ২. *খি (ক্ষি) চয়ন গতিশীল যাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি; খিচি ও মিচি (= সীমিত হয়ে যাওয়া গতিশীল যাহাতে) থাকে যাহাতে; খিচি রয়ে যাহাতে ও বিপরীতে মিচি রহে যাহাতে।* ৩. বিরক্তিকর বিষয়, গোলমাল, বকাবকি, ঝগড়াঝাঁটি, কচকচি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. খিচিখিচিতে কেবল একপক্ষের বারংবার চেষ্টা চলে অন্যের কিছুটা অংশ খিঁচে নেওয়ার, খিচিমিচিতে তা হয় না। এতে এক পক্ষ খিঁচে নিতে থাকে এবং বিপরীত পক্ষ নিজের যে অংশে টান পড়েছে তাকে ত্যাগ করে যেটুকু তারপরও থেকে গেল সেটুকুকে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করে। তাই একদিকে খিচি, অপর দিকে মিচি। এর ফলে দু পক্ষই টানাটানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর, এই যুগপৎ চেষ্টার একদিকের চেষ্টায় থাকে খিচির, অপর দিকের আত্মরক্ষার চেষ্টায় থাকে মিচির।

খিটখিট (খিটমিট, খিটিখিটি, খিটিমিটি, খিটিরখিটির, খিটিরমিটির) : ২. ***খিটখিট** = খি (ক্ষি) করণের টান বিপরীত পক্ষের অবয়বে বারংবার যে টঙ্কার সৃষ্টি করে। **খিটমিট** = এক পক্ষের খিট ও বিপরীত পক্ষের মিট (সীমায়ন টঙ্কারিত যাহাতে) থাকে যাহাতে। **খিটিখিটি** = যাহাতে এক পক্ষের খিট-ই (ক্ষি-করণচেষ্টা) বারংবার চলে। **খিটিমিটি** = যখন একপক্ষের খিটির বিপরীতে অপর পক্ষ আত্মরক্ষার চেষ্টা চালায়। **খিটিরখিটির** = খিটি বারংবার রহে যাহাতে। **খিটিরমিটির** = খিটি ও মিটি রহে যাহাতে।* ৩. তিরস্কার, ভর্ৎসনা, ঝগড়া, বকা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. এই ধরনের শব্দগুলিকে অভিধানকার ও শব্দকোষ-কারগণ বিশেষ গুরুত্ব দেননি। কিন্তু এগুলিতে শব্দের ভিতরে অর্থ

রাখার ও তা নিষ্কাশন করার ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মটি আজও অক্ষত ও প্রচলিত রয়েছে। এগুলি তাই অত্যন্ত সজীব শব্দ। বাংলাভাষার প্রাণ রয়েছে এই শব্দগুলির ভেতর।

খিল (খিলভূমি, খিলিপান, খিলখিল হাসি) : ১, ✓খিল্ (?) + ক। (ব.শ.)। ২. ***খিল** = খি (ক্ষি) এর লয় হয় যেখানে; (বাইরের থেকে) ক্ষি-করে (খিমচে) নেওয়ার চেষ্টাকে রুখে দেয় যে।* **৩.** অপ্রহত, অকৃষ্ট, আচষা, সারসংক্ষিপ্ত, ন্যূন, ব্রহ্মা, নারায়ণ, হলাদি দ্বারা অকৃষ্ট বা অপ্রহত ভূমি, আচষা খেত, পতিত বা অনুর্ব্বর ভূমি। অপ্রহত স্থান, শেষ, অবশিষ্ট, (বেদে) শাখান্তরস্থিত যে বিষয় আকাঙক্ষা-বশতঃ শাখান্তরে পঠিত হয়, তাহা 'খিল', (গৌণার্থে) পুরাণপাঠে পুরাণান্তরস্থিত আকাঙক্ষাবশতঃ পাঠ্য বিষয়, উত্তরখণ্ড, পরিশিষ্ট, (যেমন ঋগ্বেদে শ্রীসুক্তাদি, যজুর্বেদে শিবসঙ্কল্পাদি, মহাভারতে হরিবংশ)। শূন্যস্থান, শূন্য, সংক্ষেপ, সার, সংগ্রহ। অচট বা আচোট ভূমির খিল ভাঙা — পতিতভূমি-কর্ষণ। (ব.শ.)। **৪.** lock অর্থে প্রচলিত। **৫.** খিল শব্দের প্রতীকী অর্থ lock, সবাই জানেন। কিন্তু যখনই 'অখিল', 'নিখিল', 'খিলভূমি', 'খিল-হরিবংশ' প্রভৃতি শব্দগুলি সামনে আসে, তখন 'খিল' শব্দের lock অর্থটি কেমন যেন গুবলেট হয়ে যেতে থাকে। জমির বা গ্রন্থের lock কী বস্তু, কিছুতেই মাথায় ঢোকে না। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থ সেকথা স্পষ্ট করে বলে দেয়। যেখানেই বাইরে থেকে কোনো আক্রমণ আসে, কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা আসে, তাকে রুখে দেওয়ার ব্যবস্থা প্রায় সকল অবয়বের মধ্যেই থাকে। সেই অবয়বের মধ্যে যেখানে বাইরের আক্রমণকে লয় করে দেওয়ার বা থামিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে, সেই স্থানটি 'খিল'। বাইরের কাউকে ভেতরে ঢুকতে হলে সেই খিল খুলে ঢুকতে হবে। অন্যথায় ভিতরে ঢোকা যায় না। অখিল জগৎ বা নিখিল জগৎ মানে যে জগতের কোথাও খিল নেই, অবারিত। কিন্তু ভূমি সেরকম হয় না। চাষি মানুষেরা জানেন, পতিত-অচষা জমির উপরিতলে বৃষ্টির কারণে এক ধরণের আস্তরণ পড়ে, যা জমির ভিতরে ঢুকতে বাধা দেয়। সেটিই জমির খিল। এরকম জমিকে তাই 'খিলভূমি' বলে। সেরকম জমির উপরে লাঙল চালানোর অর্থই হল, সেই আস্তরণ ভেঙে দিয়ে ভিতরের মাটিকে 'উগরে' সূর্যালোকে উন্মুক্ত করে দেওয়া। তাই সেই প্রথম হলকর্ষণকে 'উগাল' বলে। পতিত-অচষা জমিতে 'উগাল-সামাল' করতে পারলে, সে জমি 'লালিত'-পালিত হয়ে তার উর্বরতাকে উপরে তুলে দেয় ও ফসল উৎপাদন করে দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে; তখন তাকে বলে 'লাল-ভূমি'। আর এই লাল জমি অতএব কেবল ফসল উৎপাদনই করে না, রাজপুরুষের চোখে তা খাজনা-যোগ্যও হয়ে যায়। মন্দ রাজপুরুষেরা অবশ্য যেকোনো জমিকেই 'লাল-ভূমি' লিখে খাজনা আদায় করতে চায়। তাদের কথা বলতে গিয়েই কবিকঙ্কণ বলেছেন, তারা 'খিলভূমি লিখে লাল'।

পানের খিলি বা খিলিপানেও খিল থাকে। ভেতরে সুপারি ও মশলাদি দিয়ে পাতাটি কেবল খিলের মতো করেই মোড়া হয় না, কেউ কেউ তাতে একটি সরু সুপারিকুচি বা কাঠি দিয়ে খিল দিয়ে দেন। তাই তাকে খিলিপান বলে। খিলখিল হাসিতেও খিল থাকে। থাকে বলেই তা প্রতি পর্বে আটকে আটকে, যেন খিল খুলে খুলে টপকে টপকে বেরোয়।

কিছু কিছু গ্রন্থেরও খিল হয়। সেই খিল খুলে মূল গ্রন্থটিতে অনুপ্রবেশ করতে হয়। উপরোক্ত গ্রন্থ তিনটির ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা ঘোষিত ভাবেই আছে — ঋগ্বেদের এলাকায় ঢুকতে হলে শ্রীসুক্তাদি পাঠের পথ ধরে ঢুকতে হবে; যজুর্বেদে ঢুকতে হলে শিবসঙ্কল্পাদি পাঠ করে তবেই ঢুকতে পারা যাবে; এবং মহাভারতের প্রকৃত অর্থ যদি বুঝতে হয়, খিল-হরিবংশ পাঠ সমাপ্ত করে এগোলে তবেই মহাভারতের প্রকৃত অর্থের এলাকায় প্রবেশাধিকার পাওয়া যাবে। তবে, বলে রাখা ভালো, আমাদের ভাষা বিবর্ত্তিত হয়ে হয়ে এত দূরে চলে এসেছে যে, এখন হরিবংশের খিল খোলাও রীতিমতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই যোগ্যতা সবাই যাতে অর্জন করতে পারেন, আমরা এই শব্দার্থকোষের মাধ্যমে সেই চেষ্টাই করছি। **৬.** ইংরেজি skill।

খেট (খেটক) : ১. ✓খিট্ (ভয়, ভীষণ) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দিশাগ্রস্ত **ক্ষি**-র টঙ্কার যাহাতে।* দ্র. **ক্ষেত্র**। **৩.** অধম, নিন্দিত, কুৎসিত, সুনিন্দক, অস্ত্রবান, সশস্ত্র, ধনবৃদ্ধিজীবী, সুদখোর, সূর্য্যাদিগ্রহ, ঘোটক, বলরামের গদা, সুনন্দক, গ্রামবিশেষ, কর্ষকগ্রাম, চাষীর গাঁ, মৃগয়া, চর্ম্ম, ঢাল, কফ, তৃণ, খড়, চামড়া। (ব.শ.)। **৪.** গ্রামবাংলায় এখনও কমবেশি প্রচলিত। **৫.** শব্দটি অতীতে, মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে খুবই প্রচলিত ছিল। এক পক্ষ, যে কিনা অন্য পক্ষের অস্তিত্বে, বিষয়ে, বস্তুতে বারংবার ক্ষি করত, খাবলে নিত এবং ফলে অন্য পক্ষের তরফে যে প্রতিবাদ, কষ্ট, আর্তনাদ প্রভৃতি টঙ্কার উঠত; সেই খেট দু পক্ষের দৃষ্টিতে দুরকম ছিল। যে আর্তনাদ করত, তার চোখে খেট ছিল অধম, নিন্দিত, কুৎসিত, অস্ত্রবান, সশস্ত্র, ধনবৃদ্ধিজীবী, সুদখোর, সূর্য্যাদিগ্রহ, ঘোটক (ঘোট পাকায় যে), বলরামের গদা ইত্যাদি; আর যে খাবলে নিত, তার চোখে খেট ছিল গ্রামবিশেষ, কর্ষকগ্রাম, চাষীর গাঁ, মৃগয়া, চর্ম্ম, ঢাল, কফ, তৃণ, খড়, চামড়া ইত্যাদি। তবে সুনিন্দক ও সুনন্দক-কে কেন খেট বলা হত, এখনও বোঝা যায়নি।

খেলা (খেল) : ১. ✓খেল্ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***খেল** = দিশাগ্রস্ত **ক্ষি**-র লয় যাহাতে; **খেলা** = খেল্-এর আশ্রয় যাহাতে।* **৩.** ক্রীড়াশীল, বিলাসযুত, কম্পিত; ক্রীড়া, খেলার স্থান বা আশ্রয়, প্রসার, বিকাশ, কৌশল; খেলা করা, কৌতুক দেখান, কৌশলপূর্ব্বক পদচারণ করা, বিহার বা কামক্রীড়া করা, বেগে সঞ্চালিত হওয়া, অক্ষ-প্রভৃতি দ্বারা ক্রীড়া করা, প্রসার লাভ করা, প্রতিফলিত হওয়া; ক্রীড়া, লীলা, ভবলীলা, শিশুচিত ক্রীড়া, অস্ত্রাদির কৌশলপূর্ব্বক সঞ্চালন, কৌতুককর অঙ্গভঙ্গি, ছুটাছুটি, নৃত্য, রঙ্গ, তামাশা, বিষয়বিশেষে আসক্তির কার্য্য। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** ক্রীড়া থেকে খেলা শব্দটি তৈরি হয়নি। হয়েছে ক্ষ থেকে। এটি সম্ভব হয়েছে দুভাবে। প্রথমত পরস্পরের মানসিক অধিকারে ক্ষি-করণ চেষ্টা মানসিক ভাবেই সমাপ্ত হয় খেলায়। দ্বিতীয়ত বাস্তবিক ক্ষি-করণে (উৎপাদনে, দখল করার

শ্রমে ও খাওয়ায়) যে তেজ ক্ষয় হয় ও জন্মায় তার উদ্বৃত্ত লয় করার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক উপায় হল মিথ্যা শিকার ও মিথ্যা যুদ্ধ এবং নৃত্যাদি, যার থেকে পরবর্তী ক্ষি-করণের নতুন বিদ্যা ও পটুত্ব অর্জিত হয়। এগুলি সবই খেলা পদবাচ্য এজন্যই যে, এগুলিতে কোনো নতুন বস্তু উৎপন্ন হয় না অথচ (উদ্বৃত্ত) তেজের লয় হয়। ক্রীড়া ও নৃত্যাদির উৎস বিষয়ে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের যে সকল নিবন্ধাদি রয়েছে, তাতে এই উদ্বৃত্ত তেজের লয়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এত উচ্চমার্গের ভাবনা আমাদের শব্দশাস্ত্রকারদের ছিল, একথায় যেমন বিশ্বাস করতে সাহস কুলোয় না; অপরদিকে তেমনি নেচার এত গভীর থেকে মানুষের মুখের শব্দকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাতেও বিশ্বাস করতে সাহসে কুলোয় না। কিন্তু ক্ষি-ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে দেখা যাচ্ছে, কার্যত সেরকমই হয়েছে; অন্তত 'খেলা' শব্দের ক্ষেত্রে সেরকমই মনে হয়। দ্র. **ক্রীড়া, লীলা**।

খোয়া, খোয়াড় : ১. ক্ষয় > খয় > খোয়া। (ব.শ.)। ২. ***খোয়া** = সকল খ (ক্ষ) এর আশ্রয় যাহাতে। **খোয়াড়** = খোয়ানো (গবাদি) যেখানে (অস্তিত্বের আবর্তন চালাতে) থাকে (অথবা, খোয়ার গড়ান-উড়ান থাকে যাহাতে)।* ৩. ক্ষয়, বিনাশ, বিলয়, কুহেলিকা, গাঢ় ডেলাক্ষীর, মেওয়া; অপব্যয় করা, নষ্ট করা, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, ক্ষয় করা, হারান, নিঃশেষ করা, ত্যাগ করা, ছাড়া, হতমান বা অবজ্ঞাত করা; বাছুর আটকাইয়া রাখার নিমিত্ত আগড় (ঝাঁপ) দিয়া ঘেরা গোয়ালের অংশবিশেষ, টাটি, গৃহপালিত পশু গো-ছাগ প্রভৃতি আটক করিয়া রাখিবার স্থান, শূকরের ঘর, শূকরশালা, শূকরশালার ন্যায় অপবিত্র জঘন্য স্থান বা দেশ, কাঙালিবিদায়ের নিমিত্ত ঘেরা জায়গা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. গরু বাঁধন ছিঁড়ে চলে গিয়ে লোকের ফসলে মুখ দেয়, তারা সে গরু ধরে খোয়াড়ে দেয়, এবং সেই খোয়া যাওয়া গরু খুঁজতে খুঁজতে লোকে হন্যে হয়। লোকে বলে 'গরু খোঁজা'। তবে শেষ পর্যন্ত তা গিয়ে পাওয়া যায় — 'খোয়ার গড়ান যেখানে গিয়ে *ঠেকে*', সেই 'খোয়াড়'-এ বা খোঁয়াড়ে।

'ক্ষিপ্' (ক্ষপ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : **অধিক্ষিপ্ত, অধিক্ষেপ, অবক্ষিপ্ত, অব্যাক্ষেপ, আক্ষিপ্ত, আক্ষেপ, আক্ষেপক, আক্ষেপণ, আক্ষেপী, উৎক্ষিপ্ত, উৎক্ষেপণ, উপক্ষেপ, উপসংক্ষেপ, ক্ষপ্, ক্ষপ, ক্ষপণ, ক্ষিপ্, ক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্র, ক্ষেপ, ক্ষেপক, ক্ষে(ক্ষ্যা)পলা, ক্ষে(ক্ষ্যা)পা, ক্ষে(খে)পাম, ক্ষে(খে)পী, ক্ষেপ্তা, ক্ষেয়া, ক্ষেয়ানী, ক্ষে(খে)য়ারি(রী), ক্ষ্যাপ, খপ্, খপখপানি, খপ্পর, খাপ (ক্ষোপ > খোপ > খাপ), খাপকান, খাপরেল, খাপা, খাপ্পা, খাপি, খাবি, খি, খিয়া, খুপরি, খুপুরি, খে, খেআ, খেই, খেউ, খেও, খেওয়া, খেঘাট, খেপ, খেপলা, খেপা, খেয়, খেয়া, খেয়ানি(নী), খেয়ার, খেয়ারি(রী), খেয়াঘাট, খোপ, খোপচাল, খোপরি, ছয়েপ, নিঃক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত, প্রক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত, সংক্ষেপ, সংক্ষেপক।**
ক্ষিপ্ (ক্ষপ্) = গতিশীল ক্ষ-এর পালন। **ক্ষিপ** = গতিশীল ক্ষ পালিত হয় যাহাতে।

ক্ষপণ (ক্ষপ, ক্ষপণক, ক্ষেপ, খেপ) : ১. ✓ক্ষপ্ + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক্ষ (ক্রান্তিকর পুনরাবৃত্তিমূলক ছেদন কর্ম) পালন করে যে।* / যে বিষয়রাগ **ক্ষেপণ করে**। (ব.শ.)। ৩. ক্ষেপক, নাশক, নিরাসক, জৈনসন্ন্যাসী, দিগম্বর, বৌদ্ধসন্ন্যাসী, অশৌচ, ক্ষেপণ, প্রেরণ, উপবাস। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একতম। ৪. অপ্র.। ৫. ক্ষপ (খপ) একই রকম ভাবে একটানা চললে তাকে ক্ষেপ বলে। ক্ষেপ বা খেপ কথাটি কুলিমজুরদের মাল বহনের ক্ষেত্রে, নৌকা পারাপারে, সাটল ট্যাক্সির যাতায়াতে খুবই প্রচলিত। এক ক্ষেপ বা একবারের ক্ষেপণে যত মানুষ বা মালপত্র একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে ফেলা হয়, সেটাই এক ক্ষেপ। অবয়ব থেকে ছেদন করে নেওয়া অংশ হল ক্ষ, তা পালিত হয় যাতে, তাই **ক্ষপ**; তাকে ক্ষপ করে বা খপ করে কেটে নেওয়া বা খুবলে নেওয়াও বলে। এই ক্ষপ থেকেই ক্ষিপ্র, ক্ষিপ্ত প্রভৃতি শব্দগুলি নিষ্পন্ন। ক্রিয়াকারীর দিক থেকে দেখলে, ক্ষেপ হল ফেলে বা ঢেলে দিয়ে আসা, বিপরীত দিক থেকে দেখলে মনে হয় ক্রিয়াকারী ক্ষেপে গেছে!

জীবন কোন নীতিতে কাটানো হবে, তার দুটি মার্গ সেকালের চিন্তাবিদদের সামনে উঠে এসেছিল — যোগে না বিয়োগে? বিষয়টি পরবর্তীকালের ইংরেজি দার্শনিকরা চীনদেশের লাও-ৎ-সু ও কনফুসিয়াসকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুঝেছিলেন — life in engagement, নাকি life from withdrawal। ভারতবর্ষে জৈন ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা জগৎ থেকে বিয়োগে নিজেদের মোক্ষ দেখেছিলেন। বিষয়ের প্রতি অনুরাগকে তাঁরা ক্ষেপণ করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনরা যখন বেদবাদীদের অজস্র দোষ দেখাচ্ছিলেন, তখন বেদবাদীরা বৌদ্ধ ও জৈনদের এই দোষের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন। এই দোষের কারণেই তাঁদের ক্ষপণক বলা হত। ৬. ইংরেজি (e)scape, জারমান schopfe।

খপখপ (খপাখপ, খপখপানি) : ১. খপখপ + আনি। (ব.শ.)। ২. *ক্ষ (খাত ক্ষুদ্রাংশ) পালিত যাহাতে* = ***ক্ষপ** বা খপ*। ৩. খপখপ-ভাব, অতিক্ষিপ্রভাব, উদ্বেগ হেতু হৃৎপিণ্ডে রক্তপ্রবাহের ক্ষিপ্রতা, ধড়াশ-ধড়াশ-ভাব, কোনো কার্য্য হেতু মনের ধুক-ধুকানি বা খুঁতখুঁতানি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ক্ষপ, ক্ষিপ্র, ক্ষিপ্ত**।

খাপ, খাপছাড়া : ২. ***খাপ** = খপ (দ্র. **ক্ষপ**) হইতে জাত; **খাপছাড়া** = খাপসমূহের মধ্যবর্তী এক বা একাধিক খাপ ছেড়ে এগিয়ে যায় যে।* / **খাপছাড়া** = যাহা খাপ খায় না। (ব.শ.)। ৩. অসির আধার, কোশ, অস্ত্রকোষমাত্র, আধারমাত্র ... । (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. 'খপ' করে তুলে নেওয়া শব্দটির অর্থ সব বাংলাভাষীই বুঝতে পারেন। খপ করে খাত অংশ তুলে ফেলে দেওয়া যায় (**ক্ষপণক**রা যা করতেন), আবার খপ করে তুলে নিয়ে গুছিয়ে রাখাও যায়। হাতের যে মুঠোতে ওই 'খাবলা' বা 'ক্ষ' পালিত হয়, সেটিই খপ। সেই মুঠো ভরা আনয়ন বা 'খপ' রাখার জন্য কোনো আধার বানালে সেটি হবে তার খাপ। খাপ তাই 'খপ হইতে জাত'। মুঠোর পর মুঠো 'খপ' করে তুলে আনা হচ্ছে, রাখা

হচ্ছে খাপের পর খাপে। এইরকম কর্মসঙ্গতিতে খপ ও খাপ **সুবিন্যস্ত। পরের** পর খাপে খাপে মিলে যায় আনা ও রাখা। এরপর **কেউ যদি প্রথম** খেপটির মাল প্রথম ঘরে রাখল, কিন্তু দ্বিতীয় **ক্ষেপের মাল** দ্বিতীয় ঘর ছেড়ে তৃতীয়টিতে রাখতে যায়; তখন তা **খাপছাড়া** হয়ে বেখাপ্পা হয়ে যাবে। অর্থাৎ, যার ঠিক পর পর খাপের **পর খাপে** যাওয়ার কথা, সে যদি এক খাপ ছেড়ে পরের কোনো **খাপে** চলে যায়, তাকে **খাপছাড়া** বলে।

খাপলা (খাবলা, খেপলা-জাল) : ১. খাপ + লা। ২. ***খাপলা** = খা (ক্ষা) পালিত হয় যাহাতে। **খাবলা** = খা (ক্ষা) বহন রূপ অভীষ্ট দেয় যে।* ৩. মাছধরার জালবিশেষ। (স.বা.)। ৪. যথার্থে গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. এ জাল ছুঁড়ে ফেলতে হয় এবং ফেললে তা ১৫/২০ হাত ব্যাসের বৃত্তাকার এলাকায় পড়ে। জলের ওই অংশে যা মাছ থাকে, তা সব ওই জালে ছাঁকা হয়ে উঠে আসে। অনেকের ধারণা, এই জাল ক্ষেপণ করা হয় বলে এর নাম 'ক্ষেপলা' বা 'খেপলা'। ধুলো জমা করে উঁচু ও লম্বা করে, তাতে কাঠি লুকোনোর খেলা খেলে গ্রামবাংলার শিশুরা। একজন সেই ধুলোর বাঁধে কাঠি লুকোয়। তারপর অন্যজন হাতের চেটো দিয়ে সেই ধুলোর বাঁধের যে অংশে কাঠিটা থাকতে পারে, তা আন্দাজ করে হাতের থাবায় ঢেকে রাখে। একে 'খাপলা-মারা' বা 'খাবলা-মারা' বলে। বাকি অংশের ধুলো সরিয়ে কাঠিটি পাওয়া গেলে 'খাপলা'কারী হেরে যায়। আর, তার খাপলার ভিতরে কাঠিটি পাওয়া গেলে সে জিতে যায়। এই ঘটনা আমাদের বলে, কথাটা আদিতে খাপলা-জালই হয়ে থাকবে, 'খেপলা' নয়। কেননা, এ জালও তো জলের খানিকটা অংশে খাপলা বা খাবলা মারে। সেই অংশের জল ছেঁকে মাছ তুলে নেয় জালটি। ৬. ইংরেজি scuffle, scoop।

'ক্ষু' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আছোলা, **ক্ষু, ক্ষুঁয়া, ক্ষুঁয়াড়, ক্ষুৎ, ক্ষুত, ক্ষুপ, ক্ষুমা, ক্ষুর্, ক্ষুর, ক্ষুরকর্ম্ম, ক্ষুরধান, ক্ষুরধার, ক্ষুরপা, ক্ষুরপ্র, ক্ষুরপ্রান্ত, ক্ষুরভাণ্ড, ক্ষুরি(রী)কা, ক্ষু(খু)রূপ, ক্ষু(খু)রূপা,** ক্ষেউরি, ক্ষোণি(ণী), ক্ষোম, ক্ষৌণি(ণী), ক্ষৌম, ক্ষৌর, ক্ষৌরিক, খুঁজ, খুঁয়া, খুঁয়াড়, খুঁয়েতাঁতি, খুইয়া, খুক, খুকি, খুকী, খুচ, খুচখাচ, খুচখুচ, খুচ(জ)রা, খুচুরখুচুর, খুজ, খুট, খুটখাট, খুটখুট, খুটুরখাটুর, খুটুরখুটুর, খুঞা, খুঞি, খুন, খুনখারাপ(ব), **খুনাখুনি**, খুনী, খুন্তি, খুব, খুবসুরত, খুবানী, খুমার, খুয়া, খুর্, খুর, **খুরখুর**, খুরখুরে, খুরপা, খুরপি, খুরপ্র, খুরভাঁড়, খুরা, খুরালিক, **খুল**, খুশ, খুশখুশ, খুশহাল, খুশা, খুশী, খুশু(সু)রখুশু(সু)র, খুশ্‌ক, **খুস্‌ক**, খুশ(স)কা (খোসা ছাড়ানো), খুসখুস, খুসি(সী), খুসুরখুসুর, **খেউর**, খেউরি(রী), খোঁচ, খোঁচড়া, খোঁচড়ান, খোঁচা, খোঁচান, **খোঁজ**, খোঁজা, খোঁড়, খোঁড়া, খোঁপা, খোঁয়াড়, খোঁয়ারি, খোকন, **খোকা**, খোক্কস, খোগুাড়, খোচা, খোজ, খোট, খোটা, খোট্টা, **খোন্তা**, খোপা, খোম্পা, খোর, -খোর, খোরক, খোরদানী, খোরপোষ, **খোরা**, খোরাক, খোরাকী, খোরাসান (খোর-আসান), খোল, খোলক, **খোলতা**, খোল(লো)ষ, খোল(লো)স, খোল(লা)সা, খোলা, খোল্লো, খোশ, খোশকবলা, **খোশখবর**, খোশগল্প, খোশচেহারা, খোশনাম, খোশপোষাক, **খোশা(সা)**, খোশা(সা)মোদ, খোশাল, খোষা(সা)ল (খুশহাল, কুশল), খোস, খোসপাঁচড়া, খোসা, খৌণী, খৌরি, ছুল, ছুলি, ছোল, **ছোলা**।

ক্ষু = নবরূপে উত্তীর্ণ **ক্ষ**-করণ।

ক্ষুৎ (ক্ষুত, ক্ষুৎকাতর, ক্ষুতি) : ১. ✓ক্ষু + ক্বিপ (০) - ভাববাচ্যে; ✓ক্ষু + ত (ক্ত) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ক্ষুৎ** = ক্ষু (খুদে নেওয়া অংশ) এর তারণ বা ক্ষু-তারণ। **ক্ষুত** = ক্ষুৎ থাকে যাহাতে।* ৩. ক্ষুত, হাঁচি; ক্ষবথু। (ব.শ.)। ৪. ক্ষুৎকাতর কমবেশি প্রচলিত। বাকিগুলি অপ্রচলিত। ৫. ক্ষু-তারণ এমন একটি ক্রিয়া, যা অবয়বের কাটা অংশের তারিত হওয়া বোঝায়। কিন্তু কে সেই তারণ ঘটাচ্ছে? অবয়ব নিজে, নাকি অন্য কেউ? যখন অবয়ব নিজে সেই তারণ ঘটায়, তখন সেই **ক্ষুৎ** শব্দের অর্থ হাঁচি। আর, অন্য কেউ যখন সেই তারণ ঘটাচ্ছে, তখন সেই ক্ষুৎ শব্দের অর্থ **ক্ষুধা**। ক্ষুধা অবয়বের ক্ষু (খুদে নেওয়া অংশ)-কে তারণ করে নিয়ে এসে ধারণ করে বলেই ক্ষুধা। স্বভাবতই **'ক্ষুৎকাতর'** শব্দটির দুটো মানে হয় — হাঁচবার জন্য কাতর, খাওয়ার জন্য কাতর (বা ভোজনেচ্ছা)। হাঁচির জন্য কাতর জিনিসটি কীরূপ ব্যাপার, এখন সেকথায় যাওয়া যাক।

মহাভারতের সূত্রপাত যার থেকে, সেই **ইক্ষ্বাকু** শব্দের মানে জানতে গিয়ে এই শব্দের অর্থ জানার প্রয়োজন পড়ে। বলা হয়েছে বৈবস্বত মনুর ক্ষুৎকালে, তাঁর হাঁচি থেকে এই ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়েছিল বলেই তাঁর নাম ইক্ষ্বাকু। এখান থেকে বোঝা যায়, আমাদের আদি শব্দকারগণ হাঁচিকে দুরকম ভাবে বুঝেছিলেন — মানবদেহের হাঁচি, সমাজদেহের হাঁচি। ইক্ষ্বাকু জন্মেছিলেন বৈবস্বত মনুর (= আইনবোঝা মানুষদের) হাঁচি থেকে। দ্র. **ইক্ষ্বাকু**। তবে কিনা, ক্ষুত তো আসলে অবয়বের কেটে নেওয়া অংশই। সেই **ক্ষুত** ক্ষুত যোগ করে হয় ক্ষুতি। বাংলায় শব্দটি বিবর্তিত হয়ে 'খুঁত' ও 'খুঁতখুঁতি' বা 'খুঁতখুঁতে' শব্দে পরিণত হয়েছে। ৬. ইংরেজি scuttle, shuttle।

খুঁজ, খোঁজ : ২. ***খুঁজ** = খুঁ (**ক্ষুং**) জনন করে যে। **খোঁজ** = খুঁজ থাকে যাহাতে।* ৩. অন্বেষণ করা, তল্লাশ করা, খোঁজা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. খুদে বা খোদাই করে অর্থাৎ খুবলে যে বস্তু আনতে হবে, সেই ক্ষুং কোথায় পাওয়া যাবে? সেই ক্ষুং-ক্রিয়াটিকে কোথায় পাওয়া যাবে সেই তথ্য জনন করে যে, তাকে বলে ক্ষুং-জ বা **খুঁজ**। সেই খুঁজ চলে যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা তাই হল **খোঁজ**।

খুঁড় (খোঁড়া, খোঁড়া) : ২. ***খুঁড়** = খুঁ (**ক্ষুং**) এর ডয়ন (আবর্ত্তন) যাহাতে। **খোঁড়া** = যাহার অবয়বাংশ খুঁড়ে নেওয়া হয়েছে।* ৩. বিদীর্ণ করা, খনন করা, খননপূর্ব্বক বাহির করা, কটুবাক্যে আঘাত করা, নিন্দা করা, কুনজরে বা ঈর্ষার চোখে দেখা, প্রতিঘাতে বিদীর্ণ বা খণ্ডিত করা, কোটা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ক্ষুং-চয়ন, ক্ষুং-জনন, ক্ষুং-টঙ্কারণ, ক্ষুং-ডয়ন, ক্ষুং-তরণ অর্থাৎ যথাক্রমে খুঁচ, খুঁজ, খুঁট, খুঁড়, খুঁত — এই ক্রিয়াগুলি কাছাকাছি ব্যাপার

হলেও মানুষের সঙ্গে মানুষের ও জগতের সম্পর্কের অজস্র রূপের বেশ কিছু রূপ এই ক্রিয়াগুলি ধারণ করে। এর মধ্যে **খঞ্জ** কেমন করে ঢুকল, সেটি বেশ রহস্যজনক। যে ব্যক্তি খোঁড়ায়, তার শরীরের কোনো অংশের অভাব তার খোঁড়ানোর কারণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে তার 'অবয়বাংশ খুঁড়ে নেওয়া হয়েছে', এমন কথা আমরা ভাবতে পারি। তা যদি ঠিক হয়, তাহলে বলতে হয়, খঞ্জ শব্দের অপভ্রংশ রূপ খোঁড়া, এই কথাটি ঠিক নয়। খঞ্জার্থে খোঁড়া শব্দটি 'খুঁড়'-এর পথ বেয়ে প্রসৃত হয়েছে।

খুপরি (খুপুরি, খোপরি) : ২. *খুপরি = খু (ক্ষু)-পালন রহে যাহাতে। খুপুরি = খু-এর পুরি। খোপরি = খোপ (ক্ষোপ) রহে যাহাতে।* ৩. গুহাতুল্য গৃহ, ক্ষুদ্রগৃহ, কুঁড়েঘর, দেয়ালে কাটা গর্ত্ত, কুলঙ্গি, দেয়ালের ফাটাল বা ছোট গর্ত্ত, পায়রার খোপ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ছেদন করে আনা ক্ষুদ্রাংশ হল ক্ষু। তার পালনকারী হল ক্ষুপ বা খুপ। সেই খুপ রহে যাহাতে, তা হল খুপর। খুপর গতিশীল হলে খুপরি বা খুপুরি। ক্ষুপের আশ্রয় হল ক্ষোপ বা খোপ। সেই খোপ-এর গতিশীল রহন যাহাতে, তাকে বলে খোপরি। দ্র. **খাপ**। ৬. ইংরেজি scoop।

খুর (খুরপা, খুরপি, ক্ষুরপ্র, খুরি, খুরী, খোরা) : ২. *খুর = খু (ক্ষু) রহে যাহাতে; খুরপা = খুর পালিত হয় যাহাতে; খুরি = খুরের গতিশীল অস্তিত্ব থাকে যাহাতে।* ৩. গবাদি পশুর পদের অগ্রভাগ, শফ, নখীনামক গন্ধদ্রব্য, খট্টাদির পাদ, পায়া, খুরা, নাপিতের অস্ত্রবিশেষ, ক্ষুর, গাড়ু কলসী প্রভৃতির তলায় সংলগ্ন ধাতুবলয়; ঘাস তোলার বা মাটি খোঁড়ার অস্ত্রবিশেষ, বাণবিশেষ, চর্ম্মকারের চর্ম্মছেদনার্থ অস্ত্রবিশেষ, খুরপ্র; খুরীবাটি, ছোট কটোরা বা বাটি, মৃৎপাত্রবিশেষ, কট্‌রা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. অবয়বের ছেদিত অংশকে ধারণ করে যে, সেটিই **খুর**। ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধের আগে তারা পায়ের খুর কোদালের মতো মাটি কেটে ছুঁড়ে ফেলার কাজে ব্যবহার করে। এর ফলে যেটুকু মাটি পায়ের শফ-অংশে লেগে থাকে, তাই ক্ষু। সেই পরিমাণ ক্ষু যে পাত্রে থাকে, তাই **খুরি**। ৬. ইংরেজি scour।

খুল[১], খুলা[১], খুলি[১], খোল[১], খোলস[১], খোলা[১] : ১. খুল[১] = খ-ল (আকাশ পাওয়া) > খুল। ২. *যাহাতে আকাশরূপ অভীষ্ট লাভ করা যায়; খুলা[১] = খুল[১]-এর আশ্রয় যাহাতে; খুলি[১] = যাহাতে (ঘট) আকাশ থাকে; খোল[১] = যাহা আকাশ রূপে থাকে; খোলস[১] = খোল-এর বিসর্জ্জনীয় অস্তিত্ব (বিসর্গ) থাকে যাহাতে; খোলা[১] = খোল[১]-এর আধার যে।* ৩. উদঘাটিত হওয়া, মুক্ত হওয়া, উদ্ভিন্ন বা বিকশিত হওয়া, পরিস্ফুট হওয়া, ফোটা, শোভা পাওয়া, উন্মীলিত করা, প্রকাশ করা, স্পষ্ট করা, উন্মুক্ত করা, উদ্‌ঘাটিত করান, ... মাথার খুলি, শিরোস্থি, কপাল, শম্বুকাদির কঠিন আবরণ বা ছোট খোলা। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. চোখ খোলা, মুখ খোলা, স্কুল খোলা, দোকান খোলা, মন খোলা, বই খোলা, খোলা মাঠ, শামুকের খোল, বালিশের খোল, সুপুরির খোল, খোলা আকাশ, সাপের খোলস, ... এই ধরনের বহু বাক্যাংশ রয়েছে। **পূর্বতন অভিধানকারগণ** ক্ষ্ (খ্), স্খল্, খুড় এই তিনটি ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট **শব্দগুলিকে স্খল্** ও খুড় দুটি ক্রিয়ায় ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাতে **বুঝবার নানা** অসুবিধে ছিল। আমরা ক্ষ (খুল্), স্খলন (খুল্), খুড় (খুল্) এই তিনভাগে ভাগ করে অর্থগুলিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করলাম।

খুল[২], খুলা[২], খুলি[২], খোল[২], খোলস[২], খোলা[২] : ১. খুল[২] = স্খলন > খুল। ২. *যাহা স্খলিত হয়; খুলা[২] = খুল[২]-এর আশ্রয় যাহাতে; খুলি[২] = যাহা (যে গৃহাদি) হইতে স্খলন হয়; খোল[২] = যাহা হইতে (শব্দাদি) স্খলিত হয়; খোলস[২] = খোল[২]-এর বিসর্জ্জনীয় অস্তিত্ব (বিসর্গ) থাকে যাহাতে; খোলা[২] = খোল[২]-এর আধার যে।* ৩. শিথিলবদ্ধ হওয়া, খসা, মানান, অপ্রতিবন্ধ বা প্রসন্ন হওয়া, বন্ধনমুক্ত করা, গোপন না করা, প্রতিষ্ঠিত করা, আরম্ভ করা, অনাবৃত করা, কোষমুক্ত করা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. খুলে বলা, কাপড় খোলা, খোল বাজান, মুড়ি ভাজার খোলা, ইটখোলা, হাটখোলা, খোলার চাল, নৌকার বাঁধন খোলা, খোঁপা খোলা, চুল খোলা, রং খোলা, খুলে (খসে) পড়া, খোলা বাজার, হাত খুলে মারা, ...।

খুল[৩], খুলা[৩], খুলি[৩], খোল[৩], খোলা[৩] : ১. খুল[৩] = খুড (ক্ষুড) > খুল। ২. *খু (ক্ষু) রূপ অভীষ্ট দেয় যে; খুলা[৩] = খুল[৩]-এর আশ্রয় যাহাতে (খনন করা); খুলি[৩] = খুল[৩]-ই মাত্র; খোল[৩] = যাহার অভ্যন্তরভাগ খুলা[৩] হইয়াছে; খোলা[৩] = খোল[৩]-এর আধার যে।* ৩. খনন করা, খোঁড়া, বিদ্ধ করিয়া উৎপাটন করা, খুঁড়িয়া তোলা, দাঁত দিয়া কাটা বা কামড়ান; খনন করান, খোঁড়ান, খাপ খাওয়া, কার্য্যারম্ভ হওয়া, । ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. খুলে খাওয়া, গর্ত খোলা, পুকুর খোলা, নৌকার খোল, কানের খোল ...।

খোকা, খোক্কস, খোক্‌লা বা খোখলা : ১. খো (ক্ষো) + কা। ২. *খোকা = ক্ষ, ক্ষি, ও ক্ষু এর আধার যে; যে (পিতামাতার সম্পদ ইত্যাদি) ছেদন করে খেয়ে নেয়; খোক্কস = যে সার্বিকভাবে খুদে বা কেটে কেটে নেয়; খোক্‌লা, খোখলা = খোক্কস খেয়ে নেওয়ার পর যা থেকে যায়।* ৩. দুগ্ধপোষ্য বা অল্পবয়স্ক বালক, শিশু, শিশুপুত্র, ছোট ছেলে, কোলের ছেলে, সদ্যোজাত শিশু, ছেলের আদরের নাম, শিশুর মতো অবোধ বা কাণ্ডজ্ঞানহীন; রাক্ষসের অনুশব্দ। (ব.শ.)। রূপকথায় বর্ণিত রাক্ষসের মতো কল্পিত প্রাণী। (স.বা.)। ৪. male child ও demon অর্থে প্রচলিত। ৫. **ক্ষ**-করণের যতগুলি অন্যের অবয়ব কেটে নেওয়ার রূপ আছে, সেগুলিকে 'খো' বলা যায়। দ্র. **খোয়া**। খোকা তার পিতামাতার অস্তিত্বের সবকিছু খো-করণ করে থাকে। তাই খোকা। তবে সেই খো-করণ যদি রাক্ষসের মতো হয়, তবে সেই খো-করণকারী হল খোক্কস।

'ক্ষুদ্' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অক্ষুণ্ণ, ক্ষুণ্ণ, ক্ষুদ্, ক্ষুদ, ক্ষু(খু)দে, ক্ষুদ্র, ক্ষুণ্ণ, **ক্ষুন্ন, ক্ষুন্নতাত, ক্ষেদ, ক্ষোদ,** ক্ষোদিত, ক্ষৌদ্র, ক্ষৌদ্রেয়, খ, খাঁদা, খ্যাঁদা, **খান্দা, খিদ্র, খিনখিন**

(ক্ষুণ্ণক্ষুণ্ণ), খুঁচড়া, খুঁচা, খুঁচি, খোঁচড়া, খোঁচা, খোঁচান, খুচনি, খুড়, খুড়তা, খুড়শাশুড়ি, খুড়শ্বশুর, খুড়া, খুড়াখুড়া, খুড়াত, খুড়ী, খুড়ীমা, খুড়ো, খুদ, খুদ্দ, খুদ্র, খুন্ন, খুন্নতাত, খো, খোজা (ক্ষুণ্ণ জননাঙ্গ), খোদ, খোদ, খোদকার, খোদগার, খোদা, খোদাওন্দ, খোদাতালা, খোদাবন্দ, খোদায়তালা, খোয়া।

ক্ষুদ্‌ = নবরূরে উত্তীর্ণ ক্ষ-এর দান। **ক্ষুদ** = নবরূপে উত্তীর্ণ ক্ষ-এর দান থাকে যাহাতে।

ক্ষুণ্ণ : ১. ✓ক্ষুদ্‌ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যার (অংশবিশেষ) খুদে (খনন করে) নেওয়া হয়েছে।* ৩. চূর্ণিত, চূর্ণীকৃত, প্রহৃত, মর্দ্দিত, অভ্যস্ত, উৎসাদিত, ভগ্ন, বিপ্লুত, খণ্ডিত, আহত, তাড়িত, আয়াসিত, সংহত, গুণিত, পরাভূত, ব্যথিত, পীড়িত, দুঃখিত। (ব.শ.)। ৪. mentally hurt অর্থে প্রচলিত। ৫. আপনার কোনো বিষয়ের অবয়বের বা আপনার মনের খানিকটা অংশ খনন করে নিয়ে নিয়েছে অন্য জন, তাই আপনার বিষয়টি বা মনটি ক্ষুদিত বা **ক্ষুণ্ণ**। সেকারণেই আপনি মনোক্ষুণ্ণ। দ্র. **ক্ষিতি**।

ক্ষুদ্র (খাঁদা) : ১. ✓ক্ষুদ্‌ + র (রক্‌) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক্ষুদে (কেটে) নেওয়া অংশ থাকে যাহাতে।* দ্র. **ক্ষিতি**। ৩. অল্প, লঘু, ছোট, নীচ, অধম, তুচ্ছ, হেয়, অচিরনির্গত, ক্রুর, হিংস্র, কৃপণ, নিকৃষ্ট, ছলান্বেষী, দুর্ব্বল, দরিদ্র, অপকৃষ্ট, দুরাত্মা, অকিঞ্চিৎকর, সামান্য, হ্রস্ব, অনুন্নত, খাঁদা, নিন্দিত, ইতর, অন্ত্যজ, অনুদার, ক্ষুদ, কণা। (ব.শ.)। ৪. little অর্থে প্রচলিত। ৫. খোদাই করে বা খুদে খুদে যে ছোট ছোট অংশ নেওয়া হয়, তাই হল 'ক্ষু'। সেই 'ক্ষু'র দানই ক্ষুদ্‌। সেই ক্ষুদ্‌ রহে যাহাতে, তাই হল ক্ষুদ্র।

যে **নাক** টিয়াপাখির নাকের মতো, একটু বাঁকানো, চ্যাপটা, যা দিয়ে খুদে নেওয়া যায়, তাকে বলে **খাঁদা** নাক। গ্রামবাংলায় কারও ক্ষুদ্রতম সংস্করণটির (ছোট ছেলেটির) খোঁজ নিতে গিয়ে বয়স্কাদের আজও বলতে শোনা যায়, 'তুমার খাঁদাটা (খ্যাঁদাটা) কুথা গেল?' অর্থাৎ শব্দটিতে কেবল খুদে নেওয়ার ব্যাপারটিই ঢোকানো নেই, ক্ষুদ্র-এর ব্যাপারটিও ঢোকানো রয়েছে।

খুঁচ, খুঁচা, খুঁচান, (খুঁচি, খোঁচা, খোঁচাখুঁচি) : ২. *খুঁ* **(ক্ষুৎ)** *চয়ন থাকে যাহাতে (দ্র.* **খাই, ক্ষ, ক্ষুৎ***); খুঁচ-এর আশ্রয় যাহাতে; খুঁচা অন থাকে যাহাতে; যাহার দ্বারা খুঁচান হয়; ...* (দ্র. **কেশাকেশি**)। ৩. কুন্তাদির আঘাত, কোঁচের মতো সূক্ষ্মাগ্র দণ্ডাদি দ্বারা আঘাত করা, হুল দিয়া বিদ্ধ করা, চঞ্চু দিয়া খাত করা, ঠোকরান, বারংবার বলিয়া ব্যতিব্যস্ত বা ত্যক্ত করা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. মুড়ি ভাজার সময় গরম বালি থেকে ভাজা মুড়িগুলিকে নিজের দিকে টেনে নেওয়ার জন্য খুঁচি ব্যবহার করা হয়। এ হল, কয়েকটি নারিকেলকাঠির গুচ্ছ, ঝাঁটার মতো, যা উল্টো করে ব্যবহার করা হয়। একেই খুঁচি বলে। যা দিয়ে লোকে খোঁচা দেয়, **খোঁচা** খায়, তা সবই খুঁচি পদবাচ্য। এই খোঁচা লাগে এইজন্য যে, যার খোঁচা লাগে তার (অস্তিত্বের, সম্পদের) কিছু অংশ, যে খোঁচাচ্ছে সে, 'চয়ন' করে নিতে চেষ্টা করছে; খোঁচাটা লাগছে সেকারণেই। তবুও যে চয়ন করে নিতে চায়, তার খোঁচান বা খুঁচিয়ে আনা বন্ধ হয় না। এখানেই যে **খোঁচা** খায়, তার জ্বালা!

'ক্ষুধ্‌' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ক্ষিদে, ক্ষিদ্যমান, ক্ষুৎ, ক্ষুধ্‌, ক্ষুধা, ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুধার্ত্তি, ক্ষুধিত, ক্ষুন্নিবৃত্তি, খিদা, খিদে, খিদ্যমান, খুধা।

ক্ষুধ্‌ = নবরূপে উত্তীর্ণ ক্ষ-এর ধারণ। **ক্ষুধ** = নবরূপে উত্তীর্ণ ক্ষ ধারিত যাহাতে।

ক্ষুধা (ক্ষুধার্ত) : ১. ✓ক্ষুধ্‌ + ক্বিপ (০) + স্ত্রী আ (টাপ্‌)। (ব.শ.)। ২. *ক্ষু ধারণ করে যে।* ৩. বুভুক্ষা, ভোজনেচ্ছা, বিষয়ভোগ-লালসা, তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা। (ব.শ.)। ৪. hunger অর্থে প্রচলিত। ৫. ক্ষুধা অবয়বের ক্ষু (খুদে নেওয়া অংশ)-কে তারণ করে নিয়ে এসে ধারণ করে বলেই **ক্ষুধা**। তবে ব্যাকরণের নিয়মে কাতর শব্দের সঙ্গে একত্রে ব্যবহার করতে গেলে **ক্ষুধ্‌** কথাটি **ক্ষুৎ** হয়ে যায় বলে আমরা 'ক্ষুৎকাতর' শব্দটি শুনি। কিন্তু সে যে ব্যাকরণবিদের ইচ্ছের জন্য ঘটে না, বাস্তবে ক্রিয়ার চরিত্রই সেরকম বলে ঘটে, সেকথাটি সহসা মনে আসে না আমাদের। ক্ষুধ্‌-এর জন্য কাতরতা তো আসলে **ক্ষুৎ**-এর জন্য কাতরতা। ভিখারি **ক্ষুধার** জন্য ভিক্ষা চায়। কিন্তু যখন হাত পেতে নেয়, তখন তার কাতরতা আপনার হাতের দানটির প্রতি। তাই **ক্ষুধ্‌** তখন পরিণত হয় **ক্ষুৎ**-এ। তাই **ক্ষুধ্‌**-কাতরতা একত্রে **ক্ষুৎ**কাতরতা হয়ে যায়। আমাদের ভাষায় সন্ধি ও সমাসের ক্ষেত্রে এই অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ করা হয়ে থাকে এবং আমাদের জিহ্বা, কণ্ঠ প্রভৃতি উচ্চারণক্ষেত্রগুলি এই প্রাকৃতিক নিয়ম কঠোরভাবে অনুসরণ করে থাকে। যেমন **ক্ষুধার্ত**-এর বেলায় দুটো শব্দ — **ক্ষুধা** + **ঋত**। ঋত মানে গতিপ্রাপ্ত। **ক্ষুধা** নিজে গতিপ্রাপ্ত হতে পারে না, হতে পারে **ক্ষুধায়** কাতর ব্যক্তি বা **ক্ষুধার** আধার। সেই কারণে ঋত শব্দের আগে একটি 'অ'-এর আগম হয়, ঋত পরিণত হয় আর্ত শব্দে। তখন **ক্ষুধা** ও **আর্ত** জুড়ে হয়ে যায় **ক্ষুধার্ত**।

'ক্ষুভ্‌' ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অক্ষুব্ধ, অক্ষোভ, অক্ষোভ্য, ক্ষুব্ধ, ক্ষুভ্‌, ক্ষুভ, ক্ষুভিত, ক্ষোভ, খোভ, বিক্ষুব্ধ, বিক্ষোভ, সংক্ষুব্ধ, সংক্ষোভ।

ক্ষুভ্‌ = নবরূপে উত্তীর্ণ ক্ষ-এর ভবন। **ক্ষুভ** = নবরূপে উত্তীর্ণ ক্ষ ভূত (আবির্ভূত) যাহাতে।

ক্ষোভ, ক্ষুব্ধ : ১. ✓ক্ষুভ্‌ + অ (ঘঞ্‌) - ভাববাচ্যে; ✓ক্ষুভ্‌ + ত (ক্ত) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ক্ষু** ভূত *হয়ে আশ্রয় পায় যাহাতে; ক্ষুভ্‌ ধারিত যাহাতে। / সঞ্চলিত বা কম্পিত করে যে; যাহার দ্বারা ক্ষোভ সাধিত হয়।* (ব.শ.)। ৩. চলন, উদ্‌ঘাত,

ঝাঁকরানি, বিকার, অসংযম, প্রবাহ, বেগ, অভিভব, ব্যথা, চিত্তচাঞ্চল্য, আন্দোলন, সঞ্চালন; মন্থনদণ্ড, মউনী, দ্রবদ্রব্যসম্পৃক্ত সক্তু, রতিবন্ধবিশেষ, ক্ষোভযুক্ত, ব্যথিত, অশান্ত, সঞ্চলিত। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. উ-কারের অর্থে আমরা আগেই দেখিয়েছি, তার গতি অ-ই তে যা চলছিল, উ-এ এসে তা উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে ফেলে। এতক্ষণ ক-বাবু খবাবুকে খাবলে নিচ্ছিল (ক্ষ), খিমচে নিচ্ছিল (ক্ষি), কিন্তু এবার সেই ক্ষ উলটো দিকে মুখ ফিরিয়েছে। এবার সে খ-বাবুর হয়ে ক-বাবুর বিরুদ্ধে ক্ষ করবে, তাকে ছাড়বে না। ক-বাবু এবার দেখবে, তার এতাবৎ বারংবার খাবলে-খিমচে নেওয়ার কারণে খ-বাবুর ভিতরে ক্ষ আবির্ভূত হয়ে ক্ষুভ হয়ে গেছে, ক্ষোভ হয়ে দেখা দিয়েছে, খ-বাবু নিতান্তই ক্ষুব্ধ হয়েছে।

ক্ *(কা, কি, কে, কো)* নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অক, অকস্মাৎ, অকাতর, অকায়, অকু, অকুতভয়, অকুতোভয়, অকুতোমৃত্যু, অকুপার, অকুস্থল, অকূপার, অক্কা, অতিকা, অতিকায়, অবিক্লব, আকস্মিক, আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষিত, আকাঙ্ক্ষী, আকাঙ্ক্ষ্য, কাঙ্ক্ষা, আকিঞ্চন, ক, ক (কতি), ক (করে যে), ক-অক্ষর, কই (কোথায়), কই (মাছ), কউতর, ক-এক, কঁহি, ককান, ককানি, ক-কার, ককিয়, কক্খট, কক্খন, কঙ্কণ, কখন, কখান, কখানা, কখানি, কচ্ছ, কচ্ছপ, কঞ্রোন, কড়মা, কড়া, কড়ি, কড়িপাতি, কড়ী, কঢ়ী, কর্ণুই, কত, কতই, কতক, কতক্ষণ, কতখান, কতখানি, কতগুলা, কতগুলি, কতটা, কতটুক, কতটুকু, কতদূর, কতবার, কতবে, কতয়ে, কতমত, কতহি, কতহু, কতহুঁ, কতহো, কতি, কতিচিৎ, কতিপয়, কতিবিধ, কতিহু, কতিহুঁ, কতেক, কথি, কতো (কৌতুক, কৌতূহল), কদম, কদর, কদল, কদলক, কদলি, কদা, কদাচ, কদাচন, কদাচিৎ, কদাপি, কদিম (ক-আদিম), কদ্দিন, কন, কনুই, কনখল, কপর্দ, কপর্দক (কবর্দক), কপর্দিনী, কপর্দী, কপাট, কপাটি, কপাল, কপালতটী, কপালফলক, কপালভৃৎ, কপালমালী, কপালমোচন, কপালি, কপালিকা, কপালী, কপালে, কপোত (কবুতর), কপোতপালি, কপোতবৃত্তি, কপোতহস্ত, কপোতহস্তক, কপোতারি, কপোতিনী, কফ (কফ্, cough), কফণি, কফল, কফান্তক, কফারি (কফি), কফোণি, কবজী, কবন্ধ, কবন্ধন, কবয়ি(য়ী), কবর্গ, কবর্দক, কবল, কবলা, কবলিত, কবাট, কবাটি, কবাবহ (কাবাব), কবীলা (ক-ইলা), কবীর (ক-ইরা), কবীরপন্থী, কবুল, কবে, কবো, কম্বু, কমন, কমণ্ডল, কমণ্ডলু, কমনে, কয়, কয়েক, করম্ভ, করোট, কল্ল, কলঙ্ক, কশেরু (কসেরু), কস্তুভ (কৌস্তুভ), কস্মিনকালে, কহ্লার, কা, কাআ, কাইল (কাহিল, কাতর), কাউকে, কাওরা (কা-বরা), কাঁকলা, কাহা, কাকেন্দু (কেঁদ), কাঙ্গনী (কাউন), কাছটি, কাত (চিৎ), কাত, কাতন্ত্র, কাতর, কাতরা, কাতরানি, কাতর্য্য, কাতল(া), কাতুকুতু, কাতুর, কাত্যায়ন, কাত্যায়নী, কাদাচিৎক, কাদি, কানন (ক-আনন), কানা, কানাই, কানামাছি, কানু, কাপাল, কাপালি(লী), কাপালিক, কাপালী, কাপুরুষ, কাপোত, কাফির, কাফরি, কাফি, কাবাড়ি, কাবাড়ী (দ্র. কুঁজড়া), কাবাব, কাবাবচিনি, কায় (কাত, চিৎ), কায়চিকিৎসা, কায়জ, কায়দণ্ড, কায়দা, কায়দাকানুন, কায়বার, কায়ব্যূহ, কায়মনোবাক্য, কায়স্থ, কায়স্থিনী, কায়া, কায়িক, কায়েত, কায়েম, কায়েমী, কার?, কারব, কাসর, কাসার, কাহা, কাহাকুহী, কাহার?, কাহি, কাহিল, কাহু, কাহে, কাহো, কাহোঁ, কি, কিএ, কিং, কিংকর্তব্য, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কিংখাপ, কিংবদন্তী, কিংবা (কিম-বা, দ্র.ব, বা), কিংশুক, কিখি, কিঙ্কর, কিঙ্কিণী(নী), কিঙ্কিণিকা, কিচু, কিছু, কিঞ্চ, কিঞ্চন, কিঞ্চিৎ, কিঞ্চিদূন, কিঞ্চিন্মাত্র, কিঞ্চিলি(লু)ক, কিঞ্চুলুক, কিঞ্জল, কিত্তা, কিন্তু, কিন্নর, কিন্তু, কিপ্রকার, কিবল, কিবা, কিবে, কিম্ (ক-বিকাশ পরিমিত), কিমত, কিমধিক, কিমনে, কিমর্থ, কিমাকার, কিমাশ্চর্য্য, কিমিয়াবিদ্যা (chemistry), কিম্পুরুষ, কিম্বা, কিম্ভূত, কিম্ভূত-কিমাকার, কিয় (কি), কিয়ৎ, কিয়ান, কি(কে)য়ারি, কিয়ে, কিশল, (কিসল), কিশ(স)লয়, কিশোর, কিশোরা, কিষ্কিন্ধ, কিষ্কিন্ধ্য, কিসে, কিশ্‌তি (কিম্ শক্তি তারিত যাহাতে, কিশ্‌ত্), কিস্তি, কিস্তিবন্দী, কিস(শ)মৎ, কী, কীকট, কীচক, কীট, কীটঘ্ন, কীটজ, কীটমণি, কীটাণু, কীড়া, কীদৃশ, কীর, কীল, কীলাল, কীলিকা, কীলিত, কীশ (কিশ্‌তি)কুঁচবক, কুছ, কুণি, কুষ্ঠি, কুতঃ, কুত্র, কুথা, কুন, কুলপৈত, কুহ, কূজ, কূজন, কূর্ম্ম, কে, কেউ, কেউকেটা, কেউটিয়া, কেউটে, কেউর, কেও, কেওকেটো, কেওট, কেওয়ার, কেঁউকেঁউ, কেঁক, কেঁকলাস, কেঁকা, কেঁকো, কেঁকোর-কেঁকোর, কেঁচকেঁচ, কেঁচো, কেঁচুয়াকেঁদ, কেঁদু, কেকয়, কেকর, কেকা, কেকী, কেকৈ, কেঙ, কেচিত, কেটা, (কেডা), কেত্তা, কেদার, কেদারা, কেদারিকা, কেন, কেনমণে, কেনমতে, কেনি, কেনিপাত, কেনে, কেন্দা, কেন্দু, কেন্দুক, কেন্দ্র (ক-ইন্দ্র), কেন্দ্রিত, কেন্দ্রী, কেবল, কেবাড়, কেমত, কেমন, কেমনতর, কেমনধারা, কেয়ঙ্কার, কেয়ারি, কেয়ূর, কেরাল, কেরে, কেলেন, কেহ, কেহন, কেহু, কেহো, কেহেন, কেহ্ন, কেহে, কেহ্নাতে, কৈ, কৈকয়, কৈকয়, কৈকসী, কৈকেয়, কৈকেয়ী, কৈছন, কৈটভ, কৈবর্ত্ত, কৈবর্ত্তিনী, কৈবল্য, কৈরব, কৈসন, কৈসনে, কৈসে, কো, কোই, কোউ, কোঁয়র, কোজাগর, কোটে, কোঠে, কোথা, কোথায়, কোন, কোনটি, কোনটে, কোনো, কোবিদ, কোবিদার, কোমটমুছি, কোযষ্ঠি, কৌতর, কৌতরখুপী, কৌন, কৌর্ম্ম, নাক।

অকস্মাৎ : ১. ন + কস্মাৎ। ২. কোনো কারণ হইতে নহে। (ব.শ.)। ৩. অকারণ, অতর্কিত, সহসা, হঠাৎ। (ব.শ.)। ৪. ইংরাজি suddenly অর্থে প্রচলিত। ৫. শুরুতে যে-ঘটনা কোনো কারণ থেকে ঘটেনি, অকারণ ঘটেছিল, সেটি ছিল 'অকস্মাৎ'। এখন সেটি দাঁড়িয়েছে suddenly। এই ইংরেজি শব্দটি আদিতে 'চোরি চোরি চুপকে চুপকে' সামনে এসে ঝট করে পর্দা সরিয়ে আবির্ভূত হওয়াকে বোঝাত। এখন বোঝায় 'হঠাৎ'কে। ৬. ইংরেজি *acc*ident।

অক্কা (অক্‌কা) : ২. *অস্তিত্বকরণ করে যে।* **৩. জননী, মা, (অক্কা** পাওয়া = মরিয়া যাওয়া, বোধ হয়, বৈষ্ণবদিগের **'কেষ্টো-পাওয়া'র** মতো শাক্তদিগের 'অক্কা-পাওয়া' মরণসূচক, **অর্থাৎ** মাকে পাওয়া বা মরা।)। (ব.শ.)। ৪. শব্দটি **'অক্কা-পাওয়া'** রূপে প্রচলিত এবং তার অর্থ মরা। ৫. কোনো একটি **অস্তিত্বকে অস্তিত্ব** রূপে সৃষ্টি বা

জনন করে যে, সেই হল **অক্-কা**। ফারসিতে শব্দটি 'অকা' বা 'আকা' রূপে বহুল প্রচলিত। যেহেতু প্রাচীনকালের মাতৃতান্ত্রিক সমাজে জ্যেষ্ঠা ভগিনীই পালন-পোষণের কর্তব্য করতেন, তাই কোনো কোনো সংস্কৃতিতে জ্যেষ্ঠা ভগিনীই **অক্কা**-পদবাচ্য হয়ে গেছেন। একই ভাবে আমার প্রভু বা মালিক হয়ে গেছেন 'মেরে আকা'। সেই বিচারে **অক্কা** হলেন সর্বোচ্চ। ৬. ফারসি - অকা = প্রভু, মালিক, মারাঠি - আকা = জ্যেষ্ঠা ভগিনী বা বয়োজ্যেষ্ঠা নারী। ল্যাটিন - Acca। (ব.শ.)।

কতি : ১. কিয়ৎ, কিত্না, কত। ২. *কী পরিমাণ ত'রে যাচ্ছে তার হিসাব থাকে যাহাতে।* ৩. ক) কত, বহু, অনেক, কিছু, কত প্রকার। (ব.শ.) খ) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। ইনি মহর্ষির ঔরসে শীলাবতীর গর্ভের জন্মগ্রহণ করেন। এই কতি কর্তৃক **কাত্যায়ন** বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যতদূর বোঝা যায়, এই 'কতি' মহর্ষি আসলে মধ্যবিত্ত কেরানীকুলের আদি রূপ। এর থেকেই কাত্যায়ন ও কাত্যায়নী।

কপর্দ্দক, কপর্দ্দী : দ্র. **গঙ্গাধর**।

কপাট : ১. ক + ✓ পাটি + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কারীর পালন টঙ্কারিত হয় যাহাতে।* / যাহা বায়ু রোধ করে। (ব.শ.)। ৩. কাষ্ঠাদি রচিত দ্বারাবরণ, কাষ্ঠফলক, তক্তা, শিরোহস্থি, কুষ্ঠবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. 'দরজা' অর্থে প্রচলিত। ৫. কারীর পালন টঙ্কারিত হয় যাহাতে, তাকে কপাট বললে, ধরে নিতে হয় কারী থাকে দরজার পেছনে, ঘরের ভেতরে। বাইরে থাকে তার নেমপ্লেট বা তজ্জাতীয় পরিচিতি, যার থেকে দরজার পেছনে কে রয়েছে, তা বোঝা যায়।

কপাল : ১. ক + ✓ পালি + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কারীর পালনকে লালন-লয়ন করে যে; অর্থাৎ, কারী পালিত হয় যাহাতে।* / শিরকে রক্ষা করে যে। (ব.শ.)। ৩. মাথার খুলি, মৃন্ময় শরাবাদি ভিক্ষাপাত্র, ঘটাদির ভগ্নাংশ, কর্পর, খাপরা, অণ্ডের কঠিন আবরণ, অণ্ডকটাহ, যজ্ঞিয় পুরোডাশাদির সংস্কারাধার মৃন্ময় পাত্রবিশেষ, ভাজনা-খোলা, আবরণ, সমূহ, সন্ধিবিশেষ, মহাকুষ্ঠ-বিশেষ, ললাটদেশ, ভাগ্য, অদৃষ্ট, দৈব। (ব.শ.)। ৪. forehead, fortune এই দুই অর্থে এখনও প্রচলিত। ৫. কারী যদি চিন্তাশীল জীবরূপী মানুষ হয়, তবে তার মাথার খুলি হয় তার কপাল; যদি ক্ষুধার্ত দেহীমাত্র হয়, তবে তার মাটির ভিক্ষাপাত্র হয় তার কপাল; কারী যদি অণ্ড হয়, তবে তার কঠিন আবরণ হয় তার কপাল; কারী যদি একটি জনগোষ্ঠী হয়, তবে যজ্ঞীয় পুরোডাশাদির সংস্কারাধার মৃন্ময় পাত্রবিশেষ হয় তাদের কপাল। এভাবেই ভাজনা-খোলাদি কপাল রূপে চিহ্নিত। আর, ললাটদেশ কপাল হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল সেই যুগে, যখন ললাটলিপি (দুই-তিন-চার রেখাঙ্কিত কপাল) দেখে ঠিক হত, যৌথসম্পদের কতখানি অংশ সেই ললাটলিপিধারী পাবেন। সেটাই সেই যৌথতার কালে মানুষের ভাগে পাওয়া চাল-ডাল-নুন-লকড়ির অংশ বা **'ভাগ্য', 'অদৃষ্ট', 'দৈব'** হয়ে যায়।

কপাল শব্দের সঙ্গে শিবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কপালভৃৎ, কপালমালী, কপালি, কপালী প্রভৃতি শব্দ শিবকে বোঝায়। কাপালিক শব্দটিও এর থেকেই জাত। এর কারণ হল, আদিতে এই শিব বা আবিষ্কারক ব্রাহ্মণেরাই যৌথতার হোতা ছিলেন। দ্র. **কাপালিক, শিব**।

কপালমোচন : ১. কপাল + মোচন। ২. যে স্থানে কপালের (পাপ) মোচন হয়। (ব.শ.)। ৩. কাশীর তীর্থবিশেষ। মহাদেব ব্রহ্মার শিরশ্ছেদ করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন এবং নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই স্থানে আসিয়া পাপমুক্ত হইলে, ব্রহ্মকপাল হস্ত হইতে খসিয়া পড়ে। তদবধি ইহার নাম 'কপালমোচন'। ৪. অপ্র.। ৫. এটুকু বোঝা যায় যে, আবিষ্কারক সত্তা শিব জ্ঞানজীবীদের বা বেদবাদীদের মাথা স্বরূপ যে মহর্ষিরা ছিলেন, তাঁদের কাউকে কাউকে হত্যা করেন। এতে তাঁর যে দুর্নাম হয়, কাশীর তীর্থে এসে তাঁর সেই দুর্নাম ঘোচে। কিন্তু বিষয়টি ঠিক কী, তা এখনও দুর্বোধ্য। দ্র. **কপাল, কাপালিক**।

কপোত : ১. ক + পোত। ২. / ক (বায়ু) তাহার পোত তুল্য; ক পোত যাহার। (ব.শ.)। ৩. পারাবত, পায়রা, বনকপোত, ঘুঘু, পক্ষিমাত্র, কপোতবর্ণ, ধূসরবর্ণ, শ্লিষ্টমূলাগ্রপার্শ্বক করদ্বয়। (ব.শ.)। ৪. পায়রা অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. ক 'কারক' বাচক বলে, অনেক সত্তাকে সে উল্লেখ করতে পারে, **পোত**ও তেমনি বহু সত্তাকে উল্লেখ করতে পারে। কপোত যেহেতু পক্ষী, যে দুই ডানায় (ক্রেতাপক্ষ ও বিক্রেতাপক্ষ) ভর করে উড়ে বেড়ায়, তাকে আমরা দোকানদার শ্রেণীর সামাজিক সত্তা ভাবতে পারি। কিন্তু প্রাচীন ভারতে কোন মানুষদের কপোত বোঝাত, তা স্পষ্ট নয়। আমরা বড়জোর ভাবতে পারি, সম্প্রদায়ের উদ্ভবের প্রথম যুগে যে মহর্ষিরা সম্প্রদায় শীর্ষে সম্প্রদায়-পরিচালক রূপে ছিলেন, তাঁরা তাঁর সম্প্রদায়ের থেকে প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করে সাধারণ্যে যাদের প্রয়োজন তাদের সেসব বিলিয়ে দিতেন; এবং পরিবর্তে নিজেরা কিছুই নিতেন না। কেননা সেটিই ছিল সেকালের **কপোতবৃত্তি**। অবশ্য অন্য কিছুও হতে পারে। (কলিম খান-এর 'পক্ষীপুরাণের মকসো' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।) দ্র. **ঘুঘু, উশীনর, শিবি**।

কপোতবৃত্তি : ১. কপোত + বৃত্তি। ২. / কপোতের ন্যায় বৃত্তি যাহার। (ব.শ.)। ৩. কপোত খাদ্যসঞ্চয় করে না, প্রত্যহ যাহা পায় তাহাই খায় — তাদৃশ বৃত্তিযুক্ত। সঞ্চয়রহিত জীবিকা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.।

কবন্ধ : ২. / ক (শিরঃ), তাহার বন্ধ (বন্ধনস্থান)। (ব.শ.)। ৩. ক) ক্রিয়াযুক্ত শিরোহীন কলেবর, মস্তকহীন দেহ, উদর, ধূমকেতু। খ) রাক্ষসবিশেষ, দনু রাক্ষস। ইহার পূর্বনাম দনু। শ্রীদানব ইহার পিতা। স্থূলশিরা ঋষির শাপে দনু রাক্ষসরূপ প্রাপ্ত হয় এবং ব্রহ্মার বরে দীর্ঘায়ু লাভ করে। ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে, বজ্রাঘাতে ইহার কবন্ধরূপ হয় এবং বনবাসকালে রামের হস্তে নিহত ও শাপমুক্ত হয়। গ) রাহু। বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন রাহুদানবের 'শিরোভাগ' 'রাহু' এবং 'শিরোহীন

দেহ' অর্থাৎ 'কবন্ধ' 'কেতু' নামে অভিহিত। সুতরাং 'কেতু'ই 'কবন্ধ' শব্দবাচ্য, 'রাহু' নহে। (ব.শ.)। ঘ) এক মহাকায় দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষস। ... সে মুণ্ডগ্রীবাহীন কবন্ধ, তার উদরে মুখ এবং তাতে একটিমাত্র জ্বলন্ত চোখ অগ্নিশিখার মতো বর্তমান। তার যোজন প্রমাণ দীর্ঘ হস্তের সাহায্যে সে সর্বদা বিবিধ পশুপক্ষী হত্যা করে ভক্ষণ করে এবং রাক্ষসরূপে বনবাসী ঋষিদের ভীতি প্রদর্শন করে। একদিন স্থূলশিরা ঋষির সংগৃহীত ফলমূল অপহরণ করায় উক্ত ঋষির অভিশাপে সে কদাকার রূপে পরিণত হয়। এই রাক্ষস নাকি পূর্বে রূপবান ছিল। শাপমোচনের জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হয়ে, ঋষি বলেন যে, রামচন্দ্র যেদিন তার বাহুচ্ছেদন করে বিজন বনে তাকে দগ্ধ করবেন, সেইদিন সে পূর্বরূপে রূপান্তরিত হবে। সে তখন কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে দীর্ঘায়ু হবার বরলাভে গর্বিত হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে রত হয়। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে তার দুই উরু ও মস্তক শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন তার অনুনয়ে, জীবন ধারণের উপায় স্বরূপ ইন্দ্র তার যোজন প্রমাণ দুই বাহু এবং উদরে তীক্ষ্ণ দন্ত ও মুখ স্থাপন করেন এবং বলেন যে, রাম-লক্ষ্মণ তার বাহুচ্ছেদন করলে তবে তার স্বর্গলাভ হবে। সীতার অন্বেষণকালে মতঙ্গাশ্রমের কাছে এক নিবিড় বনের মধ্যে কবন্ধ কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণ আক্রান্ত হলে, তাঁরা খড়্গাঘাতে তার একমাত্র বল দুই বাহু ছেদন করেন। ভূপতিত কবন্ধ তাঁদের পরিচয় পেয়ে তার শরীর অগ্নিতে সৎকার করতে অনুরোধ করে। রাম-লক্ষ্মণ কর্তৃক অগ্নি-সৎকারের পর কবন্ধ তার পূর্ব রূপ ফিরে পায় ও রাম-লক্ষ্মণকে ঋষ্যমূক পর্বতে গিয়ে সীতার উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে পরামর্শ দেয় ও সেইস্থানে যাওয়ার উত্তম পথনির্দেশ দিয়ে হংস-সংযোজিত রথে দিব্যবসনভূষণে শোভিত হয়ে পুণ্যলোকে প্রস্থান করে। ((পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যার কারক (ক) বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তার মাথাটিই তো আর কাজ করছে না; সেই ক্রিয়াযুক্ত শিরোহীন কলেবরকে কবন্ধ বলা হয়েছে। এ হল এমন আধার যার আধেয়টিই নেই। একটা শরীর সক্রিয় রয়েছে, আহার সংগ্রহ করছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে কিন্তু কেন খাচ্ছে, কী তার অস্তিত্বের লক্ষ্য, সে জানে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জীবন আছে কিন্তু তার কোনো লক্ষ্য নেই, সেরকম জীবনের কোনো মানে হয় না। অত্যন্ত দেহবাদী মানুষ বা সমাজগোষ্ঠীও অনেকটা এরকম। তাদের মন নাই, রয়েছে কেবল শরীর। একালের মানবসভ্যতা কি কবন্ধ হয়ে গেছে?

ইতিহাস বলছে এরকম একটি সত্তা ছিল, এবং আদিতে সে ছিল শ্রীদানব-এর পুত্র অর্থাৎ সে দান-বাহক এবং এমন হতেই পারে যে সে দান করে কিন্তু প্রতিদান নেয় না। অর্থাৎ তার মধ্যে আগের সৎ-অসুরের উত্তরাধিকার ছিল। কিন্তু তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়া হয়। আর সে কাজটি করেন বিষ্ণু ও ইন্দ্র। এই দুটি সত্তাই সে সময় দেবতার পক্ষে। এঁরা দানবটির ক-কে বন্ধ করে দেন। অর্থাৎ তার মাথাটি আর কাজ করত না। তাই তার নাম হয়ে যায় কবন্ধ। ফলে সে বেঁচে থাকে কেবল পেটের জন্য, শরীরের জন্য। একালে মার্কিন সমাজের সঙ্গে কিংবা দেহবাদী মার্কসবাদীদের দ্বারা পরিচালিত সমাজের সঙ্গে কি এর তুলনা করা যায়? ... দ্র. কেতু।

কবল : ১. ক + ✓বল্ (সঞ্চরণ) + অ (অচ্) - ক। (ব.শ.)। ২. *ক-এর বল যেখানে*। / যাহা জলের সহিত উদরে যায়। (ব.শ.)। ৩. গ্রাস, গ্রাসমিত খাদ্য, মৎস্যবিশেষ, বেলেমাছ, রোগনাশার্থ ঔষধমিশ্র কবলপরিমিত উষ্ণোদকাদি, কুলি (gargle)। (ব.শ.)। ৪. 'শাসনের অন্তর্ভুক্ত' অর্থে প্রচলিত। ৫. কারও ধমক-ধামক-শাসনের এলাকার ভিতরে পড়ে গেলে তাকে 'কবলিত' হওয়া বলে। আরবি ভাষার কব্‌লা, কবুলতি, কবুলিয়ত, কবজা, কবজি প্রভৃতি শব্দগুলি এরই সগোত্র সন্দেহ নেই।

করম্ভ (করম্ভক) : ১. ক (দধিজল) + ✓রম্ভ্ (শব্দ) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. কৃত অম্ভ *যাহাতে*। / যাহা দধিজলের সহিত শব্দ করে। (ব.শ.)। ৩. উদমন্থ, ভৃষ্টযবমাত্র, কর্দ্দম, তপ্ত, মিশ্রগন্ধ, প্রিয়ঙ্গুলতা, শতাবরী। **করম্ভক** = বিবিধ ভাষায় রচিত গদ্যপদ্যময় কাব্য। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কৃ অম্ব হল করম্ব — যে কৃত অম বহন করে। করম্ব শব্দের অর্থ বলা হয় 'মিশ্রিত'। এর ভিতরে শ্রম (শ্র্-অম) ঢুকে যায়। হয়তো সেকারণেই করম্ব। তাই যদি হয়, তবে কৃত অম ভক্ষণ বা ভরণ-পোষণ করে যে, তাকে করম্ভ বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে যবভাজা, চালভাজা, সবই করম্ভ হতে পারে। ভাববার কথা। দ্র. **কর্দ্দম**।

কহোড় : ১. ক + হোড়। ২. ?? ৩. একজন মুনি। ইনি উদ্দালক ঋষির শিষ্য ও অষ্টাবক্র ঋষির পিতা। উদ্দালক নিজ কন্যা সুজাতার সঙ্গে কহোড়ের বিবাহ দেন। সুজাতা গর্ভবতী হলে গর্ভস্থ বালক গর্ভে থেকেই সমুহ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করেন। গর্ভবাসকালেই পুত্র একদিন পিতা কহোড়ের বেদপাঠে ত্রুটি দেখিয়ে দেন। সেইজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে কহোড় নিজ পুত্রের দেহ আট জায়গায় বক্র হবে বলে অভিসম্পাত দেন। তার ফলে অষ্টাবক্র মুনির জন্ম হয়। গর্ভের দশম মাসে সুজাতা তাঁর স্বামীকে বলেন যে, তাঁরা নিঃস্ব, সন্তানপালন করবার উপযুক্ত অর্থ তাঁদের নেই। সেজন্য কহোড় রাজা জনকের কাছে ধনপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হন। সেখানে জনক রাজার সভাপণ্ডিত বন্দী তর্কে কহোড়কে পরাস্ত করে জলে নিমজ্জিত করে রাখেন। বারো বৎসর বয়সে মাতার নিকট থেকে অষ্টাবক্র তাঁর পিতার বিষয়ে সবকিছু জানতে পারেন। তখন তিনি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে বন্দীকে তর্কে পরাস্ত করে পূর্বের সমস্ত পরাজিতদের সঙ্গে পিতাকেও মুক্ত করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু এবং জামাতা কহোড়, তার পুত্র অষ্টাবক্র মুনি। এই অষ্টাবক্র মুনির শাপে বর হয়েছিল ভগীরথের। শ্বেতকেতুর সময়টি মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এসময় থেকে নারীর বহুগামিতা নিষিদ্ধ হয় ও পিতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। আবার অষ্টাবক্রের পরেই ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করেন। কহোড় তাহলে কে? বোঝা যায়, অষ্টাবক্র জনকের সমর্থক, মানুষ কর্তৃক মানুষের নিয়োগের সমর্থক, আবার ভগীরথেরও সমর্থক অর্থাৎ পণ্যবিপণন ধারা প্রবাহের সমর্থক। কহোড় বোধহয় প্রথমে এর বিরুদ্ধে ছিলেন, পরে অষ্টাবক্রের জন্যই তার প্রাণ বাঁচে। হয়তো সেকারণেই পরে তিনি অষ্টাবক্রের নীতির সমর্থক হয়ে যান।

কাতন্ত্র : ১. কা + তন্ত্র। ২. *কায়ের তন্ত্র।* ৩. কার্ত্তিকেয় প্রসাদে সর্ব্ববর্ম্মকৃত কলাপব্যাকরণ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কার্ত্তিকেয়কে চেনা যায় আদি সৈন্যবাহিনী হিসেবে। সেই কার্ত্তিকেয়র 'প্রসাদে' এমন কলাপব্যাকরণ রচিত হয়েছে, যার সব দিক থেকে বর্ম্ম রয়েছে! এ একপ্রকারের রাষ্ট্রব্যবস্থার মডেল, সমাজশরীরের বা কায়ার মডেল, যা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে সৈন্যবাহিনীর উদ্ভবের কালে গড়ে উঠেছিল। অর্থাৎ কাতন্ত্র মানে সমাজশরীরের বা কায়ের তন্ত্র। আর তন্ত্র মানে যে সিস্টেম, সেকথা পাঠক **তন্ত্র** শব্দে পেয়ে যাবেন। অতএব কাতন্ত্র শব্দটির মানে হল, The System of Social Structure। এ তো একালের একটি বইয়ের নাম হয়ে গেল। দ্র. **কলাপ**।

কাতর, কাতল (কাতলা, কাৎলা) : ২. **কাতর** = *কারী (কারীর শরীর) তারিত হয়ে রয় যাহাতে।* **কাতল** = *কারী তারিত হয়ে লালিত-লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে।* / **কাতর** = কে (জলে) আতর। ৩. **কাতর** = ব্যসনাকুল হৃদয়, ভীত, চকিত, ভয়বিহ্বল, বিবশ, চঞ্চল, দীন, অসুস্থ, পীড়িত, (ভীরু বলিয়া -) কাতলা মাছ, উড়ুপ, ভেলা, ভীতভাব, ভীরুতা। কাতল = মৎস্যবিশেষ, কাতলা মাছ (Cyprinus Catla), শিকার বা বধ্য পথিক প্রভৃতি ... (কাতলামারার দেশ = যে দেশে ঠেঙাড়েরা ঠেঙার আঘাতে মারিয়া ফেলে = রাঢ় দেশ)। (ব.শ.)। ৪. কাতর 'বিবশ' অর্থে এবং কাতল catla অর্থে প্রচলিত। ৫. এই শব্দটির মূল ক্রিয়া হল 'শরীর গলে তর তর হয়ে যাওয়া'। এই ভাবটিকে হিন্দিতে বলে 'হো গয়ে পানি পানি'। এই ক্রিয়াটি যদি বরফখণ্ডে ঘটে গরমে, তবে মানুষে ঘটে ভয়ে, আশঙ্কায় ও লজ্জায়। কাতলা মাছের এবং ধনবান মানুষের এই ভাবটি অত্যন্ত বেশি। যে পুকুরে বেশ কিছু কাতলা মাছ রয়েছে, সে পুকুরটি যদি গোলাকার এবং অবাধ হয়, তাহলে দু-একটি কাতলা ধরার জন্য কষ্ট করে জাল ফেলতে হবে না; জনা চার-পাঁচেক মানুষ পুকুরটির চারদিকে জোরে জোরে পা ফেলে অকস্মাৎ দৌড়তে শুরু করলেই দেখা যাবে, সেই আকস্মিক পদশব্দে দু-চারটি কাতলা মাছ ঘাবড়ে-ঘুবড়ে জল থেকে লাফ দিয়ে ডাঙায় এসে পড়েছে। একই কথা বলা যায় ধনবানদের ক্ষেত্রে। কোনো বিশেষ নগরে যদি বহু ধনী ব্যক্তি থাকেন, নগরের বাইরে বড় ডাকাতের সমাবেশ ঘটলে এবং তার ছুটকো-ছাটকা দু-চারটে খবর রটলেই, সেই ধনীরা আত্মরক্ষার্থেই এমন ছুটোছুটি শুরু করতে পারে যে, নিজেরাই ভুল করে এসে সেই ডাকাতের খপ্পরে পড়ে যেতে পারে। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য 'গ' গ্রন্থটির প্রথম নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কাত্যায়ন : ১. কাত্য + অয়ন (অপত্যার্থে)। (ব.শ.)। ২. *করণ তারিত হয় যাহাতে = কত। কত যাহাতে থাকে = কাত্য। কাত্যের অয়ন = কাত্যায়ন।* ৩. কতনামক ঋষির যুবগোত্রের অপত্য ঋষিবিশেষ। ইনি ধর্ম্মসংহিতা, পাণিনির বার্ত্তিকসূত্র, যজুর্ব্বেদপ্রাতিশাখ্য ও শ্রৌতসূত্র প্রণয়ন করেন। ইনিই প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচি। ইঁহার পিতা সোমদত্ত, জননী বসুদত্তা। (ব.শ.)। মহর্ষি কাত্যের পুত্র। মহিষাসুর এঁর শিষ্য। রৌদ্রাশ্বের তপোভঙ্গ করায় মহর্ষি শাপ দেন যে, সে নারী-হস্তে নিহত হবে। এর ফলে, ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রত্যেকের দেহ হতে পৃথক পৃথক তেজ বহির্গত হয়ে যে দেবী সৃষ্ট হন, তাঁরই নাম হয় কাত্যায়নী, কারণ মুনি কাত্যায়ন কর্ত্তৃক ইনি পূজিতা হন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যজুর্ব্বেদ, সোম, বসু — এই শব্দগুলি বলে দেয়, এই ঋষিরা আদিম বৈদিক ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন না। বিপরীতে মহিষাসুরকে আমরা জানব বৈদিক যুগের অপরাহ্নের গণনেতা হিসাবে। সেই সুবাদে কাত্যায়ন এমন ঋষিগোষ্ঠী যিনি বৈদিক যুগের শেষ লগ্নের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ধনতন্ত্রের সমর্থক।

কাত্যায়নী : ১. কাত্যায়ন + ই। ২. *কাত্যায়নের আধারশক্তি।* ৩. কাত্যায়ন-পত্নী, যাজ্ঞবল্ক্যের পত্নী (যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী — মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী; মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন, কাত্যায়নীই পত্নীকার্য্য করিতেন।), পরিব্রাজিকাবিশেষ, অর্দ্ধবৃদ্ধা কাষায়বস্ত্রা বিধবা, ভিক্ষুকা, অধবা। (ব.শ.)। ভগবতীর মূর্তিবিশেষ। মহর্ষি কাত্যায়ন এই দেবীর প্রথম অর্চনা করেন বলে এঁর নাম কাত্যায়নী। দেবতারা নিজ নিজ দেহের তেজ দ্বারা এই দেবীকে সৃষ্টি করেন। মহিষাসুর নিজের সৈন্য ও সেনাপতিসহ এই দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে সদলবলে নিহত হন। দশভুজা সিংহবাহিনী দেবী আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে সৃষ্ট হন ও শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে কাত্যায়নের পূজা নিয়ে দশমীতে মহিষাসুর বধ করেন। বাংলায় ও বাংলার বাহিরে যে দুর্গাপূজা হয়, তা এই দেবীরই পূজা। (পৌ.অ.)। ৪. দেবী দুর্গার নাম হিসেবে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. **যাজ্ঞবল্ক্য**কে আমরা চিনেছি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আদি দার্শনিক ও সমর্থক হিসেবে। (দ্র. **কপিঞ্জল**)। তাঁর আধারশক্তি দুজন — মৈত্রেয়ী, কাত্যায়নী। **মিত্র**কে জানলেই (দ্র. **অগ্নি, ইন্দ্র**) মৈত্রেয়ীকে খানিকটা জানা যায়, আর কাত্যায়নীর কথা তো বলাই আছে। যখন এঁকে যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী রূপে দেখা হয়, তখন ইনি সেই সম্প্রদায়, যাঁরা যাজ্ঞবল্ক্যের নীতিতে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চালাতেন ও তদনুযায়ী জীবনযাত্রা অতিবাহিত করতেন। যখন ইনি দেবী কাত্যায়নী, তখন ইনি বিদ্রোহী জনসাধারণ, যাঁরা তৎকালীন গণনেতাদের (মহিষাসুরকে) ধ্বংস করেছিলেন।

কাপালি (কাপালী, কাপালিক) : ২. *কপাল হইতে জাত।* / যাহারা নরকপালে ভক্ষণাদি করে। (ব.শ.)। ৩. শৈব যোগিবিশেষ (ইহারা নরকপালের ভূষণ ধারণ করে। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করে এবং নরকপালে ভোজন ও পান করে। ব্রহ্মার শিরশ্ছেদজন্য পাপমোচনের নিমিত্ত কালভৈরব শিবাদেশে কাপালিকব্রত গ্রহণ করেন। **কালভৈরব** প্রথম কাপালিক।), বামাচারী-বিশেষ, সঙ্কীর্ণজাতিবিশেষ, কাপালি, কাপালিক সম্প্রদায়, ক্ষুদ্রকপাল। (ব.শ.)। ৪. সম্প্রদায়ের নাম ও পদবী রূপে শব্দটি কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **কপাল**।

কাপুরুষ : ১. কা + পুরুষ। ২. *যে পুরুষ নতুন কাজে ভয় পায়, অর্থাৎ একই কাজের (মৌলবাদীসুলভ) পুনরাবৃত্তি করে।* ৩. কুৎসিত পুরুষ, নিন্দিত জন, পৌরুষহীন জন, ভীরু। (ব.শ.)। ৪. coward অর্থে প্রচলিত। ৫. সম্ভবত প্রাচীন কালে কোনো একসময় আবিষ্কারক

পুরুষদের (বা শিবকে) পুরুষ ও একই কর্মের পুনরাবৃত্তিকারীদের (বা দক্ষকে) কাপুরুষ বলা হয়েছিল। সেই থেকে নতুন উদ্যমে নতুন কিছু করার সাহস যাদের নেই, তাদের কাপুরুষ বলার প্রচলন হয় এবং শব্দটি ক্রমে পৌরুষহীন বা ভীতু অর্থে ব্যাপ্তি লাভ করে।

কায় : ১. ক (প্রজাপতি) + অ (অণ্) 'তাহা ইহার দেবতা' অর্থে, ই (ইৎ)। ✓চি + অ (ঘঞ্) অধিকরণে।... কর্ম্মবাচ্যে।... ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহা দ্বারা কারীর (আয় বা অস্তিত্ব) চলে; অর্থাৎ কারীর আধার যে।* / যাহা প্রজাপতি দেবতার; যাহাতে অস্থ্যাদি চিত হয়, যাহা উপচিত হয়, যাহা দ্বারা উপচিত হয়। (ব.শ.)। ৩. প্রাজাপত্য বিবাহ। দেহ, নিবাস, বাসস্থান, বীণাদণ্ড, বৃক্ষকাণ্ড। মূলধন, নির্ণীত বা নিশ্চিত, লক্ষ্য। স্বভাব, রাশীকরণ, সমূহ। কনিষ্ঠ-অঙ্গুলির মূল, প্রজাপতিতীর্থ। (ব.শ.)। ৪. কদাচিৎ body অর্থে প্রচলিত। ৫. 'কায়' মানে body কেন? শব্দটির ভিতরে কী ক্রিয়া রয়েছে, যে, সত্তাটি সে-ক্রিয়াটি করে বলে তাকে 'কায়' বলা হয়? প্রদত্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থগুলিতে শব্দটির উদ্ভব দেখানো হয়েছে একটি ক্রিয়ার (করণ বা ক) ভিত্তিতে একভাবে, এবং অপর একটি ক্রিয়ার (চয়ন বা চ) ভিত্তিতে তিনভাবে। আমরা দেখেছি 'ক' কখনো কখনো 'চ'-এ পরিণত হয়, যথা — বাক-পতি থেকে বাচস্পতি। ক্রিয়ার বিচারে, গাছ থেকে ফল পাড়লেই কর্মফল হাতে আসে না, সেই ফল চয়নও করতে হয়। করণের চয়নে পরিণতি হতেই পারে। যাই হোক, প্রদত্ত অর্থগুলি বলে যে, সত্তাটি চয়ন করে বা সত্তাটিতে 'চিত' হয়। তার ফলে সত্তাটির অবয়ব বাড়ে। দ্র. **দেহ**। কিন্তু তার চেয়ে সহজ ও যুক্তিসঙ্গত হয় যদি এর অর্থটি করা হয় — 'ক-এর আধার যাহাতে'। এই আধারে থেকে কারী চয়ন করে, ফলে তার আয়তন বাড়ে। এই কায় মানবদেহ হতে পারে, রাষ্ট্রদেহ হতে পারে, এমনকি এককোষী জীব প্রটিস্টা বা স্পাইরোগাইরার শরীরও হতে পারে। এরকম অর্থ করলে কেবল উপরোক্ত অর্থগুলিই যথাযথ প্রমাণিত হয় না, **কায়স্থ**, কায়জ, কায়দণ্ড, কায়দা, কানুন, কায়বার, কায়ব্যূহ প্রভৃতি শব্দের অর্থগুলিও যথাযথ ও যুক্তিসঙ্গত হয়ে যায়।

কায়স্থ (কায়স্থা) : ১. কায় ✓স্থা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কায়ে (সমাজশরীরে) থাকে যে।* / যাহা কায়ে স্থিত। (ব.শ.)। ৩. পরমাত্মা, হিন্দু জাতিবিশেষ (ইহারা লেখনবৃত্তি, রাজার বিচারালয়ে লেখকের বা মুহুরীর কার্য্য ইহাদের বৃত্তি। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে ও কবিকঙ্কণ কাব্যে ইঁহাদের অত্যাচারের বর্ণনা আছে।), কায়স্থ বংশীয় ব্যক্তি, রাজার বিচারালয়ের লিপিকর রাজপুরুষ, হিসাবরক্ষক, সরকার। দ্র. **করণ**। বৈশ্য-শূদ্রা-জাত জাতি (অমরকোষ); বৈশ্য-শূদ্রী-জাত জাতি (যাজ্ঞবল্ক্য); ক্ষত্রিয়-বৈশ্যা-জাত জাতি (নীলকণ্ঠ); ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণায় জাত জাতি (কুল্লুক); ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন জাতি (পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ)। কায়স্থা = কায়স্থ স্ত্রীজাতি, কায়ের স্থিতিসাধন দ্রব্য, হরীতকী, আমলকী, দ্বিবিধ এলা, তুলসী, কাকোলী। (ব.শ.)। ৪. 'হিন্দু জাতিবিশেষ' অর্থেই প্রচলিত। ৫. 'কায়ে স্থিত' বলতে যদি 'যারা রাষ্ট্রদেহে থাকে' এই অর্থ করা হয়, তাহলে আর সন্দেহ মাত্র থাকে না যে, এঁরা সেকালের সরকারি কর্মচারী ছিলেন। কেবল তাই নয়, যাঁরা নগরের বা 'পুর'-এর কর্মচারী ছিলেন, তাঁরা তাই 'পুরকায়স্থ' — একথাটিও স্পষ্ট হয়ে যায়। পরে সেটিই তাঁদের পদবী হয়ে গেছে, যেমন আরও বহু পদবীর ক্ষেত্রে ঘটেছে। ইংরেজিতে এই কায়স্থদের statesman বলা হয়ে থাকে। সুতরাং কায় যে কেবল মানবদেহ হয় না, রাষ্ট্রদেহ বা state-ও হয়, তাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। এরকম হলেই 'কায়েম', 'কায়েমি' প্রভৃতি শব্দের অর্থও স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায় এবং আমাদের জানিয়ে দেয়, বিদেশাগত শব্দগুলির সবগুলিই শব্দবংশের নিরিখে পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখা অত্যন্ত জরুরী। যদি প্রশ্ন করা হয়, মানবশরীরকে-সমাজশরীরকে-জগৎশরীরকে একরকমভাবে টিকিয়ে রাখে কোন সত্তা? মানুষের কায়ের স্থিতিসাধন দ্রব্য কী কী, সমাজশরীরের স্থিতিসাধন দ্রব্য কী কী, জগৎশরীরের স্থিতিসাধন দ্রব্য কী কী? এককথায় এর উত্তর আমরা বলতে পারি না। কারণ আমাদের বর্তমান জ্ঞান, বিশেষত অ্যাকাডেমিক জ্ঞান অত্যন্ত খণ্ডতা দোষযুক্ত। কিন্তু ভারতবর্ষের গৌরব ছিল অখণ্ড জ্ঞানের। সেকালের জ্ঞানী মানুষেরা সেই 'কায়ের স্থিতিসাধন দ্রব্য'টির নাম দিয়েছিলেন, 'কায়স্থা'। মানবশরীরের কায়স্থা কী কী, ব.শ. তা জানিয়ে গেছেন। সেগুলি হল — হরীতকী, আমলকী, দ্বিবিধ এলা, তুলসী, কাকোলী। সমাজশরীরের কায়স্থা কী কী? এককথায় তা হল সরকারী কর্মচারীগণ বা আমলাতন্ত্র। জগৎশরীরের কায়স্থা কী কী? ব.শ. বলেছেন — পরমাত্মা। এর অর্থ হল অমৃতরূপিণীর মূল রূপ। অর্থাৎ মানবশরীরের ক্ষেত্রে আমলকী, সমাজশরীরের ক্ষেত্রে আমলা, এবং জগৎশরীরের ক্ষেত্রে অমৃতরূপিণী একই সত্তার তিনটি রূপ। দ্র. **কর্ম্মকর, পদবী**।

কিং (কিঙ্, কিঞ্, কিণ্, কিন্, কিম্) : ২. *গতিশীল কারীর রহস্যরূপ (করণ-বিযুক্তরূপ, চয়ন-বিযুক্তরূপ, টঙ্কার-বিযুক্তরূপ, তরণ-বিযুক্তরূপ, সীমায়িত রূপ) থাকে যাহাতে।* ৩. কি, কী, ইত্যাকার নানাপ্রকারের প্রশ্নে অব্যয় শব্দ, জিজ্ঞাসার প্রতীকী আওয়াজ। ৪. পৃথকভাবে অপ্রচলিত। শব্দাংশরূপে প্রচলিত, যথা — কিংবা, কিংবদন্তী ইত্যাদি। ৫. শব্দটির পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ, অব্যয় — চারটি রূপ। তার থেকে অজস্র শব্দ জন্মেছে — কস্য, কা, কি, কী, কিংকর্তব্য, কিংবা, কিংশুক, কিঙ্কর, কিঙ্কিণী, কিঞ্চিৎ (কিছু), কিঞ্চন, কিঞ্জল, কিন্তু, কিন্নর, কিম্পুরুষ, কিম্ভূত, কিশোর, কিষ্কিন্ধ, কিষ্কিন্ধ্য প্রভৃতি। এর ভিতরে কি, কী, কিংবা, কিন্তু অত্যন্ত বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গতিশীল কারী সীমায়িত যাহাতে, তাকে কিম বলে। যতদূর বোঝা যায়, প্রাচীন যুগে যখন রাষ্ট্র-রাজা ইত্যাদির কোনো ধারণাই মানুষের গড়ে ওঠেনি, তখন জনগোষ্ঠীর যে পরিচালক সত্তা মানুষের দঙ্গলকে চালাত, তাদের বলা হত কিং বা কিম। পরে পরে তা পৃথিবীর নানান ভাষায় প্রায় 'পরিচালক' অর্থেই আজও প্রচলিত আছে। কোথাও তা অধঃপতিত হয়েছে 'রাজা' অর্থে, কোথাও বা আদি অর্থটিই এখনও প্রচলিত রয়েছে। ইংরেজির king, কিংবা কোরীয় ভাষার কিম এরই উত্তরাধিকার। ফারসির 'কিম্‌খাব্' সম্ভবত

এরই উত্তরাধিকার। বাংলাভাষায় এই কিম রয়েছে কিঙ্কর, কিন্নর, কিম্পুরুষ, কিংবদন্তী প্রভৃতি শব্দে। আপাতত ভাবনার সুবিধার জন্য কিম শব্দটিকে ইংরেজির king শব্দের সঙ্গে সমোচ্চারিত সমার্থক শব্দ হিসাবে বুঝে নিলে বহু শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ সহজে বোধগম্য হয়ে যায়। ৬. ইংরেজি king।

কিংবদন্তী : ১. কিম্ + ✓বদ্ + অন্তি (ঝিচ্)। (ব.শ.)। ২. *কিম্ (রাজা) যাহা বলেন।* ৩. জনশ্রুতি, গুজব, সত্য বা অসত্য অপবাদ। (ব.শ.)। ৪. জনশ্রুতি অর্থে প্রচলিত। ৫. রাজার ইচ্ছা রাষ্ট্র হলে সেটি king বলেছেন বা কিংবদন্তী রূপে চাউর হয়ে যায়। ভারত সমাজে পণ্যজীবীদের রমরমা বাড়ার পর গুজবের আবির্ভাব ঘটে এবং তাকে কিংবদন্তীর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হয়। দ্র. **গুজব, ঘটোৎকচ**।

কিঙ্কর : ১. কিম্ + ✓কৃ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে (ব্যক্তি) কিমের জন্য কাজ করে।* ৩. ভৃত্য, দাস, পরিচারক। কিঙ্করা = দাসী, পরিচারিকা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **কিম**। আদিতে যাঁরা কিঙ্কর ছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত সম্মানীয় ছিলেন। পরে পরে তা রাজার সেবক থেকে বাবুর বাড়ির চাকরে পরিণত হয়ে যায়।

কিঞ্চিৎ (কিচু, কিছু, কিঞ্চ, কিঞ্চন, কিঞ্চিদুন, কিঞ্চিন্মাত্র) : ১. কিম্ + চিৎ অসাকল্যার্থে। (ব.শ.)। ২. *কিম যেটুকু চয়ন করে নেন।* ৩. অসাকল্য, অল্প, ঈষৎ, কিছু, একটু, কোনো-এক, কিয়ৎ পরিমাণ, অল্পমাত্র; ঈষদুন, একটুকম, কিছুকম; অল্পই, কিছুমাত্র। (ব.শ.)। ৪. 'কিছু' শব্দটি অধিক ব্যবহৃত, বাকিগুলিও যথেষ্ট প্রচলিত। ৫. আদিম যুগে, যখন মানবসমাজের পরিচালকদের সর্বপ্রথম 'কিম' বলা শুরু হয়, তাঁরা যৌথসমাজের যে সম্পদ তাঁদের ভোগের জন্য গ্রহণ করতেন, তা ছিল খুবই কম। সেই কারণে 'কিম কর্তৃক চয়িত' বা কিঞ্চিত-র অর্থ হয়ে যায় 'কিছু'। ধারণাটি অতঃপর 'কিম কর্তৃক গৃহীত'কে ছেড়ে, কিম-কে ছেড়ে কেবলমাত্র 'পরিমাণে কম' অর্থেই প্রচলিত হয়ে যায়।

কিন্নর, কিম্পুরুষ : ১. কিম্ + নর; কিম্ + পুরুষ। ২. *কিম্-এর (king-এর) নর; কিম্-এর পুরুষ।* ৩. কুৎসিত অর্থাৎ অশ্বমুখ নরশরীর বা নরমুখ অশ্বশরীর, দেবযোনিবিশেষ, কিন্নর ও কিম্পুরুষ — হেমকূট ইহাদের বাসস্থান এবং ইহারা কুবেরের অনুচর। নববর্ষান্তর্গত বর্ষবিশেষ। ইহা হরিবর্ষ ও ভারতবর্ষের মধ্যস্থিত কিম্পুরুষবর্ষ নামে অভিহিত। অর্হদ উপাসক বিশেষ। **কিন্নররাজ** = কুবের। (ব.শ.)। ক) কুৎসিত নর। কিন্নর দুই প্রকারের : এক প্রকারের শরীর মানুষের মতো এবং মুখ অশ্বের তুল্য (কিন্নর), আর এক প্রকারের শরীর অশ্বের ন্যায় আর মুখ মানুষের তুল্য (কিম্পুরুষ) । এদের অন্য নাম কিম্পুরুষ। দেবযোনি বিশেষ। এদের রাজা কুবের। এরা স্বর্গের গায়ক। ব্রহ্মার ছায়া হতে এরা উৎপন্ন হয়েছে। কৈলাসে এরা বিচরণ করে। খ) কশ্যপ ও অরিষ্ট হতে এদের জন্ম। চিত্ররথ এদের শাসনকর্তা। হিমালয়ে এদের বাসস্থান ছিল। গ) এরা অশ্বমুখের সন্তান এবং অনেক 'গণে' বিভক্ত। এদের অবয়ব অর্ধ-মনুষ্যাকৃতি এবং অর্ধ-অশ্বাকৃতি। সঙ্গীত ও নৃত্যের জন্য এরা প্রসিদ্ধ। কিমের পুরুষ। ঘ) কুৎসিত পুরুষ। দেবযোনি বিশেষ। এক শ্রেণীর স্বর্গের অধিবাসী। কিন্নরদের মতো ব্রহ্মার ছায়া থেকে এদের জন্ম। কৈলাস পর্বতে এরা বিচরণ করত। কুবের এদের অধিপতি। ঙ) জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত হেমকূট পর্বত দ্বারা বেষ্টিত একটি দেশ। (পৌ.অ.)। ৪. অবমানব, নপুংসক বা হিজড়ে অর্থে প্রচলিত এবং কদাচিৎ মানুষের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. প্রকৃতপক্ষে যারা মুখ ছুটিয়ে কাজ চালায় (রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পুরস্কার' কবিতায় লিখেছেন, 'মুখ ছুটাইলে রথাশ্বে তার না দেখি আবশ্যক।') তাদের **কিন্নর** এবং যারা দেহ ছুটিয়ে কাজ চালায় তাদের **কিম্পুরুষ** বলা হত। সেই সুবাদে **গণেশ** বা সরকারের কেরানিরা আদিতে **কিন্নর** এবং **কার্তিক** বা সরকারের পুলিশ-মিলিটারিরা আদিতে **কিম্পুরুষ** পদবাচ্য ছিলেন। এরা মহামায়ার (সমগ্র মানবজাতির) অংশরূপিণী মা-দুর্গার (বা শিক্ষিত জনসাধারণের) সন্তান। মোটকথা রাজকর্মচারীদের পুরো ইতিহাসটিই এদের কাহিনীর মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। সেই ইতিহাসে রাজকর্ম-চারীদের যেমন যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তাদের ইতিহাসেও সেভাবে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। পাশ্চাত্যে কিন্নরের প্রতিকৃতি দেখা যায় না, কিন্তু কিম্পুরুষের প্রতিকৃতি দেখা যায়। দ্র. **কার্ত্তিকেয়**। ৬. কিম্পুরুষ মূর্তিকে গ্রীক পুরাণে বলা হয়েছে Kentauroi, যে শব্দের ইংরেজি রূপ centaur।

কিম্পুরুষ : দ্র. **কিন্নর**।

কিষ্কিন্ধ (কিষ্কিন্ধ্য, কিষ্কিন্ধ্যা) : ১. কিম্ কিম্ + ✓ধা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কিমের কিম ধারিত থাকে যাহাতে; কিমের (রাষ্ট্রের) কিম (রাষ্ট্র) ধারিত যাহাতে।* ৩. দেশবিশেষ (ইহা মহীশূর রাজ্যের উত্তরে পম্পার নিকটে ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বালী ইহার রাজা ছিলেন।), পর্ব্বতবিশেষ (কিষ্কিন্ধপর্ব্বতের গুহা, বালিরাজের রাজধানী বা পুরী।)। (ব.শ.)। মহীশূরের উত্তরে পম্পার নিকট বানররাজ বালীর রাজ্য। রাজধানীর নামও কিষ্কিন্ধ্যা। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. একালের ভাষায় 'কিষ্কিন্ধপর্ব্বত'কে বুরোক্র্যাসি বা আমলাতন্ত্র বলে। ভারতের ইতিহাসে এহ আমলাতন্ত্রের উদ্ভবের ঘটনাবলী লিখিত হয়েছে বালী ও সুগ্রীবের পিতা ঋক্ষরজার কাহিনীতে। (দ্র. **ঋক্ষরজা**) আর ভারতে আমলাতন্ত্রের পরবর্তী ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে।

কীচক : ১. ✓চীক্ (স্পর্শ) + অক (বুন) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. যাহাকে বায়ু স্পর্শ করে; যে বাঁশ বায়ুপূর্ণ হইয়া শব্দ করে। (ব.শ.)। ৩. বংশবিশেষ, বাঁশ, নল, বৃক্ষবিশেষ, দৈত্যবিশেষ, রাক্ষসবিশেষ, কেকয়রাজ-পুত্র (ইনি বিরাটরাজের শ্যালক ও সেনাপতি ছিলেন এবং অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদীর প্রতি অনুরাগ হেতু ভীমসেন কর্তৃক নিহত হন।), দেশবিশেষ। (ব.শ.)। মৎস্যরাজ বিরাটের শ্যালক ও প্রধান সেনাপতি। বিরাটের স্ত্রী সুদেষ্ণা কীচকের ভগিনী। বিরাটরাজ্যে অজ্ঞাতবাসকালে দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নাম নিয়ে

পরিচারিকার কাজ করতেন। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে কীচক তাঁর পাণিগ্রহণে প্রলুব্ধ হলে, ... ভীমের হস্তে নিহত হন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. একালে রাষ্ট্রের গোয়েন্দাবিভাগের পরিচালকরূপে যে সত্তাকে দেখা যায়, তারই প্রাচীন রূপের নাম কীচক। তার সহকারীরা উপকীচক। দ্র. **উপকীচক**।

কেকয় : ২. *কে-করণ আশ্রয় যাহার বা যাহাদের।* ৩. সূর্য্যবংশীয় নৃপবিশেষ। ইনি কেকয়ীর পিতা। বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যস্থ কেকয়দেশ ইঁহার রাজ্য এবং গিরিব্রজপুর ইঁহার রাজধানী। (ব.শ.)। চন্দ্রবংশীয় রাজা। এঁর কন্যা কৈকেয়ীর সঙ্গে সূর্যবংশীয় রাজা দশরথের বিবাহ হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **শতদ্রু** শব্দের অর্থ থেকে আমরা জানতে পারি, সেখানে একালের উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের মতো অনেক পরিবার-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এগুলি নিজেদের প্রয়োজনের জন্যই কেবল উৎপাদন করত না, পাশাপাশি যে জনগোষ্ঠীগুলি ছিল, তাদের জন্যও উৎপাদন করত; অর্থাৎ উদ্বৃত্ত উৎপাদন করত এবং বিনিময়ও করত। ভারতের ইতিহাসের বিচারে এটি একটি উত্তরণ পর্য্যায় (বা ট্রানজিশনাল পিরিয়ড)। যে কারণে এই কেকয় দেশের রাজা সূর্য্যবংশীয় (অর্থাৎ যৌথতায় বিশ্বাসী), আবার চন্দ্রবংশীয়ও (পণ্যজীবিতায়ও বিশ্বাসী) বটে। অন্য তথ্য অনুসারে তিনি চন্দ্রবংশীয়, কিন্তু সূর্য্যবংশীয় রাজার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেন।

'কে' শব্দটির অর্থ 'দিশাগ্রস্ত গতিশীল কারক'; অর্থাৎ কিনা, যে সত্তা একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতিতে চলে। বঙ্গীয় শব্দকোষ বলছেন কেকয় সূর্য্যবংশীয়, পৌরাণিক অভিধান বলছেন সে আসলে চন্দ্রবংশীয়। যে বংশীয়ই হোক, তারা যে 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তির দক্ষনীতি' গ্রহণ করেছিল তাতে সন্দেহমাত্র নেই। এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে, ইতিহাসের যে পর্য্যায়ে যৌথসমাজ ভেঙে ভেঙে পণ্যবাহী সমাজে পরিণত হচ্ছিল, এটি তার প্রাথমিক পর্য্যায়। তাছাড়া, আমরা জানি বিপাশা, শতদ্রু প্রভৃতি নদীগুলি সিন্ধু নদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। **সিন্ধু** যেহেতু 'স্যন্দনাদ্য অভিমানী দেবগণ'-এর এলাকা, সেই সুবাদে কেকয়ের চন্দ্রবংশীয় হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা হয়ে থাকলেও, এই চন্দ্রবংশ (পুঁজিবাদবংশ) খুবই প্রাচীন। এতে দেবগুণ থাকলেও, তা কেবলমাত্র কৃষিজ উদ্বৃত্তের। বিনিময়ের জন্য উৎপাদনের নীতি তখনও সেভাবে তাঁরা গ্রহণ করেননি। হয়তো প্রথম যুগে নিজেদের উদ্বৃত্ত এমনিই দিয়ে দেওয়া হত এবং বিনিময়ে কিছু নেওয়াও হত না, কেবল দিয়ে দেওয়া হত; দেবতাদের যা ছিল আদি স্বভাব। যেখানে কিনা কোশলদেশ তাদের কারুজ উৎপন্নের উদ্বৃত্তকে পণ্য করে ফেলেছে এবং তা করেছে প্রাচীন সমাজতান্ত্রিক বা বৈদিক ব্যবস্থার মধ্যেই। মনে রাখতে হবে, এই কেকয় দেশের কন্যাই কৈকেয়ী। দ্র. **কৈকেয়ী, কেকা, কেতুধর্মা**।

কেকা (কেকী, কেকিন্) : ১. কে + ✓কে (শব্দ) + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *'কে' করে যে, তাহার আধার।* ৩. ময়ূরবাণী, ময়ূরের ডাক, কেকারব, ময়ূর। (ব.শ.)। ৪. কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। ৫. কা-রব করে কাক, কে-রব (দ্র. কৈরব) করে হংস, আর 'কে? কে?' রব করে ময়ূর। 'কী করেছ, বানিয়েছ?', জানতে চায় কাক; 'কে আমি?', জানতে চায় হংস; 'কে কী জমিয়েছ?', তা জানতে চায় ময়ূর। কাকের গতি রামায়ণ-কথক কাকভুষণ্ডি পর্যন্ত; হংসের গতি পরমহংস ব্রহ্মা পর্যন্ত; ময়ূরের গতি কার্ত্তিকেয়র বাহন হওয়া পর্যন্ত। প্রকৃতির এই 'কেকা'-সত্তা যেমন সর্পবিনাশ করে, সমাজের এই 'কেকা'-সত্তা তেমনি সামাজিক সম্পদের 'সর-পালনকারী' 'সর্প'কে বিনাশ করে। এই সত্তার আদি সামাজিক রূপের বিকাশ ঘটেছিল কেকয়দেশে। একে ত্রিগর্ত্তদেশ বা জালন্ধরও বলা হয়। দ্র. **কেকয়**।

কেন (কেন-উপনিষদ) : ১. ✓কম্, তৃতীয়া একবচন। (ব.শ.)। ২. *(কোন্) দিশাগ্রস্ত কারকের দ্বারা (ইহা ঘটিয়াছে?); কেন বিষয়ক **উপনিষদ**।* ৩. কি হেতু, কি কারণ, কি নিমিত্ত, কি প্রকার, কি হেতু, না ('না' পরবর্ত্তী হেতুভূত বিষয়ের অবধারণ-সূচক, উদাহরণ — কেন না সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রান্তর); কি হেতু, না ('না' কাকু হেতু পরবর্ত্তী ক্রিয়ার সম্মতিসূচক অবধারণ, উদাহরণ — কর না কেন অঙ্গীকার!)। (ব.শ.)। ৪. খুবই প্রচলিত। ৫. সংস্কৃতকারগণ প্রবাহিত ভাষার ধারা থেকে যে সকল শব্দকে গ্রহণ করে সংস্কার করে 'সংস্কৃত' শব্দ বলে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন, 'কেন', 'যেন' সেরকমই দুটি শব্দ। শব্দ দুটির ফলিত অর্থ বাংলাভাষায় আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। আদিতে শব্দটির অর্থ ছিল 'কাহার দ্বারা'। যেমন 'ফলেন' শব্দের মানে ছিল 'ফলের দ্বারা', সেইরকম 'কেন' শব্দের অর্থ ছিল "কে-র (কাহার) দ্বারা"। এই অর্থই রয়েছে সেকালের 'কেন' শব্দের ব্যবহারে। যেমন কেন-উপনিষদ গ্রন্থটির মূল কথাই হল 'কাহার দ্বারা' আমাদের এই মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ কাজে ব্যাপৃত হয়। এই 'কেন' প্রশ্নগুলির উত্তরের জন্যই কেন-উপনিষদ। বলা বাহুল্য, এই 'কে'-রূপে যাকে শেষ পর্যন্ত কেনোপনিষদ খুঁজে পেয়েছে, তাঁকেই 'ব্রহ্ম' বলে।

আরও একটি কথা এক্ষেত্রে স্মরণ রাখা জরুরি। কেন?, কেন?, কেন?, — এভাবে কার দ্বারা, কার দ্বারা, কার দ্বারা চিনতে চিনতে এগোতে থাকলে যাদের পাওয়া যায়, সেই যেন-যেন-যেন-রা সারি দিয়ে মনের মাঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। এই কেন-যেনদের যে পূর্ণরূপ, তাদের সমগ্রকে যেমন 'কোন' বলে, তেমনি তাদের প্রত্যেকটিকেও 'কোন' বলে। আজকাল এই শব্দটিকে 'কোনো' এবং 'কোনও' বানানেও লেখা হয়।

কেন্দ্র : দ্র. **কম**।

কেবল (কৈবল্য, কৈবল্যধাম, ক্যাবলা) : ১. ✓কেব (সেবন) + অল - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *'কে' (দ্র. **কেন**) বল যাহার = কেবল; কেবল থাকে যাহাতে = কৈবল্য।* ৩. এক, একমাত্র, মমত্ববর্জিত, অভিমানবর্জিত, সংস্তরণবর্জিত, কৃৎস্ন, সমগ্র, বিশুদ্ধ, স্বরূপ, অদ্বিতীয়, একরূপ, অসহায়, স্বাভাবিক, প্রকৃত, শুদ্ধ, খাঁটি, নিতান্ত, অত্যন্ত, ক্রিয়াকালের অবিলম্বসূচক, যখনই, নির্ণয়, অবধারণ, জ্ঞানবিশেষ, একাত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, বিবিক্ত, বিজন। কৈবল্য = অসঙ্গ, কেবলভাব, পুরুষার্থশূন্য সত্ত্বাদিগুণের প্রলয়রূপ বা প্রকৃতিরূপে অবস্থানরূপ মুক্তি, স্বরূপে অবস্থিত চিতিশক্তি,

ঐকান্তিকভাবে ও আত্যন্তিকভাবে দুঃখত্রয়ের তিরোধানরূপ মুক্তি; মুক্তি, মোক্ষ, নির্ব্বাণ, ঐক্য, স্বরূপাবস্থান। (ব.শ.)। ক্যাবলা = বোকাসোকা, সরল। ৪. only অর্থে খুবই প্রচলিত। অবশ্য শব্দটির আদি ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ প্রায়শই না-জেনে, এবং অথচ, সেই অর্থেই শব্দটি এখনও ধর্মপ্রাণ মানুষেরা কমবেশি ব্যবহার করে থাকেন। ৫. 'কেবল' শব্দটি বর্তমানে only অর্থে পর্যবসিত হয়েছে এইভাবে — অধিকাংশ মানুষ বার্ধক্যে পৌঁছলে দেখা যায়, তার স্বভাব হয়ে গেছে শিশুর মতো। বিশেষত যে-সমস্ত মানুষের জীবন কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব পেরোতে পেরোতে অত্যন্ত বিকৃত হয়ে যায়নি, তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে এরকম হয়। মানুষের শৈশব-চেতনার সঙ্গে তার বার্ধক্যের চেতনার এই যে সাদৃশ্য, এ হল অনেকটা যাদুকরের থলির মতো। মাঝে তাতে কোটি টাকা এসেছে, খরচও হয়ে গেছে, কিন্তু মহামূল্য থলিটি আছে। মানুষের শৈশব-বার্ধক্যের মাঝে যা ঘটে তা হল, আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিক-আদিদৈবিক সুখ-দুঃখের সমস্যা। তখন মানুষের মনে ষড়রিপুর আগুন জ্বলে, তার থেকে বাণ নির্গত হতে থাকে। কিন্তু যখন সে আগুন নিভে যায়, বাণের নির্গমন বন্ধ হয়ে যায়, মানুষের সত্তা নির্ব্বাণ লাভ করে, ষড়রিপুর আগুন আর জ্বলে না, অনির্ব্বাণ থাকে না, নিভে যায়, তখন থাকে প্রকৃতির দেওয়া যাদুকরের থলির মতো 'কে' শক্তি বা আদি ৯ (লি) এবং সুদীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসার ফলে প্রাপ্ত আর-এক ৯ (লি); এই দুইয়ে মিলে হয় ৯৯। এই শক্তিই ৯৯লা বা লীলা করবার শক্তি ধরে। যাঁরা তাঁদের যৌবনেই এই শক্তি অর্জন করতে পারেন, তাঁরাই সমাজে তাঁদের লীলা করে যেতে পারেন, যেমন পেরেছিলেন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু; যেমন পারেন কোনো কোনো সাধু দরবেশরা। সাধারণ মানুষ পারেন না। এই 'কে' বল রূপে যখন মানুষের থাকে তখনই তার কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়েছে বলা হয়। ৯ বা লি কথাটির ইংরেজি রূপান্তর করা যায় না, যায় না 'লীলা' কথাটিরও। তবে চীনদেশের পণ্ডিত লাও-ৎ-সু এই 'লি'কে 'ব্রহ্ম' রূপে শনাক্ত করে গেছেন। আমরা একে তা ছাড়াও 'কে' রূপেও শনাক্ত করতে পারি। এই 'কে'-সম্বল হল সেই সত্তা, যার আর কিছুই নেই, কে-টুকুই সম্বল, only সম্বল বা oneness-টিই সম্বল; সেই মহাথলি যাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে।

কৈকয়, কৈকেয়, কৈকেয়ী : ১. কেকয় + অ = কৈকয়, কৈকেয়। কেকয় + অ, স্ত্রী = কৈকেয়ী। (ব.শ.)। ২. *কেকয় হইতে জাত, জাতা।* ৩. কেকয়রাজ, কেকয়পুত্র, কেকয় রাজকন্যা ভরতমাতা। (ব.শ.)। কেকয়-রাজকন্যা। অযোধ্যার রাজা দশরথের মধ্যমা স্ত্রী ও ভরত-জননী। ... দাসী মন্থরার কুপরামর্শে কৈকেয়ী ... দুই বর প্রার্থনা করেন। এক বরে রামের চোদ্দো বছর বনবাস এবং অপর বরে ভরতের সিংহাসন গ্রহণ ... পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু হয়। ভরত অযোধ্যায় উপস্থিত হতেই পটপরিবর্তন হয়; ... এবং মাতা কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করেন। ... কৈকেয়ীও ভরতের অনুগমন করেন রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. রামায়ণ মহাভারতে দুটি চরিত্র কৈকেয়ী ও গান্ধারী, যাদের সহযোগী যথাক্রমে মন্থরা ও শকুনি। উভয়ের আগমন যে অঞ্চল থেকে তা **সিন্ধু** বিধৌত **শতদ্রু-বিপাশা সংশ্লিষ্ট অঞ্চল। দ্র. কেকয়**। এদের মধ্যে বৈদিক ব্যবস্থা থেকে **খানিকটা অধঃপতন যেমন** দেখা যায়, তেমনি সুস্পষ্ট পণ্য-বাহিতার এঁরা **বিরোধী। যতদূর বোঝা যায়, সেই জনগোষ্ঠীই কৈকেয়ী** পদবাচ্য, যাঁরা **কৃষিউৎপাদনে লিপ্ত, উদ্বৃত্ত উৎপন্ন** কেউ নিয়ে গিয়ে বিক্রিবাটা করুক, তাতে তার **আপত্তি নেই**। কিন্তু সে নিজে বিক্রির জন্য উৎপাদনের কথা ভাবতেই পারে না। কেবল তাই নয়, সে যে কৃষিব্যবস্থা অনুসরণ করে, তা চিরমন্থর; তাই মন্থরা তার চিরসাথী। এমনকি, তার উৎপাদিত সন্তানও হয় ভরত, ভরণপোষণ করাই যে সম্পদের মূল কাজ। দ্র. **মন্থরা, ভরত**।

কৈকসী : ৩. রাক্ষসজননী, রাবণাদির জননী। বাল্মীকি রামায়ণে, রাবণাদির জননী কৈকসী, পিতা বিশ্রবাঃ, মাতামহ সুমালী। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণাদির জননী নিকষা, পিতা বিশ্বশ্রবা, মাতামহ মাল্যবান। অমরকোষে নিকষা পুলস্ত্যভার্য্যা। 'নিকষা' শব্দের আরেকটি অর্থ 'নিকটে'। (ব.শ.)। রাবণাদির মাতা। রাক্ষসরাজ সুমালীর ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী কেতুমতীর গর্ভে কৈকসীর জন্ম হয়। এঁর অন্য নাম নিকষা। একবার সুমালী তাঁর কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে মর্ত্যলোকে এসে কুবেরের ধনৈশ্বর্য দেখে কৈকসীকে বলেন কুবেরের পিতা বিশ্রবা মুনিকে পতিত্বে বরণ করতে। কৈকসী তপস্যারত বিশ্রবার কাছে গিয়ে অধোমুখে মাটিতে আঙুল দিয়ে অঙ্কন করতে থাকেন। বিশ্রবা তাঁর পরিচয় ও আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলে, তিনি তাঁর পরিচয় দিয়ে মুনিকে তপোবলে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য জেনে নিতে বলেন। বিশ্রবা তখন ধ্যানে তাঁর উপস্থিতির উদ্দেশ্য জ্ঞাত হয়ে বলেন যে, তুমি পুত্রলাভের উদ্দেশ্যে এসেছ, কিন্তু প্রদোষকালে উপস্থিত হয়েছ বলে তোমার পুত্রগণ রাক্ষস হবে। কৈকসীর অনুনয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি বলেন যে, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ধার্মিক হবে। যথাসময়ে বিশ্রবার ঔরসে কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শূর্পনখা ও বিভীষণের জন্ম হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কস, কষ, কশ শব্দগুলির সঙ্গে কৈকসী ও নিকষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। হিসাবনিকাষ বা হিসাবনিকাশ কথাটি এখনও খুবই প্রচলিত। নিকষা বা নিকসা বা নিকশা হল যারা কষ্টিপাথরে যাচাই করে হিসাবের ফলাফল প্রকাশ করে। একালের সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতরে সরকারি হিসাবরক্ষক রূপে আমরা যে নিকষাকে পাই তার নাম A G Bengal, A G Bihar ইত্যাদি। এই A G বা অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল অফিসে কর্মরত জনগোষ্ঠীর প্রাচীন (প্রায় ১০০ খ্রিস্টাব্দের) রূপটিকে বলা হয়েছে কৈকসী। তবে বাল্মীকি রামায়ণে সত্তাটি যতখানি স্পষ্ট, তার চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট কৃত্তিবাসী রামায়ণে। কৃত্তিবাস তার নাম দেন নিকষা। এর থেকে বোঝা যায়, কৃত্তিবাসের পক্ষে সত্তাটির স্বরূপ আরও স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব হয়েছিল। হয়তো বাল্মীকি রামায়ণের রচনাকাল (প্রায় ৬০০ খ্রিস্টাব্দ) থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণের রচনাকাল (প্রায় ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ) অনেক পরে বলেই এরকম হয়েছে; কারণ ৬০০ থেকে ১৫০০, এই ৯০০ বছরে নিকষার যথেষ্ট বিকাশ ঘটেছিল, এবং তা কৃত্তিবাসের চোখে আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল। দ্র. **নিকষ, বিশ্রবা, মাল্যবান**।

কৈটভ : ১. কীট + অভ। ৩. দৈত্যবিশেষ। একার্ণবে যোগনিদ্রাগত

বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ দৈত্যের উৎপত্তি হয়। ইঁহারা বিষ্ণুর নাভিকমলজাত ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মার স্তবে বিষ্ণু যোগনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, ইহাদিগকে নিহত করেন। এই দৈত্যদ্বয়ের **মেদ**-এ সঞ্জাত বলিয়া পৃথিবীর নাম '**মেদিনী**'। (ব.শ.)। প্রলয়-সমুদ্রে বিষ্ণু যখন অনন্তনাগের দেহের উপর যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। বিষ্ণুর কর্ণমল হতে দুই অসুর নির্গত হয়ে কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল অবস্থায় বাস করতে থাকে। ব্রহ্মা এদের দুজনের মধ্যে বায়ু চালনা করে জীবনের সঞ্চার করেন। এদের একজনের শরীর কোমল বলে নাম হয় মধু ও অপরের শরীরের গঠন কঠিন বলে নাম হয় কৈটভ। এই দুই দানব বলদীপ্ত হয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসে। ব্রহ্মা সন্ত্রস্ত হয়ে পদ্মনাল কম্পিত করে বিষ্ণুকে জাগরিত করেন। বিষ্ণু দুই দানবকে স্বাগত জানিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু সহস্র বৎসর যুদ্ধ করেও তাঁরা ক্লান্ত হন না। তখন তারা বিষ্ণুর উপর প্রীত হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলে। বিষ্ণু বলেন, লোকহিতার্থে আমি এই বর চাই যে, তোমরা আমার বধ্য হও। এই বাক্য শ্রবণান্তে মধু ও কৈটভ বলে যে, তুমি অনাবৃত স্থানে আমাদের বধ কর এবং এই বর দান কর, আমরা যেন তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করি। বিষ্ণু 'তথাস্তু' বলে স্বর্গে মর্ত্যে কোথাও অনাবৃত স্থান না পেয়ে আপন অনাবৃত জানুর উপর মধু ও কৈটভের মস্তক সুদর্শনচক্রে ছিন্ন করেন। এই দুই দৈত্যের শরীর-নিঃসৃত মেদ সাগরজল আবৃত করে পৃথিবীর সৃষ্টি করে। সেইজন্য পৃথিবীর নাম হয় মেদিনী। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি অন্যত্র পৃথু-উৎপত্তির বা ভারতসমাজে আদিরাষ্ট্রের উৎপত্তির কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে অন্যভাবে। দ্র. **পৃথু**। কিন্তু সেই বর্ণনায় সামাজিক কাঠামো ইত্যাদির বর্ণনাই প্রধান। সমাজের অর্থনৈতিক ও **আধ্যাত্মিক** (মানসসম্পদের) দিকটি তাতে বিস্তারিত ভাবে বলা নেই। তা বলা হয়েছে মধুকৈটভের কাহিনীতে। বেণবিরোধী প্রলয়ের কালে সম্প্রদায়গুলি যখন একাকার হয়ে গেছে, তখন মানসসম্পদ ও বাহ্যসম্পদ জনসাধারণ্যে বিলীয়মান রূপে শয়ান, সেই সম্পদের যে অংশ **কর্ণে** মল রূপে জমে যায়, তার অবধারক রূপে দুই গোষ্ঠীর জন্ম হলেও, তারা অসাড় কাঠের মতোই ছিল; একজনের হাতে মানসসম্পদের মল, অন্যজনের হাতে বাহ্যসম্পদের মল। কিন্তু জনসাধারণ্যে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক পদগুলিতে আসীন জ্ঞানজীবীরা সেই অসাড় গোষ্ঠীর মধ্যে বায়ুপ্রবাহ বা খবরাখবর লেনদেনের সূত্রপাত ঘটান। এই লেনদেন অন্যত্র বেণ-কাহিনীতে প্রকাশ করা হয়েছে। ফল হয় এই যে, তারা জ্ঞানজীবীদেরই মেরে ফেলার চেষ্টা করে। স্বভাবতই এর বিরুদ্ধাচরণ করেন ব্রহ্মা বা সেকালের মহর্ষিরা। এই মাল্যবানদের অবকাশে হত্যা করবার উপায় বাৎলে দেয় সেই মল-অধিকারী মালিকরা। in the pores of socity বা দ্বীপে দ্বীপে সেই মালিকদের কেমন করে সম্পদবানে বদলে ফেলা হয়, সেকথা কল্পনা করে নিতে হয়। এর ফলে যে সম্পদ একত্রিত হয়ে ওঠে, সেই পুঁজিই আদিরাষ্ট্রের আদিপুঁজি। রাষ্ট্রের সূত্রপাত এই পুঁজির মেদের উপর পা রেখে। তাই **পৃথিবী**-র অন্য নাম **মেদিনী**।

কৈবর্ত্ত : ১. কেবর্ত্ত + অ। (ব.শ.)। ২. *কে (= **দিশাগ্রস্ত গতিশীল** কারক) বৃত্তি যাহার, তজ্জাত*। ৩. **দাশ, ধীবর, কেওট, জেলে**। কৃষিজীবী বা ব্যবসায়ী জাতিবিশেষ, হেলে কৈবর্ত্ত। **শূদ্রার গর্ভে** ক্ষত্রিয়জাত সঙ্করজাতিবিশেষ; আয়োগবীর গর্ভে **ব্রাহ্মণজাত** নৌকর্ম্মজীবী 'দাশ' নামক জাতি, আর্য্যাবর্ত্তে ইহাদের **নাম কৈবর্ত্ত**। উভয় জাতির মূল নাম এক হইলেও, বৃত্তি অনুসারে **মৎস্যজীবী** কৈবর্ত্ত 'কেওট' বা জেলে কৈবর্ত্ত, এবং কৃষিজীবী **কৈবর্ত্ত 'হেলে** কৈবর্ত্ত'। (ব.শ.)। ৪. জাতির উল্লেখ করতে গ্রামবাংলায় **শব্দটি** আজও ব্যবহৃত হয়। ৫. যে হাল বা লাঙ্গল চালায়, চাষ করে, তাকে হেলে কৈবর্ত্ত এবং যে মাছ ধরে বিক্রি করে, তাকে জেলে কৈবর্ত্ত বলে। কিন্তু মানুষ তো আর হুট করে 'চলরে ভাই, আজ থেকে আমরা চাষ করতে যাই, মাছ ধরতে যাই' — এভাবে কিছুই ঘটেনি, ঘটতেও পারে না। একটি বিশেষ পেশায় যাওয়ার জন্য, তদনুসার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য মানুষকে কী পরিমাণ ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের বন্ধন এবং মানসিক ও সামাজিক বাধা ও বিধিনিষেধ পেরিয়ে যেতে হয়, তা একালের অ্যাকাডেমির পক্ষে অকল্পনীয়। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' গ্রন্থে রামায়ণের যুগের 'তাঁতি'দের জীবনের যে ধ্বংসাবশেষ দেখানো হয়েছে, সেখানে তার কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে। কৈবর্ত্তদেরও সেইরকম সুদীর্ঘ কণ্টকর উত্তরাধিকার রয়েছে। *তিতাস একটি নদীর নাম* গ্রন্থে তার ছায়ার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। জনসাধারণকে যখন 'জল' বলা হত, তাদের মধ্যে যে দু-চারজনের সামান্য ব্যক্তিগত সম্পদ জমেছে এবং তাদের 'মৎস্য' বলার সূত্রপাত সদ্য সদ্য হয়েছে, যখন টাকার কুমির ও রাঘব বোয়ালেরা সমাজের মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছে, সেই সময় 'যে-মৎস্য (ব্যক্তিমালিক) অন্য মৎস্যদের (ব্যক্তিমালিকদের) হিংসা করে' তাদের বলা হত **দাশ**। তারও আগে এই **দাস** ছিল আদি সদাশয় অসুর বা দেবতাদের যৌথ নাম। তার পরে তারা কে-বৃত্তি গ্রহণ করে **কেকয** হয়ে যায়। একসময় তাঁরাই ছিলেন বরণীয় ধীসম্পন্ন ধ্যানসাধনকারী **ধীবর**। মহাভারতের সূচনাতে এই ধীবরের কন্যার ভূমিকা অপরিসীম। স্বয়ং ব্যাসদেব এই ধীবরকন্যার পুত্র। ধীবরকে বাদ দিয়ে মহাভারতের কল্পনাও অসম্ভব। এই অগ্রণী জাতি বহু বিপর্যয় পেরিয়ে, মৌলবাদী বৈদিক সভ্যতার বহু বিধিনিষেধ পেরোনোর দায়ে শাস্তি পেয়ে পেয়ে আজ তার বর্তমান অবস্থানে পৌঁছেছে। এদের একটি বড় অংশ পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ও মুসলমান হয়ে যায়।

কোজাগর : ১. কো + জাগর। ২. কঃ (কে) জাগর (জাগিতেছে) — এই পূর্ণিমায় কে জাগে। (ব.শ.)। ৩. আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথি, দ্যূতপূর্ণিমা, লক্ষ্মীপূর্ণিমা। লক্ষ্মী বলেন, এই পূর্ণিমায় যে জাগে, তাহাকে ধন দিব। এই তিথিতে অক্ষক্রীড়া নারিকেল জলপান ও চিপিটক ভক্ষণ বিহিত। (ব.শ.)। শরৎকালে দুর্গাপূজার পর যে পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা হয়, তাকে কোজাগরী পূর্ণিমা বলে। '**কো জাগর্তী**' হতে এই কথার উৎপত্তি; অর্থাৎ কে জেগে আছে। পুরাণের মতে ঐদিন রাত্রে লক্ষ্মীদেবী এসে বলেন, কে জেগে আছ, আজ আমি তোমাকে ধন দেব। এইজন্য কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে জাগরণের

প্রথা আছে। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. জগতের জ্যোতি ও সমাজের জ্যোতি বিষয়ক বিদ্যার সঙ্গে এই কোজাগর শব্দটি সম্পর্কিত। চাঁদের আলো পূর্ণতা পায় দুর্গাপূজার ঠিক পরের পূর্ণিমাতে। সেই পূর্ণিমা রাতে সবাইকে নিয়ে লক্ষ্মীপূজার উৎসবাদিতে মত্ত থাকা, ঘরের দরজা সারারাত খোলা রাখা (এবং অতএব জেগে থাকা, নইলে লক্ষ্মী আসুন না আসুন, চোর আসতে পারে), আড্ডা মারা, সারা রাত তাস-দাবা খেলা ইত্যাদি করা বাংলাভাষীদের বহুকাল ক্রমাগত অভ্যাস। আর সমাজের জ্যোতির ক্ষেত্রে — ধনপুঁজির সর্বোচ্চ উত্থানের কালে (পূর্ণিমাকালে), যখন পুঁজির প্রবাহ চূড়ান্ত রূপে চলছে, তখনই যদি সদা সতর্ক থেকে বিক্রিবাটার খেলাটি না খেলা যায়, **অক্ষক্রীড়া** বা **বাণিজ্য** না করা যায়, লক্ষ্মী বা ধনসম্পদ আসবেন কী করে? সাধকের ঘরে বসতি করবেন কী করে? তাই তিনি জানতে চান, এ সময়ে কে সদাসতর্ক আছো, জেগে আছো?

কোবিদার : ১. কু (ভূমি) + বি - ✓দৃ + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ভূমি বিদারণ করে যে।* ৩. রক্তকাঞ্চনবৃক্ষ; কোবিদার-দারু, কোবিদার কাঠ, পারিজাত, মন্দার। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পরিবার থেকে শুরু করে জাতিসংঘ পর্যন্ত যত সামাজিক সংগঠন এখন রয়েছে, একালে তাদের 'প্রতিষ্ঠান' বলা হয়। এইসব প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব থেকে আজ পর্যন্ত বিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। আদিতে যৌথসমাজের ভেতরে বা আদি মানবঝাঁকের ভেতরে যখন প্রথম প্রথম ছোটখাটো সামাজিক সংগঠনের জন্ম হতে শুরু করে, মানুষ তাকে 'বৃক্ষ' বা 'দারু' রূপে শনাক্ত করেছিল। পরে তাকে পর্ব্বত নামে শনাক্ত করে। যেমন আমলাতন্ত্রের প্রথম উদ্ভূত রূপটিকে সেকালে চিহ্নিত করা হয়েছিল মন্দার বৃক্ষ নামে। পরে সেটিই হয় **মন্দর** পর্ব্বত। মানব-ঝাঁকের প্রচলিত ব্যবস্থা বিদারণ করে উঠেছিল বলে এই আদি প্রতিষ্ঠানগুলি সবই ছিল কোবিদার। দ্র. **পারিজাত**।

কৃকলাস : যে শিরোগ্রীব বা কণ্ঠ কম্পিত করে। **কৃকবাকু** : কুক্কুটধ্বনি বাক যাহার। ***কৃচ্ছ্রসাধন*** : কৃৎ (কৃত বস্তু বা বিষয়) চয়ন করে লুকিয়ে রাখা হয় যে সাধনায়। **কৃত** : যাহা করা হইয়াছে। **কৃতক** : কার্য্য হইতে জাত। **কৃতকর্ম্মা** : যে কার্য্য করিয়াছে। **কৃতকাম** : যাহার কামনা পরিপূর্ণ। **কৃতকাল** : যে সময়বিশেষ নির্দ্ধারিত করিয়াছে। যাহার কাল নিরূপিত। **কৃতকৃতার্থ** : যাহাকে কৃতার্থ করা হইয়াছে। **কৃতকৃত্য** : যে কার্য্য করিয়াছে। **কৃতকৌতুকমঙ্গল** : কৃত কৌতুকমঙ্গল যাহা কর্ত্তৃক। **কৃতক্রিয়** : কৃত ক্রিয়া যাহা কর্ত্তৃক। **কৃতার্থ** : যাহার উদ্দেশ্য বা অর্থ সিদ্ধ (কৃত) হইয়াছে।

খ

খ্ বর্ণের অর্থ : খ্ বর্ণটি তৈরি হয়েছে (ক্ + হ্ = খ্) ক্-এর সঙ্গে হ্ জুড়ে। সেকারণে, সাধারণভাবে খ্-এর অর্থ হল করণ-হওয়ন, অর্থাৎ 'করা যেখানে থেমে যায়'। (দ্র. ঘ)। তবে আরও একরকম 'খ্' রয়েছে। সেটি এসেছে ক্ষ-এর বিবর্তিত একটি রূপ হিসেবে। এই 'ক্ষ-জাত খ্'-এর অর্থ হল — মূল অবয়ব থেকে খনন করে বা কেটে নেওয়া। দ্র. **ক্ষ**। এই ক্ষ বা খ স্বভাবতই এমন স্থানকে বোঝায়, যে স্থানের বস্তু সেই স্থানে আর নেই; অর্থাৎ স্থানটি শূন্য হয়ে গেছে। এই সেই কারণ, যে-কারণে খ শূন্যকে, আকাশকে, এমনকি মুখগহ্বরের ফাঁকা অংশটিকে পর্যন্ত বোঝাতে পারে। প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে, আদিতে আরও কয়েক রকমের 'খ্' ছিল বলে মনে হয়, যার উত্তরাধিকার পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি ভাষায় দেখতে পাওয়া যায়। সংস্কৃতকারগণ সেই সমস্ত এলোমেলো 'খ্' সংস্কার করে মাত্র দুটি 'খ্'-এ সংক্ষিপ্ত করে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন বলে, আমাদের ভাষায় অন্য 'খ্'গুলির কোনো উত্তরাধিকার আজ আর তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। তবে জনসাধারণ্যে উচ্চারণ ভিন্নতার দিকে গভীরভাবে নজর করলে, তাদের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ নিশ্চয় দেখতে পাওয়া যাবে। এদেরই একটি সম্ভবত স্খলনের খ। এই স্খ-এর বিবর্তিত রূপও খ। অতএব **খ** = খ্-অন করে যে; ক্ষ্-অন করে যে; করণস্থিত = কৃত = খ। খা, খি, খু ইত্যাদির জন্য **ক বর্ণের অর্থ** দ্রষ্টব্য।

খ্ বর্গ থেকে জাত শব্দবংশের তালিকা : *খঞ্জ্*, খণ্ড্, খন্, খা (খাদ্), খিদ্, খ্যা, খ্ = ৬ + ১

***খঞ্জ্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : খেঁ(খে)সারি, খঞ্জ, খঞ্জকারী, খঞ্জন, খঞ্জনগঞ্জন, খঞ্জনা, খঞ্জনি(নী), খঞ্জনিয়া, খঞ্জরীট, খঞ্জরীটক, খুঁড়িয়ে চলা, খোঁড়া, খোঁড়ানো, খোড়, খোড়া। **খঞ্জ্** = ক্ষণ জনন। **খঞ্জ** = ক্ষণ জনিত হয় যাহাতে (যার চালে)।

খঞ্জ (খোঁড়া) : ১. ✓খঞ্জ্ (গতিবৈকল্য) + অ - ক। (ব.শ.)। ২. *ক্ষণ জনিত হয় যাহাতে (যাহার চলনে)*। ৩. একপাদবিকল, খোঁড়া, গতিবৈকল্য-যুক্ত, বিকৃতপাদ, খঞ্জপাদ। ৪. lame অর্থে প্রচলিত। ৫. একজন খোঁড়া মানুষ যখন হাঁটে, দেখা যায়, তার খোঁড়ানোর একটা ছন্দ আছে। ধরা যাক তা — ইই-যঃ, ইই-যঃ, ইই-যঃ — এইরকম। এই যে মহাকাল থেকে দু-তিনটি মুহূর্ত এভাবে প্রতি পদক্ষেপে ছিন্ন করে নেওয়া হচ্ছে, ক্ষ করে নেওয়া হচ্ছে, সেটিই ক্ষং বা ক্ষণ। সেই ক্ষণন জনিত হয় যার চালে, সেই হল *খঞ্জ*। প্রাথমিক ভাবে মনে হয়, এই '**খঞ্জ**'-এর বিবর্তিত রূপই হল খোঁড়া। কিন্তু খঞ্জের চালে অনেক সময় এমন মনে হতে পারে, সে যেন

কিছু খুঁড়ছে। তখন তাকে বলা যেতেই পারে 'খোঁড়া'। সুতরাং শব্দটির উদ্ভবের দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথাটি ফেলে দেওয়া যায় না।

খঞ্জকারি (খেঁসারি) : ১. খঞ্জ + কারী। ২. *যে খঞ্জ করে।* ৩. খঞ্জের শত্রু, খেঁসারি, কলায়বিশেষ, তেউড়ে কলাই (Lathyrus sativus), খেঁসারির ডাল, তেউড়ে ডাল। ইহা দীর্ঘকাল খাইলে খঞ্জত্বরোগ জন্মায়। (ব.শ.)। ৪. 'খেঁসারি' নামক কলায়কে বোঝাতেই প্রচলিত। ৫. খঞ্জকারি শব্দটিই বিবর্তিত হয়ে খেঁসারি শব্দে পরিণত হয়েছে। খেঁসারি কলাই তুলনায় সস্তা। গরিব লোকেরা তা খেতে বাধ্য হন, এবং গ্রামবাংলার সব অধিবাসীই জানেন তার অন্তিম ফল খঞ্জত্ব। যে কারণে, যাঁদের উপায় আছে তাঁরা অন্য ডাল খান এবং পারতপক্ষে খেঁসারি ডাল এড়িয়ে চলেন।

খঞ্জন (খঞ্জনা, খঞ্জনি, খঞ্জনী) : ১. ✓খঞ্জ্ + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক্ষণজাতকে অন করে যে।* ৩. ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ, wag-tail। খঞ্জনা, খঞ্জনিকা, খঞ্জনিয়া, খঞ্জনী = খঞ্জন-স্ত্রীজাতি। খঞ্জনি, খঞ্জনী, খঞ্জরি, খঞ্জরী = একমুখে চর্ম্মবদ্ধ চক্রাকার বাদ্যবিশেষ। ইহা কাষ্ঠচক্রে রচিত। একমুখ চামড়ায় ছাওয়া, অন্য মুখ খোলা; কাষ্ঠচক্রের গায়ে ছিদ্রে করতাল লাগানো থাকে; খঞ্জনী বাজাইলে ঝন্ ঝন্ শব্দ হয়। (ব.শ.)। ৪. wag-tail, ও বাদ্যযন্ত্র খঞ্জনী অর্থে এখন প্রচলিত। ৫. খঞ্জনা পাখিই হোক, আর খঞ্জনী বাদ্যযন্ত্রই হোক, এরা আসলে ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ করে মহাকালের ক্ষুদ্রাংশকে খণ্ডিত করে নিয়ে প্রকাশ করে থাকে; অর্থাৎ ক্ষণ-জনন অন করে থাকে। সেই কারণে এদের খঞ্জনা ও খঞ্জনী ইত্যাদি বলে।

খণ্ড্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অখণ্ডিত, অখণ্ড, অখণ্ডন, অখণ্ডনীয়, অখণ্ডমণ্ডল, অখণ্ডিত, অখণ্ড্য, আখণ্ড, আখণ্ডল, আখণ্ডলচাপ, আখণ্ডলধনু, আখণ্ডিত, খণ্ড্, খণ্ড, খণ্ডক, খণ্ডকথা, খণ্ডকপালিনী, খণ্ডকাব্য, খণ্ডখিরিসা, খণ্ডজ, খণ্ডন, খণ্ডনীয়, খণ্ডপরশু, খণ্ডপূজা, খণ্ডপ্রলয়, খণ্ডবিখণ্ড, খণ্ডবিয়নী, খণ্ডব্রত, খণ্ডমধু, খ(খা)ণ্ডা, খণ্ডাতি, খণ্ডাভ্র, খণ্ডিক, খণ্ডিত, খণ্ডী, খাঁড়, খাঁড়া, খাঁড়ি, খাণ, খাণি, খাণিক, খান, খানা, খানি, খানিক (খণ্ডকয়েক) , খানেজাদ, খাণ্ডব, খাণ্ডবদাহন, খাণ্ডবপ্রস্থ, খাণ্ডবিক, খাণ্ডিক। **খণ্ড্** = ক্ষণ-এর ডয়ন (গড়ান্-উড়ান্-ভাব)। **খণ্ড** = খণ্ড্ থাকে যাহাতে।

খণ্ড (খণ্ডন) : ১. ✓খণ্ড্ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ক্ষণ-এর ডয়ন (গড়ান্-ভাব বা উড়ান্-ভাব) থাকে যাহাতে; খণ্ড অন যাহাতে।* (দ্র. **ক্ষণ**)। ৩. ভেদন, ভঞ্জন, মন্থন, বিলোড়ন ছেদন; খণ্ডিত, ভিন্ন, ছিন্ন, ভগ্ন, অসম্পূর্ণ, ছেদযুক্ত, খণ্ডয়িতা, নাশক, ছেদক, মন্দ, ভাঙা, বিনষ্ট, নিরাকৃত, শকল, দল, অংশ, ভাগ, টুকরা, একদেশ, দেশ, বর্ষ, কণা, ক্ষুদ্রাংশ, পুস্তকের অংশ, পরিচ্ছেদ, স্বরূপ, সমূহ, খাঁড়, খণ্ডিতচরিত্র জন, দুর্বৃত্ত, দস্যু। ছিন্ন করা, দূর করা, হরণ করা, অপনয়ন করা, ব্যর্থ করা, অতিক্রম করা, প্রতিকার করা, নাশ করা, অন্যথা করা, লঙঘন করা, নিরাকৃত করা, প্রত্যাখ্যান করা, ন্যূন বা হীন করা, পরাজয় করা, মার্জ্জনা করা, ক্ষমা করা, ত্যাগ করা, অগ্রাহ্য করা, ছেদন করা, ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া, প্রশমিত হওয়া, ঘুচিয়া যাওয়া, সমাপ্ত হওয়া, শেষ হওয়া, অনুপভুক্তভাবে বা ভোগ ব্যতীত যাওয়া; **খণ্ডক**, ছেদক, ভেদকারক, শমন, দমন, নিরাসক, নিরাকর্ত্তা, দংশন, ক্ষত, ভঙ্গ, বিপ্রলম্ভ, নিরাকরণ, নিরাস, পরমতনিরাকরণ শাস্ত্রভেদ, অচরিতার্থতা, অপ্রাপ্তি, ন্যূনীকরণ, কমানো, ব্যাঘাত, বাধা। (ব.শ.)। ৪. কেবলমাত্র part of anything ও cutting or breaking to pieces অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দটির ভিতরে রয়েছে 'অবয়বের ছিন্ন অংশের ডয়ন (গড়ান্-উড়ান্-ভাব)', যা কিনা অবয়ব থেকে কেউ কেটে এনেছে অথবা অবয়ব নিজে ছেদন করে ত্যাগ করেছে। এই খণ্ড স্বভাবতই শ্রীখণ্ড বা অমৃতখণ্ড থেকে শুরু করে মন্দ বস্তু পর্যন্ত অনেক কিছুকেই বোঝায়। এই ক্রিয়াটি তাই এতরকম ভাবে প্রতিভাত হয় যে, তার প্রয়োগক্ষেত্র অতি বিশাল। সেকারণেই এর এত বেশি অর্থ পাওয়া যায়, যেগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রহ করে রেখে গেছেন বঙ্গীয় শব্দকোষ। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই শব্দটির এত বিপুল প্রয়োগ ঘটেছে যে, একে সর্বার্থসাধক শব্দ বলা চলে। ৬. ইংরেজি scant, candy (sugar candy)।

খাণ্ডব (খাণ্ডবদাহন, খাণ্ডবপ্রস্থ, খাণ্ডবিক) : ১. খণ্ড্ + অ। (ব.শ.)। ২. ***খাণ্ডব** = **খণ্ড** বহন করে যে; **খাণ্ডবদাহন** = খাণ্ডবের দহন যাহাতে; **খাণ্ডবপ্রস্থ** = খাণ্ডব (করণ) যেখানে প্রশস্থ (দ্র. **ইন্দ্রপ্রস্থ**); **খাণ্ডবিক** = যে খাণ্ডব তৈরি করে।* / খাণ্ডব যাহার শিল্প। (ব.শ.)। ৩. খণ্ডবিকার, খণ্ডবিকার মিষ্টান্নবিশেষ, ভক্ষ্যবিশেষ, পিপ্পলী, শুণ্ঠীযুক্ত মুদগযূষ, ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে যমুনাতীরস্থ বনবিশেষ, এই বন ইন্দ্ররক্ষিত, অগ্নির প্রার্থনায় অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ইহা দগ্ধ করেন। খাণ্ডবপ্রস্থ নগরবিশেষ। খাণ্ডববন দগ্ধ হইলে ঐ স্থানই 'খাণ্ডবপ্রস্থ' নামে অভিহিত হয়। খাণ্ডবিক হল — মোদককারক, ময়রা। মহাভারতে 'রাগখাণ্ডবিক' আছে, কেবল 'খাণ্ডবিক' নাই; উহার অর্থও বিভিন্ন। সুতরাং 'ময়রা' অর্থ বিবেচ্য। (ব.শ.)। পাণ্ডবগণ যমুনাতীরস্থ খাণ্ডবপ্রস্থে ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে ইন্দ্রপ্রস্থ নগর স্থাপন করে বসবাস করতে থাকেন। একদিন কৃষ্ণার্জুন যমুনায় জলবিহারের পরে যমুনাতীরস্থ খাণ্ডববনের সন্নিকটে পানভোজনে রত ছিলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণবেশে অগ্নি তাঁদের কাছে এসে খাণ্ডববন দগ্ধ করার জন্য তাঁদের সাহায্যাভিলাষী হন। শ্বেতকি রাজার যজ্ঞে দ্বাদশ বৎসর ঘৃতপান করায় তাঁর অগ্নিমান্দ্য হয়। ব্রহ্মা তাঁকে বলেন যে, খাণ্ডববন দগ্ধ করে সেখানকার প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ করলে তাঁর অজীর্ণ রোগ দূর হবে। খাণ্ডববন ইন্দ্রের প্রিয় ছিল। অগ্নি এর আগে সাতবার এই বন দগ্ধ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সহস্র সহস্র হস্তী শুণ্ড ও নাগগণ মস্তক সাহায্যে জলসেচন করার ফলে তিনি ব্যর্থ হন। কৃষ্ণার্জুন অগ্নির সাহায্য করতে সম্মত হন, কিন্তু তাঁরা নিরস্ত্র বলে অগ্নি বরুণের নিকট থেকে অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ ও কপিধ্বজ রথ এবং কৃষ্ণকে কৌমোদকী গদা ও সুদর্শন চক্র দান করেন। সশস্ত্র কৃষ্ণার্জুন ইন্দ্রের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও খাণ্ডববন দহন

করতে সাহায্য করে অগ্নিকে তপ্ত করেন। পনেরো দিন ধরে অগ্নি এই খাণ্ডববন দগ্ধ করেন। সেখানকার সমস্ত জীবের মধ্যে ময় নামক দানব, তক্ষক নাগের পুত্র অশ্বসেন ও চারিটি মাত্র শার্ঙ্গক পক্ষী রক্ষা পায়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. মহাভারতের ইতিহাস বোঝার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। খাণ্ডবকে বুঝতে হলে মনে রাখতে হয়, রাষ্ট্রীয় পুঁজি বা সূর্য্য রৌদ্র রূপে ক্ষমতার তাপ দিয়ে প্রজাদের থেকে সম্পদ নিয়ে আসে; আর ধনতান্ত্রিক পুঁজি বা চন্দ্র জ্যোৎস্না দিয়ে মোহিত করে বা মোদিত করে প্রজাদের সম্পদ আহরণ করে। সেই সুবাদে পণ্যপুঁজির চরিত্র অনেকটা মোদকদের মতো, যাঁরা খণ্ড খণ্ড পণ্যরূপ মিষ্টান্ন বানান। সেই খণ্ডের নামই বীরখণ্ডী, কদমা, শ্রীখণ্ড প্রভৃতি। এই খাণ্ডবই মোদককারক বা ময়রাদের বন (সংসার-অরণ্য) অর্থাৎ যেখানে ময়রাদের অনেক **'দোকানদানি'** আছে, এরকমই একটি অঞ্চলের কথা। স্বভাবতই এর নিহিতার্থ হল — যেখানে ঘরে ঘরে বীরখণ্ড বা শ্রীখণ্ডের মতো উপাদেয় পণ্য উৎপাদন কর্ম চলে। এই খাণ্ডববনের অধিপতি ছিলেন ব্যক্তিমালিক ইন্দ্র অর্থাৎ যৌথব্যবস্থার গর্ভে বেড়ে ওঠা 'আমি'। মনে রাখা ভালো, এই ইন্দ্রের পুত্রই অর্জ্জুন বা সাদা টাকা ও তার মালিকেরা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কালো টাকা ও তার মালিকগণ। পুঁজি বা অগ্নির বা তেজের দাবিতে তখনকার সমাজ কুটির শিল্প থেকে পাইকারি উৎপাদনে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। কৃষি উৎপাদনকে পাইকারি উৎপাদনে পরিণত করা হয়েছিল জনক রাজার কালে, বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে (বা অশোকের কালে। ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বুদ্ধের জন্ম হলেও, দেশের শাসনক্ষমতা দখল করেছিল সে অশোকের কালেই।)। আর কুটির শিল্পকে পাইকারি শিল্পে উন্নীত করা হয়েছিল বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্নে। পুঁজির এই পাইকারি-উৎপাদন-চেষ্টাকেই অগ্নির প্রার্থনা বলা হয়েছে। পুঁজির এই দাবিতে ইয়োরোপে কুটির শিল্পের বন ধ্বংস করে দেওয়ার ঘটনার নামই শিল্পবিপ্লব। ভারতবর্ষে সেই ঘটনা ঘটেছিল গোবর্দ্ধন (পণ্যবর্দ্ধন), রাজ্যবর্দ্ধন (সাম্রাজ্যবাদ), হর্ষবর্দ্ধন (আনন্দবর্দ্ধন)-এর রাজত্বকালে। বঙ্গদেশে তারই চূড়ান্ত একটি রূপের নাম গোপাল, দেবপাল, ধর্মপাল ইত্যাদি রাজাদের কাল।

খান (খানা, খানি, খানিক, খানেক, একখান, একখানি) : ১. খান + ইক, এক। ২. *খান = খন (**ক্ষণ্ড**) হইতে জাত*। ৩. খণ্ড, খান, টুকরা, তৎস্বরূপ, তদ্‌বস্তু, টি, বিন্দু, টু, মাল্যযষ্টি, ছড়া, পরিমাণ, কিয়ৎকাল, কিছুক্ষণ, একটু, একদিন, অল্প, ক্ষণ, কাল; কিয়দংশ, কিঞ্চিৎ, অত্যল্প, কিছু, ঈষৎ, অণুমাত্র, আংশিকভাবে; প্রায় এক, প্রায় পুরা। ৪. unit অর্থে প্রচলিত। ৫. ক্ষ-করে যে খণ্ড পাওয়া যায়, তার প্রতিটিকে একখণ্ড বা একখান বলে। একখান-এর আধারকে বলে একখানা। এই খণ্ডটি যদি গতিশীল বা বিকাশশীল হয়, যেমন দেহকোষ-জাতীয় কিছু, তবে সেক্ষেত্রে সে হল একখানি। 'একটুখানি' হলে, তার অর্থ 'আরেকটু' পালটে যায়। একে 'একটি' বা 'একটু'ও বলে, বলে 'টা' বা 'টি' কিংবা 'টু'ও। দ্র. **টা**।

খন্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অখাত, অভিমুখ, অনামুখ, **অনামুখো, আখনিক**, আখাত, আখু, আখুবাহন, আখুরথ, **আখুভুক্, আখুভুজ্ঞ, আমুখ, উৎখাত**, খ, খগ, খন্, খন, খনক, খনকাল, **খনখন, খনতি**, খনতী, খনন, খনা, খনি(নী), খনিত, খনিতা, **খনিত্র, খনিল, খন্তা**, খন্তিক, খন্তিকা, খন্দ, খন্দ, খন্দক, খন্দকার, **খন্ধ, খাত, খাতক**, খাতা, খাতির, খাতেমা (খাতিমা, খতম), খানা, খুল, খেয়, খোদ, খোদা, খোদাই, খোদিত, খোন্তা, খোলা, দুঃখ, নিখনন, প্রমুখ, বিমুখ, বিমুখী, মুখ, মুখকমল, মুখ-করা, মুখগত, মুখগ্রহণ, মুখঘণ্টা, মুখচঙ্গ, মুখচন্দ্র, মুখচন্দ্রমাঃ, মুখচন্দ্রিকা, মুখচপল, মুখচাপল্য, মুখচপেটিকা, মুখচিরা, মুখচূর্ণ, মুখচোরা, মুখছানি, মুখছোপ্পা, মুখচ্ছদ, মুখচ্ছবি, মুখজ, মুখজন্মা, মুখজোর, মুখঝামটা, মুখটি(টী), মুখড়, মুখতঃ, মুখদূষি, মুখদূষিকা, মুখ-দেখান, মুখদেখানী, মুখদোষ, মুখধাবন, মুখনল, মুখনাড়া, মুখনালি(লী), মুখপঙ্কজ, মুখপট, মুখপ(ফ)টকা, মুখপদ্ম, মুখপাক, মুখপাত, মুখপাত্র, মুখপূরণ, মুখপোড়া, মুখপ্রসাদ, মুখপ্রিয়, মুখপ্রেক্ষী, মুখফোঁড়, মুখফোঁড়া, মুখফোটা, মুখবন্ধ, মুখবন্ধন, মুখবাজি, মুখবাদ্য, মুখবাস, মুখবাসন, মুখবীথি, মুখবুক, মুখব্যাদন, মুখভঙ্গ, মুখভঙ্গি, মুখভেদ, মুখমণ্ডন, মুখমণ্ডল, মুখমদ, মুখমধু, মুখমারুত, মুখমার্জ্জন, মুখমিঠে, মুখমিষ্টি, মুখমুদ্রা, মুখযন্ত্রণ, মুখর, মুখরক্ষা, মুখরজ্জু, মুখরন্ধ্র, মুখরা, মুখরাগ, মুখরিকা, মুখরিত, মুখরী, মুখরীকৃত, মুখরুক্ (-জ্), মুখরুচি, মুখরেখা, মুখরোগ, মুখরোচক, মুখলাজ, মুখলেপ, মুখশ(ষ,স), মুখশশী, মুখশালা, মুখশুদ্ধি, মুখশোধন, মুখশোধী, মুখশোষ, মুখশ্রী, মুখসন্ধি, মুখসম্ভব, মুখসাট, মুখসাপট, মুখসুখ, মুখস্রাব, মুখহাস, মুখোষ (মুখোস, মুখকোশ), মুখস্থ, মুখা, মুখাকার, মুখাগ্নি, মুখাগ্র, মুখাদিম (মোকাদিমা, মোখাদিম, মুকদ্দম), মুখানল, মুখানি, মুখানিল, মুখাপেক্ষ, মুখাপেক্ষী, মুখাজ, মুখাম্বুজ, মুখারবিন্দ, মুখাময়, মুখামুখি (মুখামুখী, মুখোমুখি, মুখোমুখী), মুখামৃত, মুখারি, মুখাসব, মুখি(খী), মুখেন্দু, মুখো (পুবমুখো), মুখোপাধ্যায়, মুখোষ, মুখোমুখি(খী), মুখোস, মুখখী, মুখখু, মুখ্য, মুখ্যকুলীন, মুখ্যচান্দ্র, মুখ্যতঃ, মুখ্যনৃপ, মুখ্যপতি, মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যরাট্(জ্), মুখ্যসর্গ, মুখ্যাটী, মুখ্যার্থ, মুখ্যিকুলীন, মুখ্যী, মুচঙ্গ, মুরসঙ্গ, মোচঙ্গ, মোচোং, মৌখ, মৌখর্য্য, মৌখিক, শতমুখ, সমুখ, সম্মুখ, সাম্মুখ্য, সুমুখ।

খন্ = ক্ষ (খাবলানো) অন। **খন** = ক্ষ (খাবলানো) অন থাকে যাহাতে।

খ : ১. ✓খন্ + অ (ড) - ক। (ব.শ.)। ২. *করণ স্থিত হয় যাহাতে*। ৩. আকাশ, উদরাদ্যবচ্ছিন্ন বা দৈহিক আকাশ, শিরঃস্থিত ইন্দ্রিয় — চক্ষুঃকর্ণাদি, বিন্দু, শূন্য, শব্দতন্মাত্র, ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র — চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা মুখ পায়ু উপস্থ এই নব ছিদ্র, ৯ সংখ্যা, অনুস্বার চিহ্ন, স্বর্গ, পুর, ক্ষেত্র, অভ্র ধাতু, ব্রহ্মাকাশ, শর্ম্ম, সুখ, কর্ম্ম, সংবেদন, জ্ঞান, লগ্ন হইতে দশম স্থান। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. করণ স্থিত হয় নানা ভাবে। আমরা একটি বই ছাপলাম, আপনি তা কিনে নিয়ে গিয়ে পড়ে ফেললেন, আর রামবাবু বইটা উল্টেপাল্টে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যাচ্ছেতাই'! তাহলে ছাপার পরে আমাদের বইটি গিয়ে থামছে কোথায়? উত্তর হল ঘটাকাশে (পণ্যাকাশে), যেখানে প্রবাহিত

থাকে আকাশগঙ্গা। আপনি দাম দিয়ে বইটি হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়েছেন সেই আকাশগঙ্গার প্রবাহ থেকে। এরপর বইটির থেকে জ্ঞানার্জন করলেন আপনি, আপনার সে জ্ঞানার্জন গিয়ে থামল কোথায়? আপনার মনোলোকের আকাশে, যার আরেক নাম চিদাকাশ। আপনার জ্ঞানার্জন যদি বেশ আলোকময় হয়, তাহলে আপনার চিদাকাশে গিয়ে তা গ্রহনক্ষত্রের মতো ঝিকমিক করতে থাকবে, অন্যথায় হারিয়ে যাবে চিদাকাশের অন্ধকারে। কিন্তু রামবাবু যে চেঁচিয়ে উঠলেন, তাঁর এই চিৎকার গিয়ে কি কোথাও থামে? আধুনিক বিজ্ঞান বলছে, হ্যাঁ থামে। থামে গিয়ে পার্থিব আকাশে, এখন আমরা যাকে sky বলি। আপনি 'খক্-খক্' শব্দ করে কাশলেও আপনার সেই 'খক্-খক্' শব্দ এই আকাশে গিয়েই থামে; কারণ এই আকাশ শব্দগুণসম্পন্ন। আওয়াজ মাত্রেই তার আশ্রয় পায় এই আকাশে। পার্থিব আকাশের (sky-এর) উপরে নাকি স্তর স্তরে সেই সব চিৎকার জমা হয়ে থাকে। তার মানে করণ যেখানে যেখানে থামে সবই খ-পদবাচ্য। তা সে পার্থিব খ, মনোলোকের খ, পণ্যলোকের খ, সবই হতে পারে। ৬. ইংরেজি sky।

খগ : ১. খ + গম্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *খ-এ গমন করে যে।* / যে আকাশে যায়। (ব.শ.)। ৩. সূর্য্য, গ্রহ, দেব, পক্ষী, মক্ষিকা, বায়ু, বাণ, গরুড়। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. জ্ঞান ও পণ্যমাত্রেই যথাক্রমে চিদাকাশে ও ঘটাকাশে যায়, কিন্তু বঙ্গীয় শব্দকোষ তাদের কথা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলেননি। বলেছেন, পার্থিব আকাশে যারা যায় (যথা sun, planet, bird, fly, air) ও সামাজিক আকাশে যারা যায় (যথা যৌথ-রাজকোষ, সামাজিক মর্যাদাবান গ্রহণকারী, বিনিময়-জীবী, দোকানদার, উটকো লোক, মিডিয়া, এবং আইনব্যবসায়ী) তাদের কথা। পুরাণাদিতে অবশ্য গরুড়কে বোঝাতে খগ, খগেন্দ্র, খগেশ্বর, খগাধিপ প্রভৃতি শব্দ বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দের সঙ্গে উড়িষ্যাবাসীদের পরিচয় ঘটে শৈশবেই। তাঁদের বর্ণমালাশিক্ষার শুরুতেই থাকে — 'ক-এ কনকলোচন শ্রীহরি, খ-এ খগ আসনে মুরারি'; ইত্যাদি। কিন্তু এই সত্তাটি কে, সেকথা কেউ জানেন বলে মনে হয় না। আমরা এখানে জানলাম, সমাজের আকাশে উড়ে বেড়ানো সত্তাদেরও খগ বলে; পুরাণ অনুসারে তিনি গরুড় বা আইনব্যবসায়ীও বটে যিনি বিষ্ণুর (নগদ-নারায়ণের?) বিশেষ বাহন।

খচর : ১. খ + ✓চর্ + অ (ট) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *খ-এ চরে যে।* ৩. খেচর, আকাশচারী, শূন্যগামী, মেঘ, সূর্য্য, বায়ু, রাক্ষস, পক্ষী, গ্রহ, বিদ্যাধর, আকাশগামীমাত্র — দেবতা-শর-প্রভৃতি। খচরী = রাক্ষসী, হিড়িম্বা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. একালের ইংরেজি প্রভাবিত দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা cloud-কে মেঘ, sun-কে সূর্য্য, air-কে বায়ু, bird-কে পক্ষী, planet-কে গ্রহ, monster-কে রাক্ষস, এবং educated person-কে বিদ্যাধর বুঝি। এভাবে বোঝার ফলে গ্রহ পর্যন্ত বেশ মিলেও যায়। কিন্তু যেই না রাক্ষস ও বিদ্যাধরে আসি, কিছুতেই বুঝতে পারি না, তারা কীভাবে আকাশে চরে বেড়ায়! তখন রাক্ষসকে চিনতে যেতে হয়। দেখা যায়, তার অস্তিত্ব বাস্তবিক নয়, মানসিক। মানুষের মন, সমাজের মন রাক্ষস নামক জীবটিকে ধরে রেখেছে। **এ হল এমন সামাজিক সংগঠন, যা সামাজিক সম্পদ দেখভালের দায়িত্ব নেয়, সেগুলিকে 'রক্ষা করব'** বলে, কিন্তু রক্ষা করে না, খেয়ে ফেলে'; **তাই তাদের 'রাক্ষস' বলে।** একালের উদাহরণ দিই। যেমন আমাদের **West Bengal State** Electricity Board, সে আমাদের বিদ্যুৎ সম্পদ রক্ষা করবে বলে, জনসাধারণের থেকে যতটুকু বিদ্যুৎ যাকে দেয়, তার দাম নেয়; কিন্তু প্রায় সবটাই খেয়ে ফেলে। বিষয়টিকে ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলে বোঝা যায়, sky ছাড়াও আর একধরণের আকাশ আছে, সেটা সমাজের মনোলোকের আকাশ। সেই আকাশে ঘুরে বেড়ায় এই রাক্ষসেরা। এদেরই সঙ্গীসাথী বিদ্যাধরেরা, যারা টাকা নিয়ে বিদ্যা বিক্রয় করে এবং তথাকথিত লেখাপড়ার সাহায্যে মানুষকে ভুলপথে চালিত করে। এই পর্যন্ত পৌঁছনোর পর অকস্মাৎ কথাটি মাথায় ঢুকে যায় যে, আকাশ তাহলে অনেকগুলিই! এবং সব আকাশে সব আকাশগামী সত্তারা চরে বেড়ায় না। কেউ একটিমাত্র আকাশে চরে বেড়ায়, কেউবা দুই তিনটি আকাশে, কেউবা সবক'টিতেই চরে বেড়ায় এবং সব আকাশে তাদের আমরা এক নামে চিনি না। যেমন বায়ুকে sky-আকাশে আমরা চিনি air নামে, সমাজমনের আকাশে চিনি 'মিডিয়া' বা 'প্রচার' নামে। দ্র. **বায়ু**।

তা সে যাই হোক, এখানে আমরা দেখছি, খচর আর খেচর, দুটি শব্দে 'খ' ও 'খে' উভয়েই 'আকাশ'কে বোঝাচ্ছে। কিন্তু আমাদের বর্ণভিত্তিক ভাষায় বানান বদলে গেলে মানেও বদলে যাওয়ার কথা। এক্ষেত্রে তাই খ ও খে-র মধ্যে নিশ্চয় পার্থক্য রয়েছে। যতদূর বোঝা গেছে — খ হল আকাশ, আর খে হল দক্ষ-জ্ঞানকর্মের আবির্ভাবের পরবর্তীকালের দিশাগ্রস্ত আকাশ। প্রাচীন শব্দকারগণ সেজন্যই 'খচর' শব্দের প্রয়োগ 'খেচর' রূপেও করতেন। (দ্র. **খচ্চর**)।

খনন (খনক, খনতি, খনতী, খুন্তি, খন্তা, খোন্তা, খনিত্র) : ১. ✓খন্ + অন; ✓খন্ + অক; ✓খন্ + ত - ই। ... (ব.শ.)। ২. *খ (বা খাত করে নেওয়া) অন যাহাতে সেটি* ***খন****। সেই খন করে যে, সে হল* ***খনক****। সেই খন অন যাহাতে, তাকে বলে* ***খনন****। সেই খননের তারণ গতিশীল যাহাতে তাকে বলে* ***খনতি****। সেই খনতির ধারককে বলা যায়* ***খনতী****। ... ...* / **খনক** = সুড়ঙ্গ দ্বারা গুপ্তমার্গ তৈরি করে যে। (ব.শ.)। ৩. অবদারণ, বিদারণ, খোঁড়া; বিদারক, খননকর্ত্তা, 'খননশিল্পী', সন্ধিচৌর, সিঁধেল চোর, সুড়ঙ্গকারক, কূপবাপীনির্মাতা, খননদক্ষ, মূষিক, ভূমিবিত্তজ্ঞ অর্থাৎ স্বর্ণাদির উৎপত্তিস্থানজ্ঞ, আকর; খুনতী, অস্ত্রবিশেষ। ৪. খনন digging অর্থে, খনতি-খনতী-খুন্তি-খন্তা-খোন্তা spud অর্থে প্রচলিত, অন্য দুটি অপ্রচলিত।

খন্দ (খানা, খানাখন্দ) : ১. খন + দ। ২. *খাত (খাতজমি) যে ফসল দান করে; যার খাত অংশ (অন্যত্র) ক্ষিপ্ত হয়েছে।* ৩. **শস্য**, ফসল, মটর মুগ প্রভৃতি শীতের শস্য, রবিশস্য; **খাত, খাই, লম্বা** গর্ত্ত, কূয়া, গড়খাই, পরিখা। (ব.শ.)। **খানাখন্দ = খানা ও খন্দ**, লম্বা গর্ত ও খুঁড়ে রাখা ফসুলে জমি। **৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. খানা**

শব্দটি 'ভোজ' অর্থে উর্দু বা হিন্দি থেকে আগত, এবং গৃহ বা স্থান অর্থে ফারসি থেকে আগত বলা হয়। কিন্তু মূলে তাকালে দেখা যায়, ভোজ মানেই 'যা খাত করে করে মুখে পোরা হয়'; এবং গৃহ বা স্থান মানেও 'যা খাত কেটে বানানো হয়েছে'। সেই কারণে খানাপিনাতেও 'খানা' থাকে, গরীবখানাতেও 'খানা' থাকে। তাছাড়া আমরা তো জানিই — খন্দ শব্দটি অনেক ক্ষেত্রে বড় গর্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেখানে অনেক কিছু থাকতে পারে।

খাত (খাতক, খাতা) : ১. ✓খন্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *খনন কৃত যাহাতে; (খাত করে যে; খাত আশ্রিত যাহাতে)।* ৩. কৃতখনন, অবদারিত, নিষ্কুষিত, জারিত, ছিন্ন, বিদ্ধ, ভূমিনিহিত, নিখাত; পুষ্করিণী, গর্ত্ত, বিল, পরিখা, গড়খাই, কূপ, গুহা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. খেলার মাঠে গর্ত করে এক ঝুড়ি মাটি কেটে নেওয়া হল। 'খনন কৃত যাহাতে' বা 'খাত' এখানে দুটি সত্তা। মাঠের গর্তটি যেমন খাত, ঝুড়ির মাটিও তেমনি খাত। এই খাত করে যে, সেই খাতক। তার মানে, গর্ত করে ঝুড়িতে করে মাটি তুলে নিয়ে যায় যে, সে হল **খাতক**। কিন্তু সেই গর্তটি যদি সে মাঠে না করে আপনার টাকার থলিতে, মানিব্যাগে কিংবা ব্যাঙ্ক-অ্যাকাউন্টে করে, তবে সে আপনার **খাতক**। আর সেই খাতকের নাম আপনি যেখানে লিখে রাখেন, তাকে বলে **খাতা**।

খাতেমা (খাতিমা, খতম) : ৩. শেষ, চূড়ান্ত। সমাপ্তি, শেষ, মরিয়া-যাওয়া। (ব.শ.)। সমাপ্তি, পরিণাম, মৃত্যু। (আরবি-ফারসী অভিধান — কাজী রফিকুল হক।) ৪. 'খতম পড়া' রূপে শব্দটি বাংলাভাষী মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। ৫. ক্ষত শব্দের একটি অর্থ ছিন্ন করে ফেলা। একে হত বা নিহতও বলা হয়। মানুষ তো ঝাঁক-জীব। তার ঝাঁক থেকে, পরিবার থেকে কাউকে ছিন্ন করে নেওয়া হয় তার মৃত্যুর মাধ্যমে। একে ক্ষতং বলা চলে। এই ক্ষতং শব্দটি যে ক্রিয়ামূল থেকে জন্মেছে, সেই বংশেই আরবিতে খতম, খাতিমা বা খাতেমার জন্ম ও বিবর্ত্তন ঘটেছে। **খতম** শব্দটিকে আমরা ক-বর্গে '**ক্ষ**' শব্দে পৃথকভাবে আলোচনা করেছি।

মুখ : : ১. ✓খন্ + অ (অচ্) - কর্ম্মবাচ্যে, করণবাচ্যে, ডিৎ, 'মু' (মুট্) আগম। (ব.শ.)। ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়িত খননসাধন (রহে) যাহাতে।* / বিধাতা কর্তৃক খাত; যাহার দ্বারা খাদ্যখনন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. মুখোপলক্ষিত সমুদয় মুখভাগ, বদনমণ্ডল, শিরঃ, মুখস্বরূপ প্রতিনিধিবক্তা, মুখপাত্র, পক্ষিচঞ্চু, পোত্র, গৃহাদির নিষ্ক্রমণ-প্রবেশপথ ... ... (ব.শ.)। (শব্দটির আরও অজস্র অভিধা-অর্থ, শবল-অর্থ ও ব্যঞ্জনা-অর্থ ব.শ. দিয়ে গিয়েছেন, আমরা এখানে কয়েকটি মাত্র দিলাম।) ৪. যথার্থে ও অজস্র ব্যঞ্জনার্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ৫. সত্তা মাত্রেরই গ্রহণ ও বর্জন করার বাধ্যবাধকতা থাকে। সত্তা তার যে অংশে সীমায়িত হয়ে এই গ্রহণের কাজ (এবং কখনো কখনো বর্জনের কাজ) চালায়, সেই অংশটি তার মুখ। এটি জীবের মুখ, গৃহের মুখ, নদীর মুখ ... যা খুশি হতে পারে। অবশ্যই সেই মুখে একটি 'হাঁ' বা শূন্যস্থান থাকবেই, যেখানে থাকবে আগ্রহ বা গ্রহণ করবার ইচ্ছা এবং গৃহীত বস্তুকে গ্রহণ করবার (কিংবা বর্জ্য বস্তুকে ত্যাগ করার বা দানের) ব্যবস্থা। মানুষের ক্ষেত্রে এই মুখ যেমন খাদ্যগ্রহণের কাজ চালায়, তেমনি আত্মপ্রকাশের কাজটিও চালায়, বক্তব্য ত্যাগ করে বা দান করে, কথা বলে। একটি সামাজিক সংগঠনের মুখও একই ভাবে তার মুখের মাধ্যমে গ্রহণ করে, বর্জনও করে। সামাজিক সংগঠনের যে মুখ বর্জন করে, তাকে মুখপাত্র বলে। ঘর থেকে বেরিয়ে যেদিক দিয়ে বাইরে যাওয়া যায়, কিংবা গণ্ডগ্রাম থেকে বেরিয়ে যেদিক দিয়ে শহরে যাওয়া যায়, সেই দিকটিকে যথাক্রমে ঘরের মুখপাত ও গ্রামের মুখপাত বলে। ... শব্দটির যথার্থে ব্যাপক প্রয়োগ প্রচলিত রয়েছে। ৬. ইংরেজি mouth; জারমান mund (বাংলা মুণ্ড বা মুণ্ডু)।

খা (খাদ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অখদ্যে-অবদ্যে, অখাদ্য, খা, খাআ, খাই, খাইএ, খাইখালাসী, খাইদ, খাইশ, খাউই, খাওন, খাওন্দ, খাওয়া, খাঁ, খাঁই, খাঁক, খাঁ(খা)কতি, খাঁকরা, খাঁকরি, খাঁ(খেঁ)কার, খাঁকা(খা)র, খাঁখাঁ, খাঁচ, খাঁচা, খাঁজ, খাঁট, খাঁটি(টী), খাক, খাকার, খাকী, খাখা, খাগ, খাগড়া, খাগী, খাজনা, খাজা, খাজাঞ্চি(ঞ্চী), খাঞ্চা (খঞ্চা), খাঞ্জা, খাদ্, খাদ, খা'দ (খাইদ), খাদক, খাদা, খাদান, খাদি(দী), খাদিম, খাদী, খাদ্য, খান্, খান, খানক, খানকা, খানকী, খানপান, খামকা, খাম(মো)খা, খানসামা, খানা, খানেখরাব, খানেখারাপ, খাব, খাবল, খাবলা, খাবা, খেশ্, খেশকো, খোড়েখাড়ে।

খা (খাদ্) = যাহাতে অন্য অবয়বকে ক্ষ (খাত) করা হয়; খ-করণ চলে যাহাতে। **খাদ** = খা দেওয়ন থাকে যাহাতে; যাহা খাদিত হইয়াছে অথবা যাহা খাদিত বা ছেদিত হয়ে আলাদা করে নেওয়া দরকার।

খা, খাওয়া : ১. খ্ (ক্ষ) + আ। ২. *যাহাতে অন্য অবয়বকে* **ক্ষ** *(খাত) করা হয়; খ-করণ চলে যাহাতে।* ৩. ভোজন করা, দংশন করা, ভোগ করা, গ্রহণ করা, পান করা, বিপন্ন করা, নষ্ট করা, কলঙ্কিত করা, আত্মসাৎ করা ...; ভক্ষণ করা, পান করা, উপভোগ করা। ৪. eating অর্থে প্রচলিত। ৫. খাওয়া শব্দটি কোথা থেকে এসেছে, তাই নিয়ে আমাদের পূর্বসূরি অনেকেই অত্যন্ত সংশয়গ্রস্ত হয়েছেন। খ-কে আকাশ ধরলে অন্য অর্থগুলির সঙ্গে তা যেমন মেলে না, স্খলন ধরলে আর একদিকে অসংগতি দেখা দেয়। আমরা তাঁদের সমস্ত চেষ্টাগুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে স্থিরনিশ্চিত হয়েছি যে, এর মূলে রয়েছে **ক্ষ**। সবচেয়ে কাজের কথা হল, এই ক্ষ-কে মূল ধরলে খা-সংক্রান্ত শব্দসমূহের অর্থনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে আর কোনো অসংগতি থাকে না। তাছাড়া আমরা হাত দিয়ে ছিঁড়ে বা দাঁত দিয়ে কামড় দিয়ে রুটি, পিঠা, বা কেক যেভাবে খেয়ে থাকি, তাতে এই 'খা' ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যায়। তাই সেভাবেই 'খা' শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দেওয়া হল। দ্র. গা।

খাই, খাদ, খাঁই, খাঁকতি : ১. খা (ক্ষা) + ই। ২. ***খাই, খাদ*** = *যাহা খাদিত হইয়াছে অথবা যাহা খাদিত বা ছেদিত হয়ে আলাদা করে নেওয়া দরকার;* ***খাঁই*** = *খাদ করিবার অতি ইচ্ছা থাকে যাহাতে;* ***খাঁকতি*** = *খাদিত দ্বারা পূর্ণ করিবার মতো ফাঁক থাকে যাহাতে*। ৩. খাত, পরিখা, খানা, গর্ত্ত, গভীরতা, স্বর্ণাদির খাদ; আকাঙক্ষা, তৃষ্ণা, লাভেচ্ছা, লিপ্সা; অভাব, অসঙ্গতি, কমী, রিক্ততা, দারিদ্র্য, শূন্য, খালি। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. খাই আর খাঁই শব্দ দুটির ভিতরে একটি চন্দ্রবিন্দুর পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য হল ক্ষ ও ক্ষং-এর মধ্যেকার পার্থক্য। ক্ষং-এ 'ং' রয়েছে বলে, খাঁই শব্দটির মধ্যে অসীমতা ও রহস্য রয়েছে, খাই-এর মধ্যে যা নেই। খাই সুনির্দিষ্ট, সসীম। খাঁই-এর মধ্যে যে অসীমতা রয়েছে, সেই অসীমতা খাঁকতি, খাঁখাঁ প্রভৃতি চন্দ্রবিন্দু যুক্ত সকল শব্দ সম্পর্কে বলা যায়।

খাঁখাঁ, খাখা : ২. *খাই খাই ভাব কিংবা প্রবল খাঁই থাকে যাহাতে*। ৩. ভীষণ শূন্যতাসূচক ভাব, 'খাঁও-খাঁও' (খাই খাই) ভাবাত্মক, (উদর শূন্য হইলে ক্ষুধিত যেমন খাঁখাঁ (খাই খাই) করে, সেইরূপ শূন্য গৃহাদি যেন খাইতে আসে।)। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. খাই আর খাঁই-এর পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। সন্দেহ হয়, যেখানেই চন্দ্রবিন্দু থাকে, সেখানেই ক্রিয়াটি (এক্ষেত্রে খাওয়া ক্রিয়াটি) অপরিমেয় ও রহস্যগুণসম্পন্ন। সেই কারণে রহস্যময় রাক্ষসেরা 'হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ' বলে থাকে; পেত্নিদের ভাষাতেও চন্দ্রবিন্দুর প্রাবল্য। তাদের ইচ্ছেকে মাপা যায় না এবং তা রহস্যময়। সেই বিচারে 'খাঁ খাঁ রোদ্দুর' হওয়াই সমীচীন মনে হয়। এক্ষেত্রে 'খাখা' কথাটি ঠিক নয়।

খাঁটি : ২. *'আমি ক্ষালনকৃত' — এই টঙ্কার থাকে যাহাতে*। ৩. বিশুদ্ধ, অমিশ্র, অকৃত্রিম, সাঁচ্চা, নির্জ্জল, নির্দ্দোষ, নিখুঁত, অকপট, সত্যবাদী, সরল, দ্বৈধশূন্য, একান্ত, একাগ্র, ন্যূনাধিকশূন্য অর্থাৎ যাহা কম বা বেশি নয়, ঠিক, পূরা, যথার্থ, স্থির, নিশ্চিত, ব্যাভিচারহীনা, সতী। (ব.শ.)। ৪. pure অর্থে প্রচলিত। ৫. যার মন্দ, ত্রুটি, দূষণ ইত্যাদি ক্ষালন করা হয়ে গেছে, তাই ক্ষাং বা খাঁ। তার টঙ্কার গতিশীল থাকলে বা চলতে থাকলে তাকেই খাঁটি বলা যায়।

খাংরা, খেংরা : ২. *খাং (ক্ষাং) রহে যাহাতে; যার দ্বারা দেহীর দেহ হইতে দোষ ক্ষালন করা হয়*। ৩. সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা। (ব.শ.)। ৪. broom অর্থে প্রচলিত। ৫. **ক্ষ** (খ) মানে আমরা জেনেছি, অন্য অবয়ব থেকে কেটে কেটে একটু একটু করে নিয়ে নেওয়া। কিন্তু সেটি যখন অন্য-অবয়বের দোষ বেছে বেছে কেটে নেওয়া হয়, কাজটি রহস্যজনক ও অপরিমেয় গুণসম্পন্ন হয়; তাই ক্ষাং। সেই ক্ষাং বা খাং রহে যাহাতে, তার আধারকে তাই খাংরা বলে। সেই ক্ষাং ক্রিয়াটি একই কর্মের পুনরাবৃত্তির কারণে দিশাগ্রস্ত হলে সেটি 'খেংরা' পদবাচ্য হয়ে যায়। ৬. ??

খাদক, খাওন, খাদন, খাদ্য (খাদান) : ১. খাদ্ + অক - ক। (ব.শ.)। ২. ***খাদক*** = *(গ্রহণযোগ্য বস্তুকে)* ***খাদ*** *বা* ***খাহ****-এর মতো কেটে কেটে খায় যে।* ***খাওন*** = *খা (ক্ষা) অন থাকে যাহাতে;* ***খাদন*** = *খাদ কাটা অন থাকে যাহাতে;* ***খাদ্য*** = *খাদ থাকে যাহাতে অর্থাৎ যে বস্তু থেকে খাদ কেটে গ্রহণ করা যায়;* ***খাদান*** = *খাদন-এর আধার যে।* / **খাদ্য** = যাহার দ্বারা খাদন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. ভক্ষক, ভোক্তা, অধমর্ণ; খাওয়া, ভক্ষণ, পান করা; **ভক্ষণ**, ভোজন; ভক্ষ্য। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. খদ্দর, খাদি বা খাদী বলে একধরনের কাপড় আছে। বঙ্গীয় শব্দকোষের সন্দেহ হয়েছে, শব্দটি 'ক্ষুদ্রাংশ' থেকে জাত কি না। আমাদের বিচারে **ক্ষ** ও দ যে ক্রিয়ার কথা বলে, তা কোনো না কোনোভাবে ওই কাপড়ের ভিতরে রয়েছে; তাই তা খদ্দর বা খাদি।

খা-এর দান থাকে যাহাতে তাকে খাদ বলে। এই খাদ অন (on) থাকে যাতে তাকে 'খাদন' বলে। আর সেই খাদনের আধার হল খাদান; যেমন বালিখাদান, কয়লাখাদান। এই খাদানগুলিতে খাদ কেটে কেটে আনা চলতে থাকে।

খিদ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : খনন, খিদ্, খিদমত, খিদ্যমান, খিন্ন, খেজায়, খেদ, খেদা, ঝুর, সখা, সখী, সখেদ, সখ্য, সখ্যতা, হেদা।

খিদ্ = ক্ষি-র (খিমচে নেওয়ার) দেওয়ন। **খিদ** = খিদ্ থাকে যাহাতে।

খেদ, খেদা : ১. ✓খিদ্ + অ - ভাববাচ্যে; ✓খেদি। (ব.শ.)। ২. ***ক্ষি****-র দিশাগ্রস্ত দানন যাহাতে; খেদ-এর আশ্রয় যাহাতে*। ৩. অবসাদ, দৈন্য, দীনভাব, গ্লানি, ম্লানভাব, শোক, ক্লান্তি, শ্রম, দুঃখ, বিষাদ, উপতপ্তীভাব, ব্যথিত ভাব, রোগ, দারিদ্র্য; খেদিত বা খেদযুক্ত করা, তাড়ান, ভাগান, খেদান, অপসৃত করা, দূর করা, আক্রমণার্থ অভিধাবন করা, অনুধাবন বা অনুসরণ করা, অপবারিত করা, চালিত করা, শিকারের অনুধাবন করা বা পশ্চাৎ তাড়াইয়া যাওয়া। (ব.শ.)। ৪. depression ও drive away অর্থে প্রচলিত। ৫. নিজের খানিকটা কেটে কাউকে দিয়ে যে আত্মরক্ষা করা হয়, সেই ক্রিয়াকে 'ক্ষিদ' বলে। একাদিক্রমে সেই ক্রিয়া চলতে থাকলে তাকে বলে 'ক্ষেদ'। এরকম ঘটনার দ্রষ্টা কিন্তু ব্যাপারটিকে দুরকম দেখতে পায়। সে দেখে, একজন নিজের খানিকটা দিয়ে দিয়ে পিছিয়ে পিছিয়ে চলে যাচ্ছে, আর অন্যজন প্রদত্ত বিষয় বা বস্তু নিতে নিতে তার দিকে এগিয়ে চলেছে এবং স্বভাবতই মনে হচ্ছে, সে যেন ক্ষি-দাতাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই ক্ষি-দানকারীর দিক থেকে ঘটনাটি তার ক্ষেদ, খেদ, অবসাদ, দৈন্য, ম্লানভাব ... দুঃখ, বিষাদ ইত্যাদি; কিন্তু অন্য দ্রষ্টার চোখে ঘটনাটি তাকে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া, তাড়ানো। ৬. ইংরেজি scathe; জারমান schade।

খ্যা ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অক্ষেআতি, অখেয়াতি, অখ্যাত, অখ্যাতি, অভিখ্যা, অসংখ্য, অসংখ্যক,

অসংখ্যাত, অসংখ্যেয়, আখ্যা, আখ্যাত, আখ্যাতব্য, আখ্যাতা, আখ্যাতি, আখ্যান, আখ্যানক, আখ্যায়িক, আখ্যায়িকা, আখ্যায়ী, আখ্যেয়, খিআ(য়া)তি, খেআ(য়া)তি, খ্যা, খ্যাত, খ্যাতি, খ্যাপক, খ্যাপন, প্রখ্যাত, প্রত্যাখ্যাত, প্রত্যাখ্যান, বিখ্যাত, ব্যাখ্যা, যথাখ্যাত, সংখ্যা, সংখ্যাতীত, সাংখ্য, সুখ্যাতি।

খ্যা = **খ**-গামীর (আকাশগামীর) আধার আশ্রিত যাহাতে; যাহা (অপরের মানসলোক) খনন করে, তাহার আধার; **খ্যাত** = যে খ্যা তারিত হইয়াছে; **খ্যাতি** = খ্যা তারণের ক্রমান্বয় বৃদ্ধি থাকে যাহাতে।

আখ্যা (আখ্যাত, আখ্যান, আখ্যায়িকা) : ১. আ + ✓খ্যা + অ (অঙ্) - করণবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *খ্যা-এর আশ্রয় যাহাতে; যাহা খ্যাত হইয়াছে; **আখ্যা** অন যাহাতে; **আখ্যান** কথিত হয় যাহাতে।* / আখ্যা = যাহা দ্বারা খ্যাত হয়। আখ্যায়িকা = যে বিষয় কবি স্বয়ং অথবা অন্য কেহ অনুভব করিয়াছেন। (ব.শ.)। ৩. শোভা, উক্ত, কথিত, সংজ্ঞিত, প্রকটিত, সূচিত। তিঙ্ রূপ প্রত্যয়, তিঙন্তপদ, ক্রিয়াপদ। কথন, উক্তি, বচন, বিজ্ঞাপন, নিবেদন, পূর্ব্বসংঘটিত বিষয়ের উক্তি বা বর্ণন, স্বয়ংদৃষ্ট বিষয়ের কথন, প্রতিবচন, উপাখ্যান, ইতিহাস, বৃত্তান্ত, আর্যমহাকাব্যান্তর্গত সর্গবিশেষ, ভেদক ধর্ম্ম, নাম, কথা, ব্যাপার, ঘটনা। উপলব্ধার্থা, ইতিহাস, আপনার কিম্বা অন্যের জ্ঞাত যে বিষয় তদর্থক যে গদ্যসমূহ সেই কথা, বিশিষ্টার্থতাৎপর্য্যক স্বকপোলকল্পিত যে বিষয় তদর্থক গদ্যসমূহ সেই কথা। (ব.শ.)। ৪. name ও story অর্থে যথাক্রমে আখ্যা ও আখ্যান প্রচলিত। বাকি দুটি কম প্রচলিত। ৫. দ্র. **খ্যা**।

খ্যা, খ্যাত, খ্যাতি (ব্যাখ্যা, সংখ্যা) : ১. খ (**ক্ষ**) + য, আ। ২. *খ-গামীর (আকাশগামীর) আধার আশ্রিত যাহাতে; **খ্যাত** = যে খ্যা তারিত হইয়াছে; **খ্যাতি** = খ্যা তারণের ক্রমান্বয় বৃদ্ধি থাকে যাহাতে।* ৩. কথন, প্রকাশন, প্রসিদ্ধি; প্রসিদ্ধ, অভিহিত, কথিত, বিজ্ঞাত, বর্ণন, প্রশংসা, জ্ঞান; যশঃ, কীর্ত্তি, নাম, দুর্নাম। (ব.শ.)। মহর্ষি ভৃগুর স্ত্রী। ইনি দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। এঁর সঙ্গে ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুর বিবাহ হয়। খ্যাতির গর্ভে লক্ষ্মী নামে কন্যা এবং ধাতৃ ও বিধাতৃ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। (পৌ.অ.)। ৪. যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. বহুরকম জন্তুজানোয়ার রয়েছে কনভয়টিতে, যাবে পাশের এক মেলায় প্রদর্শনী করতে। কনভয়টি বেরোনোর সময় গেটের সামনে শুরু হল পরীক্ষা নিরীক্ষা। মালিক একটু দূরে চেয়ার নিয়ে বসেছেন। গেটের কাছে দাঁড়িয়েছে এক কর্মচারী। গাড়ি বেরচ্ছে এক এক করে। কর্মচারীটি জোরে জোরে চেঁচিয়ে বলছে — একটি হাতি গেল। একটি বাঘ গেল। একটি উট গেল। ... এইরকম চলছে। এই যে চেঁচানো — 'একটি হাতি গেল' — একে বলে 'খ্যা'। খ মানে শব্দগুণসম্পন্ন আকাশ। সেই আকাশে যাচ্ছে একটি অর্থপূর্ণ জটিল আওয়াজ — 'একটি হাতি গেল'। এই যে 'অর্থপূর্ণ জটিল আওয়াজ', একে বলে খ্যা। এই খ্যা তারিত হয়ে যে পর্যন্ত যাচ্ছে এবং যতজন মানুষ তা শুনছেন, ততদূর পর্যন্ত কথাটি খ্যাত হচ্ছে। এই খ্যাত গতিশীল থাকলে আমরা তাকে খ্যাতি বলি। যে শব্দের সাহায্যে এই খ্যা করা হচ্ছে সেটি আখ্যা। এই আখ্যা অন হতে থাকে যে-কথামালায়, তাকে বলে আখ্যান। যার সম্পর্কে এই আখ্যা প্রযুক্ত হয়, সে হল আখ্যাত। সবচেয়ে বড় কালো জন্তুটির 'আখ্যাত' হল 'একটি হাতি'; কালো-হলুদ ডোরাকাটা জন্তুটির 'আখ্যাত' হল 'একটি বাঘ' ... ইত্যাদি। এই আখ্যাত জন্তুটিকে যদি নানা দিক থেকে দেখে আরও বিশেষভাবে আখ্যাত করা হয় — এর দৈর্ঘ্য সাত হাত, এর গায়ে খুব দুর্গন্ধ ... ইত্যাদি — তখন সেই বহুকথাযুক্ত আখ্যাকে ব্যাখ্যা বলে। আর যদি একটি করে জন্তু যাচ্ছে, কথক কর্মচারীটি চেঁচাচ্ছে আর মালিক একটি কাগজে একটি করে দাগ কাটছেন — তাহলে কর্মচারীর খ্যা-এর সমান হয়ে যাবে মালিকের দাগগুলি। এই সম-সংখ্যক খ্যা-কে বলে 'সংখ্যা' — কারণ, যতগুলি জন্তু বেরোল, ঠিক ততগুলি চিৎকারের বা খ্যা-এর দাগ রয়েছে মালিকের কাগজে। এই দাগগুলি জুড়ে নিলে বহির্গত জন্তুগুলির মোট সংখ্যা বা যোগফল পাওয়া যায়। তাই সংখ্যা করা মানেই গণনা করা।

আখ্যাত, বিখ্যাত, প্রখ্যাত, সুখ্যাত প্রভৃতি শব্দগুলি খ্যাতির নানা রূপের কথা বলে। অন্য দৃষ্টিতে এই খ্যা মানুষের মনোলোক দখল করার ব্যাপার; যতটা দখলে এসেছে, ততটাই খ্যাতি। আর ভৃগুর পত্নী প্রাচীন খ্যাতি হলেন সেই সম্প্রদায়, যাঁরা ভৃগুনীতির কথা খ্যাত করতেন, বিখ্যাত করতেন।

খ্যাপক, খ্যাপন : ১. ✓খ্যা + ই (ণিচ্) + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *খ্যা পালন করে যে; খ্যা পালন অন যাহাতে।* / যে খ্যাপন করে। (ব.শ.)। ৩. বাদয়িতা, জ্ঞাপক, নিবেদক, প্রকাশক, সূচক; খ্যাতিপ্রাপণ, প্রকাশন, কথন, সূচন। (ব.শ.)। ৪. কম প্রচলিত। ৫. দ্র. **খ্যা**।

খ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অক্ষোট, অক্ষোটক, আক্ষেটি, আক্ষোট, আক্ষোড়, অখট্টি, আখরোট, আখেট, আখেটক, আখেটি, আখেটিক, খ, খক্, খ-কার, খগ, খগম, খগাধিপ, খগান্তক, খগাসন, খগেন্দ্র, খগেশ, খগেশ্বর, খগোল, খচর, খচরা, খচারী, খজল, খদ্যোৎ, খধূপ, খপর, খবর, খবরদার, খবিচারী, খবি(বী)শ (খ-বিষ), খেচর, খোয়াব (খ-অব)।

খগম : ১. খ + গম। ২. *খ-তে গমন যাহার স্বভাব।* / আকাশে গমনকারী। (ব.শ.)। ৩. আকাশগামী, গন্ধর্ব্বাদি, বাণ, গন্ধর্ব্ব, পক্ষী, গগনচারীমাত্র। (ব.শ.)। তপোবলসম্পন্ন এক সত্যবাদী তপস্বী। সহস্রপাদ নামে এক ঋষিপুত্রের সঙ্গে এঁর বন্ধুত্ব ছিল। এই বন্ধু উপহাস করে একবার তৃণনির্মিত এক কৃত্রিম সর্প তৈরি করে খগমকে ভয় দেখান এবং তাতে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। পরে জ্ঞানলাভ করে সহস্রপাদকে শাপ দেন যে, সে বিষহীন ডুণ্ডুভরূপে (ঢোঁড়া) পরিণত হবে। পরে বন্ধুর কাতরতায় ও অনুনয়ে তুষ্ট হয়ে খগম বর দেন যে, প্রমতি-পুত্র রুরু-মুনির দর্শনে সে শাপমুক্ত হবে। রুরু

কর্তৃক শাপমুক্ত হয়ে ইনি আবার সশরীর প্রাপ্ত হন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **খচর**।

খচ্চর (খেসর, খচর): ১. খে + সর। ২. *আকাশে সরে সরে যায় যে; যে ক্ষচ্ (অন্য অবয়বের ক্ষুদ্রাংশ কেটে চয়ন) করার জন্যে চরে বেড়ায়; ক্ষ-করার (অন্য অবয়বের ক্ষুদ্রাংশ খাবলে নেওয়ার) উদ্দেশ্যে চরে বেড়ায় যে*। ৩. অশ্বতর, বর্ণসঙ্কর, মিশ্রজাতি, জারজ, বেজন্মা, দুষ্ট, ধূর্ত্ত, বদমাশ, শঠ, ঘোটকীতে গর্দ্দভের ঔরসে বা গর্দ্দভীতে ঘোটকের ঔরসে জাত মিশ্রজাতি পশুবিশেষ। তিলে খচ্চর = তিলচিহ্নযুক্ত অশ্বতর, বড় দুষ্ট লোক, অতিধূর্ত্ত। (ব.শ.)। ৪. mule, wicked person অর্থে প্রচলিত। ৫. অশ্ব শব্দের অর্থ আমরা জেনেছি, 'যে অশ্ বহন করে'। অশ্বতর শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে ব.শ. জানাচ্ছেন, এ হল 'অশ্বধর্ম্মের ন্যূনতাযুক্ত অশ্ব', 'গর্দ্দভ হইতে অশ্বায় জাত মিশ্রজাতি অশ্ববিশেষ'। তাহলে কি অশ্বধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা রয়েছে অশ্বে, আর সর্বাপেক্ষা হীনতা রয়েছে গর্দ্দভে? নাকি উল্টো? আমরা জানি, গতির বিচারে অশ্বই শ্রেষ্ঠ, অশ্বতর মধ্যম, গর্দ্দভ হীন; বহনের নিরিখেও তাই। তাহলে অশ্ব-অশ্বতর-অশ্বতম বললে আমরা কি গর্দ্দভ-খচ্চর-ঘোটক বুঝব? এরকম বোঝার সমস্যা হল, সেক্ষেত্রে অশ্ব মানে দাঁড়িয়ে যায় গাধা! তা তো আর সত্যি হতে পারে না। অথচ ইংরেজদের আমরা দেখছি গর্দ্দভকে অশ বা ass বলতে, এবং তার মানে বোঝার ক্ষেত্রে তাঁরা 'গাধা' জন্তুটিকেই কেবল বোঝেন না, dull, stupid fellow-কেও বোঝেন। আর, প্রাচীন ইংরেজ তাকে বলতেন assa, ল্যাটিনে বলা হত asinus (অশ্বিনঃ)। তাহলে কি আদিতে, সংস্কৃত-পূর্ববর্তী যুগে, গাধাকে অশ্ব, খচ্চরকে অশ্বতর, এবং ঘোড়াকে অশ্বতম বলা হত? তা যদি সত্যিও হয়, বুঝতে হবে ইংরেজ এই শব্দের সব উত্তরাধিকার হারিয়ে কেবল 'অশ্ব'কে ধরে রেখেছে তাদের assa বা ass শব্দে। আর, ভারতীয়রা 'অশ্বতম'কে বর্জন করে দিয়ে অশ্ব ও অশ্বতরকে এখনও ধরে রেখেছে বটে, কিন্তু অশ্বের নিজস্ব অর্থ ফেলে দিয়ে তাকে অশ্বতম অর্থে ধরে রেখেছে।

যাই হোক না কেন, animal-এর দুনিয়ায় আমরা যেমন অশ্ব-অশ্বতর-গর্দ্দভকে পাচ্ছি, তার সমান্তরালে মানুষের দুনিয়াতেও তাদের পাচ্ছি। আমাদের রাজা-রাজড়ারা তো তাঁদের সামাজিক আচরণে তাঁদের ঘোড়াকে (শিক্ষিত অনুচরকে) দিয়ে ঘোড়ার চাল চালতেনই, এবং সমাজের খচ্চর-বদমাস লোকেদের বাগে আনার নানা উপায় বের করতেন। সমাজের মূর্খ গর্দ্দভেরা সেসব দ্যাখে, মুখ বুজে সহ্য করে, না পারলে ল্যাকড়ায়। (গাধার ডাককে 'ল্যাকড়ানো' বলা হয়।) আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, পশুজগতের অশ্ব-অশ্বতর-গর্দ্দভদের সঙ্গে মানবজগতের অশ্ব-অশ্বতর-গর্দ্দভেরা কি সর্বৈব সমান্তরাল? এর উত্তর হল, হ্যাঁ। এবং আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা তা দেখতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিলেন।

গর্দ্দভ বা রাসভের কথাই ধরা যাক। সে যখন জানোয়ার মাত্র, তখন তার গতি শ্লথ, পিঠে বোঝা তুলে দিয়ে নির্দেশ দিয়ে দিলে গন্তব্যে নিজেই চলে যায়, মাঝপথে দাঁড়িয়ে ঘাসে মুখ দিয়ে সময় নষ্ট করে না, বিপরীত দিক থেকে অন্য গর্দ্দভ এলে তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে না, ঠিক যেন ক্রিকেটের রানার, সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলার তখন তার সময় নেই। গন্তব্যে পৌঁছে গর্ দানের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে — 'পিঠ থেকে বোঝা নামিয়ে নাও!' অন্যথায় পা দিয়ে চারিদিকে ধুলোকাদা ছড়াতে থাকে, সেও গর্ দানই বটে। কিন্তু ছুটির সময় হয়ে গেলে, আপনার ঘড়ি যদি ৫ মিনিট লেট থাকে তবে ঠিক ৪ টা ৫৫ তেই সে ঘাড় নাড়া দেবে। এমনই সঠিক সময়জ্ঞান তার। এত আবেগপ্রবণ এই জানোয়ার যে, অন্য কোনো গাধাকে মরে যেতে দেখলেই সেও মরে যায়। গাধাপোষা যাঁদের পেশা, তাঁরা সেকথা জানেন বলেই মৃতপ্রায় গাধাকে অন্য গাধাদের চোখের আড়ালে সরিয়ে নেন, অন্যথায় অন্য গাধাগুলিও এক এক করে মরে যায়।

এবার খচ্চরের কথায় আসা যাক। সে দুরকম। গাধা বাবা আর ঘোটকী মা হলে তার নাম ইংরেজিতে আছে (mule), বাংলায় নেই। আবার ঘোড়া বাবা আর গাধী মা হলে তার নাম ইংরেজিতে হয় হীন্নি (hinny), বাংলায় গাধা-ঘোড়ার সব সঙ্করেরই এক নাম — খচ্চর বা অশ্বতর। এরা গাধার চেয়ে মালবহন ও গতিতে উচ্চশ্রেণীর। এরা পাহাড়ী পথে ভাল হাঁটতে পারে। ঠাণ্ডা বেশি সইতে পারে। এদের বাগে রাখা কষ্টকর। নানা রকমের খুচরো শয়তানি করে থাকে।

আর অশ্ব বা ঘোটক হল এই শ্রেণীর জানোয়ারদের মধ্যে সেরা। এরা গতিতে ও মালবহনে উভয় ক্ষেত্রেই উন্নতমানের। বলতে গেলে শিল্পবিপ্লব-পূর্ব সভ্যতার সমস্ত ভার বহন করত এই ঘোড়া, ও ঘোড়ার গাড়ি। হাতির সঙ্গে ঘোড়ার রেষারেষি আছে। ঘোড়াকে দেখলে হাতি যেমন পালায়, হাতিকে দেখলে ঘোড়াও তেমনি পালিয়ে যায়।

এবার সামাজিক গাধাতে আসা যাক। তারা হুবহু গাধার মতোই। সংসারের বোঝা বয়। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ। ছেলেমেয়েদের অ্যাকাডেমিতে পাঠায়, সমাজের অশ্ বা জ্ঞানসার-বহনকারী অশ্বদের কাছে ট্রেনিং নিতে পাঠায়। উল্টোটাও হয়। উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটকেরা সরাসরি গাধাদের মাঝে এসে ঘোরাফেরা করে, শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করে, গাধাদের ছেলেমেয়েদের নানা বিদ্যা দেয়। ফলে যাদের জন্ম হয়, যে গাধা-ঘোড়ার সন্তানরা দ্বিজ হয়ে জন্মায়, তারা হয় খচ্চর বা তিলে খচ্চর। তারা বিভিন্ন পর্ব্বতাকীর্ণ দেশে চলাফেরা করে অর্থাৎ পর্ব্বতে বা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে, সভ্যযুগের মানুষের সংসারের বোঝা বহন করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জানোয়ার হল সমাজের অশ্ব। এরা সমাজের অশ্ বা জ্ঞানসার বহন করে। দ্র. **অশ্বত্থ**। যৌথসমাজে এঁরা অত্যন্ত সম্মানীয়। দ্র. **উচ্চৈঃশ্রবা**। যখন পণ্যজীবীদের বোঝা সে বহন করে, পণ্য সৃজনের দেখভাল করে, অন্যদের নানান বুদ্ধি দিয়ে 'ঘট' পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে, ঘটনা ঘটায়, ঘট বানানোর ব্যবস্থা করে, তখন সে ঘোটক। অবশ্য সে কখনো কখনো ঝামেলাও করে, ঘোঁট পাকায়, এমনকি ঘোটালা পর্যন্ত করে। তবে তার দ্বারা আর যাই হোক, বিদ্রোহ বিপ্লব কোনোদিনই হয় না। তাই ঘোড়ার ডিম হয় না, সেটা অলীক, অসম্ভব; ঘোড়ার অণ্ড হওয়া তো বহু দূরের কথা।

খদ্যোত : ১. খ + ✓দ্যোতি + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *(আপন) অবয়বের খাত অংশকে উর্দ্ধে তারিত করে যে। /* যে আকাশ দ্যোতিত করে। (ব.শ.)। ৩. জ্যোতিরিঙ্গণ, জোনাকি পোকা, সূর্য্য। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় দুভাবে করা যায়। ব.শ. করেছেন খ + দ্যোত, আমরা করছি খদ্ + য + উৎ। তাই আমাদের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি বঙ্গীয় শব্দকোষ থেকে পৃথক। এক শব্দকে দুভাবে দেখার এ রীতি যাস্ক অনুমোদিত। তবে, শনাক্ত ক্রিয়ার কারক রূপে অভিহিত সত্তাকে যেন সঠিকভাবে বোঝানো যায়, সেদিকেই মূল লক্ষ্য রাখতে হয়।

খবর : ১. খ + বর। ২. *আকাশ যাকে বরণ করে নেয়।* ৩. বার্ত্তা, সংবাদ, বৃত্তান্ত, মঙ্গলামঙ্গলের বা অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান বা তত্ত্ব, তত্ত্বাবধান, মনের ভাব, অনুসন্ধান। ৪. news অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দটিকে আরবি থেকে আগত বলা হয়। কিন্তু সেও তো একই বংশের সন্তান। বংশধারার গোড়ায় গেলে তাকেও যে ক্রিয়ার ভিত্তিতে দেখে ফেলা যায়, 'খতম'-এর মতো এই 'খবর' শব্দটিও তার আরেকটি প্রমাণ। এরকম আরও অনেক তথাকথিত 'আরবি থেকে আগত' শব্দ রয়েছে, যাদের এরকম ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দেখতে পাওয়া যায়। এই কোষে তার দু-চারটি নেওয়া হচ্ছে মাত্র।

গ

গ্ বর্ণের অর্থ : গ্ বর্ণটি 'গমন্' ক্রিয়ার ধারক। ইংরেজিতে go, সংস্কৃতে 'গং' বা 'গম্'। এই গমন করা ও যাওয়া কিন্তু সম্পূর্ণ এক ব্যাপার নয়। গমনের ভিতরে ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দুর দিকে (দ্র. ঘ) একটানা চলে যাওয়া রয়েছে। যাওয়ার ভেতরে রয়েছে (ই + অ = য) গমন ও দাঁড়ানো, পুনরায় গমন ও দাঁড়ানো, এইভাবে ক্রমান্বয়ে গমন। এতে এক পা যখন গতিশীল, অন্য পা স্থিতিশীল। একেই যাওয়া বলে। মানুষের হাঁটা বা দৌড়ানোয় থাকে এই যাওয়া; তীর-বাণ-বুলেটের ছোটায় থাকে গমন। নদীর স্রোতে ও বায়ুর প্রবাহে গমন ও যাওয়া উভয়ই থাকে। এই গ্ অক্ষরটি পৃথিবীর সব ভাষাতেই রয়েছে। তবে ইংরেজিতে একে 'জি' (g) বলে কেন, সেটি ভাবলে অদ্ভুত লাগে। অক্ষরের উচ্চারণ 'জি', কিন্তু প্রায় সময়ই শব্দে তার উচ্চারণ 'গ্'। ইংরেজির বহু অক্ষরের ক্ষেত্রেই একথা খাটে। এর উত্তর পাওয়া যায় ক্-গ্-চ্-জ্ এই চারটি অক্ষরের পরস্পর স্থানবদলের নিয়মে। উচ্চারণে (সন্ধি-সমাসে) বাক্ধারা থেকে বাগ্ধারা, বাক্-পতি থেকে বাচস্পতি, বাচ্-স্তুতি থেকে ব্যাজস্তুতি হতে দেখা যায়। এরকম হয় কেবল নেচারের দেওয়া জিহ্বা-কণ্ঠ প্রভৃতির উচ্চারণযন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের জন্যই নয়, প্রকৃতিতে যে সকল ক্রিয়া চলে, তার নিয়মেও করণ, গমন, চয়ন, জনন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানবদল করে। সেই কারণটি আদিকালে এত ঘনিষ্ঠভাবে ছিল যে, তার উত্তরাধিকার আমাদের ভাষার মতো ইংরেজি প্রভৃতি ভাষারও কমবেশি রয়েছে। রয়েছে বলেই তাদের সি (c) থেকে ক্ ও চ্ দুটো অক্ষরেরই উচ্চারণ হয়, তাদের জি (g) থেকে জ্ ও গ্ দুটোই উচ্চারিত হয়।

যাই হোক, এতসব অন্তর্নিহিত ব্যাপার যাতে রয়েছে, সেই 'গ' বর্ণের অর্থ সংক্ষেপে জানব — **গ** = 'গ্-অন' করে যে; গামী। গা, গি, গু, গৃ প্রভৃতির অর্থের জন্য ক বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য।

গ্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : *গঠ্* (গ্রন্থ্), *গড়্*, গণ্, গদ্, গম্ (*গঞ্জ্*), গর্হ্, *গল্* (*গল্ভ্*), গাহ্ (গৈ), গু (গুং, গুঙ্, গুঞ্জ্, গুন্, গুম্), গুণ্ (গুণ্ঠ্, গুণ্ড্), গুপ্, গুহ্ (গহ্), গৃ (গৄ, গর্জ্জ্), গ্রস্, গ্রহ্, *গ্লৈ*, গ্ = ১৬ + ১

***গঠ্* (গ্রন্থ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অগ্রন্থিত, আগ্রথন, *গঠ্* (*গড়্*, *গঢ়্*), গঠন, গঠিত, গাঁইট, গাঁইটা, গাঁইঠা, গাঁইতি, গাঁট, গাঁট-কাটা, গাঁটে-গাঁটে, গাঁট(ঠ)-ছড়া, গাঁট(ঠ) -বন্দি, গাঁট(ঠ)রা, গাঁট(ঠ)রি(রী), গাঁট(ঠ)শূল, গাঁটি(ঠি), গাঁট্টা, গাঁট্টাগোঁট্টা, গাঁঠল, গাঁঠা, গাঁঠিছড়া, গাঁঠলি, গাঁ(গা)ঠ্যার, গাঁথ, গাঁথন, গাঁথনাকল, গাঁথা, গাঁথিল, গাটি(ঠি), গাট্টা, গাঠ, গাঠিত, গাঠিয়া, গাথ, গাথন, গাথ(থু)নি, গাথা, গাম্থ, গিঁট(ঠ), গিঁঠা, গিট(ঠ), গিটকিরি(রী), গ্রথন, গ্রন্থ, গ্রন্থ, গ্রন্থন, গ্রন্থনকল, গ্রন্থি, গ্রন্থিক, গ্রন্থিচ্ছেদক, গ্রন্থিত (গঠিত), গ্রন্থিপর্ণ, গ্রন্থিবন্ধন, গ্রন্থিভেদ, গ্রন্থিভেদক, গ্রন্থিমান, গ্রন্থিমোচক, গ্রন্থিল, গ্রন্থিহর, গ্রন্থী, সংগঠন।

গঠ্ = গামীর টঙ্কারের স্থির হওয়ন। **গঠ** = গামী (গমনশক্তি) টঙ্কারিত হয়ে থামে যাহাতে। **গ্রন্থ্** = গ-রক্ষণের নাকরণ (দ্র. **অন**) থামে যাহাতে।

গঠন (গড়ন, গঠিত) : ১. গঠ + অন। ২. *গামীর টঙ্কার-স্থিতি অন (on) থাকে যাহাতে; (গঠন তারিত যাহাতে)।* ৩. নির্ম্মাণ করা, সংশ্লিষ্ট বা সম্মিলিত করা, রচনা করা; ঘটন, নির্ব্বন্ধ, নির্ম্মাণ, নির্ম্মাণপ্রণালী, অবয়বসংস্থান, সৃষ্টি, উৎপাদন, ব্যূহরূপ আকার; ঘটিত, কৃত, নির্ম্মিত, রচিত, সৌষ্ঠবসম্পন্ন, মানানসই, পরিণতিপ্রাপ্ত, পরিপুষ্ট। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **গ্রন্থন, গাঁথন**। গ্রন্থন বা গাঁথন প্রধানত দুভাবে হয়, এবং তা সাধারণত বাহ্যিক গ্রন্থনের ক্ষেত্রেই হয়। একধরনের গ্রন্থনে গ্রন্থিতব্যের ভিতরে আবর্ত্তন বা গোলাকার ভাব থাকে, তাকে বলে 'গড়ন'; আর একধরনের গ্রন্থনে গ্রন্থিতব্যের ভিতরে টঙ্কার-স্থিতির ভাব থাকে, তাকে বলে গঠন; যার জন্যে গড়ন হয় সুডৌল, আর গঠন হয় পেশীবহুল, শক্ত-সমর্থ ইত্যাদি। গঠনের প্রতিটি পর্য্যায় হয় টনটনে, সুগঠিত। তার সার্বিক গঠনের সৌকর্য্যের কথা যখন আসে তখন গঠনের কথা বলা হয় না, বলা হয় তার 'গড়ন' সুডৌল ইত্যাদি।

গাঁথন (গাঁথা, গাঁথনি, গাঁথনাকল) : ১. গ্রন্থ্ > গাঁথ। গাঁথ + অন। ২. *গামীর রহস্যরূপের স্থিতি অন (on) থাকে যাহাতে।* ৩. সজ্জিত করিয়া সূত্রবদ্ধ করা, গাঁথা (ফুল ইত্যাদি), রচনা করা, সংযুক্ত করা, উপর্য্যুপরি রাখিয়া জোড়া দেওয়া (ইঁট গাঁথা),

কবিতারূপে বা প্রবন্ধরূপে বিন্যাস করা, (গান) রচনা করা, বিদ্ধ করা, দংশন করা, বিদ্ধ করিয়া সংযুক্ত করা; গ্রন্থন, রচনা, বিন্যাস, মালা রচনা, শ্রেণিবদ্ধ, গ্রথিত, নির্ম্মিত। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **গ্রন্থ**। গ্রন্থন শব্দটিই বিবর্ত্তিত হয়ে গাঁথন-এ পরিণত হয়েছে, এ হল গ্রন্থনের তদ্ভব রূপ। এই গাঁথনের অর্থ স্বভাবতই গ্রন্থন থেকে খানিকটা বদলে গেছে। লোকে গাঁথা বলতে ইঁট গাঁথা, ফুল গাঁথা, ইত্যাদি বোঝে বটে, তবে স্বতন্ত্রভাবে 'গাঁথা' কথাটি বললে তাকে 'বিদ্ধ করা' অর্থেই বোঝে।

গাঁথনাকল শব্দটি প্রচলিত দেখা যায় না। এক আদিবাসী গ্রাম্য বাংলাভাষী কিশোরী, যে আগে কখনো stapler দেখেনি, জনৈক শিক্ষককে stapler-এর সাহায্যে কাগজ গাঁথতে দেখে মুহূর্তে বলে উঠেছিল — 'বাবু, তুমার গাঁথনাকলটা কামের (জিনিস) বটেক, পটাপট কাগজগুলা গাঁথে!' মূর্খ বাংলাভাষী (!) এভাবেই নতুন নতুন শব্দ সৃজন করে থাকে। নতুন শব্দ অ্যাকাডেমিতে তৈরি হয় না, হলেও তা প্রায়শই মরে যায়। মানুষের সন্তান যেমন একটি পরিবারে জন্মায়, স্বাভাবিকভাবে বড় হয়, সমাজের সদস্য হিসেবে জনসাধারণ্যে মিশে যায়; শব্দের সন্তানও তেমনি একটি শব্দপরিবারে জন্মায়, স্বভাবত বড় হয়, ক্রমে শব্দ-সমাজের সদস্য হিসাবে ভাষায় মিশে যায়। উপরোক্ত ঘটনায় যেমন আদিবাসী মেয়েটি তার সহজ প্রবৃত্তি থেকে 'গ্রন্থ' শব্দ-পরিবারের সন্তান হিসেবেই 'গাঁথনাকল' শব্দটির সৃজন করেছিল।

গিঁট (গাঁইট, গাঁট) : ১. **গ্রন্থি** > গিঁট, গাঁইট, গাঁট। ২. *গতিশীল গামীর রহস্যরূপ টঙ্কারিত যাহাতে।* ৩. গিঁট = গাঁঠ, গিরা, শরীরগ্রন্থি, সন্ধিস্থল; গাঁইট, গাঁট = অবয়বের সন্ধিস্থল, জোড়ের মুখ, গ্রন্থি, আখ বাঁশ ইত্যাদির পর্ব্বসন্ধি বা গিরো, বৃক্ষলতাদির শাখাপ্রশাখার সন্ধিস্থল, রশি দড়ী ইত্যাদির বন্ধ বা গিরো ... (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. মাটির দেয়ালের গ্রন্থন বা গঠন, ইঁটের দেয়ালের গ্রন্থন, ফুলমালার গ্রন্থন, বইয়ের পাতার গ্রন্থন, জালের সুতোর গ্রন্থন, লতা বা বাঁশ ইত্যাদির গ্রন্থন, মানবশরীরের গ্রন্থন — সব গ্রন্থনের কলাকৌশলের মধ্যে কিছু কিছু ফারাক রয়েছে, আবার একটি সাধারণ মিলও রয়েছে। সব ক্ষেত্রেই যেটি সাধারণ, তা হল অবয়বের (দেয়াল, মালা, বই, জাল, লতা, জীবদেহ, প্রত্যেকের) একটি পর্য্যায়ের সঙ্গে অপর পর্য্যায়টিকে ঠিকঠাক ভাবে জুড়ে দেওয়া। একেই গ্রন্থন বা 'গাঁথা' বলে। এই জোড়ই গ্রন্থনের মূল বা গ্রন্থি (অর্থাৎ গিঁট, গাঁইট, গাঁট, গিঁঠ, গাঁইঠ, গাঁঠ) ইত্যাদি। মানুষের শরীরে, গাছের শরীরে, বাঁশের শরীরে, লতার শরীরে, দূর্ব্বা ঘাসের শরীরে এরকম অজস্র গ্রন্থি বা জোড় বা গাঁট আছে। সেই গাঁটগুলি থেকে পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা হয়; কখনো কখনো নতুন শাখা বা প্রশাখার বিস্তার ঘটে।

তবে এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গাঁট রয়েছে। যে সম্পর্কের জালে মানবসমাজের, পরিবারের, গোষ্ঠীর, সংগঠনের সদস্যরা আবদ্ধ থাকে, তাতেও থাকে অজস্র গ্রন্থি বা গিঁট বা গাঁট। দ্র. **গাঁটকাটা, গাঁটছড়া, নট**। ৬. ইংরেজি knit, knot।

গাঁটকাটা : ২. *গাঁট কাটে যে।* ৩. **গাঁটকাটা** = **যে গাঁট কাটিয়া** অন্যের টাকাপয়সা চুরি করে, **উচক্কা, pick-pocket, cut-purse**। (ব.শ.) ৪. 'পকেটমার' শব্দটি এসে **'গাঁটকাটা' শব্দটিকে শহর থেকে** তাড়িয়ে দিয়েছে। আধুনিক শিক্ষিত বাংলাভাষী তাই **'গাঁটকাটা' শব্দটি** আর ব্যবহার করেন না। তার বদলে ব্যবহার **করেন 'পকেটমার'**। ৫. কিন্তু গাঁটকাটা শব্দটির অর্থের ব্যাপ্তি **'পকেটমার' শব্দের তুলনায়** অনেক বেশি। কিন্তু সেটিকে বুঝতে হলে আগে **গাঁটছড়া শব্দটির** অর্থ জানা দরকার। দ্র. **গাঁটছড়া**। ৬. ইংরেজি **knot & cut**।

গাঁটছড়া : ২. *যে গাঁট (বা গ্রন্থি বা গিঁট) থেকে (অস্তিত্ব) তার পরবর্তী অধ্যায়ে ছড়ায়।* ৩. গাঁটছড়া = গ্রন্থিশাটক (?), **বরকন্যার** বস্ত্র অন্য বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সংযোগপূর্ব্বক বন্ধন, (গৌণার্থে) **গাঁটছড়া-**বাঁধা বরবধূর ন্যায় দুইজনের সতত সাহচর্য্য-সূচক। (ব.শ.)। ৪. বাংলাভাষীর মানসলোকে কে থাকবে সেই প্রশ্নে **'গাঁটছড়া' শব্দের** সঙ্গে contract বা 'চুক্তি' শব্দের এখনও তুমুল লড়াই চলছে, মীমাংসা এখনও হয়নি। তাই সবগুলিই প্রচলিত আছে, এখনও। ৫. **গাঁটছড়া** একটি মহত্তম বাংলা শব্দ। এর ব্যবহার অবিকল প্রচলিত রয়েছে বাংলাভাষীর বিবাহের সংস্কারে, বরবধূর বস্ত্রখণ্ড বন্ধনে। যতদূর অনুমান করা যায়, বৈদিক যুগেরও আগে সনাতন যুগ থেকে এই প্রথার প্রচলন রয়েছে; ফলে এর উত্তরাধিকার পৃথিবীর সকল জাতির কমবেশি রয়েছে। তবে হিন্দু বিবাহে এই 'গাঁটছড়া'র সংস্কার অনেক স্পষ্টভাবে রয়েছে। বর কনের কাপড়ের **খুঁট** বা প্রান্ত দুটিকে বেঁধে দেওয়া বা গ্রন্থিবদ্ধ করা বা গিঁট (knit) দেওয়া হয় যে-সংস্কারে তাকেই 'গাঁটছড়া' বলে। সবাই জানেন, বদ্ধ গিঁটকে গাঁট (knot) বলে। কিন্তু যেটি কিছুতেই বোঝা যায় না, কিংবা আমরা বোঝার চেষ্টা করতে ভুলে যাই, তা হল এই 'গাঁট'-এর সঙ্গে **'ছড়া'** শব্দটি জোড়া হয়েছে কেন?

জাল বোনার বা জাল বোনা ভাল করে দেখার অভিজ্ঞতা থাকলে শব্দটিকে বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। একটি গাঁট থেকে দুটি সুতো বেরিয়ে দুদিকে যায়, অনেকটা '×' এর মতো। উপরের দিক থেকে দুটি সুতো নেমে এসেছে, মাঝে তৈরি হয়েছে গাঁট, তারপর সেই গাঁট থেকে নীচে দু'দিকে দুটি সুতো চলে গেছে। উপরের একটি সুতোকে যদি বর ভাবেন, তবে অপর সুতোটি কনে; তারা এসেছে দুটি ভিন্ন পরিবার থেকে। এবার তাদের গাঁটছড়া বাঁধার পর তাদের যে সন্তানসন্ততি হবে তারাই হবে নীচের দিকে নেমে যাওয়া সুতো দুটি। তারা আবার দুটি ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের দুটি সন্তানসন্ততির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে। ঠিক এভাবেই গড়ে উঠেছে মানবসমাজের প্রকৃত সম্পর্কের জাল। এই জাল এত ব্যাপকভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রসারিত যে, অতি দূর প্রাচীন ইতিহাস থেকে আজ পর্যন্ত এই জালের সুতো ও গাঁট ধরে ধরে আপনি যদি এগোন, রহিম শেখের সঙ্গে রামা কৈবর্ত্তের সম্পর্ক তো খুবই সামান্য ব্যাপার, চাইলে পৃথিবীর যে কোনো মানুষের সঙ্গে আপনার জৈব **(পিতৃলোক-**এর) সম্পর্ক দেখতে পেয়ে যাবেন; **দৈব (বাহ্যসম্পদের) ও ব্রাহ্ম** (জ্ঞানসম্পদের) সম্পর্ক তো আছেই।

এর থেকে একটি কথা পরিষ্কার বোঝা যায়। যাঁরা 'গাঁটছড়া'

শব্দটির প্রচলন ঘটিয়েছিলেন, তাঁরা, কীভাবে মানবসমাজের জাল ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বজুড়ে, সেকথা আমাদের তুলনায় অনেক ভালভাবে বুঝেছিলেন। পুরুষ নারীর এই 'গাঁটছড়া'ই মানবসমাজের প্রকৃত বন্ধন, যার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে গোটা মানবসভ্যতা। অন্যান্য রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বন্ধনগুলি এই বন্ধনের তুলনায় অর্বাচীন এবং যথেষ্ট ভঙ্গুরও বটে। কিন্তু সে বন্ধনগুলিও আছে। বৈদিক যুগের সূত্রপাতের পর থেকে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল প্রকারের বন্ধনে ধনসম্পদের ক্ষমতার সাধারণ প্রবাহপথ ছিল একটিই — স্বামী-স্ত্রীর গাঁটছড়া। একেই বলা হয় 'উত্তরাধিকার'। মানুষের পূর্বসূরীর অর্জন ধরা থাকে বর্তমান গাঁটে, তারপর প্রবাহিত হয় সেই গাঁটের উত্তর (পরে) যে গাঁট সৃষ্টি হয় তাতে। গাঁটে গাঁটে প্রবাহিত হয় মানুষের ধনসম্পদ, জ্ঞানসম্পদ ইত্যাদি।

কিন্তু এই গাঁট যদি কেটে দেওয়া হয়, তাহলে কী হবে? তাহলে উপর থেকে বা পূর্বসূরীগণের থেকে প্রবাহিত হয়ে আসা সম্পদের ধারা সেই কাটা স্থানের ফাঁক দিয়ে গলে যাবে, বাঁধ কেটে দিলে নদীর ধারা যেমন বিপথে প্রবাহিত হয়ে যায়, সেইরকম। তাই গাঁটকাটা কেবল পকেটমার নয়, তার চেয়ে আরও অনেক বেশি। সে মানুষের সামাজিক জাল ফুটো করে দেয়, কেটে দেয়। (দ্র. **চুরি**)। বলে রাখা যাক, এই গাঁটছড়া, গাঁটকাটা প্রভৃতি শব্দ মধ্যযুগের বাংলাভাষীদের তুলনাহীন সৃষ্টি। দ্র. **ছড়া**।

গ্রন্থ (গ্রন্থন, গ্রন্থি) : ১. ✓গ্রন্থ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে; ✓গ্রন্থ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গামী-রক্ষণের অন (দ্র. অন) থামে যাহাতে; গ্রন্থ্ অন (on) যাহাতে।* ৩. গুম্ফন, গাঁথা, নিবন্ধ, রচনা, গ্রথিত বিষয়, সন্দর্ভ, প্রবন্ধ, পুস্তক, বত্রিশ-অক্ষরী অনুষ্টুপ ছন্দ, শাস্ত্র, ধন, বিত্ত। (ব.শ.)। ৪. মৌখিক কথাবার্তায় অপ্রচলিত, যদিও লেখালেখির ক্ষেত্রে শব্দটির প্রচলন আছে। ৫. মাটির দেয়াল 'গাঁথা' আর ফুলের মালা 'গাঁথা' বাংলাভাষীর বহু প্রাচীন উত্তরাধিকার। পরে এসেছে মন্দির-মসজিদ বা প্রাসাদ বানানোর জন্য ইঁট-পাথর গাঁথা। পুঁথির কিংবা পুস্তকের পাতা 'গাঁথা'ও খুব কম পুরনো প্রথা নয়। কিন্তু এ সবই বাহ্যিক গাঁথাগাঁথি। মানসিক গাঁথাগাঁথিও আছে, যেগুলি বাহ্যিক চোখ দিয়ে দেখা যায় না, দেখতে হয় মনের চোখ দিয়ে। যেমন দৃশ্যের পর দৃশ্যের কাহিনী গেঁথে নাটক রচনা করা, অধ্যায়ের পর অধ্যায় জুড়ে কাব্য রচনা করা। এই সবগুলিকেই 'গ্রন্থন' বা 'গাঁথা' বলা হয় কেন?

আজও বাংলার গ্রামে মাটির বাড়ির দেয়াল কীভাবে 'গাঁথা' হয়, তা জানলে আমরা এই গ্রন্থন বা গাঁথনের মূল ক্রিয়াটিকে চিহ্নিত করতে পারি। গোল গোল কাদার তাল, যা কিনা দেয়াল গড়ে ওঠার এক-একটি অণু বা অণু-গড়, তা তুলে তুলে গাঁতিদারকে দেওয়া হয়; সে দেয়ালের উপরে বসে সেই তালগুলিকে পর পর ঠেসে ঠেসে হাত খানেক উঁচু করে বসায়, দু'ধারে গাঁতি (কাঁচা মাটির দেয়ালের দুই ধার সমান করার তরোয়ালের মতো হাতিয়ার) দিয়ে কাটে এবং এভাবেই ক্রমশ এগোতে থাকে। এই কাদার তালগুলি হল 'গামী'। এই গামীর রক্ষণ অর্থাৎ কাদার তাল রাখার শ্রেণিবদ্ধ ক্রিয়া থামে ঐ গ্রন্থনে বা 'গামী রক্ষণের অন থামে যাহাতে'। ফুলের মালা গাঁথা, বইয়ের পাতা গাঁথা, আর কাহিনীর দৃশ্য গাঁথা, যাই গাঁথা হোক না কেন, এই একই প্রক্রিয়ায় তা হয়ে থাকে। আমাদের সংস্কৃতকার পূর্বপুরুষেরা এই সর্বপ্রকারের গাঁথাগাঁথিকেই 'গ্রন্থন' ও তজ্জাত শব্দেই চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু আমাদের বাংলাভাষী পূর্বপুরুষেরা এখানেই থেমে থাকেননি। তাঁরা প্রথমে গ্রন্থনকে 'গাঁথন'-এ পরিণত করেছেন এবং অতঃপর সেই গাঁথনকে আরও সুনির্দিষ্ট করার জন্য দুটি নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন — '**গঠন**' ও '**গড়ন**'। ৬. ইংরেজি grant।

গ্রন্থকার : ২. *গ্রন্থন করেন যিনি।* ৩. সন্দর্ভকারক, পুস্তকরচয়িতা। (ব.শ.)। ৪. writer বা 'লেখক' অর্থে প্রচলিত। ৫. যদিও গ্রন্থন করা বা গাঁথা বহু রকম বিষয়ে এবং বহুভাবে করা হয়ে থাকে, কিন্তু গ্রন্থকার শব্দে কেবলমাত্র যিনি কাহিনীর বিভিন্ন অংশকে একত্রে গাঁথেন, এবং সেভাবেই কাব্য, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি রচনা করেন, তাঁকেই গ্রন্থকার শব্দে বোঝানো হয়ে থাকে। অথচ শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ অনুসারে যা-কিছু গ্রন্থন করা হয়েছে তাকেই 'গ্রন্থ' বলা যায়; এবং সেই 'গ্রন্থ' যিনিই করুন তাঁকেই গ্রন্থকার বলা যেতে পারে।

গড়্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অগড়বগড়, আগড়, আগড়বাগড়, আগড়ম-বাগড়ম, আগড়া, আগড়ুম-বাগড়ুম, আগডোম-বাগডোম, আগ'ড়ে, গড়, গড়খাই, গড়ক (গড়ুই), গড়খাঞ্চি, গড়গড়, গড়গড়া, গড়গড়ি, গড়গোয়ালা, গড়ন, গড়বড়, গড়লবণ, গড়া, গড়াগড়ি, গড়ান, গড়ি, গড়িমসি(সী), গড়িয়া, গড়িয়ান, গ'ড়ে, গড়েন, গড়ু, গড়ুই, গড্ডর, গড্ডারি(লি)কা, গড্ডুক, গড্যা, গর(ড়্)ই, গাড়, গাড়ড়ি, গাড়া, গাড়ি(ড়ী), গাড়ু, গাড়েলা, গাড়োয়ান, গার, গিড়গিড়, গিড়িগিড়ি, গেড়া, গেড়ে, গৈড়, গৈর, গোউড়, গৌড় (গড় দিয়ে ঘেরা), গৌড়িয়া।

গড়্ = গামীর আবর্ত্তন, গড়ান, সমাবর্ত্তন। **গড়** = গামী আবর্ত্তিত হয় যেখানে বা যাহাতে, কিংবা যেখান থেকে; অথবা গামীর সমাবর্ত্তন যাহাতে।

গড়, গড়ন, গড়খাই, গড়গড়, গড়বড়, গড়া, গড়ান : ১. গ + ড়, অন, খাই, আন। ২. *গামী আবর্ত্তিত হয় যেখানে বা যাহাতে, কিংবা যেখান থেকে; অথবা গামীর সমাবর্ত্তন যাহাতে।* ৩. মৎস্যবিশেষ, গড়ইমাছ, পরিখা, ব্যবধান, অন্তরায়, দেশবিশেষ; ক্ষুদ্র দুর্গ, দুর্গ, ঢেঁকির মুষলের গর্ত্ত, পরিখা-সমেত গড়, দুর্গসদৃশ সুরক্ষিত স্থান; আকৃতি, গঠন; গড়ের বা পাহাড়ের মতো উচ্চ স্তূপ; মস্তকে পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম, নমস্কার, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা; প্রত্যেকের মোটামুটি হিসাব, জন পিছু বা এক-একটার হিসাব (average), গড়-পড়তা; গড়ান (ঢালু) জমি বহিয়া পড়া, প্রবাহরূপে যাওয়া, বহা, ভূতলে বিলুণ্ঠন করা বা গড়াগড়ি দেওয়া; গড়িয়ে যাওয়া; গড়ের চতুর্দ্দিক্ স্থিত খাদ, পরিখা, পরিবেষ্টক খাদ; মেঘের গর্জ্জন, বজ্রের ধ্বনি, করকা (শিলা) পতনের শব্দ, ... প্রস্তুত করা,

নির্ম্মাণকৌশল, অবয়বসংস্থান, অঙ্গসৌষ্ঠব, আকার, নির্ম্মিত দ্রব্য, কারুকার্য্য, গঠিত বিষয়; অব্যবস্থা, রচনায় পৌর্ব্বাপর্য্যের অভাব বা অপরিপাটি, উলট-পালটভাব, ক্রমভঙ্গ, অব্যবস্থিত, বিশৃঙ্খল, গোলমাল, কোলাহল; নির্ম্মিত, কৃত, গঠিত, মূর্ত্ত, সাবয়ব, সৃষ্ট, রচিত, কল্পিত; নির্ম্মাণ করা, নির্ম্মাণ করান, গড়ান; (কলসি) কাত করা, একতর পক্ষ আশ্রয় করা, কোনো ঘটনার বা বিষয়ের অবস্থাবিশেষে পর্যবসিত বা পরিণত হওয়া, কার্য্যে পরিণত হওয়া, বিছানায় গড়াগড়ি দেওয়া বা এপাশ-ওপাশ করা, নিম্নমুখে প্রবাহিত করান, মাটিতে আবর্ত্তিত করা, জলের নিম্নমুখে বহিয়া যাওয়া, কলসী প্রভৃতি গড়াইয়া (নিম্নমুখ করিয়া) জল ঢালা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ৫. মনে হতে পারে, এত ভিন্নার্থক বিষয় একই গড় শব্দে বোঝানো যায় কীভাবে! কিন্তু মূল ক্রিয়া তো একটিই, এবং যে সেই ক্রিয়ার আচরণকারী, শব্দটির দ্বারা সেই দ্যোতিত হবে, সেটাই স্বাভাবিক। আর হয়ও তাই। যেহেতু গামীর আবর্ত্তন চলে বহু ক্ষেত্রে, তাই শব্দটি অনেককেই বোঝাতে পারে। গর্ত্তে তো গামীর আবর্ত্তন চলেই, তাই গর্ত্তে থাকা মাছ হল গড়ই মাছ। তবে এ কেবল Ophiocephalus punctatus-কেই বোঝায় না, 'গর্ত্তে থাকে যে' তাকেই বোঝায়। সেকারণে গড়ইয়ের দলে শোলমাছের বাচ্চার নামও শোনা যায়। উপরোক্ত সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে 'গামীর আবর্ত্তন চলা'র ধারক। তাই তাদের নামের সঙ্গে 'গড়' শব্দটি যুক্ত হয়ে যায়। নির্ম্মাণের ক্ষেত্রেও কথাটি খাটে। দ্র. **গঠ, গাঁথা**। তাই সেও গড়া। যা গড়া (গঠিত করা) হয়ে গেছে, সেও গড়। যে ঘেরা এলাকার মধ্যে সেনানী ঘোরে-ফেরে (= আবর্ত্তিত) হয়, মহড়া দেয়, সেকারণেও ঐ গড়া চৌহদ্দিকে আবারও গড় বলা যায়। এই গড়ের চারদিকে যে খাদ কাটা হয় (**খাই**), তাকে বলে গড়খাই। এরকম এক বা একাধিক গড়-এর ভেতর যদি নগর, সৈন্যাবাস ইত্যাদি থাকে, তাকে বলে গৌড়। তবে কার্যত এইসব গড় গড়ে ওঠে ছোট ছোট অণু-গড় গেঁথে গেঁথে। দ্র. **গ্রন্থন**। তাই গড় কথা মানে সমগ্রের এমন পরিমাণে পৌঁছনো, যার যোগফলে পুনরায় সমগ্রে পৌঁছান যায়। কিন্তু 'গড়' কথাটি যখন প্রতীকী প্রণাম অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন অন্যের পায়ের কাছে গড়ান অর্থেই গড় শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। তাছাড়া, আবর্ত্তিত হওয়া মানেই তো গড়ান, গড়িয়ে যাওয়া। দ্র. **গাড়**।

গাড়, গাড়া, গাড়ি, গাড়োয়ান (গৌড়) : ১. দ্র. **গড়**। ২. *গাড় = গড় হইতে জাত (গড়তে গিয়ে যা করতে হয়); গাড়া = গাড়ের আশ্রয় যাহাতে; গাড়ি = যে গামী গড়িয়ে বা আবর্ত্তিত হতে হতে চলে; গাড়োয়ান = গাড়ি চালায় যে*। ৩. ঢুকান, নিখাত করা, পোতা, খাড়া করিয়া পোতা, মাটিতে প্রবেশ করান, বিদ্ধ করান, পাতিত করা, পাতা, পাড়া; গর্ত্তে নিহিত, নিখাত; নিখাত করান, পোতান; শকট, গোযান, রেলগাড়ি, এক গাড়িতে বহনযোগ্য দ্রব্য বা ভার; শকটচালক, কোচোয়ান। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে বহুল প্রচলিত। ৫. দ্র. **গা**। মধ্যযুগে সংস্কৃত গড্ড, গর্ত্ত, গঠ, গন্ত্রী, গাঢ়, গড্ডুক, ঘট প্রভৃতি শব্দগুলিকে 'গড়' শব্দে বদলে নেওয়া হয়। আসলে, মূল ধ্বন্যাত্মক 'গড়্গড়্' শব্দে নেচার যে অর্থ দিয়ে রেখেছে, তার থেকে বের করে নেওয়া হয় গড় শব্দটি। তারপর তা থেকে গড়া, (দ্র. **গড়**), গাড়, গাড়া, গাড়ি, গুড়, গোড়া, গৌড় — এরকম অনেক শব্দ তৈরি করে নেওয়া হয়। এগুলি সবই একই ক্রিয়ামূল থেকে জাত। তবে পরে 'গড়া' যেন পৃথক একটি ধাতুর মতোই ব্যবহৃত হতে থাকে। গড়া হয়ে যায় আবর্ত্তিত হওয়া এবং গড়ে তোলাও। কেল্লা অর্থে গড় যেমন প্রচলিত হয়, তেমনি প্রণাম অর্থে গড় করাও প্রচলিত হয়ে যায়। সারা ভারতে 'গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ' পরিবার রয়েছেন দেখে অনেকের সন্দেহ হয়, বাংলার গৌড়-দেশ থেকে ঐ ব্রাহ্মণেরা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন কি? ব্রাহ্মণদের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা ভাবনা-চিন্তা করেন তাঁদের মনে এ প্রশ্ন আজও ডত্তর খুঁজে পায়নি। আসলে তাঁরা সবাই বাংলার গৌড় থেকেই সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েননি। তাঁরা 'গড়'-এর ভিতরে বসবাস করতেন বলেই তাঁরা ছিলেন সেকালের সরকারি ব্রাহ্মণ বা রাজ-ব্রাহ্মণ অর্থাৎ 'গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ'; হতে পারে সে গড় মহীশূরের, কাশ্মীরের কিংবা বঙ্গের। কেবল তাই নয়, পঞ্চগৌড়-এর (সারস্বত কান্যকুব্জ মৈথিল গৌড় উৎকল) পাশাপাশি পঞ্চদ্রাবিড়ও রয়েছে। দ্র. **দ্রাবিড়**।

ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে 'গড় হইতে জাত' সত্তাকে গাড় এবং 'গাড় গতিশীল যাহাতে', অর্থাৎ যে-যান গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, তাকে গাড়ি বলে। aeroplane-কে উড়াজাহাজ, উড়াকল ইত্যাদি বলতে শোনা যায়, কিন্তু উড়াগাড়ি বলা হয় না। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে — পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ির নিকট যে পাহাড়, তার পশ্চিমে পর পর ঢেউ খেলিয়ে টানা যে পর্ব্বতশ্রেণী মাথা তুলেছে, আর পূর্বদিকে জমির গড়ান শুরু হয়ে সমতলভূমি হয়ে যাচ্ছে, সেই পাহাড়টির নাম **গাড়পাহাড়**।

গণ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অগণন, অগণিত, অগণ্য, অতিগণ্ড, অতিগন্ধ, অপোগণ্ড, আগণ, আগণা, গঁদ, গণ, গণক, গণক্‌কার, গণৎকার, গণতন্ত্র, গণদেব, গণদেবতা, গণদ্রব্য, গণন, গণনা, গণনাথ, গণনীয়, গণপতি, গণপর্ব্বত, গণরাজ, গণরাত্র, গণরায়, গণা, গণাই, গণাগণ, গণাধিপ, গণাধিপতি, গণান্ন, গণি, গণিকা, গণিকারিকা (গৈনারি), গণিত, গণেশ, গণেশ-আঁক(কুঁ) ড়ি, গণেশান, গণেশ্বর, গণ্ড, গণ্ডক, গণ্ডগোল, গণ্ডগ্রাম, গণ্ডদেশ, গণ্ডপিণ্ড, গণ্ডফলক, গণ্ডভিত্তি, গণ্ডমালা, গণ্ডমূর্খ, গণ্ডযোগ, গণ্ডলেখা, গণ্ডশৈল, গণ্ডস্থল, গণ্ডস্থলী, গণ্ডা, গণ্ডাকীয়া, গণ্ডার, গণ্ডি, গণ্ডী, গণ্ডু, গণ্ডূষ, গণ্ডোপধান, গণ্ডোপল, গণ্য, গৈনারি, গাঁড়, গাঁড়ি(ড়ী)য়া, গাঁত, গাঁতা, গাঁতি, গাড়িয়া, গাতা, গাণপত্য, গাণ্ডি(ণ্ডী), গাণ্ডি(ণ্ডী)ব, গাণ্ডীবধন্বা, গাণ্ডীবী, গাণ্ডু, গেঁড়, গেঁড়া, গেঁড়ো, গেঁড়্, গেঁড়্য়া, গেঁড়্খোর, গেঁ(গ্যা)দড়া, গেণ্ড, গেণ্ডুক, গেণ্ডুয়া, গেন্দুয়া, নগণ্য।

গণ্ = গামীর রহস্যরূপের বোধন, সূত্রায়ন। **গণ** = গামীর রহস্যরূপের বোধের সূত্রায়ণ যাহাতে; গামীর সংখ্যা বিষয়ে জ্ঞান যাহাতে।

অগণিত (অগণ্য, নগণ্য) : ১. ন + গণিত। ২. **অগণন** = *গণন নেই যাহাতে;* **অগণিত** = *অগণন তারিত যাহাতে। /* যাহা গণা হয় নাই। (ব.শ.)। ৩. অসংখ্যাত, অজ্ঞাত, অসংখ্যক, বহু। (ব.শ.)। ৪. many অর্থে প্রচলিত। ৫. অগণিত, অগণ্য, অমূল্য, **অজয়, অজিত** প্রভৃতি **শব্দগুলি অজ**-এর মতো। এতে গণনা নেই। অর্থাৎ এগুলি এত বেশি বা কম যে গণনা করা যায় না, কিংবা এমন যে, যাকে গণনা করা হয়নি। সেজন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শব্দ দুটির ব্যবহার হয় **'বহু' অর্থে**। কিন্তু শব্দটির ভেতরে বলা আছে যে, সেটি 'বহু' নাকি 'হাতে গোনা', তা সে জানে না। দুটোই হতে পারে। সে কেবল জানে যে, যাই থাকুক আর যতই থাকুক, তাকে গণনা করা হয়নি। তা অগণিত, অগণ্য। এর থেকে বোঝা যায় গণনার একটি এলাকা (range) আছে। আমাদের চোখ যেমন একটি বিশেষ পরিমাপের এলাকার মধ্যেই তার দেখার কাজ চালায়; অতি বড় কিংবা অতি ছোটকে দেখতে পায় না। আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সম্পর্কেই একথা খাটে। গণনারও সেইরকম একটি বিশেষ পরিমাপের এলাকা থাকে। তার বাইরে হলে, তাকে গণনার যোগ্য বলে মনে করা হয় না। তখন তাকে নগণ্য বলে। ব্রিটিশ আমলে একসময় যাঁরা চৌকিদারী ট্যাক্স দিতেন, তাঁরাই ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিতে নাগরিক রূপে গণ্য ছিলেন, তাঁদের ভোটাধিকার ছিল। বাকিরা ছিল নগণ্য।

গণ (গণতন্ত্র) : ১. ✓গণ্ + অ (অচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গামীর রহস্যরূপ যাহাতে; গামীর সংখ্যা বিষয়ে জ্ঞান যাহাতে। /* যাহারা মিলিতভাবে এক কার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে। (ব.শ.)। ৩. সমূহ, নিচয়, সমুদয়, যূথ, দল, সমবায়, সঙ্ঘ, বর্গ, শ্রেণী, অনুচরবর্গ, স্বপক্ষ, জাতি, প্রমথ, সেনাসংখ্যাবিশেষ (অক্ষৌহিণী), সম্প্রদায়, গণপতি, গণেশ, মহাদেব, চোরনামক গন্ধদ্রব্য, ... গ্রামাদিজনসমূহ, বণিগাদিসমূহ, ভক্ত, পথ, কায়স্থের উপাধিবিশেষ; সংখ্যা করা, গণনা করা, হিসাব করা, রাশির ফলাফল নির্ণয় করা, মনে করা, চিন্তা করা, ভাবা, বোধ করা, জানা, হিসাবে ধরা, স্বীকার করা, গ্রাহ্য করা, সমর্থ বলিয়া মনে করা। (ব.শ.)। প্রমথগণ, শিবের অনুচর ও শিবের ভৃত্যগণ। শিব ও পার্বতীর অনুচরদের 'গণ' বলা হয়। অনেক সময়ে শিবের বাহন নন্দীকে গণদের কর্তা বলা হয়েছে। এই গণরা সর্বদা শিব ও গণেশের কঠোর শাসনে থাকত। অন্যায় অত্যাচার করলে গণদের কৈলাস হতে পৃথিবীতে নির্বাসিত করা হত। (পৌ.অ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. গণ হল একটা বোধ, ধারণা; বাহ্য বস্তুসমূহের বিষয়ে মানুষের মস্তিষ্কে অর্জিত জ্ঞানসম্পদ। তবে এ-সম্পদ মানুষ সর্বাগ্রে অর্জন করেছিল নিজেদের যৌথ অস্তিত্ব থেকে। আজও 'বহু মানুষ' বোঝাতে শব্দটি আকছার ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষায় এই গণ হল যৌথ সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অতীতের সাক্ষ্য বহনকারী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। মেধাতিথি ঠিকই জানিয়ে গেছেন — 'যাহারা মিলিতভাবে এক কার্য্য দ্বারা জীবিকার্জ্জন করে' তাদেরই 'গণ' বলা হত। এরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দাবি করত না এবং রীতিমতো দক্ষবিরোধী, যদিও একালের **গণতন্ত্র** সেই মানুষদের সামাজিক সংগঠনকে বোঝায়, যারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দাবি করে থাকে। (দ্র. **তন্ত্র**) দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করার অপরাধে এদের **পাষণ্ড** বলে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এই **মানবযূথ স্বভাবত শিবপন্থী** (আবিষ্কারক-অনুসারী) আদিম সাম্যবাদী, সনাতনবাদী, বেদবিরোধী, দক্ষবিরোধী। বহু পথ বেয়ে বহু অর্থের বদল ঘটিয়ে এই 'গণ' শব্দটি আজও ব্যাপকভাবে প্রচলিত, তবে, দুঃখজনক মনে হলেও, আজকের 'গণ' কিন্তু আদৌ দক্ষবিরোধী নয় এবং বহু ক্ষেত্রেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ও দক্ষতার পূজারী। দ্র. **গুণ**। ৬. ইংরেজি gang। তাছাড়া, প্রায় সমার্থে রয়েছে ল্যাটিন gens (= গেন্‌স্), gentis (= গেন্তিস্), ইংরেজি gentle (= জেন্ট্‌ল্)। গ্রামবাংলায় **'মজুরের কাজ'** করাকে বলা হয় **'জন খাটা'**। আমাদের ধারণা আদি গণই পরবর্তীকালে ক্রমে **জন**-এ পরিণত হয়েছে। এখানে আমরা দেখছি, ল্যাটিনের গেন্‌স্ নিঃসন্দেহে গণ্-এর উত্তরাধিকার, কিন্তু ইংরেজিতে পরিণতি পেতে পেতে সেই গেন্‌স্ শব্দটি রূপান্তরিত হয়ে গেছে জেন্ (জেন্ট্‌ল্) শব্দে। দ্র. **জন**।

গণক (গণৎকার) : ১. ✓গণ্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গণনা করে যে।* ৩. সংখ্যাকারক, গণয়িতা, দেবল হইতে বৈশ্যাগর্ভে জাত সঙ্কীর্ণ জাতিবিশেষ (তিথি বার ইত্যাদি জ্ঞাপন ইঁহাদের কর্ম্ম), জ্যোতির্ব্বিদ, জ্যোতিষিক, দৈবজ্ঞ, গ্রহাচার্য্য, অঙ্কশাস্ত্রবিৎ, আয়ব্যয়ব্যবহারী। (ব.শ.)। ৪. শব্দটি এখন 'হস্তরেখা দেখে ভবিষ্যৎ বলে দেওয়ার দাবি করে যে', শুধুমাত্র তাকেই বোঝায় এবং প্রায়শই মনে করা হয় সে মিথ্যাবাদী। ৫. দ্র. **জ্যোতির্ব্বিদ**।

গণন (গণনা) : ১. ✓গণ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে; ✓গণ্ + অন (যুচ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *গণ অন (on) ক্রিয়া চলে যাহাতে; গণন-এর আশ্রয় যাহাতে।* ৩. সংখ্যাকরণ, সঙ্কলন, গণা, যোগ, বিচারণা, সমীক্ষা, অবেক্ষা; সংখ্যান, রাশিনক্ষত্রাদি অনুসারে শুভাশুভফলনিরূপণ। (ব.শ.)। ৪. count বা 'হিসাব করা' অর্থে প্রচলিত, সে হিসাব বাহ্যবস্তুর হিসাবও হতে পারে, আবার 'রাশিনক্ষত্রাদি অনুসারে ভবিষ্যৎ হিসাব করা'ও হতে পারে। ৫. 'গণ' শব্দটির ভিতরে 'হিসাব করা' অর্থটি আছে বেশ অদ্ভুতভাবে। 'পহ্‌লে আপ, পহ্‌লে আপ'-এর গল্প যাঁরা জানেন, তাঁরা সহজেই বুঝতে পারেন, 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার' যতই করি, ছোট দরজা দিয়ে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে (এবং আরও বহু ক্ষেত্রে) দুই বা ততোধিক মানুষের সমমর্যাদা কিছুতেই রক্ষা করা যায় না; কাউকে আগে এবং কাউকে পেছনে যেতেই হয়। অন্যথায় পঙ্গু-বুদ্ধি প্রয়োগ করে প্রত্যেক বিড়ালের জন্য পৃথক ছিদ্রের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে পরিত্যাজ্য। তাই গণ যখন যায়, তখন এক-এক করেই যায় — শুরু হয়ে যায় গণের অন হতে থাকা, বা গণনা। এই গণনা শেষ হওয়ার পর আপনার মাথায় যে-সংখ্যাটি এল, সেই সংখ্যাটি আরও রহস্যময়। এটি একটি সংখ্যা যা সত্য কিন্তু সত্য নয়। সত্য এইজন্য যে, তা গণ-এর গণনফল; মিথ্যা এইজন্য যে, সংখ্যাটি গণ নয় — সংখ্যাটিকে ধারণারূপে মাথায় রাখলে তা পুরো রহস্যময়, আর তা লিখে রাখলে আরও রহস্যময় চিহ্নমাত্র। তবে এই যে ধারণা তা কিন্তু অনন্ত শক্তিধর সূত্র, গামীর বিষয়ে মানুষের বোধ। দ্র. **গুণ**।

গণদেবতা : ১. গণ + দেবতা। ২. *গণের দেবতা।* ৩. গণভূতা বা সঙ্ঘভূতা দেবতা, আদিত্যাদি দেবতাগণের সমষ্টিভূত দেবগণবিশেষ। আদিত্য ১২, বিশ্বদেব ১০, বসু ৮, তুষিত ৩৬, আভাস্বর ৬৪, অনিল ৪৯, মহারাজিক ২২০, সাধ্য ১২, রুদ্র ১১ — সর্ব্বসুদ্ধ ৪২২ গণদেবতাগণ। (ব.শ.)। ... এঁদের স্থান অবশ্য দেবতাদের চেয়ে নিম্নস্তরে। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র। ৫. একালে এই গণদেবতাদের কেউই চেনেন না। একালের ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাস লেখেন বাংলাভাষায়। কিন্তু তাতে উপরোক্ত গণদেবতাদের কোনো স্থান থাকে না। কারণ, উপরোক্ত গণদেবতাগণ তাঁর কাছেও দুর্বোধ্য। তিনি ঈশ্বর ও জনসাধারণকে মিলিয়ে মিশিয়ে একটি অতিপ্রাকৃত সত্তার কল্পনা করে নিয়ে তাকে নাম দিয়েছেন গণদেবতা। মাটির গুণ এভাবেই উঠে আসে উপরিতলে। বস্তুত প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশের জনগণ ও তাঁদের পরিচালকদের যেমন যেমন বিভাজন (বিকাশ) ঘটেছে, দেশের মানুষের মনের মাটিতে জনগণ ও গণপরিচালকদের বিষয়ে তেমন তেমন ধারণাও ক্রমশ দানা বেঁধেছে। আমাদের পুরাণকারগণ একসময় সেই গণপরিচালকদের উক্ত বিভাজনকে ৪২২ রকম রূপে সক্রিয় দেখেছিলেন। উপরে সেই ভাগগুলির কথা বলা হয়েছে।

আমরা দেখছি, এই গণদেবতারা ছিলেন, আছেন, থাকবেনও। একালের মানুষ তাদের চিনলেও চেনেন অন্য নামে এবং উপরোক্ত দেবতাদের সঙ্গে তাঁদের মেলাতে পারেন না। সে যাই হোক, এই গণদেবতাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে এখন পর্যন্ত আমরা সুস্পষ্ট রূপে চিহ্নিত করতে পেরেছি। যেমন ১২ আদিত্যের **ইন্দ্র মিত্র বরুণ**কে, ৪৯ অনিলের কয়েকজনকে। আমরা বুঝেছি, সব গণদেবতাকেই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে এই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থের পথে গবেষণা এগিয়ে নিয়ে গেলেই।

গণেশ : ১. গণ + ঈশ। ২. *গণের ঈশ থাকে যাহাতে।* ৩. প্রমথগণের অধিপতি, শিব, গণদেবতার পতি, গণপতি। শ্রীকৃষ্ণ বালক রূপে পার্ব্বতীর মন্দিরে বিহারশয্যায় অবস্থান করেন এবং পার্ব্বতী কর্ত্তৃক পুত্ররূপে গৃহীত হন। ইনি হস্তিমুখ। পরশুরামের সহিত যুদ্ধে ইঁহার এক দন্ত ভগ্ন হয়; তদবধি ইনি 'একদন্ত'। ব্যাসের প্রার্থনায় ইনি মহাভারতের লেখকত্ব গ্রহণ করেন। ইনি চতুর্হস্ত রক্তবর্ণ লম্বোদর স্থূলতনু মূষিকবাহন। ইনি জ্ঞানদাতা, বিঘ্ননাশক বলিয়া 'বিঘ্নরাজ', সর্বাগ্রে পূজ্য এবং কার্য্যসিদ্ধিকারক। (ব.শ.)। (ক) শিব ও পার্বতীর পুত্র দেবতাবিশেষ। সিদ্ধিদাতা। সকল কর্মের প্রারম্ভে গণেশের পূজা করা হয়। খর্বাকৃতি দেহ, ত্রিনয়ন, চারি হস্ত, এবং হস্তীর ন্যায় মস্তক। এক হস্তে শঙ্খ, এক হস্তে চক্র, তৃতীয় হস্তে গদা ও চতুর্থ হস্তে পদ্ম। মূষিক এঁর বাহন। কারণ, এই মূষিক বৃষরূপধারী ধর্মের অবতার; মহাবল ও পূজাসিদ্ধির অনুকূল। গণেশ মঙ্গল ও সিদ্ধির জনক বলে সকল দেবতার আগে পূজিত হন। ... সতী দেহত্যাগ করে হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বহু বৎসর সন্তান না হওয়ায় বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে পুণ্যকব্রত অনুষ্ঠান করেন। যথাসময়ে বিষ্ণুর বরে পার্বতীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দেবতারা স্বর্গ মর্ত্য পাতাল থেকে নবজাত শিশুকে দেখার জন্য উপস্থিত হন। ... শনিও আসেন। শনির ... অভিশাপ ছিল, তিনি যার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন, তারই বিনাশ হবে। সেই শাপ স্মরণ করে শনি এই নবজাতকের দিকে দৃষ্টিপাত না করে অধোমুখে ছিলেন। কিন্তু পার্বতী শনিকে তাঁর পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করতে বারংবার অনুরোধ করেন। উত্তরে শনি ... তাঁর শাপের কথা বলেন। তথাপি পার্বতী নবজাতকের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করতে বলেন। ... করা মাত্র শিশুর মুণ্ড দেহচ্যুত হয়। এই সংবাদ বিষ্ণুর কাছে যাওয়া মাত্র তিনি এর ব্যবস্থা করতে এগিয়ে আসেন। পথিমধ্যে একটি নিদ্রিত হস্তী দেখে সুদর্শনচক্রের সাহায্যে তার মস্তক কেটে নিয়ে আসেন এবং গণেশের গলার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। গণেশ যাতে এইজন্য সকলের কাছে অনাদৃত না হন, সেজন্য দেবতারা নিয়ম করেন যে, প্রথমে গণেশের পূজা না হলে তাঁরা কেহই কোনো পূজা গ্রহণ করবেন না। তাই প্রত্যেক দেবকার্যে ও পিতৃকার্যেও প্রথমে গণেশ পূজিত হন। (খ) ... সিন্দুর নামে এক দৈত্য পার্বতীর গর্ভে অষ্টম মাসে প্রবেশ করে গণেশের মস্তক কর্তন করে। ... জন্মগ্রহণ করার পর নারদ তাঁকে নিজেই নিজের মস্তক সংগ্রহ করতে বলেন। বালক তখন আপন তেজে গজাসুরের মাথা কেটে নিজের দেহে যোগ করেন। সেই হতে গণেশ গজানন। (গ) ... পার্বতীর দিব্য গাত্র-মল থেকে গণেশের জন্ম হয়। মহাদেব পার্বতীকে প্রীত করবার জন্য একটি গজমস্তক এঁর মস্তকহীন দেহে সংশ্লিষ্ট করেন। মহাদেবের করুণায় ইনি সঙ্গে সঙ্গে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন এবং মাতা পার্বতীকে প্রদক্ষিণ করে পাদবন্দনা দ্বারা আপন মহিমা ও পরম জ্ঞান-ভক্তি প্রকাশ করেন। পার্বতী ও মহাদেবের বরে ইনি গণের অধিপতি, বিঘ্ন-বিনাশক ও সর্বসিদ্ধিদাতা রূপে গণ্য হন।

গণেশ সর্বদা তপস্যায় মগ্ন থাকতেন। তুলসী এঁকে পতিরূপে পাবার জন্য আকাঙক্ষা করেন। কিন্তু গণেশ তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর বিকলচিত্তের জন্য দানবপত্নী হবেন বলে অভিশাপ দেন। এর প্রত্যুত্তরে তুলসী দেবীর অভিশাপে বিবাহ-বিরত গণেশকে পুষ্টি নামক এক কন্যাকে বিবাহ করতে হয়।

ব্যাসদেব মহাভারত গ্রন্থের লিপিকারের অভাবে চিন্তিত হয়ে ব্রহ্মার কাছে যান। তিনি ব্যাসদেবকে গণেশের শরণাপন্ন হতে বলেন। গণেশ রাজী হন এক শর্তে। শর্তটি হচ্ছে — তিনি যখন মহাভারত লিখতে আরম্ভ করবেন, তখন লেখার আর কোনো বিরতি ঘটতে দেওয়া হবে না। ব্যাসদেবও গণেশকে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে নেন যে, কোনো শ্লোক লেখার পূর্বে তার সম্পূর্ণ অর্থ গণেশকে ভালো করে বুঝে তবে লিখতে হবে। এতে ব্যাসদেবের সুবিধাই হয়। তিনি দুরূহ শ্লোক সৃষ্টি করে গণেশের লেখায় মাঝে মাঝে দেরি করিয়ে দিতেন এবং সেই অবসরে নূতন নূতন শ্লোক তৈরি করে ফেলতেন। এইভাবে সমগ্র মহাভারত লিখিত হয়। (পৌ.অ.)। ৪. ঠাকুর ও নাম রূপে প্রচলিত। ৫. প্রকৃতপক্ষে ইনি হলেন রাষ্ট্রের কেরানিকুল। দ্র. **চোর, চোরগণেশ**। এদের মাথায় বসেন বুরোক্র্যাটরা। তাই এরা গজমুণ্ডী। দ্র. **কিন্নর, কিম্পুরুষ**। দেশের পুলিশ-মিলিটারি বা সৈন্যবাহিনী কার্ত্তিকেয় এর ভাই। মহামায়া জনসাধারণই এদের মাতা। এই কেরানিকুলের ইতিহাসই গণেশের ইতিহাস। এদের মাধ্যমেই রাষ্ট্র সম্পদ আহরণ করে। তাই একে গজানন বলে। কেরানিকে তুষ্ট না

করে বড়সাহেবের কাছে পৌঁছানো বেশ কঠিন। সেই কারণে সবার আগে গণেশের পুজো। ... দ্র. **আনন, গজানন, গাজী**।

গণ্ড (গণ্ডক, গণ্ডা, গণ্ডার) : ১. গম্‌ + ড। (ব.শ.)। ২. *গণ্ড = গামীর রহস্যরূপের আবর্তন বা গড়ান-উড়ান যাহাতে। গণ্ডক = গণ্ড করে যে। গণ্ডা = গণ্ড-এর আধার যে। গণ্ডার = গণ্ডা রহে যাহাতে।* ৩. শ্রেষ্ঠ, স্থূল, কপোল, গাল, হস্তিকপোল, কট, গণ্ডক, গণ্ডার, স্ফোটক, ফোড়া, গ্রন্থি, গাঁট, পিটক, জড়ুল, ঘাড়ের মাংসবৃদ্ধি, পৃষ্ঠগুড়, বুদ্বুদ, চিহ্ন, দাগ, অশ্বভূষণ, বীর, দোষজনক অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের ভাগবিশেষ, যোগবিশেষ, গণ্ডযোগ; খড়্গী, গণ্ডার, গ্রন্থি, ভূষণ, অবচ্ছেদ, অন্তরায়, বিদ্যাবিশেষ, সংখ্যাবিশেষ, গণ্ডা (চার) সংখ্যা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. গণ (বহু) গড়ায় বা এগিয়ে চলে যাতে, তাই হল গণ্ড। সমাজের প্রেক্ষিতে গণ্ড শব্দটি এককালে গৌরবজনক ছিল, বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থায় গণ আবর্তিত হত। পরে সেই প্রকার গড়ান-উড়ান নিন্দাজনক হয়ে যায়। আজ শব্দটি যাকেই বোঝাক, তা যে মানুষের প্রিয় নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। গণ্ডগ্রাম, গণ্ডমূর্খ ছাড়াও গলগণ্ড রোগটির কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। এ হল গলায় ঝুলে থাকা 'অণ্ডবৎ পিণ্ড'। এই যে গোল মতো পিণ্ড, যার ভিতরের অণুগুলি জড়াজড়ি করে থাকে, তাকেই গণ্ড বলে। খুব সহজভাবে বললে, মুখের ভেতরে খাবার-দাবারগুলো যেরকম একটা গোলাকার পিণ্ডের মধ্যে নড়া-নড়ি করে, সমাজের ক্ষেত্রে এও তাই; তাই তাদের যৌথতাকেও গণ্ড বলা যায়। একটি গ্রামের বা সমাজের সদস্যগণ যে পরস্পর দেওয়া-নেওয়া, টানা-টানি, ছোটা-ছুটি করেন, তাঁদের এইরূপ সক্রিয় রূপটিকেও গণ্‌-ড বা গণ্ড বলে। এই গণ্ড চলে যে ধারায়, তাকে গণ্ডক বলা হত। বুড়িগঙ্গাকে এখনও বিহারের মানুষ 'বুড়িগণ্ডক' বলেন।

বুনো গরুকে বাঘের মুখোমুখি পড়ে যেতে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বলেন, কমপক্ষে চারটি গরু একত্রে থাকলেই তারা বাঘকে সিং দিয়ে চিরে ফেলে। চারের কম থাকলে তারা পালায় অথবা আক্রান্ত হয়ে মরে। এর কারণ হল, বাঘের গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গরুগুলি পরস্পরের পেছনে পেছন ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। গরুর সংখ্যা অনেক বেশি থাকলে এই অবস্থানটি হয়ে যায় গোল এবং পরিধিতে উদ্যত থাকে গরুগুলির ধারাল সিং। কমপক্ষে সংখ্যাটি চার হলেও পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চারদিকে মুখ করে তারা দাঁড়িয়ে যায়। (দ্র. **চতুর**)। গণ্ড-এর ঘনিষ্ঠতম আধার বলে, একে বলা হয় গণ্ড থেকে জাত বা গণ্ডা। গণ যদি এইরকম অতি-ঘনিষ্ঠ হয়, এত ঘনিষ্ঠ যে মাঝে বিন্দুপরিমাণ ফাঁক না থাকে, তবে তাকে গণ্ডা বলাই যায়। এই গণ্ডা রহে যাহাতে তাকেও গণ্ডার বলা চলে। সবাই জানেন, গণ্ডারের চামড়ায় তীর ঢোকে না। কারণ তার চামড়ার কণাগুলি গণ্ডারূপে অতিঘনিষ্ঠ বলেই এরকম সম্ভব হয়। দ্র. **খণ্ড, গণ্ডগোল**।

গণ্ডগোল : ১. **গণ্ড + গোল**। ২. *যাহাতে গণ্ড রূপ গামীগণ লয় প্রাপ্ত হয়*। ৩. কোলাহল, গোলমাল, তুমুল শব্দ, বিবাদ, ঝগড়া, বচসা, উদ্‌ঘোষণ, উচ্চ শব্দে ঘোষণ বা প্রচার। (ব.শ.)। ৪. ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ৫. কিন্তু এই শব্দের প্রচলন রয়েছে ঠিক উল্টো ভাবে, **ক্ষিপ্ত** শব্দের **'ফেলে দেওয়া'** অর্থের বদলে 'রেগে যাওয়া' অর্থের মতো। কেন্দ্র থেকে পরিধিতে গামীগণ লয় প্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু ভেতরের এই লয়কে পরিধির বাইরে থেকে দেখে বা শুনে বলা হচ্ছে 'চেঁচামেচি চলছে'। অর্থাৎ, মুখের ভেতরের ফাঁকা অংশটিকে যদি গোল বলেন, তবে তার ভেতরে খাবার-দাবারগুলো যে নড়া-নড়ি করছে, তারা হল গণ্ড। দ্র. **গোল, গণ্ডূষ, কোলাহল, হট্টগোল, গোলমাল**।

গণ্ডগ্রাম, গণ্ডমূর্খ : ১. গণ্ড + গ্রাম। ২. *যে গ্রামে রহস্যরূপী গামীগণের ডয়ন (গড়ান-উড়ান) চলে; যে মূর্খ রহস্যরূপী গামীগণের ডয়ন (গড়ান-উড়ান) চালায়।* ৩. গণ্ডগ্রাম = শ্রেষ্ঠ গ্রাম, বৃহৎ সমৃদ্ধ ও ভদ্রসমাজযুক্ত গ্রাম। **গণ্ডমূর্খ** = মহামূর্খ, অতিমূর্খ। (ব.শ.)। ৪. একালে গণ্ডগ্রাম শব্দটি **'অজ'**-গাঁ বা শহর থেকে দূরবর্তী ছোট গ্রাম অর্থে এবং **গণ্ডমূর্খ শব্দটি** 'অতিমূর্খ' অর্থে প্রচলিত। ৫. বৃহৎ সমৃদ্ধ ও ভদ্রসমাজযুক্ত গ্রাম বলতে ঠিক কী বোঝায়, একালে তা কল্পনা করা একটু কঠিন। কারণ, একালে শিক্ষা ও সমৃদ্ধি সবই থাকে শহরে। সেকালে তা ছিল না। এমন বহু গ্রাম ছিল, যা পাণ্ডিত্য ও সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিল। তেমন গ্রামে কার্যত জ্ঞান ও পণ্য দুটোই ছিল এবং সেই রহস্যরূপী গামীগণের (মানসিক পণ্যবাহী জ্ঞানী ও বাহ্যিক পণ্যবাহী ধনীগণের) ডয়ন (গড়ান-উড়ান) চলত। সমাজশাসনের ক্ষমতাকেন্দ্রও ছিল কোনো কোনো গ্রামে। কিন্তু পরবর্তী কালের আধুনিক শহরের কাছে সেই শ্রেষ্ঠ গ্রাম সেকেলে হয়ে যায়। ফলে গৌরবজনক গণ্ডগ্রাম হীনতাব্যঞ্জক সেকেলেপন্থী গণ্ডগ্রামে পরিণত হয়ে গেছে। ওদিকে পণ্যবাহিতার ঘোর বিরোধী ছিলেন প্রাচীনপন্থীরা। যাঁরা উৎপন্নকে পণ্যে পরিণত করছিলেন, গামীদের রহস্যরূপী করে তুলছিলেন এবং নিজেরা সেই পণ্য নিয়ে নিজেদের জীবনের গড়ান-উড়ানে মত্ত ছিলেন, আমাদের প্রাচীনপন্থীরা তাঁদের 'গণ্ডমূর্খ' বলে শনাক্ত করলেন। প্রথম যুগের বিনিময়জীবীদের প্রতি এই নিন্দামূলক শব্দটি কিন্তু যথারীতি থেকে গেল এবং পরবর্তীকালের গণ্ডগ্রাম শব্দের সহোদর হয়ে গেল। তার মানে, প্রাচীন সমাজের চোখে যে ছিল নিন্দিত গণ্ডমূর্খ, ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে সেই গণ্ডমূর্খই একদিন প্রশংসার্হ হয়ে যায় এবং তার কারণেই তার গণ্ডগ্রাম হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ গ্রাম। আর ঠিক তার পরের যুগে সেই প্রশংসিত গণ্ডগ্রাম হয়ে যায় নিন্দনীয়। তখন, এক প্রজন্ম আগের গণ্ডমূর্খ শব্দটিও তৃতীয় প্রজন্মের নিন্দনীয় গণ্ডগ্রামের পাশে এসে বসে যায়। প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে **ভিক্ষু** শব্দের ক্ষেত্রে।

গণ্ডি, গণ্ডী : ১. গণ্ড্‌ + ই। ২. *গণ্ড যাহাতে (যে পরিধির মধ্যে কেন্দ্র থেকে) পরিব্যাপ্ত হয়।* ৩. ভূতাদির বা দুর্বৃত্তের উপদ্রব হইতে রক্ষার্থ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অঙ্কিত বৃত্তরেখা, সীমাসূচক বেষ্টনরেখামাত্র। (ব.শ.)। ৪. কম প্রচলিত। ৫. যে সীমারেখার মধ্যে রহস্যরূপী গামীগণের গড়ান-উড়ান বা আবর্তন চলবে, তেমন একটি সীমারেখার প্রয়োজন ঘটেছিল সমাজের; সেইরকম সীমারেখা টানার প্রয়োজন পড়েছিল। তারই নাম দেওয়া হয়েছিল গণ্ডী। এর মধ্যে স্বনির্ধারিত বা self-imposed সীমারেখা যেমন ছিল, তেমনি রাষ্ট্র

নির্ধারিত সীমারেখাও ছিল; ছিল এক ব্যক্তি কর্তৃক অন্যের জন্য নির্ধারিত সীমারেখা। দেবর লক্ষ্মণের টেনে দেওয়া গণ্ডীরেখার বাইরে আসার ফলেই না সীতা রাবণের হাতে লাঞ্ছিতা ও অপহৃতা হয়েছিলেন। আমাদের সংবিধান ব্যক্তির জন্যও একরকম গণ্ডী কেটে রেখেছে। সরকারও যদি সেই গণ্ডী অতিক্রম করে, তাকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত করা যায়। বিপরীতে দাঙ্গার সময় ১৪৪ ধারা বা কার্ফু ঘোষণা করে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্র যে গণ্ডী কেটে দেয়, সেই গণ্ডীর বাইরে এলেই রাষ্ট্র তাকে গণ্ডী-ভাঙার (আইন ভঙ্গ করার বা আইন অমান্যের) অপরাধে গ্রেফতার করে। সাধারণভাবে এই গণ্ডীকে একালে বাহ্যিক ক্ষেত্রে কাস্টমস্ ইত্যাদি নানা নামে এবং মানসিক ক্ষেত্রে সেনসর নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

গণ্ডূষ : ১. ✓গণ্ড্ + উষ (উষন্)। (ব.শ.)। ২. *গণ্ডের এমন পরিবর্তন, যা পূর্ব রূপের বিলোপ ঘটায়।* ৩. মুখপূরণ, মুখপূরণ-পরিমাণ বা মুখমধ্যধৃত জলাদি, মুখপূরণপরিমিত অংশ, প্রসৃতিপরিমাণ (এককোষ) জলাদি, হস্তীশুণ্ডাগ্র, উন্নতনাভি, গোঁড়, ভোজনের পূর্ব্বে বা পরে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণাদির পানার্থ প্রসৃতিপরিমাণ জল, গণ্ডূষসদৃশ স্বল্প গ্রাস বা খাদ্য-কবল। (ব.শ.)। ৪. কম প্রচলিত। ৫. এমনিতে লোকে গণ্ডূষ বলতে একটা পরিমাণ বোঝে — মুখপরিমাণ। এ হল ব্যক্তির নিজস্ব অবয়বের মধ্যে জগৎকে ধরে রাখা ধারণার অংশ। কিন্তু সামাজিক প্রেক্ষিতে এই গণ্ডূষ অনেক বড় ব্যাপার। ভারতের ইতিহাসে এই গণ্ডূষকে নিয়ে একটি কাহিনী আছে। তা হল গঙ্গার প্রবাহকে এক গণ্ডূষে পান করে নিয়েছিলেন জহ্নু রাজা, তারপর দেবগণ ও ভগীরথের প্রার্থনায় কর্ণপথে, মতান্তরে উরুভেদপূর্ব্বক তাঁকে নিঃসারিত করে দেন। এর অর্থ হল, উদ্ভাবনশীল ব্রহ্মগুণসম্পন্ন মানুষেরা (শিব) তো পণ্যপ্রবাহের প্রচলন করার দায় মাথা পেতে নিয়ে নিলেন, তাঁদের নির্দেশে মালপত্র নিয়ে এক এক দল আদি বণিকের দল (সার্থ) পণ্য নিয়ে এক এক দিকে যেতে লাগল। জহ্নুরাজার এলাকায় পৌঁছলে তাঁর প্রচলিত উৎপাদন কর্মযজ্ঞ বা যজ্ঞবাট (উৎপাদন ব্যবস্থা) প্লাবিত হল। তিনি দেখলেন, বাইরের এই মালপত্র আসতে থাকলে, বিনিময় শুরু হলে, তাঁর প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। মার্কস সাক্ষী দিয়ে গেছেন, এভাবে প্রাচীন ভারতীয় পণ্য প্রাচীন ইয়োরোপকে প্লাবিত করেছিল; তবে সে অনেক পরের ঘটনা। তো, জহ্নুরাজা আগন্তুক বণিকদের ধরে রেখে দিলেন, তাদের মালপত্রও বাজেয়াপ্ত করলেন। তাঁর রাজত্বের আয়তন ও ক্ষমতার বিচারে এই আগন্তুকদের গ্রাস করা ছিল গণ্ডূষ-পরিমাণ গলাধঃকরণ। হতে পারে, পুনরায় যারা পণ্য নিয়ে এল, সেই দ্বিতীয় বাহিনীকেও তিনি গ্রাস করেছিলেন। কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে পণ্যপ্রবাহ তো আর বইতেই পারবে না, শুকিয়ে যাবে সমগ্র প্রবাহই, গঙ্গা জহ্নুরাজার গ্রাসে কবলিত হয়ে শুকিয়ে যাবে! অতএব তাঁকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করানো হল। তিনি কর্ণপথে অর্থাৎ কিছু ফেরিওয়ালা-দোকানদার সৃষ্টি করে যে মালপত্র বাজেয়াপ্ত করেছিলেন তা বিক্রির ব্যবস্থা করে দিলেন; কিংবা (অন্যমতে) তাঁর (উরুভেদপূর্ব্বক বা) নিজের রাজভাণ্ডার থেকে সেই মালপত্র ও তার বাহকদের ছেড়ে দিলেন। গণ্ডূষের টানেই শুকিয়ে যেতে বসেছিল পণ্যপ্রবাহ বা গঙ্গা, তা পুনরায় প্রবাহিত হতে পারল। ভারতের ইতিহাসে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

গাণ্ড, গাণ্ডি, গাণ্ডী, গাণ্ডীব, গাণ্ডীবধন্বা : ১. গণ্ড > গাণ্ড > গাণ্ডি > গাণ্ডী > গাণ্ডীব > গাণ্ডীবধন্বা। ২. *গাণ্ড = গণ্ড হইতে জাত; গাণ্ডি = গাণ্ড গতিশীল যাহাতে; গাণ্ডী = গাণ্ডির আধার যে, অর্থাৎ গণ্ডীর অভ্যন্তরে গণের যে বিধিসম্মত আচরণ চলে; গাণ্ডীব = গাণ্ডী বহন করে যে, অর্থাৎ গণ্ডীর মতো (নীতি বা ধনু)।* ৩. গাণ্ডীব ধনু, ধনুমাত্র। (ব.শ.)। অর্জুনের ধনুক। কথিত আছে, ব্রহ্মা-নির্মিত এই ধনুক প্রথমে পেয়েছিলেন চন্দ্র, পরে চন্দ্র হতে বরুণ এর কর্তৃত্ব পান। খাণ্ডবদাহনের পরে অগ্নি বরুণের নিকট থেকে এই ধনু নিয়ে অর্জুনকে দান করেন। গণ্ডারের মেরুদণ্ড দিয়ে প্রস্তুত বলে এর নাম গাণ্ডীব। এই ধনুর অধিকারী বলে অর্জুনকে গাণ্ডীবী বলা হয়। ... মহাপ্রস্থানের পথে অগ্নি স্বয়ং এসে পথরোধ করে গাণ্ডীব বরুণকে প্রত্যর্পণ করতে বলেন। তখন অর্জুন গাণ্ডীব ও দুই অক্ষয় তূণ জলে নিক্ষেপ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **খাণ্ডবদাহন**। একটি বিশেষ যুগে বিশেষ অঞ্চলের মানুষেরা যে নীতি নিয়ে চলছিলেন, বিশেষত তাঁদের মধ্যে যাঁরা শুক্ল-অর্থ বা white money-র আধার ছিলেন, তাঁরা সেই সমাজনীতির ধারক ছিলেন। তাই অর্জ্জুন ছিলেন গাণ্ডীবধন্বা।

গদ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অগদ, গদ্, গদ, গদগদ, গদড়া, গদ্দড়, গদা, গদাই-নাচ, গদাধর, গদি, গদ্দিত, গদিয়ান, গদী, গদ্দি, গদ্দিনসীন, গদী, গদ্‌গদ, গদ্য, গেদা, নগদ, নগদ-নারায়ণ, নিগদ।

গদ্ = গামীর (অর্থপূর্ণ শব্দের) দান। **গদ** = গামীর দান থাকে যাহাতে।

অগদ : ১. ন + গদ। *গদ্* = ভাষণ। (গমনদান বা গতিদান)। ২. *যাহার গদ (গতিদাতা, ছোঁয়াচে রোগ, ভাষা) নাই।* / যাহাতে রোগ থাকে না। (ব.শ.)। ৩. নীরোগ, অভাষী, ভাষাহীন, নীরব। ভেষজ, ঔষধ। বিষঘ্ন ঔষধ। গদের অভাব, নৈরুজ্য, অরোগিতা। ... (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. নেই গদ যাহাতে, তাকেই অগদ বলে। যেহেতু গদ মানে 'গামীর দান থাকে যাহাতে', সেইহেতু অর্থপূর্ণ বয়ানের রব, ছোঁয়াচে রোগ ইত্যাদি গদ পদবাচ্য। সেই গদ নেই যাতে, সেটিই অগদ পদবাচ্য। বলে রাখা ভাল, পদ যাহাতে থাকে তাকে পদ্য বলে, গদ যাহাতে থাকে তাকে গদ্য বলে। গদগদ করে কথা বলে যে তাকে গদাধর বলে। আইনবাজ, বকমবাজরা সবাই গদাধর। আর সর্বশ্রেষ্ঠ গদাধর হলেন দুর্যোধন, একালের ভাষায় যাঁদের আইনযুদ্ধবাজ আমলাতন্ত্র বলে। ব্যবসায়ীদের পরিকল্পিত প্রচারও (ভীমও) অবশ্য কম যায় না। যতদূর বোঝা যায়, এই 'গদ' শব্দটি ইংরেজি god শব্দের সহোদর। দ্রষ্টব্য **নগদ-নারায়ণ**।

গদ, গদগদ, গদা, গদাধর, গদিত, গদ্য : ১. ✓গদ্ + অ - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গদ = গামীগণের দান থাকে যাহাতে;* ***গদগদ*** *= গদ ক্রিয়া ক্রমান্বয়ে চলে যাহাতে;* ***গদা*** *= গদ-এর আধার যে;* ***গদাধর*** *= গদা ধারণ করেন যিনি;* ***গদিত*** *= যাহা গদন করা হইয়াছে;* ***গদ্য*** *= গদ থাকে যাহাতে।* / **গদ** = যাহা পীড়িত করে বা যাহা রোগকে হিংসা করে; **গদগদ** = হর্ষভয়াদি হেতু গদগদযুক্ত (যাহা); **গদা** = যাহা মেঘবৎ শব্দ করে; **গদাধর** = গদার ধারক; গদিত, গদ্য — ব.শ.-তে এই শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দেওয়া নেই। (ব.শ.)। ৩. ভাষণ, কথন, রোগ, ব্যাধি, ঔষধ, রোহিণী গর্ভজাত বাসুদেব পুত্র, কুষ্ঠ বিষ; অস্ফুট, অব্যক্ত, গলদক্ষর, ভাঙা, বিহ্বলতাজনক, অস্পষ্টভাষী, অস্ফুটবক্তা, স্খলিতভাষী, তোতলা; গদ নামক অসুরের অস্থিনির্মিত অস্ত্র 'গদা', পাটলাবৃক্ষ, মুগুর; গদাপাণি, বিষ্ণু (দেবপ্রদত্ত গদাস্ত্র ধারণ করিয়া 'হেতি' অসুরকে বিনাশ করেন বলিয়া বিষ্ণু 'গদাধর' নামে খ্যাত।) শ্রীকৃষ্ণ, গদাযুদ্ধে পণ্ডিত; কথনীয়, বাচ্য, উচ্চার্য, কথ্যভাষার ন্যায় পদচ্ছন্দোবন্ধ-হীন ও তান-সাম্য যুক্ত কবিকৃত রচনাবিশেষ, বৃত্তলেশহীন শ্রব্যকাব্য। গদাসুর বিষ্ণু কর্তৃক নিহত হওয়ায় বিশ্বকর্মা তার হাড় সংগ্রহ করে আদ্যগদা নির্মাণ করে বিষ্ণুকে প্রদান করেন। বিষ্ণু ঐ আদ্যগদা দিয়ে হেতি প্রমুখ রাক্ষসদের বিনাশ করে গদাধর নামে প্রখ্যাত হন। ... ইনি যদুবংশীয় বীর। কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। (পৌ.অ.)। ৪. এর মধ্যে 'গদ্য' শব্দটি prose অর্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলির প্রচলন তুলনায় কম। ৫. এক্ষেত্রে প্রাণময় বা অর্থপূর্ণ আওয়াজ হল 'গামী' (= গ) । তার 'দান' (= দ) থাকে গদে অর্থাৎ অর্থময়-শব্দে বা অর্থময়-আওয়াজে। সেই সুবাদে 'কথা' মাত্রেই 'গদ'। কিন্তু একাদিক্রমে না থেমে এবং অর্থ অস্পষ্ট করে দিয়ে বলতে থাকলে তা হয়ে যায় 'গদগদ'। অন্যথায় কথার জোরে কী না করা যায়! তাই গদের আধার বা যথার্থ বাক্য ও বাক্যাবলীই হল গদা। গদা বা কথা যাদের মুখে (অধিকারে) থাকে, তাঁরা উকিল, নেতা, প্রফেসর, ব্যবসায়ী, যেই হোন, তাঁরা আসলে গদাধর। এই বাক্যবাগীশদের নানা প্রেক্ষিতে নানা নাম। দীর্ঘস্থায়ী আইনযুদ্ধ যাঁরা চালান, সেই দুর্যোধনকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ গদাধর' বলা হত। অপশাসন বা দুঃশাসনের দাদা এই প্রশাসনিক আইনী কূটকচালি যাঁরা চালান তাঁরাই দুর্যোধন। বৌদ্ধযুগে এঁদের একবার ধ্বংস করা হয়েছিল। পুঁজিরও এরকম আইন আছে, বিজ্ঞাপন আছে, প্রচার আছে, এবং সেও চলে কথার সাহায্যে বা গদের সাহায্যেই। তা যিনি চালান, সেই ভীমেরও গৌরব আইনযুদ্ধে বা গদাযুদ্ধে। ইনি বায়ুপুত্র বা বুনিয়াদী মিডিয়ার পুত্র, প্রচার যার ধর্ম্ম। (It is *air*-ed)। তবে সবার ওপরে স্বয়ং নারায়ণ। কৃত্তিবাস জানাচ্ছেন — 'গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর। লক্ষ্মীসহ তথায় আছেন গদাধর।' এই গদাধর স্বয়ং গদ (= god)-নারায়ণ ও নগদ-নারায়ণ।

অতএব, কিছু বলা মানেই কথিত বা গদিত। এই গদ যাহাতে থাকে তাকে তাই গদ্য বলে। একালের গদ্যকারদের কারণে 'গদ্য' এখনও বেঁচে থেকে গেছে। জনসাধারণ্যে কিন্তু গদা, গদগদ, গদাধর — এই তিনটি শব্দ এখনও বেঁচে রয়েছে খানিকটা অর্থহীন ভাবে, খানিকটা পুরাণাদির অনুষঙ্গে। অ্যাকাডেমি গদ্য ছাড়া গদ যুক্ত সমস্ত শব্দকেই তাচ্ছিল্য করেছে।

গম্ (*গচ্ছ্*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অঙ্গ (অংগো), অগ, **অগতি, অগতিক**, অগত্যা, অগথ, অগম, অগম্য, অগম্যা, অগস্ত্য, **অগস্ত্যমার্গ**, অগস্ত্যযাত্রা, অগস্ত্যসংহিতা, অগস্ত্যসেবিত, অগস্ত্যাচরিত, **অগস্ত্যোদয়**, অগার, অগিনি, অগো, অগ্নি, অতিগ, অতিদুর্গতি, **অধিগত, অধিগন্তব্য**, অধিগমন, অধিগম্য, অধোগামী, অনধিগত, **অননুগতি**, অনবগত, অনাগত, অনাগম, অনুগত, অপগত, অবগত, অবগতি, অভিগত, অভিগমন, অভিগামী, অভ্যাগত, অসঙ্গত, অসগোত্র, অসুগম, আইস, আওল, আগচ্ছ, আগত, আগতখামার, আগতরাইয়তী, আগন্তু, আগন্তুক, আগন্তুকজ্বর, আগন্তুজ, আগম, আগমন, আগমনী, আগমবাগীশ, আগমবৃদ্ধ, আগমবেদী, আগমরহিত, আগমিত, আগয়ান, আগস্ত্য, আগাছা, আগাম, আগামিকা, আগামী, আগামুক, আগুআন, আনাগনা, আনাগোনা, আপগা, আপগেয়, আয়ত, আয়তীগব, আয়ল, আয়িল, আয়িলা, আস, আসন, আসো, ইঙ্গ্, ইঙ্গিত, ইঙ্গিতকোবিদ, ইঙ্গিতাকার, ইঙ্গিতাধ্যাসিত, ইঙ্গুদ, ইঙ্গুদী, ইঙ্গুলী, উদগত, উপগ, ওগো, কণ্ঠগত, গ, গইড়মুণ্ড, গএর, গগন, গগনচর, গঙ্গ, গঙ্গা, গঙ্গাচিল্লী, গঙ্গাজ, গঙ্গাজল, গঙ্গাজলী, গঙ্গাদ্বার, গঙ্গাধর, গঙ্গাপথ, গঙ্গাপুত্র, গঙ্গাপ্রাপ্তি, গঙ্গাফড়িং, গঙ্গাফল, গঙ্গাবতরণ, গঙ্গাবাস, গঙ্গামাটি, গঙ্গাম্বু, গঙ্গাযমুনা, গঙ্গাযাত্রা, গঙ্গারাম, গঙ্গালাভ, গঙ্গাসাগর, গঙ্গোত্রী, গঙ্গোদ্ভেদ, গচ, গচ(জ)গিরি, গচি(ছি), গচ্চা, গচ্ছ, গচ্ছি, গচ্ছিত, গছ, গছা, গছান, গজ, গজকা, গজকেতু, গজগজ, গজগড়ি, গজগতি, গজগামিনী, গজগিরি, গজঘণ্ট, গজঘণ্টা, গজঘোট, গজঠাটে, গজদন্ত, গজদাঁত, গজদান, গজনাসা, গজনিধি, গজ(জে)ন্দর, গজপতি, গজপিপ্পলী, গজপুঙ্গব, গজপুর, গজব, গজবক্ত্র, গজবদন, গজবন্ধ, গজবন্ধনী, গজবাহ, গজভুক্ত, গজমণ্ডন, গজমতি, গজমোতি, গজমনি, গজমাতা, গজমুক্তা, গজমৌক্তিক, গজমুখ, গজযূথ, গজরগজর, গজরা, গজরাজ, গজল (গঞ্জল), গজশাল, গজশিক্ষা, গজস্কন্ধ, গজস্নান, গজহস্তী, গজা, গজাজিন, গজারি, গজারোহ, গজাল, গজাশন, গজাসুর, গজাস্য, গজী, গজেন্দ্র, গজেন্দ্রগমন, গজেন্দ্রমোক্ষণ, গজেশ, গঞিঙ, গঞ্জ্, গঞ্জ, গঞ্জন, গঞ্জিকা, গঞ্জিত, গট, গটগট, গটরা, গটিয়া, গৎ, গত, গতজ্বর, গতপ্রত্যাগত, গতপ্রায়, গতব্যথ, গতর, গতরস, গতরাইয়তী, গতরায়তী, গতসঙ্গ, গতস্পৃহ, গতা, গতাগত, গতাগতি, গতানুগত, গতানুগতিক, গতায়াত, গতায়ু, গতায়ুষ, গতার্থ, গতাসু, গতি, গতিক, গতিপথ, গতিবিধি, গতিভঙ্গ, গতিশক্তি, গতিহীন, গতে, গত্যন্তর, গন, গনগন, গনগনি, গন-বেগন, গন্তব্য, গন্ধ্, গন্ধ, গন্ধক, গন্ধকালী, গন্ধকাষ্ঠ, গন্ধকুটী, গন্ধখড়, গন্ধগোকলো, গন্ধগোকুলা, গন্ধতৃণ, গন্ধতেল, গন্ধতৈল, গন্ধদারু, গন্ধদ্বিপ, গন্ধনকুল, গন্ধপুষ্প, গন্ধবণিক, গন্ধবতী, গন্ধবহ, গন্ধবাণ্যা, গন্ধবান, গন্ধবাহ, গন্ধবিরজা, গন্ধবিরাজ, গন্ধবেণিয়া, গন্ধবেণে, গন্ধবেনা, গন্ধভাদাল, গন্ধভাদুলি(লে), গন্ধমাদন, গন্ধমার্জ্জার, গন্ধমালতী, গন্ধমূলক, গন্ধমূলা, গন্ধমু(মু)ষিক, গন্ধমৃগ, গন্ধরস, গন্ধরাজ, গন্ধর্ব্ব, গন্ধর্ব্বনগর, গন্ধর্ব্ববিদ্যা, গন্ধর্ব্ববিবাহ, গন্ধর্ব্ববেদ, গন্ধর্ব্বমার, গন্ধর্ব্বরাজ, গন্ধলেপ, গন্ধশালি, গন্ধসার, গন্ধহস্তী, গন্ধাজীব, গন্ধাঢ্য, গন্ধাধিবাস, গন্ধাধিবাসন, গন্ধামোদ, গন্ধার, গন্ধালী, গন্ধি, গন্ধিক, গন্ধিত, গন্ধী, গন্ধেন্দ্রিয়, গন্ধেশ্বরী,

গন্ধোপজীবী, গব, গবগব, গবুচন্দ্র, গবয়, গবা, গবাক্ষ, গবারাম, গবালি, গবাশন, গবাশ্ব, গবী, গবেড়ু, গবেড়ুকা, গবেধু, গবেধুকা, গবেষ, গবেষণ, গবেষণা, গব্য, গব্যুতি, গভীর (গহ্বর), গম্, গম, গমক, গমগম, গমন, গমনীয়, গমি, গমিত, গম্ভারী (গামার), গম্ভীর, গম্ভীরা, গম্য, গয়, গয়ঘড়, গয়লা, গয়সাল, গয়া, গয়ার, গয়ালি(লী), গয়ের, গরু, গহরা, গহি(হী)র, গহি(হী)রা (গইরা), গা, গাঅ, গাই, গাওয়া, গাওয়া (গবাহ, গওয়া), গাং, গাঁক-গাঁক, গাঁ-গাঁ, গাঁগদাড়া, গাঁজ, গাঁজা, গাঁজাই, গাঁজিয়া, গাঁদা, গাঁদাল, গাঁধি, গাঁধিপোকা, গাঙ(ঙ্গ), গাঙতাড়া, গাঙদাড়া, গাঙি(ঙ্গি)নী, গাঙুলি, গাঙ্গ, গাঙ্গরী, গাঙ্গি, গাঙ্গেয়, গাঙ্গুড়, গাঙ্গুলি(লী), গা-চাবি, গাছ, গাছগাছালি, গাছড়া, গাছল, গাছা (গুচ্ছ) গাছালি, গাছি, গাজা, গাজী, গাজুরী, গা-জ্বালা, গাত, গাতর, গাত্র, গাত্রদাহ, গাত্র-শোঁকাশুঁকি, গাদ, গাদন, গাদমনি, গাদ(দো)লা, গাদা (গেদে দেওয়া), গাদালি, গাদাগাদি, গাদি(দী), গান্ধর্ব্ব, গান্ধার, গান্ধারি, গান্ধারী, গান্ধিক, গান্ধিচুষা, গাপ, গাফিল, গাফিলতি, গাব, গাভী, গামছা (গা-মোছা), গামার, গামারি, গামী, গাম্ভারি(রী), গাম্ভীর্য্য, গায়, গা-শোঁকাশুঁকি, গিআ, গুইসাপ, গুষ্টি(ষ্টী), গুষ্ঠী, গুহাল, গেঁট, গিজগিজ, গিজ্‌গিজি (ঘিজ্ঞি), গুড়মুড়া, গে, গেও, গেঁজ, গেঁ(গাঁ)জলা, গেঁজেল, গেঁজা, গেঁজিয়া, গেঁজে, গেঁতি (গেতি), গেঁতিজাল, গেঁদা, গেঁদাল, গেঙ্গান, গেঙ্গানি, গেছো, গেজা, গেল, গে(গ্যা)স (গঃ), গৈড়, গৈর, গো, -গো, গো (সুপারি), গোআ(য়া)ল, গোঁ, গোঁআ, গোঁগা (গুংগা), গোঁঙার, গোঁজ, গোঁড়, গোঁৎ, গোঁধলা, গোঁফ (গুম্ফ), গোঁয়া, গোঁয়ার, গোঁয়ারা, গোঁসা (গুসসা), গোঁসাই, গোঁসাঞি, গোকর্ণ, গোকল, গোকুল, গোক্ষুর, গোখরি, গোখুর, গোখুরা, গোগ্রন্থি, গোগ্রহ, গোগ্রাস, গোঘৃত, গোঘ্ন, গোঙা, গোঙান, গোঙানি, গোঙার, গোঙ্গা, গোঙ্গান(নি), গোচর, গোচর্ম্ম, গোচারক, গোচী (গচ্ছি), গোজননী, গোজন্ম, গোঞা, গোট, গোটা, গোঠ, গোড়, গোড়া, গোড়ালি, গোতম, গোতীর্থ, গোত্র, গোত্রভিৎ, গোত্রস্খলন, গোদন্তী, গোদাগা, গোদানা, গোদাবরী, গোদারণ, গোদুহ, গোধন, গোধু(ধূ)ম, গোধূলি(লী), গোধেনু, গোনর্দ্দ, গোন(না)স, গোনাথ, গোপাল, গোপিত্ত, গোপুচ্ছ, গোপ্রচার, গোপ্রত(তা)র, গোপ্রবেশ, গোবধ, গোবর, গোবরকুড়, গোবরগণেশ, গোবর্দ্ধন, গোবলীবর্দ্দ, গোবাঘা, গোবাট, গোবাস, গোবাসন, গোবিট, গোবিন্দ, গোবিন্দাই, গোবিসর্গ, গোবৃত্তি, গোবৃষ, গোবেচারা, গোবৈদ্য, গোব্রজ, গোব্রত, গোভঙ্গিমা, গোভাগাড়, গোভৃৎ, গোমক (গোড়ম্বা), গোমক্ষিকা, গোমড়ক, গোমতী, গোমধ্যমধ্যা, গোমন্ত, গোময়, গোমাই, গোমাতা, গোমী, গোমুখ, গোমুণ্ডা (গোমুঞা), গোমুড়ি, গোমূত্রিকা, গোমূর্খ, গোমৃগ, গোমেদ, গোমেধ, গোযান, গোয়াল, গোয়ালা, গোযুগ, গোরক্ষ, গোরক্ষক, গোরক্ষণ, গোরক্ষ্য, গোরথ, গোরশুনা, গোরস, গোরু, গোরুত, গোরূপ, গোরেণু, গোরোচনা, গোলাঙ্গুল, গোলোক, গোলোকধাম, গোশাল, গোশালা, গোশীর্ষ, গোষা গোষ্ঠ, গোষ্ঠিক, গোষ্ঠী, গোষ্ঠীপতি, গোষ্ঠেশয়, গোষ্ঠেশূর, গোষ্পদ, গোসংখ্য, গোসর্প, গোসা (গুসসা), গোসাঁই, গোসাঞি, গোসাপ, গোস্ত, গোস্তন, গোস্তাকি (গুসতাখী), গোস্থান, গোস্বামী, গোহত্যা, গোহাড়, গোহারি, গোহাল, গোহালি, গোহালিয়া, গোহাল্যা, গৌতম, গোতমী, জগ, জগৎ, জগৎকর্ত্তা, জগৎগৌরী, জগৎপতি, জগৎময়, জগৎযোনি, জগৎস্রষ্টা, জগৎসৃষ্টি, জগতী, জগদন্ত, জগদম্বা, জগদম্বিকা, জগদাত্মা, জগদায়ু, জগদায়ুঃ, জগদীশ, জগদেকনাথ, জগদেকচন্দ্র, জগদ্‌গুরু, জগদ্‌গৌরী, জগদ্ধাতা, জগদ্‌যোনি, জগদ্রূপ, জগধি, জগন্নাথ, জগন্নিবাস, জগন্মঙ্গল, জগন্ময়, জগন্মাতা, জগবন্ধু, জগমোহন, জগাখিচুড়ি, জঙ্গম, তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, তুরঙ্গিণী, দুরধিগ, দুরবগম, দুর্গত, নগ, নিগম, নির্গত, নির্গম, নির্গমন, বিগত, বিনির্গত, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, বেগতিক, যথাগম, সঙ্গত, সঙ্গতি, সঙ্গতিপন্ন, সঙ্গম, সদাগম, সমাগত, সমুদগত, সমুপাগত, সুগত, সুগতি, সুগন্ধ, সুগন্ধি, সুগম, সৌগত, সৌগন্ধ, স্বাগত, স্বাগতম।

গম্ (গঞ্জ) = গামীর সীমায়ন। **গম** = গামীর সীমায়ন যাহাতে, যাহাতে গামী এক স্থান হইতে অন্য স্থান পর্যন্ত যায় (অনন্ত গমন করে না)। **গঞ্জ** = গং বা গামীর রহস্যরূপ জনিত হয় যেখানে।

অগ : ১. ন + গমন। ২. *নেই গমন যাহাতে।* / যে যায় না। (ব.শ.)। ৩. গতিহীন, দুর্গম। বৃক্ষ, পর্ব্বত। তুলনীয় - নগ। সূর্য্য (আর্য্যভট্ট মতে সূর্য্যের গতি নাই)। ... (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **অজ** শব্দের মতো করে অগ শব্দকে বুঝতে হয়, নইলে **অগস্ত্য** ইত্যাদি শব্দের মানে বোঝা যায় না। নেই গমন যাহাতে, সে এমন সত্তা হতে পারে, যে এক অবস্থানে স্থির থাকে। তার বিকাশ নেই, গতি নেই, চলন নেই, অনড়, অটল। সেই সুবাদে পর্ব্বত বা সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি। কিন্তু যার ভেতরে কেউ গমন করতে পারে না, সেও অগ হতে পারে। সে ক্ষেত্রে অগ অভেদ্য, অগম্য। এই কারণে এই শব্দের একটি অর্থ ছিল দুর্গম। ৬. ইংরেজি ago।

অগত্যা : ১. অগতি + আ। ২. *অগতি যাহাতে থাকে তাহার আধার।* ৩. গতির অভাবে, উপায়ান্তরের অভাবে, কার্য্যগতিকে, কাজে-কাজে। (ব.শ.)। ৪. 'কাজে-কাজে' অর্থে প্রচলিত। ৫. যার গতি নেই, সেই হল অগতি। সেই অগতির কারণে যা ঘটে বা হয়, তাই অগত্যা।

অগস্ত্য : ১. অগ, স্ত্যৈ = স্তম্ভন। / অগ + ✓স্ত্যৈ স্তম্ভন + অ - ক। ২. *অগকে (দ্র. অগ) স্তম্ভিত করেন যিনি।* / যিনি অগকে (বিন্ধ্যপর্বতকে) স্তম্ভিত করেন। (ব.শ.)। ৩. বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অর্থাৎ বেদের বহু শ্লোক এঁর লেখা। আদিত্যযজ্ঞে মিত্র ও বরুণ উর্বশীকে দেখে যজ্ঞকুম্ভের মধ্যে শুক্রপাত করেন, তার থেকে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্ম হয়। দু'জন পিতার সন্তান বলে এঁদের প্রত্যেকের নাম 'মৈত্রাবরুণী'। বংশরক্ষার জন্য তিনি বিদর্ভরাজকন্যা লোপামুদ্রাকে বিবাহ করেন। ইনি বিন্ধ্যপর্বতের গুরু হয়েও দেবতাদের অনুরোধে বিন্ধ্যপর্ব্বতকে দমন করেন। দেবতাদের অনুরোধেই ইনি সমুদ্রপান করেন। (পৌ.অ.)। ৪. বর্তমানে এই শব্দের ব্যবহার নেই, তবে ব্রাহ্মণের পদবীরূপে এর একরকম প্রচলন এখনও আছে; যথা 'অগস্তি'। ৫. সেকালের একটি ব্রাহ্মণগোষ্ঠী, যাদের প্রত্যেককেই অগস্ত্য বলা হত। যেমন কংগ্রেস বা কমিউনিস্টদের প্রত্যেককেই কংগ্রেস বা

কমিউনিস্ট বলা হয়, সেইরকম। 'সত্যজ্ঞান'-ধারণকারী ('অহরভিমানী' মিত্র, দ্র. **অগ্নি**) ও 'সত্যগোপন'-কারী (আবরণ সৃষ্টিকারী বা বরুণ), এই দুই শ্রেণীর মানুষের বা এই দুই সত্তার মিলনে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞের ভিতর থেকেই এঁদের (অগস্ত্যের) জন্ম। প্রাচীন পণ্যজীবীদের /হকারদের (বা অপ্সরাকে) দেখে তাঁরা (মিত্র ও বরুণ) এই মিলনের প্ররোচনা পান। এর ফলে সামাজিক কর্মযজ্ঞ থেকেই অগস্ত্য গোষ্ঠীর জন্ম হয়। এই গোষ্ঠীর কিছু মানুষ (অগস্ত্য) সুদ-নিষিদ্ধ দেশে (**বিদর্ভ** দেশে) মুদ্রা-অব্যবহারকারী জনসাধারণের (**লোপামুদ্রার**) পরিচালক নিযুক্ত হন। এঁরাই পণ্যজীবী ব্যবস্থার অচলায়তনকে (বিন্ধ্যপর্ব্বতকে বা অগকে) পরামর্শ দিতেন, তাই অগস্ত্যই বিন্ধ্য-পর্ব্বতের (পর্ব্বে পর্ব্বে বিন্যস্ত ব'লে সামাজিক সংগঠনকে বা organisation-কে সেকালে পর্ব্বত বলা হত) গুরু, যা কিনা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার যৌথ-সম্পদের (সূর্য্যের) বিরোধী ছিল। কিন্তু পণ্যজীবী-ব্যবস্থার অতি-অগ্রগতিকে সেকালের পণ্যজীবীরাও (সেকালের দেবতারাও) ভয় পেতে শুরু করে (যে কারণে বর্তমানের সেকেলে পুঁজিপতিরা করপোরেট পুঁজির বিকাশের বিরোধিতা করেন এবং পাব্লিক সেকটর-বাদী রাষ্ট্রের সমর্থন করেন, খানিকটা সেইরকম।) এবং অগস্ত্যের শরণাপন্ন হয়। তাঁদের অনুরোধে অগস্ত্য **বিন্ধ্যপর্ব্বত**কে বা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চিরতরে নিম্নমর্যাদা-সম্পন্ন করে দেন। স্তম্ভিত ('স্তৈ' ক্রিয়া) করার অর্থ static করে দেওয়া, আর বাড়তে না-দেওয়া। ভারতে পুঁজির বিকাশ যতভাবে রোধ করা হয়েছে, এটি তারই একটি ঘটনা। দ্র. **ষড়যন্ত্র**।

আগম (আগমশাস্ত্র) : ১. গম্ = গমন, শাস্ = উপদেশ, শাসন। (শাস্ত্র = যার দ্বারা শাসন সাধিত হয়।) ২. *যাহা (দর্শক, শ্রোতা, ভোক্তার নিকট) আসে।* / যাহার দ্বারা জ্ঞানলাভ সাধিত হয়; যাহা চারিদিকে যায় বা শাখা বিস্তার করে; যাহা শিবমুখ হইতে আগত, গিরিজামুখে গত, এবং বাসুদেবের অভিমত। (ব.শ.)। ৩. আগমন। ... আয়। ... আবির্ভাব। পণ্যদ্রব্যের দেশান্তরে উপস্থিতি, আমদানি। ... ক্রয়প্রতিগ্রহাদি সপ্ত বিত্তলাভের উপায়। ... স্ত্রীসঙ্গম। (ব.শ.)। দ্র. অসদাগম। ৪. অপ্র.। ৫. শিবপুরাণ মতে 'শিবগুণ উৎপন্ন হইলে মানুষ সংসারের দোষ দর্শন করে।' এর থেকে বোঝা যায়, কোনো মানুষের মধ্যে শিবসত্তার উদ্ভব হলে সে প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দেখতে পায়। তখন সেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য সে চেষ্টা করে। প্রয়োজনে ঊর্ধ্বসীমালঙ্ঘনও করে। আর, সেটিও একটি শিবগুণ। সেই ধরনের শিবগুণসম্পন্ন মানুষেরা তাঁদের অনুসারীদের যা বলতেন, সেটাই আগমশাস্ত্র বা তন্ত্র। একে পঞ্চমবেদ, ঊর্দ্ধাম্নায় ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। বঙ্গীয় শব্দকোষ মতে 'বৈদিক'-এর বিপরীত হল 'তান্ত্রিক'। সেই সুবাদে তন্ত্র হল বেদবিরোধী শাস্ত্র। বস্তুত সনাতন যুগকে (আদিম সাম্যবাদকে) সরিয়ে বৈদিক যুগের (আদিম সমাজতান্ত্রিক যুগের) সূত্রপাত হয়েছিল। তাই বৈদিক যুগের বিরোধিতা করার জন্য আদি সনাতনপন্থীরা তো ছিলই, নতুন সনাতনপন্থীরা (বা তান্ত্রিকরা) জন্মায় বৈদিক যুগকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থান দখল করতে। এদেরকেই মূলত তান্ত্রিক বলা হয়। এই দুই সনাতনপন্থীরা যোগ দেয় বৌদ্ধদের সঙ্গে। অশোকের হাতে শুরু হয় বৌদ্ধ যুগের (আদি ধনতন্ত্রের স্বর্ণযুগের)। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পর সেই বৌদ্ধদের সরিয়ে ক্ষমতায় আসে হিন্দু যুগের প্রতিষ্ঠাতারা। তাই বৌদ্ধযুগেই ভারতে তন্ত্রের (এবং ধনতন্ত্রেরও) রমরমা হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য বেদচর্চার মতো তন্ত্রচর্চাও নানা কারণে, বিশেষত নিম্নাধিকারীদের হাতে পড়ে ক্লেদাক্ত হয়ে গেছে।

আগমনী : ১. গম্ = গমন। ২. *যাহাতে (উমার) আগমন সম্বন্ধে কথা ও গান আছে।* ৩. গিরিরাজ হিমালয় ও তাঁর স্ত্রী মেনকার কন্যা উমা বা পার্বতী বিবাহের পর স্বামীর (শিবের) ঘরে গিয়েছিলেন। তাঁকে আনবার জন্য এই বিষয় নিয়ে অনেক বাঙালী কবি গীত রচনা করেছেন। প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় এই আগমনী গান গেয়ে লোকের মনে উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলা হয়। আগমনী বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট গান। (পৌ.অ.)। ৪. একই অর্থে প্রচলিত। ৫. বিষয়টি এখন অর্থহীন আচারে পরিণত। কেউ জানে না **গিরিরাজ হিমালয়** বলতে কাকে বোঝায়, **মেনকা** কে, **উমাই** বা কে? আমাদের বাংলাভাষী-পূর্বপুরুষগণ অকালবোধন করে শিক্ষিত-জনসাধারণকে (দুর্গাকে) আগমনী গান গেয়ে আবাহন করে, জাগিয়ে (**বোধন-উদ্বোধন** করে), সামাজিক রিপু মৌলবাদী শাসক মহিষাসুরকে নিধন করেছিলেন। সেই প্রাচীন কাহিনীর সর্বস্ব বাদ দিয়ে ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন 'আধুনিক' শিক্ষিত বাঙালি সেই আগমনী গানে কেবলমাত্র নিজের কন্যার জন্য আকুলতাকে ঢুকিয়ে দিয়ে আগমনী গান এখনও গেয়ে চলেছে।

গ : ১. গ = গ্ + অ = গ। / ✓গম্ + অ (ড) - ক। স্ত্রী গা। ✓গৈ + অ (ড) - ক। (ব.শ.)। ২. *যায় যে; (গমনের বুনিয়াদি আধার বা গমনকারক = গমনের প্রযুক্তির আধার, গমনের তেজের আধার ইত্যাদি।)* ৩. গামী, যায়ী, গত, প্রাপ্ত পতিত, প্রাপক, প্রবাহী, আস্থিত, গায়ক, গাতা, গণেশ, গন্ধর্ব্ব। (ব.শ)। ৪. পৃথকভাবে শব্দটি অপ্রচলিত। কিন্তু উরগ, কামগ, খগ, তুরগ, পারগ, সর্ব্বগ — এভাবে শব্দটি প্রচলিত রয়েছে। ৫. গ আর গো, শব্দদুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গ্ উচ্চারণ করা যায় না, তাই গ্-এর সঙ্গে অ জুড়ে উচ্চারণ করতে হয়। তেমনি গমনকে দেখা যায় না, তাকে দেখতে হলে একজন গমনকারীকে জুড়ে নিয়ে তবে গমনকে দেখতে হয়। সেই কারণে গ মানে গমনকারক বা যায় যে। কিন্তু গো মানে তাতে অ থেকে উ পর্যন্ত ধারক-স্বরগুলি বিদ্যমান। গ, গা, গি, গু, গৃ সবই এর ভিতরে থাকে। তাই গো হল সর্বপ্রকার গ-এর আধার। কথাটি ক কো, খ খো প্রভৃতি সব বর্ণের ক্ষেত্রেই খাটে। ৬. ইংরেজি go, জারমান gehen, সুয়েডিশ ga, ড্যানিশ gaa, ডাচ gaan।

গগন (গগনচর) : ১. ✓গম্ + অন (যুচ্) - কর্তৃবাচ্যে; গগন + ✓চর্ + অ (ট) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গামী গমন করে যেখানে; গগনে চরে যে।* / যাহা ব্যাপ্ত করে; আকাশচারী। (ব.শ.)। ৩. শূন্য, লগ্ন হইতে দশম রাশি, আকাশগামী, সিদ্ধগন্ধর্ব্বাদি; দেব, সূর্য্যাদিগ্রহ, রাশিচক্র, অশ্বিনীপ্রভৃতি নক্ষত্র, পক্ষী। (ব.শ.)। ৪. প্রায় অপ্রচলিত। ৫. অমরকোষ টীকা উদ্ধৃত করে বঙ্গীয় শব্দকোষ

জানাচ্ছেন যে, 'গগণ' (বানানটি দেখুন) শব্দটি অসাধু; কেবল যমকে ও অন্যত্র শ্লেষে তার প্রয়োগ আছে। সন্দেহ নেই এই 'গগণ' শব্দের অর্থ 'গামী-গণ'। বঙ্গীয় শব্দকোষের পথ অনুসরণ করে এখানে আমরা 'গগন' শব্দটি নিয়েছি। যেখানে গামী গমন করে, সেই স্থানকে গগন বলে, আকাশও বলে। কিন্তু সেখানে যেসব গামীরা যান বলে ব.শ. জানাচ্ছেন, তাঁরা সিদ্ধগন্ধর্বাদি থেকে পক্ষী পর্যন্ত অনেকেই। আজকের দিনে এই গগনচারীদের তালিকায় আমরা বিমান, রকেটও ঢুকিয়ে দিতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হল সিদ্ধগন্ধর্বাদিদের তো এই মুহূর্তে আমরা চিনি না। তাঁরা সত্যিই আকাশে যান কিনা, তা আমরা গন্ধর্বকে চিনে তবে বুঝতে পারব।

গঙ্গা : ১. গম্ + গ (গন্) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *গামীর সীমায়িত রূপ (রহস্যরূপ) গমন করে যাহাতে।* ৩. আর্য্যাবর্ত্তস্থিত পবিত্র নদীবিশেষ, নদী, হ্লাদিনী-প্রভৃতি সপ্তগঙ্গা, গাঙ। দেবীবিশেষ, গঙ্গাদেবী। ইনি মেনকার গর্ভজাতা হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ভগীরথ সগরসন্তানগণের উদ্ধারার্থ কঠোর তপস্যা করিয়া ইঁহাকে ভূতলে আনয়ন করেন। মহাভারতে, শান্তনুর পত্নীরূপে ইনি, বশিষ্ঠ কর্তৃক অভিশপ্ত অষ্টবসুর জননী। (ব.শ.)। (ক) ... কপিলের শাপে ভস্ম হওয়া সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানকে ... পুনরুজ্জীবিত করতে সগর রাজা গঙ্গা আনয়নের উপায় চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু ত্রিশ সহস্র বৎসর রাজত্বের পরও তিনি উক্ত কর্মে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন না। তাঁর পৌত্র অংশুমান, অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ কঠোর তপস্যায় স্বর্গ হতে গঙ্গা আনয়নের অনুমতি পান। ... মহাদেব তাঁর জটা থেকে গঙ্গাকে মুক্ত করে বিন্দু সরোবরে ত্যাগ করেন। গঙ্গা তখন পশ্চিমে হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী, পূর্বে সুচক্ষু, সীতা, সিন্ধু ও ভগীরথের পশ্চাতে এক স্রোত — এই সাতটি স্রোতে প্রবাহিত হতে থাকেন। ... ব্রহ্মার বরে গঙ্গা ভগীরথের জ্যেষ্ঠা দুহিতা ও তাঁর নাম ভাগীরথী হয়। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবাহিত বলে গঙ্গার অপর নাম ত্রিপথগা। (খ) দেবর্ষি নারদ নানা রাগ-রাগিনীযুক্ত সঙ্গীতে অভিজ্ঞ; কিন্তু তাঁর ত্রুটির জন্য সঙ্গীতের তাল ভঙ্গ হয়ে যায়। ... রাগ-রাগিণীরা বিকলাঙ্গ নরনারীর আকারে পথে পড়ে থাকে। নারদ এই পথে গমনকালে তাদের এই বিকলাঙ্গতার কারণ ... জানতে পারেন। ... কী উপায়ে বিকলাঙ্গতা দূর হবে? ... মহাদেব এসে স্বয়ং সঙ্গীত শোনালে তারা আবার তাদের পূর্বদেহ ফিরে পাবে। ... মহাদেব এতে সম্মত হন, কিন্তু বলেন, প্রকৃত শ্রোতা না হলে তিনি সঙ্গীতচর্চা করবেন না। ... প্রকৃত শ্রোতার নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নাম করেন। ... রাগ-রাগিণীরা সুস্থতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ব্রহ্মা মহাদেবের সঙ্গীতের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করতে অসমর্থ হন। বিষ্ণু ... কিছুটা পেরেছিলেন, সে কারণে তিনি দ্রবীভূত হয়ে গেলেন। ব্রহ্মা সঙ্গীতে একাগ্র হতে পারেননি, সেজন্য তিনি তাঁর কমণ্ডলুতে দ্রবীভূত বিষ্ণুকে গ্রহণ করলেন। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা নামে খ্যাত। তার পরে ... ভগীরথের তপস্যায় ব্রহ্মার কমণ্ডলু হতে গঙ্গা মর্ত্যে নেমে এলেন। ... (গ) পর্বতরাজ হিমালয় ও তাঁর স্ত্রী সুমেরু-দুহিতা মেনকার দুই কন্যা উমা ও গঙ্গা। কোনো বিশেষ কারণে দেবতারা হিমালয়ের নিকট হতে গঙ্গাকে ভিক্ষা করে নেন। এই গঙ্গায় মহাদেবের বীর্য নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু গঙ্গা তা ধারণ করতে অসমর্থ হওয়ায় হিমালয় পর্বতের পার্শ্বে শরবনে মহাদেব তা নিক্ষেপ করেন। ... তার থেকে কার্তিকেয়র জন্ম হয়। ... এরপর গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থান গ্রহণ করেন। ... তারপর ভগীরথ তাঁকে মর্ত্যে নিয়ে যান। ... (ঘ) গঙ্গা কুরুরাজ শান্তনুর স্ত্রী ও দেবব্রত ভীষ্মের মাতা। একবার মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে মহাতেজা বসুগণের পক্ষে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করা অনিবার্য হয়ে উঠলে, তাঁরা গঙ্গার কাছে তাঁদের জন্ম ও মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনা পূরণ করবার জন্য ... সর্তাধীনে শান্তনুকে পতিত্বে বরণ করেন। সর্ত এই ছিল যে, রাজা শান্তনু গঙ্গার কোনো কার্যে বাধা দিলে সেই মুহূর্তেই গঙ্গা তাঁর নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করবেন। এই সর্তে গঙ্গা শান্তনুর স্ত্রী হয়ে সাত পুত্রের জননী হন এবং জন্মমাত্রই প্রত্যেকটিকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু অষ্টম পুত্র প্রসব হতেই শান্তনু এই পুত্রের প্রাণবধে বাধা দেন। রাজার এই নিয়মভঙ্গের অপরাধে গঙ্গা বিদায় নিলেন এবং বিদায়কালে তাঁর আত্মপরিচয় ও কর্মের হেতু জানিয়ে রাজ-আজ্ঞায় নবজাত শিশুকে সঙ্গে নিয়ে যান এবং বৎসর পরে রাজোচিত শিক্ষা দিয়ে পুত্রকে শান্তনুর হস্তে অর্পণ করেন। গঙ্গার এই পুত্র দেবব্রত ভীষ্ম নামে জগতে খ্যাতিলাভ করেন। (ঙ) একবার গঙ্গা সোমবংশীয় রাজা জহ্নুকে পতিরূপে বরণ করার জন্য ব্যাকুল হন, কিন্তু জহ্নুর এতে মত ছিল না। সে কারণ গঙ্গা জহ্নুর যজ্ঞস্থল প্লাবিত করেন। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে গলাধঃকরণ করেন। তখন মহর্ষিরা গঙ্গাকে তাঁর কন্যারূপে স্থির করে দেওয়ায় তিনি গঙ্গাকে মুক্তি দেন। সেই থেকে গঙ্গার নাম হয় জাহ্নবী। (চ) গঙ্গার জন্ম বিষ্ণুর দেহ থেকে। তিনি বিষ্ণুর স্ত্রী। বিষ্ণুর তিন স্ত্রীর নাম যথাক্রমে লক্ষ্মী, সরস্বতী, ও গঙ্গা। একসময়ে বিষ্ণু গঙ্গার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এতে লক্ষ্মী বিষ্ণুকে ক্ষমা করলেও সরস্বতী তা সহ্য করতে অক্ষম হন। ফলে কলহ ...। সরস্বতী গঙ্গাকে শাপ দেন যে, তুমি নদীরূপে পরিণত হও। গঙ্গাও সরস্বতীকে অনুরূপ শাপ দেন। (ছ) একবার গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাভিলাষিণী হন। শ্রীকৃষ্ণও ...। রাধা এতে ক্রুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণকে তিরস্কার করেন ও গঙ্গাকে গণ্ডুষে পান করতে উদ্যত হলে ... গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নেন। পৃথিবী জলশূন্য হবার উপক্রম হলে ... দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। তিনি গঙ্গাকে তাঁর নখাগ্র হতে নিষ্ক্রান্ত করে দেন। সেই থেকে গঙ্গার নাম হয় বিষ্ণুপদী। পরে ব্রহ্মার অনুরোধে কৃষ্ণ গঙ্গাকে গন্ধর্ব মতে বিবাহ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. গঙ্গানদী ও গঙ্গাদেবী অর্থে প্রচলিত। ৫. ইয়োরোপের ইতিহাসে flow of knowledge, flow of power, flow of commodities, flow of capital — এসব নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। জ্ঞান, ক্ষমতা, পণ্য, পুঁজির বিকাশের সেসব কাহিনী অনেকেই জানেন। ভারতে কি তেমন কিছুই হয়নি? আজ আমরা জানি হয়েছিল। বলতে গেলে ভারতই ছিল এ বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী দেশ। কিন্তু তার ইতিহাস ভারতবাসী লিখে রেখে গেছেন যে ভাষায়, তা আজকের বিশ্ব জানে না। তাঁদের জানানোর জন্য উপরোক্ত গঙ্গার কাহিনীর অর্থ নিষ্কাশন করে বলে দেওয়া জরুরি। এই কাহিনীগুলিতেই রয়েছে পুঁজির বিকাশের ইতিহাস,

পণ্যপ্রবাহের ইতিহাস। এ বিষয়ে বর্তমান গ্রন্থের সংকলকদ্বয় কিছুটা কাজ করে রেখেছেন তাঁদের দুটি বড় নিবন্ধে। দ্র. (খ) গ্রন্থের 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা' এবং (জ) গ্রন্থের 'ঝর্নাধারা থেকে সৃষ্টিধারা'। দ্র. **দক্ষা**। ৬. ইংরেজি gang, gangway।

গঙ্গাচিল্লী : ১. গঙ্গা + চিল্লী। ২. *যে গঙ্গায় বা গঙ্গার ধারে চিল্লায়*। ৩. গঙ্গাতীরস্থ চিল্লীবিশেষ, গাঙচিল। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সমগ্রের ভাবনা ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের। তাঁরা পার্থিব আকাশ, মানসিক আকাশ, পার্থিব গমনশীল ধারা ও মানসিক গমনশীল ধারা সমূহকে একত্রে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। পার্থিব গাঙচিল এবং পণ্যধারার হকার (hawk) তাঁদের চোখে একই সত্তা ছিল। আর, এ যে কেবল একটি পাখি আর একটি পণ্যবিনিময়কারীর ক্ষেত্রেই ছিল, তা নয়; ছিল প্রায় সব **পক্ষী**র ক্ষেত্রেই। দ্র. *খনন* পত্রিকায় প্রকাশিত 'পক্ষীপুরাণের মকশো' / কলিম খান। ৬. ইংরেজি gang, gangway।

গঙ্গাজ : ১. গঙ্গা + ✓জন্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গঙ্গা হইতে জাত*। ৩. ভীষ্ম ও কার্তিকেয়। (ব.শ.)। ৪. নামরূপে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. এখান থেকে জানা যাচ্ছে, পণ্যপ্রবাহের একটি বিশেষ পর্যায়ে ভারত সমাজের যোজনা কমিশনের মতো সত্তা ও সৈন্যবাহিনীর মতো সত্তা অর্থাৎ যথাক্রমে ভীষ্ম ও কার্ত্তিকেয় জন্মলাভ করেছিলেন। দ্র. **ভীষ্ম, কার্ত্তিকেয়**।

গঙ্গাজল : ১. গঙ্গা + জল। ২. গঙ্গার জল। (ব.শ.)। ৩. গঙ্গাজলের মতো সাদা লাডুবিশেষ, শ্বেতধান্যবিশেষ ও তাহার চাউল, গঙ্গাজল-ধবল চামর, শ্বেতপট্টবস্ত্রবিশেষ, গঙ্গাজলতুল্য নির্ম্মলচিত্ত নারীদ্বয়ের সখীত্বসূচক সম্বন্ধবিশেষ, শাদা শাড়ীবিশেষ, শাদা শীতলপাটি, অসির নাম, প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্তরায়ের অসি। গঙ্গাজল পাতান — 'গঙ্গাজল'-সম্বন্ধ করা; গঙ্গাজল স্পর্শ করা — দেহশুদ্ধির জন্য গায়ে গঙ্গাজল ছিটান; শপথার্থ গঙ্গাজলে হাত দেওয়া; গঙ্গাজলে ফেলা — সৎপাত্রে দান করা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. পার্থিব গঙ্গাজল-ধারা এককালে কত শুদ্ধ ছিল এবং এখন কতটা দূষিত হয়েছে, তার সাক্ষী জলবিজ্ঞানীরা। পণ্যধারা এককালে কত পবিত্র ছিল, যখন পণ্যের বিনিময়ে পণ্যবিক্রয়ের সূত্রপাত বা প্রথম পণ্যপ্রবাহের প্রচলন করা হয় অর্থাৎ গঙ্গা আনয়ন করা হয়, তখন সেই প্রবাহ কত পবিত্র ছিল, তার বর্ণনা রামায়ণে তো রয়েছেই, অজস্র সাংস্কৃতিক নিদর্শনও রয়েছে আমাদের সমাজে এবং ভাষায়; উপরে তারই কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। আমার গঙ্গাজল-সই আমার উদ্বৃত্ত বা জমে যাওয়া পাপের (পণ্যের) হাত থেকে আমায় বাঁচায় তার উদ্বৃত্ত বা জমে যাওয়া **পাপ** (পণ্য) আমাকে দিয়ে, আমারটি নিয়ে। এইরকম সখীত্বে (দ্র. **সখা**) কোনোরকম লাভ (profit) নেই, অথচ নিজ নিজ পাপের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে আমরা দুই সখীই পুণ্যবান হই, উভয়েই লাভবান হই। তাই এ গঙ্গাজলসখীত্ব সদাই শুভ্র, সাদা। দ্র. **পাতা**।

এভাবে সমাজে বিনিময়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পর, অর্থাৎ **গঙ্গা** আনয়নের পর, অর্থ বা বিনিময়ের মাধ্যম রূপে গোরু, গোধূম, চাল, সোনা, মুদ্রা — এসব আসে পেছনে পেছনে। ঢুকে পড়ে লাভ। শুরু হয় **গঙ্গাদূষণ**। পার্থিব গঙ্গাধারা দূষণের মতো এই পণ্যধারা এখন কত দূষিত সেকথা সবাই কমবেশি জানেন। কিন্তু এখন জগদ্দর্শনের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আমরা হারিয়েছি বলে, আজকের দূষিত গঙ্গার সঙ্গে দূষিত পণ্যধারা উভয়ই যে একযোগে আমাদের জীবনকে ব্যতিব্যস্ত করছে, সেকথা আমরা একত্রে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারি না। বৃষ্টিধারার মতো কোটি কোটি তীর ছুটে আসছে মানবসমাজের ওপরে। যে মেঘ থেকে সেই আক্রমণ আসছে, তাকে আমরা চিনতেই পারি না, চিনি যে তীরটি আমার শরীরে বা প্রতিবেশীর শরীরে বিদ্ধ হয়েছে, কেবল সেই একটি বা দুটি ক্ষত-সৃষ্টিকারী ঘটনাকেই।

গঙ্গাধর : ১. গঙ্গা + ধর। ২. *গঙ্গাকে ধারণ করেছিলেন যিনি*। ৩. গঙ্গার ধারক শিব। ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট শিব, আকাশ হইতে অবতরণ সময়ে গঙ্গাদেবীকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। নদীসমূহের ধারক; সমুদ্র। জীর্ণাতিসার-নাশক চূর্ণবিশেষ। (ব.শ.)। গঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণ করেছিলেন বলে শিবের অন্য নাম গঙ্গাধর। পিতৃপুরুষের মুক্তির জন্য ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে ভগীরথ গঙ্গাকে আনবার অনুমতি পেলেন, কিন্তু গঙ্গাকে ধারণ করবার ক্ষমতা এক মহাদেব ছাড়া আর কারও ছিল না। ভগীরথের কঠোর তপস্যায় মহাদেব তাঁর মাথায় গঙ্গাকে ধারণ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. ভারতের ইতিহাসে পণ্যপ্রবাহের সূত্রপাতের ঘটনাবলীর বিবরণ রয়েছে গঙ্গাধরের কথায়। এই সত্তা পণ্যপ্রবাহের সূত্রপাতের বিশাল ঝামেলা সামাল দিয়েছিলেন। উদ্বৃত্ত উৎপাদন তখন বোঝা হয়ে রয়েছে বহু মানুষের হাতে, তা সব দাম দিয়ে কিনে নিয়ে সারা দেশে এমনভাবে বিতরণ করা যেন দাম পাওয়া যায়, যে-দাম দেওয়া-নেওয়ার রেওয়াজই প্রচলিত হয়নি — এ ছিল এক কঠিন কর্ম। প্রথম সমস্যা ছিল, তোমার উদ্বৃত্ত আমি নেব কেন? বলা হল, বদলে তোমার উদ্বৃত্ত আমরা নিয়ে নেব। বেশ! লেনদেন হোক। কিন্তু আবারও সমস্যা! তোমার উদ্বৃত্ত আমার দরকার বটে, কিন্তু আমার তো আর কোনো উদ্বৃত্ত নেই। সৃষ্টি হল সেই পরিবেশ যখন গঙ্গাধর 'কপর্দ্দী' (= শিব) সৃষ্টি করলেন কপর্দ্দক বা কড়ি।

গঙ্গাপুত্র দ্র. **গঙ্গাজ**।

গঙ্গাপ্রাপ্তি (গঙ্গাবাস, গঙ্গাযাত্রা, গঙ্গালাভ) : ১. গঙ্গা + প্রাপ্তি, বাস, যাত্রা, লাভ। ২. *যে ক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তির গঙ্গাপ্রাপ্তি, গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গায় যাত্রা, গঙ্গাকে লাভ হয়*। ৩. জীবনান্তে গঙ্গাতীরে মৃতের সৎকার ও গঙ্গায় অস্থিদান, গৌণার্থে মৃত্যু, বৃদ্ধের মরণকালে গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাস্নানার্থ যাত্রা, মুমূর্ষুর প্রাণত্যাগার্থ গঙ্গাতীরে যাত্রা। (ব.শ.)। ৪. ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ শব্দগুলি আজও ব্যবহার করেন। ৫. এই ঘটনাটি পূজাদিতে **গোময়-গোমূত্র** ব্যবহারের মতো। একসময় এগুলি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত অর্থে প্রচলিত হয়েছিল, এখন তা প্রাণহীন এবং প্রায়ই বিড়ম্বনাপূর্ণ প্রথায় পরিণত হয়েছে। একদিকে রাষ্ট্র অসুরে পরিণত হয়েছে, রক্ষক হয়ে গেছে রাক্ষস, সে 'সমাজের সম্পদ রক্ষা করব, সবাইকে ভাগ করে দেব' বলে, কিন্তু নিজেই

খেয়ে ফেলে; অন্যদিকে যাঁরা দেবেন বলেন, সেই দেবতারা দিতে পারেন না। দেবেন কীভাবে। আরও প্রাচীন কালে দেবতারাও দিতেন, অসুরেরাও দিতেন, বিনিময়ে কিছু নেওয়ার কথা তখন তাঁরা ভাবতেই পারতেন না। এখন যুগ বদলেছে। অসুরেরা তো রাক্ষস হয়ে গেছেন, দেন না; ওদিকে দক্ষতার যথেষ্ট বিকাশের দরুন মানুষের উৎপন্ন বহু বিভক্ত। যে চাষ করে তার কাপড় চাই, যে কাপড় বোনে তার অন্ন চাই। দেবে কে? দেবতারা দিতে থাকলে তো ভিখারি হয়ে যাবেন। এখন দিতে গেলে বিনিময়ে কিছু নিতে হয়। কিন্তু তা নিতে গেলে বিনিময়ের ধারা প্রচলিত থাকা দরকার। তাই বন্যাত্রাণ-খরাত্রাণের ধারার মতো এক **পবিত্র** ধারার প্রবর্তন হল মানুষের সমাজে। 'তুমি আমাকে এই বস্তু দিলে আমি এই বস্তু দিব' — এইরকম **সত্যঙ্কার** করার সূত্রপাত হল। ধীরে ধীরে শুরু হল পবিত্র পণ্যপ্রবাহ। 'উৎপাদনের উপায়' (তাঁত ইত্যাদি) প্রস্তুতকারক ভগীরথের চেষ্টায় একদিন সেই পণ্যপ্রবাহ প্রতিষ্ঠা পেল। কিন্তু সে তো তখন পবিত্র ধারা। দ্র. **গঙ্গাজল**। উদ্বৃত্ত উৎপন্ন, বাড়তি ফসল, যা কিছু বৃদ্ধিলাভ করেছে, বৃদ্ধ হয়েছে, তা নষ্ট না করে তখন সেই দেবধারায় দিয়ে দেওয়া মানবিক ধর্ম বলে মনে হত মানুষের; একালে যেমন বন্যাত্রাণের প্রার্থনাকারীদের লরীতে লোকে ব্যবহৃত জামাকাপড় দিয়ে দেয়, অনেকটা সেইরকম। তো, সেইসব ঘটনার বিবরণকে বহুকাল পরে নিজের অতীতহারা অধঃপতিত পুরোহিত বুঝতেই পারল না। সে যেমন **কুমারীসাধনাকে**, **গোময়-গোমূত্রকে** কেবল মাত্র দৈহিক অর্থে বুঝেছিল, সত্যি-সত্যিই কুমারী মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে সাধনার মাধ্যম করেছিল, গরুর মল ও মূত্রকে পূজার অঙ্গ করে দিয়েছিল; ঠিক সেভাবেই বয়স্ক মানুষকে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় হাজির করাকেই একমাত্র কর্তব্য স্থির করেছিল, বলেছিল এই হল গঙ্গাপ্রাপ্তি, গঙ্গাবাস ইত্যাদি।

গঙ্গোপাধ্যায় (গাঙ্গুলি, গাঙ্গুলী) : দ্র. **পদবী**।

গচ্ছিত : **১.** ✓গচ্ছ — মূল?। (ব.শ.)। **২.** *গামীর গতিশীল চয়ন ছাদিত রূপে তারিত যাহাতে।* / যাহা গচ্ছান হইয়াছে। (ব.শ.)। **৩.** ন্যস্ত, ন্যাসভূত, রক্ষিত (deposited)। (ব.শ.)। **৪.** deposited অর্থে প্রচলিত। **৫.** আমাদের দেওয়া উপরোক্ত (২) ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি ছাড়াও আরেক ভাবে শব্দটির অর্থে পৌঁছান যায়। গচ্ছ কথাটির প্রাচীন অর্থ কোনো বিশেষ দিকে বা স্থানে যাওয়ার নির্দেশ — 'যাও' বা 'যান'। যাকে এই নির্দেশ দেওয়া হল, সে তা করলে হয় গত। কিন্তু সে তো নির্দেশকের দৃষ্টিতে দেখা। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে সেই গত একই সঙ্গে গচ্ছিতও বটে। অবশ্যই এই গচ্ছিত কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'গচ্ছান' হয়ে থাকতেও পারে।

গজ (গজগজ, গজরগজর) : **১.** ✓গজ্ (মদ) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *গামী জনন করে যে।* / যে মত্ত হয়। (ব.শ.)। **৩.** হস্তী, দিগ্‌গজের সংখ্যা অনুসারে '৮' এই সংখ্যা, বাস্তুস্থানভেদ, ঔষধপাকার্থ হস্তপ্রমাণ গর্ত্ত বা পুট, মহিষাসুরের পুত্র। (ব.শ.)। **৪.** elephant অর্থে প্রচলিত। **৫.** হস্তীকে **হস্তী** এবং গজকে গজ বলার কারণ হল তার হস্ত (শুঁড়) আছে বলে সে হস্তী বা হাতি; এবং গামী জনন করে বলে গজ। এই **'গ-জনন'** বা **'গামী জনন'** হল 'কথা', 'শ্রমজাত বস্তু' ইত্যাদি উৎপাদন করা বা জনন করা। যে তা করে, সে 'গজ' পদবাচ্য। আর তার সেই জাত বিষয় ও বস্তুগুলিকে যথাক্রমে শব্দসম্ভার ও পণ্যসম্ভার বলা যেতে পারে। অভিধানগুলিতে গজকেতু, গজগতি, গজমতি, গজেন্দ্র, **গজানন** — এধরনের প্রচুর শব্দ রয়েছে। এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের সমাজে একসময় **গজ** একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্তা ছিল, যাকে নিয়ে অনেক কথা বলার দরকার হয়েছিল। অনুসন্ধানে জানা যায়, এই গজ কেবলমাত্র animal-এর দুনিয়ার elephant-কেই বোঝাত না, অনেক বেশি বোঝাত মানুষের সমাজের সেই গজসত্তাকে, একালের ভাষায় যাকে বুরোক্র্যাট বা আমলা বলে। তবে সে ছিল একালের বুরোক্র্যাটের আদি রূপ। যে যে বিষয়, বস্তু প্রজাসাধারণের ভোগের নিমিত্ত যাওয়া উচিত, তার উৎপাদন ও বিতরণের ব্যবস্থা করতেন তাঁরা। তাই তাঁরা ছিলেন 'গামী জননকারী' গজ। ভারতের রাজধানী যখন হস্তিনাপুর বা **গজপুর** (যেখানে এই আমলারা থাকতেন, একালের দিল্লি), তখন এঁরাই সমাজ পরিচালনা থেকে শুরু করে প্রশাসন পর্যন্ত সবই চালাতেন। এঁরা অতি ক্ষমতাবান হলে এবং জাতীয় সম্পত্তি আত্মসাৎকারী রাক্ষস হয়ে গেলে, এঁদের **গজাসুর** বলা হত। সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা যদি এই গজকে সামনে রেখে চলতে থাকে, তখন তাকে **গজানন** বলে। একালের প্রায় সমস্ত সরকারি সংস্থার উপরে বসে থাকেন বিদ্যাদিগ**গজ** স্পেশালিস্টরা। এঁরাই সরকারি প্রশাসনের মুখ বা আনন। সরকার তাই **গজানন**।

তবে এখানেই **গজ**-এর শেষ হয় না। যাঁদের কথার শেষ নেই, বোলচাল চলতেই থাকে, তেমন সত্তাকেও গজ বলা যায়; কারণ সে অবিরত 'গামী (= কথা) জনন' করে বা 'গজ-গজ' করে। তার এই গজগজ করতে থাকাকে বলা হয় **গজরগজর**। দ্র. **গঞ্জনা**।

গজকচ্ছপ : **১.** গজ + কচ্ছপ। **২.** *গজ ও কচ্ছপ থাকে যাহাতে।* **৩.** গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ — মহাভারতের গজকচ্ছপের যুদ্ধের ন্যায় তুল্যবল পক্ষদ্বয়ের বিরোধ। (ব.শ.)। বিভাবসু নামে একজন কোপনস্বভাব মহর্ষি ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতীক ধন বিভাগের জন্য বার বার অনুরোধ করায় বিভাবসু বিরক্ত হয়ে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে শাপ দেন — তুমি হস্তী হও। সুপ্রতীকও জ্যেষ্ঠকে শাপ দেন — তুমি কচ্ছপ হও। তারপর বহুকাল ধরে এক সরোবরে এই দুই ভ্রাতা পরস্পর যুদ্ধে রত হয়। অমৃত আনয়নের জন্য যখন গরুড় যাত্রা করেন, তখন পিতার পরামর্শে তিনি গজকচ্ছপকে এক তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গে নিয়ে গিয়ে ভোজন করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** এই কাহিনী নানাভাবে পুরাণাদি গ্রন্থে রয়েছে। দ্র. **জয়-বিজয়**, **বিজয়**, **তৃণবিন্দু**। বিভাবসুর পুত্র জয়-বিজয়। অন্যত্র বলা হয়েছে **তৃণবিন্দুর** পুত্র জয়-বিজয়। এই তৃণবিন্দুর কন্যা হবির্ভুর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন **বিশ্রবা**। বিশ্রবার পুত্র কুবের, রাবণ ইত্যাদি। মুনিদের শাপে জয় সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ, ত্রেতায় রাবণ ও দ্বাপরে **শিশুপাল** রূপে এবং বিজয় সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় **কুম্ভকর্ণ** ও দ্বাপরে **দন্তবক্ররূপে** জন্মগ্রহণ করেন। সেই জয়-বিজয় **সত্তাই গজ ও কচ্ছপ**। অর্থাৎ গজ সত্তাটি হল একালের **বুরোক্র্যাটদের আদি রূপ**, এবং কচ্ছপ

সত্তাটি হল একালের বিদ্যাধর ডাক্তার-মাস্টার-উকিল প্রভৃতি জ্ঞানজীবীদের আদি পুরুষ।

গজনিধি দ্র. **নিধি**।

গজপুর দ্র. **হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ**।

গজানন (গজাস্য) : ১. গজ + আনন, আস্য। ২. *গজ আনন বা আস্য যাহার*। / যাহার গজাননতুল্য আনন। ৩. গজবদন, গণেশ, শনির দৃষ্টিতে গণেশের শিরশ্ছেদ হইলে, বিষ্ণু হস্তীর মস্তক গণেশের স্কন্ধে যোজিত করেন। তদবধি গণেশ 'গজানন' নামে খ্যাত। (ব.শ.)। দ্র. **গণেশ**। ৪. অপ্র.। ৫. 'আনা অন (on) থাকে যাতে' তাকে যেমন 'আনন' বলে, তেমনি 'যাহাতে গ্রাস ক্ষিপ্ত হয়' তাকে 'আস্য' বলে। বঙ্গীয় শব্দকোষ মতে এটি মুখবিবর বা মুখ। দশটি আনন যার সে হল দশানন, আর গজ যার আনন বা আস্য সে হল গজানন বা গজাস্য। এ হাতি বুরোক্র্যাট তো বটেই! রাষ্ট্রের যা কিছু আগম, তা সবই এই গজের মাধ্যমেই আসে। সেকারণে রাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিকে সেকালে গজানন বা গজাস্য বলা হত। দ্র. **গজ, গণেশ**।

গঞ্জ (গঞ্জন, গঞ্জনা) : ১. ✓গঞ্জ্‌ + অ (ঘঞ্‌) - অধিকরণে; ✓গঞ্জি + অন (ল্যুট্‌) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***গঞ্জ*** *= গং বা গামীর রহস্যরূপ জনিত হয় যেখানে;* ***গঞ্জন*** *= গঞ্জ্‌ অন যাহাতে;* ***গঞ্জনা*** *= গঞ্জনের আশ্রয় যাহাতে*। / **গঞ্জ** = যে স্থানে পণ্য আনীত ও রক্ষিত হয়। **গঞ্জনা** = যে অবজ্ঞা বা তিরস্কার করে। (ব.শ.)। ৩. হট্ট-স্থান, গোলা, খনি, গোষ্ঠাগার, গোয়ালঘর; হাট, বাজার, বাণিজ্যস্থান, স্তূপ, রাশি; নিন্দা করা, দোষ দেওয়া, পরাজয় করা, তিরস্কার করা, নিরাকৃত করা; অবজ্ঞাতা, অতিশায়ী, তিরস্কারক, দমন, শাসিতা, ভর্ৎসনা, নিন্দা, অপবাদ, অপযশঃ। (ব.শ.)। ৪. কম পরিমাণে প্রচলিত। ৫. উৎপন্ন, তা সে বাহ্যিক হোক আর শাব্দিক (মানসিক) হোক, যতক্ষণ তা চারিত বা বিবর্তিত হয়, কিংবা অন্য উৎপন্নের সঙ্গে বিনিময় করা হয় ততক্ষণ সে 'গ' বা 'গামী' মাত্র। তাকে বিশেষ অর্থবহ শব্দ বা মূল্যবহ পণ্য বলে না। কিন্তু যে মুহূর্তে তা তৃতীয় মাধ্যমের (সমার্থ শব্দ, প্রতিশব্দ, মানে; এবং গরু, কড়ি, সোনা, মুদ্রা — এককথায় অর্থের) দ্বারা অর্থমূল্য নির্ধারিত হয়ে বিনিময় করা হল, সেই মুহূর্ত থেকে তা আর 'গ' থাকে না, রহস্যরূপী হয়ে, হয়ে যায় 'গং'। এভাবে বাহ্যিক গ-কে বাহ্যিক গং-এ পরিণত করে গঞ্জ, হাট বা বাজার; fetish of capitalism-এর সূত্রপাত হয়ে যায়। প্রাচীন ভারতের এই 'গঞ্জ' নামটি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। ফারসি ভাষায় তো শব্দটি গিয়েছিলই, এমনকি ইহুদিদের দেশে শব্দটি পৌঁছে যায় geniza রূপে। তবে এর অপর যে রূপ, গঞ্জন বা গঞ্জনা, তা ভারতেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে বলে মনে হয়। এটি বাহ্যিক নয়, মানসিক। মানসিক গ-কে (শব্দকে) গং বা রহস্যময় শব্দে রূপান্তরিত করে গঞ্জনা। সাধারণত কাউকে দমন, অবজ্ঞা, তিরস্কার করতে গিয়ে যে শব্দের প্রয়োগ চলে, তা রহস্যময় শব্দে পরিণত হয়। 'আচ্ছা গাধা তো! মাথায় কি কিছুই নেই!' এই তিরস্কারে মানুষকে গাধার সমার্থে প্রকাশ করে 'মানুষ' শব্দটিকে গং রূপে জনন করা হয়েছে। সেকারণেই এটি একটি 'গঞ্জনা' বাক্য।

গঞ্জা, গঞ্জিকা (গাঁজা, গাঁজান, গেঁজান) : ১. গঞ্জ + স্ত্রী আ। ২. ***গঞ্জা*** *= গঞ্জের আশ্রয় যাহাতে;* ***গঞ্জিকা*** *= গঞ্জকে সক্রিয় করে যে, তাহার আধার।* ৩. মদিরাগৃহ, শুণ্ডা (tavern), গাঁজা। (ব.শ.)। ৪. hemp ও fermentation অর্থে প্রচলিত। ৫. মানসিক গঞ্জের দুনিয়ায় গং-জনন (দ্র. **গঞ্জ**) যদি অতি মাত্রায় চলে, তখন স্বভাবতই শব্দের রহস্যরূপ ক্রমাগত বদলায় এবং সেই শব্দসমূহে ধরে রাখা ভাবরস ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। এরকম ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলি গেঁজানো। রকের আড্ডায় তরুণরা যখন বসে বসে 'গেঁজায়', আমরা খেয়াল করি না, তারা আসলে শব্দের গংজনন অতিমাত্রায় করে চলেছে। একই ভাবে, একই বাজারে, একই পণ্য বারংবার হাত বদল হয়ে, তার মূল্য বারংবার ক্রমে বাড়তে থাকে, তখন তাও গাঁজানো। পণ্যের এরূপ গাঁজানো যেখানে চলে, সে তো গঞ্জিকাই। আর এই ভাবরস, অর্থরস, মূল্যরস, চিনিরস — যে কোনো রসই যদি এভাবে গ থেকে গং হতে থাকে বারংবার, তা সবই গেঁজানো। hemp জিনিসটি সেবন করলে এইরকম কোনো ক্রিয়া ঘটে; যেকারণে তাকে গাঁজা বলে। আর তা যে হয়ই, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল গাঁজাখোর ও তাদের বিখ্যাত সব গাঁজাখুরি গল্প।

গটগট : ১. গ + ট, গট + গট। ২. *গামী বারংবার টঙ্কারিত হয় যাহাতে*। ৩. পাকা রাস্তায় দ্রুতগমনে জুতার গোড়ালির শব্দ। (ব.শ.)। ৪. ধ্বন্যাত্মক শব্দ রূপে প্রচলিত। ৫. ধ্বন্যাত্মক শব্দ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করতেন, মানুষের ভাষার আদিতে ছিল ধ্বন্যাত্মক শব্দ। কিন্তু পরবর্তী কালের ভাষাতাত্ত্বিকরা তাঁদের ঠাট্টা করেন 'বৌ-ঔ' তত্ত্বের তাত্ত্বিক ব'লে। কিন্তু আজ আমরা দেখছি, মানুষের মুখ দিয়ে যে অনুকরণমূলক ধ্বনি বেরোয়, তা আদৌ অর্থহীন নয়। কোন আওয়াজে কী রকম মানে থাকবে, তার যে প্রকরণ নেচার নির্দেশিত, মানুষ নিজের অজান্তে সেটিই অনুসরণ করে থাকে। বুটের শব্দকে বাংলাভাষীরা 'গটগট' বলে থাকেন, ঘোড়ার যাওয়াকে 'টগবগ' বলে থাকেন, ভাতের ফোটাকেও বলেন 'টগবগ'। বর্ণের ভিতরে তাকাতে শিখলে আমরা দেখতে পাই কথাগুলি অদ্ভুত যথার্থতায় প্রকাশিত।

গত (গতপ্রায়, গতায়াত, গতাসু) : ১. ✓গম্‌ + ত - ক। (ব.শ.)। ২. ***গত*** *= গামীর তারণ সম্পন্ন হইয়াছে যাহাতে;* ***গতপ্রায়*** *= যাহা প্রায় গত হইয়াছে;* ***গতায়াত*** *= যাহা গত ও আয়াত হইয়াছে;* ***গতাসু*** *= গত প্রাণ যাহার*। / **গতপ্রায়** = যাহার প্রায় (অধিকাংশ) গত; **গতাসু** = গত অসু যাহার। (ব.শ.)। ৩. প্রস্থিত, চলিত, পলায়িত, অতীত, অতিক্রান্ত, অন্তর্হিত, অবসিত, প্রাপ্ত, আরূঢ়, প্রবিষ্ট, পরলোকপ্রস্থিত, মৃত, আশ্রিত, অধিষ্ঠিত, অভিনিবিষ্ট, তদেগাচর, সংঘটিত, অধিগত, নিবৃত্ত, উৎক্রান্ত, পতিত, অবগত, সমাপ্ত, গমন, গতি, খ্যাতি, গোচর, প্রকার, বৃত্তান্ত; প্রায় অতীত; যাতায়াত, গমনাগমন, মরণ-জনন, জন্ম-মৃত্যু; গতপ্রাণ, মৃত, গতপ্রায়প্রাণ, ক্ষীণায়ুঃ। (ব.শ.)। ৪. যথেষ্ট প্রচলিত। ৫. যা চলে

গেছে, তাই গত। অনেক কিছুই আমাদের কাছ থেকে চলে যায় বলে এই শব্দের উদ্দিষ্ট অনেক। তাই 'গত' শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তুলনায় কম প্রচলন বাকি তিনটি শব্দের। এর মধ্যে গতায়াত শব্দটি এখন যাতায়াত শব্দের এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিলীন হতে চলেছে। আর গতাস্‌ শব্দটির ব্যবহার হয় অত্যন্ত কম। কম বলেই এখন আমরা অসুরকে বুঝতে পারি না। দ্র. **গতি, অসুর**।

গতি (গতিক, গতিবিধি) : ১. ✓গম্ + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গামীর তারণের চলমানতা থাকে যাহাতে; গতি যাহা করে; গতির নিয়মাবলী থাকে যাহাতে*। ৩. গমন, চলন, গমনপ্রকার, প্রয়াণ, প্রাপ্তি, উপস্থিতি, পহুঁছান, প্রবেশ, সঞ্চার, প্রসর, নভোগমন, উৎপতন, শরাদি অস্ত্রের উৎপতন, পরিণাম, পরিণতি, লাভ, যাত্রা, গ্রহের কক্ষভ্রমণ, পদপ্রাপ্তি, নিষ্ঠা, উৎপত্তি, অবগতি, নির্গমন, অবস্থা, দশা, ভাব, প্রকার, কৌমার-যৌবন-জরা, পদ, স্থান, বৃত্তি, স্বরূপ, বিষয়, কর্ম্মফল, গম্যপুরুষার্থ, গম্যস্থান, স্বর্গাদিফল, রক্ষক, শরণ, আশ্রয়, ভাগ্য, উপায়, মার্গ, নক্ষত্রের গমনপথ, প্রমাণ, জ্ঞান, বিদ্যা, নাড়ীব্রণ, (ব্যাকরণে) ক্রিয়াযোগে উপসর্গ-প্রভৃতি, ... অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-প্রভৃতি, শিষ্য, অনুচর, রীতি, আচার, পদ্ধতি, মুক্তি, মোক্ষ, উদ্ধার, বেগ, পরিবর্তন; অবস্থা, দশা, ভাব, আড়ম্বর, উপায়, কৌশল, চালচলন, ভাবভঙ্গি, পরিণাম, ফল, নাড়ীর স্পন্দন, ক্রমে, প্রভাবে, বশে, অনুসারে; উপায়ের বিধান, শবের সৎকার ব্যবস্থা, গমনাগমনের ব্যবস্থা, যাতায়াত। (ব.শ.)। ৪. নানার্থে খুবই প্রচলিত। ৫. যে চলে গেছে, সে হল গত। এইরকম একের পর এক গত হতে থাকলে আমরা তাকে দেখতে পাই 'গতি' রূপে। তার মানে, গতি হল সেই ক্রিয়াশৃঙ্খলা যাতে গামীরা চোখের সামনে দিয়ে গত হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের যাওয়ার যে শৃঙ্খলা, তাকে একত্রে দেখতে পেয়ে আমরা তাকে 'গতি' বলছি। ব.শব্দকোষে সমস্ত শব্দের মূলে কী রয়েছে খুঁজতে গিয়ে আমরা যেখানে গিয়ে পৌঁছাই, দেখা যায় সেটি একটি মূল ক্রিয়ারই নানান রূপ, আর সেই মূল ক্রিয়াটি হল 'গতি'। মানুষের সমাজজীবনে এই 'গতি' এত বেশি প্রাসঙ্গিক যে, বহু সত্তাকেই আমরা 'গতি' রূপে দেখি। তাই শব্দটির এত বেশি অর্থ। ৬. ইংরেজি gate, get। দ্র. **গেতি**।

গন (গন্‌গন্, গন্তব্য) : ১. গ্ + অন্। ২. *গমন অন্ (on) থাকে যাহাতে; গন্-এর ক্রমান্বয় যাহাতে; যে গন্ পালনীয়*। ৩. পথ, রাস্তা, নদীপথ, জলপথ, জলপ্রবাহের পথ, নদীপথে গমনের অনুকূল স্রোত (গন হওয়া, গন যাওয়া, গন অতীত হওয়া, গন মারা যাওয়া ইত্যাদি); গজঘণ্টার গম্ভীরধ্বনি, অগ্নির অতিদীপ্তভাব, দগদগে ভাব (আগুন গনগন ক'চ্ছে), অসন্তোষ প্রকাশ করিতে না পারায় ক্রোধে অস্ফুট গর্জ্জন বা গজগজ করা; গমনীয়, যাতব্য, প্রাপ্তব্য, উপস্থাতব্য, অভিগমনীয়, অতিক্রমণীয়, মন্তব্য, জ্ঞেয়, কর্ত্তব্য, অভিগন্তব্য। (ব.শ.)। ৪. 'গন' কথাটি মাঝিমাল্লা ও জেলেদের মুখে এখনও কমবেশি প্রচলিত। গনগনে আগুন এখনও সবাই বলে। গন্তব্য অ্যাকাডেমিতেও চলে। ৫. গন্ অতি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। মধ্যযুগের সাহিত্য শব্দটিকে স্থান দিয়ে রেখেছিল। ব.শ. 'মনসার ভাসান' থেকে উদাহরণ দিচ্ছেন — **'বেহুলা বলে ... যাব আমি ছয় মাসের গন'**। এ হল ছয় মাসের **'গমন'**। **পৃথকভাবে এই 'গন'কে** আমাদের অ্যাকাডেমিক শিক্ষা এখন ভুলে গেছে। **এই 'গন'কে ধরে** রেখেছেন বাংলাভাষী মাঝিমাল্লা ও জেলেরা। **জলস্রোতে 'গন' বা** গমন অন থাকে। কথাটি তাঁদের নিজেদের **প্রয়োজনেই মনে রাখতে** হয়েছে। এর প্রকৃত স্বরূপ উপরে **ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে বলা আছে**। গনগনে আগুনও সেইরকম। তার তাপের গমন অন থাকে এবং পারিপার্শ্বিকে ছড়ায়; তাই সে গনগনে। তবে এই যে গন বা 'যাওয়া', যা কিনা চলতে থাকে কোনো দিকে, তা যদি কারও পালনীয় হয়, তবে সেই যাওয়া বা গন্ অবশ্যই তার গন্তব্য। ৬. ইংরেজি gone, মালয় ভাষা থেকে ইংরেজিতে আসা শব্দ gong।

গন্ধ (গন্ধক, গন্ধকালী, গন্ধবতী) : ১. ✓গন্ধ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গন্ধ = গন্ ধারণ করে যে; **গন্ধক** = গন্ধ করে যে; **গন্ধকালী** = যে কালশক্তি গন্ধময়ী; **গন্ধবতী** = যে প্রকৃতি শক্তি গন্ধবৎ বা গন্ধযুক্তা*। ৩. ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীগত গুণবিশেষ, সৌরভ, আমোদ, গন্ধক, লেশ, কণ, সম্বন্ধ, গর্ব্ব, অহঙ্কার, প্রতিবেশী, শোভাঞ্জন, দ্রব্য, গন্ধযুক্ত মৃগমদাদি, চন্দন, শিব, কৃষ্ণাগুরু; গন্ধযুক্ত পীত উপধাতুবিশেষ, শোভাঞ্জন, সজনাগাছ; ব্যাসদেবের জননী সত্যবতী (পরাশরের বরে গাত্রসৌগন্ধ্য হেতু ইঁহার অন্য নাম 'গন্ধবতী'), গন্ধমাদনে সরোবরস্থিতা অপ্সরোবিশেষ; 'গন্ধযুক্তা', পৃথিবী, সত্যবতী, বনমল্লিকা, মুরা, বায়ুপুরী। (ব.শ.)। মৎস্যগন্ধা, ব্যাসের মাতা। এঁর অন্য নাম সত্যবতী। ... একদিন পরাশর মুনি নদী পার হবার সময় মৎস্যগন্ধাকে দেখে কামাতুর হন এবং মৎস্যগন্ধার গায়ের দুর্গন্ধে তাঁকে গ্রহণ করতে না পেরে তপোবলের সাহায্যে সুগন্ধযুক্তা করেন। সেই থেকে এঁর নাম হয় গন্ধবতী। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের জানিয়েছে, গন্ধ অবয়বহীন নয়। অতি সূক্ষ্ম কণা থাকে গন্ধের ধারক রূপে। গন্ বা গমন বাহিত-ধারিত থাকে সেই কণস্বরূপ অবয়বে। কিন্তু এ তো গেল বাহ্যিক গন্ধের কথা। যে গন্ধে 'কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে'র গন্ধ বা খবর থাকে, সে গন্ধ মারাত্মক। সমস্ত যৌবনশক্তিকে সে পাগল করে। তার কথা মাথায় না রেখে এগোলে অনেক কিছুই চোখের বাইরে থেকে যায়। দ্র. **গন্ধর্ব্ব**।

বাহ্য গন্ধ বহু কিছু থেকেই সৃষ্টি হয়। গন্ধক অতএব অনেক কিছুই হতে পারে। তবে ইতিহাসের কোনো বিশেষ প্রেক্ষিতে sulphur-ই আমাদের ভাষায় 'গন্ধক' নাম পেয়ে প্রতীকী হয়ে গেছে। আর গন্ধকালী, গন্ধবতী, সত্যবতী, মৎস্যগন্ধা এঁরা হলেন মানব-সমাজের ঐতিহাসিক 'গন্ধক সত্তা'; কেবল ভিন্ন ক্রিয়াশীলতার জন্য তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম। এই সত্তা হল এক জনগোষ্ঠী, যাদের মধ্যে 'আমি' 'আমি' ধারণা প্রথম দেখা দেয়; 'এটি আমার' বলবার প্রচলন হয়। তৎকালীন সমাজের চোখে তা ছিল নিন্দনীয়। তাই ঐ প্রকার জনগোষ্ঠী বা গন্ধকালী ছিলেন সমাজের কাছে দুর্গন্ধবতী। পরাশর সেই 'আমি'ষ গন্ধকে গ্রহণীয় বলে ঘোষণা করেন; দুর্গন্ধবতী সুগন্ধবতী হয়ে যান। অর্থাৎ এখন যেমন লোকে গল্প করে — 'অমুকের জানো দুটো গাড়ি আছে, তিনটে বাড়ি আছে' — সম্পদের

এই সুগন্ধ পাশের বাড়ির মাংস রান্নার মতো। যে তা ভোগ করতে পায় না, তারও মন আকুলি-বিকুলি করে। এ আমিষগন্ধ এখন মানুষের ভালো লাগে। সেকালে এই আমিষ ও তার গন্ধ নিন্দনীয় ছিল। ভার্গব **পরাশর** তাকে গৌরবজনক ঘোষণা করে দেন। গন্ধকালী হয়ে যান গন্ধবতী।

অতএব, এ হল গন্ধের সামাজিক প্রেক্ষিত। যে কোনো ঘটনার, (যা ঘটানো হয়, ঘটে, উৎপাদিত হয়, এবং উৎপাদিত হয়ে দান বা বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যের অধিকারে যাওয়ার জন্য সদা উন্মুখ) বা পণ্যের খবরও গন্ধ পদবাচ্য। শব্দ যেমন উচ্চারিত হলেই হল না, তার মানে চাই, প্রতিশব্দ চাই, ভাবের বিনিময়ের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হওয়া চাই তবেই সেটি গন্ধ পদবাচ্য; তেমনি উৎপন্নেরও হয়, এবং কেবল তখনই তা পণ্য পদবাচ্য হয়। এর ব্যক্তিমালিক বা গোষ্ঠী-মালিক থাকে, যে-মালিক এটি অন্যকে দিয়ে দেওয়ার অধিকারী; এর মূল্য নির্ধারণ করা যায় বা করা হয়; এবং এটি কাঙিক্ষত বস্তুর সঙ্গে বিনিময় করা হয় না, এর মূল্যস্বরূপ তৃতীয় একটি বস্তু নেওয়া হয়, যা দিয়ে কাঙিক্ষত বস্তুটি পাওয়া যায়। এই যে পণ্য, এরই বাণিজ্য করে **গন্ধবণিক**। অমুক জায়গায় দারুণ শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে, তমুক জায়গায় দারুণ হাঁড়ি পাওয়া যাচ্ছে — এই গন্ধই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। প্রায় সকল পুরাণে অজস্র স্থানে লেখা রয়েছে যে — এই 'গন্ধ-তন্মাত্রাত্মক সংঘাত' থেকেই বাকি 'সমস্ত সৃষ্টি বিস্তারিত' হয়েছে। ৬. ইংরেজি gone, gain।

গন্ধমাদন : ১. গন্ধ + মাদন। ২. *যাহা গন্ধে মাদয়িত (মত্ত) করে।* / গন্ধ যাহার মাদয়িতা। (ব.শ.)। ৩. গন্ধ দ্বারা মাদয়িতা, সুগন্ধি বন যুক্ত পর্ব্বতবিশেষ, ইহা ইলাবৃত ও ভদ্রাশ্ব বর্ষের সীমাপর্ব্বত এবং মেরুর পূর্ব্বে অবস্থিত, ভ্রমর, রামসৈন্যস্থ বানরবিশেষ, গন্ধমাদনস্থ বনবিশেষ। (ব.শ.)। হিমালয়ে স্বর্ণময় ঋষভপর্বত ও কৈলাসপর্বতের মধ্যস্থিত দীপ্তিমান ঔষধিপর্বত। এই পর্বতের শীর্ষদেশে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী — এই চারপ্রকার মহৌষধি জন্মগ্রহণ করত। হনুমান রাম-রাবণের যুদ্ধকালে দুইবার ঔষধিপর্বত উৎপাটন করে আনেন। প্রথমবার ঔষধির গন্ধ আঘ্রাণ করে রাম-লক্ষ্মণ শল্যমুক্ত হন ও বানরেরা সুস্থ হয়। পরে লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে মৃতপ্রায় হলে হনুমান ঔষধি চিনতে না পেরে ঔষধি-শৃঙ্গ তুলে নিয়ে আসেন। এই ঔষধি মৃতকল্পকে জীবন দান করে। ঔষধি-বৃক্ষের গন্ধ সকলকে মত্ত করে বলে এই পর্বতের নাম গন্ধমাদন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সেকালের বৈদিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বলা হত হিমালয়, তার ভিতরে যত বিভাগ ছিল, তাকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছিল। তারই একটি গন্ধমাদন। এটি সম্ভবত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেকার ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা। একেবারে নিখুঁত ভাবে চিহ্নিত করতে হলে, ১০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ঠিক কেমন ছিল, তার কী কী বিভাগ ছিল, সেসব বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য হাতে থাকা দরকার। দ্র. **ওষধি**।

গন্ধর্ব্ব (গন্ধর্ব্বন্) : ১. গন্ধ + অর্ব্বন্; অর্ব্বন্ = ✓ঋ + বন্ (বনিপ্) - কর্তৃবাচ্যে। দ্র. **অর্ব্বা**। (ব.শ.)। ২. *গন্ধকে পরিধি পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যায় যে।* / গান ধর্ম্ম ইহার। (ব.শ.)। ৩. স্বর্গগায়ক দেবযোনিবিশেষ — **হাহা, হূহূ** প্রভৃতি, (মর্ত্ত্য ও দিব্য ভেদে গন্ধর্ব্ব দ্বিবিধ। হাহা হূহূ চিত্ররথ হংস বিশ্বাবসু গোমায়ু তুম্বুরু নন্দি প্রভৃতি গন্ধর্ব্ব নামে খ্যাত। ইহাদের একাদশ গণ।), গায়কমাত্র, পুংস্কোকিল, সারঙ্গজাতি পশুবিশেষ, **কস্তুরীমৃগ**, খেচর, ঘোটক (রামায়ণ ও মহাভারতে গন্ধর্ব্বী ঘোটক জাতির মাতা। ঋগ্বেদে দিব্যগন্ধর্ব্ব সূর্য্যের অশ্বের নিয়ন্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয়, ইহাদের সহিত এই অর্থের কোনো সম্বন্ধ আছে।), অন্তরাভব সত্ত্ব অর্থাৎ মরণ জন্মের মধ্যস্থিত যাতনাশরীর সত্ত্ব (স্বামী), যে মরণের পরে কায়ান্তরপ্রাপ্ত হয় নাই তাদৃশ অশরীর সত্ত্ব (সুভূ), গর্ভ, ভ্রূণ, গুপ্তপ্রাণী, দেবাদি অষ্টবিধ গ্রহের একতম, বালাস্ত্রীর প্রথমযৌবনের উপভোক্তা রূপশরীরাধিষ্ঠিতা দেববিশেষ, শিব, জাতিবিশেষ। (ব.শ.)। স্বর্গীয় গায়ক। দেবযোনি বিশেষ। এদের বাসস্থান গুহ্যকলোক ও বিদ্যাধরলোকের মধ্যে। এরা অতিশয় রূপবান, স্বর্গলোকে এদের চেয়ে সুন্দর আর কেউ নেই। বৈদিক যুগে গন্ধর্বরা ছিল স্বর্গের উচ্চশ্রেণীর উপদেবতা; কিন্তু এরা পরে সংখ্যায় বর্ধিত হয়ে নিম্নশ্রেণীর দেবতায় পরিণত হয়। এ ছাড়া, এরা ঔষধি বিষয়েও বিশেষ অভিজ্ঞ এবং দেবতাদের বিশ্বস্ত অনুচরও ছিল। এরা সোমরসের রক্ষাকর্তা ও প্রস্তুতকারক। সোমরস সকল প্রকার ব্যাধিমুক্ত করতে সক্ষম হত বলে এদের স্বর্গীয় বৈদ্য বলা হত। এরা সূর্যের অশ্বচালনা করত এবং অগ্নি ও বরুণের দাস ছিল। গায়ক ও বাদক হিসাবেও দেবতাদের সর্বপ্রকার উৎসবে এরা যোগদান করত এবং অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়ও ছিল। এদের মধ্যে নরনারীর অবাধ মেলামেশা ছিল এবং তদবস্থার পরিণতিতে স্ত্রীলোকের প্রতি এদের বিশেষ আসক্তি ছিল। পুরাণে গন্ধর্বদের উৎপত্তি বিষয়ে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়। বেদের পরবর্তী যুগে অপ্সরারা এদের স্ত্রীরূপে বা সঙ্গিনীরূপে বাস করত। ইন্দ্রসভায় অপ্সরাদের সাথে এরা স্বর্গের গায়ক হিসাবে যোগদান করত। অন্তরীক্ষে স্বচ্ছন্দগতিতে ও আনন্দে এরা বিচরণ করতে সক্ষম ছিল। কখনও কখনও সুন্দরী নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গন্ধর্বরা পৃথিবীতে অবরোহন করত। তাদের নাম হতেই গান্ধর্ব-বিবাহের প্রথা এই মর্তলোকে প্রচলিত হয়। নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে যে বিবাহ হয়, তাই গান্ধর্ববিবাহ। কারণ, বায়ু দেবতাই এই বিবাহের একমাত্র সাক্ষী এবং উপকরণ। বিষ্ণুপুরাণের মতে গন্ধর্ব্বেরা ব্রহ্মার কান্তি থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। অন্য মতে কশ্যপের দুই স্ত্রী মুনি ও প্রধার গর্ভে ষোলোটি ও দশটি গন্ধর্বের জন্ম হয়। হরিবংশ মতে স্বারোচিষ মন্বন্তরে অরিষ্ঠার গর্ভে গন্ধর্ব জন্মগ্রহণ করে। গন্ধর্বদের সমৃদ্ধশালী নগরী ও প্রাসাদ ছিল। হাহা, হুহু, চিত্ররথ, হংস, বিশ্ববায়ু, সোমায়ু, তুম্বুরু, নন্দি প্রভৃতি বিখ্যাত গন্ধর্ব। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যে-সত্তা **গন্ধ**কে জনগোষ্ঠীর পরিধি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায়, আদিতে তাদেরই গন্ধর্ব্ব বলা হত। এদের ধারিকা শক্তিকে বলা হত গন্ধর্বী বা **অপ্সরা**। মানুষের সমাজে এই সত্তার প্রথম উদ্ভব ঘটেছিল সম্প্রদায়ের যৌথ উৎপন্ন বহন করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বে কর্মরত সত্তা রূপে। পরে সমাজের চরিত্র ব্যক্তিমালিকানার দিকে পরিবর্তিত হতে শুরু করলে, এরাও ক্রমে ক্রমে স্বাধীন দোকানদারে পরিণত হতে থাকে। এই গন্ধর্ব্বদের আধুনিক রূপগুলিকে আমরা

সহজেই চিনতে পারি, কিন্তু এঁদের আদি রূপকে চেনা একটু কঠিন। কঠিন হত না যদি আমরা জানতাম পৃথিবীতে যৌথ সমাজব্যবস্থার ভেতর থেকে কেমন করে, ঠিক কী কী অধ্যায় পেরিয়ে সর্বপ্রকারের দোকানদার প্রজাতির বিকাশ ঘটেছে।

আধুনিক রূপে এঁরা অজস্র খণ্ডে বিভাজিত হলেও মূলত এঁদের দুটি শ্রেণী রয়েছে। প্রথমটি মূলত শব্দ বা আওয়াজনির্ভর উৎপাদন দ্বারা মনোরঞ্জন করে থাকে, যেমন গায়ক, নায়ক, কবি, কথাকার, নৃত্যশিল্পী, নাট্যকার প্রভৃতি শব্দগন্ধ-যাচনকারীরা; এবং দ্বিতীয়টি মূলত পণ্য বা তেজনির্ভর উৎপাদন দ্বারা মনোরঞ্জন করে থাকে, যথা হকার থেকে শুরু করে শপিংমল-মালিক পর্যন্ত সমস্ত পণ্যগন্ধ-যাচনকারীরা। আদিতে সম্ভবত এরা একই সত্তা ছিল। যৌথ সমাজের উৎপন্ন-বাহকদের কেবল উৎপাদিত বস্তুই বহন করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হত না, পরিচালক শাসকদের (মহর্ষিদের) বার্তাও পৌঁছে দিতে হত। আর, আদিতে এই বার্তা ছিল ছন্দময় ভাষণ। অতএব গন্ধর্বগণকে গানও গাইতে হত, মালও দিতে হত। হয়তো বিপরীত আচরণও করতে হত — প্রান্তের মাল ও বার্তা পৌঁছে দিতে হত শাসকদেরকে (মহর্ষিকে)। আজকের বাস্তবে এই গন্ধর্ব্ব-সত্তা অজস্র বিভাজনে বিভক্ত। তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, আদি গন্ধর্ব্বরা যৌথসম্পদের (সূর্য্যের) ধারক-বাহকদের (অশ্বের) নিয়ন্তা ছিল। তাঁদের থেকেই পরবর্তী যুগের পণ্যউৎপাদক-পরিচালকদের (ঘোটকদের) জন্ম হয়েছিল। এদের নাকি এগারটি জনগোষ্ঠী বা 'গণ' ছিল। হরিবংশ জানিয়েছে, মানুষ যখন যে-যার নিজের রুচি মতো চলতে শুরু করে অর্থাৎ কিছু কিছু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্ম হয়েছে, সেই **স্বারোচিষ মন্বন্তরে** গন্ধর্ব্বদের জন্ম হয়েছে। এ বিষয়ে আরও অনেক তথ্য রয়েছে। সেগুলি একত্র করে পৃথকভাবে গবেষণা করলে আমরা এদের আদি রূপকে যথেষ্ট স্পষ্টরূপে চিনে নিতে পারি। **৬.** ইংরেজি gone, gain।

গন্ধর্ব্বনগর, গন্ধর্ব্ববিদ্যা, গন্ধর্ব্ববিবাহ, গন্ধর্ব্ববেদ, গন্ধর্ব্বমার, গন্ধর্ব্বরাজ, গন্ধর্ব্বলোক : ২. ***গন্ধর্ব্বনগর*** *= গন্ধর্ব্বের পুর বা নগর;* ***গন্ধর্ব্ববিদ্যা*** *= গন্ধর্ব্বগণের অর্জিত বিদ্যা (সঙ্গীতশাস্ত্র);* ***গন্ধর্ব্ববিবাহ*** *= গন্ধর্ব্বগণের (ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণের) রীতি অনুসারে বিবাহ বা চুক্তি;* ***গন্ধর্ব্ববেদ*** *= গন্ধর্ব্বের বেদ (সঙ্গীতবিষয়ক বেদ);* ***গন্ধর্ব্বমার*** *= গন্ধর্ব্ব-কৃত প্রহার;* ***গন্ধর্ব্বরাজ*** *= গন্ধর্ব্বের রাজা (**চিত্ররথ**, ইনি কুবের-সখা। দ্র. **অঙ্গারপর্ণ**);* ***গন্ধর্ব্বলোক*** *= গন্ধর্ব্বের লোক।* **৩.** সঙ্গীতশাস্ত্র গন্ধর্ববেদ নামে কথিত হয়ে থাকে এবং সঙ্গীতবিদ্যাকে গন্ধর্ববিদ্যা বলা হয়ে থাকে। ... গুহ্যকলোকের উপরে ও বিদ্যাধরলোকের নীচে অবস্থিত একটি স্থান। এই স্থানে দেবগায়ক গন্ধর্বরা বাস করে। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** যে-কোনো শব্দকোষ থেকেই একথা প্রমাণ করা যায় যে, যে সত্তা সমাজে যত বেশি সক্রিয়, তার জন্য নির্দেশক শব্দটি তত বেশি ব্যবহৃত বা প্রচলিত ও গুরুত্বপূর্ণ থেকেছে; আর সেজন্যই তাকে শনাক্তকারী শব্দটি শব্দকোষে তত বেশি পরিমাণে স্থান দখল করেছে। যেমন **'খঞ্জ' (খঞ্জন)** শব্দের জন্য ব.শ. খরচ করেছেন এক পৃষ্ঠার এক-চতুর্থাংশ, যখন কিনা 'গন্ধ' (গন্ধর্ব্ব) শব্দের জন্য খরচ করেছেন প্রায় দুই পৃষ্ঠা। তার মানে **গন্ধ ও গন্ধর্ব্ব** মানুষের সমাজে অনেক বেশি সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ সত্তা। **পৌরাণিক** অভিধানকারের তথ্য থেকে বোঝা যায়, উকিল-ডাক্তার-মাস্টার প্রভৃতি বিদ্যাধরদের যে লোক, তার নীচে এবং মজুতদার-আড়তদার-পাইকার প্রভৃতি গোপনকারীদের যে লোক, এই দুই লোকের মধ্যবর্তী অবস্থানে এই গন্ধর্ব্বরা থাকেন। এঁরা যে সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন, তার উত্তরাধিকার এখনও আমাদের আছে। সুতরাং এসব আদৌ রূপকথা নয়, বাস্তব ছিল। কিন্তু ঠিক কীভাবে ছিল, এতদিন তার যথাযথ স্বরূপটি বোঝা যায়নি। আজ আমরা জেনেছি, গন্ধ কী, গন্ধর্ব্বই বা কাকে বলে। আজকের গন্ধর্ব্বরা শব্দবাহক, পণ্যবাহক, পণ্যবিষয়ক শব্দবাহক এই তিন গোষ্ঠীর অজস্র সত্তায় অতি খণ্ডিত রূপে অজস্র ভাগে বিভক্ত।

গন্ধাজীব (গন্ধেশ্বরী, গন্ধোপজীবী, গন্ধবণিক, গন্ধবেণে, গান্ধী) : ১. গন্ধ + আজীব। **২.** *গন্ধ (বিক্রয়) থেকে যার জীবিকা চলে।* / গন্ধ আজীব যাহার; গন্ধদ্রব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; যাহার গন্ধবিক্রয় উপজীবিকা; গন্ধদ্রব্যের বণিক। (ব.শ.)। **৩.** 'গন্ধদ্রব্য-বিক্রয়োপজীবী', গন্ধবণিক; গন্ধবণিকের উপাস্যদেবতা, শাক্তিদেবতা-বিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** গন্ধবণিক, গন্ধবেণে বাদে বাকি সব অপ্রচলিত। **৫.** সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যত গন্ধবণিক বা গন্ধবেণে আছেন, তাঁরা যে সুগন্ধিদ্রব্য বিক্রয় করেন না, সেকথা সবাই জানেন। এঁরা আদি পণ্যজীবীর বংশধর। পঞ্চাশবছর আগেও গন্ধবেণের দোকানে মশলাপাতি থেকে জামাকাপড় সবকিছুই পাওয়া যেত। 'কলকাতা কমলালয়' ছিল তারই শেষ উত্তরসূরি। এখন আবার বিদেশী ধারণার সঙ্গে জোট বেঁধে এক ছাদের তলায় 'সব পেয়েছির দেশ' বানানোর মতো বিগ-বাজার, শপিং-মল তৈরি হচ্ছে। আদি একার্ণবের একাকার ফিরে আসছে নতুন রূপে। তাছাড়া আদিতে বিভাজন খুব কমই ছিল। জ্ঞানজীবীদের মধ্যে যেমন অঙ্কজ্ঞানী, ভূগোলজ্ঞানী, ইতিহাসজ্ঞানী — এরকম কোনো বিভাজন ছিল না, জ্ঞানীমাত্রেই সবকিছু জানতেন; তেমনি আদি পণ্যজীবীদেরও কোনো বিভাজন ছিল না। তাঁরা সব বিক্রয়যোগ্য পণ্যই তাঁদের দোকানে রাখতেন। এঁরাই ছিলেন গন্ধবণিক বা গন্ধবেণে। আমাদের জাতির পিতা গান্ধী তো গন্ধবেণের বংশেই জন্মেছিলেন। তবে তিনি বাহ্য-উৎপন্নের দুনিয়া ছেড়ে মৌখিক-উৎপন্নের দুনিয়ায় গন্ধেশ্বর হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। দ্র. **গান্ধিনী**।

গপ (গপগপ, গব, গবগব) : ১. গ + প, ব। **২.** *গামীকে পান বা ভক্ষণ করে যে; গামীপানের বা গামীভক্ষণের ক্রমান্বয় থাকে যাহাতে; গামীকে বহন করে (ভিতরে নিয়ে যায়) যে; গামীবহনের ক্রমান্বয় যাহাতে।* **৩.** অতিক্ষুধায় আগ্রহের সহিত দ্রুত গলাধঃকরণের শব্দ, ক্রমাগত 'গপ্' শব্দ। (ব.শ.)। **৪.** সুপ্রচলিত। **৫.** ধ্বনিমূলক শব্দ যে অর্থপূর্ণ, এই শব্দ পুনরায় তা প্রমাণ করে। গপগপিয়ে খাওয়া, গপগপ বা গবগব করে খাওয়া, কিংবা গপাগপ বা গবাগব খাওয়া — এসব কথা আমরা এখনও স্বভাবতই বলি। কিন্তু নেচার অর্থহীনভাবে এই শব্দ আমাদের শেখায় না, যদিও এতদিন সেরকমই

আমরা জানতাম বা ভাবতাম। ৬. ইংরেজি gob, gap।

গবাক্ষ : ১. গো + অক্ষ। ২. *যে পথে অক্ষি যায়।* / গো (কিরণ) + অক্ষি (রন্ধ্র)। (ব.শ.)। ৩. কিরণসমূহের রন্ধ্রতুল্য অর্থাৎ পথের মতো, বাতায়ন, জানালা, রামসৈন্যস্থ বানরবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. অক্ষি শব্দের অর্থটি ঠিক ভাবে অনুধাবন করা থাকলে, আমাদের বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না যে, গবাক্ষ হল ঘরের ভেতর থেকে বাইরের জিনিসকে দেখে নেবার জন্য চোখ রাখার রন্ধ্রমাত্র। এটি বড় বা ছোট যাই হোক না কেন। তবে সাধারণত ছোট ফুটোকেই গবাক্ষ বলা হয়ে থাকে। সেকালের দুর্গে এর অজস্র ব্যবহার ছিল। চিতোর দুর্গের সীমানা-দেওয়ালে প্রচুর গবাক্ষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়।

গবেষণা : ১. গো + **এষণা**। ২. *গতিশীল (বিষয় ও বস্তু) সম্পর্কে দিশাগ্রস্ত জ্ঞানের আহরণ থাকে যাহাতে।* ৩. অনুসরণ, অনুসন্ধান, অন্বেষণ, তর্কাদি দ্বারা যথাবোধিত ধর্ম্মাদির অন্বেষণ, বিচারণা, বিষয়বিশেষের তত্ত্বান্বেষণ। (ব.শ.)। ৪. research অর্থে প্রচলিত। ৫. অনেকেই ভাবেন, রিসার্চ বোঝাতে বাংলায় যে 'গবেষণা' শব্দ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তাতে 'গো' বা গরুর প্রাদুর্ভাব কেন! এখন বোঝা যাচ্ছে, গবেষণা যে বিশাল অর্থ ধারণ করে, research তার অংশমাত্র। উভয়ের মিল হচ্ছে উভয়েই দিশাগ্রস্ত জ্ঞানীর খোঁজাখুঁজি; আর অমিল হল রিসার্চ যেখানে 'পুনরায় খোঁজাখুঁজি' মাত্র, গবেষণা সেখানে যে-কোনো 'গামী'র বা 'গো'-এর অর্থাৎ গতিশীল বিষয় ও বস্তুর বিষয়ে অনুসন্ধান। এই বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিসার্চ-স্কলার'কে বড়জোর 'ডক্টর' বলা যেতে পারে, কিন্তু আইনস্টাইন বা রবীন্দ্রনাথের মতো 'গো-গণ বিষয়ে যথার্থে জ্ঞানী'দের **গোস্বামী** বলাই সমীচীন। দ্র. **এষণ, গোস্বামী**। ৬. ??

গভীর : ১. ✓গম্ + ঈর (ঈরন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। গভ্ + ঈর। (দ্র. **সমীর**)। ২. *গামীর ভরণ প্রবাহিত হয় যাহাতে।* / যে স্থানে জল যায়। (ব.শ.)। ৩. নিম্ন, গর্ত্তযুক্ত, অগাধ, অতলস্পর্শ, গম্ভীর, প্রচণ্ড, প্রবল, গহন, দুরধিগম, দুর্ব্বোধ, নিবিড়, দুর্গম, অক্ষোভ্য, মন্দ্র, মাংসল, উচ্চ, প্রগাঢ়, দুরবগাহ, অনন্ত, ধীর, প্রশান্ত, দুঃসহ, তীব্র, মর্ম্মপীড়াকর, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, শান্তরস, দীর্ঘ, মন্থর। (ব.শ.)। ৪. deep অর্থে প্রচলিত। ৫. এই শব্দটিকে এতদিন ভুল ভাবে বোঝা হয়েছে এই কারণে যে, 'গভ'যুক্ত অন্য কোনো শব্দ এখন আর প্রচলিত নেই। **গ** যে গামী, সেকথা আমরা আগেই বিস্তারিত করেছি। এই গ বা গামী বায়ুপ্রবাহের, জলপ্রবাহের, চিন্তাপ্রবাহের, সংবাদপ্রবাহের, পণ্যপ্রবাহের, শব্দপ্রবাহের — যে কোনো প্রবাহের অন্তঃসত্তা হতে পারে। সম ঈরণ বা সম ঈর যেমন সমীরণ বা সমীরকে বোঝায় যা কিনা সমভাবে সর্বদিকে প্রবাহিত হয়, তেমনি গভ্ (গামীর ভরণ / ভক্ষণ) বিশেষ দিকে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ, এ প্রবাহ স্বভাবতই ঢালের টানে দিশাগ্রস্ত হয় ও যেখানে সবচেয়ে বেশি ঢালের কারণে আকৃষ্ট হয়, সেখানে গিয়ে জমা হয়। সেই স্থানটি জলপ্রবাহের ক্ষেত্রে ভূতলের নিম্ন ও গর্ত্ত স্থান যেমন হতে পারে, বায়ুপ্রবাহের ক্ষেত্রে নিম্নচাপ অঞ্চল হতে পারে, আবার চিন্তাপ্রবাহ-সংবাদপ্রবাহ-পণ্যপ্রবাহ-শব্দপ্রবাহের ক্ষেত্রে যেখানে সেই প্রবাহের নিম্নচাপ অঞ্চল, সেখানেও গিয়ে জমা হতে পারে। তবে যেখানেই এই প্রবাহ অতিমাত্রায় গিয়ে জমা হোক না কেন, সেই স্থানটি যে গভ্ ঈর বা গভীর, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দ্র. **গহন**। ৬. ইংরেজি govern।

গম্ (গম্‌গম্) : ১. গ + ম্। ২. *গামীর রহস্যরূপ থাকে যাহাতে; গামীর রহস্যরূপের ক্রমান্বয় যাহাতে।* ৩. গতি, গমন, প্রাপ্তি, জ্ঞান, অতিক্রম, স্ত্রীসম্ভোগ, অত্যয়; গোলার গম্ভীর ধ্বনি, ঈষৎ গরমের বা উত্তাপের ভাব। (ব.শ.)। ৪. 'গম্' ধ্বনি অর্থে প্রচলিত। ৫. গামী যদি একটি বিমান হয়, তখন যে 'গম্' ধ্বনি শুনি, গামী যদি ধনিমেয়ের গমগমিয়ে চলে যাওয়া হয় তাঁর চলে যাওয়ায় যে 'গম্' ধ্বনি শুনি; দুটি ধ্বনিই কিন্তু আলাদা এবং সেই ধ্বনিই বলে দেয় কে গেল, বিমান না ধনিমেয়ে। অর্থাৎ ধ্বনির ভিতরে গামীর ছায়া থাকে। [একথা টেবিল থেকে চামচ পড়ার ঘটনা দিয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্র. (ছ) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।]। সেই ছায়াই গামীর রহস্যরূপ, যা মাপবার, সুনির্দিষ্টভাবে বলবার কোনো উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। গম্‌গম্ করে সেই রহস্যরূপী ছায়া তার সেই অস্তিত্বের কথা জানান দিতে থাকে। ৬. ইংরেজি game।

গম, গমক, গমন : ১. গমন = গম্ অন্। / ✓গম্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***গম*** = *গামীর সীমায়ন যাহাতে, যাহাতে গামী এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায় (অনন্ত গমন করে না)।* ***গমক*** = *গম করে যে;* ***গমন*** = *গম অন (on) থাকে যাহাতে।* ৩. গামী, গন্তা, গমন, উপভোগ, দ্যূতবিশেষ, রবিশস্যবিশেষ; গময়িতা, প্রাপক, বোধক, জ্ঞাপক, স্বরবিশেষ, স্বরকম্পন, বাদ্যবিশেষ, তবলার ঈষৎ-কম্পিত ধ্বনি, সাদা কাঁকুড়বিশেষ; গতি, চলন, পাদক্ষেপ, বিক্রম, প্রস্থান, প্রয়াণ, প্রাপ্তি, জিগীষুর প্রয়াণ, অভিনির্য্যাণ, কুচ, পঞ্চবিধ কর্ম্মের একতম, উড্ডয়ন, উৎপতন, মরণ, উপভোগ, স্ত্রীসম্ভোগ, ঘূর্ণিতি। (ব.শ.)। ৪. তুলনায় going অর্থে গমন অধিক প্রচলিত। ৫. বিহঙ্গম, পারঙ্গম প্রভৃতি শব্দে গম শব্দটি 'গমন করে যে' অর্থে প্রচলিত থাকলেও, পৃথকভাবে গম শব্দটির প্রয়োগ রয়েছে কেবল 'রবিশস্যবিশেষ' বা wheat অর্থে। দ্র. **গোধূম**। গমক-এর ব্যবহার রয়েছে সঙ্গীতচর্চার মহলে। কিন্তু 'গমন' রয়েছে সাধারণভাবে। তবে এর অর্থ বোঝা হয় going। এতে 'গামীর রহস্যরূপ অন থাকে' বলেই যে একে 'গমন' বলা হয়, এই বোধ সাধারণভাবে এখন আর নেই। ৬. ইংরেজি game, -gamy।

গয় (গয়া) : ২. ***গয়*** = *গামী যেখানে থামিয়াছে;* ***গয়া*** = *গয়-এর আশ্রয় যাহাতে।* ৩. রাজর্ষিবিশেষ, রামসৈন্যের বানরবিশেষ, অসুরবিশেষ, দেশবিশেষ; বিহারের অন্তর্গত নগরীবিশেষ ও তীর্থবিশেষ, গয়রাজর্ষিপুরী (ইহা রাজর্ষি গয়ের পুরী। বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার বরে ঐ পুরী গয়ের নামানুসারে পুণ্যতীর্থ গয়াপুরী নামে খ্যাত হয়। মতান্তরে, গয়াসুরের দেহত্যাগ হেতু এই স্থান অসুরের

নামে খ্যাত হইয়াছে।)। গয়ার পাপ — গয়ায় পিণ্ডদানে মৃতের পাপমোচন ও মুক্তি হয়, গয়ায় পাপ করিলে মুক্তি নাই। (ব.শ.)। (ক) সুগ্রীবের বানর অনুচর। সুগ্রীবের আহ্বানে ইনি অসংখ্য বানর সেনার সহিত অন্বেষণে কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। (খ) একজন ধার্মিক রাজা — রাজা অমূর্তরায়ের পুত্র। ইনি শতবর্ষ পর্যন্ত কেবল আহুতি-অবশিষ্ট খেয়ে অগ্নির উপাসনা করতেন। এতে অগ্নি সন্তুষ্ট হয়ে গয়কে বর দিতে চান। গয় বর প্রার্থনা করেন, তিনি যেন বেদ অধ্যয়ন করবার অধিকার পান। অগ্নি তাঁকে এই বর দান করে প্রস্থান করেন। অগ্নির বরে গয় পৃথিবীর উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। ... এরপর তিনি এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। গয়ের যজ্ঞফলে যে একটি বটবৃক্ষ চিরজীবী হয়, তা অক্ষয়বট নামে প্রসিদ্ধ। (গ) বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত অসুর। এর নামানুসারেই গয়াতীর্থের নামকরণ হয়েছে। ... এঁর কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে এর একটা বিধান প্রার্থনা করেন। ... গয় রাজ্য ও ঐশ্বর্য না চেয়ে বললেন, আমার শরীর যেন ব্রাহ্মণ, তীর্থশীলা, দেবতা, মন্ত্র, যোগী প্রভৃতি সমস্ত পবিত্র পদার্থ থেকেও পবিত্র হয়। বরলাভ করে এঁর দেহ দেবতা, ব্রাহ্মণ, যোগী, কর্মী ও ধর্মীদের চেয়েও পবিত্রতম হয়। এর পবিত্র দেহ দর্শন মাত্র সকলে বৈকুণ্ঠে গমন করতে থাকে, ফলে দেশ জনশূন্য হয়ে যায়। যমপুরীতে যাবার লোকের অভাব ঘটে। ... দেবতারা গয়াসুরকে নিশ্চল করবার উপায় উদ্ভাবন করতে থাকেন। একদিন দেবতারা গয়াসুরের কাছে গিয়ে তার শরীর ভিক্ষা করেন। গয়াসুর সম্মত হওয়ায় এক প্রকাণ্ড শিলা তার উপর স্থাপন করে দেবতারা সেই শিলার উপর অবস্থান করেন। এতেও গয়াসুর নিশ্চল না হওয়ায় বিষ্ণু তার বক্ষোপরি স্থাপিত শিলায় আসীন হন। তখন গয়াসুর সমূহ ব্যাপার জ্ঞাত হয়ে নিশ্চল অবস্থায় দেবতাদের বলেন যে, তার সঙ্গে এ কৌশলের কোনো আবশ্যক ছিল না। কারণ, সে কখনো দেবগণের অবাধ্য হয়নি। দেবতারা গয়াসুরের বিনয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর প্রদানে সম্মত হন। তখন গয়াসুর এই বর প্রার্থনা করে যে, যে পর্যন্ত চন্দ্র সূর্য বা পৃথিবী থাকবে, সে পর্যন্ত দেবতারা তার বুকের উপর স্থাপিত থাকবেন। এইরূপে গয়া অতি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** গমন শব্দে স্ত্রীসম্ভোগ কথাটি বারংবার এসেছে। শব্দটি সে অর্থে ব্যবহৃত হয়েও থাকে। গামী তখন পুং বা স্ত্রীর লিঙ্গ পদবাচ্য। যখন কোনো আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনী একটি দেশে প্রবেশ করে, সেও গামী। দেশটির পক্ষে এই গামী ভয়াবহ। ভারতসমাজের ইতিহাসে একটা সময় ছিল, যখন বৈদিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তার রাক্ষসরূপ ত্যাগ করে আদি-অসুর-এর রূপে উত্তীর্ণ হয়ে থামে। সন্দেহ নেই, সেই আদি-অসুরব্যবস্থা এতই শুভ ছিল যে, তার বিরুদ্ধে বলার মতো কিছুই ছিল না। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি রাক্ষসতন্ত্রের কারণে সমাজ অনেকটাই অধঃপতিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এই ভাল অসুরের অস্তিত্ব দেবতাদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে। গয়াসুরের বেলায় বোধকরি তাই হয়েছিল। তাকে একেবারেই অন্যায়ভাবে পুঁজির সমর্থকেরা স্তব্ধ করে দেয়। ভারতসমাজে ব্রাহ্মণ এইরকম কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়েছে এবং তার দায় নিজেই গ্রহণ করেছে। শালগ্রাম শিলার ঘোরবিরোধী এই ব্রাহ্মণ সেই শিলা জনসমুদ্রে নিক্ষেপ করেনি, জনসাধারণকে গয়াসুরের শালগ্রাম শিলার আরাধনা করতে দেয়নি; নিজেই তা বহন করবার দায় গ্রহণ করেছে এবং আজও তা বহন করে নিয়ে চলেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই সে আজও টিকে রয়েছে।

গা (গাওয়া) : **১.** গাত্র > গা; সা-রে-গা-র 'গা'; **সম্বোধনে 'গা'**; গৈ > গা; গাহ্ > গা। (ব.শ.)। **২.** *গামীর আধার যাহাতে*। **৩.** দেহ, শরীর, অবয়ব, পূর্ব্বকায়, স্ত্রীলোকের বক্ষঃস্থল, স্তন, গাত্র; স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর; সম্বোধনে, গো, সরোষ সম্বোধনে, বিস্ময়ে, ঘৃণাপ্রকাশে, ধিক্কারে, বিরক্তিপ্রকাশে; গান করা, কীর্ত্তন করা, গুণগান করা, মিষ্টি সুরে রব করা, (নাম) উচ্চারণ করা, ছন্দে বর্ণনা করা, ভক্তিপূর্ব্বক উল্লেখ করা, গুঞ্জনচ্ছলে গান করা, অভিহিত করা, বলা, স্বর উচ্চারণ করা, ঘোষণা করা, তন্ত্রধ্বনিতে উচ্চারণ করা, পালা গান করা, মঙ্গলকাব্য গান করা; মেরামত করা। (ব.শ.)। **৪.** বহুল প্রচলিত। **৫.** প্রশ্ন হল, এতগুলো পৃথক ধাতুকে বাংলাভাষী এরকম এক শব্দে পরিণত করল কেন? এ তো কোনো রাজনির্দেশ মান্য করে ঘটেনি, মানুষ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে করেছে। কী সেই নিয়ম? দুটি পরস্পর-বিপরীত প্রবণতা থেকে আমরা এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করতে পারি। এ-ভাষার মূলে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি থাকার ফলে, তার কার্যকারিতার এলাকা এত বিশাল যে, তার ক্রিয়ামূলক শব্দগুলি নিজস্ব এলাকায় পূর্ণ শক্তিতে সক্রিয় হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ **খা** শব্দটি নিলে আমরা দেখব, যা কিছু **ক্ষ** করা হয় বা খাদিত হয় তা সবই এই খা-শব্দটি ধারণ করতে পারে; তা আমরা রুটি খাই, জল খাই, বিড়ি খাই, হাওয়া খাই, দোল খাই কিংবা যতই ঘাবড়িয়ে ঘোল খাই না কেন। কারণ মূল 'খ' বর্ণটি তার অর্থ নিয়ে সর্বক্ষেত্রে সক্রিয়। অথচ বিভিন্ন প্রকারের খাওয়া পৃথক ভাবে বোঝা যাচ্ছে তাদের প্রেক্ষিতের কারণে। তাহলে তো প্রেক্ষিতই ঠিক করছে একই 'খা' কোথায় কী প্রকার খাওয়ার ভিন্নতার নির্দেশ করছে। গভীর খাদ অর্থে 'খাই' আর ভাত খাওয়া অর্থে 'খাই' কিংবা গান গাওয়া অর্থে 'গাই' আর গাভী অর্থে 'গাই' আমাদের বাংলাভাষীদের কথাবার্তা বলা ও বোঝার সময় সেম্সাইড করে না; প্রেক্ষিত এক্ষেত্রে ট্রাফিক পুলিশের মতো আমাদের চিন্তাকে নিজ নিজ পথে চলে যেতে পূর্ণ সহযোগিতা করে। তাই যদি হয়, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন খাওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দের অকারণ কোনো প্রয়োজন নেই। একই 'খা' ও তার প্রেক্ষিত হলেই কাজ চলে যায়, বলা ভালো সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়। কিন্তু কোনো কারণে 'খা' শব্দের ভিতরের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি বিস্মৃত হয়ে গেলে এবং তাকে প্রতীকী অর্থে বুঝতে শুরু করলে, কেবল প্রেক্ষিত দিয়ে কাজটি চালানো যাবে না। সেই সমস্যা হয়েছিল ইংরেজি প্রভৃতি ভাষাগুলির। তাই তাদেরকে eat-এর পাশাপাশি drink, smoke প্রভৃতি পৃথক শব্দ তৈরি করতে হযেছিল। ফলে তাদেরকে বানাতে হয় এক বিশাল লিলিপুট বাহিনী। বিপরীতে আমাদের এক গালিভারকে নিয়েই কাজ চলে গেছে। অতএব বর্ণের ভিতরে অর্থ যখন রয়েছে, আর প্রেক্ষিত যখন সেহ মানেটিকে সুনির্দিষ্ট বাস্তবতায় ব্যবহার করবার উপায় করে দিচ্ছে, তখন যেকোনো ক্ষেত্রেই এই নীতি গ্রহণ করা যেতে

পারে। সম্ভবত এই প্রবণতার কারণেই সংস্কৃত-পরবর্তী যুগে, বিশেষত মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে, উপরোক্ত 'খাদ-খাই', 'গাভী-গাই'-এর মতো গাত্র, গৈ, গাহ্ প্রভৃতি শব্দকে একই 'গা' শব্দের অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা দেখা যায়। মধ্যযুগ দুদিক থেকে এই কাজটি এত ব্যাপকভাবে করেছিল যে, একে বাংলাভাষীদের সুবর্ণযুগ বললে অত্যুক্তি হয় না। একদিকে 'করা', 'চলা', 'যাওয়া', 'হওয়া', 'গাওয়া' প্রভৃতি শব্দগুলির এলাকার বিপুল বিস্তার ঘটিয়েছিল; অপরদিকে, *মানুষের নিজ শরীর ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সে বিশ্বসংসারকে ঢুকিয়ে ফেলেছিল।* আর, তা সে করবে নাই বা কেন! জগৎকে নিজ দেহের মাধ্যমে বুঝে নেওয়ার এই ভাবনা-প্রক্রিয়াই তো আমাদের ঐতিহ্য! সেইকারণে হাত, পা, কান, মাথা, মুখ এবং সর্বোপরি 'গাত্র' বা 'গা' দিয়ে বাংলাভাষীর মধ্যযুগ যে কত শব্দ বানিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। গা-করা, গা কেমন করা, গা জুড়ান, গা-ঝাড়া দেওয়া, গা-জ্বালা করা (**গাত্রদাহ**), গায়ে না মাখা, গায় লাগা, গায়ে পড়া, গা রি রি করা, গা লাগান — এরকম অজস্র। বাংলাভাষার অভিধানগুলি দেখলেই এ সত্য অনুভব করা যেতে পারে। ... একটা কথা এখন স্পষ্ট বোঝা যায়, চন্দ্রকে চাঁদ, গ্রামকে গাঁ, কণ্টককে কাঁটা শখ করে বাংলাভাষী করেনি; কিংবা লেখাপড়া জানত না বলে এবং সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করতে অসুবিধা হয় বলে করেনি। ভাষার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মেই করেছে। একে তদ্ভব বলে আলাদা করতে আমরা রাজি নই, তাহলে হরিদ্বারের গঙ্গার জল ও পাটনার গঙ্গার জলকে আলাদা নাম দিতে হবে।

গাছ : ১. গা (গাত্র) + ছ; গ + অ + ছ; গা + ছ। ২. *গা আচ্ছাদিত যাহার; কিংবা গামীর আধার আচ্ছাদিত যাহাতে; অথবা গমনকারী আচ্ছাদিত থাকে যাহাতে।* ৩. উদ্ভিদ, বৃক্ষমাত্র, ঘানিযন্ত্র, ঘানিগাছ, গাছের মতো খাড়া ও মাটিতে পোঁতা ঘানির স্থূল কাষ্ঠখণ্ড, দীর্ঘ সরু বস্তুর পরে প্রযোজ্য তদ্ভিন্নতাসূচক শব্দ, টি, টা (একগাছ লাঠি, দুগাছ দড়ি), (সাদৃশ্যে) দীর্ঘাকৃতি, লম্বা, ঢেঙা। ৪. tree অর্থে প্রচলিত। ৫. গাছের পাতায় গাছের সারা শরীর ঢাকা থাকে। সেই বিচারে গাছ মানে 'গা আচ্ছাদিত যাহার'। এক্ষেত্রে 'গামীর আধার' হল গাছটির শাখা-প্রশাখা। এগুলো ঢাকা থাকে; তাই গাছ। যে মানুষ নিজের নানান কাজ-কারবার, নানান ভূমিকা দিয়ে নিজের স্বরূপকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তাকেও গাছ ভাবার চল রয়েছে বাংলাভাষায়। তার সেই স্বরূপ অন্যের পক্ষে সুখকর হলে লোকে শাখা-প্রশাখা-পাতাভরা সেই মানুষের জন্য গান গায় — 'বটবৃক্ষের ছায়া যেমন রে, মোর বন্ধুর মায়া তেমন রে'; আর দুঃখকর হলে বলে 'লোকটা বদমাইসের গাছ'। আরও বড় প্রেক্ষিতে বুঝলে, গাছ হল সমাজবৃক্ষ; একালের ভাষায় বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা। এই সংস্থাগুলিতে যাঁরা চাকরি-বাকরি করেন, তাঁরা সেই সমাজবৃক্ষে আশ্রয় করে থাকেন। তাঁরা কী করেন না-করেন, বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় থাকে না। তাঁদের গমন তাই আচ্ছাদিত। এই আচ্ছাদনকর্মটি সামাজিক সংগঠনগুলি করে বলেই তারা 'গাছ' পদবাচ্য। দ্র. **ছাগ**।

গাত্র (গাত্রদাহ) : ১. ✓গম্ + ত্র (ত্রন্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গামীকে (গমনসমস্যা থেকে) ত্রাণ করে যে।* ৩. দেহ, শরীর, অবয়ব, অঙ্গ, হস্তীর **পৃষ্ঠজঙ্ঘাদিভাগ**। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **গা**। জ্বলে মানুষের মন, বলা **হয়, পুড়ে যাচ্ছে** তার গা। দ্র. **খড়িবাজি**।

গান্দিনী (গান্ধিনী) : ২. *যে জনগোষ্ঠী নিয়মিত পণ্যবিক্রয় করে।* ৩. কাশীরাজকন্যা, শফল্কের ভার্য্যা ও অক্রূরের জননী, গঙ্গা। (ব.শ.)। কাশীরাজের কন্যা এবং যদুবংশের **শ্বফল্কের** স্ত্রী ও অক্রূরের মাতা। হরিবংশ মতে এঁর নাম নিরুক্তি। ইনি প্রতিদিন ব্রাহ্মণদের গোদান করতেন বলে এঁর নাম হয়েছে গান্ধিনী। ইনি মাতার গর্ভে বহু বৎসর বাস করেন। বহুদিন ভূমিষ্ঠ না হওয়ায় এঁর পিতা এঁকে শীঘ্র ভূমিষ্ঠ হতে বলেন। কন্যা উত্তর দেন, প্রতিদিন গোদান করতে পেলে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন। পিতা এই কথা স্বীকার করলে পর তাঁর মনের বাসনা পূর্ণ হয়। গান্ধিনীর গর্ভে **শ্বফল্কের** ঔরসে অক্রুর নামে এক পুত্র হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **গন্ধ, গন্ধবেনে**।

গান্ধার : ২. *গান ধারণ রীতি যাহার।* ৩. দেশবিশেষ, কান্ধার, গান্ধারবাসী, সিন্দুর, (সংগীতে) স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর (ইহা ছাগরব তুল্য। ইহা গন্ধ, অর্থাৎ নাসিকা, ও কর্ণ চালিত করিয়া নির্গত হয়, তজ্জন্য 'গান্ধার' নামে খ্যাত।), রাগবিশেষ। (ব.শ.)। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর হতে আফগানিস্থানের অধিকাংশকে পুরাকালে গান্ধারদেশ বলা হত। বর্তমান কান্দাহার প্রাচীন গান্ধার নগরী। (পৌ.অ.)। ৪. সুরসাধকদের মহলে তৃতীয় স্বর রূপে প্রচলিত। ৫. অন্ততপক্ষে চারটি লোকে 'গান্ধার'কে চিহ্নিত করেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা। প্রথম, ভৌগোলিক ক্ষেত্রে। প্রাচীন পৃথিবীর কান্দাহার অঞ্চলে, যখন পৃথিবীতে কোথাও রাষ্ট্রের জন্মই হয়নি, তখনই দুটি ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে — ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু। সিন্ধুর অববাহিকা অঞ্চল কান্দাহার বা গান্ধার নামে প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয়, গান্ধার হল বিশেষ রকমের দানকারী জ্ঞানধারা ও পণ্যধারা। ব্রহ্মপুত্র হল বেদজীবী-জ্ঞানজীবীদের ধারা, আর সিন্ধু হল 'স্যন্দনাদ্যাভিমানী দেবগণ'-এর ধারা। উভয় ধারাই একসময় দানকারী থেকে বিনিময়ের পরিবর্তে দানকারী হয়ে গান্ধার হয়ে যায়। তৃতীয়, গানের তৃতীয় স্বর যে 'গান্ধার', যা করতে হয় গন্ধগ্রাহক নাক আর শব্দগ্রাহক কানের ব্যবহার ক'রে, যা কিনা ছাগরবতুল্য, যে ছাগ দক্ষতার ধারক-বাহক। চতুর্থ, পণ্যের যে প্রকাশ, তা প্রচারগ্রাহক নাক (দ্র. **নাক**) আর দো-কান (দ্র. **কর্ণ**) ব্যবহার ক'রে তবেই করতে হয়।

গান্ধারী : ২. ***গান্ধার** দেশের (হস্তান্তরিত) সম্প্রদায়।* ৩. ধৃতরাষ্ট্রের ভার্য্যা ও দুর্যোধনের জননী। (ইনি শিবের বরে শত পুত্র লাভ করেন। পতির অন্ধত্ব হেতু ইনি স্বীয় চক্ষু বহুগুণ বস্ত্রে বন্ধন করিয়া রাখিতেন; তজ্জন্য ইঁহার সতীত্ব বিখ্যাত। ...), নাড়ীভেদ, দুরালভা লতা, মাদকদ্রব্য গাঁজা। (ব.শ.)। গান্ধার দেশের রাজা সুবলের কন্যা, ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রী ও দুর্যোধনাদির মাতা। গান্ধারদেশের কন্যা বলে এঁর নাম গান্ধারী। ... সুবল গান্ধারীকে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করতে ইচ্ছা করে যথাসময়ে বিবাহ দেন। ... জন্মান্ধ স্বামীকে

অতিক্রম করবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করে গান্ধারী বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সর্বদা নিজের চোখ বেঁধে রাখতেন। ব্যাসদেব বর দিয়েছিলেন যে, গান্ধারীর শত পুত্র হবে। যথাকালে গান্ধারী গর্ভবতী হলেন, কিন্তু দুই বৎসরের পরেও তাঁর কোনো সন্তান ভূমিষ্ঠ হল না। ... তাঁর গর্ভ হতে একটি লৌহকঠিন মাংসপিণ্ড নির্গত হল। গান্ধারী তা ... শীতল জলে সিক্ত করে একশত ভ্রূণে বিভক্ত করেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ঘৃতপূর্ণ কলসীতে রাখা স্থির করেন। এর এক বৎসর পরে দুর্যোধন, এবং এক বৎসর এক মাসের মধ্যে দুঃশাসন, দুংসহ প্রভৃতি শত পুত্র ও দুঃশলা নামে একটি কন্যার জন্ম হয়। ... নিজ পুত্রের অন্যায় আচরণের জন্য গান্ধারী কোনোদিন দুর্যোধন ও দুঃশাসনকে ক্ষমা করতে পারেননি। ... পুত্রকে ত্যাগ করার জন্য তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ করেন। ... তাঁর দৃষ্টিপাতে যুধিষ্ঠিরের নখাগ্র কুৎসিত হয়ে যায়। ... কৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিসম্পাত যথাকালে কার্যকরী হয়েছিল। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। **৫.** অনেক সময় মনে করা হয়, যৌথতাবাদীরাই কেবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধিতা করে; কিংবা সমাজতন্ত্রবাদীরাই কেবল পুঁজিবাদীদের বিরোধিতা করে। তা ঠিক নয়। ইতিহাসে প্রায়শই দেখা গেছে নতুন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে সেকেলে পুঁজিবাদ আর তার সঙ্গে সে পেয়ে গেছে সমাজতন্ত্রবাদীদের। গন্ধর্ব্ব, গান্ধার, গান্ধারী, কর্ণ, দ্রোণাচার্য প্রভৃতি সত্তাগুলি মূলত পুঁজিবাদী সত্তা, কিন্তু তাদের কাহিনীগুলি থেকে বোঝা যায় তারা বিরোধিতা করেছে নতুন পুঁজিবাদের, আধুনিক পণ্যের, যুদ্ধ করেছে নতুন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। অনেক সময় মনে হতে পারে, এই সত্তাগুলি পণ্য উৎপাদন করবার যোগ্যতা অর্জন করেও যেন-বা পণ্য উৎপাদন না-করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গান্ধার থেকে ধৃতরাষ্ট্রে আগত সম্প্রদায় সেই গান্ধারী। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পতিকে অতিক্রম করবেন না। এই তাঁর সতীত্ব।

গেঁতিজাল : দ্র. **জাল**।

গো (গোধুম) : ১. ✓গম্ + ও (ডো) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে (কেউ) যায়।* / যে যায়; যাহা দ্বারা স্বর্গে যায়। (ব.শ.)। ৩. গোজাতি, গরু, বৃষরাশি, সূর্য্য, চন্দ্র, গোমেধযজ্ঞ, ইন্দ্রিয়, ঋষিবিশেষ, গায়ক, গৃহ, ৯ সংখ্যা, গোজাতি স্ত্রী, ধেনু, দিক, বাক্, বাক্যাধিদেবতা সরস্বতী, পৃথিবী, স্বর্গ, বজ্র, অম্বু, জল, আকাশ, রশ্মি, কিরণ, চক্ষুঃ, বাণ, লোম, কেশ, হারক, গোসম্বন্ধী দুগ্ধঘৃতচর্ম্মাদি, গৃহপালিত পশুগণ, সিংহ। (ব.শ.)। ৪. cow বা 'গরু' অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। **৫.** ব.শ. এই শব্দের সংক্ষিপ্ততম ও যথার্থ ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়েছেন 'যে যায়'। এর প্রকৃত অর্থ হল গ (= গামী), গি (= গতিশীল গামী), গু (= নবরূপে উত্তীর্ণ গামী), গে (= দিশাগ্রস্ত গামী) প্রভৃতি সর্বপ্রকারের গামীদের আশ্রয় যাহাতে, সেই হল 'গো'; তা সে অতি উচ্চ মার্গের গো (ধরা যাক সূর্য্য কিংবা গোলোকবাসী **নারায়ণ, গোবিন্দ**) থেকে অতি নিম্ন মার্গের গো (ধরা যাক গরু), এদের মধ্যে যে কেউ হতে পারে। কোনো গো বাহ্য চোখে দেখা যায়, কোনো গো-কে চোখ বন্ধ করে দেখতে হয়, নইলে দেখা যায় না; যেমন বাক্ কিংবা তত্ত্বকথা। কেউ মুহূর্তে বিশ্বের যেকোনো স্থানে যেতে পারে, কাউকে আপনি যতটুকু তাড়ালেন ততটুকুই গেল। তার মানে 'গতিশীল বস্তু' মাত্রেই 'গো' পদবাচ্য; **অর্থাৎ, Whoever or** whatever goes। উপরোক্ত **(৩-এ প্রদত্ত) ৩২ টি অর্থের প্রত্যেকটিই** কোনো না কোনো ভাবে 'যাওয়া' ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত; তাদের সে-যাওয়ার কথা আমরা জানি কিংবা না-জানি। তবে cow-কে যে 'গো' বলা হত, তার কারণ ভিন্ন। সে অন্য জীবদের মতো হেঁটে-চলে স্থানান্তরে যেতে পারে বলে তাকে 'গো' বলা হত না; তাহলে তো ঘোড়া-গাধা-ছাগলকেও গো বলা যেত। cow-কে 'গো' বলা হত তার বিশেষ 'গতিশীল' ভূমিকার জন্য। এই জীবটিই মানবসভ্যতার হাতে পোষমানা প্রথম জীব যা 'প্রেরিত' হত, তা সে বিনিময়যোগ্য পণ্য রূপে হোক আর বিনিময়ের মাধ্যম রূপেই হোক। উভয় ক্ষেত্রেই সে 'প্রেরিত' হত বা 'যেত'। একই কথা গোধুম (ধুম বা ধোঁয়ার মতো গুঁড়ো যে বস্তু যায়; অর্থাৎ, গমের আটা-ময়দা ইত্যাদি) সম্পর্কেও বলা যায়। (চালও 'চলে যেত' বলে তার নাম হয়ে যায় চাউল বা চাল। দ্র. **চাল**।) এখানে একথাটি স্মরণ রাখা চাই যে, একালের অর্থনীতির সূত্রানুসারে 'উৎপন্ন' (production) 'পণ্যে' (commodity-তে) পরিণত হয় অন্যত্র প্রেরিত হওয়ার জন্য উৎপাদিত হলে। সেই সুবাদে 'গো'-এর বৃদ্ধি করার অর্থই হল পণ্য-উৎপাদন বাড়ানো। তার ওপর cow-এর ছিল সর্বপ্রথম 'বিনিময়ের মাধ্যম' হওয়ার যোগ্যতা। gold-money আবিষ্কারের আগে 'গো'-এর যে সে ভূমিকা ছিলই, তার স্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায় মহাভারতে; কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে যার বয়ান এইরূপ — 'গো প্রভৃতি পবিত্রতাসম্পাদক পদার্থসমূহের মধ্যে সুবর্ণই সর্বাপেক্ষা অধিক পবিত্রতাসম্পাদক পদার্থ।' তার মানে গরু দিয়ে যেভাবে যত মাল কেনা যায়, সোনা দিয়ে তার চেয়ে সহজভাবে অনেক বেশি মাল কেনা যায়। দ্র. **পবিত্র, গুপ্ত, গোপ**। **৬.** Avesta - gao, Greek - Bous, Latin - Bos, Lithuanian - Cow, Kelt - Bo, English - cow, ফারসি - গাও। (ব.শ.)। আমাদের মতে, এই গো শব্দের উত্তরাধিকার ইংরেজির রয়েছে go রূপে। 'গো' শব্দের যে মূল অর্থ — 'যে যায়' — তার থেকে তাঁরা কেবলমাত্র 'যাওয়া'কেই ধরে রেখেছেন, যাত্রীকে হারিয়ে ফেলেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষারও এই উত্তরাধিকার কমবেশি রয়েছে। যেমন চীনের ngo। তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান বলে নেওয়া দরকার। তা হল, আধুনিক যুগে যে-বহুভাষাবিদগণ একটি ভাষার একটি শব্দের সঙ্গে অন্য ভাষার সমার্থক শব্দের মিল খুঁজতে গিয়েছিলেন, তাঁরা ক্রিয়ামূল ও ধ্বনির দিক দিয়ে তাঁদের অনুসন্ধান করতে যাননি। গিয়েছিলেন শব্দটি যে বস্তু বা বিষয়কে বোঝাচ্ছে, সেই বস্তু বা বিষয়কে অন্য ভাষায় কী বলা হয় তা জানতে। এই 'দেহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি'ই তাঁদেরকে সর্বভাষার একজাতীয়তায় পৌঁছতে দেয়নি। এর কারণ ছিল **'আধুনিক'** যুগের 'দেহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির' রমরমা। হরিচরণও অনেক ক্ষেত্রে সেই ভুল পথে পা দিয়েছেন (যেমন অন্য ভাষায় বাংলা শব্দের সমার্থক শব্দ খুঁজতে গিয়ে), যদিও নিজের স্বাভাবিক **পথটি** অনুসরণ করতে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভোলেননি।

গোট, গোটা, গোটাগুটি, গোটাগোটা, গোটান : ২. ***গোট*** =

গো টঙ্কারিত যাহাতে; ***গোটা*** *= গোটের আধার;* ***গোটান*** *= গোটকে তার কেন্দ্রে সঙ্কুচিত করে আনা হয় যাহাতে;* ***গোটাগোটা*** *= গোটের আধার ও তদ্রূপ সত্তার একাধিক অস্তিত্ব যাহাতে;* ***গোটাগুটি*** *= যাহা গোটান হইয়াছে এবং গু-টঙ্কারণ গতিশীল যাহাতে।* **৩.** তৎসংখ্যক, তৎসমুদয়, (একগোটা, দুইগোটা, গোটা তিন, গুটিকয়েক) টা, টি, তদ্বস্তু, একটি, অখণ্ডিত, সম্পূর্ণ, আস্ত, সকল, সব, প্রায় তৎসংখ্যক। (ব.শ.)। **৪.** 'সম্পূর্ণ একটি' অর্থে 'গোটা' প্রচলিত; বাকিগুলিও যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ট**। এক চামচ জল আর সারা সমুদ্রের জল — স্বাদ ও গঠন একই। এরকম হলে সেই খণ্ডের ভেতরেও একপ্রকার অখণ্ডভাব বা পূর্ণতা থাকে। বাংলাভাষায় এই উত্তরাধিকারকে 'বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন' বলে, বলে 'একটি ভাত টিপে সব ভাতের খবর নেওয়া'। খণ্ডের ভিতরে এভাবে অখণ্ডের ভাব থাকলে, সে খণ্ড হয়েও একপ্রকার পূর্ণতার অধিকারী। এইরকম পূর্ণতা যার থাকে, তা খণ্ড হলেও তাতে গামীর টঙ্কার থাকে; তাই তাকে গোটা বলা হয়। বলতে কি, এমন অস্তিত্ব অসম্ভব, যার ভিতরে কোনো গামী নেই। সেই সুবাদে যা কিছুই একটি পৃথক অবয়ব নিয়ে ফেলেছে, তাতে গো টঙ্কারিত ব'লেই তাকে গোটা বলা যায়। আর সেভাবে গুটিয়ে গুটিয়ে (মাদুর যেভাবে গোটায় সেভাবে) 'গোটা করে ফেলা'কে বলে গোটান বা গোটানো; কারণ তাতে 'গোটা অন (*on*) হয়ে' থাকে, যেমন চলন-এ চল অন থাকে বলেই তা চলন, সেইরকম।

গোতম : **২.** *গো (গতিশীলগণের) মধ্যে যিনি (যে* ***মহর্ষি****) সর্ব্বাধিক তমগুণসম্পন্ন।* / গো-ধ্বস্ত তমঃ যাঁহার; যাঁহার তমঃ (অজ্ঞানান্ধকার) জ্ঞানধ্বস্ত। (ব.শ.)। **৩.** ব্রহ্মার পুত্র অহল্যার পতি শতানন্দের পিতা ঋষিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র, অঙ্গিরোবংশীয় এবং গোত্রপ্রবর্ত্তক। ন্যায়-দর্শনপ্রণেতা ঋষিবিশেষ। সংহিতাকার গৌতম। অতিশয় গো, অতিজড়। (ব.শ.)। দর্শনের ন্যায়শাস্ত্র বিভাগের ও ঋগ্‌বেদের অনেক মন্ত্রের রচয়িতা। ইনি শতানন্দ নামেও পরিচিত। ইনি ধর্মশাস্ত্র নামে আইন পুস্তক প্রণয়ন করেন। কথিত আছে, মহর্ষি গোতম মরুভূমিতে থাকাকালীন অশ্বিদ্বয় অন্য দেশ হতে একটি কূপ উঠিয়ে তাঁর নিকট আনেন এবং তাঁর স্নান ও পানের সুবিধার জন্য এই কূপের মুখ নীচু করে ও তলদেশ উঁচু করে ধরেছিলেন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** এই সত্তাটিকে চেনার জন্য সবার আগে মৌলবাদ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকলে সুবিধে হয়। ('ঘ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)। মৌলবাদ শব্দটি একালে অতি-ব্যবহৃত শব্দ কিন্তু সময়ের বিচারে শব্দটি অর্ব্বাচীন, যদিও মৌলবাদের ধারণাটি অত্যন্ত প্রাচীন। প্রাচীন কালে এই মৌলবাদকে বলা হত গোতম। এঁর নীতি হল 'ন্যায়'নীতি — এতকাল সব কিছু যেভাবে করা হত, করা হয়ে এসেছে, 'তাহার ন্যায়' করার নীতিই গোতমের নীতি। আর, এই নীতি কট্টরভাবে অনুসরণ করাকেই মৌলবাদ বলে। গোতম নামের মহর্ষি (দ্র. **মহর্ষি**) এই 'ন্যায়দর্শন'-এর রচয়িতা। গোতমের গোত্রাপত্যগণকে **গৌতম** বলে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য (ঘ) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গোত্র : দ্র. **ত্রৈ** (ক্রিয়ামূল)।

গোদাবরী : দ্র. **দা** (ক্রিয়ামূল)।

গোবর্ধন (গোবর্দ্ধন) : **২.** *যে বা যিনি গো-বৃদ্ধি করেন।* **৩.** বৃন্দাবনের একটি পর্বত। **শ্রীমদ্ভাগবত** অনুসারে একবার ব্রজধামে অনাবৃষ্টির ফলে কৃষিকার্য নষ্ট হবার উপক্রম হয়। তখন দেশবাসীরা ইন্দ্রকে তুষ্ট করে বৃষ্টিপাতের জন্য ইন্দ্রযজ্ঞের ব্যবস্থা করে। কিন্তু কৃষ্ণ ইন্দ্রের পূজা না করে গোপদের গোবর্ধন-পর্বত পূজা করতে বলেন। ... গোপগণ তাই করেন। ... ক্রুদ্ধ ইন্দ্র শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাতদ্বারা বৃন্দাবন ধ্বংস করতে উদ্যত হন। ... তখন কৃষ্ণ গোকুল ও গোপদের রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন পর্বত উৎপাটন করে ছাতার মতো খুলে এদের উপরে স্থাপন করেন। ... সাতদিন সাতরাত্রি ঐ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরেও বৃন্দাবনবাসীদের কোনো অনিষ্ট হল না। ... (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** প্রাচীন ভারতে সামাজিক সংগঠনকে প্রথম প্রথম বৃক্ষ বলা হত (**অশ্বত্থ**বৃক্ষ, বটবৃক্ষ, **কদম্ব**বৃক্ষ ইত্যাদি), পরবর্তী কালে তাদের **পর্ব্বত** অভিধায় চিহ্নিত করা হয় (হিমালয়, সিন্ধু, মলয়, গোবর্দ্ধন ইত্যাদি)। দ্র. **পর্ব্বত**। আমাদের ঐতিহাসিকরা ইয়োরোপের **শিল্পবিপ্লব** থেকে শিখেছেন পণ্যবৃদ্ধি হয়ে গেলে রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী হয়। কিন্তু নিজেদের দেশে সেসব যে তার প্রাচীন রূপে আগেই হয়ে গিয়েছিল, সে খবরই তাঁরা রাখেন না। তাঁরা খেয়াল রাখতেই ভুলে যান যে, ভারত যখন কপিকল বানিয়েছে, চিনি উৎপাদন করে খেতে শিখেছে ... ইয়োরোপ সেসব শিখেছে তার থেকে প্রায় ৮০০-১০০০ বছর পরে। কার্যত, যে সত্তাকে ভারত বহু প্রাচীন কালেই চিনেছিল গোবর্দ্ধন-রাজ্যবর্দ্ধন-হর্ষবর্দ্ধন (কিংবা গোপাল-দেবপাল-ধর্মপাল) নামে, সেই সত্তাকেই ৮০০ বছর পরে ইয়োরোপ চিনেছিল যথাক্রমে Capitalist Production (= পুঁজিবাদী উৎপাদন = গোবর্দ্ধন = গোপাল), Imperialism (= সাম্রাজ্যবাদ = রাজ্যবর্দ্ধন = দেবপাল), ও Enlightenment (= আলোকপ্রাপ্তি = হর্ষবর্দ্ধন = ধর্ম্মপাল) নামে। পাশ্চাত্য-প্রভাবে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে আমাদের ইতিহাসকারগণ এই গোবর্দ্ধন-রাজ্যবর্দ্ধনাদিকে ব্যক্তি বাপে সনাক্ত করায় তাঁদের লেখা প্রাচীন ভারতের সমস্ত ইতিহাসটিই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে। তবে সব ইতিহাসই রয়েছে, সবই রয়েছে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায়, সবই পুনরুদ্ধার করা যাবে।

গোবিন্দ (গোবিন্দাই) : **১.** গো + ✓বিদ্ + অ (শ) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *যিনি (সর্বপ্রকারের) গো-গণ বিষয়ে বিদিত (ও তাহাতেই বিধৃত থাকেন)।* / যিনি বেদোক্তি ভূমি ধেনু স্বর্গ বা প্রলয়সলিল প্রাপ্ত হন। (ব.শ.)। **৩.** কৃষ্ণ, গবাধ্যক্ষ, বৃহস্পতি। পূজ্য বা দেব গোবিন্দ, স্নেহপাত্র গোবিন্দ, সখা গোবিন্দ, ভক্তবৎসল গোবিন্দ। (ব.শ.)। **৪.** 'ঠাকুরের নাম' রূপে প্রচলিত, অন্যথায় অপ্রচলিত। **৫.** একটি মাত্র শব্দ '**গো**'। (দ্র. **গো, গোপ**)। এর অর্থ ছিল 'যে যায়'। তাতে বাঙালির গোয়ালের গাইটাকেও যেমন বোঝাতো, তেমনি মুহূর্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেকোনো স্থানে যিনি যেতে পারেন, তেমন সত্তাকেও বোঝাত, বোঝাত আমাদের মনকে, ইন্দ্রিয়কে, চোখকে, আমাদের অর্থবহ বাক্যকে, কথিত বেদকে, অর্জিত ও পরিবেশিত

তত্ত্বকে (থিয়োরিকে), মানসিক উৎপন্ন ও দৈহিক উৎপন্নকে, পণ্যপ্রবাহের পণ্যকে, টাকাপয়সাকে, এবং সর্বোপরি বিশ্বব্যাপ্ত **নারায়ণ**কে, **অংরূপিণী**কে। কিন্তু আমরা তাকে একমাত্র cow বলে নিশ্চিত রূপে বুঝে ফেললাম এবং তার অন্য সব অর্থগুলি ভুলে গেলাম। ফল হল এই যে, বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাণ্ডার আমাদের কাছে বাজে কথার ঝুড়ি হয়ে গেল। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব ও নিজেদের ইতিহাসের বিস্মৃতি আমাদের একেবারে নিঃস্ব রিক্ত করে দিল। আমাদের আধুনিক পণ্ডিতেরা রাধাকৃষ্ণের ভিতরে খুঁজলেন ইয়োরোপের রোমান্স; গোপী ও গোপিনীদের যতটা নীচ নজরে দেখা সম্ভব হয়, ততটাই নীচ দৃষ্টিতে দেখলেন। আমাদের বিশাল বৈষ্ণবসাহিত্য, শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর গোষ্ঠ, গোপালন, গোচারণ, সব কিছুকেই আমরা নেহাতই গরুর পূজায় পরিণত করে ফেললাম। অথচ, বাংলাভাষী হিসেবে আমাদের কিছুতেই ভোলা উচিত ছিল না যে, বাংলাভাষা যে মহান ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আজ তার বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, তার মূল গঠনকার্য্য চলেছিল পাঠান রাজত্বের ছত্রছায়ায়, কৃত্তিবাস-কাশীরামের হাতে, বৈষ্ণবসাহিত্য ও মঙ্গলকাব্যের বিপুল ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করে; হিন্দু ও মুসলিম পদকারদের হাতে, গোপ-গোপাল-গোপিকা-গোপিনীদের অবলম্বন করে রচিত কীর্তনগানে। বাংলাভাষার সেই স্বর্ণযুগে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সময়ে সেই গো-কে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছিল বৈষ্ণব সাহিত্যের ও কীর্তনের সুবিশাল ভাণ্ডার। যে মহাজ্ঞানী মানুষেরা সেই সব গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন **'গোস্বামী'**। রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামীরা কেউই অনেক cow-এর মালিক ছিলেন না, অনেক তত্ত্বকথার মালিক ছিলেন। [যে ইচ্ছা বা এষণাকে **গবেষণা** (গো + এষণা) বলে, সে হল তত্ত্বের অন্বেষণ করা; গরু বা cow-খোঁজা নয়।] এই গোস্বামীদের পাণ্ডিত্য নিয়ে কেবল তাঁরাই প্রশ্ন তুলতে সাহস পান, যাঁদের বাংলাভাষার শব্দ সম্পর্কে যথার্থে কোনো জ্ঞানই নেই। এই গোস্বামীগণই সর্বতত্ত্বের আধার-সত্তাকে নাম দিয়েছিলেন গোবিন্দ, উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে (২) যার বয়ান দেওয়া হয়েছে। দ্র. **কৃষ্ণ, চেতন, গো, গোপ, নারায়ণ**।

গোষ্ঠ, গোষ্ঠী (গোঠ, গোষ্ঠবিহারী, গোষ্ঠীপতি) : ১. গোষ্ঠ = গো + ✓স্থা + অ (ঘঞর্থে ক) অধিকরণে। গোষ্ঠী = গোষ্ঠ্ + ই (ইন্) - অধিকরণে + স্ত্রী ঈ (ঙীষ্)। (ব.শ.)। ২. ***গোষ্ঠ** = গো-স্থিতির টঙ্কার স্থিত যাহাতে; **গোষ্ঠী** = গোষ্ঠ-এর গতিশীলতার আশ্রয় যাহাতে।* ৩. গোসমূহস্থান, গোস্থান, গোপালকের আশ্রয়, গোষ্ঠবিষয়ক কীর্তনগান, সমাজ, সভা, স্থান। পরিষদ, সমাজ, পারিষদ, গণ, পরস্পর আলাপ, সম্ভাষণ, পোষ্যবর্গ, পরিজনগণ, সঙঘাত, সমূহ, উপরূপকবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. group বা clan অর্থে কেবল গোষ্ঠী শব্দটি প্রচলিত, বাকিগুলি অপ্রচলিত। ৫. গো-সমূহের টঙ্কার থাকে যাহাতে, তাকে বলে গোষ্ঠ। এখন গো যদি গরুকে বোঝায় তাহলে গোষ্ঠ হবে গোয়াল; আর গো যদি মানুষকে বোঝায় তাহলে গোষ্ঠ হবে পরিষদ বা সমাজ বা গণ, একালে যাকে আমরা গোষ্ঠী শব্দে চিহ্নিত করে থাকি। (এই 'গোষ্ঠ' ধারণার থেকেই জন্মেছে 'দুষ্ট গরু থেকে শূন্য গোয়াল', 'এক গোয়ালের গরু', কিংবা 'পার্লামেন্ট সুয়োরের খোঁয়াড়' জাতীয় প্রবাদগুলি।) সেই গোষ্ঠীর যিনি পতি, তিনি গোষ্ঠীপতি। আর সর্বপ্রকারের গোষ্ঠে গোষ্ঠে যিনি **বিহার** করে ফেরেন সেই **গোষ্ঠবিহারী** তাঁর সর্বোচ্চ রূপে যেমন **গোস্বামী**দের গোষ্ঠে গোষ্ঠে (তত্ত্বজ্ঞানীদের গ্রন্থে গ্রন্থে) বিহারকারী মুকুটমণি তত্ত্ব (তত্ত্বাধার) হতে পারেন, তেমনি নিম্নতম রূপে গোহাটায় ঘুরে বেড়ানো গরু-পাইকারও হতে পারেন। এর মাঝের অজস্র রূপ তো তাঁর আছেই। দ্র. **গোপ**। তবে গোষ্ঠবিহারী সাধারণত সর্বোচ্চ অর্থেই প্রচলিত এবং গোঠ বা গোষ্ঠ সাধারণত নিম্নার্থেই প্রচলিত অর্থাৎ গরুর গোষ্ঠকেই বোঝায়, মানুষের বা তত্ত্বের গোষ্ঠকে নয়। দ্র. **গোটা**।

গোস্বামী (গোঁসাই, গোসাঞী) : ৫. দ্র. **গো, গোপ, গোষ্ঠ, গোবিন্দ, পদবী**। এখানে এটুকু বলা দরকার যে, রূপ ও সনাতন প্রমুখ বড় বৈষ্ণব গুরুদের বলা হত রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী। গোস্বামী বা গোঁসাই শব্দের বড় অর্থ অন্তত কিছুদিন আগেও লোকে জানত। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসে বৈষ্ণবী কমললতা শ্রীকান্তকে 'গোঁসাই' বলে এবং শ্রীকান্তের মুসলমান বন্ধু গহরকে 'গহর গোঁসাই' বলে সম্বোধন করতেন। নেহাত অভ্যাসবশে কমললতা যে তাঁদের 'গোঁসাই' বলতেন না, উভয়ের অর্জনে জগতের কিছু তত্ত্ব (= গো) যে বোধরূপে ছিলই, শরৎচন্দ্র তা যথার্থভাবেই উপস্থাপন করেছেন। উপন্যাসে তাঁদের ভূমিকাও তার প্রমাণ। এছাড়া বৈষ্ণব আখাড়ার কর্তাকে 'বড় গোঁসাই' বলার চলও ছিল। সতীনাথ ভাদুড়ি থেকে শুরু করে আরও অনেকে এঁদের নিয়ে আধুনিক উপন্যাস লিখেছেন। তবে, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এই লেখকেরা নিজেরাই সেই গোঁসাই ও গোঁসাই কথিত শব্দসমূহের সব মানে বুঝতে পারেননি। দ্র. **তুষার**।

জগৎ (জগৎসৃষ্টি) : ১. ✓গম্ + ক্বিপ্ (০) - কর্তৃবাচ্যে, 'ম্'-লোপে 'ৎ' (তুক্); ✓গম্ + অতি। (ব.শ.)। ২. *জনিতের গমন ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন থাকে যাহাতে।* ৩. গমনশীল, চরাচরলক্ষণ, ভুবন, লোক, বিশ্ব। (ব.শ.)। ৪. world অর্থে জগৎ শব্দটি প্রচলিত। জগৎসৃষ্টি অপ্রচলিত। ৫. গম ক্রিয়া দিয়ে যত শব্দ তৈরি হয়, তার কয়েকটিতে দেখা যায় জ বর্ণটি সামনে আসছে। যেমন জগৎ, জিগমিষা, জিগীষা, জুগুপ্সা ইত্যাদি। এরকম কেন হয়, সেকথা চট করে বোঝা যায় না। **জিজ্ঞাসা** শব্দের ব্যাখ্যায় তা বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে শুধু এই মাত্র কহতব্য যে, তন্ত্রে ও পুরাণাদি গ্রন্থে এই শব্দটিকে তিনভাগে ভাগ করে **জগৎ** শব্দের মানে দেওয়া হয়েছে এইভাবে — জ = জন্ম, গ = গমন, ৎ = উল্লম্ফন। এর অর্থ হল, যার জন্ম গমন ও উল্লম্ফন ঘটে সেই **জগৎ** পদবাচ্য। অর্থাৎ যে বস্তুর বা বস্তুসমুদয়ের origin, development ও revolutionary change ঘটে, তারা সবাই **জগৎ** পদবাচ্য; তা সে পার্থিব ধূলিকণা হোক কিংবা হিমালয় পর্বত হোক আর অদৃশ্য সামাজিক সংগঠন বা সত্তাগুলিই হোক। এই বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই যেহেতু জন্ম-গমন-উল্লম্ফনের চক্রটি পার হয়ে চলে, সেই কারণে

সমগ্র বিশ্বকে জগৎ বলাই ঠিক। তাতে বিশ্বের প্রতিটি বস্তু বা **বিশ্বত্রের ও সমগ্র** বিশ্বের মূল স্বভাবটিকেই উল্লেখ করা হয়। এই **বিচারে বিশ্বের 'জগৎ'** নামকরণ যথার্থই হয়েছে। আমরা ব্যুৎপত্তি **ও জ-আগমের** নিয়ম মেনে শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়েছি, যা **উপরোক্ত** জন্ম-গমন-উল্লম্ফন অর্থটিকেও একই সঙ্গে ধারণ করে।

জগৎসৃষ্টি শব্দটি অবশ্য কোনো অভিধানেই পাওয়া যায় না। **শব্দটিকে** আমরা রেখেছি দায়ে পড়ে। প্রায় সমস্ত পুরাণের শুরুতেই **জগৎসৃষ্টির** বর্ণনা রয়েছে, রয়েছে বাইবেল কোরাণেও। এই **জগৎসৃষ্টির** তাৎপর্য কী, সেকথা বিস্তারিতভাবে জানান হয়েছে পৃথিবীর আদি আইনের গ্রন্থ মনুসংহিতায়। তা বুঝতে হলে **জগৎসৃষ্টি** কীরূপ ব্যাপার তা জানা জরুরি। বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে আমাদের 'ঘ' গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠায় 'জগৎসৃষ্টি' নামক পৃথক পরিচ্ছেদে। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া জরুরি। জগৎ যেহেতু জন্ম-গমন-উল্লম্ফনশীল সত্তা, তাতে সামাজিক সত্তাগুলির সৃষ্টির কথাও বলা হয়েছে। এই শব্দটিকে যথার্থ ভাবে না জানলে আদিম মানুষের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ প্রকৃত ইতিহাস, ভারতীয় মনীষা যা পরম্পরাগতভাবে লাভ করেছিল এবং লিখে রেখেছিল, মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সেই মূল বয়ানটিই অজানা থেকে যায়। বলতে কি, সেই ইতিহাসকে বাদ দিয়েই গড়ে তোলা হয়েছে মানবসভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস; আজকের অ্যাকাডেমিতে যা সব পড়ানো হয়। ...

জগৎ-সৃষ্টির একটি ছক বা কাঠামো রয়েছে। এই ছকটি পুরাণ সংহিতাদিতে প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। জগৎসৃষ্টি কেমন করে হয়েছে, এ হল তারই বর্ণনা। মনুসংহিতা ও পুরাণাদি সমস্ত গ্রন্থেই ছকটি প্রায় অবিকল একরকম পাওয়া যায়। জগৎ বলতে যাদের বোঝায়, মানুষ সমাজ প্রকৃতি বা নেচার সবই এই জগতের মধ্যে পড়ে। জগতের (= মানুষের, সমাজের, প্রকৃতির) শৈশব কেটে গিয়ে কৈশোর শুরু হয় বুদ্ধিপূর্বক বিকৃত সৃষ্টি দিয়ে, যার প্রথম সৃষ্টি মুখ্যসৃষ্টি বা স্থাবর জঙ্গমাদি সৃষ্টি। এই স্থাবর জঙ্গম কারা? মনুসংহিতা তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেছেন। সেগুলি পার্থিব জড়, উদ্ভিদ, জীব সম্পর্কে যেমন সঠিক, তেমনি সামাজিক সত্তাদের (জ্ঞানজীবী, শ্রমিক, কৃষক, শাসক, হিংসাকারী, চোর, লুঠেরাদের) সম্পর্কেও ঠিক।

জগৎসৃষ্টির এই ছক কারও মনগড়া ব্যাপার নয়। মনু বলছেন — 'যাদের যেরূপ কর্ম্ম, ... এবং ... সেই সেই কর্ম্মযোগক্রমে যে যেরূপে জন্মলাভ করেছে', তিনি কেবল সেই বর্ণনাটুকুই দিচ্ছেন; তাও আবার নিজের মাথা থেকে নয়, 'পূর্ববর্তী আচার্যগণের কীর্ত্তন অনুসারে।' সুতরাং সমাজ সংগঠনগুলির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বিষয়ে এর চেয়ে 'অথেনটিক' আর কী হতে পারে! দ্র. **তির্য্যক, তির্য্যকস্রোতাঃ।**

***গর্হ্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অগর্হিত, গরিহণ, গরিহা, গর্হ্, গর্হণ, গর্হন, গর্হিত।

গর্হ্ = গামীর রক্ষণশীল হওয়ন। **গর্হ** = গামীর রক্ষণশীল হওয়ন থাকে যাহাতে।

গর্হন, গর্হিত : ১. ✓গর্হ্ + অন - ভাববাচ্যে; **✓গর্হ্** + ত - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***গর্* *হওয়া অন যাহাতে; গর্ হওয়া তারিত যাহাতে*।** **৩.** নিন্দা, **কুৎসন, অপবাদ, ভাষালক্ষণবিশেষ;** নিন্দিত, কুৎসিত, অবজ্ঞাত, নিন্দিত বাক্য। (ব.শ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** এই **গর্** শব্দটি এইখানে এসে এমন **একটি অর্থের দিকে** ইঙ্গিত করছে, যেদিকে গেলে ফারসি 'গর' (গরমিল, গরহাজির, গরআবাদী শব্দে যে গর রয়েছে) শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ মিলে যায়। দ্র. **গর (ক্রিয়ামূল - গৄ)।**

***গল্* (গল্‌ভ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অপ্রগল্‌ভ, আগর, আগল, আগলিত, গপ, গপগপ, গপ্‌প, গরগণ্ড, গল্, গল, গলই, গলগণ্ড, গলগল, গলগ্রহ, গলগ্রাহিতা, গলৎ, গলৎকুষ্ঠ, গলতী, গলদ্, গলদশ্রু, গলদ্ঘর্ম্ম, গলদ্ধার, গলদ্বার, গলন, গলবস্ত্র, গললগ্নীকৃতবাস, গলস্তন, গলহস্ত, গলা, গলাকাটা, গলাখুসকি, গলাখুসখুসানি, গলাগলি, গলাটিপ, গলাটেপা, গলাধঃকরণ, গলাধাক্কা, গলাবন্দ(ন্ধ), গলাবাজি(জী), গলাভাঙা, গলাশি, গলি, গলিকুচা, গলিঘুজি, গলিত, গলুই, গল্‌দা, গল্প, গল্‌ভ, গল্ল, গল্লর্ক, গল্লা, গল্বর্ক, গসগস, গস্ত, গস্তান, গস্তানি(নী), গাইল, গারি(রী), গা'ল, গাল, গালগল্প, গালগালাজ, গালচাল্লা, গালন, গালপাটা(ট্টা), গালব, গালবাদ্য, গালবালিশ, গালমুচ্চ, গালয়িতা, গালসি, গালা, গালাগালি, গালাঘুষা, গালি(লী), গালিগালাজ, গালিত, গালিনী, গিজগিজ, গিল্, গিল, গিলন, গিলা, গিলিত, গিসগিস (গিজগিজ), গেল, গেলন, গেলা, গেলাস (glass), গেলান, গেলাপ, জঙ্গল, প্রগল্‌ভ, বিগলিত।

গল্ (গল্‌ভ্) = গামীর লালন-লয়ন। **গল** = গামীর লালন-লয়ন যাহাতে। **গল্‌ভ্** = গামীর লালন-লয়ন-ভক্ষণ-ভরণ।

গল, গলগল, গলন : ১. ✓গল + অ - ণ। (ব.শ.)। **২.** ***গল** = গামী লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে; **গলগল** = গামীর লয়প্রাপ্তির ক্রমান্বয় যাহাতে; **গলন** = গামীর (অন্যমধ্যে বা আত্মমধ্যে) লয়প্রাপ্তি অন থাকে যাহাতে*। **৩.** গ্রীবার পুরোভাগ, কণ্ঠ, গলা, **কন্ধর**, গ্রীবা, ঘাড়, স্বর, সর্জ্জরস, ধুনা, বাদ্যবিশেষ, গড়কমৎস্য, রজ্জু, গড়া; ক্রমাগত বকবক করিয়া বকার শব্দ, শিশুর অনর্গল মধুরাস্ফুট বাক্যপরম্পরা, অনর্গল পাঠ করার ক্রমাগত শব্দ, কলসীতে জল পোরার ক্রমাগত ধ্বনি; ক্ষরণ, ঝরা, গলা, ছিদ্রপথে নিঃসরণ, পতন, দ্রবীভব, গলা। (ব.শ.)। **৪.** নানার্থে প্রচলিত। **৫.** গামী মানেই একদিকে যাচ্ছে। যেখানে লয়প্রাপ্ত হচ্ছে, সেটা কারও গ্রাস হতে পারে, আবার গামীর নিজের অস্তিত্বের পরিধিও হতে পারে। কারও গ্রাসে ঢুকে গেলে গামী যেমন লয়প্রাপ্ত (গল) হয়, তেমনি নিজের অস্তিত্বের পরিধি থেকে কেন্দ্রে ফিরে লয়প্রাপ্ত (অত্যন্ত আত্মসঙ্কুচিত) হলেও সে লয়প্রাপ্ত (গল) হয়। তাই প্রথম ক্ষেত্রে 'গল'কে আমরা pass through বুঝি, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'গল'কে আমরা melting বুঝি। এই গল-এর পুনরাবৃত্তিই গলগল। এই ধ্বন্যাত্মক শব্দ প্রকৃতার্থেই অর্থবহ। ছিদ্রের বা নলের ভেতর দিয়ে 'চলে যাওয়া'কে আমরা বলি 'গলে

যাওয়া'। এই গলা দুভাবে ক্রিয়া করে। এক, বস্তুসমুদয়ের দলবেঁধে চলে যাওয়া; দুই, এক একটি বস্তুর অভ্যন্তর নরম হয়ে যাওয়া। যেমন একমুঠো ভাত গলা দিয়ে গলে যায়, আবার প্রতিটি ভাতের ভেতরটা এত নরম যে তার ভেতরে কাঠি ঢোকালে ঢুকে যায়। অর্থাৎ গল শব্দটির ক্রিয়া বাইরের দিকে গলতে পারে, ভিতরের দিকেও গলতে পারে। সুতরাং 'গলে যাওয়া' বললে 'রন্ধ্রপথে চলে যাওয়া' যেমন বোঝায়, তেমনি নিজের ভিতরে নিজে 'অবলুপ্তির পথে চলে যাওয়া'ও বোঝায়। কিন্তু যখন আমরা বলি 'গলগল' করে চলে গেল, তখন কেবল বস্তুসমুদয়ের একাদিক্রমে রন্ধ্রপথে চলে যাওয়াই বোঝায়। আর এই সবটাই যার ভিতর দিয়ে সম্ভব হয়, তাকে আমরা বলি গল-এর আধার বা গলা অর্থাৎ কণ্ঠনালী। সেই গলা দিয়ে যা বেরিয়ে আসে (= গলজাত), তাকে বলে 'গাল'। আবার, যে আধারে সেই গাল বা গালাগালি থাকে তাকেও গাল বলা যায়। এই গলায় 'গিলা' বা 'গেলা'ও হয়। ... এখন এগুলিকে বিস্তারিত করা যায়। দ্র. **গলা, গাল, গোল** ইত্যাদি।

গলা১, গলা২, গলা৩, গলাগলি : ১. গল + আ। (ব.শ.)। ২. *গলা১ = গল-এর আধার যে, অর্থাৎ যে পথে গামীর লয়প্রাপ্তি হয়। (গলপথ। throat); গলা২ = (গলপথে) চলে যাওয়া, কিংবা (অন্যমধ্যে) গলন যাহাতে। (pass through); গলা৩ = গামীর আত্মমধ্যে লয় কিংবা (আত্মমধ্যে) গলন যাহাতে। (boiling, melting)। গলাগলি = দ্র.* **কচকচি**। ৩. গ্রীবার পুরোভাগ, কণ্ঠ, কণ্ঠনালী, কণ্ঠস্বর, স্বর, সুর, কলসী গাড়ু প্রভৃতির গলভাগ; ক্ষরিত হওয়া, ছিদ্রপথে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়া, অতিক্রান্ত হওয়া; দ্রব্যের ঘনত্ব নষ্ট হওয়া, সিদ্ধ হওয়া, অভিভূত হওয়া, দ্রব হওয়া; পরস্পরের গলায় গলায় ধারণ, প্রণয় হেতু ঘনিষ্ঠতা বা মিশামিশি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. একই গলা শব্দ লোকে এত ভিন্ন অর্থে এত সুনির্দিষ্টতায় ব্যবহার করে যে, কখনোই ভুলবোঝাবুঝি হয় না। এটা সম্ভব হয় শব্দটির 'গামী লয়প্রাপ্ত যাহাতে' (= গল) এই ক্রিয়াভিত্তিকতার কারণেই। ৬. ইংরেজি gullet, ল্যাটিন gull (দুটি শব্দের অর্থই 'গলদেশস্থ খাদ্যনালী')। আবার, যে ব্যক্তি সহজে গালগল্প গিলে ফেলে এমন ব্যক্তিকে তিন-চারশ বছর আগের ইংরেজিতে বলা হত gull। আর 'যেখান দিয়ে গলে যায়' তেমন নালা অর্থে ইংরেজি gully শব্দ তো রয়েছেই।

গলানো১, গলানো২ : ২. *গলানো১ = (অন্যমধ্যে) গলন চালানো হয় যাহাতে। (help to pass through); গলানো২ = (আত্মমধ্যে) গলন চালানো হয় যাহাতে। (help to boil or melt)।* ৩. ছিদ্র বা সংকীর্ণ পথ দিয়া নিঃসারিত করা বা বাহির করা; অতিশয় সিদ্ধ বা পক্ব করা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. কার্যত দুভাবে গলানো যায়। এক, সংকীর্ণ পথে এদিক থেকে ওদিকে পার করে দেওয়া, গেলার ক্ষেত্রে বা বমি করার ক্ষেত্রে মানুষ যা করে। গলপথে এই ক্রিয়া করা হয় বলে একে গলানো বলে। দুই, দ্রব্যের ঘনত্ব নষ্ট করে দেওয়াও গলানো। এক্ষেত্রে দ্রব্যটি নিজেই প্রথমে এত নরম হয় যে, যে কোনো কাঠি ইত্যাদি সেই বস্তুর ভিতরে গলিয়ে দেওয়া যায় এবং পরে দ্রব্যটি আরও গলে জলে বা বাষ্পে পরিণত হয়ে যায়। এও গলানো।

গাল১, গাল২, গালি : ১. গল্ল > গাল, গালি > গাল। (ব.শ.)। ২. *গাল১ = গল হইতে জাত; বা গল-এর আশ্রয় অর্থাৎ গলকে ঘিরে থাকে যে (inner wall of cheek); গাল২, গালি = গল হইতে জাত অর্থাৎ গলপথে যাহা বহির্গত হয় (scolding)।* ৩. গণ্ডদেশ, মুখের দুই পাশ, মুখবিবর, মুখ, হা, গালের প্রান্ত, সৃক্কণী, গালাসি, মুখবিবরপূরক খাদ্য, গ্রাস; শাপ, আক্রোশ, ভর্ৎসনা, কটুবাক্যপ্রয়োগ, নিন্দাবাদ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. 'গাল দেওয়া' ও 'গালি দেওয়া' দুটো শব্দ একই অর্থে বলা হয়ে থাকে। এই ধারা আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়। যেমন কচাকচি, কচকচি। দুটো একই কথা। দ্র. **ঢাল**। ৬. gully।

গালব : ২. *গাল বহন করে যে।* ৩. মুনিবিশেষ, শ্বেতলোধ্র, কেন্দুকবৃক্ষ। (ব.শ.)। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রিয় শিষ্য। ... গৃহে প্রত্যাগমনের পূর্বে গুরুদক্ষিণা দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে বিশ্বামিত্র ঈষৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ... চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র একটি কন্যা ও শ্যামবর্ণ আট শত এমন অশ্ব গুরুদক্ষিণা চান যাদের কান্তি চন্দ্রের মতো শুভ্র এবং একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ। ... গালবের বন্ধু গরুড় তাঁকে যযাতির কাছে যেতে বলেন। রাজা যযাতি গালবের হাতে তাঁর কন্যা মাধবীকে দিয়ে বলেন যে, এই কন্যাকে নিয়ে রাজাদের হস্তে সমর্পণ করলে কন্যার শুল্কস্বরূপ তাঁরা আটশত অশ্ব নিশ্চয় তাঁকে দান করবেন এবং তিনিও দৌহিত্র লাভ করবেন। ... মাধবী গালবকে বলেন যে, এক মুনির বরে তিনি প্রত্যেকবার প্রসবের পর আবার কুমারী হবেন। ... গালব ও মাধবীর সম্মতিক্রমে অযোধ্যার রাজা হর্যশ্ব মাত্র দুই শত অশ্ব দিয়ে মাধবীকে গ্রহণ করেন এবং মাধবীর গর্ভে বসুমনা নামে একটি পুত্র উৎপাদন করেন। ... কাশীরাজ দিবোদাস ও ভোজরাজ উশীনরও দুই শত করে অশ্ব দিয়ে মাধবীকে গ্রহণ করেন এবং মাধবীর গর্ভে একটি করে পুত্র উৎপাদন করেন। তাদের নাম যথাক্রমে প্রতর্দন ও শিবি। তখন গরুড় গালবকে বলেন, প্রাচীন কালে মহর্ষি ঋচীক কান্যকুব্জরাজ গাধিকে এইরূপ সহস্র অশ্ব দিয়ে তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেছিলেন। এই সকল অশ্ব ঋচীক পেয়েছিলেন বরুণের কাছ থেকে। একদা গাধি সেই সমস্ত অশ্ব ব্রাহ্মণদের দান করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে হর্যশ্ব, দিবোদাস, ও উশীনর প্রত্যেকে দুই শত করে অশ্ব ক্রয় করেন। অবশিষ্ট চার শত অশ্ব পথে অপহৃত হয়। সুতরাং আর অশ্ব আর পাওয়া যাবে না। এই ছয় শত অশ্বই বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দাও। ... অতঃপর বিশ্বামিত্রের কাছে গমন করে গালব এই ছয় শত অশ্ব দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করতে বলেন এবং অবশিষ্ট দুই শত অশ্বের পরিবর্তে মাধবীকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। ... বিশ্বামিত্র মাধবীকে গ্রহণ করেন এবং যথাকালে অষ্টক নামে মাধবীর অপর একটি পুত্র হয়। পরে বিশ্বামিত্র এই পুত্রকে ধর্ম, অর্থ ও অশ্বগুলি দান করে এবং শিষ্য গালবের হস্তে মাধবীকে দিয়ে বনগমন করেন। গালব পরে গরুড়ের পরামর্শে মাধবীকে তাঁর পিতা যযাতির হস্তে প্রত্যর্পণ করে বনে তপস্যা

করতে প্রস্থান করেন। যযাতি মাধবীর জন্য স্বয়ংবর সভার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু মাধবী তা প্রত্যাখ্যান করে তপোবনে ব্রহ্মচর্য ব্রতপালন করে ধর্মসঞ্চয় করতে থাকেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **গাল** কথাটির একটি অর্থ হল, যা গল দিয়ে বেরিয়ে আসে; যার থেকে **গালাগালি** শব্দটি তৈরি হয়েছে। এই গাল যিনি বহন করেন, তিনি **গালব**। ইনি গানের বাহক হতে পারেন, পণ্যের বাহকও হতে পারেন। তবে কাহিনী তাঁকে পণ্যবাহক হিসেবেই শনাক্ত করে। কেননা, এই ঘটনাবলীতে একটিমাত্র চরিত্র **যযাতি** ছাড়া বাকি সব চরিত্রগুলিই — **বিশ্বামিত্র, দিবোদাস, উশীনর, শিবি, গরুড়,** সবাই যুগসন্ধিক্ষণের চরিত্র। কেবল যযাতি ছিলেন তৎপূর্ববর্তী ব্যবস্থার 'স্ট্যাটাস-কো মেনটেনকারী', যেমন চলছে তেমন যিনি চলেন — য-যাতি।

গালা, গালাগালি : ২. *গালা = গলগল করে বহির্গত হয় যে ক্রিয়ার দ্বারা। (pull through)। গালাগালি = গলপথে বহির্গত ও বহির্গামী থাকে যাহাতে।* দ্র. **কচাকচি**। ৩. ক্ষরিত করা, ছিন্ন করিয়া গলিত করা বা গলান; পরস্পর গালিপ্রদান, কটূক্তি ও নিন্দাবাদ, দুর্বাক্যপ্রয়োগ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. গলপথ বা কণ্ঠনালী দুদিকেই খোলা এবং তা মানুষের মুখে ভেতর থেকে লাগান। এই নালী দিয়ে খাদ্যবস্তু ভেতরে যেতে পারে, বাইরেও আসতে পারে। যে কোনো নালীর দ্বারা গ্রাসিত বা গ্রস্ত ও নিঃসৃত বস্তুকে নাম দেওয়ার সময় দেখা হয়, সে বেরোচ্ছে নাকি ভিতরে ঢুকছে। যদি বহির্গত হয়, তখন তাকে বলে 'গালা'। 'ফোঁড়া গালা বা গেলে দেওয়া' কিংবা 'চোখ গেলে দেওয়া' বাক্যবন্ধে এই ধারণার প্রকাশ ঘটে।

গিল, গেল, গেলা, গেলানো (গুল) : ১. ✓গিল্ + অন - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***গিল** = দিশাগ্রস্ত গামীর লয়প্রাপ্তি যাহাতে। (swallow); **গুল** = নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর লয়প্রাপ্তি যাহাতে। (ruminate); **গেল** = দিশাগ্রস্ত গামীর লয়প্রাপ্তি হইয়াছে যাহাতে। (went, to swallow); **গেলা** = দিশাগ্রস্ত গামী লয়প্রাপ্তি হয় যাহাতে। (to swallow); **গেলানো** = দিশাগ্রস্ত গামীর লয়প্রাপ্তি ঘটানো হয় যাহাতে।* ৩. ভক্ষণ, গলাধঃকরণ; অঙ্গারচূর্ণে নির্ম্মিত বর্ত্তুল, তামাকের গুল, হাত ও পায়ের গোল মাংসপেশী, জলাদি দ্রব দ্রব্যে ঘূর্ণিত করিয়া মিশ্রিত করা, গোলা; ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৬. ইংরেজি. gulp।

গোল, গোলা[১], গোলা[২], গৌল (গুলা) : ১. ✓গুড় + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে; গো + ✓লা (গ্রহণ) + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***গোল** = গো লয় (বা লওয়া) হয় যাহাতে, অথবা গুল-এর আশ্রয় যাহাতে। (rumination / circular); **গুলা, গোলা[১]** = গুল বা গোল করা হয় যে প্রক্রিয়ায়। (= গ); **গোলা[২]** = গুল থাকে যেখানে। (= গ); **গৌল** = গোল-এর আশ্রয় যাহাতে।* / **গোলা** = যিনি প্রলয়ে পৃথিবী ধারণ করেন; যিনি সখীর বাক্য গ্রহণ করেন। (ব.শ.)। ৩. জারজাত বিধবাপুত্র, মদনবৃক্ষ, ময়না গাছ, **গন্ধরস, বোল, ষড়গ্রহ বা সপ্তগ্রহের** একরাশিতে যোগবিশেষ (গোলযোগ), **খগোলভূগোলজ্ঞাপক** গোলাধ্যায়াখ্য গ্রন্থ। বৃত্ত, বৃত্তাকার পদার্থমাত্র, ... **বন্দুকের গুলি**। মণ্ডল, বালকের ক্রীড়নক, বৃহৎ জলাধার, **অলিঞ্জর, পত্রাঞ্জন,** মসী, মনঃশিলা (red arsenic)। দুর্গা, সখী, গোদাবরী নদী, ধানের মরাই বা পুঁড়া, পণ্যদ্রব্যের বড় গুদাম বা আড়ত, কামানের গোলা বা বোমা, ধূসরবর্ণ সাধারণ জঙ্গলী পায়রা। বৃত্তাকার, মণ্ডলাকার, বর্ত্তুলাকার, অণ্ডাকার, সংশয়, সন্দেহ। কোলাহল, উচ্চরব, মহাশব্দ, বিবাদ, বিসংবাদ, বচসা, বিপদ, দুর্ঘটনা, লোকসংমর্দ্দ, জনতা, ভিড়। ঢেঁকির মুষলের প্রান্ত সংলগ্ন বৃত্তাকার লৌহপিণ্ড, জমিদারকে দেয় দলিলে শস্যের নির্দ্দিষ্ট অংশ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **গোল** শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থই তার এই বিচিত্র ও বহুবিধ অর্থের কারণ। এমনিতেই 'গো মানেই অতি উচ্চমার্গের গামী থেকে নিম্নমার্গের গামী পর্যন্ত সর্বপ্রকারের গামীদের বোঝায়, যা কিনা এমনিতেই বহু বিচিত্র সব সত্তা (দ্র. **গো**); তার ওপর 'ল'-এর মানে হল লালন-লোপন বা লালন থেকে শুরু করে লোপ পাওয়া পর্যন্ত যে কোনো অধ্যায় হতে পারে। ফলে গোল শব্দের ভিতরে বহুরকমের গামীর লালন রয়েছে, কিছু লালন কিছু লোপন রয়েছে, সম্পূর্ণ লোপনও রয়েছে। ফলত 'গোল' এত বিচিত্র সব সত্তাকে বোঝাতে পারে যে খেই পাওয়া যায় না। আমরা বলতে পারি, উপরোক্ত (৩) প্রদত্ত প্রতীকী অর্থগুলি কোনো না কোনোভাবে গামীর এই লালন-লোপন ক্রিয়াটিকে নিশ্চয়ই ধারণ করে। কিন্তু কীভাবে করে, কিছু ক্ষেত্রে তা বলা গেলেও সবগুলির ক্ষেত্রে সেকথা বলা কঠিন। তার জন্য আরও অনুসন্ধান লাগবে। ৬. ইংরেজি goal।

গল্প : ১. গল্ + প। ২. *গামীর লয় অন পালিত হয় যাহাতে।* ৩. উপাখ্যান, উপকথা, গপ্প (বা গপ্পো), কথা, কল্পিত বিষয়ক আখ্যান, অনাবশ্যক বা অমূলক কথা, বন্ধুগণের সহিত বিশ্রম্ভালাপ বা কথোপকথন, গল্পের মতো মিথ্যা সংবাদ। ৪. story অর্থে প্রচলিত। ৫. গাঁয়ের বাংলাভাষী যাকে '**গল্প**' বলে, শহরের অ্যাকাডেমি তাকে '**গল্প**' বলে না। অ্যাকাডেমি '**গল্প**' বলতে কেবল story বোঝে। কিন্তু '**গল্প**' শব্দটির ভেতরে যে অর্থ রয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, **গল্প** জিনিসটি তাৎক্ষণিক। 'ওরা ওখানে বসে কী করছে? গল্প করছে।' এই হল সাধারণভাবে গল্প। অর্থাৎ গামীদের লয়-অন পালিত হয় গলায়, সেটিই গল্প। সেখান থেকে তা শ্রোতার কাছে যায় এবং সেও গল্প গেলে। 'হাঁ করে গল্প গেলা'র অনুযোগ বাংলাভাষায় হামেশাই শোনা যায়। গলায় যা কিছু বলার জন্য পালিত হয়, এবং হাঁ-করে গেলার জন্য শ্রোতাদের কাছে যায়, তা সবই এই **গল্প** পদবাচ্য। তবে এ 'গল্প' তথাকথিত ছোটগল্পকারদের 'গল্প' বা story হতেও পারে, তবে সে হয় কদাচিৎ। ৬. ইংরেজি gulp।

গাহ্ (গৈ) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অগাধ, অনবগীত, অবগাহন, অবগীত, অবিগীত, উদগাতা, উদগীত, গভর, গভস্তি, গহ্বর, গা, গাঅন, গাইন, গাইয়ে, গাউনী,

গাএ(য়ে)ন, গাওক, গাওন, গাওয়া, গাঢ়, গাঢ়া, গাত, গাতব্য, গাথক, গাথা, গাথিকা, গাধ, গাধা, গাধি, গাধী, গাধেয়, গান, গান্দিনী, গাব, গাবগুবাগুব, গায়, গায়ক, গায়কী, গায়ত্রী, গায়ত্ত্রী, গায়ন, গায়ন্ত, গায়িত্রী, গায়েতা, গাহ, গাহক, গাহন, গাহনা, গাহিত, গীত, গীতা, গীতি, গেয়, গৈ, গোতালা, দুরবগাহ, দুর্ব্বিগাহ, প্রগাঢ়, সঙ্গীত।

গাহ্ (গৈ) = গামীর আধারের হওয়ন। **গাহ** = গামী-ধারী হয় যাহাতে (গান হয় যাহাতে)। **গৈ** = দিশাগ্রস্ত গামীর আধার যাহাতে।

অগাধ : ১. ন গাধ্, গাধ্ = স্থিতি। ২. *গামীর আধার ধৃত নয় যাহাতে।* / যাহাতে গাধ (প্রতিষ্ঠা) নাই। (ব.শ.)। ৩. 'সুগাধ' — সুখে অবগাহনীয়। প্রতিষ্ঠাহীন, অতলস্পর্শ, অতিগভীর। গম্ভীর। অনবগাহ্যমহিমা, গম্ভীরমহত্ত্ব। প্রচুর, বিপুল, অসীম, অনন্ত। .. (ব.শ.)। ৪. প্রচুর, বিপুল অর্থে প্রচলিত। ৫. গামীর আধার হল দৃষ্টি, বাক, গান, কথা, উৎপাদিত বস্তু, পণ্য ইত্যাদি। এই সকল গামী ধৃত যাতে, সেগুলি হল গাধ। এ হল আসলে গামীর গতিশীলতা যেখানে থেমে গেছে। হতে পারে সেটি গমনলব্ধ ফল, বা অন্য কিছু। তারই বিকাশ সাধন করে যে, সে হল **গাধি**। (গাধিনন্দন **বিশ্বামিত্র**কে বুঝতে হলে অগাধ শব্দটির সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার।) বিপরীতে অগাধ হল, যেখানে গামী থামছে না, চলছে, অনন্ত বা অসীমের দিকে। তাই অগাধ প্রচুর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গহ্বর : ১. ✓গাহ্ + বর - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. গহ্-কে বরণ করে যে। ৩. গভীর, দুষ্প্রবেশ, দুর্গম, দুর্বোধ, মোহময়, নিকুঞ্জ, লতাগৃহ, গুহা, বন, নিভৃত, গূঢ়স্থান, ছল, ছদ্ম, প্রহেলিকা, গভীর গর্ত্ত, অগাধ-খাত। (ব.শ.)। ৪. deep hole অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. গহন।

গাঢ় : ১. ✓গাহ্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গামীর আবর্ত্তন স্থির যাহাতে (= গঢ়), তাহা হইতে জাত।* ৩. অতিশয়, নির্ভর, দৃঢ়, তীব্র, একান্ত, প্রচণ্ড, প্রবল, নিবিড়, নিরন্তর, নীরন্ধ্র দুষ্প্রবেশ, দুর্গম, গহন, অতরল, ঘন, গভীর, অবগাঢ়, প্রবিষ্ট, কৃতাবগাহন, শ্লিষ্ট, সংসক্ত। (ব.শ.)। ৪. deep (colour) অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **গহন**। প্রাচীন বাংলায় গাঢ়, গাড়, গা, গহন, সবই যেন মিলে রয়েছে। হরিচরণ প্রায় একই সমার্থক শব্দ দিয়েছেন গহন ও গাঢ় শব্দের বেলায়।

গাথা : ১. ✓গৈ + থ (থন্) - কর্ম্মবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *দিশাগ্রস্ত গামীর আধার থাকে যাহাতে; অথবা, গান থাকে যাহাতে।* / যাহা গীত হয়। (ব.শ.)। ৩. গানমাত্র, আর্য্যাশ্লোক, শ্লোক, আর্য্যাচ্ছন্দ, সংস্কৃতভিন্ন ভাষা, প্রাকৃতভাষা, মঙ্গলকাব্যের পালাগান। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. উপরে (৩-এ) প্রদত্ত তথ্য থেকে অনুমান করা যায়, আদিতে আর্য্যাশ্লোক-আর্য্যাচ্ছন্দকে গাথা বলা হয়ে থাকলেও, পরবর্তীকালে তার উত্তরণ ঘটে সাধারণ্যে এবং সবশেষে মঙ্গলকাব্যের পালাগানকেই গাথা বলা হত।

গাধ, গাধা, গাধি (গাধী) : ১. গাধ = ✓গাধ্ + অ - অধিকরণে; গর্দ্দভ > গাধা; ✓গাধ্ + ই; গাধি + এয়। (ব.শ.)। ২. ***গাধ*** = *গামীকে ধারণ করে যে;* ***গাধা*** *= গাধের আধার যে;* ***গাধি*** *= গাধ সক্রিয় বা গতিশীল যাহাতে।* / **গাধ** = যেখানে প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি আছে। (ব.শ.)। ৩. অগভীর, সুপ্রতর, সুখোত্তরণীয়, পরিচ্ছিন্ন, স্থান, প্রতিষ্ঠা, স্থিতি, তলস্পর্শ; গর্দ্দভ, হিতাহিতজ্ঞানহীন, মূর্খ; চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ, বিশ্বামিত্রের পিতা (ইঁহার পিতা কুশনাভ এবং ঋচিকপত্নী সত্যবতী ইঁহার জ্যেষ্ঠা সহোদরা। কান্যকুব্জ ইঁহার রাজধানী। (ব.শ.)। ইনি রাজা কুশির পুত্র, কুশনাভের পৌত্র ও বিশ্বামিত্রের পিতা। ... রাজা কুশি ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের জন্য তপস্যা আরম্ভ করলে ইন্দ্র ভীত হয়ে তাঁর কাছে এসে কিছু না বলে চলে যান। তারপর সহস্র বৎসর পরে আবার ইন্দ্র এঁকে দেখে যান। কুশির উগ্র তপস্যা দেখে ইন্দ্র এঁর পুত্রজন্মের জন্য নিজ অংশ দান করেন। কুশির স্ত্রী পৌরকুৎসীর গর্ভে ইন্দ্রের অংশে গাধি জন্মগ্রহণ করেন। (পৌ.অ.)। দ্র. **কৌশিক**। ৪. অপ্র.। ৫. গামী যদি মানসফল বা 'জ্ঞানবাক্য' হয়, **গাধি** তবে সেকালের দার্শনিক ঋষি; আর গামী যদি দেহমনের যৌথফল হয়, **গাধি** তবে সেকালের পণ্যজীবী। সমাজেতিহাসের প্রেক্ষিত থেকে বুঝতে হয়, তিনি ঠিক কী। আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই প্রেক্ষিতে রয়েছে **কুশনাভ, কান্যকুব্জ, চন্দ্রবংশ**, এবং সর্বোপরি **বিশ্বামিত্র**। এই সত্তাগুলিকে যৌথসমাজ থেকে ব্যক্তিগতমালিকানাভিত্তিক সমাজে উত্তরণের প্রাথমিক পর্যায়ে নানা রূপে সক্রিয় দেখা যায়। সেই সুবাদে গাধি সেকালের পণ্যজীবী সত্তাই হবেন। হতে পারে তিনি তাঁর আচরণের সপক্ষে যে সকল সওয়াল করেছিলেন, তা বহু 'জ্ঞানবাক্য' সহযোগেই করেছিলেন।

গান : ১. ✓গৈ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গামী অন থাকে যাহাতে।* / যাহা গীত হয়। (ব.শ.)। ৩. গীতি, গাওয়া, স্তবন, স্তুতি, প্রশংসা, ধ্বনি, শব্দ, গানসদৃশ মধুর ধ্বনি, কূজন, গুঞ্জন, শিঞ্জন বা ভূষণধ্বনি, কীর্ত্তন, গীত, গীতিকা। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এখানে শব্দ, সুর, ধ্বনি ইত্যাদি হল গামী, তারা অন (on) থাকে গানের সুরে ও পণ্যের স্রোতে। এর কারণ হল, আমাদের পূর্বপুরুষেরা জ্ঞানকে বিশেষভাবে দেখতেন না, তাঁদের ছিল সামগ্রিক বোধ। যতদূর বোঝা যায়, তাঁদের বিচারে সঙ্গীত বা 'গান' কেবল শব্দ-সুর-তাল-লয়-ভাবের ধারক ছিল না, ছিল অভিজ্ঞতা-জ্ঞান-তথ্য-ভক্তি-বিশ্বাস-পণ্য-চাহিদা-যোগান-মূল্য-পুঁজিরও ধারক। এরকম ভাবে ভাবা ছাড়া উপায় ছিল না তাঁদের হাতে। প্রাচীন ভারতের মানুষ প্রথম যখন পণ্য উৎপাদন ও বিক্রির উপায় বার করল, তখন তাদের ওই নতুন আচরণের কী নাম দিতে পারত তারা! সারা পৃথিবীতে তখন পণ্য তো আবিষ্কৃতই হয়নি। একজন মানুষ এক বস্তা চাল নিজে না খেয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্যকে দিয়ে পরিবর্তে কিছু নেওয়ার জন্য — এরকম আচরণ তখনও সেকালের সাধারণ মানুষের কাছে ততখানি দুর্বোধ্য ছিল, একালের কমপিউটার-না-জানা মানুষের কাছে 'নেট-সার্ফিং' যতখানি দুর্ব্বোধ্য। মানুষের সমাজে সঙ্গীত বা গান-এর আবিষ্কার, চর্চা এবং ব্যবহারের বহু পরে এসেছে পণ্যগন্ধ, গন্ধবেণে ইত্যাদি।

গায়ত্রী, গায়ত্ত্রী, গায়ন : ১. গায়ৎ + ✓ত্রৈ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী ঈ (ঙীষ্); ✓গৈ + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***গায়ত্রী** = যে-গায়ন (অস্তিত্বকে) ত্রাণ করে; **গায়ত্ত্রী** = গায়ন-তারণকে ত্রাণ করে যে; **গায়ন** = গামীধারীর যাওয়া অন থাকে যাহাতে।* / **গায়ত্রী** = যাহা দ্বারা দেবতা স্তুত হন; যে গাতাকে ত্রাণ করে; গায়ক অর্থাৎ গান করে যে। (ব.শ)। ৩. বৈদিক ত্রিপাদ মন্ত্রবিশেষ, ছন্দোমাতা, ষড়ক্ষরপাদ বৈদিক ছন্দোবিশেষ, দুর্গা, গঙ্গা; গীতশিল্পী, গানবৃত্তিজীবী, স্তুতিপাঠক, স্তাবক, জল্পক, বাচাল, গান, গীতি, মধুর কূজন। (ব.শ.)। ঋগ্বেদের পবিত্রতম মন্ত্র। দ্বিজগণের উপাস্য বৈদিক মন্ত্রবিশেষ। প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এই মন্ত্র দ্বারা সূর্যকে মনে মনে ধ্যান করতে হয়। মন্ত্রটি এই — ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধীয়ো য়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। (ঋগ্বেদ, ৩য় মণ্ডল, ৫ম অধ্যায়, ৬২ সূক্ত)। এই মন্ত্রগুলি সাবিত্রীর (সূর্য) উদ্দেশ্যে লিখিত। ... দেবীরূপে এই সবিতা ব্রহ্মার স্ত্রী এবং চতুর্বেদের মাতা। গায়ত্রী পাঠে মানুষ পরিত্রাণ পায়। গায়ত্রীর শক্তিতে ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হয়েছিলেন। যাঁরা এই মন্ত্র পাঠ বা গান করেন, তাঁরা ত্রাণপ্রাপ্ত হন বলে এই মন্ত্রটির নাম গায়ত্রী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ বেদ-পারদর্শী আচার্যের কাছে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হন; তখন তাঁদের পুনর্জন্ম হয় এবং তখন তাঁরা দ্বিজ বলে অভিহিত হন। তাঁদের ত্রিসন্ধ্যায় পবিত্রভাবে গায়ত্রী জপ করে উপাসনা করতে হয়। গায়ত্রী একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও তিন বেদ। (পৌ.অ.)। ৪. কেবলমাত্র হিন্দু পুরোহিত ও ধর্মপ্রাণ হিন্দুর ভাষায় শব্দ দুটি প্রচলিত। ৫. গায়ত্রীর দুরকম পাঠ আছে — এক-'ত'কার, ও দ্বি-'ত'কার। দ্বি-তকার কমপিউটারে লেখা যায় না বলে 'গায়ত্ত্রী' শব্দটি এভাবে লিখতে হল। সংস্কৃতে অধিকাংশ 'ত্র' স্থানে দ্বি-তকার বা 'ত্ত্র' রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুরকম অর্থ ছিল বলেই দুরকম তকার প্রচলিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে অর্থবিস্মৃতির কারণে লেখকেরা প্রায় সবক্ষেত্রেই দ্বি-তকারের প্রয়োগ করে গেছেন। এগুলির মধ্যে অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে আমরা দেখছি শব্দার্থ বলে দিচ্ছে, দ্বি-তকার না দিলে ভুল হবে। যেমন এই **গায়ত্রী** ও **গায়ত্ত্রী**, **ছাত্র** ও **ছাত্ত্র**, এবং **পত্রিকা** ও **পত্ত্রিকা**। আরও বহু ক্ষেত্রে হয়তো বা এই ব্যাপার থেকে থাকবে, কিন্তু সব ক্ষেত্রে সেভাবে অনুসন্ধান চালানো যায়নি।

গায়ত্রী মন্ত্র ও সাবিত্রী মন্ত্র একই মন্ত্র। আদিতে, মানুষ যখন আদিম যৌথসমাজে বাস করত, তখনই এর উদ্ভব হয় এবং তার নাম রাখা হয় সাবিত্রী মন্ত্র। পরে, যৌথসমাজ যখন ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল, মানুষ দান-বিনিময় করতে লাগল, তখন তাকেই নতুন নাম দেওয়া হল 'গায়ত্রী'। এর কারণ হল, এই মন্ত্রটি আসলে সমাজের উৎপাদন ও বিতরণের মন্ত্র এবং সম্পূর্ণতই জীবননির্ভর। এর অর্থ জানা না থাকায় একে অর্থহীন 'অংবংচং'-এর মতো শব্দসমষ্টি ভাবা হয়। আদিম যৌথসমাজ বিভাজিত হয়ে পণ্যবাহিতার দিকে দিশাগ্রস্ত হয়ে গেলে উৎপাদন ও বিতরণের প্রক্রিয়া বদলে যায়। সাবিত্রী মন্ত্র তখন গায়ত্রী মন্ত্রে বদলে নেওয়া হয়। দ্র. **গন্ধ**, **গান**।

গীত, গীতি : ১. ✓গৈ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে; ✓গৈ + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***গীত** = গতিশীল গামী তারিত যাহাতে; **গীতি** = **গীত** গতিশীল যাহাতে।* / যে গান করিয়াছে; গেয় পদ অর্থাৎ যে পদ গাওয়া হয়। (ব.শ.)। ৩. উচ্চারিত, পঠিত, কথিত, শব্দিত, স্তুত, কৃতগান, গান, গীততুল্য মধুর কূজন; গান, গুঞ্জন, মধুর অস্ফুটধ্বনি, আর্য্যাছন্দোবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. song অর্থে প্রচলিত। ৫. যে গামী চলে গেছে সে **গত**। কিন্তু কেউ যদি তাকে পাঠিয়ে থাকে তবে সে **গীত**। গামীকে এরকম পাঠাতে থাকাই হল গীতি। এই গামী সুরধারায় ভেসে চলা অর্থপূর্ণ শব্দ হতে পারে, বাক্‌ধারা হতে পারে; আবার গঙ্গাধারায় ভেসে চলা অর্থময় পণ্যও হতে পারে। তবে প্রধানত ভাবধারার বাহক ধারাকেই গীত বা গীতি শব্দে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। দ্র. **গত**, **গতি**।

গু (গুং, গুঙ্, গুঞ্, গুণ্, গুন্, গুম্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : কুঞ্জ, কুঞ্জকানন, কুঞ্জদার, কুঞ্জবন, কুঞ্জবাড়ী, কুঞ্জর, কুঞ্জি, গম্বুজ (গুম্‌বজ্), গাছি, গু, গুআ(য়া), গুও, গুওটা, গুঃ, গুঁজ, গুঁজি, গুঁটলি, গুঁটি, গুঁড়া, গুঁড়া, গুঁড়ি, গুঁড়িকচু, গুঁড়িগুঁড়ি, গুড়িপিপড়া, গুঁড়ী, গুঁতা, গুঁতান, গুখেগো, গুখোর, গুগুলি, গুগ্‌লি, গুগ্‌গুল, গুগ্‌গুলু, গুচি, গুছি, গুচ্চার, গুচ্ছ, গুচ্ছা, গুচ্ছার, গুছা, গুজ, গুজগাজ, গুজগুজ, গুজব, গুজরৎ, গুজরা, গুজরান, গুজরী, গুজার, গুজুরগুজুর, গুঞ্জ্, গুঞ্জ, গুঞ্জন, গুঞ্জর, গুঞ্জরণ, গুঞ্জরি(রী), গুঞ্জা, গুঞ্জার, গুঞ্জিকা, গুঞ্জিত, গুটা, গুটান, গুটি(টী), গুটিক, গুটিকা, গুটিয়া, গুটিসুটি, গুড়্, গুড়, গুড়ক, গুড়গাঁঞি(ঞী), গুড়গুড়, গুড়গুড়ি(ড়ী), গুড়চাউলি(লী), গুড়চাকুলি, গুড়চাকুলিয়া, গুড়চী, গুড়ূচী, গুড়ত্বক, গুড়পিঠা, গুড়পিপুলী, গুড়পিষ্ট, গুড়পুষ্প, গুড়শর্করা, গুড়া, গুড়াকু, গুড়াকেশ, গুড়াপূপ, গুড়ি, গুড়িকা, গুড়িগুড়ি, গুড়িশুড়ি, গুড়ী, গুড়ীয়া, গুড়ূক, গুড়ূম, গুড়ে, গুতা, গুতাগুতি, গুতুনি, গুৎস, গুদ্, গুদ, গুদড়, গুদম, গুদাম, গুদোম (godown), গুদ্দ (গোদ), গুফা, গুবাক, গুম, গুমখুন, গুমট, গুমটি, গু(গো)মর, গুমসা, গুমসো, গুমা, গুমান, গুমি, গুম্ফ্, গুম্ফ (গুমর হলে গোঁফ বেরোয়), গুম্ফা, গুম্ব(ম্বু)জ, গুয়া, গুয়াকাটা, গুয়াগুটি, গুয়াবাড়ী, গুয়ামুটি, গুয়াহাটী (গৌহাটী), গুয়েশালিক, গুল্‌ফ, গুল্ম, গুল্মিনী, গু্, গৃথ, গো, গোচ, গোচা, গোছ (মাঝারি গোছের), গোছা, গোছান, গোছাগুছি, গোছাল, গোচ্ছা, গোটা, গোটান, গোটাগুটি, গোড়, গোড়া, গোড়ালি, গোডিম, গোড়ে, গোদ, গোদা, গোধ, গোধা, গোধিকা, গোনা (গুনাহ্), গোফা, গোমক, গোমখুনি, গোমস্তা (গমস্তা), গোমা, গোমায়ু, গোল, গোলক, গোলকধাঁধা, গোলগাল, গো(গু)লজার, গোলদার, গোলন্দাজ, গোলমাল, গোলযোগ, গোলা, গোলাট, গোলাধ্যায়, গো(গু)লাপ(ব), গোলাপী, গোলাম, গোলাল, গৌড় (গুড়বিকার), গৌড়তিত্তিরি, গৌল্মিক, গৌহাটী।

গু (গুং, গুঙ্, গুঞ্, গুণ্, গুন্, গুম্) = গামী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **গুং** = নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর রহস্যরূপ যাহাতে। **গুঙ** = নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর করণমূলক-রহস্যরূপ যাহাতে। **গুঞ** = নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর চয়নমূলক-রহস্যরূপ যাহাতে। **গুণ** = নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর টঙ্কারমূলক-রহস্যরূপ যাহাতে। **গুন** =

নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর তরণমূলক-রহস্যরূপ যাহাতে। **গুম** = নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর সীমায়ন-মূলক রহস্যরূপ যাহাতে।

কুঞ্জ (কুঞ্জবন) : ১. ✓গুঞ্জ্ + অ (ঘঞ্) - বি। (ব.শ.)। ২. কুং *(নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর রহস্যরূপ) জাত হয় যেখানে; অথবা, নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর রহস্যরূপ জাত হয় যেখান থেকে।* / পর্ব্বতাদির লতাপল্লবাদিতে সমাচ্ছন্নগর্ভ গহ্বরাদি দেশ। (ব.শ.)। ৩. **কুঞ্জ** = লতাদিসমাবৃত উদরবৎ স্থান, নিকুঞ্জ, লতাগৃহ, লতাদিগূঢ় স্থান। হস্তিদন্ত, হস্তিহনু। **কুঞ্জবন, কুঞ্জকানন** = কুঞ্জযুক্ত বন, বিহারার্থ কুঞ্জবিশিষ্ট বন বা উপবন। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. যে গোপনীয়তায় কুং (দ্র. **কোণ**) জনিত হয়, সেই স্থানটিকে বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত। যতদূর বোঝা যায় ঝোপ বোঝাতে '**কুঞ্জ**' শব্দটির ব্যবহার এইজন্য হয় যে, সম্ভবত প্রাচীনকালে ঝোপের ভেতরেই পুরুষ ও নারীর মিলন হত; অন্তত যতদিন মানুষ গৃহে বাসর সাজাতে শেখেনি। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে এখনও ঝোপই প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রথম মিলনস্থান। এই **কুঞ্জে** যেমন সন্তান জনন হত, ঠিক সেইরকম সামাজিক **কুঞ্জ**গুলিতেই কারুশিল্পের উৎপাদনগুলি হত। **কুঞ্জ**তে তাই দক্ষের বা হস্তীর বা কুঞ্জরদের দাপট বেশি। অতএব, **কুঞ্জবিহারী**গণ কোন কুঞ্জে বিহার করতেন তা ভেবে দেখা দরকার। দ্র. **কুঞ্জব, নিকুঞ্জ**।

কুঞ্জর : ১. কুঞ্জ + অ (অস্ত্যর্থে)। (ব.শ.)। ২. *কুঞ্জ রক্ষা করে যে; কিংবা কুঞ্জ রহে যাহাতে।* / হনুযুক্ত রয়েছে যাহাতে। (ব.শ.)। ৩. হস্তী, শ্রেষ্ঠার্থবাচক, কুঞ্জরপিপ্পলীবৃক্ষ, আট (৮ এই সংখ্যা, দিগগজের সংখ্যানুসারে), দেশবিশেষ, (হস্তিকরাকৃতি) হস্তানক্ষত্র, কেশ (?) (হরিচরণ এই জিজ্ঞাসাচিহ্ন দিয়েছেন)। কুঞ্জরা = হস্তিনী, (কুঞ্জরদন্ততুল্য পুস্পহেতু) ধাতকীবৃক্ষ, ধাইফুল, পাটলাবৃক্ষ। কুঞ্জরাশন = হস্তীর অশন (খাদ্য), অশ্বত্থ। (ব.শ.)। ক) বানররাজ। ইনি কেশরী বানরের স্ত্রী অঞ্জনার পিতা ও মহাবীর হনুমানের মাতামহ। খ) কশ্যপ-স্ত্রী কদ্রুর গর্ভজাত অন্যতম নাগ। ((পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. সেকালে বনের হাতিকে যেমন কুঞ্জর বলা হত, তেমনি সমাজ-বনের দক্ষদেরও কুঞ্জর বলা হত। এঁরা সামাজিক কুঞ্জগুলির রক্ষাকর্তা ছিলেন। সমগ্র কেরানী-শ্রেণীর এঁরা আদিপুরুষ। এর থেকেই পরবর্তী-কালে **হনুমান** (ডিগ্রির বড় লেজ আছে যার) প্রভৃতির উদ্ভব ঘটে।

গু : ১. গ্ + উ। ২. *যে গামী নবরূপে উত্তীর্ণ*। ৩. মল, বিষ্ঠা, অসারভাগমাত্র, বিষ্ঠাবৎ জঘন্য বা কুৎসিত বস্তু, ঘৃণাজনক দ্রব্যমাত্র। (ব.শ.)। ৪. stool অর্থে প্রচলিত। ৫. গ, গা, গি, গী, গু, গু, গৃ, গে, গৈ, গো, গৌ — গ্-এর যে বিভিন্ন রূপ, তাতে তার অর্থ কীভাবে বদলায়, সেকথা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। 'গু'-এর প্রসঙ্গে কথনীয় এই যে, তাতে যে গামী থাকে, তা মিলেমিশে নতুন রূপে নতুন ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়। মানবশরীরের ক্ষেত্রে এই গু কাকে বলে সবাই জানেন। কিন্তু মানুষের মানসলোকে গু কাকে বলে অনেকেই জানেন না। তবে বলে দিলে মনে পড়ে যাবে। **গুজগুজ** করে যখন কাউকে কিছু বলা হয়, যে বলে সে গু জনন করে। এ হল **খবর-গু**। অর্জিত জ্ঞান এখানে নবরূপে উত্তীর্ণ। এই গু যাঁর নিকট থেকে আমরা পাই, তাঁকে **গুরু** বলে। (দ্র. **গৌর**।) সমাজশরীরের ক্ষেত্রে এই গু হল **মল**। একে **পণ্য**ও বলা হয়। এই মলের খবর যখন বাতাসে ছড়ায় তখন তাকে বলে **মলয়**। এরকম আরও বহু প্রকারের গু আছে। এই গু ইংরেজিতে goods হয়ে গেছে। ফারসি ভাষাতে এর নানা রূপ বিদ্যমান। আমরা দেখেছি, এই গু বা 'গুদ' (= গু দান করে যে) শব্দটির উত্তরাধিকার পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় মলবাচক-গু ও মালবাচক-গু (অর্থাৎ **পণ্য** = **পুষ্প**) দুই ভাবেই রয়েছে। কার্যত, মালপত্র (পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়) নিয়ে মানুষের আচরণ কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে যে-সমাজগোষ্ঠী যেরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার মলমূত্র ত্যাগের আচরণাদিও সেই ভাবে বদলে গেছে। তার মানে, মলমূত্র ত্যাগের ক্ষেত্রে পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির আচরণ তার মালপত্র উৎপাদন ও ত্যাগের আচরণের সমান্তরাল। এই সমান্তরাল আচরণ **মল-মাল**, ক্যাশ-**কেশ**, ফরেস্ট-সমাজ**বন**, **গঙ্গা**ধারা-পণ্যধারা, **পর্ব্বত**-সমাজসংগঠন ... ইত্যাদি সকলের ক্ষেত্রেই সক্রিয়; কিন্তু কেন এইরূপ সমান্তরাল সক্রিয়তা, তা এখনও খুব সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যায়নি।

তা সে যাই হোক, আমরা দেখছি, বৈদিক ভারতের চোখে উভয় প্রকার গু-ই নিন্দনীয় ছিল। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দুযুগের সূত্রপাতের পর সেই নিন্দনীয় মানসিকতা ভারতে আরও কট্টরভাবে অনুসৃত হতে শুরু করে। এই কট্টরতা অত্যন্ত ভয়ানক এইজন্য যে, উভয়প্রকার গু কেন নিন্দনীয়, তার কারণ ভুলে যান তাঁরা। ফলে তা আরও বেশি করে চেপে বসে। কতখানি চেপে বসেছে, হিন্দুদের প্রায় উলঙ্গ হয়ে পায়খানায় যাওয়া এবং তৎক্ষণাৎ স্নান করে অন্য বস্ত্র পরে নেওয়ার কট্টর বিধিনিষেধ দেখলে সকলেই তা অনুধাবন করতে পারবেন। সম্প্রতি শহরাঞ্চলে এই কট্টরতা যথেষ্ট কমে গেলেও গ্রামাঞ্চলে এখনও তা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। তাঁদের এই আচরণ একথা জানিয়ে দেয়, এই জাতি মূলগতভাবে পণ্যবিরোধী।

বিপরীতে বেদবিরোধী মানুষদের চোখে মালবাচক-গু ভাল-অর্থবাচক হয়ে যায়। তাঁদের মলমূত্রাদির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতেও নিন্দার ভাব অত্যন্ত কম। এত কম যে, তা স্বাভাবিক শুচিতার ধারণাকেও কখনো কখনো আঘাত করে থাকে। বলতে কি, শপিং মলের মল হাতে-পায়ে-গায়ে-মুখে সর্বত্র মেখে নিয়ে আজকের গোলোকায়িত উপকরণবহুল সভ্যতা অত্যন্ত দুর্গন্ধময় ও নোংরা হয়ে গেছে। এর সূত্রপাত হয়েছিল মলত্যাগ ও মালত্যাগের প্রতি বৈদিক সভ্যতার নাক-উঁচু ভাবের বিরোধিতা করতে গিয়ে। মনে করা হয়েছিল, মলত্যাগ-মালত্যাগও জীবনের অঙ্গ, তা অত নিন্দনীয় ব্যাপার নয়। সেই অনিন্দ্য ধারণার উত্তরাধিকার পেয়েছিল ফারসি ভাষা তার 'গুল' (= গোলাপ ফুল, দ্র. **পুষ্প**), গুলবদন, গুলতানি, **গুলজার** প্রভৃতি শব্দে। বাংলাভাষীর পূর্বপুরুষেরাও যেহেতু বেদবিরোধী ছিলেন, তাঁরাও এই অনিন্দ্য উত্তরাধিকার অর্জন করেছিলেন তাঁদের 'গুড়' ও তজ্জাত শব্দের ব্যাপক ব্যবহারে। আর পাশ্চাত্যের সেই উত্তরাধিকারের চিহ্ন আমরা ইংরেজিতে পাই তাদের good, goods, godown প্রভৃতি শব্দে। তাই বলে নিন্দার ধারণাটি তাঁদের নেই, তা

নয়। নিন্দার ধারণাটি তাঁদের mal-যুক্ত (যথা, *mal*-practice) সমস্ত ইংরেজি শব্দে তাঁরা ব্যাপকভাবে ধরে রেখেছেন। দ্র. **মল**। ৬. Avesta - gutha, Pahlavi - guh, Afgan - gul, Kurdish - gu। (ব.শ.)। ইংরেজি good, goods, godown ... ইত্যাদি।

গুঁজ (গুঁজি, গোঁজ, গোঁজা) : ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর রহস্যরূপ জনন করে যে*। ৩. গোঁজের মতো বলপূর্ব্বক প্রবেশ করান, খুসিয়া রাখা, ঢুকান, বসান, অন্তরালে বা ফাঁকে প্রবেশ করান, গলান, ফাসান, গুপ্ত বা লুক্কায়িত করা, নত করা; ছোট গোঁজ, সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র কীলক বা খিল, খোঁপায় গোঁজার কাঁটা বা কাঠি, উপনয়নে কর্ণবেধার্থ সূক্ষ্মাগ্র রূপা-প্রভৃতির ক্ষুদ্র কীল; কীলক, বাঁশ প্রভৃতির খোঁটা, অসন্তোষ হেতু সঙ্কুচিত বা নিষ্প্রভ (মুখ), গোঁজার মতো পীড়াজনক বিষয়, চালের ছাউনিতে গুঁজিয়া দেওয়া গোঁজের মতো সূক্ষ্মাগ্র খড়ের গুচ্ছ। (ব.শ.)। ৪. push into অর্থে প্রচলিত। ৫. সূক্ষ্ম একটি পার্থক্য রয়েছে **গুঞ্জ** ও গুজ শব্দের মধ্যে। তা হল একটিতে গু-এর রহস্যরূপ রয়েছে, অন্যটিতে নেই। **গুঞ্জ**কে তাই সুস্পষ্ট রূপে বোঝা ও সুনির্দিষ্ট করা কঠিন। আমাদের বিবেচনায় এই গুঁজ শব্দটি মধ্যযুগের বাংলাভাষীদের সৃষ্টি। **গুঞ্জ** থেকেই তাঁরা এই শব্দটি সৃষ্টি করে বিস্তারিত করেছিলেন। দ্র. **গুঞ্জ**।

গুঁতা (গুঁতান) : ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ রহস্যরূপী গামী তারিত হয় যাহাতে*। ৩. মাথা বা শিঙ দিয়া আঘাত, ঢুঁ মারা, ঢুসান, লাঠির আগার দ্বারা আঘাত, হুড়া, প্রহার, বিপদ, উৎপীড়ন, দৌরাত্ম্য, শাসানি, *ঠেলা*, পীড়ন করা। (ব.শ.)। ৪. শিং দ্বারা আঘাত অর্থ ব্যঞ্জনা সহ প্রচলিত। ৫. গামীর যদি অন্যের প্রতি রোষ হয়, সেই রোষ নবরূপে উত্তীর্ণ হয় গরুর সিংয়ের *ঠেলা*মারার শক্তিতে বা 'গুঁ'-এ। সে-শক্তি যখন তারিত হয়ে কারও গায়ে লাগে, তখন তা হয় গুঁতা, সেই ক্রিয়া চলতে থাকা হল গুঁতান। এই অর্থটিকে আরও প্রসারিত করে শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ৬. ইংরেজি gnar, gnash।

গুচ্ছ, গুচ্ছা, গুছান (গোছা, গোছান) : ২. **গুচ্ছ** = **গু**-*র চয়ন আচ্ছাদিত হয় যাহাতে;* **গুচ্ছা** = *তাহার আধার;* **গুছান** = *তাহার ক্রমান্বয় থাকে যাহাতে*। ৩. কলিকাকুসুমাদির স্তবক, পুষ্পাদির স্তবক, ফুল ইত্যাদির থোকা, স্তম্ব, গোছা, তৃণধান্যযবাদির স্তম্ব বা গোছ, যাহাদের মূল হইতে লতাসমূহ জন্মে এবং কাণ্ড নাই তাদৃশ উদ্ভিদ — মল্লিকা প্রভৃতি, বত্রিশ-নরী হার, মুক্তাহার, নিচয়, স্তবক, ময়ূরপুচ্ছ, কলাপ, গুচ্ছকরঞ্জ; স্তবক, গোছা; গুচ্ছাকারে বদ্ধ করা, গোছ বাঁধা, মিলিত বা একত্র করা, পরিপাটিপূর্ব্বক রাখা, সজ্জিত করা, শৃঙ্খলাবদ্ধ করা, নিয়মিত করা, সুসঙ্গত করা, যথাক্রমে সাজান। (ব.শ.)। ৪. cluster ও arrange অর্থে প্রচলিত। ৫. **গু** বা নবরূপে উত্তীর্ণ গামীকে চয়ন করে আচ্ছাদিত করা মানে গুচ্-ছ করা। এর স্বাভাবিক নাম সেকারণেই হয়েছে গোছ-গাছ করা বা গোছান। এই সব তথাকথিত 'গেঁইয়া' বাংলা শব্দগুলি আগাগোড়া ক্রিয়াভিত্তিক অর্থেই প্রচলিত।

গুজ, গুজগুজ, গুজব : ১. দ্র. **গু**। ২. **গু** *জনিত হয় যাহাতে;* **গুজ**-*এর ক্রমান্বয় যাহাতে;* **গুজ**-*বহন করে যে*। ৩. পরস্পর গুহ্যভাষণের (চাপা সুরে কথা বলার) শব্দ, মৃদুস্বরে ভারী গলায় কথোপকথনের শব্দ, কোনো অপ্রিয় বিষয়ের গুহ্যভাবে মৃদুস্বরে সমালোচনার শব্দ; অসম্ভব কথা, মুখে মুখে প্রচারিত কথা, জনরব। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. শারীরিক **গু** কী বস্তু সবাই জানেন, কিন্তু মানসিক গু কী বস্তু, বলে দিলেই বুঝতে পারা যায়। গুজগুজ করে কেউ কানে কানে কথা বললেই আমরা বুঝতে পারি, কথক মানসিক গু জনন করছে। এ হল খবর, মন্ত্রণা। অবশ্য, গুজব শব্দটি ফারসি থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। তা ঠিক নয়। বড়জোর একই উত্তরাধিকারের রিনিউয়াল বা নবরূপায়ণ হতে পারে। হয়তো আদিতে আমাদের ভাষায় গুজবের তুলনায় **ঘটোৎকচ** বেশি প্রচলিত ছিল। শব্দ দুটি একই ঘটনাকে দুদিক থেকে বোঝাত। পরে মধ্যযুগে গুজব বেশি প্রচলিত হয়ে যায়। মধ্যযুগের বাংলাভাষী কবিদের ভাষা ও ফারসি ভাষা এই শব্দের ক্ষেত্রে এমন মিলেজুলে গেছে যে, তাদের আলাদা করে বোঝা বেশ সমস্যাসঙ্কুল। *গুজর, গুজর-বসর, গুঃ, মারফৎ, গুজরৎ, গুজরা, গুজরনা, গুজরান, গুজুর-ফুসুর, গুজগাজ-ফিসফাস* প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে এই সমস্যা স্পষ্ট দেখা যায়।

গুঞ্জ, গুঞ্জন, গুঞ্জরণ (গুঞ্জা) : ১. ✓গুঞ্জ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে; ✓গুঞ্জ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে; গুঞ্জর + অন। (ব.শ.)। ২. **গুঞ্জ** = **গু**-*এর রহস্যরূপ জনিত হয় যাহাতে;* **গুঞ্জন** = **গুঞ্জ** *অন থাকে যাহাতে;* **গুঞ্জরণ** = **গুঞ্জ** *রক্ষক-ভক্ষক অন থাকে যাহাতে*। / যেখানে গুঞ্জন করে; যাহা অব্যক্ত শব্দ করে। (ব.শ.)। ৩. কূজন, অব্যক্ত শব্দ, গুনগুন ধ্বনি, পুষ্পস্তবক, গুচ্ছ, গুনগুন শব্দ করা, অব্যক্ত শব্দ করা, গুঞ্জাফল, কুঁজ; অব্যক্ত শব্দ, কূজন; গুঞ্জনতুল্য মৃদুমধুর উচ্চারণ; কলধ্বনি, চর্চা, লতাবিশেষ, কুঁচগাছ, গুঞ্জাফল, রক্তিকা, কুঁচ, দুই যব পরিমাণ, দুই গম পরিমাণ, চার ধান পরিমাণ, পটহ, ঢাক। (ব.শ.)। ৪. 'গুঞ্জন' শব্দটি অ্যাকাডেমিতে sweet sound অর্থে এবং গ্রামবাংলায় 'মৃদু জনরব' অর্থে প্রচলিত। ৫. 'গুং' হল নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর রহস্যরূপ। এটি 'গুণ'ও বটে। এই 'গুঞ' জনন হয় উৎপাদিতের গুণগান করলে, তার উৎপাদিত হওয়ার খবর ছড়িয়ে দিলে, অর্থাৎ গুঞ্জন করলে। কার্যত, আওয়াজের দুনিয়ায় গুনগুন শব্দ করা যেমন গুঞ্জন করা, তেমনি গু-জননের অন্য লোকগুলিতেও তাদের জনন হয়। একে **কূজন** করাও বলে।

গুট, গুটলি, গুটান, গুড়ান, গুটি, গুটিক, গুটিকা, গুটিগুটি, গুটিসুটি : ২. **গুট** = *গু টঙ্কারিত যাহাতে;* **গুটলি** = *গু-টঙ্কারণের লয়প্রাপ্তি চলে যাহাতে;* **গুটান** = *টঙ্কারিত গু আনা হয় যাহাতে;* **গুড়ান** = *আবর্ত্তমান গু আনা হয় যাহাতে;* **গুটি** = *গু টঙ্কারণের বিকাশ যাহাতে;* **গুটিগুটি** = *গুটির ক্রমান্বয় যাহাতে*। ৩. (গুট শব্দটি ব.শ.-তে নাই); ক্ষুদ্র দৃঢ় পিণ্ড, গুলি, পাশাখেলার গুটি, মৃদঙ্গ-তবলার গোল কাঠের খণ্ড, তসরপোকার কোষ বা কোয়া, কচি আম, গো-বসন্ত; সংহত, সংক্ষিপ্ত, রাশ করা, জড়ান,

জলে ছড়াইয়া-ফেলা জাল টানিয়া একত্র করা, ডাকাতি হইতে নিবৃত্ত হওয়া, সঙ্কুচিত করা; তৎসংখ্যক, গুলি, একটি; এক গুটি, একটি, অত্যল্প, স্বল্পসংখ্যক, কিঞ্চিৎ, কতকটা; বটিকা, বড়ি, গুলি, বর্তুলাকার পদার্থ, গোল শিলাখণ্ড, গোলক, মুক্তা, ক্ষুদ্রব্রণ, তসরকীটের কোষ, বর্তুলাকার ফল; একটি-একটি, একে-একে, এক-এক করিয়া অনেক, পর্য্যায়ক্রমে, একটু-একটু করিয়া, ধীরে ধীরে; শরীর গুটাইয়া বা সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থিত। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে বহুল প্রচলিত। ৫. এসব শব্দ সবই মধ্যযুগের কবিদের সংগ্রহ। এখনও গ্রামাঞ্চলে এসব শব্দের বিপুল ব্যবহার রয়েছে।

গুড়, গুড়ক (গুড়গুড়, গুড়গুড়ি, গুড়া, গুড়িয়া, গুড়ীয়া), গুড়াকেশ : ১. ✓গুড্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে; ✓গু (অব্যক্ত শব্দ) + ড - কর্তৃবাচ্যে; গুড় + ক। (ব.শ.)। ২. **গুড়** = **গু**-*এর আবর্তন (গড়ান-উড়ান) যাহাতে;* **গুড়ক** = *গুড় করে যে;* **গুড়গুড়** = *গুড়-এর ক্রমান্বয় যাহাতে;* **গুড়গুড়ি** = ***(কচকচি সদৃশ)*** *গুড় ও গুড়ি;* **গুড়া** = *গু-এর আবর্তনকে ধরা হয় যাহাতে;* **গুড়িয়া** = *গুড়-ই যান যাহার;* **গুড়ীয়া** = *গুড়াধারীর গতিশীলতা ধৃত যাহাতে;* **গুড়াকেশ** = *গুড়াশ্রয় কেশ যাহার।* ৩. মাটির গোল পদার্থ, গোলক, গোলা, ক্রীড়াগোলক, গ্রাস-কবল, কার্পাসবৃক্ষ, হস্তিসজ্জাবিশেষ, ইক্ষুপাক, আকের গুড়, খেজুরগুড়, উপাধি, মধুর, মিষ্ট; গোলক, গ্রাস, কবল, গুড়পক্ক ঔষধবিশেষ; মেঘের মৃদুগম্ভীর শব্দ, আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র দুন্দুভি প্রভৃতির শব্দ, বন্দুকের গুলির শব্দ, হুঁকার বুদবুদের শব্দ, শিশুর দ্রুতগমনের শব্দ, ভূমিচর ক্ষুদ্রপক্ষিবিশেষ, হুঁকাবিশেষ, ফুরশী; গুটা; গুড়ের দ্রব্যের ব্যবসায়ী; নিদ্রার বা ধনুর্ব্বিদ্যার ঈশ, জিতনিদ্র বা ধনুর্ব্বেদপারগ অর্জ্জুন। (ব.শ.)। নিদ্রা ও আলস্যবিজয়ী বলে ইহা অর্জুনের অপর নাম। (পৌ.অ.)। ৪. গুড়াকেশ শব্দটি এখন অপ্রচলিত, বাকিগুলি যথার্থে প্রচলিত। 'উপাধি' রূপে গুড়-কে বিখ্যাত করে গেছেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচিত 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' রচনায়। ৫. প্রাচীন যুগে মানুষের ভোজনপাত্র থেকে শুরু করে আজ আমরা যে-পাত্রে খাই, সেই পর্যন্ত অনুসন্ধান করলে নিশ্চয় আমরা ভোজনপাত্রের বিকাশের একটা কালানুক্রমিক ইতিহাস পাব। তাতে নিশ্চয় দেখতে পাব, সেই ভোজনপাত্র যুগে যুগে কেমন এবং কতখানি বদলে গেছে। হয়তো প্রতি যুগে পরিবর্ত্তিত ভোজন-পাত্রের পৃথক নামও পেয়ে যেতে পারি। মানুষের কর্ম্মজাত উৎপন্নের ক্ষেত্রে ঠিক সেরকমই ঘটেছে, যুগে যুগে তার উৎপাদন ও লেনদেনই শুধু বদলায়নি, তার নামও বদলে গেছে। বাংলাভাষার স্বর্ণযুগে (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগ) এর নাম দিয়েছিল **গুড়**। যে কারণে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে গুড় শব্দের বিপুল ব্যবহার রয়েছে। ***গুড়গাঁথি, গুড়চাউলি, গুড়ূচী, গুড়ত্বক, গুড়ত্বচা, গুড়পিঠা, গুড়পিপুলী, গুড়পিষ্ঠ, গুড়পুষ্প, গুড়মুড়া, গুড়শর্করা, গুড়াকু, গুড়াপূপ, গুড়ি, গুড়িকা, গুঁড়ি*** প্রভৃতি গুড়-সংশ্লিষ্ট শব্দগুলিই তার প্রমাণ। এই সমস্ত গু-যুক্ত শব্দগুলি কোনো না কোনো রকম উৎপন্নের অভিধা রূপে উদ্ভূত হয়, সেই উৎপন্ন গুহ্যদেশজাত, কর্ম্মোৎপন্ন, বাক্-উৎপন্ন ইত্যাদি যাই হোক না কেন। দ্র. গড়, গৌড়।

গোট, গোটা, গোটাগুটি, গোটাগোটা, গোটান : ২. ***গোট*** = *গো টঙ্কারিত যাহাতে;* ***গোটা*** = *গোটের আধার;* ***গোটান*** = *গোটকে তার কেন্দ্রে সঙ্কুচিত করে আনা হয় যাহাতে;* ***গোটাগোটা*** = *গোটের আধার ও তদ্রূপ সত্তার একাধিক অস্তিত্ব যাহাতে;* ***গোটাগুটি*** = *যাহা গোটান হইয়াছে এবং গু-টঙ্কারণ গতিশীল যাহাতে।* ৩. তৎসংখ্যক, তৎসমুদয়, (একগোটা, দুইগোটা, গোটা তিন, গুটিকয়েক) টা, টি, তদ্বস্তু, একটি, অখণ্ডিত, সম্পূর্ণ, আস্ত, সকল, সব, প্রায় তৎসংখ্যক। (ব.শ.)। ৪. 'সম্পূর্ণ একটি' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. ট। এক চামচ জল আর সারা সমুদ্রের জল — স্বাদ ও গঠন একই। এরকম হলে সেই খণ্ডের ভেতরেও একপ্রকার অখণ্ডভাব বা পূর্ণতা থাকে। বাংলাভাষায় এই উত্তরাধিকারকে 'বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন' বলে, বলে 'একটি ভাত টিপে সব ভাতের খবর নেওয়া'। খণ্ডের ভিতরে এভাবে অখণ্ডের ভাব থাকলে, সে খণ্ড হয়েও একপ্রকার পূর্ণতার অধিকারী। এইরকম পূর্ণতা যার থাকে, তা খণ্ড হলেও তাতে গামীর টঙ্কার থাকে; তাই তাকে গোটা বলা হয়।

গোঠ : দ্র. গোষ্ঠ।

গোল, গোলক, গোলকধাম, গোলগাল, গোলা, গোলাদার (গোলদার), গোল্লা : ১. ✓গুড্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে; গো + ✓লা (গ্রহণ) + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***গোল*** = *সর্ব প্রকারের গ যেখানে লয় প্রাপ্ত হয়।* ***গোলক*** = *গোল করে যে।* ***গোলকধাম*** = *গোলকের ধাম।* ***গোলগাল*** = *গোল গাল যাহাতে।* ***গোলা*** = *উৎগামী বা অবগামীর (গু-র) লালন-লয়ন হয় যে ক্রিয়ায় (গুলান), গোলের আধার;* ***গোলাদার*** = *গোলার দেখাশোনা করে যে।* ***গোল্লা*** = *গোল রূপ অভীষ্ট লাভ যাহাতে।* ৩. **গোল** = জারজাত বিধবাপুত্র, মদনবৃক্ষ, ময়না গাছ, গন্ধরস, বোল, ষড়গ্রহের বা সপ্তগ্রহের একরাশিতে যোগবিশেষ, বৃত্ত, বৃত্তাকার পদার্থমাত্র, বর্তুল, বর্তুলাকার পদার্থপাত্র, ভূগোল, খগোল, নালাস্ত্রের লৌহময় গর্ভঘুটিক বা ঘুলি; মণ্ডলাকার, অণ্ডাকৃতি, ... পাঁচসেরী গোল, (মনে কোনো বিষয়ে নানা ভাবের উদয় হেতু) সংশয়, সন্দেহ; কোলাহল, উচ্চরব, মহাশব্দ, বিবাদ, বিসংবাদ, বচসা, বিপদ, দুর্ঘটনা, লোক-সংমর্দ্দ, জনতা, ভিড়। গোলক = জারজ বিধবাপুত্র, মণ্ডল, পিণ্ড, গুড়, গোলদ্রব্যমাত্র, নালাস্ত্রের লৌহময় গর্ভঘুটিক বা গুলি, বালকের গোল খেলনক, ভাঁটা, বল্, মৃন্ময় জলাধার, গন্ধরস, কলায়, মটর, একরাশিতে ষড়গ্রহের সংযোগ, গোলোক, ইন্দ্রিযাধিষ্ঠানভেদ। **গোলকধাম** = একপ্রকার খেলা। ইহার ছক আছে। ছকে চৌষট্টি ঘর। গোলকধাম সর্বোচ্চ ঘর। গুঁটি সকল ঘর অতিক্রম করিয়া গোলকধামে উঠিলে খেলা শেষ হয়। **গোলগাল** = প্রায় বর্তুলাকৃতি, বেঁটে-খেটে-পরিপুষ্ট। গোলগাল গড়ন, গোলগাল চেহারা। **গোলা** = মিশান ইত্যাদি, তণ্ডুলাদির চূর্ণে মিশ্রিত জল দুধ প্রভৃতি তরলদ্রব্য, নিকানোর নিমিত্ত গোবর-মাটি মিশ্রিত জল, রোজা-নামাজ-হীন মুসলমান, সাধারণ লোক, অশিক্ষিত, (ধানের গোলা)। **গোলাদার, গোলদার** = গোলাওয়ালা, গোলার মালিক, আড়তদার, হিন্দুর উপাধিবিশেষ। **গোল্লা** = গোলবস্তু, পিণ্ড, গোলাকার মিষ্টান্ন, সন্দেশ, কামানের গেলা, শূন্য, কিছুই না। (ব.শ.)। ৪. বহুল

প্রচলিত। **৫.** গামী যেখানে লয় পায় সেটি গল বা গলন। এ ক্রিয়া দুভাবে সম্ভব। কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে গলে যাওয়া, অথবা নিজের অভ্যন্তরে কাউকে গলিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা; নিজে 'গলে জল' হয়ে যাওয়া। যেখান দিয়ে গলন হয়, সেটি গলা; আর যে ভাত এত নরম যে, তাতে কাঠি বা অন্য কিছু গলে যেতে পারে, সেও গলা। এই গলার ভিতর দিয়ে যে গলন চলে তা উভয় দিক গামী। কিন্তু যে কোনো একদিক থেকে গলিয়ে নেওয়ার জন্য যে টান, তা গলনকে (গল্-অন্-কে) দিশাগ্রস্ত করে একদিকে টানে; তাকে বলে গিলে নেওয়া বা গেলা বা গলাধঃকরণ করা। এবং যে পথ দিয়ে গলা যায় তার ভেতরের ডান-বাম দিকের দেওয়ালকে বলে গাল। সেই গলা দিয়ে যা বেরিয়ে আসে তাকেও গাল বা গালাগালি বলে। সর্বোপরি, যে গামী তার আত্মস্বরূপ পরিবর্তন করে, সেই গু (গুলান) এইখানে অন্যদের সঙ্গে মিশে লয় প্রাপ্ত হয়। অতএব, দুই দিকে গাল থাকা এই যে গলনালী, যার ভেতর দিয়ে গলন, গলা, গাল দেওয়া, গিলে নেওয়া বা গেলা ও গোলা বা গোলান — সমস্ত প্রকার 'গল' ক্রিয়া চলে, তা হল বৃত্তাকার একটি হাঁ-মুখ। যা কিছু 'গলে যায়', সেই গো-গণ এই বৃত্তাকার হাঁ-মুখে লয় প্রাপ্ত হয়। সেই কারণে একে গোল বলে এবং সন্দেহ নেই এই গোল বৃত্তাকারও বটে। দ্র. **গল, গণ্ড, গণ্ডূষ, গণ্ডগোল, গণ্ডি**।

এই 'গোল' অতঃপর তার অভিধার্থ লক্ষণার্থ ব্যঞ্জনার্থ নিয়ে ক্রমে বিস্তার লাভ করেছে অনেক দূর পর্যন্ত। বৃত্তাকার বস্তুমাত্র থেকে শুরু করে সকল গামীদের লয়প্রাপ্তির চেঁচামেচি পর্যন্ত সবকিছুকেই সে ধারণ করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বৃত্তাকারে ঘোঁটা হয়ে গেছে গোলা বা মেশানো। এই গোলা (ঘোলা) গ্রামবাংলায় আজও ব্যাপকভাবে প্রচলিত। যে-ব্যক্তি কোনো দলে পড়ে না, যার কোনো বিশেষ প্রতীকী ধর্ম নেই, তেমন লোককে বলা হয় 'গোলা-লোক'। ব.শ. তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন 'রোজা-নামাজ-হীন মুসলমান'। গজি (গিজা) খেলায় যে খেলোয়াড় উভয় দলের হয়েই খেলে, তাকে গোলা বা ঘোলা বলে। ... মোট কথা, ব.শ. প্রদত্ত উপরোক্ত সব অর্থই এই গোল-এর অন্তর্ভুক্ত। তবে কোনো কোনো অর্থ তাদের ঐতিহাসিক তথ্যাভাবের কারণে স্পষ্ট নয়। যেমন গোল মানে কেন বিধবাপুত্র তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। **৬.** ইংরেজি goal।

গোলোক (গোলোকধাম) : **১.** গো + লোক। **২.** *যে লোকে প্রচুর গো (থাকে)। /* গো প্রচুর (তেজোময়) লোক। (ব.শ.)। **৩.** শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধস্থিত লোক। (গোলোকের নিম্নে পরব্যোম বিষ্ণুলোক — নারায়ণাদি অনন্তস্বরূপের বাস ও অনন্ত বৈকুণ্ঠের আধার। ইহার পরে পরিখাস্বরূপা বিরজা নদী। বিরজার অন্য পারে অখণ্ডব্রহ্মাণ্ডধাম — বাহ্যাবাস। গোলোক ও বিষ্ণুলোক প্রকৃতির অতীত; বাহ্যাবাস প্রকৃতির অধিকৃত ও মায়িক বিভূতির লালাভূমি।) (ব.শ.)। বিষ্ণু বা কৃষ্ণের আবাসস্থান। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সমস্ত লোকের উপর একটি লোক। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে বৈকুণ্ঠের উপরে গোলোক অবস্থিত। এর আয়তন পঞ্চাশ কোটি যোজন। বিষ্ণুর অভিপ্রায়ে এই গোলোক বায়ুর উপর অবস্থিত। এখানে একটি বিশাল পর্বত আছে। এই পর্বত গোলোকের প্রাচীর স্বরূপ। পর্বতের বহির্দেশে একটি বন আছে। এই বন কৃষ্ণ-রাধিকার ক্রীড়ার স্থান; বৃন্দাবন নামে খ্যাত। এর পরেই গোলাকার গোলোকপুরী। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথম শ্লোকের প্রথম শব্দটি হল গোলোক ('গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর। / লক্ষ্মী সহ তথায় আছেন গদাধর।।'), যে লোকে গতিশীলগণের প্রাচুর্য। হরিচরণ জানিয়েছেন, তাঁরা তেজোময়। আমরা জেনেছি, তাঁরা এমন সব সত্তা, যাঁরা সর্বপ্রকার গতিশীলতার চূড়ান্তে সক্রিয়, অর্থাৎ অতি উচ্চ মার্গের গো। তাঁদের নামকরণ করার নানা অসুবিধা রয়েছে। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে যে যা করে, তাকে সেই ক্রিয়াকারী হিসেবে নামকরণ করতে হয়। যে যায় সে 'গো', যে সাধনা করে সে 'সাধক' এইরকম। এই নিয়মে অতএব যে সত্তা ১০৮ টি কাজ করে, তাকে ১০৮টি নামে শনাক্ত করতে হয়। আর সেজন্যই উপরোক্ত গোলোকে বাসকারী সত্তাদের 'অষ্টোত্তর শতনাম' রাখার চল রয়েছে। এঁরাই থাকেন গোলোকে। তথ্যানুসারে এই লোক দেবলোকের ওপরে। আজ আমরা এই অষ্টোত্তর নামধারীদের কমবেশি চিনতে পারি। দ্র. **দেবতা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, গণেশ, ইন্দ্র** ইত্যাদি।

পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা যখন মানুষের মনোলোকের বিভিন্ন বিভাজন করে আমাদের বোঝান — এইটা হল ফিনানসিয়াল স্ফিয়ার, ওইটা হল কালচারাল স্ফিয়ার, সেইটা হল পলিটিক্যাল স্ফিয়ার, তখন আমরা কমবেশি বুঝে যাই কাদের কথা বলা হচ্ছে এবং এ বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের শব্দচয়ন নিয়ে আমরা কোনো আপত্তি তুলি না। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন মানুষের মনোলোকের আরও যথার্থ এবং যুক্তিসংগত বিভাজন করে উপরোক্ত গোলোক, বিষ্ণুলোক, দেবলোক, গন্ধর্বলোক ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের বলেন, আমরা তাঁদের কথা বুঝতেই পারি না এবং তাঁদের উক্ত-প্রকার শব্দচয়ন বিষয়ে আপত্তি তুলি। কিন্তু আজ, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি হাতে আসার পর, **ইন্দ্র, বিষ্ণু, নারায়ণ, ব্রহ্মা** প্রমুখ সত্তাগুলিকে চিনে ফেলার পর হয়তো আর সে পরিস্থিতি থাকবে না।

গৌড় (গৌড়তিত্তিরি, গৌড়ীয়-ব্রাহ্মণ) : **১.** গুড় + অ (অণ্)। (ব.শ.)। **২.** *সমস্ত* **গুড়** *যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়।* **৩.** দেশবিশেষ, গৌড়বাসীগণ, ঔপনিবেশিক বা পশ্চিমা ব্রাহ্মণ। (ইঁহারা, সারস্বত কান্যকুব্জ, মৈথিল, গৌড় ও উৎকল এই পঞ্চ গৌড়-ব্রাহ্মণের একতম। ইঁহারা পশ্চিমদেশ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন। সম্বন্ধনির্ণয়।)। গুড়বিকার, গুড়জাত, রাজত, রৌপ্যময়। গৌড়বাসী গোপ, গোড়গোয়ালা। (ব.শ.)। **৪.** একালের হিন্দু ব্রাহ্মণ জাতির একটি শ্রেণী 'গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ' রূপে আজও বিদ্যমান রয়েছেন। শব্দটি তাঁদের উল্লেখ করতে এখনও প্রচলিত। তাছাড়া পশ্চিমবাংলার মালদহ জেলার একটি স্থানের নাম গৌড়। শব্দটি সেই স্থানকে বোঝাতেও প্রচলিত। 'গৌড় এক্সপ্রেস' নামে একটি ট্রেনও আছে। **৫.** '**গু**-র গড়ান্-উড়ান্ যাহাতে' সেই সত্তাকে বোঝাতে **গুড়** শব্দের প্রচলন হয়েছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু যেহেতু **গু** (= নবরূপে

উত্তীর্ণ গামী) বহু কিছুকে বোঝায়, সেইহেতু গুড়ও বহু বিষয় ও বস্তুকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। এককালে যেখানে গড় (কেল্লা) গড়ে তোলা হত, যেখানে দেশের ক্ষমতাকেন্দ্র থাকত, দেশের সমস্ত শ্রেষ্ঠ উৎপন্ন (জ্ঞানোৎপন্ন ও ধনোৎপন্ন) বা **গুড়** সেখানে এসে কেন্দ্রীভূত হত, সেই স্থানটিকে বলা হত **গৌড়**। সেখানে যে ব্রাহ্মণেরা থাকতেন তাঁদের বলা হত 'গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ'; একালের ভাষায় যাকে 'রাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণ' বা 'সরকারি শিক্ষক' বলা যেতে পারে। এই গৌড়ে বসবাসকারী সরকারি কেরানীদের বলা হত '**গৌড়তিত্তিরি**'। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণকে ভারতের কেরালা কিংবা কাশ্মীর অথবা গুজরাটে কিংবা আসামের শেষ প্রান্তে দেখে অনেকে ভাবতে বসেন, বঙ্গের গৌড় থেকে এই ব্রাহ্মণেরা এভাবে ছড়িয়ে পড়লেন কীভাবে? উত্তর পান না, 'ধাপাগোঁজা' দিয়ে একটা মানে বের করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেরকম গোঁজামিল দেওয়ার প্রয়োজন নেই। রাজার গড় যেখানে যেখানে ছিল, সেই গড়ের ভিতরে যে ব্রাহ্মণ থাকতেন, তিনিই আদিতে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ হয়ে যান। আর গড় তো সারা ভারতেই ছিল। তাই গৌড়ীয় ব্রাহ্মণকে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা সর্বত্রই পাওয়া যেতে পারে।

আরও অন্তত দুটি বিষয় এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার। এক) ব.শ. যে পঞ্চ-গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের কথা বলেছেন, তাঁদের প্রত্যেক শ্রেণীর সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য, যজুর্বেদ, বেদবিক্রয়, **কান্যকুব্জ**, **মিথিরাজা** প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে সান্নিধ্য দেখা যায়। এগুলি সবই মূলত আদি বেদপন্থার বিরোধী এবং কোনো-না-কোনো ভাবে (অনিন্দ্য) ধনতন্ত্রের সমর্থক। দুই) সম্বন্ধনির্ণয় নামে একটি গ্রন্থ থেকে ব.শ. জাতি, শ্রেণী, গোত্র, পদবী ইত্যাদি সংক্রান্ত বহু তথ্য গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এ-পর্যন্ত তাঁর সেই গৃহীত তথ্যগুলির যে-কয়টি আমরা পরীক্ষা করেছি, তার অধিকাংশ ভুল এবং তা প্রধানত এই কারণে ঘটেছে যে, সম্বন্ধনির্ণয়-রচয়িতা শব্দের অর্থ ভুলে গিয়েছেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি আমাদের বিপথে চালিত করেছেন। কত বিপথে চালিত করেছেন, **পদবী** শব্দের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সেকথা আমরা পদে পদে দেখাব। দ্র. **তিত্তিরি**।

গুণ্ (গুণ্ঠ্, গুণ্ড্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অগুণ, অগুণতি, অগৌণ, অগৌণে, অগৌণেতে, অতিগুণ, অনবগুণ্ঠিত, গউণ(ন), গুণ, গুণক, গুণকথন, গুণকরণ, গুণকর্ম্ম, গুণকীর্ত্তন, গুণগান, গুণগুণ, গুণগ্রাম, **গুণগ্রাহক**, গুণগ্রাহী, গুণজ্ঞ, গুণজ্ঞান, গুণতি (গুনতি, গিনতি), **গুণত্রয়**, **গুণধর**, গুণধাম, গুণন, গুণনিধি, গুণনীয়ক, গুণবচন, **গুণবন্ত**, **গুণবাচন**, গুণবাদ, গুণবান, গুণবাস, গুণবৃক্ষ, গুণবৃক্ষক, **গুণবৃত্তি**, **গুণবেদী**, গুণভূপ, গুণমই, গুণমণি(নি), গুণমন্ত, গুণময়, **গুণলুব্ধ**, **গুণশীল**, গুণসংখ্যান, গুণসংগ্রহ, গুণসঙ্গ, গুণসমুদ্র, গুণসম্পদ, **গুণসাগর**, গুণস্তুতি, গুণহীন, গুণা(না), গুণাকর, গুণাগার (**গুনাহ্গার**), **গুণাগীর**, গুণাগুণ, গুণাঢ্য, গুণাতীত, গুণানুবাদ, গুণানুরাগ, **গুণান্তর**, গুণান্বিত, গুণাবপাদ, গুণাবতার, গুণাশ্রয়, গুণিআ, গুণিত, **গুণিন**, **গুণী**, গুণীভূত, গুণেশ্বর, -গুণো, গুণোৎকর্ষ, **গুণোৎকীর্ত্তন**, **গুণোৎকৃষ্ট**, গুণোত্তর, গুণোপেত, গুণ্ঠ্, গুণ্ঠন, **গুণ্ঠিত**, **গুণ্ড্**, **গুণ্ড**, **গুণ্ডা**, **গুণ্ডি**, **গুণ্ডিচা**, **গুণ্ডিত**, **গুণ্দ্র**, গৌণ, -গুন, -গুনা, -গুল, **গুল**, **গুলকন্দ**, **গুলগুলা**, **গু(গো)লন্দাজ**, গুলঞ্চ, গুলতাই, গুলতান, **গুলতানি**, **গুলতি**, **গুলদার**, **গুলনকশ**, গুলবাহার, গুল(লা)ল, -গুলা, -গুলান, **গুলাপ(ব)**, **গুলামুখি**, -গুলি, গুলি, গুলি(ল)কলম, **গুলিকা**, **গুলিবাঁট**, **গুলিয়া**, **গুলুঞ্চ(ঞ্জ)**, গুলী, -গুলো, গুন, গুনগুন, গুনতি, **গুনা**, **গুনাগার**, **গোণী**, **গোণ্ড**, গোণ্ডকরী, গোণ্ড(ণ্ডা)কিরী, গোণ্ডগিরি, গোলাপ (**গুলাব**), **গোলী**, গৌণ, গৌণচান্দ্র, গৌণিক, গৌণী, সগুণ।

গুণ্ (গুণ্ঠ্, গুণ্ড্) = **গুণ্ (গুণ্ঠ্, গুণ্ড্)** = নবরূপে **উত্তীর্ণ গামীর** বোধন। **গুণ** = নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর বোধ থাকে যাহাতে। **গুণ্ঠ** = গুণ্-এর টঙ্কার থেমে থাকে যাহাতে। **গুণ্ড** = গুণ্-এর উড়ান-গড়ান থাকে যাহাতে।

গুণ : ১. ✓গুণ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গু-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর) রহস্যময়তা (বোধ বা জ্ঞান থাকে) যাহাতে।* / যাহা আমন্ত্রণ করে; যাহার দ্বারা বন্ধন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. ব্যাবর্ত্তক সিদ্ধ বা নিত্য বস্তুধর্ম্ম, ধর্ম্ম, ভাব, বিশিষ্টতা, পাত্রতা, উৎকর্ষবিশেষ, শ্রেষ্ঠতা, রজ্জু, দড়ি, বন্ধনসূত্র, সূতা, দীপবর্ত্তি, দশা, তন্ত্র, তাঁত, তার, ধনুকের ছিলা, মৌর্ব্বী, জ্যা, হার, নৌকার মাস্তলে বদ্ধ আকর্ষণ রজ্জু, স্নায়ু, সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিবিধ পদার্থ (ইহারা দেহীকে দেহে বন্ধন করে, এই গুণসাধর্ম্মে সত্ত্বাদি 'গুণ' নামে অভিহিত), বিদ্যাবিনয়াদি, জ্ঞানাদি, ধর্ম্মভেদ, বিশেষধর্ম্ম, ভব্যাশ্রিত শৌর্য্যাদি, বৈশেষিক অনুসারে চতুর্বিংশতি বিষয়, পঞ্চতন্মাত্র, মাধুর্য্যাদি, ষাড়গুণ্য, শব্দাদিগুণযুক্ত আকাশাদি, রাজশক্তিত্রয়, উৎসাহাদি, অপ্রধানধর্ম্ম, বিশেষণ, ইন্দ্রিয়, ব্যঞ্জন, '৩' সংখ্যা, বৃত্তখণ্ডের জ্যা, ব্যাকরণে অ-কার এ-কার ও-কার, বিবার-প্রভৃতি একাদশ বাহ্য প্রযত্ন, মুমুক্ষাসাধন বিবেকবৈরাগ্যশুশ্রূষা প্রভৃতি, অষ্টবিধ বীর্য্য, সূদ, পাচক, ভীমসেন, গুণক, দূর্ব্বা, মূর্ব্বা, শব্দধর্ম্মের একতম, ত্যাগ, উপকার, আবৃত্তি, অভ্যাস, বার (প্রত্যেক'বার'-এর বার), পূরণ, ফল, অর্থ, শ্রেয়ঃ, স্তম্ব, আতিশয্য, বশীকরণার্থ মন্ত্রৌষধের প্রয়োগ, গুণাঢ্য-কৃত বৃহৎকথা, অলৌকিক উপায়, নবগুণ, পৈতা; গুণচট; গণনা করা, গণা, স্বীকার করা, মানা, চিন্তা করা, স্মরণ করা, গ্রাহ্য করা, গণ্য করা, স্থির করা, মনে করা, উচ্চারণ করা, বিচার করা, বোধ করা। (ব.শ.)। ৪. অ্যাকাডেমি কেবল quality, multiply অর্থে শব্দটির প্রয়োগ করে থাকে, তবে জনসাধারণ্যে শব্দটি এখনও বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। ৫. আমাদের এই শব্দার্থ-অনুসন্ধান কর্মে একটি অদ্ভুত সত্যের উপলব্ধি ঘটেছে আমাদের। আমরা অবাক হয়ে দেখেছি, যেসব বিষয় বুঝে ওঠা সবচেয়ে কঠিন বলে মনে হয় সেগুলির ক্ষেত্রে প্রায়শই যথার্থে অতীব জ্ঞানী মানুষের বোধ এবং একেবারেই লেখাপড়া না-জানা তথাকথিত সাধারণ মানুষের বোধ এক বিন্দুতে অবস্থান করে। 'ণ' বর্ণটির কথাই ধরা যাক। আমরা জানি 'ণ' বর্ণটি ং-এর রহস্যরূপ। এই রূপ সর্বত্র সুনির্দিষ্টভাবে বোধগম্য হয় না, তবে অনুমিত হয়। এখানে **গণ**, **গুণ** প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে 'ণ' বর্ণের ভিতরের অর্থটি অনুমান করার চেষ্টা করা

যাক। আগেই দেখেছি, **গণ** হল 'গামীর রহস্যময়তা থাকে যাহাতে'। এই রহস্যরূপ গামীদেরকে একত্র ধরে রাখার সূত্র। অর্থাৎ 'ণ' বর্ণের ভিতরে 'সূত্র' অর্থটি রয়েছে। কিন্তু গুণ-এর বেলায় রহস্যময়তা গামীর নয়, নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর। একে সঠিক ভাবে বুঝেছিলেন আমাদের সংস্কৃতকার জ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা এবং তথাকথিত সাধারণ মানুষেরা। সেই সাধারণ মানুষেরা আজও যে দড়িতে নৌকা বেঁধে টানেন, তাকে 'গুণ' বলেন। এতে নৌকার গতিশীলতা গুণ-দড়িতে (নবরূপে) উত্তীর্ণ। এই গুণ ধরে টান মারলেই গোটা নৌকাটিই এগিয়ে চলে। আর আমাদের জ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা দেহীমাত্রের গুণ (অস্তিত্বের মূলসূত্র) দেখে ফেলেছিলেন, এবং তা ধরে টান বা ঠেলা মারলে দেহী আকৃষ্ট বা নিগৃহীত হয়। দেহীর এই গুণকে তাঁরা পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছিলেন সত্ত্ব রজ তম বলে এবং একত্রে এদের বলতেন দেহীর 'গুণ'। উপরে গুণ শব্দের যত প্রচলিত অর্থ দেওয়া হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিই বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের এইরূপ মূলসূত্র বা 'গুণ'। তার ভিতরে নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর রহস্যরূপ হিসেবে সেই দেহীর সূত্র বা সূত্রগুচ্ছ একত্র হয়ে রয়েছে। এই গুণকে ধরে নিতে পারলে দেহীকেও ধরা যায়। এই সত্যটিকে ঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারলে আমরা একই সঙ্গে 'গণনা করা', 'গণ্য করা', 'গুণ করা' (= multiply), 'গুণ করা' (মন্ত্রৌষধের প্রয়োগ করা) — সবই বুঝতে পারি। গণনা-র কথাটিই প্রথমে ধরা যাক। 'পহ্‌লে আপ, পহ্‌লে আপ'-এর গল্প যাঁরা জানেন, তাঁরা সহজেই বুঝতে পারেন, 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার' যতই করি, দরজা দিয়ে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে (এবং আরও বহু ক্ষেত্রে) দুই বা ততোধিক মানুষের সমমর্যাদা কিছুতেই রক্ষা করা যায় না; কাউকে আগে এবং কাউকে পেছনে যেতেই হয়। অন্যথায় প্রত্যেক বিড়ালের জন্য পৃথক ছিদ্রের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তা মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে পরিত্যাজ্য। তাই গণ যখন যায়, তখন এক-এক করেই যায় — শুরু হয়ে যায় 'গণের অন' হতে থাকা, বা **গণনা**। এই গণনা শেষ হওয়ার পর আপনার মাথায় যে-সংখ্যাটি এল, সেই সংখ্যাটি আরও রহস্যময়। এটি একটি সংখ্যা যা সত্য কিন্তু সত্য নয়। সত্য এইজন্য যে, তা গণ-এর গণনফল; মিথ্যা এইজন্য যে, সংখ্যাটি গণ নয় — সংখ্যাটিকে ধারণারূপে মাথায় রাখলে তা পুরো রহস্যময়, আর তা লিখে রাখলে আরও রহস্যময় চিহ্নমাত্র। তবে এই যে ধারণা তা কিন্তু অনন্ত শক্তিধর সূত্র। এ গামী নয়, এ হল গামীদের একটি সূত্র, গামীদের এক গুণ; নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর রহস্যময়তা। এই গুণ ধরে টান মারলে সকল গামীরা তাতে এসে যাবে গুণফল রূপে। কিন্তু এরকম দুই গুণ ধরে টান মারলে এসে যাবে সকল গামীদের হাতের গুণফল, আর বিশ গুণ ধরে টান মারলে এসে যাবে সমস্ত গামীদের আঙুলের গুণফল। শুধু তাই নয়, এই গুণসূত্র ধরে টান মেরে বা গুণসূত্র দিয়ে সেলাই করে গামীকে নিজের বশেও আনা যায়। এই কারণে 'গুণ' নৌকার গুণ হয়, পণ্ডিতদের 'গুণ' (quality, multiply, subjugate, gunny-bag) করাও হয়। **৬.** ইংরেজি gunny-bag।

গুণ্ঠন (গুণ্ঠিত) : **১.** ✓গুণ্ঠ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে; ✓গুণ্ঠ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। **(ব.শ.)**। **২.** **গুণ্**-*এর টঙ্কার স্থিতি অন থাকে যাহাতে।* **৩.** **বেষ্টন, আচ্ছাদন,** লেপন; বেষ্টিত, আবৃত, গুণ্ঠিত, নিষ্পিষ্ট, **চূর্ণীকৃত, কৃতধূলিধূসর**। (ব.শ.)। **৪.** কেবলমাত্র 'অবগুণ্ঠন' বা **'ঘোমটা' অর্থে কমবেশি প্রচলিত**। **৫.** গুণ্ঠন ক্রিয়াটিকে বুঝতে সুবিধা করে দেয় **'অবগুণ্ঠন-মুদ্রা'**। মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত সামনে করুন, সেই মুঠোর থেকে কেবল তর্জনীকে সামনের দিকে লম্বা করে অধোমুখ করে ঘোরালে, তবেই সেটি হবে অবগুণ্ঠন-মুদ্রা। আমরা জানি, গুণ টঙ্কারিত হয়ে স্থিত হলে গুণ্ঠ হয়। তাকে অন করে দিলে গুণ্ঠন হয়। এই গুণ্ঠন-এর ব্যবহার এখন নেই। রয়েছে 'অবগুণ্ঠন'-এর, ঘোমটা দেওয়ার। তাতে গুণ বা 'মনোভাব গামীরূপে চোখেমুখে নবরূপে উত্তীর্ণ', যা কিনা টঙ্কারিত হয়েও থেমে আছে মুখেই, বাইরে প্রকাশিত হচ্ছে না। তার সঙ্গে অব উপসর্গ যুক্ত হয়ে তাকে করেছে নতমস্তক। তাই তা 'অবগুণ্ঠন'। যে অবগুণ্ঠন করেছে, সে অবগুণ্ঠিত। তবে এর সঙ্গে গুণ্ঠিত শব্দকে মেলানো ঠিক নয়।

গুণ্ড (গুণ্ডা) : **১.** ✓গুণ্ড্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। **২.** *গুণ্-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে;* ***গুণ্ড-এর আধার।*** **৩.** চূর্ণীকরণ, নিষ্পেষণ, চূর্ণ, গুঁড়া। **৪.** 'গুঁড়া' ও 'গুণ্ডা' রূপে প্রচলিত। **৫.** চূর্ণীকরণ বা নিষ্পেষণ করলেই সত্তার গড়ান্-উড়ান্ সম্ভব হয়। অর্থাৎ চূর্ণীকরণ অর্থটি সত্তার পূর্ববর্তী রূপ। এই চূর্ণীকরণ করে যে, সে গুণ্ড-এর আধার। তাই গুণ্ডা শব্দের অর্থ দাঁড়ায় দুর্বৃত্ত।

-গুল, -গুলা, -গুলি, (গুলো, গুন, গুনা) : **২.** **গুল** = *নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর লালন-লয়ন যাহাতে;* **গুলা** = *গুল-এর আধার যে;* **গুলি** = *গুল গতিশীল বা সক্রিয় যাহাতে।* **৩.** সমূহার্থক, সংখ্যা। গুলিকা, বটিকা, গুড়িকা। (ব.শ.)। **৪.** অনেকার্থে শব্দের প্রত্যয় রূপে ব্যবহৃত হয়। খুবই প্রচলিত। **৫.** এই প্রত্যয়টি বাংলাভাষায় কোথা থেকে এল, তা নিয়ে প্রায় কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। যতদূর বোঝা যায়, এই প্রত্যয়টি মধ্যযুগের বাংলাভাষীর নিজস্ব সৃষ্টি। আর তা সম্ভব হয়েছে বেশ কয়েকটি শব্দের মিশ্রণে। এর মধ্যে গুট, গুড়, গুণ, এবং 'গোল বস্তুবাচক' গুল শব্দের মিশ্রণ রয়েছে। এই শব্দগুলি আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগে ফারসির গুল ও গুল-যুক্ত অন্যান্য শব্দের আবহে উপরোক্ত গুট-গুড় প্রভৃতি শব্দগুলির মিলনে অনেকার্থক গুলি শব্দটি তৈরি হয়ে ওঠে। এর অর্থ উপরে (২) তে দেওয়া হয়েছে।

গুপ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অজুগুপ্সা, অজুগুপ্সিত, কুপ্য, গুত, গুপ্, গুপগাপ, গুপগুপ, গুপত, গুপীযন্ত্র, গুপ্ত, গুপ্তি, গুপ্তী, গোই, গোই(য়ে)ন্দা, গোপ, গোপকন্যা, গোপত, গোপতি, গোপন, গোপানসী, গোপায়ক, গোপাল, গোপাষ্টমী, গোপিকা, গোপিত, গোপিনী, গোপী, গোপুচ্ছ, গোপুর, গোপেন্দ্র, গোপ্তা, গোপ্য, গোয়েন্দা, গোয়েন্দাগিরি, জুগুপ্সা, সংগুপ্ত, সংগোপন, সঙ্গোপন।

গুপ্ = নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর পালন। **গুপ** = নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর পালন থাকে যাহাতে।

গুপ্ত : ১. ✓গুপ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. গুপ্** *বা* **গু**-*পালন তারিত যাহাতে।* **৩.** রক্ষিত, ত্রাত, পালিত, গূঢ়, সংবৃত, প্রচ্ছন্ন, নিয়মিত, সংযত, বশীকৃত, অবিদিত, অপ্রকাশিত, বৈশ্যের নামের পরে প্রযোজ্য উপপদবিশেষ। (ব.শ.)। **৪. পদবী** রূপে এবং secretly kept অর্থে প্রচলিত। **৫.** গাছ কেটে চেরাই করে আপনি অনেকগুলি চেয়ার-টেবিল বানালেন, এবার সেগুলি আপনি কাউকে (মূল্য নিয়ে বা না নিয়ে) দিয়ে দেবেন। এই যে টেবিল-চেয়ার, এতে কী আছে? এতে, গাছের তক্তায় আপনার শ্রম ও মেধা যুক্ত হয়ে নবরূপে উত্তীর্ণ হয়েছে। এইটিকে এখন আপনি রক্ষা করছেন, পালন করছেন, কাউকে দেবেন বলে। একেই শব্দার্থের নিয়মে বলে 'নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর পালন তারিত যাহাতে', অর্থাৎ 'গুপ্ত'। সেকালের সমাজ এরকম কাজ করতে নিষেধ করে দেয়। কিন্তু সমাজবিকাশের সাধারণ নিয়মে কাজটি ছিল অনিবার্য। মানুষে মানুষে ভেদ এসে গেছে, একই কর্মের পুনরাবৃত্তি মানুষকে বিশেষ বিশেষ পেশার দিকে ঠেলে দিয়েছে, বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের ফল ফলে উদ্বৃত্ত হচ্ছে, অথচ তা বিক্রি করা যাবে না — এ নিষেধ মান্য করা কঠিন ছিল। অগত্যা লোকে এই 'গুপ্' (= নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর পালন) কর্ম্মটি সমাজের চোখের আড়ালে লুকিয়ে করতে শুরু করে বা করতে বাধ্য হয়। ফল হয় এই যে, 'গামীকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে পালন করা'র মানেই দাঁড়িয়ে যায় 'লুকিয়ে কিছু করা'। যে তা করে সেও একদিন 'গুপ্ত' নাম পেয়ে যায়। যৌথসমাজের উৎপন্নের বিলিব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন যে বৈশ্য সম্প্রদায়, তারাই একাজ করতে শুরু করেন। সমাজে বিনিময়ের মর্য্যাদা (**অধর্ম্ম**-এর মর্য্যাদা) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এঁরা ব্যবসায়ী নামে কথিত হন এবং 'গুপ্ত' শব্দটি হীনতাবাচক না হয়ে মর্য্যাদাসূচক হয়ে যায়; আর সেই মর্য্যাদাসূচক 'গুপ্ত' শব্দটি একসময় তাঁদের নামের শেষে উপপদ বা **পদবী** রূপে যুক্ত হয়ে যায়।

গোপ (গোপন, গোপাল, গোপালন, গোপিনী, গোপী) : ১. ✓গুপ্ + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে; গো + ✓পা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***গোপ = গুপ বা গুপ্ত করে যে; গোপাল*** *= গো পালন করে যে।* **৩.** রক্ষক, ত্রাতা, পালক, উপকারক, গোপন করা, লুকান, ঢাকা। (ব.শ.)। **৪.** গোপন কথাটি secret অর্থে, গোপাল শব্দটি নাম রূপে প্রচলিত। গোপ শব্দটি আজকাল কেবলমাত্র 'গোয়ালা' সম্প্রদায়কে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, অন্যথায় শব্দটি এখন অপ্রচলিত। পরিবর্তে কখনো কখনো 'গাপ' (গাপ করে দেওয়া) শব্দের ব্যবহার হতে দেখা যায়। **৫.** দ্র. **গোবিন্দ**। 'গো পালন করা' বলতে একালে আমরা 'গরু' পালন বা cow breeding বুঝি। 'টাকা' বললে ৫-১০-২০-৫০-১০০-৫০০-১০০০ টাকার নোট কিংবা কোটি টাকার চেক অথবা ব্ল্যাংক চেক বাদ দিয়ে সবাই যদি কেবলমাত্র ১ টাকার মুদ্রাই বোঝে, তাহলে যে ভুল হয়, 'গোপালন' কথাটি শুনে কেবল গরু-পালন বুঝলে অনেকটা সেইরকম ভুল হয়। বলতে কি, যাঁরা গোপালন বলতে animal husbandry বোঝেন, বৈষ্ণব সাহিত্যের তাঁরা কিছুই বোঝেননি। গোলোকে, গোলোক-বৈকুণ্ঠপুরীতে স্বয়ং **নারায়ণ** থাকেন **লক্ষ্মী**কে নিয়ে; cow থাকে না। কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণের প্রথম পদেই জানিয়েছেন, 'গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর। / লক্ষ্মী সহ তথায় আছেন গদাধর।।' ইংরেজি শিক্ষার চাপে এবং দেশীয় শিক্ষার বিস্মৃতির কারণে অনেকেই মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণের গোপালন animal husbandry-ই বটে। বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ সেরকম আদৌ ভাবতেন না। রূপ সনাতন প্রমুখ বৈষ্ণব গুরুদের কথা বাদ দিন, বহু সাধারণ বৈষ্ণব-ধর্মাবলম্বীরাও জানেন, শ্রীকৃষ্ণের এই গরু চরানো cow তাড়ানো নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে-গো-এর পেছনে দৌড়ে-বেড়ানো-কৃষ্ণের প্রেমে বিভোর ছিলেন, সেই গো cow ছিল না; সে ছিল সেকালের মানুষের দ্বারা অর্জিত সর্বোচ্চ তত্ত্ব, বোধের ক্ষেত্রে মানুষের সর্বোচ্চ অর্জন — ব্রহ্মস্বরূপ অরূপরতন। (দ্র. **গবেষণা, গোস্বামী**।) এই বোধও বাক্যের মাধ্যমে যায়, তাই তারা 'গো'-পদবাচ্য। গোস্বামীরা এই গো-এর বা তত্ত্বকথার অধিকারী ছিলেন, cow-এর মালিক বা গোহাটার গরু-পাইকার ছিলেন না। অতএব গোপ বললে তার উচ্চ থেকে নিম্ন সব স্তরের অর্থই বুঝতে হবে। গোপ গোয়ালা গরুর দুধের কারবারি হতে পারেন, ব্রহ্মরসেরও কারবারি হতে পারেন। দ্র. **ব্রহ্ম, নারায়ণ**।

গুহ্ (গহ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অগহীন, অতিগহন, অগূঢ়,. গএনা, গয়না, গয়নাগাঁটি, গহ্, গহ, গহন, গহনা, গহীন, গুহ্, গুহ, গুহক, গুহা, গুহাশয়, গুহ্য, গুহ্যক, গূঢ়, গূঢ়োৎপন্ন, গূহন, গোফা, গোহ্য, নিগূঢ়।

গুহ্ (গহ্) = গু-এর হওয়ন। **গুহ** = গু-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর) হওয়ন যাহাতে। **গহ** = গামীর হওয়ন যাহাতে।

গহন (গহনা) : ১. ✓গভ্ + অন্। / ✓গহ্ + অন (ল্যুট্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *গামীর ভরণ এবং বা ভক্ষণ অন থাকে যাহাতে।* **৩.** দুষ্প্রবেশ, দুরবগাহ, দুর্গম, নিবিড়, নিরন্তর, ঘন, সূচিভেদ্য, গাঢ়, দুর্ব্বোধ, দুর্জ্ঞেয়, ক্লেশকর, দুঃখকর, পীড়াকর, সান্দ্র, অত্যধিক, প্রবল, বিবৃদ্ধ, গভীর, গম্ভীর, অগাধ, কানন, বন, নিবিড়ারণ্য, নিভৃতস্থান, গূঢ়প্রদেশ, দুঃখ, কষ্ট, বৈষম্য, দুর্গমস্থান, গহ্বর, গণ, সমূহ, সঙ্ঘ, লোকসংঘাত, সংমর্দ্দ, ভিড়, রাজি, সমূহ, পুঞ্জ। (ব.শ.)। **৪.** deep (forest) অর্থে প্রচলিত। **৫.** যতদূর বোঝা গেছে, এই 'গহ্' শব্দের 'হ্' আসলে 'ভ্'। গহ্বর, গভীর, গম্ভীর, ও গহন মূলত একই ধারণার ইতরবিশেষে বদলেছে। একে গভন, গভর, গভীর, গংভীর হিসেবে বুঝলে তবু খানিকটা বোঝা যায়। অন্যথায় গহনাদি শব্দগুলির বঙ্গীয় শব্দকোষ প্রদত্ত অর্থের সঙ্গে তাদের কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। দ্র. **গভীর, গম্ভীর**।

গুহ, গুহা (গুহক, গুহাশয়) : ১. গুহ = **✓**গুহ্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে; অথবা, গুহা + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে। **গুহা = ✓**গুহ্ + অ (অঙ্) - অধিকরণে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (**গুহাশয় = গুহা + =** ✓শী + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে)। (ব.শ.)। **২.** ***গুহ*** *= নবরূপে উত্তীর্ণ গামী (স্থির) হয় যাহাতে;* ***গুহা*** *= গুহ-র আধার যে।* / দেবসেনাকে

রক্ষা করে যে; গুহায় বাস করে যে। (ব.শ.)। ৩. **গুহ্** = অশ্ব, শৃঙ্গ**বের পুরাধিপতি** রামচন্দ্রের মিত্র নিষাদরাজ, গুহক। সংবরণস্থান, **অকৃত্রিম পর্ব্বত**রন্ধ্র, দেবখাতবিল, পর্ব্বতাদির গহ্বর, গর্ত্ত, (সাদৃশ্যে) **হৃদয়, বুদ্ধি, গুপ্ত**স্থান, নিভৃত, বুদ্ধির অবিষয় স্থান, শালপর্ণীবৃক্ষ, **সিংহপুচ্ছা**লতা, চাকুলিয়া, কার্ত্তিকেয়। গুহাশায়ী, সিংহব্যাঘ্রাদি জন্তু, **মূষিক**, হৃদিস্থ বিষ্ণু, পরমাত্মা। (ব.শ.)। **গুহক** = নিষাদরাজ। গঙ্গার **তীরস্থিত** শৃঙ্গবেরপুর-এর এক নিষাদজাতীয় বলশালী রাজা এবং রামচন্দ্রের মিত্র। ... বনগমনকালে রাম ... গুহকের অতিথি হন। ... রামলক্ষ্মণের জটা নির্মাণের জন্য গুহক বটবৃক্ষের নির্যাস সংগ্রহ করে দেন ও ভাগীরথীর অন্য পারে যাবার নৌকা প্রভৃতি দান করে রামের পরিচর্যা করেন। ... রামের অন্বেষণকালে ভরত এঁরই অতিথি হন এবং এঁরই সহায়তায় ... নদীর পরপারে পৌঁছতে সক্ষম হন। চোদ্দো বছর পর রাম অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করবার সময় গুহকের সঙ্গে রামের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। ((পৌ.অ.)। ৪. গুহ শব্দটি পদবী রূপে এবং গুহা শব্দটি cave অর্থে প্রচলিত, বাকিগুলি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কোণ**। হজরত মহম্মদ গুহায় ধ্যান করে জগৎস্রষ্টার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। আইনস্টাইন জগৎ থেকে নিজেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে তাঁর আবিষ্কারের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। মানুষের সমাজে যাঁদেরকে নতুনের স্রষ্টা বলে মনে করা হয়, তাঁরা এইরকম '**কোণ**' বা গুহা বেছে নেন, নিজেদের অন্বিষ্ট খুঁজে পাওয়ার সাধনায় লিপ্ত থাকার জন্য। একে কেউ কেউ বাহ্যিক গুহা ভাবেন, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই গুহা বাহ্যিক গুহা নয়, সমাজের ভিড়ের ফাঁক মাত্র। এখানেই নতুনের (নতুন উৎপন্নেরও) জন্ম হয়েছিল সেকালেও। যাঁরা সেই নতুনের সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, তাঁদের **গুহ** বলা হত। ব.শ. জানিয়েছেন, স্বয়ং বিষ্ণু বা পরমাত্মা আমাদের হৃদিস্থ গুহায় শয়ন করে থাকেন। আর মহাভারতে স্পষ্ট করে বলাই আছে — ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত।

বস্তুত 'গুহ' বা 'গামীকে নবরূপে উত্তীর্ণ হওয়ানো' কথাটির মধ্যে গোপন করা বা লুকোনোর কোনো অর্থ নেই। এটি একটি স্বাভাবিক ক্রিয়া। কিন্তু এককালে সমাজ গুহ-করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষকে গুহন (গূহন) ক্রিয়া করতে হত, হয়েছিল। আর, সমাজের নিষেধের কারণে তা করতে হয়েছিল সমাজের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। ফলে, গুহন-কর্ম্মের বা 'গামীকে নবরূপে উত্তীর্ণ করা'র নাম হয়ে যায় কোনো কিছু 'লুকিয়ে করা', বা 'গোপনে করা'। দ্র. **গুপ্ত**।

গুহ্য, গুহ্যক : ১. গুহ্য = ✓গুহ্ + য (ক্যপ্) - কর্ম্মবাচ্যে; গুহ্যক = ✓গুহ্ + য (ক্যপ্) - কর্তৃবাচ্যে বাহুলকে + স্বার্থে ক (কপ্) । (ব.শ.)। ২. **গুহ্য** = *গুহ থাকে যাহাতে;* **গুহ্যক** = *গুহ্য করে যে।* ৩. আচ্ছাদ্য, গোপনীয়, রহস্য, বিবিক্ত, গূঢ়, গুহার্হ, হৃদয়নিহিত বিষ্ণু, মহাদেব, উপদেবতাবিশেষ, কচ্ছপ, দম্ভ, গোপ্য, গূঢ়বিষয়, গুহ্যদ্বার, উপস্থ, স্ত্রীপুংসচিহ্ন, নিভৃতস্থান। কুবেরের নিধিরক্ষক, কুবেরানুচর দেবযোনিবিশেষ, মণিভদ্রাদি যক্ষ। (ব.শ.)। ... এদের আবাসস্থল পিশাচলোকের উপর ও গন্ধর্বলোকের নীচে। (পৌ.অ.) । ৪. একমাত্র rectum বোঝাতে 'গুহ্যদ্বার' শব্দটি কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. যা কিছু গোপন করা হয়, তা সবই গুহ্য পদবাচ্য, তা উপরোক্ত (৩) অর্থের যেকোনোটিই হতে পারে। আমাদের উপস্থ, লিঙ্গাদি আমরা গোপন করি, তাই সেগুলিও গুহ্য। এমনকী সেকালে, যখন বিক্রিবাটা নিষিদ্ধ ছিল, টাকাপয়সাও গুহ্য ছিল। যারা সেটি গোপন করত, তাদের বলা হত গুহ্যক। স্বভাবতই তারা সেকালের ব্যাঙ্কের বা কুবেরের **নিধি** (প্রতিনিধি) ছিল।

গূঢ় (ঢাকঢাক-গূঢ়গূঢ়, ঢাকঢাক-গুড়গুড়) : ১. ✓গুহ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহাকে* **গুহ** *করা হইয়াছে।* ৩. গুপ্ত, আচ্ছাদিত, সংবৃত, অপ্রকাশ, অব্যক্ত, প্রচ্ছন্ন, ছদ্মবেশ, গম্ভীরার্থ, মাংসলত্ব হেতু নিমগ্ন, অলক্ষ্য, অদৃশ্য, নিভৃত, একান্ত, রহস্য, গুহ্য। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি প্রচলিত। তবে ঢাকঢাক-গুড়গুড় শব্দবন্ধটি অনেক বেশি প্রচলিত। ৫. প্রথমে আমাদের মনে হয়েছিল, ঢাকঢাক-গুড়গুড় শব্দটি বুঝিবা ঢাকঢাক-গূঢ়গূঢ় শব্দেরই একটি রূপ। কিন্তু গূঢ় ও গুড় শব্দের নিহিতার্থ আমাদের জানায়, শব্দটি দুরকম ভাবেই সিদ্ধ হতে পারে। দ্র. **ঢাকা**।

গৃ (গৄ, গর্জ্জ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা: অগর, অগরু, অগর্ব্ব, অগিম, অগুরু, অগোর, অগৌর, অতিগুরু, আগর, আগার, উদগার, উদগীর্ণ, উদ্‌গ্রীব, গউর, গউরব, গড়ল (গরল), গত্ত, গদ্দান, গর, গরগর, গ'র (গইর), গরজ, গরজ (গর্জ্জ), গরজা, গরদ, গর(ড়)ফুটন্ত, গরব, গরভ, গরম, গরমাই, গরমি, গরমী, গররা, গরল, গ'রশাল, গরহাজির, গরাণ, গরাদ, গরিব (গরীব), গরিমা, গরিষ্ঠ, গরীয়, গরীয়ান, গরুঅ, গরুড়, গরুড়ধ্বজ, গরুড়পুরাণ, গরুড়ব্যূহ, গরুড়মণি, গরুড়াগ্রজ, গরুৎ, গরুৎমন্ত, গরুত্মান, গরুবে, গরুয়া, গর্গ, গর্গর, গর্জ্জ্, গর্জ্জ, গর্জ্জন, গর্জ্জিত, গর্ত্ত, গর্দ্দভ, গর্দ্দা, গর্দ্দান, গর্দ্দানা, গর্দ্ধভ, গর্দ্ধন, গর্ব্ব, গর্ব্বিত, গর্ব্বী, গর্ভ, গর্ভক, গর্ভকেশর, গর্ভকোশ, গর্ভগৃহ, গর্ভঘুটিক, গর্ভথোড়, গর্ভদাস, গর্ভভবন, গর্ভর (গহ্বর), গর্ভস্থ, গর্ভস্নান, গর্ভস্রাব, গর্ভাগার, গর্ভাঙ্ক, গর্ভাধান, গর্ভাশয়, গর্ভিণী, গর্ভিত, গর্ভোদক, গর্ভোপঘাতিনী, গাগর, গাগরা, গাগরি(রী), গাজ, গাজন, গাজর, গাদ, গাব, গাবড়া, গাভা, গাভিন, গারুড়, গারুড়ি, গারুড়িক (বিষবৈদ্য, চিকিৎসক, জাঙ্গুলিক, বিষভীষক), গারুড়িয়া, গারুড়ী, গারুড়ীয়, গরুত্মত, গার্গী, গার্জ্জেন (guardian), গাঁরদ (গর্দ্দ, guard), গিধিনী, গিন্নি, গির, গিরগিটি, গিরস, গিরস্ত, গিরস্থ, গিরা, গিরি, -গিরি, গিরিকা, গিরিচক্রবর্ত্তী, গিরিজ, গিরিজা, গিরিনদী, গিরিনিতম্ব, গিরিদুর্গ, গিরিবি (গির্‌বি, গরিব), গিরিব্রজ, গিরিভূ, গিরিমান, গিরিয়াল, গিরিরাজ, গিরিরায়, গিরিশ, গিরিসঙ্কট, গিরিসার, গিরিসুত, গিরীন্দ্র, গিরীশ, গিরে, গিরেগ্তার, গিরো (গেরো) , গির্জ্জা (গর্জ্জ, গিরিজা), গীঃ (গির্), গীর (ঝরা), গীর্ণ, গীর্ব্বাণ, গীষ্পতি, গুজরাট, গুরগুর, গু(গৃ)রণ, গুরু, গুরুকথা, গুরুকরণ, গুরুক্রম, গুরুগতি, গুরুগর্ব্বিত, গুরুগিরী, গুরুগুরু, গুরুগুষ্টি, গুরুঘ্ন, গুরুচণ্ডালী, গুরুচর্য্যা, গুরুজন, গুরুতম, গুরুতর, গুরুতল্প, গুরুতা, গুরুত্ব, গুরুদশা, গুরুদৈবত, গুরুপত্নী, গুরুপাদ, গুরুপ্রসাদ,

গুরুপ্রসাদী, গুরুবল, গুরুবার, গুরুবৃত্তি, গুরুভাই, গুরুমতী, গুরুমাতা, গুরুমারা-বিদ্যা, গুরুয়া, গুরুলাঘব, গুর্জ্জর, গুর্জ্জরাতী, গুর্ব্বঙ্গনা, গুর্ব্বর্থ, গুর্ব্বিণী, গুর্বী, গৃঞ্জন, গৃধিনী, গৃহিণী, গৃঞ্জন, গৃধ্ (greed), গৃধিনী, গৃধ্নু, গৃধ্য, গৃধ্র, গৃবা, গৄ, গেজেট (গাজৎ, gazzetta), গেরম্বারী (গেরেম্ভারী, গরিমায় ভারী), গেরি, গেরিমাটি, গৈরিক, গৈরী, গোউর, গোবরাট, গোর, গোর (গামীকে রাখা হয়েছে যেখানে), গোরা, গোরো, গৌরী, গৌর, গৌরচন্দ্র, গৌরচন্দ্রিকা, গৌরব, গৌরবচন, গৌরবিত, গৌরবী, গৌরমুখ, গৌরাং, গৌরাঙ, গৌরাঙ্গ, গৌরিক, গৌরিন, গৌরী, গ্রাবা, গ্রাবু, গ্রীক, গ্রীবা (grib), গ্রেপ্তার (গৃপ্ত), গ্রেপ্তারি (গিরফতার, grib), গ্রৈব, টগর, তগর, তগির, নিগর, নিগীর্ণ, সগর, সমুদগরণ, সসাগর, সাগর, সাগরগামী, সাগরসঙ্গম। **গৃ (গৄ, গৰ্জ্জ) =** গমনের রক্ষণ-ভক্ষণ; আবর্ত্তমান গামী। **গৄ =** আবর্ত্তমান গামীর আবর্তন। **গর্জ্জ =** গামীর আবর্ত্ত-জনন জাত হয় যাহা হইতে। [ইংরেজির gra-, gree-, gri-যুক্ত অধিকাংশ শব্দ (যথা, grab, grasp, grass etc; greedy, greet etc; grim, grip, etc.) এই শব্দ-পরিবারের সদস্য।]

গর্, গর্গর্ : ১. গ + র্। গর্ + গর্। ২. ***গব** = গামীর রক্ষণ-ভক্ষণ (আবর্তন) থাকে যাহাতে; **গরগর** = গর-এর ক্রমান্বয় থাকে যাহাতে।* ৩. **গরগর করা** = (কোপে) গরগর করা, কোপব্যাকুলতা প্রকাশ করা, কোপজ্বলিত বা ক্রোধান্ধ হওয়া, কোপে ব্যাকুলতা অনুভব করা। (ব.শ.)। ৪. ধ্বন্যাত্মক শব্দ রূপে গর্ ও গর্গর্ প্রচলিত। ৫. দ্র. **কৃ**। গামী যদি কোথায় যাওয়ার জন্য একটি বিন্দুতে ঘুরতে থাকে, তাকে বলে গৃ বা গর্। তবে গমনেচ্ছুর দিক থেকে দেখলে, এ তার প্রয়োজন মেটানোর শুভ ইচ্ছা; কিন্তু যার দিকে গমন করে তার দিক থেকে দেখলে, এ হল ভয়ানক শক্তির আগমন, যে কিনা গ্রাস করতে পারে, গ্রহণ করতে পারে, গিলে নিতে পারে, মেরে ফেলতে পারে ইত্যাদি। সেকারণেই গমনেচ্ছুক বাসনার একই বিন্দুতে আবর্ত্তিত হতে থাকাকে বলা হয় গর্গর্, যা কিনা গামী যার দিকে যেতে চায়, তার চোখে ভয়ানক। অতএব 'গর্' গামীর তরফে রক্ষণেচ্ছা হলেও বিপরীত তরফে ভক্ষিত হওয়ার বিপদ বা বিরোধী অহিতকরই বটে। এই 'গর্'-ই প্রসারিত বিস্তারিত হতে হতে গর্জ্জন, গর্দ্দন ইত্যাদি হয়ে থাকে।

বাংলায় রক্ষকই ভক্ষক হয়ে যাওয়ার ধারণাটি প্রাচীন। কার্যত যে রক্ষা করব বলে কিন্তু গ্রাস করে নেয়, তাকেই রাক্ষস বলে। আর এরকম হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, রক্ষা করা মানেই এখতিয়ারভুক্ত করা। আর, এখতিয়ারভুক্ত করা মানেই যাকে এখতিয়ারভুক্ত করা হল, তার নিজস্বতা চলে যায়। ফলে তার স্বাভাবিক প্রাণটি আর থাকে না। রক্ষিত তখন দুদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রক্ষকের গ্রাসকবলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। প্রথমত, তার ওপর তার নিজের রীতিনীতি-আইনকানুন আর চলে না, চলে রক্ষকের রীতিনীতি-আইনকানুন। স্বভাবতই যে প্রাকৃতিক রীতিনীতিতে তার অস্তিত্বের বিকাশ চলছিল, তা ধ্বংস হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত রক্ষা মানেই যেমন আছে তেমন রাখার চেষ্টা। তাতে যাকে রাখা হচ্ছে তার বিকাশ অসম্ভব হয়ে যায়। একই কর্মের পুনরাবৃত্তিজনিত গড্ডালিকা তাকে ধ্বংস করে দেয়। এই কারণে যে-গামী রক্ষা করতে আসে, সে-গামী আসলে গ্রাস করতে আসে। উল্লিখিত রক্ষণ এবং বা ভক্ষণ তাই একই কথা হিসেবে লেখা হয়েছে।

আর একটি কথাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তা হল, গরগর করাকে ব.শ. 'কোপব্যাকুলতা প্রকাশ করা' বলেছেন। এই কোপ দেখা দেয় তখনই, যখন গামীর পথ আটকে কেউ দাঁড়িয়ে পড়ে। তখন সে 'গর্ জনন' করতে থাকে। একে 'গর্জ্জন করা' বা 'রাগ' দেখানো বলে। এই রাগ শব্দটিও অনুরাগ ও বিরাগ দুদিক থেকে আসে। এ হল ক্ষমতাধরের প্রেম, গ্রাসে যার শান্তি।

গর (গরমিল, গররাজী, গরহাজির ইত্যাদি) : ১. ✓গৃ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে; (ব.শ.)। ২. ***গর** = যে-গামী রক্ষণ ও ভক্ষণ করে; অথবা, গামী আবর্ত্তমান যাহাতে। /* **গর** = ভক্ষণ বা গ্রাস করে যে। (ব.শ.)। ৩. রোগ, পীড়া, বিষ, উপবিষ, বিষঘ্ন ঔষধ, করণসমূহের অন্তর্গত পঞ্চম করণ। (ব.শ.)। ৪. উপসর্গ রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **গর্, গর্গর্**। স্বতন্ত্রভাবে রোগাদি অর্থে 'গর' শব্দটির প্রচলন এখন আর নেই, কিন্তু **গরল** (গর লালিত যাহাতে) রূপে আছে। এই 'গর' হল আবর্তনশীল গামী অর্থাৎ **গৃ** (দ্র. **কৃ**)। আর 'করণসমূহের অন্তর্গত পঞ্চম করণ' কী বস্তু সেকথা কেউ জানে বলে মনে হয় না। আমাদের অনুমান, এর অর্থ 'সরকারি কর্মচারী'। কারণ, ব.শ. **করণ** শব্দের যে পাঁচটি জাতিবাচক অর্থ দিয়েছেন, তার পঞ্চমটি হল — 'ব্রহ্মার কায় হইতে জাত জাতি'। এই জাতি যে 'সরকারী কর্মচারী' সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে। প্রজাসাধারণ এদেরকে বিপজ্জনক পীড়নকারী রূপে দেখেছিল বলেই তারা সাধারণের চোখে 'গর' পদবাচ্য হয়েছিল। দ্র. **কায়স্থ, খিল**।

তবে উপসর্গ রূপে গর শব্দের ব্যবহার বিপুল। এটি আরবি ভাষা থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। কথাটি ঠিক এবং ভুলও। ঠিক এইজন্য যে, বঙ্গদেশে পাঠান রাজত্বের সূচনার পরই বাংলা ভাষায় গর-উপসর্গ যুক্ত শব্দগুলির প্রচলন করেছিলেন সেকালের বাংলাভাষীরা; কেমন করে করেছিলেন, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর *পঞ্চতন্ত্রের* ২য় পর্বের 'ভাষা' নিবন্ধে। আর ভুল এইজন্য যে, 'গর' শব্দটি আরবির একার 'উত্তরাধিকারলব্ধ' সম্পত্তি নয়, বাংলারও 'উত্তরাধিকারলব্ধ' সম্পত্তি। পার্থক্য এই যে, **গর্** (গামীর যাওয়ার ইচ্ছা) শব্দটিকে বাংলা দুদিক থেকেই দেখতে জানত, আরবি জানত কেবল বিপরীত দিক থেকে। তাই গর-মাত্রেই তাদের কাছে ছিল পর, অপর, **বেচারা**, বিরূপ, বিরোধী, ক্ষতিকর, অস্বস্তিকর, মন্দ, গ্রাসকারী, গ্রহণকারী, দখলকারী ইত্যাদি। বলতে কি, যে সব শব্দ ক্ষতিকর বস্তুকে বোঝাত, আরবিভাষীগণ তাদের সকলের সামনে 'গর' শব্দটিকে উপসর্গ রূপে যোগ করে নিতেন। বঙ্গদেশে তাঁদের আগমনের পর, তাঁদের শব্দব্যবহারের এই পদ্ধতিটি বাংলাভাষীরা গ্রহণ করে নেন। তাতে প্রচুর নতুন শব্দের সৃজন ঘটে বাংলায়। যথা — ***গরকবুল, গরকায়েম, গরঠিকানা, গরপছন্দ, গরপসন্দ, গরবনেদী, গরমিল, গররাজী, গরলায়েক, গরহজম, গরহাজির, গরহাজিরা, গরদিশ*** (বিরূপ

দিশা যাহাতে), ***গরম*** (গর অম যাহাতে), ***গরিব*** (গর ইব যে) ইত্যাদি। অর্থাৎ 'গর' পর হলেও বাংলাভাষীর চোখে পর ছিল না। তাই তাকে নিজের করে নিতে বাংলার দেরি হয়নি। একই ঘটনা ঘটেছিল ফারসির 'বে' উপসর্গের বেলায়। দ্র. **বি, বে**।

গরিব (গরীব) : ১. গর + ইব। **২.** *গর-এর (পরের, বেচারার) মতো যে।* **৩.** দরিদ্র, কাঙাল, নির্দোষ, নিরাশ্রয়। (ব.শ.)। **৪.** poor অর্থে প্রচলিত। **৫.** শব্দটিকে ফারসি থেকে আগত, বলা হয়ে থাকে। কথাটি সত্যি এবং মিথ্যাও। কেন, উপরে **গর** শব্দে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ফারসির গরিব বা গরীব একই গৃ শব্দবংশের সদস্য, যেখান থেকে বাংলার গর-যুক্ত বহু শব্দের জন্ম হয়েছে। এই আত্মীয়তা থাকার কারণে গরিব শব্দটি বাংলায় এমনভাবে গৃহীত হয়েছে, যেন সে তার নিজেরই ঘরের ছেলে।

গরিমা, গরিষ্ঠ, গরীয়ান : ১. গুরু + ইমন্ (ইমনিচ্); গুরু + ইষ্ঠ (ইষ্ঠন্) বহুর মধ্যে একাতিশয্যে; গুরু + ঈয়স্ (ঈয়সুন্) দুইয়ের মধ্যে একাতিশয্যে। (ব.শ.)। **২.** ***গুর্****-এর সীমায়িত রূপ যাহাতে;* ***গুর্****-এর উৎকৃষ্টতম রূপ যাহাতে;* ***গুর্****-এর উৎকৃষ্টতর রূপ যাহাতে।* **৩.** গুরুভাব, গুরুত্ব, ভার, শ্রেষ্ঠত্ব, পূজনীয়তা, গুরুতর, উৎকর্ষ, শিবের অষ্টসিদ্ধির একতম, গৌরব, মাহাত্ম্য; অতিশয় গুরু, গুরুতম, অতিপূজ্য, শ্রেষ্ঠ, গৌরবযুক্ত, অত্যাবশ্যক, ন্যায্যতম, অতিগুরু, নিপুণ, অতিদুর্দমনীয়; গুরুতর, পূজ্যতর, প্রশস্যতর, বলবত্তর, প্রেয়ান, প্রিয়তর। (ব.শ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** ইংরেজিতে good, better, best-এর এখন বাংলা প্রতিশব্দ করা হয় গুরু - গরীয়ান (গরীয়স্) - গরিষ্ঠ। কিন্তু এই প্রতিশব্দকরণ সম্পূর্ণ সমার্থক নয়। good (গুদ) শব্দের ভিতরে **গু** ও **দ** (দান) থাকলেও বাকি দুটি ইংরেজি শব্দের মধ্যে 'গামীর নবরূপে উত্তীর্ণ হওয়া'র বিষয়ে কিছুই নেই। যে গুণের জন্য এই তুলনাত্মক শব্দ, গরিমাদি শব্দ সেই গুণের প্রকৃত স্বরূপ ধারণ করে। মনে রাখা ভাল, শিবের যে **অষ্ট ঐশ্বর্য্য** অণিমাদি গুণ রয়েছে, তাতে গরিমা নেই। নেই বলেই শিব সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা। তাঁর সবকিছু আছে, কিন্তু সে-থাকার গরব নেই; গরিমা নেই। দ্র. **গুরু**।

গরুড় : ১. ✓গৃ, + উড় (উড়চ্) - কর্তৃবাচ্যে; গুরু + ✓ডী + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *যে* ***গর্*** *উড়ে। / যে গুরু ভার লইয়া উড়িয়াছিল।* (ব.শ.)। **৩.** পক্ষিরাজ (ইঁহার মাতা বিনতা, পিতা কশ্যপ। স্বর্গ হইতে সুধা আনিয়া ইনি কদ্রুর নিকটে দাসীপণে বদ্ধ জননীকে উদ্ধার করেন; তদবধি ইনি সর্পগণের পরম শত্রু। সুধানয়নের সময়ে বিষ্ণুদত্ত বরে সুধাপান ব্যতীত ইনি অজর অমর হন এবং বিষ্ণুর উপরে স্থিতি লাভ করেন। নারায়ণও ইঁহার প্রদত্ত বরে ইঁহাকে বাহনরূপে ও রথের ধ্বজরূপে গ্রহণ করেন।), গরুড়াকৃতি ব্যূহবিশেষ, গরুড়সংস্থান (গরুড়াকৃতি) অগ্নিসঞ্চয়, হাড়গিলা, গৃধ্রজাতি বলবান পক্ষিবিশেষ, গরুড়তুল্য মহাবীর। (ব.শ.)। ঋষি কশ্যপ ও তার স্ত্রী বিনতার পুত্র; পক্ষীরাজ ও বিষ্ণুর বাহন। ইনি অর্ধপক্ষী ও অর্ধমানব। শ্বেতবর্ণ মুখ, রক্তবর্ণ পক্ষ ও স্বর্ণাভ দেহ। পক্ষীর ন্যায় চঞ্চু ও নখর। এঁর পুত্রের নাম সম্পাতি। মাতা বিনতাকে কদ্রুর দাসীত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য গরুড় স্বর্গ হতে অমৃত আনয়ন করেন। ... একবার ইন্দ্রসারথি মাতলি তাঁর কন্যা গুণকেশীর সহিত নাগবংশীয় সুমুখের বিবাহ দিতে চান; কিন্তু সুমুখ একমাস পরে গরুড়ের ভক্ষ্য হবেন জেনে মাতলি সুমুখকে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র ও বিষ্ণুর কাছে সমূহ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন। বিষ্ণু সুমুখকে অমৃত পান করিয়ে অমরত্ব দান করার জন্য ইন্দ্রকে বলেন। ইন্দ্র সুমুখকে অমৃত না দিয়েই দীর্ঘায়ু করে দেন। এই সংবাদ পেয়ে গরুড় ইন্দ্রকে বলেন যে, তিনিই নাগদের ভক্ষণ করার বর দান করে এক্ষণে বাধা দান করছেন কেন? ইন্দ্র তখন বলেন যে, বিষ্ণুই সুমুখকে অভয় দিয়েছেন। গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে বিষ্ণুর কাছে আস্ফালন করেন যে, আমি আমার পক্ষের একাংশ দিয়েই তোমাকে ধারণ করি। বিষ্ণু ... তাঁর বাম বাহু গরুড়ের উপর রাখা মাত্রই গরুড় হতচেতন হয়ে ভূমিতে নিপাতিত হন এবং বিষ্ণুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। ... সেই হতে গরুড় সুমুখকে হিংসা করা থেকে বিরত হন।

অন্যত্র লিখিত আছে, কশ্যপ পুত্রেচ্ছু হয়ে যজ্ঞ করতে আরম্ভ করেন। ইন্দ্র, বালখিল্য মুনিগণ ও দেবতারা যজ্ঞের কাঠ আনবার জন্য নিযুক্ত হন। ইন্দ্র খুব বড় বড় পর্বতপ্রমাণ কাঠ আনতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বালখিল্যরা সকলে মিলিতভাবে একখানি পলাশপত্র বয়ে নিয়ে যান। ... ইন্দ্র উপহাস করেন। এর ফলে বালখিল্যরা অত্যন্ত অপমানিত ও রাগান্বিত হয়ে অন্য কোনো দেবতাকে ইন্দ্রত্বে অধিষ্ঠিত করার জন্য সংকল্প করেন। ইন্দ্র ভীত হয়ে কশ্যপের শরণাপন্ন হন। ... কশ্যপ তখন বালখিল্যদের বলেন ... তোমাদের ইন্দ্র পক্ষীদের ইন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করবেন। ... এই দক্ষকন্যা বিনতা পুত্রলাভের জন্য ... এলে কশ্যপ বলেন যে, ... তুমি পৃথিবীশ্রেষ্ঠ দুই পুত্র প্রসব করবে। বালখিল্যদের তপস্যা ও আমার সংকল্পের ফলে এরা পক্ষীদের ইন্দ্র হবে। ... গরুড় পক্ষীদের ইন্দ্রত্ব লাভ করেন।

গরুড় বিভিন্ন নামে পরিচিত। পিতামাতার নাম থেকে গরুড়ের দুই নাম কাশ্যপী ও বৈনতেয়। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে তিনি একটি সুন্দর স্বর্ণময় পালক ফেলে দিয়েছিলেন বলে সুপর্ণ নামেও তিনি পরিচিত। এতদ্ব্যতীত রক্তপক্ষ, সুবর্ণকায়, গগনেশ্বর, খগেশ্বর, খগরাজ, খগপতি, কামায়ুধ, বিষ্ণুরথ, সুধাহর, সুরেন্দ্রজিৎ, বজ্রজিৎ প্রভৃতি বিভিন্ন নামেও গরুড়ের নাম নামাঙ্কিত। রাম-লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক নাগপাশে বদ্ধ হলে, গরুড় এসে এঁদের মুক্ত করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** ইয়োরোপ এরকম পাখি দেখেনি, ভারত দেখেছিল, দেখেছিল নারায়ণ মূর্ত্তির অনুষঙ্গে। বাস্তবে এরকম পাখি দেখা যায় না। কিন্তু মানসবাস্তবে খুব সুস্পষ্ট ভাবেই এ-পাখি রয়েছে, যেকারণে আমাদের পূর্বপুরুষরা তাকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাছাড়া, যা অদৃশ্য কিন্তু মানুষের সমাজে অত্যন্ত সক্রিয়, তাকে বোঝানোর জন্যই তো আমাদের পূর্বপুরুষেরা শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন। 'যে গর্ উড়ে' বেড়ায় আমাদের মানসলোকে, যে কিনা একদা 'গুরু ভার লইয়া উড়িয়াছিল', তাকে তাঁরা দেখেছিলেন বলেই, তাকে নিয়ে এতবড় কাহিনী লিখে গিয়েছেন। **বাহন**-এর অর্থ থেকে আমরা দেখতে পাই, আদিতে মূল ক্রিয়াকারী সত্তাটিকে সনাক্ত করা হয়েছিল, ধরা যাক নারায়ণ রূপে। কিন্তু কালের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজের আরও বিকাশ ঘটলে,

আমাদের পূর্বপুরুষেরা দেখেন, সেই **নারায়ণ** সত্তার দুটো সুস্পষ্ট ভাগ দেখা যাচ্ছে — নারায়ণ-পুরুষ, নারায়ণ-প্রকৃতি। প্রথমটি সত্তাটির বোধ, দ্বিতীয়টি সেই বোধের আধারশক্তি। এই আধারশক্তি প্রকৃতিকে **'লক্ষ্মী'** নামে চিহ্নিত করা হয়। পরে সমাজ আরও বিকশিত হতে থাকলে, আরও বিচূর্ণীভবন ঘটে, দেখা দেয় সত্তার নানা স্তরের বাহন। তখন **শিবশক্তির** বাহন রূপে **বৃষকে**, নারায়ণের বাহন রূপে গরুড়কে, লক্ষ্মীর বাহন রূপে **পেঁচাকে** ... চিহ্নিত করা হয়।

একালের ভাষায় এঁকে **'পুঁজির সমর্থক'** (পুঁজিপতি, পুঁজিবাদী দর্শন, পুঁজিবাদী আইনজীবীগণ ... ইত্যাদি) বলা যেতে পারে। তবে এরকম বলায় একটা বড় ত্রুটি ঘটে যায়। নারায়ণের ও তাঁর বাহনের যে 'পূর্ণ' রূপ, 'পুঁজির সমর্থক' অর্থে তার সিংহভাগ (অধিকাংশই) বাদ পড়ে যায়। দ্র. **গুপ্ত, গোপ**। তবে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় দিয়ে আমরা যেমন বাংলাভাষা-শিক্ষা শুরু করি, নারায়ণ ও তাঁর বাহনের এই প্রাথমিক অর্থ দিয়ে আমরা তাঁর সম্পর্কে বুঝবার চেষ্টা শুরু করতে পারি।

একালের বাংলাভাষীর প্রাথমিক দৃষ্টিতে গরুড়কে আমরা পুঁজির (জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের) বাহন বলতে পারি। এঁরা বড় জ্ঞানের ও বড় পুঁজির সমর্থক কিন্তু ক্ষুদ্র জ্ঞান ও ক্ষুদ্র সম্পদের বিরোধী। এঁরা তাদের গিলে খান, সমাজের সেকেলে পুঁজিকে বা দুধসর পালনকারী ('সরপালনকারী') সর্পদের ভক্ষণ করেন। এই বিষ-শক্তি সমাজ-আকাশে উড়ে বেড়ায়। তাই গরুড়। ইতিহাসের একটি বিশেষ কালখণ্ডে (সম্ভবত অশোকের রাজত্বকালের আগে) এঁদের ভূমিকাই উপরোক্ত কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটির শব্দ ধরে ধরে তার নিহিতার্থ উদ্ধার করতে পারলে, আমরা সেই বিশেষ যুগের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে পেতে পারি। মনে রাখা ভাল, শিল্প বিপ্লবের সময় ছোটপুঁজি, কুটির শিল্প যেমন তার বিরোধী ছিল এবং বড়পুঁজি বা শিল্পপুঁজি ছোটপুঁজিকে খেয়ে ফেলেছিল, ভারতের **নাগেরাও** ছিল গরুড়বিরোধী এবং গরুড় **নাগেদের** ভক্ষণ করেছিল।

গর্গ, গর্গর, গর্গ্য (গার্গ্য, গার্গী) : **১.** ✓গৃ, + গ - কর্তৃবাচ্যে; গর্গ + ✓রা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে; গর্গ + য (য্যঞ্); গার্গ্য + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। (ব.শ.) **২.** ***গর্গ** = যে-গর্ গমন করে; **গর্গর** = গর্গ রহে যাহাতে; **গর্গ্য** = গর্গ (থাকে) যাহাতে; **গার্গ্য** = গর্গ-জাত থাকে যাহাতে; **গার্গী** = গার্গ্যের প্রকৃতিশক্তি যে।* **৩.** আঙ্গিরস মুনিবিশেষ, ব্রহ্মার পুত্র মুনিবিশেষ (ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। গয়া ক্ষেত্রে যজ্ঞার্থ ইনি সৃষ্ট হন। ইনি যদুবংশের পুরোহিত ও আচার্য্য। কৃষ্ণ ও বলরামের নামকরণার্থ বসুদেব ইঁহাকে ব্রজে প্রেরণ করেন।), গর্গের গোত্রাপত্যগণ, তালবিশেষ; গর্গ (গর্গর্)-শব্দকারক মৎস্যবিশেষ, গাগরা টেঙরা, বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, ঘাগর, দধিমন্থনভাণ্ড, মন্থনকলস, মন্থনী, গাগরী, ছোটঘড়া; গর্গের গোত্রাপত্য অর্থাৎ গর্গের পৌত্রাদি; গর্গের গোত্রাপত্য-স্ত্রী অর্থাৎ পৌত্রী প্রভৃতি। (ব.শ.)। বৃহস্পতির বংশজাত এক মুনি বিতথের পুত্র। ভাগবত অনুসারে ইনি শিবের আরাধনা করে চৌষট্টি অঙ্গ জ্যোতিষাদিতে জ্ঞান লাভ করেন। ইনি যাদবগণের কুলগুরুরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁর পুত্র গার্গ্য ও কন্যা গার্গী। বিষ্ণুপুরাণ মতে গর্গ্য হতে শিনির জন্ম হয়। এই শিনি হতে গার্গ্য ও শৈন্য নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণরা জন্মগ্রহণ করে। **গার্গী** = বৈদিক যুগের একজন বিদুষী ঋষিকন্যা। ইনি গর্গমুনির কন্যা। বেদের অনেক সূক্ত ও মন্ত্রের রচয়িতা এই ব্রহ্মবাদিনী গার্গী। মিথিলার রাজা জনকের ... যজ্ঞসভায় গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত (তর্ক) বিচার করতে আরম্ভ করেন। ... প্রশ্ন জর্জরিত যাজ্ঞবল্ক্য ক্রোধে আত্মহারা হয়ে গার্গীকে প্রশ্ন করা বন্ধ করতে বলেন, নতুবা বেদবিধি অন্যায়ভাবে অতিক্রম করার অপরাধে তৎক্ষণাৎ গার্গীর মাথা খসে পড়বে — একথাও জানান। এরপরও গার্গী দুইটি প্রশ্ন করেন। ... যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয়, কিন্তু গার্গী যে বেদবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলেন, তাতে তিনি প্রাচীন ভারতের একজন মহীয়সী, শক্তিমতী ও ব্রহ্মবাদিনী নারী বলে পরিগণিত হন। **গার্গ্য** = মহাতপা মহর্ষি। ইনি অন্ধক ও বৃষ্ণিদের গুরু ছিলেন। ব্রহ্মচর্য ব্রত অবলম্বন করায় স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতেন না; চিরকাল ঊর্ধ্বরেতা হয়ে কালক্ষেপ করতেন। ... ইনি বৃষ্ণিবংশেই বিবাহ করেন। একবার তাঁর শ্যালক গার্গ্যের পুরুষত্ব পরীক্ষার জন্য তাঁর পুরুষাঙ্গ চালনা করলে তাঁর দৃঢ়-ব্রতত্বের জন্য রেতঃস্খলন হয় না। তখন তাঁকে নপুংসক অপবাদ দেওয়া হয়। ... পরে মহাদেব তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাতেজা পুত্র লাভের বর দেন। ... জানতে পেরে ... যবনরাজা গোপালী নামে এক অপ্সরাকে তাঁর সঙ্গে মিলিত করে দেন। গোপালীর গর্ভে অন্ধক ও বৃষ্ণিদের প্রবল শত্রু কালযবন নামক এক মহাতেজা পুত্রের জন্ম হয়। ... (পৌ.অ.)। **৪.** নামরূপে গার্গী প্রচলিত। বাকিগুলি অপ্রচলিত। **৫.** দিশাগ্রস্ত জ্ঞান জ্ঞানীর অগ্রগতিকে দুর্নিবার করে সন্দেহ নেই, বিপরীতে যাদের দিকে সে যায় তাদের পক্ষে সেই গর হয় ক্ষতিকর, বিপজ্জনক, গরল পদবাচ্য। এই কারণে গর্-গমনকারী নিজ পক্ষে শুভ হলেও অন্য পক্ষে অশুভ হয়।

তা সেই যাই হোক, এই 'গর্গ' শব্দটি কেবল গাগরী কিংবা গাগরা-টেঙরা মাছকেই বোঝাত না, বোঝাত মানুষের সমাজে যে জ্ঞানজীবীরা **গর** নিয়ে চলার কারণে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতেন, সেই সমস্ত মানুষকেই। সমগ্র ইতিহাসের প্রেক্ষিতে দেখলে বোঝা যায়, এই শব্দে ও তার অনুষঙ্গে ভারতে বেদজীবী ব্রাহ্মণদের একটি গোষ্ঠীর ইতিহাস অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। শব্দশাস্ত্রে এই গর্গ গোষ্ঠীর বা গার্গ্যগণের অবদান যাস্ক লিখে গেছেন। এঁরা শব্দের ক্রিয়াভিত্তিকতা ত্যাগ করে প্রতীকী অর্থের দিকে সর্বাগ্রে পা বাড়ান। পরে সেই পথের শ্রেষ্ঠ পথিক রূপে আসেন পাণিনি। গার্গীর পুরাকথা বুঝে-না-বুঝে এখনও কমবেশি প্রচলিত আছে। এমনকি যে গর্গ শব্দের সাহায্যে এই গোষ্ঠীটিকে বোঝানো হত, সেই শব্দটিই ইংরেজিতে পরিণত হয়েছে George শব্দে। রুশ ভাষায় শব্দটি 'গিয়র্গি' হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দ্র. **গার্গ্য, গার্গী**। **৬.** ল্যাটিন gurges। (ব.শ.)। ইংরেজি georgic (= জর্জিক = কৃষিকর্ম সংক্রান্ত)।

গর্জ্জ, গর্জ্জক, গর্জ্জন : **১.** ✓গর্জ্জ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে; ✓গর্জ্জ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓গর্জ্জ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***গর্জ্জ** = গর্ জনন থাকে যাহাতে; **গর্জ্জক** = গর্জ্জ্ করে যে; **গর্জ্জন** = গর্জ্জ্ অন থাকে যাহাতে।* **৩.** শব্দ, মহাধ্বনি, হস্তিধ্বনি,

মেঘধ্বনি; গর্জ্জনকারী হস্তী, মৎস্যবিশেষ, শাল বা গজাল মাছ; **ভীষণ শব্দ**, স্তনিত, বীরের গর্জ্জন, সিংহনাদ, সিংহাদির শব্দ, বৃংহণ, **তিরস্কার**, ভর্ৎসন, কোপ, যুদ্ধ, হুঙ্কার, উচ্চ বৃক্ষবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. **roar** বা howl অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **গর্**। গর জনন করছে যে, **তার** বিপরীত দিক থেকে শব্দটিকে দেখা হচ্ছে। তাই গর এখানে **ক্ষতিকর** সত্তা রূপে প্রতিভাত। অবশ্য 'গর্জ্জন' গাছ কেন 'গর্জ্জন' নাম পেয়েছে, উদ্ভিদ জগৎ থেকে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন বলে আমরা তা জানতে পারিনি। তবে আশ্চর্য এই যে, বাংলাভাষীর মুখে ইংরেজি guardian শব্দটি গার্জ্জেন শব্দে পরিণত হয়েছে যদর্থ 'ছাত্রের অভিভাবক', যিনি প্রায়শই তাঁর 'ভাবনা'র প্রকাশ ঘটান গর্জ্জন করে। সম্ভবত শব্দটির মূলে 'গু-অর্দ্দন' রয়েছে। **৬.** ইংরেজি gorge (= গর্জ), ইতালীয় gorgia (= গর্জা)।

গর্ত্ত : **১.** ✓গৃ + ত (তন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *গর্ তারিত হয় যাহাতে*। **৩.** বিল, ছিদ্র, রন্ধ্র বিবর, নিতম্বস্থ কূপদ্বয়, ককুন্দর, ত্রিগর্ত্তদেশ, রোগবিশেষ, অষ্ট সহস্র ধনুর (৩২০০০ হাতের) ন্যূন জলাশয়বিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** hole অর্থে প্রচলিত। **৫.** **গর্** যেখানে যেখানে গিয়ে জমে, সেই সমস্ত গর্তগুলিই আসলে গর্ তারণের আধার। এটি জলাশয়বিশেষ হতে পারে, যে কোনো **গভীর** স্থানই হতে পারে; ধনসম্পদ রাখার গুপ্ত স্থানও হতে পারে। এই সমস্ত গর্তকে তিনভাগে ভাগে ভাগ করে দেখা হত। দ্র. **কেতুধর্মা, কালকেয়**।

গর্দ্দভ (গর্দ্ধভ, গর্দ্ধন) : **১.** ✓গর্দ্দ্ + অভ (অভচ্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓গৃধ্ + অন (যুচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *গর্ দান ও ভরণ এবং-বা ভক্ষণ করে যে অর্থাৎ গর্ দিয়ে চারপাশ ভরে দেয় যে*। **৩.** রাসভ, গাধা, গন্ধ, গর্দ্দভসদৃশ, মূর্খ, হিতাহিতজ্ঞানহীন; লুব্ধ, লোভী, অভিলাষশীল, গর্দ্ধনশীল, লোভী, অভিলাষী। (ব.শ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** **গর্** দান (চিৎকার) ভরণ করে যে, অর্থাৎ যে ভয়ানক চেঁচায় (ল্যাকড়ায়), তাকে গর্দ্দভ বলে। আবার, **গর্** দান (মার, পেটাই) অনায়াসে সহ্য করে যে, সেও গর্দ্দভ পদবাচ্য হতে পারে। কেবল তাই নয়, যে গৃধ্ (greed) করে বা 'গৃধী' (greedy) সেও গর্দ্ধভ হতে পারে। ফারসির গর্দ্দা, গর্দ্দান এই গর্দ্দ শব্দপরিবারেরই সদস্য বলে মনে হয়। দ্র. **খেসর, খচ্চর**।

গর্ব্ব, গর্ব্বিত, গর্ব্বী : **১.** ✓গর্ব্ব্ + অ - ভাববাচ্যে; গর্ব্ব + ইত; গর্ব্বী + ইন্। (ব.শ.)। **২.** *গর্ব্ব = গর্ (ঘুরন্ত গামী) বাহিত হয় যাহাতে; গর্ব্বিত = গর্ যাহাতে বাহিত হইয়াছে; গর্ব্বী = গর্ব্ব-এর বিকাশশীল আধার যে*। **৩.** অহঙ্কার, দর্প, অভিমান, শ্লাঘা, ব্যাভিচারী ভাববিশেষ; জাতগর্ব্ব, অবলিপ্ত, দৃপ্ত, আত্মশ্লাঘী, বিকত্থন, পূজনীয়, মান্য, পূজিত; গর্ব্বযুক্ত, গর্ব্বিত, দর্পী। (ব.শ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** দ্র. **গর্, গর, কৃ**। **৬.** ইংরেজি grab।

গর্ভ : **১.** ✓গৃ + ভ (ভন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *গর্ ভরা থাকে যাহাতে*। **৩.** গর্ভাশয়, কুক্ষি, উদর, কুক্ষিগত সত্ত্ব, ভ্রূণ, গর্ভাধান, গর্ভজাত পুত্র, **শিশু**, **অভ্যন্তর**, **শয়নমন্দির**, গর্ভাগার, অপবরক, নদীখাত, নদীর আবরা, **সূর্য্যকিরণে** বাষ্পীভূত বায়ুমণ্ডলস্থ জলবিন্দু-সমূহ, আভ্যন্তরিক **বস্তুমাত্র**, **গহ্বর**, (কোষ্ঠমধ্যস্থ বলিয়া) অগ্নি, অন্ন, পনসকণ্টক, কাঁটালের ভোঁতা, **ফলমাত্র**, পঞ্চসন্ধির তৃতীয় সন্ধি, পদ্মকোষ। (ব.শ.)। **৪.** womb অর্থে প্রচলিত। **৫.** গৃহ ও গৃহবাসীর মধ্যে আধার-আধেয় **সম্বন্ধ** বিদ্যমান — প্রাসাদে রাজা, কুটিরে দরিদ্র প্রজা, মাতৃগর্ভে **শিশু**, **কুক্ষিতে** মালিকানা, কাঁঠালভূতিতে কোয়া, নদীখাতে নদীজলধারা ... ... কবরে মৃতদেহ ... ... যেমন গৃহ তেমনি গৃহবাসী। এককথায় বললে এই সমস্ত গৃহবাসীই আসলে গর্। আর, যেখানে তারা থাকে সে তাদের নিজ নিজ গর্ভ। দেবমন্দিরের অভ্যন্তরের যে প্রকোষ্ঠে দেবতার বিগ্রহ থাকে, সেই প্রকোষ্ঠকে **গর্ভগৃহ** বলা হয়। **৬.** ইংরেজি grave।

গাজ, গাজন, গাজী : **১.** **গর্জ্জ** > গাজ; **গর্জ্জন** > গাজন। **২.** দ্র. **গর্জ্জ, গর্জ্জন**। **৩.** গর্জ্জন করা, ভীষণ শব্দ করা, সিংহনাদ করা, হুঙ্কার করা, হাঁকা, ডাকা, বাদ্যধ্বনি করা, বাজা, গুঞ্জন করা, উচ্চে কূজন করা, হর্ষধ্বনি করা; ধর্ম্মরাজের উৎসব, ধর্ম্মের ভক্তগণ, ধর্ম্মমন্দির, চড়কপর্ব্বে শিবের উৎসব, শিবের ভক্তগণ ও সন্ন্যাসীর দল; ধর্ম্মের জন্য বিধর্ম্মীদিগের বিজেতা মুসলমান বীরপুরুষ, যোদ্ধা, বীরপুরুষ। (ব.শ.)। **৪.** গাজ অপ্রচলিত; গাজন উৎসব হিসেবে প্রচলিত; গাজী মুসলমানের পদবী রূপে প্রচলিত। **৫.** গাজনের মধ্যে কী গর্জ্জন ছিল, এখন তা বিস্মৃত। একে এখন শুধুমাত্র উৎসব মনে করা হয়। এককালে বেদবিরোধী জনসাধারণ, যাঁদের চণ্ডী বলা হত, তাঁরা যে চণ্ডীমণ্ডপ গড়ে তুলেছিল, সেখানে প্রচলিত বৈদিক ও বৈদিকোত্তর সমাজের বিরুদ্ধে যে গর্জ্জন প্রকাশিত হত, তার অন্যতম বাহন ছিল এই গাজন। ছিল বলেই মধ্যযুগের বাঙালির গাজ শব্দটিকে ফারসির গাজী শব্দের সঙ্গে এক করে বুঝে নিতে সেকালের বাংলাভাষীদের অসুবিধে হয়নি। বাংলাভাষার সেই স্বর্ণযুগে বা তথাকথিত 'মধ্যযুগে' আমাদের বাংলাভাষী পূর্বপুরুষেরা তখনও সুনির্দিষ্টভাবে জানতেন জনসমাজে কোন কোন সামাজিক সত্তাদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ কার্ত্তিক গণেশ ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয় এবং বঙ্গদেশে মুসলমান আগমনের পর সেই সামাজিক সত্তাগুলি নতুন করে কী কী নাম পায়। চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর এই মানসিকতার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় রামাই পণ্ডিতের গ্রন্থের বয়ানে —

'ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ, বিষ্ণু হৈল পেগাম্বর,
আদম হৈল শূলপাণি।
গণেশ হইল কাজী, কার্ত্তিক হইল গাজী,
ফকির হৈল যত মুনি।।
তেজিয়া আপন ভেক, নীরদ হইল শেক,
পুরন্দর হৈল মৌলানা।
চন্দ্র-সূর্য আদি দেবে, পদাতিক হইয়া সেবে,
সবে মিলি বাজায় বাজনা।।'

এধরনের পদ রচনা করতে রামাই পণ্ডিতদের তখনও কোনো অসুবিধা ছিল না। লোকে সেসব কথার মানেও বুঝত। অন্তত এভাবে

তো বুঝতই — আমরা যাকে ব্রহ্মা বলি, আগন্তুক ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণ তাঁকেই মহম্মদ বলেন; আমরা যাকে বিষ্ণু নামে জানি, এঁরা তাঁকে পয়গম্বর বলেন; আমরা যাকে শূলপাণি বলি, এঁরা তাঁকে আদম বলেন; আমাদের গণেশই এঁদের কাজী; আমাদের কার্ত্তিকই এঁদের গাজী ... ইত্যাদি। সন্দেহ নেই, এই 'গাজী' তখনও 'বিজয়ী সৈন্য'দের বোঝাত। দ্র. **কার্ত্তিকেয়**। ৬. ইংরেজি gage।

গার্গী, গার্গ্য : দ্র. **গর্গ**।

গিরি (গির, গিরা, বাবুগিরি, গৃহী) : ১. ✓গৃ + ই (কি) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নিগরণ বা ভক্ষণ করে যে। / যে স্তুত হয়।* (ব.শ.)। ৩. পর্ব্বত, গেন্দুক, গেঁড়ুয়া, তান্ত্রিক সন্ন্যাসীবিশেষ, শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মচারী পরিব্রাজকের (অরণ্য, গিরি ... ইত্যাদি) দশ নামের একতম, নেত্ররোগবিশেষ, পারদের দোষবিশেষ, কুলাচলের সংখ্যানুসারে '৮' সংখ্যা, বালমূষিকা, নেঙটি, নিগরণ, ভক্ষণ, গৌরীপিতা হিমালয়। (ব.শ.)। ৪. পদবীরূপে এবং 'বাবুগিরি', 'নেতাগিরি' — এভাবে শব্দটি খুবই প্রচলিত, কিন্তু mountain অর্থে প্রায় অপ্রচলিত। ৫. পুরাণাদিতে ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'গিরি' ও '**পর্ব্বত**' শব্দটি বহুল প্রচলিত। আজও সেই বিপুল ব্যবহার রয়েছে বটে, কিন্তু এমন ভাবে রয়েছে যে আমরা তাকে ঠিকঠাক চিনতে পারি না। শব্দটি এখন সবচেয়ে বেশি প্রচলিত রয়েছে 'নেতাগিরি', 'বাবুগিরি', 'দাদাগিরি' প্রভৃতি শব্দে, রয়েছে 'গর্' বা 'গির্' থেকে জাত 'গুরু', 'গেরো', 'গোরা', 'গৌরব' প্রভৃতি শব্দে। এই 'গির্'-এর উত্তরাধিকার ফারসির যেমন রয়েছে তাদের 'গরী', 'গির্' ও 'গিরিফ্‌তার' প্রভৃতি শব্দে, তেমনি ইংরেজিরও রয়েছে তাদের 'gir' যুক্ত gird, girl ... প্রভৃতি সমস্ত শব্দে।

বাংলাভাষার বিশেষজ্ঞগণ 'গিরি'কে ফারসি ভাষা থেকে আগত ভেবে 'নিজের লগন পরকে দিয়া' স্বেচ্ছায় ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছেন। জনসাধারণ কিন্তু বহুকাল-ক্রমাগত ভাষাস্রোতকে বিবর্ত্তনের নিয়ম মেনে বহন করে নিয়ে চলেছেন আজও। সেকালে যা কিছু নিগরণ বা উদ্‌গীরণ করা হত, তাই ছিল 'গির' পদবাচ্য। এই 'গির'-এর গতিশীল অস্তিত্বকে ধরে রাখত গিরি, তা সে mountain হোক আর সামাজিক প্রতিষ্ঠানই (যা পর্ব্বে পর্ব্বে বিন্যস্ত, সেই পর্ব্বত) হোক। প্রাচীন কালের গুরু হোন আর একালের নেতা বা কেরানিবাবুই হোন, এঁদের একধরনের পিরামিডের মতো পর্ব্বত-সংগঠন থাকে; ছোট গুরু, বড় গুরু থাকে, ছোট নেতা বড় নেতা থাকে — এঁরা যে ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সেটি নিগরণ-উদ্‌গীরণ করে, তাঁরা নিজেরাও এই গিরির আচরণ করেন জনসাধারণের সঙ্গে। তাই বাবুগিরি, কেরানিগিরি। এমনকি সেই গিরি-ব্যবস্থার সবচেয়ে নীচে থেকে যে কুলিগিরি করে সেও সেই ব্যবস্থার নিদান মতোই চলে। দ্র. **পর্ব্বত**।

আমরা দেখেছি, মেদিনীপুরের গ্রামে বড় চাষিকে তার জমিতে নিযুক্ত কৃষিমজুরেরা 'গিরস্' বলে। একে 'গৃহস্থ' বা 'গৃহী' শব্দের বিবর্ত্তন হিসেবে অনেকেই দেখে থাকেন। এর সঙ্গে আরও দুটি বিষয় যোগ করে আমরা ভাবতে চাই। এক, জনসাধারণ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে কথা বলেন, প্রচলিত ভাষাস্রোত থেকে কোন শব্দ তুলে নিয়ে পণ্ডিতেরা তাকে সংস্কার করে কী রূপ দিয়ে সংস্কৃত বানিয়েছেন, তা তাঁরা জানেন না। দুই, '**গা**' শব্দে আমরা দেখেছি, মধ্যযুগে বহু ক্রিয়াপদকে এক করে নেওয়ার একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। সেই নিয়মে গির, গৈরিক, গৃহস্থ, গিরি, গৃহী একই গির হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।) সেই নিয়মেই 'গিরা' কথাটি 'গিরে দেওয়া' অর্থাৎ **গিঁট (গাঁট)** দেওয়া বা গেরো অর্থে যেমন প্রচলিত আছে, তেমনি কদাচিৎ 'পড়ে যাওয়া' অর্থেও তা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সাঁওতালী ভাষার 'গিরা' কথাটিও এক্ষেত্রে বিবেচ্য। দ্র. **গর, গী**।

গিরিকা : ১. দ্র. **গিরি**। গিরি + ক (কন্) স্বার্থে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *গিরি-করণের আধার যে*। ৩. রাজা উপরিচর বসুর স্ত্রী। ... তাঁর রাজধানীর কাছে শুক্তিমতী নামে একটি নদী ছিল। কোলাহল নামে এক সচেতন পর্বত কামান্ধ হয়ে শুক্তিমতীকে আক্রমণ করে। তখন বসুরাজ (উপরিচর) পর্বতের অন্যায় ব্যবহার দেখে তাকে পদাঘাত করেন এবং তাতে এই পর্বত বিদীর্ণ হয়। তখন সেই বিদীর্ণ পথ দিয়েই বেগবতী শুক্তিমতী প্রবাহিত হয়। কোলাহল পর্বতের সঙ্গমে এই নদীর গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যার নাম গিরিকা। বসুরাজ লাবণ্যবতী গিরিকার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন। একদা গিরিকা ঋতুস্নাতা হয়ে স্বামীর সহবাস প্রার্থনা করেন; কিন্তু সেই সময়ে উপরিচর বসুর পিতৃগণ তাঁকে মৃগয়ায় গমনের জন্য আদেশ দেন। ... তিনি মৃগয়ায় গমন করেন। কিন্তু বসন্তকাল উপস্থিত হওয়ায় ঋতুস্নাতা স্ত্রীকে স্মরণ করে তিনি বৃক্ষপত্রে রেতঃস্খলন করেন এবং একটি শ্যেন পক্ষীকে তাঁর স্খলিত রেতঃ তাঁর স্ত্রীকে পৌঁছে দিতে বলেন। এই শ্যেন চঞ্চুপুটে পত্রটি ধারণ করে রেতঃ নিয়ে যাবার সময় অন্য একটি শ্যেন কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় সেই রেতঃ যমুনার জলে পড়ে যায়। অদ্রিকা নামে এক অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎস্য হয়ে সেই জলে বাস করত। সেই পতিত রেতঃ গ্রহণ করায় অদ্রিকার গর্ভসঞ্চার হয়। কালে সেই গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যার জন্ম হয়। এই পুত্রটি মৎস্য নামে এবং কন্যাটি সত্যবতী নামে খ্যাত হন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **উপরিচর বসু**-র কাহিনী ও অর্থ থেকে আমরা জানতে পারি, এই সত্তা জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের সবচেয়ে প্রাচীন বোধ। তাঁর সময়ে **কোলাহল** নামে এক সচেতন পর্ব্বত বা সামাজিক সংগঠন অত্যাচার চালিয়েছিল **শুক্তি**মতী (যৌথসমাজের উদ্বৃত্ত উৎপন্নধারা ও তার ধারীগণ) নামে কোনো ধারার উপর। উপরিচর বসুর সহায়তায় সেই কোলাহল পর্ব্বত বিদীর্ণ হয় এবং শুক্তিমতী ধারা প্রবাহিত হতে পারে। এর ফলে এক নতুন সম্প্রদায়ের জন্ম হয়, যার নাম গিরিকা। হিন্দির 'গির' বা 'পতন' বা 'উৎপতন' শব্দের সঙ্গেও 'গিরিকা'র সম্পর্ক থাকতে পারে। দ্র. **মৎস্যগন্ধা**।

গিরিজ, গিরিজা : ১. গিরি + ✓জন্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। ... ... স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *গিরি হইতে জাত; গিরি হইতে জাতা।* ৩. মধুক, মউয়া গাছ, গৌরশাক, অভ্রক, গৈরিক, শিলাজতু, লৌহ, (গিরিজাকুমার) কার্ত্তিকেয় গণেশ, (গিরিজাপতি) উমাপতি শিব; গিরিজাতা, হিমবৎসুতা, পার্ব্বতী, গঙ্গা, গিরিকদলী, মল্লিকা

লতা। (ব.শ.)। হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর অন্য নাম। পতিনিন্দায় দেহত্যাগের পর সতী পুনরায় হিমালয়ের গৃহে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর এই নাম হয়। (পৌ.অ.)। ৪. দুর্গাপূজার অনুষঙ্গে ছাড়া অপ্রচলিত। ৫. উপরোক্ত অর্থগুলি থেকে দেখা যায়, গিরি আসলে দুরকম। প্রথম পার্থিব গিরি বা mountain; দ্বিতীয় সামাজিক গিরি বা social organisation। পার্থিব গিরির পুত্রকন্যা মহুয়া গাছ, মল্লিকালতা, পাহাড়ে কলা, অভ্র, লোহা, শিলাজতু, এমনকি গঙ্গা নদীও। আর সামাজিক গিরির কন্যা ও জামাতা হলেন **উমা** ও উমাপতি **শিব**, এবং তাঁদের পুত্রকন্যারা হলেন কার্ত্তিক গণেশ ইত্যাদি। পার্থিব গিরির পুত্রকন্যাদের এখনও আমরা বুঝতে-চিনতে পারি; কিন্তু সামাজিক গিরির পুত্রকন্যাজামাতাদের আমরা এখন চিনতে বুঝতে পারি না, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা পারতেন। পারতেন বলেই তাঁরা তাদের নামকরণ করে তাদের বিষয়ে বিস্তারিত কাহিনী কীর্তন করে গেছেন। আজ যদি আমাদেরকে সেই সব সন্তাদের চিনতে হয়, তাহলে তাদের নামশব্দগুলির অর্থ যথার্থ ভাবে জানতে হবে। অতি সংক্ষেপে তাঁরা হলেন — **কার্ত্তিক** = মিলিটারি, **গণেশ** = সরকারি কেরানিবাহিনী, **পার্ব্বতী** = রাষ্ট্রের প্রজাসাধারণ, **উমা** = সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠরত উত্তরপ্রজন্ম, **গঙ্গা** = পণ্যধারা। দ্র: **কার্ত্তিক, গণেশ, পার্ব্বতী, উমা, গঙ্গা**।

গিরিব্রজ : ১. গিরি + ব্রজ। ২. *যেখানে গিরিবহন-রক্ষক জনিত হয়।* / যে স্থানে গিরির সমূহ। (ব.শ.)। ৩. মগধস্থিত জরাসন্ধপুর। (ব.শ.)। রাজগৃহ (রাজগীর)। কুশ নামক ধর্মাত্মার চার পুত্র — কৌশাম্বী, মহোদয়, ধর্মারণ্য, ও গিরিব্রজ। তন্মধ্যে গিরিব্রজ এই নগর স্থাপন করেন। গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গমস্থলে এই নগর প্রতিষ্ঠিত। জরাসন্ধের সময় এই নগর মগধের রাজধানী ছিল। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. হায়রে! আজ যখন গিরিব্রজগুলি সল্টলেকে পরিণত হচ্ছে, অথচ কেউ তার মূল চরিত্রের কথা জানছে না; কেবল কতগুলো বাড়িঘর টাওয়ার আর ঝকঝকে গাড়ি দেখছে। এ-যে নিগরণ ও উদ্গিরণকারীদের আশ্রয়, তাদের বহনকারীদের জননের স্থান, এগুলি যে আসলে একালের গিরিব্রজ, সেকথা আজ আর কেউ জানছে না। কত উপেন্দ্রজালগিরি (নেটগিরি), কোমলগান্ধারগিরি (সফট্অয়ারগিরি), পরাশরগন্ধগিরি (বিপিওগিরি) এই একার্ণবকালীন গিরিব্রজে নিয়মিত জন্মায়, কত কত লোক যে এখানে এখন উপেন্দ্রজালগিরি, গান্ধারগিরি, পরাশরগিরি করে খাচ্ছে, স্থানটির নামোল্লেখ করার সময়ই সেবিষয়ে কেউ আমাদের সতর্ক করে না। আমরা তাই জানি না, সল্টলেকে কী হয়! শব্দবিসর্জনের ফলে মানুষের 'ধারণার জগৎ' এভাবেই ছোট হয়ে গেছে, যাচ্ছে। সেকালের বাংলাভাষী পরস্পরকে উদ্দিষ্টের ক্রিয়ার কথা বলে পরস্পরকে আগ্রহী বা সাবধান করে দিতে পারত। এখন সেভাবে কেউ নামের মধ্যেই বলে দিচ্ছে না সামনের জিনিসটির, যানটির, প্রাসাদটির, নগরটির মূল চরিত্র কী। ফলে মানুষ আজ দিশাহারা।

গিরিরাজ : ১. গিরি + রাজ। ২. গিরির রাজা। (ব.শ.)। ৩. পর্ব্বতগণের রাজা বা শ্রেষ্ঠ, হিমালয়। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দাদাগিরি, নেতাগিরি, **গুরুগিরি** ইত্যাদি যত প্রকার গিরি আছে তাদের মধ্যে **শ্রেষ্ঠ গিরি হল হিমালয়**। এ হিমালয় কিন্তু mountain হিমালয় নয়, এ **হল হিমের আলয় অর্থাৎ** যেখানে সবকিছুকে stable করার নামে **stagnant** বা অচল করে ফেলা হয় বলে রবীন্দ্রনাথ তার নাম **দিয়েছিলেন** 'অচলায়তন'। এ হল রাষ্ট্রগিরি বা সরকারগিরি **অর্থাৎ রাজাগিরি**। এই গিরি হল সব গিরির রাজা। দেশে যত পর্ব্বত বা institution গড়ে ওঠে, রাষ্ট্র হল তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান। সেকালে তাকে হিমালয় বলা হত। দ্র. **উমা**।

গিরিসার : ১. গিরি + সার। ২. গিরির সার। (ব.শ.)। ৩. লৌহ, রঙ্গ, টিন, 'পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ', মলয়। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. গিরির অর্থ ভুলে গেলে গিরিসারের অর্থ মনে থাকবে কী করে! যাই হোক, সেকালের মানুষ পার্থিব গিরি থেকে সেরা যা কিছু সংগ্রহ করতে পারতেন, তার মধ্যে তাঁরা দেখেছিলেন লোহা, রাঙ্ ও টিনই সেরা। তাই গিরিসার বলতে তাঁরা এই তিনটি ধাতুকে বুঝতেন। ওদিকে সামাজিক গিরিসার বলতে তাঁরা যে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠকে বুঝেছিলেন, সেটির তাঁরা নাম দিয়েছিলেন 'মলয় পর্ব্বত'। এই পর্ব্বত হল যাঁরা মলত্যাগ করেন, তাঁদের মলত্যাগকারী সামাজিক সংগঠন, একালের ভাষায় পণ্য-উৎপাদনকারী কোম্পানি। তাদের মলের বা মালের গন্ধকে কেউ বলেন ভাল, কেউ বলেন মন্দ। এর যে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হয়, তাকেও তাই মলয় বায়ু বলে। সেকালের কোনো কোনো মানুষের চোখে এই মলয় ছিল শ্রেষ্ঠ গিরিসার। একালে 'গিরিসার' শব্দের পার্থিব অর্থ তো বদলাবেই, কেননা লোহা রাঙ্ টিন থেকে অনেক মূল্যবান জিনিস এখন গিরিসমূহ থেকে পাওয়া যায়; আর পণ্য উৎপাদক কোম্পানিই একালের সামাজিক গিরিসার কিনা, একথাটাও গোলোকায়নের বর্তমান তুমুল কোলাহলে আর একবার আমাদের স্মরণ করা উচিত।

গীর, গীর্ণ, গীর্ব্বাণ : ১. দ্র. **গর**। গীর্ণ = ✓গৃ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***গীর*** = *গতিশীল গামীর আধার রহে যাহাতে;* ***গীর্ণ*** = *যাহা (বিপরীত দিকে) গীরণ (গিলিত) হইয়াছে;* ***গীর্ব্বাণ*** = *যে* ***বাণ*** *উদ্গীরিত হইয়াছে।* / গীঃ (বাক্য) বাণ যাঁহার। (ব.শ.)। ৩. বাক্য, কথা, পাখীর বুলি; ভক্ষিত, গিলিত, স্তুত, বর্ণিত; বাক্য যাঁহার বাণতুল্য কার্য্যসাধক, দেবতা, সুর। (ব.শ.)। ৪. এর মধ্যে 'গীর্ণ' শব্দটি এখন সন্ধিকৃত হয়ে 'উদ্গীর্ণ' রূপে প্রচলিত, বাকি দুটি অপ্রচলিত। ৫. এই বাংলা শব্দগুলি কিন্তু মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে ছিল। বাংলাভাষীর সে আবিষ্কার একালের আধুনিক বাংলাভাষার পণ্ডিতেরা ফেলে দিয়েছেন। ৬. ইংরেজি yearn; জারমান gern।

গুরণ (গুরণ, গুর, গুরগুর) : ১. ✓গু (গৃ)র + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ গামী (গামীর স্থিতি) অন থাকে যাহাতে।* ৩. হননার্থ দণ্ডাদির উদ্যমন, উচান। অবগোরণ, উচান। গম্ভীর মেঘধ্বনি। ৪. মেঘের **'গুরুগুরু'** রূপে কেবল গুরগুর

শব্দটি প্রচলিত। গ্রামবাংলা গুরণ বা গুরণ ডাংগুলি খেলার অনুষঙ্গে প্রচলিত। ৫. গ্রামবাংলায়, বিশেষত মায়েদের মুখে, পুত্রকন্যা বিষয়ে প্রবল আশঙ্কা বোঝাতে 'বুকটা গুরগুর করছে' বাক্যবন্ধটি শুনতে পাওয়া যায়। 'মেঘের গুরুগুরু' বাক্যবন্ধটি পাওয়া যায় আধুনিক কবিতায়। আমরা জানি, জলপূর্ণ মেঘ কিন্তু গুড়গুড় করে, গুরগুর করে না। এই যে সূক্ষ্ম পার্থক্য, এখান থেকেই 'গুর'কে চিনে নেবার চেষ্টা করা দরকার। আমরা গুরণ শব্দে তাকে বুঝতে চেষ্টা করেছি।

বাংলাভাষীর প্রাচীন সংখ্যা-বোধে 'সাত'-এর মহিমা ছিল সবচেয়ে বেশি। ডাংগুলি খেলায় সাত-সাত জুড়ে গুনতি করার রীতি আছে। তা হল — এড়ি-দড়ি-গুরণ-চোল-চম্পা-ঢেক-লঙ্কা — এই সাতটি অধ্যায় পেরিয়ে পেরিয়ে গণনা এগোয়। যতগুলি লঙ্কা হয়, ততগুলি সাত হিসেবে যুক্ত হয়। ... তারপর আরও কত কী হয়। কত হলে জানি একটি 'গাছ' হয়। গ্রামবাংলার অনেকেই এটা বলতে পারবেন। এই গণনার অর্থ সম্ভবত এইরকম ছিল — এড়ি = বিরোধী হই (এই এড়ি আর আড়ি খুব দূরের ব্যাপার নয়; ছোটদের খেলার মধ্যে কতবার যে **আড়ি** আর ভাব হয়! দ্র. **আড়ি**); দড়ি = ঘুরে দাঁড়াই; গুরণ = আঘাতে উদ্যত হই; চোল = চয়ন সম্পন্ন করি; চম্পা = অতঃপর চম্পট দিই; ঢেক = পালিয়ে ঘরে যাই; লঙ্কা = (হৃতবস্তু রাক্ষসের মতো) রক্ষণ করি ভক্ষণ করি।

গুরু : ১. ✓গৃ + উ (কু) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **গু-র** *(নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর) রক্ষণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* / যিনি গর্ভাধানাদি সংস্কার করেন ও অন্ন দ্বারা প্রতিপালন করেন। (ব.শ.)। ৩. মহান, বিশাল, বৃহৎ, দুর্ভর, ভারবান, ভারী, দুর্জ্জর, দুষ্পচ, দুস্তর, অতিশয়, উৎকট, নির্ভর, অতিতীব্র, বিস্তীর্ণ, সুদীর্ঘ, দীর্ঘমাত্রক, পূজ্য, মান্য, প্রিয়, অভিমত, ইষ্ট, গম্ভীরার্থ, সর্ব্বাতিশায়ী, উত্তম, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, দুর্ব্বহ, কষ্টসাধ্য ... ... (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. মানুষের 'অর্জন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে' তাকে জ্ঞানসম্পদ (ধনসম্পদও) বলা চলে। সেই 'জ্ঞান যেখানে বা যার কাছে রয় বা রক্ষিত হয়' (= গুর্), তা যদি তার মাধ্যমে পুনরায় নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে (ভাষণ, কীর্তন, শিক্ষণ, নির্দেশ, উপদেশ ইত্যাদি) রূপে বেরিয়ে আসে, তখন সেই জ্ঞানাধারকে গুরু বলে। কেননা, তখন 'গুর্' (= নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর রক্ষণ) পুনরায় নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। মানবসভ্যতার সূচনাকাল থেকে সমস্ত মানুষকে (এমনকি ধনসম্পদের মালিক, রাজা, রাজরাজেশ্বর সম্রাটদেরকেও) চালাতেন এই গুরুরাই। সেকারণে শব্দটির এত বিপুল ব্যবহার দেখা যায়। মানুষের বিগত ১২ হাজার বছরেব ইতিহাসে এই 'গুরু' প্রধান ও কেন্দ্রীয় চরিত্র। সেই কারণে বিভিন্ন ঐতিহ্যে গুরুবন্দনার কতরকম রীতি যে প্রচলিত রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। ব্যঞ্জনার্থে এই গুরু-ই ভারবান, ভারী, দুর্ভর, নির্ভর, দুষ্পচ ইত্যাদি নানার্থক হয়ে গেছে। এই কারণে ব.শ. শব্দটির পঞ্চাশটিরও অধিক অর্থ দিয়েছেন। কেবল তাই নয়, শব্দটির ব্যবহার বোঝাতে প্রায় তিন পৃষ্ঠা স্থান খরচ করেছেন। ৬. ইংরেজি grow।

গৌর (গৌরচন্দ্র, গৌরচন্দ্রিকা, গৌরাঙ্গ, গৌরমুখ) : ১. গৌর + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে; ✓গু + র (রন্)। (ব.শ.)। ২. *গৌর = **গুর্** (নবরূপে উত্তীর্ণ গামীর রহন) থাকে যাহাতে; অথবা, **গুর্** সক্রিয় থাকে যাহাতে।* ৩. **গৌর** = পীত, হরিদ্রার্ক্ত, শ্বেত, ধবল, অরুণ, লোহিত, উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, পীতবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, অরুণবর্ণ, গৌরসর্ষপ, চন্দ্র, গৌরমৃগ, ধববৃক্ষ, রাজসর্ষপত্রয়-পরিমাণ। **গৌরচন্দ্র** = চৈতন্যদেব (ইনি ১৪০৭ শকে ফাল্গুনি পূর্ণিমায় নবদ্বীপে মায়াপুরে আবির্ভূত হন। ইঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শচীদেবী। ইনি গয়ায় ঈশ্বরপুরীর নিকট দশাক্ষরমন্ত্র গ্রহণ করেন এবং কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকটে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইনি প্রেমের অবতার।)। **গৌরচন্দ্রিকা** = গৌরচন্দ্রসম্বন্ধিনী গীতি, কীর্ত্তনারম্ভে গৌরচন্দ্রের কৃপা প্রার্থনাদিবিষয়ে ভক্তের গীতি। গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক; এই হেতু কীর্ত্তনগায়কেরা কীর্ত্তনের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা গাহয়া থাকেন। (গৌণার্থে) কোনো বিষয়সূচনার পূর্ব্বে তদনুকূল ভূমিকা। **গৌরাঙ্গ** = যুগাবতারভেদে শ্বেতদেহ বা পীতদেহ, বিষ্ণু, বিশুদ্ধদেহ, শ্রীকৃষ্ণ, গৌরচন্দ্র। (ব.শ.)। গৌর অঙ্গ যাহার। **গৌরমুখ** = শমীকমুনির শিষ্য। মৃগয়াকালে রাজা পরীক্ষিৎ বাণবিদ্ধ মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করে শমীকের আশ্রমে উপস্থিত হন এবং তাঁকে মৃগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। মৌনাব্রতধারী মুনি উত্তর দিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্রুদ্ধ রাজা তাঁর গলায় মৃত সর্প স্থাপন করে যান। এই সংবাদে শমীকের পুত্র শৃঙ্গী ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে তক্ষক দংশনে মৃত্যুর অভিশাপ দেন। শমীক পুত্রকে অভিশাপ প্রত্যাহারে অনিচ্ছুক দেখে গৌরমুখকে দিয়ে রাজার কাছে এই সংবাদ পাঠিয়ে তাঁকে সাবধান হতে বলেন। (পৌ.অ.)। ৪. শব্দগুলির প্রচলন কমতে কমতে প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। গৌরমুখ শব্দটি তো অপ্রচলিতই হয়ে গেছে। ৫. শব্দের মানে হারিয়ে গেলে, তার ব্যবহার ক্রমশ কমবেই। এখনও পর্যন্ত এর একটিই মানে কমবেশি প্রচলিত আছে, তাহল গোরা, যার মানে ফর্সা। তবে গ্রামবাংলার বয়স্ক মানুষদের মুখে শব্দটির আর একপ্রকার প্রয়োগ দেখা যায়, বিশেষত কনের গায়ের রং নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে — "গায়ের রং ফর্সা কিন্তু মনটা কালো, ও-মেয়ে ভালো না। কথায় বলে 'রঙে কালো গুণে আলো'। কালো রং তাও চলবে, কিন্তু কালো মনের মেয়ে চলবে না।" মজার ব্যাপার হল, কেমন মনকে তাঁরা ফর্সা মন ব'লে মনে করতেন, তাও এখন আমরা **গৌরী** শব্দের আলোচনায় জানতে পারি। তা সে যাই হোক, মাঝে কিছুদিন গোরা শব্দের জায়গাটি দখল করেছিল ইংরেজ সাহেবরা, যারা দেখতে ফর্সা ছিল (এবং অধিকাংশের মনটা কালো ছিল), যাদের বলা হত 'গোরা সৈন্য'। তবে গ্রামবাংলায় এবং হিন্দিতে গোরা কথাটি যেকোনো সাদাটে বিষয়-বস্তু-ব্যক্তিকে বোঝাতে আজও যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়।

ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি শব্দের মতো গৌর শব্দটিও অত্যন্ত উঁচু মানের শব্দ। ব.শ. গৌর শব্দের কেবলমাত্র বাহ্যিক অর্থগুলিই (৩) দিয়েছেন। প্রকৃত অর্থের দিকে তাঁর ইশারা গেছে কেবল 'উজ্জ্বল' ও 'বিশুদ্ধ' অর্থে। আজ আমরা জানতে পারছি, এই গৌর-এর প্রকৃত অর্থ হল — "নবরূপে উত্তীর্ণ গামী রহে যাহাতে, সেই 'গুর' সক্রিয় থাকে যাহাতে।" ব.শ. একেই 'বিশুদ্ধ' বলেছেন;

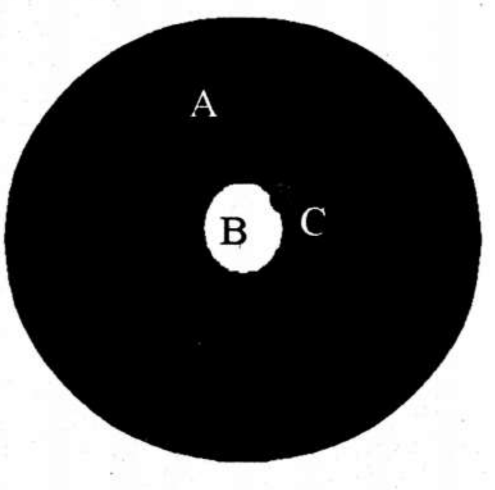
কথাটি ঠিক হলেও একদেশাত্মক। **গৌর** শব্দটির সর্বদিশাময় পূর্ণ অর্থ কেবল তার উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক (২) অর্থেই পাওয়া যায়। ব্যাখ্যা করে বলতে গেলে বলা যায় — বাহ্যিক প্রেক্ষিতে, রঙের ক্ষেত্রে, যা কিছু নিজের ভিতরের সমস্ত রং ত্যাগ করে করে রং-হীন হয়ে গেছে এবং স্বভাবতই সাদা হয়ে গেছে, তাই-ই গৌর। আবার, কোনো বস্তু যখন আপন পরিবর্তনের মাধ্যমে নিজের সমস্ত অবগুণ বা অন্যগুণ এক এক করে ত্যাগ করে করে আপন স্বাভাবিক প্রাকৃতিক স্বগুণে ফিরে আসে অর্থাৎ বিশুদ্ধ হয়, তাকেও গৌর বলা যায়। অজ্ঞাত অজানা জ্ঞানজগতের যে অংশ জানা হয়ে গেছে, আবিষ্কৃত হয়ে গেছে এবং প্রচলিত আছে, অজানার মাঝে সেই জানা অংশকে (pet-concept-এর এলাকাকে) যিনি ধারণ করেন, তিনিও গৌর (বা **গৌরী**) পদবাচ্য। ... এইভাবে চিন্তার বিভিন্ন স্তরে গৌর-এর একটির পর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। তবে গৌর-এর সর্বোচ্চ যে বোধ, তা হল — মানসিক প্রেক্ষিতে, গুণের ক্ষেত্রে; যা কিছু নিজের ভিতরের সমস্ত গুণ ত্যাগ করে করে গুণহীন বা নির্গুণ ব্রহ্ম (শূন্য) হয়ে গেছে, তাই-ই গৌর পদবাচ্য ('হীরের টুকরো')। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই গৌরকে আমরা চিনতে পারি 'ব্ল্যাঙ্ক চেক'-এ, যা শূন্য বটে আবার অসীম সংখ্যক অর্থের পরিমাণও বটে। তার পরিমাণ নির্ভর করে কীরকম ভক্ত সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তার উপর। (গরীব বা বর্ণপরিচয়-জ্ঞানহীন লোক যেমন ব্যাংক চেকের মর্ম বোঝে না, তেমনি অজ্ঞানী বা তত্ত্ব-বর্ণপরিচয়-জ্ঞান-হীন লোকও ব্রহ্মের মর্ম বুঝতে পারে না।) এই গৌর অতএব একত্রে 'অর্থহীন ও অসীম অর্থবান'; 'না ও হ্যাঁ'-এর এক দ্বৈতাদ্বৈত রূপ। সামাজিক ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মতো দু-একজন গৌর-অঙ্গধারী গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। (এই গৌর-এর দিকে যাওয়া বা নিজেকে পূর্ণ গৌরে পরিণত করাই বৈষ্ণব ধর্মের মোক্ষ। বৈষ্ণবদের 'গৌর-গৌর' নমস্কার-বাণী সেই কথাই বলে।) দার্শনিক, মানবিক, জাগতিক ক্ষেত্রে এঁদের সুচিহ্নিত করার কাজটি বেশ কঠিন। ... এ বিষয়ে (চ) গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধে 'হীরের টুকরো ছেলে' বিষয়ক আলোচনা এবং শেষ নিবন্ধ 'শূন্য কিন্তু জিরো নয়, ব্ল্যাঙ্ক চেকের মতো ফাঁকা' দ্রষ্টব্য।

গৌরী : ১. ✓গু + র (রন্) + স্ত্রী ঈ (ঙীষ্)। (ব.শ.)। ২. *গৌর-এর আধারশক্তি যে।* ৩. পার্ব্বতী, গৌরবর্ণা স্ত্রী, গৌরাঙ্গী, অষ্টবর্ষা কন্যা, অরজস্কা কন্যা, বরুণপত্নী, মাতৃকাবিশেষ, হরিদ্রা, গোরোচনা, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতদূর্ব্বা, মল্লিকা, তুলসী, সুবর্ণকদলী, প্রিয়ঙ্গু, পৃথিবী, গঙ্গা, রজনী, রাগিণীবিশেষ। **গৌরীশঙ্কর** = হিমালয়শৃঙ্গবিশেষ (Everest)। (ব.শ.)। (ক) বরাহপুরাণ মতে, ব্রহ্মা নিজের শরীর হতে গৌরীকে সৃষ্টি করে রুদ্রকে দান করেন। রুদ্র তপস্যার জন্য জলে নিমগ্ন হলে ব্রহ্মা গৌরীকে নিজের দেহে বিলীন করেন এবং পরে গৌরীকে দক্ষের হাতে প্রদান করেন। এদিকে রুদ্র দীর্ঘকাল তপস্যা করে জল থেকে উত্থিত হয়ে পৃথিবীর সুশোভন অবস্থা ও মানুষের পরিপূর্ণতা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করতে থাকেন। ফলে, তাঁর কর্ণ হতে ভূত, প্রেত, বেতাল ইত্যাদি সৃষ্টি হয়ে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে এবং দেবতাদের প্রতি অত্যাচার করতে থাকে। তখন বিষ্ণু নিজেই রুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তখন ব্রহ্মা উভয়ের মধ্যস্থ হয়ে বিবাদের মীমাংসা করে দেন এবং গৌরীকে রুদ্রের হাতে প্রদান করতে দক্ষকে আদেশ দেন। ... এদিকে রুদ্রের দ্বারা দক্ষযজ্ঞ ও সুধা বিনষ্ট হওয়ায় গৌরী অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় রত হন। এর ফলে তাঁর দেহ ভস্মীভূত হয়। তখন গৌরী হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করে উমা নামে পরিচিতা হন এবং মহাদেবকেই পতিরূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করতে থাকেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উমার কাছে উপস্থিত হয়ে খাদ্যভিক্ষা করেন। উমা বৃদ্ধকে স্নান করে আহার গ্রহণ করতে বলেন। গঙ্গায় স্নান করতে গেলে এক মকর বৃদ্ধকে আক্রমণ করে। তখন বৃদ্ধ উমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে উমা অগ্রসর হয়ে দেখেন যে, স্বয়ং মহাদেব তাঁর হস্তধারণ করেছেন। পিতা হিমালয় এই বিবরণ জ্ঞাত হয়ে উমাকে মহাদেবের হাতে সমর্পণ করেন। (খ) বামনপুরাণ অনুসারে, পার্বতীর অন্য নাম গৌরী। হিরণ্যাক্ষের পুত্র অন্ধক মন্দর পাহাড়ে ভ্রমণকালে মহাদেবের স্ত্রী গৌরীকে দেখে মোহিত হন। তাঁকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করলে প্রহ্লাদ অন্ধককে ঐ কার্যে অগ্রসর হতে বিশেষরূপে নিষেধ করেন। কিন্তু অন্ধক সে কথায় কর্ণপাত করেন না। ফলে, গৌরী শতরূপা হয়ে অন্ধককে নির্যাতন করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. শব্দের অর্থ অনুসারে গৌরী যে সত্তাকে বোঝায়, তার বাহ্যিক রূপগুলির অধিকাংশ ব.শ. দিয়েছেন উপরোক্ত (৩-এ প্রদত্ত) অর্থগুলিতে। অনেকগুলি স্তরে তারা বিভক্ত। পার্থিব গৌরী হল হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতদূর্ব্বা, মল্লিকা, তুলসী, সুবর্ণকদলী (কাঁচা অবস্থায় লাল এবং পাকলে হলুদ রঙের হয়), প্রিয়ঙ্গু এবং গোরোচনা। আয়ুর্বেদিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বস্তুগুলিতে যে গুণাগুণ রয়েছে, তা মানুষকে বিশুদ্ধ হতে বা করতে সাহায্য করে। মানবিক স্তরে গৌরী হল গৌরবর্ণা স্ত্রী, গৌরাঙ্গী, অষ্টবর্ষা কন্যা, অরজস্কা কন্যা, এককথায় ফর্সা মেয়ে। সামাজিক-ঐতিহাসিক স্তরে গৌরী হল **পার্ব্বতী**, বরুণপত্নী, মাতৃকাবিশেষ, **পৃথিবী**, ও **গঙ্গা**। এরা প্রত্যেকেই ভারতের ইতিহাসে বিশেষ সামাজিক সত্তা। এবং জাগতিক স্তরে রাগিণীবিশেষ হল এমন এক গৌরী-সত্তা, যাতে কোনো না কোনো ভাবে **গুর** (নবরূপে উত্তীর্ণ গামী) সক্রিয় রয়েছে। এর সত্যতা বলতে পারবেন ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত বিশেষজ্ঞরা। আর, নন্দনতাত্ত্বিক স্তরে (বা আধ্যাত্মিক স্তরে) এই গৌরী হলেন মানসিক গৌরাঙ্গী; **শ্যাম** শব্দে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায় — যে অনন্ত অসীম জ্ঞানসম্পদ বা ধনসম্পদ মানবসমাজ আত্মস্থ করতে পারেনি এবং সমাজ ও রাষ্ট্র যাকে (জ্ঞান বা ধন ব'লে) স্বীকৃতি দেয়নি, তা হল কালো বা **কৃষ্ণ** (= wild concept, unachieved wealth); যে সীমিত জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ মানবসমাজ আত্মস্থ করে ফেলেছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র যাকে (জ্ঞান বা ধন ব'লে) স্বীকৃতি দিয়েছে, তা হল **গৌর** বা **শুক্ল** (= pet concept, achieved wealth), এবং যে সীমিত জ্ঞানসম্পদ বা ধনসম্পদ সবেমাত্র আবিষ্কার বা অর্জন করা গেছে কিন্তু সমগ্র মানবসমাজে তা এখনও প্রচলিত নয়, সমাজ বা রাষ্ট্র তাকে স্বীকার করেনি, অস্বীকারও করেনি (স্বীকার বা অস্বীকার করার প্রক্রিয়া চলছে), তা হল **শবল** বা **শ্যাম** (=

new explorations)। এই শুক্ল বা গৌর-এর আধারশক্তিকেও **গৌরী** বলে। সহজ করে বললে, যে নারী প্রচলিত জ্ঞান, সংস্কার, সামাজিক ঐতিহ্য, পরম্পরা ইত্যাদি ধারণ করে রাখেন অর্থাৎ প্রায়োগিকভাবে জানেন, তিনিই **গৌরী**। তিনি দেখতে ফর্সা হলে দেহে-মনে **গৌরী**। গ্রামবাংলার বয়স্ক মানুষেরা বলেন, 'দেখতে কালো, গুণে আলো, তবেই ভাল বউ।' (এই কথায় 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদের' সুস্পষ্ট প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।) এঁকে আবও স্পষ্ট চেনা যায়, যখন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের হিন্দি রূপে কৃষ্ণকে রাধার উদ্দেশে বলতে শোনা যায় — 'তু কিঁউ গোরী, ম্যয় কিঁউ কালা?' কিংবা কমলাকান্ত যখন প্রশ্ন করেন 'শ্যামা মা কি আমার কালো রে?' জ্ঞানসম্পদের ক্ষেত্র ও ধনসম্পদের ক্ষেত্র, উভয় দুনিয়াতেই রয়েছে এই সংশয়!

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রটি আমরা আজকাল সহজে বুঝি। একালের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষ্ণকে বলা হয় black money, গৌরীকে বলা হয় white money, এবং শ্যামকে বলা হয় grey money। এমনকি, যে কালো টাকা কাউকে ব্যবসাদি করার জন্য ধার দিয়ে দেওয়া হয়, অধমর্ণের হিসেবের খাতাপত্রের সরকারি পরীক্ষকের আইনে সেই টাকা হয়ে যায় সাদা টাকা বা white money; সেকালেব ভাষায় এই অধমর্ণই 'ধারকারী' রাধা। সেই কারণে রাধাও **গৌরী**। জ্ঞানসম্পদের ক্ষেত্রে (বা নন্দনতাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে) এরকম কোনো নাম ইংরেজি ভাষায় নেই, আধুনিক বাংলাভাষাতেও নেই; রয়েছে কেবল ক্রিয়াভিত্তিক বাংলাভাষায় — **কৃষ্ণ, শ্যাম, গৌর**। তাদের আধারকে যথাক্রমে **কৃষ্ণা, শ্যামা,** ও **গৌরী** বলে। শিব যদি অ্যাকাডেমিতে না-যাওয়া আবিষ্কারক-স্রষ্টা হন (যথা রবীন্দ্রনাথ), তবে অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত (হিমালয়জাত) সদ্য পাশকরা যুবসমাজ হলেন গৌরী। এঁরা শুক্ল জ্ঞানের আধার বলেই 'গৌরী' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত হন। প্রাচীন কালে এক সম্প্রদায়ের নতুন প্রজন্মকে অন্য সম্প্রদায়ের মহর্ষির হাতে তুলে দেওয়াকে বলা হত 'গৌরীদান'। এই গৌরীদের একালে কেউ কেউ 'কোরা কাগজ' বলেন, ল্যাটিন-থেকে আসা ইংরেজি শব্দে বলা হয় tabula rasa। ইতিহাস ভুলে আমরা সেই গৌরীদানকে শিশুকন্যাদান-এ অধঃপতিত করেছি। তার মানে এই নয় যে, প্রকৃত গৌরীদান বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের উত্তর প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ অংশকে, গৌরীকে, আমাদের দেশের নেতারা যে কর্পোরেট-মহর্ষিদের দান করে দিচ্ছেন, তারা যে দলে দলে সাইবার-কুলি হয়ে যাচ্ছে, সে কি গৌরীদান নয়? এই গৌরীদানে মাটি-মায়ের প্রাণ কাঁদছে না? দ্র. **রাধাকৃষ্ণ, রাধেশ্যাম**। (নীচের চিত্র দ্রষ্টব্য)।

সবশেষে গৌরীশঙ্কর বিষয়ে দু'কথা না বললেই নয়। এ এক অদ্ভুত সত্তা। ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে শব্দটি কী বোঝায় তা জানতে গিয়ে যেসব তথ্য হাতে আসে, তা দেখে তাজ্জব লাগে। এভারেস্ট হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ, একথা কি সেকালের ভারতীয়রা জানতেন? যদি না জানতেন, তাহলে তার নাম 'গৌরীশঙ্কর' রাখলেন কীভাবে? গৌরীশঙ্কর শব্দের অর্থ তো বলেই দিচ্ছে, তা গুণমানে সর্বোচ্চ। নিশ্চয় বাহ্যিক উচ্চতাও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নইলে এমন (গৌরীশঙ্কর) নামকরণ কেন? বিষয়টি নিশ্চয় সৈয়দ মুজতবা আলীও জানতেন। নইলে তিনি সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পর্বতের উদাহরণ দিতে গিয়ে 'কোথায় গৌরীশঙ্কর আর কোথায় উইয়ের ঢিবি!' লিখবেন কেন?



A = অনৰ্জ্জিত জ্ঞানসম্পদ বা ধনসম্পদ।
B = অৰ্জ্জিত জ্ঞানসম্পদ বা ধনসম্পদ।
C = সদ্য-উদ্ভাবিত জ্ঞানসম্পদ বা ধনসম্পদ।
A = কৃষ্ণ, B = শুক্ল, C = শ্যাম।
A = কৃষ্ণ, B = গৌর, C = শ্যামা।
A = কালো B = সাদা, C = শ্যামল।
A = black, B = white, C = grey।
A + C = হর, B = গৌরী।
B + A = রাধেকৃষ্ণ।
B + C = রাধেশ্যাম।
A = intutive mind, B = rational mind,
C = inventive mind.

গৌরব : ১. গুরু + অ (অণ্)। (ব.শ.)। ২. *গৌর বহন করে যে; অথবা শুক্ল-কে বহন করে যে।* ৩. গুরুভাব, দুর্ভরতা, গুরুত্ব, শরীরগুরুত্বস্বরূপ গর্ভিণীধর্ম্মভেদ, পূজ্যতা, সম্মান, মর্য্যাদা, আদর, উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা, জন্মস্থানোৎকর্ষ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, অলঘুতা, অবশ্যকরণীয়তা, আবশ্যকতা, অনুরোধ, অনুবর্ত্তন, অনুভাব, প্রভাব, গাম্ভীর্য্য, দুরূহতা, বাহুল্য, বিস্তার, বর্ণগুরুত্ব, দীর্ঘমাত্রতা, অতিভার, প্রাচুর্য্য। (ব.শ.)। ৪. glory অর্থে সুপ্রচলিত। ৫. শুক্ল বা গৌর, যেভাবেই দেখা হোক না কেন, আমরা পৌঁছাই এক জায়গাতেই। শুক্ল শব্দ থেকে আমরা জানতে পারি, অর্জিত জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদ নতুনভাবে (উন্নীতভাবে, বিশুদ্ধভাবে) প্রকাশিত হয় যার মাধ্যমে, সেই সত্তাকে বহন করে যে, সে তো গৌরবই বটে। আবার, যে গৌর আত্ম-গ্লানি ত্যাগ করে করে সম্পূর্ণ গ্লানিমুক্ত, তাকে বহন করে যে, সেও গৌরবই বটে। উপরে (৩-এ) প্রদত্ত অর্থগুলি কিন্তু গৌরবের এই ক্রিয়াশীলতার কথা সরাসরি কেউই বলতে পারে না, নানা খণ্ড ও প্রতীকী রূপে বলার চেষ্টা করে।

গ্রস্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অঘাস, অঘাসি, আগ্রাসন, গরাস, গাঁ, গাঁই, গাঁইগুঁই, গাগ্রি(গ্রী), গাম, গামাল, গাস, গিম (গীম), গিমা (গীমা), গি(গী)রিষ, গ্রস্, গ্রসন, গ্রস্ত, গ্রাম, গ্রামণী, গ্রামভাটি, গ্রামাধিকৃত, গ্রামাধিপতি, গ্রামাধ্যক্ষ, গ্রামান্ত, গ্রামান্তর, গ্রামিক, গ্রামী, গ্রামীণ, গ্রামীয়, গ্রামেয়, গ্রাম্য, গ্রাম্যতা, গ্রাস, গ্রাসশল্য, গ্রাসাচ্ছাদন, গ্রীষ্ম, গ্রৈষ্ম, গ্রৈস্মিক, ঘাস, ঘাসকর, ঘাসজল, ঘাসিয়াড়া, ঘেসেড়া, ঘেসেড়ানী, ঘেসেড়ে, ঘেসুড়ে, সংগ্রাম।

গ্রস্ = গমন-আবর্ত্তক (গ্র) শক্তির অগ্রসরণ (স্)। **গ্রস** = গমন-আবর্ত্তক (গ্র) শক্তি অগ্রসর (স) যাহাতে। দ্র. **গ্রসন**।

গিমা (গীমা) : দ্র. **গ্রীষ্ম**।

গ্রসন, গ্রস্ত : ১. ✓গ্রস্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে; ✓গ্রস্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গ্রহণেচ্ছা অন থাকে যাহাতে; গ্রহণেচ্ছা তারিত যাহাতে।* ৩. ভক্ষণ, গ্রাস, গ্রহণ, রাহুকৃত চন্দ্রসূর্য্যের উপরাগ বা গ্রহণ, মুখান্তর্বর্ত্তী ছিদ্র। ভক্ষিত, গিলিত, অভিপন্ন, আক্রান্ত, পীড়িত, নিমীলিত, রাহুভক্ষিত, উপপ্লুত, উপরক্ত, গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন, অস্পষ্টীকৃত, লুপ্ত, অনুচ্চারিত, গৃহীত। (ব.শ.)। ৪. কেবলমাত্র গ্রস্ত শব্দটি 'affected' অর্থে এবং প্রত্যয় রূপে বহু শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; যথা চিন্তাগ্রস্ত, দারিদ্র্যগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত ইত্যাদি। ৫. প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে গ্রস্ ক্রিয়াটিকে বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। আমাদের কামনা তৃপ্ত হয় গ্রহণে। কামনার লক্ষ্য কোনো সত্তা, গ্রহণের বিষয়ও সেই সত্তা। আমাদের 'কামনা-ইচ্ছা' মাত্রেই কাঁচির মতো একটা 'হাঁ'-মুখ। এটি ত্রিমাত্রিক বৃত্তের অর্দ্ধাংশ, যাকে আমরা বলছি গমন-আবর্ত্তক। এই হাঁ-মুখ এগোয়। এই এগোনোকে গামীর আগ্রহ বা গ্রহণ করার ইচ্ছা বলে। সেই ইচ্ছা পূরণ হয় 'কোনো কিছুর (সত্তার) গ্রহণ'-এ। এই কোনো কিছুর (সত্তার) গ্রহণকে গ্রসন বলে। এই গ্রসনের অন্তর্ভুক্ত যে, সেই হল গ্রস্ত। কামনার এই হাঁ-মুখে যতখানি (সত্তা) ধরে, ততটাকে বলা হয় গ্রাস। সেই কারণে মুখের হাঁ-পরিমাণ কিছুকে (সত্তা) গ্রসন করলে তাকে বলে 'গ্রাস করা'। ৬. ইংরেজি grass, graze, gross।

গ্রাম : ১. ✓গ্রস্ + ম (মন্) - অধিকরণে; ✓গম্ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গ্রাসকারীগণ সীমিত যেখানে বা সীমায়িত যাহাতে। /* যেখানে ভোগী ভোগ্য গ্রাস করে। (ব.শ.)। ৩. লোকের গমনস্থান, সংবসথ (= সকলের মিলিত বাসস্থান), একক্রোশ পরিমিত ও সহস্র রৌপ্যমুদ্রারাজস্ব ভূভাগ, সমূহ, নিচয়, ষড়জ মধ্যম গান্ধার এই ত্রিবিধ স্বরবিভাগ। বিপরীত শব্দ = অরণ্য, পুর, নগর। (ব.শ.)। ৪. village অর্থে প্রচলিত। ৫. ব.শ. এই শব্দের যে দুটি ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করেছেন, তার প্রাচীন উৎস উণাদিসূত্র। সেই উণাদিসূত্র অনুসারে **গ্রাম** শব্দের মূলে রয়েছে গ্রস্ ক্রিয়া। আর, বৌদ্ধযুগে রচিত অমরকোষ অনুসারে **গ্রাম** শব্দের মূলে রয়েছে গম্ ক্রিয়া। উণাদিসূত্র অমরকোষের তুলনায় প্রাচীন। আমরা লক্ষ্য করেছি, শব্দের স্বভাব বা প্রকৃতির প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠা রেখেও উভয়েই একটি ক্ষেত্রে পরস্পর থেকে একটুখানি পৃথক। যেহেতু দুজনের মধ্যে কালের ব্যবধান অনেক, সমাজবাস্তব দুজনের কাছে খানিকটা আলাদা। ফলে একই শব্দে আগে যাকে বোঝাত, পরে তার রূপ অনেকটাই বদলে গেছে। উণাদিসূত্র **গ্রাম** বলতে যাকে বোঝেন, অমরকোষের সময়ে সেই গ্রামের চেহারা অনেক বদলে গেছে। ফলে, দুজনের গ্রাম শব্দের অর্থও বদলে গেছে। আর সেই বদলানো অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে গিয়ে অমরকোষকে শব্দের ভিত্তি-ক্রিয়াটির বদল ঘটাতে হয়েছে। সবদিক বিচার করে আমাদের মনে হয়েছে, **গ্রাম** শব্দটি গ্রস্ ক্রিয়া-পরিবারেরই সন্তান। এবং এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি যেরূপ হলে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তা হল — গ্রাসকারীগণ সীমিত যেখানে বা সীমায়িত যাহাতে।

যতদূর বোঝা যায়, মহেঞ্জদারো (মহান-জ-দারু) প্রভৃতি নগরকেন্দ্রিক আদিম যৌথসভ্যতা ভেঙে পড়ার পর যৌথসমাজ টুকরো টুকরো হয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যায়। সেই ছোট ছোট দল অতঃপর এক একটি এলাকায় বাস করতে শুরু করে, সেগুলিকেই এক একটি **গ্রাম** বলা হত। এগুলির চরিত্র ছিল, এই গ্রামের মানুষেরা তাঁদের পরিচালকের (মহর্ষির / বিপ্রের) নেতৃত্বে যা-কিছু উৎপাদন ও সংগ্রহ করতেন, তার সবটাই তাঁরা ভাগ করে ভোগ করে নিতেন। এইজন্য ব.শ. বলেছেন, 'গ্রাম' হল সেই স্থান 'যেখানে ভোগী ভোগ্য গ্রাস করে'। এ হল একেবারে প্রথম যুগের গ্রাম বা আদি **গ্রাম**। একালের সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্র রাজধানী, সেই রাজধানী থেকে দূরে যেসকল প্রান্তিক-ক্ষমতাকেন্দ্র থাকে, একালে তাদের বলা হয় 'জেলা সদর'; এই **গ্রামগুলি** ছিল তারই আদি রূপ। অতঃপর সেই গ্রামগুলির বিকাশ হতে শুরু করে, ক্রমে একদিন কোনো কোনো গ্রাম **গণ্ডগ্রাম**-এ পরিণত হয়; বহু গ্রামে শিবমন্দির গড়ে ওঠে এবং ক্রমে (আদিম নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ধ্বংসের পরবর্তী যুগে) এই সমস্ত গ্রামগুলি মিলে মানুষের নতুন সমাজের মডেলটি মন্দিরকেন্দ্রিক সভ্যতা রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ভারতের ইতিহাসে এই গ্রামভিত্তিক মন্দিরকেন্দ্রিক সভ্যতার ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ। প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তা বিস্তারিত। (বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে 'চ' গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধে।) মাঝে মাঝে ক্ষমতাকেন্দ্র রূপে কিছু কিছু নগর গড়ে উঠেছে, কিন্তু সেগুলির একটিও স্বনির্ভর হতে পারেনি, সম্পূর্ণরূপেই গ্রামনির্ভর থেকেছে; যদিও কালে কালে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোনো কোনো নগর স্বনির্ভর হওয়ার দিকে এগিয়েছে। যদিও তা সত্ত্বেও পরনির্ভরতার হাত থেকে তার মুক্তি মেলেনি। যেকারণে, আজও এই নগরগুলিকে বাদ দিয়ে গ্রামগুলি চেষ্টা করলে কোনো না কোনোভাবে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু গ্রামগুলিকে বাদ দিয়ে নগরগুলির একটিও টিকে থাকতে পারে কিনা, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

যাই হোক, গ্রাম শব্দের ভিতরে ছিল গ্রস্ বা **গ্রাস** করার ব্যাপার। ছিল সীমিত সংখ্যক মানুষের একটি দল, ছিল একটি বিশেষ এলাকা। এবং সর্বোপরি এদের মূল চরিত্র ছিল আত্মনির্ভরতা অর্থাৎ কিনা এই সীমিতসংখ্যক মানুষের দলটি নিজেতে নিজে পূর্ণ ছিল, বলা ভালো, 'পূর্ণ' গুণসম্পন্ন ছিল। সেই কারণে 'গ্রাম' শব্দটি বাংলা

ইংরেজি উভয় ভাষাতেই গণের একটি পরিমাপ রূপে প্রচলিত হতে পেরেছে; যথা — ইন্দ্রিয়গ্রাম, kilogram ইত্যাদি। দ্র. **কূর্ম্ম, কূর্ম্মাবতার**। **৬.** ইংরেজি gram, -gram, gross, grass।

গ্রাস (আগ্রাসন, গ্রাসাচ্ছাদন) : **১.** ✓গ্রস্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *গ্রসন হয় যাহাতে।* **৩.** গলাধঃকরণ, ভক্ষণ, গ্রহণ, রাহুস্পর্শ; মুখপূরক অন্নাদি, কুক্কুটাণ্ডমিত অন্নাদিপিণ্ড, কবল, পিণ্ড, ভোজ্যদ্রব্য, খাদ্যমাত্র, সূর্য্যচন্দ্রের রাহুগ্রস্ত অংশ, পরস্পরখণ্ডিত বৃত্তদ্বয়ের মধ্যস্থ সাধারণ অংশ। (ব.শ.)। **৪.** gulp অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **গ্রসন**। বারংবার এবং অনেক গ্রাস থাকে যে ক্রিয়ায় তাকে আগ্রাসন বলে। মানুষ বাঁচে তার প্রতিদিন কয়েকবার 'মুখপরিমাণ অন্ন' বা গ্রাস খেয়ে খেয়ে; আর শীত-গ্রীষ্মে নিজেকে জামাকাপড়-ঘরের ছায়া ইত্যাদি আচ্ছাদনের তলায়। গ্রাসাচ্ছাদন মানে এই গ্রাস ও আচ্ছাদন, অর্থাৎ পেটের ভাত ও গায়ের কাপড় এবং ঘরের চাল। তাই গ্রাসাচ্ছাদন শব্দের অর্থ করা হয় অশন-বসন। ধনীরা দরিদ্রের অন্ন কেড়ে নেয় বলে কোনো কোনো কবি লিখেছেন, তাঁর লেখায় সেই ধনীদের সর্বনাশ হবে যারা অন্যের 'মুখের গ্রাস' কেড়ে নেয়। **৬.** ইংরেজি grass; graze।

গ্রীষ্ম (গ্রীষ্মসুন্দর) : **১.** গ্রীষ্ম + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে; ✓গ্রস্ + ম (মক্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *গতিশীল গ্রাহকের আধার (গ্রী) দিশাগ্রস্ত থাকে যে সীমায়নে। /* উত্তাপ আছে যাহার; অথবা, রস **গ্রাস** করে যে। (ব.শ.)। **৩.** উত্তপ্ত, উষ্ণ, নিদাঘ, উষ্ণকাল, উত্তাপ, উষ্মা। (ব.শ.)। **৪.** summer অর্থে প্রচলিত। **৫.** গ্রীষ্ম কাকে বলে আমরা সবাই জানি। কিন্তু তার ভিতরে কী ক্রিয়া থাকার জন্য তার ঐরূপ নামকরণ তা জানি না। বর্ণের অর্থের ভিত্তিতে এগোলে আমরা যে ক্রিয়াসমাহারকে পাই, উপরোক্ত (৩) ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে সেকথাই বলা হয়েছে। একেই ব.শ. খানিকটা বিশেষীকৃত করে বলেছেন, 'রস গ্রাস করে যে'। কিন্তু এর ফলে সত্তাসমূহের মধ্যে নানা ধরনের পার্থক্য ঘটে যায়, কেউ বেশি শুকোয়, বেশি সঙ্কুচিত হয়; কেউ বা কম শুকোয়। গ্রীষ্মসুন্দর এই বেশি-কম মাত্রার মধ্যে সাম্য আনে, তাই তার নাম গ্রীষ্মসুন্দর। (দ্র. **সুন্দর**)। বাহ্যিক ক্ষেত্রে এ হল একটি শাকের নাম, যা গ্রীষ্মকালে জন্মায়, চলিত বাংলায় বর্তমানে একে বলা হয় গিমাশাক। যেখানে মাটিতে রস নেই বলে মনে হয়, সেখানেও সে জন্মাতে পারে, প্রসারিত হয়ে পুরো স্থানটি ঢেকে দিতে পারে। এই (তিক্ত) শাক খেলে, গ্রীষ্মকালে মানুষের শরীরে যে সকল তাপজাত ক্ষতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সেগুলি স্বাভাবিক হয়ে যায়। কেবল তাই নয়, এমনও শোনা যায় যে, খরার দেশে কূপ খনন বা টিউবওয়েল বসানোর ক্ষেত্রে এই শাক-এর সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। কোথায় খুঁড়লে বা পাইপ বসালে জল পাওয়া যাবে, তা নিয়ে নাস্তানাবুদ মিস্ত্রিরা তাঁদের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, যেখানে গিমাশাক জন্মেছে এমন স্থানে খুঁড়লে বা টিউবওয়েল বসালে পরিশ্রম ব্যর্থ যায় না, মাটির গভীরে নিশ্চিত জল পাওয়া যায়।

ঘাস : **১.** ✓অদ্ + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *যাহাকে গ্রাস (বা কবলিত) করা হয়।* **৩.** গবাদিখাদ্য, তৃণবিশেষ, খাদ্যমাত্র, আহার। (ব.শ.)। **৪.** grass অর্থে প্রচলিত। **৫.** এই একটি শব্দ, ব.শ. যার মূলে পেয়েছেন 'অদ্' ক্রিয়া। দ্র. **অদ্**। এই অদ্ কথাটির অর্থ গ্রহন করা, গ্রাস করা। যাকে গ্রাস করা হয় সেই সত্তাটিকে ঘাস বলে। তবে সেটি ঠিক কোন কোন পথ পেরিয়ে 'ঘাস'-এ পরিণত হল, তার সব কথা এখনও ঠিকঠাক বোঝা যায়নি। এমনও মনে করা চলে যে, 'ঘস্‌ঘস্' করে কাটা যায় বলে তাদের ঘাস বলে। **৬.** grass।

সংগ্রাম : **২.** *সংহত গ্রাম যাহাতে। /* সম্ (সঙ্গত) গ্রাম (গ্রামবাসী) যাহাতে; যে বিবাদে গ্রামবাসী মিলিত (প্রতিদ্বন্দ্বী)। (ব.শ.)। **৩.** যে বিবাদে গ্রামবাসী মিলিত প্রতিদ্বন্দ্বী, এই মুখ্যার্থ হইতে গৌণার্থে 'যুদ্ধ' (?), সমর। (ব.শ.)। **৪.** struggle অর্থে প্রচলিত। **৫.** একটি গ্রামের সমস্ত মানুষ যদি কোনো ব্যাপারে একত্রিত হয়ে একই প্রকার আচরণ করে, তাহলে তাকে সংগ্রাম বলতে হয়। এরকম আচরণ তারা করত যখন আক্রান্ত হয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য হত, কিংবা কোনো বিশাল সরোবরে মাছ ধরার জন্য সবাই একত্রিত হত। পরে পরে এই অর্থটি বদলে যায়। গ্রামের সমাজ-সাংগঠনিক কাঠামো বদলে যায়, মেধা-ক্ষমতা সবই চলে যায় শহরে; গ্রামের গৌরব নষ্ট হয়ে যায়, গ্রামবাসীদের মধ্যে (জাতীয়তাবোধের মতো) যে স্বাভাবিক 'গ্রামীয়তাবোধ' ছিল, একধরনের গ্রামকেন্দ্রিক যৌথতার বোধ ছিল, তা নষ্ট হয়ে যায়। তখন স্বভাবতই সংগ্রাম 'সারা গ্রামের সকলের জড়ো হয়ে একটা কিছু করা'র অর্থটি হারিয়ে কেবল 'লড়াই' বা যুদ্ধ-বাচক হয়ে যায়।

গ্রহ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অগৃহ, অসংগ্রহ, অগ্রাহ্য, অনবগ্রহ, অনিগ্রহ, অনুগৃহীত, অবিগ্রহ, আগ্রহ, গহ, গারস্ত, গারস্থ, গারিহস্থ, গারা, গার্হপত্য, গার্হস্থ্য, গাহক, গিরি, গেরস্ত, গৃষ্টি, গৃহ, গৃহকন্যা, গৃহকপোত, গৃহকরণ, গৃহকর্ম্ম, গৃহকলহ, গৃহকারক, গৃহকারী, গৃহগোধা, গৃহগোধিকা, গৃহচুল্লী, গৃহছিদ্র, গৃহজ, গৃহজাত, গৃহতটী, গৃহতরু, গৃহদীপ্তি, গৃহদেবতা, গৃহপতি, গৃহপাল, গৃহপ্রবেশ, গৃহবলি, গৃহবাসী, গৃহবিবাদ, গৃহবীথি, গৃহব্যবহার, গৃহভঙ্গ, গৃহভূমি, গৃহভেদী, গৃহমেধ, গৃহরন্ধ্র, গৃহলক্ষ্মী, গৃহস্থ, গৃহস্থালি(লী), গৃহহারা, গৃহাগত, গৃহাধিপ, গৃহাবগ্রহণী, গৃহাম্ল, গৃহায়নিক, গৃহারাম, গৃহার্থ, গৃহাশ্রম, গৃহিণী, গৃহীত, গৃহীতা, গৃহেশ্বর, গৃহ্য, গৃহ্যসূত্র, গেরস্ত, গেরস্তো, গেহ, গ্রহ্, গ্রহ, গ্রহওঝা, গ্রহগ্রস্ত, গ্রহচিন্তক, গ্রহণ, গ্রহণি(ণী), গ্রহদেবতা, গ্রহপতি, গ্রহপীড়ন, গ্রহপীড়া, গ্রহপূজা, গ্রহবলি, গ্রহবৈগুণ্য, গ্রহযাগ, গ্রহরাজ, গ্রহশান্তি, গ্রহস্থ, গ্রাহ, গ্লহ, ঘর, দুষ্পরিগ্রহ, নিগৃহীত, নিগ্রহ, বিগ্রহ, বিনিগ্রহ, সংগৃহীত, সংগ্রহ, সংগ্রাহক, সবিগ্রহ, সুসংগৃহীত।

গ্রহ্ = গমন-আবর্ত্তক-এর (স্থির) হওয়ন। **গ্রহ** = গমন-আবর্ত্তক (স্থির) হয় যাহাতে।

অগ্রাহ্য : ২. *যাকে গ্রহণ করা যায় না, যাহা গ্রাহ্য নহে।* ৩. গ্রহণের অযোগ্য, নিষিদ্ধগ্রহণ, ঈষদ্‌গ্রাহ্য, অস্বীকার্য্য, অপ্রতিগ্রহণীয়, পরিত্যাজ্য। (ব.শ.)। ৪. ignore করা অর্থে প্রচলিত। ৫. যাকে গ্রহণ করা যায়, তাই ছিল গ্রাহ্য। অতএব ন-গ্রাহ্য শব্দটির অর্থ ছিল 'যাকে গ্রহণ করা যায় না বা হয় না'। কিন্তু কালে কালে অর্থটি দাঁড়িয়েছে ignore করা।

গৃহ (গৃহস্থ) : ১. ✓গ্রহ্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. / ধান্যাদি গ্রহণ করে যে; যার দ্বারা নির্দ্দেশ সাধিত্ হয়। (ব.শ.)। ৩. ইষ্টকাদিরচিত বাসস্থান, বাড়ী, প্রাসাদ, প্রকোষ্ঠ, মন্দির, আশ্রয়, আধার, স্থান, কলত্র, স্ত্রী, গৃহস্থাশ্রম, রাশিচক্রে রাশিস্থান; নাম, সংজ্ঞা, ভবন, দার, স্ত্রী, গৃহজন, কুটুম্ব, পরিবারগণ। (ব.শ.)। ৪. home অর্থে প্রচলিত। ৫. গৃহ বলতে এখন আমরা 'বাড়ী' বা home বুঝি। কিন্তু শব্দটি প্রস্তুত করা হয়েছিল 'গ্রহণ' ক্রিয়ার অনুষঙ্গে। মানুষের গ্রহণ-গ্রসন বা গ্রাস করে আনা বাহ্যসম্পদ রাখা হত যেখানে, তাকেই গৃহ বলা হত। কেননা, যতদূর বোঝা যায়, নিজেকে রক্ষা করার জন্য আদিম মানুষ গৃহের প্রয়োজন বোধ করেনি; প্রকৃতির মাঝে আকাশের নীচে উদোম থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর ছিল। (এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 'আবরণ' নিবন্ধটি সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়।) তবুও একদিন তার গৃহের প্রয়োজন পড়ে, আর সর্বাগ্রে তার প্রয়োজন পড়ে সংগৃহীত বাহ্যসম্পদকে রক্ষা করার জন্য। হাতিয়ার ও আগুন আবিষ্কারের পর মানুষের আহরণের মাত্রা তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বা উদ্বৃত্ত হয়ে যায়। তার জন্য 'গৃহ' বা 'ধান্যাদিগ্রাহক' বানাতেই হয়। পরে পরে, সময় যত এগিয়েছে, মানুষ যত বেশি প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তত বেশি তার প্রয়োজন হয়েছে নিজের শরীরকে রাখার জন্য পৃথক জায়গা। সম্পদের জন্য বানানো 'গৃহে স্থিত' হয়ে একদিন 'গৃহস্থ' হতে শুরু করেছে মানুষ। সেখান থেকে এগোতে এগোতে সে এখন কোথায় পৌঁছেছে, সবাই তা জানেন। আবার চিন্তাজগতে সবকিছুকে বিন্যস্ত করতে গিয়ে সকলের জন্যই বিধিবদ্ধ গৃহের ভাবনা এসেছে তার মনে। তাতে রাশিচক্রের যেমন ঘর নির্দিষ্ট হয়েছে, তেমনি হয়েছে ঠাকুরঘর, দোকানঘর, বাঘ-বকরির ঘর, নাচের ঘর, তাসের ঘর ... ইত্যাদি ইত্যাদি। সবই হয়ে গেছে গৃহপদবাচ্য। কিন্তু 'শেষ' বিচারে এসব তাসের-ঘরই বটে। এই 'শেষ'-এর খবর আসছে বায়ুদূষণ, গ্লোবাল-ওয়ার্মিং, জলসংকট, এবং সর্বোপরি স্থানসংকট থেকে। সর্বাধুনিক নগর-স্থাপত্যবিদেরা হিসেব করে দেখেছেন, আমাদের শহরগুলিতে জনবসতির যে ঘনত্ব তাকে স্বাভাবিক করতে গেলে অন্ততপক্ষে তেরোগুণ জায়গা লাগবে; অর্থাৎ আমরা প্রায় তেরোটি পৃথিবীর মানুষ এখন (২০০৮ খ্রিস্টাব্দে) একটিমাত্র পৃথিবীতে ঠাসাঠাসি করে বাস করছি। দ্র. **চাল, চট**।

গ্রহ, গ্রহণ : ১. ✓গ্রহ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓গ্রহ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. / ফলদায়ক রূপে গ্রহণ করে যে; যার দ্বারা গ্রহণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. সূর্য্যচন্দ্রাদি নবগ্রহ, ৯ সংখ্যা, রাহু, পূতনাদি বালঘাতিনী অপদেবতা, গৃহ, মকর; গ্রহণ, স্বাকীর, প্রাপ্তি, ধারণ, আকলন, আকর্ষণ, বোধ, জ্ঞান, অপহরণ, উচ্চারণ, নির্ব্বন্ধ, আসক্তি, আগ্রহ, আক্রমণ, অভিনিবেশ, উপরাগ, অনুগ্রহ, অনুকম্পা, নাশন, ক্ষয়, রণোদ্যম, যুদ্ধাদিতে গৃহীত বা লুণ্ঠিত দ্রব্য, দর্ব্বি, হাতা, গ্রহজন্য বিপদ, দুর্দৈব। (ব.শ.)। ৪. গ্রহ শব্দটি planet অর্থে এবং গ্রহণ শব্দটি to take অর্থে প্রচলিত। ৫. গ্রহ অন থাকে যাহাতে, তাকে বলে গ্রহণ। আবার গ্রহণ করে যে, তা সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেমন সত্তাই হোক না কেন, তাকে বলে **গ্রহ**। আবারও যার দ্বারা গ্রহণ করা হয়, তাকেও বলে **গ্রহণ**। গ্রহণ করা বস্তু যেখানে রাখা হয়, সেটিকে বলা হত **গৃহ**। '**আগ্রহ**'তে গ্রহণকারীর গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকটিত থাকে। বিপরীত পক্ষের (গ্রস্ত-এর) দৃষ্টিতে সেটিই **গ্রাস**। গ্রাসে ঢুকে গেলে **গ্রস্ত** হয়। বিশেষভাবে বা বিপরীত-ভাবে গ্রহণ করে যে, সে হল **বিগ্রহ**। মূর্ত্তি বা ঠাকুর দাঁড় করিয়ে গ্রহণ করা হত বলে একসময় বিগ্রহ মানেই হয়ে যায় ঠাকুরের মূর্ত্তি। আবার কারও কোনো কিছু কেড়ে নিয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দেওয়াকে বলে **নিগ্রহ**। যে পুরো গ্রহণ করে না, পূর্ণ গ্রহণের কাছাকাছি গ্রহণ করে তাকে বলে **উপগ্রহ**। কিন্তু সার্বিক ভাবে পূর্ণরূপে গ্রহণ করাকে বলা হয় **পরিগ্রহ** (দার পরিগ্রহ)। সম্যক রূপে গ্রহণ করা হলে, তাকে বলা হয় **সংগ্রহ**। কাউকে জ্ঞান বা তজ্জাতীয় কিছু দিলে পরিবর্তে যদি সেও কিছু দেয় এবং তা গ্রহণ করা হয়, তাকে বলে **প্রতিগ্রহ**। কিছুই না দিয়ে প্রতিগ্রহ হয় না। এই সব গ্রহ-উপগ্রহের দ্বারা নিগ্রহকে লোকে একসময় **গ্রহদোষ** রূপে শনাক্ত করে এবং তার থেকে বাঁচার জন্য **গ্রহশান্তির** উপায় খোঁজে।

পৃথিবীতে (পৃথুর শাসনাধীন এলাকাতে) **গ্রহণ** লাগে তখনই, যখন একদিকে চন্দ্র (ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও তার চাঁদির আলো) এবং অপরদিকে সূর্য্য (অধঃপতিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা রিপাবলিক ব্যবস্থা ও তার রাষ্ট্রীয় পুঁজির আলো) দুদিক থেকে মানুষের সমাজকে শোষণ করতে শুরু করে। চন্দ্র সূর্য্য হাত মেলালে এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অর্থনীতির বিচারে আজকের (২০০০ খ্রিস্টাব্দের) পৃথিবীতে এখন **গ্রহণ** চলছে। জোয়ার-ভাঁটায় মানুষ ব্যতিব্যস্ত হচ্ছে।

গ্লৈ ক্রিয়াপদের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : গ্লপন, গ্লান, গ্লানি, গ্লৈ, গ্লৌ।

গ্লৈ = গমনের লালন-লয়ন দিশাগ্রস্ত যাহাতে।

গ্লানি : ১. ✓গ্লৈ + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *(অসতর্কতাবশত) লালিত গামীর হানির (দুঃখজনক) বোধ যাহাতে।* ৩. হর্ষক্ষয়, খেদ, অবসাদ, গাত্রধ্বংস, দৌর্ব্বল্য, বলহীনতা, হানি, হ্রাস, স্বকর্ম্মে বৃত্তিরাহিত্য বা অসামর্থ্য, রতিশ্রমাদিজাত অসামর্থ্যাদিকর ব্যভিচারীগুণভেদ, অনুৎসাহ, ঘৃণা, অবমাননাবোধ, কলঙ্ক, অপবাদ। (ব.শ.)। ৪. shame, mental distress ইত্যাদি অর্থে প্রচলিত।

গ্লৌ : ১. ✓গ্লৈ + ঔ (ডৌ) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *লালিত গামীর সার্বিক ক্ষয়ন যাহাতে।* ৩. প্রতিমাসে ক্ষয় হেতু চন্দ্র, কর্পূর। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. অন্তর্কলহের মজা এই যে, কোনো সত্তার

ভেতরে যখন অন্তর্কলহ চলে, তার সর্বনাশ হয় আর বাইরের লোকের ভারি আনন্দ হয়। কেননা, কলহ অন্তরকে ছিন্নভিন্ন করে সত্তাটিকে আগের তুলনায় দুর্বল করে দেয়; বিপরীতে কলহাগ্নির আলো বাইরে প্রকাশিত হলে লোকে সে আগুনের আলোয় নিজেদের সুবিধা দেখে। আমরা যাকে চকচক ঝকঝক করতে দেখি, কার্যত তার ভিতরে চলছে ক্ষয়, আমরা পাচ্ছি ঝকঝকানি। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা চন্দ্রের মধ্যে সেই ক্ষয় দেখেছিলেন এবং চন্দ্রালোকে মানুষের সুবিধা দেখেছিলেন। নইলে তাকে গ্লৌ নাম দিতে যাবেন কেন? **৬.** ইংরেজি glow।

গ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : আজগুবি, গ, গইবি (গ-ইব), গইর (গঅর), গ-কার, গবলগণ, গাব, গাবদা (গেবদো), গাবর (গবরু), গাবলগণি, গাবান, গাবুর, গাবুরয়ালি, গাবুরাণী, গাবুরাল, গাবুরালি(লী), গাভুর, গাভুরালি(লী), গুবি, গৈবি, গৈর, গোবদা।

ঘ

ঘ্ বর্ণের অর্থ : ঘ্ বর্ণটি তৈরি হয়েছে (গ্ + হ্ = ঘ্) গ্-এর সঙ্গে হ্ জুড়ে। সেকারণে, সাধারণভাবে ঘ্-এর অর্থ হল গমনস্থিত, অর্থাৎ 'গমন যেখানে গিয়ে থেমে যায়'। তাই **ঘ** = ঘ্-অন করে যে; গমনস্থিত = গত = ঘ। এই ঘ হল গমনের সমাপ্তির ফল। গমন বললে আমরা বুঝি ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দুর দিকে যাওয়া। গিয়ে পৌঁছে গেলেই ঘ হয়। এই ঘ-এর আধারকে বলে ঘা। একে আঘাত-ও বলে। ঘি, ঘু, ঘৃ প্রভৃতির অর্থের জন্য অতঃপর **ক বর্ণের অর্থ** দ্রষ্টব্য।

ঘ্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : ঘট্ (ঘট্ট্), ঘু, ঘুষ্, ঘূর্ণ্, ঘৃ (ঘৃষ্), ঘ্রা, ঘ্ = ৬ + ১

ঘট্ (ঘট্ট্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অঘট, অঘট-ঘটক, অঘটন, অঘটনঘটন, অঘটনঘটনা, অঘটনা, অঘটিত, অঘাট, অঘাট-অপাট, অঘাটি, **আঘট্টক**, আঘাট, আঘাটা, উদ্‌ঘাট, উদঘাটন, ঘট্, ঘট, ঘটক, ঘটকর্পর, ঘটকার, ঘটকারক, ঘটকৃৎ, ঘটদাসী, ঘটন, ঘটনা, ঘটপট, ঘটপটিয়া, ঘটবারি, ঘটযোনি, ঘটরঘটর, ঘটস্থাপন, ঘটা, ঘটাখানা, ঘটাটান, ঘটাটোপ, ঘটারোল, ঘটি, ঘটিকা, ঘটিত, ঘটী, ঘটোৎকচ, ঘটোদর, ঘটোঘ্নী, ঘট্ট্, ঘট্ট, ঘট্ট-ঘট্ট, ঘট্টজীবী, ঘট্টন, ঘট্টপাল, ঘট্টরাজ, ঘড়, ঘড়ই (গড়পতি), ঘড়ঘড়, ঘড়রঘড়র, ঘড়া, ঘড়াঞ্চে, ঘড়ালে, ঘড়ি, ঘড়িআল, ঘড়ি(ড়ী)য়াল (হেঁড়াল, ঘ কেমন করে হ হয়, দ্র. ঘৃষ্ট), ঘড়েঘড়, ঘড়েল, ঘণ্ট, ঘণ্টক, ঘণ্টকর্ণ, ঘণ্টা, **ঘণ্টাকর্ণ**, ঘণ্টাতাড়, ঘণ্টানাদ, ঘণ্টাপথ, ঘণ্টাপাটলি, ঘণ্টাবাদ, ঘণ্টারাব, **ঘণ্টালী**, ঘণ্টাশব্দ, ঘণ্টি, ঘণ্টিকা, ঘণ্টেশ্বর, ঘাঁট, ঘাঁটা, ঘাঁটান, ঘাঁটি, ঘাঁটু, ঘাঁত, ঘাঁতঘোঁৎ, ঘাট, ঘাটওআল, ঘাটতি, ঘাটা, ঘাটি (হাটি), ঘাটিআল, ঘাটিয়াল, ঘাটী, ঘাটোয়াল, ঘাড়, ঘাণ্টিক, ঘেঁটকোল, ঘেঁটু, ঘেটেল, ঘেটি, ঘোঁট, ঘোঁটন, ঘোঁটনা, ঘোঁটা, ঘোঁটান, ঘোঁড়া, ঘোঁড়ারু, ঘোট, ঘোটক, ঘোটন, ঘোটনা, ঘোটালা, ঘোড়, ঘোড়ই (ঘোড়ৃই), ঘোড়তোলা, ঘোড়া, ঘোড়ারু, ঘোড়ারোগ, ঘোড়েল, ঘড়্যাল, ধর্মঘট, নির্ঘণ্ট, বিগাড়, বিঘটন, সঙঘটন, হাটি।

ঘট্ (ঘট্ট্) = ঘ-এর (গমনস্থিতের) টঙ্কারণ। **ঘট** = ঘ-এর (গমনস্থিতের) টঙ্কারণ যাহাতে। **ঘট্ট** = ঘট্-এর টঙ্কার যাহাতে।

ঘট (ঘটন, ঘটনা) : ১. ✓ঘট্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓ঘট্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে; ✓ঘটি + অন (ল্যুট্, যুচ্) + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২. ঘট** = *ঘ (গমনস্থিত) টঙ্কারিত যাহাতে;* ***ঘটন*** *= ঘ-এর টঙ্কার অন (on) থাকে যাহাতে;* ***ঘটনা*** *= ঘ-এর গতিশীল টঙ্কার অন থাকে যাহাতে তাহার আধার।* / যাহা মৃত্তিকাদি দ্বারা ঘটে। (ব.শ.)। **৩.** কলস, কুম্ভ, (সাদৃশ্যে) হস্তিশিরঃ, করিকুম্ভ, শিরঃ, কুম্ভপরিমাণ, দ্রোণপরিমাণ, সমাধিবিশেষ, কুম্ভক, স্তম্ভাংশ, দেহ, মন, আবাহিত দেবতার অধিষ্ঠানভূত মৃত্তিকাদির কলস ... ... ইত্যাদি। চেষ্টা, প্রযত্ন, সম্ভব, সংঘটন। সম্পাদন, সাধন, সংযোজনা, মেলন, সন্দর্শন, সংঘাতীকরণ, সমূহীকরণ, নির্ম্মাণ, গঠন, বিরোধ, শত্রুভাব, ব্যাপার। (ব.শ.)। **৪.** বহু অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **উত্তানপাদ**। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আজকের সভ্যতা উপকরণবহুল, নিত্যনতুন ভূরি ভূরি বস্তু উৎপাদিত হচ্ছে। এগুলি নানারকম বিভিন্ন বস্তুর যথাযথ মিশ্রণে, সংযোজনে এবং মানুষের মেধা, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও শ্রমে উৎপাদিত হয়। সরল রূপে দেখলে, কাদামাটিতে 'ঘ' (মেধা ও শ্রম) গমন ক'রে স্থিত হয়; ফলে তা পরিণত হয় নতুন এক বস্তুতে (হাঁড়িতে), যাতে গমনস্থিত বা ঘ টঙ্কারিত হতে থাকে। সে কারণে কলসি প্রভৃতি মাটির তৈরি জিনিসগুলিকে ঘট বলে। ব.শ. কেবলমাত্র এই মাটির তৈরি জিনিসের কথাই বলেছেন। তবে কাদামাটি ছাড়াও আর যে সকল বস্তুতে একই ভাবে মানুষের ইচ্ছা, শ্রম, মেধা ইত্যাদি গমন করে স্থিত হয়, তেমন সব বস্তুকেই কিন্তু এই নিয়মে 'ঘট' বলা যায়। যায় বলেই যত্নসাধ্য সব উৎপন্নই ঘট পদবাচ্য। এমনকি, অনেক পরিশ্রমে অর্জিত জ্ঞান যে শিরে গিয়ে স্থিত হয়ে টঙ্কারিত হয়, তাকেও ঘট বলে ('ঘটে বুদ্ধি থাকলে' কথাটি এই অর্থে বোঝা যেতে পারে)। তাছাড়া 'সর্ব্বঘটের কাঁঠালি কলা' তো কেবল ঘটে ঘটে বা ভাঁড়ে ভাঁড়েই থাকে না, সব ধরনের ঘটনাতেও হাজির থাকে। সেক্ষেত্রে ঘট মাত্রেই যে-ঘটনা ঘটানো হয়, সেই ঘটনাও বটে। তবে এই সব ঘট-ঘটনা স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, **ঘটক** ছাড়া ঘটনা ঘটে না। ছোটখাট ঘটকার (**কুম্ভকার**), ঘটকারক, ঘটকৃৎগণ শুধুমাত্র ঘটিবাটি, হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতি ঘটায় বা বানায়; আর সামাজিক ঘটক ঘটকালি করে বিবাহ সংঘটন করে; অতি ক্ষুদ্র **ঘটিকা** অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়ে ঘটিয়ে মুহূর্ত মাপে বা ঘণ্টা-সময় মাপে; কিন্তু আরও বড় ঘটকেরা বড় বড় সামাজিক **ঘটনাবলী** ঘটিয়ে **ঘটা** করে **ঘটারোল** ফেলে দেয়। আরও অনেক প্রকার

ভূমিকা আছে ঘটের। অঘটনঘটন-পটীয়সী স্বয়ং পরমাপ্রকৃতি-মহামায়াই তো সবচেয়ে বড় **ঘটকী**। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাঁর ঘটানো ঘট। তবে আমাদের শুষ্কতর্কনিষ্ঠ **ঘটপটিয়া** ন্যায়বাদী নৈয়ায়িকেরাও কম যান না। তাঁরা দুনিয়াটাকেই ঘট আর **পট**-এ ভাগ করে দেখেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন **ঘটনাচক্র**-এর অধিপতি **দৈবজ্ঞরা**। তাঁরা দিশে দিশে দেশে দেশে **ঘটস্থাপন** করেন, সেজে-সেজে (SEZ-এ SEZ-এ) **ঘটবারি** সিঞ্চন করে, অঘটন ও অপটনকে ঘটিয়ে আর পটিয়ে ঈশ্বরকে চমকে দেওয়ার তাল করেন। শেষে ভবিতব্যের নির্দেশে নিজেরাই **লটপটিয়ে লটরপটর** করতে করতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান।

ঘটক, ঘটকী : ২. *ঘট করে যে; ঘট করে যে-প্রকৃতি।* ৩. ঘটয়িতা, যোজক, সাধক, বরকন্যার বিবাহে যোজক। (ব.শ.)। ৫. যে ঘটকালী করে তেমন পুরুষকে **ঘটক** ও মহিলাকে **ঘটকী** বলে। দ্র. **ঘট**।

ঘটকর্পর : ৩. ভগ্নঘটাবয়ব, ঘটের খাপরা, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একতম। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. নামের বিষয়ে আমরা জেনেছি যে, প্রাচীন যুগে কোনো ভাষাতেই অর্থহীন নামের প্রচলন ছিল না; বাংলাভাষায় তো ছিলই না। স্বভাব, ধর্ম্ম বা এককথায় ক্রিয়া অনুসারেই প্রত্যেকের নামকরণ হত। নাম থেকেই জানা যেত, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি কী করেন। ঘটকর্পর কী করতেন যে, তাঁর নাম 'ঘটকর্পর' রাখা হল? শব্দার্থ থেকে যতটুকু অনুমান করা যায়, তা হল — ঘটনা কীভাবে ঘটানো হবে, অর্থাৎ কীভাবে সংযোজন-মেলন-শ্রম ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো জিনিস উৎপন্ন করা যাবে, তা করার এবং তার পরে তা নিয়ে কীভাবে বিক্রিবাটা বা উপঢৌকনাদি দিয়ে শ্রমমূল্য লাভ করা যাবে, এ বিষয়ে যিনি পরামর্শ দিতেন অর্থাৎ প্রোডাকশন ও বিজনেস ম্যানেজমেন্টের যিনি পরামর্শদাতা পণ্ডিত ছিলেন, তিনিই ঘটকর্পর পদবাচ্য ছিলেন। তাঁর সমসাময়িক কালে রচিত বাৎস্যায়নের **কামসূত্র** এরকম কথা ভাবতেই প্ররোচিত করে।

ঘটনাবলী, ঘটনাচক্র : ৫. ঘটনা পর পর সুবিন্যস্ত ভাবে সাজানো থাকলে তাকে বলে ঘটনাবলী। কিন্তু ঘটনাচক্র তা নয়। একটি ঘটনার থেকে যখন অপর একটি বা একাধিক ঘটনা ঘটে, এবং তারপর তার থেকে আরও এক বা একাধিক ঘটনা ঘটে যায় ... এইভাবে ঘটনা থেকে ঘটনার জন্ম হতে হতে যখন তা আদি ঘটনার কাছে ফিরে আসে, তখন ঘটনাচক্র পূর্ণ হয়। বস্তুজগতে এই ঘটনাচক্রের হিসেব করেন বিজ্ঞানীরা; আর পণ্যজগতে এই ঘটনাচক্রের হিসেব করেন অর্থনীতিবিদেরা। সেকালে এই অর্থনীতিবিদগণকে **দৈবজ্ঞ** বলা হত।

ঘটপট (ঘটপটিয়া, ঘটানো-পটানো) : ২. *ঘট ও পট (= পালন টঙ্কারিত যাহাতে);* ***ঘটপটিয়া*** *= ঘটপট (বিষয়ক ধারণাদি ও কর্ম্মাদি) নিয়ে গতিশীলভাবে গমন করে যে।* / **ঘটপটিয়া** = যে কেবল ঘটপট জানে। (ব.শ.)। ৩. নৈয়ায়িক, শুষ্কতর্কনিষ্ঠ। (ব.শ.)। ৪. ঘটানো to make ও পটানো to manage অর্থে খুবই প্রচলিত। ৫. **ঘট ও পট বা ঘটপট শব্দটি** প্রাচীন বাংলায় খুবই প্রচলিত ছিল, এখনও কমবেশি আছে। এর অতি পরিচিত দৈনন্দিন ব্যবহারিক অর্থ ও তদর্থধারী বস্তু যেমন ছিল, তেমনি অতি উচ্চ মানের দার্শনিক অর্থ ও তদর্থধারী সত্তাও ছিল; এবং আছেও। ছোট প্রেক্ষিতে, একটি হাঁড়ি (ঘটানো বস্তু) ও একটি গরু (পালিত বস্তু) বেচতে চাইলে বিক্রেতা আসলে একটি ঘট ও একটি পট বেচতে চায়। প্রথমটি **উত্তানপাদ**, দ্বিতীয়টি **প্রিয়ব্রত**। বড় প্রেক্ষিতে, জগৎসংসার যদি ঘট হয়, যে নিয়মগুলির দ্বারা তা পালিত, সে হয় পট। যে মহামায়ার (= জনসাধারণের) বোধন করা হয়, তিনি ঘট-এ (উৎপাদিত পণ্যসম্পদে) আসতে পারেন, পটেও (পালিত বা সংগৃহীত বাহ্যসম্পদেও) আসতে পারেন।

আরও আছে। আমরা হ্যান বানাব, ত্যান বানাব বলে **ঘটবারি**-সিঞ্চনকারীরা ঘ-এর **টঙ্কার** তুলতে পারেন; সে হল তাদের ঘটানোর **ঘটারোল**। আবার, আমরা দুধের আর মধুর বন্যা বইয়ে দিয়ে তোমাদের পালন-ব্যবস্থা করব বলে তাঁরা পালন-এর **টঙ্কার** তুলতে পারেন; সে হল তাদের পটানোর মহারোল।

ঘটবারি, ঘটস্থাপন (ধর্ম্মঘট) : ৩. **ঘটবারি** = দেবতার অধিষ্ঠানভূত ঘটে ধৃত মন্ত্রপূত জল; দেবতার সজল অধিষ্ঠানঘট। **ঘটস্থাপন** = আবাহিত দেবতার অধিষ্ঠানার্থ বিধিপূর্ব্বক বেদিকার ঘটাধান। **ধর্ম্মঘট** = ধর্ম্মার্থ বৈশাখমাসে প্রত্যহ দেয় গঙ্গোদকপূর্ণ সভোজ্য সদক্ষিণ চন্দনাক্ত কলস। ধর্ম্মসাক্ষিপূর্ব্বক স্থাপিত ঘট (বারি); ধর্ম্মঠাকুরের বারি। **ধর্ম্মঘট করা** = ধর্ম্মঘট স্পর্শ করিয়া কোনো বিষয়ের সিদ্ধির নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাকরণ; প্রার্থনা পূরণার্থ শ্রমিকগণের সমবেতভাবে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কর্ম্মবন্ধ করা। (to strike)। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **ঘট**। উত্তরাধিকার সূত্রে আমাদের ছিল **ঘটবারি**, **ঘটস্থাপন**, এবং **ধর্ম্মঘট**ও। মানেটা পণ্ডিতেরা কমবেশি জানতেন। শব্দগুলির অর্থ তিনটি স্তরে ব্যাপ্ত ছিল। প্রথম স্তরের অর্থ বুঝতেন সবাই, দ্বিতীয় স্তরের অর্থ বুঝতেন কিছু কিছু নিম্ন অধিকারী, এবং তৃতীয় স্তরের অর্থ বুঝতেন কেবল উত্তম অধিকারীগণ। প্রথম স্তরে ঘট ছিল মাটির ঘটমাত্র, যা স্থাপন করা হত পূজার বেদিতে, তাতে থাকত জল এবং সেই ঘটগুলির মধ্যে যে ঘট বৈশাখ মাসে ধর্ম্মঠাকুরের নামে স্থাপন করা হত এবং তা ছুঁয়ে কোনো একটি প্রতিজ্ঞা করা হত — যেমন 'যতদিন বৃষ্টি না হবে, ততদিন প্রত্যহ রাত্রিতে উপবাস করা হবে'। দ্বিতীয় স্তরে ঘট ছিল কোনো বাহ্যবস্তু ঘটানো বা প্রস্তুত করা, যাকে ঘট (ঘটি-বাটি ইত্যাদি) বলা যেত, যার প্রতিষ্ঠা হত কোনো কারুকর্ম্মক্ষেত্রে, তাতে থাকত **গঙ্গাজল**-এর মতো পণ্যপ্রবাহের ধারার কিছু অংশ (মূল্যবান কাঁচামাল, মেধা ও শ্রম), এবং সেই ঘটনার প্রতিষ্ঠার পর দেশের বা রাষ্ট্রের বিধির কাছে নানান 'আবদার-মূলক' প্রার্থনা করা হত — যেমন, 'নতুন তৈরি করা শাড়ি জমিদারবাড়ির কর্ত্তামা না পরলে তা বিক্রি করা হবে না।' তৃতীয় স্তরে ঘট ছিল মননজাত নান্দনিক (আধ্যাত্মিক) তত্ত্ব, তা স্থাপিত থাকত গোস্বামীগণের গবেষণার বেদিতে, তাতে থাকত জগতের সঙ্গে সম্বন্ধধারার বারি, এবং সেই তত্ত্ব-জাত ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য বিশ্বব্যবস্থার নিয়মের সঙ্গে তাকে খাপ

খাওয়ানোর চেষ্টা বা (জ্ঞা-এর বিপরীতে প্রতিজ্ঞা) চালান হত নানাভাবে — যেমন, 'যতদিন বনের পশু গান শুনে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে না পড়বে, ততদিন একান্তে চলবে এই বিশেষ সুরের সাধনা।' অর্থাৎ ঘটবারি শব্দের অর্থ ছিল — যে ঘটে বারণ গতিশীলভাবে বিদ্যমান, ঘটস্থাপন শব্দের অর্থ ছিল — ঘটের অস্তিত্বকে রক্ষা করে পালন করা, এবং ধর্ম্মঘট শব্দের অর্থ ছিল — **ধর্ম্ম** অনুসারে (স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে বা আইন অনুসারে) ঘটনা ঘটুক, ঘটানো হোক, ঘটাব, ঘটাতে চাই ... ইত্যাদি।

এবার ইংরেজ এসে হাজির হল আমাদের দেশে। তার ছিল strike। আমাদের যে পণ্ডিতেরা ধর্ম্মঘটের অর্থ জানতেন, তাঁরা strike-এর পরিবর্তে ধর্ম্মঘট শব্দটি প্রয়োগ করে দিলেন। হিন্দিভাষীরা প্রয়োগ করলেন **হরতাল**। ফল হল এই যে ধর্ম্মঘট ও হরতালের নিজস্ব অর্থ যেটুকু যা ছিল, তাও পরিত্যক্ত হয়ে তা strike-এর প্রতিশব্দ হয়ে গেল। বাংলা-ভাষাসমাজের গণ্যমান্য সদস্য শব্দেরা আপন আপন অট্টালিকা হারিয়ে ইংরেজি শব্দের মতো এক-কামরা ফ্ল্যাটের বাসিন্দা হয়ে গেল। (দ্র. 'খ' গ্রন্থের ১ম নিবন্ধ)।

অজস্র বাংলা শব্দের ক্ষেত্রেই এরকম ঘটনা ঘটেছে। একালের একটি চালু শিল্পকারখানার মানেই যে দেবতার সজল অধিষ্ঠানঘট বা ঘটবারি; অনেকখানি জমির উপর শিল্পকারখানা গড়ে তোলার মানেই যে আবাহিত দেবতার অধিষ্ঠানার্থ বিধিপূর্ব্বক বেদিকার ঘটাধান বা ঘটস্থাপন; সেসব কথা এখন আমরা একেবারেই ভুলে গেছি। ফলত, এর সঙ্গে ধর্ম্মঘটের যে সম্পর্ক — **ধর্ম্ম** অনুসারে (স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে বা আইন অনুসারে) এই ঘটবারির (কারখানার) ঘটনাসকল ঘটুক — তাও আমরা ভুলে গেছি। আজ আমরা এতই নিঃস্ব যে ঘটবারি, ঘটস্থাপন প্রভৃতি শব্দের শুধুমাত্র নিম্ন-অধিকারীসুলভ অর্থই এখন আমরা বুঝি — ঘটির জলে এবং ঘটি রাখায় দেখতে পাই ঘটবারি ও ঘটস্থাপনকে। এর সঙ্গে বিশাল জমি দখল করে সেখানে কারখানা স্থাপনকে আর আমরা দেখতে পাই না। অথচ, আজকের ধর্ম্মঠাকুর (আদালত) জনসাধারণের জমি অধিগ্রহণ করে দেবতাদের (পুঁজিপতিদের) আবাহনার্থ ঘটস্থাপন করছেন জনসাধারণের স্বাভাবিক সম্মতি ছাড়াই।

ঘটা (ঘটারোল) : ২. **ঘট**-*এর আধার যে।* **৩.** ঘটা = ঘটন, চেষ্টা, যত্ন, সঙ্ঘাত, সমূহ, করিসমূহ, সভা, গোষ্ঠী, পুঞ্জ, রাশি, আড়ম্বর, সমারোহ, বৈচিত্র্য, কৌশল। ঘটারোল = **ঘটার** সহিত শব্দ, শব্দাড়ম্বর, মহাশব্দ। (ব.শ.)। **৫. ঘট** হওয়া। প্রচুর ঘট-এর আধারকেও ঘটা বলে। ঘটা করে কিছু করার অর্থ প্রচুর ঘট ঘটিয়ে ফেলা।

ঘটি, ঘটিকা, ঘটী : ২. **ঘটি** = **ঘট** *গতিশীল যাহাতে।* **ঘটিকা** = **ঘটি**-*কারীর আধার যে।* **ঘটী** = *গতিশীল* **ঘট**-*এর আধার যে।* **৩. ঘটি** = দণ্ড, চব্বিশ মিনিট, ধাতু নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ঘটবৎ জলপানপাত্র। (**ঘটি মারা** = অস্তগত হওয়া। 'চান জ্যান ঘটি মারিলে পৃথিবি হয় অন্ধকার'।) **ঘটিকা** = ক্ষুদ্র ঘট, দণ্ড, একঘড়ি, চব্বিশ মিনিট, এক মুহূর্ত্ত, দুই দণ্ড বা আটচল্লিশ মিনিট, ... ঘটিকা এক মাপঘট, তাম্রনির্ম্মিত। ইহার তলে সরু ছিদ্র থাকিত। জলে ভাসাইয়া দিলে, যত সময়ে ঘটিকা জলপূর্ণ হইয়া ডুবিয়া পড়িত, তত সময়ের নাম এক ঘটিকা। ঘটিকার পরিমাণ এমন যে, এক অহোরাত্রে ঠিক ষাটিবার ডুবিত। ... **ঘটী** = কূপ হইতে জলোত্তোলনার্থ ঘটীসহিত যন্ত্রবিশেষ, অরঘট্ট, দণ্ডকাল জ্ঞাপক ঘটীরূপযন্ত্রবিশেষ। ঘড়ী। (ব.শ.)। **৪.** কাঁসার তৈরি ভাঁড়ের মতো জলাধার অর্থে ঘটি, এবং 'পশ্চিমবঙ্গবাসী' অর্থে ঘটী শব্দটি প্রচলিত। **৫. দ্র. ঘট, ঘণ্টা।** পশ্চিমবঙ্গবাসীকে পুববাংলার অধিবাসীরা **ঘটি** বলেন কেন? বিপরীতে পশ্চিমবঙ্গবাসীরা তাঁদের বাঙাল বলেন কেন? (দ্র. **বঙ্গ**)। এবং উভয়ক্ষেত্রে যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তাকে 'হীন করে দেখানো'র চেষ্টা বা উপহাস থাকে কেন? আরও বড় কথা এই যে, এই **ঘটি-বাঙাল** সম্বোধনটি বাইরের (মারাঠি, পাঞ্জাবি কিংবা ইয়োরোপের) লোকেরা করেন না; পশ্চিমবঙ্গবাসীরা পূর্ববঙ্গবাসীদের বাঙাল বলেন, এবং বাঙালরা পশ্চিমবঙ্গবাসীদের **ঘটি** বলেন। কেন এরকম আচরণ করেন তাঁরা? এরকম শাড়ি পরা, ওরকম রাঁধাবাড়া, সেরকম চলাফেরা, বাঙাল পরিবারে ঘটি মেয়ের বিয়ে, কিংবা ঘটি পরিবারে বাঙাল মেয়েকে বিয়ে করে আনা — এসব নিয়ে নানারকম আপত্তি হীনম্মন্যতা আত্মগৌরব ও পরনিন্দা বহু কিছুই রয়েছে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। তবে এই রেষারেষি রয়েছে প্রধানত দুই দেশের হিন্দু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বদ্যিদের মধ্যেই, শূদ্র বা মুসলমান কিংবা আদিবাসীদের মধ্যে সেরকম কিছু দেখা যায় না। কেন এরকম সাংস্কৃতিক বিরোধ?

বঙ্গ শব্দটি থেকে বঙ্গাল বা বাঙাল কথাটি প্রসৃত হয়েছে। বঙ্গ শব্দটির নিহিতার্থ পাওয়া যায় দুটি শব্দে — বঙ্গো ও বঙ্গী। বঙ্গো হল একটি বাদ্যযন্ত্র, যাতে হুবহু সমান দুটি ক্ষুদ্র তবলা কয়েকটি লৌহদণ্ডের সাহায্যে পাশাপাশি একত্রে এমনভাবে আবদ্ধ থাকে; যাতে দু'হাতে দুটিকেই বাজানো যায়, ডিগি-তবলার মতো। (দ্র. **দীর্ঘ**)। আর বঙ্গী হল 'ভারবহনার্থ বংশাদির দণ্ড' বা বাঁক, যাকে বাউঙ্ক ও বাউঙ্কা শব্দে চিহ্নিত করেছেন ব. শব্দকোষ। গ্রামবাংলায় একে বাঁক, বঙ্গী বা বাঙ্গী বলা হয়। এই বংশদণ্ডের দুই দিকে ভার ঝুলিয়ে বংশদণ্ডটি কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। গোয়ালাদের কাঁধে এই বাঁক প্রায়শই দেখা যায়। বঙ্গ শব্দের প্রচলিত এই দুটি প্রয়োগ — বঙ্গ ও বঙ্গী — থেকে আমরা বুঝতে পারি, এর মধ্যে উভয় পক্ষকে সমমর্যাদায় বহন করে নিয়ে চলার প্রক্রিয়া রয়েছে। **অঙ্গদেশ** শব্দে আমবা জেনেছি, এই দেশের বাসিন্দাগণ মানুষের যে আদিম (স্বাভাবিক প্রাকৃতিক) সনাতন ব্যবস্থা, বৈদিক যুগেরও আগে যা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই উত্তরাধিকার ছাড়তে রাজি হননি; সেটিই বহন করে নিয়ে চলেন বলে তাঁদের **অঙ্গদেশ** বলে। সেই হিসেবে যে দেশের বাসিন্দাগণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সনাতন ব্যবস্থার পাশাপাশি নিজেদের আধুনিক অর্জন বা আধুনিক ব্যবস্থা, দুটোকেই সমমর্যাদায় বহন করে নিয়ে চলেন, তাঁদের বলে **বঙ্গবাসী**।

যতদূর জানা যায়, বঙ্গালুরু (বাঙ্গালোর) শহরের আদি ইতিহাসে (দশম শতাব্দীর আগে) বীর বল্লালের কাহিনীতে গ্রাম্যবৃদ্ধা কর্তৃক বীর বল্লালকে (বঙ্গের বল্লাল সেন স্মর্তব্য) আশ্রয় দেওয়ার ঘটনার মধ্যে অতীত ও বর্তমানের সমমর্যাদার কথাটি রয়েছে, যেকারণে স্থানটির নাম হয়েছে বঙ্গালুরু; যদিও ঐতিহাসিকরা সেরকম বলেন

না। তাতে আমাদের ধারণার সহসা কোনো বদল হওয়ার কারণ নেই। কারণ, আমরা জানি, ঐতিহাসিকরা যত সৎ, নিরপেক্ষ, নিষ্ঠাবান, জ্ঞানবান হোন না কেন, শব্দজ্ঞানের বিষয়ে তাঁরা নেহাতই কালের ক্রীড়নক। শব্দের ভিতর থেকে অর্থ বের করবার উপায় তো বেচারাদের জানা নেই; কারণ বিশ্বের কোনো অ্যাকাডেমিরই 'ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবোধ' নেই। হয়তো একই ধরনের কোনো ব্যাপার বঙ্গাইগাঁওয়ের ক্ষেত্রেও থেকে থাকবে। মোট কথা উভয়ের সমমর্যাদা থাকলে বঙ্গ থাকতেই পারে।

এককালে বিহার-বাংলা-উড়িষ্যাকে যথাক্রমে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ বলা হত। এদের উদ্ভব হয়েছিল কীভাবে, সেকথা আমরা **দীর্ঘতমা, বলিরাজা, সুদেষ্ণা**র পুরাকাহিনী থেকে জানতে পারি। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের যে বঙ্গ, অনেকে তাকে 'বৃহৎবঙ্গ' বলেন। এর এলাকা পশ্চিমদিকে বিহার-উড়িষ্যার সীমা থেকে পুবে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত। বেদবিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ তিনজাতির চোখেই এই বঙ্গের গৌরব ছিল অতুলনীয়; বিপরীতে বেদবাদী গোবলয়ের চোখে এই তিন জাতিই ছিল নিন্দনীয় ম্লেচ্ছ। অধঃপতিত আদিম সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে অশোকের কালে ভারতবর্ষে যে আদি শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়েছিল এবং হর্ষবর্দ্ধনের কালে যা আরও বিকশিত হতে পেরেছিল, তারপর সারা ভারতে তা স্তিমিত হয়ে গেলেও বঙ্গদেশ গোপাল-দেবপাল-ধর্মপালের শাসনে সেই স্রোতধারাকে তার চূড়ান্তে নিয়ে যায়। দ্র. **গোবৰ্দ্ধন**। তবে সেখানেই সে থেমে থাকে না, আপন অর্জনকে সে তার সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যায় মধ্যযুগে, পাঠান রাজাদের ছত্রছায়ার গড়ে ওঠা মঙ্গলকাব্যের যুগে, কৃত্তিবাস-কাশীরামের যুগে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহাপরিক্রমার যুগে। এইখানে বঙ্গদেশ তার সর্বোচ্চ অর্জনের যুগে পৌঁছতে পেরেছিল। এই সময় এই দেশের অধিবাসীরা বঙ্গাল বা বাঙাল (বা পরে বাঙালী) নাম পায়।

দীর্ঘকালের ব্যবধানে এই গৌরবের কথা ক্রমশ ধোঁয়াটে হয়ে যেতে থাকে। ইংরেজ ভারতে আসার পর ভাগীরথীর তীর-বরাবর যে বঙ্গবাসীগণ বাস করেন, তাঁরা নতুন আর একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইয়োরোপে শিল্পবিপ্লব সেরে আসা ইংরেজের সঙ্গে তালে তাল দেবার জন্য তাঁরা ভাগীরথীর তীর বরাবর গড়ে তোলেন তাঁদের কারুপণ্যের বাজার। কুটিরশিল্পকেই এই বঙ্গবাসীরা পাইকারী উৎপাদনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ করে ফেলেন। পাঠান মোগলের আগমনে প্রায় অর্ধেক বঙ্গীয়-শূদ্র যেমন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, তেমনি ইংরেজের আগমনে বিশাল সংখ্যক বঙ্গবাসী তাঁদের 'বঙ্গ'-স্বভাবকে পাশে সরিয়ে রেখে **ঘটিজীবী**-পণ্যজীবী বা **ঘটী** (= গতিশীল **ঘট**-এর আধার যে) হয়ে যেতে লাগলেন। মধ্যযুগে প্রায় অর্ধেক শূদ্রের মুসলমান হয়ে যাওয়া যেমন বাকি শূদ্রদের দুঃখ দিয়েছিল, কলকাতাকেন্দ্রিক বঙ্গালদের এ-হেন 'ঘটিজীবী' বা পণ্যজীবী হয়ে যাওয়া ঢাকা-কেন্দ্রিক বঙ্গালদেরও তেমনি দুঃখ দিয়েছিল; কারণ, স্বধর্মত্যাগ ত্যাগী ও ত্যক্ত উভয়কেই দুঃখ দিয়ে থাকে। বঙ্গবাসী তার অর্জনের শিখরে উঠেছিল যখন তার কেন্দ্র ছিল গৌড়বঙ্গ, যা কিনা পরে নবদ্বীপ-কাটোয়া হয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহে শেকড় গাড়ে। এবার সেই বঙ্গবাসী আপন অর্জনকে পাশে রেখে 'ঘটী'তে পরিণত হল কলকাতাকে কেন্দ্র করে। ফল হল এই যে, ঢাকাকেন্দ্রিক বঙ্গাল কলকাতাকেন্দ্রিক বঙ্গালকে 'স্বধর্মত্যাগের' জন্য নিন্দা করতে লাগলেন, ইংরেজের পাল্লায় পড়ে 'পণ্যজীবী' বা 'ঘটিবাটিজীবী' বা 'ঘটী' হয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের 'ঘটী' বলে গাল পাড়লেন। বিপরীতে কলকাতাকেন্দ্রিক বঙ্গাল ঢাকাকেন্দ্রিক বঙ্গালকে 'সেকেলে', 'পিছিয়ে-পড়া', 'অনাধুনিক' ইত্যাদি হয়ে থেকে যাওয়ার জন্য 'বাঙাল' বলে গাল পাড়তে লাগলেন।

এখানে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। এক) বেদবাদের উদ্ভব যাদের **পাষণ্ড ও ম্লেচ্ছ** বলে ঘোষণা করে হীন করে দিয়েছিল, তাদেরই একটি অংশ হল বাঙালী জাতি। বৈদিক যুগের সেই হীনতা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টায় এই জাতি তান্ত্রিক হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তারাই বৌদ্ধ হয়েছে, বৈষ্ণব হয়েছে, মুসলমান হয়েছে, বাঙাল হয়েছে, ঘটী হয়েছে; তারপর দু-ভাইয়ের সংসার পৃথক করে একদিকে বাঙাল হয়ে গেছে 'বাংলাদেশী', অন্যদিকে ঘটী হয়ে গেছে ভারতবাসী 'বাঙালী', যারা আবার সম্প্রতিকালে 'কমিউনিস্ট' হয়েছে, কিন্তু তাও তাদের কপালে মুক্তি জোটেনি, আজও। ...

ঘটোৎকচ : ২. *যে ঘট-এর কচ (catch, কেশ) উৎগামী হয়েছে বা উঠে গেছে; অর্থাৎ, যে ঘটনার খবরের মালিকানা নাই।* / ঘট উৎকচ যাহার; যাহার মস্তক কেশহীন। (ব.শ.)। **৩.** হিড়িম্বার গর্ভজাত ভীমপুত্র রাক্ষসবিশেষ। ... (ব.শ.)। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমের ঔরসে ও রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভজাত মহাবীর রাক্ষসবিশেষ। রাক্ষসীরা গর্ভবতী হয়েই সদ্য প্রসব করে; তাই হিড়িম্বাপুত্র ঘটোৎকচ জন্মাবার পরেই যৌবনলাভ করে সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগে দক্ষ হয়। ঘট অর্থাৎ হাতির মাথা, উৎকচ অর্থ কেশশূন্য। এর মাথা হাতির মতো কেশশূন্য ছিল বলে নামকরণ হয় ঘটোৎকচ। জন্মের পরে ঘটোৎকচ স্মরণমাত্র উপস্থিত হবে বলে পাণ্ডবদের কাছে বিদায় নেয়। বদরিকাশ্রম যাত্রাপথে ভীমের স্মরণমাত্র ঘটোৎকচ পরিশ্রান্ত দ্রৌপদীকে স্কন্ধে নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছিয়ে দেয়। ... কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিবসে ঘটোৎকচের পরাক্রম সহ্য করতে না পেরে কৌরবদের কাতর অনুরোধে কর্ণ অর্জুনবধের জন্য রক্ষিত ইন্দ্রদত্ত বৈজয়ন্তী শক্তি নিক্ষেপ করে ঘটোৎকচকে বধ করেন। ... ঘটোৎকচের পুত্রের নাম অঞ্জনপর্বা। চতুর্দ্দশ দিবসের যুদ্ধে অঞ্জনপর্বা অশ্বত্থামা কর্তৃক নিহত হয়। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্র.। **৫.** ঘট বা ঘটনা ঘটেছে কি না, নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। কেননা, সেই ঘটনার বা ঘটের খবর কে ছড়াল তা জানা যাচ্ছে না। এইরকম ঘটকে বলে ঘটোৎকচ; একালের ভাষায় একে বলা হয় গুজব। এর জন্ম হয়েছিল হিড়িক-এর (হিড়িম্বার) গর্ভে। আর, তাতে বীর্য্য প্রদান করেছিল বায়ুপুত্র (মিডিয়াপুত্র) ধনতন্ত্রবাদী আইনযোদ্ধা বা **গদাধর** ভীম। ঘটোৎকচ-এর উপরোক্ত কাহিনী বিস্তারিতভাবে রয়েছে মহাভারতে। তার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ থেকে আমরা সুস্পষ্টরূপে জানতে পারি, মহাভারতের (বেদবাদী বনাম বৌদ্ধবাদীদের) যুদ্ধে, ভারতজোড়া অপশাসন চালানো সরকারি কর্মীদের (দুঃশাসনকে) কীভাবে ধনতন্ত্রবাদী গুজব মেরে ফেলেছিল। আর, জনসাধারণের মধ্যে পণ্য ফেরি করতে ঘুরে ঘুরে — 'সব বাজে কথা, গুজব মাত্র' —

বলে সেই গুজবকে মেরেছিল আদি ফেরিওয়ালা সত্তা (= **কর্ণ**)।

ঘটোৎকচ : দ্র. **কুম্ভজ**।

ঘড়, ঘড়ঘড়, ঘড়া, ঘড়ি (ঘড়ী) : ২. **ঘড়** = **ঘ**-*এর (গমনস্থিতের) গড়ান-উড়ান যাহাতে।* **ঘড়ঘড়** = **ঘড়**-*এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **ঘড়া** = **ঘড়**-*এর আধার যে।* **ঘড়ি** = **ঘড়** *গতিশীল যাহাতে। (***ঘড়ী** = **ঘড়ি**-*র আধার যে।)* ৩. **ঘড়** = সমূহ। **ঘড়ঘড়** = নিদ্রাকালে নাকের ডাক, বিড়ালের গলশব্দ (purring), বড় গ্রাস গেলার শব্দ, শ্লেষ্মায় কণ্ঠরোধ জন্য গলশব্দ, গাড়ীর চাকার শব্দ। **ঘড়া** = কলসী, ঘড়াপরিমিত দ্রব্য, পিতলের কলসী। **ঘড়ি (ঘড়ী)** = কালজ্ঞাপক যন্ত্র, বাজাইয়া সময় জানাইবার কাঁসার চাকি, দণ্ড, কিয়ৎকাল, ক্ষণ, ঘণ্টা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ট-এর ড বা ড়-এ বিবর্তন বাংলাভাষায় একটি সাধারণ ঘটনা। তবে তাতেও অর্থের বদলও যে ঘটেছে, অন্তত **ঘটা** ও **ঘড়া**-র ক্ষেত্রে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কেননা, ঘট-অন হতে থাকা বা ঘটনা ঘটতে থাকাকে যেমন **ঘটা** বলে, তেমনি যা ঘটে গেছে, তাকেও **ঘটা** বলে। যেহেতু কলসীও এক **ঘটা** বস্তু, তাকেও **ঘটা** বলা হয়। কিন্তু এই **ঘটা** যখন বাজারে বিক্রির জন্য চলে যায়, জল আনতে চলে যায়, তখন আর **ঘটা** থাকে না, হয়ে যায় **ঘড়া**। তার মানে **ঘটাই ঘড়া** হলেও, তাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য রয়েছে। **ঘটা** তার পরিণত বয়সে **ঘড়া** হয়। (দ্র. পৃষ্ঠা ৩০৮)

আরও গুরুত্বপূর্ণ অর্থ-পরিবর্তন ঘটে **ঘড়ি**-র বেলায়। কথাটি ছিল **ঘটি** বা **ঘটিকা**। সেই ঘটি হয়ে গেল ঘড়ি। একঘণ্টা সময়ে ঘটিটি জলপূর্ণ হয়ে ডুবে যেত বলে সময়টির নাম হয়ে যায় 'এক ঘটি' বা 'এক ঘটিকা'; অর্থাৎ এক ঘণ্টা। এই ঘটিকা, যা কিনা সময় ও পাত্রের যুগপৎ নির্দেশক, তা ক্রমে **ঘড়ি** শব্দবাচ্য হয়ে যায়। পরে সময়-নির্দেশক যন্ত্র মাত্রেই হয়ে নাম পেয়ে যায় **ঘড়ি**। সময়ের মাপ বোঝাতে **ঘড়ি** শব্দ এখনও বাংলাভাষীর কথ্যভাষায় পাওয়া যাবে।

ঘণ্টা (ঘণ্ট, নির্ঘণ্ট) : ১. ✓ঘণ্ট্ (শব্দ) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. **ঘ**-*এর রহস্যরূপ টঙ্কারিত যাহাতে, তাহার আধার।* ৩. কাংস্যনির্মিত বাদ্যবিশেষ, ঘণ্টাপাটলী বৃক্ষ, অতিবলা, নাগবলা, পেটাঘড়ি, পেটাঘড়ির ধ্বনিতে সূচিত ষাটমিনিটপরিমিত কাল। ঘাঁটিয়া রাঁধা, ব্যঞ্জনবিশেষ, ঘাঁটিয়া মিশান বা সংমিশ্রিত দ্রব। (ব.শ.)। ৪. hour ও bell অর্থে প্রচলিত। ৫. ষাট মিনিট পরে পরে একবার ঢং করে বেজে উঠবে, সময় মাপার এই রীতি অর্বাচীন এবং একে **'একঘণ্টা-সময়'** বলা হয়। তুলনায় প্রাচীন রীতি হল — এমন ঘট জলের উপর ছেড়ে দেওয়া যাতে বিন্দু বিন্দু জল ঢুকে সময়ের পরিমাপ করে এবং একসময় ঘটটি ডুবে যায়; একে এক ঘটিকা সময় বলে। ছিদ্র দিয়ে বালুর নির্গমন করিয়েও এরকম ঘটিকা প্রস্তুত করা হত। বর্তমানে ষাট মিনিট সময়, সেই সময়ে বেজে ওঠা আওয়াজ, সেই আওয়াজ যার দ্বারা বাজান হয় সেই বাদ্যযন্ত্র; এই তিনটি বস্তু ও ব্যাপারকেই ঘণ্টা বলে, কখনো কখনো ঘটিকাও বলা হয়। অনুষ্ঠানের নির্ঘণ্টে প্রায়শই এই ঘটিকা শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'সান্ধ্যভোজ সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়' — এরকম বাক্যাংশ নির্ঘণ্টে থাকে। এর থেকে বোঝা যায় একালে ঘটিকা ও ঘণ্টা (hour) সমার্থক।

কিন্তু শব্দের নিজস্ব নিয়মে ঘণ্টা ও ঘটিকা আলাদা শব্দ। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে ঘটিকা কী, তা আমরা **ঘট** ও **ঘটিকা** শব্দে জেনেছি। ঘণ্টা শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ উপরে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বাড়তি রয়েছে একটি রহস্যরূপ (ণ)। **ঘট**-এ গমনস্থিত শ্রম-মেধাদি সরাসরি টঙ্কারিত হয়। ঘণ্ট-তে গমনস্থিতের বা ঘ-এর রহস্যরূপ (ঘং বা ঘণ্) টঙ্কারিত হয়। তার মানে ঘণ্ট-এর বেলায় গমনস্থিত একা নেই, রহস্যরূপিণী-অংরূপিণীর একটি রূপ রয়েছে। আর সেকারণেই ঘণ্টা শব্দটি খানিকটা অব্যক্ত অর্থবাহী।

কারক শব্দে আমরা দেখেছি, ক্রিয়ার চতুর্থ মাত্রা হল সময়। যে কোনো কাজ করতে সময় লাগে। প্রতিটি প্রকল্পে অনেকগুলি ক্রিয়া, ক্রিয়ার উপকরণ ও কর্মফল মিলে-মিশে থাকে। সেই প্রকল্পে সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত যে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া লাগে, ক্রিয়ার বিভিন্ন উপকরণ লাগে, পর্বে পর্বে যে সময় লাগে, তাকে একত্রে বললে সে এক রহস্যরূপ হয়ে যায়। কর্ম, কর্মের উপকরণ ও কর্মের ওই কালগুলিতে গমনস্থিত বা ঘ হয়ে যায় ঘং বা ঘণ্। সেই ঘণ্ টঙ্কারিত হয় যাহাতে তাকে বলে ঘণ্ট। ব্যঞ্জনাদির (অন্নের সঙ্গে প্রদত্ত তরকারির পদ) ক্ষেত্রে অনেকগুলি সবজিকে একত্রে মিলিয়ে রহস্যরূপী করে ফেললে তাকে সেকারণেই বলতে হয় ঘণ্ট (বা ঘেঁট)। পূজানুষ্ঠানাদির যে নির্ঘণ্ট প্রকাশ করা হয়, তাতে ক্রিয়াসমূহের সময়ের এই ঘং নিঃসারিত করা হয়, তাই তাকে নির্ঘণ্ট বলে। এই নির্ঘণ্ট গ্রন্থশেষেও থাকে। আজকাল গ্রন্থাবশেষের এই নির্ঘণ্টের মানে ফেলে দিয়ে তাকে ইংরেজি Index-এর প্রতিশব্দ করে ছেঁটে ছোট করে নেওয়া হয়েছে।

যাই হোক, এই ঘণ্টের আধারকে বলে ঘণ্টা। মোট কথা, ক্রিয়ার মিশ্রণ, ক্রিয়ার উপকরণের মিশ্রণ, ক্রিয়ার সময়ের মিশ্রণ ... ইত্যাদি বিষয়ের রহস্যরূপকে সম্ভাব্য স্পষ্টতায় ও গ্রহণযোগ্যতায় বিন্যস্ত করে প্রকাশ করে 'ঘণ্ট'; আর তার আধারকে বলে ঘণ্টা।

ঘণ্টাকর্ণ : ২. *ঘণ্টা কর্ণে যাহার।* ৩. শিবানুচর বিশেষ, ঘেঁটুঠাকুর। (চৈত্রসংক্রান্তিতে আরোগ্যার্থ ও বিস্ফোটক ভয়ে রক্ষার্থ ইঁহার পূজা হয়।) (ব.শ.)। এক বিষ্ণুবিরোধী পিশাচ। হরিনাম শোনবার ভয়ে এর কর্ণে সর্বদা ঘণ্টা বাঁধা থাকত এবং তা আন্দোলন করে সর্বদা বাজাত। কারণ, পাছে কোনোক্রমে বিষ্ণুর নাম তার কর্ণে প্রবেশ করে। এই জন্য এর নাম হয় ঘণ্টাকর্ণ। বিষ্ণুবিদ্বেষী হলেও ঘণ্টাকর্ণ শিবভক্ত ছিল। ... বদরিকাশ্রমে কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুর দর্শনলাভ করে ও তাঁকে স্তবে সন্তুষ্ট করে ঘণ্টাকর্ণ মুক্তিলাভ করে। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **কর্ণ**। সামাজিক দৃষ্টিতে এই সত্তার স্বরূপ হল দোকানদারীর বিরোধিতা। যৌথসভ্যতার পক্ষপাতী ও পণ্যজীবিতার বিরোধী এই সত্তা তার এলাকায় কাউকে বিক্রিবাটা করতে দিত না। পণ্যজীবীদের চোখে তাই সে ছিল পিশাচ। তবে এর একটি আধ্যাত্মিক রূপও আছে।

ঘাঁট (ঘাঁটা, ঘাঁটান, ঘাঁটি) : দ্র. **ঘণ্ট**। ২. ***ঘাঁট*** = **ঘ**-*এর আধারের রহস্যরূপ টঙ্কারিত যাহাতে;* ***ঘাঁটা*** = *ঘাঁট-এর আধার যে;*

ঘাঁটান = ঘাঁটা অন যাহাতে; ঘাঁটি = ঘাঁট অন গতিশীল যাহাতে। **৩.** চালিত করা, আবর্ত্তিত বা আলোড়িত করা, নাড়াচাড়া করা, ব্যস্ত করা, উলটাইয়া পালটাইয়া দেখা, তন্ন তন্ন করিয়া দেখা, চালনাপূর্ব্বক মেশানো; ক্ষুদ্রঘণ্টিকা, কিঙ্কিণী, ঘণ্টা; ঘাট, প্রহরীর স্থান বা আড্ডা, থানা, ডাকাইতের আড্ডা। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে বহুল প্রচলিত। **৫.** আদি 'ঘণ্ট' শব্দের অর্থকে বিস্তারিত ও প্রসারিত করে মধ্যযুগের বাংলাভাষী এই শব্দগুলি সৃষ্টি করেছিলেন। স্বভাবতই শব্দগুলির অর্থ ঘণ্ট থেকে বহু দূরে সরে গেছে। কিন্তু মূলে কোনো না কোনো ভাবে তা ঘণ্ট-ঘেঁট-ঘাঁট ক্রিয়ার অর্থই বহন করে থাকে।

ঘাট (ঘাটতি, ঘাড়, উদঘাট, উদ্ঘাটন) : ১. ✓ঘাটি + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *ঘ-এর (গমনস্থিতের) আধার টঙ্কারিত যাহাতে। /* **ঘাট** = যা দেহের সহিত শিরকে সংযুক্ত করে। **উদঘাট** = যে গৃহে রাজপুরুষকে আবৃত পণ্যাদি খুলিয়া দেখাইতে হয়। (ব.শ.)। **৩. ঘাট** = গ্রীবার পশ্চাদভাগ, ঘাড়, নদ্যাদির অবতরণস্থান; নদীপারে যাওয়ার স্থান, খেয়াঘাট, ধোপার কাপড় কাচার স্থান, পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যস্থ পথ, গিরিসঙ্কট, পুরীর প্রবেশপথ, যুদ্ধস্থলে প্রবেশপথ, তবলার চাকে চর্ম্মরজ্জুদ্বয়ের মধ্যস্থ স্থান। **ঘাটতি** = ন্যূন হওয়া, কমা, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ঠকা, হীন হওয়া, বিকৃত হওয়া, হতবুদ্ধি বা বিকৃতবুদ্ধি হওয়া, কম করা, কমান, প্রতারিত করা, ঠকান; ন্যূনতা, কমী। **ঘাড়** = গ্রীবার পশ্চাদভাগ। **উদঘাট** = প্রচ্ছাদিত পণ্যাদিদর্শনার্থ উদঘাটনাগার, চৌকীর ঘাট বা থানা। **উদঘাটন** = অর্গলাপনয়ন, হুড়কা খোলা, প্রতিবন্ধদূরীকরণ, ব্যক্তীকরণ। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** শব্দার্থের নিয়মানুসারে **ঘট** হইতে জাত যে, তাকে ঘাট বলা যায়। কিন্তু কীভাবে সে একই সঙ্গে দৃশ্যত পরস্পর-সম্পর্কহীন বিষয় যথা — ঘাড়, নদীর ঘাট, উদঘাটন, ঘাট-মানা (আমার ঘাট হয়েছে!), ঘাটতি বা কমতি হওয়া — ইত্যাদিকে একই সঙ্গে বোঝাতে পারছে, তা বেশ বিস্ময়ের। আমরা জানি অর্জিত বস্তু যেখানে পৌঁছায়, সেই স্থানকে **ঘট** বলে। শির যখন ঘট, ঘাড়ের তখন **ঘাট** হতে বাধা নেই। আবার পুরী, যুদ্ধক্ষেত্র প্রভৃতি যখন ঘট পদবাচ্য, সেগুলিতে প্রবেশের পথ তখন **ঘাট** হতেই পারে। জলধারা বা পণ্যধারা যখন ঘট, নদীতে বা হাটে (ঘাটে) অবতরণ-স্থানের তখন **ঘাট** হতে বাধা থাকে না। আর সেই ঘাটে রাজপুরুষ আবৃত পণ্যাদি খুলে দেখতেই পারেন। সেকালে পণ্য বাহিত হত প্রধানত জলপথে। পণ্যের পেটিকা নদীর ঘাট বেয়ে উপরে (উদ্-এ) উঠার পর **উদ্ঘাট**-এর অধ্যক্ষের সামনে ঢাকনা বা আবরণ সরিয়ে দেখাতে হত, তারপর শুল্ক ধার্য্য হত। (এই উদঘাট ক্রমে দ্বারোদ্ঘাটন, রহস্য উদ্ঘাটন পেরিয়ে আরও অনেক দূর প্রসারিত হয়েছে।) সুতরাং ঘাটে ঘাটে **উদঘাটন**-ব্যবস্থা থাকাই স্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া আমরা জানি, ঘট্ট থেকে গ্ বাদ দিলেই (গ্ + হ = ঘ, অতএব ঘ - গ্ = হ) তা হট্ট হয়ে যায়। ব.শ. জানাচ্ছেন **হাটি** ও **ঘাটি** একই শব্দ। আর, মানসলোকের যে পণ্যপ্রবাহ, তার নামই তো গঙ্গা; তীর্থে তীর্থে, ঘাটে ঘাটে, হাটে হাটে, উদ্ঘাটন-ব্যবস্থা থাকাই স্বাভাবিক।

তবে কিনা, যে পথ দিয়ে লোকে নামে সেই পথেই ওঠে। **ঘট**-এ থাকে অর্জন, ঘাট বা **ঘাড়** দিয়ে তা নীচে নামলে, ঘটের দৃষ্টিতে সে তো কমে যাওয়াই **হল**। আর সেকারণেই ঘাট তারিত যাহাতে সেই হল **ঘাটতি**। **ঘাট হওয়া** মানেই কমে যাওয়া। **ঘাট মানার** অর্থই হল ন্যূনতা **স্বীকার করা**। **ঘাটা** করা মানেই কমানো। ... স্মর্তব্য যে, এই **শব্দগুলির বিস্তর** ব্যবহার দেখা যায় মধ্যযুগের সাহিত্যে। সর্বোপরি, গ্রামবাংলায় এই শব্দগুলির ব্যাপক ব্যবহার আজও প্রচলিত রয়েছে। ইংরাজি প্রভাবিত বাংলার অ্যাকাডেমিগুলি স্বভাবতই এই **শব্দগুলিকে** বাদ দিয়ে চলে।

ঘাটী (ঘাটিআল, ঘাটিয়াল, ঘাটোয়াল) : ২. *ঘাটের গতিশীলতার আধার যে।* **৩.** পথের (বা ঘাটের) করগ্রাহক; পাটনী, ঘাটির অধ্যক্ষ, পথরক্ষক; ঘাটরক্ষক পথের দানী (ইহারা রাজকর্ম্মচারী। তীর্থপথে থাকিয়া যাত্রীর নিকটে কর গ্রহণ করিত। এই কার্য্যের বিনিময়ে ইহারা যে জমি পাইত, তাহার নাম 'ঘাটোয়ালী')। হিন্দুস্থানী জাতিবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি প্রচলিত। **৫.** পদবী রূপে 'ঘাটী' শব্দটি প্রচলিত। যথা, কবি 'রতনতনু ঘাটী'। এঁর পূর্বপুরুষ নিশ্চয় উক্তপ্রকার রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। ঘাট যখন হাট, তখন এঁদের 'হাটিনা' বা 'হাটীলা' বলা হত। ব.শ. মতে এঁরাও একটি জাতিবিশেষ।

ঘড়, ঘড়া, ঘড়ি (ঘড়ী) : ২. ঘড় = *ঘ-এর (গমনস্থিতের) গড়ান-উড়ান যাহাতে;* **ঘড়া** = *ঘড়-এর আধার যে;* **ঘড়ি** = *ঘড় গতিশীল যাহাতে।* **৩.** সমূহ; কলসী, ঘড়াপরিমিত দ্রব্য, পিতলের কলসী; কালজ্ঞাপক যন্ত্র, বাজাইয়া সময় জানাইবার কাঁসার চাকি, পেটাঘড়ি, দণ্ড, কিয়ৎকাল, ক্ষণ, ঘণ্টা। (ব.শ.)। **৪.** ঘড় অপ্রচলিত, কিন্তু ঘড়া, ঘড়ি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** ব.শ. জানিয়েছেন, ঘট থেকেই ঘড় শব্দটি প্রসূত হয়েছে। টঙ্কার তার টঙ্কারণের কাজ ছেড়ে একটু এগোলেই গড়াতে শুরু করে, তার পরে শুরু করে উড়তে। অর্থাৎ ঘট-এ টঙ্কারমাত্র বিদ্যমান, কিন্তু ঘড়-এ আবর্ত্তন রয়েছে, উড়ে চলে যাওয়া রয়েছে। অর্থাৎ কিনা, ঘড় হল ঘট-এর প্রসারিত রূপ। যাঁরা কুম্ভকারের চাকে কলসী প্রস্তুত হতে দেখেছেন, তাঁরা জানেন আবর্ত্তন থেকেই তার জন্ম। পোড়ানর পর তা বাজারে গিয়েই শুরু হয় তার ওড়া। তাই এই ঘট ঘড়ও বটে। এই ঘড়-এর আধার হল ঘড়া। তাতে ঘড় একটি মাত্রায় সীমিত হয়ে গেছে। আর, ঘড়ি হল সেই বস্তু যাতে গমনস্থিত বা ঘ আবর্ত্তিত হতে হতে গতিশীল থাকে। তাই সে ঘড়ি। তাতে যদি কারও কাল-মুহূর্ত-ক্ষণাদি মাপা হয়েই যায়, হল; তাতে ঘড়ির কোনো লাভ বা ক্ষতি নেই। কেননা সময় মাপা তার কাজ নয়, তার চলা ও ঘোরাকে কেউ যদি হিসেব করে নিয়ে কাল মাপে, সে কীই বা করতে পারে। সে কেবল একটা নিয়মে আবর্ত্তিত হয়ে হয়ে চলেছে। তাই সে ঘড়ি। তবে যদি 'ঘড়ী' বানান লেখা হয়, তবে মানতে ঘড়ির আধার স্বরূপ যন্ত্রটির কথাই বলা হচ্ছে।

ঘড়িয়াল (ঘড়িআল, ঘড়ীয়াল, ঘড়েল, ঘোড়েল) : ২. / যাহার কাছে ঘড়ী থাকে; যে ঘড়ী বাজাইয়া সময় জানায়। (ব.শ.)। **৩.** গোসাপ, কুম্ভীরবিশেষ, মেছোকুমীর; ঘড়িওয়ালা। (ব.শ.)। **৪.** মেছোকুমীর ভিন্ন অন্য অর্থে ঘড়িআল, ঘড়িয়াল প্রভৃতি অপ্রচলিত, কিন্তু ঘোড়েল শব্দটি crooked, tricky person অর্থে এখনও

প্রচলিত। ৫. দ্র. **কুম্ভীর**। যে আবর্তিত হয়ে হয়ে চলে, গড়িয়ে-উড়ে চলে, সেই হল ঘড়ি। এই ঘড়ি যন্ত্র (ঘড়ী) হতে পারে, স্বভাবও হতে পারে। সেই ঘড়ি যার কাছে থাকে, সেই ঘড়িয়াল পদবাচ্য; তাসে water-জলের ঘড়িয়াল হোক আর people-জলের (বা মানবসমাজের) ঘড়িয়াল হোক। জনসাধারণের মধ্যে যে ঘোড়েল লোক থাকে তার স্বভাব, এবং জলের মধ্যে মেছোকুমীর বা **কুম্ভীর** রূপে যে ঘড়িয়াল থাকে তার স্বভাব একপ্রকার। তাই তাদের ঘড়িয়াল বা ঘড়েল বা ঘোড়েল বলে। আর যন্ত্রঘড়ির মালিক বা সময়ে ঘণ্টাবাজনদারকে যে ঘড়িয়াল বলা হয়, সে একেবারেই প্রতীকী। ঘড় (ঘড়ী) শব্দের ক্রিয়াভিত্তিকতা ফেলে দিয়ে তাকে ইংরেজ সাহেবদের clock-এর প্রতিশব্দ করে নেওয়া হয়েছে। তারপর তার সঙ্গে হিন্দি ভাষার 'ওয়ালা'কে প্রত্যয় রূপে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পাওয়া গেছে 'ঘড়িওয়ালা'। এবার তাকে মাজাঘসা করে বানান হয়েছে বাঙালিবাবু — 'ঘড়িআল' বা 'ঘড়িয়াল'। ঘড়িওয়ালা ঘড়িয়াল আর যাই হোক ঘোড়েল নয়।

ঘোটক (ঘোড়া, ঘোড়ই, ঘোড়ুই) : ১. ✓ঘুট্ + অ (অচ্) + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ঘোটক*** *= সর্বপ্রকার ঘ-এর (গমনস্থিতের) টঙ্কার করে যে;* ***ঘোড়া*** *= সর্বপ্রকার ঘ-এর গড়ান-উড়ানের আধার যে;* ***ঘোড়ই (ঘোড়ুই)*** *= সর্বপ্রকার ঘ-এর গড়ান-উড়ানকে গতিশীল করে যে বা নবরূপে উত্তীর্ণ করে গতিশীল করে যে।* ৩. অশ্ব; ছাতার বাঁটে লাগান ঘোড়ার মুখের মত বাঁকা তার, ছাতার কল, বন্দুকের কল যাহা টিপিলেই গুলি বাহির হয়। (ব.শ.)। ৪. horse অর্থে প্রচলিত। অশ্ব শব্দটি বহু প্রাচীন, ঘোটক শব্দটি তুলনায় অর্বাচীন। কেবল তাই নয়, প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে অশ্ব শব্দের যে বিপুল ব্যবহার রয়েছে, তার তুলনায় ঘোটকের ব্যবহার খুবই কম। আর, ঘোড়া শব্দের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে মধ্যযুগের সাহিত্যে। একালের বাংলাভাষাতে অশ্ব বা ঘোটক শব্দের ব্যবহার খুবই কম, তুলনায় ঘোড়া শব্দের ব্যবহার খুবই বেশি। ৫. একালের বাংলাভাষীরা অশ্ব, ঘোটক, ঘোড়া — তিনটি শব্দেরই একটি মানে বোঝেন — horse। বাকি সব মানে তাঁরা হারিয়ে ফেলেছেন। ফলে **অশ্বত্থ, অশ্বত্থামা, অশ্বডিম্ব** প্রভৃতি **অশ্বযুক্ত** শব্দ, ঘোঁট, ঘোটালা কিংবা ঘোড়ারোগ, ঘোড়াটেপা, ঘোড়ার-ডিম, ঘোড়ার ঘাস কাটা — এসব শব্দের সঙ্গে জন্তুটির কোনো সম্পর্কই আর ঠিকঠাক বোঝা যায় না। কেবল অশ্ব নয়, ঘোটক, ঘোড়া তিনটি শব্দই জীবজগতের যে জীবটিকে বোঝায় (horse) তাকে আমরা কেউই ভুলিনি। কিন্তু তিনটি শব্দই মানবজগতের যে সত্তাকে বোঝায়, তাকে আমরা ভুলে গেছি। এই শব্দার্থকোষে **অশ্ব**-এর পাঠ থেকে আমরা তাকে একটু আগেই চিনলাম। এখন ঘোটক ও ঘোড়ার কথা হোক।

ঘোটক তাকেই বলা হয়, যে 'সর্বপ্রকারের ঘট ঘটানোর বিদ্যাবুদ্ধিক্ষমতা ধরে' (= ঘোট) এবং তা করতে পারে। আর সেজন্য চাইলে **ঘোঁট** পাকাতেও পারে। কারণ সে হল সমাজবনের **অশ্ব**, স্পেশালিস্ট বা বিশেষজ্ঞ। (তাঁদের সুদূর উত্তরসূরীরাই আজও ঘোড়ই পদবী ধারণ করেন বলে মনে হয়।) তবে সে যদি আত্মসর্বস্ববাদী হয়ে যায়, তখন তার **ঘোট** আর ঘোট থাকে না, হয়ে যায় ঘোঁট, এবং কখনো কখনো তা **ঘোটালাও হয়ে যেতে পারে।** সেই ঘোটালার আদিরূপটিকে চিনেছিলেন বাংলাভাষার **আদিকবি** কৃত্তিবাস। রাবণের দাপটে কোন কোন সামাজিক **সত্তা কী কী** করতে বাধ্য হচ্ছে তার বয়ান দিতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন —

'শুনিলে যমের কথা হইবেক হাস।
কাটিয়া আনেন তার ঘোটকের ঘাস।।'

অর্থাৎ কিনা, উচ্চরবকারী সমাজশাসক রাবণের (একালের ভাষায় নির্বাচিত সরকারের) সময়ে ধর্মাবতার যম বা আদালত রাবণের বিশেষজ্ঞদের জন্য জনসাধারণের উপর নানাবিধ জরিমানা করে টাকা আদায় করে নিয়ে আসে। ঘোড়ার ঘাস কাটা এই জিনিস।

আমরা আগেই জেনেছি (দ্র. **ঘড়, ঘড়েল, ঘোড়েল**) তবুও তো ঘোট-কর্মটি অনেক সরাসরি। সে তুলনায় ঘোড় অনেক বেশি জটিল এবং অর্বাচীন বা আধুনিক। মানুষের সভ্যতা এগিয়েছে, অশ্ব ঘোটকে এবং ঘোটক ঘোড়ায় পরিণত হয়েছে। এককালের যৌথসমাজের সম্মানীয় বিশেষজ্ঞ অশ্ব ক্রমে একদিন যৌথপুঁজি ও ব্যক্তিপুঁজি উভয় পুঁজির স্পেশালিস্ট হিসেবে উৎপাদন সংগঠনে নেতৃত্ব দিয়েছে, বহু ঘট ঘটিয়েছে। পণ্যধারার বন্যায় দুনিয়া যখন প্লাবিত হতে শুরু করেছে, ঘোটক ক্রমে ঘোড়ায় পরিণত হয়েছে। আমরা জানি, ঘোড়ায় সর্বপ্রকার ঘ-এর (গমনস্থিতের) গড়ান-উড়ান থাকে। এই ক্রিয়ার আধার যে-সত্তা, সেই হল ঘোড়া। আজকের শাসকদেরও ঘোড়াশালে (যেখানে বিশেষজ্ঞরা থাকেন) ঘোড়া, হাতিশালে (যেখানে ব্যুরোক্র্যাটরা থাকেন) হাতি থাকে। এই ঘোড়া কামড়ালে ছাড়ে না। দ্র. **ডিম্ব**।

ঘু (ঘ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ঘাগী, ঘাঘী, ঘাগু, ঘাঘু, ঘু, ঘুংঘুরু, ঘুঁঘুট, ঘুঁঘুর, ঘুঁজি, ঘুঁট, ঘুঁটা, ঘুঁটি, ঘুঁটে, ঘুঁড়ী, ঘুঁশঘুঁশ, ঘুগনি(নী), ঘুঘরা, ঘুঘু, ঘুঘুর, ঘুঙঘট, ঘুঙঘুট, ঘুঙট, ঘুঙ্গড়ি, ঘুঙ্গর, ঘুঙ্গানি, ঘুঙ্গুর, ঘুঙঘুর, ঘুচ, ঘুট, ঘুটঘুট, ঘুটা, ঘুটি, ঘুটিং, ঘুটিক, ঘুটিকা, ঘুটিঙ্গ, ঘুটী, ঘুটে, ঘুড়িনী, ঘুড়ী, ঘুড়ডী, ঘুণ, ঘুণাক্ষর, ঘুণিত, ঘুণ্‌ঘুণ্‌, ঘুন্ট, (ঘুঁট ঘুঁটকে মরনা), ঘুণ্টক, ঘুণ্টি, ঘুণ্টিকা, ঘুৎকার, ঘুন, ঘুনঘুন, ঘুনশি, ঘুনুঘুনু, ঘোঁঘর, ঘোঁজ, ঘোঙ্গট, ঘোঙ্গর, ঘোঙ্গা, ঘোঙঘ, ঘোঙ্‌ঘট, ঘোণা, ঘোমটা।
ঘু = গমনস্থিতের (ঘ-এর) নবরূপে উত্তরণ। ঘু = গমনস্থিতের (ঘ-এর) নবরূপে উত্তরণ যাহাতে। ঘু = ঘু-এর আধার যে।

ঘুট (ঘুটঘুটে, ঘুঁট, ঘোঁট, ঘোঁটন, ঘোঁটা) : ২. ***ঘুট*** *= ঘ নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে টঙ্কারিত হয় যাহাতে;* ***ঘুটঘুটে*** *=* ***ঘুট*** *ও* ***ঘুটে*** *(= ঘুট দিশাগ্রস্ত যাহাতে);* ***ঘুঁট*** *= ঘ-এর নবরূপে উত্তীর্ণ রহস্যরূপ টঙ্কারিত যাহাতে;* ***ঘোঁট*** *= ঘুঁট সক্রিয় যাহাতে;* ***ঘোঁটন*** *= ঘোঁট অন যাহাতে;* ***ঘোঁটা*** *= ঘোঁট-এর আধার যে।* ৩. পরিবর্তন, প্রত্যাগমন, বিনিময়, প্রতিঘাত, আবর্তন, ঘোঁটা; অতিঘোর, অতিনিবিড়; পেষণ করা, গুঁড়া করা, আবর্তিত করা, আলোড়ন করা, ঘুঁটা (দুগ্ধাদি), তন্ন তন্ন করিয়া দেখা; আন্দোলন, সমালোচনা, বাদানুবাদ; পেষণ,

গুঁড়ান, আবর্ত্তন; আবর্ত্তিত। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ধরা যাক, একটি আঘাত গমন করে স্থির (ঘ) হল আপনার পায়ে। আঘাতটি (ধরা যাক, মিথ্যা অপবাদে কেউ করেছিল এবং তা) মৃদু ছিল না। ফলে ঘ ঘা-এ পরিণত হল। তাছাড়া এক-ঘা মারেনি, মেরেছিল কয়েক-ঘা। ফলে অনেকগুলি ঘা হয়েছিল। এখন, সেই ঘা যদি ক্রমশ বাড়তে থাকে, পুঁজ হতে থাকে, আপনার গা **'ঘিনঘিন'** করতে পারে। ঘ তখন ঘা পেরিয়ে 'ঘি'ন-এ পরিণত। কিন্তু তার কষ্টে যদি আপনি মনের জ্বালায় ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে শুরু করেন, অথচ কাউকে বলতে না পারেন; তখন ঘ আর ঘা বা ঘি রইল না, ঘ নবরূপে উত্তীর্ণ **ঘু** হয়ে ঘুরে দাঁড়াল, প্রকাশ (ঘোষণা < ঘুষ্ < ঘু) করতে শুরু করল তার অস্তিত্বের কথা। সেই ঘু যদি টঙ্কারিত হতে থাকে, তবেই **ঘুট**। ঘুটঘুটে অন্ধকারে এই ঘুট থাকে। কিন্তু আঘাত বা ঘা-এর কথাটি যদি সেভাবে ছটফট না করে অনেক কিছুকে জড়িয়ে নিতে থাকে, মেশাতে থাকে, তখন ঘুট আর ঘুট থাকে না, হয়ে যায় ঘুংট — যাকে ঘুণ্ট, ঘুঁট ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। তখন ঘুট ঘোঁট পাকায়, ঘোঁটে, ঘুঁটাঘুঁটি করে।

ঘুঘু (ঘাগী, ঘাঘী, ঘাগু, ঘাঘু) : ১. ঘু + ঘু। (ব.শ.)। ২. ঘু ঘু (উচ্চারণ বা রব) করে যে। *[**ঘাগী** = আহত হয়েও গতিশীলভাবে গমন করে যে; **ঘাঘী** = আহত হয়েও পুনরায় আঘাত সহন করে যে; **ঘাগু** = আহত হয়েও (না থেমে) বিপরীত মুখে গমন করে যে; **ঘাঘু** = আহত হয়ে (আঘাতের) কষ্ট (আঘাতকারীর উদ্দেশে) প্রকাশ করে যে।]* ৩. 'ঘুঘু'রবকারক পক্ষী, বনকপোত, 'ঘুঘু' এই ধ্বনি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. যাঁরা ঘুঘু পাখি দেখেছেন, তাঁরা জানেন, এই পাখি খুবই নরম স্বভাবের, খানিকটা পায়রার মতো দেখতে, সহজে অন্যের (বাজের) শিকার হয়ে যায়। তাদের 'ঘু-ঘু' ডাকের অর্থ হল — 'আমি ঘা খেয়েছি, কাউকে ঘা দিয়ো না' (= ঘুঘু)। এই দুঃখের কথা যে বলে, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থের নিয়মে তাকেই **ঘুঘু** বলে; সে বনের ঘুঘু হতে পারে, মানবসমাজের ঘুঘুও হতে পারে; বাস্তুঘুঘুও হতে পারে যে শত আঘাতেও কিছুতেই বাস্তু ছেড়ে যেতে চায় না; গেলেও বারবার ফিরে ফিরে আসে।

ঘুঘু বিষয়ে এই যে ধারণা, প্রাচীন ভারতের তা সুস্পষ্ট ছিল **'কপোত'** বিষয়ে। **কপোতবৃত্তি** বললে সেকালে সেইরকম মানুষদের বুঝতে হত, যাঁরা কখনো সঞ্চয় করেন না; প্রতিদিনের প্রয়োজনটুকু জগৎ থেকে সংগ্রহ করে গ্রহণ করে কালাতিপাত করেন। আমরা দেখেছি, ঘুঘুপাখি প্রতিদিনই তার খাদ্যশস্যাদি খুঁটে খাওয়ার পর কাঁকর খাওয়ার জন্য ফিরে আসে সেই উঁচু ভিটেয়, যেখানে ঘরবাড়ি ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে কিংবা মিশে গেছে কিন্তু ভিটা উঁচু থাকায় সেখানে ঘাস জন্মায়নি অথচ বৃষ্টিতে মাটি ধুয়ে গিয়ে কাঁকর বেরিয়ে পড়েছে। কারও 'ভিটেয় ঘুঘু চরানো'র অর্থ হল ঘুঘুর এইভাবে কাঁকর খেতে আসার ব্যবস্থা করে দেওয়া। (প্রবাদ আছে — 'আমার নাম রাজা রঘু, ভিটাতে চরাই ঘুঘু'। অর্থাৎ রঘুরাজা এতই অত্যাচারী ছিলেন যে, প্রজাদের ভিটেমাটি **চাটি** করে দিতেন। দ্র. **রঘু**।) কপোত সত্তার এই নরম-অস্তিত্ব ও শ্যেন পক্ষীর কঠোর অস্তিত্বকে সবচেয়ে ভাল বুঝেছিলেন সেকালের পুরাণকারগণ। কপোতরূপী অগ্নি ও বাজ বা শ্যেনরূপী ইন্দ্রের কাহিনী এবং শিবি (দ্র. **উশীনর**) রাজার আপন শরীরের মাংস তুলে দিয়ে কপোতকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টার সামাজিক ইতিহাসে সেকথা তাঁরা ধরে রেখেছেন। কেবল তাই নয়, এই নরম সত্তাটিকে ধরে রাখা ছিল বাংলাভাষীর 'ঘুঘুসই' খেলায়। ব.শ. জানিয়েছেন, ইহাতে চিত হইয়া শুইয়া কুঞ্চিত ও মিলিত পায়ের পাতায় ঘোড়ায় চড়ার মত শিশুকে বসাইয়া 'ঘুঘু-সই, পুত কই' ইত্যাদি ছড়া বলিয়া দোলাইতে হয়।

কিন্তু কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধারণা বদলায়। বাংলায় এই ঘুঘুর ধারণাটি অধঃপতিত হয়ে ঘুঘু শব্দের মানে দাঁড়ায় বদলোক। যারা বাস্তু আঁকড়ে পড়ে থাকে, নানান কুমতলব আঁটে, কিন্তু কিছুতেই পথ ছাড়ে না, তারা হয়ে যায় বাস্তুঘুঘু পদবাচ্য। তাদের উদ্দেশে শায়েস্তাকারীর বয়ান দাঁড়িয়েছিল — 'ঘুঘু দেখেছ, ঘুঘুর ফাঁদ দেখনি!' **ঘাগু** লোক মানেই সব ফাঁদ কেটে যে ব্যক্তি নিজের পথ করে নিতে পারে। 'ঘুঘু'র অর্থের এই অধঃপতনের ফল হয় অদ্ভুত এবং একেবারেই বেখাপ্পা।

ইয়োরোপের, বিশেষত ইংরেজি ভাষার একটি সাধারণ চরিত্র হল, তাতে আদি ধারণার উত্তরাধিকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে সেই ধারণাধারী শব্দটির সম্পর্ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেই। তাঁরা উপরোক্ত ঘুঘু বিষয়ক ধারণাটিকে ধরে রেখেছিলেন তাঁদের dove শব্দে। তাঁদের 'my-dove' ছিল অবিকল আমাদের 'ঘুঘু-সই'-এর মতো। আর, dove-এর অর্থ ছিল — '... a word of endearment : an emblem of innocence, gentleness, also of the Holy Spirit. ... a person who seeks peace and conciliation rather than confrontation or war (opposite to hawk) ...' [Chambers English Dictionary, 1988]। অর্থাৎ চিল (বাজপাখি) ও ঘুঘুর (কপোতের) ধারণাটি প্রাচীন পৃথিবীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের জনসাধারণের ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পরেই রাশিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর কমিউনিস্টরা ভাবতে শুরু করলেন, এবার বুঝি আমেরিকা ফ্যাসিস্টদের মতোই কমিউনিস্ট-নিধনে হাত লাগাবে। বিশ্বের কমিউনিস্টরা শরণাপন্ন হলেন উপরোক্ত dove-এর। পিকাসো এঁকে দিলেন Peace Dove। বিপ্লবের জন্য অন্য মানুষ হত্যায় যাঁরা নীতিগতভাবে বিশ্বাসী, সেই কমিউনিস্টরাই এই Peace Dove ওড়ালেন সারা বিশ্ব জুড়ে। কিন্তু সেই Peace Dove ওড়াতে গিয়ে সেসময়ের বাংলার কমিউনিস্টরা পড়লেন বিপাকে। Peace Dove তো 'শান্তির ঘুঘু'! বাংলায় এই ঘুঘু তো ততদিনে অত্যন্ত অধঃপতিত! অতএব তাঁরা ঘুঘুকে পায়রা বানিয়ে নিলেন, Peace Dove-এর মানে হয়ে গেল 'শান্তি পারাবত'! সারা বিশ্ব যখন ঘুঘু ওড়াল, বাংলাভাষী কমিউনিস্টরা তখন 'উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা'র গান গেয়ে পায়রা ওড়ালেন। বেখাপ্পা একেই বলে।

('ঘুঘুসই' খেলার সম্পূর্ণ ছড়াটি সংগ্রহ করা যায়নি। শৈশবে ছড়াটি আমি শুনেছিলাম এইরকম : 'ঘুঘু-সই, তালপুত কই?' — রবি চক্রবর্ত্তী। তবে মেদিনীপুরের খেড়িয়া-মুসলিমদের মধ্যে এই একই খেলা যে ছড়া সহকারে প্রচলিত আছে, তা এইরূপ — 'ঝুঝ্-ঝু পই্য়া। / তাল-ত্লে গই্য়া॥ / তাল কি বিবি মোটি। / খায়

খ্জানে কি রোটি।। / আপ খায়ে থালি মে। / মাণিক খায়ে পালী মে।। / থালি গিয়া টুট। / পালী গিয়া ফুট।। — বোলো, গু-বাড়ী না মূত-বাড়ী?' ছড়া শেষে শিশুকে এই কথা জিজ্ঞাসা করার অর্থ হল, একদিকে রয়েছে গু-এর ক্ষেত অন্য দিকে রয়েছে প্রস্রাবের ক্ষেত; তুমি কোন ক্ষেতে যেতে চাও? শিশুটি দুটির একটি বললে তাকে ডানদিকে বা বাঁদিকে উলটে দেওয়া হয়। কিন্তু কোনো দিকে যেতে না চাইলে, হাঁটুর নিম্নাংশকে খুব উঁচুতে তুলে শিশুটিকে একেবারে বুকের উপর তুলে আনা হয় ও আদর করা হয়। — কলিম খান।)

ঘুঙ্গুর (ঘুঘুর, ঘুঙুর, ঘুঙ্গর, ঘুঙ্গুট, ঘুঙ্ঘুট, ঘুঙঘুর, ঘুঙ্গরু, ঘুঙঘরু, ঘুঙ্গুরু) : ২. ঘুং *(নবরূপে উত্তীর্ণ ঘ-এর রহস্যরূপ) ঘুরতে থাকে যাতে।* ৩. ঘুমুর, মঞ্জীর, কিঙ্কিণী, ঘাঘর, নূপুর। (ব.শ.)। ৪. শব্দ একটিই, কিন্তু লোকে নানাভাবে উচ্চারণ করে এবং সেকারণেই তার নানা বানান প্রচলিত রয়েছে। এখানে 'ঘুঙঘুর' বানান ধরেই অর্থটি নিষ্কাশন করা হল। ৫. ঘুঙঘুর ফাঁপা সুপারির মতো, পিতল দিয়ে প্রস্তুত হয়। এর ছোট ফাঁপা অবয়বের ভেতরে একটি ছোট গুলি থাকে, কাটা অংশ দিয়ে যা দেখা যায়, কিন্তু গুলিটি কখনোই পড়ে যায় না। ঘুঙঘুর নড়লেই গুলিটি ঘুরতে থাকে, আর সেটি পিতলের গায়ে লেগে আওয়াজ হয়। এই আওয়াজ খুবই মৃদু এবং শ্রুতিমধুর এবং হয়তো-বা বেদনাবিধুর। গর্ভের শিশু মায়ের পেটে নড়েচড়ে মাকে যতখানি ব্যথাময় আনন্দ দেয়, ঘুঙঘুরের গুলি যেন সেরকমই আওয়াজ সৃষ্টি করে। মোটকথা, এতে গুলির ঘা রহস্যরূপী আওয়াজে পরিণত হয়ে আপন আবহের ভিতরে ঘুরতে থাকে, তাই এর নাম ঘুঙঘুর।

ঘুষ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অঘোষ, আঘোষ, আঘোষণ, অঘৌষ, ঘুষ্, ঘুষ (ঘুস), ঘুষঘুষে, ঘুষিত, ঘুষ্ট, ঘুষ্টান্ন, ঘুস, ঘুসকি(কী), ঘুসা, ঘুসৃণ, ঘোষ, ঘোষক, ঘোষণা, ঘোষবান, ঘোষবতী, ঘোষবর্ণ, ঘোষযাত্রা, ঘোষয়িত্নু, ঘোষা, ঘোষাল, ঘোষী, ঘোস, ঘোষিত।

ঘুষ্ = নবরূপে উত্তীর্ণ ঘ-এর (গমনস্থিতের) দিশাগ্রস্ত শয়ন। **ঘুষ** = নবরূপে উত্তীর্ণ ঘ (গমনস্থিত) দিশাগ্রস্তভাবে শায়িত যাহাতে।

ঘুষ, ঘুষকী, ঘুষঘুষে, ঘুষিত, ঘুষা, ঘুষি, ঘুষ্ট, ঘুষ্টান্ন, ঘোষ, ঘোষক, ঘোষণা (ঘুস, ঘুসকি, ঘুসকী, ঘুসা, ঘুসি, ঘুসী) : ১. ঘুষিত = ✓ঘুষ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। ঘোষ = ✓ঘুষ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে ...; ঘোষক = ✓ঘুষ্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে; **ঘোষণা** = ✓ঘোষি + অন - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***ঘুষ** = নবরূপে উত্তীর্ণ ঘ (গমনস্থিত) দিশাগ্রস্তভাবে শায়িত যাহাতে।* ***ঘুষকী** = ঘুষ-কারীর আধার যে।* ***ঘুষঘুষে** = ঘুষ 'আছে কিন্তু নেই' যাহাতে।* ***ঘুষিত** = যাহা ঘুষ (ঘোষণা) করা হইয়াছে।* ***ঘুষা** = ঘুষ-এর আধার যে।* ***ঘুষি** = ঘুষ গতিশীল যাহাতে।* ***ঘুষ্ট** = ঘুষ টঙ্কারিত যাহাতে।* ***ঘুষ্টান্ন** = যে-অন্ন ঘোষণার মাধ্যমে প্রদত্ত হয়।* ***ঘোষ** = (নানা প্রকারে) ঘুষ করে যে।* ***ঘোষক** = ঘোষণা করে যে।* ***ঘোষণা** = ঘোষ অন (on) করে যে।* ৩. **ঘুষ (ঘুস)** = ঘোষণা করা, কীর্ত্তন করা, বলা; (কার্য্য উদ্ধারার্থ অনুচিতভাবে কাহাকে দেয় অর্থাদি, উৎকোচ)। **ঘুষকী** = যে দুশ্চরিত্রা নারী সদরে নাম লিখাইয়া ব্যভিচার করে না, গ্রামস্থিতা গোপনে পুরুষগামিণী স্ত্রী। **ঘুষঘুষে** = অস্পষ্ট, চাপা (জ্বর)। **ঘুষিত** = বিশব্দিত, প্রতিজ্ঞাত, শব্দ দ্বারা প্রকটীকৃত-অভিপ্রায়। **ঘুষা, ঘুষি, ঘুষী (ঘুসা, ঘুসি)** = মুষ্টি, মুঠি, মুঠির আঘাত। **ঘুষ্ট** = উৎপাদিত, কূজিত, শব্দিত। **ঘুষ্টান্ন** = 'কে অভোক্তা আছ, এস' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ঘোষণা করিয়া সত্রাদিতে প্রদত্ত অন্ন। মনু মতে, এই অন্ন অভোজ্য। **ঘোষ** = ধ্বনি, শব্দ, নাদ, রব, ডাক, মেঘগর্জ্জিত, কোলাহল, উচ্চারণ, শব্দদ্বারা প্রকটীকরণ ...। **ঘোষক** = শব্দকারক, শব্দদ্বারা প্রকটীকারক, জ্ঞাপক। **ঘোষণা** = শব্দ দ্বারা প্রকটীকরণ বা বিজ্ঞাপন। (ব.শ.)। ৪. proclaim অর্থে ঘুষ শব্দটি অপ্রচলিত, তার বদলে চলছে ঘোষণা; কিন্তু bribe অর্থে ঘুষ খুবই প্রচলিত। ঘুষকী অপ্রচলিত। ঘুষঘুষে, ঘুষা, ঘুষি, ঘুষী যথার্থে প্রচলিত, কিন্তু ঘুষ্ট ও ঘুষ্টান্ন অপ্রচলিত। ঘোষ পদবী রূপে, ঘোষক proclaimer অর্থে এবং ঘোষণা declaration অর্থে প্রচলিত। ৫. সর্বাগ্রে বলে নেওয়া দরকার যে, উপরোক্ত শব্দগুলির বানানে সব ক্ষেত্রেই 'ষ' হবে এবং সেরকম হলেই উপরোক্ত অর্থগুলি নিষ্কাশন করা যায়। 'স' বানান হলে শব্দগুলি প্রায় নিরর্থক হয়ে যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, ব.শ. থেকে শুরু করে বহু শব্দকোষ বা অভিধান এই শব্দগুলির ক্ষেত্রে 'স' ব্যবহার করেছেন, সে কি ভুল? আমরা বলি, তাঁরা ঠিক করেছেন। আমরাও 'স' বানানে শব্দগুলিকে 'ষ' বানানের পাশেই রেখেছি, ফেলে দিইনি, এবং ঠিকই করছি। কারণ বহু সাহিত্য-কাব্য-ইতিহাস গ্রন্থেই 'স' বানান রয়েছে। সেগুলিকে তো বদলানো যাবে না। এবার অর্থের কথায় যাওয়া যাক।

ঘু বর্ণটির মধ্যে যে ক্রিয়াটি রয়েছে, তা হল কোনো একটি আঘাত (গমনের স্থির হওয়ন = ঘ > ঘা) এসে লেগেছিল সত্তাটির গায়ে, লাগার পর সেখানে সেই ঘা ক্রমে নানা পর্য্যায় পার হয়ে প্রতিক্রিয়া রূপে প্রত্যাঘাতের মতো প্রকাশিত হচ্ছে। যেন-বা ক-বিন্দু থেকে একটি রেখা গিয়ে খ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকা একটি খুঁটিকে পেঁচিয়ে ফিরে আসতে চায় ক-বিন্দুতে। রেখাটির গিয়ে (গমন করে = গ্) খুঁটিকে ছুঁয়ে থাকা (হ্) পর্যন্ত হল (গ্ + হ্ =) ঘ। খুঁটিকে পেঁচিয়ে ফিরে আসাকে (আসতে উদ্যত হওয়াকে) বলে ঘ্।

অর্থাৎ, এককথায় 'ঘু' মানে ঘুরে আসা, 'ষ' মানে এক দিশায় চলতে থাকা বা পুনরাবৃত্ত হওয়া। ঘ বা ঘা না থাকলে ঘু হতেই পারবে না। যে কারণে ব.শ. 'ঘুষিত' শব্দের অর্থ দিয়েছেন — বিশব্দিত, প্রতিজ্ঞাত। আগে শব্দিত, তার বিপরীতে ঘুরে আসছে বিশব্দিত; আগে জ্ঞাত, তার বিপরীতে ঘুরে আসছে প্রতিজ্ঞাত। কাজ উদ্ধার করার জন্য যে ঘুষ দেওয়া হয়, তা আলটপকা টাকা দিয়ে দেওয়া নয়। যাকে ঘুষ দেওয়া হচ্ছে, সে সরাসরি বলে-কয়ে কিংবা না-বলে ইশারায় কিংবা সেরকম আবহ তৈরি করে কোনো না কোনোভাবে জানিয়েছে তার দাবির কথা। সেই দাবিই ঘ বা ঘা, তার উত্তরে তার দিকে টাকাটা যে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেটিই

ঘুষ। সহসা কাউকে কার্য্যোদ্ধারের জন্য কিছু টাকা দেওয়াকে ঘুষ বলা যায় না, বলতে হবে **উৎকোচ**। ঠিক এভাবেই, বিশেষ কিছু আবেদন-নিবেদন-প্রার্থনা-দাবি এসে পৌঁছবার পর উত্তররূপে সেই প্রার্থনাকারীদের যেকথা জানানো হয়, তাকেই ঘুষ (ঘোষণা) বলতে হয়। অর্থাৎ, গমন হয়ে ঘ হয়, তার থেকে ঘা হয়, তার থেকে ঘু হয়ে ফিরে আসে। গোষ্ঠ বা গো-ব্রজ যেখানে হয়, সেই স্থানকে তো ঘুষ-পল্লী বা ঘোষপল্লী বলতেই হবে; ব.শ. বলছেন, 'সেখানে গোসমূহ শব্দ করে।' এই কারণে 'ঘুষ' (ঘোষণা) সাধারণ declaration নয়, তা বিশেষ পাত্রদের উদ্দেশে কথিত এবং সেকারণেই দিশাগ্রস্ত; যদিও একালে ঘোষণাকে আর তার অন্তর্নিহিত অর্থ অনুসারে দিশাগ্রস্ত রাখা হয়নি, ইংরেজি general declaration শব্দের প্রতিশব্দ করে নেওয়া হয়েছে। আগের কালে, যে-বাবু ঘুষ (ঘোষণা) করতেন, তাকে বলা হত 'ঘুষ-বাবু' বা 'ঘোষবাবু'। বাস্তবে যা ঘটার সে তো ঘটে গেছে বা ঘটে যাচ্ছে; তা সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন বলে 'যত দোষ নন্দ ঘোষ!' ইংরেজ আসার পর ঘুষবাবু ও ঘোষবাবু সব্বাই ঘোষ-বাবু হয়ে যান; একই পথ অনুসরণ করেন ঘোষাল-বাবুরাও। দ্র. **পদবী**। আজকাল এই ঘুষ সাধারণভাবে ঘোষ-রূপে প্রচলিত। যিনি সেইরূপ ঘোষণা করেন তাকে বলে **ঘোষক**। তবে **ঘুষঘুষে** হল এমন ব্যাপার, যা 'ঘোষণা করছে অথচ করছে না'; ফলে বোঝা যাচ্ছে না রোগের আক্রমণের (ঘ-এর) প্রতিক্রিয়া (ঘু) আছে কি নেই। **ঘুষকি**ও ঘুষঘুষের মতো। সে অন্যের দাবি (ঘ) মতো স্বদেহ ব্যবহারের জন্য ভাড়া দেয়, **ঘুষ** করে, গতিশীলভাবেই করে (-কি) অথচ লাইসেন্স নিয়ে তার কাজকে সাধারণীকৃত করেনি, করে রেখেছে দিশাগ্রস্ত (ষ)। তাই সে ঘুষকি। আর, ঘুষা বা ঘুষির ব্যাপার একেবারে সরাসরি। শারীরিক কিংবা মানসিক কোনো না কোনো আঘাতের বিপরীতে তা (**ঘুষ**) হাতের মুঠোয় কেন্দ্রীভূত হয়ে বিশেষ দিশায় গিয়ে আছড়ে পড়ে। হাতের মুঠা ঘুষ-এর আধার হয়ে যায় ব'লে তাকে বলে **ঘুষা**। আর, তা যখন গতিশীল থাকে তখন তার নাম **ঘুষি**।

ঘোষা (ঘোষী) : ১. ঘোষ + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***ঘোষা*** *=ঘোষ-এর আধার যে;* ***ঘোষী*** *= ঘোষ-এর গতিশীলতার আধার যে। /* **ঘোষী** = ঘোষ (শিব) যাহার দেবতা। (ব.শ.)। ৩. শতপুষ্পা, মধূরিকা (মৌরি), কর্কটশৃঙ্গী, কোশাতকী, ধ্রুবপদ, ধুয়া (পালাগানে প্রত্যেক শ্লোকের পরে ঘোষা গীত হয়। ...); ঘোষিত করা, উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করান, পড়ান। (**ঘোষী** = শৈব)। (ব.শ.)। কাক্ষীবান ঋষির কন্যা। এই কন্যা কুমারী অবস্থায় কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হওয়াতে কেহই তাঁকে বিবাহ করতে রাজী হননি। তখন তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্তবে সন্তুষ্ট করে তাঁদের দয়ায় পুনরায় যৌবন ও স্বামী লাভ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **ঘোষ** কী ব্যাপার, তা আমরা আগেই দেখেছি। সেই ঘোষের আধারকে ঘোষা বলে, এবং সেই ঘোষ-এর গতিশীলতার আধারকে ঘোষী বলে। ভাল কথা। কিন্তু এরা কারা? ব.শ. আমাদের জানাচ্ছেন, শতপুষ্পা-মৌরি-কর্কটশৃঙ্গী ... প্রভৃতি উদ্ভিদজগতের কয়েকটি সত্তাকে ঘোষা বলে। কারণ, এদের ভিতরে ঘোষ বা ঘুষ রয়েছে। কীভাবে রয়েছে, একালে আমরা অত্যন্ত প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন ব'লে সেসব কথা যথাযথভাবে জানি না; আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানতেন। হয়তো-বা মৌরি মুখে গিয়ে সুগন্ধ প্রকাশ করে বলেই তাকে ঘোষা বলে; কিন্তু সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। আর, শতপুষ্পা-কর্কটশৃঙ্গীদের সম্পর্কে তো কিছুই জানি না। রইল বাকি ধুয়ার কথা।

আমরা দেখেছি, দিশাগ্রস্ততার মূলে রয়েছে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি। একে বলে 'ষ'। নতুন আবিষ্কার বা সৃষ্টি হল 'শ'। তার পুনরাবৃত্তি হল 'ষ'। এই পুনরাবৃত্তিও বিশেষ দিকে নিয়ে যায়। মূল গায়েন একটি ধ্রুবসত্য (ধ্রুবপদ) আবিষ্কার বা সৃষ্টি করেছেন; সেই সত্য বারংবার গাইলে তাকে বলে ঘোষা। এই ঘোষা গাওয়া হয় মূল গায়েন যখন কয়েকটি সম্ভাব্য ধ্রুবসত্যের আবাহন করার চেষ্টা করেন, ঠিক তার পরে পরে। তাতে মূল গায়েন ও তাঁর সহযোগীরা সত্যের এলাকাতেই থাকতে পারেন, হঠাৎই একেবারে অজানা অন্ধকার এলাকায় আলটপকা পৌঁছে যান না। ঘোষা তাঁদের কীর্ত্তন বা পালাগানকে সত্যের ও তার সংলগ্ন এলাকায় ধরে রাখে, সম্পূর্ণ অজানা (wild concept-এর) এলাকায় সূতাকাটা ঘুড়ির মতো হারিয়ে যেতে দেয় না। সবশেষে, কাক্ষীবান ঋষির কন্যার নাম ঘোষা কেন, তিনি কোন ঘোষ-এর আধার ছিলেন, সেকথায় যেতে হয়। নিজের অধিকারে বা কাক্ষীতে (কাঁখে, কুক্ষিগত করে) রাখার মতো কাক্ষী ছিল যে ঋষির তার কন্যা ঘোষা। তথ্যানুসারে এই ঘোষা কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত; অর্থাৎ কিনা, পিতৃদোষে (বা পরিচালক দোষে) কন্যাটির (জনগোষ্ঠীটির) উৎপন্ন উদ্বৃত্ত হয়ে সমস্যা (দ্র. **কুশ, কুষ্ঠ**) তৈরি করেছিল। অশ্বিনীকুমারের (বিশেষজ্ঞদের) আশীর্বাদে সেই উদ্বৃত্তের ঘোষণা করে সেগুলি ক্রমে বেচে দিয়ে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছিল। এইরূপ ঘোষণা করতে পারার কারণেই তারা ঘোষা পদবাচ্য হয়ে গিয়েছিল।

ঘূর্ণ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অঘোর, অঘোরঘোররূপ, অঘোরপথ, অঘোরপথী, অঘোরপন্থী, অঘোরপ্রমাণ, অঘোরমার্গ, অঘোরা, অঘোরি, অঘোরী, আগরি, আগুরি, আগোর, আঘুরি, আঘূর্ণন, ঘুম, ঘুমচোখ, ঘুমপাড়ানি(নী), ঘুমন্ত, ঘুমুর, ঘুর, ঘূর, ঘুরঘুট্টি, ঘুরঘুরী, ঘুরণপাক, ঘুরণি(ণী)য়া, ঘুরণী, ঘুরা, ঘুরুণি, ঘুরুলী, ঘুরুলে, ঘুর্ঘুর, ঘূর্ণা, ঘুল, ঘুলঘুলি, ঘূর্ণ্, ঘূর্ণমান, ঘূর্ণা, ঘের, ঘেরাও, ঘেরাটোপ, ঘেরোয়াল, ঘোনা, ঘোর, ঘোরা, ঘোরাল, ঘোরালো।

ঘূর্ণ্ = নবরূপে উত্তীর্ণ গমনস্থিতধারীর রক্ষণের বোধন। ঘূর্ণ = নবরূপে উত্তীর্ণ গমনস্থিতধারীর রক্ষণের বোধন যাহাতে।

অঘোর (অঘোরি, অঘোরী, অঘোরপন্থী) : ১. ন + **ঘোর**। ২. *নেই ঘোর যাহার। /* যাহা হইতে ঘোর নাই। (ব.শ.)। ৩. অতিভীষণ, অতিভয়ানক, সুগভীর, প্রগাঢ়, নিদ্রানিমীলিত, সুষুপ্তিজড়িত, শিব, রুদ্রমূর্ত্তিবিশেষ, অঘোরোপাসক, শৈব। অঘোরমতানুসারী বা অঘোরপথাবলম্বী শৈবসম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক অঘোরমন্ত্র গ্রহণ করে। পূর্ব্বকালীন অঘোরীরা শৈবশক্তিবিশেষের অর্চ্চনা করিত, অস্থিসহকৃত ও নরকপালযুক্ত যষ্টিদণ্ড কমণ্ডলুরূপে

ব্যবহার করিত, এবং মদ্যমাংসভক্ষণ ও নরবলি প্রভৃতি ঘোরতর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত। অধুনাতন অঘোরীরা বিষ্ঠা ও চন্দন সমান, ইহা দেখাইয়া থাকে। সকল বস্তুতে সমভাব জানাইবার উদ্দেশ্যে শরীরে বিষ্ঠামূত্রাদি লেপন করে এবং করোটিতে বা কাষ্ঠপাত্রে উহা রাখিয়া সঙ্গে লইয়া যায়। ইহারা ঐ সমস্ত ঘৃণিত বস্তু ভক্ষণ করে, অথবা ভিক্ষা না পাইলে গৃহস্থের গৃহে উহা নিক্ষেপ করে। ... অঘোরী সম্প্রদায়ের যোগী। (ব.শ.)। ৪. 'প্রগাঢ়' অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. একটি শব্দ কত মহৎ অর্থ থেকে কত ঘৃণ্য অর্থের ধারক হতে পারে, অঘোর শব্দটি তার সবচেয়ে ভাল উদাহরণ। ভারতীয় ঐতিহ্যমূলক জ্ঞানের যেন ঠিক এই দশা ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে অঘোর কথাটির অর্থ ছিল, যার **ঘোর** কেটে গেছে। ঘোর মানে সংসারের ঘোর, প্রচলিত ব্যবস্থার ঘোর, তাতে ঘুরে মরার মোহ। এ মোহ থেকে মুক্ত হয়ে যান **শিব**, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী। সেই শিবের, সেই ব্রাহ্মণের সেই মোহমুক্ত অঘোরতার আচারসমূহকে দক্ষেরা যখন ক্রমে একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতিতে শত শত বছর বহন করে নিয়ে চলে, সে-অঘোরপন্থাই হয়ে যায় 'অতিভীষণ', 'অতিভয়ানক' এবং অতি ঘৃণ্য। এই অঘোরাচার থেকে শিবের সমস্ত অর্জনকে বিদায় করে দেওয়া হয়। তন্ত্রে আদি অঘোরপন্থার যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ করলে আমরা অবাক হয়ে দেখি, একজন সম্পূর্ণ মুক্তমনের অত্যন্ত জ্ঞানী সৎ মনীষীপদবাচ্য মানুষই যেন-বা সেই অঘোরপন্থী। অথচ আজ পাঁচ-সাতশো বছর পরে, বাস্তবে যে-অঘোরপন্থীকে দেখা যায়, যার কথা বঙ্গীয় শব্দকোষ লিখেছেন, সে সেই আদি অঘোরপন্থীর একেবারেই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। ধর্মের বা তত্ত্বের প্রাণপাখি উড়ে গেলে (তা সে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্ম হোক আর গান্ধীবাদ-মার্কসবাদ প্রভৃতি তত্ত্বই হোক), যে খাঁচাটি পড়ে থাকে, তাকেই চরম ও পরম বলে যাঁরা গ্রহণ করেন, এ দুর্ভাগ্য থেকে তাঁদের বাঁচানো অসম্ভব।

ঘুম (ঘুমন্ত, ঘুমপাড়ানি) : ১. ✓ঘূর্ণ > ঘুম। (ব.শ.)। ২. **ঘুম** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ঘ সীমায়িত যাহাতে [**ঘুমন্ত** = ঘুম অন্ত (ঘুম ক্রিয়ার অবিরাম যাহাতে) যাহাতে; **ঘুমপাড়ানি** = ঘুম পাড়ান যিনি (যে স্ত্রীলোক, গান)।]/* **ঘুমপাড়ানি** = যে ঘুম পাড়ায়। (ব.শ.)। ৩. 'ঘূর্ণন', নিদ্রাঘোর, তন্দ্রা, নিদ্রা, মহানিদ্রা; চারি ধারে ঘোরা, পরিভ্রমণ করা, ঘোরা, তন্দ্রাযুক্ত হওয়া, মোহে নিরুদ্যম হওয়া। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. 'নবরূপে উত্তীর্ণ ঘ' (= ঘু) হল সেই দড়িটি (গমন-হওয়ন) যে কিনা খুঁটিটিকে বেড় দিয়ে ফিরে আসতে উদ্যত হয়েছে। দ্র. **ঘুৎ**। কিন্তু তাকে আর এগিয়ে আসতে দেওয়া হল না, তাকে সীমায়িত (ম) করে দেওয়া হল। বলা হল, ওই খুঁটিটিকে পুনরায় বেড় দিয়ে দিয়ে ঘুরতে থাকো। একেই বলে ঘুম, বলে ঘুমঘোর, বলে ঘুমানো। হিন্দি ভাষায় বলে ঘুমনা অর্থাৎ ঘুরতে থাকা, পরিভ্রমণ করা। এই ঘুম ক্রিয়া অবিরাম চলতে থাকলে তাকে বলে ঘুমন্ত। মানুষ এভাবে ঘুমায় বলেই সে দীর্ঘায়ু হয়, বেঁচে থাকে। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে জগৎ থেকে যত আগন্তুক তার কাছে আগমন করে, তাকে আঘাত করে, তার সবগুলিকে সে ফিরিয়ে পাঠায় না, অধিকাংশই সে হারিয়ে ফেলে, ভুলে যায়। আর, তার এই ভোলার কাজে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে এই ঘুম। তবে সে ঘুম ওঠা-পড়া করে কেন, **অর্থাৎ কেন** বাংলাভাষীরা ঘুমিয়ে 'পড়ে' এবং ঘুম থেকে জেগে '**ওঠে**', **কিংবা** কীভাবে অন্য কেউ তাদের ঘুম 'পাড়ায়', সে আর এক **মজার** ব্যাপার। মজার দেশের সেই মজার ব্যাপারটি জানা না গেলে 'ঘুমপাড়ানি'কে চেনা কঠিন।

জাগ্রত মানে উপরে আর ঘুমন্ত মানে নীচে — এরকম ধারণা দুনিয়ার সব ভাষাতেই কমবেশি রয়েছে। বাংলা বা হিন্দি ভাষায় ঘুম থেকে জাগাতে হলে বলা হয়, 'উঠো'। অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও এই 'উঠো' বা তার প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়। ইংরেজিতেও বলা হয় get up, arise। আবার ঘুমাতে বললে নীচে পতিত হওয়ার ব্যাপার এসে যায়। তাই, বাংলায় ঘুমানোর নির্দেশ দিতে হয় 'শুয়ে পড়ো' বলে; হিন্দিভাষীরা বলেন — 'শো যাও', 'লেট যাও'; ইংরেজরা বলেন, 'lie down'। জাগা ও শোয়ায় এই যে ওঠা-পড়া, এতে আর একরকমের পড়ার কথা আছে বাংলায় — 'ঘুমিয়ে পড়ো', ইংরেজিতে আছে fall asleep। এরকম কেন?

এই সমস্যার সমাধান করতে হলে ডাকতে হবে ইয়োরোপের মিলটন সাহেব ও আমাদের বিবেকানন্দকে। কিন্তু এরকম মানুষদের ডাকার আগে একটু গোছাগুছি করে নেওয়া দরকার।

আসলে মানুষ তো একটি সত্তা নয়, সে হল দ্বৈতাদ্বৈত সত্তা — একটা তার দেহ, আর একটা তার মন, দুয়ে মিলে এক। শুয়ে পড়ো নির্দেশ দিলে তার শরীরটি ভূমির সমান্তরালে লম্বমান হয়ে যায়। মাথা তখন পায়ের সমতলে। অন্যথায় সে বসে বা দাঁড়িয়ে থাকে যখন তার মাথাটি থাকে উপরে। এই হল তার শারীরিক শুয়ে পড়া ও জেগে ওঠা। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ো নির্দেশ দিলে তাকে দুটো কাজ করতে হয় — প্রথমে শরীরটাকে পার্থিব ভূমিতে লম্বমান করতে হয়, তার পরে ডাকতে হয় মন-আমিকে। কারণ, সে তো তার আমি-বিমান নিয়ে মনোলোকের মহাকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। সেই আমি-বিমান এসে তার মনোভূমির বিমানবন্দরে অবতরণ করে, আমি-বিমানের ইঞ্জিন বন্ধ করে। তখন মানুষটি যথার্থে ঘুমায় — শারীরিকভাবে সে তো আগেই শুয়ে পড়েছিল, এবার মানসিকভাবেও সে শুয়ে পড়ল। যে কারণে, শুয়ে পড়েও আমরা ভাবতে পারি, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে আর আমরা ভাবতেও পারি না। কেননা, তখন আমাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শয়ন চলে।

বাংলায় তাই শারীরিক শয়নকে বলে শুয়ে 'পড়া', এবং মানসিক শয়নকে বলে ঘুমিয়ে 'পড়া'। উভয় ক্ষেত্রে নীচে পতিত হওয়ার ব্যাপার রয়েছে। শিশুকে ঘুম পাড়াতে হলে, তাকে কেবল শারীরিক ভাবে পেড়ে ফেললেই (ধরে ভূমির সমান্তরালে শুইয়ে দিলেই) হবে না, তার আমি-বিমানটিকে পেড়ে আনতে হবে তার মনোলোকের আকাশ থেকে এবং অবতরণ করাতে হবে তার মনোভূমির বিমানবন্দরে। অন্যথায় সে ঘুমাবে কী করে! সেকারণেই শিশুর মনোভূমির বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে তার মনোলোকের আকাশে উড়ে বেড়ানো আমি-বিমানটিকে ডাকতে হয় গান শুনিয়ে। আর, মজার ব্যাপার হল শিশুর সেই মন-বিমানটি রূপকথা আর গান শুনতে পেলে সব ছেড়েছুড়ে সেই গানের দিকেই দৌড় দেয়। শিশুর আমি-বিমান গানের লোভে নেমে আসে তার মনোভূমির বিমানবন্দরে।

গান শুনতে শুনতে একসময় তার বিমানের ইঞ্জিন বন্ধ হয়। সে ঘুমিয়ে পড়ে। এই কারণে শিশুর ঘুমের জন্য ঘুমপাড়ানি গানের ও ঘুমপাড়ানি-মাসিপিসির বড় প্রয়োজন। নইলে শিশুর আমি-বিমানকে তার মনোলোকের আকাশ থেকে পেড়ে আনবে কে!

এতক্ষণ শোয়ার ও ঘুমানোর কথা হল, এবার জাগাতে হবে। বিবেকানন্দ বললেন — 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! ওঠো, জাগো।' মিলটন বললেন — 'awake, arise! জাগো, ওঠো!' শায়িতের সমস্যা দাঁড়াল, সে আগে উঠবে তার পরে জাগবে; নাকি, আগে জাগবে তার পরে উঠবে? বিবেকানন্দ বলবেন, যে আগে শুয়েছে সেই আগে উঠবে; যে পরে শুয়েছে সে পরে উঠবে। মিলটন বলবেন, তা কী করে হয়? মন না উঠলে শরীর উঠবে কী করে? বিবেকানন্দ বলবেন, সেটা পরিস্থিতিনির্ভর। ঘুমন্ত মানুষের গায়ে আগুন পড়ে গেলে তার মন জেগে ওঠার আগেই শরীর জেগে উঠে দৌড় দেয়; মন জেগে ওঠে পরে। আবার, এমন মানুষও আছে, যার শরীর ওঠেই না, মন উঠে তার সব কাজ সারে। জীবন্ত কিন্তু শারীরিক অক্ষমতার কারণে চির-শয্যাশায়ী তো তাই-ই করে। বদ্ধপাগল বা স্মৃতিলুপ্ত মানুষের ক্ষেত্রে উল্টোটাও হয়। মিলটন বলবেন, আমি স্বাভাবিক পরিস্থিতির কথা বলছিলাম। বিবেকানন্দ বলবেন, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও প্রতিদিনের বিচারে দেখলে তোমার কথা ঠিক; কিন্তু মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়া ও জেগে ওঠাকে সমগ্রভাবে একটানা দেখলে আমার কথা ঠিক। মানুষ জন্মায়, ক্রমশ জাগে, যৌবনে উঠে দাঁড়ায়, ক্রিয়াকর্মাদি করে, বৃদ্ধ হয়, শোয়, ঘুমায়। তার মানে, খণ্ডবুদ্ধিতে দেখলে তোমার কথাই ঠিক; কিন্তু অখণ্ডবুদ্ধিতে দেখলে আমার কথা ঠিক। লোকালে তুমি সত্য, গ্লোবালে আমি সত্য। তুমি আমি মিলনেই ধ্রুবসত্য। অন্যথায় তুমিও খণ্ডসত্য, আমিও খণ্ডসত্য।

ঘুর (ঘুরা, ঘুরান, ঘোরা) : ১. ✓ঘূর্ণ্ > ঘুল > ঘুর। (ব.শ.)। ২. **ঘুর** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ঘ (গমনস্থিত) রহে যাহাতে।* ৩. ঘূর্ণন, ঘূর্ণি, পাক, বেড়, অসরলভাব, পেঁচ, দুর্বোধ্যতা, জটিলতা; চক্রাকারে ভ্রমণ করা, বেষ্টন করা, বেড়া, পরিভ্রমণ করা, পাক খাওয়া, চক্রাকারে প্রবাহিত হওয়া, আবর্ত্তিত হওয়া, ভ্রমি বোধ করা, প্রত্যাবর্ত্তন করা, ফিরা; চক্রাকারে ভ্রমণ করান, প্রত্যাবৃত্ত করান, ফিরান, পাক দেওয়া, পরিভ্রমণ করান, আবর্ত্তিত করান। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ঘুম**।

ঘোর (ঘোরাল, ঘোরালো) : ১. ✓ঘুর্ (ভীষণীভাব) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ঘুর**-*এর সার্বিক আশ্রয় যে।* ৩. ভীষণ, ভয়ানক, ক্রুর, অতিবিষম, বিকটশব্দকারী, প্রচণ্ড, বিকট, গাঢ়, নিবিড়, গভীর, শিব, বিষ, ভয়, ত্রাস, ভীষণতা, কল্কুম, অন্ধকার, অস্বচ্ছতা, জড়িমা, আবিলতা, মাদকতা, নেশা, বিষম সঙ্কট। ঘোরযুক্ত, ভয়াল, ভীষণ, অন্ধকারময়। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ঘুর**। সম্পূর্ণ এবং বা সার্বিক ঘুর থাকে যাহাতে, তাকে বলে ঘোর। সেই খুঁটিকে বেড় দিয়ে ঘুরতে থাকা দড়িটির কথা ভাবুন, যা কিনা ঘুরেই চলেছে। এবার দড়ির স্থানে অন্য কোনো সত্তাকে ঐ একই ক্রিয়া করতে দেখুন, ঘোর-এর ভয়াবহতা আন্দাজ করা যাবে। কলুর চোখবাঁধা বলদের মতো এই ঘোরকে দেখেছিলেন রামপ্রসাদ।

ঘৃ (ঘৃষ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আঘর্ষ, গিহ, **ঘর, ঘরকথা, ঘরকন্না, ঘরকরণ, ঘরকরনা,** ঘরগারি(রী), **ঘরঘর (ঘোরার ধ্বনি)**, ঘরঘেঁষা, ঘরচড়া, ঘরচোর, ঘরজামাই, **ঘরজ্বালানী, ঘরট্ট,** ঘরণী, ঘরদোর, ঘরদ্বার, ঘরপালানী, ঘরপোড়া, ঘরবসতি, ঘরবাড়ী, ঘরবাসী, ঘরভাঙানী, ঘরভেদী, ঘরম, ঘরমজানি, ঘরময়, **ঘরমুখো**, ঘরসংসার, ঘরাও, ঘরানা, ঘরামি(মী), ঘরিণি(ণী), ঘরিনি(নী), ঘরিষণ, ঘ'রো, ঘরোয়া, ঘর্ঘর, ঘর্ঘরা, ঘর্ঘরিকা, ঘর্ঘরী, ঘর্ম্ম, ঘর্ম্মিত, ঘর্ষ, ঘর্ষণ, ঘষঘষ, ঘষটা, ঘষটাঘষটি, ঘষটান, ঘষড়া, ঘষড়ান, ঘষা(সা), ঘষাঘষণী, ঘষাড়, ঘষান, ঘষিল, ঘষী, **ঘষ্টি-ঘর্ষণা**, ঘস্মর, ঘার্ত্তিক, ঘাম, ঘামকিরণ, ঘামতেল, ঘামা, ঘামাচি, ঘি, ঘিই, ঘিউ, ঘিওর, ঘিওড়, ঘিচাঘিচি (ঘৃষাঘৃষি), ঘিচিঘিচি, ঘিজিঘিজি, **ঘিঞ্জি**, ঘিন, ঘিনঘিন, ঘির, ঘিলা (ঘি-র মতো বস্তু), ঘিলু, ঘী, ঘৃ, ঘৃণা, ঘৃণালু, ঘৃণি, ঘৃণিত, ঘৃণ্য, ঘৃত, ঘৃতাচী, ঘৃতার্চ্চিঃ, ঘৃতোদ, ঘৃষ্, ঘৃষ্ট, ঘেঁচড়া, ঘেঁষ(স), ঘেঁষটা, ঘেঁষটান, ঘেঁষড়া, ঘেঁষড়ান, ঘেন্না, ঘেয়ারূ, ঘেসাট-ঘোসাট, ঘ্যানঘেনে, সঙ্ঘর্ষ, হিঁচড়, হিঁছড়, হিঁচড়ান (হেঁচড়া, হেঁচড়ান), হিঁচড়া-হিঁচড়ি (হেঁচড়া-হেঁচড়ি), হিচড়, হিছড়, হিচড়া, হিছড়া, হেঁচড়া, হেঁচড়ান, হেঁচড়া-হেঁচড়ি।

ঘৃ (ঘৃষ্) = গমনস্থিতের (ঘ-এর) রক্ষণ-ভক্ষণ যাহাতে। **ঘৃষ** = গমনস্থিতের রক্ষণ-ভক্ষণের দিশাগ্রস্ত শয়ন যাহাতে।

ঘর (ঘরাণা) : ১. ✓ঘৃ + অ। ২. *গমনস্থিত (ঘ)* ***বর্ত্তমান*** *রহে যাহাতে।* ৩. গৃহ, বাড়ী, প্রকোষ্ঠ, কামরা, গার্হস্থ্য, গৃহধর্ম্ম, গৃহস্থাশ্রম, শয়নমন্দির, পরিবার, বংশ, কুল, পরিজন, আত্মীয়, স্বজন, বাড়ীর ভিতর, অন্দর, ... । (ব.শ.)। ৪. যথার্থে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ঘুর**। ঘর শব্দটি তৈরি হয়েছে ঘৃ ক্রিয়া থেকে। এর অর্থ গমনস্থিতের (আ)বর্ত্তমানতা। তার মানে, আগন্তুক এসে স্থির (ঘ) হল বটে, কিন্তু তার এই স্থিরতা কার্যত একই বিন্দুতে বর্ত্তমান থাকা, আবর্ত্তমান থাকা। তার মানে, বাইরে থেকে যেখানে গমন করে স্থির হয়ে আমরা নিজের নিজের অস্তিত্ব 'বর্ত্তমান' রাখি, তাকে ঘর বলে। যতদূর বোঝা যায়, আদিম মানুষ ঘর বা গৃহ বানিয়েছিল সংগৃহিত খাদ্যাদি রাখার জন্য, নিজে থাকার জন্য নয়। পরে পরে সে নিজেও সেই ঘরে থাকতে শুরু করে। ফলে 'ঘর' ধারণাটির মধ্যে বাইরে থেকে বা কর্মক্ষেত্র থেকে ঘরে যাওয়ার কথা রয়েছে; একালে আমরা যেমন ভাবি, ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে কর্মক্ষেত্রে যাওয়া এবং পুনরায় ঘরে ফিরে আসা — 'ঘর' শব্দটির ভেতরে কিন্তু সেই কথাটির বিপরীত কথাই রয়েছে। রয়েছে — বাইরে থেকে বা কর্মক্ষেত্র থেকে ঘরে যাই খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য, তারপর কাজের মানুষ (দলবদ্ধ মানুষ, যৌথ ঝাঁকের মানুষ) কাজে ফিরে আসি (দলে ফিরে আসে, ঝাঁকের কই ঝাঁকে ফিরে আসে)। যৌথতার যুগের ছায়া থেকে গেছে 'ঘর' শব্দের ভেতর। তখন যৌথতায় মানুষ নিরাপদ বোধ করত,

একা হলে ভয় পেত। ... আজকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী মানুষ উল্টো স্বভাবের। সে একা হলে খানিকটা নিরাপদ বোধ করে, যৌথতার **জনঅরণ্যে** গেলেই তাকে শুরু করতে হয় **পাশবিক** যুদ্ধ। সেই কারণে সে ঘরে থাকতে ভালবাসে। ঘর নিয়ে তাই তার অনেক কথা।

তার এই ঘর অন থাকে যাহাতে, তাকে ঘরণ বলা চলে। ঘরণের আধারকে বলে ঘরাণা। অর্থাৎ, যে নিয়মনীতি বা সংস্কৃতিতে ওই ঘরটি অন (on) হয়ে থাকতে পেরেছে, তাকে ঐ ঘরের ঘরাণা বলে। মধ্যযুগের বাংলাভাষী এই ঘরকে এত মানসসম্পদে ধনী করেছেন যে, তার তুলনা হয় না। ব.শ. প্রণেতা সেকারণেই এই ঘর-এর জন্য অনেক স্থান ব্যয় করেছেন। ঘরকথা, ঘরঘেঁষা, ঘরচড়া, ঘরচোর, ঘরজামাই, ঘরজোড়া, ঘরজ্বালানী, ঘরপালানী ... এরকম অজস্র শব্দ রয়েছে তাঁর ডালিতে এবং সেই শব্দগুলির অধিকাংশই ক্রিয়াভিত্তিক, প্রতীকীর সংখ্যা কম।

ঘর্ম্ম (ঘাম, ঘামাচি) : ১. ✓ঘৃ (ক্ষরণ, দীপ্তি) + ম (মক্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ঘর্ম্ম** = *ঘর্ (গমনস্থিতের আবর্তন) সীমায়িত যাহাতে; অথবা ঘর্ মিতি মিত যাহাতে। (দ্র. ধর্ম্ম)।* / যাহা গাত্র হইতে ক্ষরে। (ব.শ.)। ৩. আতপ, সূর্য্যকর, রৌদ্র, উত্তাপ, উষ্মা, গ্রীষ্মকাল, নিদাঘ, আতপযুক্ত দিবস, শ্রমবারি, স্বেদ। ঘর্ম্মচর্চ্চিকা, ঘর্ম্মজন্য ফুসকুড়ি। (ব.শ.)। ৪. ঘাম, ঘামাচি যথাক্রমে sweat, prickly heat অর্থে প্রচলিত। ৫. **কর্ম্ম, চর্ম্ম, ধর্ম্ম, ঘর্ম্ম** — শব্দগুলি একই নিয়মে প্রসূত হলেও একটু পার্থক্য আছে। প্রথম তিনটিতে মন যথাক্রমে কর্, চর্, ধর্-এ রূপায়িত হয় বলেই এদের যথাক্রমে **কর্ম্ম, চর্ম্ম, ধর্ম্ম** বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ঘর্ম্মের বেলায় মন নাই, আছে শুধু ম। অর্থাৎ 'সীমায়ন হতে থাকা' (= মন্) নেই, আছে সীমায়িত বা 'ম'। ফলে, এর অর্থ দাঁড়ায়, গমনস্থিত রূপে সূর্য্যকর বা রৌদ্রাদি এসে গায়ে ঢোকে এবং স্থির হয়ে (= ঘ) আবর্তিত হতে থাকে (= র্), তারপর তা সীমায়িত রূপ (= ম) লাভ করে। ফল হয় ঘর্ম। উচ্চারণের নিয়মে সেটিই হয়ে যায় 'ঘর্ম্ম'। তারপর চর্ম্ম যেমন চাম হয়, তেমনি ঘর্ম্ম হয়েছে ঘাম। ৬. Greek - thermos, English - thermal। (ব.শ.)।

ঘিচিঘিচি (ঘিঞ্জি) : ২. *ঘিচিঘিচি* = ***ঘিচি**-র (গমনস্থিতি ও চয়নস্থিতির) পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ঘিঞ্জি*** = *গমনস্থিতির রহস্যরূপ-জনন গতিশীল যাহাতে।* ৩. **ঘিচিঘিচি** = গায়-গায়, লাগালাগি, ঘন-ঘন। (ব.শ.)। **ঘিঞ্জি** = ঘন, নিবিড়, সংকীর্ণ, ঘেঁষাঘেঁষি, ঘুপচি, জনবহুল বা ঘন বসতিপূর্ণ। (ব্য.বা.অ. ঢাকা)। ৪. 'ঘেঁষাঘেঁষি' অর্থে প্রচলিত। ৫. 'গিজগিজ', 'গিজিগিজি', 'গিঞ্জিগিঞ্জি' কিংবা 'ঘিজঘিজ', 'ঘিজিঘিজি' এবং 'ঘিঞ্জি' — এই শব্দগুলির সাহায্যে 'ঘনত্ব' বোঝানো হয়ে থাকে। তবে এ-**ঘনত্ব** বাইরে থেকে দেখা নয়, ভেতর থেকে দেখা; ঘনবস্তুর ভেতরের একটি কণা যেন নিজেই তার চারপাশের পরিস্থিতিকে **দেখছে**। শব্দগুলি প্রসূত হয়েছে এই অনুক্রমে — গজ, গজগজ, **গিজগিজ**, গিজিগিজি, ঘিজঘিজ, ঘিজিঘিজি, গঞ্জ, গিঞ্জি, **গিঞ্জিগিঞ্জি, ঘিঞ্জি**। অর্থাৎ মূলে রয়েছে গমন ক্রিয়া, তার থেকে জাত গিজগিজ, গিজিগিজি, ঘিজঘিজ, ঘিজিঘিজি, গিঞ্জিগিঞ্জি, এবং ঘিঞ্জি — এই শব্দগুলি কোনো না কোনো প্রকারের ঘনত্বকে বোঝায়।

গিঞ্জিগিঞ্জি বা ঘিঞ্জি শব্দদুটি এসেছে **গঞ্জ** থেকে, আর গঞ্জ এসেছে গম্ থেকে। হিন্দিতে শব্দটি 'ঘিঞ্জি' রূপে প্রচলিত। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, ব.শ. 'ঘিঞ্জি'কে অন্তর্ভুক্ত করেননি, সংসদ অভিধান ও ঢাকার ব্য.বা. অভিধান শব্দটিকে অন্তর্ভুক্ত করলেও, তাঁরা বলে দিয়েছেন এটি ফারসি শব্দ 'গুন্‌জান' বা 'গুনজা' শব্দ থেকে এসেছে। বাংলাভাষীর নিজস্ব **গম্, গজ, গঞ্জ** — এসব মূল শব্দের উত্তরাধিকারের কথা তাঁদের মনে পড়েনি। যদিও ব.শ. আন্দাজ করে ফেলেছিলেন যে, গিঞ্জিগিঞ্জি শব্দ থেকেই ঘিঞ্জি শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকবে। ঢাকার ব্য.বা.অভিধান এতদূর ভাবতে পেরেছেন যে, 'গিঞ্জি' থেকেই বুঝিবা 'ঘিঞ্জি' শব্দটি প্রসূত হয়েছে। কিন্তু তারপর তাঁদের এগোতে ইচ্ছে করেনি। কেননা, 'ঘিঞ্জি' শব্দটি যে ফারসি থেকে এসেছে, সেকথাটি তো তাঁদেরকে জোর গলায় বলতে হবে! তবুও তাঁদের দোষ ধরব না আমরা। বহুকালের অমর্যাদা মানুষকে আত্মপরিচয়ের ন্যায্য-অন্যায্য দাবির পক্ষে ওকালতি করতে প্ররোচনা দেয়। কিন্তু কলকাতার বাবু-পণ্ডিতরা? তাঁদের কোন্ দায় ছিল যে, তাঁরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাংলার অধিকাংশ শব্দ বাইরে থেকে এসেছে, এমন কথা প্রমাণ করতে যেন উঠে পড়ে লেগেছেন? বিদেশী শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দের কোনোরকম সম্পর্ক পাওয়া না গেলে তাঁরা হতাশ হন এবং আশ্রয় নেন 'মুণ্ডারি' নামক একটি অলীক ভাষার — অমুক অমুক বাংলা শব্দের আদি উৎস নাকি 'মুণ্ডারি'। বাংলা শব্দগুলির মালিকানা এইভাবে অন্যদের দান-খয়রাত করে দেওয়ার পর, কিছু শব্দ তারপরও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়ে থেকে যায়। আপাতত 'বাংলা শব্দ' হিসেবে সেগুলির প্রাণ বাঁচে বলে মনে হলেও, ক'দিন বাঁচবে তা নিয়ে সংশয় কাটে না। কেননা, আবার কোন বিদ্যাদিগ্‌গজ হঠাৎ কী সম্পর্ক হাতে নিয়ে কোন শব্দকে যে কোন বিদেশী ভাষার 'অওলাদ' বলে ঘোষণা করে বসবেন, খোদায় মালুম।

যাক্ গে সেসব মনোকষ্টের কথা। কাজের যেকথাটি এখানে বলা জরুরি, তা হল — গ্রামবাংলায় মানুষের মুখে আমরা ঘিজঘিজ, ঘিজিঘিজি শুনেছি। এখনও তা কোনো অভিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। দ্র. **থিকথিক**।

ঘির (ঘের, ঘেরা, ঘেরাটোপ) : ১. ✓ঘারি। (ব.শ.)। ২. ***ঘির*** = *ঘ গতিশীল রহে যাহাতে;* ***ঘের*** = *ঘ (গতিশীলভাবে) দিশাগ্রস্ত রহে যাহাতে।* ৩. আচ্ছাদন করা, ঢাকা, বেষ্টন করা, বেড়া। প্রাকারসদৃশ বেষ্টন, জামা-প্রভৃতির পরিধি বা বেড়, চারাগাছ রক্ষা করার নিমিত্ত বংশাদির বেষ্টন, বস্ত্রের বেষ্টন, কাপড়ের কাণ্ডার। বেষ্টিত, আচ্ছাদিত, বেড়া, প্রাচীরে বেষ্টিত, আঁটা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. আপনি চারাগাছটির কাছে গেলেন, হাতে কয়েকটি বাঁশ ইত্যাদি নিয়ে, সেগুলি দিয়ে গাছটিকে বেড় দিতে শুরু করলেন। বাইরে থেকে গিয়ে নির্দিষ্ট অস্তিত্বটির বা 'খুঁটি'টির (দ্র. **ঘুষ, ঘুম, ঘুর**।) চারদিকে বেড় দেওয়াকে বলে ঘির বা ঘিরা। কারণ এই প্রক্রিয়া ঘ গতিশীলভাবে আবর্তিত হয়। তাই ঘির। কিন্তু এটি বারংবার চলতে থাকলে তখন হয় ঘের বা ঘেরা। আর, সেই

ঘেরা যদি বোকা বানানোর বা **টুপি** পরানোর কাজ করে, তবে তা হবে ঘেরাটোপ।

ঘৃণা (ঘৃণি, ঘৃণিত, ঘৃণী, ঘৃণ্য, ঘিনঘিন) : ১. ✓ঘৃ + ন (নক্) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. **ঘৃণা** = *আবর্তনশীল ঘ-এর বোধের ধারণা যাহাতে।* / হৃদয়সেচন করে যে। (ব.শ.)। ৩. দয়া, করুণা, কৃপা, জুগুপ্সা, নিন্দা, অশ্রদ্ধা, বিরাগ। কিরণ, কর, জ্বালা, সূর্য্য। ঘৃণার পাত্রভূত, নিন্দিত, অবজ্ঞাত, হেয়। ঘৃণাযুক্ত, দয়াবান। ঘৃণার যোগ্য, অশ্রদ্ধেয়। (ব.শ.)। ৪. ঘৃণি ও ঘৃণী অপ্রচলিত, বাকিগুলি যথার্থে প্রচলিত। ৫. আগত স্থির সত্তা (= ঘ) মনের মধ্যে ঘোঁট পাকায়, আবর্ত্তিত হতে থাকে (= ঘৃ)। তার থেকে যে ব্যথা, কষ্ট, রাগ, জ্বালা, সুখ, খুশি, আনন্দ, প্রেম প্রভৃতি, এককথায় যে-বোধ জন্মায়, তাকেই ঘৃণ্ বলে। এই ঘৃণ্-এর আধারকে বলে ঘৃণা। এই সেই কারণ, যেজন্য ব.শ. ঘৃণা শব্দের অর্থ 'দয়া, করুণা, কৃপা' ইত্যাদিও দিয়ে গেছেন। তার মানে আগত সত্তার ঘোঁট পাকানোর বোধই ঘৃ, তা আনন্দদায়ক হতে পারে, দুঃখদায়কও হতে পারে। আজকাল বাংলায় কেবলমাত্র দুঃখদায়ক ঘৃ-কেই ঘৃণা শব্দে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ঘৃণার ভাল দিকটি এখন অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

ঘৃত (ঘি, ঘিই, ঘিউ, ঘী) : ১. ✓ঘৃ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে, করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ঘৃত** = *আগত স্থির আবর্ত্তমান সত্তা তারিত যাহাতে।* / **ঘৃত** = যাহা ক্ষরিত হয়, অথবা যাহা দ্বারা বহ্নি দীপ্ত হয়। (ব.শ.)। ৩. **ঘৃত** = সর্পিঃ, আজ্য, হবিঃ, ঘনীভূত সর্পিঃ, বসা-ঘি, নবনীত, জল। মস্তিষ্ক, মগজ, ঘিলু। (ব.শ.)। ৪. বাহ্যিক অর্থে প্রচলিত। ৫. এখানে আগত-স্থির-আবর্ত্তমান-সত্তার অন্ততপক্ষে দুটিকে আমরা সুস্পষ্টভাবে চিনি। এক, দুধের সারবস্তু, যা তারিত হয় দুগ্ধজাত ঘি-তে। দুই, জগতের বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতাসমূহ, যা তারিত হয় আমাদের ঘিলুতে, মস্তিষ্কে। আরও দুটিকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা খুব ভালভাবে চিনতেন, আমরা খানিকটা ভুলে গেছি। এখন মনে করার চেষ্টা করা যাক। প্রথমটি হল আমাদের শ্রম ও মেধা জাত উৎপন্নদ্রব্য। তাও কিন্তু (সমাজের) দুধের থেকে জাত ক্ষীরসর। (পুঁজিবাদীদের কাঙ্ক্ষিত শান্তি বিষয়ে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — 'যে শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীরসর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে ...।' *বাতায়নিকের পত্র*।)। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এর নাম দিয়েছিলেন সর্পিঃ। যার কাছে তা জমা হত, তার নাম দেওয়া হয়েছিল সর্প। আর একধরনের **ঘৃত** ছিল সম্পূর্ণতই মানসিক। তাকে বলা হত আজ্য ও হবিঃ। তত্ত্ব ও তথ্যের সর্বোচ্চ জ্ঞানকে দেওয়া হয়েছিল এই নাম। অজ বা দক্ষ-স্পেশালিস্ট বিশেষজ্ঞরা এই জ্ঞানকে কাজে পরিণত করতেন বলে এর নাম ছিল আজ্য। সেই জ্ঞান জনসাধারণের শ্রমাগ্নিতে ঢালা হত বা হবন করা হত কাঙ্ক্ষিত বস্তু উৎপাদন করার জন্য; সেইজন্য তাকে বলা হত হবিঃ। দ্র. **দধি, নবনী**।

ঘৃতাচী : ৩. ঘৃত (জল) হইতে জাতা অপ্সরোবিশেষ। (ব.শ.)। স্বর্গের এক অপ্সরা। মহাভারত মতে যে ছয়টি অপ্সরা শ্রেষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে ইনি একজন। বহু ঋষি ও মানুষের সহিত এঁর প্রণয়কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা — (ক) বেদ বিভাগকর্তা ব্যাস একদিন হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করবার জন্য দুইখানি অরণি (যজ্ঞকাষ্ঠ) ঘর্ষণে রত ছিলেন; এমন সময় তিনি ঘৃতাচীকে দেখতে পান। তাতে মহর্ষির ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হয় এবং তাঁর বীর্য অরণির মধ্যে প্রবেশ করে। ঘৃতাচী ভীত হয়ে শুকপক্ষিণীর রূপ ধারণ করে ঐ স্থান হতে প্রস্থান করে। ব্যাস পূর্ব্ববৎ অরণি ঘর্ষণ করতে থাকেন। তখন যজ্ঞকাষ্ঠ হতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির মতো (ব্যাসপুত্র) শুকদেব নিজের তেজে তা থেকে বেরিয়ে আসেন। (খ) চ্যবন ঋষির পুত্র প্রমতি ঘৃতাচীর গর্ভে রুরু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। (গ) মহারাজ কুশের পুত্র কুশনাভের ঘৃতাচীর গর্ভে একশত কন্যা হয়। তাঁদের রূপে মুগ্ধ হয়ে পবনদেব একদা তাদের সঙ্গ প্রার্থনা করলে পিতার বিনা অনুমতিতে কন্যারা অসম্মতা হন। ফলে পবনের অভিশাপে এই শত কন্যা কুব্জা হন। ... কাম্পিল্য নগরের রাজা তাঁদের পাণিগ্রহণ করলে তাঁরা পূর্বরূপ ফিরে পান। ... যে স্থানে কন্যারা কুব্জা হয়েছিলেন, সে স্থানের নাম হয় কান্যকুব্জ। (ঘ) ভরদ্বাজ মুনি একবার ঘৃতাচীকে নদীতে স্নানরত অবস্থায় দেখে কামার্ত হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর রেতঃপাত হয়। ঋষি সেই রেতঃ তৎক্ষণাৎ দ্রোণীর (এক প্রকার পাত্র) মধ্যে ধারণ করেন। এই দ্রোণীরক্ষিত রেতঃ হতে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্রই ... দ্রোণাচার্য। (ঙ) কুবেরের ঔরসে ঘৃতাচীর চিত্রা নামে এক কন্যা হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. এখন যেহেতু আমরা ঘৃত সত্তাটিকে চিনি, চেষ্টা করলে এই ঘৃতাচীকেও আমরা চিনতে পারব। উপরোক্ত কাহিনীগুলি থেকে স্পষ্ট হয় যে, সমাজের অর্থনৈতিক ক্ষীরসর-জাত সম্পদের আধার এবং অর্জিত জ্ঞানের বা মানসসম্পদের আধার যে সত্তা, এখানে তার কথাই বলা হয়েছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পুরাণকারগণ তাকে যেভাবে সমাজে সক্রিয় দেখেছিলেন, সেভাবেই তার বর্ণনা করে গেছেন পৌরাণিক ভাষায়। এই সত্তার সঙ্গে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মহর্ষির (সম্প্রদায়-পরিচালকদের) মিলনে যথাক্রমে **শুকদেব, রুরু, কন্যাকুব্জ, কাম্পিল্য, দ্রোণাচার্য,** চিত্রা প্রমুখ আরও পাঁচটি সত্তার জন্ম হয়।

ঘ্রা ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অঘ্রেয়, অনাঘ্রাত, আঘাণ, আঘ্রাণ, আঘ্রাত, আঘ্রেয়, আঘ্রান, ঘ্রা, ঘ্রাণ, ঘ্রেণা, ঘ্রেয়, ব্যাঘ্র।

ঘ্রা = গমনস্থিতি-রক্ষিত যাহাতে, তাহার আধার।

ঘ্রাণ : ১. ✓ঘ্রা + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গমনস্থিতিকে (ঘ্-কে) আগ্রহের সহিত ধারণের থেকে জাত বোধ থাকে যাহাতে।* / যাহার দ্বারা ঘ্রাণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. গৃহীতগন্ধ, আঘ্রাত, গন্ধগ্রহণ, সোঁকা, গন্ধ, নাসিকা। (ব.শ.)। ৪. সোঁকা অর্থে প্রচলিত। ৫. এতক্ষণ ঘ-যুক্ত শব্দগুলিতে ঘ-অর্থে গমনস্থিত বা আগত সত্তা, তার আগমন, আঘাত করা, ঘা ইত্যাদি নিয়ে আমরা ভাবিত ছিলাম। এখন প্রথম আমরা যে সত্তার সাক্ষাৎ পাচ্ছি, সে হল আগত সত্তা স্বয়ং আসছে না, তাকে আসতে বলা হচ্ছে, তার

আগমন আকাঙক্ষা করা হচ্ছে, ডাকা হচ্ছে। এইরূপ ডেকে যে গমনস্থিতকে ধারণ করা হয়, তাকে বলে ঘ্রা। সেই ঘ্রা-এর বোধ যাহাতে তাকে বলে ঘ্রাণ।

ব্যাঘ্র (ব্যাঘ্রপদ, বৈয়াঘ্রপদ্য) : ১. বি-আ + ✓ঘ্রা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ব্যাঘ্র = ব্যাপকভাবে আঘ্রাত হয় যে।* ৩. শার্দুল, বাঘ, (কশ্যপভার্য্যার দ্রংষ্ট্রা হইতে ব্যাঘ্রের উৎপত্তি।) শ্রেষ্ঠার্থ, রক্ত-এরণ্ড, করঞ্জ। (ব.শ.)। ৪. tiger অর্থে প্রচলিত। ৫. এই শব্দটি আমাদের আবারও দেখিয়ে দেয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের এই বিশ্বপ্রকৃতি ও তার জীবজগৎ সম্বন্ধে কত গভীর জ্ঞান ছিল। এমনকি ব.শব্দকোষও বুঝতে পারেননি, কেন আমাদের পূর্বপুরুষগণ tiger-কে ব্যাঘ্র নাম দিয়েছিলেন, যদিও তিনি অত্যন্ত সঠিকভাবেই শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন।

বাঘ ভয়ানক জন্তু। বন্যজীবদের ত্রাস। অন্য জীবরা যাতে ঝাড়েবংশে তার হাতে না মরে, অন্য জীবদেরকে তার উপায় দিয়ে রেখেছেন পরমাপ্রকৃতি স্বয়ং। অন্তত দুটো উপায়ের কথা আমরা জানি। এক, বাঘের পেছনে ফেউ লাগিয়ে দেওয়া। সে ফেউ ফেউ করে ডাকতে ডাকতে বাঘের পেছনে পেছনে ঘোরে। উদ্দেশ্য, বাঘের শিকারের পড়ে থাকা রক্ত-মাংস চেটে খাওয়া, তাতেই ফেউয়ের পেট ভরে; কারণ সে নিজে শিকার করতে পারে না। বাঘ কিন্তু এই ফেউকে মারতেও পারে না, কারণ সে প্রধানত গাছের ডাল থেকে ডালে দৌড়ে বেড়ায়। এদিকে, এই ফেউয়ের ডাক শুনলেই অন্য জীবেরা সতর্ক হয়ে যায়, বুঝে যায়, ধারেকাছে বাঘবাবাজী এসে গেছেন, অতএব পালাও!

কিন্তু কোনো কারণে যদি বাঘটি ফেউহীন হয়ে একা একা ঘুরে বেড়ায়, তখন অন্য জীবেরা বাঁচবে কীভাবে? তারও উপায় রেখেছেন মা-প্রকৃতি। বাঘের গায়ের গন্ধ। স্পর্শকাতর নাক অনেক দূর থেকে তা টের পেয়ে যায়। বন্য মানুষেরা এরকম গন্ধ নাকে লাগার সঙ্গে সঙ্গে একমুঠো ধুলো তুলে ছেড়ে দিয়ে দেখে নেয়, হাওয়া কোনদিক থেকে আসছে। আর তা দেখে নিয়েই বিপরীত দিকে দৌড় দেয়। কেবল তাই নয়, আপনি একটি বাঘের বাচ্চাকে ধরে চট-থলিতে ঢুকিয়ে যদি কোনো গ্রামে ঢোকেন, থলিটি ধরা যাক আপনার স্কুটারে বা জিপে রয়েছে, আর জিপটি দাঁড় করিয়েছেন কোনো গেরস্থবাড়ির সামনে, পাশেই গরুর গোয়াল, আপনি অবাক বিস্ময়ে দেখবেন যে, প্রাণপণ শক্তিতে দড়ি ছিঁড়ে খুঁটি ভেঙে গরুগুলো ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিচ্ছে; যদিও ধারে-কাছে যাদের সঙ্গে আপনি কথা বলছেন তাদের কেউই টের পায়নি আপনার জিপে একটি বাঘের বাচ্চা রয়েছে। ... এইরূপ ব্যাপকভাবে আঘ্রাত হয় বলেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা এর নাম দিয়েছিলেন ব্যাঘ্র। একই গুণ থাকার জন্য তাঁরা রক্ত-এরণ্ড ও করঞ্জকেও ব্যাঘ্র নাম দিয়েছিলেন। পরে পরে, এমন সত্তাকেও 'ব্যাঘ্র' নামে ডাকার চল হয়ে যায়, যার খবর ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু দূর থেকে মানুষ তা জানতে পেরেই পালায়, আত্মরক্ষা করে। বহু দুর্দ্ধর্ষ হিংস্র লুঠতরাজকারী দিগ্বিজয়ী বীরকে পুরাণাদি গ্রন্থে এই কারণেই 'ব্যাঘ্র' বলা হয়েছে।

তবে এখানেই শেষ নয়। সমাজে সবচেয়ে বড় হিংসাকারী বা সিংহ যখন রাজা, তখন যাঁদেরকে রাজকোষ সামাল দেওয়ার দায়িত্বে বসানো হয়েছিল, তাঁদেরকেও বলা হত ব্যাঘ্র এবং তাঁদের সরকারি পদটির নাম হয়েছিল 'ব্যাঘ্রপদ'। এঁরা ছিলেন সরকারের খাজনা ইত্যাদি আদায়কারী। মানুষ এঁদের আঘ্রাণ পেলেই ভয় পেত। সম্ভবত এঁদের 'অর্ণব' (পরবর্তীকালে বক্‌শী বা বক্সী) বলা হত। এঁদের গোত্র সেকারণেই 'বৈয়াঘ্রপদ্য'; যদিও কথাটি ভুলভাবে 'বৈয়াঘ্রপদ্ম' বা 'বৈয়াগ্রপদ্ম' প্রভৃতি বানানে লেখা হয়ে থাকে। দ্র. পদবী।

আজকাল অবশ্য পরিস্থিতি বদলে গেছে। প্রাণীবাচক শব্দের সামাজিক অর্থ আমরা ভুলে গেছি। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে কুকুর বংশে জন্মেছিলেন, সেই কুকুর যে আদৌ dog নয়, সেকথা এখন কেউ বোঝে না। লোকে বাঘকে tiger ভাবেন এবং সেজন্যই তাকে আর সম্মানীয় ভাবেন না। সেকারণেই হয়তো অনেক 'বাঘ'ই আজকাল 'বাগ' হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু বাগবান তো বাগানকারী মালী। মনে হয় একালে বাঘের তো গৌরব নেই সিংহের মতো। তাছাড়া, আজকাল সামাজিক অর্থটি যেহেতু সবাই ভুলে গেছেন, নিজের নামের শেষে বন্যপ্রাণীবাচক শব্দ অনেকেরই ভাল লাগে না। যেকারণে আজকাল বাংলাভাষীদের মধ্যে প্রায় দায়ে পড়ে সিংহ, বাঘ, হাতি, ঘোড়া (ঘোড়ই) — এই চারটি পদবীই যা প্রচলিত আছে; আর কোনো প্রাণীর নামের সমান্তরাল পদবী নেই বলেই মনে হয়। আদিবাসীদের মধ্যে তবুও হাঁসদা রয়েছে। কিন্তু ইংরেজিতে এখনও Lion ছাড়াও রয়েছে Fox, Lamb এমনকি Butcher-ও।

ঘ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অনঘ, অঘ, অঘকৃৎ, অঘঘ্ন, অঘনাশক, অঘনাশন, অঘমর্ষণ, অঘর, অঘর্ম্ম, অঘা, অঘায়ুঃ, অঘাসুর, ঘ (গ্-হ), ঘ-কার, ঘগরি, ঘগ্‌ঘগ্, ঘচঘচ, ঘচাঘচ, ঘ(ঘা) বড়া, ঘাঁঘর, ঘাগর, ঘাগরা, ঘাগরি(রী), ঘাঘুরি, ঘাঘড়, ঘাঘর, ঘিঁচ, ঘীঁচি, ঘেঁ(ঘে)চিকড়ি, ঘেঁচু, ঘেঁতঘোঁত, ঘেঙা(ঙ্গা)ন, ঘেচিকড়ি, ঘেঞ্চুলিকা, ঘোঁৎঘোঁৎ, ঘোগ, ঘোঘ, ঘোঙ্গা (ঘঙা, ফাঁকা বড় গেঁড়ি), ঘোঙ্ঘ, ঘোপা, ঘ্যাঙা, ঘ্যানঘেনে।

অঘমর্ষণ : ১. অঘ্ = পাপকরণ; মর্ষণ। ২. *যাহার দ্বারা পাপের সহন সাধিত হয়। /* যাহা দ্বারা পাপ কর্ম্ম-অক্ষম হইয়া সহনীয় হয়। পাপের সহনসাধন। (ব.শ.)। ৩. পাপনাশক সূক্ত — 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চ ...' ইত্যাদি। অঘমর্ষণজপের সহিত আঘ্রাতজলপ্রক্ষেপরূপ ক্রিয়াবিশেষ। অশ্বমেধযজ্ঞাঙ্গভূত অবভৃথস্নানের মন্ত্র। ৪. অপ্র.। ৫. মন্ত্রটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণমাত্রেই জানেন ও জপ করে থাকেন। এই মন্ত্রের দ্বারা নাকি পাপ তার কর্ম্ম করতে অক্ষম হয়, অর্থাৎ পাপের (পণ্য উৎপাদনের) পাপত্ব নাশ হয়ে যায় এবং সেই পাপত্বহীন-পাপ মন্ত্রোচ্চারণকারীর পক্ষে সহনীয় হয়ে ওঠে। সত্যি তেমন হয় কি না, তা তাঁরাই বলতে পারবেন। কী কৌশলে পণ্য উৎপাদন করব, অথচ বৃথামাংস ভক্ষণ হবে না, তার কার্যকরী ব্যবস্থার কথা সম্ভবত মন্ত্রটির ভিতরে কোড রূপে রয়েছে; সব মন্ত্রের ক্ষেত্রে যেমন থাকে। যাই হোক না কেন, এই শব্দটি থেকে অন্তত এটুকু নিশ্চিত রূপে জানা

যায় যে, একসময় পাপকে (পণ্য উৎপাদনকে) সহনীয় করে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিল আমাদের প্রাচীন সমাজ।

অঘাসুর : ১. অঘ্ = পাপকরণ; অসুর। ২. *যে অসুর পাপ (অঘ) করে।* (অঘ = পাপ /ব.শ.)। পাপ = পালকের পালয়িতা = উৎপন্ন, পণ্য, অন্নাদি। ৩. বকাসুর ও পুতনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও কংসের সেনাপতি। অজগর রূপে কৃষ্ণবধের চেষ্টা করেন ও কৃষ্ণকর্তৃক নিহত হন। (পৌ.অ.)। অঘ নামক অসুরবিশেষ। এই কংসচর অসুর বৃন্দাবনে গোষ্ঠপথে সর্পদেহ ধারণ ও মুখবিস্তার করিয়া অবস্থান করে। গোপবালকেরা গুহাভ্রমে ধেনুবৎস-সহিত মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইলে, শ্রীকৃষ্ণ অসুরমায়া বুঝিয়া, মুখে প্রবেশ ও স্বদেহ-বৃদ্ধি করিয়া অসুরের গলরোধপূর্ব্বক প্রাণসংহার করেন। (ব.শ.)। ৪. অগ্র। ৫. বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন (**পাপ**) করা ভারতের বুকে অনাদিকাল থেকেই নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও বহু সমাজতন্ত্রবাদীরাই (বেদবাদীরাই) ভিতরে ভিতরে পাপাচরণ করত। অঘাসুর তেমনি এক মানবগোষ্ঠী যারা সমাজের বিশেষ স্তরে পরিচালকের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। উঠতি ধনতন্ত্র কেমন করে বিশাল বিশাল পূর্বতন ক্ষমতা ও তার প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংসে করেছিল, ইউরোপ তার ইতিহাস প্রতীকী ভাষায় লিখে রেখেছে, আর ভারত লিখে রেখেছে এই ভাষায় — শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুরবধ তারই এক নিদর্শন।

চ

চ্ বর্ণের অর্থ : চ = চ্ বর্ণটি 'চ্-অন' ক্রিয়ার ধারক। এর স্বরূপ হল — ক-বিন্দুতে রয়েছে অস্তিত্ব, তার রয়েছে কিছু অভাব এবং সেই অভাব পূরণের ইচ্ছা বা চাওয়া। খ-বিন্দুতে রয়েছে এমন সত্তা যা সেই অভাব পূরণ করতে পারে। চাওয়া অতএব হাত বাড়ায় খ-বিন্দুর দিকে এবং প্রয়োজনীয় বস্তু-বিষয় নিয়ে আসে। একে বলে চয়ন করা। অর্থাৎ একদিকে রয়েছে চাওয়া, অপর দিকে রয়েছে চাওয়া-পূরণের বিষয়। দুটির যোগ ঘটায় চ-অন। অস্তিত্বের ভিতরে থাকা অভাব, নাকি সেই অভাবপূরক বস্তু-বিষয়ের আত্মপ্রকাশ, কে চাওয়াকে সক্রিয় করে, সে প্রশ্ন প্রেক্ষিতের সামনে খোলা-প্রশ্ন রূপেই থেকে যায়।

অভাবী ইচ্ছুক-এর যে চলন বা চাওয়া, অন্যকে নিজের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়ার বা অন্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার যে ক্রিয়া, চ-অন হল তাই। একেই 'চ্' ('চয়', 'চয়ন') বলে। ব.শ. বলেছেন এ হল এক প্রকার 'অন্বাচয়', অর্থাৎ 'প্রধানভাবে উক্ত কার্য্যের সহিত গৌণভাবে উক্ত কার্য্যের আনুষঙ্গিকভাব।' এই কারণে সংস্কৃতে বর্ণটি 'এবং' অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় এটি রয়েছে প্রত্যয় রূপে — অথচ (অথ-চ), বরঞ্চ (বরং-চ), কদাচ, অপিচ, তত্রাচ ইত্যাদি। প্রাচীন ইংরেজিতে 'চ্' বর্ণটি নেই, ল্যাটিন এবং গ্রীক-এও বর্ণটি ছিল না; তবে এক অর্থে ছিলই। [ক্লাসিক্যাল ল্যাটিন ও ক্লাসিক্যাল গ্রীক, অর্থাৎ যে দুটি ভাষায় রোম ও গ্রীস গৌরবময় যুগে তাদের ভাবসম্পদ প্রকাশ করেছিল, সেখানেও 'চ' বর্ণটি ছিল না। প্রাচীন বা ক্লাসিক্যাল গ্রীকের x (= অনেকটা 'খ'-এর কাছাকাছি) বর্ণযুক্ত গ্রীক শব্দকে ল্যাটিনে স্থাপন করা হত ch (ক্ হ্) বর্ণ-সমন্বয় দিয়ে। গ্রীকের xopos এসে ল্যাটিনে হয়ে গিয়েছিল chorus। কিন্তু তথাকথিত মধ্যযুগে যখন ফরাসি ভাষা আত্মপ্রকাশ করছে ল্যাটিনের প্রাকৃত রূপ থেকে, তখন তাদের লিখিত ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে ch-এর ব্যবহার, প্রায় আমাদের 'চ'-এর মতন উচ্চারণে। সেই ফরাসি থেকে ধার-করা শব্দের সূত্রে ইংরেজিতে 'চ' বা 'ch' উচ্চারণ-যুক্ত শব্দের প্রাদুর্ভাব ঘটে যায় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে।] আধুনিক ইংরেজির 'ch', 'sc', 'sch' প্রভৃতি বর্ণযুক্ত শব্দগুলিতে (যথা chase) এই 'চ্'-এর উত্তরাধিকার আছে। আদিতে ক্ ও হ্ বর্ণের একধরনের মিলনেই যে চ্ বর্ণটি প্রস্তুত হয়েছিল, ইংরেজি ch তার একটি প্রমাণ। এর একটি মানে দাঁড়ায় এরকম যে, কিছু করতে হলে প্রথমে তাকে ধরতে হবে; অর্থাৎ চয়ন না করলে করণ হয় না। বাংলায় ইক্ প্রত্যয় (অর্থনৈতিক) আর ইংরেজির ic (economic), উভয়ের মূলে রয়েছে একই চ ও ক (ইচ্, ইচ্ছু, ইখ্ — ich, ic)।

যাই হোক, আদিতে চ্ বর্ণটি বহু রূপে ছিল বলেই আমাদের মনে হয়। গরু যখন চয়ন করে, চরে, তখন সে চয়ন-ভক্ষণ-গমন একসঙ্গেই করে। মানুষ যখন মন দিয়ে খায় (মানসিক চয়নকার্য চালায়) তখনও গরুর মতো চয়ন-ভক্ষণ-গমন একত্রেই করে। দুনিয়ার অন্যান্য ভাষায় নিশ্চয় তার কিছু উত্তরাধিকার রয়েছে। সংস্কৃতকারগণ তুলনায় অগ্রণী ভাষাবিদ ছিলেন। তাঁরা এলোমেলো 'চ্'-গুলির উত্তরাধিকার রাখেননি। সেগুলিকে সংস্কার করে একটি মাত্র 'চ্'-এ সুনির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। এই চ্-এ অ যোগ করে তাঁরা যে উচ্চারণযোগ্য চ বানিয়েছিলেন, তার মূল অর্থ ছিল — আঁচড়ায় যে বা আঁচড়ে ধরে যে। একে চয় বা চয়ন করাও বলে। সংস্কৃতে এর তিনটি রূপের উল্লেখ করেছেন ব.শ. — তৃপ্তি, ঘাত (ব্যাঘাত), ভ্রান্তি। তাঁর এই উল্লেখ সঠিক এবং তা বুঝতে অসুবিধা হয় না যদি আমরা ভাবি — চয়ন > অভাবপূরণ = তৃপ্তি; চয়ন = অভাবপূরণের নিমিত্ত যে-বস্তুবিষয় চয়ন করে নিয়ে আসা হয়, চয়নক্ষেত্রে তা ঘাত (গাছ থেকে আম পেড়ে আনা) ও ব্যাঘাত (পলাতক মৎস্যকে পশ্চাদ্ধাবন করে ধরে আনা) রূপে প্রতীয়মান হয় = ঘাত ও ব্যাঘাত; চয়ন = চয়নের উদ্দেশ্যে একের পর এক কাঙ্ক্ষিত বস্তু-বিষয়ের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকা (হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনোখানে) বা চক্রাকারে ঘুরতে থাকা = ভ্রান্তি।

আরেক দিক থেকেও বিষয়টি বুঝে নেওয়া দরকার। শুধু চ্-এ চয়নবাচকতা থাকে, কিন্তু 'অচ্'-এর মানে দাঁড়ায় — 'যে অস্তিত্ব চায়' (= চায়ী বা ইচ্ছাকারী) এবং 'চ'-এর মানে দাঁড়ায় — 'চায় যে' (= চায়ী বা ইচ্ছাকারী)। এই যে অ, যা কিনা চ্ বা চয়নকে চায়ীতে উত্তীর্ণ করে, তার এই বিশেষত্ব বা বিশেষ্য রূপ পেতে অনেক ছোট ছোট (ইচ্ছানুরূপ ফল পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টাকারী, সেই উদ্দেশ্যে অন্যকে আঘাতকারী, অবশেষে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জনকারী ইত্যাদি অজস্র) অধ্যায় পেরোতে হয়। অর্থাৎ, ইচ্ছা, চয়নেচ্ছা, চয়নেচ্ছু, চয়নেচ্ছায়-কারী, চয়নেচ্ছায়-গামী, চয়নেচ্ছায়-ধাবক, চয়নেচ্ছা-ধারী, চয়নেচ্ছু-ভ্রামক প্রভৃতি সত্তাগুলি সবই চ-পদবাচ্য। এককথায় একে শুধুমাত্র বিশেষ্যরূপী 'ইচ্ছা'ও বলা যেতে পারে। দ্র. ক।

আপাতত শব্দার্থ নিষ্কাশনের কাজ চালানোর জন্য আমরা খুব নমনীয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি এভাবে — *চ = চ্-অন্ (on) করে যে = চায়ী = ইচ্ছাকারী (= ইচ্ছা); চ-এর আধার যে = চা; চ গতিশীল যাহাতে = চি; চি-এর আধার যে = চী; চ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে = চু; চু-এর আধার যে = চূ; চ আবর্ত্তিত যাহাতে = চৃ (চর্); ... ইত্যাদি। দ্র.* ক।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার। চ-বর্গের থেকে যেসকল শব্দ-পরিবারের ও সেই পরিবারের সদস্যদের জন্ম হয়েছে, তাদের অধিকাংশ শব্দই বাংলাভাষার স্বর্ণযুগের অর্থাৎ মধ্যযুগের নিজস্ব সৃষ্টি। এগুলিকে আধুনিক বাংলাভাষা ও অ্যাকাডেমি গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেনি। অথচ গ্রামবাংলায় ও সাধারণ বাংলাভাষীদের মধ্যে শব্দগুলি ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। প্রচলিত ভাষাকে সংস্কার করে যখন সংস্কৃত ভাষা সৃজন করা হয়, তখনকার প্রচলিত ভাষায় ঘ, চ, ছ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, থ, ফ বর্গের খুব বেশি শব্দের জন্মই হয়নি। ফলে এই বর্গগুলির অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। সেগুলির জন্ম হয়েছে মধ্যযুগে। মধ্যযুগের সাহিত্যে এই বর্গগুলি থেকে জাত শব্দের বিপুল ব্যবহার দেখা যায়।

চ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : *চক্ (চকাস্, চক্ষ্), চট্, চণ্ (চণ্ড), চত্, চন্দ্, চপ্, চম্, চর্ (চারি), চল্, চি (চিৎ), চিত্ত্ (চিহ্ন্), চুম্ব্, চুর্ (চূর্ণ্), চুষ্, চেষ্ট্, চ্যু (চ্যুত্, শ্চুৎ), চ্ = ১৬ + ১*

চক্ (চকাস্, চক্ষ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অচক্র, অচক্ষু, অচক্ষুঃ, অচক্ষুর্বিষয়, অবিচক্ষণ, অচাক, অচাকনির্ম্মাণ, চউক(খ), চক্, চক, চকখড়ি, চকচক, চকরচকর, চকদার, চকবন্দী, চকমক, চকমকি, চকমকে, চকমিলান, চকা, চকাচকি, চকার, চকার-বকার, চকাস্, চকিত, চকুয়া, চকেবা, চকো, চকোআ, চকোর, চকোরিণী, চকোরী, চক্ক(ক্কো)র, চক্খু, চক্র, চক্রক, চক্রগতি, চক্রগ্রহণী, চক্রজীবক, চক্রজীবী, চক্রতীর্থ, চক্রদহ (চাকদা), চক্রধর, চক্রধারা, চক্রনেমি, চক্রনায়ক, চক্রপাণি, চক্রপাল, চক্রবন্ধু, চক্রবক্র, চক্রবর্ত্তী, চক্রবাক, চক্রবাড়, চক্রবাত, চক্রবান, চক্রবান্ধব, চক্রবাল, চক্রবিভেদিনী, চক্রবৃদ্ধি, চক্রব্যূহ, চক্রমর্দ্দ, চক্রযান, চক্রাঙ্গ, চক্রান্ত, চক্রাবর্ত্ত, চক্রাবলী, চক্রায়ুধ, চক্রাশ্ম, চক্রাহ্ব, চক্রাহ্বয়, চক্রিক, চক্রিকা, চক্রী, চক্রীবান, চক্রু, চক্রেশ, চক্রেশ্বর, চক্ষ্, চক্ষণ, চক্ষু, চক্ষুঃ, চক্ষুদান, চক্ষুর্দান, চক্ষুর্বিষয়, চক্ষুলজ্জা, চক্ষুষ্মতা, চক্ষুষ্য, চক্ষুস্বান, চক্ষ্রোগ, চখা, চখু, চরকা, চরখা, চশমখোর (চক্ষমখোর), চশমা (চক্ষমা), চাঁদনী-চক, চাক, চাকচক্য, চাকচিক্য, চাকনচিকণ, চাকতি, চাক(কু)ন্দা, চাকভাঁউরি(রী), চাকভাওরি(রী), চাকলা, চাকা, চাকি(কী), চাক্খুসে, চাক্র, চাক্রিক, চাক্ষুষ, চাক্ষুষিক, চাখ, চাখড়ি, চিক, চিকচিক, চিকন, চি(চে)কনাই, চিকনিয়া চিকমিক, চিকা, চিকি, চিকিচিকি, চিকিৎস, চিকিৎসক, চিকিৎসা, চিকিমিকি, চিকীর্ষক, চিকুর, চিক্ক, চিক্কণ, চিক্কণাই, চিক্কির, চুক, চুকচুক, চুকচুকে, চুকতি, চুকলি (চুগলি), চুকা, চুকান, চুকুচুকুচুকু, চুক্র, চুঙি, চুঙ্গি, চুঙ্গী, চুচু(চূ)ক, চূচুক, চুক্তি, চের, চের-বের (চক্রাকারে আবর্ত্তিত হওয়া, বুনি পাখি চের-বের, বগলা হাগে ন্যাড়), চৈক্কণ্য, চোক, চোকড়া, চোকলা, চোকা, চোক্ষ, চোখ, চোখান, চোখো, চোঙ, চোঙক, চোঙা, চোঙ্গ, চোঙ্গদার, চোঙ্গা, চৌকী, চৌকীয়া, চৌক্ষ, বিচক্ষণ, সচকিত।

চক্ (চকাস্, চক্ষ্) = চায়ীর (ইচ্ছাকারীর) করণ। **চক** = চায়ীর করণ থাকে যাহাতে। **চকাস** = চকের আধার নিঃশেষিত যাহাতে। **চক্ষ্** = চায়ীর ক্ষ (খাবলানো) যাহাতে।

চক : ২. *চায়ীর (ইচ্ছাকারীর) করণ থাকে যাহাতে।* ৫. শব্দটির এই অর্থ যথার্থ হলেও বুঝতে একটু অসুবিধা হয়। কিন্তু এর সঙ্গে 'চক্‌মা দেওয়া', পাঞ্জাবি ভাষার শব্দ 'চক্ দে' (আঘাত কর, হারিয়ে দাও) এবং ইংরেজির 'চেক' (check) বা 'ঠেকাও' শব্দগুলি মেলাতে গেলে দেখা যায়, এদের মধ্যে অর্থের একধরনের সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্ক বুঝতে হলে প্রশ্ন তুলতে হয় — 'চায়ীর করণ' বা 'চয়ন' ক্রিয়াটিকে দেখা হচ্ছে কোন বিন্দু থেকে — ইচ্ছাকারীর দিক থেকে (= ক-বিন্দু থেকে) নাকি চয়নক্ষেত্রের দিক থেকে (= খ-বিন্দু থেকে)। ইচ্ছাকারীর 'চক্' চয়নক্ষেত্রের দৃষ্টিতে হয়ে যায় 'চক্‌মা' বা বিস্ময়; হয়ে যায় 'চেক (check)' বা ঠেকাও; হয়ে যায় 'চক্ দে' বা পাল্টা আঘাত কর, কেড়ে নিয়ে যেতে দিয়ো না, হারিয়ে দাও। তার মানে 'চক' শব্দের প্রকৃত অর্থ হল 'চায়ী-কারী' বা 'চয়নক্রিয়া থাকে যাহাতে'; কিন্তু তার কার্য্যকরী অর্থ নির্ধারিত হয় প্রেক্ষিত থেকে। ৬. ইংরেজি check, chuck (= আঘাত করা, বাতিল করা), shock।

চকচক : ২. *(আমাকে) চয়ন কর, চয়ন কর বলে যে।* ৩. দীপ্তি প্রকাশের ভাব, দীপ্ত, উজ্জ্বল। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. চকচক কথাটি 'চায়ী-কারী থাকে যাহাতে, তাহার দ্বিত্ব'; এভাবেই রয়েছে। কিন্তু তার অর্থ স্পষ্ট হয় না। চকচকে বস্তুর মধ্যে যে সত্তা থাকে, আপন দীপ্তিপ্রকাশের দ্বারা সে চয়নকারীকে ডাকে। তার এই ডাকের ভিতরেই চয়নকারীর প্রকৃত অস্তিত্ব। (মনীষীরা বলেন, বিজয়ীর বিজয়গৌরবের মূলে থাকে পরাজিতের দুর্বলতা।) সেই কারণে, উপরোক্ত (২) ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটিকে একধাপ এগিয়ে আনা হয়েছে। ৬. ইংরেজি chick (= ঝকঝকে তরুণী, মন কাড়ে এমন মানবশিশু, পক্ষীশাবক ইত্যাদি)।

চকমক, চকমকি : ২. *(আমাকে) চয়ন কর, সীমায়িত কর — বলে যে; (আমাকে) চয়ন ক'রে সীমায়িত ক'রে গতিশীল কর — বলে যে।* (দ্র. **চকচক**)। / **চকমকি** = যে পাথর হইতে আঘাতে অগ্নি বাহির হয়। (ব.শ.)। ৩. অগ্নিপ্রস্তর, দীপ্তিপ্রকাশ, প্রভাবিস্তার। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৬. তুর্কি ভাষায় - চক্-মাক্, এবং ফারসি ভাষায় - চক্‌মাক্ শব্দটি একই অর্থে প্রচলিত। (ব.শ.)।

চকিত : ১. ✓চক্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চায়ীর*

করণ গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে। ৩. সন্ত্রাস্ত, বিস্মিত, কর্তব্যবিমূঢ়, ভীত, চঞ্চল, নায়িকার যৌবনে স্বভাবজ সাত্ত্বিক অলঙ্কারবিশেষ, প্রকাশ, স্ফুরণ, বিদ্যুৎস্ফুরণপরিমিতকাল, তৎক্ষণাৎ, তখনিই, একটু, কটাক্ষক্ষেপে। (ব.শ.)। ৪. startled অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **চক**।

চকোর (চকোরিণী, চকোরী) : ১. ✓চক্ + ওর (ওরন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে চয়নকারী ওর (ওপারের সমসত্তার) সঙ্গে সম্বন্ধিত থাকে। /* চন্দ্রকর পানে তৃপ্ত হয় যে। (ব.শ.)। ৩. পক্ষিবিশেষ, চক্রবাক। চকোর-স্ত্রীজাতি, চক্রবাকী। (কবিসিদ্ধান্তে ইহা প্রসিদ্ধ যে, চকোব চন্দ্রকর পান করে এবং চন্দ্রদর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কাব্যে চন্দ্রচকোরের রূপক প্রসিদ্ধ।)। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠত্বের একটি অন্যতম প্রমাণ এই 'চকোর' শব্দটি। বলা হয় এটি নাকি সংস্কৃত 'চক্রবাক' শব্দের বাংলা রূপ। কিন্তু এর নিজস্ব ব্যুৎপত্তি বলে দেয়, সে স্বাধীনও বটে। চক্রবাকের সঙ্গে চাঁদের কোনো সম্পর্ক সংস্কৃতসাহিত্যে দেখতে পায়নি, বাংলার বৈষ্ণবসাহিত্যে চকোরের সঙ্গে চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনটি স্তরে শব্দটির সত্য প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত বাহ্যস্তর — চকোর পাখি = চক্রবাক পাখি, চকা পাখি, শুক পাখি, love bird। বিপরীতে আকাশের চাঁদ বা moon। এদের সম্বন্ধ — চন্দ্র জ্যোৎস্না বা চন্দ্রকর পান করায়, চকোর তা পান করে। দ্বিতীয়ত সামাজিক স্তর — ক্ষুদ্র পণ্যউৎপাদক। বিপরীতে পণ্যপুঁজির ধারাপ্রবাহের ব্যবস্থা। এদের সম্বন্ধ, পণ্যপুঁজি পুঁজির কিরণ উৎপন্নের দাম রূপে পান করায়, ক্ষুদ্র পণ্যউৎপাদক তা পান করে তার উৎপাদিত **পাপের** (পণ্যসম্ভারের) হাত থেকে মুক্তি পায়। তৃতীয়ত আধ্যাত্মিক স্তর — মননশীল মানুষ। বিপরীতে বিশ্বব্যবস্থার কারিকা মূল নিয়মাবলী স্বরূপ কল্যাণী লক্ষ্মীরূপা পরমাপ্রকৃতি স্বয়ং। পরমাপ্রকৃতি জ্ঞানের জ্যোৎস্না পান করান, মননশীল মানুষ তা পান করে। এই পানেই তার মহানন্দ, চরম তৃপ্তি, মোক্ষলাভ। দ্র. **কোক, কোকনদ, কোকিল**।

চক্র (চক, চকমিলান, চক্কর, চাঁদনী-চক, চৌকী) : ১. ✓কৃ + অ (ঘঞর্থে) - করণবাচ্যে, নিপাতিত; ✓চক্ + র - কর্তৃবাচ্যে, সংজ্ঞার্থে। (ব.শ.)। ২. *ইচ্ছাকারীর (চায়ীর) ক্র সম্পূর্ণ হয় যাহাতে; অথবা, ইচ্ছামূলক ক্র রহে যাহাতে। (দ্র. ক্রন্দ)*। ৩. **চক্র** = রথাঙ্গ, চাকা, কুমোরের চাক, চক্রাকার আয়ুধবিশেষ, সুদর্শন চক্র, হস্তস্থিত চক্রাকার রেখা, জলাবর্ত্ত, জলভ্রমি, বৃত্তাকার ব্যূহবিশেষ, আবর্ত্ত, ঘূর্ণি, চক্রাকার বস্তুমাত্র, মণ্ডল, দিগ্‌বলয়, ঘানি, নদীর বক্রগতি, পক্ষীর চক্রাকার উড্ডয়ন, রাশিচক্র, মূলাধারাদি ষটপদ্ম, বর্ষাপর্য্যায়, বর্ষক্রম, কূটমন্ত্রণা, কূটবুদ্ধি, কপটকৌশল, সৈন্য, সীমা, বিভাগ, গণ, সমূহ, নিকর, রাষ্ট্র, রাজ্য, আজ্ঞা, রাজাদেশ, রাজপরিষদ্‌মণ্ডল, গ্রামজাল, চাকলা, কার্য্যকারণভাবে পরিবর্ত্তমান বিষয়পর্য্যায়, পরস্পরাশ্রিত সম্বন্ধ, শালগ্রামস্থিত বৃত্তাকার চিহ্ন, দণ্ডবিশেষ, তগরপুষ্প, সর্পফণা, মদ্যপায়ীর বা যোগিনীর মণ্ডল। **চক্রগতি** = আবর্তন। **চক্রগ্রহণী** = সৈন্যনিগ্রাহিকা, মোর্চা। **চক্রজীবক, চক্রজীবী** = কুমোর। **চক্রদহ** = চাকদহ, চাকদা। **চক্রধারা, চক্রনেমি** = প্রান্ত, প্রধি (পরিধি)। **চক্রনায়ক** = সৈন্যাধ্যক্ষ। চক্রপাণি, চক্রভৃৎ, চক্রহস্ত = সুদর্শনধর বিষ্ণু। **চক্রপাল** = সেনাপতি, প্রদেশাধ্যক্ষ। **চক্রবাত** = ঘূর্ণিবায়ু। **চক্রব্যূহ** = চক্রাকার ব্যূহবিশেষ। **চক্রমর্দ, চক্রমর্দ্দক** = চাকন্দা গাছ। **চক্রযান** = রথ, শকট। **চক্র দেওয়া** = বেড় দেওয়া। (ব.শ.)। ৪. **বহু অর্থে** প্রচলিত। ৫. ক-বিন্দুতে রয়েছে একটি সত্তা, যার অভাব আছে, অভাবপূরণের ইচ্ছা আছে। খ-বিন্দুতে রয়েছে তার অভাবপূরণের বস্তু বা বিষয়। কিন্তু এই খ-বিন্দুটি রয়েছে ক-বিন্দুর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বের সর্বদিকের সমবিন্দুতে। তার মানে ক-বিন্দুটি যদি কেন্দ্র হয়, তবে তাকে ঘিরে থাকা বৃত্তের পরিধির প্রতিটি বিন্দুই খ-বিন্দু। ক-বিন্দুতে বসে বা কেন্দ্রে বসে ইচ্ছাকারী তার অভাবপূরণের জন্য তাকে ঘিরে থাকা বৃত্তের পরিধির খ-বিন্দুগুলি পর্যন্ত হাত বাড়ায়, একের পর এক প্রতিটি বিন্দুকে ছোঁয়ার চেষ্টা করে। তাতেই গড়ে ওঠে চক্রটি। চয়নের জন্য কেন্দ্রস্থিত সত্তা পরিধির এক বিন্দু থেকে পরবর্তী বিন্দু পর্যন্ত যাওয়ার এই যে চেষ্টা করে, সেটিই ইচ্ছাকারীর বা চ-এর (চায়ীর) ক্র (crawling)। (যেনবা ক-বিন্দু থেকে রেখাটি খ-বিন্দুতে পৌঁছে একটুখানি নীচের দিকে বেঁকে যায়, বঁড়শির কাঁটার মতো।) এই ক্র-গুলির যোগফলে গড়ে ওঠে **চক্র**টি। একটি মানুষ নিজে স্থির থেকে তার দুই হাত প্রসারিত করে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চালনা করলে যে বৃত্তের সৃষ্টি হয়, এ হল সেই; একেই **চক্র** বলে। মানুষের হাতদুটি সরলরেখায় সক্রিয় হলে সেটিই বৃত্তটির ব্যাসের কাজ করে। তাতেই চক্রটি সচল দেখা যায়। মানুষটিকে যদি রাজা ভাবা হয়, তাহলে তার সৈন্যবাহিনী, পুলিশ-প্রশাসন ইত্যাদি তার ঐ হাত। রাজচক্রবর্তী তাঁর এই হাতের সাহায্যে তাঁর রাজত্বের এলাকা বা **চক্র** শাসন করে থাকেন। বড় চাষী যে-পর্যন্ত হাত বাড়াতে পারেন, চাষাবাদ করতে পারেন, সেই পর্যন্ত তাঁর চাকলা। অনেক বড় চাকলার শাসনকর্তার নাম তাই **চাকলাদার**। চক্রের এইসব ধারণা অতঃপর ব্যাপক ভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং নানারকমের বিষয় ও বস্তুকে শনাক্ত করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। উপরোক্ত মানুষটিকে একটি সাপ ভাবলে, তার মুখছিদ্রের দুই দিকে যে বৃত্ত গড়ে ওঠে, তাকেও **চক্র** (কুলোপানা **চক্কর**) বলা হয়েছে। আবার, পুলিশের চৌকী বা চারকোণা চৌকিও যেমন চক্র, তেমনি **চাঁদনী**-চকও চক্র। সে হল কেনাকাটার বা চাঁদনীর চক্রাকার এলাকা। উপরে (৩) প্রদত্ত প্রতীকী অর্থগুলিতে সেই ব্যাপক ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। ৬. ফারসি - চরখ্, আবেস্তা - chakra। (ব.শ.)। ইংরেজি *craw*ling, circle। ল্যাটিন circus (কিরকুস্), গ্রীক kirkos ব্যবহার হত চক্রাকার এলাকা বোঝাতে। তবে ঐসব ভাষায় 'ক্র' উপাদানটি থাকে শব্দের প্রথমাংশে, এবং শব্দের দ্বিতীয়াংশে থাকে **ক**, যা হল চ-এর পূর্বসূরী।

চক্রবর্তী : ১. চক্র + ✓বৃৎ + ইন্ (ণিনি)। ২. *চক্রে বর্তমান (আবর্তমান, ঘূর্ণমান) থাকেন যিনি। /* যিনি চক্রে (দ্বাদশ রাজসমূহে) প্রভুভাবে অবস্থান করেন। (ব.শ.)। ৩. সার্বভৌম, সমুদ্র পর্যন্ত ক্ষিতির অধীশ্বর, অধিরাজ, প্রধান, শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের সম্মানসূচক উপাধিবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. শুধুমাত্র **পদবী** রূপে প্রচলিত। ৫. বৃত্তের ব্যাস কী নিয়মে গোটা বৃত্তকে নিয়ন্ত্রিত করে, সেকথা জানার জন্য জ্যামিতি বিশারদ বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার প্রয়োজন নেই; ব্যাসকে

বনবন করে ঘোরালেই কমবেশি বোঝা যাবে। ঘোল মন্থন করে মাখন তোলার মন্থনদণ্ডটির দিকে তাকালেও বোঝা যায়।

চক্রে বর্ত্তমান থাকেন যিনি, তাকে বলে চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী শব্দের মূল অর্থ এই। তবে তিনি জড়ের মতো বিদ্যমান থাকেন না, ঘোরেন, ব্যাসের মতো তাঁর বৃত্তে আবর্ত্তিত হতে থাকেন (দ্র. **চক্র**), জ্ঞান ও কর্মের মাখন উঠে আসে তাঁর হাতে। তাঁর এই *বর্ত্তমান* থাকা বা আবর্ত্তিত হতে থাকাকে তাই ব.শ. বলেছেন 'প্রভুভাবে অবস্থান'।

কিন্তু **চক্র** তো একপ্রকার নয়। রথের চাকা বা কুমোরের চাক থেকে মদ্যপায়ীদের মধুচক্র বা মৌচাক কিংবা যোগিনীর মণ্ডল পর্যন্ত **চক্র** অজস্র রকমের। (দ্র. **চক্র**)। এক হিসেবে এইসকল চক্রের যে কোনো একটিতে যিনি *বর্ত্তমান* থাকেন, তিনিই চক্রবর্ত্তী; তা সে বাহ্যিক চক্র আর মানসিক চক্র যাই-ই হোক। কিন্তু বাস্তবে সব চক্রের ভিতরে আবর্ত্তনকারীকে চক্রবর্ত্তী বলার প্রচলন নেই। প্রাচীনকালে কোনো সময় সেকালের পণ্ডিতেরা বসে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, অন্তত দুটি চক্রের অধিকারীকে চক্রবর্ত্তী বলা হবে। এক) বারোটি ছোট ছোট রাজার এলাকার যোগফলে যে বিশাল ভৌগোলিক এলাকা বা চক্র হয়, সেই চক্রে যে সত্তা *বর্ত্তমান*, তাকে (অর্থাৎ সেই চক্রের অধীশ্বরকে) বলা হবে 'চক্রবর্ত্তী'; কথাটি 'রাজচক্রবর্ত্তী' রূপে প্রচলিত হয়ে যায়। দুই) মনোলোকের বিশাল অজানা এলাকার কেন্দ্রে রয়েছে মানুষের অর্জ্জিত মোট জ্ঞানের এক চক্রাকার এলাকা; যে এলাকার ক্রমবিস্তার ঘটে চলেছে উদ্ভাবক ও আবিষ্কারকদের চেষ্টায়। যিনি অর্জিত জ্ঞানের এই চক্রে *বর্ত্তমান* থাকেন, তাকেও বলা হবে চক্রবর্ত্তী। যেহেতু সেকালের ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূতগণের কেউ কেউ মানবসভ্যতার তৎকাল-পর্যন্ত অর্জিত সমস্ত জ্ঞান বা বেদ ধারণ করতেন, তাঁদের নাম দেওয়া হল 'চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ'। পদ, উপাধি, বৃত্তি থেকে যে নিয়মে **পদবী** হয়েছে, সেই নিয়মে পরবর্তীকালে সেই 'চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ'-এর উত্তরসূরীগণ পৈতৃক 'চক্রবর্ত্তী' উপাধিকে পদবী রূপে গ্রহণ করে নেন। তারপর সেই প্রক্রিয়ার বিবর্ত্তন ঘটেছে নানাভাবে।

চক্ষু (চক্ষুঃ, চক্ষুস্) : ১. ✓চক্ষ্ + উস্ (উসি) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **চক্ষু** = *যাহার দ্বারা ইচ্ছাকারীর করণ নবরূপে উত্তীর্ণ হয়; অথবা, (সর্বাগ্রে) চক্ষণ করে (চাখে) যে।* / যাহার দ্বারা দর্শন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. নয়ন, চোখ, জ্ঞানমাত্র সাধন, দৃষ্টিশক্তি, তেজঃ। (ব.শ.)। ৪. eye অর্থে প্রচলিত। ৫. *দ্র.* **অক্ষি**। আমাদের প্রত্যেকের ইচ্ছা চোখের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর কাছে সর্বাগ্রে পৌঁছায়, বস্তুটিকে চেখে দেখে, চেখে কেমন লাগল সে সংবাদ নিয়ে আসে মাথার কাছে। চোখের সেই মাথা সেই চক্ষণফল বিচার করে দেখে, তারপর করণীয় স্থির করে। এই সব কারণে তাকে চোখ বা চক্ষু বলে। কিন্তু যেক্ষেত্রে চোখের চেখে দেখে নেওয়ার পরও চক্ষুধারীর কোনোরকম প্রতিক্রিয়া ঘটে না, তেমন চক্ষুধারীকে সেকারণেই বলা হয়, 'চোখের মাথা খেয়েছ!' 'চোখ খেয়েছ!' চক্ষু বা চোখ শব্দের অর্থের আরও বিস্তার ঘটেছে — চোখ-ঠারা, চোখ চাপা, চক্ষু স্থির হওয়া ... ইত্যাদি নানা অর্থে। এবং সবক্ষেত্রেই শব্দটির মূল ক্রিয়াভিত্তিক শব্দের সঙ্গে সেই অর্থগুলি কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত। মনে হতে পারে, চোখের এই যে কর্মকুশলতা, সাধারণ বাংলাভাষী কি তা জানতেন বা বুঝতেন? আমরা বলি, এটা জানা-বোঝার ব্যাপার নয়, অনায়াস উপলব্ধি। মানুষ প্রকৃতি থেকে এবং আপন সম্প্রদায়ের ভাষা-সংস্কৃতি থেকে এই যোগ্যতা অনায়াসে অর্জন করে এবং সেই যোগ্যতা মানুষের মনের গভীরে অন্তঃসলিলা থাকে। সেজন্যেই, এমনকি আধুনিক বাংলাভাষী নতুন যে শব্দটি বানিয়েছেন — 'চোখ মারা' — তারও সম্পর্ক রয়েছে উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের সঙ্গে। চক্ষুর মাধ্যমে ইচ্ছাকারীর ইচ্ছা ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দুর দিকে যায় এবং চেখে দেখে, এই ধারণা মনের গভীরে না থাকলে আধুনিক বাংলাভাষী কেমন করে 'ঢিল মারা'র মতো 'চোখ মারা' শব্দটি বানায়? তাছাড়া, অন্তঃসলিলা সেই ধারণা মনের গভীরে না থাকলে, বাংলাভাষী কি 'চোখের চামড়া' থাকা না-থাকার কথা কোনোদিন বলতে-বুঝতে পারত? *দ্র.* **চর্ম্ম**। ৬. অন্য ভাষাতেও চক্ষুর নানারকমের ক্রিয়া বা ভাব নিয়ে অনেক রকমের প্রয়োগ থাকারই কথা। ইংরেজিতে eye শব্দের বহু রকমের প্রয়োগ দেখা যায়। একটি উল্লেখ করা হচ্ছে — cut one's eye-teeth, মানে সেয়ানা হওয়া। কিন্তু ধ্বনিগত সাদৃশ্যের শব্দে ভাবগত নৈকট্য প্রায়ই পাওয়া যায় না। তবে চোখের নিচের অংশ বা কপোল বোঝায় যে cheek শব্দে, তার একটি মানে ঔদ্ধত্য, বা প্রত্যাঘাত করার মনোভাব।

চিক, চিকচিক, চিকন, চিকনাই (চেকনাই), চিকনি, চিকমিক, চিকি, চিকিমিকি, চিক্কণ : ২. *চিক* = *(আমাকে) দ্রুত চয়ন করো বলে যে।* **চিকচিক** = *বারংবার চিক করে যে।* **চিকন** = *চিক অন থাকে যাহাতে।* **চিকনাই** = *চিকনের আধার গতিশীল যাহাতে।* **চিকনি** = **চিকন** *গতিশীল যাহাতে।* **চিকমিক** = *দ্রুত চয়ন করো ও সীমায়ন করো বলে যে।* **চিকি** = **চিক** *গতিশীল যাহাতে।* **চিকিমিকি** = *গতিশীল চিক ও গতিশীল মিক যাহাতে।* **চিক্কণ** = *চিকচিকে কণ থাকে যাহাতে।* ৩. **চিক** = স্বর্ণের কণ্ঠভূষাবিশেষ, স্নিগ্ধ কিরণের চুম্বন, উজ্জ্বলরেখা, সরু বাঁশের শলার ঝাঁঝরা পর্দ্দা। **চিকচিক** = অল্পদীপ্তি প্রকাশ। **চিকন** = মনোহর, সুন্দর, সূক্ষ্ম, পাতলা, সূক্ষ্মাগ্র, হলন্ত, নিষ্পিষ্ট, সরু, মসৃণ, স্নিগ্ধ, চকচকে। **চিকনাই (চেকনাই)** = চিক্কণতা, মসৃণতা, চকচকে ভাব। **চিকনি** = সুছাঁদ, চিকণ-গাঁথা, সুগ্রথিত। **চিকমিক** = অল্পদীপ্তিবিশিষ্ট। **চিকি** = সিদ্ধ-করা একপ্রকার নরম সুপারি। **চিকিমিকি** = চিকমিক। **চিক্কণ** = মসৃণ, স্নিগ্ধ, তেলা, চকচকে, পিচ্ছিল, পিছল, চিকণ, পাতলা, চিক্কণদেহা উত্তমা গবী, পূগফল। (ব.শ.)। ৪. চকচকে বস্তুর রকমফের বোঝাতে প্রচলিত। ৫. *দ্র.* **ঝরঝর, ঝিরঝির**। চকচক ও চিকচিক শব্দের মধ্যে পার্থক্য একটি 'ই'-কারের। তাতে অর্থের সূক্ষ্ম বদল ঘটে যায়। এই পার্থক্য হল — যা চকচক করে, তা আমাদের জানায় তার বিশেষত্বের কথা। কিন্তু যা চিকচিক করে, তা কেবল তার বিশেষত্বের কথাই জানায় না, আরও বেশি কিছু জানায়। সেই বেশিটুকু হল — বস্তুটি তুলনায় সূক্ষ্ম, পাতলা, সরু, এবং গতিশীলও বটে। কথাটি **ঝলক** ও **ঝিলিকের** ক্ষেত্রেও অনুভূত হয়। তাছাড়া, সার্বিকভাবে এই চক, চিক, চিকচিক প্রভৃতি শব্দগুলি বস্তুটিকে

বাহ্যিকভাবে হাতে নিয়ে কিছুই করে না, যা কিছু করে সবই মনে মনে; যার সঙ্গে বস্তুটির কোনো বাস্তব সম্পর্ক নেই। ৬. ইংরেজি chick। (দ্র. **চকচক**)।

চিকিৎসক (চিকিৎসা, চিকিৎস্য) : ১. ✓কিৎ + সন্ স্বার্থে + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *কিৎ (গতিশীল কারীর তারণ যাহাতে) করিবার ইচ্ছা করে যে।* ৩. ব্যাধিপ্রতিকারক, ভিষক্, বৈদ্য, ডাক্তার। রোগপ্রতিকার, রোগাপনয়ন, ব্যাধিনির্ণয়, চিকিৎসা ব্যবসায়। প্রতিকার্য্য, প্রতিবিধেয়। (ব.শ.)। ৪. প্রথম শব্দ দুটি যথাক্রমে ডাক্তার ও রোগপ্রতিকার অর্থে প্রচলিত; কিন্তু 'চিকিৎস্য' অপ্রচলিত। ৫. কতকগুলি শব্দ বেশ অদ্ভুত নিয়মে তৈরি করা হয়। 'জ্ঞ-এর ইচ্ছা' = জানিবার ইচ্ছা = '**জিজ্ঞাসা**'। কিন্তু নিয়ম অনুসারে 'জ্ঞাসা' হওয়া উচিত ছিল। একই ভাবে পানের ইচ্ছা = 'পাসা' হতে পারত, হয়েছে **পিপাসা** (হিন্দিতে 'প্যাস' বা 'পিয়াস' হয়, যার মানে 'পিপাসা', আর পিপাসা মেটে যে পাত্রে তাকে ফারসিতে পিয়ালা বা পেয়ালা বলে)। একেবারে একই নিয়মে কৃ-র ইচ্ছা বা করিবার ইচ্ছা = চিকীর্ষা হয়। কিন্তু কিকীর্ষা না হয়ে হয়েছে চিকীর্ষা হয় কেন? দ্র. **জুগুপ্সা**। সেই নিয়মেই 'কিৎ-এর ইচ্ছা' হয়ে গেছে চিকিৎসা। হল কী করে? তাছাড়া 'কিৎ-এর ইচ্ছা' মানেই বা কী?

কিৎ শব্দের কিছু অর্থ বিস্তারিত করা হয়েছে **কেত, কেতু, কিতব, কৈতব** প্রভৃতি শব্দে। কিৎ-এর অর্থ বলা হয়েছে 'গতিশীল কারক তারিত যাহাতে', অর্থাৎ টপকে যাওয়া কিংবা কাউকে পেরিয়ে ছাপিয়ে যাওয়া। সেই কারণে এখনও 'কিৎ কিৎ' উচ্চারণ করে 'বউমারী' বা 'হাডুডু' খেলা হয়। এই 'কিৎ বহন করে যে', তাকে **কিতব** বলে। সেই কিতব কারা? ব.শ. জানিয়েছেন, তারা হল অক্ষদেবী, দ্যূতকার, জুয়ার, ধূর্ত, খল, বঞ্চক ইত্যাদি। আমরা জেনেছি, **অক্ষক্রীড়া** বা দ্যূতক্রীড়া শব্দের ভিতরে ক্রয়বিক্রয়াদিলক্ষণ ব্যবহার রয়েছে। তাতে একে অপরকে হারিয়ে দেওয়ার, টপকে যাওয়ার, বঞ্চিত করার বা ঠকানোর ব্যাপার স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। অতএব, কিৎ করিবার ইচ্ছা মানেই টপকে যাওয়ার বা ঠকানোর ইচ্ছা ভাবা যেতে পারে। এই হিসেবে 'চিকিৎসক' শব্দের মানে দাঁড়ায় 'যে টপকে যেতে চায়' কিংবা 'যে ঠকাতে চায়' অর্থাৎ 'প্রবঞ্চক'। কিন্তু সেই 'টপকানো' বা 'প্রবঞ্চনা' আদিতে করতে চাওয়া হয়েছিল রোগটিকে, রোগীকে নয়। কালে কালে রোগকে ছেড়ে রোগীকেই প্রবঞ্চনা করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। যে রোগনিরাময় করাকে সবচেয়ে মহান পেশা (most noble profession) বলা হত, তার এমন রূপান্তরে বিশ্বাস হতে চায় না। অথচ, কিৎ শব্দের ও ডাক্তারি পেশার ঐতিহাসিক বিচার আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তেই যেতে বাধ্য করে। শুনতে খারাপ লাগলেও দেখা যায়, কথাটি 'কিৎ' ও 'ডাক্তারি'র ঐতিহাসিক বিচার, দু দিক থেকেই ঠিক।

বলে রাখা দরকার, যে ডাক্তারগণ মানুষকে সুস্থ করা জীবনের ব্রত বলে মনে করেন, অন্ততপক্ষে সুস্থ করার জন্য চেষ্টা ও নিজের প্রাণরক্ষার জন্য জীবিকা — দুটোরই সমমর্যাদায় বিশ্বাস করেন, তাঁদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। একালের বিশ্বে চিকিৎসাব্যবস্থার অগ্রণী নেতানেত্রী ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গরাই সংখ্যায় বেশি এবং তাঁরা টাকা রোজগারকেই জীবনের মূল মন্ত্র মনে করেন, রোগনিরাময় বা তার চেষ্টা এবং তৎসংক্রান্ত আচার-আচরণ তাঁদের টাকা রোজগারের অজুহাত মাত্র। তাঁদের নেতৃত্বেই একালের চিকিৎসাব্যবস্থা এগিয়ে চলেছে। ফলে একালের সমগ্র চিকিৎসাব্যবস্থাই কলুষিত হয়ে গেছে। সমাজের কল্যাণী-পুঁজি আজ অবহেলিত এবং কলুষিত কুবের-পুঁজি উচ্চপ্রশংসিত। একালে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সমাজদেহের পুঁজজাত এই কলুষিত কুবের-পুঁজির প্রবেশ ঘটেছে, ঘটেছে খেলা-শিক্ষা-বিচার-চিকিৎসা এই চারটি সদ্‌বংশের ক্ষেত্রেও। বলতে কি, পুঁজির প্রবেশ এই চারটি সদ্‌বংশের একেবারে জাত মেরে দিয়েছে এবং তাদেরকেও বদজাত বা বজ্জাত করে দিয়েছে।

মানুষের রোগ প্রতিকার হয় দুভাবে — এক) রোগের উৎপত্তির কারণ নির্মূল করা এবং দুই) রোগকে টপকে যাওয়া অর্থাৎ রোগ যতখানি 'কার' ঘটিয়েছে তার চেয়ে বেশি প্রতিকার করা; রোগের বিধানের চেয়ে অধিক প্রতিবিধান করা। প্রথমটিকে নিরাময় বলে, দ্বিতীয়টিকে চিকিৎসা বলে। পাশ্চাত্যে প্রথমটি বিকাশলাভ করেছে হোমিওপ্যাথি রূপে, এবং দ্বিতীয়টি বিকশিত হয়েছে অ্যালোপ্যাথি রূপে। সেই কারণে চিকিৎসা শব্দের অর্থে নিরাময় বা নীরোগ করার কথা নেই, রয়েছে ব্যাধিপ্রতিকার, প্রতিবিধান ইত্যাদি, একালের ভাষায় যাকে বলে suppressive medicine দিয়ে রোগকে চেপে দেওয়া। অর্থাৎ চিকিৎসক রোগপ্রতিকার করে, রোগের প্রতিবিধান করে, কিন্তু রোগীকে নিরাময় করে না, নীরোগ করে না। ভারতে তা করতেন বা করার চেষ্টা করতেন বৈদ্যগণ, কবিরাজগণ; পাশ্চাত্যে সেই চেষ্টা করতেন হোমিওপ্যাথ ডাক্তারগণ। দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও প্রাচীনকালে এরকম রোগনিরাময়কারীগণ ছিলেন।

ডাক্তারির ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই — নেউল জানে, সাপে কামড়ালে কোন গাছের শিকড় খেতে হয়। আফ্রিকার অরণ্যের বনমানুষও বর্ষাকালে সকালবেলায় বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে একটি বিশেষ গাছের পাতা (খেতে তিতো হলেও) খেয়ে নেয়, যাতে বর্ষায় ভিজে সর্দিজ্বর না হয়। বিজ্ঞানীরা খোঁজখবর করে দেখেছেন, ওই গাছের পাতা অত্যন্ত উচ্চমানের 'অ্যান্টিবায়োটিক' এবং তার সেই গুণ সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে সকালবেলায়। অতএব প্রাচীন মানুষ যে তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক জ্ঞান থেকেই নিজেদের শারীরিক রোগ সারানোর সব বিদ্যাই কমবেশি জানত, সেকথা হলফ করে বলে দেওয়া যায়। — বেদ বিভাজন বা জ্ঞান বিভাজনের পরে, একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি প্রচলিত হয়ে গেলে, লোকে চাষী জেলে কাঠুরে হয়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তি করতে লাগাল। ফলত, একই লোক প্রতিদিন ভেষজ সংগ্রহে যেতে লাগল এবং তা নিয়ে এসে সম্প্রদায়ের অন্য সদস্যদের রোগাদি নিরাময় করতে লাগল। ফলে ভেষজ জ্ঞান বা বেদ হয়ে গেল একজনের হাতে কেন্দ্রীভূত। তার উত্তরসূরীরা ক্রমে হয়ে গেল বৈদ্য বা বদ্যি। একটা যুগ পর্যন্ত এই বদ্যিরা ছিলেন আত্মনিবেদিত। সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষকে সুস্থ-সবল রাখাই তাঁদের জীবনের মূল মন্ত্র বলে তাঁরা মনে করতেন। বেঁচে থাকার একটাই মানে ছিল সেই বদ্যিদের — সম্প্রদায়ের সরাইকে সুস্থ রাখার জন্য আজীবন আপ্রাণ পরিশ্রম করে যাওয়া। বিপরীতে সমগ্র সম্প্রদায় ও শাসকগণ এই বদ্যিদের সংসার চালানোর

খরচ যোগাতেন, যথার্থ সম্মান সহকারে। কিন্তু 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি'র যান্ত্রিকতার সাধারণ নিয়মে, এই ব্যবস্থা ক্রমে ভেঙে পড়তে লাগল। আপন কর্মের প্রতি বৈদ্যের নিষ্ঠার যেমন অভাব ঘটতে লাগল, বৈদ্যের প্রতি সমাজের নিষ্ঠারও অভাব ঘটতে লাগল।

অতঃপর সমাজে পণ্যজীবিতার সূত্রপাত হলে, বৈদ্য বা ডাক্তারের প্রথম কাজ হয়ে গেল সত্যগোপন; অন্যথায় প্রাণ বাঁচে না। সৎ নিষ্ঠাবান বদ্যিকে না খেয়ে কালাতিপাত করতে অনেকেই দেখে থাকবেন। স্বভাবতই তার সংগৃহীত গাছের পাতা বা শেকড়কে এমন গুলিতে বদলে ফেলার প্রয়োজন হল, অন্য কেউ যাতে তা চিনতে না পারে। সমাজের মান্য কবিরাজ সত্যগোপন করে গোপনকারী গুপ্ত হয়ে গেলেন; ভারতসমাজে '**গুপ্ত**'-এর আবির্ভাব ঘটে গেল। **দাশগুপ্ত, সেনগুপ্ত, দত্তগুপ্ত, করগুপ্ত** রূপে তাঁর জ্ঞাতিরা ছড়িয়ে পড়লেন। এর পর এল প্রতিবিধানলিপি। প্রেসক্রিপসন যেন নিজের কম্পাউন্ডার ছাড়া আর কেউ বুঝতে না পারে। ক্রমে এই সত্যগোপন বর্তমান সময় পর্যন্ত এসে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। আজকের দিনে যারা বিশাল বিশাল হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের ব্যবসা করেন, দেখা যায়, কার্য্যক্ষেত্রে তারা সবচেয়ে বড় সত্যগোপনকারী এবং প্রকৃত বিচারে এঁরাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে নিষ্ঠুর প্রবঞ্চক ও মানবসভ্যতার সবচেয়ে বড় শত্রু, নির্মম খুনী। এদের তুলনায় জর্জ বুশ বা লাদেন অনেক কম নিষ্ঠুর। তারা মারব বলেই মানুষকে মারে। এরা বাঁচাব ব'লে মানুষকে আশ্বাস দিয়ে মেরে ফেলে, চরম ঠকায়। তার আগে চিকিৎসার নামে নানা অত্যাচার করে, নাকে-মুখে নল গুঁজে দিয়ে বারংবার সূঁচ ফুটিয়ে নরকযন্ত্রণা দেয়। তাকে এরা বলে 'সেবা' এবং সেই সেবার জন্য অত্যন্ত উচ্চহারে দাম নেয়। সকল আগন্তুক নিরাময়কাঙ্ক্ষী রোগীর কাছেই এরা তাদের সেই অত্যাচার চালানোর জন্য আগেভাগেই প্রচুর পরিমাণ টাকা নিয়ে থাকে। মানুষের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি হয়েছে, তাকে এরা অত্যন্ত কলুষিত করে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। মানুষের রোগ এদের কাছে সবচেয়ে আনন্দের কথা। 'চিকিৎসক' শব্দের মানেই যে 'প্রবঞ্চক', সেকথাটিকে এই চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ সত্যে পরিণত করেছেন। দ্র. **জিজ্ঞাসা**। **৬.** ইংরেজিতে চিকিৎসক বোঝাতে অনেক সময় leech (= রক্তচোষা জোঁক) ব্যবহার হত।

চিকুর : ১. চি (অব্যক্তশব্দ) + √কুর (উচ্চারণ) + অ (কর্ত্তৃ) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গতিশীল চয়নকারী নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে রহে যাহাতে। /* যে দোষনিশ্চয় না করিয়া বধবন্ধনাদি করে। (ব.শ.)। **৩.** চপল, অবিনিশ্চিতকারী, **কেশ, সরীসৃপ**, সর্প, পর্ব্বত, পক্ষিবিশেষ, গন্ধমূষক, ছুঁচা, চিকা। (ব.শ.)। ঐরাবত নাগবংশীয় আর্যকের পুত্র চিকুর। চিকুর বিনতাপুত্র গরুড় কর্তৃক নিহত হন। চিকুরের পুত্র সুমুখ। তিনি মাতলির কন্যা গুণকেশীকে বিবাহ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. মেয়েদের **লম্বা চুল** অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। **৫.** কী করে চিকুর শব্দটি একই সঙ্গে চপল থেকে ছুচো পর্যন্ত (দ্র. ৩) একেবারে আলাদা স্বভাবের সত্তাগুলিকে বোঝায়, সেকথা চট করে বোধগম্য হতে চায় না। কিন্তু 'চিক নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে' কোন কোন সত্তায় থাকে তার খোঁজ করতে গেলেই বিষয়টি ক্রমান্বয়ে বোধগম্য হতে থাকে। কেউ যদি অনেক উঁচু থেকে এই পৃথিবীকে দেখে, তার চোখে যা চিকচিক করে ধরা দেবে তা হল কোনো কোনো সত্তার চপলতা। এই সত্তাকে আপনি 'অবিনিশ্চয়কারী'ও বলতে পারেন। এমনকি তার নিয়মহীন মারামারি বধবন্ধনাদিও দূরের দ্রষ্টার চোখে চিকচিকানি রূপে ধরা পড়তে পারে। আর এই সমস্ত ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি — চিক নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে রয়েছে। একই চিকচিকানি রয়েছে মানুষের **কেশে**ও, তবে তা অনেক বেশি স্পষ্ট তার সম্পদের মালিকানায়। অন্যদিকে জীবজগতের সরে সরে যাওয়া অর্থে যে সর্প, তার গায়ে যেমন চিকচিকে ভাব রয়েছে, তেমনি মানবসমাজে সম্পদবান ব্যক্তিমালিকের অস্তিত্বেও রয়েছে। আজও গ্রামবাংলায় ধনীকে বোঝাতে 'তেল চকচকে' এবং দরিদ্র মানুষ বোঝাতে 'খড়ি ফোটা গা' শব্দবন্ধ দুটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চকচকে পর্ব্বত বা চপল পক্ষিবিশেষ থাকলেও থাকতে পারে, আমরা জানি না। কিন্তু ছুঁচোকে চিকুর বলে একেবারে ভিন্ন কারণে। তার গায়ে বা স্বভাবে চিকচিকে কিছুই নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে চিকুর বা চিকা বলে এই কারণে যে, তার মধ্যে চিক চিক রয়েছে ডাক রূপে, শব্দ রূপে। ছুঁচো 'চিক চিক' শব্দ করে ছটফট করে ঘুরতে থাকে। তাই সেও চিকুর।

চুক (চুকচুক, চুকান) : ২. **চুক** = *নবরূপে-উত্তীর্ণ-চয়ন কৃত যাহাতে।* **৩.** বিস্মৃতসংকেতা, ভ্রম, ভুল গলতী, ভুল করা, গলতী করা, ভোলা, কর্ত্তব্যভ্রষ্ট বা লক্ষ্যচ্যুত হওয়া, কাজ ভোলা, হতবুদ্ধি হওয়া; সমাপ্ত হওয়া, সম্পন্ন হওয়া, নিঃশেষ হওয়া, মিটিয়া যাওয়া (আপদ, গোলমাল, দেনা, বিবাদ, হাঙ্গামা, হিসাব), নিঃশেষ করা, শোধ করা, মিটান (আপদ, গোলমাল ইত্যাদি)। (ব.শ.)। ৪. নানার্থে প্রচলিত। **৫. চকচক, চিকচিক**, এই দুই শব্দের বেলায় আমরা দেখেছি, বস্তুটি ছিল খ-বিন্দুতে এবং সে নিজের বিশেষত্ব ঘোষণা করছিল; আর দ্রষ্টা দাঁড়িয়েছিল ক-বিন্দুতে। এখন আমরা দেখছি খ-বিন্দুটিতে স্থিত সত্তা নবরূপে উত্তীর্ণ হয়েছে; সে 'চয়ন করো চয়ন করো' না বলে নিজেই নিজের দিকে কোনো কিছুকে আকর্ষণ করে আপন অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে নিচ্ছে। এই ক্রিয়া **চক** ও **চিক**-এর বিপরীত ক্রিয়া। একেই বলে চুক। কিন্তু ক-এর তরফে এই চুক ক্রিয়ার মানে দাঁড়িয়ে যায় 'হাতছাড়া হওয়া', 'ভ্রমবশত ত্যাগ করা'। এটা ভুল নয়, তার চেয়ে বেশি। দ্র. **ভুলচুক**। কিন্তু এই 'হাতছাড়া করা'র কাজটি ক-এর তরফে যদি জেনেবুঝে করা হয়, তাহলে চুক শুধুমাত্র খ-এর চয়নমূলক আকর্ষণই থাকে না, ক-এর তরফে তা চুকিয়ে দেওয়া বা চুকানও বোঝায়।

বারংবার চুক ক্রিয়া চলতে থাকলে আমরা বলি চুকচুক। চুকচুক করে শিশু স্তন্যপান করে।

চুক্তি (চুক্তিপত্র) : ২. **চুক** *তারিত হয়ে গতিশীল থাকে যাহাতে।* **৩.** ব্যবস্থা, নিষ্পত্তি, মিটমাট, চোকা (settlement), প্রাপ্য অর্থাদির ব্যবস্থা বা স্থিরতা। (ব.শ.)। ৪. agreement অর্থে প্রচলিত। **৫.** উপরোক্ত **চুক** শব্দটির ব্যাখ্যায় আমরা দেখি, ব্যাপারটি স্বভাবতই

জটিল এবং তাতে দুটি সত্তা সবসময় পরস্পর বিরোধী অবস্থানে সক্রিয়। কিন্তু কখনো কখনো এমনও হতে পারে যে, কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে ক-বিন্দুর সত্তা ও খ-বিন্দুর সত্তা উভয়েই **চুক** করতে রাজি হয়ে গেল — একজন **চুকচুক** করে টানবে, গ্রহণ করবে, হয়তো-বা সবই টেনে নেবে না, গ্রহণ করবে না; অন্যজন আহা-আহা (**চুকচুক**) করবে, কিছুটা পরিমাণে **চুক** করতে দেবে, চুকিয়ে দেবে, কিছুটা পরিমাণ হয়তো দেবে না — তখন তাদের উভয়ের **চুক** তারিত হয়ে ক্রিয়াশীল থাকে যে ঐক্যমত্যের উপর ভিত্তি করে, সেই ঐকমত্যকে বলে **চুক্তি**। যে পত্রে সেই **চুক্তি** লেখা হয় তাকে বলে চুক্তিপত্র।

***চট্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অচট, আঁচড়, আঁচড়া, আঁচড়া-আঁচড়ি, আঁচড়-কামড়, আঁচড়ান, আঁচড়ান-কামড়ান, আচট, আচড়, আচোট, চওড়, চট্, চট, চটক, চটকা, চটচট, চটচটা, চটচাট, চটপট, চটপটে, চটা, চটাচট, চটাৎ, চটাপট, (চে)চটাল, চটি, চটিত, চটিতং, চটু, চটুল, চট্ট, চট্টরাজ, চট্টোপাধ্যায়, চড়, চড়ই, চড়(ড়্)ভাতি, চড়ক, চড়ক, চড়কা, চড়চড় (চচ্চড়), চড়চড়ি (চচ্চড়ি), চড়তী, চড়ন, চড়া, চড়াই, চড়াৎ, চড়ান, চড়্কে, চড়োয়া, চড়াউ, চাঁটি, চাট, চাটনী, চাটি, চাটিগাঁ, চাটিগ্রাম, চাটিমকলা, চাটিয়াল, চাটী, চাটু, চাটুকার, চাটুজ্জে, চাটুতি, চাট্যাতী, চাড়, চাড়া, চাড়ান, চাড়ি, চাড়ী, চুট্, চুট, চুটকি(কী), চুটা, চুড়ি, চুড়িদার, চুড়িপাড়, চুড়েল, চুড়, চুড়(ড়া)ন্ত, চূড়া, চূড়াকরণ, চূড়াকর্ম্ম, চূড়ামণি, চূড়ারত্ন, চূড়াল (চুড়েল, দ্র. চিয়াড়ী, চণ্), চেট, চেটক, চেটা, চেটাং, চেটাস, চেটিকা, চেটী, চেটো, চেটোনেটো, চেট্টেনেট্টে, চেড়, চেড়ক, চেড়িকা, চেড়ী, চোট, চোটখণ্ডী, চোটপাট, চোটা, চোট্টা, চোত্রা, চৌড়, চৌড়া, চৌড়াই, চ্যাটাংচ্যাটাং, চ্যাটাংচ্যাটাং-কথা, ছটকা।

চট্ = চারীর টঙ্কারণ। **চট** = চারীর টঙ্কার থাকে যাহাতে।

অচট, আচট, আচোট : ২. ***অচট*** = *নেই* ***চট*** *যাহাতে;* ***আচট*** = *যাকে* ***চটান*** *হয়নি;* ***আচোট*** = *যাতে* ***চোট*** *লাগেনি।* ৩. যে জমিতে লাঙলের চোট লাগে নাই, অকৃষ্ট, আচষা, পতিত। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। **৫. দ্র. চট**।

আঁচড়, আঁচড়-কামড় (আঁচড়া, আঁচড়া-আঁচড়ি, আঁচড়ান, আঁচড়ান-কামড়ান) : ২. ***আঁচড়*** = *চড়-এর রহস্যময় আশ্রয় যাহাতে;* ***আঁচড়-কামড়*** = *আঁচড় ও কামড় (কামের আবর্তন যাহাতে)।* ৩. **আঁচড়** = নখঘাত জন্য ভেদ, নখ দ্বারা বিদারণ, নখাদির দাগ। ... দন্তাঘাত, দংশন, হুলফুটান, দংশন দ্বারা ছিন্ন অংশ, কবল, খাবল। ধান্যাদির ক্ষেত্র আঁচড়াইয়া ঘাস উঠানোর কৃষিযন্ত্র-বিশেষ, ছুতারের কাঠে রেখা কাটার যন্ত্রবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. কোনো স্থানে 'চড়া'র জন্য বা ওঠার জন্য হাত দিয়ে কোনোকিছুকে যেভাবে আকর্ষণ করা হয়, তাকে আঁচড় বলে। অর্থাৎ উপরে ওঠার জন্য (চড়ার জন্য) মাটির ঢিবিতে উপুড় হয়ে দুই হাত দিয়ে উপরের মাটিকে যেভাবে আকর্ষণ করে ধরে এগোন হয়, তাকে আঁচড় বা আঁচড়ান বলে। তাতে মাটির উপরে নখের যে দাগ বসে যায়, তাকেও আঁচড় বা আঁচড়ান বলা হয়। মোট কথা চড়ার জন্য যে ব্যবহার, তাই আঁচড়। তবে শব্দটির অর্থ এখানেই সীমিত থাকেনি। তা যে কোনো প্রকারের আকর্ষণের দাগ, নখের দাগ ইত্যাদি থেকে মানুষের রুজিরোজগারের চেষ্টা পর্যন্ত অনেক কিছুকে চিহ্নিত করে। গ্রামবাংলার ডেলি-প্যাসেঞ্জার চাকুরিজীবী নাতিপুতি-ছেলেভাইপোদের সম্পর্কে গ্রামবাংলার ঠাকুমা-জ্যাঠাইমার মুখে এমন কথাও শোনা যায় — 'এমন দুর্দিন দেখতে হবে ভাবিনি। দু মুঠো অন্নের জন্য ছেলেপুলেগুলো দিনরাত **আঁচড়-কামড়** করে মরছে, নাম কি না চাকরি! ছ্যাঃ-ছ্যাঃ!'

চট, চটা (চটাচটি, চটান, চটান-পটান, চোট, চোট্টা) : ২. ***চট*** = *চয়ন টঙ্কারিত যাহাতে;* ***চটা*** = *চট আধারিত হয় যাহাতে।* ৩. ভেদন, বর্ষণ, আবরণ, বধ; পাটের বা শণের সূতার মোটা কাপড় বিশেষ; শীঘ্র, ক্ষিপ্রতা, চড়-চাপড়ের শব্দ। চট শব্দে ভিন্ন হওয়া বা ফাটা, চিড় খাওয়া, ক্রুদ্ধ হওয়া, রাগ করা; স্ফুটিত, ক্রুদ্ধ, রাগী, কাষ্ঠাদির চটিত অংশ, চাকলা, চালা, বাঁশের চটিত (ফাড়া) অংশ, বাখারি, রাগারাগি, ফাটান, রাগান, অস্ত্রাঘাত। ... (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **গৃহ** ও **ঘর** শব্দ থেকে জানা যায়, মানুষ সর্বাগ্রে গৃহ বানিয়েছিল তার বাহ্যসম্পদ রাখার জন্য, নিজের জন্য নয়। **চট** এবং **পট** শব্দ আমাদের জানায়, মানুষ পাট ও শণের সুতো থেকে মোটা কাপড় বানিয়েছিল তার সংগৃহীত বাহ্যসম্পদ রাখার জন্য। একই কথা তার **বস্ত্র** শব্দের ভিতরেও রয়েছে। শণ বা পাটের মোটা কাপড় মাটির উপর বিছিয়ে সংগৃহীত বা উৎপাদিত বস্তু তার উপর রাখা হত। এগুলি **চট** পদবাচ্য। তবে সংগৃহীত বস্তু যে সকল ছোট ছোট চটের থলেতে ভরে বেঁধে রাখা হত, সেগুলিকে বলা হত **পট**। পরে পরে মানুষ একদিকে যেমন শস্য রাখার স্থানে বা ঘরে নিজেই থাকতে শুরু করল, তেমনি তার শস্য ঢেকে-বেঁধে রাখার আবরণকেও সে নিজের আবরণ করে নিল। কেন, সে অনেক কথা। দ্র. **চটপট**।

চয়ন টঙ্কারিত হয় যাহাতে, তাকে বলে **চট**। বংশের বা বাঁশের গায়ের পাতলা ছাল তুলে চাঁচ বানাবেন বলে তার গায়ে কাটারির কোপ দিলেন, 'চট্' করে শব্দ হল, একেই বলে চট। এই চট যার গায়ে পড়ল, সে পেল আপনার কাটারির চোট বা আঘাত। 'কাঁচা বাঁশে চটিও না বা চটাসনি' বাক্যের অর্থ হল কাঁচা বাঁশে কোপ মেরো না। 'পাকা বাঁশে চটা' মানে পাকা বাঁশে কোপ মারো। 'বাঁশ না চিনে যেকোনো বাঁশে চটান ঠিক নয়' — এই 'চটান' মানে কোপ মারা। 'যেখানে সেখানে এরকম চটাচটি করা ঠিক নয়' কথাটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যেকোনো বাঁশে কোপ-মারামারি ঠিক কাজ নয়। এ তো গেল জড়ের উপর চটাচটি বা কোপ-মারামারি। কিন্তু যার উপর চটাচ্ছেন বা কোপ মারছেন, সে যদি তৃণশ্রেষ্ঠ বংশ না হয়ে ঘোষবংশ বা রায়বংশ হয়? তাদের সম্পদে চটালে অর্থাৎ তার সম্পদের উপর আপনার কোপ পড়লে তারা তো চটবেই; তারা তো তৃণশ্রেষ্ঠ বংশের মতো চোটটা চুপচাপ সয়ে নেবে না। তাদের এই চটে যাওয়া বা রেগে যাওয়ার ফল ভাল হয় না। চটাচটি

করার বা কোপ-মারামারির আগে দেখা চাই কাকে চটাচ্ছেন বা রাগাচ্ছেন! অন্যথায় উভয় পক্ষের চটাচটির বা রাগারাগির ফলে বড় হাঙ্গামা দেখা দিতে পারে। অতএব চটানর আগে, পটানর ভাবনা ভেবে রাখা চাই। দ্র. **চটপট**।

উপরোক্ত ব্যাখ্যায় আমরা দেখলাম, চট্ ক্রিয়াকে ক-বিন্দুর দিক থেকে যখন দেখা হচ্ছে, তখন তার একরকম মানে; আবার যখন খ-বিন্দুর দিক থেকে দেখা হচ্ছে তখন তার আর একরকম মানে। দ্র. **ক্ষিপ্ত**। আশুতোষ কোট তুলে ট্রেন থেকে ফেলে দিলেন, কোটটি হয়ে গেল ক্ষিপ্ত; এবং যার কোট সেই সাহেব হয়ে গেলেন রেগে কাঁই অর্থাৎ ক্ষিপ্ত। চট-ও সেইরকম। তবে শব্দটির আরও একরকম ব্যবহার চলে। চোট-মারা মানেই অন্য অবয়বে কামড় দিয়ে খানিকটা অংশ তুলে নেওয়া বা খাবলে নেওয়া। **কোপ**-এর সঙ্গে **চোট**-এর পার্থক্য হল, আঘাতের ক্ষেত্র কোপের বেলায় নীরবে আঘাত হজম করে, আঘাত গ্রহণ করে পালন করে; চোটের বেলায় সে বিরুদ্ধাচরণ করে, আঘাতের বিপরীতে চিৎকার করে, টঙ্কারিত হয়। এই চোট-এর ইংরেজি উত্তরাধিকারকে আমরা সহজে চিনতে পারি quote বা quotation রূপে, যা কিনা কোনো-না-কোনো রচনার একটুখানি অংশ খাবলে নিয়ে থাকে। বাংলায় **সর্প** শব্দের সামাজিক অর্থ ভুলে গেছি বলে সাপের কামড়কে কেন **চোট** বলে, সেকথাটিও ভুলে গেছি। তবে যে মানুষ এভাবে অন্যের সম্পত্তির উপর চোট মারে, তাকে গ্রামবাংলায় এখনও **চোট্টা** বলে। **৬.** যাঁরা পাশ্চাত্যের ভাষা বিষয়ে খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা জানেন ল্যাটিনে ধাতুরূপ, শব্দরূপ ছিল। ল্যাটিনে মূল ধাতু প্রায়ই -re (রে)-অন্ত ছিল। (যেমন complete < comple*re*)। তার থেকে সংস্কৃতের 'ক্ত'র corresponding রূপ হত -ate (= আতে)-অন্ত। আবার সেই সমাপ্ত রূপ পাবার প্রক্রিয়াটি বোঝানর জন্য শব্দটি হত -ation (= আতিওন) -অন্ত। এই 'আতিওন'টি মধ্যযুগে ল্যাটিনের প্রাকৃত-জাত ভাষায় (অর্থাৎ ফরাসি ভাষায়) উচ্চারিত হয় 'এষণ' রূপে। এরকম যত -ation-অন্ত বা এষণ-অন্ত শব্দ, এই সেই মতন অন্য সূত্রে প্রাপ্ত ধাতুতেও -ation লাগানর রীতি — এ সবই ফরাসি থেকে ইংরেজি নিয়ে নিয়েছে। মনে রাখা ভাল, আমাদের বাংলার সঙ্গে মারাঠির যতখানি ব্যবধান, ইংরেজির সঙ্গে ফরাসির ব্যবধান তার থেকে অনেক অনেক বেশি; আগেও ছিল, এমনকি এখনও তাই। ইংরেজি quote মূলত ল্যাটিন শব্দ, কিন্তু quotation এসেছে ঘুরপথে। কিন্তু মূলে আমাদের **কোপ, চোট,** এবং **এষণ** যে আদিভাষার উত্তরাধিকার, তাদের quote quotation-ও তারই উত্তরাধিকার।

চটক (চটকা, চড়ই, চড়াই) : **১.** ✓চট্ + অক (বুন) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *চট করে যে।* **৩.** কলবিঙ্ক, চড়া পাখী, শ্যামাপক্ষী। কান্তি, সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব, আড়ম্বর, ভড়ং, বাহার, শোভা, চাকচিক্য, শীঘ্রতা, ফূর্ত্তি, মোহজনকতা, মনোহারিত্ব। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** কিছু একটা নিতে যায়, আর সঙ্গে তার একটা প্রকাশ ঘটে যায়, টঙ্কার হয়; এমন কাজ যে করে তাকে চটক বলে। ব.শ. জানাচ্ছেন, কলবিঙ্ক, চড়া (চড়াই), শ্যামা প্রভৃতি পাখিগুলিকে চটক পাখি বলা হয়। নিশ্চয় তাদের আচরণে এই 'চট' করা আছে। তবে কিনা চট-কারী চটক কেবল পাখিই হয় না, আরও অনেকেই হয়। মানুষের সমাজে এমন বহু মানুষ থাকেন, যাদের চট করাই সম্বল। তাদের চটকদার, আড়ম্বরকারী বা ভড়ং-কারী বলে। তবে কারও কারও সত্যিই আড়ম্বর করার মতো সৌষ্ঠব থাকে। তারা সত্যিকারের চটকদার। দ্র. **চটচট, চটপট**।

চটচট (চটপট, চটপটে, চোটপাট) : **২.** ***চটচট*** = *চয়নজাত টঙ্কারের দ্বিত্ব যাহাতে; বারংবার চট যাহাতে।* ***চটপট*** = *চয়নের ও পালনের টঙ্কার যাহাতে;* ***চটপটে*** = *চটপট করে যে;* ***চোটপাট*** = *চটপটের সার্বিক আধার যে।* **৩. চটচট** = চাবুক মারার শব্দ, চড় মারার শব্দ, বেত্রাদির আঘাতের শব্দ, গদার ঘাতপ্রতিঘাতের শব্দ, মুষ্টিঘাতের শব্দ, পয়জার বা চটিজুতোর প্রহারের শব্দ, আঠার বা তেলচিটার আঁট-আঁট-ভাব ...। **চটপট** = শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। **চটপটে** = কার্য্যতৎপর, উৎসাহী, উদ্যোগী, চালাক, চতুর, যে চটপট বলে, বলিতে-কহিতে তৎপর, মুখফোঁড়। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. চট** শব্দে আগেই আমরা দেখেছি, চয়ন করে এনে রাখা হয় যাহাতে, সেটি যেমন **চট**; তেমনি, সেই রক্ষিত বস্তুকে বেঁধে-বুঁধে নেওয়াকে বলে **পট**। এর কার্য্যকরী পরিস্থিতির সাক্ষাৎ মেলে গ্রামবাংলার রবিশস্যের চাষে। শীতের রোদে চাদর গায়ে চাষী পরিবার মাঠে গিয়ে মুগ, মসুর প্রভৃতি শস্য তোলে, চাদর বিছিয়ে তার ওপর জমা করে, সেই চাদরের চারকোণা একত্র করে বেঁধে মাথায় তুলে নিয়ে আসে। এই চাদরের উপর রাখাই চট, বেঁধে নিয়ে চলাই পট। তবে শস্যচয়ন না করে শব্দচয়ন করলে সেও **চট** হওয়ারই কথা। এবং সেই চট করে করা কাজকে পট (গুছিয়ে পাট বা পুটলিবদ্ধ) করে ফেলাই চটপট-করা এবং তা বাহ্যবস্তুর ক্ষেত্রে যেমন হতে পারে, তেমনি মানসবস্তুর (বক্তব্যের) ক্ষেত্রেও হতে পারে।

আবার, বাঁশে কোপ মারলে যে চট শব্দ হয় সেটিও **চট**। কিন্তু তাই বা হতে যাবে কেন, যে-কোনো স্থানে আঙুল ছুঁয়ে টানলে যদি চট করে আওয়াজ হয়, তবে সে স্থানও চটচটে বা আঠাল রূপে প্রতীয়মান হয়। তেলচিটার আঁট-আঁট-ভাব না থাকলে অমন চট শব্দ উঠতই না। এবার আঙুল বা কাটারি দিয়ে না ছুঁয়ে যদি বেত, চাবুক, জুতো, গদা, ঘুঁষি দিয়ে একই কাজ করা হয়, তাহলেও একই ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তবে সেই প্রক্রিয়া যে চালায়, সে যদি একই সঙ্গে **পটিয়ে** নেওয়ার ব্যবস্থা করে বা তৎক্ষণাৎ পলায়নের চেষ্টা করে এবং তার সেই পটান বা পলায়নও টঙ্কারিত হয়ে যায়, তাহলে শুধু চট হয় না, পটও হয়ে যায়। তখন আমরা বলি চটপট। যে ক্রিয়ায় চয়ন (গ্রহণের উদ্দেশে আঘাত) এবং পালন বা পলায়ন দ্রুত ঘটে তাকে চটপট বলে। চটপট-ক্রিয়ার আধারকে বলে চটপটে।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, সংস্কৃতভাষা সৃষ্টির যুগে ভাষাস্রোত তখনও অনেকটা প্রবাহিত হয়ে চলে আসেনি। সেকারণে ছ, ঝ প্রভৃতি বর্ণের তখনও পর্যন্ত তেমন বিকাশ ঘটেনি। এই চটপট শব্দ **ছটফট, ঝটপট** প্রভৃতি শব্দে উত্তীর্ণ হয়েছে আরও পরে। **৬.** খুব তাড়াতাড়ি কথা বলা অর্থে ইংরেজিতে chatter শব্দের ব্যবহার হয়। তার থেকেই chat অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ গল্প-আলাপ ইত্যাদি। আবার দ্রুত উত্তর এলে ইংরেজিতে বলা হয় — pat came the reply।

চটিত (চটি, চটিতং) : ১. ✓চট্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চটি = চায়ীর (ইচ্ছাকারীর) টঙ্কারণ গতিশীল যাহাতে। চটিত = চটি তারিত যাহাতে।* / **চটি** = যাহা চটচট শব্দ করে। (ব.শ.)। ৩. **চটি** = গোড়ালির চামড়া-রহিত একপ্রকার জুতা, পান্থশালা, মকরধ্বজ ঔষধ। **চটিত** = ভিন্ন, খণ্ডিত, বিভাজিত, বণ্টিত, আরূঢ়। (ব.শ.)। ৪. চটি শব্দটি জুতো অর্থে প্রচলিত, কিন্তু 'চটিতং' শব্দটি 'রেগে গেছে' অর্থে প্রচলিত। ৫. কারও উপর ধারাল অস্ত্র নিয়ে চটালে বা কোপ মারলে, সেটি ভেদিত বা ভিন্ন, খণ্ডিত, বিভাজিত ইত্যাদি হবেই। ফলে আপনি যাকে চটালেন (কোপালেন) সে গেল চটে (রেগে); এই হল চটিত। যাকে চটালেন সে জড়বস্তু হলে আওয়াজ-মাত্র প্রতিক্রিয়া জানাবে, কিন্তু জীব হলে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাবে এবং প্রতিরোধ করবে। তার 'চটিতং' ভাবকে চিনতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে চায়ীর টঙ্কারণ গতিশীল যাহাতে সেটি জুতোমাত্র নয় (জুতো কেবল চট্ চট্ শব্দটুকুই করতে থাকে ব'লে চটি), সে পান্থশালা হতে পারে, মকরধ্বজ হতে পারে, এমনকি চটি-বইও হতে পারে। চয়নের উদ্দেশ্যে চলমান 'সুদূরের পিয়াসী' যেখানে যেখানে ক্ষণিকের অতিথি হয়ে স্থির হয়, সেই অতিথিনিবাসগুলি প্রত্যেকটিই সেই পিয়াসীর চটি। এগুলির সাহায্যেই তার চট গতিশীল থাকে। কিন্তু মকরধ্বজ কেন চটি-পদবাচ্য, তা আমরা জানি না। হয়তো মকরধ্বজের সেই গুণের কথা আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রীগণ বলতে পারবেন। তবে চট করে দেখে নেওয়া যায় বলে ছোট বইকে বলে **চটি** বই। ৬. ইংরেজি chat, chatter-এর মধ্যে এই গতিশীলতার ব্যঞ্জনা আছে। দ্র. **চটচট**।

চটু, চটুল (চাটু, চাটুকার) : ১. ✓চট্ + উ (উন্) - কর্তৃবাচ্যে; চটু + ল (লচ্) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। ২. *চটু = চায়ীর টঙ্কার নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; চটুল = চটু লালিত হয় যাহাতে।* / **চটু** = যাহা চিত্তকে ভেদ করে। (ব.শ.)। ৩. চাটু, প্রিয়বাক্য, ব্রতীর আসনবিশেষ, উদর। চঞ্চল, চপল, শীঘ্র, লঘু, মনোহর, অব্যবস্থিত (fickle)। (ব.শ.)। ৪. 'চপল' অর্থে চটুল প্রচলিত। চাটু ও চাটুকার যথাক্রমে 'খোসামোদ' ও 'খোসামোদকারী' অর্থে প্রচলিত। চটু অপ্রচলিত। ৫. **চট** গিয়ে টঙ্কারিত হয়, **চটা** গিয়ে খাবলে দেয়, **চটি** গিয়ে খাবলাতেই থাকে, কিন্তু **চটু** উলটো মুখে ঘুরে আঘাত করতে আসে। তার সেই আঘাত-ইচ্ছাকে **চটুলতা** বলে মনে হয়। আর, যা দিয়ে তেমন আঘাত বারংবার করা হয়, তাকে বলে **চাটু**। এই চাটু দিয়ে তরকারিকে যেমন নাড়ানাড়ি করা যায়, খানিকটা তুলে নিয়ে চাটাচাটি করা যায়, তেমনি চাইলে সবটাকেই **চটকে** দেওয়া যায়। ফলে, **চাটুকারিতা** ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে। তবে **চাটুকার** শেষ পর্যন্ত কতটা ক্ষতি করবে, চাটুকারিতাকে প্রশ্রয় না দিলে সেকথা বোঝার উপায় থাকে না।

চট্ট, চট্টরাজ, চট্টোপাধ্যায় : দ্র. **পদবী**।

চট্ট (চট্টগ্রাম, চাটিগাঁ, চাটিগ্রাম, চ্যাটাংচ্যাটাং) : ২. *চট্ট = চট্ (আঘাত) টঙ্কারিত যাহাতে; চট্টগ্রাম = চট্টগণের গ্রাম।* ৪. বাংলাদেশের জেলাশহর রূপে চট্টগ্রাম প্রচলিত। একে চাটগাঁ-ও বলা হয়। ৫. প্রয়োজন হলেই চট করতে পারি, কোপ মারতে পারি, এমন কথা যে সত্তা থেকে বেরিয়ে আসে, তাকে বলে **চট্ট**। এই সত্তা আদিতে ছিলেন সেকালের সরকারি প্রতিনিধি বা ক্ষত্রিয়, পরে সেই স্থান দখল করে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরোধী ক্ষত্রিয় ও জলদস্যু। এমনকি যে গ্রামে এই ক্ষত্রিয় অধিষ্ঠান করতেন, সে গ্রামকেও **চট্টগ্রাম** বলা হত। মনে রাখা দরকার, এককালে গ্রাম নামধারীর সেই মর্যাদা ছিল, একালে সবচেয়ে আধুনিক শহরের যে মর্যাদা রয়েছে। সেকালে স্থানীয় সরকারি শাসনকেন্দ্র ছিল কোনো কোনো **গণ্ডগ্রাম**। চট্টগ্রাম ছিল সেকালের এমনই এক কেন্দ্র, যেখান থেকে সমগ্র এলাকায় শাসনকার্য, খাজনা আদায় ইত্যাদি চালান হত। তবে সবক্ষেত্রে যা হয়, এক্ষেত্রেও সম্ভবত তাই হয়েছিল। শাসক তার নীতিতে মৌলবাদী হয়ে উঠলে সে ক্রমে অত্যাচারী হয়ে ওঠে। আর, শাসক অত্যাচারী হয়ে উঠলে জন্ম হয় শাসকবিরোধী ক্ষত্রিয়ের। ফলে, এতকাল জনসাধারণের চোখে যে **চট্ট** ভয়ানক ছিল, এবার কেন্দ্রীয় শাসকের চোখে সেই চট্টই ভয়ানক দস্যু রূপে দেখা দেয়। চট্টের কথাবার্তাই শাসকের চোখে হয়ে যায় 'চ্যাটাং চ্যাটাং কথা'। **চট্টগ্রাম** হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় শাসনবিরোধী দস্যুদের গ্রাম, একালের ভাষায় যাকে আদি 'বিপ্লবীদের মুক্তাঞ্চল' বলা যেতে পারে।

চড় (চড়ন, চড়া, চড়াই, চড়ুইভাতি) : ১. ✓চট্ > প্রাকৃত ✓চড়। (ব.শ.)। ২. *চড় = চায়ীর (ইচ্ছাকারীর) গড়ান-উড়ান (আবর্ত্তন) যাহাতে।* ৩. আরোহন করা, উঠা, চাপা, বৃদ্ধি পাওয়া, বাড়িয়া যাওয়া (দর, দাম, রাগ), তীব্র হওয়া, উচ্চ হওয়া বা তেজ হওয়া (সুর), আরব্ধ হওয়া, উত্তেজিত হওয়া, রাগা, গরম হওয়া (মেজাজ), চলিত হওয়া, সরা, আরোহণ করান, উঠান, স্থাপন করা, সংলগ্ন করা, বসান, চাপান, তীব্র করা, উঠান (সুর), বাড়ান (দর), রন্ধনার্থ রন্ধনপাত্রে স্থাপন করা বা চাপান, যোজনা করা, খাটান, ধারণ করা, পরিস্ফুট করা, ফুটান (রঙ), লেপন করা, মাখান। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. একটি উঁচু ঢিবিতে হাত দুটো উপরে কোনো কিছুকে ধরে বা আকর্ষণ করে করে বা আঁচড়ে আঁচড়ে কেউ উপরে উঠছে। এভাবে ইচ্ছাতাড়িত কোনো সত্তা যদি ভূতলের একটু ওপরে আবর্ত্তিত হতে হতে এগিয়ে চলে, তাকে বলে চড় (চড়া)। এই চড় অন থাকলে তাকে বলে চড়ন বা চড়া। একে আরোহণও বলে। এই চড়া বা উপরে ওঠা দর, দাম, রাগ, মেজাজ প্রভৃতি বহু সত্তার ক্ষেত্রেই ঘটে। জোয়ারের সময় বা বর্ষার সময় নদীর জল যেখানে চড়ে বা আরোহণ করে, নদীর মধ্যস্থিত তেমন দ্বীপকেও সেকারণেই নদীর চড়া বলে। অনেক সময় তাকে 'চর'ও বলা হয়, কিন্তু তার কারণ ভিন্ন — মানুষ, গরু বা অন্যান্য জীব সেখানে বিচরণ করতে পারে, চরতে পারে বলেই তাকে চর বলে। আর সেই চড়া গতিশীল যাহাতে (যে ভূমিতে), তাকে বলে চড়াই; যার বিপরীত হল 'উত্‌রাই'। নদীর চড়ায় যে বনভোজন করা হয়, তাকে বলে চড়াইভাতি বা চড়ুইভাতি।

চাট (চাটনী, চাটা, চাটাচাটি) : ১. ✓চাটি + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চাট = চট হইতে জাত; চাটনী = চাট অন*

(on) যাহাতে তাহার আধার। / **চাট** = বিশ্বাস উৎপাদনপূর্ব্বক ধন অপহরণ করে যে; **চাটনী** = যাহা চাটিয়া খাওয়া হয়। (ব.শ.)। ৩. প্রতারক, নেশায় মুখরোচক খাদ্য বা অনুপান, গোরু ঘোড়া প্রভৃতির পেছনের পায়ের লাথি। অম্লমধুর ব্যঞ্জনবিশেষ, লঙ্কা লবণ অম্ল দ্রব্যাদি দ্বারা কৃত স্বাদু বস্তুবিশেষ। মধু প্রভৃতি তরল দ্রব্য 'চটচট' শব্দে জিভ দিয়া মুছিয়া খাওয়া, লেহন করা। পরস্পর চাটা, গা-চাটাচাটি করা — গৌণার্থে ভালবাসা জানান। গো-প্রভৃতির গা-চাটাচাটি ভালবাসার লক্ষণ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **চট**। এই চট থেকে জাত যে ক্রিয়াকারী (চাট), তাকে ব.শ. বলেছেন — 'বিশ্বাস উৎপাদন পূর্ব্বক ধন অপহরণ করে যে'। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, 'চাট্' ক্রিয়াটি কীরূপ কাজকে বোঝায় সেকথা ব.শ. এই বাক্যে যথার্থই বলেছেন। মানুষের সঙ্গে জীবের (গরু বা ঘোড়ার) সম্পর্কের ক্ষেত্রেও চাট্ অনুরূপ ক্রিয়াই করে — গরুর **চাট** যিনি জীবনে অন্তত একবার খেয়েছেন, তিনি জানেন, গরুটি যখন চাট মেরেছিল তার আগে গরুটিকে এতই নিরীহ গোবেচারা মনে হয়েছিল যে, তার পিছন দিয়ে হেঁটে চলে যেতে তাঁর মনে দ্বিধার উদয়মাত্রও হয়নি। তাই তিনি নিশ্চিন্তে গরুর পেছন দিক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সেই বিশ্বাস ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল **চাট** খেয়ে ছিটকে পড়ে যাওয়ার পর। মানুষের সঙ্গে জড়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও চাট্ ক্রিয়া অনুরূপ ঘটনাই ঘটায়। মিষ্টি মিষ্টি লাগছে বলে বেশ খানিকটা তুলে মুখে ঢুকিয়ে নিয়েছেন, আর পড়ে গেছেন বিপদে — গিলবেন না ফেলে দেবেন ঠিক করতে পারছেন না এতই টক। বেশি বয়সের মানুষের ক্ষেত্রে চাট বা **চাটনীর** সম্পর্ক এইরকম আত্মনিগ্রহজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। যদিও মাতালদের ক্ষেত্রে (রসিকদের ক্ষেত্রে), কম বয়সের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এবং সাধারণভাবে স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে এই চাট বা চাটনী থেকে প্রাপ্ত 'আত্মনিগ্রহ' একপ্রকার তৃপ্তি দিয়ে থাকে; তার কারণ ভিন্ন। তাতে চাটের টক্কারের ক্রিয়াটির কোনো বদল ঘটে না; তা যথারীতি 'বিশ্বাস উৎপাদন করে ক্ষতি করে, কষ্ট দেয়, বা ঠকায়'। কেউ যদি কষ্ট পেয়ে, ঠ'কে, ক্ষতি স্বীকার ক'রে আনন্দ পেতে চায়, তার তো ভাল লাগবেই। এই 'আত্মনিগ্রহ'-এর সুখ একেবারেই আলাদা বস্তু, যার সংবাদ কেবল বাংলার মাটিই জানে। এযুগের ইংরেজিতে যাকে Masochism বলে, তার থেকে অনেক ব্যাপক এই 'আত্মনিগ্রহ'। দ্র. **টক, রসকথা, বাঁশী**।

চাটুতি, চাট্যাতী : দ্র. **পদবী**।

চাড়, চাড়া, চাড়ান, চাড়ি, চাড়ী : ২. ***চাড়*** = *চড় হইতে জাত;* ***চাড়া*** = *চাড়-এর আধার যে;* ***চাড়ান*** = *চাড়া অন (on) যাহাতে;* ***চাড়ি*** = *চাড় গতিশীল যাহাতে;* ***চাড়ী*** = *চাড়ির আধার যে।* ৩. কলা, চেঁদে, সাড়, ইঙ্গিত (?), বলপ্রয়োগ, ধাক্কা, দণ্ডদ্বারা উর্দ্ধ দিকে বলপ্রয়োগ বা চাপ, ভারজন্য নিম্নাভিমুখে চাপ। ধনুকের গুণ (ছিলা), নারিকেলের মালা, নৌকা **উর্দ্ধে** যত দূর বোঝাই করা যায় ততটা খোল, নথ, কচ্ছপের কঠিন পৃষ্ঠাবরণ, গোঁফের আঙুলের চাঁড়ে উপরে তোলা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. আরোহণ করা বা চড়া থেকে **চাড়** কথাটি এসেছে। চাড় দেওয়া মানে কাউকে চড়তে সাহায্য করা। বাহ্যিক বস্তুকে যেমন চাড় দিয়ে উপরে তোলা হয়, তেমনি আমাদের মনের নানারকমের আবেগও চাড় দিয়ে উপরে ওঠে বা প্রবল হয়। যাই হোক, এই চাড়কে সেকারণেই বলপ্রয়োগ, ধাক্কা ইত্যাদি নানা অর্থে বিস্তারিত করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বড় গেরস্তবাড়িতে সারা বছরের জ্বালানি কাঠ চৈত্র-বৈশাখ মাসেই সংগ্রহ করে আলাদা কাঠ রাখার ঘরে উঁচু মাচায় চড়িয়ে গুছিয়ে রাখা হত, এখনও কোথাও কোথাও হয়। ওই উঁচু মাচাকে বলে **চাড়** বা **চাঁড়**।

আর, নৌকার খোলকে কেন চাড়ী বলে, তার একটা কারণ জানতে পারা যায় গামলাকে চাড়ী বলার কারণ থেকে। পঞ্চাশ বছর আগেও, বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গ্রামাঞ্চলে বর্ষাকালে এক এক জায়গায় এমন প্লাবিত হত যে, সে সময় গ্রামগুলি দ্বীপের মতো মাথা তুলে থাকত যেন। তখন, সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি স্কুলের ছাত্ররা পর্যন্ত ছোট ছোট মাটির গামলায় চড়ে গ্রামান্তরের স্কুলে যেত। সেই গামলাকে বলা হত **চাড়ী**। হাত দিয়ে জল কেটে যাতায়াত করত লোকেরা। অর্থাৎ, এই ভাসমান গামলায় চড়া হত বলে একে বলা হত চাড়ী। তাই নৌকার খোলও চাড়ী। হয়তো নাকের নথ শরীরের উচ্চ স্থানে চড়ত বলে, এবং নারকেলের খোল গাছে চড়ে পাড়তে হত বলেই তাদের চাড়ী নাম হয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই।

চুট, চুটকি, চুটা, চোট : ২. ***চুট*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ীর (ইচ্ছাকারীর) টঙ্কার যাহাতে;* ***চুটকি*** = *চুট করণের গতিশীলতা যাহাতে;* ***চুটা*** = *চুট-এর আধার যে;* ***চোট*** = *চট-এর সার্বিক আশ্রয় যাহাতে।* ৩. **চুট, চুটা** = ছেদন করা, আঘাতপূর্ব্বক অর্থাৎ চোট মারিয়া কাটা, ছেদনার্থ আঘাত করা। **চুটকি** = পায়ের আঙুলের আভরণবিশেষ, চিমটি, অল্প কথায় ভাবপ্রকাশক সরল সরস ঈষদ্‌গম্ভীর ভাষার সাহিত্যবিশেষ, টিকি, সামান্য, সাদাসিধা, তুচ্ছ, খ্যাতিহীন, ওঁছা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. চট করা আর চুট করার মধ্যে পার্থক্য হল, প্রথম ক্ষেত্রে চায়ী (ইচ্ছাকারী) ছিল ক-বিন্দুতে; সেখান থেকেই সে এগিয়ে গিয়ে খ-বিন্দুতে ছুঁয়েছিল এবং তাতে উঠেছিল টঙ্কার। আর চুট-এর ক্ষেত্রে চায়ী (ইচ্ছাকারী) এসেছে খ-বিন্দু থেকে, এবং একই ঘটনা সে ঘটিয়েছে ক-বিন্দুতে। অর্থাৎ কিনা, চট-এর প্রতিক্রিয়ামূলক-চটকেই চুট বলে। দুই বিন্দু যদি মিলিত ভাবে চুট করে, তখন আমরা দু-আঙুলে (বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীতে) ওঠা টঙ্কার শুনতে পাই। ওই **চুটকি** ভরে কিছু নেওয়া হলে তাকে হিন্দিভাষীরা বলেন 'চুটকিভর'। বাংলায় কথাটি এখন রান্নাঘরে প্রচলিত — 'চায়ে চিনির সঙ্গে এক চুটকি নুন দিয়ে দিস।'

চূড়া (চূড়াকরণ, চূড়াকর্ম্ম, চূড়ান্ত, চূড়াল) : ১. চূড়া = ✓চুল (উন্নতি) + অ (অঙ্) - কর্ম্মবাচ্যে, অন্তর্ভাবিতণ্যর্থ + স্ত্রী আ (টাপ্) ভিদাদি, দীর্ঘ। (ব.শ.)। ২. ***চূড়া*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ীধারী (ইচ্ছাকারীসত্তা) আবর্ত্তিত (বর্ত্তমান) যাহাতে তাহার আধার।* / **চূড়া** = যাহা উন্নমিত হয়। **চূড়াকরণ, চূড়াকর্ম্ম** = চূড়ার করণ রূপ কার্য্য যাহাতে। **চূড়ান্ত** = চূড়ায় যাহার শেষ। (ব.শ.)। ৩. শিখা,

জুটিকা, টিকি, চূড়াকরণ সংস্কার, ময়ূরশিখা, কুক্কুটমস্তকস্থ শিখাবৎ অবয়ব, অগ্রভাগ, শিখর, বলভী, চন্দ্রশালা, চিলাঘর, মস্তক, কূপ, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, পূজ্য। চূড়ারূপ কার্য্য, সংস্কারবিশেষ। উচ্চতম স্থানে সমাপ্ত, কোনো বিষয়ের যতদূর সম্ভব তদবধি, চরম, শেষ, সবিশেষ, সবিস্তর, অতিশোভন, খুব ভাল। চূড়াবান, শিখাযুক্ত, মস্তক, শ্বেতগুঞ্জা, নাগরমুস্তা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. প্রথমে একটি জীবকে ধরা যাক — মোরগ। তার নবরূপে উত্তীর্ণ ইচ্ছাধারীসত্তা আবর্ত্তন করে তার ঝুঁটিতে; সেকারণে একে বলে চূড়া। মানুষের একই সত্তা আবর্ত্তিত হয় তার শিখায় বা টিকিতে, সেকারণে তাকেও চূড়া বলে। আপনার একটি দোতলা বাড়ি আছে। কিন্তু তাতেও আপনার উদ্‌গামী ইচ্ছার স্থান হয়নি। তাকে আপনি নিয়ে গেছেন চিলেকোঠার একমাত্র কামরায়। এই কামরাটি যেন শিখার মতো আপনার বাড়ির শিখরে দীপ্তি পাচ্ছে। একে বলে চূড়া। উদ্ভিদজগতে একই রকম সত্তা হল শ্বেতগুঞ্জা ও নাগরমুস্তা। তাই তাদেরকেও শিখাবান বা চূড়াল বলে। তবে পরে পরে চূড়ার এই অর্থ আরও বিস্তারিত হয়েছে।

***চণ্ (চণ্ড্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অচণ্ড, আচণ্ডালাদি, চণক, চণ্ড্, চণ্ড, চণ্ডকৌশিক, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডবতী, চণ্ডমুণ্ড, চণ্ডমুণ্ডা, চণ্ডসিদ্ধ, চণ্ডাংশু, চণ্ডাল, চণ্ডালিকা, চণ্ডিকা, চণ্ডিমা, চণ্ডীমণ্ডপ, চণ্ডীশ্বর, চণ্ডু, চণ্ডেশ্বর, চাঁড়, চাঁড়া, চাঁড়াল, চাড়া, চাণক্য, চাণূর, চাণ্ডাল, চানা, চামুণ্ডা, চিয়াড়ী, চিয়াড়ীপাড়া, চু(চো)য়াড়, চেআড়, চোয়াড়, প্রচণ্ড, রাড়-চুয়াড়।

চণ্ (চণ্ড্) = চায়ীর রহস্যরূপের বোধন। **চণ** = চায়ীর রহস্যরূপের বোধন যাহাতে। **চণ্ড** = চায়ীর রহস্যরূপের বোধের গড়ান-উড়ান যাহাতে।

চণক, চাণক্য : ১. ✓চণ (দান) + অ (অচ্) - কর্ম্মবাচ্যে + ক (কন্) স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. ***চণক** = যিনি অভিজ্ঞতালব্ধ বোধ প্রকাশ করেন; **চাণক্য** = চণক-জাত থাকে যাহাতে।* ৩. চণকমুনির গোত্রাপত্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, বাৎস্যায়ন, কৌটিল্য। (ব.শ.)। ৪. চণক অপ্রচলিত। চাণক্য ভারতের একটি ঐতিহাসিক চরিত্রের নাম হিসেবে ও 'কূটবুদ্ধিজন' অর্থে প্রচলিত। ৫. চণক কথাটিকে চানার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। আসলে ক্রিয়া একটিই — 'চায়ী (ইচ্ছাকারী বা অর্জনকারী) সত্তা অন (on) থাকে যাহাতে'; অর্থাৎ অর্জিত দানা ছড়ায় যাহাতে, তাকে বলে চণ বা চন। এই দানা অভিজ্ঞতার দানা হতে পারে, বাহ্যিক ফলের দানাও হতে পারে। সিম, বরবটি প্রভৃতির শুঁটি পেকে গেলে শুঁটিটি যে অদ্ভুত কৌশলে তার দানাগুলিকে নিজের চারদিকে যত দূরে সম্ভব ছড়িয়ে দেয় (যাতে সেগুলি ছায়ায় না পড়ে যেখানে রোদ বৃষ্টি লাভের সম্ভাবনা আছে সেখানে পড়ে) তা অনেকেই জানেন। হাত উপরে তুলে আঙুলগুলিকে হঠাৎ ছড়িয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে নাচের মুদ্রায় যেমন করা হয়, অনেকটা সেরকম। একে বলে চন-জাত চানা। (এই চন-এর বিপরীত হল 'চুন' বা কুড়ানো।) পরে পরে সিম ছাড়া আরও অনেক দানাশস্যের ক্ষেত্রে এই শব্দের ব্যবহার হয় এবং ছোলাতে গিয়ে শব্দটি প্রতীকী হয়ে যায়। আর, সেই দানা যদি অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের দানা হয়, তবে তাকে বলে চণ এবং যিনি জনসাধারণের মনের মাটিতে এই অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের দানা ছড়িয়ে দেন, তাঁকে বলে **চণক**। এই চণকের গোত্রাপত্যগণকে **চাণক্য** বলে। ভারতের ইতিহাসে ইনি একটি বিশেষ চরিত্র।

চাণক্যের পদবী কী? কেউ জানেন না। আমরা জেনেছি, প্রাচীনকালে আমাদের দেশে মানুষের নাম হত গোষ্ঠীর নামে। একালে যেমন 'কংগ্রেস' বললে একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে বোঝায়, তেমনি সেই গোষ্ঠীর যেকোনো সদস্যকেও বোঝায়; সেইরকম। পরে সেই গোষ্ঠীনামটিই সেই গোষ্ঠীর প্রতিটি মানুষের **পদবী** হয়ে যায়। প্রায় ১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এই শ্রেণীর মানুষেরা ভারতের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দ্র. **কুশ**। এঁদের বাৎস্যায়নও বলা হত। দ্র. **বাৎস্যায়ন**।

চণ্ড (চণ্ডমুণ্ড, চণ্ডসিদ্ধ) : ১. ✓চণ্ড্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চণ্-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে।* ৩. খর, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, নিশিত, প্রবল, বেগবান, অত্যন্তকোপন, অতিরোষণ, দারুণ, ভীষণ, উগ্র, তীব্র, দুঃসহ, দুর্দ্ধর্ষ, উচ্চৈঃ, অতিতার, গম্ভীর, শিব, কার্ত্তিকেয়, অপদেবতাবিশেষ, ভূতযোনিবিশেষ, যমকিঙ্কর, ভৈরববিশেষ, তিন্তিড়ীবৃক্ষ, দুর্বৃত্ত, কোপ, উত্তাপ। (ব.শ.)। একজন প্রসিদ্ধ দৈত্য। দৈত্যরাজ শুম্ভের প্রধান অনুচর ও সেনাপতি। এর কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম মুণ্ড। শুম্ভের আদেশে যুদ্ধস্থলে গিয়ে চণ্ড ও মুণ্ড উভয়ে ভগবতীর হস্তে নিহত হন। চণ্ডকে বিনাশ করে ভগবতী চণ্ডী বা চণ্ডিকা নামে খ্যাতা হন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র। ৫. চণ্ডী, চণ্ডাল প্রভৃতি শব্দগুলিকে বোঝার জন্য এই শব্দটির অর্থ বুঝে নেওয়া দরকার। শব্দের নিজস্ব নিয়মে চং-এর (বা চায়ীর রহস্যরূপের) পরে ট-বর্গের যেকোনো বর্ণ থাকলেই চং হয়ে যায় চণ (অর্থাৎ চায়ীর বোধ)। এর কারণ হল ট-বর্গে রয়েছে উড্ডয়ন, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসলোকের ব্যাপার। ণ-এর অর্থ তাই বোধ। কিন্তু বোধ তো বিষয়হীন হয় না; এখানে যেমন চণ-এর অর্থ হল কোপের বা 'রাগের বোধ'। এই কোপের বোধ বা ক্রোধ যাকে আবর্ত্তিত করে নিয়ে চলেছে, আবর্ত্তমান রেখেছে, তাকে বলে চণ্ড; তা সে ব্যক্তি, বস্তু, বোধ, বৃক্ষ, যাই হোক না কেন। প্রাচীন কালে কোনো একসময় বৈদিক (অধঃপতিত সমাজতান্ত্রিক) সমাজের (অসুরের) শাসকগণের দুই প্রতিনিধি-গোষ্ঠী অত্যন্ত কোপনস্বভাব হয়ে উঠেছিল এবং জনসাধারণের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল। ফলত বিদ্রোহী জনগণের একটি বিশাল গোষ্ঠী, যাঁরা ততোধিক কোপনস্বভাব, তাঁরা ওই অত্যাচারীদের হত্যা করেছিলেন। সেই কারণে **মহামায়া**র অংশ সেই বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীকে **চণ্ডী** বলা হয়। একালের ভাষায় বললে — সেকালের সরকারী গুণ্ডাদমন শাখার একটি অফিসারগোষ্ঠী অত্যন্ত কোপনস্বভাব ও অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল। তখন সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের একটি বৃহৎ গোষ্ঠী বিদ্রোহ করে সেই অফিসারগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে।

উপরোক্ত (৩) অর্থে প্রায় সমস্ত তীক্ষ্ণ, তীব্র বোধগুলিকেই বলা হয়েছে 'চণ্ড'-পদবাচ্য। অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সামাজিক সত্তার মধ্যে

'চণ্ড' বলা হয়েছে **শিব** ও **কার্ত্তিকেয়**কে। আর, উদ্ভিদজগতের যে সত্তাকে 'চণ্ড' বলা হয়েছে তা হল তিন্তিড়ীবৃক্ষ বা তেঁতুলগাছ। এই গাছ সম্পর্কে যাঁরা যথেষ্ট জানেন, তাঁরা বলতে পারবেন, কেন তেঁতুলগাছকে চণ্ড বলা হয়। মনে রাখা ভাল, তেঁতুলের আয়ুর্বেদিক নাম হল — 'প্রাণদা যমদূতিকা', অর্থাৎ যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে সে মৃত ব্যক্তিকে প্রাণ দিতে পারে, কিন্তু ভুল ব্যবহারে যমদূত রূপে দেখা দিতে পারে।

মানুষের সমাজে চণ্ডের বাহ্যরূপ হল এমন একজন মানুষ যার সমস্ত চুলগুলি (স্ব-এর বোধগুলি) রাগে খাড়া হয়ে আছে। আর **মুণ্ড** হল এমন একজন মানুষ যার মাথা মুড়িয়ে ফেলা হয়েছে (মুণ্ডন করা হয়েছে) ব'লে তার মাথায় একটিও চুল নেই। তার মানে চণ্ডমুণ্ড দুই ভাই হল আসলে ক্রোধে খাড়াচুলওয়ালা একজন মানুষ এবং ক্রোধে মাথা মুড়িয়ে ফেলা চুলহীন একজন নেড়া মানুষ। 'যতদিন প্রতিশোধ না নিই, ততদিন একটিও চুল কাটব না' কিংবা 'যতদিন প্রতিশোধ না নিই, ততদিন মাথায় চুল রাখব না' — ইত্যাকার প্রতিজ্ঞা এখনও বাংলাভাষীদের মধ্যে কোথাও কোথাও শোনা যায়।

চণ্ডাল (চণ্ডালী) : ১. ✓চণ্ড্ + আল (আলঞ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***চণ্ডাল*** = *চণ্ড-অস্তিত্ব লালিত যাহাতে।* ৩. **চণ্ডাল** = ব্রাহ্মণীতে শূদ্র হইতে জাত সঙ্কীর্ণ জাতিবিশেষ, চাঁড়াল, চণ্ডালজাতীয় জন। **চণ্ডালী** = চণ্ডালজাতি-স্ত্রী, চণ্ডালপত্নী, চণ্ডালবৎ ক্রূরকর্ম্মা। (ব.শ.)। ৪. 'চাঁড়াল' জাতি হিসেবে এবং কোপপ্রবণ ব্যক্তিকে বোঝাতে শব্দটি প্রচলিত। ৫. দয়া-গুণ যার আছে তাকে যেমন দয়াল বলে, রস-গুণ যার আছে তাকে যেমন রসাল বলে, সেইরকম চণ্ড-গুণ যার আছে তাকে চণ্ডাল বলে। একটি জনগোষ্ঠীর সব মানুষই স্বভাববশত কোপপ্রবণ বা চণ্ডগুণসম্পন্ন, এরকম হয় না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি, চণ্ডাল জাতীয় মানুষও অন্য সকলের মতো স্বাভাবিক মানুষ হন। 'চণ্ডাল'-এর মতো নিন্দনীয় নাম কোনো জাতি ভালবেসে নিতে পারে না, নেয়নি। যতদূর বোঝা যায়, ভারতসমাজে এঁদের জন্ম হয়েছে **'নিষাদ'** রূপে প্রজাপতিতন্ত্রের শেষে, শেষ প্রজাপতি **'বেণ'**-এর আমলে, বিশ্বের আদি রাষ্ট্র **'পৃথু'**র প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে। এঁরা বৈদিক সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহকারী বেণ-প্রজাপতির সহচর ছিলেন। এঁদের চণ্ডাল, পারশব, ব্যাধ, কিরাত ইত্যাদি বলা হয়। রামের মিতা গুহক চণ্ডাল ছিলেন এঁদেরই একজন। বেণ পরাজিত হওয়ার পর বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বেণ ও বেণপন্থীরা নিন্দিত হয়ে যান। বিশ্বে সর্বপ্রথম পণ্যের জয়গান গেয়েছিলেন এই বেণই। কিন্তু তিনি পরাজিত হন। ফলে, তাঁর সমর্থক গোষ্ঠীগুলি ভারতসমাজে নিন্দনীয় হয়ে যান। কেবল তাই নয়, পরবর্তীকালে আরও বহু শাসকবিরোধী যুদ্ধে এই চণ্ডালজাতি যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেন। আজ যখন সারা দুনিয়ায় পণ্যের জয়জয়কার, ইতিহাস-বিস্মৃতির কারণে আদি পণ্যযোদ্ধার সামাজিক দুর্নাম আজও ঘোচেনি।

ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে যাঁরা জন্মেছিলেন তাঁদের উত্তরপুরুষদের চণ্ডাল বলে। কোনো কোনো গ্রন্থে 'শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে' বলা হয়েছে। এর থেকে প্রথমেই মনে হয়, সেকালে এরকম সম্পর্ক কমবেশি প্রচলিত ছিল, এবং এরকম দম্পতি ও তাদের সন্তানদের মেরে ফেলা হত না। কিন্তু তার পরেই মনে হয়, কথাটি বোধহয় আরও একটু বেশি ওজন ধরে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নরনারীর বিবাহ তখন কমবেশি প্রচলিত ছিলই, এবং বিভিন্ন 'সঙ্কীর্ণ জাতিবিশেষ' হিসেবে যত জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, সবই এরকম মিশ্রণের ফল এবং তাদেরকে সমাজের কোনো না কোনো ধাপে সামাজিক স্বীকৃতিও দেওয়া ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র সেকথা বোঝাতেই 'ব্রাহ্মণীতে শূদ্র কর্তৃক জাত' কিংবা 'শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক জাত' কথাটির প্রয়োগ হয়নি। আরও একটি কথা বোঝাতে ওরকম প্রয়োগ হয়েছে — উচ্চমানের নীতিধারীতে (প্রকৃতিতে) নিম্ন মানের নীতি (পুরুষ) কর্তৃক জাত নতুন নীতি, কিংবা নিম্নমানের নীতিধারীতে উচ্চমানের নীতি কর্তৃক জাত নতুন নীতিও বটে। আজ আমরা বুঝতে পারি, ***পণ্য তো তাই। তাতে মনগুণ ও দেহগুণের মিশ্রণ রয়েছে। তাতে মনের উচ্চতা দেহের নিম্নতায় অধঃপতিত, কিন্তু যথাযথভাবে তাকে ব্যবহার করতে পারলে তাতে দেহের নিম্নতা মনের উচ্চতায় উন্নীত হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ এই পণ্য কুবেরের নীচতায় কিংবা নারায়ণী লক্ষ্মীর উচ্চতায় পরিণত হতে পারে ভক্তের ভক্তির (ব্যবহারের) গুণে। হয়তো সেকারণেই চণ্ডাল সত্তাকে লেঠেলরূপেও ব্যবহার করা গেছে, বিপ্লবীশক্তি রূপেও ব্যবহার করা গেছে।*** স্বাধীনতাসংগ্রামী যোগেন মণ্ডলের জীবনী, তাঁর সময়ের চণ্ডাল সম্প্রদায়ের ইতিহাস এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়। বলে রাখা ভাল, মানুষের চণ্ডাল রূপটিকেই রুদ্রশিব বলে। ভারতের ইতিহাসে একে দিয়ে ভাল কাজ যেমন করানো হয়েছে, তেমনি মন্দ কাজও করিয়ে নেওয়া হয়েছে। দ্র. **নাপিত**।

গুহক চণ্ডালের অস্তিত্বের কেন্দ্র ছিল তাঁর রাজধানী **শৃঙ্গবেরপুর**। শৃঙ্গবের শব্দের অন্য অর্থ হল আদা বা আর্দ্রক। মানবসমাজের যে সত্তাকে চণ্ডাল (চণ্ডগুণধারী) রূপে শনাক্ত করা হয়, আমাদের প্রাচীন শব্দশাস্ত্রীরা দেখেছিলেন, উদ্ভিদজগতে সেই সত্তা রক্ষিত হয় আর্দ্রকে বা আদায় অর্থাৎ শৃঙ্গবেরপুরে। আদার ঝাঁজালো রসকেও চণ্ডাল বলা যায়। এ হল ব্রাহ্মণনীতি ও শূদ্রনীতির এক মিশ্ররূপ। কিন্তু তাতে কী! নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ইতিহাসে তো আমাদের জানিয়ে গিয়েছিলেন — চণ্ডালের করোটির সঙ্গে ব্রাহ্মণের করোটির কোনো ভেদ নেই, আমরা কিন্তু সেকথা শুনেও শুনিনি। আমরা মানবজগৎটাই ঠিকভাবে চিনি না, জানি না, জানতে চাই না; জীবজগৎ উদ্ভিদজগৎ, জড়জগৎকে চিনব কীভাবে!

চণ্ডী (চণ্ডালিকা, চণ্ডিকা, চণ্ডীমণ্ডপ, চণ্ডু, চণ্ডেশ্বর) : ১. ✓চণ্ড্ + ঈ (ঙীপ্)। ২. ***চণ্ডী*** = *গতিশীল চণ্ড-এর আধার যে;* ***চণ্ডালিকা*** = *চণ্ডালকে গতিশীল করে যে আধারশক্তি;* ***চণ্ডিকা*** = *চণ্ডকে গতিশীল করে যে আধার;* ***চণ্ডীমণ্ডপ*** = *চণ্ডীর মণ্ডপ;* ***চণ্ডু*** = *চণ্ ডয়ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে;* ***চণ্ডেশ্বর*** = *চণ্ডীর ঈশ্বর যে।* ৩. **চণ্ডালিকা** = চণ্ডালবীণা, ওষধিভেদ, দুর্গা। **চণ্ডিকা** = চণ্ডী, কোপনা। **চণ্ডীমণ্ডপ** = চণ্ডীর গৃহ, দুর্গাদি প্রতিমার পূজার্থ গৃহ। **চণ্ডু** = অহিফেনের মাদকদ্রব্য বিশেষ। **চণ্ডেশ্বর** = চণ্ডীপতি, শিব,

কবিরাজী ঔষধবিশেষ। (ব.শ.)। (ক) দেবী দুর্গার মূর্তি। এই মূর্তিতে দেবী মহিষাসুর বধ করেন। (খ) মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য কথা। আসলে চণ্ডী মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত কয়েকটি অধ্যায়। এর শ্লোকসংখ্যা সাত শত। ... ভগবতী অসুর শুম্ভের সৈন্যবাহিনী ও প্রধান সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করে 'চণ্ডী' নামে অভিহিত হন। (পৌ.অ.)। **চণ্ডী** = পার্ব্বতীর মূর্ত্তিভেদ, মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি, মারণ উচাটন বশীকরণ (**ষড়যন্ত্র**) প্রভৃতি কার্য্যের অধিষ্ঠাত্রী যোগিনীপ্রধানা দেবী, অতিকোপনা স্ত্রী। (ছা.অ.)। ৪. কোপনা নারী ও দেবী দুর্গা অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কালী, ছিন্নমস্তা, মহামায়া**। সংক্ষেপে সমগ্র জনগণ একটি বিমূর্ত সত্তা। তাকে আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা মূর্ত্ত করেছিলেন মহামায়ার মূর্ত্তিতে। সেই মহামায়ার একটি রূপ হল ক্রুদ্ধ জনগোষ্ঠী, যা রাজবিদ্রোহী জনগোষ্ঠী বা বিপ্লবী জনগোষ্ঠী যে কোনোটিই হতে পারে। একে বলে চণ্ডী। এই চণ্ডী **চণ্ডমুণ্ড**কে হত্যা করেছিলেন। সেই কারণে এঁকে চণ্ডমুণ্ডা, চামুণ্ডা প্রভৃতিও বলা হয়।

চুয়া, চুয়াড় (চোয়া, চোয়াড়) : ২. **চুয়া** = *নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ী যায় যাহাতে, তাহার আধার;* **চুয়াড়** = *চুয়ার (চুঁইয়ে পড়ার) গড়ান-উড়ান (আবর্ত্তন) যাহাতে।* ৩. ক্ষরিত করা, ঝরান, চুয়ান (to distil); পর্ব্বতীয় দস্যু, ব্যাধজাতি, চণ্ডাল, পুরীরক্ষক, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। (ব.শ.)। ৪. distil অর্থে চুয়া ও চোয়া প্রচলিত; দুর্বিনীত এবং দৈহিক বলে বলবান ব্যক্তি সম্পর্কে চুয়াড় বা চোয়াড় গ্রামবাংলায় যথেষ্ট প্রচলিত হলেও শহরে ও অ্যাকাডেমিতে কম প্রচলিত। ৫. কথাটি হল চায়ী (ইচ্ছাকারী) নবরূপে উত্তীর্ণ হয়েছে। চ-চা-চি-এর বেলায় এতক্ষণ ক-বিন্দু থেকে চায়ী যাচ্ছিল খ-বিন্দুতে। কিন্তু এখন সে খ-বিন্দু থেকে বিপরীত দিকে মুখ করে এগোচ্ছে। এই চু যদি গতিশীল হয় তবে সে চুই হয়ে যায় বা চুয়ায় (চুয় = চু + ই + অ, দ্র. গ), ঝরে পড়ে, ক্ষরিত হয়। কিন্তু সে যদি গতিশীল হবে না বলে ঠিক করে এবং যেখানে আছে সেখানেই পালিত হতে শুরু করে, আমরা বলি, সে '**চুপ**' করে গেল। আর যদি খ-বিন্দু থেকে ক্ষরিত হয়ে ক-বিন্দুর সত্তার উপর এসে পড়ে এবং তার অস্তিত্বকে গলিয়ে দিতে শুরু করে, তখন সেই চুয়ান চুয়াড়ই বটে। দ্র. **উপদ্রব**। সেকালে যারা অন্য কোনো সম্প্রদায় থেকে এসে অত্যাচার লুঠপাট করে নিয়ে যেত তাদের বোঝাতে শব্দটির ব্যবহার হত, পরে পরে শব্দটির অর্থ অন্য ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করে।

প্রচণ্ড : দ্র. **চণ্ড**। ৫. প্রকৃষ্টরূপে চণ্ডগুণসম্পন্ন যে, তাকে প্রচণ্ড বলে। সম্প্রতি নেপালের মাওবাদী নেতা নিজের ছদ্মনাম নিয়েছিলেন প্রচণ্ড। চণ্ডীর উত্তরাধিকার মনের গভীরে থাকার কারণে নেপালের মানুষের মনের মাটিতে নামটি গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়।

চত্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : চউ, চউকি, চউতোর, চউথ, চউদ্দ, চউরি(রী), চওড়া, চকদার, চকবন্দী, চকমিলান, চকি, চতুঃ, চতুঃপঞ্চাশৎ, চতুঃশাল, চতুঃশালক, চতুঃশালা, চতুঃশালী, চতুঃশ্লোকী, চতুঃষষ্টি, চতুঃসন, চতুঃসপ্ততি, চতুঃসম, চতুঃসাগরী, চতুঃসীমা, চতুর, চতুরং, চতুরঙ্গ, চতুরন্ত, চতুরপণ, চতুরশীতি, চতুরস্র, চতুরা, চতুরাই, চতুরাক্ষ, চতুরানন, চতুরালি(লী), চতুরাশ্রম, চতুরিম, চতুর্গব, চতুর্থ, চতুর্দ্দন্ত, চতুর্দ্দশ, চতুর্দ্দশী, চতুর্দ্দিক, চতুর্দ্দোল, চতুর্নবতি, চতুর্ব্বর্গ, চতুর্ব্বর্ণ, চতুর্ব্বাহু, চতুর্ব্বিংশতি, চতুর্ব্বিদ্য, চতুর্ব্বিধ, চতুর্ব্বেদ, চতুর্ব্যূহ, চতুর্ভজ, চতুর্ভুজ, চতুর্ম্মাস, চতুর্ম্মুখ, চতুর্যুগ, চতুর্হোত্র, চতুশ্চত্বারিংশৎ, চতুশ্চন্দ্রবাহী, চতুষ্ক, চতুষ্কর্ণ, চতুষ্কি, চতুষ্কোণ, চতুষ্টয়, চতুষ্পথ, চতুষ্পদ, চতুষ্পদী, চতুষ্পাঠী, চতুষ্পাদ, চতুস্ত্রিংশৎ, চতুস্বল, চত্তর, চত্বর, চত্বারিংশৎ, চবুতরা, চব্বিশ, চল্লিশ, চহ, চহঁ, চাইট্টা, চাইর, চার, চাতক, চাতকিনী, চাতর, চাতাল, চাতুর, চাতুরাই, চাতুরালি(লী), চাতুরাশ্রমিক, চাতুর্থক, চাতুর্ব্বর্ণ্য, চাতুর্ব্বিদ্য, চাতুর্ব্বৈদ্য, চাতুর্ম্মাস, চাতুর্য্য, চাদর (ছাদর), চালশা, চালসে, চাল্লিশ, চিকা, চুত, চুয়া(হা)ত্তর, চুয়ান্ন, চুয়াল্লিশ, চুরানব্বই, চুরাশী, চু(চো)হান, চ্যুত, চৃত, চোঁতা, চোঠাই, চোউরি, চোক, চোটা, চোদ্দ, চোবে, চৌ, চৌউরি, চৌক, চৌকা, চৌকন, চৌকস, চৌকা, চৌকাঠ, চৌকি, চৌকী, চৌখণ্ড, চৌখণ্ডি, (চৌখণ্ডী), চৌখণ্ডিয়া, চৌখান, চৌখুপী, চৌখুরি(রী), চৌগাম, চৌগোঁপ্পা, চৌগোঁফা, চৌঘাট, চৌঘুড়ি(ড়ী), চৌচাপটে, চৌচালা, চৌচীর, চৌট, চৌড়া, চৌতরা, চৌতারা, চৌতাল, চৌতিশা, চৌত্রিশ, চৌথ, চৌথাই, চৌদন্তী, চৌদল, চৌদশী, চৌদানী চৌদিক, চৌদিশ, চৌদুলী, চৌদোল, চৌদোলা, চৌদ্দ, চৌধুরী, চৌনরগোট, চৌপথ, চৌপদ, চৌপদী, চৌপল, চৌপা(বা)ড়ি(ড়ী), চৌপায়ী, চৌপালা, চৌপাশ, চৌবাচ্চা, চৌবে, চৌবেড়, চৌবেদী, চৌমহলা, চৌমাথা, চৌমুনী, চৌমুড়া, চৌমোহনী, চৌযুগ, চৌরঙ্গ, চৌরশ(স), চৌরাশি(শী), চৌরাস্তা, চৌশাল, চৌষট্টি, চৌহদ্দী, চৌহান, ছক, ছকা।

চত্ = চায়ীর তরণ। **চত** = চায়ীর তরণ যাহাতে।

চতুর, চতুঃ (চতুর্, চার) : ১. ✓চত্ (প্রার্থনা) + উর (উরচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **চতুর** = *চায়ী নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে রহে যাহাতে (সকল দিকের বিষয়ে জানে যে);* **চতুঃ** = *চায়ীর নবরূপে উত্তরণ নিঃশেষ যাহাতে;* **চতুর্** = *চায়ীর নবরূপে উত্তরণ যাহাতে;* **চার** = *যাহা চর (= < চতুর, চত্বারঃ, চত্বারি) হইতে জাত।* ৩. **চতুর** = কার্য্যদক্ষ, পটু, বিদগ্ধ, পণ্ডিত, রসিক, উপভোগক্ষম, উপভোগযোগ্য, সুভগ, মনোজ্ঞ, মনোহর, মধুর, ধূর্ত্ত, আলস্যহীন, বক্রগতি, হস্তিশালা, নায়কবিশেষ। **চতুঃ** = চারি, চতুঃসীমা-বদ্ধ বিস্তৃত সমভূমি। ৪. যথাক্রমে clever ও four অর্থে প্রচলিত। ৫. 'প্রবল দূষণের কারণে আমাদের চারিদিকের (বা চতুর্দিকের) বায়ু এখন অত্যন্ত দূষিত।' এই বাক্যে চারিদিক বা চতুর্দিক শব্দের মানে হল আমাদেরকে ঘিরে থাকা বৃত্তাকার সমস্ত দিক। আমরা যেন সেই বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে দূরে পরিধির সমস্ত বিন্দুর দিকে আঙুল দেখাচ্ছি। সত্যিই তো! এইরকম ক্ষেত্রে আমরা 'সকল দিক' না বলে চার-দিক বা 'four'-দিক বলি কেন? দশদিক বলা যেতে পারত, কিন্তু সেরকমও বলি না আমরা। সমস্ত বাংলাভাষী মানুষই এইরূপ 'বৃত্তাকার সমস্ত দিক' বোঝাতে 'চারিদিক', 'চারদিক', 'চতুর্দিক'

অনায়াসে বলে থাকেন? কেন এরকম ভুল কথা বলেন তাঁরা?

চত শব্দের অর্থ হল 'চায়ী (ইচ্ছাধারী > ইচ্ছা) তারিত যাহাতে', ব.শ. যাকে বলেছেন 'প্রার্থনা'। এর রহস্য হল — মানুষকে অপূর্ণ অবস্থায় জন্ম দিয়ে ভগবান তো ছেড়ে দিলেন, এবার নিজেকে পূর্ণ করার জন্য নিজের সমস্ত দিকে স্থিত জগতের কাছে হাত পেতে প্রার্থনা করে বা চত করে মানুষকে ঘুরে বেড়াতে হয়। এর ফল তো একদিন ফলবেই! চত একদিন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে সমস্ত দিক থেকে পাল্টা হাত বাড়াবেই, অর্থাৎ ঘিরে থাকা জগৎ হাজির হবে পাল্টা প্রার্থনা নিয়ে। একেই বলে চতু। এই চতু যখন সকল দিক দিয়ে এতকালের চিরপ্রার্থী মানুষটিকে ঘিরে ধরে, তখন সেই পাল্টা প্রার্থনা সকল দিক দিয়ে চতুঃ (অন্য শব্দের সঙ্গে সন্ধিকালে যা 'চতুর্' হয়ে যায়) হয়ে দেখা দেয়। একে বলে চতুর্দিক, অর্থাৎ 'পাল্টা প্রার্থনাকারী সর্বদিক'। আদিতে চতুঃ শব্দের এই রকম মানেই ছিল। এই চতুঃ (বা চতুর্) বা সর্বদিকের সমস্ত পাল্টা প্রার্থনার বিষয়ে জ্ঞান রহে যার, তাকে সেকারণেই চতুর বা চালাক বলে।

এখন প্রশ্ন হল, সেই সর্বদিক-বাচ্য 'চতুর্দিক' কেমন করে four দিক পদবাচ্য হয়ে গেল? তা হয়েছে সম্ভবত এইভাবে — ঘিরে থাকা বৃত্তের টানা (হরাইজন্টাল) ও পোড়েনের (ভার্টিক্যালের) দুটি ব্যাস বৃত্তের পরিধির যে চারটি বিন্দুতে থাকে, সেই চারটি বিন্দু, অর্থাৎ মানুষকে ঘিরে থাকা বৃত্তের পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের চারটি বিন্দু সর্বাগ্রে মানুষের সামনে প্রার্থী রূপে স্পষ্ট হয়। তারপর সেই বিন্দুগুলির সংযোগকারী বৃত্তাংশটি তার বক্ররেখারূপ হারিয়ে ধীরে ধীরে সরলরেখায় পরিণত হয়ে যায়। তখনই মানুষের চার কোণের ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতঃপর স্পষ্ট হয়ে ওঠে চতুর্ভুজের ধারণা। সর্বদিক হয়ে যায় মানুষকে কেন্দ্র করে অবস্থিত বর্গক্ষেত্রের চার বাহু বা চার দিক। সম্ভবত এভাবেই মানুষকে ঘিরে-থাকা পাল্টা-প্রার্থনাকারী গোলাকার জগতের (চতুঃ-র) ধারণা থেকে মানুষ চার বা four-এর ধারণায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

এ-প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা এসে যায়। চতুঃ বা সর্বদিক বলতে মানুষের যে আদি ধারণা, তা বৃত্তাকার। মানুষ যেন তার কেন্দ্রে। এই ধারণার জন্ম হয়েছিল মানুষ যখন যৌথসমাজে বাস করত, এবং অখণ্ড ধারণার অধিকারী ছিল। শূন্যের ধারণাও জন্মেছিল সেই সময়ে। একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি (যা খণ্ড ধারণার জন্ম দিয়ে থাকে) ধারণকারী দক্ষের আবির্ভাবের পর যৌথসমাজ যেমন ক্রমে ভেঙে ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, বৃত্তের ধারণাও খণ্ডিত হয়ে চতুর্ভুজ, ত্রিভুজ ইত্যাদি হতে থাকে। প্লেটো ঠিকই বলেছেন যে, বৃত্তই হল perfect geometrical shape। মনে রাখা ভাল, প্রচার-বিচার-আচার প্রভৃতি শব্দে যে চার-কে পাওয়া যায়, সে জন্মেছে 'চর' শব্দ থেকে। দ্র. **চারা**। দ্র. **এক, দুই, তিন**।

৬. ফারসি চোহার, Avesta - chathru, cathra; Pahlavi - cahar; Latin - quattuor; Russian - chetvero। (ব.শ.)। বলে রাখা ভাল, আমরা 'চ' রূপে যে উত্তরাধিকার পেয়েছি, ল্যাটিন তা পেয়েছে qu রূপে। সেই কারণে আমরা যাকে 'চত্বার' রূপে পেলাম, ল্যাটিনভাষীরা তাকে পেয়েছিল quattuor রূপে। সেখান থেকেই ক্রমে ইংরেজির quater, quarter।

চতুরাশ্রম : দ্র. **বর্ণাশ্রম**।

চতুর্থ (চতুর্থক, চতুর্থী) : ২. **চতুর্থ** = *চতুঃ (চতুর্) স্থিত যাহাতে।* **চতুর্থক** = *চতুর্থ-কারী যে বা চতুর্থ তিথিতে সক্রিয় যে।* **চতুর্থী** = *চতুর্থের গতিশীল ধারী যে।* / **চতুর্থ** = চতুঃ সংখ্যা পূরণ করে যে। **চতুর্থক** = যে জ্বর প্রতি চতুর্থ দিনে হয়। (ব.শ.)। ৩. **চতুর্থ** = চার সংখ্যার পরবর্ত্তী, চতুর্থভাগ, চতুর্থাংশ, বর্গের চতুর্থ বর্ণ, পিতামাতার মৃত্যুর চতুর্থ দিনে বিবাহিতা কন্যার করণীয় শ্রাদ্ধ। **চতুর্থী** = চন্দ্রের চতুর্থ কলার ক্রিয়াকালরূপ তিথি, (ব্যাকরণে) বিভক্তিবিশেষ, ভূঃ ভূবঃ স্বঃ — এই ব্যস্ত ব্যাহৃতিত্রয়ের পরবর্তী সমস্ত ব্যাহৃতি 'ভূর্ভূবঃস্বর্', 'মহঃ'-ব্যাহৃতি। (ব.শ.)। ৪. **চতুর্থ** fourth অর্থে, **চতুর্থী** উপরোক্ত তিথি অর্থে এবং ব্যাকরণের বিভক্তি অর্থে প্রচলিত। **চতুর্থক** অপ্রচলিত। ৫. আমরা জানি আদিতে চতুর্ শব্দের অর্থ ছিল প্রার্থনাকারী-সর্বদিক। পরে পরে শূন্য থেকে দশ, শত ইত্যাদি গণনা করবার যোগ্যতা মানুষ অর্জন করে ফেলে। ফলে, চতুঃ সম্পূর্ণরূপে 'চার'-অর্থবাচক হয়ে যায়। কিন্তু তার পরও একটি সমস্যা থেকেই যায়। আঙুল দিয়ে গণনার সূত্রপাত করা হবে, নাকি আঙুলের মাঝে যে ফাঁক, সেই ফাঁক দিয়ে গণনার সূত্রপাত করতে হবে? (পাটিগণিতের খুঁটি পোঁতার অঙ্কে আজও সেই সমস্যার কথা শেখানো হয়।) আঙুলকে সূত্রপাতে ধরলে 'চার সংখ্যার পরবর্তী' — এই অর্থটিই যথার্থ হয়। পাণিনি থেকে সেই কথাটিকেই তুলে ব.শ. জানিয়ে গেছেন যে, চতুর্থ শব্দের মানে হল 'চার সংখ্যার পরবর্ত্তী'। চন্দ্রের কলার বা তিথির হিসেবেও মাঝের ফাঁকটিকে মাপার বা গণনা করবার এই নীতি মান্য করতেই হয়।

চতুর্ব্বর্ণ : দ্র. **বর্ণ**।

চতুর্ব্বেদ : দ্র. **বেদ**।

চতুর্ম্মুখ : ২. *চারটি মুখ যাহার।* ৩. মুখচতুষ্টয়যুক্ত, চতুর্ম্মুখরূপী, চতুরানন, ব্রহ্মা। (ব.শ.)। ব্রহ্মার অন্য নাম। সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই দৈত্য ব্রহ্মার বরে অমর হয়। তাদের পরস্পরের হস্ত ব্যতীত অন্য কারো হস্তে তাদের মৃত্যু হবে না, এই ছিল ব্রহ্মার বর। ... তখন ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য তিল তিল করে সংগ্রহ করে এক রূপবতী নারী সৃষ্টি করতে বলেন। এই নারীরই নাম হয় তিলোত্তমা। এই তিলোত্তমাকে নিয়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হওয়ায় তারা পরস্পরের হাতে নিহত হয়। সৃষ্টির পর তিলোত্তমা ঘুরতে ঘুরতে যেদিকেই যায়, তাকে দেখবার জন্য সেই দিকেই ব্রহ্মার একটি করে মুখ নির্গত হয়। এইরূপে ব্রহ্মা চতুর্মুখ হন। ইন্দ্র তিলোত্তমাকে দেখবার জন্য সহস্রলোচন হন। শিব স্থিরাবস্থা প্রাপ্ত হন বলে তাঁর নাম হয় স্থাণু। (পৌ.অ.)। দ্র. **তিলোত্তমা**। ৪. অপ্রচলিত। ৫. পাঁচ মুখ যার, তিনি হলেন শিব। তিনি 'কুকথায় পঞ্চমুখ'। সৃষ্টির কথা, আবিষ্কারের কথা পাঁচ কাহন করে পাঁচজনকে বা সর্বজনকে বলা তাঁর অনিবার্য স্বভাব। তাই তিনি পঞ্চানন। জ্ঞানজীবী ব্রহ্মারও নাকি পাঁচটি মুখ ছিল। আপন কন্যা শতরূপার রূপে মুগ্ধ হলে কামুক ব্রহ্মার একটি মুখ শিবঠাকুর কেটে দেন। ব্রহ্মা তাই চতুরানন। অনেকের মতে তিনি তিলোত্তমাকে দেখে চতুর্ম্মুখ

হয়েছিলেন। এই বক্তব্যগুলি বৈদিক সভ্যতার সূত্রপাতের (আনুমানিক ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের) পর থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়ে ভারতসমাজে ঘটে যাওয়া জ্ঞানজীবীদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার (ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় প্রদত্ত) বিবরণ; **ব্রহ্মা, শিব, তিলোত্তমা, শতরূপা** প্রভৃতি শব্দের প্রত্যেকটির অর্থ জেনে প্রেক্ষিত অনুসারে যার অর্থ অনুধাবন করতে হবে।

চতুর্যুগ : ২. যাহাতে চতুর্যুগ আছে। (ব.শ.)। ৩. যুগচতুষ্টয়, চারিযুগ। (ব.শ.)। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি — এই চার যুগ। সত্য যুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ বৎসর। এই যুগে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, ও নৃসিংহ — এই চার অবতার আবির্ভূত হন। ত্রেতা যুগের পরিমাণ ১২, ৯৬, ০০০ বৎসর। এই যুগে বলরাম ও বুদ্ধ এই দুই অবতারের আবির্ভাব ঘটে। দুই যুগের পর দ্বাপর যুগ, অর্থাৎ তৃতীয় যুগ। এর পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বৎসর। কলিযুগের পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বৎসর। এহ যুগের শেষে বিষ্ণু কল্কি অবতার রূপে অবতীর্ণ হবেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই হিসেব দৃশ্যত ত্রুটিপূর্ণ বটে, এবং তা নিয়ে নানান মতপার্থক্যও আছে। আমরা বৎসর-সংখ্যানির্ভর এই হিসেবকে নস্যাৎ করে দিচ্ছি না, আবার গ্রহণও করছি না। আমাদের ধারণা, এই হিসেবের ভিতরে নিশ্চয় কিছু নিয়ম ও যুক্তিগ্রাহ্য কোনো বক্তব্য আছে, যা বুঝে নেওয়ার যোগ্যতা আমরা এখনও অর্জন করতে পারিনি। যে সংস্কৃত ভাষায় আদিতে এইভাবে যুগের হিসাব লেখা হয়েছিল, তার প্রতীকী অনুবাদও বিষয়টিকে ভুলভাবে উপস্থাপিত করে থাকতে পারে।

তা সে যাই হোক, আমাদের দেশে মানবসভ্যতার কাল-বিভাজনের যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা এই রকম — সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ, ও কলিযুগ। এটি **জগৎ**-দর্শনের অখণ্ড নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাতে অস্তিত্বের বিন্দুরূপ থেকে সিন্ধুরূপ পর্যন্ত সব কিছুর পরিণতির অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে রূপান্তর থাকে এবং প্রতিটি অধ্যায়ের চারটি পর্ব থাকে। চার পর্বের শেষে একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি হয় ও পরবর্তী অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। পৌরাণিক ভাষায় এই পরিণতিকে বলা হয় — সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-একার্ণব এবং পুনরায় সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি-একার্ণব। এই কাল-বিভাজন মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি মানবসমাজের ও বিশ্বব্যবস্থার জীবনের ক্ষেত্রেও সত্য। (বাংলাভাষীগণ, যে-ব্যক্তির তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, তাকে **বৃদ্ধ** বলেন।) কিন্তু কাল-বিভাজনের এই অখণ্ড নীতি থেকে পরবর্তী কালের জ্ঞানীগুণীগণ সরে আসেন। গড়ে ওঠে খণ্ড নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কাল-বিভাজনের ধারণা। সে-ধারণা আরও খণ্ডিত হয় ঐতিহাসিক ও আধুনিক পণ্ডিতদের প্রস্তর যুগ, তাম্র-যুগ, লৌহ-যুগ ... ইত্যাকার অতি-খণ্ডিত বিভিন্ন ধারণায়। এমনকি, ভারতের ক্ষেত্রে আমাদের উদ্ধার করা কাল-বিভাজনের ধারণাটিও খণ্ড হয়ে যায়, যদি না তাতে একার্ণবের বা একাকারের কালটিকে আমরা যুক্ত করে নিই। সেক্ষেত্রে ভারত-সমাজের কাল-বিভাজন লিখতে হবে এই ভাবে — সনাতন-যুগ (একার্ণব), বৈদিক-যুগ (সত্য-ত্রেতা-), বৌদ্ধ-যুগ (ত্রেতা-দ্বাপর), হিন্দু-যুগ ও মোগল-যুগ (দ্বাপর-কলি-), ব্রিটিশ-যুগ ও স্বাধীন-যুগ (-কলি-ঘোরকলি), ও একাকারের যুগ (-একার্ণব)। বিশ্বায়নের নামে বর্তমানে একাকারের যুগের সূত্রপাত ঘটে গেছে। এই একাকারের পরে মানবসভ্যতা আদৌ যদি টিকে থেকে যায়, তবে সে তার পরবর্তী অধ্যায়ে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং নতুন সত্যযুগের সূত্রপাত ঘটাবে।

এ প্রসঙ্গে আমরা পাশ্চাত্যের যুগ-বিষয়ক ধারণার কথা স্মরণ করতে পারি। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার আগে পাশ্চাত্যের মানুষ তিন রকম কালের কথা জানতেন — Golden Age (= আদি দেবতা Kronos-এর রাজত্বের কাল), Silver Age (= ইন্দ্রাদি দেবতাদের স্বজাতি দেবরাজ Zeus বা 'দৌ' = রোমানদের Jupiter বা দৌ পিতর্-এর যুগ), এবং Iron Age (= কলিযুগ, ঐতিহাসিকদের তথাকথিত Iron Age নয়)। একটু গভীরে গেলে টের পাওয়া যায়, আমাদের ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ-দুটিকে একত্রে ধরে রেখেছে পাশ্চাত্যের Silver Age-এর ধারণা। তার মানে, আমরা সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি রূপে যে চতুর্যুগের ধারণা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, পাশ্চাত্যও তাঁদের গ্রীক-রোমান (ইত্যাদি) পৌরাণিক ভাবনায় সেই একই ধারণাকে তাঁদের স্বর্ণযুগ (Golden Age), রৌপ্যযুগ (Silver Age), ও লৌহযুগ (Iron Age) রূপে পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে গড়ে-ওঠা ইহুদি বংশজাত খ্রিস্টীয় ভাবনা পাশ্চাত্যের এই কাল-বিভাজনের আদি ধারণাকে গ্রাস করে নেয়। তাঁরা আনেন Prelapsarian, Redemption, ও Doomsday — এই তিন কালের ধারণা। Prelapsarian হল Adam-এর পাপের আগের স্বল্পকাল, যার পার্থিব মাপ নেই; এটি আমাদের আদি যুগ বা **সনাতন-যুগ**-এর ধারণার সঙ্গে মেলে। Redemption হল Adam-এর পাপ থেকে যিশুর আত্মবলিদান পর্যন্ত সময়কাল; এটি আমাদের বৈদিক-যুগ থেকে বৌদ্ধ-যুগের সূত্রপাতের কাল পর্যন্ত যে-সময়, তার সঙ্গে কিয়দংশে মেলে। আর, Doomsday হল Crucifixion দ্বারা Redemption থেকে Day of Last Judgement পর্যন্ত সময়কাল। এটি আমাদের কোনো যুগের ধারণার সঙ্গেই মেলে না। ফলে, প্রাচীন পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মানবসভ্যতার কাল-বিভাজনকে যেভাবে বুঝেছিলেন, সেখান থেকে পাশ্চাত্যের মানুষের পতন ঘটে যায়। অতঃপর তার সঙ্গে যুক্ত হয় তথাকথিত আধুনিকতাবাদীদের আরও খণ্ডিত যুগ-বিভাজন-জ্ঞান। এরূপ যুগ-বিভাজনে অতীত এবং ভবিষ্যৎ দুটোই অধরা থেকে যায়। দ্র. **কলিযুগ, যুগ**।

চাতক (চাতকী, চাতকিনী) : ১. ✓চত্ (প্রার্থনা) + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে; চাতক + ইনী। (ব.শ.)। ২. / যে মেঘজল প্রার্থনা করে। (ব.শ.)। ৩. পক্ষিবিশেষ, চাতক-পক্ষি-স্ত্রীজাতি, চাতকী পদ্যে চাতকিনী। (ব.শ.)। ৪. 'চাতকপাখি' অর্থেই প্রচলিত। ৫. চাতক শব্দটির কথা ব.শ. সঠিকভাবেই বলে দিয়েছেন। আমরা কেবল এটুকুই বলতে পারি, আমাদের সব প্রাচীন নামই সেই সত্তার কোনো না কোনো ক্রিয়ার কথা বলে দেয়। পাখির ক্ষেত্রেও সেই নীতি অনুসৃত। চাতক প্রার্থনা করে বলেই **চাতক**। তবে এখানেই আমাদের শব্দব্যবহার থেমে থাকে না। এই চাতক পা-পিহ্, পা-পিহ্, পান

করব, পান করব, **বৃষ্টিজল দাও, বৃষ্টিজল দাও,** ইত্যাদি বলে থাকে; সেকারণে তাকে **পাপিয়াও** বলে। এই পাপিয়া আর পণ্যকামী খদ্দের একই সত্তা; তাকে **পাপীও** বলে। তবে এই 'পাপী' নিন্দাজনক নয়, বাংলার দুষ্টু এবং ইংরেজির naughty শব্দের মতো **অম্লমধুর**। এই **পাপিয়া 'চাঁপা**র বনে' বা '**মহুয়া** বনে' গান গায়; অর্থাৎ এই চাহিদাকারী খদ্দের **চম্পা**-উৎপাদনব্যবস্থা ও **মহুয়া**-উৎপাদনব্যবস্থার কাছে আরও পণ্য দাও বলে তার চাহিদার কথা জানাতে থাকে। তার মানে, একালে যাকে আমরা বাজারের 'চাহিদা' বলি, সেকালে তাকেই চাতকের বা পাপিয়ার প্রার্থনা বলা হত। অতএব শেষ বিচারে একে সাধারণ মানুষ বা শ্রমিক-মজুর-প্রজাবৃন্দ বলাই যায়। দ্র. **চম্পক, কপোত, ঘুঘু, মহুল, ত্রিশিরাঃ।**

চূত : ১. ✓চুত্ (ক্ষরণ) + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ীর আধার তারিত হয় যাহাতে।* ৩. আম্রবৃক্ষ, চূতবিকার, আম্রফল, চূতকুসুম, গুহ্যদেশ। কবিপ্রসিদ্ধি যে, চূত স্ত্রীগীতে বিকসিত হয়; স্ত্রীগীত ইহার দোহদ। (ব.শ.)। দ্র. **দোহদ**। ৪. প্রায় অপ্রচলিত। ৫. চূত শব্দটি সম্ভবত পাণিনির কালে ছিল না। ব.শ. যে যে গ্রন্থ থেকে শব্দটিকে উদ্ধার করেছেন, সবই বলতে গেলে মধ্যযুগের বাংলার। এর প্রতীকী অর্থ যেগুলি ব.শ. দিয়েছেন, তা মূলত দুটি — আম (গাছ, ফল, ফুল) ও গুহ্যদেশ বা rectum। মধ্যযুগের বাংলা এমন একটি শব্দ উদ্ভাবন করল কেমন করে? তার প্রকৃত অর্থই-বা কীরূপ, যা একই সঙ্গে এমন বিসদৃশ দুটি বস্তু 'আমগাছ' ও 'গুহ্যদেশ'কে বোঝাতে সক্ষম?

গু শব্দে আমরা জেনেছি, গুহ্যদেশ থেকে গু বা 'নবরূপে উত্তীর্ণ গামী' **মল** (**মাল** = goods = 'গুড্স্') রূপে বহির্গত হয়। **আম** শব্দে আমরা জেনেছি, এর ভেতর আমিত্বের ভাব, তেজের কণা ইত্যাদি রয়েছে, যাকে স্বাধিকারে উৎপাদিত বস্তুরূপে শনাক্ত করা হয়েছে। এখন আমরা জানছি, চূত শব্দের অর্থ হল সেই গুহ্যদেশ এবং আমগাছ, তার ফুল, ফল। তার মানে, চূত এমন একটি ব্যবস্থার কথা বলে, যার থেকে 'চুঁইয়ে চুঁইয়ে' বা ক্ষরিত হয়ে হয়ে এমন কিছু বেরিয়ে আসছে, যা স্বাধিকারে উৎপাদিত বস্তুই বটে! তার মানে, চূত শব্দটির একটি সামাজিক ও একটি উদ্ভিদজাগতিক রূপ রয়েছে। এবং দুটোই সত্য। এর সামাজিক সত্যটি এরকম — পাঠান রাজত্বের ছত্রছায়ায় বঙ্গসমাজে পুনরায় শত শত কুটীরশিল্প গড়ে উঠেছে, তার থেকে প্রচুর পরিমাণে বিশেষ বিশেষ পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে, চাঁদ সদাগরেরা সদাগরি শুরু করছেন, চাহিদা যত বাড়ছে ততই উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ছে। নগদ নারায়ণ লাভ হচ্ছে। এই কুটীরশিল্পজাত রপ্তানিযোগ্য পণ্যকে চূত বলে। আর, উদ্ভিদজাগতিক সত্যটি হল — mango গাছকে মেয়েরা আলিঙ্গন করছে বা গীত শোনাচ্ছে এবং তার ফলে সে গাছের প্রচুর পরিমাণে মুকুল ও mango ফল ফলছে। এই ফলটির মধ্যে রয়েছে আমিত্বের গুণ বা ইন্দ্রগুণ বা বিষ্ণুগুণ। তাই এই আমকে বলে চূত।

এই পর্যন্ত আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না। জনসাধারণের চাহিদাকে 'স্ত্রীগীত' বলতেও অসুবিধে নেই, যদি তাকে সামাজিক ব্যবস্থার আধারশক্তি বা প্রকৃতিরূপে বুঝি। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় mango গাছকে গান শোনানো বা আলিঙ্গনের বেলায়। কুটীরশিল্প-ব্যবস্থাকে চাহিদার গান শোনালে সে অধিক উৎপাদন করতেই পারে, কিন্তু mango গাছকে মানবীর গান শোনালে সে অধিক ফল ফলাবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? আর সেকথা যদি সত্যিই হয়, সেকথা আমাদের মধ্যযুগের পূর্বপুরুষেরা জানলেন কীভাবে? দ্র. **দোহদ**। ৬. ইংরেজি chute (পূর্বের উচ্চারণ 'চুট্' বর্তমানের 'শুট্')।

চোবে, চৌবে (চৌবেদী), চৌধুরী : দ্র. **পদবী**।

চন্দ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : চন, চনচন, চনমন, চনমনে, চনা, চন্দ্, চন্দ, চন্দন, চন্দনকলিকা, চন্দনগিরি, চন্দনধেনু, চন্দনপঙ্ক, চন্দনপর্ব্বত, চন্দনপাটা, চন্দনপীঁড়ি, চন্দনবোড়া, চন্দনশাল, চন্দনসার, চন্দনা, চন্দনাচল, চন্দনাদিতৈল, চন্দনাদ্রি, চন্দনি(নী), চন্দনীয়া, চন্দা, চন্দ্র, চন্দ্রক, চন্দ্রকলা, চন্দ্রকান্ত, চন্দ্রকান্তি, চন্দ্রগুপ্ত, চন্দ্রচূড়, চন্দ্রপুলী, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রবল্লরী, চন্দ্রবল্লী, চন্দ্রবিন্দু, চন্দ্রবিম্ব, চন্দ্রব্রত, চন্দ্রভাগা, চন্দ্রমণি, চন্দ্রমণ্ডল, চন্দ্রমল্লিকা, চন্দ্রমল্লী, চন্দ্রমা, চন্দ্রমাঃ, চন্দ্রমালতী, চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমৌলি, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রলোক, চন্দ্রশালা, চন্দ্রশেখর, চন্দ্রহা, চন্দ্রহার, চন্দ্রহাস, চন্দ্রা, চন্দ্রাণী, চন্দ্রাতপ, চন্দ্রানন, চন্দ্রাপীড়, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রাভাস, চন্দ্রায়ণ, চন্দ্রার্দ্ধ, চন্দ্রিকা, চন্দ্রিম, চন্দ্রিমা, চন্নন, চাঁদ, চাঁদআ, চাঁদওয়া, চাঁদড়(র), চাঁদনি, চাঁদনী, চাঁদবা, চাঁদমারী, চাঁদমালা, চাঁদয়া, চাঁদা, চাঁদাড়, চাঁদি(দী), চাঁদোয়া, চান্দোয়া, চাঁন, চান, চানা, চানাচুর, চান্দ, চান্দআ(য়া), চান্দড়, চান্দনি, চান্দনিক, চান্দা, চান্দ্র, চান্দ্রমস, চান্দ্রমাস, চান্দ্রায়ণ।
চন্ = চায়ীর নাকরণ। **চন** = চায়ীর নাকরণ যাহাতে; চঅন অন যাহাতে।

চনচন (চনমন, চনমনে) : ১. ধ্বন্যাত্মক সংস্কৃত শব্দ ✓চন্ = শব্দ। (ব.শ.)। ২. ***চনচন*** *= রহস্যরূপী চায়ী অন থাকে যাহাতে, তাহার দ্বিত্ব;* ***চনমন*** *= চন দ্বারা আবিষ্ট যে মন;* ***চনমনে*** *= চন দ্বারা আবিষ্ট মন দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ৩. গো-মহিষাদির মূত্রত্যাগের শব্দ। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. আমাকে চয়ন করো চয়ন করো যে বলে, আমরাও যাকে চাই, এইরূপ যে-চায়ী, সে অন থাকে যাতে, তাকে বলে চন্। এই চন্ অংরূপিণীর পাঁচটি (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ) লোকেই নানা রূপে অজস্র সত্তার ভিতরে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এর নিম্নতম বাহ্যিক রূপ হল গরুর চোনা, শস্যরূপ হল চানা (চানাচুর), উদ্ভিদ-জাগতিক রূপ হল চন্দনকাঠ, জীবজাগতিক রূপ হল চাঁদা মাছ ও চন্দনাপাখি, ময়ূরের লেজের পালকের চাঁদা, সর্বোচ্চ বাহ্যরূপ হল চন্দ্র (চাঁদ), এবং 'বিমূর্ত্ত কিন্তু সক্রিয়' রূপ হল চাঁদি, চন্দনগিরি, চন্দ্রবংশ ইত্যাদি। এই সত্তাগুলি থেকে চায়ী তার রহস্যময় শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে আমাদের মনের কাছে আসে, কানে-গায়ে-চোখে-জিভে-নাকে ধরা দেয়, আমাদের মনকে 'আহ্লাদ' দেয়, আহ্লাদিত করে; তাই আমরাও সেগুলিকে চাই। সেগুলির জন্য আমাদের মন 'আনচান' করে, 'চনমন' করে, চনমনে হয়।

চন্দন (চন্দনা, চন্দনি, চন্দনগিরি) : ১. ✓চন্দি + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চন্ দান অন (on) থাকে যাহাতে। /* আহ্লাদ জনন করে যে। (ব.শ.)। ৩. **চন্দন** = চন্দনবৃক্ষ, চন্দনকাষ্ঠ, চন্দনপঙ্ক, চন্দনরস, শ্রেষ্ঠার্থ, আনন্দজনক, প্রীতিকর। **চন্দনা** = শারিকাভেদ, পাখায় রক্তচন্দনের মত চিহ্নযুক্ত একজাতীয় টিয়া। **চন্দনি** = গোরোচনা। **চন্দনগিরি** = মলয়াচল, চন্দনপর্ব্বত, চন্দনাচল, চন্দনাদ্রি, চন্দনজনক গিরি। (ব.শ.)। ৪. চন্দনি ও চন্দনগিরি অপ্রচলিত। চন্দন 'চন্দনকাঠ' অর্থে এবং চন্দনা বিশেষ পাখি অর্থে প্রচলিত। ৫. তথ্যানুসারে উপরোক্ত সত্তাগুলিতে 'চন্ দান অন' থাকে। এদের বাহ্য রূপগুলিকে আমরা চিনতে পারি। এমনকি চন্দনকাঠ যে পর্ব্বতে পাওয়া যায়, তাকেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু যে মুহূর্তে বলা হয়, সেই চন্দনগিরি আসলে মলয়াচল, তখনই তা আর বাহ্যরূপে থাকে না, হয়ে যায় 'বিমূর্ত কিন্তু সক্রিয়'। এ-চন্দনগিরি তখন পণ্যগন্ধী ধনতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশন বা সংস্থা হয়ে যায়, যেখান থেকে অর্থময় চন্দনগন্ধ মলয়পবন রূপে চারিদিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। আর তার পরেই প্রশ্ন দেখা দেয়, সব চন্দনের কি এরকম বিমূর্ত রূপ আছে?

হ্যাঁ, কমবেশি আছে। আছে বলেই যা-কিছু যায় অর্থাৎ **গো** বা পণ্য, তাদের থেকে যে লিকুইড মানি বেরয় সেই চন্ বা টাকার ঝনঝনানি আমাদের কাছে চন্দনি বলে মনে হয়! আর তখনই গোমূত্রের বা গোরোচনার প্রকৃত মানেটা বুঝতে পারি। বুঝতে পারি, চন্দনি তিন লোকেই বিদ্যমান — দেহের দুনিয়ায় তা গরুর মলমূত্ররূপে, দেহমনের যৌথতার দুনিয়ায় তা ধনসম্পদের ছনছনি রূপে, এবং মনের দুনিয়ায় তা জ্ঞাত-অজ্ঞাত জ্ঞানসম্পদের হাতছানি রূপে সগৌরবে বিদ্যমান। বুঝতে পারি, আমাদের ভাষার্থবিস্মৃত পুরোহিতগণ **চন্দনি**র শুধুমাত্র নিম্ন অর্থটুকু বুঝে, গোময়-গোমূত্র খাইয়ে, আমাদের কোথায় নামিয়ে এনে দাঁড় করিয়েছেন! ফলস্বরূপ আমাদের ছেলেমেয়েরা সেই পুরোহিতের সত্যকেই বাংলাভাষীর একমাত্র সত্য মনে ক'রে নিজেদেরকে 'গোচোনা-ভুক' প্রাণী ভাবে এবং হীনম্মন্যতায় ভোগে, বিশ্বের সামনে মাথা তুলে কথা বলতে পারে না। এমতাবস্থায় আমাদের অ্যাকাডেমির পরিচালক পণ্ডিতদের করণীয় ছিল পুরোহিতদের বিস্মৃত ভাষার্থ সবাইকে বলে দেওয়া। কিন্তু সে পরিশ্রম তাঁরা করেননি। পুরোহিত তবুও চন্দনি শব্দের অন্তত একটি অর্থ মনে রেখেছেন, কিন্তু এই ভাষাবিশেষজ্ঞরা সবগুলি অর্থকেই ফেলে দিয়ে পাশ্চাত্যের শরণাপন্ন হয়েছেন। যেহেতু পাশ্চাত্যের ভাষায় এমন শব্দ নেই যার অর্থ হতে পারে চন্দনি, সেহেতু চন্দনি একটি বাজে শব্দ; ওটা ফেলে দাও — এই তাদের সিদ্ধান্ত। অ্যাকাডেমি তাই চন্দনি শব্দটিই ফেলে দিয়েছে — না রহেগা বাঁশ, না বজেগি বাঁশরী।

চন্দ্র : ১. ✓চন্দ্ + র (রক্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চন্ দান 'বর্ত্তমান রহে যাহাতে। /* আহ্লাদ করে যে। (ব.শ.)। ৩. দেবতাবিশেষ, চাঁদ, গ্রহবিশেষ, কর্পূর, (সাদৃশ্যে) স্বর্ণ, জল, বিসর্গবর্ণ, ময়ূরপুচ্ছস্থ গোলচিহ্ন, রক্তমুক্তাফল, চন্দ্রদেবতাক ঈড়া নাড়ী, আহ্লাদজনক দ্রব্যমাত্র, শ্রেষ্ঠার্থক, দ্বীপবিশেষ, (যোগশাস্ত্রে) ভ্রূ-মধ্যস্থ সোমমণ্ডল, চন্দ্রদেবতাক মৃগশিরা নক্ষত্র, ১ সংখ্যা, চন্দ্রসদৃশ জ্যোতিষ্কমণ্ডল, চন্দ্রগুপ্ত। (ব.শ.)। (ক) ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রিমুনির পুত্র। জন্মের পরেই চন্দ্র ত্রিচক্ররথে আরোহণ করে পৃথিবী পরিক্রমা ও আলোকদান করতে আরম্ভ করেন। দক্ষের ভরণী, কৃত্তিকা, আর্দ্রা, অশ্লেষা, মঘা, উত্তরফাল্গুনী, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, রোহিণী প্রভৃতি সাতাশটি কন্যাকেই ইনি বিবাহ করেন। এঁদের মধ্যে রোহিণীই চন্দ্রের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তমা হওয়ায় অন্য কন্যারা দক্ষের কাছে পতির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ... দক্ষ অভিশাপ দেন যে, চন্দ্র পুত্রকন্যাহীন ও যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হবেন। ... কন্যাদের অনুরোধে শাপ পরিবর্তন করে বলেন যে, যক্ষ্মারোগে চন্দ্র মাসের মধ্যে এক পক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত হবেন ও অন্য পক্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবেন। এই দুই পক্ষই কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। (খ) ... সমুদ্রমন্থন থেকে ... লক্ষ্মী, ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবাদের সঙ্গে চন্দ্রের জন্ম হয়। ... রাহুকে অমৃত পান করতে দেখে বিষ্ণুকে বলে দেন। বিষ্ণু রাহুর মস্তক ছেদন করেন। ... সেই হতেই রাহুর সঙ্গে চন্দ্রের শত্রুতা এবং মস্তকরূপী রাহু সুযোগ পেলেই চন্দ্রকে গ্রাস করেন ...। (গ) ... দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করার ফলে ইনি দেবতাদের বিরাগভাজন হন। ... ফলে মহাসংগ্রাম হয়। মহাদেব ও শুক্রাচার্য বৃহস্পতির পক্ষ নেন। ... ব্রহ্মা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে মহাদেব ও শুক্রাচার্যকে নিবৃত্ত করেন এবং তারাকে চন্দ্রের নিকট হতে গ্রহণ করে বৃহস্পতির নিকট প্রত্যর্পণ করেন। তারা তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। ... চন্দ্রের এই পুত্রের নাম বুধ। আকাশে এই বুধ চন্দ্রের বিপরীত দিকে উদিত হয়। বৃহস্পতির শাপে চন্দ্র যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হন, এবং পিতা অত্রির অনুগ্রহে শাপমুক্ত হন। ((পৌ.অ.)। ৪. moon অর্থে প্রচলিত। ৫. যে সত্তায় চন্-দান বর্তমান থাকে, তেমন সত্তাকে চিনতে পারলেই আমরা চন্দ্রকে চিনতে পারব। সর্বাগ্রে আসে চাঁদ বা moon-এর নাম। তার **চন্** চোখে দেখা যায় জ্যোৎস্না রূপে, মিহি স্পর্শরূপে ধরা দেয় ত্বকে। আমাদের আহ্লাদ হয়। তাই সে **চন্দ্র**-পদবাচ্য। তারপর আসে কর্পূর। তার **চন্** নাকে ধরা দেয় গন্ধরূপে। আমাদের ভাল লাগে। অতএব কর্পূরও চন্দ্র-পদবাচ্য। অতঃপর আসে ময়ূরপুচ্ছস্থ চিকচিকে গোলচিহ্ন, যা আমাদের চোখে ধরা দেয় সুন্দর রূপে। আমাদের আহ্লাদ হয়। তাই তাকেও চন্দ্র (চন্দ্রক) বলা হয়। আর 'আহ্লাদজনক দ্রব্যমাত্র' কিংবা যে কোনো 'শ্রেষ্ঠার্থক' বস্তু বা বিষয়কে একই কারণে চন্দ্র বলা যেতেই পারে। এমনকি স্বর্ণ, বিসর্গবর্ণ (যে বর্ণ সর্গশেষে থাকে, অর্থাৎ) প্রভৃতিকেও চন্দ্র পদবাচ্য মনে করা যেতেই পারে। কিন্তু বাকি বিষয়গুলি [জল, রক্তমুক্তাফল, চন্দ্রদেবতাক ঈড়া নাড়ী, দ্বীপবিশেষ, (যোগশাস্ত্রে) ভ্রূ-মধ্যস্থ সোমমণ্ডল, চন্দ্রদেবতাক মৃগশিরা নক্ষত্র, ১ সংখ্যা, চন্দ্রসদৃশ জ্যোতিষ্কমণ্ডল, চন্দ্রগুপ্ত,] কেন 'চন্দ্র'পদবাচ্য, তা বোঝা কঠিন। আমরা কয়েকটিকে উদ্ধার করতে পারলেও, সবগুলির অর্থ উদ্ধার করতে পারিনি। তবে পৌরাণিক কাহিনীতে যে-চন্দ্রের বা চন্দ্রদেবতার কথা বলা হয়েছে, তাকে আমরা কমবেশি চিহ্নিত করতে পেরেছি। ইনি ব্যক্তিমালিকানার ধনসম্পদ, এঁকে অর্থবাচক চাঁদিও বলা হয়। রাষ্ট্রীয় ধনসম্পদের, অর্থাৎ সূর্যের বিপরীতে এই চন্দ্রের উদয় হলেও, সূর্যের কিরণই এর মূল শক্তি। দক্ষোৎপত্তির পর যৌথসমাজ বিভাজিত হয়ে যে সাতাশটি সম্প্রদায়ের উদয় হয়, তাদের মধ্যে এই চন্দ্রের বা ব্যক্তিগত সম্পদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রচলন হয়। তার

পর থেকে ভারতসমাজে ব্যক্তিপুঁজির যেমন যেমন বিকাশ ঘটেছে, তার কাহিনী নানা যুগে নানা ভাবে লিখিত হয়েছে। সেই ইতিহাস উপরে পৌরাণিক অভিধান দিয়েছেন। সেগুলি এক এক করে উদ্ধার করা দরকার। দ্র. **নষ্টচন্দ্র**। আমরা আপাতত **চন্দ্রবংশ**-তে চলে যাই। কিন্তু চাঁদকে বাংলাভাষী 'চাঁদমামা' বলেন কেন? দ্র. **মামা**।

চন্দ্রবংশ : ৩. চন্দ্রের সন্তান পরম্পরা। (ব.শ.)। চন্দ্র থেকে উদ্ভূত বংশের নাম। এই বংশ যাদব ও পৌরব নামে দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম বংশ যদু থেকে দ্বিতীয় বংশ পুরু থেকে উদ্ভূত। কৃষ্ণ যদুবংশোদ্ভূত এবং কুরুপাণ্ডব পুরুবংশোদ্ভূত। (পৌ.অ.)। ৪. ভারতে এখনও এমন বহু সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন, যাঁরা নিজেদের চন্দ্রবংশী বা সূর্য্যবংশী বলে ঘোষণা করে থাকেন। সেভাবেই চন্দ্রবংশ কথাটি আজও প্রচলিত। ৫. বিষয়টিকে বুঝতে না পারার জন্য কেউই খুব একটা গুরুত্ব দেননি। কিন্তু যিনি ভারতের ইতিহাসকে সবচেয়ে ভাল বুঝেছিলেন, সেই কৃত্তিবাস দিয়েছিলেন। তাঁর রামায়ণে চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশের পৃথক বর্ণনা রয়েছে। এ হল ভারতভূমিতে ধনতন্ত্রপন্থী ও সমাজতন্ত্রপন্থী জনগোষ্ঠীর দুটি পৃথক বংশধারা। এই ধনতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীরা কখনো কখনো হাত মিলিয়েছে। রামচন্দ্র জন্মেছিলেন সূর্য্যবংশে এবং সীতার জন্ম হয়েছিল চন্দ্রবংশে। কৃত্তিবাস লিখছেন এইভাবে —

চন্দ্রবংশের উপাখ্যান

সাগর মন্থনে চন্দ্র হইলে উৎপন্ন।
হইল চন্দ্রের পুত্র **বুধ** অতি ধন্য॥
পুরুগুচ নামে হ'ল তাঁহার নন্দন।
তাঁর পুত্র **শতাবর্ত্ত** জানে সর্ব্বজন॥
স্বর্গ নামে তাঁহার হইল এক সুত।
হইল তাঁহার পুত্র **শ্বেতনাম** যুত॥
নামেতে হইল **নিমি** তাঁহার নন্দন।
নিমিকে প্রশংসা করে যত দেবগণ॥
সকলে মিলিয়া তাঁর মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র **মিথি** নামে বীর॥
সেই বসাইল এই **মিথিলা** নগর।
সীরধ্বজ কুশধ্বজ তাঁহার কোঙর॥
এ সৃষ্টি সৃজন করিয়াছে মুনিবরে।
কহিল **লক্ষ্মী**র জন্ম **জনকের** ঘরে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
চন্দ্রবংশ রচনা করিল কবিবর॥

রামায়ণ (আদিকাণ্ড), কৃত্তিবাস ওঝা

উপরোক্ত বর্ণনার কয়েকটি শব্দকে আমরা মোটা হরফে লিখলাম। কারণ, ঐ শব্দগুলির অর্থ জেনে বর্ণনাটিকে বোঝার চেষ্টা করলে আমরা ভারতের ইতিহাসে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ কেমন করে হয়েছিল তার কিছুটা বুঝতে পারব।

***চপ্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : চপ্, চপ, চপচপ, চপ(পে)ট, চপটান, চপল, চপলা, চপেটা, চপেটিকা, চপেটী, চবক, চবচব, চবি, চবিকা, চবী, চাপ, চাপকান, চাপগারি, চাপজরিপ, চাপট(ড়), চাপড়া, চাপড়াষষ্ঠী, চাপদাড়ি, চাপন, চাপরাস, চাপল, চাপলুসি, চাপল্য, চাপা, চাপান, চাপানউতোর, চাপুরচুপুর, চাবকান, চাবা, চাবান, চাবাড়ি, চাবালি, চাবি, চাবুক, চিপ, চিপট, চিপিটক, চিপুট, চিপ্‌প, চিপ্য, চিবা, চিবুক, চুপ্, চুপ, চুপ(ব)ড়ি, চুপ(ব)ড়ী, চু(চো)পসা, চুবক, চুবন, চুবান (চোবান), চুবানি, চু(চো)য়াল, চুবা, চেপটা, চেভা, চোপ, চোপ(ব)দার, চোপসা, চোপসান, চোপা, চোপাড়, চোবচীনী।

চপ্ = চায়ীর পালন। **চপ** = চায়ীকে পালন করে যে।

চপ (চপট, চপচপ, চপেটা) : ২. *চায়ীর পালন যাহাতে।* ৩. **চপ** = সান্ত্বনা, উপশম, শাঠ্য, চূর্ণীকরণ, শীঘ্র, চর্ব্বণশব্দ, আঘাতজন্য শব্দ। **চপট** = চর্পট, চড়, চপেটাঘাত, চাপ, অধিক্য, প্রচুর আয়োজন। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি প্রচলিত। ৫. একটি ঘটনার কথা বলি — মেদিনীপুরের এক ত্রিশোর্ধ্ব সাঁওতাল যুবক তার চার বছরের শিশুসন্তানকে কুড়ুল দিয়ে হত্যা করে নিজেই থানায় এসে বলে, তাঁকে শাস্তি দেওয়া হোক, কারণ সে নিজের সন্তানকে খুন করেছে। কেন খুন করেছে জানতে চাওয়ায় সে বলেছিল, 'কুড়ালটা তুলছিই যখন, **চপাই** করি কাটি দিলি।' কুড়ালটা তুললে কেন? উত্তরে যা সে বলেছিল, সংক্ষেপে তা হল, স্ত্রী অবিশ্বাসিনীর কাজ করেছে। ঘরে ফিরে তাকেই হত্যা করতে সে কুড়ুল নিয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী তখন শিশুসন্তানকে খাওয়াচ্ছিল। স্ত্রীকে হত্যা করার জন্যই সে কুড়ুল তুলেছিল। স্ত্রী ত্বরিতগতিতে সরে গিয়ে দৌড়ে পালায়। তখন সেই যুবক স্ত্রীকে মারার জন্য কুড়ুল তুলেই ফেলেছিল। এই প্রচেষ্টা তার ব্যর্থ যাবে কেন! তাই সে শিশুসন্তানটিকেই 'চপাই করে' কেটে দিয়েছে।

চপ শব্দটি কেবল খাঁটি বাংলা শব্দই নয়, গ্রামবাংলায় এখনও শব্দটির যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে। **চপানো** মানেই কোপানো, কুচি কুচি করে কাটা। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকারসূত্রে বাংলাভাষীর উপলব্ধি ও ইংরেজিভাষীর উপলব্ধি একেবারেই একরকম। এমনকি এই **চপ** আর সংস্কৃতের **কোপ**-এর মধ্যে এই প্রেক্ষিতে কোনো ফারাক নেই। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে এই শব্দের ব্যবহার আছে। ব.শ. তার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। কিন্তু যেকথাটি গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হয়নি, তা হল **চপ** শব্দটি ঠিক কী অর্থ ধারণ করত। আজ আমরা জেনেছি, এর অর্থ ছিল — 'চায়ীর পালন যাহাতে।' আপনি পেয়ারায় কামড় দিলেন, মুখে খানিকটা পেয়ারা ঢুকে গেল। এই 'কামড়ে মুখের ভেতর নিয়ে নেওয়া'কে বলে চপ্। এতে চায়ীর পালন থাকে। চপচপ শব্দের অর্থ সেকারণেই ব.শ. দিয়েছেন চর্ব্বণশব্দ। আর, চপ টঙ্কারিত হয় যাহাতে, তাকে বলে চপট। তা যখন দিশাগ্রস্ত আঘাত, তখনই চপেটাঘাত। ৬. Greek - koptein (= to cut); Dutch - kappen; Danish - kappe; Swedish - kappa। (ব.শ.)। ইংরেজি chop। ইংরেজি chopper শব্দের প্রধান অর্থই হল মাংস কুচোনোর ধারাল ছুরি।

চপল (চপলা, চাপল্য) : ১. ✓চপ্ + অল (কল) - কর্তৃবাচ্যে; ✓চুপ্ + কল। (ব.শ.)। ২. *চায়ীর পালন লালিত যাহাতে।* / যে দোষ নিশ্চয় না করিয়া বধবন্ধনাদি করে। (ব.শ.)। ৩. **চপল** = শীঘ্র, সত্বর, দ্রুত, চঞ্চল, ক্ষণিক, নশ্বর, তরল, অস্থির, জাতপ্রবাহ, চলিত, বেগবান, প্রবল, অব্যবস্থিত, চল, লোল, অব্যবস্থিতচিত্ত, চলমতি, বহুগর্হিতবাদী, পরুষভাষী, অনুপযুক্তবস্তুগ্রাহী, বৃথা ভ্রমণকারী, বিকল, অবিনিশ্চিতকারী, রস, পারদ, মৎস্যভেদ, চেলামাছ (?), জাতক, মূষিকভেদ, চোরনামক গন্ধদ্রব্য, ক্ষয়রোগ, প্রস্তরভেদ, কৃষ্ণসর্ষপ। **চপলা** = লক্ষ্মী, চাপলবতী স্ত্রী, বিদ্যুৎ, পুংশ্চলী, পিপ্‌পলী, মদিরা, বিজয়া, ভাঙ, জিহ্বা, আর্য্যাচ্ছন্দোবিশেষ। **চাপল্য** = চপলভাব, চঞ্চলতা, অস্থৈর্য্য, নশ্বরতা ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. naughty অর্থে প্রচলিত। ৫. যার ভিতরে চায়ীর (ইচ্ছাকারীর, ইচ্ছার) পালন লালিত হয়, তাকে চপল বলে। লালিত (দ্র. **লালন**) কথাটির মানে যাকে লোল (loose) দেওয়া আছে। ফলে সে চঞ্চল আচরণ করতে থাকে। সেকারণেই তাকে চপল বলে। চপল-এর স্ত্রীলিঙ্গে চপলা হয়। চপলতা থাকে যাহাতে তাকে চাপল্য বলে। উপরোক্ত (৩) অর্থগুলিতে চপল শব্দের অনেক বিস্তারিত ও প্রসারিত অর্থও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

চাপ (চাপন, চাপা, চাপান, চাপান-উতোর, চেপে-দেওয়া, চাপা-দেওয়া, চেপ্‌টা) : ১. চপ (বংশভেদ) + অ (অণ্) 'তদ্বিকার' অর্থে; ✓চপ্ - চূর্ণীকরণ। (ব.শ.)। ২. ***চাপ** = **চপ** হইতে জাত; **চাপন** = চাপ অন যাহাতে; **চাপা** = চাপ-এর আধার যে; **চাপান** = চাপা অন যাহাতে; **চাপান-উতোর** = চাপান ও উতরে বা নামিয়ে দেওয়া।* / **চাপ** = চপবংশজাত; **চাপা** = যে মনের কথা খুলিয়া বলে না। (ব.শ.)। ৩. **চাপ** = ধনুঃ, কার্ম্মুক, ইন্দ্রধনু, (জ্যামিতিতে) বৃত্তক্ষেত্রার্দ্ধ (arc), ধনুঃ রাশি; করতলসদৃশ মৃত্তিকাখণ্ড, চাপড়া, তাল, পিণ্ড, ফলক, জমাট দ্রব্য, চাঙ্গড়া, সমবেতগণ, দল, প্রাকৃতিক দৃশ্যসমুদায়, লোকসংমর্দ্দ, ভিড়, ভার; চাপ দেওয়া, চাপা, সংবাহন করা, টেপা, ইঙ্গিতার্থ টেপা, বাহির না করা, গোপন করা, ঢাকা (to suppress), রোধ করা, আবৃত করা, আরোহন করা, অধিষ্ঠান করা, অধিকার করা, পূর্ণ করা, বিশেষ পীড়িত করা, আবিষ্ট বা অভিভূত করা। **চাপন** = চাপ, ভার। **চাপা** = চাপ দেওয়া ইত্যাদি, চাপা দেওয়ার নিমিত্ত ভারী দ্রব্য, আচ্ছাদন, ঢাকা ...। **চাপান** = স্থাপন, রাখা ইত্যাদি। **চাপান-উতোর** = তর্জ্জা-প্রভৃতি গানে বিপক্ষের প্রতি পৌরাণিকাদি কূটপ্রশ্ন (এবং তার উত্তরদান)। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. চপ করে যে অংশটি কেটে বা কামড়ে নেওয়া হল, সেই অংশটিকে বলে **চাপ**। (জ্যামিতির চাপ-এর আকারও ভাবুন।) সেই চাপ রাখা হল কোনো স্থানে। এর পর চপের পর চপ কেটে কেটে নিয়ে রাখা হল চাপের পর চাপে। একে বলে **চাপন**। এর ফলে একটি চাপ-এর নীচে আগের চাপগুলি **চাপা** পড়ে গেল। তবুও তার উপর আরও চাপ রাখতে থাকা মানেই হল **চাপান** বা চাপানো। যা চাপানো হচ্ছে, তাকে কেউ যদি নামিয়ে দেয়, তবে সে হয়ে গেল চাপান-উতোর। চাপের উপর চাপ চেপে চেপে রাখলে চাপগুলি তো চাপা পড়ে চেপ্‌টা বা চিঁড়ে-'চ্যাপটা' হয়ে যাবে। অতএব কাউকে চেপে দেওয়া বা চেপে রাখা ঠিক নয়, তা সে গাড়ি দিয়ে চেপে দেওয়া হোক আর সত্য চেপে দেওয়াই হোক। গাড়িতে চাপাই হোক আর গাড়ি দিয়ে চাপাই হোক, চাপা সর্বত্র প্রসারিত। ... ৬. Portuguese - chapa; English - chop; (seal-impression)। (ব.শ.)।

চুপ (চুপচাপ, চুপিচুপি, চুপিসাড়ে) : ১. ✓চুপ — মন্দগতি, অর্থাৎ নিঃশব্দগমন। (ব.শ.)। ২. ***চুপ** = নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ীর পালন যাহাতে। **চুপচাপ** = **চুপ** ও **চাপ**। **চুপিচুপি** = চুপ গতিশীল যাহাতে, তাহার স্থিত্ব। **চুপিসাড়ে** = সাড়া চুপ করা থাকে যাহাতে।* ৩. **চুপ** = নিঃশব্দ, বাক্যহীন, নীরব, নিরুদ্যম, নিশ্চেষ্ট, গোপনে, ধীরে। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ইচ্ছা কিংবা ব্যথা বা আনন্দটুকু বুকের মধ্যে ছিলই। এবার সেটি ভাষায় রূপ পাওয়ার জন্য উঠে এসেছে জিভে। চায়ী এখানে নবরূপে উত্তীর্ণ। কিন্তু তাকে প্রকাশ না করে পালন করা হচ্ছে সেখানেই, মুখের ভিতরেই। সেজন্যই **চুপ**। বুকের ব্যথা মুখ ফুটে বেরোতে পারে না। চাপা থাকে এভাবে। তাই **চুপচাপ**। 'চুপ করো' মানে, তোমার 'নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ীকে পালন করো'; এখনই ছেড়ে দিয়ো না। চাপো মানে, তোমার মুখের কথাটাকে বেরোতে দিয়ো না, চেপে রাখো। কিন্তু সেই **চুপ** যদি গতিশীল হয়ে যায়, তবে সে হয় **চুপি**। এতে চুপ কথাটিকেই চলমানতা দিয়ে দেওয়া হয়, **চুপিচুপি** চলে যায় অন্যের কাছে, কানে কানে। নবরূপে উত্তীর্ণ চু যদি স্বাভাবিকভাবে যেতে পারত, তাতে যে সাড়া জাগতে পারত, সেই সাড়াকে আগেভাগেই চুপ করিয়ে দেওয়া হয়। এখন যেটুকু সাড়া থাকবে, সে কেবল চুপ-এর স্বার্থে অর্থাৎ চুপিসাড়ে। ৬. ইংরেজি coup, coup d'etat ইত্যাদি।

চুপসা, চুপসান (চুপসে-যাওয়া, চোপসা, চোপসানো) : ২. ***চুপ** অস্তিত্ব যাহার; **চুপসান** = চুপসা অন যাহাতে।* ৩. রস শুষিয়া আর্দ্র হওয়া, ভিতরের রস বা বায়ু বাহির হওয়ায় সঙ্কুচিত হওয়া, রস-বায়ু-নিঃসরণ হেতু সঙ্কুচিত, তোবড়ান। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. মনোব্যথাটি কথায় পরিণত হয়ে বুক থেকে উঠে এসেছিল মুখে, আর সেকথা গলা ফুলিয়ে বড়মুখ করে বলার জন্য এক মুখ পঞ্চমুখের চেহারা নিয়েছিল। কিন্তু এখন আপাতত সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, কথাটি না বলে বরং সে কথাকে **পালন** করা হোক, ঘরে ফেরানো হোক। ফলে, পাঁচমুখ হয়ে যাবে একমুখ, সে মুখও হয়ে যাবে ছোট, মুখ ছোট করে ঘুরে বেড়াবে বক্তা, ফোলানো গলা তার সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। তার মুখের ভেতরে কথার অস্তিত্বের পালন শুরু হবে। সে ছোট হয়ে যাবে, সঙ্কুচিত হয়ে যাবে। একেই বলে চুপসা। এই চুপ অস্তিত্ব অন যাহাতে, তাকে বলে চুপসান। দ্র. **লালন-পালন**।

চুবান (চুবানি) : ২. ***চুবান** = **চুবা** (নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ী বাহিত যাহাতে, তাহার আধার) অন যাহাতে। **চুবানি** = **চুবান** গতিশীল যাহাতে।* ৩. **চুবান (চুবন, চুবানি)** = নিমজ্জন, ডুবা। (ব.শ.)। **চুবনো, চুবানো, চোবানো** = পানি বা অন্য কোনো তরল পদার্থে

নিমজ্জিত করা। **চুবনি, চুবানি, চোবানি** = পানিতে চোবানো, ডুবিয়ে রাখন, নিমজ্জন, নিমজ্জিতকরণ। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **চুপ**। নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ী বা **চু** বাহিত হয় **চুব**-এ। **চুপ**-এর মতো নবোত্তীর্ণ-ইচ্ছা এখানে পালিত নয়, বাহিত। যেনবা রাজবিদ্রোহীকে ধমকে দেওয়া হয়েছে, ফলে তার বিদ্রোহেচ্ছা মুখে পালিত হলেও প্রকাশ পাচ্ছিল না, সে **চুপ** ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে সেই বিদ্রোহেচ্ছা প্রকাশ না করে সে তা বহন করে নিয়ে চলেছে। তাকে যদি কোনো আধারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তা সে জলাধার (যেখানে শরীর ঢুকে যায়) হোক কিংবা মৌজ-মজলিস হোক (যেখানে মন ঢুকে যায়), তাহলে **চুব** হয়ে যায় **চুবা**। এই **চুবা** অন হয়ে থাকলে বা একটানা চলতে থাকলে হয়ে যায় **চুবান**। নবোত্তীর্ণ-ইচ্ছা বা **চু** বাহিত হওয়া সত্ত্বেও 'বাহির হইবার' পথ পায় না আর। স্বভাবতই এই **চুবানি** তাকে কষ্ট দেয়। অর্থাৎ, **চুবা, চুবান** প্রভৃতি শব্দের ভিতরে যে অর্থটি রয়েছে, তা হল, নবরূপে উত্তীর্ণ ইচ্ছাকে এমনভাবে ঢেকে-রেখে দেওয়া, যাতে সে কোনোমতেই আত্মপ্রকাশ করতে না পারে। একালের ভাষায় বললে, 'একালের ধনবাদী সরকার উল্লাসকর প্রমোদে জনমতকে **চুবায়, চুবিয়ে** রাখে।'

চোপা : ২. *সর্বপ্রকার চুপ-এর আশ্রয় যাহাতে।* ৩. মুখমণ্ডল, কড়া জবাব। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. 'অত চোপা করিসনি বউ' কিংবা 'তোর বড্ড চোপা হয়েছে দেখছি!' এইভাবে শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। প্রথম ক্ষেত্রে চোপার অর্থ দাঁড়ায় 'মুখ করা'; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চোপার অর্থ হয় 'মুখর'। বিষয়টি ব.শ. উপস্থাপন করলেও, এই চোপা শব্দের মূলে যে 'সর্বপ্রকার চুপ' রয়েছে, সেকথা খেয়াল করেননি।

চম্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অচঞ্চল, আঁচতাকুড়, আঁস্তাকুড়, আচন্ত, আচম, আচমকা, আচমন (দ্র. আঁচা, অঞ্চ), আচমনি, আচমনী, আচমনীয়, আচমান, আচম্বিত, আচান্ত, আচান্তকুণ্ড, আচাভুয়া, আচাম, আস্তাকুঁড়, চওকি, চওর, চঙ্ক, চঙ্গ, চঙ্গড়ক, চঞ্চরি, চঞ্চরিক, চঞ্চরী, চঞ্চল (চম্, চল্), চঞ্চলিত, চঞ্চলা, চঞ্চলায়মান, চঞ্চা, চঞ্চু, চম্, চমক, চমকা, চমকান, চমকিত, চমচম, চমচমা, চমচমে, চ(চা)মচা, চমৎকরণ, চমৎকার, চমৎকৃত, চমৎকৃতি, চমর, চমস, চমু, চমূরু, চম্প, চম্পক, চম্পকনগর, চম্পকমালা, চম্পকলতা, চম্পট, চম্পা, চম্পাবতী, চম্পু, চাঁচ, চাঁচ(ছ)নী, চাঁচি(ছি), চাঁছ, চাঁছা, চাঁছাছোলা, চাঁছাপুঁছা, চাপকলি, চাঁপা, চাঞ্চল্য, চামচা, চামর, চামরিক, চামরিণী, চামরিয়া, চামরী, চামীকর, চামেলি(লী), চাম্পা, চাম্পেয়, চিমটা, চিমটি, চুঞ্চ, চুঞ্চু, চেংড়া, চেঙ(ঙ্গ)ড়া, চেঁচাড়ি, চেঁচুড়া, চোওর, চোঁচ, চোচ, চোমর, চোয়র, চৌঙকি।

চম্ = চায়ীর সীমায়ন। **চম** = চায়ীর সীমায়ন যাহাতে।

চঞ্চল (চঞ্চলা) : ১. ✓চল্ + ষ (ষঙ) — ✓চঞ্চল্ (যঙ্-লুক্) + অ (অন্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓চঞ্চ্ + অল (অলচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***চঞ্চল*** = *চায়ীর সীমায়ন (ভয়) চালায় (দ্র.* ***চল****) যাহাকে; অথবা, চমকে চমকে চলে যে।* ৩. অতিশয় বা পুনঃ পুনঃ চল, অস্থির, চপল, তরল, অনবস্থিত, নশ্বর, ক্ষণিক, কম্পমান, চলিত, শীঘ্র, বায়ু, কামুক, লম্পট, অস্থিরমতি ব্যক্তি, অপরিণামদর্শী। লক্ষ্মী। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. চায়ীর রহস্যরূপ হল চং। এই 'ং'-এর পূর্ণ ব্যক্তরূপ 'ম্'। চং-কে পৃথকভাবে বলতে গেলে আমরা তাকে চম্ বলতে পারি। এই চম্-এর সঙ্গে চল যোগ করতে গেলে চম্ হয়ে যাবে চঞ্, ফল হবে চঞ্চল। কারণ, চ-বর্গে যুক্ত হলে তা হয়ে যায় চঞ্। তাই, চল-এর সঙ্গে যুক্ত হতে গিয়ে চঞ্-চল হয়ে যায় চঞ্চল।

প্রকৃতপক্ষে ইচ্ছার সীমায়ন, না-করণ, বোধে পরিবর্তন ইত্যাকার কারণে, সেই ইচ্ছা যখন চমকে ওঠে, সরে সরে যায়, ছটফট করে, তখনই তাকে আমরা চঞ্চল বলি। গর্ত থেকে বেরোনো একটি ইঁদুরের দিকে দেখুন, কিংবা একটি চড়াই পাখির দিকে দেখুন। খাদ্য চয়নের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে কিন্তু শত্রুভয় তার ইচ্ছাকে সীমিত হতে বলে, আর সে এদিক-সেদিক তাকিয়ে ত্বরিতগতিতে সরে সরে যায়, তারই মাঝে নিজের খাদ্য খুঁটে নেয়। অর্থাৎ কিনা, ইচ্ছার সীমায়ন হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে যে সরে সরে ছটফট করে চলতে থাকে সেই হল চঞ্চল। তেমন প্রকৃতিশক্তিকে আমরা বলি চঞ্চলা। একে আমরা **বরুণ**-সত্তার সক্রিয়তাও বলতে পারি। দ্র. **অংরূপিণী**।

চমক (চমকা, চমকান, চমকিত, চমচম, চমচমা, চমচা, চমস, চামচা) : ২. ***চমক*** = *চায়ীর (ইচ্ছার) সীমায়িত-করণ থাকে যাহাতে।* ***চমকা*** = *চমকের আধার যে।* ***চমকান*** = *চমকের আধার অন থাকে যাহাতে।* ***চমকিত*** = *চমক গতিশীল হয়ে তারিত হয় যাহাতে।* ***চমচম*** = *বারংবার চায়ীর সীমায়ন যাহাতে।* ***চমচমা*** = *চমচমের আধার যে।* ***চমচা*** = *চায়ীর সীমায়নের ইচ্ছা থাকে যাহাতে।* ***চমস*** = *চায়ীর সীমায়িত অস্তিত্ব থাকে যাহাতে।* ***চামচা*** = *চমচা হইতে জাত।* ৩. **চমক** = আশ্চর্য, সবিস্ময় ভয়, দীপ্তি, ক্ষণিক প্রভাপ্রকাশ, চৈতন্য, হুঁশ, আতঙ্ক; দীপ্তি পাওয়া, অকস্মাৎ ভয়ে কাঁপিয়া উঠা বা খাড়ুমাড় খাওয়া, চঞ্চল হওয়া। **চমকিত** = বিস্মিত, চমৎকৃত, চঞ্চল, অধীর, কম্পিত। **চমচম** = ছানা বা ক্ষীরজাত মিঠাইবিশেষ। **চমচমা** = বিস্ময় বা আতঙ্ক হেতু কর্তব্যবিমূঢ়তা। **চমস, চামচা** = ছোট হাতাবিশেষ (tea-spoon)। (ব.শ.)। ৪. সবগুলি যথার্থে প্রচলিত, কেবল চমচমা ও চমস অপ্রচলিত। ৫. একটি দড়ি নেবেন বলে হাত বাড়ালেন, দড়িটা নড়ে উঠল — আরে! এটা তো সাপ! আপনার দড়ি নেওয়ার 'ইচ্ছা মুহূর্তে একেবারে সীমায়িত' (= **চম**) হয়ে গেল। আপনি চমকে গেলেন, **চমকিত** হলেন। ইচ্ছার এরকম সীমায়ন হয় জ্ঞাত-অজ্ঞাত **পদ** কিংবা **বিপদ** দেখে। পদ থেকে এই সীমায়ন ঘটলে আপনি মুহূর্তে খুশি হয়ে ওঠেন, এবং পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে এগিয়ে যান। আর, বিপদ থেকে এই সীমায়ন ঘটলে আপনি মুহূর্তে ভয় পেয়ে যান এবং পরমুহূর্তে পেছন দিকে লাফ দিয়ে পিছিয়ে যান। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ এভাবেই আপনার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকে প্রকাশ করে থাকে। তবে সেভাবে বলতে গেলে, বাংলাভাষী

ময়রা কিন্তু অনেক ভাল শব্দবিদ, অন্তত অ্যাকাডেমির পণ্ডিতদের চেয়ে তো বটেই। তাঁরা ক্রিয়াভিত্তিক ভাষার নিয়ম একশ ভাগ মান্য করে তাঁদের অধিকাংশ মিষ্টির নাম দিয়েছেন। যে মিষ্টিটি এত-বেশি sweet যে, মুখে দিলে চমকে চমকে উঠবেন, তাকে তাঁরা সেকারণেই নাম দিয়েছেন **চমচম**। এই চমচম যার ভেতরে থাকে তাকে বলে **চমচমা**।

এ তো গেল আপনার নিজের চমকে ওঠার কথা। কিন্তু আপনি নিজেই যদি চান অন্য কেউ চমকে উঠুক, আনন্দে উল্লসিত হোক, কিংবা ভয় পেয়ে যাক, তাহলে এমন কিছু করতে হবে যাতে সে চমকে যায়। একে বলে **চমকান**। এটি ভাল-চমক হতে পারে, মন্দ-চমকও হতে পারে; অর্থাৎ, হঠাৎ আনন্দের কারণ ঘটিয়ে চমকান যায়, হঠাৎ বিপদের ভয় দেখিয়েও চমকান যায়। পৃথিবীতে যেদিন থেকে ধনের রাজত্ব শুরু হয়েছে, ভাল-চমকের বংশ ক্রমশ লোপ পাচ্ছে; এখন মন্দ-চমকের রমরমা। আজকের পশ্চিমবাংলার শহরগুলিতে এই মন্দ-চমক বা চমকান-র বিপুল ব্যবহার ঘটছে, ঘটছে প্রধানত তথাকথিত মাস্তানদের ভাষায়। তারা মানুষকে চমকায়। তাদের পরিচালকেরা অন্যকে চমকে তোলা চয়ন করতে লোক পাঠায়, এই পাঠানো লোকটিকে **চমচা** বলে; প্রাচীনকালে এদের বলা হত চমস। কিন্তু এই চমচা নিজে না গিয়ে তার চেলাকে পাঠিয়ে দিল চমকে তোলা আনতে। চম-চয়নকারীর চেলার এই চেলাকে বলে **চামচা**। আমরা যখন চামচ দিয়ে পাত্রের খাদ্যকে একটুখানি তুলে মুখে দিই, আমরা কিন্তু জানতেই পারি না পাত্রের খাদ্যগুলি বাইরে থেকে হঠাৎ এসে পড়া হাতার হেলনে চমকাল কি না! তবে যাঁরা হাতা অর্থে চামচ বা চামচা শব্দটি প্রথম তৈরি করেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় অনুভব করেছিলেন, হাতা যেখানেই পাঠানো বা ডোবানো হবে, সেখানেই চমক লেগে যাবে। **৬.** ইংরেজি gimmick (গিমিক)। তবে **চমক**-এর তুলনায় gimmick শব্দের ব্যাপ্তি অনেক কম।

চম্প, চম্পক (চম্পকমালা, চম্পকলতা, চম্পট, চম্পা, চম্পাবতী, চম্পকনগর, চম্পকারণ্য, চম্পারণ, চম্পূ) : ১. ✓চম্প্ (গতি) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓চম্প্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. *চম্প*** = *'চায়ীর (ইচ্ছার) সীমায়ন' (= চম্) পালন করে যে;* ***চম্পক*** *= চম্ পালিত-করণ থাকে যাহাতে।* **৩. চম্প** = কোবিদার বৃক্ষ, কোবিদার পুষ্প। **চম্পক** = পুষ্পবৃক্ষবিশেষ (স্ত্রীলোকের বক্ত্রবাত বা ফুঁ চম্পকের দোহদ), চাঁপাফুলের পাপড়ির মতো কাঁটালের চাঁপা, কদলীতরুভেদ, চাঁপাকলা গাছ, চম্পকপুষ্প, চাঁপাকলা। **চম্পকমালা** = চম্পকরচিত মালা, স্ত্রী-কণ্ঠাভরণবিশেষ, বর্ণবৃত্তবিশেষ। **চম্পকলতা** = গামছাবিশেষ। **চম্পট** = অন্তর্দ্ধান, পলায়ন, প্রস্থান। **চম্পা** = অঙ্গদেশস্থ কর্ণপুরীবিশেষ, ভাগলপুর, কাঁটালের চাঁপা। **চম্পাবতী** = কর্ণ-রাজধানী। **চম্পূ** = গদ্যপদ্যময় কাব্য, যথা চম্পূভারত, চম্পূরামায়ণ, গোপালচম্পূ, নলচম্পূ। (ব.শ.)। **চম্পকনগর** = চম্পা নামক রাজা কর্তৃক স্থাপিত প্রসিদ্ধ নগরী। ইহা অঙ্গরাজ কর্ণের রাজধানী ছিল। এই নগরী বর্তমান ভাগলপুরের নিকট অবস্থিত। **চম্পকারণ্য, চম্পারণ** = তীর্থস্থান। এই তীর্থে একরাত্রি বাস করলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। ইহার বর্তমান নাম চম্পারণ। (পৌ.অ.)। **৪. চম্প, চম্পক** প্রভৃতি চাঁপা-রূপে প্রচলিত, **চম্পা** ব্যক্তিনাম রূপে প্রচলিত, **চম্পারণ** স্থাননাম রূপে প্রচলিত, অন্যথায় সবগুলিই অপ্রচলিত। **৫. দ্র. কোবিদার, দোহদ**। চম্প এক বিচিত্র শব্দ। একই সঙ্গে সে চাঁপানটে, চাঁপাকলা, কাঁটালে-চাঁপা, চাঁপাফুল, চাঁপা-গামছা, চাঁপাবন বা চাঁপা-অরণ্য, চাঁপানগর, চাঁপাপুরী, চাঁপা-কাব্য — সবকিছুকে বোঝাতে পারে! শুধু তাই নয়, এ-চম্প একই সঙ্গে হাজার গোদানের ফল দিতে পারে, আবার ভয়ে **চম্পট** দিতেও পারে কিংবা ভাগল্‌ভা (ভাগলপুর) হয়ে যেতে পারে! তার মানে 'চম্প্'-ক্রিয়াকারী সত্তাটি একই সঙ্গে ভাল-চমক ও মন্দ-চমক (দ্র. **চমক**) উভয় প্রকার চমক পালন করে থাকে; অনেকটা ঘরের **কোণ**-এর মতো। একই সঙ্গে নিষেধ ও উৎসাহ থাকলে তবেই এরকম **চম্প** বা **চাঁপা** হয়। একালে এরকম ঘটনা আমরা দেখি ফুটপাথের দোকানদারিতে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, ধূমপানে, নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণে, রোমান্টিক অনুসরণে। ফুটপাথে দোকান পাতা নিষেধ, তাতেই লোকে দোকান পাতে, সেরকম দোকানে দোকানে ফুটপাতে হাঁটাই দায় হয়ে ওঠে এবং হল্লাপুলিশ এসে গেলে সেই দোকানদারেরা মালপত্র তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। ইংলিশ মিডিয়ামকে পঞ্চমুখে নিন্দা করা হয়, সেই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেই ছেলেমেয়েদের পাঠানো হয়; যার ফলে ব্যাঙের ছাতার মতো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গড়ে ওঠে পাড়ায় পাড়ায়। ...

আমাদের পূর্বসূরী শব্দবিদগণ দেখেছিলেন, এই 'চম্প' একই সঙ্গে উপরোক্ত সবগুলি সত্তায় সক্রিয়। সেই কারণে তাঁরা তাদের সবাইকে 'চম্প'-যুক্ত নামগুলি দিয়ে শনাক্ত করেছিলেন। আমরা একালের মানুষ। আমাদের অনুভবশক্তি তাঁদের মতো শংসতিভ (sensitive) নয় যে, কোনো বস্তু দেখে বা ছুঁয়েই তার ইষ্টার্থশংসন করতে পারে। যন্ত্রের সহায়তা ও যান্ত্রিক (প্রতীকী) ভাষা আমাদের চোখ-কান-নাক-ত্বক-জিভের সক্রিয়তার স্বাভাবিক ক্ষমতাকে বিকশিত হতে দেয়নি, আমাদের পূর্বপুরুষদের ক্ষেত্রে যেমন দিত; এখনও অন্ধ ও বোবা-কালাদের বাকি ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন দিয়ে থাকে। ফলে, গ্রাহ্যসত্তার সূক্ষ্ম-অতিসূক্ষ্ম রূপকে আমরা যেমন প্রায়শই চিনতে-বুঝতে পারি না, তেমনি অতি-প্রসারিত রূপকেও আমরা এখন আর চিনতে-বুঝতে পারি না; আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন পারতেন; কিন্তু মাঝারি রূপটিকে আমরা এখনও কমবেশি চিনতে-বুঝতে পারি। অতএব, আমাদের দৃষ্টিতে যতটা ধরা দেয়, ততটাই ধরার চেষ্টা করা যেতে পারে।

চম্প = নিষেধ ও উৎসাহ পালিত হয় যাহাতে = ব.শ. মতে, 'কোবিদার বৃক্ষ, কোবিদার পুষ্প।' = যৌথসমাজের নীতি-আইন-ধর্মের মাটি বিদারণ করে যে কুটীরশিল্প সংঘগুলি গড়ে উঠেছিল, সেইসকল সংঘ কিংবা তদ্রূপ সংস্থার উৎপাদিত পণ্য। ভারতে একসময় যৌথসমাজের মূলনীতির মাটি ভেদ করে ব্যক্তিমালিকানা-ভিত্তিক বা উপদল-ভিত্তিক কুটীর শিল্পের জন্ম হয়েছিল এবং তার উৎপন্ন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল আবার উৎসাহের সঙ্গে প্রচলিতও ছিল। সেই ব্যবস্থাকে ও তার ফলকে বলা হত **চম্প**। দ্র. **চমক**।

চম্পক = ব.শ. মতে 'পুষ্পবৃক্ষবিশেষ (স্ত্রীলোকের বক্ত্রবাত

বা ফুঁ চম্পকের দোহদ), চাঁপাফুলের পাপড়ির মতো কাঁটালের চাঁপা, কদলীতরুভেদ, চাঁপাকলা গাছ, চম্পকপুষ্প, চাঁপাকলা।' = চাঁপাফুলের গাছ, কাঁটালে-চাঁপা, চাঁপাকলাগাছ, চাঁপাফুল, চাঁপাকলা, চাঁপানটে ইত্যাদি; ক্রিয়াভিত্তিক মতে, 'সীমায়িত বা নিষেধ সত্ত্বেও পালন চলে যাতে' সেটিই চম্পক = কিন্তু এগুলির মধ্যে কোথায় চম্প্ বা নিষেধ ও উৎসাহ রয়েছে, আমাদের যথেষ্ট অনুভবশক্তির অভাবের কারণে আমরা এখনও তা জানি না। আমাদের শব্দবিদ পূর্বপুরুষেরা জানতেন, তাঁই তাঁরা ওই সত্তাগুলির ওইরকম চম্প-যুক্ত নামকরণ করেছিলেন। তবে **দোহদ** শব্দটির থেকে আমরা জানতে পারি, চাঁপাগাছে মানবী ফুঁ দিলে চাঁপাগাছ খুশি হয়ে প্রচুর পরিমাণে ফুল উৎপাদন করে। একই কথা সামাজিক চম্পকবৃক্ষ বা কুটীরশিল্প ব্যবস্থা সম্পর্কেও বলা যায়। এই কুটীরশিল্প-ব্যবস্থায় খদ্দের বা প্রকৃতিশক্তি তাদের প্রয়োজনের বা চাহিদার ফুঁ দিলে এই শিল্পের বাড়বাড়ন্ত হয়, তারা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করে থাকে। দ্র. **চাতক**।

চম্পকমালা = ব.শ. মতে, 'চম্পকরচিত মালা, স্ত্রী-কণ্ঠাভরণ-বিশেষ, বর্ণবৃত্তবিশেষ।' = চাঁপাফুলের মালায় চাঁপাফুল থাকে, সেকারণেই তাকে চম্পকমালা বলা যেতেই পারে। স্ত্রীর কণ্ঠাভরণে কোথায় চম্প থাকে আমরা জানি না। বর্ণবৃত্তবিশেষের ভিতরে চম্প থাকতে পারে কিন্তু সেকথার পক্ষেও যথেষ্ট সাক্ষ্য আমাদের হাতে নেই। আমরা কেবল যুক্তির হিসেবে বলতে পারি, নিষিদ্ধ কিন্তু উৎসাহিত বৃত্তিতে নিযুক্ত এক বা একাধিক জনগোষ্ঠী থাকতেই পারে, নইলে সেকালের সামাজিক স্বীকৃতিহীন-কুটীরশিল্পগুলি বা চম্পক-বৃক্ষগুলি চলত কেমন করে!

চম্পকলতা = ব.শ. মতে 'গামছাবিশেষ।' = কুটীরশিল্পজাত গামছাকে সেকালে চম্পকলতা বলা অবশ্যই সম্ভব ছিল। আর সেকথা অত্যন্ত সমর্থিত হয় সেই আদিকালের কুটীরশিল্পের ধ্বংসাবশেষের সতীনাথ ভাদুড়ী-কৃত বর্ণনায়, যা পাওয়া যায় তাঁর *ঢোঁড়াইচরিতমানস* গ্রন্থে 'ঢোঁড়াই রাম' নামক চরিত্রটির অতীতপুরুষদের বিষয়ে কথাবার্তায়। তাঁরা কাপড় বুনতেন। তাঁদের বর্ণনা বোঝায়, তাঁদের অতীতপুরুষেরা চম্পকবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।

চম্পট = ব.শ. মতে 'অন্তর্দ্ধান, পলায়ন, প্রস্থান।' = চম্প টঙ্কারিত হয় যাহাতে = এই অর্থে চম্পট কথাটির মানে পলায়ন নয়। কিন্তু **ক্ষিপ্ত, চট** প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে যেমন শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অভিধা-অর্থটির প্রয়োগ পেরিয়ে ঠিক পরের ব্যঞ্জনা-অর্থটির প্রয়োগই প্রচলিত, তেমনি চম্পট শব্দটির অভিধা-অর্থটি পেরিয়ে তার ব্যঞ্জনা-অর্থটিই বেশি প্রচলিত। ব.শ. সেই অর্থটিই দিয়েছেন। চম্প অর্থাৎ নিষেধ সত্ত্বেও উৎসাহের সঙ্গে কাজটি করা হয়েছে, সেই কর্মফল টঙ্কার দিচ্ছে, এসো এসো, নাও, নিয়ে যাও, লাল সুতার নতুন গামছা ইত্যাদি বলছে — আর সেই টঙ্কার শুনে চলে এল নিষিদ্ধকারী সেকালের আদি-জমিদারী পুলিশ; টঙ্কার বদলে গেল পলায়নে — পালাও, পালাও, হল্লা এসেছে!

চম্পা = ব.শ. মতে, 'অঙ্গদেশস্থ কর্ণপুরীবিশেষ, ভাগলপুর, কাঁটালের চাঁপা।' **চম্পাবতী** = ব.শ. মতে 'কর্ণ-রাজধানী।' **চম্পকনগর** = পৌ.অ. মতে 'চম্পা নামক রাজা কর্তৃক স্থাপিত প্রসিদ্ধ নগরী। ইহা অঙ্গরাজ কর্ণের রাজধানী ছিল। এই নগরী বর্তমান ভাগলপুরের নিকট অবস্থিত।' **চম্পকারণ্য, চম্পারণ** = পৌ.অ. মতে, 'তীর্থস্থান। এই তীর্থে একরাত্রি বাস করলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। ইহার বর্তমান নাম চম্পারণ।' — কাণ্ডটি ঘটেছিল রামরাজত্বের কালে বা বৌদ্ধযুগে, বিশেষত বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে; আর যখন তা ঘটেছিল, তখন **গোবর্দ্ধন** (পণ্যবৃদ্ধি), রাজ্যবর্দ্ধন (পণ্যবিক্রির উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবিস্তার), এবং তার ফলে জাত মানুষের হর্ষবর্দ্ধন নালন্দায় পাটলিপুত্রে (পাটনায়) সক্রিয় হয়েছিলেন। প্রাচীনপন্থী (১০০ খ্রিস্টাব্দের আগের) বেদবাদীগণ ও পরবর্তী যুগের (৭৫০ খ্রিস্টাব্দে) শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে নব্যবেদবাদীগণ (বা হিন্দুবাদীগণ) ছিলেন বিক্রয়ের জন্য উৎপাদনযজ্ঞ চালানোর ঘোর বিরোধী। তাঁদের সেই পণ্যবিরোধী নীতির দ্বারাই ভারতভূমির সমাজের মনের মাটি এতকাল ধরে তৈরি হয়েছিল। মাঝে অশোকের যুগে কয়েকশ' বছর তার কিছুটা ব্যত্যয় ঘটলেও শঙ্করাচার্যের যুগে ভারতে পণ্যবাদিতা পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ফলে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যার সঙ্গে ১৯৮০ সালের পশ্চিমবাংলার পরিস্থিতি অনেকটাই মিলে যায়। সরকারে অধিষ্ঠিত কমপিউটার-বিরোধী, ইংলিশ-মিডিয়াম-বিরোধী, ব্যবসাবিরোধী — এককথায় পণ্যবিরোধী-দর্শনে বিশ্বাসী একটি দল; আর জনসাধারণ কমপিউটারের দিকে, ইংলিশ মিডিয়ামের দিকে, ব্যবসার দিকে ঝুঁকে গেছেন। ফলে দৃশ্যত কমপিউটারের-ইংলিশমিডিয়ামের-ব্যবসার নিন্দা চলছে সরকারী ও দলীয় প্রচারে-ঘোষণায়, আর অদৃশ্যত বাঙালি তার ছেলেমেয়েকে কমপিউটারে, ইংলিশমিডিয়ামে ক্রমশ ঠেলছে এবং তাদেরকে জ্ঞানের চেয়ে ধনের পিছনে বেশি করে ছুটতে শেখাচ্ছে। 'টাকা স্বর্গ টাকা ধর্ম টাকা হি পরমন্তপঃ' গানে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হতে শুরু করেছে।

এই এক অদ্ভুত পরিস্থিতি! আর, ঠিক এইরকম অদ্ভুত পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল একটি জাতিকে যাদের নাম **বিহারী**। সারা বিশ্বের প্রেক্ষিতে এই জাতি আখ থেকে চিনি আবিষ্কার করেছিল সবার আগে, ৭০০ খ্রিস্টাব্দে; যেখানে কিনা ইয়োরোপ চিনি দেখেছে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে। এই বিহারের লাগোয়া **কনখল** হল সেই স্থান যেখানে দক্ষ (স্পেশালিস্ট) সবার আগে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যৌথব্যবস্থার ভিতরে জন্ম যে আদি দোকানদারের, যে কিনা ফেরিওয়ালারই একটি পরিণত রূপ, সেই **কর্ণ**কে এই দেশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। যৌথব্যবস্থার ভিতরে বাস করেও এই জাতিই সবার আগে (হর্ষবর্দ্ধনের কালে) ঢালাও পণ্যবিনিময় শুরু করেছিলেন। সে ছিল রামরাজত্বের কাল। বিহার এসময়ই রামভজনা শুরু করেছিল। প্রতিটি অর্থনৈতিক বিপ্লব যেমন সাহিত্যে তার সাক্ষ্য রেখে যায়, এই বিহারী অর্থনৈতিক বিপ্লব তুলসীদাসের মাধ্যমে সেই সাক্ষ্য রেখে গেছে। ভারতসমাজের প্রচলিত রীতির বিপরীতে চম্পকনগরের সেই বিপরীতগামিতা বা বিশেষ প্রকারের **হর (হার)** স্বভাবের অস্তিত্বের কারণে এসময় থেকেই অঙ্গদেশবাসীগণের নাম হয়ে যায় **বিহারী**। এই সময় তথাকথিত বেদবাদীগণ অঙ্গদেশের (বা বিহারের) মানুষকে কতখানি হীন চোখে দেখতেন এবং কী পরিমাণ ঘৃণা করতেন, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে বেদবাদীদের মহাভারতে। তাসত্ত্বেও বিহারের মানুষ কোনো নিষেধ শোনেননি।

তাঁরা সামাজিক নিষেধ অগ্রাহ্য করে, বৌদ্ধ সরকারের আশ্রয়ে উৎসাহের সঙ্গে শত শত কুটীরশিল্পব্যবস্থা গড়ে তোলেন এবং সেই কুটীরশিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য গড়ে ওঠে অজস্র দোকান-হাট-বাজার, সেকালের ভাষায় **বন** বা **অরণ্য**। চম্পকারণ্য ছিল তেমনি এক অরণ্য। এই সব অরণ্য (৭৫০ খ্রিস্টাব্দে) হিন্দুযুগের সূত্রপাতের পর ক্রমশ ধ্বংস হয়ে যায়। ফলত বিহারী আত্মার বিষাদবিধুর কান্না আর থামে না; তা শোনা যেতে থাকে বিহারীদের রামায়ণ-পাঠে, রামায়ণ-গানে, আজও। আজকের চম্পারণ তেমনি এক আদি হাটের ধ্বংসাবশেষ। এরকম আরও কিছু অরণ্যের ধ্বংসাবশেষের কথা বলে গেছেন সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর *ঢোঁড়াই চরিতমানস* গ্রন্থে, অবশ্যই নিজের অজ্ঞাতসারে। তাঁর ঢোঁড়াই রাম যে আদি রামরাজত্বের স্মৃতিহারা উত্তরসূরী, সেকথা না ঢোঁড়াই রাম জানত, না তার স্রষ্টা জানতেন! কী দুর্ভাগ্যের কথা!

চম্পা, চাঁপা = বাংলাভাষীদের সমাজে মেয়েদের নাম রূপে প্রচলিত = যে মেয়ে চাপা স্বভাবের কিন্তু তার ভিতরে তেজ আছে, বিশেষ পরিস্থিতিতে সে এমন উৎসাহী হয়ে উঠতে পারে যা তার দৃশ্য স্বভাবের একেবারে বিপরীত। চাঁপা ফুলও সম্ভবত এই স্বভাবের বলেই তাকে চম্পা বা চাঁপা বলা হয়। বেল কামিনী প্রভৃতি ফুলের গাছের পঞ্চাশ হাত দূর দিয়ে গেলেও তাদের গন্ধে টের পাওয়া যায় ধারে কাছে বেল বা কামিনী ফুল ফুটেছে। কিন্তু চাঁপা ফুলের গন্ধ সেভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু কাছে গিয়ে হাতে নিয়ে শুঁখলে টের পাওয়া যায়, তার গন্ধ কত তীব্র। কাঁঠালে-চাঁপার তীব্র গন্ধ দূর থেকে প্রায় বোঝাই যায় না, এতই চাপা অথচ অত্যন্ত তীব্র।

চম্পু = চম্প্ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে = নিষেধ ও উৎসাহ এখানে নবরূপে উত্তীর্ণ = এ হল এমন ধরনের কাব্যগ্রন্থ, যা লোকসমাজে পড়ে বা গেয়ে শোনানো হয়। কিন্তু এর বিষয়বস্তু এমন যা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কত উৎসাহের সঙ্গে মানুষ করেছিল এবং তা কীভাবে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল বা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এতে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। = গদ্যপদ্যময় কাব্য, যথা চম্পুভারত, চম্পুরামায়ণ, নলচম্পূ ইত্যাদি।

এর পরেও কিছু কথা আছে। চম্প-র সম্পর্ক রয়েছে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের সঙ্গে। চম্পই তরুণ-তরুণীর প্রেমের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক রূপ, অতি-যান্ত্রিকতার কারণে আজ যা লোপ পেতে চলেছে। এই প্রেমের স্বরূপ হল, যাকে ভাল লাগে সাধারণত তরুণীটি (কখনও কখনও তরুণটিও) তার সঙ্গে নঞর্থক আচরণ করে — যেমন তার নিন্দে করা, তাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে পালিয়ে যাওয়া, তাকে জ্বালাতন করা ... ইত্যাদি। বিপরীত পক্ষ কীভাবে জানি বুঝে যায়, এই বিরোধী আচরণ তাকে দৃশ্যত কাছাকাছি যেতে নিষেধ করছে কিন্তু অদৃশ্যত তাকে উৎসাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে প্ররোচিত করছে। চম্প-ক্রিয়ার এই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক রূপটি এভাবেই মানব-মানবীর সম্পর্কের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছেন পরমাপ্রকৃতি স্বয়ং। সেকালের সেই কুটীর শিল্পের উপর নিষেধ ও উৎসাহ সমাজমনে পরমাপ্রকৃতি-প্রদত্ত চম্পই বটে। আমরা তাকে বেদবাদীদের কুকর্ম, বৌদ্ধবাদীদের সুকর্ম, বোকাদের শিল্পবিরোধিতা ইত্যাদি নাম দিয়ে নিজেদের কূপমণ্ডুকতা প্রমাণ করি। বাস্তবে পরমাপ্রকৃতির যা করার তিনিই করেন, অন্যে নিমিত্তমাত্র। ... **একথার পক্ষে আরও অন্তত দুটি সাক্ষ্য হাজির করা** যাক। কবি **বিষ্ণু দে একটি কবিতা লিখেছিলেন** — 'সাত ভাই চম্পা'। তার **প্রথম পাঁচটি পঙ্‌ক্তি এরকম — 'চম্পা! তোমার মায়ার অন্ত নেই, / কত না পারুল-রাঙানো রাজকুমার / কত সমুদ্র কত নদী হয় পার! / বিরাট বাংলা দেশের কত না ছেলে / অবহেলে সয় সকল যন্ত্রণাই — / চম্পা কখন জাগবে নয়ন মেলে।'** ... কবিতাটি বেশ বড়, এবং **সমগ্র কবিতায় তিনি চম্পার 'চাপা কিন্তু শক্তিরূপিণী'** চরিত্রটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, চম্পা শব্দের শব্দগত অর্থ না-বলেই। সমগ্র কবিতাটি পড়ার পর পাঠকের বিশ্বাস হতে চাইবে না, কবি চম্পা শব্দের শব্দগত অর্থ জানতেন না। অর্থাৎ, মনের গভীরে শব্দের যে-মানে আমাদের মনে ধরা দেয়, কবির মনেও সেই মানে ধরা দিয়েছিল; সচেতনভাবে না হলেও। আর একটি গান আছে — **'চাঁপার বনে, হায়, পাপিয়া কেন গায় ...!'** চাঁপার বন ও পাপিয়া-পাখিকে নিয়ে এরকম আরও কথাবার্তা আছে। আজ আমরা জানি, চাঁপাগাছ ও পাপিয়া যেমন উদ্ভিদ ও জীবজগতে সক্রিয়, সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ কুটীরশিল্পব্যবস্থা ও পিয়াসী-খদ্দের তেমনি সমাজসংগঠন ও মানবজগতে সক্রিয়। এই পাপিয়াই প্রাচীনপন্থীদের চোখে পাপিষ্ঠ। দ্র. **পাপ**। ৬. camp, campus, chameleon, champion।

চর্ (চারি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অগোচর, অচর, অচরম, অতিচার, অত্যাচার, অত্যাচারী, অনাচরণ, অনাচার, অনাচারী, অনুচর, অবিচার, অবিচারণ, অবিচারণীয়, অবিচারিত, অবিচার্য্য, অব্যভিচারী, অব্যভিচরিত, অব্যভিচার, অভিচরণ, অভিচার, আউতন (উচ্চারণ), আচর, আচরণ, আচর্য্য, আচার, আচারদীপ, আচারপূত, আচারবর্জ্জিত, আচারবান, আচারব্যপেত, আচারভ্রষ্ট, আচারী, আচারহীন, আচার্য্য, আচার্য্যক, আচার্য্যকরণ, আচার্য্যদেব, আচার্য্যমিশ্র, আচার্য্যা, উচ্চারণ, উপচরিত, উপচার, একচর, একচারী, ঔপচারিক, খচর, গোচর, গোচারক, চন্নামৃত, চর্, চর, চরক, চরচা, চরণ, চরণগ্রন্থি, চরণপর্ব্ব, চরণব্যূহ, চরণামৃত, চরণাম্বুজ, চরণারবিন্দ, চরণায়ুধ, চরণোদক, চরন্তী, চরম, চরা, চরাচর, চরাট, চরিত, চরিতার্থ, চরিত্র, চরু, চর্চ্, চর্চ্চ, চর্চ্চরি, চর্চ্চরিকা, চর্চ্চরী, চর্চ্চা, চর্চ্চিকা, চর্চ্চিত, চর্ব্ব্, চর্ব্বণ, চর্ব্বি, চর্ব্বী, চর্ব্ব্য, চর্ব্ব্যুট্ট, চর্ম্ম, চর্ম্মক, চর্ম্মকার, চর্ম্মকারক, চর্ম্মকারী, চর্ম্মকীল, চর্ম্মচক্ষু, চর্ম্মচটক, চর্ম্মচটকা, চর্ম্মচটিকা, চর্ম্মচটী, চর্ম্মণ্বতী, চর্ম্মনয়ন, চর্ম্মপ্রসেবক, চর্ম্মপ্রসেবিকা, চর্ম্মাম্বরধর, চর্ম্মার, চর্ম্মিক, চর্ম্মী, চর্য্য, চাঁচর, চাচর, চাট্টি, চাড়ডি, চাম, চামসা, চামাটি, চামার, চার, চা'র, চারক, চারচক্ষুঃ, চারণ, চারভট, চারা, চারাল, চারি, চারিত্র্য, চারিবেদী, চারী, চারু, চার্ব্বাক, চার্ম্মণ, চাহারম, চিমড়া, চিমড়ে, চিমসা, চিমসিয়া, চিমসে, চীর্ণ, জলচর, দুরাচর, দুরাচার, দুশ্চর, দুশ্চরিত, নির্ব্বিচার, নিশাচর, প্রচর, প্রচার, বিচার, ব্যভিচার, ভট্টাচার্য্য, যথাচার, যথেচ্ছাচার, ষট্‌চরণ, সগোচর, সচরাচর, সচ্চরিত্র, সঞ্চর, সঞ্চরণ, সঞ্চরমান, সঞ্চার, সঞ্চারিণী, সঞ্চারী, সদাচার, সমাচরণ, সমাচার, সহচর, সহচারিণী, সাহচর্য্য, সুচরিত।

চর্ (চারি) = চায়ীর রক্ষণ-ভক্ষণ। **চর** = চায়ীর রক্ষণ-ভক্ষণ যাহাতে। **চার** = চর হইতে জাত। **চারি** = চার-এর বিকাশ যাহাতে।

আচরণ : ১. আ + ✓চর্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চরণসমূহের আধার; অথবা, চরণে চরণে (চরণ = যাহার দ্বারা চরে) যে ক্রিয়া হয়ে থাকে।* ৩. আচার, অনুষ্ঠান, বিধান। ... বৃত্ত, চরিত, ব্যবহার। ... (ব.শ.)। ৪. ব্যবহার। ৫. দৈহিক চরণ হল পা, যার দ্বারা চরে দৈহিকভাবে। সেও চরৈবেতি। আর, মানসিক চরণ হল শ্লোকের বা কবিতার চরণ, যার দ্বারা চরে মানসিকভাবে। তাও চরৈবেতি। দৈহিক চারণের নানা ভঙ্গিকে একত্রে আচরণ বলে, মানসিক চারণের নানা ভঙ্গিকেও একত্রে আচরণ বলা যায়, যদিও এর অন্য নামও রয়েছে, যথা — পদ্য, ধর্ম্মালোচনা বা অধ্যাত্মচিন্তা, ইত্যাদি। ৬. ইংরেজি (ven)ture, (adven)ture ইত্যাদি।

আচার : ১. আ + ✓চর্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ)। ২. *আচরণের পুনরাবৃত্তি যাহাতে থাকে।* ৩. আচরণ। ... স্নান আচমন প্রভৃতির অনুষ্ঠান। ... বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। পারম্পর্য্যক্রমাগত বিধি। ... রীতি। ... (ব.শ.)। ৪. পুরুষানুক্রমিক রীতি। ৫. বিশেষ **আচরণ** যখন একই কর্মের পুনরাবৃত্তিতে পরিণত তখনই তা আচার। ৬. ইংরেজি (cul)ture।

আচার্য্য (আচার্য) : ১. আ + ✓চর্ + য (ণ্যৎ) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **আচার্য্য** = **আচার** *গতিশীলরূপে স্থিত হয়ে (ধৃত) থাকে যাহাতে;* **আচার্য** = **আচার** *গতিশীলরূপে স্থিত যাহাতে। /* বেদাভ্যাসার্থ যাঁহার নিকটে যায়; অথবা, যে দ্বিজ শিষ্যকে উপনীত করিয়া সঙ্কল্প ও সরহস্য বেদ পাঠ করান। (ব.শ.)। ৩. **আচার্য্য** = বেদাধ্যাপক, শাস্ত্রবিশেষের অধ্যাপক, মতপ্রবর্ত্তক শঙ্করাদি, শিক্ষকমাত্র, পূজ্যমাত্র, দ্রোণ, যজ্ঞাদিতে ধর্ম্মোপদেশক গুরু, ভক্তিশাস্ত্রের উপদেশক। (ব.শ.)। ৪. teacher বা professor অর্থে প্রচলিত। ৫. শ্রুতি স্মৃতি লোকাচার বা ধর্মগ্রন্থাদি যিনি মুখস্থ রাখেন। এগুলি যার কাছে পাওয়া যায়। পণ্ডিত। ঐসকল গ্রন্থ বিক্রেতা। পাঠাগার। এই অর্থটি বর্তমানে য-ফলাহীন আচার্য শব্দের দ্বারাই প্রকাশিত হয়ে থাকে, যার মানে দাঁড়ায় *আচার ধারণ করে রাখে যে।* অর্থাৎ, শ্রুতি, স্মৃতি, লোকাচার, ধর্মগ্রন্থ, আচারের বিষয়ে লেখা রয়েছে এমন যে কোনো গ্রন্থাদি। অথচ বর্তমানে অধ্যাপক মাত্রকে আচার্য বলা হয়। প্রাচীন বাংলায় 'আচার্য' শব্দটি নেই, রয়েছে 'আচার্য্য'। এটি একালের বর্ণার্থজ্ঞানহীন শব্দতাত্ত্বিকদের কীর্তি। ইংরেজির মুখোমুখি হয়ে অনন্যোপায় তাঁরা professor-এর পরিবর্ত প্রতীকী শব্দ করেছেন আচার্য।

চর : ১. ✓চর্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চায়ী (ইচ্ছাকারী, ইচ্ছা) রহে যাহাতে; অর্থাৎ চরে যে; কিংবা, চরে যেখানে।* ৩. চল, গতিশীল, অনবস্থিত, ভ্রমণকারক, চরণকারক, কম্পমান, অনুষ্ঠাতা, 'ভূতপূর্ব্ব' অর্থে প্রত্যয়, স্বপররাষ্ট্রবৃত্তান্ত-জ্ঞানার্থ নিযুক্ত রাজপুরুষ, কপর্দ্দক, খঞ্জনপক্ষী, অক্ষক্রীড়াভেদ, মঙ্গলবার, মেষ কর্কট তুলা ও মকর রাশি; চড়া; পশুপক্ষীর ঘুরিয়া ঘুরিয়া তৃণকীটাদি খাওয়া, উড়িয়া বেড়ান, প্রবাহিত হওয়া, ভ্রমণ করা, গমন করা। (ব.শ.)। ৪. spy বা 'গুপ্তচর' অর্থে প্রচলিত। ৫. যে গমনে চয়নেচ্ছা ও গ্রহণেচ্ছা রহে, তাকে চরা বলে। সেকারণে এই গমন হল যেতে যেতে, খাদ্য খুঁজে খুঁজে খেতে খেতে চলা। কিন্তু সবাই একই ভাবে চরে না। কেউ ঘাস খুঁজে খুঁজে খেতে খেতে চলে, কেউ-বা খবর খুঁজে খুঁজে খেতে খেতে চলে। অর্থাৎ, পশুপাখি সাপখোপ কীটপতঙ্গ এবং মানুষও যে যার নিজের মতো চরে। যেভাবেই চরুক না কেন, চরে বলে তাদের প্রত্যেককেই **চর** বলে। শুধু তাই নয়, যেখানে চরে, তাকেও **চর** বলে। তা বলুক। তবে এ তো সবই স্থানে বা স্থান-ক্ষেত্রে (পার্থিব ক্ষেত্রে বা সামাজিক ক্ষেত্রে) চরা। তা না হয়ে চরাটি যদি কালে বা কাল-ক্ষেত্রে ঘটে, তখন কী হবে? সপ্তাহের যে দিনটিতে শনি বা Saturn চরে বেড়ায়, সেই দিনটিকে হিন্দিভাষীরা বলেন 'শনিচর'। বাংলায় বা ইংরেজিতে দিনের 'চর' নামের উত্তরাধিকার নেই। রয়েছে যথাক্রমে **'বার'** ও **'দিবস'**-এর (day-এর)। মোটকথা, সপ্তাহের সাত দিন সাত জন দেবতার দখলে। দ্র. **চরাচর**।

চরক (চরকসংহিতা) : ১. চর + ক (কন্) স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. *চর (চরবৃত্তি) করে যে।* ৩. চর, ভিক্ষু, চরককৃত চিকিৎসাশাস্ত্র। আয়ুর্ব্বেদবিৎ মুনিবিশেষ। ইনি অনন্তদেব। চরসদৃশ গূঢ়ভাবে পৃথিবীর ঘটনাবলী দেখিতে আসিয়াছিলেন বলিয়া ইনি 'চরক' নামে খ্যাত। আত্রেয় শিষ্য অগ্নিবেশাদি মুনির চিকিৎসাগ্রন্থ সংগ্রহ ও সংস্কার করিয়া ইনি নিজ নামে খ্যাত 'চরক'-গ্রন্থ রচনা করেন। (ব.শ.)। আয়ুর্বেদবেত্তা এবং বিখ্যাত চরকসংহিতার প্রণেতা। ... অনন্তদেব ষড়ঙ্গ বেদবেত্তা মুনিপুত্ররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মানবের রোগজনিত দুঃখের অবসান করে খ্যাতিলাভ করেন। ইনি চররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে চরকরূপে খ্যাতি। ইনি ব্রহ্মা, প্রজাপতি, অশ্বিনীকুমার, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয় এবং অগ্নিবেশ্যের নিকট যথাক্রমে সূত্র, শরীরস্থান, ঐন্দ্রিয়, চিকিৎসা, নিদান, বিমান, বিকল্প ও সিদ্ধি — এই অষ্টস্থান শিক্ষা করে চরকসংহিতা নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। চরকসংহিতা গ্রন্থনাম ও গ্রন্থটি আজও প্রচলিত। ৫. দ্র. **আয়ুর্ব্বেদ, ধন্বন্তরি**। কথিত আছে, ধন্বন্তরি তাঁর গুরু অশ্বিনীকুমারের নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলে, অশ্বিনীকুমার তাকে বলেন ধরাধামে যে বস্তুতে মানুষের ব্যাধি-নিরসনের কোনো গুণ নেই, সেই বস্তু সংগ্রহ করে এনে গুরুদক্ষিণা দিতে। ধন্বন্তরি দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করে এমন একটিও বস্তু পেলেন না যা দিয়ে গুরুদক্ষিণা দেওয়া যায়। কথাটি তিনি গুরুদেবকে জানালেন। গুরুদেব সন্তুষ্ট হয়ে যা বললেন, তার মর্মার্থ হল — সমস্ত বস্তু হাতে-নাতে পরীক্ষা করে কোনো নির্গুণ বস্তু না-পাওয়াই তাঁর গুরুদক্ষিণা। অর্থাৎ, ধন্বন্তরি কেবল তাত্ত্বিকভাবে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র শিক্ষা করেননি, বাস্তবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছিলেন। এই ধন্বন্তরি সহ পূর্বতন সকল আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উত্তরাধিকারী ছিলেন **চরক**। তিনি সমস্ত পূর্বতন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করে সংস্কার করেছিলেন। কেবল তাই নয়, তিনি ধন্বন্তরির

মতো, অনন্তদেবের মতো 'চরসদৃশ গূঢ়ভাবে' পৃথিবীর যাবৎ বস্তু ও ঘটনার মূল সংবাদ সংগ্রহ করে, চর্-চা বা **চর্চা** করে তবেই পূর্বতন সমগ্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকে সংস্কার করেছিলেন। সেইজন্যই তাঁকে 'চরক' বলা হয়। তাঁর লেখা সংহিতা গ্রন্থের নাম চরকসংহিতা।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল। **বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রের** মতো চরকসংহিতা গ্রন্থটি ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় রচিত। এতে একই সঙ্গে মানবশরীরের, সমাজশরীরের (এবং কখনো-বা জগৎশরীরেরও) ব্যাধিসমূহের কথা এবং তার নিরসনের কথা বলা রয়েছে এক বয়ানেই। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যাক। যেমন শরীর সুস্থ রাখার নির্দেশাবলীতে চরকসংহিতার একটি নির্দেশ এরকম — 'ন বেগান ধারয়তি'; বেগ ধারণ করিবে না। এই বেগ হল হাঁচি, কাশি, বাতকর্ম, প্রস্রাব, পায়খানার বেগ। এই বেগগুলিকে চেপে রাখলে শরীর খারাপ হয়। কথাটি কেবল মানবশরীরের ক্ষেত্রেই একশোভাগ খাটে না, সমাজশরীরের পক্ষেও সমানভাবে খাটে। তবে কিনা, তার আগে জানা চাই, সমাজশরীরের হাঁচি (যাতে **ইক্ষ্বাকুর** জন্ম হয়েছিল), কাশি, বাতকর্ম, মূত্রত্যাগ ইত্যাদি কোন কোন সামাজিক প্রক্রিয়াগুলিকে বলে। একালের সমাজশাস্ত্রীরা ও জগৎশরীর-নিরাময়াভিলাষী গ্রিনপিসবাদীরা যথাক্রমে সমাজশরীরের ও জগৎশরীরের রোগ নিরাময়ের জন্য চাইলে চরকসংহিতা পড়ে দেখতে পারেন; অবশ্য তার আগে তাঁদেরকে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিটি রপ্ত করে নিতে হবে। দ্র. **বায়ু**।

চরণ : ১. ✓চর্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে; ✓চর্ + অন - ণ। (ব.শ.)। ২. *চর্ অন (on) থাকে যাহাতে। /* যাহার দ্বারা গমন সাধিত হয়; যাহার দ্বারা চলন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. ভ্রমণ, গতি, ভক্ষণ, অনুষ্ঠান, আচার, আচরণ, পাদ, পদ, চক্রাদি, আশ্রয়, আলম্বন, বেদৈকদেশ, বেদশাখা, শাখাধ্যেতা, শ্লোকের চতুর্থাংশ, চতুর্থভাগমাত্র, সিকিভাগ, বৃক্ষমূল, পদাতিসৈন্য, সূর্য্যকিরণ, গৌরবসূচক পাদ, পদচিহ্ন, গবাদির তৃণাদিভক্ষণ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. যার দ্বারা একটি সত্তার **চর**-করা অন থাকে, তাকে তার চরণ বলে। সেই সুবাদে সমস্ত জীবের leg বা পা-কে চরণ বলে। এমনকি গাছের গোড়া বা বৃক্ষমূলকেও সেকারণে চরণ বলা যায়। কিন্তু মানুষ তো কেবল দেহসম্বল জীব নয়, তার মন আছে এবং সেও চরে বেড়ায়; চরে গদ্যে, পদ্যে, শ্লোকে, কাব্যে, বেদে। আর, সেখানে সে এক বারেই গোটাটা চরে ফেলতে পারে না; সেখানেও তাকে পা ফেলে ফেলে এগোতে হয়। সেই পা হল গদ্যের ক্ষেত্রে বিভক্ত্যন্ত পদ বা চরণ। আর, কবিতার, পদ্যের, শ্লোকের ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্লোকের চতুর্থাংশ হল তার এক-একটি পদ বা চরণ। মানুষের মানসিক চরা চলে মনে মনে গদ্যপদ্যগ্রন্থের এইসব পদে পদে বা চরণে চরণে হেঁটে। কিন্তু রাজা বা রাষ্ট্রশরীর হাঁটে কীভাবে? ব.শ. জানাচ্ছেন রাষ্ট্রশরীরের এক একটি পা বা চরণ হল তার এক একটি সৈন্য। তার মাধ্যমেই রাজশাসন হাঁটে। তবে সবচেয়ে সক্রিয় কিন্তু সবচেয়ে অদৃশ্য চরণ যার, তিনি হলেন সূর্য্য। তিনি যখন sun-রূপে জগৎ আলো করার জন্য প্রকাশিত হন, তখন তাঁর পা বা চরণ হল প্রতিটি কিরণকণা। কিরণে কিরণে তিনি জগৎ আলো করে কিরণমালী রূপে প্রতিষ্ঠা পান। আর, তিনি যখন জ্ঞান ও ধনের আলো ছড়িয়ে মানুষের সমাজ ও মানসলোক আলোকিত করেন, তখন একজন জ্ঞানসম্পদ-বাহী পরিব্রাজক ও একজন ধনসম্পদবাহী সরকারি কর্মচারীও তাঁর কিরণ বা চরণই বটে। দ্র. **কিরণ**, **পদ**। ৬. ইংরেজিতে কবিতার চরণের ধারণাটি গেছে foot শব্দে, কিন্তু চরণ শব্দটি গেছে খানিকটা ভিন্ন অর্থে — chariot।

চরম : ১. ✓চর্ + অম (অমচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চরা সীমায়িত যেখানে; যার পরে আর চরা নেই।* ৩. অন্ত্য, অন্তিম, শেষভব, পশ্চিম, পাশ্চাত্য, গলিত, পরিণত, পশ্চাদভাগ। (ব.শ.)। ৪. highest অর্থে প্রচলিত। ৫. আমাদের চরার এলাকার শেষ যেখানে, সেই স্থানকে চরম বলে; তা সে দৈহিকভাবে চরার এলাকা হোক আর মানসিকভাবে চরার এলাকাই হোক। তাই অন্ত্য, অন্তিম, শেষভবকে চরম বলে। প্রাচীনকালে ভারতের মানুষ দৈহিকভাবে শেষ যেখানে দেখতে পেতেন, সেই স্থানকে তাঁরা বলতেন **পশ্চিম** বা **পাশ্চাত্য** এবং স্বভাবতই তা চরমও বটে। অস্তিত্বের গলিত, পরিণত রূপই তার চরম স্থান। জীবিত অস্তিত্বের পেছনদিকটিই তার শেষ দিক বা চরম দিক।

চরাচর : ১. চর + অচর। ২. *যে চরে এবং যে চরে না; অথবা, যেখানে চরা যায় এবং যেখানে চরা যায় না।* ৩. জঙ্গম, গমনশীল, জঙ্গমস্থাবরবান, স্থাবরজঙ্গমাত্মক, জঙ্গম ও স্থাবর। (ব.শ.)। ৪. earth অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দটির অর্থ এখন সাধারণভাবে জগৎ বোঝা হয়ে থাকে। 'জগৎ-চরাচর' বা 'বিশ্ব-চরাচর' শব্দটি বলতে সাধারণভাবে world বোঝা হয়ে থাকে। কখনোই খেয়াল করা হয় না যে, এর ভিতরে 'চর'-বার কথা রয়েছে। অথচ আমাদের শব্দবিদ পূর্বপুরুষেরা নিশ্চিত ভাবেই জানতেন, আমাদের এই দুনিয়াটায় দুই জাতির অস্তিত্ব রয়েছে। একদল চরে বেড়ায় (= চর), আর একদল চরে বেড়াতে পারে না (= অচর); স্থির দাঁড়িয়ে থাকে। কেবল তাই নয়, তাঁরা স্পষ্টভাবে অনুভব করেছিলেন যে, আমাদের দৈহিক ও মানসিক চরে বেড়ানোর এলাকা (দৈহিক গোচর ও মানসিক গোচর) ছাড়াও বিশাল এলাকা রয়েছে, যেখানে আমরা চরে বেড়াতে পারি না। সেই জ্ঞাত-অজ্ঞাত দুই এলাকা নিয়েই আমাদের দৈহিক ও মানসিক চরাচর। অর্থাৎ কিনা বাংলাভাষীর চেতনায় তার জগৎ মোট তিনটি জোড়ে বিভক্ত — গতিশীল বা জঙ্গম-চর (= চর) ও স্থিতিশীল বা স্থাবর-চর (= অচর); চক্ষুগোচর বা দৈহিক গোচর (= চর) ও চক্ষুর অগোচর বা দৈহিক অগোচর (= অচর); মানসিক গোচর বা জ্ঞানগোচর (= চর) ও মানসিক অগোচর বা জ্ঞানের অগোচর (= অচর)। বিশ্বচরাচর বললে এই তিনজোড়া চর ও অচরকে বোঝায়।

চরিত (চরিতার্থ): ১. ✓চর্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চর্ গতিশীল হয়ে তারিত যাহাতে।* ৩. আচরিত, অনুষ্ঠিত, কৃত, ভক্ষিত, আচরণ, অনুষ্ঠান, ক্রিয়া, কৃত বিষয়, কার্য্য, বৃত্তি, ব্যবহার,

জীবনবৃত্ত, উপাখ্যান, প্রকৃতি, স্বভাব। কৃতপ্রয়োজন, কৃতার্থ, প্রাপ্তফল, সফল, সার্থক, অন্বর্থ, প্রীত, তুষ্ট। (ব.শ.)। ৪. successful অর্থে 'চরিতার্থ' প্রচলিত এবং biography বা 'জীবনচরিত', 'চরিতকথা', 'চরিতাভিধান' ইত্যাদি রূপে চরিত শব্দটি প্রচলিত, অন্যথায় অপ্রচলিত। ৫. চরিত কথাটি বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় কারণ তা 'কাশ'-এর মতো স্বতন্ত্রভাবে প্রচলিত নয়। তবে তার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে উপসর্গযোগে। সেই কারণে 'আচরিত' বললে আমরা চরিতকে সহজে চিনতে পারি। এ হল সেই সত্তা, যার চরা হয়ে গেছে। তার মানে, যে ক্ষেত্রে চরা হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্র যেমন চরিত হতে পারে, তেমনি সেই ক্ষেত্রে চরণে চরণে চরে চরে চরা শেষ করেছে যে, সেও চরিত হতে পারে। জীবনচরিত কথাটিতে এর সুস্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে। মানুষের জীবন তো একটি সুদীর্ঘ চরণক্ষেত্র। একজন মানুষ তার সেই চরণক্ষেত্রে কিভাবে চরণ ফেলে ফেলে কী কী আচরণ করে করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে, সেটিই তার জীবনচরিত।

চরিত্র : ১. ✓চর্ + ইত্র - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চর গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে। /* যাহার দ্বারা চরণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. স্বভাব, অনুষ্ঠান, ব্রতাদি অনুষ্ঠান, চেষ্টিত, কার্য্য, আচার, শিষ্টব্যবহার, কুল, বংশ, সুচরিত, সদ্ধর্ম্ম, চারিত্র, জীবনচরিত, জীবিতকার্য্য। (ব.শ.)। ৪. character অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দটির প্রকৃত অর্থ খানিকটা ধরা আছে ব.শ. প্রদত্ত অর্থের স্বভাব, শিষ্টব্যবহার, সদ্ধর্ম্ম শব্দে। প্রকৃতপক্ষে চরণ (আচরণ) যখন গতিশীল হয়, যে স্বভাব, যে শিষ্টব্যবহার, যে সদ্ধর্ম্ম তার সেই গতিশীল চর-অনকে চরার বাধাবিপত্তি থেকে ত্রাণ করে, তাকেই **চরিত্র** বলে। অন্যভাবে বললে, সুচরিতকে ত্রাণ করে যে সেই হল **চরিত্র**। ৬. ইংরেজি character।

চর্চ্চা (চর্চ্চিত) : ১. ✓চর্চ্চ্ + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *চয়িতের চর্-চয়ন চলে যাহাতে।* ৩. অধ্যয়ন, আলোচনা, বিচারণা, অনুশীলন, চিন্তা, বিমর্শন, চন্দনাদিবিলেপন, স্থাসক, ঠসক, সংখ্যান, গণনা, গায়ত্রীরূপা মহাশক্তি, দুর্গা। আলোচিত, বিচারিত, অনুশীলিত, দিগ্ধ, খণ্ডিত, লিপ্ত। (ব.শ.)। ৪. discussion করা অর্থে প্রচলিত। ৫. যা কিছু মানসিকভাবে চয়ন করে আনা হয়েছে, গ্রন্থাদিতে রাখা হয়েছে, মানুষের অভিজ্ঞতায় রাখা হয়েছে, তা সবই চয়িত। সেই চয়িতের বিশাল ক্ষেত্রে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় চয়ন করে আনার জন্য যে চরা, তাকে বলে চর্চ্চা। ফলত, এই চরা একটি বিশেষ বিষয়কে ধরে ধরে বিশেষ পথে এগিয়ে এগিয়ে যাওয়া। কীভাবে জানি আমাদের পূর্বপুরুষেরা বুঝেছিলেন, যে, এই চর্চ্চার পথটি বেশ একটা ছবির মতো সুন্দর হয়। শামুকের চলার পথে যেমন দাগ পড়ে সেইরকম। একেও তাঁরা নাম দিয়েছিলেন চর্চ্চা। কারও গায়ে ঠিক সেভাবে চন্দন লেপে দিতে পারলে, তাকে সেকারণেই চন্দনচর্চ্চিত বলে।

চর্ব্বণ (চর্ব্ব্য, চর্ব্বী) : ১. ✓চর্ব্ব্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *বাহিতের চর্-বহন অন থাকে যাহাতে।* ৩. দন্ত দ্বারা চূর্ণন, চিবান, আস্বাদন, কাব্যরসাস্বাদ, ভক্ষণ। চর্ব্বণীয়, চর্ব্বণযোগ্য খাদ্য। মেদ, বসা (fat)। (ব.শ.)। ৪. chewing অর্থে প্রচলিত। ৫. যা কিছু বহন করে আনা হয়েছে, তা সে দৈহিকভাবে হোক আর মানসিকভাবেই হোক, তা সবই বাহিত। সেই বাহিতের ভিতরে চরে চরে কাজের জিনিসটি বহন করে আনার কাজ চলে যাতে, তাকে বলে চর্ব্বণ। এই চর্ব্বণ অন্নব্যঞ্জনের (বা বাহ্যবস্তুর) পদের চর্ব্বণ হতে পারে, আবার কাব্যের পদ-চর্ব্বণও হতে পারে।

চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় — আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়াটিকে এই চারভাগে ভাগ করে বুঝেছিলেন। কিন্তু এভাবে বললে একালের গোলোকায়িত আধুনিক ছেলেমেয়েরা বুঝবে কী করে! তার চেয়ে বরং আমাদের পূর্বপুরুষদের বোঝার প্রক্রিয়াটিকে 'আপডেট' করে নেওয়া হোক। মানুষের খাওয়া ক্রিয়াটিকে এমন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হোক, যাতে সেটি একটি কারখানার মতো বিশাল কর্মকাণ্ড হয়ে যায়। সেই কারখানার চারটি ডিভিশন। কারখানার গেটে আগত লরিভর্ত্তি কাঁচামাল চেক করে নিয়ে তাদের দেখেশুনে ঠিক করা হবে, সেগুলি কোন ডিভিশনে পাঠান হবে। যদি কাঁচামালের ধরন শক্ত হয়, যাদের গুঁড়ো করে রস বের করা দরকার, তবে তাদের পাঠান হবে এক নম্বর ডিভিশনে, যার নাম গ্রাইন্ডিং-ডিভিশন বা চর্ব্ব্য-বিভাগ। কাঁচামালের ধরন যদি ভেজা কাপড়ের মতো হয় যাদের নিঙ্ড়ে রস বের করা দরকার, তাহলে সেগুলিকে পাঠান হবে সাকিং-ডিভিশনে অর্থাৎ চোষ্য-বিভাগে। কাঁচামালের ধরন যদি চটচটে হয়, যাদের চেঁছেমুছে নেওয়া দরকার, তবে সেগুলি পাঠানো হবে লিকিং-ডিভিশনে অর্থাৎ লেহ্য-বিভাগে। এবং কাঁচামালের ধরন যদি জলের মতো হয়, তাহলে সেগুলিকে পাঠিয়ে দিতে হবে ড্রিঙ্কিং-ডিভিশনে বা পেয়-বিভাগে। এই ডিভিশনের কর্মীসংখ্যা সবচেয়ে কম হলেও এটি ইমার্জেন্সি বিভাগ। এ-কারখানাতেও স্ট্রাইক হয়, কাঁচামালের অভাবে কারখানা বন্ধও থাকে; কিন্তু পেয়-বিভাগ চালু রাখতেই হয়। বিশেষ কারণে কদাচিৎ এক-আধদিনের জন্য পেয়-বিভাগও বন্ধ রাখা যায়, তবে সে কদাচিৎ। যেদিন স্বেচ্ছায় তেমন করা হয়, সেদিনটিকে বলে নির্জ্জলা উপবাসের দিন। অবশ্য মানুষের যেদিন পৃথিবীটাই উবে যায়, সেদিন গোটা কারখানাই বন্ধ হয়ে যায়। — তবে এসবই হল বাহ্যিক খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার কথা। মানসিক খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এরকম করে আপডেট করে নেওয়া যেতে পারে।

চর্ম্ম (চাম, চামড়া) : ১. ✓চর্ + মন্ (মনিন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *সীমায়িত মন (আত্মন্) চারিত যাহাতে; অর্থাৎ, চর্ মিতি মিত যাহাতে। (দ্র. ধর্ম্ম)।* ৩. ত্বক, চামড়া, স্পর্শেন্দ্রিয়, চর্ম্মময় তনুত্রাণ, ফলক, ঢাল। (ব.শ.)। ৪. skin অর্থে প্রচলিত। ৫. শরীরে যে কোনো স্থানে ছুঁয়ে দিলেই আমরা টের পাই কেন? কারণ, আমাদের দেহের ত্বক বা চামড়ায় চরে বেড়ায় আমাদের নিজ নিজ মন, সেই কারণে একে চর্ম্ম বলে। শব্দের জন্মপ্রক্রিয়ার বিচারে শব্দটি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বর্ম্ম ... ইত্যাদির মতো। এর অর্থ হল, মনন ক্রিয়ার আচরণ চলে দেহের যে সীমায়, সেই সীমা। তার মানে আমাদের মন আমাদের

শরীরের সমগ্র চামড়ায় চরে বেড়ায়। সেজন্যই শরীরের যে-কোনো অংশের চামড়ায় কোনো কিছুর স্পর্শ ঘটলেই আমরা টের পেয়ে যাই। সেই জন্যে তাকে স্পর্শেন্দ্রিয় বলে। শরীরে যে-অংশে চামড়া থাকে না, সেখানে মন থাকে না। তাই সেখানে কোনো কিছু স্পর্শ করলেও আমরা টের পাই না। যে-চোখে চামড়া থাকে, সে চোখে দুঃখজনক বা আনন্দজনক যেমন ঘটনাই পড়ুক, সেই চোখের চামড়ায় যে-মন থাকে সে তা টের পেয়ে যায়। কিন্তু যে-চোখে চামড়া নেই, সে তা টের পায় না। তাই সে-চোখ হাসে না, কাঁদে না; কাঁদবার কারণ দেখতে পায় না। কারণ সে-চোখের পেছনে মন নেই, থাকে না; কারণ এই চোখের যে চামড়ায় মনের থাকার কথা, সেই চামড়াটাই নেই। আর, যে-চোখ কাঁদে না, তা মানুষের স্বাভাবিক চোখের গুণাগুণ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে অধঃপতিত হয়ে গেছে। অতএব যে-চোখের চামড়া নেই, সে চোখ হল মরা চোখ, তাকিয়ে থাকে কিন্তু দেখে না, কিংবা দেখেও দেখে না; এ হল ক্যামেরার চোখ, যে কিনা 'অন্ধ হয়ে দেখে'। এ চোখে স্বভাবতই স্বপ্ন, ঘুম, হাসি, কান্না, এসব আর থাকে না। উপাসকেরা তাই বলেন, যে-চোখ কাঁদে না, তার কোনো দাম নেই। বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে 'খ' গ্রন্থের 'প্রাচ্যের চোখ ও রবীন্দ্রনাথ' নিবন্ধে।

চর্ম্মণ্বতী : ১. চর্ম্মন্ + বৎ (বতুপ) অস্ত্যর্থে + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। (ব.শ.)। ২. *চর্ম্ম অন যাহাতে তদ্বৎ সত্তার আধার যে।* ৩. বুন্দেলখণ্ডস্থ নদীবিশেষ, চম্বল নদী (ইহা দানবপুরপতি রন্তিদেবের যজ্ঞে নিহত গোসমূহের চর্ম্মের রক্তে উৎপন্না)। (ব.শ)। মহারাজ রন্তিদেব প্রতিদিন কয়েক সহস্র বৃষ বধ করে ব্রাহ্মণ ও অতিথিদের ভোজন করাতেন। এই সকল বৃষের চর্মনিঃসৃত রক্ত ও ক্লেদে এই নদীর উৎপত্তি হয়। এখন এই নদী বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত চম্বল নামে খ্যাত। (পৌ.অ.)। ৫. এই কাহিনীটিকে উদ্ভট এবং বাজে কথা বলে যাঁরা উড়িয়ে দিতে চান, তাঁরা এভাবেই ভারতের ইতিহাস মুছে দেওয়ার পক্ষে কাজ করে গেছেন। আর এই কাহিনীটিকে যাঁরা কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর (এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের) বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার বদ-উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে এগোতে চান, তাঁরাও মিথ্যাচারী হন। কেননা, সবাই জানে চম্বল নদীতে গরুর রক্ত প্রবাহিত হয় না। তাহলে কাহিনীটির ভিতরে প্রকৃতপক্ষে কী বলা হয়েছে? হ্যাঁ, সেকথাটিই কষ্ট করে, অনুসন্ধান করে জানতে হবে। এ-পর্যন্ত এরকম কিছু কাহিনীর অর্থ আমরা উদ্ধার করেছি। (দ্র. **গঙ্গা, কংসাবতী, মন্দাকিনী** ইত্যাদি)। কিন্তু এটির প্রকৃত অর্থ এখনও উদ্ধার করতে পারিনি। তার কারণ বুন্দেলখণ্ড, রন্তিদেব, চম্বল, প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের নিতান্ত অভাব। যাঁরা এগুলি বিষয়ে যথেষ্ট জানেন, তাঁরা যদি ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি আয়ত্ত করে এ বিষয়ে তাঁদের তথ্যাদি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন, উপরোক্ত কাহিনীর পশ্চাতে বিদ্যমান সত্যকে অবশ্যই পেয়ে যাবেন। আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি, সত্য মানববিরোধী হয় না।

চারা (চার, চারণ, চারভট, চারান, চারী, বেচারা) : ২. *চারা = 'চর হইতে জাত-র' (= চারের) আশ্রয় যাহাতে।* ৩. ছোট গাছ, (চারা মাছ = **মাছের বাচ্চা, ছোট মাছ**); উপায়, প্রতিকার, গতি, পশুর খাদ্য। **চারান = বীজ হইতে অঙ্কুরোৎপাদন**। (ব.শ.)। ৪. চারা **sibling, small fish, way out** অর্থাৎ যথাক্রমে গাছের বাচ্চা, মাছের বাচ্চা, ও পথের বাচ্চা অর্থে প্রচলিত। চার চারিয়ে দেওয়ার মূল ক্রিয়া রূপে (আচার-বিচার ইত্যাদি রূপে) প্রচলিত। সবদিকে ছড়িয়ে দেওয়া অর্থে চারান প্রচলিত। **৫. চর** থেকে জাত চার। কর থেকে যেমন কার হয়, এও সেইরকম। এই কার ও চারকে চিনতে আমাদের অসুবিধা হয় বটে কিন্তু আকার-বিকার-প্রকার যেমন আমাদের খুবই পরিচিত শব্দ, তেমনি আচার-বিচার-প্রচারও আমাদের অতি পরিচিত শব্দ। উপসর্গযোগে এদের চেনা খুব সহজ। তবে কার-কে ক্রিয়ায় পরিণত করে আমরা 'কারিয়ে দেওয়া' বলে কোনো শব্দ বানাতে পারি না, কিন্তু চার-কে ক্রিয়ায় পরিণত করে আমরা 'চারিয়ে দেওয়া' শব্দ বানিয়ে নিতে পারি। একে 'চারান'ও বলে। এই শব্দ বহু শব্দের জন্ম দিয়ে থাকে।

চর = চায়ী (ইচ্ছাকারী, ইচ্ছা) রহে যাহাতে।

চার = **চর** হইতে জাত; অর্থাৎ, চর ক্রিয়ার কার্য্য থাকে যাতে।

চারণ = **চার** অন থাকে যাহাতে।

চারণ কবি = **চারণ** করেন যে কবি।

চারভট = যে ভটগণ কীর্ত্তি চারিয়ে দেন বা প্রচার করেন।

চারা = **চার**-এর আধার যে; অর্থাৎ যার ভিতরে চার থাকে।

চারী = চার করে যে সত্তা।

বেচারা = চারা নেই যার।

কার-এর মতো **চার** শব্দের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায় উপসর্গ-যোগে — **অপচার, অভিচার, আচার, উপচার, প্রচার, বিচার, সঞ্চার** প্রভৃতি শব্দে। এরকম উপসর্গ যুক্ত হয়ে যাওয়ায় চার ক্রিয়াটি তার অনির্দ্দিষ্টতা হারিয়ে বিশেষত্ব পেয়ে যায়। চার-এর আশ্রয় যাহাতে তাকে বলে চারা। অস্তিত্ব ইচ্ছারূপে থাকে চার-এ। চারায় সেই ইচ্ছা থেকে যায় উত্তরসূরী রূপে; থেকে যায় বদ্ধ অস্তিত্ব থেকে বেরোনোর উপায় রূপে। যেকারণে উপায়, প্রতিকার, গতি (অগতির গতি) প্রভৃতিকে চারা বলে। যারা কোনো উপায় বা চারা নেই সে হল বেচারা। চারা ও বেচারা দুটো শব্দকেই ফারসি শব্দ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু শব্দদুটি বাংলাভাষীর অজানা শব্দ নয়। এরা চর্ শব্দবংশের সদস্য এবং বাংলাভাষীর আপন উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত। পাঠানের হাত ধরে ফারসির চারা-বেচারা বাংলায় এলে, বাংলাভাষী তাকে আপন শব্দ বলে চিনতে পেরেছিল বলেই শব্দ দুটির ব্যবহার বেড়ে যায়। দ্র. **বেচারা**।

চারু (চার্ব্বাক) : ১. ✓চর্ + উ (ঞুণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চারু = চার নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে; চার্ব্বাক = যে বাক চার বহন করে।* / চিত্ত চারী যে; চারু বাক যাহার (অথবা আপাতলোক-মনোরম যাহার বাক্য)। (ব.শ.)। ৩. শোভন, মনোজ্ঞ, মনোহর, রুচির, মধুর, ললিত, অনিন্দ্য, শুভ, সাধু। বৃহস্পতিমতানুসারী নাস্তিক-বিশেষ, লোকায়তিক। ইনি আকাশ ভিন্ন চারি ভূত স্বীকার করেন এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী। ইঁহার মত লোকায়ত বা অনাত্মবাদ (materialism); শাস্ত্র, পরলোক নাই; মৃত্যুই অপবর্গ। যাবজ্জীবেৎ

সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ। ইত্যাদি। (ব.শ.)। (ক) দুর্যোধনের সখা জনৈক রাক্ষস। পুরাকালে চার্বাক বদরিকাশ্রমে তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার নিকট অভয় বর লাভ করে দেবগণের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করে। তখন ব্রহ্মার নিকট দেবগণ শরণাপন্ন হলে তিনি বলেন যে, চার্বাক দুর্যোধনের সখারূপে ব্রাহ্মণদের অপমান করলে ব্রহ্মশাপে দগ্ধ হবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর আত্মীয়বধজনিত গ্লানিতে সংশয়াকুল যুধিষ্ঠির সকলের পুনঃপুনঃ অনুরোধে যখন সিংহাসন আরোহণে গমন করেন, তখন সমবেত ব্রাহ্মণদের মধ্য হতে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশী চার্বাক যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে, ব্রাহ্মণরা তাঁকে আত্মীয়বধের জন্য ও গুরুক্ষয়কারী বলে ধিক্কার দিয়ে মৃত্যুবরণ করতে বলেছেন। যুধিষ্ঠির তাতে মর্মাহত হন। ব্রাহ্মণগণ জ্ঞাননেত্রের দ্বারা চার্বাককে চিনতে পেরে সক্রোধে হুংকার দিয়ে ওঠেন। তাতে চার্বাক দগ্ধ হয়ে নিপাতিত হন। (খ) একজন দার্শনিক মুনি। ইনি বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন। এঁর মতে, সচেতন দেহ ছাড়া আত্মা নাই; সুখই পরম পুরুষার্থ; প্রত্যক্ষমাত্রই প্রমাণ; পৃথিবী জল, বায়ু, অগ্নি হতে সৃষ্টি হয়েছে। ((পৌ.অ.)। ৪. চারু শব্দটি nice-looking অর্থে প্রচলিত এবং চার্ব্বাক নাম রূপে প্রচলিত। **৫. চর চার** প্রভৃতি শব্দে এতক্ষণ আমরা চয়নেচ্ছাকারীকে চারিয়ে যেতে, ছড়িয়ে পড়তে, চরতে চরতে এগিয়ে যেতে দেখছিলাম। এখন ব্যাপারটি উল্টে গেছে। বিপরীত দিক থেকে চার এসে মনকে খুশী করতে লেগেছে। একে বলে চারু।

চল্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অচল, অচলকন্যকা, অচলকন্যা, অচলনন্দিনী, অচলজ, অচলপতি, অচলরাজ, অচলা, অবিচল, অবিচলিত, আটচালা, উঁচলা, উচ্চালিত, ওঁচলা, খইচালা, চল্, চল, চলকা, চলকান, চলচল, চলচল-ছলছল, চলচ্চিত্র, চলতি, চলৎফিরৎ, চলৎশক্তি, চলন, চলনবলন, চলনি, চলন্ত, চলবল, চলবেচল, চলল, চলা, চলাচল, চলাচলি, চলিত, চাইল (চাল), চাউল (চাল), চারচালা, চাল, চালক, চালকি, চালকুমড়া, চালচলন, চালচুলা, চালচুলো, চালন, চালনা, চালনি(নী), চালমুগরা, চালা, চালাক, চালাঘর, চালাচালি, চালান, চালি, চালিত, চালিতা (চালতা), চালিয়ে নেওয়া, চালু, চালুনী, চেল, চেলগোজা, চেলা, চেলি, চেলিকা, চৈল, চোড, চোল, দোচালা, নিশ্চল, প্রচল, প্রচলন, সচঞ্চল, সচল, সঞ্চালক।

চল্ = চায়ীর লালন-লয়ন। **চল** = চায়ীর লালন-লয়ন যাহাতে।

চল (চলকা, চলকান, চলন) : **১.** ✓চল্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চল = চায়ীর (চয়নেচ্ছুগামীর) লালন চলে যাহাতে।* ***চলকা*** *= চল করে যে তাহার আধার।* ***চলকান*** *= চলকা অন যাহাতে।* ***চলন*** *= চল অন যাহাতে।* **৩. চল** = চঞ্চল, কম্পযুক্ত, **গতিশীল**, ধাবমান, অনিয়ত, অনবস্থিত, **বায়ু**, পারদ, চলন; গমন করা, যাওয়া, প্রস্থান করা, পদব্রজে যাওয়া, হাঁটা, কম্পিত হওয়া, নড়া, সরিয়া যাওয়া, প্রবাহিত হওয়া, স্পন্দিত হওয়া, চড়িয়া যাওয়া, নির্ব্বাহিত হওয়া, সম্পন্ন হওয়া, বিনিয়োগের যোগ্য হওয়া ... ইত্যাদি। ৪. 'কর'-এর মতো বাংলাভাষার প্রধান ক্রিয়াপদ রূপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। **৫.** শব্দটির অজস্র অর্থ দিয়েছেন ব.শ., কিন্তু কোনো ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দেননি। আমরা ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি দিলাম। এই অর্থ থেকে ব.শ.-প্রদত্ত উপরোক্ত (৩) সমস্ত প্রতীকী অর্থগুলি জাত হয়েছে। যে গামী চয়নেচ্ছু, সে লালন পায় যে ক্রিয়ায় তাকেই চল্ বলে। কম্প, গতিশীল ইত্যাদি সবই 'চল'-এর নানা রূপ। সংস্কৃতে চল শব্দটি থাকলেও তার ব্যবহার বিপুল বিস্তার লাভ করেছে বাংলাভাষায়। **৬.** ইংরেজি cal-যুক্ত কিছু শব্দ, যথা *cal*culate, *cal*f, *cal*k।

চাল (চাইল, চাউল, চালকি, চালকুমড়া, চালচলন, চালচুলা, চালবাজ, চালবাজী, চালা, চালাক, চালাঘর, চালাচালি, চালান, চালি, চালিত, চালিয়ে-নেওয়া, চালু) : ১. ✓চল্ + অ (ঘঙ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *চাল = চল হইতে জাত; অথবা, চলন থাকে যাহাতে।* **৩.** চলন, গতি, গৃহের বংশাদিপঞ্জরময় আচ্ছাদন, চালন, চালা, দুর্গাদি প্রতিমার উপরিস্থিত বা পশ্চাদবর্ত্তী চিত্রসংবলিত বৃত্তাকৃতি অংশ, দাবা-পাশা খেলায় বলের বা ঘুঁটির চালন, প্রসার, বৃদ্ধি, অশ্বের গতিবিশেষ, জীবনযাত্রার রীতি, ব্যবহার, ভাব-গতিক, বৃথা বড়াই, বারফট্টাই, কৌশল, ছল, ফন্দি, ধনমানাদি হেতু দাম্ভিক ভাব বা কথাবার্ত্তা, স্বভাবের গতি বা রীতি; চাউল; চালিত করা, গতিযুক্ত করা, চালান, অন্য ঘরে লওয়া বা সরান, বিক্ষিপ্ত করা, ছড়ান, বীজিত করা, মন্ত্রবলে দংশনার্থ চালিত বা উত্তেজিত করা, খেপান, পরীক্ষা করা, চালনীতে নাড়িয়া নিস্তুষ করা, চরণ-চালনে প্রবর্ত্তিত করা, বাহিয়া লওয়া, বাহা, স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপারিত করা, কার্য্যনির্ব্বাহে সমর্থ বা উপযুক্ত করা, পরিচালিত করা, ব্যবহারে লাগান, প্রেরণ করা, পাঠান, প্রবর্ত্তিত বা প্রচলিত করা, প্রবেশ করান বা ঢুকান, প্রহারার্থ ব্যবহার করা বা প্রয়োগ করা, নিক্ষেপ করা, নির্ব্বাহ করা। (ব.শ.)। ৪. বহু অর্থে বহুল প্রচলিত। **৫.** মূল কথাটি হল '**চল** হইতে জাত' = **চাল**। **চল** যেহেতু বহু অর্থধারী, চাল স্বভাবতই বহু অর্থের ধারক। একে আমরা 'চলন থাকে যাহাতে' বলতে পারি, বলতে পারি 'চলনের আধার'। তবে ভাতের চাল ও ঘরের চালকে (rice ও roof কে) **চাল** (চাইল বা চাউল, চালাঘর) বলার কারণ একটুখানি অন্যরকম। আদি রপ্তানির বস্তু কেবল গরু বা গো-ই ('যে যায়' = **গো**) ছিল না, গোধূম বা গমের আটা-ময়দাও ছিল এবং 'চাল' বা rice-ও ছিল। ধান থেকে নিস্তুষিকৃত এই বস্তু রপ্তানি হয়ে বাইরে 'চলে যেত' বলেই তার নাম হয়ে যায় **'চাল'**। আর, শুকনো ধান্যাদি ঢাকা দেওয়ার জন্য শঙ্কু আকৃতির একরকম খড়ের বিশাল ঢাকনাকেও বলা হত **চাল**, যে চাল প্রয়োজন অনুসারে তাঁবুর মতো সরিয়ে সরিয়ে নেওয়া যেত; **চালাচালি** করা যেত। এই বস্তু এখনও কোনো কোনো রাইসমিলে দেখতে পাওয়া যায়। **গৃহ**-এর এটিই ছিল আদি রূপ। পরে পরে এরকম যে-কোনো বড় ঢাকনা বা ছাদকেই **চাল** বলার প্রচলন হয়ে যায়। তবে মূল পার্থক্য হল, এই **চাল** সরণযোগ্য (moveable), কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সব চাল (ছাদ = আচ্ছাদন) সরণযোগ্য থাকে না, বরং অধিকাংশ

চালই (ছাদই) স্থাবর হয়ে যায়। তবুও তাদের 'চাল' নামটিই প্রচলিত থেকে যায়। তখন সরণযোগ্য নয় তেমন চাল লাগানো ঘরও হয়ে যায় **চালাঘর**; আর তার **চালে** থাকা কুমড়ো হয়ে যায় **চালকুমড়া** (চালকুমড়ো)। ঘরের উপরে এমন চাল যার নেই, তার না আছে মাথার উপর ছাদ, না আছে রান্নার চুলা। (চুল্লীর উপর ছাদ না থাকলে স্থায়ী চুলা থাকে না, নষ্ট হয়ে যায়।) এমন মানুষকে বলা হতে থাকে **চালচুলা**-হীন (বা চালচুলো-হীন)। অবশ্য কথাটির এমনও অর্থ হতে পারে, যে, তার চাউলও নেই এবং সেই চাউল রান্না করার জন্য **চুল্লী**ও (বা চুলোও) নেই; তাই সে চালচুলোহীন।

পরে পরে এই চাল-কে ক্রিয়াবাচক শব্দরূপে (**কার**-এর মতোই) বিস্তারিত করে নেওয়া হয়। তখন, 'চাল-অন থাকে যাহাতে', সেটি হয়ে যায় **চালন**। 'চালন করে যে', সে হয়ে যায় **চালক** এবং যাকে চালন করে সে হয়ে যায় **চালিত**। এই চাল-অন গতিশীল থাকে যে সত্তায় তাকে তাই **চালকি** (চালব্যাপারী) বলে। তখন স্বভাবতই গতিশীল 'চালনের আধার' হয়ে যায় **চালনা** বা **চালা**। যে যন্ত্রে এই চালনা বা চালার কাজ করা হয়, 'খইচালা' জাতীয় সেই যন্ত্রগুলির নাম স্বভাবতই হয়ে যায় **চালনী, চালি** বা **চালা**। এমনকি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চালনা করে নিয়ে যাওয়া বা সরানোকে বলা হতে থাকে **চালাচালি**।

সংস্কৃতের মতো বাংলাভাষা 'চাল'কে ক্রিয়ারূপে (চালন) ব্যবহার করেই থেমে যায়নি; 'চালা'কেও সে ক্রিয়াবাচক শব্দরূপে বিস্তারিত করে নেয়। ফলে বাংলাভাষায় 'চালা-অন থাকে যাহাতে', সেটি হয়ে যায় **চালান**। যাকে চালান (চালানো) হয়, তার চালাচালি (চলাচল) অন থাকে; সে **চালিয়ে-নিতে** পারে। এই চালান সমস্ত প্রকারের 'চালাচালি-অন-যোগ্য বস্তু'কে চালান্ বা চালানি বা রপ্তানি করে দেয়। আর, যারা এই চালান করায় সিদ্ধহস্ত, ভাল চালান করতে পারে, তারা হয়ে যায় **চালাক** পদবাচ্য। তবে, এই চালাকদের পরিচালনার চালকে যারা টেক্কা দিয়ে যায়, তারা নতুন নাম পায় **চালবাজ**। প্রাচীন **বাজ** তখন ফারসির হাত ধরে বাংলায় ফিরে এসেছে প্রত্যয় রূপে। তা সে যাই হোক, চালবাজদের এইসব **চালবাজি** শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যায়। কিন্তু যার চালবাজি কিছুতেই ধরা পড়ে না, তার 'চাল নবরূপে উত্তীর্ণ' বলে তাকে নাম দেওয়া হয় **চালু**। ৬. ইংরেজি challenge।

চি (চিৎ) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অচিকিৎসা, অচিকিৎস্য, অচিৎ, অচিন্ত, অচিন, অচির, অচিরক্রিয়, অচিরদ্যুতি, অচিরপ্রভ, অচিরাংশু, অচিরাৎ, অচিরাতে, অচিরাভা, অচিরে, অচেত, অচেতন, অচেনা, অচৈতন্য, অতিনীচ, অতিপরিচয়, অতিসঞ্চয়, অত্যুচ্চ, অনচির, অনিশ্চয়, অনীচ, অন্বাচয়, অপচয়, অপরিচিত, অসঞ্চয়িত, আচয়, আচিত, আচির, আচির-প্রাচীর, উচ্চ, উচ্চয়, উপচয়, কায় (ক), কায়ক্লেশ, কায়চিকিৎসা, কায়জ, কায়দণ্ড, কায়দা, কায়দাকানুন, কায়বার, কায়ব্যূহ, কায়মনোবাক্য, কায়স্থ, কায়স্থিনী, কায়া, কায়িক, কায়েত, কায়েম, কায়েমী, চইত, চয়, চয়ন (chain), চয়নীয়, চা, চা (চয়িত, চায়িত), চাইতে (চাহিতে), চাউনি, চাওনি, চাওয়া, **চাঁই (চয়িত অঙ্গ — চাঙ্, চাঙ্)**, চাকর (নবকর-স্থিতকর, চিতকর **বা চা-কর)**, **চাঙ, চাঙড়া, চাঙারি**, চাঙ্গ, চাঙ্গড়, চাঙ্গড়া, চাঙ্গদোলা **(চেঙ্গদোলা)**, **চাঙ্গা**, চাঙ্গারি (চেঙ্গারি), চাঙ্গী, চায়, চাহ্, চাহন, **চাহন্ত, চাহি, চাহিদা, চাহিয়া**, চি, চিআড়ি (চিআড়িপাড়া, চয়নে আড়ি দেয় যে), চিংড়ি, চিঁচি, চিঁড়া, চিহি, চিঙ্গট, চিঙ্গড়, **চিজ (চীজ)**, চিচিঙ্গা, চিচ্চিড়, চিচ্ছক্তি, চিঞ্চা, চিট্, চিট, চিটকে, চিটা, চিঠা, চিঠি(টি), চিড়, চিড়চিড়, চিড়চিড়া, চিড়চিড়ে, চিড়বিড়, চিড়া, চিড়িক, চিড়িতন, চিড়িয়া, চিড়িয়াখানা, চিত, চিত(তু) ই, চিতর, চিতল, চিতা, চিতি, চি(চী)ৎকার, চিত্ত, চিত্তচাঞ্চল্য, চিত্তচোর, চিত্তজ, চিত্তজ্ঞ, চিত্তনাশ, চিত্তপ্রসন্নতা, চিত্তপ্রসাদন, চিত্তবিক্ষেপ, চিত্তবিভ্রম, চিত্তবৃত্তি, চিত্তবৈকল্য, চিত্তর, চিত্তহারী, চিত্তান্তর, চিত্তাভোগ, চিত্য, চিত্র, চিত্রক, চিত্রকার, চিত্রকর্ম্মা, চিত্রকলা, চিত্রকূট, চিত্রগ, চিত্রগত, চিত্রগন্ধ, চিত্রগুপ্ত, চিত্রজল্প, চিত্রপট, চিত্রফলক, চিত্রবহ, চিত্রবিচিত্র, চিত্রবিদ্যা, চিত্রভানু, চিত্রযোধী, চিত্ররথ, চিত্রল, চিত্রলেখ, চিত্রশাল, চিত্রশালিকা, চিত্রশিখণ্ডী, চিত্রসেন, চিত্রা, চিত্রাঙ্গ, চিত্রাঙ্গদ, চিত্রাপূপ, চিত্রারম্ভ, চিত্রার্পিত, চিত্রিণী, চিত্রিত, চিত্রিকরণ, চিত্রোক্তি, চিৎ, চিৎস্বরূপ, চিদংশ, চিদম্বর, চিদাকাশ, চিদাত্মা, চিদানন্দ, চিদাভাস, চিদ্ঘন, চিদ্রূপ, চিপিটক, চিয়া, চিয়াড় (আড় দ্র.), চির, চিরকাল, চিরকুট, চিরকুমার, চিরঞ্জীব, চিরঞ্জীবক, চিরঞ্জীবী, চিরণ(ণী), চিরণ্টী, চিরতা, চির(রা)তিক্ত, চিরৎকার, চিরথাই, চিরদিন, চিরনিদ্রা, চিরন্তন, চিরযুগ, চিরশ্যামল, চিরস্থায়ী, চিরহরিৎ, চি(চী)রা, চিরা, চিরাই, চিরাউ, চি(চে)রাগ, চিরানন্দ, চিরানুকূল, চিরায়, চিরায়ু, চিরায়ুঃ, চিরায়ুষ্মতী, চির্ণ, চির্ভটী, চি(চী)ল, চিলতা, চিলতে, চিলমচী, চিলা, চিলে, চিলিচিন, চিলু, চিল্ল, চিল্ল(ল্লি)কা, চিল(ল্লী)কা (হকার — দেয় নেয় বলে ি-কার ী-কার দুটোই), চী, চীন, চীনা, চীনাংশুক, চীনাক, চীবর, চীর, চীরবাস, চীরবাসাঃ, চীরভৃৎ, চীরা, চীরী, চীর্ণ, চেঁ(চে)চা, চেৎ, চেত, চেতঃ, চেতন, চেতনা, চেতরা, চেতোজন্মা, চেতোমান, চেদ্, চেদি, চেয়, চেয়া, চেয়াড়ি, চেয়ে, চের-আট, চেরয়াট (চেরাট), চেরা, চেরাট, চেরান, চেল, চেলা(রা)কাঠ, চেল্লা, চেল্লান, চেহল (চহল), চেহারা (চাহ), চৈত, চৈতন, চৈতন্য, চৈতালি, চৈত্ত, চৈত্য, চৈত্যতরু, চৈত্যদ্রু, চৈত্যদ্রুম, চৈত্যবৃক্ষ, চৈত্যপাল, চৈত্যবিহার, চৈত্র, চৈত্ররথ, চৈত্ররথ্য, চৈত্রিক, চৈদ্য, চোদ, নিকায়, নিচয়, নিশ্চয়, নীচ, পরিচয়, প্রচয়, প্রাচীর, বিচিত্র, বিনিশ্চয়, সচিত্র, সচেতন, সঞ্চয়, সঞ্চয়ন, সঞ্চয়নী, সঞ্চয়ী, সঞ্চিত, সমুচ্চয়, সমুচ্চিত, সুনিশ্চয়।

চি (চিৎ) = গতিশীল চায়ী। **চিৎ** = গতিশীল চায়ীর উল্লম্ফন (যাহাতে)।

চয় (চয়ন, চয়নীয়, চয়িত, চা, চাই, চাইতে, চাউনি, চাওনি, চাওয়া, চায়, চায়িত, চাহ্, চাহন, চাহন্ত, চাহি, চাহিতে, চাহিদা, চাহিয়া, চিত, চেয়ে) : ১. √চি + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **চয়** = *চায়ী (ইচ্ছা, চয়নেচ্ছা, চয়নেচ্ছায় গামী ...) গতিশীল হয়ে থামে যাহাতে বা যেখানে।* / যাহার উপরে প্রাকার অবস্থিত হয়। (ব.শ.)। ৩. রাশীকরণ, পুষ্পাদিচয়ন, অগ্নিচয়ন, সমূহ,

রাশি, পুঞ্জ, সঙ্ঘ, গণ, প্রাকার, পরিখোদ্ধৃতমৃত্তিকাস্তূপ, পীঠ, আসন, কাষ্ঠরাশি। রাশীকরণ, আহরণ, সংগ্রহ, সংস্কারসাধন ধৃপাদি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে সুপ্রচলিত। ৫. **নিশ্চয় অপচয় সঞ্চয়** প্রভৃতি উপসর্গযুক্ত 'চয়' শব্দগুলি আমাদের খুবই চেনা, কিন্তু **চয়** ততখানি চেনা নয়। কারণ **কার** বা **চার**-এর মতো **চয়** খানিকটা অনির্দিষ্ট শব্দ। আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রতীকী ভাষাব্যবস্থায় সেজন্যই অনির্দিষ্ট শব্দের প্রচলন কম। 'চায়ী থেমেছে যাতে' (= **চষ**), সে কীরূপ চয়? — বর্তমান প্রতীকী মন সেকথা জানতে **চায়, অপচয়, সঞ্চয়,** না **নিশ্চয়**? অর্থাৎ রাশীকৃতের নষ্টাংশ, সম্যক-রাশীকৃত অংশ, নাকি হিসেব-নিকেশ করা নিঃসংশয়িত রাশী? এটা এমন কিছু অস্বাভাবিকও নয়। যে-কোনো মানুষকে দেখে একালের সভ্যমানুষ জানতে চায় সে কার ছেলে, কোথায় থাকে, কী করে? উটকো অনির্দিষ্ট সত্তায় তার সুনির্দিষ্ট স্বভাব অস্বস্তি বোধ করে। তবে চয়-অন যাহাতে, সেই চয়নকে বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না। সেখানে চয়নেচ্ছাকারী একটার পর একটা কাম্য বস্তুকে আনয়ন করতে থাকে। সেজন্যই তাকে আমরা বলি চয়ন, ইংরেজ বলেন chain। 'যাকে চয়ন করে আনা উচিত' তাকে বলে **চয়নীয়**। আর যা-কিছু চয়ন করে আনা হয়ে গেছে, তা হল **চয়িত** বা **চিত**।

'চয়নেচ্ছা থাকে যাহাতে' তাকে বলতে হয় **চা**। এই চা যখন গতিশীল, তখন আমরা তাকে **চাই** বলি। যেহেতু চীনা ভাষা আমাদের ক্রিয়ামূলের উদ্ভবকালেই সকলের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল, হয়তো সেজন্যই **চা** ক্রিয়াটিই তাদের ভাষায় 'যাকে চাই' অর্থে tea বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং সেভাবেই চীনা ভাষা থেকে বাংলায় এসে বাংলার আপনজন হয়ে গেছে। 'চাই-এর যাওয়া'কে বলে **চাওয়া**। চোখের দৃষ্টির মাধ্যমে এই চাওয়া দূরে যায় বলে তাকে **চাউনি, চাওনি** বা **চাহনি** বলে। 'চয় থেকে জাত' সত্তাকে বলে **চায়**। চায় গতিশীল হয়ে তারিত হয় যাহাতে, তাকে বলে **চায়িত**। চয়নেচ্ছা চায়-এ স্থির রূপে থাকে বলে একে **চাহ** বলে; হিন্দি উর্দুতে একে **চাহ্** বলে এবং সেই চাহ্ তারিত যাহাতে, তাকে বলে **চাহত্** বা কামনা। আমাদের যা-কিছু চাওয়া, যেগুলিকে আমরা **চাহি**, তাদের দান থাকে যাহাতে, তাকে বলে **চাহিদা**। দ্র. **চাতক**।

চ দিশাগ্রস্তভাবে গতিশীল হয়ে স্থিতিলাভ করলে তাকে বলে **চেয়ে**। **চাহিতে** ও **চাইতে** শব্দের পরিবর্তে আমরা **চেয়ে** শব্দটিও ব্যবহার করে থাকি। এটি চাইতে-র বিশেষ্য রূপ। রামের চাইতে শ্যাম কিংবা রামের চেয়ে শ্যাম ভাল যখন বলি, তখন কার্যত দুটি দিশাগ্রস্ত চয়নের তুলনা হয়ে যায়। গোটা বাক্যটি তখন আসলে এরকম — রামের প্রতি দিশাগ্রস্ত চয়ন ও শ্যামের প্রতি দিশাগ্রস্ত চয়ন, এই দুই চয়নের মধ্যে শ্যামের চয়ন ভাল। ৬. chain।

চাকর, চাকরি (চাকর-নৌকর, চাকর-বাকর, চাকরি-বাকরি) : চা + কর। ২. ***চাকর** = চা (চয়িত বস্তুর আধার) নিয়ে (নির্দেশিত) কাজ করে যে; **চাকরি** = **চাকর** গতিশীল থাকে যাহাতে।* ৩. ভৃত্য, পরিচারক, কর্মচারী; ভৃত্যকার্য্য, দাসত্ব, সেবা। (ব.শ.)। ৪. servant ও service অর্থে প্রচলিত। ৫. বলা হয়, শব্দ দুটি ফারসি ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে। তার আগে বাংলায় শব্দ দুটির কোনো উত্তরাধিকার ছিল না, এমন কথা নিয়ে আগে ভাবা হয়নি। আমরা দেখছি, আগে থেকেই তা ছিল বলেই ফারসির নৌকর-চাকর, চাকরি-বাকরি প্রভৃতি শব্দগুলি এত জনপ্রিয় বাংলা শব্দ রূপে গৃহীত হয়ে গেছে।

আদিম যুগে কোনো মানুষ কোনো মানুষের **চাকর** ছিল না। মানুষের সমাজে যখন থেকে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষকে আদেশ-নির্দেশ দিয়ে কাজ করাতে পারল, ভৃত্য নিয়োগ করতে পারল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত ভৃত্য নিয়োগ বা চাকর রাখার সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তবে মধ্যযুগের আগে-পরে কোনো সময় এই ভৃত্যদের দুই ভাগে ভাগ করে দেখবার এক কার্যকরী দৃষ্টিভঙ্গির প্রচলন হয়। সম্ভবত তখন যারা ভৃত্য নিয়োগ করতেন, তারা খুব বড় কৃষক বা ততোধিক ধন-জ্ঞান-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তাদের ঘরে চাষ করে বা সংগ্রহ করে আনা বহু সম্পদ থাকত, থাকত জমি-পুকুর-খামারবাড়ি ইত্যাদি। এঁদের ভৃত্য ছিল দুই শ্রেণীর। যারা প্রভুর ঘরের সংগৃহীত রেডিমেড জিনিসপত্র, তেল-নুন-লকড়ি ইত্যাদি, নিয়ে প্রভুর প্রয়োজনীয় ও আদিষ্ট কিছু বানিয়ে দিত, তাদের বলা হত **চাকর**। এই **চা** ছিল '**চয়িত** বা **চিত** বস্তুর আধার'। তা নিয়ে কাজ করত বলেই তাদের 'চা-কর' বলা হত। আর, যারা নতুন বস্তু সংগ্রহ করে আনত, এনে কিছু করত, যেমন পুকুর থেকে মাছ ধরে আনা, মাঠে গিয়ে শাকসব্জি চাষ করা, কিংবা সেই শাকসব্জি তুলে আনা — মোট কথা যারা প্রভুর নির্দেশানুসারে নতুন জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনত এবং/বা তা দিয়ে নির্দেশানুসারে কিছু বানাত, তাদের বলা হত **নবকর** বা **নওকর (নোকর** বা **নৌকর)**। আরও সরল করে নিলে কথাটি এইরকম দাঁড়ায় — যারা প্রভুর ঘরের কাজ করত তাদের বলা হত **চাকর**, আর যারা প্রভুর বাইরের কাজ করত, তাদের বলা হত **নোকর**। এই দুই প্রকার কাজ করাকে বলা হত যথাক্রমে **চাকরি** ও **নোকরি**। শব্দজোড় দুটিকে নোকর-চাকর, নোকরি-চাকরিও বলা হয়ে থাকে। আরও আছে, তা হল **চাকর-বাকর**। চাকরের কাজ কমবেশি সুনির্দিষ্ট, কিন্তু বাকরের কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ নেই। সে হল বিকল্প কর। হাতের কাছে কেউ না থাকলে সে থাকে। প্রভুর হুকুম শুনে আরেকজনকে সেই হুকুমটি শুনিয়ে আসে। একালের কারখানার ভাষায় তাকে বলে 'ফালতু'।

ইংরেজ ভারতে আসার পর নোকর-চাকর, চাকর-বাকর, সব শব্দের মানে হয়ে যায় servant। **আশেপাশে, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ, চিন্তা-ভাবনার** মতো জোড়শব্দগুলির ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল। এমনকি, আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ নিজের জীবন বন্ধক দিয়ে অন্যের চাকর হওয়াকে গৌরবজনক ভাবতে শুরু করে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য (খ) গ্রন্থটির প্রথম নিবন্ধ '*বাংলাভাষা : সাতরাজার ধন মানিক আছে যেখানে*' দ্রষ্টব্য।

চিৎ, চিত্ত (চিৎকার): ১. ✓চিৎ + কিপ্ (০) - ভাববাচ্যে; ✓চিৎ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***চিৎ** = গতিশীল চায়ীর তারণ যাহাতে; **চিত্ত** = গতিশীল চায়ীর তারণ তারিত যাহাতে। /* **চিত্ত** = যাহার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. জ্ঞান, উপলব্ধি, চেতন, চৈতন্য, সংবিৎ। সংজ্ঞাত, জ্ঞাত, জ্ঞাতা, মনঃ, মানস, অনুসন্ধানাত্মিকা

অন্তঃকরণবৃত্তি, সঙ্কল্প, বিচারশক্তি, বিবেক। (ব.শ.)। ৪. 'আকাশের দিকে মুখ করে থাকা' অর্থে 'চিৎ' এবং মন অর্থে 'চিত্ত' প্রচলিত। ৫. দ্র. **অন্তঃকরণ, চাতক**। 'চায়ী (ইচ্ছা, চয়নেচ্ছাকারী) তারণ যাহাতে' তাকে বলে চত্। সে যদি গতিশীল হয়, তবে তাকে **চিৎ** বলে। এই চিৎ বাহ্যিক হলে সত্তাটি আকাশের দিকে মুখ করে চয়নেচ্ছুক হয়ে তাকিয়ে থাকে; কোনো কিছু চাইতে থাকে। এই অবস্থাতেই লোকে ভাবে, ভাবনাচিন্তা করে। চিৎ অবস্থাতেই জ্ঞানাকাশের দিকে মন ছুটতে থাকে নানান বাসনায়। অর্থাৎ, চিৎ সত্তাটি মানসিক হলে সে অজানা চিদাকাশের দিকে চয়নেচ্ছুক হয়ে অনুসন্ধান করতে থাকে। তাই, চিৎ-করণ মানেই হল কোনো কিছুকে কাছে পাওয়ার জন্য আহ্বান করা, ডাকা। ডাকার জন্যই 'যার দ্বারা চিৎকরণ করা হয়' তাকে বলে চিৎকার। অর্থহীন আওয়াজকে চিৎকার বলা হত না। এখন সবরকম আওয়াজ করাকেই চিৎকার বলা হয়ে থাকে। ... পুরাণাদিতে এই **চিৎ**-কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, অবিভাজ্য সৎ-চিৎ-আনন্দই (সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্-ই) ব্রহ্ম। অর্থাৎ, অবিভাজ্য তিন সত্তা — অস্তিত্ব (= সৎ), অস্তিত্বকে বুঝে নেওয়ার জন্য অনুসন্ধান (= চিৎ), এবং সেই অনুসন্ধানে সফল হয়ে চরম আনন্দ (= আনন্দম্) লাভই ব্রহ্মলাভ।

এই চিৎ-এর আধার হল **চিত্ত**। ব.শ. বেদান্তসার উদ্ধৃত করে একে সঠিকভাবেই বলেছেন — 'অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি'। বেদান্তসার মতে, চিত্ত দুই প্রকার — বুদ্ধির চিত্ত ও মনের চিত্ত। একালের ভাষায় বললে বলতে হয়, অ্যাকাডেমিক রিসার্চকে বলে বুদ্ধির চিত্ত এবং নন-অ্যাকাডেমিক রিসার্চকে বলে মনের চিত্ত। উদাহরণস্বরূপ, এশিয়াটিক সোসাইটি কিংবা টাটা রিসার্চ সেন্টারের রিসার্চকে বলে বুদ্ধির চিত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ বা আইনস্টাইনের অনুসন্ধানকে বলে মনের চিত্ত। বলে রাখা ভাল, আজ পর্যন্ত মানুষের সমাজ যা কিছু আবিষ্কার করেছে, সৃষ্টি করেছে, তার অধিকাংশই নন-অ্যাকাডেমিক রিসার্চের ফল। কারণ, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক, প্রোগ্রামড্, সুনিশ্চিত যুক্তিবাদী। আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করবার ক্ষমতা পরমাপ্রকৃতি তাকে দেন না। তবে, আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্বকে সে গুছিয়ে বিন্যস্ত করে রাখতে পারে। সেখানেই তার গৌরব। সেই সুবাদে সে হল মানবসভ্যতার সমগ্র জ্ঞানচর্চার প্রকৃতিশক্তি বা 'বেটার হাফ'। বিপরীতে মনের চিত্ত হল সেই সত্তা, যে আবিষ্কার কিংবা উদ্ভাবন করে আনতে সক্ষম। তার মস্তিষ্ক প্রোগ্রামড্ নয়, সে সঙ্কল্পবিকল্প সবকিছুতে ভরসা রাখে। তবে কিনা আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করতে পারলেও সে গুছিয়ে সুবিন্যস্ত করে রাখতে পারে না। তবুও সে হল মানবসভ্যতার সমগ্র জ্ঞানচর্চার পুরুষশক্তি। এদের কেউ কারও চেয়ে বড় নয়, ছোটও নয়। প্রকৃতির চোখে পুরুষ বড় ও মহৎ, এবং পুরুষের চোখে প্রকৃতি বড় ও মহতী। যেকারণে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিতে পুরুষের চোখে নারী 'বেটার-হাফ', আবার নারীর চোখে পুরুষ 'বেটার-হাফ'। এইরকমই স্বাভাবিক। একজন শিকার করে সংগ্রহ করে আনে, অন্যজন তা গুছিয়ে বিন্যস্ত করে রাখে। পরমাপ্রকৃতি যাকে যেমন যোগ্যতা দিয়েছেন, সে সেইরূপ আচরণ করলেই মঙ্গল। কোনো কারণে এই স্বাভাবিকতা নষ্ট হলে মানব-সমাজের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। পৃথিবীতে ধর্মগুলির পরাজয়ের পর ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে এই স্বাভাবিকতা নষ্ট হতে শুরু করে। গোলোকায়নের সূত্রপাতের পর এ-অস্বাভাবিকতা আরও বেড়ে যায়। অ্যাকাডেমির নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির চিত্তই মানব-সভ্যতার সমগ্র জ্ঞানচর্চার দায়িত্ব নিয়ে ফেলেছে এবং মনের চিত্তকে অপাঙ্‌ক্তেয় ঘোষণা করে দিয়েছে। ফলত আজকের মানবসভ্যতা পরিণত হয়েছে এক শক্তিমান অন্ধে, যে লাফালাফি-দাপাদাপি করে জগতের সমস্ত অস্তিত্বকে লণ্ডভণ্ড করতে লেগেছে। এই অন্ধের চোখ ফুটতে পারে একমাত্র মনের চিত্তকে সসম্মানে তার ভূমিকা পালন করতে দিলে। দ্র. **পুরুষ-প্রকৃতি**। ৬. ইংরেজি kit।

চিতা (চিত্য, চৈত্ত, চৈত্য, চৈত্যতরু, চৈত্যদ্রু, চৈত্যদ্রুম, চৈত্যবৃক্ষ, চৈত্যপাল, চৈত্যবিহার) : ১. ✓চি + ত (ক্ত) - অধিকরণে, বাহুলকে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *গতিশীল চায়ীর তারণ যাহাতে, তাহার আধার।* / যাহাতে অগ্নি চিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **চিতা** = শবদাহার্থ অগ্ন্যাধার, চিলু। **চিত্য** = চয়নীয়, চিতাভব, চিতা, চৈত্য, স্তূপ। **চৈত্ত** = চিত্ত-ভব, ক্ষেত্রজ্ঞ, স্মরণ, স্মৃতি। **চৈত্য** = পথিপার্শ্বস্থ অশ্বত্থাদি, রথ্যাবৃক্ষ, গ্রামস্থ একমাত্র পত্রফলান্বিত বৃক্ষ, উদ্দেশবৃক্ষ, দেবতরু, দেবাবাস, বৃদ্ধ, জিন, ভূসীমা নির্দ্ধারণার্থ পাষাণস্তূপ, দেবকুল, দেবায়তন, দেউল, আয়তন, যজ্ঞগৃহ, পুণ্যস্থান, গ্রামাদির প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, অশ্বত্থবৃক্ষ, গ্রামাদি চিহ্নভূত বৃক্ষ। (ব.শ.)। ৪. কেবলমাত্র 'শবদাহার্থ অগ্ন্যাধার' অর্থে প্রচলিত। বাকি সব অপ্রচলিত। ৫. আগুন কত প্রকার সেকথা আমরা **অগ্নি** শব্দে জেনেছি। সেগুলির মধ্যে কেবল fire-কেই এখন আগুন হিসেবে আমরা মনে রেখেছি, অগ্নি শব্দের বাকি সমস্ত অর্থকে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্জিত 'অগ্নি' ধারণার কেবলমাত্র অপ্রধান ক্ষুদ্রাংশ-অগ্নিকেই আমরা মনে রেখেছি এবং প্রধান ও অধিকাংশ-অগ্নিকেই আমরা ভুলে গেছি। ফলত, fire-অগ্নি যেখানে 'চিত' (চয়ন করে এনে রাখা হত) হত, মড়া পোড়ানোর সেই চিতাটিকেই কেবল মনে রাখা হয়েছে; বাকি আর যত রকম অগ্নি ছিল এবং সেগুলি যেখানে চিত হত, সবই ফেলে দেওয়া হয়েছে। ফলে, অগ্নি বিষয়ে আমাদের পূর্বপুরুষের অর্জন ক্ষুদ্র হয়ে গেছে, হিমালয় পরিণত হয়েছে উইয়ের ঢিবিতে। সেকালে মানুষের চিত্তের সমস্ত সম্পদ, জনসাধারণের সমস্ত আহৃত জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ, বৌদ্ধ-জৈনদের হাতে অর্জিত জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ ও তাদের কেন্দ্র 'চৈত্যবিহার', গ্রামের সমস্ত ধনসম্পদ ... ইত্যাদি ইত্যাদি, মোটকথা যেখানে যেখানে অগ্নি 'চিত' হত, সেই দেউল, চৈত্যবিহার, গ্রামে গ্রামে গড়ে ওঠা প্রতিটি গ্রামের নিজস্ব অশ্বত্থবৃক্ষ, চৈত্যতরু, চৈত্যদ্রুম, চৈত্যবৃক্ষ, বা এককথায় গ্রামের নিজস্ব সম্পদভাণ্ডার ও তার সংগ্রহ ও বণ্টনব্যবস্থা ... সকলের কথাই আমরা ভুলে গেছি। ভুলে গেছি সেই চৈত্য দেখাশোনা করত যে চৈত্যপাল, তার কথাও। চৈত্য, চৈত্যতরু, চৈত্যদ্রু, চৈত্যদ্রুম, চৈত্যবৃক্ষ, চৈত্যপাল, চৈত্যবিহার প্রভৃতি শব্দ এখন তাদের অর্থ হারিয়ে চিতার উপরে মড়ার মতো কেবলমাত্র অভিধানের শব্দরূপেই পড়ে আছে। হয় সেই চিতায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া দরকার, নয় চিতার উপর থেকে তাদের নামিয়ে জীবন্ত প্রাণবন্ত করে ফেলা দরকার। কপালে থাকলে এমনও হতে পারে

যে, চিতার আগুনে পুড়ে মরেই তারা প্রমাণ করতে পারে, এতকাল তারা 'মরে নাই'।

চিত্র, চিত্রা (চিত্রক, চিত্রকার) : ১. ✓চিত্র + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে; ✓চি + ত্র। স্ত্রী -ত্রা। (ব.শ.)। ২. *চিত্র = গতিশীল চায়ীর তারণ (আ)বর্ত্তমান রহে যাহাতে। চিত্রা = চিত্র-এর আধার যে।* ৩. **চিত্র** = অদ্ভুত, অপূর্ব্ব, নানাবর্ণযুক্ত, শবল, মধুর, আশ্চর্যজনক, কৌতুককর, উজ্জ্বল, ভাস্বর, উদ্বেগকর, নানাবর্ণ, যমবিশেষ, চিত্রক, চিতাগাছ, অশোক, এরণ্ড বৃক্ষ, আশ্চর্য, আলেখ্য, ছবি, তিলক, আকাশ, শ্বেতকুষ্ঠ, চিহ্ন, দাগ, ছন্দোবিশেষ, শব্দালঙ্কারবিশেষ। **চিত্রা** = মায়া, চিতাসাপ, নক্ষত্রবিশেষ (এই নক্ষত্রে জন্মিলে নর মহাপ্রতাপ নীতিশাস্ত্রদক্ষ বিচিত্রবাসা ও শাস্ত্রে বিচিত্রবুদ্ধি হয়।), মঞ্জিষ্ঠা, অপ্সরোবিশেষ, নাড়ীবিশেষ, ছন্দোবিশেষ, নদীবিশেষ। **চিত্রক** = ব্যাঘ্রবিশেষ, চিতাবাঘ, চিতাগাছ, এরণ্ডবৃক্ষ, মুচকুন্দবৃক্ষ, তিলক, চিত্রীকরণ, আলেখন। **চিত্রকর** = চিত্রকারক, রঙ্গাজীব, পটুয়া। (ব.শ.)। ৪. picture অর্থে 'চিত্র' শব্দটি প্রচলিত এবং 'চিত্রা' মেয়েদের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. অস্তিত্ব থেকে চয়নেচ্ছা বেরিয়ে কোনো বস্তু বা বিষয়ের দিকে চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে সেই ইচ্ছা তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারল না। মাঝপথে সেই ইচ্ছা যদি অগত্যা অন্য কোনো সত্তায় ঘাঁটি গাড়ে, তখন তাকে **চিত্র** বলা যায়। মাঝের আশ্রয়দাতা এই ঘাঁটিটি স্বভাবতই এত **বিচিত্র** যে, তা অন্য অন্য ঘাঁটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সেকারণেই চিত্র শব্দের উদ্দিষ্ট সত্তাগুলি, যাদের কথা উপরোক্ত (৩-এ) প্রদত্ত অর্থে বলা হয়েছে, এত আলাদা চরিত্রের। এই ইচ্ছা ঘাঁটি গাড়ে কাম্য বস্তু ও বিষয়ের ছবিতে, যা-কিছু অদ্ভুত, অপূর্ব্ব, নানাবর্ণযুক্ত, শবল, মধুর, আশ্চর্যজনক, কৌতুককর, উজ্জ্বল, ভাস্বর, সেগুলিতে। একই রকম নানাবর্ণযুক্ত থাকে বলে চিতাবাঘ (চিত্রক), চিতাগাছ, চিতিসাপ, তিলক, আলেখ্য, চিহ্ন, দাগ প্রভৃতি সত্তাকেও **চিত্র** বলা হয়। এগুলি সবই চিত্র শব্দের অর্থের বিস্তার, যার মধ্যে আকাশ, ছন্দোবিশেষ, শব্দালঙ্কারবিশেষও থেকে থাকবে। এমনকি উদ্বেগের ভিতরও ইচ্ছা থেকে যায়। তবে অশোক (বকুল), এরণ্ড (ভেরেণ্ডা) বৃক্ষ, মুচকুন্দ বৃক্ষ, চিত্রানাড়ী, চিত্রানক্ষত্র ইত্যাদিকে কেন চিত্র বলে, তা আমাদের বোধবুদ্ধির বাইরে; আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানতেন বকুলগাছ ইত্যাদির ভিতরে কী কী গুণ রয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্রীরা চিত্রানক্ষত্রের এবং তান্ত্রিকগণ চিত্রানাড়ীর ভিতরে 'চিত্র'গুণের ব্যাপার কীভাবে রয়েছে, জেনে থাকতে পারেন। তাঁরা হয়তো বলতে পারবেন, ওই সত্তাগুলির ভিতরে কীভাবে ইচ্ছা ঘাঁটি গাড়ে। তা নইলে আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণ এগুলিকেও **চিত্র** শব্দে শনাক্ত করবেন কেন। তবে শ্বেতকুষ্ঠকে কেন চিত্র বলে তা ভাবনার কথা। হতে পারে, শরীরের ত্বকের বাকি অংশের মাঝে ছবির মতো এর একটা পার্থক্য থাকে বলেই একে **ত্বক** বলে। কিন্তু সেটিই সব কথা নয় বলে মনে হয়। কেননা, **কুষ্ঠ** রোগের উদ্ভবের সঙ্গে উদ্বৃত্তসম্পদ বিক্রির ইচ্ছার ও ব্যক্তিমালিকানার আকাঙ্ক্ষার **সম্পর্ক** রয়েছে। আর চিত্রা যে **মায়াই** তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কেননা, যার চিত্র, তাকে অবিকল জীবন্ত অবস্থায় চিত্রে পাওয়া যায় না। বাঘের ছবি কোনোদিন বাঘ হয়ে খেতে আসে না। সেটি বাঘের মায়াই বটে। দ্র. **ধোবা**।

চিত্রগুপ্ত : ২. *চিত্রকে গুপ্ত করেন যিনি।* / যাহার কর্ম্মরক্ষণ বিচিত্র। (ব.শ.)। ৩. চতুর্দ্দশ যমের একতম, যমের লেখক। (ব.শ.)। যমের কর্মচারী। ব্রহ্মার অঙ্গ হতে এঁর জন্ম। ব্রহ্মা যখন জগৎসৃষ্টি করে ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর অঙ্গ হতে নানা বর্ণে চিত্রিত এক পুরুষ মস্যাধার ও লেখনীসহ উদ্ভূত হন। জন্মের পর তিনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁকে কি কাজ করতে হবে? যোগনিদ্রা থেকে ব্রহ্মা উত্থিত হয়ে পুত্রকে আদেশ দেন যে, মানুষের পাপপুণ্য বিচার করবার জন্য তুমি যমালয়ে বাস কর। আমার কায়া হতে তোমার উদ্ভব হয়েছে বলে তুমি কায়স্থ নামে অভিহিত হবে। ইনি পাপপুণ্যের চিত্রবিচিত্র হিসাব গুপ্ত রাখেন বলে চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হন। চিত্রগুপ্তের অম্বষ্ঠ, মাথুর, গৌড়, সেনক, শ্রীবাস্তব্য ইত্যাদি নামে নয়টি পুত্র হয়। চিত্রগুপ্ত মানুষের ললাটে ভাবী শুভাশুভ ফলও লিখে থাকেন। কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে চিত্রগুপ্তের পূজা হয়। অভিশপ্ত রাজা সৌদাস চিত্রগুপ্তের পূজা করে পাপমুক্ত হয়ে স্বর্গগমন করেন। ঐ তিথিতে ভীষ্ম এই চিত্রগুপ্তের উপাসনা করে তাঁর প্রসাদে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রাপ্ত হন। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে পাপীদের যন্ত্রণা দেবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। (পৌ.অ.)। ৪. **যম**-এর লেখকের নাম হিসেবে প্রচলিত। ৫. চিত্রগুপ্তকে চিনতে হলে প্রথমে **ধর্ম্ম** ও ধর্ম্মরাজ-**যম**কে চিনে নেওয়া প্রয়োজন, নইলে বোঝার অসুবিধে হয়। সংক্ষেপে এঁদের পরিচয় হল : সমাজবদ্ধ মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে, জীবের সঙ্গে, জড়ের সঙ্গে যে সকল আচরণ স্বভাবতই করে থাকে, সেগুলিই মানুষের **ধর্ম্ম**। সেই ধর্ম্মের যে-অংশ সমাজ-পরিচালক প্রতিষ্ঠান (রাষ্ট্র) স্বীকার করে, সেটুকুকে বলে সামাজিক ধর্ম্ম বা আইন। এর দুই ভাগ — যা করা উচিত বা বিধেয় (= **বিধি**), এবং যা করা উচিত নয় বা করা নিষিদ্ধ (= **নিষেধ**)। ধর্ম্মরাজ যম এই দুই প্রকার আইনের রক্ষক। একালের ভাষায় এই রক্ষককে আদালত বলে। এই আদালতের যে কেরানিকুল তাদের বলা হয় **চিত্রগুপ্ত**। সাধারণ মানুষের কাছে এই কেরানিকুলের সংরক্ষিত সমস্ত চিত্রই **গুপ্ত**। তাই এই কেরানিকুলকে **চিত্রগুপ্ত** বলে। চিত্রগুপ্ত বিষয়ে উপরোক্ত পৌরাণিক কাহিনীটিতে এই কেরানিকুলের উদ্ভব ও বিকাশের কথা রয়েছে। এরা সরকারি কর্মচারী বলে এদের **কায়স্থ** বলা হয়। উপরোক্ত তথ্যানুসারে, আদালত কোনো এক সময় এই চিত্রগুপ্তকে শাস্তিদাতা হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।

চিত্রজল্প (চিত্রকল্প) : ২. *জল্পনার চিত্র থাকে যাহাতে।* ৩. নানাভাববৈচিত্র্যযুক্ত চমৎকারজনক বাক্যবিশেষ। চিত্রজল্প দশ প্রকার — প্রজল্প, পরিজল্পিত, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্পিত, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ভবিষ্যতের কাজকর্ম ও তৎসংক্রান্ত ভাবনার বিষয়ে আমাদের পূর্বপুরুষগণের অর্জন কীরূপ ছিল, তার সাক্ষ্য বহন করে এই শব্দদুটি। ভবিষ্যতের ভাবনাকে তাঁরা মূলত দুই ভাগে ভাগ করে বুঝেছিলেন — **কল্পনা** ও **স্বপ্ন**। কল্পনাকে আবার তাঁরা দুই ভাগে ভাগ করে দেখেছিলেন — **কল্পনা** ও **জল্পনা**। এর মধ্যে কল্পিত ব্যাপারে যে চিত্র আঁকা হত,

তাকে বলা হত **চিত্রকল্প**; এবং জল্পিত ব্যাপারের যে চিত্র আঁকা হত, তাকে বলা হত **চিত্রজল্প**। এই চিত্রজল্পের আবার দশটি ভাগ ছিল। উপরোক্ত (৩-এ) প্রদত্ত তথ্যে ব.শ. সেগুলির নাম জানিয়েছেন। সেই নামগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা জানতে পারি — প্রকৃষ্ট রূপে কৃত জল্পচিত্রকে বলা হত **প্রজল্প**; সামগ্রিকভাবে করা জল্পচিত্রকে বলা হত **পরিজল্পিত**; বিপরীত বা বিশেষ জল্পচিত্রকে বলা হত **বিজল্প**; উদ্‌গামী জল্পচিত্রকে বলা হত **উজ্জল্প**; সম্যকরূপে জল্পিতের চিত্রকে বলা হত **সংজল্প**; অবগুণসম্পন্ন জল্পচিত্রকে বলা হত **অবজল্প**; উপর থেকে জল্পিত জল্পচিত্রকে বলা হত **অভিজল্পিত**; জল্পচিত্রের আধারকে বলা হত **আজল্প**; অন্য কোনো জল্পের প্রত্যুত্তরে যে জল্পচিত্র নির্মিত হত তাকে বলা হত **প্রতিজল্প** এবং অতি ভালভাবে জল্পিত জল্পচিত্রকে বলা হত **সুজল্প**। জল্পনার এমন দশ রকম বিন্যাস বিশ্বের আর কোনো সাহিত্যসংস্কৃতিতে রয়েছে বলে মনে হয় না।

ভবিষ্যতের ধারণা সব জীবেরই কমবেশি থাকে। বাবুই যখন তালপাতা চিরে ছোট ছোট টুকরো মুখে করে নিয়ে সেই তালগাছেই বাসা বুনতে শুরু করে, তার মস্তিষ্কে সেই ভবিষ্যতের বাসার একটা কাল্পনিক ছবি নিশ্চয় থাকে; তাকে intuition নাম দিয়ে 'নিম্নমানের জ্ঞান' বলে আমরা মানুষেরা বড়াই করে থাকি। ভবিষ্যৎ বিষয়ে মানুষের এইরূপ কল্পনার মাত্রা ঘরবাড়ি দোকানবাজার রাস্তাঘাট ছাড়িয়ে শহর-নগর পরিকল্পনা ('town & city planning') পর্যন্ত প্রসারিত। ভবিষ্যতের এইরকম কল্পনাকে (দ্র. **কল্প**) একালের ভাষায় বলা হয় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন ও প্ল্যান, এককথায় **প্রকল্প**। দৃশ্যত বাড়িঘরের এই প্ল্যান বা ছবি কাল্পনিক হলেও হিসেব ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। একে কর্মযজ্ঞে রূপায়িত করা হয়; (প্র)কল্পের চিত্র বলে সেকালে এরূপ ব্যাপারকেই বলা হত **চিত্রকল্প**। আপনি যে বিল্ডিং বানাবেন, তার প্ল্যানটি যথার্থেই একটি **চিত্রকল্প**। আরেক রকম কাল্পনিক চিত্র ছিল, যা ছিল বেহিসেবি এবং অনেকসময় মনে হত অযৌক্তিক, যা দেখতে অপূর্ব্ব হলেও যাকে কর্মযজ্ঞে রূপায়িত করা যায় না; তেমন চিত্রকে বলা হত **চিত্রজল্প**। তার মানে, বাস্তবায়িত করার জন্য হিসেবি কল্পনার উপর ভিত্তি করে যে চিত্রগুলি আঁকা হত, তা সে কথায়, রঙে-রেখায়, যে মাধ্যমেই হোক না কেন, তাকে বলা হত **চিত্রকল্প**। আর সৃজনশীল ভাবনার বিকাশের জন্য হিসেবি-বেহিসেবি, যৌক্তিক-অযৌক্তিক মিশিয়ে কথায়-রঙে-রেখায় বা অন্য কোনো মাধ্যমে যে চিত্র আঁকা হত, তাকে বলা হত **চিত্রজল্প**। (দ্র. **জল্প, জল্পনা, 'সুন্দরসমাজ'**)। কিন্তু চিত্রকল্প ও চিত্রজল্পের এসব নিহিতার্থের কথা একালের অ্যাকাডেমিক বাংলাচর্চায় এখন বিস্মৃত।

সেকালে চিত্রজল্প নিয়ে কত গভীর বিশ্লেষণাত্মক কাজ করা হয়েছিল প্রাচীন বাংলায়, সেকথা উপরে বলা হয়েছে। এখন বিষয়টিকে একটুখানি সরলীকরণ করে নেওয়া হোক — ইঞ্জিনিয়ারের আঁকা প্রকল্পের ছবিকে বলে **চিত্রকল্প**; আর শিল্পী-সাহিত্যিকদের আঁকা ছবিকে বলে **চিত্রজল্প**। কিন্তু বর্তমান বাংলাভাষায় চিত্রজল্পকে সম্পূর্ণ বর্জন করে দেওয়া হয়েছে, চিত্রকল্পকেও স্বস্থানে রাখা হয়নি; তার নিহিত অর্থ ফেলে দিয়ে চিত্রকল্পকে ইংরেজির visual image শব্দের প্রতিশব্দ করে নেওয়া হয়েছে। আর, আধুনিক ইংরেজ ও তাদের অ্যাকাডেমি এই image-এর যে-পঞ্চেন্দ্রিয়ভিত্তিক visual, auditory প্রভৃতি পাঁচরকম image-এর ধারণা খাড়া করেছেন, উপরোক্ত জল্প-কল্পের ধারণার তুলনায় তা প্রায় শিশুসুলভ।

চিত্ররথ : ২. *চিত্র রথ যাহার।* ৩. নানাবর্ণরথ, সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব-রাজবিশেষ। ইঁহার মাতা দক্ষকন্যা মুনি, পিতা কশ্যপ। দ্রুপদনগরে গমনকালে অর্জ্জুনের সহিত ইঁহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি পরাজিত ও বন্দীকৃত হন এবং 'অঙ্গারপর্ণ' নাম ত্যাগ করিয়া 'দগ্ধরথ' নাম গ্রহণ করেন। ইঁহার ইন্দ্র দত্ত নাম 'চিত্ররথ'। (ব.শ.)। একজন গন্ধর্ব ও কুবেরের বন্ধু। এঁর পর্ণ বা বাহন জ্বলন্ত অঙ্গারতুল্য ছিল বলে তিনি অঙ্গারপর্ণ নামে খ্যাত। চিত্র-বিচিত্র রথের অধিকারী হিসাবে এঁর অপর নাম চিত্ররথ। ... তাঁর সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়, এবং অর্জুনের আগ্নেয়াস্ত্রে রথ দগ্ধ হওয়ায় গন্ধর্বরাজ (চিত্ররথ) অচেতন হয়ে পড়েন ও অর্জুনের হাতে বন্দী হন। তাঁর স্ত্রী কুম্ভীনসী যুধিষ্ঠিরের শরণ নিলে, তাঁর অনুরোধে অর্জুন এঁকে মুক্তি দেন। ... গন্ধর্বরাজ যুধিষ্ঠিরকে ও তাঁর প্রত্যেক ভ্রাতাকে এক শত বেগবান গন্ধর্বদেশীয় অশ্ব উপহার দেন ও অর্জুনকে চাক্ষুষী বিদ্যা দান করেন। এই বিদ্যার প্রভাবে ত্রিলোকের সব কিছু ইচ্ছামাত্র দেখা যায়। এর পরিবর্তে অর্জুন এঁকে আগ্নেয়াস্ত্র দান করেন। ইনি অর্জুনকে পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষ সংবরণ ও তপতীর কাহিনী বলেন এবং বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কাহিনী শোনান। এঁরই পরামর্শে পাণ্ডবেরা দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উৎকোচতীর্থে তপস্যাকারী ধৌম্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. যতদূর বোঝা যায়, কারেন্সি নোটের প্রচলনের পূর্বে সম্পদের যতরকমের লিখিত কাগজ ছিল, তা সবই ছিল 'চিত্ররথ' পদবাচ্য। দ্র. **অঙ্গারপর্ণ, তপতী**।

চির (চেরা) : ১. √চি + র (রক্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গতিশীল চায়ীর আবর্ত্তন যাহাতে।* ৩. দীর্ঘ, দীর্ঘকালবর্ত্তী, অত্যন্ত, বহু, অনেক, নিত্য, আমরণ, যাবজ্জীবন, অনন্তকালব্যাপী, নিরবধি, জন্মজন্মান্তরসম্বন্ধী, সর্ব্বকালসম্বন্ধী, সতত। (ব.শ.)। ৪. ever অর্থে প্রচলিত এবং প্রায় উপসর্গের মতো বহু শব্দের আগে ব্যবহৃত। ৫. চির শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ 'গতিশীল চায়ীর আবর্ত্তন যাহাতে', অথচ তার ব্যবহারিক অর্থ হয় অনন্তকাল। এরকম হওয়ার কারণ এই যে, চির শব্দটি অস্তিত্বনির্ভর। অস্তিত্ব মাত্রেই চয়নেচ্ছাকারী। যতদিন অস্তিত্ব আছে, ততদিন তার চাওয়া আছে; গতিশীল চয়নেচ্ছার আবর্ত্তন আছে। সেকারণে অস্তিত্ব থাকলেই তার সঙ্গে তার চির থাকবে। আর, সেজন্যেই চির শব্দটির প্রতীকী অর্থ হয় 'যাবজ্জীবন', 'আমরণ' ইত্যাদি। কিন্তু পরে পরে চির শব্দের এই অর্থকে প্রসারিত করে নেওয়া হয়; চির-কে তার অস্তিত্বনির্ভরতা থেকে মুক্ত করে 'অনন্তকাল' অর্থে প্রয়োগ করা হতে থাকে। কিন্তু কালের তেমন স্থান-নিরপেক্ষ বা পাত্র-নিরপেক্ষ কার্যকারিতা বাস্তবে সম্ভব হয় না। সময় মানেই গাছের সময়, মাছের সময়, মানুষের সময়, পৃথিবীর সময় ইত্যাদি। চির (= গতিশীল চায়ীর আবর্ত্তন) বললেই প্রশ্ন উঠবে কোন চায়ীর আবর্ত্তন? অগত্যা, চির-র পেছনে গোপন পাত্র হিসেবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বা জগতের অস্তিত্বকে দাঁড় করিয়ে রাখতে হয়; জগৎ যতদিন আছে, তার চির (চয়নেচ্ছার আবর্ত্তন) ততদিন আছে। সেই

কারণে চিরকাল বলতে আমরা কার্যত জগতের অস্তিত্বের শেষদিন পর্যন্ত সময়কে বুঝে থাকি।

তা সে যাই হোক, কথা হচ্ছে চায়ীর আবর্তন নিয়ে। চয়নেচ্ছা-মূলক এই আবর্তন যদি চয়নেচ্ছা করতে করতে, আবর্তিত হতে হতে, ঘুরতে ঘুরতে পার্শ্ববর্তী অবয়বের দিকে এগোতে থাকে; ফল হয় এই যে, পার্শ্ববর্তী অবয়বটি চীর্ণ বা চিরিত বা চেরা হয়ে যায়। একে দ্বিখণ্ডিত, বিদীর্ণ, দো-ফাঁক, ফাড়া ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।

চিরজীবী (চিরঞ্জীব, চিরঞ্জীবী) : ১. চির + ✓জীব্ + ইন (ণিনি) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যিনি চিরকাল জীবিত থাকেন।* ৩. দীর্ঘকালজীবনযুক্ত, দীর্ঘজীবী, অমর, বিষ্ণু, মার্কণ্ডেয়, অশ্বত্থামাদি সপ্তজন। (অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ, পরশুরাম — এই সাতজন)। (ব.শ.)। বিষ্ণু, কাক, মার্কণ্ডেয়, অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, রূপ, পরশুরাম — এঁরা চিরজীবী। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. একালে সবাই জানেন, **চিরজীবী** ধারণাটিই বাজে ধারণা! অথচ কাদের **চিরজীবী** বলা হত, তা নিয়ে একটুখানি খোঁজখবর নেওয়ার চেষ্টা করলে আমরা জানতে পারি, মানুষের সমাজ যতদিন আছে এবং থাকবে, ততদিন সাতটি সত্তা অবশ্যই বেঁচে থাকবেন। পুরাণাদি গ্রন্থে এঁদের 'সপ্তচিরজীবী' বলা হয়। এঁদের সাতটি সুনির্দিষ্ট নাম দিয়ে গেছেন ব.শ.। বহু পৌরাণিক গ্রন্থে ব.শ.-প্রদত্ত সাতটি নামই রয়েছে; অন্যগুলি নেই। এই সাতটি নামকে একালের ভাষায় অনুবাদ করে আমরা যা পেয়েছি, সেগুলি হল **অশ্বত্থামা** = আই এ এস পাশ-করা ব্যুরোক্রাট; **বলি** = ট্যাক্স সংগ্রাহক; **ব্যাস** = শিক্ষকগণের নিয়ন্ত্রক-শিক্ষকগণ; **হনুমান** = বহুডিগ্রি-ধারী পণ্ডিত; **বিভীষণ** = (গণতান্ত্রিক) রাষ্ট্রে বিরোধী-পক্ষ; **কৃপ** = সরকারি কর্মযজ্ঞের পরিচালক; **পরশুরাম** = বিচারক। এই সত্তাগুলির বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নাম ছিল। মানবসমাজে পরমাপ্রকৃতি এই সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে সক্রিয় থাকেন। আমাদের এই উপলব্ধি চূড়ান্ত এবং নির্ভুল এমন দাবি আমরা করি না। এ বিষয়ে আমাদের পূর্বতন উপলব্ধি ইতিমধ্যেই একটু বদলেছে। আমাদের ধারণা, শব্দার্থবোধ যত নিখুঁত হবে, এই উপলব্ধি তত নিখুঁত হতে পারবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য (ঘ) গ্রন্থের ১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চিরুনী, চিরুনী-তল্লাসী : ২. ***চিরুনী*** = *গতিশীল চায়ীর নবরূপে উত্তীর্ণ রক্ষণ/ভক্ষণ অন থাকে যাহাতে তাহার আধার।* ***চিরুনী-তল্লাসী*** = *যে তল্লাসীতে জনসাধারণকে চিরে চিরে (চুলের মাঝে উকুন খোঁজার মতো মানুষের মাঝে) উদ্দিষ্টকে (সমাজবিরোধী, বিদ্রোহী, শত্রু, সন্ত্রাসবাদী ইত্যাদিকে) খোঁজা হয়।* / যাহা দ্বারা চুল চিরে বা আঁচড়ায়। (ব.শ.)। ৩. কাঁকই।

চিল্ল (চিল, চিলেকোঠা, চিল্লান, চীল) : ১. ✓চিল্ (ভাবকরণ) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***চিল্ল (চিল, চীল)*** = *গতিশীল চায়ীর লালন লয় পায় যাহাতে; দেওয়া-নেওয়া করার জন্য **চিৎকার** করে যে।* ***চিলেকোঠা (চিলা, চিলাকোঠা)*** = *যে কোঠা-ঘরে উঠে **চিল্লান** (অন্যকে আওয়াজ করে ডাকা) হয়।* ***চিল্লান*** = *চিল্ল অন (on) যাহাতে।* ৩. **চিল্ল** = শকুনিকা, চিলপাখী, **ক্ষতযুক্ত চক্ষুঃ**; গৃধ্রজাতীয় মাংসাশী পক্ষিবিশেষ। **চিলা, চিলে** = অট্টালিকার উপরিস্থ গৃহ, গাছের শাখায় জাত একপ্রকার পরগাছা। (ব.শ.)। ৪. hawk বা 'চিলপাখী' অর্থে প্রচলিত। চিল্লান, চিলেকোঠা যথার্থে সাধারণ বাংলাভাষীদের মধ্যে প্রচলিত। ৫. **চিল্ল** শব্দের মধ্যে যে ক্রিয়ার কথা বলা ছিল, তার জীবজাগতিক অর্থটি বাংলায় প্রচলিত রয়েছে, কিন্তু সামাজিক অর্থটি অপ্রচলিত হয়ে গেছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, ইংরেজি hawk ও hawker শব্দে দুটি অর্থই প্রচলিত রয়েছে। বাংলায় অবশ্য **বাজপাখী, বাজপেয়ী, বাজসনেয** কিংবা **বাজসনেয়ী** সংহিতা প্রভৃতি শব্দে দুটো ধারণাই তার সমস্ত অর্থ নিয়ে বিদ্যমান রয়েছে।

চেতন (চেতনা, চৈতন্য, শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) : ১. ✓চিৎ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***চেতন*** = *দিশামুখী **চিৎ** অন যাহাতে।* ***চেতনা*** = *চেতনের আধার যে।* ***চৈতন্য*** = *চেতন-জাত সত্তা থাকে যাহাতে।* ***শ্রীচৈতন্য*** = *'গতিশীল শক্তির আবর্তনধারী' (= শ্রী) চৈতন্য যাহার।* ***শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য*** = ***শ্রী**-যুক্ত **কৃষ্ণ** চৈতন্য যাহার।* / **চেতনা** = যাহার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **চেতন** = জ্ঞাতা, চৈতন্যযুক্ত, প্রাণবান, আত্মা, পরমেশ্বর, জীব, প্রাণী, মনুষ্য, সহৃদয়, চেতনা, চৈতন্য। **চেতনা** = বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, সংবিৎ, জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, চৈতন্য, সংজ্ঞা, মনঃ। **চৈতন্য** = চেতনভাব, চেতনা, জ্ঞান, বুদ্ধি, চিৎস্বরূপ পরমাত্মা, আত্মরূপ চেতনা, প্রকৃতি, কলিকালে ভগবদবতারবিশেষ। ইঁহার মাতা শচীদেবী, পিতা জগন্নাথ মিশ্র। 'বিশ্বম্ভর' ও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ইঁহার নামান্তর। ঈশ্বরপুরী ইঁহার দীক্ষাগুরু, কেশবভারতী ইঁহার সন্ন্যাসমন্ত্রদাতা। ইনি বঙ্গে হরিনামসঙ্কীর্তনের প্রবর্তক। জগাই মাধাই উদ্ধার, যবন হরিদাসের প্রতি কৃপা ইঁহার বিশ্বজনীন প্রেমের পরিচায়ক। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ ইঁহার প্রধান পার্ষদ ও গোবিন্দ সেবক ছিলেন। জগন্নাথক্ষেত্রে ইঁহার তিরোভাব হয়। (ব.শ.)। ৪. চেতন, চেতনা sense অর্থে এবং শ্রীচৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বৈষ্ণবধর্মপ্রবর্তকের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. **চিৎ** দিশাগ্রস্ত হয় অর্থাৎ একটি বিশেষ দিকে বিশেষ বিষয় চাইতে থাকে, তখন তাকে বলে চেত। সেই চেত অন থাকে যাহাতে, তাকে বলে চেতনা। এই চেতনা যেখানে জমায়েত হয় বা সঞ্চিত হয়, তাকে বলে চৈতন্য। সেই চৈতন্য যদি গতিশীল শক্তির আবর্তন বিষয়ক চৈতন্য হয়, তাকে বলে শ্রীচৈতন্য। আর, **কৃষ্ণের** শক্তির আবর্তন বিষয়ক চৈতন্য হলে, তাকে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এবং এই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক চৈতন্য যাঁর থাকে, তাঁকেও **শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য** বলে। তবে এসবই চেতনার এলাকা, **চিত্তের** এলাকা। আর চিত্তের যেহেতু দুরকম এলাকা রয়েছে — বুদ্ধির চিত্ত ও মনের চিত্ত — উপরোক্ত চৈতন্যগুলিও একরকম থাকে না। সর্বাগ্রে তা মনের এলাকার বিষয় থাকে, সেখানেই তাকে নবরূপে অর্জন করা হয়। তখন তার নাম হয় **শ্যাম** বা **শবল**। তারপর তা পাড়ি দেয় বুদ্ধির এলাকায়। তখন শ্যাম হয়ে যায় গৌরবর্ণ, গৌরী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমগ্র চৈতন্যের ধারক। তাতে **রাধা (গৌরী), শ্যাম,** ও **কৃষ্ণ** — এই সমগ্র জ্ঞানসত্তাই বিদ্যমান। দ্র. **গৌরী, নিমাই**।

চিন্ত্ *(চিহ্ন্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অচিন্তনীয়, অচিন্তিত, অচিন্ত্য, অচিহ্ন, অনিশ্চিন্ত্য, অবিচিন্তন, চিন, চিনচিন, চিনা, চিনাজোঁক (ছিনে-জোঁক), চিনি, চিনিচিনি, চিন্ত্, চিন্ত, চিন্তক, চিন্তনীয়, চিন্তবেশ্ম, চিন্তয়িতব্য, চিন্তা, চিন্তাভাবনা, চিন্তামণি, চিন্তাযজ্ঞ, চিন্ময়, চিহ্ন, চেনা, চেনা-জানা, চেনা-পরিচয়, চেনা-শোনা, নিশ্চিন্ত, সচিন্তিত, সুচিন্তিত।

চিন্ত্ (চিহ্ন্) = গতিশীল চায়ীর রহস্যরূপের তারণ। **চিন্ত** = গতিশীল চায়ীর রহস্যরূপের তারণ যাহাতে। **চিহ্ন** = গতিশীল চায়ীর স্থিত হওয়ন যাহাতে। (চিন্ত্ ক্রিয়ার ভিতরে যে রহস্যরূপটি রয়েছে, চিহ্নে তা খানিকটা স্পষ্ট। এটি মূলত চি ক্রিয়া থেকে প্রসূত। চিহ্নিত করা মানেই চিন্ করা। অর্থাৎ, চিন্ত্-এর ভিতরে চিহ্ন-ক্রিয়াটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে। সেই কারণে এখানে চিহ্নকে রাখা হল।)

চিন (চিনচিন, চিনা, চিনি, চিনিচিনি, চীন, চীনা) : ২. *চিন = গতিশীল চায়ীর না-করণ যাহাতে।* ৩. **চিন** = চিহ্ন, দাগ, লক্ষণ, ছাবা, সৃষ্টির লক্ষণ, বিশেষ বা ভেদকারক লক্ষণ; চিহ্নে বা লক্ষণে জানা, চেনা, পরমার্থভাবে জানা, দুই-এর প্রভেদপূর্ব্বক জানা, আপনার অবস্থাদি বা স্বরূপ জানা। **চিনচিন** = দুর্ব্বলতা-বোধ, অল্পবেদনা-বোধ। (ব.শ.)। ৪. 'চিহ্নে বা লক্ষণে জানা' অর্থে চিন, এবং very little or sweet pain অর্থে চিনচিন প্রচলিত। ৫. কার্যত চিহ্ন থেকে যেমন চিন শব্দের অর্থে পৌঁছানো যায়, সরাসরি চি-এর নাকরণ থেকেও চিন শব্দে পৌঁছানো যায়। ন বর্ণে বিষয়টিকে আমরা বিস্তৃত করেছি। চিন-এর মূলে রয়েছে চায়ীর সঙ্কোচন ক্রিয়া। সেই ক্রিয়ার পরবর্তী স্তরে তা দুভাগে বিভক্ত — একদিকে তা ক্ষুদ্রকরণ (= চিন্), অন্যদিকে তা ক্ষুদ্রকৃত সত্তার দ্বারা পৃথককরণ (= চিহ্ন্)। দুদিক থেকে শব্দের দুরকম অর্থের এই প্রস্রবণ স্বভাবতই দুরকম ধারার জন্ম দিয়ে থাকে; অথচ উচ্চারণের সমতার কারণে আমাদের মনে হয়, অর্থের ধারাও বুঝিবা একটিই। যাই হোক, চিন শব্দের ভিতরে স্বভাবতই একদিকে রয়েছে গতিশীল চায়ীর না-করণ করে করে তাকে বিন্দুবৎ অবস্থায় অনুভব করা — চিনচিন ব্যথায় যে-চিনকে আমরা পাই; অন্য দিকে রয়েছে চিহ্নিত করা, চিহ্নিত করে করে দৃষ্ট অবয়বসমূহকে পৃথক করে ফেলা, পৃথক করে চেনা। না-করণের ধারায় আমরা যাদের পাই, তারা হল চিনি বা sugar, চিনা বা ছোট, ক্ষুদ্র, চীন, চীনা বা চীনদেশীয় প্রভৃতি সত্তাদের; অপরদিকে চিহ্নের ধারায় আমরা চিহ্নিত বা চিনা বা চেনা, চেনাজানা, চিনে রাখা, চিনেছি বলে মনে হওয়া অর্থাৎ চিনি-চিনি মনে হওয়া ইত্যাদি। তবে চিনি কেবল সঙ্কুচিত ক্ষুদ্র দানা বলেই চিনি-পদবাচ্য নয়, কিংবা যে-ব্যক্তি কখনো চিনি খায়নি, সে মুখে চিনি নিয়ে চিনচিনে মিষ্টি (**চাটনী**র মতো) ব্যথা অনুভব করে বলেই চিনি-পদবাচ্য নয়; ব.শ. মতে এই বস্তুটি বিশ্বে প্রথম চীন দেশে ৬২০ খ্রিস্টাব্দে আবিষ্কৃত ও প্রস্তুত হয়েছিল এবং সেখান থেকেই ভারতে এসেছিল বলেই এর নাম চিনি। হতে পারে। যদিও নীডহ্যাম-এর দেওয়া তথ্যানুসারে ভারতের বিহারে ৭২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম আখ থেকে চিনির প্রচলন হয়, এবং ইয়োরোপে বিট ও আলু থেকে তা হয় ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের পরে। কিন্তু ব.শ. অনুসারে চিনি শব্দটিই জানিয়ে দেয়, ভারতে প্রথম চিনি এসেছিল চীন থেকে, এবং সেকারণেই তার নাম চিনি। অবশ্য আমাদের বিচারে সেক্ষেত্রে এর নাম হওয়া উচিত ছিল চীনী। আমাদের মতে, শব্দের 'চিনি' বানানটি শব্দটির সঙ্গে চীনের সম্পর্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, বস্তুটি চীন থেকে প্রথম এসেছিল, সেকথা ঠিক। তাই আদিতে তার নাম 'চীনী'ই হয়ে থাকবে। তারপরে ভারত তা নিজেই বানাতে শিখে গিয়েছিল এবং ক্রিয়াভিত্তিক শব্দবিধির নিয়মে বস্তুটির স্বভাব বিচার করে তার নাম রেখেছিল চিনি। পরে পরে 'চীনী' ও 'চিনি' মিলেজুলে চিনি শব্দটিই বাংলা ভাষায় বলবৎ হয়ে যায়।

চিন্তন (চিন্তা, চিন্তাভাবনা) : ১. ✓চিন্তি + অন (ল্যুট্, যুচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***চিন্তন** = গতিশীল চায়ীর রহস্যরূপ তারিত হওয়া অন থাকে যাহাতে।* ৩. ভাবনা, আলোচনা, অনুধ্যান, স্মরণ, আকাঙ্ক্ষা। (ব.শ.)। ৪. thinking, thought অর্থে শব্দগুলি প্রচলিত। ৫. দ্র. **চিন, চিহ্ন**। চিনে চিনে (চিহ্নিত করে করে) এগোনোই **চিন্তন**। এই প্রক্রিয়ার আশ্রয় যাতে, তাই-ই চিন্তা। কিন্তু আমাদের চিন্তার মধ্যে 'চিনে চিনে এগোনো'র প্রক্রিয়াটি ঠিক কীরকম?

বাস্তব পৃথিবীতে জীবমাত্রেই যে নিয়মে হাঁটাহাঁটি ঘোরাঘুরি করে, গাছ থেকে গাছ, ঝোপ থেকে মাঠ, মাঠ থেকে পুকুর — এভাবে নিজের এলাকা চিনে রাখে; মানুষ তার মনোলোকেও সেই নিয়মে চলাফেরা (ভাবনাচিন্তা) করে থাকে। নতুন অঞ্চলে গিয়ে যে মানুষের কাছে বাসাভাড়া নিই, তার মাধ্যমে পরবর্তী মানুষটির সঙ্গে আলাপ হয়, তার থেকে অন্য মানুষের সঙ্গে — এভাবেই পরিচিতির অগ্রগতি হতে থাকে। ভূ-পরিমাপকারী সার্ভেয়ারগণও শুরু করেন একটি বিন্দু থেকে। তারপর সেখান থেকে পরবর্তী বিন্দু, তার থেকে তার পরের বিন্দু, এভাবেই তাঁরাও এগোন। বাস্তবে এই বিন্দু হল একটি খুঁটি। সেই খুঁটি থেকে ফাঁক, তারপর পরবর্তী খুঁটি, আবার ফাঁক, আবার খুঁটি — এভাবেই এগোয়। সমগ্র এলাকাকে বুঝতে হলে স্বভাবতই খুঁটির পর খুঁটি ধরে ধরে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে; চাইলে দুই খুঁটির মাঝের ফাঁকগুলি যোগ করে করে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে। মনোলোকের চলাফেরায় (ভাবনাচিন্তায়) এই খুঁটিগুলির যোগফলকে বলে **চিন্তা**, আর ফাঁকগুলির যোগফলকে বলে **ভাবনা**। রসিকের ভাষায় রসগোল্লা হল **চিন্তা**, আর রস হল তার **ভাবনা**। দুই-এ মিলে সম্পূর্ণ — চিন্তাভাবনা।

ভাবনা শব্দটির অর্থও এখন আমরা বুঝি thought। কার্যত এর অর্থ অনেক বড় ও ব্যাপক। 'ভূ' মানে 'হওয়া'। 'হয়ে গেল' তো '**ভব**' (অস্তিত্ব)। ('ছিল ডিম, হয়ে গেল একটা প্যাঁকপেকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।' কিন্তু ডিম থেকে হাঁস পর্যন্ত এই যে যাত্রা, একে কী বলা হবে? অর্থাৎ —) কী কারণে কীভাবে কী 'হয়ে গেল', আর কীভাবে কী হতে পারে, তার সবটাকে কী বলা হবে? প্রাচীন বাংলার বিধি অনুসারে বলতে হবে — '**ভাব**' (হওনের অঙ্ক)। ['ভব' হল তথ্য বা প্রকৃতি (যেন রসগোল্লা), আর 'ভাব' হল তত্ত্ব বা পুরুষ (যেন রস, যাতে রসগোল্লা ডুবে থাকে)।] এই 'ভাব'-কে

অন্ (on) করে দিলে অর্থাৎ একটার পর একটা 'ভাব' (হওনের অঙ্ক) জুড়ে জুড়ে চলতে থাকলে হয় 'ভাবন' (যেমন চলন, বলন ইত্যাদি)। সেই ভাবন-এর আশ্রয় যাতে তাকে বলে **ভাবনা**। তার মানে ভাবনা শব্দের প্রকৃত অর্থ হল (এ-ভবসংসারে) পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে (আগে কীভাবে-কীকারণে-কী ছিল, এখন কীভাবে-কীকারণে-কী হল, এবং পরে কীভাবে-কীকারণে-কী হবে — এই) ত্রিকাল বিষয়ক মনন। সংক্ষেপে বললে — 'ভাবনের (হওনের অঙ্কগুলির) আশ্রয় যাহাতে' তাকেই 'ভাবনা' বলে। নিশ্চয় ইংরেজি thinking-এর চেয়ে ভাবনার অর্থ অনেক স্পষ্ট ও ব্যাপক।

এই 'ভাবনা'কে 'চিন্তা'র সঙ্গে জুড়ে যে **চিন্তাভাবনা** শব্দটি তৈরি হয়, তার অর্থের এলাকা স্বভাবতই আরও বিশাল। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দবিধির নিয়মে চিন্তা আর ভাবনা আলাদা শব্দ, আলাদা প্রক্রিয়া; যদিও শব্দদুটির উদ্দেশ্য এক — মনে মনে এগোনো। চিন্তা চিনে চিনে এগোয়, ভাবনা হওয়নের অঙ্ক কষে কষে এগোয়। (অতএব, বিশ্বের মূলে যে তরঙ্গ (wave) ও কণা (particle), তার তরঙ্গ-বিষয়ক মননকে **ভাবনা** এবং কণা-বিষয়ক মননকে **চিন্তা** বলা যেতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানীরা এতদিন পরে explicitly টের পেয়েছেন, তরঙ্গ আর কণা আসলে একই বিষয়ের দুই রূপ। তাই তাঁরা তাদের নাম দিয়েছেন wavicle। মনোলোকের সেই ব্যাপারকেই আমাদের পূর্বপুরুষেরা 'চিন্তাভাবনা' শব্দে একত্রে বুঝেছিলেন।) বিশ্বব্যাপারে আমাদের মনন এই দুটি প্রক্রিয়াই চালায়। তাই শব্দদুটিকে জুড়ে 'চিন্তাভাবনা' বললে মননের সমগ্র ক্রিয়াটিকে সামগ্রিকভাবে বোঝানো যায়। এখন তাহলে চিন্তক, ভাবুক, চিন্তাভাবনাকারী সত্তাদেরও আমরা স্পষ্টভাবে চিনে ফেলতে পারি। সেই সুবাদে, 'আধুনিকতাবাদী'দের thinking প্রক্রিয়াকে 'চিন্তা', ভাবপ্রবণ মানুষের thinking প্রক্রিয়াকে 'ভাবনা', এবং কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীদের thinking প্রক্রিয়াকে 'ভাবনাচিন্তা' বা 'চিন্তাভাবনা' বললে মোটামুটি ঠিক বলা হবে। সুতরাং, 'ভাবনাচিন্তা'র অর্থরূপে শুধুমাত্র thinking বলে দিলে চিনে চিনে এগোনোর কথাও বলা হয় না, হওয়নের অঙ্ক কষে কষে এগোনোর কথাও বলা হয় না। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য (খ) গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

চিহ্ন (চিহ্নিত, চিনা, চেনা) : ১. ✓চিহ্ন্ + অ (অচ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চিহ্ন = গতিশীল চায়ীর স্থিত হওয়ন যাহাতে। /* যাহার দ্বারা লক্ষণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **চিহ্ন** = লাঞ্ছন, লিঙ্গ, লক্ষণ, অঙ্ক, পতাকা, অভিজ্ঞান, মুদ্রা, সংস্কার, দাগ, চিনা, জানা, পরিচিত বলিয়া জানা, প্রভেদপূর্ব্বক বুঝা, স্বরূপে বুঝা বা নির্ণয় করা, নামানুসারে নির্ণয় করা বা ঠাহরান। **চিহ্নিত** = অঙ্কিত, লাঞ্ছিত, চিহ্নযুত, উপলক্ষিত, পরিচিত। (ব.শ.)। ৪. 'দাগ' অর্থে চিহ্ন প্রচলিত এবং acknowledge অর্থে চিনা ও চেনা প্রচলিত। ৫. ইচ্ছাকারীর অবয়বে কি ইচ্ছার বা কামনা-বাসনা-আকাঙ্ক্ষার দাগ লেগে থাকে? আমাদের শব্দবিদ পূর্বপুরুষেরা মনে করতেন, হ্যাঁ, লেগে থাকে। মানুষ মাত্রেই জন্মায় একেবারে নির্মল জলের মতো, সাদা কাগজের মতো, দাগহীন, চিহ্নহীন। কিন্তু যতই বয়স বাড়তে থাকে, সমাজের ইতিহাসের ক্লেদের ভাগ তার অভিজ্ঞতায়, তার চাওয়া-পাওয়ায় স্থান করে নিয়ে তার মনের সাদা পাতাকে ক্রমশ দাগে দাগে ভরিয়ে তোলে। ফলত, যাদের মনে (মনোভাবে) যেরূপ ইচ্ছা জন্মায়, তাদের মুখে-চোখে সেইরকম ছায়া পড়ে, দাগ পড়ে, চিহ্ন পড়ে। সরল মানুষদের মুখে-চোখে সেই দাগ স্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়। তবে, যারা যত বেশি অ্যাকাডেমি-শিক্ষায় শিক্ষিত হয়, যত বেশি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লেন-দেনে জটিল-কুটিল (কমপ্লিকেটেড-সফিসটিকেটেড) হয়, তাদের এই দাগ-গোপনের ক্ষমতা তত বেশি বাড়তে থাকে। সাধারণত বদ দেশনেতা, সংস্থার সর্বোচ্চ পরিচালক এবং বড় ব্যবসায়ী মাত্রেই এমন মানুষ হন, যাদের মনের কথা মুখে-চোখে কখনোই ফুটে ওঠে না; ফুটে উঠতে দেন না তাঁরা। (ফুটে উঠলে, প্রতিযোগিতামূলক সমাজের যে স্তরে তাঁরা সক্রিয় থাকেন, সেখানে তাঁদের পরাজয় অবধারিত হয়ে যায়। বাস্তবতার দায়ে পড়া এই জটিল-কুটিল মানুষেরা নিজ নিজ মনের গভীরে বড় দুঃখী হন।) কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দাগ গোপন করা যায় না। দেখবার চোখ পরমাপ্রকৃতি যাঁদের দিয়েছেন, সবচেয়ে জটিল-কুটিল মানুষের মনোবাঞ্ছাও তাঁদের চোখে পড়ে যায়। কার্যত, পরমাপ্রকৃতির নিয়মে এমন মানুষের অস্তিত্ব অসম্ভব, যার মুখে-চোখে-গায়ে-গতরে তার মনের ইচ্ছার ছায়া বা দাগ পড়বেই না। সেই দাগ থেকে ইচ্ছাকারীদের প্রত্যেককে পৃথক করে চিহ্নিত করা যায় বা চেনা যায়, 'প্রভেদপূর্ব্বক বুঝা যায়'। যায় বলেই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে আমরা আলাদা করে চিনতে পারি। এই বিধিলিপি অনিবার্য। ৬. ল্যাটিন signum, ফরাসি signe, ইংরেজি sign।

চুম্ব্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : চুম্, চুম, চুমকি(কী), চুমকুড়ি, চুমরা, চুমুক, চুমুর, চুমুরি, চুমা, চুম্ব্, চুম্ব, চুম্বক, চুম্বন, চুম্বিত, চুম্বী, চুম্বুক।
চুম্ব্ = নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ীর সীমায়ন বহন। **চুম্ব** = নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ীর সীমায়ন বহন থাকে যাহাতে।

চুম (চুমকি, চুমা, চুমু, চুমুক) : ২. *চুম = নবরূপে উত্তীর্ণ চয়নেচ্ছার সীমায়ন থাকে যাহাতে।* ৩. **চুম** = চুম্বন করা। **চুমকি, চুমকী** = চমকচুক্ত, দীপ্তিশীল সোনার রূপার ছোট চাকতি। **চুমা** = চুম্বন। **চুমুক** = চুম্বনের ন্যায় ওষ্ঠ ঠেকাইয়া পান-করা যে-পরিমাণ জলাদিতে পূর্ণ হয়, তৎপরিমাণ পানীয়, চুমকির মতো জলবিম্ব। (ব.শ.)। ৪. যথাক্রমে kiss, sparkler, kiss, kiss, sip অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **চুম্বক**।

চুম্বক (চুম্বন, চুম্বী) : ১. ✓চুম্ব্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *চুম্বক = চুম্ব্ (নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ীর সীমায়ন বহন) করে যে; চুম্বন = চুম্ব্ অন করে যে। /* **চুম্বক** = চুম্বন করে যে। (ব.শ.)। ৩. **চুম্বক** = কামুক, শঠ, ধূর্ত্ত, বহুগ্রন্থের একদেশজ্ঞ, পল্লবগ্রাহী, লৌহাকর্ষক লৌহবিশেষ, অয়স্কান্ত, কান্তলৌহ (load-

stone), ধটের (তুলার) উর্দ্ধাবলম্বন (pivot), বস্তুসংক্ষেপ, পুস্তকাদির বিষয়সার, বেগে আকর্ষণ। **চুম্বন** = মুখসংযোগবিশেষ, চুমা। (ব.শ.)। ৪. যথাক্রমে magnet ও kiss অর্থে শব্দদুটি প্রচলিত। ৫. চ বা চায়ী (ইচ্ছা) যখন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তখন সে নিতে চাওয়ার বদলে দিতেও চায়; তখন শব্দে তার প্রকাশ ঘটে 'চু'-তে। সেই নবরূপী ইচ্ছার বা চু-এর সীমায়ন ঘটে 'চুম্'-এ; অর্থাৎ চায়ী দেওয়া-নেওয়া করতে চায় বটে, তবে তার একটা সীমা আছে। এই 'চুম্'-কে বহন করে 'চুম্ব্' এবং সেই চুম্ব্ করে যে, সে হল **চুম্বক**। আর, সেই চুম্ব্ অন থাকে যাহাতে সে হল **চুম্বন**। magnet চুম্ব্ করে বলেই তাকে **চুম্বক** বলে। অত্যুচ্চ অট্টালিকা গগনকে চুম্বন করে ব'লে আমাদের রসিক পূর্বপুরুষেরা তাকে বলতেন — গগনচুম্বী। আজকের সমাজবাস্তব আমাদের রস মেরে দিয়েছে, আমরা বলি 'আকাশছোঁয়া'। আর, রসহারা দোকানদার 'ছোট ইংরেজ' বলেন skyscraper; কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যার বাংলা অনুবাদ করেছিলেন 'আকাশ-আঁচড়ানো বাড়ী'।

চুর্ (চূর্ণ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অশ্মচূর্ণ, চু(চূ)ণ, চুণা, চু(চূ)ণাতি, চু(চূ)ণারী, চুণী, চুন, চুনট, চুনরি, (চুনুরি), চুনা, চুনায়লি, চুনারী, চুনী, চুনো, চুন্নী, চুর্, চুর, চুরট (চুরুট), চু(চূ)রমার, চুরি, চুল, চুলকা, চুলবুলে, চুলা, (চুলা), চুলি, (চুলি) চু(চূ)লিক, চু(চূ)লিকা, চুলুক (সমুদ্রচুলুক, চুল্লু-ভর-পানি, অগস্ত্য), চুল্লি, চুল্লী, চু(চূ)লো, চূর্ণ্, চূর্ণ, চূর্ণক, চূর্ণকার, চূর্ণকুন্তল, চূর্ণখণ্ড, চূর্ণন, চূর্ণমান, চূর্ণী, চূর্ণীকৃত, চোনা, চোর, চোরকর্ম্ম, চোরকাঁটা, চোর(া)কুঠরী, চোরগণেশ, চোরা, চোরাই, চোরাগর্ত্ত, চোরাগলি, চোরাগোপ্তা, চোরাপকেট, চোরাপথ, চোরাবালি(লু), চোরাযুদ্ধ, চোরায়, চোরি, চোল, চোলক, চোলাই, চৌর, চৌরি, চৌরিকা, চৌরোদ্ধরণিক, চৌরোদ্ধর্ত্তা, চৌর্য্য, প্রচুর, প্রাচুর্য্য, সমুদ্রচুলুক।

চুর্ (চূর্ণ্) = নবরূপী চায়ীর আবর্ত্তন। **চুর** = নবরূপী চায়ীর আবর্ত্তন যাহাতে। **চূর্ণ** = নবরূপী চায়ীর আবর্ত্তনের বোধ থাকে যাহাতে।

চুর (চুরমার, চুরি, চুর, চুরচুর) : ২. **চুর** = *নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ীর আবর্ত্তন রহে যাহাতে;* **চুরমার** = *চুরপূর্ব্বক* **মার** *থাকে যাহাতে;* **চুরি** = **চুর** *গতিশীল যাহাতে।* ৩. **চুর** = চূর্ণ, গুঁড়া, চূর্ণিত, খণ্ড-খণ্ড, বিদলিত, মর্দ্দিত, প্রভাবহীন, বিফল, ব্যর্থ, অভিভূত, মত্ত, চূর্ণ হওয়া, গুঁড়া হওয়া, চূর্ণ করা, গুঁড়া করা। **চুরমার** = চূর্ণ ও বিনষ্ট, খণ্ড-খণ্ড। **চুরি** = অপহরণ, গোপনকর্ম্ম। **চুরি করা** = গোপন-প্রণয়ে আকৃষ্ট বা আসক্ত করা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **চর**-এর বেলায় আমরা দেখেছি, সেখানে চায়ী কোনো ক্ষেত্রের ওপরে-ওপরে এগোতে থাকে; **চির**-এর বেলায় দেখেছি, চায়ী সেখানে ক্ষেত্রকে দু'ফাঁক করে বা চিরে দিয়ে এগোতে থাকে; এখন **চুর**-এর বেলায় দেখছি, চায়ীর চয়নেচ্ছা ক্ষেত্রকে খণ্ড-খণ্ড করে, টুকরো টুকরো করে দিয়ে এগোচ্ছে এবং এগোতে এগোতে কাঙ্ক্ষিত বস্তু বা বিষয় চয়ন করে নিচ্ছে। এই ক্রিয়া চলতে থাকলে, একে বলে **চুরি** করা। চায়ী যদি এভাবে চলে, তার এই ঘোর (ভয়ানক) আবর্ত্তমানতা যেমন ক্ষেত্রকে টুকরো টুকরো করে দেয়, তেমনি সে নিজেও থাকে এক ঘোরের মধ্যে, যাকে বলে **চুর**; যেকারণে আমরা বলি লোকটা (মদ খেয়ে) 'চুর' হয়ে আছে। (এতে চায়ী নিজেই চু-এর আধার, তাই এর বানান চুর।) এর ফলে ক্ষেত্র চুরমার হয়ে যায়; অর্থাৎ, ভেঙে চুরচুর হয়ে যায়, তার কিছু অংশ মারা পড়ে। দ্র. **গাঁটকাটা, গাঁটছড়া, মারা**।

চোর (চোরকর্ম্ম, চোরকাঁটা, চোরগণেশ, চোরা, চোরাই, চোরাকুঠরী, চোরাগর্ত্ত, চোরাগলি, চোরাগোপ্তা, চোরাপকেট, চোরাপথ, চোরাবালি, চোরাযুদ্ধ, চৌর, চৌর্য্য, চৌর্য্যবৃত্তি) : ১. ✓চুর্ + আ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **চোর** = **চুর** *ক্রিয়ার আধার যে; অথবা, সার্বিক* **চুর**-*কর্ম্ম করে যে।* ৩. তস্কর, অপহারক, গন্ধদ্রব্যবিশেষ, কবিবিশেষ, মনচোর, লম্পট, অসৎকর্ম্মা, কপট, আত্মভাবগোপনকারী, মায়াবিগ্রহধারী। (ব.শ.)। ৪. thief অর্থে প্রচলিত। ৫. যে শক্তি কোনো অবয়বের ভিতরে ফাঁক দেখে দেখে প্রবেশ করে, প্রয়োজনে অবয়বকে ফাটিয়ে খণ্ড-খণ্ড করে ফাঁক তৈরি করে নিয়ে এগোয় এবং আপন কাঙ্ক্ষিত বস্তু বা বিষয় চয়ন করে নিয়ে আসে, তাকে বলে চোর। ব.শ. মতে জড়ের ক্ষেত্রে এমন চোর কোনো এক গন্ধদ্রব্যবিশেষ; মানুষের সমাজে এমন চোর সেই মানুষ যে অপ-হরণ করে, তস্কর; যার কর্ম্ম সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত নয় বলে তাকে অসৎকর্ম্মা, কপট, লম্পট ইত্যাদি বলে। ফলত, সমাজের ভয়ে এই অসৎকর্ম্মকারী তার স্বরূপ ঢেকে রাখার চেষ্টা করে, আত্মভাব গোপন করে, এমন বিশেষ গ্রহণকারীর রূপ গ্রহণ করে, যা সত্য নয়, মায়া। সেকারণেই তাকে আত্মভাবগোপনকারী ও মায়াবিগ্রহধারী বলে। মানুষের মনোলোকে এমন চোরকে বলে মনচোর বা কবিবিশেষ।

অতঃপর চোর শব্দটি বিস্তার লাভ করে। তার কর্ম্ম নাম পেয়ে যায় **চোরকর্ম্ম**। যে কাঁটা চোরের মতো গোপনে কাপড়ের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ে তার নাম হয়ে যায় **চোরকাঁটা**। যে ব্রতব্রত ব্যক্তি সরকারের রীতি-অনুসারে জপ করে, জপিয়ে (অর্থাৎ, আবেদনপত্র দিয়ে সমস্ত ফর্মালিটিস পূরণ করে) সরকার থেকে প্রার্থিত বিষয় পাওয়ার চেষ্টা করে, তার সেই জপানোয় কোনো ফাঁক থাকলে যে কেরানি জপের ফল হরণ করে, তাকে বলে **চোরগণেশ**। এই চোর-এর আধারকে বলে **চোরা**। চোরা গতিশীল হয় যাতে, তাকে বলে **চোরাই**। কোনো প্রাসাদোপম ঘরের কোনো কুঠুরি যদি চোরের মতো আত্মগোপনকারী হয়ে সকলের চোখের আড়ালে থাকে, তার নাম হয়ে যায় **চোরাকুঠরী**। এভাবেই প্রসূত হয় **চোরাগর্ত্ত, চোরাগলি, চোরাগোপ্তা, চোরাপকেট, চোরাপথ, চোরাবালি, চোরাযুদ্ধ** প্রভৃতি শব্দ। এই চোর-স্বভাবের আধারকে বলে **চৌর**। চৌরকর্ম্ম চলে যাহাতে তাহার আধারকে বলে **চৌর্য্য**। এই চৌর্য্য যখন বৃত্তিরূপে অনুসৃত হয়, তখন তাকে বলে **চৌর্য্যবৃত্তি**।

আধুনিক যুগে এই চুরির একটি উচ্চতর প্রয়োগ দেখা যায়

অফিস-আদালতে। সেখানে সম্পদের প্রবাহ যে ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই ব্যবস্থা অজস্র টেবিলে টেবিলে, পদে পদে বিভক্ত থাকে। টেবিলে টেবিলে পদে পদে এই যে ফাঁক, এখানেই প্রার্থীর জপের ফল হরণ হয়ে যায়। ফাইলের এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে যাওয়ার ফাঁকে এই চুরি সক্রিয় হয়, কমিশন, কাট্‌-মানি, ঘুষ ইত্যাদি নামে। আজকাল এই চুরি ঠেকানোর জন্য বহু ক্ষেত্রেই 'এক-টেবিল' বা 'ওয়ান-উইনডো' ব্যবস্থার দাবী উঠছে।

চুল (চুলকা, চুলবুলে, চুলা, চুলি, চুলুক, চুলো, চুল্লি, চুল্লী, চূলিক, চূলিকা) : ২. *চুল = নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ী লালিত যাহাতে।* ৩. **চুল** = কেশ, চূড়া, অত্যুচ্চ স্থান। **চুলকা** = কণ্ডূতি নিবারণার্থ নখ দিয়া (গাত্র) ঘর্ষণ করা, চুলকান। **চুলবুলে** = চঞ্চল, অস্থির। **চুলা** = উনান। **চুলি** = চিতা। **চুলুক** = নিবিড়, কর্দ্দম, ঘন কাদা, প্রকৃতি, অঞ্জলি, মুখগহ্বরমিত জল, গণ্ডূষ। **চুলো** = উনান। **চুল্লি** = অগ্নিক্রীড়াস্থান, চুলা, উনান। **চুল্লী** = চিতা, চুলি, ত্রিশাল অর্থাৎ উত্তরপূর্ব্বপশ্চিম অভিমুখ প্রকোষ্ঠত্রয় যুক্ত গৃহ। (ব.শ.)। ৪. hair অর্থে **চুল**, scratch / itch অর্থে **চুলকা**, restless অর্থে **চুলবুলে**, oven অর্থে **চুলা, চুলি, চুলো** প্রচলিত; বাকি কয়টি অপ্রচলিত। ৫. বলা হয়ে থাকে যে, **চুল** কথাটি নাকি **চূড়া** থেকে এসেছে। সেক্ষেত্রে তার মানে দাঁড়ায় নবরূপী ইচ্ছাধারীর গড়ান-উড়ান যাহাতে, সেই হল চুল। অর্থাৎ ব.শ. মতে 'যাহা উন্নমিত হয়' বা উপর দিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, তাকে চূড়া বা চুল বলে। **চুলবুলে** শব্দে আমরা ক্রিয়াটিকে যথার্থে বুঝতে পারি। বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুর উচ্চস্থান থেকে নেমে সবেগে পরিধির প্রতিটি বিন্দুর দিকে চলে যাওয়াকে বলে বুল করা বা **বুলা** বা ভ্রমণ করা; আর পরিধির প্রতিটি বিন্দু থেকে সবেগে কেন্দ্রবিন্দুতে জলের ঢেউয়ের মতো পৌঁছে উছলে উঁচুতে উঠে যাওয়াকে বলে **চুল** করা বা চুলা। **চুলবুল** করার অর্থই হল এভাবে একবার কেন্দ্রে পৌঁছে উছলে-যাওয়া জলের মতো বা আগুনের শিখার মতো, পরক্ষণেই সেই উচ্চতা থেকে নেমে সবেগে সর্বদিকে প্রসারিত হয়ে যাওয়া। মানুষের সমস্ত অর্জন এভাবেই তার চুলে পৌঁছায়। উনান, চিতা, **চুল্লি** — এসবে যে আগুন জ্বলে সে এভাবেই জ্বলে। এভাবেই সমুদ্রের সমস্ত জলকে এক **চুলুকে** কেন্দ্রে আকর্ষণ করে পান করেছিলেন বলে **অগস্ত্য** মুনির নাম হয়ে যায় **সমুদ্রচুলুক**। মনে হয়, ফারসিতে এই চুলুক-কেই বলে 'চুল্লু', 'অঞ্জলি-পরিমাণ-জল'কে বলা হয় 'চুল্লু-ভর-পানি'। তবে **চুলুক** অর্থে ঘন কাদা বা কর্দ্দম কেন বোঝায়, তা এখনও বুঝে ওঠা যায়নি। দ্র. **চালচুলো**।

চূর্ণ (চূর্ণক, চূর্ণকার, চূর্ণকারী, চূর্ণখণ্ড, চূর্ণন — চুণ, চুণা, চুন, চুনকালি, চুনো, চোনা।) : ১. ✓চূর্ণ + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। ২. *চূর্ণ = নবরূপে উত্তীর্ণ ইচ্ছাধারীর আবর্ত্তমানতার বোধ যাহাতে।* ৩. পেষণ, গুঁড়ান, চূর, গুঁড়া, পেষণজাত গোধূম, ময়দা, আবীর, কুঙ্কুমচন্দনাদিরজঃ, বাসযোগ, পটবাসক্ষোদ, গন্ধদ্রব্যের গুঁড়া, ক্ষারবিশেষ, চুন, ধূলি, পিষ্ট করা, গুঁড়া করা। (ব.শ.)। ৪. dust অর্থে প্রচলিত। ৫. **পূর্ণ** শব্দের বিপরীত শব্দ হল চূর্ণ। পূর্ণকে চূর্ণ করে করে যা পাওয়া যায় তাকেও **চূর্ণ** বলে; অর্থাৎ, চূর্ণ করার প্রক্রিয়াকে চূর্ণ বলে। কিন্তু ক্রিয়ারূপে পূর্ণ ও চূর্ণ দুটো শব্দই মানুষের বোধের ব্যাপার, বাস্তবের ব্যাপার নয়। এই চূর্ণ ক্রিয়াটি করে যে, তাকে **চূর্ণক** বলে। তবে **চূর্ণকার, চুণারী, চুনারী, চূর্ণকারী** — এসব শব্দের অর্থ আর একটু প্রসারিত। এরা পাথর শামুক ঝিনুক ঘুটিং ইত্যাদি পুড়িয়ে **চূর্ণ-খণ্ড** (= ক্ষার = lime) প্রস্তুত করে, যা কিনা চূর্ণিত বস্তু হওয়ার কারণে চূর্ণ বা চুন-পদবাচ্য; তাই এদেরকে ওই চারটি শব্দে চিহ্নিত করা হয়। চূর্ণিত বস্তু মানেই গুঁড়া, ক্ষুদ্র, ছোট। সেকারণে চুনো মাছ = ছোট মাছ। গোচোনাও (গরুর গোবর ও গোমূত্র মিলেজুলে যে গুঁড়ো গুঁড়ো বস্তু হয়) মূলত চূর্ণিত বস্তু বলেই চোনা বলে। তবে চুনকালি বা চুন ও কালি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণার আধার। চুন দিয়ে সাদা এবং কালি দিয়ে কালো করা হয়, যা কিনা স্বাভাবিক রং নয়। সমাজে যা কিছু স্বাভাবিক, সমাজস্বীকৃত, কোনো মানুষ সেরকম আচরণ না করে অস্বাভাবিক আচরণ করলে, তাকে এই অস্বাভাবিক রঙে রাঙিয়ে দিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়, মুখে চুনকালি মাখা এই ব্যক্তি স্বাভাবিক নয়।

চোল, চোলক, চোলাই : ১. ✓চুল + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***চোল** = **চুল**-এর আধার যে; **চোলক** = চোল করে যে; **চোলাই** = চোল-এর আধার গতিশীল যাহাতে।* ৩. **চোল** = কঞ্চুলিকা, কাঁচুলি, নিচোল, স্ত্রীলোকের আপাদলম্বিত বস্ত্র, দাক্ষিণাত্যস্থ দেশবিশেষ, তাঞ্জোরদেশ (ইহা পুরুরাজ চোলের রাজ্য ও তদনুসারে নামকরণ।)। **চোলক** = চোলদেশ, কঞ্চুলিকা, বল্কল, বল্কল রচিত পরিচ্ছদ, কবচ, কবচধারী সৈন্য, মণিবন্ধ, কবজি, নারঙ্গ, বংশাঙ্কুর। **চোলাই** = বকযন্ত্র দ্বারা পাত্রান্তরে পাতন, চোয়ান (distillation)। (ব.শ.)। ৪. কেবল distillation অর্থে **চোলাহ্** প্রচলিত, বাকি অপ্রচলিত। ৫. চোরাই মাল আর চোলাই মাল বললে পার্থক্যটি আমরা সহজে বুঝতে পারি। জনসাধারণের দৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে চুরি করে নিজের কাছে (কেন্দ্রে) আনাকে বলে চোরাই; আর, জনসাধারণের চোখের সামনে তাদের কাছ থেকে নিয়মানুসারে (খাজনাদি আনার মতো) আকর্ষণ করে উচ্চে তুলে কেন্দ্রে আনাকে (দ্র. **চুল, চুলবুল**) বলে **চোলাই**। এই চোলাই যাঁরা করতেন, তাঁদের বলা হত **চোল** বা চোলক। কিন্তু এ চোলাই-এর কথা আমরা ভুলে গেছি। আমরা কেবল মনে রেখেছি বাহ্যিক দৃষ্টিগ্রাহ্য চোলাইয়ের কথা; মনে রেখেছি বকযন্ত্রে মদ চোলাইয়ের কথাটুকুই। তবে তাতেও চোলাই হয় উপর দিকে উঠে একটি জায়গায় গিয়ে সঞ্চিত হয়ে।

চুষ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আচুষণ, চূ(চূ)ষ, চূ(চূ)স, চূষ্, চূষক, চূষা, চূ(চো)ষ্য, চোষ, চোষা, চোষান, চোষ্য, চোস্ত।

চুষ্ = নবরূপী চায়ীধারীর বিশেষ সটকান। **চুষ** = নবরূপী চায়ীধারীর বিশেষ সটকান থাকে যাহাতে।

চুষা (চুষক, চুষ্য, চোষা, চোষান, চোষ্য, চোস্ত) : ১. ✓চুষ্ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***চুষা*** = *নবরূপী চায়ীধারীর বিশেষ সটকানর আধার যে।* ৩. **চুষা** = চুষণ, পান, হস্তিমধ্যবন্ধনরজ্জু, কক্ষা। **চুষক** = চুষণকারক, পানকারী। **চুষ্য** = চুষণযোগ্য খাদ্য, চতুর্ব্বিধ (চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয়) খাদ্যের একতম। **চোস্ত** = যাহা খুব ঢিলা বা খুব আঁট নয়, ঠিক মাপমত, আঁটসাঁট (জামা ইত্যদি - tight), চতুর, চালাক, উদ্যোগী, কার্য্যোৎসাহী। (ব.শ.)। ৪. sucking অর্থে প্রচলিত। চুষক, চুষ্য অপ্রচলিত। ৫. ইচ্ছাধারী যখন শক্তির একমুখী প্রয়োগ করে কাঙ্ক্ষিত বিষয়কে তার নিজের দিকে টানে, তখন তাকে বলে চুষ্। চুষ ক্রিয়ার আধারকে চুষা বা চোষা বলে। যে এরূপ চুষ্ অন (চুষণ, চোষণ) করে, তাকে বলে চুষক বা চোষক। আর যাকে চুষণ করা হয়, তাকে বলে চুষ্য বা চোষ্য। কক্ষাকে চুষা বলা হয় যেকারণে, তা হল, কক্ষা সবকিছুকে আপনার দিকে আকর্ষণ করে কুক্ষিগত করে থাকে। আর চোস্ত একেবারেই ভোল-বদলানো শব্দ। দেখে বোঝার উপায় নেই যে, এর ভেতরেও চুষ্ ক্রিয়া সগৌরবে বিদ্যমান। কার্যত যার সমস্ত রস চুষে নেওয়া হয়েছে, তার শোভন নাম চোস্ত আর অশোভন নাম কাঠখোট্টা। তাছাড়া, মানুষের মধ্যে রস থাকলে কি চালাক-চতুর হওয়া যায়? চালাক-চতুর হতে গেলে কাঠখোট্টা হতে হয়। 'তিনি চোস্ত ইংরেজিতে কথাবার্তা বলেন' কথাটির মানে হল, তাঁর কথায় রস বা আর্দ্রতা নেই; রয়েছে কেবল কাজের কাঠখোট্টা কথাবার্তা। তবে হস্তিমধ্যবন্ধনরজ্জুকে কেন চুষা বলে, তা এখনও অজানা।

চেষ্ট্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অচেষ্ট, আচেষ্টিত, চেষ্ট, চেষ্টক, চেষ্টা, চেষ্টিত, প্রচেষ্টা, সচেষ্ট।

চেষ্ট্ = দিশাগ্রস্ত চায়ীর বিশেষ টঙ্কারণ। **চেষ্ট** = দিশাগ্রস্ত চারীর বিশেষ টঙ্কার থাকে যাহাতে।

চেষ্টা (চেষ্টন, চেষ্টিত) : ১. ✓চেষ্ট্ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***চেষ্টা*** = *দিশাগ্রস্ত চায়ীর টঙ্কারের আধার যে।* ৩. **চেষ্টা** = কৃতিজন্য কায়িক ব্যাপার, ঈহা, প্রযত্ন, ব্যাপার, ক্রিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান, প্রাণাপানাদি-ব্যাপার, প্রাণনাদি, গমন, গতি, স্পন্দন, ক্রিয়াশক্তি, লীলা, করাস্ফালনাদি ক্রিয়া। **চেষ্টন** = চেষ্টা, যত্ন, ব্যাপার। **চেষ্টিত** = কৃতচেষ্ট, চেষ্টা, ব্যাপার, হস্তাস্ফালনাদি। (ব.শ.)। ৪. endeavour অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ঈহামৃগ**। ষ-র অর্থ হল একদিকে শক্তির বিচ্ছুরণ বা গমন, টর্চের আলোর মতো। চেষ্-র অর্থ হল এমন দিশাগ্রস্ত চায়ী, যে বিশেষ দিকে কিছু চয়ন করার জন্য শক্তি খরচ করছে বা যাচ্ছে। এই চেষ্ শব্দের স্বতন্ত্র উত্তরাধিকার আমাদের নেই, রয়েছে ইংরেজির — chase। এর অর্থ কাউকে ধরার জন্য পিছনে ধাওয়া করা। এই চেষ্-এর সঙ্গে আমাদের রয়েছে ট বা টঙ্কার। অর্থাৎ **অনুধাবন** (পিছনে ধাওয়া) করার ক্রিয়াটি কোনোভাবে (শব্দ-ধাক্কা-আলো ইত্যাদি কোনোকিছুর মাধ্যমে) টঙ্কারিত হলে তাকেই **চেষ্ট** বলা যায়। (এই চেষ্ট-এর কেন্দ্র আমাদের বুক বা ছাতি। তবে তার **উত্তরাধিকার** আমাদের **নেই**, রয়েছে ইংরেজির তাদের chest **শব্দে**।) **এই চেষ্ট-এর আধারকে চেষ্টা** বলে। চেষ্ট অন থাকে যাতে, তাকে বলে **চেষ্টন**। চেষ্টন করে **চেষ্টক**। প্রকৃষ্ট রূপে চেষ্টা চলে যাতে তাকে বলে **প্রচেষ্টা**। তবে কিনা, যে সত্তাগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়, যথা মাছ-পাখি-হরিণ, এদের পেছনে ধাওয়া করা আর তাদের ধরবার চেষ্টা আমরা সবাই দেখতে পাই, এবং বুঝতেও পারি। কিন্তু যাকে দেখা যায় না, মুকুটমণি তত্ত্ব, ব্রহ্ম, ঈশ্বরপ্রতিম শক্তিরূপিণীর কণার ধারণা — এসবকে ধরবার চেষ্টাও অনেকে করে থাকেন। তাকেই বলে **ঈহামৃগের** বা সোনার হরিণের পেছনে ছোটা। চেষ্টার সেটিই সর্বোচ্চ মানবিক প্রয়োগ। দ্র. **লীলা**। ৬. ইংরেজি chase, chest।

চ্যু **(চ্যুত্, শ্চুৎ) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অচ্যুত, অচ্যুতাগ্রজ, অচ্যুতাঙ্গজ, অচ্যুতাত্মজ, অচ্যুতি, অপ্রচ্যুত, অবিচ্যুত, ঘৃতশ্চুৎ (ঘৃতশ্চ্যুৎ), চ্যবন, চ্যু, চ্যুৎ, চ্যুত, চ্যুতি, চ্যুপ, চ্যোত, বিচ্যুত, শ্চুৎ (শ্চ্যুৎ), শ্চুতিত (শ্চ্যুতিত), শ্চোত (শ্চ্যোত), শ্চোতন (শ্চ্যোতন)।

চ্যু (চ্যুত্, শ্চুৎ) = নবরূপী চায়ী থাকে যাহাতে। **চ্যুত** = নবরূপী চায়ীর আধার তারিত হয় যাহাতে। **শ্চুৎ** = সর্বত্রগামী শক্তিরূপী চায়ীর নবরূপায়িত তারণ।

অচ্যুত : ২. *নেই চ্যুতি যাহাতে।* / যাহা চ্যুত নহে; যাঁহার স্বপদ হইতে চ্যুতি নাই; যিনি স্বপদ হইতে চ্যুত হন না। (ব.শ.)। ৩. অপতিত, অভ্রষ্ট, অস্খলিত। অক্ষর, অনশ্বর, অবিনাশী, ধ্রুব। স্থির, একাগ্রমতি ... বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। (ব.শ.)। ৪. নামরূপে প্রচলিত। ৫. যে নিজে (স্ব-স্থান বা স্ব-গতিপথ থেকে) চ্যুত হয় না, বা কেউ যাকে তার অবস্থান থেকে চ্যুত করতে পারে না, তেমন সমস্ত সত্তাই এই শব্দ দ্বারা চিহ্নিত হয়। বলে রাখা ভালো, প্রতিটি অস্তিত্বকেই বিশেষ অবস্থানে চলমান রূপে বোঝাই মানুষের স্বাভাবিক অভ্যাস।

চ্যবন : ১. ✓চ্যু + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ীর আশ্রয় অন থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা চ্যুত হয়; অথবা, যা (উদ্বৃত্ত হয়ে) চুঁইয়ে পড়ে যায়।* ৩. ক্ষরণ, ভ্রংশ, ঔষধবিশেষ, মুনিবিশেষ। ইঁহার পত্নী শর্য্যাতিসুতা সুকন্যা এবং পুত্র প্রমতি। ইনি গর্ভচ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়া 'চ্যবন' নামে খ্যাত। ইনি অশ্বিনীকুমারের ব্যবস্থানুসারে ঔষধ পান করিয়া জরামুক্ত ও রূপবান যুবা হইয়াছিলেন। ঐ ঔষধ 'চ্যবনপ্রাশ' নামে খ্যাত। (ব.শ.)। মহর্ষি ভৃগু ও পুলোমার পুত্র। গর্ভাবাসকালে পুলোমার পূর্বেকার পাণিপ্রার্থী পুলোমা নামধারী এক রাক্ষস ভৃগুপত্নীকে হরণ করতে চেষ্টা করেন। গর্ভস্থ পুত্র মাতাকে বিপদগ্রস্তা দেখে গর্ভ হতে বের হলে তার তেজে রাক্ষস ভস্মীভূত হয়ে যায়। মাতৃগর্ভচ্যুত হওয়ার জন্য এঁর নাম হয় চ্যবন। নর্মদার নিকট বৈদুর্য পর্বতে চ্যবন দীর্ঘকাল তপস্যা করে জরাগ্রস্ত হন এবং তাঁর দেহ বল্মীকে ও লতায় আবৃত হয়।

একদিন রাজা শর্যাতি তাঁর চার সহস্র স্ত্রী ও সুন্দরী কন্যা সুকন্যাকে নিয়ে সেখানে বিহার করতে আসেন। সুকন্যার রূপ দেখে চ্যবন তাঁকে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকেন, কিন্তু সুকন্যা শুনতে পান না। কিন্তু বল্মীক-স্তূপমধ্যে খদ্যোতবৎ দীপ্যমান দুই চক্ষু দেখতে পেয়ে কৌতূহলবশে সুকন্যা কণ্টক দিয়ে তা বিদ্ধ করেন। তাতে চ্যবন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে রাজার সৈন্যদের মলমূত্রত্যাগ রূদ্ধ করেন। শর্যাতি এর কারণ ক্রমে জ্ঞাত হয়ে কন্যার জন্য চ্যবনের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেন। চ্যবন বলেন ... সুকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হলে তিনি তাঁকে (সুকন্যাকে) ক্ষমা করবেন। তখন শর্যাতি তাঁকে কন্যা সম্প্রদান করতে বাধ্য হন। একদিন স্নানান্তে নগ্ন সুকন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁকে প্রার্থনা করেন। সুকন্যা তাঁর স্বামীর প্রতি অনুরক্ত বলে জানান। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তখন বলেন যে, জরাগ্রস্ত চ্যবনকে তাঁরা পুনর্যৌবন দান করবেন। ... তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় চ্যবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করেন এবং পরমুহূর্তেই দিব্যরূপ ও সমান বেশ নিয়ে চ্যবন উত্থিত হন। সুকন্যা চ্যবনকে চিনতে পেরে তাঁকেই বরণ করেন। চ্যবন সন্তুষ্ট হয়ে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে যজ্ঞে সোমপায়ী করেন। ... মহর্ষি চ্যবন একদা ব্রতধারী হয়ে বারো বৎসর গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে জলের মধ্যে বাস করেন। জলচর প্রাণীরা তাঁর কাছে নির্ভয়ে আগমন করত। ... চ্যবন রাজা নহুষকে ক্লান্ত ধীবরদের মৎস্যের মূল্য দিতে বলেন। ... মৎস্যের মূল্য স্বরূপ ... ক্রমে রাজা নহুষ সমগ্র রাজ্যই দিতে চান। ... চ্যবন তাতে সম্মত হন না। তখন গো-গর্ভজাত এক ব্রাহ্মণের পরামর্শে নহুষ গাভী দ্বারা চ্যবনকে ক্রয় করেন। ... চ্যবন জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর বংশ ব্রাহ্মণবংশ হলেও ক্ষত্রিয় কুশিকের বংশ থেকে তাঁর বংশে ক্ষত্রাচার সংক্রামিত হবে। ... চ্যবন কুশিক ও তাঁর মহিষীর উপর নানারূপ উপদ্রব করে তাঁদের ব্যতিব্যস্ত করলেও তাঁরা অকুণ্ঠিতচিত্তে সমস্ত কষ্ট অগ্রাহ্য করে প্রসন্ন মনে তাঁর সেবা করে যান। ... শেষে চ্যবন তাঁদের বর দিতে চাইলে, রাজা বলেন যে, চ্যবনের সংস্পর্শে এসে তাঁরা যে দগ্ধ হননি, এই-ই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট। ... তবুও চ্যবন বলেন যে, রাজার অধস্তন তৃতীয় পুরুষ বিশ্বামিত্র (গাধির পুত্র) ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবেন এবং ভৃগুবংশে ঔর্ব নামে এক ঋষি জন্মাবেন; তাঁর পুত্র ঋচীক সমগ্র ধনুর্বেদ আয়ত্ত করে নিজ পুত্র জমদগ্নিকে তা দান করবেন এবং জমদগ্নির সহিত কুশিকের পুত্র গাধির কন্যার বিবাহ হবে আর তাঁদের পুত্র পরশুরাম ক্ষত্রাচারী হবেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. চ্যু-অন থেকে চ্যবন। শব্দটির অর্থ হল, যে-সত্তা তার মূল অবস্থান থেকে অসময়ে চ্যুত হয়ে গেছে। আদিম যৌথতান্ত্রিক সমাজ থেকে অযৌথতান্ত্রিক সমাজে (অর্থাৎ, স্বতান্ত্রিক ব্যক্তিমালিকানাভিত্তিক সমাজে) যাওয়ার জন্য যে-সন্ধ্যাকাল ('ট্রানজিশনাল পিরিয়ড') লাগে, প্রাচীন ভারতীয় সমাজের যৌথতা থেকে স্বতন্ত্রতায় যাওয়ার মাঝের সেই সন্ধ্যাকালের সূত্রপাত হয়েছিল এই চ্যবন থেকে। অধিকাংশ পৌরাণিক চরিত্রের মতোই ইনি কোনো ব্যক্তি নন, একটি সত্তা, যিনি সেকালের মানুষের ও সমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত ছিলেন; ঠিক যেমন কামদেব, যিনি ব্যক্তির কাম, গোষ্ঠীর কাম, জাতির কাম রূপে জগতে ব্যাপ্ত থাকেন, সেইরকম। (দ্র. **কলি**)। কামনাকে আজও কাম বলা হয় বলে, কামদেবকে তাই খানিকটা চিনতে পারি, কিন্তু চ্যবনকে একালে কী বলা হয় সেকথা জানা না থাকায়, চ্যবনকে আমরা চিনতে পারি না। একালের ভাষায় ইনি হলেন বাড়তি অর্থাৎ উদ্বৃত্ত হওয়া বা উদ্বৃত্ত।

একালে আমরা প্রতিটি সত্তাকে তার খণ্ড রূপে পাই, কারণ, আদিম যৌথতা থেকে খণ্ড খণ্ড হতে হতে এখন আমরা বহু দূরে চলে এসেছি; আমাদের সামনে সবকিছুই এখন ছোট ছোট টুকরো বা খণ্ড রূপে বিদ্যমান। ভৃগু-পুলোমার কালে যৌথসমাজে সবেমাত্র চিড় ধরেছে, ফাটল তৈরি হয়েছে, এবং বড় বড় চাঁই রূপে সমগ্রের কয়েকটি বড় বিভাজন ঘটছে মাত্র। এই অবস্থায় আসে উদ্বৃত্ত বা চ্যবন। এই চ্যবন বা উদ্বৃত্তের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একালের বিচারবুদ্ধি তাকে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত ভেবে ফেলবে এবং অন্য কিছু ভাবতেই পারবে না। কিন্তু সেকালে সেরকম ঘটবার মতো পরিস্থিতিই ছিল না। তখনও সবকিছু যৌথতার রসে চোবানো — ভাবনাচিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, বিষয়আশয়, সামাজিক সম্পর্ক — সবই। উদ্বৃত্ত মানে রাজনৈতিক-সামাজিক-দার্শনিক-অর্থনৈতিক-পারিবারিক সর্বপ্রকারের উদ্বৃত্ত ও সর্বপ্রকারের সম্পর্কযুক্ত উদ্বৃত্তই এই চ্যবনের অন্তর্ভুক্ত — বেগুন চাষ করলাম, ভেজেভুজে খেলাম, বাড়তি যা থাকল সেগুলি বাজারে পাঠিয়ে দিলাম — এরকম উদ্বৃত্তকেই কেবলমাত্র চ্যবন বলে না। তাছাড়া, তখনকার কালে তখনও হাট-বাজার নেই, বিনিময় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বিনিময়ের গোড়ায় যে স্ব-স্ব বিষয় বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিমালিকানা, তাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি; ফলে একালের মতো সমগ্র সমাজ-সংস্কার-প্রেক্ষিতবিহীন বাজারগামী উদ্বৃত্ত ও সেই উদ্বৃত্তের মালিকের মতো চাঁছা-ছোলা নিখুঁত উদ্বৃত্তের জন্ম তখনও হয়নি। বলতে গেল, একালে উদ্বৃত্ত বলতে যা-কিছু বোঝায়, চ্যবন তারই আদিম ও প্রথম রূপ।

চ্যবনের উপরোক্ত পৌরাণিক কাহিনী আমাদের অনেক কথা জানায়। আমরা অতি সংক্ষেপে তার কয়েকটি কথার অর্থ এযুগের মতো করে বলার চেষ্টা করছি। প্রথমত, পুলোমাদের স্ত্রী হবেন পুলোমারাই, এই যৌথতার বিরুদ্ধে গিয়ে **ভৃগু** একপতিপত্নীত্বের দিকে পা বাড়িয়েছেন। এ হল সম্পর্কমূলক যৌথতার থেকে সম্পর্কমূলক স্বতন্ত্রতার দিকে যাত্রা। **অগ্নি** তৎকালীন সমাজের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পুলোমার পক্ষে সাক্ষী (দ্র. **অগ্নিসাক্ষী**) দেওয়া সত্ত্বেও ভৃগু শোনেননি, উল্টে অগ্নিকে অভিশাপ দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, আদিম যৌথসমাজের পরিচালক আদিব্রাহ্মণকে (= **শিবকে**) বাদ দিয়ে একই কর্মের পুনরাবৃত্তিকারী দক্ষেরা (= আদি স্পেশালিস্টরা) যে যৌথউৎপাদন কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছিলেন, ভৃগু ছিলেন তাঁর সমর্থক; অর্থাৎ এ হল যূথতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্কের থেকে স্বতান্ত্রিক উৎপাদনসম্পর্কের দিকে যাত্রা। তৃতীয়ত, কিন্তু সে-যাত্রাকে সফল করতে হলে প্রচলিত ব্যবস্থার ক্ষমতা দখল করা দরকার। সেজন্যই আদি ব্রাহ্মণ-পরিচালিত যৌথসমাজের প্রকৃতিশক্তিকে (যৌথ উৎপন্ন, উৎপাদনক্ষেত্র, উৎপাদনকারী জনসাধারণকে) আপন গোষ্ঠীর কুক্ষিগত করার চেষ্টা করেছিলেন নবযুগের মহর্ষিগণ; ভৃগু ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। চতুর্থত, ততদিনে ভৃগুর বুদ্ধিতে পরিচালিত জনসাধারণ যৌথসমাজে থেকেই ভিতরে ভিতরে উদ্বৃত্ত উৎপাদন করে ফেলেছিল। সেই উদ্বৃত্ত সম্পদ ও সেই সম্পদের মালিকেরা,

যারা সেকালের সেই যৌথসমাজের গর্ভেই সামাজিক-অস্বীকৃতি সত্ত্বেও লালিত-পালিত হচ্ছিল, তারা, প্রকৃতিশক্তিকে নিয়ে যৌথতাবাদী (পুলোমা) ও স্বতন্ত্রতাবাদীদের (ভৃগুদের) মধ্যে টানাটানি-বাদবিসম্বাদের মধ্যেই গর্ভ থেকে আত্মস্বরূপে বেরিয়ে আসে। উদ্বৃত্ত জ্ঞানসম্পদ, উদ্বৃত্ত ধনসম্পদ, উদ্বৃত্তের রাজনীতি-অর্থনীতি-দর্শন-সমাজসম্পর্ক সবই ক্রমান্বয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে সমগ্র মানবসমাজে।

এরপর স্বভাবত এখানেই সে থেমে থাকে না। সেই আদি উদ্বৃত্তের থেকে বা চ্যবনের থেকে অতঃপর নতুন নতুন সত্তার জন্ম হয়, এবং শেষ পর্যন্ত জন্মান **পরশুরাম**, যিনি একুশবার অধঃপতিত আদিম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে (পৃথিবীকে) নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। কৃত্তিবাস মতে, এই চ্যবন থেকেই একসময় জন্মেছিলেন নগদ নারায়ণের রামচন্দ্র-রূপের গুণগানকারী মহর্ষি **বাল্মীকি**। বিশেষত্ব এই যে, উদ্বৃত্তের সমগ্র ইতিহাস — সমাজে উদ্বৃত্তের উদ্ভব, তার সক্রিয়তা, তার ফলাফল, তার ক্রমান্বয় অগ্রগতি, আজ পর্যন্ত ওই উদ্বৃত্ত কোথায় এসে পৌঁছেছে — এসব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চ্যবনের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে তা হুবহু মিলে গেছে। দ্র. **অগ্নিসাক্ষী, পুলোমা**।

চ্যুত (চ্যুতি) : ১. ✓চ্যু + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ চায়ীধারী তারিত যাহাতে; অথবা, যা (অস্তিত্ব হইতে নির্গত বা) চুঁইয়ে (অস্তিত্বের বাইরে) পড়ে গেছে।* ৩. গত, নির্গত, নিঃসৃত, গলিত, ক্ষরিত, পতিত, ভ্রষ্ট, স্রস্ত, স্খলিত, ক্ষত, ব্যাহত, নষ্ট। (ব.শ.)। ৪. 'স্খলিত' অর্থে প্রচলিত। ৫. বাংলায় 'চুঁইয়ে পড়া' কথাটি এখনও প্রচলিত, হিন্দিতে বলে 'চ্যুনা'। পদচ্যুত, সিংহাসনচ্যুত প্রভৃতি শব্দে যে চ্যুত শব্দের প্রয়োগ হয়, তাতে চুঁইয়ে পড়ার কথা বোঝায় না, বোঝায় আসন থেকে *ঠেলে* ফেলে দেওয়া। অর্থাৎ শব্দটি পরে পরে স্থির চরিত্র পেয়েছে এবং প্রতীকী হয়ে গেছে। অথচ, শব্দের নিজস্ব ক্ষমতা অনুসারে অবয়ব থেকে যা-কিছু উদ্বৃত্ত হয়ে চুঁইয়ে পড়ে যায়, তাই চ্যুত পদবাচ্য। এবং সেই চ্যুত গতিশীল হলে তাকে বলে চ্যুতি।

চ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অপ্রচোদিত, চ, চইচই, চই, চওড়া, চ-কার, চঙ্ক্রমণ, চরস, চর্পট, চষ্ (কৃষ্, আকৃষ্ট-চাষ), চষ, চষক, চষত, চষা, চষান, চাউল, চাষ, চাষ-কারকিত, চাষবাস, চাষা, চাষালোক, চাষাড়ে, চাষাভু(ভূ)ষো, চাষী, চাষীবাসী, চাচা, চিকা, চিমনি (চুঙি, চোঙা), চুওয়াল, চুংগী, চুঁ(চূ)চি, চুঁ(চূ)য়া, চুঁ(চো)য়া, চু(চো)য়া, চেকিতান, চেগরা (চেগ্রাস), চেঙ, চেঙ্গ, চেঙ(ঙা) মুড়ী, চেঙ্গ, চেঙ্গদোলা, চেঙ্গারি, চেঙ্গুয়া, চেঙ্গো, চোংদার, চোঙ্গদার, চোঁ, চোঁ-বোঁ, চোঁয়া, চোঁয়া-পোড়া, চোয়া, চোয়ান, চোহুড়, চৌড়া, চৌড়াই।

চষ, চষক, চাষ (চাষা, চাষাড়ে, চাষাভুষো, চাষী) : ১. ✓চষ্ (ভোজন) + অক (কুন্) - করণবাচ্যে; ✓চাষি (ভক্ষণ) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***চষ** = চায়ীর দিশাগ্রস্ত শক্তিপ্রয়োগ (বিদারণ) যাহাতে। **চষক** = **চষ্** করে যে। **চাষ** = **চষ** হইতে জাত। **চাষা** = **চাষ**-এর আশ্রয় যাহাতে। **চাষাড়ে** = **চাষা**-র দিশাগ্রস্ত গড়ান-উড়ান (আবর্তন) থাকে যে সত্তায়। **চাষী** = **চাষ**-এর গতিশীলতার আধার যে।* / যাহার দ্বারা ভোজন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. সুরাপান-পাত্র, মদ্যবিশেষ, মধু। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে বহুল প্রচলিত। ৫. **চাষ** কথাটি কেমন করে কৃষ থেকে প্রসূত হল, তা নিয়ে ব.শ. প্রণেতা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। কারণ, সিদ্ধান্তে আসার মতো কোনো তথ্য তিনি পূর্বসূরীদের থেকে পাননি। শব্দটিকে তিনি পেয়েছেন মধ্যযুগের সাহিত্যে। তাঁর মনে হয়েছে, আমাদেরও স্বভাবতই মনে হয়, কৃষ থেকেই চাষ কথাটি এসে থাকবে। কিন্তু কীভাবে কৃষ শব্দটি চাষ শব্দে বদলে যেতে পারল, তার কোনো স্পষ্ট কারণ তিনি পাননি। আমাদের ধারণা, শব্দটি বাংলাভাষীর নিজস্ব সৃষ্টি। এর ভিত্তিতে যে ক্রিয়া রয়েছে, উপরে ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে আমরা সেকথা লিখলাম। দ্র. **ভুষা, ভুষো**।

ছ

ছ বর্ণের অর্থ : ছ্ বর্ণটি তৈরি হয়েছে (চ্ + হ্ = ছ্) চ্-এর সঙ্গে হ্ জুড়ে। সেকারণে, সাধারণভাবে ছ্-এর অর্থ হল চ-অন-স্থিত, অর্থাৎ 'চ-অন যেখানে গিয়ে থেমে যায়'। তাই **ছ** = ছ্-অন করে যে; চ-অন-স্থিত = চিত, চয়িত = ছ। (ছ তারণ = ছত্, তারণ কোনো ক্ষেত্রে প্রদত্ত হয়ে গেলে, দান হয়; তখন ত্ হয়ে যায় দ্ বা দান; তাই ছত্ হয়ে যায় ছদ। তার থেকে হয় ছাদ।) ছ = চয়নস্থিত = চয়িত = ছ। এই ছ হল চ-অনের সমাপ্তির ফল। চয়ন বললে আমরা বুঝি ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দুতে গিয়ে তাকে মুঠোর মধ্যে নেওয়া, সেই নেওয়া হয়ে স্থির হয়ে গেলেই ছ। তার মানে চয়ন-ছাদনই ছ-করণ। একে ছাওয়া বা ছেয়ে দেওয়া বলে। ইচ্ (ich, ic, I) ছাদিত থাকে যাহাতে, তাকে তাই **ইচ্ছা** বলে। ছাদিত, আচ্ছাদিত প্রভৃতি ছাওয়ারই প্রাচীন অভিধা। আবার, একদিকে স্থ বা থাকা যেমন ছ-এ (স্থ > থ > ছ) পর্যবসিত হয়, তেমনি ইচ্ছাকারীও (চ-ও) ছ-এ পরিণত হয়; যা কিনা আসলে চয়নকামী অস্তিত্বমাত্র। এ হল 'অহংকারী'র মতোই 'অহংচারী'। একে আমরা 'ইচ্ছাকারী' বা 'ইচ্ছাচারী'ও বলতে পারি। সেই সুবাদে এই অহংচারী অস্তিত্বও অনেকসময় ছ-রূপে প্রতীয়মান হয়। এই ছ-এর আধারকে বলে ছা। ছি, ছু প্রভৃতির অর্থের জন্য অতঃপর **ক বর্ণের অর্থ** দ্রষ্টব্য।

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার। রং-এর একটিই রূপ ছিল — কালো। সেই কালো ক্রমে সাত রূপে সাত রং-এ বিচূর্ণীভূত হয়ে যায়। সেই সাত রং-ই শতাধিক রঙে এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুতে বিধৃত আছে। একালের কমপিউটার সেই রং-কে আরও সূক্ষ্ম বিভাজন ও মিশ্রণের সাহায্যে দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের জন্য আলাদা আলাদা রং-এ পরিণত করার ক্ষমতা ধরে। এইভাবে অংরূপিণী পরমাপ্রকৃতির অগ্রগতি ঘটেছে 'শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ' এই পঞ্চপ্রকাশের 'রূপ'-এর ক্ষেত্রে। শব্দের ক্ষেত্রেও তার বিবর্তন ঘটেছে

প্রায় একভাবেই। ... আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন সংস্কৃত ভাষা নির্মাণ করেন, তখনও পর্যন্ত জনসাধারণ্যে শব্দের ব্যবহার এখনকার মতো এত বিপুল সংখ্যক হয়নি, এমন বহু স্বর তখনও ছিল যা তখনও দু-তিনটি বা ততোধিক স্বরের যৌথরূপ। তখনও তা ভেঙে আরও খণ্ডিত হয়ে বর্তমান চেহারা পায়নি। সেই কারণে প্রাচীন কালের ভাষাগুলিতে আমরা এমন বহু শব্দ পাই, যা দু-তিনটি স্বরের যৌগিক রূপ। গ্রীক ল্যাটিনে তার বেশ কিছু নিদর্শন রয়েছে। আমাদের সংস্কৃতে যদিও তখনই পৃথক স্বরকে চিহ্নিত করে পঞ্চ বর্গে ৩৫টি বর্ণে ভাগ করে ফেলা গেছে, কিন্তু জনসাধারণ্যে ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ফ, ল প্রভৃতি বর্ণ দিয়ে তখনও খুব বেশি শব্দের প্রচলন হয়নি। যে কারণে সংস্কৃতে ঐ বর্ণগুলিতে বেশি শব্দ নেই। কিন্তু মধ্যযুগে বাংলা ভাষা যখন সৃষ্টি হচ্ছে, তখন এই অনতিব্যবহৃত বর্ণগুলিতে বিপুল পরিমাণ শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালে আমাদের অভিধান ও শব্দকোষকারগণ যখন শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরে ঐ বর্ণগুলির শব্দগুলিকে সাজাতে গেছেন, পড়ে গেছেন বিপদে। একদিকে শব্দের মূলে কোনো ক্রিয়াকে যেমন খুঁজে পাননি, অপরদিকে শব্দটিকে কোন শব্দ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করবেন ঠিক করতে পারেননি। কেননা, সংস্কৃতকারদের মতো যৌথভাবে ভাষাসংস্কারের কাজ আর সেভাবে হয়নি। যতটুকু যা হয়েছে, সবই হয়েছে বাংলার মধ্যযুগের কবিগায়কদের শব্দব্যবহারে। যেমন এই **ছ** বর্ণটি। এর মূলে স্থ, থ, চ ও হ্, সবাই রয়েছে আদিতে। মধ্যযুগের বাংলায় তা বিশ্লিষ্ট হয়ে পৃথক হয়েছে এবং তা পণ্ডিতদের ইচ্ছায় নয়, জনসাধারণের ভাষা ব্যবহারেই তা ঘটেছে অর্থাৎ বাংলাভাষী জনসাধারণই তা ঘটিয়েছেন। কবিগণ তাকেই রূপ দিয়েছেন তাঁদের রচনায়। একই কথা অন্য বর্ণগুলির ক্ষেত্রেও ঘটেছে। এবং একই ঘটনা পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও কমবেশি ঘটেছে।

ফলে উপরোক্ত ঘ, ছ, ঝ ... প্রভৃতি বর্ণের ক্ষেত্রে বহু কাজ বাকি আছে, এবং আগামী যুগের শব্দকোষকারগণকে সেই বিশাল কাজ করতে হবে। আমরা বিষয়টি শনাক্ত করলাম এবং দু-চারটি দৃষ্টান্তমূলক শব্দোৎপাদন রহস্য ও তার শব্দার্থ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। পরিস্থিতি এ বিষয়ে আমাদেরকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার অবকাশ না দেওয়ায়, বলতে গেলে, আমরা কেবল বিষয়গুলি ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

ছ্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : ছদ্ (*ছদি, ছাদি*), ছর্দ্ (*ছড়্*), ছিদ্ (ছিদ্র), *ছো*, ছ্ = ৪ + ১

ছদ্ (*ছদি, ছাদি*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আচ্ছন্ন, আচ্ছাদ, আচ্ছাদক, আচ্ছাদন, আচ্ছাদিত, আচ্ছাদী, আপ্রচ্ছন্ন, **ছই, ছইল**, ছতর, **ছতরি**, ছত্তর, ছত্‌ত্র, ছত্র, ছত্রক, ছত্রচ্ছায়া, ছত্রপতি, **ছত্রভঙ্গ, ছত্রা, ছত্রাক, ছত্রী**, ছদ্, ছদ, ছদি, ছদিঃ, ছদ্ম, ছদ্মতাপস, **ছদ্মবেশ, ছদ্মবেশী, ছদ্মী**, ছন, ছনছনি, ছননন-ছননন, ছন্দ্, ছন্দ, ছন্দঃ, ছন্দন, **ছন্দস্কৃত, ছন্দানুবর্ত্তী**, ছন্দি, ছন্দোগ, ছন্দোবিচিতি, ছন্ন, ছয়ল, ছলিক, ছলিকা, ছলুকা, **ছল্লি, ছল্লী**, ছা, ছাঅ, ছাআল, ছাউনি (সাউলি, সাএল), ছাও, ছাওআল, ছাওয়া, ছাওয়াল, ছাওলা, ছাঁদ, ছাঁদন, ছাঁদনা, ছাঁদলা, ছাঁদা, ছাত, ছাতরা, ছাতা, ছাত্‌ত্র, ছাদ, ছাদনাতলা, ছাদ্মিক, ছান, ছানা, ছানি, ছান্দ, ছান্দন, ছান্দস, ছান্দা, ছান্দোগ্য, ছাপরখাট, ছাপ্পর, ছাবাল, ছামনি, ছামুনি, ছায়নি, ছাল, ছিল, ছিলা, ছিলিকা, **ছুঁ, ছুঁয়ে-দেওয়া, ছুঁচা, ছুঁচো, ছুচ্ছুন্দর, ছুৎ**, ছুৎমার্গ, ছুতুক, ছেঁদো, ছেবড়, ছেবলা, ছেমড়া, ছেলে, ছেলেখেলা, ছেলেধরা, ছেলেপিলে, ছেলেপুলে, ছেলেবুদ্ধি, ছেলেমানুষ, ছৈ, ছৈঁ, ছৈঘর, ছৈল, ঢাক, ঢাকন, ঢাকা, **প্রচ্ছদ, প্রচ্ছন্ন, প্রচ্ছাদন**।

ছদ্ (ছদি, ছাদি) = ছ (চয়ন-ছাদন বা ছাওয়া) দেওয়ন। **ছদ** = ছ (ছাওয়া) দেয় যে। **ছদি** = ছদ্-এর বিকাশকরণ বা গতিদান করে যে। **ছাদি** = ছদ্জাত-র গতিশীলতা থাকে যাহাতে।

আচ্ছন্ন (আচ্ছাদ) : ১. আ + ✓ছাদি + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে, নিপাতিত। (ব.শ.)। ২. **আচ্ছন্ন** = *যাকে ছাওয়া হয়েছে; অর্থাৎ, যে (কোনো কিছু দ্বারা) ঢাকিত (আচ্ছাদিত) হইয়াছে।* **আচ্ছাদ** = *যাহা ঢাকন (আচ্ছাদন) দেয়।* / **আচ্ছাদ** = যাহার দ্বারা আচ্ছাদন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **আচ্ছন্ন** = আবৃত, ব্যাপ্ত, সংবীত। **আচ্ছাদ** = বস্ত্র, আবরণমাত্র, আবরণ, ঢাকনী, পরিচ্ছদ, কোষ, পিধান, গৃহের কাষ্ঠপঞ্জর, চাল। (ব.শ.)। ৪. mental-distress অর্থে আচ্ছন্ন প্রচলিত; আচ্ছাদ অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ছদ**। 'ঢাকিত' শব্দটি প্রচলিত নয়, 'যাকে ঢেকে দেওয়া হয়েছে' বোঝাতে আমরা শব্দটির ব্যবহার করলাম। যে-কোনো ঢেকে দেওয়া বস্তু বা বিষয়কে 'ঢাকিত' বা 'আচ্ছাদিত' বা আচ্ছন্ন বলে। তবে অজানা কারণে 'আচ্ছন্ন' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানসিক 'ঢাকাঢাকি' বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে; বাস্তবিক 'ঢাকাঢাকি' বোঝাতে নয়। এর কারণ এখনও উদ্ধার করা যায়নি।

ছই (ছাওয়া) : ১. ✓ছদি > ছই। ২. *আচ্ছাদন গতিশীল থাকে যাহাতে।* ৩. গাড়ীর বা নৌকার ছতরি। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. দ্র. **ছদ**। গ্রাম বাংলায় একপ্রকার ঘাসের তৈরি 'ত্রিপল'-এর মতো ছাদন-সামগ্রীকে ছই বলে। এটি গরুগাড়ি, নৌকা, সাময়িক বিশ্রামঘরের উপর 'ছাওয়া' হয় বা ছাদ রূপে স্থাপিত করা হয়। একে 'ছেয়ে' দেওয়াও বলে। সেই ছই দিয়ে ছাদের মতো ঢাকা ঘরকে ছইঘর, ছৈঘর ইত্যাদি বলে। ব.শ. **ছদি** শব্দের অর্থ দিয়েছেন ছই।

ছত্‌ত্র, (ছত্র, ছত্‌ত্রক, ছত্‌ত্রচ্ছায়া, ছত্‌ত্রপতি, ছত্‌ত্রভঙ্গ, ছাতা) : ১. ✓ছাদি + ত্র (ষ্ট্রন্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ছত্র** = ছ *(চয়নস্থিতের) তারণ রহে যাহাতে।* **ছত্‌ত্র** = *ছত্ (চয়নস্থিতের তারণ) পূর্ব্বক তারণ (আবর্তমান) রহে যাহাতে; অর্থাৎ, ছাওয়ার (আচ্ছাদন-সমস্যার) তারণব্যবস্থা (আ)বর্ত্তমান যাহাতে।* **ছত্‌ত্রক** = **ছত্‌ত্র** *করে যে।* **ছত্‌ত্রচ্ছায়া** = *ছত্‌ত্রের ছায়া।* **ছত্‌ত্রপতি** = *ছত্‌ত্রের পতি।* **ছত্‌ত্রভঙ্গ** = *ছত্‌ত্র ভঙ্গ যাহাতে।* **ছাতা** = *আচ্ছাদিতকে তারণ করে*

যে আধার। / যাহার দ্বারা আচ্ছাদন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. ছত্র** = আতপত্র, ছাতা, রাজচ্ছত্‌ত্র, গুরুর দোষাবরণ, আবরণমাত্র। **ছত্‌ত্রক** = মৎস্যরঙ্গ, মাছরাঙা পাখী, শিবমন্দিরবিশেষ, রাঙা কুলেখাড়া। **ছত্‌ত্রচ্ছায়া** = রাজচ্ছত্‌ত্রের ছায়া, রাজশাসন। **ছত্‌ত্রপতি** = সম্রাট। **ছত্‌ত্রভঙ্গ** = রাজচ্ছত্‌ত্রের নাশ, নৃপনাশ, রাষ্ট্রবিপ্লব, রক্ষিতার নাশ, স্বাতন্ত্র্য, স্বেচ্ছাচার, বৈধব্য, ছত্‌ত্রপতন। **ছাতা** = ছত্‌ত্র, রাজচ্ছত্‌ত্র, (সাদৃশ্যে) তাপনিবারক, দুঃখনাশক। (ব.শ.)। ৪. ছত্রচ্ছায়া, ছত্রভঙ্গ এই বানানে যথাক্রমে 'under the rule' ও 'dispersed' অর্থে প্রচলিত; কিন্তু বাকি শব্দ তিনটি প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার যে, এই শব্দগুলি লিখবার একটি সমস্যা আছে। বাংলায় এক-তকার (ত্র) ও দুই-তকার (ত্‌ত্র) দুটোই আছে, এবং তাদের অর্থও আলাদা। কমপিউটারে দুই-তকার লেখা যায় না, তাই 'ত্‌ত্র' লেখা হল। এদের অর্থ নিয়ে মুশকিলে পড়েছেন ব.শ.। যদিও তিনি নিজেই স্পষ্ট লিখে গেছেন ছত্র দুইরকম হয়, ছাত্‌ত্র কেবলমাত্র দ্বি-তকার লিখতে হয়, নইলে ভুল হয়। কিন্তু কমপিউটারে একটি মাত্র ত্র থাকার কারণে আমরা কেবল দুই রকম ছত্র ও ছাত্‌ত্র শব্দের ক্ষেত্রে পৃথকভাবে লিখব। অন্যত্র প্রচলিত পন্থা অনুসরণ করব।

অন্নসত্র ও অন্নছত্র একই শব্দ। এই **ছত্র** এক-তকার। এর অর্থ চয়নস্থিত বা ছ (যা কিছু চয়ন করে এনে রাখা আছে) তারিত যাহাতে। যেকারণে ব.শ. ছত্র শব্দের বানানে এক-তকার দিয়েছেন এবং অর্থ লিখেছেন — অন্নাদিবিতরণ স্থান। কিন্তু দ্বি-তকার হলেই এর মানে দাঁড়ায়, 'ছ তারণ তারিত যাহাতে'। অর্থাৎ ছত্র-ব্যবস্থা। একেই একালের ভাষায় বলে ছাতা।

সূর্য্যের তাপ (আতপ) থেকে ত্রাণ করে যে, তাকে আতপত্র বলে। এটি 'তাপনিবারক' দৃশ্য ছত্র, যা মাথাকে ছায়, ছায়া দেয়। আর রাজচ্ছত্র দেয় রাজশাসনের ছায়া। এটিও একধরনের ছত্র-ব্যবস্থা। যে দেশ প্রায়ই বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, সে দেশের অধিবাসীগণ এই রাজচ্ছত্রের মর্ম বোঝেন। মনে হয়, এই রাজশাসন-ছায়াকে বোঝাতেই 'ছত্‌ত্র' শব্দটির প্রথম প্রচলন হয়েছিল। পরে, ব.শ. বলছেন, সেই রাজচ্ছত্‌ত্রের 'সাদৃশ্যে' দৃশ্য ছত্‌ত্র তৈরি হয়েছে সমাজে। তবে 'গুরুর দোষাবরণ'কারী যে ছত্র, তার অর্থ আলাদা, তাই বানানও তার আলাদা — ছত্‌ত্র। দ্র. **ছাত্র (ছাত্‌ত্র)**।

ছত্রক শব্দটি অদ্ভুত! সে তিনটি সত্তাকে বোঝায় — মাছরাঙা, কুলেখাড়া, শিবমন্দিরবিশেষ। আমরা জানি কুলেখাড়া শরীর ঠাণ্ডা রাখে, অর্থাৎ মানবশরীরকে ছায়া দেয়। কিন্তু মাছরাঙা কীভাবে ছায়া দেয়, তা নিষ্ঠার সঙ্গে নজর না করলে বোঝাই দুষ্কর। সাধারণত গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলা, সূর্য যখন মাথার উপরে, এবং এত গরম যে পুকুরের বা নদীর স্থির জল গরম হয়ে গেছে, সেই সময় মাছরাঙা একই অবস্থানে উড়তে থাকে। কেন যে একই অবস্থানে উড়তে থাকে তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। আসলে, মাছরাঙার শরীরের ওইটুকু ছায়াতেই ছোট মাছেরা ছায়ার লোভে আসে এবং মাছরাঙার শিকার হয়। এই কারণে মাছরাঙাও ছত্রক। আর, কোনো কোনো শিবমন্দির যে ছত্রক অভিধা পেয়েছিল, তার ইতিহাস প্রাচীন। শিব ছিলেন বেদবিরোধী। বেদবাদীদের দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করে শিবপন্থী ভৈরবেরা যখন বেদবাদীদের ধ্বংস করার জন্য তাড়া করে ফিরছে, তখন রুদ্রশিবের মূর্তি গড়ে মন্দির বানিয়ে বেদবাদীরা শিবের পূজা শুরু করে দেয়। ফলে, রুদ্রশিবের অনুসারীরা বুঝে পায় না, এই শিবপূজক-বেদবাদীদের তারা মারবে কি না। ফলস্বরূপ ক্রমে এই শিবমন্দিরের ছত্রছায়াতেই দক্ষপন্থী বেদবাদীরা আত্মরক্ষা করে এবং ক্রমে বৈদিক যুগের রমরমা শুরু হয়। সম্ভবত এই কারণে শিবমন্দিরকে **ছত্রক** বলা হত। মনে রাখা ভাল, তথ্যানুসারে রুদ্রমূর্ত্তিই পৃথিবীর আদিমূর্ত্তি এবং শিবমন্দিরই পৃথিবীর আদি মন্দির। দ্র. **দক্ষযজ্ঞ**।

সবসময় যে কথাটি আমাদের মনে রাখতে হয়, তা হল, আমাদের শব্দজ্ঞানী পূর্বপুরুষদের শব্দসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তাদের বিশেষ বিশেষ আওয়াজের সাহায্যে শনাক্ত করা। সমাজের শাসনব্যবস্থা দৃশ্য নয়, কিন্তু অত্যন্ত সক্রিয়। তাঁরা সেই শাসনব্যবস্থাকে নাম দিয়েছিলেন ছত্‌ত্র বা ছত্‌ (চয়নস্থিতের তারণ) রহে যাহাতে। অনেক বাংলাভাষী ঘরের ছাদ বা roof-কে ছত্‌ বলেন, হিন্দিভাষীরাও বলেন। মানবসমাজের উপরে এই যে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও 'দার্শনিক' (= বিশ্বাসের) ছাদ, একেই **ছত্‌ত্র** বলে। এই ছত্রের ছায়ায় বা ছত্রচ্ছায়ায় সমাজের সদস্যগণ শান্তিতে বাস করেন। রাজা কিংবা রাজার রাজা সম্রাট এই ছত্রের পতি হওয়ায়, তাঁকে ছত্রপতি বলে। আর, এই ছত্র যদি ভেঙে যায়, সমাজের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-দার্শনিক ছাতাটি যদি ভেঙে যায়, **বিশ্বাস** যদি ভেঙে পড়ে, তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়; ছাতা ভেঙে যায়। (দ্র. 'খ' গ্রন্থ)। ফলে, ছত্রচ্ছায়ায় বাসকারী মানুষেরা যে যেদিকে পারে উন্মাদের মতো পালায়। ফলে 'ছত্রভঙ্গ' শব্দের অভিধা অর্থটির চেয়ে ব্যঞ্জনা অর্থটি বড় করে সকলের চোখে ধরা পড়ে। সেই কারণেই ছত্রভঙ্গের মানে আমরা ছাতা ভাঙা বুঝি না, বুঝি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া। ইংরেজ বাংলায় আসার পর আমরা ছত্রভঙ্গকে disperse শব্দের প্রতিশব্দ করে নিলাম। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সাংবাদিক রিপোর্ট লিখতে লাগলেন — 'জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ দশ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করেছিল।' জনতার রাজনৈতিক বা দার্শনিক ছাতা ভেঙে পড়েছিল কি না, তার কোনো খবর সেই রিপোর্টে থাকে না।

ছদ, ছদি, ছাদ, ছাদনাতলা : ১. ✓ছদ্ + অ (ঘ) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ছদ** = *ছ-এর (অহংচারী-অস্তিত্বের বা ইচ্ছাকারীর) দান থাকে যাহাতে।* **ছদি** = *ছ-এর দান গতিশীল যাহাতে।* **ছাদ** = *ছদ হইতে জাত।* **ছাদনাতলা** = *ছাদিত অংশের তলা। /* **ছদ** = যাহার দ্বারা ছাদন সাধিত হয়। **ছাদ** = যাহার দ্বারা আবরণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **ছদ** = ছদ পক্ষ, পত্র, পাখা, দল, পাতা, পাপড়ি, আবরণ, আচ্ছাদন, গ্রন্থিপর্ণবৃক্ষ, তমালবৃক্ষ, ঢাকনা, পিধান, অসিকোষ, তমালপত্র। **ছদি** = পটল, চাল, শকটের আচ্ছাদন, ছই, আচ্ছাদক। **ছাদ** = আচ্ছাদক, পটল, ছাত, চাল, আচ্ছাদন, আবরণ, পত্র, যবনিকা, পরিচ্ছদ, পরিধান। **ছাদনাতলা** = বিবাহমণ্ডপের তলদেশ, কন্যা সম্প্রদানের স্থান, ছাঁদ্নাতলা। ৪. ছদ শব্দটি প্রচ্ছদ, পরিচ্ছদ ইত্যাদি রূপে প্রচলিত। ছদি ছই রূপে, ছাদনাতলা ছাঁদ্নাতলা রূপে এবং ছাদ সমস্ত প্রতীকী অর্থে প্রচলিত। ৫. বকুল গাছের তলায় ফুল পড়ে

পড়ে একটা আস্তরণ হয়ে যায়। এইভাবে কোনো আচ্ছাদন তৈরি হয়ে গেলে, তাকে **ছদ** বলে। শব্দটির নিহিত অর্থ অনুসারে এইভাবে বাইরের কোনো অস্তিত্বের টুকরো টুকরো পড়ে পড়ে এমন হলে তবেই তাকে **ছদ** বলে। এই ছদের থেকে ছাদ বা আচ্ছাদন সম্ভব হয়। **ছদ** শব্দের এই অভিধা অর্থটি অতঃপর নানান শবলার্থ ও ব্যঞ্জনার্থের জন্ম দিয়েছে। দ্র. **ছিদ্র**। ৬. ??

ছদ্ম (ছদ্মবেশ, ছদ্মবেশী) : ১. ✓ছদ্ + মন্ (মনিন্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ছদ্ম** = *যাহার দ্বারা (অন্যের) মন আচ্ছাদিত হয়।* ৩. **ছদ্ম** = কপট, শাঠ্য, ব্যাজ, ছল, কপটবেশ, স্বরূপ আচ্ছাদন, পটল। (ব.শ.)। ৪. deceit অর্থে প্রচলিত। ৫. ছদ্মবেশ ছদ্মবেশীর মনকে আচ্ছন্ন করে না, তাকে যারা দেখে তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে দেয় বলেই তাকে ছদ্মবেশী বলা হয়। যদিও বিষয়টিকে ঠিক উলটো ভাবে এখন আমরা বুঝে থাকি। ভাবি, ছদ্মবেশী নিজের স্বরূপ আচ্ছাদন করছে; আমাদের আর কী! কিন্তু ফলটা ভুগতে হয় আমাদের। প্রাচীন শব্দকারগণ এক্ষেত্রে সেই ভোগান্তির দিকে নজর রেখেই শব্দটি তৈরি করেছিলেন, ছদ্মবেশী কী করছে সেদিকে গুরুত্ব দেননি। গুরুত্ব দিয়েছিলেন আমাদের মনের উপর ছদ্মবেশীর আচরণের কী প্রভাব পড়ছে। আর সেভাবেই শব্দটি তৈরি করেছিলেন — আমাদের মন ছাদিত (আচ্ছাদিত) করে যে, সেই হল ছদ্মবেশী।

ছন্দ (ছন্দঃ, ছন্দোগ, ছন্নছাড়া, ছাঁদ, ছেঁদো) : ১. ✓ছন্দ্ + অ (অচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ছন্দ** = *ছাদন (ছাওয়া অন, ঢাকন) দান করে যে।* ৩. **ছন্দ** = গোপনীয়, রহঃস্থিত, রহস্য, অভিপ্রায়, ইচ্ছা, বশ, কামচার, যথেচ্ছচিত্তবৃত্তি, তাৎপর্য্য, আশয়, আকার, অবয়ব-সংস্থান, বিষ, প্রকার, ভাব, বেশ, পদ্য, ছন্দোবদ্ধ বাজনার গৎ, গবাদি নিয়মনার্থ পদবন্ধন রজ্জু, ছাঁদনদড়ি। **ছন্দঃ** = বেদ, নিয়তাক্ষর মাত্রাযুক্ত চতুশ্চরণ লৌকিক পদ্য, কবিতা, বেদাঙ্গভূত ছন্দঃশাস্ত্র, অভিপ্রায়, ইচ্ছা, স্বৈরাচার, কামচার, আশয়, তাৎপর্য্য, কপট, শাঠ্য, ছল। (ব.শ.)। ৪. rhythm, metre, এমনকি অন্ত্যমিল মূলক rhymes অর্থে প্রচলিত। কাজের 'ছন্দ' অর্থেও প্রচলিত। ৫. ছন্দ ও ছন্দঃ শব্দের উপরোক্ত (৩-এ প্রদত্ত) অর্থগুলি এতই বিজাতীয় এবং পরস্পরের স্বভাববিরোধী যে, তারা একই ছন্দ শব্দের উদ্দিষ্ট, একথায় বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কোথায় বিষ, যথেচ্ছাচার, কপট, শাঠ্য, ছল ইত্যাদি আর কোথায় বেদ, বেদাঙ্গভূত ছন্দঃশাস্ত্র! ছন্দ শব্দের এমন অর্থে স্বভাবতই বিশ্বাস করেননি বঙ্গীয় শব্দকোষকার কিংবা ছাত্রবোধ অভিধানকার। তাঁরা ছন্দতে সব অর্থগুলিই কমবেশি রেখেছেন, কিন্তু বেদকে রাখেননি; রেখেছেন 'ছন্দঃ' শব্দে। কিন্তু তাতেও বেদকে ঠিক নিষ্কলুষ রাখা যায়নি, কেননা, সেখানেও কপট, শাঠ্য, ছল ইত্যাদি শব্দ এসে গেছে বেদের সতীর্থ রূপে। কলকাতার সংসদ বাংলা অভিধান কিংবা ঢাকার বাংলা একাডেমীর ব্যবহারিক বাংলা অভিধান ছন্দ শব্দের অর্থতালিকা থেকে 'বেদ' শব্দটিকেই বহিষ্কার করে দিয়ে এই সমস্যা থেকে আত্মরক্ষা করেছেন। অন্যদের বহিষ্কার করার 'মহৎ' কাজটি এতকাল আমরা বেদকেই করতে দেখেছি (পুরাণাদি গ্রন্থে); আর আজ কপালের এমনি ফের যে, সেই বেদকেই আধুনিক কলকাতা ও আধুনিক ঢাকার অভিধান থেকে বহিষ্কৃত হতে হল!

আসলে সমস্যাটি 'আধুনিক' প্রজন্মের। ইতিহাসের মারে তাঁরা শব্দোৎসারণের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মটি ভুলে গিয়েছিলেন। ফলে, অভিধান বা শব্দকোষ লেখার সময় তাঁরা পড়েছেন মুশকিলে। কেউবা পরস্পরবিরোধিতার কারণ বুঝতে না পারলেও সেগুলি যেভাবে সম্ভব রেখে দিয়েছেন, অতীত ত্যাগ করেননি; কেউবা অবোধ্য-দুর্বোধ্যকে ফেলে দেওয়াই উচিত বিবেচনা করেছেন। কিন্তু একবার যদি ভাবা যেত যে, কথাকে ছন্দোবদ্ধ করে ফেললে কিংবা লিখে ফেললেই তো তা গোপন করা হয়ে যায় তাদের কাছ থেকে যারা ছন্দোবদ্ধ বাক্যের মানে বুঝতে জানে না কিংবা লেখাপড়া জানে না। সেকারণে ছন্দোবদ্ধ বা লিখিত কথাবার্তা মাত্রেই কিছু মানুষের কাছে তা গোপনীয় হয়ে যায়। এবার ছন্দোবদ্ধ বা লিখিত বাক্যাবলী যদি সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে ওঠে, তখনই তা কপট, শাঠ্য, ছলনা রূপে প্রতীয়মান হয়ে যেতে পারে। আর সেটিই ঘটেছিল। সেই কারণে *'ছ-অন দান করে যে' বা 'ছাদন (ছাওয়া অন, ঢাকন) দান করে যে'* সেই **ছন্দ** গোপনীয়, রহঃস্থিত, রহস্য ইত্যাদি অর্থে প্রকট হয়ে যায়।

কিন্তু ছন্দ শব্দটি ঠিক এই অভিপ্রায়েই প্রাচীন শব্দকারগণ সৃষ্টি করেননি। সম্ভবত তাঁদের অভিপ্রায় ছিল আরও গভীর। হয়তো তাঁদের সেই **ছন্দ**-বোধের উত্তরাধিকার বহন করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — 'স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল / ক্ষণকালের ছন্দ, / উড়ে গিয়ে হারিয়ে গেল / সেই তারই আনন্দ।' স্ফুলিঙ্গ বা অগ্নিশিখার মধ্যে এই যে **ছন্দ** থাকে, শিল্পীর তুলির টানে যে শিখার ছবির রেখাগুলি অসম (সাম্য থেকে দূরে) কিন্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাসে নাচতে থাকে [সম্ভবত, তাকেই বিজ্ঞানী ইলিয়া প্রিগোজিন বলেছেন dissipative structure, বলেছেন স্ব-সংগঠনের (flower of self-organisation-এর) পুষ্প।], তাকেই **ছন্দ** বলে। এই ছন্দ অস্তিত্বকে তার বাস্তব স্বরূপ থেকে, অতীত থেকে সরিয়ে নেয়। (ব্যাপারটি নিৎশের নিকট ধরা দিয়েছিল মহামিথ্যা বা মহামায়া রূপে — 'Artistic pleasure is the greatest kind of pleasure, because it speaks the truth quite generally in the form of lies'। আর সেকারণেই ছান্দস্ রূপী বেদ 'অতিসত্যে' সমুজ্জ্বল। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য 'গ' গ্রন্থের ২১৩-১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) ফলে তা অতীতের কাছে গুপ্ত হলেও বর্তমানের কাছে অভিপ্রায়, ইচ্ছা, বশ, কামচার, যথেচ্ছচিত্তবৃত্তি, তাৎপর্য্য, আশয়, আকার, অবয়ব-সংস্থান, প্রকার, ভাব, বেশ ইত্যাদি হয়ে যায়। আওয়াজের ক্ষেত্রে স্বভাবতই এই **ছন্দ** পদ্য, ছন্দোবদ্ধ বাজনার গৎ, এবং আরও নিম্ন দৈহিক অর্থে গবাদি নিয়মনার্থ পদবন্ধন রজ্জু, ছাঁদনদড়ি পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। বিশেষ জ্ঞান বা দিশাগ্রস্ত জ্ঞান বলে, ছন্দোবদ্ধ জ্ঞান কখনো কখনো বিষ রূপে প্রতীয়মান হয়। মানুষে মানুষে যে বিশেষ ধরনের আওয়াজের সাহায্যে মনোভাব লেনদেন করে, তা যখন মানুষের সমস্ত জ্ঞানের আধার হয়ে ছন্দোবদ্ধ জ্ঞানভাণ্ডার রূপে প্রতিষ্ঠা পায়, তখন তাকেও সেকারণেই **ছন্দ** বা বেদ বলে। বিসর্গ যুক্ত যেকোনো শব্দ, যেমন 'নরঃ', 'ছন্দঃ' ইত্যাদি হল যার রূপটিকে কখনসময়ে স্থির রূপে,

সগহীন রূপে, ধরা হচ্ছে; যদিও বাস্তব সবসময় গতিশীল।

এই সব কারণে **ছন্দ** কারও কাছে ভাল, কারও কাছে মন্দ হতেই পারে। নতুনকে কোনো যুগই সহজে পথ ছেড়ে দেয়নি। যাঁরা পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি লিখতেন, তখনকার মূল স্রষ্টা-লেখক, প্রতিলিপি-লেখক, বিভিন্ন পুরাণাদি কপি করে দেওয়ার জন্য জমিদাতা জমিদার, পাঠক, শ্রোতা — এদের সকলকে নিয়ে একপ্রকার সামাজিক শৃঙ্খলা (ছন্দ) ছিল। মোগলযুগের সেই ভারতীয় লেখকরা প্রিন্টিং প্রেসকে ৩০০ বছর ভারতের মাটিতে ঢুকতে দেননি; লেখাপড়ার ব্যবস্থার নতুন সামাজিক শৃঙ্খলা (ছন্দ) গড়ে তুলতে দেননি। কথাটি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও খাটে। ভারতের ধ্রুপদী সঙ্গীতে অর্থপূর্ণ শব্দকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে মাত্র চার-পাঁচশো বছর আগে; তার আগে কেবল সুরের মাধ্যমেই মনের ভাবের প্রকাশ ঘটানো হত সঙ্গীতে এবং তাই নিয়েও একধরনের সামাজিক **ছন্দ** গড়ে উঠেছিল। মুখে মুখে পদরচনাকারীগণ সেই পদকে কাগজে লিখে রাখার রীতির প্রচলন করতে কতখানি বাধা দিয়েছিলেন, তার কোনো হিসেবে নেই। এমন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে দেখা গেছে, যিনি লেখাপড়া জানা মিস্ত্রি একেবারেই পছন্দ করতেন না; কারণ তাদের স্মৃতিশক্তি কম। তিনি দেখেছিলেন, নির্মীয়মান কাঠামোর প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাপ মূর্খ মিস্ত্রি বলে দেওয়া মাত্র অবশ্যই মনে রাখে; সে জানে কোনো কারণে পরিমাপ ভুলে গেলে সে কাজ করতে পারবে না, চাইলে ড্রয়িং দেখে নিতে পারবে না, কারণ সে লেখাপড়া জানে না। এমন নিরক্ষর কর্মীকে নিয়েও কর্মযজ্ঞের একপ্রকার **ছন্দ** গড়ে ওঠে। যা কিছু কমপিউটারের সাহায্যে জানা যায়, সেসব বিষয়ে এখনকার ছেলেমেয়েদের স্মৃতি অত্যন্ত কম, ৭/৮-এর নামতাও তারা মুখস্ত বলতে পারে না। অথচ যত অতীতের দিকে আমরা যাব, ততই অধিক স্মৃতিধর মানুষদের দেখা পাব আমরা; এত স্মৃতিধর যে, এক লক্ষ শ্লোকও সে একটানা বলে যেতে পারে! অবিশ্বাস্য হলেও কথাটি সত্য বলেই আমাদের মনে হয়। সমগ্র কোরাণ মুখস্থ বলতে যাঁরা পারেন, তাঁদেরকেই তো 'হাফেজ' বলে। এঁদের জন্ম তো সপ্তম শতাব্দীতে। তাঁদের চেয়ে আরও পাঁচ-সাতশো হাজার বছর আগের মানুষ যে আরও বেশি মনে রাখতে পারতেন, তা বিশ্বাস করতে আপত্তির কারণ দেখি না। লেখালেখি ছাপাছাপির উপায় যখন নেই, মনে তো রাখতেই হবে; স্মৃতি-শ্রুতি জিইয়ে রাখতেই হবে, উপায় কী! পুরাণাদি গ্রন্থে, চরকসংহিতায়, বাৎস্যায়নের কামসূত্রে এইপ্রকার লক্ষ লক্ষ শ্লোক মনে রাখার লিখিত প্রমাণ রয়েছে।

আরও আছে। 'ছন্দময় গমন যাহার' সে হল **ছন্দোগ**। বৈদিক নিয়মের ছন্দে তার জীবনযাত্রা চলে। একে **ছাঁদ**ও বলে। **ছন্দোগ্য** (ছান্দোগ্য) উপনিষদ এঁদের নতুন ধরনের ছন্দোময় জীবনযাত্রা পদ্ধতির পক্ষে সওয়াল করেছে। আর কোনো ছন্দই যার জীবনযাত্রায় নেই, কোনো রকম শ্রী ও ছন্দ নেই, ছিরি-ছাঁদ নেই, সব ছন্দকেই যে ছাড়িয়ে গেছে, তাকে বলে 'ছন্দছাড়া' বা 'ছন্নছাড়া'। কিন্তু ছন্দ বা 'ছাঁদ অন থাকে যাহাতে' তাকে বলে **ছাঁদন**। একে গাইয়ের ছাঁদনদড়িতে যত না চেনা যায়, তার চেয়ে অনেক ভাল চেনা যায় ঘোলের হাঁড়িতে যে মন্থনদণ্ড ঘোরে, তাকে বাঁধার দড়িতে। সেই দড়িই মাখন তোলার জন্য যে মন্থন-ঘূর্ণন, তার **ছন্দ** রক্ষা করে। আবার, কোনো বিষয় বা বস্তুর ছন্দ যদি একই কর্মের পুনরাবৃত্তির চক্রে পড়ে গড্ডালিকা-প্রবাহ হয়ে গ্লানিগ্রস্ত হয়ে যায় এবং ফলত সেই ছন্দে যে-বস্তুবিষয় ধৃত ছিল তা নষ্ট হয়ে যায়, তখন সেই ছন্দ বা ছাঁদ হয়ে যায় **ছেঁদো**। কথা যখন ছন্দোবদ্ধ কিন্তু তাতে কোনো মর্ম নেই, তখন তেমন 'ছেঁদো-কথা'য় আমরা বিরক্ত বোধ করি।

ছা, ছাওয়াল, ছানা, ছা-পোষা, ছাবাল, ছেলে (ছেলেখেলা, ছেলেধরা, ছেলেপিলে, ছেলেপুলে, ছেলেবুদ্ধি, ছেলেমানুষ) : ১. শাব > ছা, ছাওয়াল ইত্যাদি। (ব.শ.)। ২. **ছা** = ছ-এর *(ইচ্ছাচারীর) আধার যে।* **ছাওয়াল** *= (পিতামাতা কর্তৃক) আচ্ছাদিত হইয়া লালিত হয় যে।* **ছানা** *= ইচ্ছা অন থাকে যাহাতে।* **ছা-পোষা** *= উত্তরসূরীকে পালন-পোষণ করাই যাহাদের একমাত্র ব্রত।* **ছাবাল** *= ছাওয়াল।* **ছেলে** *= দিশাগ্রস্ত ইচ্ছা দিশাগ্রস্তভাবে লালিত হয় যাহাতে।* ৩. **ছা** = শাবক, ছানা, শিশু, ছোটছেলে। **ছাওয়াল** = পুত্র, শিশু, বালক, সন্তান, ছেলে, শিশুতুল্য, অনভিজ্ঞ, অল্পবয়স্ক বালক, অল্পমতি বা সরলা বালিকা, দুগ্ধপোষ্য শিশু, পুত্রবৎ স্নেহভাজন। **ছানা** = শাবক, বাচ্চা, ছাঁ। **ছা-পোষা** = যাহার পোষ্য কতকগুলি অপোগণ্ড শিশু। **ছাবাল** = সন্তান, ছেলে, শিশু, পুত্র, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, শিশুতুল্য অবোধ। **ছেলে** = পুত্র, কন্যা, সন্তান, শিশু, বালক, ভ্রূণ, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, ছাত্র, শিষ্য, বিবাহের পাত্র। **ছেলেখেলা** = শিশুর ক্রীড়াতুল্য সহজসাধ্য বিষয়। **ছেলেধরা** = যাহারা ছেলে ধরে।...। **ছেলেপিলে, ছেলেপুলে** = পুত্রকন্যা, ছেলেমেয়ে, স্নেহের পাত্রপাত্রী। **ছেলেবুদ্ধি** = শিশুচিত বুদ্ধি, কোমল মতি। (ব.শ.)। ৪. সবগুলিই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. ব.শ. অনুমান করেছেন, সংস্কৃত 'শাবক' শব্দটি ভ্রষ্ট হতে হতে ক্রমান্বয়ে ছা-ছাওয়াল প্রভৃতি বাংলা শব্দগুলি তৈরি হতে পেরেছে। এরকম হতেও পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ছা-ছাওয়াল-ছেলে প্রভৃতি শব্দগুলি কেবলমাত্র পূর্বসূরীর শক্তি ও দেহের উত্তরাধিকারীই বোঝাবে, তার মনের উত্তরসূরী বোঝাবে না। কিন্তু যদি ছ-কেই মূল ক্রিয়া ধরা হয়, তাহলে ছা-ছাওয়াল-ছেলে প্রভৃতি শব্দগুলি উত্তরসূরীদের অন্ততপক্ষে দুটি দিক থেকে প্রকাশ করে — যারা ইচ্ছার বা মনের উত্তরসূরী এবং যাদের আচ্ছাদিত করে লালন-পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তো বলেই গেছেন, ছেলেমেয়ে হল সেই সত্তা যে 'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে'। ছা-ছাওয়াল-ছেলে প্রভৃতি শব্দের ভিতরে এই দুইরকম কথা কীভাবে রয়েছে, তার কথা বলা হয়েছে উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে (৩)।

ছেলেপিলে বা **ছেলেপুলে** শব্দটির ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, পিলে বা পুলে শব্দটিকে তেলুগু 'পিলে' শব্দ থেকে আগত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আধুনিক যুগের শব্দবিদগণের এই দোষটি ভয়াবহ, প্রায় মহামারীর মতো। প্রায় সমস্ত আধুনিক শব্দশাস্ত্রীদের তা প্রভাবিত করেছে, এমনকি বঙ্গীয় শব্দকোষকেও বহু ক্ষেত্রে কলুষিত করেছে। ইংরেজি শিক্ষা এই আধুনিক শব্দবিদগণের আত্মবিশ্বাসটাই ভেঙে দিয়েছে; তাঁদের এই ভুল বিশ্বাসটা তৈরি করেছে যে বাংলার নিজের কিছুই নেই, অধিকাংশই অন্য ভাষা থেকে ধার করা। তাঁরা জানেন না, সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টির পর ভাষার অর্থ নিয়ে যথার্থে কাজ হয়েছে কেবলমাত্র বঙ্গদেশেই।...

যাক সেসব কথা। পিলু, পিপীলিকা, পিপুল, বিপুল, পুলিপিঠা ... এসব কথা আমাদের ছিল, আছে। এই পিল ও পুল জুড়েই আমাদের পূর্বপুরুষগণ স্বাভাবিকভাবেই ছেলেপিলে ও ছেলেপুলে শব্দদুটি বানিয়েছিলেন। দ্র. **পিল, পুল**।

ছাত্ত্র : ১. ✓ছত্ত্র + অ (ণ) শীলার্থে। (ব.শ.)। ২. ***ছাত্ত্র*** = *ছা (আচ্ছাদিত, ছন্দোবদ্ধ জ্ঞান) তারণপূর্ব্বক তারিত হয় যাহাতে।* ৩. গুরুর দোষাবরণশীল, শিষ্য, অন্তেবাসী, পড়ুয়া, বরটার ছত্রাকার পটলজাত মধুবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. student অর্থে প্রচলিত। ৫. এই শব্দের ক্ষেত্রে ব.শ. স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, 'ছাত্র' বানানে শব্দটি ভুল। এটি অবশ্যই দ্বি-তকার হবে অর্থাৎ 'ছাত্ত্র' লিখতে হবে। সেরকম লিখলে, শব্দটির মানে দাঁড়ায় — **সমাজের অর্জিত জ্ঞান শিক্ষকের মাধ্যমে তারিত হয়ে যার কাছে পৌঁছায়**, সেই সত্তা। তাকেই ছাত্ত্র বলা যাবে। নিঃসন্দেহে ছাত্ত্র (এখন লেখা হয় 'ছাত্র') শব্দের এই অর্থই সঠিক; 'গুরুর দোষাবরণশীল' অর্থটি অমূলক। ছাত্র বা ছাত্ত্র শব্দের ভিত্তিতে সেরকম কোনো 'দোষাবরণ' ক্রিয়া যেমন নেই, তেমনি সেরকম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার উত্তরাধিকারও পাওয়া যায় না।

ছিল, ছিলা, ছিলিকা (ছল, ছাল, ক্ষাল, ছুল, ছোলা, চাঁছা-ছোলা) : ২. ***ছিল*** = *ছ-এর (চয়নস্থিতের) লালন যাহাতে; কিংবা ছ-কে (আচ্ছাদন) গতিশীলভাবে লয় যে।* ***ছিলা*** = *ছিলের আধার যে; অর্থাৎ ছিল্ ক্রিয়া চলে যাহাতে।* ***ছিলিকা*** = *ছিলকে গতিশীল করে যে, তাহার আধার।* ৩. ধনুকের গুণ (সাঁওতালেরা ধনুকে বাঁশের ত্বকের বা পাতলা চটার গুণ করে। ইহাকে বাঁশের 'ছাল' বলে।), কাপড়ের শেষের সুতা, দশি বা ফুঁপি। ছাল, খোসা। (ব.শ.)। ৪. শব্দটি বিভিন্ন অর্থে গ্রামবাংলায় খুবই প্রচলিত। ৫. **'ছিল'** বললে প্রথমেই আমাদের অতীতকালে 'থাকা' অর্থটি মাথায় চলে আসে। কিন্তু সেটি আদিতে স্থ বা থাকা ক্রিয়া থেকে জাত, যাকে আগেকার কালে **স্থিল, থিল**, এবং **আছিল** বলা হত। এই আছিল বা ছিল শব্দের ভিতরে চাঁছা-ক্রিয়াটি নেই; আমাদের বর্তমান আলোচ্য **'ছিল'** শব্দের মধ্যে তা একরকম ভাবে আছে। এটির মূলে রয়েছে ক্ষাল্ ক্রিয়া। ক্ষালন করার একটা অর্থ হল ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া। দ্র. **খল**। কিন্তু আমরা দেখছি, **ছুলা, ছোলা** প্রভৃতি শব্দও একই 'ছাল-ছাড়ানো' অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। ছিলা, ছুলা, ছোলা, সব ক্ষেত্রেই কোনো বস্তুর আচ্ছাদন বা ত্বক ছাড়িয়ে নেওয়ার কথাটি বলা হয়। সেক্ষেত্রে ছদ্ ক্রিয়ার থেকেও শব্দটি প্রসূত হয়ে থাকতে পারে। ছ (আচ্ছাদন) লালিত যাহাতে, তাকে **ছল** (কপট) বলা হয়। তার থেকে জাত হয় **ছাল** অর্থাৎ আচ্ছাদক লালিত যাহাতে। সেই ছাল তোলার ক্রিয়াকে যেমন ছিলা বলে, তেমনি, ক্রিয়াটি সম্পাদিত হওয়ার পর যে ফলটি পাওয়া যায়, তাকেও ছিলা বলে। এরই অপর নাম ছিলিকা। ব.শ. সাঁওতালদের বিষয়ে যে তথ্যটি দিয়েছেন, সেটি আমাদের সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে মেলে না। বাঁশের যে ছাল ধনুকে লাগানো হয়, তাকে তাঁরা **ছিলা** বলেন, ছাল বলেন না।

ছুৎ, ছুৎমার্গ : ২. ***ছুৎ*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ইচ্ছাচারীর তারণ যাহাতে।* ***ছুৎমার্গ*** = *ছুৎ মার্গ যাহাতে।* ৩. ***ছুৎ*** = স্পর্শ, অশুচি দ্রব্যের বা অস্পৃশ্যজাতির স্পর্শজন্য অশুচিতা বা দোষ (untouchability)। ***ছুৎমার্গ*** = স্পর্শদোষ সম্বন্ধী ধর্ম্মমতবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. untouchability অর্থে প্রচলিত। ৫. ছুঁয়ে দেওয়ার মধ্যে 'ইচ্ছাচারী'র তারণ থাকে। যাকে ছোঁয়া হয়, তাকে কিছু দিয়ে দেওয়া হয়। অন্য অন্য ক্ষেত্রে এই 'স্পর্শদ্বারা দান' স্পষ্ট বোঝা না গেলেও, কাঁচা যুবক-যুবতীর ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি স্পষ্ট বোঝা যায়। পুরাণাদিতে আরও গভীর অর্থে 'দর্শন ও স্পর্শনে সন্তান জনন'-এর কথা বলা হয়েছে। এসব কথা কী অর্থে সত্য এই মুহূর্তে সে-প্রসঙ্গে আমরা যাব না। আমরা কেবল **ছুৎ** শব্দের ভিতরে 'ইচ্ছাচারীর তারণ' রয়েছে, সেই কথাটাই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছি।

'কারও স্পর্শ লেগে গেলে আমার ক্ষতি হয়ে যেতে পারে' এরকম একটি বোধ জীবজগতে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। কোনো কোনো পাখির বাচ্চাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে তার বাসায় রেখে দিয়ে এলে, সে-বাচ্চাকে সে পাখি-মা আর গ্রহণ করে না; অথচ কাঠি দিয়ে ধরে তুলে রেখে এলে তাকে গ্রহণ করে। চড়াই পাখির ক্ষেত্রে এ-অভিজ্ঞতা আমাদের স্বকীয়। মানুষের সমাজে 'মস্তক-আঘ্রাণ' হয়তো-বা তারই উত্তরাধিকার। কোনো কোনো আদিবাসী সমাজে অন্য জাতির মানুষদের সংস্পর্শ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। যেন-বা অন্যে ছুঁয়ে দিলে তাদের নিজেদের অর্জিত জ্ঞানসম্পদ বা ধনসম্পদ ও সেই সম্পদের পবিত্রতা কলুষিত হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীর সব দেশের আদিবাসীদের মধ্যেই এইরকম আচার কমবেশি দেখতে পাওয়া যায়। এ হল একপ্রকারের **ছুৎমার্গ**।

এছাড়াও আরও দুরকম ছুৎমার্গ রয়েছে। এক) যাঁরা নতুন জ্ঞান অর্জন করেন, জ্ঞানের অগ্নিশিখা বহন করেন, সেকালের ভাষায় যাকে বলা হয় ব্রহ্মগুণ-অর্জন করা, মোক্ষলাভ করা কিংবা অমৃতের স্বাদ পাওয়া; এবং একালের ভাষায় বলা যেতে পারে যাঁরা pure excellence-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন; তাঁরা প্রথম প্রথম খানিকটা ভয়ে ভয়ে থাকেন, এই বুঝি তাঁর প্রাপ্ত অমৃত কলুষিত বা নষ্ট হয়ে গেল! এঁরা ব্রহ্মলাভ করার পর সময়াভাবে বা অন্য কোনো কারণে যথেষ্ট পেকে উঠতে পারেননি বলে ভয়ে ভয়ে থাকেন, পাছে তাঁর ব্রহ্মের পবিত্রতা বা purity of excellence কেঁচে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। (উত্তরাধিকার সূত্রে যাঁরা ব্রহ্মের সান্নিধ্য পান, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি প্রকট।) ফলে, তাঁরা একপ্রকার ছুৎমার্গের অনুসরণ করেন। এইরূপ কাঁচা ব্রাহ্মণদের হাত ধরেই তাদের এই **ছুৎমার্গ** ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যতার জন্ম দিয়েছে।

দুই) কিন্তু যাঁদের ব্রহ্মলাভ পেকে ওঠার যথেষ্ট সুযোগ ও সময় পেয়ে যায় (যেমন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ), সেই সব পাকা ব্রাহ্মণের স্পর্শভয় থাকে না। তাঁদের ক্ষেত্রে বরং উলটো ঘটনা ঘটে। তাঁদের নিষ্কলুষ পাকা ব্রহ্মগুণ তাঁদের ইচ্ছারূপে তারিত হয়ে গিয়ে পড়ে, যাকে ছুঁয়ে দেন, তার ওপর। স্পৃষ্ট-ব্যক্তি মুহূর্তে টের পায়, স্পর্শ থেকে সে কী পেল। সেই কারণে পাকা-ব্রাহ্মণেরা কাউকে স্পর্শ করে দিলে স্পৃষ্ট-ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ছিটকে যায় কিংবা সম্বিত হারায়। এই পাকা-ব্রাহ্মণেরা হলেন আরেক

প্রকারের **ছুৎমার্গী**। এই ছুৎমার্গীরা অস্পৃশ্যতাকে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

ছর্দ্ (ছড়্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আছড়া, আছাড়, ছচ্ছড়, ছট, ছটক, ছটকা, ছটকী, ছটছটানি, ছটছটি, ছটপটি, ছটফট, ছটফটা, ছটফটানি, ছটফটে, ছটরা, ছটা, ছটাক, ছটাভা, ছটি, ছড়, ছড়র-ছড়র, ছড়া, ছড়ান, ছড়ি, ছড়ী, ছরকট, ছরকুটি, ছর্দ্, ছর্দ্দ, ছর্দ্দন, ছর্দ্দি, ছর্দ্দিঃ, ছর্দ্দিকা, ছর্দ্দী, ছররা, ছল, ছলক, ছলচ্ছল, ছলছল, ছলি (ছুলি), ছাট, ছাড়, ছাড়ন, ছাড়ন্ত, ছাড়া, ছাড়ান, ছাড়ি, ছার, ছারখার, ছারপোকা, ছিট, ছিটকা, ছিটকিনি, ছিটা, ছিটকান, ছিরক, ছিরকা, ছিরিকা, ছুঁড়, ছুঁড়ী, ছোঁড়া, ছুট, ছুটি, ছোট, ছোটকি, ছোটা, ছোটাছুটি, ছোটান, ছোটি, ছোটিকা, ছোট্ট, ছোড়, ছোড়ান, ছুর্, ছুরণ, ছুরি, ছুরিকা, ছোরণ, ছোরা।

ছর্দ্ (ছড়্) = চয়নস্থিতের রক্ষণদানের দেওয়ন। **ছর্দ্দ** = চয়নস্থিতের রক্ষণদানের দান থাকে যাহাতে। **ছড়** = চয়নস্থিতের গড়ান-উড়ান যাহাতে।

আছড়া, আছড়ান, আছাড় : ২. ***আছড়া*** = ***ছড়া****র আশ্রয় যাহাতে;* ***আছড়ান*** = ***ছড়ান****র আশ্রয় যাহাতে;* ***আছাড়*** = ***ছাড়****-এর আশ্রয় যাহাতে।* ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. আছাড় খাওয়া, আছড়ে দেওয়া, আছড়ান প্রভৃতি শব্দ এতই প্রচলিত যে এর অর্থ স্বতই বোধগম্য। এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি **ছড়, ছড়া, ছাড়** শব্দে রয়েছে। এখানে তার সঙ্গে আধার যুক্ত হয়েছে মাত্র। তাছাড়া **আছাড়** শব্দটি **কাছাড়** শব্দের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আলোচিত হয়েছে **কাছাড়** শব্দের ভুক্তিতে। দ্র. **কাছাড়**।

ছট, ছটক, ছটকা, ছটকানি, ছটফট, ছটফটানি, ছটফটে (ছটকি, ছটছটানি, ছটাক) : ১. ছটক, ছটকা = ✓চট (ভেদন) > ছটক ইত্যাদি। (ব.শ.)। ২. ***ছট*** = ***ছ*** *টঙ্কারিত যাহাতে।* ***ছটক*** = ***ছট*** *করে যে।* ***ছটকা*** = ***ছটক****-এর আধার যে।* ***ছটকানি*** = ***ছটকা*** *অন রূপে গতিশীল যাহাতে।* ***ছটফট*** = ***ছ*** *টঙ্কারিত যাহাতে এবং* ***ফ*** *(স্ফ) টঙ্কারিত যাহাতে।* ***ছটফটা*** = ***ছটফট****-এর আধার যে।* ***ছটফটানি*** = ***ছটফটা*** *অন রূপে গতিশীল যাহাতে।* ৩. **ছটক** = বেগে ভিন্ন হওয়া বা ছুটিয়া যাওয়া, বিক্ষিপ্ত হওয়া, ঠিকরাইয়া যাওয়া, দল বা সঙ্গ ছাড়িয়া যাওয়া, ছটকা-চিঙড়ি। **ছটফট** = যন্ত্রণাজন্য ব্যাকুলতা, অধীরভাব, ব্যাকুল হওয়া, ধড়ফড় করা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **ছট** শব্দটি ব.শব্দকোষে নেই, নেই ছটকানি, ছটফটানি, ছটফটে। যেগুলি আছে, তার মূল ক্রিয়া হিসেবে ধরা হয়েছে 'ছো'। আমাদের মতে এই ছট শব্দের মূলে রয়েছে অহংচারী বা ছ। সেই ছ টঙ্কারিত যাহাতে, তাকে বলে ছট। অস্তিত্ব এখানে তার পরিধিতে টঙ্কারিত হয় বা আঘাত করে। সেই আঘাত করে শেষ হয়ে গেলে, তাকে বলে **ছট**, কিন্তু তার চেয়ে বেশি করে ফেললে — পরিধির রেখাকে বাইরের দিকে ঠেলে উঁচু করে দিলে, জলের ভেতর থেকে ঠেলে উঠে তার **উপরিতলের** রেখায় বুদ্‌বুদ বানিয়ে ফাটিয়ে দিতে পারলে — তাকে বলে **স্ফট বা ফট**। (দ্র. **স্ফটিক**)। এভাবে বারংবার পরিধিতে আঘাত ও **পরিধিকে ফুলিয়ে ফাটিয়ে** দেওয়া চলতে থাকলে তাকেই বলা হয় **'ছটফট'**। মানুষের বা অন্য কোনো জীবের বেলায় এই ক্রিয়ারই ব্যঞ্জনা অর্থকে বলা হয় 'ছটফট'।

নদীতে খেপলা জাল ফেলে পাড়ে টেনে আনার পর অন্য মাছ পড়লে আপনি জাল ঝাড়ার আগে বুঝে উঠতে নাও পারেন যে, কোন্ মাছ পড়েছে। কিন্তু **ছটকা**-চিংড়ি পড়লে স্থলে জালটি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে **ছট-ছট ছট-ছট** করে জানিয়ে দেয় তার অস্তিত্বের কথা। স্বাভাবিক প্রাকৃতিক মন তার সেই অস্তিত্ব-জানান দেওয়া টঙ্কারকে কিছুতেই **'ছটফট'** বলে না, বলে 'ছট-ছট'। যে-বাঙালী-পাঠক জীবনে অন্তত একবার জাল ফেলে **ছটকা**-চিংড়ি ধরেছেন, তিনি এই ছটছটানি নিশ্চয় স্বকর্ণে শুনেছেন। (ছটছটানি আর ছটফটানির এই পার্থক্য যে-মন বোঝে, সেই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক মনই শব্দ তৈরি করে, তাকে প্রসারিত করে। এই মন এখনও বাংলাভাষীদের গ্রামবাংলায় টিকে রয়েছে। আধুনিক ইংরেজি প্রভাবিত অ্যাকাডেমি এই মনটাকেই মেরে ফেলে।) আর সেকারণেই মেছো-বাঙালী এর নাম দিয়েছেন 'ছটকা-চিংড়ি'। গ্রামাঞ্চলে এমন মেয়ের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব নয়, ভাইবোনের মধ্যে যে ছোট নয়, এমনকি হয়তো-বা বাবামায়ের একমাত্র সন্তান, কিন্তু তার নাম **ছটকী** এবং সে নামটি রেখেছেন তার কোনো দাদু-দিদা। শহুরে আমরা প্রায়শই তাকে ছোটকী বা ছুটকী ভেবে ফেলি। আসলে তা 'ছটকী' এবং তার কারণ হল মেয়েটি **ছটকে** বেড়ায়। (কলিম খান ব্যক্তিগতভাবে এক গ্রাম্য বৃদ্ধাকে দেখেছেন তাঁর একটি ছটফটে 'টিলিয়া'কে অর্থাৎ 'কিশোরী-মুরগি'কে **ছটকী** নামে ডাকতে।)। এই ছট থেকেই বাকি ছটযুক্ত শব্দগুলি তৈরি হয়ে থাকে। এর মধ্যে **ছটকানি বা ছটফটানি** শব্দদুটি গ্রামবাংলায় ব্যবহৃত হয় এভাবে — 'কাটা ছাগলের মতো তার **ছটকানি** দেখে সইতে পারলাম না।' এবং 'আসার কথা ছিল সকালে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। মনের **ছটফটানি** কি আর থামে! তাই আমিই চলে এলাম।' কিন্তু হিন্দির 'ছটপূজা'র যে ছট, তা তৈরি হয়েছে ষট থেকে। বাংলায় তাকে আমরা পাই **ছটাক** শব্দে, যার অর্থ ষোড়শ ভাগ করে যে। দ্র. **চটপট, ঝটপট**।

ছটা (ছটাভা, ছাট) : ১. ✓ছো + অট (অটন্) কিৎ। (ব.শ.)। ২. ***ছটা*** = ***ছট****-এর আধার যে।* ৩. **ছটা** = দীপ্তি, প্রভা, পরম্পরা, সমূহ, চমৎকারিত্ব। **ছটাভা** = বিদ্যুৎ। (ব.শ.)। ৪. radiance অর্থে প্রচলিত। ৫. অহংচারী অস্তিত্বের টঙ্কার অন থাকে যাহাতে তাকে ছটন বা **ছটা** বলা হয়। এ হল মূল অস্তিত্বের অংশবিশেষ। আলোর ছটার স্থলে আলোই এই অহংচারী অস্তিত্ব; অর্থাৎ আলোর যে-ছটা আমরা দেখতে পাই, তাতে সেই আলোকেই আমরা দেখতে পাই। আর সে-ছটা যদি আলোর না হয়ে কাব্যের ছটা হয়, তবে তাতে সেই কাব্যের অংশকেই আমরা দেখতে পাই। বিদ্যুতের ছটার আভাকে বলে ছটাভা। ছটাভা-ই বিদ্যুৎ। আবার, ছটন হতে থাকা বা ছটন করাকেও **ছটা বা ছড়া** বলে। মোটকথা, ছটার 'ছ'-তে সেই সত্তা থাকে, যার ছটা আমরা দেখতে বা শুনতে পাই। তবে সেই ছটা যদি

তার মূল উৎস থেকে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত হয়ে পৃথক স্থান-কাল-পাত্রে অস্তিত্ব লাভ করে, তখন তাকে বলে **ছাট**, যা কিনা 'ছট হইতে জাত'।

ছড়, ছড়া, ছড়ান (ছিঁড়া, ছেঁড়া) : ১. ✓ছট্ > ছড় > ছড়া > ছড়ান। ২. **ছড়** = **ছ**-*এর (অহংচারী অস্তিত্বের, ইচ্ছাকারীর) গড়ান-উড়ান যাহাতে।* **ছড়া** = **ছড়**-*এর আধার যে।* **ছড়ান** = **ছড়া** *অন থাকে যাহাতে।* ৩. **ছড়া** = জলাদি তরল দ্রব্যের বিন্দু-বিন্দু বর্ষণ, ছিটা, গোবরজলের ছিটা, পশলা, গুচ্ছ, থোকা, হারাদির যষ্টি, ধানের গুচ্ছ বা স্তম্ব, কোনো বিষয় লইয়া রচিত গ্রাম্য কবির কবিতা, ক্ষুদ্র নদী, স্রোত। **ছড়ান** = বর্ষণ করা, ছিটান, বিক্ষিপ্ত বা বিকীর্ণ করা, বপন করা (বীজাদি), প্রসারণ করা, বিকীর্ণ হওয়া। (ব.শ.)। ৪. সমস্ত অর্থেই প্রচলিত। ৫. অস্তিত্ব নানাভাবে বিকীর্ণ হয়, এই বিকীর্ণ হওয়া বা বিকীর্ণ করাকে **ছড়া** বলে। ছড়িয়ে পড়ে বা ছড়িয়ে দেওয়া হয় কিংবা ছড়িয়ে দেওয়া যায় বলেই এই ক্রিয়াটিকে ছড়-ক্রিয়া বলে। এই ছড় ক্রিয়াটি দ্বিমুখী। অস্তিত্ব নিজেই নিজের কিছু অংশ ত্যাগ করে ছড়িয়ে দিতে পারে; আবার অন্যের গা থেকে খানিকটা অংশ তুলে নিতে পারে, যাকে বলে ছড়ে যাওয়া। (এই **'ছড়ে যাওয়া'** ক্রিয়াটিই গতিশীল ও রহস্যরূপী হলে হয়ে যায় **ছিঁড়া** বা **ছেঁড়া**।) এর মধ্যে তথাকথিত nonsense rhymes-কে যে **ছড়া** বলা হয়, তার কারণ তা গ্রাম্য কবি কর্তৃক রচিত কবিতা বলে নয়; তা অনায়াসে সর্বসাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে বলেই তাকে **ছড়া** বলে। এই **ছড়া** সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি এক্ষেত্রে স্মরণীয় — 'প্রায় প্রত্যেক ছড়ায়, প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়। ... (মেঘও তাই) ... উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ... অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলি স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশুহৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে।' এ বিষয়ে আরও কয়েকটি কথা জেনে রাখা দরকার।

'ইকড়ি মিকড়ি চাম-চিকড়ি' কিংবা 'চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে', 'তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা' — এধরনের ছড়ার অর্থ হয় না বলেই আমরা জানতাম। এইসব ছড়ায় নাকি ছন্দ মেলানোর জন্য প্রচুর অর্থহীন ধ্বন্যাত্মক শব্দ রয়েছে, কিন্তু কোনো মানে নেই। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি প্রমাণ করে, সে ধারণা ভুল। দ্র. **কাঁড়, কাদম্বিনী**। বাংলাভাষীর এই ছড়াগুলি অত্যন্ত উচ্চমানের সৃষ্টি। জ্ঞানমূলক তথ্য-তত্ত্বের দুধ পরিশীলিত হতে হতে যখন মাখন হয়ে ঘি-তে পৌঁছে যায় এবং তার থেকে একেবারে গন্ধে রূপান্তরিত হয়ে তার চূড়ান্তে বা জনশ্রুতির অমতলোকে পৌঁছে যায়; কেবল তখনই তা দিয়ে এমন সর্বজনীন ছড়া বানানো সম্ভব হয়। জ্ঞানরস গন্ধে রূপান্তরিত হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলে, তা দিয়ে এমন মালিকহীন অনামিকা (anonymous) সর্বজনীন ছড়া বানানো সম্ভব হয় না। ঘৃত (সংক্ষিপ্ততম তত্ত্ব) পর্যন্ত জ্ঞানের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে। কিন্তু জনশ্রুতিতে উত্তীর্ণ ছড়ার কোনো স্রষ্টালেখক বা মালিক থাকে না। এককালে বাংলাভাষীর যথার্থ শব্দজ্ঞান ও ক্রিয়াভিত্তিক অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই এরকম ছড়া সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ **ছড়ার** মাধ্যমে যে 'স্নেহরসে বিগলিত কল্পনাবৃষ্টি'র কথা বলেছেন, প্রাচ্যের শিশুমনে সেই বৃষ্টিজলের পরিমাণ পাশ্চাত্যের শিশুমনের তুলনায় অনেক বেশি। এই ছড়াগুলিকে 'নন্‌সেন্স' বলা ঠিক নয়, ছড়াগুলির অর্থ ও তাদের সামাজিক সক্রিয়তা তার সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। দুঃখের ব্যাপার হল, এখন **ছড়ার** সেই জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে ফেলায়, জনশ্রুতিতে থাকা এইসব ছড়ার মানেও বাংলা-ভাষীরা ভুলে গেছেন।

এছাড়া **ছড়া** শব্দের একটি গভীর সামাজিক প্রয়োগ দেখা যায় **গাঁটছড়া** শব্দে। গাঁটের পর গাঁট জুড়ে যেমন (মাছধরার) জাল বিশালাকার ধারণ করে, তেমনি মানবসমাজের যৌথতার জাল ছড়িয়ে পড়ে এই **গাঁটছড়া**-র মাধ্যমে। দ্র. **গাঁটছড়া**। তবে এই ছড়া যদি তার মূল উৎস থেকে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত হয়ে পৃথক স্থান-কাল-পাত্রে অস্তিত্ব লাভ করে, তখন তাকে বলে **ছাড়**, যা কিনা **'ছড় হইতে জাত'**। দ্র. **ছাড়**। ৬. জারমান schade (= আঘাত, কষ্ট ইত্যাদি)।

ছাড় (ছাড়ন, ছাড়ত্ত, ছাড়া, ছাড়াছাড়ি, ছাড়ান) : ১. ✓ছট্ > ছড় > ছাড় > ছাড়ন > ছাড়ত্ত > ছাড়া > ছাড়ান। ২. **ছাড়** = **ছড়** *হইতে জাত।* ৩. **ছাড়** = মুক্তি, মুক্তিপত্র, জমি ব্রহ্মোত্তর বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়ার প্রমাণপত্র, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণপত্র বা সার্টিফিকেট, বাদ দেওয়া জমি। **ছাড়া** = ত্যাগ করা, ফেলিয়া দেওয়া, রুদ্ধ না করা, বাদ দেওয়া, প্রাপ্য বিষয় ত্যাগ করা, নিক্ষেপ করা ... ইত্যাদি। **ছাড়ন** = মোচন। **ছাড়ান** = ত্যাগ করান, মুক্তি, নিষ্কৃতি ...। **ছাড়াছাড়ি** = দ্র. **কচাকচি**। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ছড়া**। অস্তিত্ব যখন নিজেকে বা নিজের অংশকে অজস্র খণ্ডে ছড়িয়ে দেয়, সেই ছড়-অন কাজটি যে মুহূর্তে অস্তিত্ব থেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হয়ে, সম্পর্কহীন হয়ে, পৃথক স্থান-কাল-পাত্রে পৃথক অস্তিত্ব হয়ে যায়, তখনই তাকে **ছাড়** বলে। দ্র. **আছাড়**। অর্থাৎ অস্তিত্ব কর্তৃক ত্যাগ করা অংশটি বা সেই ত্যাগ করা ক্রিয়াটি **ছাড়**-পদবাচ্য। এই ছাড়ের আধারকে **ছাড়া** বলে। বাদ দেওয়া বা ত্যাগ করার সঙ্গে এই **ছাড়ার** পার্থক্য হল, ত্যাগ করা বা বাদ দেওয়াতে এমন ইঙ্গিত নেই যে, যাকে ত্যাগ করা হচ্ছে বা বাদ দেওয়া হচ্ছে সে ত্যাগীর অংশ। কিন্তু ছাড়া-তে যাকে ছাড়া হচ্ছে, সে ত্যাগীর (অহংচারীর বা ছ-এর) অংশ। ৬. ইংরেজি scatter, shatter।

ছিট (ছিটকা, ছিটকান, ছিটকিনি, ছিটগ্রস্ত, ছিটা, ছিটাফোঁটা) : ১. ✓ছট > ছিট > ছিটকা > ছিটকান ইত্যাদি। ২. ***ছিট*** = *ছ (অহংচারী, ইচ্ছাকারী) গতিশীল হয়ে টঙ্কারিত হয় যাহাতে।* ***ছিটকা*** *=* ***ছিট*** *করে যে, তাহার আধার।* ***ছিটকান*** *=* ***ছিটকা*** *অন থাকে যাহাতে।* ***ছিটকিনি*** *=* ***ছিটকান*** *গতিশীল থাকে যাহাতে।* ***ছিটগ্রস্ত*** *=* ***ছিট*** *দ্বারা আগ্রাসিত যে।* ***ছিটা*** *=* ***ছিট****-এর আধার যে।* ***ছিটাফোঁটা***

= ***ছিটা*** ***ও*** ***ফোঁটা***। ৩. **ছিট** = রঙ-বিরঙের বেল-বুটাদার বা নক্সার ছাপ দেওয়া কাপড়, জলকণ, দ্রবদ্রব্যমাত্রের বিন্দু, অবশিষ্ট ভাগ, শেষ, ক্ষুদ্র, ফড়কি, টুকরা, সরু ডাল। **ছিটকা** = ছটকা, ছিটকান। **ছিটকিনি** = কপাট মুক্ত রাখার নিমিত্ত চৌকাঠে লগ্ন কাষ্ঠখণ্ড। **ছিটা, ছিটে** = প্রক্ষিপ্ত জলবিন্দু, মন্ত্রপূত জলাদির ছাট, বর্ষণ, প্রক্ষেপ, ছড়া, বিন্দু, বন্দুকের ছটরা, মাদকবিশেষের ছোট বড়ী, লম্বা ফালি; বর্ষণ করা, প্রক্ষিপ্ত করা, ছড়ান, বপন করা, বোনা। **ছিটাফোঁটা** = বৃষ্টির দু-এক ছিটা ও ফোঁটা, তরল দ্রব্যের অত্যল্প মাত্র, বশীকরণার্থ পড়া জলের ছিটা ও মন্ত্রপূত ঔষধের তিলক। (ব.শ.)। ৪. scatter in minute parts অর্থে প্রচলিত। ৫. উপরোক্ত অর্থগুলি থেকে ছিট শব্দটির কেবলমাত্র দৈহিক অর্থই প্রচলিত আছে বলে মনে হয়; যাতে ধারণা হয় জল বা জলজাতীয় কিছু ছড়িয়ে দেওয়াই ছিটান শব্দের মানে। কিন্তু যে রস চোখে দেখা যায় না, মন দিয়ে দেখতে হয়, তেমন রসের ছিটাও তো হতে পারে। হয় বলেই ব.শ. উদাহরণ দিচ্ছেন — 'করুণ রসের একটু ছিটে'। এ ছিটে-তে মনের রঙের জলবৎ তরল রসের ছিটে থাকে। বিষয়টি একটু বিস্তারিত করা দরকার।

মানুষের মানসলোকে বা মস্তিষ্কে 'ইচ্ছাচারীর নানান গতিশীল টঙ্কার' (ছিট) থাকে। এগুলোর স্পর্শবাহী, রসবাহী, গন্ধবাহী প্রকাশ থাকলেও সেগুলিকে আমরা চিনতে পারি না, কিন্তু রূপবাহী ও শব্দবাহী বা শাব্দিক প্রকাশগুলিকে কমবেশি চেনা যায়। আওয়াজের সাহায্যে সেই ছিটের প্রকাশই আমাদের সমগ্র ভাষাজগৎ; আমাদের গল্পগাছা, কথাবার্তা, কাব্য, মহাকাব্য সবই। আর, সেই ছিটের রূপবাহী প্রকাশ হল আমাদের সমগ্র দৃশ্যজগৎ; আমাদের ছবি-ছাবা, রঙিন সবকিছুই। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '... মনের রঙে পান্না হল সবুজ'। কাপড়েও সেরকম রং ছিটান থাকে বলে তাকে বলা হয় 'ছিট কাপড়' বা কাপড়ের **ছিট**। এই হিসেবে সকল মানুষের মনই ছিটগ্রস্ত। কিন্তু তাই বলে সব মানুষকে 'ছিটগ্রস্ত' বলে না। সমাজ মানুষের মনের যে-ধরনের ছিটগুলিকে স্বাভাবিক, সমাজ-স্বীকৃত, ন্যায্য, সঠিক বলে মনে করে, অধিকাংশ মানুষের মস্তিষ্ক সেইভাবেই 'প্রকল্পিত' (programmed) করা থাকে। তাঁরাও 'ছিটগ্রস্ত', কিন্তু তাঁদের 'ছিটগ্রস্ত' বলে নিন্দা করা হয় না এই কারণে যে, তাঁদের ছিটগ্রস্ততা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত। যাদের মনের রং সেই 'প্রকল্পিত' বা 'স্বীকৃত' ছিটগ্রস্ততার বাইরেও সক্রিয় থাকে, কেবল তাদেরই 'ছিটগ্রস্ত' বলে নিন্দা করা হয়। তার মানে, মানুষের মনের আকাশে যদি একশো প্রকার ছিট থেকে থাকে এবং সমাজ তার ভিতরে আশিটি ছিটকে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, তাহলে বাকি কুড়ি শতাংশ ছিট স্বীকৃতিহীন। এই কুড়ি শতাংশ ছিটগ্রস্ত মানুষকেই সমাজ 'ছিটগ্রস্ত' বলে নিন্দা করে থাকে। বাকি আশি শতাংশ ছিটগ্রস্ত মানুষকে ছিটগ্রস্ত বলা হয় না। যদিও ফরাসি লেখক ফুকোর মতো চিন্তাবিদগণ আশি শতাংশ মানুষকেই ছিটগ্রস্ত বলেছেন এবং কুড়ি শতাংশ মানুষকে বলেছেন স্বাভাবিক মানুষ। যার যেমন দৃষ্টিভঙ্গি! ব.শব্দকোষও 'পাগলের ছিট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মনে রাখা ভালো, আবিষ্কার বা সৃষ্টির সামাজিক স্বীকৃতি লাভের আগে আবিষ্কারক-স্রষ্টাদেরকেও **ছিটগ্রস্ত** বলা হয়ে থাকে।

তা সে যাই হোক, আমরা দেখছি, 'ভালবাসা'র মতো 'ছিটগ্রস্ত' শব্দটিও আধুনিক বাংলাভাষীর বানানো ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ। আর, ছিটকে গিয়ে আটকে যায় বলে বিশেষ ধরনের দরজার খিলকে **ছিটকিনি** বলে। ৬. ইংরেজি skit।

ছুট (ছুটি, ছোট, ছোটকি, ছোটখাট, ছোটা, ছোটাছুটি, ছোটান, ছোট্ট) : ১. ✓ছট্ > ছাট > ছিট > ছুট > ছোট। ২. ***ছুট*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ছ (অহংচারী অস্তিত্ব) টঙ্কারিত যাহাতে।* ***ছুটি*** = ***ছুট*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ছোট*** = ***ছুট***, *উচ্চারণ সুবিধার্থে ছোট।* ***ছোটকি*** = ***ছোট****-কৃত গতিশীল যাহাতে।* ***ছোটখাট (ছোটোখাটো)*** = *ছোট এবং 'খাট' ('***ক্ষ*** *করে নেওয়ার ফলে বা খাবলে নেওয়ার ফলে টঙ্কার যাহাতে =* ***ক্ষট***, *তাহা হইতে জাত।' ছোটো এবং খাটো)।* ***ছোটা*** = ***ছোট****-এর আধার যে।* ***ছোটাছুটি*** = ***দ্র. কচাকচি***। ***ছোটান*** = ***ছোটা*** *অন যাহাতে।* ***ছোট্ট*** = ***ছু****-এর (= নবরূপে উত্তীর্ণ ছ-এর) টঙ্কার টঙ্কারিত যাহাতে। /* **ছুট** = যাহা ছাড় যায়। (ব.শ.)। ৩. **ছুট** = দৌড়, পরিত্যাজ্য অংশ, অতিরিক্ত ভাগ, বাদ, চুল বাঁধার নিমিত্ত বিনান চুলের সূতা বা সরু দড়ি, পরিধেয় বস্ত্র; বেগে যাওয়া, দ্রুত যাওয়া, ধাবিত হওয়া, দৌড়ান, বেগে বহিত্র চালিত হওয়া, বেগে চালিত হওয়া, লোপপ্রাপ্ত হওয়া, দূর হওয়া, ছাড়া, বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া, ছাড়া পাওয়া, স্খলিত হওয়া, শিথিল হওয়া, উদঘাটিত হওয়া, খুলা, বিচ্ছিন্ন হওয়া, ছাড়িয়া যাওয়া, বিলীন হওয়া, ভাঙিয়া যাওয়া। **ছোট** = হ্রস্বাকৃতি, অল্পবয়স্ক, নীচ, অধম, সামান্য, তুচ্ছ, নগণ্য, হীন, দরিদ্র, কনিষ্ঠ, অনুদার, ইতর, খর্ব্ব, বেঁটে। **ছোটকি** = তালবিশেষ। **ছোট্ট** = ছোট (আদরসূচক), কনিষ্ঠ, ক্ষীণ, সরু।(ব.শ.)। **ছুটি** = ফুরসত, অবসর, অবকাশ, দৈনিক কর্মসূচির অবসান (অফিসের ছুটি)। পর্বাদি উপলক্ষে নির্দিষ্ট কাজের বিরাম (ঈদের ছুটি), কর্ম থেকে কিছুকালের জন্য অবসর, কর্ম থেকে স্থায়ীভাবে অবসর, চির বিদায়, নিষ্কৃতি, খালাস (কয়েদির ছুটি)। (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ঢাকা একাডেমী)। ৪. সবগুলিই প্রতীকী অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দটির মূলে যে ক্রিয়াটি রয়েছে, সেটি ব.শ. ঠিক নজর করেছেন। তাই ছুট শব্দের তিনি ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়েছেন — 'যাহা ছাড় যায়'। মূলকে ছেড়ে কেউ যদি পৃথক হয়ে চলে যায়, সেটিই **ছুট**। হিন্দি ভাষায়, গণনার সময় ধরা যাক 'তিন' বাদ থেকে গেল; তাঁরা বলবেন, 'তিন ঠো ছুট গিয়া'। এই **ছুট** যথার্থ। এতে নবরূপে উত্তীর্ণ চারী-অস্তিত্ব, যা কিনা মূল অস্তিত্ব থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে বা থেকে গিয়েছে, তার টঙ্কার বোঝায়। মূল অস্তিত্ব থেকে এভাবে তার যত ক্ষুদ্রাংশগুলি ছেড়ে যায়, চলে যায়, ছুটে যায়, সেগুলি সবই ছুট বা ছোট (দৌড়) বা ছোট (ক্ষুদ্র)। আর, সেগুলি গতিশীল থাকলে হয় **ছুটি**। এর একটি অর্থ 'দৌড়ই', আর একটি অর্থ 'অবকাশ'। অবকাশ অর্থে ছুটির বানান হওয়া উচিত **'ছুটী'**, কারণ তা **'ছুটি'**র আধার। ঠিক সেভাবেই 'দৌড়-দৌড়' বলে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, তার বানান হওয়া উচিত 'ছোট'; কারণ তা **'ছুট-ছুট'** শব্দেরই একটি রূপ। এতে মূল থেকে বেরিয়ে দ্রুতগতিতে অন্যত্র চলে যাওয়া বোঝায়। কিন্তু ক্ষুদ্র অর্থে যে ছোট শব্দের ব্যবহার হয়, তার বানান হওয়া উচিত **ছোটো**। এই ছুটি শব্দটি ব.শ.-তে নেই, আমরা ঢাকা

একাডেমীর ব্য.বা.অভিধান থেকে তার প্রতীকী অর্থগুলি দিলাম। সংসদ বাংলা অভিধানও প্রায় একই অর্থ দিয়েছেন। ৬. ইংরেজি shoot (= অঙ্কুর)।

ছুড়, ছুড়ী, ছোড়া (ছুঁড়, ছুঁড়ী, ছোঁড়া) : ১. ✓ছট্ > ছড় > ছাড় > ছাড়ন > ছাড়ন্ত > ছাড়া > ছাড়ান > ছিড় > ছুড় > ছোড় > ছোড়া। **২. ছুড়** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ছ-এর (অহংচারীর) রহস্যরূপের গড়ান-উড়ান যাহাতে।* **ছুড়**-*এর স্ত্রী-আধার যে। নবরূপে উত্তীর্ণ ছ-এর সর্বপ্রকার রহস্যরূপের গড়ান-উড়ান যাহাতে।* **৩. ছুড়** = ক্ষিপ্ত করা, নিক্ষেপ করা, ছোড়া, বিক্ষেপ করা। **ছুঁড়ী** = (অবজ্ঞায়) বালিকা, তরুণী। **ছোঁড়া** = বালক, ছোকরা, যুবা। **ছোড়া** = মোচন করা, ত্যাগ করান, ছাড়ান। **৪.** যথাক্রমে throw, girl, boy অর্থে প্রচলিত। **৫. দ্র. ছড়, ছাড়, ছুট**। ছড়ে যাওয়া গতিশীল হলে বলা হয় ছিড়ে যাওয়া। অহংচারী অস্তিত্বের বা ছ-এর উপর এই ক্রিয়াগুলি ঘটে তার বাইরে থেকে। কিন্তু সেই ছ নবরূপে উত্তীর্ণ হলে, ছু হয়। তখন তা মূল থেকে বেরিয়ে বর্হিদেশের উদ্দেশ্যে দৌড়য়। ছু-এর গড়ান-উড়ান চলে যাতে, তাকে বলে ছুড়। বংশের অংশ নিঃসারিত হয় ছুড়ার বা ছোড়ার মাধ্যমে, তাই সন্তান-সন্ততিকে ছোড়া বা ছুড়ী বলে। এক্ষেত্রে প্রায়শই চন্দ্রবিন্দুর প্রয়োগ হতে দেখা যায়। সেই প্রয়োগকে সঠিক বলে মেনে নিলে, এর ভিতরে অংরূপিণী পরমাপ্রকৃতির শক্তিরূপের কোনো না কোনো রহস্যরূপ থাকার কথা। সেরকম কিছু চোখে না পড়ায় আমরা এগুলিকে চন্দ্রবিন্দুহীন বানানেই লিখেছি। তবে বন্ধনীর ভেতরে চন্দ্রবিন্দুসহ বানান রাখা হল ভবিষ্যতের কথা ভেবে। হয়তো ভবিষ্যতে দেখা যাবে, চন্দ্রবিন্দু বানানটিই ঠিক।

ছিদ্ (ছিদ্র) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অচ্ছিদ্র, অচ্ছিদ্রাবধারণ, অচ্ছিন্ন, অচ্ছেদ, অচ্ছেদ্য, অবচ্ছিন্ন, অবিচ্ছিন্ন, আছিদর, আচ্ছিদ্র, আচ্ছিন্ন, আছাটা, ছাঁট, ছাঁটা, ছাট, ছাটনি, ছাটা, ছাটাই, ছাটাছোটা, ছাটান, ছান, ছানা, ছানুবানু, ছান্‌তা, ছি, ছিঁচকা, ছিঁচকাচোর, ছিঁচকাঁদুনে, ছিঁড়, ছিঃ, ছি-ছি, ছিছিক্কার, ছিত্তি, ছিদ, ছিদ্র, ছিদ্রিত, ছিনা, ছিনাজোঁক, ছিনান, ছিনাল, ছিন্ধি, ছিন্ন, ছিণ্ড, ছিন্নভিন্ন, ছিন্নমস্তা, ছিয়া, ছিয়াকাঠ, ছেঁড়া, ছেঁড়াখোড়া, ছেঁড়ান, ছেঁদা, ছেত্তা, ছেদ, ছেদন, ছেদ্য, ছেনি, ছেনী, ছেয়া, ছেয়ানি, দুরুচ্ছেদ, নিরবচ্ছিন্ন, বিচ্ছেদ, ব্যবচ্ছিন্ন, ব্যবচ্ছেদ, সচ্ছিদ্র, সমুচ্ছিন্ন। **ছিদ্ (ছিদ্র)** = ছ-এর (অহংচারী অস্তিত্বের) গতিশীল দান। **ছিদ** = ছ-এর গতিশীল দান থাকে যাহাতে। **ছিদ্র** = ছিদ (আবর্ত্তমান) রহে যাহাতে। (এই দান donation নয়, দেওয়া-মাত্র বা রেখে দেওয়া বোঝায়।)

ছি, ছিঃ, ছিছি, ছিছিক্কার : ২. ছি = *ইচ্ছাচারী গতিশীল যাহাতে।* **ছিঃ** = **ছি**-*এর নিঃশেষ যাহাতে।* **ছিছি** = *ইচ্ছাচারীর গতিশীলতা বারংবার থাকে যাহাতে।* **ছিছিক্কার** = *যাহাতে ছি ছি করা হয়।* **৩. ছি** = ধিক্কারে, নিন্দায়, ঘৃণায়, লজ্জায়। **ছি-ছিক্কার** = ধিক্‌ধিক্-কার, ছি-ছি বলা। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** অস্তিত্ব থেকে তার ইচ্ছা কোনো বস্তু, বিষয়, শব্দ, থুতু, কথা, ফুঁ-বাতাস ইত্যাদিতে ভর করে যদি কারও প্রতি নিঃসারিত হয়, তাকে ছি বলে। এর মূল অর্থ 'ছ গতিশীল যাহাতে।' এই ছ বা ইচ্ছা লজ্জামূলক, ঘৃণামূলক, নিন্দামূলক হতে পারে। দ্র. **ধিক**।

ছিদ্র (ছিদ্রিত, ছিন্ধি, ছেঁদা) : ১. ✓ছিদ্ + র (রক্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ছিদ্র** = *ছিদ আবর্ত্তমান রহে যাহাতে।* **৩. ছিদ্র** = ভূগর্ভস্থ গর্ত্ত, রন্ধ্র বিবর, বিল, অবকাশ, দেহস্থ কর্ণাদিবিবর, বস্ত্রাদির ছিন্নস্থান, ফুটা, সন্ধি, ভিত্তিভেদ, বিঘ্ন, ব্যাঘাত, দূষণ, দোষ, লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান, সুযোগ। **ছিন্ধি** = ছেদন কর, কাট। **ছেঁদা** = ছিদ্র, রন্ধ্র ছিদ্রযুক্ত, সচ্ছিদ্র। (ব.শ.)। **৪.** hole অর্থে প্রচলিত। **৫. ছদ**-এর বেলায় আমরা দেখেছি, বকুলফুল পড়ে পড়ে যে আস্তরণ হয়ে গেছে, সেইরকম আস্তরণকে **ছদ** বলে। হিম-আলয়ে বরফ পড়ে পড়েও এরকম হয়ে থাকে। পাতায় ঢাকা ঘরের উপরও এরকম আস্তরণ পড়তে পারে। কিন্তু সেই বরফ যদি মিহি তুষারপাত না হয়ে শিলাবৃষ্টি হয়, তাহলে কী হয়? তাহলে, যেখানে পড়ে সেখানে ফুটো হয়ে যায়। একেই **ছিদ** বলে। কারণ, এতে **ছ** (ইচ্ছাচারী অস্তিত্ব) গতিশীল রূপে দান করে। ফলে দানক্ষেত্রটি ছিন্ন বা ফুটো হয়ে যায়। এই ছিদ বা ফুটো-স্থানটি যদি আবর্ত্তমান রহে, তবে তাকে ছিদ্র বলে। তবে এ-সবই দৃশ্য ছিদ্র। অদৃশ্য ছিদ্রই সেকালের বিবেচনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেই অদৃশ্য ছিদ্রগুলি হয় আমাদের **কাশ**-এ, যাকে আমরা অবকাশ বলি। হয় আমাদের জীবনের চলার পথে, যাকে আমরা বিঘ্ন বা ব্যাঘাত বলি। এগুলি হল আমাদের কর্ম্ময়-কালের মাঝে সৃষ্টি হওয়া ফাঁক বা ছিদ্র (অবকাশ), চলমান জীবনযাত্রার ফাঁক বা ছিদ্র (বিঘ্ন)।

ছিনা (ছিনাজোঁক, ছিনাল) : ১. ছিন্ন - মূল। (ব.শ.)। **২. ছিনা** = *ছিন্ন করে যে।* **৩. ছিনা** = ছিন্ন করিয়া লওয়া, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা, কাড়িয়া লওয়া। **ছিনাজোঁক** = তৃণস্থিত জলৌকাবিশেষ, চিনাজোঁক, ছিনেজোঁক। **ছিনাল** (ছিনার, ছিন্নাল, ছিন্নালী) = জারস্ত্রী, ব্যভিচারিণী, ব্যাভিচার, লাম্পট্য। (ব.শ.)। **৪.** taking by force, abduction অর্থে প্রচলিত। **৫.** ছিনিয়ে নেওয়া কথাটি খুবই প্রচলিত শব্দ। কিন্তু আমাদের মনেই থাকে না যে, শব্দটি বাংলাভাষী 'ছিন্ন' শব্দ থেকেই বানিয়ে নিয়েছেন। দ্র. **ছিন্ন**। ছিনাজোঁক হল সেই প্রকারের রক্তচোষা জীব, যে কিছুতেই ছাড়ে না, ছিদ্র করে রক্ত বার করে শোষণ করে নেবেই। ব.শ. একে 'বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা' বলেছেন। শব্দটি দুভাবে প্রযুক্ত হয়। প্রথমত, বিশেষ ধরনের জলৌকাকে বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত। এই জীবটি একবার গায়ে চিপকে গেলে কিছুতেই ছাড়ান যায় না, গায়ে ছিদ্র করে, ছিন্ন করে, রক্ত চুষে নিয়ে, ছিনিয়ে (ছিন্নিয়ে) নিয়ে তবে ছাড়ে। এই কারণে তাকে ছিনেজোঁক বা ছিনাজোঁক বলে। মানুষের সমাজেও এইরকম কিছু লোক রয়েছে, যারা ছিনেজোঁকের মতো অন্যের সামাজিক সত্তার গায়ে চিপকে গিয়ে তার সম্পদ হরণ করে তবে ছাড়ে। তাদেরও

ছিনাজোঁক বলা হয়ে থাকে। আর, **ছিন্নাল** বা **ছিনাল** যে নারীদের বলা হয়, তারা পরিবার থেকে পুরুষকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় বলে মনে করা হয়। সেকারণেই তাদের ছিনাল বলে। তবে এ হল পরিবারের সদস্যদের চোখে দেখা এবং স্বভাবতই একদেশদর্শী। ৬. ইংরেজি skin।

ছিন্ন (ছিন্নভিন্ন, ছিন্না, ছেঁড়া, ছেঁড়াখোঁড়া, ছানা) : ১. ✓ছিদ্‌ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ছিন্ন** = *যাহাকে ছেদন করা হইয়াছে।* **ছিন্নভিন্ন** = *যাহাকে ছেদন ও ভেদন করা হইয়াছে।* **ছিন্না** = *ছিন্নের (স্ত্রী)-আধার যে; (অথবা, যে স্ত্রীলোক পরিবার থেকে বিচ্ছিন্না কিংবা যে স্ত্রীলোক পরিবারকে ছেদন করে।)।* **ছেঁড়াখোঁড়া** = *যাহাকে ছিন্ন করা হইয়াছে এবং যাহাকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে।* **ছানা** = *যাহাকে ছিন্ন করা হইয়াছে তাহার আধার।* ৩. **ছিন্ন** = কৃত্ত, লূন, কৃতচ্ছেদন, খণ্ড, খণ্ডিত, বিভক্ত, নিরাকৃত, ব্যাহত। **ছিন্না** = পুংশ্চলী, কুলটা, গুড়ূচী। **ছেঁড়া** = ছেদন করা, কাটা, ছিন্ন করান। **ছেঁড়াখোঁড়া** = ছিন্নখণ্ডিত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন। **ছানা** = অম্লযোগে ছিন্ন (ছেঁড়া) দুধ হইতে জাত পিণ্ডাকার দ্রব্য, ছা, শাবক, বাচ্চা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ছড়্‌**। ছিদ্‌ করতে করতে একটি তল যে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, **ছিন্ন** হয়ে যায়, তা সকলেই জানেন। কিন্তু যেকথাটি আমরা সহজে বুঝতে পারি না, তা হল, **ছানা** বলতে সন্তানসন্ততি এবং দুধজাত-ছানা একই সঙ্গে বোঝায় কীভাবে! যাকে আচ্ছাদন করে রাখা হয়, সে আচ্ছাদিত বা ছা হতে পারে। কিন্তু ছানা হতে পারে না। তার জন্য সন্তানসন্ততির সঙ্গে 'ছিন্ন' ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকতে হবে। 'নাড়ী-ছেঁড়া দুলাল আমার' — এমন ধরনের বাক্যের প্রয়োগ হতে আমরা দেখেছি গ্রামবাংলায়। ধানগাছের নাড়া বা নাড়ী গ্রামে সবাই চেনেন। সন্তানসন্ততিকে মাতৃজঠরের নাড়ী ছিন্ন করেই পৃথক অস্তিত্ব লাভ করতে হয়। সেই সুবাদে ছানা শব্দে 'সন্তান' বোঝানো যেতেই পারে। কিন্তু দুধজাত-পিণ্ডদ্রব্য বোঝায় কীভাবে!

দাবাড়ুর গল্পটি অনেকেই জানেন। বারংবার চায়ের সরবরাহ করে বীতশ্রদ্ধ গিন্নি। তাঁর নির্দেশমতো চাকর এসে জানাচ্ছে — বাবু, দুধ ছিঁড়ে গেছে, আর চা হবে না। বাবু দাবায় ডুবে থেকেই উত্তর দিচ্ছেন, ছিঁড়ে গেছে তো গেরো দিয়ে জুড়ে নে-না বাবা।

হ্যাঁ, দুধ ছিঁড়ে যায়; ছিন্ন হয়। **ছিন্ন** হয়ে যে বস্তুতে পরিণত হয়, তাকে সেকারণেই ছানা বলে। ব.শ. ছানা শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে প্রথমেই লিখেছেন শব্দটির মূলে 'ছিন্ন' ক্রিয়া রয়েছে। সম্ভবত তারপরও তিনি নিশ্চিত হতে পারেননি; তাই বন্ধনীর ভিতরে একটি জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে গেছেন তিনি। আজ আমরা নিশ্চিত, ছিন্ন থেকেই ছানা কথাটি বাংলাভাষী তৈরি করেছিলেন। 'ছিন্নিত' মানে ছানা।

তবে এখানেই বিষয়টিকে শেষ করে দেয়া যাচ্ছে না। এই **ছিন্ন** বা ছিঁড়ে যাওয়ার ভাবটি কী রকম যে, দুধের মতো তরল বস্তুও ছিঁড়ে যেতে পারে ব'লে ধারণা হয়েছিল বাংলাভাষীর? দ্বিতীয় কথা দুধ ছিন্ন হয়ে ছানা হয়, এই ধারণায় তাঁরা পৌঁছলেন কীভাবে? তৃতীয় কথা হল, সারা ভারতে ছানা খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল কেন? চতুর্থত বাংলাভাষীগণ সেই ছানা কেবল খায়নি, তা দিয়ে রসগোল্লা বানিয়ে বস্তুটিকে তার জাতিচিহ্নে উত্তীর্ণ করতে পারল কী করে?

সবার আগে জানা দরকার, **ছিন্ন** হওয়া বা ছিঁড়ে যাওয়া বলতে ঠিক কী বুঝতেন প্রাচীন বাংলাভাষীরা। আমরা জানি, ছিন্ন কথাটির ভিতরে ছিদ (ফুটো করা, ছেদ করা, ছিদ্র) কথাটি রয়েছে। কোনো অবয়ব ছিদ্রের মাধ্যমে **ছিন্ন** হতে পারে। শতচ্ছিন্ন মানে যাতে অজস্র ছিন্ন বা ছিদ্র রয়েছে। তবে সেই ছিদ্রগুলি যদি টানাভাবে বা তির্য্যকভাবে (horizontally) পরপর পাশাপাশি হয়, অথবা একটি মাত্র ছিদ্রই ক্রমশ খুব বড় হয়ে যায়, তখন ছিন্ন অবয়বটি আর শুধুমাত্র ছিন্ন থাকে না, দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় অর্থাৎ ভিন্ন হয়ে যায়। একে বলা হয় **'ছিন্নভিন্ন'**। একে **'ফুটো-ফাটা'**ও বলা হয়ে থাকে।

একটুখানি চিনির রস টেবিলে ফেলে দিন। শুকিয়ে গেলে তুলুন, পাতলা চাদরের মতো উঠে চলে আসবে। কিন্তু সেই রসে খানিকটা গোটা-মুগডাল-জাতীয় কিছু মিশিয়ে টেবিলে ফেলে দিন, শুকিয়ে গেলে তোলার চেষ্টা করুন; দেখবেন প্রতিটি দানার স্থান যেন ঐ চিনির রসের চাদরের মাঝে একটি করে ছিদ্র করে দিয়েছে এবং চাদরটি ঐ ছিদ্র-বরাবর ছিঁড়ে ছিঁড়ে উঠছে। অবশ্য, এরকম দানার সাহায্যে ছিদ্র না করে অন্যভাবেও কাজটি করা যায়। যদি রসের সারাংশ বিভিন্ন বিন্দুতে নিজে থেকেই পুঞ্জীভূত হয়ে রসের তুলনায় কঠিন চেহারা নিয়ে নেয়, সেক্ষেত্রেও ঐ বিন্দুগুলি ছিদ্রের ভূমিকা গ্রহণ করবে।

আর, ঠিক সেটাই ঘটে দুধে অম্ল দিয়ে দিলে। দুধের সার-অংশ দুধের ভেতরে অজস্র বিন্দুতে পুঞ্জীভূত হয়ে দুধের তুলনায় কঠিন রূপ নিয়ে নেয়। অজস্র বিন্দুতে পরিণত এই সারাংশকে একত্র করে ফেললে একদিকে বিন্দুগুলি বা ছিদ্রগুলি (ছিন্ন স্থানগুলি) জমা করা হয়ে যায়, অপরদিকে সারাংশহারা-দুধ পাতলা জলের মতো পৃথক হয়ে যায়। এই জমা-করা বস্তুকে বলে ছানা এবং সারাংশ খোয়ানো পাতলা জলকে বলে 'ছানা কাটা জল'। অর্থাৎ দুধে অম্ল দিয়ে দিলে তা ক্রমে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় — প্রথম ভাগে যায় ছিদ্রে ছিদ্রে ছিন্নিত বা ছানা এবং দ্বিতীয় ভাগে যায় ছানা-কাটা জল। একে ছিন্নিত ও ভিন্নিত কিংবা ছানা-ভানাও বলা যেতে পারত।

তবে তেমন 'ছানা-ভানা' শব্দ আজও বাংলাভাষী তৈরি করেননি। কিন্তু দুটো শব্দকে পৃথকভাবে ব্যবহার করতে ভোলেননি তাঁরা। গ্রামবাংলার কোনো ধানকলে যান, যেখানে গ্রামের মানুষেরা শুকনো ধান নিয়ে আসেন, তা ভাঙিয়ে চাল করার জন্য। একে তাঁরা বলেন দুভাবে। কেউ বলেন 'ধান ভানাতে এসেছি', কেউ বলেন 'ধান ভাঙাতে এসেছি'। অর্থাৎ ধান-ভানানো ও ধান-ভাঙানো। একই কাজকে দুভাবে বলা হয় সম্পূর্ণ ন্যায্য কারণে। সেদ্ধ-শুকনো ধান **ভঙ্গ** করে চাল ও তুষ আলাদা করা যায়, তাই ধান-ভাঙানো। আবার, ধানকে ভেদ করে চাল তুষ **ভিন্ন** করে চাল ও তুষ আলাদা করা যায় বলে বলা হয় ধান-ভানানো। দুটোই ঠিক কথা। তাছাড়া 'ধান ভানতে শিবের গীত' প্রবাদের পাশাপাশি ঢেঁকির গান তো এখনও আছেই — 'ও ধান ভান রে ভান রে সখি, গান শুনি।'

তা সে যাই হোক, আমরা দেখছি, কোনো বস্তু, তা সে কঠিন বা তরল যেমনই হোক, তার ভেতরে ছিন্ন হওয়ার বা ছিঁড়ে যাওয়ার ধারণা থাকতেই পারে। রসায়নশাস্ত্রে এর যথার্থ শব্দ হল coagulate। সেকারণেই 'দুধ ছিঁড়ে গেলে ছানা হয়' বলে তাঁদের মনে হয়েছিল।

কিন্তু সেকালের মানুষ তো একালের মতো খণ্ডিত বোধের অধিকারী ছিলেন না। তাই, কেবল গোরস ও তার ছিঁড়ে যাওয়া ছানাতেই তাঁদের ধারণা সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁরা একই সঙ্গে সর্বপ্রকারের গো-রস এবং তার থেকে জাত ছানাকেও শনাক্ত করেছিলেন। সেই শনাক্তকরণের কারণে উৎপন্নের প্রবাহের বা গোরসের মধ্যে অম্ল বা আমিত্বের টক প্রয়োগ করে ধনসম্পদ বানাতে নিষেধ করেছিলেন সেকালের বেদবাদীগণ। বাংলাভাষীদের সমাজ তা মানেনি। তাঁরা ছানা খেয়েছিলেন। ... গোপাল-দেবপাল-ধর্ম্মপালের যুগে বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করেছিলেন। মাঝে কিছুদিন তাঁদের এই প্রচেষ্টা নানা কারণে প্রতিহত হলেও পাঠান রাজত্বের ছত্রছায়ায় বৈষ্ণবযুগে পুনরায় বাঙালী ছানা বানায় ও খায়; এবং সেই ছানাকে রসগোল্লায় উত্তীর্ণ ক'রে বাঙালীর জাতিচিহ্নে পরিণত করে ফেলে। কিন্তু তাই বলে তারা কুবের-সাধনা করতে রাজি হয়নি, করেছিল লক্ষ্মীসাধনা। বেদবাদীদের অস্বীকার করে লক্ষ্মীসাধনা করবার মানসফল বাঙালীর জীবনযাত্রার সব ক্ষেত্রেই ফলে।

ছিন্নমস্তা : ২. ***ছিন্ন** মস্তক যাঁহার (যে প্রকৃতি শক্তির)।* **৩.** দশমহাবিদ্যার অন্যতমা। ইনিই প্রচণ্ড চণ্ডিকা নামে খ্যাতা। ... ইনি বাম হস্তে নিজের মস্তক ধারণপূর্বক লৌল্য জিহ্বা দ্বারা নিজের কণ্ঠনিঃসৃত রক্তধারা পানে নিরত। ... ইনি মুণ্ডমালা বিভূষিতা হয়ে রতি ও কামের উপরে দণ্ডায়মানা। বাম ও দক্ষিণ হস্তে নরকপাল ও কর্তরী। গলায় নাগ-যজ্ঞোপবীত ও মুণ্ডমালা। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। কেবল যে বাংলাভাষীরা এখনও 'ছিন্নমস্তা'দেবীর পূজা করেন, তাঁদের মহলে দেবীর নামরূপে প্রচলিত। **৫.** *দ্র.* **কালী, চণ্ডী, মহামায়া।** এই দেবীর চেহারাটি আগে ভাল করে দেখুন। কাম (শিব) নীচে শুয়ে আছেন, তাঁর উপরে 'বিপরীত-রতাতুরা' (পুরাণাদিতে শব্দটি ঠিক এরকমই রয়েছে।) হয়ে (সঙ্গম-অবস্থায়) রয়েছেন রতি (শক্তি)। এর উপরে দাঁড়িয়ে আছেন ছিন্নমস্তা, যাঁর মাথা নেই, মাথাটি কেটে নিজের হাতেই তিনি তুলে নিয়েছেন এবং সে-মাথা উপর দিকে হাঁ করে রয়েছে, আর কাটা-গলা থেকে উত্থিত রক্ত এসে পড়ছে সেই মুখে। ... এর অর্থই আমাদের জানতে হবে। যাঁরা মনে করেন, এসব সেকালের মূর্খ মানুষদের অশ্লীল নিষ্ঠুর কল্পনা, তাঁদের এসব বিষয়ের মানে বোঝার দরকার নেই।

বিদ্রোহী চেতনাকে, বিদ্রোহী জনসাধারণকে **চণ্ডী** বলে কেন, তা কমবেশি আমরা জেনেছি। কিন্তু সেই চণ্ডীর ছিন্নমস্তা রূপ কোনটি, তা বোঝা একটু কঠিন। আমরা বিদ্রোহী চেতনার তিনটি সম্মুখী ও দুটি বিমুখী উদাহরণ দিচ্ছি। সেই চেতনাধারণকারী সত্তাই ছিন্নমস্তা। বলে রাখা ভাল, অনেকের মতে, ছিন্নমস্তাই মহামায়ার শেষ রূপ।

মহাত্মা হ্যানিম্যানের জীবনী যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, তিনি ছিলেন এলোপ্যাথি শাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং জার্মানি দেশের অতি উচ্চপদস্থ চিকিৎসক। একদিন তিনি ঘোষণা করলেন, এলোপ্যাথি একপ্রকারের এলোপাথাড়ি চিকিৎসামাত্র। এই বলে তিনি এলোপ্যাথি চিকিৎসা ত্যাগ করে, শহর ছেড়ে চলে যান। তারপর নতুন জায়গায় গিয়ে প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি 'হোমিওপ্যাথি' আবিষ্কার করেন। পরে তাঁর অনুগামীদের জন্ম হয় এবং সারা পৃথিবীতে হোমিওপ্যাথি ছড়িয়ে পড়ে। ... কার্ল মার্কস ছিলেন দর্শনশাস্ত্রের বড় পণ্ডিত। একদিন তিনি ঘোষণা করেন, দর্শন জগৎকে বহুভাবে বিশ্লেষণ করেছে, এখন আর সে দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন নেই। এখন প্রয়োজন পৃথিবীটাকে বদলানোর। (ফয়েরবাখ সম্বন্ধে থিসিসসমূহ)। এই বলে তিনি প্রয়োগের মাধ্যমে পৃথিবীটাকে বদলানোর জন্য কমিউনিস্ট ইশতেহার দিয়ে কাজ শুরু করেন।

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন আইনজ্ঞ। আইনব্যবসায়ী হিসেবেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। একদিন তিনি ঘোষণা করলেন, আইনটাই যত নষ্টের গোড়া। আইন আর আইনজ্ঞরা যদি না থাকত মানুষ অনেক সুখে জীবন কাটাতে পারত। এই বলে তিনি আইন অমান্য আন্দোলন করতে শুরু করেন।

কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধধর্মের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তারপর একদিন ঘোষণা করেন, বুদ্ধ নয়, শঙ্করাচার্য্যের কথাই ঠিক। অতঃপর তিনি যে পথ অনুসরণ করেন তাতে শঙ্করাচার্য্যের নতুন ধর্ম প্রচারের কাজ সহজ হয়ে যায়। বৌদ্ধধর্ম-সংগঠনগুলি আগেই হীনবল হয়েই পড়েছিল, এবার তা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

গর্বাচভ একজন শ্রেষ্ঠ সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন। পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ ইউ এস এস আর-এর সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন তিনি। তারপর একদিন ঘোষণা করলেন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাটিই ঠিক নয়। এই বলে তিনি শুরু করলেন পুনর্গঠন, পেরেস্ত্রৈকা। তারপর কী ঘটল সবাই জানেন।

এই ঘটনাগুলির বিশেষত্ব হল, একটি বিশেষ চেতনার (এলোপ্যাথি, দর্শন, আইন, বুদ্ধবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ) সর্বোচ্চ স্তরে যিনি উঠলেন, তিনিই ঘোষণা করলেন, চেতনাটি ত্রুটিপূর্ণ। ফলে যে প্রচণ্ড সামাজিক প্রতিক্রিয়া ঘটল তার ফল (রক্ত) পান করতে লাগল সেই সর্বোচ্চ চেতনাধারী মস্তিষ্কই। অর্থাৎ ছিন্নমস্তা নিজেই নিজের মাথাটি কেটে ফেললেন। এরপর, সেখান থেকে যে রক্তক্ষরণ হতে লাগল সেটি তিনি নিজেই পান করতে লাগলেন। তারপর তিনি আর তত্ত্ব নিয়ে কর্ম করতে গেলেন না — পুরুষ প্রকৃতির উপর কর্মরত হল না, প্রকৃতিই পুরুষের উপর কর্মরত হল; অর্থাৎ আগের মতো থিয়োরি হাতে নিয়ে প্র্যাকটিসে যাওয়া হল না, প্র্যাকটিস করে থিয়োরি গড়ে তোলা হতে লাগল। ... যে-ব্যক্তি ও জনসাধারণ এই নতুন চেতনার আধার, তাঁদের বলে ছিন্নমস্তা।

ছিন্না, ছিন্নাকাঠ, ছেনী, ছেন্নানি : ২. ***ছিন্না** = যাহাকে ছেদন করা হইয়াছে। **ছিন্নাকাঠ** = যে-কাঠকে ছেদন করা হইয়াছে। **ছেনী** = যাহার দ্বারা ছিন্ন করা হয়। **ছেন্নানি** = যাহার দ্বারা ছিন্না করা হয়।* **৩. ছেনী, ছেন্নানি** = লোহা পাথর ইত্যাদি কাটার বা নকাশি করার লোহার বাঁটালি, টাকি। (ব.শ.)। **৫. ছিন্না, ছিন্নাকাঠ** = কোনো অভিধানে শব্দটি নেই। মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে উপরোক্ত (২) অর্থে শব্দ দুটি প্রচলিত।

ছেদ, ছেদন : **১.** ✓ছিদ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***ছেদ** = দিশাগ্রস্ত ইচ্ছাচারীর দান থাকে যাহাতে। **ছেদন** = **ছেদ** অন থাকে যাহাতে।*

ছো ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অচ্ছ, অচ্ছাবাক, অচ্ছোদ, কচ্ছ, ছগল, ছবি, ছবোরা, ছল, ছলন, ছলনা, ছলনি, ছলা, ছলাকলা, ছাগ, ছাগল, ছাগলা, ছাগা, ছায়া, ছায়াভিনয়, ছায়ামণ্ডপ, ছায়ালোক, ছেক, ছেলি, ছেলী, ছোকরা, ছোবল।
ছো = চয়নস্থিতের সর্বরূপ (অস্তিত্ব-বিকাশ-পরিণাম) থাকে যাহাতে।

অচ্ছ : ১. ✓ছো (ছেদন) + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ইচ্ছাচারী-অস্তিত্বের চলন ছাদিত নয় যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা দৃষ্টিকে ছেদন করে না, চলে যেতে দেয়। (transparent।)* / যাহা দৃষ্টি ছেদন (নির্ম্মলতা হেতু দৃষ্টি রোধ) করে না। (ব.শ.)। ৩. প্রসন্ন, অনাবিল, নির্ম্মল, স্ফটিক, ভল্লুক। (ব.শ.)। ৪. সরাসরি অপ্রচলিত, কিন্তু 'আচ্ছা' রূপে খুবই প্রচলিত। ৫. বাংলায় 'অচ্ছ' শব্দটির সরাসরি প্রচলন নেই; যুক্তভাবে রয়েছে 'অচ্ছ' (অচ্ + ছ) আর 'কোণাচ' (কোণ + অচ) শব্দে। এই 'অচ্ছ'র একটি আধুনিক রূপ হল 'আচ্ছা'। এর অর্থ 'ভালই তো' কিংবা 'ঠিক আছে'। শব্দটি তৈরি হয়েছে এই নিয়মে — **অচ্ছ** হইতে জাত = আচ্ছ; আচ্ছ-র আধার যে = **আচ্ছা**। হিন্দিতে অবশ্য 'অচ্ছা' মানেই 'ভাল'। 'সু'-এর সঙ্গে এই 'অচ্ছ' যোগ করে '**স্বচ্ছ**' শব্দটি তৈরি করা হয়েছে। এর অর্থ more transparent। transparent হলেই তো 'ভাল' এবং 'ঠিক আছে' বলা যায়। বোঝা যাচ্ছে, প্রাচীন ভারত স্বচ্ছতার বা more transparency-র সমর্থক ছিল।

কোণাচ-এর ক্ষেত্রে যে অচ শব্দটি রয়েছে, মনে হয়, তা সিধে বা ৯০ ডিগ্রি কোণের দুই বাহুর সঠিক অবস্থান বোঝাতে প্রযুক্ত। এই অচ জানালা বা দরজার কোণে না-থাকলে তা সমকোণ বা যথার্থ কোণ থাকে না। অযথার্থকারী কোণকে **কচ** বলে। জানালার এই **কচ** ভেঙে দিলে কোণাচ ঠিক হয়ে যায়, অর্থাৎ সমকোণ বা ৯০ ডিগ্রি হয়ে যায়। রাজমিস্ত্রি ও ছুতারমিস্ত্রিগণ এই 'কচ-ভাঙা' শব্দটি নিত্য ব্যবহার করেন। আমরা বাবুরা এই 'অশিক্ষিত' বাঙালীদের ব্যবহৃত বাংলাশব্দের খবর রাখি না; পৌরাণিক কচের (**কচ**-দেবযানী) খবরও কি রাখি?

উপরোক্ত (৩) অর্থে এই অচ্ছকে প্রসন্ন, অনাবিল, নির্ম্মল, স্ফটিক বলার কারণ এখন আমরা সহজে বুঝতে পারি; কেননা, এগুলি অচ্ছ বা স্বচ্ছ। কিন্তু ভল্লুক কেন অচ্ছ? দ্র. **জানা, ভল্লুক**।

অচ্ছাবাক : ২. *অচ্ছের আধার বাক যাহার।* ৩. এই শব্দটি পৃথকভাবে ব.শ. কিংবা পৌ.অভিধানে নাই, রয়েছে পুরাণে। ৪. অপ্র.। ৫. পুরাণাদিতে 'অগ্নিষ্টোম'-এ যে হোতৃগণের বা কর্মযজ্ঞ-পরিচালকদের কথা বলা হয়েছে, অচ্ছাবাক তাঁদের মধ্যে তৃতীয় দলের। এঁরা কোনো কিছু গোপন করেন না। কর্মপরিকল্পনার সবকিছু সবাইকে প্রকাশ করে বুঝিয়ে বলে দেন। দ্র. **অগ্নিষ্টোম**।

অচ্ছোদ : ২. / অচ্ছ উদ (উদক) যাহার। (ব.শ.)। ৩. হিমালয়ে স্থিত স্বচ্ছজল সরোবর বিশেষ। ইহা অচ্ছোদা নদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কাদম্বরীতে ইহার বর্ণনা আছে। ... অগ্নিস্বাত্ত পিতৃগণের মানসী কন্যা বিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. কোনো প্রবাহ (জলপ্রবাহ জ্ঞানপ্রবাহ পণ্যপ্রবাহ যাই হোক) যদি স্বচ্ছ বা ট্রান্সপারেন্ট হয়, তাকে অচ্ছোদ বলে। এরকম স্বচ্ছ সম্পদের ভাণ্ডারকে (সরোবরকে) অচ্ছোদ সরোবর বলে। আদি জ্ঞানজীবীদের ছাত্রসম্প্রদায় অর্থাৎ অগ্নিস্বাত্ত পিতৃগণের কন্যা নাকি এই স্বচ্ছতার অধিকারী ছিলেন।

ছাগ (ছাগবাহন, ছাগমুখ, ছাগল, ছাগলক) : ১. ✓ছো (ছেদন) + গ (গন্) - কর্ম্মবাচ্যে; ছাগ + অ (অণ্)। (ব.শ.)। ২. ***ছাগ*** = *আচ্ছাদিত গমন যাহার।* ***ছাগবাহন*** = ***ছাগ*** *বাহন যাঁহার।* ***ছাগমুখ*** = ***ছাগ****-এর মুখের ন্যায় মুখ যাহার।* ***ছাগল*** = ***ছাগ*** *লালিত যাহাতে।* ***ছাগলক*** = ***ছাগল*** *করে যে।* ৩. **ছাগ** = ছাগল, মেষরাশি। **ছাগবাহন** = অগ্নি। **ছাগমুখ** = কার্ত্তিকেয়। **ছাগল** = ছাগ। (ব.শ.)। ৪. goat অর্থে প্রচলিত। ৫. যাদের গমন আচ্ছাদিত, তাদের প্রত্যেককে ছাগ বলে। তাতে প্রথমেই আসে goat-এর কথা। দুভাবে তার গমন আচ্ছাদিত বলে মনে হয়। এক, বুনো ছাগল সম্ভবত ঘাসের বনের ভিতর নিজেকে গোপন রেখে চলাচল করে; দুই, মানুষ তাকে পালন-পোষণ না করলে প্রাণীটি হয়তো বেঁচে থাকতেই পারত না। তবে এই goat হল ছাগ-এর দৃশ্য অর্থ। কিন্তু আমরা জানি, আমাদের ভাষার শব্দগুলি মূলত অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় সত্তাদের বোঝানোর জন্যই তৈরি করা হয়েছিল। প্রধানত তেমন অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় ছাগের কথাই পুরাণাদিতে বলা হয়েছে। এই ছাগ হলেন 'বিশেষ জ্ঞানী'রা প্রত্যেকেই — কৃষক, জেলে, তাঁতি, কামার, কুমোর, ডাক্তার, মাষ্টার, উকিল, মোক্তার, কেরানি ... প্রমুখ সবাই। এই ছাগ তার বিশেষ বিদ্যাটির সাহায্যে রুজি-রোজগার করে জীবন কাটায়। কৃষক বা তাঁতি তার বিদ্যাটির প্রয়োগ করেই রুজি-রোজগার করে। ডাক্তার বা উকিল যদি তার বিদ্যাটি অন্যকে দিয়ে দিত, তবে তার রোজগার হত কীভাবে, খেত কী? তার দক্ষতার দ্বারা বা ঐ দক্ষসুলভ বিদ্যার (কর্মময়ী অবিদ্যার) দ্বারা তার জীবনযাত্রা আচ্ছাদিত হয়ে চলে। তাই এঁরা প্রত্যেকেই ছাগ। ভাগবতে শিবপন্থীরা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন — 'এ (এই দক্ষ) বস্তুতই ছাগ।'

একটি কাজ একই কর্মের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে চালালে মানুষ সেই কাজে **দক্ষ** হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই নীতিতে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করা শিবনীতির বিরোধী; কেননা এ নীতি অনুসরণ করলে যৌথ সমাজের যৌথ-জ্ঞানসম্পদ ও যৌথ-ধনসম্পদ আর যৌথ থাকবে না, বিশেষ বিশেষ পাত্রে কুক্ষিগত হয়ে যাবে, এবং যৌথসমাজ ভেঙে পড়বে। যৌথসমাজের 'অখণ্ডজ্ঞানী-অখণ্ডধনী মানুষ' ক্রমে 'খণ্ডজ্ঞানী-খণ্ডধনী মানুষ'-এ পর্য্যবসিত হয়ে যাবে, মানুষ **অপগামী** বা ছাগ হয়ে যাবে! সেকারণেই সবাই সব কাজ জানবে, করবে, এটাই ছিল প্রাচীনকালের যৌথসমাজের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নীতি। দক্ষ এই নীতির বিরোধী হওয়ায় এবং দক্ষনীতিতে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ করতে শুরু করায় আবিষ্কারক-শিব ও (ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত বিদ্যার অনুসরণকারী-) দক্ষদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দেয়। **দক্ষযজ্ঞ** ধ্বংস করেও শেষ পর্যন্ত দক্ষনীতিতে সমাজ চালানোর দক্ষসুলভ চেষ্টাকে পথ ছেড়ে দিতে হয়। জেনারেলাইজেশনের যুগ পেরিয়ে স্পেশালাইজেশনের যুগের সূত্রপাত হয়; যৌথসমাজ ভেঙে

গিয়ে তথাকথিত 'সভ্যযুগ'-এর সূত্রপাত হয়। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'ঘ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

শ্রমের অপর নাম অগ্নি। সভ্যসমাজের দক্ষ মানুষেরাই সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞের প্রধান আশ্রমিক বা শ্রমদানকারী। সেই কারণে এঁরাই অগ্নির বহনকারী বা বাহন। এঁদের নাম ছাগ হয়ে যাওয়ায় অগ্নিকে বলা হয় ছাগবাহন বা **অগ্নিবাহন**। এঁরাই একালে অগ্নিকে বহন করে নিয়ে চলেন। এই ছাগের মুণ্ড বসানো 'ছাগমুণ্ডি-দক্ষ'কে **অত্রিমুনি** বলে। **কার্তিকেয়**র মুখ বা মিলিটারির **মুখ**ও এই ছাগের মুখ দিয়েই তৈরি।

তবে **অত্রি**কে কেন **'ছাগমুণ্ডি-দক্ষ'** বলে, তার কারণ ভিন্ন। প্রাচীন যৌথসমাজের পরিচালকদের (রুদ্রের) উপেক্ষা করে সেকালের আদি দক্ষমানুষেরা যে দক্ষযজ্ঞ করেছিলেন, রুদ্র ও তাঁর সহযোগীরা সেই দক্ষদের অগ্রণী অংশকে মেরে ফেলেন। দক্ষেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। বহু রক্তপাতের পর সেকালের জ্ঞানজীবীদের উদ্যোগে অবশেষে রুদ্রকে রাজি করান হয়, যাতে তিনি দক্ষযজ্ঞ চলতে দেন। কিন্তু ছিন্নভিন্ন দক্ষমানুষদের পুনর্গঠিত করা যাবে কীভাবে? তাঁদের অগ্রণী নেতৃস্থানীয়গণ তো যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতাদেরকেই অবশিষ্ট দক্ষমানুষদের নেতৃত্বে বসান হয় এবং তারা পুনরায় দক্ষযজ্ঞ শুরু করেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতৃত্বকে বলা হয় ছাগ। দক্ষমানুষদের মাথায় এই ছাগদের বসিয়ে দেওয়ায় তাঁরা হয়ে যান ছাগমুণ্ডি; এই ছাগমুণ্ডি দক্ষমানুষদের **অত্রি** বলে। সর্বদেশে প্রায় সমস্ত বিদ্রোহের পর এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ভারতের কিংবা পশ্চিমবাংলার স্বাধীনোত্তর নেতৃত্ব কি অত্রি নয়? কিংবা সত্তর দশকে পশ্চিমবাংলায় যে নতুন বামপন্থীদের উত্থান ঘটে, তাদের অগ্রণী অংশ কি শাসনক্ষমতা দখলের আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাননি? ছাগমুণ্ডি লাভ বুঝিবা প্রতিটি বিদ্রোহের ভবিতব্য! দ্র. **অগ্নিবাহন, গাছ**।

ছায়া : ১. ✓ছো + য - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *আচ্ছাদিত হাঁটার আধার যে।* **৩.** অনাতপ, প্রতিবিম্ব, সাদৃশ্য, কান্তি, দ্যুতি, ছবি, শোভা, বর্ণ, তমঃ, অন্ধকার, পঙ্‌ক্তি, উৎকোচ, রক্ষণ, আশ্রয়, সংজ্ঞা-প্রতিকৃতি সূর্যপত্নী, কাত্যায়নী। (ব.শ.)। সূর্যের প্রথমা স্ত্রী। এঁর গর্ভে বৈবস্বত, শ্রাদ্ধদেব ও যম এবং যমুনার জন্ম হয়। সূর্যের অপর স্ত্রী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করতে না পেরে মায়া দ্বারা নিজের ছায়া হতে নিজের অনুরূপ এক নারীমূর্তি সৃষ্টি করে তাঁকে সূর্যের কাছে রেখে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। ... পিতা ত্বষ্টা (বিশ্বকর্মা) কন্যার (সংজ্ঞার) এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে স্বামীগৃহে ফিরে যেতে বলেন। ... কিন্তু সংজ্ঞা সেখানে না গিয়ে উত্তর কুরুবর্ষে গিয়ে ঘোটকীর রূপ ধারণ করে ভ্রমণ করতে থাকেন। ... ইতোমধ্যে ছায়ার গর্ভে সূর্যের ঔরসে সাবর্ণিমনু ও শনি নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ... যম একদা ক্রুদ্ধ হয়ে বিমাতাকে পদাঘাত করতে উদ্যত হন। তখন বিমাতা ছায়া যমকে অভিসম্পাত দেন যে, 'তোমার পা খসে যাক'। ... সূর্য নিজপুত্র যমকে অভিশাপ থেকে মুক্ত না করে বলেন যে, তাঁর পায়ের মাংস নিয়ে কৃমিরা মাটিতে প্রবেশ করবে; কিন্তু সূর্য ছায়াকে ... তিরস্কার করেন। ছায়া ... সূর্যকে সংজ্ঞার পিতৃগৃহে গমনের সমস্ত সংবাদ বলে দেন। ... তখন সূর্য ... ঘোটকের রূপ ধারণ করে তার সঙ্গে মিলিত হন। এর ফলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্ম হয়। ... (পৌ.অ.)। **৪.** shade অর্থে প্রচলিত। **৫.** আমাদের দেশে এখনও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতির আদি উদ্ভাবক ছিলেন অশ্বিনীকুমার। তাঁর শিষ্য পরম্পরায় যে ঐ চিকিৎসা পদ্ধতি আজ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, সংশ্লিষ্ট কবিরাজেরাই তাঁর সাক্ষ্য দেবেন। তাহলে সেই অশ্বিনীকুমার কাল্পনিক চরিত্র নয়। কাল্পনিক নয় সংজ্ঞা কিংবা ছায়াও। এই ছায়া এমন এক সামাজিক সত্তা, যিনি আদিম যৌথজ্ঞানসম্পদ, ধনসম্পদ ইত্যাদির দ্বারা সৃষ্ট নিরাপত্তার আধার। সংজ্ঞার আধুনিক রূপ যদি রাষ্ট্রের সংবিধান হয়, তবে ছায়ার আধুনিক রূপ হবে রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের ছায়া ও আবছায়া, যাকে সম্ভবত 'কাস্টমারি-রুলস' বলে। সিবিআই, সিআইডি, ইনকাম-ট্যাক্স, সেলস-ট্যাক্স, কাস্টমস্ প্রমুখ শনিগ্রহ জন্মায় সেই ছায়া থেকেই।

ছ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : ছ, ছ-কার, ছপ, ছপছপ, ছপটি, ছপ্‌পর, ছবছব, ছবড়ি (চুবড়ি), ছমছম, ছমগু, ছাঁক, ছাঁকনা, ছাঁকনি, ছাঁকা, ছাঁচ, ছাঁচি, ছাঁট, ছাঁৎ, ছাক, ছাকনা, ছাকনি, ছাকা, ছানা, ছিপ, ছিপি, ছিবড়া, ছিবড়ে, ছিম, ছিমছাম, ছুকরী, ছৈল, ছোঁচকা, ছোঁচা।

ছমছম : ২. *ইচ্ছাচারী-অস্তিত্বের সীমায়ন যাহাতে, তাহার দ্বিত্ব।* **৩.** ভীত-ভীতভাব। **৪.** 'গা ছমছম করছে' — এইভাবে শব্দটি প্রচলিত। **৫.** ইচ্ছা তো অস্তিত্বের চারদিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে এগিয়ে চলেছে, যেন-বা অক্টোপাস চলেছেন জলবিহারে। কিন্তু কোনো কারণে যদি সেই ইচ্ছার হাত-পাগুলি আহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখে ফেলে গুটিয়ে আসে, তখন তাকে বলে ছম। বারংবার ছম-বোধ হলে তাকে বলে ছমছম। ধ্বন্যাত্মক বলে দিয়ে এই ধরনের শব্দগুলিকে নিরর্থক করে রাখা হয়েছে। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে ধ্বন্যাত্মক বলে কোনো পৃথক জাতের শব্দ হয় না, সব শব্দই ধ্বন্যাত্মক।

ছিপ : ৫. দ্র. **ক্ষিপ্**।

ছিমছাম : ২. *গতিশীল* **ছ**-*এর সীমায়ন (= ছিম) ও* **ছম** *হইতে জাত (= ছাম) যে; অর্থাৎ, যাহাতে অগ্রগতি ও পশ্চাদস্থিতি উভয়ই সীমায়িত থাকে।* **৩.** পরিপাটি। **৪.** neat and clean অর্থে প্রচলিত। **৫.** উপরোক্ত (২-এ প্রদত্ত) প্রথম অর্থটি শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ রূপে নিষ্কাশিত হলে দেখা যায়, তার থেকে প্রতীকী 'পরিপাটি' অর্থে পৌঁছানো যাচ্ছে না। কারণ কী, জানার জন্য একটু অনুসন্ধান চালালে বোঝা যায়, শব্দটির উদ্ভব হয়েছে আরও গভীর থেকে। বলতে কি, ছিমছাম শব্দটি বাংলাভাষীর একটি অনন্য সৃষ্টি। এর মূলে রয়েছে 'ক্ষেম' ও 'ক্ষাম' এই দুটি শব্দ। এই 'ক্ষেম' শব্দটিকে একালের শিক্ষিত মানুষেরা সহজে চিনতে পারবেন scheme শব্দ থেকে, যা কিনা 'ক্ষেম' শব্দের ইংরেজি উত্তরাধিকার। দিশাগ্রস্ত ক্ষি-করণ সীমায়িত যাহাতে তাকে ক্ষেম বলে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বহু পরিকল্পনাদি সুবিন্যস্ত ভাবে ক'রে তবেই এই 'ক্ষেম' করা হয়।

('যোগক্ষেম', 'ক্ষেমঙ্করী' আমাদের অত্যন্ত অর্থপূর্ণ শব্দ।) আর, ক্ষম শব্দ থেকে জাত হয় ক্ষাম। ক্ষেম-এ যা কিছু নতুন অগ্রগতি, তাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে বাস্তবায়িত করা হয় এবং ক্ষাম-এ প্রচলিতের নবরূপায়ণ করা হয়। সেই কাজেরই অতি সাধারণ রূপ হল ছিমছাম। ৬. ইংরেজিতে shipshape শব্দটি ব্যবহার হয় ছিমছাম অর্থে। যেহেতু বাংলায় ছিমছাম বলতে 'ছি-এর সীমায়ন' ও 'ছা-এর সীমায়ন' বোঝায়, 'ছিপছাপ' তার খুব কাছাকাছি অর্থ বহন করে — সীমায়িত করে রাখার জায়গায় পালন করা। পালন করার মধ্যেও একধরনের সীমায়ন রয়েছে, যা আমরা **লালনপালন** শব্দে পেয়ে থাকি। এভাবে অর্থ ও ধ্বনি দু'দিকের বিচারে shipshape একই উত্তরাধিকার বহন করে।

জ

জ্ বর্ণের অর্থ : জ = জ্-অন করে যে; অর্থাৎ জনন থাকে যাহাতে = জন্য। আগেও বলা হয়েছে, বর্ণের মূলে যে অর্থ তার অধিকাংশই অব্যক্ত। তার ভেতরে যতটুকু যা বোঝা যায়, আমরা তাকে ভাষা দেওয়ার চেষ্টা করছি মাত্র। বর্ণার্থকে সেভাবেই বুঝতে হবে। এই অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট বা explicit করার ভাষা পাওয়া যায় না। প্রচলিত ভাষার শব্দ প্রয়োগ করলেই সেই ভাবার্থ তার সূক্ষ্ম রূপ হারিয়ে স্থূল হয়ে যায়; ভুল বোঝার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। তবুও আমরা তা সাধ্যমত ব্যক্ত করার চেষ্টা করছি।

গ্-এ (গমন ক্রিয়ায়) সমগ্র সত্তা কোনো বিশেষ বিন্দু (ধরা যাক x বিন্দু) থেকে y বিন্দুতে যায়। কিন্তু **জ্**-এ (জনন ক্রিয়ায়) সমগ্র সত্তা যায় না, x বিন্দুতে বসে থেকে সে তার নিজের আকারে ছোট কিন্তু গুণে সমান (দ্র. **অণ্ড**) একটি অংশকে (ক্ষুদ্রাকার যথার্থ প্রতিনিধিকে) y বিন্দুর দিকে পাঠিয়ে দেয় (দ্র. ঘ্); অর্থাৎ গ্-এর মতো জ্-তেও একটু অন্যভাবে 'যাওয়া'র ব্যাপারটি রয়েছে। মোটকথা, 'সত্তার ক্ষুদ্রাকার যথার্থ প্রতিনিধির x বিন্দু থেকে y বিন্দুতে যাওয়া'কে **জ্** বলে। (জীবের ক্ষেত্রে এই প্রতিনিধিকে আধুনিক বিজ্ঞান নাম দিয়েছে 'জিন', gene।) তার মানে, চ্-এ যেমন ক্-এর অদৃশ্য উপস্থিতি থাকে, তেমনি জ-এ গ্-এর অদৃশ্য উপস্থিতি থাকে। এই গ্ বা যাওয়ার দুটি রূপ। প্রথম রূপটি জ্, যার মূলে রয়েছে গ্; দ্বিতীয় রূপটি হল য্, যার মূলে রয়েছে ই এবং অ। দ্র. **গ**। এর উত্তরাধিকার ইংরেজিরও রয়েছে, তবে তা রয়েছে একটুখানি জড়াজড়ি হয়ে। প্রথমত, তাদের জ্ বা 'জি' (g) একই সঙ্গে জ্ ও গ্, উভয়ভাবে উচ্চারিত হয়। শুধু তাই নয়, তাদের রয়েছে আরও দুটি জ — j, y। আমরা যাকে উত্তরাধিকার সূত্রে জ্ ও য্ রূপে পেয়েছি, তাঁরা সেটি তিনভাবে পেয়েছেন। তাঁদের g অক্ষরের উচ্চারণ 'জি', কিন্তু প্রায়-সময়ই শব্দে তার উচ্চারণ 'গ্'। ইংরেজির বহু অক্ষরের ক্ষেত্রেই একথা খাটে। এর উত্তর পাওয়া যায় ক্-গ্-চ্-জ্ এই চারটি অক্ষরের পরস্পর স্থানবদলের নিয়মে। উচ্চারণে (সন্ধি-সমাসে) বাক্‌ধারা থেকে বাগ্‌ধারা, বাক্-পতি থেকে বাচস্পতি, বাচ্-স্তুতি থেকে ব্যাজস্তুতি হতে দেখা যায়। এরকম হয় কেবল নেচারের দেওয়া জিহ্বা-কণ্ঠ প্রভৃতির উচ্চারণযন্ত্রের বৈশিষ্ট্যের জন্যই নয়, প্রকৃতিতে যে সকল ক্রিয়া চলে, তার নিয়মেও করণ, গমন, চয়ন, জনন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানবদল করে। সেই কারণটি আদিকালে এত ঘনিষ্ঠভাবে ছিল যে, তার উত্তরাধিকার আমাদের ভাষার মতো ইংরেজি প্রভৃতি ভাষারও কমবেশি রয়েছে। রয়েছে বলেই তাদের সি (c) থেকে ক্ ও চ্ দুটো অক্ষরেরই উচ্চারণ হয়, তাদের জি (g) থেকে জ্ ও গ্ দুটোই উচ্চারিত হয়। (দ্র. **বর্ণ**)।

ব.শ. জ বর্ণের তিনরকম ব্যুৎপত্তি দিয়ে তার তিনরকম অর্থ দিয়েছেন। প্রথম ব্যুৎপত্তি — ✓জন্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। অর্থ, জাত, জন্য। দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তি — ✓জি + অ - কর্তৃবাচ্যে। অর্থ, জেতা। তৃতীয় ব্যুৎপত্তি — ✓জু + অ - কর্তৃবাচ্যে। অর্থ, বেগিত, শীঘ্র, পিতা, মৃত্যুঞ্জয়, শিব, বিষ্ণু, জন্ম, তেজঃ, বেগ, ছন্দঃশাস্ত্রে মধ্যে গুরুবর্ণবিশিষ্ট গণবিশেষ। এভাবে সূত্রপাতেই জ বর্ণের ত্রিদশাত্মক অর্থ দিয়ে দিয়েছেন ব.শ.। কারণ, আরও মূলে, যেখানে গেলে জ বর্ণের একটি মাত্র ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ পাওয়া যায়, সেখানে তিনি যাননি। তার প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে, সেই স্তরে প্রায়শই অর্থটিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করলে তা তার সূক্ষ্মতা হারিয়ে স্থূল রূপ লাভ করে। তাছাড়া তিনি নিজে ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের পৃথক শব্দকোষ লিখতে যাননি। আমরা আবার সেই কাজটিই করতে লেগেছি। আমাদের সেকাজ না করে উপায় নেই। আমরা জ-এর মূলে গিয়েছি। আমরা জ-এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ করেছি — *অস্তিত্ব যে আত্মস্বরূপকে আপন (দেহমন) হইতে বহির্গত করে; কিংবা, অস্তিত্ব হইতে তার যে আত্মস্বরূপ বহির্গত হয়।* একে আমরা বলেছি জ্-অনকারী বা **জন্য**। কিন্তু এই জননের তাৎক্ষণিক ফল দাঁড়ায় স্থানদখল বা জননকারীর অবস্থানক্ষেত্রকে ক্রমশ আচ্ছাদন করে ফেলা। সেটি ঘটে এইভাবে। **জ** নিজের চারপাশে জনন করে বা ছানাপোনা সৃষ্টি করে ক্রমশ বাড়তি স্থান দখল করে, ঠিক যেন একটি হাঁস একের পর এক ডিম পাড়ছে আর সেই ডিমগুলি মুহূর্তে ফুটে শিশুহাঁসে পরিণত হয়ে হাঁসটির চারদিক ঘিরে প্যাঁক প্যাঁক করছে। অর্থাৎ জ মানে, যে তার ছানাপোনা জনন ক'রে তার চারদিকের স্থান দখল করে। এককোষী জীব এভাবেই বংশবৃদ্ধি করে কিংবা মেঝেতে জল পড়ে গেলে, সে এভাবেই ছড়িয়ে পড়ে। সেই কারণে জ্ ক্রিয়াটির প্রথম অর্থ জনন করা বা জাত হওয়া এবং দ্বিতীয় অর্থ স্থানদখল করা বা আবৃত করা বা আচ্ছাদিত করা বা তরলের মতো সবদিকে সমভাবে ছড়িয়ে পড়া।

জন্য অতএব জনন করে, জনিতও হয়, আচ্ছাদনও করে। জন্য তারিত যাহাতে তাকে বলে জাত; জন্য দিশাগ্রস্তভাবে গতিশীল যাহাতে তার আধারকে বলে জেতা; জন্য নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে তাকে বলে জু, যা জ্-ক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়া করে। ইত্যাদি।

যাই হোক, এতসব অন্তর্নিহিত ব্যাপার যাতে রয়েছে, সেই 'জ্' বর্ণের অর্থ সংক্ষেপে জানব — **জ** = 'জ্-অন' করে যে; জন্য। জ-এর আধার যে = জা; জ্ গতিশীল যাহাতে = জি; জ্ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে = জু; জ্ আবর্তমান যাহাতে = জ্। দ্র. **ক বর্ণের অর্থ**।

জ্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : *জট্ (জুট্)*, জন্ (জনি), জপ্, জম্, জাগৃ, জি, জীব্ (জীবী), জু, জৃ (জৃ৲), জ্ঞা (জ্ঞাপ্, জ্ঞাপি), জ্বর্, জ্বল্, জ্ = ১২ + ১

জট্ (জুট্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : খাল-জোল, খালে-জোলে (জলাভূমি), জট্, জট, জটলা, জটা, জটাজুট, জটাধর, জটাবান, জটামাংসী, জটায়ুঃ, জটাল, জটাসুর, জটি, জটিত, জটিল, জটিলা, জটী, জটু(ড়ু)ল, জ'টে, জট্ট, জঠর, জঠরাগ্নি, জঠরানল, জঠরাময়, জঠুর, জড়, জড়ওয়া, জড়তা, জড়ভরত, জড়সড়, জড়া, জড়াও, জড়াক্ষ, জড়ি, জড়িত, জড়িমা, জড়ীভাব, জড়ুর(ল), জড়োয়া, জল, জল-আচরণী, জলকণ্টক, জলকন্যা, জলকরঙ্ক, জলকাক, জলকান্ত, জলকুক্কুট, জলকুন্তল, জলকুমরী, জলকেলি, জলক্রীড়া, জলখাবার, জলখেংরা, জলগদা, জলগোজা, জলচর, জলচল, জলচোরা, জলচৌকি, জলছত্র, জলছবি, জলজ, জলজলাট, জলজন্ম, জলজীবী, জলজীয়ন্ত, জলঝারা, জলটঙ্গী, জলটুঙ্গী, জলটল, জলতরঙ্গ, জলতাড়ন, জলত্রাস, জলদ, জলদকাল, জলদক্ষয়, জলদগম্ভীর, জলদপটল, জলদল, জলদলপতি, জলদস্যু, জলদাগম, জলদেবতা, জলদোষ, জলদ্রোণী, জলধনু, জলধার, জলধি, জলনলিনী, জলনাড়ী, জলনালী, জলনাথ, জলনিধি, জলনির্গম, জলনীলী, জলন্ধর, জলপটল, জলপড়া, জলপতি, জলপথ, জলপাই, জলপাত, জলপাত্র, জলপান, জলপানি, জলপিপি, জলপিপ্পলী, জলপুষ্প, জলপ্রদান, জলপ্রপা, জলপ্রপাত, জলপ্রলয়, জলপ্রায়, জলপ্লব, জলফল, জলবদ্ধ, জলবহ, জলবাদ্য, জলবায়স, জলবায়ু, জলবাস, জলবাহ, জলবিছুটি, জলবিড়াল, জলবিম্ব, জলবিহার, জলবুদবুদ, জলবৃশ্চিক, জলবেতস, জলব্যাল, জলব্রহ্ম, জলভৃৎ, জলমণ্ডুক, জলমদ্গু, জলময়, জলমার্গ, জলমার্জ্জার, জলমূক, জলমূর্ত্তি, জলযন্ত্র, জলযাত্রা, জলযান, জলযুদ্ধ, জলযোগ, জলরাক্ষসী, জলরাজ, জলরাশি, জলশায়ী, জলশুচি, জলশোষ, জলশৌচ, জলসত্র, জলসূচি, জলস্পর্শ, জলহরি, জলহস্তী, জলহাঁস, জলা, জলাকাশ, জলাগম, জলাচরণীয়, জলাজলি, জলাঞ্জলি, জলাত্যয়, জলাধার, জলাধিদৈবত, জলাবতার, জলাবর্ত্ত, জলায়ুকা, জলারণ্য, জলার্ক, জলার্দ্র, জলালুক, জলাশয়, জলাশ্রয়, জলিকা, জলু(লূ)কা, জলেচর, জলেন্দ্র, জলেন্ধন, জলেশ, জলেশ্বর, জলেশয়, জলো, জলোচ্ছ্বাস, জলোদর, জলোদ্ভব, জলৌকস, জলৌকা (পটালুকা), জলৌকাঃ, জাট, জাটি (দ্র.যুজ), জাঠর, জাঠা, জাড়, জাড়াও, জাড়ি, জাড়িবেঙ, জাড়িবেঙ্গ, জাড্য, জল্প, জল্প, জল্পন, জল্পনা, জাল, জালি-কারবার, জালহপ্তম, জালতী, জালন্ধর, জালা, জালাক্ষ, জালালি, জালি, জালিক, জালিকা, জালিনী, জালিবোট, জালিয়া, জালিয়াৎ, জালিয়াতি, জালী (ঐন্দ্রজালিক), জাল্ম (জালিম), জুট, জুটক, জুটি(টী), জুড়্, জুড়, জুড়নী, জুড়া, জুড়ি(ড়ী), জুলি (নয়ানজুলি), জেলে, জোঁক, জোঁকা, জোট, জোটন, জোটান, জোড়, জোড়তাড়, জোড়ভাঙা, জোড়-বিজোড়, জোড়ন, জোড়া, জোড়ানী, জোত্র, জোল, ঝরকা, ঝরোখা, ঝুঁটি, ঝুটাঝুটি, ঝুটি।

জট্ (জুট্) = জন্যর টঙ্কারণ। **জট** = জন্য টঙ্কারিত যাহাতে। **জুট** = নবরূপী জন্য টঙ্কারিত যাহাতে। (ক-এ যেমন কারী, গ-এ যেমন গামী, জ-এ সেভাবে জানী করা যায় না, তাই 'জনন থাকে যাহাতে' সেই 'জন্য'কে অভিধা রূপে ব্যবহার করা হল।)

জট (জটলা, জটা, জটাজুট, জুট, জুটি, জোট) : ১. ✓জট্ + অন - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। **২. জট** = *জাত* **টঙ্কারিত** *যাহাতে; অর্থাৎ, জন্য-গণ যেখানে সংহত (হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করে)।* **জটলা** = **জট** *লালিত যাহাতে, তাহার আধার।* **জটা** = **জট**-*এর আধার যে।* **জটাজুট** = **জটা** *ও* **জুট***।* **জুট** = *জ (জন্য) নবরূপে টঙ্কারিত যাহাতে; অর্থাৎ, জন্যগণ যাহাতে সংহত (জড়ো) হয়।* **জুটি** = **জুট** *গতিশীল যাহাতে।* **জোট** = **জুট**-*এর আধার যে।* **৩. জট** = সংহত দীর্ঘ কেশ, জটের মতো জড়িত বস্তুমাত্র, তিল, জড়ুর (pimple)। **জটলা** = সংহতভাব, জনতা, ভিড়, একত্র মিলিত লোকের কথাবার্তা, গল্পগুজব। **জটা** = লগ্নকচ, সংহতকেশ, ব্রতীর শিখা, (সাদৃশ্যে) বৃক্ষমূল, শিকড়, শাখা, শতাবরী, জটামাংসী, রুদ্রজটা, কপিকচ্ছু, বেদপাঠবিশেষ, জটার মতো বস্তুমাত্র, সিংহকেশর, বটের শাখা-শিকড়। **জটাজুট** = জটাসমূহ, ঝুটী, শিবজটা। **জুট, জোট** = দল, গজযূথ, দলবদ্ধ হওয়া, মিলিত হওয়া, সংগৃহীত হওয়া, মিলা। **জুটি (জুটী)** = দলের লোক, সঙ্গী, সাথী, সমকক্ষ ব্যক্তি, জুড়ী। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** জটলা, জোট বাঁধা, খাদ্য জোটা বা জোটানো ... ইত্যাদি রূপে এই শব্দ এখন খুবই ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতে জট আছে, কিন্তু জুট জোট নেই। মধ্যযুগে জুট জুটি জোট তিনটিই সৃষ্টি হলেও এদের যথেষ্ট ব্যবহার ঘটেছে আধুনিক যুগে। বলতে গেলে এই **জোট, জোটান** আধুনিক বাংলাভাষীর তৈরি করা ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ। (মধ্যযুগের 'ঘুষ'বাবু এভাবেই ঘোষবাবু হন আধুনিক যুগে।) এর মূলে রয়েছে জট্ ক্রিয়া, অর্থাৎ জন্যগণকে একত্রিত করা বা জন্যগণের একত্রিত হওয়া। এই জট খায় না, মাখে না, দিয়েও দেওয়া যায় না; এ-জট কেবল পাকায় আর খোলে। কিন্তু তাতে চুলের জটার কথা এত বেশি করে আসছে কেন?

জন্যগণ একত্রিত হল, দলবদ্ধ হল, মিলিত হল, জটলা হল, কথাবার্তা হল — এসব বোঝা যায়। তারা কথা জনন করতে পারে, জুটতে পারে, জুটি হতে পারে, জুড়তে পারে, জোটাতে পারে, তাও নাহয় মেনে নেওয়া গেল (দ্র. **জুড়্**)। এমনকি সেই জটা গাছের শিকড় হতেই পারে, কেননা তাতেও জনন থাকে। আলকুশি বা কপিকচ্ছুও হতে পারে, কেননা তাতেও কী জনন রয়েছে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন। কিন্তু সংহতকেশ, ব্রতীর শিখা, জটামাংসী, রুদ্রজটা, সিংহকেশর প্রভৃতি সত্তায় জনন কোথায়, খুঁজে পাওয়া যায় না।

সাধারণভাবে মানুষের মাথার চুল জড়িয়ে জড়িয়ে মোটা মোটা গোছা হয়ে থাকলে, তাকে জটা বলা হয়। সন্ন্যাসী-কাপালিকদের এরকম জটা দেখা যায়। কিন্তু এই জটার ভিতরে জননক্রিয়া কীভাবে সক্রিয়, তা চট করে চোখে পড়ে না। পুরাণাদিতে অবশ্য এমন গল্প আছে, যে, রুদ্রশিব তাঁর এক-একটি জটা ছিঁড়ে মাটিতে ফেলছেন আর এক-একটি মহাশক্তিধর ভৈরব জন্মাচ্ছে এবং শত্রুনিধন করতে

লেগে পড়ছে। এর অর্থ আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। ...

কেশ ও **কেশর** বিষয়ক তথ্যগুলি থেকে জানা যায়, সেকালে যে মানুষের জ্ঞানসম্পদ বা ধনসম্পদের উপর অধিকার বা মালিকানা যত বেশি ছিল, তার মাথায় তত বেশি কেশ ছিল। সেই মালিকানা জটিল হয়ে থাকলে, কেশও হয়ে যেত জটার মতো জটিল। আর, মালিকানা না থাকলে একেবারেই নেড়া। কাউকে নিকেশ করে দেওয়ার অর্থই ছিল সমাজসদস্য হিসেবে তার সমস্ত অধিকার বা মালিকানা কেড়ে নিয়ে মাথা নেড়া করে তাড়িয়ে দেওয়া। অর্থাৎ কিনা, জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের অধিকার যার যত বেশি থাকবে মাথায় তার তত বেশি জটিল কেশ থাকবে; যার যত কম থাকবে তার কেশ তত কম থাকবে, সরল থাকবে; এবং বিন্দুমাত্র অধিকার না থাকলে তার জটা তো দূরের কথা, একটি কেশও থাকবে না। আর সম্পদের অধিকার থাকলে, তার জননক্ষমতা তো থাকবেই। সে তো ভৈরবের জন্ম দিতে পারবেই। বদবুদ্ধিমূলক জ্ঞানসম্পদের সাহায্যে কিংবা ধনসম্পদের সাহায্যে হত্যাকারী দল গড়ার ইতিহাসই তো গুণ্ডারাজের ইতিহাস। অতএব বুদ্ধি ও টাকা থাকলে বা জটা থাকলে ভৈরব জনন করা সম্ভব। দ্র. **জটামাংসী**। বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'ঙ' গ্রন্থের ৫২-৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জটামাংসী (জটাচার্ব্ব-বংশ, জটাল, জটালা) : ২. *জটা-র মাংস ভক্ষণ করে যে।* ৩. **জটামাংসী** = গন্ধদ্রব্যবিশেষ। **জটাচার্ব্ব-বংশ** = **জটা** চর্ব্বণ করে বেঁচে থাকে যে বংশ। **জটাল** = জটাবান, জটিল, সংহত, মিলিত, বটবৃক্ষ, গুগ্‌গুলু। **জটালা** = জটামাংসী। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **জটা**, **আস্তিক**। এখানে আমরা দেখছি যে, বটবৃক্ষকে জটাল বলে। **অশ্বত্থবৃক্ষ** ও **বটবৃক্ষ** শব্দ থেকে আমরা জেনেছি, প্রাচীনকালের যৌথ সামাজিক ব্যবস্থাকে অশ্বত্থ এবং প্রথম যে ধনতান্ত্রিক পরিবার-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাকে বটবৃক্ষ বলা হত। বটবৃক্ষের আধারকে **জটালা** বলে, যা **জটামাংসী**ও বটে। বিক্রিবাটার লাভকে বলা হয় আমার অংশ বা **মাংস**। অর্থাৎ, জটায় মাংস থাকে। যারা সে মাংস খায়, তাদের জটামাংসী বলে। সাগরমেলার মালিকানার জটার চেহারা দেখলে এই জটামাংসীদের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বোধ জন্মে; কাশীদাশী মহাভারতে এই জটামাংসীদের বলা হয়েছে '**জটাচার্ব্ব-বংশ**' ও '**যাযাবর-বংশ**', যে বংশে জন্মেছিলেন **জরৎকারু** ও **আস্তীক** মুনি। একালের শেয়ারবাজারে ষণ্ডামি করতে গেলেও কোম্পানিগুলির মালিকানার জটা বিষয়ে সেই বোধ অবশ্যই জন্মে যায়। প্রাচীন পৃথিবীর ষণ্ড বা Bull-এর ধারণাই বহু পথ ঘুরে একালের শেয়ারবাজারের Bull-এ পরিণত হয়েছে। (বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের 'গ' গ্রন্থে **বৃষোৎসর্গ** গল্পটি দ্রষ্টব্য)। তাছাড়া যে **গন্ধ**কে আমরা আগেই চিনেছি মালিকানার সংবাদ রূপে, ব.শ. তাকে স্পষ্ট করে বলছেন — **জটামাংসী** হল গন্ধদ্রব্যবিশেষ। তার মানে, সামাজিক নিয়মের বা আইনের সূত্রের সাহায্যে দূরে বসে থেকেও যে-সত্তা মালিকানার অংশ ভোগ করে, সেই হল **জটামাংসী**। দ্র. **জরৎকারু**।

জটায়ু (জটায়ুঃ) : ২. *যাহার আয়ু **জটা** হইতে নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে আসে। (দ্র. **আয়ু**)।* / **যাহার আয়ু জট (সংহত, প্রচুর)**। (ব.শ.)। ৩. পক্ষিরাজ বিশেষ। বায়ুবেগগামী কামরূপ পক্ষী। গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সূর্যসারথি অরুণের দুই পুত্র — সম্পাতি ও জটায়ু। জটায়ু সকল পক্ষীর উপর আধিপত্য করবার অধিকার লাভ করে। এই জন্য জটায়ুকে পক্ষীরাজ নামে উল্লেখ করা হয়। মহারাজ দশরথের সঙ্গে জটায়ুর বন্ধুত্ব ছিল। ... সীতাহরণ কালে ... রাবণের খড়্গাঘাতে জটায়ু ছিন্নপক্ষ ও মৃতপ্রায় হলে রাবণ সীতাকে নিয়ে পলায়ন করে। ... জটায়ুই রামকে প্রথম বলেন যে, সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হয়ে দক্ষিণদিকে গমন করেছেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দশ বিভাগওয়ালা যে রাষ্ট্রব্যবস্থা (দশরথ) তার সঙ্গে জটা আয়ু যার, তার ছিল বন্ধুত্ব। এই সত্তাটি শ্যেনীগর্ভজাত অর্থাৎ বাজপাখীর গর্ভজাত। এ হল কপোতারি বা **কপোত**-এর শত্রু। খুব সহজ করে বললে জটায়ু সত্তাটি হল দশরথের কালের লুঠেরা সম্প্রদায়ের এমন উত্তরসূরী, যে তখন আর লুঠতরাজ করে না; লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে দোকানদারী করে বা বাণিজ্য করে। একসময় সে ছিল পক্ষীরাজ বা সমস্ত দোকানদারদের নেতৃস্থানীয়। যতদূর বোঝা যায়, সেই ঘটনা ১০০ থেকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের মাঝে ভারতের সামাজিক ইতিহাসের একটি ঘটনার কাহিনী।

জঠর : ১. ✓জন্ + অর - অধিকরণে। (ব.শ.)। ২. *জনন-টঙ্কার স্থির রূপে আবর্ত্তমান রহে যাহাতে।* ৩. কঠিন, দৃঢ়, বদ্ধ, বৃদ্ধ, কুক্ষি, উদর, গর্ভাশয়, ভ্রূণস্থান, মধ্যভাগ, অভ্যন্তর। (ব.শ.)। ৪. belly অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দটির নানা রকম ব্যুৎপত্তি দেখতে পাওয়া যায়। আমরা বর্ণকে ভিত্তি ধরে এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি নিষ্কাশন করলাম। এ অর্থ উপরোক্ত প্রতীকী (৩) অর্থগুলিকে যেমন স্থান করে দিতে পারে, তেমনি দেশের কৃষি ও শিল্পকেন্দ্রগুলিকেও স্থান করে দিতে পারে।

জড় (জড়সড়, জড়ো) : ১. ✓জল (ঘনীভাব) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **জড়** = *জন্য-র গড়ান-উড়ান থাকে যাহাতে।* ৩. শীতগুণযুক্ত, হিমগ্রস্ত, শিশির, শীতল, মন্থর, নিস্পন্দ, মোহিত, অপ্রাজ্ঞ, বেদাভ্যাসে অসমর্থ, অনুদ্যম, মূক, বধির, জল, সীসক, (বেদান্তে) চেতনভিন্ন অজ্ঞানাদিসমূহ, অচেতন পদার্থ, অবস্তু; বৃক্ষমূল, শিকড়, ভিত্তি, ভিত, মূল, আদি-কারণ; মিলিত, সমবেত। (ব.শ.)। ৪. inanimate matter ও assemble অর্থে প্রচলিত। ৫. গমন বা চলা বললে আমরা সাধারণত তার দৃশ্য অর্থ করি বলেই মনে হয়। কিন্তু তা নয়। নিরক্ষর সাক্ষর সব বাঙালীর মনের গভীরে অদৃশ্য-চলাই যে বিচারের প্রধান বিষয়, একটু আঁচালেই সেকথা টের পাওয়া যায়। 'কেমন আছেন?' প্রশ্নের উত্তরে এরকম উত্তর প্রায়শই শোনা যায় — 'চলে যাচ্ছে।' 'চলছে একরকম।' এই চলাকে জীবন-'যাত্রা' বলা হয়। এই চলা দৃশ্য নয়। ...

জড় বললে সাধারণভাবে নিষ্প্রাণ বাহ্যবস্তু বোঝানো হয়ে থাকে। এই অর্থ হল শব্দটির ব্যঞ্জনার্থ। এর অভিধার্থ হল, যার ভিতরে প্রাণ রয়েছে, জনন রয়েছে, ভিতরে ভিতরে গতিও রয়েছে, এমনকি নিজেকে সে নিজের কেন্দ্রের দিকে সংকুচিতও করছে, কিন্তু দৃশ্যত

স্থান বদল করছে না। সেকারণেই জড়ো হওয়া বা জড়ো করা মানে একস্থানে সমবেত হওয়া বা সমবেত করা। অর্থাৎ, জড়-এর অর্থ হল, যার ভেতরে জনন দৃশ্যত সঙ্কুচিত হচ্ছে কিন্তু অদৃশ্যত নিজের মূলের মধ্যে নিজে সপ্রাণ রয়েছে। সেই কারণে জড়কে শীতগ্রস্ত মনে হয়, মনে হয় নিস্পন্দ, অচেতন পদার্থ। যখন সে প্রসারিত হয়ে যায়, তখন আমরা বলি, 'এর জড় কোথায়?' অর্থাৎ গোড়া বা মূল কোথায়। ... আরও আছে। যে দৃশ্যত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছে না, কিন্তু নিজের মধ্যে নিজে সপ্রাণ রয়েছে, সে যখন জড়; তখন সেই জড় অবস্থাতেই সে যদি একটু সরে সরে যায়, তাকে বলে সড়। জড়সড় মানে জন্য কেবল আত্মসংকোচনই করছে না, দৃশ্যতও সরে সরে যাচ্ছে।

জড়ভরত : ২. *ভরণ তারিত যাহাতে তদ্রূপ* **জড়** *যে।* ৩. পুরাকালে ভরত নামে এক রাজা বানপ্রস্থ অবলম্বন করে বনে ঈশ্বরচিন্তায় কালাতিপাত করতেন। ... উদ্ধার করা একটি মৃগশিশুর লালনপালনে এমনই আসক্ত হয়ে পড়েন যে, তাঁর ধর্মকর্ম সমস্তই লোপ পেয়ে যায়। ... মৃত্যুকালে কেবল মৃগচিন্তা করেছিলেন বলে রাজা ভরত এক জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ... মৃগরূপে মৃত্যুর পরে পুনরায় জাতিস্মর হয়ে এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ... কিন্তু সর্বদা জড়বুদ্ধি উন্মত্তের মতো অবস্থান করতেন, জড়িত স্বরে কথা বলতেন এবং কাজকর্মে বিমুখ ছিলেন বলে এঁর নাম জড়ভরত হয়। ... সকলে তাঁকে জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ভেবে অপমান করত এবং আহার্য মাত্র দান করে তাঁর দ্বারা সর্বপ্রকার কাজ করিয়ে নিত। একসময় রাজা সৌবির তাঁকে শিবিকা-বহনের কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। ... শেষে জড়ভরত ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করে সেই জন্মেই মোক্ষলাভ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. idle বোঝাতে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. এর অর্থ যে সত্তা আত্মপালন কোনোরকম ভাবে করে, কিন্তু তার অধিক কিছুই করে না, নিজের মধ্যে নিজে সঙ্কুচিত হয়ে দিন কাটায়। তাই বলে এটি একেবারেই তুচ্ছ বিষয় নয়; এ একধরনের জীবননীতি। জড়ভরত সেই নীতির প্রবক্তা। ভারতের ইতিহাসে এই সত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। চীন দেশে লাও-ৎ-সু প্রায় একই নীতির প্রবক্তা ছিলেন। একে বলা হয় 'life from withdrawal'। এর বিপরীতে রয়েছে 'life in engagement' তত্ত্বটি; আধুনিকতা যার ওকালতি করে থাকে। দুটি নীতিই কট্টরভাবে বা অধিক পরিমাণে অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর। হিন্দুভারত প্রথমটির চূড়ান্ত করেছিল বলে এবং আধুনিক ইয়োরোপ দ্বিতীয়টির চূড়ান্ত করেছে বলে রবীন্দ্রনাথ উভয়কেই দুষেছেন। আর সাম্প্রতিক বিশ্বায়ন প্রথমটিকে মুছে দিয়ে দ্বিতীয়টির এমন চূড়ান্ত করেছে যে, মানবসভ্যতাই শেষমেষ টিকবে কি না, সেটাই এখন প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

জল (জলা, জলায়ুকা, জলাশয়, জলি) : ১. ✓জল (জীবন) + অ (অচ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **জল** = **জন্য** *লালিত হয় যাহাতে।* **জলা** = *জলের আধার যে।* **জলি** = **জল** *গতিশীল যাহাতে।* / **জলায়ুকা** = জল আয়ু যাহার। **জলাশয়** = জলে আশয়। (ব.শ.)। ৩. **জল** = বারি, অশ্রু, দ্রব, রস, চাকচিক্য, দীপ্তি, সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র, বৃষ্টি, সুপ্রবেশ, জলবৎ তাপনাশক দ্রব্য। **জলা** = জলমগ্ন নিম্নভূমি, বিল। **জলায়ুকা** = জলৌকা, জলিকা, জলুকা, জলুকা, জোঁক। (ব.শ.)। ৪. water অর্থে এবং নানান ব্যঞ্জনার্থে প্রচলিত। ৫. জল শব্দটি প্রাচীন হলেও তার 'অদৃশ্য-কিন্তু-সক্রিয়' অর্থ পরবর্তীকালে কমেছে এবং দৃশ্য অর্থ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। মধ্যযুগে উভয় প্রকারের অর্থের বিপুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে অদৃশ্য অর্থটি প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে এবং কেবলমাত্র দৃশ্য অর্থের রমরমা হয়েছে। কিন্তু অদৃশ্য অর্থই তো বেশি প্রয়োজনীয়। সেই কারণে আধুনিক যুগ তার নিজের মতো করে জল-যুক্ত অজস্র শব্দ সৃষ্টি করেছে, যার সূত্রপাত হয়েছিল মধ্যযুগে। সেই সৃষ্টির পরিমাণ কত, তার একটি নিদর্শন 'অবাক জলপান', আর একটি নিদর্শন ব.শব্দকোষের জল-ভাঙা, জল-হওয়া, জল-গলা, জল-গালা, জলে-ফেলা ইত্যাদি দু-পৃষ্ঠা জোড়া অজস্র উদাহরণ।

প্রাচীন কালে জল শব্দটির সাহায্যে জনসাধারণের আবেগময় যৌথতাকে বোঝান হত। পুরাণাদিতে অধিকাংশ স্থলে একে 'সাগর সংজ্ঞায় অভিহিত' করা হয়েছে। 'জনসমুদ্র', 'জনস্রোত' শব্দদুটি এসেছে এই ধারণা থেকেই। **জলজ্যান্ত** শব্দটিও আমাদের সেই প্রাচীন ধারণার উত্তরাধিকার। তাছাড়া 'টাকার কুমীর', 'ঘোড়েল', 'রাঘববোয়াল', 'রুইকাৎলা' প্রভৃতি শব্দ থেকেও এই ধারণাকে চেনা যায়। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'গ' গ্রন্থটির প্রথম নিবন্ধ দ্রষ্টব্য)। দ্র. **একার্ণব**। জলের অন্য যে দুটি রূপ — জলীয় বাষ্প (**মেঘ**) ও বরফ (**হিমশৈল**) — তার উল্লেখ করা হত এইভাবে : যে নেতৃস্থানীয় লোকেরা সমাজের উপরিতলে উঠে সম্পদ বণ্টন করত, শাসন করত তাদের বলা হত 'গর্জ্জনকারী মেঘ'। আর, যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় 'রাষ্ট্রব্যবস্থা' রূপে জনসাধারণের উপর চেপে বসে, তাকে বলা হত 'হিমালয়'। রবীন্দ্রনাথ একেই নাম দিয়েছেন 'অচলায়তন'। পুরাণাদিতে বহু স্থানে জনসাধারণ বোঝাতে 'জল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই জলের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ উপরে (২-এ) দেওয়া হয়েছে। এই অর্থে জনন-লালনকারী শ্রমিক-কর্মী জনমজুর যেমন বোঝায়, তেমনি water-ও বোঝায়।

ছাত্রবোধ অভিধান জল শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন — ✓জল (আচ্ছাদন করা) + অন্ - কর্তৃবাচ্যে। আর, প্রতীকী অর্থ দিয়েছেন সলিল, বারি, জড়, ও শীতল। অথচ, তাঁর দেওয়া ব্যুৎপত্তি অনুসারে জলের ক্রিয়াভিত্তিক মানে দাঁড়ায় — 'আচ্ছাদন করে যে'। এটি ভুল নয়, জল শব্দের মূল ক্রিয়াভিত্তিক অর্থও নয়, দ্বিতীয় স্তরের অর্থ বা ব্যঞ্জনার্থ। (দ্র. **জ** বর্ণের অর্থ।) তাছাড়া, জলের মধ্যে ঢুকে অনেকে আত্মরক্ষা করে। পুরাণে কালকেয়, ইন্দ্র, ঘোটকী রূপে সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা ... এরকম অনেকেই জলের (জনসাধারণের) ভিতরে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষা করেছেন। একালের কমিউনিস্টদের ভাষায় একে 'আন্ডারগ্রাউন্ডে যাওয়া' বলে। এই জল বা জনসাধারণ যে মূলত জননকারী সত্তা (*যাহা দ্বারা জন্য লালিত হয়*), সেই কথাটি পেরিয়ে তাদের অন্য একটি গুণের কথা বলে। সেই গুণটি হল জলের সমোচ্চশীলতা। দ্র. **উন্দ, সুন্দরী, ওল, সমুদ্র**। জলের উপরিতল সদা সমান থাকে, চকচক ক'রে দীপ্তি প্রকাশ করে;

আবেগপ্রবণ জনসাধারণও স্বভাবতই সমান থাকা পছন্দ করেন সন্দেহ নাই (দ্র. কলিম খানের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল ...' নিবন্ধ, কলকাতার 'রোয়াক' পত্রিকার ৭ম সংখ্যা, ২০০৮-এ প্রকাশিত); এবং অত্যন্ত ধনী কিন্তু অসাম্যবাদী দেশের জনগণের তুলনায় বেশি 'সুখবোধ' করেন, চকচক করেন। সেইজন্য তাঁদের **জলি** বলে। কিন্তু এই জলি শব্দটির উত্তরাধিকার বাংলায় দেখতে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় ইংরেজিতে — jolly। ৬. jolly।

জলকণ্টক : ২. *জলের কণ্টক (কাঁটা) যে।* ৩. পানিফল, কুমীর। ৪. অপ্রচলিত। ৫. জলে বা water-এ বসবাসকারী প্রাণীর পথের কাঁটা কুমীর (crocodile); জলে বা জনসমুদ্রে সাধারণ মানুষের পথের কাঁটা হল টাকার কুমীর।

জলকন্যা : ২. *জল হইতে যে কন্যা জাত।* ৩. **অপ্সরা**।

জলজ্যান্ত (জলজীয়ন্ত) : ২. / যাহা জলে জীবিত ছিল। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. জলে জ্যান্ত বা জীবিত থাকে যে সত্তা, তাকে জলজ্যান্ত বলে। কিন্তু শব্দটি water-এ জীবিত মাছ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রচলিত নেই, প্রচলিত রয়েছে 'জনসাধারণের মধ্যে জীবিত' অর্থে। ব.শ. তার উদাহরণ দিয়েছেন — 'জলজ্যান্ত মিছা কথা'। রুগীর পথ্যের জন্য কই, মাগুর, সিঙি, লেঠা, চ্যাং প্রভৃতি মাছ ধরে নিয়ে এসে জালার মধ্যে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। এগুলিকে যেকারণে 'জীয়ন্ত-মাছ' বা 'জ্যান্ত-মাছ' বলে, কিন্তু জলজ্যান্ত-মাছ বলে না; অথচ জলেই জীয়ন্ত রাখা হয়। এর কারণ, এই 'দৃশ্য-অর্থ'টি আদি শব্দোৎপাদনকারীদের উদ্দিষ্ট ছিল না। উদ্দিষ্ট ছিল 'জনসাধারণের মধ্যে জীয়ন্ত বা জ্যান্ত'। তাই 'জলজ্যান্ত মিথ্যা', 'জলজ্যান্ত-সত্যি', 'জলজ্যান্ত-ঘটনা', 'জলজ্যান্ত-ব্যাপার' প্রভৃতি শব্দবন্ধের প্রচলন রয়েছে। রয়েছে এরকম বাক্যও — 'জলজ্যান্ত মানুষটা লা-পাত্তা হয়ে গেল!'

জলদ : ২. *জল দেয় যে।* ৩. মেঘ, মুস্তক, কর্পূর। (ব.শ.)। ৪. প্রায় অপ্রচলিত। ৫. মুস্তক ও কর্পূর কীভাবে জল দেয়, তা আমরা জানি না। মুথাঘাসের মূল থেকে কি জল পাওয়া যায়? কিংবা কর্পূর থেকে? আসলে প্রকৃতি থেকে আমরা এত বিচ্ছিন্ন যে, মুথাঘাস কী বস্তু তাই জানি না ঠিকমত। যেদিন তা ঠিকভাবে জানা যাবে, সেদিন বোঝা যাবে সেগুলিকে কোন হিসেবে জলদ বলা হত।

জলন্ধর (জালন্ধর) : ১. জল + ধৃ + থ - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. *জনসাধারণকে ধারণ করে (একত্রিত) রাখে যে।* / জলকে ধারণ করে যে। (ছা.অ.)। ৩. আধুনিক লাহোরের বিরানব্বই ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্ববর্তী নগর। এখানে শিখজাতির বাস। পর্ব্বত। তীর্থবিশেষে। (ছা. অভিধান)। দৈত্যবিশেষ। একদিন ইন্দ্র কৈলাসে শিবের সহিত সাক্ষাৎ করতে গিয়ে এক ভীষণাকার পুরুষ দেখেন। শিবের কথা জিজ্ঞাসা করায় তার কোনো উত্তর না পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্র তার মস্তকে বজ্রাঘাত করেন। সেই বজ্রাহত পুরুষের মস্তক হতে এক ভীষণ অগ্নি নির্গত হয়ে ইন্দ্রকে ভস্ম করতে উদ্যত হয়। তখন ইন্দ্র উপলব্ধি করেন যে, তিনি স্বয়ং রুদ্রের মস্তকে বজ্রাঘাত করেছেন। নানারকম স্তবস্তুতিতে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করলে পর মহাদেব তুষ্ট হয়ে সেই অগ্নি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন। তা থেকে এক বালক আবির্ভূত হয়ে ক্রন্দন করতে থাকে। এই সংবাদ পেয়ে ব্রহ্মা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হন। তখন সমুদ্র ব্রহ্মাকে বলেন যে, 'এ আমার পুত্র, একে আপনি পালন করুন।' ব্রহ্মা তাকে নিজক্রোড়ে স্থাপন করেন। এই শিশু ব্রহ্মার শ্মশ্রু এমন দৃঢ়ভাবে ধারণ করে যে, ব্রহ্মার চক্ষু দিয়ে জলধারা নির্গত হতে থাকে। ব্রহ্মা সেই বালকের নাম রাখেন জলন্ধর এবং তাকে এই বর দেন যে, রুদ্র ছাড়া সে সকলেরই অবধ্য হবে। তাকে তিনি অসুররাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

কালনেমির কন্যা বৃন্দার সঙ্গে জলন্ধরের বিবাহ হয়। জলন্ধরের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বর্গচ্যুত হয়ে শিবের আশ্রয় নেন। মহাদেব জলন্ধরকে বধ করার জন্য ইন্দ্রকে পুনরায় স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিজে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বৃন্দা স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য বিষ্ণুর পূজা করেন। বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ গ্রহণ করে তাঁর কাছে উপস্থিত হন। স্বামী অক্ষত দেহে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন মনে করে পূজারতা বৃন্দা অসমাপ্ত পূজা ত্যাগ করেই চলে আসেন। এরই ফলে জলন্ধরের মৃত্যু হয়। বৃন্দা বিষ্ণুর এই কপট ব্যবহারে তাঁকে শাপ দিতে যান। তখন বিষ্ণু বললেন যে, 'তুমি সহমৃতা হও। তোমার ভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ — এই চারি প্রকার বৃক্ষ জন্মলাভ করবে।' (পৌ.অ.)। জালন্ধর = বিশাখা-শতদ্রুর মধ্যস্থ দেশ। ত্রিগর্ত্ত দেশ। জালন্ধরবাসীগণ। ঋষিবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. স্থান-নাম রূপে কমবেশি প্রচলিত। ৫. **ব্রহ্মপুত্র** ও **সিন্ধু** হল দুটি ধারা। প্রথমটি জ্ঞানসম্পদের ধারা, দ্বিতীয়টি ধনসম্পদের ধারা। সিন্ধুর সঙ্গে অজস্র ছোট ছোট ধারার (শত-দ্রু-র) সূত্রপাত হয়েছিল। সেগুলিই **শতদ্রু**। আর, যে ধারা এই সিন্ধুধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, সেটিই ছিল **বিশাখা**। এর মধ্যবর্তী দেশ ছিল জলন্ধরের দেশ। কে সে? কীই-বা তার কর্মবিশেষত্ব?

যতদূর অনুমান করা যায়, এর অস্তিত্ব মানসলোকের জ্ঞানকর্মের বিভাজনে; আর তার সমান্তরাল বাস্তব ঘটনা ভারতের পাঞ্জাব অঞ্চলের জলন্ধর (বা জালন্ধর) অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর। ভারতীয় ভূখণ্ডের আবিষ্কারক-পরিচালক শ্রেণীর সঙ্গে আদিম জাতীয়তাবাদী-ধনতান্ত্রিক বিরোধে যে শক্তি জলন্ধর অঞ্চলে চলে যায় এবং সেখানকার জনগোষ্ঠী তাকে সসম্মানে নেতৃপদে বরণ করে নেয়, তাকেই জলন্ধর বলে। পরে এই শক্তি ভারত ভূখণ্ডের (মূলত) ধনতান্ত্রিক শক্তির কাছে পরাজিত হয় এবং সে পরাজয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন নগদ নারায়ণ। তবে তার সঙ্গে তুলসী, অশ্বত্থ ইত্যাদির সম্পর্ক এখনও অপরিষ্কার।

জল্প, জল্পনা : দ্রষ্টব্য **চিত্রজল্প**।

জাল (জালক, জালা, জালি, খেপলাজাল, গেঁতিজাল, বেড়াজাল, ইন্দ্রজাল) : ১. ✓জল্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***জাল** = **জল** হইতে জাত। **জালক** = **জাল** করে যে। **জালা** = **জল** থাকে যে কৃত্রিম আধারে। **জালি** = **জাল** গতিশীল যাহাতে। **খেপলাজাল** = যে **জাল** ক্ষেপন করা হয় (করে মাছ ধরা হয়)।*

***গৌতিজাল** = দিশাগ্রস্ত রহস্যময় গতি থাকে যে জালে। **বেড়াজাল** = যে জাল (বৃত্তের পরিধির মতো) বেড় দেওয়া হয় (দিয়ে মাছ ধরা হয়)। **ইন্দ্রজাল** = দ্র. **ইন্দ্রজাল**।* / **জাল** = আচ্ছাদন করে যে। (ব.শ.)। ৩. **জাল** = পাশ, ফাঁদ, গবাক্ষ, লৌহাদি তন্তু রচিত জালবৎ পদার্থ, জালসদৃশ বর্ম্ম এবং শিরস্ত্রাণ, সমূহ, গণ, কুঁড়ি, ক্ষারক, কুমড়ো প্রভৃতির ছোট জালি, ইন্দ্রজাল, দম্ভ, হংসাদির অঙ্গুলিযোজক চর্ম্ম, চক্ষুরোগবিশেষ। **জালক** = গবাক্ষ, পাশ, কোরক, সমূহ, খোঁপার জাল, ইন্দ্রজাল, দম্ভ, কুলায়, কদলীফল, মেষলোম। **জালা** = বৃহৎ মৃন্ময় জলাধারবিশেষ। (Portuguese - jarra; Parsian - jarrah; English - jar)। **জালি** = ছোট জাল, জালের মতো বোনা কাপড়, কচি ফল। (ব.শ.)। ৪. জালক অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি কমবেশি নানার্থে প্রচলিত। ৫. **জল** শব্দের 'আচ্ছাদন' অর্থটির কারণ আমরা আগেই জেনেছি। জল প্রসারিত হয়ে যতখানি এলাকায় ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, জলের সেই উপরিতলকে জাল বলে। সুতো দিয়ে বোনা জালও সেরকম অনেকখানি এলাকা জুড়ে প্রসারিত হয় বলে তাকেও জাল বলে। জলের উপরিতল বা জাল যেমন জলজ প্রাণীদের ঢেকে রাখে, সুতোর জালও তেমনি অনেক কিছুকে ঢেকে রাখে। জলের উপরিতলের বা জালের ফাঁক দিয়ে যেমন মাছেরা লাফ দিতে পারে কিংবা পারে না, তেমনি (পার্থিব) সুতোর জাল ভেদ করে জালের ভেতরের প্রাণীরা (মাছেরা) লাফ দিতে পারে কিংবা পারে না। একই ভাবে **ইন্দ্র** যে মানসিক (নিয়মের) সুতোর জাল বিস্তার করেন, সেই জাল ভেদ করে ব্যক্তিমালিক 'আমি'রাও (মাছেরাও) বেরোতে পারে কিংবা পারে না। স্বাভাবিক কারণেই জাল যে ফেলে তার পক্ষে সেটি শুভফলদায়ী হলেও যাদের উপর ফেলে তাদের সকলের পক্ষে শুভ হয় না। ফলে জাল কারও চোখে ভাল, কারও চোখে নিন্দনীয়, বিপজ্জনক। বিশেষত্ব হল, জাল শব্দের এই মন্দ অর্থটির উত্তরাধিকার রয়েছে আরবি ভাষার। দ্র. **জালী**। মাল থেকে যেমন মালিক হয়, তেমনি জাল থেকে জালিক হয়। দ্র. **জালিক, জালী**।

জালিক (জালিকা) : ১. জাল + ইক। (ব.শ.)। ২. ***জালিক** = জালকে গতিশীল করে যে।* / জাল উপজীবিকা যাহার। (ব.শ.)। ৩. **জালিক** = কৈবর্ত্ত, ধীবর, বাগুরিক, ব্যাধ, মর্কটক, মাকড়সা, ঐন্দ্রজালিক, কপট, ধূর্ত্ত, গ্রামসমূহাধ্যক্ষ, গ্রামজালী। **জালিকা** = মর্কটক, জালবৎ অবগুণ্ঠনবস্ত্র, লৌহজালময় বর্ম্ম, বিধবা, কদলী, 'জলবাসী', জলৌকা, মুকুল, কুঁড়ি। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. মাল থেকে যেমন মালিক হয়, তেমনি **জাল থেকে জালিক হয়। জাল** নিয়েই এদের কারবার। জেলে ব্যাধ মাকড়সা, গ্রামাধ্যক্ষাদি যেমন এই জাল নিয়ে জীবন কাটায়, তেমনি ঐন্দ্রজালিক, কপট, ধূর্তেরাও তাদের নিজ নিজ জাল নিয়ে জীবন কাটায়। তবে কিনা, গ্রাম-সমূহাধ্যক্ষের মতো সন্তা যে জাল বিছিয়ে সবাইকে তার এখতিয়ারে রাখেন, তা সমাজস্বীকৃত বা রাষ্ট্রস্বীকৃত বলে, সেই জালিক নিন্দনীয় নয়। কিন্তু কপট ও ধূর্তেরা যে জাল বিছিয়ে ব্যক্তিমালিক মৎস্যকে ধরে, তা সমাজস্বীকৃত বা রাষ্ট্রস্বীকৃত নয় বলে কপট ও ধূর্ত জালিকেরা নিন্দনীয়। তবে ইন্দ্রজাল দেখানো ঐন্দ্রজালিক হল শবলগুণসম্পন্ন, যে স্বীকৃত নয়, নিন্দনীয়ও নয়। নিন্দনীয় যখন হয়, তখন সে আর জালিক থাকে না, হয়ে যায় **জালী**-কারবারের কারবারী **জালিয়াৎ**, সমাজ যাকে জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্ত করে থাকে। কিন্তু 'বিধবা' কেন জালিকা, তা এখনও দুর্বোধ্য।

জালী (জালী-কারবার, জালিয়াৎ, জালিয়াতি) : ২. ***জালী** = জালির আধার যে।* ৩. **জালী** = জালবান, পাশযুক্ত, গবাক্ষযুক্ত, ঐন্দ্রজালিক, ধীবর, ব্যাধ, মায়াবী, ঝিঙ্গা। (ব.শ.)। ৪. false অর্থে জাল, জালি, জালী খুবই প্রচলিত। ৫. আমাদের জালওয়ালা বা জালী বলতে তাদেরই বোঝানো হত, যাদের জাল আছে, জাল নিয়ে কারবার আছে, তাদের প্রত্যেককেই; তা সে জেলে বা ব্যাধ কিংবা জাল লাগানো দেয়ালের ফুটোই হোক আর ঝিঙ্গা-পুরুলই হোক। এমনকি ইন্দ্রজালের কারবারী মায়াবীও ছিল জালী পদবাচ্য। এর মধ্যে এসে গেল আরবী-ফারসিরা। তাদের উত্তরাধিকারে **জাল** শব্দের কেবলমাত্র নিন্দনীয় অর্থটি ছিল। তা শুনে আমাদের বাংলাভাষী পূর্বপুরুষেরা এই নিন্দনীয় 'জাল'কে চিনে ফেললেন, আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মেকি **জাল** জালবাজ, জালবাজি, জালসাজি, জালিয়াৎ, জালিয়াতি লাইন দিয়ে বাংলাভাষীর জট্ পরিবারের সদস্য হয়ে গেল। ব.শ. তো বলেই দিলেন, আমাদের প্রাচীন জালবৎ থেকেই ওদের জালিয়াত জন্মেছে!

জাল্ম (জালিম, জুলুম, জুলুমবাজি) : ১. ✓জল্ + ম (মক্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***জাল্ম** = **জাল** সীমায়িত যাহাতে; অথবা, **জাল** গোটায় যে।* ৩. পামর, ক্রূর, অসমীক্ষ্যকারী, দুর্বৃত্ত, দুরাত্মা, দুষ্কৃতি, নীচ জন, অসমীক্ষ্যভাষী। (আরবি - **জালিম** = অত্যাচারী)। (ব.শ.)। ৪. জালিম 'অত্যাচারী' অর্থে কমবেশি প্রচলিত, কিন্তু জাল্ম অপ্রচলিত। ৫. আমাদের ছিল জাল্ম, আরব উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল জালিম (জুলুম, জুলুমবাজি); দুটো শব্দের নির্দেশকতা বা অর্থ একরকম ছিল, উপরে (৩-এ) যা দেওয়া হয়েছে। সেই অর্থগুলোর সামনে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত একটাই সাইনবোর্ড ছিল — 'জাল্ম'। পাঠান রাজত্বের সূত্রপাতের পর সেখানে আরও একটি সাইনবোর্ড ঝোলান হল — 'জালিম'। ক্রমে দিন যত গেল, প্রথম সাইনবোর্ডটা ধূলোবালি ময়লা পড়ে পড়ে অপাঠ্য হয়ে যাচ্ছিল, আধুনিক যুগের সূচনার পর প্রথম সাইনবোর্ডটা খুলে সরিয়ে দেওয়া হল। এখন রয়েছে একটিই — জালিম এবং সেই সাইনবোর্ডের পেছনে রয়েছে সেই একই পরিবার ও তার সদস্যরা। যে আধুনিক বাংলাভাষাবিদগণ কোনো একটা শব্দ শুনলেই বলতে শুরু করেন — এটা অমুক বিদেশী ভাষা থেকে, সেটা তমুক বিদেশী ভাষা থেকে এসেছে, নেহাত না পেলে বলেন এটা মুণ্ডারি, ওটা দ্রাবিড়; (এভাবে নিজেদের বাপকেলে সম্পদ — মধ্যযুগের বিশাল সাহিত্য ও তার বিশাল শব্দভাণ্ডার — ফেলে দিয়ে স্বেচ্ছায় যাঁরা অবোধ ভিখারী হয়েছেন) তাঁরা দয়া করে একটু ঘরের পুরোনো বাংলাভাষার সিন্দুকটা খুলুন, সেখানে যে সমস্ত ধুলোময়লা-পড়া সাইনবোর্ডগুলো ডাঁই করে রাখা হয়েছে, সেগুলো উল্টেপাল্টে ধুলো ঝেড়ে দেখুন। তারপর না হয় ভিক্ষাবৃত্তি করবেন।

জুট (জুটি, জোট, জোটন, জোটান) : দ্র. **জট**।

জুড় (জুড়নী, জুড়া, জুড়ি, জুড়ী, জোড়, জোড়তাড়, জোড়ভাঙা, জোড়-বিজোড়, জোড়ন, জোড়া, জোড়ানী) : ২. **জুড়** = *নবরূপে উত্তীর্ণ জন্যের গড়ান-উড়ান যাহাতে।* **জুড়নী** = **জুড়** *অন যাহাতে, তাহার (গতিশীল) আধার যে।* **জুড়া** = **জুড়**-*এর আধার যে, অর্থাৎ যাহাতে জুড়ন হইতে থাকে।* **জুড়ি, জুড়ী** = **জুড়** *গতিশীল যাহাতে, তাহার আধার।* **জোড়** = **জুড়**-*এর আশ্রয় যাহাতে।* **জোড়ন** = **জোড়** *অন যাহাতে।* ৩. **জুড়** = যোজিত করা (to join), যোজনা বা (শর) সন্ধান করা, গ্রথিত করা (to patch up), যুগে যুক্ত করা, জুতিয়া দেওয়া (to yoke), নিয়োজিত করা, লাগান, আরম্ভ করা, ব্যাপ্ত করা, ঢাকা, মিলিত করা, লব্ধ হওয়া, মিলা। **জুড়নী** = বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইলে বরের বাড়ী হইতে কন্যার বাড়ীতে প্রেরিত বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি উপহার। **জুড়া** = শীতল হওয়া বা করা, তাপহীন (ঠাণ্ডা) হওয়া বা করা, সন্তাপহীন হওয়া বা করা, শান্ত হওয়া বা করা, তৃপ্ত হওয়া বা করা, নির্ব্বাণ করা, নিবান। **জুড়ি, জুড়ী** = দুই সমকক্ষ ব্যক্তি বা সমান পদার্থ, একরকমের ঘোড়া বা বলদের জোড়া, শকটের একজোড়া বাহকমাত্র, যাত্রাদলের গায়কের জোড়া, সেতারের একসূত্রে বাঁধা দুটি তার। (ব.শ.)। ৪. ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ৫. কীভাবে জুড় জোড়ে পরিণত হয়, সেকথা আমরা জেনেছি **জুট** থেকে **জোট** হওয়ার রীতি থেকে। দ্র. **জট**।

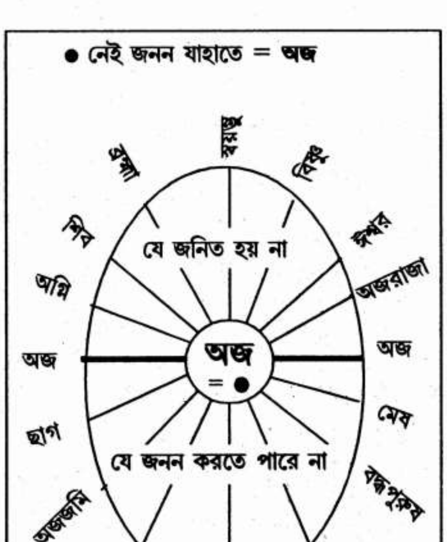
জুলি (জোল, খালে-জোলে, নয়ানজুলি, জুয়াল, জোয়াল) : ২. **জুলি** = *নবরূপে উত্তীর্ণ জন্যের লয়ন গতিশীল যাহাতে।* ৩. **জুলি** = জোল, জুরি, জলনালী। **জোল** = বড় খাত বা জুলি, নিম্নভূমি। **নয়নজুলি** = মাটি কাটায় রাস্তার পার্শ্বস্থ খাত। **জুয়াল** (জোয়াল) = গাড়ী বা লাঙলের অগ্রে আড়ভাবে বদ্ধ বলদের স্কন্ধস্থ দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড, যুগকাষ্ঠ, জোয়ালি। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় যথার্থে প্রচলিত। ৫. জল অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে থাকতে পারে এমন যেকোনো অগভীর জলাশয়কে জুলি বলে। তবে নদী বা খালের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। খাল হল সেই গর্ত, যে স্থানের মাটি খাবলে তুলে নেওয়া হয়েছে। এই খাল যদি গভীরতায় অত্যন্ত বেশি না হয়, প্রস্থে খুবই কম এবং দৈর্ঘ্যে খুবই বেশি হয় এবং তাতে যদি নাব্যতা থাকে, তাহলে তা নালী বা নালা রূপে সক্রিয় হতে পারে। কিন্তু তা যদি অগভীর হয়, প্রস্থে তুলনায় বেশি হয়, এবং দৈর্ঘ্যও অনেকখানি হয়, তাহলে তাকে জুলি বলে। কিন্তু সেই জুলি যদি একটি রাস্তার দুই পাশে হয়, তাহলে তাকে নয়নজুলি বলে। কারণ, নয়নজুলি তৈরি হয়েছে সেখান থেকে মাটি কেটে তুলে এনে ('আনয়ন করে') রাস্তায় ফেলা হয়েছে ব'লে। অর্থাৎ যে জুলির মাটি আনয়ন করা হয়েছে, তাকে নয়নজুলি বলে। আর জোয়াল বলা হয় তাকেই, যে বাঁশ বা কাঠ দুটি বলদকে জোড়ে। এটি লাঙলের জোয়াল (যুগ) বা গাড়ীর জোয়াল (যুগ) হতে পারে।

জন্‌ (জনি) ক্রিয়াপদের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অজ, অজক্ষীর, অজগন্ধা, অজগন্ধিকা, অজগর, অজগব, অজচ্ছল, অজজীবিক, অজদেবতা, অজন, অজন্মা, অজন্য, অজবীথি, অজবীথী, অজমীঢ় (আজমীর), অজমুখ, অজম্মিত, অজা, অজাকৃপাণীয়, অজাগর, অজাগলস্তন, অজাজীব, অজাশু, অজাত, অজা'ত, অজাতপক্ষ, অজাতব্যঞ্জন, অজাতব্যবহার, অজাতশত্রু, অজাতশ্মশ্রু, অজাতারি, অজাতি, অজান, অজানত, অজানা, অজানি, অজানিত, অজাপুত্র, অজামিল, অজারেণু, অজাশাল, অজিন, অজিনপত্রা, অজিনপত্রী, অজিনবাসী, অজিনযোনি, অজির, অজিরাবতী, অজী, অজীগর্ত্ত, অজৈকপাদ, অতিজাত, অনুজ, অপজাত, অপ্রজ, অপ্রজাঃ, অপ্রজাতা, অবীজ, অবীজক, অবীজা, অব্জ, অব্জজ, অব্জভব, অব্জভূ, অব্জযোনি, অব্জিনী, অব্যাজ, অভিজন, অসৌজন্য, আজ, আজগব, আজগবি, আজগুবি, আজগর, আজনন, আজনম, আজন্ম, আজব, আজবক, আজমীঢ়, আজানু, আজানুলম্বিত, আজানুলম্বিনী, আজি, আজে, উজবক, উপজাত, একজ, এজন্য, কঞ্জ, জ, জউ, জং, জংলি (জঙ্গলি), জঙ্গ, জঙ্গম, জঙ্গম-সৃষ্টি, জঙ্গল, জঙ্গাল, জঙ্গুল, জঙঘা, জঙঘাল, জঞ্জাল, জঞ্জির (জন্‌জির, জন-জীর্ণ করে যে), জঠর, জতু, জতুগৃহ, জতুধাম, জতুরস, জতুক, জতুকা, জত্রু, জত্রুদেশ, জন্‌, জন, জনওআর (জানোয়ার), জনঃ, জনক, জনকতনয়া, জনকরাজা, জনতা, জনন, জননী, জনপদ, জনপদবধূ, জনপ্রাণী, জনপ্রিয়, জনম, জনমদুখিনী, জনমেজয়, জনয়িতা, জনরঞ্জন, জনরব, জনলোক, জনশ্রুতি, জনস্থান, জনস্রোত, জনা, জনাতিগ, জনাধিপ, জনাধিনাথ, জনান্ত, জনান্তিক, জনাব, জনারণ্য, জনার্দ্দন, জনাশ্রয়, জনি, জনিত, জনী, জনু, জনুঃ, জনৈক, জনেশ্বর, জন্তু, জন্ম, জন্ম-আয়তি, জন্ম-এয়ন্ত্রী, জন্ম-কুঁড়ে, জন্মকুণ্ডলী, জন্মজন্মান্তর, জন্মজয়, জন্মান্তর, জন্মান্তরীণ, জন্মান্তরীয়, জন্মান্ধ, জন্মাবচ্ছিন্ন, জন্মায়(য়ো)তি, জন্মাষ্টমী, জন্মিত, জন্মী, জন্মেজয়, জন্য, জলজ, জাই, জাং, জাঁওয়াতি, জাঁয়তিপত্র, জাঙাল (জাঙ্গাল), জাঙিয়া (জাঙ্গিয়া), জাঙিঘ, জাঙ্গ, জাঙ্গড়া, জাঙ্গল, জাঙ্গলি, জাঙ্গলিক, জাঙ্গুলী, জাঙিঘক, জাত, জাতক, জাতকর্ম্ম, জাতকলাপ, জাতকাঠ, জাতকুমড়া, জাতক্রোধ, জাতদন্ত, জাতপাত (জাতঃপাত), জাতবিশ্বাস, জাতবেদাঃ, জাতবোষ্টম, জাতভাই, জাতমাত্র, জাতরূপ, জাতসাপ, জাতস্পৃহ, জাতাপত্যা, জাতি, জাতিকচু, জাতিকলা, জাতিকোশ, জাতিকোশী, জাতিধর্ম্ম, জাতিপত্রী, জাতিফল, জাতিব্রাহ্মণ, জাতিবর্ণ, জাতিবাদ, জাতিবৈরী, জাতিবৈষ্ণব, জাতিব্যবহার, জাতিরস্তা, জাতিসঙ্কর, জাতিসম্পন্ন, জাতিসর্প, জাতিস্মর, জাতিহীন, জাতী, জাতীয়, জাতুধান, জাতুষ, জাতেষ্টি, জাত্য, জাত্যংশ, জাত্যন্ধ, জাদ (জাত > শাহজাদ), জাদা, জাদী (হারামজাদা, জাদী), জান (যা জনিত হয়েছে), জানক, জানপদ, জানপদী, জানপ্রাণ, জানবাচ্চা, জানবিৎ, জান(নো)য়ার, জানা (রাজার বড় জন, পদবী), জানানা, জানালা (পর্তুগীজ), জানী (রাজাজানী), জানু, জাম-টাকুর, জায়ফল, জায়া, জায়াজীব, জায়াঘ্ন, জায়ানুজীবী, জিঞ্জির (দ্র.জঞ্জির), জিঞ্জলি, জিঞ্জির, জৌ, দ্বিজ, নিজ, প্রজনন, প্রজা, প্রজাপতি, বিজন, বিজাতীয়, বিয়নী, বীজ, ষড়জ, সজন, সজ্জন, সঞ্জনন, সঞ্জাত, সপরিজন, সরোজ, সরোজিনী, সহজ, সহজাত, সহজিয়া, সহজে, সাজাত্য, সাহজিক, সুজাত, সুজাতা, সুপ্রজ, সোজা (সহজা), সোজাসুজি, সৌজন্য।

জন্‌ (জনি) = জন্যর অন-করণ বা নাকরণ। **জন** = জন্যর অন-

করণ বা নাকরণ (negation) যাহাতে; জন্য অন যাহাতে। **জনি** = জন্যর বিকাশ বা গতি থাকে যাহাতে।

অজ : ১. ন + জ (জনন)। ২. **অজ** = *নেই জনন যাহাতে। /* **অজ** = যে জন্মে না; যাঁহার জন্ম হয় নাই, হয় না ও হইবে না; যে মন হইতে জন্মে। (ব.শ.)। ৩. (ক) যিনি কাহারও গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন নাই। যথা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। (খ) মহারাজ রঘুর পুত্র ও রামচন্দ্রের পিতামহ দশরথের পিতার নাম অজ। শাপভ্রষ্টা অপ্সরা বিদর্ভরাজকন্যা ইন্দুমতীকে বিবাহ করেন। স্ত্রীবিয়োগের পর দশরথের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি স্বর্গারোহন করেন। (পৌ.অ.)। বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, অগ্নি, জীবাত্মা, জীব, বদ্ধপুরুষ, মেষ, অগ্নির বাহন (ছাগ), চন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণপুত্র কামদেব, শস্যবিশেষ, রঘুর পুত্র ও দশরথের পিতা। (ব.শ.)। ৪. কেবলমাত্র 'ছাগল' অর্থে শব্দটি এখনও প্রচলিত আছে।



৫. (অন-করণ ও না-করণ মূলত একই ক্রিয়া। দ্র. **অন, ন**।) যে জনন করতে পারে না বা জনিত হয় না, সেরকম সকল সত্তাই অজ শব্দের দ্বারা নির্দেশিত হয়। **অজ** শব্দের উপরোক্ত অর্থগুলির বিশেষত্ব এই যে, হয় তারা জনিত হয় না, কিংবা তারা জনন করতে পারে না, এই দুই শ্রেণীর কোনো না কোনো শ্রেণীতে পড়ে। তাই তারা **অজ** পদবাচ্য। সেই কারণে শব্দটির অর্থে একদিকে যেমন ব্রহ্মা প্রভৃতি স্বয়ম্ভুদের উল্লেখ রয়েছে, অপরদিকে তেমনি জননক্ষমতাহীন ছাগল-পাঁঠাদেরও উল্লেখ রয়েছে। (উপরের রেখাচিত্রটি দেখুন।) এতদিন কিছুতেই বোঝা যাচ্ছিল না, কেন অজ শব্দে ব্রহ্মার পাশাপাশি ছাগকেও বোঝায়! এমনকি ভাগবতে শিবপন্থীদের ভাষায় 'এই **দক্ষ** বস্তুতই **ছাগ**' বলে সেকালের স্পেশালিস্টদের ছাগ বলা হয়েছিল, তার কারণটিও জানা যায় এখান থেকে। কারণ স্পেশালিস্ট ও পাঁঠা উভয়ে '**অপগামী**'। (দ্র. 'পরমাভাষার বোধন-উদ্বোধন', পৃষ্ঠা ৩৯-৪৫)। আগের কালে রাজাকে নিয়োগ করতেন ব্রাহ্মণ। কিন্তু যে-রাজা 'ক্যু-দেতা' করে নিজেই রাজা হয়ে যায়, তাকে তো কেউ জনন করল না। সেই হল ব্রাহ্মণ কর্তৃক জনিত না-হওয়া বা স্বয়ম্ভু অজ-রাজা (দশরথের পিতা)। কিংবা যে গ্রাম এত গণ্ড যে খাজনা দেওয়ার মতো শস্যাদিও উৎপন্ন হয় না, সেও অজগাঁ। এইভাবে অজ শব্দের অর্থ 'নেই জনন যাহাতে' বুঝলে এযাবৎ প্রাপ্ত সমস্ত অর্থের যাথার্থ্য বুঝতে পারা যায়। যে জনিত হয় না, সে যেমন 'অজ', তেমনি যে জনন করতে পারে না, সেও অজ। মোট কথা, অজ-র ভিতরে জনন নেই। সে নিজ অস্তিত্বের বাইরে জনন গুণ পাঠাতে পারে না, কেউ তার ভেতরে জনন গুণ প্রবেশ করাতে পারে না। সেই কারণে 'অজ' যেমন স্বয়ম্ভুদের বোঝাতে পারে, নপুংসকদেরও বোঝাতে পারে। এই নিয়মে তৈরি হয়েছে বলেই শব্দটি এমন পরস্পরবিরোধী অর্থ ধারণ করার যোগ্যতা ধরে। একই নিয়মে আরও অনেক শব্দ তৈরি হয়েছে। যেমন অজয়, অজিত, অপর, অমূল্য, লোক প্রভৃতি।

অজগর : ১. অজ + গর। ২. *অজকে গ্রাস করে যে। /* ছাগকে ভক্ষণ করে যে, অর্থাৎ যে একটা ছাগল গিলে। (ব.শ.)। ৩. বৃহৎ সর্পবিশেষ, শয়ু, বাহস। (ব.শ.)। ৪. সাপের নাম হিসেবে প্রচলিত।

অজগব : ১. অজ + গব। ২. *জননহীনতা-গমনহীনতা বহন করে যে*। ৩. এই শব্দের ছয়টি রূপ — অজকব, অজগব, আজকব, আজগব, অজকাব, অজগাব। এটি শিবের ধনুর নাম। পিনাক। (ব.শ.)। ৪. সম্ভবত 'আজগুবি' শব্দটি এরই অপভ্রংশরূপে প্রচলিত আছে; অন্যথায় অপ্রচলিত। ৫. শারীরিক ভাবে কাউকে এগোতে না দিলে সে সন্তান উৎপাদন করে বংশানুক্রমিকভাবে চলতে পারে। কিন্তু শারীরিক গমন এবং জনন দুটোই বন্ধ করে দিলে তার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু। এই নীতির ছয়টি রূপ হয়। সম্ভবত, বৈদিক যুগের আগে বা মহান যুগে (সনাতন যুগে) আবিষ্কারক মানুষেরা (শিব) যখন সমাজ-পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, তখন শত্রুর ক্ষেত্রে এই ছিল তাঁদের নীতি। শত্রুর অগ্রগতি ছয়রকম ভাবে রুদ্ধ করে দেওয়া। তারই মূল নাম **অজগব**।

অজমুখ : ১. অজ, খন্ = খনন। ২. *অজের ন্যায় মুখ যাহার।* ৩. দক্ষপ্রজাপতির অন্য নাম। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের সংবাদে শিব অনুচরসহ এসে যজ্ঞ নষ্ট করে দক্ষের মস্তক ছিন্ন করলেন। পরে সকলের স্তবস্তুতিতে প্রসন্ন হয়ে শিব দক্ষকে প্রাণদান করেন বটে, কিন্তু তার গলার উপরে একটি ছাগমুণ্ড সংযোজিত করেন। সেই হতেই দক্ষের নাম অজমুখ। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. মানবসভ্যতার ইতিহাসে প্রথম সচেতন সমাজব্যবস্থার নাম প্রজাপতিতন্ত্র। তার পরে ক্ষত্রিয়তন্ত্র, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদির আবির্ভাব। প্রজাপতিতন্ত্র

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ছিল সনাতন সমাজ এবং তখনও কোনো প্রকার শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা সমাজে উদ্ভূত হয়নি। **সনাতন** ব্যবস্থায় স্বাভাবিক সমাজপরিচালকদের বলা হত **মহান** বা **শিব**। সেই মহান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেই দক্ষ প্রজাপতির আবির্ভাব। স্পেশালাইজেশন বা একই কর্মের পুনরাবৃত্তি জনিত দক্ষতা ও মৌলবাদিতার সেই আদি প্রকাশ। কিন্তু সকল সামাজিক অভ্যুত্থানে যা হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। বিদ্রোহ-পরিচালকদের অগ্রগামী নেতাদের বেশির ভাগেরই মৃত্যু হয়েছিল। যারা সেকেন্ড-রেট লিডার, ছাগলের মতো, বিজয় লাভের পর তারাই ক্ষমতায় বসেন। এদের সৃজনীশক্তি নেই, তাই এরাই অজ। দ্র. **অত্রি**। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রগামী নেতাদের মৃত্যু ঘটেছিল এবং স্বাধীন ভারতের ক্ষমতা যারা দখল করেছিলেন, তাঁরা বেশির ভাগই দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা। কথাটি ভারতের স্বাধীনোত্তর নেতাদের ক্ষেত্রে এবং ১৯৭২-এ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাদখলকারী সিপিএম নেতাদের ক্ষেত্রেও খাটে, খাটে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও। বলে রাখা ভালো, ছাগমুণ্ডি-দক্ষকেই **অত্রি** কহে। অত্রিই দ্বিতীয় **প্রজাপতি**। দ্র. **ছাগমুণ্ড**।

অজাতশত্রু : ১. জন্ = জনন; শদ্ = শাতন। ২. / যাহার শত্রু জন্মে নাই। (ব.শ.)। ৩. যুধিষ্ঠির। শিব। কাশীরাজপুত্র। মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র। ইঁহার মাতা বিদেহরাজকন্যা এবং বিমাতা উত্তর কোশল-রাজ প্রসেনজিতের ভগিনী। ইনি পিতাকে নিহত করিলে ও বিমাতা পতিশোকে প্রাণত্যাগ করিলে, প্রসেনজিৎ যুদ্ধে ইঁহাকে বন্দি করিয়া কাশী অধিকার করেন এবং পরে কন্যাদান করিয়া কাশী প্রত্যর্পণ করেন। ইঁহার শাসনকালে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। (ব.শ.)। ৪. বীর অর্থে প্রচলিত। ৫. যতদূর বোঝা যায়, **অযোধ্যায়** বা উত্তর কোশলে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালের ঘটনা এই প্রসেনজিতের ঘটনাবলি।

অজামিল : ২. *অজ-নীতির অনুসরণকারীদের সঙ্গে মিলিত হয় যে।* ৩. কান্যকুব্জবাসী দ্বিজবিশেষ। ইনি দাসী সংসর্গে দূষিত হইয়া দ্যূতচৌর্য-প্রভৃতি অসদ্‌বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেন। দাসীগর্ভজাত দশ পুত্রের মধ্যে 'নারায়ণ' কনিষ্ঠ। নারায়ণের প্রতি অজামিলের অতিশয় স্নেহ ছিল। মৃত্যুকালে দূরে ক্রীড়াসক্ত নারায়ণকে তদ্‌গতচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া পাপমুক্ত হইয়া ইনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **কান্যকুব্জ**। বোঝা যায়, এই দ্বিজ বৈদিক (সমাজতান্ত্রিক) ব্যবস্থার ভিতরেই কিছু লোকজন (দাসী) নিয়ে কার্যতই পণ্যজীবিতা গ্রহণ করেছিলেন। কাজটি সেযুগের বিচারে রীতিমতো পাপকাজ ছিল। ফলে তিনি দেবপ্রবাহে প্রবাহিত হয়ে যান এবং দেবলোকে শ্রেষ্ঠ লোক বিষ্ণুলোক (ধনসম্পদের লোক) প্রাপ্ত হন।

অজিন (অজিনযোনি) : ১. ✓অজ্ + ইন (ইনন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **অজ ইন** *যাহার।* / **অজিন** = যাহা আবরণরূপে ধূলি প্রভৃতি ক্ষেপণ করে। (ব.শ.)। ৩. চর্ম্ম, কৃত্তি, ব্রহ্মচারীর বা যোগীর ব্যবহার্য্য ব্যাঘ্র ও কৃষ্ণসারাদির চর্ম্ম। **অজিনযোনি** = অজিনের উৎপত্তিস্থান, মৃগ, **হরিণ, কদলী কন্দলী** প্রভৃতি ষড়্‌বিধ হরিণ। (ব.শ.)। ৪. **অপ্রচলিত**। **৫.** বাঘের বা হরিণের চামড়া কেউ গায়ে দেয় না, বিছিয়ে বসে; তাও সবাই নয়, যাঁরা ব্রহ্মচারী বা যোগী তাঁরাই এরকম করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব.শ. বলছেন 'যাহা আবরণরূপে **ধূলি প্রভৃতি ক্ষেপণ করে**', তাকেই **অজিন** বলে। কী মুশকিল!

চামড়া **ধূলি ক্ষেপণ করে** — এমন কথায় সহসা বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু গরু-ছাগলকে অদ্ভুত একটি ভঙ্গি করে, 'গা-ঝাড়া' দিয়ে গায়ের চামড়ার ধুলোবালি কিংবা গায়ে-পড়া বৃষ্টির জল ঝাড়তে দেখা যায়, যাকে ক্ষেপণ করা বললেই যথার্থ বলা হয়। হয়তো বাঘ বা হরিণেরাও সেরকম ধূলিপ্রভৃতি ক্ষেপণ করতে পারে; আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বাঘের বা হরিণের মৃত চামড়া গায়ে চাপালে সেরকম ধূলিক্ষেপণ কোনোভাবেই সম্ভব হবে না; অন্তত যাঁরা গরু-ছাগলের 'ধূলিপ্রভৃতি ক্ষেপণ' করা একবার স্বচক্ষে দেখেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এ-বিষয়ে একমত হবেন। আর, ব্রহ্মচারী কিংবা যোগীরা তো সে-চামড়া আবরণরূপে গায়েও জড়ান না, বিছিয়ে বসেন! তাহলে, ব.শ. কেন বলছেন — 'ব্রহ্মচারীর বা যোগীর ব্যবহার্য্য ব্যাঘ্র ও কৃষ্ণসারাদির চর্ম্ম'ই সেই অজিন, 'যাহা আবরণরূপে ধূলিপ্রভৃতি ক্ষেপণ করে'?

না, ব.শ. একেবারেই ভুল বলেননি। তিনি কোথাও না কোথাও ঐরকম অর্থ পেয়েছিলেন বলেই সেকথা লিখে গেছেন। আর, সেটি যে যথার্থই, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবোধের সাহায্যে কথাগুলির ভিতরের ক্রিয়ার দিকে তাকালেই তা বোধগম্য হতে পারে। আদতে, অজিন শব্দটি যেকালের কথা, সেকালে লোকে সামাজিক কর্মকাণ্ডকে ব্যক্তির আচরণ থেকে পৃথকভাবে বুঝবার খণ্ডবাদী চিন্তনপদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিল না; লিখে বা বক্তৃতা দিয়ে বোঝানোর তো প্রশ্নই ছিল না। হাঁড়িকুড়ি, ইঁট, ইঁটের ঘরবাড়ি, মহেঞ্জদারুর মতো নগরের যুগ পেরিয়ে মন্দিরকেন্দ্রিক সভ্যতার যুগে ঢুকে পড়া গেছে, অথচ মাত্র হাজার দুয়েক শব্দের (দুনিয়ার আদি অভিধান যাস্ক-র নিরুক্ততে মাত্র ১৮০০ শব্দ আছে, যা ৪০০ খ্রিস্ট-পূর্বার্দ্ধে রচিত বলে মনে করা হয়।) ক্রিয়াভিত্তিক বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে সব কাজের কথা পরস্পরকে বোঝানোর কাজ চালাতে হচ্ছে, যার মূল বাহন সুর, আচার-আচরণ, ভঙ্গি, হাতের মুদ্রা, শরীরের নানান ভাষা। সেই সময়ে **ব্রহ্মজ্ঞান**-সম্পন্ন এবং তার আচরণকারী যে-**ব্রহ্মচারী** কিংবা যে-**যোগী** (জ্ঞানকর্মের থিয়োরি-প্র্যাকটিসের যোগসাধনকারী) সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞে যোগ সাধনের কাজ চালাতেন, তাঁকে ঘিরে থাকত এমন সামাজিক আবরণ, যা **ব্যাঘ্রচর্ম্ম** ও **কৃষ্ণসার** মৃগের **চর্ম্মের** মতোই **ধূলিপ্রভৃতি** সমস্ত বহিরাগত ঝঞ্ঝাটকে দূরে সরিয়ে রাখত। আর, ব্রহ্মচারী যোগীর সেই সামাজিক ভূমিকার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটত বাস্তবে বাঘের ও ছোপওয়ালা হরিণের চামড়ার উপর বসে থাকা তাঁদের ধ্যানস্থ উপবেশনে।

যাঁদের এসব কথা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে, তাঁরা আজকের যুগের সবচেয়ে বড় একটি ইন্ডাস্ট্রির প্রোজেক্ট ম্যানাজারকে তার চেয়ারে উপবিষ্ট অবস্থায় ভাবুন। সমগ্র আবহ (সিকিউরিটি, ফিনান্স ইত্যাদি) সহ যে-ছবি পাচ্ছেন, তার উপরে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ লিখুন। তারপর

সেইস্থানে ১৯০০ লিখুন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আবহ সহ ছবিটা ১০০ বছর পিছিয়ে কী দাঁড়াচ্ছে, তা ভাবুন এবং দেখুন। তারপরে আরও ১০০ বছর পিছিয়ে ১৮০০-তে যান, যে ছবি পাচ্ছেন তা দেখুন। এভাবে পেছনে যেতে যেতে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পৌঁছোলে আপনি যে ছবিটা পাবেন, তার সঙ্গে ব্রহ্মচারী যোগীর বাঘের চামড়ার উপরে উপবিষ্ট ধ্যানস্থ ছবিটা **হুবহু** মিলে যাবে।

অজীগর্ত : ২. *অজ-ই গর্ত যাহার।* ৩. শুনঃশেপ বা শুনঃশেফ ঋষির পিতা।... (ব.শ.)। দ্র. **শুনঃশেফ**। ৪. অপ্র.। ৫. একই ঘটনা রামায়ণে একরকম এবং মহাভারতে একটু অন্যরকম ভাবে বলা হয়েছে। রামায়ণ মতে এঁর নাম **ঋচিকমুনি**, সেই বিখ্যাত চরিত্র যিনি একদিকে **পরশুরামের** (ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম কিন্তু ক্ষত্রিয়ের আচরণ), আর একদিকে **বিশ্বামিত্রের** (ক্ষত্রিয় হয়ে জন্ম কিন্তু ব্রাহ্মণের আচরণ) জন্মের কারণ। এঁরই মধ্যম পুত্র নাকি **শুনঃশেফ**, যাকে তিনি অনেক অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। যিনি কেনেন, তিনি, রামায়ণের কাহিনীতে অযোধ্যার রাজা **অম্বরীষ**, এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (মহাভারতের) কাহিনীতে তিনি রাজা **হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত**; যে হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন এবং পুত্র হলে বরুণকে উৎসর্গ করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। তবে এক্ষেত্রে শুনঃশেপের পিতার নাম অজীগর্ত। উভয় কাহিনীতেই শুনঃশেফ শেষ পর্যন্ত বেঁচে যায়। উভয় কাহিনীতেই শেষ পর্যন্ত সে বিশ্বামিত্রের সঙ্গ লাভ করে। এর একটি অর্থ এই হতে পারে যে, ক্রমান্বয়ে কম-উৎপাদন বা জননহীনতাই সমাজতন্ত্রের 'গর্ত', একালে 'ইনকামবেনসি ফ্যাক্টর' বলে যাকে বোঝানোর চেষ্টা হয়ে থাকে। বৈদিক (সমাজতান্ত্রিক) ব্যবস্থার এই জননহীনতা বা উৎপাদন-হ্রাস সেই ব্যবস্থায় থাকা মানুষদের কষ্টের কারণ এবং তা থেকে তাদের বাঁচাতে পারত কেবল তাদের উৎপন্নের বিক্রির ব্যবস্থা বা বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রের সান্নিধ্যে তাই শুনঃশেফের মুক্তি ঘটে। অপরদিকে প্রচলিত বৈদিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাপ্য উৎপন্ন না দিয়ে হরিশ্চন্দ্র নানান উপায়ে আত্মরক্ষার উপায় খোঁজেন। সেখানেও শেষ পর্যন্ত **বিশ্বামিত্র** ত্রাতা। বিশ্বামিত্র যে বৈদিক ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন এবং নতুন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তকদের সহায়ক ছিলেন, সেকথা তাঁর ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। অতএব, সিদ্ধান্ত করা চলতে পারে, সমাজে একই কর্মের পুনরাবৃত্তিকারী দক্ষ বা ছাগের বা অজের প্রাদুর্ভাব সমাজে অর্থনৈতিক (হয়তো বা রাজনৈতিক সামাজিক বা অন্য প্রকার) **গর্ত** তৈরি করে ফেলেছিল; সেই গর্তসৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের পরিচালকদেরকেই অজীগর্ত বলা হত। দ্র. **গর্ত**, **ত্রিগর্ত**।

জঙ্গম (জঙ্গ, জঙ্গী, জঙ্গম-সৃষ্টি) : ১. ✓গম্ + য (যঙ্-লুক্) — জঙ্গম্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **জঙ্গম** = *জননের রহস্যরূপের গমন থাকে যাহাতে।* **জঙ্গ** = *জননের রহস্যরূপী গমন থাকে যাহাতে।* **জঙ্গী** = *জঙ্গ-এর আধার যে; অর্থাৎ, যে জঙ্গ করে।* **জঙ্গম-সৃষ্টি** = *জঙ্গম রীতিতে যে সকল সৃষ্টি হয়।* ৩. **জঙ্গম** = সততগতিযুক্ত, গতিশীল, চরিষ্ণু, সঞ্চারী, গতিশীলমাত্র, অস্থায়ী দ্রব্য। **জঙ্গ** = যুদ্ধ, বিবাদ, কোঁদল, মরিচা। **জঙ্গী** = যুদ্ধসম্বন্ধী। (ব.শ.)। **জঙ্গমসৃষ্টি** = দ্র. **জরায়ুজ**। ৪. unstable অর্থে প্রচলিত। ৫. কবিতা গল্প **গুজগুজ** খবর গান ইত্যাদি এবং সবশেষে সন্তান — এসব জিনিস সৃ**জন** বা **জন**ন করা যায় এবং আমরা সেই জনিত বিষয়বস্তুগুলি কমবেশি দেখতে পাই। কিন্তু রাম শ্যামকে ঘুষি মারলে রামের কাছ থেকে কিছু কি জনিত হয়ে শ্যামের কাছে যায়? হ্যাঁ, যায়। এর ডাকনাম আঘাত; ভাল নাম শক্তি। এই শক্তিরূপিণীকে রহস্যরূপী ং বা ঙ্ বলে। এক্ষেত্রে রামের কাছ থেকে 'জনিত হয়ে' শ্যামের কাছে যা 'গেল', তাকে 'জঙ্-গমন' করা বা 'জঙ্গ' বলে। একালের ভাষায় বললে বলতে হয়ে 'মার দেওয়া'। যারা এইরকম **জঙ্গ** করে বা মার দেয়, আজকাল তাদের প্রায়শই **জঙ্গী** বলা হয়ে থাকে। তবে সে তো হল সামাজিক জঙ্গ ও জঙ্গীর কথা। আরও এক রকমের জঙ্গ রয়েছে। একে প্রাকৃতিক জঙ্গ বা জং বলে। যাকে মার দেওয়া হয়, তার মার-খাওয়া স্থানটি যদি আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে খানিকটা ফোঁপরা ঝুরঝুরে হয়ে যায়, সেই স্থানটিকে বলা হয় 'জঙ্-খাওয়া' বা 'জং-খাওয়া'। একে লৌহমল বা মরচাও বলা হয়ে থাকে।

সবাই জানেন, যে সকল সত্তা নিজের মধ্যে নিজে স্থিত, নিজের পরিধির বাইরে বেরোয় না কোনোভাবেই, তাদের **জড়ভরত** বা স্থাবর বলে। (দ্র. **জগৎসৃষ্টির** স্থাবরসৃষ্টি) কিন্তু যারা নিজের পরিধির বাইরে নিজের কোনো না কোনো অংশকে পাঠায়, আশেপাশের অন্যান্য সত্তাগুলিকে সরিয়ে বা আঘাত করে স্থান দখল করে, তারা উপরোক্ত ভাবে 'জঙ্-গমন' করে। তাই তাদের **জঙ্গম** সত্তা বলে। সমস্ত জঙ্গম সত্তাকে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে **জঙ্গম-সৃষ্টি**। দ্র. **জগৎসৃষ্টি**, **জিজ্ঞাসা**।

প্রায় সকল বাংলা অভিধানেই জং, জঙ, জংগ, জংগী (জঙ্গ্, জঙ্গ, জঙ্গী) প্রভৃতি শব্দকে ফারসি থেকে আগত শব্দ বলা হয়ে থাকে। আমরা স্পষ্ট দেখছি, এটি আমাদেরও উত্তরাধিকার। ফারসি এদেশে আসার পর শব্দটি সমগোত্রীয় বিধায় এবং রাষ্ট্রক্ষমতায় ফারসি থাকায় শব্দটির বাংলা সাইনবোর্ডটি লুপ্ত হয়েছে। অন্যথায়, শব্দটির উত্তরাধিকার বাংলা ও ফারসি উভয়েরই রয়েছে। কেউ কারও কাছে ঋণী নয়।

জঙ্গল (জঙ্গলী, জংলী) : ১. ✓গল্ + য (যঙ্-লুক্) — ✓জঙ্গ ল + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **জঙ্গল** = *জননের রহস্যময় গতির লালন-লয়ন যেখানে।* ৩. নির্জল, নির্জন, মাংস, নির্জনস্থান, নিভৃত, নির্জলদেশ, মরু, বন। (ব.শ.)। ৪. forest অর্থে প্রচলিত। ৫. এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ বঙ্গীয় শব্দকোষ দেননি, এবং যে সমার্থক শব্দ দিয়েছেন, তার সব শেষে রয়েছে বন বা forest। তাঁর দেওয়া 'মাংস' শব্দটি বাদ দিলে নির্জলাদি অর্থগুলি ব্যঞ্জনার্থে গৃহীত হতে পারে। তবে, শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ নিষ্কাশন করতে পারলে আমরা শব্দটির অভিধার্থ পেয়ে যাই এবং তখন প্রতীকী অর্থগুলির ভিত্তিটি স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। জননের রহস্যময় গতি বা শক্তি লালিত বা লয়প্রাপ্ত হয় মারামারি, কাটাকাটি, কাড়াকাড়িতে। একে জং করা, জঙ্-করা বা **জঙ্গ** করা বলে। জঙ্গ করে বা যুদ্ধ করে দখল করার কাজটি যেখানে চলে, তাকে বলে জঙ্গল। আর, যারা তা করে,

তাদের বলে **জঙ্গলী** বা জংলী। সেই জঙ্গলকে forest ভাবলে সেটি তার বাহ্যিক **অর্থ** হয় এবং সে স্থান স্বভাবতই নির্জন, নির্জল ইত্যাদি হতেই পারে; আর, সামাজিক ভাবলে পাওয়া যায় সংসার-**অরণ্য**কে। 'মাংস' কেন **জঙ্গল** বোঝাবে, তা চট করে বোধগম্য হয় না। কিন্তু একবার সামাজিক মারামারি-কাটাকাটি-কাড়াকাড়ির সংসার-অরণ্যের কথা ভাবলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায়। হাটে-বাজারে তো মাল-কাড়াকাড়ির যুদ্ধ বা **মল্লযুদ্ধ**ই চলে। তাছাড়া, কথাটি বিস্তারিত ভাবে রয়েছে **অরণ্য** ও **জাঙ্গল** শব্দে।

জঙ্ঘা (জঙ্ঘাল) : ১. ✓হন্ + য (যঙ্-লুক্) — ✓জঙ্ঘ + অ (ড) - করণবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. **জঙ্ঘা** = জঙ্ *গমন স্থিত হয় যাহার দ্বারা।* / যাহার দ্বারা গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **জঙ্ঘা** = প্রসৃতা, জাঙি, পদের উপরিভাগ, ঊরু, রথ-শকটের অংশবিশেষ, খট্টার অংশবিশেষ। **জঙ্ঘাল** = জঙ্ঘাবান, দ্রুতগামী, ধাবক, হরিণবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. thigh অর্থে প্রচলিত। ৫. মানুষের শরীরে বলের কেন্দ্র বুক না ঊরু, তাই নিয়ে ধাঁধার শেষ নেই। কোথায় সামাজিক শক্তির কেন্দ্র, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে নাকি বৈশ্যদের মধ্যে? সামরিক বাহিনীতে বুকের মাপ নেওয়া হয়, কিন্তু জানুর মাপ নেওয়ার নিয়ম নেই। অর্থাৎ, মানুষের বুকে বল থাকে বলেই তাঁদের ধারণা। কিন্তু মানুষের ইতিহাসে কখনো বুকের বল, কখনো জানুর বল প্রাধান্য লাভ করেছে। **তালজঙ্ঘ** ও **উর্ব্ব** ঋষির ইতিহাসে সেই কথা সবিস্তারে বলা হয়েছে। দ্র. **তালজঙ্ঘ, উরু, উর্ব্ব**।

জঞ্জাল (জঞ্জীর) : ১. জং > জঞ্ + জাল। ২. **জঞ্জাল** = *জং-এর জাল।* **জঞ্জীর** = *জনন শক্তিকে জীর্ণ করে যে।* ৩. বিপদ, আপদ, অস্বস্তি, অনর্থ, উৎপাত, কষ্ট, দুঃখ, বিঘ্ন, বাধা, ঝঞ্ঝাট, লেঠা, গোলযোগ, বিরক্তিকর বিষয়, বিবাদ, উদ্বেগ, ভয়, অসুখের হেতু, অপ্রাপ্য বিষয়ে নির্ব্বন্ধ, মোহ, দুঃসাধ্য বিষয়, আবর্জ্জনা, পাপ, সংশয়। (ব.শ.)। ৪. waste বা 'আবর্জ্জনা' অর্থে এবং জঞ্জীর 'শেকল' অর্থে প্রচলিত। ৫. জঞ্জাল বললে সাধারণভাবে আমরা 'আবর্জ্জনা' বুঝি, কিন্তু এখানে আমরা দেখছি, ব.শ. তার অর্থ বলেছেন বিপদ, আপদ ইত্যাদি। এরকম তিনি করতে গেলেন কেন?

সবার আগে **জাল** ও **জং (জঙ্গ)** শব্দের অর্থ দেখুন। জং (আঘাত) জাল রূপে কোনো সত্তার উপর পরিবৃত হলে, সত্ত্বাটির মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সে আক্রান্ত। তখন তার আর যা যা মনে হতে পারে, ব.শ. প্রদত্ত উপরোক্ত (২) অর্থগুলিতে তাদের কথাই বলা হয়েছে। সবশেষে বলা হয়েছে 'আবর্জ্জনা, পাপ, ও সংশয়'-এর কথা। আবর্জ্জনা আধুনিক সভ্যতার উপর জাল রূপে চেপে বসে আঘাত (**জঙ্গ**) করছে না কি? পাপবোধ ও সংশয় একই ভাবে মানুষের মনের উপর চেপে বসে নাকি? আমাদের মনে হয়, জঞ্জাল শব্দের তেমন ব্যঞ্জনার্থও হতে পারে। তবে এর আরও স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায় 'জননকে জীর্ণ করে যে' সেই 'জনজীর' বা 'জঞ্জীর' (যনজীর > জিঞ্জির) শব্দে। এর অর্থ শৃঙ্খল বা শেকল। শেকলে আবদ্ধ সত্তার জনন তো জীর্ণ হবেই। তবে এই শব্দের উত্তরাধিকার বাংলায় সরাসরি পাওয়া যায় না। শব্দটি ফারসি থেকে আগত সন্দেহ নেই। কিন্তু এদেশে এসে যাওয়ার পর নিশ্চয় তার প্রকৃত স্বরূপের ভিতরে বাংলাভাষী আত্মীয়তা দেখতে পেয়েছিল। নইলে তাকে আপন করে নেবে কেন! এ শব্দ তো জন্ শব্দবংশেরই সন্তান!

জন (জনওআর, জনিত, জাত, জাতি, জানোয়ার) : ১. ✓জন্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **জন** = **জ্** *(জনন) অন যাহাতে।* **জনিত** = **জন** *গতিশীল হইয়া তারিত (উত্তীর্ণ) হইয়াছে যাহাতে।* **জাত** = *যাহা* **জনিত** *বা প্রসূত হইয়াছে।* **জাতি** = **জাত** *গতিশীল (রহে) যাহাতে।* ৩. **জন** = জন্মী, প্রাণীমাত্র, জীব, লোক (নর ও নারী), লোকসমূহ, মানবজাতি, প্রজা, দেহ, মহর্লোকের ঊর্দ্ধলোক, জনলোক, পামর, নীচ, অসুরবিশেষ, পুরুষ, শ্রমজীবী, মজুর। **জনওয়ার, জানোয়ার** = পশু, বাঘ, গোবাঘা, (সাদৃশ্যে) মূর্খ। (ব.শ.)। ৪. person ও labour অর্থে **জন**, এবং **পশু** অর্থে জানোয়ার প্রচলিত। ৫. **জ্** অন (on) হয়ে থাকে যাতে, তাকে জন (জনমজুর)বলে; তা সে যে-কোনো জীবের সন্তানের মধ্যে থাকুক আর মানুষ-সৃষ্ট শ্রম বা শব্দের মধ্যেই থাকুক; এমনকি সাম্রাজ্যবাদী দেশ যখন অপরাধীদের দ্বীপান্তরে চালান করে সেই দ্বীপে আর একটি খুদে-সমাজ বানায়, তখন তাতেও জ্ অন থাকে। অর্থাৎ কিনা, গমন ক্রিয়ায় যেমন সমগ্র সত্তাই 'চলে' যায়, জনন ক্রিয়ায় সেরকম সমগ্র সত্তাটি পরবর্তী অধ্যায়ে চলে যায় না। কার্যত সত্তা নিজেকে অক্ষত অবিকল রেখে নিজের স্বরূপকে অতি ক্ষুদ্র আকারে কিন্তু সমান গুণ দিয়ে পাঠিয়ে দেয় নিজের বাইরে। (জনিত মাত্রেই জন্মকালে জনকের চেয়ে আকারে অনেক ছোট কিন্তু গুণে সমান হয়, কদাচিৎ সামান্য বেশি বা কম গুণসম্পন্ন হয়। দ্র. **অণ্ড**।) একেই বলে জনন করা। যে জনন করে বা জনিত হয়, তার মধ্যেই এই জন ক্রিয়া সক্রিয় বা গতিশীল থাকে। অন্য সব বাদ দিয়ে আজকাল আমরা এই **জন**কে জীব-অর্থেই বুঝে বা বুঝিয়ে থাকি, যথা এক**জন** পাঁচ**জন** ইত্যাদি।

কিন্তু মানুষ তো কেবল সন্তান জননই করে না, হাঁড়ি-কুড়ি থেকে বিশাল বাহ্যসম্পদের পাহাড় জনন করে আজ সে পৃথিবী ভরিয়ে তুলেছে। এই বাহ্যসম্পদের জননকারী **জন** ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আত্ম-বিক্রয়জীবী **জন** বা মজুরও বটে। যতদিন সে যৌথসমাজ-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল, ততদিন সে ছিল **গণ**; যেদিন থেকে সে চূর্ণবিচূর্ণ যৌথসমাজের একটি খণ্ডমাত্র হয়ে স্বতন্ত্র মানুষ হয়ে আত্মবিক্রয়ের অধিকারী হল, সেদিন থেকে সে হয়ে গেল **জন**। কেমন করে আধা-যৌথসংস্কৃতিতে থাকা কৃষিজীবী বা পশুপালক **গণ** ক্রমে **জন**-এ পরিণত হল, দেহভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই নিয়ে বিশাল গবেষণাপত্র লিখেছেন এঙ্গেলস, যার নাম 'ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা'। দৈহিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টিকে দেখার ফলে, গণ কেমন করে **জন** হল, তার কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দিকটিই গবেষকের চোখে পড়েছে; মানসিক দিকটি গ্রাহ্যের মধ্যেই আসেনি, যদিও সেটিই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। দ্র. **গণ**।

বর্ব্বর শব্দ থেকে আমরা জেনেছি, বরণীয় বর যাকে বরণ করে নেয়, তাকে বর্ব্বর বলে। অর্থাৎ আমাদের (পশুশক্তিতে)

শক্তিমান বরণীয় রাজা (= বর) যদি তার চেয়ে আরও (অধিক পশুশক্তিতে) শক্তিমানকে — 'আসুন, আমার সিংহাসনে বসুন, আমি আপনার সেবক ইত্যাদি' — ব'লে বরণ করে নেয়, তখন সেই আরও শক্তিমানকে বলা হয় 'বর কর্তৃক বরণীয়' বা বর্ব্বর। ঠিক সেইভাবে **জন** যদি কাউকে তার পশুশক্তির কারণে বরণ করে নেয়, তাকে বলে **জনবর**। কিন্তু শব্দটির সরাসরি উত্তরাধিকার আমাদের নেই; ফারসি ঘুরে তাকে আমরা পেয়েছি 'জনওয়ার' বা '**জানোয়ার**' রূপে। **জাত** ও **জাতি** শব্দের জন্য **জাতি** দ্রষ্টব্য।

৬. ইংরেজি ভাষা এই **জন** শব্দের উত্তরাধিকার পেয়েছেন তাঁদের *-gen (oxygen), gen- (gen*der, *gene*alogy, *gene*rate, *gene*rous. etc.), *geni- (geni*al, *geni*tal, *geni*tor, *geni*us, etc.), *-gine* (en*gine*) প্রভৃতি শব্দে।

জনক : ১. ✓জনি + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *জনন করে যে; কিংবা, **জন** করে যে।* ৩. উৎপাদক, জনয়িতা, পিতা, মিথিপুত্র রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ। ইনি, নিমি হইতে জন্মহেতু 'জনক', বিদেহ-নিমি হইতে জাত বলিয়া 'বৈদেহ', এবং মিথির দেহমন্থনে উৎপত্তি হেতু 'মিথিল' নামে খ্যাত। মিথিলা ইঁহার নির্ম্মিত। মিথিলরাজ হ্রস্বরোমার পুত্র ও কুশধ্বজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সীতা ইঁহার পালিতা কন্যা। ইনি ব্রহ্মবিৎ রাজর্ষি ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ইঁহার সভায় অবস্থান করিতেন। (ব.শ.)।

মিথিলার ধার্মিক রাজা। (ইক্ষ্বাকুবংশের একটি শাখা। এই বংশের সকলেই জনক উপাধিধারী। বিষ্ণুপুরাণ মতে এই বংশে ৫৬ এবং ভাগবত মতে ৫৩ জন রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন।) এই বংশে নিমি নামে এক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। একদা ধর্মাত্মা রাজা নিমি বশিষ্টকে ত্যাগ করে যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এতে বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাপ দেন। তখন ঋষিরা গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি দিয়ে নিমির দেহ পূজা করে মন্থন করেন। সেই মথিত দেহ হতে এক পুত্র জন্মায়। সেই জন্য এই পুত্রের নাম হয় মিথি। এঁর অন্য নাম জনক। বিচেতন দেহ থেকে উৎপন্ন বলে এঁর আর এক নাম হয় বৈদেহ। এই মিথি থেকে আরম্ভ করে তাঁর অধস্তন সকল পুরুষ জনক নামে খ্যাত হন। রামায়ণে কথিত আছে, মিথির পুত্র জনকই প্রথম জনক। মিথি রাজার নাম হতে রাজ্যের নাম হয় মিথিলা।

রামায়ণে দুই জনকের নাম পাওয়া যায়। একজন মিথির পুত্র ও উদাবসুর পিতা এবং অন্যজন হ্রস্বরোমার পুত্র ও সীতার পিতা। মিথিলার রাজা জনক সীতার পিতারূপে পরিচিত। এঁর প্রকৃত নাম সীরধ্বজ। জনক যজ্ঞার্থ ভূমি কর্ষণকালে লাঙ্গলের রেখা থেকে যে অলোকসামান্যা রূপবতী কন্যা পান, তাঁকেই সীতা নামে নামাঙ্কিত করে কন্যারূপে পালন করেন। সীতা বিবাহযোগ্যা হলে জনক তাঁকে বীর্য্যশুল্কা করবেন বলে স্থির করেন। সাংকাস্যার রাজা সুধন্বা সীতাকে প্রার্থনা করেন, কিন্তু জনক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে মিথিলা অবরোধ করেন। সীরধ্বজ যুদ্ধে সুধন্বাকে নিহত করে আপন ভ্রাতা কুশধ্বজকে তার রাজ্য দেন। হরধনু ভঙ্গকারীর হাতে সীতাকে অর্পণ করবেন, জনকের এই পণ ছিল। রামচন্দ্র এই হরধনু ভঙ্গ করে সীতাকে লাভ করেন। সীরধ্বজের অপর কন্যা উর্মিলার সহিত লক্ষণের ও কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সহিত যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়। ((পৌ.অ.)। ৪. father ও 'জনকরাজা' অর্থে প্রচলিত। ৫. 'কোথায় যাচ্ছেন? — জন করতে মুনিষপাড়ায় যাচ্ছি গো।' এরকম প্রশ্নোত্তর মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে আজও শোনা যায়। যারা বড় চাষিদের জমিতে **জন** (= মজুর) খাটে, তাদের পাড়ায় গিয়ে ক্ষেতে কাজ করার জন্য লোক ঠিক করাকে বলে 'মজুর করা' বা 'জন করা'। 'জন খেটে খায়' কথাটির অর্থ হল 'মজুর খেটে জীবিকার্জন করে'। গ্রামবাংলায় এরকম অনেক পাড়া রয়েছে, যেখানকার অধিবাসীরা অন্যের জমিতে জন খেটে খায়। তাদের সঙ্গে কাজের চুক্তি করাকেই বলে জন-করা।

তা সে যাই হোক, ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম যিনি জন করেছিলেন, তাঁর নাম জনক রাজা। তাঁর আগে পর্যন্ত কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষকে চুক্তি করে নিজের ক্ষেত্রে কাজ করিয়ে পাইকারী উৎপাদন করতে পারত না। দ্র. **নিমি**। কার্যত, তার আগে পর্যন্ত সেরকম কথা কেউ কাউকে বলার কথা ভাবতেও পারত না। তার জন্য ভারত সমাজকে অনেকগুলি স্তর পার হতে হয়েছিল — এক) প্রচলিত যৌথ সামাজিক কর্মযজ্ঞ পরিচালন-পদ্ধতির পরিচালকদেরকে (বশিষ্ঠকে) বাদ দেওয়ার দরকার ছিল, অন্য ধরনের পরিচালকদের (অত্রি, অঙ্গিরা, ভৃগু ও গৌতমদের) নিয়ে উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চালানোর প্রয়োজন ছিল। দুই) প্রচলিত সমাজদেহ (social structure) ভেঙে ফেলে নতুন সমাজদেহ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল, যার আগের দেহ নেই বা চলে গেছে (বিগত দেহ যাহার = বিদেহ)। তিন) নতুন ব্যবস্থার মূলে থাকতে হত মিথি, অর্থাৎ নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে কর্মের মূলনীতির বিকাশসাধন না করে 'একই কর্মের গতিশীল' (= মি) পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পাইকারী উৎপাদন (= থি)। এই তিনটি মৌলিক পরিবর্তন সাধনের ফলে, একদিকে যেমন পাইকারি উৎপাদন করার জন্য জন করার প্রয়োজন দেখা দিল, অন্যদিকে তেমনি আগেকার সমাজদেহ (social structure) না থাকায় যৌথসমাজের হাত থেকে 'মুক্ত জন' (free labour) পাওয়ার উপায় পাওয়া গেল। এর ফলে স্বভাবতই জনকরাজা জন করতে সক্ষম হলেন। অতঃপর আর কী কী হল, সে সংবাদ আমরা পাব **সীতা, হরধনু** ভঙ্গের কাহিনীতে। ৬. genitor। দ্র. **জন**, **নিমি**।

জনমেজয় (জন্মেজয়) : ১. জন + ✓এজি (কম্পন) + অ (খশ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *জনকম্পন গতিশীলরূপে থাকে যাহাতে।* ৩. ইরাবতীর গর্ভজাত পরীক্ষিতের পুত্র চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ। উতঙ্কের মুখে তক্ষকদংশনে পিতার মৃত্যুকথা শ্রবণ করিয়া, ইনি সর্পক্ষয়ার্থ সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করেন। সত্রে তক্ষক ভিন্ন সর্পকুল নিহত হইলে, আস্তীক ইঁহার নিকটে সত্রবিরতি-বর গ্রহণ করিয়া মাতুলবংশ রক্ষা করেন। সত্রাবসানে ইনি ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের মুখে পূর্ব্বপিতামহগণের চরিতকথা মহাভারত শ্রবণ করেন। ... (ব.শ.)।

তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের প্রপৌত্র। ইনি অভিমন্যুর পৌত্র ও রাজা পরীক্ষিতের পুত্র। বাল্যকালেই পিতার মৃত্যুর পর জনমেজয় রাজপুরোহিত এবং মন্ত্রীগণদ্বারা রাজসিংহাসনে আরূঢ় হন। যথাকালে

কাশীরাজ সুবর্ণবর্মার কন্যা বপুষ্টমার সহিত এঁর বিবাহ হয়। ... পিতৃহন্তা তক্ষকের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ... সর্পকুল বিনাশের জন্য তিনি সর্পসত্র নামে এক মহাযজ্ঞ করেন। যজ্ঞভূমি পরিমাপ কালে সূত নামে এক পুরাণ-কথক ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কোনো ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন। ... জনমেজয় দ্বাররক্ষার জন্যে কঠোর ব্যবস্থা করেন। ... মাতার আদেশে আস্তীক যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হয়ে জনমেজয়কে নানারূপে স্তুতি করে সন্তুষ্ট করেন। ... ফলে তক্ষক ও অবশিষ্ট সর্পরা নিষ্কৃতি পায়। এর পর জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে উদ্যত হন। কলিযুগে অশ্বমেধ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তিনি এই যজ্ঞ করা স্থির করেন। যজ্ঞস্থলে এক ব্রাহ্মণকুমারকে কোনো কারণে জনমেজয় সর্প করে দেন এবং ফলে সে হত হয়। এই ব্রহ্মহত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হতবুদ্ধি জনমেজয় বেদব্যাস রচিত মহাভারত ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের কাছে শ্রবণ করে এই মহাপাপ থেকে মুক্তিলাভ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ইংরেজিতে agitation কথাটির অর্থ আমরা সহজেই বুঝতে পারি, কিন্তু আমাদের দেশে 'সামাজিক বিদ্রোহী সত্তা' বা বিদ্রোহ-বিপ্লবকে যে 'জনমেজয়' বলা হত, তা আমরা আদৌ জানি না; যদিও ব.শ. 'জনমেজয়' শব্দটির ব্যুৎপত্তি দেওয়ার সময় সঠিকভাবেই 'এজি' (*agi*-tation) ক্রিয়াটিকেই তার মূলে চিহ্নিত করে রেখে গেছেন। বলে রাখা ভাল, সর্পনিধনযজ্ঞ বা নাগ বংশকে ধ্বংস করার যজ্ঞ হল আসলে বুর্জোয়া-নিধনযজ্ঞ, একালের মার্কসীয় ভাষায় যাকে 'সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' বলে। **জনমেজয়ের** এই বিপ্লব-প্রচেষ্টা প্রথমে তিন রাজ্যে (অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে) জয়ী হলেও ভারতের বাকি সমস্ত প্রদেশে পরাজিত হয় এবং প্রতিবিপ্লব বিজয় অর্জন করে। পরে ধীরে ধীরে অঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশে এবং সবশেষে বঙ্গদেশে পালবংশের রাজত্বের ধ্বংসের ভিতর দিয়ে এই তিন প্রদেশেও প্রতিবিপ্লব বিজয় লাভ করে। শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রতিবিপ্লবের কাহিনী বা জনমেজয়ের পরাজয়ের কাহিনী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা; যার ফলে সারা পৃথিবীর ইতিহাসের গতি বদলে যায়। কীভাবে তা ঘটে, তার বিস্তারিত বিবরণ 'ঘ' গ্রন্থের 'অভিভব' অধ্যায়ে (৮৪ থেকে ৯৫ পৃষ্ঠা) রয়েছে। যেহেতু বিষয়টি অনেক বড়ো, এখানে তা দেওয়া গেল না। আগ্রহী পাঠক উপরোক্ত গ্রন্থটি দেখে নিতে পারবেন। দ্র. **আস্তিক**। ৬. ইংরেজি Generate (দ্র. **জন**), agitation।

জন্তু (জন্তুকা, জীবজন্তু) : ১. ✓জন্ + তু (তুন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **জন্তু** = *জনন-তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **জন্তুকা** = *জন্তু-করণের আশ্রয় যাহাতে।* **জীবজন্তু** = **জীব** *(জন্যের গতিশীলতাধারীকে বহন করে যে)* ও **জন্তু**। ৩. মনুষ্য, প্রাণী, জীবমাত্র, মনুষ্যেতর প্রাণী, পুত্র। **জন্তুকা** = লাক্ষা। (ব.শ.)। রাজা সোমকের শত স্ত্রী ছিল। বৃদ্ধ বয়সে জন্তু নামে তাঁর এক পুত্র হয়। একদা সেই পুত্র পিপীলিকা দংশনে রোদন করলে রাণীগণ ও রাজা সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। রাজা একটিমাত্র পুত্রলাভের জন্য রাজপুরোহিতকে আদেশ করলে তিনি বলেন যে, জন্তুকে যদি এক যজ্ঞে আহুতি দানে সম্মত হন তবে তিনি শতপুত্র লাভ করবেন। জন্তুও বামপার্শ্বে কনকবর্ণ চিহ্নিত হয়ে তাঁর মাতৃগর্ভেই পুনর্জন্ম লাভ করবেন। রাজা যাজকের সহায়তায় জন্তুকে বলি দিয়ে যথাবিধি যজ্ঞ করলে শতপুত্র ও জন্তুকে পুনরায় লাভ করেন। মৃত্যুর পর সোমক ও পুরোহিত পরলোকে গমন করলে উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করবার জন্য পুরোহিতের নরকভোগ হয়। তখন সোমক তাঁকে পরিত্যাগ করতে অসম্মত হয়ে তাঁর সঙ্গেই স্বেচ্ছায় নরকভোগ করেন এবং পাপক্ষয় হলে উভয়েরই মুক্তিলাভ হয়। (পৌ.অ.)। **জীবজন্তু** শব্দটি ব.শব্দকোষে নেই। সংসদ অভিধানে ও ঢাকার ব্য.বা.অভিধানে থাকলেও অর্থ রয়েছে একই — নানান জীব। ৪. animal অর্থে প্রচলিত। ৫. জন্তু শব্দটির ব.শ. প্রদত্ত যে অর্থ — 'মনুষ্য, প্রাণী, জীবমাত্র, মনুষ্যেতর প্রাণী, পুত্র' — এগুলির মধ্যে 'মনুষ্য' ও 'পুত্র'কে 'জন্তু' ভাবতে কোনো বাংলাভাষীই রাজি হবেন বলে মনে হয় না। তার ওপর 'জীবজন্তু' কথাটিও কেমন অদ্ভুত! এ শব্দ সেই **'আশেপাশে'** শব্দের মতো। এখানেও নিশ্চয় দুটো মানে ছিল, কিন্তু একটা মানে আমরা ভুলেছি। তাই আমাদের কাছে এখন জীব মানে animal, জন্তু মানেও animal। এর রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় শব্দ দুটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের পাশাপাশি উপরোক্ত পৌরাণিক কাহিনী এবং বঙ্গসমাজে শব্দ দুটির প্রচলনের পার্থক্য থেকে।

জীব শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল, 'জন্যের গতিশীলতাধারীকে বহন করে যে'; অর্থাৎ যার ভিতরে জনন-ক্রিয়া গতিশীলভাবে রয়েছে এবং সেকারণে সে তার সন্তান জনন করতে পারে। আরও সরল করে বললে, সন্তান জনন করতে পারে যে, তাকেই জীব বলা যায়। আর, জন্তু শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল, 'জনন তারিত হয়ে নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে'; অর্থাৎ, এই সত্তাটি জননশক্তি বহন করে কি না, সেকথা শব্দটির ভেতরে বলা নেই; বলা আছে তার অতীত কথা। সেই অতীত কথা হল, সত্তাটিতে জনন তারিত হয়েছিল, তারপর সেই তারিত জননশক্তি নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সেই নব রূপটিকেই বলা হয় জন্তু। এটি কীরকম প্রাণী বা বস্তু?

পুরাণের কাহিনীটি জানাচ্ছে যে, এই সত্তাটিকে পুনর্বিনিয়োগ করলে মূলধন ও লাভ রূপে মূলের সাথে সাথে আরও শতগুণ তদ্রূপ সত্তা লাভ করা যায়। তার মানে, বনমুরগি ও পোল্ট্রির মুরগির মধ্যে যে পার্থক্য, জীব ও জন্তুর মধ্যে সেই পার্থক্য। আরও স্পষ্ট করে বললে, সেকালের বাংলাভাষীরা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক animal কে বলতেন জীব; পোষা বা গৃহে-উৎপাদিত ও গৃহপালিত এবং স্বভাবতই খানিকটা প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন ও কৃত্রিম — এরকম animal কে বলতেন জন্তু। তাই, যেকোনো animal-ই জীব, কিন্তু যে কোনো জীবই জন্তু নয়। সেই কারণে, বঙ্গসমাজে জন্তুর মানসম্মান জীবের তুলনায় অনেক কম। বৈষ্ণবসাহিত্যে 'জীব'-এর জয়গান আছে, 'জীবসেবাই শিবসেবা' আমাদের জনশ্রুতি স্তরের প্রবাদ। সব বাংলাভাষীই জানেন, মানুষ ঈশ্বরের জীব, কৃষ্ণের জীব; কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের বা কৃষ্ণের জন্তু নয়।

কিন্তু সেই মানুষ যখন একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি অনুসরণ করে করে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে 'পোষা মানুষ'-এ পরিণত হয়ে 'উৎকৃষ্ট প্রজা'য় (একালের অ্যাকাডেমির ভাষায় 'quality people'-এ) পরিণত হয়ে যায়, তখন সেও জন্তু হয়ে যায়। সেই

জন্তুর জন্য বানাতে হয় জন্তুদের জীবনযাত্রার রীতিনীতি, শাসন-শোষণ করার নিয়মাবলী। ইংরেজ ভারতে এসে সর্বপ্রথম যে অলঙঘনীয় সমস্যায় পড়েছিল, তা এই জন্তুর জীবনযাত্রার নিয়মাবলী নির্ধারণ। তাঁরা দেখেন — এক) যে জাতির 'আইন' (= জীবনযাত্রার নিয়মাবলী = ধর্ম) যত উন্নত, সেই জাতি মানসিকভাবে তত উন্নত। দুই) ভারতের, বিশেষত বঙ্গদেশের আইন ইয়োরোপের আইনের তুলনায় উন্নত। তার অনেকগুলি বিশেষত্বের একটি হল, এরা বেনামী সম্পত্তি রাখতে জানে এবং এদের সমাজে তার আইন আছে; ইয়োরোপ যার নাম পর্যন্ত আগে শোনেনি। তিন) উন্নত জাতিকে নিম্ন জাতির আইন দিয়ে শাসন করা অসম্ভব।

এই কারণে, ভারতের ব্রিটিশ সরকার ভারতের কিছু অধঃপতিত ব্রাহ্মণ (সেকালের যথার্থ ব্রাহ্মণ না-খেয়ে মরে যেতে রাজি ছিল, কিন্তু যবনের অন্ন খেতে রাজি হয়নি, প্রায়শই যবন-রাজশক্তিকে কোনো রকম সহায়তাও করেনি) ও কায়স্থাদির সহায়তায় বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি আত্মস্থ করার চেষ্টা করে এবং সর্বপ্রথম একটি আইনের বই লেখে। বইটির নাম 'জন্তু-আইন' বা 'Gentu Code'। মনে রাখা ভাল, gentleman শব্দটির মূলেও রয়েছে আমাদের ঐ **জন্তু**। জন্তুই পুরাণকথিত 'উৎকৃষ্ট প্রজা', পোষমানা মানুষ, quality people, এবং সেকালে যাঁরা ইংরাজকে বাংলা সংস্কৃতির ও ভাষার জ্ঞান দিচ্ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয় জানতেন, উৎকৃষ্ট প্রজাকে **জন্তু** বলে। ৬. *gent-* (*gent*eel, *gent*ile, *gent*le, *Gent*oo, etc.) প্রভৃতি। দ্র. **জন**।

জন্ম : ১. ✓জন্ + মন্ (মনিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *জনিত মন যাহাতে; অথবা, মন জননে রূপায়িত ও সীমায়িত হয় যাহাতে।* ৩. উৎপত্তি, উদ্ভব, গর্ভ হইতে যোনিপথে নিঃসরণ, জীবন, রোপণ। (ব.শ.)। ৪. birth অর্থে প্রচলিত। ৫. এই শব্দে দুরকম অর্থ থাকা সম্ভব বলে মনে হয়। এক) পূর্বসূরীর মন উত্তরসূরীতে উত্তীর্ণ হয় বলেই একে **জন্ম** বলে; দুই) দৃশ্যত জনন ক্রিয়াটি জলপ্রবাহের মতো একটানা ধারাবাহিক নয়, প্রতি ক্ষেত্রে তার একপ্রকার সীমায়ন ঘটে বলেই একে **জন্ম** বলে। ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতির সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসালে দ্বিতীয় অর্থটিই ঠিক বলে মনে হয়। দ্র. **জন, জনক**।

জন্য (জন্যে, এজন্য) : ১. ✓জন্ + য (যৎ) - কর্তৃবাচ্যে। ... (ব.শ.)। ২. ***জন্য*** *= জন্ (জনন) থাকে যাহাতে।* ***জন্যে*** *=* ***জন্য*** *দিশাগ্রস্ত যাহাতে। /* **এজন্য** = ইহা হইতে জাত। (ব.শ.)। ৩. জায়মান, জাত, জননীয়, উৎপাদ্য, জনক, প্রাণয়িতা, জননীজ, জনের জল্প, নিমিত্ত, কারণ, হেতু, জনন, উৎপত্তি, উৎপাদ্যমাত্র, পরীবাদ, নিন্দা, নির্ব্বাণ, যুদ্ধ, হট্ট, হাট, মেলা, জন্মকালের দুর্নিমিত্ত, দেহ, জনসমূহ, সমাজ। (ব.শ.)। ৪. for অর্থে **প্রচলিত**। ৫. **দ্র. জ্ বর্ণের অর্থ**। জন্য শব্দটি কাকে বোঝায়, তা নিয়ে ধাঁধার যেন শেষ নেই! কিছুতেই বুঝে ওঠা যায় না, **জন্য** সত্তাটি কে? পূর্বসূরী জনক, না কি উত্তরসূরী জনিত। নাকি এরা কেউই নয়, **জন্য** হল কেবলমাত্র **কারণ, নিমিত্ত, হেতু** ইত্যাদি? আর, অভিধান বা **শব্দকোষগুলির** বয়ান দেখুন, যত প্রাচীনে যাবেন, ততই **উৎপাদক (জনক)** ও উৎপাদিত (জনিত) উভয়কেই দেখতে পাবেন শব্দার্থ রূপে, এবং শেষে পাবেন **নিমিত্ত, কারণ, হেতু**কে। আর যত আধুনিক অভিধানাদিতে আসবেন, আগে পাবেন **নিমিত্ত, কারণ, হেতু**কে এবং শেষে নামকা-ওয়াস্তে পাবেন জনক-জনিতকে। কলকাতার সংসদ বাংলা অভিধান তো জনককে বাদই দিয়ে দিয়েছে। অভিধানকারগণের কেন এই বিপর্যস্ত ভাব?

কারণটি সত্যিই অভিনব। বিষয়টি বিস্তারিত করা হয়েছে **অজ** শব্দে। এখানে সংক্ষেপে এই বলা যায় যে, জনন ক্রিয়াটি একক ক্রিয়া নয়। গমন ক্রিয়াতে সত্তা ক বিন্দু থেকে খ বিন্দুতে সশরীরে চলে যায়, কিন্তু জনন ক্রিয়ায় সত্তা নিজে যায় না। এতে সত্তা ক বিন্দুতে বসে থেকে নিজগুণকে অবিকল রেখে এবং নিজরূপকে ক্ষুদ্রতম আকারে পরিণত ক'রে নিজ শরীর থেকে নিঃসারণ ক'রে নিঃসৃত অংশটিকে খ বিন্দুতে পাঠায়। অর্থাৎ এতেও গমনের মতো যাওয়া আছে, কিন্তু সত্তা নিজে যায় না, তার বিশেষ ধরনের অংশকে পাঠায়। একেই বলে জনন করা। তাই, এই জননে একটি সত্তা জনন করে, যা জনিত হয়, সেও আর একটি সত্তা রূপে দেখা দেয়। তার মানে, একজন জনন করে, অন্যজন জনিত হয়। ফলে, জনন ক্রিয়াটি থাকে উভয়ের মধ্যেই। তাই জননকারী **জন্য**রা পড়ে উৎপাদকদের দলে, এবং জনিত **জন্য**রা পড়ে উৎপাদিতের দলে। অতঃপর এই **জন্য**র ব্যঞ্জনার্থ রূপে দেখা দেয় আর একরকমের **জন্য** — ইহা হইতে জনিত, তাহা হইতে জনিত ইত্যাদি বোঝাতে এই**জন্য** বা এ**জন্য**, ওই**জন্য** বা সে**জন্য** শব্দের প্রচলন হয়। এধরনের **জন্য**গুলির মানে দাঁড়ায় এইকারণে, একারণে, সেকারণে, সেহেতু, সেই নিমিত্ত। আধুনিক অভিধানকারগণ এই ব্যঞ্জনার্থকেই শব্দটির অর্থ বলে মনে করেছেন এবং মূল অর্থ থেকে দূরে সরে গেছেন। দ্র. **অজ**।

জাঙ্গল : ১. জঙ্গল + অ। (ব.শ.)। ২. *জঙ্গলে জাত*। ৩. জঙ্গলভব, বনস্থিত, বনপ্রায়, আরণ্য, বন্য, অসভ্য, বর্ব্বর, (মনু, কুল্লুক ভট্ট অনুসারে) অল্পজলতৃণ প্রবাত প্রচুরাতপ বহুধান্যাদিযুত (দেশ), কপিঞ্জল পক্ষী, নির্বারিদেশ, (শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে) হরিণ এণ কুরঙ্গ ঋষ্য ইত্যাদি নয়প্রকার মৃগবিশেষ, জঙ্গলস্থ হরিণাদিপশুমাংস, মাংস। (ব.শ.)। ৪. wild অর্থে প্রচলিত। ৫. যা কিছু জঙ্গলে জন্মায় বা জঙ্গলে পাওয়া যায়, তাদের জাঙ্গল বলা যেতে পারে। কিন্তু **জঙ্গল** তো একটা নয়, দুটো। দুটোতেই বিচরণকারী সত্তার জঙ্ লড়ে। একটি হল পার্থিব **জঙ্গল**, যেখানে জীবজন্তু পশুপাখীরা থাকে, যা নির্জন, নির্জলা। অপরটি হল সংসার-জঙ্গল, যেখানে মানুষেরা মাল নিয়ে মারামারি-কাটাকাটি-টানাটানি-কেনাকাটা প্রভৃতি **মল্লযুদ্ধ** করে; যেখানে সামাজিক **সিংহ** ও **ব্যাঘ্র** প্রভৃতি সামাজিক পশুরা থাকে, কামড়াকামড়ি করে। সেকথা বলার জন্যই মনুকে উল্লেখ করে কুল্লুক ভট্ট জানাচ্ছেন — জঙ্গলে প্রচুর ধান্যাদি হয়। দ্বিতীয়ত শব্দকল্পদ্রুম জানাচ্ছেন, সেখানে নয় প্রকার মৃগ বা **হরিণ** পাওয়া যায়। ইতোপূর্বে **কপিঞ্জল** পক্ষীকে আমরা চিনেছি, মানুষের সমাজে যাঁরা তৈত্তিরীয় সংহিতা লিখেছিলেন। সুতরাং এই জাঙ্গল-সত্তাগুলি যে শুধুমাত্র forest-বিহারী animal-সত্তাগুলিকেই বোঝায় না, সংসারঅরণ্য-বিহারী সত্তাগুলিকেও বোঝায়, তা বলাই বাহুল্য। দ্র. **অরণ্য**।

জান (জানপ্রাণ) : ২. ***জান* = *জন্*** *হইতে জাত; অথবা,* ***জ*** *অন যাহাতে; অথবা, যাহা জনিত হইয়াছে।* **জানপ্রাণ = *জান* ও *প্রাণ*** *(যাহার দ্বারা জীবন সাধিত হয়। দ্র. প্রাণ)।* ৩. দ্র. **জানা**। ৪. life অর্থে দুটি শব্দই প্রচলিত। ৫. মূল কথা একটিই — 'জন্ থেকে জন্মেছে যে', সেই হল 'জান'। জীবনবাহী শরীর মাত্রেই পূর্বতন জীবিত শরীরের উত্তরাধিকার। তাই সে 'জান' পদবাচ্য। কিন্তু এটি নাকি বাংলায় ছিল না, এসেছে ফারসি থেকে। কিন্তু সে যে একই 'জন্' শব্দবংশের সন্তান, তা নিয়ে সংশয় নেই। বাংলাভাষী সেকারণে স্বভাবতই তাকে আপন করে নিয়েছে। কেবল তাই নয়, 'জান'-এর সঙ্গে 'প্রাণ' জুড়ে নতুন একটি শব্দ তৈরি করেছে 'জান-প্রাণ'। উত্তরাধিকারীর শরীরে জন্-এর চলমান থাকাই জান। এবং সেটিই **প্রাণ**ও বটে। কেননা, **প্রাণ** তো সেই সত্তা, যা শরীরের অভ্যন্তরে 'প্রকৃষ্টরূপে অন (on)' থাকে। পার্থক্য শুধুমাত্র এইটুকু যে, জানকে দেখা হয় তার অতীতের প্রবহমানতার নিরীখে, আর প্রাণকে দেখা হয় তার বর্তমানের চলমানতার নিরীখে। এই কারণে শব্দদুটি কার্যত সমার্থক। তবে, একই শব্দ দুবার ব্যবহার করার (ডবল খরচের) নীতি প্রাচীন বাংলার ছিল না, নেই। অথচ এক্ষেত্রে তা হয়েছে। কেন এবং কীভাবে এইরকম 'জানপ্রাণ', 'খাতিরযত্ন', 'দোকানহাট' প্রভৃতি সমার্থক দুটি ক'রে শব্দ একত্রে বসানোর চল বাংলাভাষায় হয়েছে, তার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর 'ভাষা' নিবন্ধে। তার জন্য এই কোষের পরিশিষ্ট দেখুন।

জানা (জানান, জানানা, জানালা, জানি, জানিত, জানী, জানু) : ২. ***জানা* = *জান*-*এর আধার যে।* *জানান* = *জানা*** *অন যাহাতে।* ***জানানা (জনানা)* = *জন*** *অন থাকে যাহাতে, তাহার আধার।* ***জানালা* = *জানা*-*রূপ অভীষ্ট লালিত যাহাতে; অথবা, যাহা হইতে জানা আনীত হয় বা আসে।* ***জানু* = *জান*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* / **জান্** = যাহা হইতে গতি জন্মে। (ব.শ.)। ৩. **জানা** = জান জ্ঞান, জ্ঞানবান, পণ্ডিত, বিদগ্ধ, রসিক, দৈবজ্ঞ, গণৎকার; প্রাণ, প্রাণবায়ু, উৎসাহ, প্রাণশক্তি, তেজ, রাগের সংবাদী সুর; অবগত হওয়া, জানা, বিশেষরূপে অবগত হওয়া, বুঝিতে পারা, বুঝা, পরিচিত বোধ করা, চিনা, বোধ করা, মনে করা, ভাবা, পরীক্ষা করা, অনুভব করা, ভোগ করা; অবগত করান, জানান; উড়িষ্যার মহারাজের পুত্র, উপাধিবিশেষ। **জানানা** = স্ত্রীলোক, পরিবারবর্গ। **জানালা (জানলা, জানেলা)** = বাতায়ন, গবাক্ষ। **জানি** = ভার্য্যা। **জানী** = প্রিয়া, দয়িতা। **জান্** = **উরুপর্ব্ব**, হাঁটু। (ব.শ.) ৪. **জানা** know অর্থে ও 'পদবী' রূপে; **জানান** let to know অর্থে; **জানানা** woman অর্থে; এবং **জানু** thigh **অর্থে প্রচলিত**। ৫. নারী বা ভার্য্যা অর্থে **জানানা, জানি** প্রভৃতি **শব্দের মানে বুঝতে** অসুবিধা হয় না। কেননা, শব্দগুলির সঙ্গে জননের **সম্পর্ক থাকতেই পারে**। কিন্তু know অর্থে জানা, window অর্থে জানালা, **কিংবা** thigh **অর্থে** জানু প্রভৃতি শব্দগুলি জন্-শব্দবংশে কেমন করে জন্মাল, এগুলির ভিতরে জনন ক্রিয়া কীভাবে রয়েছে, তা বুঝতে একটু বেগ পেতে হয়।

আমাদের প্রাচীন শব্দতাত্ত্বিকেরা **জানা**-কে দেখেছিলেন তাঁদের নিজেদের ক্রিয়াভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। কোনো বস্তু সম্পর্কে আমরা এমনিতে নাকি জানতেই পারি না; জানতে পারি মাত্র দু'ভাবে। এক, যদি বস্তুটি থেকে কোনো **কিছু জনিত** হয়ে, বেরিয়ে চারিদিকে ছড়ায়, এবং আমাদের মনের যে পাঁচজন সেক্রেটারি (শ্রবণ, দর্শন, ঘ্রাণন, চাখন, স্পর্শন প্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়) রয়েছে, তাদের কাছে এসে রিপোর্ট করে, তাহলে আমরা তাকে **জানতে** পারি; দুই, আমাদের এই পাঁচজন সেবাদাস সেক্রেটারিদের (ইন্দ্রিয়দের) অন্তত একজনও যদি আমাদের মনের মণিকোঠার **জানালা** দিয়ে বেরিয়ে সেই জ্ঞাতব্য বস্তু বা বিষয়ের কাছে গিয়ে তাতে লীন হওয়ার চেষ্টা করে (দ্র. **লিঙ্গ**) এবং তার ফলে, সেই চেষ্টিত ক্রিয়ার বিপরীতে জ্ঞাতব্য বস্তু বা বিষয় তার প্রতিক্রিয়া জনন করে; আর, সেই **জনিত-প্রতিক্রিয়া** হাতে নিয়ে আমাদের সেই ইন্দ্রিয় আমাদের মনের সেই মণিকোঠার জানালা দিয়ে ফিরে আসে এবং অতঃপর সেই ইন্দ্রিয় তার বহন করে আনা বস্তুর সেই '**জনিত-প্রতিক্রিয়া**'র কথা আমাদের মনের মণিকোঠায় দাখিল করে; একমাত্র তখনই আমরা যথার্থ ভাবে বস্তু বা বিষয়টি সম্পর্কে জানতে পারি। তার মানে, জ্ঞাতব্য বস্তু ও বিষয় থেকে '**জনিত-ক্রিয়া**' বা '**জনিত-প্রতিক্রিয়া**' আমাদের মনের গোচরে এলে, তাকে বলে **জানা**। আর, এই দুইভাবেই কেবল আমরা আমাদের ঘিরে থাকা জগতের বস্তু ও বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারি। এই **জান**-এর আধার যে, তাকে বলে **জানা**।

সেকালে রাজার যে কর্মচারী রাজ্যের সমস্ত খবর জানতেন, তাঁকেও সেকারণে **জানা** বলা হত; একালের ভাষায় যাকে 'তথ্য দপ্তর' বলা হয়ে থাকে। এ হল সব জানার উপরে জানা। সেকালের সেই জানা-র উত্তরসূরীগণ আজও তাঁদের নামের শেষে **জানা** পদবী লেখেন। তবে কিনা, মানুষের সভ্যতা যত এগিয়েছে, একদিকে **জানা**কে ঘেরাটোপে বন্দী করা হয়েছে, সত্য গোপন করা হয়েছে; অপরদিকে **জানা**র মুক্তির দাবী ক্রমশ বেড়েছে। সম্প্রতিকালে transperancy বা স্বচ্ছতার স্বীকৃতির মাধ্যমে ও **জানা**র অধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে **জানা**র মুক্তি ঘোষিত হয়েছে; যদিও তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হতে এখনও ঢের বাকি।

তা সে যাই হোক, বস্তু-বিষয়ের '**জনিত-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া**' বা **জানা** মনের যে-গবাক্ষ দিয়ে আমাদের মনের ভিতরে ঢোকে, তাকে তাই **জানালা** বলে; অর্থাৎ, '**জানা** নিয়ে আসে যে'। এর একটি সমান্তরাল ব্যাপার আছে নেচারে এবং মানবসমাজে। আমাদের ঘরের জানালা দিয়ে **বায়ু** আসে, আমাদের মনের জানালা দিয়ে 'জনিত-ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া'র **খবর** আসে। বায়ু বয়, বহন করে নিয়ে আসে। **খবর** বা মিডিয়াও প্রবাহিত হয়, 'জনিত'র কথা বহন করে নিয়ে আসে। তাতে যদি উৎপাদিত পণ্যের (মলের) খবর থাকে, তবে সেই বায়ুকে বলে **মলয়পবন**। আর, যদি তা সমান ভাগে পাওয়ার (সম-ঈরণের) খবর বা বায়ু হয়, তবে তাকে বলে **সমীরণ**। আর, জননের আধার যে নারী তাকে ফারসি ভাষায় বলা হয় জনানা; যা বাংলায় এসে **জানানা**-য় পর্যবসিত হয়েছে। একই কথা **জানী** বা **রাজাজানী** সম্পর্কেও বলা যায়। আবার, গলে যেখান দিয়ে, তার আধারকে যেমন গাল (cheek) বলে, সেইভাবে যে স্থান দিয়ে জনন হয়, তার পাশের দেহাংশকেও সেজন্যেই হয়তো **জানু** বলে। ৬. ইংরেজি ভাষা এই **জানা**র উত্তরাধিকার বহন করে তাদের know

শব্দে, কিন্তু সে যে **জন**-শব্দবংশেরই জ্ঞাতিভাই, সেকথা আমরা জানতে পারব **জ্ঞ** ও **জ্ঞান** শব্দে। আর, **জানু**র উত্তরাধিকার তাঁদের রয়েছে genu শব্দে।

জায়া (জায়, জায়গা, জায়দাদ, জায়বেজায়) : **১.** ✓জন্ + য - অধিকরণে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *জা = জন্য-এর আধার যে। জায় = জা (জন্যের আধার) গিয়ে থামে যাহাতে। জায়া = জায়-এর আধার যে; অর্থাৎ, জননশক্তি গমনপূর্ব্বক স্থির হয় যেখানে। জায়গা = জায় গমনের আধার যে।* / **জায়া** = যাহাতে পতি গর্ভ হইয়া জন্মে। (কাশিরাম দাশের মহাভারত অনুসারে — 'পুত্ররূপে জন্মে লোক ভার্য্যার উদরে। তেকারণে জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে।।')। (ব.শ.)। **৩.** **জা** = তদ্‌বংশজাত (ঘোষজা, বোসজা ইত্যাদি)। **জায়া** = ভার্য্যা। **জায়গা** = স্থান, অবকাশ, গ্রাম, দেশ, পাত্র, আধার, অবস্থা, কার্য্যগতিক, ক্ষেত্র, পদ, অধিকার। **জায়দাদ** = ভূসম্পত্তি। **জায়বেজায়** = স্থান-অস্থান, পাত্রাপাত্র, ভাল-মন্দ, অপমানজনক কথা, কুৎসিত গালি। (ব.শ.)। **৪.** wife অর্থে **জায়া**, place অর্থে **জায়গা**, very much অর্থে **বেজায়** প্রচলিত। **৫.** দ্র. **জন্য**। বর্ণানুসারে জ্-এর আধারকে **জা** বলা যায়। ভাইয়ের স্ত্রীগণ হয়তো সেকারণেই পরস্পরকে **জা** বলে থাকেন। জা ই (গতিশীল) হয়ে অ (অস্তিত্বলাভ) করলে হয় **জায়**। (ই + অ = য, দ্র. গ)। যায়, গায়, আর জায় — এই তিনটি শব্দের অর্থের পার্থক্য হল যায়-এ (দ্র. গ্) সত্তা ক বিন্দু থেকে খ বিন্দুর দিকে হাঁটে; গায়-এ সত্তা তার আওয়াজকে ক বিন্দু থেকে খ বিন্দুতে পাঠায়; এবং জায়-এ সত্তা তার **জ্**-কে (**জন্যকে**) জননক্ষেত্রের দিকে পাঠায়। (ফারসিতে যা কিছু এভাবে 'জায়', তার সবই 'তালিকাভুক্ত' বলা হয়। যা তালিকাভুক্ত নয়, সেগুলি সবই 'বেজায়'। কিংবা যাকে যাকে জীবিত করা গেছে বা জয় করা গেছে, তার তালিকাই জায়; এবং যাদের তা করা যায়নি, তারা বেজায়।) সেই পাঠানো **জ্**-কে আধার রূপে ধারণ করে যে, তাকে **জায়া** বলে; অর্থাৎ **জায়**-এর আধারকে বলে **জায়া**। এই জায়া হল সেই মানবী-ক্ষেত্র, যেখানে 'পতি পুত্র হইয়া জন্মে।' অর্থাৎ, যেখানে **জ্** (জিন্ বা জননবীজ) গমন করে স্থির হয়, সক্রিয় হয়, নবজীবন লাভ করে। সেই কারণে পুরুষ তার **লিঙ্গের** সাহায্যে এই ক্ষেত্রে (জায়ায়) বীজাধান করে। জমিও সেই রকম পার্থিব-ক্ষেত্র বটে, কিন্তু সেখানে চাষী তার নিজের লিঙ্গের সাহায্যে নিজ বীজের আধান করে না, **লাঙ্গলের** ও বিভিন্ন শস্যদানার সাহায্যে তার কল্পবীজকে (= পরিকল্পনাকে) আধান বা বিনিয়োগ করে। সেই কারণে এই পার্থিব ক্ষেত্রকে জায়া না-বলে বলা হয় **জায়গা**। (দ্র. **জমি**)। আরও বলা হয় যে, **জায়গা** শব্দটি বাংলায় এসেছে ফারসি থেকে। আমরা জানি, মূলে বিষয়টি একই। মানুষের সমাজ 'সভ্য' হলে এই পার্থিব জায়াই হয়ে যায় জায়গা, যা কিনা দৃশ্যত একই অবস্থানে স্থবির পড়ে থাকে, কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিতে কার্যত একই স্থানে ঠায় পড়ে থাকে না; হাতবদল হতে থাকে, এক মানুষের মালিকানা থেকে অন্য মানুষের মালিকানায় চলে যায়। যে বস্তু ঠায় পড়ে আছে, যার কোনো পার্থিব গতি নেই, মানুষের সভ্যসমাজ তাকেই দান করে দেয়, বিক্রি করে দেয় কিংবা কিনে নিতে পারে। এভাবে স্থির কৃষিক্ষেত্রকে বা পার্থিব জায়াকে মানুষ যখন চলমান (transferable) করে ফেলে, তখন সেই জায়া কার্যত **জায়গা** হয়ে যায়, হয়ে যায় **জায়দাদ**। এমনকি অনেক পার্থিব জায়গা যার এখতিয়ারে থাকে, সে নাম পেয়ে যায় **জায়গীরদার**। বলা হয়ে থাকে, এই শব্দগুলি ফারসি থেকে এসেছে; সেকথা ভুল নয়, আবার একশোভাগ ঠিকও নয়। কেননা, আদি **জন্** শব্দবংশের সন্তান হওয়ার সুবাদে বাংলাভাষীরা তাদের সহজেই চিনে নিতে পেরেছিল, আপন করে নিতে পেরেছিল। **৬.** জায় শব্দটির উত্তরাধিকার ইংরেজির রয়েছে তাদের *geo-* (*geo*graphy, *geo*logy, *geo*metry ইত্যাদি অনেক শব্দে। তবে অন্য অনেক ক্ষেত্রের মতন এখানেও গ্-এর সঙ্গে জ্-এর স্থানবদলের ব্যাপারটি বুঝে নিতে হবে।

বিয়নী (বিয়ন, বিয়ান, বিয়েন, বিয়নি, বেন, বেনধান) : **১.** বি - ✓জন্ (গর্ভমোচন) > বিজনন। (ব.শ.)। **২.** *বিয়নী = বিপরীত দিকে জনন করে যে, তাহার গতিশীল আধার।* **৩.** প্রসব, প্রসব করা, পাখার বাতাস দেয়, ব্যজন করে। (ব.শ.)। **৪.** 'সন্তান জনন' অর্থে প্রচলিত। **৫.** 'বিয়ান' বা 'বিয়ানো' কথাটি বাংলায় যথেষ্ট প্রচলিত। শব্দটি 'বিজনন' শব্দের বিবর্ত্তিত রূপ হতেই পারে। যে-পথে বীর্য্য নিষেক হয়, তার বিপরীতে এই জনন ঘটে বলেই একে **বিজনন** বলা হয়ে থাকবে। শব্দগুলি বঙ্গভাষী মেয়েদের কথাবার্তায় খুবই প্রচলিত, গ্রামে সাধারণভাবেই প্রচলিত। গ্রামবাংলায় বীজধানকে **বেন** বা **বেনধান** বলা হয়ে থাকে। দ্র. **বয়ান**। **৬.** হিব্রু ভাষায় 'সন্তান' অর্থে 'বেন' শব্দটি প্রচলিত আছে।

জপ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অজপ, অজপা, জপ্, জপ, জপন, জপমালা, জপযজ্ঞ, জপা, জপান, জপ্য, জাপ, জাপটা, জাপটাজাপটি, জাপটান, জাপান, জাপ্য।

জপ্ = জন্য পালন। **জপ** = জন্যর পালন / পান যাহাতে।

জপ (জপন, জপা, জপান) : **১.** ✓জপ্ + অ (অপ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *জপ = জ (জন্য) পালিত হয় যাহাতে। জপন = জপ্ অন (on) যাহাতে। জপা = জপ-এর আধার যে। জপান = জপা অন যাহাতে।* / **জপা** = যাহার দ্বারা তান্ত্রিকের জপ সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩.** **জপ** = হৃদয়োচ্চারণ, মন্ত্রাদির মানস উচ্চারণ বা আবৃত্তি, সপ্তশতীপাঠ, ব্রহ্মযজ্ঞ, বেদপাঠ; জপকারক। **জপন** = হৃদয়োচ্চারণ। **জপা** = জবাপুষ্পবৃক্ষ, জবাকুসুম। (ব.শ.)। **৪.** **জপ** 'মনে মনে বা অনুচ্চস্বরে বারবার উচ্চারণ' অর্থে, **জপান** coax বা ফুসলানো বা ভজানো অর্থে প্রচলিত। **৫.** সাধারণত মুখ দিয়ে কথা বেরোনো (দ্র. **গুজগুজ**) কিংবা যোনিপথে সন্তানের বেরিয়ে আসাকে (দ্র. **জন্ম**) **জনন** বলা হয়ে থাকে। জনন মূলত এই দুই প্রকার, একটি মনের **জনন** ক্রিয়া, অতএব অলীক; অপরটি দেহের জনন ক্রিয়া, অতএব **বাস্তব**। আরও একপ্রকার জনন ক্রিয়া রয়েছে। তা হল মন ও দেহের **যৌথ** জনন ক্রিয়া। এতে দেহমনের মিলিত রূপের একটি অংশ

বহির্গত হয়ে জনিত-তে রূপ লাভ করে। এই জনন বাস্তব, কিন্তু অলীক; কিংবা, অলীক কিন্তু বাস্তব। এরকম ঘটে যখন আমরা মনের কল্পনাকে দেহের শ্রমের সাহায্যে বাস্তবে রূপদান করি — মাটির হাঁড়িকুড়ি বা কাঠের আসবাবপত্র বানিয়ে। এই জননের ফলই আজকের মানবসভ্যতার বিশাল রসদসম্ভার, অজস্র নির্মাণ। নিঃসন্দেহে এও একধরনের জনন ক্রিয়া। তবে, এই তৃতীয় প্রকারের জনন ক্রিয়ার বিশেষত্ব হল, এতে জনন ক্রিয়াটি বাস্তবে থেকেও বাস্তবোত্তীর্ণ, কিংবা অলীক হওয়া সত্ত্বেও বাস্তব। ফলত এর যে **জ্‌** (জননবীজ বা জিন), তার স্বভাবও পূর্বকথিত দুইপ্রকার জননবীজ থেকে আলাদা। এই জননবীজকে বলে **মন্ত্র**। একালের ভাষায় আমরা যাকে কলাকৌশল বলে থাকি।

আপনি একটি অদ্ভুত কৌশল আবিষ্কার করেছেন। সেই কৌশলে কাঠের টুকরো থেকে অতি অল্প সময়ে কাঠের আসবাবপত্র বানিয়ে ফেলা যায়। স্বভাবতই আপনার ইচ্ছা হতে পারে বারংবার সেই কৌশলে অজস্র আসবাবপত্র বানাতে থাকা। তা যদি আপনি করেন, তখনই তাকে বলে **জপ** করা। আপনার এই কর্মে **জন্য** পালিত হচ্ছে বলেই একে **জপ** করা বলে। আরও সহজ করে বললে, একই ধরনের বস্তুর বা বাক্যের সৃজন-কর্মের পুনরাবৃত্তি নিয়মিত করতে থাকলে তাকে বলে **জপ** করা। 'ঠাকুর, আমায় অমুক দিন, তমুক দিন, সংসার-জ্বালা থেকে মুক্তি দিন' — এধরনের কথা বারংবার বলতে থাকাও সেকারণে ইষ্টমন্ত্র **জপ** করা।

আপনি কাউকে কিছু দিতে চান। কিন্তু দিতে চাইলেই অন্যে তা নেবে, এমন নাও হতে পারে। তার জন্য তাকে রাজি করানর চেষ্টা করতে হতে পারে। এই চেষ্টা এবং সে-চেষ্টায় সফল হওয়া — এই ক্রিয়াকেও বলে **জপ** করা, বা **জপা**। কারণ এতে একই বাক্য সৃজনের পুনরাবৃত্তি রয়েছে। (এর উল্টো ক্রিয়াকে, অর্থাৎ নেওয়ার ইচ্ছা হলে তাকে বলা হত ভজনা করা বা ভজা।) এই **জপা** একটানা চালাতে থাকলে, তাতে **জপা** অন হয়ে থাকে, তাই তাকে **জপান** বলে।

জাপ (জাপটা, জাপটাজাপটি, জাপটান, জাপান) : **১.** ✓জপ্‌ + অ (ঘঞ্‌) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***জাপ*** *=* ***জপ*** *হইতে জাত।* ***জাপটা*** *=* ***জাপ*** *টঙ্কারিত যাহাতে, তাহার আধার।* ***জাপটান*** *=* ***জাপটা*** *অন যাহাতে।* **৩. জাপ** = জপ, জপনীয় মন্ত্র। **জাপটা** = নিয়ন্ত্রিত করা, জব্দ করিয়া ধরা, হাত দিয়ে বেড়া, জড়ান। **জাপটাজাপটি** = পরস্পর জাপটান, জড়াজড়ি। (ব.শ.)। **৪.** জাপ অপ্রচলিত। জাপান, একটি দেশের নাম রূপে প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** রাজি করা বা **জপান** দুরকমভাবে হয়। যদি **আবেদন**মূলক বাক্য সৃজন করে করে কাউকে রাজি করা হয়, তাকে বলে **ভজান**; আর, যদি **নিবেদনমূলক** বাক্য সৃজন করে করে কাউকে রাজি করা হয়, তাকে বলে **জপান**। এই জপানর আচরণকে বলা হয় **জাপ**। এ হল একই বাক্যের বা কর্মের বারংবার পুনরাবৃত্তি। এতে মানুষ দক্ষ হয়ে ওঠে। যে দেশের মানুষের স্বভাবে এরকম একই কাজের পুনরাবৃত্তির কারণে নিখুঁত দক্ষতা জন্মায়, তাদের সেকারণেই **জাপান** বলে; কেননা, তাতে **জাপ** সর্বদা ও সর্বথা অন (on) থাকে। নামকরণের **ইতিহাস** থেকে জানা যায়, পুরাকালে সাধারণভাবে দেশের **নাম সেই** দেশের মানুষ রাখত না, রাখত বিদেশের মানুষ। প্রাচীন পৃথিবীতে বোধ হয় একমাত্র দেশ ভারত, যে নিজে নিজের নাম রেখেছিল এবং তার দ্বিতীয় নামটি (ইন্ডিয়া) রেখেছিল বাইরের মানুষেরা। প্রাচীনকালের বাকি প্রায় সকল দেশের নামই বিদেশীরা রেখেছিল। জাপানের নিজের নাম সম্ভবত নিপ্পন ইত্যাদি, কিন্তু বিদেশীদের দেওয়া নাম হল **জাপান**। বিদেশীদের দেওয়া নাম প্রধানত আদিভাষার ক্রিয়ার ভিত্তিতেই তৈরি হত এবং তা দেশটির বিশেষ ক্রিয়াকারী স্বভাবকে বোঝাতেই ব্যবহৃত হত। আর, কে না জানে, জাপান সেইরকম দেশ, যে-দেশের মানুষ সূক্ষ্মকর্মে বা কারুকর্মে অত্যন্ত দক্ষ!

এই **জাপ**-এর টঙ্কার ধারিত হয় যাহাতে তাকে বলে **জাপটা**। জাপটা ও জাপটি হল **কেশাকেশি**র মতো, প্রথমটি পুরুষ, দ্বিতীয়টি প্রকৃতি। আর, জাপটা অন থাকে যাহাতে, তাকে **জাপটান** বলে।

জম্‌ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : জম, জমক, জমকা, জমকাল, জমজম, জমদগ্নি, জমধর, জমল, জমা, জমাখরচ, জমাট, জমাত, জমাবন্দী, জমায়(য়ে)ত, জমাদানী, জমাদার, জমানী, জমি, জমী, জমীন, জম্পতি, জম্বাল, জম্বি(ম্বী)র, জম্বু, জম্বুক, জম্বুখণ্ড, জম্বুদ্বীপ, জম্বুনদ, জম্বুমালী, জম্ভ, জম্ভ, জম্ভক, জম্ভন, জাম, জামতা, জামদগ্নেয়, জামদগ্ন্য, জামাই, জামাতৃ, জামাতা, জামিত্র, জামীর, জাম্ববান, জাম্বুবতী, জাম্বুবান, জাম্বুনদ, জাম্বুমালী, জিম্মা, জেম্মা, জৈমিনি (মীন)।

জম্‌ = জন্যর সীমায়ন। **জম** = জন্যর সীমায়ন যাহাতে।

জম (জমক, জমকা, জমকাল, জমজম) : ✓জম। (ব.শ.)। **২.** ***জম*** *=* ***জাত*** *সীমায়িত যাহাতে।* ***জমক*** *=* ***জম*** *করে যে।* ***জমকা*** *=* ***জমক****-এর আধার যে।* ***জমকাল*** *=* ***জমকা*** *লালিত যাহাতে।* ***জমজম*** *=* ***জম****-এর পুনরাবৃত্তি থাকে যাহাতে।* **৩. জম** = সঞ্চিত হওয়া, জমা (টাকা, জল ইত্যাদি), পুঞ্জীভূত হওয়া, রাশি হওয়া, সমবেত হওয়া, একত্র হওয়া, গাঢ় বা ঘন হওয়া (জল, দুধ, দই), স্থায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া (গান, সুর), সংসক্ত হওয়া, আঁটিয়া যাওয়া, অসম্পাদিতভাবে থাকা (কাজ), গাঢ় বা ঘোরাল হওয়া। **জমক** = একসাথ, যুগপৎ, আড়ম্বর, সমারোহ, শোভা, সোনার রং উজ্জ্বল করার নিমিত্ত লবণ ফটকিরি ও সোরার জল। **জমকা** = আড়ম্বরযুক্ত হওয়া, ঝাঁকিয়া উঠা, আড়ম্বরযুক্ত করা, সুশোভিত করা। **জমকাল** = জমকযুক্ত, আড়ম্বরপূর্ণ, দীপ্তিমান, সমুজ্জ্বল। **জমজম** = লোকের সমবায়ে ভরপুরভাব। (ব.শ.)। **৪.** সবগুলিই উপরোক্ত প্রতীকী অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** আপনি বিস্তর শস্য উৎপাদন করলেন, সেগুলি হল আপনার দ্বারা **জাত**। সেই জাতগুলিকে সীমায়িত করলে, একত্রীভূত করে সংক্ষিপ্ত করে ফেলতে পারলে সেই হবে আপনার **জম্‌** করা বা **জমা**। যা কিছু এভাবে জমা হয়, তা সে উৎপাদিত বাহ্যসম্পদ টাকা পয়সা ইত্যাদি হোক, মানুষের সন্তানাদি হোক আর গান বা

সুরই হোক, যার এখতিয়ারে সঞ্চিত বা পুঞ্জীভূত হয়, তার চোখেমুখে তো ঝিলিক দেখা দেবেই, একেই বলে **জমক**। জমক খুব বেশি পরিমাণে লালিত হলে, ব্যাপারটাই **জমকাল** হয়ে দাঁড়ায়।

জমদগ্নি : ১. জমৎ + অগ্নি। ২. *যে সম্পদ (জ্ঞান বা ধন) অন্য সম্পদকে গ্রাস করে বা জমা করে।* / যে অগ্নি হুত ভক্ষণ করে। (ব.শ.)। ৩. প্রজ্জ্বলিত অগ্নিবৎ তেজস্বী, মুনিবিশেষ। ইঁহার পিতা ভৃগুপুত্র ঋচীক, মাতা গাধিসুতা সত্যবতী, এবং পত্নী প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকা। ইঁহার পাঁচ পুত্র, পরশুরাম কনিষ্ঠ। ইঁহারই আদেশে পরশুরাম মাতৃবধ করেন এবং পিতৃবরে মাতৃবধপাপ হইতে মুক্ত হন। (ব.শ.)। ... ভৃগুপুত্র ঋচিকের ঔরসে কান্যকুব্জরাজ গাধির কন্যা সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়। একদা স্ত্রীসহ ভৃগু তাঁর পুত্র জমদগ্নি ও পুত্রবধূ সত্যবতীকে দেখতে এসে বর দিতে উদ্যত হলে, সত্যবতী নিজের ও তার মাতার জন্য পুত্র ভিক্ষা করেন। ভৃগু ঋতুস্নানের পর সত্যবতীর মাতাকে অশ্বত্থবৃক্ষ ও সত্যবতীকে উড়ুম্বর বৃক্ষ আলিঙ্গন করতে উপদেশ দেন, এবং দুই জনের জন্য দুই চরু ভক্ষণার্থ দিয়ে যান। সত্যবতী ও তার মাতা বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চরু ভক্ষণে বিপর্যয় ঘটান (উলটো করেন)। ভৃগু যোগবলে এই ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে সত্যবতীকে বলেন যে, 'তোমরা বিপরীত কাজ করেছ। তোমার মাতাই তোমাকে বঞ্চনা করেছেন। ... চরু আহারে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ায় তোমার গর্ভস্থ পুত্র ব্রাহ্মণ হলেও ক্ষত্রিয়ধর্মী হবে এবং তোমার মাতার পুত্র ক্ষত্রিয় হলেও আচারে ব্রাহ্মণ হবে।' সত্যবতীর বহু অনুনয়ে ভৃগু বলেন যে, তার পুত্রের পরিবর্তে পৌত্র ক্ষত্রিয়াচারী হবে। জমদগ্নি নামে তার পুত্র কালক্রমে অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে উঠলেন। ঋচীক এঁর সঙ্গে রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকার বিবাহ দেন। তার গর্ভে পাঁচটি পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে পঞ্চম পুত্র পরশুরাম বিষ্ণুর অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ... পরশুরাম পিতার আদেশ শ্রবণমাত্র কুঠারাঘাতে মাতার শিরশ্ছেদ করেন। ... একবার হৈহয়রাজ সহস্রবাহু কার্তবীর্য্যার্জুন অনুচরগণসহ আশ্রমে উপস্থিত হন। স্ত্রী রেণুকা তাঁদের যথোচিত অতিথিসৎকার করা সত্ত্বেও তাঁরা আশ্রমের বৃক্ষাদি ভগ্ন করেন ও কামধেনু সুরভিকে হরণ করে নিয়ে যান। পরশুরাম ফিরে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়ে কার্তবীর্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং তীক্ষ্ণ ভল্লের আঘাতে তাঁর সহস্র বাহু ছেদন করে কার্তবীর্যকে বধ করেন। পরে একদিন কার্তবীর্যের পুত্রগণ আশ্রমে এসে পরশুরামের অনুপস্থিতিতে জমদগ্নিকে হত্যা করেন। আশ্রমে প্রত্যাগত পরশুরাম পিতাকে নিহত দেখে কার্তবীর্যের পুত্রদের সানুচর নিহত করেন ও একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করে স্যমন্তপঞ্চক প্রদেশে পাঁচটি রক্তময় হ্রদ সৃষ্টি করে পিতৃগণের তর্পণ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ভারতের ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সত্তা। দ্র. **কার্তবীর্য্য**। বৈদিক সভ্যতার ভেতরে যে কয়টি বৈদিক সমাজতন্ত্রবিরোধী সংগ্রাম হয়েছিল, জমদগ্নি-কার্তবীর্য্য-পরশুরাম-কেন্দ্রিক এই ঘটনাবলী তাদের অন্যতম। এই সময় থেকে বৈদিক ব্যবস্থার মৌলবাদী হয়ে পড়া, এবং তার ফলে মহর্ষিদের মধ্যে ধনসম্পদ সঞ্চয় করার প্রবণতা অত্যন্ত বেড়ে যায়। তার আগে মহর্ষিদের ব্ল্যাংক চেক দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা রাজার কাছে যা খুশি দাবি করতে পারতেন। কিন্তু তখন ব্রাহ্মণেরা ছিলেন জ্ঞানপিপাসু, ধনসম্পদকে তাঁরা গুরুত্বই দিতেন না। পরবর্তীকালে তাঁরা মৌলবাদী ও অধঃপতিত হয়ে যান, অত্যন্ত দানগ্রহণেচ্ছু হয়ে পড়েন। ফলে, একসময় ব্রাহ্মণকে দান করতে করতে ক্রমে দেউলিয়া ক্ষত্রিয়রা এই সময় ব্রাহ্মণদের উপরেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে, ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি হরণ করতে শুরু করে। জমদগ্নি সত্তাটি এইরকম এক সম্পদসঞ্চয়কারী সত্তা, একালের ভাষায় মজুতদার।

জমা, জমাট, জমাত (জমায়েত), জমাদার : দ্র. **জম**। ২. **জমা** = *জম-এর আধার যে।* **জমাট** = *জমা টঙ্কারিত যাহাতে।* **জমাত** = *জমা তারিত হয় যাহাতে।* **জমায়েত** = *জমা বিশেষ দিকে গিয়ে (বিশেষ উদ্দেশ্যর দিকে প্রণোদিত হয়ে) তারিত হয় যাহাতে বা যেখানে।* **জমাদার** = *জমা-র (সঙঘবদ্ধ দলের) খবরদারি করে যে।* ৩. **জমা** = সমষ্টি, মোট সংখ্যা, আয়, সঞ্চিত অর্থ, রাইয়তের অধিকৃত ভূমিসমূহ, হাট ঘাট ইত্যাদির বার্ষিক কর। **জমাট** = ঘনীভূত, কাঠিন্যপ্রাপ্ত, নড়চড়-রহিত, পাকা, স্থায়িত্বভাবপ্রাপ্ত, জমিয়া যাওয়া (গান, সুর)। **জমাত (জমায়ত)** = সমবায়, মিলন, দল। **জমায়েত** = একত্র মিলিত, সমবেত, দলবদ্ধ। **জমাদার** = দলের অধ্যক্ষ। ... (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. প্রায় সব বাংলা অভিধানেই জমা ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলিকে আরবি ভাষা থেকে আগত বলে দেখান হয়েছে। আমরা দেখছি, শব্দগুলি বাংলার নিজস্ব উত্তরাধিকারও বটে। আরবি শাসক রূপে আসায় সেই উত্তরাধিকার শাসকের জোর পেয়ে খানিকটা সবল হয়ে গেছে মাত্র। আজকাল যেমন ইংরেজ শাসকের জোর পেয়ে জম শব্দটিই 'চাক্কা জাম', 'রাস্তা জাম'রূপে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। কার্যত আরবির জামুরিয়া, আফ্রিকান জামাইকা, জাম্বিয়া, (সোয়াহিলির) জাম্বো ... সকলের মূলেই এই জম্ ক্রিয়া। ৬. ইংরেজি jam।

জমি (জমিদার, জমী, জমীন, জমীনদার) : ২. **জম** *গতিশীল যাহাতে।* ৩. **জমি** = পৃথিবী, ভূতল, মাটি, কৃষিক্ষেত্র, চাষের ভূঁই, কাপড়ের পিঠ (surface) বা বুননি (texture), চিত্রপটের তলদেশ (ground)। **জমিদার** = ভূস্বামী, রাজা। (ব.শ.)। ৪. land অর্থে জমি এবং landlord অর্থে জমিদার শব্দটি প্রচলিত। ৫. যতদূর বোঝা যায়, ভূতলের অংশ বা কৃষিক্ষেত্রের লেনদেন শুরু হওয়ার পরেই **জমি** ও **জায়গা** শব্দদুটির সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, দুটি শব্দের ভিতরেই **ই** বা গতিশীলতা রয়েছে। জমি-তে ই-কার রয়েছে সরাসরি, জায়গাতে ই রয়েছে 'য়'-এর ভিতরে। কিন্তু প্রশ্ন হল — জমিজায়গা গতি পায় কীভাবে?

ঠিকই, জমিজায়গা হেঁটে-চলে বেড়ায় না। একবস্তা ধান কাউকে দিয়ে দেওয়ার মতো জমিজায়গা কাউকে হাতে তুলে দিয়ে দেওয়া যায় না, কেউ তা কাঁধে করে স্থানান্তরে নিয়ে যেতেও পারে না; অথচ একালের মানুষ মাত্রেই জানেন, জমিজায়গা দিয়ে দেওয়া যায়, দান করা যায়, বিক্রি করা যায় এবং অন্যে তা নিয়েও নিতে পারে! কী করে তা সম্ভব হয়?

কার্যত জমিদান, জমিক্রয় ইত্যাদি ব্যাপার মানবসভ্যতার একটি অদ্ভুত আবিষ্কার। বিষয়টিকে বুঝবার জন্য সর্বাগ্রে জানা চাই, ভূতলের কি কোনো অধিকারী বা মালিক হয়? হ্যাঁ হয়। ভূতল যাদের অস্তিত্বের ভিত্তি, তেমন সমস্ত জড় ও জীবই ভূতলের প্রতিটি বিন্দুর অধিকারী। জড় থেকে জীবে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্রমান্বয়ে উচ্চতর উত্তরণের সমস্ত ধাপ পেরিয়ে এই ভূতল মানুষের সৃষ্টি করেছে। সেই কারণে এই পার্থিব জগৎ হল সমস্ত পার্থিব অস্তিত্বের মাতা, মানুষ হল তার শ্রেষ্ঠ সন্তান; তার সর্বাধিক আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম বুদ্ধিমান ছেলে; অন্যেরা তুলনায় কম আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম। যে নিজেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে অন্যের সাহায্য স্বভাবতই করতে পারে না। মানুষই একমাত্র পারে এই বিশ্বের সকল জীব ও জড়কে রক্ষা ক'রে তাদের সবাইকে নিয়ে চলতে। ফলত, ভূতলকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, তা নিয়ে তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার জন্মে যায়। ফলত, বিশ্বের সমস্ত মানুষ সমগ্র ভূতলের প্রতিটি বিন্দুর মালিক হয়ে যায়। আর, এই মালিকানার ধারণা চলে আদিম যুগ থেকে মহেঞ্জদাড়োর যুগ পর্যন্ত। এই সময় পর্যন্ত ভূতল হাঁটা-চলা করতে পারেনি, গতিশীল হয়নি।

কিন্তু সুবিধাবাদিতার পাল্লায় পড়ে সেই মানুষ একদিন আত্মকলহে জড়িয়ে পড়ে। পরমাপ্রকৃতি তাকে সাধারণভাবে **শিবতার** এবং প্রয়োজনে **দক্ষতার** ব্যবহার করবার যোগ্যতা দিয়েছিল। নিজের নাবালকত্বের কারণে সে অপ্রয়োজনেও **দক্ষতার** ব্যবহার শুরু করে দেয়। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ মানবসমাজে **মৌলবিবাদের** জন্ম হয়ে যায়। সেই বিবাদের প্রথম ফল ফলে আদিম মানবসমাজের বিভাজনে। সৃষ্টি হয় সম্প্রদায় ও সম্প্রদায় পরিচালক মহর্ষিদের বা জ্ঞানীমানুষদের। সেই **সম্প্রদায়** সৃষ্টির কালে আদি জ্ঞানীগণকে বা **কশ্যপকে পৃথিবী** দান করে দেওয়ার আদি ঘটনাটি ঘটে যায়; আদিম যৌথসমাজের প্রতিটি মানুষ তাদের তিনটি অধিকার জ্ঞানীগণকে দান করে দেন; যার তৃতীয় অধিকারটি ছিল ভূতলের উপর প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ অধিকার। ভূতলের অংশ বা জমির হাঁটা-চলার সূত্রপাত হয়ে যায় সেই থেকে। এই অবস্থাতেই কেটে যায় আরও হাজার বছর।

তারপর একদিন মহর্ষি (জ্ঞানী, ব্রাহ্মণ, মন্দির-চার্চ-মঠ-মন্দিরের অধিকারী) তাঁর অধিকারের ভূমির দেখভাল করার জন্য রাজা নিয়োগ করেন, অর্থাৎ রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। রাজা ও রাজার সাগরেদ রূপে সামন্তগণ জমির দেখভালের দায়িত্ব পেয়ে যান; কিন্তু তাঁরা তো আর চাষবাস করেন না। অতএব তাঁরা সে অধিকার দিয়ে দেন রায়তদের। এরপর এক রাজা আরেক রাজাকে সরিয়ে ক্ষমতায় বসে, দেখভালের দায়িত্ব কাঁধবদল হতে থাকে; যদিও গোড়ায় থেকে যায় আদি জ্ঞানজীবী মন্দির-মঠ-চার্চ-মসজিদ এবং শেষ সীমায় থেকে যায় একই রায়ত। এর মাঝে জমির যে লেনদেন চলতে থাকে, তা কেবলমাত্র দেখভালের-চাষাবাদের অধিকারের লেনদেন। জমির মালিকানা কিন্তু তার আদি রূপেই থেকে যায় মহর্ষি, জ্ঞানজীবী ব্রাহ্মণাদির কাছে। এভাবেই চলে আরও প্রায় দু'হাজার বছর।

এরপর আসে আধুনিক যুগের গণতন্ত্র। রাজাকে সরিয়ে রাজার আসনে সে বসিয়ে দেয় জনসাধারণের বা সম্প্রদায়সমূহের প্রতিনিধিকে। এর মধ্যে আদি ইতিহাসটাও লোকে ভুলে যায়। ভুলে যায় অ্যাকাডেমিও। **ফল হয় এই যে, জ্ঞানজীবী**-মন্দিরাদির হাত থেকে সকলের **অজান্তেই মালিকানা** ফিরে চলে আসে জনসাধারণের হাতেই; অথচ ইতিহাস **বিস্মৃতির** কারণে না রাষ্ট্র না জনসাধারণ, নিশ্চিত রূপে কেউই জানে না, জমির মালিকানাটা তবে গেল কোথায়? এর ফলে এক উদ্ভট সমস্যা দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মধ্যে জমির প্রকৃত মালিকানা নিয়ে বিরোধ দেখা দিচ্ছে সারা বিশ্বজুড়ে। পশ্চিমবাংলার সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের জমি রক্ষা আন্দোলন সেই বিরোধের দুটি উদাহরণ মাত্র।

জম্বু (জম্বীর, জম্বুক) : **১.** ✓জম্ (ভক্ষণ) + উ (কু) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. জম্বু = জম্** *বহন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **জম্বুক (জম্বুক) = জম্বু** *ধারণ করে যে।* **৩. জম্বু** = জামগাছ, জম্বুদ্বীপ, জম্বুফল, জাম। **জম্বুক** = জম্বুবৃক্ষ, গোলাপজাম গাছ, শৃগাল, (সাদৃশ্যে) নীচ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫. জম্বু শব্দটির অর্থ** খুব স্পষ্টভাবে ধরা যায়নি এখনও। যতটুকু যা বোঝা গেছে, আমরা তাই লিখছি। জমা করা ক্রিয়াটির মধ্যে একধরনের সংক্ষিপ্তকরণ রয়েছে। কিন্তু এমন যদি হয় যে, আপনি নিজে আপনার জিনিসগুলিকে জমা করছেন না বা সংক্ষিপ্ত করছেন না, অন্য কেউ বাইরে থেকে এসে আপনার জিনিসগুলিকে জমা করে দিচ্ছে, জমিয়ে দিচ্ছে, সংহত ক'রে ঘনীভূত ক'রে সংক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে, তখন সেই বহিরাগত সত্তাটিকে **জম্বু** বলা যায়। বিশ্বাস না হলে আপনি প্রচুর ভোজন করার শেষে বেশ কিছু জম্বু বা জাম খেয়ে ফেলুন, বিশেষত কালোজাম। দেখবেন, আপনার ভূরিভোজকে সে **হজম** করে সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। কেউ কেউ খাওয়ার শেষে একগ্লাস লেবুজল খেয়ে থাকেন। এও সেই **জাম** গুণসম্পন্ন **জম্বীর** বা **জামীর**, এবং ক্রিয়া প্রায় একই। কিন্তু এই জম্বু থেকে জাত শব্দ কেমন করে শৃগালকে বোঝায়, তা স্পষ্ট হবে **জাম্বুবান** শব্দের ব্যাখ্যায়।

জম্বুখণ্ড, জম্বুদ্বীপ : **৩.** জম্বুবৃক্ষযুক্ত ভূখণ্ড, সপ্তদ্বীপের একতম। ইহা ভুবনকমলের মধ্যকোশ; অন্য ছয় দ্বীপ ইঁহার চতুর্দিকে স্থিত। ইলাবৃতাদি নব বর্ষ জম্বুদ্বীপান্তর্গত; ইলাবৃতবর্ষের নাভিদেশে মেরুবর্ষ, উত্তরে রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ, কুরুবর্ষ, দক্ষিণে হরিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, ভারতবর্ষ, পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ অবস্থিত। ইহাতে জম্বুনদী প্রবাহিতা। ইহার তীর জাম্বুনদ-সুবর্ণ। (ব.শ.)। পৃথিবীর সপ্তদ্বীপান্তর্গত একটি দ্বীপ। এর চারিদিকে লবণসমুদ্র। জম্বুদ্বীপ পৃথিবীর মধ্যস্থলে ও অন্য ছয় দ্বীপ এর চারিদিকে পদ্মফুলের মতো অবস্থিত। এই দ্বীপ নয় বর্ষে বিভক্ত। এই নয় বর্ষের নাম — ইলাবৃত, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, হরিবর্ষ, কিম্পুরুষ, ভারত, কেতুমাল, এবং ভদ্রাশ্ব। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫. ভারতবর্ষ** শব্দে এই বিষয়টিকে বিস্তারিত করা হয়েছে। এখানে কেবল একটি বিষয় বলে নেওয়া দরকার। একটি দেশের অধিকাংশ মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রার মূল উদ্দেশ্য যদি তাদেরই কোনো একটি গোষ্ঠীর মানুষের জন্য ধনসম্পদ জমা করে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে সেই দেশটিকে জম্বুদ্বীপ বলাই বিধেয়। কারণ, সেই দেশে যে সমাজব্যবস্থা এবং পরিবার ব্যবস্থা বা **বৃক্ষ**, সেগুলি সবই **জম্বুবৃক্ষ**। সেই গাছের ফল, অর্থাৎ

সেই পরিবারগুলির উদ্বৃত্ত উৎপন্ন সবই ব্রাহ্মণদের ভরণপোষণের জন্য নিবেদিত।

জাম (জামা, জামাই, জামাতৃ, জামাতা) : ২. ***জাম*** = ***জা***ত-কে *সীমায়িত করে যে।* ***জামা*** = ***জাম****-এর আধার যে।* ***জামাতৃ (জামাতা, জামাই)*** = ***জামা*** *তারিত হয় যাহাতে।* ৩. দুহিতৃপতি, কন্যার পতি, পতি, সূর্য্যমুখী। (ব.শ.)। ৪. বৃক্ষবিশেষ অর্থে জাম, shirt-pant অর্থে জামা, এবং son-in-law অর্থে জামাই ইত্যাদি প্রচলিত। ৫. যা কিছু বাইরে থেকে জমিয়ে দেয়, জমা করে দেয়, সংক্ষিপ্ত করে দেয়, তাকেই জাম বলে। দ্র. **জম্**। যে সকল গাত্রাবরণ আঁটোসাঁটো, মানুষের শরীরকে ঘিরে বেঁধে রাখে, তেমন গাত্রাবরণকে সেকারণেই জামা বলে। অনেকের মতে 'জামা' শব্দটি ফারসি থেকে আগত। হতে পারে। কিন্তু আমরা তাকে জম্ শব্দবংশের সদস্য রূপেই দেখতে পাচ্ছি। আর, জামাই বা জামাতৃ বা জামাতা প্রভৃতি শব্দ কিন্তু একেবারেই বিপরীত ক্রিয়া থেকে জাত। এতে সত্তা নিজেই নিজের গুণকে অক্ষত রেখে আকারকে সংক্ষিপ্ততম রূপে জনন করছে, এবং সেই জনিত সত্তাটিই জামা। এই জামা স্বভাবতই মানুষের সন্তান হতেই পারে। তাকে গতিশীল বা তারণ করে যে, সেই হল **জামাই** বা **জামাতা**। তবে সূর্য্যমুখীকে কেন জামাতা বলে, তা দুর্বোধ্য।

জাম্ববান (জাম্বুনদ, জাম্বুবতী, জাম্বুবান, জাম্বুমালী) : ৩. ব্রহ্মার পুত্র ভল্লুকরাজ জাম্ববান ত্রেতাযুগে সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিলেন ও রাম-রাবণের যুদ্ধকালে সুগ্রীব ও রামকে সাহায্য করেছিলেন। দ্বাপরে কৃষ্ণের সঙ্গে জাম্ববানের যুদ্ধ হয়। ... একুশ দিন যুদ্ধ হবার পর জাম্ববান পরাজিত হয়ে কৃষ্ণকে স্যমন্তক মণি সমর্পণ করেন। জাম্ববান উপলব্ধি করেন যে, রামই কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। পরে তিনি তাঁর কন্যার সঙ্গে কৃষ্ণের বিবাহ দেন এবং বিষ্ণুর আরাধনায় রত হয়ে দেহত্যাগ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই শব্দগুলি জম্বুমালী, জম্বুনদ, বিভিন্ন বানানে পাওয়া যায়। এই নামগুলি সবই রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বিভিন্ন সত্তা। এরা রাজার জন্য সম্পদ-আহরণকারী সত্তা, যাদের অনেক অধঃস্তন কর্মচারী রয়েছে। এদের দ্বারা যে সম্পদের প্রবাহ আসে, তাকেই **জম্বুনদ** বা **জাম্বুনদ** বলে। এদের অনুসারী জনগোষ্ঠীকে বলে **জম্বুবতী** বা **জাম্বুবতী**। এদের মধ্যে যাঁরা মালপত্রের মালা সাজান (দোকানদার) তাদের বলা হত **জম্বুমালী** বা **জাম্বুমালী**। অর্থাৎ জাম্বু বিশেষ দেশের বিশেষ কালের আমলাশ্রেণীই বটে। তবে এরা যখন জনগণের সঙ্গে তঞ্চকতা করেন, তখন তাদের স্বভাবের সঙ্গে শৃগালের স্বভাব মিলে যায়। সম্ভবত সেকারণেই শৃগালকে **জম্বুক** বলা হয়।

জাগ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : কোজাগর, জাগ, জাগন্ত, জাগর, জাগরণ, জাগরি(রী), জাগরিত, জাগরূক, জাগা, জাগান, জাগৃ, জাগৃতব্য, জাগ্রৎ, জাগ্রত, সজাগ।
জাগ্ = জাগ-এর আবর্ত্তনমূলক (ঋ) গতি থাকে যাহাতে। (**জগ** = জন্যর গমন যাহাতে। **জাগ** = জগ হইতে জাত।)

জাগর (জাগ, জাগন্ত, জাগরণ, জাগরী, জাগরূক, জাগা, জাগান, জাগৃ) : ১. ✓জাগ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***জাগর*** = ***জা****-এর (**জা**ত-র) গমন (আবর্ত্তমান) রহে যাহাতে।* ***জাগ*** = ***জা****-এর গমন যাহাতে।* ***জাগন্ত*** = ***জাগ****-এর অন তারিত যাহাতে।* ***জাগরণ*** = ***জাগর*** *অন রয় যাহাতে।* ***জাগরিত*** = *যাহাকে* ***জাগান*** *হইয়াছে, বা যে জেগে আছে।* ***জাগরী*** = ***জাগর****-এর গতিশীলতাকে ধারণ করে যে।* ***জাগরূক*** = ***জাগর****-কে নবরূপে উত্তীর্ণ করে ধারণ করে যে।* ***জাগা*** = ***জাগ****-এর আধার যে।* ***জাগান*** = ***জাগা*** *অন থাকে যাহাতে।* ***জাগৃ*** = ***জাগ*** *আবর্ত্তমান রহে যাহাতে।* ***জাগ্রত*** = ***জাগরিত****।* / **জাগন্ত** = যে জাগিয়া আছে। (ব.শ.)। ৩. **জাগর** = জাগরিত, জাগরাবস্থাজন্য, অপ্রমত্ত, সাবধান, প্রকাশিত, আবির্ভূত, জাগরণ, অপ্রমাদ, নিদ্রাহীন। **জাগ** = জাগরিত হওয়া, জাগা, উদ্যোগী বা সচেষ্ট হওয়া, প্রকাশ পাওয়া, আবির্ভূত হওয়া, উত্থিত হওয়া, দৃষ্টিগত হওয়া ... ইত্যাদি। **জাগরণ** = অনিদ্রা, প্রজ্বলন, নিশাপালা। **জাগরী** = জাগরণবান, জাগরিত, সাবধান। **জাগরূক** = জাগরণশীল, সম্যক জাগরিত, সাক্ষিরূপে নিত্যপ্রবুদ্ধ, সাবধান, অপ্রমত্ত, অবহিত, অশিথিল, উদ্যোগী, সম্পূর্ণ বিদ্যমান, আবির্ভূত, অভিব্যক্ত। **জাগা** = জাগরিত করা, জাগান, উত্তেজিত করা, অভিচারে শক্তিসম্পন্ন করা। **জাগৃ** = জাগরণ, নিদ্রাক্ষয়, ইন্দ্রিয় দ্বারা বোধ, প্রবোধ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. জাগ-যুক্ত উপরোক্ত শব্দগুলির মূলে রয়েছে **জাগৃ** ক্রিয়া। এর অর্থ হল, **জা**-এর গমন আবর্ত্তমান রহে যাহাতে। তার মানে জনিতের গমনাগমন সক্রিয় রয়েছে যাতে, তাকে **জাগৃ** বলে। কীসে এবং কীভাবে জনিতের গমনাগমন সক্রিয় থাকে, তা সুস্পষ্ট হয় কোনো প্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে যে দারোয়ানি ব্যবস্থা থাকে, তার আচরণে। ভেতর থেকে কিছু বেরোতে চাইলে, দারোয়ান তা দেখে বুঝে নিয়ে তাকে যেমন বাইরে যেতে দেয়; তেমনি বাইরে থেকে কিছু এসে ভিতরে ঢুকতে চাইলে, সে তা দেখে-বুঝে নিয়ে তাকে ভেতরে যেতে দেয়। ভেতর থেকে বাইরে কিংবা বাইরে থেকে ভেতরে যাওয়ার জন্য কেউ আসছে কি না, এ বিষয়ে সে সদা সতর্ক। একে বলে জনিতের গমনাগমন সক্রিয় থাকা বা **জাগৃ**। এই জাগৃ যে সত্তার মধ্যে তারিত থাকে, সে জাগরিত বা জাগ্রত থাকে। জনিতের গমনাগমন বিষয়ে সদাসতর্ক। একেই বলে জেগে থাকা। চৌকিদার যখন হাঁকে — 'জাগতে রহো', তখন সে আবাসিকদের মনকে সতর্ক হতে বলে, ঘরে কে ঢুকল বা ঘর থেকে কে বেরোল সেদিকে নজর রাখতে বলে।

জি ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অজয়, অজয়া, অজিত, অজিতবল্লভা, অজিতাত্মা, অজিতেন্দ্রিয়, অজিহ্ন, অজেয়, অপরাজিত, অভিজিৎ, উজ্জয়িনী, জপ্তি, জয়, জয়কার, জয়কেতু, জয়ঙ্করী, জয়ঘণ্টা, জয়ঘোষ, জয়জয়কার, জয়জয়ন্তী, জয়ট্যামটেমি, জয়তি, জয়ত্রী, জয়দেব, জয়দ্রথ, জয়ন, জয়ন্ত, জয়ন্তী, জয়পত্র, জয়পাল, জয়বিষহরি, জয়মঙ্গল, জয়া, জয়াক্ষ-গ্রন্থ, জয়াজয়, জয়াবতী, জয়াবহ, জয়া-বিজয়া, জয়িত্রী, জয়িষ্ণু, জয়ী, জয্য, জায় (যাকে জীবিত করা গেছে বা জয় করা গেছে, তার তালিকা),

জায়জ, জায়গা, জায়গীর, জায়দাদ, জায়বেজায়, জি, জিকির (জিগির, জিগীর), জিগমিষা, জিগীষা, জিঘাংসা, জিঘৃক্ষা, জিঘ্র, জিঙ্গিনী, জিজীবিষা, জিজ্ঞাস, জিজ্ঞাসন, জিজ্ঞাসা, জিৎ, জিত, জিতাক্ষর, জিতাত্মা, জিতামিত্র, জিতারি, জিতাষ্টমী, জিতেন্দ্রিয়, জিত্বর, জিদ, জিদ্দি (জেদী), জিন, জিন (ফা), জিন (ফা-জীন, E-jean), জিনা (জয় করা, জিয়ন্ত থাকা বা বেঁচে থাকা), জিনিশ (জিনিস), জিনিসপত্র, জিন্দা (জিয়ন্ত, জ্যান্ত), জিন্দাপীর, জিব, জিভ, জিভেগজা, জিমূত, জিলা (জলা, জেলা), জিষ্ণু, জিহীর্ষা, জিহ্ম, জিহ্মগ, জিহ্মিত, জিহু, জিহ্বা, জেদ (জেদী), জী, জৈগীষব্য, জৈন, নির্জিত, বিজয়, বিজয়া, বিজয়ী, বিজিগীষা, বিজিত, বিজেতা, বৈজয়ন্তী, সঞ্জয়, সুজয়।
জি = **জন্য** গতিশীল থাকে যাহাতে।

অজয় (অজয়া, অজিত, অজেয়) : ১. ন + জয়, জিত। ২. **অজয়** = *নেই জয় যাহাতে।* **অজয়া** = *অজয়-এর আধার যে।* **অজিত** = *নেই জিত যাহাতে।* **জেয়** = *যাহাকে জয় করা যায়।* **অজেয়** = *যে জেয় নহে।* / **অজয়** = যাহার জয় (পরাভব) নাই। **অজিত** = জিত ভিন্ন (অন্যরূপ যে)। **অজেয়** = যাহাকে জয় করা যায় না। (ব.শ.)। **৩. অজয়** = অভিভবহীন, অজেয়, সারবান, বীরভূম জেলায় স্থিত নদবিশেষ, জয়ের অভাব, পরাজয়, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, শিব, বুদ্ধদেব। **অজয়া** = ভাঙ, ভঙ্গা, দুর্গার সখীবিশেষ, অবিদ্যা, মায়া, দুর্গা, অজয় নদ। **অজিত** = অপরাজিত, অবিজিত, অপ্রতিহত, ষষ্ঠ মন্বন্তরের অবতার। চাক্ষুষ মনুর অধিকার কালে ভগবান অজিত নামে অবতীর্ণ হন। ইঁহার পিতা বৈরাজ, মাতা সম্ভূতি। সমুদ্রমন্থনে ইনি কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠে মন্দর ধারণ করেন। (ব.শ.)। **অজিত** = দেবগণবিশেষ। প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করার পূর্বে একাকী সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর নয় বলে প্রথমে জয় নামে বারো জন দেবতার সৃষ্টি করেন। কিন্তু ব্রহ্মার কথা না-শুনে এঁরা ধ্যানে নিযুক্ত থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টিবিস্তারের ব্যাঘাত জন্মান। তাই ব্রহ্মা এদের অভিসম্পাত করেন, এঁরা যেন প্রতি মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। এঁরা সপ্ত মন্বন্তরে ক্রমে অজিতগণ, তুষিতগণ, সত্যগণ, হরিগণ, বৈকুণ্ঠগণ, সাধ্যগণ, ও আদিত্যগণ নামে খ্যাত হয়েছিলেন। (পৌ. অ.)। **৪. অজয়, অজিত** শব্দদুটি এখন অর্থহীন নাম রূপেই প্রচলিত; তবে **অজেয়** শব্দটি যথার্থেই প্রচলিত। **৫.** এতদিন **অজয় অজিত** প্রভৃতি শব্দের ঠিকঠাক অর্থই জানতাম না আমরা। বিশেষ করে, এই শব্দে একই সঙ্গে বিজয়ী ও পরাজিত উভয়কে কী ভাবে বোঝানো সম্ভব হয়, তা নিয়ে ধন্দের অন্ত ছিল না। এখন ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির দৌলতে সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। অজয় ও অজিতের ভেতরে যথাক্রমে জয় ও জিত নেই। তাই এঁরা কাউকে জয় করেন না এবং একইসঙ্গে কেউ এদের জয় করতে পারে না, তাই এই সত্তা **অজয়**; কাউকে জেতেন না কিংবা কারও দ্বারা বিজিত হন না ব'লে এই সত্তা **অজিত** পদবাচ্য। (দ্র. **অজ**)। চিরন্তন মানুষের এই চরিত্র। তাঁরা কাউকে জয় করতে চান না, কারও দ্বারা বিজিতও হতে চান না। তাই তাঁরা **অজয়, অজিত**। সমাজ যখন অধঃপতিত হয়ে খণ্ড বিখণ্ড হচ্ছে, তার প্রথম যুগে মানুষের এইরূপ স্বভাব ছিল। ইতিহাস অনুসারে, আদি **জ্ঞানজীবীরা প্রথম যখন একই কর্মের পুনরাবৃত্তির** নীতি অনুসরণ করে **সমাজ চালানোর** চেষ্টা করেন, তখন এঁরা (এই **সপ্তর্ষি**রা) কিছুতেই তাতে **রাজি** হন না। তাই এঁরা সপ্ত মন্বন্তরের প্রথম যুগের গণ — **অজিতগণ**। এ-কাহিনী অন্যত্রও রয়েছে **সনসনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার**দের নামে। দ্র. **মনু (চাক্ষুষ), সপ্তর্ষি**। আর, **অজয়া** শব্দটির জন্য **জয়া** দ্রষ্টব্য।

জয় (জয়া, জয়াক্ষ-গ্রন্থ) : ১. √জি + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **জয়** = *গতিশীল জন্য গিয়ে থামে যাহাতে।* **জয়া** = *জয়-এর আধার যে।* **৩. জয়** = উৎকর্ষপ্রাপ্তি, ন্যূনীকরণ, অভিভব, শত্রুপরাঙ্মুখীকরণ, যুদ্ধজয়, চরিতার্থতা, বশীকরণ, ন্যূনীভাব, অতিক্রম, বিষ্ণুপার্ষদ, অর্জ্জুন, সূর্য্য, জয়ন্ত, ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির, অগ্নিমন্থ বৃক্ষ, সংসারজয়ী গ্রন্থ, মহাভারত, পুরাণাদি, সংসারজয়সাধন গ্রন্থ। **জয়া** = দুর্গা, দুর্গাসহচরী বিশেষ, (রোগহরা) জয়ন্তীবৃক্ষ, হরীতকী, বিজয়া, ভাঙ, নীলদূর্ব্বা, অগ্নিমন্থবৃক্ষ, পতাকাবিশেষ, জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ, রক্ষোঘ্ন অস্ত্রবিদ্যাবিশেষ। (ব.শ.)। **জয়াক্ষ (জয়াক্ষ-গ্রন্থ)** = শব্দটি অভিধানাদিতে পাওয়া যায় না, যদিও তন্ত্রগ্রন্থাদিতে শব্দটির উল্লেখ রয়েছে। তাতে উপরোক্ত মহাভারত পুরাণাদি ছাড়াও তন্ত্রগ্রন্থগুলিকেও বলা হয়েছে 'জয়াক্ষ-গ্রন্থ'। **৪.** জয় **শব্দটি** victory অর্থে প্রচলিত; এবং জয়া শব্দটি মেয়েদের নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** আমাদের মস্তিষ্ক যেন একটি কারাগার, অ্যাকাডেমির আর প্রচলিত ভাবনাচিন্তার পদ্ধতিতে এমনই এক ঘেরাটোপে বন্দী যে, তার বাইরে সহসা ভাবতেই পারে না। কিন্তু ভাবতেই হবে। নইলে আমাদের প্রাচীন পুরুষদের শব্দজ্ঞানকে কিছুতেই অর্জন করা যাবে না।

জন্য শব্দে আমরা যে জননের কথা বুঝি, তা প্রায়শই সন্তান জননেই সীমাবদ্ধ থাকতে চায়। কিন্তু সে তো আমাদের শরীরের জনন, আমাদের মনেরও জনন আছে, আছে দেহমন উভয়ের যৌথ জননও। আমাদের ঘুষির আঘাত, ছুঁড়ে দেওয়া বল্লমের আঘাত, শব্দের (ধমক, গালাগালির) আঘাত, যুক্তি-তথ্যের আঘাত — এসবও তো **জন্য**। এবং আমাদের যেকোনো দ্বন্দ্বে শরীরজাতর তুলনায় মনের জননই মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে। এই সকল জনন যেখানে গিয়ে থামে, সেখানে বিপরীত পক্ষ ধরাশায়ী হয়; সেই কারণে একে **জয়** বলে। তবে কিনা এই জয় অতীত-নিরপেক্ষ। কে প্রথম যুদ্ধ শুরু করেছিল, সেকথা এর ভিতরে বলা নেই; যেমন কিনা আক্রান্ত হওয়ার পর পাল্টা আক্রমণে জয় লাভ করলে তাকে বলে **বিজয়**। সমাজের ইতিহাসে জয় বিজয়ের অজস্র ঘটনার উত্তরাধিকার একালের মানুষের রয়েছে। সেই ইতিহাস জানা থাকলে জয়লাভের সুবিধে হয়। যে গ্রন্থগুলিতে সেই জয়লাভের পথ দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলিকে সেকারণেই **জয়** বা **জয়াক্ষ-গ্রন্থ** বলে। আমাদের শব্দবিদগণ জানাচ্ছেন, আমাদের রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-তন্ত্রাদি গ্রন্থে সেই ইতিহাস রয়েছে। যেহেতু একালের ঐতিহাসিকরা শব্দের মানে ভুলে গেছেন, তাঁরা সেগুলি পড়তে জানেন না, পড়তে পারেন না। তাই তাঁরা ঐ গ্রন্থগুলিকে ইতিহাস বলেন না। তাই তাঁরা ওগুলি পড়তে বা পড়াতে নিষেধ করেন। ব্যর্থ শৃগালের বুদ্ধিতে আঙুরফল টক তো হবেই!

কিন্তু জয়া কেন একই সঙ্গে দুর্গাদি সত্তাগুলিকে বোঝায়, কেনই বা ভাঙ-কে অজয়া, বিজয়া, জয়া তিনটি শব্দেই বোঝানো হয়ে থাকে, তা বুঝতে একটু বেগ পেতে হয়। (রোগহরা) জয়ন্তীবৃক্ষ, হরীতকী, বিজয়া, ভাঙ, নীলদূর্ব্বা, অগ্নিমন্থবৃক্ষ, পতাকাবিশেষ, জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষ, রক্ষোঘ্ন অস্ত্রবিদ্যাবিশেষ — এরা সবাই নাকি জয়া। জয়াকে দুর্গা বা দুর্গাসহচরী বলার কারণ বোধ্য হয় তখনই, যখন আমরা তার অর্থ বুঝি মধ্যবিত্ত জনগণ। অগ্নিমন্থবৃক্ষ, রক্ষোঘ্ন অস্ত্রবিশেষকে বুঝতে পারি, যখন আমরা তাদের যথাক্রমে মিলিটারি, পুলিশ-মিলিটারি, এবং বহিরাক্রমণকারীকে ঠেকানোর অস্ত্র বুঝি। আর, জয়ন্তীবৃক্ষ (Sesbania aegyptiaca), হরীতকী, নীলদূর্ব্বা, জ্বরঘ্ন ঔষধবিশেষকে জয়া বলে বুঝতে পারি যখন তাদের সাহায্যে আমরা আমাদের দৈহিক রোগজ্বালাকে জয় করতে পারি। কিন্তু ভাঙ-এর ব্যাপারটি অন্যরকম। সেই উল্টে মানুষের উপর জয় লাভ করে। অবশ্য এমন শক্তিমান মানুষও থাকতে পারেন, যিনি ভাঙ খেয়েও ভাঙ-কর্তৃক বিজিত হন না। হয়তো সেকারণেই তাকে তিন নামেই ডাকা হয়ে থাকবে। দ্র. **ভাঙ**।

জয় ও বিজয় : ২. (উপরে **জয়** দ্রষ্টব্য) ৩. পৃথকভাবে **জয়** শব্দের প্রতীকী অর্থ উপরে দেওয়া হয়েছে। পৃথকভাবে **বিজয়** শব্দের প্রতীকী অর্থ এইরূপ — বিশিষ্ট জয়, ন্যূনীকরণ, পরাভবপূর্ব্বক গ্রহণ, উৎকর্ষ, মুহূর্ত্তবিশেষ, অর্জ্জুনের দশনামের একতম, যম, বিষ্ণুপার্ষদ, বিমান, রথ, ব্যূহবিশেষ, মঙ্গল, মৃত্যু ...। (ব.শ.)। একসঙ্গে **জয়-বিজয়** শব্দের অর্থ — (ক) এই দুই ভ্রাতা স্বর্গে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক ছিলেন। দ্বাররক্ষাকালে একদিন সনকাদি ঋষিরা বিষ্ণুদর্শনে আসেন। এই ভ্রাতাদ্বয় তাঁদের প্রবেশাধিকার দিতে সম্মত না হওয়ায় ঋষিরা এদের মর্তে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন। কিন্তু পরে এদের অনুনয়ে প্রীত হয়ে বলেন যে, 'আমাদের শাপ ব্যর্থ হবে না; তবে তোমরা দ্বিবিধ উপায়ে মুক্তি পেতে পার। প্রথমত মর্তলোকে ঈশ্বরকে মিত্রভাবে ভজনা করলে সাত জন্মে এবং দ্বিতীয়ত বৈরিভাবে ভজনা করলে তিন জন্মে স্বর্গে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করবে।' জয় ও বিজয় আশু মুক্তিলাভের আশায় ঈশ্বরকে শত্রুভাবে ভজনা করে মুক্তি প্রার্থনা করলেন। মুনিদের শাপে জয় সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ, ত্রেতায় রাবণ ও দ্বাপরে শিশুপাল রূপে এবং বিজয় সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় কুম্ভকর্ণ ও দ্বাপরে দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে এঁরা বিষ্ণুর হস্তে নিহত হয়ে স্বর্গগমন করেন। (খ) বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাসকালে যুধিষ্ঠিরের গৃহিত গুপ্ত নাম। উপকীচকগণ দ্রৌপদীকে শ্মশানে দগ্ধ করবার জন্য হরণ করলে তিনি পঞ্চভ্রাতার **পঞ্চ** গুপ্ত নাম গ্রহণ করে তাদের আহ্বান করেন। ভীম উপকীচকদের হত্যা করে দ্রৌপদীকে উদ্ধার করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **গজকচ্ছপ**।

জয়কেতু : ২. / যে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত যখন যাহার কাছে থাকে, তখন তাহারই জয়গান করে। (ব.শ.)। ৩. খোশামুদে, জয়কেতে। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কেতু**।

জয়দ্রথ : ২. / জয়ৎ রথ যাহার। (ব.শ.)। ৩. সিন্ধুপতি ... রাজাবিশেষ। ইনি দুর্যোধনের ভগিনীপতি, দুঃশলার স্বামী, দ্রৌপদীহরণ হেতু ইনি ভীম কর্তৃক বিশেষ নিগৃহীত হন। অভিমন্যুবধে ইনি সপ্তরথীর একতম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি অর্জ্জুন কর্তৃক নিহত হন। (ব.শ.)। ... ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশলার স্বামী। পুত্রের নাম সুরথ। ... পাণ্ডবদের অনুপস্থিতির সুযোগে ইনি দ্রৌপদীকে হরণ করার চেষ্টা করেন। ... ভীম তাঁকে হত্যা না করে তাঁর মস্তকের মধ্যে মধ্যে ক্ষৌরকার্য করে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর সম্মুখে লাঞ্ছিত করে মুক্তি দান করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ইনি মহাদেবের তপস্যা করে অর্জুন ভিন্ন সমস্ত পাণ্ডবকে অন্তত একদিনের জন্যও জয় করতে পারার বরলাভ করেন। ... ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে চক্রব্যূহের দ্বার রক্ষাকালে ইনি অর্জুন ভিন্ন চার পাণ্ডবকেই পরাস্ত করেন। ... অর্জুন পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করেন ... । কৃষ্ণ অজুনকে বলেন যে, জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্র তাঁর পুত্রের জন্মকালে দৈববাণী শুনেছিলেন যে, রণস্থলে জয়দ্রথের মুণ্ডচ্ছেদ হবে। তাতে তিনি এই অভিসম্পাত করেন যে, যে তাঁর পুত্রের মস্তক ভূলুণ্ঠিত করবে, তার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে বৃদ্ধক্ষত্র স্যমন্তপঞ্চক দেশের বহির্ভাগে তপস্যায় রত ছিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন ... জয়দ্রথের মস্তক শরাঘাতে ছেদনপূর্বক তা মাটিতে নিপতিত হবার পূর্বেই আরো কয়েকটি বাণে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যাবন্দনারত রাজা বৃদ্ধক্ষত্রের ক্রোড়ে ফেলেন। সন্ত্রস্ত রাজা বৃদ্ধক্ষত্র দণ্ডায়মান হতেই মস্তকটি তাঁর ক্রোড় হতে ভূপতিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের মস্তকও শতধা বিদীর্ণ হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই সত্তাটিকে সঠিক ভাবে এখনও চেনা যায়নি। যেহেতু এ সিন্ধুরাজ, সেহেতু মনে করা যেতে পারে, এই সত্তা সেকেলে পণ্যজীবিতার সমর্থক। কিন্তু তার স্বরূপ কেমন, তা এখনও দুর্বোধ্য।

জয়ন্ত : ১. ✓জি + অন্ত (ঝচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *জয় অন্তে যাহার।* ৩. বিষ্ণু, শিব, চন্দ্র, রুদ্রবিশেষ, ইন্দ্রপুত্র, ছদ্মবেশী ভীম, দশরথমন্ত্রিবিশেষ, যাত্রিক যোগবিশেষ। (ব.শ.)। (ক) ইন্দ্র ও শচীর গর্ভজাত পুত্র। রাবণের স্বর্গাভিযানকালে জয়ন্ত বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাক্ষসসেনাদের পরাস্ত করেন। কিন্তু মেঘনাদ মায়াবলে দশ দিক তমসাচ্ছন্ন করে অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করে জয়ন্তকে পরাস্ত করেন। তখন শচীর পিতা ... দৈত্যরাজ পুলোমা জয়ন্তকে পাতালে নিয়ে রক্ষা করেন। (খ) অযোধ্যার রাজা দশরথের মন্ত্রী। (গ) বিরাট ভবনে ছদ্মবেশী ভীমের গুপ্ত নাম। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. রামায়ণে জয়ন্ত একটি কাকের নাম। সেই কাক সীতার স্তন আঁচড়ে দিয়েছিল। ... যতদূর বোঝা যায়, এই সত্তা একালের কৃষিপণ্যের পাইকারের আদি রূপ। ভারতসমাজে সর্বপ্রথম মজুর নিয়োগ করে (দ্র. **জনক**) প্রচুর কৃষিপণ্য উৎপাদন করা শুরু হয়, তখন যে পাইকারেরা সেই পণ্য হামলে পড়ে কেড়ে কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তাদেরই বলা হত **জয়ন্ত কাক**।

জিকির (জিকীর, জিগির, জিগীর, জেকের) : ২. *গতিশীল (শব্দ) জনন করা হয় যাহাতে।* ৩. (আরবি - জি-ক্‌র্)। ঈশ্বরের

নামগান বা স্তবপাঠ, স্পষ্ট উচ্চারণ (mention)। (ব.শ.)। আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারণ বা জপ। (আরবি-বাংলা অভিধান)। ৪. বাংলাভাষী ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত। ৫. গতিশীল জনন মাত্রেই **জি**-বাচক, তা যার উদ্দেশ্যেই নিঃসারিত হোক। সেরকম শব্দ নির্গত করলেই **জিকির** করা হয়। সে শব্দ পরমকরুণাময়ের উদ্দেশ্যে আমার আপনার মুখ থেকে নির্গত হতে পারে; আবার আমার আপনার উদ্দেশ্যে আমাদেরই কোনো অনুগ্রহপ্রার্থীরও হতে পারে। অবশ্য সেক্ষেত্রে সে হাঁ-জি, কিঁউ-জি, কাঁহা-জি ইত্যাদি বাড়তি জিজ্ঞাসাকারী শব্দও জনন করতে পারে।

জিনিস (জিনিসপত্র) : ২. ***জিনিস*** = *গতিশীল জনন অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে যাহাতে।* ***জিনিস*** *ও* ***পত্র***। ৩. বস্তু, দ্রব্য, পণ্যদ্রব্য, অস্থাবর দ্রব্য, ঘরের আসবাব, তৈজসপত্রাদি, সারভাগ, বিশুদ্ধদ্রব্য, তাৎপর্য্য, মর্ম্ম। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. মেধা ও শ্রম জনিত হয়ে গিয়ে অস্তিত্বলাভ করে উৎপাদিত বস্তুতে। যে বস্তুতে এই জনিত শ্রম ও মেধার কিছুই নেই, তাকে **জিনিস** বলা যায় না। যে কারণে সারভাগ, তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম বোঝাতেও শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। হ্যাঁ, শব্দটি আরবি থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু এ যে **জন্** শব্দবংশের সদস্য, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব, শব্দটি আমাদেরও উত্তরাধিকার। বড় জোর এই বলা যায়, শব্দটিকে আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম, পেয়েছি আরবির হাত ঘুরে।

জৈগীষব্য : ২. / জিগীষুর অপত্য-পৌত্রাদি যে। (ব.শ.)। ৩. তপস্বী অসিত দেবল সকল সময়ে ব্রহ্মচর্য ও ধর্মকার্যে নিযুক্ত হয়ে দিনাতিপাত করতেন। এমন সময় একদিন জৈগীষব্য নামে এক মহর্ষি দেবলের আশ্রমে এসে যোগনিরত হয়ে বসবাস করতে থাকেন। ... (দ্রষ্টব্য **অসিতদেবল**) ... সিদ্ধরা দেবলকে জানালেন যে, জৈগীষব্য শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গিয়েছেন, সেখানে দেবলের যাবার শক্তি নেই। তখন দেবল আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে জৈগীষব্যকে দেখে তাঁর কাছে মোক্ষধর্ম শিক্ষা করার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। দেবল ভেবে দেখেছিলেন, মোক্ষধর্ম ও গার্হস্থধর্মের মধ্যে মোক্ষধর্মই শ্রেষ্ঠ; তখন তিনি জৈগীষব্যের কাছে মোক্ষধর্ম শিক্ষা ও গ্রহণ করে সিদ্ধিলাভ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. সমাজে ব্যক্তিমালিকানা আবির্ভূত হবার প্রাথমিক পর্যায়ে, একজন মানুষ কর্তৃক অপর মানুষকে জয় করার বাসনা জন্মায়। এঁরাই আদি জিগিষু। এই জিগীষুদের থেকে যে সত্তাটি জন্মায়, তাকে **জৈগীষব্য** বলা হয়। যাদের জয় করা হবে তাদের বিষয়ে যথেষ্ট তথ্যাদি, জয় করার জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশল, এই সত্তা নিশ্চয় সেসকল জানতেন এবং তার প্রয়োগ করতেন কিংবা করতে জানতেন। তিনি **অসিতদেবল**কে (বিনিময়াদি বা দেবদ্রব্যোপজীবিকা গ্রহণ করার জন্য যাঁরা হিংসা করতেও দ্বিধা করতেন না।) মোক্ষধর্মের পাঠ দেন। বাকিটা কী হতে পারে, সেটা ভাববার বিষয়।

জীব্ (জীবী) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অজীব, অজীবন, আজীব, আজীবক, আজীবন, আজীব্য, উপজীবক, জি, জিআ, জিউ, **জিওন**, **জিওল**, **জিতা**, **জিয়**, **জিয়ন্ত**, জি(জী)য়া, জি(জী)য়াপুত, **জী**, **জীউ**, **জীব্**, **জীব**, **জীবক**, **জীবৎ**, জীবদ, জীবদশা, জীবদ্দশা, **জীবধন**, **জীবধানী**, **জীবমাতৃকা**, জীববৃত্তি, জীবশক্তি, জীবন, জীবনক, জীবনকাঠি, **জীবনতরঙ্গ**, **জীবনসর্ব্বস্ব**, জীবনাবধি, জীবনিকা, জীবনী, জীবনীয়, **জীবন্ত**, **জীবন্মুক্ত**, জীবন্মৃত, জীবন্মৃত্যু, জীবন্যাস, জীবপুত্রক, জীববান, **জীবলীলা**, জীবলোক, জীবা, জীবাতু, জীবাত্মা, জীবান্তক, জীবাপত্য, **জীবিকা**, জীবিত, জীবিতব্য, জীবিতমান, জীবিতাপহা, **জীবিতাশা**, **জীবিতেশ**, **জীবী**, জীবেন্ধন, জীবেশ, জীবোৎসর্গ, **জীবোপাধি**, **জীবোর্ণা**, **জীব্য**, **জীমূত**, **জীমূতবাহন**, জীমূতবাহী, **জীমূতেন্দ্র**, **জীয়ন**, **জীয়ন্ত**, জীয়ল, জীয়া, জীয়াচ, জীয়াপুত, জীত, জৈব, **জৈবাতৃক**, **জৈবেয়**, **নির্জীব**, **সজীব**, **সঞ্জীব**, **সঞ্জীবনী**, সুরাজীব।

জীব্ (জীবী) = **জি**-র আধারের বহন। **জীব** = জি-র আধারের বহন থাকে যাহাতে। **জীবী** = **জীব**-এর গতিশীলতা ধারণ করে যে।

জীব (জীবক, জীবন, জীবনী) : ১. ✓জীব্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***জীব*** = *গতিশীল জন্যধারীকে বহন করে যে।* ***জীবক*** = ***জীব*** *করে যে।* ***জীবন*** = ***জীব*** *অন থাকে যাহাতে।* ***জীবনী*** = ***জীবন****-এর গতিধারী যে।* / **জীবক** = প্রাণ ধারণ করে যে। **জীবন** = যাহার দ্বারা জীবন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **জীব** = প্রাণীমাত্র, জীবাত্মা, **ক্ষেত্রজ্ঞ**, উপাধিপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম, শরীরত্রিতয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য, বুদ্ধিস্থ চৈতন্যপ্রতিবিম্ব, **ক্ষেত্রজ্ঞরূপে** প্রাণাধিধারয়িতা, লিঙ্গদেহ, অন্তরাত্মা, কর্ণ; **জীবন্তীবৃক্ষ**, পুষ্যনক্ষত্র, মরুদ্‌বিশেষ, বিষ্ণু, পরমাত্মা, মন্ত্রবলে জীবয়িতা, বৃহস্পতি; জীবনহেতু, বৃত্তি, আজীব; জীবন, প্রাণধারণ, চেতনা, তত্ত্ব, স্বরূপ, পরমাত্মা; বাঁচিয়া থাক, বাঁচ, দীর্ঘায়ু হও; প্রাণধারণ করা, পুনর্জীবিত হওয়া, বাঁচা। **জীবক** = প্রাণধারক, প্রাণী, সেবক, অনুজীবী, বৃদ্ধিজীবী, ক্ষপণক, অহিতুণ্ডিক, সাপুড়ে, জীবনবৃক্ষ, পীতসাল। **জীবন** = জীবয়িতা, প্রাণদ, প্রাণধারণ, প্রাণ, প্রাণধারণ আয়ুঃ, জীবিকা, প্রাণধারণোপায়, জল, গঙ্গা, মজ্জা, পূর্ব্বদিবসের দুগ্ধজাত ঘৃত, পরমেশ্বর, পুত্র। **জীবনী** = কাকোলী, মেদা, মহামেদা, যূথী, জীবনের চরিতাবলী। (ব.শ.)। ৪. **জীব** living being অর্থে, **জীবন** life অর্থে, এবং **জীবনী** biography অর্থে প্রচলিত। **জীবক** অপ্রচলিত। ৫. জনন-ধারণ করে **প্রাণ**, সেকারণে প্রাণ হল জন্যধারী। সে (আ)**বর্ত্তমান** থাকলে, অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে পরবর্তী স্তরে এগোতে থাকলে, সেই হল গতিশীল জন্যধারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে নিজের 'পূর্ণগুণ-ক্ষুদ্রতমরূপ'কে নতুন সত্তায় উত্তীর্ণ করতে পারে না; অর্থাৎ, জনন করতে পারে না। সে প্রয়োজন মেটাতে হলে সেই প্রাণ বা গতিশীল জন্যধারীকে বহন করে নিয়ে চলার জন্য একটি দেহের প্রয়োজন। দেহ পেয়ে গেলেই সে দেহবান-প্রাণ হয়ে যায়; তখনই সে জননশক্তিকে বা **জী**-কে বহন করতে পারার যোগ্যতা অর্জন করে; তখনই তাকে **জীব** বলে। সংক্ষেপে **জী**-কে বহন করে **জীব**। বাপু**জী**, বাবা**জী** প্রভৃতি সম্বোধনে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির দেহকে বাদ দিয়ে তাঁর **জী**-কে (= মন-প্রাণ-আত্মাকে) সম্বোধন করা হয়ে থাকে। একই ভাবে হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় এই **জী**-এর

ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। এই **জীব** অন থাকে জীবের সমস্ত **জীবন**-এ। এই সমগ্র জীবনের যে ঘটনাবলী, যে ঘটনাবলী অতিক্রম করে করে জীবন তার অন্তে পৌঁছয়, তাকে বলে জীবের **জীবনী**। ...

তবে এই শব্দগুলির প্রতীকী অর্থের প্রধান সমস্যা হল, যেহেতু জীব শব্দের মূলে 'গতিশীল জন্যধারী' ও 'বহনকারী', অর্থাৎ প্রাণ (মন) ও দেহ দুটি সত্তার যৌথ অস্তিত্ব ও তাদের ক্রিয়া রয়েছে; সেই কারণে প্রতীকায়নের কালে অর্থগুলির একদেশদর্শী হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তার ওপর এ তো কেবল দুটি সত্তার যৌথতাই নয়, আরও একটি সত্তা ঢুকে বসে রয়েছে 'গতিশীল জন্যধারী' বা 'প্রাণ'-এর ভিতরে। এর নাম মন। ফল হয়েছে আরও জটিল। জীবাদি শব্দের নির্দেশকতার দিকে যখনই আঙুল তুলে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে বা প্রতীকায়ন করা হয়েছে, তখনই তা অন্ধের হাতি-দেখা হয়ে গেছে। জীবাদি শব্দের ব.শ.-প্রদত্ত অর্থ — 'প্রাণীমাত্র, জীবাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ, উপাধিপ্রবিষ্ট ব্রহ্ম, শরীরত্রিতয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য, বুদ্ধিস্থ চৈতন্যপ্রতিবিম্ব, ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রাণাধিধারয়িতা, লিঙ্গদেহ, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা, প্রাণধারণ, চেতনা' প্রভৃতি সমগ্র জীবকে নির্দেশ করে না, দেহ বাদ দিয়ে জীবের যে-অংশ তাকেই নানা দিক থেকে বোঝায়। আবার, 'কর্ণ; জীবন্তীবৃক্ষ, পুষ্যনক্ষত্র, মরুদ্‌বিশেষ, বিষ্ণু, মন্ত্রবলে জীবয়িতা, বৃহস্পতি; জীবনহেতু, বৃত্তি, আজীব; জীবন, তত্ত্ব, স্বরূপ, বাঁচিয়া থাক, বাঁচ, দীর্ঘায়ু হও; প্রাণধারণ করা, পুনর্জীবিত হওয়া, বাঁচা', প্রভৃতি শব্দ নানান ব্যঞ্জনার্থ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের নিয়মে বিশেষত্ব লাভ করেছে। সেগুলি সরাসরি জীব নয়, কিন্তু জীবকে বাদ দিয়েও নয়। ...

আসলে, জীব শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ ব.শ. দেননি। নিশ্চয় তা তিনি কোনো পূর্বতন গ্রন্থে পাননি। তবে, এই শব্দগুলির প্রতীকী অর্থ ব.শ. পেয়েছেন এবং সেগুলি যথানিয়মে দিয়ে গেছেন, এবং আমরা দেখছি, সেগুলির অধিকাংশই কমবেশি ঠিক। ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ যেভাবে প্রতীকায়িত হয়, সেইভাবে ঠিক। কিন্তু তারা কীভাবে জীবাদি শব্দের অন্তর্নিহিত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের সঙ্গে যুক্ত, তা প্রেক্ষাপট ও ইতিহাস ধরে ধরে নির্ণয় করতে হয়। আমরা এখানে মূল ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি দিয়ে দিলাম। প্রতিটির পৃথক বিশ্লেষণ করতে গেলে তাই নিয়ে একটি পৃথক প্রবন্ধ লিখতে হয়। কারণ, **জীব** শব্দের সঙ্গে **চেতন, চৈতন্য, প্রাণ, মন, অহং (অহংকার), বুদ্ধি, ভাবনা, চিন্তা, সংজ্ঞা, আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম** প্রভৃতি শব্দ জড়িত। আমরা এই শব্দগুলির নিজ নিজ ভুক্তিতে শব্দগুলির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়ে যাচ্ছি। পাঠক সেই ক্রিয়াভিত্তিক অর্থগুলিকে একত্র করে নিয়ে চেষ্টা করলে উপরোক্ত প্রতীকী অর্থগুলির যাথার্থ্য পেয়ে যাবেন।

জীবিকা (উপজীবিকা, জীব্য, উপজীব্য, উপজীব্যতা) : ১. ✓জীব্ + ক (কন্) স্বার্থে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***জীবিকা*** = ***জীবকে*** *গতিশীল করে যে, তাহার আধার।* ***উপজীবিকা*** = ***জীবিকার উপ*** *যে।* *জীব্য* = ***জীব*** *থাকে যাহাতে।* ***উপজীব্য*** = ***জীব্য****-এর* ***উপ*** *যে।* ***উপজীব্যতা*** = ***উপজীব্য*** *তারিত হয় যাহাতে।* / **উপজীব্য** = যাহার দ্বারা জীবন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **জীবিকা** = বৃত্তি, আজীব। উপজীবিকা = **বৃত্তি, আজীব। উপজীব্য** = জীবনার্থ আশ্রয়ণীয়, জ্ঞানার্থ অবলম্বনীয়, প্রযোজক, আশ্রয়, শরণ, পালক, প্রমাণ, জ্ঞানপ্রযোজক, জীবনসাধন ধন, জীবনোপায়, বৃত্তি, জীবিকা। (ব.শ.)। ৪. profession অর্থে **জীবিকা** শব্দটি প্রচলিত। **উপজীব্যাদি** শব্দ অপ্রচলিত। ৫. জীবিকা শব্দটির মূলে রয়েছে **জীব**। সেই জীবকে গতিশীল করে তার **জীবিকা**। জীবিকাই মানুষ নামক জীবের **জীব্য**, অর্থাৎ '**জীব** (বেঁচে) থাকে যাহাতে'। আর, সেই জীব্যের সহযোগী বা **উপ** হল সেই জীবিকা সংক্রান্ত জ্ঞান-বুদ্ধি ও কলাকৌশল বিষয়ে দক্ষতা। সে-জীবিকা যদি এমন কাজকর্ম হয়, যাতে তার দৈহিক খাদ্যাদি সংগ্রহ বোঝায়, তবে গতিশীল হয় জীবের দেহ। আর, সে-জীবিকা যদি এমন কাজকর্ম হয়, যাতে তার মানসিক খোরাক সংগ্রহ বোঝায়, তবে গতিশীল হয় জীবের মন (প্রাণ, আত্মা)। পৃথিবীর আদি আইনস্রষ্টা ভৃগুমহারাজের উত্তরসূরী মহাত্মা গান্ধী বলেন, 'আত্মার তৃপ্তির জন্য মানসিক শ্রম করতে হবে', তাতে জন্মাবে রস; আর 'দেহের তৃপ্তির জন্য দৈহিক শ্রম করতে হবে', তাতে জন্মাবে রসদ; রস ভোগ করবে মন, রসদ ভোগ করবে দেহ। অর্থাৎ মানুষের শরীর ও মন দুটি পৃথক সত্তা, যে যা বানাবে সে তাই খাবে, এমনটাই নিয়ম। উৎপাদনের সঙ্গে ভোগের নাকি সেরকম 'যার যার তার তার' সম্পর্ক নেই, বললেন প্রমথ চৌধুরী। 'বাস্তবে আমরা ফেন ফেলে ভাত খাই, সাহিত্যে আমরা ভাত ফেলে ফেন খাই, আর বৈষ্ণবদের জন্য রয়েছে গলাভাতের ব্যবস্থা।' তিনি বললেন। তার মানে, একই কাজকর্ম বা জীবিকা থেকে দেহের খোরাক ও মনের খোরাক একই সঙ্গে উঠে আসতে পারে! রবীন্দ্রনাথ বললেন, ঠিকই তো! ও দুটো তো আসলে যমজ। 'জীবিকার ক্ষেত্রে মানুষ কেবল আপন অন্নই পাবে না, আপন সত্যও পাবে, এই তো চাই।' অর্থাৎ, সমাজ-ইতিহাসের যত পিছনের দিকে আমরা যাব, ততই আমরা দেখব, মানুষ যে-জীবিকায় লিপ্ত, সেই জীবিকা তাকে একই সঙ্গে দেহের খোরাক ও মনের খোরাক যোগাচ্ছে। এমনও দেখা যায়, সত্তর / আশি বছরের জীবনের দৈহিক খোরাকের জন্য কুড়ি / পঁচিশ বছর খরচ করছে, বাকি সময় সে কাটাচ্ছে সত্যের সন্ধানে, জীবনের রসে ডুবে। পরবর্তীকালে কলের আবির্ভাবের পর, জীবিকা ক্রমশ হয়ে পড়ে একদৈশিক। লোকে জীবদেহকে বাঁচাতে জীবন খরচ করে ফেলে, দৈহিক ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করতে সমগ্র জীবনসময় খরচ হয়ে যায়, তার পরেও ধার থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের সময়ে পৌঁছে পরিস্থিতি যা দাঁড়ায় তার হিসাব দেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই — 'আজকাল জীবিকা জিনিসটি জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠছে।' হয়তো সেকারণে আজকাল জীবিকা বলতে লোকে কেবল তার দৈহিক অর্থটিই বোঝে। মনে করা হয়, দেহের ক্ষুধা মেটানোর জন্যই লোকে দিনরাত খেটে মরে, গাদা গাদা টাকা রোজগার করে, মানুষ যেন টাকা রোজগারের মেসিন। এ মানুষের মন নেই, মনের খিদে নেই, সেই খিদের জন্য হাহাকার নেই। কিন্তু তা তো হতে পারে না। অন্য জীবের কথা বাদ দিয়ে সেভাবে দেখতে গেলে, মানুষ নামক জীবটির মনের ক্ষুধা ও সেই ক্ষুধার অন্নসংস্থানই তো মানবজীবনের কারণ ও উদ্দেশ্য। তার মনটিকে বাদ দিয়ে যে-সমাজ চালানোর চেষ্টা হবে, তার ধ্বংস তো অনিবার্য! আজ বোঝা যায়, আজকের বিশ্বমানবের মনের হাহাকারেই পৃথিবী ধূমায়িত, ধ্বংসোন্মুখ।

আমাদের সমাজে যতরকম জীবিকার প্রচলন রয়েছে, তা সবই **উপজীব্য** পদবাচ্য। কিছুদিন আগেও উপজীব্য শব্দটি বেশ প্রচলিত ছিল। ব.শ. কালীপ্রসন্ন সিংহের বয়ান থেকে উদ্ধৃত করছেন — 'বিশ্বকর্ম্মার শিল্পকার্য্য উপজীব্য করিয়া মনুষ্যেরা জীবিকানির্ব্বাহ করে।' অর্থাৎ যে কোনো ধরনের কর্মধারাকেই **উপজীব্য** করে লোকে নিজ নিজ জীবিকা **নির্ব্বাহ** করতে পারে। কিন্তু তার জন্য উপজীব্য কর্মধারাটি বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ **উপজীব্যতা** থাকা আবাশ্যক। সেই **উপজীব্যতার** জন্য যার কাছে যেতে হয়, একালে তাদের নানা নামের অ্যাকাডেমির শিক্ষক বলে; সেকালে বলা হত **আর্য্য**। 'উপজীব্যতা হেতু উপগমন' করতে হয় যার কাছে, তিনিই আর্য্য।

জীমূত (জীমূতবাহন) : ২. ***জীমূত** = **জী**-এর সীমাধারী তারিত যাহাতে। **জীমূতবাহন** = **জীমূত** বাহন যাহার।* / **জীমূত** = জীবন মূত (বদ্ধ) যাহা দ্বারা; যে জল দ্বারা বদ্ধ করে। (ব.শ.)। **জীমূতবাহন** = জীমূত (মেঘ) বাহন (যান) যাঁহার, তিনি। (ছা.অ.)। **৩.** জীবনের মূত (পুটবদ্ধ), জলের পুটবদ্ধতুল্য, মেঘ, (সাদৃশ্যে) পর্ব্বত, (মেঘদৈবত) ইন্দ্র, (রসপ্রচুর) মুস্তা, দেবতাড়বৃক্ষ, ভৃতিকর, পালক, সূর্য্য। জীমূতবাহন = মেঘযান, ইন্দ্র, শালিবাহনপুত্র (গৌণ আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে বা জিতাষ্টমী তিথিতে স্ত্রীলোকেরা প্রাঙ্গণে পুষ্করিণী করিয়া পুত্রকামনায় সন্ধ্যায় শালিবাহনপুত্র জীমূতবাহনের পূজা করেন।), জীমূতকেতু-পুত্র বিদ্যাধরপতি (ইনি দয়াবীর, নাগানন্দ নাটকের নায়ক। সর্পের পরিবর্তে নিজ শরীরদানে উদ্যত হইয়া ইনি সর্প-গরুড়ের চির শত্রুতা দূর করেন।) (ব.শ.)। ... বারো শতকের একজন স্মার্ত। (ব্যা.বা.অভিধান, ঢাকা)। ... ইন্দ্র, স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহকর্ত্তা, দায়ভাগ নিবন্ধকার, বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতুর পুত্র; ইনি বিখ্যাত নাগানন্দের নায়ক। (ছা.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** যদিও জীমূত, জীমূতবাহন শব্দদুটি এখন অপ্রচলিত, তবুও বেশ কয়েকটি কারণে এই সত্তা দুটিকে বিস্তারিতভাবে জানা দরকার। সত্তাটির মূল স্বভাব হল, জননশক্তিকে সীমায়িত করে ধারণ করে যে-সত্তা সে তার ভিতরে থেকে ক্রিয়া করে। এর বাহ্য উদাহরণ হল রসপ্রচুর মুস্তা, বৃষ্টিপ্রচুর মেঘ ইত্যাদি। আমরা জানি **মেঘ** দুরকম হয় — অসুরস্বামিক ও ইন্দ্রস্বামিক। এই মেঘ ইন্দ্রস্বামিক। তাই **জীমূতবাহন**কে ইন্দ্র বলা হয়। এই সত্তা সূর্য্যের মতো ভৃতিকর বা পালক। সত্তাটি সম্পর্কে ব.শ. জানিয়েছেন, সে জলদ্বারা বদ্ধ করে; জীবনের পুঁটলি বদ্ধ রাখে, জলের পুটলি বদ্ধ রাখে, সে পর্ব্বতও বটে। এর অর্থ হল, সত্তাটি জনসাধারণের জীবনকে বিশেষ নিয়ম-নীতি-ধর্মের (= আইনের) মাধ্যমে আবদ্ধ রাখে, রসগোল্লাকে যেভাবে রসে ডুবিয়ে রাখা হয়। আবার, সেই সত্তাটিই ১১০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো একসময় মানুষের সমাজে সক্রিয় হয়েছিল এবং প্রাচীন ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (= সর্প) এবং বৌদ্ধ-বৌদ্ধপরবর্তী যুগের আধুনিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের (= গরুড়ের) চিরশত্রুতা মিটিয়ে দিয়েছিল। কেবল তাই নয়, এই সত্তাই মানবসভ্যতার সর্বোচ্চ আইন **দায়ভাগ**-এর সংকলন করেন। এই দায়ভাগ প্রধানত বঙ্গদেশে ও তার সংলগ্ন বিহার-উড়িষ্যা-আসাম অঞ্চলে প্রচলিত ছিল; বাকি পৃথিবীতে প্রচলিত ছিল যে আইন তার নাম **মিতাক্ষরা**। বর্তমানে যে আইন প্রচলিত আছে, তা সেই **সেই দেশের আদি আইনের বিবর্তিত রূপ মাত্র**। এর অর্থ হল, **জীমূতবাহনের কীর্তি আজও বঙ্গদেশীয়গণের অস্তিত্বের ভিত্তিতে সক্রিয় রয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি কথা** অবশ্যই মনে রাখা দরকার। এক, **একটি দেশের মানুষের স্বভাব মূলত কেমন হবে তা ঠিক করে দেয়, সেই দেশের (সমাজের) প্রচলিত আইন** (= নীতি, ধর্ম)। যেদেশের **আইন যত উন্নত সেই** দেশের মানুষ তত উন্নত প্রজাতির মানুষ **হয়, তারা ধনবলে অস্ত্রবলে দুর্বল** হলেও। দুই, ভারতের **মাটিতে পা দিয়ে ইংরেজ সবচেয়ে অবাক হয়েছিল বঙ্গ** দেশের আইন দেখে। **তাদের সেকালের আইনবেত্তাগণ স্পষ্ট বুঝেছিল, এদের আইন যেহেতু উন্নত মানের, এদের নিজেদের আইনবেত্তাগণকে সঙ্গে না নিয়ে এদের শাসন করা যাবে না। সেকারণে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গোড়ায় সমস্ত বিচারকদের পাশে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে জুরি** রূপে বিদ্যমান দেখা যায়। **এঁদের বলা হত জজপণ্ডিত**। এঁদের নিয়ে একালের গবেষকদের **কিছু** গবেষণা **গ্রন্থও** রয়েছে। **দ্র. জন্তু, বঙ্গ**।

জু ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিজব, জব, জবন, জবজব, জবড়, জবড়ান, জবড়াঞ্জা, জবনিকা, জবনী, জবর (জব্বর, জব্বার), জবরদস্তি, জব্দ (জবত্), জবাই (জবহ্), জবান, জবানবন্দী, জবাব, জবাবী, জবাল, জবালা, জাব, জাবনা, জাবড়, জাবড়া, জাবড়া, জাবড়ান, জাবালা, জাবালি, জাবেদা, জবী, জু, জুগুপ্সন, জুগুপ্সা, জুজু, জুজুবুড়ি, জুঠ (ঝুটা, উচ্ছিষ্ট), জুবুথুবু, জুষ্, জুষ, জুষ্ট (দ্র.জুঠ), জবুস্থবু, জুট, জুতি, জুর্, জুর্ণ, জুষ, জোশ, জোষ, জোষম, জোষা, জোষিকা, জোষিৎ, জোষিতা।

জু = **জন্য** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।

জব (জবন) : **১.** ✓জু + অ (অপ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***জব** = নবরূপে উত্তীর্ণ **জন্য** (জনিত শক্তি বা গতি) বাহিত হয় যাহাতে। **জবন** = **জব** অন থাকে যাহাতে।* **৩.** বেগযুক্ত, বেগ, ক্ষিপ্রতা, ধাবক। বেগবান, দ্রুত, শীঘ্রগামী, দূরগামী, বেগবান অশ্ব, অশ্বমাত্র, দেশবিশেষ (ইউরান — ইরান?), ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ, যবন। (ব.শ.)। **৪.** শব্দটি 'যবন' রূপে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** শব্দটি বাংলায় আর এক রূপে সম্প্রতি কালে প্রচলিত হয়েছে, হচ্ছে। একালের বাংলাভাষীর মুখে এমন বাক্য স্বাভাবিক ভাবেই আজকাল বেরিয়ে আসে — 'পূর্ত দপ্তর থেকে একটা জব পেয়েছি।' এই জব শব্দটি পশ্চিম থেকে ঘুরে আসা শব্দ job। এই **জব**-এর ভিতরেও মানুষের জনিত শক্তি ধারিত-বাহিত হয়। জু শব্দবংশ থেকে এটি ইংরেজদের নিজস্ব উত্তরাধিকার। আমরা বাংলাভাষীরা শব্দটিকে ক্রমশ আমাদের নিজেদের শব্দ রূপে আপন করে নিচ্ছি, চেনা-চেনা লাগছে বলে। **৬.** ইংরেজি job।

জবজব (জাব, জাবনা) : **২.** ***জবজব** = **জব**-এর দ্বিত্ব। **জাব** = **জব** হইতে জাত। **জাবনা** = **জাব** অন যাহাতে, তাহার আধার।* **৩.**

জবজব = সুষিক্ত। **জাব, জাবনা** = গোমহিষাদির খাদ্য খ'ল-ভূসি-মিশান কাটা ঘাস বা খড়। দেয়াল গাঁথার নিমিত্ত খড়ের কুটি দিয়া চটকাইয়া-করা কাদা। (ব.শ.)। ৪. উপরোক্ত প্রতীকী অর্থে প্রচলিত। ৫. **জন্য** বাহিত হয় যাহাতে, তা বেগ হতে পারে ঠিকই; তবে তা একই সঙ্গে **জল**ও হতে পারে। জলের এই রূপটিকে আমরা **উন্দ্** শব্দবংশে লক্ষ্য করেছি, দেখেছি **ওল, সুন্দরী, সমুদ্র** প্রভৃতি শব্দে। এই জল যেন শক্ত বরফের চাঁই, যা তরলে রূপ পেলেই নিজের অবয়বের এলাকা থেকে প্রসারিত হতে থাকে সর্বদিকে। তাতে পাশের বস্তু যদি ভিজে যায়, সে হয় **জবজবে**। গরুর খাদ্য ভিজিয়ে জবজবে করা হয় বলেই তাকে **জাব** বলে।

জবড় (জবড়জং, জবড়জঙ্গী, জবড়ান, জাবড়, জাবড়ান) : ২. **জবড়** = **জব** *(= জনিত গতি) একই স্থানে আবর্তিত যাহাতে।* **জবড়া** = **জবড়**-*এর আধার যে।* **জবড়ান** = **জবড়া** *অন যাহাতে।* **জাবড়** = **জবড়** *হইতে জাত।* **জাবড়ান** = **জাবড়** *অন যাহাতে।* ৩. **জবড়** = অসভ্যরকম ভারী বা গরমানান (পোষাক প্রভৃতি)। **জাবড়** = জাবের মতো, সুষিক্ত, ভিজা, জবজবে (ব.শ.)। ৪. **জবড়** পৃথকভাবে অপ্রচলিত, কিন্তু **জবড়জং (জবড়জঙ্গ, জবড়জঙ্গী)** রূপে কমবেশি প্রচলিত। অন্য শব্দগুলি গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. গতিশীল কালির দাগ একই জায়গায় আবর্তিত হতে থাকলে তাকে জবড়ান, জাবড়ান কিংবা জেবড়ে দেওয়া বলে। কোনো কিছুকে জড়িয়ে একই অবস্থানে ঘোরাতে থাকলে তাকেও জাবড়ান বলে।

জবা : ২. **জব**-*এর (= জনন বহন করে যে, তাহার) আধার যে।* ৩. জবাকুসুম, জবাপুষ্পবৃক্ষ। ৪. একটি বিশেষ লাল রঙের ফুলের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. এই ফুলে মা কালীর পূজা হয়। এর সাধারণত পাঁচটি পাপড়ি থাকে এবং রং টকটকে লাল। একে পঞ্চমুখী জবাও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এর ভিতরে জনন কোথায়? আছে। প্রথমত, মেয়েদের 'পুষ্পকালের' সমস্যা ও জনন সমস্যা থাকলে গ্রামবাংলার বয়স্কা মহিলা কিংবা গ্রামের কবিরাজের কাছে এর একটি সহজ সমাধান পাওয়া যায় — রোগিণীকে প্রত্যহ সকালে জবা পাতার রসের সরবৎ খাওয়ানো। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর জনন সমস্যা মিটে যায়। দ্বিতীয়ত, রাতে দুটি শিশু পাশাপাশি শুয়ে থাকলে এবং তাদের একজনকে নিয়ে গিয়ে প্রস্রাব করিয়ে এনে অন্য শিশুটির পাশে শুইয়ে দিলে প্রায়শই দেখা যাবে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় শিশুটি বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলেছে। কারণ, শরীর শরীরকে তার খালি হয়ে যাওয়ার সংবাদ জানিয়ে দেয়। মাতৃদুগ্ধপায়ী শিশুর খিদে পেলেই দেখা যায় মায়ের স্তনে দুধের প্রবাহ এসে গেছে। গাইয়ের বা গর্ভবতী মায়ের সন্তান জননের পরে ধাত্রীমায়েরা জানতে চান 'ফুল' পড়েছে কি না। এর সাদৃশ্য রয়েছে জবাফুলের সাথে। মা কালী বা শ্রমিক শ্রেণীর উন্মাদিনী রূপ শান্ত হয় জবা ফুল দেখলে। তখন সে তার স্বাভাবিক জননে আগ্রহী হয়। হয়তো সেকারণেই জবা ফুলে মা কালী পূজা নিতে ভালবাসেন।

মোট কথা, প্রাচীন বাংলা ভাষায় প্রতিটি ফুল ও গাছের নামের মধ্যেই তার ভিতরের ক্রিয়াশীল স্বভাবটির কথা বলা আছে; সেসব কথা আমরা জানি আর না-জানি। তাদের সেই নামরহস্য আত্মস্থ করতে পারলে আমরা বহু সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি।

জবান (জবানবন্দী, জবাব, জবাবী) : ২. **জবান** = **জবা** *অন থাকে যাহাতে।* **জবানবন্দী** = **জবান** *বন্দী যাহাতে।* **জবাব** = **জবা** *বহন করে যে।* **জবাবী** = *গতিশীল* **জবাব**-*এর আধার যে।* ৩. **জবান** = ভাষা, কথা, জিহ্বা, মৌখিক, কথামত, কথানুসারে লিখিত। **জবানবন্দী** = লিখিত এজাহার বা সাক্ষ্য। **জবাব** = উত্তর, পক্ষসমর্থন, মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর উত্তর, কৈফিয়ৎ। ৪. উপরোক্ত প্রতীকী অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দও জনিত হয়। যার সাহায্যে শব্দ জনিত হয়, তাকে যেমন জবান বলে, তেমনি যা জনিত হয় তাকেও জবান বলে। সেই কারণে ভাষা-কথা-জিহ্বা সবই **জবান** পদবাচ্য। জনিত শব্দ বহন করে যে, তাকে বলে **জবাব**। সেই জবাব গতিশীল হলে, তাকে বলা হবে জবাবি। সেই জবাবির আধার যে, তাকে বলা হয় **জবাবী**। বলা হয়ে থাকে, এই শব্দগুলি ফারসি ভাষা থেকে আগত। আমরা তো স্পষ্ট দেখছি, শব্দগুলি **জু** শব্দপরিবারের সদস্য এবং বাংলা ভাষায় তাদের নিজস্ব উত্তরাধিকার থাকতে অসুবিধা ছিল না। তাই এগুলিকে বাংলার নিজস্ব উত্তরাধিকার বলা যেতে পারে। ফারসির হাত ঘুরে এসেছে বললেও লজ্জার কিছু নেই। ৬. ভাষা এবং জিহ্বা, দুইই যেমন জবান পদবাচ্য, তেমনি ল্যাটিনের lingua শব্দটি একই সঙ্গে ভাষা এবং জিহ্বা দুটোকেই বোঝায়। এই lingua থেকেই ইংরেজির language, linguistic প্রভৃতি শব্দ এসেছে। দ্র. **লিঙ্গ**।

জুগুপ্সন (জুগুপ্সা) : ১. ✓গুপ্ (নিন্দা) + স (সন্) স্বার্থে + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **জুগুপ্সা** = *নবরূপে উত্তীর্ণ জননকারীর সত্য গোপনের ইচ্ছা থাকে যাহাতে।* ৩. নিন্দা, কুৎসন, বীভৎসরসের স্থায়ীভাব। দোষ দর্শনাদি হেতু বিস্ময়োদ্ভূত নিন্দা। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **জিজ্ঞাসা**।

জৃ (জৃ২) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অজর, অজরা, অজরাইল (ইস্রাইল), অজরামর, অজীর্ণ, অজীর্ণী, অতিজর, জর, জরকশী, জরজর, জরঠ, জরণ, জরৎ, জরৎকার, জরৎকারু, জরদ, জরদ্গব, জরা, জরাগ্রস্ত, জরাজীর্ণ, জরাভীরু, জরায়ু, জরায়ুজ, জরাসন্ধ, জরি(রী), জরিত, জরিপ, জরিমানা, জরীকষ (জরকশী), জরু, জরুয়া, জরুর, জর্জ্জর, জর্জ্জরিত, জার, জারক, জারণ, জারণী, জারা, জারি, জারিতা, জারী, জারীগান, জারুয়া, জারুল, জি(জী)রা, জিরান, জীন, জীর, জীরক, জীরা, জীরাৎ (জারি), জীর্ণ, জৃম্ভ, জৃম্ভ, জৃম্ভা, জৃ, জৃম্ভক, জৃম্ভন, জৃম্ভিকা, জোর, জোর-জুলুম, জোরাল, জোরাবরি, জ্যা, জ্যাঠা, জ্যাঠামি, জ্যামঘ, জ্যামিতি, জ্যায়ান, জ্যেঠ, জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠতাত, জ্যেষ্ঠা, জ্যেষ্ঠাংশ, জ্যেষ্ঠাম্বু, জ্যেষ্ঠাশ্রম, জ্যেষ্ঠী, জৈষ্ঠ, জৈষ্ঠ্য, জৈষ্ঠমধু, জৈষ্ঠিনেয়।

জৃ (জৃ২) = **জন্য** আবর্ত্তমান যাহাতে। **জৄ** = **জৃ**-র আধার যে।

জরৎকারু : ২. / যাহার কারু (দারুণ শরীর) তপস্যায় ক্ষয়প্রাপ্ত (হইয়াছে)। (ব.শ.)। ৩. যাযাবর মুনিবিশেষ। বংশনাশ হেতু বীরণমূলাশ্রিত গর্ত্তে লম্বমান অধোমুখ পিতৃগণকে দেখিয়া ইনি বংশরক্ষার্থ সনামা কন্যা বিবাহ করিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়া, বাসুকিভগিনী জরৎকারুকে বিবাহ করেন। আস্তীক জরৎকারুগর্ভজাত জরৎকারুর পুত্র। (ব.শ.)। ভৃগুবংশীয় মুনি। জরা শব্দের অর্থ ক্ষয়, কারু শব্দের অর্থ দারুণ। কঠোর তপস্যার দ্বারা ইনি শরীরকে ক্ষয় করেছিলেন বলেই এঁর নাম হয় জরৎকারু। (ক) যাযাবর নামে ঋষি বংশীয়ের পুত্র। ঊর্ধ্বরেতা, ব্রহ্মচারী, মহাতপা পরিব্রাজক মুনি। ইনি বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে কঠোর তপস্যা ও ব্রতানুষ্ঠান করতেন। একদা ভ্রমণরত অবস্থায় তিনি কতকগুলি লোককে বৃক্ষশাখা অবলম্বনপূর্বক ঊর্ধ্বপাদ ও অধোমুখ হয়ে লম্বমান দেখেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেন যে, জরৎকারু নামে তাঁদের এক পুত্র বিবাহ ও সন্তানোৎপাদন না করায় তাঁরা বংশলোপের আশঙ্কায় এইরূপ অবস্থায় লম্বমান আছেন। জরৎকারু তাঁদের আত্মপরিচয় দিয়ে বলেন যে, কেবলমাত্র পিতৃপুরুষের মুক্তির জন্যই তিনি তাঁরই সমনামা কোনো কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত আছেন, অবশ্য যদি সেই কন্যার আত্মীয়গণ স্বেচ্ছায় তাঁকে দান করেন, তবেই তিনি তাঁকে ভিক্ষা স্বরূপ গ্রহণ করে তাতে সন্তানোৎপাদন করবেন। ... বাসুকি ঐ বাক্য শ্রবণ করে তার ভগিনী জরৎকারুকে নিয়ে এসে মুনি জরৎকারুকে অনুরোধ করেন তাকে গ্রহণ করতে। কন্যার নামের সঙ্গে তাঁর নামের একত্ব লক্ষ্য করে জরৎকারু মুনি তাকে বিবাহ করেন। বিবাহের সময় স্থির হয় যে, ইনি স্ত্রীর ভরণপোষণ করবেন না এবং স্ত্রী অন্যায় কোনো আচরণ করলে তিনি তাকে ত্যাগ করবেন। ... একদিন মহর্ষি স্বীয় স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে নিদ্রিত আছেন, এমত অবস্থায় সায়ংসন্ধ্যা-বন্দনাদির সময় অতিক্রান্তপ্রায় লক্ষ্য করে আশঙ্কিত স্ত্রী স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করেন। মহর্ষি জরৎকারু এই ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও অপমানিত বোধ করে স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যান। (... কারণ তিনি সুপ্ত অবস্থায় থাকাকালীন সূর্যেরও অস্ত যাবার সামর্থ্য ছিল না।) যাবার সময় বলে যান যে, তার এক তেজস্বী পুত্র জন্মগ্রহণ করবে এবং এই পুত্রই 'আস্তীক' নামে অভিহিত হবে। (খ) নাগরাজ বাসুকি ভগিনী। ইনিই মনসা দেবী, জরৎকারু মুনির স্ত্রী। ... সর্পমাতা কদ্রু যে সমস্ত সর্প উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছলগ্ন হতে অস্বীকার করে তাদের অভিশাপ দেন যে, তারা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বিনষ্ট হবে। কদ্রুর জ্যেষ্ঠপুত্র বাসুকি সর্পকুল রক্ষার উপায় চিন্তা করতে থাকেন। তখন এলাপত্র নামে এক নাগ বাসুকিকে বলেন যে, অভিশাপ দানকালে তিনি মাতৃক্রোড় হতে শ্রবণ করেছিলেন যে, ব্রহ্মা দেবগণকে বলছেন, জরৎকারু মুনির ঔরসে বাসুকির ভগিনী জরৎকারুর গর্ভে জাত সন্তান আস্তীক মুনি সর্পদের রক্ষা করবেন। বাসুকি জরৎকারু মুনির সন্ধান করে তাঁর সঙ্গে ভগিনীর বিবাহ দেন। ... স্ত্রীকে ত্যাগ করে যাবার সময় ... তিনি কেবল স্ত্রীর উদরে তিনবার হস্ত স্পর্শ করে বলেন যে, 'অস্তি' অর্থাৎ গর্ভে আছে। সেকারণেই জরৎকারুর গর্ভজাত পুত্রের নাম হয় আস্তীক। ইনি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ নষ্ট করে নির্মূলপ্রায় সর্পকুলকে রক্ষা করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **আস্তীক**। ভারত ইতিহাসের কাল-বিভাজনের এই ক্রম — সনাতন যুগ, বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ, ব্রিটিশ যুগ, স্বাধীন যুগ। সনাতন যুগের শেষ সময়ে ও বৈদিক যুগের সূত্রপাত-কালের অর্থাৎ দুই যুগের সন্ধিক্ষণের পরিস্থিতির সঙ্গে বৌদ্ধ যুগের শেষ সময় ও হিন্দু যুগের সূত্রপাতের যুগসন্ধিকালের অদ্ভুত মিল দেখা যায়। এই মিল 'সনামা' পুরুষ-প্রকৃতি নিয়ে। সনাতন-বৈদিক সন্ধ্যাকালের একটি বড় ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় দুই পুলোমাকে নিয়ে, একজন অসুর আর একজন তার স্ত্রী, দুজনের নামই পুলোমা। (দ্র. **অগ্নিসাক্ষী**)। বৌদ্ধ-হিন্দু সন্ধ্যাকালের একটি বড় ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় দুই জরৎকারুকে নিয়ে, একজন ভৃগুবংশে (**জটাচার্ব্ব**-বংশে বা **যাযাবর**-বংশে) জাত মুনি আর একজন তার স্ত্রী, দুজনের নামই জরৎকারু। এরকম ঘটনার কথা আমাদের বেদ-পুরাণ-রামায়ণ-মহাভারতাদি গ্রন্থে আর কোথাও একটিও নাই। জরৎকারুর কাহিনীতে স্পষ্ট করে বলা আছে, তিনি কেবলমাত্র জরৎকারু নাম্নী কোনো নারীকেই বিয়ে করবেন, অন্য কাউকে নয়। এবং করলেনও। তাতেই **আস্তীক** মুনির জন্ম হল। এই আস্তীক মুনিই ভারত ইতিহাসের দিক-পরিবর্তনের প্রধান হোতা। হিন্দু যুগের সূত্রপাত তাঁরই হাত ধরে।

কিন্তু এ হল ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় হিন্দু যুগের সূত্রপাতকালের বয়ান। একালের ভাষায় তা দুর্বোধ্য। বিষয়টিকে একালের মতো করে বুঝতে গেলে উপরোক্ত কাহিনীকে বিস্তারিতভাবে অনুবাদ করে নেওয়া দরকার। তার জন্য অন্ততপক্ষে ৩০/৪০ পৃষ্ঠার নিবন্ধ লেখা জরুরি। এখানে অতি সংক্ষেপে মূল কথা কয়েকটি বলে নেওয়া যেতে পারে। — সময় ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ। বৌদ্ধযুগের দাপটে বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ্যবাদ নিঃশেষিতপ্রায়, টিকে থেকে গিয়েছিল **জটাচার্ব্ব**-বংশের শেষ উত্তরসূরী। একই ভাবে বৈদিকযুগের মধ্যভাগ থেকে চলে আসা প্রাচীন পুঁজিও (সর্প বা নাগও) বৌদ্ধযুগে আবির্ভূত প্রথম-আধুনিক-পুঁজির (গরুড়ের) আক্রমণে ক্রমক্ষীয়মান; তার ওপর গণ-জাগরণের (**জনমেজয়ের** আক্রমণের) ফলে তার সম্পূর্ণ বিনাশ হবে-হবে করছে। এমতাবস্থায় জরৎকারু-ব্রাহ্মণশক্তি ও জরৎকারু প্রাচীন-পুঁজিশক্তি, এই দুই শক্তির মিলন হয় এবং সে-মিলনে জন্ম হয় নতুন শক্তির। তারই প্রতীকী নাম শঙ্করাচার্য। এই শক্তি প্রাচীন পুঁজির সার্বিক বিনাশ আটকে দেয়, বৌদ্ধযুগের অবসান ঘটায়; হিন্দুযুগের সূচনা করে। যেহেতু, এই ঘটনা স্বভাববশতই বৈদিক পুনরুত্থানবাদ, হয়তো সেই কারণে এই যুগটিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রতিক্রিয়ার যুগ'।

জরা (জরায়ু, জরায়ুজ) : ১. ✓জৄ + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***জরা*** = *জনন আবর্ত্তমান রহে যাহাতে, তাহার আধার; অথবা, জনন ঘেরাটোপে আবদ্ধ হয় যাহাতে, তাহার আধার।* ***জরায়ু*** = *জনন রহনের গতিশীলতা নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে।* ***জরায়ুজ*** = ***জরায়ু*** *হইতে জাত।* ৩. **জরা** = বয়ঃকৃত শ্লথমাংসাদি অবস্থা, বার্দ্ধক্য, পরিপাক, জরাসদৃশ দেহক্ষয়মাত্র, ক্ষীরিকাবৃক্ষ, রাক্ষসীবিশেষ। (ব.শ.)। (ক) রাক্ষসীবিশেষ। এই রাক্ষসী জরাসন্ধের জন্মকালে তাঁর অর্ধশরীর যুক্ত করে তাঁকে জীবিত করেন। জরা প্রতি গৃহে ভ্রমণ করত বলে ব্রহ্মা এর নাম রেখেছিলেন গৃহদেবী।

কথিত আছে, ভক্তিভরে গৃহদেবীকে কক্ষগাত্রে অঙ্কিত করে রাখলে গৃহস্বামীর শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই রাক্ষসীই ষষ্ঠী নামে খ্যাতা। (খ) কৃষ্ণ যখন যদুবংশ ধ্বংসের পর বৃক্ষতলে মৌনভাবে অবস্থান করছিলেন, উক্ত সময় জরা নামে এক ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁকে বধ করে। কথিত আছে, এই ব্যাধ দ্বাপরে অঙ্গদের অবতার। (পৌ.অ.)। **জরায়ু** = গর্ভাবরণচর্ম্ম, গর্ভাশয় (uterus), (সাদৃশ্যে) নির্মোক, সাপের খোলশ, অগ্নিজারবৃক্ষ। **জরায়ুজ** = জরায়ুমধ্যজাত (viviparous), জরায়ুতে প্রাদুর্ভূত এবং পশ্চাৎ মুক্ত ও ভূমিষ্ঠ (মনুষ্যাদি)। (ব.শ.)। **৪. জরা** old অর্থে, **জরায়ু** uterus অর্থে, এবং **জরায়ুজ** viviparous অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫. জরা** বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি, যা ক্রমশ জীর্ণ হয়ে চলেছে, জারিত হয়ে সংক্ষিপ্ত রূপ লাভ করছে, সেটিই জরা। কারণ ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মে এর ভেতরে জনন থাকলেও তা একই বৃত্তের মধ্যে ক্রমক্ষীয়মান বেগে ঘুরে ঘুরে নিজের কেন্দ্রের দিকে ক্রমান্বয়ে সংক্ষিপ্ত হচ্ছে। (প্রাচীন ভারতের সামাজিক ইতিহাসে এই জরা সত্তা **রাক্ষসী** রূপে দেখা দিয়েছিল। কৃষ্ণের কাহিনীতে তার উল্লেখ রয়েছে; রয়েছে **জরাসন্ধ**-এর কাহিনীতে।) কিন্তু জরায়ুর বেলায় জননের আবর্ত্তনের বেগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় এবং একসময় বৃত্তের বাইরে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়াই তার ভবিতব্য। একেই জনন বলে। তাই, জরায়ুজ শব্দের বেলায় আমরা সরলভাবে ভাবতে পারি যে, যারা মাতার জরায়ু থেকে জন্মায় তারা সবাই জরায়ুজ। কিন্তু এই সরল চিন্তা, পৌরাণিক ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় লেখা মনুসংহিতায় ব্যবহৃত **জরায়ুজ** শব্দের অর্থ বুঝতে গিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। হত না, যদি সেখানে **জঙ্গম** সৃষ্টিকে তিনটি ভাগে (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ) ভাগ করা না হত; এবং স্বেদজ ও উষ্মাজাত জীবগুলির নাম ডাঁশ, মশা, যূকা, মক্ষিকা (মাছি), মৎকুণ (উকুন) ও পিপীলিকাদি বলা না হত। কারণ, সবাই জানেন ঘাম ও উষ্মা থেকে আর যাই হোক মশা মাছি পিপড়েদের জন্ম হয়, এরকম কথায় বিশ্বাস করা শক্ত। ফলে, **স্বেদজ** শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করতে যেতেই হয়। আর, যে-মুহূর্তে জানা যাবে, সমাজের অন্তর্বিরোধ থেকে যে-মানুষেরা বিতাড়িত হয় ... ইত্যাদি, তারাই মশা-মাছি পদবাচ্য; তৎক্ষণাৎ **অণ্ডজ** ও **জরায়ুজ** শব্দের প্রদত্ত অর্থে (**অণ্ডজ** = পক্ষী, সর্প, নক্র, মৎস্য ইত্যাদি এবং **জরায়ুজ** = পশু, মৃগ, ব্যাল, উভয়তদত, রাক্ষস, পিশাচ, মনুষ্য) যাদের বোঝানো হয়েছে, তাদের সামাজিক স্বরূপ বোঝার প্রয়োজন দেখা দেবে। তখন জানা যাবে, সমাজবিপ্লব থেকে যাদের সৃষ্টি হয়, তারা অণ্ডজ এবং সমাজের প্রচলিত নীতির ক্রমান্বয়ে মৌলবাদী হয়ে পড়ার বিরুদ্ধাচরণ থেকে যে সত্তাগুলির জন্ম হয়, তারাই **জরায়ুজ**।

জরাসন্ধ (দ্র. জরা) : **২.** *জরা (জরাগ্রস্ত সত্তা) কর্তৃক সন্ধিকৃত বা যুক্ত হয়েছে যে।* **৩.** চন্দ্রবংশীয় **মগধরাজ** বৃহদ্রথের পুত্র। বৃহদ্রথ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ছিলেন। ইনি কাশীরাজের দুই যমজ কন্যাকে বিবাহ করেন, কিন্তু যৌবন গত হওয়ায় পুত্রলাভে বঞ্চিত হন। ... মহর্ষি চণ্ডকৌশিক তাঁকে একটি মন্ত্রসিদ্ধ আম্রফল দান করেন। ... সেটিকে সমান দুই ভাগ করে রাজা দুই স্ত্রীকে খেতে দেন। ... দুজনই একটি মাংসপিণ্ড জন্মদান করে। ... মাংসপিণ্ড দুটিকে শ্মশানে পরিত্যাগ করা হয়। ... জরা রাক্ষসী সে-দুটিকে সংযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই এক সম্পূর্ণাঙ্গ বীর রাজকুমার সৃষ্টি হয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করতে থাকে। সেই রোদন শুনে রাজা সস্ত্রীক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে নারীমূর্তিধারিনী রাক্ষসী বৃহদ্রথকে সেই পুত্র দান করে বলে যে, এই পুত্র ভুবনবিজয়ী বীর হবে এবং জন্মকালীন অবস্থার ন্যায় দ্বিধাবিভক্ত না হলে এর কখনো মৃত্যু হবে না। জরা রাক্ষসী কর্তৃক সন্ধিকৃত বা যোজিত বলে এর নাম হল জরাসন্ধ।

... জরাসন্ধ তাঁর দুই কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তিকে কংসের হস্তে সমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের হাতে কংস নিহত হলে জরাসন্ধ জামাতাবধের জন্য শত্রুনির্যাতন মানসে অষ্টাদশবার মথুরা আক্রমণ করেন। ... এরপর কৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের জন্য প্রস্তুত হন। ... ভীম জরাসন্ধের দুই পা ধরে টান দিয়ে তাঁর দেহ দ্বিধাবিভক্ত করার ফলে জরাসন্ধের মৃত্যু হয়। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** একটি শারীরিক বা সামাজিক ব্যবস্থার জরাগ্রস্ততার কারণে অভ্যন্তরস্থ দুটি শক্তিকে যোগ করে ফেলার ঘটনা আজও ঘটে। বৃহদ্রথ বা বৃহৎ রথ যাহার, অর্থাৎ যার প্রশাসনিক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা অত্যন্ত বড়, যে আবার **কাশী**রাজের যমজ কন্যাকে বিবাহ করেছে যাদের দুজনের একটিমাত্র পুত্র হয় **জরাসন্ধ**, যে কিনা আসলে দুই, কিন্তু জুড়ে দিয়ে এক করা হয়েছে। এর আবার দুই কন্যা — অস্তি এবং প্রাপ্তি। এই মূলধন-শক্তি (অস্তি) ও লাভ-শক্তির (প্রাপ্তির) সঙ্গে **কংস** রাজার বিয়ে দেন জরাসন্ধ। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ইনি আঠারোবার অভিযান চালান। এই জরাসন্ধের মৃত্যুই হয় না, যতক্ষণ তাকে পুনরায় দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়া না হয়। কে এই সত্তা? খুবই ভাবনার কথা। আমরা এখনও নিশ্চিত হতে পারিনি।

জর্জ্জর (জর্জ্জরিত) : **১.** ✓জর্জ্জ্ (হিংসা) + অর। (ব.শ.)। **২.** ***জর্জ্জর** = জরণ (জর্ + অন) কর্তৃক জরিত যে; অথবা, জর্ জনিত হয়ে রহে যাহাতে।* **৩.** জরাতুর, জীর্ণ, বিচ্ছিন্ন, শিথিল, পুরাতন, বিশীর্ণ, বিমিশ্র, খণ্ডিত, পীড়িত, পৃথগ্‌ভূত, শৈলজ, শক্রধ্বজ, প্রাচীন। (ব.শ.)। **৪.** 'পীড়িত' অর্থে প্রচলিত। **৫. জরা** শব্দে আগেই আমরা দেখেছি, জর ক্রিয়াটি দুরকম স্বভাবের হতে পারে। এক, ক্ষীয়মান বেগসম্পন্ন আবর্ত্তনমূলক রহন; দুই, বর্দ্ধমান বেগসম্পন্ন আবর্ত্তন-মূলক রহন। দুটির ফল দুরকম হয়। আর সেজন্যই প্রথমটি বিলুপ্তির দিকে, দ্বিতীয়টি নবসৃষ্টির দিকে এগোতে পারে। যে-জরা বিলুপ্তির দিকে এগোয় সে যখন কোনো সত্তাকে জরাগ্রস্ত করে তখন সেই জরাগ্রস্ত সত্তাটিকে বলা হয় **জর্জ্জর**। এই জর্জ্জর গতিশীল হয়ে তারিত হয় যে সত্তায়, তাকে বলা হয় **জর্জ্জরিত**।

জার (জারক, জারজ) : **১.** ✓জৃ + ই (ণিচ্) — জারি + অ (অচ্) - ক। (ব.শ.)। **২.** ***জার** = জর হইতে জাত। **জারক** = জার করে যে। **জারজ** = জার হইতে জাত যে।* **৩. জার** = উপপতি, বিশ্বস্ত বন্ধু, সতীধর্ম্মনাশক; জীর্ণ হওয়া, ম্লান হওয়া, শুখান, জীর্ণ করা, জর্জ্জর করা, জ্বলিত করা। **জারক** = জীর্ণতাজনক, জঠরাগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, হজমী। **জারজ** = জারজাত, উপপতিজাত। (ব.শ.)। **৪.** 'উপপতি' অর্থে জার, 'হজমি' অর্থে জারক, এবং

'অবৈধ সন্তান' অর্থে জারজ প্রচলিত। **৫. জরা** শব্দে আগেই আমরা জেনেছি, বেগের কমা-বাড়ার উপর নির্ভর করে বিলুপ্তিমুখী ও জননমুখী দুরকম **জর** হয়ে থাকে। ফলত, সেই জর থেকে জাত **জার** শব্দটিও দুরকম স্বভাবের হয়ে থাকে। বিলুপ্তিমুখী জার জারিয়ে দেয়, জীর্ণ করে দেয়, জর্জ্জরিত করে, ম্লান করে, শুকিয়ে দেয়, সতীধর্ম্মনাশ করে। আর জননমুখী জার জ্বলিত করে, জারণ ক'রে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায় ইত্যাদি। বলে রাখা যেতে পারে, জারিত খাদ্যদ্রব্য রাখা হয় যে বয়ামে, তাকেও জার বলে। **৬.** ইংরেজি উত্তরাধিকারে jar শব্দটি তাই দুরকমভাবেই রয়েছে। জননমুখী জারকে তাঁরা পেয়েছেন তাঁদের সংঘাতব্যঞ্জক jar, jargon, jark প্রভৃতি শব্দে এবং বিলুপ্তিমুখী জারকে পেয়েছেন jar, jardiniere শব্দে। তবে শেষোক্ত আধারসূচক jar শব্দটি আরবি থেকেও ইংরেজিতে গিয়ে থাকতে পারে। এমনকি মূল ল্যাটিন নাম Caesar এবং সেখান থেকে পাওয়া ইংরেজি Caesar, জার্মান Kaiser, রাশিয়ান Czar, Czarina প্রভৃতি শব্দও এই জৃ শব্দবংশেরই সদস্য বলেই মনে হয়।

জারি (জারিগান, জারিজুরি, জারী) : ২. ***জারি*** *=* ***জার*** *গতিশীল যাহাতে।* ***জারিগান*** *= যে গানের সাহায্যে (শোক) জারি করা হয়।* ***জারিজুরি*** *=* ***জারি*** *(ঘোষণা পূর্ব্বক করানো) ও* ***জুরি*** *(জোর পূর্ব্বক করানো)।* ***জারী*** *=* ***জারির*** *আধার যে।* ***জারীজুরী / জারী*** = জ্বরকে জারিয়ে (নাশ করে) দেয় যে (জ্বরজারয়িত্রী)। (ব.শ.)। **৩.** প্রচলিত, কার্য্যে প্রবর্ত্তিত, কার্য্যকর, বলপ্রকাশ, আস্পর্দ্ধা, প্রতাপ, প্রভাব, ক্ষমতা, বাহাদুরী; ওষধিবিশেষ; মহরমপর্ব্বের শোকের যাত্রা, জারীযাত্রা, মুসলমানের শাস্ত্রসম্বন্ধী যাত্রামাত্র। (ব.শ.)। **৪.** declare অর্থে জারি /জারী এবং বিশেষ ধরনের গান অর্থে জারিগান প্রচলিত। **৫.** দ্র. **জার**। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিলুপ্তিমুখী জার গতিশীল হলে যে ক্রিয়া বোঝায়, তারই উত্তরাধিকার রয়েছে 'জারি করা' শব্দে। বলা হয়ে থাকে, এটি নাকি আরবি শব্দ। কিন্তু সমাজে বিশেষ নীতি জারি করাও সমাজকে বিশেষ নীতিতে জারিত করে এবং প্রায়শই তা একমুখী হওয়ায় বিলুপ্তিমুখী হয়ে থাকে। ব.শ. **জারী** শব্দের যে-ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়েছেন, তা সেই কারণে '**জ্বরজারয়িত্রী**' বা 'ওষধিবিশেষ'কেও বোঝায়।

জ্যা (জ্যামিতি) : ১. √জ্যা + অ (অঙ্) - ণ + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** ***জ্যা*** *=* ***জন্য*** *থাকে যাহাতে, তাহার আধার।* ***জ্যামিতি*** *=* ***জ্যা****-এর গতিশীল সীমায়ন তারিত হয়ে গতিশীল থাকে যাহাতে।* / যাহার দ্বারা ধনুর জীর্ণীভাব সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. জ্যা** = শিঞ্জিনী, গুণ, (সাদৃশ্যে) বৃত্তখণ্ডের কোটিযোজক রেখা (chord), পৃথিবী, ভূমি, মাতা। **জ্যামিতি** = জ্যার মিতি অর্থাৎ পৃথিবীর পরিমাণ, ভূমিপরিমাণ বিষয়ক অঙ্কশাস্ত্র, ক্ষেত্রব্যবহারশাস্ত্র (Geometry)। **৪. ৫.** জ্যামিতি ও Geometry শব্দ দুটি নিজেরাই বলে দেয়, তারা পরস্পরের নিকটাত্মীয়। এর ব্যাখ্যা নিতান্তই বাহুল্য বলে মনে হয়।

জ্ঞা (জ্ঞপ্, জ্ঞাপি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অগা, অগেআন, অগেয়ান, অগেয়ানি, অজ্ঞ, অজ্ঞাত, **অজ্ঞাতকুলশীল, অজ্ঞাতবাস, অজ্ঞাতচর্য্যা, অজ্ঞাতযৌবনা,** অজ্ঞাতসারে, **অজ্ঞাতি, অজ্ঞান, অজ্ঞানতঃ, অজ্ঞানতিমির, অজ্ঞানী,** অননুজ্ঞাত, **অনভিজ্ঞ, অনুজ্ঞা, অবজ্ঞা, অবিজ্ঞাত, অবিজ্ঞাতা,** অবিজ্ঞান, **অবিজ্ঞেয়, অভিজ্ঞ, অসংজ্ঞ,** আগ্‌গা, **আজ্ঞপ্ত, আজ্ঞা,** আজ্ঞাকর, **আজ্ঞাকারী, আজ্ঞাকরণ, আজ্ঞাচক্র, আজ্ঞাদান, আজ্ঞাধীন, আজ্ঞানুবর্ত্তী, আজ্ঞানুযায়ী, আজ্ঞানুসারী, আজ্ঞাপক, আজ্ঞাপত্র,** আজ্ঞাপান, **আজ্ঞাপালন, আজ্ঞাপিত, আজ্ঞাপ্য, আজ্ঞাবন্দী, আজ্ঞাবহ,** আজ্ঞাভঙ্গ, **আজ্ঞামালা, আজ্ঞে,** গিআ(য়া)ন, গে(আ)য়ান, **জান,** জানত, **জানা, জানালা, জানি, জানিত, জানিল, জিজ্ঞাস, জিজ্ঞাসন,** জিজ্ঞাসা, **জ্ঞ, জ্ঞপিত, জ্ঞা, জ্ঞাত, জ্ঞাতি, জ্ঞাতিকুল, জ্ঞাতিগোষ্ঠী, জ্ঞাতেয়, জ্ঞাতিত্ব, জ্ঞান, জ্ঞানকাণ্ড, জ্ঞানকৃত, জ্ঞানগম্য, জ্ঞানগোচর, জ্ঞানচক্ষুঃ, জ্ঞাননিষ্ঠ, জ্ঞানদ, জ্ঞানবন্ত, জ্ঞানবিজ্ঞান, জ্ঞানবৃদ্ধ, জ্ঞানময়, জ্ঞানযজ্ঞ, জ্ঞানযোগ, জ্ঞানলক্ষণা, জ্ঞানশক্তি, জ্ঞানসাধন, জ্ঞানহত, জ্ঞানহারা, জ্ঞানাগম, জ্ঞানাঞ্জন, জ্ঞানী, জ্ঞানেন্দ্রিয়, জ্ঞাপক, জ্ঞীপ্সা, জ্ঞেয়, জ্ঞেয়াতি, জ্ঞেয়ান, প্রজ্ঞ, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞাত, প্রজ্ঞাবান, প্রতিজ্ঞা, প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন, সংজ্ঞা, সংজ্ঞাবান, সুপ্রজ্ঞ।**

জ্ঞা (জ্ঞাপ্, জ্ঞাপি) = জন্যর রহস্যরূপের আশ্রয় যাহাতে। **জ্ঞাপ** = **জ্ঞা** পালিত হয় যাহাতে। **জ্ঞাপি** = **জ্ঞাপ** গতিশীল যাহাতে।

অজ্ঞ : ১. ন + **জ্ঞ**। **২.** *নয়* ***জ্ঞ*** *যে।* / যে জানে না; যাহা হইতে জ্ঞানী নাই। (ব.শ.)। **৩. জ্ঞানহীন,** অনাত্মজ্ঞ, বিশেষজ্ঞানশূন্য, চৈতন্যহীন, অচেতন, **অল্পজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ,** বেদান্তিমতসিদ্ধাজ্ঞানবান। (ব.শ.)। **৪.** fool অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **জ্ঞ, জ্ঞা**। সাধারণভাবে অজ্ঞ শব্দটি 'যে জানে না' অর্থে প্রচলিত থাকলেও, যেকারণে ব.শ. একই সঙ্গে উপরোক্ত **জ্ঞানহীন** ও **সর্ব্বজ্ঞ** দুরকম পরস্পর বিরোধী অর্থ দিয়েছেন, সেটি বোঝা দরকার। এ বিষয়ে আমরা **অজ্ঞ, অমূল্য** প্রভৃতি শব্দের শরণাপন্ন হতে পারি। আসলে জননটুকু জানা হল বিশেষ **জ্ঞান**। যে তার চেয়ে কম জানে সে যেমন **অজ্ঞ**-পদবাচ্য হয়, তেমনি যে তার চেয়ে বেশি জানে সেও **অজ্ঞ**-পদবাচ্য হয়। সেই কারণে **অজ্ঞ** শব্দটির দুরকম অর্থে ব্যবহৃত হতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে, তার '**জ্ঞানহীন**' অর্থের প্রচলনটিই খুব বেশি। **স্বল্পজ্ঞ** বা **সর্ব্বজ্ঞ** অর্থে শব্দটির প্রচলন এখন আর হয় না বললেই চলে। **৬.** ইংরেজি agnostic।

আজ্ঞা (আজ্ঞাকারী, আজ্ঞাচক্র, আজ্ঞাধীন, আজ্ঞানুবর্ত্তী, আজ্ঞানুসারী, আজ্ঞাবহ) : ১. আ + √**জ্ঞা** + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** ***আজ্ঞা*** *=* ***জ্ঞা****-র আশ্রয় যাহাতে।* ***আজ্ঞাকারী*** *=* ***আজ্ঞা*** *করে যে।* ***আজ্ঞাচক্র*** *=* ***আজ্ঞা*** *রহে যে চক্রে।* ***আজ্ঞাধীন*** *=* ***আজ্ঞার*** *অধীন যে।* ***আজ্ঞানুবর্ত্তী*** *=* ***আজ্ঞার*** *অনুবর্ত্তন করে যে।* ***আজ্ঞানুসারী*** *=* ***আজ্ঞা*** *অনুসারে চলে যে।* ***আজ্ঞাবহ*** *=* ***আজ্ঞা*** *বহন করে যে।* **৩.** নিয়োগ, আদেশ, বিধি, (জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে দশম স্থান, (তন্ত্রে) ষটচক্রান্তর্গত ষষ্ঠ চক্র, আদেশস্বীকারে। **৪.** order অর্থে প্রচলিত। **৫.** 'বাহিরে যাও' — এই বাক্যটি একটি আজ্ঞা-বাক্য। এর ভিতরে যে ক্রিয়ার ধারণা

ধারিত হয়ে রয়েছে, তাকে বলে **জ্ঞা**। সেই ক্রিয়ার ধারণাটি যে আওয়াজ বা শব্দবন্ধটিতে আশ্রিত রয়েছে, তাকে বলে **আজ্ঞা**। এই আজ্ঞা এমনিতে অবাস্তব, কিন্তু আজ্ঞাকারী ও আজ্ঞাধীনের মাঝে এই আজ্ঞা উচ্চারিত হয়ে বাস্তবায়িত হলে, তখন তা বাহ্যসত্যে পরিণত হয়। তবে আজ্ঞাকারী যদি সংখ্যায় অনেক হয়, তাদের যদি একটি চক্র থাকে, তবে তাকে বলে **আজ্ঞাচক্র**। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি নানারকম সমাজদেহ-তান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থায় বা তন্ত্রে এই **আজ্ঞাচক্র** খুবই সক্রিয় থাকে। ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে শরীর-কাঠামোয় এই আজ্ঞাচক্র থাকে তার ভ্রূ-তে, ভ্রূ-মণ্ডলে; আর রাষ্ট্রকাঠামোয় এই আজ্ঞাচক্র থাকে রাষ্ট্রশরীরের ভ্রূ-মণ্ডলে। এই ভ্রূ-মণ্ডলে যাঁরা থাকেন একালে তাদের বলা হয় 'মন্ত্রী-পরিষদ' বা মন্ত্রীমণ্ডল। রাষ্ট্রশরীরের সেটিই **আজ্ঞাচক্র**। দ্র **তন্ত্র**।

জিজ্ঞাসা (জিজ্ঞাসু) : ১. ✓জ্ঞা + স (সন্) + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***জিজ্ঞাসা*** = *গতিশীল **জন্য**-র জানিবার ইচ্ছা থাকে যাহাতে; অর্থাৎ জিজ্ঞাসুর জানিবার ইচ্ছা থাকে যাহাতে।* ৩. **জিজ্ঞাসা** = জানিতে ইচ্ছা, প্রশ্ন, পৃচ্ছা, পরীক্ষা, তদর্থবিচার। **জিজ্ঞাসু** = জানিতে ইচ্ছু, জ্ঞানেচ্ছু, আত্মজ্ঞানেচ্ছু। (ব.শ.)। ৪. question অর্থে প্রচলিত। ৫. **জিজ্ঞাসা** শব্দটি যে-নিয়মে তৈরি করা হয়েছে, সেরকম বেশ কিছু শব্দের উত্তরাধিকার আমাদের আছে। সেগুলি হল —**চিকিৎসা, চিকীর্ষা, জগৎ, জগৎসৃষ্টি, জঘন্য, জাজ্বল্য, জিগমিষা, জিগীষা, জিঘাংসা, জিঘৃক্ষা, জিঘ্র, জিজীবিষা, জিহ্মা, জুগুপ্সা, পিপাসা, মুমূর্ষা** ইত্যাদি। এই শব্দগুলির বিশেষত্ব হল, এগুলির অর্থে ক্রিয়াকারীর উল্লেখ রয়েছে প্রথম বর্ণে। **জিজ্ঞাসা** শব্দটির কথাই ধরা যাক। এতে জি মানে 'গতিশীল জন্য' (= জিজ্ঞাসু) আর জ্ঞাসা মানে জানিবার ইচ্ছা। অতএব **জিজ্ঞাসা** শব্দের মানে দাঁড়াচ্ছে — জিজ্ঞাসুর জানিবার ইচ্ছা। একইভাবে **জঘন্য** মানে দাঁড়ায় জঘনকারীর পক্ষে ঘন্য বা হন্য, **জাজ্বল্য** মানে জ্বলিতের জ্বল্যমানতা ইত্যাদি। একই নিয়মে পানকারীর পান করিবার ইচ্ছাই হল **পিপাসা**, মুমূর্ষুর মরিবার ইচ্ছাই **মুমূক্ষা**। তবে এই নিয়মের একটু ইতরবিশেষ দেখা যায় ক ও গ বর্ণের ক্ষেত্রে, যেকারণে কিৎসার বেলায় কিকিৎসা না হয়ে চিকিৎসা হয়, গীষার বেলায় গিগীষা না হয়ে জিগীষা হয়। ক-এর বেলায় চ এবং গ-এর বেলায় জ আসে যে কারণে সেটি আমরা বর্ণের শুরুতে ব্যাখ্যা করেছি। তবুও সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক — **কিছু করতে** (ক্) গেলে প্রথমে সেটিকে ধরতে (চ = চয়ন করতে) হয়, ক্ ও চ্ তাই পরস্পর সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া। একই ভাবে, একটি সত্তা থেকে কাউকে যদি বেরিয়ে কোথাও যেতে হয়, আগে তো তাকে সত্তাটি থেকে বহির্গত বা জনিত হতে হবে! সেই জন্যই গ্-এর আগে জ্। অন্য বর্ণগুলির ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি দেখা যায় না। তা সে যাই হোক, এই শব্দগুলির শুরুতে মূল ক্রিয়ার ক্রিয়াকারীকে আগম রূপে না আনলে আমরা শব্দগুলিকে পেতাম যথাক্রমে এই রূপে — কিৎসা, কীর্ষা, গৎ, গৎসৃষ্টি, ঘন্য, জ্বল্য, গমিষা, গীষা, ঘাংসা, ঘৃক্ষা, ঘ্র, জীবিষা, হ্মা, গুপ্সা, পাসা, মূক্ষা।

জ্ঞ : ১. ✓জ্ঞা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। স্ত্রী '**জ্ঞা**'। (ব.শ.)। ২. *জননের রহস্যরূপ থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, জানে যে।* ৩. জ্ঞাতা, বেদিতা, বিদ্বান, বুধ, পণ্ডিত, ব্রহ্মা, বুধগ্রহ, মঙ্গলগ্রহ, সর্বজ্ঞ আত্মা। (ব.শ.)। ৪. পৃথকভাবে অপ্রচলিত, কিন্তু যুক্তভাবে, যথা '**অভিজ্ঞ**', '**বিশেষজ্ঞ**' ইত্যাদি রূপে প্রচলিত, যার অর্থ 'জানে যে'। ৫. **জ্ঞ** শব্দটি তৈরি হয়েছে জ্-এর সঙ্গে ঞ্ + অ যোগ করে। এই জ্ হল জনন ক্রিয়া, এবং ঞ হল তার রহস্যরূপ-করণ; যা কিনা চ-বর্গে শক্তিরূপিণীর রহস্যরূপই বটে। একে আমরা 'মানুষিক ধারণা'রূপও বলতে পারি। এতে সাধারণ জনন ক্রিয়াটি নেই, রয়েছে লিঙ্গিত হওয়ার পরবর্তী জনন বা প্রতিক্রিয়া-জনন। এই জনন-ধারণাটিই জ্-এর অঞরূপিণী বা জ্-ঞ। অর্থাৎ জনন বিষয়ক ধারণা থাকে যাতে, সেটিই **জ্ঞ**; অর্থাৎ 'জানে যে'। এই 'যে' হল জ্ঞ-এর আধার মাত্র, কিন্তু সাধারণত তাকে খানিকটা বাড়িয়ে নিয়ে আমরা 'যে' বলতে কোনো ব্যক্তিকে বুঝি। তখন **জ্ঞ** মানে দাঁড়িয়ে যায় 'জানে যে-ব্যক্তি'। এর সঙ্গে প্রকৃতিশক্তি আধার রূপে যুক্ত হলে সেটি **জ্ঞা** হয়ে যায়। ৬. ইংরেজিতে একে প্রাচীনকালে বলা হত gnow, একালে বলা হয় know। অর্থের ক্ষেত্রে এর অবস্থা go-এর মতো। বাংলায় আমরা 'যায় যে' অর্থে 'গো' পেয়েছিলাম, ইংরেজি পেয়েছে 'যাওয়া' অর্থে go, যাওয়া-ক্রিয়ার কারী পড়েছে বাদ। তেমনি 'জানে যে' অর্থে আমরা পেয়েছি '**জ্ঞ**', ইংরেজি পেয়েছে 'জানা' অর্থে gnow বা know, জানা-ক্রিয়ার কারী বাদ পড়ে গেছে।

জ্ঞাত, জ্ঞাতি (জাত, জাতি) : ১. জ্ঞাত = ✓জ্ঞা + ত (ক্ত) কর্মবাচ্যে। জ্ঞাতি = ✓জ্ঞা + তি (ক্তিন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***জ্ঞাত*** = ***জ্ঞ*** *ক্রিয়ার আধার তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, যাহা উৎস হইতে জনিত হইয়া আধারে তারিত হইয়াছে।* ***জ্ঞাতি*** = ***জ্ঞাত*** *গতিশীল যাহাতে।* ৩. **জ্ঞাত** = বুদ্ধ, বিদিত, বোধ, জ্ঞান। **জ্ঞাতি** = ছিদ্রজ্ঞ বা কুলস্থিতিজ্ঞ, বান্ধব, দায়াদ, স্বজন, সকুল্য, সমানোদক, সপিণ্ড, পিতৃবংশ্য সপিণ্ডাদিরূপ একগোত্রজ পিতৃব্য-প্রভৃতি, পিতা। (ব.শ.)। ৪. **জ্ঞাত** known অর্থে এবং **জ্ঞাতি** persons of the same family অর্থে প্রচলিত। ৫. জন্মেছে যে, সে হল জাত; সেই জাত গতিশীল হলে তাকে বলে জাতি। একই নিয়মে যাকে জানা গেছে, তাকে জ্ঞাত বলে। সেই জ্ঞাত গতিশীল হলে তাকে একই নিয়মে জ্ঞাতি বলা হয়। কিন্তু আমরা যা-যা জেনেছি, জ্ঞাত হয়েছি, তারা আমাদের জ্ঞাতি (kin) হয় কেমন করে?

'রাম সীতাকে জ্ঞাত হইলেন। তাহাতে লব ও কুশের জন্ম হইল। লব ও কুশ রাম-সীতার জ্ঞাতি হইলেন।' — এরকম বাক্যের মানে বোঝা যায় না। জ্ঞাত হলে জ্ঞাতি জন্মায় কেমন করে? জ্ঞাত হওয়াই বা কী ব্যাপার? বাইবেলে যখন এইরকম বাক্যই আমরা পড়ি, তখন আমাদের মনে প্রশ্ন আসে না; কিংবা এলেও সে প্রশ্নের উত্তর পাই না আমরা। তবে **জানা, জ্ঞ** ও **লিঙ্গ** শব্দ থেকে আমরা আগেই জেনেছি, প্রকৃতপক্ষে জনন ঘটে দু'ভাবে — সত্তার **জনিত-ক্রিয়া** থেকে জনন হয়, সত্তার **জনিত-প্রতিক্রিয়া** থেকেও জনন হয়। জনিত-প্রতিক্রিয়া পেতে হলে লিঙ্গিত হতে হয়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান এই লিঙ্গকে 'পার্টিসিপেটর' নাম দিয়েছে। লিঙ্গিত হলেই বিপরীত

তরফ থেকে সন্তান জনিত হয়, তা সে জ্ঞান-সন্তান হোক আর পুত্র-সন্তানই হোক। **জনিত-ক্রিয়া** থেকে যে-সন্তানকে পাওয়া যায়, তাকে **জাত** বলে। আর **জনিত-প্রতিক্রিয়া** থেকে যে-সন্তানকে পাওয়া যায়, তাকে **জ্ঞাত** বলে। এই সন্তান কার্যত **জ্ঞাত**-ই বটে। তার মানে, **জ্ঞাত** হল সঙ্গম-লব্ধ সন্তান। এবং **জাত** হল সন্তান মাত্র, তা সে সঙ্গমলব্ধ হতে পারে, অন্য কোনোভাবেও হতে পারে। অতঃপর শব্দের বিকশিত হওয়ার নিজস্ব নিয়মে **জাত** গতিশীল হলে **জাতি**, এবং **জ্ঞাত** গতিশীল হলে **জ্ঞাতি** হয়। এই হিসেবে, স্বতঃজনিতদের **জাতি** এবং প্রতিক্রিয়া-জনিতদের **জ্ঞাতি** বলার কথা। কার্যত, একই রক্তসম্পর্কের স্বজনদের **জ্ঞাতি** এবং তাঁদের ঘিরে সমস্ত পরিজনদের নিয়ে যে সার্বিক সত্তা তাদের **জাতি** রূপে শনাক্ত করা হয়ে থাকে।

জ্ঞান (জ্ঞানগম্য, জ্ঞানগোচর, জ্ঞানী) : **১.** ✓জ্ঞা + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***জ্ঞান*** *= **জ্ঞ** ক্রিয়া অন যাহাতে।* ***জ্ঞানগম্য*** *=* ***জ্ঞান*** *যাহাতে গমন করিতে পারে; কিংবা* ***জ্ঞান****-এর যাহাতে গমন করা উচিত।* ***জ্ঞানগোচর*** *=* ***জ্ঞান****-রূপ গামী যেখানে বিচরণ করিতে পারে।* ***জ্ঞানী*** *= গতিশীল* ***জ্ঞান****-এর আধার যে। /* **জ্ঞান** = যাহার দ্বারা বোধ সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩.** **জ্ঞান** = বোধ, বিশেষজ্ঞতা, উপদেশ, ধ্যান, শাস্ত্রবোধ, নির্ণয়, বিশেষ বা সামান্য ক্ষঅববোধ, যথার্থবিষয়বোধ, (বেদান্তে) পদার্থগ্রাহিকা মনোবৃত্তি, (ন্যায়ে) বুদ্ধিমাত্র, শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজ আত্মবিষয়ক মোক্ষফল বুদ্ধি, আত্মতত্ত্বাববোধ, মহাবাক্যজন্যা অখণ্ডাকারবুদ্ধিবৃত্তি, স্বস্বরূপস্ফুরণ, অধ্যবসায়, 'আমি ব্রহ্ম সম শান্ত' এবংবিধ উপাসনা, আত্মবিষয়বিবেক ...। **জ্ঞানগম্য** = জ্ঞানমাত্রগোচর। **জ্ঞানী** = জ্ঞানবান, সামান্য জ্ঞানযুক্তমাত্র, অধীতগ্রন্থার্থজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞানবান, আত্মজ্ঞানবান, বিষ্ণুতত্ত্ববিৎ, দৈবজ্ঞ। (ব.শ.)। **৪.** knowledge অর্থে **জ্ঞান**, knowable অর্থে **জ্ঞানগম্য**, এবং wise অর্থে **জ্ঞানী** প্রচলিত। জ্ঞানগোচর প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **জানা**। **৬.** Gnow, Know।

জ্ঞাপক (জ্ঞাপন, বিজ্ঞাপন) : **১.** ✓জ্ঞাপি + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। *জ্ঞপ > জ্ঞাপ > জ্ঞাপি > জ্ঞাপক।* **২.** ***জ্ঞাপক*** *=* ***জ্ঞা*** *পালনকে গতিশীল করে যে।* ***জ্ঞাপন*** *=* ***জ্ঞাপ*** *অন যাহাতে।* ***বিজ্ঞাপন*** *= বিশেষ রূপ* ***জ্ঞাপন*** *থাকে যাহাতে।* **৩.** **জ্ঞাপক** = জ্ঞাপয়িতা, নির্দ্দেশক, উপদেশক, আজ্ঞাপয়িতা, রাজপুরুষবিশেষ, সংজ্ঞাবচন, নির্দ্দেশক সূত্রাদি। **জ্ঞাপন** = বোধন, ব্যঞ্জন, সূচন। **বিজ্ঞাপন** = বিজ্ঞপ্তি, নিবেদন, সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত বিষয়বিশেষের লিখিত বা মুদ্রিত পরিচয়পত্র (advertisement, notice)। (ব.শ.)। **৪.** inform অর্থে **জ্ঞাপন**, এবং advertisement অর্থে **বিজ্ঞাপন** প্রচলিত। **জ্ঞাপক** প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** **জ্ঞ** পালিত হয় যাহাতে, তাকে **জ্ঞপ** বলে। এই জ্ঞপ হইতে জাত হয় **জ্ঞাপ**। এ হল পালিত জ্ঞানের বিভিন্ন রূপ। তারই কোনো একটি রূপকে বা জ্ঞাপকে অন করে দিলে **জ্ঞাপন** করা হয়ে যায়। বিশেষ ধরনের জ্ঞাপনকে **বিজ্ঞাপন** বলে।

জ্বর্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অজ্বর, অসংজ্বর, জ্বর্, জ্বর, **জ্বরঘ্ন, জ্বরঘ্নী, জ্বরান্তক**, জ্বরিত, জ্বরী, জ্বরোৎপত্তি।

জ্বর্ = জন্য-বহনের (আ)**বর্ত্তমানতা**। **জ্বর** = জন্য-বহন বর্ত্তমান যাহাতে।

জ্বর (জ্বরোৎপত্তি, জ্বরঘ্ন, জ্বরঘ্নী, জ্বরান্তক) : **১.** ✓জ্বর্ + অ (ঘ) - করণবাচ্যে; অথবা, ✓জ্বর্ + অ (অপ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***জ্বর*** *= জন্য-বহন রহে যাহাতে।* **৩.** **জ্বর** = সন্তাপ, ব্যাধিভেদ, রোগবিশেষ, (সাদৃশ্যে) জ্বরবৎ পীড়াকর বিষয়মাত্র, ব্যথা, পীড়া, জ্বরাধিদেবতা, শোক; **জ্বরাক্রান্ত** হওয়া। (ব.শ.)। **জ্বরোৎপত্তি** = দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে মহাদেবের ঘর্মবিন্দু হতে উৎপন্ন এক পুরুষ। ব্রহ্মার অনুরোধে মহাদেব জ্বরকে নানা ভাগে বিভক্ত করেন। হস্তি-মস্তকের তাপ, পর্বতের শিলাজতু, জলের শৈবাল, সর্পের নির্মোক, গোজাতির খুররোগ, ভূমির উর্বরতা, পশুর দৃষ্টিরোধ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখোদ্‌ভেদ, কোকিলের চক্ষুরোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকের হিক্কা, এবং শার্দুলের শ্রমকে জ্বর বলা হয়। বৃত্রবধ কালে মহাদেব ইন্দ্রের দেহে তেজ ও বৃত্রের দেহে জ্বররোগ সংক্রামিত করে বৃত্রকে বজ্রাঘাতে বধ করবার জন্য ইন্দ্রকে আদেশ দেন। ইন্দ্রও সেইভাবে বৃত্রকে বধ করেন। (পৌ.অ.)। সত্যযুগ গত হইবার সময়ে কোনো কোনো ব্যক্তি ধনাদির অতি গ্রহণ জন্য সাম্পন্নিক হওয়ায় তাহাদের শরীরের গুরুত্ব হইয়াছিল। শরীরের গুরুত্ববশত শ্রান্তি, শ্রান্তিবোধ হইতে আলস্য, আলস্য হইতে ধনসঞ্চয়ে আকাঙ্ক্ষা, সঞ্চয়েচ্ছা হইতে প্রতিগ্রহ এবং প্রতিগ্রহ হইতে লোভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। তৎপরে ত্রেতাযুগ আরম্ভ হইলে লোভ হইতে জিঘাংসা, জিঘাংসা হইতে মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা হইতে কাম ক্রোধ অভিমান দ্বেষ পরুষতা অভিঘাত ভয় তাপ শোক চিন্তা ও উদ্বেগাদির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ... এবং জ্বরাদি ব্যাধি কর্তৃক শরীর আক্রান্ত হইয়াছিল, তজ্জন্য তাহাদের আয়ু ক্রমশ হ্রাস পাইতে লাগিল ... রোগসমূহের প্রথমোৎপত্তির বিবরণ কথিত হইল। (— চরকসংহিতা)। (দক্ষযজ্ঞের মহাপ্রলয়কাণ্ডের পর কেমন করে জ্বরোৎপত্তি ও রোগোৎপত্তি হল, তার বিষয়ে এই হল চরকসংহিতা-র অভিমত। মানবসমাজে জ্বরোৎপত্তি ও রোগোৎপত্তি বিষয়ে এই ধরণের বিশদ বর্ণনা মহাভারতে এবং কোনো কোনো পুরাণেও দেখতে পাওয়া যায়।) **জ্বরঘ্ন** = বাস্তুক, গুড়ূচী। **জ্বরঘ্নী** = মঞ্জিষ্ঠা। **জ্বরান্তক** = জ্বরনাশক, নেপালনিম্ব। (ব.শ.)। **৪.** fever অর্থে **জ্বর** শব্দটি প্রচলিত। **৫.** একালের খণ্ডিত ধারণার মানুষ আমরা, জ্বর বলতে কেবলমাত্র মানুষের গায়ের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া বুঝি। বাস্তবে জ্বর এমন বিচ্ছিন্ন পৃথক ঝামেলা-মাত্র নয়। সে হল সত্তার কোনো-না-কোনো প্রকারের জননশক্তি, যা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সত্তার উপরিতলে আবর্ত্তমান রয়েছে বা একই স্থানে আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে; সেই সত্তা জড়, উদ্ভিদ, জীব, মানুষ, মানুষের সমাজ যে-কেউ হতে পারে। আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণ জ্বরকে সেই সমগ্রতায় দেখেছিলেন এবং মানুষ ও সমাজের ক্ষেত্রে সেই জ্বর নাশ করার জন্য জ্বরনাশকারী **জ্বরঘ্ন**

সত্তাগুলিকেও চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁদের মতামতগুলি উপরে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সেই মতামতকে প্রতীকী শব্দার্থবোধ নিয়ে বুঝলে তাঁদের বক্তব্য বোঝা যায় না, বুঝতে হয় ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবোধের সাহায্যে। পৌরাণিক অভিধান কথিত মতামতটির কথাই ধরা যাক। তাতে ভূমির উর্বরতাকে বলা হয়েছে জ্বর। একে পার্থিব ভূমি, মনোভূমি প্রভৃতি যতপ্রকার ভূমি হয়, সকলের ক্ষেত্রেই বুঝতে হবে। এ-উর্বরতা আটকে থাকে ভূমির আস্তরণে। দ্র. **খিলভূমি**। একই কথা ফরেস্টের হস্তি-মস্তকের এবং সামাজিক হস্তি-মস্তকের; অর্থাৎ সকল হস্তি-মস্তকের তাপ বলেই বুঝতে হবে। আবার, সামাজিক সংস্থাও তো পর্বত, পার্থিব পর্বতের মতো তারও শিলাজতু হয় এবং সেও জ্বর। পার্থিব জলের উপরিতলের শৈবাল আর জনসাধারণের মনের উপরিতলে থাকা শৈবাল একই বস্তু, তাদেরও জ্বর বলে। প্রাচীন পন্থায় যারা অর্থসঞ্চয় করেন, সেই বাহ্যসম্পদবানদের বা সামাজিক নাগ বা সর্পদের পারিবারিক-ব্যবসায়িক স্ট্রাকচার বা কাঠামো আর পার্থিব snake-সর্পের নির্মোক বা খোলসই হল তাদের জ্বর। একইভাবে 'যা-কিছু যায়', সেই সমস্ত গো-গণের খুররোগ, পশুগণের দৃষ্টিরোধ, অশ্বের গলরোগ, ময়ূরের শিখোদ্‌ভেদ, কোকিলের চক্ষুরোগ, মেষের পিত্তভেদ, শুকের হিক্কা, এবং শার্দুলের শ্রমকে জ্বর বলা হয়। এবং এই গো, পশু, অশ্ব, ময়ূর, কোকিল, মেষ, শুক ও শার্দুল কেবল পার্থিব বনের পশুপাখি নয়, এরা সমাজবনের সমস্বভাবের সত্তাও বটে। মানবদেহের জ্বর নিরাময়ের জন্য লাগে বাস্তুক, গুড়ুচী, ও মঞ্জিষ্ঠা। আমাদের জানতে হবে এই তিনটি বস্তু — বাস্তুক, গুড়ুচী, ও মঞ্জিষ্ঠা — সমাজের ক্ষেত্রে কাদের বোঝায়। সমাজের জ্বরনাশের জন্য এই তিনের শরণাপন্ন হওয়া দরকার। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে কাদের বাস্তুকাদি বলে, সেকথা এখনও আমরা বুঝতে পারিনি।

জ্বল্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : উজ্জ্বল, জাজ্বল্যমান, জাল, জিল্লা (জ্বলা, জ্বলন্ত), জেল্লা, জেল্লাদার, জ্বল্, জ্বল, জ্বল-জ্বল, জ্বলকা, জ্বলজ্জ্যোতি, জ্বলদ্-অক্ষর, জ্বলদগ্নি, জ্বলদর্চ্চি, জ্বলন, জ্বলনি, জ্বলনাশ্মা, জ্বলন্ত, জ্বলা, জ্বলিত, জ্বাল, জ্বালা, জ্বালাতন, জ্বালান, জ্বালানী, জ্বালানে, জ্বালামুখী, জ্বালিত, জ্বালী, সমুজ্জ্বল।
জ্বল্ = জন্য-বহনের লালন-লয়ন। **জ্বল** = জন্য-বহনের লালন-লয়ন যাহাতে।

জ্বল (জ্বল-জ্বল, জ্বলন, জ্বলন্ত) : ১. ✓**জ্বল্** + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **জ্বল** = *জন্য-বহন লালিত যাহাতে।* **জ্বল-জ্বল** = *পুনঃপুনঃ জ্বল থাকে যাহাতে।* **জ্বলন** = **জ্বল** *অন যাহাতে।* **জ্বলন্ত** = **জ্বলন** *তারিত যাহাতে।* ৩. **জ্বল** = দীপ্ত, জ্বলিত, দীপ্তি পাওয়া, দগ্ধ হওয়া, পোড়া, কোপে জ্বলিত হওয়া, অতিক্রুদ্ধ হওয়া, ব্যথিত বা নিপীড়িত হওয়া, দাহযন্ত্রণা বোধ করা, বিরক্ত হওয়া, ম্লান বা বিবর্ণ হওয়া, দাহ বা জ্বালা উৎপাদন করা। **জ্বল-জ্বল** = অতিজ্বলিত, প্রজ্বলিত, অতিদীপ্তভাব। **জ্বলন** = দীপ্তিশীল, ভাস্বর, অগ্নির সংখ্যানুসারে (৩) সংখ্যা, চিত্রকবৃক্ষ, ক্ষার, দীপ্তি, প্রভা, অগ্নির শিখা রূপে প্রকাশ, জ্বলা, জ্বালা, দাহ, যন্ত্রণা, ব্যথা, পীড়া। **জ্বলন্ত** = দীপ্যমান, জ্বলিত, অগ্নিময়, তেজোময়, প্রচণ্ড, জ্বালাময়, প্রজ্বলিত। (ব.শ.)। ৪. fire ও burn অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **অগ্নি**। জলে যেমন জনন থাকে, তেমনি অগ্নিতেও জনন থাকে। একালের ভাষায় একে 'তেজ' বা 'এনার্জি' বলে। তবে তার প্রকাশ ঘটে দীপ্তিতে, সে-দীপ্তি শিখাযুক্ত হতে পারে, শিখাহীনও হতে পারে। তাকেই **জ্বল** বা **জ্বলন** বলে। **অগ্নির** যত রূপ, এই **জ্বলারও** তত রূপ।

জ্বাল (জ্বালা, জ্বালাতন, জ্বালান, জ্বালানী, জ্বালামুখী) : ১. ✓জ্বল্ + অ (ণ) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **জ্বাল** = **জ্বল** *হইতে জাত।* **জ্বালা** = **জ্বাল**-*এর আধার যে।* **জ্বালাতন** = **জ্বালা** *তারিত হয়ে অন থাকে যাহাতে।* **জ্বালান** = **জ্বালা** *অন যাহাতে।* **জ্বালানী** = *গতিশীল* **জ্বালান**-*এর আধার যে।* **জ্বালামুখী** = **জ্বালা** *মুখ যাহার।* ৩. **জ্বাল** = অগ্নিশিখা, দীপ, বর্ত্তি, আগুনের আঁচ, ইন্ধন, জ্বালানী কাঠ, জ্বালা, তেজ, যন্ত্রণা, পীড়া; জ্বলিত করা, দীপ্ত করা ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. শুধুমাত্র দৃশ্য অর্থে প্রচলিত। ৫. ব.শ. মতে জ্বালাতন শব্দটি আরবি জলাবতন (নির্বাসিত) শব্দ থেকে এসেছে। শব্দটির উদ্ভব বিষয়ে ব.শ. জানিয়েছেন — 'এই আরবী শব্দের পূর্ব্বভাগ 'জলা', সংস্কৃত 'জ্বালা' শব্দের সহিত উচ্চারণসাম্যে 'জলাবতন'।' আমাদের যেহেতু ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক অর্থ প্রকাশের দায়, সেকারণে আমরা আর একটু এগোতে বাধ্য হই। আমরা দেখি, দেহের জ্বালা (উষ্ণতা) যেমন ঘাম হয়ে বেরোয়, দেশের বা সমাজদেহের জ্বালাও (অন্তর্বিরোধও) নির্বাসিত হয়ে বেরোয়। ফলে, নির্বাসিত বোঝাতে দেশের (বতনের) জ্বালার ফল বা জলাবতন হতেই পারে। এই জ্বালার মূলে যে **জ্বল**, তা মূলত মানবদেহের ও সমাজদেহের **জ্বরও** বটে।

জ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অজঘন্য, অজড়, অজস্ত, অজল, অজল-অস্থল, অজস্র, অজিহ্ম, অজিহ্ম, অজিহ্মগ, অজিহ্মগামী, অজ্যেষ্ঠবৃত্তি, জ, জ-কার, জক্ষ (জক্ষণহেতু যক্ষ), জখম (জক্ষম্), জঙ্ঘ, জঘন্য, জলদি (জল্‌দ্), জলসা, জলুস, জল্লাদ, জশম, জহৎস্বার্থা, জহদজহল্লক্ষণা, জহর (বিষ), জ(জৌ)হর, জহরৎ (বিষয়, বিষ আর বিষয় যেমন, জহর ও জহরৎ-ও তেমনই।), জহরব্রত, জহল্লক্ষণা, জহীন, জহুরা, জা, জাইগীর, জাঁক, জাঁকজমক, জাঁকড়, জাঁকা, জাঁকান, জাঁকাল (জাঁকালো), জাঁদরেল, জাঁহা (জহান্ < জ-ধান < জীবধানী = পৃথিবী), জাঁহাপনা (জহান্-পনাহ্), জাঁহাবাজ (জান্‌বাজ), জাজলি, জাজিম, জাজ্বল্য, জাজ্বল্যমান, জাদু, জাহান্নম (জহন্নম্), জাফরান, জাফরি, জাব্‌দা, জামদানী, জামবাটি, জামা, জামানত, জামানতনামা, জামিন, জাশু, জাসু, জাসুস, জান্তী, জাহাজ, জাহান, জাহান্নব, জাহির, জাহিল, জিয়াদা (জিযাদা), জিহাদ (জেহাদ), জিহ্ম, জিহ্ম, জিহ্মগ, জুন, জুবড়া, জুব্বা (জোব্বা), জুমলা, জুম্মাঘর, জুলপি, জুলুম, জুলুস, জেওর (জেবর), জেব, জের, জেরবার, জেরা, জেল, জেলা, জ্যেষ্ঠ, জৈহ্ম, জোবড়া, জোব্বা, জোয়ার, জোয়ার-ভাটা, জোলা, জৌলুস, বিজল্প।

অজস্র : ১. ন + √জস্ (মোক্ষণ) + র - কর্তৃবাচ্যে, ক্রিয়াসাতত্যে। (ব.শ.)। ২. *অমোক্ষণ রহে যাহাতে; ছেদহীন ধারায় (প্রবাহিত) থাকে যে।* ৩. সন্তত, অবিচ্ছেদ, নিরন্তর, সতত, নিত্য; পর্য্যাপ্ত, প্রচুর। (ব.শ.)। ৪. in an unbroken flow বা 'অবিচ্ছিন্ন' অর্থে শব্দটি প্রচলিত। ৫. জস্ কথাটির মানে হল 'জনিতের অস্তিত্ব লাভ করা'। জস্র হল, সেই জনন পর পর হয়ে চলেছে যে সত্তায়। একে ব.শ. বলেছেন মোক্ষণ। অর্থাৎ জস্র হল সেই ব্যাপার, যাতে টপ টপ করে, মাঝে একটুখানি ছেদ রেখে রেখে, একের পর এক জনিত হয়ে চলেছে। আর, ন-জস্র হল, সেই টপ টপ করে পৃথক জনন আর হচ্ছে না, একেবারে টানা জনিত হয়ে চলেছে। ছেদহীন। এর প্রতীকী অর্থে 'অবিচ্ছেদ' কথাটি সঠিক দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করে। এই অবিচ্ছিন্ন ধারায় যা চলছে, তাকে পরবর্তীকালে 'অনেক' বা 'বহু' অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ঝ

ঝ্ বর্ণের অর্থ : ঝ = ঝ্-অন করে যে; জননস্থিত = জাত = ঝ। ঝ্ বর্ণটি তৈরি হয়েছে (জ্ + হ্ = ঝ্) জ্-এর সঙ্গে হ্ জুড়ে। সেকারণে, সাধারণভাবে ঝ্-এর অর্থ হল জননস্থিত, অর্থাৎ 'জনন যেখানে গিয়ে থেমে যায়'। তাই **ঝ** = ঝ্-অন করে যে; জননস্থিত = জাত = ঝ। একটি সত্তার অংশ (জিন) জনিত হয়ে পরবর্তী রূপে স্থিত হলে ঝ হয়। কার্যত, জনন বললে আমরা বুঝি ক-বিন্দু থেকে সত্তার 'সম্পূর্ণ-গুণরূপ + ক্ষুদ্রতম দেহরূপ'-এর (সত্তার পুত্রের) খ-বিন্দুর দিকে যাওয়া। গিয়ে পৌঁছে গেলেই ঝ হয়। আর, এই পৌঁছে যাওয়ার মধ্যে ছিটকে বেরোনোর বা দ্রুততার ব্যাপার লেগেই থাকে। অতএব এই ঝ-কে আপনি জনিত-গতি, জনিত-আওয়াজ, জনিত-গন্ধ, জনিত-তেজ, জনিত-রোষ, জনিত-লোভ ... এবং সর্বোপরি সত্তার জনিত উত্তরসূরি হিসেবে বুঝে নিতে পারেন। অর্থাৎ, জননস্থিত বললেই ঝ বোঝায় বটে; তবে কীরূপ জনন সেটি ঠিক হয় প্রেক্ষিত থেকে। তা লোভের, ইচ্ছার, গতির, প্রকাশের ... ইত্যাদি নানা প্রকারের জনন হতেই পারে। এই ঝ-এর স্বরূপ আরও সহজে অনুভব করা যায় **থপ** ও **ঝপ** শব্দের তুলনা করলে। তরণ থামে যেখানে সেটি থ, সেই থ পালিত হয় থপ-এ। আর, জনন থামে যেখানে সেটি ঝ, সেই ঝ পালিত হয় ঝপ-এ। থপ-থপ ও ঝপ-ঝপ ধ্বনির মধ্যে সেই পার্থক্য অনেকটাই স্পষ্ট। আমরা 'থপ করে' বসে পড়ি; 'ঝপ করে' তুলে নিই। এর ভিতরের ক্রিয়াটিকে এবং ধ্বনির সাযুজ্যকে মেলান। দেখবেন, এদের ক্রিয়া ও ধ্বনির স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক মিল রয়েছে, এবং সেই সাযুজ্যকে আমরা আমাদের অজান্তেই চিনি। সেজন্যই 'থপ করে তুলে নেওয়া' কথাটি যে ত্রুটিপূর্ণ তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এমনকি 'থপ করে বসে পড়া' ও 'ঝপ করে বসে পড়া'র মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য কী, তাও অনুভব করতে পারি; বুঝতে পারি ক্রিয়াটি দ্রুত ঘটে গেছে। এই ঝ সক্রিয় হলে আমাদেরকে বলতে হয়, ঝ অন হয়ে রয়েছে অর্থাৎ ঝন। তার মানে, জননস্থিত অন হলে তাকে আমরা ঝন বলি। এই ঝন-কে আমরা মেঝেতে থালা পড়ে যাওয়ার শব্দ রূপে বুঝি। কারণ, থালার আহত-প্রতিক্রিয়া আওয়াজ রূপে জনিত হয়ে ওই ঝন শব্দের ভিতরে স্থিত হয়েছে। এই ঝন-এর মূল রূপ হল ঝং। ... ঝ-এর আধারকে ঝা বলা যায়। এর রহস্যরূপটিকে আমরা 'ঝাঁ' (দ্র. ঝম্প) শব্দে সহজে চিনতে পারি। ঝি, ঝু প্রভৃতির অর্থের জন্য অতঃপর ক বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য।

ঝ-এর একটি বিশেষত্ব রয়েছে। সেই বিশেষত্ব রয়েছে ছ, ঘ, ঠ, ঢ প্রভৃতি বর্ণেরও। বিষয়টি **ছ-বর্ণের অর্থে** বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। সেই বিশেষত্ব অনুসারে ঝ বর্ণের ক্ষেত্রে বহু কাজ বাকি আছে। দ্র. **ছ**। ঝ বর্ণে মাত্র তিনটি ক্রিয়ামূল পাওয়া যায়। এই বর্ণে জাত প্রায় সব শব্দই মধ্যযুগের বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি। ফলে, সেগুলির 'সংস্কার' করা বাকি আছে, সংস্কৃতায়ন বাকি আছে। আর সেজন্যই এই ঝ-বর্ণে অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলির অধিকাংশই অ্যাকাডেমিতে প্রায় অচল। এগুলির বিপুল ব্যবহার ঘটে গ্রামবাংলার মানুষের মুখের ভাষায়; ঘটেছে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে। একালের কিছু কিছু লেখক-কবিরাও কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন, করেন। আমরা বিষয়টি উল্লেখমাত্র করে, নিদর্শন স্বরূপ এই শব্দগুলির কিছু কিছু সংস্কার করার চেষ্টা করছি। তার চেয়ে অধিক অবকাশ আমাদের নেই। হয়তো এগুলির যথার্থ সংস্কার ঘটবে উত্তরসূরীগণের হাতে।

ঝ্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : ঝং (ঝম্, ঝম্প্, ঝুল্), ঝট্ (ঝাড়্), ঝৃ, ঝ্ = ৩ + ১

ঝং (ঝম্, ঝম্প্, ঝুল্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ঝঙ্ক, ঝঙ্কৃ, ঝঙ্কার, ঝঙ্কারিণী, ঝঙ্কারিত, ঝঙ্কৃত, ঝঙ্কৃতি, ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট, ঝঞ্ঝানিল, ঝঞ্ঝামরুৎ, ঝঞ্ঝাবাত, ঝণজ্ঝণিত, ঝণঝণ, ঝণঝণৎকারী, ঝণঝণা, ঝণঝণায়মান, ঝণঝণায়িত, ঝণঝণীভূত, ঝণৎকার, ঝণ্ডা, ঝন, ঝনক, ঝনকাঠ, ঝনঝন, ঝনঝনা, ঝনন, ঝনা, ঝনাঝন, ঝনাৎ, ঝপ, ঝপক, ঝপট, ঝপাক, ঝপাঝপ, ঝম, ঝমক, ঝমকঝমক, ঝমকিত, ঝমঝম, ঝমঝমি, ঝমরঝমর, ঝম্প, ঝম্পন, ঝম্পান, ঝাঁ, ঝাঁক, ঝাঁকড়মাকড়, ঝাঁকড়া, ঝাঁকা, ঝাঁকার, ঝাঁকি, ঝাঁগড়, ঝাঁগুড়গুড়, ঝাঁজ, ঝাঁজর, ঝাঁজরা, ঝাঁঝর, ঝাঁঝরা, ঝাঁঝরি, ঝাঁঝাঁ, ঝাঁঝাঁবাত, ঝাঁঝাল, ঝাঁঝি, ঝাঁপ, ঝাঁপতাল, ঝাঁপন, ঝাঁপল, ঝাঁপা, ঝাঁপান, ঝাঁপানিয়া, ঝাঁপি(পী), ঝাক, ঝাকার, ঝাঝর, ঝাঝরি(রী), ঝাণ্ডা, ঝানু, ঝাপট, ঝাপটা, ঝাপনি, ঝাপসা, ঝাপা, ঝাপান, ঝামক, ঝামটা, ঝামর, ঝামরণ, ঝামরি(রী), ঝামরু, ঝামা, ঝামুরঝুমুর, ঝাম্প, ঝাম্পানি, ঝামেলা, ঝি, ঝিঅর, ঝিআরি, ঝিআরী, ঝিই, ঝিউ, ঝিউড়ি, ঝিএ, ঝিঁক, ঝিঁকা, ঝিঁকে, ঝিঁঝিঁ, ঝিক, ঝিকঝিক, ঝিকিঝিকি, ঝিকমিক, ঝিকিমিকি, ঝিকর, ঝিকরাটী, ঝিঝিট, ঝিল্লি, ঝিল্লী, ঝি-মা, ঝিয়রী, ঝিয়াই, ঝিয়ারি(রী), ঝিয়ে, ঝিয়েন, ঝিল (ঝীল), ঝিলমিল, ঝিলিক, ঝিলিমিলি, ঝিল্লিকা, ঝিল্লী, ঝিঙা, ঝিঙ্গা, ঝিঙ্গাক, ঝিঙ্গিনী, ঝিণ্টি, ঝিনঝিন, ঝিম, ঝিমকিনি, ঝিমঝিম, ঝিমলী, ঝিমানি, ঝিমিঝিমি, ঝুঁক, ঝুঁকি, ঝুপ, ঝুপড়ি, ঝুপড়ী, ঝুপসি-ঝাপসি,

---

ঝুমকা, ঝুমঝুম, ঝুমঝুমি, ঝুমরি, ঝুমকো, ঝুমুর, ঝুমুরঝুমুর, ঝুল, ঝুলটঙ্গী, ঝুলসন্ন্যাস, ঝুলন, ঝুলা, ঝুলাঝুলি, ঝুলি(লী), ঝোঁক, ঝোঁকা, ঝোপ, ঝোপড়া, ঝোল, ঝোলঙ্গা, ঝোলঝাল, ঝোলা।

ঝং (ঝম্, ঝম্প্, ঝুল্) = জননস্থিতের রহস্যরূপ থাকে যাহাতে। **ঝম** = জননস্থিত সীমায়িত যাহাতে। **ঝম্প** = জননস্থিতের সীমায়ন পালিত হয় যাহাতে। **ঝুল্** = নবরূপে উত্তীর্ণ জননস্থিতের লালন-লয়ন যাহাতে। [ঝং, ঝম্, ঝম্প্ বলে কোনো ক্রিয়াপদ সংস্কৃতে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রযুক্ত রূপে পাওয়া যায় মধ্যযুগের বাংলায়। তাও 'ঝম্' রূপে (যদর্থ 'ভক্ষণ' - ব.শ.) ও 'ঝম্প্' (ঝম্-প্) বা 'ঝাঁপ দেওয়া' রূপে; আর রয়েছে ইংরেজিতে jump রূপে। আমরা শুরুতেই জেনেছি, (অ)ং ধ্বনিটি ক-বর্গের আগে ঙ, চ-বর্গের আগে ঞ, ট-বর্গের আগে ণ, ত-বর্গের আগে ন, এবং প-বর্গের আগে ম রূপ গ্রহণ করে (যথা ঝঙ্ক, ঝঞ্ঝ, ঝণ্ট, ঝন্ত, ঝম্প)। এবং প্রথমে এই ং আপন অর্থ সম্পূর্ণই অব্যক্ত রাখে, পরে পরে যতই সে এগোয়, অর্থ একটুখানি ব্যক্ত রূপ গ্রহণ করতে থাকে। ম্-তে পৌঁছে সে তার সবচেয়ে বেশি ব্যক্তরূপ দেখায় — সীমায়ন। তার মানে ঝং, ঝঙ্, ঝঞ্, ঝণ্, ঝন্, ঝম্ — এই ক্রমে ঝং অধিকতর ব্যক্ত রূপ গ্রহণ করে থাকে। বালুপূর্ণ গরম কড়াইতে ধান ফেলে নাড়ালে কড়া থেকে কিছু কিছু খই যেমন ছিটকে পড়ে, তেমনি এই ঝ হল সত্তা থেকে ছিটকে পড়া সত্তার জনিত ও স্থিত অংশ। তার সীমায়ন ঘটে ঝম-এ। এটি শুধুমাত্র আওয়াজের জনিত ও স্থিত সত্তার সীমায়ন হলে তাকে আমরা **ঝমঝম** রূপে সহজে চিনতে পারি। এই ঝম্ পালিত হয় যে ক্রিয়ায় তাই হল ঝম্প বা ঝাঁপ বা jump। কিন্তু ছিটকে-লাফিয়ে, ঝাঁপ দিয়ে পড়ার পরেও যদি মূল সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে তদবস্থায় থেকে যায়, তখন সে হল **ঝুল্**।]

ঝঞ্ঝা (ঝঞ্ঝাট, ঝঞ্ঝাবাত, ঝাঁঝাঁ) : ১. ✓ঝং + ঝ, স্ত্রী আ। ২. *ঝঞ্ঝা = ঝং জনিত হয়ে থামে যাহাতে, তাহার আধার। ঝঞ্ঝাট = ঝঞ্ঝা টঙ্কারিত যাহাতে। ঝঞ্ঝাবাত = ঝঞ্ঝা বাহিত হয়ে তারিত যাহাতে। ঝাঁঝাঁ = ঝং-ধারীর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ৩. **ঝঞ্ঝা** = প্রচণ্ডবায়ু, বাত্যা, ঝড়, ঝড়বৃষ্টি, ঝঞ্ঝন শব্দ, মহাধ্বনি, বাত্যাশব্দ। **ঝঞ্ঝাট** = বৃথা বিবাদ, গোলমাল, হাঙ্গামা, বিপদ, অশান্তি, বিপাক, লেঠা। **ঝঞ্ঝাবাত** = ঝঞ্ঝাধ্বনিযুক্ত বায়ু, বর্ষাজাত বায়ু, সবৃষ্টি বায়ু, প্রচণ্ডবাত, ঝড়। **ঝাঁঝাঁ** = বাদ্যধ্বনি, নিশীথনিস্তব্ধতাজন্য শব্দবিশেষ, মধ্যাহ্নিস্তব্ধতাজন্য শব্দ, রৌদ্রের প্রচণ্ডতা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. হ্যাঁ, সমস্যা হল ঝঞ্ঝা বলতে আমাদের বাংলাভাষী পূর্বপুরুষেরা 'storm' বুঝতেন কেন? সন্দেহ নেই, 'জনিত-গতি' (ঝ) রয়েছে ঝড়বৃষ্টির মূলে। কিন্তু প্রশ্ন হল জনিত-গতিটি কার? উত্তর হল, 'ঝং'-এর। অর্থাৎ 'ঝং-এর ঝ'-কে আমরা ঝঞ্ঝা বলি এবং তাকেই ঝড়বৃষ্টি বলে। এই 'ঝং-এর ঝ'র ভিতরে ঝড়বৃষ্টি কোথায়? 'জনিত-গতি'র রহস্যরূপ হল ঝং; সেই ঝং যখন জনন করে তখন ঝং-জ বা ঝঞ্জ (দ্র. ঝাঁজ); এবং সেই জনন যখন তার পরবর্তী রূপে স্থিতি লাভ করে, তখন ঝং হয়ে যায় ঝং-ঝ বা ঝঞ্ঝ। এই ঝঞ্ঝ-এর আধারকে বলে ঝঞ্ঝা। এতে (নিম্নচাপ)-'জনিত গতির রহস্যরূপটি' (= ঝং-টি) তার 'জনিত রূপের আধারে' (= ঝা-এ বা বৃষ্টিবাদলায়) উপস্থিত। তাই ঝংঝা বলতে আমরা ঝড়বৃষ্টি বুঝি। তবে ঝংঝা কেমন করে ঝঞ্ঝা হয়ে গেল, সে ব্যাপার আলাদা — শব্দসমাজের লোক-লৌকিকতা আচার-আচরণ মানতে গিয়ে 'ঝংঝা'কে 'ঝঞ্ঝা' হয়ে যেতে হয়। কীভাবে এবং কোন নিয়মে তা হয়, সেকথা ঝং-এর অর্থে আগেই বলা হয়েছে।

কিন্তু এই ঝঞ্ঝার গোড়ায় যদি নিম্নচাপের জনিত গতি না থেকে অন্য কারও জনিত কিছু থাকে, তা সে পারিপার্শ্বিকের দাবি, হুজুক, স্কুলের পথে পথ-অবরোধ, সেও তো ঝঞ্ঝাই বটে। তবে সে আপনার চলার পথে এসে পথ আটকাচ্ছে, টঙ্কারিত হচ্ছে; তাই তাকে আপনি ঝঞ্ঝা রূপে নয়, **ঝঞ্ঝাট** রূপে চিনতে পারেন। এ হল সামাজিক বা অর্থনৈতিক নিম্নচাপের ফল। তবে কিনা, যে কোনো সত্তার ঝং (ঝঁ) রূপটিই আপনার পক্ষে অস্বস্তিকর, শঙ্কার কারণ। কারণ তার সবটা তো বোঝা যায় না। সামনে পড়ে গেলে কান মাথা **ঝাঁ ঝাঁ** করে ওঠে। ঝ-এর এই বিন্দুরূপিণী কত যে রহস্যরূপে দেখা দেন, বলে শেষ করা যায় না। অতি শব্দ থেকে নৈঃশব্দ্যে, সর্বত্র তাঁর অবাধ আনাগোনা। ৬. ইংরেজি junk।

ঝণ্ডা (ঝাণ্ডা) : ১. ✓ঝং + ড, আ। ২. *ঝণ্ডা = ঝং-এর রহস্যরূপের উড়ান যাহাতে, তাহার আধার।* ৩. পতাকা, নিশান। (ব.শ.)। ৪. flag অর্থে সুপ্রচলিত। ৫. শব্দটি প্রাচীন বাংলায় ছিল না, এমনকি বাংলাভাষা নিজে এই শব্দ সৃজন করেনি, এসেছে বাইরে থেকে। শব্দবিদরা বলছেন মুণ্ডারি থেকে এসেছে। আমরা যে নিয়মে দেখছি, তাতে শব্দটি বাংলায় থাকতেই পারত। ... তা সে যাই হোক, এখানে ঝণ্ডা শব্দের অর্থে যে ঝং-কে আমরা পাই, তাতে নিম্নচাপের জনিত গতি নাই; রয়েছে শাসনকেন্দ্রের উর্দ্ধচাপের বা নিম্নচাপের জনিত গতি। সেই গতি উড্ডয়নশীল কাপড়ের টুকরোতে আশ্রিত হয়েছে। বীরের গৌরব, রাজার গৌরব = উড়ন্ত কাপড়ের টুকরো; ঝং-এর রহস্যরূপের উড়ান। তাই সে ঝণ্ডা। বাঙালীর উচ্চারণ অভ্যাসের সংস্পর্শে তা ঝাণ্ডায় পরিণত হয়েছে।

ঝন (ঝনক, ঝনঝন, ঝনঝনা, ঝনন, ঝনা, ঝনাৎ) : ২. *ঝন = ঝ (জননস্থিত) অন (on) যাহাতে। ঝনক = ঝন করে যে। ঝনঝন = ঝন-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ঝনঝনা = ঝনঝন-এর আধার যে। ঝনন = ঝন অন যাহাতে। ঝনা = ঝন-এর আধার যে। ঝনাৎ = ঝন হইতে নিঃসারণ যাহাতে।* ৩. **ঝনক** = শব্দ করা। **ঝনঝন** = ধাতুদ্রব্যের শব্দ, অলঙ্কার ধ্বনি, বজ্রধ্বনি, কড়িনাড়ার শব্দ। **ঝনঝনা** = বজ্রধ্বনি, বজ্রশব্দবৎ কঠোর ধ্বনি, বজ্র, অস্ত্রাদির শব্দ, ঝনঝন শব্দ করা। **ঝনন** = নূপুরাদিধ্বনি। **ঝনাৎ** = ঝন শব্দ, টাকার ধ্বনি। (ব.শ.)। ৪. ধাতুদ্রব্যের ধ্বনি, নূপুরাদিধ্বনি ইত্যাদি অর্থে প্রচলিত। ৫. এই শব্দটি মূলত 'জনিত আওয়াজ'-এর, স্থিত রূপের, অন হয়ে থাকার বিভিন্ন প্রতীকী অর্থে প্রচলিত। সেকারণেই তা সামান্য নূপুরাদিধ্বনি থেকে বজ্রধ্বনি পর্যন্ত প্রসারিত।

ঝপ (ঝপক, ঝপটা, ঝপঝপ, ঝপাক, ঝপাঝপ, ঝপাৎ, ঝাপ,

ঝাপট, ঝাপটা, ঝাপসা) : ২. ঝপ = ঝ *(জননস্থিত) পালিত হয় যাহাতে।* ***ঝপক*** *=* ***ঝপ*** *করে যে।* ***ঝপটা*** *=* ***ঝপ*** *টঙ্কারিত যাহাতে, তাহার আধার।* ***ঝপঝপ*** *=* ***ঝপ****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ঝপাক*** *=* ***ঝপ****-এর আধার যাহা করে।* ***ঝপাঝপ*** *=* ***ঝপ****-এর অবিচ্ছিন্ন (তরল প্রবাহের মতো) পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ঝপাৎ*** *=* ***ঝপ****-এর আধার তারিত যাহাতে।* ***ঝাপ*** *=* ***ঝপ*** *হইতে জাত।* ***ঝাপট*** *=* ***ঝাপ*** *টঙ্কারিত যাহাতে।* ***ঝাপটা*** *=* ***ঝাপট****-এর আধার যে।* ***ঝাপসা*** *=* ***ঝাপ****-এর অস্তিত্বের আধার যে।* **৩. ঝপ** = ক্ষিপ্রভাবে, শীঘ্র, বেগে, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ার শব্দ, জলে নৌকার দাঁড় পড়ার শব্দ। **ঝপটা** = শিথিল জটাজুটের আন্দোলন ভাব। **ঝপাক, ঝপাৎ** = ঝম্পপ্রদান শব্দ। **ঝপাঝপ** = জলে দাঁড় পড়ার শব্দ, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ার শব্দ, শীঘ্র-শীঘ্র। **ঝাপ** = দোকানের ঝাপতাড়া, নৌকার তক্তা-সংযোজক কাষ্ঠখণ্ড, আচ্ছাদন করা। **ঝাপট** = জোরে আঘাত; পাখীর পাখার আঘাত। **ঝাপসা** = ঝাপে ঢাকার মতো, অস্পষ্ট, দৃষ্টি বহির্ভূত, ঈষৎদৃষ্টিসম্পন্ন। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** আবার সেই **কল** শব্দে কথিত সৈয়দ মুজতবা আলির গল্পটি স্মরণ করুন। কল থেকে টারালাপ-টারালাপ করে দ্রুতগতিতে একটির পর একটি জুতো প্রসূত হচ্ছে। একেই বাংলাশব্দের নিজস্ব নিয়মে বলে **ঝপাঝপ** — অর্থাৎ 'অবিরত জননস্থিতের পালন'। এই **ঝপ** শব্দকে কতরকম ভাবে প্রয়োগ করা যায়, উপরোক্ত প্রতীকী অর্থগুলিই সেকথা বলে দেয়। আপনি নিজেই **ঝপ** থেকে **ঝোপ** পর্যন্ত অজস্র শব্দ বানাতে পারেন।

ঝম (ঝমক, ঝমকঝমক, ঝমকিত, ঝমঝম, ঝমঝমি) : ১. ✓ঝম্ + অ। **২. ঝম** = *জননস্থিত সীমায়িত যাহাতে।* ***ঝমক*** *=* ***ঝম*** *করে যে।* ***ঝমকঝমক*** *=* ***ঝমক****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ঝমঝম*** *=* ***ঝম****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ঝমকিত*** *=* ***ঝমক*** *গতিশীল হয়ে তারিত যাহাতে।* ***ঝমঝমি*** *=* ***ঝমঝম*** *গতিশীল যাহাতে।* **৩. ঝমক** = ভূষণঝঙ্কারপূর্ব্বক নৃত্য করা, দ্রুত যাওয়া। **ঝমকঝমক, ঝমঝম** = ধাতুদ্রব্যের শব্দ, বাদ্যধ্বনি, প্রবলবৃষ্টিধারাশব্দ। **ঝমকিত** = দীপ্তিময়, সমুজ্জ্বল। **ঝমঝমি** = দাঁড়ের জলে পড়ার শব্দ। (ব.শ.)। **৪.** শব্দগুলি সুপ্রচলিত, কিন্তু মজার ব্যাপার হল, এগুলির যথার্থ অর্থ কী, কেউ জানে না; অথচ শব্দগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। লোকে সেগুলির মানেও কেমন করে জানি বুঝে নেয়। অথচ অভিধানকারগণ শব্দগুলির মানে ঠিকঠাক বলতে ইতস্তত করছেন, যেন-বা আধা আধা বলছেন। কারণ শব্দগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে আসেনি, উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ নয়, বাংলাভাষীর নিজের অর্জিত। কিন্তু সেই অর্জনকে আজও সংস্কার করা হয়নি। সেই কারণেই অভিধানকার ও শব্দকোষকারগণের এইরূপ ইতস্তত ভাব। **৫. ঝ** বর্ণের অর্থে আমরা খই-এর একটা উদাহরণ দিয়েছি। এই ছিটকে বা লাফ দিয়ে বেরোনো খইয়ের মতো যে 'জননস্থিত' বা **ঝ**, তার ঝঙ, ঝঞ, ঝণ্, ঝন্, ঝম্, এই রূপগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যক্তরূপ হল ঝম্। এর অর্থ হল '**ঝ**-এর সীমায়ন'। তাই ঝম মানে '**ঝ** সীমায়িত যাহাতে'। এই **ঝ** বা জননস্থিত গতি, তেজ, কাম, ক্রোধ, রোষ, লোভ ইত্যাদি নানা কিছুর জননের স্থিতি রূপ হতে পারে। (দ্র. **ঝ** বর্ণের অর্থ)। সত্তা থেকে ছিটকে পড়া জননস্থিত যখন খইয়ের মতো স্পষ্ট সীমায়িত রূপ নিয়ে ফেলছে, তখনই 'ঝম'। 'ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে' বললে **বৃষ্টিফোঁটার** একটা সুস্পষ্ট রূপ দেখতে পাই আমরা। তার আগের অপরিণত রূপগুলি (ঝনঝন ইত্যাদি) সেকারণেই ঝমঝম, **ঝঙ্কার** প্রভৃতি শব্দের প্রতীকী অর্থের মধ্যে বারংবার ঢুকে পড়েছে। প্রতীকী শব্দার্থবিধির অভিধানকারগণ তাদের ঠেকাতে পারেননি।

ঝম্প (ঝম্পন, ঝম্পান, ঝাঁপ, ঝাঁপন, ঝাঁপা, ঝাঁপাঝাঁপি, ঝাঁপান, ঝাঁপানিয়া, ঝাঁপী, ঝেঁপে) : ১. ঝম্ + ✓পা + অ। **২.** ***ঝম্প*** *=* ***ঝম্*** *(জননস্থিতের সীমায়ন) পালিত যাহাতে।* ***ঝম্পন*** *=* ***ঝম্প*** *অন যাহাতে।* ***ঝম্পান*** *=* ***ঝম্প****-এর আধার অন যাহাতে।* **৩. ঝম্প** = সম্পাতপতন, লম্ফ, ঝাঁপ, ঝাঁপ দেওয়া, ঝাঁপ দিয়া পড়া, লাফাইয়া যাওয়া, আচ্ছাদন করা, ঢাকা। **ঝম্পন** = ঝম্প, ঝাঁপ দেওয়া, আচ্ছাদন, আলিঙ্গন, আচ্ছাদনরূপ-পদাশ্রয়। **ঝম্পান** = একপ্রকার দোলা। **ঝাঁপ** = হাত-পা ছড়াইয়া উবুড় হইয়া পড়া, আক্রমণ, গাজনে শাল প্রভৃতির উপরে পতন, আচ্ছাদন, চাঁচ দরমা ইত্যাদির কপাটবিশেষ, আগড়, তরলদ্রব্য দুগ্ধাদি উছলিয়া না পড়ে এই নিমিত্ত তাহার উপরে দেওয়া পল্লবাদি, ব্যাপ্ত করা, প্রভা বা রূপে অভিভূত করা বা পরাজয় করা, রক্ষার্থ আবরণ করা বা আশ্রয় দেওয়া, বৃষের গবীসংসর্গ করা। **ঝাঁপন** = ঢাকা। **ঝাঁপা** = খোঁপার মতো বেণীর বা স্ত্রীভূষণের সজ্জাদ্রব্যবিশেষ, ঢাকা। **ঝাঁপানিয়া** = সর্ব্বদেহ আবরক, বিশাল। **ঝাঁপী (ঝাঁপি)** = ঝাঁপ (ঢাকনী) - ওয়ালা বেত্রাদির পেটিকাবিশেষ, ঢাকনী-দেওয়া চুপড়ি, সাজি, অন্নপূর্ণার বা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানভূত পেটিকা। **৪.** jump অর্থে **ঝম্প** ও তজ্জাত শব্দগুলি প্রচলিত। তবে ঝাঁপ ও তজ্জাত শব্দগুলি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। **৫.** ঝাঁপ ও তজ্জাত শব্দগুলি বাংলাভাষীর নিজস্ব অর্জন। এর প্রতীকী অর্থের প্রাচুর্যই বলে দেয়, এর ব্যবহার কত বেশি। কেবল তাই নয়, এগুলির কালক্রম ১৩০০-১৪০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ক্রমশ বেড়েছে। তবে 'ঝম্ পালিত যাহাতে' (= ঝম্প) ক্রমান্বয়ে 'ঝাঁ পালিত যাহাতে' (= ঝাঁপ) শব্দে পরিণত হয়েছে এবং শব্দটি তার অভিধার্থ থেকে ক্রমে অজস্র ব্যঞ্জনার্থে প্রয়োগ হতে থেকেছে। এমনকি 'এসো বৃষ্টি ঝম্প দিয়ে' বলতে আমরা বলেছি, 'আয় বৃষ্টি **ঝেঁপে**, ধান দেব মেপে'। ...

এখন প্রশ্ন হল, ঝম্প বা ঝম্পন কেমন করে ঝাঁপ (jump, jump-on) হল? একই প্রশ্ন অঙ্ক-আঁকা, কম্প-কাঁপা, গঞ্জ-গাঁজা, গ্রন্থ-গাঁথা, চন্দ্র-চাঁদ, ছন্দ-ছাঁদ ... ইত্যাদি অজস্র শব্দের ক্ষেত্রে তোলা যায়। **অ** বর্ণের অর্থে আমরা অংরূপিণী বা বিন্দুরূপিণীর (যাকে সংস্কৃতে ॰ রূপে লেখা হয়) সাতটি রূপের কথা জেনেছি। ং-ঙ-ঞ-ণ-ন-ম- — এর মধ্যে বিন্দুরূপিণী যদি সর্বশক্তির আধার সূর্য্য হয়, তবে তাকে চন্দ্রবিন্দুতে উত্তীর্ণ হতে পাঁচটি অধ্যায় পেরিয়ে যেতে হয়। কেবল তাই নয়, বাংলায় বিন্দুরূপিণী হয়ে গেছে একটি বিন্দুর সঙ্গে দণ্ড চিহ্নে (ং), এবং চন্দ্রবিন্দুতে সেই দণ্ডটিই বেঁকে গেছে চাঁদের মতো (ঁ)। কেন এরকম হল? আমরা দেখছি, সমাজের অগ্রগতির সমান্তরালে সমাজব্যবস্থার ও তত্ত্বের যে অগ্রগতি ঘটে তারই ছাপ পড়েছে এই অংরূপিণীর বিন্দু থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত

যাত্রায়। বৈদিক যুগের আগে সমাজ ছিল সম্পূর্ণতই যৌথ, অংরূপিণী ছিল পূর্ণবৃত্তের এক বিন্দুমাত্র। বৈদিক যুগের সূত্রপাতের পর জ্ঞানী-কর্মীতে বা পুরুষ-প্রকৃতিতে সমাজ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়; আমরাও বিন্দুকে দুই ভাগে বিভক্ত রূপে পাই — ক্ষুদ্রবিন্দু ও তার পাশে দণ্ডাকার চিহ্ন রূপে (ঃ)। তার পর নানান ঘটনার ভিতর দিয়ে আমরা পৌঁছাই অজস্র খণ্ডে বিভক্ত এমন এক পণ্যবাহী সমাজে, যেখানে শাসকের চরিত্র হয়ে যায় বঙ্কিম, এবং শাসিত হয়ে যায় শাসনের ঘেরাটোপে বন্দী জনসাধারণ। তন্ত্রের ক্ষেত্রেও পুরুষ-প্রকৃতির অজস্র বিভাজন ঘটে ...। বিন্দুরূপিণী তার ং রূপ থেকে পৌঁছায় চন্দ্রবিন্দুতে (ঁ)। এসব ভাবনাকে কষ্টকল্পিত বলে আমরা উড়িয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু সমাজের দিকে তাকিয়ে আমরা নিরস্ত হই। আমরা দেখি, একদিকে যেমন বিন্দুরূপের আধারস্বরূপ যৌথসমাজের প্রবক্তারা আজও রয়েছেন, সূর্যবংশীরা রয়েছেন, সূর্যোপাসক জাতিরা ও 'সূর্য্য-ওঠা ভোর'-এর বন্দনাকারী সমাজতন্ত্রীরা রয়েছেন, সূর্য্য চিহ্নের পতাকাধারীরা রয়েছেন; তেমনি অন্যদিকে বহুবিভক্ত পণ্যবাহী সমাজের প্রবক্তারাও রয়েছেন, চন্দ্রবংশীরা রয়েছেন, চন্দ্রচিহ্নের পতাকাধারীরাও রয়েছেন। অন্তঃসলিলা ধারার মতো সমাজে, তত্ত্বলোকে, দর্শনে, ধর্মে, বর্ণানুক্রমে সর্বলোকে বিন্দুরূপিণীর ক্রমান্বয় প্রবাহ রয়েছে; আমরা তাকে দেখতে পাই আর না পাই, চিনতে পারি আর না পারি। (প্রশ্ন উঠতে পারে, উভয়েই চন্দ্রবংশী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের পণ্যবাদী কর্পোরেটবাদী মার্কিনদের সঙ্গে আরব্য ইসলামী শক্তির বিরোধ কেন? এর উত্তর পাওয়া যায় নগদ-নারায়ণের বাহন গরুড়ের সর্প-বিরোধিতার কাহিনী থেকে। দ্র. **জরৎকারু**।)। আর সেজন্যই মানুষের শব্দোচ্চারণেও তার ছায়া পড়েছে একই নিয়মে। বাংলাভাষী ঝম্প থেকে চলে গেছেন ঝাঁপে, ইংরেজিভাষী চলে গেছেন jump-এ। **৬.** jump।

ঝাঁক (ঝঙ্ক, ঝঙ্কার, ঝাঁকড়া, ঝাঁকা, ঝাঁকার, ঝাঁকি, ঝাঁকী) : ২. ***ঝঙ্ক*** *=* ***ঝং*** *করে যে।* ***ঝঙ্কার*** *= ঝম-করণ হইতে জাত।* ***ঝাঁক*** *=* ***ঝং*** *বা* ***ঝাঁ*** *করে যে।* ***ঝাঁকড়া*** *=* ***ঝাঁক****-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে।* ***ঝাঁকা*** *=* ***ঝাঁক****-এর আধার যে।* ***ঝাঁকার*** *=* ***ঝাঁকা*** *রহে যাহাতে।* ***ঝাঁকি*** *=* ***ঝাঁক*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ঝাঁকী*** *=* ***ঝাঁকি****র আধার যে।* ৩. **ঝঙ্ক** = অব্যক্ত মধুর ধ্বনি। **ঝঙ্কার** = 'ঝম্'-শব্দ, ভ্রমরাদিধ্বনি, গুঞ্জন, মধুরাস্ফুটধ্বনি, গীতধ্বনি, বজ্রধ্বনি, ঝনঝনা, ভূষণধ্বনি, শিঞ্জন, রুষ্টস্বর, তর্জ্জন, মহাশব্দ। **ঝাঁক** = দল, রাশি, শব্দধ্বনির অভ্যাবৃত্তি বা বার (times)। **ঝাঁকড়া** = ঝোপের মতো, ঝাপসা, বহুশাখাপ্রশাখা হেতু খর্ব্ব (গাছ)। **ঝাঁকা** = চওড়া-মুখ মোট বহার ঝুড়িবিশেষ। **ঝাঁকার** = ঝঙ্কৃত করা, ঝনঝনশব্দপূর্ব্বক কম্পিত করা বা নাড়া, ঝাঁকা বা ধাক্কা দেওয়া, বলে আকর্ষণ করা, টানা। **ঝাঁকি** = জোরে গা-ঝাড়া, ঝাঁকি মারা। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** **ঝং** আর **ঝাঁ**-এর মধ্যে পার্থক্য সামান্য — জননস্থিতের রহস্যরূপ হল **ঝং**; আর, জননস্থিতের রহস্যরূপের আধার হল **ঝাঁ**। যে কারণে **ঝঙ্ক**ই পরে **ঝাঁক** হয়ে গেছে। কথাটি আমরা সহজে বুঝতে পারি **ঝঙ্কার** শব্দ থেকে। এর ইংরেজি রূপটিকে orchestra বলে। এ হল ঝাঁকের আওয়াজ। একক নয়, দলবদ্ধ সুরধ্বনিই **ঝংকৃত** হতে পারে। প্রচুর চুল দড়ির মতো অনেক গুচ্ছ হয়ে মাথা ঢেকে রাখলে, তাকে বলে ঝাঁকড়া চুল। একই ভাবে ঝাঁকড়া গাছও হয়। এক ঝাঁক বস্তুকে যে ঝুড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, তাকে সেকারণেই ঝাঁকা বলে। একসঙ্গে এক ঝাঁক শক্তি প্রয়োগ করলে তাকে বলে ঝাঁকার দেওয়া। আর ঝাঁককে গতিশীল করে দেওয়াই **ঝাঁকিয়ে** দেওয়া। সাধারণত ছোট ঝাঁকাকে **ঝাঁকী**ও বলে। **৬.** ইংরেজি junk, পর্তুগিজ junco।

ঝাঁজ (ঝাঁঝ), ঝাঁজরা (ঝাঁঝরা), ঝাঁঝরি, ঝাঁঝাল : ২. ***ঝাঁজ*** *=* ***ঝাঁ*** *(জননস্থিতের রহস্যরূপী) হইতে জনিত যে।* ***ঝাঁঝ*** *=* ***ঝাঁ****-জনিত স্থিত যাহাতে।* ***ঝাঁজরা*** *=* ***ঝাঁজ*** *রহে যাহাতে, তাহার আধার।* ***ঝাঁঝরা*** *=* ***ঝাঁঝ*** *রহে যাহাতে, তাহার আধার।* ***ঝাঁঝরি*** *=* ***ঝাঁঝ*** *রক্ষণ গতিশীল যাহাতে।* ***ঝাঁঝাল*** *=* ***ঝাঁঝ****-এর আধার লালিত যাহাতে।* ৩. **ঝাঁজ (ঝাঁঝ)** = করতাল, কাঁসর, রাগ, তেজ, কটুতা, ঝাল, প্রখরতা, তীব্রতা, উত্তাপ, আঁচ (আগুনের), মত্ততা, গুমর, উত্তেজনা। **ঝাঁজরা (ঝাঁঝরা)** = বহুছিদ্রযুক্ত। **ঝাঁঝরি** = বহুছিদ্র হাতা, ছানতা, জালবৎ বহুছিদ্র লৌহপট্ট, তলায় বহুছিদ্র মাটির হাঁড়ি। **ঝাঁঝাল** = ঝাঁঝযুক্ত, কটু, তেজাল, উগ্র, প্রখর (তেল, গন্ধ)। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** সম্ভবত আদিতে শব্দ দুটি ছিল 'ঝঞ্জ' ও 'ঝঞ্ঝ'। কিন্তু সেই শব্দের উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। ঝঙ্ক থেকে ঝাঁক, এই নিয়মে ঝঞ্জ থেকে ঝাঁজ এবং ঝঞ্ঝ থেকে ঝাঁঝ হওয়ার কথা। আমরা ঝাঁজ, ঝাঁঝ, ঝাঁজরি, ঝাঁঝরি ... এসব পাচ্ছি, কিন্তু ঝঞ্জ ও ঝঞ্ঝ-কে পাচ্ছি না; তবে **ঝঞ্ঝা**-কে পাওয়া যায়। এই যে ঝঞ্জ, যা কিনা আসলে ঝংজ, তার ক্রিয়ারূপ হল — **ঝং** জনিত যাহাতে। এটি লঙ্কার ঝালের **ঝং** (জননস্থিতের রহস্যরূপ) জনিত হয়ে অন্যের নাকে পৌঁছোলে সে যেমন টের পায়; মানুষের ক্রোধের **ঝং** জনিত হয়ে তার কাছে পৌঁছোলেও একই ভাবে টের পায়।

ঝাম (ঝামক, ঝামটা, ঝামর, ঝামরণ, ঝামরি, ঝামরী, ঝামরু, ঝামা, ঝামুরঝুমুর, ঝামেলা) : ২. ***ঝাম*** *=* ***ঝম*** *(তেজের জনন-স্থিত সীমায়িত যাহাতে) হইতে জাত।* ***ঝামক*** *=* ***ঝাম*** *করে যে।* ***ঝামটা*** *=* ***ঝাম*** *টঙ্কারিত যাহাতে, তাহার আধার।* ***ঝামর*** *=* ***ঝাম*** *রহে যাহাতে।* ***ঝামরণ*** *=* ***ঝামর*** *অন যাহাতে।* ***ঝামরি*** *=* ***ঝামর*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ঝামরী*** *=* ***ঝামরি****-র আধার যে।* ***ঝামরু*** *=* ***ঝামর*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***ঝামা*** *=* ***ঝাম****-এর আধার যে।* ***ঝামুরঝুমুর*** *=* ***ঝাম*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে রহে যাহাতে এবং* ***ঝুমুর*** *(দ্র.* ***ঝুম****)।* ***ঝামেলা*** *=* ***ঝাম*** *দিশাগ্রস্ত হয়ে লালিত যাহাতে, তাহার আধার।* ৩. **ঝামক** = অতিপক্ব ইষ্টকা, ঝামা ইট। **ঝামটা** = রোষে অপ্রসন্ন মুখভঙ্গি, চাপড়। **ঝামর** = তর্কুশাণ, টেকোর শাণপাথর; কৃষ্ণবর্ণ, কাল, দাহময়, প্রখর, প্রচণ্ড, শুষ্ক, ম্লান, দগ্ধ, মলিন, কান্তিহীন, বিবর্ণ, জ্যোতিহীন, নিষ্প্রভ। **ঝামরণ** = ঝামরবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ। **ঝামরি, ঝামরী** = মলিনা, বিবর্ণা। **ঝামরু** = বিবর্ণ, মলিন। **ঝামা** = ঝামা ইঁট (বিপরীত আমা)। **ঝামুরঝুমুর** = নূপুরাদির ধ্বনি। **ঝামেলা** = ঝঞ্ঝাট, গোলযোগ। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** **ঝম** হইতে জাত যে, তাকে **ঝাম** বলে। এই ঝাম তেজের জননস্থিতের পরবর্তী রূপ। তাই এ ঝামের আধার পোড়া বা কালো হয়ে যাওয়া ইটকে

যেমন বোঝায়; তেমনি **ঝামরী** গাইকেও বোঝায়। সূর্যতেজের সর্বাধিক গ্রহণকারী হল ঝামরী গাই। তার রং কালো। বাংলাভাষী তার শিশুকে যে গান শোনায় — 'আয় আয় চাঁদমামা টিপ দিয়ে যা ... কালো গাইয়ের দুধ দেব, দুধ খাওয়ার বাটি দেব, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা' — এই কালো গাইয়ের দুধ সর্বশ্রেষ্ঠ, সেকথা সে বুঝে গিয়েছিল। গ্রামবাংলার প্রত্যেক মানুষই জানেন কালো গাই বা **ঝামরী** গাইয়ের দুধ সবচেয়ে ভাল। সূর্যতেজের এই গুরুত্বের কথা পশ্চিমের সাদা-চামড়ার মানুষেরা জানেন বলেই বছরে তিন মাস ছুটি নিয়ে রোদের দেশের সমুদ্রসৈকতে যান রোদে গা পোড়াতে, চামড়া কালো করতে; যদিও কালো আফ্রিকান ও শ্যামল এশিয়ানরা তাদের না-পসন্দ্! তবে চাঁদকে মামা বলার কারণ ভিন্ন। দ্র. **মামা**।

ঝামা ঝামরী ছাড়া অন্য অর্থগুলিও এইরকম কোনো না কোনো প্রকারের তেজের জননস্থিতের কথা প্রকাশ করে। কিন্তু **ঝামেলা** শব্দটি আর একটু এগিয়ে যায়। সত্তার থেকে জাত বস্তু যদি একই ভাবে একই দিকে ছিটকে পড়ে পড়ে জমা হতে থাকে, সেরকম **মাল**-কে **ঝমাল** বা (ব.শ. মতে হিন্দিতে) **ঝমেলা** বলে। যে সত্তা থেকে এই রূপ **ঝমাল** সৃজিত হয়, সেই **ঝমাল** যদি সৃজক-সত্তার পক্ষে সমস্যাসৃষ্টিকারী ও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়, তখনই তাকে সত্তার পক্ষে **ঝামেলা** বলে। ঝামেলা শব্দের এই নিহিত অর্থ মূলত একই কর্মের পুনরাবৃত্তিমূলক পাইকারী উৎপাদকের সামাজিক বিপদ বোঝাতে প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয়। অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদনের সবচেয়ে বড় বিপদ তার এই **ঝামেলা**। (বলতে গেলে মানুষের সমাজ বিগত শিল্পবিপ্লবের কাল থেকে এই পুঁজিবাদী-**ঝামেলায়** জেরবার হয়ে চলেছে এবং বর্তমানে এই **ঝামেলাই** তার মৃত্যুঘণ্টা বাজাতে লেগেছে।) পরবর্তীকালে যে কোনো সমস্যাজনক ব্যাপারের ক্ষেত্রেই শব্দটির প্রয়োগ হতে থাকে।

ঝিঁক, ঝিঁকা : ২. ***ঝিঁক*** = *গতিশীল জননস্থিতের রহস্যরূপ কৃত যাহাতে।* ***ঝিঁকা*** = ***ঝিঁক****-এর আধার যে।* **৩. ঝিঁক** = হাঁড়ির আধার উনানের চূড়াকৃতি মৃৎপিণ্ড, ফেলিয়া মারা, হানা, ধরা, নিবারণ করা। **ঝিঁকা** = বেগে আঘাত বা ধাক্কা, নৌকা চালনার্থ জোরে হালের ধাক্কা। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ঝিক**। উপরে ঝিক শব্দের প্রথম অর্থটি বাদ দিয়ে বাকিগুলি সঠিক। কেননা, তাদের প্রত্যেকটির ভিতরে শক্তিরূপিণীর রহস্যরূপ রয়েছে। কিন্তু 'হাঁড়ির আধার উনানের চূড়াকৃতি মৃৎপিণ্ড'তে তা নেই। এই অর্থটি বেরোয় **ঝিক** শব্দে। অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুটি সেক্ষেত্রে বাদ দিতে হয়।

ঝি (ঝিঅর, ঝিআরী, ঝিউ, ঝিউড়ি, ঝী) : ২. ***ঝি*** = ***ঝ*** *(মানবের জননস্থিত) গতিশীল যাহাতে।* ***ঝিঅর*** = ***ঝি****-এর অস্তিত্ব রহে যাহাতে।* ***ঝিআরী*** = ***ঝিঅর*** *হইতে জাত যে, তাহার আধার।* ***ঝিউ*** = ***ঝি****-র নবরূপে উত্তরণ যাহাতে।* ***ঝিউড়ি*** = ***ঝিউ****-এর উড়ান গতিশীল যাহাতে।* ***ঝী*** = ***ঝি****-এর আধার যে।* **৩. ঝি (ঝী)** = কন্যা, মেয়ে, কন্যাসদৃশী স্নেহপাত্রী, কন্যাতুল্যা পরিচারিকা, দাসী। **ঝিঅর (ঝিআরি, ঝিআরী)** = কন্যা, কন্যাতুল্যা স্নেহপাত্রী ('বহুআরী'র অনুকরণে 'ঝিআরী')। **ঝিউ** = কন্যা (বউ-এর অনুকরণে ঝিউ)। **ঝিউড়ি (ঝিউড়ী, ঝিউরী)** = কন্যা, কন্যাবৎ স্নেহপাত্রী (বউড়ির অনুকরণে ঝিউড়ি)। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** কেন মানবশরীরের জননস্থিত বা **ঝ** গতিশীল হয় কন্যা সন্তানের মাধ্যমে, পুত্রের মাধ্যমে হয় না; অর্থাৎ **ঝি** বললে শুধুমাত্র কন্যা বোঝায় কেন, পুত্র বোঝায় না কেন, সে এক গুরুতর প্রশ্ন। তবে **ঝিক** ও **ঝিঁক** শব্দের একটি অর্থ আমাদের এক নতুন দিগন্ত দেখায়। বাচ্চারা যখন 'পুঁ-**ঝিক-ঝিক**' বা 'কু-ঝিক-ঝিক' খেলে, তখন প্রতিটি **ঝিক** (>) যেন এক-একটি জননস্থিতের অগ্রগতিকে বোঝায় — একটি নিঃশ্বাস জনিত হল, আর সত্তাটি খানিকটা এগিয়ে গেল; যাকে এই (**ঝিক-ঝিক** = >>) চিহ্নের মতো ভাবা চলে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় উনুনের **ঝিঁক** দেখলে, যা হুবহু এই চিহ্নের (>) মতো, তবে গতিমুখটি উপর দিকে। এ হল চূড়াকৃতি মৃৎপিণ্ড। জ্বলন্ত উনুনের উপর এরকম তিন-চারটি ঝিঁক একত্রে ধরে রাখে রান্নার হাঁড়িকে। ... মানবপ্রজাতির অগ্রগতি কি কন্যাসন্তানই ধরে রাখে? পুত্রসন্তান ধরে রাখে না? এর উত্তর হল, যতদিন মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ছিল ততদিন কন্যাসন্তানই মায়ের দেখভাল করত, সংসারের জোয়াল টানত এবং তার মর্যাদা পেত। এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কন্যাসন্তানই তা করে বধূরূপে, কদাচিৎ কন্যারূপেই, তবে তাকে সে মর্যাদা পিতৃতন্ত্রে আর দেওয়া হয় না। আর, এজন্যই প্রাচীনকাল থেকে সে **ঝি** পদবাচ্য। মানবপ্রজাতিকে যদি রেলগাড়ি ভাবা হয়, তবে কন্যা-সন্তানগণ বা **ঝি**-গণই তার **ইঞ্জিন**, আর পুত্র-সন্তানগণ তার দিক-নির্ণায়ক ব্যবস্থা। — অতএব, **ঝি** বলা হয় কন্যাসন্তানকে। ব্যঞ্জনার্থে তা দাসী বা কন্যাতুল্যা স্নেহপাত্রীকেও বোঝায়। তবে **ঝিঅর** ও **ঝিআরী** বোঝায় কন্যার মেয়ে বা তাদের ছেলেমেয়েদের। আর **ঝিউ** ও **ঝিউড়ি** বোঝায় কৈশোর উত্তীর্ণ যে-কোনো বয়সের কন্যাসন্তানকে। **ঝি** ও **ঝী** এই দুইরকম বানানের কোনটি ঠিক জিজ্ঞাসা করলে, তার উত্তর পাওয়া যায় শব্দদুটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থেই। তাতে দুটি শব্দের দুরকম অর্থ দেওয়া আছে। সেখান থেকেই আমরা উভয়ের মিল এবং পার্থক্য বুঝতে পারি। তদনুসারী girl অর্থে **ঝি** এবং daughter অর্থে **ঝী** বানান সঠিক হতে পারে।

আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে নজর করা যেতে পারে। ব.শ. **ঝি** শব্দের বিবর্তনের একটি ক্রম দেখিয়েছেন — দুহিতা > ধীতা > ধীআ > ঝীআ > ঝি বা ঝী। তাঁর এই উল্লেখ নির্ভুল মনে হয়। তবে **দুহিতা** ধ্বনিপুঞ্জটি ধীরে ধীরে বাংলাভাষীর জিহ্বাতে বিবর্তিত হয়েই কেবল **ঝি** ধ্বনিতে পৌঁছয়নি; **দুহিতা** শব্দের অন্তর্গত ক্রিয়াপুঞ্জও ধীরে ধীরে **ঝি** শব্দে লয় পেয়েছে। অবশ্য কর্মের ক্রমহ্রাস-মানতার সঙ্গে তার প্রকাশের উচ্চারণের ক্রমহ্রাসমানতার সম্পর্কের বিষয়টি খুবই জটিল; এবং সে নিয়ে গবেষণার কাজ প্রায় সম্পূর্ণই বাকি।

আধুনিকতার ও তথাকথিত অ্যাকাডেমিক শিক্ষার পাল্লায় পড়ে বাংলাভাষার যে কী দুরবস্থা হয়েছে, **ঝি** শব্দটি তার একটি স্পষ্ট নিদর্শন। অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাঙালীর ধারণা হয়েছে ঝি-কে ঝি বললে, তার অপমান হয়। তাই সে তাকে 'কাজের মেয়ে' বলে স্বস্তি পায়; কেউবা ভোরের শিয়ালদা লোকালকে ঠাট্টা করে 'ঝি-স্পেশাল' বলে মজা পায়। 'শব্দসমূহের সমাজ আছে, সেখানে প্রতিটি শব্দের

ছোট-বড় ভাল-মন্দ শ্লীল-অশ্লীল জাত-বজ্জাত ইতর-ভদ্র নেটিভ-সাহেব উচ্চ-নীচ স্থান রয়েছে' — অ্যাকাডেমির এই নষ্ট বোধবুদ্ধি বাংলাভাষার বিস্তর ক্ষতি করেছে, করছে। খণ্ডিত মানবসমাজের অধঃপতিত সামাজিক উচ্চনীচ বোধবুদ্ধির হাত থেকে মনীষীরা নিজেদের রক্ষা করেছেন, তাঁরা মানবসমাজের কোনো সদস্যকে যেমন ছোট-বড় ভাবতেন না, শব্দসমাজের কোনো সদস্যকেও (শব্দকেও) উচ্চ-নীচ ভাবতেন না। অ্যাকাডেমির উচিত ছিল মনীষীদের প্রদর্শিত পথেই চলা; নিজেকে মিথ্যা গরবের হীন গর্বিত স্তরে নামিয়ে না আনা। বাংলাভাষায় **ঝি** ছিল সমমর্য্যাদাসম্পন্ন শব্দ। উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থগুলি তো বটেই, এমনকি ব.শ. প্রদত্ত অর্থগুলিও কোনোরকম হীনতাসূচক ছিল না। দাসী শব্দও ততদিন মর্যাদাসম্পন্ন ছিল, যতদিন দাসীর মতো প্রভুও তার দায়িত্ব পালন করত; প্রভুত্বের আসনকে পূজা করত না।

ঝিক, ঝিকঝিক, ঝিকিঝিকি, ঝিকমিক, ঝিকিমিকি : ২. ***ঝিক** = **ঝি** করে যে। **ঝিকঝিক** = **ঝিক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। **ঝিকিঝিকি** = **ঝি**-করণ গতিশীল যাহাতে, তাহার পুনরাবৃত্তি। **ঝিকমিক** = **ঝিক** ও **মিক** (গতিশীল সীমায়ন কৃত যাহাতে)। **ঝিকিমিকি** = **ঝিক** গতিশীল যাহাতে ও **মিক** গতিশীল যাহাতে।* **৩. ঝিক** = অঙ্কুশঘাতে চালান। **ঝিকঝিক, ঝিকিঝিকি** = দীপ্তিপ্রকাশ, দীপ্তভাবে, উজ্জ্বলরূপে। **ঝিকমিক, ঝিকিমিকি** = দীপ্তিপ্রকাশ, করতালধ্বনি, জ্যোৎস্নায় আলোকিত ভাব। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. ঝি** এগিয়ে নিয়ে যায়। একটি বস্তু ঝিক-ঝিক করছে, মানে, নিজের অস্তিত্বকে তার দীপ্তির মাধ্যমে আমার চোখ পর্যন্ত পাঠাচ্ছে। এই জন্যই সে ঝিক। আর যদি সে যতখানি দীপ্ত হয়েছে, তাকে সীমিত করে নেয় তবে সে মিক (দ্র. **কাচুমাচু**)। ঝিকিমিকি, কিচিমিচি, ঝিকিরমিকির, কিচিরমিচির প্রভৃতি সমজাতীয় প্রকাশ-অপ্রকাশের ব্যাপার, প্রথমটিতে তেজের এবং দ্বিতীয়টিতে শব্দের উচ্চারিত-প্রকাশ ও সীমায়িত-প্রকাশ ঘটে।

এক্ষেত্রে আর একটি বিষয় চোখে পড়েছে। এরকম কমই হয়, তবু এক্ষেত্রে কিন্তু হয়েছে। তা হল, **ঝিঁক** শব্দের অর্থ যদি উনুনের ঝিক হয়, তবে তাতে চন্দ্রবিন্দুটি না থাকারই কথা। এটি সম্ভবত চন্দ্রবিন্দুর প্রতি আমাদের অধিক পক্ষপাতের কারণেই ঘটে থাকবে।

ঝিম, ঝিমকিনি, ঝিমঝিম, ঝিমঝিমানি, ঝিমলী, ঝিমিঝিমি, রিমঝিম, রিমলীঝিমলী : ২. ***ঝিম** = **ঝি** সীমায়িত যাহাতে। **ঝিমকিনি** = **ঝিম**করণ গতিশীল যাহাতে তাহার গতিশীল নাকরণ। **ঝিমঝিম** = **ঝিম**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। **ঝিমঝিমানি** = **ঝিমঝিম**-এর আধারের গতিশীল নাকরণ। **ঝিমলী** = **ঝিম** লালনের গতিশীল আধার যে। **ঝিমিঝিমি** = **ঝিম** গতিশীল যাহাতে, তাহার পুনরাবৃত্তি। **রিমঝিম** = **রিম** (= গতিশীল রহনের সীমায়ন যাহাতে) ও **ঝিম**। **রিমলীঝিমলী** = **রিম** লালনের গতিশীল আধার যে এবং **ঝিমলী**।* **৩. ঝিম** = মৎস্যাদির জৃম্ভণ হেতু জলের বুদ্বুদ বা ভুড়ভুড়ি, নেশা তন্দ্রা ইত্যাদি হেতু ক্ষীণতা, জড়ীভাব বা অবসন্নতা। **ঝিম, ঝিমা** = নেশা তন্দ্রা ইত্যাদি হেতু অবসন্ন হওয়া বা অবসন্ন হইয়া ঢুলা, অবসন্ন (নিঝুম) হইয়া থাকা। **ঝিমকিনি** = নেশা ইত্যাদির অবসন্নতাজন্য ঢুলনি। **ঝিমঝিম** = দুর্ব্বলতা-বোধ, অসাড়ভাব। **ঝিমলী, ঝিমঝিমানি** = ঝিমঝিম শব্দে বৃষ্টি। **ঝিমিঝিমি** = নিশীথনিস্তব্ধতা-জন্য শব্দ, বৃষ্টিপাতের শব্দ। **রিমঝিম, রিমিঝিমি** = নিরন্তর মৃদু বৃষ্টিপাতের শব্দ। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** 'থম মেরে বসে থাকা' শব্দবন্ধটি বাংলাভাষায় একটি প্রচলিত শব্দবন্ধ। এই **থম** মানে 'স্থিত যেখানে সীমায়িত হয়ে গেছে'; যেন-বা পায়ে হেঁটে চলা মানুষটি বস্তাবন্দী হয়ে গেছে। কিন্তু সে অবস্থায় বসে না থেকে সে যদি বস্তাবন্দী অবস্থাতেই গড়াতে শুরু করে, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়ম অনুসারে তাকে বলতে হবে 'থিম'। না, এই থিম বাংলাভাষায় প্রচলিত নয়, রয়েছে ইংরেজিতে — theme। একটি চলমান ধারণা আর চলমান না-থেকে স্থিত হয়ে বস্তাবন্দী হয়ে যাওয়ার পর যদি গড়াতে শুরু করে তাকে বলে theme। দুর্গাপূজার থিম নিয়ে একালে কত ব্যাপারই না হচ্ছে!

ঝম ও ঝিম প্রায় একই ব্যাপার। থ-এ যেমন তরণগতি স্থিত হয়, এতে তেমনি জননগতি স্থিত হয়। কোনো সৃজনশীল মানুষ যখন কোনো বিশেষ সৃষ্টির সিদ্ধান্তে মনে মনে উপনীত হয়ে স্থির হয়ে যান এবং তা কাজে রূপায়িত করার জন্য ভাবতে থাকেন, তখন তার বসে থাকাকে **ঝিম মেরে** বসে থাকা বলে। এখানে **মেরে** শব্দটির প্রয়োগই বহু কথা জানিয়ে দেয়। একে **ঝিমান** বা **ঝিমানি**ও বলে। তার পরেও এই ব্যাপারটিকে বুঝতে অসুবিধা হলে বাঙালীর পরিত্রাতা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করুন। তিনি বলেন, তিনি কবি এবং কবি হল শিবভক্ত, যে-শিব নেশাগ্রস্ত, সৃজনচিন্তায় **ঝিম মেরে** বসে থাকে। এর বাস্তবরূপটি কেমন হতে পারে, তা আমাদের পূর্বপুরুষেরা নিশ্চয় অনুভব করেছিলেন। অন্যথায় **ঝিমঝিম, ঝিমঝিমানি** প্রভৃতি শব্দের জন্মই দিতে পারতেন না তাঁরা।

যেভাবেই হোক না কেন, আমাদের পূর্বপুরুষগণ বৃষ্টি পড়ার অজস্র রূপগুলিকে কত সূক্ষ্মভাবে অনুভব করেছিলেন, বৃষ্টি পড়ার রকমফের অনুসারে তাঁদের সৃষ্ট শব্দগুলি তা সুস্পষ্টরূপে আমাদের জানায়। যেমন ঝমঝম বৃষ্টি, ঝমঝমিয়ে পড়া বৃষ্টি, ঝেঁপে (ঝম্প দিয়ে) আসা বৃষ্টি, ঝিমঝিম বৃষ্টি, ঝিমঝিমানি বৃষ্টি, রিমঝিম বৃষ্টি, রিমিঝিমি বৃষ্টি, ঝরঝর বৃষ্টি, ঝিরঝির বৃষ্টি, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি — এগুলি সবই মৃদু বৃষ্টিপাতের নানা রূপ। এর বাইরে রয়েছে মুষলধারায় প্রবল বৃষ্টি বা অতি মৃদু ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টির নানা রূপ।

এবার বৃষ্টিধারার রূপগুলিকে নিষ্ঠাভরে অনুভব করার চেষ্টা করা যাক। **ঝমঝম** বৃষ্টি হল, জলীয় বাষ্প ছোট ছোট ফোঁটায় পরিণত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একটি ফোঁটা থেকে আর একটি ফোঁটার দূরত্ব রয়েছে; সর্ব দিকেই। জননস্থিতি এতে যথার্থভাবেই সীমায়িত। **ঝিমঝিম** বৃষ্টির বেলায় বৃষ্টির ফোঁটা, দূরত্ব, গতিবেগ সবই যেন আরও সূক্ষ্ম, ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু পতন বিরামহীন। **রিমঝিম**-এর বেলায় বৃষ্টি-ফোঁটার আবর্তন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুতে বিচ্ছুরণ মিলে থাকে ঝিমঝিম বৃষ্টির ভিতরেই। এটি খুবই মনোহর। ... দ্র. **চিক**।

ঝিল, ঝিলমিল, ঝিলিক, ঝিলিমিলি, ঝিল্লি : ২. ***ঝিল** = **ঝি** লালিত (বা লয়প্রাপ্ত) যাহাতে। **ঝিলমিল** = **ঝিল** ও **মিল** (=*

গতিশীল সীমায়ন লালিত বা লয়প্রাপ্ত যাহাতে)। ***ঝিলিক*** *=* ***ঝি****-এর গতিশীল লালন করে যে।* ***ঝিলিমিলি*** *=* ***ঝি****-এর গতিশীল লালন যাহাতে এবং* ***মিল****-এর গতিশীলতা যাহাতে।* ***ঝিল্লি*** *=* ***ঝি****-র গতিশীল লালনকে লালন করে যে।* **৩. ঝিল, ঝীল** = স্বভাবজাত বৃহৎ জলাশয়বিশেষ। **ঝিলমিল** = ঝলমল, কম্পিত জ্যোতিপ্রকাশ, খড়খড়ি। **ঝিলিক** = চমক, ক্ষণিক প্রভাপ্রকাশ বা বিদ্যুৎপ্রকাশ। **ঝিলিমিলি** = খড়খড়ি, মণিমুক্তাদির দীপ্তিশীল হার, দীপ্তিপ্রকাশ, দীপ্তিময়, প্রভাতরঙ্গযুত। **ঝিল্লি** = বাদ্যবিশেষ, করতাল, কীটভেদ, ঝিঁঝিঁপোকা, ঝিল্লিরব, আতপরুচি, রৌদ্রের তেজ, দীপ্তি, প্রভা, উদ্বর্ত্তনবস্ত্র, ঝিণ্টি, করতালবাদ্য, বর্ত্তী, পলিতা, স্থালীলগ্ন দগ্ধান্ন। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** মানবশরীরের তেজের **ঝি** না হয়ে যদি রৌদ্রতেজের কিংবা শব্দতেজের **ঝি** হয়, তার **ঝিল** হতে বাধা নেই, **ঝিলিক** মারতেও বাধা নেই, **ঝিলমিল**ও করতে পারে সে; এমনকি **ঝিল্লি** হতেও তার আটকায় না। ... উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থ (৩) তাকে সর্বৈব সমর্থন যোগায়। দ্র. **চিক**।

ঝুঁক, ঝুঁকি, ঝোঁক, ঝোঁকা : ২. ***ঝুঁক*** *= নবরূপে উত্তীর্ণ* ***ঝ****-এর রহস্যময় রূপায়ণ করে যে।* ***ঝুঁকি*** *=* ***ঝুঁক*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ঝোঁক*** *=* ***ঝুঁক****-এর আধার যে।* ***ঝোঁকা*** *=* ***ঝোঁক****-এর আধার যে।* **৩. ঝুঁক** = সামনে নত হওয়া বা হেলা, বিষয়বিশেষে অভিনিবিষ্ট হওয়া, তৎপ্রবণ বা তদ্বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া, পক্ষপাতী হওয়া, একতর পক্ষে টানিয়া কথা বলা, আক্রমণার্থে তদভিমুখে ধাবিত হওয়া। **ঝুঁকি** = কাজের ভার, জবাবদিহি, দায়িত্ব। **ঝোঁক** = ঝুঁকিয়া (হেলিয়া) থাকার ভাব, ভার, দায়িত্ব, বেগ, প্রচণ্ড গতি, আতিশয্য, তীব্রতা, নেশার প্রভাব, আবেগ, আগ্রহ, প্রবৃত্তি, অনুরাগ, সখ, খেয়াল, একতর পক্ষে টান, পক্ষপাত, তুলাদণ্ডের অধিকতর ভারের দিকে টান, নির্ব্বন্ধাতিশয়, জেদ। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** ড-কার সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। সত্তার অংশ লাফ দিয়ে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে একটি স্থির রূপ গ্রহণ করে **ঝ্‌** হয়। সেই **ঝ্‌** যদি নবরূপে উত্তীর্ণ হয়, তখন তাকে বলে **ঝু**। এই নবরূপে উত্তীর্ণ হওয়ার রহস্য হল, সে যেন মূল সত্তার থেকে লাফ দিয়ে বেরোলেও, কোমরে দড়ি বেঁধে লাফ দিয়েছে, সত্তার সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেনি। তাই তার রহস্যময় রূপকে বলে **ঝুঁ**। এই **ঝুঁ** করে যে, সেই হল **ঝুঁক**। এই ঝুঁক গতিশীল (**ই**) হলে তবেই তাকে **ঝুঁকি** বলে। সেকারণেই ঝুঁকির বেলায় সত্তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই ঝুঁকির ব্যঞ্জনার্থ হল কোনো কিছু হস্তগত করার জন্য এতটা দূরে যাওয়া, যেখান থেকে কাঙ্ক্ষিত বস্তু নিয়ে স্বস্থানে ফিরে আসতে পারে, না-ও পারে; অর্থাৎ লাভের প্রত্যাশায় গিয়ে সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, না-ও পারে।

ঝুপ, ঝুপড়ি(ড়ী), ঝুপসি-ঝাপসি, ঝোপ, ঝোপড়া : ২. ***ঝুপ*** *=* ***ঝু*** *(দ্র.* ***ঝুঁক****) পালিত যাহাতে।* ***ঝুপড়ি*** *=* ***ঝুপ****-এর গড়ান-উড়ান গতিশীল যাহাতে।* ***ঝুপড়ী*** *=* ***ঝুপড়ি****-র আধার যে।* ***ঝুপসি-ঝাপসি*** *=* ***ঝুপ****-রূপ অস্তিত্ব গতিশীল যাহাতে ও* ***ঝাপ****-রূপ অস্তিত্ব গতিশীল যাহাতে।* ***ঝোপ*** *=* ***ঝুপ****-এর সার্বিক আধার যে।* ***ঝোপড়া*** *=* ***ঝোপ****-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে তাহার আধার।* **৩. ঝুপ** = ঝাঁপ দিয়া পড়ার **শব্দ**, **ঝম্পের শব্দ**, **জলে দাঁড় ফেলার শব্দ**। **ঝুপড়ি, ঝুপড়ী** = তৃণকুটীর, কুঁড়ে-ঘর। **ঝুপসি-ঝাপসি** = ঝোপ-ঝাপ সদৃশ, ঝোপঝাপযুক্ত। **ঝোপ** = **গুল্মগহন**, ছোট ছোট গাছের জঙ্গল। **ঝোপড়া** = **পর্ণশালা**, কুঁড়েঘর। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. ঝ (জননস্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ হলে ঝু (দ্র. ঝুঁক) হয়। এই ঝু** জননকারীর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে পুনরায় সম্পর্কিত হয়ে গেছে, **ঝ**-এর মতো বিচ্ছিন্ন নয়। এটিই **ঝ**-এর নতুন রূপ। সেই কারণে এই **ঝু (ঝ বর্ণের অর্থে যাকে কড়াই থেকে ছিটকে বেরোনো বলা হয়েছে) ঝুলতে পারে**, ঝুঁকে দেখতে পারে, এমনকি এমনভাবে নীচে পড়তে পারে যাতে মনে হয়, তাকে উপর থেকে কেউ ধরে রেখেছে; তাই সে সজোরে মাটিতে পড়েনি; **ঝুপ** করে পড়েছে। গাছের ডালপালা যদি এভাবে তার চার দিকে ঝুঁকে মাটিকে ছুঁয়ে ফেলে, তাকে বলে **ঝোপ**। তার ভিতরে মানুষের জীবনযাত্রা চললে আমরা বলি **ঝোপড়ি** বা **ঝোপড়ী**।

ঝুল (ঝুলটঙ্গী, ঝুলসন্ন্যাস), ঝুলন, ঝুলা, ঝুলাঝুলি, ঝুলি, ঝুলী, ঝোল, ঝোলা : ২. ***ঝুল*** *=* ***ঝ*** *(জননস্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***ঝুলটঙ্গী*** *= যে টঙ্গী ঝুলে থাকে।* ***ঝুলসন্ন্যাস*** *= যে সন্ন্যাসে ঝুলে থাকা হয়।* ***ঝুলন*** *=* ***ঝুল*** *অন যাহাতে।* ***ঝুলা*** *=* ***ঝুল****-এর আধার যে।* ***ঝুলাঝুলি*** *= দ্র.* ***কচকচি****।* ***ঝুলি*** *=* ***ঝুল*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ঝুলী*** *=* ***ঝুলি****-র আধার যে।* **৩. ঝুল** = দোল, ধোঁয়ার কালি-মাখা মাকড়সার জাল (soot), জামা-প্রভৃতির লম্বমান অংশ বা নিম্নাভিমুখ প্রসার, লম্বমান রজ্জু-প্রভৃতির দীর্ঘতা, দোলিত বা ইতস্তত সঞ্চালিত করা, দোল খাওয়া, লম্বিত হওয়া। **ঝুলটঙ্গি** = ঝুলান মঞ্চ। **ঝুলন** = দোলন, শ্রীকৃষ্ণের দোলনোৎসব বা হিন্দোলযাত্রা। **ঝুল-সন্ন্যাস** = গাজনে ভারায় পা আটকাইয়া সন্ন্যাসীর বা ভক্তের অগ্নিশিখার উপরে ঝুলিয়া থাকার উৎসববিশেষ। **ঝুলা** = দোলিত করা, দোল দেওয়া, দোলান, লম্বিত করা, টানান। **ঝুলাঝুলি** = টানাটানি। **ঝুলি, ঝুলী** = কাপড়ের ছোট ঝুলা, থলি। **ঝোল** = ব্যঞ্জনের জলীয়াংশ, সুপ, যূষ, সুপযুক্ত ব্যঞ্জন। **ঝোলা** = ঝোলের মত, তরল, পাতলা, বড় ঝুলি বা কাপড়ের থলি। (**মউঝোলা** = মউয়ের মত পাতলা গুড়)। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** অর্থানুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিপথে ঠেলে দেওয়ার ব্যাপারে **ঝোল** ও **ঝোলা** শব্দদুটি এককথায় আদর্শ শব্দ। যা কিছু ঝুলে থাকে, তাকে ঝুলি বা ঝোলা বলা যেতেই পারে। তবে কিনা ঝুলি হল আকারে খুবই ছোট, তাই ভিক্ষার ঝুলি। আর ঝোলা হল আকারে বড়। সেও ঝুলে থাকে। তবে 'ঝোলা' বললে থলে বা ব্যাগ ইত্যাদি তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে বটে, কিন্তু ঝোলাগুড় পাশ কাটিয়ে যায়। তাকে খুঁজতে হয় **ঝোল**-এ। ঝোলের মতো, অর্থাৎ মাছের ঝোলের মত কিংবা উপরোক্ত মউঝোলার মতো পাতলা গুড় হলে তবেই ঝোলাগুড়। এই প্রকার গুড়ের মূল অংশ থেকে পাতলা রসাংশ ঝুলে পড়ে বলেই একে ঝোলাগুড় বলে। ঝোলায় করে আনা হয় (আদৌ যদি সেরকম ঝোলায় করে আনাই হয়!) বসে তাকে ঝোলাগুড় বলে না। **ঝোলের** মতো গুড় বলেই ঝোলাগুড়। কিন্তু

তাহলে মাছের বা মাংসের ঝোলকে **ঝোল** বলে কেন? হ্যাঁ, তাতেও মাছের বা মাংসের মাছত্ব বা মাংসত্ব তাদের রসাংশে ঝুলে থাকে, তাই **ঝোল**। হোটেলের মাছের ঝোলকে বঙ্গীয় মায়েরা 'মাছের-ঝোল' বলতে প্রায়শই অস্বীকার করেন। কারণ, তার রসাংশে মাছত্ব থাকে না; কারণ সেই ঝোল আগে বানিয়ে রাখা হয়, খদ্দের খেতে বসলে সেই ঝোলে মাছভাজা ডুবিয়ে 'মাছের-ঝোল' বলে দিয়ে দেওয়া হয়। ঝোলের ভিতরে মাছের মাছত্ব ঢুকবার অবসর পায় না। ৬. ইংরেজি shoal।

ঝট্ (*ঝাড়্*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আজড়া, আজাড়, আঝাড়া, ঝট্, ঝট, ঝটক, ঝটকা, ঝটপট, ঝটঝটি, ঝটাপট, ঝটাপটি, ঝটি, ঝটিকা, ঝটিৎ, ঝটিত, ঝটিতি, ঝড়, ঝড়ঝঞ্ঝা, ঝড়বৃষ্টি, ঝড়ি, ঝাঁইট, ঝাঁট, ঝাঁটা, ঝাঁটি, ঝাট, ঝাটা, ঝাটি, ঝাট্যাতি, ঝাড়, ঝাড়-ফুঁক, ঝাড়ন, ঝাড়া, ঝাড়াই, ঝাড়াই-মাড়াই, ঝাড়াঝাড়ি, ঝাড়াঝোড়া, ঝাড়ান, ঝাড়ি(ড়ী), ঝাড়ু, ঝাড়ুদার, ঝিঁটি, ঝুঁট, ঝুঁটি, ঝুঁজকোবেলা, ঝুট, ঝুট-কথা, ঝুটা, ঝুটাঝুটি (কেশাকেশি), ঝুটি, ঝুটী, ঝুড়, ঝুড়ি, ঝুড়িঝুড়ি, ঝুণ্ট, ঝুনঝুন, ঝুনঝুনি, ঝুনা, ঝুনুঝুনু, ঝুনুরঝুনুর, ঝুনো, ঝোটা, ঝোড়, ঝোড়া, ঝোড়ে-ঝাড়ে।
ঝট্ (ঝাড়্) = জননস্থিতের টঙ্কারণ। **ঝট** = জননস্থিতের টঙ্কারণ যাহাতে। **ঝাড়** = (**ঝড়** = জননস্থিতের গড়ান-উড়ান যাহাতে) ঝড় হইতে জাত।

ঝট, ঝটক, ঝটকা, ঝটপট, ঝটাপট, ঝটাপটি : ২. *ঝট = ঝ টঙ্কারিত যাহাতে। ঝটক = ঝট করে যে। ঝটকা = ঝটক-এর আধার যে। ঝটপট = ঝট ও পট।* ৩. **ঝট** = শীঘ্র, সত্বর। **ঝটক** = জোরে ঠেলিয়া বা সরাইয়া দেওয়া। **ঝটকা** = ধাক্কা, প্রবল ঘাত, ঝড়, ঝটিকার প্রতিঘাত (ধাক্কা)। **ঝটপট** = অতিশীঘ্র, পক্ষীর পক্ষের শব্দ, ছটফট, অস্থিরতা। **ঝটাপট, ঝটাপটি** = বিবাদ, বাগযুদ্ধ, তুমুল ঝগড়া। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **চটপট, ছটফট**। সবাই জানেন 'ঝট করে' মানে দ্রুত বা চট করে। কিন্তু সেই মানেটি 'ঝট'-এর ভিতরে কীভাবে বিদ্যমান, তা সহসা বোঝা যায় না। আমরা আগেই জেনেছি (দ্র. **ঝ**) জনিত শক্তি, জনিত গতি, জনিত বায়ুতাড়ন ... এগুলো সবই **ঝ** হতে পারে এবং তার ভিতরে দ্রুততার ব্যাপারটি থাকেই। তবুও ঝ (জনন) এবং প (পালন) এর মধ্যে পার্থক্য থাকেই। যেমন 'ঝট করে' ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায়, তেমনি 'পট করে' তুলে নেওয়াও যায়। ঝট করা ও পট করার মধ্যে পার্থক্যটি একেবারেই বিপরীত।

ঝটি, ঝটিকা, ঝটিৎ, ঝটিত, ঝটিতি : ২. *ঝটি = ঝট গতিশীল যাহাতে। ঝটিকা = ঝটি-কারীর আধার যে। ঝটিৎ, ঝটিত = ঝটি তারিত যাহাতে। ঝটিতি = ঝটিত গতিশীল যাহাতে।* ৩. **ঝটি** = ক্ষুদ্রতৃণবিশেষ, ঝাঁটি, ঝড়ি, ঝড়। **ঝটিকা** = ঝড়। **ঝটিৎ, ঝটিত** = শীঘ্র। **ঝটিতি** = শীঘ্র। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. ঝট।

ঝড়, ঝড়ি : ২. *ঝড় = ঝ-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে। ঝড়ি = ঝড় গতিশীল যাহাতে।* ৩. **ঝড়, ঝড়ি** = বাত্যা, প্রবলবায়ু, (সাদৃশ্যে) বিপত্তিজালের প্রচণ্ড আঘাত। ৪. যথার্থে প্রচলিত।

ঝাঁট, ঝাঁটা, ঝাঁটান, ঝাঁটি : ২. *ঝাঁট = ঝাঁ-এর (ঝ-এর রহস্যরূপের আধার যে, তার) টঙ্কার যাহাতে। ঝাঁটা = ঝাঁট-এর আধার যে। ঝাঁটান = ঝাঁটা অন যাহাতে। ঝাঁটি = ঝাঁট গতিশীল যাহাতে।* ৩. **ঝাঁট** = শীঘ্র, ঝাঁটা, গৃহপরিষ্কার। **ঝাঁটা** = (সাদৃশ্যে) সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা দিয়া প্রহার করা, ঝাঁটান, ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা বা ঝাড়া, ঝাঁটায় আবর্জ্জনা নিঃশেষে দূর করার ন্যায় কোনো বিষয় একেবারে নিরবশেষ করা। **ঝাঁটি** = ঝাঁটা, ঝাপটা, জল-ছেঁচার পাত্রে যতটা জল ধরে তৎপরিমাণ, ঝড়, তুমুলঝগড়া। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **ঝা** কথাটির ভিতরে রয়েছে সত্তার জননস্থিত ও দ্রুতি। (দ্র. **ঝ**)। তাতে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ করলে এসে যায় শক্তিরূপিণীর রহস্যরূপ। এক্ষেত্রে তাকে বায়ুতাড়নও বলা যায়। অতএব **ঝাঁ** মানে শক্তিপ্রয়োগে বায়ুর আন্দোলন করবার আধার। সেই **ঝাঁ**-এর টঙ্কার তোলা যায় যে সত্তার সাহায্যে, তাকে তাই **ঝাঁটা** বলে, আর সেই ঝাঁটন ক্রিয়াটিকে বলে ঝাঁটান। এই শব্দটির ভিতরে যথেষ্ট অর্থবহতা থাকার কারণে, বাংলাভাষী একে আরও বহু প্রকারে প্রয়োগ করে থাকেন। যথা — ঝাঁটাখাওয়া, ঝাঁটাখাগী, ঝাঁটাখেগো, ঝাঁটাতারা, ঝাঁটাপড়া, ঝাঁটাপারা, ঝাঁটাপেটা, ঝাঁটামারা, ঝাঁটালাগা ... ইত্যাদি। দ্র. **ঝগড়াঝাঁটি**।

ঝাড়, ঝাড়-ফুঁক, ঝাড়ন, ঝাড়া, ঝাড়াই, ঝাড়াই-মাড়াই, ঝাড়াঝাড়ি, ঝাড়ান : ২. *ঝাড় = ঝড় হইতে জাত। ঝাড়-ফুঁক = ঝাড় ও ফুঁক (দ্র. ফুঁক)। ঝাড়ন = ঝাড় অন যাহাতে। ঝাড়া = ঝাড়-এর আধার যে। ঝাড়াঝাড়ি =* (দ্র. **কেশাকেশি**)। *ঝাড়ান = ঝাড়া অন যাহাতে।* ৩. **ঝাড়** = লতাগহন, গুল্মগহন, গুল্মজাতীয় গাছ, বাঁশ ইত্যাদির গুচ্ছ (clump), গাছ, ডালপালা, লতা, বংশ, গোষ্ঠী, বহুশাখাযুক্ত গাছের মতো দীপাধারবিশেষ (chandelier), মন্ত্র দ্বারা রোগ-ভূতাদির অপনয়ন বা ঝাড়ন, ক্ষরিত করা, চ্যুত করা, ঝরান, ঝাড়া, মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা রোগ বিষ ভূত ইত্যাদি দূর করা (to exorcise), ধূলি প্রভৃতি ক্ষারণার্থ বেগে কম্পিত করা বা জোরে নাড়া, ঝাঁটা ইত্যাদি দ্বারা ধূলা প্রভৃতি দূর করা বা পরিষ্কার করা, কুলা দিয়া তুষাদি পৃথক করা বা নিস্তুষীকরণ, ক্ষরিত করা, কম্পিত করা, গাড়ী প্রভৃতি হইতে মাল উঠাইয়া ফেলা (to unload)। **ঝাড়ন** = ঝাড়া ইত্যাদি, ধূলা-প্রভৃতি ঝাড়ার কাপড়, ঝাঁটা। **ঝাড়া** = ক্ষরিত করান, ঝাড়ান, মার্জ্জিত, পরিষ্কৃত, নিস্তুষীকৃত, ন্যূনাধিক্যহীন, শস্যহীন, ঝরান ইত্যাদি, সঞ্চালন, কম্পন, মল, যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। **ঝাড়াই** = ক্ষরিত করা, ঝরান, ঝাড়া (ধান ঝাড়া, ভূত ঝাড়া, ধূলা ঝাড়া ...) ইত্যাদি। **ঝাড়াঝাড়ি** = বিশেষ নাড়ানাড়ি। **ঝাড়ান** = ক্ষরিত করান ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **ঝড়** হওয়ার পরে কত কী যে কতরকম ভাবে পড়ে থাকে, তার ইয়ত্তা থাকে না। সে সবই ঝড় হইতে জাত। গায়ে কী একটা পোকা বসে গিয়েছিল, আপনি **ঝেড়ে** ফেলে দিলেন, **ঝাড়লেন**; পোকাটার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে

গেল, তাই সে ছিটকে পড়ে গেল। অর্থাৎ, ঝাড়া মানেই ঝড় বহিয়ে দেওয়া। এর ফল, যে ঝাড়ে নিশ্চয় তার পক্ষে শুভ হয়, যাকে ঝাড়ে তার পক্ষে বিপজ্জনক হয়। ...

একালের দুটি বাক্য শোনা যাক — 'যা **ঝাড়** দিয়েছি না, আর রা কাড়বে না শালা!' এবং 'কেলো মাস্তান মালটাকে (লোকটিকে) **ঝেড়ে** দিয়েছে।' দুটো বাক্যই একালের শহুরে মাস্তানদের মুখে শোনা যায়। এই মাস্তানেরা অধিকাংশই অ্যাকাডেমি শিক্ষিত নয়। কিন্তু গ্রামবাংলার মানুষের মতো, ভাষাতত্ত্বের বিচারে, এরাও যথার্থেই ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ সৃষ্টি করে কথা বলছে। প্রথম বাক্যে 'ঝাড়' শব্দের অর্থ 'মারপিট করা' এবং দ্বিতীয় বাক্যে 'ঝেড়ে-দেওয়া' শব্দের মানে গুলি করে হত্যা করা।

ঝাড়ু, ঝাড়ুদার : ২. *ঝাড়ু = ঝাড় নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। ঝাড়ুদার = ঝাড়ু দেওয়া রহে যাহাতে।* ৩. **ঝাড়ু** = ঝাঁটা। **ঝাড়ুদার** = মেতর। (ব.শ.)। ৪. broom ও sweeper অর্থে প্রচলিত। ৫. এতক্ষণ ঝাঁটা ছিল আমার হাতে, আমি ঘরদোর পরিষ্কার করছিলাম, ঝাড়ছিলাম। এখন সেই ঝাড় দেওয়ার উপায়টি নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে, পরিণত হয়েছে **ঝাড়ু**তে। কেবল তাই নয়, সেটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর একজন। এবার সে আমার নির্দেশে ঝাড়বে, ঝেড়ে দেবে, ঘরদোর পরিষ্কার করে দেবে; তার নাম **ঝাড়ুদার**। এর সঙ্গে মিহ্‌ শব্দ জাত মিহ্‌ তর বা মেতর বা **মেথর** শব্দ মিলে যায়। দ্র. **মেথর**।

ঝুট, ঝুটা, ঝুটাঝুটি, ঝুটি (ঝুটী, ঝুঁটি, ঝুঁটী) : ২. *ঝুট = ঝু (নবরূপে উত্তীর্ণ জননস্থিত) টঙ্কারিত যাহাতে। ঝুটা = ঝুট-এর আধার যে। ঝুটি = ঝুট গতিশীল যাহাতে। ঝুটাঝুটি = ঝুটা ও ঝুটি। ঝুঁটি = ঝু-র রহস্যরূপের টঙ্কার গতিশীল যাহাতে। ঝুঁটী = ঝুঁটি-র আধার যে।* ৩. **ঝুট** = চূড়া, স্থূল শিখা, মিথ্যা। **ঝুটা** = উচ্ছিষ্ট। **ঝুটাঝুটি** = পরস্পরের ঝুটি ধরিয়া কৃত বিরোধ, চুলাচুলি, তুমুল ঝগড়া। **ঝুটি, ঝুটী** = দীর্ঘ কেশগুচ্ছ, উদ্‌গ্রথিত কেশগুচ্ছ, লোটন, বালকের শিখা, কাকপক্ষ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. সত্তা থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোথাও টঙ্কারিত হলে তাকে **ঝট** বলে, সন্দেহ নাই। কিন্তু উ-কার যুক্ত হয়ে সেটি **ঝুট** হয়ে গেলে, সত্তা থেকে সে বেরোয় বটে কিন্তু সত্তাকে ত্যাগ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যায় না। বরং সত্তার গৌরব-কলঙ্ক, ক্ষমতা-দুর্বলতা বা অন্যতর হ্যাঁসূচক বা নাসূচক বিশেষত্বের ধারক রূপে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তবে যখন হাঁসূচক বিশেষত্বের ধারক হয়, তখন তাতে চন্দ্রবিন্দুর আগম ঘটে (ঝুঁট); আর নাসূচক বিশেষত্বের ধারক হয়, তখন তা 'ঝুট' রূপেই থাকে। ময়ূর, বিভিন্ন পাখি ও মোরগের মাথায় যে চূড়া থাকে, তাকে সেকারণেই ঝুঁটি বা ঝুঁটী বলে। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে যখন পড়বেন 'দ্বাদশ বর্ষের রাম শিরে পঞ্চঝুঁটি' তখন চিন্তায় পড়ে যাবেন। এ-**ঝুঁটি** মাথার চুলের পাঁচটি গুচ্ছমাত্রই নয়, তা শক্তিরূপিণীর এক রহস্যরূপও বটে। কেননা, তা **পঞ্চশিখ, পুঞ্জিকস্থলা, কাকপক্ষ, অঞ্জনা** প্রভৃতি শব্দে বিধৃত ধারণার সঙ্গে যুক্ত। এর সঙ্গে জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের মালিকানার-শক্তি জড়িয়ে থাকে।

চন্দ্রবিন্দুহীন শুধুমাত্র ঝুট শব্দটি প্রধানত মিথ্যা অর্থে, উচ্ছিষ্ট অর্থে এবং **ঝুট-ঝামেলার ঝুট** রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উচ্ছিষ্ট বা উৎসৃষ্ট কেন এঁটো হয়, সেকথা আমরা **উৎসৃষ্ট** থেকে জেনে গেছি। ঝুট শব্দের নিহিতার্থ বলছে, উৎসৃষ্টই ঝুটও বটে। কারণ তা ছিটকে গিয়ে স্থির রূপ নিয়ে টঙ্কারিত হচ্ছে। অর্থাৎ, উৎ-সৃজিত ও 'সত্তা থেকে ছিটকে গিয়ে স্থির হওয়া'র (= **ঝ**-এর) মধ্যে ক্রিয়ার স্বরূপটি একই। এমনকি **উৎসৃষ্টের** 'ট' এবং ঝট-এর 'ট', উভয়ের টঙ্কারও একই। তাই **উৎসৃষ্ট** > উচ্ছিষ্ট > এঁটো এবং ঝুট বা ঝুটা একই ব্যাপার। কিন্তু এ তো মূলকে বাদ দিয়ে সুদ নিয়ে টানাটানি! সৃষ্টকে বাদ দিয়ে উৎসৃষ্টকে নিয়ে, মূল রান্নাকে বাদ দিয়ে উপচে পড়া বাড়তি বা উদ্বৃত্তকে নিয়ে টানাটানি! সেই কারণে ঝুট মিথ্যাও বটে। আর মিথ্যা বলেই তা নানান সমস্যা তৈরি করে। সেই কারণে তা ত্যক্তের মায়া, অতএব ঝামেলার মতোই ঝুট।

ঝুড়, ঝুড়ি, ঝুড়িঝুড়ি, ঝোড়, ঝোড়া : ২. *ঝুড় = ঝু-এর (নবরূপে উত্তীর্ণ জননস্থিতের) গড়ান-উড়ান যাহাতে। ঝুড়ি = ঝুড় গতিশীল যাহাতে। ঝুড়িঝুড়ি = ঝুড়ির পর ঝুড়ি। ঝোড় = ঝুড়-এর আধার যে। ঝোড়া = ঝোড়-এর আধার যে।* ৩. **ঝুড়** = গাছের অনাবশ্যক শাখা কাটা, ছাঁটা। **ঝুড়ি** = কঞ্চি বাঁশ বা বেতের বেতি দিয়া বোনা চওড়ামুখ পাত্রবিশেষ, ঝুড়ি-পরিমিত দ্রব্য। **ঝুড়িঝুড়ি** = বহুঝুড়ি পরিমিত, প্রচুর, রাশি-রাশি। **ঝোড়** = গুল্মরাজি, লতাদিগহন, ঝোপ, স্তম্ব, গুচ্ছ, থোপ, (ঝোড়ের সাদৃশ্যে) সমুদ্রের খাড়ী, বড় নদীর খাল (creek)। **ঝোড়া** = বড় ঝুড়ি, ঝরিত জল, নিম্নাভিমুখ জলপ্রবাহ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ঝুড় শব্দের মানে এমনিতে ঠিক হৃদয়ঙ্গম হতে চায় না। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমরা একালের বাংলাভাষীর সৃষ্টি-করা 'ঝুড়-ঝামেলা' কিংবা 'ঝুট-ঝামেলা' শব্দটির মুখোমুখি হই, তৎক্ষণাৎ বিষয়টি সহজ হয়ে যায়। দ্র. **ঝুট**।

ঝৃ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ঝর, ঝরঝর, ঝরঝরা, ঝরঝরি, ঝরণ, ঝরণা(না), ঝরা, ঝরিত, ঝর্ঝর, ঝর্ঝরা, ঝর্ঝরিত, ঝর্ঝরী, ঝার, ঝারা (ধারা, দ্র. সহস্রঝারা), ঝারি(রী) ঝারিত, ঝারী, ঝির, ঝিরঝির, ঝিরঝিরানি, ঝিরিকা, ঝিরিঝিরি, ঝিরী (ঝিল্লি), ঝুর, ঝুরঝুর, ঝুরা, ঝুরি, ঝুরী, ঝুরুঝুরু, ঝৃ, ঝোর, ঝোরা।

ঝর, ঝরঝর, ঝরণ, ঝরণা(না) : ১. ✓ঝৃ + ত (অপ্‌) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ঝর = ঝ রহে যাহাতে। ঝরঝর = ঝর-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ঝরণ = ঝর অন যাহাতে। ঝরণা = ঝরণ-এর আধার যে।* ৩. **ঝর** = পর্ব্বতাবতীর্ণ জলপ্রবাহ, নির্ঝর, বারিপ্রবাহ, ক্ষরিত হওয়া, প্রবাহে বা ধারায় পতিত হওয়া, অশ্রুবর্ষণ করা, ধারারূপে নিঃসৃত হওয়া, জীর্ণ হওয়া। **ঝরঝর** = নির্ঝরাদির জলক্ষরণের বা বৃষ্টিধারাপাতের শব্দ, পাতার কম্পনশব্দ, অবিরত ক্ষরিত, অবিরত গলদশ্রু। **ঝরণ, ঝরণা, ঝরনা** = নির্ঝর, (সাদৃশ্যে) প্রবাহ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. সত্তা থেকে জনিত হয়ে বা

উপচে বাইরে বেরোনো হল **ঝ**। সেই ঝ যখন ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকে, বাইরের চোখে তা **ক্ষরণ** বা ক্ষরিত হয়ে পড়া বা **ঝরা**। এই ঝর অন (on) হতে থাকলে **ঝরণ**। বর্ণসমাজের সামাজিক নিয়মে র-এর পরে ন-এর বসার অধিকার নেই, সেখা বসে ণ। তাই ঝরন হয় না, হয় **ঝরণ**।

ঝ্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অঝর, অঝরনয়ন, অঝরনয়নে, অঝোর, অঝোরঝরণে, অঝোরনয়নে, আঝর, আঝালা, ঝ, ঝক, ঝকঝক, ঝকঝকি, ঝকঝকে, ঝকড়া, ঝকমক, ঝকমারি, ঝগড় (লগড়-ঝগড়), ঝগড়া, ঝগড়াঝাঁটি, ঝগিতি, ঝ-কার, ঝল, ঝলক, ঝলকা, ঝলকিত, ঝলঝল, ঝলমল, ঝলস, ঝলসা, ঝলসান, ঝলা, ঝল্ল, ঝল্লক, ঝল্লকণ্ঠ, ঝল্লরা, ঝষ্‌, ঝষ, ঝষা, ঝষোদরী, ঝাউ, ঝাবু, ঝাল, ঝালদার, ঝালা (বস্তা), ঝালাই, ঝালাপালা, ঝালি।

ঝক, ঝকঝক, ঝকঝকে, ঝকমক, ঝকমারি : ২. ***ঝক*** *=* ***ঝ*** *(জননস্থিতি) করে যে।* ***ঝকঝক*** *=* ***ঝক****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ঝকঝকে*** *=* ***ঝকঝক*** *দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ***ঝকমক*** *=* ***ঝক*** *ও* ***মক*** *(সীমায়ন করে যে)।* ***ঝকমারি*** *=* ***ঝক*** *মারি যাহাতে।* ৩. **ঝক** = শীঘ্রতা, ত্বরা, দীপ্তি পাওয়া, চকচক করা। **ঝকঝক** = উজ্জ্বলভাবে, দীপ্তিপ্রকাশপূর্বক, প্রভাবিস্তার। **ঝকমক** = দীপ্ত, উজ্জ্বল, চমকদার, দীপ্তিপ্রকাশ, প্রভাবিস্তার, ঝাঁঝরের শব্দ। **ঝকমারি** = মূর্খতা, বোকামি, পাগলামি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ঝক-এ রয়েছে জননস্থিতের সক্রিয়করণ। যে কোনো ইচ্ছার জননস্থিতকে সক্রিয় করাকে **ঝক** করা বলে। তবে সেই জনন যখন পঞ্চভূতের (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের) রূপ-বিষয়ক বা আলোজনক হয়, তখন আমরা তাকে দীপ্তিরূপে চিনতে পারি। **ঝকঝক** করা মানে বারংবার জনিত আলোর স্থিতিকে প্রকাশ করা। আর সে ক্রিয়া যে চালায়, তাকে বলা হয় **ঝকঝকে**। তবে সেই শেয়ালটিকে চেনেন তো, যার আঙুরফল লাভের জনিত ইচ্ছা সক্রিয় হয়েছিল বারংবার লাফ-মারায়? এ হল **ঝক-মারা**। এই ঝকমারা চলতে থাকলে তাকে বলে **ঝকমারি**।

ঝগড়, ঝগড়া, ঝগড়াঝাঁটি (লগড়-ঝগড়, রগড়-ঝগড়) : ২. ***ঝগড়*** *=* ***ঝ****-এর (জননস্থিতের) গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা ঝ-রূপী গামীর আবর্তন যাহাতে।* ***ঝগড়া*** *=* ***ঝগড়****-এর আধার যে।* ***ঝগড়াঝাঁটি*** *=* ***ঝগড়া*** *ও* ***ঝাঁটি****।* ***লগড়-ঝগড়*** *=* ***ল*** *(লালন-লয়ন) রূপী গামীর আবর্তন যাহাতে ও* ***ঝ****-রূপী গামীর আবর্তন যাহাতে।* ***রগড়-ঝগড়*** *=* ***র*** *(রক্ষণ-ভক্ষণ) রূপী গামীর আবর্তন যাহাতে ও* ***ঝগড়***। ৩. **ঝগড়** = ঝগড়া, বিবাদমূলক অপরাধ। **ঝগড়া** = বাককলহ, বিবাদ, বচসা, যুদ্ধ, লড়াই। **ঝগড়াঝাঁটি** = বিবাদ-বিসম্বাদ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. এই **ঝ**-এর বেলায় জননস্থিতটি গ্রহণেচ্ছার। সে যখন কারও দিকে **আবর্তিত** হয়ে হয়ে এগোয়, অর্থাৎ গড়িয়ে বা উড়ে চলে, তখনই **শুরু হয় ঝগড়**। যে আচরণে এই ঝগড় থাকে, তাকে বলে **ঝগড়া**। **ঝ**-এর গড়ান-উড়ান যার দিকে এগোয়, সে যদি বিরোধিতা করতে **শুরু** করে, তখন **শুরু** হয় **লগড়** বা **রগড়**। এই রগড়-ঝগড়ের ভিতর দিয়েই কৌরব-পাণ্ডবের ইতিহাস যেমন এগোতে থাকে, তেমনি আমেরিকা-কিউবার ইতিহাসও এগোতে থাকে।

ঝল, ঝলক, ঝলকা, ঝলকিত, ঝলঝল, ঝলমল, ঝলস, ঝলসা, ঝলসান : ২. ***ঝল*** *=* ***ঝ****-এর লালন-লয়ন যাহাতে।* ***ঝলক*** *=* ***ঝল*** *করে যে।* ***ঝলকা*** *=* ***ঝলক****-এর আধার যে।* ***ঝলকিত*** *=* ***ঝলক*** *গতিশীল হয়ে তারিত যাহাতে।* ***ঝলঝল*** *=* ***ঝল****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ঝলমল*** *=* ***ঝল*** *ও* ***মল*** *(সীমায়ন লালিত যাহাতে)।* ***ঝলস*** *=* ***ঝল****-এর অস্তিত্ব থাকে যাহাতে।* ***ঝলসা*** *=* ***ঝলস****-এর আধার যে।* ***ঝলসান*** *=* ***ঝলস*** *অন যাহাতে।* ৩. **ঝল** = দীপ্তি পাওয়া। **ঝলক** = অগ্নিশিখা, দীপ্তি, শোভা, জলাদির উচ্ছলন (উছলান), এক-এক বার বেগে নিঃসৃত রক্তরাশি, দীপ্তি বা প্রকাশ পাওয়া, শোভা পাওয়া, উছলিয়া পড়া। **ঝলকা** = অগ্নিশিখাতুল্য। **ঝলকিত** = প্রভাযুক্ত, দীপ্ত, তেজোময়। **ঝলঝল** = উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, চমক, দীপ্তি পাওয়া, চমকান। **ঝলমল** = দীপ্তি, প্রভাবিস্তার, জ্যোতিঃপ্রকাশ, চমৎকারিত্ববৃদ্ধি, শোভাবিস্তার, সৌন্দর্যবিকাশ। **ঝলস** = দীপ্তি, প্রভা, দীপ্তিযুক্ত, সমুজ্জ্বল, তীব্রালোকস্পর্শে অন্ধীভূত, ধাঁধা-লাগা, দীপ্তি পাওয়া, চকচক করা, দগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ করা, তীব্রালোকে অন্ধপ্রায় করা। **ঝলসা** = অর্দ্ধদগ্ধ করা, তীব্রালোকে অন্ধপ্রায় হওয়া, ধাঁধা-লাগা হওয়া। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. মূল সত্তাটি এক্ষেত্রে খুবই পরিচিত — জ্বল। তার থেকে জনিত শিখা হল **ঝল**। সেই ঝল গায়ে লাগলে আমরা **ঝলক**-কে টের পাই। সেই ঝলকের আধার হল **ঝলকা**। কিন্তু শিখা বাদ দিয়ে শুধু যদি তাপটুকু গায়ে লাগে, তখন **জ্বলা** বাদ পড়ে যায়, জ্ + হ্ মিলে যে **ঝ** হয়, তার জ্ বাদ পড়ে, থেকে যায় **হ্**। ফলে সেই তাপটুকু হয়ে যায় আগুনের **হলকা**।

ঝাল, ঝালা : ২. ***ঝাল*** *=* ***ঝল*** *হইতে জাত।* ***ঝালা*** *=* ***ঝাল****-এর আধার যে।* ৩. **ঝাল** = জ্বালাতুল্য জ্বালাকর স্বাদ, কটুস্বাদ ফলবিশেষ, লঙ্কা, ঝালের ব্যঞ্জন, লঙ্কা-মরিচের বাটনা, তেজ, জ্বালা, দাহ, ক্রোধ, ক্রোধজন্য গাত্রদাহ, তীব্রতা, কিরণ, উত্তাপ, অগ্নির উত্তাপ বা আঁচ, আগুনের ঝালে ধাতুদ্রব্য বা তাহার ছিদ্রাদি পান দিয়া জোড়া (soldering), পঙ্কোদ্ধারপূর্ব্বক কূপাদি সংস্কার করা, ধাতুদ্রব্য ... জোড়া। **ঝালা** = কূপাদি বা ধাতুদ্রব্য সংস্কার করান, সংস্কার করা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. জ্বলন থেকে জন্মালেও **ঝাল** শব্দটি বেশ মজার। লঙ্কার ঝাল আমরা খাই, বাঙালীর ব্যঞ্জনে ঝাল থাকে। আবার কাঁসাপিতলের হাঁড়িতে ফুটো হয়ে গেলে আমরা ঝাল দিই, কূপ ঝাল দিই বা ঝালাই করি, এমনকি সিউনিঝালে (সেচন-ঝালে) জল সেচন করি। এই ঝালগুলির প্রথম দুটি বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। জ্বলন বা জ্বালা রয়েছে লঙ্কায়, রয়েছে কাঁসাপিতলের ছিদ্রাদির soldering-এ। কিন্তু কূপ-সারাই, বা জলসেচনের খালকে কেন যে **ঝালাই** বলে, সে কথা কিছুতেই বোধগম্য হয় না।

ট

ট্ বর্ণের অর্থ : ট্ বর্ণটি 'ট্-অন' ক্রিয়ার ধারক। একে টঙ্কার বলা হয়ে থাকে। এর স্বরূপ হল — ধরা যাক, x-বিন্দুতে রয়েছে অস্তিত্ব, তার রয়েছে কিছু স্বভাব এবং সেই স্বভাবের কারণে তার থেকে কিছু না 'কিছু'র উদ্ভব ঘটে। আর, y-বিন্দুতে রয়েছে এমন সত্তা যেখানে সেই স্বভাবজাত 'কিছু' যেতে চায়। সেই চাওয়া অতএব y-বিন্দুর দিকে চলতে শুরু করে এবং একসময় সেখানে গিয়ে পৌঁছে যায়, ধাক্কা মারে, আটকে যায়। একে বলে 'ট্-অন' করা বা টঙ্কারিত হওয়া। অর্থাৎ একদিকে রয়েছে অস্তিত্বের স্বভাবজাত সত্তা, অন্য দিকে রয়েছে সেই সত্তা যেখানে গিয়ে পৌঁছায় সেই স্থানে পৌঁছে ধাক্কা মারা। দুটির যোগ ঘটে টঙ্কারে। তাহলে তো ইতোপূর্বে ক বর্ণে 'কারী' রূপে যেমন একজন সত্তাকে আমরা পেয়েছি, **ট** বর্ণে 'ট-কারী' বা 'টঙ্কারী' রূপে একটি সত্তাকে আমরা পাচ্ছি, যে কিনা 'আত্মপ্রকাশকারী'ও বটে। এই আত্মপ্রকাশক-টঙ্কারী পঞ্চভূতের যে কেউ এবং তার যে-কোনো ক্ষুদ্রাংশ হতে পারে। সংক্ষেপে এও বলা যায় — **ট** = আপন অস্তিত্বের জানান দেয় যে। এই ক্ষুদ্রাংশ একটি কোষ হলে তাকে মনে মনে বেশ বড় করে নিয়ে একটি বৃত্তরূপে ভাবুন, যার কেন্দ্র থেকে উর্ধ্বমুখী ক্রিয়া (ধরা যাক জলের ধারা) উত্থিত হয়ে সর্বদিকে পরিধিতে গিয়ে ধাক্কা দিচ্ছে। একে বলে 'পরিপূর্ণতাজন্য উচ্ছলিতভাব'। (দ্র. **টল, ঢল**)। বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধিতে পৌঁছোনো সমস্ত ব্যাসার্দ্ধের মুখে যদি তীর চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলেই ব্যাপারটিকে রেখাচিত্রে খানিকটা হলেও দেখানো যায়। এইভাবে যদি একটি জীবকোষের ক্রিয়াফল তার পরিধিতে পৌঁছায়, সেটিই কোষটির 'ট'-করা। মানুষের ক্ষেত্রে এটি পৌঁছায় তার মাথায়, তার কানের বহির্গমন ছিদ্রে। একে বলে কান কট-কট করা। যা কটকট করে, তাকেই **টক** বলে। দ্র. **টিম**। দ্র. **ক**।

তবে ং-যোগে ট-এর রূপটি একটু ভিন্ন। 'রেগে টং', কিংবা 'নেশায় টং হয়ে থাকা', অথবা গ্রামের লোকেরা যেমন বলেন, 'বুড়োটা তো এখনও টংক আছে গো', 'এখনও টনটনে জ্ঞান আছে' — এই সব বাক্যে টং (টঙ্, টঞ্, টণ্, টন্, টম্) শব্দের যে অর্থ, তাকেও 'টং-কার' বলা চলে। টং-এ ওঠা আর তুঙ্গে ওঠা একই কথা। যেনবা তুঙ্গই টঙ্গ হয়ে গেছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি, হিন্দি, মারাঠী, মৈথিলীতে ত-বর্গ ও ট-বর্গ নানাভাবে স্থানবদল করেছে। ইংরেজিতে তো শুধুই ট, ত-বর্গটিই নেই; ফলে তাদের ভাষার প্রায় সমস্ত ত-বর্গীয় শব্দই ঢুকে গেছে এই ট-বর্গে। (তৃ = tree)। ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটেছে ফরাসি, ইটালীয়, জাপানি প্রভৃতি ভাষার বেলায়। তাদের ট-বর্গের সবই ঢুকে রয়েছে ত-বর্গে। বঙ্গীয় শব্দকোষ দেখিয়েছেন, 'ট-বর্গ ও ত-বর্গ স্পর্শবর্ণ; আভ্যন্তর প্রযত্ন ও অভিন্ন করণ হেতু উভয় বর্গের যে অন্তরতমভাব আছে, তাহাই এই বর্ণবিনিময়ের কারণ, বোধ হয়।' আমরা দেখছি প্রতি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে মূল করণগুলিকে সাজিয়েছিলেন আমাদের সংস্কৃতকারগণ। ক গ চ জ ট ড ত দ প ব এই বর্ণগুলিতে তাঁরা যথাক্রমে করণ, গমন, চয়ন, জনন, টঙ্কারণ, ডয়ন, তরণ, দান, পালন, বর্দ্ধন, এই দশটি মূল ক্রিয়ার ধারক রূপে চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে টঙ্কারণ, ডয়ন, তরণ যেনবা একই ক্রিয়া তিনভাগে বিভক্ত। (দ্র. **বর্ণ**)। **টঙ্কারণ হল** — যেন একজন নিজেই নিজের পরিধিতে ঘুরছে, নিজের ভিতরেই নিজে রয়েছে কিন্তু যেনবা একটা ঘোরের মধ্যে স্ব-আত্মায় স্থিত। উড়ে যাওয়ার আগে ধুলোঘূর্ণি যেমন নিজের চারদিকে ঘোরে, অনেকটা সেইরকম। তারপরই তার ডয়ন বা উড্ডয়ন। সেই উড্ডয়ন দুরকম, সোজা এবং আবর্তনশীল। সোজা ডয়ন ড-বর্ণে এবং আবর্তনশীল ডয়ন ড়-বর্ণে চিহ্নিত। এই ডয়ন যখন লতার মতো চলে বা সাঁতারের মতো এগিয়ে চলে, তখন তাকে তরণ বলে। এর মধ্যে ডয়ন ও তরণ বোঝা গেলেও টঙ্কারণকে বুঝতে হয় ডয়ন-তরণের ঠিক আগের অধ্যায় রূপে। একে আমরা **উৎগমনোন্মুখ সত্তা** বলতে পারি। কিন্তু এর মূল ক্রিয়াটি নিজেকে কেন্দ্র করে নিজের চারদিকে এমন ঘূর্ণমানভাবে স্থিত যে, যেকোনো সময় তা উড়ে যেতে পারে। একে আত্মকেন্দ্রিক-ঘূর্ণমান উন্মুখ সত্তা বললে খানিকটা ঠিক বলা হয়। এই সত্তাকে আমরা টঙ্কারণ শব্দে চিহ্নিত করছি। অতএব — **ট** = ট্-অন করে যে; টঙ্কারী।

মনে রাখা ভাল, রসায়ন শাস্ত্রের Periodic Table-এর মতো ভাষা-সংস্কারক সংস্কৃতকারগণ অঙ্ক কষার মতো বর্ণগুলির স্থান নিরূপণ করে, সাত-পাঁচে পঁয়ত্রিশের কোন কোন ঘরে কোন কোন বর্ণ রয়েছে, তা বিস্তারিত করেছিলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত জনসাধারণ্যে ছ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, থ, ফ, শ, ষ, হ, ক্ষ প্রভৃতি বর্ণের ব্যবহার তেমন করে প্রচলিত হয়নি। বলতে কী, সংস্কৃত-সৃষ্টির কালে (খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০-৫০০) ঠ, ঢ, থ বর্ণ দিয়ে কোনো শব্দই ছিল না। ঠ বর্ণে একটি মাত্র শব্দ পাওয়া যায় 'ঠক্কুর'; তাও অর্বাচীন সংস্কৃত। মোট কথা উপরোক্ত বর্ণগুলিতে সংস্কৃত শব্দ খুবই কম; এতে যা সব শব্দ বর্তমানে পাওয়া যায়, সেগুলি জন্মেছে পরে পরে বিশেষত বাংলাভাষার স্বর্ণযুগে (মধ্যযুগে)। এই যে বিবর্তন, এটি সংস্কৃত-পরবর্তী বিবর্তন এবং এগুলি পরবর্তীকালের মৌলবাদী সংস্কৃতের চক্ষুশূল ছিল। সেকারণেই, বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভকালে কোনো কোনো অঞ্চলে ট-বর্গের সকল বর্ণ ও শ, ষ, হ, ক্ষ সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। এ তথ্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত 'বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন?' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে জানা যায়। দ্র. **বর্ণ, ভাষা**।

তা সে যাই হোক, আপাতত শব্দার্থ নিষ্কাশনের কাজ চালানোর জন্য আমরা খুব নমনীয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি এভাবে — **ট** = *ট্-অন্ (on) করে যে = টঙ্কারী = আত্ম-অস্তিত্ব-ঘোষণাকারী; ট-এর আধার যে =* ***টা****; ট গতিশীল যাহাতে =* ***টি****; টি-এর আধার যে =* ***টী****; ট নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে =* ***টু****; টু-এর আধার যে =* ***টূ****; ... ইত্যাদি। দ্র.* ***ক***।

এখানে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার। ট-বর্গের থেকে যেসকল শব্দ-পরিবারের ও সেই পরিবারের সদস্যদের জন্ম হয়েছে, তাদের অধিকাংশ শব্দই বাংলাভাষার স্বর্ণযুগের অর্থাৎ মধ্যযুগের নিজস্ব সৃষ্টি। এগুলিকে আধুনিক বাংলাভাষা ও অ্যাকাডেমি সসম্মানে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেনি। তার কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার কুপ্রভাব। অথচ গ্রামবাংলায় ও সাধারণ বাংলাভাষীদের মধ্যে শব্দগুলি ব্যাপক

ভাবে প্রচলিত। প্রচলিত ভাষাকে সংস্কার করে যখন সংস্কৃত ভাষা সৃজন করা হয়, তখনকার প্রচলিত ভাষায় ঘ, চ, ছ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, থ, ফ বর্ণের ধারায় খুব বেশি শব্দের জন্মই হয়নি। ফলে এই বর্গগুলির অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। সেগুলির জন্ম হয়েছে মধ্যযুগে। মধ্যযুগের সাহিত্যে এই বর্গগুলি থেকে জাত শব্দের বিপুল ব্যবহার দেখা যায়। ট-এর শব্দ পরিবারগুলি ও তাদের সদস্যসমূহ সেকারণেই বাংলাভাষার নিজস্ব সৃষ্টি, বাঙালীর নিজস্ব উত্তরাধিকার।

ট বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : *টং (টঙ্ক), টক্, টপ্, টল্, ট্* = ৪ + ১

***টং (টঙ্ক)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : একটা, একটি, একটু, -ট, -টা, -টি, -টু, টং, টংয়সটংয়স, টঙ্ক, টঙ্কক, টঙ্কণ, টঙ্কপতি, টঙ্কশালা, টঙ্কবিদ্যা, টঙ্কা, টঙ্কার, টঙ্কারণ, টঙ্কারী, টঙ্কিণী, টঙ্গ, টঙ্গি(ঙ্গী), টঙ্গণ, টঙটঙ, টণ্ডু, টন, টনক, টনটন, টনটনে, টনটান, টনাৎ, টনিক, টমটম, টমটমি, টয়া, টয়ে, টাঁক, টাঁকশাল, টাঁকসাল, টাঁগ, টাঁগন, টাক, টাকা, টাঙন, টাঙান, টাঙ্গ, টাঙ্গন, টাঙ্গা, টাঙ্গান, টাঙ্গি, টাঞ্জি, টান, টানা, টানকচু, টাননি, (টানুনি), টানমান, টানল (টানেল, tunnel), টানা, টানাটানি, টানাপড়েন (দ্র. **পঠ**), টিপ্তিশ, টিন, টিম (টাইম, time), টিমটিম, টিয়া, টিয়ে, টুং, টুংটাং, টুঁই, টুঁটি, টুঁ-শব্দ, টুঙি, টুঙ্গি, টুঙ্গী, টুনটুন, টুনটুনি, টুনি, টেংরা, টেঁক, টেঁকখোর, টেঁকসই, টেঁকশাল, টেঙা, টেঙ্গরা, টেনা, টেমাই, টেমি, টোং, টোঙ্গ, টোন, টোনা, টোনিয়া, ট্যাংটাঙে, ট্যাঁ, ট্যাঁক, ট্যাঁস, ট্যাঙ্গট্যাঙ্গ, ট্যাঙ্গনা, ট্যামটেমী।

টং (টঙ্ক) = টঙ্কারের রহস্যরূপ যাহাতে। **টঙ্ক** = টঙ্কারের রহস্যরূপ (সক্রিয়) করে যে।

ট, টা (টায়-টায়), টি, টু (একট, একটা, একটি, একটু) : **২.** *ট = টঙ্কারণ থাকে যাহাতে (সাময়িক-পূর্ণ আত্মস্বরূপে আত্মকেন্দ্রিক ঘূর্ণায়মানতায় স্থিত যে)।* ***টা*** *= ট-এর আশ্রয় যাহাতে। (টায়-টায় = টা-গতিশীল হয়ে স্থিত হয় যাহাতে, তাহার পুনরাবৃত্তি)।* ***টি*** *= ট গতিশীল যাহাতে।* ***টী*** *= টি-এর আধার যে।* ***টু*** *= ট নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **৩. ট** = বামন, চতুর্থাংশ, জ্যাধ্বনিবৎ শব্দ; বাংলায় অনুধ্বনিজাত শব্দের আদিবর্ণ। **টা** = **খণ্ড**, টুকরা, সংখ্যার পরে তৎসংখ্যাবাচক, ... অনাদরে, ...; **অল্পতা** ...। **টি (টী)** = আদর, স্নেহ, সস্নেহ অনুকম্পা, সবিশেষ নির্দেশ, **অল্পতা**, সংখ্যার পরে কেবল তৎসংখ্যক। **টু** = অত্যল্প, কিঞ্চিৎ, লুকাচুরি খেলায় সাড়া, ফাঁকি। (ব.শ.)। **৪.** one piece অর্থে প্রচলিত। **৫. দ্র. খণ্ড, খান, গোটা**। এক চামচ জল আর সারা সমুদ্রের জল — স্বাদ ও সংগঠন একই। এরকম হলে সেই খণ্ডের ভেতরেও একপ্রকার অখণ্ডভাব বা পূর্ণতা থাকে। খণ্ডের ভিতরে এভাবে অখণ্ডের ভাব থাকলে, সে খণ্ড হয়েও একপ্রকার পূর্ণতার অধিকারী। এইরকম পূর্ণতা যার থাকে, তা খণ্ড হলেও তাতে গামীর টঙ্কার থাকে, টঙ্কারী থাকে; তাই তাকে **গোটা** বলা যায়। তাছাড়া প্রতিটি অস্তিত্বের একপ্রকার সাময়িক-পূর্ণতা তো থাকতেই পারে। অস্তিত্বের নিজের বাড়বৃদ্ধি সেই পূর্ণতায় পৌঁছে উপচে পড়ার ভাব হলে আমরা বলি **'টায়-টায়'** অর্থাৎ প্রায় পূর্ণ।

যেভাবে হোক না কেন, একটি খণ্ডকে সম্পূর্ণ রূপে বোঝাতে **ট, টা, টি, টু, টো** শব্দের বিপুল ব্যবহার হয় বাংলা ভাষায়। এটি কোথা থেকে কীভাবে এল, তা নিয়ে বিস্তর সংশয় আছে বাংলা অভিধানকারগণের। সংসদ বাংলা অভিধান 'টু' শব্দটিকে পৃথকভাবে সারণিতে রাখেননি। আমরা দেখছি, যা-কিছু খণ্ডমাত্র, তা বোঝাতে টা, টি, টু-এর বিপুল ব্যবহার। এর মধ্যে কিছু নিয়ম যে কাজ করে, তা আমরা বুঝতে পারি যখন সময় (একটু সময়) বোঝাতে **টু**-ব্যবহার হয়, কিন্তু টা বা টি-র (একটি সময়) ব্যবহার হয় না। আবার, বারের বেলায় টি (একটি বার) ব্যবহার হয়, কিন্তু টু-র (একটু বার) ব্যবহার হয় না। শুধু তাই নয়, উ-কারের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, তা বাইরে থেকে সত্তার কাছে আসে। (দ্র. **টুক**)। এই টু-এরই বিপুল ব্যবহার হয় ইংরেজি ভাষায়, to রূপে। আরও লক্ষ্যনীয় এই যে, মেয়েদের ভাষা ব্যবহারে টি-র ব্যবহার বেশি; যখন কিনা পুরুষের ভাষা ব্যবহারে টা-র ব্যবহার বেশি। টি-এর মধ্যে যাকে দেখা যায়, সে যেন একটি বৃত্তরূপী সত্তার কেন্দ্র ক্রমে **উর্ধ্বে** উঠে আপন সামগ্রিক অস্তিত্ব ঘোষণা করছে, সদর্পে টিকে আছে, খাড়া আছে। **৬.** ইংরেজি to।

টং, টংয়সটংয়স (টঙ্গসটঙ্গস) : **২.** *টং = ট-এর রহস্যরূপ থাকে যাহাতে।* ***টংয়সটংয়স*** *= টং-এর হাঁটা-অস্তিত্ব (চলমান অস্তিত্ব) থাকে যাহাতে, তাহার পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***টঙ্গসটঙ্গস*** *= টং-এর গামী অস্তিত্ব থাকে যাহাতে।* **৩. টং** = কাঁসিবাদ্যের শব্দ, টিকারাবাদ্যের শব্দ, বাজাঘড়ির শব্দ, দৃঢ়, তুঙ্গ স্থান, মাচা, শস্যরক্ষকের ক্ষেত্রমধ্যস্থ মাচা, পায়রার উচ্চখোপ, কপোতপালিকা। **টংয়সটংয়স** = দুর্ব্বলতা হেতু গমনে ঠেঙে ঠেঙে (জঙঘায়-জঙঘায়) লাগার ভাব, নেঙড়াইয়া হাঁটার ভাব। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. টং** হল ট-এর বা টঙ্কারীর রহস্যরূপ। সে রূপ নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। হ্যাঁ, কাঁসা-পিতলে আঘাত লাগলে সে তো 'টং' আওয়াজের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেই; তবে তার আত্মপ্রকাশের আরও অনেক রূপ রয়েছে। চারিদিকে জলময়, মাঝে জলের ওপরে জেগে রয়েছে একটি মাচাঘর; সেটিও **টং**। ছাদের উপরে **চিলে**কোঠা ঘরও **টং**। এরকম আরও অনেক প্রকার **টং** রয়েছে। কারও নেশা, ক্রোধ, বিরাগ ইত্যাদি তার 'মাথায় উঠে' গিয়ে টঙ্কারী রূপে দেখা দিলে, আমরা বুঝতে পারি সে **'টং'** হয়ে রয়েছে। তবে, এগুলির অধিকাংশই **টঙ্ক, টঙ্গ** এবং **তুঙ্গ** ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত রূপই বটে। এর মধ্যে **টংয়সটংয়স** শব্দটি দৃশ্যত **টঙ্গসটঙ্গস** শব্দেরই একটি অন্যরকম রূপ বলেই মনে হয়। কিন্তু বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সে পার্থক্য হল **হাঁটা** (য়) ও **গমন**-এর (গ-এর) মধ্যেকার পার্থক্য। দ্র. **ই**। **৬.** ইংরেজি twang।

টঙ্ক, টঙ্কক, টঙ্কণ, টঙ্কশালা, টঙ্কবিদ্যা, টঙ্কা : ১. টঙ্ক = ✓টঙ্ক্ (বন্ধন) + অ (ঘঞ্, অচ্)। (ব.শ.)। **২. *টঙ্ক*** = *টঙ্কারীর রহস্যরূপ (= টং) প্রকাশ করে যে। **টঙ্কক** = **টঙ্ক** করে যে। **টঙ্কণ (টঙ্কন)** = **টঙ্ক** অন যাহাতে। **টঙ্ককশালা (টঙ্কশালা)** = **টঙ্কক**-এর **শালা**। **টঙ্কবিদ্যা (টঙ্ককবিদ্যা)** = যাহা হইতে **টঙ্কক** বিষয়ে বিদিত হওয়া যায়। **টঙ্কা** = **টঙ্ক**-এর আধার যে। /* **টঙ্কণ, টঙ্কন** = যাহার দ্বারা বন্ধন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. টঙ্ক** = পাষাণভেদন অস্ত্র, পরশু, টাঙি, খনিত্র, খড়্গ, খড়্গাকোষ, পর্ব্বতের উন্নত প্রদেশ, ঠ্যাঙ, নীলকপিত্থ, মুদ্রা, টাকা, চারি মাষা পরিমাণ, সোহাগা, গর্ব্ব, ক্রোধ, ছেদ, শক্ত, অপক্ব, কাঁচা, স্থায়ী, মজবুত, কষ্টসহিষ্ণু, পরিপক্ব, ঝানু। **টঙ্কক** = মুদ্রা, টাকা। **টঙ্কণ** = দেশবিশেষ, অশ্ববিশেষ, টাঙ্গন ঘোড়া, সোহাগা, ধাতুযোজনবিশেষ, পান দিয়া ঝালা, বন্ধন। **টঙ্কশালা** = টাঁকশাল, মুদ্রা প্রস্তুত করার স্থান (mint)। **টঙ্কবিদ্যা** = মুদ্রাজ্ঞানশাস্ত্র। **টঙ্কা** = জঙঘা। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** যা-কিছু অন্য কোনো-কিছুতে গিয়ে ঠেকে বা আঘাত করে, টং করে তার গায়ে লেগে যায়, হয়তো তাতে 'টং' করে আওয়াজও হয় কিংবা হয় না, তা সবই **টঙ্ক** পদবাচ্য। তা উপরোক্ত 'পাষাণভেদন অস্ত্র' থেকে 'ঝানু' পর্যন্ত অনেককিছুই হতে পারে। তবে নীলকপিত্থ বা নীল কৎবেল ঠিক কাকে বলে, আমরা জানি না; স্বভাবতই তা 'টং করে' কি না তাও জানা নেই। তবে, উপরোক্ত প্রতীকী অর্থগুলির ভিতরে কোনো না কোনো ভাবে **টঙ্ক**-ক্রিয়াকারী রয়েছে, তা আমরা জানি চাই না-জানি; কিন্তু আমাদের পূর্বসূরী শব্দসৃজনকারীগণ জানতেন এবং সেকারণেই ঐ নামে তাদের চিহ্নিত করেছিলেন। আর **টঙ্কা** শব্দের অর্থে যে জানু বা জঙঘা বলা হয়েছে, তা আমরা **টঙ্গা** বা **টাঙ্গ**-তেও পাই। একে **টাংগ, ঠ্যাংগ, ঠ্যাঙ** ইত্যাদিও বলা হয়ে থাকে। দ্র. **টঙ্গ**। **৬.** ইংরেজি twang।

টঙ্কার, টঙ্কারণ, টঙ্কারী, টঙ্কিণী : ২. *টঙ্কার* = ***টঙ্কা*** *রহে যাহাতে; অথবা, **টং** করে যে, তাহার আধার রহে যাহাতে। **টঙ্কারণ** = **টঙ্কার** অন যাহাতে। **টঙ্কারী** = **টঙ্কার**-এর গতিশীল আধার যে। **টঙ্কিণী** = **টঙ্ক**-কে গতিশীলরূপে ধারণ করে যে।* **৩. টঙ্কার** = 'টম্' এই শব্দ, ধনুর্গুণশব্দ, জ্যাধ্বনি, ধ্বনি, বিস্ময়হেতুক শব্দ, প্রসিদ্ধি, ধনুর্গুণ টানিয়া ধ্বনিত করা, টঙ্ক বা টাকা টং করিয়া বাজান বা ঝুনান। **টঙ্কারণ** = টঙ্কারকরণ, গুণাকর্ষণ। **টঙ্কারী** = টঙ্কারকারী, টঙ্কারযুক্ত। **টঙ্কিণী** = টঙ্কধারিণী, অসিধারিণী কালী। (ব.শ.)। **৪.** 'ধনুর্গুণশব্দ' রূপে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **টাকা**।

টঙ্গ, টঙ্গি, টঙ্গী, টঙ্গণ, টঙ্গন : ২. *টঙ্গ* = ***টং*** *গত হয় যাহাতে। **টঙ্গি** = **টঙ্গ** গতিশীল যাহাতে। **টঙ্গী** = **টঙ্গি**-র আধার যে। **টঙ্গণ, টঙ্গন** = **টঙ্গ** অন যাহাতে।* **৩. টঙ্গ** = পরশুবিশেষ, খনিত্র, জঙঘা, ঠ্যাঙ, টঙ্কন, সোহাগা, চার মাষা পরিমাণ। **টঙ্গি, টঙ্গী** = জলের মধ্যস্থ উচ্চ বিলাসগৃহ, জলটুঙ্গি, উচ্চ বিলাসভবন, শয়নমন্দির, প্রাসাদ চূড়াস্থ গৃহ, বলভী। **টঙ্গণ, টঙ্গন** = টঙ্কণ, সোহাগা। **৪.** গ্রামাঞ্চলে জলটুঙ্গি শব্দটি প্রচলিত, যাকে 'টুঙি'ও বলা হয়ে থাকে। **৫.** পরশু বা কুঠার দিয়ে কাঠ বা পাথরে আঘাত করা হয়। অর্থাৎ এর মাধ্যমে টঙ্কারী কাঠে বা পাথরে গমন করে থাকে। সেই কারণে তাকে টঙ্গ বা টাঙ্গী বা টাঙী বলা হয়। যে কোনো উচ্চস্থান বোঝাতে টঙ্গ বা টং বলা হয়, টঙ্কারী সেখান থেকে আত্মপ্রকাশ, আত্মপ্রচার, আত্মঘোষণা করতে পারে বলেই। চারিদিকে জল, মাঝে একটি স্থান উঁচু হয়ে থাকলে, তাতে টঙ্কারীর বা ট-এর রহস্যরূপ (মাছ-পাহারাদারের, বিলাসী মানুষের ... ইত্যাদির) ঘোষিত হবেই। ... দ্র. **টাঙ্গ**।

টাঙ্গ (টাঁগ), টাঙ্গন (টাঁগন, টাঙন), টাঙ্গা (টাঙা), টাঙ্গান (টাঙান), টাঙ্গি (টাঙি) : ২. *টাঙ্গ* = ***টঙ্গ*** *হইতে জাত। **টাঙ্গন** = **টাঙ্গ** অন যাহাতে। **টাঙ্গা** = **টাঙ্গ**-এর আধার যে। **টাঙ্গি (টাঙ্গী)** = **টাঙ্গ** গতিশীল যাহাতে (তাহার আধার)।* **৩. টাঙ্গ** = টঙ্ক, কুঠারবিশেষ, পরশু, ঝুলাইয়া বাঁধা, টানান, লটকান, খাটান; জঙঘা। **টাঙ্গন** = দোলন, ঝুলন; পর্ব্বতীয় অশ্ববিশেষ, পাহাড়ী টাটু। **টাঙ্গা** = ঝুলাইয়া বাঁধা, টানান, লটকান ... ইত্যাদি। **টাঙ্গান** = ঝুলাইয়া বাঁধা ইত্যাদি। **টাঙ্গি, টাঙ্গী** = ক্ষুদ্র টঙ্ক, কুঠারিকা, কুড়ালী। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. টঙ্গ** বলতে এমন স্থান বোঝায় যেখানে টঙ্কারীর রহস্যরূপ গমন করে থাকে। সাধারণভাবে এটি এমন কোনো উঁচু বা স্পষ্ট স্থান-কাল-পাত্রকে বোঝায়, যা সবার আগে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়-র কারও না কারও চোখে পড়ে। তার থেকে জাত সত্তাকে **টাঙ্গ** বলে। **টঙ্গ** (বা টং) থেকে ঝোলানো যে কোনো অস্তিত্বই **টাঙ্গ** পদবাচ্য, তা সে ঘরের টং থেকে কাপড় ঝোলান হোক আর কোমরের নীচে দু'খানা **টাঙ্** (ঠ্যাং) ঝোলানই হোক। তাই ঝোলান মাত্রেই টাঙ্গান, কারণ তাতে **টাঙ্গ** অন হয়ে থাকে। এই **টাঙ্গ** বা **টাংগ** হল সেই বস্তু 'যার দ্বারা (আমাদের) গমন সম্ভব' হয়। তবে কিনা, শারীরিক গমনের উত্তরাধিকারটি রয়েছে হিন্দিভাষীদের হাতে **টাং** (পা) রূপে; এবং মানসিক (বাক্যের) গমনের উত্তরাধিকারটি রয়েছে ইংরেজিভাষীদের হাতে tongue রূপে (যার মানে জিভ হয়, ভাষাও হয়); আর, আমরা বাংলাভাষীরা পেয়েছি **ঠ্যাং**। মনে রাখা ভাল, ইংরেজি tongue-এর উচ্চারণ **টাং** ও **ঠ্যাং**-এর মাঝামাঝি।

আবার পরশুবিশেষকে টঙ্গ ও টাঙ্গী (টাঙ্গি) বলে এইজন্য যে, যখন তাকে তার 'অন্যকে গিয়ে আঘাত করা'র দিক থেকে দেখে নামকরণ করা হয়, তখন তাকে বলে টঙ্গ; আর যখন ঝুলে-থাকার দিক থেকে তার নামকরণ করা হয়, তখন তাকে বলা হয় টাঙ্গী। আর, টাঙ্গন বা পাহাড়ী ঘোড়াকে বা টাটু ঘোড়াকে বোঝায় বলেই, ঘোড়াগাড়িকে বলে টাঙ্গা। আর, ঘোড়ার চাল টঙ্কারীর স্পষ্ট প্রকাশ তো বটেই। **৬.** ইংরেজি tongue।

টন, টনক, টনটন, টনটনে (টনিক) : ২. *টন* = ***টূ*** *অন যাহাতে। **টনক** = **টন** করে যে। **টনটন** = **টন**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। **টনটনে** = **টনটন** দিশাগ্রস্ত যাহাতে। (**টন** = **টন** গতিশীলকৃত যাহাতে)।* **৩. টন** = তৃণ, ওজনবিশেষ, কুড়ি হন্দর (ton)। **টনক** = 'টনক্' ভক্তের স্মরণে দেবতার কপালের যে শিরা টনটন করে, নিপুণ (টন্‌কো)। **টনটন** = ঘণ্টাধ্বনি, টানটান হেতু যন্ত্রণাবোধ, টানের জন্য পীড়াবোধ, বেদনাজন্য পীড়াবোধ। **টনটনে** = আধেয়ের আধিক্যে টানটান বা অতিস্ফীত, সম্পূর্ণ, অবিকৃত, বিশুদ্ধ, নিখুঁত।

টনিক = বলকর ঔষধ (tonic)। (ব.শ.)। **৪.** প্রদত্ত প্রতীকী অর্থে শব্দগুলি প্রচলিত। **৫. ট** বর্ণটির অর্থে আমরা দেখেছি, টঙ্কারী নিজের মধ্যে একপ্রকার পূর্ণতা পেয়ে নিজেকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করে বলে তাকে **ট** বলে। পাশ্চাত্যের ভাষায় বললে 'I *t*hink, I *t*ell, I s*t*ay ..., therefore I am' — এই কথাটি বলছে এই 'ট'-সত্তাটি। (দ্র. **টা, টি**।) সে যখন অন (on) হয়ে থাকে তখনই **টন**। দীর্ঘ ইংরাজ-সংস্পর্শে বাংলা ভাষা যে কয়েকটি ইংরেজি শব্দকে ট-শব্দবংশের সদস্যরূপে কমবেশি চিনতে পেরে আপন করে নিয়েছিল, ton ও tonic তাদের মধ্যে দুটি। তবে এগুলি **তন** ও **তনিক (তনিকা)** শব্দের সগোত্রও হতে পারে। **৬.** ইংরেজি tone, tonic।

টান, টানা, টানাটানি, টানাপড়েন (টানেল, টেনা) : ২. *টান* = *টন হইতে জাত। **টানা** = টান-এর আধার যে। **টানাটানি** = টানা ও টানি (দ্র. **কেশাকেশি**)। **টানাপড়েন** = যাহা টানায় ও পড়ন-এ বিস্তারিত। **টানেল (টানল)** = টান লালিত (লয়প্রাপ্ত) হয় যাহাতে। **টেনা** = দিশাগ্রস্ত **টানা** যাহাতে।* **৩. টান** = নীরস, কর্কশ, কড়া, কোপন, উগ্রবীর্য্য, কষা, আকর্ষণ-জন্য অশিথিল, আঁট, বিস্তার, প্রসার, আকর্ষণ, রক্তের সম্বন্ধের বা স্নেহের আকর্ষণ, মমতা, আসক্তি, শিরাসম্বন্ধ-জন্য আকর্ষণ, বিক্রমের বেগ বা তেজ, স্রোতোবেগ, বেগ, পণ্যের চাহিদা বা কাটতি, কথার উচ্চারণে স্বরের বিশেষত্ব, শক্ত, দৃষ্টিপাতভঙ্গি, লেখনের বা রেখাপাতের ভঙ্গি, জোরে ধূমপান। **টানা** = বিস্তৃত করা, প্রসারিত করা, লম্বা করা, আকর্ষণ করা, প্রসারিত করিয়া ঝুলান ... আকৃষ্ট, লম্বিত, সোজা, বিশাল, আয়ত, ইত্যাদি। **টানাটানি** = পরস্পর টানা, বারংবার টানা, জোরে টানা, পীড়াপীড়ি, অভাব, অসঙ্গতি, রক্ষার্থ প্রাণপণ চেষ্টা। **টানাপড়েন** = কাপড়ের দৈর্ঘ্যের ও বিস্তারের সূতা। **টানেল** = পাহাড়ের বা মাটির ভিতর দিয়া করা রাস্তা। **টেনা** = কাপড়ের তানার মতো ভিন্নসূত্র বস্ত্র, জীর্ণ বস্ত্র, ছেঁড়া কাপড়, কানি। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **পঠ**। প্রশ্ন হল, ট-অন থাকলে যে-ক্রিয়া বোঝায়, তার থেকে জাত সত্তা **টান** হয় বটে; কিন্তু তা 'আকর্ষণ' বোঝায় কেন? এর উত্তর পাওয়া যায় হাওয়া-মিঠাই তৈরির কলটির দিকে তাকালে। ঘূর্ণমান কেন্দ্রটি (ট-টি) চারিদিকের তুলোর মতো বস্তুগুলিকে নিজের মধ্যে জড়ো করে নেয় এবং তার জন্য যে-ক্রিয়াটি সে করে, তা অবশ্যই 'টন হইতে জাত' বা **টানই** বটে। একেই আকর্ষণ, শোষণ, কষে ফেলা ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। এটি সংকোচনশীল হলে আমরা বলি আকর্ষণ বা টান, আবার প্রসারণশীল হলেও বিপরীত দিক থেকে তাকে আকর্ষণ বা টান বলাই চলে। সংকোচনশীল **টানই** ইংরেজির tan ইত্যাদি, এবং এই টানা ক্রিয়া যার ভিতর দিয়ে চলে তাকে স্বভাবতই ইংরেজির tunnel (টানেল) বলে; বাংলায় **টানিল**, টানল ইত্যাদি রূপে ক্রিয়াবাচক শব্দ রয়েছে বটে কিন্তু বিশেষ্যবাচক 'টানার নল' হিসেবে 'টানল' বা 'টানেল' শব্দের প্রচলন নেই। বাংলা ইংরেজির tunnel-কেই আপন শব্দ করে নিয়েছে।

কিন্তু **টেনা** শব্দটি এক দিগন্ত-উন্মোচক শব্দ। **ত** ও **ট** সেকালে মিলেমিশে জড়িয়ে থাকত, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার ভিতরে ইংরেজ নিল কেবল **ট**-বর্গ, তাদের **ত**-বর্গ নেই; আমাদের বাংলার রয়েছে দুটোই। ফলে, যাকে আমরা **তানা** (বা তানার সূতা /horizontal) বলি, তাকেই **টানা** বা টানার সুতোও বলি। কিন্তু কোনো কাপড়ে কেবল যদি টানার (**প্রোত**-এর) সুতোই থাকে, পড়েনের (বা **ওত**-এর / vertical-এর) সুতো খুলে খুলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে (দ্র. **ওতপ্রোত**), সেরকম কাপড়ের সংহতি থাকে না। মনে হবে, কাপড়টি যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে। একেই বলে **টেনা**। এরই ঘনিষ্ঠ শব্দ হল **তেনা, ত্যানা, নেতপাট, নেতা, ন্যাতা** ইত্যাদি। দ্র. **নেতপাট**। **৬.** ইংরেজি tan, tanning, tunnel।

টিম, টিমটিম (টাইম) : ২. *টিম = গতিশীল টঙ্কারী (ট) সীমায়িত যাহাতে। **টিমটিম** = **টিম**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **৩. টিমটিম** = দীপাদির মৃদু আলোকপ্রকাশ, মাদলের শব্দ। (ব.শ.)। **৪.** টিম শব্দটির পৃথকভাবে প্রচলন নেই, রয়েছে টিমটিম রূপে যার মানে মৃদু আলো। **৫.** 'হা টিমা টিম টিম' ছড়ায় 'টিম' শব্দটি রয়েছে, যদিও এই 'টিম' শব্দটিকে মনে করা হয় 'অনর্থক'। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক বিধিতে **টিম** শব্দের পৃথকভাবেও একটা অর্থ হয়, উপরে যা দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতের একটি উল্টো ধরনের নিয়ম আছে, যা আমরা **উমা** (মা উ করে যে) ও **সিংহ** (হিংসা করে যে) শব্দে পাই। সেই নিয়মে 'যে মিট মিট করে' তাকে 'টিম' বলাই সঙ্গত হয়। এদিকে 'মিট'-এর মানে হল 'গতিশীল সীমায়ন টঙ্কারিত যাহাতে'। নিঃসন্দেহে সেটি 'টিম'ই বটে। আমাদের স্থূল বাস্তবে একটি টুনি-বাল্‌ব 'জ্বলে নিভলে' তাকে 'টিম' এবং 'নিভে জ্বললে' তাকে 'মিট' বলতে হয়। টিমটিম করছে মানেই মিটমিট করছে। তাকে দেখার সময় কাকে আগে দেখছি, জ্বলাকে না নেভাকে, তাই দিয়েই ঠিক হচ্ছে তাকে টিমটিম বলা হবে নাকি মিটমিট বলা হবে। এই-যে, মুহূর্তে জ্বলা মুহূর্তে নেভা, যথাক্রমে টিম করা ও মিট করা, এরই অন্যতর উত্তরাধিকার রয়েছে ইংরেজির time ও team এবং meet শব্দে।

তা সে যাই হোক, আমাদের বিচার অনুসারে এমনকি হাটিম ... ইত্যাদি শব্দগুলিও অর্থহীন নয়। নয় যে, হাটিম-যুক্ত ছড়াটির অর্থ নিষ্কাশন করলে সেবিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। তবে সেটিকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করার আগে ছড়াটিকে ঠিকভাবে লিখে নেওয়া দরকার।

'হাটিম-মাটিম টিম / তারা মাঠে পাড়ে ডিম / তাদের খাড়া দুটো সিং / তারা হাটিম-মাটিম টিম।' এর অর্থ হল — যাদের টিমটিমানিকে হত্যা করা হয় (= হাটিম), এবং যাদের টিমটিমানিকে সীমায়িত করা হয় (= মাটিম), সেরকম **টিম**গুলি বা টিমটিমকারী সত্তাগুলি (কী করে?) / তারা মাঠে তাদের ফসল ফলায় / তাদের হিংসা করার মতো দুটো উপায় খাড়া রয়েছে (তবু তারা কিছুই করে না বা করতে পারে না; কিংবা সম্প্রতি তাদের হিংসাকারী সত্তা বা সিং খাড়া হয়ে উঠেছে।) / তাই তারা হাটিম-মাটিম টিম।

সমাজ-ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এই ছড়াকে বুঝতে হলে, **হাটিম** শব্দের মানে করুন 'লুণ্ঠিত চাষী', যাদের টিমটিমানিকে হত্যা করা হয়েছে। এবং **মাটিম** শব্দের মানে করুন 'শোষিত চাষী' অর্থাৎ 'যে চাষী তার উৎপাদিত শস্যের অধিকাংশ কর রূপে দিতে বাধ্য হয়েছে'; তার মানে যাদের টিমটিমানি সীমিত করে দেওয়া হয়েছে। এইরকম

যে টিমটিম করে জ্বলা চাষী-সম্প্রদায়, তাদেরও হিংসা করার উপায় রয়েছে। গরুর দুটো সিংয়ের মতো তাদেরও আক্রমণ করার উপায় রয়েছে, কিন্তু তারা তা করে না; গরুর মতোই সব অত্যাচার সয়ে যায়। অথবা, সম্প্রতি তাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, তাদের হিংসাকারী সত্তা জেগে উঠেছে; সিং দুটো খাড়া হয়ে উঠেছে। এই হল বাংলার বিদ্রোহী কৃষক-সম্প্রদায়। এই ছড়াটি সম্ভবত বাংলায় ইংরাজ শাসনের সূত্রপাতকালে (চুয়াড় বিদ্রোহের সময়) মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়ে থাকবে। ৬. ইংরেজি time, team।

টুঙ্গী (টুঁই, টুঙি, টুঙ্গি, টোং, টোঙ্গ) : ২. ***টুঙ্গী*** = *'নবরূপে উত্তীর্ণ টঙ্কারী'র (বা 'টু'-এর) রহস্যরূপ গমন করে যাহা হইতে, তাহার আধার।* ***টুঁই, টুঙি*** *= টু-এর রহস্যরূপ গতিশীল যাহাতে।* ***টুঙ্গি*** *= টু-এর গতিশীল রহস্যরূপের গমন চলে যাহাতে।* ***টোং*** *= সর্বপ্রকার ট-এর আধার রহস্যময় যাহাতে।* ***টোঙ্গ*** *=* ***টোং*** *গমন করে যাহাতে।* ৩. **টুঁই** = ঘরের চূড়া, মটকা। **টুঙি, টুঙ্গি, টুঙ্গী** = উচ্চ গৃহ, মঞ্চ, টোঙ, হাওয়ার উচ্চ-গৃহ, হাওয়া-খানা। (ব.শ.)। ৪. peak point অর্থে প্রচলিত। ৫. ধরা যাক, ক-সত্তার মুখ থেকে আওয়াজ বা আলোর প্রকাশ ঘটছে। এই প্রকাশকে দেখবার দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, ক-সত্তার ভিতর থেকে সেই প্রকাশ ধীরে ধীরে উত্থিত হয়ে তার মুখ দিয়ে প্রকাশিত হয়। সুতরাং, ক-সত্তার নিজের দিক থেকেই তাকে দেখা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, বাইরে থেকে সেই প্রকাশকে দেখা বা শোনা। যতক্ষণ প্রকাশকে তার পেছন দিক থেকে (অর্থাৎ ক-সত্তার দিক থেকে) দেখা বা শোনা হচ্ছে, ততক্ষণ তা **ট, টা, টি, টী** ইত্যাদি রূপে প্রতিভাত। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই প্রকাশকে বাইরে থেকে বা সামনের দিক থেকে (অর্থাৎ শ্রোতা বা দর্শকের দিক থেকে) দেখা বা শোনা হবে, তখনই তাকে বলতে হবে **টু**। উপরোক্ত **টুঙ্গী**-ভুক্ত সমস্ত শব্দগুলিকে তাই বুঝতে হবে বাইরে থেকে। অর্থাৎ, ঘরের চিলেকোঠাকে গৃহবাসী বলতে পারে **টং**, কিন্তু ঘরের বাইরে দূরে দাঁড়িয়ে সেই চিলেকোঠাকে যে দেখছে, সে বলে টুঁই।

টেংরা, টেঙ্গরা : ২. ***টেংরা*** *= দিশাগ্রস্ত টঙ্কারীর রহস্যরূপ রহে যাহাতে, তাহার আধার।* ***টেঙ্গরা*** *= দিশাগ্রস্ত টঙ্কারীর রহস্যরূপী-গমন রহে যাহাতে, তাহার আধার।* ৩. সংস্কৃত ত্রিকণ্ট বা ত্রিকণ্টক। ত্রিকণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষ। (Macrones vittatus)। (ব.শ.)। ৪. মাছের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. হ্যাঁ, মাছটির তিনটি কাঁটা রয়েছে বটে, দুটি দুই চোয়ালে এবং একটি পিঠে। এমন হতেই পারে যে, সংস্কৃতকারগণ মাছটির সেই তিনকাঁটার বিশেষত্ব দিয়ে মাছটিকে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু সেই **টেংরা**কে যখন পল্লীগীতিতে (বা চটকা-গানে) শুনি — 'টেংরা তবু কাটন যায় / মাগুর মাছে কটকটায় / আর সিঙ্গি মাছটা মারলে কাঁটা / পরাণ যায় জ্বলিয়া রে / কী মাছ ধরিছ বঁড়শী দিয়া, ও গুরুজি।' তখন টের পাওয়া যায়, এই টেংরা কেবলমাত্র macrones vittatus নয়; সে জনসমুদ্রের মাছও বটে। দ্র. **কাতলা**। মাছ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'গ' গ্রন্থটির প্রথম নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

টেনা : দ্র. **টানা**।

টক্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : টক্ (talk), টক, **টকটক, টকটকে**, টকবগ, টকর, **টক্কর**, টকরাটকরি, টাক, টাকনা, **টাকরা, টাকা**, টাকাটুকি, টাকার, টাকু, টাকুর, টিক, টিকটিক, **টিকটিকি, টিকর**, টিকল, টিকলি, টিকা, টিকান, টিকারা, টিকি, টিকিট, **টিকিটবাবু**, টিকির (ঠিকির), টিকরি (ঠিকরি), টিকে-থাকা, টীকটীক, **টীকলো**, টীকা, টুক, টুকটাক, টুকটুক, টুকনি, (টুকনী), টুকরা, **টুকরো**, টুকরি (টুকরী), টুকলি, টুকা, টুকি, টুকিটাকি, টুকু, টুকুটাকু, **টুকুন**, টেক (take), টেকর, টেকাল, **টেক্কা**, টেক্কা-দেওয়া, **টেকো, টেকসই**, টেকা, টেকাল, টেপ, টেপা, টেপারি, টোকচা, টোকর, টোকলা, টোকা, ট্যাকট্যাক, ট্যাকা।

টক্ = টঙ্কারের করণ। **টক** = টঙ্কার করে যে।

টক (অম্ল, অম্লমধুর, টকমিষ্টি), টকটকে, টক্কর : ১. সংস্কৃত তক্র > টক। ✓অম + ল (ক্র) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***টক*** *= টঙ্কার (আত্ম-অস্তিত্বের ঘোষণা) করে যে;* (***অম্ল*** *= অম লালন-লোপন হয় যাহাতে।)* ৩. টক লাগিলে জিহ্বার শব্দ, অম্বল (মাছের টক, টক কথা, টক পালঙ, টকে যাওয়া ইত্যাদি), গোরু চালানোর সময় গাড়োয়ানের জিহ্বার শব্দ। অম্র, আম্র, রসবিশেষ, অম্লরস, অম্লবেতস, জম্বীরবৃক্ষ, রোগবিশেষ, তক্র, ঘোল (অম্ল পঞ্চবিধ ফল — কুল, ডালিম, তেঁতুল, আমরুল, অম্লবেতস। মতান্তরে জম্বীর, নারঙ্গ, তেঁতুল, আমরুল, অম্লবেতস।) **অম্লমধুর** = ঈষৎ অম্লরসযুক্ত ও মিষ্টতাপ্রধান (ফলাদি)। নেংড়া অম্লমধুর, ফজলী ও বোম্বাই আম মধুর। (ব.শ.)। ৪. অম্ল ও অম্লমধুর অর্থে প্রচলিত। ৫. ট করে যে, সেই হল **টক**। যেহেতু 'ট'-করা মানেই টঙ্কার করা, সেই কারণে টঙ্কার বা 'ট'করণ কীরূপ ব্যাপার, তা জানা দরকার। ট-বর্ণের অর্থে তা বিস্তারিত করা হয়েছে। বিপরীত শব্দ দিয়ে বুঝবার নিয়মে 'যা কিছু কট করে এসে লাগে' তাকে **টক** বলে। এই টক স্বভাবতই পঞ্চইন্দ্রিয়ের কাছে পাঁচ ভাবে ধরা দেয়। তবে সাধারণত জিহ্বায় ধরা দেওয়া টক-কেই **টক** বলা হয়ে থাকে। কানে, চোখে, গায়ে, নাকে যেসকল **টক** ধরা দেয়, তাদের কথা আমরা খুব একটা জানি না। সুকুমার রায়ের নাকে অবশ্য এই **টক** ধরা দিয়েছিল। তাই তিনি লিখে গেছেন — 'শুনেছ কি ব'লে গেল সীতানাথ বন্দ্যো? / আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ? / টকটক থাকে নাকো হ'লে পরে বৃষ্টি — / তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।'

তবে কেবল সুকুমার রায় নয়, গাঁয়ের মায়েরা ডাক্তারের কাছে শিশুর রোগলক্ষণ বলতে গিয়ে হামেশাই এমন বাক্য ব্যবহার করে থাকেন — 'ওর বাহ্যিতে টকটক গন্ধ।' অর্থাৎ জিভে ধরা দেওয়া টকই একমাত্র টক নয়, আরও অনেক রকমের **টক** আছে, থাকতে পারে, থাকা অসম্ভব নয়। সেই নানারকমের **টক**গুলিকে আমরা **টকটকে, টক্কর** ... প্রভৃতি শব্দে চিনতে পারি। অস্তিত্বের কেন্দ্র থেকে তার আত্মপ্রকাশক ক্রিয়া এসে হাজির হয় তার পরিধিতে। তা যদি কোনো বস্তু হয়, তবে তাকে আমরা **টকটক**-গুণসম্পন্ন বা **টকটকে** বলি। এরকম দুটি পরস্পরবিরোধী **টক**-গুণসম্পন্ন বস্তু যখন পরস্পরের মুখোমুখি হয় যায়, তখন তাকে বলে **টক্কর**। এতে

দুটি বিপরীতমুখী পক্ষ পরস্পরের বিপরীতে **টক** করে থাকে। খুব সম্ভব এই **টক**-কেই ইংরেজ তার উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে talk রূপে।

মোট কথা, টঙ্কার-কারী হল টক। (জিহ্বা 'আনন্যাচারাল' হয়ে না গেলে) কাঁচা আমে কামড় দিলেই জিভে 'টকাস্' করে শব্দ হবেই। বিশ্বাস না হলে, কোনো কিশোর-কিশোরীকে কাঁচা আম খেতে দিয়ে দেখতে পারেন। অম-এর লালন হলেই তা অম্ল বা টক হয়ে যায়। মানুষের পক্ষে তা যেমন আর সহজগ্রাহ্য থাকে না, তেমনি রোগেরও কারণ হয়। এই অম কীরূপ ব্যাপার, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা **'অং', 'অম্' 'আম', 'আমি', 'আমিষ'** প্রভৃতি শব্দে পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে এই সব **টক**ত্বের মূলে রয়েছে **অম্ল** ('অম্ লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে' বা 'আমিত্ব')।

আমাদের মনে হয়, জিহ্বা আমাদের অন্ততপক্ষে দুটো। একটি হল দেহের জিহ্বা, যা থাকে মুখে, যা দিয়ে আমরা বাহ্যবস্তুর রসাস্বাদন করি। আর একটি হল মনের জিহ্বা, যা থাকে মনে, যা দিয়ে আমরা মনোলোকের বস্তুসমূহের রসাস্বাদন করি। এই দুইপ্রকারে রসাস্বাদন করে আমরা যে রস পাই, সেই **রস** ছয় রকম — মধুর অম্ল লবণ কটু কষায় তিক্ত এবং তা দেহের জিহ্বাও চিনতে পারে মনের জিহ্বাও জানতে পারে। যেমন 'অম্লমধু' বা 'গুড়-টক'কে আমাদের দেহের জিভ তো চেনেই, মনের জিভও কেমন চেনে, তার উদাহরণ দিয়ে গেছেন ব.শ. — 'হরবধূ অম্লমধূ দিতে আরবার। খসিল কাঁচলি হৈল পয়োধর ভার।।' তাছাড়া, 'তেতো কথা', 'মিষ্টি কথা' প্রভৃতি বাংলা শব্দবন্ধের প্রচলনই হতে পারত না, বাংলাভাষীর মনের জিভ এবং সে বিষয়ে বাংলাভাষীর ধারণা যদি না থাকত। তার মানে এই নয় যে, পাশ্চাত্যের ধারণায় মনের জিভ, তার স্বাদের কোনো ধারণাই ছিল না। একালে হয়তো নেই, কিন্তু সেকালে ছিলই। সক্রেটিস তাঁর জিভে সুমিষ্ট আলোচনার স্বাদ পেতেন। দ্র. **ঠা**।

বিষয়টি আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। কেননা, অম্লমধুরের প্রকৃত ব্যবহার একমাত্র বাংলাভাষী ছাড়া বিশ্বের আর কোনো জাতি সেভাবে অর্জন করতে পারেনি। অন্তত আমাদের কাছে তেমন কোনো তথ্য নেই। রাঁধুনিরা জানেন, চাটনিতে যত বেশি টক দেওয়া হয়, তাকে মধুর বানাতে তত বেশি চিনি বা গুড় লাগে। টক আর মিষ্টির মিশ্রণের সেই মাত্রাটি একমাত্র ভাল রাঁধুনিরাই জানেন, যে-মাত্রায় 'টক-ভাব'টাকে রেখে দিয়ে টক হারিয়ে যায় মিষ্টতায়; অন্যদিকে মিষ্টতা তার স্বাভাবিক-মিষ্টতা পরিত্যাগ করে এবং টকের তীব্রতাকে আত্মসাৎ করে উঠে যায় এক সুমিষ্ট তীক্ষ্ণতায়। এতে টকের টকত্ব থাকে না কিন্তু টকের তীব্রতা থাকে; এবং মিষ্টির মিষ্টত্ব থাকে না কিন্তু মিষ্টির মাধুর্য্য থাকে। ফলত সৃজিত হয় এক তীব্র-মাধুরী। এরই ডাকনাম **চাটনি**। রসগোল্লার মতোই এই প্রকার চাটনি বাঙালির এক অনন্য অর্জন।

কিন্তু এ তো গেল বাহ্যিক জিহ্বা দিয়ে বাহ্যিক রসের অর্জন। যে বাংলাভাষী-মন এমনতর বাহ্যিক অর্জনের যোগ্যতা অর্জন করেছিল, মানসিক অর্জনের বেলায় সে তো বন্ধ্যা থাকতে পারে না! তাই, তার মনের জিহ্বা দিয়ে মনোলোকের রসের অর্জন ছিল আরও মধুর, অম্লমধুর। গ্রামবাংলার কিশোরী নবযুবতীকে দেখা যায়, যাকে তার মনে ধরেছে তাকে সে ঢিল ছুঁড়ে মারে, কিংবা নানাভাবে ঠকায় এবং মজা করে। তার 'না'-এর মধ্যেই 'হ্যাঁ' লুকিয়ে থাকে। প্রেমের এই যে অদ্বৈত বোধ, ভারতবাসী ছাড়া অন্য জাতি কমই বোঝে। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাংলার তো বটেই, এমনকি হিন্দি সিনেমার কাহিনীগুলিতেও এইরকম 'বাইরে টক ভেতরে মিষ্টি' প্রেমের রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যেত। আমরা লক্ষ্য করেছি, মা-মাসি-জেঠিমা-ঠাকুমারা তাঁদের সবচেয়ে আদরের ছোট ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলেন নিন্দাজনক শব্দ প্রয়োগ করে। যার প্রতি অত্যন্ত মমতা-প্রেম, তাকে সরাসরি মমতা বা প্রেমের কথা বলা যেন-বা নিষিদ্ধ। বললেই, সেই মমতা বা প্রেম যেন-বা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই নিন্দে করে বলা, নিন্দের ভিতর দিয়ে বলা, 'নিন্দার ছলে কৃষ্ণভজনা'। আর, বাংলাভাষীর গায়ক-নায়কেরা তাঁদের এই বোধকে উচ্চস্তরের গানে প্রকাশ করে থাকেন এভাবে — 'ও দয়াল বিচার করো / বিচার করে দাও না তারে ফাঁসি / আমায় খুন করেছে গুণ করেছে / ও বাঁশি। / ও আমার মনের মানুষ বলে / মরেছি অনেক জ্বালায় জ্বলে / ও দয়াল / সত্যি করে বলছি তোমায় / তারেই ভালবাসি। / ও আমায় খুন করেছে গুণ করেছে ...।' বলে রাখা ভাল, এই অর্জনের পরাকাষ্ঠা ছুঁয়েছেন মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলিম পদকর্তাগণ, লালন ফকির, ও সবশেষে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। দ্র. **সুন্দর**।

আবেগহীন যন্ত্রভিত্তিক আধুনিক যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মন এই 'একের ভিতরে দুই'-বোধের বা 'অদ্বৈতবোধ'-এর মর্মই বুঝতে পারে না। যদিও অত্যাধুনিক বিজ্ঞান সম্প্রতি সেই উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। সে অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করেছে যে, 'না-হ্যাঁ' দুটোই রয়েছে এমন এক অনিবার্য 'অনিশ্চয়তার তত্ত্বে' যাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই তাদের।

তবে এর একটি মন্দ দিক রয়েছে। 'না-হ্যাঁ'কে ঠিকভাবে মেলাতে না পারলে ক্ষতির অন্ত থাকে না। সেগুলি আমাদের মনের রোগও বটে। মহাত্মা হানিম্যান চুলকানির রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে দেখান, চুলকানি মানুষের অত্যন্ত প্রিয়; জ্বালা করে, ভালও লাগে। এই ভাললাগার মোহে মোহগ্রস্ত হলে মানুষের সামূহিক ক্ষতি। এরই একটি বাহ্যিক রূপ হল কুষ্ঠ (দ্র. **কুশ, কুষ্ঠ**)। কণ্ডু শব্দের থেকে (দ্র. **কণ্ডু, কণ্ডুয়ন**) আমরা জেনেছি, দু-হাতে লুঠ করা আর দু-হাতে মাথা চুলকানো একই ব্যাপারের মানসিক ও বাহ্যিক প্রকাশ। আমরা মনে করি, আদি যুগে প্রথম যখন মানবজাতি ব্যক্তিমালিকানার চুলকানির পাল্লায় পড়ে, গোটা জাতিই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়ে যায়। বাইবেলের কাহিনীতে (লুক, ১৭,১১) তার স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। এখন তো সারা পৃথিবীই ব্যক্তিমালিকানার চুলকানিতে ভুগছে, সবাই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত; তবে নেহাৎ মানসিক ভাবের সমান্তরালে নানান কারণে শারীরিক ভাবের বদল এখন আর হয় না বলেই আজকের পৃথিবী দৈহিক-কুষ্ঠরোগ ও রোগীতে ছেয়ে যায়নি। এই প্রেক্ষিতে বাংলাভাষীর গৌরব এইখানে যে, মধ্যযুগের (১৪৮০-১৫৩০) বাংলাভাষী ঐ মাত্রাজ্ঞান অর্জন করেছিল, যাতে যৌথতার সঙ্গে ব্যক্তিমালিকানার অম্লমধুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। অন্যথায় তার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণলীলা লেখাই সম্ভব হত না। তার সেই মাত্রাজ্ঞান অর্জনের জোরেই বাংলাভাষী তার শিবসাধনার সঙ্গে নগদ-নারায়ণের সাধনার

সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছিল। নগদ-নারায়ণের সাধনাকে লক্ষ্মীসাধনায় পরিণত করতে পেরেছিল, কুবেরসাধনায় নয়। ফলে গড়ে উঠেছিল এক কল্যাণমূলক পরিবেশ। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের এই টকমিষ্টি মেলবন্ধন করবার যোগ্যতা রয়েছে একমাত্র বাংলাভাষীর। দ্র. **চাট, চাটনী, বঙ্গদেশ, সুন্দর**।

টাক, টাকনা, টাকরা, টাকা, টাকার : ২. *টাক = টক হইতে জাত। টাকনা = টাক অন যাহাতে, তাহার আধার। টাকরা = টাক রহে যাহাতে, তাহার আধার। টাকা = টাক-এর আধার যে। টাকার = টাকা রহে যাহাতে।* ৩. **টাক** = মস্তকের কেশহীনতা, ইন্দ্রলুপ্ত; তৎপর্যন্ত, তদবধি, প্রায় তৎপরিমাণ বা তৎসংখ্যক, মনে করা, ভাবা, নির্ভর করা। **টাকনা** = অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে চাটনির মতো অল্প করিয়া খাওয়ার ব্যঞ্জন। **টাকরা** = তালু। (আলজিভের মতো আলটাকরা)। **টাকা** = রৌপ্যমুদ্রাবিশেষ, ধন। **টাকার** = টোকা, অঙ্গুলির আঘাত, সামান্য আঘাত। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. শব্দার্থের নিয়মে 'টক হইতে জাত' যা-কিছু, তাদের প্রত্যেককেই **টাক** বলে। কিন্তু মানুষের মাথার **টাক** ছাড়া অন্য টাক-দের কথা চট করে আমাদের মনে আসে না। যেমন ঘণ্টাটাক, ঝুড়িটাক, টুকটাক; কিংবা **টাকনা** বা **টাকরা**, অথবা **টাক**-ডুমা-ডুম শব্দে যে-**টাক**কে পাই, এদের কথা আমরা ভুলে যাই। মাথার **টাক** কীভাবে 'টক হইতে জাত' হয়, তা বুঝতে গেলে সবার আগে মনকে টক-সংস্কার থেকে মুক্ত করা দরকার। টক মানেই sour, এই ধারণার দ্বারা আমাদের মন সংস্কারগ্রস্ত থাকায়, আমরা **টক** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ ('টঙ্কার করে যে') জানা সত্ত্বেও ভাবতে পারি না যে, sour বস্তু ছাড়া আরও অনেক কিছুই 'টঙ্কার করতে পারে' এবং অতএব **টক** হতে পারে। মানুষের মানসক্রিয়ার ফল গিয়ে টঙ্কারিত হয় তার টং-এ, তুঙ্গে। একে 'কট' ক্রিয়ার ফল বা টকোৎপত্তি কিংবা কেশোৎপত্তি বলা যেতে পারে, যাকে আমরা **টিকি** শব্দে শনাক্ত করে থাকি। সেই কেশ একটির পর একটি ঝরে ঝরে শেষ হয়ে গেলে, যা ঝরে গেল, তাকে যেমন টাক বলা যায় তেমনি, ঝরার ফলে যা থেকে যায়, তাকেও টাক (দ্র. **ইন্দ্রলুপ্ত**) বলা যায়; কারণ উভয়েই 'টক হইতে জাত'। সেই ঝরিত টাককে ধারণ করে টাকা। কথিত আছে যে, **টঙ্কা** বা **তঙ্কা** শব্দ থেকেও **টাকা** শব্দটি প্রসূত হয়েছে। **আতঙ্ক**-গ্রস্ত মানুষের মাথা থেকে কেশ ঝরে গিয়ে, তা **টাক**-এ পরিণত হয় বলেও মনে করা হয়। ৬. ইংরেজি tuck।

টিক, টিকটিক, টিকটিকি, টিকা, টিকি : ২. *টিক = গতিশীল টঙ্কার করে যে। টিকটিক = টিক-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। টিকটিকি (টিকটিকী) = টিকটিক গতিশীল যাহাতে। টিকা = টিক-এর আধার যে। টিকি = টিক গতিশীল যাহাতে। (টিকী = টিক গতিশীল যাহাতে, তাহার আধার)।* ৩. **টিক** = স্থায়ী হওয়া, অবিকৃত থাকা, নষ্ট না হওয়া, টেকা (to last), বাস করা, তিষ্ঠান, থাকা, সুস্থ বা কার্য্যক্ষম থাকা, ভার বা বেগ সহিয়া দৃঢ় থাকা, দেহে থাকা, কোনো ভারী দ্রব্য ঠিক স্থানে রাখার নিমিত্ত নীচে বা পাশে দেওয়া কাষ্ঠখণ্ড। **টিকটিক** = ছোট ঘড়ির মৃদু শব্দ, টিকটিকির রব। **টিকটিকি (টিকটিকী)** = 'টিকটিক' **রবকারী প্রাণীবিশেষ**, জ্যেষ্ঠী, জ্যেষ্ঠীরব, অপরাধীর হাত **পা বাঁধিয়া বেত-সাজার নিমিত্ত** তেরচা তিনখান কাঠের ফ্রেম, (**টিকটিকি পুলিস** = গোয়েন্দা পুলিস বা detective)। **টিকা** = মৃত্তিকাচন্দনাদিরচিত গোল চিহ্ন, তিলক, ফোঁটা, রাজ্যাভিষেকে রাজার **কপালের তিলক**, রাজফোঁটা, কয়লা-গুঁড়ার চাকতি, টিকে, **শরীরে ক্ষত দ্বারা** বসন্তাদির বীজের সংক্রমণ ও তজ্জন্য গোল চিহ্ন (টিকাদার = যে টিকা দেয়)। **টিকি (টিকী)** = শিখা, চূড়া। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. টিক শব্দটির মূল অর্থ হল 'টি করে যে', অর্থাৎ, 'এই দেখো, আমি টিকে আছি, টিকে গেছি' — এরূপ আচরণ করে যে। আমরা জানি, ঘড়ি টিক টিক শব্দ করে, জ্যেষ্ঠী নামক প্রাণীটিও করে। কিন্তু তার সঙ্গে টিকে থাকার সম্পর্ক কোথায়, চট করে বোঝা যায় না। কিন্তু যে-সত্তাটি গতিশীল টঙ্কার করে, ধরা যাক সেটি একটি ঘড়িই হোক আর কোনো জীবের ফুসফুসই হোক, সে টঙ্কার করছে বা টিক টিক করছে মানেই তো সে অস্তিত্ববান রয়েছে, বা টিকে রয়েছে! সেই কারণে 'টিক টিক করা' বা **টিকা** মানেই to last, টিকে থাকা। আবার, **টিক**-এর আধার হতে পারে বাংলার গোল টিকা বা (সিঁদুরের) টিপ চিহ্ন (০), ইংরেজির টিক (✓) চিহ্ন, হতে পারে ঠেকনার মতো 'কাষ্ঠখণ্ড'। এমনকি teak-এর মতো দীর্ঘস্থায়ী সেগুণ কাঠও। দ্র. **ঠিক**। আর, এই টিক যখন কেশোৎপত্তির মাধ্যমে গতিশীল হয়, তখন তাকে আমরা বলি **টিকি**। দ্র. **টাক**। কেবল তাই নয়, টিকি ধরে ধরে যদি মাথা গুনতে হয়, তবে মাথাপিছু টিকিটের শরণাপন্ন হওয়াই সুবিধাজনক। ইংরেজি ticket শব্দটির সঙ্গে বাংলা টিকাৎ শব্দের কি খুব বেশি ফারাক আছে? ৬. ইরেজি detective, tick, teak, stick।

টুক, টুকটাক, টুকটুক, টুকরা (টুকরো), টুকরি, টুকলি : ২. *টুক = নবরূপে উত্তীর্ণ টঙ্কার করে যে। টুকটাক = টুক ও টাক। টুকটুক = টুক পুনরাবৃত্ত যাহাতে। টুকরা = টুক রহে যাহাতে, তাহার আধার। টুকরি = টুক-এর রহন গতিশীল যাহাতে। টুকলি = টুক-এর লালন গতিশীল যাহাতে। টুকু = টুক নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. **টুক** = অল্প পরিমাণ, আকারের অল্পতা, খণ্ড, টুকরা; সংক্ষেপে লিখিয়া রাখা, নিষেধ করা, বাধা দেওয়া, তিরস্কার করা। **টুকটাক** = ঘড়ি-চলার শব্দ। **টুকটুক** = টকটক > আদরে টুকটুক, অতিলোহিত, টুকটুকে। **টুকরা (টুকরো)** = ছিন্ন বা ভগ্ন অংশ, খণ্ড, অসংবদ্ধ, কাটা-কাটা, ছোট-খাট। **টুকরি (টুকরী)** = ছোট ঝুড়ি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. 'টকটকে লাল' ও 'টুকটুকে লাল', এই শব্দবন্ধ দুটির অর্থের মধ্যেকার পার্থক্য হল, প্রথম ক্ষেত্রে লাল বস্তুটিকে আমরা বস্তুটির পেছন দিকে বা তার কেন্দ্রে বসে (দ্র. ট-বর্ণের অর্থ) দেখছি; বস্তুটির লালিমা আমাদের থেকে সরে সরে চলে যাচ্ছে, তার প্রতি আমাদের আগ্রহ যেন-বা নেই, রয়েছে নিস্পৃহ ভাব। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বস্তুটিকে আমরা সামনে থেকে দেখছি। তার লালিমা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, সে আমাদের কাম্য, আমাদের প্রিয়। কেউ যদি কোনো গাছ থেকে টুক টুক করে একটি একটি করে, ধরা যাক লঙ্কা বা চা-পাতা, তুলে তার ছোট চুপড়িতে

রাখে, তখন সেই 'টুক'গুলিকে বলে 'টুকরা' বা 'টুকরো'; আর সেই চুপড়িতে '**টুক**' গতিশীলভাবে রয়ে যাচ্ছে বলে তাকে বলে টুকরি। এখন তাহলে **টুক** শব্দের সঠিক ক্রিয়াটিকে চিহ্নিত করার আর কোনো অসুবিধা থাকল না — টঙ্কার বাইরে থেকে আসছে, পড়ছে লঙ্কাগাছে বা চা-গাছে, একটি ক্ষুদ্রাংশকে হস্তগত করছে। এই ক্রিয়াটিই **টু** করা। এই **টু**-এর উত্তরাধিকার বাংলায় রয়েছে মায়েদের মুখের একটি শিশুতোষ গানে — '... চাঁদের কপালে চাঁদ টু দিয়ে যা'; আর ইংরেজিতে সেই **টু**-ই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় to রূপে। কার্যত, টক, টিক পেরিয়ে উল্টো মুখী এই **টুক** ক্রিয়া। ইংরেজিতে এর উত্তরাধিকার রয়েছে took শব্দে। বাংলায় টুক করে যেটুকু ছিন্ন করে বা ভেঙে (দ্র. **টুট**) নিয়ে নেওয়া হল, সেটিই অতএব **টুকরা** বা **টুকরো**। এই টুক নবরূপে উত্তীর্ণ হলেই হয়ে যায় **টুকু**। কিন্তু যে-গাছ থেকে টুক টুক করে একটু একটু খুঁটে নিয়ে অন্যত্র রাখছেন, সেই গাছ যদি ঘটনার গাছ বা কাণ্ডকারখানা বা তার কাহিনী হয়, তখন যেটুকু আপনি টুক টুক করে তুলে এনে রাখছেন সে তো একালের রকের ভাষায় হয়ে গেল 'টুকলিফাইং' বা টুকলি করা অর্থাৎ টুকা বা টোকা! হ্যাঁ, টুক বা টোকা লালিত হয় **টুকলিতেই**। দ্র. **টাট, টু, টো**। ৬. ইংরেজি take, to, took। পর্তুগীজ toca = to note down। (ব.শ.)।

***টপ্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : টপ্, টপ, টপকা, টপকান, টপটপ, টপাটপ, টপ্পা, টপ্পাবাজ, টপ্পাবাজি, টা, টাই-টাই, টাপ, টাপটুপ, টাপর, টাপুরটুপুর, টাপে-টোপে, টাপসা-পেটা, টায়-টায়, টায়-টোয়, টি, টিপ, টিপটাপ, টিপটিপ, টিপনদাঁড়া, টিপননড়ি, টিপা (টাইপ, type), টিপাই, টিপাটিপি, টিপি, টিপিটিপি, টিপিশটিপিশ, টিপুনি(নী), টিপ্পনি(নী), টী, টুপ, টুপটাপ, টুপটুপ, টুপি, টোপ, টোপনা, টোপর, টোপলা, টোপসা, টোপাকুল, টোপান, টোপাপানা, ট্যাপা।

টপ্ = টঙ্কারের পালন। **টপ** = টঙ্কারের পালন যাহাতে।

টপ, টপকা (আল-টপকা), টপকান, টপটপ, টপাটপ, টপ্পা : ২. ***টপ*** = *টঙ্কার পালন করে যে।* ***টপকা*** = ***টপ*** *করে যে, তাহার আধার।* ***টপকান*** = ***টপকা*** *অন যাহাতে।* ***টপটপ*** = *টপ-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***টপাটপ*** = ***টপ****-এর পুনরাবৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন যাহাতে।* ***টপ্পা*** = *ট-পালন পালিত যাহাতে, তাহার আধার।* ৩. টপ = শীঘ্রতা, ত্বরা, লাফ দেওয়ার ভাব। **টপকা** = উল্লঙ্ঘন করা, লাফাইয়া পার হওয়া, ডিঙান। **টপকান** = উল্লঙ্ঘন। **টপটপ** = জলাদির বিন্দুপাতের শব্দ। **টপাটপ** = অশ্বের খুরের শব্দ, অতিশীঘ্র। **টপ্পা** = সংক্ষিপ্ততর গানবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. বাংলায় যাকে আমরা '**টপটপ**' করে বা ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়া বলি, হিন্দিতে তাকেই বলা হয় '**টপক্না**'। **ট** বর্ণের অর্থে আমরা জেনেছি, ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় **ট**। তা পালিত হয় একটি বিন্দুরূপে, যাকে ফোঁটা বলে। এই হল **টপ**। ইংরেজিতে একেই top বলে। এই টপ যখন অস্তিত্বের পরিধি পেরিয়ে ঝরে পড়ে, তখনই হিন্দির **টপক**; আর বাংলায় তাকেই আমরা বলি 'টপ করে পড়ে গেল'; বলি, আধারের সীমারেখা বা 'আল' (আলি) 'টপকে পড়ে গেল', অতএব **আল-টপকা**। এটি লাফ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া এবং ঝরে পড়াও বটে। টপটপ কথাটি তাই একই সঙ্গে শীঘ্রতা যেমন বোঝায়, তেমনি ঝরে পড়ার শব্দও বোঝায়। টপকান তাই ঝরাও বটে, উল্লঙ্ঘনও বটে। ৬. ইংরেজি top।

টাপ, টাপুরটুপুর : ২. ***টাপ*** = ***টপ*** *হইতে জাত।* ***টাপুরটুপুর*** = ***টাপুর*** *(টাপ নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে রহে যাহাতে)* ও ***টুপুর*** *(টুপ নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে রহে যাহাতে)।* ৩. **টাপ** = অশ্বক্ষুরাঘাত শব্দ। **টাপুরটুপুর** = বৃষ্টিধারাপাতের শব্দ। (ব.শ.)। ৪. টাপুরটুপুর প্রচলিত, কিন্তু পৃথকভাবে টাপ শব্দটি অপ্রচলিত। তাকে আমরা প্রচলিত দেখি **টুপটাপ** শব্দে। ৫. **টপ** করে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল, পড়ে যা যা হল, সেসবই **টাপ**। সেটি তার পতিত রূপ, পতনের শব্দ, পতনের ফল ইত্যাদি অনেক কিছুই হতে পারে। আবার সেই টাপ নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে শ্রুত হতে থাকে তার চলমান শব্দধারায়; তখন তাকে বলে **টাপুর**। একই ভাবে **টুপ** থেকে **টুপুর** হয়। ৬. ইংরেজি tap (জলের কল, যেখান থেকে জল ঝরে বা টপকায়)।

টায়-টায়, টায়-টোয় : দ্র. **টা**।

টিপ, টিপটাপ, টিপটিপ, টিপা (টেপা), টিপাটিপি, টিপি, টিপিটিপি, টিপুনি (টিপুনী, টিপ্পনী) : ২. ***টিপ*** = *গতিশীল টঙ্কার পালিত যাহাতে।* ***টিপটাপ*** = ***টিপ*** *ও* ***টাপ****।* ***টিপটিপ*** = ***টিপ****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***টিপা*** = ***টিপ****-এর আধার যে। (****টেপা*** = *দিশাগ্রস্ত গতিশীল টঙ্কার পালিত যাহাতে।)* ***টিপাটিপি*** = ***টিপা*** *ও* ***টিপি*** *(দ্র.* ***কেশাকেশি, কচাকচি****)।* ***টিপি*** = ***টিপ*** *গতিশীল যাহাতে।* ***টিপিটিপি*** = ***টিপি****-র পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***টিপুনি*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ* ***টিপ*** *চলমান থাকে যে-গতিশীলতায়। (****টিপ্পনী*** = ***টিপ্*** *পালন অন যাহাতে, তাহার আধার।)* ৩. **টিপ** = হাত বা আঙুল দিয়া চাপা, টেপার উপায়স্বরূপ আঙুলের ডগা, বুড়া আঙুলের প্রথম পর্বের দৈর্ঘ্য-পরিমাণ, বুড়া আঙুলের টিপে প্রস্তুত গাঁজা, আঙুলের চাপ, চোখ টেপা, আঙুলের টিপ হেতু লক্ষ্যনির্ণয়, টিপিয়া লওয়া হেতু চিমটি, কপালের ফোঁটা — ভূষণবিশেষ, তিলক, ফোঁটার আকারে কপালের অলঙ্কার; হাত বা আঙুল দিয়া চাপা, সংবাহন করা, চাপা। **টিপটাপ** = চাপচোপ, ব্যয়ে কৃপণতা। **টিপটিপ** = অবিরল বৃষ্টিবিন্দু পাতের শব্দ, টিপার মতো বেদনাবোধ, ভয়াদিহেতু হৃৎপিণ্ডের দ্রুতস্পন্দন, দীপালোকের মৃদুভাব। **টিপা** = চাপ দেওয়ান, টিপান, ডলান। **টিপিটিপি** = টিপটিপ-এর সমার্থক, পা টিপিয়া অর্থাৎ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, চুপে চুপে। **টিপুনি (টিপুনী, টিপ্পনী, টিপ্পনিকা)** = টীকার ব্যাখ্যা, টীকা, টিপন, চাপন; তিলকাকৃতি চিহ্নহেতু টিপ্পন বা টিপ্পনিকা, বিবরণ, ব্যাখ্যা, টীকা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. বিপরীত শব্দবোধের নিয়মে (দ্র. **উমা, সিংহ**) 'যা পিট পিট করে', তাকে 'টিপ' বলা যায়। ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মে 'গতিশীল পালন টঙ্কারিত যাহাতে', তাকে বলে 'পিট'; আর 'গতিশীল টঙ্কার পালিত যাহাতে'

তাকে বলে 'টিপ'। এ-ও সেই মিটমিটকারী **টিম**-এর মতো। চোখের পাতা খুলে চোখের তারা একটুখানি দেখছে বা জ্বলে উঠছে, পুনরায় সেই পাতা বুজে যাচ্ছে, এরকম হলে আমরা বলি 'পিট পিট করে দেখা'। এতেও 'চোখের পাতার খোলা আগে এবং চোখের তারার জ্বলে ওঠা পরে' হলে তাকে বলা হবে **'পিট'**; আর 'জ্বলে ওঠা আগে এবং পাতার বন্ধ হয়ে যাওয়া পরে' হলে তাকে বলতে হবে **টিপ**। সেই টিপ কপালে থাকতে পারে, উত্থিত টঙ্কারের ঝরে পড়া রূপ হতে পারে, আবার আদেশমূলক 'চাপ দাও' বা টিপও (টিপাটিপি) হতে পারে; 'টিপ-ছাপ'ও হতে পারে। এই টিপ দিশাগ্রস্ত বা একদিকে চাপ দিতে থাকা বোঝালে তাকে **টেপা** বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে উপচে আসা কোনো সত্তা, তা সে জলবিন্দু হোক আর অন্যের আঙুলের ডগাই হোক, তা যখন গায়ে এসে ঠেকে, তাকে টিপ বলে। আঙুলের ডগার সেই টিপে দেওয়ায় সিঁদুর লেগে থাকলে, তাতেই সিঁদুরের টিপ আঁকা হয়ে যায়। পুলি-পিঠা বানানোর সময় পিঠার মুখগুলো দুই আঙুলে টিপে দেওয়া হয়। কিন্তু বস্তুটি পুলি-পিঠা না হয়ে কোনো প্রবন্ধ-নিবন্ধ হলে, তখন তার টিপে দেওয়া স্থানগুলিকে বলা হয় **টিপ্পনী**। ইংরেজিতে সেটিই হয়ে গেছে tips দেওয়া। **৬.** ইংরেজি tip, tips, *pit*ter-patter, pal*pit*ation। (ব.শ.)।

টুপ, টুপটাপ, টুপটুপ, টুপি : **২.** ***টুপ*** *= নবরূপে উত্তীর্ণ টঙ্কার পালিত যাহাতে।* ***টুপটুপ*** *=* ***টুপ****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***টুপটাপ*** *=* ***টুপ*** *ও* ***টাপ****।* ***টুপি*** *=* ***টুপ*** *গতিশীল যাহাতে।* **৩. টুপ** = ছোট ফল পড়ার শব্দ। **টুপটাপ (টুপটুপ)** = জলবিন্দু ইত্যাদির মৃদু পতনশব্দ। **টুপি** = মস্তকের আবরণবিশেষ, ছাতার বাঁটের আগায় ধাতুকোষ। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** নিজের পরিধি পেরিয়ে নতুন রূপ (বাষ্পের ক্ষেত্রে জলবিন্দু রূপ) গ্রহণ করে পালিত/পতিত হয় যে-টঙ্কারী সত্তা তাকে **টুপ** বলে। সেই কারণে, গাছের ফল হোক আর জলবিন্দু হোক কিংবা অন্য কোনো টঙ্কারী-সত্তাই হোক, সে যখন উপর থেকে এসে পড়ে, আমরা তাকে **টুপ** বলি। শব্দটির যথার্থ প্রয়োগ করেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কবিতায় — 'টুপ টুপ দেয় ডুব / দেয় পানকৌটি / টুপ টুপ দেয় ডুব / ঘোমটার বৌটি।' তবে **টিপ** শব্দে আমরা যেমন দেখি, টঙ্কারী-সত্তা গতিশীল হয়ে অন্য অবয়বে গিয়ে লেগে যায়, তেমনি **টুপ** শব্দটি বাইরে থেকে এসে দ্রষ্টার উপরে পতিত বা স্থিত হয়। কিন্তু তা যদি কেবলমাত্র পতিত বা স্থিত না হয়ে খানিকটা চেপে বসতে থাকে (খানিকটা টিপে বসার মতো) তখন তাকে বলে টুপি। এই টুপি বাহ্যিক না হয়ে মানসিক হলে, তাকে আমরা বলি 'টুপি পরানো'। এই **টুপি** যাকে পরানো হয়, তার বিস্তর ক্ষতি হয়ে যায়। দ্র. **উষ্ণীষ**।

টল্ **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অটল, টর, টরক, টরটর, টরম, টল্, টল, টলটল, টলট্টল, টলন, টলবল, টলমল, টলাটল, টসকা, টসকানা, টসটস, টহল, টার, টারল (টার্ন, turn), টাল, টালনি(নী), টালমাটাল, টালবাহানা, টিলা, টুল, টুলি, টুলী, টোল, টোলা, টোলি, ট্রাম, তর।

টল্ = টঙ্কারের লালন-লয়ন। **টল** = টঙ্কারের লালন-লয়ন যাহাতে।

টর, টরক, টরটর, টরম (ট্রাম, টার্ম), টারল (টার্ন) : **২.** ***টর*** *= টঙ্কার রহে যাহাতে।* ***টরক*** *=* ***টর*** *(টরটর) করে যে।* ***টরটর*** *=* ***টর****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***টরম*** *=* ***টর*** *সীমায়িত যাহাতে।* ***টারল*** *=* ***টর****-জাত লালিত যাহাতে।* **৩. টর** = নেশায় টলিত, মাতাল। **টরক** = দ্রুত যাওয়া। **টরটর** = সত্বর বা দ্রুত যাওয়া। **টরম** (term) = বন্ধের পরে আদালত খোলার সময়। **টারল** = গত করিল, যাপন করিল। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** যদিও সংস্কৃতে বলা হয় র ও ল অভেদ, অর্থাৎ তাদের মধ্যে ফারাক নেই; তথাপি আমরা দেখছি **টর** ও **টল** এক কথা নয়। **টর** শব্দটির যথার্থ ব্যবহার রয়েছে গ্রামবাংলার (বিশেষত) মেয়েদের মুখের ভাষায় — 'বুড়োটা তো রেগে টর টর করে চলে গেল!' কেবল তাই নয়, 'নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকা'কেও বলে **টর**, যথা — 'লোকটি মদ বা হাঁড়িয়া খেয়ে টর হয়ে রয়েছে।' এ হল আত্মস্বরূপের টং-এ অবস্থান করতে থাকা, নিজের মধ্যে নিজে আত্মমগ্ন হয়ে ঘুরতে থাকা। এরকম মানুষ যদি হাঁটে, তার চলনে এই টর-টর ভাব থাকে। এই যে টর টর করে যাওয়া, এতে একধরনের গতি ও ছেদ থাকে, খানিকটা বাঁদিক চেপে যাওয়া এবং আবার খানিকটা ডানদিক চেপে যাওয়া থাকে। একে নড়ে নড়ে যাওয়াও বলা যায়। সেই যাওয়াকে বিস্তারিত করে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ — 'কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে'। এই **টর** সীমায়িত হয় **টরম** শব্দে। এ হল উপরোক্ত টর টর করে চলার একটি টর-এর (বা একটি নড়ার) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ রূপ। ইংরেজিতে একে বলে term, ব.শ. বলেছেন **টরম**। এই **টরম** সমূহের যোগফলেই পাওয়া যায় সম্পূর্ণ-যাওয়াকে। কিন্তু **টর** থেকে জাত টার লয় পায় যাহাতে, তাকে বলে **টারল**। ইংরেজিতে একেই বলে টারন্ বা turn। **টারল** মানেই turn down বা সরিয়ে দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া। শব্দটির ব্যবহার ছিল বৈষ্ণবসাহিত্যে। **৬.** ইংরেজি *tor*ture, *tor*toise, *term, turn* ইত্যাদি।

টল, টলটল, টলন, টলমল, টলাটল : **২.** ***টল*** *= টঙ্কার লালিত / লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***টলটল*** *=* ***টল****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***টলন*** *=* ***টল*** *অন (on) যাহাতে।* ***টলমল*** *=* ***টল*** *ও 'মল' (= 'সীমায়িত লালিত / লয়প্রাপ্ত যাহাতে')।* ***টলাটল*** *=* ***টল*** *ও* ***অটল*** *(যাহা টলে না)।* **৩. টল** = বিচলিত হওয়া, অধীর হওয়া, স্থানভ্রষ্ট বা স্খলিত হওয়া, কম্পিত হওয়া, নড়া, সঙ্কল্পচ্যুত হওয়া, বিহ্বল হওয়া, চলিত হওয়া, দুলা, হেলা, অন্যথা হওয়া, পশ্চাৎপদ বা বিরত হওয়া, শিথিল হওয়া। **টলটল** = চঞ্চল, তরঙ্গিত, কম্পমান, বিহ্বল, ইতস্তত সঞ্চলিতভাবে, চঞ্চলভাব, কম্পন, উড়ু উড়ু ভাব, **পরিপূর্ণতাজন্য উচ্ছলিতভাব**, অশান্তভাব, টলনের বা দোলনের ভাব। **টলন** = বিক্লব, বিহ্বলীভাব। **টলমল** = স্খলিত, শিথিল, উচ্ছলিত, ভরপুর, শিথিল, প্রয়াণোন্মুখ, চঞ্চল, **পরিপূর্ণতাজন্য উচ্ছলভাব** ... ইত্যাদি। **টলাটল** = কম্পিত। (ব.শ.)। **৪.** মধ্যযুগে এই শব্দগুলি যথার্থে

প্রচলিত থাকলেও, এখন প্রধানত 'নড়ে যাওয়া' অর্থেই প্রচলিত। ৫. ট বর্ণের অর্থে যে কথাটি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে, সেই কথাটিকে এখানে ব.শ. দিয়েছেন 'পরিপূর্ণতাজন্য উচ্ছলভাব' বাক্যবন্ধে। একে আত্মস্বরূপের চূড়ান্তে উঠে স্থিত হওয়াও বলা যায়। (**ঢল** শব্দে কাপের জলের উদাহরণ দেখুন)। এই স্থিতি খাড়া থাকলে টল (কারণ তাতে **ট** লালিত হয়), আর নড়ে গেলেও টল (কারণ তাতে **ট** লয়প্রাপ্ত হয়)। প্রথমটির উত্তরাধিকার বাংলায় নেই, রয়েছে ইংরেজিতে tall রূপে; আর দ্বিতীয়টির উত্তরাধিকার রয়েছে বাংলায় 'নড়ে যাওয়া' অর্থে **টল** রূপে, **টলটল** রূপে। তবে **টলমল** শব্দের বেলায় শুধুমাত্র সত্তাটির স্বস্থান থেকে নড়ে যাওয়াই বোঝায় না, তার স্বস্থানে ফিরে সঙ্কুচিত বা সীমায়িত হওয়াও বোঝায়। ৬. ইংরেজি tall, talk।

টাল, টালমাটাল, টালবাহানা : ২. ***টাল*** = ***টল*** *হইতে জাত।* ***টালমাটাল*** = ***টাল*** *ও 'মাটাল' ('সীমায়নকৃত টাল বা সামলে নেওয়া টাল')।* ***টালবাহানা*** = *বাহানার বা ভানের (বহানহ্ - ফারসি) সাহায্যে টাল করা হয় বা একদিকে সরিয়ে দেওয়া হয় যে প্রক্রিয়ায়।* **৩. টাল** = কোনো বিষয়ে আজকাল করিয়া মিছা বলিয়া ঘুরান, টলান, বঞ্চনা, প্রতারণাবাক্য, ছল, চালাকী, টলন, হেলা, একদিকে ঝোঁকা, ঠেলা, ধাক্কা, তালপ্রমাণ, উচ্চ স্তূপ, বড়রাশি; টলিত করা, বিচলিত বা বিহ্বল করা, অপসারিত করা, সরান, উৎসারিত করা, ধাক্কা দেওয়া, দূর করা, নিবারণ করা, বঞ্চনা করা, গোপন করা ... ইত্যাদি। **টালমাটাল** = ছল-ছুতা, বায়না। (ব.শ.)। **টালমাটাল** = উভয়দিকে পুনঃপুনঃ হেলন, টলমল অবস্থা। **টালবাহানা** = ওজর, ছল। (ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, ঢাকা)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. টলিয়ে দিলেই হয়ে গেল টাল। সাইকেল বা রিকশার চাকা একঝোঁকা ঘুরলে তাকে বলা হয়, চাকার **টাল**। তাকে ঠিক করাকে বলা হয় চাকার 'টাল ভাঙা'। হিন্দিতে যেকোনো বিষয়কে সরিয়ে দিলে, ঠেলে সরিয়ে দিলে, পাশে রেখে দিলে, গোপন করে দিলে বলা হয় 'টাল দেনা'। টালা মানেই সরিয়ে টলিয়ে সরিয়ে রাখা। 'টালা থেকে টালীগঞ্জ' এই টাল-এর অন্যতর রূপ।

টিলা (টীলা) : ২. ***টিলা*** = ***টি*** *লালিত হয় যাহাতে, তাহার আধার।* **৩. টিলা (টীলা)** = ছোট পাহাড়, উচ্চভূমি, ডেঙ্গা। (ব.শ.)। ৪. 'ছোট পাহাড়' অর্থে প্রচলিত। ৫. ভাবুন, একটি গোল কাপড় কিংবা জাল রাখা আছে একটি ছোট বৃত্তে। সেই কাপড়ের বা জালের কেন্দ্রবিন্দুটি ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠে দাঁড়াতে লাগল, (মনে করা যাক, কাপড়ের ভিতরে একটি কাঠি কিংবা ভূত ঢুকে গিয়ে কাপড়টিকে ঠেলে উপর দিকে তুলছে), ফলে বৃত্তটি ক্রমে ছোট হয়ে গেল, ঠিক যেন খেপলা জাল। এই খাড়াই অবস্থাটি হল **টি**। বাংলার ই, ঈ, উ, ঊ, ঐ, ঔ এবং ট, ঠ প্রভৃতি বর্ণগুলির মধ্যে এই ভাবটি নানাভাবে রয়েছে। ইংরেজি T অক্ষরটির মধ্যেও সেই খাড়াই তালগাছের ভাব — 'তালগাছ, একপায়ে দাঁড়িয়ে'। কোনো সত্তা এরকম **টি** হতে থাকলে বা লালিত হলেই তাকে **টিল** বলা যায়। আর, সেই টিল-এর আধারকে বলা হয় **টিলা**।

তাহলে তো যে-কোনো সত্তাকে ভেতর থেকে উপর দিকে ঠেলে তুলে দেওয়াকেই **টিল** বলা যায়। হ্যাঁ, বলা যায়। কিন্তু সে উত্তরাধিকার আমাদের বাংলাভাষায় নেই, রয়েছে ইংরেজিতে। ৬. ইংরেজি till, until, tilt ইত্যাদি।

টুল, টুলি (টুলী), টোল, টোলা (নিটোল) : ২. ***টুল*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ টঙ্কারী লালিত / লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***টুলি*** = ***টুল*** *গতিশীল যাহাতে।* ***টুলী*** = ***টুলির*** *আধার যে।* ***টোল*** = ***টুল*** *সক্রিয় থাকে যাহাতে।* ***টোলা*** = ***টোল****-এর আধার যে।* **৩. টুল** = লাল পাতলা একপ্রকার কাপড়, উঁচু বসিবার একপ্রকার চৌকিবিশেষ। **টুলি, টুলী** = বস্তীর ছোট ভাগ বা পাড়া। **টোল** = সংস্কৃত পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, কর্কশ বাক্য, কড়া কথা। **টোলা** = নগরের অংশ, পাড়া, পল্লী। (ব.শ.)। ৪. 'পাড়া' বোঝাতে 'টুলি' এবং 'সংস্কৃত পাঠশালা' অর্থে 'টোল' প্রচলিত। ৫. গালে টোল পড়লে সেটি কেমন দেখায়, তা সবাই জানেন। কিন্তু টোল না পড়লে, অর্থাৎ গালটি টোলহীন বা **নিটোল** হলে গোল গালটিতে কোনো গর্ত থাকে না, তা সম্পূর্ণ গোলই থাকে; তাতে মুখাবয়বের সৌন্দর্যে যাই খামতি ঘটুক। তার মানে, **টল, টাল, টিল** প্রভৃতি শব্দের বেলায় আমরা দেখছিলাম, **ট** বা টঙ্কারী-সত্তাটি আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করছে, ঊর্ধ্বে উঠে দাঁড়াচ্ছে, সদর্পে টঙ্কারিত হচ্ছে। কিন্তু 'নবরূপে উত্তীর্ণ ট' (= টু) একই ক্রিয়া করলেও তা বিপরীতমুখী, তাকে দেখা হচ্ছে উলটো দিক থেকে। এই টু লালিত বা লয়প্রাপ্ত হয় 'টুল'-এ। এটি নীচ থেকে দেখা একটি চৌকি হতে পারে, হতে পারে গালের টোল, হতে পারে সমাজের মাঝে গড়ে ওঠা এমন একটি স্থান, যেখান থেকে জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের উৎসার ঘটে, তাদের প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ ঘটে; ফলত যা সমাজরথের পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের মূল। ইংরেজিতে tool কথাটি মূলত সেই সত্তাকেই বাহ্যিকভাবে বোঝায়। সেকালের বাংলাভাষীদের সমাজের **টোলই** যে আমাদের সমাজ-মুখের সৌন্দর্যের কারণ, সে বিষয়ে এখন আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। ৬. ইংরেজি toll, tool।

ট্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অটুট, টুট, ট-কার, টইটুম্বুর, টগর, টগরা, টগরে, টট্টরী, টট্টরে, টট্টুর, ট-বাজার, টাট, টাটক, টাটকা, টাটা, টাটান, টাটি, টাটী, টাটু, টাড়, টাবা, টাবুটুবু, টায়-টায়, টায়-টোয়, টিট (টীট), টিটকার, টিটকারি, টিটকিরি, টিটিপাখী, টিট্টিভ, টুট, টুটা, টুটা-ফাটা, টুটি, টুটিয়া, টুটিল, টুটুরে, টুডু, টুয়া, টুসকি, টে, টেংটা, টেঁটন, টেঁটা, টেঁশটেঁশ, টেটারি, টেটিয়া, টেড়া, টেড়ি, টের, টেরচা, টেরা, টেরি, টেরী, টৈটুম্বুর, টৈয়া, টো, টোটক, টোটকা, টোটন, টোটা, টো-টো, টোড়ী, টোয়ত, টোয়া, টোয়ে, টোরা, টোসা, টৌ, ট্যাড়চা, ট্যার, ডা (একডা)।

টাট, টাটক, টাটকা, টাটা, টাটান, টাটি(টী), টাটু, টিট, টিটকার, টিটকারি, টিটকিরি, টুট্ (টুটা, টুটা-ফাটা, টুটি, টুটিল), টে,

টেটিয়া, টেড়া, টেড়ি (টেরি), টের, টেরচা, টেরা, টো, টোটক, টোটকা, টোটন, টোটা, টো-টো : ২. *টাট* = *টঙ্কারের আধার টঙ্কারিত যাহাতে। টাটক = টাট করে যে। টাটকা = টাটক-এর আধার যে। টাটা = টাট-এর আধার যে। টাটান = টাটা অন যাহাতে। টাটি = টাট গতিশীল যাহাতে। টাটী = টাটির আধার যে। টাটু = টাট নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। টিট = গতিশীল টঙ্কারী টঙ্কারিত যাহাতে। টিটকার = টিট করা হয় যাহাতে। টিটকারি (টিটকিরি) = টিটকার গতিশীল যাহাতে। টুট = নবরূপে উত্তীর্ণ টঙ্কারী টঙ্কারিত যাহাতে। (টুটা = টুট-এর আধার যে। টুটা-ফাটা = টুটা ও ফাটা। টুটি = টুট গতিশীল যাহাতে। টুটিল = টুট গতিশীল হয়ে লালিত / লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে।), টে = গতিশীল টঙ্কারী দিশাগ্রস্ত যাহাতে। টেটিয়া = গতিশীল টঙ্কারী দিশাগ্রস্তভাবে টঙ্কারিত হয়ে চলে যাহাতে। টেড়া = টে-র গড়ান-উড়ানের আধার যে। টেড়ি = টে-র গড়ান-উড়ান গতিশীল যাহাতে। টের = টে (আবর্তমান) রহে যাহাতে। টেরা = টের আধার যে। টেরচা = টে-র রহন চয়িত হয় যে আধারে। টো = টু-এর আধার যে। টোটক = টো-টঙ্কার করে যে। টোটকা = টোটক-এর আধার যে। টোটা = টো-টঙ্কারের আধার যে। টো-টো = টো-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ৩. **টাট** = থালী, ছোট থালা, পূজার সজ্জাবিশেষ, মহাজনের বসার বিছানা বা গদী, কপট প্রবন্ধ, মায়াজাল। **টাটক** = মোহ, বিস্ময়। **টাটকা** = তাৎকালিক, তখনি বা সদ্যঃপ্রস্তুত, নূতন, তাজা, সদ্যঃপ্রস্ফুটিত (ফুল), জলজীয়ন্ত (মাছ), সদ্যঃপ্রাপ্ত (খবর), গরম-গরম (ভাজা), তখনি দোহা (দুধ)। **টাটা** = যন্ত্রণাযুক্ত হওয়া, যন্ত্রণাবোধ করা, টাটান। **টাটি (টাটী)** = বাঁশ শর ইত্যাদির আগড়, পাল্লা বা ঝাঁপ, ঘরের বেড়া, পালঙ্ক, তক্তাপোশ, শিশুর খেলার সামগ্রী — মাটির ছোট থালা। **টাটু** = খর্ব্ব অশ্ববিশেষ। **টিট (টীট)** = ধূর্ত্ত। (**টিটপনা** = চতুরতা)। **টিটকার (টিটকারি, টিটকারী, টিটকিরি, টীটকারি)** = অবজ্ঞাসূচক শব্দ, ধিক্কার, উপহাস, টিটিপাখীর ডাক। **টুট** = হানি, ক্ষয় (অটুট শরীর = অক্ষয় দেহ), ন্যূনতা, ছিন্ন হওয়া, স্খলিত হওয়া, ভঙ্গ হওয়া, বিকৃত বা মলিন হওয়া, হীন হওয়া, কমা, নষ্ট হওয়া, শক্তিহীন বা ব্যর্থ হওয়া, ... ইত্যাদি। **টে** = স্থানে, নিকটে, টিয়াবিশেষ, টা। **টেটিয়া** = শঠ, ধূর্ত্ত। **টেড়া** = তির্য্যক, বক্র, বাঁকা, অসমান্তর, তেরচা, কুটিল, পেঁচাল, উগ্র, উদ্ধত, রাগী, গরম, ব্যাবৃত্ত, বাঁকা। **টেড়ি (টেরি)** = বক্র, বাঁকা, প্রতিকূল, তেরচা; চীৎকার করিয়া, কুপিতভাবে চেঁচাইয়া, বন্য কাঁটা ক্ষুপবিশেষ ও তাহার শুটিফল (ইহা কালির উপকরণ)। **টের** = গৃহাদির সম্মুখস্থ মধ্যভাগ হইতে টেরা (তির্য্যকস্থিত) অংশ, তির্য্যকদর্শন, কটাক্ষে দেখা, গূঢ় বিষয়ের বোধ। [টের পাওয়া = অনুভব করা, জানা, বিপদে পড়া (শাসন বাক্যে)। টেরক বা টেরা = তির্য্যকদৃষ্টিবিশিষ্ট, কেকর, টেরা]। **টেরচা** = বক্র, বাঁকা, টেরা, অসমান্তরাল, আড়া-আড়ি, কোণা-কোণি, আড়ভাবে বোনা। **টো** = টে-র সমার্থক। **টোটক** = পক্ষিবিশেষ (ত্রোটক)। **টোটকা** = তন্ত্র-মন্ত্র, অভিচার-কার্য্য, গাছ-গাছড়া ইত্যাদির ঔষধ, (ত্রোটকা)। **টোটন** = চয়ন (ত্রোটন)। **টোটা** = কারতুস (cartridge), জ্বলিত বাতির শেষাংশ বা টুকরা, উদ্যান, বাগিচা। **টো-টো** = সেই-সেই স্থানে, নানাস্থানে, এদিকে-সেদিকে, চারিদিকে। (ব.শ.)। ৪. **টাট অপ্রচলিত মনে হলেও কার্যত তা প্রচলিত রয়েছে** টাটানো, টাটিয়ে চড় মারা প্রভৃতি রূপে। বাকি সমস্ত শব্দগুলিই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. **শব্দগুলির প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে দেখার চেষ্টা করা যাক।**

টাট = টাট **কথাটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল** 'টঙ্কারের-আধার টঙ্কারিত যাহাতে'। **এটি 'টট হইতে জাত'**। তার মানে, **টাট** হল এমন একটি সত্তা যে তার আপন স্বভাববশত যেন-বা কিছু একটা উৎপাদন বা সৃজন করে, ধরা যাক তা শব্দ, কথা, গান, গালাগালি, থুতু, কিংবা দূত, পত্রবাহক, পণ্য, বার্তা ইত্যাদি। তারপর সেই সৃজিত বিষয়কে সে তার আশেপাশে সর্বদিকে বিক্ষেপ করে, এবং সেই বিক্ষিপ্ত বিষয় গিয়ে কোনো কিছুতে আঘাত করছে। এইরূপ ক্রিয়াকারী সত্তাকে বলে **টাট**। এখানে মূল সত্তাটি রয়েছে কেন্দ্রে এবং তৎসৃষ্ট শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ তার সর্বদিকে বিকীর্ণ হয়ে একটি পরিধি তৈরি করেছে। এই পরিধিকে বা পরিধির অংশকে **টাটি বা টাটী** বলে। গ্রামবাংলায় সাধারণত গেরস্থবাড়ির চারদিকে যে বেড়া দেওয়া থাকে, তাকে **টাটি** বলে; এমনকি সেই বেড়ার যে অংশটি দরজার মতো ব্যবহৃত হয়, তাকেও **টাটি** বলা হয়। **শব্দার্থ** অনুসারে সত্তাকে (এক্ষেত্রে বসতবাটিকে) ঘিরে থাকা তার আত্ম-অস্তিত্ব ঘোষণামূলক ও আত্মরক্ষামূলক এই পরিধি রেখা ধরে বেষ্টিত বেড়াকেই **টাটি** বলা হয়। সত্তার অস্তিত্বের **ট** কিংবা বহিরাগতের **ট** এই বেড়ায় গিয়ে টঙ্কারিত হয়, সেকারণেই **টাটি**। এই টাট অন থাকলে হয় **টাটান** বা **টাটানো**। ফোঁড়ার ক্ষেত্রে ভেতর থেকে সৃষ্ট পুঁজের টঙ্কার ত্বকের বহিরাবরণে গিয়ে টঙ্কারিত হয়, তা ফেটে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে; তাই ফোঁড়া **টাটায়**। একই ভাবে আরও অনেক কিছুই টাটায়, মেজাজও **টাটায়**; মনের নিজস্ব সংযম-সীমায় গিয়ে টঙ্কারিত হয়। সেই সীমা বেলুনের মতো প্রসারিত-সংকুচিত হতে থাকে। এইভাবে সেই **টাট** গতিশীল বা সক্রিয় (অর্থাৎ টঙ্কার ধারণ করে বহির্দেশের দিকে কিংবা অন্তর্দেশের দিকে প্রসারিত বা সংকুচিত হতে) থাকলে তাকে বলে **টাটি**। টাটির আধারকে ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মে বলে **টাটী**। তবে কিনা এই টাটের **ট** যদি স্থির হয়ে **ঠ** হয়ে যায়, তখন **টাট** হয়ে যায় ***ঠাট***। সেই ***ঠাট*** বজায় রাখতে উত্তরসূরীর জীবন দুর্বিষহ হয়, তা সে মানসিক সাংস্কৃতিক আভিজাত্যমূলক জাঁকজমকের ***ঠাট***-ঠমক হোক আর শারীরিক প্রাচীর-পাঁচিল কিংবা দখলীকৃত এলাকা ঘোষণাকারী বাউন্ডারি-ওয়ালের নিরাপত্তা বেষ্টনীর ***ঠাট***ই হোক।

এতৎসত্ত্বেও যদি **টাট**-কে ঠিকঠাক উপলব্ধি করতে না পারেন, একবার ইংরেজির দিকে তাকান। আমরা যে **টাট**কে পাচ্ছি সত্তা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 'থুতু' ... ইত্যাদি রূপে, ইংরেজি তাকে পেয়েছে tat রূপে। গালাগালি, থুতু, নিন্দামূলক কথা প্রভৃতি এসে পড়লে কেউ কি চুপ থাকতে পারে, ইংরেজও চুপ করে থাকেনি; সে গালাগালি বা থুতুর উত্তরে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে, tat-এর বদলে tit করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছে। **টাট**-এর বদলে এইরকম **টিট** করার কথা আমরা বাংলাভাষীরাও জানি, জানি **টিট** আর **টিট** রূপে। টিট রূপে আমরা কাজ সারি কেবল আওয়াজের মাধ্যমে, তাকে বলা হয় **টিটকারি**। আর, **টিট** রূপে আমরা ইংরেজদের মতোই tit for tat

করে ছাড়ি। এই **টিট** যার সাহায্যে করি, তাকে বলে **টিল**; তাতে **টি** লালিত/লয়প্রাপ্ত হয়। সেভাবে বলতে গেলে, প্রত্যুত্তরে যে বস্তুটি ছোঁড়া হয়, তাকেই **টিল** বলে। আর, যদি সেই প্রত্যুত্তর বিপরীত পক্ষের প্রার্থনার উত্তরে দেওয়া হয়, তাকে বলে **টিলা** (আলগা করে) দেওয়া। তখন বোঝা যায়, **টিটকারী** টাইটকারীও (tight-কারীও) বটে। তার ফলে টাইটকৃত বাধ্য হয় প্রার্থনা করতে — আর **টিট** কোরো না, একটু **টিল** দাও। ... দিশাগ্রস্ত **টিলকে টিলা** বা **ঢেলাও** বলে।

আরও আছে। আপনি **টাট** রূপে শব্দ পাঠাচ্ছেন, বার্তা পাঠাচ্ছেন, লোক পাঠাচ্ছেন। কিন্তু সে যখন চলে যাচ্ছে, **অটন** (পর্যটন) করছে, তখন তাকে কী বলবেন? এর উত্তরাধিকার বাংলার রয়েছে উপরোক্ত **টাটানো**-য়; রয়েছে ইংরেজিরও। ইংরেজ প্রেরিতকে বলেন, যাও যাও, গিয়ে টঙ্কারিত হও — ta-ta। তবে সত্তা থেকে এইভাবে সদ্য সদ্য প্রেরিত হয়ে আমাদের কাছে যে আসে, তাকে আমরা বলি **টাটকা**।

টুট (টুটা, টুটা-ফাটা) = **'টু** (নবরূপে উত্তীর্ণ টঙ্কারী) টঙ্কারিত হয় যাহাতে', তাকে বলে টুট। এই টঙ্কারী তার মূল সত্তাকে ত্যাগ করে ভিন্ন হয়ে দ্রষ্টার চোখে পড়ে বা তার কাছে চলে আসে। দ্রষ্টা দেখে বস্তুটি ভেঙে গেল এবং তার **টুকরো** বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এই **টুট**-এর আধারকে বলে **টুটা**। যাতে ফাঁক বা পার্থক্য তৈরি হয়েছে কিন্তু তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি, তাকে বলে **ফাটা**; আর যা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে সে হল **টুটা**।

টেড়া (টের, টেরা, টেরচা) = **'টে**-র (বা দিশাগ্রস্ত টঙ্কারীর) গড়ান-উড়ান যাহাতে (= টেড়) তাহার আধার'কে বলে টেড়া। তার মানে, যে টঙ্কারী দ্রষ্টার চোখে বিশেষ একটিমাত্র দিশার দিকে চলছে, দ্রষ্টার চোখে সে হল **টেড়া** (ট্যাড়া)। কিন্তু এই দিশাগ্রস্ত টঙ্কারী বা **টে** যদি গড়ান-উড়ান না করে একই স্থানে ঘুরতে থাকে, রক্ষিত/ভক্ষিত হতে থাকে, তাকে বলে **টের**। যে-সত্তা সেই **টের**-এর খবর পেয়ে যায়, সে **টের** পায় কী ঘটছে বা ঘটতে চলেছে। আর, যে-সত্তা সেই **টের** চয়ন করে, সে স্বভাবতই **টেরচা** হয়ে যায়।

টো (টোটক, টোটকা, টোটন, টোটা, টো-টো) = টু-এর আধারকে টো বলে। এই টু-কে সহজে বোঝা যায় ইংরেজির to থেকে। সত্তা বা তার অংশ যখন উলটো মুখে এসে আঘাত করে, তখন তাকে টু বা টো বলে। শব্দটিকে আমরা সহজে বুঝতে পারি, যখন কেউ এসে জনে জনে ছুঁয়ে যায়, যাকে বলা হয় 'টো-টো' (toe-toe) করা। ইংরেজির goes to, give to প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই টু এবং টো-এর বিপুল ব্যবহার রয়েছে। দ্র. **টু, টুক**। **তু.** ইংরেজি tat, ta-ta, tight, tit, take, to, took।

ঠ

ঠ বর্ণের অর্থ : ঠ = ঠ্-অন করে যে; টঙ্কারস্থিত = টঙ্কৃত = ঠ। ঠ্ বর্ণটি তৈরি হয়েছে (ট্ + হ্ = ঠ্) ট্-এর সঙ্গে হ্ জুড়ে। সেকারণে, সাধারণভাবে ঠ্-এর অর্থ হল ট্-অন-হওয়ন, অর্থাৎ 'ট-অন যেখানে গিয়ে থেমে যায়'। তাই ঠ = ঠ্-অন করে যে অর্থাৎ ট-অন-স্থিত = ঠয়িত = **ঠ**। এই **ঠ** হল ট-অনের ক্রিয়াসমাপ্তির হওয়ন বা স্থিতি রূপ। তার মানে, টয়ন বললে আমরা বুঝি ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দুতে গিয়ে টঙ্কারিত হওয়া, সেই টঙ্কার স্থির বা থিতু হয়ে গেলেই **ঠ**। তার মানে টয়নের হওয়নই ঠ-অন। একে 'গিয়ে ঠেকা' ভাবা যেতে পারে। অর্থাৎ **ঠ** হল 'ঠেকা'র অভিধা। একে 'ঠেক'ও বলা হয়ে থাকে ('চায়ের ঠেক' ইত্যাদি, যেখানে চা-পায়ীরূপী টঙ্কারী গিয়ে থিতু হয়।)। আবার, একদিকে স্থ বা থাকা যেমন ছ-এ (স্থ > থ > ছ) পর্যবসিত হয়, ঠ-এও পর্যবসিত হয়। এ হল 'টঙ্কারী'র মতোই 'ঠঙ্কারী'। যে আঘাতকারী মেঝেতে পড়ে গিয়ে 'টন-টন' করে আওয়াজ করে এবং যে আঘাতকারী 'ঠন-ঠন' করে আওয়াজ করে, তাদের মধ্যে যে পার্থক্য, এই **ট** ও **ঠ**-এর মধ্যে সেই পার্থক্য। তবে মনে রাখা ভাল, ঠ বর্ণের বিকাশ ঘটেছে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের পরে। দ্র. **ট বর্ণের অর্থ**।

মোট কথা, সত্তার নিজের দিক থেকে দেখলে, **ঠ** হল কোথাও গিয়ে সজোরে আঘাতপূর্বক স্থির হওয়া বা 'ঠেকে' যাওয়া; বিপরীত দিক থেকে দেখলে **ঠ** হল সেই, যে, বাইরে থেকে এসে আঘাত ক'রে সত্তার পরিধিকে ভেতর দিকে সঙ্কুচিত হতে বাধ্য করে বা দাবিয়ে দেয়; এবং তৃতীয় জনের দৃষ্টিতে দেখলে **ঠ** হল সেই, যে, ক বিন্দু থেকে খ বিন্দুতে গিয়ে সেঁটে যায়। এই ঠ-এর আধারকে বলে ঠা। ঠি, ঠু প্রভৃতির অর্থের জন্য **ক** ও **ট বর্ণের অর্থ** দ্রষ্টব্য।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন সংস্কৃত ভাষা নির্মাণ করেন, তখনও পর্যন্ত জনসাধারণ্যে শব্দের ব্যবহার এখনকার মতো এত বিপুল সংখ্যক হয়নি। এমন বহু স্বর তখনও ছিল যা তখনও দু-তিনটি বা ততোধিক স্বরের যৌথরূপ। তখনও তা ভেঙে আরও খণ্ডিত হয়ে আরও বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্তমান চেহারা পায়নি। সেই কারণে প্রাচীন কালের ভাষাগুলিতে আমরা এমন বহু বর্ণ পাই, যা দু-তিনটি স্বরের যৌগিক রূপ। গ্রীক ল্যাটিনে তার বেশ কিছু নিদর্শন রয়েছে। ইংরেজির C, D, G, T প্রভৃতি যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের সংস্কৃতে, যদিও সেই সংস্কৃতভাষার সৃষ্টি কালেই, স্বর-ব্যঞ্জনের বিশ্লেষণ অনেকটাই করে ফেলা গিয়েছিল, পৃথক স্বরকে চিহ্নিত করে পঞ্চ বর্গে ৩৫টি বর্ণে ভাগ করে ফেলা গেছিল, কিন্তু সামাজিক ব্যবহারে ঘ, ছ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, থ, ফ প্রভৃতি ধ্বনি দিয়ে তখনও খুব বেশি শব্দের প্রচলন হয়নি। যে কারণে সংস্কৃত ভাষায় ঐ বর্ণগুলিতে শব্দসংখ্যা খুবই কম। সংস্কৃত অভিধানে ঘ, ছ, ফ বর্ণে কিছু শব্দ থাকলেও ঝ, ট, ড বর্ণে শব্দ রয়েছে মাত্র ২০/২৫টি করে এবং ঠ, ঢ, ও থ বর্ণে দু-তিনটির বেশি শব্দই নেই। কিন্তু মধ্যযুগে বাংলা ভাষা যখন বিকশিত হচ্ছে, তখন বঙ্গভাষীগণ তৎকালের এই অনতিব্যবহৃত বর্ণগুলিতে বিপুল পরিমাণ শব্দ সৃষ্টি করেছেন। পরবর্তীকালে আমাদের অভিধান ও শব্দকোষকারগণ যখন শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরে ঐ বর্ণগুলির শব্দগুলিকে সাজাতে গেছেন, পড়ে গেছেন বিপদে। একদিকে শব্দের মূলে কোনো ক্রিয়াকে যেমন খুঁজে পাননি, অপরদিকে শব্দটিকে কোন শব্দ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করবেন ঠিক করতে পারেননি। কেননা, সংস্কৃতকারদের মতো যৌথভাবে ভাষাসংস্কারের

কাজ পরবর্তীকালে আর তো সেভাবে হয়নি। যতটুকু যা হয়েছে, সবই হয়েছে বাংলার মধ্যযুগের কবি-গায়কদের শব্দব্যবহারে। এই 'পরবর্তীকালে বিকশিত বর্ণ'গুলির মধ্যে **ঠ** অন্যতম। **থ**-এর পরেই এর স্থান। সংস্কৃতে **থ**-এ ক্রিয়াপদ তো দূরের কথা, শব্দই নেই; তবে **ঠ**-এ রয়েছে মাত্র একটি শব্দ (ঠক্কুর), তাও অর্বাচীন সংস্কৃতে তার দেখা মেলে। নিজস্ব স্বতন্ত্র বর্ণ-সত্তা নিয়ে এই **ঠ** বিশ্লিষ্ট হয়ে বেরিয়ে এসেছে **ট, স্থ, থ** থেকে। মধ্যযুগের বাংলায় তা বিশ্লিষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ পৃথক হয়েছে এবং তা পণ্ডিতদের ইচ্ছায় হয়নি, জনসাধারণের ভাষা ব্যবহারেই তা ঘটেছে অর্থাৎ বাংলাভাষী জনসাধারণই তা ঘটিয়েছেন। কবিগণ তাকেই রূপ দিয়েছেন তাঁদের রচনায়। একই ঘটনা ঝ, ঢ, থ প্রভৃতি বর্ণগুলির ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

ফলে উপরোক্ত ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ ... প্রভৃতি বর্ণের ক্ষেত্রে বহু কাজ বাকি আছে, এবং আগামী যুগের শব্দকোষকারগণকে সেই বিশাল কাজ করতে হবে। আমরা বিষয়টি শনাক্ত করলাম এবং দু-চারটি দৃষ্টান্তমূলক শব্দোৎপাদন রহস্য ও তার শব্দার্থ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। পরিস্থিতি এ বিষয়ে আমাদেরকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার অবকাশ না দেওয়ায়, বলতে গেলে, আমরা কেবল বিষয়গুলি ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

ঠ্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : *ঠক্, ঠ্ = ১ + ১*

***ঠক* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** *: ঠক্কুর,* ঠক্, ঠক, ঠকঠক, ঠকঠকা, ঠকঠকি, ঠকঠকে, ঠকঠাক, ঠকঠান্দি, ঠকরঠকর, ঠকা, ঠকান, ঠকাম, ঠাকরীকলাই, ঠাকরুণ, ঠাকুর, ঠাকুরঘর, ঠাকুরজামাই, ঠাকুরঝি, ঠাকুরদা, ঠাকুরদাদা, ঠাকুরদালান, ঠাকুরদেবতা, ঠাকুরপো, ঠাকুরপ্রণামী, ঠাকুরবাড়ী, ঠাকুরমশাই, ঠাকুরমা, ঠাকুরণদিদি, ঠাকুরাইন, ঠাকুরাণি, ঠাকুরানী, ঠাকুরাল, ঠাকুরালি(লী), ঠাকুরিকলাই, ঠাকুরুণ, ঠানদি, ঠানদিদি, ঠিক, ঠিকঠাক, ঠিকর (ঠিকুর), ঠিকরা, ঠিকরি, ঠিকরী, ঠিকা, ঠিকানা, ঠিকারী, ঠুক, ঠুকরা (ঠোকরা), ঠেক, ঠেকনা, ঠেকনো, ঠেকা, ঠেকাঠেকি, ঠোক, ঠোকনা, ঠোকর, ঠোকরা, ঠোকরান, ঠোকা, ঠোকাঠুকি, ঠোক্কর, ঠোকা, ঠক্কুর।

ঠক্ = টঙ্কারস্থিতের করণ। **ঠক** = টঙ্কারস্থিতের করণ যাহাতে।

ঠক (ঠকঠক, ঠকঠকা, ঠকঠকি, ঠকঠকে, ঠকঠাক), ঠকা : ২. ***ঠক*** *= ঠ করে যে (ভেতর দিকে দাবিয়ে দেয় যে)।* ***ঠকা*** *=* ***ঠক****-এর আধার যে।* **৩. ঠক** = ধূর্ত্ত, প্রতারক, কঠিন দ্রব্য ঠোকার শব্দ। **ঠকা** = প্রতারিত হওয়া, অকৃতকার্য্য হওয়া, হারা, অপ্রস্তুত হওয়া, প্রতারিত করা, ঠকান, হারান, অপ্রস্তুত করা। (ব.শ.)। **৪.** মধ্যযুগের কবিদের হাতে ঠক ও তজ্জাত শব্দসমূহের কত বিপুল ব্যবহার ছিল, ব.শ. তার বহু উদাহরণ দিয়েছেন। এমনকি আধুনিক কবি-সাহিত্যিকরাও শব্দটির কমবেশি ব্যবহার করেছেন (যেমন 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর **'ঠকচাচা'**, কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঠকা যাঁই ঠাঁই, কাঁদিছে নেহাই আগুন ঢুলিছে ঘুমে'); যদিও পরবর্তীকালে অ্যাকাডেমির বিমাতৃসুলভ আচরণের কারণে শব্দগুলির ব্যবহার অ্যাকাডেমিতে ক্রমশ কমেছে; কিন্তু জনসাধারণ্যে তার ব্যবহার ক্রমশ বেড়েছে। 'কপালে না থাকলে ঘি / **ঠকঠকালে** হবে কী!' — এমন বাক্য তো বাঙালির সর্বজনবোধ্য প্রবাদ হয়ে রয়েছে। **৫.** ট স্থির রূপ নিলেই হয়ে যায় ঠ। **টাট** শব্দে আমরা দেখেছি, তা স্থির রূপ নিলেই হয়ে যায় **ঠাট**। তেমনি, **টক**-এর স্থিতিরূপই **ঠক**। এটি যতক্ষণ বাহ্যিক **টক**-এর স্থিতিরূপ, ততক্ষণ তাকে আমরা তাকে **ঠকঠকানি**-র নানা আওয়াজ রূপে চিনতে পারি। কিন্তু যখন তা মানসিক **টক**-এর স্থিতিরূপ হয়ে দেখা দেয়, তখন আমরা তাকে সামাজিক **ঠক** (ঠগ) রূপে শনাক্ত করে থাকি। এই **ঠক** আহত সত্তার পরিধিকে ভেতর দিকে দাবিয়ে দেয়, *ঠেলে* দেয়। ফলে, এই ক্রিয়াটি যে করে তাকে যেমন **ঠক** বলে, তেমনি বিপরীতে যার উপর **ঠক** করে, সে ভেতর দিকে দেবে যায়, সংকুচিত হয়ে যেতে বাধ্য হয়, তার স্বাভাবিক অস্তিত্ব-বিকাশ-অগ্রগতি পিছিয়ে আসে বা **ঠকে**। এই **'ঠক** অন থাকে যাহাতে' তাকে বলে **ঠকান**। ব.শ. জানাচ্ছেন, সামাজিকভাবে এই **ঠকান** একই সঙ্গে ঝঞ্ঝাট, বিপদ, হাঙ্গামা, হুজ্জতি রূপে দেখা দেয়। এই **ঠক্** ক্রিয়া থেকেই আমরা **ঠাক, ঠিক, ঠুক, ঠেক, ঠেকান, ঠোকা** প্রভৃতি পরবর্তী শব্দগুলিতে অনায়াসে চলে যেতে পারি। দ্র. **ঠিক** ইত্যাদি।

ঠাক (ঠিকঠাক, ঠুকঠাক), ঠাকুর (ঠাকুরঘর, ঠাকুরজামাই, ঠাকুরঝি, ঠাকুরদা ইত্যাদি) : **২.** ***ঠাক*** *=* ***ঠক*** *হইতে জাত।* ***ঠাকুর*** *=* ***ঠাক*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে আবর্ত্তমান রহে যাহাতে।* **৩. ঠাকুর** = দেবমূর্ত্তি, প্রতিমা, দেবতা, ইষ্টদেবতা, শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণবিগ্রহ, অনাদি, ধর্ম্মদেব, বিষ্ণু, বিষ্ণুর অবতার, চৈতন্যদেব, সম্রাট, রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের উপাধি, বৈষ্ণবের উপাধি, প্রভু, মনিব, সর্ব্বোপরি দেবতা, দেবদেব, পূজ্য, মহাশয়, নায়ক, সরদার, শ্বশুর, ভাশুর, প্রভু, পতি, পিতা, অধিকারী, স্বামী, মালিক, দীক্ষাগুরু, গুরুদেব, বৎস, বাছা, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ, পাচক-ব্রাহ্মণ, জ্যেষ্ঠ, বড়, গৃহীর নিত্যপূজ্য শালগ্রাম। (ব.শ.)। **৪. ঠাক** শব্দটি সরাসরি অপ্রচলিত, কিন্তু **ঠিকঠাক, ঠুকঠাক** রূপে প্রচলিত। তবে **ঠাকুর** শব্দটি এককভাবে এবং অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। **৫.** যে নিয়মে কচ > কাচ, গল > গাল, দশরথ > দাশরথি, ইত্যাদি হয়, সেই একই নিয়মে **ঠক** থেকে **ঠাক** হয়। এটি স্থাক (থাক, কাপড়ের 'থাক') শব্দের আরও বিশ্লিষ্ট একটি শাখায় জাত স্বতন্ত্র রূপ। এই **ঠাক** 'ঠক হইতে জাত'। সেই কারণে **ঠাক** শব্দটি নিম্নলিখিত অর্থধারণ করে থাকে।

জালকাঠিগুলো আপনার হাত থেকে **ঠক ঠক** করে মেঝেতে পড়ে গেল, আর মেঝেতে ছোট ছোট দাগ হয়ে গেল। এই দাগগুলি হল **ঠাক**। এরা **ঠক** হইতে জাত। অন্যভাবে ভাবলে, একটি বড় কাদার তালে ছোট একটি কাচের গুলি পড়ে গেলে যে-অর্ধবৃত্তাকার গর্ত হয়ে যায়, সেটিই হল **ঠাক**। এখানে গুলি দিয়ে ঠোকা হয়েছে, ফলে কাদার গোলকটির খানিকটা অংশ দেবে গেছে, অর্থাৎ

অবয়বহীন হয়ে গেছে বা **ঠকে** গেছে, তাই **ঠাক**। তবে এভাবে **ঠাক** শব্দটির সঙ্গে আমাদের সেভাবে পরিচয় নেই; যতটুকু পরিচয় রয়েছে, তা সবই অদৃশ্য গোলকের ক্ষেত্রে। এই অদৃশ্য অপার্থিব গোলকটি পার্থিব কাদার গোলক নয়, এটি মানসিক গোলক — যথা মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, মান-অভিমান, ভয়-ভক্তি, মায়া-মমতা ইত্যাদি; সেখানেও **ঠাক** থাকে। মনে আঘাত লাগলে, মানসিক গোলকেরও কিছু অংশ দেবে যায়, ঠকে যায়। সেই দেবে যাওয়া বা ঠকে যাওয়া অংশও অতএব **ঠাক** পদবাচ্য। তবে তেমন **ঠাক**কেও আমরা সহসা চিনতে পারি না

তার মানে, বাহ্যিক অর্থে **ঠাক** শব্দটির প্রচলন নেই, যতটুকু রয়েছে তা সবই মানসিক অর্থে। (দ্র. **ঠিকঠাক**।) এই **ঠাক** পার্থিব গোলকে বা মেঝেতে না হয়ে যদি মানুষের মনে, তার জ্ঞান-বিজ্ঞানে, মান-অভিমানে, ভয়ে-ভক্তিতে, মায়া-মমতায়, সহায়-সম্পদে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে হয়, তখনই কেবল তাকে খানিকটা চেনা যেতে পারে, তবে তাকে সুস্পষ্টভাবে চেনা যায় যখন সেই **ঠাক** 'নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে আবর্ত্তনশীল (উর)' **ঠাকুর**-এ পরিণত হয়ে যায়, তখন তাকে চেষ্টা করলেই আমরা চিনতে পারি। কারণ সেই ঠাকুর তখন আমাদের মনের **ঠাক**গুলির উপর (ভয়-ভক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মায়া-মমতা ইত্যাদির উপর পড়া গর্তগুলির উপর) নির্ভর করে আবর্ত্তমান থাকে। মনের **ঠাক**গুলি (দেবে যাওয়া অংশ স্বরূপ দাগগুলি) তখন **ঠাকুর**-এর অস্তিত্বের ভিত্তি হয়ে যায়। ফলত, এই ঠাকুর যেমন মন্দিরের বিগ্রহে পরিণত হতে পারে, তেমনি ঘরের ঠাকুরজামাই, ঠাকুরঝি, ঠাকুরমশাইতেও পরিণত হতে পারে।

ঠিক (ঠিকঠাক, ঠিকানা) : ২. *ঠিক = ঠ (টঙ্কারের স্থিতিরূপ) গতিশীল কৃত যাহাতে।* ৩. **ঠিক** = স্থিত, দৃঢ়, অটল, সত্য, যথার্থ, ন্যায্য, সঙ্গত, ন্যায়বান, ধার্ম্মিক, যোগ্য, উপযুক্ত, ভ্রমরহিত, নির্ভুল, ভাল, আচ্ছা, কমবেশি-হীন, পুরা, নির্দ্ধারিত, প্রস্তুত, প্রকৃতিস্থ, অবিকৃত, ত্রুটিহীন, নিখুঁত, স্বাভাবিক, নিশ্চিত, সম্পূর্ণ, ভরা, খাঁটি, মাপসই, শাসিত, সীধা, সজ্জিত। (ব.শ.)। ৪. correct অর্থে প্রচলিত। ৫. **ঠ** বর্ণের মূল অর্থে আমরা জেনেছি, কোনো সত্তা টঙ্কারিত হয়ে স্থিতিরূপ পেয়ে গেলে সে হল **ঠ**। সেই ঠ যদি তদ্রূপেই গতিশীল হয়ে চলতে শুরু করে, তবেই সে হয় **ঠি**। এই **ঠি**-করণ যাহাতে, সেই হল **ঠিক**। এর মূলে যে-ক্রিয়াটি রয়েছে, তাকে আমরা **টিক** শব্দে আগেই শনাক্ত করেছি। এই **টিক**-এর স্থিতিরূপকেই **ঠিক** বলে। অর্থাৎ যা কিছু **টিকে থাকে**, সেই হল **ঠিক**। **স্থিত** শব্দেরই এটি একটি রূপ। এই **ঠিক** একটি চিহ্ন (✓), ইংরেজিতে যাকে বলে tick। ইংরেজি কিন্তু **'ঠিক'** শব্দের মূল অর্থটিকে ধরে রেখেছে তার stick শব্দে। আর, তার **'ঠিক'** ধারণাটিকে বোঝানর জন্য tick (✓) চিহ্নটির ব্যবহারের প্রচলন করেছে। কীভাবে সেই চিহ্নে ইংরেজের আদিপুরুষেরা পৌঁছেছিলেন, আমরা জানি না। আমরা কেবল লক্ষ্য করেছি, এই চিহ্নের ভিতরে **ঠিকরান**-র ধারণাটি রয়েছে; যেন-বা কিছু একটা ভূমিতে পড়ে **ঠিকরে যাচ্ছে**। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে tick, teak, stick, tack, tackle, tuck, stuck এগুলো ইংরেজি ভাষায় **খুবই কাছাকাছি** ধারণার ধারক শব্দ। বাংলায় যেমন **টিক, টেকা, টিকি, টাক, ঠাক, ঠিক, ঠিকা, ঠেকনা, স্থিত, স্থাক, তাক, ত্যকা, থাক** প্রভৃতি খুবই কাছাকাছি ধারণার ধারক শব্দ। সে তুলনায় ইংরেজি ভাষা t-থেকে আর বিশ্লিষ্ট হতে পারেনি, তার আগেই সম্পূর্ণরূপে মৌলবাদী হয়ে সম্পূর্ণ স্থির রূপ পেয়ে গেছে। ভাষাটি আরও বিশ্লিষ্ট হয়ে **ঠ** ও **থ** ধ্বনি দুটির জন্মই দিতে পারেনি, একটু মিশ্র অবস্থানে থেকে গেছে। অন্যান্য ভাষাতেও নিশ্চয় এর সমগোত্রীয় শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। কিন্তু বাংলা আরও এগিয়েছে, 'যে টিকে থাকে' তাকে সে কেবল 'টিক' নামই দেয়নি, 'যে টিকে থাকে' তাকে সুনিশ্চিত নাম দিয়েছে **ঠিক**। (সন্দেহ নেই, এর মূলে **স্থ, থাকা, স্থিত, স্থিক, থিক, থিকথিক**, এসব রয়েছে।) যে সত্তা **টিকে** থাকে বা থাকতে পারে, সেই সত্তাই **টিক** (teak) পদবাচ্য, **ঠিক** পদবাচ্য। ইংরেজিতে সেকারণেই সেগুন কাঠকে teak বলে। এই কাঠের দীর্ঘজীবিতার কথা কাঠের আসবাবপত্র নির্মাণকারীরা ভালোই জানেন। বিশেষত, এই কাঠের ভিতরে অত্যন্ত তিতো রস থাকে, এত তিতো যে, উইপোকাও তাতে দাঁত বসাতে সাহস পায় না। সেই রস এমনকি দু'শো বছরের পুরনো সেগুন কাঠের ভিতরেও কমবেশি থাকে বলে শুনেছি।

সর্বোপরি, **ঠক** শব্দের থেকে আমরা জেনেছি যে, গালে **টোল** পড়ার মতো যেকোনো অবয়বে যে-কোনো বহিরাঘাত জনিত গর্ত মাত্রেই **ঠাক**, যা কিনা **ঠক** হইতে জাত। এই ঠকজাত-সত্তাটি যদি যেমনকে তেমন পড়ে থাকে, তাকে বলে **ঠাক**; কিন্তু তা না করে সে যদি গতিশীল হয়ে পড়ে বা হতে থাকে, তখন তাকেও **ঠিক** বলা যায়। তার মানে **ঠক**-জাত যেমন আছে তেমন পড়ে থাকলে **ঠাক**, আর গতিশীল হলে হয়ে যায় **ঠিক**। অতএব **ঠিকঠাক** শব্দের অর্থ দাঁড়ায়, যার ভিতরে **ঠি-করণ** আছে এবং যা ঠক হইতে জাত।

ঠিক শব্দের এই অর্থটি পরে প্রতীকী রূপে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। যা কিছুই অন্য সমস্তগুলির তুলনায় টিকে থাকতে পারে, অতএব **ঠিক** পদবাচ্য, সেরকম প্রতিটি বিষয় ও বস্তুকে **ঠিক** বলা হতে থাকে। এমনকি, **ঠিক-স্থান** হয়ে যায় ঠিক-স্থানা > ঠিক-থানা > **ঠিকানা**। ৬. ইংরেজি teak, tick।

ঠিকর (ঠিকুর), ঠিকরা, ঠিকরান, ঠিকরি (ঠিকরী) : ২. *ঠিকর = **ঠিক** রহে যাহাতে। **ঠিকরা** = **ঠিকর**-এর আধার যে। **ঠিকরান** = **ঠিকর** অন যাহাতে। **ঠিকরী** = **ঠিকর** গতিশীল যাহাতে তাহার আধার।* ৩. **ঠিকর (ঠিকুর)** = ঠক্কর খাওয়া, প্রতিহত হওয়া, ছিটকান, ছটকাইয়া পড়া, বিকীর্ণ হওয়া। **ঠিকরা** = বাঁটুল, ঠাকুরীকলাই, টিকার মতো ছোট বড়া। (ব.শ.)। ৪. 'ছিটকান' অর্থে **ঠিকর, ঠিকরা, ঠিকরান** প্রভৃতি শব্দ কয়টি প্রচলিত; এবং খই ইত্যাদি ভাজার মাটির কড়াই বোঝাতে কিংবা তার ভাঙা অংশকে বোঝাতে **ঠিকরী** শব্দটি মেদিনীপুরের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত। ৫. টঙ্কার যখন স্থিতিরূপ গ্রহণ করে তখন হয় **ঠ**। গরম কড়াইয়ে আপনি ধান ফেলে দিলেন, সে স্থিতিরূপ নিল খইয়ে। এইবার সেই **ঠ** গতিশীল হল, খই লাফ দিল কড়াই থেকে। **ঠ** হয়ে গেল **ঠি**। এই **ঠি-করণ** রহে যাহাতে, তাই **ঠিকর**। যে কড়াইয়ে এই ঠিকর হয়, তাকে বলে

ঠিকরা বা **ঠিকরী**। এই ঠিকর চলতে থাকলে তাকে বলে **ঠিকরান**। এখানে বিশেষ নজর দিয়ে দেখার বিষয় এই যে, ইংরেজি tick (✓) চিহ্নটি উপরোক্ত **ঠিকরান** ক্রিয়াটিকেই বোঝাচ্ছে। ট ভূমিতে পড়ে স্থিতিরূপ পাচ্ছে এবং তারপরই লাফ দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। বীজ মাটিতে পড়ে অঙ্কুরোদগমের পর এভাবেই বেরিয়ে আসে। আর এই ব্যাপারটিই ইংরেজির tick (✓) চিহ্নের মধ্যেই রয়েছে। তাতে একটি সত্তা (ট) ভূমিতে পড়ছে, স্থির রূপ নিচ্ছে, তারপর গতিশীল হয়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। হয়তো, বীজ এভাবেই নবজন্ম লাভ করে টিকে যায়। দ্র. **টিক**।

ঠিকা (ঠিকাদার) : ২. *ঠিকা = ঠিক-এর আধার যে। ঠিকাদার = ঠিকা দানের আধার রহে যাহাতে।* / **ঠিকা** = নির্দ্ধারিত মজুরীতে কার্য্য সম্পাদনের চুক্তি (বা contract থাকে যাহাতে)। **ঠিকাদার** = যে ঠিকায় কাজ করে। (ব.শ.)। ৩. **ঠিকা** = ভাড়া, নির্দ্ধারিত মজুরীতে নির্দিষ্ট কালের নিমিত্ত নিযুক্ত চাকর, খুচরো কাজ (piece work)। কনট্রাকটর। (ব.শ.)। ৪. contract ও contractor অর্থে শব্দ দুটি প্রচলিত। ৫. একটি সত্তা টঙ্কারিত হবে, স্থিতিশীল রূপ পাবে, এবং তারপর সেই স্থিত রূপেই গতিশীল হবে — এই সমগ্র ক্রিয়া বা কর্মটিকে বলে **ঠিক**। এই সমগ্র কর্মের আধার হল **ঠিকা**। এই সমগ্র কর্মটি করবার দায়িত্ব যে নেয়, তাকে বলে **ঠিকাদার**।

ঠিকাদার শব্দের ভিতরে এরকম অর্থ রয়েছে, ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। সবচেয়ে ঘৃণিত শব্দের এত পবিত্র উৎস, বিশ্বাসই হতে চায় না। সত্যি বলতে কী, গোটা একটা কর্মের পরিকল্পনা বা **ঠিকা** মর্যাদার সঙ্গে বাস্তবে রূপায়ণ করার দায়িত্ব পালন করে যে, সে তো অতীব দায়িত্ববান মানুষ। সমাজের বিবর্তন, কালের দোষ, প্রেক্ষিত ইত্যাদি সেই **ঠিকা** ও তার প্রতিপালনকারী **ঠিকাদার**কে টাকা-লাভ-লোভ-দুর্নীতি ইত্যাদির সংস্পর্শে অতি-নিন্দনীয় করে দিয়েছে। সেই সব ময়লা সাফ করে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই সমাজ যতদিন থাকবে, ততদিন **ঠিক, ঠিকা, ঠিকাদার**ও থাকবে।

ঠুক, ঠুকরা (ঠুকরান, ঠোকরা, ঠোকরান, ঠোক্কর) : ২. *ঠুক = ঠ নবরূপে উত্তীর্ণ যে করণে। ঠুকরা = ঠুক রহে যাহাতে, তাহার আধার। ঠুকরান (ঠোকরান) = ঠুকরা অন যাহাতে বা ঠুকঠুক করা অন থাকে যাহাতে।* ৩. 'ঠুক' শব্দে আহত বা তাড়িত করা, আস্তে চাপড়ান, প্রহার করা, মারা। চঞ্চু দ্বারা আঘাত করা, অস্ত্রের অগ্র দ্বারা আঘাত করা। (ব.শ.)। ৪. to hit অর্থে ঠুক এবং 'ঠুকঠুক-করা' অর্থে ঠুকরা প্রচলিত। ৫. টঙ্কার স্থিতি রূপ নিয়ে কোনো স্থানে গিয়ে আঘাত করলে, তাকে বলে ঠু-করণ বা **ঠুক**। কাঠের উপর এই ঠু-করণ করে যে, তাকে সেকারণেই কাঠঠুকরা বা কাঠঠোকরা বলে। **টুক** ও **ঠুক** — এই দুটি শব্দের যে সম্পর্ক, একই সম্পর্ক রয়েছে টোকা-মারা আর ঠোকা-মারা শব্দে। **ঠোকাঠুকি** এই ঠুক থেকেই পুরুষ-প্রকৃতির নিয়মে জন্মায়। দ্র. **কেশাকেশি**। টক্কর-ঠক্কর, টুক্কর-ঠুক্কর, টোক্কর-ঠোক্কর প্রভৃতি শব্দগুলি টক-ঠক থেকে ক্রমান্বয়ে উৎসারিত হয়েছে।

ঠেক (ঠেকনা, ঠেকনো, ঠেকা, ঠেকাঠেকি) : ২. *ঠেক = দিশাগ্রস্ত ঠ-করণ যাহাতে। ঠেকনা = ঠেক অন যাহাতে, তাহার আধার। ঠেকা = ঠেক-এর আধার যে। ঠেকাঠেকি = ঠেকা ও ঠেকি (দ্র. কেশাকেশি)।* ৩. আশ্রয়, অবলম্বন, রোধ, আটক, বিপদ, স্পর্শ, রুদ্ধ হওয়া, বাধা পাওয়া, আটকান, বদ্ধ হওয়া, স্পৃষ্ট হওয়া, লাগা, বিপন্ন হওয়া, দায়ে পড়া, যুক্ত হওয়া, গতিরোধ করা ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে বহুল প্রচলিত। ৫. **ঠিক** দিশাগ্রস্ত হলে **ঠেক** হয়। যা টিকে থাকে, তার স্থিতিশীল রূপটিকে আমরা **ঠিক** হিসেবে চিনেছি। এই **ঠিক** একমুখী হয়ে দিশাগ্রস্ত হয়ে গেলে, সেই ঠিকটি আর ঠিক থাকে না, হয়ে যায় **ঠেক**। যে-কোনো তত্ত্বের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। তত্ত্ব-মাত্রেই দিশাগ্রস্ত-মৌলবাদী হয়ে গেলে, পাত্রের নিকট তা **ঠেক**-এ পরিণত হয়। তখন একদিকে সে যেমন সেই দিশাগ্রস্ত তত্ত্বের উপর **ঠেস** দিয়ে দাঁড়ায়, তাকে **ঠেক** রূপে ব্যবহার করে; অন্যদিকে তেমনি সেই **ঠেক** দিয়ে অন্যদের **ঠেকায়**, অন্যদের আটকায়, **ঠেকিয়ে** রাখে, এগোতে বা যেতে দেয় না। তত্ত্বটি তখন স্বভাবতই হয়ে যায় **ঠেকনা** বা **ঠেকনো**। তবে যদি যাদের ঠেকানো হয়, তারাও বিপরীতভাবে ঠেকায়, তখন উভয় পক্ষের সমগ্র আচরণ হয়ে যায় **ঠেকাঠেকি**। দ্র. **কেশাকেশি**।

ঠ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অঠেল, ঠ, ঠং, ঠ-কার, ঠ(ঠো)ক্কর, ঠক্কুর, ঠগ, ঠঠনি, ঠন, ঠনঠন, ঠনঠনা, ঠনঠনে, ঠনঠান, ঠনাঠন, ঠমক, ঠস(সো)ক, ঠসঠাস, ঠা, ঠাউর, ঠাএ, ঠাওর, ঠাওরা, ঠাওরালি, ঠাই, ঠায়, ঠাঞ্জি, ঠাট, ঠাটবাট, ঠাটী, ঠাট্টা, ঠাঠ, ঠা-ঠা, ঠাড়, ঠাড়মোড়, ঠাণ্ডা, ঠান, ঠাম, ঠামঠমক, ঠায়, ঠায়ঠিকানা, ঠার, ঠারেঠোরে, ঠাস, ঠাসা, ঠাসাঠাসি, ঠাহর, ঠিলা, ঠুং, ঠুংবী, ঠুঁটা, ঠুঁটো, ঠুঁটো-জগন্নাথ, ঠুটা, ঠুন্ডি, ঠুঙ্গি, ঠুন্ট, ঠুন, ঠুনকা, ঠুনকো, ঠুলি, ঠুস, ঠুসকি, ঠুসঠাস, ঠুসাঠুসি, ঠুসি, ঠে, ঠেং, ঠেটা, ঠেটি, ঠেঠী, ঠেঙ, ঠেঙা, ঠেঙ্গ, ঠেঙ্গা, ঠেল, ঠেলা, ঠেলাঠেলি, ঠেস, ঠেসনা, ঠেসাঠেসি, ঠেসান, ঠোঁট, ঠোঁটকাটা, ঠোঙা, ঠোঙ্গা, ঠোনা, ঠোলা, ঠোসা, ঠ্যাং, ঠ্যাঙ, ঠ্যাটা, ঠ্যাকনা, ঠ্যাকার, ঠ্যাঙ্গ, ঠ্যাঙ্গা, ঠ্যালা, ঠ্যাটা।

ঠন (ঠনঠন, ঠনঠনা, ঠনঠনে, ঠনঠান, ঠনাঠন) : ২. *ঠন = ঠ অন যাহাতে। ঠনঠন = ঠন-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ঠনঠনে = ঠনঠন দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ৩. **ঠন** = কঠিন দ্রব্যের আঘাতজন্য শব্দ। **ঠনঠন** = বাণে বাণে আঘাতের শব্দ, ঘড়ির শব্দ, কঠিন দ্রব্যের ঘাত-প্রতিঘাতের শব্দ, রান্নার সময় হাঁড়িতে কাটি-নাড়ার শব্দ। **ঠনঠনে** = ঠনঠন শব্দকারক, শুষ্ক, কঠিন। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **টন** ও **ঠন** কথাটির মধ্যেকার পার্থক্য শব্দ দুটির ভিতরের রহস্য অনেকখানি বলে দেয়। **ঘটে** বুদ্ধি-জ্ঞান থাকলে আমরা বলি, টনটনে জ্ঞান। আর, না থাকলে বলি 'বুদ্ধি তো ঠনঠন করছে।' একেই অত্যন্ত সঠিকভাবে ব.শ. বলেছেন 'ঠঠং' শব্দের অর্থে — 'শূন্যগর্ভ কঠিন দ্রব্যের আঘাতজন্য শব্দ'। তার মানে

পূর্ণগর্ভ দ্রব্যের আঘাত থেকে টন শব্দ হয়, শূন্যগর্ভ দ্রব্যের আঘাত থেকে ঠন শব্দ হয়। এই শূন্যগর্ভ ঠনঠন শব্দটির প্রয়োগ এভাবেও হয়ে থাকে — 'আমার তো পকেট ঠনঠন, গড়ের মাঠ। এদিকে পেট খাঁ খাঁ করছে।'

ঠমক : দ্র. **ঠাট**।

ঠা, ঠাউর, ঠাওর, ঠাওরা (ঠাহর) : ২. ***ঠা*** = *টঙ্কারস্থিত-এর আধার যে।* ***ঠাউর*** = ***ঠা*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে রয় যাহাতে।* ***ঠাওরা*** = ***ঠাউর****-এর আধার যে।* ৩. **ঠা** = (স্থায়িন > ঠাই বা ঠা) দ্রুত লয়ের চতুর্গুণকালব্যাপী ও মধ্য লয়ের দ্বিগুণকালব্যাপী লয়। **ঠাউর, ঠাওর** = (স্থাবর > ঠাবর > ঠাঅর বা ঠাউঅর বা ঠাউর বা ঠাওর) স্থাবর বা স্থিতিশীল করা, স্থির করা, নির্ণয় বা নিশ্চিত করা, পরিণাম ভাবা, বুঝা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **ঠাওরান** বা কোনো কিছুকে দাঁড় করিয়ে বোঝা — এই অর্থে **ঠাউর, ঠাওর** প্রভৃতি শব্দের প্রচলন রয়েছে। অর্থাৎ কিনা, **ঠাওর** করা আর স্থাবর করা একই ব্যাপার। এই বিশ্বে কিছুই তো দাঁড়িয়ে নেই, সবই গতিশীল, জঙ্গম। সেই জঙ্গমের ভেতর থেকে কাউকে দাঁড় করিয়ে বোঝাই তো **ঠাওর** করা বা **ঠাউরান**! বাংলাভাষীর এই বোধের ডগাটি গিয়ে পৌঁছায় গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের চিন্তার ডগায়। সক্রেটিস বলছেন — 'মহান দার্শনিকরা আমাদের শিখিয়েছেন যে 'এই বস্তু', 'অমুক', 'আমি', 'সেটা', 'ওটা' — এরকম শব্দ অথবা অন্য কোনোরকম অর্থ-আটকে-ফেলা নামশব্দ ব্যবহার করাই উচিত নয়। কারণ সব কিছুই সব সময় স্রোতের মতো বয়ে চলেছে। জন্মাচ্ছে, মরছে, নষ্ট হচ্ছে। উদ্ভবের পর পরই অন্য কোনো আকারে পরিণত হয়ে লয় পাচ্ছে। কোনো নাম দিয়ে ওই বস্তুগুলিকে থামিয়ে রাখা, স্থির করে দাঁড় করিয়ে রাখা সম্ভবই হয় না। যে তাদের থামিয়ে স্থির করতে চায়, তাকে শেষপর্যন্ত হারতে হয়। আহা, বন্ধু থিয়েটিটাস। আমাদের এইসব তত্ত্ববিচারচিন্তা কি মধুর মতো মিষ্টি নয়? মুখের ভেতরে এই দার্শনিক বিচারের আস্বাদ তুমিও কি টের পাচ্ছ না?' — (প্লেটোর থিয়েটিটাস — ১৫৬এ-১৫৭সি)।

কিন্তু যে-কথাটি এখানে সক্রেটিস বলেননি, তা হল মানুষ মাত্রেই একটি শরীরের অধীন, যা কিনা স্থিতিগুণসম্পন্ন (অতি শ্লথগতি সম্পন্ন)। তাই মানুষকে তার বাস্তব সংসার চালাতে গেলে, চলমান জঙ্গম জগৎকে দাঁড় করিয়ে **ঠাওর** করে বুঝে কাজে লাগাতে হয়। আর সেজন্যই 'অর্থ-আটকে-ফেলা শব্দ'ও তার দরকার পড়ে; আর, সেজন্যই **ঠাওর** তাকে করতেই হয়। যদিও এই **ঠাওর**-করার বিদ্যাটি স্থানিক বা লোকাল গুণসম্পন্ন এবং নিতান্তই সাময়িক; তবুও তা করতেই হয়। যদিও, সার্বিকভাবে জগৎকে তার স্বরূপে বোঝার ক্ষেত্রে এই স্থিত-করে বা **ঠাওর** করে বোঝার বুদ্ধি নানা রকম সমস্যাও তৈরি করে। তবুও এরকম ভাবে **ঠাওর** করে বুঝেই বাস্তব সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হয় মানুষকে।

তবে কিনা, দুরকমভাবে বোঝাই হল যথার্থ বোঝা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমরা গতিকেও চাই স্থিতিকেও চাই; অখণ্ডকে চাই, খণ্ডকেও চাই; নইলে সম্পূর্ণ বোঝা হয় না। যতদূর বুঝি, সক্রেটিস রবীন্দ্রনাথের এই অবস্থানে পৌঁছোতে পারেননি।

ঠাই (ঠাঁয়, ঠাঞি) : ২. ***ঠাই*** = *ঠ-এর রহস্যরূপের আধার গতিশীল থাকে যেখানে।* ***ঠাঁয়*** = *ঠ-এর রহস্যরূপের আধার যায় যেখানে।* ***ঠাঞি*** = *ঠ-এর আধারের রহস্যরূপ গতিশীল যাহাতে।* ৩. **ঠাই** = স্থান, আশ্রয়, ভূমি, অধিষ্ঠিত স্থান, স্থানে, নিকটে, কাছে, অধিকারে। (ব.শ.)। ৪. residing place অর্থে প্রচলিত। ৫. স্থাবর হয়ে যায় ঠাবর বা ঠাওর; স্থায়ী হয়ে যায় ঠাই; কিন্তু স্থান হয় ঠাঁই। অংরূপিণী কেমন করে স্থান-এর **ন** থেকে ঠাই-এর চন্দ্রবিন্দুতে বদলায়, এটি তার একটি স্পষ্ট নিদর্শন। ঠান শব্দে ব.শ. একই অর্থ দিয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় **স্থান** শব্দটি **ঠান** পেরিয়ে **ঠাই**-এ পৌঁছেছে।

ঠাট, ঠাটবাট, ঠাটী, ঠাট্টা (ঠাটঠমক) : ২. ***ঠাট*** = *ঠ-এর আধার টঙ্কারিত যাহাতে।* ***ঠাটবাট*** = ***ঠাট*** ও বাট *(বট হইতে জাত)।* ***ঠাটী*** = ***ঠাট*** *গতিশীল থাকে যাহাতে।* ***ঠাট্টা*** = ***ঠাট*** *টঙ্কারিত যাহাতে, তাহার আধার।* ***ঠাটঠমক*** = ***ঠাট*** ও *ঠমক (ঠ-কে সীমায়িত করে যে)।* ৩. **ঠাট** = বংশাদিরচিত গৃহপঞ্জর, চালের কাঠামো, প্রতিমার কাঠামো, পঞ্জরমাত্র, খাঁচা, অবয়বসংস্থান, সাজসজ্জা, কপটপ্রবন্ধ, বেশবিন্যাস, আড়ম্বর, আয়োজন, সহচরগণ, সৈন্যসমূহ, সমূহ, রাশি, দল, বাগবিদগ্ধতা, কৌতুক, নির্ব্বন্ধভাব, কপটভাব, পসার-প্রতিপত্তি, কেলি, সাধ, সেতার প্রভৃতি তারের যন্ত্রের শ্রুতি-অনুসারে সাজান সপ্ত সুরের পর্দ্দাসমূহ। **ঠাটঠমক** = সাজসজ্জা হাবভাব। **ঠাট** ও **ঠমক** (**ঠমক** = সবিলাসগমনভঙ্গি, খেলগতি, হাবভাবসহিত অঙ্গ ভঙ্গি, সখেল প্রকাশ, প্রতিবন্ধক, মন্থরগমনে; চলিতে চলিতে থামা, সবিলাস অঙ্গভঙ্গিপূর্বক পা ফেলা। ব.শ.।) **ঠাটবাট** = আড়ম্বর, জাঁকজমক, বেশবিন্যাস, সাজসজ্জা, পসার-প্রতিপত্তি। **ঠাটী** = ঠাটপ্রিয়া, বেশবিন্যাসপ্রিয়া, বিলাসিনী, ধৃষ্টা, দুর্ব্বিনীতা, বেহায়া। **ঠাট্টা** = উপহাস (**ঠাট্টা-তামাসা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, ঠাট্টা-মসকরা** = কৌতুক-পরিহাস)। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **টাট**। **টাট**-এর স্থির রূপ **ঠাট**, অর্থাৎ টঙ্কারের স্থির রূপের আধার টঙ্কারিত হয় যাতে, সেটিই **ঠাট**। এর আসবাবপত্র বা তজ্জাতীয় জড় রূপ হয়, জীবন্ত মানবিক রূপও হয়। যেমন সাহেবের উর্দিপরা চাপরাশি, রাজার পারিষদবর্গ হাতিঘোড়া ইত্যাদি, রাজকুমারীর সখীগণ, নেতার চেলা-চামুণ্ডা গাড়িবাড়ি ইত্যাদি। এই **ঠাট**গুলি যথাক্রমে সাহেবের, রাজার, রাজকুমারীর, ও নেতার টঙ্কার প্রকাশের স্থির রূপ। তাই এগুলি তাদের **ঠাট**। ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার বিশেষ পোষাক-পরিচ্ছদ তার **ঠাট** হয়, বিশেষ চলন-বলনভঙ্গি হয় তার **ঠমক** এবং তার আবাসস্থল তার **বাট** হয়। বাঘের রাজকীয় চালচলন অঙ্গভঙ্গি তার **ঠাটঠমক** এবং তার গুহা তার **বাট** হতে পারে।

ঠার (ঠারেঠোরে) : ২. ***ঠার*** = *ঠ-এর আধার রহে যাহাতে।* ***ঠারে-ঠোরে*** = ***ঠার*** *দিশাগ্রস্ত যাহাতে এবং* ***ঠোর*** *(নবরূপে উত্তীর্ণ সমগ্র ঠ রহে যাহাতে) দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ৩. **ঠার** = ইঙ্গিত, সঙ্কেত, দৃষ্টিপাত, চাহনি; সঙ্কেত করা। (ব.শ.)। ৪. code language অর্থে ঠার শব্দটি প্রচলিত এবং 'ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে অন্য যেকোনো ভাবে বক্তব্য প্রকাশ করা' অর্থে 'ঠারেঠোরে' শব্দটি প্রচলিত। ৫.

মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে সবাই যে ভাষা বুঝতে পারে, সেই প্রচলিত ভাষা বাদে যে-কোনো ভাষায় কথা বললে, লোকে বলে, 'ওরা ঠারে কথা বলছে।' বাংলাভাষীদের মাঝে সাঁওতালি ভাষায় বা খেড়িয়া ভাষায় কথা বললেও যেমন 'ঠারে কথা বলছে' বলা হয়, তেমনি মেয়েদের মহলে প্রচলিত 'কিচা রেচা ভাচা লচা আচা ছিচা সচা' (অর্থাৎ 'কিরে ভাল আছিস') এরকম 'কোড' ভাষাকেও 'ঠার' বলে। তবে **ঠার** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ খুবই স্পষ্ট। তাতে যে-কোনো প্রকাশের বা টঙ্কারের স্থির রূপের আধারকেই **ঠার** বলা যায়, তা সে আওয়াজ করেই হোক কিংবা ইশারা অঙ্গভঙ্গি দিয়েই হোক।

ঠাস, ঠাসা, ঠাসাঠাসি, ঠুস, ঠুসকি, ঠুসঠাস, ঠুসি, ঠেস, ঠেসনা, ঠেসান : ২. ***ঠাস*** = *ঠস (টঙ্কারমূলক অস্তিত্ব থাকে যাহাতে) হইতে জাত।* ***ঠাসা*** = *ঠাস-এর আধার যে।* ***ঠাসাঠাসি*** = ***ঠাসা*** *ও ঠাসি, দ্র.* **কেশাকেশি***।* ***ঠুস*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ঠ-এর অস্তিত্ব যাহাতে।* ***ঠুসকি*** = ***ঠুস*** *করণ গতিশীল যাহাতে।* ***ঠুসঠাস*** = ***ঠুস*** *ও* ***ঠাস****।* ***ঠুসি*** = ***ঠুস*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ঠেস*** = *যে* ***ঠস*** *দিশাগ্রস্ত হয়।* ***ঠেসনা*** = ***ঠেস*** *অন থাকে যাহাতে, তাহার আধার।* ***ঠেসান*** = ***ঠেস*** *অন যাহাতে।* ৩. **ঠাস** = নিবিড়, ঘন, চাপিয়া নিরেট করা, কসিয়া নিবিড় করা, আঘাতে নিরেট করা, গাদা, চাপ দিয়া ডলা, সংবাহন করা, চাপ দেওয়া। **ঠুস** = নিবিড় (নিরেট) ভাবে পূর্ণ করা, কষিয়া ভরা, গাদা। **ঠুসকি** = 'ঠুস' শব্দে অপানত্যাগ। **ঠুসঠাস** = ফাঁপা দ্রব্যের আঘাতের মৃদু শব্দ। **ঠুসি** = ফুলের কলি, (সাদৃশ্যে) পুলি পিঠার আবরণ। **ঠেস** = আশ্রয়ে হেলিয়া ভর দেওয়া, হেলান দেওয়ার আধার মাত্র, আঘাত, ধাক্কা, চাপ, বক্রোক্তি, ব্যঙ্গ, দায়, বক্রনিন্দা, চাপ দেওয়া, গায় গা লাগান, হেলান, ভেজান। **ঠেসনা** = হেলান। **ঠেসান** = ঠেসের আধার বা অবলম্বন। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. 'ঠাস করে এক চড় মারব' — এরকম বাক্যে **ঠাস্** শব্দ যথার্থে প্রচলিত। ঃ বা স্-কে ব.শ. বলেছেন 'নির্য্যাসত্যাগ'। **ঠা**-এর নির্য্যাসত্যাগ থাকে **ঠাস্**-এ। এতে আঘাতকারীর টঙ্কার স্থিত-আধাররূপে বা **ঠা**-রূপে অস্তিত্ব লাভ করে। টঙ্কারের এইরূপ নানা প্রকার স্থিতিরূপই **ঠাসা, ঠুসা, ঠেসা** শব্দের দ্বারা প্রকাশ পায়।

ঠুং, ঠুংরী, ঠুনকা, ঠুনকো : ২. ***ঠুং*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ঠ-এর রহস্যরূপ থাকে যাহাতে।* ***ঠুংরী*** = ***ঠুং*** *রহে যাহাতে তাহার গতিশীল আধার যে।* ***ঠুনকা (ঠুনকো)*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ঠ-এর বাস্তবিক রহস্যরূপায়ণ করে যে, তাহার আধার। /* **ঠুনকা, ঠুনকো** = ঠুন-শব্দে যাহা ভাঙে বা অল্প আঘাতে যাহা ভাঙে। (ব.শ.)। ৩. **ঠুং** = (ঠং > ঠুং অল্পার্থে) মৃদু ঠং শব্দ। ঠুং ঠুং, হিন্দি ঠুন ঠুন — বারংবার ঠুং শব্দ। **ঠুংরী** = (হিন্দি - ঠুমরী) তালবিশেষ (প্রকৃতপক্ষে ঠুমরী তাল নহে, টপ্পাধরণের গীতবিশেষ; খেয়ালের গমক ও টপ্পার তান এই দুইএর মিশ্রণে ঠুমরী গীতের উৎপত্তি। ইহার তাল পঞ্জাবী ঠেকা, কাহারবা, দাদ্‌রা।) **ঠুনকা, ঠুনকো** = থুমকো স্তনে স্তন্যস্তম্ভনজন্য রোগবিশেষ (ঠুনকোজ্বর — ঠুনকাজন্য জ্বর)। (ব.শ.)। ৪. **ঠুং** ধ্বন্যাত্মক শব্দরূপে, **ঠুংরী** একপ্রকার গান রূপে, এবং **ঠুনকা** বা **ঠুনকো** fragile অর্থে প্রচলিত। ৫. টং টং ও ঠং ঠং শব্দের ভেতরে টঙ্কারের **শাঁসপূর্ণরূপ এবং শাঁসহীনরূপ** থাকে। টুংটাং ও ঠুংঠাং শব্দের ক্ষেত্রেও কথাটি বলা যায়। 'ঠুংরী' সঙ্গীতের ব্যাখ্যা বিষয়টিকে অনেক স্পষ্ট করে। গমক ও তানের মিশ্রণে কেমন করে 'ঠুং গতিশীলভাবে রয়' সে-বিষয়ে হয়তো-বা সঙ্গীতজ্ঞগণ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবেন। সঙ্গীত বিষয়ে অজ্ঞ বলে আমরা বিষয়টি স্পষ্ট করে বোঝাতে পারছি না, যদিও ঠুং থাকার ব্যাপারটি খানিকটা অনুভব করতে পারি মাত্র।

ঠুঁটা (ঠুঁটো, ঠুঁটো-জগন্নাথ) : ২. ***ঠুঁটা*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ঠ-এর রহস্যরূপ টঙ্কারিত হয় যাহাতে তাহার আধার।* ৩. **ঠুঁটা (ঠুঁটো)** = ছিন্নহস্ত, বিকৃতহস্ত, নুলা, অঙ্গুলিহীন হস্ত, কুণ্ঠিতধার, ভোঁতা, ছিন্নপক্ষ, অঙ্গহীন, নির্লজ্জ। (ব.শ.)। **ঠুঁটো-জগন্নাথ** = বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের অবতারবিশেষ। ... উড়িষ্যার পুরী শহরে এঁর মন্দির আছে। ... জগন্নাথের জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে — এক ব্যাধ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু হলে, তাঁর মৃতদেহ একটি বৃক্ষের তলায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। কৃষ্ণের কয়েকজন অনুরাগী এই দৃশ্য দেখে বৃক্ষতল হতে মৃত কৃষ্ণের কয়েকটি অস্থি সংগ্রহ করে একটি বাক্সের মধ্যে স্থাপন করে। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা বিষ্ণুকে পূজা করবেন মনে করেন। কিন্তু কী মূর্ত্তিতে বিষ্ণুর উপাসনা করবেন সেই চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েন। তখন বিষ্ণু উপস্থিত হয়ে তাঁকে বিষ্ণুর এক সনাতন মূর্তি নির্মাণ করে সেই মূর্তির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অস্থি রক্ষা করতে বললেন। দেব-শিল্পী বিশ্বকর্মা এই মূর্তি প্রস্তুতের ভার নিলেন এই শর্তে যে, যতদিন পর্যন্ত এই মূর্তি প্রস্তুত না হয়, ততদিন পর্যন্ত কেউই যেন তাঁকে মূর্তির জন্য বিরক্ত না করে। কিন্তু পনেরো দিন পরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অত্যন্ত অস্থির হয়ে মূর্তি দেখবার জন্য বিশ্বকর্মার নিকটে এসে উপস্থিত হন। ফলে বিশ্বকর্মা অত্যন্ত কুপিত হয়ে এই কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রেখে প্রস্থান করেন। মূর্তির হাত-পা তখন অসম্পূর্ণ, কেবলমাত্র কাঠামো অবস্থায়ই ছিল বলা চলে। ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়ে এসম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ করেন। তখন ব্রহ্মা রাজার অনুরোধে প্রীত হয়ে ঐ অসম্পূর্ণ মূর্তির চক্ষু ও প্রাণ দান করেন এবং নিজে পুরোহিত হয়ে মূর্তি স্থাপনপূর্বক পূজা করেন। (পৌ.অ.)। ৪. 'অঙ্গহীন' অর্থে প্রচলিত। ৫. ঠুঁটা শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ আমরা বর্ণ ধরে ধরে উদঘাটন করলাম বটে, কিন্তু বাস্তবে যাকে ঠুঁটা বলে, তার সঙ্গে এই ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের সম্পর্কটিকে বোঝা দরকার।

আমরা জানি, 'নুলো'কে **ঠুঁটা**ও বলে। তার মানে, নুলোর অক্ষমতাই তার 'টঙ্কার-স্থিত রূপ' (ঠ), যা 'নবরূপে উত্তীর্ণ ও রহস্যরূপী' (**ঠুঁ**) হয়ে 'টঙ্কারিত' (ট) হচ্ছে (অতএব **ঠুঁট**); এরকম **ঠুঁট** ক্রিয়াটি হচ্ছে নুলোর নিজের অস্তিত্বের পরিধিতে (অতএব **ঠুঁটা**)। তার মানে, অস্তিত্বের নুলোপনা তার নিজের চেহারায় স্বপ্রকট। তাই সে **ঠুঁটা**। বাজ পড়ে যে তালগাছের মাথা পুড়ে গেছে, তাকে গ্রামবাংলায় বলে **ঠুঁটা** তালগাছ।

তা সে যাই হোক, আমরা জানি, নুলো বা **ঠুঁটো** মানুষ কোনো কাজ করতে পারে না। পরকে সাহায্য তো দূরের কথা, নিজের খাওয়া-পরাও সে ঠিকঠাক করতে পারে না। কিন্তু আমরা দেখছি,

আমাদের একজন ঈশ্বরপ্রতিম দেবমূর্তিকে বলা হচ্ছে 'ঠুঁটো জগন্নাথ'। যে-জগতের নাথের বা জগন্নাথের জগতের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কিছুই করার নেই, তাঁকে **ঠুঁটো-জগন্নাথ** বলে। অলস যুবকের প্রতি — 'ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকলে চলবে?' — এরকম বাক্য বাঙালির রোজকার ভাষায় স্থান করে নিয়েছে। মনে রাখা ভাল, শূন্য থেকে এরকম বাক্যের জন্ম হয়নি। কোথা থেকে হয়েছে, তার বিস্তারিত বয়ান রয়েছে পুরীর জগন্নাথের কাহিনীতে। তবে সে-কাহিনী লিখিত হয়েছে পৌরাণিক ভাষায়। এ-ভাষায় বলা বয়ানের অর্থ এখনকার পণ্ডিতেরাও ভুলে গেছেন। ফলে, কাহিনীটিকে বাজে কথা বলে মনে হয়। তা কিন্তু আদৌ ঠিক নয়।

ভারতসমাজের, বিশেষত অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের অর্থাৎ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার জনসমাজের ইতিহাসে এই ঘটনাবলী ছিল ফ্রান্সের ইতিহাসে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উত্থান ও পতনের ঘটনাবলীর চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেই বিশাল ঘটনাবলীর ধ্বংসাবশেষ পুরীর রথযাত্রা থেকে শুরু করে অজস্র মানসিক ধ্বংসাবশেষ রূপে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাষা-সংস্কৃতিতে ও আচার আচরণে আজও টিকে রয়েছে। কী ছিল সেই ঘটনাবলী, আমরা এখানে তার অতি সংক্ষিপ্ত একটি রূপরেখা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

বৌদ্ধযুগে ভারতের প্রথম পুঁজিবাদী বিপ্লব রামরাজত্বের নামে (অশোক ও হর্ষবর্ধনের হাতে) প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও, পরে তা নানাভাবে অত্যন্ত কলুষিত হয়ে যায় এবং শঙ্করাচার্য্যের হাত ধরে পুঁজিবাদবিরোধী প্রতিবিপ্লব হিন্দুধর্ম নাম নিয়ে সেই পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে দেয়, বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত হয়। কিন্তু তার পরে, সেই পুঁজিবাদ, ভারতের আর সমস্ত প্রদেশে বিপর্যস্ত হয়ে গেলেও, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাতে তার অকলুষিত শুভ চেহারার নবরূপায়ণের মাধ্যমে আরও কিছুকাল, পাল রাজত্বের শেষ দিন পর্যন্ত, টিকে থেকে যায়; কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হতে পারে না, চাঁদ সদাগরের ব্যবসা শেষ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অপরদিকে সারা ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত অধঃপতিত কলুষিত আদিম সমাজতন্ত্র ক্রমে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার পুঁজিবাদকে আর স্বতন্ত্রভাবে পূর্ণরূপ গ্রহণ করতে দেয় না, মেরে ফেলে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নগদ-নারায়ণ বিষ্ণু, তাঁর কৃষ্ণ রূপে উত্তীর্ণ হয়েও কেবল মারাই পড়েন না, তাঁর জগতের নাথ রূপ বা জগন্নাথ রূপ গ্রহণের চেষ্টা অসমাপ্ত থেকে যায়। ইয়োরোপের কুবেরভিত্তিক পুঁজিবাদের কোপে প্রকুপিত শিল্পবিপ্লবের বহু আগে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার লক্ষ্মীভিত্তিক পুঁজিবাদের উত্থান ও পতনের এই হল অতি সংক্ষিপ্ত দুঃখজনক কাহিনী। ... বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ব্যর্থমনোরথ মানুষ বড় দুঃখে তাঁদের প্রিয় জগন্নাথকে **ঠুঁটো-জগন্নাথ** রূপেই আজও উপাসনা করে চলেছে।

ঠুলি, ঠেল, ঠেলা, ঠেলাঠেলি (ঠোলা) : ২. ***ঠুলি*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ঠ-এর লালন / লয়ন গতিশীল যাহাতে।* ***ঠেল*** = *দিশাগ্রস্ত ঠ-এর লালন / লয়ন যাহাতে।* ***ঠেলা*** = ***ঠেল****-এর আধার যে।* ***ঠেলাঠেলি*** = ***ঠেলা*** *ও ঠেলি (দ্র.* ***কেশাকেশি****)।* ***ঠোলা*** = ***ঠুলি****-র আধার যে।* ৩. **ঠুলি** = ঠোলার মত গো-প্রভৃতির চক্ষুর ঢাকনী, কোষ, ঠোঙা, (সাদৃশ্যে) ছল, কুহক, মোহকর হাবভাব, অম্বরস, আড়ি। ***ঠেল*** = ধাক্কা, কাজের বেগ, লোকমর্দ্দ, ভিড়; সম্মুখভাগে বলপ্রয়োগ করা, ধাক্কা দেওয়া, অপসারিত করা, দূর করা, সরান, উপরে উঠান, অগ্রাহ্য করা, বলে অধিকার করা, সমাজচ্যুত করা, পাশে সরান। ***ঠেলা*** = ধাক্কা, ঢেকা, বেগ। ***ঠেলাঠেলি*** = ধাক্কাধাক্কি। ***ঠোলা*** = পত্রপুট, ঠোঙা, (সাদৃশ্যে) আমের খোশা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ঠুলি-থলি, ঠেলাঠেলি-হেলাহেলি, ঠোলা-খোলা — এইভাবে তুলনা করে বুঝবার চেষ্টা করলে ঠুলি, ঠেলাঠেলি, ঠোলা প্রভৃতি শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ বেশ খানিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের সঙ্গে শব্দগুলির সঙ্গতি দেখতে পাওয়া যায়।

ড/ড়

ড ও ড় বর্ণের অর্থ : (প্রথমেই **ট বর্ণের অর্থ** দেখে নিন)। টঙ্কারণ পর্যন্ত অস্তিত্বের ক্রিয়াকলাপ প্রধানত নিজের ভেতর থেকেই চলে। বাইরে বেরোলেও তাকে উড্ডয়নে বা ডয়ন-এ পরিণত হতে গেলে তার অন্তর্নিহিত টয়নকারী সত্তাকে আরও বেশি অর্থধারী হতে হয়। তবেই টয়ন ডয়নে উত্তীর্ণ হতে পারে। (কথাটি ক্ থেকে গ্, চ্ থেকে জ্-এ উত্তরণের ক্ষেত্রেও বলা যায়।) ডয়ন-এ এসে সে বেরিয়ে পড়ে, এগোয়, লাউডগা যেভাবে এগোয়, সেইভাবে। আমরা তাই ড-কে **ডয়নী** বলছি, যে কিনা উড্ডয়ন করে অন্যত্র যাচ্ছে। এই ডয়নী স্বভাবতই আওয়াজ, ঘোষণা, মানুষের ইচ্ছা, রাগ, কথা, শব্দ, পণ্য ইত্যাদি নানা কিছু হতে পারে; শুধু দেখতে হবে তারা উড়ে বা লাফিয়ে দূরে গিয়ে অন্য কোনো সত্তার কাছে যাচ্ছে কি না। তবে, কোনো কারণে তার এই এগিয়ে চলা যদি আবর্তনমূলক হয়, যদি সে গড়িয়ে গড়িয়ে আবর্ত্তিত হতে হতে চলে, তবে সে ডয়ন হয়ে যায় ড়য়ন। (নীচে এর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।) ড্-কে তখন আমরা ড়্-হিসেবে চিহ্নিত করি। অন্যান্য ভাষায় বর্ণ-বিবর্তন ড-এ পৌঁছে আটকে গেছে, বোধহয় কেবলমাত্র বাংলাভাষাই ড়-পর্যন্ত বিবর্ত্তিত হতে পেরেছে। মোট কথা, **ড্** হল সত্তার থেকে বেরোনো সত্তারই একটি অংশ, যা গড়ান-উড়ান করে অন্যত্র চলেছে। অতএব — **ড** = ড্-অন করে যে; যে উড়ে, উড়ায় বা গড়ায়; ডয়ন-কারী, ডয়ন-ধারী, ডয়নী বা ডী।

যতদূর বোঝা যায়, **ড** ও **ড়** খুব কাছাকাছি ব্যাপার হলেও তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভেদ রয়েছে। **ড়**-এর ভিতরে রয়েছে এক দুর্বার শক্তি, যে-কারণে বাংলাভাষায় **আড়** প্রভৃতি শব্দের বিপুল ব্যবহার অ্যাকাডেমিও রোধ করতে পারেনি। কারণ, ড় বর্ণের অর্থের ভিতরেই রয়েছে সেই শক্তি, যা আড়-এর মতো 'ড়'-বর্ণযুক্ত বহু শব্দকে ব্যাপকার্থে ব্যবহারের যোগ্য করে তুলেছে। **ড** ও **ড়** এই দুই বর্ণের মধ্যেকার পার্থক্য এক্ষেত্রে গভীরতার সঙ্গে বিবেচ্য।

ড সেই ক্রিয়াকে বোঝায়, যা ব্যোমলোকে দ্রুতগতিতে চলে যায়। আর, **ড়** সেই ক্রিয়াকে বোঝায়, যা ঘুরে ঘুরে ওড়ে অর্থাৎ একইসঙ্গে আবর্ত্তিত হতে হতে চলে। যেকারণে আমরা একে 'গড়ান-উড়ান' বলেছি। **উড়** শব্দের ভিতরে এই আবর্তনমূলক দ্রুতগমন

রয়েছে। এই আবর্তন ঋ-মূলক। আবর্তন সম্পূর্ণ হলেই বৃত্ত হয়, বৃত্ত মাত্রেই আসলে বিন্দু পদবাচ্য। তাই একে বিন্দুরূপিণীও বলা হয়। এই বিন্দুর স্থান রয়েছে **ড়, ঢ়, র, য়** এই চারটি বর্ণে। কারণ প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই ঋ-এর ক্রিয়ার একটি অংশ বিদ্যমান রয়েছে। সেই ক্রিয়া হল ঘূর্ণনের (দ্র. **ঋ**) একটি রূপ। ড়-এর ক্ষেত্রে সেই রূপটি হল ডয়ন-অডয়নের দ্বৈরাজ্য — মূল সত্তাকে ছেড়ে পৃথক হয়ে চলে যাব বলে ছুটে চলে যায় **ড** বা ডয়ন। কিন্তু **ড়** তা করে না। সে ড-এর মতোই মূল সত্তাকে ছেড়ে পৃথক হয়ে চলে যাব বলে উঠে দাঁড়ায়, বসে যায়, পুনরায় উঠে দাঁড়ায়, একটুখানি যায়ও, আবার দাঁড়ায়, বসে, পুনরায় উঠে দাঁড়ায়। এই উঠে দাঁড়ানো, কিন্তু চলে না যাওয়া; যেতে যেতে না যাওয়া, ঘুরে আসা, পুনরায় যাব বলে এগোনো — এই হল **ড়**-এর স্বরূপ। ড-এর সঙ্গে ড়-এর এই পার্থক্য। যেকারণে, ড় একইসঙ্গে মূলের সঙ্গে পার্থক্য, পৃথকত্ব, বাধা, যেতে যেতে না-যাওয়া, ওড়া এবং না-ওড়া, মূল থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া কিন্তু মূলকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করা, তার পাশে পৃথক হয়ে অবস্থান করা, ... ইত্যাদি নানা বিষয়কে বোঝায়। মোট কথা, **গমন** (গ) ও **যাওয়া**-র (য়-এর) মধ্যে যে-পার্থক্য (দ্র. **গ বর্ণের অর্থ**), **উড্ডয়ন** (ড) ও উড়া-র (ড়-এর) মধ্যেও সেই পার্থক্য। য় বর্ণটি যেমন শব্দের শুরুতে কখনোই প্রযুক্ত হয় না, ড়-ও শব্দের শুরুতে প্রযুক্ত হয় না। আমরাই প্রথম **ড়য়ন** বোঝাতে শব্দটির প্রয়োগ করলাম একবার।

যাই হোক, এখন আমরা **ড বর্ণের অর্থ** বলতে সংক্ষেপে বুঝব **ড** = *ড়-অন্ (on) করে যে = ডয়নী = গড়ান-উড়ানকারী; ড-এর আধার যে =* **ডা**; *ড গতিশীল যাহাতে =* **ডি**; *ডি-এর আধার যে =* **ডী**; *ড নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে =* **ডু** *... ইত্যাদি। দ্র.* **ট**। *একই ভাবে গড়ান অর্থে বুঝে নেব* **ড়** *বর্ণটিকেও।*

ড় বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : ডং *(ডম্ব্, ডুগু)*, *ডাক, ডিম্ব্, ডী, ডুব্, ড্* = ৫ + ১

ডং (ডম্ব্, ডুগু) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আড়ম্বর, আড়ম্বরি, ডঙ্ক, ডঙ্কা, ডন, ডম (damn), ডমক, ডমর, ডমরু, ডমুর, ডমুরু, ডম্ফ, ডম্ব, ডম্বর, (ডম্বরু, ডম্বুরু), ডম্বুর, ডমডামর, ডাং, ডাংগুলি, ডাংপিটে (ডানপিটে), ডাঁই, ডাঁগর (ডাঙ্গর), ডাঁট (ডেঁটে দাঁড়ান), ডাঁটা, ডাঁটা (খাড়া), ডাঁড়ুক (দাঁড়ুক), ডাঁড়ুকা, ডাঁটো, ডাণ্ড (দণ্ড), ডাণ্ডশ, (ডাণ্ডস), ডাঙা, ডাঙ্কৃতি, ডাঙ্গ (দম-গ), ডাঙ্গর, ডাঙ্গশ, ডাঙ্গস, ডাঙ্গা, ডাঙ্গুলি, ডাটি, ডাণ্ডা, ডাণ্ডাগুলি, ডামক, ডামর, ডামাডোল, ডাম্বাডোল (ডাম্বাডৌল), ডামার, ডিংগি, ডিঙা, ডিঙি, ডিঙ্গয়ান, ডিঙ্গর, ডিঙ্গসাই, ডিঙ্গা, ডিঙ্গি, ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া), ডুম, ডুমনী, ডুমা, ডুমিনী, ডুমুনী, ডুমডুমু, ডুমুর, ডুম্বুর, ডুমো, ডেঁইয়া, ডেংগু, ডেংডেং, ডেঁপো, ডেকরা, ডেগরা, ডেঙো, ডেঙ্গর, ডেঙ্গা, ডেঙ্গু, ডেঙ্গো, ডেম, ডেমাক, ডোকরা, ডোঙ্গা, ডোম, ডোমকাক, ডোমচিল, ডোমনা, ডোম্ব, ড্যাংড্যাং, দাঁড়ুক, দাঁড়ুকা, দাড়ুকা, দাড়োয়া, বিড়ম্বনা।

ডং (ডম্ব্, ডুগু) = ডয়নের (গড়ান-উড়ানের) রহস্যরূপ যাহাতে। **ডম্ব** = ডয়নের **সীমায়ন বহন করে যে।** (আড়ম্বর)। **ডুগু** = নবরূপী ডয়নের বোধের উড্ডয়ন যাহাতে।

আড়ম্বর, আড়ম্বরী : ১. আ + ✓ডম্ব্ + অর (অরন্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. আড়ম্বর** = *আশ্রিত* **ডম্বর** *যাহাতে।* **আড়ম্বরী** = **আড়ম্বর**-*এর গতিশীল আধার যে।* **৩. আড়ম্বর** = তূর্যধ্বনি, মহারব, হস্তিগর্জ্জন, মেঘগর্জ্জন, আরম্ভ, একত্র সন্নিবেশ, সংরম্ভ, হর্ষ, দর্প, প্রপঞ্চ, পটহ, বাহ্য দৃশ্য, বাদ্যবিশেষ, দর্পযুক্ত বাক্য। **আড়ম্বরী** = আড়ম্বরযুক্ত, গর্ব্বিত, দাম্ভিক। (ব.শ.)। **৪.** 'দর্পযুক্ত আয়োজন' অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ডম্বর**।

ডঙ্ক, ডঙ্কা : ২. ডঙ্ক = *ডয়নীর রহস্যরূপ করণ যাহাতে, অর্থাৎ ডং করে যে।* **ডঙ্কা** = **ডঙ্ক**-*এর আধার যে।* **৩. ডঙ্ক** = সর্পদংশন, মন্ত্রবলে নাগরাজের অধিষ্ঠিত মনুষ্যদেহ। **ডঙ্কা** = চর্ম্মাচ্ছাদিত তাম্রের বা লৌহের কটাহের বাদ্যবিশেষ, টেঁটরা। (ব.শ.)। **৪.** প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** মূল সত্তা থেকে বেরিয়ে গড়ান-উড়ানকারী সত্তাংশটি বাহ্যবিষ, ঘোষণা-বিষ বা তদ্রূপ অন্য কোনো ডয়নকারী সত্তা হতে পারে। সেই সত্তাকে ডং বা ডঙ্ বলে। সেই ডঙ্ করা হয় যাহাতে, তাকে **ডঙ্ক** বলে, তা সর্পদংশন হতে পারে। দংশ শব্দের সমার্থক একটি শব্দ হল ডাঁশ। হিন্দিতে দংশন করাকে বলে 'ডঁশ-লেনা'। এই কামড়ের ফলে অনেক সময় মানুষ ভয়েই মারা যায়। একই রকম ভয় বাহিত হয় **ডঙ্কা**র শব্দে। যে তা শোনে, সে ভয় পায়। পরে ডঙ্কাবাজরা সত্যি সত্যিই আক্রমণ করতে পারে, নাও করতে পারে। **ডঙ্কা**র শব্দ কিন্তু ভয় বহন করে নিয়ে গিয়ে শ্রোতাকে একপ্রকার দংশনই করে। **৬.** ইংরেজি dong, ding-dong।

ডাং, ডাঙ্গ (ডাঙ), ডাঙ্গর (ডাঙর), ডাঙ্গশ (ডাঙশ), ডাঙ্গা (ডাঙা), ডাংগুলি : ২. ডাং = *ডয়নীর আধারের রহস্যরূপ যাহাতে।* **ডাঙ্গ** = **ডাং** *গমন করে যাহাতে বা যাহার দ্বারা।* **ডাঙ্গর** = **ডাঙ্গ** *রহে যাহাতে।* **ডাঙ্গশ** = **ডাঙ্গ** *শক্তি যাহার।* **ডাঙ্গা** = **ডাঙ্গ**-*এর আধার যে।* **ডাংগুলি** = **ডাং** ও **গুলি**। **৩. ডাং, ডাঙ, ডাঙ্গ** = দণ্ড, লাঠি, কোঁৎকা, দণ্ডমাত্র; চূড়া-তুল্য উচ্চ, স্তূপ, রাশি। **ডাঙ্গর (ডাঙর)** = বড়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, শ্রেষ্ঠ, মহাকায়, বিপুল (capacious), অবিনীত, কর্কশ, বৃদ্ধ, নিপুণ, পণ্ডিত, ডাঙ্গা, উচ্চস্থান। **ডাঙ্গশ, ডাঙশ, ডাঙস** = অঙ্কুশ-অস্ত্র, হস্তিচালনার্থ অঙ্কুশ। **ডাঙ্গা (ডাঙা)** = উচ্চস্থান, স্থল, তীর, স্তূপ; ডাঙ্গ দিয়া মারা, ডাঙ্গাইতে (ঠেঙাইতে), ডাঙ্গাইবার, ডাঙ্গাইয়া, ডাঙ্গাইলে ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** গ্রামবাংলায় শব্দগুলি খুবই প্রচলিত। **৫.** অ্যাকাডেমিক বাংলাচর্চায় **ডাং** শব্দের চর্চা নেই বললেই চলে। বংশদণ্ড বা গাছের এমন ডাল যা প্রায় বাঁশের লাঠির মতোই সিধে, এরকম দণ্ড যখন মানুষের হাতে হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়, তখনই তাকে **ডাং** বলে। কারণ, তখন সেই হাতিয়ারটির ভিতরে মানুষের মনোবাঞ্ছা উড্ডয়ন করে। সেই মনোবাঞ্ছা যদি পেটাই করা

হয়, ডাং-টি সেইরূপ আচরণ করে অর্থাৎ মারামারি করে; আর মনোবাঞ্ছা যদি কেবলমাত্র ছুঁয়ে-নাড়িয়ে দেখা হয়, ডাং-টি তদ্রূপ আচরণ করে। তবে এর যথাযথ অর্থ ধারণ করে **ডাঙ্গ** শব্দটি। কেননা, তাতে মনোবাঞ্ছা গমনের কথাটিও বলা আছে। আর, মনোবাঞ্ছা যত রকমের হয়, ডাঙ্গও তত রকমের হয়, ডাঙ্গাও তত রকমের হয়। এই ডাঙ্গ যখন হাতির পিঠ, তখন সেখানে উঠে শক্তির প্রকাশ ঘটান হয় যার দ্বারা তাকে **ডাঙ্গশ** বলে; যা কিনা আসলে মাহুতের অঙ্কুশই বটে। তাছাড়া, জল থেকে যেখানে গিয়ে ওঠা যায়, সেটাই তো ডাং-এর গমন করার জায়গা বা **ডাঙ্গা** বা **ডাঙাই** বটে। মানুষ যখন শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে সেইরূপ উঁচুতে উঠে যায়, তখন স্বাভাবিক কারণেই তাকে **ডাঙ্গর** বা ডাঙর বলা যেতেই পারে; তা তিনি যুবতী কন্যাই হোন আর মহাপণ্ডিতই হোন। আর **ডাংগুলি**র বেলায় ডাং-এ থাকে মনোবাঞ্ছা এবং **গুলি**তে থাকে 'নবরূপে উত্তীর্ণ গামী লালিত যাহাতে তাহার গতিশীলতা'। সেই কারণে মনোবাঞ্ছা **গুলি**-র মাধ্যমে নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে ছুটতে শুরু করে। মনে রাখা ভাল, ডং (ডঙ, ডঞ, ডণ, ডন, ডম), দং খুবই কাছাকাছি শব্দ। ইংরেজিতে তা একই d বর্ণে প্রকাশিত হয়ে থাকে। যেমন dam, damn, dong, dumb, dumble, dump ইত্যাদি। **৬.** ইংরেজি ding-*dong, dang*er।

ডাঁট (ডেঁটে দাঁড়ান), ডাঁটা (ডেঁটে দেওয়া, dont), ডাঁটা (খাড়া), ডাঁটো : ২. *ডাঁট = ডয়নীর আধারের রহস্যরূপ টঙ্কারিত যাহাতে বা যাহার দ্বারা। ডাঁটা = ডাঁট-এর আধার যে। ডাঁটো = ডাঁট সার্বিকরূপে থাকে যাহাতে।* **৩. ডাঁট** = দৃঢ়, শক্ত, দুশ্ছেদ্য, আপাকা, অসিদ্ধ (ভাত)। **ডাঁটা** = দণ্ডবৎ শাকের শাখা, দণ্ডশাক, সজনার দণ্ডবৎ ফলশাক, গাছের সরু ডাল, পদ্ম-প্রভৃতির নাল। (ব.শ.)। **ডাঁটা** = তিরস্কার করা, ধমক দেওয়া। **ডাঁটো** = শক্ত, কঠিন, সবল, দৃঢ়, সমর্থ, অপক্ব, ডাঁসা। (ব্য.বা.অ. - বাংলা একাডেমী, ঢাকা)। **৪.** শব্দগুলি অ্যাকাডেমিতে কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাংলাভাষীর মুখে খুবই প্রচলিত। **৫.** রোয়াব দেখানো বা তেজ দেখানো প্রভৃতি অর্থে **ডাঁট** কথাটি খুবই প্রচলিত। আবার **ডেঁটে** দেওয়া বা ধমকে দেওয়া অর্থেও কথাটি সমভাবে প্রচলিত। সর্বোপরি **ডাঁটা** যেমন ধমকানো (don't বা 'করিও না') বোঝায়, তেমনি সজনে পুঁই লাউ প্রভৃতি শাকসব্জির 'ডাঁটা'কেও বোঝায়। এর কারণ হল, এই সব ক্ষেত্রেই 'ডয়নীর আধারের রহস্যরূপ টঙ্কারিত' হয়ে থাকে। প্রবল বৈপরীত্যের সামনে দণ্ডায়মান থাকাকেও ডেঁটে থাকা বলা হয়। কার্যত, দণ্ড ও ডণ্ড খুব কাছাকাছি ধারণা, মূলে তা ড বর্ণ থেকে উৎসারিত। **৬.** ইংরেজি don't। বাংলা 'দ্যু' বা দ্যোতিত হওয়া আর ইংরেজি 'do' একই ক্রিয়ার প্রকাশক আওয়াজ। 'দ্যোতিত হইও না' বা "don't" মূলে সমার্থক। মনে রাখা ভালো, ড ও ঢ মূলে শুধুমাত্র 'ড' (d); ইংরেজিতে তা d, dh-এর বেশি আর বিকশিত হয়নি। কিন্তু বাংলায় তার মোট ছয়টি রূপে বিকাশ ঘটেছে — ড, ঢ, ড়, ঢ়, দ, ধ। এই ছয়টির মধ্যে ড় ও ঢ় বর্ণের সমগোত্রীয় কোনো বর্ণ ইংরেজিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বাকি চারটি বর্ণের দ্বারা প্রারম্ভিক শব্দগুলি (ধরা যাক — ডাক, ঢাক, দাক, ধাক) ইংরেজিতে কেবলমাত্র প্রারম্ভিক d বর্ণেই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ইংরেজিতে d-এর পরে আর বর্ণবিভাজন ঘটেনি। তবে, d-এর পর h যোগ করে 'ধ' আর 'ঢ'-এর মতো ধ্বনি অনেকটা সৃষ্টি করা যায়। **৬.** ইংরেজি don't।

ডাণ্ডা, ডাণ্ডাগুলি : দ্র. **ডাং, ডাংগুলি**।

ডিঙ্গ (ডিং, ডিংগ্), ডিঙ্গা (ডিঙা), ডিঙ্গান (ডিঙান), ডিঙ্গি (ডিংগি, ডিঙি), ডিঙ্গয়ান, ডিঙ্গর, ডিঙ্গসাই : ২. *ডিঙ্গ = গতিশীল ডয়নীর রহস্যরূপ গমন করে যাহাতে, অথবা উড়িয়া গমন থাকে যাহাতে। ডিঙ্গা = ডিঙ্গ-এর আধার। ডিঙ্গান = ডিঙ্গ অন থাকে যাহাতে। ডিঙ্গি = ডিঙ্গ গতিশীল যাহাতে। ডিঙ্গয়ান = ডিঙ্গ যান যাহার। ডিঙ্গর = ডিঙ্গ রহে যাহাতে। ডিঙ্গসাই = ডিঙ্গ রূপ অস্তিত্বের আধার গতিশীল যাহাতে।* **৩. ডিঙ্গা, ডিঙা** = নৌকা, ছোট নৌকা; নভোগতি দ্বারা অতিক্রম করা, উল্লম্ফন করা, ডিঙান, লাফান। **ডিঙ্গান, ডিঙান** = লাফাইয়া যাওয়া, অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করা (ডিঙি মারা — লাফান)। **ডিঙ্গি, ডিঙি** = ছোট নৌকা। **ডিঙ্গয়ান** = পোতবণিক। **ডিঙ্গর** = সেবক, ধূর্ত্ত, ক্ষেপ, নিন্দা, বন, নীচজন, সাধারণ লোক। **ডিঙ্গসাই** = উপাধি। দ্র. **পদবী**। (ব.শ.)। **৪.** জনসাধারণ্যে যথেষ্ট প্রচলিত থাকলেও অ্যাকাডেমিতে কম প্রচলিত। **৫.** 'ডিঙিয়ে যাওয়া বা ডিঙ্গিয়ে যাওয়া' কথাটি শুনলেই বাংলাভাষী বুঝতে পারেন — মাঝে রয়েছে কোনো বাধা, উপর দিয়ে সেই বাধাকে টপকে যাওয়াই ডিঙান বা ডিঙ্গান। বাধাটি একটি পাথর, তেপান্তরের মাঠ, খাল, নদী, এমনকি সাত সমুদ্দুরও হতে পারে। কিন্তু পরে ইংরেজির প্রভাবে 'ডিঙিয়ে যাওয়া' কথাটি overtake-এর বাংলা অনুবাদ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডিঙ্গান শব্দের অর্থটি সঙ্কুচিত হয়ে যায়; মানে দাঁড়িয়ে যায় অন্য গতিশীল সত্তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া বা অতিক্রম করা মাত্র।

কার্যত, **ড** বর্ণের অর্থে আমরা জেনেছি, যে সত্তা উড়ে যায়, উড্ডয়নকারী, যাকে আমরা ডয়নী বলছি; সেই **ড** গতিশীল হলেই হয় **ডি**। তার নানান রূপ থাকতেই পারে। তাকেই আমরা বলি **ডিং**। এই ডিং গমন করে ডিঙিতে, বা ডিঙিয়ে। একেই ডিঙ্গা, ডিঙা, ডিঙ্গি, ডিঙি ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। মধ্যযুগের বাংলাভাষী এই শব্দের বিপুল ব্যবহার করেছে তাদের সাহিত্যে। তখনকার নৌ-বাণিজ্যে রত বণিকদের বলাই হত **ডিঙ্গয়ান**। তার সঙ্গে যুক্ত ব্রাহ্মণেরা ছিলেন **ডিঙ্গসাই**। **দেবযান, পিতৃযান, মহাযান** ... প্রভৃতির নিরিখে একালের Overseas Export Business-এর নীতিকে সেই সুবাদে **ডিঙ্গযান** বলা যায়। দ্র. **পদবী**।

ডুণ্ডুভ : ১. ✓ডুণ্ড, মজ্জন + ভ - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. ডুণ্ডুভ** = *ডু-র (নবরূপে উত্তীর্ণ ডয়নীর) রহস্যরূপ পুনরায় ডু-রূপে বাহিত-রক্ষিত হয় যাহাতে।* **৩.** ঢোঁড়া সাপ। (ব.শ.)। একদা সহস্রপাদ নামে এক ঋষি খগম নামে তাঁর এক ব্রাহ্মণসখার অভিসম্পাতে ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া সাপ) দশা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ... বহু অনুনয়ের পর খগম বলেন যে, তাঁর কথা মিথ্যা হবে না; তবে প্রমতীর পুত্র রুরুর দর্শনলাভ করলে সহস্রপাদ মুক্তিলাভ করবেন। রুরুর স্ত্রী প্রমদ্বরা

দুর্দৈবক্রমে সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করলে দেবদূতের পরামর্শে রুরু তাঁর অর্ধায়ু দান করে প্রমদ্বরাকে জীবিত করেন বটে, কিন্তু সর্পকুল বিনাশ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ... ডুণ্ডুভকে হত্যা করতে উদ্যত হলে, সে বলে ওঠে যে, ... সে অন্য জাতি। রুরু তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে ডুণ্ডুভরূপী সহস্রপাদ পূর্ব-বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন ও পূর্বরূপ ফিরে পেয়ে রুরুকে অহিংসা ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হন।(পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **আস্তিক, জনমেজয়, পরীক্ষিৎ**। এই ডুণ্ডুভই হল সেই ঢোঁড়া সাপ, পরীক্ষিৎ যা মৌনব্রতী শমীক মুনির গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। সেই কারণে শমীক মুনির পুত্র শৃঙ্গী পরীক্ষিৎকে সর্পদংশনে মৃত্যুর অভিশাপ দেন। এবং তার ফলেই ভারতের সেই বিখ্যাত **সর্পসত্রের** আয়োজন করেন **জনমেজয়**। অতএব এ ঢোঁড়া সাপ কতখানি ঢোঁড়া, তা বিচারের অপেক্ষা রাখে। আমরা এখনও এর স্বরূপ বুঝে উঠতে পারিনি।

ডুম, ডুমনী, ডুমা (ডুমো), ডুমিনী, ডুমুনী, ডুমুডুমু, ডুমুর : ২. **ডুম** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ডয়নী সীমায়িত যাহাতে।* **ডুমনী** = **ডুম** *অন যাহাতে তাহার গতিশীল আধার যে।* **ডুমা** = **ডুম**-*এর আধার যে।* **ডুমিনী** = **ডুম** *ইন যাহাতে তাহার গতিশীল আধার যে।* **ডুমু** = **ডুম** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **ডুমুনী** = **ডুমু** *গতিশীল থাকে যে আধারে।* **ডুমুডুমু** = **ডুমুর** *পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **ডুমুর** = **ডুমু** *রহে যাহাতে।* ৩. **ডুম, ডুমা, ডুমো** = খণ্ড, টুকরা। **ডুমনী (ডুমিনী, ডুমুনী)** = ডোমজাতির বা ডোমের স্ত্রী, চৌকাঠের বাজুতে সংলগ্ন হাঁশকলের আধার খিল। **ডুমুডুমু** = ডমরুধ্বনি। **ডুমুর** = বৃক্ষবিশেষ ও তাহার ফল-শাক, ছোট ডুমুর (কাকোডুম্বরিকা = Ficus hispida) ও বড় ডুমুর বা যজ্ঞডুমুর (উডুম্বর = Ficus glomerata)। ৪. শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত; কিন্তু অ্যাকাডেমিতে প্রায় অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ডোম**। ৬. ইংরেজি doom।

ডোম, ডোমকাক, ডোমচিল, ডোমনা, ডোমনী, ডোম্ব, ডোম্বী : ২. **ডোম** = **ডু** *অর্থাৎ নবরূপে উত্তীর্ণ ডয়নীর সার্বিক রূপ সীমায়িত যাহাতে।* **ডোমকাক** = *ডোমরূপী* **কাক** *বা কাকদিগের* **ডোম** *যে।* **ডোমচিল** = *ডোমরূপী* **চিল** *বা চিলদিগের* **ডোম** *যে।* **ডোমন** = **ডোম** *অন যাহাতে।* **ডোমনা** = **ডোমন**-*এর আধার যে।* **ডোমনী** = **ডোমন**-*এর গতিশীল আধার যে।* **ডোম্ব** = **ডোম** *বহন করে যে।* **ডোম্বী** = **ডোম্ব**-*এর গতিশীল আধার যে।* ৩. **ডোম** = চণ্ডাল। **ডোমকাক** = দাঁড়কাক। **ডোমচিল** = গোদাচিল। **ডোমনা** = ডোমস্বামী। **ডোমনী** = ডোমজাতির স্ত্রী বা ডোমের পত্নী। **ডোম্ব** = ডোমজাতির পুরুষ, চণ্ডাল। **ডোম্বী** = নৈরাত্মদেবী — ইনি পরিচর্য্যামাত্রে ভক্তকে ভবসমুদ্র পার করেন। ... ডোমনীরূপা চণ্ডীর যে খেয়াপারের বিবরণ আছে, তাহার মূল ডোম্বীর ঐ ভবসমুদ্রে পার করার কথা, মনে হয়; তাহা পারলৌকিক; ইহা ইহলৌকিক। এই ডোম্বী হইতে পুংলিঙ্গে 'ডোম্ব' 'ডোম' হইয়াছে। (ব.শ.)। ৪. শব্দগুলি মধ্যযুগের সাহিত্যে যেমন খুবই ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি বাংলাভাষীর দৈনন্দিন বাক্যালাপেও তার বিস্তর ব্যবহার রয়েছে; কিন্তু অ্যাকাডেমিতে শব্দগুলি অপাঙ্‌ক্তেয়। সেকালের সমাজে শব্দগুলি কমবেশি **যথার্থেই প্রচলিত ছিল**। ৫. **মূল শব্দটি হল ডুম**। এর অর্থ **হল 'নবরূপে উত্তীর্ণ** ডয়নী **সীমায়িত** যাহাতে'। সত্তার পরিধি পেরিয়ে **সর্বোচ্চে তার যে অংশ** উত্থিত **হয়**, এবং খানিকটা পৃথক চেহারা নেয়, **তাকেই ডুম** বলে। জড়ের ক্ষেত্রে সত্তার খণ্ড খণ্ড রূপ **ডুম হতে পারে,** যা কিনা সত্তাটির অংশবিশেষের লয়প্রাপ্তিও হতে পারে (doom); প্রাসাদের ক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চে থাকা অংশটি (dome) হতে **পারে**; জাতির ক্ষেত্রে তাদের প্রেরিত সামরিক সত্তা হতে পারে। বাঙালি ডোম সেকালের সামরিক সত্তাই বটে। 'আগডুম-বাকডুম-ঘোড়াডুম' সাজে কিংবা 'আগডোম-বাকডোম-ঘোড়াডোম' সাজে — **সামরিক সাজসজ্জার বর্ণনাই** বটে। যে-বাহিনী সর্বাগ্রে যায় সে হল **আগডোম**; যারা কথায় কাজ সারে অর্থাৎ দূতাদি, তারা হল **বাগডোম**; এবং যারা ঘোড়সওয়ার করে অর্থাৎ অশ্বারোহী সৈনিক তারা **হল ঘোড়াডোম**। ৬. ইংরেজি doom, dome।

ডাক্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ডাইন, ডাইনী, ডাক (ডয়নকারী-জাত), ডাকখরচা, ডাকগাড়ি, ডাকঘর, ডাকচৌকি, ডাকটিকিট, ডাকনাম, ডাকপাখী, ডাকপিওন, ডাকবাংলা, ডাকমাশুল, ডাকমুনসী, ডাকসংক্রান্তি, ডাকসাইটে, ডাকসিদ্ধা, ডাকসিদ্যা, ডাকহরকরা, ডাকহাঁক, ডাকা, ডাকাইত, ডাকাডাকি, ডাকাত, ডাকাতি, ডাকাতিয়া, ডাকাতে, ডাকিনী, ডাকিনীবিদ্যা, ডাকাবুকা, ডাকু, ডান, ডাহিনি, ডাহিনী, ডাহুক (দাত্যূহ), ডাহুকা, নামডাক।

ডাক = ডক (**ডক** = ডয়ন করে যে।) হইতে জাত।

ডক : ২. *ডয়ন করে বা করায় যে।* ৫. বাংলায় এই শব্দটির উত্তরাধিকার নেই, রয়েছে **ডাক**, যা কিনা 'ডক হইতে জাত'। তবে ইংরেজিতে dock রয়েছে। সে কাকে ডয়ন করে বা করায়, জানতে চাইলে আমরা বড়জোর এই উত্তর পেতে পারি যে, সে জাহাজ, স্টিমার ইত্যাদি প্রেরণ করে থাকে। দ্র. **ডাক**। ৬. ইংরেজি dock।

ডাক (ডাকা, ডাকাবুকা) : ২. **ডাক** = ডক *(ডয়ন করে যে) হইতে জাত।* **ডাকা** = **ডাক**-*এর আধার যে।* **ডাকাবুকা** = **ডাক** *দিয়ে লুঠ করার মত বুক যাহার।* ৩. **ডাক** = কৃষ্ণ উভচর পক্ষিবিশেষ, জ্ঞানী পুরুষ; দূর দেশে পত্রপ্রেরণ বা গমনের নিমিত্ত দীর্ঘ পথের কিছু অন্তরে অন্তরে ঘোড়া যান বা বাহকের ব্যবস্থা, ঠিকানা-অনুসারে পত্রাদি বিলি করার সরকারী ব্যবস্থা (post), ডাকে আনীত বা প্রেরিত পত্রাদি, ডাকের ক্ষেপ; রাঙের খুব পাতলা পাত; আহ্বান, সম্বোধন, হুঙ্কার, হাঁক, শব্দ, গর্জ্জন, নাদ, রব, পক্ষিরব, বুলি, উচ্চরব, চীৎকার, মুক্তকণ্ঠে ইষ্টমন্ত্রোচ্চারণ, যত দূরে আহ্বানের শব্দ যায় তত দূর, শ্রবণগোচর স্থান (ear-shot), প্রভাব, গৌরব, খ্যাতি, মৌখিক শুভঙ্করী প্রশ্ন; আহ্বান করা, ডাকা, উচ্চারণ করা, অভিহিত করা, উচ্চৈঃস্বরে বলা, স্মরণ করা, গর্জ্জন করা, কূজন বা রব করা, বাদিত হওয়া বা বাজা, উচ্চরব করা, চেঁচান, ডাক দিয়া চালান বা তাড়ান,

আহ্বান করান। **ডাকা** = ডাক, আহ্বান, ডাক দিয়া আমন্ত্রণ, লুণ্ঠন, লুঠপাট, দুঃসাহসের কার্য্য। **ডাকাবুকা** = ডাকাতের মত যাহার বুক। (ব.শ.)। ৪. মধ্যযুগের সাহিত্যে **ডাক** ক্রিয়াজাত শব্দগুলির প্রচলন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। এখনও বাংলাভাষীর ভাষা ব্যবহারে শব্দগুলি ব্যাপকভাবে প্রচলিত। 'ডাকার মতো ডাকা' নিয়ে আধুনিক যুগেও গান-কবিতাদি রচিত হয়েছে। ৫. **ড** বা ডয়নী করে যে, তাকে বলে **ডক**। এই ডক শব্দের উত্তরাধিকার বাংলার নেই, রয়েছে ইংরেজির — dock। এখান থেকে পণ্য, পণ্যবাহী মানুষ ও তার জাহাজ অন্যত্র যায়। তবে, **ডক**-এর উত্তরাধিকার না থাকলেও 'ডক হইতে জাত' **ডাক**-এর উত্তরাধিকার বাংলাভাষার রয়েছে বিপুল পরিমাণে। এর অর্থ হল **ডক**-এর মাধ্যমে আহ্বান করা বা অন্য কিছু জানান দেওয়া। এই **ডাক** যেমন যেকোনো রকম 'আহ্বানমূলক-রব পাঠানো' বোঝায়, তেমনি উভচর পক্ষী (ডাহুক-পাখি) বা duck-কেও বোঝায়। এই **ডাক**-এর আধুনিক রূপ হল ডাকব্যবস্থা বা পোস্ট ও টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা। এখনকার ফোন, মোবাইল — এসবও **ডাক**-এরই অত্যাধুনিক রূপ।

ডাকখরচা, ডাকগাড়ি, ডাকঘর, ডাকটিকিট, ডাকনাম, ডাকপিওন, ডাকবাংলা, ডাকমাশুল, ডাকমুনসী, ডাকসংক্রান্তি, ডাকসাইটে, ডাকসিদ্ধা, ডাকসিদ্যা, ডাকহরকরা, ডাকহাঁক : ২. ***ডাকখরচা*** *=* ***ডাক****-এর জন্য যে খরচা হয়।* ***ডাকগাড়ি*** *= যে গাড়ি* ***ডাক*** *(চিঠিপত্রাদি) বহন করে।* ***ডাকঘর*** *= যে ঘর হইতে* ***ডাক*** *(চিঠিপত্রাদি) পাঠানো হয়।* ***ডাকটিকিট*** *= যে টিকিটের সাহায্যে* ***ডাক*** *পাঠানো হয়।* ***ডাকনাম*** *= যে নামে* ***ডাকা*** *হয়।* ***ডাকপিওন*** *= যে পিওন* ***ডাক*** *(চিঠিপত্রাদি) বহন করে নিয়ে যায়।* ***ডাকবাংলা*** *= যে বাংলোবাড়ি থেকে* ***ডাকাডাকি*** *করা হয়।* ***ডাকমাশুল*** *=* ***ডাক*** *পাঠানোর জন্য যে মাশুল দিতে হয়।* ***ডাকমুনসী*** *= যে মুনসী* ***ডাক*** *(চিঠিপত্রাদি) প্রেরণ বিষয়ক কাজ করে (পোস্টমাস্টার)।* ***ডাকসংক্রান্তি*** *= যে সংক্রান্তিতে কৃষকগণ ডাকাডাকি করেন।* ***ডাকসিদ্ধা (ডাকসিদ্যা, ডাকসাইটে)*** *= যে* ***ডাক*** *ডাকিবা মাত্র সিদ্ধ হয়।* ***ডাকহরকরা*** *=* ***ডাক*** *হরণ (নিয়ে যায়) করে যে।* ***ডাকহাঁক*** *=* ***ডাক****-এর জন্য যে হাঁক। /* **ডাকঘর** = যেখানে বা যেখান হইতে ডাক আসে বা যায়। **ডাকসাইটা, ডাকসিদ্যা** = যে নামের ডাকেই সিদ্ধি (হয়), অর্থাৎ, যে নাম করামাত্র বোধগম্য হয়। (ব.শ.)। ৩. **ডাকখরচা** = ডাকে পত্রাদি পাঠানর ব্যয়। **ডাকগাড়ী** = ডাক যাওয়ার গাড়ী বা রেলগাড়ী। **ডাকঘব** = যেখানে বা যেখান হইতে ডাক আসে বা যায়, পোস্ট অফিস। **ডাকটিকিট** = ডাকের মাশুলপত্র (postage, stamp)। **ডাকপিওন** = ডাক বিলি করার কর্ম্মচারী। **ডাকবাংলা** = সরকারী কর্ম্মচারী বা অন্যের বিশ্রামার্থ বাঙ্‌লা বা মোকাম। **ডাকমাশুল** = ডাক-খরচা। **ডাকমুনসী** = পোস্টমাস্টার। **ডাকহরকরা** = ডাকের ধাবক (runner)। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

ডাকাইত, ডাকাত, ডাকাতি, ডাকু : ২. ***ডাকাইত*** *=* ***ডাক****-এর আধার গতিশীল হইয়া তারিত হয় যাহাতে বা যাহা দ্বারা।* ***ডাকাত*** *=* ***ডাকা*** *তারিত হয় যাহা দ্বারা বা যাহাতে।* ***ডাকাতি*** *=* ***ডাকাত*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ডাকু*** *=* ***ডাক*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। /* ***ডাকাত*** *= যে ডাক দিয়া পড়ে। (ব.শ.)।* ৩. **ডাকাইত, ডাকাত** = দস্যু, লুঠেরা, জলদস্যু, ডাকাইততুল্য অপহারক, অতিদুর্ব্বৃত্ত। **ডাকাতি** = দস্যুবৃত্তি, ডাকাইতের কাজ। **ডাকু** = ডাকাত। (ব.শ.)। ৪. 'দস্যু' অর্থে প্রচলিত। ৫. চুরি করা ও ডাকাতি করার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। তাই চোর ও ডাকাত আলাদা সত্তা। চোর গোপনে অপহরণ করে, ডাকাত বলে-কয়ে অপহরণ করে। ব.শ. ঠিকই বলেছেন, 'যে ডাক দিয়া পড়ে', তাকেই ডাকাত বলে। হিন্দিতে তাই ডাকাতি করাকে বলে 'ডাকা ডালনা'। মোট কথা না-ডেকে চুরি করা যায়; কিন্তু না-ডেকে ডাকাতি করা যায় না।

ডাকিনী (ডাইন, ডাইনী, ডান, ডাহিনি, ডাহিনী), ডাকিনীবিদ্যা : ২. ***ডাকিনী*** *= যাহা ডাকিলেই (যে-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই) বোধগম্য হয়; অথবা যে-আধারশক্তি ডাকিয়া ইষ্ট/অনিষ্ট করিতে পারে।* ***ডাকিনীবিদ্যা*** *= যাহা ডাকিলেই বোধগম্য হয়, তদ্রূপ বিদ্যা।* ৩. **ডাইন, ডাইনী, ডান** = পিশাচী, পেতনী, (সাদৃশ্যে) জাদুবিদ্যাবলে দৃষ্টিমাত্রে শিশুর অনিষ্টকারিণী স্ত্রীলোক (witch), গালিবিশেষ। **ডাকিনী** = ডাকসমূহ, পিশাচগণ, কালীর গণবিশেষ, উপদ্রবকারিণী নারী, ডাইনী, গৌরী (অপ্রচলিত)। (ব.শ.)। পিশাচীবিশেষ। এরা হরপার্বতীর অনুচরী। (পৌ.অ.)। ৪. গালাগালি রূপে 'ডাইনী' শব্দটি প্রচলিত। গ্রামবাংলায় ডাইন, ডাইনী, ডাকিনী, ডান খুবই প্রচলিত। অ্যাকাডেমিতে অপ্রচলিত। ৫. এই শব্দগুলির ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল মধ্যযুগে। তন্ত্রে শব্দগুলির যথার্থে প্রচলন আছে, যদিও তার মর্মার্থ প্রায় সমস্ত তান্ত্রিকেরাই ভুলে গেছেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই — বৈদিকেরা যদি বেদের অধিকাংশ অর্থই ভুলে গিয়ে থাকেন, তান্ত্রিকেরাও তাঁদের পূর্বসূরীদের অধিকাংশ অর্জনের মানে ভুলে যাবেন, সেটাই স্বাভাবিক। দ্র. **বেদ, তন্ত্র**।

তা সে যাই হোক, ভারতের নিজস্ব উত্তরাধিকার বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার। কথাটি হল, প্রাচীন ভারতীয় অর্জন ছিল পরিপূর্ণ সরোবর এবং তার বর্তমান উত্তরাধিকার হল শুষ্ক সরোবর। শুষ্ক গর্তের বিশালত্ব দেখে তার আদি স্বরূপ আন্দাজ করা যেতে পারে, কিন্তু শুষ্ক সরোবরকে পূর্ণ প্রাণবন্ত সরোবর ভাবার বোকামি একপ্রকার দুষ্ট মৌলবাদী প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়ে থাকে। ...

যাই হোক, আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্জিত ডাকিনীবিদ্যা আসলে কী ছিল? একালের ভাষায় সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় — 'স্লোগান তৈরি ও প্রয়োগের বিদ্যা'ই ছিল **ডাকিনীবিদ্যা**। ভারতের স্বাধীনতা-পূর্বকালে, ১৯০৫-১৯৪৭ কালপর্বে, আমাদের ডাকিনীবিদ্যা ছিল 'বন্দে মাতরম'। সেই সময়ের যে-সকল মানুষ এখনও বেঁচে আছেন, তাঁরা জানেন, সেসময় 'বন্দে মাতরম' ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বুঝতে পারতেন সেই ডাকের মর্মকথা কী! সারা শরীরে মনে তাঁদের তীব্র শিহরণ জেগে উঠত। অনেকের জীবনে 'ইনকিলাব-জিন্দাবাদ' ডাকটি একই তরঙ্গ সৃষ্টি করত। ১৯৭০ সালের আগে-পরে নকশালদের 'গ্রামে চলো'র ডাক একই তরঙ্গ তুলেছিল

পশ্চিমবঙ্গবাসী তরুণদের মনে, যার ফলে তাদের অনেকেই কলেজ-ইউনিভার্সিটি ছেড়ে গ্রামে চলে গিয়েছিল। দুনিয়ার প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতার লড়াই বা বিপ্লবকালে এই ডাকিনীবিদ্যার প্রয়োগ ঘটেছে। যাঁরা তাঁদের যৌবনে সেই সকল লড়াইয়ে অংশ নিয়েছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন, ঐ-প্রকার **ডাক** কী উত্তাল ও বিপুল প্রাণোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করত তাঁদের মনে। ডাকিনীবিদ্যার ফলিত স্বরূপ তাঁরা প্রত্যেকেই দেখেছেন।

কিন্তু এ হল সামাজিক শক্তিকে জাগানোর ডাকিনীবিদ্যা। প্রাকৃতিক শক্তিকে জাগানোর ডাকিনীবিদ্যাও প্রচলিত ছিল পৃথিবীর সব দেশেই। ভারতের তন্ত্রসাধনার গৌরব এই যে, তাঁরা সেই মধ্যযুগের আগেই এই উভয় প্রকার ডাকিনীবিদ্যার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন এবং তাকে চিহ্নিত করে যেতে পেরেছেন। প্রাচীন কালে যাঁরা প্রাকৃতিক শক্তিকে ডাক দিয়ে জাগানোর জন্য ডাকিনীবিদ্যার প্রয়োগ করতে শিখেছিলেন, তাঁদের সে বিদ্যা একসময় কলুষিত হয়ে যায়। কিন্তু সে বিদ্যা যে আদৌ কার্য্যকরী নয়, এমন কথা ঠিক নয়। যে অসুখ কখনো সারবে না বলে সবাই অভিমত দিয়ে দিয়েছে, তথাকথিত গুণীন, পীরবাবা, কিংবা অন্যতর সেকেলে জ্ঞানের অধিকারী তেমন অসুখ সারিয়ে দিয়েছেন, এমন দু-একটি ঘটনা অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন; আমরাও সেরকম দু-একটি ঘটনার সাক্ষী। এই ব্যাপারটি আমাদের জানায়, প্রকৃতির শক্তিকে ডাক দেওয়ার কিছু কিছু বিদ্যা কেউ কেউ জানতেন, তার ব্যবহারও তাঁরা জানতেন; কিন্তু সেই অব্যক্ত জ্ঞানকে (tacit knowledge-কে) ব্যক্ত জ্ঞানে (explicit knowledge-এ) উন্নীত করা হয়নি কিংবা করা যায়নি। অথচ ওই বিদ্যার নাম করে এতই কুকর্ম হতে থাকে যে, মাঝ থেকে এই ধরনের বিদ্যাগুলি সবই মন্দ, সমাজে এরকম একটি ধারণার সৃষ্টি হয়ে যায়। তার ওপর এসে যায় আধুনিকতার একটেরে গোঁয়ার্তুমি। সে বিশ্বাস করে, সে যেটা জেনেছে, সেটিই সঠিক জ্ঞান; আর কোনো জ্ঞানই পৃথিবীতে নেই। ***মানুষের 'অজ্ঞানের এলাকা' সম্পর্কে আধুনিকতা সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং নিজের এই অজ্ঞতা সম্পর্কেও সে অত্যন্ত অজ্ঞ এবং মৌলবাদীর মতো অত্যন্ত গোঁয়ার।*** সেই আধুনিকতা ইয়োরোপে শেকসপীয়ারের কালে ডাইনি পুড়িয়েছে, ভারতের ওয়াহাবি আন্দোলনও এই ডাইনি বিদ্যা ধ্বংসের জয়গান গেয়েছে। আর, বাংলার গ্রামে গ্রামে আজও ডাইনি-পোড়ানো চলছে। এই ডাইনি পোড়ানোর বিরুদ্ধে আমাদের একটি কথাই স্পষ্ট করে বলবার আছে। কোনো সুস্থমতির মানুষই throwing the baby out with the bathwater-এর নীতি অনুসরণ করতে পারেন না। প্রাচীন মানুষের ডাকিনীবিদ্যার প্রকৃত অর্জনকে চেনার চেষ্টা পর্যন্ত না করে, বদ ও নষ্ট ডাকিনীবিদ্যাকে বিতাড়নের নামে পূর্বপুরুষের প্রকৃত অর্জনকেও এভাবে ফেলে দেওয়া খুবই গর্হিত কাজ। একালের তথাকথিত কট্টর বিজ্ঞানবাদীরা কেউ কেউ এরকম গর্হিত কাজকেই উচিত কাজ বলে বিবেচনা করে থাকেন। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মৌলবাদী-বিজ্ঞানবাদী। তাঁদের অন্ধত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব তাঁদেরকে এমনই জড়বুদ্ধি করে দিয়েছে যে, তাঁরা একালের আরও বেশি বদ ও নষ্ট ডাইনীবিদ্যাকে দেখতেও পান না। আটঘণ্টা কাজের দাবীওয়ালা 'মে-দিবস'বাদী কমিউনিস্টরা যেমন একালের আইটির দুনিয়ায় ১২/১৪ ঘণ্টা কাজের অমানবিক **অন্যায় ন্যক্কারজনক ব্যাপারকে দেখতেই পায় না, এই মৌলবাদী-বিজ্ঞানবাদীরাও সেরকম।**

একালের **সবচেয়ে জঘন্য ডাইনীবিদ্যা** হল 'গোলোকায়িত ডাইনীবিদ্যা'। **এই রাক্ষসী রয়েছে** সকলের চোখের সামনে। একালের তথাকথিত **কুবের-ভক্তরা** এই রাক্ষসীর বা ডাইনীবিদ্যার প্রয়োগ করে থাকে। **সবকিছুকেই** তারা তাদের টাকা-রোজগারের উপায় হিসেবে ব্যবহার না-করে থাকতে পারে না। 'বৃথামাংস ভক্ষণ' করার জন্য, অন্ধ ধনলালসাকে তৃপ্ত করার জন্য তারা সামাজিক শক্তিকে ডাক দেয়, জাগিয়ে তোলে। এই ডাকিনীবিদ্যা হল একালের পণ্যবিক্রির নানা স্লোগান, টাকা রোজগারের নানা লোভনীয় নিশির ডাক। মানুষের সন্তানের জীবনকে শুষে নিয়ে এই রাক্ষসী ছিবড়ে করে দিচ্ছে। ধ্বংসের গভীর খাদে সমাজরথকে হুড়মুড়িয়ে ফেলে দিয়েই এই ডাইনী নিস্তার নেবে বলে মনে হয়।

নামডাক : ২. *যে নাম ডাকিবামাত্র চেনা যায়; যে নামকে বারে বারেই ডাকা হয়।*

ডিম্ব্ **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : ডম্বুর, ডিণ্ডিম, ডিণ্ডিমি, ডিণ্ডির, ডিণ্ডিশ, ডিবিডিবি, ডিম, ডিমক, ডিমডিম, ডিমিকি, ডিমিডিমি, ডিম্ব, ডিম্বযুদ্ধ, ডিম্বিকা, ডিম্বিকি, ডিম্ভ, ডিম্ভক, ডুকর, ডুকরা, ডুকুর, ডুগডুগি, ডুগী (ডিগি)।

ডিম্ব্ = গতিশীল ডয়নের সীমায়ন বহন। **ডিম্ব** = গতিশীল ডয়নের সীমায়ন বহন করে যে।

ডিম (ডিমক, ডিমডিম, ডিমিডিমি, ডিমিকি, ডিম্বিকি) : ২. ***ডিম*** *= গতিশীল ডয়নী সীমায়িত যাহাতে।* ***ডিমক*** *=* ***ডিম*** *করে যে।* ***ডিমডিম*** *=* ***ডিম****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ডিমিকি*** *= ডিমি (****ডিম*** *গতিশীল যাহাতে)-কে গতিশীল করে যে।* ***ডিম্বিকি*** *= ডিম্বি (****ডিম্ব****কে গতিশীল করে যে)-কে গতিশীল করে যে।* ৩. **ডিম** = রূপকবিশেষ, অণ্ড, ডমরু ও ডিণ্ডিমের ধ্বনি, (ডিম্ব সাদৃশ্যে) লোষ্ট্র, ঢিল। **ডিমক** = বাদ্যবিশেষ। **ডিমডিম, ডিমিডিমি** = ডিণ্ডিমবাদ্য, ডমরূধ্বনি। **ডিমিকি** = মাদলের ধ্বনি। **ডিম্বিকি** = বাদ্যবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. উপরোক্ত শব্দগুলি 'ডিমডিম' ধ্বনি অর্থে কমবেশি প্রচলিত এবং কখনো-বা egg অর্থে 'ডিম' শব্দটি প্রচলিত। ৫. দ্র. **ডিগি-তবলা**। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন — 'দুন্দুভি বেজে ওঠে ডিম ডিম রবে / সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে।' দুন্দুভি বা মাদলের আওয়াজকে 'ডিম ডিম' আওয়াজ বলা হয়। ঢাক ঢোলের আওয়াজকে কিন্তু তা বলা হয় না, কারণ মাদলের আওয়াজ উত্থিত হয়ে যেন নিজের ভিতরে নিজে গুমরায়, গুমরে গুমরে ওঠে। দ্র. **ডিম্ব**। ৬. ইংরেজি dim, diminish ইত্যাদি।

ডিম্ব (ডিম্বযুদ্ধ, ডিম্বিকা) : ১. ✓ডিম্ব্ প্রেরণ, সঙ্ঘ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ডিম্ব*** *=* ***ডিম*** *(গতিশীল ডয়নী সীমায়িত*

যাহাতে) বহন করে যে। ***ডিম্বযুদ্ধ*** *= ডিম্বগণের যুদ্ধ, বা ডিম্বের জন্য যুদ্ধ, কিংবা যে যুদ্ধ ডিম্ব প্রসব করে।* ***ডিম্বিকা*** *=* ***ডিম্ব****-কে গতিশীল করে যে, তাহার আধার।* **৩. ডিম্ব** = অণ্ড, ডিম, (সাদৃশ্যে) পুপ্‌ফুস, ফুসফুস, প্লীহা, জরায়ু, গোলক, কলল, (ডিম্বজাত) শাবক, শিশুমাত্র, কলহ, যুদ্ধ, ভয়, ভয়ধ্বনি, বিপ্লব, ভূতযোনিবিশেষ। **ডিম্বযুদ্ধ** = নৃপতিরহিত যুদ্ধ। **ডিম্বিকা** = ক্ষুদ্র ডিম্বতুল্য জলবিম্ব। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** ডিম শব্দটিকে আমরা দু-ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখি — ধ্বনি রূপে এবং ইংরেজি egg অর্থবাচক বাংলা শব্দ রূপে। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে, 'ডিম' শব্দের ভিতরে যে ক্রিয়া ও ক্রিয়াকারীর কথা বলা হয়েছে, তাতে দুটোই বোঝায়। কেবল তাই নয়, তা একই সঙ্গে ইংরেজি dim শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থকেও সুনির্দিষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়। কারণ সব ক্ষেত্রেই উদ্দিষ্ট অর্থগুলি 'গতিশীল ডয়নীর সীমায়িত রূপ'। ধ্বনির ক্ষেত্রে 'গতিশীল ডয়নী' হল বিশেষ ধরনের আওয়াজ, যা নিজের ভিতরে গুমরায়; তাই তা **ডিম** পদবাচ্য। egg-এর ক্ষেত্রে 'গতিশীল ডয়নী' হল সত্তার উত্তরসূরী, যে কিনা **অণ্ড**-এর ন্যায় বিকাশশীল নয়, কেবলমাত্র জেরক্সের জেরক্স, তস্য জেরক্স এবং স্বভাবতই ক্রমক্ষীয়মান; সেই কারণে তাকে **ডিম** বা **ডিম্ব** বলে। আর, dim-এর ক্ষেত্রে 'গতিশীল ডয়নীর সীমায়ন' ক্রিয়াই উদ্দিষ্ট। dim, diminish প্রভৃতি শব্দগুলির মূলে রয়েছে সত্তার উড়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে বা প্রকাশকে কমিয়ে দেওয়ার ক্রিয়াটি। সর্বোপরি জলের মিথ্যা বিপ্লব থাকে ডিম্বিকায় বা জলবিম্বে, জনসাধারণের মিথ্যা বিপ্লব থাকে প্রতিবিপ্লবে। এও সমাজের অগ্রগতিকে কমিয়ে দেয়, তাই একেও **ডিম্ব** বা ডিম বলে, কিন্তু সাচ্চা বিপ্লবকে বলে **অণ্ড**। বাংলাভাষায় 'অশ্বডিম্ব' বা 'ঘোড়ার ডিম' একটি অদ্ভুত কথা। এরকম একটি ধারণা বাংলাভাষীর কেমন করে হল, তা জানার চেষ্টা করলেই আমরা বিষয়টিতে পৌঁছে যেতে পারি। **অশ্ব** ও **ঘোড়া** বা **ঘোটক** শব্দের অর্থ আমরা আগেই জেনেছি। তো, রাষ্ট্রের স্পেশালিস্ট (**অশ্ব**) ও পুঁজিপতিদের স্পেশালিস্ট (**ঘোড়া**), এদের দিয়ে কি বিপ্লব হতে পারে? না, কখনোই হয় না। অ্যাকাডেমিতে উচ্চশিক্ষিত বিশেষজ্ঞরা কোনোদিন সামাজিক শক্তিকে জাগিয়ে কোনো সমাজবিপ্লব কোনোদিন করতে পারেনি, করতে পারবেও না কোনোদিন। কারণ, দীর্ঘ অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় তাদের মস্তিষ্ক 'প্রোগ্রামড্' হয়ে যায়। ফলে, অশ্ব-অণ্ড বা ঘোটক-অণ্ড তো সম্পূর্ণ অলীক ব্যাপার; এমনকি অশ্বডিম্ব ও ঘোড়ার ডিমও যে বাস্তবায়িত হয় না, সেকথা সাধারণ বাংলাভাষী নিশ্চিত ভাবেই জানেন। তাই যে কোনো অলীক অসম্ভব ব্যাপারকেই তাঁরা **অশ্বডিম্ব** বা **ঘোড়ার ডিম** বলে সম্বোধন করে থাকেন।

এখানে শব্দের সরলীকরণ বিষয়টিও খুব স্পষ্ট। সংস্কৃতে যাকে **ডিম্ব** বলা হয়, বাংলায় তাকে **ডিম**ও বলা হয়। তাতে অর্থের পার্থক্য ঘটে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া ভাল। এখানে আমরা দেখছি, **ডিম** = গতিশীল ডয়নীর সীমায়ন যাহাতে; এবং **ডিম্ব** = গতিশীল ডয়নীর সীমায়ন যাহাতে, তাহা বহন করে যে। দেখা যাচ্ছে, পার্থক্য একটা আছেই। কিন্তু একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি, কালের প্রকোপ, মানুষের শ্রমসংক্ষেপের স্বাভাবিক প্রবণতা **ডিম্ব**কেও ডিম করে ফেলে। ব-এর (বহন করে যে) অর্থটি তখন স্বভাবতই উহ্য হয়ে **ডিম**-এর ভিতরে ঢুকে পড়ে; আর, পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যবহারের কারণে শব্দের ব্যবহারকারীগণ তা বুঝে যায়। শৈশবের 'হাত ধুয়ে খেতে বসো' মায়ের এই নির্দেশ যেমন ক্রমে ক্রমে একদিন 'খেতে বসো'তে সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়, এবং তাসত্ত্বেও ছেলে হাত ধুয়েই খেতে বসে, এও অনেকটা তেমনি। **ডিম্ব** সংক্ষিপ্ত হয়ে **ডিম** হয়ে যায়, কিন্তু লোকে তাকে **ডিম্ব**ই বোঝে, **ডিম-ডিম** ধ্বনির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে না। অধিকাংশ বাংলা তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই একথা খাটে। **৬.** ইংরেজি dim. diminish।

ডী ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিডীন, অবডীন, উড়ন, উড়নচণ্ডী, উড়ানী, উড়ান, উড্ডয়ন, ড, ডয়ন, ডর, ডাইল, ডানা, ডার, ডাল, ডালকুত্তা, ডালচিনি, ডালনা, ডালা, ডালি, ডালিমা, ডালিয়া (ডালুয়া), ডালে-ডালে (আড়ালে-আবডালে), ডী, ডীউসাঁই, ডীন, ডেনা, সণ্ডীন।

ডী = গতিশীল ডয়নের আধার যে। = উড্ডয়ন।

উড়ন (উড়নচণ্ডী, উড়া, উড়ান, উড়ানী), উড্ডয়ন (ডয়ন, ডয়নী) : **১.** উড়ন = উদ্ + ✓ডী > ✓উড্ + অন। উড্ডয়ন = উদ্ + ✓ডী + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. উড়ন** = *উড় (উদ্‌লোকে উড়ান-গড়ান) অন যাহাতে।* ***উড়নচণ্ডী*** *= যে-চণ্ডী উড়নশীল।* ***উড়া*** *=* ***উড়****-এর আধার যে।* ***উড়ান*** *=* ***উড়া*** *অন যাহাতে।* ***উড়ানী*** *=* ***উড়ান****-এর গতিশীল আধার যে।* ***উড্ডয়ন*** *= উদ্‌লোকে* ***ডয়ন*** *যাহাতে।* ***ডয়ন*** *= ডী-এর (গড়ান-উড়ানের গতিশীলতার) যাওয়া অন থাকে যাহাতে।* ***ডয়নী*** *=* ***ডয়ন****-এর গতিশীল আধার যে।* / **উড়নচণ্ডী** = যে টাকাকড়ি অপব্যয় করিয়া উড়ায় বা আসবাবপত্র নষ্ট করে, কিংবা যে কার্য্যে অর্থব্যয় অন্যায়। **৩. উড়ন** = উৎপতন, উড়া, খুঁটির যে অংশ মাটির উপরে থাকে, অর্থাৎ পোঁতা থাকে না; উত্তরীয়, ওড়না, আচ্ছাদন, চাদর। **উড়নচণ্ডী** = অমিতব্যয়ী, লক্ষ্মীছাড়া, অপকৃষ্ট কার্য্য, গর্হিত কর্ম্ম। **উড়া** = পক্ষীর আকাশগমন, আকাশে লম্ফ, উড়ালাফ, অতিদ্রুতগতি, দ্রুতধাবন, গায় দেওয়া ইত্যাদি, উড্ডয়নে প্রবর্ত্তিত করা, উড়ান, আকাশে উত্থাপিত করা, উঠান, মন্ত্রবলে সঞ্চালিত করা, বেগে হটাইয়া দেওয়া বা তাড়ান, অগ্রাহ্য করা, তাচ্ছিল্য করা, বেগে চালিত করা, অপব্যয় করিয়া শীঘ্র নিঃশেষ করা, অপরিমিত খরচ করিয়া শীঘ্র ফুরাইয়া দেওয়া, আঘাতের বেগে উৎপাটিত করা, উঠাইয়া দেওয়া, গাত্রে ধারণ করান, পরান। **উড়ান** = নভোগতি, উড়ন, বায়ুতে সঞ্চলন, অনাদর, অবজ্ঞা, নভোগতি করান, অপব্যয়ে অর্থ নিঃশেষ করা। **উড়ানী** = উড়িবার বস্ত্র, উত্তরীয়, চাদর, স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ, ওড়না। **উড্ডয়ন** = নভোগমন, উৎপতন, উড়া। **ডয়ন** = নভোগতি, উড়া। (ব.শ.)। (**ডয়নী** = যে ওড়ে।) **৪.** যথার্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। **৫.** সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টির কাল পর্যন্ত এই 'ওড়া'র ধারণার বিকাশ ঘটেছিল উড্ডয়ন পর্যন্ত। তার থেকে ধারণাটি আরও বিবর্তিত হতে পেরেছে বাংলাভাষীদের হাতে। উড়, উড়ন, উড়া, উড়ান,

ওড়া ... এসব শব্দই বাংলাভাষীর নিজস্ব সৃষ্টি। মধ্যযুগের থেকে এই সব শব্দের বিপুল ব্যবহার চলে আসছে। আজও।

ডর, ডরা, ডরান, ডার, ডাল (ডাইল), ডালকুত্তা, ডালচিনি, ডালনা, ডালা, ডালি, ডালিমা, ডালিয়া, ডালুয়া, ডালে-ডালে (আড়ালে-আবডালে) : ২. **ডর** = *ডয়নী রহে যাহাতে।* **ডরা** = **ডর**-*এর আধার যে।* **ডরান** = **ডরা** *অন যাহাতে।* **ডাইল** = **ডা** *(ডয়নীর আধার) গতিশীল হইয়া লালিত হয় যাহাতে।* **ডার** = **ডা** *রহে যাহাতে, অথবা* **ডর** *হইতে জাত।* **ডাল** = **ডা** *লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা যা উড়ে যেতে যেতে যায়নি কিংবা লয় পেতে পেতে পায়নি, ঝুলে থেকে গেছে।* **ডালকুত্তা** = **ডাল**-*এর মতো কুত্তা।* **ডালচিনি** = *যে চিনি* **ডাল** *বা শাখায় হয়।* **ডালনা** = **ডাল** *নহে যাহা।* **ডালা** = **ডাল**-*এর আধার যে।* **ডালি** = **ডাল** *গতিশীল যাহাতে।* **ডালিমা** = **ডালি** *সীমায়িত যাহাতে, তাহার আধার।* **ডালিয়া** = **ডালি**র *যাওয়া থাকে যাহাতে।* **ডালুয়া** = **ডাল** *নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায় যাহাতে।* **ডালে-ডালে** = **ডাল**-*এর পুনরাবৃত্তি দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* **আড়ালে-আবডালে** = *ডালের ও অবডালের আশ্রয়ে থাকে যে।* / **ডালনা** = যাহা ডালের মত তরল নয়। (ব.শ.)। ৩. **ডর** = ভয়, ভয় করা। **ডরা** = ভয় করা। **ডরান** = ভয় পান। (**ডরানে** = ভীতু)। **ডার (ডাল)** = বিক্ষেপ করা, ছুঁড়িয়া ফেলা, খুলিয়া ফেলা, ধারারূপে পাতিত করা, ফেলিয়া দেওয়া বা ঢালা, পাতিত করা বা ফেলা, স্থাপন করা বা বসান, ত্যাগ করা, ছাড়া, নিক্ষেপ করা, ভাসান, সমর্পণ বা উৎসর্গ করা, ঝুলাইয়া দেওয়া, অপনীত করা, ঝাড়া, পরিধান করা; শাখা, (সাদৃশ্যে) ঝাড়ের শাখা, শাখানদী। **ডালকুত্তা** = ডালের মত দীর্ঘকায় কুকুরবিশেষ। **ডালচিনি** = দারুচিনি। **ডালনা** = ঘনব্যঞ্জনবিশেষ। **ডালা** = বংশাদি-রচিত পাত্রবিশেষ, আধার, বাক্সের ঢাকনী, ছোট ডালা, চেঙ্গারী, ডালিতে সজ্জিত ফল ফুল বা খাদ্যাদির উপহার। ডালিমা = ঘৃতপক্ব ডালিমবীজাকৃতি ময়দার পিষ্টকবিশেষ। **ডালুয়া** = ডালের মত লম্বা। **আড়ালে-আবডালে** = অন্তরালে। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. যে সত্তা দূরে থাকলেও উড়ে এসে আমাকে মারতে পারে, তাকে আমরা ভয় পাই। সেই কারণে 'ডয়নী রহে যাহাতে' বা **ডর** ভয় পদবাচ্য। শব্দটি গ্রামবাংলায় ব্যবহৃত হলেও অ্যাকাডেমিক বাংলায় হয় না; তবে হিন্দি ভাষায় শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হয়।

ব.শ. শব্দটিকে **ডাল** ও **ডার** শব্দের সঙ্গে একার্থক বিবেচনা করেছেন। কারণ, মূলে **র** ও **ল** অভেদ অর্থাৎ তাদের কোনো পার্থক্য নেই। কথাটি ভুল নয়, আবার ঠিকও নয়। কেননা, বর্ণের বিবর্তন সংস্কৃতকারগণের কাল পর্যন্ত যতখানি হয়েছিল, তাতে **র** ও **ল** তখন সবেমাত্র দুটি পৃথক ধারায় রূপান্তরিত হচ্ছিল; জনসাধারণের মুখে তখন **র** ও **ল** সবেমাত্র আলাদা হতে শুরু করেছে। ফলে তাঁরা দুটি ধারাকে চিহ্নিত করে গেছেন, কিন্তু অর্থের দিক থেকে তাদের অভেদাত্মক ভাবটিকেই গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। কিন্তু মধ্যযুগে এসে ধারা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে; এখন তো একেবারেই আলাদা ধারা। যেকারণে এখন আমরা র ও ল-এর কেবল পৃথক উচ্চারণই করি না, পৃথক অর্থও উপলব্ধি করে থাকি।

তা সে যাই হোক, **ডাল শব্দটি** যেকারণে একই সঙ্গে গাছের শাখা, অন্নব্যঞ্জন এবং ঢেলে দেওয়া বা ফেলে দেওয়া অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে, সেকথাটি বুঝে নেওয়া দরকার। আগেই আমরা দেখেছি, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দের নিয়মে এরকম হওয়াই স্বাভাবিক, এরকমই হয়; শব্দের ভিতরে একধরনের ক্রিয়ার কথা বলা থাকে, সেই ক্রিয়া করে যে, তাকেই সেই শব্দে চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে ডাল হল সেই সত্তা যাতে '**ডা** লালিত-লয়প্রাপ্ত' হয়। **ডা** হল ডয়নের আধার, অর্থাৎ উড়নশীল সত্তা। **ল** বর্ণটি, আমরা জানি, একই সঙ্গে লালন ও লয় করণ করে। তার মানে, **ডা**-এর লালন-লয়ন একত্রে ঘটায়। এরকম হয় তখনই, যখন সত্তাটি উড়ে যেতে যেতে যায়নি কিংবা লয় পেতে পেতে পায়নি, ঝুলে থেকে গেছে। এই অবস্থা গাছের শাখার ক্ষেত্রে যেমন হয়, তেমনি ভাতের ব্যঞ্জনরূপী ডাল-এর ক্ষেত্রেও হয় (যা ঝুলে থেকে যায় বলে ঝোল পদবাচ্যও বটে), হয় 'ঢেলে দেওয়া'র ক্ষেত্রেও। প্রতি ক্ষেত্রেই 'যাচ্ছে কিন্তু যাচ্ছে না' — এই দ্বৈততা রয়েছে। (তবে হিন্দিভাষার 'ডাল-দেনা'র, অর্থাৎ 'ছেড়ে দেওয়া'র ক্ষেত্রে এই দ্বৈততা নেই; তা একেবারেই পৃথক হয়ে চলে যায়।) এই দ্বৈততার কারণেই ডালিয়া, ডালিমা, ডালুয়া তাদের স্বনামখ্যাত।

ডী, ডীন, ডেনা (ডানা), সণ্ডীন : ১. ডীন = ✓ডী + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। সণ্ডীন = সম্ + ✓ডী + ত (ক্ত) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ডী** = *ডয়নীর গতিশীল আধার যে।* **ডীন** = **ডী** *অন যাহাতে।* **ডেনা** = *দিশাগ্রস্ত উড্ডয়ন অন যাহাতে, তাহার আধার।* **ডানা** = *ডয়নের আধার অন যাহাতে, তাহার আধার।* **সণ্ডীন** = *সম্যক রূপে* **ডীন** *যে।* ৩. **ডী** = নভোগতি, উড়া, গতি। **ডীন** = উৎপতিত, নভোগত, নভোগতি, আগমশাস্ত্রবিশেষ। (অবডীন, উড্ডীন, নিডীন, প্রডীন ইত্যাদি ভেদে পক্ষীর একাধিক শত গতিভেদ আছে। সংপাত, বিপ্রপাত ইত্যাদি গতিভেদ।)। **ডেনা (ডানা)** = পক্ষ, শাখা (wing), হাতের উপরি ভাগ, বাহু, বাহুর আঘাত। **সণ্ডীন** = পক্ষীর গতিক্রিয়াবিশেষ, বৃক্ষাদিতে পক্ষীর পতন বা উড়িয়া বসা, পরিক্রমণপূর্ব্বক পক্ষীর প্রপতন। (ব.শ.)। ৪. wing অর্থে 'ডানা' প্রচলিত, গ্রামবাংলায় তা 'ডেনা' রূপেও প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. **ডী, ডীন** সংস্কৃত শব্দ এবং সেকালের পণ্ডিতদের হাতে যথেষ্ট পরিশীলিত। তাঁরা পক্ষীর (bird ও দোকানদার-এর, যাদের দুটি পক্ষ আছে, তাদের) একশো-এক রকম উড়বার পৃথক পৃথক একশো-একটি নামকরণ করেছিলেন — অবডীন, উড্ডীন, নিডীন, প্রডীন, সণ্ডীন ইত্যাদি। সম্প্রতি বিশ্বায়নের দাপটে 'মার্কেটিং'-এর মহা-রমরমা চলছে; দোকানদারীর কসরতের বা পক্ষীর উড়ানের হাজার কলাকৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে, হচ্ছে। অথচ সেগুলির পৃথক পৃথক নামকরণ বোধহয় সেভাবে এখনও হয়নি; দু-চারটি নামকরণ হয়ে থাকলেও সেগুলিকে সুচিহ্নিত করে বিন্যস্ত করা হয়নি। অথচ আমরা দেখছি, ভারতবর্ষ হাজার বছর আগেই সেরকম নামকরণ করে সুবিন্যস্ত করেছিল।

এই সব জায়গায় যখন পৌঁছাই, তখন আমাদের অপার বিস্ময় জাগে! এই বঙ্গজনেরা কেমন জাতি, যারা ১০১ রকম উড়ানের

১০১টি পৃথক নামকরণ করবার যোগ্যতা ধরত; যারা ১৬৭ রকম অন্নব্যঞ্জন বা তরকারির ১৬৭টি পৃথক নামকরণ করবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল ('দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত, সম্ভবত জ্যোতিভূষণ চাকীর কলকাতার ইতিহাস বিষয়ক কোনো রচনায় উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার 'অভিজাত'রা কীরকম ভোজের আয়োজন করতেন, তার বিবরণ ছিল। তাতে একস্থানে জানানো হয়, শোভাবাজারের রাজবাড়ির কোনো এক শ্রাদ্ধের ভোজে মোট '১৬৭ পদের ভোজ' দেওয়া হয়েছিল। সেই ভোজে যেসকল পদ ছিল, তার নামও ওই আলোচনায় ছিল, যথা 'বাটা মাছের হরগৌরী'।); যারা প্রায় ২০০ বা ততোধিক প্রকারের মিষ্টান্নের পৃথক পৃথক নামকরণ করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। দুই বাংলার মিষ্টি দোকানগুলো ঘুরলেই পাঠক ঐ নামগুলি সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। এসব সত্ত্বেও যারা বলেন, বাংলাভাষায় শব্দসংখ্যা কম, তাঁরা অসংগৃহীত-অসংকলিত শব্দসম্ভারকে হিসেবেই ধরেননি। যাই হোক, **ডী**-এর উত্তরাধিকারের এই গৌরবজনক দিকটি বিস্মৃত হওয়ায় বর্তমান অ্যাকাডেমিও **ডী, ডীন** প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার ভুলেছে। উচ্চে **উড্ডীন** থাকার এই ধারণাই যে ইংরেজিতে doyen, dean প্রভৃতি শব্দের মূলে বিদ্যমান রয়েছে, তাও তাঁরা জানেন না। আর কেনই বা **ডানাকে ডানা** বলা হয়, সেকথা জানার দরকারও মনে করেননি তাঁরা। দ্র. **দক্ষিণ**। ৬. ল্যাটিন decanus, ইংরেজি dean, doyen ইত্যাদি।

ডুব্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : ডুব, ডুবজল, ডুবমারা, ডুবা, ডুবান, ডুবারি(রী), ডুবারু, ডুবি, ডুবুডুবু, ডুবুরি(রী), ডোব, ডোবা।

ডুব্ = নবরূপী ডয়নের বহন। **ডুব** = নবরূপী ডয়নের বহন যাহাতে।

ডুব, ডুবজল, ডুবমারা, ডুবা, ডুবান, ডুবারি(রী), ডুবারু, ডুবুডুবু, ডুবুরি, ডুবুরী, ডোব, ডোবা : ২. **ডুব** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ডয়নী বহন করে যে।* **ডুব-জল** = *যতখানি গভীর জলে মানুষ ডুবে যায়। ডুব-মারা দ্র.* **মারা**। **ডুবা** = **ডুব**-*এর আধার যে।* **ডুবান** = **ডুবা** *অন যাহাতে।* **ডুবারি** = **ডুবা** *রহে যাহাতে, তাহার গতিশীলতা।* **ডুবারু** = **ডুবা**-*র রহন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **ডুবুডুবু** = **ডুবুর** *(***ডুব** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে, তাহার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **ডুবুরি** = **ডুবু** *রহে যাহাতে তাহার গতিশীলতা।* **ডুবুরী** = **ডুবুর** *গতিশীলতার আধার যে।* **ডোব** = **ডুব** *সার্বিক যাহাতে।* **ডোবা** = *ডোব-এর আধার যে, অর্থাৎ যাহা (বর্ষাকালে) ডুবে যায়।* / **ডুবারি, ডুবারী, ডুবারু, ডুবুরী** = যে ডুব দিতে পটু; অথবা যে ডুবিয়া নিমগ্ন-দ্রব্য উত্তোলন করে; কিংবা, যে ডুবিয়া রত্ন উদ্ধার করে। **ডোব, ডোবা** = যে গর্ত বর্ষার জলে ডোবে। (ব.শ.)। ৩. **ডুব** = নিমজ্জন, অবগাহন, স্নান। **ডুবজল** = গভীর জল। **ডুবমারা** = নিমজ্জন করা, লুকান। **ডুবা** = জলে নিমগ্ন হওয়া, প্লাবিত হওয়া, নিবিষ্ট হওয়া, আধ্যাত্মিকনাশ-প্রাপ্ত হওয়া, লীন হওয়া, অস্তমিত হওয়া। **ডুবান** = নিমগ্ন করা, আধ্যাত্মিকভাবে নষ্ট করা, সর্ব্বস্বান্ত করা, মজান (to ruin), বিপ্লাবিত বা বিনষ্ট করা, অশোভন বা বেমানান করা। **ডুবারু** = পানীকৌড়ী পাখী। **ডুবুডুবু** = নিমগ্নপ্রায়, প্রায় অস্তমিত, প্লাবিতপ্রায়, রসাবেশপূর্ণ, নিমগ্নপ্রায় ভাব, রসাবেশপূর্ণভাব। **ডোব, ডোবা** = বড় গর্ত্ত, গাড়া, কুয়া, নষ্ট হওয়া, ডুবা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. গড়ান-উড়ানশীল ডয়নী সত্তা উল্টো-মুখো হলে, সে জলে ডোবে, রসে ডোবে, গল্পে-গানে-প্রেমে বা ভোগরসে ডোবে। কোনো কোনো ডয়নী সত্তা বিলুপ্তি-সমুদ্রেও ডোবে, যেমন ব্যবসা ডোবে, সূর্য ডোবে, চাঁদ ডোবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবের সূর্য ডোবে। এরকম কত-কী যে ডোবে তার ঠিক নেই। তবে এই সব কিছু সত্যিই ডুবে গেছে না-কি এখনও টিকে আছে, তা নিয়ে যদি সংশয় হয়, তখন সেগুলি 'ডুবিয়াস্' dubious, কিংবা 'ডুবৎ'-শীল doubt-ful। ৬. ইংরেজি dubious, doubt।

ড় নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অড়, অবডাল, আইড়, আইল, আউড়, আড়, আ'ড়, আড়ং, আড়-ওড়, আড়কাঁথি, আড়কাতী, আড়কাট, আড়কাটি, আড়কাঠি, আড়কোল, আড়কোলা, আড়খেমটা, আড়গড়া, আড়ঘোমটা, আড়ঙ্গ, আড়ঙ্গছাটা, আড়ঙ্গধোপ, আড়চা, আড়চাল, আড়চোখ, আড়নয়ন, আড়ত, আড়ন, আড়নিএগ্রা, আড়পাগলা, আড়পার, আড়বাঁকা, আড়বাঁকী, আড়বাঁশি, আড়বাড়, আড়বুঝো, আড়মাদলা, আড়রি, আড়ষ্ট, আড়া, আড়া-আড়ি, আড়াই, আঢ়াই, আড়াইরাজ, আড়াকুশি, আড়াঠেকা, আড়ানা, আড়ানি, আড়ানী, আড়ামোড়া, আড়াল, আড়ি, আড়িউড়ি, আড়িবক, আড্ডা, আঢ়ক, আঢ্য, আদাড়, আদাড়বাদাড়, আদাড়ীয়া, আদাড়ে, আবডাল (আড়ালে-আবডালে), আরি, আল, আলটা (আটলা), আল্‌সা, আলসে, আলি, আলিশান, আলিসান, আয়ড়, আহড়, আহলবাহল, ড, ড়, ড-কার, ডউয়া, ডক (dock), ডগ (dog), ডগমগ, ডগমগি, ডগর, ডগা, ডগি, ডড়া, ডবকা, ডবল (দ্বিবল), ডবলা, ডবিথ, ডয়রা, ডর, ডরা, ডল, ডলক (ডল্লক, ডালা), ডলকা, ডহর, ডাগর, ডাগরডোগর, ডাল, ডালিম, ডাব, ডাবর, ডাবা, ডাবু, ডাবুশ (ডাবুষ, ডাবুস), ডিগ, ডিগি, ডিগিডিগি, ডিপো, ডিবা, ডিবিয়া, ডিবে, ডুণ্ডুভ, ডুগ, ডুগী, ডুরি (ডুরী), ডুলি, ডেউয়া, ডেক, ডেকচি (ডেকচী), ডেগ, ডেড় (দ্বি-অড়), ডেড়ি, ডেফল, ডেবরা, ডেরা, ডোকলা, ডোগা, ডোগাশাল, ডোর, ডোরক, ডোল, ডৌল, ড্যাকরা, ড্যানাক, ড্যাবডেবে, দাইল, দাল, দালনা, দালি, (আড়াআড়ি, উড়াউড়ি, কড়াকড়ি, কাড়াকাড়ি, কুড়াকুড়ি, খাড়াখাড়ি, খুঁড়াখুঁড়ি, গড়াগড়ি, গাড়াগাড়ি, চড়াচড়ি, ছড়াছড়ি, ছাড়াছাড়ি, ছিঁড়াছিঁড়ি, ছুঁড়াছুঁড়ি, জড়াজড়ি, জোড়াজোড়ি, ঝাড়াঝাড়ি, তাড়াতাড়ি, দড়াদড়ি, নড়ানড়ি, নাড়ানাড়ি, পড়াপড়ি, পাড়াপাড়ি, পীড়াপীড়ি, পুড়াপুড়ি, ফাড়াফাড়ি, ফোঁড়াফোঁড়ি, বাড়াবাড়ি, বুড়াবুড়ি, ভিড়াভিড়ি, মাড়ামাড়ি, লড়ালড়ি, ষাঁড়াষাঁড়ি, হুড়াহুড়ি)।

আড় (আড়-ওড়, আড়কাঁথি, আড়কাতী, আড়কাট, আড়কাটি,

আড়কাঠি, আড়কোল, আড়কোলা, আড়খেমটা, আড়গড়া, আড়ঘোমটা, আড়চা, আড়চাল, আড়চোখ, আড়নয়ন, আড়ত, আড়ন, আড়নিঞা, আড়পাগলা, আড়পার, আড়বাঁকা, আড়বাঁকী, আড়বাঁশি, আড়বাড়, আড়মাদলা, আড়রি, আড়ষ্ট, আড়া, আড়া-আড়ি, আড়াই, আঢ়াই, আড়াইরাজ, আড়াকুশি, আড়াঠেকা, আড়ানা, আড়ানি, আড়ানী, আড়ামোড়া, আড়াল) : ২. অড় *(নেই ড় বা উড়ান যাহাতে) হইতে জাত; অথবা অড়ের আশ্রয় যে।* ৩. **আড়** = ক্ষেত্রের সীমাস্বরূপ জলরক্ষার্থ দীর্ঘ উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ, জাঙ্গাল, আল, (সাদৃশ্যে) উচ্চস্থান, তীর, ধার, পাড়, প্রতিবন্ধক, নিবারক, অন্তরাল, উচ্চস্থানের পার্শ্বস্থ দেশ, আবরণ, পরদা, অন্তর, ব্যবধান; হাঁড়ি-ইত্যাদি রাখার নিমিত্ত ঘরের মধ্যে আড়ার মত আড়ভাবে স্থাপিত পাশের দেয়ালে সংলগ্ন সমান্তরালস্থিত দুই খণ্ড বাঁশের বা কাঠের উচ্চ আধার, তাক, পক্ষীর উপবেশনার্থ কাষ্ঠাদির দণ্ড, দাঁড়, বস্ত্রাদি রাখার বংশাদির দণ্ড, আল্না, গৃহের প্রস্থ, ক্ষেত্র নদী ইত্যাদির প্রস্থ, বিস্তারমাত্র, প্রস্থানুসারে আড়ার মত লম্বা হইয়া অবস্থিত বা পতিত, লম্বালম্বিভাবে পতিত, লম্বা, সটান; অর্দ্ধ, আধ, অসম্পূর্ণ, অর্দ্ধ-চর্ব্বিত; বক্র, কুটিল, কটাক্ষ, আবর্ত্তিত, বিকল, বাঁকাচুরা, নিস্পন্দ, আড়ষ্ট ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. অ্যাকাডেমিতে কমবেশি প্রচলিত, কিন্তু বাংলাভাষীর ব্যবহারে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ৫. **আড়** শব্দটি বাংলাভাষার নিজস্ব অর্জন। মধ্যযুগের সাহিত্যে এর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়। গ্রামবাংলার মানুষের মুখে তো বটেই, এমনকি শহুরে বাঙালির মুখেও এ-শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়; যদিও অ্যাকাডেমিতে এর ব্যবহার খুবই সীমিত। বলতে কী, অ্যাকাডেমির বিচারে আড় ও আড়যুক্ত শব্দগুলি নেহাতই 'গেঁইয়া'। যেন-বা ভদ্রলোকদের দুনিয়ায় এই শব্দগুলি ব্যবহার করায় বক্তার আভিজাত্য নষ্ট হয়।

তা সে যাই হোক, আমরা জানার চেষ্টা করব, কেন এই শব্দের এত বিপুল ব্যবহার? কেন এর অর্থের এত ব্যাপক এলাকা? কেন এত বিচিত্র বিষয়কে এই শব্দটি শনাক্ত করতে পারল?

ড় বর্ণের অর্থ থেকে আমরা জানতে পারি, তা উড়া এবং না-উড়া একইসঙ্গে বোঝানর ক্ষমতা ধরে। সেই সুবাদে তা একই সঙ্গে পার্থক্য, পৃথকত্ব, বাধা, যেতে যেতে না-যাওয়া, ওড়া এবং না-ওড়া, মূল থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া কিন্তু মূলকে সম্পূর্ণ ত্যাগ না করা, তার পাশে পৃথক হয়ে অবস্থান করা, ... ইত্যাদি বিষয়কে বোঝাতে পারে। ব.শ. একে সঠিকভাবে hindrance, a line of separation, obstruction, barrier ইত্যাদি রূপে চিহ্নিত করেছেন। আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখব, বাংলাভাষী কী বিচিত্র অর্থে **আড়** ও **আড়**-যুক্ত শব্দসমূহের ব্যবহার করে থাকেন।

আড়-ওড় (আড়ি-উড়ি) : ২. **আড়** *এবং* **ওড়** *(উপরে উড়) যাহার।* ৩. আড়াল ও নিম্নস্থান। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. **আড়** শব্দ প্রসূত হয়েছে অড় থেকে। অড় মানে, 'নেই নড়ন যাহাতে'। আপনার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে একটু সরে বসে আছে, যেন-বা ধ্যানস্থ, নড়ে না; এই হল **আড়** হয়ে থাকা। একে প্রস্থে থাকাও বলা চলে। তাই **আড়** শব্দ প্রস্থকেও বোঝায়। সেই আড়ে আপনি একটি চাদর টাঙিয়ে তার **আড়ালে** বসে কিছু করছেন। হাওয়া লাগছে না আপনার গায়ে। কারণ আপনি চাদরের **আড়**-এ রয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঠাণ্ডা লাগছে। কী আর করবেন, আর একটি চাদর গায়ের উপর দিক থেকে চাপিয়ে নিজেকে ঢেকে নিলেন। চাদর যেন উপর থেকে **উড়ে** এসে আপনাকে ঢেকে দিল। একে বলে চাদর **ওড়া**। এখন আপনার হাওয়া লাগছে না, ঠাণ্ডাও লাগছে না; কারণ আপনি চাদরের **আড়ে-ওড়ে** রয়েছেন।

আড়কাঁথি : ২. *আড়াল দেয় যে* ***কাঁথ*** *(কারকের রহস্যরূপ থাকে যাহাতে = মাটির দেওয়াল)।* ৩. শত্রুপ্রতিরোধার্থ কৃত দেয়ালসদৃশ মৃত্তিকার উচ্চ আলি (বাঁধ)। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. মাটির দেওয়াল দিয়ে শত্রুনিবারণ একালে অচল। প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত এইরকম ধারণা কমবেশি প্রচলিত ছিল। তাই শব্দটিও সেকেলে হয়ে গেছে। তবে এখনও গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও বন্যপ্রাণী বা জীবজন্তুর হাত থেকে শস্যাদি রক্ষা করতে গৃহস্থেরা এরকম দেওয়াল দিয়ে থাকেন। সাধারণত মাটির বাড়ি তৈরি করার সময় কাদার তাল দিয়ে যে দেয়াল তৈরি করা হয়, তাকে কাঁথ বলে।

আড়কাটি (আড়কাঠি) : ২. ***আড়ে*** *বা আড়ালে থাকিয়া কাঠি করে যে।* / অন্যদেশে পাঠাইবার নিমিত্ত অর্থাদির লোভ দেখাইয়া কুলি সংগ্রহ করে যে (recruiter)। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে কমবেশি প্রচলিত।

আড়ঘোমটা : ২. *যে-ঘোমটা (দর্শনকে) আড় বা আড়াল করে।* ৩. অর্দ্ধাবগুণ্ঠন। (ব.শ.)। ৪. বাংলাভাষীদের সমাজে ঘোমটার প্রচলন যে পরিমাণে কমেছে, আড়ঘোমটা শব্দের প্রচলনও সেই পরিমাণে কমেছে। ৫. সাধারণত কোনো নারী যখন কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলবার সময় বাঁ-হাতে নিজের ঘোমটার বাঁ দিকের কাপড়টিকে (যেদিকে ব্যক্তিটি রয়েছেন) একটু বেশি টেনে ধরে ব্যক্তিটিকে নিজের মখ দেখতে দেন না, তখন সেই রূপ ঘোমটাকে **আড়ঘোমটা** বলে।

আড়চোখ : ২. *যে চোখের দৃষ্টি* ***আড়া-আড়ি*** *দেখে।* ৩. কটাক্ষ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. চোখ সাধারণভাবে সামনে দেখে। কিন্তু আড়চোখ বা আড়নয়ন কথাটি তখনই প্রযুক্ত হয়, যখন চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে না-তাকিয়ে **আড়াআড়ি** (horizontally) দেখে, অথচ মুখ দৃষ্ট বস্তুর দিকে ঘোরানো হয় না। পুরুষ ও নারীর দৃষ্টি কীভাবে সক্রিয় থাকে, তা নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে Barbara Pease & Allan Pease-এর লেখা Why Men Don't Listen & Women Can't Read Maps বইতে। তাতে বলা হয়েছে, পুরুষের দৃষ্টি সাধারণভাবে সম্মুখগামী এবং এককেন্দ্রিক (tunnel vision), কিন্তু নারীর দৃষ্টি সাধারণভাবে অর্ধবৃত্তাকার এলাকার সর্বদিকে (peripheral vision), যা কিনা চোখের দুইদিকে ১৮০ ডিগ্রি রেখায় সক্রিয় এবং সম্মুখে অর্ধবৃত্ত এলাকা পর্যন্ত সবকিছুকে একসঙ্গে দেখবার ক্ষমতা ধরে। ফলে সে তার চোখের ১৮০ ডিগ্রি এলাকা পর্যন্ত কারও দিকে না তাকিয়েও তাকে দেখে নিতে পারে। কিন্তু পুরুষ সাধারণভাবে যাকে দেখে, তার দিকে মুখ না-ঘুরিয়ে পারে না। নারীর এই যে ১৮০ ডিগ্রিতে দেখতে পারা, একেই বলে **আড়াআড়ি** দেখা। যে-চোখ এইরূপ

দর্শন করে, তাকে বলে আড়চোখ বা আড়নয়ন। কোনো কোনো পুরুষও এভাবে দেখতে পারে, তবে সেটি সাধারণ গুণ নয়, বিশেষ।

আড়ত : ২. *যাহার আড়ে উৎপাদকের পণ্যাদি তারিত হয়।* ৩. দস্তুরী বা কমিশন লইয়া বিক্রয় করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত যে স্থানে অন্যের মাল মজুত থাকে (Agency)। ৪. প্রতীকী রূপে খুবই প্রচলিত। ৫. আড়তদার বা Agent তার মাল বিক্রিবাটা করবার লাইসেন্স, দাড়িপাল্লা-বাটখারা, লোকজন নিয়ে একটি দোকান খুলে বসে থাকে। উৎপাদক তার উৎপন্নসম্ভার সেখানে নিয়ে যায়, আড়তদার তার লোকজন ব্যবস্থাদির সাহায্যে সেই উৎপন্নসম্ভার নির্দিষ্ট কমিশন নিয়ে বেচে দেয়। যে-স্থানে উৎপাদক এই আড় বা আড়াল পায়, পেয়ে তার পণ্যাদিকে তারিত করে দিতে পারে, সেই স্থানকে **আড়ত** বলে।

আড়বাঁশি : ২. *যে-বাঁশী আড়ভাবে ('টানা'ভাবে অর্থাৎ ১৮০ ডিগ্রিতে) ধরে বাজাতে হয়।* ৩. আড়ভাবে (লম্বালম্বিভাবে) ধরিয়া বাদনীয় বংশীবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. বাঁশের তৈরি বাঁশীকেই সাধারণত **আড়বাঁশী** বলা হয়। এই বাঁশী আড়ভাবে অর্থাৎ 'টানা'ভাবে (horizontally) ধরে বাজাতে হয়, অন্যথায় বাজানো যায় না। সেই কারণে একে **আড়বাঁশী** বলা হয়।

আড়ষ্ট : ২. *আড়ভাবে স্থিত যে-টঙ্কারী।* ৩. স্থির, স্তব্ধ, নিস্পন্দ। (ব.শ.)। ৪. 'সংকুচিতপ্রায়' অর্থে প্রচলিত। ৫. অভিমান করে ছোট ছেলেটি আড়ভাবে বসে রয়েছে। সে স্বভাবতই **আড়ষ্ট**। কিন্তু শব্দটি ক্রমান্বয়ে প্রতীকী হয়ে এখন মানে দাঁড়িয়েছে 'সংকুচিতপ্রায়', ব.শ. যাকে বলেছেন 'স্থির, স্তব্ধ, নিস্পন্দ'। দ্র. **আড়-ওড়**।

আড়া : ২. *আড়-এর আধার যে।* ৩. ঘরের দেয়ালের মাথায় আরার ন্যায় স্থাপিত স্থূল কাষ্ঠখণ্ড বা বংশদণ্ড, ঘরের কড়িকাঠ, আল্‌না, উচ্চতীর, পাড়, ধার, (সাদৃশ্যে) উচ্চস্থান, ডাঙ্গা, রাস্তার ধারের নয়নজুলি, মাছ ধরার নিমিত্ত দামদলের আল বা বাঁশের পাটা (বেড়), আড়ভাব, বক্রতা, টেরচাভাব, বাঁকিয়া যাওয়া, বিকৃত হওয়া। (ব.শ.)। ৪. ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এমনকি **আঢ়া** শব্দটিও অনেক সময় **আড়া** রূপে প্রচলিত। ৫. অতি সহজ বিষয়ে ভুল করে খেসারত দিয়ে এলে গ্রামবাংলায় বলা হয় — 'শেষে কিনা শুকনা **আড়ায়** আছাড় খেলি!' এই **আড়া** অবশ্যই স্থল বা শুকনো ডাঙা বোঝায়। কার্যত নদীর, পুকুরের, জলাশয়ের কিনারা বোঝাতেই **আড়া** শব্দটির প্রচলন হয়। কেননা, তা জল থেকে পৃথক, কিন্তু তাই বলে জলকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে অনেক দূরে সরে যায়নি; জল থেকে **আড়** হয়ে আছে। পরে পরে তা সাধারণীকরণ হয়ে যে-কোনো উচ্চস্থানের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে শুরু করে।

আড়া-আড়ি : ২. *আড়া ও আড়ি। দ্র. কেশাকেশি।* ৩. পরস্পর বক্রভাব, দ্বেষাদ্বেষি, পরস্পর ব্যবধান বা অন্তরকাল, আগু-পিছু ভাব। (ব.শ.)। ৪. কম প্রচলিত। ৫. **আড়** মানে হল সরে থাকা, অভিমান বা রাগ করে বেঁকে বসে থাকা। এই '**আড়** হয়ে থাকা'কে বলে **আড়া**, এবং **আড়**-এর গতিশীলতা বা 'আরও বেশি **আড়** হতে থাকা'কে বলে **আড়ি**। একজন যখন **আড়া** করে, অন্যজন তখন **আড়ি** করে। তাই **আড়া-আড়ি** মানে দ্বেষাদ্বেষি। দ্র. **কেশাকেশি**।

আড়াল : ২. *আড়া লালিত হয় যাহাতে।* ৩. অন্তরাল, ব্যবহিত স্থান, গোপনস্থান, আবরণ, পর্দ্দা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. আল প্রত্যয়যোগে শব্দটি প্রসূত হয়েছে বলে দেখানো হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রেও অর্থটি একই থাকে। তখন এর মানে বুঝতে হয় এভাবে — '**আড়**-এর আধারকে লালন করে যে'।

আড়ং, আড়ঙ্গ (আড়ংধোলাই) : ২. *অঙ্গের (রাষ্ট্রশরীরের) আড়ে যা চলে।* ৩. গঞ্জ, গোলা, বাজার, প্রতিমা বিসর্জ্জনোপলক্ষে নদী-প্রভৃতির তীরে সাময়িক বাজার, কারখানা। (ব.শ.)। ৪. আড়ত ও আড়ং-ধোলাই শব্দদুটি প্রচলিত থাকলেও, হাটবাজারকে আজকাল কেউ আড়ঙ্গ বা আড়ং বলে না। ৫. প্রাচীন ভারতে সুদীর্ঘকাল পণ্যজীবিতা নিষিদ্ধ ছিল। বেণ প্রজাপতির আমলে (সম্ভবত ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) পণ্যজীবিতার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল এবং তারপরই তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বৌদ্ধযুগে (১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে) পুনরায় পণ্যজীবিতার প্রচলন ও রমরমা হলেও বৌদ্ধযুগের অন্তে এবং হিন্দুযুগের সূত্রপাতে পুনরায় তা নিন্দনীয় হয়ে যায়। ফলে ভারতের অধিকাংশ হাটবাজারই সেকালের অধিকাংশ সময় জুড়ে রাষ্ট্রের চোখের **আড়ে** বা **আড়ালে** **আবডালে** চলত। এই হাটবাজারে ধোপাখানা বা কাপড়কাচার সূত্রপাত কবে থেকে হয়েছিল, জানা নেই। তবে সেই আড়ং-এর ধোপার কাপড় ধোলাইকে যে 'আড়ং ধোলাই' বলা হত, তাতে সন্দেহ নেই। আর, ধোপারা কাপড়কে কীভাবে তক্তার উপর আছাড় মারে, অনেকেই দেখে থাকবেন। সম্ভবত তাতে কাপড়ের দফা-রফা হয়ে যেত। ধোপাখানায় কাপড় দিলে সে কাপড় বেশিদিন টেকে না, এ বিশ্বাস এখনও বয়স্কদের মধ্যে দেখতে পাই। পরে পরে ধোপার সেই 'আড়ং-ধোলাই' শব্দটি 'বেধড়ক পেটাই' অর্থে প্রচলিত হয়ে যায়। দ্র. **অক্ষবাট**।

আড়ি : ২. *আড় গতিশীল যাহাতে। দ্র. আড়া-আড়ি।* ৩. আড়মাছ, শরারিপক্ষী, তীর, পার, উঁচু আল, অন্তরাল, আড়াল, আড়ভাব, কুটিলতা, অসদ্‌ভাব, মনোমালিন্য, দ্বেষ, হিংসা, শত্রুতা, ক্রোধ, পাশা খেলায় বিপক্ষের গুটি মারার জিদ, জুয়া খেলায় বাজি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. মূল সত্তার থেকে সরে **আড়** হয়ে থাকা এবং সেই 'আড়-হয়ে-থাকা'কে ক্রমশ বাড়াতে থাকাকে আড়ি বলে। অবশ্য অনেক সময় শুধুমাত্র **আড়**-কেই আড়ি কিংবা **আড়ি**-কেই আড় বলে। যেমন **আড়মাছ, আড়িমাছ** একই কথা। মোট কথা, মূল থেকে বা সঙ্গীর থেকে সরে থাকে যে, সে **আড়** করে বা **আড়ি** করে। একে স্বভাবতই মনোমালিন্য, শত্রুতা ইত্যাদিও বলা যায়।

তবে বাংলাভাষীর **আড়ি**, ছোটরা যা করে, তা একটুখানি অন্যরকমও বটে। একটি সমকোণ আঁকুন। তার ভূমিতে রয়েছেন আপনি, এটি যেন-বা আয়তাকার ঘরের দীর্ঘ এক বাহু। আর, তার উপর লম্বমান বাহুটি রয়েছে প্রস্থের (**আড়ের**) দিকে, সেই দিকে বসে রয়েছে **আড়ি**-করা শিশুটি। আপনি বসে রয়েছেন শিশুটির দিকে মুখ করে, আর শিশুটির মুখ আপনার দিকে নেই, রয়েছে তার সামনের দেয়ালের দিকে। অর্থাৎ সে আপনার থেকে মুখ ঘুরিয়ে

বসে আছে, আর আপনি তার দিকে মুখ করে বসে আছেন। **আড়ি** এই রকম ব্যাপার। এ-ব্যাপার, ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। বাংলাভাষী কিন্তু শৈশব থেকেই জানে **আড়ি** কাকে বলে। যে **আড়ি** করে, সে পরিবারের সকলের যৌথ স্বাভাবিক কাজে থাকে না বা থাকতে চায় না, অভিমান-ভরা রাগ করে আলাদা হয়ে সরে থাকে, কিন্তু **আড়াল** থেকে সবকিছুই দেখে, একে বলে **আড়ি-পাতা**। এভাবেই সে সবকিছুই নজরে রাখে, খবর রাখে; আশা করে সবাই তাকে তার অভিমানের কারণ জেনে আদর করে, তার মানহানি না করে তাকে সকলের মাঝে ডেকে নেবে। অন্যথায় তার **আড়ি**। দ্র. **শুরণ**।

এর একটি শুভ দিক রয়েছে, যা প্রায়শই আমাদের চোখে পড়ে না। একালে সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি বা আইনের বিপরীতে কেউ কোনো কাজ করলে, তার শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। সেই শাস্তি নিঃসন্দেহে প্রতিক্রিয়াজনক বা 'কাউন্টার-প্রোডাক্টিভ'। ফলস্বরূপ বিরোধী কিংবা অপরাধী মনের কলুষ ও গ্লানি আদৌ সাফ হয় না, বরং বাড়তে থাকে। এই শাস্তির প্রতিক্রিয়া বাড়তে বাড়তেই আজকের বিশ্ব বুশপন্থী ও লাদেনপন্থীতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। বিপরীতে **লজ্জা**র মতো **আড়ি**ও একধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া, যা কিনা প্রতিক্রিয়া জনন না-করেই ভুল বা ক্ষতিকর সিদ্ধান্তকারীদের আত্মশোধনের সুযোগ করে দেয়, অথচ একালের 'শাস্তি'র মতো তার কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া জন্মায় না। সম্প্রতি বাংলাভাষায় একটি গানের জন্ম হয়েছে, যা বিশ্বায়িত সভ্যতার একটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ দিকে (জীবিকা জীবনকে সম্পূর্ণ ছাপিয়ে গেছে, ফলে মানুষের হাসবার, কাঁদবার, ভাববার জন্যও একবিন্দু সময় নেই।) আঙুল দেখিয়ে তার কোমল বিরোধিতা করছে; এবং সেকারণেই গানটি অতি অল্প সময়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গানটি হল — 'বন্ধু, তোমার সাথে আড়ি / বড্ড তোমার তাড়াতাড়ি'।

আড়িবক : ২. *আড়ি ও বক।* ৩. আড়মাছ ও বকপক্ষী। পুরাণে 'আড়িবক সংগ্রাম' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী রয়েছে। ... ৪. অপ্রচলিত। ৫. পুরাণকাহিনীতে 'আড়িবক সংগ্রাম'-এর কথা বিস্তারিতভাবে রয়েছে। জীবজগতে এই **আড়ি** সত্তাটি আড়মাছ এবং **বক** সত্তাটি বকপাখিকে বোঝায়। সমাজজগতে এই **আড়ি** প্রাচীন পুঁজিবাদী **মৎস্য** সত্তা এবং **বক** সত্তাটি বকধার্মিক বেদবাদী সত্তাকে বোঝায়। প্রাচীন ভারতে এদের যে সংগ্রাম হয়েছিল, আড়িবক সংগ্রামের কাহিনীটিতে সেকথাই বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। **আড়ি**মাছ-এর আঁশ নেই। সে মাছ বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ মৎস্যগুণসম্পন্ন নয়। তবুও যৌথসমাজের সঙ্গে তার **আড়ি**। যতদূর বোঝা যায়, বেণ প্রজাপতির আমলে আদিম পুঁজিবাদের সঙ্গে বেদবাদীদের যে সংগ্রাম হয়েছিল, পরবর্তীকালে রচিত পুরাণে সেই কাহিনীকেই 'আড়িবক সংগ্রাম' রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আড়ি শব্দটি দ্যূতক্রীড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। পাশাতে **আড়ি** পড়ে। **দ্যূতক্রীড়া** কী, সে তো **অক্ষ** শব্দে বলাই আছে, আর বক তো বকধার্মিক। **আড়ি** ব্যবসাবাদী, আর **বক** বেদবাদী। বক বকধার্মিক, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, অথচ বেদের বা জ্ঞানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে আগেভাগেই নিজের সুবিধা করে নিয়েছে; অন্যদিকে হাতেরও যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সংসারে রয়েছে, তাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার কথা সে ভুলে যায়। সেই বেদবাদী (বা আদিম সমাজতন্ত্রবাদী) বক ও আদিম পুঁজিবাদী **আড়ি**র সংগ্রামই পুরাণে আড়িবক সংগ্রামের নামে বর্ণিত হয়েছে।

আড্ডা (অড্ডা) : ২. *অড্-ডয়নের (ডয়নহীনতার ডয়নের) আশ্রয় যাহাতে।* **৩. থাকার নির্দিষ্ট স্থান**, বাসস্থান, ঠিকানা, ঠিকা গাড়ি পাল্কি প্রভৃতি যানের **থাকার নির্দিষ্ট স্থান**, কার্য্যবিশেষের নিমিত্ত তৎসংক্রান্ত লোকদিগের **সম্মিলনস্থান**, একব্যবসায়ী বা একদেশবাসী লোকদিগের বাসস্থান, সম্প্রদায়বিশেষের বাসস্থান, পথিকের বিশ্রামস্থান ... (আড্ডা গাড়া, আড্ডা জমান, আড্ডা-মারা, আড্ডা দেওয়া = অনর্থক গল্প-গুজবে সময় কাটানো)। (ব.শ.)। ৪. উপরোক্ত প্রতীকী অর্থগুলি বোঝাতে শব্দটি বেশ প্রচলিত। **৫. আড্ডা** জিনিসটি কী, ইয়োরোপকে সেকথা বোঝানো বেশ মুশকিল। সক্রেটিসের কালে, এমনকি শেকস্‌পীয়ার বা ভলটেয়ারের সময়ে এরকম ধারণা একটু-আধটু থাকলেও, শিল্পবিপ্লবের পর আড্ডার ধারণাটিই সে দেশের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অনর্থক সময় খরচ করার মতো সময় শিল্পপুঁজির থাকে না, কারণ সে জানে সময় মানেই অর্থ, টাকা, সম্পদ, পুঁজি।

তা সে যাই হোক, শব্দটির মূল উত্তরাধিকার হিন্দি ভাষার। বাংলাভাষায় **নড়, অনড়, অড়, আড়, আড়ি** প্রভৃতি থাকলেও অড্ডা ছিল না; শব্দটিকে **অড়**-এর উত্তরাধিকার স্বরূপ **অড্ডা** রূপে পেয়েছিল হিন্দি ভাষা। পরে পরে হিন্দির সংস্পর্শে সেটি বাংলা ভাষাতেও চলে আসে এবং রূপ নেয় **'আড্ডা'**য়। এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি উপরে দেওয়া আছে (দ্র.২)। তার মর্মার্থ হল — চলমান থাকাই (ডয়নশীলতাই) মানবধর্ম। তবে এই চলমানতায় একধরনের স্থিতি-গতির দ্বৈরাজ্য রয়েছে। (দ্র. **যাওয়া**)। বিশেষ দেশকালে বিশেষ মানসিক অবস্থানে পৌঁছে অনড় হওয়া এবং সেই অনড় (ডয়নহীন) অবস্থাতেই কিছুদিন চলতে থাকাও (ডয়ন করাও) মানবধর্ম। একেই বলা হয় **অড্ডা**। [ব্যক্তির যেমন দৈহিক গতি-স্থিতি মিলিয়ে হাঁটা বা **যাওয়া** হয় (দ্র. **গ বর্ণের অর্থ**), তেমনি মানসিক গতি-স্থিতি মিলিয়েও মানসিক হাঁটা বা **যাওয়া** হয়, অর্থাৎ মানসিক অগ্রগতি সম্ভব হয়।] মানবসমাজ এক-একটি ধর্ম্ম অর্জন ক'রে সেই ধর্ম্মে থিতু হয় (ডয়নহীন হয়), এবং সেই ধর্ম্মানুসারে চলতে (ডয়ন করতে) শুরু করে। এ হল মানুষের ও তার সমাজের মানসিক চলন। এই চলনের কাজটি যেখানে চালানো হত, সেই আলোচনার স্থানগুলিকে বলা হত **'অড্ডা'**। অর্থাৎ কিনা, মোক্ষাদি-আলোচনা ও তা অর্জনের চেষ্টাই ছিল **আড্ডার** মূল ভিত্তি। পরে পরে একই কর্ম্মের পুনরাবৃত্তি ও অন্যান্য নানান কারণে এবং সবশেষে ইয়োরোপ-আগত আধুনিকতার প্রভাবে **আড্ডার** প্রাণবায়ু উবে যায়, থেকে যায় শুধু **আড্ডার** ধড়টুকু। এই ধড়সম্বল **আড্ডার** মানে হয়ে যায় 'অনর্থক গল্প-গুজবে সময় কাটানো'।

তাই বলে **আড্ডা**বাজ বাঙালিকে আমরা যেন চিনতে ভুল না করি। তাছাড়া, শ্রেষ্ঠ বাঙালি রবীন্দ্রনাথের বিবেচনা-পদ্ধতি অনুসরণ

করে **আড্ডা**বাজ বাঙালিকে চেনার চেষ্টা করাই ভাল। এই **আড্ডা** আজ বিশাল এক শুষ্ক পুষ্করিণীর মতো। তাকে দেখে বোঝা উচিত, যখন তা জীবন্ত ছিল, কী বিপুল জলরাশি, ফুল-মাছ-শৈবালাদিতে তা পরিপূর্ণ ও প্রাণবন্ত ছিল। মানসিক অর্জনের চেষ্টায় কী বিপুল চর্চার কেন্দ্র ছিল বাঙালির এই **আড্ডা**! যতদূর বোঝা যায়, পালযুগে এই আড্ডার সূত্রপাত, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আমলে তা প্রাণবন্ত-যৌবনদীপ্ত হয়ে ওঠে, হোসেন শাহের আমলে তার রমরমা হয়, আধুনিক যুগে পৌঁছেও তা কতখানি সক্রিয় ছিল, রবীন্দ্রযুগের আড্ডার খবর যাঁরা জানেন, তাঁরা সবাই তার সাক্ষ্য দিতে পারবেন। কিন্তু ক্রমে একদিন বাঙালির এই আড্ডারও প্রাণবায়ু উবে যায়। কিন্তু তার সেই বিশাল আড্ডার কঙ্কালটা থেকে গেছে, আড্ডার প্রতি আকর্ষণ ও মোহটা থেকে গেছে, যদিও আজ সেই আড্ডা নেহাতই প্রাণহীন এক কঙ্কাল মাত্র, শুকনো পুকুর মাত্র। আজকাল সরকারী দাক্ষিণ্যে 'পয়লা বৈশাখ'-এর নামে যে-সকল আড্ডা বসে, খটখটে শুকনো পুকুরের সবচেয়ে ভাল উদাহরণ সেগুলিই।

আজ বোঝা যায়, বাঙালি এমনি এমনি আড্ডাবাজ হয়নি। এক বিশাল উত্তরাধিকারের ধ্বংসাবশেষকে সে আজও বয়ে নিয়ে চলেছে। এখনও সে গান গায় 'কফিহাউসের সেই আড্ডাটা ...' ইত্যাদি। কে জানে, এই আড্ডার পুনর্নবীকরণই হয়তো তাকে বাঁচাবে!

কিন্তু সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আড্ডার প্রকৃত স্বরূপকে উদ্ঘাটিত হতে হবে। কেন আড্ডার একজন মধ্যমণি থাকেন, এবং তিনি প্রায়শই প্রচলিত অ্যাকাডেমিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত হন; কেনই-বা সেরকম মধ্যমণি অ্যাকাডেমি-শিক্ষাহীন স্রষ্টাকে অত্যন্ত সম্মান দেন, মর্যাদা দেন; এই সব তথ্যই জানা যাবে। আবিষ্কার ও সৃষ্টিরসের (ব্রহ্মরসের) সঙ্গে আড্ডার কী সম্পর্ক — এসব বিষয়ের মর্মকথা নিশ্চয় পুনরুদ্ধার করা হবে। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের বিখ্যাত Mermaid Tavern-এর আড্ডা, যেখানে কখনো-সখনো অ্যাকাডেমি-শিক্ষাহীন শেকসপীয়ার আসতেন, সেই বিখ্যাত আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন অতি উচ্চশিক্ষিত বেন জনসন। নিজেকে বেন-অনুসারী বলে স্বীকৃতি পেলে সেকালের লন্ডনের শিক্ষিত মানুষেরা বর্তে যেতেন, এতই প্রতাপ ছিল বেন জনসনের। সেই জনসন মূর্খ শেকসপীয়ারকে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা বলে মনে করতেন ও সম্মান জানাতেন। যদি কোনো মাহেন্দ্রক্ষণে সেই আড্ডায় জনসন ও শেকসপীয়ার মুখোমুখি হয়ে কোনো বিষয়ে বিতর্ক শুরু করতেন, শ্রোতাদের সে হত এক মহানন্দের দিন; ব্রহ্মরসে স্নান করার সেই বিরল অভিজ্ঞতা তাঁদের পরম সৌভাগ্য বলে মনে হত। ... আর ঠিক এই জিনিসের উদার বিস্তৃতি ছিল ভারতের তথা বাংলাভাষীদের বহুকাল ক্রমাগত আড্ডার সংস্কৃতিতে, বাংলায় যা অনুষ্ঠিত হত বিখ্যাত **চণ্ডীমণ্ডপ**গুলিতে। ... ... তারপর সেই উত্তরাধিকার কেমন করে 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডা পেরিয়ে 'খালাসিটোলা'য় পৌঁছাল, ব্রহ্মরসের সঙ্গে কেমন করে দ্রাক্ষারস মিশতে লাগল এবং ক্রমে তা সরকারি দাক্ষিণ্যে পয়লা বৈশাখের বানরকুলের শুষ্ক কিচকিচিতে পরিণত হল, তা সবই উদ্ধার করতে হবে। তবেই করা যাবে আড্ডার **পুনর্নবীকরণ**। ...

ডগ, ডগমগ, ডগমগি, ডগর, ডগা, ডগি : ২. ডগ = *ডয়নশীল গমন যাহার; অথবা, ডয়নী গমন করে যাহাতে বা যাহার দ্বারা।* **ডগমগ** = **ডগ** ও **মগ** *(সীমায়িত বা সীমিতকরণ-উদ্দেশ্যে গমন যাহার)।* **ডগমগি** = **ডগমগ** *গতিশীল যাহাতে।* **ডগর** = **ডগ** *রহে যাহাতে।* **ডগা** = **ডগ**-*এর আধার যে।* **ডগি** = **ডগ** *গতিশীল যাহাতে।* **৩. ডগ** = শিশুর হাসির শব্দ। **ডগ, ডগা** = শাখার বা বৃক্ষের অগ্রভাগ, অগ্রভাগ, প্রান্ত। **ডগমগ** = চঞ্চল, ভাস্বর, ভাবাবেশময়, বিহ্বল, লাবণ্যপ্রভাময়, চঞ্চল দীপ্তিপ্রকাশ, চঞ্চলভাব, টলটল, অতিলোহিতভাব, টকটক; ডম্ফ বাদ্যের ধ্বনি। **ডগমগি** = ডমরুধ্বনি, উচ্ছলিত। **ডগর** = বাদ্যবিশেষ। **ডগি (ডগী)** = ডগা, কচি। (ব.শ.)। **৪.** (লাউ)**ডগ**, (লাউ)**ডগা**, **ডগমগ** তাদের প্রতীকী অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** ড-এর গমন থাকে যাহাতে, তাকেই **ডগ** বলে। লাউগাছের বর্দ্ধনেচ্ছা গমন করে তার **ডগ** বা ডগার মাধ্যমে। হয়তো শিকারীর ইচ্ছা তার dog-এর মাধ্যমে গমন করে বলে, ইংরেজ শিকারী কুকুরকে ডগ বলে। শিশুর খিলখিল হাসি যেভাবে প্রকাশিত হয়, তাকেও সেজন্যেই **ডগ** বলা হয়ে থাকবে। তবে ডগমগ শব্দে 'ডয়িত গমন ও মাপিত গমন' দুটোই থাকে। **৬.** ইংরেজি dog।

ডবকা : ২. *ডয়ন (উড়ে বেড়ানো) বহন করে যে, তাহার আধার।* **৩.** তরুণ। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** সাধারণত উচ্ছল তরুণীকে 'ডবকা-ছুঁড়ি' বলা হয়ে থাকে। যেন-বা সে উড়ে বেড়ায় বা উড্ডয়ন বহন করে, তাই ডবকা।

ঢ/ঢ়

ঢ ও ঢ় বর্ণের অর্থ : (প্রথমেই **ড ও ড় বর্ণের অর্থ** দেখে নিন।) ঢ = ঢ্-অন করে যে; ডয়নস্থিত বা ডয়নথিতি = ডয়িত = ঢ। ঢ় = ঢ়্-অন করে যে; ড়য়নস্থিত বা ড়য়নথিতি = ড়য়িত = ঢ়।

ঢ সেই সত্তাকে বোঝায়, যা মূলসত্তা থেকে তার পরিধি পেরিয়ে বাইরে বেরিয়ে গড়ান-উড়ান করে স্থির হয়। অতঃপর সে যদি আবর্তন বা ঘূর্ণনগুণ লাভ করে, তখন তা ঢ় বর্ণবাচ্য হয়। তবে মনে রাখা দরকার, ট-বর্গের ধারাটি আদিতে ট ও ত মিলিয়ে এক ধারাই ছিল। পরে তা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মানুষের এমন বহু জাতি আছে, যারা একটি মাত্র ধারাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। যেমন ইংরেজ পেয়েছে ট-বর্গের ধারাটি, জাপান পেয়েছে ত-বর্গের ধারাটি; ভারতীয় ভাষাগুলি পেয়েছে দুটি ধারাই। তন্মধ্যে বাংলার গৌরব এই যে, সে কেবল দুটি ধারাই পায়নি, তার প্রায় সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। সংস্কৃতে দুটি ধারাই চিহ্নিত হয়েছিল, কিন্তু ট-বর্গের ধারাটি তাতে সম্পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়নি। কেননা, প্রচলিত ভাষাকে সংস্কার করে যখন 'সংস্কৃত' ভাষা তৈরি করা হচ্ছিল, তখন পর্যন্ত জনসাধারণ্যে ট-বর্গের সব বর্ণের বিকাশ ঘটেনি। এমনকি সমাজশাসকেরা সেই বিকাশে বাধাও সৃষ্টি করতেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা

করিতেন' শীর্ষক নিবন্ধে জানাচ্ছেন, 'শুনা যায়, মগধ দেশে শিশুনাগ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আপনার অন্তঃপুরে (court) নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন যে, যে আটটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়, তাহা বর্ণমালা হইতে তফাত করিয়া দিতে হইবে। যথা — ট, ঠ, ঢ, ণ, শ, ষ, হ আর ক্ষ।'

কেবল এটুকুই নয়, একই নিবন্ধে তিনি আরও জানাচ্ছেন, "শ্রূয়তে হি শূরসেনেষু কুবিন্দো নাম রাজা। তেন পুরুষসংযোগক্ষর-বর্জ্জং অন্তঃপুর এবেতি।' ইত্যাদি। শূরসেন অর্থাৎ মথুরায় কুবিন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অন্তঃপুরের মধ্যে নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে-সকল সংযুক্ত অক্ষর বর্ণকঠোর হয়, তাহাদের ব্যবহার চলিবে না।" ...

নিবন্ধ-শেষে হরপ্রসাদ বলছেন, 'বুদ্ধদেবের সময়ে রাজবাড়িতে ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ, হ, ক্ষ, উচ্চারণ হইত না এবং সংযুক্ত অক্ষরও চলিত না। ...'

এসব কথা এখানে পুনরায় বলার উদ্দেশ্য এই যে, ঢ বর্ণকে চিহ্নিত করার কাজটি সংস্কৃতকারগণ করে যেতে পেরেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের সময় পর্যন্ত জনসাধারণ্যে এই বর্ণের ব্যবহার যথেষ্ট ছিল না; সেকারণে সংস্কৃতকারগণ এই বর্ণের অর্থধারণ বিষয়ে যথেষ্ট কিছু বলে যেতে পারেননি এবং ঢ-আরম্ভিক শব্দের (যথা **ঢপ, ঢিল, ঢুক** ইত্যাদি) অত্যন্ত অল্প সংখ্যক উদাহরণ দিয়ে যেতে পেরেছেন; এবং ঢ়-বর্ণের ক্ষেত্রে সেসব প্রায় কিছুই করে যেতে পারেননি। কথাগুলি সমগ্র ট-বর্গের ক্ষেত্রেই কমবেশি প্রযোজ্য। এই বর্গের যা-কিছু বিকাশ, তার ৮০/৯০ শতাংশ ঘটেছে বাংলাভাষীর নিজের হাতে এবং তাও পালযুগের পরবর্তী সময়কাল থেকে ক্রমান্বয়ে আজ পর্যন্ত।

তা সে যাই হোক, আপাতত আমরা ঢ বর্ণের মানে বুঝব এমন এক সত্তা রূপে, যা উড্ডয়ন বা গড়ান-উড়ান করতে করতে আর করে না, থামিয়ে স্থির হয়; ফলে তার সবদিক খোলা বা ফাঁকা, ঢিলা-ঢালা। ডয়ন এখানে ঢয়ন হয়, উড্ডয়নকে ঢেকে রাখা হয়। ফলে একধরনের গোপনীয়তা, লুকানো, ও মিথ্যা স্থান পায়। ... এই ঢ-কে আমরা আপাতত 'ডয়নস্থিত' বা 'ডয়নথিতি' এবং ঢ়-কে আমরা 'গড়ানস্থিত' বা 'গড়ানথিতি' নাম দিচ্ছি। অতএব — *ঢ = ঢ় -অন্ (on) করে যে = ডয়নথিতি; ঢ-এর আধার যে = ঢা; ঢ গতিশীল যাহাতে = ঢি; ঢি-এর আধার যে = ঢী; ঢ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে = ঢু ... ইত্যাদি। দ্র. ড। একই ভাবে গড়ানথিতি অর্থে বুঝে নেব ঢ় বর্ণটিকেও।*

ঢ় বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : ঢক্, ঢপ্, ঢল্ (ঢর্), ঢ় = ৩ + ১

***ঢক্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : উপঢৌকন (ঢোনা বা বহন করা), ঢকঢক, ঢ-কার, ঢক্কঢক্ক, ঢক্কা, ঢাক, ঢাক, ঢাকঢাক-গুড়গুড় (গুঢ়গুঢ়), ঢাকন, ঢাকনা, ঢাকনি, ঢাকনী, ঢাকবাজানী, ঢাকা, **ঢাকাই, ঢাকাইয়া**, ঢাকাঢাকি, ঢাকী, ঢাকুরি, ঢিক, ঢিকা, ঢুক, **ঢুকুঢুক, ঢুকা, ঢুকান, ঢেঁকি**, ঢেক, ঢেকা, ঢোক, ঢোকা, ঢোকান (ঢোনা), **ঢৌক, ঢৌকন, ঢৌকিনী**।

ঢক্ = ডয়নস্থিতের করণ। ঢক = ডয়নস্থিতের করণ থাকে যাহাতে।

ঢক (ঢকঢক, ঢকঢকে) : ২. *ঢক = ঢ করে যে। ঢকঢক = ঢক-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ঢকঢকে** = **ঢকঢক** দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* **৩. ঢক** = তরল দ্রব্য গলাধঃকরণের শব্দ। **ঢকঢক** = ঢেঁকির শব্দ, শিথিল-নিখাত স্তম্ভাদির সঞ্চালন শব্দ। **ঢকঢকে** = যাহা ঢকঢক করে। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** ডয়নকে গ্রহণ করে স্থির করে নেয় যে, **সেই হল ঢক**। এতে গ্রহণ করা, আত্মস্থ করা, কবলিত করা, লুকিয়ে ফেলা ... প্রভৃতি ক্রিয়ার ব্যাপার থাকে। জল যখন মুখে 'ঢালা' হয়, সে তা গ্রহণ করে, জলের ডয়নকে সে স্থির করে আত্মস্থ করে নেয়, আর সেই স্থিরকরণকে সে জানান দেয় 'করেছি' 'করেছি' বলে। সেই 'ঢ-করণ' জানান দেওয়াকেই আমরা বলি 'ঢকঢক' করে জল-খাওয়া (ঢেকুর তোলা)। একই কাণ্ড ঘটে ঢেঁকির বেলায়। তার উড্ডয়নপূর্বক গমনকে গ্রহণ করে স্থির করে নেয় ঢেঁকির গর্তটি, আর সেই স্থিরকরণকে সে জানান দেয় 'ঢক' শব্দে। আর, যে-স্থানে এই ঢক-ঢক ক্রিয়া চলে, সে-স্থান স্বভাবতই চারদিক খোলা বা 'শিথিল-নিখাত' হয় বলেই ব্যাপারটি হয় **ঢকঢকে**।

ঢক্, ঢক্কঢক্ক, ঢক্কা, ঢাক, ঢাকবাজানী, ঢাকী : **১.** ঢক্কা = ঢক + √কৈ শব্দ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *ঢক্ক = ঢক্ (ঢ-করণ) করে যে।* ***ঢক্কঢক্ক** = **ঢক্ক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ঢক্কা** = **ঢক্ক**-আধার যে।* ***ঢাক** = **ঢক** হইতে জাত।* ***ঢাকী** = **ঢাক**-এর গতিশীলতার আধার যে; ঢাক স্কন্ধে যাহার, কিংবা যে ঢাক বাজায়। /* **ঢাকবাজানী** = যে স্ত্রীলোক ঢাক বাজাইয়া কলঙ্ক রটায়। **ঢাকী** = ঢাক বাজায় যে। (ব.শ.)। **৩. ঢক্কঢক্ক** = নিরন্তর ঢক শব্দ। **ঢক্কা** = যশঃপটহ, ঢাক। **ঢাক** = বাদ্যবিশেষ (ঢাকে কাঠি দেওয়া = ঢাক বাজান, ঢাক বাজাইয়া প্রচার করা, ঢাক পেটা। ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি = মুখ্য কর্ম্ম অপেক্ষা গৌণ কর্ম্মের ব্যয়বাহুল্য হওয়া। ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জ্জন = অভীষ্ট বস্তুর সহিত আনুষঙ্গিক সমস্ত ত্যাগ করা।)। **ঢাকবাজানী** = ব্যাপিকা নারী। **ঢাকী** = ঢক্কাবাদক। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** এখানে প্রশ্ন একটিই — ঢাক বাদ্যবিশেষকে যেমন বোঝায়, তেমনি ঢেকে দেওয়াকেও বোঝায়। কিন্তু কেন এবং কীভাবে? নিম্নে **ঢাক** দ্রষ্টব্য। আরও দ্র. **ঢক**। **৬.** ইংরেজি ক্রিয়ামূল duck।

ঢাক, ঢাকন, ঢাকনা (ঢাকনি, ঢাকনী) : ২. *ঢাক = ঢক হইতে জাত।* ***ঢাকন** = **ঢাক** অন যাহাতে।* ***ঢাকনা** = **ঢাকন**-এর আধার যে।* ***ঢাকনি** = **ঢাকন** গতিশীল যাহাতে।* ***ঢাকনী** = **ঢাকনি**-র আধার যে।* **৩. ঢাক** = আচ্ছাদন করা, গোপন করা, বাহির হইতে না-দেওয়া, আটকান, প্রতিহত করা, পূর্ণ করা, লুকান। **ঢাকন** = আচ্ছাদন, গোপন। **ঢাকনা (ঢাকনি, ঢাকনী)** = আচ্ছাদন, ঢাকনী

(cover)। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার — একই 'ঢাক' শব্দ 'বাদ্যবিশেষ' ও 'আচ্ছাদন করা', এই দুইরকম ব্যাপারকে ধারণ করে কীভাবে? শব্দোৎসারণের নিয়মানুসারে আমরা জেনেছি, '**ঢক** হইতে জাত' যে, তাকে **ঢাক** বলে; অর্থাৎ **ঢক-করণই ঢাক**। এই ঢাক ঢাকা-ক্রিয়াকে (বা আচ্ছাদন করাকে) যেমন বোঝায়, তেমনি 'যে ঢাকে' তেমন ঢাক বা বাদ্যবিশেষকেও বোঝায়। সমজাতীয় বেশ কিছু শব্দ রয়েছে বাংলাভাষায়। যেমন ধরা যাক **মার**। '**মর** হইতে জাত' যে, তাকে **মার** বলে; অর্থাৎ **মর-করণই মার**। এই মার মারা-ক্রিয়াকে যেমন বোঝায়, তেমনি 'যে মারে' তেমন (শিশুমার, ধন্ধুমার প্রভৃতি) মারকেও বোঝায়।

অতএব আমরা নিশ্চিত হতে পারি, **ঢাক** লুকানকেও যেমন বোঝাতে পারে, তেমনি বাজানোর যন্ত্রবিশেষকেও বোঝাতে পারে। কিন্তু তারপরই প্রশ্ন জাগে, তাহলে **ঢাক** বাজিয়ে কী ঢাকা হয়? **ঢাক** পেটানো শব্দে আমরা তো বরং উলটো জেনেছি — ঢাক হল যশঃপটহ, যা কিনা প্রচার করে। কিন্তু শব্দটির গভীরে গেলে আমরা অবাক হয়ে দেখি, সেখানে রয়েছে একেবারে উলটো কথা — ঢাক পেটানো মানে মিথ্যা প্রচার, যা কিনা সত্যকে চাপা দেয়। শোনা যায়, সতীদাহের সময় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে একদিকে যেমন মহানন্দ প্রকাশ করা হত, অন্যদিকে তেমনি সতীর মর্মভেদী কান্না যাতে কেউ না শুনতে পায়, তার ব্যবস্থা করা হত। যে কোনো ঢাক-পেটানোর পেছনেও কারও না কারও পরাজয়, গ্লানি, ব্যর্থতাকে আড়ালও করা হয়ে থাকে। কথাটির সমর্থন আরও পাওয়া যায় **ঢাকঢাক-গুড়গুড়** শব্দে। আমাদের ধারণা, বাদ্যবিশেষটির **ঢাক** নামকরণ যখন হয়েছিল, তখন সেই বাদ্য-বিশেষটি বিশেষ কোনো মিথ্যার প্রকাশের দ্বারা বিশেষ কোনো সত্যকে চাপা দেওয়ার কাজেই ব্যবহৃত হত। তাই তার ওইরকম নামকরণ হয়ে থাকবে।

ঢাকঢাক-গুড়গুড় (গূঢ়গূঢ়) : ২. ***ঢাকঢাক-গূঢ়গূঢ়*** *= ঢেকে দাও, ঢেকে দাও, ইহা গূঢ় বিষয়, ইহা গূঢ় বিষয়।* ৩. **ঢাকঢাক-গুড়গুড়** = (তাৎপর্য্যে) গোপন, লুকান। ৪. 'লুকান' অর্থে প্রচলিত। ৫. মূল শব্দটি 'গূঢ়গূঢ়'। কিন্তু ব্যবহারের সুবিধার্থে বাংলাভাষীর মুখে শব্দটি দাঁড়িয়েছে — 'গুড়্‌গুড়্'। তবে মূল অর্থটির বদল ঘটেনি।

ঢাকা, ঢাকাই, ঢাকাইয়া, ঢাকাঢাকি : ২. ***ঢাকা*** *= ঢাক-এর আধার যে।* ***ঢাকাই*** *=* ***ঢাকা*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ঢাকাইয়া*** *=* ***ঢাকাই*** *যায় যাহাতে।* ***ঢাকাঢাকি*** *=* ***ঢাকা*** *ও* ***ঢাকি*** *(দ্র.* ***কেশাকেশি****)।* ৩. **ঢাকা** = আচ্ছাদিত, গুপ্ত, ঢাকনি। **ঢাকাই, ঢাকাইয়া** = ঢাকায় নির্ম্মিত (বস্ত্রাদি)। **ঢাকাঢাকি** = পরস্পর ঢাকা। (ব.শ.)। ৪. বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী শহরটির নাম রূপে প্রচলিত। ৫. আমরা নিঃসন্দেহ যে, কোনো এক সময়ে কোনো কারণে গোপনীয়তার কারণে, আচ্ছাদিত করে রাখা বা লুকিয়ে রাখার কারণে উপরোক্ত শহরটির নাম **ঢাকা** হয়েছিল। ঢাকায় কী ঢেকে রাখা হত, কেন ঢেকে রাখা হত, এসব বিষয়ে কোনো তথ্যই আমাদের হাতে নেই। কিন্তু শব্দটি বলছে, সে **ঢক** ক্রিয়া থেকে জাত, যার সঙ্গে ঢেকে রাখার সম্পর্ক ছিল। আমরা আশা করি, হয়তো ভবিষ্যতের কোনো গবেষক তা খুঁজে বের করবেন।

ঢুক (ঢোক), ঢুকঢুক, ঢুকা (ঢোকা), ঢুকান (ঢোকান), ঢৌক, ঢৌকন : ২. ***ঢুক*** *= ঢ-কে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে।* ***ঢুকঢুক*** *=* ***ঢুক****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ঢুকা*** *=* ***ঢুক****-এর আধার যে।* ***ঢুকান*** *=* ***ঢুকা*** *অন যাহাতে।* ***ঢৌক*** *=* ***ঢুকান*** *হয় যাহাকে।* ***ঢৌকন*** *=* ***ঢৌক*** *অন যাহাতে।* ৩. **ঢুক (ঢোক)** = গমন করা, প্রবেশ করা, ঢোকা। **ঢুকঢুক** = মৃদু ঢুক ঢুক শব্দ। **ঢুকা (ঢোকা)** = প্রবেশ করান, ঢুকান। **ঢৌক** = গতি, প্রেরণ, আবরণ, নয়ন। **ঢৌকন** = গতি, প্রেরণ, উপহার, উপঢৌকন। (ব.শ.)। ৪. মূলত 'প্রবেশ করা বা করান' অর্থে শব্দগুলি প্রচলিত। কেবল **ঢুকঢুক** শব্দটি 'অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঢুকে পড়া' অর্থে প্রচলিত। ৫. রাজাদের বহু কাহিনীর চিত্রনাট্যে আমরা দেখেছি, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী কোনো ধনী-ক্ষমতাবান যখন রাজদর্শনে যান, তখন তাঁর লোকজনেরা প্রচুর ধনরত্নাদি বহন করে রাজকোষের জন্য নিয়ে যান। একে বলে **উপঢৌকন**। '**উপ**' এইজন্য যে, এগুলি মূল **ঢৌকন** নয়; অনুসারী, আনুষঙ্গিক, সহকারী বা বাড়তি **ঢৌকন**। অর্থাৎ কিনা, **ঢৌকন** হল, যা প্রচলিত নিয়মানুসারেই রাজকোষে **ঢুকিয়ে** দিয়ে আসতে হয়। এই যা-কিছু **ঢুকিয়ে** দিয়ে আসতে হয়, তাকে **ঢৌক** বলে। **ঢক**-এর বেলায় যেখানে গ্রহণ করা, আত্মস্থ করা ... প্রভৃতি ক্রিয়া থাকে, **ঢুক**-এর বেলায় (উ-কারের অর্থধারণের নিয়মানুসারে) ঠিক তার বিপরীত ক্রিয়া থাকে। আর, সেকারণেই **ঢুকঢুক** মানেই হয়ে যায় অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে দেওয়া।

ঢপ্ **ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : ঢপ, টিপ, টিপ(ব)লা, টিপা, টিপি(বি), টিপেশোকা, ঢুপ, ঢেপ, ঢেপঢেপে, ঢেপসা, ঢেপুয়া, ঢ্যাপঢ্যাপে।

ঢপ্ = ডয়নস্থিতের পালন-পান। **ঢপ** = ডয়নস্থিতের পালন-পান থাকে যাহাতে।

ঢপ (ঢপের-কেত্তন, ঢপ-মারা) : ২. *ঢ (ফাঁকা ব্যাপার) পালিত হয় যাহাতে।* ৩. নির্ম্মাণপ্রকার, ঢঙ্গ, গড়ন, প্রকার, রকম, মধু কানের কীর্তনগান বিশেষ; ফাঁপা জিনিসে আঘাতের শব্দ, ফাঁপা জিনিসের পতনের শব্দ। (ব.শ.)। ৪. অযৌক্তিক আয়োজন বোঝাতে 'ঢপের কেত্তন' কথাটি প্রচলিত ছিল আগে থেকেই; সম্প্রতি 'মিথ্যা কথা' অর্থে 'ঢপ মারা' শব্দটি খুবই প্রচলিত। ৫. যদি প্রশ্ন করা হয়, ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মে সাধারণ ভাষা-ব্যবহারকারীরা নিজেরাই যে নতুন নতুন শব্দের জন্ম দিয়ে থাকেন, তার প্রমাণ কী? এর উত্তর হল, প্রতিটি ভাষার প্রতিটি শব্দই সর্বপ্রথমে সেভাবেই তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু কালক্রমে সেগুলি প্রতীকী হয়ে গেছে এবং সেগুলিকে স্থানকাল দিয়ে যথাযথভাবে চিহ্নিত করার কোনো উপায় এখন আর নেই। কিন্তু ধারাটি তো আজও চলে আসছে! আজও তো নতুন নতুন শব্দ সেভাবেই তৈরি হচ্ছে! তার উদাহরণ জনসাধারণের তৈরি করা

সাম্প্রতিক কালের শব্দে আমরা অবশ্যই পেতে পারি। সেরকম কোনো নিদর্শন কি আছে?

আমরা বলি, এরকম অজস্র নিদর্শন আছে। তারই একটি উদাহরণ হল '**ঢপ-মারা**'। খুব সম্ভব ১৯৬০ সালের পরে বাংলাভাষী এই শব্দের জন্ম দিয়ে থাকবে। অবশ্য তার জন্য বাংলাভাষীকে **ঢপের-কেত্তন** শব্দটি পেরিয়ে আসতে হয়েছে। মূল কীর্ত্তনে ছিল জগৎস্রষ্টার কীর্ত্তিকথা, মোক্ষের কীর্ত্তিকথা, এবং আরও নানান ভারী ভারী বিষয়। **ঢপ-কীর্ত্তন** গানে সেরকম কোনো মানবিক মহত্ত্বের মর্মবাণী ছিল না। তা ছিল ফাঁকা, ফাঁপানো, নেহাতই দেহভিত্তিক সাময়িক সুখশ্রুতিমুখর। এই ঢপের কীর্ত্তনের অভিজ্ঞতা নিয়েই বাংলাভাষী অতঃপর যেকোনো ফাঁকা-আয়োজনকে **ঢপের কেত্তন** নাম দেয়। পরে পরে সে অভিজ্ঞতাই তাকে পৌঁছে দেয় **ঢপ-মারার** মতো শব্দ তৈরির যোগ্যতায়। দ্র. **মারা**।

টিপ, টিপলা, টিবলা, টিপা, টিপি, টিবি : ২. *টিপ* = *ট গতিশীল হইয়া পালিত হয় যাহাতে। (**টিব** = ট গতিশীল হইয়া বাহিত হয় যাহাতে।)* ***টিপলা*** *=* ***টিপ*** *লালিত হয় যাহাতে, তাহার আধার।* ***টিবলা*** *=* ***টিব*** *লালিত হয় যাহাতে, তাহার আধার।* ***টিপা*** *=* ***টিপ****-এর আধার যে।* ***টিপি*** *=* ***টিপ*** *গতিশীল যাহাতে।* ***টিব*** *=* ***টিব*** *গতিশীল যাহাতে।* **৩. টিপ** = মাটিতে পড়ার শব্দ, প্রণামে মাথা ঠোকার শব্দ, রাগে মাথা ঠোকার শব্দ। **টিপলা, টিবলা** = ছোট ঢিপি। **টিপা** (হিন্দি) = বৃহৎ মৃত্তিকাখণ্ড। **টিপি, টিবি** = স্তূপ, রাশি। (**টিপি-ঢাপা** = ছোট-বড় স্তূপ, ছোট-বড় মাংসপিণ্ড)। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫. ঢপ** ও **ঢপলা** শব্দ যে ফাঁকা স্থান বা ফাঁপা বস্তুকে বোঝায় তা আমরা আগেই জেনেছি এবং জানি। এই ঢপের পার্থিব চেহারা হতে পারে খানিকটা ফাঁপা উঁচু মতো স্থান। কিন্তু তা যখন গতিশীল হয়ে পালিত-লালিত হতে থাকে, তখন তা হয়ে যায় টিলার মতো। টিলাতে বস্তু থাকে, ভেতরটি ফাঁপা নয়; কিন্তু টিপি বা টিবিতে ভেতরের বস্তুর পরিমাণ কম, সেটি ভিতরে ভিতরে ফাঁকা, সার্বিকভাবে ফাঁপা। মোটকথা **টিলার** মতো মৃত্তিকাস্তূপ ঘন বা 'সলিড' থাকলে তাকে **টিলা** বলে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ফাঁকা, ফাঁপা থাকলে তাকে **টিপি** বা **টিবি** বলে। আর, এই ফাঁকা করার কাজটি ক'রে প্রতি বর্ষায় টিপিকে ভূমির সমতলে খানিকটা করে নেমে আসতে বাধ্য করে বলেই মূষিককে উন্দুর বা ইঁদুর বলে। দ্র. **উন্দ্, উন্দুর**।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বলে রাখা ভাল। ফাঁকা বলেই **টিপ** করে প্রণাম করার অর্থই হল ভক্তিশ্রদ্ধাহীন ফাঁকা প্রণাম। একই কথা **টিপ** করে তাল পড়ার সম্পর্কেও খাটে। কেননা, শক্ত বস্তু পড়লে যেরকম ঘন টনটনে আওয়াজ হয়, পাকা তাল পড়লে সেরকম আওয়াজ হয় না; কারণ, পাকা তাল নরম হয় এবং পতনের টনটনে আওয়াজ তালের গায়ের খোসা ফেটে বেরিয়ে যায়। ফলে আওয়াজটি হয়ে যায় **ঢপঢপে** অর্থাৎ ফাঁকা। সেকারণেই আমরা বলি '**টিপ** করে তাল পড়ল'।

***ঢল্ (ঢর্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** অঢেল, একঢাল, **ঢর, ঢরক, ঢল, ঢলক**, ঢলঢল, ঢলমল, ঢলা, ঢলাঢলি, ঢলান, **ঢলানি, ঢার**, ঢাল, ঢালসুমর, ঢালা, ঢালাই, ঢালাইখানা, ঢালাও, **ঢালাঢালি**, ঢালি, ঢালী, ঢালু, ঢিল, ঢিলা, ঢিলাঢালা, ঢিলাঢিলি, **ঢিলামি(মী)**, ঢিলেমি, ঢুঁর, ঢুল, ঢুলঢুল, ঢুলা, ঢুলান, ঢুলানি(নী), **ঢুলি(লী), ঢুলুঢুলু**, ঢুলুনি, ঢের, ঢেরা, ঢেরাসই, ঢেরি, ঢেলাফেলা, ঢোল, ঢোলক, ঢোল-কান, ঢোলা, ঢৌল, ঢ্যারা, ঢ্যালা-ফ্যালা।

ঢল্ (ঢর্) = ডয়নস্থিতের লালন-লয়ন। ঢল = ডয়নস্থিতের লালন-লয়ন থাকে যাহাতে। **ঢর** = ডয়নস্থিত রহে যাহাতে।

ঢল, ঢলক, ঢলঢল, ঢলমল, ঢলা, ঢলাঢলি, ঢলান, ঢলানী : ২. ***ঢল*** *= ঢ লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***ঢলক*** *=* ***ঢল*** *করে যে।* ***ঢলঢল*** *=* ***ঢল****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ঢলমল*** *=* ***ঢল*** *ও* ***মল****।* ***ঢলা*** *=* ***ঢল****-এর আধার যে।* ***ঢলাঢলি*** *=* ***ঢলা*** *ও* ***ঢলি*** *(দ্র.* ***কেশাকেশি****),* ***ঢলান*** *=* ***ঢলা*** *অন যাহাতে।* ***ঢলানী*** *=* ***ঢলান****-কে গতিশীল করে ধরে রাখে যে।* **৩. ঢল** = জলের পঙ্কিলতা, শিথিল, আলগা; হেলিয়া পড়া, লম্বমান হওয়া, নামা (to incline), বিচলিত হওয়া, প্রবাহিত বা সঞ্চলিত হওয়া। **ঢলক** = (রাত ঢলকান — রাত্রি অবসানপ্রাপ্ত হওয়া)। **ঢলঢল** = পর্য্যাকুল, বিহ্বল, মদিরভাবময়, রসাবেশে জড়, ভরপুর, প্রবাহতরল, ছলছল, লাবণ্যপ্রবাহ-প্রচুর, লাবণ্যপূর্ণভাব, ভরপুরভাব, শোভাবিস্তার, নির্ম্মলজলে পরিপূর্ণভাব; অতিটিলাভাব; টলটল। **ঢলমল** = ঝলমল, অতিদীপ্তভাব। **ঢলা** = গর্হিত কার্য্যে লোক হাসান, হেলিয়া পড়া ... ইত্যাদি। **ঢলাঢলি** = বিহ্বলতা, বিভোরভাব, লোক হাসান, কেলেঙ্কারী। **ঢলান** = লোক হাসান। **ঢলানী** = যে স্ত্রীলোক কুকর্ম্মে লোক হাসায়। (ব.শ.)। **৪.** সবগুলি শব্দই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত, কেবল ঢলমল এখন অপ্রচলিত। **৫. টলটল** করা আর **ঢলঢল** করা, এই দুটি শব্দবন্ধ **ট** ও **ঢ**-এর অর্থধারণ ক্ষমতার পার্থক্য স্পষ্ট রূপে বুঝবার সুযোগ করে দেয়। পুষ্করিণী-ভরা জল 'টলটল করে' বলা যায়, 'ঢলঢল করে'ও বলা যায়। পার্থক্য কী?

একটি চায়ের কাপ এমনভাবে জলপূর্ণ করুন যাতে তা সম্পূর্ণ ভরে যায়, কিন্তু একটুও না পড়ে। এইবার তাতে একটি একটি করে আলপিন ফেলতে শুরু করুন। দেখবেন, কাপের জল কাপের উচ্চতার চেয়েও উপরে উঠে গেছে কিন্তু তখনও উপচে পড়ে যাচ্ছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কাপের উচ্চতার চেয়ে উপরে থাকছে কিন্তু উপচে পড়ে যাচ্ছে না, ততক্ষণ কাপের জল **টলটল** করে, **টলমল** করে। এর পরও সমানে পিন ফেলতে থাকুন, দেখবেন একসময় কাপের জল উপচে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। যে মুহূর্ত থেকে কাপের জল উপচে পড়তে শুরু করে দিল, তারপর আপনি যতই পিন ফেলবেন, ততই কাপের জল উপচে পড়তে থাকবে। জল কাপের উচ্চতার থেকে উপরে কিছুতেই আর দাঁড়াবে না। এই অবস্থায় পরিপূর্ণ কাপের জলকে বলা হয় **ঢলঢল**। তার মানে কাপের উচ্চতার চেয়ে উঁচু জলকে বলে **টলটল**-জল, এবং কাপের উচ্চতার সমান উঁচু জলকে বলে **ঢলঢল**-জল। অর্থাৎ **টলটল**-সত্তা উঁচুতে উঠলেও ডাইনে

বাঁয়ে পড়ে যায় না, কিন্তু **ঢলঢল**-সত্তার উঁচুতে ওঠার উপায় নেই, সে টঙ্কার করতে পারে না, উড়ানও পারে না, সে ক্ষমতা তার নেই। **টলটল**-এর মতো তার পরিধির বন্ধন নেই, নিষেধের বেড়া নেই। তাই সে উঁচুতে ওঠার চেষ্টা করলেই ডাইনে-বাঁয়ে গড়িয়ে বা **ঢলে** পড়ে যায়। এইজন্যই তাকে বলে **ঢলা, ঢলানী** ইত্যাদি। ('ঘরজ্বালানী, পর**ঢলানী**' বাংলাভাষীর বিখ্যাত গালি।) কারণ এই **ঢলঢল**-সত্তাতে **ট** বা টঙ্কারণ নেই, **ড** বা ডয়নও নেই। এ হল ডয়নস্থিত — ঢ; ঢ-এর লালন-লয়ন। বৈষ্ণবকবিতা এই **ঢলকে** পৌঁছে দিয়েছে তার সর্বোচ্চ রূপে — 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি, অবনী বহিয়া যায়'।

ঢাল, ঢালা, ঢালাই, ঢালাইখানা, ঢালাও, ঢালি, ঢালী, ঢালু : ২. ***ঢাল*** *=* ***ঢল*** *হইতে জাত।* ***ঢালা*** *=* ***ঢাল****-এর আধার যে।* ***ঢালাই*** *=* ***ঢালা*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ঢালাইখানা*** *= যে 'খানে' (স্থানে)* ***ঢালাই*** *করা হয়।* ***ঢালাও*** *=* ***ঢালা*** *সার্বিক যাহাতে।* ***ঢালি*** *=* ***ঢাল*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ঢালী*** *=* ***ঢালির*** *আধার যে।* ***ঢালু*** *=* ***ঢাল*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **৩. ঢাল (ঢার)** = ধারারূপে ক্ষরিত বা পাতিত করা, প্রবাহিত করা, ঢালা (to pour), প্রচুর বিস্তার করা বা ছড়ান, পাত্র হইতে পাতিত করা, শিথিলভাবে পাতিত করা; খড়্গাদিঘাত-রোধার্থ ধাতুচর্ম্মময় ফলক; ক্রমনিম্ন স্থান (slope), পাশাখেলার নিমিত্ত ক্রমনিম্ন ফলক, প্রকার, রকম। **ঢালা** = ধারারূপে পাতিত করা ... ইত্যাদি; ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত, ঢালিয়া জমান, ঢালিয়া দেওয়ার মতো, দেদার, প্রচুর, গৃহতলব্যাপী, সুবিস্তৃত, স্রাবী, ঢালিয়া দেওয়া; ঢালার কাজ করান, ঢালান। **ঢালাই** = ঢালার কাজ, ছাঁচে ঢালিয়া পাত্রাদি প্রস্তুত করার কাজ, ঢালার মজুরী। **ঢালাইখানা** = ঢালাই করার কারখানা। **ঢালাও (ঢালোয়া)** = প্রচুর। **ঢালি, ঢালী** = ঢালযুক্ত, চর্ম্মী, ফলকধারী। **ঢালু** = অবসর্পী, প্রবণ, ক্রমনিম্ন (জমি)। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. গল** থেকে **গাল, ঢল** থেকে **ঢাল** — এরকম ক্ষেত্রে আমরা 'গল হইতে জাত', 'ঢল হইতে জাত' এইরূপ বাক্য ব্যবহার করেছি। **দশরথ** থেকে যেমন **দাশরথি** হয়, এও সেইরকম। **গাল**-এর ক্ষেত্রে এর ব্যাখ্যা আমরা কমবেশি দিয়েছি। **ঢল** থেকে জাত বলেই ঢেলে দেওয়াকে যেমন **ঢাল** বলে, আবার যেস্থান দিয়ে ঢেলে দেওয়া যায়, সেই স্থানকেও **ঢাল** বলে। বাংলাভাষীর মুখে মুখে স্থানের এই **ঢাল** অনায়াসে সেই স্থানের নাম রূপে খ্যাত হয়ে গেছে। বর্ধমান জেলায় যেমন 'পিচকুরির ঢাল', 'ঝাপটের ঢাল', 'নোয়াদার ঢাল' নামে বেশ কয়েকটি স্থানের নাম আছে। শহরে পরিণত হয়ে গেলে, **ভূমির স্বরূপ** হারিয়ে যায়। উপরোক্ত নামের স্থানগুলি দেখে এখন আর সেই **ঢালকে** চেনা যায় না, কিন্তু মানুষের ভাষায় তার চিহ্ন থেকে যায়, থেকে গেছে। এমনকি যুদ্ধে যে **ঢাল** ব্যবহৃত হয়, তাকেও একই কারণে ঢাল বলে; কেননা, অস্ত্রের আঘাত তাতে লেগে পিছলে ঢালা হয়ে যায়।

ঢিল, ঢিলা, ঢিলাঢালা, ঢিলাঢিলি, ঢিলামি, ঢিলামী, ঢিলেমি : ২. ***ঢিল*** *= ঢ গতিশীল হইয়া লালিত-লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে।* ***ঢিলা*** *=* ***ঢিল****-এর আধার যে।* ***ঢিলাঢালা*** *=* ***ঢিলা*** *ও* ***ঢালা****।* ***ঢিলাঢিলি*** *=* ***ঢিলা*** *ও ঢিলি (দ্র.* ***কেশাকেশি****)।* ***ঢিলামি*** *=* ***ঢিলা*** *গতিশীল হইয়া সীমায়িত থাকে যাহাতে।* ***ঢিলামী*** *=* ***ঢিলামি****-র আধার যে।* ***ঢিলেমি*** *=* ***ঢিল*** *দিশাগ্রস্তভাবে গতিশীল হইয়া সীমায়িত হয় যাহাতে।* **৩. ঢিল (ঢিলা)** = শিথিল, আলগা, শিথিলযত্ন, (ঢিল দেওয়া = শৈথিল্য করা, শিথিল করা); ডেলা (ঢিল মারা)। **ঢিলাঢালা** = অল্প ঢিলা। **ঢিলাঢিলি** = ঢিল মারামারি। **ঢিলামি** = আলস্য, জড়তা। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **টাট**। ঢিলা শব্দটি রবীন্দ্রনাথ প্রায় সর্বার্থে ব্যবহার করেছেন এবং ব.শ. উদাহরণ-বাক্যগুলি সেখান থেকেই নিয়েছেন। তার মধ্যে ঢিলামি শব্দের উচ্চতর ব্যবহারও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — 'প্রাচ্যের অত্যুক্তি মানসিক ঢিলামি'। অর্থাৎ, প্রাচ্যবাসীগণ যে অধিক কথা বলেন, সে তাদের মানসিক ঢিলেমির কারণেই বলেন। এই ঢিলেমি ধনসম্পদের বা আর্থিক উন্নতির বাধাস্বরূপ, কিন্তু মানসিক উন্নতির ও আত্মার তৃপ্তির সহায়ক। আজ আমরা জানি, ছোট-ইংরেজের স্বভাবে, দোকানদারিতে, স্পেশালাইজেশনে, শহরে, আধুনিকতায়, অ্যাকাডেমিতে এই 'মানসিক ঢিলেমি' থাকে না, রাখা হয় না, থাকলে তা আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়; আর সেজন্যেই আজকের শহুরে শিক্ষিত মানুষের আত্মা অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। বাইরে সে উল্লসিত, নৃত্যরত, মুগ্ধ, বিরক্ত, ক্রুদ্ধ, সর্বদা মার-মার কাট-কাট; ভিতরে তার আত্মা একটানা কেঁদে চলেছে। কারণ আজকের সমাজশাসকেরা 'মানসিক ঢিলামি'কে প্রশ্রয় দেন না। তাঁরা 'মানসিক-**কষণী**'র সমর্থক। মানুষের মনকে আইনের **কষণ**-দড়ি দিয়ে **কষে** বেঁধে কাঠ-কাঠ (আঁটসাঁট বা টাইট-টাইট) করে রাখতে পারলে তাঁদের শাসনের সুবিধা হয়, অর্থকরী সুবিধা হয়। এঁদের শাসনে মানুষের **কষ্ট** তো হবেই।

ঢুল, ঢুলঢুল, ঢুলা, ঢুলান, ঢুলানি(নী), ঢুলি(লী), ঢুলুঢুলু, ঢুলুনি : ২. ***ঢুল*** *= ঢ নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* ***ঢুলঢুল*** *=* ***ঢুল****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ঢুলা*** *=* ***ঢুল****-এর আধার যে।* ***ঢুলান*** *=* ***ঢুলা*** *অন যাহাতে।* ***ঢুলানি*** *=* ***ঢুলান*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ঢুলানী*** *=* ***ঢুলানির*** *আধার যে।* ***ঢুলি*** *=* ***ঢুল*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ঢুলী*** *=* ***ঢুলির*** *আধার যে।* ***ঢুলু*** *=* ***ঢুল*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***ঢুলুঢুলু*** *=* ***ঢুলু****-র পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***ঢুলুনি*** *=* ***ঢুলু*** *অন হইয়া গতিশীল যাহাতে। /* **ঢুলানী** = যে ঢুলায় বা তন্দ্রাজড়িমা জন্মায়। (ব.শ.)। **৩. ঢুল** = ভাবাবেশে আন্দোলিত হওয়া বা দোলা, ঝোলা, নেশায় বা তন্দ্রায় দোলা, ঘূর্ণিত হওয়া। **ঢুলঢুল** = নেশা তন্দ্রা বা ভাবাবেশে জড়িমাময় বা বিভোর (আঁখি, চোখ)। **ঢুলা** = আন্দোলিত করা, ব্যজন করা, চালিত করা, ঘুরান। **ঢুলান** = আন্দোলিত করা বা চালিত করা, আন্দোলন, চালন, দোলান। **ঢুলানি** = ঝুলান, লম্বভাব (hanging down)। **ঢুলি, ঢুলী** = ঢোলবাদক। **ঢুলুঢুলু** = তন্দ্রাবেশজড়িত, ঘুমঘোরে আবিষ্ট, নেশায় বিভোর, ভাবাবেশময়। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. ঢল, ঢাল, ঢিল** প্রভৃতি ক্ষেত্রে সত্তা নিজের থেকে বাইরে বেরোয় বা বেরোনোর উদ্যোগ নেয়, কিন্তু উ-কারের নিয়ম অনুসারে ক্রিয়াটি উলটো হওয়ার কথা, হয়ও। **ঢুল**-এর বেলায় দেখা যাচ্ছে, সত্তা আপনার ভেতর দিকে ফিরে আসে, নিজের ভিতরে নিজে ঢুকে গিয়ে নড়তে থাকে। একেই **ঢুলানি, ঢুলুনি** ইত্যাদি বলে। তবে **ঢোলবাদক**-কে **ঢুলী**

বলে অন্য কারণে। সম্ভবত সে তার বাদনের সাহায্যে এই **ঢুলুঢুলু** ভাবকে ঢুলতে সহায়তা করে। সেজন্যেই তার বাদ্যযন্ত্রটিকে **ঢুল** বা **ঢোল** বলে; অনেকটা **ঢাল**-এর (to pour, shield) মতো।

ঢের (অঢেল), ঢেরা (ঢ্যারা), ঢেরাসই, ঢেরি : ২. *ঢের = ঢ দিশাগ্রস্ত হয়ে রয় যাহাতে। (**অঢেল** = নেই ঢেল যাহার), **ঢেরা** = ঢের-এর আধার যে। (**ঢ্যারা** = ঢ-এর যাওয়া রহে যাহাতে তাহার আধার), **ঢেরাসই** = **ঢেরা** রূপ সহি বা সই যাহাতে। ঢেরি = **ঢের** গতিশীল যাহাতে।* **৩. ঢের** = অনেক, বহু, অধিক, প্রচুর (জল, দুধ), রাশীকৃত (জিনিস), গভীর, বহু লোক। **ঢেরা (ঢ্যারা)** = যোগ চিহ্নের (+) ন্যায় আড়ভাবে স্থাপিত দুই খণ্ড কাষ্ঠে রচিত দড়ি পাকাইবার যন্ত্রবিশেষ। **ঢেরাসহ** (ঢেরাসহি) = দলিলের উপর ঢেরার মত চিহ্ন, নিরক্ষর লোকে দলিলের উপরে নিজ হস্তে যে ঢেরাচিহ্ন (+) দেয়, সেই চিহ্নযুক্ত সহি। **ঢেরি** = অনেক, প্রচুর। (অঢেল = ঢের > ঢেল > অঢেল = ঢের, প্রচুর, অনেক।)। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** সংস্কৃতকারগণের সময়ে **র** ও **ল** অভেদ ছিল, সন্দেহ নেই। তার উত্তরাধিকার বাংলায় এখনও রয়েছে এই **ঢের** শব্দে। **অঢেল** শব্দের বেলায় **ঢেরই ঢেল** রূপ ধারণ করে **অমূল্য**র মতো **অঢেল** হয়ে যায়, যদিও **ঢেল** শব্দটির প্রচলনই হয়নি। 'ওখানে ঢের ঢের খাদ্যসম্ভার **ঢেরি** (জমে পাহাড়) হয়ে রয়েছে' — এরকম বাংলা বাক্য গ্রামবাংলায় আজও শুনতে পাওয়া যায়, 'প্রচুর' বোঝাতে 'অঢেল' শব্দেরও ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু **ঢেল** শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না।

তবে এই আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্য একটি ব্যাপার রয়েছে, তা হল 'ঢেরাচিহ্ন'। ইংরেজরা এটিকে বলেন plus। গ্রামবাংলায় চাষিবাসী মানুষেরা দিনের কাজের শেষে ঘরে ফিরে সন্ধ্যেবেলা কিংবা আশ্বিন-কার্ত্তিকের অতিবৃষ্টির অলস সময়ে **ঢেরা** নিয়ে শনের দড়ি তৈরি করতে (দড়ি কাটতে) বসেন। এই **ঢেরা** গ্রামবাংলার সব মানুষই চেনেন। কিন্তু তাকে **ঢেরা** বলে কেন, তা কেউই জানে না। **ঢের** মানে প্রচুর। তার আধার মানে 'প্রচুরধারক'। ঢেরাচিহ্নে বা যোগচিহ্নে **ঢের** বা প্রচুর হয়; কারণ ক্রমান্বয়ে যোগ হতে থাকে বলেই যোগচিহ্নে প্রচুর বা **ঢের** হয়। ঢেরাচিহ্ন বা যোগচিহ্ন তাই **ঢের**-এর আধার, বা **ঢেরা**। আর, **ঢেরায়** কাটা দড়ির পরিমাণের তো শেষ নেই। ছোট্ট কাঠের **ঢেরা** দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না, তার উৎপাদন ক্ষমতা কত! তা সে যাই হোক, আমরা কিন্তু জানি না, ইংরেজের বা আমাদের যোগচিহ্নের প্রকৃত উত্তরাধিকার ঠিক কোথা থেকে কীভাবে এসেছে।

ঢ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : ঢ, ঢ়, ঢং, ঢঙ, ঢক্কিনী, ঢঙ্গ, ঢঙ্গ-ঢাঙ্গাতি, ঢঙ্গা, ঢঙ্গি, ঢঙ্গিয়া, ঢঙ্গে, ঢনঢন, ঢনঢনিয়া, ঢনঢনে, ঢাঁচা, ঢাঁট, ঢাউস (ধাউস), ঢাঙ্গাইত, ঢাঙ্গাতি, ঢামালি, ঢি(ঢী)ট, ঢিঢি, ঢি(ধি)মা, ঢিমে, ঢুঁ, ঢুঁ-ঢুঁ, ঢুঁড়, ঢুঢু, ঢুণ্ঢ্, ঢুণ্ঢ, ঢুণ্ঢন, ঢুস, ঢেউ, ঢেঁটরা, ঢেঁড়শ, ঢেঁড়া, ঢেঁড়ি, ঢেঙা, ঢেঙ্গা, ঢেমচ, ঢেমসা, ঢেমন, ঢেমনা, ঢোঁড়, ঢোঁড়া, ঢোসর, ঢোসকা, ঢোসা।

ঢং, ঢঙ, ঢঙ্গ, ঢঙ্গ-ঢাঙ্গাতি, ঢঙ্গা, ঢঙ্গি, ঢঙ্গিয়া, ঢঙ্গে, ঢাঙ্গাইত, ঢাঙ্গাতি, ঢেঙা, ঢেঙ্গা : ২. ঢং *= ঢ-এর সম্পূর্ণ রহস্যরূপ যাহাতে। **ঢঙ** = ঢ-এর অংশীর রহস্যরূপ যাহাতে। **ঢঙ্গ** = **ঢং** গমন করে যাহাতে। **ঢঙ্গ-ঢাঙ্গাতি** = **ঢঙ্গ** ও **ঢাঙ্গাতি** (নিম্নে দ্রষ্টব্য)। **ঢঙ্গা** = ঢঙ্গ-এর আধার যে। **ঢঙ্গি** = **ঢঙ্গ** গতিশীল যাহাতে। **ঢঙ্গিয়া** = **ঢঙ্গি** যায় যাহাতে। **ঢঙ্গে** = **ঢঙ্গ**-এর দিশাগ্রস্ত গমন যাহাতে। **ঢাঙ্গা** = ঢঙ্গহইতে জাত যে তাহার আধার। **ঢাঙ্গাইত, ঢাঙ্গাতি** = **ঢাঙ্গা** গতিশীল হইয়া তারিত হয় যাহাতে। **ঢেঙা, ঢেঙ্গা** = দিশাগ্রস্ত ঢ-এর রহস্যরূপ গমন করে যাহাতে তাহার আধার।* **৩. ঢং, ঢঙ, ঢঙ্গ** = পদ্ধতি, রীতি, প্রণালী, প্রকার, রকম, ভাব, ভঙ্গি, নির্ম্মাণপ্রকার, গড়ন, ধাঁচা, অভিপ্রায়সাধনের পথ, উপায়, ব্যপদেশ, ছল, সজ্জা, সাজগোছ, রঙ্গ-ভঙ্গি, ধূর্ত্ততা, মায়া, ছলনা, ছদ্মবেশী, পাষণ্ড, বাহ্য বেশ, কৃত্রিম ভাব, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার; ঘণ্টার শব্দ, বাজা ঘড়ির শব্দ। **ঢঙ্গ-ঢাঙ্গাতি** = কপটবেশ ও উপদ্রব, পাষণ্ডতা ও অত্যাচার। **ঢঙ্গা** = লম্পটব্যবহার। **ঢঙ্গি, ঢঙ্গিয়া, ঢঙ্গে** = কপট, ধূর্ত্ত, চালবাজ, চালাক, রঙ্গরসপ্রিয়। **ঢাঙ্গাইত, ঢাঙ্গাতি** = কপটী, ধূর্ত্ত, চৌর্য্যবৃত্তি, চোর। **ঢেঙা, ঢেঙ্গা** = দীর্ঘজঙ্ঘ, লম্বা। (ব.শ.)। **৪.** অ্যাকাডেমিতে প্রচলিত না থাকলেও গ্রামবাংলায় শব্দগুলির প্রচলন আজও কমবেশি রয়েছে। **৫.** এই শব্দগুলির বিশেষত্ব লক্ষ্যণীয় যে, এগুলির গোড়ার দিকে পদ্ধতি বা 'রকমফের' জাতীয় অর্থ থাকলেও, যতই **ঢং** শব্দটির অগ্রগতি ঘটেছে ততই শব্দার্থগুলি 'রকমফের' থেকে ক্রমশ বেশি বেশি করে 'ফেরেব্বাজি'র দিকে এগিয়েছে। যতদূর অনুমান করা যায়, এর কারণ হল ঢ বর্ণের মূল অর্থের 'গোপনীয়তা' বা 'অন্তঃসার-শূন্যতা'। তবে **ভঙ্গ** বা **ভঙ্গি** শব্দের সাহায্য নিলে আমরা এই **ঢঙ্গ** বা **ঢঙ্গি** শব্দকে অনেকটাই বুঝে নিতে পারি। দ্র. **দৃষ্টিভঙ্গি**।

ঢিট, (ঢীট), ঢিঢি, ঢিমা (ধিমা), ঢিমে : ২. *ঢি = ঢ গতিশীল যাহাতে। **ঢিট** = ঢ গতিশীল হইয়া টঙ্কারিত হয় যাহাতে। **ঢিঢি** = ঢি-র পুনরাবৃত্তি যাহাতে। **ঢিমা** = ঢি সীমায়িত যাহাতে তাহার আধার। **ঢিমে** = ঢি সীমায়িত হয়ে দিশাগ্রস্ত যাহাতে। (**ধিমা** = গতিশীল ধারণ সীমায়িত হইয়া ধারিত যাহাতে।)* **৩. ঢিট (ঢীট)** = নির্লজ্জ, অশিষ্ট, চতুর, শঠ, দুর্বৃত্ত, (**ঢিটপনা** = চাতুরী, শঠতা, নির্লজ্জভাব, বেহায়াপনা)। **ঢিঢি** = ঢেঁটরার বাদ্য, ঢেঁটরার বাদ্যে ঘোষণা, ধিক-ধিক-কার, ছি-ছিক্কার, অকীর্ত্তি-ঘোষণা। **ঢিমা (ধিমা), ঢিমে** = ধীর, মন্দ, মন্থর (চাল), মৃদু (আঁচ, জ্বাল), বিলম্বিত, অলস, কুঁড়ে। (ঢিমে-তেতালা = সঙ্গীতে — চাতুর্ম্মাত্রিক তালবিশেষ।) (ব.শ.)। **৪.** অ্যাকাডেমির বাইরে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **টাট**।

ঢেউ : ২. *ঢ দিশাগ্রস্ত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **৩.** তরঙ্গ, তরঙ্গায়িত চিত্র, (সাদৃশ্যে) নতোন্নতভাব, উঠানামা, চিত্তের অব্যবস্থা, সাময়িক উত্তেজনা, হুজুক, কলঙ্ক রটনা; উদগারের শব্দ, ঢেকুর। (ব.শ.)। **৪.** wave অর্থে প্রচলিত। **৫.** ঢেউয়ের ভিতরে 'নতোন্নতভাব' রয়েছে, 'উঠানামা' রয়েছে বলেই **ঢেউ**-এর মধ্যে সৃষ্টিগুণ রয়েছে। তবে এর অধিক এই শব্দটির বিষয়ে আর কিছু

এখনও উদ্ধার করে উঠতে পারিনি আমরা। হয়তো ভবিষ্যতে পারা যাবে।

ঢেমন, ঢেমনা (ঢেমনী) : ২. *ঢেমন* = *ঢ দিশাগ্রস্ত* ও *সীমায়িত হয়ে অন থাকে যাহাতে।* ***ঢেমনা*** = ***ঢেমন****-এর আধার যে।* ***ঢেমনী*** = ***ঢেমন****-এর গতিশীল আধার যে।* **৩. ঢেমন** = অসচ্চরিত্র ব্যক্তি, লম্পট, গালিবিশেষ। **ঢেমনা** = দাঁড়াশ সাপ, সর্পসঙ্গমে দাঁড়াশ পুরুষ, তজ্জন্য 'ঢেমনা' (?)। **ঢেমনী** = উপপত্নী। (ঢেমনীবাজ = উপপত্নীপ্রিয়, লম্পট। ঢেমনীবাজী = লাম্পট্য)। (ব.শ.)। **৪.** শহরে ও অ্যাকাডেমিতে 'অশ্লীল' শব্দ রূপে বর্জিত, যদিও গ্রামবাংলায় যথারীতি প্রচলিত। **৫.** শব্দগুলির বিশেষত্ব এই যে, এদের অর্থ যেরূপ মানুষের কথা বলে, সেরূপ মানুষের সংখ্যা শহরে, অ্যাকাডেমিতে, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ও মার্কিন সংস্কৃতিতে সবচেয়ে বেশি। দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের মানবসমাজের সেই অংশগুলিতেই শব্দগুলি অশ্লীল রূপে নিন্দনীয় ও বর্জিত হয়েছে। আর, তাজ্জবের কথা এই যে, গ্রামবাংলায় ঐরূপ মানুষের সংখ্যা তুলনায় কম, সেখানেই ঐ অশ্লীল শব্দগুলি আজও কমবেশি প্রচলিত। সেখানে ঐসকল শব্দোচ্চারণে কোনো নিষেধ নেই। লোকে শব্দোল্লিখিত ব্যাপারকে মন্দ মনে করে, কিন্তু সে বিষয়ে কথা বলাকে নিষিদ্ধ করার কথা ভাবে না।

ত

ত্ বর্ণের অর্থ : (**ট্ বর্ণের অর্থ** দেখুন)। ত = ত্-অন করে যে; তারী। এই তারী যে-কোনো সত্তাকে বোঝাতে পারে, যদি সে তরণ করে। তরণ করা কীরূপ ক্রিয়া সহসা মনে পড়ে না, কিন্তু উত্তরণ করা কথাটি আমরা সহজে মনে করতে পারি। একটু উপরে উঠে তরণ করাকে বলে উত্তরণ করা। উপরে না উঠে যে সম-তরণ বা সন্তরণ ক্রিয়া করা হয়, তাকেই তরণ করা বলে। যে তা করে, তাকেই এখানে **তারী** বলা হচ্ছে; ঠিক যেভাবে আমরা **কারী** ও **চারী**কে চিনেছি। **ক ও চ বর্ণের অর্থ** দ্রষ্টব্য।

যে তরণ ক'রে (সন্তরণ ক'রে) চলে যায় বা তারিত হয়, তাকে তারী বলা হচ্ছে। এর স্বরূপ হল — মূল সত্তা বা তার একটি অংশ তার আপন পরিধি পেরিয়ে চলে যাচ্ছে, লাউডগার মতো, যেনবা সাঁতার কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। একেই তরণ বলে। ত বর্ণ এই তরণ ক্রিয়ার ধারক।

এখানে মনে রাখা দরকার, পৃথিবীর বহু ভাষায় ট-বর্গটি নেই, রয়েছে কেবল ত-বর্গটি, যেমন ইতালি, ফরাসি, জাপানি প্রভৃতি। ফলে ট-বর্গের ক্রিয়াগুলি সবই তাদের ত-বর্গে স্থান করে নিয়েছে। যাই হোক, আপাতত শব্দার্থ নিষ্কাশনের কাজ চালানোর জন্য আমরা খুব নমনীয় একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি এভাবে — **ত** = ত্-অন্ *(on) করে যে = তরণকারী = তারী; ত-এর আধার যে =* ***তা****; ত গতিশীল যাহাতে =* ***তি****; তি-এর আধার যে =* ***তী****; ত নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে =* ***তু****; তু-এর আধার যে =* ***তূ****; ... ইত্যাদি। দ্র.* **ক**।

ত্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : তক্ষ্, তট্ (তড়্), তন্ (তঙ্ক্, তঞ্চ্), তপ্, তম্, তর্ (তর্ক্, তর্জ্), তল্, *তি (তিজ্, তিল্)*, তু (তুদ্, তুর্, তুল্, তুষ্), তৃ (তৃপ্, তৃষ্, তৃ,, *তারি)*, ত্য (ত্যক্, ত্যজ্), ত্র (ত্রপ্, ত্রস্, ত্রৈ), ত্ব (ত্বর্), ত্ = ১৩ + ১

তক্ষ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : তক্ষ্, তক্ষ, তক্ষক, তক্ষণ, তক্ষশীলা, তক্ষা।

তক্ষ্ = তারীর **ক্ষ** (খিমচে নেওয়া, চাঁছা, খাবলানো) অন। **তক্ষ** = তারীর **ক্ষ**-অন থাকে যাহাতে।

তক্ষ্, তক্ষক, তক্ষণ, তক্ষণী, তক্ষা (তক্ষন্) : ১. তক্ষ্ = ✓তক্ষ্ = তনুকরণ, চাঁছা, ছোলা; আচ্ছাদন। তক্ষক = ✓তক্ষ্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। তক্ষণ = ✓তক্ষ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। তক্ষণী = ✓তক্ষ্ + অন-ণ + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। তক্ষা (তক্ষন্) = ✓তক্ষ্ + অন্ (কনি) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **তক্ষ্** = *(ত-অন করণ ও অতীত বিস্মরণ) ত-করণ দিশাগ্রস্ত ও ফলত অতীত বিস্মরণ।* ***তক্ষ*** *= তারিত করণ দিশাগ্রস্ত (ও বিস্মৃত) যাহাতে।* ***তক্ষণ*** *=* ***তক্ষ*** *অন যাহাতে।* ***তক্ষণী*** *=* ***তক্ষণ*** *গতিশীল হইয়া ধারিত থাকে যাহাতে।* ***তক্ষা*** *=* ***তক্ষ****-এর আধার যে।* / **তক্ষণী** = যাহার দ্বারা তক্ষণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. তক্ষক** = তনুকারক, ছেত্তা, বিশ্বকর্ম্মা, সূত্রধর, ছুতার (সূচক হইতে বিপ্রকন্যায় ইহাদের উৎপত্তি), (নাটকে) সূত্রধার, অষ্টনাগের একতম (ইনি কদ্রুগর্ভজাত কশ্যপপুত্র এবং ইন্দ্রের বন্ধু। ইনি শৃঙ্গিশাপে পরীক্ষিৎকে দংশন করেন এবং জনমেজয়ের সর্পসত্রে প্রাণরক্ষার্থ ইন্দ্রের শরণাপন্ন হন ও আস্তীক কর্তৃক রক্ষিত হন। ইনি ক্ষপণকবেশে উত্তঙ্কের (উতঙ্কের) নিকট হইতে গুরু-দক্ষিণার্থলব্ধ কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করেন। (ব.শ.)। প্রধান অষ্টনাগের মধ্যে তক্ষক অন্যতম। পুরাণমতে অষ্টনাগের মধ্যে শেষ, বাসুকি ও তক্ষক — এই তিনজন প্রধান। ইনি নাগরাজ বাসুকির ভ্রাতা এবং অনন্তনাগ নামেও প্রসিদ্ধ। ... এর বাসস্থান ছিল খাণ্ডববনে। ... খাণ্ডবদহন কালে তক্ষক তথায় অনুপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্র পলায়নকালে অর্জুনের শরে বিদ্ধ হন। ফলে, অর্জুন তার শত্রুপদবাচ্য হয়ে পড়েন। ... শৃঙ্গীর অভিশাপ অনুসারে কীটরূপী তক্ষক অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে দংশন করেন। ... উপাধ্যায় বেদের শিষ্য উতঙ্ক যখন গুরুদক্ষিণাস্বরূপ রাজা পৌষ্যের রাণীর নিকট হতে উপাধ্যায়িনীর জন্য মণিকুণ্ডল নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তক্ষক ঐ কুণ্ডল হরণ করেন। উতঙ্ক তক্ষকের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বিনাশের জন্য (পরীক্ষিৎপুত্র) রাজা জনমেজয়কে উত্তেজিত করেন। ... জনমেজয় সর্পসত্রের আয়োজন করেন। ... আস্তীকের কৌশলে ... যজ্ঞাগ্নিতে পতনোন্মুখ তক্ষক ও অবশিষ্ট নাগকুল রক্ষা পায়। (পৌ.অ.)। তক্ষণ = তনুকরণ, চাঁছা। তক্ষণী = বাসী বস্ত্র। তক্ষা = সূত্রধর, ছুতার, বিশ্বকর্ম্মা, তক্ষদেবতাক চিত্রানক্ষত্র, কাষ্ঠচ্ছেদকমাত্র। (ব.শ.)। **৪.** snake অর্থে তক্ষক শব্দটি কমবেশি প্রচলিত। বাকি অপ্রচলিত। **৫.** নিম্নে **তক্ষ** দ্রষ্টব্য।

তক্ষ, তক্ষশীলা : ১. ✓তক্ষ্‌ = তনুকরণ, চাঁছা, ছোলা। (ব.শ.)। ২. **তক্ষ** = *তারীর* **ক্ষ**-*অন থাকে যাহাতে।* **তক্ষশীলা** = *তক্ষণ-ক্রিয়ার শীলন চলে যাহাতে বা যেখানে।* ৩. **তক্ষ** = সূত্রধার, রামের ভ্রাতা ভরতের জ্যেষ্ঠপুত্র। (ব.শ.)। দশরথের পৌত্র ও ভরতের অন্যতম পুত্র। ভরত গান্ধার দেশ জয় করে নিজের পুত্র তক্ষের নামানুসারে তক্ষশীলা ও পুষ্কলের নামানুসারে পুষ্কলাবত নগর স্থাপন করেন। (পৌ.অ.)। **তক্ষশীলা** = প্রস্তর কেটে যে নগরী নির্মিত হয়েছে। পাঞ্জাবের একটি প্রাচীন নগর ও প্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। রাজা জনমেজয় এই নগরীতে সর্পযজ্ঞ করেছিলেন। ভরতের পুত্র তক্ষের নামানুসারে এই স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়। মহাভারতের মতে এই স্থান গান্ধারের মধ্যে। এই নগরীর ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান। বর্তমানে ইহা পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। এইস্থানে এখনও বহু বৌদ্ধমন্দির ও ভগ্নস্তূপ দৃষ্ট হয়। (পৌ.অ.)। ৪. 'তক্ষশীলা' প্রতীকী স্থাননাম রূপে প্রচলিত, যেন শব্দটির নিজস্ব কোনো মানে নেই। ৫. গ্রামবাংলায় — যে-সাপের লেজ খসে খসে খুব ছোট হয়ে যাওয়ার পর পাখনা বেরিয়ে যায়, তখন সে নাকি উড়তে পারে এবং 'তক্ষ্‌' 'তক্ষ্‌' আওয়াজ করে, সেইরূপ সাপকে **তক্ষক** বলে। এ-জন্তুটি আমরা কোনোদিন দেখিনি, লোকে বলে। তবে, **তক্ষক** ও **তক্ষা** নিয়ে আমাদের পুরাণে বহু কথা রয়েছে। কিন্তু মূলে বিরাজিত **তক্ষ** শব্দটির অর্থবিস্মৃতির কারণে শব্দগুলি এখন প্রায় অপ্রচলিত। অতএব প্রশ্ন হল, **তক্ষ** শব্দের দ্বারা কী-এমন ক্রিয়াকে বোঝানো হত যে, তাতে একই সঙ্গে সাপ, সূত্রধর, সূত্রধার, ছুতার, বিশ্বকর্ম্মা, তক্ষক-নাগ, তক্ষশীলার মহাবিদ্যালয় — সব কিছুকেই বোঝানো সম্ভব হত?

আসলে **তক্ষ** শব্দটির ভিতরে ছিল 'তরণপূর্ব্বক **ক্ষ**-অন' করা। এই **ক্ষ** হল এমন একপ্রকার করণ, যা পুনরাবৃত্ত হওয়ার কারণে দুরকম ফল প্রদান করে। প্রথমত একদিকে যেমন একই কর্মের পুনবাবৃত্তি করে এবং ফলে করণক্রিয়াটি দিশাগ্রস্ত (**ষ্‌**) হয়ে যায়; অন্যদিকে তেমনি পূর্বতন পরিস্থিতির বিস্মরণ ঘটায়। কাঠের উপর এই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি চললে কাঠ পরিণত হয় আসবাবে, কাঠের আসল রূপকে তখন আমরা ভুলে যাই। এই কাজটি করে যে তাকে সেকারণেই **তক্ষক** বা ছেত্তা বলে। কিন্তু তাকে **সূত্রধর** বলে অন্য কারণে। কাঠকে আসবাবে রূপান্তরিত করার জন্য মাথায় থাকে পরিকল্পনা, হাতে থাকে হাতিয়ার, সামনে থাকে কাঠ। হাতিয়ারের সাহায্যে কাঠটিকে পরিকল্পিত স্বপ্নে উত্তীর্ণ করানো হয়। এই কাজটি যে করে, সে সমগ্র কল্পনার সূত্রটি ধারণ করে, তদনুসারে কাঠটিকে আপন শ্রম ও মেধার দ্বারা ক্রমে পরিবর্তিত করে থাকে। তাই সে **সূত্রধর**। কিন্তু সেই পরিকল্পিত ব্যাপারটি যদি কাঠের আসবাব না হয়ে কোনো বিষয়ের নাট্যরূপায়ণ হয়, তখন **সূত্রধর** হন নাট্যকার স্বয়ং এবং সেই নাটকের সূত্রপাতে যিনি নাটকটির গতিবিধি ধরে রাখেন, তিনি হন **সূত্রধার**।

এ তো গেল **তক্ষ** শব্দের দৃশ্য অর্থ। কিন্তু অদৃশ্য জগতে **তক্ষ** শব্দের অর্থ জানতে গেলে আমাদেরকে অদৃশ্য জগতে যেতে হবে। অন্তত দুটি ক্ষেত্রে আমরা 'তরণপূর্ব্বক ক্ষ-অন' কর্মটিকে সক্রিয় থাকতে দেখি। প্রথম হল আমাদের **জ্ঞান** অর্জনের ক্ষেত্র এবং দ্বিতীয় হল ধন অর্জনের **ক্ষেত্র**। **দ্র. জানা, জ্ঞ, জ্ঞাত, জ্ঞান**। একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি অনুসরণ করে একই প্রকার **জানা** বা **জ্ঞ** ক্রমান্বয়ে চালিয়ে গেলে যে-জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাসমূহ লাভ হয় তা যেমন **তক্ষণ** পদবাচ্য তেমনি একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি অনুসরণ করে পাইকারি হারে একই প্রকার উৎপাদন চালিয়ে গেলেও সেই প্রকার **তক্ষণ** কর্মই হয়; আর যারা সেকাজ করে, তারা 'সরপালনকারী সর্প'তে পরিণত হয়। এই সব সমাজের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ উভয়ই হতে পারে এবং তাকে মানবসমাজের '**দুধসর**' বলে, যা পালন করে জ্ঞানবান ও ধনবানরা। শব্দের নিয়মে এই দুধসরের প্রতিপালকদের **সর্প** বলার কথা। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, জ্ঞানসম্পদের মজুতদারকে সর্প বলা হত না। আমরা দেখছি, পৌরাণিক বর্ণনায় মূলত ধনপতিদের পরিকল্পক সত্তাকে নাগশ্রেষ্ঠ বা **তক্ষক** বলা হত। প্রাচীন ভারতে এদের সঙ্গে বিদ্রোহীদের যে যুদ্ধ হয় তাকেই **জনমেজয়ের সর্পসত্র** বলা হয়েছে। ...

আর, **বিশ্বকর্ম্মাকে তক্ষা** বলা হত এই জন্য যে, কাঁচামালে শ্রম প্রবেশ (**বিশ্‌**) করানোর **কর্ম** করা (**কর্ম্ম**) হয় বলে এই কর্ম্মকারী-সত্তাটি একই সঙ্গে 'বিশ্বকর্ম্মা'ই বটে! আর, এই কর্ম্মের মূল জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার চর্চা যেখানে করা হত, তাকে বলা হত **তক্ষশীলা;** কারণ সেখানে **তক্ষণ** বিষয়ক জ্ঞানের অনু**শীলন** করা হত। তবে, পাথর কেটে নগরী বানানো হয়ে থাকলে, তার নাম হতে পারত **তক্ষশিলা**; এ-তক্ষশিলার বানানটাই আলাদা। মনে রাখা ভাল, বিশ্বের আদি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল **তক্ষশীলা**। একালের প্রতীকী ইতিহাস অনুসারে **তক্ষশীলা** বিশ্ববিদ্যালয় মহারাজ অশোকের কালে নির্মিত। আর পৌরাণিক ইতিহাস অনুসারে শহরটি **ভরতের** হাতে নির্মিত। বাস্তবে, তক্ষশীলা স্থানটি **গান্ধার** (কান্দাহার) দেশে অবস্থিত এবং সেখানে বৌদ্ধযুগের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান রয়েছে; যদিও মার্কিনী-বুশ সাহেবের সঙ্গে আফগানি-তালিবানদের যুদ্ধের ফলে সেই ধ্বংসাবশেষের বিপুল ক্ষতি হয়েছে; তথাপি এখনও ছিটেফোঁটা রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

তবে **ভরতের** পুত্রকে কেন **তক্ষ** বলা হত, তার রহস্য ভিন্ন। **ভরত** হলেন সেই সত্তা যা কিনা মানুষকে তার ভরণপোষণ সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ করে। **নগদ নারায়ণ** (পুঁজি বা ক্যাপিটাল) যখন রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, এই চার (অর্থাৎ যথাক্রমে finance capital, fixed capital, subsistence money, foreign money) রূপে অবতীর্ণ, তখন **ভরত** বা subsistence money-র সন্তান রূপে জন্মায় খাজনা বা কর অর্থাৎ **তক্ষ** বা tax-money। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলকাতা কর্পোরেশনকে **ভরত** বা subsistence money দিয়ে থাকে, পরিবর্তে tax বসিয়ে তার কিছু-পরিমাণ উদ্ধার করার অধিকার তার স্বভাবতই জন্মে যায়। তাই **ভরতের** পুত্র হল **তক্ষ**। ৬. ইংরেজি tax।

তট্‌ (তড়্‌) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আস্তাড়, তট্‌, তট, তটস্থ, তটাক, তটাঘাত, তটিনী, তড়্‌, তড়, তড়কা, তড়তড়, তড়বড়, তড়াক, তড়াগ, তড়াতড়, তড়াৎ, তড়ি, তড়িঘড়ি,

তড়িৎ, তড়িত, তড়িত্বান, তড়িদ্‌গর্ভ, তড়িদ্দাম, তড়িন্ময়, তড়িল্লতা, তড়িল্লেখা, তড়োয়া, তাটক, তাটকা, তাট(ড়)স্ত, তাটস্থ্য, তাড়, তাড়(ট)কা, তাড়ঙ্ক, তাড়ন, তাড়না, তাড়নী, তাড়নীয়, তাড়পত্র, তাড়বলয়া, তাড়বালা, তাড়সে, তাড়া, তাড়াতাড়ি, তাড়ান, তাড়াহুড়া, তাড়াহুড়ি, তাড়াহুড়ো, তাড়ি(ড়ী), তাড়িত, তাড়ি(ড়ী)পত্র, তাড়িফল, তাড়ু, তাড্য, তাড্যমান, দড়কা।

তট্ (তড়্) = তারীর টঙ্কারণ। **তট** = তারী টঙ্কারিত হয় যাহাতে। **তড়** = তারীর উড়ান-গড়ান থাকে যাহাতে।

তট, তটস্থ, তটিনী : ১. তট = ✓তট্ (উচ্ছ্রায়) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। তটস্থ = তট + অ ✓স্থা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। তটিনী = তট + ইন্ (ইনি) অস্ত্যর্থে + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। (ব.শ.)। **২.** *তট = তারী টঙ্কারিত যাহাতে বা যেখানে। তটস্থ = তটে স্থিত (বা থাকে) যে। তটিনী = তট গতিশীল হইয়া না করণ হয় যে আধারে, বা তট আছে যে স্ত্রী আধারের।* / **তটস্থ** = তটে স্থিত যে; কিংবা, যাহাতে বাদি-প্রতিবাদী ভাব নাই। **তটিনী** = প্রশস্ত তট আছে যাহার (যে আধারশক্তির)। (ব.শ.)। **৩. তট** = উচ্চস্থান, প্রবণ ভূমি (slope), আকাশ, 'সর্বোচ্চ', মহাদেব, বেলা, তীর, কূল, উপান্ত, সানু, অবয়বের প্রবণ ভাগ। **তটস্থ** = তটে স্থিত, তীরবর্ত্তী, কূলস্থ, বাদিপ্রতিবাদিভাবশূন্য, অপক্ষপাত, উদাসীন, সমীপস্থ, অ-স্বরূপ, লক্ষণবিশেষ (লক্ষণ দ্বিবিধ — স্বরূপ ও তটস্থ। স্বরূপই লক্ষণ, স্বরূপলক্ষণ; যেমন, সত্যজ্ঞান অনন্ত, ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। তটস্থলক্ষণ লক্ষ্যের ইতরব্যাবর্ত্তক বিশেষণ বা ধর্ম্ম; যেমন, জগৎকর্ত্তৃত্বাদি ব্রহ্মের তটস্থলক্ষণ। এইরূপ পৃথিবীর গন্ধবত্ত্ব তটস্থলক্ষণ।); ভীত, চকিত, ভয়ে শশব্যস্ত, ভয়ে জড়সড়। **তটিনী** = নদী। (ব.শ.)। **৪.** edge অর্থে তট, afraid অর্থে তটস্থ প্রচলিত। তটিনী শব্দটি অ্যাকাডেমিক জগতে 'নদী' অর্থে প্রচলিত। **৫.** প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বের কেন্দ্র থেকে তার পরিধিতে গিয়ে তরণ বা 'তারী টঙ্কারিত হয়' বলে, একটি অস্তিত্বের শেষসীমাকে **তট** বলে। সেই নিয়মেই নদীর জলের শেষসীমাকে, অর্থাৎ জল ও স্থলের সংযোগস্থলকে **তট** বলে। তাই **তট** শব্দে বেলা, তীর, কূল, উপান্ত ... ইত্যাদিকে বোঝায়। এখানেই অস্তিত্বের আপন স্বরূপের শেষ বা **অ-স্বরূপ**। এখানেই সে অন্য কোনো অস্তিত্বের **সমীপস্থ**, এখানেই সে কোনো পক্ষেই নাও থাকতে পারে বা **অ-পক্ষপাতী, উদাসীন, বাদিপ্রতিবাদিভাবশূন্য** হতে পারে। এই ভাবে অস্তিত্বের পরিধিতে বা শেষসীমায় থাকা মানেই **তট**-এ থাকা বা **তটস্থ** থাকা। এরকম থাকা ভয়াবহ, কেননা, আপন চেনা জগতের এমন স্থানের ঠিক পরেই ভয়াবহ খাদ থাকতে পারে। ভাল কিছু থাকলেও থাকতে পারে, তবে সেকথা **তটস্থের** জানা নেই; কারণ তার পর থেকেই অজানা-অচেনা জগতের শুরু। এই কারণে **তটস্থ** শব্দটিকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ অতি বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ ও প্রয়োগ করে গেছেন। আপন অস্তিত্বের ভেতরে থাকাকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন **'স্বরূপ'-এ থাকা**; এবং আপন অস্তিত্বের **তট**-এ থাকাকে তাঁরা নাম দিয়েছিলেন **তটস্থ থাকা**। এই তটস্থ থাকা মানে এমন এক সন্ধিরেখায় থাকা, যেখান থেকে একদিকে রয়েছে নিজস্ব চেনা-জানা-শুভ এলাকা এবং অপরদিকে রয়েছে অচেনা-অজানা এবং হয়তো-বা অশুভ এলাকা। মোটকথা, এই অবস্থান হল অনিশ্চয়তার এলাকা, তাই ভয়েরও এলাকা। তাই, অস্তিত্বের বাইরে থেকে কেউ যদি তাকে দেখে, তখন সে তার **তটস্থলক্ষণ** দেখতে পায়। ... এখানে আর একটি কথা বলে রাখা যেতে পারে। 'পৃথিবীর গন্ধবত্ত্ব তটস্থলক্ষণ' কথাটির সামাজিক অর্থ হল, আদিম সমাজতান্ত্রিক বা বৈদিক ব্যবস্থার 'তটস্থলক্ষণ' ছিল তার গন্ধবত্ত্ব, অর্থাৎ সম্পদের **গন্ধ**। ...

তড়, তড়তড়, তড়বড়, তড়াক (তড়াগ), তড়ি, তড়িঘড়ি, তড়িৎ : ২. *তড় = তারীর উড়ান-গড়ান যাহাতে। তড়তড় = তড়-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। তড়বড় = তড় ও বড় (বাহকের উড়ান-গড়ান যাহাতে)। তড়াক = তড়-এর আধার কৃত যাহাতে। (তড়াগ = তড়-এর আধার গত যাহাতে।)। তড়ি = তড় গতিশীল যাহাতে। তড়িঘড়ি = তড়ি ও ঘড়ি (দ্র. ঘট, ঘটিকা, ঘড়)। তড়িৎ = তড়ি-র তারণ যাহাতে।* / **তড়িৎ** = যাহা দৃষ্টি আহত করে। (ব.শ.)। **৩. তড়** = আঘাত, তাড়ন, তট, তীর, স্থল, স্থলপথ। **তড়তড়** = তাড়াতাড়ি, শিলাপতনের শব্দ, বৃষ্টিপাতের শব্দ, তড়তড় শব্দে বৃষ্টিধারাপাত। **তড়বড়** = শিলাপতনের শব্দ, দ্রুত অশ্বপদ-শব্দ, শীঘ্র কথা বলার জন্য জড়িতভাব। **তড়াক (তড়াগ)** = নদী-সমুদ্রের তটভাগ, ত্বরা, তাড়াতাড়ি, সপদ্ম অগাধ জলাশয়, পদ্মাকর, অগাধ মহাজলাশয়, পঞ্চশতধনুঃপরিমিত জলাশয়, প্রসিদ্ধ সরঃ। **তড়ি** = তড়িৎ, ক্ষিপ্রতা। **তড়িঘড়ি** = ত্বরান্বিত কালে, অল্পক্ষণে, ত্বরান্বিতভাবে, শীঘ্র। **তড়িৎ** = বিদ্যুৎ। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ থেকে সমস্ত প্রতীকী অর্থে পৌঁছনো গেলেও, **তড়, তড়িঘড়ি, তড়িৎ** প্রভৃতি শব্দের ভেতরে যে 'quick' ভাবটি আছে, তা আসে কোথা থেকে, তা চট করে বোঝা যায় না। এমনকি পরে **তাড়াতাড়ি** শব্দের মূলেও এই 'quick' ভাবটি নেই। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ভাবটি রয়েছে **তড়** শব্দের ভেতরেই, এবং সেখান থেকেই তা চুঁইয়ে **তড়**-জাত শব্দগুলির ভিতরে, এমনকি **তাড়াতাড়ি**র ভিতরেও, ঢুকে গেছে।

এ প্রসঙ্গে যতটুকু অনুমান করা যায়, তা হল এই যে, ত (= তারী) তরণ ক'রে চলে, সন্তরণ ক'রে চলে। সেই তরণ (ত্) দ্রুত হতে হতে উড়তে (ড়) শুরু করলেই **তড়** হয়ে যায়। বিষয়টি সাইকেল, বিমান ও হোভারক্র্যাফটের চালকেরা অবশ্যই বুঝতে পারবেন। তাঁরা জানেন, তরণ থেকে একটি বিশেষ দ্রুততায় উঠতে না পারলে, তাঁদের গড়ান-উড়ান হতেই পারে না। অর্থাৎ কিনা, **তড়** (= তারীর উড়ান) হওয়া মানেই দ্রুত হওয়া। এই দ্রুততার ভাবটিই ঢুকে গেছে **তড়িঘড়ি, তাড়াতাড়ি** প্রভৃতি শব্দের ভিতরে। **৬.** ইংরেজি torrid।

তাড়, তাড়ন, তাড়না, তাড়নী, তাড়নীয়, তাড়সে, তাড়া, তাড়াতাড়ি, তাড়ান, তাড়াহুড়া, তাড়াহুড়ি, তাড়াহুড়ো, তাড়ি (তাড়ী), তাড়িত, তাড়ু (তাঁড় /টাড়) : ২. *তাড় = তড় হইতে জাত। তাড়ন = তাড় অন যাহাতে। তাড়না = তাড়ন-এর আধার*

*যে। **তাড়নী** = **তাড়ন** গতিশীল রূপে ধারিত যাহাতে। **তাড়নীয়** = **তাড়নী** যায় যাহাতে বা যেখানে। **তাড়সে** = **তাড়**-এর অস্তিত্ব দিশাগ্রস্ত যাহাতে। **তাড়া** = **তাড়**-এর আধার যে। **তাড়াতাড়ি** = **তাড়া** ও **তাড়ি** (দ্র. **কেশাকেশি**)। **তাড়ান** = **তাড়া** অন যাহাতে। তাড়াহুড়া (তাড়াহুড়ি, তাড়াহুড়ো) = **তাড়া** ও **হুড়া, ... হুড়ি, ... হুড়ো**। (দ্র. **হুড়**)। **তাড়ি** = **তাড়** গতিশীল যাহাতে। **তাড়ী** = **তাড়ি**-র আধার যে। **তাড়িত** = **তাড়** গতিশীল হইয়া তারিত হয় যাহাতে। **তাড়ু** = **তাড়** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। (**তাঁড়** = তারীর রহস্যরূপের আধার গড়ায় যাহাতে। **টাঁড়** = টঙ্কারীর রহস্যরূপের আধার গড়ায় যাহাতে।)* / **তাড়নী** = যাহার দ্বারা অশ্বাদি তাড়ন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. তাড়** = তাড়ন, আঘাত, প্রহার, (তাড়নজন্য) শব্দ, ধ্বনি, তাড়া, পৰ্ব্বত, হস্তাভরণবিশেষ, তাড়বালা, তাড়িত করা, আঘাত করা, তাড়া বা আক্রমণ করা, বিদীর্ণ করা, বিদারণার্থ প্রবেশ করা, গলনালী তাড়িত করা, গলা খেঁকার দেওয়া, তাড়ু দিয়া তাড়িত করা বা ঘোঁটা, প্রহার করা, মারপিট করিয়া ভাগান, আক্রমণার্থ অনুধাবন করা, দূর করা, দূর করা, আঘাতে চালিত করা, তাড়াইয়া যাওয়া (তেড়ে ফুঁড়ে উঠা, তেড়ে যাওয়া)। **তাড়ন** = আঘাত, প্রহার, শাসন, দীক্ষাঙ্গে দীক্ষণীয় মন্ত্রসংস্কারভেদ, গুণন, অস্ত্রবিশেষ। **তাড়না** = আঘাত। **তাড়নী** = কশা, চাবুক। **তাড়নীয়** = আহননীয়। **তাড়সে** = তাড়নায়, শাসনে, প্রভাবে, প্রচণ্ডতায়, বেদনার তীব্রতায়। **তাড়া** = তাড়িত করা ইত্যাদি, ধমক, শাসন, আক্রমণ, আক্রমণার্থ পশ্চাদ্ধাবন, আক্রমণের ভয় দেখান, গোছা, বাণ্ডিল, আঁটি, ত্বরা, ক্ষিপ্র, শীঘ্র করার নিমিত্ত পীড়ন, (তাড়াবন্দি — গুচ্ছবন্ধন, বাণ্ডিল বাঁধা)। **তাড়াতাড়ি** = পরস্পর তাড়ন বা আঘাত, সকলের সমবেতভাবে তাড়না বা আক্রমণ, তাড়া বা ধমক, অত্যন্ত তাড়নাপূৰ্ব্বক, অতিশীঘ্র। **তাড়ান** = তাড়িত, দূরীকৃত, বহিষ্কৃত। **তাড়াহুড়া (তাড়াহুড়ি)** = 'তাড়না ও ঝগড়া', তাড়াতাড়ি, শীঘ্র কার্য্য করিবার জন্য পীড়ন। **তাড়ি (তাড়ী)** = তালবৃক্ষবিশেষ, আভরণ-বিশেষ, গাঁজান তাল বা খেজুরের রসের মদ্যবিশেষ (toddy)। **তাড়িত** = আহত, আস্ফালিত, ব্যথিত, দূরীকৃত, বহিষ্কৃত; তড়িৎ-সম্বন্ধী, বৈদ্যুত। **তাড়ু** = ভিয়েনে ব্যবহাৰ্য্য কাঠের চেপটা-মুখ হাতলবিশেষ। (ব.শ.)। **৪. তাড়** ও **তাড়**-সংশ্লিষ্ট শব্দ ব্যাপক ভাবে প্রচলিত। আর **তাঁড়** বা **টাঁড়** মেদিনীপুর-পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলার পাহাড়-সংলগ্ন সমভূমি অঞ্চলে প্রচলিত। **৫.** কোনো অভিধানেই **তাঁড়** বা **টাঁড়** শব্দটি পাওয়া যায় না। বাংলাভাষার নিজস্ব অর্জন এই তাঁড় বা **তাড়** শব্দ। যেহেতু এর মূলের ক্রিয়াভিত্তিকতা অবিকল রয়েছে, সেই কারণে শব্দটি এত বিচিত্র অর্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে পেরেছে। গ্রামবাংলায় মাটি **তাড়া** মানে মাটি বিদীর্ণ করা। কোনো স্থানে কোদাল দিয়ে মাটি কেটে তুলে ডাইনে বাঁয়ে রাখা হলে, সেই **তেড়ে** তোলা মাটিকে বলে 'তাড়া-মাটি'। তবে সেই তাড়া ক্রিয়াটি মাটিতে না চালিয়ে কাগজের স্তূপে চালালে, তেড়ে তোলা এক-খাবলা কাগজকে বলে 'এক-তাড়া' কাগজ। এই **তাড়া** স্বভাবতই এক গুচ্ছ কাগজকে বোঝায়।

তবে, তাঁড় বা টাঁড় জমি বলতে লোকে সেই লালমাটি-পাথর মেশান সমভূমিকে বোঝে, যেখানে চাষাবাদ করার জন্য মাটি তেড়ে সমান করার চেষ্টা করলে মাঝে মাঝে পাথরের চাঁই মেলে; সেগুলিকে গড়িয়ে-সরিয়ে দিয়ে তবেই চাষের উপযোগী করে ক্ষেত প্রস্তুত করতে হয়। যেকারণে এইধরনের জমিকে **টাঁড়**জমি বা **তাঁড়**জমি বলে। ফুলারিতাঁড়, জমনিয়াতাঁড় কর্মতাঁড় — এসব হল ঐরকম তাঁড়ভূমি-লগ্ন গ্রামের নাম। বিদ্যাসাগর তাঁর অভিমানী শেষজীবন যেখানে কাটিয়েছিলেন, আদিবাসী-অধ্যুষিত সেই গ্রামটির নাম ছিল কর্মতাঁড়। কথাটি 'করমৃতাঁড়' পেরিয়ে ক্রমান্বয়ে Karmatar-এ পরিণত হয়ে যায়। ...

যাই হোক, এখন পুনরায় তাড়ায় ফেরা যাক। **তাড়াহুড়া** হল দুরকম ক্রিয়ার যোগফল। লাঠি হাতে গরুকে ভয় দেখিয়ে বা আঘাত করে বিশেষ দিকে চালানকে বলে **তাড়া**, আর, সেই লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে বিশেষ দিকে চালানকে বলে **হুড়া**। তবে কতকগুলি শব্দের ক্ষেত্রে **তড়** শব্দের মূল যে ক্রিয়া ('তারীর গড়ান-উড়ান যাহাতে) তা পেরিয়ে অন্যতর অর্থের মিশ্রণ ঘটেছে। ...

গ্রামবাংলায়, ধরা যাক, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হয়েছিল, স্ত্রী গলায় দড়ি দিয়েছে। পুলিশ আসবে। ইতোমধ্যে দেখা গেল, তার স্বামী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই ঘটনাকে বলা হয় — 'লোকটা **তাড়সে** মরে গেল'। শাসনের **তাপ** তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। সেই তাড়নায় ছটফট করে বেড়ানোকেই বলে **তাড়স**। তবে, আভরণ বা তাল-খেজুরের গাঁজান রস বোঝাতে যথাক্রমে **তাড়ী**, (তাল)**তাড়ী** বা (খেজুর)**তাড়ী** কেন ব্যবহৃত হয়, তা এখনও আমরা জানি না। কোন কারণে এমন ব্যবহার সম্ভব হয়, এখনও দুর্বোধ্য।

তাড়কা : **২. তাড়কা** = *যে-আধারশক্তি (প্রজাগণকে) **তাড়ন** করে।* **৩.** রাক্ষসীবিশেষ। তাড়কা সুকেতু যক্ষের কন্যা, সুন্দ-এর পত্নী ও মারীচের মাতা। অগস্ত্যের শাপে তাড়কা রাক্ষসযোনিপ্রাপ্ত হয় এবং মিথিলাগমন-কালে রামকর্তৃক নিহত হয়। (ব.শ.)। ... ব্রহ্মার বরে সুকেতু সহস্র হস্তীতুল্য বলশালিনী এক কন্যারূপে তাড়কাকে প্রাপ্ত হন। জম্ভ দৈত্যের পুত্র সুন্দ অসুরের সহিত তাড়কার বিবাহ হয় ও তাদের পুত্র মারীচের জন্ম হয়। ... অগস্ত্যমুনি সুন্দকে বিনাশ করেন। এই কারণে তাড়কা ও মারীচ উভয়েই প্রতিহিংসা-পরায়ন হয়ে অগস্ত্যকে ভক্ষণ করতে উদ্যত হয়। তখন অগস্ত্যের শাপে তাড়কা বিকৃতাননা রাক্ষসী ও মারীচ ভীষণ রাক্ষসে পরিণত হয়। পরে সেখানকার মলদ ও করুষ নামধেয় দুইটি সমৃদ্ধ জনপদ তাড়কা বিনষ্ট করে। ... অগস্ত্যের তপোবন ক্রমে তাড়কা রাক্ষসীর বনে পরিণত হয়। ... বিশ্বামিত্র এদের দমন করার অভিপ্রায়ে ... রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে আসেন। ... রামের হাতে তাড়কা নিহত এবং মারীচ রামের বাণে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। ... (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** সেকালে যে সরকারি কর্মচারীরা ধমকে, ভয় দেখিয়ে, নিপীড়ন করে বা তাড়না করে জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করত, বিশেষ স্থান-কালে তাদের নামকরণ করা হয়েছিল **তাড়কা**। রামায়ণের কালে এই শ্রেণীটির উদ্ভব, বিকাশ, পরিণাম ইত্যাদি বিষয়ে যা যা ঘটেছিল, তারই বর্ণনা রয়েছে **তাড়কা** রাক্ষসীর ইতিহাসে।

তন্ (তন্ক্, তঞ্চ, তণ্ড্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : (ত-অন অনক্, অনচ্, অনড ইত্যাদি) অতনু, অতন্ত্র, অতন্ত্রী, অতন্দ্র, অতন্দ্রিত, অতন্দ্রী, আঁতকা, আতঙ্ক, আতঙ্কিত, আতঙ্গ, আতঞ্চন, আতত, আততাই, আততায়ী, উত্তান, টক, টণ্ডু, টান, টানা, টানাটানি, তইনাতী (তৈনাৎ < তনাৎ), তওত. তক্র, তক্ষক, তক্ষা, তঙ্ক, তঙ্ক, তঙ্কা (তন্‌খা), তচনচ (তহস-নহস), তচ্ছীল (তৎশীল), তজ্জন্ত্র (তৎ-জ্ঞা), তজ্জ (তৎ-জন), তজ(স্)দীক (তৎ-দিক), তজবি(বী)জ (তৎ-বিচ্, বিবেচনা), তঞ্চ, তণ্ড্, তণ্ডক, তণ্ডা (বিতণ্ডা), তণ্ডু, তণ্ডুল, তৎ, তৎ, তৎকাল, তৎকালীন, তৎক্ষণ, তৎক্ষণাৎ, তৎতুল্য, তৎপদ, তৎপর, তৎপরায়ণ, তৎপুরুষ, তৎপূর্ব্ব, তৎপ্রথম, তত, ততঃ, ততক্ষণ, ততহি, ততি, ততেক, ততোধিক, তত্র, তত্রাচ, তত্রাপি, তত্ত্বৎ, তত্ত্ব, তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞানী, তত্ত্বতঃ, তত্ত্বতল্লাস, তত্ত্বতালাস, তত্ত্বন্যাস, তত্ত্ববিৎ, তত্ত্বমসি, তত্ত্বান্বেষ, তত্ত্বাবধান, তত্ত্বাবধায়ক, তত্ত্বাববোধ, তত্ত্বার্থ, তথা, তথাগত, তথাগুণ, তথাচ, তথাত্ব, তথাপি, তথাবিধ, তথাভূত, তথাস্তু, তথাহি, তথি, তথিপর, তথিমধ্যে, তথৈব, তথৈবচ, তথো, তথ্য, তদ্, তদ্‌গত, তদ্‌গুণ, তদ্‌ঘড়ি, তদনন্তর, তদনু, তদনুযায়ী, তদনুসরণ, তদন্ত, তদন্তর, তদন্তিক, তদপেক্ষা, তদবধি, তদর্থ, তদর্হ, তদা, তদাকারবৃত্তি, তদাত্মা, তদাত্ব, তদানীন্তন, তদানীম্ (তদানীং), তদাযুক্তক, তদারুক (তদারক্ষণ), তদ্দিতরবর্জ্জ্য, তদীয়, তদেকচিত্ত, তদেকাত্মরূপ, তদেব, তদ্দিন, তদ্ধর্ম্মা, তদ্ধিত, তদ্ধেতু, তদ্বৎ, তদ্বাচক, তদ্বান, তদ্বিধ, তদ্বির, তদব্যতীত, তদ্ভাব, তন্, তন্‌চ্, তন, তনয়, তনয়া, তনিক, তনিকা, তনিমা, তনিষ্ঠ, তনী, তন্বী, তনু, তনুকূপ, তনুজ, তনুজা, তনুতা, তনুত্যক্ (জ্), তনুত্যাগ, তনুত্র, তনুত্রাণ, তনুনপাৎ, তনুপত্র, তনুবল্লি, তনুবার, তনুভবা, তনুভৃৎ, তনুমধ্যা, তনুরুট্, তনুরুহ, তনুসুখ, তন্তি, তন্তু, তন্তুক, তন্তুকী, তন্তুকীট, তন্তুজ, তন্তুদণ্ড, তন্তুনাভ, তন্তুপর্ব্ব, তন্তুবাপ, তন্তুবায়, তন্তুব্যাপ্ত, তন্তুশালা, তন্তুসন্ততি, তন্তুসন্তান, তন্তুসার, তন্ত্র, তন্ত্র, তন্ত্রকাষ্ঠ, তন্ত্রধারক, তন্ত্রধীর, তন্ত্রবাপ, তন্ত্রবায়, তন্ত্রা, তন্ত্রাবাপ, তন্ত্রি, তন্ত্রী, তন্ত্রীপাল, তন্দুর, তন্দুরো, তন্দ্র, তন্দ্রা, তন্দ্রালু, তন্দ্রি, তন্দ্রিত, তন্নতন্ন, তন্নিবন্ধন, তন্নিষ্ঠ, তন্মন, তন্মনা, তন্ময়, তন্মাত্র, তম্বুর, তম্বুরা (তানপুরা), তরশু (তৎপরশ্ব), তসর, তসি(সী)ল, তস্কর, তস্করী, তস্থিবান, তস্মাৎ, তস্য, তহশীল (তৎশীল), তহশী(সী)লদার, তহসীল, তা, তাই, তাঁউ(ড়্)ল, তাঁত, তাঁতগড়, তাঁতগাড়, তাঁতঘর, তাঁতশাল, তাঁতি, তাঁতিনী, তাচ্ছীল্য (দ্র. তচ্ছীল), তাণ্ডব, তাণ্ডবিত, তাণ্ডবিনী, তাণ্ডবী, তাত, তাৎকালিক, তাত্ত্বিক, তাৎপর্য্য, তাদর্থ্য, তাদাত্ম্য, তাদৃশ, তান, তানপ্রধান, তানপুরা, তানব, তানা, তানা-দেওয়া, তান্তব, তান্ত্রিক, তাবৎ, তুঁদুল (তন্দুর — তণ্ডুল), তুঁষ, তুঁষাটি, তুণ্ড, তুণ্ড, তেঁদড়, তেঁদড়ামি, তৈ, তৈখন, তৈখনি, তৈখনে, তৈছন, তৈনাত, তৈনা(নি)তী, তোরণ্ড, নূতন, পুরাতন, প্রতান, বিতণ্ডা, বিতান, সতত, সতত্ত্ব, সন্তত, সন্ততি, সন্তান, সন্তানসন্ততি, সুতনু।

তন্ (তন্ক্, তঞ্চ) = তারীর নাকরণ। তন = তারীর নাকরণ যাহাতে; তারী অন থাকে যাহাতে। **তঙ্ক = তারীর** রহস্যরূপ (করা) **থাকে যাহাতে। তঞ্চ = তারীর রহস্যরূপ চয়িত** (সঞ্চয়িত) যাহাতে।

তঙ্ক (আতঙ্ক), তঙ্কা : ১. তঙ্ক = ✓তঙ্ক্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। আতঙ্ক = আ + তঙ্ক। (ব.শ.)। ২. **আতঙ্ক** = *তঙ্কের ('প্রিয়বিরহ জাত তাপ'-এর /ব.শ.) আশ্রয় যাহাতে।* ৩. **তঙ্ক** = কৃচ্ছ্রজীবন, প্রিয়বিরহজ তাপ, ভয়, আতঙ্ক. পাষাণভেদন অস্ত্র, **টঙ্ক**। (**আতঙ্ক** = ভয়, ত্রাস, তাপ, সন্তাপ, উদ্বেগ, সন্দেহ, পীড়া, ক্লেশ।) **তঙ্কা** = টাকা। (ব.শ.)। ৪. ত্রাস বা awe অর্থে প্রচলিত। ৫. **তঙ্ক** শব্দটির ব্যবহার বাংলায় নেই, তবে হিন্দিতে আছে, যথা — 'তং মত্ করো'। তঙ্ক কীভাবে করা যায়? করলে কী হয়? এ প্রশ্নের উত্তর হল — যাকে তঙ্ক করতে হবে, তার প্রিয়বস্তু, প্রিয়বিষয় বা প্রিয়জনকে কেড়ে নিতে হয়। এমনভাবে কেড়ে নিতে হয় যে, সে যেন বিরুদ্ধাচরণ তো দূরের কথা, প্রতিবাদ করতে পর্যন্ত ভয় পায়। এমন হলে, তার শরীরে একধরনের তাপ জন্মায়। সেই তাপে সে কাঁপে, কিন্তু কিছু করতে পারে না। এর ফলে তার মাথার চুল উঠে যায়। তাই মানুষ 'আতঙ্ক'গ্রস্ত হলে তার মুখ থেকে হাসি উবে যায়, ক্রমে মাথার চুল উবে যায় এবং তা বংশানুক্রমিক রোগে পরিণত হয়। সমাজ আতঙ্কিত হলে, সে সমাজে কমেডিয়ানের জন্ম হওয়া বন্ধ হয়ে যায়, সমাজসংস্কৃতিতে হাস্যরসের অভাব ঘটে এবং সমাজের **ইন্দ্রলুপ্ত** (= টাক) রোগ হয়। তখন পরচুলা পরার মতো বিদেশ থেকে ইন্ডাস্ট্রি আমদানি করতে হয়। মোট কথা আতঙ্ক **ইন্দ্রলুপ্ত** বা **টাক**-রোগের কারণ, কি মানুষের, কি তার সমাজের।

তবে **তঙ্কা** শব্দটির ভিতরে কিছুতেই টাকাকে পাওয়া যায় না। এটি ফারসি তন্‌খাহ্ থেকে এসেছে বলা হয়। কিন্তু সেটিই বা কীভাবে হল, তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে '**শঙ্ক** হরণ করে যে', সে যদি **শঙ্খ** হয়, তবে **তঙ্ক** হরণ করে যে তাকেও **তঙ্খা** বা তন্‌খাহ্ বলা যেতেই পারে! কিন্তু তা কি ঠিক? আমরা নিঃসন্দেহ নই।

তণ্ডা (বিতণ্ডা), তণ্ডুল, তাণ্ডব : ১. তণ্ডা = ✓তণ্ড্ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। তণ্ডুল = ✓তণ্ড্ + উল (উলচ্) - কর্মবাচ্যে। তাণ্ডব = তণ্ডু + অ (অণ্)। (ব.শ.)। ২. (**তণ্ড** = *তারীর অন ডয়িত যাহাতে)।* **তণ্ডা** = **তণ্ড**-*এর আধার যে।* **বিতণ্ডা** = *বিপরীত* **তণ্ডা** *থাকে যাহাতে।* **তণ্ডুল** = **তণ্ড** *নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া লালিত হয় যাহাতে। (***তাণ্ড** = **তণ্ড** *হইতে জাত)* **তাণ্ডব** = **তাণ্ড** *বহন করে যে।* / **বিতণ্ডা** = যাহাতে বাদী ও প্রতিবাদী কেহই স্বপক্ষ সমর্থন করে না, সকলেই পরপক্ষ খণ্ডন করে বা পরপক্ষে দোষারোপ করে, তাদৃশ বাক্যপ্রপঞ্চ। ৩. **তণ্ডা** = তাড়ন। **বিতণ্ডা** = প্রতিপক্ষস্থাপনাহীন জল্প। ... **তণ্ডুল** = নিস্তুষ ধান্য, চাউল। **তাণ্ডব** = তণ্ডুমুনি-প্রোক্ত, নৃত্য, নর্তন, নাট্য, পুংনৃত্য, উদ্ধতনৃত্য, সবিলাস সঞ্চার, শিবনৃত্য, নৃত্যকলাবিশেষ, তৃণবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. **বিতণ্ডা** quarrel অর্থে, **তণ্ডুল** rice অর্থে এবং **তাণ্ডব** abrupt-disruption অর্থে প্রচলিত। ৫. ব.শ. **বিতণ্ডা** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটিকে যথেষ্ট ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এখানে নিজের কোনো অংশকে তাড়ানো হচ্ছে না, বাইরে থেকে যে আসছে, তার পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিয়ে তাকেই তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। **তাণ্ডব**-এর বেলায় সেই ক্রিয়ার প্রেক্ষিত প্রকাশ পাচ্ছে। আর, **তণ্ডুল**-এর বেলায়, তাড়ানো হচ্ছে তুষ, উলটে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে তার মূল অংশটিকে।

তাড়ানো ক্রিয়াটি এখানে তাই নবরূপে উত্তীর্ণ। এখানে সে তাড়িয়ে গ্রহণ করে। সেই কারণে **তণ্ড** এখানে নবরূপে উত্তীর্ণ।

তৎ, তদ্, তন্ (তন্ময়, তন্মাত্র) : ২. তৎ = *তারীর তরণ যাহাতে।* **তদ্** = *তারীর দান যাহাতে।* **তন্** = *তারী অন যাহাতে।* **তন্ময়** = **তদ্** *দ্বারা আচ্ছন্ন (স্বরূপলুপ্ত) যে।* **তন্মাত্র** = **তদ্**-*টুকুই রয়েছে যাহাতে।* / **তদ্** = যাহার অর্থ ও বিষয় পূর্ব্বে অনুভূত। **তন্মাত্র** = তাহা মাত্রা যাহার। (ব.শ.)। **৩. তৎ** = ব্রহ্ম, তাহার, তাহা। **তদ্** = পরোক্ষবস্তুনির্দ্দেশ, বিপ্রকৃষ্টবিষয়, প্রসিদ্ধ, অনুভূতার্থ বিষয়, প্রক্রান্ত, অভিন্নার্থ, সেই। **তন্** = বিস্তার, ব্যাপ্তি, প্রসারণ। **তন্ময়** = তদ্বিকার, তৎস্বরূপ, তদাত্মক। **তন্মাত্র** = তাহাই, কেবল তাহা, (সাংখ্যে) সূক্ষ্ম পঞ্চভূত — শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ। (ব.শ.)। **৪.** স্বতন্ত্রভাবে প্রায় অপ্রচলিত; প্রধানত 'সেই' বা that অর্থে এবং অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দগুলি প্রচলিত। **৫.** শব্দ তিনটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ জানিয়ে দেয়, এরা প্রায় সমার্থক-শব্দ। অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সময় কখনও **তৎ** (তৎকাল), কখনো **তদ্** (তদেব) এবং কখনো-বা **তন্** (তন্মাত্র) রূপ ধারণ করে; কিন্তু মূলে 'তারীর তরণ'কে অর্থাৎ ত্-কে উল্লেখ করে। সেই **ত** যদি অতঃপর পুনরায় তারণ রূপ গ্রহণ করে, তখন **ত** হয়ে যায় **তৎ**; আর যদি আর একটু এগিয়ে স্থির থাকা বা দণ্ড রূপ গ্রহণ করে, তখন **ত** হয়ে যায় **তথ্** বা **তদ্**; এবং এই **ত** যদি অতঃপর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও রহস্যময় রূপ গ্রহণ করে, তখন **ত** হয়ে যায় **তন্**। দ্র. **তনয়**। এই **তৎ** বা **তদ্** আদিতে যেকোনো বস্তুর অভ্যন্তরস্থ সত্তাকে (পুরুষকে / content-কে) বোঝাতে ব্যবহৃত হত, বর্তমানে যেকোনো বস্তু বা বিষয়কে তার অবয়বের (প্রকৃতির /form-এর) দিক থেকে উল্লেখ করে থাকে। বাংলায় এই **তৎ** বা **তদ্**-কে এখন আমরা 'তাহা', **'তা'** ইত্যাদি বলে থাকি (দ্র. **তা**), ইংরেজরা বলেন that।

আমরা আগেই দেখেছি, প্রাচীনকালের মানুষ দৃশ্যবস্তুকে বোঝানোর জন্য শব্দের সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি; প্রধানত অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় বিষয় বা বস্তুকে বোঝানোর জন্যই তাঁরা শব্দের ব্যবহার শুরু করেছিলেন। সেই সুবাদে প্রতিটি বস্তুর ভিতরে যে সত্তাটি রয়েছে, যা দৃশ্য নয় কিন্তু নানানভাবে সক্রিয় এবং উপলব্ধ, প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় যাকে বলা হয় পুরুষ এবং ইংরেজিতে যাকে বলা হয় content, তাকে বোঝানো বা উল্লেখ করাই ছিল **তৎ** শব্দের মূল উদ্দেশ্য। বস্তুর ভিতরে এই-যে অদৃশ্য পুরুষ বা content, ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় তাকে বলতে হয় **তৎ** (= তারীর তরণ যাহাতে)। **ক** (কারী) ও **চ** (চারী)-র মতো এই সক্রিয় সত্তাটি **ত** (তারী) পদবাচ্য। পার্থক্য এ-সত্তা করণ বা চারণ করে না, এই **তারী** তরণ করে, উত্তীর্ণ হয়, ত্রাণ করে, তারিত হয়, তরে যায়। কেউ যেন বস্তুর ভিতরে যে ক্রিয়াশক্তিটি সক্রিয় তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, 'দেখো, ঐ যে গাছের ভেতরে, মাছের ভেতরে, জলের ভেতরে, বায়ুর ভেতরে ... তারী রূপে বর্ত্তমান বা আবর্ত্তমান বা তরণশীল রয়েছে — ওই হল সেই, যার কথা বোঝাতে চাইছি। সে একটি বস্তুর ভিতর দিয়ে পরবর্তী বস্তুতে উত্তীর্ণ হচ্ছে, তরে যাচ্ছে।' ঠিক এভাবেই সেকালে জন্ম নেয় **তৎ** শব্দটি। কার্যত এই **তৎ-ই সত্য, তার বহিরঙ্গটি সাময়িক রূপ মাত্র। এই তৎ-ই রূপ থেকে রূপে, দেহ থেকে দেহে উত্তীর্ণ হয়ে হয়ে চলেছে।** সেই কারণে **এই তৎ-ই সত্য — ওঁ তৎসৎ।** যেহেতু বিশ্বের সমস্ত বস্তুর ভিতরে সক্রিয় সত্তাটি এইভাবে **ব্রহ্ম**-এর একটি রূপ হিসেবে শনাক্ত হয়, ফলে, **তৎ** শব্দের একটি অর্থ **ব্রহ্ম**-ও হয়ে যায়। ফলে **তৎ** শব্দটি বিশ্বের নিকৃষ্টতম থেকে উৎকৃষ্টতম অস্তিত্ব পর্যন্ত প্রতিটি বস্তুর অভ্যন্তরস্থ সত্তাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। সেই কারণে শব্দটির দ্বারা একদিকে যেমন 'ওঁ তৎ সৎ', 'তত্ত্বমসি', প্রভৃতি উচ্চতম ব্রহ্মবাক্য গড়ে তোলা গেছে, তেমনি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুকে বোঝাতেও প্রতিনিয়তই **তৎ** (= তাহা, তা) শব্দের ব্যবহার চলেছে, চলছে। এমনকি বিশ্বের সকল বস্তুর মূলে যে পঞ্চমহাভূতকে (**তন্মাত্র** = শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ মাত্ররূপে) শনাক্ত করেছিলেন আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা, সেই **তৎ**-কে বোঝাতে তাঁরা তাঁদের পুরাণাদি গ্রন্থে বারংবার **তন্মাত্র** শব্দটিই প্রয়োগ করে গেছেন। জানিয়ে গেছেন, 'গন্ধতন্মাত্রাত্মক সংঘাত' থেকেই এই জগতের সৃষ্টি। (দ্র. **নাক**) এই **তন্**-এর ভিতরে যে ডুবে থাকে, তাকেই **তন্ময়** বলে।

পরবর্তীকালে, এই অভ্যন্তরস্থ সত্তাকে বোঝানোর ব্যাপারটি ক্রমশ বাদ পড়ে যায়। যেকোনো বস্তুকে তার বাহ্যরূপের দিক থেকে শনাক্ত করার প্রবণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সেভাবে শব্দটি ক্রমে তার নিহিতার্থ হারিয়ে কেবল বাহ্যার্থে প্রযুক্ত হতে থাকে। এখন সেই বাহ্যার্থেই শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে।

এই **তৎ** শব্দটিই ইংরেজিতে that হয়ে গেছে। বাংলায় এখন তাকে আমরা 'তা', 'তাই', 'তাহা', 'ওই' বা 'সেই' রূপে ব্যবহার করে থাকি। দ্র. **সে**। **৬.** Avesta - tad, Greek - to, Latin - istud, Old German - daz, Gothic - thata, Anglo Saxon - thaet, English - that। (ব.শ.)। জারমান das।

তত (আতত, বিতত, সতত, আততাই, আততায়ী, তাত), তদন্ত : ১. ✓তন্ + ত (ক্ত) কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তত** = *তারী তারিত যাহাতে; তৎ (তাহা) তারিত যাহাতে।* **আতত** = **তত** *আশ্রিত যাহাতে।* **বিতত** = **তত** *বিস্তারিত যাহাতে।* **সতত** = **স** *তত যাহাতে; অর্থাৎ, অস্তিত্ব অবিচ্ছেদে বিদ্যমান যাহাতে।* **আততাই** = **আতত**-*এর আধার গতিশীল যাহাতে।* **আততায়ী** = **আতত**-*এর আধারের গতিশীল আধার যে।* **তাত** = *তত হইতে জাত।* **তদন্ত** = **তৎ**-*এর অন্ত যাহাতে বা যেখানে।* / **তত** = জগৎ ব্যাপন করে যে; তন্ত্রীর ব্যাপন যাহাতে। **আততায়ী** = যে সন্নদ্ধ হইয়া, অর্থাৎ বর্ম্মধারণপূর্ব্বক বধে উদ্যত। **তাত** = যিনি আপনাকে পুত্ররূপে বিস্তার করেন। **তদন্ত** = তাহাতে যাহার নাশ। (ব.শ.)। **৩. তত** = বিস্তারিত, প্রসারিত, ব্যাপ্ত, আচ্ছাদিত, বিলম্বিত, দীর্ঘীকৃত, বায়ু, তন্ত্রীবাদ্য, বীণাদি তারের যন্ত্র; তৎসংখ্যক, তৎপরিমাণ, গভীর, সেইরূপ, সেপ্রকার, সেরূপ; এখনই, তখনই। **আতত** = বিস্তৃত, প্রসারিত, আরোপিত, সর্বত্র গত, ব্যাপ্ত। **বিতত** = প্রসারিত, বিস্তৃত, দীর্ঘীকৃত ... ছড়ানো, সতত প্রবৃত্ত, তন্ত্রীবাদ্য, বীণাদি। **সতত** = অবিচ্ছেদবান, নিরন্তর, অবিরত ...। **আততাই, আততায়ী** = বধোদ্যত, শত্রু। আততায়ী ছয় প্রকার — অগ্নিদাতা, বিষদাতা,

শস্ত্রপাণি, ধনাপহারক, ক্ষেত্রাপহারী, ভার্য্যাপহারক। (মতান্তরে) খড়্গাঘাতে বিষপ্রয়োগে ও অগ্নিদানে উদ্যত, শাপদানার্থ উদ্যতহস্ত, অভিচার দ্বারা বধকারক, রাজসমীপে কুৎসাকারী এবং ভার্য্যাপহারী — এই সপ্তজন। **তাত** = পিতা, পিতৃতুল্য পূজ্য, পুত্র, বৎস, শিষ্য, অনুজ, অনুকম্পা; তপ্ত, গরম, অগ্নিতাপ, আঁচ, সূর্য্যতাপ, আতপ, রৌদ্র। **তদন্ত** = তাহাতে নাশপ্রাপ্ত, তাহার শেষ, কোনো বিষয়ের তথ্যনির্ণয়, তত্ত্বাবধারণ, ঠিক কথা, সিদ্ধান্ত, নির্ণয়, নির্দ্ধারণ, বিশেষ বৃত্তান্ত, তত্ত্বসিদ্ধান্ত। (ব.শ.)। **৪.** 'সেই পরিমাণ' অর্থে **তত** খুবই প্রচলিত, কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে যে **তত** শব্দটি সংশ্লিষ্ট তার প্রচলন কমবেশি থাকলেও, তদর্থে **তত** পৃথকভাবে অপ্রচলিত, **আতত**, **বিতত**ও তাই। কিন্তু **আততাই** বা **আততায়ী** criminal অর্থে **সতত** always অর্থে প্রচলিত। **৫.** 'যত মত তত পথ' — রামকৃষ্ণের এই বাণীর কথা সব বাংলাভাষীই জানেন। এই **তত** 'তৎপরিমাণ' অর্থে গৃহীত। আর, বাদ্যযন্ত্র-সংশ্লিষ্ট **তত** শব্দটিকে সহজবোধ্য হয়, যখনই আমরা বুঝি, তারী হল বীণাদি বাজনার তারের শব্দমাত্র। (বাদ্যযন্ত্রের চারটি ভাগ করেছিলেন আমাদের পূবসূরীগণ — আনদ্ধ, শুষির, **তত**, ও ঘন। বীণা, সেতার, বেহালা ইত্যাদিকে বলা হত **তত**।) তবে **তত** বিষয়ে আরও বহু কথা আছে।

বস্তুত **তৎ** শব্দে আমরা দেখেছি, এ হল বস্তুর অভ্যন্তরস্থ চলমান সত্তা বা সত্তার সূক্ষ্ম রূপ। এই সত্তা অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে, বস্তু থেকে বস্তুতে উত্তীর্ণ হয়, নিজের স্বভাব ক্রমান্বয়ে বদলায় ও নতুন নতুন দেহ লাভ করে। **তৎ**-এর তাৎক্ষণিক রূপটিকে স্থির বলে ধরলে তখন তৎ হয়ে যায় **তৎ + অ = তত**; অর্থাৎ, 'তৎ তারিত যাহাতে' বা যে পর্যন্ত। আর, **তৎ**-এর পরবর্তী রূপগুলিকে পর পর একাদিক্রমে যতদূর যায়, ততদূর পর্যন্ত স্থির রূপে ধরলে সবগুলি মিলে হয়ে যায় **আতত**, আর এই একাদিক্রমে অবিচ্ছিন্ন রূপগুলিকে বলে **সতত**; যদিও তার অর্থ এখন সংকুচিত করে তাকে always-এর সমান করে নেওয়া হয়েছে।

স্থির জলে মাছ ঘাই দিল। তার সেই ঘাই-ঢেউয়ের আবর্ত্ত ক্রমক্ষীয়মান হয়ে ছুটল পাড়ের দিকে। গায়ক গান জুড়লেন, সর্বদিকে ক্রমশ ক্ষীণতনু হতে হতে সেই শব্দের আবর্ত্ত ছুটল এক **যোজন**। রাজা হুঙ্কার দিলেন, রাজপ্রতাপের সেই আবর্ত্ত ছুটল তার রাজ্যের সীমা পর্যন্ত। এই যে মাছের-গায়কের-রাজার নিজ নিজ আবর্ত্তগুলিতে তাদের নিজ নিজ অস্তিত্ব সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত থাকে, যা কিনা ক্রমক্ষীয়মানভাবে চলতে থাকে তাদের শেষ সীমার দিকে, এগুলিকেই মাছের-গায়কের-রাজার নিজ নিজ 'তদ্রূপ' বা **তত**-রূপ বলে। এই ততগুলিকে একত্রে ধরলেই **আতত** হয়। আর, এই যে এগুলি তাদের নিজ নিজ উৎসস্থল থেকে প্রসারিত হয়ে শেষ সীমা পর্যন্ত চলে যায়, একে বলে **বিতত** হওয়া।

ধনুকের ছিলা ধনুককে যে-পরিমাণ (সং)**যত** করে (বাঁকিয়ে বাঁধে), তার **তত**সকল বা **আতত** সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। স্বভাবতই সেই ছিলা থাকে টান টান হয়ে। একে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি টানলেই ধনুকটি ভেঙে যাবে। সেই কারণে একে বলে **আতত**-ছিলা এবং তার সেই 'টান-টান-ভাব'কে 'tense' বা **আততি** বলে। এই শব্দদুটি এখন বাংলাভাষী একেবারেই ভুলে গেছেন। কিন্তু এমনকি কবি বিষ্ণু দে-র আমল পর্যন্ত শব্দ দুটি প্রচলিত ছিল।

সে যাই হোক, **তৎ**-এর এই যে স্থির রূপসমূহ, যাদের আমরা **আতত** বলছি, এই সবগুলির ভিতর দিয়ে উৎসস্থল পর্যন্ত হেঁটে আসে যে, সেই হল **আতত**-আয়ী বা **আততায়ী**। যে-ছয় বা সাত প্রকার আততায়ীর কথা ব.শ. বলেছেন, তারা প্রত্যেকেই তাদের প্রত্যেকের সামনে প্রসারিত **তত**সমূহের সীমা থেকে যাত্রা শুরু করে উৎসস্থলে চলে আসে বলেই তারা প্রত্যেকেই **আততায়ী**। 'রাজার আততায়ী' কথাটির মানে হল, রাজত্বের সীমা থেকে কিংবা তার পরের কোনো **তত** থেকে রাজপ্রাসাদের সিংহদরজা এবং অন্যান্য সমস্ত দরজা, প্রহরা ও প্রত্যেকটি **তত** পেরিয়ে যে-সত্তা রাজার শয়নকক্ষের দরজা পর্যন্ত চলে এসেছে, এর পরেই সে রাজাকে হত্যা করতে পারে, সেই হল 'রাজার আততায়ী'। সে কিন্তু রাজাকে হত্যা করেনি, করতে 'উদ্যত'। ব.শ. **আতত** পেরিয়ে আসা এই সমস্ত 'উদ্যত' সত্তাগুলিকেই (উপরোক্ত **৩**-এ) **আততায়ী** বলে শনাক্ত করেছেন। শোনা যায়, সেকালের রাজপ্রাসাদে রাজার নাকি অজস্র শয়নকক্ষ ছিল এবং তার কোনটিতে তিনি শয়ন করবেন, তা শেষ মুহূর্তে তিনি নিজে ঠিক করতেন এবং কেউ তা জানতে পারত না। **আততায়ী** ঠেকানোর এবম্বিধ উপায় বিচিত্র বৈকি!

যাই হোক, এই **তত**-এর থেকে জাত শব্দ হল **তাত**। এটি আগুনের **তাত** হতে পারে, মানববংশের **তাত**-ও হতে পারে। যেকারণে **তাত** শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে পিতাকে যেমন বোঝায়, পুত্রকেও বোঝানোর যোগ্যতা ধরে। আর **তৎ**-এর ক্রমান্বয়ে রূপান্তরের শেষ যে সীমা, সেখান পর্যন্ত **তৎ**-এর এগিয়ে চলার সমগ্র ক্রিয়া ও ঘটনাসমূহের **তত্ত্বকথা**গুলি জানতে হলে **তৎ**-এর এই ক্রমান্বয় চলনের অন্তে যেতে হয়, তৎ-অন্ত বা **তদন্ত** করতে হয়। তখনই জানা যায় তত্ত্বসিদ্ধান্ত কী! **তদন্ত** বা তদ্ অন্ত বা তাহার অন্ত করলে সার্চ করা বা তদন্ত করা বোঝায় এজন্যেই। বাংলার প্রবাদ-প্রায় প্রতিজ্ঞা হল — 'শেষ দেখে ছাড়ব।'

তত্ত্ব (তত্ত্বমসি) : **১.** ✓তন্ + ক্বিপ্ (০) · তৎ = ব অস্ত্যর্থে। তত্ত্বমসি = তৎ + ত্বম্ + অসি। (ব.শ.)। **২.** **তত্ত্ব** = **তৎ** *তারিত যাহাতে তাহার বাহক; অর্থাৎ, তত্তকে বহন করে যে।* **তত্ত্বমসি** = *তাহার ও তোমার অস্তিত্ব গতিশীল যাহাতে। /* **তত্ত্ব** = তদ্‌ভাব যাহার; যাহার দ্বারা সত্যার্থপ্রতিপাদক সাধন করা যায়। **তত্ত্বমসি** = তুমি (জীবচৈতন্য) তৎ (অপ্রত্যক্ষচৈতন্য ব্রহ্ম) হও। (ব.শ.)। **৩.** **তত্ত্ব** = স্বরূপ, যাথার্থ্য, বস্তুস্বরূপ, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্, অদ্বয় জ্ঞান, বীজ, কারণ, বস্তু, ভাব, তাৎপর্য্য, পদার্থ, বীজমন্ত্র, চেতঃ, চিত্ত, বিলম্বিত নৃত্যবাদ্যাদি, পরমেশ্বর, (সাংখ্যে) প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি পদার্থ (প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র ও ষোড়শ বিকার — পঞ্চমহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, ও মনঃ), সত্যজ্ঞানের উপায়, বার্ত্তা, অনুসন্ধান, খোঁজ, সংবাদ, খবর, পর্ব্বাদিতে প্রেরিত মিষ্টাদি দ্রব্য। **তত্ত্বমসি** = জীবাত্মা ও পরমাত্মার এক চৈতন্যে তাৎপর্য্যের (ঐক্যজ্ঞানের) সূচক মহাবাক্যবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** ইংরেজি theory অর্থে এবং 'পর্ব্বাদিতে প্রেরিত মিষ্টাদি দ্রব্য' অর্থে **তত্ত্ব** শব্দটি আজও প্রচলিত। শব্দ দুটির বাকি ব্যবহার

প্রায় অপ্রচলিত। ৫. আমরা দেখেছি, বস্তুর অভ্যন্তরে যে বিকাশশীল সত্তা থাকে, তাকেই **তৎ** বলে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা তাকে বস্তুর 'প্রাণ' বা 'আত্মা' বলতে পারি। এই প্রাণ কেমন করে জন্মায়, বিকশিত হয়, পরবর্তী রূপে উত্তীর্ণ হয়, সেই সমস্ত খবর থাকে 'তৎ-এর তারণ-কথা বহন করে যে', সেই **তত্ত্বে**। তত্ত্বেই পাওয়া যায় বস্তুর অভ্যন্তরস্থ আত্মার চাল-চলনের খবরাখবর বা সংবাদ। গ্রীক ভাষায় এই **তত্ত্বকেই** theorema বলার চেষ্টা করা হয়েছে। ইংরেজি theory শব্দটি তার থেকেই এসে থাকলেও 'বস্তুবিষয়ের প্রাণকথা' থেকে তা অনেক দূরে চলে গেছে। কিন্তু বাংলাভাষীদের ভাষায় **তত্ত্ব** শব্দের ব্যবহার তা থেকে দূরে সরে যায়নি। তত্ত্বতালাস, তত্ত্বন্যাস, তত্ত্বান্বেষণ, তত্ত্বাবধান প্রভৃতি শব্দ থেকে তত্ত্ব-পাঠান পর্যন্ত সর্ব ক্ষেত্রে 'বস্তুবিষয়ের প্রাণকথা' অর্থটি এখনও কমবেশি জীবন্ত রয়েছে। বাংলাভাষী হিন্দুদের বিয়ের তত্ত্বে কী কী দ্রব্য কীভাবে সাজানো ও পাঠানো হয়, তা একটু গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করলেই আপনি দেখতে পাবেন, বিবাহ নামক বিষয়ের প্রাণকথার মূল সংবাদ তত্ত্বের ভিতরেই দিয়ে রাখা রয়েছে।

তথা, তথাগত, তথাপি : ২. **তথা** = *তারী থাকে যাহাতে।* **তথাগত** = *তথা-য় গত যে।* **তথাপি** = *তথা-র পালন গতিশীল যাহাতে।*/ **তথা** = সেই প্রকারে (প্রকারের আধার যে)। **তথাগত** = সেইপ্রকারে গত বা আগত (যে); তাদৃশ দশা প্রাপ্ত (যে)। ৩. **তথা** = সেই প্রকারে, সাম্য, সত্য, সমুচ্চয়, নিশ্চয়, পৃষ্টপ্রতিবচন; সেখানে, এদিকে, সেই স্থান, ওদিকে, ওখানে। **তথাগত** = তদবস্থ, তদবস্থায় উপস্থিত, বুদ্ধ, জিন। **তথাপি** = সেপ্রকার হইলেও, তাহা হইলেও, তবু, তবে। (ব.শ.)। ৪. there অর্থে তথা, গৌতম বুদ্ধ নামক ব্যক্তিকে বোঝাতে তথাগত, even-though অর্থে তথাপি, এবং 'তাহাই হউক' অর্থে তথাস্তু শব্দটি কমবেশি প্রচলিত। ৫. তারী চলনশীল বটে, কিন্তু আমরা মানুষেরা আমাদের বুঝবার সুবিধার জন্য অনেক সময় তাকে স্থির ক'রে বা **ঠাউর** ক'রে বুঝি। তখন, কেবলমাত্র তখনই তারী থাকে যাহাতে, তাকে বলা হয় **তথ**। **তথ**-এর আধারকে বলে **তথা**। তার মানে, এতক্ষণ ধরে আমরা যাকে **তৎ** বলে চিনেছি, তারই একটি স্থির রূপ হল **তথা**। সেটি **তৎ**-এর পরবর্তী কিংবা তারও পরবর্তী বা আরও দূরবর্তী কোনো আপাত স্থিররূপও হতে পারে। সহজ করে বললে — তথায়, সেখানে, সেই সেখানে, তারপর আরও দূরে সেখানে, তথায় — সেই রূপে পৌঁছানোই **তথায়** পৌঁছানো। এইভাবে **তৎ**-এর সর্বশেষ স্থিররূপে পৌঁছাতে যে পারে, তাকেই **তথাগত** বলে।

তথ্য : ২. **তথ** *থাকে যাহাতে। (দ্র.* ***তথা****)।* ৩. সত্যযুক্ত, যথার্থ, সম্যক, যে বস্তু যথা, তথা অবস্থিতি, সত্যবচন, সত্য। (ব.শ.)। ৪. data অর্থে প্রচলিত। ৫. উপরে **তথা** শব্দের ব্যাখ্যায় **তথ** কাকে বোঝায় তা আমরা আলোচনা করেছি। এই **তথ** থাকে যাতে, তাকে বলে **তথ্য**। একটু গভীরে গিয়ে দেখলে দেখা যায়, কার্যত '**তৎ** থাকে যাতে' তাকেই **তথ্য** বলে। অর্থাৎ কিনা, পুরুষ বা content থাকে যে অবয়বে বা আধারে, তাকেই **তথ্য** বলে। তাহলে তো **তৎ**-এর কথা বাদ পড়ে গেল, এসে গেল **তৎ**-এর আধারের কথা! পুরুষকে বাদ দিয়ে **প্রকৃতির কথা**, content-কে বাদ দিয়ে form-এর কথা! এই কারণে **তত্ত্ব** '**বস্তুবিষয়ের** প্রাণের কথা' বলে, এবং **তথ্য** 'বস্তুবিষয়ের দেহের কথা' বলে।

ব্যাপারটিকে উলটো দিক থেকেও দেখা যেতে পারে। **তৎ** তারিত হয়ে যেখানে **পৌঁছল**, সেখানকার দর্শক দেখল — কে-জানি কী-জানি কী-একটা **দিল**। তার কাছে এটি হয়ে গেল **দত্ত**। বাংলাভাষা এই দত্তকে উত্তরাধিকারসূত্রে পায়নি, পেয়েছে ল্যাটিন এবং ইংরেজি। তারা একেই data শব্দ রূপে বহন করে নিয়ে চলেছে। ৬. data।

তনয় (তনয়া, তনিক, তনিকা, তনিমা, নূতন, পুরাতন) : ১. তনয় = ✓তন্ + অয় (কয়ন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **তনয়** = *তন্ যায় যাহাতে।* **তনয়া** = *তনয়-এর আধার যে।* **তনিক** = *তন-কে গতিশীল করে যে।* **তনিকা** = *তনিক-এর আধার যে।* **তনিমা** = *তন গতিশীল হইয়া সীমিত হয় যাহাতে, তাহার আধার।* / **তনয়** = কুল বিস্তার করে যে। (ব.শ.)। ৩. **তনয়** = পুত্র, লগ্নাবধি পঞ্চম স্থান। **তনয়া** = পুত্রী, কন্যা, চক্রকুল্যা (চাকুলিয়া) লতা, ঘৃতকুমারী। তনিক = অল্প, কিঞ্চিৎ, একটু। **তনিকা** = রজ্জু। **তনিমা** = তনুভাব, কৃশতা, অর্থকার্শ্য, দারিদ্র্য। (ব.শ.)। ৪. **তনয়** son অর্থে, **তনয়া** daughter অর্থে এবং **তনিমা** মেয়েদের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. আগেই আমরা দেখেছি, একই **তৎ** শব্দ কখনও কখনও **তন্** রূপ গ্রহণ করে (তৎ + মাত্র = তন্মাত্র)। এই রূপটিতে তারী তার তারণ, থাকন, দান প্রভৃতি কমবেশি স্পষ্ট রূপ না নিয়ে সূক্ষ্ম রহস্যরূপী হয়ে যায়। **কণ** ও **কন**-এর পার্থক্যে এই **তন**কে খানিকটা স্পষ্ট বোঝা যায়। মানুষ নামক অবয়বের ভিতরে যে **তৎ** সক্রিয় থাকে, তার সূক্ষ্মতম রূপকে যদি তার শুক্র-রূপ বা sperm ভাবি, তাকেও **তন্** বলা চলে। এভাবে শব্দের স্পর্শের রূপের রসের গন্ধের ... সকল সত্তার শুক্ররূপই তার **তন্** পদবাচ্য হতে পারে। এভাবে দেহের **তন্** থেকে তনু, রেশমের **তন্** থেকে তন্তু, সম্পর্কের **তন্** থেকে তন্ত্র ... প্রভৃতি অজস্র **তন্**-জাত সত্তাকে আমরা শনাক্ত করতে পারি। এমনকি, যে **তন্** সদ্য সক্রিয় হয়েছে, তাকে **নূতন**, এবং যে **তন্** পুরাকালে সক্রিয় হয়েছে, তাকে **পুরাতন** এবং **অধুনা** সক্রিয় হয়েছে তাকে **অধুনাতন** বলে শনাক্ত করা যেতে পারে। (দ্র. **অর্বাকতন**।) তবে এই সমস্ত ক্ষেত্রে **তন্** শব্দটি যেন **তৎ**-এর পরের ধাপকে ধরে রাখে বা ধরে রাখবার ক্ষমতা ধরে, পরের ধাপকে সৃজন করে বা করতে চায়। ...

যাই হোক, এই **তন** বিকশিত হয় বা 'যায় যাহাতে', সেই হল **তনয়**, তার আধারশক্তিরূপিণী হল **তনয়া**। **তনিক** শব্দটির প্রচলন বাংলায় নেই, রয়েছে হিন্দিতে। তাতে এর **অর্থ** হল 'অতি **অল্প** পরিমাণ'। আমাদের অর্থনীতি-অর্থ**নৈতিক**-এর মতো (দ্র. **ইক**) **তনিক** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ তাকে যথার্থে সমর্থন করে। **তনিকা** তার আধারশক্তি। এর পাশাপাশি দুটি ইংরেজি শব্দ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে রয়েছে - ton ও tonic। **তন**-এর সঙ্গে ton-এর কোনো সম্পর্ক দেখা যায় না, কিন্তু ten- শব্দযুক্ত অনেক শব্দের (tend, tender, tent, tenure ... ইত্যাদি) সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

অন্যদিকে **তনিক** ও tonic একই উৎসজাত বলে মনে হয়; কিন্তু তার যথার্থ প্রমাণ এখনও হাতে আসেনি। **৬.** ইংরেজি tend, tender, tense, tone, tonic।

তনু (তনুজ, তনুজা, তন্বী) : ১. ✓তন্ + উ - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তনু** = *তন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **তনুজ** = *তনু হইতে জাত।* **তনুজা** = *তনু হইতে জাত যে স্ত্রীলোক।* **তন্বী** = *তন্ বাহকের আধারশক্তিরূপিণী যে; অথবা তন নবরূপে উত্তীর্ণ যে-স্ত্রীরূপে।* **৩. তনু** = কৃশ, ক্ষীণ, কৃশাঙ্গ, সূক্ষ্ম, অল্প, অনতিস্থূল, কলাক্ষীণ, বিরল, ক্ষুদ্র, অগভীর, মূর্ত্তি, দেহ, কায়, চতুর্বিংশতি-অক্ষরপাদ বৃত্তবিশেষ। **তনুজ** = দেহজাত, আত্মজ, পুত্র। **তনুজা** = কন্যা। **তন্বী** = কৃশাঙ্গী, সুন্দরী। **৪.** ইংরেজি body অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **তন, তনয়**। **৬.** ইংরেজি tone, tonic।

তন্তি (তন্তিপাল) : ১. ✓তন্ + তি (ক্তিন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তন্তি** = *তন্ তারণ গতিশীল থাকে যাহাতে।* **তন্তিপাল** = *তন্তি-কে পালন করে যে।* **৩. তন্তি** = দীর্ঘপ্রসারিত রজ্জু, সূত্র, গোমাতা, কৌলিক, তাঁতি। **তন্তিপাল** = গোমাতাপালক, বিরাটগৃহে গুপ্তাকার সহদেব। (ব.শ.)। বিরাটগৃহে গুপ্তভাবে অবস্থানকালে সহদেব তন্তিপাল নামে পরিচিত ছিলেন। (পৌ.অ.)। **৪.** 'তাঁতি' রূপে প্রচলিত। **৫.** উপরোক্ত প্রতীকী অর্থগুলি কোনো না কোনো ভাবে **তন**-কে পরের ধাপে নিয়ে যায়, প্রসারিত করে; এমনকি গোমাতাও গো-এর **তন** পরবর্তী ধাপে নিয়ে যায় বলেই হয়তো তাকে **তন্তি** বলা হয়ে থাকবে। কিন্তু সহদেব যে অজ্ঞাতবাসকালে (ভারতসমাজের পুঁজিবাদবিরোধী সিদ্ধান্ত মান্য করতে বাধ্য হওয়ার কালে) **তাঁতিপাল** নাম নিয়েছিলেন, এবং বিরাট-রাজত্বের **তাঁতি**দের পালকের কাজ করেছিলেন, এই শব্দে আমরা সেই সংবাদ পাচ্ছি। এক্ষেত্রে আমরা গবেষক-পাঠককে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' গ্রন্থে বিবৃত আদি-তাঁতিদের ইতিহাসের ধ্বংসাবশেষের কথা বুঝে দেখবার অনুরোধ করব।

তন্তু (তন্তুবাপ, তন্তুবায়) : ১. ✓তন্ + তু (তুন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তন্তু** = *তন্ তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে বা যাহার দ্বারা।* **তন্তুবাপ** = *তন্তুকে বপন করে যে।* **তন্তুবায়** = *তন্তুকে বয়ন করে যে।* **৩. তন্তু** = সূত্র, তার, মৃণালাদির সূত্রবৎ পদার্থ, লূতাকৃত উর্ণা, সন্তান, অপত্য, পরম্পরা, অবিচ্ছেদ, গ্রাহ। **তন্তুবাপ** = তন্তুবয়নকারী, কৌলিক, তাঁতি, তন্তুবয়নসাধন যন্ত্র, তন্ত্র, তাঁত, সূত্রবয়ন। **তন্তুবায়** = তন্তুবয়নকারী, কৌলিক, তাঁতি, উর্ণনাভ, বর্ণসঙ্করজাতিবিশেষ, তন্তুবয়ন, বেম, নারাজ (loom)। (ব.শ.)। **৪.** fibre অর্থে তন্তু শব্দটি এখনও কমবেশি প্রচলিত। বাকি অপ্রচলিত। **৫.** উপরোক্ত প্রতীকী অর্থে **তন্তুবাপ** ও **তন্তুবায়** শব্দের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না, যদিও শব্দ দুটি আলাদা; কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি তাদের মধ্যেকার পার্থক্য দেখিয়ে দেয়। তবে সে পার্থক্য কেবল **বপন** ও **বয়ন**-এর। একটি বপ্ ক্রিয়া থেকে জাত, অপরটি বে ক্রিয়া থেকে জাত। জেনে রাখা ভাল, বাংলাভাষী ধান বুনে, কাপড়ও বুনে। একটা বপন থেকে বোনা, অন্যটি বয়ন থেকে বোনা। দ্র. **বুন, তন্ত্র**।

তন্ত্র (তন্ত্রধারক, তন্ত্রবাপ, তন্ত্রবায়), তান্ত্রিক : ১. ✓তন্ + ত্র (ষ্ট্রন্) - কর্তৃবাচ্যে; - কর্ম্মবাচ্যে ণ। (ব.শ.)। **২. তন্ত্র** = *তন্-তারণকে রক্ষা করে যে; অথবা, তন্-তারণ রহে যাহাতে।* **তন্ত্রধারক** = *তন্ত্র ধারণ করেন যিনি।* **তন্ত্রবাপ** = *যে তন্ত্রে বপন করা হয়।* **তন্ত্রবায়** = *যে তন্ত্রে বয়ন করা হয়।* **তান্ত্রিক** = *তান্ত্র-কে (তান্ত্র = তন্ত্র হইতে জাত = তন্ত্রশাস্ত্র) গতিশীল করে যে।* / **তন্ত্র** = যাহার দ্বারা বয়ন সাধিত হয়। **তন্ত্রধারক** = যিনি কর্ম্মপদ্ধতির গ্রন্থ পাঠ করেন। **তন্ত্রবাপ** = যাহার দ্বারা তন্ত্রের বপন সাধিত হয়। **তন্ত্রবায়** = যাহার দ্বারা তন্ত্রের বয়ন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. তন্ত্র** = সন্তান, কুল, শ্রেণী, শাস্ত্রীয় বিধিপরম্পরা, বয়নসাধনযন্ত্র (তাঁত), সূত্র, তন্তুবায় (তাঁতি), পরচ্ছন্দ, সিদ্ধান্ত, প্রধান, ওষধি, ঔষধ, অভিচারমন্ত্র, শপথ, পরিচ্ছদ (পরিজন, পরিকর, retinue, train), গৃহ, বেদশাখাবিশেষ, শাস্ত্র (সূত্র, মতবাদ), প্রবন্ধ, শিবপ্রোক্ত শাস্ত্রবিশেষ (তন্ত্রশাস্ত্র), হেতু, ব্যবহার, উভয়ার্থপ্রযোজক, ইতিকর্তব্যতা, রাষ্ট্র, করণ, উপকরণ, স্বরাষ্ট্রচিন্তা, সৈন্য, ধন, নারাজ (loom দ্র. তন্তুবায়), রাশি, সুখ, আদর্শ, পরিরক্ষণ, শাসন, তন্তুবায়শলাকা, কুটুম্বভরণ, কুটুম্বকৃত্য। (ব.শ.)। শিব ও শক্তির উপাসনা যে শাস্ত্র দ্বারা করা হয়েছে, তাকে তন্ত্র বলে। সর্বশুদ্ধ ১৯২ টি তন্ত্র আছে, তার মধ্যে ৬৪টি বঙ্গদেশের। মহাতন্ত্র ছাড়াও কতকগুলি উপতন্ত্রও আছে। ... তন্ত্রকে একটি গুহ্যশাস্ত্র বলা হয়েছে। ... এর অনুকরণে বৌদ্ধতন্ত্র রচিত হয়েছিল। (পৌ.অ.)। **তন্ত্রধারক** = কর্ম্মস্বরূপজ্ঞাপক পুস্তকের পাঠক। **তন্ত্রবাপ** = তন্ত্রবপনকারী, তন্ত্রবায়, তাঁতি, তন্ত্রের বয়ন, তাঁত, বেম, নারাজ। **তান্ত্রিক** = তন্ত্রশাস্ত্রবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞাতসিদ্ধান্ত, তন্ত্রবিহিত, শাস্ত্রসম্বন্ধী, তন্ত্রমতাবলম্বী। (ব.শ.)। **৪.** পৃথকভাবে **তন্ত্র** শব্দটি প্রায় অপ্রচলিত, কিন্তু গণ**তন্ত্র**, ধন**তন্ত্র** ইত্যাদি বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে যুক্তভাবে খুবই প্রচলিত। বাকিগুলি তুলনায় কমপ্রচলিত বা অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **ডাকিনী, আজ্ঞাচক্র, নাড়িনক্ষত্র, ষড়চক্র**। **তন্ত্র** শব্দের ৩৫ টি মানে দিয়েছেন বঙ্গীয় শব্দকোষ। আর এই মানেগুলি এতই ছড়ানো, পরস্পর থেকে আলাদা যে, এমন বিভিন্ন প্রকার অর্থপ্রতিপাদকতার শক্তি **তন্ত্র** শব্দটি ধরে রাখে কীভাবে, সেটাই এক গবেষণার বিষয়! কোথায় তাঁত, কোথায় মানুষের সন্তান, আর কোথায় বেদবিরোধী তন্ত্রশাস্ত্র, এবং কোথায়ই বা স্বরাজ্যবিষয়ক চিন্তা! সবই **তন্ত্র**-পদবাচ্য হয় কীভাবে, সেকথা বুঝে উঠতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়।

আদিতে তিনটি শব্দ ছিল — **তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্র**। এ অর্জন সংস্কৃতকারগণের। যে-ব্যাপকার্থ **মন্ত্র** শব্দটি ধারণ করে রাখে, তার অধিকাংশ অর্জনই তাঁদের হাতে। কিন্তু **তন্ত্র** ও **যন্ত্র** শব্দের ব্যাপকার্থ অর্জিত হয় বৌদ্ধযুগে। তবে পরবর্তীকালে বাংলাভাষীদের হাতে এই শব্দদুটির আরও বিকাশ ঘটেছে।

তন্ত্র শব্দের বিষয়ে খোঁজখবর করতে গিয়ে আমরা দেখছি, বাংলাভাষার প্রকৃত শব্দজ্ঞান তার সর্বোৎকৃষ্ট রূপে পৌঁছেছিল মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের হাত ধরে, শ্রীচৈতন্যের হাত ধরে, মুসলিম-পদকর্তাদের হাত ধরে এবং তার রেশ চলেছিল দীর্ঘকাল। এমনকি

১৯২০-৩০ সাল পর্যন্ত সেই বাংলাশব্দজ্ঞানের কিছু কিছু তখনও অবশিষ্ট ছিল। যাঁরা physics-এর বাংলা অনুবাদ করেছিলেন **পদার্থবিদ্যা**, writers' building-এর বাংলা করেছিলেন **মহাকরণ** এবং democracy-র বাংলা করেছিলেন **গণতন্ত্র**, তাঁরা বাংলা শব্দের মর্মকথা কমবেশি তখনও জানতেন। এই অনুবাদগুলির বিশেষত্ব হল, এগুলি কেবল ইংরেজি শব্দের বাংলা অনুবাদ নয়, ইংরেজি শব্দটি চিন্তার যে-এলাকাকে যতখানি ব্যাপকতায় বোঝায়, তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপকতায় বোঝায় তার অনুবাদ করা এই বাংলা শব্দগুলি। মনে রাখা ভাল, **পদার্থবিদ্যা, মহাকরণ, গণতন্ত্র** ... প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতে নাই; এগুলি বাংলাভাষীর নিজস্ব অর্জন।

যাই হোক, আমরা জানতে চাইব, আমাদের পূর্বসূরি বাংলাভাষার জ্ঞানী মানুষেরা **তন্ত্র** শব্দটির কীরূপ অর্থ বুঝতেন যে, তাঁরা democracy-র মানে করলেন **গণতন্ত্র**? আসলে, **তন্ত্র** শব্দটি তৈরি হয়েছিল '**তন্**-এর তারণ রহে যাহাতে', কিংবা, '**তন**-এর ত্রাণ থাকে যাহাতে' সেই সত্তাটিকে উল্লেখ করতে; অনেকটা একইভাবে '**মন**-এর ত্রাণ থাকে যাহাতে' সে ছিল **মন্ত্র**-পদবাচ্য এবং '**(সং)যম**-এর ত্রাণ থাকে যাহাতে' সে ছিল **যন্ত্র**-পদবাচ্য।

এর মানে হল, **তৎ** বা সে বা that যে কোনো বস্তু বা বিষয়ই হতে পারে। তার রহস্যরূপ হল **তন্**। তার মানে, রাজপ্রাসাদের **তন্** বা রহস্যরূপ হল তার নকশা; মানুষের রহস্যরূপ বা **তন্** হল তার বীর্য্য (= sperm); কেননা, সেই নকশা থেকে রাজপ্রাসাদকে পুনর্জন্ম দেওয়া যায়; বীর্য্য থেকে মানুষটিকে পুনর্জন্ম দেওয়া যায়। দ্র. **তন্মাত্র**। এই প্রেক্ষিতে যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের **তদ্** বা **তন্** যে প্রক্রিয়ায় তার পরবর্তী রূপে তারিত হয়, উত্তীর্ণ হয়, ত্রাণ পায়, সেই প্রক্রিয়াটিকে ধারণ করে রাখে যে-ব্যবস্থা, তাকে বলে **তন্ত্র**। তুলোর আঁশকে তার পরবর্তী-রূপ সুতোতে কিংবা সুতোকে তার পরবর্তী অধ্যায় কাপড়ে তারিত করতে পারে যে-ব্যবস্থা তাকেও সেকারণেই বলা হত **তন্ত্র**। স্ব-কে তার পরবর্তী অধ্যায়ে, পরকে তার পরবর্তীরূপে, রাষ্ট্রকে তার পরবর্তী অধ্যায়ে, দেবতাকে তার পরবর্তী অধ্যায়ে তারিত করতে পারত যে-ব্যবস্থা, তাদেরকেও যথাক্রমে **স্বতন্ত্র, পরতন্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্র, দেবতন্ত্র** ইত্যাদি বলা হত। এই **তন্ত্র**গুলি গড়ে উঠত **যোগসাধনা**র মাধ্যমে, অর্থাৎ, **পুরুষ** ও **প্রকৃতি** এই দুই সত্তাকে সঠিকভাবে যোগ করার মাধ্যমে। একালের ভাষায় বললে মেকানিজম (= পুরুষ) ও ফুয়েল (= প্রকৃতি) এই দুয়ের যথার্থ যোগসাধনের ফলে যে **তন্ত্র**টি (system-টি) গড়ে ওঠে, তাতেই চলে একালের মোটর-ভেহিকল। এই **তন্ত্র**কে ইংরেজ চেনে system রূপে, যার মূলে রয়েছে 'standing together' মানেটি। কিন্তু কারা তাদের system-এ একত্রে দাঁড়ায়, তা নিয়ে ইংরেজের কোনো উত্তরাধিকার নেই। আমাদের আছে। আমরা জানি, **তন্ত্রে** যে দুজন একত্রে দাঁড়ায় তাদের বলে **পুরুষ-প্রকৃতি**। তাদের যথাযথভাবে জুড়ে বা যোগ করেই, **যোগসাধনা** করে তবেই, **তন্ত্র**টি গড়ে তুলতে হয়। এই যোগসাধনে কোনো ত্রুটি থেকে গেলে **তন্ত্র** বা system-টি কাজ করে না, বিগড়ে যায়। তখন তাদের জোড় বা pair-টি ঠিক করে দিতে হয়, re-pair করতে হয়। আর, যোগসাধনা করে এরকম **তন্ত্র** কেবল কাপড় বুনতেই কাজে লাগে না, মানুষের দেহতন্ত্র, সমাজের দেহতন্ত্র ... **সবক্ষেত্রেই লাগে। স্বতন্ত্র** হতে হলে স্ব-মন ও স্ব-দেহের যথার্থ যোগসাধনার মাধ্যমে গড়ে তোলা **স্ব-তন্ত্র** লাগে; **গণতন্ত্র** প্রতিষ্ঠিত করে চলতে হলে গণের-নেতা ও গণের-জনতার যোগসাধনার মাধ্যমে গড়ে তোলা **গণ-তন্ত্র** লাগে; ... ইত্যাদি। **সাম্যমন্ত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র** পরিচালনা করে সমস্ত সমাজসদস্যদের ভাল রাখার দাবি করে থাকে আজকের **গণতন্ত্র**। সেজন্যেই ইংরেজের democratic-system বাংলায় হয়ে যায় **গণতন্ত্র**। তাঁতযন্ত্রেও এই মেকানিজম (**পুরুষ**) ও মানুষের শ্রমশক্তির (প্রকৃতির) **তন্ত্র** রয়েছে বলেই তাকেও **তন্ত্রযন্ত্র** বা তাঁতযন্ত্র বলে।

তন্ত্র বিষয়ে আরও দু-একটি কথা বলা দরকার। সেকালের বিচারে সত্তা ছিল মূলত দুটি — **পুরুষ** ও **প্রকৃতি**; প্রাণ ও দেহ। জ্ঞানের দুনিয়ায় প্রাণ-বিষয়ক জ্ঞানকে বলা হত **বেদ**, এবং দেহ-বিষয়ক জ্ঞানকে বলা হয় **তন্ত্র**। দেহতন্ত্রের ভিতরে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত থাকে। দেহতত্ত্বের কথা জানা আর কাঠামো (স্ট্রাকচার) বিষয়ে জানা একই কথা। সেকালের চিন্তাপদ্ধতির স্বাভাবিক নিয়মে সকল প্রকার দেহের আলোচনা থাকত **তন্ত্র**-আলোচনায়, তা সে মানুষের শরীরের দেহতন্ত্র হোক আর সমাজের দেহতন্ত্র বা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদি যাই হোক। মানবিক-সামাজিক তত্ত্বের মূল কথাগুলি প্রাধান্য পেয়েছিল বৈদিক-আলোচনায়, আর মানবিক-সামাজিক তন্ত্রের মূল কথাগুলি প্রাধান্য পেয়েছিল তান্ত্রিক-আলোচনায়। তবে, পরবর্তীকালে বিকশিত অদ্বৈতবাদী কিংবা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী অধ্যাত্ম আলোচনায় দুটোই সমান গুরুত্ব পেয়েছিল। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথও ছিলেন কার্যত অদ্বৈতবাদী। কথাটি বাউল-সুফীদের সম্পর্কেও বলা যায়।

তন্দ্রা : ১. ✓তন্দ্ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. **তন্** *দান রহে যাহাতে।* / যাহার আদিতে ও অন্তে আলস্য থাকে। (দ্র. 'নিদ্রা'/ ব.শ.)। ৩. অবসাদ, খেদ, ঈষৎ নিদ্রা, নিদ্রাবেশ। (ব.শ.)। ৪. sleeping অর্থে প্রচলিত। ৫. আগের অধ্যায় থেকে পরবর্তী অধ্যায়ে **তন** দান ক্রিয়া চলতে থাকলে, লেনদেনকারী অধ্যায় দুটির ধারক সত্তাদ্বয় একধরনের আবেশের মধ্যে থাকে। সেই কারণে **তন্দ্রা** শব্দটির ব্যঞ্জনার্থ হয়ে যায় ঘুমানো, যদিও শব্দটির অভিধার্থ হল 'তন্ দান রহে যাহাতে'। অর্থাৎ, **তন্দ্রা** শব্দটির ভিতরে ঘুমানোর কোনো কথা নেই, রয়েছে **তন্** লেনদেনের কথা। সেই লেনদেন চলতে থাকলে, লেনদেনকারী সত্তা-দুটি আবেশে আচ্ছন্ন থাকে। একে আলস্য বলে মনে হয়। একেই **তন্দ্রা** বলে। দ্র. **নিদ্রা, দ্রাণ**।

তন্নতন্ন : ১. তন্ন = তৎ + ন। (ব.শ.)। ২. **তন্নতন্ন** = **তৎ** *নহে,* **তৎ** *নহে।* / তাহা নহে, অর্থাৎ তত্তদ্ দ্রব্য অভীষ্ট বিষয় নহে। (ব.শ.)। ৩. অভীষ্ট দ্রব্য, 'তাহা নয় তাহা নয়' বলিয়া এক এক করিয়া খোঁজা; পাতি পাতি করিয়া দেখা, উলট-পালট করিয়া সন্ধান করা, বিশেষ সন্ধান করা। (ব.শ.)। ৪. 'searching each and every point' অর্থে শব্দটি প্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

তান (প্রতান, বিতান, সন্তান), তানা : ১. ✓তন্ + অ (ঘঞ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***তান* = *তন* *হইতে জাত। (প্রতান* =**

প্রকৃষ্ট ***তান*** *যাহাতে।* ***বিতান*** *=* *বিশেষ* ***তান*** *যাহাতে।* ***সন্তান*** *=* *সমান* ***তান*** *যাহাতে।)* ***তানা*** *=* ***তান****-এর আধার যে।* / তান = যাহা দ্বারা মূর্চ্ছনাসহিত গীত প্রয়োগ বিস্তৃত হয়। (ব.শ.)। **৩. তান** = মূর্চ্ছনান্তর্গত স্বরসমূহের নানাবিধ বিন্যাস, সূত্র, আঁশ, জ্ঞানবিষয়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, বিস্তার, প্রসার। **প্রতান** = বিস্তার, শাখাপত্রপ্রচয়, লতার কুটিলতন্তু বা আঁকড়া, প্রতানযুক্ত অলাবু প্রভৃতি, কাণ্ড-প্ররোহহীন সরলযায়ী সারিবাদি, বায়ুরোগভেদ। **বিতান** = তুচ্ছক, শূন্য, মন্দ, বিস্তার, জাল, অনুষ্ঠান, মধ্য, চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, ব্রণবন্ধনবিশেষ (bandage), ক্রতু, যজ্ঞবেদি, পুঞ্জ, নিচয়। **সন্তান** = দ্র. **সন্তান**। **তানা** = কাপড় বোনার সময়ে কাপড়ের লম্বা সূতা (warp), টানা, মনের ভাবব্যঞ্জক বাক্যভঙ্গি, ব্যঙ্গোক্তি। (ব.শ.)। **৪.** 'সুরের বিন্যাস' অর্থে **তান**, son অর্থে **সন্তান** এবং 'ব্যঙ্গোক্তি' অর্থে **তানা**-দেওয়া প্রচলিত। **বিতান ও প্রতান** অপ্রচলিত। **৫. তন**-এর থেকে **তান** শব্দটি শব্দ-তৈরির নিজস্ব নিয়মেই জন্মায়। এখন **তন** শব্দে যাকে যাকে বোঝানো যায়, তাদের প্রত্যেকের থেকেই **তান** জন্মাতে পারে। সুরের **তন** থেকে যে **তান** জন্মায়, তাকেই একালে সবাই মনে রেখেছে। কিন্তু লাউয়ের **তন** থেকে যে **প্রতান** জন্মায়, কিংবা বিশেষ বা বিপরীত **তানও (বিতানও)** যে জন্মায়, এবং সবশেষে মানুষের অস্তিত্বের সমান **তন** থেকে যে সম-তান বা **সন্তান** জন্মায়, তাদের সকলের কথাই আমরা ভুলে যাই। বলে রাখা যেতে পারে, মনুসংহিতাতে জগৎসৃষ্টি অধ্যায়ে অন্য সংস্থা বা সামাজিক সংগঠনের উপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র সংস্থাকে **প্রতান** শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। একালের ভাষায় বিগবাজারের কোনো দোকানের সঙ্গে মাসে ১০০০ সায়া-ব্লাউজ সেলাই করে সাপ্লাই দেওয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ একটি ছোট সংস্থাকে বলা যায় **প্রতান**। তাদের চুক্তিটি হল **প্রতানের** আঁকড়িতে আবদ্ধ বড় সংস্থাটির অঙ্গ।

তপ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতপস্ক, অতপাঃ, অনাতপ, অনুতাপ, অনুত্তাপ, আ-উতা, আওতা, আত, আতপ, আতপচাল, আতপর্তাড়ুল, আতপত্র, আতপত্রক, আতপবারণ, আতপলঙঘন, আতপাত্যয়, আতবচিড়া, আতবতণ্ডুল, আল, আলচাল, আলোচাল, উতা, উত্তপ্ত, উত্তাপ, কুতপ, তপ্, তপ, তপঃ, তপঃকর, তপঃকাল, তপঃপ্রভাব, তপঃসমাধি, তপঃস্থলী, তপত, তপতী, তপন, তপনতনয়, তপননন্দিনী, তপনবংশ, তপনমণি, তপনাত্মজ, তপনী, তপনীয়, তপনেষ্ট, তপনোপল, তপ(ফ)শীল, তপশ্চরণ, তপশ্চর্য্যা, তপসি(সী), তপসিয়া, তপসে, তপস্য, তপস্যা, তপস্বী, তপস্বিনী, তপাঃ, তপা(ফা)ৎ, তপাত্যয়, তপান্ত, তপাস, তপাসি, তপাসিয়া, তাপা(বা)স, তপিষ্ণু, তপী, তপোধন, তপোনিধি, তপোনিষ্ঠ, তপোবন, তপোবন্ত, তপোবৃদ্ধ, তপোভৃৎ, তপোময়, তপোমূর্ত্তি, তপোলোক, তপ্ত, তপ্তকাঞ্চন, তপ্তকুম্ভ, তপ্তকৃচ্ছ্র, তপ্তবালুক, তপ্তমুদ্রা, তা, তাওয়া (তাবা), তাওয়া (তাপি), তাত, তাতদানি, তাতল, তাতা, তাপ, তাপক, তাপত্য, তাপত্রয়, তাপন, তাপনী, তাপনীয়, তাপমান, তাপস, তাপসতরু, তাপসদ্রুম, তাপসপ্রিয়, তাপসপ্রিয়া, তাপসারণ্য, তাপসেন্দ্র, তাপস্য, তাপহর, তাপহরী, তাপাস, তাপিচ্ছ, তাপিঞ্ছ, তাপিত, তাপিয়া, তাপী, তাবাস, দীপ্তি, প্রতাপ, সন্তপ্ত, সন্তাপ, সুতপ্ত।

তপ্ = তারীর পালন-পান। **তপ** = তারীর পালন-পান যাহাতে।

তপ (আতপ), তপন (তপনতনয়, তপননন্দিনী, তপনবংশ), তাপ, তাপক, তাপন : ১. তপ = ✓তপ্ + অ (অচ্) - কর্ত্তৃবাচ্যে। তপন = ✓তপ্ + অন (ল্যুট) - কর্ত্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***তপ*** *= তারীর পালন যাহাতে। (****আতপ*** *=* ***তপের*** *আশ্রয় যাহাতে)।* ***তপন*** *=* ***তপ*** *অন থাকে যাহাতে।* ***তাপ*** *=* ***তপ*** *হইতে জাত।* **৩. তপ** = উজ্জ্বল, দীপ্ত, তাপক, পীড়য়িতা, তাপ, উত্তাপ, তপস্যা. আতপ। **তপন** = তাপয়িতা, দাহক, সূর্য্য, গ্রীষ্ম, সূর্য্যকান্তমণি, অর্কবৃক্ষ, ভল্লাতকবৃক্ষ, অগ্নিবিশেষ, অগ্নিময় নরকবিশেষ, মদনদাহক শিব, অন্তকর্ত্তা, দাহ, প্রিয়বিচ্ছেদে নায়িকার কামোদ্বেগজনিত চেষ্টা। **তপনতনয়** = সূর্য্যপুত্র যম, কর্ণ, সুগ্রীব। **তপননন্দিনী** = যমুনা, গোদাবরী। **তপনবংশ** = সূর্য্যবংশ। **তাপ** = সন্তাপ, বিরহসন্তাপ, কৃচ্ছ্র, কষ্ট, দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, আতপ, রৌদ্র; তপ্ত হওয়া, ব্যথিত হওয়া, কুপিত হওয়া। **তাপক** = তাপয়িতা, দাহক, জ্বর, রজোগুণ। **তাপন** = তাপয়িতা, দাহক, পীড়ক, ক্লেশয়িতা, প্রকাশক, তপন, সূর্য্য, গ্রীষ্ম ঋতু, সূর্য্যকান্তমণি, কামের বাণবিশেষ, অর্কবৃক্ষ, নরকবিশেষ, তপনীয়, স্বর্ণ, তপ্তীকরণ, দাহন, ব্যথন, পীড়ন। (ব.শ.)। **৪. তপন** শব্দটি নাম রূপে প্রচলিত। বাকি সব অপ্রচলিত। যে শব্দসম্ভার আমরা হারাচ্ছি, **তপ ও তপ-যুক্ত** অধিকাংশ শব্দই সেই দলে পড়ে। **৫. তপ** ও **তাপ** শব্দদুটির মধ্যেকার পার্থক্যটি বুঝতে পারলে, উভয় শব্দের ভিতরে সক্রিয় ক্রিয়াটিকে চেনা সহজ হয়ে যায়। সাধারণভাবে আমরা বাংলাভাষীরা **তাপ** বললে বুঝতে পারি, যার ভিতরে 'উষ্ণতা পালিত' হয়, তার কথা বলা হচ্ছে। আবার, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে **তাপ** মানে '**তপ** *হইতে জাত যে*'। তাহলে **তপ**-এর (ত-পালনের) ব্যাপারটি যেন আগুন, তার থেকে সৃষ্টি হচ্ছে **তাপ**। তার মানে **তপ** হল আগুনের জ্বলতে থাকার মতো ব্যাপার।

হ্যাঁ, ব্যাপারটি সেরকমই বটে, তবে তার চেয়ে একটু বেশি ও ব্যাপক। অস্তিত্বের ভেতর থেকে তার সৃজনগুণ বা রজোগুণের উন্মেষ হতে থাকাই **তপ** চলতে থাকা। তবে কিনা, রজোগুণ তো আধারহীন হয়ে বেরোতে পারে না; তাকে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ, আত্মপ্রকাশের জন্য এই পঞ্চমহাভূতের কারও না কারও সহায়তা নিতে হয়। সেগুলির ভিতর থেকে রূপ বা অগ্নিকে আধার রূপে গ্রহণ করে সেই প্রকাশক ইচ্ছা চলতে থাকলে, তাকেই বলা হয়ে থাকে — '**তপ** (= তারীর পালন) চলছে।' এছাড়াও যে নানারকম **তপ** রয়েছে, নিম্নে **তপঃ** শব্দেই আমরা তা জানতে পারব। এই **তপ** অন থাকে যাহাতে, তাকেই **তপন** বলা হয়। সূর্য্যে এই **তপ**-অন ক্রিয়া নিরন্তর চলে বলে, তপনদিগের মধ্যে সে সর্বশ্রেষ্ঠ। সেকারণে পরে পরে **তপন** শব্দটি সূর্য্যের একচেটিয়া হয়ে যায়। অন্য **তপ**-অন কারীদের আর আমরা চিনতে পারি না, তেমন কোনো সত্তা থাকলেও।

কিন্তু এ তো গেল বাহ্যিক **তপন**-এর কথা। এই **তপনকে** ইংরেজ বলেন sun। কিন্তু আমাদের **তপন** কেবল আকাশের sun-মাত্র নয়। সমাজমনের আকাশে যে সামাজিক **তপন** বিরাজ করে, তপ-অন করে থাকে, তাকেও আমরা **তপন** বলি। এই **তপন**-এর ছেলে হয়, মেয়ে হয়, এর বংশ আছে। একালের ভাষায় বললে আপনিও একে এখনই চিনতে পারবেন। এ হল সামাজিক (গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক) শাসনের কেন্দ্র, যেখান থেকে সর্বদিকে জ্ঞান-ধনের আলো ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই আলোর সাথে সাথে তাপ গিয়ে শাসন-শোষণ করে সমাজের রসকে মেঘে পরিণত করে পুনরায় বৃষ্টিরূপে সমাজে বর্ষণ করে ... ইত্যাদি। প্রাচীন ভারতের এইরকম কেন্দ্রীয় শাসনকেন্দ্রকে বলা হত **তপন**। যাঁরা এই ব্যবস্থার পরিচালক বা তাদের ঘনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন, ভারতসমাজে আজও তাঁরা **সূর্য্যবংশী** নামে পরিচিত। এই শাসনের বিচারব্যবস্থাকে **তপনতনয় যম** বলা হত, বিতরণের সংযমিত ধারার ব্যবস্থাকে (রেশনব্যবস্থার মতো) বলা হত **যমুনা** ... ইত্যাদি। দ্র. **তপঃ**।

তপঃ (তপস্, তপঃকর, তপশ্চরণ, তপঃসমাধি, তপঃস্থলী, তপস্যা, তপস্বী, তপস্বিনী, তপোধন, তপোনিধি, তপোনিষ্ঠ, তপোবন, তপোবৃদ্ধ, তপোলোক) : ১. ✓তপ্ + অস্ (অসুন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তপঃ (তপস্)** = *তারীর পালক বিসর্গীকৃত হয় যাহার দ্বারা বা যাহাতে; অথবা,* **তপ**-*নির্য্যাস ত্যক্ত হয় যাহাতে।* **তপস্যা** = **তপস্** *থাকে যাহাতে, তাহার আধার।* **তপস্বী** = **তপস্** *বহন করে যে আধার। /* **তপোধন** = যাহার তপঃ ধনবৎ রক্ষণীয়। **তপোনিধি** = **তপের** আধার বা তপঃ যাঁহার নিধিতুল্য। **তপোনিষ্ঠ** = তপে যাঁহার নিষ্ঠা। **তপোবৃদ্ধ** = **তপঃ** দ্বারা বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত (যে)। (ব.শ.)। **৩. তপঃ** = তাপ, নিয়ম, ধর্ম্ম, অভীষ্টলাভার্থ কৃচ্ছ্রসাধন, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ব্রতনিয়মোপাসনাদি কর্ম্ম, কায়েন্দ্রিয়চিত্তের সমাধান, মৌনাদিব্রত, বৈধক্লেশকর কর্ম্ম, স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্ম, বানপ্রস্থের অসাধারণ ধর্ম্ম, তপস্যা (শারীর বাঙ্ময় ও মানস ভেদে ইহা ত্রিবিধি। সত্ত্বাদিগুণভেদে শারীদি তপঃ প্রত্যেকে ত্রিবিধ), যুধিষ্ঠির-পিতা ধর্ম্ম, মন-ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা, জনলোকের ঊর্দ্ধস্থিত লোক, লগ্নাবধিক স্থান। **তপঃকর** = তপস্যাকারক। **তপশ্চরণ** = তপোনুষ্ঠান। **তপঃসমাধি** = তপস্যায় একাগ্রতা। **তপঃস্থলী** = তপস্যার স্থান, কাশী। **তপস্যা** = তপশ্চরণ, তপশ্চর্য্যা, ব্রতচর্য্যা। **তপস্বী** = প্রশস্ততপোযুক্ত, তপঃসম্পন্ন, দীন, সন্তাপবান, দুঃখযুক্ত, সভাগ্য, ক্ষুদ্র, তাপস, নারদ, তপসে মাছ, চটকপক্ষী, ধার্ম্মিক, ব্রতচারী। **তপস্বিনী** = তাপসী, ঋষিপত্নী, দীনা, বরাকী, চটকা, ব্রতধারিণী। **তপোধন** = তপস্যা-ধনসম্পন্ন, তপস্বী, মুনি। **তপোনিধি** = তপোধন, মুনি। **তপোনিষ্ঠ** = তপোনিরত। **তপোবন** = তপস্যার স্থান, বনবিশেষ, মুনির আশ্রম। **তপোবৃদ্ধ** = তপঃসম্পন্ন, মহাতপাঃ। **তপোলোক** = তপোনামক ভুবন, সপ্তলোকের একতম। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫. তপ** শব্দের সঙ্গে বিসর্গ যোগ হলে **তপঃ** হয়। উৎসর্গ যেমন উপর দিকে সর্জ্জন করা বা 'নির্য্যাসত্যাগ' করা বোঝায়, বিসর্গ তেমনি বিশেষ দিকে বা বিপরীত দিকে সর্জ্জন করা বোঝায়। সর্জ্জিত এই অস্তিত্বকে বলে স্। (দ্র. **শ্ বর্ণের অর্থ**)। সেই কারণে **তপঃ** আর **তপস্** একই কথা। একে **তপ-শক্তি, তপ-ইচ্ছা,** তপ-চেষ্টা ইত্যাদি নানা রূপে প্রতিভাত হতে দেখা যায়। এক কথায় একে **তপ**-এর (= তারী-পালকের) মেধা ও **শ্রমের** একটি অভেদ **সূক্ষ্ম** একক রূপ বলা যেতে পারে। অতএব **তপঃ** = **শ্রম** ও মেধার একক, ইউনিট। এই **তপস্** থাকে যাতে তাকে **তপস্যা** বলে। একালের (মার্কসের) ভাষায় বলতে হলে একে **শ্রম** বলতে হয়, যার ভেতর থেকে মেধাকে সম্পূর্ণতই বাদ রাখা হয়েছে। যারা এই **তপস্** বহন করে, তাদের **তপস্বী** বলে; একালের ভাষায় যাকে **শ্রমিক** বলা হয়। যেখানে এই **তপস্বী**গণ এইরূপ **তপস্** বা **তপঃ** ক্রিয়া করেন, তাকে **তপোবন** বলে; একালে তার একটি নাম **'ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স'**। তপোবনগুলি সবই আদতে **শ্রমক্ষেত্র** বলেই সেগুলিকে **আশ্রম**ও বলা হয়ে থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সেকালের বর্ণনায় যাকে **তপঃ** বলা হত, সে উৎপাদনশীল কাজ করা বই অন্য কিছুই নয়। **তপঃকর** কথাটির মানেই ছিল শ্রমকর। **তপশ্চর্য্যা** মানে ছিল উৎপাদনশীল শ্রমমূলক আচরণ করা। **তপ**-এর 'স্' বা 'নির্য্যাসত্যাগ' আচরণের মাধ্যমে নতুন শক্তিতে পরিণত হয়ে যায় বলেই তপস্ + চর্য্যা হয়ে যায় **তপশ্চর্য্যা**। আর, এ শুধু জিহ্বার সুবিধার্থেই হয় না, কর্মজগতেও তার অনুরূপ বদল ঘটে। **তপঃসমাধি** কথাটির মানে ছিল শ্রম করায় একাগ্রতা। সেকালে যাঁকে **তপোবৃদ্ধ** বলা হত, তিনি তপস্যাজনিত ঋদ্ধির কারণে বৃদ্ধ বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য ছিলেন; ঠিক যেভাবে জ্ঞানে যিনি বৃদ্ধ তাঁকে জ্ঞানবৃদ্ধ বলা হয়ে থাকে, বয়স তাঁর যাই হোক। যে সমাজ টাকাকে অধিক মর্য্যাদা দেয়, সে সমাজ এইরূপ তপোবৃদ্ধকে আজকাল super-annuated man বা 'ছিবড়ে মানুষ' বলে থাকে। শিক্ষিত-সভ্যমানুষদের এবম্বিধ আচরণকে ঠাট্টা করে গ্রামবাংলা প্রবাদ রটিয়েছে — 'ছেঁড়া ছাতা বুড়া বাপ, যত খাটাবি তত লাভ'।

আর, **তপঃস্থলী** বা **তপোবন** যে কুটির শিল্পের একটি বিশাল এলাকাকে বোঝাতো, তা নিয়ে আজ আর সন্দেহমাত্রও নেই। সর্বোপরি একালের অ্যাকাডেমিক দুনিয়ার মতো জ্ঞানের জগৎকে যেমন সারস্বত-ব্রহ্মলোক বলা হত, উৎপাদনশীল শ্রমের বিশাল কর্মযজ্ঞের এলাকাকে বলা হত **তপোলোক**। দ্র. **ধর্ম্মারণ্য**।

তবে মনে রাখা দরকার, সেকালের ভারতে শ্রমের বিকাশ ঘটেছিল শ্রমের মহত্ত্বের বিকাশের সাথে সাথেই, এবং তা ঘটেছিল ব্যাপকভাবে। মানুষের শ্রম করা, শ্রমিকের কাজ করা, পণ্য উৎপাদন করা, সবই এমন মহত্ত্বপূর্ণ ছিল যে, লোকে তা করত অত্যন্ত ভক্তিভরে, তার জীবনধর্ম্মের অঙ্গরূপে। তপস্যা, তাপস, মুনি, তপোবন সবই শ্রদ্ধা ও ভক্তির আধার ছিল। বৌদ্ধযুগের কলিকাল পর্যন্ত শ্রমের এই মর্যাদা ছিল সমাজে। হিন্দু যুগে তার সামাজিক মর্যাদা খানিকটা নাশ করা হলেও, কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ ধর্ম্মাচরণের অংশ ছিল। বলতে কী, অন্তত ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সারা বিশ্বেই শ্রম বা তপস্যা করে পণ্য উৎপাদন করা ভক্তিশ্রদ্ধাহীন আচরণ কিংবা সামাজিক-মানবিক আবেগহীন আচরণ ছিল না।

কিন্তু ইয়োরোপে শিল্প বিপ্লবের পর, অর্থাৎ ঘোরকলির সূত্রপাতের পর শ্রমের দুনিয়াটা ন্যাংটো হয়ে যায়। শ্রমের প্রতিটি বিন্দু থেকে তার সমস্ত মহিমাকে মুছে সাফ করে আলাদা করে

নস্যাৎ করে দেওয়া হয়। কুবেরপুঁজির স্বেচ্ছাচারিতা শ্রমের শরীর থেকে তার সমস্ত মহত্ত্বকে খুলে টেনে নামিয়ে তাকে একেবারে উলঙ্গ-বিবস্ত্র করে দেয়। শ্রমকারী শ্রমিককে সে পরিণত করে একটি যন্ত্রে — যার মনুষ্যত্ব নেই, ধর্ম নেই, মর্যাদা নেই, আবেগ নেই, মানবিকতা নেই, সামাজিকতা নেই। খানিকটা রূঢ়ভাবেই, প্রাচীন গ্রীস বা রোমের ক্রীতদাসদের নিয়ে খনিতে কাজ করান হত, জাহাজে দাঁড় টানান হত। তারই প্রভাব পড়ে যায় সারা বিশ্বের ইন্ডাস্ট্রি-ক্ষেত্রে। ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিক ও শ্রম সবই মহত্ত্বহীন হয়ে যন্ত্রবৎ হয়ে যায়। কৃষিক্ষেত্রে তার প্রভাব কমবেশি পড়লেও, পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে কৃষিশ্রমের মহত্ত্ব এখনও কমবেশি বিদ্যমান রয়েছে। ভারতের তথা বাংলার শ্রমিক আজও বিশ্বকর্মা পূজার দিন তার নিজের যন্ত্রকে পূজা করে, যদিও তার মহত্ত্ব সে অনেকটাই ভুলে গেছে। যদিও তাদের কারও কারও মুখে এখনও আপন জাতি-গোত্রের উল্লেখ ঘটে এভাবে — আমরা হলাম 'বিশ্‌করমা ব্রাম্‌ভন'।

সেকালের ভারতে কিন্তু শ্রমের মহত্ত্ব পুরোমাত্রায় ছিল। এমনকি ১৯৬০-৭০ সাল পর্যন্ত বাংলার কৃষিক্ষেত্রেও তার সুস্পষ্ট উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যেত। কৃষিমজুরের সঙ্গে কৃষকের সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ ও ধর্ম্মভাবে জারিত। কিন্তু পরবর্তীকালে, পশ্চিমবাংলার তথাকথিত বামপন্থী আন্দোলন কৃষিক্ষেত্রেও শ্রমের ও শ্রমিকের মর্যাদাকে ধ্বংস করে উলঙ্গ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে, তা যে সম্পূর্ণ সফল হয়নি, এখনও তার নিদর্শন কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। এত কথার প্রয়োজন ছিল শুধু এটুকু বোঝাতে যে, শ্রমকে মর্যাদা দেওয়া, ভক্তিভরে শ্রম-আচরণ বা তপশ্চরণ করা, তপস্যা করা, তপস্বী-তপস্বিনীদের সম্মান করা, তপোবনকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা, তপঃ-কে ধর্ম্মের অঙ্গ হিসেবে, জীবনের অঙ্গ হিসেবে দেখা — এসবই মানবসভ্যতার যথার্থ অর্জন। সারা পৃথিবী এই কথা ভুলে গেলেও আমরা যেন ভুলে না যাই। আমাদের বিশ্বাস, আগামী বিশ্বের মানুষ শ্রমের প্রতি পুনরায় শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে, তাকে ধর্ম্মভাবে ভক্তিভাবে জীবনের অঙ্গ করে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

তপতী : ২. ***তপ**-কে গতিশীলভাবে তারণ করে যে।* **৩.** সূর্য্যপত্নী ছায়া। সাবিত্রীর গর্ভজাতা সূর্য্যকন্যা, পুরুরাজ সংবরণের ভার্য্যা ও কুরুরাজের জননী। তাপ্তী নদী। (ব.শ.)। (ক) সূর্যের রূপবতী কন্যা। সাবিত্রীর কনিষ্ঠা। সূর্যের স্ত্রী ছায়ার গর্ভে এঁর জন্ম। সূর্য এই কন্যার উপযুক্ত পাত্র বহু চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাপ্ত হন না। উক্ত সময় কুরুবংশীয় ঋক্ষ নামধারী এক রাজার পুত্র সূর্যভক্ত সংবরণ প্রত্যহ উদয়কালে সূর্যের আরাধনা করতেন। ... বশিষ্ঠের মধ্যস্থতায় তপতী ও সংবরণের বিবাহ হয়। ... তপতীর গর্ভে কুরু নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই কুরুই কৌরববংশের প্রতিষ্ঠাতা। (পৌ.অ.)। **৪.** মেয়েদের নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **চিত্ররথ**। সূর্য্যপত্নী ছায়াকে **তপতী** বলা হয়, আবার সাবিত্রীর গর্ভজাতা সূর্য্যকন্যাকেও **তপতী** বলা হয়। মোট কথা সূর্য্যপত্নীও **তপতী**, সূর্য্যকন্যাও **তপতী**। প্রাচীন শব্দার্থের এই ধাঁধার কারণ না জানা থাকলে এই ধাঁধাই এক দীর্ঘকালীন যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়ায়। একই ঘটনা ঘটে আরও বহু চরিত্রের ক্ষেত্রে। স্বয়ং সীতাকে নিয়েই কি কম যন্ত্রণা? প্রাচীনতম রামায়ণে তিনি রামের ভগিনী, পরবর্তী রামায়ণে তিনি রামের স্ত্রী। ... এ রহস্যের জট এখন খুলে ফেলা সম্ভব। কার্যত, **তপ** অন থাকে যাহাতে সে তো একটি ক্রিয়াকারী সত্তা। তার নানা প্রকারের আধারশক্তি থাকতেই পারে। **তপন**-এর তেমনি এক গতিশীল আধারশক্তি হল **তপতী**। সামাজিকভাবে ব্যাখ্যার জন্য যে পৌরাণিক কাহিনী লেখা হয়েছে, তাতে তাকে কখনো **তপন**-এর পত্নী, কখনো-বা কন্যা রূপে দেখানো হয়েছে। **যমুনা**র মতো এই সত্তার আধার-ধারাকে **তাপ্তী** নদীও বলা হয়ে থাকে। ... আরও অনেক প্রাচীন শব্দের মতো, **তপতী** বিষয়েও আমরা যথোপযুক্ত কাজ এখনও করে উঠতে পারিনি।

তপশীল (তপোব্রত, তফশীল) : ২. ***তপশীল** = **তপ** **শীল** (স্বভাব) যাহার; অর্থাৎ, যে শ্রম করিয়া জীবনযাপন করে।* ***তপোব্রত** = **তপঃ** ব্রত যাহার; অর্থাৎ, শ্রম করে উৎপাদন করা বৃত্তি যাহার।* **৩. তপশীল** = বিবরণ, তালিকা, ফর্দ্দ (schedule)। (ব.শ.)। **৪.** শব্দটি schedule অর্থে প্রচলিত রয়েছে কেবলমাত্র জমি বিষয়ক সরকারি খাতায়। সেখানে কোন তপশীলে কোন জমি রয়েছে, তার উল্লেখ থাকে। **৫.** দ্র. **উঞ্ছ, উঞ্ছশিল, ঋতব্রত, অর্কব্রত, দেবব্রত, সত্যব্রত**। যতদূর বোঝা যায়, মোগল আমলে **তপশীল** বা **তফসিল** শব্দটি আরবি তফ্‌সীল্‌ শব্দের থেকে প্রচলিত হয়েছে, তোডরমল যখন সারা ভারত জরিপ করেন, সম্ভবত তখনই জমিজোতের তালিকা বোঝাতে এই schedule অর্থে **তপশীল** বা তফশীল শব্দটির প্রচলন ঘটে। কিন্তু **তপশীল** শব্দটি নিজেই বলছে, সে এক প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ। তার সঙ্গে **উঞ্ছশিল** শব্দের সম্পর্ক রয়েছে। রয়েছে **তপোব্রত, অর্কব্রত** ... প্রভৃতি শব্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আসলে মানুষ এখন পর্যন্ত যে বৃত্তিগুলি গ্রহণ করে জীবন অতিবাহিত করে এসেছে, এগুলি তারই সমাজস্বীকৃত নাম। যে উঞ্ছবৃত্তি গ্রহণ করত সে ছিল উঞ্ছব্রত; যে শিলবৃত্তি গ্রহণ করত সে শিলব্রত (দ্র. **উঞ্ছ, উঞ্ছশিল**)। একইভাবে যে তপঃবৃত্তি (একালের ভাষায় শ্রমিকবৃত্তি) গ্রহণ করত, তাকে বলা হত **তপোব্রত**। এভাবেই **অর্কব্রত, ঋতব্রত, সত্যব্রত, দেবব্রত** ইত্যাদি শব্দের প্রচলন হয়েছে। এদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

তপ্ত (তপ্তকাঞ্চন) : ১. ✓তপ্‌ + ত - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***তপ্ত** = **তপ্‌** তারিত যাহাতে।* ***তপ্তকাঞ্চন** = যে কাঞ্চনকে তপ্ত করা হইয়াছে।* **৩. তপ্ত** = দগ্ধ, পুটপাকশোধিত, দ্রবীকৃত, আচরিত, কৃত, পীড়িত, তাপযুক্ত, জ্বলিত, আতপজ্বলিত। **তপ্তকাঞ্চন** = অগ্নিশোধিত স্বর্ণ। (ব.শ.)। **৪.** hot অর্থে প্রচলিত। **৫.** ব্যাখ্যা অপ্রয়োজন।

তাপস (তাপসতরু, তাপসদ্রুম, তাপসপ্রিয়, তাপসপ্রিয়া, তাপসারণ্য, তাপসেন্দ্র) : ১. তপস্‌ + অ (অণ্‌) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। **২.** ***তাপস** = **তপঃ** (বা তপস্‌) হইতে জাত।* **৩. তাপস** = তপোবিশিষ্ট, তপশ্চরণশীল, তপঃসম্বন্ধী, তাপসসম্বন্ধী, তপস্বী, বানপ্রস্থ, বক, ইক্ষুবিশেষ। **তাপসতরু, তাপসদ্রুম** = তাপসপ্রিয় বৃক্ষ, ইঙ্গুদী। **তাপসপ্রিয়** = প্রিয়ালবৃক্ষ (পিয়াসাল)। **তাপসপ্রিয়া**

= দ্রাক্ষা। **তাপসারণ্য** = মুনিবন, তপোবন। **তাপসেন্দ্র** = শ্রেষ্ঠ তাপস, শিব। (ব.শ.)। ৪. এখনও একনিষ্ঠ মানুষকে বোঝাতে তাপস শব্দটি কমবেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৫. এখানে ভাবনার কথা দুটি — প্রথমত **তপস্বী** শব্দটি থাকতেও **তাপস** শব্দটির প্রচলন হল কেন? শব্দদুটির মূল অর্থ এক, নাকি আলাদা? দ্বিতীয়ত, তাপসযুক্ত শব্দগুলি যথা **তাপসপ্রিয়, তাপসারণ্য** ... এগুলির অর্থের ব্যাপ্তি কি **তপঃ**-যুক্ত শব্দের মতোই?

হ্যাঁ, **তপস্বী** ও **তাপস** মূলে এক বংশের সন্তান হলেও, তাদের স্বভাবে ফারাক আছে। **তপস্বী** শব্দ সেই সত্তাকে বোঝায়, যে **তপস্** বহন করে। একালের ভাষায় ইনি একজন 'কাজের মানুষ', যিনি কী করতে হবে তা জানেন, কীভাবে কখন কোথায় কোন কৌশলে করতে হবে তাও জানেন, এবং যথাসময়ে তা করেনও। আর, **তাপস** শব্দ সেই সত্তাকে বোঝায়, যে **তপস্** হইতে জাত। তার মানে, **তপস্বী** যদি একজন তত্ত্ব ও প্রয়োগ (থিয়োরি-প্র্যাকটিস) বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষ হন, **তাপস** হবেন তাঁর অনুসারী একজন একনিষ্ঠ আত্মনিবেদিত সহযোগী কর্মী। আজকের সমাজের সদস্যদের ভিতর থেকে এরকম **তপস্বী** বা **তাপস**কে খুঁজে বের করা কঠিন, কেননা, এখনকার সমাজ বিবর্তিত হয়ে **তপস্বী**দের কাল থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। স্বভাবতই সেকালের **তপস্বী** সত্তাটি এখন অনেকগুলি ছোট ছোট সত্তায় বিভাজিত — বিজ্ঞানী, পরামর্শদাতা, উদ্যোক্তা, পুঁজিবিনিয়োগকারী, সংস্থা-পরিচালক, কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগকারী ইত্যাদি। আর, সেকালের **তাপস** সত্তাটি বর্তমানে হুকুম মেনে কাজ করা শ্রমিক-মজুরে পরিণত হয়ে গেছে; কাজের পরিকল্পনা কিংবা তার বিজ্ঞান কোনো বিষয়েই যার কোনো বোধ বা দায় নেই।

তাই বলে সেকালের সমাজের চোখে **তপস্বী** ও **তাপস** এই শব্দদুটির যে মহত্ত্ব ছিল, তা কিন্তু মুছে যায়নি। সেই কারণে বাংলাভাষীরা আজও জ্ঞানীগুণী নিষ্ঠাবান মানুষদের জ্ঞান**তপস্বী** বলে থাকেন। কেবল তাই নয়, মহর্ষি বা holy man বোঝাতে বাংলায় এখনও **তাপস** শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর কারণ হল, সেকালের **তপস্বী**ই হোন আর **তাপস**ই হোন, তাঁরা এমন ধর্ম্মাচার-পালনের ন্যায় একনিষ্ঠ কর্ম্মসাধনা করতেন যে, তাঁদের সমগ্র জীবনাচরণে লোভ বা আত্মসেবার কোনো স্থানই ছিল না; ছিল কেবল আপন লক্ষ্যের প্রতি নিরন্তর একনিষ্ঠ চেষ্টা। **তাপস-তপস্বী**দের স্বভাবের এই বিশেষত্বের কথা ভারতসমাজ আজও ভোলেনি বলেই শব্দদুটির ঐরূপ ব্যবহার আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে চলে আসছে।

তম্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অন্ধতামস, অন্ধতামিস্র, তম্, তম, তমঃ, তমলুক, তমস, তমসা, তমসুক (তমস-উক), তমস্কাণ্ড, তমস্তুতি, তমস্বতী, তমস্বান, তমস্বী, তমা, তমাবৃত, তমাল, তমালিকা, তমালিনী, তমি, তমিস্র, তমী, তমীনাথ, তমোগুণ, তমোঘ্ন, তমোনুৎ(নুদ্), তমোপহ, তমোব্রত, তমোমণি, তমোময়, তমোরি, তমোহর, তমোহার, তম্বাখু (তম-বাহক), তম্বি (তম-বিহ্), তান্ত, তাম, তামরস, তামলি(লী), তামস, তামসিক, তামা, তামাটে, তামাক, তামাকু, তামাদি, তামাম, তামাশা, তামিল (তম-ইল, তামলি ও তামিলরা ব্যবসা **করে, হুকুম তামিল** মেনে নেয়, তাই তম-ইল), তামিস্র, তামু, তামে, **তামেলি**, তাম্বা, তাম্বু, তাম্বুরা, তাম্বুল, তাম্বুলাধিকার, তাম্বুলিক, **তাম্বুলিয়া**, তাম্বুলী, তাম্র (সোনা, রুপো, তামা — সত্ত্ব, রজ, তম), তাম্রকর্ণী, তাম্রকার, তাম্রকুট্ট, তাম্রকূট, তাম্রকৃমি, তাম্রগর্ভ, **তাম্রচূড়**, তাম্রচূড়া, তাম্রজাত, তাম্রদ্রু, তাম্রদ্বীপ, তাম্রপট্ট, তাম্রপত্র, **তাম্রফলক**, **তাম্রপল্লব**, তাম্রপুষ্প, তাম্রলিপ্ত, তাম্রশিখী, তাম্রসার, তাম্রসারক, তাম্রাশ্ম, তাম্রী, তাম্রোষ্ঠ, তুমুল, তোমর, নিতম্ব, নিতম্বিনী, নিতান্ত, বিতণ্ডা।

তম্ = তারীর সীমায়ন। **তম** = তারী সীমায়িত যাহাতে।

তম, তমা, তমাল, তমালিকা, তমালিনী : ১. তম = ✓তম্ + অ (ঘঞ্) - করণবাচ্যে। তমাল = তমতাল > তমাল (?); তুলনীয় 'কালতাল, নীলতাল'। (ব.শ.)। ২. **তম** = *তারী সীমায়িত যাহাতে।* ***তমা*** *=* ***তম****-এর আধার যে।* ***তমাল*** *=* ***তমা****র লালন-লয়ন যাহাতে।* ***তমালিকা*** *=* ***তমাল****-কে গতিশীল করে যে, তাহার আধার।* ***তমালিনী*** *=* ***তমাল****-কে গতিশীল যে আধারশক্তি।* ৩. **তম** = অন্ধকার, রাহু, তমালবৃক্ষ, তমোগুণ, পাদাগ্র; বহুর মধ্যে একাতিশয্যার্থে পটু**তম**, লঘু**তম** ইত্যাদি। **তমা** = রাত্রি, গর্ব্ব, অহঙ্কার। **তমাল** = কৃষ্ণত্বক বৃক্ষবিশেষ, তাপিঞ্জ বৃক্ষ (Diospyros tomentosa), সাম্প্রদায়িক তমালপত্রাকার তিলক, কৃষ্ণখদির, বরুণবৃক্ষ, বংশত্বক, খড়গবিশেষ। **তমালিকা, তমালিনী** = তমালপ্রচুর দেশ, তমলুক। (ব.শ.)। ৪. বহুর মধ্যে একাতিশয্যে প্রত্যয় রূপে **তম** (পটু**তম**) এবং নাম রূপে **তমাল** ও **তমালিকা** প্রচলিত। অন্য দুটি অপ্রচলিত। ৫. **তৎ** শব্দে আমরা দেখেছি, তারীর স্বভাবই হল ক্রমান্বয়ে পরবর্তীতে তারিত হয়ে চলা। কোনোভাবে তাকে আর এগোতে না দিলে, তার এগোনো শেষ হয়ে গেলে, অর্থাৎ তাকে সীমায়িত করে দিলে **তর** আর **তর** থাকতে পারে না, হয়ে যায় **তম**। এ-যেন তারীর সামনে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। ফলে, **তম** শব্দটি এমন ব্যাপারের প্রকাশক হয়ে যায়, যা কিনা তারীর সর্বোচ্চ সীমা বা **তম**, যার আর এগোনোর উপায় নেই, সামনে দেখার বা যাওয়ার ব্যাপারে যাকে **অন্ধ** করে দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে **তম** মানে হয়ে যায় **অন্ধকার**।

কিন্তু **তমাল** ও তজ্জাত শব্দগুলি খুবই রহস্যময়। ভয় থেকে যেমন ভয়াল হয়, তম থেকে তেমনি তমাল হওয়াই স্বাভাবিক। বলা হয়, এটি নাকি একটি বিশেষ ধরনের গাছের নাম। এ কেমন গাছ? একি তবে তালগাছ? ব.শ. বলেছেন 'কৃষ্ণত্বক বৃক্ষবিশেষ'। তাঁর নিজের সন্দেহ হয়েছে গাছটি 'তমতাল' কি না। কিন্তু তা ঠিক কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কেননা, 'তমালতালিবনরাজিনীলা' প্রভৃতি শ্লোকে একথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তমাল ও তাল দুটো আলাদা গাছের নাম; হতে পারে তারা খুব কাছাকাছি স্বভাবের। তবে কি সে নারকেল গাছ? না, তাও নয়। ব.শ. বলেছেন, এ হল 'তাপিঞ্জ বৃক্ষ' এবং তার ল্যাটিন নামটিও দিয়েছেন। কিন্তু অনেককে জিজ্ঞেস করেও আমরা তাপিঞ্জ গাছ কেমন গাছ, তার কোনো পরিচয় পাইনি। আমাদের মনে হয়েছে, তাল তো দু'রকম হয় — কালোতাল

ও হলুদাভ তাল। কালোতাল প্রধানত মিষ্টি, তার তিতোভাবটি কম এবং এই তালেরই রস চোয়ানো হয়, তাড়ি হয়, পাকলে এই তাল থেকেই পিঠে হয়। আর, বোঁটার দিকটায় একটু কালো রং থাকলেও নীচের দিকটি লালচে হলুদ যে-তাল, যা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ফলে, তার তিতোভাবটি একটু বেশি এবং এই তালের কাঁদি কাঁচা অবস্থায় কেটে তালের শাঁস খাওয়া হয় এবং এই তাল পাকলে প্রধানত গরুর খাদ্য রূপে ব্যবহৃত হয়। আমাদের ধারণা, তমাল বলতে ঐ পিঠা তৈরির কালো তালকেই বোঝান হত।

উল্টো দিকে ব.শ. জানিয়েছেন, তমলুক বন্দরটি ছিল 'তমাল প্রচুর দেশ'। আমরা জানি, তমলুক প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দরের আধুনিক নাম। এখানে সেকালে প্রচুর তমাল গাছ ছিল কি না, এবং তার জন্যই বন্দরটি বিখ্যাত কি না, তা আমরা শুনিনি; আর কেউ সেরকম জানেন কি না, তাও আমরা জানি না। কিন্তু ব.শ. যখন তথ্যটি দিয়েছেন, তার সত্যতা নিয়ে আমাদের সংশয় কম। তাহলে ব্যাপারটি আসলে কী?

আমাদের ধারণা, আসলে **তমাল** শব্দটি একদিকে যেমন বাহ্যিক কালোতাল-গাছকে বোঝায়, তেমনি সামাজিক রপ্তানিকারী সংস্থাকেও বোঝায়। আমরা দেখেছি, বাংলাভাষীদের চেতনায় **অশ্বত্থবৃক্ষ, বটবৃক্ষ** যেমন যথাক্রমে যৌথ উৎপাদক-সংস্থা (সমাজতান্ত্রিক-ব্যবস্থা) ও পণ্য উৎপাদক-সংস্থাকে (পুঁজিবাদী-ব্যবস্থাকে) বোঝাত, সেইভাবে রপ্তানিকারী সংস্থাকে **তালবৃক্ষ, তমালবৃক্ষ** ইত্যাদি বলা হত। (দ্র. **তালজঙ্ঘ**)। মনে রাখা ভাল, এই বৃক্ষ কাউকে ছায়া দেয় না; রপ্তানিকারী সংস্থাও মালিক ছাড়া আর কাউকে খুব একটা ছায়া দিতে পারে না। এরূপ পণ্যরপ্তানির থেকে প্রাপ্ত সম্পদের গন্ধ জ্ঞানীগুণী মানুষেরা প্রায়শই সহ্য করতে পারেন না; এমন মনীষীর নাম খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব যিনি পণ্যরপ্তানির ব্যবসা করতেন। পাকা তালের গন্ধও অনেক মানুষ সহ্য করতে পারেন না। আমাদের মনে হয়, তাম্রলিপ্ত বন্দরে প্রচুর রপ্তানিকারক সংস্থা ছিল বলেই তাকে 'তমালপ্রচুর দেশ' বা **তমলুক** বলা হয়ে থাকবে। দ্র. **দামলিপ্ত**।

তমঃ (তমস্), তমস, তমসা : ১. ✓তম্ + অস্ (অসুন্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **তমঃ** = *তারী সীমায়িত হইয়া বিসর্গীকৃত হয় যাহার দ্বারা বা যাহাতে; অথবা,* ***তম****-নির্য্যাস ত্যক্ত হয় যাহাতে।* ৩. **তমঃ, তমস্** = অন্ধকার, তিমির, মোহ, অবিবেকতা, অনাত্মবিষয়ে আত্মজ্ঞান, অবিদ্যা, অজ্ঞান, নরকাদিদুঃখ, দুঃখ, পাপ, বিশেষদর্শন-বিরোধিদোষ, প্রকৃতিজাত গুণত্রয়ের একতম। **তমস** = তমোযুক্ত, তিমিরময়, কূপ, অন্ধকার, নগর। **তমসা** = অন্ধকার, নদীবিশেষ। (ব.শ.)। **তমসা** = এই নদীর নিকট আশ্রমে মহামুনি বাল্মীকির কণ্ঠ হতে বীণাযন্ত্রের লয়যুক্ত ছন্দোবদ্ধ প্রথম শ্লোকের উৎপত্তি হয়েছিল। ... বনগমনের সময় এই তমসা নদীতীরে রামচন্দ্র রাত্রিযাপন করেছিলেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. darkness অর্থে **তমসা** প্রচলিত, বাকি সব অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **তপঃ**। ভারতের বৈদিক ব্যবস্থা একসময় মৌলবাদী হয়ে পড়ায় ভারতসমাজে **তমস্**-এর ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, তখন **বাল্মীকি মুনি** তারই পাশে **নতুন** জীবনের গান গেয়েছিলেন। সেই গানই **রামায়ণ**।

তাম, তামা, তাম্বুল, তাম্র (তাম্রকর্ণী, তাম্রকার, তাম্রকুট্ট, তাম্রকূট, তাম্রকৃমি, তাম্রগর্ভ, তাম্রচূড়, তাম্রচূড়া, তাম্রবাটী, তাম্রদ্রু, তাম্রদ্বীপ, তাম্রপট্ট, তাম্রপত্র, তাম্রফলক, তাম্রপল্লব, তাম্রপুষ্প, তাম্রলিপ্ত, তাম্রশিখী, তাম্রসার, তাম্রসারক, তাম্রাশ্ম, তাম্রী, তাম্রোষ্ঠ) : ২. *তাম =* ***তম*** *হইতে জাত।* ***তামা*** *=* ***তাম****-এর আধার যে।* ***তাম্বুল*** *=* ***তাম*** *বাহক নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে লালিত হয় যাহাতে।* ***তাম্র*** *=* ***তাম*** *রহে যাহাতে।* ৩. **তাম** = তাম্র। **তামা** = তাম্র। **তাম্বুল** = পর্ণ, পান, সাজা পান। **তাম্র** = তাম্রবিকার, তাম্রময়, তাম্রবর্ণযুক্ত, ধাতুবিশেষ, তামা, (সাদৃশ্যে) অরুণবর্ণ, রক্তগুঞ্জা, মঞ্জিষ্ঠা। (**তাম্রকর্ণী** = পশ্চিমদিকের দিগগজের হস্তিনী। **তাম্রকার, তাম্রকুট্ট** = তাম্রোপজীবী, সঙ্কীর্ণজাতিবিশেষ। **তাম্রকূট** = তামাক। **তাম্রকৃমি** = ইন্দ্রগোপকীট। **তাম্রগর্ভ** = তাম্রজাত, তুথ। **তাম্রচূড়** = রক্তচূড়াযুক্ত, কুক্কুট। **তাম্রচূড়া** = রক্তবর্ণ শিখা। **তাম্রবাটী** = কোশা। **তাম্রদ্রু** = রক্তচন্দন। **তাম্রদ্বীপ** = দক্ষিণদেশস্থ দ্বীপ, লঙ্কা। **তাম্রপট্ট, তাম্রপত্র, তাম্রফলক** = লেখনার্থ তাম্রময় পত্র বা পাত। **তাম্রপল্লব** = অশোক। **তাম্রপুষ্প** = রক্তকাঞ্চন, ভূমিচম্পক বা ভুঁইচাঁপা। **তাম্রলিপ্ত** = তমলুক। **তাম্রশিখী** = তাম্রচূড়, কুক্কুট। **তাম্রসার** = রক্তচন্দন বৃক্ষ। **তাম্রসারক** = রক্তখদির, রক্তচন্দন। **তাম্রাশ্ম** = রক্তমণি, পদ্মরাগ। **তাম্রী** = তাম্রময় বাদ্যবিশেষ, সময়নিরূপণার্থ তাম্রপাত্রবিশেষ। **তাম্রোষ্ঠ** = তাম্র ওষ্ঠ যাহার, রক্তৌষ্ঠ।) (ব.শ.)। ৪. copper অর্থে **তামা** শব্দটি প্রচলিত। তাম্বুল শব্দটি **তামলি** বা **তামলী** রূপে পদবী অথবা জাতি (caste) বিশেষের নাম হিসেবে প্রচলিত। দ্র. **পদবী**। বাকি সবই অপ্রচলিত। ৫. একথা বুঝতে কোনো অসুবিধাই হয় না যে, **তম** শব্দ থেকেই **তাম, তামা, তাম্বুল, তাম্র** ও **তাম্র**-যুক্ত অজস্র শব্দ প্রসূত হয়েছে। কিন্তু ঠিক কীভাবে **তম** শব্দের অন্তর্নিহিত ক্রিয়ার সঙ্গে ওই প্রসূত-শব্দগুলি সম্পর্কিত, তা স্পষ্ট রূপে বোঝা যায় না। আমরা দেখেছি, **তামা** মিশিয়ে তৈরি কাঁসার থালাবাসনে অম্ল ভোজন করা যায় না; অথচ তেঁতুল দিয়েই সেগুলি পরিষ্কার করা হয়। পঞ্চাশ বছর আগেও এ-বাংলায় **তামা**জাত কাঁসা-পিতলের থালাবাসন ঘটিবাটি প্রায় প্রতি পরিবারেই ব্যবহৃত হত। ওদিকে **তাম্বুলী** বা **তামলী**-শ্রেণীর বাংলাভাষীরাই গ্রামবাংলায় ব্যবসায়ী জাতি রূপে পরিচিত ছিলেন। এঁদের অনেকেই ভুষিমাল দোকান (grocery shop) চালাতেন, কলুর কাজ করতেন, পান ব্যবসা করতেন। তাঁদের বাড়িতে চণ্ডাল মুসলমান থেকে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সব মানুষের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। সর্বোপরি **তাম্রলিপ্ত** বন্দর যে ব্যবসায়েরই কেন্দ্র ছিল, তা সকলেই জানেন। **তাম্র**-যুক্ত শব্দের বিশাল তালিকাই বলে দেয়, বাংলার সমাজে বিষয়টির কতখানি ব্যাপ্তি ছিল।

দেহবাদী ঐতিহাসিকরা, যাঁরা মানুষের সভ্যতার বিচার করেন বাহ্যবিকাশের নিরিখে, তাঁরা **তাম্রযুগ** বলে একটা আলাদা যুগই চিহ্নিত করে থাকেন। একথাও সত্য যে, মানবসভ্যতার বিকাশের একটি অধ্যায়ে তামার আবিষ্কার ও ব্যবহার মানুষের জীবনযাত্রাকে অনেকটা সহজ করে তুলেছিল। স্বভাবতই **তাম্র** শব্দযোগে অনেক শব্দই তৈরি হয়ে থাকবে। এখানে তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে, দেওয়া হয়েছে প্রতিটি শব্দের প্রতীকী অর্থও। কিন্তু যেটা কিছুতেই

বোঝা যায় না, তা হল, এগুলির সঙ্গে **তম** শব্দের সম্পর্কের সূত্র কোথায়; যদিও সম্পর্ক যে রয়েছেই, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

তর্‌ (তর্ক্‌, তর্জ্জ্‌) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : (রত-তর, দ্র. তল্‌) অতর্ক, অতর্কিত, অতর্কিতোপপন্ন, অতর্ক্য, অপ্রতর্ক্য, অবিতর্কিত, টাক, তকরার, তক্ক, তক্কো, তর্ক্‌, তর্ক, তর্কণ, তর্কণীয়, তর্কিত, তর্কগ্রন্থ, তর্কবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, তর্কাতর্কি, তর্কী, তর্জ্জ্‌, তর্জ্জ, তর্জ্জ-গর্জ্জ, তর্জ্জন, তর্জ্জন-গর্জ্জন, তর্জ্জনীমুদ্রা, তর্জ্জা (তরজা), তর্জ্জাবন্ধ, তরজই-বন্দ্‌, তর্জ্জিত, তাক, তাগ, তাজ, তাজনি, তার্কিক, বিতর্ক, সতর্ক।

তর্‌ (তর্ক্‌, তর্জ্জ্‌) = তারীর রক্ষণ-রহন। **তর** = তারী রহে যাহাতে। **তর্ক** = তারীর রক্ষণ করে যে। **তর্জ্জ** = তারীর রক্ষণ জনন করে যে।

তর্ক, তর্কণ, তর্কিত (তর্কবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, তর্কাতর্কি, বিতর্ক, অতর্ক, অতর্কিত, সতর্ক, তর্‌কিব, তক্কে-তক্কে) : ১. ✓তর্ক্‌ + অ (অচ্‌) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তর্ক** = *তারীর রক্ষণ করে যে।* **তর্কণ** = **তর্ক** *অন যাহাতে।* **তর্কিত** = **তর্ক** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* / **তর্ক** = অবিজ্ঞাত বিষয়ে কারণানুসারে তত্ত্বজ্ঞানার্থ বিমর্শ (যাহাতে)। **অতর্ক** = যাহার তর্ক (তর্কহেতু) নাই। **অতর্কিত** = যাহা তর্কিত (চিন্তিত) নহে। (ব.শ.)। **৩. তর্ক** = ব্যভিচার-নিবর্ত্তক সম্ভাবন, বিতর্ক, পর্য্যালোচনা, সংশয়, ... স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে বিচারণা, অর্থবাদ, হেতুশাস্ত্র — মীমাংসাদি, ন্যায়শাস্ত্র, বেদ-অবিরোধী মীমাংসাদি ন্যায়, মানস জ্ঞান, ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত হেতুমূলক অপবর্গফল মতবাদবিশেষ, ছয় (৬) সংখ্যা। ... **তর্কণ** = সম্ভাবনা, বিমর্শ, বিচার। **তর্কবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র** = ন্যায়শাস্ত্র। **তর্কাতর্কি** = পরস্পর তর্ককরণ, বাদানুবাদ। **বিতর্ক** = সংশয়, সন্দেহ, উহ, সম্ভাবন, বিতর্কণীয় বিষয়, বাদানুবাদ, বাককলহ। **অতর্ক** = অহৈতুক, তর্কহীন, যাহার তর্ক অপ্রশস্ত, তর্কাভাব, ন্যায়াভাব, কুতর্ক। **অতর্কিত** = অচিন্তিত, অননুমিত, অবিচারিত। **সতর্ক** = তর্কসহিত, সাবধান, অপ্রমত্ত, অবহিত, বিমৃশ্যকারী। (ব.শ.)। **৪. তর্কণ, তর্কিত,** ও **অতর্ক** বাদে বাকি শব্দগুলি কমবেশি প্রচলিত। তাদের মধ্যে **তর্ক, তর্কাতর্কি, বিতর্ক** তিনটি শব্দই বাদানুবাদ বা debate, argument অর্থে, **তর্কবিদ্যা** ও **তর্কশাস্ত্র** Logic অর্থে, **অতর্কিত** suddenly অর্থে এবং **সতর্ক** cautious অর্থে প্রচলিত। **৫. তর্ক** শব্দের মূলে যে অর্থটি বিদ্যমান, তা সূক্ষ্মবোধ সম্মত। মানুষের অবচেতনে বিরাজিত পরমাপ্রকৃতির **অতিচেতনা** মানবমনের গভীরে এত বিজ্ঞান-সম্মতভাবে চিন্তাভাবনা চালান, বিশ্বাস হতে চায় না। আমরা দেখছি, সাধারণ মানুষের মনের গভীরে বসে পরমাপ্রকৃতি ধ্বনির ভিতরে মানে ঢোকানোর কাজটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবেই করে থাকেন। বিশ্বাসই হতে চায় না যে, সাধারণ মানুষই এরকম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম অনুসরণ করে এরকম অর্থপূর্ণ শব্দ সৃষ্টি করে চলেছেন।

তর্ক শব্দের মূলে রয়েছে — ত-এর বা তারীর রক্ষণ (র্‌) করে যে; অর্থাৎ কিনা, যে **সত্তা তারীকে রাখে,** কিংবা, 'তারীর রহন' (= **তর্‌**) ঠিক করে যে। তার **মানে — তর্‌ করে যে,** সেই হল **তর্ক**। আসলে, তারীর থাকা না-থাকা নিয়ে এত কথার কারণ হল, তারী তার বর্তমান অধ্যায় থেকে নতুন যে-অধ্যায়ে যেতে চাইছে কিংবা যাবে বলে ভাবছে, সেই অধ্যায় তো আসলে তারীর সামনে রাখা সম্ভাবনাসমূহ বা 'অপ্‌সন্‌স্‌'। কোন সম্ভাবনাটি গ্রহণ করা তারীর পক্ষে ভাল হবে, **তর হবে,** bet*ter* হবে (বি-তর হবে), সেটি বিচার-বিবেচনা করে নির্ণয় করা দরকার; তারপর নতুন অধ্যায়ে লাফ দেওয়া উচিত, তার আগে নয়। সম্ভাবনাগুলির মধ্যে সেই তুলনামূলক বিচারের কাজটি যে করে, সেইই **তর্ক**-পদবাচ্য। তার মানে **তর্ক** শব্দের গোড়ায় 'বাদানুবাদ করা' বা argument করার ব্যাপার নেই, রয়েছে বিভিন্ন সম্ভাবনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাটিকে তুলনামূলক বিচার বিবেচনা করে স্থির করার গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা। সেভাবে সম্ভাবনাগুলির তুলনা করা ও বিচার-বিবেচনা করাকেই **তর্ক** বলে। মানুষ স্বভাবতই সেই **তর্কে-তর্কে** বা **তক্কে-তক্কে** থাকে। বিপরীত কিংবা বিশেষ সম্ভাবনাকে বিচার-বিবেচনার জন্য গ্রহণ করলে, তাকেই বলা হয় **বিতর্ক** করা। আবার, কোনো রকম **তর্ক** ছাড়াই নতুন অধ্যায়ের দিকে গেলে কিংবা নতুন অধ্যায়ের আগমনকে বিনা বিচারে গ্রহণ করে নিলে, তা হয়ে যায় **অতর্কিত**। নতুনের এরকম স্বীকৃতি স্বভাবতই তারীর পক্ষে হয়ে যায় আকস্মিক। তাই **অতর্কিত** শব্দের ব্যঞ্জনা-অর্থ হয়ে যায় 'হঠাৎ'। তবে যদি সর্বপ্রকারের আগন্তুকদের প্রতি কড়া নজর রাখা হয়, সর্বদা তুলনামূলক বিচার-বিবেচনা বা **তর্ক** চালু থাকে, তখনই বলা হয় **সতর্ক**। এই তর্ক-ইব বা **তর্‌কিব** সমূহ জানলে তবেই না কৌশলী! তা সে যাই হোক, **তর্ক** শব্দের এই অর্থটি আজকের অ্যাকাডেমি জানে না, **তর্ক**কে সে debate বা argument শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ করে নিয়ে **তর্ক** শব্দটিকে দূষিত ও সংকুচিত করে নিয়েছে; যদিও সাধারণ বাংলাভাষী শব্দটির যথাযথ অর্থ মনের গভীরে পোষণ করেন এবং তাঁরা এখনও better option অর্থেই 'তক্কে-তক্কে থাকা' কথাটির ব্যবহার করেন। এসব না-জেনে বুঝে কেউ কেউ ভারতবাসীকে *Argumentative Indian* বা 'তর্কশীল ভারতীয়' বলে আখ্যা দিয়েছেন। এরকম করা সম্ভব হয় রবীন্দ্রকথিত সেই 'একটেরে' বুদ্ধিতে, যে-বুদ্ধি বাংলাভাষীকে তার মনের মাটি থেকে উৎখাত করেছে, করছে। ... **৬.** আরবি 'তর্‌কিব'। ইংরেজি bet*ter*, -er।

তর্জ্জন, তর্জ্জন-গর্জ্জন, তর্জ্জনা, তর্জ্জনী, তর্জ্জা (তরজা), তর্জ্জিত : ১. ✓তর্জ্জ্‌ + অন্‌ (ল্যুট্‌) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তর্জ্জন** = **তর্‌** *জনন অন থাকে যাহাতে।* **তর্জ্জন-গর্জ্জন** = **তর্জ্জন** ও **গর্জ্জন** *থাকে যাহাতে।* **তর্জ্জনা** = **তর্জ্জন**-*এর আধার যে।* **তর্জ্জনী** = **তর্জ্জন**-*এর গতিশীল আধার যে।* **তর্জ্জা** = **তর্জ্জ**-*এর আধার যে।* / **তর্জ্জনী** = যাহার দ্বারা তর্জ্জন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. তর্জ্জন** = ভর্ৎসন, ভয়প্রদর্শন, শাসান। **তর্জ্জন-গর্জ্জন** = ভর্ৎসনা ও শাসনবাক্যপ্রয়োগ। **তর্জ্জনা** = ভর্ৎসনা। **তর্জ্জনী** = বৃদ্ধাঙ্গুলির পরবর্তী অঙ্গুলি, প্রদেশিনী। **তর্জ্জা** = কবিগানজাতীয় লোকসংগীত-বিশেষ, গানবিশেষ। (ব.শ.)। **৪. তর্জ্জনা** শব্দটি অপ্রচলিত, বাকিগুলি

কমবেশি প্রচলিত। scolding অর্থে **তর্জ্জন**, **তর্জ্জন-গর্জ্জন**, এবং index finger অর্থে **তর্জ্জনী**, আর 'কবিগান' অর্থে **তর্জ্জা** প্রচলিত। **৫.** তুলনামূলক বোঝাতে বাংলায় যে **তর** শব্দের প্রয়োগ হয়, তার ভিত্তিটিও এখানে দেখানো হল। **তর্ক** শব্দে আমরা **তর** শব্দের ব্যাপকতা উপলব্ধি করেছি। এই **তর্** জনন করাই যে তর্জ্জন করা, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ... তবে, **তর্** যেখানে শেষমেষ গমন করে, সেই **তর্গত** শব্দটি বাংলায় প্রচলিত নেই, রয়েছে ইংরেজিতে, target রূপে। মনে হয়, কাল্পনিক চরিত্র ইংরেজি ভাষার Tarzan শব্দটিও এই গোত্রের। **৬.** ইংরেজি target, Tarzan।

তল্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : (লত-তল, লতিয়ে লতিয়ে যায় যে স্থান দিয়ে — তল) অতল, অতলস্ত, অতলস্পর্শ, অতলান্ত, উত্তাল, তল্, তল, তলগড়, তলঘাত, তলতল, তলতা, তলতাল, তলত্র, তলত্রাণ, তলপ্রহার, তলব, তলবার, তলয়ার, তলবারণ, তলযুদ্ধ, তললোক, তলপাল, তলসারক, তলহৃদয়, তলা, তলাখাঁকতি, তলাগুছি, তলাগোচা, তলাতল, তলাতি, তলান, তলানি(নী), তলাপাত্র, তলাশ, তলি, তলিকা, তলিত, তলিম, তলী, তলুয়া, তলো, তলোয়ার, তল্প, তল্পক, তল্পল, তল্পি(ল্পী), তল্পিতল্পা, তল্পিবাহক, তল্লাশ, তাল, তালই, তালক, তালকাণা, তালকেতু, তালগর্ভ, তালচটা, তালজঙ্ঘ, তালজটা, তালপ্রলম্ব, তালদোরস্ত, তালধ্বজ, তালনবমী, তালপত্তর, তালপত্র, তালপাতা, তালবানা, তালবৃন্ত, তালবৃন্তক, তালবেতাল, তালব্য, তালা, তালাই, তালভৃৎ, তাললক্ষণ, তালমর্দ্দল, তালযন্ত্র, তালশাঁস, তালাশ, তালাস, তালি, তালিক, তালী, তালীপত্র, তালীশ, তালীশপত্র, স্থল।

তল্ = তারীর লালন-লয়ন। **তল** = তারীর লালন-লয়ন থাকে যাহাতে।

তল (অতল, অতলস্পর্শ), তল, তলতল, তলতা, তলা, তলান, তলানি, তলাশ (তল্লাশ, তালাশ) : **১.** ✓তল্ + অ (ঘঞর্থে ক) - অধিকরণে। (ব.শ.)। **২.** **তল** = *তারীর লালন-লয়ন যাহাতে।* (**অতল** = **তল** *নাই যাহার।* **অতলস্পর্শ** = *যাহার তল স্পর্শ করা যায় না।*), **তলতল** = **তল**-*এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **তলতা** = **তল** *তারিত যে আধারে।* **তলা** = **তল**-*এর আধার যে।* **তলান** = **তলা** *অন যাহাতে।* **তলানি** = **তলায়** *গতিশীলভাবে অন থাকে যে।* **তলাশ, তল্লাশ, তালাশ** = *যাহাতে* **তল** *(স্পর্শ করার) আশা বা আশ থাকে।* / **অতল** = যাহার তল নাই। **অতলস্পর্শ** = যাহার তলের (অধোদেশের) স্পর্শ নাই। **তলতল (তলতলে)** = যাহা তলতল করে। (ব.শ.)। **৩.** **তল** = স্বরূপ, পৃষ্ঠ, উপরিভাগ, অধোভাগ, বৃক্ষাদির বা আচ্ছাদনের নিম্নস্থিত স্থান, চপেট, প্রসৃতপাণি (palm), পদের নিম্নভাগ, চপেটাঘাত, বিস্তৃতি, নদী-প্রভৃতির অধোভাগ, তলা, তালবৃক্ষ, শিব, খড়্গমুষ্টি, সব্যপাণি দ্বারা তন্ত্রীঘাত, আধার, কানন, গর্ত্ত, কার্য্যবীজ, কারণ, জ্যাঘাতবারণ, গোধা, পুষ্করিণী, পাতাল। **তলতল** = চঞ্চলভাব, তুলতুলে ভাব, নমনীয়তা, কোমলতা, চঞ্চল, কিরণে ভরপুর। **তলতা** = শিথিলগ্রন্থী ফাঁপা একপ্রকার বাঁশ। **তলা** = অধোভাগ, বৃক্ষের বা আচ্ছাদনের নিম্নস্থিত স্থান, কলসী-প্রভৃতির অধঃকপাল ও অধঃকপালের অন্তর্বহির্ভাগ, নদী-প্রভৃতির তলভূমি, দেবতার অধিষ্ঠিত স্থান, গৃহতল, পিণ্ড, নিকটবর্ত্তী বা পার্শ্বস্থ স্থান, জুতার নীচের চর্ম্মপটী; তলগত হওয়া, নিমগ্ন হওয়া, ভিতরে প্রবেশ করা, পাতালগত হওয়া — ['তলান' বা 'তলিয়ে যাওয়া' কথাটি ব.শ.-স্রষ্টা পৃথকভাবে তাঁর ভুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করেননি, **তলা** শব্দের দ্বিতীয় ভুক্তিতে 'তলান' শব্দের অর্থকে এইভাবে স্থান করে দিয়েছেন।]। **তলানি** = তলার জল, তলায় থিতান দ্রব্যমাত্র গাদ (sediment), তলার খবর, ভিতরের কথা, রহস্য। **তলাশ, তল্লাশ, তালাশ** = অনুসন্ধান, খোঁজ। (ব.শ.)। **৪.** সব শব্দগুলিই তাদের প্রতীকী অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে শব্দার্থ অনুসন্ধানের সময় সাধারণ প্রশ্নটি দাঁড়ায় এরকমই — তলকে **তল** বলে কেন? অর্থাৎ, **তল** শব্দের ভিতরে তল বা surface অর্থটি কোথায় কীভাবে রয়েছে? ২ নম্বর অর্থে আমরা জেনেছি, এর ভিতরে 'তারীর লালন-লয়ন' রয়েছে বলেই একে **তল** বলে। **তল** শব্দের ভিতরে এই লালন-লয়ন একত্রে বিদ্যমান থাকায়, **তল** শব্দের **তল** পাওয়া বেশ কঠিন। তবুও চেষ্টা তো করতেই হবে। আমাদের ধারণায় লালন-লয়ন মানে এরকম — **তারী** (= ত) যেন আর্টিজিয়-কূপের উপচে ওঠা জল, যা তার চারপাশের জমিতে ছড়িয়ে পড়ে বা পড়তে পারে। চারপাশের জমি ওই **তারী**কে (উপচে পড়া জলকে বা ত-কে) লালন করে, নিজের ভিতরে লয়প্রাপ্ত করে নেয়, অর্থাৎ **তারীকে লালন-লয়ন** করে; সেই কারণে চারপাশের ভূমিকে **তল** বলে। লালন-লয়নের স্থান বলেই (দ্র. **লালনপালন**) এই **তল** স্বভাবত নরম হয়, কোমল হয়, **তলতলে** হয়; তাতে **তলিয়ে যাওয়ার** সুযোগ থাকে। উপরি**তল** থেকে **অতলে** (দ্র. **থই**) ডুব দেওয়া যায়। তবে কিনা, সবক্ষেত্রেই লালনকে প্রাথমিকভাবে সক্রিয় ধরা হয় বলেই বিছানা থেকে শুরু করে ভূতল-রসাতল পর্যন্ত সর্বত্রই একটা গড়াগড়ি দেওয়ার মতো **তল** পাওয়া যায়। ... **৬.** আরবি 'তলাশ'। উপত্যকা-সূচক জারমান tal, ইংরেজি dale, জলাশয়-সূচক হিন্দি — 'তাল', 'তালাও' — যথা, Naini Lake = নৈনিতাল, Bhim Lake = ভীমতাল ইত্যাদি।

তলাতল, তলাপাত্র : **৫.** **তলাতল** = আমাদের প্রাচীন ধারণায় এই সমাজের মনোলোকের মোট চোদ্দোটি ভুবন বা চতুর্দ্দশ **লোক** রয়েছে। তার মধ্যে সাতটি ভুবন উপরে, এবং বাকি সাতটি ভুবন পাতালে। পাতালের সেই সাতটি ভুবনের নাম তাঁরা দিয়েছিলেন — অতল, বিতল, সুতল, **তলাতল**, মহাতল, রসাতল, পাতাল। এইসব নামগুলি তাঁরা বহু পরিশ্রমে নির্দিষ্ট করেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই নামগুলির অর্থ ও ঐরূপ নামকরণের কারণ, সবই আমরা ভুলেছি। দ্র. **লোক**। **তলাপাত্র** = দ্র. **পদবী**।

তল্প (তল্পক, তল্পি, তল্পিতল্পা, তল্পী, তল্পীবাহক) : **১.** ✓তল্ + প (পক্) - অধিকরণে। (ব.শ.)। **২.** **তল্প** = **তল্** *পালিত যাহাতে।* **তল্পক** = **তল্প** *করে যে।* **তল্পা** = **তল্প**-*এর আধার যে।* **তল্পি** = **তল্প**

*গতিশীল যাহাতে। **তল্পিতল্পা** = তল্পি ও তল্পা। **তল্পী** = তল্প-এর গতিশীল আধার যে। **তল্পীবাহক** = তল্পী বহন করে যে।* / **তল্পীবাহক** = তল্পী বহন করে যে। (ব.শ.)। **৩. তল্প** = শয্যা, দার, পত্নী, শয্যাধার, পল্যঙ্ক, খাট, অট্টালিকা, দুর্গপ্রাকার, গৃহোপরিস্থ গৃহ, রণমণ্ডপ, শকটের উপবেশনস্থান। **তল্পক** = শয্যাকারক, শয্যাপাল। **তল্পি, তল্পী** = শয্যা-প্রভৃতি, বিছানাপত্র কাপড়চোপড় ইত্যাদির গাঁটরি বা মোট। **তল্পিতল্পা** = বিছানাপত্রাদি। **তল্পীবাহক** = তল্পীদার। (ব.শ.)। **৪.** তল্পক বাদে বাকি শব্দগুলি তাদের প্রতীকী অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫. তল্প** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের এলাকার ভিতরে বিছানা, শয্যা, উপবেশনস্থান, শয্যাধার প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা গেলেও, দার পত্নী অট্টালিকা রণমণ্ডপ প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অথচ **তল্প** শব্দের সেরকম অর্থও দিয়ে গেছেন ব.শ.। তাতে আবার অমরকোষের উল্লেখ রয়েছে। আমরা দেখেছি, অমরকোষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভুল। তাহলে, এরকম হতেই পারে যে, আমরা **তল** শব্দের যার্থার্থ উপলব্ধি করতে এখনও সম্পূর্ণ সফল হতে পারিনি। **তল** শব্দের ক্ষেত্রে সেকারণেই আমরা বলেছিলাম, 'তল-এর তল পাওয়া কঠিন'। তবে অসম্ভব বলে ভাবতে আমাদের ভাল লাগে না, আমরা না পারি, আমাদের উত্তরসূরিরা পারবে। আমরা যেটুকু অনুমান করেছি, সেটুকু বলে যেতে পারি।

পুরুষ-প্রকৃতির বিচারে প্রকৃতি হল পুরুষের আধারশক্তি। অর্থাৎ কিনা, প্রকৃতি পুরুষকে ধারণ করে। সেই সুবাদে 'দার', 'পত্নী', এঁরা স্বামীর **তল্প** হতেই পারেন। আর, অট্টালিকা তো অবশ্যই ধনীর বা রাজার **তল্প** হতে পারে। ইংরেজিতে resting place (যেখানে মানুষ এসে অন্তত দু-দণ্ডের জন্য আশ্রয় পায়) বললে যা বোঝাতে পারে, তা সবই দেখা যাচ্ছে এই **তল**-পালনের অন্তর্গত। অন্তত দু-দণ্ড বিশ্রামের স্থান (এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রও, সেখানেও তো fallen soldier শয্যা পায়) — এই অর্থে এরা সকলেই **তল্প** পদবাচ্য হতে পারে।

তাল (তালা, তালি, তালী, তালু) : ১. তাল = ✓তল্ + অ (অণ্) স্বার্থে। **২.** *তাল = তল হইতে জাত। তালা = তাল-এর আধার যে। তালি = তাল গতিশীল যাহাতে। তালী = গতিশীল তাল-এর আধার যে। তালু = তাল নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* / **তালু** = যাহার বর্ণের উত্তরণ সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. তাল** = বৃক্ষবিশেষ, করতল, বাহুতে করতলাঘাত, করতলবাদন, তালি, বাদ্যভেদ, করতাল, হস্তিকর্ণাস্ফালন, খড়্গামুষ্টি, দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত দীর্ঘতা, উচ্চতার পরিমাণবিশেষ, জলের গভীরতার পরিমাণবিশেষ, দ্বারযন্ত্র, তালা (lock), (সঙ্গীতে) কালক্রিয়ামান, (ছন্দঃশাস্ত্রে) আদিগুরু ও অন্ত্যলঘু গণবিশেষ (Trochee), তালফল, তালরসজাত মদ্য, হরিতাল, দুর্গাসিংহাসন, তালীশপত্র, তালের মতো পিণ্ড, পিশাচবিশেষ, চিত্তের অব্যবস্থিত ভাব, খেয়াল, সাংসারিক কাজের ঝঞ্ঝাট বা ঝামেলা। **তালা** = সঙ্গীতে তাল, কুলুপ (lock), ঢাকপ্রভৃতির মুখের আচ্ছাদন চর্ম্মপট্টী, তীব্র শব্দের জন্য কর্ণের বধিরতা। **তালি** = করতলের পরস্পর আঘাতজন্য শব্দ, করতলাঘাত, চড়, কক্ষবাদনশব্দ, পদতলাঘাতজন্য শব্দ, উরুতে স্পর্দ্ধাসূচক করতলাঘাত, ঢালের তালের প্রতিঘাত, ঢালের ঘা, তাড়নাজন্য ভয়, পটী (patch), ছিপি। **তালী** = তালবৃক্ষবিশেষ, তাড়িয়াৎ, তালরসজাত সুরা, তাড়ী, **তালমূলী**, ভূঁই-আমলা, তালীশপত্রবৃক্ষ, কুঞ্চিকা, চাবি, ত্র্যক্ষরপাদ ছন্দোভেদ। **তালু** = জিহ্বার অধিষ্ঠানস্থান বা অধস্তন-প্রদেশ, তল। (ব.শ.)। **৪.** অনেকগুলি অর্থে **তাল, তালা, তালি, তালী** ও **তালু** শব্দ প্রচলিত। **৫.** যে সকল শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক গৌরব বিশেষ ম্লান করা যায়নি, **তাল** শব্দটি তন্মধ্যে অন্যতম। শব্দটি প্রসূত হয়েছে **তল** থেকে, যা নিজেই একটু রহস্যময়। আমাদের হাতের যে **তল** হয়, তাকে আমরা **করতল** বলি। **করতল** থেকে জাত শব্দ হল **করতাল**। বাংলাভাষী মাত্রেই খোল-**করতাল** দেখেছেন। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, **তল**-এ **তল**-এ আঘাত লাগলে **তাল** জন্মায়। এই **তাল**-এর দুরকম প্রকাশ আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই। প্রথমত, কালপরিমাণবিশেষ অনুসারে শব্দের উৎসারণ, যাকে সঙ্গীতের **তাল** বলে; নির্দিষ্ট সময় পর পর হাতের **তল** দুটি পরস্পরকে আঘাত করে এই **তাল**-এর জন্ম দিয়ে থাকে। এই **তাল** সুরধারার দুই দিকে **তীর**-এর মতো সক্রিয় থেকে সুরধারাকে প্রবাহিত রাখার ব্যবস্থা করে দেয়। এবং দ্বিতীয়ত, কাদার বা আটার **তাল**, যা করতলের আঘাতে আঘাতে গোল হয়ে একটি গোলকের মতো গড়ে ওঠে। গাছের **তাল** একই রকম দেখতে বলে, সেও **তাল** পদবাচ্য হয়ে যায়। হাতির কান দুটি বড় দুটি **তল**-এর মতো, তারা যখন ঝাপটায় তখনও **তাল** জন্মায়। তাই হস্তিকর্ণাস্ফালনকে **তাল** বলে। হাতের তল দিয়ে যা পাকানো হয়, তাকে বলে **তাল** পাকানো। আমাদের পূর্বপুরুষদের ধারণা ছিল, মানুষের ব্যক্তিজীবন, সমাজ-জীবন, এমনকি সমগ্র জগৎসংসার ছন্দময় সঙ্গীতের মতো বেজে চলেছে। যে ব্যক্তি সঙ্গীতের **তাল** শুনতে পায় না, বুঝতে পারে না, তালে তালে তাল দিতে পারে না, সে তো **তালকাণা**ই; যে মানুষ সেই জীবনসঙ্গীতের, জগৎসঙ্গীতের তাল বুঝে বুঝে দেখে দেখে চলতে পারে না, সে মানুষও **তালকাণা**। আবার, যারা ভোরবেলা তাল কুড়োতে যায়, তারা অনেকেই কালোতাল সবসময় দেখতে পায় না, তারাও **তালকাণা**। কিন্তু এত স্থূল অর্থে সাধারণ বাংলাভাষীও **তালকাণা** শব্দের ব্যবহার করেন না। দ্র. **তম, তমাল**।

তালজঙ্ঘ : ২. *তাল জঙ্ঘাতে যাহার বা যাহাদের।* / তালসদৃশ জঙ্ঘা যাহাদের। (ছাত্রবোধ অভিধান)। তাল তুল্য দীর্ঘ জঙ্ঘা (যাহার)। (ব.শ.)। **৩.** দেশবিশেষ, তদ্দেশবাসীগণ, তদ্দেশীয় নৃপগণ। তালজঙ্ঘগণ শকাদির সহিত মিলিত হইয়া বাহুরাজকে রাজ্যচ্যুত করে। বাহুসুত সগর ইহাদিগকে নিহত করেন। (ব.শ)। যদুবংশীয় নৃপবিশেষ। তালজঙ্ঘগণ ইঁহারই পুত্র। তাহারা হৈহয়গণ ও শশবিন্দুর সহিত সগরের পিতা অসিত বা বাহু রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে। গ্রহবিশেষ। দেশবিশেষ। তালজঙ্ঘ বাস করে এখানে, এই অর্থে। (ছাত্রবোধ অভিধান)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** এই শব্দটি দৃশ্যত অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু এ শব্দকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করা দরকার। কেননা ভারতের পৌরাণিক ইতিহাসে যে-অধ্যায়টি কম গুরুত্ব পেয়েছে, **কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, হৈহয়, তালজঙ্ঘ** প্রভৃতি সত্তা সেই অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার নায়ক। কিন্তু সেই ঘটনা বেদবিরোধী হওয়ায় পুরাণাদিতে এই অধ্যায়ের যথেষ্ট

বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই, যতটুকু রয়েছে তাও বেদবাদীর চোখে দেখা এবং স্বভাবতই খানিকটা একপেশে। তবে পুরাণের একটি গৌরব অবশ্যই রয়েছে — পুরাণ সত্য গোপন করে না, করেনি।

তা সে যাই হোক, এই যদুবংশীয় রাজা ও তার পুত্রগণের নাম **তালজঙ্ঘ** হল কেন? সত্যিই কি তাদের তালগাছের মতো জানু ছিল? বাস্তবে এরকম হয় না এবং কার্যত সেরকম ছিলও না। যতদূর বোঝা যায়, ভারত ইতিহাসের এই অধ্যায়ে সমাজশরীরের **উরু** বা **জঙ্ঘা** নিয়ে নানান সমস্যা তৈরি হতে থাকে। এই সময় নানান কারণে ভারতসমাজের শরীরে (জানুতে) বৈশ্যবৃত্তি শক্তি অর্জন করে। ফলস্বরূপ **উর্ব্ব** (ঔর্ব) ঋষির জন্ম হয়। বেদপন্থী শক্তির পক্ষে যারা জড়ো হয়, তাদের মধ্যে যে-বৈশ্যশক্তি বা জঙ্ঘাশক্তি একত্রিত হয়, তার কথা আমরা পাই **সগর**রাজার কাহিনীতে, **উর্ব্ব** ঋষির কাহিনীতে। একইভাবে বেদবিরোধী পক্ষেও কিছু বৈশ্যশক্তি সংহত হয়েছিল। তাদের কথা পাই **হৈহয়-কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনে**র দলে যোগ দেওয়া এই **তালজঙ্ঘ**দের কাহিনী থেকে। ... এই কাহিনী আমাদের প্ররোচিত করে আর একটি কথা ভাবতে। তাহলে কি **তাল** শব্দের আর একটি মানে হয়? **তমাল** বৃক্ষের অর্থে আমরা দেখেছি, রপ্তানিকারী সংস্থাকে **তমাল** বলা হত। একই ভাবে পণ্যের পাইকারি সংস্থাকেও তালবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এই সংস্থাও অধিক মানুষকে ছায়া দেয় না। ... আমরা এখনও নিশ্চিত নই।

***তি (তিজ্, তিল্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অতৈল, অতৈলপুর, আতেলা, আতৈল, তিক্ত, তিক্তক, তিক্তকা, তিক্ততণ্ডুলা, তিক্ততুম্বী, তিক্তধাতু, তিক্তপত্র, তিক্তপর্ব্বা, তিক্তসার, তিখ, তিখিণী, তিগ্ম, তিগ্মকর, তিগ্মদ্যুতি, তিগ্মরশ্মি, তিগ্মাংশু, তিজ্, তিজল, তিজারত (তেজারত্), তিড়বিড়, তি(তী)ত, তিতল, তিতা, তিতিক্ষা, তিতিক্ষু, তিতিল (তিত-ইল), তিথি(থী), তিথিক্ষয়, তিথিপালন, তিমিত, তিনিশ, তিন্তিড়, তিন্তিড়িকা, তিন্তিড়ী, তিন্তিলিকা, তিন্তিলী, তিন্দু, তিন্দুক, তিন্দুকী, তিম্, তিমি, তিমিঙ্গিল, তিমিত, তিমির, তিমিরারি, তিল্, তিল, তিলক, তিলকাঞ্চন, তিলকালক, তিলকী, তিলপর্ণিকা, তিলপর্ণী, তিলপিটালি, তিলা, তিলাঞ্জলি(লী), তিলার্দ্ধ, তিলার্দ্ধক, তিলি(লী), তিলেক, তিলেলোহা, তিলোত্তমা, তিলোদক, তিলৌদন, তিষ্ঠ, তিষ্ঠদ্গু, তিষ্ঠান, তিষ্য, তিহ্, তিহি, তিহুঁ, তিহোঁ, তিহোঁ, তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণকন্দ, তীক্ষ্ণকর্ম্মা, তীক্ষ্ণগন্ধ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, তীক্ষ্ণপুষ্প, তীক্ষ্ণরশ্মি, তীক্ষ্ণরস, তীক্ষ্ণলৌহ, তীক্ষ্ণসার, তীক্ষ্ণা, তীক্ষ্ণাংশু, তীক্ষ্ণায়স, তীখ, তীখন, তীবর, তীব্র, তেঁতুল, তেঁতুলী, তেঁদু, তেজ, তেজঃ, তেজন, তেজনী, তেজপত্র, তেজবান, তেজমান, তেজরাশি, তেজস্কর, তেজস্বতী, তেজস্বান, তেজস্বী, তেজস্বিনী, তেজা, তেজারৎ, তেজারতি, তেজাল, তেজিত, তেজিয়ান, তেজী, তেজীয়ান, তেজোপুঞ্জ, তেজোবান, তেজোবন্ত, তেজোবৃত্ত, তেজোমণ্ডল, তেজোমন্ত, তেজোময়, তেজোমূর্ত্তি, তেজোরূপ, তেজ্য, তেত, তেল, তেলকালি, তেলকুচকুচে, তেলচিঠা, তেলতামাক, তেলধুতি, তেলপলা, তেলশাক, তেলক, তেলঙ্গা, তেলা, তেলাকচু, তেলাকচুয়া, তেলাকুচা, তেলা(রা)না, তেলানী, তেলাপোকা, তেলি(লী), তেলুগু, তেলেঙ্গা, তেলো, তৈজস, তৈতিল, তৈল, তৈলকার, তৈলচৌরিকা, তৈলদ্রোণী, তৈলপক্ব, তৈলপর্ণী, তৈলবট, তৈলবাটী, তৈলযন্ত্র, তৈলসেক, তৈলাধার, তৈলাভ্যঙ্গ, তৈলাম্বুকা, তৈলাভ্র, তৈলিক, তৈলিত, তৈলী, তৈষ, তৈল্ল, নিস্তেজ। **তি (তিজ্, তিল্)** = তারীর গতিশীলতা যাহাতে। **তিজ** = তারীর গতিশীলতা জনন করে যে। **তিল** = তারীর গতিশীলতার লালন-লয়ন করে যে।

তিক্ত, তিক্তক, তিক্তকা (তিক্ততণ্ডুলা, তিক্ততুম্বী, তিক্তধাতু, তিক্তপত্র, তিক্তপর্ব্বা, তিক্তসার), তিত (তিতা, তিতো) : **১.** ✓তিজ্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***তিক্ত*** = *তিজ্ (তারীর গতিশীলতা জনন বা করণ) তারিত হয় যাহাতে।* ***তিক্তক*** = ***তিক্ত*** *করে যে।* ***তিক্তকা*** = ***তিক্তক****-এর আধার যে।* ***তিত*** = *তারীর গতিশীলতা তারিত যাহাতে।* / **তিক্ত** = ক্ষুধাকে তীক্ষ্ণীকরণ করে যে। (ব.শ.)। **৩. তিক্ত** = তিক্তরসযুক্ত, তিত, সুরভি, সুগন্ধি, বিরক্ত, দুঃখময়, পাচকরসবিশেষ, সৌরভ, কুটজবৃক্ষ, বরুণবৃক্ষ। **তিক্তক** = পটোল, পলতা, চিরতিক্ত, চিরতা, কৃষ্ণখদিরবৃক্ষ। **তিক্তকা** = কটুতুম্বী, তিতলাউ। **তিক্ততণ্ডুলা** = পিপ্‌পলী। **তিক্ততুম্বী** = তিতলাউ। **তিক্তধাতু** = পিত্ত। **তিক্তপত্র** = কর্কোটক, কাকরোল। **তিক্তপর্ব্বা** = গ্রন্থিদূর্ব্বা, হিলমোচী, গুড়ূচী, যষ্টিমধুলতা। **তিক্তসার** = খদিরবৃক্ষ। **তিত, তিতা (তিতো)** = তিক্তরসযুক্ত, দুঃখময়, অপ্রীতিকর, বিস্বাদ। (ব.শ.)। **৪. তিক্ত** শব্দটি 'তিতা' বা 'তিতো' অর্থে প্রচলিত, বাকি সবগুলিই অপ্রচলিত। **৫. তিক্ত**কে **তিক্ত** বলে কেন? বলে এইজন্য যে, সে একপ্রকার তেজ তারিত করতে পারে, কিংবা বলা ভাল, তার ভিতরে একপ্রকার তেজ তারিত হয়ে রয়েছে। তা বাহ্যত 'বিস্বাদ' হলেও শরীরের হিতসাধন করে। বাংলাভাষীগণ এই 'তিত'রসকেও তাঁদের 'ষড়রস' বা ছয় প্রকার রসের (মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায়, তিক্ত) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের খাদ্যসম্ভারে মধুর ও লবণের পাশাপাশি অম্ল, কটু (ঝাল), কষায়, ও তিক্ত সসম্মানে গৃহীত। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই প্রধানত মধুর ও লবণ ছাড়া বাকি রসগুলি সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ। ফলে, মানবশরীরে নেচারের সার্বিক উপস্থিতি সম্ভব হয় না। বঙ্গবাসীগণ নেচারের ষড়রস গ্রহণ করেন বলেই নেচারের সার্বিক প্রতিনিধিত্বকারী হওয়ার যোগ্য হয়ে থাকেন। খাদ্যব্যবস্থার কারণেই বাংলাভাষীর শরীর নেচারের ষড়রসের আধার রূপে গড়ে ওঠে। উপরোক্ত তিক্ত-যুক্ত শব্দগুলির ('তিক্তক, তিক্তকা, তিক্ততণ্ডুলা ...' ইত্যাদি) উত্তরাধিকার স্পষ্ট বলে দেয়, উদ্ভিদজগৎকে কত ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন আমাদের পূর্বপুরুষরা। আমরা তো শব্দগুলিই ভুলে গেছি, সেগুলির মানে জানা, সেই বস্তুগুলিকে জানা আমাদের ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। তবে এই দুর্ভাগ্য ঘটেছে প্রধানত অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত শহুরে বাঙালির। গ্রামবাংলার মানুষ এখনও উপরোক্ত 'তিক্ত' উদ্ভিদগুলিকে কমবেশি চেনেন। দ্র. **কর্কোটক**।

তিথি (তিথিক্ষয়, তিথিপালন) : ১. ✓অত্ + ইথি (ইথিন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***তিথি*** = *তারীর গতিশীলতা স্থিতি করে যাহাতে বা যে সময়ে। /* **তিথিক্ষয়** = যাহাতে তিথির (চন্দ্রকলার) ক্ষয় (থাকে)। (ব.শ.)। ৩. **তিথি** = চন্দ্রকলাক্রিয়োপলক্ষিতকাল, প্রতিপদাদি, তিথির সংখ্যা অনুসারে ১৫ সংখ্যা। **তিথিক্ষয** = অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, দিনক্ষয়। **তিথিপালন** = তিথিবিশেষে বৈধকার্য্যানুষ্ঠান। (ব.শ.)। ৪. 'বিশেষ দিন' অর্থে 'তিথি' এবং 'তাহার ক্ষয়' এবং সেই 'বিশেষ দিন' পালন অর্থে যথাক্রমে তিথিক্ষয় ও তিথিপালন শব্দ ধর্মভীরু বাংলাভাষীগণের মধ্যে কমবেশি প্রচলিত। অ্যাকাডেমিতে ও শহরে প্রায় অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অতিথি**। এখানে যে রহস্যটি প্রথমেই চোখে পড়ে তা হল, **অতিথি** ও **তিথি** দুটি শব্দের সম্পূর্ণ একরকম ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন ব.শ.। অথচ অর্থ দেওয়ার সময় একেবারেই পৃথক অর্থ দিয়েছেন। এর রহস্য কোথায় জানার চেষ্টা করলে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি পড়তে হয়, তা এককথায় বিস্ময়কর। বর্তমানে **অতিথি** guest অর্থে এবং **তিথি** phase of the moon অর্থে প্রচলিত। এরকম হওয়ার কারণ হল, দুটির মূলেই ছিল 'স্থিতি' ক্রিয়াটি। **অতিথি**র ভিতরে guest অর্থে সেটি থেকে গেছে, 'যে থাকে না, চলে যায়' এই অর্থে; কিন্তু **তিথি**র ভিতরে phase of the moon অর্থে সেটি নেই। সেখানে 'তারীর গতিশীলতা স্থিতি করে যাহাতে' অর্থটিকে পাওয়া যায়, যার সঙ্গে phase of the moon অর্থটি মিলে যায়। তার মানে, **তিথি** শব্দটি দু'ভাবে তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে প্রথম অর্থটিকে ধরে রেখেছে **অতিথি** শব্দ, এবং দ্বিতীয় অর্থটিকে ধরে রেখেছে **তিথি** শব্দ।

তিমি, তিমিত, তিমির : ১. তিমি = ✓তম্ + ই (ইন্) - কর্ম্মবাচ্যে। তিমিত = ✓তিম্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। তিমির = ✓তিম্ + ইর (কিরচ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***তিমি*** = *তারীর গতিশীলতা সীমায়িত হয়ে গতিশীল যাহাতে।* ***তিমিত*** = ***তিমি*** *তারিত যাহাতে।* ***তিমির*** = ***তিমি*** *রহে যাহাতে।* ৩. **তিমি** = সমুদ্রচর স্তন্যপায়ী বৃহৎ মৎস্যভেদ, সমুদ্র। **তিমিত** = আর্দ্রীভূত, ভিজা, নিশ্চল, স্থির, স্তব্ধ। **তিমির** = তমঃ, অন্ধকার, চক্ষুরোগবিশেষ, লৌহকলঙ্ক, লোহার মরিচা। (ব.শ.)। ৪. whale অর্থে **তিমি** এবং darkness অর্থে **তিমির** প্রচলিত; তবে **তিমিত** শব্দটি অপ্রচলিত। ৫. শব্দের নিয়মে 'তারীর গতিশীলতা' (= তি) 'সীমায়িত' (= ম) হলে **তিম** হয়। আর সেই সীমায়ন যদি বাড়তে থাকে, গতিশীল হতে থাকে তবে **তিম** হয়ে যায় **তিমি**। সেক্ষেত্রে স্বভাবতই **তিমি** শব্দের অর্থ হয়ে যায় ক্রমশ কালো ও আবদ্ধ হতে থাকা এমন একটি অবয়ব যা বিশাল একটা কালো বেলুনের মতো কেবলই ফুলছে। বাংলাভাষীর পূর্বপুরুষেরা তিমিমাছের মধ্যে, সমুদ্রের মধ্যে সেই ক্রিয়া দেখে থাকবেন, তাই তাঁরা তাদের **তিমি** নামকরণ করে গেছেন। আবার এই **তিমি** রহে যাহাতে তাকে তাঁরা নাম দিয়েছেন **তিমির**। এসবই যে গতিকে সীমিত করে, স্থিতিশীল শক্তি দিয়ে আবদ্ধ করে, স্তব্ধ, নিশ্চল করে দেওয়ার কথা বলে, সেকথা অপ্রচলিত **তিমিত** শব্দের অর্থ থেকে স্পষ্ট জানা যায়। বলে রাখা ভাল, রাত্রি, অন্ধকার, আর্দ্রতা, স্থিতি, এসবই প্রকৃতির গুণ! বিপরীতে গতি হল পুরুষ গুণ। আরও একটি কথা এ প্রসঙ্গে মনে হতে পারে, যে, ইংরেজি teem, team শব্দ দুটি সম্ভবত একই উৎস থেকে জন্মেছে। ৬. ইংরেজি teem, team, esteem। (স্মর্তব্য : **টিম, টিমটিম**)।

তিল, তিলা, তিলি (তিলকাঞ্চন, তিলকালক, তিলপর্ণিকা, তিলপর্ণী, তিলপিটালি, তিলাঞ্জলি, তিলার্দ্ধ, তিলার্দ্ধেক, তিলেক, তিলেলোহা) : ১. ✓তিল্ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***তিল*** = *তারীর লালন-লয়ন যাহাতে; অর্থাৎ, তারীর শুরু ও শেষ হয় যাহাতে বা যে অবয়বে।* ***তিলা*** = ***তিল****-এর আধার যে।* ***তিলি*** = ***তিল*** *গতিশীল যাহাতে।* ৩. **তিল** = শস্যবিশেষ, তিলবৃক্ষ, শরীরস্থ তিল চিহ্ন, তিলতুল্য স্বল্পপ্রমাণ, অত্যল্পস্থান, অত্যল্পকাল, শুভঙ্করীতে কড়ার আশীভাগের এক ভাগ। **তিলা** = তিলের খাদ্যবিশেষ। **তিলি** = তৈলব্যবসায়ী হিন্দুজাতিবিশেষ। **তিলকাঞ্চন** = তিল কাঞ্চন ইত্যাদি দ্বারা স্বল্পব্যয়ে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধবিধিবিশেষ। **তিলকালক** = তিলতুল্য কাল দেহস্থ চিহ্ন, তিল। **তিলপর্ণিকা, তিলপর্ণী** = রক্তচন্দন। **তিলপিটালি** = তিলমিশ্র পিটালির গোলা। **তিলাঞ্জলি, তিলাঞ্জলী** = প্রেতের তৃপ্ত্যর্থ প্রদত্ত সতিল জলাঞ্জলি, পরিত্যাগ। **তিলার্দ্ধ, তিলার্দ্ধেক** = তিলের অর্দ্ধপরিমিত কাল। **তিলেক** = এক তিল। **তিলেলোহা** = তিল-কাটা লোহার খাড়ু বিশেষ। (ব.শ.)। ৪. সবগুলি অর্থেই **তিল** শব্দটি প্রচলিত। **তিলা** একপ্রকার মিষ্টি অর্থে এবং **তিলি** গ্রামবাংলায় হিন্দুজাতিবিশেষ অর্থে প্রচলিত। **তিল**যুক্ত বাকি সব শব্দই বর্তমানে অপ্রচলিত। ৫. অস্তিত্বের শুরু ও শেষ রূপটি হল তার ক্ষুদ্রতম রূপ, **তিল** রূপ। এই রূপ থেকে সে ক্রমশ বাড়তে বাড়তে স্বরূপ লাভ করে, আবার ক্রমশ কমতে কমতে এই ক্ষুদ্রতম রূপে পৌঁছে তারপরই বিলুপ্ত হয়। এই কারণে **তিল** হল তারীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম রূপ। এখান থেকেই তারীর লালন হতে হতে সে তার স্বরূপে পৌঁছায়, আবার, স্বরূপ থেকে লয় পেতে পেতে এই রূপে পৌঁছানোর পর সে বিলুপ্ত হয়। তাই **তিল**ই হল তারীর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম রূপ। বাস্তবে তা **তিল**শস্য, সাদৃশ্যে গালের **তিল**, কিংবা যেকোনো বিষয়ের বা বস্তুর **তিল**মাত্র বা বিন্দুমাত্র হতেই পারে।

এই শব্দটির মাধ্যমে বাংলাভাষীর বিশেষ ধরণের অর্জন সংরক্ষিত ছিল। যেকারণে এককালে শব্দটির বিপুল ব্যবহার ছিল। এখন এই শব্দগুলি ঝাড়েবংশে পরিত্যক্ত হয়েছে।

তিলক : ১. তিল + ক (কন্) - স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. ***তিল*** *করে যে; অথবা,* ***তিল*** *কৃত হয় যাহাতে।* ৩. তিলবৃক্ষ, (স্ত্রীলোকের দৃষ্টিপাতে তিল বিকশিত হয়; স্ত্রীবীক্ষণ ইহার দোহদ।) বৃক্ষবিশেষ, দণ্ডকলস, মরুবক, অশ্ববিশেষ, রোগভেদ, ধ্রুবকবিশেষ, ললাটাদি দ্বাদশাঙ্গে ধার্য্য চন্দনাদিচিহ্নবিশেষ, বিশেষক, পুণ্ড্র, তিলকবৎ ভূষণভূত, শ্রেষ্ঠ, তিলকপুষ্প, দণ্ডকলস-ফুল, ক্লোম, সৌবর্চ্চল, লবণবিশেষ, চিহ্ন, যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষের কপালে চন্দনাদিচিহ্ন অর্থে এখনও কমবেশি প্রচলিত। ৫. প্রকৃত স্বরূপের ক্ষুদ্রতম রূপ হল সেই স্বরূপের **তিল**। দ্র. **তিল**। প্রকৃত স্বরূপ যদি রাজপ্রাসাদ হয়, রাজপ্রাসাদের নকশাটি তার **তিল**

হতেই পারে। একজন রাজপুরুষ, ধরা যাক তিনি একজন পরামর্শদাতা মন্ত্রী, রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাঁর অবস্থান, রাজকোষ থেকে তাঁর প্রাপ্যের পরিমাণ — এসব বিস্তারিতভাবে লিখে রাখা, বলা, ব্যাখ্যা করা কম কথা নয়। কিন্তু রাজমন্ত্রীর সেই সমগ্র স্বরূপটিকে যদি **তিল**-আকারে পরিণত করা হয় তাঁর **তিলক**-এ, তাহলে কেমন হয়? হ্যাঁ, ঠিক সেটিই করা হয়েছিল প্রাচীন কালে। কার কপালে কয় লাইন তিলকের ফোঁটা তা দিয়েই বুঝে নেওয়া হত, ইনি কে, কী এঁর স্বরূপ। দ্র. **কপাল**। আজও একই ব্যাপার বোঝানো হয় সেনাবাহিনীর উর্দ্দির তারকার সংখ্যা, কাঁধে বুকে বিভিন্ন রঙের দাগ ইত্যাদি দেখে। সেকালে একেই বলা হত **তিলক**-কাটা। যে খুশি যেমন খুশি **তিলক** কাটতে পারত না; যার যেরূপ পদমর্যাদা, সে সেই অনুসারে **তিলক** কাটত। এরই উত্তরাধিকারের ধ্বংসাবশেষ এখনও প্রচলিত রয়েছে আমাদের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষজনের মধ্যে, রয়েছে দক্ষিণী পুরোহিতদের মধ্যে। ইংরেজিতে title শব্দটি মনে হয় এই **তিলক**-এর জ্ঞাতি। **৬.** ইংরেজি title।

তিলোত্তমা : ২. *উত্তম তিলসমূহের আধার যে।* **৩.** অপ্সরাবিশেষ। সুন্দ উপসুন্দ ব্রহ্মার বরে ত্রিলোক জয় করিয়া দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিলে, দেবতার প্রার্থনায় ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে রমণীরত্ন নির্মাণ করিতে আদেশ করেন। বিশ্বকর্ম্মা তদনুসারে রত্নসমূহের তিল তিল লইয়া তিলোত্তমাকে নির্মাণ করেন। সুন্দ উপসুন্দ উভয়েই রূপে মুগ্ধ হইয়া তিলোত্তমাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে উভয়ের যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতেই উহারা নিহত হয়। (ব.শ.)। দ্র. **চতুর্ম্মুখ**। দৈত্যরাজ নিকুম্ভের দুই পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করে ত্রিলোক বিজয়ের জন্য অমরত্ব প্রার্থনা করে। ... ব্রহ্মা বলেন যে ... পরস্পরের হাতেই এদের মৃত্যু হবে, অন্য কারো হাতে নয়। ... দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে এক পরমাসুন্দরী নারী সৃষ্টি করতে বলেন। ত্রিভুবনের সমস্ত উত্তম জিনিস তিল তিল করে সংগ্রহ করে বিশ্বকর্মা ... এই সুন্দরীর সৃষ্টি করেছিলেন বলে ... এর নাম হয় তিলোত্তমা। ... তাঁকে দেখবার জন্য ব্রহ্মার চারিদিকে চারিটি মুখের সৃষ্টি হয় এবং ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু হয়। ... সুন্দ ও উপসুন্দ তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে পাবার জন্য পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করে ও একে অন্যকে নিহত করে। একবার তিলোত্তমা বলির পুত্র সাহসিকের সহিত খেলায় মত্ত হয়ে ঋষি দুর্বাসার ধ্যান ভঙ্গ করেন। ফলে, তিনি দুর্বাসার শাপে বাণের কন্যা উষা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** মেয়েদের নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** সন্দেহ নেই যে, তিলোত্তমা কোনো নারী বা woman নয়। কেননা, সেভাবে তিল তিল করে কোনো নারীকে সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু পুরাণ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, সেভাবেই বিভিন্ন স্থান থেকে তিল তিল নিয়ে একত্র করে তিলোত্তমাকে গড়ে তোলা হয়েছিল। সেভাবে দেখলে, এই সত্তাটি অবশ্যই পৌরাণিক কালের একটি বিশেষ আধার শক্তি; হতে পারে এ একটি জনপদ ও সেখানকার কর্মী জনসাধারণ, যাদের নানা স্থান থেকে আনা হয়েছে, যাদের তাঁবে আনতে পারলে শাসকের অত্যন্ত সুবিধা হতে পারত। এই সত্তাটি অতএব অনেক কিছুই হতে পারে — হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন গুণসম্পন্ন বীরদের নিয়ে গড়ে ওঠা কোনো সামরিক বাহিনী, কিংবা একদল সেরা ছাত্রবাহিনীও হতে পারে। প্রাচীনকালের ওই তিলোত্তমা ঠিক কাকে বলা হয়েছিল, আমাদের কাছে এখনও তা স্পষ্ট নয়।

তেজ, তেজন, তেজনী, তেজপত্র, তেজবান, তেজমান, তেজরাশি, তেজা, তেজারত, তেজারতি, তেজাল, তেজিত, তেজিয়ান, তেজী, তেজীয়ান, তেজ্য : ১. তেজন = ✓তিজ্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তেজ** = *তারীর দিশাগ্রস্ত গতিশীলতা জনন করে যে।* **তেজন** = **তেজ** *অন যাহাতে।* **তেজনী** = *তেজন-এর গতিশীল আধার যে।* **তেজপত্র** = **তেজ** *জনক যে পত্র।* **তেজবান** = *তেজ-বাহক অন যাহাতে।* **তেজমান** = *সীমায়িত তেজ অন (থাকে) যাহাতে।* **তেজরাশি** = *তেজ-এর রাশি।* **তেজা** = *তেজ-এর আধার যে।* **তেজারত** = **তেজ** *আরত যাহাতে।* **তেজারতি** = *তেজ-এর আরতি (চলে) যাহাতে।* **তেজাল** = *তেজ-এর আধার লালিত-লুপ্ত যাহাতে।* ... **তেজী** = *তেজ-এর গতিশীল আধার যে।* / **তেজন** = যাহার দ্বারা উদ্দীপন সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. তেজ** = দীপ্তি, প্রভা, কান্তি, কিরণ, তাপ, তীক্ষ্ণতা, ঝাঁজ, প্রখরতা, ক্ষিপ্রতা, বেগ, পরাক্রম, প্রভাব, বল, জোর, বীর্য্য, বীজ, প্রভাব, শক্তি, অভিভব-অসহন, স্পর্দ্ধা, কোনো দ্রব্যের সারাংশ। **তেজন** = তীক্ষ্ণীকরণ, নিশান, উদ্দীপন, দীপ্তীকরণ, ঘর্ষণ-সংস্কার, পালিস করা, শরফলক, অস্ত্রধারা। **তেজনী** = মূর্ব্বা, তৃণগুচ্ছ, শষ্প। **তেজপত্র** = তীব্রগন্ধপত্র, তেজপাত, তেজপাত-গাছ। **তেজবান** = বেগবান। **তেজমান** = শক্তিমান। **তেজরাশি** = তেজঃপুঞ্জ। **তেজা** = তেজযুক্ত, বলবান, প্রতাপশীল, তেজস্বী, তেজী, তীব্র, কড়া। **তেজারৎ** = সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবসা, কুসীদব্যবহার। **তেজারতী** = তেজারৎ সম্বন্ধী, তেজারতের কাজ। **তেজাল** = তেজস্বান, উজ্জ্বল, ঝাঁঝাল, কড়া, তেজী। **তেজিত** = তীক্ষ্ণীকৃত, নিশিত, শাণান, উত্তেজিত। **তেজিয়ান, তেজীয়ান** = তেজস্বী, তেজী, তপঃপ্রভাবসম্পন্ন। **তেজী** = তেজস্বী, ঝাঁঝাল, কড়া, স্পষ্টবাদী। (ব.শ.)। **৪.** দ্র. **তেজঃ**। **৫.** দ্র. **তেজঃ**। বলা হয়ে থাকে, 'তেজারৎ', 'তেজারতি' প্রভৃতি শব্দ ফারসি ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে। আমরা দেখছি, একে **তিজ্**-জাত শব্দ মনে করে এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে পৌঁছলে দেখা যায়, সেই অর্থ শব্দ দুটির ফারসি অর্থের সমান হয়ে তাকে ছাপিয়ে গেছে। সুতরাং, আমরা আমাদের পূর্বসিদ্ধান্তে আরও দৃঢ় হতে পারি যে, মূল উৎস দুই ভাষার এক। পাঠান-মোগলের হাত ধরে ফারসি এদেশে আসার পর বাংলার নিজস্ব উত্তরাধিকার ছিল বলেই বাংলাভাষা 'তেজারৎ', 'তেজারতি' প্রভৃতি শব্দকে আপন ভাষার সদস্য করে নিতে বিন্দুমাত্র দেরি করেনি।

তেজঃ (তেজস্, তেজস্কর, তেজস্বতী, তেজস্বান, তেজস্বী, তেজস্বিনী, তেজোপুঞ্জ, তেজোবান, তেজোবন্ত, তেজোবৃত্ত, তেজোমণ্ডল, তেজোমন্ত, তেজোময়, তেজোমূর্ত্তি, তেজোরূপ) : ১. ✓তিজ্ + অস (অসুন্) - ভাববাচ্যে। **২.** ***তেজঃ (তেজস্)*** = *তেজ-এর নির্য্যাস ত্যাগ করে যে; অথবা তেজ-ফল ত্যাগ করে যে।* দ্র. *তপ, তপঃ*। **৩. তেজঃ** = নিশান, তীক্ষ্ণীকরণ, তীক্ষ্ণতা,

দীপ্তি, তাপ, তৃতীয় মহাভূত, অগ্নি, পিত্ত, কান্তি, প্রভাব, তপঃপ্রভাব, প্রতাপ, পরাক্রম, তেজস্বী, ব্যবসায়, প্রাণনাশেও শত্রুকৃত ভর্ৎসনা-পরাভবাদির অসহনরূপ গুণবিশেষ, রেতঃ, সার, সজ্জা, নবনীত, সুবর্ণাদি, তেজোময় পদার্থ, বেগ, প্রাগল্‌ভ্য, চৈতন্যাত্মক জ্যোতিঃ, সত্ত্বগুণজাত লিঙ্গদেহ, রজোগুণ, দর্প, বিষ্ণু, শিব। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত শব্দগুলির মধ্যে এই শব্দটি অতি প্রাচীন কালেই উপলব্ধ এবং এখনও যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলিত। তবে, তা **তেজ** রূপেই অধিক প্রচলিত। **তেজঃ** রূপেও প্রচলন রয়েছে তবে সন্ধিকৃতভাবে। যেমন **তেজস্কর, তেজোপুঞ্জ** ইত্যাদি। ইংরেজির প্রভাব অধিকাংশ সংস্কৃত-বাংলা শব্দের বিপুল আর্থিক ক্ষতিসাধন করলেও, তেজঃ শব্দের খুব বেশি ক্ষতিসাধন করতে পারেনি। **৫. দ্র. তেজ।** 'তেজপাতে তেজ কেন, ঝাল কেন লঙ্কায় ...' কবি জানতে চেয়েছেন। আমরা বলি, তেজপাতায় তেজ কেন, সে তো পরের কথা; আগে তো জানা দরকার — **তেজ**-এ তেজ কেন? কী ক্রিয়া ঘটায় বলে আমরা **তেজ**-কে **তেজ** বলি। কিংবা ইংরেজির সাহায্য নিয়ে বললে বলতে হয়, **তেজ** বললে আমরা 'energy' বুঝি কেন?

কারণ, এর ভিতরে **তিজ্** ক্রিয়া চলে এবং তাও একদিশায়। সেই কারণে একে **তেজ** বলে। বেশ, কিন্তু ওই **তিজ্** ক্রিয়া কীরূপ ব্যাপার? এর উত্তর হল — 'তারীর গতিশীলতা জনন' করাই হল **তিজ্** ক্রিয়া। 'তারী' কে? তার গতিশীলতাই বা কী? সেই গতিশীলতার জনন করাই বা কীরূপ ব্যাপার?

তৎ শব্দে আমরা তারীর তরণ দেখেছি। এক অধ্যায় থেকে অন্য অধ্যায়ে এগিয়ে চলাই তার স্বভাব। বিশ্বের প্রতিটি অস্তিত্বের ভিতরে **তৎ**-রূপে (তদ্রূপে) যে **পুরুষ** (content) বর্ত্তমান, সেই হল এই **ত** বা তারী। তারীর এই চলা গতিশীল হলেই তাকে **তি** বলা যায়। এই গতিশীলতাকে জনন করে যে, সে হল **তিজ**। স্বভাবতই এরকম জনন বারংবার হলেই তা একদিশাগ্রস্ত না-হয়ে যায় না। তাই **তিজ** হয়ে যায় **তেজ**। বাস্তবে ব্যাপারটি দাঁড়ায় এরকম।

আপনার রাগ হয়েছে। সেই রাগে আপনার মন আরক্ত হয়ে উঠছে, আর আপনি ছুটে চলেছেন রাগের প্রকাশ ঘটনোর জন্য কিছু একটা করতে। এই যে বিশেষ দিকে আপনার রাগ তারিত হচ্ছে, একে সেদিকেই আরও ত্বরান্বিত করে দেয় বা বাড়িয়ে দেয় যে, অর্থাৎ আপনার রাগের গতিশীলতাকে, যেদিকে তা চলেছে সেই বিশেষ দিকে, আরও আরও জনন করে দেয় যে, সেই হল **তেজ**। তার মানে, আপনি যা করছেন, যেভাবে করছেন, যেদিকে করছেন, সেই দিকে সেইভাবে করাকে গতিশীল করে দেয় যে, সেই হল **তেজ**। অর্থাৎ, আপনার রাগ, আনন্দ, উজ্জ্বলতা, জোর, প্রভাব, বেগ ... ইত্যাদিকে বাড়িয়ে দেয় যে, সেই হল **তেজ**। এখন কথা হল, প্রতিটি বস্তুই তো তার পরবর্তী চেহারা লাভের জন্য একধরনের গতিশীল আচরণ করে। তার মানে, বস্তুর ভিতরের স্বাভাবিক গতিশীলতাকে বাড়িয়ে দেয় যে, সেই **তেজ** পদবাচ্য। অর্থাৎ গতিশীলকে আরও গতিশীল করে যে, তাকেই **তেজ** বলা হচ্ছে। তার মানে বাড়তি গতিকে **তেজ** বলা হচ্ছে। কিন্তু গতি ও বাড়তি গতির মধ্যে আসলে তো কোনো ফারাক নেই। তাহলে, আরও একটি কথা এ-প্রসঙ্গে আসতেই পারে। তা হল, **তেজ**-ই বস্তুর অভ্যন্তরস্থ **সেই সত্তা, যে-সত্তা বস্তুর আত্মা** বা **পুরুষ** (content) রূপে বস্তুর ভিতরে **সক্রিয় থাকে। তাহলে তো বস্তুজগতের সঙ্গে** সম্পর্কের **ক্ষেত্রে মানুষের ধর্তব্যের বিষয়গুলির মধ্যে তেজকে** অগ্রগণ্য স্থান দিতেই হয়; এবং সে তা পেয়েছেও। হ্যাঁ, এই সেই কারণ, যে-কারণে আমাদের পূর্বপুরুষেরা **তেজ** শব্দের বহু ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন। যেকারণে **তেজ** শব্দ থেকে বহু শব্দও প্রসূত হয়েছে। তার মানে, সেকালের মানুষেরা বিশ্বব্যবস্থার মূলে যে-**তেজ** বিদ্যমান তাকে তৃতীয় মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, **তেজ**, মরুৎ, ব্যোম) রূপে ঠিকই চিনেছিলেন; তবে তাঁদের সে চেনা ছিল অব্যক্তভাবে (tacitly) চেনা। আর, $E = mc^2$ বলে আইনস্টাইন তাকেই চিনলেন ব্যক্তভাবে (explicitly)।

এখানে আর একটি বিষয় বলে রাখা দরকার। এখনও বিশ্বের প্রায় সমস্ত জাতির প্রাচীনপন্থীগণ, ধর্মভীরু-প্রকৃতিঘনিষ্ঠ মানুষেরা খাদ্যগ্রহণ কালে প্রায় একই রকম আচরণ করে থাকেন। সেই আচরণগুলির মূলে রয়েছে খাদক, খাদ্য, ও খাদ্যের প্রেক্ষিতের প্রতি একধরনের সৌজন্যবোধ — খাদ্যের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি, নিজের প্রতি একধরনের ভক্তিভাব, পবিত্রভাব, কৃতজ্ঞভাব। আধুনিক মানুষ খাদ্যগ্রহণ কালে কাউকে শ্রদ্ধা-ভক্তি জানানোর ধার ধারে না। সে প্রকৃতি, ঈশ্বর, খাদ্য, এমনকি নিজেকেও শ্রদ্ধা করে না, সম্মান দেয় না। কারণ, প্রাচীনপন্থীগণের চিন্তাশৃঙ্খলা মূলত অখণ্ডবোধে সিক্ত, আধুনিক মানুষের চিন্তাশৃঙ্খলা মূলত খণ্ডবোধ দ্বারা কলুষিত। তাই সে যেটুকু জানে, তাই নিয়ে তার গর্বের অন্ত নেই; যেটুকু জানে না সেটা কতটা তার সম্পর্কে তার কোনো বোধই নেই। সেকেলে মানুষ অখণ্ডবোধ দ্বারা সিক্ত ছিল বলেই জানার চেয়ে অজানাকে বড় বলে জানত। সেজন্যই জগৎ ও জীবনের প্রতি তাদের ভক্তিভাব ছিল, সবকিছুর প্রতি সম্মানবোধ ছিল। নিজেকে সে দেখতে পেত সকলের মাঝে একজন হিসেবে। এখনকার মানুষ নিজেকে দেখতে পায়, তাকে ঘিরে থাকা পরিবেশকে সে খুব একটা নজর করে না; কেবল আটকে গেলে তখন ভাবতে বসে।

তা সে যাই হোক, এখানে আমরা কেবল এটুকুই বলতে চাই যে, কোনো বিষয়কে অব্যক্তভাবে চেনা ও ব্যক্তভাবে চেনার এইরকম কুফলও ফলে।

তৈল, তেল (তৈলকার, তৈলচৌরিকা, তৈলদ্রোণী, তৈলপক, তৈলপা, তৈলপর্ণিক, তৈলপর্ণিকা, তৈলপর্ণী, তৈলফল, তৈলবট, তৈলবাটী, তৈলযন্ত্র ... তেলকালি, তেলকুচকুচে, তেলচিঁঠা, তেলতামাক ... তেলাকচু, তেলাকচুয়া, তেলাকুচা ... তেলি, তেলী, তিলি) : ১. ✓তিল্ + অ (অণ্)। (ব.শ.)। **২. তৈল** = *তারীর দিশাগ্রস্ত-আধারের লালন-লয়ন যাহাতে।* **তেল** = *তারীর দিশাগ্রস্ত লালন-পালন যাহাতে।* **তৈলকার** = ***তৈল*** *করে যে।* **তৈলচৌরিকা** = ***তৈল*** *চুরি করে যে।* **তৈলদ্রোণী** = ***তৈল****-এর দ্রোণী।* **তৈলপক, তৈলপা** = ***তৈল*** *পান করে যে। ... /* **তেলাকচু, তেলাকচুয়া, তেলাকুচা** = যাহার কুচের মতো লাল ফল; যাহার ফল কুঁচতুল্য লাল এবং কাঁকুড়ের মতো। (ব.শ.)। **৩. তৈল** = তিলবিকার, সর্ষপাদি-স্নেহ, স্নেহদ্রব্যমাত্র। **তেল** =

তিলসর্ষপাদির স্নেহময় পদার্থ, প্রাণিদেহস্থ তৈলবৎ পদার্থ, (অশিষ্ট) রস, স্পর্দ্ধা, চুলকানি। **তৈলকার** = তৈলিক, তেলি, কলু। **তৈলচৌরিকা** = তৈলপায়িকা, তেলাচোরা। **তৈলদ্রোণী** = তৈলপূর্ণকটাহ। **তৈলপক, তৈলপা** = তৈলপায়ক, তৈলপায়িকা, তৈলপায়ী, তেলাপোকা, অসি। **তৈলপর্ণিক, তৈলপর্ণিকা, তৈলপর্ণী** = চন্দন, হরিচন্দন, সিহ্লক। **তৈলফল** = ইঙ্গুদীবৃক্ষ, বিভীতক, তিল। **তৈলযন্ত্র** = তিলাদিনিষ্পীড়ন যন্ত্র, ঘানিগাছ। **তৈলবট** = ব্যবস্থাপত্রের মূল্যস্বরূপ স্মার্ত্তপণ্ডিতের প্রাপ্য অর্থ। **তৈলবাটী** = দ্র. **পদবী**। ... ... **তেলকালি** = তৈলমিশ্রিত কালি। **তেলকুচকুচে** = তেল-মাখান দ্রব্যের মতো চকচকে। **তেলচিঠা** = তেলধূলায় মিশ্রিত চিটের মতো ময়লা। **তেলতামাক** = তৈলমর্দ্দনপূর্ব্বক ধূমপান। ... **তেলাকচু, তেলাকচুয়া, তেলাকুচা** = বন্যলতাবিশেষ ও তাহার ফল। **তেলি, তেলী, তিলি** = তৈলবিক্রেতা হিন্দুজাতি-বিশেষ। (ব.শ.)। ৪. **তৈল** ও **তৈলযুক্ত** শব্দ এখন অপ্রচলিত, কিন্তু **তেল** ও **তেলযুক্ত** শব্দগুলি oil বা তৎসংশ্লিষ্ট অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** মনে হতে পারে, **তৈল** আর **তেল** সমার্থক হয়ে গেল কীভাবে, যখন কিনা **তৈল** সংস্কৃত শব্দ এবং **তেল** বাংলা শব্দ? এর মূলে রয়েছে শব্দদুটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ। **তৈল** আর **তেল** শব্দদুটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের পার্থক্য হল **আধার**। 'তারীর দিশাগ্রস্ত-আধারের লালন-লয়ন যাহাতে' = **তৈল**। 'তারীর দিশাগ্রস্ত লালন-লয়ন যাহাতে' = **তেল**। প্রকৃতপক্ষে **তেল**-এর বেলায় 'আধার' কথাটি উহ্য রাখা হয়েছে। বহু-ব্যবহারে, পরবর্তীকালের ব্যবহারে, পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যবহারে এরকম উহ্য করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। সেই প্রবণতা থেকে একই কথা পরবর্তীকালে মানুষের মুখে মুখেই প্রায় নিজে থেকেই সংক্ষিপ্তকরণ হয়ে যায়। তৎসম-তদ্ভব শব্দের পুরো প্রক্রিয়াটিই এই নিয়মে এগিয়েছে। তাতে জিহ্বার প্রক্রিয়া, কর্মের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণতই সমান্তরাল এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবেই সক্রিয় থেকেছে, সে-বিজ্ঞান আমরা ব্যক্তভাবে আবিষ্কার করতে বা বুঝতে পারি আর না পারি।

তৈল শব্দটির সংস্কার হয়েছিল সংস্কৃতকারগণের হাতে এবং সমাজে **তৈল**-ব্যবহার যথেষ্ট প্রচলিত হওয়ায় শব্দটির ব্যবহারও যথেষ্ট হয়েছিল; সংস্কৃত সাহিত্যে তার অজস্র প্রমাণও রয়েছে। কিন্তু বাংলাভাষীগণের হাতে শব্দটি নবরূপে অর্থাৎ **তেল** রূপে আরও বিকাশ লাভ করে এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এতই ব্যাপক যে, তেলা মাথায় তেল দেওয়া, তেল **মারা**, তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা, তেল দেওয়া প্রভৃতি নানা বাকধারার জনক হয়ে যায় এই '**তেল**' বিষয়ক ধারণা। দ্র. **মারা**।

তু (তুদ্, তুর্, তুল্, তুষ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : (তয়নের উ-উৎ-ঊর্দ্ধ মানে অত্যন্ত তয়ন, লতার ডগা অতি দ্রুত বাড়লে হয় দ্রুতগতি — আতু, আতুপুতু, তু, তুই, তুমি, তুর্, ত্বরা, তুরগ) অতুল, অতুলন, অতুলনীয়, অতুলিত, অতুল্য, অপ্রতুল, অসন্তুষ্ট, আউরা, আওরা, আতুর, আতোদ্য, তু, তুঁদ (তুঁত), তুক, তুক্ক, তুক্কো, তুখর, তুখোড়, তুঙ্গ, তুঙ্গিমা, তুঙ্গী, তুচ্ছ, তুচ্ছ-তাচ্ছ(চ্ছি)ল্য, তুজুক (তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী), তুড়, তুড়্, তুড়ি, তুড়িলাফ, তুড়ী, তুড়ুক, তুত, তুতিয়া, তুতে, তুদ্, তুন, তুন্দ, তুন্দি, তুন্দিত, তুন্দিল, তুন্ন, তুপড়ি, তুবড়া, তুবড়ি, তুবর, তুবরিকা, তুবরী, তুফান (তু-ফেন), তুমুল, তুম্ব, তুম্বক, তুম্বকী, তুম্বর, তুম্বা, তুম্বিকা, তুম্বী, তুম্বুরু (তানপুরা), তুর, তুরক, তুরকি(কী), তুরকীয়, তুরগ, তুরগানন, তুরগারোহ, তুরগি(গী), তুরঙ্গ, তুরঙ্গম, তুরঙ্গিণী, তুরঙ্গী, তুরতুর, তুরন্ত (তুরন্ত্), তুরমান, তুরাণি, তুরান, তুরাসাট(হ), তুরি, তুরিত, তুরিয়তিক, তুরী, তুরীয়, তুরুক, তুরুকি(কী), তুরুগ, তুরু(রূ)প, তুরুষ্ক, তুরপুন, তুর্য্য, তুল্, তুল, তুলা, তুলে-ধরা, তুলকালাম, তুলট, তুলতামাল, তুলন, তুলনা, তুলসী, তুলসীকাঠি, তুলা, তুলাকূট, তুলাকোটি, তুলাদণ্ড, তুলাদান, তুলাধট, তুলাধর, তুলাধার, তুলারু, তুলি, তুলিত, তুলী, তুলো, তুল্য, তুল্যমূল্য, তুল্যযোগিতা, তুশ্চু, তুষ্, তুষ, তুষানল, তুষার, তুষারকাল, তুষারগিরি, তুষারগৌর, তুষারশৈল, তুষিত, তুষোদক, তুষ্ট, তুষ্টি, তুস, তুহিন, তুহিনাচল, তূণ, তূণক, তূণবান, তূণাবর্ত, তূণী, তূণীর, তূর, তূরী, তূর্ণ, তূর্ণি, তূর্য্য, তূল, তূলা, তূলি, তূলী, তূষ্ণী, তূষ্ণীক, তূষ্ণীম, তেড়, তেড়া, তেড়া-বাঁকা, তেড়ি(ড়ী), তেড়ে-ফুঁড়ে, তোখোড়, তোটক, তোটন, তোড়, বানের-তোড়, তোড়জোড়, তোড়পাড়, তোড়ফোড়, তোড়ভাঙ, তোড়যোড়, তোড়ল, তোড়লমল্ল, তোড়া, তোড়ানি, তোড়ী (তোদি), তোত্র, তোদ, তোল, তোপ, তোফা (তোড়া, স্তবক), তোবড়া, তোয়, তোয়কর্ম্ম, তোয়কৃচ্ছ্র, তোয়ক্রীড়া, তোয়চর, তোয়দ, তোয়ধর, তোয়ধি, তোয়নিধি, তোয়নীবী, তোয়প্রসাদন, তোয়ব্যতিকর, তোয়মুক, তোয়রাশি, তোয়াক্কা, তোয়াজ, তোয়াধার, তোয়ালে, তোরঙ্গ, তোরণ, তোরপা, তোরা, তোল, তোলন, তোলপাড়, তোলবোল, তোলা, তোলাপাড়, তোলো, তোশক, তোষক, তোসক, তোশাখানা, তোষাখানা, তোষ, তোষক, তোষল, তোষামোদ, তোষী, তোস, তৌজি, তৌর্য্য, তৌর্য্যত্রিক, তৌল, তৌলা, তৌলিক, তৌলী, তৌষার, ত্যাড়া, প্রতুল, সন্তুষ্ট, সন্তোষ, সমতুল, সুপ্রতুল।

তু (তুদ্, তুর্, তুল্, তুষ্) = নবরূপী তারী থাকে যাহাতে। **তুদ** = নবরূপী তারী দেয় যে। **তুর** = নবরূপী তারী রহে যাহাতে। **তুল** = নবরূপী তারীর লালন-লয়ন যাহাতে। **তুষ** = নবরূপী তারীর বিশেষ শয়ন যাহাতে। (**৫.** অস্তিত্বের ভেতর থেকে উত্থিত হয়ে অস্তিত্বের পরিধি থেকে উপচে তারিত হয়ে চলতে থাকে যে, তাকে **ত** বা তারী বলে; একথা আগেই **ত**-বর্ণের অর্থে বলা হয়েছে। কিন্তু সে যখন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে আসে, তখন প্রকৃতপক্ষে উল্টো দিক থেকে দ্রষ্টার কাছে আসে। তার মানে, **ত, তা, তি, তী** পর্যন্ত দ্রষ্টা থাকে ত-এর পেছনে, কিন্তু **তু**-এর বেলায় দ্রষ্টা থাকে তার সামনে এবং সেই দ্রষ্টা তার দিকে তু-কে আসতে দেখে। **তু** অতএব অন্য কোনো সত্তা থেকে উপচে তারিত হয়ে দ্রষ্টার দিকে আসছে।)

তু, তুই (আতু, আতুপুতু) : ২. তু = **ত** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **তুই** = **তু** *গতিশীল যাহাতে।* **৫.** উ-কারের ব্যাখ্যায় আগেই বলা হয়েছে যে, নবরূপে উত্তীর্ণ সত্তা সাধারণভাবে দ্রষ্টার বিপরীতে থাকে।

দ্রষ্টা যদি 'আমি' হয়, যে যাকে দেখছে সে হল 'তু' বা 'তুই' বা 'তুমি'। দ্রষ্টার সামনে যদি একটি কুকুর থাকে, তাকেও সে তু তু বলে ডাকতে পারে। কেন হাঁসমুরগিকে সেভাবে তু তু করে ডাকা যায় না, তা আমরা এখনও জানি না। কাউকে 'এসো-তুমি, এসো-তুমি' বলে ডাকাডাকি করা, এবং 'খেয়ে নে বাছা, খেয়ে নে' করাই তো আসলে **আতুপুতু** করা।

তুক (তুক-তাক) : ১. ✓তুজ্ + ক্বিপ্ - কর্ম্মবাচ্যে। (ছাত্রবোধ অভিধান)। ২. **তুক** = *তারীকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে।* **তুক-তাক** = **তুক** ও *'তাক' (= তক বা তারীকরণ হইতে জাত)।* ৩. **তুক** = জাদুমন্ত্র, গুণ, বশীকরণার্থ মন্ত্রতন্ত্র, ভূতাবেশ দূরীকরণার্থ প্রক্রিয়া। **তুক-তাক** = গুণ-জ্ঞান, মন্ত্রতন্ত্রে অনিষ্টনাশক প্রক্রিয়া। (ব.শ.)। অপত্য, সন্তান, বশীকরণাদির জন্য প্রকরণবিশেষ, সঙ্গীতে কতকগুলি মাত্রা একত্র ছন্দে যোজনা করিলে তাহাকে তুক কহে। (ছাত্রবোধ অভিধান)। ৪. প্রতীকী অর্থে শব্দগুলি প্রচলিত। ৫. **তুক** শব্দের উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ বলেই দেয় — যা কিছু **তারী**কে নবরূপে উত্তীর্ণ করে বা করতে সাহায্য করে তাই-ই **তুক** পদবাচ্য; তা সে জাদুমন্ত্র, মন্ত্রতন্ত্র, গুণজ্ঞান যাই-ই হোক। এমনকি তা 'অপত্য, সন্তান'ও হতে পারে, যদি তাদের মাধ্যমেই **তারী** নবরূপে উত্তীর্ণ হয়। ৬. ইংরেজি tuck, tack।

তুখর (তুখোড়) : ২. **তুখর** = তু *(নবরূপে উত্তীর্ণ তারী)* **খর** *যাহাতে।* ৩. **তুখর, তুখোড়** = চতুর, চালাক, অভিজ্ঞ, চূড়ান্ত, ব্যবসায়ে পরিপক্ক। (ব.শ.)। ৪. শব্দটি 'তুখোড়' রূপে এবং উপরোক্ত প্রতীকী অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **খর, খরা**।

তুঙ্গ (তুঙ্গিমা, তুঙ্গী) : ১. ✓তুন্জ্ (হিংসা) + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **তুঙ্গ** = *তারীর নবরূপে উত্তীর্ণ রহস্যরূপ (বা সর্বোচ্চরূপ) গমন করে যাহাতে।* **তুঙ্গিমা** = **তুঙ্গ** *গতিশীল হইয়া সীমায়িত হয় যাহাতে, তাহার আধার।* **তুঙ্গী** = **তুঙ্গ**-*এর গতিশীল ধারক যে।* ৩. **তুঙ্গ** = উন্নত, উগ্র, প্রধান, পুন্নাগবৃক্ষ, নারিকেলবৃক্ষ, শৃঙ্গ, পর্ব্বত, উচ্ছ্রায়, বুধগ্রহ, গ্রহবিশেষের রাশিভেদ, গণ্ডক, সিংহাসন, শিব। **তুঙ্গিমা** = তুঙ্গভাব, উচ্চতা। **তুঙ্গী** = হরিদ্রা, বর্ব্বরী, রাত্রি। (ব.শ.)। ৪. 'সর্বোচ্চ স্থান' বোঝাতে **তুঙ্গ** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত। বাকি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **টং**।

তুচ্ছ (তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য) : ১. ✓তুদ্ + ছ। (ব.শ.)। ২. **তুচ্ছ** = *নবরূপে উত্তীর্ণ তারীর চয়ন ছাদিত যাহাতে; অর্থাৎ,* **তুদ্** *(নবরূপে উত্তীর্ণ তারীর দান) ছাদিত যাহাতে।* ৩. **তুচ্ছ** = শূন্য, রিক্ত, অল্প, নিরর্থক, হীন, হেয়, অকিঞ্চিৎকর, মন্দ, অলীক। **তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য** = তুচ্ছজ্ঞান, অনাদর, অবজ্ঞা, তচ্ছীলভাব, তৎপ্রকৃতিকভাব, নিয়ত-তৎস্বভাব। (ব.শ.)। ৪. 'ফালতু' অর্থে প্রচলিত। ৫. সব বাংলাভাষীই জানেন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা মানে হেয়-করা, ফালতু বলে অবজ্ঞা করা, 'দূর-ছাই' করা, 'এটি কিচ্ছু না, ফালতু' বলে ছি-ছিক্কার করা, যা-যা, ভাগ-ভাগ করা। তার মানে যাকে 'তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য' করা হচ্ছে, সে শূন্য-রিক্ত-অল্প-নিরর্থক ... ইত্যাদি নাও হতে পারে; কিন্তু তাকে সেরকমই বলা হচ্ছে। কেন কোনো বিষয় বা বস্তুকে এরকম যা-নয়-তাই বলা হচ্ছে?

এইখানে বোঝা যায়, কেন '**তুচ্ছ**'কে অমরকোষ তুদ্ ক্রিয়া থেকে জাত শব্দ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। আসলে, তুদ্‌কে আচ্ছাদিত করা হয় যাহাতে, তাকেই তুচ্ছ বলে। তার মানে, বাইরের দিক থেকে বা বিপরীত দিক থেকে কিছু বা কেউ (তু) এসে দান (দ্) রূপে আপনার সামনে হাজির হয়েছে, আপনি তাকে গ্রহণ করছেন কিন্তু মুখে বলছেন, 'না-না, এ কিছু নয়, গুরুত্বপূর্ণ নয়, ফালতু' — এই বলে বিষয়টিকে আপনি আচ্ছাদিত বা গোপন করে দিচ্ছেন। একে বলে তুচ্ছ করা। যেনবা অনেকে মিলে চলেছেন বাগানের ভেতর দিয়ে, হঠাৎ একটি পাকা আম পেয়ে গেলেন, ঝুঁকে সেটি কুড়িয়ে পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন, কিন্তু অন্যেরা তাকাতেই বলতে লাগলেন, 'না-না, এমনি ঝুঁকেছিলাম, এ কিছু না।' একেই বলে 'তু-চয়নকে ছাদিত' করা বা 'তুদ্ + ছ' করা বা 'তুচ্ছ' করা।

তবে এর সবচেয়ে মর্মান্তিক প্রকাশ ঘটে প্রান্তিক মানুষের ব্যবহারে। যতই ভাল বৃষ্টি হোক, ফসল হোক, এমন বঙ্গীয় চাষাকে আপনি চট করে খুঁজেই পাবেন না, যাকে 'এ বছর কেমন ধান হল গো' প্রশ্ন করলে সে বলবে, 'ভাল হয়েছে।' ফসল যত ভালই হোক, সে বড়জোর বলতে পারে, 'ঐ, হয়েছে একরকম', কিংবা 'মোটামুটি হয়েছে'। কিন্তু কিছুতেই বলবে না, 'ভাল হয়েছে।' যেনবা, 'ভাল ধান হয়েছে' বললে কেউ তার ধান কেড়ে নেবে। কিংবা ভয়, পাছে তার 'ভাল হয়েছে' বলার ফলে তার 'ভাল'তে শনি লেগে যায়! ব্যাপারটি তাদের সন্তানদের, বিশেষত প্রান্তিক পরিবারের তরুণ-তরুণীদের ব্যবহারেও খুব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। 'পরীক্ষার ফল কেমন হল?' এরকম প্রশ্নের উত্তরে তারা সাধারণভাবে বলে, 'ঐ, একরকম হয়েছে', 'ভাল হয়নি', 'মোটামুটি হয়েছে'। এমনকি প্রথম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেও তারা সানন্দে নিজের সাফল্যের কথা ঘোষণা করে না। তাদের মনের গোপনে কোথায় যেন একটি ভয় কাজ করে — প্রাপ্ত সৌভাগ্য কেউ কেড়ে নেবে না তো! সেই কারণে প্রাপ্ত সৌভাগ্যকে প্রকাশ্যে সানন্দে স্বীকার করতে তারা ভয় পায়, পাছে সেই সৌভাগ্য নষ্ট হয়ে যায়। যুগযুগান্তের বঞ্চনা কেমন করে মানুষের মনের কোণে বিরাজ করে এবং তাকে সাবধানী করে রাখে, এই বিষয়টি নিজে না দেখলে বিশ্বাস হতে চায় না। সম্প্রতি এরই গোলোকায়িত রূপ দেখা যায় কলকাতার তথাকথিত শিক্ষিত তরুণতরুণীদের মধ্যেও। তারা নিজেদের সাফল্যের কথা কোনোভাবে উচ্চারিত হয়ে গেলেই সাত-তাড়াতাড়ি 'টাচ্-উড্' উচ্চারণ করে এবং পার্শ্ববর্তী কাঠের কোনো কিছুকে ছুঁয়ে কল্পিত শনির আগমনপথ আটকায়। একে কি গ্লোবালাইজড্ কুসংস্কার বলা হবে?

অতএব, **তুচ্ছ** বস্তু মানে আসলে বস্তুটি শূন্য, রিক্ত, বাজে, ফালতু নয়; **তুচ্ছ** মানে বস্তুটি যাই হোক বা যেরকমই হোক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাতে কিছু নেই বলে তাকে অবজ্ঞা করা হচ্ছে, হেয় করা হচ্ছে। আর, **তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য** করা হচ্ছে মানে — তার (তুচ্ছের) মতো বা 'তৎশীল', অর্থাৎ 'তচ্ছীল' রয়েছে যাতে, বস্তুটিকে সেরকম বলা হচ্ছে।

তুড় (তোড়, তোড়জোড়, তোড়পাড়, তোড়ফোড়, তোড়ভাঙ, তোড়যোড়, তোড়ল, তোড়লমল্ল, তোড়া, তোড়ী) : ২. তুড় = *তু-র (নবরূপে উত্তীর্ণ তারীর) গড়ান-উড়ান যাহাতে।* ৩. তুড় = ভেদ করা, বিদীর্ণ করা, ভাঙা, ছিন্ন করা, তোলা, উন্মুক্ত করা, উৎপাটিত করা। **তোড়** = জলের বেগ, বৃষ্টিধারার বেগ, প্রতিঘাত, বেগ, বাক্যনিঃসরণ-বেগ। **তোড়জোড় (তোড়যোড়)** = কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত কাটা-জোড়ার কাজ। কার্য্যানুকুল উপকরণসংগ্রহ। **তোড়পাড়** = ছেদন ও পাতন। **তোড়ল, তোড়লমল্ল** = পদভূষণবিশেষ, তোড়া-মল। **তোড়া** = টাকা রাখার থলিয়া (purse), শিকলের মতো মলবিশেষ, পুষ্পগুচ্ছ। **তোড়ী** = রাগবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. তোড় শব্দটি বাংলায় 'বেগ' (বানের তোড়, কথার তোড়) অর্থে প্রচলিত, কিন্তু হিন্দিতে ভাঙা অর্থে প্রচলিত। আবার অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তোড়যোড় ইত্যাদি বাংলাতেও 'ভাঙা' অর্থে প্রচলিত রয়েছে। ৫. দ্র. তড়, তাড়। তুড় আর তোড় একই কথা হলেও ফারাক এই যে, তুড়-এর আধার রূপেও তোড় প্রযুক্ত হয়ে থাকে। তবে এদের মূলে রয়েছে তড় শব্দটি। তার থেকেই **তাড়া, তুড়, তুড়ি, তেড়া, তেড়ে-ফুঁড়ে, তোড়ফোড়** ... প্রভৃতি বহু শব্দ জন্মেছে। অর্থও বদলেছে। তোড়া মানে ভাঙা, জোড়া (যোড়া) মানে পুনরায় যোগ করে দেওয়া। অতএব **তোড়জোড়** করা মানে ভেঙে দেওয়া আবার জুড়ে দেওয়া। কিন্তু কোনো বড় কিছু করতে গেলে অনেক কিছুকে ভেঙে জুড়ে নতুন করে গড়ে তুলতে হয়। সেই কারণে, **তোড়জোড়**-এর প্রতীকী অর্থ দাঁড়িয়েছে উদ্যোগ নেওয়া। কিংবা **তেড়ে-ফুঁড়ে**র কথাই ধরা যাক। তেড়ে কথাটির দুটো মানে, দ্রুত করা এবং খনন করা। দ্র. তাড়। তেড়েফুঁড়ে কথাটির তাই দুরকম মানে দাঁড়ায় — এক, কোনো কিছুকে (ধরা যাক বাড়ির ছাদ) উপর থেকে খনন করা বা ছিদ্র করা কিংবা নিচ থেকে উপর দিকে ছিদ্র করে বা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা; দুই, কোনো বাধাকে (ধরা যাক বাড়ির দেওয়াল) দ্রুত ফুটো করে বেরিয়ে যাওয়া। হিন্দিতে **তোড়ফোড়** কিন্তু আর একটু আলাদা। তোড় হল ভাঙা, কিন্তু ফোড় হল (মাটির হাঁড়ি জাতীয় বস্তুকে) আছড়ে চূর্ণবিচূর্ণ করা। আর **তোড়ভাঙ** হল **হাটবাজার**-এর মতো সমার্থক দুটি শব্দের, একটি দেশী একটি বিদেশী, শব্দের মেলবন্ধন, যার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন সৈয়দ মুজতবা আলী। **তোড়া** মানে যে গুচ্ছ হয়, তার মূল কারণ তার পুঞ্জ রূপ নয়, সেটি ভেঙে বা 'তুড়ে' আনা হয়েছে বলেই **তোড়া**; এই অর্থেই ফুলের তোড়া মানে bunch of flowers। যেমন কিনা, **তোডরমল্ল** যে আদিতে scrap-dealer ছিলেন না, ভাঙনদার ও ভাঙা মালের ব্যাপারী ছিলেন না, সে বিষয়ে আমরা এখনও নিশ্চিত নই। ভাঙাইওয়ালারাই কি পরে **তোড়ী বা তোডী** নামে পরিচিত হয়েছিলেন? **তোডী**দের বর্তমান উত্তরসূরিরাই কি **তোদি** (অনিল তোদি, প্রকাশ তোদি ... ইত্যাদি) নামে এখন পরিচিত নয়? ৬. ইংরেজি torrent।

তুফান : ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ তারী ফেন রূপে প্রকটিত যাহাতে।* ৩. ঝড় ও বৃষ্টি, সঙ্কট, বন্যা, মহাতরঙ্গ, গোলযোগ। (ব.শ.)। ৪. storm অর্থে প্রচলিত। ৫. যতদূর বোঝা যায়, আমাদের তু ছিল, ফেনও ছিল, কিন্তু **তুফান** ছিল না। সেই কারণে আরবি **তুফান** শব্দটি বাংলার মাটিতে পা রাখার পর তাকে আপন করে নিতে অসুবিধে হয়নি। দ্র. **ফেন (স্ফায়্)**। ৬. Portuguese - tufao, English - typhoon, Greek - তুফন, চীনা - তাই-ফু.ঙ। (ব.শ.)।

তুর্, তুর্কী, তুরগ, তুরঙ্গ (তুরঙ্গম), তুরন্ত, তুরাণি, ত্‌রী, তুরীয়, তুর্য্য : ১. তুরগ = তুর (ত্বরা) + ✓গম্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। তুরঙ্গ = তুর + ✓গম্ + অ (খচ্) - কর্তৃবাচ্যে, ম্ (মুম্) আগম, ডিৎ। তুরীয় = চতুর + ঈয় (ছ) পূরণার্থে, আদ্যলোপ। তুর্য্য = চতুর + য (যৎ)। (ব.শ.)। ২. **তুর্** = *নবরূপে উত্তীর্ণ তারীর (আবর্তনমূলক) রহন (যাহাতে)।* **তুর্কী** = *তুর্ করে যে গতিশীল আধার।* **তুরগ** = *তুর গমনকারী যে।* **তুরঙ্গ** = *তুর-এর রহস্যময় গমন থাকে যাহাতে।* **তুরঙ্গম** = *তুরঙ্গ সীমায়িত যাহাতে।* **তুরন্ত** = *তুর-এর অন্ত যাহাতে।* **তুরাণি** = *তুর-অন গতিশীল যাহাতে।* **ত্‌রী** = *তুর-এর গতিশীল আধার যে।* **তুরীয়** = *তুর গতিশীল-আধার রূপে যায় যাহাতে।* **তুর্য্য** = *তুর-এর যাওয়া থাকে যাহাতে।* / **তুরগ** = বেগে যায় যে। (ব.শ.)। ৩. (তুর্ = এই শব্দটি ব.শব্দকোষে নেই। ঢাকার অভিধানে রয়েছে 'ত্বরা' অর্থে।) **তুর্কী (তুরক, তুরকি, তুরকী)** = তুরস্কদেশীয় অশ্ববিশেষ, তুরস্কের ভাষা। **তুরগ** = বেগগামী, ঘোটক, চিত্ত। **তুরঙ্গ** = তুরগ, সূর্য্যাশ্বের সংখ্যানুসারে সাত (৭) সংখ্যা। **তুরঙ্গম** = অশ্ব। **তুরন্ত** = সত্বর, শীঘ্র। **তুরাণী** = তুরকীস্থানের অধিবাসী যোদ্ধা, বক্ষু (Oxus) নদীর উত্তরতীরস্থ প্রদেশ ও তাহার ভাষা। **তুরী** = শিঙ্গার মতো বাদ্যবিশেষ (bugle)। **তুরীয়** = চতুঃপূরণ, চতুর্থ, অনুপহিত চৈতন্য, পরব্রহ্ম, জীবের কেবল চৈতন্যাবস্থা, (বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর অপেক্ষা কেবল চৈতন্য যেমন চতুর্থ, সেইরূপ জীবের বিশ্ব, তৈজস, ও প্রাজ্ঞ অবস্থা অপেক্ষা কেবল চৈতন্য অবস্থা তুরীয়। হিন্দুশাস্ত্র।), চতুর্থাংশ, চতুর্থভাগ। **তুর্য্য** = চতুর্থাংশ, সিকি, অবস্থাত্রয়-অতিরিক্ত স্বরূপ। (ব.শ.)। ৪. Turkey বোঝাতে **তুর্কী** এবং হিন্দিতে quickly বোঝাতে **তুরন্ত** শব্দটি ছাড়া বাকি শব্দগুলি বর্তমানে প্রায় অপ্রচলিত। ৫. তুর্ শব্দ থেকে বহু শব্দ তৈরি হলেও এর বেশির ভাগই এখন অপ্রচলিত। আমরা এখানে মুখ্য কয়েকটি শব্দ নিয়েছি। প্রথম **তুর্**। এর অর্থ — নবরূপে উত্তীর্ণ ত বা তারীর আবর্তন (যাহাতে)। অর্থাৎ অন্য কোনো অবয়ব থেকে বেরিয়ে কেউ (কোনো এক তারী) আবর্তিত হয়ে হয়ে আমাদের দিকে আসছে। তার মধ্যে তু আবর্তমান রয়েছে বলেই আমরা তাকে বলছি **তুর্**। বাংলাভাষায় অবশ্য এককভাবে **তুর্** শব্দটির দেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু **তুর্**-যুক্ত অনেক শব্দ রয়েছে। ইংরেজিতে **তুর্** শব্দটিকে সরাসরি পাওয়া যায় tour রূপে। বিশেষত্ব হল যে, দ্রষ্টা এই তুর্-কারীকে তার দিকে সবেগে আসতে দেখে। মধ্যযুগের ভারতবর্ষের মাটিতে যারা এইভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে আসত, ভারতবর্ষ সেকারণেই তাদের নামকরণ করেছিল **তুর্কী**। এখানে স্মর্তব্য যে, পৃথিবীর প্রতিটি দেশের নামকরণের দুটি দিক রয়েছে। অধিকাংশ দেশের নাম রাখে বাইরের দেশের মানুষেরা, সেই দেশটির যে-স্বভাব তাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল, সেই স্বভাব (বা সেইরূপ ক্রিয়া) অনুসারে। কিছু কিছু দেশ আবার নিজের নাম

নিজে রাখার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলে। ফলে, অধিকাংশ দেশের একটি স্বদেশী নাম, এক বা একাধিক বিদেশী নাম দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, ভারতের স্বদেশী নাম ভারত, বিদেশী নাম ইন্ডিয়া; মিশরের স্বদেশী নাম মিশর, বিদেশী নাম ইজিপ্ট; জাপানের স্বদেশী নাম নিপ্পন, বিদেশী নাম জাপান; ফিনল্যান্ডের স্বদেশী নাম সুয়োমি, বিদেশী নাম ফিনল্যান্ড; হাঙ্গেরির স্বদেশী নাম মজর (Magyar), বিদেশী নাম হাঙ্গেরি; হল্যান্ডের সম্ভবত দুটোই বিদেশী নাম, হল্যান্ড ও নেদারল্যান্ড; আর, জার্মানির স্বদেশী নাম ডয়েচলান্ট (Deutschland), বিদেশী নাম জার্মানি। ফরাসিরা অবশ্য জার্মানিকে অন্য একটি নামেও সম্বোধন করে থাকে। ... এই নামগুলির প্রায় প্রত্যেকটি ক্রিয়াভিত্তিক অর্থধারক শব্দ। দ্র. **ভারতবর্ষ, ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়**।

এরপর আসে **তুরগ** ও **তুরঙ্গ**-এর কথা। দুটি শব্দই 'অশ্ব'কে বোঝায় বলে মনে হলেও, কার্যত তা নয়। যতদূর বোঝা যায়, প্রথম শব্দটি দ্রুতগামী Turkish horse কে বোঝাতে ব্যবহৃত হত এবং দ্বিতীয় শব্দটি সামাজিক executive-horse কে বোঝাতে ব্যবহৃত হত। কেন্দ্রীয় রাজকোষের বা সূর্যের যে সাতটি executive-horse, বঙ্গীয় শব্দকোষ **তুরঙ্গ** অর্থে সেই অশ্বদের কথাই বলেছেন। তাছাড়া আমরা জানি, **তুরঙ্গ** শব্দের ভিতরে যে ং-রূপিণীর রহস্যরূপ রয়েছে, **তুরগ** শব্দের মধ্যে তা নেই।

তুর-এর অন্ত যেখানে, অর্থাৎ দ্রুততার শেষ যেখানে সেই সর্বোচ্চ দ্রুততাকে বলে **তুরন্ত**। কিন্তু শব্দটির প্রচলন বাংলায় নেই, রয়েছে হিন্দিতে — 'instantly' অর্থে। অন্যদিকে নবরূপে উত্তীর্ণ তারীর আবর্তন বা **তুর** যদি বিশেষ কিছু ঘোষণামূলক ধ্বনি হয়, তাহলে সেই **তুর**-কে সৃষ্টি করে যে যন্ত্র, তাকে তো তুরী (bugle) বলতেই হয়। **তুরীয়** ও **তুর্য্য** কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়। **ব্রহ্ম, শিব, মোক্ষ, কেবল** প্রভৃতি যেসব অতি অর্থপূর্ণ শব্দ বাংলাভাষীদের অর্জনের তালিকায় রয়েছে, **তুরীয়-তুর্য্য** সেই তালিকাতেই রয়েছে। এই শব্দগুলির বিশেষত্ব হল, এগুলির ইংরেজি প্রতিশব্দ হয় না, কারণ ইংরেজের পূর্বপুরুষ এই শব্দগুলিতে ধৃত ধারণা অর্জন করতে পারেননি। সেই কারণে সম-ধারণার কোনো শব্দও তাদের নেই।

তা সে যাই হোক, শব্দ দুটির উপরোক্ত (২) ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটিই দুটিই তাদের মূল অর্থ — **তুরীয়** = **তুর** গতিশীল-আধার রূপে যায় যাহাতে। **তুর্য্য** = **তুর**-এর যাওয়া থাকে যাহাতে। কথা দুটি খুবই কাছাকাছি। এই যে **তু**, নবরূপে উত্তীর্ণ তারী, এই **তু**-কে ভাবুন মানুষের মন, যে কিনা দেহের কথা সম্পূর্ণ ভুলে দেহ থেকে বহু দূরে দ্রুত ছুটে বেড়াচ্ছে, কোথাও পৌঁছে গিয়ে একনিষ্ঠভাবে কোনো কিছুর অনুসন্ধানে এমনই গভীরভাবে লিপ্ত রয়েছে যে, তার আধারস্বরূপ দেহে যেনবা সে নেই, থাকে না, থাকার দরকার নেই। ফলত, দেহটি তার যেনবা নিষ্প্রাণ পড়ে রয়েছে, যেন মৃত; লোকে বলে 'ধ্যানস্থ', বলে 'সমাধি'। মানুষের এইরূপ অবস্থানকে বলা হয় **তুরীয়**-অবস্থা। আরও সহজ করে বললে বলতে হয়, মানুষের মন যে-অবস্থায় পাগলের মতো ছুটে বেড়ায়, **তুর** (tour) করে বেড়ায়, সেই অবস্থাকে বলে **তুরীয়**-অবস্থা। এই অবস্থায় পৌঁছানোর আগে তার স্বাভাবিক তিনটি অবস্থা সে পেরিয়ে আসে, তাই একে মানুষের চতুর্থ অবস্থা বলা যায়। ব.শ. একে বলেছেন, 'অবস্থাত্রয়-অতিরিক্ত-স্বরূপ'; **বলেছেন 'কেবল চৈতন্যাবস্থা'। ব্রহ্মগুণ অর্জনকারী শিবস্বরূপ মনীষী আবিষ্কারক-স্রষ্টাগণ এই চতুর্থ অবস্থানে পৌঁছনোর পরই আবিষ্কার-সৃষ্টি-মোক্ষ-কেবল** ইত্যাদি তাঁদের হস্তগত হয়। ব.শ. হিন্দুশাস্ত্রের উল্লেখ করে একে চার ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন।

১ম	২য়	৩য়	৪র্থ
বিরাট্	হিরণ্যগর্ভ	ঈশ্বর	শুদ্ধচৈতন্য
বিশ্ব	তৈজস	প্রাজ্ঞ	তুরীয়

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, প্রাচীন শব্দবিদগণ **তুরীয়, তুর্য্য**, দুটি শব্দেরই, ব্যুৎপত্তি নির্ণয় কালে কেন 'চতুর' শব্দের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁরা **তুরীয়**-এর 'চতুর্থাবস্থা' রূপে বারংবার প্রয়োগ দেখেছেন এবং স্বভাবতই **তুরীয়**-এর প্রতীকী অর্থরূপে 'চতুর্থাবস্থা'কেই প্রধান উদ্দিষ্টরূপে শনাক্ত করেছেন। ফলে, 'চতুর' থেকেই ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা তাঁদের কাছে সঠিক বলে মনে হয়েছে।

তুর্বসু : ৩. রাজা যযাতির এক পুত্র। যযাতির ঔরসে দেবযানীর গর্ভে এঁর জন্ম হয়। যযাতি তুর্বসুকে একদিন বলেন যে, বিষয়ভোগে তাঁর পরিতৃপ্তি হয়নি। তিনি পুত্রের যৌবন কামনা করেন এবং তার পরিবর্তে পুত্রকে নিজের জরা দিতে চান। চার সহস্র বৎসর পুত্রের যৌবন ভোগ করার পর তিনি তা পুত্রকে আবার ফিরিয়ে দেবেন। পুত্র এতে অস্বীকার করায় তিনি পুত্রকে অভিশাপ দেন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** একালের ব্যবসায়ীর আদি রূপ কেমন ছিল, এ-নিয়ে ভাবতে শুরু করলে সবশেষে যেখানে আমরা পৌঁছতে পারি, সে হল মানবসমাজে ব্যবসাবৃত্তির ভ্রূণাবস্থা। এই ভ্রূণাবস্থার ব্যবসায়ীকে **বসু** বলে। **তুর্বসু** সেই ব্যবসায়ী সত্তাকে বোঝাত, যারা সেকালেই প্রথম দেশে দেশে **তুর** (tour) করে উৎপন্ন পৌঁছে দিত। এরা দেবযানীর পুত্র ছিল। দ্র. **পুরু, যযাতি, শর্মিষ্ঠা। ৬.** ইংরেজি tour।

তুল (তোল), তুলন, তুলনা, (অতুল, অতুলন, অতুলনীয়, অতুল্য, অপ্রতুল, তুলকালাম) তুলা : ১. ✓তুল্। **২. তুল** = *তু লয় যাহাতে; অর্থাৎ, নবরূপে উত্তীর্ণ তারী লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* **তুলন** = *তুল অন যাহাতে।* **তুলনা** = *তুলন-এর আধার যে।* **অতুল** = *নেই তুল যাহাতে।* **অতুলন** = *নেই তুলন যাহাতে।* **অতুলনীয়** = *যাহাকে তুলনা করা যায় না, কিংবা তুলনা করা উচিত নয়।* **অতুল্য** = *নেই তুল্য যাহার।* **অপ্রতুল** = *নয় প্রতুল যে।* **তুলকালাম** = *যাহাতে কালাম (কলাম) সমূহ তুল করা হয়।* **তুলা** = *তুল-এর আধার যে।* / **তুলা** = যাহার দ্বারা তুলন সাধন করা যায়। **অতুল** = ন তুলা যাহার। **অতুলন** = ন তুলনা যাহার। **অপ্রতুল** = প্রকৃষ্ট তুলার অভাব (যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. তুল (তোল)** = উন্মান, পরিমাণ, ওজন করা, উত্তোলন, ঊর্দ্ধনয়ন; সদৃশ, সমান, তুলনা, রথের অবয়ববিশেষ, তুমুলকাণ্ড; তৌল করান, উঠান, আরোপণ করা, চড়ান, পাত্রে করিয়া উঠান, বমন করা, উত্থাপিত করা, সূচীকর্ম্ম দ্বারা রচনা করা, উচ্চারণ করা, ভাজিয়া উঠান, ভাজা, উৎপাদন করা, উৎপাটন করা, রটনা করা, চয়ন করা, রিফু করা। **তুলা** = উন্মান, ওজন করা, সাদৃশ্য, ওজন করার যন্ত্র, অপরাধীর দোষ পরীক্ষার্থ ধটযন্ত্র, শতপল পরিমাণ, পরিমাণার্থ দ্রব্য, (জ্যোতিষে)

তুলারাশি (Libra); কাপাস শিমুল ইত্যাদি ফলের মধ্যস্থ সূত্রবৎ পদার্থ বা আঁশ। **তুলন** = উন্মান, পরিমাণ, সমীকরণ, উপমান, উত্তোলন। **তুলনা** = তুলন-স্ত্রী। (**অতুল** = তুলাহীন, তুলনারহিত, অসাধারণ, সমধিক। **অতুলন** = তুলনারহিত, অনুপম। **অতুল্য** = অসদৃশ, অতুল, বিষম, অমিত। **অপ্রতুল** = অভাব, অসঙ্গতি, দুর্দশা, দুর্গতি। **তুলকালাম** = খুব বকাবকি, তুমুল কলহ (মূলত প্রতিটি শব্দ বা কালাম ওজন বা তোল করিয়া কথা বলা।)। (ব.শ.)। ৪. নানা প্রতীকী অর্থে প্রচলিত। ৫. যে ক্রিয়ার মাধ্যমে **তু** কোনো কিছুকে 'লয়' বা নিয়ে নেয় তাকে **তুল** বলে। এই **তু** 'বাইরে থেকে আগত কোনো **তারী**'। 'লয়' মানে 'নিয়ে লালন করে' কিংবা 'নিয়ে লয়প্রাপ্ত করে'। মোট কথা বহিরাগত কোনো শক্তি এসে সকলের ভেতর থেকে কাউকে উপরে উঠিয়ে নিলে, তাকে বলে **তুল**-করা, **তুলা বা তোলা**। এর ফলে, লালন-লয়নের পাশাপাশি একই সঙ্গে অন্ততপক্ষে আরও দুটি প্রতিক্রিয়াজনিত ঘটনা ঘটে যায় — ওজন করা হয়ে যায়, তুলনা করাও হয়ে যায়। যার দ্বারা **তুল** করা বা তুলা হয়, আমরা তাকে **তুলাযন্ত্র** বলি; ইংরেজ তাকে বলে tool। এর ফলে ভার-এর যে **তুলনামূলক** বিচার হয়ে যায়, তাকেই ওজন বলে। তবে, তুলে লালন না করে লয়ন করলে, যাকে তোলা হয়, সে হয়ে যায় **তুলার** মতো ওজনহীন। ৬. ইংরেজি tool।

তুলসী : ১. তুলা + ✓সো + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী ঈ (ঙীষ্)। (ব.শ.)। ২. *তুলস্ (তুল-এর শেষ অস্তিত্ব) গতিশীলভাবে ধারণ করে যে।* ৩. হিন্দুদিগের পবিত্র বৃক্ষবিশেষ, তুলসী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া গোপীবিশেষ। রাধার শাপে ইনি মানবযোনি এবং সুদামা গোপ দানবযোনি প্রাপ্ত হন। সুদামা শঙ্খচূড় দানব, তুলসী তাঁহার পত্নী। 'পত্নীর সতীত্ব নাশে পতির মৃত্যু হইবে' ব্রহ্মার এই বর হেতু, নারায়ণ শঙ্খচূড় বেশে তুলসীর সতীত্ব নাশ করেন। তুলসী তাহা জানিয়া, 'তুমি পাষাণ হও এবং জন্মান্তরে তোমার আত্মবিস্মৃতি হইবে' নারায়ণকে এই শাপ দেন। নারায়ণ তুলসীকে বলিলেন, 'তুমি রমাসদৃশী হও, তোমার দেহ গণ্ডকী নদী ও কেশরাশি পুণ্যবৃক্ষ তুলসী হউক'। (ব.শ.)।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে, ইনি কৃষ্ণপ্রিয়া রাধিকার সহচরী। একদিন গোলোকে (স্বর্গে) তুলসীকে কৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত দেখে রাধিকা এঁকে অভিশাপ দেন যে, 'তুমি মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করবে।' এতে কৃষ্ণ দুঃখিত হয়ে বলেন যে, 'মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করলেও তপস্যাদ্বারা তুমি আমার এক অংশ লাভ করবে।' রাধিকার শাপে ইনি পৃথিবীতে রাজা ধর্মধ্বজের স্ত্রী মাধবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তুলসী নামে পরিচিত হন। নারায়ণকে স্বামীরূপে লাভ করার জন্য ইনি ব্রহ্মার তপস্যা করেন। ... ব্রহ্মা বলেন যে, 'এখন তুমি কৃষ্ণের অঙ্গসম্ভূত সুদামের স্ত্রী হও; পরে কৃষ্ণকে লাভ করবে। রাধিকার শাপে সুদাম দানবগৃহে জন্মগ্রহণ করবে। তার নাম হবে শঙ্খচূড়। নারায়ণের শাপে তুমি বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে তাঁর অতি প্রিয় হবে। তুমি না জন্মগ্রহণ করলে তাঁর সকল পূজাই ব্যর্থ হবে।' যথাসময়ে শঙ্খচূড়ের সঙ্গে ... তুলসীর বিবাহ হয়। শঙ্খচূড়ের বর ছিল যে, তার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট হলেই তার মৃত্যু হবে। ... শঙ্খচূড়ের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ... দেবতারা শিব ও নারায়ণের সমীপস্থ হলে ... নারায়ণ বলেন যে, আমার শূল দ্বারা শিব শঙ্খচূড়ের সহিত যুদ্ধে রত হলে পর, আমি এর স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করব। ... নারায়ণ শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করে তুলসীর সতীত্ব নাশ করেন। তখন শিবের হাতে শঙ্খচূড় নিহত হয়। তার অস্থি লবণসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলে এই অস্থি হতে দেবপূজার জন্য নানাপ্রকার শঙ্খের উৎপত্তি হয়। ... এসব জ্ঞাত হয়ে তুলসী নারায়ণকে অভিশাপ দেন যে, 'তুমি পাষাণে পরিণত হও।' ... নারায়ণ তুলসীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, 'তোমার দেহ থেকে গণ্ডকী নদী উৎপন্ন হবে, আর তোমার কেশ থেকে উৎপন্ন হবে তুলসীবৃক্ষ। তুমি লক্ষ্মীর ন্যায় আমার প্রিয়া হবে।' সেই হতে নারায়ণ শিলারূপে অবস্থিত হয়ে সর্বদা তুলসীযুক্ত হয়ে থাকেন।

পদ্মপুরাণের বৃত্তান্ত অনুসারে ... জলন্ধর নামে এক অসুরের স্ত্রী ছিলেন বৃন্দা। (দ্র. জলন্ধর)। ... বৃন্দার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকতে জলন্ধরের মৃত্যু হবে না জেনে বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধরে বৃন্দার সতীত্ব নাশ করেন। বৃন্দা ... বিষ্ণুকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হলে, বিষ্ণু ... বলেন, 'তুমি সহমৃতা হও, তোমার ভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ, ও অশ্বত্থ, এই চারি প্রকার বৃক্ষ উৎপন্ন হবে। বৃন্দা হতেই তুলসীর জন্ম। (পৌ.অ.)। ইন্দ্র তুলসীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে প্রেম নিবেদন করেন, এবং তুলসী তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাতে ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তুলসীকে নিগৃহীত করতে যান। কিন্তু সতী তুলসীকে কিছুতেই নিগৃহীত করতে না পেরে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র তুলসীর প্রতি তাঁর বজ্র নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সেই বজ্র সতী তুলসীর উপর পতিত হয় না। (কোনো একটি পৌরাণিক গ্রন্থে এই কাহিনী রয়েছে, কলিম খান নিজে তা পড়েছেন, কিন্তু বর্তমানে তা তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। পাঠক, ক্ষমা করবেন।) ৪. নাম রূপে এবং 'তুলসী' গাছ রূপে শব্দটি প্রচলিত। ৫. **তুলঃ** বা **তুলস্** কথাটির অর্থ হল, তুলনার শেষ রূপ; তার পরে আর তুলনা নেই। এই তুলস্-এর স্ত্রী-আধার যে, তাকে **তুলসী** বলে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ব.শ. দেখিয়েছেন যে, 'যাকে দেখে আর্য্যগণ তার তুলনা দিতে অক্ষম হন, পুরাবিদ্গণ তাকেই তুলসী নামে অভিহিত করেছিলেন।' অতএব একে 'তুলনাহীনা'ও বলা যায়, উর্দুভাষীরা একে বলেন 'বেনজীর'। আমাদের কিন্তু জানতে হবে, উদ্ভিদজগতের তুলসী, মানবজগতের তুলসী এবং সামাজিক তুলসী কে বা কারা?

সবার আগে চোখের সামনে 'তুলসীমঞ্চে' যে তুলসী গাছকে আজও আমরা দেখতে পাই তার কথা দিয়েই শুরু করা ভাল। আগেই বলা হয়েছে, প্রকৃতি থেকে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন বলে আমরা অনেক কিছু অনুভব করার যোগ্যতা হারিয়েছি। তুলসীগাছের গুণাগুণ আজ আমরা সেভাবে জানি না, যেভাবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা জানতেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে এক জার্মান চিকিৎসক নাকি ভারতীয় বৈদ্যদের সংস্পর্শে এসে বলেছিলেন — যে দেশে তুলসী, বেল, নিম গাছ ঘরের সামনেই থাকে, সে দেশে মানুষের অসুখ হওয়ার কোনো কারণ তিনি দেখতে পান না। কেবল তাই নয়, শোনা যায়, গৃহের পাশে তুলসীমঞ্চে তুলসী গাছ থাকলে সেই গৃহের ধারে-কাছে বজ্রপাত হয় না। উপরোক্ত ইন্দ্রের বজ্রনিক্ষেপ কাহিনী

তারই প্রাচীন বয়ান। আরও শোনা যায় যে, কোনো কোনো জার্মান-দেশীয় বিল্ডিং ডিজাইনে বিভিন্ন তলের বারান্দায় বজ্রবিরোধী-ব্যবস্থা হিসেবে তুলসীগাছ লাগানোর পৃথক স্থান রাখা থাকে; যা একইসঙ্গে বাসিন্দার পক্ষে স্বাস্থ্যকরও বটে।

এ তো গেল তুলসীর বাহ্যিক দিক। মানুষের সমাজে তাঁরাই **তুলসী** পদবাচ্য যাঁরা নানান দিক থেকে তুলনাহীন। তবে সেই দিকগুলি কী কী, তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়। কেননা, তার জন্য **তুলসী**গাছের বিষয়ে বিস্তারিত জানা দরকার — তার ঠিক কী কী গুণের কারণে সে সর্দি-কফ-বিরোধী, স্বাস্থ্যকর, বজ্রবিরোধী ... ইত্যাদি। এসব বিষয়ে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। ফলে **অতুলপ্রসাদ, অতুল্য** প্রভৃতি নামের বিষয়ে জানলেও **তুলসীদাস** বলতে ঠিক কীরূপ স্বভাবের মানুষকে বোঝায়, আমরা তা আজও জানতে পারিনি; যেমন কিনা **কালীদাস** বলতে কীরূপ মানুষকে বোঝায় তা আমরা জানতে পেরেছি এবং যথাস্থানে তার ব্যাখ্যাও করেছি।

রইল বাকি সামাজিক-ঐতিহাসিক **তুলসী**র কথা। উপরোক্ত নারায়ণ-তুলসীর কাহিনী, বৃন্দার কাহিনী, ইন্দ্র-তুলসীর কাহিনী — এই কাহিনীগুলি স্পষ্টভাবে জানায় যে, ভারতসমাজের ইতিহাসে **তুলসী** নামক সত্তাটির বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং পুঁজির বিকাশের পথে পবিত্র-তুলসী একটি বড় বাধা রূপে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সমাজের কোন সত্তাটিকে **তুলসী** বলে, তা চিহ্নিত করতে না-পারায়, এ-বিষয়েও আমরা যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারিনি। ভারতের ইতিহাসে সক্রিয় রাধা-কৃষ্ণকে আমরা কমবেশি চিহ্নিত করতে পেরেছি, কিন্তু কৃষ্ণসখী **তুলসী**কে কিছুতেই চিহ্নিত করতে পারিনি। তার পৌরাণিক কাহিনীটি থেকেও বিষয়টি ঠিকঠাক বোঝা যায় না। আমাদের অনুমান, খুব-সম্ভব সেকালের সরকারি বা রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ধারক-বাহক চতুষ্পাঠী-সমূহের শিক্ষক সম্প্রদায়কে **তুলসী** বলা হত। এবং সেক্ষেত্রে মানতে হবে যে, পুঁজির বিকাশ এই ধনবিরোধী-জ্ঞানপূজক সম্প্রদায়টির সঙ্গে অন্যায় আচরণ করেছিল।

তুষ (তুষানল) : ১. ✓তুষ্ + অ (ঘঞর্থে ক) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **তুষ** = তু-র *(বা নবরূপ উত্তীর্ণ তারীর) শক্তি দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* / যাহা দ্বারা পাচক তুষ্ট। (ব.শ.)। ৩. **তুষ** = ধান্যত্বক, বিভীতকবৃক্ষ, প্রীত করা। **তুষানল** = তুষের আগুন, কুকূল, শঙ্খব্যাপ্ত গর্ত্ত, বর্ম্ম। (ব.শ.)। ৪. কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। ৫. যাঁরা কাঠকুঠ খড়পাতা দিয়ে উনুন জ্বালান, রান্না করেন, তাঁরা জানেন ধানের আগড়া (যে ধানের ভিতরে চাল হয় না, খোলাটুকুই থাকে) বা কুঁড়া (চাল বের করে নেবার পর যে অংশ থাকে) দিয়ে উনুন জ্বালানোর সুবিধা অনেক। এগুলিকে যদি **তুষ** বলে এবং তার মানে ব.শ. যদি বলেন, 'যাহা দ্বারা পাচক তুষ্ট', তবে তা সঠিক কথা সন্দেহ নেই। তার মানে 'তোষণ' থাকে যাহাতে, সেটাই **তুষ**। ধান্যকে রক্ষাকারী ধান্যত্বকে পাচকের তোষণ থাকে, শাসকসুরক্ষাকারী **বিভীতকবৃক্ষে** বা থানা-পুলিস ব্যবস্থায় শাসকের তোষণ থাকে। এসব কথাই ঠিক। কিন্তু 'তোষণ' বা প্রীত করা তো আসলে '**তুষ**-অন'। সেই **তুষ**-এর ভেতরে অন্যকে 'প্রীত করা' ক্রিয়াটি থাকে কীভাবে? থাকে বেশ **অদ্ভুতভাবে**। ঠিক যে দিশায় আপনি যেতে চান, তা সে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ, কিংবা রাগ-অনুরাগ-বিরাগ-গ্রহণ-দান ইত্যাদি যেদিকেই হোক না কেন, সেদিকে যাওয়ার জন্য আপনার সেই দিকের প্রতি দিশাগ্রস্ত শক্তি কিংবা ভাব লাগে। সেই শক্তি বা ভাব বাইরের কেউ এসে যদি আপনাকে সরবরাহ করে, সে তো আপনার প্রিয়পাত্র হবেই। সেই হল **তুষ**। সে আপনাকে বাইরে থেকে এসে, আপনি যেদিকে যেতে চান, সেই দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। তাই সে **তুষ**।

তুষার (তুষারকাল, তুষারশৈল, তুষারগৌর), তোষণ : ১. তুষার = ✓তুষ্ + আর (অরন্) - করণবাচ্যে, কিৎ। তোষণ = ✓তোষি + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **তুষার** = **তুষ**-*এর আধার (আবর্ত্তমান) রহে যাহাতে।* **তোষণ** = *সার্বিক* **তুষ** *অন থাকে যাহাতে।* / **তুষার** = যাহার দ্বারা তুষ্টি সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **তুষার** = তুহিন, হিম, নীহার, বরফ (snow, frost), শীকর, জলকণ, হিমজল (dew), কর্পূরবিশেষ। **তুষারকাল** = শীতকাল। **তুষারশৈল** = হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বত, হিমালয়। **তুষারগৌর** = তুষারতুল্য শুভ্র, হিমধবল। **তোষণ** = তোষয়িতা, প্রীণন, সন্তোষজনক, সন্তোষজনন, সন্তোষজনক দ্রব্যমাত্র। (ব.শ.)। ৪. **তুষার** শব্দটি অর্থহীন নামরূপে অধিক প্রচলিত এবং কদাচিৎ বরফ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যগুলি একালে অপ্রচলিত। ৫. যাঁরা শীতকাতুরে, শীতের আমেজ তাঁদের অপ্রিয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই একটি বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত শীত, ঠাণ্ডা, বরফ — এগুলি ভাল লাগে। সেই মাত্রা পর্যন্ত ঠাণ্ডাকে বলে **তুষার**। এই **তুষার** সকলেরই কমবেশি পছন্দের তালিকাতে পড়ে। কারণ এগুলিতে মানুষ **তুষ্ট** হয়; তার শরীর-মনের **তোষণ** হয়। **তুষার** সেই মাত্রার মধ্যেই থাকে। তার চেয়ে অধিক হয়ে গেলে তাকে **তুষার** বলা যায় না। যতদূর বোঝা যায়, গুঁড়ি গুঁড়ি তুলোর মতো বরফকেই **তুষার** বলে, অন্যরকম হলে তাকে বলে **তুহিন**, বলে **শিলা**বৃষ্টি। মানুষের বিচারে **তুষার** শুভ, **তুহিন** ও **শিলাবৃষ্টি** অশুভ। তবে **তুষার**-এর আরও দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে।

তুষার কেবল বাহ্যিক ঠাণ্ডা-ভাবই বহন করে না, আর যতরকম ভাবে মানুষের তুষ্টি সাধিত হয়, সবরকম **তুষ**-ভাবই সে বহন করে থাকে। সেটিই ব.শ. প্রদত্ত **তুষার** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের অভিমত, যেকারণে তিনি **তুষার** শব্দের অর্থ দেন 'তুষ্টিসাধন'। তবে, **তুষার**-এর (তুষ্ + আর্-এর) **তুষ্** ভাবটি ঠিক সোজাসুজি **তুষ** নয়, সরাসরি তোষণ নয়; এটি আবর্ত্তনমূলক (তুষ + ঋ), অর্থাৎ **তুষার** ঘুরপথে মানুষকে তুষ্ট করে থাকে। সেই কারণে, এই **তুষার** যে-প্রকারের **তোষণ** মানুষকে দিয়ে থাকে, তা **মানুষের শরীর ও মনের পক্ষে 'সহনীয় মাত্রায় বিরুদ্ধভাবাপন্ন'**; তাই তা **তুষার** পদবাচ্য। এই 'সহনীয়-মাত্রায়-বিরুদ্ধভাবাপন্ন-**তুষার**'-এর সান্নিধ্যে এলে, মানুষের শরীর ও মন বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করবার যোগ্য হয়ে ওঠে। 'সহনীয়-মাত্রায়-বিরুদ্ধভাবাপন্ন' বলে তুষার মানবশরীর ও মানবমনে প্রতিষেধকের কাজ করে দেয়, মানুষের বিকাশের পক্ষে এই **তুষার** তাই অত্যন্ত শুভশক্তি। একালের

চিকিৎসাবিদ্যার ভাষায় একে টিকা বা vaccine বলে। যে বিচারে, Physics-এর বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে **'পদার্থবিদ্যা'**, successful research-scholar-এর বাংলা করা চলে **'গোস্বামী'**, সেই বিচারে vaccination-এর বাংলা করা উচিত 'তুষারপ্রদ'; antibody-র বাংলা করা উচিত 'তুষারসম্ভব'।

যাই হোক, পাশ্চাত্য দুনিয়া অবশ্য কেবলমাত্র শারীরিক টিকাকেই চেনে এবং সেরকম টিকাই সে আবিষ্কার করেছে। **তুষার** কিন্তু শরীর ও মন উভয় ক্ষেত্রেই টিকার কাজ করে। আদিতে **তুষার** শব্দটি সেই অর্থেই প্রসূত হয়েছিল। তবে হিমালয়কে যে **তুষারশৈল** এবং **তুহিনশৈল** দুটোই বলা হয়, তার কারণ ব্যাখ্যা করা খুবই প্রয়োজন। দ্র. **তুহিন**। ৬. ইংরেজি tosh, toss, tussle।

তুহিন (তুহিনাচল) : ১. তুহিন = ✓তুহ্ (পীড়ন) + ইন (ইনন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **তুহিন** = *তু-এর স্থিরতা গতিশীলভাবে বিলুপ্ত হয় যাহাতে। /* **তুহিন** = পীড়ন করে যে। (ব.শ.)। ৩. **তুহিন** = শীতল, হিম, নীহার (snow), হিমজল (dew), চন্দ্রকিরণ। **তুহিনাচল** = হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বত, হিমালয়। (ব.শ.)। ৪. অর্থহীন নাম রূপে **তুহিন** শব্দটি প্রচলিত। ৫. দ্র. **তুষার**। প্রায় সমস্ত বাংলা অভিধান ও শব্দকোষে **আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ, আধি-ব্যাধি** ... প্রভৃতি শব্দের দুটি করে অর্থকে এক করে ফেলা হয়েছে। (লেখকদ্বয়ের 'খ' ও 'গ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। **তুষার** ও **তুহিন** শব্দের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। যেন দুটি শব্দের প্রতীকী অর্থ একটাই — বরফ। এমনকি হিমালয়কে যে **তুষারশৈল** বলা হয়, **তুহিনশৈল**ও বলা হয় এবং সেটি যে আসলে আলাদা এবং সঠিক, তাও বুঝবার উপায় রাখা হয়নি। তবে স্মৃতির কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ বহু অভিধানেই পাওয়া যায়। যেমন **তুহিন**কে 'পীড়ক' বা 'চন্দ্রকিরণ' বলা, কিন্তু **তুষার**কে 'তুষ্টিসাধন' বলা ... ইত্যাদি। আমাদেরকে সেই ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ভর করেই **তুষার-তুহিন** শব্দের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালাতে হয়েছে।

বস্তুত ঠাণ্ডা কিংবা বরফ যে পর্যন্ত 'সহনীয় মাত্রায় বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন' সে পর্যন্ত বরফকে **তুষার** বলে; তার চেয়ে অধিক হয়ে গেলেই তাকে **তুহিন** বলে। **তুষার** তাই 'তুষ্টিসাধক', আর **তুহিন** তাই 'পীড়ক'। হিমালয় তুষারাচ্ছন্ন যেমন হয়, তেমনি তুহিনাচ্ছন্নও হয়; তাই হিমালয়কে **তুষারশৈল** বলে, **তুহিনশৈল**ও বলে। এমনকি 'শীতলকিরণ'কে **তুষাররশ্মি** বলে, **তুহিনরশ্মি**ও বলে। কিন্তু **তুহিন**কে চন্দ্রকিরণ যে-কারণে বলা হয়, তা খুবই গূঢ় ও জটিল তত্ত্বের কথা। আমরা এখানে সে বিষয়টি সাধ্যমতো স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি।

আদি যৌথরাষ্ট্রব্যবস্থাকে বলা হত **হিমালয়**, আর এই রাষ্ট্রের রাজকোষকে বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিকে বলা হত **সূর্য**। এই যৌথরাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতরেই একদিন জন্মলাভ করে **ব্যক্তিপুঁজি** — হিমালয়ে চন্দ্র ও শীতলতার জন্ম হয়। (দ্র. **অগস্ত্য**)। এই **পুঁজি**র কিরণকে চন্দ্রকিরণ বা **'শীতলকিরণ'** বলে। এই **ব্যক্তিপুঁজি** বা **চন্দ্রকিরণের** দুটি রূপ — **লক্ষ্মী (লক্ষ্মীপুঁজি)** ও **কুবের (কুবেরপুঁজি)**। ব্যক্তিপুঁজি যে-পর্যন্ত সহনীয় মাত্রায় থাকে সে-পর্যন্ত তাকে **লক্ষ্মী** বা **তুষাররশ্মি** বলে, এবং সেই মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তাকে কুবের বা **তুহিনরশ্মি** বলে। মধ্যযুগের বাংলায় লক্ষ্মীসাধনার বা **তুষাররশ্মি**র রমরমা হয়েছিল, বর্তমান যুগে কুবেরসাধনার বা **তুহিনরশ্মির** রমরমা চলছে। ...

তৃ (তৃপ্, তৃষ্, তু, *তারি*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিতর, অতিতার, অতিতৃপ্ত, অতিতৃষ্ণ, অতৃপ্ত, অবতর, অবতরণ, অবতীর্ণ, অবিতৃপ্ত, আতর, আতর্পণ, আতাই, আতাপি, আতাপী, আতার, আতারিকাতারি, আতৃপ্য, উত্তর, উত্তরণ, উত্তরপুরুষ, উত্তরসাধক, উত্তরাধিকার, উত্তরীয়, উত্তরোত্তর, উত্তীর্ণ, তর, তর(রু)ই, তরওয়াল, তরঃ, তরকচ, তরকারি(রী), তরক্ষ, তরক্ষু (তর্ক্ষু), তরখ (তরস), তরঙ্গ, তরঙ্গভঙ্গিত, তরঙ্গিণী, তরঙ্গিত, তরঙ্গিম, তরঙ্গিমা, তরজমা, তরণ, তরণি(ণী), তরণিতনয়, তরণিতনয়া, তরণীপথ, তরণীরত্ন, তরণি(ণী)সেন, তরণ্ড, তরতম, তরতর, তরফ, তরফদার, তরবার, তরবাল, তরবারি(রী), তরম্বুজ (তরমুজ), তরল, তরলনয়না, তরললোচনা, তরলা, তরলিত, তরস, তরস্বান, তরস্বী, তরা, তরাই, তরাজ, তরাজু, তরান, তরান্ধু, তরালু, তরি(রী), তরিক, তরিকা, তরিকাবান, তরিকি, তরিত্র, তরিবৎ, তরী, তরু, তরুখণ্ড, তরুজীবন, তরুণ, তরুণজ্বর, তরুণদধি, তরুণবয়স্ক, তরুণিম, তরুণিমা, তরুণী, তরুতল, তরুত্বক, তরুবর, তরুমৃগ, তরুরাগ, তরুরাজ, তরুরুহা, তরুলতা, তরুশায়ী, তরুষণ্ড, তরুসার, তরে, তর্ণ, তর্ণক, তর্তিব (তরতীব), তর্দ্দু, তর্দ্দূ, তর্পণ, তর্পয়িতা, তর্পিত, তর্পী, তর্পিণী, তর্ম্ম, তর্ষ, তর্ষণ, তর্ষিত, তার, তারক, তারকজিৎ, তারকব্রহ্ম, তারকসূদন, তারকারি, তারকাক্ষ, তারকাসুর, তারকিত, তারণ, তারণি(ণী), তারণেয়, তারতম, তারতম্য, তারল, তারল্য, তারা, তারাকান্ত, তারাকারা, তারাধিপ, তারানাথ, তারাপতি, তারাপথ, তারাপীড়, তারাবলী, তারাভূষা, তারামণ্ডল, তারামৃগ, তারামৈত্রক, তারামৈত্রী, তারিণী, তারী, তারুণ, তারুণ্য, তার্ক্ষ, তার্ক্ষ্য, তার্য্য, তালু, তালুকা, তিতির, তিত্তির, তিত্তিরি, তির, তিরণ, তিরতির, তিরপিত, তিরশূল, তিরশ্চী, তিরস্, তিরসপারস (তির্য্যকপার্শ্বে, tresspass), তিরস্কর, তিরস্কর(রি)ণী, তিরস্কার, তিরস্কারী, তিরস্কৃত, তিরস্কৃতি, তিরস্ক্রিয়া, তিরি(রী), তিরিকৃথি, তিরিতিরি, তিরোধান, তিরোভাব, তিরোহিত, তিরোভূত, তির্য্যক (দ্র. উতপ্রোত), তির্য্যকজ, তির্য্যকজন, তির্য্যকপাতী, তির্য্যকপ্রমাণ, তির্য্যকপ্রক্ষেপণ, তির্য্যকযোনি, তির্য্যকস্রোতাঃ, তিয়াষ(স), তিয়াষা(সা), তিরিষা, তিষে, তীর, তীরকর, তীরন্দাজ, তীরভুক্তি, তীর্ণ, তীর্থ, তীর্থকর, তীর্থকাক, তীর্থঙ্কর, তীর্থদেব, তীর্থপাদ, তীর্থভূত, তীর্থযাত্রা, তীর্থরাজ, তীর্থশিলা, তীর্থশৌচ, তীর্থসেবী, তীর্থোদক, তীর্থোপবাস, তরোয়াল, তৃট্, তৃণ, তৃণকূট, তৃণকুটীর, তৃণকেতু, তৃণচ্ছেদী, তৃণজলৌকা, তৃণজাতি, তৃণজীবী, তৃণজ্ঞান, তৃণজ্যোতিঃ, তৃণটাটি, তৃণদ্রুম, তৃণধান্য, তৃণধ্বজ, তৃণবিন্দু, তৃণবুদ্ধি, তৃণভুক, তৃণরাজ, তৃণাগ্নি, তৃণাঙ্কিত, তৃণাবর্ত্ত, তৃণীকৃত, তৃণোল্কা, তৃদ্, তৃপ্, তৃপান্তর, তৃপ্ত, তৃপ্তি, তৃষ্, তৃষট্, তৃষা, তৃষাতুর, তৃষার্ত্ত, তৃষিত, তৃষ্ণা, তৃষ্ণার্ত, তৃষ্ণালু, তৃ(ত্রে)স্কার, তৃ,, তেপান্তর, তেরচা, তেরছা, তেরিজ, তেরি(ড়ি)য়া, তেরিয়ান, তৈত্তিরি, তৈত্তিরীয়, তৈরিক, তৈর্থিক, ত্রপান্তর, তঃ, দুস্তর, নিস্তার,

এই শব্দার্থকোষ কীভাবে পড়তে হয়, তা জানার জন্য 'ভূ-১' পৃষ্ঠা দেখুন। সংক্ষিপ্ত আকারে তা ১ পৃষ্ঠাতেও পাওয়া যাবে।

প্রতারক, প্রত্যুত্তর, বিতরণ, বৈতরণী, সতীর্থ, সতৃষ্ণ, সন্তরণ, সুতীর্থ। **তৃ (তৃপ্, তৃষ্, তৄ, তারি) = তারীর আবর্ত্তন। তৃপ** = তারীর আবর্ত্তন পালন / পান করে যে। **তৃষ** = তারীর আবর্ত্তন ইচ্ছা দিশাগ্রস্ত যাহাতে। **তৄ** = তারীর আবর্ত্তন আবর্ত্তিত যাহাতে; অর্থাৎ, প্লবনপূর্বক দেশান্তর গমন। **তারি** = তারণের গতি যাহাতে।

তর, তরণ, তরণি, তরণী, তরণীসেন (তরতম, তারতম্য) : ১. তর = ✓তৄ + অ (অপ্) - ভাববাচ্যে। তরণ = ✓তৄ + অন (ল্যুট্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তর** = *তারী (আবর্ত্তমান) রহে যাহাতে।* **তরণ** = **তর** *অন থাকে যাহাতে।* **তরণি** = **তরণ** *গতিশীল যাহাতে।* **তরণী** = **তরণ***-এর গতিশীল আধার যে।* **তরণীসেন** = **তরণী** *রূপ সেনাবল যাহাতে।* **তরতম** = **তর** ও **তম**। **তারতম্য** = *তার (তর হইতে জাত) ও তম্য (তম থাকে যাহাতে)।* / **তরণ** = যাহার দ্বারা তরণ সাধিত হয়। **তরণি** = রোগে তারণ করে যে। (ব.শ.)। **৩.** তর = পার করা, পারের পয়সা, খেয়ার নৌকা, বৃক্ষ, অগ্নি, খেয়াঘাট; দুই-এর মধ্যে একাতিশয্যে, আতিশয্যে, হ্রস্বার্থ; শীঘ্রতা, (তাৎপর্য্যে) বিলম্ব; প্রকার, রকম (manner), পদ্ধতি, বিধি (mode), আকার, গড়ন, ভাব, ভঙ্গি, জাতি, শ্রেণী, অবস্থান; ভরপুর, বিহ্বল; উত্তরণ করা (to cross), অতিক্রম করা, লাফাইয়া অতিক্রম করা, উদ্ধার পাওয়া, উত্তীর্ণ হওয়া, সদ্‌গতি পাওয়া। **তরণ** = প্লব, ভেলা, ক্ষেপণী, নৌকার দাঁড়, দুঃখতরণস্থান, স্বর্গ, উত্তরণ, পার গমন, প্লবন, জলোপরি স্থিতি, দেশান্তরগমন, অভিভব, জয়। **তরণি, তরণী** = সূর্য্য, কিরণ, অর্কবৃক্ষ, তাম্র, নৌকা, ঘৃতকুমারী। **তরতম** = তরতমার্থযুক্ত, ন্যূনাধিক, অল্পাধিক, একটু কম-বেশি, ন্যূনাধিকভাব, প্রভেদ, উত্তম-মধ্যম-কনিষ্ঠ ভাবে ভেদ। **তারতম্য** = তরতমভাব, ন্যূনাধিকতা, প্রভেদ। (ব.শ.)। **তরণীসেন** = বিভীষণের স্ত্রী সরমার গর্ভজাত পুত্র। ইনি পিতার ন্যায় ধার্মিক ও রামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু রাবণের আদেশে রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রাণবিসর্জন দেন। (পৌ.অ.)। **৪.** যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫. ত** বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য। তর মানে তরে যাওয়া, তর সয় না, তরতম ভাব হওয়া — তর শব্দের ইত্যাকার যত রকম অর্থ হয়, সেগুলির মূলে একটি ক্রিয়াই বিদ্যমান রয়েছে। তা হল — **ত** (= তারী) রহে যাহাতে। তার মানে, লাউডগার চলনের মতো জলের উপরিতলের যে ঢেউময় অবস্থান তার উপর দিয়ে সন্তরণশীল অস্তিত্ব মাত্রেই **তর** পদবাচ্য। এই প্রেক্ষিত অনুসারে **তর** বিকশিত রূপে ভিন্ন ভিন্ন সত্তাকে শনাক্ত করে। (যে তার স্বরূপ থেকে বিকশিত হচ্ছে না, যেমনকে তেমন রয়েছে, তার চেয়ে এগিয়ে যায় বলে **তর** অন্যের তুলনায় আগে। ইংরেজিতে একে 'কমপারেটিভ ডিগ্রি' বলে।) কিন্তু মূলে তাদের একই ক্রিয়ার অস্তিত্ব রয়েছে বলেই তারা প্রত্যেকেই **তর** পদবাচ্য হয়ে থাকে। **তর**-এর এই তরে যাওয়াকে যদি এর পরও বুঝতে অসুবিধে হয়, তবে **'তর হইতে জাত' তার**-এর (string-এর) কথা ভাবুন। মনে হয়, বুঝতে আর কোনো অসুবিধাই থাকবে না। দ্র. **তার**।... **তর**-এর এই যে এগিয়ে থাকা, তা এগোতে এগোতে যেখানে গিয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়, আর এগোনোর কোনো পথ দেখতে পায় না, **ত-এর অগ্রগমনের সেই শেষ সীমা**। **তাই একে তম** বলে। দ্র. **তম**। **অতএব স্বাভাবিক অস্তিত্ব** থেকে তারিত হতে থাকে **তর**, এবং সেই **তর শেষ হয়ে গিয়ে তম**-এ। সুতরাং, **তরতম** হল সত্তার **তারণশীল রূপ এবং সেই তারণশীলতার** শেষ রূপ। **তারতম্য** হল **এই দুই রূপ থাকে যাতে**, সেই ভাব।

তরণীসেন শব্দটি প্রায় সব অভিধানকার বাদ দিয়ে গেছেন। কিন্তু রামায়ণে **এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ** চরিত্র। দ্র. **সেন, পদবী**। **৬.** ইংরেজি wa*ter*, coal-*tar*, *tar*pulin ইত্যাদি।

তরঃ (তরস্, তরসি, তরস্বান, তরস্বৎ, তরস্বী) : ১. ✓তৄ + অস্ (অসুন্) - **করণবাচ্যে**। (ব.শ.)। **২. তরঃ** = **তর**-*র 'নির্য্যাসত্যাগ' যাহাতে।* দ্র. **তপঃ**। / **তরঃ** = যাহার দ্বারা অভিভব সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. তরঃ** = **বল**, বেগ, জব, উড়ুপ, ভেলা, বানর, রোগ, তরণস্থান, তীর, **কূল**। **তরস** = মাংস; বেগ। **তরসি** = বলপূর্ব্বক, জোরে। **তরস্বান্, তরস্বৎ, তরস্বী** = বেগবান, বলবান, শূর, বীর, বায়ু, গরুড়, দূত। (ব.শ.)। **৪. সবগুলিই অপ্রচলিত। ৫. ব.শ. প্রদত্ত উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে, এমনকি মধ্যযুগেও তরসি, তরসিয়ে শব্দ দুটি প্রচলিত ছিল। এখন সবটাই পরিত্যক্ত। হিন্দি-উর্দুতে অবশ্য 'অন্যের বেগ ধারণ করা' অর্থে 'তরস্ খানা' শব্দটি এখনও কমবেশি প্রচলিত আছে।**

তরঙ্গ (তরঙ্গিণী) : ১. ✓তৄ + **অঙ্গ (অঙ্গচ্) - কর্তৃবাচ্যে**। (ব.শ.)। **২. তরঙ্গ** = **তর্** *অঙ্গ যাহার।* **তরঙ্গিণী** = *যে গতিশীল-রহস্যময়ী গতিশীল-***তরঙ্গ***কে ধারণ করে।* **৩. তরঙ্গ** = **ঊর্ম্মি**, বীচি, ঢেউ, (সাদৃশ্যে) **বস্ত্রভঙ্গ, চুনট, কুর্দ্দন, পুস্তকের পরিচ্ছেদ, অশ্বাদির** উৎফাল বা উৎপ্লবন, লম্ফ, কলহচ্ছটা, শব্দজন্য বায়ুস্তরকম্পন, বাক্যচ্ছটা, বাগ্‌বিস্তার, আবেগ, আবেশ, যুদ্ধোৎসাহ, উৎসাহবান, তরুণ। **তরঙ্গিণী** = তরঙ্গযুক্ত স্থান, নদী। (ব.শ.)। **৪.** wave অর্থে প্রচলিত। **৫. ত** বর্ণের অর্থেই আমরা দেখেছি, যে, লাউডগার মতো উচ্চনীচ অথচ প্রোত (horizontal) রেখায় যে চলে, তাকেই **ত** বলে। তার সেই চলা রহে যে উচ্চনীচ তলসম্পন্ন অঙ্গে তাকেই সেকারণে **তরঙ্গ** বলে।

তরল (তরলা, তরলিত, তলতাবাঁশ) : ১. ✓তৄ + অল (কলচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তরল** = **তর্**-*এর লালন-লয়ন থাকে যাহাতে।* **তরলা** = **তরল**-*এর আধার যে।* **তরলিত** = **তরল** *গতিশীল হয়ে তারিত হয় যাহাতে।* **৩. তরল** = চঞ্চল, চপল, কম্পিত, ভাস্বর, দ্রবীভূত (দ্রব্য), শূন্যগর্ভ, বিস্তীর্ণ, কামুক, উচ্ছলিত, ক্ষিপ্র, অধীর, অশান্ত, সংযমহীন, মত্ত, হার, হারমধ্যমণি, তল, সমভূমি, হীরক, লৌহ, তল্লাবাঁশ। **তরলা** = মধুমক্ষিকা, যবাগূ, সুরা। **তরলিত** = তরলীকৃত, চঞ্চলীকৃত, ধৃত, লুলিত, কম্পিত। (ব.শ.)। **৪.** liquid অর্থে 'তরল' প্রচলিত, বাকি দুটি শব্দ অপ্রচলিত। **৫.** যে সত্তার মধ্যে আপন অবস্থান থেকে অন্যত্র 'তরে যাওয়া'র বা 'উতরে যাওয়া'র ক্রিয়াটি সর্বদা সক্রিয় থাকে, তাকে বলে **তরল**। সেই কারণে তাকে 'চঞ্চল', 'চপল' ... ইত্যাদি বলা হয়। কিন্তু কেন 'হার,

হারমধ্যমণি, তল, সমভূমি, হীরক, লৌহ,' ইত্যাদিকে **তরল** বলে, তা আমরা জানি না। তবে 'তলতা বাঁশ' বা 'তল্লাবাঁশ'কে তরল-বাঁশ বলার কারণটি আমরা কমবেশি জানি। দ্র. **ত্বকসার**। এই বাঁশের স্বভাব ভালকি, বাঁশনি, গুঁড়ি-ভালকি, কিংবা কাঁটাবাঁশের মতো নয়। এ-বাঁশ পাতলা, সরল, সরু, সিধে অথচ ভেতরে ফাঁপা, মেদহীন, হালকা হয় এবং এতে কাঁটা-খোঁচাও তুলনায় কম। এই বাঁশের এক গাঁট থেকে পরবর্তী গাঁটের দূরত্ব, অর্থাৎ দুই গাঁটের মধ্যবর্তী অংশটি (যাকে **পাব** বলা হয়) অন্য সব বাঁশের তুলনায় বেশি। সেই কারণে যে বাঁশের-বাঁশীর এত গৌরব, তা তৈরি হয় এই বাঁশ থেকে। তাছাড়া, লম্বা ছিপও (হুইল ছিপ নয়) তৈরি হয় এই বাঁশ থেকে। মাটির বাড়ির ছাদের নীচে এই বাঁশের ব্যবহারই প্রশস্ত। এই সুবিধাগুলি অন্য বাঁশে নেই। এতে এই সুবিধা সম্ভব হয় এইজন্য যে, এই বাঁশ 'গাঁট থেকে গাঁটে তরে তরে এমনভাবে লম্বা হয়ে যায়' যার সঙ্গে কেবল **তরল** বস্তুরই তুলনা চলে। এই তরলতা এতই প্রকট যে, এরকম একটি সাফসুতরো বাঁশকে উপর দিকে খাড়া রেখে গোড়ায় বসে নাড়ালে বাঁশের ডগাটি ঠিক ১৮০ ডিগ্রির বিপরীত বিন্দুকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে নড়বে অথচ ভাঙবে না, মচকাবেও না। সম্ভবত এসব কারণেই গ্রামবাংলার বাংলাভাষী একে **তরল** বাঁশ বা তল্লাবাঁশ বা তলতা বাঁশ নাম দিয়ে থাকবেন।

যবাগূ (যাউ), সুরা প্রভৃতি বস্তুকে **তরলা** বলা যেতেই পারে, কিন্তু মধুমক্ষিকাকে **তরলা** বলা হয় সম্ভবত তার অতি-চঞ্চলতার কারণে। **৬.** দ্র. **তর**।

তরী (তরাই, তরান্ধু, তরালু, তরি) : ১. ✓তৃ + ঈ, করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তরী** = *তর-এর গতিশীল আধার যে।* **তরাহ** = *তর-এর আধার গতিশীল যেখানে; যেখান দিয়ে (বারিধারা) তরে যায়।* **তরান্ধু** = *তর-এর আধার রহস্যরূপে ধারিত হয়ে নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **তরালু** = *তর-এর আধার লালিত হয়ে নবরূপে উত্তীর্ণ হয় যাহাতে।* **তরি** = *তর গতিশীল যাহাতে।* / **তরী** = যাহার দ্বারা তরণ সাধন করা যায়। (ব.শ.)। **৩. তরী** = নৌকা, বসন-পেটক, কাপড়ের পেঁটরা, বস্ত্রান্ত। **তরাই** = পাহাড়ের নীচের (পাদদেশস্থ) জমি। **তরান্ধু, তরালু** = নৌকাবিশেষ, বড় তলা-চওড়া নৌকা। **তরি** = **তরী**। (ব.শ.)। **৪.** boat অর্থে প্রচলিত। **৫.** ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

তরু (কল্পতরু, তরুখণ্ড, তরুজীবন, তরুতল, তরুত্বক, তরুবর, তরুমৃগ, তরুরাগ, তরুরাজ, তরুরুহা, তরুলতা, তরুশায়ী, তরুষণ্ড, তরুসার) : ১. ✓তৃ + উ - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তরু** = *তারীর আবর্ত্তনমূলক রহনকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে; অর্থাৎ, যে ব্যবস্থা আবর্ত্তমান তারীকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে; কিংবা, তর নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **কল্পতরু** = *দ্র.* **কল্পতরু**। **৩. তরু** = বৃক্ষ। **কল্পতরু** = দ্র. **কল্পতরু**। **তরুখণ্ড** = তরুসমূহ। **তরুজীবন** = বৃক্ষমূল। **তরুতল** = তরুপার্শ্বস্থ ভূভাগ। **তরুত্বক** = বল্কল। **তরুবর** = তরুরাজ। **তরুমৃগ** = শাখামৃগ। **তরুরাগ** = নবপল্লব। **তরুরাজ** = তরুশ্রেষ্ঠ, তাল, শ্রেষ্ঠবৃক্ষমাত্র। **তরুরুহা** = পরগাছা। **তরুশায়ী** = পক্ষী। **তরুসার** = কর্পূর, বৃক্ষসারমাত্র।) (ব.শ.)। **৪.** tree অর্থে **তরু** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** গাছকে তরু বলে কেন? কারণ সে 'তৃ' ক্রিয়া করে। সেই কারণে ইংরেজভাষীগণ একে 'তৃ' বা tree বলে। কিন্তু 'তৃ' ক্রিয়াটি কীরূপ ব্যাপার? — সে ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চে উত্তীর্ণ হয়। এর অধিক উত্তরাধিকার ইংরেজ পায়নি। আমাদের উত্তরাধিকার আর একটু বেশি। আমাদের **তরু** কেবল নিজেই উচ্চ থেকে উচ্চে উত্তীর্ণ হয় না, তাতে যে আরোহন করে তাকেও নব নব রূপে উত্তীর্ণ করে দেয় — ফল-ফুলের অধিকারী করে দেয়, আশ্রয় দেয়, ছায়া দেয়, বিপদ থেকে ত্রাণ করে দেয়, গাছ থেকে গাছে চলে যাওয়ার পথ করে দেয়। আর সে-কাজ এই **তরু** কেবল পার্থিব tree-তরু রূপেই করে না, সামাজিক সাংগঠনিক ব্যবস্থা-তরু রূপেও করে। আর সেই সামাজিক **তরু**কে বোঝানোর জন্যই **তরু** শব্দটির অধিক প্রয়োজন পড়েছিল। বলতে কি, সেকালের গ্রন্থাবলীতে **তরু** ও তরুযুক্ত শব্দগুলি প্রধানত সামাজিক-তরুকে বোঝাতেই ব্যবহৃত হত। আদি যুগে, যৌথসমাজের ভেঙে পড়ার ঠিক আগে-পরে যে সকল ছোট-ছোট গোষ্ঠী ও পরিবার সৃষ্টি হচ্ছিল, সেগুলি সবই **তরু** পদবাচ্য ছিল। **অশ্বত্থ** ছিল আদি **তরু**। তারপর বটবৃক্ষ থেকে কদমবৃক্ষ পর্যন্ত অজস্র সামাজিক তরু জন্মায় এবং শেষমেষ জন্মায় **কল্পতরু**। পরে পরে রাষ্ট্রশক্তির আবির্ভাবের পর বিশালকায় তরুগুলি ক্রমশ নিষ্প্রাণ জড়ের ও যন্ত্রের মতো হয়ে যায়, তখন তাদের নাম হয়ে যায় **পর্ব্বত**। এখনও যে-সকল সামাজিক সংগঠন যথেষ্ট প্রাণবন্ত, সমাজের ও মানুষের মনের মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে এবং সজীব শাখা-প্রশাখায় সংগঠনের মতো আচরণ করে থাকে, তাদের **তরু** বলাই যুক্তিযুক্ত। **৬.** ইংরেজি tree। দ্র. পৃষ্ঠা ২১৮।

তরুণ (তরুণজ্বর, তরুণদধি, তরুণবয়স্ক, তরুণিম, তরুণিমা, তরুণী) : ১. ✓তৃ + উন (উনন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তরুণ** = *তর উন যাহাতে; অর্থাৎ, তর নবরূপে উত্তীর্ণ নয় যাহাতে।* **তরুণী** = *তরুণ-এর গতিশীলা আধার যে।* **৩. তরুণ** = ষোড়শোর্দ্ধবয়স্ক, যুবা, নব, অচিরজাত, কোমল, কচি, অচিরপ্রবৃত্ত, প্রথম, অচিরোদিত, বাল, পঞ্চদিবসাতীত, উৎসাহসম্পন্ন, উৎকট, স্থূলজীরক, এরণ্ডবৃক্ষ, অঙ্কুর, কোমলাস্থি। **তরুণজ্বর** = নবজ্বর, সপ্তরাত্র পর্যন্ত জ্বর। **তরুণদধি** = তরুণলক্ষণোক্ত দধি, পঞ্চদিবসাতীত দধি। **তরুণবয়স্ক** = তরুণ। **তরুণিম** = তরুণভাব, যৌবন। **তরুণিমা** = তরুণভাব, তারুণ্য, যৌবন। **তরুণী** = দ্বিতীয়বয়স্কা স্ত্রী, যুবতী, দন্তীবৃক্ষ, কুজবৃক্ষ, সেবতী। (ব.শ.)। **৪. তরুণ** ও **তরুণী** দুটি শব্দই যথাক্রমে young boy ও young girl অর্থে প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** 'উন' কথাটি ভারি সমস্যাজনক। ব্রিটিশ আমলের শেষে বাংলায় যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রচলন হয়, তার বেশ কিছুদিন পরে, ১৯৬০ সালের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত 'নন-ম্যাট্রিক' বলতে এইরকম বোঝানো হত — ছাত্রটি দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে, কিন্তু ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে 'ম্যাট্রিক' পাশ করেনি। কিন্তু বিয়ের বাজারে প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে যে ছাত্র স্কুল ছেড়ে দিয়েছে, তার বাবাও ছেলেকে 'নন-ম্যাট্রিক' বলে বিজ্ঞাপন দিতে

শুরু করে। **তরুণ** শব্দটিও অনেকটা তেমনি। যে-**তর** তখনও পর্যন্ত পূর্ণতায় উত্তীর্ণ হয়নি, সেই হল **তরুণ**। যে-জ্বর পূর্ণজ্বরে উত্তীর্ণ হয়নি, সে হল **তরুণজ্বর**। যে-দধি তখনও পূর্ণদধিতে উত্তীর্ণ হয়নি, সে হল **তরুণদধি**। যে-বয়স্ক মানুষটি পূর্ণবয়স্ক মানুষে উত্তীর্ণ হয়নি, সে হল **তরুণবয়স্ক** মানুষ। ফলে এই **তরুণ** শব্দকে কচি, বালক, কিশোর, অঙ্কুর, প্রথম ইত্যাদি থেকে যুবা পর্যন্ত অনেককেই বোঝানো যেতে পারে। কেননা, তারা কেউই পূর্ণবয়স্ক-মানুষে উত্তীর্ণ হয়নি। অতএব, **তরুণ** মানে যুবক নয়, বালকও নয়; **তরুণ** মানে 'প্রাক-পূর্ণ (বয়স্ক)'।

তর্পণ (পিতৃতর্পণ, দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ, সন্তর্পণ) : ১. ✓তৃপ্ + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তর্পণ** = ***তৃপ্তি*** *অন থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহার দ্বারা (কারও) তৃপ্তি সাধিত হয়।* ***পিতৃতর্পণ*** *= যাহার দ্বারা পিতৃগণের* ***তর্পণ*** *হয়।* ***দেবতর্পণ*** *= যাহার দ্বারা দেবগণের* ***তর্পণ*** *হয়।* ***ঋষিতর্পণ*** *= যাহার দ্বারা ঋষিগণের* ***তর্পণ*** *হয়। /* **তর্পণ** = যাহার দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. তর্পণ** = তৃপ্তিকারক, প্রীণয়িতা, প্রীণন, তোষণ, তৃপ্তি, যজ্ঞকাষ্ঠ, খাদ্য। (ব.শ.)। **৪.** হিন্দুদের পিতৃশ্রাদ্ধকর্মে সংশ্লিষ্ট মানুষেরা শব্দগুলি ব্যবহার করেন, অন্যথায় শব্দগুলি অপ্রচলিত। তবে, **সন্তর্পণ** শব্দটি 'সাবধান' অর্থে প্রচলিত। **৫.** কারও তৃপ্তি সাধনের জন্য কোনো কিছু করলে তাকে **তর্পণ** করা বলে। তবে তার ভিত্তিতে থাকতে হবে **ঋণ**। যেমন কিনা **অর্পণ** না থাকলে প্রত্যর্পণ থাকে না, তেমনি **ঋণ** না থাকলে **তর্পণ** হয় না। সেভাবে ভাবলে প্রত্যর্পণ করারই একটি বিশেষ রূপকে **তর্পণ** করা বলে এবং এসবই **পণ** বা **প্রতিজ্ঞা** সংক্রান্ত। তবে, সরাসরি **ঋণ** নিয়ে থাকলে বা **অর্পণ** নিয়ে থাকলে এবং তার পরিবর্তে প্রতি-অর্পণ বা **প্রত্যর্পণ** করলে, তাকে **তর্পণ** বলে না। যে-**ঋণ** অনিবার্য, জন্মালে এবং বেঁচে-বর্তে থাকতে হলে, চাই বা না চাই, যে-**ঋণ** নেওয়া হয়ে যায়, সেই **ঋণ** শোধ করার উপায় হল **তর্পণ**। মানুষ মাত্রেই **পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ** আপন অজান্তেই গ্রহণ করে বসে, এইগুলি ফেরত দেওয়ার উপায় হল **পিতৃতর্পণ, দেবতর্পণ,** ও **ঋষিতর্পণ**। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য লেখকদ্বয়ের 'গ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তবে এই যে সম-তর্পণ বা **সন্তর্পণ**, এ ভারি সাবধানের কাজ। এক তো, **ঋণ** যে দিয়েছে সে খুব ধীরে-সুস্থে চুপচাপ দিয়ে দিয়ে গেছে, বিপুল-বিশাল ঘোষণা করে কোনোদিন কিছু দেয়নি, দেওয়ার মধ্যে তার কোনো অহঙ্কার ছিল না, সে জানতেই দেয়নি যে, সে দাতা আর আপনি গ্রহীতা। আপনাকে সে অকাতরে শুধু দিয়েই গেছে। ফলে তার ঋণদান আপনি আপন অজান্তে নিয়ে গেছেন, ভোগ করেছেন, তৃপ্তি লাভ করেছেন; অথচ সেই দান গ্রহণের জন্য কোনোদিন লজ্জিত হতে হয়নি আপনাকে। আজ যখন তিনি দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে চলে গেছেন, আপনি তাঁর দানের সব কথা জানতে পেরেছেন, তখন আপনি সেই বিশাল ঋণ শোধ করবেন কীভাবে? শোধ করতে হবে একই ভাবে, ধীরে-সুস্থে, চুপচাপ, কোনো ঘোষণা না করে, দেওয়ার অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে এবং যাকে দিচ্ছেন সে যেন বুঝতেও না পারে যে আপনি তাকে দিচ্ছেন। যার কাছ থেকে নিয়েছিলেন **সে কে? সে আপনার পিতৃগণ**। যা নিয়েছিলেন, তা কী? সে আপনার **পিতৃঋণ**। যাকে আপনি ফেরত দেবেন, সে কে? সে আপনার **সন্তানগণ**। যা আপনি দেবেন তা কী? সে আপনার **পিতৃতর্পণ**। কেন আপনি আপনার পিতার কাছ থেকে নেওয়া পিতৃঋণ পিতৃতর্পণের নামে আপনার সন্তানগণকে দেবেন? কারণ পিতৃপরম্পরার স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক অনিবার্য এই নিয়ম অনায়াস, অনায়াসেই তা ক্রমনিম্ন উত্তরাধিকারের ধারায় পালন করতে হয়। সেই কারণে এই সমগ্র দেওয়া-নেওয়াই অতি-অনায়াস সমতর্পণ বা **সন্তর্পণ**। একাজ খুব সাবধানে করতে হয় বলেই লোকে **সন্তর্পণ** শব্দের একটা মানে বোঝে — 'সাবধানে'। এতে লুকোচুরি নেই, রয়েছে অতি নরম কোমল মমতাভরা মান-অভিমান-সম্মানের পারস্পরিক বোধ। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ'-এর মা স্বামীর আদেশ অগ্রাহ্য করতে না পেরে সন্তানের অন্নব্যঞ্জনের পাতের এক কোণায় একটুখানি ছাই দিয়েছিলেন। সে-সন্তান **পিতৃঋণ** আর কোনোদিনই গ্রহণ করেনি। পিতৃপরম্পরা ছিন্ন হওয়ার প্রকৃতিবিরুদ্ধ পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

কিন্তু লোকে জলে নেমে যে **পিতৃতর্পণ** করে, সে কী? সে হল প্রকৃত পিতৃতর্পণের 'কোড' বা অনন্যোপায় প্রকাশভঙ্গি। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য 'গ' গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

তার (তারক, তারকা, তারণ) : ১. তার = **✓**তারি + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***তার*** *=* ***তর*** *হইতে জাত।* ***তারক*** *= তার করে যে।* ***তারকা*** *=* ***তারক****-এর আধার যে।* ***তারণ*** *=* ***তার*** *অন যাহাতে। /* **তাব** = ভবার্ণব তারণ করে যে। **তারক** = তারয়িতা (বা তারণ করিয়ে দেয় যে)। **তারণ** = পারপ্রাপয়িতা (বা পার পাইয়ে দেয় যে)। (ব.শ.)। **৩. তার** = অতিশায়ী, অত্যুচ্চৈঃ (স্বর, note), তীব্র, উচ্চৈঃ (স্বর, sound), উৎকৃষ্ট, উত্তম, স্বাদু, স্ফুরিতকিরণ, নির্ম্মল, নির্ম্মলমুক্তা, মুক্তাবিশুদ্ধি, অত্যুচ্চশব্দ, বানরবিশেষ, প্রণব, ওঙ্কার, দেবীপ্রণব, বীজ 'স্ত্রীং', বিষ্ণু, শিব, তীর, তারণ, উদ্ধার, অক্ষিমধ্য, চোখের তারা, রৌপ্য, গৌণ সিদ্ধিবিশেষ, রজ্জু, কর্ণিক, সঙ্গীতে তারা-সপ্তক; স্বাদ, রস; সোনা রূপা ইত্যাদি ধাতুর সূতা, ধাতু-তন্তু, শণ-প্রভৃতির আঁশ বা আঁশের সূতা বা দড়ি, সেতার ইত্যাদির তন্ত্র (string), আঁতের (নাড়ীর) সূতা বা তাঁত, টেলিগ্রাফ, টেলিগ্রাফের সংবাদ; ত্রাণ করা, উদ্ধার করা, পরপারে উত্তীর্ণ করা। **তারক** = তারয়িতা, ত্রাতা, পারে উত্তারয়িতা, মহাদেব, কর্ণধার, ভেলক, ভেলা, চক্ষু, কনিনিকা, চক্ষুস্তারা, নক্ষত্র। **তারকা** = তারা, নক্ষত্র, উল্কা, চক্ষুস্তারা, ইন্দ্রবারুণী। **তারণ** = তারয়িতা, উদ্ধারক, বিষ্ণু, মহাদেব, ভেলক, ভেলা, পারে নয়ন। (ব.শ.)। **৪. তার** নানার্থে, **তারক** নাম রূপে, এবং **তারকা** 'স্টার' অর্থে প্রচলিত, তবে **তারণ** অপ্রচলিত। **৫.** উত্তীর্ণ হওয়া কমপক্ষে দুরকম, **উর্ধ্ব** ও **তির্য্যক**, ভার্টিক্যাল ও হরাইজন্টাল। পর্ব্বতশৃঙ্গও উত্তীর্ণ হওয়া যায়, নদীও উত্তীর্ণ হওয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই ত্বরিতে তরে যাওয়া যায়। এবং সেরকম তরে যেতে পারলে সেই যাওয়াকে বা উতরে যাওয়াকে **তার** বলে। সবচেয়ে উঁচুতে স্বরের (শব্দের) নিঃসরণ উত্তীর্ণ করা গেলে, তাকে বলে **তারস্বর**। আর, রূপের (আলোর) নিঃসরণ

সর্বোচ্চে উত্তীর্ণ করা গেলে, তাকে বলে 'দীপ্ত'; রসের নিঃসরণ উত্তীর্ণ করা গেলে তাকে বলে 'স্বাদু'। ... সবক্ষেত্রেই এই যে পারে যাওয়া, পেরিয়ে যাওয়া, উতরে যাওয়া, **তরে** যাওয়া, সেটিই **তার** পদবাচ্য। একটি শামুক খানিকটা পথ পেরিয়ে গেল, **তরে** গেল। তার যাওয়ার পথে যে আধভিজে রেখা রয়ে গেল, সেটিও **তার**-পদবাচ্য; কারণ এই পথে সে **তরে** গেছে, এই পথরেখা **'তর হইতে জাত'**। এরকম চিনির রসের **তার** হয়, লোহার **তার** হয়, সুতার **তার**ও হয়। সবক্ষেত্রেই এই **তার**গুলি হল **'তর হইতে জাত'**। এই **তার**কেই ফারসি ভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল শুধুমাত্র 'ধাতু-তন্তু' অর্থে প্রতীকী শব্দ **তার** রূপে। সেই ভাষা বাংলায় আসার পরে, সেকালের বাংলাভাষীদের পক্ষে ফারসির **তার**কে নিজেদের **তার**-এর ভাই রূপে চিনতে অসুবিধে হয়নি। ফলে, বাংলাভাষী উচ্চস্বরকে যেমন **তার**স্বর বলেছে, তেমনি সেতারের তারকেও (string-কেও) **তার** বলেছে, আবার সন্তরণের তরণকেও **সাঁতার** বা **সমতার** বলেছে। কারণ সবক্ষেত্রেই মূলে **তর** ক্রিয়াটি সক্রিয় রয়েছে। এমনকি যে-বাংলাভাষাজ্ঞানীগণ Physics-এর সৃজনশীল অনুবাদ করেছিলেন **পদার্থবিদ্যা**, তাঁরাই টেলিগ্রাফিক-সংবাদের বাংলা করেছিলেন **তার**বার্তা। পরবর্তী কালের অ্যাকাডেমিক বাংলাজ্ঞানী তাকে ভেবেছেন, এই **'তার**বার্তা' মানে message sent through wire / string। কথাটি ঠিক নয়, পুরোপুরি ভুলও নয়। কেননা, যে-বার্তা দীর্ঘপথ পেরিয়ে বা **তরে তরে** আসে, তাকেই সেকালের বাংলাভাষী জ্ঞানী মানুষেরা **তার**বার্তা নাম দিয়েছিলেন, কেননা তাঁদের শব্দবোধে সেরকম করাই স্বাভাবিক ছিল। তবে একথাও ঠিক যে, যে বস্তুর মাধ্যমে ওই বার্তা আসে, তাকেও আদিতে, ফারসির এদেশে আসার অনেক আগে থেকেই, 'রজ্জু' বা **তার** বলা হত; ফারসি আসার পর রজ্জু-অর্থে **তার** কথাটি বাড়তি জোর পেয়ে যায়। সেই সুবাদে **তারের** মাধ্যমে আসে বলেও তাকে **তার**বার্তা বলা যায়।

মোট কথা, **তরে** যাওয়ার বা **তরিয়ে** দেওয়ার ক্রিয়া থেকে যার জন্ম হয় তাকে **তার** বলে। এই **তার** করে যে, তাকেই **তারক** বলে; তা সে সংসারসমুদ্র তরিয়ে দেওয়ার মহাত্রাতা মহাদেব হোন আর সামান্য নদী তরিয়ে দেওয়ার নৌকা বা ভেলা হোক, এমনকি আমাদের চোখের নয়নতারাই হোক। নদীর এপারে দাঁড়িয়ে থেকেও তো নদী পেরোনো যায়; আমাদের চোখের **তারা** তো কারও তোয়াক্কা না করেই নদী পার হয়ে ওপারের বস্তুর কাছে আমাদের নিয়ে চলে যায়, তাকে দেখে ফেলে, চিনে ফেলে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে নদীটিকে কাঁসাই-দামোদরের চেয়ে বেশি চওড়া হলে চলে না।

তবে **তারকা** শব্দের অর্থে কেন-যে আমরা আকাশের **তারা** বুঝি এবং ইংরেজরা star (স্-**তার**) বোঝেন, সেকথাটি একটু পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। তার জন্য নীচে **তারা** দেখুন। ৬. দ্র. **তারা**।

তারকাসুর : ২. *যে-তারক অসুর রূপে আবির্ভূত। (দ্র. **তারক**, **অসুর**)।* ৩. অসুরবিশেষ। ইঁহার পিতা বজ্রাঙ্গ, মাতা বরাঙ্গী। ব্রহ্মার বরে গর্বিত তারক দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিলে, দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা বলিলেন, শিববীর্যজাত পুত্র তারককে নিহত করিবে। অতঃপর শিবসূত কার্ত্তিকেয় তারককে নিহত করেন। ... মৎস্যপুরাণ। (ব.শ.)। ... ব্রহ্মার কাছে তিনি দুইটি বর লাভ করেন। এক বরে তার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ জন্মগ্রহণ করবে না, আর দ্বিতীয় বরে একমাত্র মহাদেবের বীর্যসম্ভূত পুত্রের হস্তে ভিন্ন তার মৃত্যু হবে না। ... এই দুই বরে বলীয়ান হয়ে তারকাসুর দেবতাদের উপর নানারূপ অত্যাচার করতে আরম্ভ করে। ... দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গেলে, তিনি তাঁদের বলেন মহাদেবের যাতে সন্তান হয় তার চেষ্টা করতে। ... কামদেবের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ... তখন অগ্নি কপোতের রূপ ধারণ করে মহাদেবের নিকট আসেন। মহাদেব কপোতকে দেখে তাঁর শুক্র ধারণ করতে আদেশ দিয়ে সম্ভোগে বিরত হন। কপোত-রূপী অগ্নি শিববীর্য ধারণে অসমর্থ হয়ে গঙ্গায় বীর্য নিক্ষেপ করেন। গঙ্গা সে বীর্য ধারণে অশক্ত হয়ে তা হিমালয়ের পার্শ্বস্থ শরবনে ত্যাগ করেন। এতে বিপদ উপস্থিত হবে ভেবে দেবতারা ছয়জন কৃত্তিকাকে এ বীর্য রক্ষা করার জন্য বনে প্রেরণ করেন। কৃত্তিকারা এই বীর্যপানের পর গর্ভধারণ করেন ও এই ছয় কৃত্তিকা সকলেই একত্রে ছয় সন্তান প্রসব করেন। এদের ছয় পুত্রকে একত্র মিলিত করে এক (ষড়ানন) পুত্র সৃজিত হয়। পরে দেবী বসুন্ধরা এই পুত্রকে গ্রহণ করেন এবং শরবনে ঐ পুত্র ক্রমে বর্ধিত হতে থাকে। এই পুত্রের নাম কার্তিকেয়। কার্তিকেয় বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ... দেবসেনাপতি পদে নিযুক্ত হন এবং তারকাসুরকে নিহত করেন। (শিবপুরাণ/দেবীভাগবত — পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. মানুষের সমাজে কীভাবে কখন সর্বপ্রথম হিংসা, মারদাঙ্গা ও রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল, সেসব আমরা কমবেশি জেনেছি **পৃথুর** বা রাষ্ট্রের আবির্ভাবকথা থেকে। কিন্তু মানুষের সমাজে টাকা দিয়ে গুণ্ডা পোষার অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর আদি উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল, তা আমরা জানি না। একালের কোনো দেশের কোনো শিক্ষাব্যবস্থাই সামরিক বাহিনীর উদ্ভব কথা বিষয়ে প্রায় কিছুই জানে না। ভারতের ইতিহাসে সেই কাহিনী রয়েছে **তারকাসুরের** নিধন-উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা প্রথম সৈন্যবাহিনীর বা **কার্ত্তিকেয়**র এই জন্মকথায়। সমাজ-ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এই ঘটনা ছিল সেকালের চোখে খুবই বৈপ্লবিক এবং অত্যন্ত শুভ।

কিন্তু সেই তারকাসুর সত্তাটি কে? ভারতের ইতিহাসে বিখ্যাত **ত্রিপুর** ঘটনাবলীর মূলে যে তিন অসুর — কমলাক্ষ, তারকাক্ষ, ও **বিদ্যুন্মালী** — এই তিন অসুরের (দ্র. **ত্রিকূট**) পূর্বসূরী হলেন তারকাসুর। যতদূর বোঝা যায়, ভারতসমাজে বৈদিক (আদিম সমাজতান্ত্রিক) ব্যবস্থা যখন যথেষ্ট সেকেলে ও মৌলবাদী হয়ে গেছে, পুঁজির উদ্ভব ও **বারাণসী**র সম্ভাবনা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ঠিক তার প্রাক্কালে যে বৈদিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং পুঁজির বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই সত্তাই তারকাসুর। সম্ভবত প্রজাসাধারণকে সে তারণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

তারা, তারিণী, তারী (তারাধিপ, তারানাথ, তারাপতি, তারামণ্ডল, তারামৃগ) : ১. তারা = তার + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *তারা = **তার**-এর আধার যে। **তারিণী** = **তার** অন করে যে গতিশীল আধার শক্তি। **তারী** = **তার**-এর গতিশীল আধার যে।* ৩. **তারা** = অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র, সাধারণ জ্যোতিষ্ক, তারকা, অক্ষিমধ্য, চক্ষুস্তারা, মুক্তা, বৃহস্পতিভার্য্যা (চন্দ্র ইঁহাকে হরণ করেন।

দেবদেবীগণ তারাকে প্রত্যর্পণ করার প্রার্থনা করিলেও, চন্দ্র অস্বীকার করেন। অতঃপর ব্রহ্মা বৃহস্পতিকে তারা প্রদান করেন। তারার গর্ভে চন্দ্রের যে পুত্র হয়, তাহার নাম বুধ। বুধ চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ।) সুষেণদুহিতা কপিরাজ বালীর পত্নী। (অঙ্গদ তাহার পুত্র। বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীবের সহিত তারার বিবাহ হয়। তারা প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার একতম।) দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা। বৌদ্ধদেবী-বিশেষ। উমা। উচ্চ স্বরসপ্তক। তারক, উদ্ধারক। তারয়িত্রী, উদ্ধার-কর্ত্রী। (ব.শ.) (ক) দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী। চন্দ্র একবার তারার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হরণ করেন। বৃহস্পতি চন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য দেবতাদের সাহায্য ভিক্ষা করেন। দেবতা ও ঋষিগণ তারাকে প্রত্যর্পণের জন্য চন্দ্রকে অনুরোধ করলে চন্দ্র অসম্মত হন এবং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের সাহায্য কামনা করেন। রুদ্রদেব বৃহস্পতির পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ... ব্রহ্মা মধ্যস্থ হয়ে বিবাদ মিটিয়ে দেন এবং তারাকে বৃহস্পতির হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। ইতিমধ্যে তারা অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় বৃহস্পতি তাকে গর্ভ ত্যাগ করে তাঁর নিকট আসতে বলেন। তারা গর্ভ ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তন করার পর এক পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্রের নাম দস্যু সুন্তম। ব্রহ্মা তারাকে প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে, এই পুত্র চন্দ্রের ঔরসজাত। তখন চন্দ্র এই পুত্রকে গ্রহণ করে তার নামকরণ করেন বুধ। (খ) কিষ্কিন্ধ্যার বানরাধিপতি বালীর স্ত্রী। ইনি সুষেণ নামে বানররাজের কন্যা ও অঙ্গদের মাতা। বালী রামচন্দ্রের হাতে নিহত হলে রামের আদেশে ইনি দেবর সুগ্রীবকে বিবাহ করেন। প্রাতঃকালে উঠে এঁর নাম করলে সেদিন মঙ্গলে যায়। ইনি পঞ্চকন্যাদের অন্যতমা। (গ) দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা। সতী দক্ষযজ্ঞে যাবার জন্য মহাদেবের নিকট বারবার অনুমতি চেয়েছিলেন; কিন্তু মহাদেব অনুমতি না দেওয়াতে সতী মহাদেবকে ভয় দেখানোর জন্য দশমহাবিদ্যার রূপ ধারণ করেন —এর মধ্যে একটি 'তারা' রূপ। ((পৌ.অ.)। **তারী** = তারয়িতা, তারক, ত্রাতা। **তারিণী** = দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা, দুর্গা, বৌদ্ধদেবীবিশেষ। **তারাধিপ** = তারাপতি, চন্দ্র, শিব, বৃহস্পতি, বালী, সুগ্রীব। **তারানাথ** = শিব, তারাধিপ। **তারাপতি** = চন্দ্র, শিব, তারাধিপ। **তারামণ্ডল** = নক্ষত্রমণ্ডল, রাশিচক্র, চক্ষুস্তারা। **তারামৃগ** = মৃগরূপী নক্ষত্র, মৃগশিরাঃ। (ব.শ.)। ৪. আকাশের তারা, মানুষের নাম, ও ঠাকুরের নাম অর্থে **তারা** শব্দটি এখনও খুবই প্রচলিত। **তারিণী** নামরূপে কমবেশি প্রচলিত; **তারী** অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **তর, তার**। তারণ করে যে, সে **তারক**। সেই **তারক**-এর আধার হল **তারকা**। মানুষের সমাজে যে-সত্তা অন্য মানুষদের বিভিন্ন বিপদ-খাত থেকে **তারণ** করে, অতএব **তারক** পদবাচ্য, তার আধারশক্তিকে **তারকা** বলে। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দবিধির সাধারণ নিয়মে 'বালক' আর 'বাল'-এ যেমন ফারাক নেই, তেমনি **তারক** ও **তার**-এ, এবং **তারকা** ও **তারা**-য় কোনো ফারাক থাকে না। সেকালে, সেই আদিকালে, যখন পৃথিবীর সকল মানুষ পরস্পরের মনের খুব কাছাকাছি ছিল, পরস্পরকে বুঝত, তখনই মানুষ **তারা**দের বুঝে ফেলেছিল। তখন সমাজের **গ্রহ-নক্ষত্র** ও আকাশের **গ্রহ-নক্ষত্র** দুটি সমান্তরাল ধারণার সমস্বভাবের সত্তা ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেসময় যেভাবেই হোক বুঝেছিলেন, আকাশের **গ্রহ-উপগ্রহ-তারা** এবং সমাজের **গ্রহ-উপগ্রহ-তারা**-য় মূল স্বভাবে কোনো ফারাক নেই। যেকারণে **আকাশের তারকাদের** যেমন **তারা** বলার রেওয়াজ শুরু হয়ে যায়, **তেমনি সেকালের** মর্তের আদি সামাজিক **তারকাদেরও তারকা** বলার **রীতির প্রচলন হয়ে যায়**। ইংরেজের পূর্বপুরুষও সেই একই ধারায় **আকাশের তারাকেও** star (স্তার) বলার রীতির প্রচলন করে, **মর্তের তারকাদেরও** star বলার রীতির প্রচলন করে; যা বিবর্তিত হয়ে তাঁদের বর্তমান film-star, star-player ... ইত্যাদি শব্দের আবির্ভাব ঘটেছে। এই star বা 'স্তার' শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল, 'যে সত্তা তারণ করে'। বিশ্বজোড়া সপ্তাহের ধারণা, সপ্তাহের সাতদিনের নাম, এবং এইসব তারার ধারণা — এগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, এককালে ইংরেজের আদিপুরুষ ও আমাদের আদিপুরুষের মানসিক দূরত্ব ছিল না বললেই চলে; হয়তো-বা তাঁরা একই গোষ্ঠীর অংশ ছিলেন।

তা সে যাই হোক, এখন আমরা ভারত-ইতিহাসের বিভিন্ন কালখণ্ডে **তারা** নামক সত্তাটির ভূমিকা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথম ক্ষেত্রে **তারা** ছিলেন বৃহস্পতির ভার্য্যা, অর্থাৎ সেকালের পুঁজিবাদ-সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের অনুগামী জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীকে ব্যক্তিপুঁজি বা চন্দ্র দখল করে নেয়। চন্দ্রের সঙ্গে এই জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে যে মানুষদের জন্ম হয়, তাদের বুধ বা (ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী) জ্ঞানী বলে। ...

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে **তারা** হলেন কেরানি-শ্রেণী। এঁরা ছিলেন প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সমর্থক আমলাদের (বালীর) অনুগামী। কিন্তু পৃথিবীর আদি ধনতান্ত্রিক বিপ্লবে (বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে অশোকের কালে যা ভারতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল), এই আমলাদের ধ্বংস করা হয় এবং প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরোধী আমলাদের দলকে (সুগ্রীবকে) প্রশাসনব্যবস্থার দায়িত্বে বসান হয়; কিন্তু কেরানীকুল একই থেকে যায়। (আজকের ভারতেও ইংরেজের বদলে কংগ্রেস, বা কংগ্রেসের বদলে সিপিএম সরকারে বসলে, আমলাদের মহলে বিস্তর বদল ঘটে; কিন্তু কেরানীকুল একই থেকে যায়।) যে-কেরানীকুল এতকাল পূর্বতন আমলাদের অনুসরণ করত, এখন তারা নতুন আমলাদের অনুসরণ করতে শুরু করে। কারণ তারা আমলার চেয়ারটির প্রতি দায়বদ্ধ, সেখানে কে বসল না-বসল সেটি তাদের কাছে অবান্তর। বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীবের আগমনেও বালীপত্নী **তারা** তাই করে। সে নিষ্ঠার সঙ্গে সুগ্রীবের অনুসরণ করে। এই কারণে এই **তারা**কে সতী বলে। যে-পঞ্চকন্যাকে স্মরণ করলে মহাপাপ নাশ হয়, এই **তারা** তাঁদের একজন।

তৃতীয়ত, সমগ্র জনসাধারণকে বলা হয় মহামায়া। সেই মহামায়ার একটি অংশ মধ্যবিত্ত-নাগরিক-শ্রেণী। এঁদের দুর্গা বলে। তাঁরা যখন সমগ্র জনসাধারণকে বিপদ থেকে তারণ করেন, তখন তাঁদের বলা হয় **তারা**। একে কোথাও কোথাও উমা, তারিণী ... ইত্যাদিও বলা হয়ে থাকে। দ্র. **নক্ষত্র, দশমহাবিদ্যা**।

৬. Avesta - star, stara, Greek - aster, Latin - astrum, stella, English - star, ফারসি - সিতারা। (ব.শ.)। ইংরেজি star, star-player etc.। সুমেরীয় পুরাণের দেবী Ishtar.

তিতির (তির, তিত্তির, তিত্তিরী), তৈত্তিরীয়, তৈত্তিরীয়-সংহিতা : ২. *তির = গতিশীল তারী রহে যাহাতে। তিতির* *(**তিত্তির**) = যে গতিশীল তারী তির তির করে যায়। **তিত্তিরী** = **তিত্তির**-এর গতিশীল আধার যে। **তৈত্তিরি** = **তিত্তিরী** হইতে জাত।* ৩. **তিতির (তিত্তির, তিত্তিরি)** = পক্ষিবিশেষ। **তিত্তিরি** = কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ-অধ্যাপক ঋষিভেদ। বাদ্যবিশেষ। **তৈত্তিরীয়** = তৈত্তিরি ঋষি কর্তৃক প্রোক্ত কৃষ্ণযজুঃশাখাসমূহের অধ্যেতৃগণ। বৈশম্পায়নশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য কুপিত গুরুর আদেশে অধীত যজুর্গণ বমন করিয়া প্রস্থান করিলে, মুনিগণ তিত্তিররূপে সেই উদ্বান্ত যর্জুগণ গ্রহণ করেন। তিত্তিরসমূহ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায়, এই যজুর্গণ 'তৈত্তিরীয়' নামে প্রসিদ্ধ। বুদ্ধিমালিন্য হেতু এই যজুঃসমূহ কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল বলিয়া ইহাদের অন্য নাম 'কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ'। (ব.শ.)। যর্জুবেদের শাখাবিশেষ। কৃষ্ণ যর্জুবেদ। একদা বৈশম্পায়ন ব্রহ্ম নামে খ্যাত জনৈককে হত্যা করে প্রায়শ্চিত্তের জন্য শিষ্যদের যজ্ঞানুষ্ঠান করতে আদেশ দেন। শিষ্যদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য অসম্মত হলে বৈশম্পায়ন বলেন যে, 'তুমি আমার শিষ্যত্ব ত্যাগ কর।' যাজ্ঞবল্ক্য তাই করেন এবং গুরুর নিকট হতে পূর্বশিক্ষিত বাক্যগুলি উদ্‌গীরণ করে ফেলে দেন। অন্যান্য শিষ্যেরা তাহা তিত্তির পক্ষীর রূপ ধারণপূর্বক গ্রহণ করায় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন। বুদ্ধির মালিন্য হেতু এই যজুঃ সমূহ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করায় এর অন্য নাম কৃষ্ণযর্জুবেদ। (পৌ.অ.)। ৪. গ্রামবাংলায় 'তিত্তিরি' বা 'তিতির' পাখি রূপে শব্দটি প্রচলিত এবং পণ্ডিতদের মহলে গ্রন্থের নাম রূপে 'তৈত্তিরীয়-সংহিতা' প্রচলিত। ৫. দ্র. **তিরস্**। তির-তির করে চলে সরু জলধারা। তাতে যে পক্ষীটিকে 'তিরতির' করে চলতে দেখা যায়, তাকেই **তিতির, তিত্তির** বলে। এর দুরকম প্রয়োগ দেখা যায়। বাহ্যিক প্রয়োগে এটি একপ্রকার পাখি, যা সাধারণত নদীর চরে সামান্য জলের উপর তির-তির করে ছিটকে ছিটকে চলে; আর সামাজিক প্রয়োগে এরা কেরানি-শ্রেণী। কেল্লা বা গড়-সমন্বিত নগরের বা গৌড়-এর এলাকার মধ্যে যে কেরানি-শ্রেণী থাকতেন, তাঁদের সেকালে **গৌড়তিত্তিরি** বলা হত।

'চারে বেদ' কথাটি বাংলাভাষীদের শৈশব থেকেই শেখানো হয়। কিন্তু বেদ প্রকৃতপক্ষে পাঁচটি। এর মধ্যে যজুর্ব্বেদ দুরকম। বেদপন্থীরা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদকে স্বীকার করেন, এবং যাজ্ঞবল্ক্যপন্থীরা শুক্লযজুর্ব্বেদকে স্বীকার করেন। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের সংহিতাকেই তৈত্তিরীয়-সংহিতা বলে। যাজ্ঞবল্ক্য কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ বমন করে দিয়ে সরাসরি সূর্য্যের কাছে নতুন যজুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন ও তাকে শুক্লযজুর্ব্বেদ নামে প্রকাশ করেন। বলে রাখা ভাল, বেদবাদীগণ ছিলেন আদিম-সমাজতন্ত্রবাদী এবং তাঁরা ভোগের নিমিত্ত কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করাই উচিত বিবেচনা করতেন; একই কর্মের পুনরাবৃত্তির কারণে সে উৎপাদন-ব্যবস্থা যতই ক্লেদাক্ত (মৌলবাদী ও দুর্নীতিগ্রস্ত) হয়ে যাক। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে সেইরূপ কর্মযজ্ঞ যোজনার উপায়গুলিই বলা হয়েছে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যপন্থী বাজসনেয়গণ শুধুমাত্র ভোগের জন্য নয়, বিনিময়ের জন্যও উৎপাদন করা এবং তদনুসার কর্মযজ্ঞ যোজনাকে সঠিক বলে মনে করতেন। তাঁদের যজুর্ব্বেদ সেকারণেই শুক্লযজুর্ব্বেদ নাম পায়। বলে রাখা ভাল, রামচন্দ্র এই দলে ছিলেন। দ্র. **কপিঞ্জল, গৌড়তিত্তিরি**।

তিরস্ (তিরঃ, তির্য্যক, তিরস্কার, তিরোধান, তিরোভাব, তিরোহিত) : ১. তিরস্ = √তৃ + অস্ (অসুন্)। ২. *তিরস্* *(**তিরঃ**) = **তির**-এর নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে। **তির্য্যক** = **তির**-ভাবে যাওয়া থাকে যাহাতে, তদ্রুপ (যাওয়ার আচরণ) করে যে। **তিরস্কার** = **তিরস্** করণ হইতে জাত। **তিরোধান** = **তিরস্**-কে ধারণ করে যে। **তিরোভাব** = **তিরস্** ভূত যাহাতে। **তিরোহিত** = **তিরস্** ধারিত যাহাতে।* / **তিরোধান** = যাহার দ্বারা অন্তর্দ্ধান সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **তিরস্** = তির্য্যগ্‌ভাব, বক্রতা, অন্তর্দ্ধান, তিরস্কার। **তিরস্কার** = অন্তর্দ্ধান, তিরোধান, অনাদর, অবজ্ঞা, অভিভব, পরাজয়, ভর্ৎসনা, নিন্দা। **তির্য্যক** = বক্রগামী, তেরচা, অনুপ্রস্থ, আড়, পক্ষীর গতিবিশেষ, তির্য্যগ্‌জাতি, পশু, পক্ষী, কূর্ম্মাদি। **তিরোধান** = অন্তর্দ্ধান, তিরোভাব। **তিরোভাব** = অন্তর্দ্ধান, অদর্শন। **তিরোহিত** = অন্তর্হিত, আচ্ছাদিত, গুপ্ত, রাগাদি দ্বারা স্থাপিত রূপ। (ব.শ.)। ৪. **তিরস্** এককভাবে অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি প্রচলিত। তবে **তিরস্কার** scolding অর্থে, এবং **তিরোভাব-তিরোধান-তিরোহিত** প্রভৃতি শব্দ left অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **তর**। তরে যায় যে, সে **তর**। তরিয়ে নিয়ে যায় যে, তাকে আমরা **তরী** (নৌকা) রূপে চিনি। একটি সরোবরের এপার থেকে একটি ভেলা বা নৌকা তরে তরে ওপারে চলে যেতে পারে। কিন্তু সেই সরোবর যদি একটি ছোট গামলার মতো হয়, এবং তার থেকে **তরণশীল** সত্তা যদি হঠাৎ তীব্র গতিতে ছিটকে-যাওয়ার মতো অতি দ্রুত তরে যায়, তখন তাকে বলে **তির**। এই যাওয়া স্বভাবতই প্রোত বা horizontal। বা এই **তির**-এর মতো বা প্রোতভাবে ছিটকে যাওয়ার মতো যায় যে, সে হল **তির্য্যক** (horizontal)। (তির্য্যকের এই **তির** শব্দটিকেই ফারসি ভাষা থেকে নিয়ে arrow অর্থে **তীর** বানানে লেখা হয়ে থাকে, এবং সেটিই ঠিক বানান।) এই **তির**-এর নির্য্যাসত্যাগকে বা শেষ সত্তাকে বলে **তিরঃ** বা **তিরস্**।

এইখানে একটি ধারণা স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। আমরা যতদূর অনুভব করেছি, আমাদের প্রাচীন শব্দকারগণ অস্তিত্বকে একটি ত্রিমাত্রিক গোলক বলে মনে করতেন। তার কেন্দ্র ছিল, পরিধিও ছিল। এই অস্তিত্ব সমাজগোষ্ঠী হলে, দৈহিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কেন্দ্র হত গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ পুরুষের পুর, অর্থাৎ রাজপ্রাসাদ; একালের ভাষায় যেখানে থাকে প্রচারের লাইমলাইট; আর পরিধি হত রাজ্যের সীমানা। (মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির কথায় পরে আসছি।) তো, কোনো সত্তাকে যদি সেই কেন্দ্রের পুরে আনা হত, **পুরস্** করা হত, সে হত পুরস্কৃত। আর, কোনো সত্তাকে যদি একেবারে সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হত, **তিরস্** করা হত, সে হত **তিরস্কৃত**। এবং সর্বোপরি, কোনো সত্তাকে যদি পরিধির বাইরে থেকে ভেতরে আনা হত, **আবিস্** করা হত, সে হত আবিষ্কৃত।

কিন্তু **তিরস্ পুরস্ আবিস্** কেবল যথাক্রমে শারীরিকভাবে দূরে ঠেলে দেওয়া, শারীরিকভাবে কেন্দ্রে এনে বসানো, কিংবা শারীরিকভাবে গোষ্ঠীর এলাকার মধ্যে আনয়ন নয়; এটা মানসিকভাবেও হতে পারে। সেরকম হলে, **তিরস্কার** করা মানে **তিরস্**-শব্দ (তিরস্কার-বাক্য) তির্য্যকভাবে দ্রুত (তিরস্কৃতের উদ্দেশ্যে) ধেয়ে যায়; তাকে মনের এলাকা থেকে বের করে দূরে

ঠেলে দেয়। ... একইভাবে পুরস্কৃত ও আবিষ্কৃত শব্দের মানসিক অর্থও হতে পারে। কার্যত, তিনটি শব্দের মানসিক অর্থই অধিক প্রচলিত; পুরস্কৃত শব্দের শারীরিক মানসিক দুরকম অর্থই হয়ে থাকে।

যাই হোক, যেভাবেই হোক, আমরা দেখতে পাচ্ছি, **তিরোহিত** হওয়া মানে, পরিধি থেকে তির্য্যকভাবে ছিটকে বেরিয়ে চলে যাওয়া। **তিরোভাব** মানে তির্য্যকভাবে ছিটকে গিয়ে হওয়ন; অর্থাৎ, মূল স্থান থেকে ছিটকে গিয়ে অস্তিত্বলাভ করা। তা না হয়ে যদি উল্টো হত, তাকে বলা হত **আবির্ভাব**। **তিরোধান** মানে তির্য্যকভাবে ছিটকে যাচ্ছে যে, তাকে ধারণ করা। মূল অস্তিত্ব বা স্থান থেকে সে হঠাৎ **তির**-ভাবে চলে যায় বলে, মূল অস্তিত্বের চোখে সে হারিয়ে যায়। সেই কারণে **তিরোধান** শব্দের মানে অন্তর্দ্ধান বলা হয়।

তির্য্যক্স্রোতাঃ (তির্য্যক্স্রোতস্) : ২. / যাহার স্রোতঃ (আহার-সঞ্চার) তির্য্যক। (ব.শ.)। ৩. পশুপক্ষীপ্রভৃতি। ইহাদের অষ্টাবিংশতি ভেদ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. পুরাণাদিতে বারংবার ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। এবং দুঃখজনকভাবে এই শব্দটির অর্থ সর্বদাই ভুল বোঝা হয়ে থাকে। এখানে ব.শ. শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়েছেন, এবং অর্থটি নিঃসন্দেহে সঠিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অর্থটির বাস্তব রূপটিকে সঠিকভাবে বোঝা কঠিন। **তির্য্যক** কথাটির মানে, আমরা আগেই দেখেছি, প্রোত (horizontal) ভাবে গতিশীল হওয়া। যে-স্রোতগুলি নদীর মতো দিগন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে, সেগুলি অতএব **তির্য্যকস্রোতাঃ**। কিন্তু এ তো **তির্য্যকস্রোতাঃ** শব্দের একেবারেই জড় ও দৈহিক রূপের কথা হয়ে গেল, দিগন্তধাবী নদীসমূহের কথা হয়ে গেল! না, সেটিই শব্দটির একমাত্র নির্দেশকতা নয়; তাই, ব.শ. বলছেন, 'যাহাদের আহারসঞ্চার তির্য্যক' তারা **তির্য্যকস্রোতাঃ**। এরা নিশ্চয়ই নদী নয়। এরা তাহলে কারা? কাদের আহারসঞ্চার তির্য্যক? কারা দিগন্তিক ধাওয়া ক'রে বা horizontal ছোটাছুটি ক'রে আহার করে ও সঞ্চরণ করে? ব.শ. বলছেন, তারা হল 'পশুপক্ষিপ্রভৃতি'। কেবল তাই নয়, ব.শ. জানাচ্ছেন, তাদের নাকি আঠাশ প্রকার ভেদ রয়েছে। কথাটি ঠিক কি না, তা নিয়ে আপনার মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে। আঠাশ প্রকার পশুপাখিরা কারা? তারাই কেবল **তির্য্যক** আহারসঞ্চার করে, একথার মানেই বা কী?

ইতোমধ্যে আপনি যদি পুরাণাদি কিংবা মনুসংহিতা পড়ে ফেলেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই আরও সমস্যায় পড়ে যাবেন। কারণ, তখন আপনি একটি কথা স্পষ্টভাবে জেনে যাবেন যে, **জগৎসৃষ্টি**র একটি সুনির্দিষ্ট পৌরাণিক ছক বা কাঠামো পুরাণকারগণ অনুসরণ করতেন। তাতে জগতের প্রতিটি সৃষ্টির কাঠামোই এক — আপনি যখন বিশ্বজগৎকে পূর্ণ ধরবেন, তখন তাতে আঠাশ প্রকার বিপর্যয় দেখতে পাবেন; যাতে তন্মাত্র-মহান-বৈকারিক-**তির্য্যক** ... ইত্যাদি সৃষ্টি পর পর রয়েছে। আবার যখন কেবলমাত্র জীবজগৎকে পূর্ণ ধরবেন, তখনও দেখবেন, তাতে আঠাশ প্রকার বিপর্যয় এবং তন্মাত্রাদি সৃষ্টিগুলি একইভাবে রয়েছে। আবার যখন কেবলমাত্র মনুষ্য-সমাজকেই পূর্ণ সত্তা ধরবেন, দেখবেন সেখানেও ওই আঠাশ প্রকার বিপর্যয় ও তন্মাত্রাদি সৃষ্টিগুলি একই নিয়মে রয়েছে। এ-যেন বিশ্বজগৎ একটি তাজমহল, **তার এক-একটি অংশ আবার এক-একটি ছোট** তাজমহল, এবং **সেই তাজমহলগুলির প্রতিটি** ইটই যেন এক-একটি অতি-ক্ষুদ্র তাজমহল। ... **এইরকম**। তার মানে, অতিক্ষুদ্র তাজমহল দিয়ে গড়ে তোলা হয় **ছোট ছোট** তাজমহল, তারপর সেই ছোট ছোট তাজমহল দিয়ে গড়ে তোলা হয় একটি বড় তাজমহল। প্রতিটিই নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ, ছোটরাও সম্পূর্ণ, বড়রাও সম্পূর্ণ। **জগৎসৃষ্টি**র এই যে ছক বা কাঠামো, **তির্য্যকসৃষ্টি** তারই একটি সুনির্দিষ্ট অঙ্গ। সেই ছক অনুসারে বুঝলে দেখা যাবে, মানবজাতিকে পূর্ণ সত্তা ধরে মানুষেরই বিভিন্ন জাতিকে **তির্য্যকস্রোতাঃ** বলা হচ্ছে। যাঁরা বেদবাদী তাঁরা মুখ্যসৃষ্টি, যাঁরা বৈদিক জীবনযাত্রাপদ্ধতি মানেন না, যাঁরা বেদবাদীদের ছকে রাখা জীবনযাত্রার সুনির্দিষ্ট পথ মানেন না, ডাইনে-বাঁয়ে চলেন তাঁরা **তির্য্যকস্রোতাঃ**। দ্র. **পশু, পক্ষী**।

তীর (তীরকর, তীরন্দাজ) : ১. ✓তীরি (কর্ম্মসমাপ্তি) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***তীর*** = *গতিশীল তারী-আধার রহে যাহাতে; বা তরণ সাধন করে যে।* ***তীরকর*** = ***তীর*** *করে যে।* ***তীরন্দাজ*** = ***তীর*** *অন করে দান জনন করে যে।* / **তীরকর** = যে তীর গড়ে। (ব.শ.)। ৩. **তীর** = কূল, বেলা, গঙ্গাকূলবিশেষ; বাণ, সীসক। **তীরকর** = শরনির্ম্মাতা। **তীরন্দাজ** = (ফারসি - তীর্ অন্দাজ) তীর ছুঁড়িতে নিপুণ ব্যক্তি, ধনুর্দ্ধর। (ব.শ.)। ৪. arrow ও bank (of a river) অর্থে **তীর** শব্দটি এখনও প্রচলিত, বাকি দুটি অপ্রচলিত। ৫. **তির** শব্দের অর্থ আমরা আগেই জেনেছি। তাতে গতিশীল তারীকে আমরা চিনেছি **তি** রূপে। এই **তি**-তে ত গতিশীল থাকে। এই গতিশীল তারী বা **তি** আধারহীন। সে যদি আধার পেয়ে যায়, তখন তাকে **তী** বলে। এই **তী** রহে যাহাতে, তাকে বলে **তীর**। অর্থাৎ (নদীর ক্ষেত্রে) মাঝ দিয়ে **তির তির** করে বয়ে যাচ্ছে জলধারা, আর তাকে দুদিকে পাড় রূপে বা আধার রূপে ধরে রাখছে যে, সে হল **তীর**। যে কোনো প্রবহমান ধারা যে-খাদের পথে প্রবাহিত হয়, সেই খাদের দুই দিক 'তরণসাধনকারী' বা **তীর** বলে। তার মানে, মাঝ দিয়ে তির তির করে বয়ে যায় যে, সে হল **তির**; আর দুই দিকে যে পাড় সেই তিরতিরানিকে বয়ে যেতে সহায়তা করে, তির-এর সেই আধার হল **তীর**। ঠিক যেমন মাঝ দিয়ে কুলকুল করে বয়ে যায় যে, সে হল **কুল**; আর সেই কুলকুল ধারাকে বয়ে যেতে সহায়তা করে যে, সে হল **কুল**-এর আধার **কূল**। (আধেয় হলে ই-কার, উ-কার হয়; এবং আধার হলে ঈ-কার, **ঊ**-কার হয়; একথাটি এখান থেকে যে-কেউ সহজেই বুঝতে পারবেন।) এই কারণেই বংশধারাকে **কুল** বলা হয়। অতএব যা কিছু একটি তিরতিরে ধারার ধারক পাড় রূপে সক্রিয়, তা সবই **তীর** পদবাচ্য। আর arrow অর্থে যে **তীর** লেখা হয়, সেকথাটি এসেছে ফারসি থেকে এবং তা মূলত **তির** (দ্র. **তিরঃ**) শব্দ, যা horizontally ছিটকে যায়। এ হল **তির্য্যক**-এর **তির**, যা আধার পেয়ে যায় একটি কাঠিতে। সেই শর-কাঠিকে সেকারণেই **তীর** বলে। অর্থাৎ, **তির**-এর আধার যে, সেই হল **তীর**। অতএব, **তীর** শব্দটি ফারসি থেকে আগত হলেও, বাংলায় এর বানান **তীর** লেখাই সমীচীন।

তীর্ণ (অবতীর্ণ, উত্তীর্ণ, বিস্তীর্ণ) : ১. ✓তৃ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***তীর্ণ*** = ***তির-****এর আধারের রহস্যরূপ টঙ্কারিত যাহাতে; অর্থাৎ, তারিত হয়ে (কোনো অবস্থানে গিয়ে) ঠেকে গেছে যে।* ***অবতীর্ণ*** = ***অব****-রূপে (বা নিম্নে)* ***তীর্ণ*** *যে।* ***উত্তীর্ণ*** = *উদ্‌লোকে (বা উর্ধ্বে)* ***তীর্ণ*** *যে।* ***বিস্তীর্ণ*** = *বিশেষভাবে বা বিপরীতভাবে যে সত্তা* ***তীর্ণ*** *হইয়াছে।* ৩. **তীর্ণ** = উত্তীর্ণ, অতিক্রান্ত, অভিভূত, আপ্লুত, পালিত, চরিত। **অবতীর্ণ** = কৃতাবরোহণ, নিম্নদেশগত, ভূতলে অন্যরূপে আবির্ভূত (দেবাদি), প্রবিষ্ট, অবরূঢ়, গত, আপতিত, অতিক্রান্ত। **উত্তীর্ণ** = নির্গত, নিষ্ক্রান্ত, প্রতিনিবৃত্ত, মুক্ত, উত্থিত, সংক্রান্ত, উপস্থিত, অতিক্রান্ত, অতীত, উল্লঙ্ঘিত, পারগ, পারগত। **বিস্তীর্ণ** = বিস্তারযুক্ত, বিপুল, বিশাল, আয়ত, প্রসর। (ব.শ.)। ৪. **তীর্ণ** অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

তীর্থ (তীর্থকর, তীর্থকাক, তীর্থঙ্কর, তীর্থদেব, তীর্থপাদ, তীর্থভূত, তীর্থযাত্রা, তীর্থরাজ, তীর্থশিলা, তীর্থশৌচ, তীর্থসেবী, তীর্থোদক, তীর্থোপবাস), সতীর্থ : ১. ✓তৃ + থ (থক্‌) - করণবাচ্যে, অধিকরণে। (ব.শ.)। ২. ***তীর্থ*** = ***তীর*** *(তীর্ণ, অবতীর্ণ, উত্তীর্ণ, বিস্তীর্ণ কূল-তীর বা শর-তীর) যেখানে থাকে; অথবা,* ***তীর*** *যেখান থেকে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং-বা যেখানে গিয়ে থামে।* ***সতীর্থ*** = *একই* ***তীর্থ*** *যাহাদের। /* **তীর্থঙ্কর** = শাস্ত্র করে যে। **সতীর্থ** = সমান তীর্থ যাহার; যাহাদের একগুরু। (ব.শ.)। ৩. **তীর্থ** = অবতরণপ্রদেশ, দেবতাদির অধিষ্ঠান বা তপস্যাদি হেতু পবিত্র স্থান, নদী-প্রভৃতির জলে অবতরণের পথ, ঘাট, পাত্র, সৎপাত্র, পাবন, ঋষিসেবিত জল, খেয়াঘাট, বিপ্র, পুণ্যকাল, উপাধ্যায়, শাস্ত্র, যজ্ঞ, উপায়, আগম, দর্শনশাস্ত্র, নিদান (origin), অগ্নি, যোনি, নারী-রজঃ, মন্ত্রী, মন্ত্রি-প্রভৃতি অষ্টাদশ রাষ্ট্রসম্পদ (মন্ত্রী পুরোহিত যুবরাজ চমূপতি দ্বারপাল অন্তর্বেশিক কারাগারাধিকারী দ্রব্যসঞ্চয়কৃৎ বিনিয়োজক প্রদেষ্টা নগরাধ্যক্ষ কার্য্যনির্ম্মাণকৃৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ সভাধ্যক্ষ দণ্ডপাল দুর্গপাল রাষ্ট্রান্তপালক অটবীপালক), শত্রুপক্ষে অষ্টাদশ এবং স্বপক্ষে চমূপতি-প্রভৃতি পঞ্চদশ তীর্থ, আযুক্তকর্ম্ম, মন্ত্রি-প্রভৃতির কার্য্য, মন্ত্র, উপদেশ, রতিস্থান, ক্রীড়াস্থান, দেবগণ ও পিতৃগণের প্রিয় করতলের ভিন্ন ভিন্ন অংশ। **তীর্থকর** = বিষ্ণু, জিন। **তীর্থকাক** = তীর্থে কাকতুল্য, লোলুপ। **তীর্থঙ্কর** = জিনদেব। **তীর্থদেব** = শিব। **তীর্থপাদ** = শ্রীকৃষ্ণ। **তীর্থভূত** = পবিত্র, পূত। **তীর্থযাত্রা** = তীর্থগমন। **তীর্থরাজ** = প্রয়াগ। **তীর্থশিলা** = ঘাটের সোপান। **তীর্থশৌচ** = ঘাট পরিষ্কার। **তীর্থসেবী** = তীর্থবাসী। **তীর্থোদক** = তীর্থসলিল। **তীর্থোপবাস** = তীর্থকার্য্যার্থ বিহিত উপবাস। **সতীর্থ** = সমানগুরু, এক গুরুর শিষ্য, পরস্পরৈকগুরুক ছাত্র। (ব.শ.)। ৪. religious place অর্থে **তীর্থ** এবং classmate অর্থে **সতীর্থ** প্রচলিত; বাকি সব শব্দগুলিই অপ্রচলিত। ৫. একই **তীর্থ** শব্দের মানে পুণ্যস্থান, ঘাট, রতিস্থান, যোনি, দর্শনশাস্ত্র, মন্ত্রী ... ইত্যাদি — এসব কথা লিখে গেছেন ব.শ.-এর রচয়িতা শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধুমাত্র **তীর্থ** শব্দের ক্ষেত্রে নয়, অজস্র শব্দের ক্ষেত্রে এইরকম '**কুকীর্তি**' (?) করে গেছেন তিনি। সেই অপরাধে তাঁকে বর্জনীয় বলে মনে করেছিলেন কিছু আধুনিক বাংলাভাষা বিশেষজ্ঞ। এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁর নামে কেবল কটুকাটব্যই করা হয়নি, তাঁকে অনুসরণ না করতেই নির্দেশ দিয়েছেন অনেক বাংলার অধ্যাপক। তাঁরা যদি নিজেদের 'যদ্দেখিতং তৎপড়িতং, পড়ায়তং'-এর কর্মী অধ্যাপক বলে মনে করেন, তাহলে আমরা তাঁদের দোষ ধরব না (কারণ গবেষণা করে সংশোধন করার কাজ তো তাঁদের নয়); কিন্তু তাঁদের কেউ যদি নিজেকে বাংলাভাষার বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করেন, তাহলেই আমরা তাঁকে জানতে চাইব — **তীর্থ** শব্দের ওরকম অর্থ সরবরাহ করে হরিচরণ যদি ভুল করে থাকেন, আপনি ঠিক করে দিলেন না কেন? তাছাড়া, হরিচরণ কি সত্যিই ভুল করেছিলেন? তিনি তো নিজের মাথা থেকে শব্দের অর্থ সরবরাহ করেননি, প্রাচীন কোনো না কোনো গ্রন্থ থেকেই শব্দের ওই প্রকার অর্থ দিয়ে গেছেন। যাঁরা **তীর্থ** মানে মন্ত্রী বা রতিস্থান বুঝতেন সেই সব গ্রন্থের উল্লেখ (এক্ষেত্রে যথাক্রমে পঞ্চতন্ত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত) তো ব.শ. করেই গেছেন। তিনি তো কোনো কিছু গোপন করে যাননি। তা, সেই গ্রন্থকারেরাও তো সমান দোষী! কী বলেন আধুনিক বাংলাভাষা-বিশেষজ্ঞরা? অবশ্য, এই বিশেষজ্ঞদের সাম্প্রতিক প্রজন্ম শুধু 'মূর্খ'ই নয়, ধূর্ত এবং মিথ্যেবাদীও বটে। ১৯৯৫ সাল থেকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষের গৌরব ব্যাখ্যা করে চলেছেন কলিম খান, ১৯৯৯ থেকে সেই কাজে যোগ দিয়েছেন রবি চক্রবর্তী। বঙ্গমননের সারস্বত লোকে তাঁদের বক্তব্য ক্রমশ গৃহীত হচ্ছে। অচিরে বোঝা যাবে, হরিচরণ তাঁর সময়ে বসে যা করে গেছেন, একশো ভাগ ঠিক কাজ করে গেছেন; তাঁর যুগে বসে তার চেয়ে সঠিক কাজ আর কিছুতেই করা সম্ভব হত না। ব্যাপারটি আঁচ করে এই ধূর্তেরা সম্প্রতি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়গান করতেও শুরু করে দিয়েছেন। জ্ঞানধারার সামনে বাঁধ বাঁধার ঠিকাদারীটা এই ধূর্তদের চাই; আবার, 'এরকম বাঁধ আখেরে জনসাধারণের ক্ষতিই করে, অতএব বাঁধগুলি ভেঙে দেওয়া হোক' — এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে গেলে, বাঁধ ভাঙার ঠিকাদারীটাও এই ধূর্তদের চাই! এই না হলে 'বুদ্ধিজীবী'!

যাক গে, এখন আমরা কাজের কথায় আসি। যদি প্রশ্ন করা হয়, বাংলাভাষীদের পৌরাণিক জ্ঞানসম্পদের মহাভাণ্ডারে ঢুকবার এমন কোনো দরজা আছে কি, যে-দরজা দিয়ে সহজে সেখানে ঢোকা যেতে পারে? উত্তর হল, আছে, বেশ কিছু দরজাই আছে। সেগুলির মধ্যে **তীর্থ** শব্দ একটি সহজ দরজা। এই শব্দের ভেতর দিয়ে সেই মহাভাণ্ডারে ঢোকা অনেকের পক্ষেই সহজ মনে হতে পারে।

প্রথমে **তীর্থ** শব্দের প্রতীকী অর্থ নিয়েই দু-একটি কথা হোক। তথ্যানুসারে নদীর ঘাটকে **তীর্থ** বলে, ধর্মস্থানকেও **তীর্থ** বলে। প্রাচীনকালের প্রতিটি ধর্মস্থানই নদীর ধারে ছিল এবং ঘাট-সংলগ্ন ছিল। কিন্তু এগুলির নামকরণ **তীর্থ** করা হল কেন? সেগুলি নদীর তীর-এ অবস্থিত ছিল বলে? ধারে কাছে নদী নেই, এমনও তো বহু **তীর্থ**ক্ষেত্র আছে! তাহলে?

হ্যাঁ, **তির**-**তির** ধারা থাকলে তবেই **তীর** থাকে, **তীর**-এ থামার স্থান বা **তীর্থ** থাকে, ধারা থেকে ওঠার বা ধারায় নামার ব্যবস্থা থাকে, ঘাট থাকে, **তীর্থ**ক্ষেত্র থাকে; কারণ দুটো **তীর**-এর মাঝ দিয়ে ধারাটি তারিত হয়ে তির তির করে বয়ে যায়। ধারা না থাকলে **তীর্থ**

থাকার কোনো মানেই হয় না। কিন্তু কীসের ধারা? কেবল নদীজলের ধারা? কেন? জ্ঞানের ধারা, ধনের ধারা, পণ্যধারা, উপদেশ-নির্দেশের ধারা, আইন-কানুন-শাসনের ধারা, ধর্মের ধারা, কর্মের ধারা, করুণাধারা, রীতিরেওয়াজের ধারা, পরম্পরার ধারা, এমনকি বংশধারাও তো হতে পারে?

হতে পারে নয়, হয়। হয় বলেই বাংলাভাষীদের পূর্বপুরুষেরা সবরকম ধারার পাশেই **তীর, তীর্থ** প্রভৃতিকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁরা জ্ঞানধারার ঘাট বা **তীর্থ**কে — যেখান দিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রবাহিত জ্ঞানধারার জলে ওঠানামা করে **স্নাতক** হওয়া যেত — সেগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন উপাধ্যায়, গুরু, আগম, উপায়, দর্শনশাস্ত্র বা শাস্ত্র হিসেবে; সেকালে এগুলিই ছিল জ্ঞানধারার ঘাট বা **তীর্থ**। সেই শাস্ত্র বা জ্ঞানধারার-ঘাট যাঁরা নির্মাণ করতেন তাঁদের তাঁরা চিহ্নিত করেছিলেন **তীর্থঙ্কর** বলে; এবং সেই **তীর্থঙ্কর**-গুরু ও শাস্ত্রের শরণাপন্ন যারা একসঙ্গে হত, তাদের তাঁরা চিহ্নিত করেছিলেন **সতীর্থ** বলে। অপর দিকে, সমাজের ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত পণ্যধারাকে তাঁরা **গঙ্গা**ধারা রূপে চিহ্নিত করেছিলেন এবং সেই গঙ্গাধারার ঘাটগুলিকে বা হাটগুলিকে তাঁরা **তীর্থ** রূপে শনাক্ত করেছিলেন। এইসব **তীর্থে** বা পণ্যধারার 'অবতরণপ্রদেশ'-এ পণ্যধারার পণ্য ওঠানামা করত। তাই এগুলি ছিল (বিনিময়ভিত্তিক) দানকারী বা 'দেবনকারী' দেবতাদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র এবং শ্রমক্ষেত্র। (দ্র. **তপঃ**)। এখানে পাপস্খালন করা হয় (পণ্যকে পণ্যধারার স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, বা ধারা থেকে তুলে নেওয়া হয়), এবং বিনিময়ে পাওয়া যায় পুণ্য বা 'পবিত্রতা-সম্পাদক পদার্থ', যার বিষয়ে মহাভারতের অভিমত এই যে, সুবর্ণই (gold money) সর্বাপেক্ষা 'অধিক-পবিত্রতাসম্পাদক পদার্থ'।

আমাদের সেই প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা রাষ্ট্রীয়-উপদেশ-নির্দেশাদির ধারা বা প্রশাসনিক ধারার ঘাট বা **তীর্থ** হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন 'শত্রুপক্ষে আঠারোটি **তীর্থ** এবং স্বপক্ষে পনেরোটি **তীর্থ**'কে। ব.শ.-এর মতে সেগুলি হল উপরোক্ত 'মন্ত্রী পুরোহিত যুবরাজ দ্বারপাল দুর্গপাল ... ইত্যাদি' আঠারোটি। প্রশাসনিক ধারার সুবিধা পেতে গেলে এই আঠারোটি ঘাটের বা **তীর্থের** কোন **তীর্থে** বা ঘাটে সেই কাম্য পুণ্যফল পাওয়া যাবে, তার খবর ঠিকঠাক জানা চাই। মন্ত্রীর কাছে যবেন নাকি নগরপালের কাছে যাবেন! তবে, **অষ্ট-দিকপাল**দের দুয়ারে দুয়ারে যারা ঘুরেছে, তারা নিশ্চয়ই কমপক্ষে অষ্টতীর্থের কথা জানে, **আটঘাট** সবই জানে, চাইলে তাদের শরণাপন্নও হওয়া যেতে পারে।

এ তো গেল শাসনধারার কথা। কিন্তু কর্মধারা? রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন — 'দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায় / অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়' — সেই কর্মধারার ঘাটগুলিকে আমাদের সেই জ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা চিহ্নিত করেছিলেন 'কর্মযজ্ঞ' বা 'যজ্ঞ' রূপে। সর্বোপরি, মানুষের বংশধারার ঘাট বা **তীর্থ** হিসেবে তাঁরা চিহ্নিত করেছিলেন পাত্র, সৎপাত্র, যোনি, রতিস্থান, ক্রীড়াস্থান, নারী-রজঃ প্রভৃতি মানবপ্রজাতির বংশধারার **তীর্থ**কে। এই **তীর্থ**গুলিকে চিনে রাখতে পারলে, **তীর্থের কাক** হয়ে আর বসে থাকতে হয় না; সর্বপ্রকার **তীর্থ** ও সেই সকল **তীর্থে** যাত্রা করার ও তার থেকে কাম্য পুণ্যফল লাভ করার উপায়গুলিও জানতে পারা যায়।

সবশেষে এখন তাহলে একালের জ্ঞানধারার সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ **তীর্থ**কে চিনে নেওয়া দরকার। সেকালে গুরু ও শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল জ্ঞানধারার **তীর্থ**। এই **তীর্থ** আধুনিক যুগে এসে অজস্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অজস্র গ্রন্থে বিকশিত হয়। তাদের মাধ্যমেই জ্ঞানধারা প্রবাহিত হতে থাকে। বর্তমানে এই জ্ঞানধারা আরও বিকশিত হয়ে পরিণত হয়েছে অন্তরীক্ষের মহাজ্ঞানধারায়। সেই ধারার তীরে তীরে যে লক্ষ লক্ষ **তীর্থ** বা ঘাট গড়ে উঠেছে, সেই সমস্ত **তীর্থক্ষেত্রের** অধীশ্বরের নাম **'অন্তর্নাথ'** (বা internet)। এই মহাজ্ঞানধারার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল, এর লক্ষ লক্ষ ঘাট বা **তীর্থ** রয়েছে; এবং চাইলে অন্তর্নাথের শরণাপন্ন হওয়া যায় এবং যে-যার নিজের নিজের ঘাট বা **তীর্থ** বানিয়ে নেওয়া যায়, এমনকি চাইলে অন্য **তীর্থঙ্কর**দের তৈরি করা **তীর্থে**ও ওঠানামা করে এই ধারাস্রোতে স্নান করে স্নাতক হওয়া যায়, পাপ (অজ্ঞান) স্খালন করে পুণ্য (জ্ঞান) অর্জন করা যায়। এই **তীর্থ**গুলিকে একালের ভাষায় 'ওয়েবসাইট' (website) বলা হয়। কলিম খান ও রবি চক্রবর্তীর বন্ধুবান্ধবেরা এই মহাজ্ঞানধারায় ওঠানামা করার জন্য তাঁদের নিজস্ব যে ঘাট বা **তীর্থ**ক্ষেত্র বানিয়েছেন, তাঁরা সেই **তীর্থক্ষেত্রের** নাম দিয়েছেন — www.banglasemantics.net।

তৃণ (তৃণকেতু, তৃণজলৌকা, তৃণজীবী, তৃণজ্ঞান, তৃণজ্যোতিঃ, তৃণদ্রুম, তৃণধান্য, তৃণধ্বজ, তৃণবিন্দু, তৃণবুদ্ধি, তৃণরাজ) : ১. ✓তৃণ্ (ভক্ষণ) + অ (ঘঞর্থে ক) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. তৃণ** = *তারীর আবর্ত্তনের রহস্যরূপ যাহাতে; অথবা, আবর্ত্তমান তারীসমূহের একক যে।* **৩. তৃণ** = পশুর ভক্ষ্য, যবস, ঘাস, খড়, তৃণবৎ হেয় বস্তু, তৃণদল (a blade of grass)। **তৃণকেতু, তৃণধ্বজ** = তৃণশ্রেষ্ঠ, বংশবৃক্ষ, তালবৃক্ষ। **তৃণজলৌকা** = তৃণস্থিত জলৌকা-বিশেষ, ছিনে জোঁক। **তৃণজীবী** = তৃণভোজী (herbivorous)। **তৃণজ্ঞান, তৃণবুদ্ধি** = তৃণবৎ হেয়জ্ঞান, তুচ্ছজ্ঞান। **তৃণজ্যোতিঃ** = জ্যোতিষ্মতী লতা। **তৃণদ্রুম, তৃণরাজ** = 'তৃণজাতি বৃক্ষ', তাল, গুবাক, নারিকেল, খর্জ্জুর, কেতকী, হিন্তাল। **তৃণধান্য** = তৃণতুল্য স্বয়ংজাত ধান্য, নীবার, উড়িধান, শ্যামাক-প্রভৃতি। **তৃণবিন্দু** = রাজর্ষিবিশেষ (ইঁহার কন্যা পুলস্ত্যের পত্নী ও পৌলস্ত্যের বা বিশ্রবার জননী।)। **তৃণাবর্ত্ত** = 'তৃণসমূহের আবর্ত্তয়িতা', ঘূর্ণিবায়ু, কংসচর-বিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** grass অর্থে **তৃণ** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত, বাকি সবই অপ্রচলিত। **৫.** যা কিছু **উর্ধ্ব** দিকে উচ্চতায় উত্তীর্ণ (তৃ) হয়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র হল **তৃণ**। আবর্ত্তমান তারীর (তৃ) এ হল রহস্যরূপ। উদ্ভিদসমূহের মধ্যে এ সর্বকনিষ্ঠ। কিন্তু এই কনিষ্ঠতা বাহ্যিক আকারের বিচারে কি না, তা নিয়ে সংশয় হয়, যখন জানা যায়, তাল নারকেল বাঁশ প্রভৃতি উদ্ভিদকে **তৃণশ্রেষ্ঠ** বলে। তাছাড়া অন্তত দুটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, **তৃণ** শব্দটির কেবল পার্থিব 'ঘাস' রূপেই প্রয়োগ ছিল না, তার সামাজিক প্রয়োগও ছিল। ছিল বলেই হেয়, ফালতু, গুরুত্বহীন বলে মনে করা আর **তৃণজ্ঞান** করা একই ব্যাপার বলে মনে করা হত। **তৃণবিন্দু** ভারত ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক চরিত্র। তার থেকে জাত আধারশক্তি বা

কন্যাই **সপ্তর্ষি**গণের এক ঋষির (পুলস্ত্যের) পত্নী। কংসের অনুচর **তৃণাবর্ত্ত** অবশ্যই একটি ঐতিহাসিক চরিত্র, যদিও তার ভূমিকা স্পষ্ট নয়। সর্বোপরি, শিবের সেই বিখ্যাত উক্তি — 'বসালিপ্ত তৃণকেও যে আমার বলিয়া গর্ব করে, আমি তাহাকে ধ্বংস করি' — বাক্যটিতে 'বসালিপ্ত তৃণ' শব্দে শ্রমোৎপন্ন ফসলের একটি একক (unit) বোঝানো হয়েছে। এই **তৃণ** কয় প্রকার, জানা যাবে **দর্ভ** শব্দ থেকে।

তৃপ্ত (তৃপ্তি) : **১.** ✓তৃপ্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** **তৃপ্ত** = *তারীর আবর্ত্তনের পালন তারিত যাহাতে।* **তৃপ্তি** = *তৃপ্ত গতিশীল যাহাতে।* **৩.** **তৃপ্ত** = প্রীত, তৃপ্তিযুক্ত, প্রীণিত, তর্পিত। (ব.শ.)। **সন্তুষ্ট**, আহ্লাদিত, হৃষ্ট, পূর্ণকাম। (ছাত্রবোধ অভিধান)। **তৃপ্তি** = প্রীতি, ভোজনাদি দ্বারা আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি। (ব.শ.)। তৃষ্ণানিবৃত্তি, সন্তোষ, ক্ষুন্নিবৃত্তি, আহ্লাদ। (ছাত্রবোধ অভিধান)। **৪.** pleased ও pleasure অর্থে শব্দ দুটি প্রচলিত। **৫.** **তৃপ্তি** বলতে ঠিক কী বোঝায়, সেকথা সুস্পষ্টভাবে জানার প্রয়োজন পড়েছে নানান কারণে। কেননা, আমরা দেখেছি, বিশ্বের প্রতিটি মানুষ প্রকৃতপক্ষে যার জন্য তার প্রতিটি মুহূর্ত সময় ব্যয় করছে, তা হল **তৃপ্তি** লাভের চেষ্টা। শরীর ও মনের **তৃপ্তির** জন্যই মানুষ সব কিছু করে থাকে। এমনকি আত্মদান, আত্মহত্যা, কিংবা অপরকে হত্যার পিছনেও রয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে **তৃপ্তি**লাভের চেষ্টা। আমরা লক্ষ্য করেছি, সবচেয়ে দয়ালু মনীষীও আপন আত্মার **তৃপ্তির** জন্যই জনগণের জন্য জীবনদান করে থাকেন, জনগণকে ভালবেসে জীবনদান করছেন ব'লে মনে হলেও। সুতরাং **তৃপ্তি** বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা জানা খুবই প্রয়োজন।

যাঁরা সহজ করে বুঝতে চান, তাঁদের জন্য একথা বলা যায় যে, মানুষ মাত্রেই কোনো না কোনোভাবে কিছু না কিছুর অভাবের কারণে তার বর্ত্তমান নিয়ে অসন্তুষ্ট। তাই সে তার পরবর্তী সন্তুষ্ট-অধ্যায়ে পৌঁছতে চায়। তার জন্য তার বর্ত্তমান অভাব বা অভাবগুলি পূরণ করতে সে সচেষ্ট হয়। সে কাজে সফল হতে পারলে সে সন্তুষ্ট বা **তৃপ্ত** হয়। তার এই **তৃপ্তি** অতএব তার '**অস্তিত্বের তারণ পালিত হয় যাতে**', সেই প্রকার চেষ্টার সফলতা বোঝায়। তার জন্য তাকে যোগসাধন করতে হয়। এই যোগসাধনার সূত্রপাত হয় অমৃতসমান খাদ্যবস্তুর সঙ্গে জিভের যোগ সাধন করায়; তাতে মানুষের প্রধানত দৈহিক তৃপ্তি সাধিত হয়। এই যোগসাধন প্রক্রিয়া বাড়তে বাড়তে তার সর্বোচ্চ রূপে পৌঁছায়; **তৃপ্তিও** দৈহিক তৃপ্তি থেকে ক্রমশ বাড়তে বাড়তে মানসিক তৃপ্তির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছায়। অবশেষে এই যোগসাধনার শেষ হয় অমৃতসমান রসবস্তুর সঙ্গে মনের জিভের যোগ সাধন করায়; তাতে মানুষ অসীম **তৃপ্তি** লাভ করে, মোক্ষ লাভ করে। এরই অপর নাম **আনন্দ**।

এ তো গেল বিশ্বাসীদের প্রতি সহজ বয়ান। কিন্তু যাঁরা প্রতিটি ইঞ্চি যুক্তিপ্রমাণ ধরে ধরে এগোতে চান, তাঁদের জন্য প্রতি ইঞ্চির ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়ে এগোতে হবে। ক্লান্তিকর হলেও সে কাজটাও করা চাই। **তৃপ্ত** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে আমরা জেনেছি, 'তারীর আবর্ত্তনের পালন তারিত হয় যাহাতে', তাকে **তৃপ্ত** বলে। ঋ-কারের অর্থে আমরা আগেই দেখেছি, অস্তিত্বের (অ-এর) গতিশীলতা (ই) নবরূপে উত্তীর্ণ (উ) হয় বটে, কিন্তু নতুন রূপ থেকে পরবর্তী অস্তিত্বে উত্তীর্ণ হতে গেলে একটি আবর্ত্তনমূলক গতিশীলতা (ঋ) লাগে। তারীর সেইরূপ আবর্ত্তনমূলক গতিশীলতা (তৃ) তারীর বিকাশের পক্ষে নিশ্চিতভাবেই আনন্দদায়ক ও জরুরি। সেই তৃ-র পালন (প্) যে সত্তায় তারিত হয়, তাকে বলে **তৃপ্ত**। এই **তৃপ্ত**-এর তৃপ্ত হওয়া গতিশীল থাকে যে-প্রক্রিয়ায়, তাকে বলে **তৃপ্তি**। তাহলে, সব মিলিয়ে ব্যাপারটি এই দাঁড়ায় যে, প্রতিটি মানুষই তো দেহমন নিয়ে প্রতিদিন পরবর্তী রূপে আবর্ত্তিত হয়ে পৌঁছচ্ছে। তার সেই আবর্ত্তনমূলক অগ্রগতি কার্যত তার অস্তিত্বের স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক বিকাশের পথে চলা, তার বর্ত্তমান অভাব পূরণ করে করে চলা এবং স্বভাবতই তার খুশির কারণ। যে-প্রক্রিয়ায় তার এই আবর্ত্তনমূলক অগ্রগতি সম্ভব হয়, সেই প্রক্রিয়া অতএব তার একান্তই কাম্য। ফলে, তাতেই তার আবর্ত্তনমূলক অগ্রগতির পালন তারিত হয়ে থাকে, এবং সেজন্যই সে **তৃপ্ত** হয়।

ত্য (ত্যক্, ত্যজ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অত্যাগ, অত্যাগসহন, অত্যাগী, অত্যাজ্য, অসন্ত্যাগ, উপত্যকা, ত(তা)কিয়া, তকেয়া, তাক, তাকিয়া, তি(তে)য়াগ, তেয়জ, তেয়াগ, ত্যকা, ত্যক্ত, ত্যজ্, ত্য(ত্যা)জ, ত্যজন, ত্যজ্য, ত্যাগ, ত্যাগিতা, ত্যাজিত, ত্যাজ্য।

ত্য (ত্যক্, ত্যজ্) = তারী থাকে যাহাতে। **ত্যক** = **ত্য** করে যে। **ত্যজ** = **ত্য** জনন করে যে।

তাক, তাকা, তাকান (উপত্যকা) : **১.** উপত্যকা = উপ + ত্যক (ত্যকন্) স্বার্থে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** ***তাক*** = *তারীকরণ হইতে জাত।* ***তাকা*** = ***তাক****-এর আধার যে।* ***তাকান*** = ***তাকা*** *অন যাহাতে।* ***উপত্যকা*** = ***উপ*** *(বাড়তি)* ***ত্য*** *(তারীর থাকন) করে যে।* **৩.** **তাক** = বিচার, বিচারপূর্ব্বক অনুমান, লক্ষ্য, নিরীক্ষণ, বিশেষ দৃষ্টিপাত, সুবিধা, সুযোগ; দেয়ালে সংলগ্ন তক্তার আধার (আড়), খিলানের নীচে তক্তার আড়, শেল্ফ্, দেয়ালে কাটা গর্ত্ত, কোলঙ্গা; বিচার করা, অনুমান করা, লক্ষ্য করা, অপেক্ষা করা, অনুসন্ধান করা, দৃষ্টিপাত করা। (**তাকাতাকি** = দেখাদেখি। **মুখ তাকান** = মুখের দিকে চাওয়া, কথার অপেক্ষা করা, প্রতীক্ষা করা, প্রত্যাশা করা।) **উপত্যকা** = পর্ব্বতের আসন্ন ভূমি বা সমীপস্থ দেশ, আসন্ন ভূমি, সন্নিহিত ভূমি। (ব.শ.)। **৪.** valley অর্থে **উপত্যকা**, এবং নানার্থে **তাক** প্রচলিত। **৫.** কোনো সত্তা থেকে তারিত হয়ে কিছু একটা বাইরে বেরোল, ঠিক যেন মুখের ভেতর থেকে জিভটুকু বেরিয়ে এল — একে বলে **ত্য-করণ**। ক্রিয়াটি **ত্য-জনন**-এর বা ত্যাগের খুব কাছাকাছি ব্যাপার। ত্য-জননের বেলায় ত্যক্ত পৃথক হয়ে যায়; ত্যাগ-এর বেলায়ও তাই হয়। কিন্তু ত্যক-এর বেলায় তা হয় না। সেই কারণে তাক লেগে থাকে দেয়ালে। উপতাক বা উপত্যকা অবশ্য আর একটু বাড়তি; অনেকটাই cantilever-বারান্দার মতো। পর্ব্বতের পাদদেশ থেকে বেরিয়ে সে অনেকটাই এগিয়ে যায়।

অনেকের ধারণা, যে 'তাক'-এর শেল্ফ্ অর্থ হয়, সেটি এসেছে ফারসি বা আরবি থেকে। আমাদের বক্তব্য এই যে, তাদের সেরকম শব্দ থাকতেই পারে; কিন্তু তাদের থেকেই আমরা শিখেছি এমন নয়। আমরাও কথাটি পেয়েছি উত্তরাধিকার সূত্রে **উপত্যকা, অধিত্যকা, ত্যকা** প্রভৃতি শব্দ থেকে। **তাক** করা মানেই তো তাকানো, তাকিয়ে দেখা! নিজের থেকে তারিত হয়ে বেরোলেই তো **ত্য-করণ** বা তাকানো সম্ভব হয়। এসব কথা আমাদের বাংলাভাষী পূর্বপুরুষেরা নিশ্চয় ফারসির কাছ থেকে শেখেননি।

ত্র (ত্রপ্, ত্রস্, ত্রৈ) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : (ত্র-ত্রি, ত্রি-তীয়, তৃতীয়) অংসত্র, অত্রপ, অত্রপা, অত্রস্ত, অপত্রপ, অপত্রস্ত, কটিত্র, গোত্র, তটস্থ, তরস্ত, তরাস, তার্ত্তিয়, তাসন, তাসনী, তাসা, তি, তিঅজ, তিউ(ও)ড়ি, তিওট, তিওর, তিঁই, তিঁহ, তিঁহো, তিকাঠা, তিন, তিয়জ, তিপ্পান্ন, তিয়ড়ি, তিয়াত্তর, তিরপূর্ণি (ত্রিপুণ্য, ত্রিবেণী হবে না), তিরানব্বই, তিরাশী, তিরিশ, তিহড়ি (তিহড়ী), তিহরি(রী), তুটি, তৃতীয়, তৃতীয়া, তৃতীয়াতৎপুরুষ, তৃতীয়ী, তেইশ, তেউড়, তেউড়ী, তেওট, তেওড়, তেওড়া, তেওয়ারি (তেওয়ারী), তেওরা, তেঁতুল, তেকাট, তেকাটা, তেকাঠা, তেকেলে, তেগা, তেঘাই, তেচখ্যা, তেচোখো, তেচল্লিশ, তেজবরে, তেড়, তেতলা, তেতালা, তেতাল্লিশ, তেত্রিশ, তেথরি(রী), তেনরি(রী), তেপথা, তেপথি(থী), তেপলে, তেপাটি, তেপায়া, তেমহলা, তেমাথা, তেমু(মো)হানা, তের, তেরাত্তির, তেরাত্রি, তেষট্টি, তেসনি(নী), তেসরা, তেহ(হি)রা, তেহ(হে)রি, তেহাই, তৈলঙ্গ, ত্রপ্, ত্রপা, ত্রপু, ত্রয়, ত্রয়স্ত্রিংশৎ, ত্রয়োদশ, ত্রয়োবিংশতি, ত্রস্, ত্রস, ত্রসন, ত্রসর, ত্রসরেণু, ত্রস্ত, ত্রস্নু, ত্রা, ত্রাণ, ত্রাস, ত্রাসন, ত্রাহি, ত্রি, ত্রিংশৎ, ত্রিঃ, ত্রিক, ত্রিককুদ, ত্রিকচ্ছ, ত্রিকটু, ত্রিকড়ি, ত্রিকণ্ট, ত্রিকণ্টক, ত্রিকণ্ঠ, ত্রিকর্ম্ম, ত্রিকা, ত্রিকাটা, ত্রিকাল, ত্রিকূট, ত্রিকোণ, ত্রিগণ, ত্রিগম্ভীর, ত্রিগর্ত্ত, ত্রিগুণ, ত্রিগুণা, ত্রিগুণী, ত্রিচতুর, ত্রিচত্বারিংশৎ, ত্রিজগৎ, ত্রিজগত, ত্রিজট, ত্রিণতা, ত্রিণাচিকেত, ত্রিতন্ত্রী, ত্রিতয়, ত্রিতাপ, ত্রিতালী, ত্রিদণ্ড, ত্রিদণ্ডী, ত্রিদশ, ত্রিদশাধিপ, ত্রিদশাধিপতি, ত্রিদশায়ুধ, ত্রিদশালয়, ত্রিদশাবাস, ত্রিদশেন্দ্র, ত্রিদশেশ্বর, ত্রিদিব, ত্রিদিবেশ, ত্রিদিবেন্দ্র, ত্রিদিবেশী, ত্রিদিবেশ্বর, ত্রিদেব, ত্রিদোষ, ত্রিধা, ত্রিধাম, ত্রিধামা, ত্রিধারা, ত্রিনবতি, ত্রিনয়ন, ত্রিনয়না, ত্রিনয়নী, ত্রিনেত্র, ত্রিনেত্রা, ত্রিপঞ্চ, ত্রিপঞ্চাশৎ, ত্রিপটু, ত্রিপণ্ড, ত্রিপতাক, ত্রিপত্র, ত্রিপত্রক, ত্রিপত্র, ত্রিপথ, ত্রিপথগ, ত্রিপথগা, ত্রিপথগামিণী, ত্রিপদ, ত্রিপরিক্রান্ত, ত্রিপাঠী, ত্রিপাদ, ত্রিপি(বি)ষ্টপ, ত্রিপুট, ত্রিপুটা, ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্রক, ত্রিপুর, ত্রিপুরী, ত্রিপুরা, ত্রিপুরান্তক, ত্রিপুরান্তকর, ত্রিপুরারি, ত্রিপুরুষ, ত্রিপুষ্কর, ত্রিপৌরুষ, ত্রিফলা, ত্রিফলিয়া, ত্রিবঙ্ক, ত্রিবঙ্কা, ত্রিবর্গ, ত্রিবর্ষ, ত্রিবলি(লী), ত্রিবাটগামিনী, ত্রিবিক্রম, ত্রিবিদ্য, ত্রিবিধ, ত্রিবিষ্টপ, ত্রিবীজা, ত্রিবৃৎ, ত্রিবৃতা, ত্রিবৃত্ত, ত্রিবেণি(ণী), ত্রিবেণু, ত্রিবেদ, ত্রিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গি, ত্রিভঙ্গিম, ত্রিভাগ, ত্রিভুজ, ত্রিভুবন, ত্রিভূম, ত্রিমণ্ডলী, ত্রিমদ, ত্রিমধু, ত্রিমধুর, ত্রিমাত্র, ত্রিমার্গগা, ত্রিমুহানি, ত্রিমূর্ত্তি, ত্রিমূর্দ্ধ, ত্রিযব, ত্রিয়ম্বক, ত্রিষষ্টি, ত্রিয়হ, ত্রিযাম, ত্রিযামা, ত্রিযুগ, ত্রিরাত্র, ত্রিলিঙ্গ, ত্রিলোক, ত্রিলোকী, ত্রিলোকেশ, ত্রিলোচন, ত্রিলোচনা, ত্রিশ, ত্রিশঙ্কু, ত্রিশত, ত্রিশাখ, ত্রিশাল, ত্রিশালক, ত্রিশিখ, ত্রিশিরা, ত্রিশিরাঃ, ত্রিশীর্ষক, ত্রিশূল, ত্রিশৃঙ্গ, ত্রিশৃঙ্গী, ত্রিষষ্টি, ত্রিষ্টুপ(ভ), ত্রিসন্ধ্য, ত্রিসপ্ততি, ত্রিসবন, ত্রিসর্গ, ত্রিসাবিত্রী, ত্রিসারী, ত্রিসীমা, ত্রিসীমানা, ত্রিস্রোতাঃ, ত্রিহল্য, ত্রিহায়ণ, ত্রুট্, ত্রুটি, ত্রুটী, ত্রেতা, ত্রেধা, ত্রেপান্তরা, ত্রৈ, ত্রৈকালিক, ত্রৈগুণ্য, ত্রৈবর্ণিক, ত্রৈবার্ষিক, ত্রৈবিক্রম, ত্রৈবিদ্য, ত্রৈবেদিক, ত্রৈমাতুর, ত্রৈমাসিক, ত্রৈয়ম্বক, ত্রৈরাশিক, ত্রৈলোক্য, ত্রোটক, ত্রোটকী, ত্রোটি(টী), ত্র্যংশ, ত্র্যক্ষ, ত্র্যক্ষর, ত্র্যঞ্জল, ত্র্যবর, ত্র্যব্দ, ত্র্যমৃতযোগ, ত্র্যম্বক, ত্র্যশীতি, ত্র্যস্র, ত্র্যহ, ত্রহস্পর্শ, ত্র্যহৈহিক, ত্র্যায়ুধ, ত্র্যৃচ, সন্ত্রস্ত, সন্ত্রাস।

ত্র (ত্রপ্, ত্রস্, ত্রৈ) = তরণ-রহন (এখুনি তরিত হয়ে অন্য কোথাও চলে যাব, এই ভাব)। **ত্রপ** = ত্র পালিত হয় যাহাতে। **ত্রস** = ত্র নিঃশেষিত যাহাতে। **ত্রৈ** = দিশাগ্রস্ত ত্র-এর আধার যে; ত্রাণ।

গোত্র (গোত্রা, গোত্রকর্ত্তা, গোত্রকার, গোত্রপ্রবর, গোত্রভিৎ) : ১. গো + ✓ত্রৈ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***গোত্র** = গামীকে ত্রাণ করে যে। **গোত্রা** = **গোত্র**-এর আধার যে। **গোত্রকার** = **গোত্র** করে যে। **গোত্রভিৎ** = **গোত্র** ভেদ করে যে।* / **গোত্র** = পৃথিবীকে রক্ষা করে যে; যে পূর্বপুরুষের নাম শব্দিত করে; স্বর্গে বা পৃথিবীতে যে ত্রাণ করে; গোরক্ষা করে যে; রৌদ্র হইতে ত্রাণ করে যে। **গোত্রভিৎ, গোত্রভিদ্** = পর্ব্বতের পক্ষ ছেদন করে যে। (ব.শ.)। ৩. পর্ব্বত, অন্বয়, বংশ, কুল, বংশপরম্পরা, সন্তান, অপত্য, পৌত্রাদি, গোত্রপরম্পরাপ্রসিদ্ধ আদিপুরুষ শাণ্ডিল্যাদি মুনি [শাণ্ডিল্যাদি ২৪ জন মুনি ব্রাহ্মণের গোত্রপ্রবর্ত্তক (বৃদ্ধমনু)। ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও অন্য বর্ণসঙ্করগণের গোত্রপ্রবরাদি পুরোহিতের গোত্রপ্রবরানুসারে নির্দিষ্ট।], বান্ধব, জ্ঞাতি, স্বজন, নাম, আখ্যা, (ব্যাকরণে) অপত্যরূপে বিবক্ষিত পৌত্র-প্রভৃতি, (ছান্দস) গোষ্ঠ, গোশালা, কানন, ক্ষেত্র, বর্ত্ম, মার্গ, ছত্র (ছাতা), সঙ্ঘ, সমূহ, বৃদ্ধি, বিত্ত, ধন, সম্ভাবনীয়বোধ, ভাবিজ্ঞান, উপায়। **গোত্রা** = পৃথিবী, গোসমূহ। গোত্রকর্ত্তা, গোত্রকার, **গোত্রপ্রবব** = বংশপ্রবর্ত্তক, গোত্রপ্রবর্ত্তক। **গোত্রভিৎ, গোত্রভিদ্** = ইন্দ্র। (ব.শ.)। ৪. ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের বিবাহাদির কালে **গোত্র** শব্দটির প্রকৃত অর্থের ধ্বংসাবশেষের ব্যবহার দেখা যায়। অন্যথায় সমস্ত শব্দগুলিই এখন অপ্রচলিত। ৫. ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থের নিয়মে 'গো-কে ত্রাণ করে যে' তাকেই **গোত্র** বলা যায়। কিন্তু এই অর্থের সাহায্যে সরাসরি কোনো সত্তাকে **গোত্র** শব্দে চিহ্নিত করা যায় না; বলা যায় না যে — একেই **গোত্র** বলে। তা করতে গেলে আমাদেরকে ইতিহাসের শরণাপন্ন হতে হয়। মানুষের সমাজ কাকে কাকে **গো** বলে চিহ্নিত করেছিল, তাদের ত্রাতা বা **গো-ত্র** বলেই-বা কাকে কাকে চিহ্নিত করেছিল, তা জেনে তবেই **গোত্র** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের সঙ্গে সেই চিহ্নিত সত্তার সামঞ্জস্য বিধান করতে হয় — ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে জগৎকে বুঝবার-বোঝাবার এটাই রীতি। তা না করে, ক্রিয়াভিত্তিক (বাক্যমূলক) অর্থটির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে তার দ্বারা অঙ্কের নিয়মে যুক্তির পথ দিয়ে হেঁটে কাউকে **গোত্র** বলে শনাক্ত করলে যদিও-বা শব্দার্থটি ঠিকও হয় (না হওয়ারই কথা), বড় একটা ক্ষতি হয়ে যায় — সমাজের মনের মাটি থেকে

শব্দটির শেকড় উপড়ে ফেলা হয়। অতএব, আমরা জানতে চাইব আমাদের সমাজ **গোত্র** শব্দে কাকে কাকে বুঝত।

ব.শ. এই ক্ষেত্রে একই সঙ্গে পাঁচ-পাঁচটি ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়েছেন। প্রায় কোনো শব্দের ক্ষেত্রেই এরকম করা হয়নি। লক্ষ্যণীয় এই যে, এই পাঁচটি ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ 'গো-কে ত্রাণ করে যে' এই মূল অর্থেরই বিশেষীকরণ-চেষ্টা থেকে জাত। ফলে, এগুলিও কোনো সত্তার কথা সুস্পষ্টভাবে বলে না। তবে উপরে **৩**-এ প্রদত্ত তথ্যানুসারে আমাদের সমাজ **গোত্র** বলতে কাকে কাকে বুঝত, তার প্রায় পুরো তালিকাটিই দেওয়া হয়েছে। তাতে **গোত্র** শব্দের প্রথম অর্থই বলা হয়েছে 'পৃথিবীরক্ষক', অর্থাৎ সে নাকি 'পৃথিবীকে রক্ষা করে।' অতঃপর আর যে যে প্রতীকী অর্থগুলি পাওয়া যায়, তার প্রথম অর্থটিই হল 'পর্ব্বত'। এতে লক্ষ্যণীয় একটি সাধারণ স্বভাব চোখে পড়ে। তা হল, এরা প্রত্যেকেই এক-একটি প্রাকৃতিক বা সামাজিক সংগঠন, যা কিনা পর্ব্বে পর্ব্বে (বা rank and file-এ) বিন্যস্ত এবং অতএব **পর্ব্বত**-পদবাচ্য। অর্থাৎ কিনা, সেকালে তাকেই **গোত্র** বলা হত, যে সত্তার চেহারা ছিল পর্ব্বতের মতো। মানুষের বংশে এই পিরামিডাকৃতি চেহারাটি খুব সহজে চোখে পড়ে — সবার উপরে ১ জন বাবা, তার হয়তো ৪ টি ছেলেমেয়ে, তাদের ধরা যাক ১৬ টি ছেলেমেয়ে, তাদের থেকে হয়তো ২৫৬ টি সন্তানসন্ততি। খাড়াই ভাবে দেখলে এই হল **পর্ব্বত** বা **গোত্র**। এই সত্তা পর্ব্বে পর্ব্বে বিন্যস্ত বলে একে যেমন পর্ব্বত বলে, তেমনি এই সত্তা 'গো-কে (গামীগণকে) ত্রাণ করে' বলে একে **গোত্র** বলে। earth-এর ক্ষেত্রে এই **গোত্র** বোঝায় mountain-কে। এই পর্ব্বতই পৃথিবীকে রক্ষা করে। বিশ্বাস না হলে ভূবিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। অপর দিকে state-এর ক্ষেত্রে এই **গোত্র** বোঝায় রাষ্ট্রযন্ত্র নামক সংগঠনটিকে যার সর্বোচ্চ স্থানে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং সর্বনিম্নে কনিষ্ঠতম সরকারি কর্মচারী থাকে। এই রাষ্ট্রযন্ত্রই যে রাষ্ট্রকে রক্ষা করে, চালায়, ত্রাণ করে, সেকথা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না।

আর, ভারতসমাজের ক্ষেত্রে এই **গোত্র** বোঝায় সেই সামাজিক সংগঠনকে যার মাথায় থাকেন একজন মহর্ষি, এবং তার অজস্র পর্ব্ব পেরিয়ে একেবারে শেষে থাকে অজস্র সন্তানসন্ততি, যে সংখ্যাটি প্রতিদিনই বৃদ্ধি লাভ করছে; আর, পর্ব্বতগুলি যে ক্রমশ উপর দিকে উঠছে, সেকথা এখন সবাই জানে। ভারতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তার সমাজে মোট ২৪ টি **গোত্র** বা সামাজিক পর্ব্বত রয়েছে, যার প্রতিটির চূড়ায় রয়েছেন একজন করে মহর্ষি। প্রতিটি **গোত্রই** তার সদস্যগণকে ত্রাণ করে।

হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায়, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির একই **গোত্র** প্রচলিত আছে। তাই দেখে আধুনিকরা সন্দেহ করেন, বুঝিবা একই গোত্রের কায়স্থাদি জাতিগুলি সেই গোত্রের ব্রাহ্মণের অবৈধ সন্তান। কিন্তু এধরনের ধারণা একেবারেই ভুল। কারণ, একই গোত্রে বিভিন্ন বর্ণ বা জাতির মানুষ না থাকলে গোত্রটিই ধ্বংস হয়ে যেত। কারণ নিষ্কলুষ রক্তসম্পর্কের উপর ভিত্তি করে **গোত্র** বা সমাজসংগঠন (অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা) হয় না। এমনকি kinship বা রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে 'তীর্ণ' হওয়া সমাজসংগঠনকে গণ বা গণরাজ্যের মূল চরিত্র বলে মনে হলেও, ভিন্ন ভিন্ন ethnic group-এর মানুষকে নিয়ে রাজ্য বা 'পৃথিবী' গড়া হয়েছিল; এবং তার ভিত্তি করা হয়েছিল 'গো (বা গতিশীল) সম্পদ ত্রাণকারী' নানান সংগঠনকে, যাদের প্রতিটির নেতৃত্বে ছিল এক বা একাধিক মহর্ষি-ধরনের মানুষ। নিঃসন্দেহে এই গোত্রগুলির প্রত্যেকের মধ্যে নানা বর্ণের লোক থাকা শুধু সম্ভব তাই নয়, তা থাকা প্রয়োজনও বটে। এই কারণে একই গোত্রের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণ বা জাতির মানুষ পাওয়া যায় অনবরত। ... দ্র. **গিরি, পর্ব্বত**।

তিন, তৃতীয়, তৃতীয়া : দ্র. **ত্রি**।

তেওয়ারি (তেওয়ারী) : দ্র. **পদবী**।

ত্রপা, ত্রপু : **১.** ত্রপা = ✓ত্রপ্ + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। ত্রপু = ✓ত্রপ্ + উ - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** **ত্র** = *তৃ রহে যাহাতে; অর্থাৎ, তরে-যাই তরে-যাই ভাব যাহার।* **ত্রপা** = *ত্র পালিত হয় যে আধারে।* **ত্রপু** = *ত্র-এর পালন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। /* **ত্রপু** = যাহা অগ্নিস্পর্শে লজ্জিত (গলিত) হয়। (ব.শ.)। **৩.** **ত্রপা** = লজ্জা, ব্রীড়া, কুলটা। **ত্রপু** = সীসক (সীসা), রঙ্গ, রাঙ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** বাংলাভাষীদের ঐতিহ্যে **লজ্জাকে** নারীর ভূষণ বলা হয়। সেই লজ্জাকে **ত্রপাও** বলা হত, কারণ সে অস্তিত্বের তাৎক্ষণিক অবস্থা থেকে সরে যাওয়ার, সজীব থেকে মরে যাওয়ার, বর্তমান থেকে অন্যত্র তরে যাওয়ার, বর্তমান কঠিন রূপ থেকে গলে যাওয়ার, তরে তরল হয়ে যাওয়ার — মোট কথা বর্তমান অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় 'চলে-যাব চলে-যাব ভাব' প্রকাশ করে থাকে। এইরূপ তরতরানি-ভাব পালিত হয় বলে একে **ত্রপা** বলে। আর যাঁরা সীসা নিয়ে কাজ-কারবার করেন, তাঁরা জানেন, সীসাই সম্ভবত একমাত্র শক্ত ধাতু, যাকে গরম করলে কেবল গলে জল (অর্থাৎ তরল) হয়ে যায় না, ফুটিয়ে নিলেই প্রায় একশো ভাগ বিশুদ্ধ সীসা হয়ে যায়। যা কিছু মিশ্রণ সেই শক্ত সীসায় থেকে থাকে (সীসার ওজন বাড়িয়ে বিক্রির জন্য সেরকম করা হয়ে থাকলে) সে সবই গলন্ত সীসা থেকে একেবারেই আলাদা হয়ে যায়। যাই হোক, প্রধানত **ত্রি** বা **তিন**-এর ধারণাকে বুঝবার জন্য এই **ত্রপা** শব্দটিকে জানা দরকার ছিল। **৬.** ইংরেজি trap, trepidation।

ত্রস (ত্রসন, ত্রসর, ত্রসরেণু, ত্রস্ত, সন্ত্রস্ত) : **১.** ✓ত্রস্ (গতি) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** **ত্রস** = *ত্র-এর নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে।* **ত্রসন** = *ত্রস অন যাহাতে।* **ত্রসর** = *ত্রস রহে যাহাতে।* **ত্রসরেণু** = *ত্রস যে রেণু।* **ত্রস্ত** = *ত্রস্ তারিত যাহাতে।* **সন্ত্রস্ত** = *সম্যক রূপে ত্রস্ত যে।* **৩.** **ত্রস** = গতিশীল, জঙ্গম। **ত্রসন** = ত্রাস, ভয়, উদ্বেগ। **ত্রসর** = সুত্রবেষ্টন, মাকু (shuttle)। **ত্রসরেণু** = ত্রস (জঙ্গম) রেণু, গবাক্ষান্তর্গত সূর্য্যকিরণে দৃশ্যমান ধূলিকণা, ত্রিংশৎপরমাণুক রেণু, ষট্পরমাণুক রেণু। **ত্রস্ত** = ভীত, শীঘ্র, লঘু। **সন্ত্রস্ত** = অতিভীত, অতিভয়, মহাশঙ্কা। (ব.শ.)। **৪.** afraid অর্থে **ত্রস্ত, সন্ত্রস্ত** শব্দ দুটি প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **ত্রপা**। **ত্র** শব্দের অর্থে আমরা জেনেছি যে, যে সত্তা আপন অস্তিত্ব, অবস্থান, রূপ ইত্যাদি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত; সেগুলির কোনো একটি বা

কয়েকটি থেকে বেরিয়ে অন্য কোনো অস্তিত্বে, অবস্থানে বা রূপে চলে যাওয়ার জন্য ছটফট করছে; তাকে **ত্র** বলে। সেই **ত্র** তার অন্তিম রূপে বা তার অস্তিত্বের শেষ এবং ক্ষুদ্রতম রূপে নিজেকে প্রকাশ করলে তাকে **ত্রস**। ঘরের মধ্যে সূর্য্যালোকে যে ধূলিকণাকে দেখা যায়, সে ক্ষুদ্রতম রূপেই শুধু দেখা দেয় না, আপন অস্তিত্ব ও অবস্থানে যে সর্বদা চঞ্চল, ছটফট ছটফট করছে; যেন কেউ তাকে মারবে বা ধরে ফেলবে তাই সে সর্বদা পালাই-পালাই করছে। এই ধূলিকণাকে বলে **ত্রসরেণু**। তার এই ছটফটানিকে বলে **ত্রসন**। এই ছটফটানি যে সত্তার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ে, সে হয়ে যায় **ত্রস্ত**। ছটফটানির মাত্রা যদি আরও বেশি হয়, তবে সে **সন্ত্রস্ত**। ৬. ইংরেজি trace, trash, trust।

ত্রি (তিন, তৃতীয়, তে, ত্রয়, ত্রিঃ, ত্রে, ত্রৈ, ত্র্য) : ২. *ত্রি = ত্র (দ্র. ত্রপা) গতিশীল যাহাতে।* ৩. **ত্রি** = ত্রিসংখ্যক, তিন। **তিন** = তিন (৩) সংখ্যা। **তৃতীয়** = তৃতীয় ভাগ, ক-বর্গাদির তৃতীয় বর্ণ - গ জ ড দ ব। **তে** = তিন। **ত্রয়** = ত্রি-অবয়ব, ত্রিভাগযুক্ত, ত্রিসংখ্যক, ত্রিতয়, ত্রিসংখ্যা, তৃতীয়। **ত্রিঃ (ত্রিস্)** = ত্রিবার, তিনবার। **ত্রে** (ত্রেতা, ত্রেধা ...) = ত্রি। **ত্রৈ** (ত্রৈগুণ্য, ত্রৈবার্ষিক ...) = ত্রি। **ত্র্য** (ত্র্যংশ ...) = ত্রি। (ব.শ.)। ৪. three, third, tri- প্রভৃতি অর্থে সবগুলি শব্দই কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **এক, দুই (দ্বিতীয়), চার (চতুর)**। প্রাচীন মানুষ কেমন করে এক, দুই, তিন, চার ... প্রভৃতি ধারণা অর্জন করতে পারল, সে এক গভীর ধাঁধা। **এক দুই চার**-এ আমরা সেই ধাঁধার নিরসন করার চেষ্টা করেছি। এখানে **ত্রি** ধারণা অর্জনের রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টা করা যাক।

সাধারণ গতিকে **ই** বলে। আপনার অস্তিত্বের বিন্দু থেকে আপনি পা ফেলে ফেলে এগোবেন। এই এক-একটি পা ফেলাকে বলে ই করা বা **ইক**। প্রথম পদক্ষেপের পর দ্বিতীয়, তৃতীয় ... এভাবে পর পর এগোলেই গতিটি দিশাগ্রস্ত হয়ে যায়। প্রথম দিশাগ্রস্ত পদক্ষেপকে বা দিশাগ্রস্ত **ইক**কে অতএব **এক** বলাই ঠিক। এই গতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় স্বাভাবিক গতির পাশে বিশেষ গতির সম্ভাবনা দেখা দিলে। আমাদের মনে হয়, প্রাচীন মানুষের সামনে এই দুরকম সম্ভাবনা দেখা দিত গতিদানের ক্ষেত্রে — এদিকে যাবো না ওদিকে যাবো, একে দেবো না তাকে দেবো, দেবো না কি দেবো না? **দ্** নাকি **ব্**? অর্থাৎ, **দ্ব**! তখনই **এক** হয়ে যায় **দ্বি**। (দ্র. **দ্বি**)।

অস্তিত্বের এই যে চলমানতা, **এক** হওয়া, **দ্বি** হওয়া, এ যদি আবর্তনপূর্ব্বক উত্তীর্ণ (তৄ) হয়? 'প্লবনপূর্ব্বক দেশান্তরগমন' (ব.শ.) করে? অর্থাৎ, গতির এইযে নতুন রূপ, তাকে নিয়ে গতির মোটামুটি তিনটি রূপ হয়ে গেল। তৄ ক্রিয়াটিকে তাই স্থির রূপে **ত্র** বলে। সেই ক্রিয়া যখন গতিশীল থাকে, তখন তাকে **ত্রি** বলা হয়। এই ত্রি-র নানা রূপান্তর ঘটেছে। তার মধ্যে **ত্রীণি** রূপটি পরিণতি পেয়েছে **তিন**-এ। সেই **ত্রি** থেকেই জন্মেছে **তৃতীয়, তৃতীয়াদি** শব্দ। এই ত্রি-ই আরও বিবর্তিত হয়ে তে-রূপে পরিণত হয়েছে; যথা, তেউড়, তেকাঠ, তেকেলে, তেওয়ারী, তেচোখো ... ইত্যাদি। এভাবেই জাত হয়েছে **তৈ, ত্রয়, ত্রীণি, ত্রে, ত্রৈ, ত্র্য** ইত্যাদি। সকলের মূলে রয়েছে 'তিন' ধারণাটি, যার মূল শব্দরূপ হল **ত্রি**। মনে হয়, বিশ্বের বহু জাতিই এই **ত্রি-র উত্তরাধিকার** বহন করে থাকে। ৬. Avesta - thri, Latin - **tres**, Greek - treis, Anglo-Saxon - thri, Danish, Swedish - **tre**, Irish, Welsh, Russian - tri, English - three। (ব.শ.)।

ত্রিকূট : ২. *ত্রি কূট যাহার।* ৩. ত্রিশৃঙ্গযুক্ত, লঙ্কার আধার পর্ব্বতবিশেষ। (ব.শ.)। (ক) বামনপুরাণ অনুসারে সুমেরু পর্বতের পুত্র **'ত্রিকূট'** ক্ষীরোদসাগর থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। এই পর্বতে দেবর্ষিরা বাস করতেন এবং ইহা অপ্সরা, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব ও কিন্নর ইত্যাদির ক্রীড়াভূমি। এর তিনটি শৃঙ্গ — প্রথম সুবর্ণময়, দ্বিতীয় রজতময়, তৃতীয় সর্বদা বৈদুর্য্য ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মণির কিরণে প্রদীপ্ত — এই শৃঙ্গ সর্বশ্রেষ্ঠ। (খ) ত্রিশৃঙ্গ পর্বতবিশেষ। এই পর্বত লবণসমুদ্রের মধ্যস্থিত ও লঙ্কা এখানে অবস্থিত। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. 'ভারতের কোনো ইতিহাস নেই, অন্তত জানা কোনো ইতিহাস।' 'বাঙালী জাতির ইতিহাসজ্ঞান নেই। তারা কোনো ইতিহাস লিখে যায়নি।' এইসব লম্বা কথাবার্তা যাঁরা বলেন, তাঁদের কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়নি — আপনি যে দেশের ইতিহাস পড়বার দেশী কৌশলটি ফেলে দিয়ে ইয়োরোপের ইতিহাস পড়ার ইয়োরোপীয় কৌশল ধার করে নিয়ে এসে তাই দিয়ে দেশের ইতিহাস পড়তে লেগেছেন, সেটা খেয়াল করেছেন কি?

দেশী ইতিহাসকারের দেশী কৌশলে দেশের রাষ্ট্র-সংগঠনের বর্ণনা দেওয়া হত উপরোক্ত বামনপুরাণের ভাষায়। একালে বলা হয় Legislative, Judiciary, Executive — আমাদের তথাকথিত সরকারী ব্যবস্থা এই তিন ভাগে বিভক্ত। আমাদের সেকালের জ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা সমগ্র ব্যবস্থাটিকে একত্রে বলতেন **ত্রিকূট**, যা কিনা ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতবিশেষ। দ্র. **গোত্র, পর্ব্বত**। কীভাবে এইরকম সামাজিক-রাষ্ট্রীয়-সরকারী সংগঠন ভারতসমাজে গড়ে উঠেছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ তাঁরা দিয়ে গিয়েছেন উপরোক্ত পৌরাণিক ভাষায়। একালের ইতিহাসকার আপন পৈতৃক ভাষাজ্ঞান হারিয়ে সেসব কথার মানে আজ যদি বুঝতে না পারেন, পূর্বপুরুষকে দোষ দেওয়া বৃথা। দ্র. **তারকাসুর, ত্রিপুর, বিদ্যুন্মালী**।

ত্রিজট : ৩. ত্রিজটাযুক্ত, শিব। (ব.শ.)। পিঙ্গলবর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ইনি বনমধ্যে ভূমি খনন করে বাস করতেন। রাম বনগমনকালে ধন বিতরণ করছেন শুনে কিছু ভিক্ষা করবার জন্য ইনি রামের কাছে এলেন। রাম বললেন, 'যত দূর তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করতে পারবে, ততদূর পর্যন্ত ধেনু তোমার হবে।' তখন ত্রিজট এমন জোরে লাঠি নিক্ষেপ করলেন যে, সেটা সরযূর অপর পারে গিয়ে পড়ল। সেই পর্যন্ত সমস্ত ধেনু সেই ব্রাহ্মণ পেল। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. *দ্র.* **ধেনু, সরযূ**। এই বিষয়টি বিস্তারিত করার জন্য যতখানি তথ্য হাতে থাকার প্রয়োজন ছিল, তা নেই। পরবর্তীকালে হয়তো এর সঠিক অর্থ উদ্ধার করা যাবে।

ত্রিত : ৩. (মহাভারত অনুসারে) গৌতম মুনির তিন পুত্র — একত, দ্বিত, ও ত্রিত। এই তিন ভ্রাতা স্থির করেন যে, বহু পশু

সংগ্রহ করে তাঁরা মহাফলপ্রদ যজ্ঞ করবেন ও সোমরস পান করবেন। ... একত ও দ্বিত সমস্ত পশু নিয়ে ত্রিতকে একাকী বনমধ্যে ত্যাগ করে পলায়ন করেন। ত্রিত রাত্রিকালে একাকী গমনরত অবস্থায় এক বৃক (নেকড়ে বাঘ) দেখে ভীত হয়ে এক গভীর কূপের মধ্যে পতিত হন। অপর দুই ভ্রাতা তাঁকে কোনোরূপ সাহায্য করেন না। তখন ত্রিত কূপ মধ্যেই যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ... বৃহস্পতি ও দেবগণ ত্রিতের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করে তাঁকে বর দিতে মনস্থ করেন। ত্রিত এই বর চান যে, 'আমাকে উদ্ধার করুন এবং যে এই কূপের জল স্পর্শ করবে, সেই যেন সোমপায়ীর গতি লাভ করে।' তখন কূপ হতে সরস্বতী নদী আবির্ভূতা হন। ত্রিত তখন কূপ হতে উত্থিত হয়ে লোভী ভ্রাতাদের অভিশাপ দেন যে, তারা নেকড়ে বাঘের ন্যায় ভীষণ পশুতে পরিণত হবে এবং তাদের সন্তানরা ভল্লুক ও বানর রূপে জন্মগ্রহণ করবে। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এ-কাহিনীর মানে এখন আমরা বুঝতে পারি না। রূপকথার মতো মিথ্যা মিথ্যা মনে হয়। কিন্তু বাইবেলের জোসেফ-এর কাহিনী বুঝি না বুঝি, মন দিয়ে পড়ি। জোসেফকেও তার ভাইয়েরা কুয়োয় ফেলে দিয়ে এসেছিল এবং তার রক্তমাখা জামাকাপড় বাবাকে দেখিয়ে বলেছিল যে, তাকে বাঘে খেয়েছে। ...

প্রশ্ন হল — কে কার দেখে লিখল? বাইবেল পুরাণ থেকে টুকলি করল, নাকি পুরাণ বাইবেল থেকে টুকলি করল? যে-ভারতীয় পণ্ডিতদের টিকি অক্সফোর্ডে বাঁধা, তাঁদের বলতে বাধে না যে, আমাদের পুরাণই বাইবেল থেকে টুকলি করেছে। আবার সংঘ-পরিবারের ঘোড়েলদের বলতে বাধে না যে, বাইবেলই আমাদের পুরাণ থেকে টুকলি করেছে। কারও কখনো একথাটি মনেই আসে না — এমন তো হতেই পারে যে, আমরা আদিকালের একই ঘটনার উত্তরাধিকার যে-যার নিজের মতো করে বহন করছি, যে-যার নিজের মতো করে লিখে রাখছি। ...

যাই হোক, আমাদের বিশ্বাস, দুটি গ্রন্থকে পাশাপাশি রেখে অধ্যয়ন করে নিয়ে, দুটি বর্ণনার ভাষাগুলিকে ঠিকভাবে বুঝে নিয়ে চেষ্টা করলে মূল আদি ঘটনার আপডেটেড যথাযথ বয়ান নির্মাণ করা যেতে পারবে। ...

ত্রিতাপ : ২. *ত্রি তাপ (তপ হইতে জাত) যাহাতে।* ৩. আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক — এই তাপত্রয়। (ব.শ.)। ৪. এখনও শব্দ তিনটি কমবেশি প্রচলিত থাকলেও শেষ দুটি প্রচলিত রয়েছে প্রায় অর্থহীন ভাবে। আর, আধ্যাত্মিক শব্দটি প্রচলিত রয়েছে religious অর্থে। ৫. 'মানুষ' বললে একালে সাধারণভাবে একটি সত্তা ভাবা হয়ে থাকে। তা ঠিক নয়। কেননা, মানুষ একটি দ্বৈতাদ্বৈত সত্তা। তার একটি মন ও একটি দেহ রয়েছে। দুইয়ে মিলে এক। তাই মানুষ মাত্রেই আসলে দুটি সত্তা বা দ্বৈত, কিন্তু চলে অদ্বৈত চালে, যেন সে আসলে একজন মাত্র, two-in-one। তাই দ্বৈত হয়েও মানুষ অদ্বৈত। মানুষের এই টু-ইন-ওয়ান রূপে জগৎ কিন্তু ভোলে না। তার মন জগতের কাছে একরকমভাবে দাবি করে, দেহ আর একরকমভাবে দাবি করে। আবার, এমন কিছু কিছু দাবি আছে যা দুটো সত্তার বা দেহমনের যৌথ দাবি। মন ফুল দেখতে ভালবাসে, দেহ ফল খেতে ভালবাসে, আবার দেহমন মিলে ঘুমোতে ভালবাসে। তিনটি ক্ষেত্রে সফল হলে তিন রকম সুখ পায়; তিনটি ক্ষেত্রে বিফল হলে তিন রকম দুঃখ পায়। মনের সফলতা-বিফলতাজাত সুখদুঃখকে **আধ্যাত্মিক** সুখদুঃখ বলে, দেহের সফলতা-বিফলতাজাত সুখদুঃখকে **আধিভৌতিক** সুখদুঃখ বলে, এবং দেহমনের যৌথ-সফলতা-বিফলতাজাত সুখদুঃখকে **আধিদৈবিক** সুখদুঃখ বলে। কথাটিকে আর একরকমভাবেও বোঝা হয়ে থাকে — যে চিন্তাভাবনা আমাদের আত্মা বা মনকে **অধিকার** করে এবং তার জন্য আমাদের সুখদুঃখ হয় তাকে **আধ্যাত্মিক**; যে পার্থিব বস্তুসকলকে (আগুন, লবণ, কৃষিজ শস্য, পশুপালনজাত পশু ... ইত্যাদি) মানুষ **অধিকার** করেছে এবং ফলত তারাও মানুষের কাঁধে চেপেছে, তাদের থেকে যে সুখদুঃখ হয় তাকে **আধিভৌতিক**; এবং প্রকৃতির কাঁচামালে শ্রম ও মেধা প্রয়োগ করে মানুষ যা বানিয়েছে (হাঁড়িকলসি, কাপড় ... ইত্যাদি পণ্য) এবং দেবন (বিক্রিবাটা) করছে, সেই বিশাল পণ্যজগতের কারণে যে সুখদুঃখ হয় তাকে **আধিদৈবিক** সুখদুঃখ বলে। তবে, সুখের কথাটি লোকে বিশেষ বলে না, দুঃখের কথাটিই বলে। এই তিনপ্রকার দুঃখকেই **ত্রিতাপ**-দুঃখ বা **দুঃখত্রয়** বলে। আমাদের ধর্মশাস্ত্রাদিতে এবং পুরাণাদি গ্রন্থে এই তিন প্রকার দুঃখের কথা বিস্তারিতভাবে রয়েছে। কিন্তু অভিধানাদিতে এর অর্থকে এমনই জটিল করে রাখা হয়েছে যে, এদের অর্থ প্রায়শই আমরা ভুল বুঝি।

ত্রিদেব (ত্রিমূর্ত্তি) : ৩. দেবত্রয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর; যাহার ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবরূপ মূর্ত্তিত্রয়, ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্ররূপী। (ব.শ.)। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও মহেশ্বর। এই তিন দেবতা সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসের প্রতীকস্বরূপ। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র. ৫. মানুষ **ত্রিদেব** ও তাঁদের **ত্রিমূর্ত্তি**র ধারণায় পৌঁছতে কত ত্যাগ-তিতিক্ষার ভিতর দিয়ে কত সময় ব্যয় করে যে পৌঁছেছিল, আজকের ঈশ্বরবিরোধী নাস্তিক আধুনিকতাবাদীদের পক্ষে সেসব কল্পনা করাও কঠিন। আমরা অতি সংক্ষেপে বিষয়টি বলে নেওয়ার চেষ্টা করব।

পরমাপ্রকৃতি বা ঈশ্বর রয়েছেন মানুষের মধ্যে, একথা সবাই বলে থাকেন। মানুষ যখন শরীর-মনে এক, টু ইন ওয়ান, তখন সে অদ্বৈত বা দ্বৈত হয়েও অদ্বৈত। যখন সেই মানুষ-ঈশ্বর দ্বিধাবিভক্ত, তখন মনটা পুরুষ, শরীরটি প্রকৃতি। এই প্রকৃতি যখন মনদ্বারা চালিত হয়, তখন (মন নিজে যেহেতু ত্রিধা বিভক্ত — বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন) কার্যত মানুষটির প্রকৃতি ত্রিধা বিভক্ত হয়ে যায় — বুদ্ধি-চালিত দেহ, অহঙ্কার-চালিত দেহ, ও মন চালিত দেহ। এদের যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বলা হয়। আগেই আমরা জেনেছি, বেদমতে বিশ্বের মূলে রয়েছে তেজ বা অগ্নি (মহেশ্বর), সেই তেজের আত্মোপলব্ধিই ইন্দ্র (বিষ্ণু), সেই আত্মোপলব্ধির প্রকাশ-অপ্রকাশই মিত্রাবরুণ (ব্রহ্মা)। সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এই ব্রহ্মার দুটি রূপ — মিত্র ও বরুণ, যার অর্থ যথাক্রমে 'প্রকাশিত হই' ও 'না না, যেমন আছি তেমন থাকি'। বিষ্ণুরও (অহঙ্কারেরও) দুটি রূপ — লক্ষ্মী ও কুবের, যার অর্থ যথাক্রমে 'সন্তোষযুক্ত আত্মাভিমান' (= আত্মসম্মানবোধ) ও 'বহুলতাযুক্ত আত্মাভিমান' (= আত্মগর্ব্ব)। লক্ষ্মীতে তাই আত্মসম্মানবোধ থাকে, কল্যাণ থাকে; কুবেরে তাই

আত্মগর্ব্ব থাকে, রোখ চেপে যায়। অগ্নির বা তেজের যেমন বহু রূপ, মহেশ্বরেরও তেমনি অনেক রূপ। প্রথমত তাকে দুই রূপে দেখা যায় — শিব ও শম্ভু রূপে, যার অর্থ যথাক্রমে সংকল্পশক্তি রূপে, ও বিকল্পশক্তি। ইনি পরমাপ্রকৃতির ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম। দ্র. **অন্তঃকরণ**।

অতএব, আদিম মানবজাতির প্রথম স্রষ্টাসংক্রান্ত ধারণার বা ঈশ্বরের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অভেদ রূপটিকে আজ আমরা শনাক্ত করতে পারছি। আমাদের পূর্বপুরুষগণের এই 'একম্' বোধের উত্তরাধিকারটি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সরাসরি পাননি (যদিও বহু পরে যিশু ও মহম্মদ তাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে গেছেন এবং তাঁদের সেই উদ্ধারকৃত সত্য বাহিত হয়ে ইয়োরোপেও পৌঁছেছে), কিন্তু তার দ্বৈতাদ্বৈত 'অর্ধনারীশ্বর' বা পুরুষ-প্রকৃতি রূপটিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা পেয়েছিলেন তাঁদের 'স্রষ্টা ও স্রষ্টার পুত্র' এবং 'স্রষ্টা ও তাঁর প্রেরিত দূত' রূপে। আরও পরের তৃতীয় রূপটির উত্তরাধিকার তাঁরা সরাসরি পেয়েছিলেন (যাকে খ্রিস্টান ইয়োরোপ তাত্ত্বিক চেহারা দেয়) তাদের 'ট্রিনিটি গড'-এ — 'গড দ্য ফাদার', 'গড দ্য সন', ও 'গড দ্য হোলি গোস্ট'-এ; আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের বাসিন্দারা যার উত্তরাধিকার সরাসরি পেয়েছিলাম ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রূপে। ... বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেখকদ্বয়ের 'গ' গ্রন্থটির (১৫৫ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

ত্রিপথগামিনী : ২. *যে (ধারা) তিনটি পথ দিয়ে গমন করে থাকে।* ৩. গঙ্গা। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ভূতলের ওপরে যে গঙ্গা নদী প্রবাহিত, তাকে তিন পথে গমন করতে দেখা যায় না। কিন্তু রামায়ণের ও পুরাণের বর্ণনায় গঙ্গাকে স্পষ্টভাষায় **'ত্রিপথগামিনী'** বলা হয়েছে। কারণ, আমাদের পূর্বপুরুষদের মূল প্রতিপাদ্য ছিল মানসলোকের গঙ্গাকে বা পণ্যধারাকে দেখানো, পণ্যধারার কথা বলা, জগৎজোড়া 'কমোডিটি-ফ্লো'কে বোঝানো। পার্থিব গঙ্গাকে গঙ্গা নাম দেওয়া হয়েছিল কেবল সাদৃশ্যের কারণে। তার একটি প্রমাণ গঙ্গার এই **ত্রিপথগামিনী** নাম। এই ত্রিপথগামিনী বা উৎপন্নধারা-গঙ্গা একই সঙ্গে তিনটি sphere-এ বা লোকে প্রবাহিত হয় — মালিকানার দুনিয়ায়, ভোগের দুনিয়ায়, বিনিময়ের দুনিয়ায়। সেই কারণে এদের তিনটি নাম দেওয়া হয়েছিল — আকাশগঙ্গা (অলকানন্দা), পাতালগঙ্গা (ভোগবতী), ও মর্ত্যগঙ্গা (ভাগীরথী)। ত্রিভুবনে প্রবাহিত এই যে গঙ্গা, সে আদৌ The Ganges নদীটি নয়, **ত্রিপথগামিনী** বা ত্রিবাটগামিনী নয়; কিন্তু **গঙ্গাধারা** বা **পণ্যধারা** (commodity flow) অবশ্যই **ত্রিপথগামিনী**, ত্রিবাটগামিনী। এ হল ত্রিভুবনে প্রবাহিত তিন ধারা।

ত্রিপাঠী : দ্র. **পদবী**।

ত্রিপাৎ (ত্রিপাদ্) : ২. *তিনটি পা যাহার।* ৩. পাদত্রয়যুক্ত, তিন-পোয়া, ত্রিবিক্রম, বিষ্ণু (বিষ্ণু বামনরূপে এক পাদে বলিরাজ্য পৃথিবী, দ্বিতীয়ে স্বর্গ ব্যাপ্ত করেন এবং তৃতীয় পাদ বলির প্রার্থনানুসারে তার মস্তকে স্থাপন করেন।), পরমেশ্বর, শৈব জ্বর (বাণযুদ্ধে সৃষ্ট শৈব জ্বর ত্রিশিরাঃ ও ত্রিপাৎ)। (ব.শ.)। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে — বিষ্ণুর এক নাম। দৈত্যরাজ বলি ত্রিভুবনের অধীশ্বর হয়ে দেবতাদের স্বর্গচ্যুত করেন; তখন দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। ... বিষ্ণু বামনরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে বলির যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে দানস্বরূপ ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন। বলি সম্মত হতেই ভগবান বিষ্ণু এক পাদ দিয়ে স্বর্গ ও অন্য পাদ দিয়ে মর্ত্য অধিকার করেন, আর নাভি হতে উত্থিত তৃতীয় পাদের জন্য বলিকে স্থান নির্দেশ করতে বলেন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলি নিজের মাথা পেতে দিয়ে বিষ্ণুকে তৃতীয় পাদ ঐ স্থানে স্থাপন করতে বলেন। তখন বলির মস্তকে তৃতীয় পাদ স্থাপন করে বিষ্ণু বলিকে পাতালে প্রেরণ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. কখন এবং কীভাবে মানুষের সমাজে খাজনার উদ্ভব হল? অর্থনীতিবিদগণ এ-নিয়ে বহুৎ কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রায় কিছুই নেই। যা আছে, তা হল প্রসঙ্গ মাত্র — 'অমুক স্থানে তমুক রূপে খাজনার প্রচলন সর্বপ্রথম শুরু হয়েছিল বলে মনে হয়। ...' ইত্যাদি।

ভারতের ইতিহাসে কিন্তু সুস্পষ্ট ঘটনাবলীর বর্ণনা সহকারে জানান হয়েছে, কখন কীভাবে কোন কোন ঘটনা-পরম্পরায় ভারতসমাজে খাজনা বা ট্যাক্সের আবির্ভাব ঘটেছিল; তখন পুঁজির ভূমিকাই বা কী ছিল। সেই ঘটনাবলী পৌরাণিক ভাষায় লেখা রয়েছে বলি (ট্যাক্স) রাজার কাহিনীতে, রয়েছে পুঁজির বা নগদ-নারায়ণের বামন (মুদ্রা) রূপে আবির্ভাবের কাহিনীতে। এই কাহিনীর বর্ণনার ভাষাকে প্রতি পদে পদে উদ্ধার করে নিতে পারলে আমরা সেই ইতিহাস খুব বিস্তারিতভাবেই পেয়ে যেতে পারি। এই ঘটনাবলীর একটি সত্তা **ত্রিপাদ**। পুঁজি নাকি সে সময় ত্রিভুবনকে অর্থাৎ সমাজের তিন লোককেই (উপরে দ্র. **ত্রিপথগামিনী**) তিন পা ফেলে আচ্ছন্ন করে দেয়। ...

ত্রিপুর : ২. / ত্রি পুর যাহাদের। (ব.শ.)। ৩. ত্রিপুরের অধিপতি অসুরত্রয় — তারকাক্ষ, কমলাক্ষ, ও বিদ্যুন্মালী। শিব। অসুরত্রয়ের সৌবর্ণ রাজত ও আয়স পুরত্রয়। (সুরনির্জিত অসুরগণ ময়দানবের শরণাপন্ন হইলে, ময় আকাশে অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে এই পুরত্রয় নির্ম্মাণ করিয়া অসুরগণকে দান করে। অসুরেরা এই পুরে নির্বিঘ্নে বাস করিয়া, ত্রিলোক ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে, দেবগণ অসুরনাশার্থ শিবের শরণাপন্ন হন। শিব দেবস্তবে প্রসন্ন হইয়া ত্রিপুর দগ্ধ করেন ও অসুরগণকে নিহত করেন।) পুরত্রয়। (ব.শ.)। তাারকাসুরের মৃত্যুর পর তার তিন পুত্র তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী কঠোর তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে এই বর প্রার্থনা করেন যে, তারা তিনজন যেন এমন পৃথক পুরে (নগরে) বাস করতে পারে, যে স্থলে সর্বপ্রকার অভীষ্ট বস্তু থাকবে, যা দানব, যক্ষ বা রাক্ষসরা ধ্বংস করতে পারবে না এবং ব্রহ্মশাপেও বিনষ্ট হবে না। সহস্র বৎসর পরে তারা মিলিত হলে তাদের এই ত্রিপুর যখন একত্র হয়ে যাবে, তখন যে দেবশ্রেষ্ঠ এই সম্মিলিত ত্রিপুরকে এক বাণে ভেদ করতে পারবেন, তিনিই তাদের নিহত করতে পারবেন। ... ব্রহ্মার বরে অতঃপর তারা ময়দানবের দ্বারা তিনটি পুর নির্মাণ করেন — তারকাক্ষের জন্য স্বর্গে স্বর্ণময়পুর, কমলাক্ষের জন্য অন্তরীক্ষে রৌপ্যময়পুর, এবং বিদ্যুন্মালীর জন্য পৃথিবীতে

কৃষ্ণলৌহপুর। তারকাক্ষের পুত্র হরি কঠোর তপস্যা করে ব্রহ্মার বর পেয়ে পূর্বোক্ত তিন পুরে এক একটি মৃত-সঞ্জীবনী সরোবর নির্মাণ করেন। সরোবরের এই গুণ ছিল যে, এতে মৃত দৈত্যদের নিক্ষেপ করলে তারা পুনর্জীবিত হয়ে উঠত। ... দৈত্যদের উৎপীড়নে দেবতারা ব্রহ্মার নিকট গেলে তিনি শিবের নিকট যেতে বলেন। ... দেবতাদের স্তবে শিব তুষ্ট হয়ে এই দৈত্যদের বধ করতে সম্মত হন এবং নিজে দেবতাদের অর্ধতেজ গ্রহণ করেন। এর ফলে, তাঁর বল সকলের অধিক হয় এবং তিনি মহাদেব নামে খ্যাত হন। ... বিশ্বকর্মা পৃথিবী, দেবী, মন্দর পর্বত, দিগ্‌বিদিক, নক্ষত্রমণ্ডল, বাসুকি, হিমালয়, বিন্ধ্যপর্বত, সপ্তর্ষিমণ্ডল, সিন্ধু, গঙ্গা, সরস্বতী, দিনরাত্রি, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ প্রভৃতির অংশ নিয়ে রথ নির্মাণ করেন। চন্দ্র ও সূর্য তাঁর রথচক্র হন এবং ইন্দ্র, বরুণ, যম ও কুবের — এই চার দেবতা লোকপাল অশ্ব হন। রথের ধ্বজদণ্ড হয় সুমেরুপর্বত এবং বিদ্যুন্ময় মেঘ হয় পতাকা। মহাদেব সংবৎসরকে ধনু এবং কালরাত্রিকে জ্যা করেন। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র মহাদেবের বাণ হন। ব্রহ্মা হন সারথি। ... মহাদেব তখন অশ্বপৃষ্ঠে এক পদ ও বৃষরূপী নারায়ণের পৃষ্ঠে এক পদ স্থাপন করে দানবপুর দর্শন করতে থাকেন এবং অশ্বের স্তনচ্ছেদ ও বৃষের ক্ষুর দ্বিধাবিভক্ত করেন। তদবধি অশ্বজাতির স্তন লুপ্ত হয় এবং গোজাতির খণ্ডিত ক্ষুর হয়। ... এমন সময় দানবদের তিন পুর একত্র হয় এবং মহাদেবও অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। ... তখন এই তিন পুর অস্ত্রাঘাতে দানবদের সহিত দগ্ধ হয়ে পশ্চিম সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই বয়ান পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, অধঃপতিত সমাজতন্ত্রবাদী (বেদবাদী) সমাজনেতাদের সঙ্গে একসময় পুঁজিবাদী শক্তির সংঘাত প্রবল আকার ধারণ করেছিল। তাতে শিব পুঁজিবাদী শক্তির সহায়ক হয়ে অধঃপতিত বেদবাদী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেন। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে কীভাবে কী কী করেন, তার বিস্তারিত ঠিকঠাক জানা যায় না। তার জন্য প্রতিটি পুর বিষয়ে প্রদত্ত বয়ানগুলি বিস্তারিত ভাবে বোঝা দরকার। আমরা এখনও **ত্রিপুর**-এর বিস্তারিত অর্থ বুঝতে পারিনি। দ্র. **ত্রিকূট**।

ত্রিবেণি (ত্রিবেণী) : ৩. গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর যুক্ত প্রবাহত্রয়, প্রয়াগতীর্থ, গঙ্গাদি-নদীত্রয়ের বিচ্ছিন্ন-প্রবাহত্রয়, দক্ষিণ প্রয়াগতীর্থ, হুগলী জেলার মুক্তবেণীতীর্থ, (হঠযোগে) ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ীর সঙ্গমস্থান। ৪. স্থাননাম রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **নাড়িনক্ষত্র**। বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **নাড়িনক্ষত্র** শব্দে।

ত্রিশঙ্কু : ২. / ত্রি শঙ্কু (দোষ) যাহার। (ব.শ.)। ৩. মার্জ্জার, শলভ, চাতকপক্ষী, খদ্যোত, সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ। (ইঁহার পিতা ত্র্যয্যারুণ, পুত্র হরিশ্চন্দ্র। পরকন্যাহরণে পিতার অপরিতোষ, গোহত্যা, ও অসংস্কৃতমাংস ভক্ষণ — এই ত্রিবিধ দোষ হেতু ইঁহার নাম 'ত্রিশঙ্কু'। রামায়ণে, ইঁহার পিতা পৃথু, পুত্র ধুন্ধুমার। ইনি স্বশরীরে স্বর্গগমনার্থ, বসিষ্ঠ ও পরে তৎপুত্রগণকে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বলিলে, তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করেন। কুপিত ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু দেবগণ যজ্ঞাংশ গ্রহণ করিলেন না। তখন বিশ্বামিত্র কুপিত হইয়া স্বীয় তপস্যাফলে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, ত্রিশঙ্কু, 'তুমি গুরুশাপহত, অতএব অবাক্‌শিরা হইয়া ভূপতিত হও'। ত্রিশঙ্কুর তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া বিশ্বামিত্র 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহাকে অন্তরালে অবস্থিত করিলেন। (ব.শ.)।

(ক) সূর্যবংশীয় রাজা। কুলগুরু বশিষ্ঠের নিকট ইনি যজ্ঞের প্রভাবে সশরীরে দেবলোকে যাবার বাসনা জানালে, তিনি তা অসাধ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেন। ... বশিষ্ঠের তপস্যারত শত পুত্রও প্রত্যাখ্যান করেন। তখন ত্রিশঙ্কু গুরু ও গুরুপুত্রদের ত্যাগ করে অন্যত্র গমন করতে চাইলে গুরুপুত্রগণ ত্রিশঙ্কুকে চণ্ডাল হবার অভিশাপ দেন। ... চণ্ডালে পরিণত ত্রিশঙ্কু অতঃপর বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হন। ... বিশ্বামিত্র যজ্ঞের আয়োজন করলে বশিষ্ঠপুত্রগণ ও মহোদয় নামে এক ঋষি ছাড়া সবাই সেই যজ্ঞে উপস্থিত হন। ... বহুকাল যজ্ঞ করার পরও যখন কোনো দেবতা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতে এলেন না ... তখন বিশ্বামিত্র আপন তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে আরোহন করাতে লাগলেন। ... ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁকে স্বর্গে স্থান দিতে অস্বীকার করলে ... ত্রিশঙ্কু মর্ত্যে অবতরণ করতে থাকেন। বিশ্বামিত্র পতনোন্মুখ ত্রিশঙ্কুকে 'তিষ্ঠ, তিষ্ঠ' বলে উর্ধ্বলোকে স্থান করে দেন, এবং দক্ষিণ আকাশে অন্য এক সপ্তর্ষিমণ্ডল ও নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করেন। তাঁর সৃষ্ট জগতে তিনি নূতন দেবতা ও নূতন ইন্দ্রের সৃষ্টিতেও তৎপর হন। এতে দেবতারা ভীত হয়ে স্বীকার করে নেন যে, বিশ্বামিত্র কর্তৃক সৃষ্ট আকাশে নক্ষত্রমণ্ডল থাকবে এবং তার মধ্যে নিম্নশির ত্রিশঙ্কুও দেবতুল্য হয়ে অবস্থান করবেন। (খ) হরিবংশ মতে ইনি মহারাজ ত্রয্যারুণের সত্যব্রত নামে এক পুত্র। সত্যব্রত অন্যের বিবাহিত স্ত্রীকে হরণ করে পিতার অসন্তোষভাজন হন এবং পিতা তাকে গৃহ হতে বারো বৎসরের জন্য বহিষ্কৃত করেন ও চণ্ডালদের সঙ্গে বাস করতে বলেন। ঋষি বশিষ্ঠ ত্রয্যারুণের কুলপুরোহিত হয়েও কিছু বলেন না। ... এই সময় সত্যব্রত অন্যত্র তপস্যারত বিশ্বামিত্রের পরিবারবর্গকে অন্নসাহায্য করে তাঁদের প্রাণরক্ষা করেন। বারো বৎসর নির্বাসনের সময় পূর্ণ হলে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় সত্যব্রত বাধ্য হয়ে বশিষ্ঠের কামধেনুকে হত্যা করে আহার করেন ও কিছু মাংস বিশ্বামিত্রের পুত্রগণকে দেন। এতে বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ত্রিশঙ্কু নামে অভিহিত করেন। কারণ, সে তিনটি পাপ করেছে — পিতার অসন্তোষ উৎপাদন, গুরুর গাভী হত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ। দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর পরিবারবর্গকে খাদ্য পরিবেশন করেছিলেন বলে বিশ্বামিত্র সত্যব্রতকে বর প্রদানে ইচ্ছুক হন। তখন সত্যব্রত সশরীরে স্বর্গবাসের জন্য প্রার্থনা করেন। বিশ্বামিত্র সেই বর দানে সম্মত হন। পরে বিশ্বামিত্র এঁকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এরপর বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করলে দেবতারাও বশিষ্ঠকে অনাদর করে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহন অনুমোদন করেন। ত্রিশঙ্কুর স্ত্রীর গর্ভে হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. আদিম সমাজতান্ত্রিক (বা বেদবাদী) নীতিতে জীবন অতিবাহিত করলে, আর যাই করা যাক, পরের জমি দখল করা যায় না, পণ্য উৎপাদন করা যায় না, এবং প্রয়োজন নেই তাও মালিকানা অর্জন করা বা বৃথা মাংস ভক্ষণ করা যায় না। কিন্তু ত্রিশঙ্কু সত্তা এই তিনটি ক্ষেত্রেই বেদবাদবিরোধী কাজ করেছিলেন। ফলে, সুখস্বর্গে থাকার তার চেষ্টা

স্বর্গসুখের অন্যান্য অধিকারীদের পক্ষে অন্যায় দাবি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তাতে কী? এই 'ট্রানজিসনাল পিরিয়ড'-এর আর এক পুঁজিবাদ-সমর্থক ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ত্রিশঙ্কু সম্পূর্ণ সফল হতে পারেন না। তিনি মাঝরাস্তায় ঝুলে থেকে যান। পরে পরে, ভারতসমাজের স্মৃতিতে যে কোনো কাজে 'মাঝরাস্তায় ঝুলে থেকে যাওয়া' বোঝাতে **ত্রিশঙ্কু** নামটি ব্যবহৃত হতে থাকে। ...

ত্রিশিরাঃ : ২. / ত্রি শিরঃ যাহার। (ব.শ.)। ৩. মস্তকত্রয়যুক্ত, কুবের, রাবণপুত্র, খরসেনাপতি, জ্বর, ত্রিশূল। (ব.শ.)। (ক) রাক্ষস খরের সেনাপতি। দণ্ডকারণ্যে শূর্পনখার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য খর রাম-লক্ষ্মণকে বধ করার নিমিত্ত একে পাঠায়। ত্রিশিরা রামের হাতে নিহত হয়। (খ) রাবণের এক পুত্র। এর তিন মুণ্ড। ... যুদ্ধকালে হনুমান তার তিন মুণ্ড ছেদন করেন। (গ) কুবেরও ত্রিশিরা নামে পরিচিত ছিলেন। (ঘ) মহাভারত অনুসারে, ত্বষ্টা নামে এক প্রজাপতি ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ত্রিশিরা নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। ত্রিশিরা সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির ন্যায় তিন মুখ। তিনি এক মুখে বেদ অধ্যয়ন, এক মুখে সুরাপান, আর এক মুখে সর্বগ্রাসী দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করতেন। (দ্র. বৃত্র) ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য ত্রিশিরা কঠোর তপস্যা করলে ইন্দ্র ভয় পেয়ে এর তপোভঙ্গের জন্য বহু অপ্সরাকে পাঠান। ... তারা অকৃতকার্য হলে ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করেন। ত্রিশিরা নিহত হন বটে, কিন্তু তাঁর মস্তক জীবিত থাকে। তখন ইন্দ্র এক সূত্রধরকে এই মস্তক ছেদন করতে বলেন। সূত্রধর ত্রিশিরার তিন মুণ্ড খণ্ডিত করে ফেলেন। প্রথম মুণ্ড হতে চাতকপক্ষীদল, দ্বিতীয় মুণ্ড হতে শ্যেনপক্ষীদল ও তৃতীয় মুণ্ড হতে তিত্তিরপক্ষীদল নির্গত হয়। পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ত্বষ্টা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে বিনাশ করার জন্য অগ্নিতে আহুতি দান করে বৃত্রাসুরকে সৃষ্টি করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **ত্রিশিরা** বা **ত্রিশিরাঃ** নামে যে কাহিনীগুলি পুরাণাদিতে রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল বৃত্রাসুরের কাহিনী। যতদূর বোঝা যায়, ইনিই আদি ত্রিশিরাঃ। বেদবাদের যে কয়জন সৎ অনুসারী সত্তা ছিলেন, ইনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তা সত্ত্বেও পুঁজিবাদের সমর্থক রূপে **ইন্দ্র** এর সঙ্গে সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা করে একে হত্যা করে। ... দ্র. **বৃত্রাসুর**। তবে এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি এখানে বলে রাখা দরকার, তা হল, ভারতসমাজ যখন **ত্রিশিরাঃ** ব্যবস্থায় শাসিত পরিচালিত তখন তার তিনটি শীর্ষে তিনটি প্রশাসনিক বিভাজন ছিল। এগুলি গড়ে উঠেছিল তিন শ্রেণীর রাজপুরুষ দিয়ে। উপরে তাদেরকেই চাতক, শ্যেন, ও তিত্তির বলা হয়েছে। আবার এমনও হতে পারে, যে, এরা ছিল তিন শ্রেণীর জনসাধারণ। কোনো কোনো পুরাণে বলা হয়েছে, ইন্দ্র ত্রিশিরাকে বধ করলে তার প্রথম কাটা-গলা থেকে কঙ্ক পক্ষী (কৃষিজীবী), দ্বিতীয় কাটা-গলা থেকে কলবিঙ্ক পক্ষী (কারুজীবী) ও তৃতীয় কাটা-গলা থেকে কপিঞ্জল বা তিত্তিরি পক্ষীরা (লেখজীবী-কেরানিরা) বহির্গত হয়। দ্র. **কঙ্ক, কলবিঙ্ক, কপিঞ্জল**। এদের মধ্যে কপিঞ্জলরাই নাকি তিত্তির। মনে হয়, এরা সেকালের কেরানিকুল। দ্র. **তিত্তির, নহুষ**।

ত্রেতা : ৩. **দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্য ও আহবনীয়** — এই অগ্নিত্রয়, কলির ত্রিগুণবর্ষ **দ্বিতীয় যুগ (ইহার পরিমাণ** দিব্য ৩৬০০ বর্ষ, মানব ১২,৯৬,০০০ **বৎসর**।), **দ্যূতে পাশকের অঙ্কত্রয়যুক্ত পার্শ্বের** উত্তান (চিৎ) পতন, **বরাটকত্রয়ের চিৎপাত**। (ব.শ.)। **দ্বিতীয়** যুগ। ত্রেতাযুগে পুণ্য ত্রিপাদ এবং **পাপ এক পাদ। মানবদেহ** চতুর্দশ হস্তপরিমিত। প্রাণ অস্থিগত। **এই যুগের বামন, পরশুরাম ও রাম** — এই তিনজন অবতার। **এই যুগের পরিমাণ** ১২,৯৬,০০০ বৎসর। সূর্যবংশীয় বাহুক, ককুৎস্থ, **ত্রিশঙ্কু, হরিশ্চন্দ্র, মরুত্ত,** অনরণ্য, সগর, অংশুমান, রঘু, অজ, দশরথ ও **রামচন্দ্র প্রমুখ** রাজারা এই যুগে রাজত্ব করেন। (পৌ.অ.)। ৪. **অপ্রচলিত**। ৫. **দ্র. চতুর্যুগ**। এখানে শুধু এইটুকু বক্তব্য যে, অগ্নি শব্দের মানে 'অর্থসম্পদ' ধরলে **ত্রেতায়** পৌঁছে তিনরকম অগ্নির সাক্ষাৎ পেয়েছিল মানুষের সমাজ — দক্ষিণাগ্নি, যা দিয়ে দক্ষিণা দেওয়া হত; গার্হপত্য, যা দিয়ে ঘরসংসার চালান হত; এবং আহবনীয়, যাকে আহ্বান করা হত। টাকাপয়সাকে আহ্বান জানানো মানে কী? মনে হয়, উৎপন্নকে পণ্যে রূপান্তরিত করে, তা বেচে টাকা কামানোর নীতির সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় **ত্রেতা** যুগে।

ত্ব (ত্বর্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অত্বরা, তঁহ, তঁহি, তহি, তক, তড়তড়, তড়াক, তর, তরা, তরাত(তু)রি, তাড়া, তাড়াতাড়ি, তু, তুঅ, তুই, তুঁ, তুঁহু, তুহুঁ, তুঝ, তুঞি, তুমি, তুম্হে, তুম্মি, তুহ্মি, তুয়, তুয়া, তে, তেঁহ, তেঁহি, তেঁহো, তেঁহোঁ, তো, তোঁ, তোঁহি, তোহেঁ, তোমা, তোহর, তোহারা, তোহারি, তোহে, তোহোর, তোহ্মা, তোহ্মি, তৌহ্মিক, ত্বং, ত্বক্(চ্) (touch), ত্বক, ত্বগজ, ত্বগদোষ, ত্বঙ্কার, ত্বচিসার, ত্বত্তুল্য, ত্বৎসদৃশ, ত্বৎসম, ত্বদ্, ত্বন্মনা, ত্বম, ত্বর, ত্বরত্বর, ত্বরমাণ, ত্বরা, ত্বরাত্বরি, ত্বরাবান, ত্বরামত্ত, ত্বরিত, ত্বষ্ট, ত্বষ্টা, ত্বষ্টি, ত্বাচ (touch), ত্বাদৃক্, ত্বাদৃশ, ত্বাষ্ট্র, ত্বিট্(ষ্), ত্বিষ্, ত্বিষা, ত্বিষাম্পতি, সত্বর।

ত্ব (ত্বর্) = তারী-বহন। **ত্বর** = তারী-বহন রহে যাহাতে। (ত্-ব্ জুড়ে হয় ত্ব। সেভাবে এটি তরণ-বহন হওয়ার কথা। এর কার্যকরী রূপ হল তারী-বহন, যদিও তারী এখানে খুবই সূক্ষ্ম তরণমাত্র)।

ত্বক (ত্বচ্, ত্বক্সার, ত্বগ্জ, ত্বগ্দোষ, ত্বাচ) : ১. ✓ত্বচ্ (আচ্ছাদন) + ক্বিপ্ (০) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ত্বক্** = *তারী-বহন (করে যে)।* **ত্বচ্** = *তারী-চয়ন (করে যে)।* **ত্বক্সার** = **ত্বক্**-*এর সার যাহাতে।* **ত্বগ্জ** = *যাহা* **ত্বক্** *হইতে জন্মে।* **ত্বগ্দোষ** = **ত্বক্**-*এর মাধ্যমে দূষণ যাহাতে।* **ত্বাচ** = **ত্বচ্** *হইতে জাত।* / **ত্বক্** = যাহার দ্বারা আচ্ছাদন সাধিত হয়। **ত্বক্সার** = ত্বকে যাহার সার। **ত্বগ্জ** = ত্বক্ হইতে জাত। **ত্বগ্দোষ** = ত্বগ্দূষয়িতা (ত্বক্-এর দ্বারা দূষণ করে যে।) (ব.শ.)। ৩. **ত্বক্ (ত্বচ্)** = চর্ম্ম, ছাল, বল্কল, স্পর্শগ্রাহক বাহ্যেন্দ্রিয়, সর্পচর্ম্ম, কঞ্চুক, গুড়ত্বক, দালচিনি। **ত্বক্সার** = বংশ, বাঁশ, রন্ধ্রপ্রধান বংশ, তলতা বাঁশ। **ত্বগ্জ** = রুধির, রোম। **ত্বগ্দোষ** = কুষ্ঠরোগ। **ত্বাচ** = ত্বক্সম্বন্ধী, চার্ম্মণ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **ত্বক্** বা **ত্বচ্** শব্দের অর্থ (তারী-বহনকারী) থেকে বোঝা যায়

মানুষের অস্তিত্বের সূক্ষ্মতম কণা ছড়িয়ে থাকে তার শরীরের সমগ্র ত্বকের বা চামড়ার প্রতিটি বিন্দুতে। কথাটি যে কত সত্যি, জানা যায় **চর্ম্ম** শব্দের অর্থেও। দ্র. **চর্ম্ম**। ৬. ইংরেজি touch। (ব.শ.)।

ত্বষ্ট (ত্বষ্টি), ত্বষ্টা : ১. ত্বষ্ট = ✓ত্বক্ষ্‌ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। ত্বষ্টা (ত্বষ্টৃ) = ✓ত্বক্ষ্‌ + তৃ (তৃচ্‌) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ত্বষ্ট** = *তারী-বহনের দিশাগ্রস্তশক্তি টঙ্কারিত যাহাতে।* **ত্বষ্টি** = **ত্বষ্ট** *গতিশীল যাহাতে।* **ত্বষ্টা** = **ত্বষ্ট**-*এর আধার যে।* / **ত্বষ্টা** = তক্ষণ করে যে। (ব.শ.)। ৩. **ত্বষ্ট** = তনুকৃত, কৃশীকৃত। (**ত্বষ্টি** = তনুকরণ, তক্ষণ, চাঁছা।) **ত্বষ্টা** = তক্ষণাদিব্যাপারোপেত, ত্বষ্টদেবতাক চিত্রানক্ষত্র, সূত্রধর, ছুতার, শিব, আদিত্যগণের একতম, বিশ্বকর্ম্মা। (ইনি দেবশিল্পী। ইঁহার পুত্র ত্রিশিরাঃ, কন্যা সংজ্ঞা। সংজ্ঞা তার পতি সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারায়, বিশ্বকর্ম্মা শাণযন্ত্রে ঘর্ষণ করিয়া সূর্য্যকে ক্ষীণ ও মৃদুতেজা করেন। সূর্য্যের এই ছিন্নাংশে বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, ও অন্য দেবাস্ত্রসমূহ নির্ম্মিত হয়।)। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অশ্বিনীকুমার, উত্তানপাদ**। **ত্বষ্টা** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি যে ক্রিয়াকে বোঝায়, তার থেকে বোঝা যায়, **ত্বষ্টা** হল আসলে সেই সত্তা, যে কাঠের উপর র‍্যাঁদা চালায়। তার বিশ্বকর্ম্মা নাম থেকে আমরা জানতে পারি; এই সত্তা আসলে শ্রম-নিষেককারী, **সৎপ্রকৃতির** (আসবাব বানানোর জন্য কাঠের, এবং মাটির হাঁড়ি বানানোর জন্য কাদার) গর্ভে যে বীর্য নিষেক করে। পৌরাণিক ইতিহাস অনুসারে এই **ত্বষ্টা** হলেন সূর্য্যের শ্বশুর। সূর্য্য শব্দের অর্থ যদি সমাজের কেন্দ্রীয় জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ ধারণকারী ব্যবস্থা বলে ধরা হয়, তবে তার সঙ্গে পুরাণের অধিকাংশ বর্ণনা মিলে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি ব্যাপার কিছুতেই বোঝা যায় না, সেই সূর্য্যের তেজ কমানোর যে ব্যবস্থা বিশ্বকর্ম্মা বা **ত্বষ্টা** নিয়েছিলেন, তা ঠিক কোন ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বোঝাত। কীভাবেই বা সূর্য্যের চেঁছে নেওয়া তেজ দিয়ে বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল ইত্যাদি বানানো গিয়েছিল? এবং এইসব কথার প্রকৃত অর্থ কী?

ত্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অতট, অতদ্‌গুণ, অতুর, অনাতুর, অবিতথ, আতাম্র, আতুর, ত, তই, তইও, তইরি(রী) (তৈরি বা তৈরী < ত-ইর, তখ্ম), তওবা, তঃ, তঁহ, তঁহি, তহি, তক, তকতক, তকমা, তকলিম, তকলী, ত-কার, তক্কা, তক্ত, তক্তা, তক্‌সীম, তছু, তব, তবক, তবকী, তবর্গ, তবল, তবলকী, তবলা, তবল্লক, তবহি, তবহিঁ, তবহু, তবহুঁ, তবিয়ৎ (তৎ-বিয়ৎ), বহাল-তবিয়ৎ, তবিল (তৎবিল), তবিলদারী, তবু, তভু, তবে, তমু, তয়, তয়ফা, তয়ের, তর্হি, তলা(ল্লা)ট, তলা(ল্লা)শ(স), তল্লাশি(শী), তষ্ট, তষ্টি, তসদি, তসবি(বী), তসবীর, তসলা, তসু, তস্কির (তক্‌সীর), তহকীব, তহবিল, তহরী, তহি, তহিঁ, তহু, তহ্লো, তৈয়ার, তা, তাই, তাউই, তাঐ, তাইদগির, তাইন, তাউস, তাও, তাং, তাংড়া, তাঁ, তাঁইস, তাইঁস, তাঁবা, তাঁবু, তাঁবে, তাঁহা, তাঃ, তাক(কু)ত, তাকাতি, তাকাবী, তাকি(গি)দ, তাগা, তাগাড়, তাগাদা, তাঙ্গড়, তাজ, তাজন, তাজফেনি, তাজমহল, তাজা, তাজি, তাজী, তাজিয়া, তাজ্জব, তাঞি, তাঞ্জাম, তাতা-থৈথৈ (গরম করো, থামো), তাতিনী, তাতে, তাথই (তাথৈ), তাথে, তাধিঙ্গা-ধিঙ্গা, তাধিন, তাধিয়া, তান, তানা-না, তাফ্‌তা, তাবক, তাবড়, তাবৎ, তাবিজ, তায়দাদ, তার, তারিক, তারিখ, তারিপ(ফ), তালা (খুদাতালা), তালাক, তালাস, তালিকা, তালিম, তালুই, তালুই-মশায়, তালুক, তালেবর, তাহ, তাহাঁ, তাহি, তাহে, তাহো, তাহ্না, তাহে়, তু (আ-তু, বিপরীত দিক থেকে তি-কারীকে ডাকা), তেই, তেঁ, তেঁই, তেঁএিঃ, তেঞি, তেঞী, তেন, তেনমত, তেনমন, তেনরূপ, তেনা, তেমত, তেমন, তেমতি, তেমতি, তেহ, তেহি, তেহু, তেহো, তেহোঁ, তেহেন, তৈয়ার, তো, তোতলা, তোতা, তোপচীনী, তোফা, তোবচীন, তোবড়া, তোবা, তোমর, তোয়াক্কা, ত্যামন, ৎসরু, ৎস(সা)রুক।

ত্ইয়ার (তৈয়ার), ত্ইয়ারি (তৈয়ারি), ত্ইয়ারী (তৈয়ারী > তৈরি > তৈরী) : ২. **ত্ইয়ার** = *তরণ-এর গতিশীল যাওয়া রহে যাহাতে।* **তৈয়ার** = *তরণ-ধারীর দিশাগ্রস্ত যাওয়া রহে যাহাতে।* **ত্ইয়ারি** = **ত্ইয়ার** *গতিশীল যাহাতে।* **তৈয়ারি** = **তৈয়ার** *গতিশীল যাহাতে।* **ত্ইয়ারী** = **ত্ইয়ারি**-*র আধার যে।* **তৈয়ারী** = **তৈয়ারির** *আধার যে।* **তৈরি** = *দিশাগ্রস্ত তরণ-ধারীর রহন গতিশীল যাহাতে।* **তৈরী** = *তৈরীর আধার যে।* ৩. **তইরি (তইরী)** = প্রস্তুত করা, নির্ম্মাণ, গঠন, সজ্জিত, প্রস্তুত। (ব.শ.)। ৪. to make অর্থে **তৈরি** বা **তৈরী** শব্দটি খুবই প্রচলিত। বাকিগুলি সমার্থক, কেবল ভিন্ন বানানে লেখা। ৫. বলা হয়, **তৈরী** শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে আগত। এরকম আরও বহু শব্দ রয়েছে, যাদের দেখে বিশ্বাসই হতে চায় না যে, সেই শব্দগুলি আরবি-ফারসি থেকে এসেছে। যথা — খুশি, দরকার, অদল-বদল, শুরু, গরম, গরিব, গলদ ... এরকম অজস্র। কিন্তু একটু গভীরে গেলেই টের পাওয়া যায় যে, শব্দগুলি যে উৎস থেকে জন্মেছে, সেই উৎস বাংলাভাষীর ভাষাবোধের খুব কাছাকাছি। যেকারণে শব্দগুলিকে আত্মস্থ করে নিতে বাংলাভাষীর অসুবিধা হয়নি। এক্ষেত্রে যেমন ফারসির ছিল **ত্ইয়ার**। শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ স্পষ্ট বলে দেয়, অস্তিত্বের অংশ তারিত হয়ে অন্যত্র যাওয়ার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে, প্রস্তুত রয়েছে। সেই প্রস্তুতি চলতে থাকলে তাকে বলে **ত্ইয়ারি**। যে-ক্রিয়া বা ক্রিয়াসমূহের দ্বারা সেই **ত্ইয়ারি** চলে, সেই ক্রিয়া বা ক্রিয়াগুলির আধারকে স্বভাবতই **ত্ইয়ারী** বলা যায়। বাংলাভাষী শব্দগুলির সংস্পর্শে এসে তাদের **তৈরি** বা **তৈরী**তে রূপান্তরিত করে ফেলে। তাতে অর্থের যে বদল ঘটে, উপরে ২-তে সেকথা বলা হয়েছে। দেখা যায়, তাতে অর্থ আদৌ নষ্ট হয়নি, বরং গভীর হয়েছে।

তবু : ২. *তারী বহন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. সে প্রকারেও, তাহা হইলেও, তথাপি। (ব.শ.)। ৪. yet, though ইত্যাদি অর্থে খুবই প্রচলিত। ৫. 'এত চেষ্টা করলাম, তবু ব্যর্থ হলাম।' — এরকম বাক্যে **তবু** শব্দের অর্থ 'তা সত্ত্বেও'। এরকম অর্থ হচ্ছে কীভাবে? হচ্ছে এইভাবে — আগের ঘটনাগুলির (চেষ্টাগুলির) রেশ হল ত বা তারী, সেই রেশ বহন যেদিকে যাওয়ার কথা (অর্থাৎ চেষ্টার

ফলে যা হওয়ার কথা) সেদিকে যাচ্ছে না, নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; তাই বু। সেই কারণে **তবু** শব্দের অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'যা হওয়ার কথা ছিল, তা হচ্ছে না, অন্যরকম হচ্ছে।' আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি, **তবু** শব্দের যতরকম ব্যবহার হয়, তার এখন পর্যন্ত পরীক্ষিত সবগুলিই **তবু** শব্দের উক্ত (২) ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ মান্য করে থাকে।

তবে : ২. *তারী বহন দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ৩. সেই সময়, তখন, তৎপরে, পরে, তাহা হইলে, তাহা (কারণ) না থাকিলেও, উপমায় দোষগুণের ন্যূনাধিক্যকথনে। (ব.শ.)। ৪. but, though ইত্যাদি অর্থে খুবই প্রচলিত। ৫. দ্র. **তবু**। তবু শব্দের মধ্যে প্রত্যাশার বিপরীতে ঘটনার পরিণতিকে বোঝায়। **তবে** শব্দের মধ্যে পাওয়া যায় প্রত্যাশার আংশিক পূর্ণতা, সেটা যতই কম কিংবা দিশাগ্রস্ত হোক না কেন।

তলাট (তল্লাট) : ২. ***তলাট** = **তল**-এর (তারীর লালন-লয়নের) আধার টঙ্কারিত যাহাতে। **তল্লাট** = **তল্** (তারীর লালন-লয়ন) লালিত হইয়া টঙ্কারিত যাহাতে।* ৩. প্রদেশ, অঞ্চল। (ব.শ.)। অঞ্চল, ভূভাগ, প্রদেশ, বহুদূরব্যাপী স্থান। (ব্য.বা.অভিধান, ঢাকা)। ৪. শব্দটি **তল্লাট** রূপে অধিক প্রচলিত। ৫. একটা **তল** যতদূর পর্যন্ত **লাট** খায়, ততটাই হল সেই **তল**-এর **তল্লাট**। দ্র. **লাট**।

তলাশ (তল্লাশ, তালাশ), তল্লাশি (তালাশি) : ২. ***তলাশ** = **তল**-এর (তারীর লালন-লয়নের) আশা থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, (ব্যক্তি বা বিষয়ের) **তল** খুঁজে পাওয়ার আশা থাকে যাহাতে।* ৩. অনুসন্ধান, খোঁজ। (ব.শ.)। ৪. search অর্থে প্রচলিত। ৫. বলা হয়, এ শব্দটি আরবি থেকে এসেছে। কেবল তাই নয়, শব্দটিকে নানা রকম বানানে পাওয়া যায়। এর উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ থেকেই বোঝা যায়, শব্দটি বাংলাভাষীর কাছে আদৌ বহিরাগত নয়। তবে এমন হতেই পারে, আরবি এল **তৃলাশ** নিয়ে, আর বাংলাভাষীর ছিল **তলাশ**। **তৃলাশ**-এর হাতে শাসকের শাসনদণ্ড থাকায় নিরীহ **তলাশ** ঝামেলা-ঝক্কিতে না গিয়ে **তৃলাশ**কেই আপন আসনে বসিয়ে নেয়। কিন্তু তার প্রকৃতি তাকে ছাড়ে না। তার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য **তৃলাশ**কে যথাস্থিতি গ্রহণ করতে পারে না। অগত্যা সে তাকে **তল্লাশ, তালাশ** ইত্যাদি করে নেয়। মাঝ থেকে **তলাশ** ও **তৃলাশ** দুজনেই বলতে গেলে বেপাত্তা হয়ে যায়। তাদের **তালাশ** করতেই এতক্ষণ সময় ব্যয় হয়ে গেল।

তা : ২. *তারীর আধার যে।* ৪. নানার্থে খুবই প্রচলিত। ৫. **তা** শব্দটি বাংলায় ব্যাপকভাবে এবং নানার্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এর মূল অর্থটি উপরে ২-এ দেওয়া আছে। আর, সেই অর্থটিই শব্দটির বিভিন্ন অর্থের মূলে রয়েছে। ডিমে **তা** দেওয়ার বেলায় যে **তা**, সেটি আসলে **তাপ**-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। সেই রূপটির এমন সংক্ষিপ্তকরণ সম্ভব হয়েছে এইজন্য যে, মুরগির শরীর থেকে যে তাপ ডিমে তারিত হয়ে যায়, তাকে অনায়াসে মুরগির শরীরের গরমের বা তারীর আধার বলা যেতেই পারে। গোঁফে মোচড় বা তা দেওয়ার **বেলাতেও গোঁফধারীর ইচ্ছা** তারী রূপে মোচড়-এ ঢুকে পড়ে। **সেক্ষেত্রে মোচড় তা-ই** বটে।

সংস্কৃত **তদ্ থেকেই তা** শব্দটি এসেছে বলে মনে করা হয়। ইংরেজিতে এই **তদ্**-কে বলে that। এই তদ্ হল তারীর দান। এটির আদি প্রয়োগ **ছিল এইরকম — তদ্** হল সেই রকম বিষয় বা বস্তু যা কিনা কোনো **একটি** সত্তা থেকে উপচে দ্রষ্টার সামনে এসে পড়েছে। সে তো **'তারীর দান'ই** বটে; এবং সন্দেহ নেই, সেও তারীর আধার বা **তা-ই** বটে। একে 'তা হয়ে আছে যে আধারে' সেই **তাহা-কেও** বোঝাত। ... তবে এর সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটে গানের সুরে — তা তা থৈ থৈ ... ইত্যাদিতে। দ্র. **থই**।

তু : ২. **ত** *বা তারী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৫. বিপরীত দিক থেকে তারীকে বা ত-কারীকে ডাকা হয় **তু** বলে। কুকুরকে আ-তু, তু, তু বলে ডাকা হয়। **তুমি, তুই, তু** প্রভৃতি ডাকে এই একই **তু**-এর প্রয়োগ রয়েছে বলে মনে হয়। ৬. ল্যাটিন, ফরাসি প্রভৃতি ভাষায় 'তুমি' বা 'তুই' অর্থে tu এবং জারমান du প্রচলিত।

থ

থ্ বর্ণের অর্থ : ত্-এর সঙ্গে অর্থ-হ্ যুক্ত হয়ে থ্ বর্ণটি সম্ভব হয়। সেই কারণে একে থ্-অনের একপ্রকার স্থিতিশীল রূপ বলা যেতে পারে, যা থাকন, থামন, থাপন, থুকন প্রভৃতি একই খাতের শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত হয়ে থাকে। অঃ বা অস্-এর (বা অস্তিত্বের) অ বাদ দিলে থাকে তার 'স্'-টুকু। এই স্ স্থির রূপ নিয়ে 'হ্' হয়ে গেলে সেটি 'স্থ'-তে পরিণত হয়। এই স্থ ও থ্ দুই দিক দিয়ে দেখা একই ক্রিয়ার প্রকাশক। সংস্কৃতে সেকারণেই বাংলার থ্-বর্গের সমস্ত শব্দই 'স্থ'-র অন্তর্ভুক্ত করে দেখানো হয়েছে। বাংলাভাষী কিন্তু সংস্কৃতের 'স্থ'-তে দাঁড়িয়ে থাকেনি, তারা থ-কে নিজেদের মতো করে আরও বিকশিত ও বিবর্তিত করে নিয়েছে।

ত = তারী। তারিত = তারী যেখানে থেমে গেছে = **থ**। থ্ বর্ণটি তৈরি হয়েছে (ত্ + হ্ = থ্) ত্-এর সঙ্গে হ্ জুড়ে। সেকারণে, সাধারণভাবে থ্-এর অর্থ হল ত্-অন-হওয়ন, অর্থাৎ 'ত্-অন যেখানে গিয়ে থেমে যায়'। তাই **থ** = থ্-অন করে যে অর্থাৎ ত-অন-স্থিত = থিত বা স্থিত = **থ**। এই **থ** হল ত-অনের ক্রিয়াসমাপ্তির হওয়ন বা স্থিতি রূপ। তার মানে, তারণ বললে আমরা বুঝি ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দুতে তারিত হওয়া, সেই তারণ স্থির বা থিত (থিতু) হয়ে গেলেই **থ** হয়।

মোট কথা, সত্তার নিজের দিক থেকে দেখলে, **থ** হল কোথাও গিয়ে স্থির হওয়া বা 'থেকে' যাওয়া; ক বিন্দু থেকে খ বিন্দুতে গিয়ে চুপচাপ সেঁটে যাওয়া। এই থ-এর আধারকে বলে থা। থি, থু প্রভৃতির অর্থের জন্য অতঃপর **ক** ও **ট বর্ণের অর্থ** দ্রষ্টব্য।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন সংস্কৃত ভাষা নির্মাণ করেন, তখনও পর্যন্ত জনসাধারণ্যে শব্দের ব্যবহার এখনকার মতো এত বিপুল

সংখ্যক হয়নি। এমন বহু স্বর তখনও ছিল যা তখনও দু-তিনটি বা ততোধিক স্বরের যৌথরূপ। তখনও তা ভেঙে আরও খণ্ডিত হয়ে আরও বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্তমান চেহারা পায়নি। সেই কারণে প্রাচীন কালের ভাষাগুলিতে আমরা এমন বহু বর্ণ পাই, যা দু-তিনটি স্বরের যৌগিক রূপ। গ্রীক ল্যাটিনে তার বেশ কিছু নিদর্শন রয়েছে। ইংরেজির C, D, G, T প্রভৃতি যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমাদের সংস্কৃতে, যদিও সেই সংস্কৃতভাষার সৃষ্টি কালেই, স্বর-ব্যঞ্জনের বিশ্লেষণ অনেকটাই করে ফেলা গিয়েছিল, পৃথক স্বরকে চিহ্নিত করে পঞ্চ বর্গে ৩৫টি বর্ণে ভাগ করে ফেলা গেছিল, কিন্তু সামাজিক ব্যবহারে ঘ, ছ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, থ, ফ প্রভৃতি ধ্বনি দিয়ে তখনও খুব বেশি শব্দের প্রচলন হয়নি। যে কারণে সংস্কৃত ভাষায় ঐ বর্ণগুলিতে শব্দসংখ্যা খুবই কম। সংস্কৃত অভিধানে ঘ, ছ, ফ বর্ণে কিছু শব্দ থাকলেও ঝ, ট, ড বর্ণে শব্দ রয়েছে মাত্র ২০/২৫টি করে এবং ঠ, ঢ, ও থ বর্ণে দু-তিনটির বেশি শব্দই নেই। কিন্তু মধ্যযুগে বাংলা ভাষা যখন বিকশিত হচ্ছে, তখন বঙ্গভাষীগণ তৎকালের এই অনতিব্যবহৃত বর্ণগুলিতে বিপুল পরিমাণ নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে আমাদের অভিধান ও শব্দকোষকারগণ যখন শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরে ঐ বর্ণগুলির শব্দগুলিকে সাজাতে গেছেন, পড়ে গেছেন বিপদে। একদিকে শব্দের মূলে কোনো ক্রিয়াকে যেমন খুঁজে পাননি, অপরদিকে শব্দটিকে কোন শব্দ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করবেন ঠিক করতে পারেননি। কেননা, সংস্কৃতকারদের মতো যৌথভাবে ভাষাসংস্কারের কাজ পরবর্তীকালে আর সেভাবে হয়নি। যতটুকু যা হয়েছে, সবই হয়েছে বাংলার মধ্যযুগের কবি-গায়কদের শব্দব্যবহারে। এই 'পরবর্তীকালে বিকশিত বর্ণ'গুলির মধ্যে **থ** সবচেয়ে অগ্রণী। সংস্কৃত ভাষায় **থ** বর্ণে একটিও ক্রিয়াপদ নেই। এই বর্ণে যা কিছু শব্দ সৃষ্টি হয়েছে, সবই সংস্কৃতভাষা সৃষ্টির পরবর্তীকালে। মধ্যযুগের বাংলায় তা মানুষের মুখে মুখে বিকশিত হয়েছে, এবং তা পণ্ডিতদের ইচ্ছায় হয়নি, জনসাধারণের ভাষা ব্যবহারেই তা ঘটেছে অর্থাৎ বাংলাভাষী জনসাধারণই তা ঘটিয়েছেন। কবিগণ তাকেই রূপ দিয়েছেন তাঁদের রচনায়। একই ঘটনা ঝ, ঢ, ঠ প্রভৃতি বর্ণগুলির ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

ফলে উপরোক্ত ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ ... প্রভৃতি বর্ণের ক্ষেত্রে বহু কাজ বাকি আছে, এবং আগামী যুগের শব্দকোষকারগণকে সেই বিশাল কাজ করতে হবে। আমরা বিষয়টি শনাক্ত করলাম এবং দু-চারটি দৃষ্টান্তমূলক শব্দোৎপাদন রহস্য ও তার শব্দার্থ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। পরিস্থিতি এ বিষয়ে আমাদেরকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার অবকাশ না দেওয়ায়, বলতে গেলে, আমরা কেবল বিষয়গুলি ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

অতএব সংক্ষেপে — **থ** = থ্-অন করে যে; থাকে যে; তরণস্থিত = তরিত = স্থিত = থিত = থ।

থ্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : থ্ = ০ + ১

থ্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অথ, অথচ, অথবা, অথর্ব্ব, থ, থই, থউর, থকথক, থকথকে, থকিত, থতমত, থন, থপ, থপথপ, থপথপে, থপাস-থপাস থমক, থমথম, থমথমা, থমথমে, থম্ব, থর, থরকর, থরথর, থরথরা, থরথরী, থরথরে, থরমর, থরহর, থরেহর, থল, থলকমল, থলজলরুহ, থলথল, থলথলে, থলি, থলিয়া, থলিয়াতি, থলে, থলো, থসথস, থসথসে, থা, থাই, থাউকা, থাক, থাকবস্তা, থাকা, থাকি, থাকিয়া, থাক্যা, থাড়(ড়ো), থাতা, থাতি, থান, থানইঁট, থানফাড়া-ধুতি, থানকুনী, থানা, থাপ, থাপড়, থাপড়া, থাপা, থাবড়, থাবড়া, থাবা, থাম, থামা, থামান, থামাল, থারি, থাল, থালা, থালি(লী), থালিবিথালী, থিকথিক, থিত, থিতা, থিতি, থিম, থিয়া, থির, থু, থুঁতনী, থুক, থুকথুক, থুক(কু)রা, থুড়থুড়, থুড়থুড়ি, থুড়থুড়ে, থুড়ি, থুতনি, থুতি, থুতু, থুৎকার, থুৎকুড়ি, থুত্থুড়, থুত্থুড়ি, থুথি, থুথুৎকার, থুন, থুপ, থুপি, থুব, থুবড়া, থুবা, থুরথুরে, থুত্থুরে, থে, থেই-থেই, থেঁত, থেঁতো, থেঁতলা, থেকা, থেকে, থেবড়া, থেলোহঁকা, থেহ, থেহা, থৈ, থৈকর, থৈয়াকর, থৈ-থৈ, থৈয়া-থৈয়া, থৈলী, থো, থোঁতা, থোক, থোকা, থোড়, থোড়া, থোড়াল, থোড়াথুড়ি, থোড়াথোড়ি, থোতা, থোপ, থোপনা, থোপনি, থোপা, থোব, থোবনা, থোবা, থোর, থোরি, থোল, থোলো, থ্যাবড়া, থ্যাঁৎলা। **থ্** = থাকন। **থ** = থ্-অন করে যে; থাকে যে; তরণস্থিত = তরিত = থ। অতএব **থ** = থাকে যে, অর্থাৎ স্থিত বা থিত, একালে যাকে বলা হয় 'থিতু হওয়া'।

অথ, অথচ, অথবা : ২. অথ = *অস্তিত্ব (গিয়ে) থিতু যেখানে (বা যে পর্যন্ত)।* **অথচ** = **অথ**-*এর সহিত চয়িত যে।* **অথবা** = **অথ**-*এর (মূলাধারের পাশে) বিশেষাধার যাহাতে।* **৩. অথ** = মঙ্গল, অতঃপর, আরম্ভ, প্রশ্ন, সাকল্য, অধিকার, বিকল্প, পক্ষান্তরে, সমুচ্চয়, যদি, তাহা হইলে, সেই হেতু, প্রতিজ্ঞা। **অথচ** = পক্ষান্তরে, অন্যপক্ষে, কিন্তু, তৎসত্ত্বেও, তাহা হইলেও। **অথবা** = পক্ষান্তরে, কিংবা, বা। (ব.শ.)। **৪. অথ** অপ্রচলিত। **অথচ** ও **অথবা** 'পক্ষান্তরে' অর্থে খুবই প্রচলিত। **৫. অথ** কথাটির অর্থ বুঝতে গেলে শব্দটির ইতিহাসের দিকে তাকাতে হয় এবং স্মরণ করে নিতে হয় **অত, অতএব, অতঃ, অতঃপর** প্রভৃতি শব্দগুলির অর্থকে। (দ্র. **অত্**)। তখন আমরা বুঝতে পারি, অস্তিত্ব যেখানে তারিত হয়, সে পর্যন্ত **অতঃ**; কিন্তু তারণ থেমে গেলে হয়ে যায় **অথ**। শব্দটির অতীত রূপ ছিল **অথঃ (অথস্)** এবং **অথো**। তিনটিই এক কথার তিনটি রূপ। এর মানে, 'অস্তিত্বের স্থিতির নির্য্যাসত্যাগ থাকে যাহাতে'; অর্থাৎ, 'এ-পর্যন্ত তো এই হল, এর পর কী, তাই বলো।' তার মানে, **'অতঃপর'** শব্দেরই একটি রূপ হল **অথঃ**। পার্থক্য এইযে, **অতঃপর**-এর বেলায় অস্তিত্বের তারণ চলমান এবং তার পরের কথা সরাসরি কথিত; আর, **অথঃ**-র বেলায় অস্তিত্ব থেমে গেছে এবং তার পরের কথা বলা হয়েছে তার উচ্চারণ উহ্য রেখে। এই **অথঃ** শব্দই বিসর্গহীন হয়েছে, আর তার অর্থ দাঁড়িয়েছে, 'অস্তিত্ব যেখানে থেমে গেছে ...'। এই ফাঁকা জায়গাটায় একটি জিজ্ঞাসার স্থান উহ্য রেখে দেওয়া হয়েছে — 'এর পর?' ফলে, **অথ** শব্দের মানে দাঁড়িয়ে গেছে, 'অতঃপর'। ইংরেজিতে upto that = at বললে যে ব্যাপারটি বোঝানো যেতে পারে, **অথ** যেন ঠিক তাই। সেই **অথ**-র সঙ্গে

'এবং কিছু' (চ = চায়িত কিছু) যুক্ত হলে **অথচ** ('এ পর্যন্ত এবং') হয়; আমরা 'এতৎসত্ত্বেও' পরের কথায় যাওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারি। আর, **অথ**-র পরে বা-কে (= বিশেষাধারকে) ডাকলে তো কথাই নেই, **অথ**-র যে মূল আধারের ধারা, তার থেকে আমরা পাশেই রাখা বিশেষ আধারের ধারায় চলে যেতে পারি। ...

অথচ, অথবা শব্দের মতো সংস্কৃত **অব্যয়** শব্দগুলি বাংলাভাষায় **হুবহু** ব্যবহৃত হয়, এবং সব বাংলাভাষীই তা অনায়াসে ব্যবহার করে থাকেন। তাঁদের কাউকে যদি বলা হয়, 'আপনি সংস্কৃত ভাষায় কথা বলছেন', তিনি অবাক হয়ে যাবেন। অথচ উপরোক্ত দুটো শব্দই তাদের দেহে-আত্মায় (উচ্চারণে, বানানে, ও অর্থে) আদিতে যা ছিল এখনও **হুবহু** তাই-ই আছে। কোনো ব্যয় হয়নি তাদের। অর্থাৎ সংস্কৃত বাংলায় এসেও **হুবহু** সংস্কৃত রূপেই আছে। দ্র. **অব্যয়**। **৬.** Avesta - atha।

অথর্ব্ব (অথর্ব্বন্) : **১.** অথ + ✓ঋ (গতি) + অন্ (বনিপ্)। (ব.শ.)। **২.** *অতঃপর (**অথঃ**) আর যেসকল গতিশীল বাহকাদি অন (**অর্ব্বন্**) থাকে।* **৩.** ঐহিকমঙ্গলকর মন্ত্রস্বরূপ বেদবিশেষ, চতুর্থবেদ। (ইহার মন্ত্রসমূহ পীড়াদুর্দৈবশান্তি ও শত্রুমারণাদির উপযোগী ঐহিকফলপ্রদ যজ্ঞে প্রযুক্ত হয়, সোমযাগাদিতে ইহাদের প্রয়োগ হয় না; এইজন্য ইহাদের নাম 'অথর্ব্বা'। ... বেশির ভাগ প্রাচীন গ্রন্থে তিন বেদের উল্লেখ আছে, অথর্ব্ববেদের উল্লেখ নাই। অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র। বশিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ। (ব.শ.)। **৪.** উত্থানশক্তিরহিত, গতিশক্তিহীন, অতি বৃদ্ধ অর্থে প্রচলিত। **৫.** আমাদের দেশের প্রাচীন জ্ঞানী মানুষেরা সমাজের সমস্ত জ্ঞানকে কীভাবে বুঝতেন এবং বিন্যস্ত করে রাখা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করতেন, চারটি বেদকে একত্রে দেখলে সেকথা বুঝতে পারা যায়। একটি সমাজের সমস্ত অর্জিত জ্ঞানকে **বেদ** বলা হত। সেই বেদকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেছিলেন তাঁরা। তার মধ্যে প্রথম তাত্ত্বিক অর্জন (theoretical achievement), দ্বিতীয় প্রায়োগিক অর্জন (practical achievement), তৃতীয় সামঞ্জস্যমূলক অর্জন (relative achievement)। এর পরও যদি কিছু পড়ে থাকে, তাকে তাঁরা বাদবাকি অর্জন (residuary achievement) বলে মনে করতেন। তাঁদের মতে, এগুলি হল অতঃপর (**অথ**) যে সকল **অর্ব্বন** (গতিশীল বাহকাদি অন) রয়েছে। অর্জন বা জ্ঞান মাত্রেই মানুষের ইচ্ছার গতিশীল-বাহক বা **অর্ব্ব**। সেই কারণে এগুলির নাম **অথ্** + **অর্ব্বন্** বা **অথর্ব্ব**। প্রাচীন ভারতের তাত্ত্বিক অর্জনসমূহকে বলা হত ঋগবেদ, প্রায়োগিক অর্জনসমূহকে বলা হত যর্জুব্বেদ, সামঞ্জস্যমূলক অর্জনকে বলা হত সামবেদ, এবং বাদবাকি যেসকল অর্জন ছিল সেগুলিকে একত্রে বলা হত **অথর্ব্ববেদ**। বাদবাকি বলেই, অথর্ব্ববেদের সূক্তগুলিকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে পরে পরে সাজান হয়েছে বলেই মনে হয়।

থই, থই-থই (অথৈ, থৈ, থৈ-থৈ, তাথৈ, তা-তা-থই-থই, তাতা-থৈথৈ) : **২.** *থই = থ (থিতু) গতিশীল যাহাতে। থই-থই = থই-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। থৈ = থ-এর দিশাগ্রস্ত ধারী যে।* **৩. থই**, **থৈ** = জলাশয়ের তল, **তলা, আশ্রয়, কূল**। **থই-থই করা** = প্রচুর জলে ভরপুরভাব **প্রকাশ করা**। **তাতা-থৈ-থৈ** (তাতা-থেই-থেই) = নৃত্যের বোল। (ব.শ.)। **৪. নাচের তাল** বোঝাতে এবং জলাশয়ে টইটম্বুর জল বোঝাতে **থই শব্দটি** নানা ভাবে প্রযুক্ত হয়। **৫.** জলের আধার পূর্ণ হলে তার থেকে জল উপচে পড়ে। জলাধারের কেন্দ্রস্থল থেকে পরিধির দিকে উপরিতলের জল তরে যেতে থাকে, জলের এইরূপ তারিত হওয়াকে **ত** বলে। এর গতিশীলতাকে বক্ররেখায় আঁকা হয়, যাকে **'তরণশীল অঙ্গধারী'** বা **তরঙ্গও** বলে। এরই অপর নাম 'তারীর আধার যে', অর্থাৎ **তা**। গামলা ভর্তি জলে উপর থেকে চাপড় মারলেও এইরকম **তা**-এর জন্ম হয়। এই তরঙ্গ ঈষৎ উচ্চনীচ ভাবে এগোতে এগোতে চলে। এগোতে এগোতে যেখানে সে একটু থেমে বা থিতু হয়ে উপর দিকে ওঠে, তরঙ্গের বা ঢেউয়ের সেই বিশেষ অবস্থাটিকে **থই** বলে। **থই-থই জল** মানে, জল যেখানে তরঙ্গায়িত হতে হতে মাঝে মাঝে উচ্চমুখী অবস্থানে স্থির বা থিতু ও উর্ধ্বমুখী হয়। দাঁড়িয়ে গতিশীল হওয়া মানে উপর দিকে বাড়া। জলতরঙ্গের চলার মাঝে মাঝে এইরূপ থিতু হয়ে গতিশীল হওয়া মানে উপর দিকে ওঠা, তাকেই **থই** বলে। অতএব, এককথায় জলের উপরিতলের সমতল অংশগুলিকে **তা** এবং জলের উপরিতলের চূড়া অংশগুলিকে **থই** বলে। এই **তা** ও **থইকে** রেখাচিত্র রূপে বুঝতে হলে ই-বর্ণের উপরের শিখাটি বড় করে এঁকে ফেলুন। এর টানা (হরাইজন্টাল) অংশটি হল **তা**-এর রেখাচিত্র-রূপ, এবং আকাশমুখী শেষ অংশটি হল **থই**-এর রেখাচিত্র-রূপ।

জলের গভীরতা অনেক বেশি থাকলে এই **থইকে** ছোঁয়ার আগেই জলচর প্রাণী বা মানুষ ডুবে যায়। জলের **থই** বা **থৈ**-কে সে ছুঁতে পারে না। তখন এইরকম জলকে আমরা **অথৈ** জল বলি। অনেকে মনে করেন, 'থৈ পায় না' মানে পায়ের নীচে তল পায় না, তা কিন্তু ঠিক নয়। **থই** থাকে জলের উপরিতলে। জলের উপরিতলে **তা** (তারীর আধার) বা 'তরণশীল জলের রেখা', যা কিনা উচ্চমুখী অবস্থানে মাঝে মাঝে থিতু হয়, সেই **থই** বা **থৈ**-কে না পাওয়া গেলে, তবেই বলতে হয় **অথৈ**। আর, এই **থইটাকে** পাওয়া যায় না মানুষটা পায়ের নীচে তল না পাওয়ার কারণে ডুবে যায় বলে। তার মানে, গভীর জলকে মানুষ যখন জলে নেমে পায়ের দিক থেকে বা নীচের দিক থেকে মাপে এবং তলকে পা দিয়ে ছুঁতে পারে না, তখন তাকে **অতল** জল বলে; **অথৈ** জল বলে না। আর, যখন জলকে উপর দিকে মাপে এবং তল না পাওয়ায় ডুবে যাওয়ার কারণে উপর দিকে থাকা **থই** বা **থৈ**-কে ছুঁতে পারে না, তখন তাকে বলে **অথৈ** জল। অর্থাৎ জলাশয়ের জল যদি মানুষের মাপের বেশি হয়, মানুষ যদি তাতে ডুবে যায়, তবে সে অতল জল হতে পারে, **অথৈ** জলও হতে পারে। পার্থক্য এই যে, 'অতল-জল' হল ডুবন্ত মানুষের পা দিয়ে মাপা জল এবং **'অথৈ জল'** হল ডুবন্ত মানুষের হাত দিয়ে মাপা জল। আর, **থৈ** বা **তল** যে পাচ্ছে, সে বলতে পারে, তার দাঁড়ানর জায়গায় কয় হাত জল আছে।

সুরধারা যে কূলে-কূলে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মাঝ দিয়ে কুলকুল করে বয়ে যেতে থাকে, সেই তীরভূমিকে **তাল** বলে। সেই তালের দুনিয়াতেও **তাথৈ**-এর ব্যাপারটি ঘটে একই ভাবে। সুরের বিশেষ

স্তরে 'তরণশীল অঙ্গধারী'ই হল তা; আর, **থই** হল তা থেকে বেরিয়ে থেমে গিয়ে যে-সুরধারা উচ্চতর স্তরের দিকে উঠে সেই উচ্চতর সুরস্তরকে ছুঁয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, 'মম চিত্তে, নিতি নিত্যে, তা-তা থৈ-থৈ, তা-তা থৈ-থৈ', তখন একই সঙ্গে চারটি দুনিয়াতে ক্রিয়াটি সমান্তরালভাবে চলতে শুরু করে। প্রথম হল, তাঁর চিত্ত-সরোবর, যেখানে উপর থেকে তাঁর মন সেই সরোবরের উপরিতলে **তা-থৈ** করে নাচছে। দ্বিতীয় হল, শব্দের দুনিয়ায় তাঁর গানের শব্দগুলি তা-তা থৈ-থৈ বলে উচ্চারিত হচ্ছে। তৃতীয় হল, তবলার বোল চিত্তের নৃত্যের সমান্তরালে তা-তা থৈ-থৈ তালসঙ্গত করছে। চতুর্থ হল, সেই চিত্তের নৃত্যের সমান্তরালে বাস্তবে কোনো নৃত্যশিল্পী **তাতা-থৈ-থৈ** নাচছে।

থক (থকথক, থকথকে, থাক, থাকবস্তা, থাকা, থাকি, থাকিয়া, থেকে) : ২. ***থক*** *= **থ** (থিতু) করে যে।* ***থকথক*** *=* ***থক****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***থকথকে*** *=* ***থকথক*** *দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ***থাক*** *=* ***থক*** *হইতে জাত।* ***থাকবস্তা*** *=* ***থাক*** *কৃত বস্তা যাহাতে।* ***থাকা*** *=* ***থাক****-এর আধার যে।* ***থাকি*** *=* ***থাক*** *গতিশীল যাহাতে।* ***থাকিয়া*** *=* ***থাক*** *গতিশীল হইয়া যায় যাহাতে।* ***থেকে*** *=* ***থাকিয়া*** *দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ৩. **থকথক** = তরল দ্রব্য জ্বালে ঈষৎ ঘন হইলে, তাহার ফুটিয়া উঠার শব্দ। **থাক** = স্তবক, গুচ্ছ, শ্রেণী, নহর, নর, স্তর, পরত, অন্তরাল, আড়াল, ভাগ, সা'র; অবস্থান করা, বিদ্যমান থাকা, বাস করা, জীবিত থাকা, অবশিষ্ট থাকা, অপেক্ষা করা, বিলম্ব করা, উদ্বৃত্ত হওয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা, গণনার বহির্ভূত হওয়া, থামা, ক্রোধ শমিত করা, সংশ্লিষ্ট হওয়া, কিছুক্ষণ থামা, অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে 'নিত্য' 'প্রায়' 'সম্ভাবনা' ইত্যাদি অর্থসূচক। **থাকবস্তা** = জমির সীমা পরিমাণ কর প্রজা ইত্যাদি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক গ্রামের সমস্ত জমির জরিপ। **থাকা** = অবস্থান, বাস। **থাকি** (থাকিয়া, থাক্যা, থেকে) = অবস্থান করিয়া, (গৌণভাবে) বিশ্লেষার্থক ক্রিয়াযোগে ব্যাপকভাবে অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি — 'হইতে'। অপেক্ষার্থে পঞ্চমী — 'হইতে'। (ব.শ.)। ৪. **থক** অপ্রচলিত, বাকি সবগুলিই 'স্থিত' বা static অর্থের নানা ধরনের প্রকাশক রূপে প্রচলিত। ৫. **থ** মানে স্থির, স্থ-হয়ে আছে যে, অর্থাৎ থিতু। তাহলে, **থ** বা থিতু করণ চলে যে ক্রিয়ায় তাকে বলে **থক**। যে কোনো কারণেই হোক, **থক** শব্দটির প্রচলন দেখা যায় না; কিন্তু **থকথক** কিংবা **থকথকে** শব্দটির প্রচলন রয়েছে। এগুলির অর্থ হল, থিতুকরণ চলছে এমন পরিস্থিতিকে শব্দদুটি প্রকাশ করছে। এই থিতুকরণ প্রক্রিয়াটি শেষ হয়ে গেলে, **থক** হয়ে যায় **থাক**। এটি কাপড়ের **থাক** হতে পারে, **থাকে থাকে** সাজানো অন্য যেকোনো বস্তু হতে পারে, এমনকি একটি বস্তির জমির সীমা, পরিমাণ, খাজনা, এবং সেই জমি ভোগদখলকারী প্রজা — এদের সকলকে **থাকে থাকে** সাজিয়ে থিতু করে রাখাও হতে পারে। এমনকি এই **থক** যদি **থকে** যাওয়া (হিন্দিতে যাকে বলে 'থক্ গিয়া') বোঝায়, আমরা বলি — **থাক**, আর করতে হবে না, একটু বিশ্রাম করে নাও। এই **থাকা** অবস্থার উপর ভিত্তি করে কোনো কিছু করলে, তখন তাকে বলে **থাকিয়া** বা **থেকে**। ৬. ইংরেজি thaw, stack, stock।

থতমত : ২. ***থ*** *(থিতু বা স্থিত) তারিত যাহাতে এবং* ***ম*** *(সীমা) তারিত যাহাতে।* ৩. স্থিতের মত, স্তব্ধ, স্থির। (ব.শ.)। ৪. hesitating অর্থে খুবই প্রচলিত। ৫. তারিত বা তারী থামে যাহাতে, তাকে **তথ** বলে। (দ্র. **তথা, তথ্য**)। উল্টো যদি হত, আমরা বলতাম থামিত বা থিতু তরে যাহাতে, তাকে **থত** বলে। তার মানে, আপনি একটি 'স্থির বিষয় বা বস্তু'কে (থ-কে) স্থির-অবস্থাতেই নিয়ে এগিয়ে চলেছেন (ত)। এটি বাহ্যবস্তু হতে পারে, মানসবস্তু (বিশেষ ধারণাখণ্ড) হতে পারে। এই হল **থত**। আবার, এমনও হতে পারে যে, আপনি যেটি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন (ত), সেটিকে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয় ভেবে আপনি নিজেকে খানিকটা সঙ্কুচিত বা সীমায়িত (ম) করে ফেললেন। ফল এই দাঁড়াল যে, আপনি **থত** নিয়ে এগোচ্ছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে নিজেকে সীমায়িত বা **মত** করে ফেললেন। একেই বলে **থতমত**। দ্র. **কাচুমাচু**।

থন (থান, থানইঁট, থানকুনী, থানা) : ২. ***থন*** *=* ***থ্*** *(থিত হওয়া) অন যাহাতে।* ***থান*** *=* ***থন*** *হইতে জাত।* ***থানইঁট*** *=* ***থান*** *স্বরূপ যে* ***ইঁট****।* ***থানকুনী*** *=* ***থান কু*** *রূপে অন থাকে যে আধারে।* ***থানা*** *=* ***থান****-এর আধার যে।* ৩. **থান** = স্থান, জায়গা, নিকট, কাছ, দেবতার অধিষ্ঠিত স্থান, এক তানায় বোনা অখণ্ডিত অখণ্ডিত বস্ত্র, সাদাপাড় ধুতি, থানফাড়া ধুতি, অখণ্ড, এক, গোটা। **থানকুনী** = বন্য শাকবিশেষ (Hydrocotyle asiatica)। **থানা** = স্থান, জায়গা, দেশ, আশ্রয়স্থান, আড্ডা, চৌকির স্থান, প্রহরীর আড্ডা, সৈন্যসমাবেশ স্থান, ছাউনি, পুলিশের চৌকি বা আড্ডা (police station)। (ব.শ.)। ৪. সব শব্দগুলিই যথার্থে প্রচলিত। ৫. **থন** শব্দটি সেই সমস্ত স্থানকে বোঝাতে গ্রামবাংলায় প্রচলিত রয়েছে, যেখানে কেউ জমা হয়। এমনকি দুধ জমা হয় বলে গরুর স্তনকেও **থন** বলে। কিন্তু শব্দটিকে কোনো অভিধানেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই **থন** থেকেই **থান** শব্দটি প্রসূত হয়েছে, কেননা সেখানে মানুষজন বা অন্য কেউ থাকতে পারে বা থাকে। দেবতা যেখানে থাকে সেই স্থানকে তাই দেবতার **থান** বলে। **থান**-এর আধারকে **থানা** বলাই সঙ্গত। পুলিশ যেখানে থাকে, সেই স্থানকে পুলিশের **থানা** বলে। কিন্তু **থানকুনী** শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থবাহী। এতে বন্যশাক-বিশেষের গুণের কথা, অর্থাৎ শাকটি কী ক্রিয়া করে তার কথা বলা হয়েছে; যেমন **কায়স্থ** বলা হয় আমলকীকে, সেইরকম। মানবশরীরের পাচক-অগ্নির যে **থান**, সেখানে অগ্নির আধিক্য যেমন ভাল নয়, অগ্নির অভাবও ভাল নয়। অর্থাৎ, মানবশরীরের পাচকাগ্নির **থান** উত্তপ্ত হওয়া যেমন ভাল নয়, তেমনি ঠাণ্ডা হওয়ায় ভাল নয়; ভাল হয় যদি তা '**কুনকুনে**' গরম থাকে। শব্দটি ঈষদুষ্ণ বোঝাতে খুবই ব্যবহৃত হয়। **থানকুনী** শাক মানবশরীরের পাচকাগ্নির **থান**কে উত্তপ্ত হতে দেয় না, ঠাণ্ডাও হতে দেয় না, কুনকুনে গরম রাখে, সেই কারণে তাকে **থানকুনী** বলে। ৬. ইংরেজি stun।

থপ (থপথপ, থপথপে, থপাস-থপাস, থাপ, থাপড়া, থাপড়ান, থাপ্‌পড়, থাপা, থাপাথাপি, থাব, থাবড়া ... ইত্যাদি) : ২. ***থপ*** *=* ***থ*** *(থিতু বা স্থিতাবস্থা) পালিত যাহাতে।* ***থপথপ*** *=* ***থপ****-*

এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ***থপথপে*** *=* ***থপথপ*** *দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ***থপাস-থপাস*** *= থপাস (**থপ**-আধারের নির্য্যাসত্যাগ) এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***থাপ*** *=* ***থপ*** *হইতে জাত।* ***থাপড়া*** *=* ***থাপ****-এর গড়ান-উড়ানের আধার যে।* ***থাপড়ান*** *=* ***থাপড়া*** *অন যাহাতে।* ***থাপ্‌পড়*** *= যাহার দ্বারা **থাপ** পড়ে।* ***থাপা*** *=* ***থাপ****-এর আধার যে।* ***থাপাথাপি*** *=* ***থাপা*** *ও থাপি (**থাপ** গতিশীল যাহাতে)।* ***থাব*** *=* ***থব*** *(থিতু বা স্থিতাবস্থা পালন করে যে) হইতে জাত।* ***থাবড়া*** *=* ***থাব****-এর গড়ান উড়ানের আধার যে।* ***থাবড়ান*** *=* ***থাবড়া*** *অন যাহাতে।*... **৩. থপ** = হঠাৎ বসার ভাব, কাদার মতো নরম জিনিশের পড়ার শব্দ। **থপথপ, থপথপে** = স্থবিরের ধীর-দুর্ব্বল পদক্ষেপের ভাব, গমনে পায়ের থাবার শব্দ। **থপাস-থপাস** = স্থবিরের ন্যায় ধীরদুর্ব্বল পদক্ষেপের ভাব। **থাপ** = স্থাপন করা, রাখা, নিবিষ্ট করা। **থাপড়, থাপড়া, থাবড়, থাবড়া** = চাপড়, চড় (slap), (আদরে, শিশুর নিদ্রায়) মৃদু করাঘাত (pat, tap)। **থাপড়া, থাবড়া** (থাবড়ি) = থাবড় মারা, চড়ান, থাপড়ান, অবনত, চেপ্টা (নাক), উপবেশনে ভূমিতে পাছার ভর। **থাপা, থাবা** = উবুড় করতল বা কোষ, থাবার আঘাত, শ্বাপদের সম্মুখের সনখ পদাংশ, শ্বাপদের থাবার আঘাত, শ্বাপদের পদচিহ্ন। **থাপ্‌পড়, থাপ্‌পোড়, থাবড়, থাবড়া** = থাপড়। (ব.শ.)। **৪.** নানার্থে শব্দগুলি যথেষ্ট প্রচলিত। **৫.** ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। **৬.** ইংরেজি stop।

থমক (থম, থমথম, থমথমা, থমথমে, থাম, থামা, থামান, থিম) : ২. থম *=* ***থ*** *(থিতু বা স্থিতাবস্থা) সীমায়িত যাহাতে।* ***থমক*** *=* ***থম*** *করে যে।* ***থমথম*** *=* ***থম****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***থমথমা*** *=* ***থমথম****-এর আধার যে।* ***থমথমে*** *=* ***থমথম*** *দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ***থাম*** *=* ***থম*** *হইতে জাত।* ***থামা*** *=* ***থাম****-এর আধার যে।* ***থামান*** *=* ***থামা*** *অন যাহাতে।* ***থিম*** *= গতিশীল **থ** সীমায়িত থাকে যাহাতে।* **৩. থমক** = ঠমকবাদ্য, স্তম্ভন, মন্থরভাব; স্তব্ধ হওয়া, গতিরোধ করা, দাঁড়ান, থামা। **থমথম** = নাচার জন্য শব্দ। **থমথমা** = স্রোতের থামা-থামা ভাব, প্রায় স্রোতোহীনতা। **থমথমে** = থামা-থামা, বাড়তি-রহিত, নিস্তব্ধ, নিঝুম। **থাম** = স্তম্ভ, ইঁটপাথরের খুঁটিবিশেষ, স্তব্ধ হওয়া, স্থির বা নিশ্চল হওয়া, বন্ধ হওয়া (কান্না, গোল, ঝড়, বৃষ্টি), অপেক্ষা করা, শান্ত হওয়া, বিরত হওয়া। **থামা** = স্তব্ধ করা, স্থির করা, থামান। (ব.শ.)। **৪.** সবগুলি শব্দই কমবেশি প্রচলিত; তবে **থিম** শব্দটি ইংরেজি শব্দের আত্মীকরণ করা রূপ হিসেবে প্রচলিত। **৫.** 'শুনে থ হয়ে যাওয়া' বাংলা ভাষার সহজ স্বাভাবিক বাক্যাংশ। 'থম মেরে বসে থাকা' শব্দবন্ধটিও বাংলাভাষায় একটি প্রচলিত শব্দবন্ধ; যদিও কোনো বাংলা অভিধানেই শব্দটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এই **থম** মানে 'থিত বা স্থিত যেখানে সীমায়িত হয়ে গেছে'; যেন-বা পায়ে হেঁটে চলা মানুষটি হাতপা-বাঁধা বন্দী হয়ে গেছে। এই **থম** থেকে জাত শব্দ হল **থাম**। অর্থাৎ কিনা, **থম** করার ফলস্বরূপ **থাম** জন্ম লাভ করেছে। এরপর যে-কোনো সত্তাকে **থাম** করতে থাকলে **থাম অন** হয় বা **থামান** হয়। **থাম**-এর আধার তাই **থামা**। কিন্তু **থম** যদি তার বন্দী অবস্থায় বসে না থেকে সে যদি সেই বাঁধা অবস্থাতেই গড়াতে শুরু করে, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়ম অনুসারে তাকে বলতে হবে **'থিম'**। না, এই থিম বাংলাভাষায় প্রচলিত নয়, রয়েছে ইংরেজিতে — theme। একটি চলমান ধারণা আর চলমান না-থেকে স্থিত হয়ে যুক্তিবন্দী হয়ে (হাতপা-বাঁধা হয়ে) যাওয়ার পর যদি গড়াতে শুরু করে, তাকে বলে theme। দুর্গাপূজার থিম নিয়ে একালে কত ব্যাপারই না হচ্ছে। দ্র. **ঝিম**। **৬.** ইংরেজি stamp, theme।

থর (থরথর, থরথরা, থরহর, থরহরি, থারি, থির) : ২. থর *=* ***থ*** *(থিতু) রহে যাহাতে।* ***থরথর*** *=* ***থর****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***থরথরা*** *=* ***থরথর****-এর আধার যে।* ***থরহর*** *=* ***থর*** *ও* ***হর*** *(হ্ন রহে) যাহাতে।* ***থরহরি*** *=* ***থরহর*** *গতিশীল যাহাতে।* ***থারি*** *=* ***থার*** *(**থর** হইতে জাত) গতিশীল যাহাতে।* ***থির*** *= গতিশীল **থ** রহে যাহাতে।* **৩. থর** = স্তর, স্তবক, পরত, থাক, শ্রেণী, সার, নহর, বলি। **থরথর** = ভয়ে বা শীতে কাঁপা, দ্রুতকম্পনের ভাব। **থরথরা** = কম্পিত হওয়া, কাঁপা, ভয়াদিতে বিহ্বল হইয়া কাঁপা। **থরহর** = কম্পিত হওয়া, দ্রুতকম্প-প্রাপ্ত হওয়া। **থারি** = থালা। **থির** = স্থির, অচঞ্চল, প্রবাহহীন, অনিমেষ, শান্ত, অনাকুল, অস্খলিত, নির্দ্ধারিত, সুস্থ। (ব.শ.)। **৪. থারি** শব্দটি মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল, এখন তার প্রচলন দেখা যায় না; বাকি শব্দগুলি কমবেশি প্রচলিত। **৫.** 'পাহাড়টা তরতর করে কাঁপছে' এবং 'স্রোতোস্বিনীর জল থরথর করে বইছে' — এই বাক্য দুটি, যেকোনো বাংলাভাষীই বলে দেবেন, নিঃসন্দেহে ভুল। কেননা, কঠিন বস্তু 'তরতর' করে কাঁপে না, এবং তরল বস্তু 'থরথর' করে প্রবাহিত হয় না। কেন হয় না? কারণ, **তর** বা 'তারী (ত)' স্থির বস্তুতে 'রইতে (র)' পারে না, এবং **থর** বা 'থিতু (থ)' তরল বস্তুতে 'রইতে (র)' পারে না। অতএব, পাহাড় নিজের জায়গায় স্থির (থ) থেকে কাঁপে কিন্তু স্থান বদলায় না বলেই **থরথর**; এবং নদীজল জায়গা বদল করে প্রবাহিত হয় এবং স্থান বদল করে তাই **তরতর** করে প্রবাহিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে র-এর স্বভাব নিয়ে প্রশ্ন আসে। সে কেমন রহন (র), যে কিনা স্থির বস্তু এবং অস্থির বস্তু উভয়ের আধার হতে পারে? এর উত্তর আমরা পাই **র-বর্ণের অর্থে**। তাতে জানা যায় যে, রহনের এলাকা অতিরক্ষণ (পূর্ণস্থিতি) ও অরক্ষণ (পূর্ণগতি) — এর মাঝের অংশে চলাচল করা। ফলে, র-এর মধ্যেই একরকম ছটফটানি বিদ্যমান।

তাহলে দাঁড়াল এই যে, **থর** শব্দের অর্থ হল 'যে থিত-সত্তা অস্থিরভাবে রহে'। স্বভাবতই **থরথর**-এর বেলায় সত্তাটির **থর** ক্রিয়া বারংবার চলতে থাকে। কিন্তু **থরহর**-এর বেলায় একবার **থর** হয়, একবার **হর** হয়; অর্থাৎ, প্রথমবার স্থির খাড়াই অবস্থাতেই মাথার দিক থেকে নড়ে যায়, দ্বিতীয়বার স্থির অবস্থায় সে ফিরে আসে। এরকম বারংবার চলতে থাকলে তাকে বলে **থরহরি** কম্পমান হওয়া। তবে **থারি** আর **থালি** আসলে একই কথা। কেন, সেকথা পরে **থালি** শব্দে ব্যাখ্যা করছি। আর, **থির** ও **স্থির** একই কথা। পার্থক্য এই যে, **স্থির**-এর বেলায়, 'অস্তিত্বের হওয়ন (স্থ) গতিশীল ভাবে রহে'; আর, **থির**-এর বেলায় অস্তিত্বের (স্) কথাটি থাকে উহ্য, তারী সত্তা তারিত হয়ে এসে স্থৈর্য্য লাভ করে বলেই তাকে **থির** বলা হয়। **৬.** ইংরেজি Thor, Torah।

থল (থলথল, থলি, থলিয়াতি, থলো, থাল, থালা, থালি, থালী, থালিবিথালী) : ২. ***থল*** *=* ***থ*** *(থিতু) লালিত যাহাতে।* ***থলথল*** *=* ***থল****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***থলি*** *=* ***থল*** *গতিশীল যাহাতে।* ***থলিয়াতি*** *=* ***থলি*** *যাইয়া গতিশীলভাবে তারিত হয় যাহাতে।* ***থলো*** *=* ***থল*** *নবরূপে উত্তীর্ণ আধার রূপে থাকে যাহাতে।* ***থাল*** *=* ***থল*** *হইতে জাত।* ***থালা*** *=* ***থাল****-এর আধার যে।* ***থালি*** *=* ***থাল*** *গতিশীল যাহাতে।* ***থালী*** *=* ***থালি****-র আধার যে।* ***থালিবিথালী*** *=* ***থালি*** *ও বিথালী (বিপরীত* ***থালী****)। /* **থলিয়াতি** = চোরেরা যাহার ঘরে অপহৃত দ্রব্য রাখে। (ব.শ.)। **৩. থল** = স্থান, নিকট, ভূমি, তট, ডেঙ্গা। **থলথল** = স্থূলতা হেতু শিথিল মাংসের স্পন্দনভাব, স্পন্দন, কম্পন। **থলি** = বস্ত্রাদির আধারবিশেষ, ঝুলি। **থলিয়াতি** = থলেট। **থলো** = 'থলির মত', গুচ্ছ, থোকা, গোছা। **থাল, থালা, থালি, থালী** = পিতলের বা কাঁসার গোল পাত্রবিশেষ, ছোট থালা, পাকপাত্র, হাঁড়ী। **থালিবিথালী** = স্থানে-অস্থানে, যেখানে-সেখানে। (ব.শ.)। **৪.** প্রতিটি শব্দই যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** গ্রামবাংলায় **থল** কথাটি খুবই প্রচলিত। বিশেষত জল থেকে ডাঙায় ওঠার সময় এরকম বাক্য বলা হয় — 'যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি, দেখছ না, **থল** পাচ্ছি না, উঠব কী করে!' মনে হতে পারে, এ বুঝি **তল** শব্দের ভুল প্রয়োগ। তা নয় কিন্তু। এটি স্পষ্টভাবে **থল** এবং এর অর্থ পায়ের তলায় মাটি বা স্থল (**থল**) পাচ্ছে না কথক। **থলিয়াতি** বা **থালিবিথালী** কথা দুটি কম প্রচলিত। তবে **থালী** কথাটি থালী রূপেই বেশি প্রচলিত, যদিও কোথাও কোথাও কদাচিৎ **থারি** (বা **থারী**) শোনা যায়। **৬.** ইংরেজি stall (= দাঁড়ানর জায়গা), still (= গতিহীন)।

থিক (থিকথিক) : ২. ***থিক*** *=* ***থ****-কে (থিতুকে) গতিশীল করে যে।* ***থিকথিক*** *=* ***থিক****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **৩. থিকথিক** = ঘৃণাজনক কীটের সমাবেশে পরিপূর্ণভাব। (ব.শ.)। বিতৃষ্ণাজনক পদার্থ বা ক্ষুদ্র জীবের রাশীকৃতভাবে একত্র অবস্থানজ্ঞাপক। (ব্য.বা.অভিধান, ঢাকা)। **৪. থিক** অপ্রচলিত, কিন্তু **থিকথিক** 'ঘিঞ্জি' অর্থে খুবই প্রচলিত। **৫.** থিতুকে বা স্থিতাবস্থাকে (= থি-কে) গতিশীল করা (= **ক**) মানে হল, তার স্থিতাবস্থাকে বাড়ানো, **থিক** করা। স্থিতাবস্থাকে বাড়ালে বা **থিক** করলে, সত্তাটি আপন কেন্দ্রের দিকে ক্রমে সঙ্কুচিত হয়, ঘন হয়। (এবং চরম সঙ্কোচন ঘটলে নিশ্চয় সে তথাকথিত '**ব্ল্যাকহোল**'-এর মতো আপন কেন্দ্রে আপনিই লীন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তা যাক।) বস্তুর অন্তর্নিহিত এরকম আচরণকে **গিজগিজ** করাও (গিজিগিজি, গিজ্জিগিজ্জি করাও) বলে। তাহলে তো **গিজগিজ**-করা ও **থিকথিক**-করা সমার্থক! হ্যাঁ, দুটি শব্দই ঘনত্ব-বৃদ্ধির কথা বললেও, তাদের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য রয়েছে। বস্তুর কেন্দ্রে যেন-বা কোষ সৃজন চলছে এবং তা ছড়িয়ে পড়ছে গোলকটির পরিধি পর্যন্ত, কিন্তু পরিধির এলাকা বাড়ছে না, ফলে যে ঘনত্ব বাড়ছে তাকে বলে **গিজগিজ** করা। আর, বস্তুর কেন্দ্রের দিকে ধেয়ে চলেছে বস্তুর কোষগুলি, যেন-বা তারা ভয়ভীত বা শীতে কাতর হয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় যে ঘনত্বের বৃদ্ধি ঘটে, তাকে বলে **থিকথিক** করা। বাংলায় পৃথকভাবে **থিক** শব্দটি না থাকলেও ইংরেজিতে thick শব্দটি সমার্থে প্রচলিত রয়েছে। **থিকথিক** রয়েছে, কিন্তু **থিক** শব্দটি কোনো বাংলা অভিধানেই অন্তর্ভুক্ত হয়নি, কারণ বাংলাভাষী এই শব্দটি পৃথকভাবে ব্যবহার করেন না। কিন্তু **থিকথিক** ব্যবহার করেন। আর, **থিকথিক** আসলে **থিক**-এর পুনরাবৃত্তি মাত্র। **৬.** ইংরেজি thick।

থু (থুক, থো) : ২. ***থু*** *=* ***থ*** *(স্থিত) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***থুক*** *=* ***থু*** *কৃত যাহাতে।* ***থো*** *=* ***থু****-এর আধার যে।* **৩. থু, থো** = থুতু ফেলার শব্দ, মুখ হইতে খাদ্য ফেলিয়া দেওয়ার শব্দ; ঘৃণায়, নিন্দায়; স্থাপন করা, পরিত্যাগ করা, ঘটিতে দেওয়া, বিধান করা, মিল করিয়া রাখা, সঞ্চয় করা, অভিহিত করা, বাস করিতে দেওয়া, অবশেষ রাখা, সাজাইয়া রাখা। **থুক** = থুথু, ছেপ, ঘৃণাসূচক। (ব.শ.)। **৪.** spit ও keep অর্থে **থু** ও **থো** প্রচলিত, **থুক** হিন্দিতে spitting অর্থে প্রচলিত। **৫.** উ-কারের অর্থ দিতে গিয়ে আগেও অনেকবার বলা হয়েছে যে, উ-কার যোগে সত্তা নবরূপে উত্তীর্ণ হয়। এখানেও তাই হয়েছে। **থ** যেখানে স্থিতির কথা বলে, সেখানে **থু**-কে দেখা যাচ্ছে সে এক সত্তা থেকে বেরিয়ে অন্য সত্তার উপরে গিয়ে পড়ছে। **থু**-তে পড়াটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কোথা থেকে কীভাবে বেরোচ্ছে, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। আর **থো**-তে কোথায় পড়ছে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে '**থু-থু**' বললে লোকে মুখ থেকে বেরোনোকেই বোঝে, আর '**থো-থো**' মানে বোঝে 'রাখ্-রাখ্'। অর্থাৎ, যদিও **থ** মানেই থিত হওয়া বা থাকা, সত্তার সেই **থ** অবস্থাকে নবরূপে উত্তীর্ণ করিয়ে দেওয়া মানে তাকে আর নিজের কাছে না রেখে অন্য কোথায় নিয়ে গিয়ে রেখে দেওয়া, কিংবা ছুঁড়ে কোনো বিশেষ স্থানে ফেলা বা রাখা। একেই বলে **থু** করা। এই কারণে কাজটির দুটি অধ্যায় আছে। **থু** করার প্রথম দিকটাকেই যদি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, তবে বলতে হয় **থু**; আর শেষ দিকটাকে যদি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, তবে বলতে হয় **থো**। এই জন্যই হিন্দিতে **থুক** মানে থুতু এবং **থুকনা** মানেই থুতু ফেলা। কিন্তু **থুক** শব্দটি বাংলায় প্রচলিত নেই।

থুড়, থুড়থুড়, থুড়া, থুড়ি, থুড়থুড়ি, থুড়ী : ২. ***থুড়*** *=* ***থু****-র গড়ান যাহাতে।* ***থুড়ি*** *=* ***থুড়*** *গতিশীল যাহাতে।* ***থুড়থুড়*** *=* ***থুড়****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***থুড়া*** *=* ***থুড়****-এর আধার যে।* ***থুড়থুড়ি*** *=* ***থুড়*** *ও* ***থুড়ি****।* ***থুড়ী*** *=* ***থুড়ি****-র আধার যে।* **৩. থুড়থুড়** = অতিকম্পিতভাব (শীতে, ভয়ে)। **থুড়থুড়ি** = বার্দ্ধক্য হেতু অতিকম্পিতা, অতিবৃদ্ধা। **থুড়ি** = ভুল-চুক, অশিষ্ট বাক্য বা অকার্য্যের প্রত্যাহারে ঘৃণাসূচক শব্দ, শিশুদের খেলা বন্ধ করার শব্দ। (ব.শ.)। **থুড়া** = কুচি কুচি বা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে কাটা, ক্রমাগত আঘাতে ক্লিষ্ট বা প্রহারে জর্জরিত করা, তিরস্কারে বা ভর্ৎসনায় জর্জরিত করা। **থুড়ি, থুড়ী** = শুধরিয়ে বা সামলিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনে ব্যবহৃত শব্দ, ভুলবশত কিছু বলে তা প্রত্যাহারসূচক শব্দ, কথার মধ্যে এভাবে বলে নিজের ভুল শুধরানো। (ব্য.বা.অ. ঢাকা)। **৪.** সব শব্দগুলিই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫. থুড়** শব্দটি কোনো অভিধানেই নেই। তার থেকে মনে হয়, অভিধানকারেরা শব্দটির ব্যবহার শোনেননি। আমরা কিন্তু গ্রামবাংলার বাংলাভাষীর মুখে

'**খুড়, খুড়ে দে**' কথাটি শুনেছি। সবজি চাষের জন্য ক্ষেতের শুকনো মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ক্ষেতটিকে তৈরি করার সময় যেসকল বড় বড় মাটির ঢেলা ভূমির উপরিতলে দেখা দেয়, সেগুলিকে '**খুড়ে**' দিতে বলা হয়। এর অর্থ ঢেলাগুলিকে গড়াগড়ি করিয়ে, খণ্ড খণ্ড হতে খানিকটা সহায়তা করা ও খোঁড়া-ভূমিকে খানিকটা সমতল করা। বস্তুত **খুড়** ব্যাপারটি তাই-ই। যে-সত্তা ইতোমধ্যেই থিতু হয়ে গেছে, সংক্ষিপ্ত হয়ে, সংকুচিত হয়ে একটি স্থিত (**থ**) রূপ পেয়ে গিয়ে 'আপন স্থান থেকে অন্যত্র চলেছে' বা 'নবরূপে উত্তীর্ণ (**থু**) হয়ে গেছে', তাকে গড়ানই (ড়) তো **খুড়** পদবাচ্য। অতিবৃদ্ধ মানুষের চলাও তাই **খুড়** পদবাচ্য। আর, কেউ যদি এইরকম **খুড়** করে, তাহলে তার কাজটিকে বলা হবে **খুড়া**। কিংবা, কিছু করতে করতে দাঁড়িয়ে গিয়ে সে-পর্যন্ত যতটা করা হয়েছে, (ঢিলা গড়িয়ে সমান করার মতো) তার অসামঞ্জস্যকে **খুড়** করে সামঞ্জস্য সাধন করার জন্য কেউ বলতেই পারে, '**দাঁড়াও, খুড়-করি**' অর্থাৎ, 'দাঁড়াও, **খুড়ি**'। এই **খুড়ি-করা**র ধারণাটিকে বলা হয় **খুড়ী**। সেই কারণে **খুড়ী** হল **খুড়ি**র আধার। প্রচলিত অভিধানগুলিতে শিশুদের **খুড়ী**র যথার্থ মানে বোঝাই হয়নি।

থুপ, থুপি, (পাঁচথুপি), থোপ, থোপনা, থোপনি, থোপা : ২. ***থুপ*** *= **থু** (নবরূপে উত্তীর্ণ **থ**) পালিত যাহাতে।* ***থুপি*** *=* ***থুপ*** *গতিশীল যাহাতে। (পাঁচথুপি = পাঁচটি **থুপ** আছে যার)।* ***থোপ*** *= **থো** (দ্র. **থু, থো**) পালিত যাহাতে।* ***থোপনা*** *= **থোপ** অন যাহাতে তাহার আধার।* ***থোপনি*** *= **থোপন** গতিশীল যাহাতে।* ***থোপা*** *= **থোপ**-এর আধার যে।* ৩. **থুপ** = স্তূপ, গুচ্ছ, গোছা, রাশি। **থুপি** = ছোট গুচ্ছ। (থুপিঝিঙ্গা = গুচ্ছাকার এক প্রকার ছোট ঝিঙা)। **থোপ, থোপনা, থোপনি, থোপা** = গুচ্ছ, গোছা, স্তূপ, ঝাড়। (ব.শ.)। ৪. সবগুলি শব্দই কমবেশি প্রচলিত। ৫. বঙ্গদেশে একাধিক স্থানের নাম পাঁচথুপি। এইসব জায়গায় পঞ্চস্তূপ-ওয়ালা বৌদ্ধমন্দির ছিল, বৌদ্ধযুগের উত্তরাধিকার হিসেবে। তাই এদের নাম হয়ে যায় **পাঁচথুপি**।

দ

দ্ বর্ণের অর্থ : **দ** = দ্-অন করে যে; দায়ী অর্থাৎ 'যে দেয়' বা 'দান' করে। এখানে 'দান'-এর অর্থ 'দেওয়া'। এই দেওয়া কেবলমাত্র বিনিময়হীন দান নয়। যে কোনো প্রকারের 'দেওয়া'ই 'দ' বর্ণবাচ্য, তা সে বিনিময়হীন দান বা give হোক, আর, বিনিময়যুক্ত দান বা donation-ই হোক। যেমন, জল দেয় যে = জল'দ'; এই 'দ'। একইভাবে, জ্ঞানদ, ধনদ, প্রাণদ ইত্যাদি বহু শব্দই হতে পারে। অর্থাৎ 'দ' মানে 'দেয় যে'। কী দেয়? অন্ন দেয়, জ্ঞান দেয়, বুদ্ধি দেয়, ধাক্কা দেয়, মার দেয়, আঘাত দেয়, গলাধাক্কা দেয়, প্রবোধ দেয়, সান্ত্বনা দেয়, আনন্দ দেয়, সুখ দেয়, দুঃখ দেয় ... এবং কী দেয় না! ইংরেজিতে কিন্তু এরকম ধারণাই নেই। giving knowledge, giving beating, giving sorrow ... এধরনের বাক্যবন্ধ ইংরেজিতে বলাই যায় না। কিন্তু বাংলায় রীতিমতো বলা যায়। অতএব 'দ' মানে '(যে-কোনো বস্তু বা বিষয়) দেয় যে'। একে আমরা এভাবেও লিখতে পারি — 'দ' = '(?) দাতা'। এই জিজ্ঞাসা চিহ্নের স্থানটি প্রেক্ষিত অনুসারে পূর্ণ হয়। অতএব 'দ' = '(?) দাতা'। কিন্তু এখানে কাজের সুবিধার জন্য আমরা জিজ্ঞাসা চিহ্নটি বাদ দিয়েই লিখব। কিন্তু অর্থ বুঝবার ক্ষেত্রে সবসময় জিজ্ঞাসা চিহ্নটির কথা মনে রাখব। তাহলে আপাতত সিদ্ধান্ত করা চলতে পারে যে, 'দ্' = 'দান', 'দ' = 'দাতা'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে দ্ বর্ণটি 'দান' ক্রিয়ার ধারক। ইংরেজিতে *don*-ation। এই don বা দান করা ও দেওয়ায় পক্ষ রয়েছে। অর্থাৎ, দানের ভিতরে ক-বিন্দু থেকে খ-বিন্দুতে চলে যাওয়া রয়েছে। এই দ্ অক্ষরটি পৃথিবীর সব ভাষাতে নাই। ইংরেজিতে একে 'ডি' (d) বলে। ইংরেজির ত-বর্গটিই নেই, ফলে 'দ'-ও নেই। তাঁরা 'ডি' (d) দিয়েই 'ড' ও 'দ' উভয় ধ্বনির কাজ চালাতে বাধ্য হন। যতদূর অনুমান করা যায়, আদিম মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে জাতিগুলি কঠোর বাস্তবের মুখে পড়ে গিয়ে অতিবাস্তববাদী হতে বাধ্য হয়ে যায়, তারা স্বভাবতই অধিকতর যুক্তিবাদী হতে বাধ্য হয় (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'প্রকৃতির সহিত সত্য ব্যবহার' করতে বাধ্য হয়।) এবং তাদের জীবনে আর্দ্রতার চেয়ে শুষ্কতার প্রাবল্য দেখা দেয়। এই ধরনের জাতিগুলির ভাষায় ত-বর্গের বিকাশ হয়নি বলেই মনে হয়। বিপরীতে যারা একেবারেই উলটো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল, ফলে যাদের জীবনে আর্দ্রতার প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল, তাদের ভাষায় ট-বর্গটিই বিকশিত হতে পারেনি। এ আমাদের অনুমান।

তা সে যাই হোক, ত বর্ণের অর্থে আমরা দেখেছি, অস্তিত্বের উপচে পড়া অংশ লাউডগার মতো তারিত হয়ে এগোয় এবং তার এই তরণপূর্ব্বক গমনকে ত বলে। কিন্তু যেতে যেতে সে যদি থেমে গিয়ে নিম্নে অন্য কারও হাতে পতিত হয়, রক্ষিত হয়, গৃহীত হয়, তাহলে সেই 'তরণপূর্ব্বক গমন' (= ত্) পরিণত হয় 'দান' (= দ্) -এ। যেদিক থেকে সত্তাটি যাচ্ছে, অর্থাৎ ক-বিন্দুর দৃষ্টিতে এটি দান বা দ্ হলেও, খ-বিন্দুর দৃষ্টিতে এটি আদান বা গ্রহণ পদবাচ্য।

যাই হোক, দেওয়ার বা দানের ব্যাপার যাতে রয়েছে, সেই 'দ' বর্ণের অর্থ সংক্ষেপে আমরা জানব — **দ** = 'দ্-অন' করে যে; দাতা। দা, দি, দু, দৃ প্রভৃতির অর্থের জন্য **ক বর্ণের অর্থ** দ্রষ্টব্য।

দ্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : *দক্ষ্*, দং (দণ্ড্, দন্শ্ / দংশ্, দম্, দন্‌ভ্), দয়্, *দল্ (দুল্)*, দহ্, দা, দিব্, দিশ্, দিহ্, দী (*দীক্ষ্, দীধী*), দীপ্, দু (*দুর্, দুশ্, দুষ্, দুস্, দূ*), দুহ্, দৃ (দৃ., দরিদ্রা, দারি), দৃপ্ (দর্পি), দৃশ্ (দৃক্, দর্শি), দো, দ্যুৎ, দ্রা, দ্রু, দ্রুহ্, দ্বি (দ্বারি, দ্বিষ্), দ্ = ২২ + ১

দক্ষ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অদক্ষিণ, ডাইনা, ডান, ডানদিক, ডানহাত, ডাহিন, দক্‌খিন, দক্ষ্, দক্ষ, দক্ষকন্যা, দক্ষজা, দক্ষক্রতু, দক্ষযজ্ঞ, দক্ষবালা, দক্ষসাবর্ণি, দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী, দক্ষা, দক্ষিণ, দক্ষিণকালিকা, দক্ষিণপন্থী, দক্ষিণমার্গ, দক্ষিণস্থ, দক্ষিণে-

কালী, দক্ষিণহস্ত, দক্ষিণা, দক্ষিণাগ্নি, দক্ষিণাচল, দক্ষিণাচার, দক্ষিণান্ত, দক্ষিণাপথ, দক্ষিণাপ্রবণ, দক্ষিণাবর্ত্ত, দক্ষিণাবান, দক্ষিণাভিমুখ, দক্ষিণামুখ, দক্ষিণামূর্ত্তি, দক্ষিণায়ন, দক্ষিণারণ্য, দক্ষিণাহি, দক্ষিণীয়, দক্ষিণেন, দক্ষিণের্ম্মা, দক্ষিণ্য, দখল (দক্ষ-ল), দখিন, দখনে, দাইন, দাক্ষ, দাক্ষায়ণ, দাক্ষায়ণী, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য, দাক্ষী, দাক্ষ্য, দীক্ষা, দোখ্নে, ভূরিদক্ষিণ, সদক্ষিণ।

দক্ষ্ = দাতার ক্ষ-অন। (**দ** ও **ক্ষ** বর্ণের অর্থ দ্রষ্টব্য)। **দক্ষ** = দাতার ক্ষয় যাহাতে। (যে দাতা নিজের বা অন্যের ক্ষয় সাধন করে, সেই দক্ষ।)

দক্ষ, দক্ষিণা, দাক্ষিণ্য, দয়া-দাক্ষিণ্য, দীক্ষা, শিক্ষা-দীক্ষা (দক্ষের সমগ্র বিষয়টি যেহেতু অনেক বড় এবং জটিল, প্রচলিত ধারণা থেকে এই বিষয়ে অনুপ্রবেশের সুবিধা গ্রহণের জন্য আমরা উপরোক্ত শব্দ কয়টিকে শুরুতে একবার একত্রে বিশ্লেষণ করে নিচ্ছি। এ শব্দগুলি পরে আবার থাকবে।) : ৫. শব্দগুলি প্রাচীন হলেও বাংলাভাষায় আজও খুবই প্রচলিত। তবে শব্দগুলির মর্মার্থ কী, এখানে তা নিয়ে প্রথম সাধারণ আলোচনা করা হচ্ছে।

শব্দগুলি কী কী অর্থে প্রচলিত, প্রথমে তা দেখে নেওয়া যাক। **দক্ষ** = নিপুণ, skilled। সেকালে 'অত্যন্ত নিপুণ' বা specialist-কেও **দক্ষ** বলা হত। সমাজের নেতৃত্ব থেকে শিবের সরে যাওয়ার পর থেকে এই স্পেশালিস্ট-**দক্ষ**গণ যৌথসমাজের উৎপাদন কর্মকাণ্ড (কর্মযজ্ঞ) পরিচালনা করতেন। স্বভাবতই, একালের শিক্ষকশ্রেণীর মতো এদের একটি সামাজিক শ্রেণী ছিল। তাদেরকেও **দক্ষ** বলা হত। **দক্ষিণা** = দক্ষ-গুরুকে প্রদত্ত ধনাদি, দক্ষ-কর্মীকে প্রদত্ত salary। ... ইত্যাদি। **দাক্ষিণ্য** = উদারভাব, দক্ষিণা দেওয়া, ... ইত্যাদি। **দয়া-দাক্ষিণ্য** = কাজ না করিয়ে এমনি-এমনি কিছু দেওয়ার মানে ছিল **দয়া**, এখনও প্রায় তাই। এবং নিপুণ বা skilled লোককে কোনো কাজ করিয়ে কিছু দেওয়ার মানে ছিল **দাক্ষিণ্য**, এখন অবশ্য সেরকম মানে নেই। এখন **দাক্ষিণ্য** মানেও **দয়া**। [**আশে-পাশে, আধি-ব্যাধি, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ** ... প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে একালে যেমন দুটো শব্দের একটা করেই মানে করে ফেলা হয়েছে (আশে-পাশে = beside, আধি-ব্যাধি = illness, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ = invite), তেমনি **দয়া-দাক্ষিণ্যেরও** এখন একটাই মানে — kindness।] এখন **দীক্ষা** = দেবমন্ত্রগ্রহণ, নিয়মগ্রহণ, বিশেষ ধর্মের নিয়মগ্রহণ। **শিক্ষা-দীক্ষা** = শিক্ষা শেষে যা দেওয়া হয়।

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম, শব্দগুলি বলছে, যে, কর্মনিপুণ **দক্ষ**কে বা skilled মানুষকে তার কাজের জন্য যে salary বা মজুরি দেওয়া হত, তাকে **দক্ষিণা** বলা হত। তবে, এই দক্ষিণা দেওয়াটা একধরনের অনুগ্রহে পর্যবসিত হয়েছিল। **দাক্ষিণ্য** শব্দটি বুঝিয়ে দেয়, খাটিয়ে মজুরি না-দেওয়াটাই হয়তো একসময় রেওয়াজ হয়ে গিয়ে থাকবে। অবশ্য, শব্দটির স্বভাব বলে দেয় যে, শব্দটি নিশ্চিতভাবেই তৈরি হয়েছিল **দক্ষ-কর্মীকে খাটিয়ে** তার দাম দেওয়া বোঝাতে। আর, গুরুর কাছ থেকে লেখাপড়া শিখে, কর্ম করবার বিদ্যেবুদ্ধি অর্জন করা শেষ হলে দেওয়া হত **দীক্ষা**। এ হল দক্ষ-গোষ্ঠীতে বা specialist দলে যোগ দিয়ে তাদের একজন হওয়ার অধিকার, যৌথসমাজের কর্মকাণ্ড চালানোর অধিকার। একালের ভাষায় একে 'ক্যাম্পাস-অ্যাপয়েন্টমেন্ট' বলা যেতে পারে। সেকালে শিক্ষাশেষে **দীক্ষা** দেওয়া একটি বাধ্যতামূলক সামাজিক রীতি ছিল। একালের নির্লজ্জ সমাজ পরিচালকদের মতো উত্তরপ্রজন্মকে লেখাপড়া শিখিয়ে অন্যের **চাকর** হওয়ার জন্য এমপ্লয়মেন্ট-এক্সচেঞ্জের গোহাটায় গরু রূপে আত্মবিক্রয়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হত না। এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে আমাদের 'গ' গ্রন্থের 'উত্তরপ্রজন্মের লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষা' নিবন্ধে।

দক্ষ : ১. ✓দক্ষ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *দানকারী ক্ষ (দ্র. ক্ষ) যে; অর্থাৎ, (অন্য সত্তাকে) ক্ষ করে (ক্ষইয়ে-খসিয়ে) এনে দেয় যে; অথবা, 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি' করে যে।* **৩.** পটু, অনলস, শীঘ্রকারী, বামেতর, দক্ষিণভাগ, ডান পাশ, নৈপুণ্য, কুক্কুট, বীর্য্য, দক্ষিণনায়ক, অগ্নি, শিববৃষ, শিব, বিষ্ণু, সংহিতাকার মুনিবিশেষ; প্রজাপতিবিশেষ (ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে ইঁহার জন্ম, এই জন্য নাম 'দক্ষ'। প্রসূতি ইঁহার ভার্য্যা। প্রসূতির ষোড়শ কন্যা। কনিষ্ঠা সতী শিবপত্নী। তদ্ভিন্ন ইঁহার অন্য কন্যাগণের মধ্যে সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রের এবং অদিতিদিতি প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপের পত্নী। ইনি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শিব ও সতীকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সতী অনিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে আসিয়া দক্ষের শিবনিন্দা হেতু দেহত্যাগ করিলে, শিব দক্ষালয়ে আসিয়া যজ্ঞধ্বংসপূর্ব্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। শিবের বরে দক্ষশীর্ষ প্রজাপতির ছাগমুণ্ড হয়। ... (ব.শ.)। (ক) একজন প্রজাপতি। এঁর জন্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে মতভেদ দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে ... দক্ষ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মার অঙ্গুষ্ঠ হতে জন্ম বলে এঁর নাম দক্ষ। ইনি মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে ষোড়শ কন্যার জন্ম হয়। ... দক্ষ এর মধ্যে ১৩ টি ধর্মকে, ১টি অগ্নিকে, ১টি মিলিত পিতৃগণকে এবং অবশিষ্ট সতী নাম্নী কন্যাটিকে মহাদেবের হস্তে সমর্পণ করেন। একবার বিশ্বস্রষ্টাগণ এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে সমস্ত দেবতাগণ সেখানে উপস্থিত হন। দক্ষ প্রজাপতি এই যজ্ঞে উপস্থিত হলে সবাই দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেও কেবল মহাদেব ও ব্রহ্মা নিজেদের আসন হতে উত্থিত হন না। এতে দক্ষ ক্রুদ্ধ হয়ে শিবনিন্দা আরম্ভ করেন এবং শিবকে অভিসম্পাত দেন যে, ইন্দ্রাদি দেবতাদের সঙ্গে মহাদেব যজ্ঞের ফলভাগ গ্রহণে বঞ্চিত হবেন। কিছুদিন পরে ব্রহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতির উপর আধিপত্য করার অধিকার দান করেন। এতে দক্ষ গর্বিত হয়ে বৃহস্পতি নামে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করে ত্রিলোকের সকলকে নিমন্ত্রণ করেন, কেবলমাত্র মহাদেব ও সতীকে এই আমন্ত্রণ থেকে বাদ দেন। ... মহাদেব অনুমতি না দিলেও সতী স্বামীর বাক্য উপেক্ষা করে পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। ... তথায় স্বামীনিন্দায় অপমানিতা সতী যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। ... মহাদেব ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ... জটা ছিন্ন করে ভূমিতে নিক্ষেপ করেন এবং বীরভদ্রের জন্ম হয়। শিবানুচরদের নিয়ে বীরভদ্র দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে শুরু করেন। ... ভৃগুর শ্মশ্রু ও পূষণের দন্ত উৎপাটন করেন ও দক্ষের শিরশ্ছেদ করেন। ... সবাই

কৈলাসে গিয়ে শিবকে তুষ্ট করে দক্ষের পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। ... মহাদেবের কথানুসারে ব্রহ্মা দক্ষের শিরস্থানে এক ছাগমুণ্ড সংযুক্ত করেন। দক্ষ জীবিত হয়ে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে মহাদেবের স্তবগান করতে থাকেন। (খ) মহাভারত মতে দক্ষ ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হতে এবং তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মার বাম অঙ্গুষ্ঠ হতে উৎপন্ন হন। দক্ষের স্ত্রী ৫০টি কন্যা প্রসব করেন। এর মধ্যে ধর্মকে ১০টি, কশ্যপকে ১৩টি, চন্দ্রকে ২৭টি কন্যা প্রদান করেন। এই ২৭ জন ২৭টি নক্ষত্র। ... কথিত আছে যে, দক্ষ প্রিয়ব্রতের কন্যা ও মনুর পৌত্রী প্রসূতিকে বিবাহ করেন। প্রসূতির গর্ভে দক্ষের ঔরসে ২৪, ৫০ কিংবা ৬০টি কন্যা হয়। দক্ষের একটি কন্যা সতী শিবকে বিবাহ করেন; কিন্তু শ্বশুর-জামাতার মধ্যে বিরোধের ফলে সতী আত্মহত্যা করেন। (গ) মহাভারত ও পুরাণের অন্য কাহিনী অনুসারে অন্য এক মন্বন্তরে দক্ষ দ্বিতীয়বার প্রচেষ্টা ও মারিষার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই জন্মে তাঁর সাতটি পুত্র হয় — ক্রোধ, তামস, দম, বিকৃত, অঙ্গিরা, কর্দম ও অশ্ব। দক্ষকে এই দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করতে হয় জামাতা শিবের অভিশাপ হেতু। একদিক দিয়ে তাঁর পুত্র চন্দ্রসোম হতে দক্ষ প্রসূত; কারণ চন্দ্র দক্ষের ২৭টি কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। সেইজন্য দক্ষ সাধারণত চন্দ্রের পিতা ও পুত্র বলে কথিত হন। (ঘ) হরিবংশে দক্ষকে আমরা অন্য মূর্তিতে দেখতে পাই। এই পুরাণ মতে বিষ্ণু নিজেই দক্ষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে বিভিন্ন জীবজন্তুর সৃষ্টিকর্তা হন। যোগবলে এই প্রথম মানবপুরুষ দক্ষ নিজেকে সুন্দরী নারীরূপে সৃষ্টি করে এই নারীর ক্ষেত্রে অনেক সুন্দরী কন্যার জন্ম দেন এবং এইসব কন্যার পরে বিবাহ দেন। (পৌ.অ.)।

... ব্রহ্মার পুত্র, প্রজাপতিবিশেষ। ... ইঁহার ভার্য্যা স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা প্রসূতি; তাঁহার গর্ভে শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, মূর্ত্তি, তিতিক্ষা, হ্রী, স্বাহা, স্বধা, ও সতী এই ষোড়শ কন্যার মধ্যে অগ্নির সহিত স্বাহার, পিতৃগণের সহিত স্বধার, মহাদেবের সহিত সতীর এবং অবশিষ্ট ত্রয়োদশ কন্যার সহিত ধর্ম্মের বিবাহ হয়। ইনি কোনো সময়ে ভৃগুযজ্ঞে গমন করিলে শিব ইঁহাকে অভিবাদন করেন নাই; এই ক্রোধে ইনি শিবকে যজ্ঞভাগে বঞ্চিত করিতে উদ্যত হন এবং শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে সতী পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিলে শিবানুচরেরা দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া দেয়। এই যজ্ঞভঙ্গসময়ে নন্দী দক্ষের মুণ্ড অগ্নিসাৎ করিয়াছিল; পরে প্রসূতির অনুরোধে শিব দক্ষকে ছাগমুণ্ডযুক্ত করিয়া পুনর্জ্জীবিত করেন। মিত্রাবরুণ এই দক্ষের পুত্র। ... (ছাত্রবোধ অভিধান)। ৪. expert অর্থে **দক্ষ** শব্দটি আজও প্রচলিত। উপরে **দক্ষ, দক্ষিণা, দাক্ষিণ্য** ... ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। ৫. যদি প্রশ্ন করা হয়, মানুষের সমাজে skill বা পটুতা কীভাবে জন্মাল, কীভাবেই-বা তা বিকশিত হয়ে কলাকৌশল-জ্ঞান বা expertise পেরিয়ে বিশেষজ্ঞতায় বা specialisation-এ পৌঁছতে পারল, তার কি কোনো ইতিহাস আছে? কিংবা, বৈদিকযুগের সূত্রপাত হয়েছিল ঠিক কবে থেকে? পৃথিবীতে পূজার আবির্ভাব হয়েছিল কবে এবং কীভাবে? মানুষের শরীরে রোগের উৎপত্তি হল কবে থেকে? পৃথিবীর আদি বেকারের জন্ম হয়েছিল কবে এবং কীভাবে? সর্বোপরি আদিম যৌথসমাজ বিভাজিত হল কীভাবে এবং কখন?

এর সিধে-সাপটা **উত্তর হল** — **না**। কোনো দেশের কোনো অ্যাকাডেমিক চর্চায় এসব বিষয় নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো আলোচনাই হয়নি। কিন্তু বাংলাভাষায়, প্রাচীন ভারতের পুরাণাদিতে এই ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে লিখিত রয়েছে। **দক্ষ** ও **দক্ষ**-জাত শব্দের মধ্যে যেমন সে ইতিহাস রয়েছে, তেমনি ভারতসমাজে সেই সত্তা কীভাবে জন্মেছিল, কীভাবে কতদূর বিকশিত হয়েছিল, এবং সমাজে সে কী কী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তার সব কথা অতি বিস্তারিত ভাবেই ভারতীয় পুরাণাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমরা **দক্ষ** ও **দক্ষ**-জাত শব্দগুলির ভেতর থেকে যেমন সেই ইতিহাসকে কিছুটা পেয়ে যেতে পারি, তেমনি পুরাণাদির বয়ান থেকেও বাকিটা বিস্তারিতভাবে পেয়ে যেতে পারি।

বিষয়টিতে যাওয়ার জন্য সর্বাগ্রে **ছাগ, অপগামী, অজ, অগ্নিবাহন** প্রভৃতি শব্দের অর্থগুলি দেখে নিন। এই **দক্ষ** শব্দের অর্থের ব্যাপ্তি **শিব** শব্দের মতোই অত্যন্ত বেশি। আমাদের দুজনের (রবি চক্রবর্তী ও কলিম খান-এর) প্রায় সব ক'টি গ্রন্থেই **দক্ষ** ও **শিব** প্রসঙ্গ বারংবার এসেছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে 'ঘ' গ্রন্থে। আগ্রহী পাঠক তা দেখে নিতে পারবেন। এখানে, এই স্বল্প পরিসরে আমরা সংক্ষেপে সেই ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করব।

উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থ (২) জানিয়ে দিচ্ছে, যে, শব্দটি বিপ্রতীপ নিয়মে তৈরি হয়েছে; যেমন হিংসা করে যে = সিংহ, মা-উ = উমা — এইরকম। তেমনি **ক্ষ** করে দেয় যে = **দক্ষ**। (একইভাবে **ক্ষ** করে যায় যে = **যক্ষ**; এবং **ক্ষ** করে রহে যে = **রক্ষ**।) **ক্ষ**-করা মানে, আমরা আগেই জেনেছি, ক্ষইয়ে দেওয়া, খসিয়ে দেওয়া, খাবলে নেওয়া ... ইত্যাদি। এর থেকে আমরা বলতে পারি, **দক্ষ** (skilled, expert) কাউকে না কাউকে '**ক্ষ** করে আমাদের দেয়', তাই **দক্ষ**-পদবাচ্য। কিন্তু **দক্ষ** কাকে **ক্ষ** করে নিয়ে এসে আমাদের দেয়? এর উত্তর হল — প্রকৃতির (নেচারের) শক্তিকে ও শক্তিধারীকে, আমাদের চারপাশে থাকা প্রকৃতির (নেচারের) বিভিন্ন সত্তাকে। এর ফলে আমাদের ঘিরে থাকা চারপাশের প্রকৃতির বা নেচারের **ক্ষয়** হয় এবং তার সেই **ক্ষইয়ে** নেওয়া **ক্ষাত** (খাত) অংশ গ্রহণ করে আমরা আমাদের অভাব পূর্ণ করি, **সক্ষম** হই, **ক্ষমতা**বান (দ্র. **ক্ষমা**) হই।

কিন্তু প্রকৃতির থেকে ভাগে পাওয়া সুবিধার বাইরে এভাবে পারিপার্শ্বিকের উপর **খাবলামি** করা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। তবুও সেটা মেনে নেওয়া যায়, সেরকম কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগাদিতে মানুষ নেহাতই যদি পড়ে যায়। অন্যথায় এরকম **দক্ষতা** খুব একটা ভাল কাজ নয়। আজকের পৃথিবীতে প্রকৃতির প্রতিশোধ স্বরূপ যে ভয়ানক বিপদসমূহের কথা আজকাল আমরা শুনছি, সে কি মানুষের এই অতি-**দক্ষতা**র ফল নয়? কে জানে!

তা সে যাই হোক, ছাত্রবোধ অভিধান আমাদের জানাচ্ছে, **দক্ষস্** শব্দের অর্থ **বল** বা শক্তি। আমরা বুঝতে পারি, এ হল অন্যকে **ক্ষ** করার শক্তি, **দক্ষের** যা থাকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ শক্তি **দক্ষ** পায় কোথায় এবং কীভাবে?

এ শক্তি লাভের একটি মাত্র পথ রয়েছে **দক্ষের**। তা হল

আবিষ্কারকের শরণাপন্ন হওয়া। কোনো একটি আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত জ্ঞানকে আত্মসাৎ করেই **দক্ষ** তার এই **ক্ষ**-করণ শক্তি অর্জন করে। কিন্তু যেহেতু সে নিজে আবিষ্কারক বা উদ্ভাবক (= ব্রহ্মজ্ঞানী = শিব = আদি ব্রাহ্মণ) নয়, আবিষ্কৃত জ্ঞানটি শিখে নিয়ে তার পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া **দক্ষের** আর কোনো উপায় থাকে না। এর ফলে একদিকে সে যেমন সেই বিশেষ জ্ঞানে expert বা বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে, অন্যদিকে তার সেই আবিষ্কৃত জ্ঞানের অনুসরণ ও তার বারংবার প্রয়োগ, এককথায় তার 'কর্ম্মসম্পাদন' তাকে দিশাগ্রস্ত করে দেয়। এই দিশাগ্রস্ত হওয়া দুরকম — দৈহিক ও মানসিক। একইরকম ভাবে দৈহিক-পা ফেলতে থাকলে আমরা যেমন দৈহিকভাবে একদিকে হেঁটে চলে যাই, অর্থাৎ শারীরিকভাবে দিশাগ্রস্ত হই; তেমনি একইরকম ভাবে মানসিক-পা ফেলতে থাকলে আমরা মানসিকভাবে একদিকে এগিয়ে চলে যাই, অর্থাৎ মানসিকভাবে দিশাগ্রস্ত হই। ...

দক্ষকে দিশাগ্রস্ত বলতে হচ্ছে দুটি কারণে। এক) প্রতিটি আবিষ্কারমূলক কর্ম আসলে সমগ্র জ্ঞানের একটি ক্ষুদ্রাংশের প্রয়োগ মাত্র, অর্থাৎ জ্ঞানের সূর্য্যের যেকোনো একদিকের একটি বা কয়েকটি কিরণরেখার আধার মাত্র; সেই কারণে তা টর্চের আলোর মতো দিশাগ্রস্ত। দুই) সেই কর্ম বারংবার অনুষ্ঠিত হলে তা কার্যত 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি'র নীতি মান্য করে; এবং এই নীতি অনুসরণকারী একদিকে যেমন skilled হয়ে ওঠে অন্যদিকে তেমনি জ্ঞানের সূর্য্যের বাকি দিকগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে যায় এবং স্বভাবতই সে দিশাগ্রস্ত না হয়ে পারে না। সবাই জানেন, অত্যন্ত skilled বা অতি দক্ষকে বিশেষজ্ঞ (= expert, specialist) বলে; আর, বিশেষজ্ঞমাত্রেই দিশাগ্রস্ত। তার মধ্যে সার্বিকতা বা সার্বজনীনতা থাকে না। কখনো কখনো তা এই দিশাগ্রস্ততার চূড়ান্তে পৌঁছে যায়, আপন জ্ঞান বিষয়ে অত্যন্ত কট্টর ও মৌলবাদী হয়ে ওঠে এবং মনে করতে শুরু করে যে, সে যতটা জেনেছে তার বাইরে আর কোনো জ্ঞানই নেই। মানুষের অজ্ঞানের যে অসীম এলাকা, সে বিষয়ে সে অন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ, নিজের জ্ঞাত এলাকার বিষয়ে সে মৌলবাদী হয়ে ওঠে এবং নিজের অজ্ঞাত এলাকা বিষয়ে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে যায়। আধুনিক বিশ্বায়িত মানবসমাজ এই ধরনের দক্ষদের নেতৃত্বে চলছে বলেই মানুষের ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছে।

আমরা নই, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এই দক্ষকর্মের নাম দিয়ে গেছেন, 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি' এবং বলে গেছেন, এর ফলে মানুষ ও সমাজ 'একটেরে' হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সব কথা বলে যাননি। তিনি 'পুনরাবৃত্তিমূলক কর্মের' ঠিকানাটি দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু সেই ঠিকানায় থাকে যে, তার নাম-পরিচয়-স্বভাবচরিত্র ইত্যাদি বিস্তারিত ভাবে দিয়ে যাননি; সেসব আমাদেরকেই খুঁজে-পেতে বের করতে হয়, জানতে হয়, বুঝতে হয়। আমরা দেখেছি, একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি অনুসরণ করলে একদিকে যেমন বিপুল পরিমাণ লাভ হয় এবং অন্যদিকে তেমনি বিপুল পরিমাণ ক্ষতিও হয়ে যায়। একদিকে অনায়াসে পাইকারি হারে বিপুল পরিমাণ সম্পদ, এমনকি প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ, উৎপাদন করে ফেলা যায়, মানুষ 'বিশেষ জ্ঞানে দক্ষ'-মানুষ থেকে উন্নীত হতে হতে বিশেষজ্ঞ-মানুষ হয়ে ওঠে; ত্রিনেত্রবান মানুষ থেকে 'একচক্ষু-হরিণ'-এর মতো একচক্ষু মানুষ হয়ে ওঠে; অন্যদিকে উদ্বৃত্ত উৎপাদন মানুষের ঘাড়ে দৈত্যের মতো চেপে বসে এবং পূর্বজ্ঞানের বিস্মরণ ঘটায়। নতুন জ্ঞানের উপনদীর যোগ না ঘটলে এই দক্ষকর্মধারা মৌলবাদী হয়ে গড্ডালিকায় পরিণত হয়ে অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। ('ঘ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)।

তাছাড়া, একই কর্মের পুনরাবৃত্তি মানেই একই জ্ঞানেরও পুনরাবৃত্তি। যেমন কিনা, ধরা যাক, জাল বোনার বিদ্যা আবিষ্কারের পর, একের পর এক জাল বুনে, সেই জাল ফেলে মাছ ধরতে ধরতেই আদিম যৌথসমাজের একদল সদস্য স্বাভাবিকভাবেই জেলেতে পরিণত হয়ে যেতে থাকে। তারা মাছ ধরায় **দক্ষ** হয়ে ওঠে ঠিকই, তাদের জীবিকা সহজসাধ্য হয়ে যায় সেকথাও ঠিক; কিন্তু তাদের এতদিনকার চাষবাসের জ্ঞান, গাছগাছালির জ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদের জ্ঞান ... সবই সেই **দক্ষ** জেলেরা অতঃপর ভুলে যেতে থাকে। চাষী পেশা বদলে জেলের পেশা গ্রহণ করলেই, চাষীর জীবনযাত্রাপদ্ধতি (সংস্কৃতি) থেকে জেলের জীবনযাত্রাপদ্ধতিতে (সংস্কৃতিতে) বদলে যেতে থাকে চাষীর জীবন। আর, এসবের নিশ্চিত ফল দাঁড়ায়, প্রাচীন যৌথসমাজের সদস্যরা, যারা সবরকম জ্ঞানই কমবেশি জানত এবং সবরকম কাজ করত, তারাই ক্রমে ক্রমে চাষী, জেলে, তাঁতি, কবিরাজ প্রভৃতি বিভিন্ন দিশাগ্রস্ত জ্ঞানের জ্ঞানীকর্মীতে পর্যবসিত হয়ে যায় এবং ফলস্বরূপ সমধর্ম্মী মানুষের আদিম যৌথসমাজ বিষমধর্ম্মী মানুষের সমাজে পরিণত হতে থাকে; অনিবার্যভাবে যার ফল সমাজকে **দিশা**গ্রস্ত করে বিভাজিত হওয়ার দিকে এগিয়ে দেয়। যৌথসমাজের **দেশ**হীন মানুষ বিশেষ বিশেষ **দেশ**-এর অধিবাসীতে পরিণত হতে থাকে। ...

শ, ষ, ও স বর্ণের আলোচনায় আমরা দেখেছি, শক্তিবিচ্ছুরণের তিনটি রূপ। সূর্যের মতো সার্বিক শক্তিবিচ্ছুরণ (**শ**), টর্চের আলোর মতো দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ (**ষ**), এবং আলোর একটি কিরণরেখার মতো একটিমাত্র আলোক কণার বিচ্ছুরণ (**স**), যা কিনা আসলে সত্তামাত্র। সবাই জানেন, **দক্ষ** শব্দটি তৈরি হয়েছে দ্ + অ + ক্ + ষ্ + অ জুড়ে। অর্থাৎ, এর ভিতরে একটি **ষ** রয়েছে। উপরোক্ত জাল বোনার জ্ঞানের বারংবার প্রয়োগ কেমন করে মানুষকে দিশাগ্রস্ত করে দেয়, তা আমরা দেখেছি। আমরা আরও জানি, আবিষ্কারকের জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান বা **শিব**-এর উপলব্ধ জ্ঞান শিখেই **দক্ষ** জাল বুনতে শুরু করে। অর্থাৎ কিনা, মূলে দুটি সত্তা রয়েছে। আবিষ্কারক সত্তা বা **শিব**সত্তা ও আবিষ্কার-বাহকসত্তা বা **দক্ষ**সত্তা। **শিবসত্তা** হল আসলে **পুরুষ**সত্তা; সে নতুন জ্ঞান আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করতে পারে কিন্তু সে জ্ঞান ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখতে পারে না এবং বহন করতে পারে না। অপরদিকে **দক্ষ**সত্তা হল তার আধার বা **প্রকৃতি**সত্তা; সে আবিষ্কার করতে কিংবা সে-আবিষ্কারকে নিজের বুদ্ধিতে কাজেও প্রয়োগ করতে পারে না, কিন্তু আবিষ্কারকের কাছ থেকে তার আবিষ্কার ও প্রয়োগ শিখে নিয়ে নিয়মিত কাজে প্রয়োগ করতে পারে, কাজে লাগায়, একই কর্মের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে আবিষ্কৃত জ্ঞানকে বহন করে নিয়ে চলে যুগের পর যুগ। স্বাভাবিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে এই **শিব** ও **দক্ষের** পরস্পরের সঙ্গে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ থাকার কথা। একদিকে আবিষ্কারক, আত্মমগ্ন, ব্রহ্মজ্ঞানী **শিবেরা** আবিষ্কার করে, উদ্ভাবন করে, শিকার করে

আনবেন এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞানকে রপ্ত করে 'সার্বজনীন করা'র (বা জেনারালাইজেশনের) চেষ্টা করবেন; অপরদিকে শিবপ্রেমী দক্ষেরা তা সুবিন্যস্ত করে গুছিয়ে রাখবেন ও 'বিশেষভাবে বহন করা'র (বা স্পেশালাইজেশনের) কাজ করে চলবেন — মানবসভ্যতার অর্জিত ব্রহ্মজ্ঞান এভাবেই বেদজ্ঞানে পরিণত হয়ে বেদজ্ঞান রূপে বাহিত হয়ে চলবে — এটাই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নীতি ছিল, এবং যতদূর বোঝা যায় এটাই ছিল মানবসমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে **শিবনীতি**। ব্রহ্মজ্ঞান ও বেদজ্ঞানের সমুচ্চয়ী দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল এই শিবনীতি। বৈদিক যুগের সূত্রপাতের আগে এই শিব-পরিচালিত সমাজের বেদকে সেকারণেই বলা হত **সনাতন বেদ**। এই বেদ পরবর্তীকালে **বেদব্যাস** চার ভাগে বিভক্ত করেন।

ভারত-ইতিহাস বলছে, প্রাচীন ভারতের **দক্ষেরা** বা স্পেশালিস্টরা একসময় **শিবের** বা আবিষ্কারকের এই নীতি অমান্য করে এবং শিবের মহিমাকে অস্বীকার করেন এবং সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ফলস্বরূপ মানুষের সমাজ ক্রমান্বয়ে দিশাগ্রস্ত হয়ে যায়; রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'একটেরে'। এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে আমাদের 'ঘ' গ্রন্থে।

যাই হোক, **দক্ষ** শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ — 'অন্যকে **ক্ষ** করে (ক্ষাত অংশ আমাদেরকে) দেয় যে' — একই সঙ্গে 'পটু, অনলস, শীঘ্রকারী'কেও বোঝায়; কেননা তারা প্রত্যেকেই অন্যকে ক্ষয় করে আমাদের দেয়। এই **দক্ষতাই** 'নৈপুণ্য'। মানবশরীরের দুটি হাতের মধ্যে যে হাত **দক্ষ**, সেই হাতকে তাই **দক্ষহস্ত বা দক্ষিণ**হস্ত বলে। **দক্ষ**শ্রমেরই অপর নাম **দক্ষ**তেজ বা অগ্নি। **দক্ষশ্রমিক** সত্তাকে সেকালে বলা হত **দক্ষিণাকালী**। এই **দক্ষ** হল প্রকৃতপক্ষে আবিষ্কারকের বাহক বা **শিবের** বাহক, তাই **দক্ষ**কে 'শিববৃষ' বলে। **শিবের সঙ্গে দক্ষের** সম্পর্ক কোথায়, কতখানি মিল অমিল, বাংলাভাষীদের সমাজ তাদের কেমন বুঝত, তার একটি সহজ ও অন্যতর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে আমাদের লেখা 'গ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে — 'বৃষোৎসর্গ' শীর্ষক রচনায়।

সমাজবাস্তবে কিন্তু অধিকাংশ সময়ে **শিবই দক্ষ** রূপে দেখা দেন। আবিষ্কারক তাঁর আবিষ্কারটি করে ফেলার পর সেই আবিষ্কারকে কাজে লাগাতে নিজেই কাজে নেমে পড়েন এবং অনেক সময় তিনিই একই কর্মের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে তার প্রয়োগ করতে থাকেন। সেই কারণে কখনো কখনো **শিবই দক্ষ** পদবাচ্য হন। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকবার প্রয়োগ করে ফেলার পর **শিব** পুনরায় আপন আবিষ্কারের কাজে ফিরে যান। কারণ একই কর্মের পুনরাবৃত্তি **শিব**সত্তার ভাল লাগে না।

মোট কথা মানবসভ্যতার একটি **পুরুষ**সত্তা রয়েছে, যে আবিষ্কার করে আনে; সেকালে তাকে জ্ঞানকর্মের অগ্নিশিখাবহনকারী **শিব** বা ব্রহ্মগুণসম্পন্ন **ব্রাহ্মণ** বলা হত; একালে তাকে আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, স্রষ্টা, বিজ্ঞানী ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। অপরদিকে রয়েছে একটি **প্রকৃতি**সত্তা, সে **শিবের** আবিষ্কার প্রয়োগ করে ও বহন করে নিয়ে চলে; সেকালে তাকে একই কর্মের পুনরাবৃত্তিকারী **ছাগ, দক্ষ, ছাগমুণ্ড, অত্রি, বিষ্ণু** এমনকি **দক্ষ**-সমর্থক **ব্রহ্মা** এবং **ভৃগু** ইত্যাদিও বলা হত, একালে তাকে বিশেষজ্ঞ, স্পেশালিস্ট, ব্যুরোক্র্যাট, টেকনোক্র্যাট, প্রোডাকশন-ম্যানাজার এমনকি দক্ষশ্রমিক ইত্যাদিও বলা হয়ে থাকে। অতএব, **জ্ঞানের দুটি ভাগ — উদ্ভাবন-জ্ঞান ও উদ্ভাবিত-প্রবাহিত-জ্ঞান**। **এই জ্ঞানই** ক্রমান্বয়ে বাহিত বলে একে **বেদজ্ঞান** বলা হয়। এদের যথাক্রমে শিবজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান, অভেদজ্ঞান) ও দক্ষজ্ঞান (বেদজ্ঞান, ভেদজ্ঞান) বলেও অভিহিত করা চলে।

এবার আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে যাব এবং ভারতের ইতিহাসে **দক্ষ** যেসকল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা সাধ্যমতো বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। সন্দেহ নেই, এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক চরিত্র। ইনি কোনো একজন মানুষ নন, অন্য পৌরাণিক সত্তাগুলির মতো ইনিও একটি সত্তা। সামাজিক সত্তার এরকম নামকরণ আজকাল নতুন মনে হলেও, এ কোনো নতুন ব্যাপার নয়। ইয়োরোপে মধ্যযুগের Morality নাটকেও Truth, Beauty, Knowledge, Reason প্রভৃতি চরিত্র আমরা দেখেছি। একালে যেমন কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, বিজেপি, উগ্রপন্থী, সন্ত্রাসবাদী, কিংবা শিক্ষক, ছাত্র, শ্রমিক প্রভৃতি সত্তাগুলিকে আমরা দেখি, এও সেইরকম। এগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি সামাজিক সত্তা। এই সত্তাগুলি এক-একটি আদর্শ বা বিশেষ ধরনের ক্রিয়া বা ক্রিয়াপুঞ্জ হতে পারে, সেই আদর্শ পালনকারী একটি মানুষ বা একদল মানুষও হতে পারে। **দক্ষ**ও সেইরকম। সে skill, expertise, specialisation ... ইত্যাদি। তার সম্পর্কে পুরাণে তো স্পষ্ট বলা হচ্ছে — **দক্ষ** ছিলেন 'ব্রহ্মার পুত্র, প্রজাপতিবিশেষ।' যেহেতু **ব্রহ্মা** হলেন একধরনের Knowledge সত্তা, তার থেকে skill ... ইত্যাদির জন্ম হতেই পারে; অর্থাৎ **দক্ষের** জন্ম হতেই পারে, হওয়াই স্বাভাবিক, এবং হয়েও ছিল। তবে সে জন্মেছিল ব্রহ্মার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ থেকে। এর অর্থ বুঝতে গেলে Thumbs up-এর মানে জানতে হয়, কলা দেখানোর মানে জানতে হয়, বুড়ো আঙুল দেখানোর মানে জানতে হয় এবং সে বিষয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব, **দক্ষিণ** শব্দে। ...

যাক, যে কথা বলছিলাম। পুরাণ বলছে, '... ইঁহার (দক্ষের) ভার্য্যা স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা প্রসূতি; তাঁহার গর্ভে শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, মূর্ত্তি, তিতিক্ষা, হ্রী, স্বাহা, স্বধা, ও সতী এই ষোড়শ কন্যার' জন্ম হয়। তাদের 'মধ্যে অগ্নির সহিত স্বাহার, পিতৃগণের সহিত স্বধার, মহাদেবের সহিত সতীর এবং অবশিষ্ট ত্রয়োদশ কন্যার সহিত ধর্ম্মের বিবাহ হয়।'

বুঝতে পারছেন না তো। আমরাও সব পারিনি; যতটা পেরেছি, তার রূপরেখা দিয়ে যেতে চাই। তার আগে এগুলিকে বুঝবার সুবিধার জন্য একটি আধুনিক উদাহরণের শরণ নেওয়া যাক।

যদি বলি, 'সাম্যঘোষের ঔরসে জরার গর্ভে আতঙ্কের জন্ম হয়। তাহার ভয়ানক রূপ দেখিয়া হাসি অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং পৃথিবী বাক্হীন হয়। পূর্বজন্মে এই আতঙ্ক ধনপতির ঔরসে মন্দনীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিল।' তাহলে আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না। কিন্তু ওই একই কথা যদি এভাবে বলা যায়, তাহলে হয়তো সহজেই বোঝা যাবে — 'সমাজতান্ত্রিকদের সঙ্গে দীর্ঘকালীনতার (বা সুদীর্ঘ ক্ষমতার) সম্পর্ক ঘটলে ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়। সেই ফ্যাসিবাদের আবির্ভাবে বাকস্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয় এবং সমাজ থেকে কমেডিয়ানদের বিলোপ ঘটে। পূর্বকালে ধনতন্ত্র যখন

বিপুল মন্দার মুখোমুখি হয়েছিল তখনও ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়েছিল।'

এখন বোধ হয় খানিকটা হলেও বোঝা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে এই জন্য যে, স্টালিনের সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, চীনের সমাজতন্ত্র এবং পশ্চিমবাংলায় সমাজতন্ত্রবাদীদের দীর্ঘকালীন শাসনব্যবস্থা ও তার ফল আমরা দেখেছি। এবং তার আগে হিটলারের জমানাও আমরা দেখেছি এইসব ব্যবস্থায় ফ্যাসিবাদের উদ্ভবও আমাদের চোখে পড়েছে। তার মানে বক্তব্যের প্রেক্ষিত চোখের সামনে রয়েছে বলে উপরোক্ত বক্তব্য বুঝতে খুব বেশি অসুবিধা আমাদের হচ্ছে না।

একইভাবে প্রাচীন ঘটনাবলীকেও বুঝতে হবে, সাধ্যমতো প্রেক্ষিতটি অনুমান করে নিতে হবে। তাহলেই আমরা প্রকৃত ঘটনাবলী খানিকটা বুঝে নিতে পারব। তবে তার আগে মনে রাখতে হবে, পুরাণকারগণ একই ঘটনাবলীকে নানাভাবে লিখে গেছেন। কোনটি ওই ঘটনাবলীর যথার্থ বয়ান তা নিয়ে সংশয় হতে পারে। আমরা মনে করি, পুরাণকারগণের এই ভিন্ন ভিন্ন বয়ান আসলে পরিস্থিতিকে সঠিকভাবে বুঝবার ও বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টার ফল। সেই কারণে তাঁদের দোষ না দিয়ে এবং কোনো একটিমাত্র বয়ানে সম্পূর্ণ নির্ভর না করে, সাধারণ বা 'কমন' বয়ানগুলির উপর নির্ভর করলে আমরা বেশ খানিকটা সত্যের সন্ধান পেয়ে যেতে পারি।

প্রায় সব পুরাণের বয়ানেই যে 'সাধারণ' বক্তব্য রয়েছে তা আমরা এক এক করে বলছি ও তার সাধ্যমতো অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করছি — (ক) 'দক্ষ ব্রহ্মার পুত্র।' এর অর্থ আমরা আগেই দিয়েছি। (খ) 'দক্ষের কন্যা অনেক।' হ্যাঁ, এবং তাদের সংখ্যা নিয়ে নানারকম বয়ান রয়েছে। এর অর্থ হল, প্রাচীন যৌথসমাজে যে-দক্ষ জাল বোনায় দক্ষ তার অনুসারীরা জেলে, যে-দক্ষ হাঁড়িকুড়ি বানানোতে দক্ষ তার অনুসারীরা কুমার, এবং এইভাবে বহু শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল; তারা সবাই দক্ষকন্যা। এদের অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রও বলে। দ্র. **জ্যোতির্বিদ, গ্রহ, নক্ষত্র**। (গ) 'সেই কন্যাদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে দক্ষ আরও অনেকগুলি সামাজিক সত্তার সঙ্গে সম্বন্ধিত ছিলেন, তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন চন্দ্র এবং শিব।' তার মানে, **দক্ষকন্যা**দের এক একজন এক একটি পুরুষসত্তার সঙ্গে সম্বন্ধিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে যাঁরা উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিনিময় করতেন, তাঁদের বিবাহ হয়েছিল **চন্দ্রের** (= ব্যবসায়ী পুঁজির আদিরূপের) সঙ্গে; আর, যারা একনিষ্ঠভাবে আবিষ্কারকের কথা অনুসারে চলতেন, সেই শ্রমিকশ্রেণী বা সতী ছিলেন **শিবের** (আবিষ্কারক মহর্ষিদের) ঘরণী। (ঘ) 'তিনি (দক্ষ) শিবকে বাদ দিয়ে (উৎপাদন-কর্ম) যজ্ঞ করেছিলেন এবং শিবকে যজ্ঞভাগ দিতে অস্বীকার করেছিলেন।' শিবকে অর্থাৎ সনাতনপন্থী আবিষ্কারক আদি-ব্রাহ্মণ-মহর্ষিদেরকে বাদ দিয়ে দক্ষগণ অর্থাৎ সেকালের আধুনিক বেদপন্থী মহর্ষিরা উৎপাদন কর্মকাণ্ড চালাতে শুরু করেন এবং শিবকে অর্থাৎ পূর্বতন আবিষ্কারক মহর্ষিদের বর্তমানের উৎপাদিত সম্পদের ভাগ দিতে অস্বীকার করেন। (ঙ) 'এর ফলে দক্ষকন্যা সতীর মৃত্যু হয়।' তার মানে, এতকাল যাঁরা শিবের পরিচালনায় যৌথ সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতেন এবং মজুরী স্বরূপ যজ্ঞভাগ পেতেন, তাঁরা কর্মহীন হয়ে পৃথিবীর প্রথম বেকারে পরিণত হন এবং নিষ্প্রাণ জনগণে পরিণত হন। (চ) 'শিব ও তাঁর অনুচরেরা সেই যজ্ঞ পণ্ড করে দেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিবের প্রশংসার মাধ্যমে শিবের রোষকে স্তিমিত করেন ব্রহ্মা।' সেকালের আবিষ্কারক (ব্রহ্মজ্ঞানী) মহর্ষিগণ এই দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করতে উদ্যত হলে বেদজ্ঞানীগণ তাঁদের নিরস্ত করেন এবং **শিবের** পূজা করে তাঁর রুদ্ররূপকে ঠাণ্ডা করেন। (ছ) 'দক্ষযজ্ঞ নাশের ঘটনায় দক্ষের মুণ্ড চলে যায়।' এই মহাযুদ্ধে দক্ষশ্রেণীর মস্তিষ্কস্বরূপ তাঁদের অগ্রণী নেতাগণের মৃত্যু হয়। দ্র. **অত্রি**। (জ) 'পরে সেখানে ছাগমুণ্ড বসিয়ে দক্ষকে জীবিত করা হয় এবং সেই ছাগমুণ্ডি-দক্ষকে **অত্রি** বলে।' দ্র. **অত্রি**। (ঝ) 'সতীর মৃতদেহকে বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে ৫১ টি খণ্ডে বিভক্ত করেন এবং সেই খণ্ডগুলি ভারতে ও ভারতের বাইরে যে যে স্থানে পড়েছিল, সেগুলির প্রতিটিই এক-একটি তীর্থক্ষেত্র রূপে খ্যাত।' ভারতের সেই নিষ্ঠাবান শ্রমিকশ্রেণী (সতী) ৫১ টি স্থানে সংহত হয় এবং কালক্রমে সেগুলি কারুশিল্পের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। নগদ-নারায়ণই এদের খণ্ড খণ্ড করে সংহত করার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। এরই একটি কলিকাতার **কালীক্ষেত্র**। ইংরেজ আগমনের আগে থেকেই এটি ছিল কারুশিল্পের কেন্দ্র। দ্র. **তীর্থ**।

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে অন্তত অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের নজরে আসে। আদি বেকারের জন্ম, আদি পূজার জন্ম, আদি সামাজিক বিভাজন, এবং সর্বোপরি আদি বা প্রথম বৈদিক সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছিল এই দক্ষযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা থেকে। আরও অনেক কিছুই হয়েছিল, যেমন জ্বরোৎপত্তি, রোগোৎপত্তি ... ইত্যাদির সূত্রপাত হয়েছিল মানবসমাজে **দক্ষের** মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। তার মানে, **দক্ষযজ্ঞের** ঘটনার আগে পর্যন্ত আবিষ্কার ছিল, আবিষ্কারক ছিল, জ্ঞানও ছিল, কিন্তু কারও কোনো পৃথক মর্যাদা ছিল না, সব মানুষের সমান মর্যাদা ছিল। আবিষ্কৃত-জ্ঞানের বাহকের বা বেদবাহক-**দক্ষের** বা **বেদীর** সুপ্রিমেসি প্রতিষ্ঠাই মানবসমাজে সর্বপ্রথম মানুষে মানুষে ভেদের সূত্রপাত ঘটায় ও সনাতন যুগ পেরিয়ে বৈদিক যুগের সূত্রপাত হয়। আদিকাল থেকে আগত যৌথ মানবসমাজ বিভাজিত হতে শুরু করে। ...

কিন্তু আবিষ্কারের উপনদী এসে প্রচলিত জ্ঞানধারায় যোগ না দিলে **দক্ষ**-বাহিত জ্ঞানধারা শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। সেই কারণে শুরু হয় **শিব**-এর সঙ্গে তঞ্চকতা, বঞ্চনা। তার আবিষ্কারকে আত্মসাৎ করে **দক্ষ** প্রাণ বাঁচায়, কিন্তু **শিব**কে তার মর্যাদা আর ফিরিয়ে দেয় না। এভাবেই চলতে থাকে। আজকের মানবসমাজের ও আজকের পৃথিবীর যা-কিছু সমস্যা, বিপদ, ক্ষতি তা সবের মূলে রয়েছে সমাজপরিচালকের আসনে অধিষ্ঠিত **দক্ষ** বা স্পেশালিস্ট সত্তার এই ভূমিকা। পরিবারের শীর্ষ আসনে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর অভেদ রূপটিকে সরিয়ে দিয়ে, সেই আসনে কেবলমাত্র স্ত্রী বসে গেলে এবং স্বামী আপন মর্যাদায় বঞ্চিত হয়ে ক্রুদ্ধ মাতাল এবং/বা লালাভোলা হয়ে ঘুরে বেড়ালে পরিবারের যে-দুরবস্থা হয়, আজকের মানবসভ্যতার সেই অবস্থা হয়েছে। ...

৬. গ্রীক doxa (= মত), ইংরেজি doctor (= শিক্ষক), *doxology*, ortho-*dox* ইত্যাদি।

দক্ষকন্যা, দক্ষজা : ৩. 'দক্ষসুতা', দুর্গা। (ব.শ.)। **৫.** মধ্যবিত্ত

জনসাধারণ, যাঁরা কোনো না কোনো ধরনের দক্ষজ্ঞানের সাহায্যে সেই সেই কর্মে দক্ষ; তা সে চাষকরা, মাছধরাই হোক, আর ডাক্তারি মাস্টারিই হোক।

দক্ষক্রতু, দক্ষযজ্ঞ : ৩. দক্ষকৃত শিবহীন যজ্ঞ। (ব.শ.)। ৫. যে সকল সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ বা কর্মকাণ্ড দক্ষজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞগণ পরিচালনা করেন। প্রাচীন ভারতে প্রথম **দক্ষযজ্ঞ** চলাকালীন যে মহাসংগ্রাম ঘটেছিল, সেই ঐতিহাসিক ঘটনার কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এখানে কেবল শব্দটির মানে বলা হচ্ছে। ৬. গ্রীক kratos, ইংরেজি cracy।

দক্ষঃ, দক্ষস্ : ২. *দক্ষের শক্তির শেষ বা 'নির্য্যাসত্যাগ' যাহাতে।* ৩. বল। (ছাত্রবোধ অভিধান)। ৫. দক্ষতার থেকে জাত সত্তাই **দক্ষস্**। এ হল স্কিলড্-ওয়ার্কারের শক্তি।

দক্ষা : ৩. পৃথিবী, গঙ্গা। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ব.শ. কথিত এই **পৃথিবী** earth নয়, এ হল **দক্ষজাত** আদিম সমাজতান্ত্রিক বা বৈদিক রাষ্ট্র। বেদবাহক দক্ষের সুপ্রিমেসি প্রতিষ্ঠার পর এই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। দ্র. **পৃথিবী**। **গঙ্গা** কী, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। এ হল মানুষের তৈরি করা দুটি ধারা। একটি জলধারা, অপরটি পণ্যধারা। **দক্ষ** বা একই কর্মের পুনরাবৃত্তিকারী সত্তাই পণ্যধারার জনক। তাই গঙ্গাকে **দক্ষা** বলে। ৬. গ্রীক doxa (= মত)।

দক্ষিণ (ডান, ডানদিক, ডানহাত, ভূরিদক্ষিণ), দক্ষিণাপথ, দক্ষিণাপথিক (দক্ষিণপন্থী, দক্ষিণামূর্ত্তি) : ১. ✓দক্ষ্ + ইন (ইনন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দক্ষিণ*** *=* ***দক্ষ*** *গতিশীলভাবে* ***অন*** *থাকে যাহাতে।* ***দক্ষিণপন্থী*** *=* ***দক্ষিণ*** *পন্থার আধার যে।* ***দক্ষিণাপথ*** *=* ***দক্ষিণ*** *গামী পথ যাহার।* ***দক্ষিণাপথিক*** *=* ***দক্ষিণাপথে*** *হাঁটে যে।* ***ভূরিদক্ষিণ*** *= যাহাতে ভূরি ভূরি* ***দক্ষিণা*** *(বিতরণ করা হয়)।* ৩. **দক্ষিণ** = কুশল, সরল, উদার, পরচ্ছন্দানুবর্ত্তী, অবাম, দক্ষিণদিগবর্ত্তী, দক্ষিণপার্শ্বস্থ, অনুকূল, ডানহাত, রথের দক্ষিণপার্শ্বস্থ অশ্ব, দক্ষিণাগ্নি, বিষ্ণু, শিব, নায়কবিশেষ, দক্ষিণ দিক, দাক্ষিণাত্য। **দক্ষিণাপথ** = দক্ষিণা পন্থা, দক্ষিণ দেশ। **দক্ষিণাপথিক** = দক্ষিণাপথের রাজগণ ও অধিবাসীগণ। **দক্ষিণামূর্ত্তি** = 'অনুকূলমূর্ত্তি', শিবমূর্ত্তিভেদ। **ভূরিদক্ষিণ** = প্রভূতদক্ষিণাযুক্ত। (ব.শ.)। ৪. south ও right-side বোঝাতে শব্দটি প্রচলিত। ৫. সহজ কথায় **দক্ষ** যেদিকে যায়, সেদিকটিকে **দক্ষিণ** বলা যায়। বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের সমাজ যেহেতু কোনো না কোনোভাবে স্পেশালিস্ট কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছে, তাদের চোখে দক্ষের চলার পথ বা **দক্ষিণ** (দক্ষিণপন্থী হওয়া) সবসময়ই অনুকূল, শুভ এবং সঠিক বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। সেই কারণে তাদের কাছে **দক্ষিণ** মানেই 'কুশল', 'সরল', 'অনুকূল' ... 'শিব' (মঙ্গলকর), 'বিষ্ণু' (অর্থকরী) ... ইত্যাদি হয়ে যায়। এই দিকজ্ঞান বাহ্যিক বা ভৌগোলিক নয়, সম্পূর্ণরূপে মানসিক ও সামাজিক। (দ্র. **উত্তর**)। প্রতিটি মানসিক দিকের যেমন দিকপাল রয়েছে, তেমনি এই মানসিক দক্ষিণ দিকেরও দিকপাল রয়েছে। (দ্র. **দিকপাল**।) আর মনে হয়, যেহেতু ভারতের south দিকটি মানুষের বাসের অনুকূল, সেদিকে যাওয়া অনায়াস-সাধ্য ... ইত্যাদি ব'লে সেদিকটির নাম কালক্রমে **দক্ষিণদিক** হয়ে যায়। সমুদ্রের দিকের মানুষ বোঝাতে উত্তর ভারতের মানুষেরা আজও তাদের 'নামাল দেশের লোক' বা 'দোখ্‌নো লোক' বলেন। বিপরীতে উঁচু বলে এবং তাতে উত্তীর্ণ হতে হয় বলে north দিকটি হয়ে যায় **উত্তরদিক**, এবং তা মানসিক ভৌগোলিক উভয় দিক থেকে। **শিব** ও **কুবের** থাকেন কৈলাসে যা রয়েছে **উত্তর** দিকে এবং উচ্চতর জ্ঞানে উত্তীর্ণ হতে হতে বা উচ্চতর জ্ঞানবান হতে হতে শিবের কাছে যেতে হয়; আর উচ্চতর ধনে উত্তীর্ণ হতে হতে বা উচ্চতর ধনবান হতে হতে **কুবের**-এর কাছে পৌঁছতে হয়। আর, বাহ্যিক বা ভৌগোলিক ভাবে সে কারণেই, **উত্তর** দিক হল হিমালয়ের দিক এবং কৈলাস সেখানেই। কিন্তু **দক্ষিণ** কেন ডানদিক (right-side) হয়ে গেল?

মানুষ সাধারণভাবে ডান হাতে অধিক কাজ করে এবং বাম হাতে কম কাজ করে। যতদূর বোঝা যায়, উদ্ভবকালে মানবপ্রজাতির এই প্রবণতা ছিল না। বানরদের মধ্যে ডান হাতের অধিক ব্যবহার এবং বাঁ হাতের কম ব্যবহার নেই বলেই শুনেছি। কিন্তু বৈদিক যুগের সূত্রপাতের আগেই আগুন, নতুন নতুন হাতিয়ারের ব্যবহার ও চাষাবাদের মাধ্যমে মানুষের স্বভাবে ডান হাতের ব্যবহার অধিক হতে থাকে। দক্ষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পর, অর্থাৎ বৈদিক যুগের সূত্রপাতের পর থেকে মানুষ ক্রমশ সম্পূর্ণভাবেই দক্ষিণহস্ত-নির্ভর হয়ে যায়। সমাজমনে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, দক্ষনীতি অনুসরণ করাই সঠিক। কেননা, একে তো চারিদিকে ছিল নেচারের অঢেল সম্পদ, আর সে-পর্যন্ত যতখানি আবিষ্কৃতজ্ঞান হাতে এসেছিল, তার পুনরাবৃত্তিতেই যথেষ্ট সম্পদ অর্জিত হয়ে যাচ্ছিল; ফলে, শুধু শুধু আগের মতো উদ্ভাবন-নীতিতে বা শিবনীতিতে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চালানো অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল। সেই কারণে দৈহিক দিক থেকে মানুষ যেমন সম্পূর্ণ দক্ষিণহস্ত-নির্ভর হয়ে পড়ে, তেমনি মানসিক দিক থেকেও মানুষ দক্ষতা-নির্ভর হয়ে যায়; **দক্ষিণা**-নির্ভর হয়ে যায় (দ্র. **দক্ষিণা**)। ফলে, এই দিকে যাওয়াই **দক্ষিণাপথে** যাওয়া বলে প্রতিপন্ন হয়ে যায়। ক্রমে সমগ্র মানবসমাজই **দক্ষিণপন্থী** হয়ে যায়। আর, সেই পথে যাঁরা পাড়ি দেন, তাঁরা হয়ে যান **দক্ষিণাপথিক**। মানুষের মনে হয়, এইভাবে দক্ষিণপন্থী হওয়াই সবদিক থেকে সঠিক।

কিন্তু **দক্ষিণ**-এর এই 'সঠিক' অর্থটির উত্তরাধিকার আমাদের বাংলাভাষীদের হাতে নেই, রয়েছে ইংরেজের। ইংরেজিভাষী সঠিক বোঝাতে যেমন right শব্দটি ব্যবহার করেন, তেমনি ডান (হাত বা দিক) বোঝাতেও right শব্দটি ব্যবহার করেন। এই right শব্দটি তাঁরা পেয়েছেন 'ঋগ্' থেকে, যা থেকে **ঋগ্বেদ** কথাটি আমরা পেয়েছি। **ঋগ্** হল উদ্ভাবিত আবর্ত্তনমূলক জ্ঞান, যার পুনরাবৃত্তি করা হয়। আর, **দক্ষ** তো সেটাই করে। অতএব, **দক্ষিণ** দিকে যাওয়া আর right দিকে যাওয়া সমার্থক হয়ে যায়। কিন্তু ভারতীয়দের, বিশেষত বাংলাভাষীদের মনে **দক্ষিণ** দিকটিই সঠিক বা right, এমন বোধ নেই। কেননা, **শিবের** উত্তরাধিকার ভারতসমাজ ভোলেনি, ভুলতে রাজি বলেও মনে হয় না। তাছাড়া **দক্ষ**ও যে খুব সফল ভাবে এখানে প্রতিষ্ঠিত, এমনও নয়। এখানে তাকে প্রতিষ্ঠিত হতে

হয়েছে একদিকে নিজের মাথা খুইয়ে ছাগমুণ্ড হয়ে এবং অপরদিকে **শিব**কে পূজার মাধ্যমে **শিবনীতি** অমান্য ক'রে; অর্থাৎ শিবের সঙ্গে তঞ্চকতা করে। ফলে, জনসাধারণের মনে **শিবের** মাহাত্ম্য কমবেশি থেকেই গেছে। অন্যদিকে **দক্ষ** অনেক বেশি কট্টরভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে ভারতের বাইরে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে। এরকমই হয়, হয়েছে ধর্মের ক্ষেত্রেও। বুদ্ধের ধর্ম ভারতের চেয়ে ভারতের বাইরেই বেশি কট্টর ও প্রতিষ্ঠিত। জার্মানি বা ইংলন্ডে নয়, মার্কসবাদ অধিক প্রতিষ্ঠা পেয়ে কট্টর হয়েছে ইয়োরোপের বাইরেই।

তা হোক, প্রশ্ন হল, **বাম** দিক বোঝাতে ইংরেজ left ব্যবহার করেন কেন? করেন এইজন্য যে, বাম দিকটিকে অতঃপর মানবসমাজ পরিত্যাগ করে। সেই কারণে বাঁদিক হল সেই দিক, ভারতীয়দের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের আদিম পূর্বপুরুষও যে দিকে যাওয়ার চেষ্টা পরিত্যাগ করেছিল। তাই সেদিকটি left দিক।

বাম-এর এই অর্থটি অবশ্য উত্তরাধিকারসূত্রে আমরাও পেয়েছি; পেয়েছি 'কলা দেখানো' বা 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন'-এর মতো উলটোভাবে। ইংরেজ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আপন বিজয় ঘোষণা করে, খুশি জাহির করে; আমরা বুড়ো আঙুল দেখলে চটে যাই, বিরক্ত হই, বুঝতে পারি, ঠকে গেছি। **দক্ষ** শব্দে প্রদত্ত তথ্যানুসারে তার জন্ম হয়েছিল ব্রহ্মার 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ' থেকে। সমগ্র 'জ্ঞানজীবী-সত্তা' ছিলেন ব্রহ্মা, পরবর্তীকালে যিনি 'শিক্ষকশ্রেণী'তে অধঃপতিত হয়েছেন। তাঁর আদি রূপটিকে ব্রহ্মা বলে। সেই সত্তার কর্মকারী অংশ হল দুটি হাত। তার মধ্যে বুড়ো আঙুল হল **দক্ষ**। কেননা, হাতের সব আঙুলের সে অধিপতি। দ্র. **কলা**। **দক্ষ** শব্দে প্রদত্ত তথ্যানুসারে আমরা দেখছি, ব্রহ্মা তাকে প্রজাপতিগণের অধিপতি করেন। সেই দক্ষ যখন তার দক্ষতার নামে জনসাধারণের সমর্থন নিয়ে শিববিরোধী বৈদিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে সফল হয়ে গেল, সাধারণ মানুষ তাদের যৌথসমাজের অধিকার হারিয়ে **সম্প্রদায়ে** পরিণত হয়ে বুঝল 'কলাকৌশল-দেখানো' বা 'বুড়ো আঙুল দেখানো'র মর্ম কী! দ্র. **কলা**। কিন্তু ইংরেজের পূর্বপুরুষ আদিম যৌথসমাজের ভেঙে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ঘটনাটিকে দেখেছিল খানিকটা প্রতীকী অর্থে। সে বুঝেছিল, অন্যদের সম্পদ বা অধিকার হরণ করে বিজয়ী হয় যে, সে-ই বুড়ো আঙুলটা উপরে তুলে ধরে, thumbs-up করে।

একই ভাবে, ইংরেজ যাকে বুঝেছে মানবশরীরের left দিক এবং ভুলে গেছে যে, আদিতে সে সমাজশরীরের পরিত্যক্ত দিকটিকেই left বলে চিহ্নিত করতে শিখেছিল; আমরা তাকেই জেনেছি **বাম** দিক বলে। এই **বাম** শব্দের অর্থই হল 'গতি সীমায়িত যাহাতে'। এই বাম দিক দিয়ে আমরা কিছু দিই না, নিই। (দ্র. **দক্ষিণাগ্নি**।) যে **শিব** বৈদিক যুগের আগে পর্যন্ত মানবসমাজের সমগ্র সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ পরিচালিত করতেন, দক্ষযজ্ঞের পর তিনি **যতি** ধর্ম গ্রহণ করেন, যা একধরনের **আড়ি**। (লাল কাপড় পরে লাল চক্ষু দেখিয়ে সেই **যতি** অতঃপর ঘোষণা করেন, 'বেশ, এবার তাহলে তোমরা দক্ষরাই সমাজ চালাও, আমি কোনো কাজে হাত লাগাব না, আমাকে আমার যজ্ঞভাগ দিয়ে দিয়ো।' শিব **যতিরূপে** মানবসভ্যতার আদি **ভিক্ষু** হয়ে যায়। বৌদ্ধযুগেও ভারতসমাজে এই ভিক্ষুদের বিপুল সম্মান ছিল।) শিব যে এভাবে তাঁর কর্মপদ্ধতি থেকে সরে থাকলেন, স্বয়ং বিধি হয়েও **বাম** হলেন, সে তো কর্মে পরাঙ্মুখ হওয়াই বটে। এও তো পূর্বতন সামাজিক প্রক্রিয়া 'পরিত্যাগ করা'ই হল! অথচ নতুন প্রক্রিয়ায় যোগ দেওয়াও হল না। তাই বামই left, left-ই বাম। আধুনিক গণতন্ত্রেও সরকার যে পদ্ধতিতে সমাজ চালাচ্ছে, তার বিরোধীরা স্পিকারের বাঁদিকেই বসেন। বামপন্থা মানেই, আড়িপন্থা, স্ট্রাইক করা শ্রমিকশ্রেণী বা **বামাকালী**। বাম মানে, সে দেবে না কিছুই, কিন্তু নিলেও নিতে পারে। উত্তরাধিকার অনুসারে বামপন্থী কখনো কোনো কর্মযজ্ঞ, সমাজ, সংগঠন চালাতে পারে না। কারণ সে **বাম**। প্রচলিত প্রক্রিয়া তার কাছে পরিত্যক্ত, left।

এইখানে আরও একটি কথা স্মরণ করে নেওয়া দরকার। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি জাতির সংস্কৃতিতে ডানহাত ও বাঁহাত নিয়ে নানারকমের সংস্কার আজও প্রচলিত আছে। সব সংস্কারের মূলে যে এই **শিব-দক্ষ** বা **বাম-দক্ষিণ** ঘটনাবলীর কোনো না কোনো ধরনের উত্তরাধিকার রয়েছে, তা নিয়ে আমাদের সংশয় নেই। বাংলাভাষীদের স্বভাবে বাঁহাতে কাউকে কিছু দেওয়া শুধু নিষিদ্ধই নয়, অপমানজনকও বটে। চাঁদ সদাগর মা-মনসাকে শেষ পর্যন্ত বাঁহাতে ফুল দিতে রাজি হয়েছিলেন, ডানহাতে নয়। বিবাহাদি বা অন্যান্য আচারাদিতে কোন হাতের কখন কীরূপ ব্যবহার হবে, তার বহু নির্দেশ রয়েছে বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্কারে। সেসবের কারণও এই আদি ঘটনা।

সবশেষে দক্ষিণ-বামকে **ডান-বাঁ** করে ফেলার ব্যাপারে বাংলাভাষীদের কীর্তিটা একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে। দক্ষিণ-বামের যা মানে, ডান-বাঁ-এরও তাই মানে। কিন্তু সেই মানেটি **ডান-বাঁ** ধরে রেখেছে কীভাবে?

'ড্ (গড়ান-উড়ান) অন থাকে যাহাতে', তাকে **ডন** বলে। (ইংরেজি Don-ও প্রায় তাই।) সেই '**ডন** হইতে জাত' বা 'ডয়নের আধার অন থাকে যাহাতে', তাকে বলে **ডান**। (সেই ডান-এর আধারকে 'ডানা' বলে। দ্র. **ডী**'।) **ডান** শব্দের ভিতরে যে 'ডয়নের আধার অন থাকে', সে আর কেউ নয়, সে হল মেধাযুক্ত শ্রমশক্তির অন থাকা, উদ্দেশ্যমূলক শক্তিনিক্ষেপ করতে পারা। **দক্ষিণ**-এ বা ডান-এ সেটাই হয়। সেজন্যই **ডান** হাত মেধাযুক্ত বা উদ্দেশ্যযুক্ত শ্রমশক্তির নিক্ষেপ অন (on) রাখে, বলেই সে ডান-পদবাচ্য। পাখির ডানাও সেই **ডান**-কর্মেরই আধার বলে তার দুদিকের দুটো হাতই **ডানা** পদবাচ্য। কিন্তু মানুষের ডানহাতটিকে **ডানা** বলা গেলেও, এবং সব্যসাচীর দুই হাতকে ডানা বলা গেলেও, সাধারণভাবে মানুষের বাঁহাতটিকে ডানা বলা যাবে না। কারণ সে কর্মজগতের থেকে **বাম** হয়ে থাকে, কর্মে যুক্ত হতে আর সে রাজী নয়। সে **বা** (= গতি) হয়েও **ম** (= সীমায়িত)। তবে এটুকু বললেই তার সব কথা বলা হয় না। সে কি সত্যিই কর্মে অক্ষম? না। ন্যাটারা (বাঁহাতিরা) তবে অত নিপুণ বা দক্ষ হয় কেমন করে? ... এসব বিষয়ে আরও অনেক কথা আছে। সুতরাং তাকে 'গতি সীমায়িত যাহাতে' অর্থাৎ **বাম** না বলে বরং রহস্যরূপী চন্দ্রবিন্দু দিয়ে **বাঁ** করে রাখাই ভাল। এতে দুই কূল রক্ষা হয়। **দক্ষিণ-বাম**কে সেকারণেই বাংলাভাষী **ডান-বাঁ** বানিয়ে ফেলেছে। **৬.** ইংরেজি dexterity, ambidextrous।

দক্ষিণা (দক্ষিণাগ্নি, দক্ষিণাবান, দাক্ষিণ্য, ভূরিদক্ষিণ) : **১.** ✓দক্ষ + ইন (ইনন্) - করণবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** ***দক্ষিণা*** = ***দক্ষিণ***-*এর আধার যে।* ***দক্ষিণাগ্নি*** = ***দক্ষিণ*** *রূপী অগ্নি যে।* ***দক্ষিণাবান*** = ***দক্ষিণার*** *অধিকারী যে।* ***দাক্ষিণ্য*** = ***দক্ষিণা*** *জাত থাকে যাহাতে।* / **দক্ষিণা** = যাহা দ্বারা যজ্ঞে দক্ষ হয়। (ব.শ.)। **৩. দক্ষিণা** = যজ্ঞাদি বিধিতে তদন্তে বিহিত দান, যজ্ঞাদিবিধিদান, ব্রহ্মচর্য্যান্তে শিষ্যের দেয় গুরুপ্রার্থিত ধনাদি, দানক্রিয়া, দান, যজ্ঞপত্নী, দক্ষিণদিক, দক্ষিণদিগবর্ত্তী দেশ, দাক্ষিণাত্য, প্রতিষ্ঠা, পয়স্বিনী গবী, নায়িকাবিশেষ। **দক্ষিণাগ্নি** = অনুকূল অগ্নি, দক্ষিণদিকের অগ্নি, অগ্নিত্রয়ের একতম। **দক্ষিণাবান** (দক্ষিণাবৎ) = দক্ষিণাযুক্ত (যজ্ঞ)। **দাক্ষিণ্য** = দক্ষিণভাব, উদারতা, মাহাত্ম্য, পরচ্ছন্দানুবর্ত্তন, অনুকূলভাব, আনুকূল্য, পটুতা, নৈপুণ্য, সরলতা, আর্জ্জব, নাটকলক্ষণবিশেষ, (তন্ত্রে) দক্ষিণাচার। (ব.শ.)। **৪.** 'পূজাশেষে পুরোহিত বা গুরুকে প্রদত্ত বস্তু বা বিষয়' এবং 'কাজ শেষে মজুরি' অর্থে **দক্ষিণা**, ও 'আনুকূল্য' অর্থে **দাক্ষিণ্য** প্রচলিত। বাকি শব্দ দুটি অপ্রচলিত। **৫. দক্ষিণা** শব্দটিকে 'অগ্নিত্রয়' বা তিনপ্রকার **অগ্নির** কথায় গেলে খুব সহজে বোঝা যায়। সামাজিক অগ্নি মাত্রেই শ্রম বা শ্রমজাত সম্পদ, টাকাপয়সা, ধনদৌলত। সংসারী মানুষকে এই অগ্নির তিন রকম রূপের উপর নির্ভর করে চলতে হয় — আহ্বনীয়, গার্হপত্য, ও দক্ষিণাগ্নি। যে আগুন (টাকা) আয় রূপে আসে, তাকে বলে আহ্বনীয় অগ্নি। যে আগুন সংসার চালানোর জন্য ব্যয় করতে হয়, তাকে গার্হপত্য অগ্নি বলে। আর, যে আগুন কাউকে না কাউকে **দক্ষিণা** রূপে দিয়ে দিতে হয়, তাকে **দক্ষিণাগ্নি** বলে। প্রাচীন ভারতে **পৃথুর** আবির্ভাবের বেশ কিছুকাল পরে একসময় এমন ধরনের রাষ্ট্রীয় কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হত, যেখানে কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণকারী দক্ষ মানুষেরা বা রাষ্ট্রের স্পেশালিস্ট কর্মচারীরা জনসাধারণের সম্পদ বা পাবলিক মানিকে ভূরি ভূরি **দক্ষিণা** রূপে ভাগ করে নিত এবং কর্মযজ্ঞটি শেষ হয়েও হত না, চলতেই থাকত, একালের ভারত সরকারের 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'র মতো। এই ধরনের যজ্ঞগুলিকে বলা হত **ভূরিদক্ষিণযজ্ঞ** বা **দীর্ঘসত্র**। পুরাণাদিতে কোথাও কোথাও একে 'দীর্ঘকালীন যজ্ঞ'ও বলা হয়েছে।

দক্ষিণায়ন (উত্তরায়ণ) : **২.** ***দক্ষিণায়ন*** = ***দক্ষিণে*** *যাওয়া অন থাকে যাহাতে।* ***উত্তরায়ণ*** = ***উত্তরে*** *যাওয়া অন থাকে যাহাতে।* **৩. দক্ষিণায়ন** = সূর্য্যের দক্ষিণ দিকে গমন, দক্ষিণায়নোপলক্ষিত কাল, শ্রাবণাদি ষণ্মাসকাল। **উত্তরায়ণ** = সূর্য্যের বিষুবরেখার উত্তরে গমন, মাঘাদি ষণ্মাসকাল, (দেবগণের উত্তরায়ণ দিন ও দক্ষিণায়ন রাত্রি), মকরসংক্রান্তি, যাগবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** কম প্রচলিত। **৫. দ্র. ইষ্ট।** এই শব্দটি বোঝার ক্ষেত্রে সবার আগে ঠিক করতে হবে, আপনি বাহ্যিক উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়নের মানে বুঝতে চাইছেন, না কি মানসিক-সামাজিক উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়নের মানে বুঝতে চাইছেন। বাহ্যিক মানে জানতে চাইলে ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ পড়ে নিলেই হবে। আরও অধিক জানতে চাইলে Astronomy-র উচ্চতর গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে পারেন। কিন্তু মানবসমাজের অর্থনৈতিক বিশ্বে কখন উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হচ্ছে না হচ্ছে, দেবতারা কখন ঘুমোচ্ছেন কখন জাগছেন, সেসব বুঝতে গেলে পড়তে হবে ভারতীয় জ্যোতিষীবিদ্যা বা Astrology। তখন এমন হতেও পারে যে, আপনি তিনটি সমান্তরাল দুনিয়াকে একই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন। দ্র. **জ্যোতির্ব্বিদ্যা (দ্যুৎ)**।

দং (দণ্ড্, দন্‌শ্ / দংশ্, দস্, দম্, দন্‌ভ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনির্দ্দশ, অনির্দ্দশাহ, অদণ্ড্য, অদন্ত, অদভ্র, অদম্ভ, অদম্য, কদম, কদমী, ডংশ, ডণ্ড, ডাংগুলি, ডাঁশ, ডাণ্ডা, ডাড়ুকা, ডাণ্ডুকা, ডানকনা, ডানিকোণা, দংশ, দংশিত, দঙ্গ, দঙ্গল, দণ্ড, দণ্ডক, দণ্ডকলস, দণ্ডকাক, দণ্ডকারণ্য, দণ্ডগ্রহণ, দণ্ডঘ্ন, দণ্ডচক্র, দণ্ডদান, দণ্ডদাস, দণ্ডধর, দণ্ডধারী, দণ্ডন, দণ্ডনতি, দণ্ডনায়ক, দণ্ডনিপাতন, দণ্ডনীতি, দণ্ডনেতা, দণ্ডপ, দণ্ডপথ, দণ্ডপাখা, দণ্ডপাট, দণ্ডপাণি, দণ্ডপাত, দণ্ডপাতন, দণ্ডপারুষ্য, দণ্ডপাল, দণ্ডপ্রণয়ন, দণ্ডপ্রণাম, দণ্ডপ্রসাদ, দণ্ডবৎ, দণ্ডবিধি, দণ্ডভগ্ন, দণ্ডভঙ্গ, দণ্ডমাণব, দণ্ডযাত্রা, দণ্ডশাস্ত্র, দণ্ডহত, দণ্ডা, দণ্ডাদণ্ডি, দণ্ডাপূপন্যায়, দণ্ডায়ন, দণ্ডায়মান, দণ্ডিক, দণ্ডিকা, দণ্ডিত, দণ্ডিম, দণ্ডী, দণ্ডীকাব্য, দণ্ড্য, দনা, দনু, দনুকবন্ধ, দনুজ, দনুজারি, দনুজেন্দ্র, দন্ত, দন্তকচকচি, দন্তকার, দন্তকূটা, দন্তকোশ, দন্তচ্ছদ, দন্তজাত, দন্তদর্শন, দন্তধাবন, দন্তনিভ, দন্তপঙ্‌ক্তি, দন্তপত্র, দন্তপত্রক, দন্তপবন (দাঁতন), দন্তপাঁতি, দন্তবক্র, দন্তবেষ্ট, দন্তমল, দন্তমুকুল, দন্তমূলীয়, দন্তলেখক, দন্তশঠ, দন্তশর্করা, দন্তস্ফুট, দন্তহর্ষ, দন্তাল, দন্তালিকা, দন্তালী, দন্তী, দন্তোদ্ভেদ, দন্তৌষ্ঠ, দন্ত্য, দন্দশূক, দন্‌ভ্, দন্‌শ্, দভ্র, দম্, দম, দমক, দমকল, দমকা, দমঘোষ, দমদম, দমদমা, দমদরদ, দমন, দমনক, দমনলতা, দমবাজ, দমবাজী, দময়ন্তী, দময়িতা, দমাদম, দমিত, দম্প, দম্পতি, দম্ফ, দম্বল, দম্ভ, দম্ভক, দম্ভন, দম্ভাল, দম্ভী, দম্য, দশ (দঅন-অংশ, দন্‌শ্), দশ (দঅন-শেষ), দশই, দশকণ্ঠ, দশকন্ধর, দশকর্ম্ম, দশকর্ম্মা, দশগ্রামী, দশগ্রীব, দশচক্র, দশতি, দশ-দশা, দশদিক্ষু, দশধা, দশন, দশনাংশু, দশনাঙ্ক, দশনামী, দশনোচ্ছিষ্ট, দশপঁচিশ, দশপিণ্ড, দশবাণ, দশভুজা, দশম, দশমহাবিদ্যা, দশমিক, দশমী, দশমী-দশা, দশমীস্থ, দশমূল, দশরথ, দশরাত্র, দশলকী, দশশত, দশশালা, দশসালা, দশসহস্র, দশহরা, দশা, দশাঙ্গধূপ, দশাঙ্গুল, দশানন, দশান্তর, দশাবতার, দশাবস্থ, দশার্ণ, দশার্হ, দশাশ্বমেধ, দশাসই, দশাস্য, দশাহ, দশি(শী), দশে(সে)রক, দশোপচার, দষ্ট, দস্ (দঅন্-অস্-মাত্র), দস্ত, দস্তক, দস্তখত, দস্তগীর, দস্তবস্ত, দস্তা (অন্য কিছু থাকে না), দস্তানা, দস্তাবেজ, দস্তুর, দস্য, দস্যু, দস্র, দহলা, দাঁড়, দাঁড়কাক, দাঁড়া, দাঁড়াকবি, দাঁড়া-গো-পান, দাঁড়া-গুয়া-পান, দাঁড়ি(ড়ী), দাঁত, দাঁতপাটি, দাঁতন, দাঁতনা, দাঁতনে, দাঁতান, দাঁতাল, দাঙ্গা, দাড়, দাড়া, দাঢ়া, দাঢ়িকা, দাণ্ডা, দাণ্ডাজিনিক, দান্ত, দাম্পত্য, দাম্ভিক, দাশরথ, দাশরথী, দাশার্হ, দুক্কার, দুড়দাড়, দুড়দুড়, দুড়দুড়ি, দুড়ুম, দুদ্দাড়, দুদ্দুড়, দুমড়া, দুমড়ান, দুমদাম, দেঁতো, দেশুরা (দণ্ড ও ঢাঁঢরা), দোঃ, দোমড়ান, দ্রংষ্ট্রা, ধনদণ্ড, ধিকদণ্ড (মনোদণ্ড), বজ্রদন্তী, বধদণ্ড, বাকদণ্ড, বেদম, সদম্ভ, সুদান্ত।

দং (দণ্ড্, দন্‌শ্ / দংশ্, দম্, দন্‌ভ্) = দাতার রহস্যরূপ যাহাতে। **দণ্ড** = দাতার (রহস্যরূপের) বোধ গড়ায়-উড়ে যাহাতে। **দন্‌শ /**

দংশ = দাতার নাকরণ শায়িত যাহাতে / দাতার রহস্যরূপ শায়িত যাহাতে। **দম** = দাতা সীমায়িত যাহাতে। **দন্‌ভ্** = দাতার নাকরণ ও ভরণ-ভক্ষণ।

দংশ (ডংশ, ডাঁশ), দংশক, দংশন, দংশিত, দ্রংষ্ট্রা : ১. দংশ = ✓দন্‌শ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দংশ*** = *দাতার রহস্যরূপ (শক্তিরূপে) শায়িত থাকে যাহাতে।* ***দংশন*** = ***দংশ*** *অন থাকে যাহাতে।* ***দংশক*** = ***দংশন*** *করে যে।* ***দংশিত*** = ***দংশন*** *করা হইয়াছে যাহাকে।* ***দ্রংষ্ট্রা*** = *যাহার দ্বারা* ***দংশন*** *করা হয়।* / **দংশক** = দংশন করে যে। (ব.শ.)। ৩. **দংশ** = দন্তক্ষত, সর্পক্ষত, খণ্ডন, দোষ, বনমক্ষিকা, ডাঁশ, বর্ম্ম; দংশন করা, কামড়ান, কাটা, দংশনের ন্যায় ব্যথা জন্মান, পীড়িত করা। **দংশক** = মক্ষিকা, কুক্কুর। **দংশন** = দন্তখণ্ডন, কামড়ান, হুল ফুটান, বর্ম্ম। **দংশিত** = 'সঞ্জাতদংশ', ধৃতকবচ, সন্নদ্ধ, ভাসমান, দীপ্যমান, সুরক্ষিত, সুগুপ্ত, দন্তখণ্ডিত, দষ্ট। **দ্রংষ্ট্রা** = স্থূলদন্তবিশেষ, দাঁড়া। (ব.শ.)। **দংশ** = জনৈক অসুর। সত্যযুগে দংশ নামে এক প্রবল মহাসুর ছিল। একদিন ভৃগুর স্ত্রীকে এই অসুর বলপূর্বক হরণ করে। এতে ভৃগু ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দেন যে, সে মূত্রভোজী কীট হবে। তখন দংশ বার বার ভৃগুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে ভৃগু বলেন, 'আমার বংশোদ্ভূত পরশুরাম হতে তুমি মুক্তিলাভ করবে।' ... কর্ণ পরশুরামের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করার সময় একদিন পরশুরাম কর্ণের কোলে মস্তক রক্ষণপূর্বক নিদ্রাভিভূত ছিলেন। উক্ত সময় এক ভীষণ কীট কর্ণের উরুদেশ ভেদ করে উর্ধ্বে উত্থিত হতে থাকে। ... পরশুরাম জাগ্রত হয়ে ... সেই কীটের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। ... কীট তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে ও শাপমুক্ত হয় ...। (পৌ.অ.)। ৪. **দংশ, ডংশ, দ্রংষ্ট্রা** অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি যথার্থে প্রচলিত। ৫. **দংশ**-এর ঐতিহাসিক অর্থ ছাড়া বাকি অর্থের ব্যাপারে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তাদের (২-এ প্রদত্ত) ক্রিয়াভিত্তিক অর্থই যথেষ্ট।

দংশ-এর ঐতিহাসিক রূপটিকে খুব স্পষ্ট বোঝা যায় না। যতটুকু অনুমান করা যায়, এখানে সংক্ষেপে সেকথা বলা হচ্ছে। মনুসংহিতার **জগৎসৃষ্টি** অধ্যায়ে বহিরাগত শত্রুদের মধ্যে যারা হঠাৎ সমাজ-শাসকের অজান্তে এসে লুঠ করে পালাত, তাদের **দংশ** বলা হয়েছে। এরা মুখ্যসৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত জঙ্গমসৃষ্টির শেষ শ্রেণী; এদের স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জাত বলা হয়। এরা মূলত সমাজের পরিশ্রমকারী-পরিবেশ কিংবা সামাজিক ক্রোধের কারণে আদি যৌথসমাজ থেকে পলাতক; কিন্তু বেশি দূরে না গিয়ে শাসনাধীন এলাকার বাইরে বনে-জঙ্গলে-পাহাড়াঞ্চলে থাকত এবং মাঝে-মধ্যে এসে সমাজের এলাকা থেকে লুঠপাট করে নিয়ে যেত। ভৃগু বা সেকালের আইনস্রষ্টা-সত্তা যে জনগোষ্ঠীর স্বামীরূপে সক্রিয় ছিলেন, সেই গোষ্ঠীকে এরা আক্রমণ করেছিল। ফলে, এদের প্রতি ভৃগুর নির্দেশ ছিল যে, এরা সমাজের তরল-অর্থসম্পদ (সেকালের কপর্দ্দক বা কড়ি এবং একালের ভাষায় liquid money) খেয়ে বাঁচবে। সম্ভবত, এর পরে তারা সমাজ থেকে তোলা স্বরূপ অর্থ পেত অথবা তাই লুঠ করে খেত। ...

দণ্ড (ডণ্ড, ডাংগুলি, ডাণ্ডা, দণ্ডকাক, দণ্ডায়মান, দাঁড়, দাঁড়কাক, দাঁড়া, দাঁড়াকবি, দাঁড়ি, দাঁড়ী) : ১. ✓দণ্ড্ + অ (অচ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **দণ্ড** = *(স্থিরতা, মার) দাতার রহস্যরূপের ডয়ন থাকে যাহাতে।* ***ডণ্ড*** = *ডয়নের রহস্যরূপের উড্ডয়ন যাহাতে।* ***ডাংগুলি*** = *ডয়নধারীর রহস্যরূপ ও* ***গুলি****।* ***ডাণ্ডা*** = ***ডণ্ড****-আধারের আধার যে।* ***দণ্ডকাক*** = ***দণ্ড*** *ও* ***কাক****।* ***দণ্ডায়মান*** = *দণ্ডের ন্যায় স্থির যে।* ***দাঁড়*** = ***দণ্ড*** *হইতে জাত।* ***দাঁড়কাক*** = ***দণ্ডকাক****।* ***দাঁড়া*** = ***দাঁড়****-এর আধার যে।* ***দাঁড়াকবি*** = *যে কবি দাঁড়ায়।* ***দাঁড়ি*** = ***দাঁড়*** *গতিশীল যাহাতে।* ***দাঁড়ী*** = ***দাঁড়ি****-র আধার যে।* / **দণ্ড** = যাহার দ্বারা দমন সাধিত হয়। **দণ্ডায়মান** = যে অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। **দাঁড়াকবি** = যে কবিওয়ালা আশরে দাঁড়াইয়াই উপস্থিত মত চাপানের বা উত্তরের কবিগান রচনা করেন। **দাঁড়ি, দাঁড়ী** = যে নৌকায় দাঁড় টানে। (ব.শ.)। ৩. **দণ্ড** = লগুড়, লাঠি, (সাদৃশ্যে) ছাতার বাঁট, উপনয়নে দ্বিজধার্য্য দণ্ডবিশেষ, সন্ন্যাসীর দণ্ড, পাঁচন, পতাকাচামরাদির বাঁট, নাল, ডাঁটা, গাছের গুঁড়ি, নৌকার দাঁড়, বীণাবাদনদণ্ড, লাঙ্গলের ঈষ, মানবিশেষ, শিশ্ন, দেহ, শ্রেণী, কালমানবিশেষ, চব্বিশ মিনিট, ব্যূহবিশেষ, দণ্ডবৎ বস্তুমাত্র, সৈন্য, সূর্য্যপারিপার্শ্বিক ইন্দ্র, দণ্ডাকার গ্রহভেদ, যম, বিষ্ণু, মহাদেব, দণ্ডকরাজ, দম, দমন, সামাদি উপায়ের একতম, সংযম, অভিধান, দাঁড়ান, দণ্ডিত অর্থ, জরিমানা, অশ্ব, দণ্ডাকার সর্পফণা, কিয়ৎক্ষণ। **ডণ্ড** = কালপরিমাণ, সন্ন্যাসীর দণ্ড, জরিমানা। **ডাংগুলি** = ডাং-গুলি খেলা। **ডাণ্ডা** = দণ্ড, লাঠি, বালকের ক্রীড়ার্থ দণ্ড, হাতল, দাঁড়া, অপেক্ষা করা। **দণ্ডকাক** = যে যম ও কাক, কাকরূপী যম, দাঁড়কাক (মরুত্তরাজের যজ্ঞে যম রাবণের ভয়ে কাকরূপ ধারণ করেন।)। **দাঁড়** = পাখীর বসার দণ্ড, ক্ষেপণী, বইঠা (oar), চারিহস্ত পরিমাণ, দণ্ডায়মান। **দাঁড়কাক** = (সংস্কৃত দণ্ডকাক), গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ বড়কাক বিশেষ। **দাঁড়া** = দণ্ড, ডাণ্ডা, মেরুদণ্ড, মেরুদণ্ডসদৃশ নৌকার ... কাঠ, গতি, ভাব, রীতি, নিয়ম; দণ্ডায়মান হওয়া, আশ্রয় করিয়া থাকা, গতি বন্ধ করা, পলায়ন না করিয়া স্থির হওয়া, অপেক্ষা করা, বদ্ধ হওয়া, জমা, প্রতিষ্ঠিত হওয়া, পরিণত হওয়া। **দাঁড়াকবি** = দ্র. (২)। **দাঁড়ি, দাঁড়ী** = তুলাদণ্ড। (ব.শ.)। ৪. **দণ্ডাদি** শব্দগুলি কম প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি যথার্থে প্রচলিত। ৫. মূল ক্রিয়া একটি — **দাঁড়**। দাঁড় করা বা দাঁড় হওয়া। যে দাঁড়ায়, কিংবা যার উপরে দাঁড়ায়, অথবা যাকে দাঁড় করায় — সবই দাঁড়, সবই **দণ্ড**। পাখির খাঁচার দাঁড়, নৌকার দাঁড়, চিংড়ির দাঁড়া, শিরের দাঁড়া ... সবই কোনো না কোনো রকমের দাঁড় বা দণ্ড। জরিমানা, শাস্তি, সাজা — এসবও আসামীকে তার কুকর্ম করা থেকে বিরত করে, আটকে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। পাঁচনছড়ি দিয়ে পেটাই করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া ওই একই ক্রিয়ার আর একটি রূপ। সাম-দান-ভেদ-দণ্ড — সেকালে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগের সমাজশাসনের এই চারটি উপায় ছিল। প্রথম তিনটি উপায় ব্যর্থ হলে চতুর্থ উপায় — **দণ্ড**। তাকে তার কুকর্মে বিরত করো। দাঁড় করিয়ে দাও। জরিমানা করো। ডাণ্ডা লাগাও। এই দণ্ড দেবে যে, সেই **দণ্ডধর**কে বলা হত **ধর্ম্মাবতার যম**। সেকালে বিচারব্যবস্থাকে এই নামেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। কোন কোন কাজে কী কী দণ্ড দেওয়া হবে, **যমই** ছিলেন তার তালিকাধারী বা **দণ্ডধারী**। এখনও, একালেও বিচারককে **ধর্মাবতার**

বলেই সম্বোধন করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রব্যবস্থা অধঃপতিত হলে, এই বিচারব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বৈরতান্ত্রিক (রাবণের) শাসনে বিচারব্যবস্থা বলতে গেলে পালিয়ে বেড়ায়। এখানে মরুত্তরাজের কাহিনী দিয়ে সেকথা বলা হয়েছে। আমরা রামায়ণ থেকে আরও জানিয়ে দিতে পারি, রাবণের ভয়ে যমের কী দশা হয়েছিল — 'শুনিলে যমের কথা হইবেক হাস। / কাটিয়া আনেন তার ঘোটকের ঘাস।।' অর্থাৎ রাবণের ভয়ে যম তার ঘোড়ার ঘাস কাটত। সব ক্ষেত্রেই **দণ্ড** কথাটির মূল যে অর্থ — 'স্থিরতা-দাতা বা মার-দাতার রহস্যরূপের ডয়ন থাকে যাহাতে' — সেই অর্থটিকে শব্দগুলি কোনো না কোনো রূপে ধারণ করে। ... ৬. ইংরেজি dandy, dunderhead।

দণ্ডক (দণ্ডকারণ্য) : ১. দণ্ড + ক (কন্) স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. ***দণ্ডক* = *দণ্ড* করে যে; অথবা, দাঁড় করায় যে। (দ্র. *দণ্ড*, ৫)**। ৩. দণ্ড, ষড়বিংশতি অক্ষরাধিকপাদ ছন্দোবিশেষ, হ্রস্ব দণ্ড, সোটা, ইক্ষ্বাকুপুত্র নৃপতিবিশেষ। (শুক্রাচার্য্যের কন্যা অরজাকে বলপূর্ব্বক উপভোগ করায়, শুক্রশাপে ইঁহার রাজ্য সপ্ত রাত্রি ভস্মবৃষ্টিতে বিনষ্ট হয়। তদবধি দণ্ডকরাজ্য 'দণ্ডকারণ্য' নামে খ্যাত। (ব.শ.)। দণ্ডকবন গোদাবরী ও নর্মদার মধ্যে অবস্থিত ছিল। পূর্বে এখানে দণ্ডক নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। শুক্রাচার্যের শাপে এই রাজ্য অরণ্যে পরিণত হয়। রাম বনবাসকালে এই অরণ্যে ১৪ বৎসর বাস করেছিলেন। এই স্থানেই রাবণ সীতাকে হরণ করে। (পৌ.অ.)। ৪. দণ্ডক অপ্রচলিত। 'দণ্ডকারণ্য' অর্থহীন নামরূপে প্রচলিত। ৫. দুটো অরণ্য, একটাই নাম — দণ্ডকারণ্য; একটি অরণ্য বাহ্যলোকের, অপরটি মানসলোকের। বাহ্যলোকের দণ্ডকারণ্য নামে অরণ্যটি কোথায় অবস্থিত, কী তার স্বরূপ, সেকথা কমবেশি সবাই জানেন। আর মানসলোকের **দণ্ডকারণ্য** কোথায় অবস্থিত তা অনেকে জানেন না। রাষ্ট্র কর্তৃক নানারকম অজস্র শাস্তির যে অরণ্য, যে অরণ্যে রাবণ সীতাকে হরণ করেছিল, আজও সেরকম অরণ্যে নানারকম হরণকার্য্য চলে। সম্প্রতিকালে সেই শাস্তির অরণ্যে মানুষের ভূমি হরণ করা হচ্ছে বিশ্বজুড়ে, শিল্পায়নের নামে। কোন আইনে, কোন দণ্ডের নিয়মে, কীভাবে তা হরণ করা হচ্ছে জানতে হলে আপনাকে যেতে হবে মানসলোকের সেই **দণ্ডকারণ্যে**। ...

দুটো লোকের সমজাতীয় ঘটনাকে একত্রে বলবার এই রীতিই ক্রিয়াভিত্তিক রীতি এবং এই রীতিতেই পুরাণকারগণ তাঁদের বয়ান দিয়ে গেছেন।

দণ্ডনীতি : ৩. চাণক্যাদিকৃত বধবন্ধনাদিলক্ষণ দণ্ডবিষয়ক নীতিশাস্ত্র। দণ্ডশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, দণ্ডপ্রণয়ন, দণ্ডব্যবস্থা, দুর্গা। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে **দণ্ডনীতি** বিষয়ে অনেক কথা রয়েছে। এর সময়কাল প্রায় ২০০ খ্রিষ্টপূর্ব্বাব্দ। এই গ্রন্থ থেকে সে সময়ে ভারতসমাজে মানুষ মানুষকে নীতি বা আইনের নামে কতখানি **দণ্ড** বা শাস্তি দিতে পারত, তার মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়; এবং বর্তমানে এই দণ্ডনীতি কোথায় এসে পৌঁছেছে সেকথা সবাই কমবেশি জানেন। কিন্তু কৌটিল্যের আগে, ভারতে রাষ্ট্র (পৃথু) প্রতিষ্ঠার আগে 'মানুষ মানুষকে শাস্তি দিতে পারে', এমন কথা সম্ভবত ভাবা যেতে পারত না। তখন কেউ যদি মানবিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক নিয়ম (**ধর্ম্ম**) **লঙ্ঘন** করত, তাকে বলা হত, 'তোমার যদি মনে হয়ে থাকে যে তোমার ত্রুটি হয়েছে, তাহলে তুমি নিজেকে নিজে শোধরাও। কীভাবে শোধরাবে, তার জন্য এই রইল প্রায়শ্চিত্তের বিধান।' অপরাধী সেই অনুসারে **প্রায়শ্চিত্ত** করত; সমাজ বা রাষ্ট্র অপরাধী মানুষকে শাস্তি দিত না। **দণ্ডনীতি**র সেই ছিল আদিরূপ। দ্র. **আত্মসমালোচনা, প্রায়শ্চিত্ত**।

দণ্ডপাট : দ্র. **পদবী**।

দনু : ২. *দ্ (দান) অন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে*। ৩. দানববিশেষ (ইঁহার মাতা শ্রী। ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে সক্‌থি ও মস্তক শরীরমধ্যগত হওয়ায়, ইঁহার অপর নাম 'দনুকবন্ধ'। দনু দণ্ডকারণ্যে বাস করিত। বনবাসকালে রামলক্ষ্মণ কর্ত্তৃক দনু নিহত হয়।), দক্ষকন্যাবিশেষ (ইনি কশ্যপের পত্নী এবং বিপ্রচিত্তি-প্রভৃতি দানবগণের জননী। ইঁহার পুত্রগণ দানব।)। (ব.শ.)। প্রজাপতি দক্ষের এক কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী। এঁর গর্ভজাত বিপ্রচিত্তি, সম্বর, বৃষপর্বা, নিকুম্ভ, প্রলম্ব, বনায়ু, কেতুমান, বিরূপাক্ষ, কেশী, নমুচি, পুলোমা প্রভৃতি ৪০টি পুত্রই দনুজ বা দানব নামে পরিচিত। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দানব**।

দম (দমক, দমকা, দমকল, দমদম, বেদম) : ১. ✓দম্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে, বৃদ্ধি-অভাব। (ব.শ.)। ২. ***দম* = (*শক্তি*) *দাতা সীমায়িত যাহাতে*। *দমক* = *দম করে যে*। *দমকা* = *দমক-এর আধার যে*। *দমকল* = *দম (দেওয়া) আছে যে কলে*। *দমদম* = *দম-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে*। *বেদম* = *দম নেই যাহার*।** / **দম** = কুৎসিত কর্ম্ম হইতে চিত্ত নিবারণ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. **দম** = দণ্ড, ইন্দ্রিয়সংযম, বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপঃক্লেশসহিষ্ণুতা, মনোদমন, অর্থদণ্ড, শারীরিক বা মানসিক দুঃখদাতার প্রতি কোপের বা প্রতিহিংসার অভাব, বিষ্ণু, কর্দ্দম; নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, প্রতারণ, প্রাণ, একবার শ্বাসগ্রহণের কাল, শ্বাসের সহিত মাদকদ্রব্যের ধূমপান, জীবনীশক্তি, কাষ্ঠাদির ভারধারণের শক্তি, মুখ-ঢাকা পাত্রে অগ্নিতে খাদ্যদ্রব্যের পাক, সুরের বিলম্বিত উচ্চারণ, স্নেহ, বাদ্যের ভাণ্ডমধ্যস্থ বদ্ধ বায়ু, ঘড়ির স্প্রিং-এর পাক; ভারীদ্রব্যের পতন শব্দ; দমন করা, অভিভব করা, বশ করা। (ব.শ.)। ৪. সব শব্দগুলিই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. বলা হয়ে থাকে যে, একটি **দম** (দমন) শব্দ সংস্কৃত থেকে এবং অপর একটি **দম** শব্দ ফারসি থেকে বাংলায় এসে এক এবং অভিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু একটু গভীরে গেলেই দেখা যায়, দুটি শব্দই আসলে একই উৎস থেকে জাত। **দম** শব্দের উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ — '(শক্তি) দাতা সীমায়িত যাহাতে = **দম**' — থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। বাচ্চাদের একটি খেলনাগাড়ির কথা ভাবুন, যাতে স্প্রিং লাগানো থাকে। সেই স্প্রিং-এ 'দম-দেওয়া' হয়। দিয়ে ছেড়ে দিলে গাড়িটি চলতে থাকে। যতখানি দম-দেওয়া হয়, গাড়িটি সেই অনুসারে ততখানি চলে। এ হল শক্তিকে একটি মাত্রায় সীমায়িত করে দেওয়া। যতদূর জানি, হাডুডু বাংলাভাষীর খেলা। সেই হাডুডু খেলার সময় যতক্ষণ **দম** থাকে, খেলোয়াড়

ততক্ষণ 'জীবন্ত' থাকে। **দম** শেষ হয়ে গেলেই 'মরে' যায়। এই **দম** নিঃসন্দেহে শ্বাসও বটে। ব.শ. দেখিয়েছেন যে, **দম** শব্দের উপরোক্ত (৩-এ প্রদত্ত) অর্থগুলির মধ্যে 'নিঃশ্বাস থেকে ঘড়ির স্প্রিং-এর পাক' পর্যন্ত অর্থগুলি সবই ফারসি ভাষার **দম** শব্দের অর্থ, বাকি অর্থগুলি সংস্কৃত বা বাংলা **দম** শব্দের। কিন্তু মূলে যে সেগুলির কোনো ফারাক নেই, সেকথা এখন আমরা বুঝতে পারি। এই সেই কারণ, যেকারণে মধ্যযুগের বাংলাভাষী বিদেশাগত ফারসি শব্দের অনেককেই আপন বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

কিন্তু এই যে **দম** ক্রিয়া, এর একটা স্পষ্ট মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে, যাকে দম-দেওয়া হচ্ছে, তাকে ছেড়ে দিলেই সে ততটা অবশ্যই দৌড়বে, যতটা তাকে দম দেওয়া হচ্ছে; বরং নেচারের নিয়মে একটু বেশিই দৌড়বে। কারণ, ধাতুর ইচ্ছাশক্তি (ধাতুর স্প্রিং কতটা বাঁকবে না বাঁকবে সে তার স্বভাবের ব্যাপার) হোক আর জীবের ইচ্ছাশক্তিই হোক, তাকে দম দেওয়া বা দমন করা হলে সে তো উলটো ফল দেয়! (নীচে **দমন** দেখুন)। এভাবে যার ইচ্ছাশক্তিকে সীমায়িত করা হয়, **দম** করা হয় বা দমন করা হয়, কার্যত সে দমিত হয় না। বরং ছেড়ে দিলেই উলটো ফল ফলে। এই সহজ কথাটা স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরা কেন যে বোঝে না, কে জানে!

আজকাল কলকাতার সাধারণ বাংলাভাষীরাও পর্যন্ত এর মর্মকথা বুঝতে পেরে নতুন বাক্যবন্ধ তৈরি করেছেন। কাউকে কোনো বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সেই কাজে উদ্দীপ্ত করে কাজটি করতে পাঠিয়ে দেওয়াকে তাঁরা বলেন, 'পাম (pump) দিয়ে ছেড়ে দেওয়া'। কেউ সেরকম উত্তেজিত হয়ে হাজির হলে বলা হয়, 'খুব পাম খেয়েছিস মনে হচ্ছে!' এই ইংরেজি পাম্প্ ও **দম** শব্দের প্রতীকী অর্থে বিশেষ ফারাক নেই। দুটিতে বাতাস ভরার ব্যাপার রয়েছে। (দ্র. **পম্পা**)। তাছাড়া আমরা দেখেছি, স্কুলের ছাত্রছাত্রীই হোক আর গোয়ালের গরুই হোক, দীর্ঘসময় আবদ্ধ রেখে তারপর ছেড়ে দিলে, তাদের যে প্রাথমিক দৌড় দেখা যায়, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় — এতক্ষণ আবদ্ধ রেখে তাদের স্বভাবের স্প্রিং-এ কতখানি দম-দেওয়া হয়ে গেছিল। তবে, ছাড়া পাওয়ার পর তাদের এই প্রাথমিক দৌড়কেই বলে **দমকা**। 'দমকা হাওয়া' মানে, এতক্ষণ তাকে কোনোভাবে আটকে রাখা হয়েছিল; এখন সে অকস্মাৎ ছাড়া পেয়ে গেছে। তাই সে **দমকা**। একই ভাবে **দম দম** ধ্বন্যাত্মক মনে হলেও অর্থহীন নয়। (বলে রাখা ভাল, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি অর্থহীন ধ্বন্যাত্মক শব্দের সাক্ষাৎ আজও পায়নি।) দুরমুশ দিয়ে মাটিতে আঘাত করলে **দম দম** ধ্বনিই কেবল হয় না, মাটি **দমিত** হয়ে চেপে বসে যায়, তার ঘনত্ব বাড়ে। এককালে **দম দম** থেকেই অন্যদের **দমন** করতে সৈন্য পাঠানো হত। কলকাতায় বন্দী শেষ মোগল বাদশাহের নামে প্রচলিত একটি উর্দু পয়ার আছে এরকম — '**দমদমে** মে **দম** নহি হ্যায়, খ্য়র মাগোঁ জান কি / কিসি দিন লনদন পে চলে শমশের হিন্দুস্তান কি।' অর্থাৎ, '**দমদমের** আর সে **দম** নেই, এখন প্রাণভিক্ষার কথা ভাবো / (অচিরে) কোনো একদিন **লন্ডনেই** হিন্দুস্তানের তরোয়াল বা শাসন চলবে।' এখন তো **শুনছি, লন্ডনের** জনগণের দেহের খোরাকের রন্ধনশালায় ভারতীয় (এবং **বঙ্গভাষীর**) পদের পাচকদের এবং মনের খোরাকের রন্ধনশালায় **ভারতীয়** সংস্কৃতির পাচকদের (সাহিত্যিকদের) রমরমা শুরু হয়েছে। বাহাদুর শাহের দমিত ইচ্ছা কি এতদিন পর তার দৌড় সমাধা করছে, একেবারে চিরতরে **বে-দম** হয়ে যায়নি? হ্যাঁ, **বেদম** কিন্তু দুরকম অর্থ প্রকাশ করে — ক) দমহীন, অতএব চলৎশক্তিহীন; আর, খ) সত্তার স্প্রিংটিকে বিপরীত দিকে খুব করে কষে দেওয়া, অত্যধিক **দম** দেওয়া — 'বেদম প্রহার'। ... ... ৬. ইংরেজি damn, damp, dame, damsel (দমশীলা!), এবং demon, demonstrate ... ইত্যাদি ও dem-যুক্ত অজস্র ইংরেজি শব্দ।

দমন : ১. ✓দম্ + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **দম** অন *যাহাতে।* ৩. শাসক, বিনেতা, দণ্ডয়িতা, উপশান্ত, যন্তা, সারথি, বীর, বিষ্ণু, মহাদেব, ব্রহ্মর্ষিবিশেষ, দময়ন্তীভ্রাতা, কুন্দবৃক্ষ, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, দ্রোণ, দোনা, দণ্ড, শাসন, বিনয়ন, বশীকরণ, সংযমন, নিয়ন্ত্রণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বিনাশ, নিধন। (ব.শ.)। বিদর্ভরাজ ভীমের পুত্র। ... দমন নামে এক মহর্ষির বরে তাঁর তিন পুত্র ও এক কন্যা হয়। ... মহর্ষি দমনের নামানুসারে তিনি তিন পুত্রের নামকরণ করেন দম, দন্ত, ও দমন এবং কন্যার নাম রাখেন দময়ন্তী। নিষধরাজ নল এই দময়ন্তীকে স্বয়ংবর সভায় লাভ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. খুবই প্রচলিত। ৫. দ্র. **দম, দময়ন্তী**। ৬. ইংরেজি demon।

দময়ন্তী : ১. ✓দমি + অৎ (শতৃ) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। (ব.শ.)। ২. *দম-এর যাওয়া অন হয়ে তারিত হয় যাহাতে।* ৩. বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা। (দ্র. **দমন**)। ব্রহ্মর্ষি দমনের বরে জন্ম হেতু ইঁহার নাম 'দময়ন্তী'। ইনি স্বয়ংবর-সভায় কলি-প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া নলকে পতিত্বে বরণ করিলে, নল কলির কোপে পাশক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত ও নির্ব্বাসিত হন। দময়ন্তী পতির অনুগমন করেন এবং পতিবিরহিতা হইয়া মাতৃস্বসার গৃহে উপস্থিত হন। অনন্তর পিতৃগৃহে নীত হইলে, দময়ন্তী দূত দ্বারা নলের সন্ধান করিয়া, স্বয়ংবরচ্ছলে বিদর্ভে নলকে আনয়ন করেন এবং পুনর্মিলিত হন। (ব.শ.)। লোকমুখে নল ও দময়ন্তী পরস্পরের রূপ ও গুণের কথা জ্ঞাত হয়ে ... পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। ... মাধ্যম কনকবর্ণ নামে হংসদূত ...। দময়ন্তী নলকে পছন্দ করেন জানতে পেরে স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম প্রমুখ দেবতারা নলের রূপ গ্রহণ করে উপবিষ্ট হন। ... কিন্তু প্রত্যেকের আকৃতি একপ্রকার হলেও দময়ন্তী পূর্বেই জানা ছিল যে, দেবতারা স্বেদবিরহিত ও স্তব্ধনেত্র, সে কারণ নলকে নির্বাচন করতে দময়ন্তীর ... কোনো কষ্ট হল না। তিনি ... নলকেই বরমাল্য দেন। ... (ফলে স্বয়ংবর-সভামুখী) কলির কোপদৃষ্টি নলের উপর পতিত হল। ... ভ্রাতা পুষ্করের সঙ্গে ... দ্যূতক্রীড়ায় ... নল রাজ্যভ্রষ্ট ... হলেন। দময়ন্তী যথাসাধ্য নলকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অক্ষম হয়ে ও সর্বনাশ আসন্ন জেনে সারথি বাষ্ণেয়কে দিয়ে নিজের পুত্র ইন্দ্রসেনকে তাঁর মাতামহের কাছে পাঠিয়ে দেন। ... নল তাঁর সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেলে একবস্ত্রে রাজ্যত্যাগ করেন। দময়ন্তীও একবস্ত্রে স্বামীর অনুগমন করেন। ... বনে নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগপূর্বক প্রস্থান করেন। ... অবশেষে দময়ন্তী চেদিরাজ সুবাহুর রাজধানীতে উপস্থিত হন। ... রাজমাতা তাঁকে সৈরিন্ধ্রী রূপে নিযুক্ত

করেন ও নিজ কন্যা সুনন্দাকে তাঁর সঙ্গে সখীবৎ আচরণ করতে বলেন। ... এদিকে নল বনমধ্যে প্রবেশ করে নারদ-শাপগ্রস্ত কর্কোটক নাগকে দাবাগ্নির মধ্য হতে উদ্ধার করেন। ... উদ্ধার পাবার পর কর্কোটক নলকে দংশন করে তাঁর রূপ বিকৃত করে দেয় ... নিজমূর্তি ধারণ করে সে বলে যে, যাতে লোকে নলকে চিনতে না পারে সেইজন্য সে তাঁর রূপ বিকৃত করে দিয়েছে। এ ছাড়া, তার বিষে আক্রান্ত হয়ে নলের দেহাশ্রিত কলি যন্ত্রণা পাবে। কর্কোটক নলকে অযোধ্যার ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা ঋতুপর্ণের নিকট বাহুক নাম গ্রহণপূর্বক সারথ্য গ্রহণ করতে উপদেশ দেয়, এবং ঋতুপর্ণকে অশ্বচালনার নৈপুণ্য শিখিয়ে তাঁর কাছ থেকে অক্ষক্রীড়ার কৌশল শিখে নিতে পরামর্শ দেয়। অতঃপর নলকে এক দিব্যবস্ত্র দান করে কর্কোটক বলে যে, পূর্বরূপ ধারণ করবার দরকার হলে, এই বস্ত্র পরিধানান্তে কর্কোটককে স্মরণ করলেই সে উপস্থিত হবে। ... তার পরামর্শ মতো রাজা ঋতুপর্ণের সারথ্য গ্রহণ করেন। ... দময়ন্তীর বাল্যসখা সুদেব চেদিরাজ্যে এসে ... দময়ন্তীকে চিনতে পারেন। রাজমাতা ও সুনন্দা সুদেবের কাছে দময়ন্তীর পরিচয় পেয়ে জানলেন যে, তিনি চেদিরাজমাতার ভগিনীর কন্যা। দময়ন্তীর অনুরোধে তাঁরা তাঁকে সমাদরে পিত্রালয়ে প্রেরণ করেন। বিদর্ভরাজের লোকগণ নলের সন্ধানে তখন চতুর্দিকে ভ্রমণরত। তাদের মধ্যে হতে পর্ণাদ নামক এক ব্রাহ্মণ রাজা ঋতুপর্ণের সারথি বাহুককে নল বলে সন্দেহ করেন। এই সংবাদ পেয়ে দময়ন্তী বাল্যসখা সুদেবকে দিয়ে রাজা ঋতুপর্ণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন যে, নল জীবিত আছেন কিনা সম্যকভাবে জ্ঞাত না-হওয়ায় পরদিন প্রাতেই দময়ন্তী পুনর্বার স্বয়ংবরা হয়ে দ্বিতীয় পতি বরণ করবেন। ঋতুপর্ণের আদেশে নল একদিনের মধ্যে রাজাকে বিদর্ভরাজপুরী কুণ্ডিননগরীতে নিয়ে যান। পথে তিনি ঋতুপর্ণের নিকট হস্তগণনাবিদ্যা ও অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করেন। এর ফলে, কলি তাঁর দেহ থেকে পলায়ন করে। ... কুণ্ডিননগরীতে স্বয়ংবর সভার আয়োজন না দেখে ঋতুপর্ণ বিস্মিত হন। ... দময়ন্তী কেশিনী নামে এক দূতীকে পাঠিয়ে নানাভাবে বাহুকরূপী নলকে পরীক্ষা করেন। কেশিনী বলে যে ... বাহুকের দৃষ্টিমাত্র শূন্য কলস জলপূর্ণ হয় এবং সূর্যকিরণে তৃণমুষ্টি ধরলেই তাহা প্রজ্জ্বলিত হয়। ... নল তাঁর পূর্বরূপে রূপান্তরিত হন। ... দ্যুতক্রীড়ায় বিজয়ী হয়ে নিজ রাজ্য উদ্ধার করেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. নামরূপে কদাচিৎ প্রচলিত। **৫.** এই কাহিনী ভারতের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ের। আদিম সমাজতান্ত্রিক (= বৈদিক) সমাজের শাসন একদিকে শিথিল অন্যদিকে মৌলবাদী হয়ে পড়েছে, কলের আবির্ভাব ঘটে গেছে অথচ পণ্যবিনিময়ের প্রচলন করা যাচ্ছে না। বৈদিকব্যবস্থার **দমন** সক্রিয় রয়েছে। তারই ভেতর পুংশক্তিরূপে **দম, দন্ত, দমন** এবং প্রকৃতিশক্তিরূপে **দময়ন্তী**র উদ্ভব। এ হল একশ্রেণীর পণ্য-উৎপাদক গোষ্ঠী, যারা এক ধরনের দমিত রূপ নিয়ে বিকশিত হচ্ছে। একালে যেমন কোটা বেঁধে দেওয়া হয় — 'এর বেশি জমিতে গাঁজা চাষ করবে না।' এই ধরনের। সেই নিয়েই শেষমেষ কী কী ঘটেছিল, সেই কাহিনী বিস্তারিতভাবে রয়েছে নল-দময়ন্তীর কাহিনীতে। সেই কাহিনী ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। আগ্রহী পাঠক আমাদের 'গ' গ্রন্থের 'বিদর্ভের কথা ...' নিবন্ধটি দেখে নিতে পারবেন।

দম্প, দম্পতি (দম্ভ) : ২. ***দম্প* = *দম্* পালিত যাহাতে। *দম্পতি* = *দম* (= জায়া) ও *পতি* সক্রিয় যাহাতে। *দম্ভ* = *দম্*-কে ভরণ-ভক্ষণ করে যে।** / **দম্ভ** = অযথার্থ-ব্যবহার (যাহাতে); অর্থাৎ, আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রচার (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. **দম্প** = অহঙ্কার। **দম্পতি** = জায়া ও পতি। **দম্ভ** = কপট, ধর্ম্মধ্বজিত্ব, লোকমোহার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান, পূজাপ্রাপ্ত্যর্থ নিজধার্ম্মিকত্বখ্যাপন, ধর্ম্মে অনুৎসাহ। (ব.শ.)। ৪. couple of husband & wife অর্থে **দম্পতি** প্রচলিত। ব.শ. মতে **দম্প** অপ্রচলিত, যদিও গ্রামবাংলায় **দম্প** শব্দটি এখনও কোথাও কোথাও প্রচলিত রয়েছে। **৫.** 'দম্ বা দাতার সীমায়ন পালিত হয় যাহাতে' তাকে বলে **দম্প**। খুব সহজ করে বললে, আপনি জমিজায়গা আত্মস্থ করে চাষাবাদ করে প্রচুর ধান-চালের মালিক হলেন; মোটকথা প্রাকৃতিক শক্তিকে আপনি দমিত করে আত্মস্থ করেছেন; ফলে আপনার যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য ও অহঙ্কারবোধ তৈরি হয়েছে — এই হল **দম্প**। কিন্তু সেসব কিছু না করে, কোনো রকম ধনার্জন না করে, কেউ যদি লোককে বোঝায় যে সে খুব ধনী, তার কাছে **দম**-এর ভরণপোষণ নিরাপদ; তাহলে সে '**দম**-কে ভরণের নামে ভক্ষণ' করে ফেলতে পারে — এই হল **দম্ভ**। অর্থাৎ কিনা, **দম্প** হল সত্যিকারের **দম**-পালন; যাতে **দম**-এর ভরণ হয়, পালন-পোষণ হয়। আর, **দম্ভ** হল **দম**-ভরণের ভান, তাতে **দম**-এর ভরণ-পোষণের চিৎকৃত ঘোষণা থাকে, কিন্তু কার্যত তা হয় না, বরং তাকে ভরণের নামে ভক্ষণ করে ফেলার সম্ভাবনা থাকে এবং সুযোগ পেলে তাকে ভক্ষণ করে ফেলা হয়। এই হল **দম্ভ**।

তা সে যাই হোক, এখন **দম্প** যদি তারিত হয়ে গতিশীল হতে থাকে, তাকে **দম্পতি** বলা যায়। সেক্ষেত্রে এর মানে দাঁড়ায়, আপনার অর্জিত সম্পদ এমন কোনো সত্তায় পরিণত হয়েছে, যে-সত্তা গতিশীল; তা সে একটি রাইসমিল হতে পারে, একটি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি হতে পারে ... এমনকি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও হতে পারে আপনি যার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। কিন্তু **দম্পতি** শব্দের এরকম অর্থের প্রচলন নেই; রয়েছে 'জায়া-পতি = **দম্পতি**'। সে অর্থে আমরা পরে যাব। আপাতত 'রাইসমিল' ইত্যাদি অর্থে কেন দম্পতি ভাবব না, সেই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা দরকার।

কথাটি আগেও আমরা বলেছি। কথাটি হল, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে শব্দের অর্থ নিষ্কাশনের বেলায় বাক্যের আকারে যে অর্থটি আমরা পাই, তাকে ধরে যুক্তির পথে হেঁটে হেঁটে কোনো একটি সত্তায় পৌঁছানোর নীতিটি কট্টরভাবে অনুসরণ করলে আমরা গভীর গাড্ডায় গিয়ে পড়ব। কারণ, চিন্তাবিদগণ অনেক আগেই জানিয়ে গেছেন যে, অঙ্ক ও যুক্তিবাদ অনেক সময়ই খাঁটি যুক্তির পথ ধরে হেঁটে হেঁটে একেবারে অবাস্তব-অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে। সেই কারণে আমরা প্রতিটি শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থমূলক বাক্যটি উদ্ধার করার পর শব্দটির প্রতীকী অর্থগুলির দিকে দৃষ্টি দিই, খোঁজ নিই বাংলাভাষীগণ শব্দটি কী কী অর্থে ব্যবহার করেন ও করতেন। তারপর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থমূলক বাক্যটি থেকে সেই প্রচলিত ও প্রতীকী অর্থগুলিতে পৌঁছনোর পথ খুঁজি। এভাবেই বোঝার চেষ্টা করি, কেমন করে ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থটি মানুষের অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে সেই সেই প্রতীকী অর্থে পৌঁছে স্থির রূপে

প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। এর কারণ হল, প্রতিটি শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের বা মূল অর্থের অনেকগুলি সম্ভাবনা (অপসন্‌স্) থাকে, সব সম্ভাবনাগুলি কখনোই ব্যবহার করা হয় না। আমাদের দেখতে হয়, কোন কোন সম্ভাবনা /সম্ভাবনাগুলি আদি শব্দব্যবহারকারীগণ ব্যবহার করেছিলেন। এভাবে না করলে, আগেই আমরা বলেছি, মানুষের মনের মাটি থেকে শব্দের শিকড় উপড়ে ফেলা হয়।

সুতরাং, **দম্পতি** মানে 'রাইসমিল' — এধরনের সিদ্ধান্ত যতই যুক্তিপূর্ণ হোক, অবশ্য পরিত্যজ্য। **দম** মানে 'যে শক্তিদানকারী বা কারিণীকে সীমায়িত করা হয়েছে' এবং সে প্রকৃতিশক্তি মানবজাতির নারীশক্তিও হতে পারেন। সেই **দম** 'জায়া' (দ্র. **জায়া**) হলে এবং তার সঙ্গে **পতি** যুক্ত হলে, দোঁহে মিলে **দম্পতি** হতেই পারে। এবং হয়ও, হয়েছেও। সেক্ষেত্রে, কেন এবং কীভাবে **দম**-এর অন্ত্য 'অ'কারের বিলোপ ঘটল, ভবিষ্যতে কেউ তা খুঁজে বের করবেন।

দশ, দাশ, দিশ, দৃশ ('দশ' বিষয়টি বড় এবং জটিল, পরম্পরা ধরে বুঝবার সুবিধা হয় বলে প্রথমে এই চারটি শব্দকে একত্রে বিশ্লেষণ করে নিচ্ছি। এ শব্দগুলি পরে আবার থাকবে।) : ৫. পারম্পর্য্য অনুসারে শব্দগুলি ক্রম এরকম — **দশ** > **দাশ** > **দিশ** > **দৃশ**। এখন কথা হল, এই **দশ** শব্দটি তৈরি হয়েছে কীভাবে? ব.শ. কোনো ব্যুৎপত্তি দেখাননি, কেবল জানিয়েছেন **দশ** ও **দশন্‌** একই কথা। আর জানিয়েছেন, মারাঠি হিন্দি মৈথিলী ফারসি প্রভৃতি ভাষায় একে **দহ, দাহা, দস** ইত্যাদি বলে; যখন কিনা অন্যান্য বিদেশী ভাষাতে তাদের dasa (Avesta), dekos (Greek), decem (Latin), desyat (Russian), tehan (German), ten (English) ইত্যাদি বলে। ছাত্রবোধ অভিধান অবশ্য সোজাসুজি বলে দিয়েছেন যে, **দশ** শব্দটি **দন্‌শ্‌** ক্রিয়া থেকে জন্মেছে। ব.শ. **দশন** কথাটির মূলে **দন্‌শ্‌** ক্রিয়াটিকে দেখিয়ে তাকে দংশন করা অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং **দশ** ও **দশন** শব্দদুটিকে পৃথক করে নিয়েছেন। ব.শ. মতে 'যাহার দ্বারা দংশন সাধিত হয়', তাকেই **দশন** বলে। আমরা দেখছি **দশধা** করার জন্যও **দশন** ব্যবহার করতে হয়। আর, এই কথাটির বিপুল সমর্থন পাওয়া যায় ইংরেজি শব্দভাণ্ডারে। তাদের das-, dec-, dos-, douc-, dous-, dows- যুক্ত অজস্র শব্দ ten অর্থে যেমন কমবেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তেমনি 'দংশন করা' বা strike অর্থে খুবই ব্যবহৃত হয়। ... সব দিক বিবেচনা করে তাই আমাদের মনে হয়েছে, **দশ** শব্দটি **দন্‌শ্‌** ক্রিয়া থেকেই জন্মেছে এবং এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল — 'দংশন হইতে জাত'। কেননা, এই 'দংশন'-এর ভিতরে যে শক্তিপ্রয়োগ রয়েছে, তাকে যেমন **দন্‌শ্‌** ক্রিয়া বলা যায়, তেমনি শুধুমাত্র দ-ও বলা যায়। দ্র. **দ বর্ণের অর্থ**। তাতে দ মানেই শক্তি ইত্যাদি দেয় যে। তাহলে তো 'দংশন হইতে জাত যে' আর 'দ শায়িত যাহাতে', এই দুরকম ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ আমাদেরকে কেবল সম ধ্বনিতে (দশ-এ) পৌঁছায় না, সম অর্থেও পৌঁছে দেয়! ...

অতএব এখন আমরা ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মে শব্দগুলির অর্থ সাজিয়ে নিতে পারি — **দশ** > **দ শায়িত যাহাতে**; অথবা, দংশন হইতে জাত যে। **দাশ** > **দশ হইতে জাত**। **দিশ** > গতিশীল দ্‌ শায়িত যাহাতে। **দৃশ** > **আবর্তনশীল দ্‌ শায়িত** যাহাতে। এই পর্যন্ত না হয় বোঝা গেল। কিন্তু **দশ** শব্দে প্রাচীন শব্দকারগণ 'দশ-সংখ্যা' বা ten বুঝতে পারলেন কীভাবে?

হ্যাঁ, এখানে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রাচীন মানুষ এক একটি সংখ্যার ধারণায় পৌঁছাল কেমন করে? এক, দুই, তিন, চার প্রভৃতি ধারণায় কেমন করে পৌঁছেছিল, সেকথা আমরা যথাস্থানে বলেছি। এখন ভাবতে হবে '**দশ**' বা 'ten'-এর কথা। এখন পর্যন্ত আমাদের পক্ষে যেটুকু বোঝা সম্ভব হয়েছে, তা হল, কয়েকটি সম্পূর্ণ সত্তাকে সেকালের মানুষ মোট **দশ** ভাগে বিভক্ত রূপে বা **দশ** ভাগে বিভক্ত করে দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। অর্থাৎ তাদের সামনে কতকগুলি সম্পূর্ণ বস্তু বা বিষয় মোট দশভাগে বিভক্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল। যেমন অস্তিত্বের **দশ** দিক, পুরুষের **দশ** দশা, আদ্যাশক্তির **দশ** রূপ ... ইত্যাদি। হয়তো সেজন্যই তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন — **দশ** মানে **দশটি ভাগ নিয়ে সবটা** বা গোটাটা, **দশ ভাগে বিভাজিত পূর্ণ** রূপটি। অর্থাৎ, **দশ** মানে ten, **দশ** মানে বহু (দশে মিলি করি কাজ), **দশ** মানে সমগ্র, **দশ** মানে যে পূর্ণকে **দংশন** করে **দশ** ভাগে বিভাজিত করে ফেলা হয়েছে। এই দশ-এর ভিতরেই সমগ্র শক্তিদাতা শায়িত থাকে। তাই **দশ** = (শক্তি ইত্যাদি) দাতা শায়িত যাহাতে। ধারণাটিকে আরও বিস্তারিত করেছেন স্বয়ং নীলকণ্ঠ। **দশতি** শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে তিনি জানাচ্ছেন — এই **দশ**কে বা সম্পূর্ণকে আরও **দশ** বার আবর্ত্তন করলে আমরা আরও বড় একটি পূর্ণে পৌঁছতে পারি; তা হল **দশ দশে** শত।

এই ধারণা আরও স্পষ্ট হয় তাঁদের **দিশ**-এর ধারণা থেকে। **দিশ**-এর ভিতরে **দশ**-দিকগামী গতিশক্তি থাকে, **দশটি দিশা** থাকে। সব দিকগুলির যোগফলই অস্তিত্বের প্রেক্ষিত বা সর্বদিক। **দৃশ**ও তাই। এতে **দশ**-দিকগামী দৃষ্টিশক্তি সক্রিয় থাকে। সে সর্ব দিশায় আবর্ত্তিত হতে পারে, সর্ব দিশায় দেখতে পেতে পারে। এমনকি **দাশ** শব্দেও একই ধারণা রয়েছে। তবে সে **দাশ** শব্দকে আমরা পাই **দাশ্ব, দাশ্বান** (ছাত্রবোধ অভিধান) প্রভৃতি শব্দে, পাই কোশাম্বীর প্রাচীন যুগের পর্য্যালোচনায়, যেখানে তিনি মানবসমাজের পরিচালক শক্তিকে **দাশ** শব্দে চিহ্নিত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে **দশ হইতে** জাত বলে **দাশ** শব্দটি একই সঙ্গে সম্পূর্ণ মানবসমাজের নেতাদের যেমন বোঝাতে পারে, তেমনি যে-জগৎ সর্বদিক থেকে মানুষকে তার প্রয়োজন জোগায় তাদেরও বোঝাতে পারে। মোট কথা **দশ** শব্দের ভিতরে পূর্ণের ও সেই পূর্ণের ভেতরের ten বিভাজনের কথা রয়েছে।

দশদিকপাল : দ্র. **দিকপাল**।

দশন, দশা : ১. দশন = ✓দন্‌শ্‌ + অন (ল্যুট্‌) - করণবাচ্যে। 'ন্‌' লোপ নিপাতিত। দশা = ✓দন্‌শ্‌ + অ (অঙ্‌) - কর্ম্মবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্‌)। (ব.শ.)। ২. ***দশন** = **দশ** অন থাকে যাহাতে। **দশা** = **দশ**-এর আধার যে।* / যাহার দ্বারা দংশন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **দশন** = দন্ত, বর্ম্ম, পর্ব্বতবিশেষ। **দশা** = অবস্থা, শরীরের দশ অবস্থা (— গর্ভবাস, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, যৌবন, স্থাবির্য্য, জরা, প্রাণরোধ, মৃত্যু), পূর্ব্বরাগে কামজ চিন্তাদি দশ অবস্থা, জীবনাবস্থা, বয়ঃক্রম, নক্ষত্রানুসারে সূর্য্যাদিগ্রহগণের ভোগ্যকাল,

কর্ম্মফল, মানসিক অবস্থা, চিত্ত, সলতে, বস্ত্রান্ত, প্রেমে ভাবাবেশ হেতু সমাধি; শিশুর জন্মের দশম দিনে কৃত্যবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দশ** (উপরে)। যা দিয়ে দংশন করা হয়, তাকে যেমন **দশন** বলে তেমনি **দশন** করা মানে দংশন করে দশ ভাগে বিভাজিত করাও বোঝায়। কিন্তু বর্ম্মের দ্বারা কীভাবে দংশন সাধিত হয়, এই মুহূর্তে সেকথা আমরা জানি না; সে তো বরং দংশন ঠেকায়! কিন্তু কোনো কোনো সামাজিক সংগঠন বা **পর্ব্বত** যে দংশন অবশ্যই করে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

এবার **দশা**র কথায় যাওয়া যাক। **কথ**-এর আধারকে যেমন **কথা** বলে, তেমনি **দশ**-এর আধারকে **দশা** বলে। 'যাহা কথিত হইয়াছে', তাকে যেমন **কথা** বলে, 'যাহা দংশিত হইয়াছে', তাকেও **দশা** বলা যায়। যায় বলেই ব.শ. **দশা** শব্দের মানে দিয়ে গেছেন **অবস্থা** ... ইত্যাদি। (দ্র. **অব্**, **অবস্থা**)। স্থা বা স্থিতি ভাল থাকলে আমরা বলি সুস্থ। কিন্তু স্থিতির অধঃপতন ঘটলে সে হয়ে যায় **অবস্থা**। **অব** মানেই নিম্ন মান। আগে যে-স্থিতি ছিল, দংশিত হওয়ার পর সেই স্থিতি থাকে না, নিম্ন মানের স্থিতি হয়ে যায়। সেই কারণে **দশাই অবস্থা**। আমাদের সেকালের জ্ঞানী মানুষেরা দেখেছিলেন, মানবশরীরের **দশ দশা**। দংশিত খণ্ডিত দশ ভাগে বিভক্ত সেই **দশা**গুলির দশটি নাম তাঁরা 'গর্ভবাস, জন্ম ... ইত্যাদি' দিয়ে গিয়েছেন। (উপরে ৩ দ্র.)। মানুষের সম্পূর্ণ জীবন এখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে মোট দশটি খণ্ডে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই জন্য এই **দশা**কে বয়ঃক্রমও বলা হয়েছে। আবার, যাকে দংশন করে আনা হচ্ছে, সে তো কর্ম্মফলও বটে। তাই **দশা** মানে কর্ম্মফলও হয়। ... ৬. দ্র. **দশ**।

দশভুজা : ২. *দশ ভুজ যাহার (যে প্রকৃতিশক্তির); যে (প্রকৃতিশক্তি) দশ হাতে ভোজন করে; যে (প্রকৃতিশক্তি) দংশন করিয়া ভোজন করে।* ৩. দুর্গা (এই দেবী স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূতা হন।), চণ্ডীমূর্ত্তি নারী। (ব.শ.)। ৪. 'দশ হস্ত সম্পন্না দেবী দুর্গা' অর্থে খুবই প্রচলিত। ৫. দ্র. **দুর্গা**।

দশম : ১. দশন্ + ম (মট্)। ব.শ.)। ২. *দশ অন হতে থাকা সীমায়িত যাহাতে।* ৪. tenth অর্থে প্রচলিত। ৫. দংশন করে দশ ভাগ করতে করতে যেখানে গিয়ে এই দশ-করণ থামে, সেটিই **দশম**।

দশমহাবিদ্যা : ৩. দশাবয়বা মহাবিদ্যা; কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা — এই দশ আদ্যা শক্তি। (ব.শ.)। কালী, তারা ... (ইত্যাদি) — এই দশ দেবী মহাশক্তির দশ মূর্তি। এই মহাবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতভেদ আছে, তবে এইটি প্রচলিত — মহাদেব সতীকে দক্ষযজ্ঞে যেতে নিষেধ করেন; এতে ভগবতী প্রথমে কালীমূর্তি ধারণপূর্বক শিবের ভয়োৎপাদন করেন। কিন্তু তাতেও মহাদেব ভীত না হলে ভগবতী দশ দিকে দশ মূর্তিতে আবির্ভূতা হন এবং মহাদেবের পথরোধ করেন। এই দশ মূর্তিতে তিনি আবির্ভূতা হয়েছিলেন বলেই এঁর নাম দশমহাবিদ্যা। (পৌ.অ.)। ৪. **ধর্মপরায়ণ ও তন্ত্রসাধকদের মহলে** শব্দটি যথেষ্ট প্রচলিত। ৫. **নিজেদের খুব বুদ্ধিমান ভাবলে এই পর্যন্ত** কমবেশি বোধ্য মনে হয় যে, প্রাচীন 'আবিষ্কারক-উদ্ভাবক জ্ঞানকর্মের অগ্নিশিখাবহনকারী **শিবশক্তি'র** ধারক জননেতাগোষ্ঠী (অর্থাৎ **শিব**) তাঁদের অনুসারী সমগ্র জনসাধারণকে **দক্ষযজ্ঞে** যোগ দিতে নিষেধ করায়, তাঁরা ক্ষেপে যান এবং যতরকম ব্যবহার করেছিলেন ততরকম রূপেই ওই নেতাগোষ্ঠী তাঁদের দেখেছিলেন; এখানে সেই দশ রূপকে কালী, তারা ইত্যাদি দশ নামে খ্যাপন করা হয়েছে মাত্র! তাঁদের ইতোমধ্যেই **কালী, ছিন্নমস্তা** ইত্যাদি শব্দে কমবেশি চেনাও গেছে। কিন্তু যে মুহূর্তে — 'কেন এগুলিকে **দশমহাবিদ্যা** বলে?' — এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ নিজেদের সবজান্তা ভাবের বেলুনটা ফুটো হয়ে যায়।

না, কোনো গ্রন্থেই এর কোনো বোধ্য উত্তর এখনও আমরা পাইনি। শব্দার্থের ভিতরে যে-অর্থ পাওয়া যেতে পারে, আমরা তারই অনুসন্ধান করেছি। তার থেকে আমরা যতটুকু অনুভব করতে পেরেছি, তা এরকম — ব.শ. বলছেন, 'যাহার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়' তাকে বলে বিদ্যা। তাছাড়া 'বিদিত হওয়ার উপায়'কে বিদ্যা বলা যেতেই পারে। আর, **মহা** শব্দের অর্থ থেকে জানা যায়, সমগ্রের ধারককে **মহা** বলা চলে। তাহলে **মহাবিদ্যা** শব্দের মানে দাঁড়ায়, সমগ্রবিদ্যা বা বিরাট বিদ্যা। ব.শ. বলেছেন 'শ্রেষ্ঠ বিদ্যা'। আমাদের মনে হয়েছে, এই **মহাবিদ্যা** আসলে এত বড় বিদ্যা যে, বাকী সবরকম বিদ্যা তার ভিতরেই কোনো না কোনো ভাবে আশ্রিত। সেই কারণে একে **মহাবিদ্যা** বলে। সেকালের অনুভবীগণ যেভাবেই হোক অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, এই মহাবিদ্যার দশটি রূপ রয়েছে। সেই দশটি রূপকে তাঁরা চিহ্নিত করে, স্বভাব অনুসারে তাদের প্রত্যেকটির নামকরণ করে গেছেন — কালী, তারা ... ইত্যাদি।

এই **দশমহাবিদ্যা**কে তাঁরা সর্বস্তরে সক্রিয় দেখতে পেয়েছিলেন বলেই আমাদের মনে হয়েছে। তা যদি না হত, শব্দার্থতত্ত্বকে যতটুকু আমরা বুঝেছি, তাঁদের পক্ষে ওইরকম দশটি নামকরণ করা কিছুতেই সম্ভব হত না। বর্তমান ঘোর কলিযুগে প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন আমাদের অনুভব শক্তি অনেকটাই ভোঁতা হয়ে গেছে। আমরা খুব বেশি হলে বহু কষ্টে মাত্র তিনটি স্তরে (প্রাকৃতিক, সামাজিক, ও রাসায়নিক) ওই **দশমহাবিদ্যা**কে সক্রিয় বলে কিছুটা অনুভব করতে পারি, কিন্তু ঠিকঠাক চিনতে পারি না; কেবলমাত্র সামাজিক স্তরে বেশ খানিকটা চিনতে পারি। প্রাকৃতিক **দশমহাবিদ্যা**র স্তরে **কালী**কে আমরা চিনেছি কৃষ্ণ ও শ্যাম-এর আধার রূপে। ছবি সহ তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে **গৌরী** শব্দে। আর, **মাতঙ্গী** কাকে বলে, সাম্প্রতিক সুনামি-ঝড় প্রত্যক্ষ করার পর অনেকেই তা অনুভব করে থাকবেন। ... সামাজিক **দশমহাবিদ্যা**র স্তরে **কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী** ... কাদের বলা হয়, তা আমরা অনেকটাই স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছি। (শব্দগুলির নিজস্ব ভুক্তিতে যথাস্থানে দেখুন)। ... আর, রাসায়নিক **দশমহাবিদ্যা**র স্তরে তাঁদের যেভাবে দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা তাঁদের তীব্র অনুভবশক্তির জোরে সেসব দেখতে পেয়ে, সেগুলিকে চিহ্নিত করে উত্তরসূরীদের বলে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা আধুনিক

শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলাভাষীরা সেসব সম্পূর্ণ ভুলেছি, সেই রাসায়নিক **দশমহাবিদ্যাকে** বুঝবার ও দেখবার যোগ্যতাও হারিয়েছি। তবে, আমাদের গ্রামবাংলার বাংলাভাষীরা এখনও সেগুলিকে কমবেশি মনে রেখেছেন, এবং ব.শ. সেগুলিকে উল্লেখ করতে ভোলেননি। ফলে রাসায়নিক **দশমহাবিদ্যাকে** যেমন গ্রামবাংলার বাংলাভাষীর সাথে কথা বলে তার সহায়তায় চিনতে পারা যায়, তেমনি ব.শ. গ্রন্থেও কমবেশি পাওয়া যায়। সেই ব.শ.-এর তথ্য অনুসারে **কালী** রয়েছেন ফটকিরিতে, তেউড়ি লতায়, কালতুলসীতে, বিছুটি পাতায়; **তারা** রয়েছেন মুক্তায়, রাখালশশায়, কাঁটাজামীর-এ। বাকি রূপগুলির এই প্রকার সংবাদ ব.শ.-তে কমবেশি রয়েছে। পাঠক সেগুলি দেখে নিতে পারবেন।

দশরথ : ২. *দশ রথ যাহার।* / যাহার রথ দশ দিকে অর্থাৎ সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। (ব.শ.)। ৩. ... ইঁহার মাতা ইন্দুমতি, ... ঋষ্যশৃঙ্গের পুত্রেষ্টিতে ইঁহার রাম লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন চারি পুত্র জন্মে। কৌশল্যার গর্ভজাতা ঋষ্যশৃঙ্গপত্নী শান্তা ইঁহার কন্যা। রামের রাজ্যাভিষেকে কৈকেয়ী ইঁহার নিকটে পূর্ব্বে স্বীকৃত বরদ্বয়ে রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করেন। সত্যভীরু রাজা এই বিসদৃশ প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া রামশোকে প্রাণত্যাগ করেন। (ব.শ.)। সূর্যবংশীয় নৃপতি দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ। ইনি অযোধ্যার রাজা ও রামলক্ষণাদির পিতা। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে এঁর তিনটি প্রধানা মহিষী ছিলেন। ... এঁর কন্যার নাম শান্তা। দশরথ এই কন্যাকে পরম মিত্র অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদের নিকট পোষ্যপুত্রিকা রূপে অর্পণ করেন। লোমপাদ শান্তাকে বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত বিবাহ দেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. অর্থহীন নাম রূপে প্রচলিত। ৫. ভারতে রামায়ণের কাহিনী লেখা চলছে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের আগে থেকে। বাস্তবে ততদিনে বহু রাজতন্ত্রের জন্ম হয়ে গেছে। তারা যে-যার শাসন চালাচ্ছে। সেই রাজতন্ত্রকে ক্রিয়াভিত্তিক দর্শন যেভাবে দেখত, সেভাবে দেখেই ওই রাজতন্ত্রগুলির বর্ণনা দিয়ে ইতিহাস লেখা হয়েছে **পুরাণ, রামায়ণ-মহাভারতাদি** নামে। সেইভাবে দেখতে শিখে তবেই আমরা সেগুলির মানে বুঝতে পারি।

একালের মতো কোনো ব্যক্তিমানুষকে রাজা রূপে চিহ্নিত করা ক্রিয়াভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বোকামি বলে মনে করা হত। দেখতে হত, রাজাটি বা রাজার দলবল মিলে যে সকল ক্রিয়া করছে, তার মূল ক্রিয়া কোনটি, যে মূল ক্রিয়া থেকে বাকি সব ক্রিয়াগুলির চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে? তো, যে-সময় সামাজিক-সংগঠনগুলির বা রাষ্ট্রের অজস্র বিভাগ একত্রে সক্রিয় হয়ে দেশ চালাচ্ছে, এবং তার ফলেই একধরনের যৌথ অগ্রগতি ঘটছে সমগ্র সমাজের, সেই সময়ের রাজা বলা হয়েছে ওই অজস্র বিভাগের সক্রিয়তাকে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে **দশরথ**। ইনি **অজ** রাজার **পুত্র**, যে-সত্তা (অনেকগুলি মানুষের গোষ্ঠী বা একজন বীর ও তার দলবল) সেকালের মহর্ষিদের তোয়াক্কা না করে নিজেই শাসনক্ষমতায় চড়ে বসেছিল। বহুকে **দশ** বলার যে রেওয়াজ প্রচলিত ছিল, সেই রীতি অনুসারেই এই **দশরথ** নামক বহু ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত শাসনব্যবস্থাই ছিল **অযোধ্যা**র রাজা। রথ শব্দের মূলে আমরা পাই 'আবর্ত্তন থাকে যাহাতে'। এই বিভাগগুলি সর্বদা আবর্ত্তিত হত। সেই আবর্ত্তনশীল ব্যবস্থাগুলির উপরে এমন একধরনের সামঞ্জস্য-বিধানকারী সত্তা ছিল, যে সমস্ত **রথচক্রগুলির** ফলাফলকে একত্রিত করতে সক্ষম ছিল। সেই সত্তাই **দশরথ**। ... (এখানে রামায়ণের পুরো কাহিনীর মানে দেওয়ার চেষ্টা আমরা করব না, তার অবকাশও নেই। আমরা তার এক একটি শব্দকে কেবল ব্যাখ্যা করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আগ্রহী পাঠক এই শব্দগুলির অর্থ ধরে ধরে রামায়ণ পাঠ করলে নিজেই খানিকটা বুঝে নিতে পারবেন। তাছাড়া, আমাদের অন্যান্য গ্রন্থাদি থেকে আরও কিছু সাহায্য পেয়ে যাবেন।)

দশানন : ৫. সবাই জানেন, **দশানন** শব্দটির অর্থ হল **'দশটি আনন** আছে যার'। তথ্যানুসারে রাবণের দশটি **আনন** ছিল বলে তাকে **দশানন** বলা হয়ে থাকে। কিন্তু **আনন** কী বস্তু? (দ্র. **আনন, কানন, গজানন**।) **দশরথ**-এর সঙ্গে **দশানন**-এর পার্থক্য এই যে, ওয়েলফেয়ার স্টেটের সমস্ত বিভাগ সক্রিয়ভাবে তাদের কাজগুলি যখন করে, এবং তাতেই যথেষ্ট জনসেবা (প্রজানুরঞ্জন) হতে থাকে, তখন সেই ব্যবস্থাকে **দশরথ** বলে। আর, সেই ব্যবস্থা যখন তাদের কাজগুলি আদৌ করে না, শুধুমাত্র সাইনবোর্ড (**আনন**) সম্বল হয়ে বসেই থাকে না, প্রতিটি **আনন** দ্বারা জনগণকে দংশন করে, তখন তাকে বলে **দশানন**।

দশাবতার : দ্র. **অবতার**।

দস্যু, দস্র (দস্, দঃ, দস্য, দস্যি) : ১. দস্যু = ✓দস্ + যু (যুচ্) - কর্তৃবাচ্যে। দস্র = ✓দস্ + র (রক্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দস্ (দঃ)** = দাতার নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে। **দস্য** = **দস্** থাকে যাহাতে। **দস্যি** = **দস্য** গতিশীল যাহাতে। **দস্যু** = **দস্য** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. **দস্** = উৎক্ষেপণ, ভয়, বস্তুহানি। **দস্য** = দস্যু, ডাকাত, চোর, দস্যুসদৃশ দুর্ব্বৃত্ত। **দস্যি** = দুরন্ত। **দস্যু** = শত্রু, মহাসাহসিক, চোর, ডাকাত, খল, মৃগবধজীবী ব্যাধাদি, দুর্ব্বৃত্ত, দুরাত্মা, ক্রিয়াদিলোপ হেতু ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে বাহ্যজাতিবিশেষ, অসুর। **দস্র** = উপক্ষয়ধর্ম্মক, গর্দ্দভ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়। (ব.শ.)। ৪. 'ডাকাত' **অর্থে** **দস্যু** এবং 'দুরন্ত' অর্থে **দস্যি** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. **দঃ** বা **দস্** একই কথা, এবং তার মানে 'দাতার শেষ যেখানে' কিংবা 'দাতার নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে'। এই দাতা কাউকে কিছু **দিচ্ছে** না, দাতা যে সত্তার পরিধির মধ্যে থাকে সেখান থেকে নিয়ে **ফেলে** দিচ্ছে। যেকারণে ব.শ. এর অর্থ দিয়েছেন — উৎক্ষেপণ, **ক্ষয়**, বস্তুহানি। নিয়মানুসারে এই 'দস্ থাকে যাহাতে' তাকে **দস্য বলাই** যায়। কিন্তু ব.শ. বলছেন, **দস্য** শব্দটি অপ্রচলিত। তবে **দস্যি খুবই** প্রচলিত। মায়েরা তাঁদের বালগোপালদের উদ্দেশ্যে এই শব্দ**টি আদর** করে আজও প্রয়োগ করে থাকেন। (মনে রাখা ভাল, মায়ে**দের মুখে** বহু প্রাচীন ও স্বাভাবিক প্রাকৃতিক শব্দ আজও প্রবাহিত **রয়েছে, তা** সে যে ভাষাতেই হোক।) **দস্যি** ছেলে ঘরের জিনিস**পত্র নিয়ে** খেলাচ্ছলে বাইরে ফেলে দেয়, নষ্ট করে, বস্তুহানি করে। **কিন্তু দস্যু** তা করে না, সে নবরূপে উত্তীর্ণ সত্তা, সে বাইরে থেকে **আসে, এসে**

ঘরের জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে দেয়, এধার-ওধার ক্ষেপণ করে দেয়, ছড়িয়ে দেয়, ক্ষয় করে, বস্তুহানি করে। **দস্যু** শব্দের ভেতরে কিন্তু 'লুঠ করে নিয়ে যাওয়া' অর্থটি নেই। ব্যঞ্জনা অর্থে সেকথাটি প্রচলিত হয়ে গেছে। আর, **দস্র** শব্দটিকে সচরাচর পাওয়াই যায় না। এর দেখা মেলে পুরাণে। বলা হয়, অশ্বিনীকুমার যমজ দুই ভাইয়ের একত্রিত নাম। তাদের পৃথক নামও নাকি আছে — **দস্র** ও **নাসত্য**। শব্দ দুটির অর্থ যথাক্রমে — উপক্ষয়ধর্ম্মক ও যাহারা অসত্য নহে। এঁরা নাকি দেবমধ্যে শূদ্র। দ্র. **অশ্বিনীকুমার**।

দয়্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অদয়, দআল, কন্যাদায়, দয়্, দয়া, দয়াবন্ত, দয়াময়ী, দয়াল, দয়ালু, দয়িত, দায়, দায়ক, দায়কাল, দায়গ্রস্ত, দায়দফা, দায়ধরা, দায়বন্ধু, দায়ভাগ, দায়মাল, দায়রা, দায়িক, দায়িত্ব, দায়ী, দায়ের, দেয়, পিতৃদায়, সদয়। **দয়্** = দাতার যাওয়া। **দয়** = দাতা যায় যাহার দ্বারা বা যাহাতে।

দয়া, দয়াল, দয়ালু, দয়িত : ১. দয়া = ✓দয়্ + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। দয়িত = ✓দয়্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দয়া** = দাতা যায় যাহাতে তাহার আধার। **দয়াল** = **দয়া**র লালন-লয়ন যাহাতে। **দয়ালু** = **দয়াল** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **দয়িত** = **দয়** গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* ৩. **দয়া** = পরদুঃখহরণেচ্ছা, আত্মবৎ সর্ব্বভূতের হিতসাধনেচ্ছা, অনুকম্পা। **দয়াল** = দয়াবান, **দয়ালু** = দয়াশীল, কারুণিক। **দয়িত** = অভীষ্ট, বল্লভ, প্রিয়, রক্ষিত, স্নিগ্ধজন, পতি, জগন্নাথের একশ্রেণীর সেবক। (ব.শ.)। ৪. সব শব্দগুলিই তাদের প্রতীকী অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. যে আচরণের ভিতর দিয়ে **দ** বা দানকারী বিষয় বা বস্তু অন্যের কাছে যায়, সেই আচরণকে দয়া বলে। দয়াল দয়া করে বলেই **দয়াল** পদবাচ্য। কিন্তু যে দয়াল না-চাইতে বাইরে থেকে এসে দয়া করে, এবং এটাই যার স্বভাব, তাকে বলে **দয়ালু**। আর, যার কাছে বারংবার দয়া যায়, সে হল **দয়িত**। সেই কারণে **দয়িত** আমাদের প্রিয়জন বলে প্রতীয়মান হয়।

দায় (দায়গ্রস্ত, দায়িক, দায়িত্ব, দেয়) দায়ী : ১. দায় = ✓দা + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। দায়ী (দায়িন্) = ✓দা + ইন্ (ণিনি) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দায়** = **দয়** হইতে জাত। **দায়গ্রস্ত** = **দায়** দ্বারা গ্রাসিত যে। **দায়িক** = **দায়**-এর গতিশীল কারক যে। **দায়িত্ব** = **দায়** গতিশীল হইয়া তারিত ও বাহিত হয় যাহাতে। **দায়ী** = **দায়**-এর গতিশীল আধার যে। **দেয়** = দিশাগ্রস্ত দানের যাওয়া থাকে যাহাতে।* ৩. **দায** = দান, দেয় বিষয়, দেয় ধনাদি, স্বামিদত্ত অলঙ্কারাদি ধন, বিবাহে কন্যাকে প্রদত্ত যৌতুকাদি, ব্রতান্তভিক্ষা, সমাবৃত্ত ব্রহ্মচারীকে প্রদত্ত ধন; খণ্ডন, ছেদন, বিভাজন, লয়, বিভাজ্য পিত্রাদিধন, রিক্থ, অংশ, ভাগ, সোল্লুণ্ঠভাষণ, ব্যাজোক্তি, উপদ্রব, ক্ষতি, ঋণ, বিপদ, কঠিন ব্যাপার, অধিকার, সম্বন্ধ, দোষ, কথা, হেতু, ভয়, বন্ধন, দোহাই, কর্তব্যানুষ্ঠানরূপ ভার, গরজ, নিমিত্ত। **দায়গ্রস্ত** = বিপন্ন, দায়ী, **ঋণী**। **দায়িক** (দায়িত্ব) = দায়যুক্ত, ঋণগ্রস্ত, বিপন্ন, ভারপ্রাপ্ত, জিম্মাদার। **দায়ী** (দায়িন্) = দাতা। **দেয়** = দাতব্য, দানার্হ, সম্প্রদানীয়, ত্যক্তব্য, শোধনীয়, দাতব্য ধনাদি। (ব.শ.)। ৪. শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. **দয়্** ও **দা** ক্রিয়া-পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রায়ই মিলে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। কোন শব্দটি কোন পরিবারের সদস্য তার পার্থক্য বোঝা যায় না। ...

দায় শব্দটি খুবই ব্যবহৃত হয়। ধার-বাকী **আদায়** করতে হয়, সবাই জানে। মধ্যযুগের সাহিত্যে শব্দটিকে নানার্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এর কারণ হল **দায়ভাগ**। নীচে **দায়ভাগ** দেখুন। **দায়** ও **দেয়** শব্দদুটির পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন যুগের আইন বা রীতি অনুযায়ী যেটি আমাদের দিতে হয়, সেটি আমাদের **দেয়**। কিন্তু যেটি দেওয়া বা দান করার তাগিদ সংস্কার হিসেবে আমাদের মনের গভীরে নিহিত আছে, সেটি আমাদের **দায়**। এটিকে বাস্তবায়িত করতে রাষ্ট্র এগোয় না, বরং এগিয়ে আসে সমাজ। এই হিসেবে পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায় শব্দকে বুঝতে হয়। আবার **দায়** শোধ না করলে যেহেতু রাষ্ট্রের দণ্ড ভোগ করতে হয় না, সেজন্য **দায়শোধ** অনেক সময়ই অবহেলার সঙ্গে করা হয়। তাই অযত্ন বা অবহেলায় করা কাজকে বলা হয় **দায়সারা** কাজ। তবে **দায়**টি যার, সেই হল **দায়ী**; কারণ **দায়**-এর তারণ বহন বা **দায়িত্ব** বহন করতে হয় তাকেই।

দায়ভাগ : ২. ***দায়**-এর **ভাগ***। ৩. রিক্থবিভাগ, ব্যবহারপদবিশেষ, জীমূতবাহনকৃত দায়ভাগ-বিষয়ক গ্রন্থ। (ব.শ.)। ৪. প্রায় অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **জীমূত**। বাংলাভাষীদের সংস্কৃতিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। মানবজাতির সাংস্কৃতিক অর্জনের ভাগ সব জাতিই কমবেশি. পেয়ে যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি জাতির নিজস্ব কিছু কিছু অর্জন থাকে। সেই সব অর্জনের মধ্যে কিছু কিছু বিশেষ অর্জন থাকে, যা কোনো একটি জাতির নিজস্ব সম্পদ। যে সম্পদটির কারণে তারা বিশ্বের অন্য সমস্ত জাতির তুলনায় 'বিশেষ' বা 'থোড়া হট্‌কে' হয়ে যায়। বাংলাভাষীদের তেমনি এক বিশেষ সম্পদ হল **দায়ভাগ**। রসগোল্লার রস যত উচ্চমানের হয়, রসগোল্লা তত ভালো থাকে। রস খারাপ হলে রসগোল্লা টকে যায়। তেমনি কোনো জাতির আইন যদি সবচেয়ে উন্নত মানের হয়, জাতিটি মানসিকভাবে উচ্চ মানের থাকে। **দায়ভাগ** বাংলাভাষীর সেই রস। এরই মধ্যে বাংলাভাষী ডুবে ছিল, এখনও কমবেশি ডুবে রয়েছে। এখনও বাংলাভাষীর জীবনযাত্রা, মনের বাঁধন বা মানসিকতা এই আইনের পরোক্ষ ধারায় আজও লালিত। লালিত বলেই, বাংলাভাষীর চিন্তাভাবনা কিছুতেই বিশ্বায়নের ধাক্কায় টাল খেতে চাইছে না। দ্র. **জীমূত**।

দল্ (দুল্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আন্দোল, আন্দোলন, আন্দোলায়মান, ডুলি, দড়মড়ি, দল্, দল, দলই (দলুই, দোলই, দলধী থেকে। যেমন পালধী থেকে পালই), দলকচু, দলঘাঁটা, দলদলে, দলন, দলনী, দলপতি, দল-পাকানো, দলপাখী, দলপিপী, দলবদল, দলবল, দলভুক্ত, দলমল, দলা, দলাদলি, দলা-

পাকানো, দলি, দলিত, দলিল (দল-ইল), দলুজ (দেহ্‌লীজ), দাইল, দাঁদাল, দাঁদুড়, দাদল, দাদাল, দাল, দালান, দালাল, দালচিনি, দুল্, দুল, দুলকি, দুলদুল, দুললিত, দুলহা, দুলহাভাই, দুলা, দুলান, দুলায়িত, দুলাল, দুলালি(লী), দুলালিয়া, দুলি(লী), দুলিত, দুলে (দোলাবাহক), দুলুদুলু, দুল্যমান, দুল্যা, দুল্লিল, দোল, দোলই, দোলক, দোলন, দোলনা, দোলনী, দোলপীঁড়ি, দোলমঞ্চ, দোলমান, দোলা, দোলাই, দোলান, দোলায়মান, দোলিকা, দোলী (ডুলি), দোলিত। **দল্ (দুল্)** = দাতার লালন-লয়ন। **দল** = দাতার লালন-লয়ন যাহাতে। **দুল** = নবরূপী দাতার লালন-লয়ন যাহাতে।

আন্দোলন : ১. আ + ✓দুল্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *আশ্রিত দোলন পুনঃ পুনঃ যাহাতে।* ৩. পুনঃ পুনঃ দোলন, মুহুশ্চালন, কম্পন, আলোচনা। (ব.শ.)। ৪. ইংরেজি political movement অর্থে খুবই প্রচলিত। ৫. দোলন বাহ্যিক হয়, মানসিক হয়, সামাজিকও হয়। স্বভাবতই **আন্দোলন**ও তিনরকমই হতে পারে। বাহ্যিক দোলনাকে দোলাতে থাকলে **আন্দোলন** হয়, মনে মনে কোনো বিষয়কে দোলাতে থাকলেও **আন্দোলন** হয়, এবং সামাজিক কোনো বিষয়কে নিয়ে জনসাধারণ এদিক ওদিক দুলতে থাকলেও **আন্দোলন** হয়। একেই political movement-ও বলে। একশো বছর আগেও **আন্দোলন** শব্দটি তিন ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হতে পারত, কিন্তু বর্তমানে শেষের অর্থটি স্থিতিশীল হয়ে প্রতীকী রূপ পেয়ে গেছে। **আন্দোলন**-এর বাকি অর্থগুলি দিন দিন সেকেলে হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ৬. ইংরেজি undulate।

দল (দল-পাকানো, দলা-পাকানো, দলবল, দলাদলি, দ'লে-দেওয়া) : ১. ✓দল্ + অ (ঘঞর্থে-ক) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দল** = দাতা লালিত-লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে।* ৩. **দল** = ভেদ, বিদীর্ণ হওয়া, খণ্ড, খণ্ডিতাংশ, শলাকা, পত্র, পাতা, তমালপত্র, (সাদৃশ্যে) অস্ত্রফলক, পত্র পাপড়ি, অঙ্কুর, কোষ, অপদ্রব্য (alloy), উৎসেধ, অর্দ্ধ, রাশি, সৈন্যসমূহ, ধন, সমূহ, পক্ষ, একজাতি পশুসমূহ, যূথ, ঝাঁক, সম্প্রদায়, ধর্ম্মসম্প্রদায়, জলজাত পত্রবহুল উদ্ভিদ, ধানগাছের মত জলজ তৃণবিশেষ, গর্ত্ত, গহ্বর; দলিত করা, নিপীড়িত করা, মর্দ্দন করা, ডলা, পদে পেষণ করা, মাড়ান, পেষণ করা। (ব.শ.)। মহাভারত অনুসারে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ মণ্ডুকরাজ আয়ুর কন্যা সুশোভনাকে বিবাহ করেন। সুশোভনা পিতৃশাপে শল, দল, ও বল নামে তিন ব্রাহ্মণবিদ্বেষী পুত্র প্রসব করেন। ... শল মহর্ষি বামদেবের অশ্বদ্বয় গ্রহণ করে প্রত্যর্পণ না করায় রাক্ষস হস্তে নিহত হন। ... এরপর দল রাজা হলেও বামদেবের প্রার্থনায় অশ্বদ্বয় ফিরিয়ে দেননি। ... তাঁর নিক্ষিপ্ত বাণে নিজ পুত্র শ্যেনজিৎ নিহত হয়। ... অবশেষে বামদেবের শরণাপন্ন হন এবং তাঁর আদেশে তাঁর স্ত্রীকে স্পর্শ করে পাপমুক্ত হন। (পৌ.অ.)। ৪. gang বা group অর্থে খুবই প্রচলিত। ৫. ভাবনার কথা এই যে, **দল** একই সঙ্গে সমবায় বা group, মাড়িয়ে দেওয়া, ভেদ, সমবায়, পাপড়ি ... ইত্যাদি নানারকম সত্তাকে বোঝাচ্ছে কী ভাবে? শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের ভিতরে একটু মনোনিবেশ করলে আমরা তার কারণটি পেয়ে যাই। যে ক্রিয়ায় '(?)-দাতা'র লালন হয়, লয়নও হয়, সেই ক্রিয়াধারীকে **দল** বলে। তার মানে, দাতা যদি শক্তিদাতা, সৌন্দর্য্যদাতা, প্রাণদাতা ... ইত্যাদির যে কোনো একটি হয়, সে যেখানে লালিত হয়, সে যেমন **দল**-পদবাচ্য; তেমনি গমনশক্তিদাতা, পীড়নদাতা, দোলনদাতা ... ইত্যাদি যেখানে লয়প্রাপ্ত হয়ে যায় সেও **দল**-পদবাচ্য। প্রথম ক্ষেত্রে সমবায় বা group হল সেইরূপ **দল**, যাতে শক্তিদাতা লালিত হয়। পদ্মের অনেকগুলি পাপড়ি একত্রে থাকে, এবং লালিত হয়, তাই সেগুলি পদ্মের **দল**। যে পাতা তরোয়ালের মতো শক্তিদাতা, সেও সংঘবদ্ধ ভাবে থাকলে **দল** পদবাচ্য হতেই পারে। আবার, যেখানে শক্তিদাতা লয়প্রাপ্ত হয়ে যায়, সেখানে সে তো ঐ ক্ষেত্রের ভিতরে ঢুকে যায়, লয় পেয়ে যায়। তাহলে তো ক্ষেত্রটি আর অবিকল থাকল না, বিদীর্ণ হয়ে গেল। ফলে, ভেদ, বিদীর্ণ হওয়া, মাড়ান ইত্যাদিও **দল** পদবাচ্য হয়ে যায়। তার মানে, **ল**-এর মানে লালন হলে **দল**-এর অর্থ **দল-পাকানো** বা **দলা-পাকানো**র দিকে যাবে; আর, **ল**-এর মানে লয়ন হলে **দল**-এর অর্থ যাবে দলিত করা বা দ'লে-দেওয়ার দিকে। তবে **দলাদলি** করা শব্দটি একই সঙ্গে সংঘবদ্ধ হওয়ার অর্থেও যেমন প্রযুক্ত হতে পারে, তেমনি মাড়ামাড়ি করার অর্থেও প্রযুক্ত হতে পারে। ...

যতদূর জানি, **দলবল** শব্দটি সংস্কৃতে নাই, এমনকি মধ্যযুগেও সম্ভবত শব্দটির প্রচলন ছিল না। শব্দটি জন্মেছে আধুনিক যুগে, ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মেই। এর অর্থ 'দল বল যাহার'। ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মে শব্দ যে আজও সৃজিত হয়ে চলেছে, এটি তার আর একটি নিদর্শন। শব্দটিকে **দল** ভুক্তিতে স্থান দিয়েছেন ঢাকার ব্য.বা.অভিধান। তাঁরা এর অর্থ দিয়েছেন, 'নিজের পক্ষীয় লোকজন, স্বপক্ষীয় সৈন্যসামন্ত'। ...

উপরের পৌরাণিক কাহিনীতে যে **শল, দল,** ও **বল**-এর কথা বলা হয়েছে, তাতে **দল** শব্দটি দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে পরীক্ষিৎ ও তৎপুত্র **জনমেজয়**-এর দ্বারা যে দ্বিজবিরোধী আন্দোলন ঘটেছিল, সেই ঘটনাবলীকে বিভিন্ন পুরাণাদি গ্রন্থে নানাভাবে লেখা হয়েছে। এও সেই বর্ণনারই এক রকমফের বলে মনে হয়। ...

দাল (দালান, দালাল, দালি), দিল (দিল্) : ১. দাল = দল + অ (অণ্)। (ব.শ.)। ২. ***দাল** = **দল** হইতে জাত। **দালান** = **দাল** অন যেখানে। **দালাল** = **দাল**-এর আধার লালিত যাহাতে। **দালি** = **দাল** গতিশীল যাহাতে। **দিল** = গতিশীল **দ্** লালিত যাহাতে। /* **দালাল** = যে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে থাকিয়া পণ্যের দর-দস্তুরী ঠিক করে। (ব.শ.)। ৩. **দাল** = পুষ্পদলসম্বন্ধী, পুষ্পদলসঞ্চিত অথবা পুষ্পদল-পতিত মধুবিশেষ, বৃক্ষকোটরজাত মধু। **দালান** = (ফারসি) লম্বা পাকা ঘর, হল্, পাকা বাড়ি, কোটা, হলের মত ঘর। **দালাল** = (আরবি) কেনা-বেচার মধ্যস্থ। **দালি** = দলিত শমীধান্য। (ব.শ.)। ৪. **দাল** ও **দালি** শব্দটি কম প্রচলিত, বাকি দুটি শব্দ 'দালান' ও 'দিল্' ফারসি ও 'দালাল' আরবি শব্দ রূপে চিহ্নিত ও প্রচলিত। ৫. **দল** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ, আমরা আগেই দেখলাম

— 'দাতা লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে'। নিয়ম অনুসারে, এই **দল** থেকে জাত শব্দ **দাল**। কিন্তু **দল** তো মূলত দুরকম অর্থের ধারক। লালনকারী **দল** অর্থাৎ সমবায়, ও লয়নকারী **দল** অর্থাৎ ভেদ বা মাড়ান। অতএব **দাল** যদি লালনকারী **দল** থেকে জাত হয়, সে সমবায়ের নানা অধঃস্তন রূপ হতে পারে। ব.শ. জানাচ্ছেন, সে পুষ্পদলসম্বন্ধী কোনো কিছু হতে পারে, পুষ্পদলের মধুও হতে পারে। সম্ভবত এইরকম **দাল**-এর উপর নির্ভর করেই ফারসি **দালান** ও আরবি **দালাল** শব্দের জন্ম হয়েছে। জমিদারের যে **দলবল**, তাদের চেলাচামুণ্ডারা যেখানে বসে আড্ডা জমায়, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দের নিয়মে তার **দালান** হতে অসুবিধা নেই। আবার রস থেকে যেমন রসাল হয়, তেমনি **দাল** থেকে **দালাল** হতেই পারে, যদি সে **দল**-এর হয়ে **দাল**-এর তরফে একজন প্রতিনিধির মতো তার কার্য্যকলাপ করে।

আর, **দাল** যদি লয়নকারী **দল** থেকে জাত হয়, সে ভেদ বা মর্দ্দনের অর্থাৎ মাড়ানোর কোনো অনুগামী রূপ হতে পারে। সেক্ষেত্রে 'দলিত শমীধান্য'র **দালি** হতে অসুবিধা নেই।

ক্রিয়াভিত্তিক শব্দের নিয়মানুসারে 'গতিশীল দ্ লালিত যাহাতে', তাকে বলতে হয় **দিল**। তার মানে, **দিল্** সত্তাটির কাজ হল **'দি'** বা 'দেওয়া'-ক্রিয়াকে **ল্**-করা বা লালন করা। এই **দিল্**-এর হসন্তটি তুলে দিলেই বাংলার **দিল** (দিলো) শব্দটি তৈরি হয়ে যায়। এর অর্থ, **দি** লয়প্রাপ্ত যাহাতে; তার মানে **দি** বা 'দেওয়া' শেষ এবং গ্রহীতার মধ্যে তা লয় পেয়ে গেছে। তাহলে তো **দিল্** মানে সেই সত্তাকে বোঝায়, যে 'দেওয়াকে লালন' করছে, দেব-দেব করছে, কিন্তু তখনও দেয়নি। কিন্তু **দিল** (দিলো) মানে, আর লালন করছে না, দেব-দেব করছে না, দিয়েই দিয়েছে এবং তা অন্যের দিকে লয় পেয়েছে। এই যদি কাণ্ড হয়, তাহলে তো বাংলার **দিল্** ও ফারসির **দিল্**-এ এবং ইংরেজির deal-এ কোনো ফারাকই থাকল না। অর্থাৎ কিনা, ফারসির **দিল্** ও ইংরেজির deal শব্দেরও সঠিক অর্থ আমরা বাংলা ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি থেকেই পেয়ে গেলাম। যে হৃদয় আত্মোৎসর্গের জন্য ছটফট করে, এ হল সেই **দিল্**; যে deliver করার জন্য নাড়ানাড়ি করতে থাকে, এ হল সেই deal। **৬.** deal ও dil-যুক্ত বহু ইংরেজি শব্দ।

দুল, দুলকি, দুলন, দুলা, দুলান, দুলাল, দুলালী : ২. ***দুল*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ দ্ (দান) লালিত যাহাতে।* ***দুলকি*** = ***দুল****-করণ গতিশীল যাহাতে।* ***দুলন*** = ***দুল*** *অন যাহাতে।* ***দুলা*** = ***দুল****-এর আধার যে।* ***দুলান*** = ***দুলা*** *অন যাহাতে।* ***দুলাল*** = ***দুলা*** *লালিত যাহাতে।* ***দুলালী*** = ***দুলাল****-এর গতিশীল আধার যে।* **৩. দুল (দোল)** = আন্দোলিত হওয়া, দোলা, বিচলিত হওয়া, ভয়ে কাঁপা, রসাবেশে বিচলিত হওয়া; কানের দোলা গহনাবিশেষ। **দুলকি** = ঘোড়ার চালবিশেষ। **দুলা (দোলা)** = আন্দোলিত বা সঞ্চালিত করা, আলম্বিত করা, ঝুলান, ভাবাবেশে অধীর করা। **দুলাল (দুলালিয়া)** = অতিপ্রিয়, আদুরে, আবদারে, অতিপ্রিয় পুত্র, আদুরে ছেলে; পুষ্পবিশেষ ও তাহার গাছ; আদর। **দুলালী** = স্নেহপাত্রী, প্রিয়কন্যা, আদরিণী। (ব.শ.)। **৪.** সব শব্দগুলিই কমবেশি প্রচলিত, তবে **দুলাল** ও **দুলালী** প্রায় অপ্রচলিত। **৫. দিল** শব্দে আমরা দেখেছি, তাতে **দ** গতিশীল হয়ে ক-বিন্দু থেকে **খ-বিন্দুর** দিকে যায়। কিন্তু **দ** যদি নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, তখন সেটা আসে বিপরীত দিক থেকে; হয়ে যায় **দুল**। এই **দুল** আধার পেয়ে গেলে হয়ে যায় **দুলা**। এই **দুলা** অন থাকলে আমরা বলি **দুলান** (দুলানো)। **দুলা** যদি এভাবে লালিত হয়, সেই হল **দুলাল**। তার স্ত্রী-আধারকে বলে **দুলালী**। কোলে নিয়ে যাকে **দুলা-দুলি** করতে থাকা হয়, সে তো আমাদের বড় আদরের ধন। তাই মধ্যযুগের বাংলায় অতি আদরের প্রিয়জন বোঝাতে **দুলাল** ও **দুলালী** শব্দের বিপুল ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। লোকে ছেলেমেয়েদের নাম রাখত **দুলাল, দুলালী**। এখন শব্দটির অর্থই লোকে ভুলে গেছে। সেই কারণে শব্দদুটি ক্রমশ অব্যবহারে পরিত্যক্ত হতে চলেছে। 'প্রিয়-জামাইবাবু' বোঝাতে হিন্দিতে **'দুল্হা ভাই'** শব্দটির মূলেও রয়েছে এই **দুল**। দ্র. **লালন, লালন-পালন**। **৬.** ইতালীয় dolce (দোল্চে = কোমল ও মিষ্ট)।

দহ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিদাহ, অদগ্ধ, অদাহন, অদাহ্য, অবিদগ্ধ, আদহন, আদাগা, ডহডহ, ডহর, ডহু, ডায়া, ডাহ, দগদ, দগদগ, দগদগি, দগদগে, দগধ, দগ্ধ, দগ্ধকাক, দগ্ধরথ, দগ্ধেষ্টকা, দহ্, দহ, দহন, দহ্যমান, দহ্র, দাগ, দাগরাজি, দাগা, দাগাদারী, দাগাবাজ, দাগাবাজী, দাগী, দাঘ, দাহ, দাহক, দাহকাষ্ঠ, দাহস্থল, দাহহর, দাহন, দাহাত্মক, দাহী, দাহ্য, নিদাঘ, বিদগ্ধ, বৈদগ্ধ। **দহ্** = দাতার হওয়ন। **দহ** = দাতার হওয়ন যাহাতে। (বিদগ্ধ)।

দগদগ (দগ, দগদগে) দাগ, দাগা, দাগী : ২. ***দগ*** = *দ '(?) দাতা' গমন করে যাহাতে।* ***দগদগ*** = ***দগ****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***দগদগে*** = ***দগদগ*** *ও দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* ***দাগ*** = ***দগ*** *হইতে জাত।* ***দাগা*** = ***দাগ****-এর আধার যে।* ***দাগী*** = ***দাগ****-এর গতিশীল আধার যে।* **৩. দগদগ** = দীপ্তি, প্রকাশ, উজ্জ্বলভাবে বা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান ভাব। **দগদগে** = উজ্জ্বল, দীপ্ত (আগুন), তাজা (ঘা)। **দাগ** = দাহের চিহ্ন, ক্ষতচিহ্ন, অঙ্ক, কলঙ্ক, চৌর্য্যাদি দোষ, চিঠায় জমির কিতার সংখ্যা বা নম্বর, রেখা, ছোপ, মার্কা; তপ্ত লৌহাদি দ্বারা চিহ্নিত করা, কামানের রঞ্জক ঘরে আগুন দিয়া ছোঁড়া, চিহ্নিত করা, ক্ষতচিহ্নযুক্ত করা, অপরাধের দাগে চিহ্নিত করা। **দাগা** = দাগ দেওয়া, শিশুর অক্ষর শেখার নিমিত্ত তালপাতায় লেখা স্বর-ব্যঞ্জনের আদর্শলিপি, চিহ্ন, ক্লেশ, পীড়া, বিঘ্ন, আক্রমণ, কলঙ্ক, প্রতারণা, শঠতা। **দাগী** = দাগযুক্ত, চিহ্নিত, কলঙ্কিত, ছোপধরা, পচার চিহ্নযুক্ত (ফল), চৌর্য্যাদি দোষে দণ্ডিত। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **দগ্ধ**। **দাগ** তো কেবল দৈহিক নয়, সামাজিক হয়, মানসিকও হয়। তাই **দাগা** দেওয়া শরীরে হয়, সম্পদে হয়, মনেও হয়। যারা মনে **দাগা** দেয়, তাদের কথা মানুষ ভুলতে পারে না। লোকে বলে, শরীরের **দাগ** কালে কালে মিটে যায়, মনের **দাগ** মেটে না। **দাগা**বাজি প্রধানত মনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মনে দাগ করে দেওয়ার অর্থেই অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রাজশক্তির শরীরে বা সৈন্যবলের উপরে দাগ দিয়ে, দাহ করে জ্বালিয়ে **দাগিয়ে** দেওয়ার জন্য কামান **দাগা** হত।

ব্যক্তিবিশেষের শরীরকে **দাগিয়ে** দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত পিস্তলকে এককালে **দাগ** বা dag বলা হত। **৬.** ইংরেজি dag, dagger (যা দিয়ে দাগ দেওয়া হয়, দাগা হয় ... ইত্যাদি)।

দগ্ধ, (বিদগ্ধ) : ১. ✓দহ্ + ত (ক্ত) কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **দগ্ধ** = *দগ্ ধারিত যাহাতে।* ***বিদগ্ধ*** *= বিশেষভাবে* ***দগ্ধ*** *যে।* ৩. **দগ্ধ** = কৃতদাহ, তপ্ত, ম্লান, অপাকৃত, নিঃস্বাদু, পাপ, অগ্নিবিশোধিত, বিদগ্ধ, অশুভ, পোড়া, দাহ, বারভেদযুক্ত নক্ষত্রভেদ; দগ্ধ করা, পোড়ান, পীড়িত করা। **বিদগ্ধ** = বিশেষ দগ্ধ, পক্ক, জীর্ণ, চতুর, নিপুণ, সুন্দর, পণ্ডিত, রসিকজন, নাগর। (ব.শ.)। ৪. 'পোড়া' অর্থে **দগ্ধ** এবং 'অভিজ্ঞ' অর্থে **বিদগ্ধ** প্রচলিত। **৫. দগদগ, দগদগে** শব্দটি অধিকাংশ অভিধানেই রয়েছে, কিন্তু **দগ** নেই। ভাবনার সুবিধার জন্য আমরা এই শব্দটি পূর্বেই অন্তর্ভুক্ত করেছি।

সমস্যা হল, কেন **ঘ ধ হ** এই তিনটি বর্ণ অনেক সময় স্থানবদল করে? করে এইজন্য যে, বাস্তবে ক্রিয়াটির, তার অনিবার্য ফলের এবং সর্বোপরি সেই ক্রিয়ার দ্রষ্টার অবস্থানের হেরফের ঘটে যায়। ফলে বর্ণেরও হেরফের না হয়ে পারে না। ধরা যাক, শরীরের একটি অংশে তপ্ত বুলেট বা গুলি ঢুকে গেল। এই **গুলি** (= 'নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে গতিশীলভাবে লয়প্রাপ্ত যে) আসলে শক্তির **গ** বা গমন। **ঘ** বর্ণের অর্থে আমরা জেনেছি, গমন স্থির রূপ নিলেই **ঘ** হয় এবং **ঘ**-এর আধারকে **ঘা** বলে। অতএব, বুলেট শরীরকে আহত করল, ঘা-কয়েক না কষিয়ে শরীরের একটি অংশ একেবারে ফুটো করে দিল। এ তো দশ-বিশ **ঘা** মারের চেয়েও বেশি হল এবং ফলে শরীরে **ঘা** হয়ে গেল। এরকম হল কেন? হল এইজন্য যে, বহিরাগত ঘ-কে বা ('প্রদত্ত গ'-কে =) **দগকে** শরীর ফেরত পাঠিয়ে দেয়নি, গ্রহণ করে ধারণ (**ধ**) করেছে। তাই **দগ্-ধ** হয়েছে। **ঘ** পরিণত হয়েছে **দগদগে** ঘা-এ। এই কারণেই শরীর আঘাতপ্রাপ্ত বা **ঘাত** হলে, বা **ঘা** পেলে **ঘা** হয়, **আহত** হয়, **হত** হয়, হয়তো বা **নিহত** হয় না। আর সেজন্যেই **গুলির ঘায়ে বা ফুটো করে** ঢুকে যাওয়ায় **শরীরের ঐ অংশটি থেকে রক্ত ঝরল, সেখানে দহন** হল, স্থানটি **দগ্ধ** হল, শরীর **আহত** হল।

(এখানে **ঘ ধ হ** বিষয়ে আর একটি বিষয় বলে রাখা যেতে পারে। তা হল, গমনস্থিত যখন **ঘ** হয়, তখন আসলে **গ্**-এর সঙ্গে **হ্** যুক্ত হয়। তার ক্রিয়ারূপটি বলার সময় আমাদের বলার কথা **ঘন্**। কিন্তু তা আমরা বলি না। **আঘাত** যাকে লাগে সে **আঘন্ত** হয় না, **আহত** হয়। সেকালের শব্দশাস্ত্রীরা এইরকম কয়েকটি কারণে বুঝেছিলেন, **ঘন্** বলা ঠিক হবে না; কারণ ভিতরের ক্রিয়াটি তখন বদলে যায়। সেই কারণে তাঁরা **গ্ + হ্ + অ + ন্** থেকে **গ্**-কে বাদ দিয়ে ক্রিয়াটিকে **হ্ + অ + ন্** বা **হন্** করে নেন। একই ধরনের ব্যাপার ঘটে **অবধাত** ও **অবহিত**-এর বেলায়; অর্থাৎ, **ধ** ও **হ**-এর বেলায়।)

কিন্তু সব মিলিয়ে শরীরের উপর যা হল, সে তো **দগ** থেকে জাত **দাগই** বটে। তবে এই **দাগ** শরীরের চেয়েও আহত শরীরধারীর মনে আরও গভীরভাবে লেগে যায়, যখন সে জানতে পারে, গুলিটি করেছে তার বিশ্বাসঘাতক প্রিয় বন্ধুই। তখন তপ্ত গুলির তাপে শরীর মন দুটোই পুড়তে থাকে বা **দগ্ধ** হতে থাকে, দুটোতেই **দহন** ক্রিয়া চলতে থাকে। ...

আজকাল আমরা **বিদগ্ধ** শব্দের অর্থ বুঝি পণ্ডিত। সে তার প্রতীকী অর্থের নষ্ট রূপ। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ **দগ্ধ** সত্তাই **বিদগ্ধ**; অর্থাৎ কিনা, একের পর এক **দাগা** খেয়ে খেয়ে যাঁর মনে অজস্র পোড়া দাগ হয়ে রয়েছে, মন পুড়ে ঝামা ইঁটের মতো **দগ্ধইট** বা **দগ্ধেষ্টকা** হয়ে রয়েছে, সেইরকম অভিজ্ঞতার আগুনে-পোড়া মনের অধিকারী মানুষকে বলে **বিদগ্ধ** মানুষ। লক্ষ পৃষ্ঠার বই পড়ে এই **বৈদগ্ধ** আসে না, ব্যবহারিক জীবনে সত্যিকারের ক্ষতির মুখোমুখি হয়ে, অন্তর্দহন সয়ে সয়ে, মনের জ্বালা সয়ে সয়ে, অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে পুড়ে যাঁর মন পরিপক্ক হয়, কেবল তাঁরই সেই **বৈদগ্ধ** আসে। যেকারণে বাংলাভাষী মাত্রেই বোঝেন, কেন '**বিদগ্ধ** মানুষের চুল রোদে পাকে না, অভিজ্ঞতায় পাকে' বাক্যটি বলা হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে অন্য একটি বিষয় এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাহল, আমরা দেখেছি, **দগদগ** শব্দটি বাংলাভাষায় থাকলেও, এককভাবে **দগ** শব্দটি বাংলায় নেই, এমনকি **দিগ** শব্দটিও বাংলায় নেই; থাকলে **দিগ**-এর মানে হত 'গতিশীল **দ্**-এর গমন থাকে যাহাতে', অর্থাৎ 'কোথাও গিয়ে ঢুকে পড়া'। কিন্তু আরবি ও ইংরেজিতে এই **দিগ** রয়েছে। ইংরেজিতে একে বলে dig, যার মানে to excavate বা খুঁড়ে ফেলা; এবং আরবিতে বলে 'দিক' করা বা বিরক্ত করা, অর্থাৎ মনের মাটি খুঁড়ে ফেলা। দ্র. **দীর্ঘ, দীঘি**। এখানে আমাদের কহতব্য এই যে, অজস্র ইংরেজি আরবি প্রভৃতি ভাষার শব্দ রয়েছে, যেগুলির আদি উৎসকে এইভাবে বাংলার সাহায্যে উদ্ধার করা সম্ভব। **৬.** ইংরেজি dig।

দগ্ধরথ : দ্র. **অঙ্গারপর্ণ, চিত্ররথ**।

দা ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিদান, অদত্ত, অদাতা, অদান, অদায়, অদায়াদ, অদায়াদবান্ধব, অদায়িক, অদাস, অদেয়, অনাদি, অনাদিনিধন, অনাদিনী, অনাদিমধ্যান্ত, অনাদেয়, অনাদ্য, অনিদান, অনুদাস, অপদান, অপাদান, অপ্রদত্তা, অব্দ, অব্দপর্য্যায়, অব্দশতান্ত, অব্দুর্গ, অব্দৈবত, অব্ধিজ, অম্ভক্ষ, অব্ভ্র, আত্ত, আদ, আদত (আদিত), আদত্ত, আদপে, আদবে, আদয়, আদা, আদাতব্য, আদাতা, আদান, আদানপ্রদান, আদাব, আদায়, আদায়ী, আদি, আদিক, আদিকচ্ছপ, আদিকর্ম্ম, আদিকর্ত্তা, আদিকবি, আদিকাণ্ড, আদিকারণ, আদিকাল, আদিকাব্য, আদিজননী, আদিতঃ, আদিতাল, আদিত্য, আদিত্যসূনু, আদিৎসা, আদিদেব, আদিদৈত্য, আদিপর্ব্ব, আদিপুরাণ, আদিপুরুষ, আদিবংশ, আদিবরাহ, আদিশূকর, আদিবল, আদিবশ্যা, আদিবৃক্ষ, আদিভব, আদিভূত, আদিম, আদিমান, আদিরস, আদিরাজ, আদিশক্তি, আদিশরীর, আদিশূর, আদিসর্গ, আদিব (আদব), আদেয়, আদৌ, আদ্য, আদ্যকবি, আদ্যকাণ্ড, আদ্যকাল, আদ্যকৃত্য, আদ্যগঙ্গা, আদ্যন্ত, আদ্যবীজ, আদ্যরস, আদ্যশ্রাদ্ধ, আদ্যা, আদ্যিকাল, আদ্যিরস, আদ্যোপান্ত, উদাত্ত, উপাদান, উপাদেয়, গোদ, গোদা, গোদাবরী, জলদ, তোয়দ, দ, দজ্জাল (দৎ-জাল), দত্ত,

দত্তক, দত্তকপুত্র, দত্তপূর্ব্বা, দত্তাত্মা, দত্তাত্রেয়, দত্তানপকর্ম্ম, দত্তাপহারী, দত্তাপ্রদানিক, দত্তাবধান, দত্রিম, দা, দাউলিয়া, দাও (দাত্র), দাও, দাওয়া (দাবা), দাওয়াই, দাঁ, দাঁও, দাতব্য, দাতা, দাতিনা, দাত্যুহ, দাতৃ, দাদা (দত্ত দান করে যে), দাদু, দাদূ, দান, দানঘাট, দানচত্বর, দানচৌতারা, দানত্তর, দানধর্ম্ম, দানধ্যান, দানপত্র, দানশীল, দানব, দানবীর, দানলেখ্য, দানসাগর, দানসজ্জা, দানা, দানা (কুর্চ্চিকা), দানাদার, দানাপানি, দানিশমন্দ্‌ (দানিসবন্দ), দানী, দানীয়, দানেশমন্দী, দায়, দায়ক, দায়াদ, দায়ী, দাশ্‌, দাশ, দাশেয়, দাশের, দাশেরক, দাস্‌, দাস, দাসখত, দাসজন, দাসনন্দিনী, দাসভাব, দাসভাবনা, দাসানুদাস, দাসাপরাধিক, দাসী, দাসেয়, দাসেয়ী, দাসের, দাসেরক, দাস্ত, দাস্য, দাস্যাঃ, দি, দিঅ, দিআ, দির্অ, দির্আ, দির্ব, দিই, দিও, দিছ, দিএগ, দিতে, দিতেছি, দিৎসা, দিৎসিত, দিদি, দিদী, দিয়া, দিয়ে, দিব, দিমু, দিল, দিলীপ, দিলে, দিলেন, দিহ, দীয়তাং, দীহ্ন, দে, দেঅত, দেআ, দেইজি, দেউ, দেএ, দেও, দেওয়া, দেওয়ান, দেন, দেনমোহর, দেনা, দেনেওয়ালা, দেয়, দেয়া, দেয়ান, দেহি, দৈ, নিদান, প্রতিদান, প্রদত্ত, প্রদান, প্রদেয়, শতাব্দ, সদাদান, সম্প্রদান, সম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িক, সুদায়।

দা = দেওয়া; **দ** বা দাতার আধার যে। দ্র. **দ বর্ণের অর্থ।**

অনাদি, অনাদিনিধন : ২. *অনাদি = নেই আদি যাহার। অনাদিনিধন = নেই আদিনিধন যাহার।* / **অনাদি** = যাহার **কারণ** বা পূর্ব্বকাল নাই। **অনাদিনিধন** = যাহার জন্ম মৃত্যু নাই। (ব.শ.)।

অপদান : ১. অপ + ✓দৈ (শোধন) + অন (ল্যুট্‌) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অপ (খারাপ) দান যাহাতে।* / যেরূপ কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়; অর্থাৎ যে কর্ম্ম হেতু সকলে সৎ বলিয়া জানে। (ব.শ.)। ৩. পরিশুদ্ধাচরণ, বৃত্তাদ্ভুতকর্ম্ম, কীর্ত্তিজনক অদ্ভুত কার্য্য, অবদান। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

অপাদান : ১. অপ + আদান। ২. *অপ **আদান** থাকে যাহাতে।* / যাহা হইতে বিশ্লিষ্ট হয়। (ব.শ.)। ৩. বিশ্লেষ বুঝাইলে যাহা অবধিভূত তাদৃশ কারকবিশেষ, বিশ্লেষণ, নিয়োজন। (ব.শ.)। ৪. ব্যাকরণের ছাত্রদের শব্দটি পড়তে হয়, অন্যথায় শব্দটি অপ্রচলিত। ৫. কথা বলার সময় শব্দের পাশে শব্দ গাঁথবার যে নিয়ম রয়েছে, সেই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে আপনি বা অন্য যে কেউ যেটি আদান রূপে পাচ্ছেন, সেটি কীরূপে করা হচ্ছে, তার বিচার থেকেই ঠিক হয়, আদানটি প্রাপকের কাছে **অপ-আদান** বা **অপাদান** নাকি **সম্প্রদান**। 'গাছ থেকে মাটিতে পাতা পড়ল।' মাটির চোখে তার এই পাওনাটা **অপাদান**। পাতা না খসিয়ে গাছের উপায় ছিল না। তাই 'গাছ থেকে' বা 'গাছের থেকে' বলতে হয়। একেই অপাদান কারক বলে।

আদান, আদানপ্রদান : দ্র. **উপাদান, উপাদেয়** : ১. আদান = আ + ✓দা + অন (ল্যুট্‌) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *আদান = দানের আশ্রয় যাহাতে। আদানপ্রদান = আদান ও প্রদান (প্রকৃষ্ট দান) যাহাতে।* ৩. **আদান** = গ্রহণ, অর্জ্জন, ছেদন। **আদানপ্রদান** = গ্রহণ ও দান, দেওয়া-নেওয়া। (ব.শ.)। ৪. **আদান** অপ্রচলিত, **আদান-প্রদান** exchange অর্থে প্রচলিত। ৫. **আশেপাশে, আধিব্যাধি, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ** ... প্রভৃতি জোড় শব্দগুলির ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, একটি শব্দের অর্থ ফেলে দিয়ে একটি মাত্র ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ রূপে জোড় শব্দটি (আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ = invite) বর্তমানে বাংলাভাষায় প্রচলিত রয়েছে, **আদানপ্রদান**-এর অবস্থাও তেমনি। ইংরেজির দ্বারা প্রভাবিত আমাদের অ্যাকাডেমি-শিক্ষার সৌজন্যে এই শব্দজোড়টি তথাকথিত শিক্ষিত বাংলাভাষীদের মহলে এখন সাধারণত exchange অর্থেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যদিও, জনসাধারণ্যে এখনও শব্দটি 'লেনদেন' বা নেওয়া-দেওয়া অর্থে যথেষ্ট প্রচলিত। অর্থাৎ, **আদান** মানে নেওয়া এবং **প্রদান** মানে দেওয়া। আর, সেই মানেটি শব্দ দুটির ভিতরে রয়েছে এইভাবে —

'দানের (দেওয়ার) আশ্রয় যাহাতে', তাকে বলে 'আদান'; এবং 'প্রকৃষ্ট দান থাকে যাহাতে' তাকে বলে 'প্রদান'। 'আদানপ্রদান'-এ 'নেওয়া-দেওয়া' চলে। এক পক্ষ দান করে, দেয়, যা দেয় সেটিই 'দেয়', দায় তার কর্তব্য; অন্য পক্ষ আদায় করে, নেয়, যা নেয় সেটিই 'আদেয়', আদায় তার কর্তব্য; তাতেই এই আদান-প্রদান ক্রিয়াটি বাস্তবায়িত হয়। এই 'দেয়' ও 'দায়' নিয়ত ও দীর্ঘ ব্যবহারে একসময় স্থির অর্থে প্রতীকী হয়ে যায়। (**দম্‌** ক্রিয়াতে **দায়** দ্রষ্টব্য।) যাই হোক, শুধু 'আদান' বললে 'প্রদান' সক্রিয় থাকলেও উহ্য থেকে যায়। তাই আদান করাকে বলা হয় 'আদায়', যথা 'খাজনা আদায়'। এই আদান প্রসূত হয় একাধিক ছোট ছোট অংশ জুড়ে। আদানের এই ছোট ছোট অংশকে বলে উপ-আদান বা উপাদান। দ্র. **অন্ন**। ঘট বা মাটির হাঁড়ির উপাদান হল তাতে ব্যবহৃত মাটি, কাপড়ের উপাদান হল তার সুতো; কিংবা ভাতের সঙ্গে যে ব্যঞ্জনাদি থাকে সেগুলি তার উপ-আদান বা উপাদান। দ্র. **উপাদান, উপাদেয়**।

আদি, আদ্যোপান্ত : ১. আদি = আ + ✓দা + ই (কি) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *আদি = আশ্রিত দান গতিশীল যাহাতে। আদ্যোপান্ত = আদি ও উপান্ত (অন্তের উপ যে)।* / **আদি** = প্রথম গৃহীত যে। (ব.শ.)। ৩. **আদি** = প্রথম, পূর্ব্ব, আদ্য, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, প্রাথম্য, গণের প্রথম, কার্য্যের প্রথম, নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তি কারণ, প্রাক্‌সত্তা, জন্ম, উপক্রম, অবয়ব, নৈকট্য, ব্যবস্থা, প্রকার, প্রকৃতি। **আদ্যোপান্ত** = প্রথমে ও শেষে। (ব.শ.)। ৪. first অর্থে **আদি** এবং 'প্রথম থেকে শেষ' অর্থে **আদ্যোপান্ত** প্রচলিত। ৫. শূন্য থেকে কোনো কিছুর জন্ম হতে পারে না, প্রতিটি সত্তার অস্তিত্বলাভের পেছনে অন্য কোনো এক বা একাধিক সত্তার **অবদান** থাকেই। তার মানে, প্রতিটি সত্তাই তার অস্তিত্বের সূত্রপাতে পূর্বতন কোনো এক বা একাধিক সত্তার থেকে কিছু না কিছু **অবদান** নিয়েই তার জীবন শুরু করে। তার মানে, যে যে সত্তার জন্ম বা শুরু আছে এবং মৃত্যু বা শেষও আছে, যেমন জীব, নদী ... ইত্যাদি, এমনকি একালের একটি ব্যবসায়ী কোম্পানীও হতে পারে; এদের প্রত্যেকের অস্তিত্বের শুরুতে পূর্বতন কোনো না কোনো সত্তার **অবদান** রয়েছেই। সেই দানকে বোঝাতে **আদি** শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। এই **আদি** হল আসলে

প্রাক্‌সত্তা, যা আগে থেকে এসেছে, এসে এই নতুন জীবন শুরু করেছে। জীবের ক্ষেত্রে এই **আদি** হল পূর্বপুরুষ প্রদত্ত ভ্রূণাবস্থা; নদীর ক্ষেত্রে এই **আদি** হল উৎসমুখের আগে থেকে আসা জল; এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে এই **আদি** হল initial-capital। দ্র. **নিদান**।

বিষয়টিকে আরও ভাল বোঝা যায় **আদ্যোপান্ত** শব্দে। অন্ত মানে শেষ, সবাই জানেন। উপ-অন্ত বা **উপান্ত** মানে, শেষের ঠিক আগের অধ্যায়। তার মানে, যে-মানুষটির মৃত্যু হল আজ ৩ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখের দুপুর ১২টায়, ১১টা বেজে ৫৯ মিনিটি ৫৯ সেকেন্ড ছিল তার জীবনের **উপান্ত**। ঠিক তার পরেই তার জীবনের অন্ত নেমে আসে। ষাট বছর আগে সেই মানুষটির জন্ম হয়েছিল, ধরা যাক, দুপুর ১২টাতেই। অর্থাৎ, ঐ ১২টাই ছিল মানুষটির জীবনের **আদি**। তার আগে মানুষটি ছিল না, জন্মায়নি। কিন্তু এই যে প্রথম রূপটি, সেটি শূন্য থেকে আবির্ভূত হয়নি; পূর্বতন কোনো সত্তার **অবদান** রূপে এসেছিল। অবদানের সেই দানটিই **আদি**, *'দানের আশ্রয় গতিশীল যাহাতে'*; যা গতিশীল হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল পরবর্তী ষাটটি বছর এবং গড়ে তুলেছিল এই জীবনটিকে। সেই **আদি** থেকে **উপান্ত** পর্যন্ত মানুষটির যে জীবন, কাল-বিচারে তা ষাট বছর আগের বেলা ১২টা থেকে আজকের বেলা ১১ টা ৫৯ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

তার মানে, **আদি** হল, বর্ত্তমান সত্তার প্রারম্ভে যাকে গতিশীল-**দান** রূপে পাওয়া গেছে; যা কিনা পূর্বতন কোনো এক বা একাধিক সত্তার অবদান; এবং যা বর্ত্তমান সত্তায় গতিশীলভাবে এগিয়ে চলেছে তার সার্থকতার দিকে, তার অন্তের দিকে — তাকেই বলে **আদি**।

আদিকচ্ছপ : দ্র. **কচ্ছপ, কূর্ম্মাবতার**।

আদিত্য : ২. ***আদির*** *তারণ থাকে যাহাতে। /* অদিতি - য, অর্থাৎ অদিতি হইতে জাত। (ব.শ.)। ৩. আদিত্যসম্বন্ধী, দেবসম্বন্ধী, সূর্য্যবংশজাত, সূর্য্যদেবতাক, সূর্য্যোপাসক, সূর্য্য, অর্কবৃক্ষ, শ্রেষ্ঠার্থ, কায়স্থের উপাধিবিশেষ, অদিতিদেবতাক পুনর্ব্বসুনক্ষত্র; অদিতির পুত্র (ত্বষ্টার কন্যা সংজ্ঞা সূর্য্যতেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইলে, ত্বষ্টা সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। দ্বাদশ মাসে এই দ্বাদশ আদিত্যের উদয় হয়। মাঘে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য্য, চৈত্রে বেদজ্ঞ, বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতাঃ, কার্ত্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে চিত্র (মিত্র?), ও পৌষে বিষ্ণু। হরিবংশ মতে দ্বাদশ নাম — ধাতা অর্য্যমা মিত্র বরুণ অংশ ভগ বিবস্বান্ ইন্দ্র পূষা পর্জ্জন্য ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। মহাভারত মতে এঁদের নাম — ইন্দ্র ধাতা মিত্র অর্য্যমা বরুণ অংশ ভগ বিবস্বান্ পূষা সবিতা ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। এঁরা প্রলয়ে এই দ্বাদশ আদিত্য উদিত হইয়া প্রলয়পয়োধি শোষণ করে। ঋগ্বেদে অর্য্যমা ভগ বরুণ মিত্র দক্ষ অংশ এই ছয়টি এবং স্থানান্তরে ও শতপথব্রাহ্মণে সবিতা (?) লইয়া সাতটি আদিত্যগণ। তৈত্তিরীয়ে মিত্র প্রভৃতি চারিটি এবং ধাতা অংশু ইন্দ্র বিবস্বান্ — এই আটটি। মহাভারতে 'অংশ'-স্থানে 'পর্জ্জন্য' ও হরিবংশে 'ইন্দ্র'-স্থানে 'শক্র' আছে। মহাভারতে গরুড় অরুণ ও বৃহস্পতিও আদিত্যগণের অন্তভূত। কায়স্থের উপাধিবিশেষ। বাংলায় শ্রেষ্ঠার্থে আদিত্য শব্দের প্রয়োগ আছে, যথা শকাদিত্য — শকরাজ শালিবাহন। (ব.শ.)। অদিতির পুত্রগণ। অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে বিবস্বান, অর্যমা, পুষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম — এই বারোজন আদিত্যের জন্ম হয়। কালিকাপুরাণে বিধাতার নামের স্থলে সোম রয়েছে। ঋক্‌বেদে আদিত্যসংখ্যা ৬। যথা — মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশু। ... তৈত্তিরীয়ে মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান — এই আটজন আদিত্য। শতপথ ব্রাহ্মণে বারোজন আদিত্য বারো মাসের প্রতীকরূপে উল্লিখিত। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. শক্তির, তেজের, ক্ষমতার, জ্ঞানের, ধনের, সম্পদের, কালের ... **আদিতে** যা ছিল, তার তারণ চলছে বর্ত্তমানে। তাই এগুলির বর্ত্তমান রূপকে **আদিত্য** বলে। কিন্তু এর সবগুলিই অখণ্ড থাকেনি, কালে কালে খণ্ডিত ও বিভাজিত হয়েছে। সামাজিক ক্ষমতা, সামাজিক সম্পদ, সামাজিক জ্ঞান — এসবই ক্রমশ বিভাজিত হয়েছে। আর সেকারণেই আদিত্য ক্রমান্বয়ে ছয়, ছয় থেকে আট, দশ, বারো ভাগে বিভক্ত হয়েছে — অন্তত আমাদের পূর্বপুরুষরা সেরকমই দেখেছিলেন।

সেই কারণে, যত আদি যুগে যাওয়া যায় দেখা যায়, আদিত্যের সংখ্যা তত কম, যত পরবর্তী যুগে আসা যায়, আদিত্যের সংখ্যা তত বেশি। এবং এটাই স্বাভাবিক। এই **আদিত্যকেই** সেকালে **অর্কবৃক্ষ** বলা হত, এবং একালে তাকেই কেন্দ্রীয় জ্ঞানতাত্ত্বিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (centre of educational, political and economic system) বলা হয়ে থাকে। সেকালে যাঁরা এই ব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিলেন, তাঁদের একটি সত্তার উত্তরসূরিদের আজও **আদিত্য** বলা হয়, তবে সে **আদিত্য** কথাটি লেগে থাকে তাদের নামের শেষে অর্থহীন **পদবী** রূপে। দ্র. **অর্কবৃক্ষ, অর্কব্রত**।

আদিদৈত্য: দ্র. **হিরণ্যকশিপু**।

আদিবৃক্ষ: দ্র. **অশ্বত্থ, সংসারবৃক্ষ**।

আদিম, আদৌ, আদ্য, আদ্যা : ২. ***আদিম*** *=* ***আদি*** *সীমায়িত যেখানে।* ***আদৌ*** *=* ***আদি*** *হইতে আগত।* ***আদ্য*** *=* ***আদি*** *থাকে যাহাতে।* ***আদ্যা*** *=* ***আদ্য****-এর আধার যে।* ৩. **আদিম** = আদিভব, পূর্ব্বস্থ, প্রথম, আদ্য। **আদৌ** = আদিতে, প্রথমে, আগে, অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বে, উপক্রমে, কার্য্যারম্ভে, মূলে, গোড়ায়। **আদ্য** = আদিভব, মূলভূত, প্রধান, প্রথমপঠিত, অব্যবহিত পূর্ব্ব, পুরাণ, আদিকারণ, আদ্যশ্রাদ্ধ, কারণ, আদিদেব, ধর্ম্ম; অদনীয়, ভক্ষণীয়, ভক্ষদ্রব্য, খাদ্য, ধান্য। **আদ্যা** = আদিভবা, দুর্গা, প্রধান শক্তি, মহাবিদ্যা, আদিদেবের শক্তি, আদ্যশক্তি গৌরী। (ব.শ.)। ৪. oldest অর্থে **আদিম** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি previous অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **আদি**। প্রতিটি শব্দের মূলে **আদি** সক্রিয় রয়েছে বটে, কিন্তু **আদ্য** শব্দটির একটি সমস্যা রয়েছে। সে আসলে দুজন, এক **আদ্য** অপর **আদ্যরই** দূর সম্পর্কের ভাই, যে কিনা দেখতে শুনতে হুবহু একরকম এবং তার নামও **আদ্য**, তবে তাকে আমরা **খাদ্য** রূপেই ভাল চিনি। এই দুই **আদ্য**-র পারিবারিক অবস্থান মোটেই এক নয়, অথচ আদ্যের অতিথি-অভ্যাগতরা প্রায়শই ভুল করে, পিয়ন ১ম আদ্যর মানিঅর্ডার দিয়ে আসে ২য় আদ্যর হাতে; উলটোও ঘটে। এভাবে এক **আদ্য**-র অর্থ

অন্য আদ্য-র অর্থ বলে ভুল হয়ে যায়। এর কারণ, তারা দেখতে শুনতে এরকম হলেও, প্রথমজন জন্মেছে 'প্রাপ্তর গতিশীলতা' (আদ্-ই) থেকে, দ্বিতীয়জন জন্মেছে 'প্রাপ্তকে তদবস্থাতেই রুদ্ধ করে আত্মস্থ করে নেওয়া' (অদ্-ই) থেকে। দ্র. **অন্ন**। প্রথমজন প্রাপ্ত দানকে ধারণ করে গতিশীল হয়; দ্বিতীয়জন সেই দানকে গ্রহণ করে খেয়ে ফেলে। আদ্যার সঙ্গে অবশ্য দ্বিতীয় আদ্যর কোনো সম্বন্ধই নেই। এ হল আদির আধারশক্তি। দ্র. **পরমাপ্রকৃতি, অষ্টচণ্ডী, অষ্টতারিণী, অষ্টযোগিনী** ইত্যাদি।

গোদ (গোদা, গোদাবরী) : ১. গোদ = গো + ✓দা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গোদ = গো দান /দমন করে যে। গোদা = গোদ-এর আধার যে। গোদাবরী = গোদা বরণীয় রূপে গতিশীল থাকে যাহাতে।* / **গোদাবরী** = জল দান করে যে। (ব.শ.)। ৩. **গোদ** = গোদাতা, স্ত্রীগবীপ্রদ; পায়ে রসজমা রোগবিশেষ, শ্লীপদ (elephantiasis)। **গোদা** = গোদরোগী, গোদযুক্ত, শ্লীপদী, গোদাবরী নদী; (মারাঠি ভাষার 'গোদা' — গোদাবরী = শ্রেষ্ঠ নদী। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠার্থক।) প্রধান, দলপতি। **গোদাবরী** = দাক্ষিণাত্যের পবিত্র নদীবিশেষ। (গোদা-ইলিশ, গোদা-খয়রা, গোদা-চিল, গোদা-ফড়িং, গোদা-পা, পালের গোদা।) (ব.শ.)। ৪. **গোদ ও গোদা** শব্দ দুটি যথার্থে প্রচলিত, **গোদাবরী** কেবলমাত্র নদীর নাম রূপে প্রচলিত। ৫. **গো** দান করে যে, তাকেই **গোদ** বলে। কিন্তু দান না করে যদি নিজের কাছে রেখে দেয়, **গো** দমন করে, তাদের যেতে না দেয়; তাতে সে-স্থান ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে যাবেই! এরকম হলে তাকেও **গোদ** বলা যায়। মানবশরীরের ক্ষেত্রে এই **গোদ** elephantiasis রোগ বলে চিহ্নিত হতে পারে; সমাজশরীরের ক্ষেত্রে এই **গোদ** স্বভাবতই অনেক **গো**-এর মালিক বা পণ্যের মজুতদার হতে পারে। এটি সমাজের পায়ের রসজমা রোগবিশেষ, মজুতদারি রোগবিশেষ। তবে সাধারণভাবে যাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে **গো** বা পণ্য জমে যায় এবং তারা তা ধারণ করে রাখে, ঠিক মতো দাম পেলে তবেই দান করে, তারা স্বভাবতই **গোদা** পদবাচ্য; একালে তাদের পাইকার বলে। এরাই সমাজে এক একটি গোষ্ঠীর **গোদা** বা পালের **গোদা** রূপে চিহ্নিত হয়ে যায়। এদের গমন স্বভাবতই অন্যদের মতো আর দ্রুত থাকে না। যে পণ্যধারা এই **গোদাদের** বরণ করে নেয়, তাদের বহন করে নিয়ে চলে, সেই পাইকারী-পণ্যধারাকে সেকালে বলা হত **গোদাবরী**; একালে বলা হয় wholesale marketing।

এখান থেকে আর একটি সংবাদ জানতে পারা যায়। পায়ে রসজমা রোগ হলে, তাকে যেমন **গোদ** বলে; তেমনি, পেটে রসজমা রোগ হলে তাকেই **পাগুল** বলে। যে লোভাতুর আগ্রাসী ধনী অন্যের সম্পদ হরণ করে ভোগদখল করে, তার সম্পর্কে গ্রামবাংলার ভুক্তভোগী মেয়েদের মুখে এরকম গালি হামেশাই শুনতে পাওয়া যায় — 'ওরে রাক্ষস, সকলের সব গিলে খেয়েও তোর শান্তি হবেনি কো! তোর পেটে পাগুল হবে, দেখিস!' দ্র. **পাণ্ডু**।

দত্তাত্রেয় : ৩. দত্ত আত্রেয়, অত্রিপুত্র দত্ত। ইঁহার পিতা অত্রি, মাতা অনসূয়া। অত্রি ভগবানের নিকটে পুত্রার্থে বর প্রার্থনা করিলে, 'আমি আপনাকেই দিলাম (ময়া দত্তোহহম্) বলিয়া, ভগবান তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করেন; এই হেতু ইনি 'দত্ত' নামে খ্যাত। ইনি চতুর্থ অবতার। (ব.শ.)। ... মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে কুশিক বংশে এক কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পতিব্রতা স্ত্রী সমস্ত ক্লেশ সহ্য করে স্বামীর সেবা করতেন। উক্ত ব্রাহ্মণ একদিন এক পতিতা নারীকে দর্শনপূর্বক কামাসক্ত হয়ে স্বীয় স্ত্রীকে উক্ত নারীর নিকট তাঁকে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীকে স্কন্ধে করে ঐ পতিতার গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অন্ধকার রাত্রে শূলবিদ্ধ অণীমাণ্ডব্য ঋষির দেহে উক্ত ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ হওয়ায়, ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন, 'সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃত্যু হবে।' ব্রাহ্মণের সতীসাধ্বী স্ত্রী এই নিদারুণ অভিশাপ শ্রবণান্তে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বলেন যে, সূর্যের আর উদয় হবে না। সাধ্বী স্ত্রীর অব্যর্থ বাক্যে প্রভাতকাল উপস্থিত হলেও সূর্যোদয় আর হল না। পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে রইল। সূর্যালোকের অনুপস্থিতিতে পৃথিবী বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখে দেবতারা ব্যস্ত হয়ে ব্রহ্মার সমীপস্থ হলেন। ব্রহ্মা বললেন, 'পাতিব্রত্যের মাহাত্ম্যেই সূর্যের উদয় হয়নি ...।' ব্রহ্মার পরামর্শে দেবতারা অত্রির স্ত্রী অনসূয়াকে ... ধরলেন। অনসূয়া ব্রাহ্মণপত্নীর কাছে গমনপূর্বক বললেন যে, সূর্যোদয়ের জন্য তিনি অনুমতি প্রদান করুন। যদি সূর্যোদয় হেতু তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়, তবে তিনি (অনসূয়া) তাঁর (ব্রাহ্মণপত্নীর) স্বামীকে পুনর্জীবিত করে নূতন দেহসম্পন্ন করে দেবেন। তখন ব্রাহ্মণপত্নীর অনুমতিক্রমে পুনর্বার সূর্যের উদয় সম্ভব হয়। দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে অনসূয়াকে বর দিতে চান। তখন অনসূয়া বলেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে তিনি যেন পুত্ররূপে লাভ করেন। অনসূয়ার গর্ভে ব্রহ্মা সোম রূপে, বিষ্ণু দত্তাত্রেয় রূপে ও মহেশ্বর দুর্বাসা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। দত্তাত্রেয় হৈহয়রাজ কার্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বর দেন, 'তোমার বাহুদ্বয় আমার বরপ্রভাবে সহস্রবাহু হবে।' (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই একটি ঐতিহাসিক কাহিনী, যা একই সঙ্গে তিনটি ধারাকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে। দ্র. **কার্তবীর্য্যার্জ্জুন**। এর আগে দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেছে। দক্ষের মাথা কাটা গেছে। ছাগমুণ্ডি দক্ষ বা অত্রি প্রজাপতি রূপে সামাজিক কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছেন। তাঁর অনুসারী জনগোষ্ঠী অত্যন্ত পতিব্রতা, এবং কারও প্রতি অসূয়াগ্রস্ত হন না। এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা পদ্ধতির থেকেই পূর্বতন জ্ঞান-ধন-শ্রম ধারণা অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর — এই তিনটি সত্তা যথাক্রমে নতুন তিনটি রূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায় — সোম-দত্তাত্রেয়-দুর্বাসা। ক্রেদাক্ত বৈদিক সমাজকে পর্যুদস্ত করে পুঁজিবাদের দিকে ভারতসমাজের যে অগ্রগতির সূত্রপাত হয়েছিল এই যুগে, তাতে **কার্তবীর্য্যার্জ্জুন** ছিলেন সবচেয়ে অগ্রণী সত্তা। ইনি ছিলেন ঘোরতর বেদবিরোধী, **জমদগ্নি**-বিরোধী। আর, এঁকেই আশীর্বাদ করেন **দত্তাত্রেয়**। ...

দাতা (দাতৃ) : ১. ✓দা + তৃ (তৃচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দাতা = দা (কিছু দেওয়া) তারণ করে যে। দাতৃ = দা-এর তারণ আবর্ত্তিত হয় যাহাতে।* ৩. **দাতা** = দানকর্ত্তা, দানশীল, সম্মানপূর্ব্বক দানকর্ত্তা, সম্প্রদানকর্ত্তা, ঋণদাতা, উত্তমর্ণ। (ব.শ.)। ৪. donator অর্থে প্রচলিত। ৫. **দা** মানে দ্-এর আধার, অর্থাৎ 'দ থাকে যাহাতে'।

একে 'দেওয়া' বলা যায়। দেওয়া তারিত হয় যে আধারের দ্বারা, তাকে বলে **দাতা**। অর্থাৎ, যে দান করে সেই দাতা, তা সে ঋণদাতা হোক আর এমনি দাতামাত্রই হোক কিংবা সম্মানপূর্ব্বক দাতাই হোক। মোট কথা, **দা** বা দেওয়া কথাটির ভিতরে কোনো 'কিছু দেওয়া'র কথাটিই রয়েছে। সেই **দা**-এর তারণ চলে **দাত্**-এ। সেই **দাত্** আধার পায় **দাত্** শব্দের সঙ্গে 'া'-কার দিলে। তখন কথাটি দাঁড়ায় **'দাত্-কারী'**, অর্থাৎ **দাতা**। যতদূর বোঝা যায়, **দাত্** শব্দের মধ্যেকার ধারণাই ইংরেজিতে প্রচলিত হয়েছিল that রূপে। কিছু দূরে, কোনো একটি **'দা-এর তারণ'**, যা কিনা এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দিকে চলে যাচ্ছে, তাকেই that শব্দটি শনাক্ত করত। একে **দাঃ** বা **দাস্**-ও বলে। (দ্র. **দাস**)। জার্মান তাকেই 'ডাস্' বলে থাকে। এখানে আরও একটি কথা বলে রাখা যায় — ইংরেজি it আর বাংলার **ইত্** (দ্র. **ইতঃস্তত**) একই শব্দ ও অর্থের উত্তরাধিকার। **৬.** ইংরেজি that, জার্মান das।

দান, দানব : ১. দান = ✓দা + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে; ✓দো + অন - ভাববাচ্যে; ✓দৈ + অন - ভাববাচ্যে। দানব = দনু + অ (অণ্)। (ব.শ.)। **২.** ***দান = দা অন যাহাতে। দানব = দান*** *বহন করে যে।* **৩. দান** = স্ব-স্বত্বত্যাগানুকূল ব্যাপার (দান ত্রিবিধ — সাত্ত্বিক রাজস তামস।), সম্প্রদান, দেয় বস্তু, সামাদির দ্বিতীয় উপায়, ধন, মানিনীর মানভঞ্জনার্থ পতির করণীয় ভূষাদানরূপ উপায়বিশেষ; অবখণ্ডন, ছেদন; শোধন, মার্জ্জন, গজমদ, মদবারি, বৃক্ষকোটরকীট-জাতমধু, নদীতরণার্থ **শুল্ক**, খেয়ার কড়ি, বরকে দেয় দ্রব্য, কন্যাশুল্ক-গ্রহণ বিনা কন্যাসম্প্রদান, পাশা খেলার দান, প্রেমারায় মাছ কাতুর ইত্যাদি, পণ্যবিক্রয়ার্থ রাজার প্রাপ্য **শুল্ক**, জলদান, তর্পণ। **দানব** = দানবসম্বন্ধী, দনুর অপত্য। দ্র. **দনু (দং)**। (ব.শ.)। কশ্যপ ও তাঁর অন্যতমা স্ত্রী দনুর গর্ভজাত সন্তানরা দানব নামে প্রসিদ্ধ। ... দনুর গর্ভজাত বিপ্রচিত্তি, সম্বর, বৃষপর্ব্বা, নিকুম্ভ, প্রলম্ব, বনায়ু, কেতুমান, বিরূপাক্ষ, কেশী, নমুচি, পুলোমা প্রভৃতি ৪০টি পুত্রই দনুজ বা দানব নামে পরিচিত। (পৌ.অ.)। **৪.** donation অর্থে **দান** এবং demon অর্থে **দানব** প্রচলিত। **৫. দ্র. দনু।** ভাববার কথা হল, আদিতে **অসুর ও দেবতা** শব্দের অর্থ এক ছিল। পরে অসুর দৈত্য হল, দানব হল; দেবতা বিনিময়জীবী হল। কিন্তু হল কীভাবে?

দ্-অন বা দেওয়া **'নবরূপে উত্তীর্ণ' হলে দনু** হয়। উ-কারের অর্থে আমরা দেখেছি, তা উলটো দিক থেকে ফিরে আসে। তার মানে, দনু-সত্তাটিতে দান উলটোমুখী হয়, নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে ফিরে আসে। দান যেখানে যাওয়ার সেখানে চলে যায় না। এর থেকেই জন্মায় সেই সত্তা, যাকে বলে **দানব**। সে দান বহন করে কিন্তু দিয়ে দেয় না, নিজের কাছে রেখে দেয়, সবটা না হলেও কিছুটা। এরকম **দান**কে 'আসুরিক-দান' বলাই যায়। একালের ভাষায়, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এইরূপে অর্জিত অর্থসম্পদকে **'কমিশন'**, **'কাট-মানি'** ইত্যাদি বলে। আদিম সমাজতান্ত্রিক বা বৈদিক ব্যবস্থা অধঃপতিত হওয়ার পর এইরূপ 'আসুরিক-দান' বহনের রমরমা হয়েছিল। এই রকম দান বহন করত বলেই **দনুর পুত্রেরা দানব** নামে অভিহিত হয়ে যায়। সামাজিক প্রেক্ষিতে, আদিতে, একমাত্র প্রতিদানহীন **দান**কেই **দান** শব্দে বোঝান হত। এইসময় তার চরিত্রের বদল শুরু হয়। বিনিময়ভিত্তিক দানে বা লেনদেন-এ যাওয়ার ঠিক আগের অধ্যায় এটি। এখানে দানের ঘোষণা আছে, বড় বড় কথা আছে, কিন্তু বাস্তবে দান এমন সব প্রশাসনিক নিয়মের বেড়াজালে বদ্ধ যে, এরকম অসুরব্যবস্থা (অধঃপতিত বৈদিকব্যবস্থা) থেকে দান গ্রহণ করার চেয়ে কিনে নেওয়া সহজ ও কম ব্যয়সাপেক্ষ বলে প্রতীয়মান হতে লাগল। এই বিচারে, বিনিময়ভিত্তিক-দানে যাওয়ার আগে, **দানবের** আবির্ভাব ছিল স্বাভাবিক। সে না জন্মালে পুঁজিবাদী-দোকানদারির জন্মই হতে পারত না। ... এভাবেই **দান** ক্রমে **সম্প্রদান** হয়ে গেল। (**নিদান, প্রদান, সম্প্রদান** ইত্যাদির জন্য নিম্নে **নিদান** দ্রষ্টব্য।) দ্র. **ছিদ**।

দাশ : ১. ✓দাশ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***দাশ = দশ*** *হইতে জাত; দানে শক্য যে, অর্থাৎ দান করিতে সক্ষম যে; যে মৎস্য অন্য মৎস্যকে হিংসা করে। /* যে মৎস্য হিংসা করে; যাহাকে (মৎস্যের মূল্য) দেয়। (ব.শ.)। **৩.** কৈবর্ত্ত, ধীবর (অয়োগবীতে নিষাদ হইতে জাত জাতি দাশ বা মার্গব। ইহারা নৌকর্ম্মজীবী। আর্য্যাবর্ত্তে ইহাদের নাম 'কৈবর্ত্ত', নাবিক, বিপ্র, ভৃত্য, বৈদ্যজাতির উপাধি। (ব.শ.)। **৪. পদবী** রূপে প্রচলিত। **৫. দ্র. কৈবর্ত্ত।** যতদূর অনুমান করা যায়, আদিম মানবজাতির ইতিহাসে, সমাজ-পরিচালক নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে যখন সুর ও অসুর বিভাজন হয়নি, একই সামাজিক সত্তাকে অসুরও বলা হত, দেবতাও বলা হত, সেই সময় সমাজের নেতৃস্থানীয়দের বলা হত **দাশ**। দক্ষযজ্ঞেরও আগে যাঁরা সমাজের সবচেয়ে শক্তসমর্থ পুরুষ ছিলেন, সমাজের জ্ঞানসম্পদ ও শ্রমসম্পদের অধিকারী ছিলেন, সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন, সংগৃহীত খাদ্যদ্রব্য সর্বাগ্রে শিশু-বৃদ্ধ-গর্ভবতীদের দিয়ে যেটুকু বাঁচত খেতেন — এভাবে যাঁরা 'দান করিতে শক্য' ছিলেন, সেকালে তাঁদের **দাশ** বলা হত। ধনসম্পদের মালিকানা তো অনেক দূরের কথা, তাঁরা এমনকি জ্ঞানসম্পদের ব্যক্তিমালিকানাতেও বিশ্বাস করতেন না বলেই মনে হয়। আহরিত খাদ্যসম্পদ, ধনসম্পদ তো বটেই, অর্জিত জ্ঞানসম্পদের ক্ষেত্রেও তাঁরা সাধারণীকরণে (জেনারেলাইজেশনে) বিশ্বাসী ছিলেন। ... মোট কথা, মানুষের শারীরিক ও মানসিক খাদ্য আহরণ করে নিয়ে এসে সবাইকে দেওয়ার ক্রিয়াটি যাঁরা একনিষ্ঠভাবে করতেন, আদিতে তাঁদেরকেই **দাশ** বলা হত।

দক্ষযজ্ঞের পরবর্তীকালে এই **দাশ**দের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পায়। এঁরা নিজেদের স্বভাববশত জ্ঞানের মালিকানা, খাদ্যসম্পদ বা ধনসম্পদের মালিকানার ঘোর বিরোধী রূপে খ্যাত হয়ে যান। কারণ, এঁরা কেবল সমাজের রাঘববোয়াল, রুইকাতলাদেরই বিরোধী ছিলেন না; টাকার কুমীরদেরও পারলে মেরে ফেলতেন। সেই কারণে এঁদের 'সামাজিক-মৎস্য-হিংসাকারী' অর্থাৎ 'ব্যক্তিমালিকানা-হিংসাকারী' বলা হত। [মনে রাখা ভাল, 'নরস্য' যেমন 'নরের' বোঝায়, মৎ (= আমি) + স্য বা 'মৎস্য' কথাটিও তেমনি 'আমার' বোঝায়।] কালে কালে এঁরাই ক্রমান্বয়ে অধঃপতিত হতে হতে fish-হিংসাকারী জেলে-কৈবর্ত্ততে পরিণত হয়ে যান।

অথচ আদিতে এঁরাই ছিলেন **বিপ্র**, ছিলেন জগৎ ও জীবন

সম্পর্কে সবচেয়ে করিৎকর্মা, জ্ঞানীগুণী; ছিলেন গাছগাছড়া প্রভৃতি বিষয়ে অধিক ওয়াকিফহাল। যেকারণে, বহু পরে, এই **দাশ** বৈদ্যজাতির **পদবী** হয়ে যায়। ... যাই হোক, মোটকথা শব্দের ভিতরের ক্রিয়া অনুসারে 'দান শক্তি যাহার' কিংবা 'দানে শক্য যে', সেই হল **দাশ**। কিন্তু দান করতে করতে তার যদি সর্বস্ব চলে যায়, হাতে যদি কোনো কিছুই আর না থাকে? দ্র. **দাস, কৈবর্ত্ত**।

দাস (দাঃ, দাস্, দাস্ত) : ১. দাস = ✓দাস্ + অ (অচ্) - স। (ব.শ.)। ২. *দাস = দা-এর (দানকারীর) অন্তিম অস্তিত্ব থাকে যাহাতে। দাঃ, দাস্ = দা-এর (দানকারীর) নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে। দাস্ত = দাস্ তারিত যাহাতে।* / যাহাকে বেতন দেয় বা কার্য্যার্থে প্রেরণ করে; যে আত্মদান করে। (ব.শ.)। ৩. **দাস** = ভৃত্য [মনু মতে দাস সপ্তবিধ — ধ্বজাহৃত, ভক্তদাস, গৃহজাত (দাসীপুত্র), ক্রীত, দত্রিম, পৈত্রিক, ও দণ্ডদাস। মতান্তরে পঞ্চদশবিধ — গৃহজা, ক্রীত, লব্ধ ইত্যাদি (যাজ্ঞবল্ক্য, মিতাক্ষরা)], শূদ্র [ঋগ্বেদে 'দাস' শব্দে ইন্দ্র কর্তৃক বিজিত 'নমুচিশম্বর'-প্রভৃতি অসুর। ভারতের অসভ্য আদিবাসীরা আর্য্যদিগের গবাদি বলপূর্ব্বক হরণ করিত বলিয়া, তাহারা 'দাস বা দস্যু' শব্দে আখ্যাত হইত। পরে ইহারা আর্য্যদিগের বশীভূত হয় ও ভৃত্যত্ব স্বীকার করে। সুতরাং 'দাস' শব্দ মূলতঃ 'ভৃত্য'-বাচী নহে। দাসেরা বা দস্যুরা ভৃত্যত্ব গ্রহণ করায়, উহার গৌণার্থ 'ভৃত্য' এবং ইহারাই শূদ্র নামে অভিহিত।], ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রকন্যাগর্ভে জাত ও ব্রাহ্মণ কর্তৃক সংস্কৃত ভোজ্যান্ন জাতিবিশেষ, শূদ্রের উপাধিবিশেষ, দস্যু, বৃত্রাসুর, কায়স্থের উপাধি, আত্মনিবেদক, জ্ঞানাত্মা, ধীবর, চর্ম্মকারের উপাধি (ভক্ত রুইদাস চর্ম্মকার ছিলেন। বোধ হয়, এই 'দাস' উপাধির মূল 'রুইদাস'। চর্ম্মকারেরা 'রুইদাস' বলিয়াও জাতির পরিচয় দেয়।), অগ্রজের প্রতি অনুজের হীনতাসূচক বিনয়বাক্য। **দাস্ত** = মল, মলত্যাগ। (ব.শ.)। ৪. **দাস** servant অর্থে এবং **পদবী** রূপে প্রচলিত। stool অর্থে **দাস্ত** প্রচলিত; বলা হয়, শব্দটি ফারসি থেকে বাংলায় এসেছে। ৫. দ্র. **কৃতদাস**। **দাশ** শব্দের অর্থে আমরা দেখেছি যে, যে-সত্তা 'দান করিতে শক্য বা পারে', অর্থাৎ, দান করবার মতো শক্তি ধরে যে, তাকে **দাশ** বলে। কিন্তু এই সত্তা যদি দান করতে করতে তার দানের বিষয় ও বস্তুসমূহ নিঃশেষ করে ফেলে এবং কেবলমাত্র তার শরীরটুকু বা শ্রম (শ্রমশক্তি ও শ্রমসময়) ছাড়া দান করার মতো তার আর কিছুই না থাকে, যখন **দান** গিয়ে ঠেকেছে তার শেষ অধ্যায়ে, বিসর্গে — **দাঃ** বা **দাস্**-এ, তখন তাকে **দাস** বলে। (এই দাস্-কেই ফারসি পেয়েছে তার 'দাস্ত' শব্দে, যদর্থ মল, এবং ইংরেজি পেয়েছে dust-এ, যার পরে অস্তিত্ব আর থাকে না।) প্রাচীন ভারতসমাজে **দাশ**-এর চেয়েও **দাস** ছিলেন বেশি সম্মানীয়। **দাশ**গণ ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানব; সেই **দাশ**গণের মধ্যে যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁদেরই বলা হত **দাস**।

হায়রে কপাল! সেই **দাস**গণই পরবর্তীকালে একসময় পরিণত হলেন প্রথমে সাতরকম, পরে পনের রকম ভৃত্যে বা servant-এ। এবং সেই **দাসত্ব** যুগের পর যুগ ধরে বাহিত হয়ে বর্তমানে পৌঁছে এমন একরকম মনোহারী প্রায়-সর্বজনীন **ক্রীতদাসত্বে** পরিণত হয়েছে যে, তা আগের সর্বপ্রকারের দাসত্বের তুলনায় হাজার গুণ নির্মম-নিষ্ঠুর হওয়া সত্ত্বেও তার **দাসত্ব** প্রায় দেখাই যায় না! প্রথম যুগের সেই সাতরকম **দাসদের নামগুলি** পাওয়া যায় মনুসংহিতায়, পনের রকম **দাসদের নামগুলি** পাওয়া যায় যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় ও মিতাক্ষরায়। কীভাবে কোন পথ বেয়ে তাঁদের এই দুর্গতি হল, সে এক বিশাল অকথিত কাহিনী। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আমাদের 'জ' গ্রন্থের 'মানুষ মানুষের ঘাড়ে চাপল কেমন করে অথবা পালকির কথা' নিবন্ধে। এখানে আমরা তার কয়েকটি বিন্দুমাত্র ছুঁয়ে যাব।

দক্ষযজ্ঞের পর যৌথসমাজ ভেঙে বহু গোষ্ঠীতে পরিণত হলে, সমাজপরিচালকদের আত্মকলহে তিতিবিরক্ত সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় আপন আপন জন্মসূত্রে-লব্ধ তিনটি মৌলিক অধিকারই (নিজের উপর অধিকার, সমাজসদস্যরূপে প্রাপ্য অধিকার, জগৎসদস্যরূপে প্রাপ্য অধিকার) মহর্ষিকে (= এক বা একাধিক জ্ঞানীকে) **সম্প্রদান** করে নিজেরা সেই মহর্ষি-পরিচালিত গোষ্ঠীতে বা **সম্প্রদায়ে** পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। এ ছিল তাঁদের স্বেচ্ছায় 'আত্মনিবেদন' — আর, ফলস্বরূপ মহর্ষি তাঁদের সার্বিক অস্তিত্বের 'মালিক' হয়ে যান। বলতে গেলে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই প্রথম মানুষের অস্তিত্বের মালিক হয়ে গেল অন্য একজন মানুষ! দাসদের সেই ছিল প্রথম সামাজিক মর্য্যাদার অধঃপতন।

কালে কালে একসময় নানা কারণে মহর্ষি আপন সম্প্রদায়ের কিছু **দাস**কে অন্য সম্প্রদায়ের মহর্ষির হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন, এবং তাদের গোত্রান্তর হয়ে যায়। (নারীদের এই গোত্রান্তর আজও প্রচলিত রয়েছে বলেই বিয়ের পর মেয়েদের পদবী স্বামীর পদবীতে বদলে যায়।) মানুষকে দাসে পরিণত করার বা **কৃতদাস** প্রথার সেই সূত্রপাত। ঠিক তার পিছু পিছু আসে **ক্রীতদাস** প্রথা। আদিতে গোত্রান্তর করা হত নিতান্ত দায়ে পড়ে। আপন গোষ্ঠীর কোনো মানুষকে অন্য কারও হাতে দিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, প্রয়োজনে আপন গোষ্ঠীর মানুষের জন্য পরিচালক-মহর্ষি আপন জীবন প্রাণ সবই বিসর্জন দিয়ে দিতেন। কিন্তু একসময় বাহ্যিক পরিস্থিতি এই ধরনের গোত্রান্তরের পক্ষে সায় দিতে থাকে। আরও পরে, ক্রমে এই বিষয়টি গা-সওয়া হয়ে যায়। ক্রমে গোত্রান্তরিত **দাসদের** পরিবর্তে গোষ্ঠী-পরিচালক মহর্ষি কিছু কিছু 'পরিবর্ত' নেওয়া উচিত বিবেচনা করলেন। **কৃতদাস** প্রথা পরিবর্তিত হতে লাগল **ক্রীতদাস** প্রথায়। এবং ক্রমে এই **ক্রীতদাসের** নানান রকমফের ঘটতে লাগল।

মোট কথা, সমাজের চোখে এক মানুষ কর্তৃক অন্য মানুষের জীবনদখল লজ্জাকর তো থাকলই না, চোখ-সওয়া গা-সওয়া হয়ে গেল। এমনকি যাদের জীবন দখল করা হতে লাগল, তারাও ব্যাপারটি কমবেশি মেনে নিতে বাধ্য হল। কেননা, দক্ষযজ্ঞের মহাসংগ্রামে বীতশ্রদ্ধ-অভিমানী হয়ে এবং জগতের ভাল চিন্তা করে, নিজের সমস্ত অধিকার মহর্ষির হাতে তুলে দিয়েছিল **দাস** নিজেই। ধীরে ধীরে সমাজমনের আকাশে এই অসম্ভব সত্য সম্ভব হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল যে, কোনোরকম মমতার বন্ধন ছাড়াই একজন মানুষ অন্য মানুষের হুকুম তামিল করতে পারে; যা কিনা সাবালক পশুপাখিও করে না বরং আত্মহত্যা করা উচিত বিবেচনা করে।

এই বোধ ক্রমে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। সারা পৃথিবীতেই

ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত হয়ে যায়। অন্যথায়, মানুষ মানুষকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে বেচে দিল, আর সে-মানুষটা ওইভাবে ক্রীতদাস হয়ে জীবন কাটাতে রাজি হয়ে গেল — এই অবিশ্বাস্য কাণ্ড কখনোই সম্ভব করা যেত না। আপন **দাস**জীবন মেনে নেওয়ার এই যে মানসিকতা সমাজমনে ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল, সেই মানসিকতা আজ কোথায় এসে পৌঁছেছে, দেখলে অবাক হতে হয়। আজকের মানুষ, রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক, আগ্রহের সঙ্গে 'চাকরি' করতে যায়, হুকুমের চাকর হতে যায়! যে ব্যক্তি চাকর রূপে অন্য ব্যক্তিকে 'নিয়োগ' করে এবং যে ব্যক্তি সেই নিয়োগ মেনে নিয়ে চাকর হয়, এই ক্রীতদাস প্রথায় তাদের কারও কোনো লজ্জাবোধই হয় না; বরং চাকরি পেয়ে চাকর হয়ে গৌরবের অন্ত থাকে না আজকের সভ্য মানুষের! রাষ্ট্র নিজেই ইস্কুল-কলেজ নামে চাকর বানানোর কারখানা খুলে বসে আছে! এই যে আধুনিক **দাস**প্রথা, এটা এতই চোখ-সওয়া হয়ে গেছে যে, এই **দাস**প্রথা লোকে দেখতেই পায় না। তার মানে এই নয় যে, কেউ কারও সঙ্গে হাত লাগিয়ে কোনো কাজই করবে না। কিন্তু করবে কীভাবে? এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আমাদের 'গ' গ্রন্থের 'উত্তরপ্রজন্মের শিক্ষাদীক্ষা ও লালনপালন' নিবন্ধে। ৬. ইংরেজি dust।

দিলীপ : ১. দিলী + ✓পা (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অভিধান)। ২. *দিল-এর গতিশীল-আধার পালিত যাহাতে।* ৩. ইনি সগরবংশীয় অংশুমানের পুত্র ও ভগীরথের পিতা এবং রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। কথিত আছে, দিলীপ একবার স্বর্গ হতে প্রত্যাবর্তন কালে সুরভি গাভীকে অতিক্রম করেন। সুরভি এইভাবে অপমানিত হয়ে দিলীপকে অভিশাপ দেয় যে, সেবা দ্বারা তার কন্যা নন্দিনীর প্রীতিসাধন না করতে পারলে দিলীপের কোনো সন্তান হবে না। ... দিলীপ তখন বশিষ্ঠ ঋষির পরামর্শে স্ত্রী সুদক্ষিণাকে সঙ্গে নিয়ে নন্দিনীর সেবা করতে আসেন। নন্দিনী দিলীপের সেবায় তুষ্ট হয়ে তাঁকে বরদান করেন। নন্দিনীর বরে দিলীপের পুত্র রঘুর জন্ম হয়। ((পৌ.অ.)। ৪. অর্থহীন নাম রূপে প্রচলিত। ৫. বাংলা শব্দের মানে জানার ক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত অভিধানকার ও কোষকারগণ কী নীতি অনুসরণ করেন, সে কথা হচ্ছে না। সাধারণ্যে শব্দটি কী অর্থে প্রচলিত, কিংবা পূর্বতন অভিধানে শব্দটির কী অর্থ রয়েছে — এসব তাঁরা নিশ্চয় দেখেন। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রে কিছুই না পাওয়া গেলে তাঁরা কী করেন?

দিলীপ শব্দটির ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, শব্দটি ব.শব্দকোষে নেই। হতে পারে কোনো কারণে তাঁর ভুক্তি থেকে শব্দটি বাদ পড়ে গেছে। কেননা, পুরাণের অধিকাংশ শব্দই তিনি **অন্তর্ভুক্ত** করে গেছেন, 'নামশব্দ' বলে তার কোনো মানে হয় না, এরকম ধারণা তাঁর ছিল না। আমরা দেখলাম, সাম্প্রতিককালের **অভিধানগুলিতেও** শব্দটি নেই; যদিও সংস্কৃত অভিধানে এবং ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত ছাত্রবোধ অভিধানে শব্দটি রয়েছে। কিন্তু **শব্দটির** ভিতরে কী অর্থ রয়েছে, কোথাও সেকথা বলা নেই। সংসদ অভিধান 'দিনেশ' শব্দটি দিয়েছেন, তার মানেও দিয়েছেন — 'সূর্য, দিন + ঈশ'। ঠিক তার পরেই 'দিলীপ' শব্দটির ভুক্তিস্থান। সেখানেই 'দিলীপ' শব্দটির থাকার কথা, কিন্তু নেই। কারণ শব্দটি দিলে, তার মানে দিতে হবে তো! যেরকম 'দিনেশ'-এর বেলায় দেওয়া হয়েছে! কিন্তু সে মানে যে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না! কী হবে এখন? অতএব শব্দটিই বাদ যাক। ...

ছাত্রবোধ অভিধান **দিলীপ** শব্দের একটি ব্যুৎপত্তি দিয়ে গেছেন। সেই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'দিলী পালন করে যে' সেই হল **দিলীপ**। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে '**দিল্**-এর গতিশীল আধার'কে 'দিলী' বলতে হয়। এই **দিল্** বিষয়টিকে আমরা **দল্** ক্রিয়ামূল বংশে জাত **দিল** শব্দে চিহ্নিত করে এসেছি। দ্র. **দিল**। তার থেকে 'দিলী' শব্দের অর্থ হয়, 'যে সত্তা অনেক কিছু দেওয়ার ইচ্ছা, ক্ষমতা ইত্যাদি লালন করে'। এইরূপ 'দিলী'কে পালন করে যে, সে হল **দিলীপ**; অর্থাৎ, **দিলীপ** হল দানশীল এক শক্তিমান সত্তা। বাহ্য প্রয়োগে সে বীর-দানশীল-ব্যক্তি থেকে শুরু করে 'welfare state' পর্যন্ত অনেক সত্তাই হতে পারে। এর পরেও সংশয় থাকলে **দিলীপ**-এর সমার্থক শব্দ **দিলীর**-এর দিকে একবার তাকানো যেতে পারে। 'দিলী রহে যাহাতে' তাকে **দিলীর** বলাই যায়। **দিল্**, **দিলদার** প্রভৃতি শব্দের মতো এটিও ফারসি শব্দ। এর অর্থ 'সাহসী, নির্ভীক'। 'বীর-দানশীল' **দিলীপ**-এর সঙ্গে এর ফারাক যৎসামান্য। ৬. ইংরেজি dealer। 'দিলী বা দিলিকে পালন করে যে, সেই হল দিলীপ' — এরকম চিন্তাপদ্ধতি কি আধুনিক ইংরেজি অভিধানকারদেরও মাথায় ঢুকতে শুরু করেছে? আমাদের এই জিজ্ঞাসার কারণ হল, The Chambers Dictionary (1993)-তে আমরা খানিকটা অবাক হয়ে দেখছি যে, তাঁরা Dilip শব্দের মানে দিচ্ছেন — Who protects Dehli!

নিদান, প্রতিদান, প্রদান, সম্প্রদান : ২. *নিদান = নির্গত দান যাহাতে। প্রতিদান = প্রতি (প্রকৃষ্ট তারণ গতিশীল) থাকে যে দানে। প্রদান = প্রকৃষ্ট দান যাহাতে। সম্প্রদান = সম্যক প্রদান থাকে যাহাতে।* ৩. **নিদান** = রোগনির্ণয়। **প্রতিদান** = দানের পরিবর্তে দান। **প্রদান** = দান। **সম্প্রদান** = হাতে তুলে দেওয়া। ৪. প্রদত্ত প্রতীকী অর্থে শব্দগুলি প্রচলিত। ৫. সম্যক শব্দটির ভিতরে 'আঁচ' করা, অর্থাৎ আন্দাজ করা বা আশা করার ক্রিয়াটি রয়েছে। অতএব 'সম্যক প্রদান' কথাটির মানে দাঁড়ায় — আমি আপনাকে ক-বস্তুটি দিলাম এই কথা আঁচ করে যে, আপনি আমায় নিশ্চয় সমমূল্যের খ-বস্তুটি দিবেন। না-দিলে কী হবে, সেকথাটি **সম্প্রদান** শব্দের ভিতরে বলা নেই। দক্ষযজ্ঞের পর ভারতের জনসাধারণের অধিকাংশ তাঁদের তিনটি মৌলিক অধিকার যে-যার আপন আপন পরিচালক মহর্ষির হস্তে **সম্প্রদান** করে দিয়ে নিজেরা **সম্প্রদায়ে** পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কন্যা সম্প্রদান করার সময় প্রত্যেক পিতামাতা আশা করেন, যার হাতে সম্প্রদান করা হল সে তার যথোপযুক্ত দেখাশোনা করবে। দ্র. **দান, সম্প্রদান (সম্)**।

দিব্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিদেব, অদেব, অদেবমাতৃক, আদিবস, আদেবক, দিব্, দিব, দিবঙ্গম, দিবস, দিবসাত্যয়, দিবসাবসান, দিবস্পৃক, দিবা, দিবাকর, দিবাকীর্ত্তি, দিবাচর, দিবাতন, দিবান (দেবন, দেওয়ান), দিবানা (দেওয়ানা), দিবানি

(দেওয়ানী), দিবানিশ, দিবানিশি, দিবান্ধ, দিবাবসান, দিবাভীত, দিবামান, দিবামুখ, দিবার, দিবাল (দেওয়াল), দিবাশয়, দিবাসঞ্চর, দিবাস্বপ্ন, দিবাস্বাপ, দিবি, দিবিজ, দিবিন্দ্র, দিবিষৎ, দিবিষ্ঠ, দিবেশ, দিবোকাঃ, দিবোদাস, দিবৌকাঃ, দিব্ব, দিব্বি, দিব্ব্য, দিব্যি, দিব্য, দিব্যগন্ধর্ব্ব, দিব্যগায়ন, দিব্যদর্শী, দিব্যদোহদ, দিব্যননী, দিব্যনারী, দিব্যমান, দিব্যরত্ন, দিব্যরথ, দিব্যরস দিব্যসার, দিব্যসরিৎ, দিব্যস্ত্রী, দিব্যস্নান, দিব্যা, দিব্যাংশু, দিব্যাঙ্গনা, দিব্যাদিব্য, দিব্যোন্মাদ, দিয়ালা (দেয়ালা), (দি)দেহালা, দিয়াশলাই (দীপশলাকা), দে, দেআ(য়া)ন, দেআল, দেউ, দেউড়ি(ড়ী), দেউল, দেউলিয়া, দেউল্যা, দেও (দৈত্য, অসুর), দেওআ(য়া)ন, দেওদার, দেওন, দেওয়া, দেওয়ান, দেওয়ানা, দেওয়ানী, দেওয়াল, দেওগিরি, দেওদার, দেদীপ্যমান (দেবদীপ্যমান? দ্র. দেদার, দিবার, দৌবারিক), দেধান, দেব্, দেব, দেবঋণ, দেবঋষি (দেবর্ষি), দেবক, দেবকন্যা, দেবকর্ম্মী, দেবকারু, দেবকিরী, দেবকী, দেবকূল, দেবকুল্যা, দেবকেতু, দেবখাত, দেবগণিকা, দেবগন্ধর্ব্ব, দেবগিরি, দেবগিরী, দেবগুরু, দেবগুহ্য, দেবগৃহ, দেবচর্য্যা, দেবচিকিৎসক, দেবচ্ছন্দ, দেবজাত, দেবতরু, দেবতা, দেবতাত, দেবতাত্মা, দেবতী, দেবতীর্থ, দেবত্তর (দেবোত্তর), দেবত্য, দেবদণ্ড, দেবদারু, দেবদাস, দেবদৃষ্টি, দেবদেব, দেবদোল, দেবদ্রোণী, দেবধান, দেবধান্য, দেবধূপ, দেবন, দেবনদী, দেবনাগরী, দেবনিকায়, দেবনিন্দক, দেবনির্ম্মিত, দেবপতি, দেবপথ, দেবপশু, দেবপালিত, দেবপুরী, দেবপূজ্য, দেবপ্রিয়, দেববধূ, দেববর, দেববর্ণিনী, দেববর্ত্ম, দেববর্দ্ধকি, দেববলি, দেববাণী, দেববাহন, দেববিমান, দেববিদ্যা, দেববৃক্ষ, দেবব্রত, দেবব্রহ্মা, দেবব্রাহ্মণ, দেবভবন (অশ্বত্থ), দেবভাগ, দেবভাষা, দেবভিষক, দেবভূমি, দেবমণি, দেবমাতা, দেবমাতৃক, দেবমান, দেবমায়া, দেবমাস, দেবমুনি, দেবযজন, দেবযজ্ঞ, দেবযাত্রা, দেবযান, দেবযানী, দেবযুগ, দেবযোনি, দেবযোষা, দেবর, দেবরথ, দেবরহস্য, দেবরাজ, দেবরাত, দেবরায়, দেবর্ষি, দেবল (অসিত-দেবল), দেবলোক, দেবশক্র, দেবশর্ম্মা, দেবশিল্পী, দেবশুনী, দেবশ্রুত, দেবসভা, দেবসাযুজ্য, দেবসেনা, দেবস্থান, দেবস্ব, দেবহুতি (দেবহূতি), দেবহেলন, দেবা, দেবাকৃতি, দেবাক্রীড়, দেবাগার, দেবাঙ্গনা, দেবাজীব, দেবাজীবী, দেবাতিদেব, দেবাত্মা, দেবাধিপ, দেবানী, দেবানুচর, দেবান্ন, দেবাবসথ, দেবাবাস, দেবায়তন, দেবায়ুধ, দেবারণ্য, দেবারি, দেবার্চ্চা, দেবালয়, দেবাসুর, দেবিতা, দেবী, দেবীকোট, দেবীভাগবত, দেবীমাহাত্ম্য, দেবীসূক্ত, দেবেন্দ্র, দেবেন্দ্রাণী, দেবেশ, দেবোত্তর, দেবোদ্যান, দেব্যা, দেয়র, দেয়ানসাল, দেয়ানা, দেয়াশিনী, দেয়াসিনি(নী), দেহড়ী, দেহরা, দেহারা, দেহেরা, দেশলাই, দৈব, দৈবক, দৈবকর্ম্ম, দৈবকৃত, দৈবকী, দৈবচিন্তক, দৈবজ্ঞ, দৈবত, দৈবতন্ত্র, দৈবতীর্থ, দৈবত্য, দৈববশ, দৈবযজ্ঞ, দৈবযোগ, দৈবলেখক, দৈববাণী, দৈবসর্গ, দৈবাৎ, দৈবাত্ত, দৈবাত্যয়, দৈবায়ত্ত, দৈবাসুর, দৈবাহোরাত্র, দৈবিক, দৈবোপহত, দৌলত (দওলাৎ, দেবলাৎ), দ্যাবাক্ষমা, দ্যাবাপৃথিবী, দ্যাবাভূমি, দ্যু, দ্যুনিবাস, দ্যুনিবাসী, দ্যুমণি, দ্যুমৎসেন, দ্যুম্ন, দ্যুত, দ্যুলোক, দ্যুষৎ(দ্), দ্যুসৎ(দ্), দ্যূত, দ্যূতকর, দ্যূতকার, দ্যূতকারক, দ্যূতকৃৎ, দ্যূতকিঙ্করী, দ্যূতক্রীড়া, দ্যূতগৃহ, দ্যূতপূর্ণিমা, দ্যূতপৌর্ণমাসী, দ্যূতবীজ, দ্যূতবৃত্তি, দ্যূতসভা, দ্যূতসমাজ, ধৃষ্টদ্যুম্ন।

দিব্ = গতিশীল দানকে বহন। **দিব** = গতিশীল দানকে বহন করে যে।

দিব্, দিব (দিবস, দেব) [দেব শব্দটি পরে আবারও রয়েছে**]** : ১. দিব = ✓দিব্ + অ (ঘঞর্থে ক) - অধিকরণে। (ব.শ.)। ২. ***দিব্** = গতিশীল দান-এর বহন। **দিব** = গতিশীল দান বহন করে যে। **দিবস (দিবস্, দিবঃ)** = **দিব**-এর বিসর্গ (বিসর্জ্জনীয়) অস্তিত্ব থাকে যাহাতে।* /**দিব** = যে স্থানে দেবতা ক্রীড়া করেন। (ব.শ.)। ৩. **দিব** = জিগীষা; ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয়, ইচ্ছা, গতি, স্তুতি, দীপ্তি, হর্ষ, মত্তীভাব, নিদ্রা, ক্রীড়া, পীড়ন, পরিকূজন; দেবতার ক্রীড়াস্থান, স্বর্গ, আকাশ, দিন। **দিব** = আকাশ, দিন। **দিবস** = দিন, বাসর, ষষ্টিদণ্ডাত্মক কাল। (ব.শ.)। ৪. 'shall/will give' অর্থে **দিব** এককভাবে প্রচলিত, কিন্তু সন্ধিযুক্ত হয়ে day অর্থে প্রচলিত; যথা **দিবালোক**। ৫. 'দিব (দিবো)' কিংবা 'দেব (দেবো)' শুনলে আমরা বুঝতে পারি, কেউ কিছু দিতে চাইছে; একটু পরেই হয়তো দিয়ে দেবে। অর্থাৎ, শব্দদুটির অর্থে আমরা কোনো ফারাক পাই না। কিন্তু দৃশ্যত একটি ফারাক দেখাই যাচ্ছে — একটিতে 'ি'-কার রয়েছে, অন্যটিতে রয়েছে 'ে'-কার। এর রহস্য আগেই আমরা জেনেছি — ই-কারের বা গতিশীলতার পুনরাবৃত্তি ঘটলেই তা দিশাগ্রস্ত বা এ-কার হয়ে যায়। একই নিয়মে 'দিব' ক্রিয়াটি বারংবার ঘটতে থাকলে সেটিও দিশাগ্রস্ত হয়ে যায়, আর দিশাগ্রস্ত হলেই 'ি'-কার পরিণত হয় 'ে'-কারে।

কিন্তু এছাড়াও, শব্দদুটির মধ্যে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। সেটি অর্থকরী এবং আমাদের সমাজজীবনে সেটিই সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। সেটি হল — 'দিব' বা 'দেব' বললে আমরা কেবল 'ভবিষ্যতে দেওয়া'ই বুঝি না, 'দেবতা' বুঝি, 'দিবস'ও (উপরে দ্র. **দিবালোক**) বুঝি। এমনকি ইংরেজ্জও দিবসার্থক এই **দেব**কে day বোঝে! এমন কেন?

এইখানে রয়েছে এক সহজ কিন্তু এক মহা-অনর্থকারী ব্যাপার। সহজ এইজন্য যে, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির স্বাভাবিক নিয়মে একটি ক্রিয়া যতজন করে, তাদের প্রত্যেককেই সেই শব্দে চিহ্নিত করা যেতে পারে। দেবো, দেবতা, দিবস — তিনটি সত্তাই 'গতিশীল দান বহন' করে (কীভাবে করে, সে অন্য প্রসঙ্গ); তাই তাদের তিনজনকেই **দিব** বলা হয়। সেকারণেই আমাদের ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণ বাংলাভাষীও **দেব, দেবতা** শব্দের বহুরৈখিক প্রয়োগ অনায়াসে করতে পারেন। **দেবন**-এর সঙ্গে **দেওন**-এর কোনো পার্থক্যই তাঁরা করেন না। '**দ্যাব্তা** (দেবতা) আমার, একটু দয়া কর্ বাছা!' — এরকম বাক্য গাঁয়ের মূর্খ বাংলাভাষী-বৃদ্ধা তাঁর উলঙ্গ পৌত্রকে, গাইয়ের বাছুরকে, ফেরিওয়ালাকে, দয়ালু মানুষমাত্রকেই অনায়াসে বলে দিতে পারেন। অথচ এই সহজ ব্যাপারটিই আজ মহা-অনর্থকারী হয়ে গেছে। কেন?

হয়েছে এইজন্য যে, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে থাকা দানবাচক বা **দেববাচক দেবতা**কে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলাভাষী god শব্দের প্রতিশব্দ করে ফেলেছেন, এবং তার ফলে আমাদের **দেবতা** শব্দের পায়ে শেকল পরানো হয়ে গেছে। অথচ

আমাদের **দেব, দেবতা** তো শুধুমাত্র god নয়; আরও অনেক কিছু। যে দেয়, সেই তো **দেবতা**-পদবাচ্য; তা সে দেওয়ার বদলে কিছু নিক আর নাই নিক। দেওয়ার বদলে নিলে সে দোকানদার, না-নিলে সে দয়ালু, দানশীল, দেওয়া-ক্রিয়াকারী যে কোনো সত্তাই হতে পারে এবং তারা প্রত্যেকেই **দেবতা**-পদবাচ্য। আর, যে-পরমাপ্রকৃতি বিশ্ববিধাতা অনন্ত দানের আধার, যিনি মোক্ষ দেন, কৈবল্য দেন, ব্রহ্মানন্দের ধারায় সিক্ত করে দেন, তিনিও **দেবতা**-পদবাচ্য। কারণ এরা প্রত্যেকেই 'দেয়'। আমাদের **দেবতা** শব্দের পায়ে কোনো বেড়ি নেই। অতএব **দিব্** ক্রিয়া থেকে জাত শব্দগুলির অর্থ বোঝার সময় আমাদের মনকে ইংরেজি ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত করে নিতে হবে, আমাদের **দেবতার** পা থেকে god-এর শেকলটা খুলে ফেলে দিতে হবে। অন্যথায় আমাদের **দেবতাকে** আমরা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সক্রিয় ও সদয় রূপে পাব না, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেভাবে পেতেন। রইল বাকি ক্রীড়ার কথা, ক্রীড়াস্থানের কথা, **দিবস**-এর কথা।

দিব্ শব্দের অর্থে 'ক্রীড়া' বা 'দেবতার ক্রীড়াস্থান'-এর কথাও উপরে বলা আছে। (**ক্রীড়া** কী, সেকথা **ক্রীড়া** শব্দে আগেই বলা হয়েছে।) যারা 'দেব নাকি দাদা, দেব?' বলে যাজ্ঞা করে, সেই দোকানদার-দেবতারা তো লেনদেনের জগতেই খেলা করে। একে বিনিময়ের স্থান বা market বলা হয়। যেহেতু 'গতিশীল দান বহন' করার কাজটি এখানে সগৌরবে চলে, সেই কারণে একেও **দিব** বলা যায়। যা কিছু আমার, নিজ-'স্ব', যা-সব দিয়ে দিলে আমি নিঃ-'স্ব' হয়ে যাব, সেই '**স্ব** রহে যাতে', সেই 'স্বর' তো আমার উৎপাদিত পণ্যই। মানুষের সেই রকম স্বরসমূহ শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে জমা হয়, তাকেই বলে **স্বর্গ**। সেও তো **দিব**। তাকে 'আকাশ' বলতে এতটুকু আপত্তি হওয়ার কথা নয়, যখন কিনা আমরা জানি যে, আমাদের সমস্ত উৎপাদিত **কাশ** গিয়ে জমা হয় **আকাশ**-এ; তা সে খুক্ খুক্ কাশির আওয়াজ **কাশ** হোক আর করণশক্তি থেকে জাত **কাশ**ই হোক। অতএব, এও **দিব**-ই বটে।

কিন্তু এটুকুতেই দেবতাদের ক্রীড়াস্থান সীমাবদ্ধ হতে পারে না। কারণ, কেবলমাত্র দোকানদাররাই দেয় না, আরও বহু বহু সত্তাই অনেক অনেক কিছুই দেন। শব্দের নিয়ম অনুসারে তাঁদের সকলের ক্রীড়াস্থানই **দিব**-পদবাচ্য। কিন্তু আমাদের মতো ছোটখাট মানুষ কেবলমাত্র নির্ব্বচনীয় ছোটখাট দানকারী দেবতাদেরই চিনি, অনির্ব্বচনীয় দেবতাদের প্রায়শই চিনি না, চিনতে পারি না। তাই বলে তাঁরা নেই, তাঁদের ক্রীড়াস্থান নেই, এমন তো হতে পারে না। যাঁরা তাঁদের চিনতে পারেন, তাঁরা নিশ্চয় তাঁদের ক্রীড়াস্থানও চেনেন কিংবা চিনে নিতে পারেন। সেরকম ক্রীড়াস্থান থাকলে তাকেও কিন্তু **দিব**ই বলতে হবে। বাংলাভাষা হিসেব করে সমস্ত সম্ভাব্য অতিথিদের জন্যই আসন পেতে রেখেছে। তাঁরা এলে বসবেন, না এলে আসন নাহয় খালিই থাকবে। আমরা সেই অতিথিকে চিনতে পারছি না বলে তাঁর আসনটি গুটিয়ে ফেলা যাবে না। Periodic Table-এর বিজ্ঞানসম্মত এই নিয়মটি ক্রিয়াভিত্তিক বাংলাভাষা সর্বদা অনুসরণ করে চলেছে, চলে, চলে থাকে।

তবে সে যাই হোক, এই **দিব**-এর **বিসর্জ্জন** চলে কখন? যখন চলে, সেই সময়টিকে শব্দের নিয়মে স্বভাবতই **দিবঃ** বা **দিবস্** বলতে হয় এবং তার আধারকে বলতে হয় **দিবস**। (কেননা, **ঃ** বা **স্** মানেই 'নির্য্যাসত্যাগ', বলেছেন ব.শ.। দ্র. **তপঃ**)। সেটি 'গতিশীল দানের রহস্যরূপী কাল'ই বটে। তাই তাকে **দিন**ও বলা যায়। দ্র. **দেব, চর**। ৬. ইংরেজি day, ল্যাটিন dies।

দিবোদাস : ২. / দিবের বা স্বর্গের দাস যে। (ছা.অ.)। ৩. জনৈক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, ইনি ভাস্করের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং চিকিৎসাদর্পণ নামে আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সামবেদোক্ত জনৈক ঋষি। কাশীস্থ নৃপবিশেষ; ইনি চন্দ্রবংশীয় ভীমরথের পুত্র; ইঁহার পুত্রের নাম সুদাস ও প্রতর্দ্দন। (ছা. অ.)। (ক) ঋগবেদে উল্লিখিত একজন ধর্মভীরু ন্যায়বান রাজা। এঁর জন্য ইন্দ্র একশত প্রস্তরপুরী বিদীর্ণ করেন। (খ) মহাভারত অনুসারে, কাশীর রাজা হর্ষশ্বের পুত্র সুদেব, সুদেবের পুত্র দিবোদাস। (**দময়ন্তী** সখা সুদেব। সংকলক)। দেবগণ আকাশ হতে পুষ্প, ও রত্ন ইত্যাদি এঁকে দান করতেন বলে এঁর নাম দিবোদাস। হর্যশ্ব ও তাঁর পুত্র সুদেব দুজনেই হৈহয় বা বীতহব্যের পুত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হন। পিতার মৃত্যুর পর দিবোদাস রাজা হন। বীতহব্যের পুত্ররা আবার কাশী আক্রমণ করে দিবোদাসকে পরাজিত করে ও তাঁর পুত্রদের বধ করে। অন্য উপায় না দেখে দিবোদাস পলায়ন করে মহর্ষি ভরদ্বাজের শরণাপন্ন হন। ভরদ্বাজ এঁকে আশ্বাস দিয়ে এক যজ্ঞ করেন। তার ফলে দিবোদাসের প্রতর্দন (প্রত্যর্দ্দন) নামে এক পুত্র হয়।... তারপর পিতার আজ্ঞায় প্রতর্দন বীতহব্যের শত পুত্র বিনাশ করেন। বীতহব্য প্রতর্দনের ভয়ে পলায়ন করে ভৃগু মুনির শরণাপন্ন হন। ... প্রতর্দন বীতহব্যকে ত্যাগ করবার জন্য ভৃগু মুনিকে অনুরোধ করেন। ... তখন শরণাগতকে রক্ষা করার জন্য ধর্মাত্মা ভৃগু বীতহব্যকে ব্রাহ্মণ করে দিয়ে বলেন যে, এখানে কোনো ক্ষত্রিয় নেই, সকলেই ব্রাহ্মণ। প্রতর্দন তখন বীর্যবান বীতহব্যকে জাতিত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন জেনে প্রসন্নমনে ফিরে যান। (গ) বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে, ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান, কেতুমানের পুত্র দিবোদাস, দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন। (ঘ) বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে, পুরুবংশীয় রাজা হর্যশ্বের পুত্র মুদ্গল। এই মুদ্গল হতে জাত ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়ে মৌদ্গল্য নামে খ্যাত হন। মুদ্গলের পুত্র বৃদ্ধশ্ব, বৃদ্ধশ্বের পুত্র দিবোদাস ও কন্যা অহল্যা। দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু, মিত্রয়ুর পুত্র রাজা চ্যবন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দিবোদাসের কাহিনীটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ইতিহাস প্রমাণ করে, বেদবিরোধী ক্ষত্রিয় হৈহয়-সত্তা (দ্র. **কার্তবীর্য্যার্জ্জুন**) যেমন বেদবাদীদের (আদিম সমাজতন্ত্রবাদীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের বিস্তর ক্ষতিসাধন করেছিল, তেমনি সেকালের কমবেশি-প্রতিষ্ঠিত আদি-পুঁজিবাদীদেরও সেই সত্তা রেহাই দেয়নি। ফল হয় এই যে, পরবর্তীকালে বেদবাদীদের সাহায্য নিয়ে সেকালের সেই পুঁজিবাদীরা হৈহয়-সত্তাকে আক্রমণ করলে সে গিয়ে তার সে-যাবৎকালের শত্রু বেদবাদীদের কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বেদবাদীরা সেই অধীনতাকামী হৈহয়-সত্তাকে আপন দলভুক্ত করে নেন। ... ইতিহাসে ক্ষত্রিয়কে শূদ্র করার অজস্র ঘটনা রয়েছে, কিন্তু ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণ করে নেওয়ার ঘটনা বলতে গেলে এই একটিই।

একমাত্র বিশ্বামিত্রের ব্যাপারটি ছাড়া এরকম ঘটনা আর নেই বলেই মনে হয়। দ্র. **চরক, ধন্বন্তরী**।

দিব্য, দিব্যা (দিব্যি) : ১. দিব + য (যৎ)। (ব.শ.)। ২. *দিব্য = দিব থাকে যাহাতে। দিব্যা = দিব্য-এর আধার যে। দিব্যি = দিব্য গতিশীল যাহাতে।* / **দিব্য** = দিবে ভব। (ব.শ.)। ৩. **দিব্য** = স্বর্গস্থিত, আকাশভব, সূর্য্যমণ্ডলস্থ, অপ্রাকৃত, অলৌকিক, মনোজ্ঞ, লোকাতীত, স্পষ্ট, দিব্যপুরুষ, যম, যব, গুগ্‌গুল, (তন্ত্রে) দেববৎপ্রাপ্ত ভাববিশেষ, নায়কবিশেষ, আন্তরীক্ষ উৎপাতবিশেষ, তত্ত্ববেত্তা, দেবভাব, হরিচন্দন, লবঙ্গ, দেবব্রাহ্মণ-সাক্ষিক দোষিকৃত প্রতিশ্রুতি, শপথ, দোষশোধনার্থ স্মৃতিবিহিত অগ্নিবিষাদিকৃত পরীক্ষা, মেঘপতিত জল (ধারাজ করকাভব তৌষার হৈম — এই চারিপ্রকার), দৈব দিন। **দিব্যা** = নায়িকাভেদ, আমলকী, হরীতকী, শতাবরী, ব্রাহ্মী, স্থূলজীরক, শ্বেতদূর্ব্বা, মহামেদা। (ব.শ.) ৪. oath অর্থে **দিব্যি** প্রচলিত, বাকি দুটি অপ্রচলিত। ৫. (দ্র. **দিব**)। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা গর্ব করেন যে, তাদের লিখিত ইতিহাস আছে, ভারতের নেই। এর চেয়ে বাজে কথা আর হয় না। একবার যদি জানতে চাওয়া হয়, আদিতে সব জাতি যৌথসমাজে বাস করত, এটা সবাই জানে। কিন্তু সেই যৌথসমাজে তো আর পণ্যবিনিময় ছিল না, সেটা সমাজে প্রচলিত হতে পারল কেমন করে? তার কি কোনো ইতিহাস কারও জানা আছে? না! এর উত্তর এখনও পর্যন্ত কেউই জানে না। কিন্তু ভারত জানে, বাংলাভাষী জানে। আমাদের ভাষার শব্দের মধ্যেই সব ইতিহাস ধরা আছে, তার ওপর পুরাণাদি তো রয়েছেই।

পুরাণাদি বলছেন, আদিম যৌথসমাজ বিভাজিত হয়ে যাওয়ার পর একসময় **অহঙ্কার**-এর জন্ম হয়েছিল। এই **অহংকার** মানে 'এটা আমার করা', 'আমি করেছি' — এই গৌরববোধ। এই **অহঙ্কারের** জন্মের পর পরই একসময় জন্ম হয় **সত্যঙ্কার**-এর। **সত্যঙ্কার** হল — 'আমার ইহা অবশ্য বিক্রেয়, কিংবা, আমার ইহা অবশ্য ক্রেতব্য — এইরূপ সত্যাকরণ'। অর্থাৎ, 'তুমি এই বস্তু **দিব** বলিলে, আমি এই বস্তু **দিব** — এইরূপ সত্যাকরণ করা'**ই সত্যঙ্কার** করা। সন্দেহ নেই, একেই বলে **দিব্য**। কেননা, এতে '**দিব** বলিয়া **প্রতিজ্ঞা**' আছে; তাই **দিব্য**। এই **দিব্যতে দিব্য**-সত্য প্রকাশকারী শব্দসমূহ রয়েছে। '**দিব থাকে**' বলেই একে **দিব্য** বলে।

কিন্তু **দিব্য** শব্দের অর্থ এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। যেহেতু **দিব** শব্দটির অনেকগুলি অর্থ, **দিব্য** শব্দটিরও অনেকগুলি অর্থ হতে বাধ্য। কিন্তু আমরা মাঝারি মানের মানুষ। আমরা তাদের মধ্যবর্তী সত্তাগুলিকে কমবেশি চিনতে পারি, কিন্তু উপরের বা নীচের সত্তাগুলিকে চিনতে পারি না। মাঝের সত্তাগুলিকে লেনদেনের দুনিয়ায় আমরা **দিব্য** রূপে কমবেশি চিনতে পারি এভাবে — 'স্বর্গস্থিত ...' = সর্বপণ্যসুবিধালব্ধ লোকে স্থিত ... ইত্যাদি। কেননা, সেখানে সমস্ত **দিব** জমা হয়ে থাকে; ফলে তা হয়ে ওঠে সুখস্বর্গলোক। কিন্তু **দিব্য** মানে সূর্য্যমণ্ডলস্থ, অপ্রাকৃত, অলৌকিক, মনোজ্ঞ, লোকাতীত, স্পষ্ট, দিব্যপুরুষ, যম — এগুলিকে **দিব্য** বলে আমরা ঠিকঠাক চিনতে পারি না। অপরদিকে যব, গুগ্‌গুল, হরিচন্দন, লবঙ্গ, মেঘপতিত জল এবং আমলকী, হরীতকী, শতাবরী, ব্রাহ্মী, স্থূলজীরক, শ্বেতদূর্ব্বা, মহামেদা — **এগুলিকে কেন যে দিব্য বা দিব্যা** বলে, তাও আমরা জানি না। কিন্তু **শব্দার্থের নিয়মে, এগুলির** ভিতরে যে **দিব্যগুণ** রয়েছে, তা নিয়ে আমাদের সংশয়মাত্র নাই। আমরা উর্ধ্বকে চিনতে পারি না, নিম্নকেও চিনতে পারি না, শুধুমাত্র মধ্যদিব্য বা মধ্যদেব-এর সঙ্গে আমাদের চেনাজানা। দ্র. **দেব**। ৬. ইংরেজি divine, ল্যাটিন deo।

দেব, দেবন, দেবা, দেবী (দেওন, দেওয়া) [সর্বাগ্রে **দিব** দ্রষ্টব্য] : ১. **দেব** = ✓দিব্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। **দেবন** = ✓দিব্ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দেব = দিশাগ্রস্ত গতিশীল দান বহন করে যে; অর্থাৎ, দেব-দেব (দেবো-দেবো) বলে যে। দেবন = দেব অন যাহাতে। দেবা = দেব-এর আধার যে। দেবী = দেব-এর গতিশীল আধার যে। দেওন = দেওয়া অন যাহাতে; অর্থাৎ, দেবন। দেওয়া = দেব যায় যাহাতে।* / **দেবন** = যাহার দ্বারা ক্রীড়া সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **দেব** = দ্যোতনাত্মক, দীপ্ত, অমর, ইষ্টদেবতা, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ, রাজা, পূজ্য, প্রভু, মেঘ, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মহাদেব, পারদ, পরমাত্মা, শিশু, দেবন, কায়স্থের উপাধি, গুরু। **দেবন** = ক্রীড়া, পাশকক্রীড়া, দ্যূত, দীপ্তি, ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয়াদি, জিগীষা, স্তুতি, দ্যুতি, কান্তি, পাশক, পদ্ম, লীলোদ্যান। **দেবা** = দেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দেবী, মেঘ। **দেবী** = দেবপত্নী, দুর্গা, সরস্বতী, সাবিত্রী, কৃতাভিষেকা রাজপত্নী, মহিষী, পূজ্যা, দ্বিজজাতিস্ত্রীর উপাধিবিশেষ, শ্যামাপক্ষী, হরীতকী, অতসী, দূর্ব্বা, শালপর্ণী, নাগরমুস্তা, রবিসংক্রান্তি, দেবীসদৃশী। **দেওন** = দেওয়া। **দেওয়া (দে)** = দেবতা, শূদ্রের উপাধিবিশেষ; দান করা, দান করান। (ব.শ.)। ৪. শব্দগুলি সবই প্রচলিত, যদিও অর্থ সংকুচিত হয়ে গেছে। ৫. দ্র. **দিব, দিব্য**। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে — অনির্ব্বচনীয় (যাকে বচনের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না) **দেব** থেকে নির্ব্বচনীয় (যাকে বচনের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়) **দেব** পর্যন্ত যত প্রকার **দেব**-কে আমাদের পূর্বপুরুষেরা **দেওন**-কারী বা **দেবন**-ক্রিয়াকারী **দেব** রূপে চিনতে পেরেছিলেন, **দেব** শব্দের অর্থ হিসেবে উপরে তাদের সকলের নাম একত্রে দেওয়া রয়েছে। এদের প্রত্যেকে নিশ্চয়ই **দেওন**কারী **দেব**-সত্তা। আমরা তাদের কয়েকজনকে চিনতেও পারছি, বুঝতে পারছি; কিন্তু সবাইকে চিনতে বুঝতে পারছি না। আমরা দেখছি, তাদের **উর্ধ্ব** মধ্য ও নিম্ন তিনটি ভাগ করা যায়, যার ভিতরে মধ্যভাগের **দেব**-শব্দবাচ্য সত্তাগুলিকে আমরা বচনে প্রকাশ করে বলতে পারি। **উর্ধ্ব**ভাগের ও নিম্নভাগের **দেব**-শব্দবাচ্য সত্তাগুলির অধিকাংশই আমাদের নাগালের বাইরে। এই **উর্ধ্বদেব** ও নিম্ন**দেব**গণের বিষয়ে আমরা খুবই কম জানি। অতএব, মধ্য**দেব**গণের বিষয়ে নির্ব্বচনীয় শব্দগুলির ব্যাখ্যাই এখানে আমরা দিয়ে যাব, অনির্ব্বচনীয় **উর্ধ্বদেব**-বাচক শব্দগুলি রেখে দেব যাঁরা জানেন তাঁদের জন্য, উত্তরসূরিদের জন্য। সেইভাবে **দেব দেবন** প্রভৃতি শব্দের এক-একটি প্রদত্ত অর্থ ধরে ধরে এগোনো যাক।

'দ্যোতনাত্মক, দীপ্ত' **দেব**-পদবাচ্য এইজন্য যে, তারা 'দ্যুতি দেয়'। ইষ্ট দান করেন বলে 'ইষ্টদেবতা' **দেব**-পদবাচ্য হতেই পারেন। 'অমর' কেন **দেব**-পদবাচ্য, সে কী দেবন করে, আমরা জানি না। অতএব

ইনি **উর্ধ্বদেব**। 'ব্রাহ্মণ' মহর্ষিগণ এক কালে দেবন করতেন, সম্প্রদায়ের সদস্যগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেন, সেজন্য তাঁদের **দেব** বলা যেতেই পারে। আর, সেই ব্রাহ্মণদের উত্তরসূরিদের **দেব** উপাধি তো রয়েইছে, যথা 'নরেন্দ্র দেব'। অতএব তাঁরাও **দেব**-পদবাচ্য হতেই পারেন। 'রাজা', 'পূজ্য', 'প্রভু', 'মেঘ' এঁরা যে নানা বিষয় ও বস্তু দেন, তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং তাঁদের **দেব**-পদবাচ্য হতে আপত্তি নেই। '**ইন্দ্র**'কে আমরা আগেই দেখেছি। ইনি হলেন নানা স্তরের অস্তিত্বের আত্মোপলব্ধি। স্বভাবতই তিনি কেবল **দেব**-পদবাচ্যই নন, তিনি **দেবরাজ**। '**বিষ্ণু**', '**মহাদেব**' যে **দেব**-পদবাচ্য, সেকথা আমরা শব্দদুটির ভুক্তিতে গিয়ে জানতে পারি। কিন্তু 'পরমাত্মা', 'শিশু' কেন **দেব**-পদবাচ্য, আমরা জানি না। এঁরাও অতএব **উর্ধ্বদেব**। 'কায়স্থের উপাধি' রূপেও '**দেব**' শব্দটির প্রচলন দেখা যায়। নিশ্চয় কোনো কালে তাঁদের আদিপুরুষ দেবন করতেন, তাই এই **পদবী**। 'গুরু' আমাদের অনেক কিছুই দেন। সুতরাং **গুরুদেব** নামটির সার্থকতা বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু 'পারদ'কে কেন **দেব** বলে আমরা জানি না। সে কি 'পার দান করে' বলেই তাকে **পারদ** বলে? এটি নিম্নভাগের **দেব** সন্দেহ নেই।

এবার আসা যাক **দেবন**-এর কথায়। এর মানে বলা হয়েছে 'ক্রীড়া, পাশকক্রীড়া, দ্যূত, দীপ্তি, ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয়াদি, জিগীষা, স্তুতি, দ্যুতি, কান্তি, পাশক, পদ্ম, লীলোদ্যান।' **অক্ষ**ক্রীড়া ও **ক্রীড়া** শব্দে আমরা জেনেছি, 'ক্রয়বিক্রয়াদি' করাই **দেবন** করা। এপাশ থেকে পণ্য ওপাশে চলে যায় বলে, একে **পাশা**খেলাও বলে। এর দুটি সমান্তরাল বোধ কাজ করে। একটি **তর্পন**-এর মতো কোডরূপে, আর একটি **অন্তরীক্ষে**; অন্তরে ঈক্ষণ করে যাকে দেখতে হয়। অন্তরীক্ষের **দেবন** বা **দেওন** ক্রিয়াটিকে আমরা স্পষ্টরূপে চিনতে পারি ব্যবসার দুনিয়ায়, লেনদেনের দুনিয়ায়। এ-দুনিয়া বাহ্যিক চোখে ঠিকঠাক দেখা যায় না বলেই গরু-ছাগলেরা ব্যবসা দেখতে পায় না।

এবার **দেবা**-র কথায় আসা যাক। এর অর্থ বলা হয়েছে, এঁরা হলেন, 'দেব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দেবী, মেঘ।' এঁদের প্রত্যেকেই যে আমাদের অনেক কিছুই দেন, তাতে সন্দেহের কারণ নেই। শব্দগুলির ভুক্তিতে সেকথা আমরা বিশেষভাবে জানতে পারি।

দেবী শব্দের অর্থে জানান হয়েছে যে, 'দেবপত্নী, দুর্গা, সরস্বতী, সাবিত্রী, কৃতাভিষেকা রাজপত্নী, মহিষী, পূজ্যা, দ্বিজজাতিস্ত্রীর উপাধিবিশেষ, শ্যামাপক্ষী, হরীতকী, অতসী, দুর্ব্বা, শালপর্ণী, নাগরমুস্তা, রবিসংক্রান্তি, দেবীসদৃশী' — এগুলিই তার অর্থ। 'শ্যামাপক্ষী' থেকে 'নাগরমুস্তা' পর্যন্ত সত্তাগুলি কেন যে **দেবী**-পদবাচ্য, আমরা জানি না। তারা কী দেয়? কী দেবন করে? — না, এ-বিষয়ে রসায়নবিদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। অতএব, এগুলি নিম্ন**দেব**। 'কৃতাভিষেকা রাজপত্নী' থেকে শুরু করে 'দ্বিজজাতিস্ত্রীর উপাধি' পর্যন্ত প্রত্যেকটি শব্দই আমাদের নির্ব্বচনীয় মধ্য**দেব**-এর এলাকায় রয়েছে। এঁদের **দেবী** বলতে আপত্তি নেই এইজন্য যে, এঁরা কিছু না কিছু দেন। 'দেবপত্নী', 'দুর্গা', 'সরস্বতী', 'সাবিত্রী' — এঁদের **উর্ধ্বদেবী** রূপকে আমরা চিনি না, কিন্তু নির্ব্বচনীয় মধ্যরূপটিকে আমরা চিনতে পেরেছি। এঁরা জনসাধারণের (মহামায়ার) তিনটি রূপ। এঁরা অবশ্যই দেবন করেন। এঁদের **দেবী** বলতে আপত্তির কোনোই কারণ নেই। দ্র. **দেবতা**। যাই হোক, এখানে সংক্ষেপে মধ্য**দেব**-এর আরও কয়েকটি নমুনা দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এগুলির **উর্ধ্বদেব** বা **নিম্নদেব** রূপ থাকলেও, তাদের চিনে ওঠার যোগ্যতা এখনও আমরা অর্জন করতে পারিনি। যথা —

দেবকন্যা, দেবদুহিতা = অপ্সরা (ব.শ.) = আদি ফেরিওয়ালা।

দেবকুল্যা = আকাশগঙ্গা, অলকানন্দা (ব.শ.) = ব্যক্তিমালিকদের পণ্যপ্রবাহ।

দেবগায়ন = গন্ধর্ব্ব (ব.শ.) = আদিকালের ব্যবসা-সহায়ক সত্তা, একালের ভাষায় বিজ্ঞাপনী সংস্থা।

দেবগিরি = পর্ব্বতভেদ (ব.শ.) = ধনপতি-ব্যবসায়ীর সংস্থা।

দেবগুরু = বৃহস্পতি (ব.শ.) = ব্যবসায়বিশেষজ্ঞ, একালের ভাষায় বিজিনেস-অ্যাডভাইসার।

দেবতরু = মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ, হরিচন্দন, এই পঞ্চ স্বর্গীয় তরু; চৈত্যবৃক্ষ, অশ্বত্থ। (ব.শ.) = মন্দা সৃষ্টিকারী উৎপাদন সংস্থা, পারে পাঠানোর জন্য বা রপ্তানির জন্য উৎপাদনকারী সংস্থা, নকলকারী সংস্থা, পরিকল্পনামাফিক বস্তু উৎপাদনের সংস্থা, এবং ... না, 'হরিচন্দন'কে এখনও বোঝা যায়নি। চৈত্যবৃক্ষ ও অশ্বত্থকেও **দেবতরু** বলা হয়েছে। সেটি ঠিক নয়। দ্র. **অশ্বত্থ, চিতা**।

দেবদারু = দেবতাদের বা পুঁজিপতিদের একটি সংস্থা। এই সংস্থার দ্বারা অন্যদের বিদারণ করা যায়। দ্র. **দারু**।

দেবনদী = গঙ্গা (ব.শ.) = দ্র. **গঙ্গা**।

দেবভাষা = সংস্কৃতভাষা (ব.শ.) = ভারতে পণ্যবিনিময় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ক্রয়বিক্রয়াদির সুবিধার্থে নগরবাসী পণ্যজীবীরা **দেবনাগরী** লিপির জন্ম দেন। সেই লিপিতে যা লেখা হত, তা ভাষার সংস্কৃত-পাঠ মান্য করে লেখা হত বলে, পরে পরে তার নাম হয়ে যায় **সংস্কৃতভাষা**। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে **ভাষা** চার প্রকার — অভিভাষা, আর্য্যভাষা, জাতিভাষা, ও জাত্যন্তরী-ভাষা। প্রতিটি প্রচলিত ভাষাই সমাজের চার স্তরে — সর্বোচ্চ স্তর (অভিভাষা), প্রাতিষ্ঠানিক স্তর (আর্য্যভাষা), সাধারণ স্তর (জাতিভাষা), ও সীমান্ত স্তর (জাত্যন্তরী-ভাষা) — এই চার স্তরে খানিকটা ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয় বলেই তাদের এই নাম। এই চারটি ভাষার প্রতিটিই দুরকমভাবে পাঠ করা যায় — সংস্কৃত-পাঠ ও প্রাকৃত-পাঠ। **দেব**গণের ভাষাই অভিভাষা বা **দেবভাষা**, এবং তার সংস্কৃত-পাঠই অধিক। মোটকথা উচ্চমার্গের ধন-লেনদেনকারী ব্যবসায়ীদের (একালে যেমন শেয়ার বাজারের) ভাষাকে যেমন **দেবভাষা** বলা যায়, তেমনি উচ্চমার্গের জ্ঞান-লেনদেনকারী পণ্ডিতদের ভাষাকেও **দেবভাষা** বলা যায়। দ্র. **ভাষা**।

দেবযজ্ঞ = দেবসম্বন্ধী যজ্ঞ (ব.শ.) = যে উৎপাদন কর্মযজ্ঞ পণ্য বানিয়ে বিক্রি করার জন্য চালান হয়। একালে এর একটি নাম 'ক্যাশ-ক্রপ প্রডাকশান'।

দেবলোক = স্বর্গ (ব.শ.) = স্ব-র বা 'আমার বস্তু' অর্থাৎ

ব্যক্তিমালিকের পণ্য যেখানে গমন করে। অর্থাৎ, যে-লোকে বা 'স্ফেয়ারে' দেবন ক্রিয়া চলে — মার্কেটিং স্ফেয়ার। দ্র. **দিব**।

দেবস্ব = যাগাদিতে বিনিয়োগ হেতু যজ্ঞশীলের ধন (ব.শ.) = শিল্পপতির বিনিয়োগ-পুঁজি বা 'ফিনান্স ক্যাপিট্যাল'।

৬. ইংরেজিতে dev-যুক্ত অনেক শব্দই **দেব** শব্দের সগোত্র। তবে তাদের চেনার ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, পুঁজিবাদের বিকাশ কারও চোখে *dev*eloping কারও চোখে *dev*astating। তাছাড়া ইংরেজি divine যেমন রয়েছে, তেমনি ল্যাটিন deus, deo-ও রয়েছে।

দেবঋণ, দেবতর্পণ : দ্র. **ঋণ, তর্পণ**।

দেবকী (দেবক) : ১. ✓দিব্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী ঈ। ২. *গতিশীলভাবে দেবন করে যে।* ৩. দেবকরাজকন্যা কৃষ্ণজননী। (ব.শ.)। বিদর্ভরাজ আহুকের দুই পুত্র, দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের সাত কন্যার মধ্যে কৃষ্ণের মাতা দেবকী অন্যতমা। বসুদেব এই সাত কন্যাকেই বিবাহ করেছিলেন। উগ্রসেনের নয় পুত্র। তাদের মধ্যে কংস কৃষ্ণের বিরোধী। বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে আটটি পুত্র হয়। অষ্টম পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। ... পরে শ্রীকৃষ্ণের হাতে কংস নিহত হন এবং বসুদেব ও দেবকী কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। যদুবংশের ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর সময়ে বসুদেব ও দেবকী জীবিত ছিলেন। অর্জুনের হাতে যাদব নারীদের রক্ষার ভার দিয়ে বসুদেব যোগস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন এবং দেবকী তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের সহিত স্বামীর চিতায় সহমৃতা হন। (পৌ.অ.)। ৪. শব্দটি হিন্দিভাষীদের মধ্যে 'দেবকীনন্দন' বা 'দেওকীনন্দন' — এরকম নাম রূপে প্রচলিত। ৫. (দ্র. **দেব, দিব**)। এই সত্তাটি 'দেবক'-এর স্ত্রীরূপ। দেবক মানে ব.শ. জানিয়েছেন, 'ক্রীড়ক, দ্যোতক'। তার মানে, এই শব্দটি **দেব** ক্রিয়ার সমর্থক ও ধারক। মোট কথা, ভারতের ইতিহাসে পুঁজিবাদ যেভাবে শনৈঃ শনৈঃ বিকশিত হয়েছে, **দেবকী** তারই একটি অধ্যায়কে ধারণ বহন করে। **দেবক, দেবকী**র ইতিহাস বা পুরাণকাহিনীর অর্থ সম্পূর্ণ রূপে উদ্ধার করে নিতে পারলে, আমরা সেই ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে জানতে পারব।

দেবতা : ১. দেব + তা (তল্) স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. *দেব তারণের আধার যে; অর্থাৎ, দেব-দেব ব'লে দেয় যে।* / যিনি মন্ত্র দ্বারা স্তবনীয়। (ব.শ.)। ৩. দেব, অমর, দেবপ্রতিমা, ত্যজ্যমান দ্রব্যে উদ্দেশ্যবিশেষ, ইন্দ্রিয়, দেবভাব, দেবত্ব, মেঘ। (ব.শ.)। ৪. god অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **অগ্নিস্বাত্ত**। **দেব** আর **দেবতা** শব্দ দুটির সাহায্যে প্রায়শই একই সত্তাকে বোঝানো হয়ে থাকে। তাদের অর্থ খুব কাছাকাছি হলেও ফারাক আছে। যে সত্তা 'দেব-দেব (দেবো-দেবো)' বলে, সেই হল **দেব**। তার দিতে পারার শক্তি আছে, ইচ্ছা আছে, দিতেও পারে; কিন্তু দিয়ে ফেলেছে, এমন নয়। **দেবতা** কিন্তু শুধুমাত্র দেব-দেব (দেবো-দেবো) বলে ক্ষান্ত থাকেনি, দিয়ে দেয় বা দিয়ে দিয়েছে। তাই সে **দেবতা**। বলা যেতে পারে, **দেব**-এর ফলিত রূপ হল **দেবতা**।

যাই হোক, যে বা যারা মানুষকে কিছু দেয়, তাদের **দেবতা** বলার রীতি সুপ্রাচীন। সেই সুবাদে চিন্ময়লোকের অনির্বচনীয় **দেবন**-কারী **পরমাত্মা**-বাচক **মোক্ষদাতা** সত্তারা যেমন **দেবতা**-পদবাচ্য প্রতীয়মান হন, তেমনি **সমাজপরিচালক** রাজা-মহারাজা, ব্রাহ্মণ, গুরু প্রমুখেরাও **দেবতা** পদবাচ্য হয়ে যান; আবার দেওয়ার বদলে নেওয়ার অভ্যাসে অভ্যস্ত লেনদেনকারী দোকানদার-পাইকার প্রভৃতি পণ্যজীবীরাও **দেবতা** পদবাচ্য হয়ে যান। আরও অনেক প্রকারের **দেব**-পদবাচ্য রয়েছেন, যাঁদের আমরা ভালভাবে চিনতে পারি না। দ্র. **দিব, দিব্য, দেব**।

দেববর্ণিনী : ৩. ভরদ্বাজ মুনির কন্যা ও বিশ্রবার স্ত্রী। বিশ্রবা এঁর গর্ভে বৈশ্রবণ নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। বৈশ্রবণের অন্য নাম কুবের। ইনি দেবগণের ধনাধ্যক্ষ। প্রথমে লঙ্কা এঁর রাজধানী ছিল। পরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণকে লঙ্কার অধীশ্বর করে হিমালয়ের উত্তরে অলকাপুরীতে কুবের রাজধানী স্থাপন করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. মানবসমাজে ব্যাঙ্কের জন্মের ইতিহাস আধুনিক জ্ঞানজগতের জানা নেই। ভারতের ইতিহাসে তা রয়েছে পৌরাণিক কাহিনীতে। তাতে আদি-ব্যাঙ্ককে **কুবের** বলা হয়। এর অপর নাম 'বৈশ্রবণ'। এই বৈশ্রবণের জন্ম হয়েছিল **বিশ্রবার** ঔরসে **দেববর্ণিনী**র গর্ভে। এই সত্তা **দেবন** বা **দেওন**-এর বর্ণন ধারণ করতেন, তাই **দেববর্ণিনী**। এমন হতেই পারে যে, আদিব্যাঙ্কের আবির্ভাবের আগে এমন এক বা একাধিক সামাজিক সত্তা ছিল, যাদের কাজ ছিল লেনদেনের বিষয়গুলি মনে রাখা, এবং প্রয়োজনমতো সেগুলির বর্ণনা দেওয়া। তাঁদের সঙ্গে **বিশ্রবার** মিলনের ফলেই আদিব্যাঙ্ক বা **কুবের**-এর জন্ম হয়েছিল।

দেবব্রত : ২. *দেব ব্রত যাহার।* / ইন্দ্রাদিদেবে নিয়ম ও ভক্তি যাহার। (ব.শ.)। ৩. ভীষ্ম, দেবসম্বন্ধী কার্য্য। (ব.শ.)। রাজা শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গার গর্ভে বশিষ্ঠের শাপজাত দ্যু নামক বসু। পরবর্তীকালে ইনিই ভীষ্ম নামে পরিচিত হন। (পৌ.অ.)। ৪. অর্থহীন নামরূপে প্রচলিত। ৫. (দ্র. **অর্কব্রত, তপোব্রত, সত্যব্রত, ঋতব্রত**।) **ব্রত** কাকে বলে, সেকথাটি আগে জানা দরকার। সহজ করে বললে, যে কোনো একটি কর্তব্য 'বহন করে তার তারণ' ঘটানোই **ব্রত** পালন করা। যদি **অর্ক**-এর (আদি পাবলিক সেকটরের) একজন সদস্য রূপে কর্তব্য পালন করা হয়, তবে সে **অর্কব্রত**। যদি **তপ** বা শ্রম করেই জীবন অতিবাহিত করা হয়, তবে **তপোব্রত**। আর যদি **দেবন** বা দেওন করেই জীবন অতিবাহিত করা হয়, তবেই **দেবব্রত**। ভীষ্ম নিজের জীবন 'দিয়ে'ই সেকথা প্রমাণ করে গেছেন। অবশ্য পরবর্তীকালে **দেব** শব্দের যেরূপ অধঃপতন ঘটে, তাতে বিনিময়জীবী ব্যবসায়ী হয়ে জীবন কাটানোও **দেবব্রত** হয়ে যায়।

দেবযান : ২. *দেব-এর যাওয়া অন থাকে যাহাতে।* / যাহার দ্বারা দেবের গমন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. দেবরথ, বিমান, দেবপথ, অনাবৃত্তিফল অর্চ্চিরাদিমার্গ। (সত্য ক্ষমা দম অলোভ — এই চতুর্ব্বিধ দেবযান। তন্ত্রে পিঙ্গলা নাড়ী দেবযান।)। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত।

৫. যান শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল, 'যাওয়া অন থাকে যাহাতে'। স্বভাবতই এটি গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদি হতে পারে। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা কিন্তু দুই প্রকার **যান** দেখতে পেয়েছিলেন। এক প্রকার **যান**গুলি ছিল বাহ্যিক, যেগুলিতে আমাদের শরীরের 'যাওয়া অন' (on) থাকতে পারত। এগুলি ছিল গাড়ি, ঘোড়া, নৌকা ইত্যাদি। আর এক প্রকারের **যান** ছিল মানসিক, সেগুলিতে আমাদের মনের যাওয়া অন (on) থাকতে পারত। সেগুলি হল **দেবযান**, মহাযান, হীনযান, বজ্রযান, সহজযান, পিতৃযান ... ইত্যাদি দর্শন বা philosophy। তার মানে, বাহ্যিক গাড়ি-ঘোড়া ইত্যাদি যেমন **যান** হতে পারে, তেমনি মানসিক পন্থাও **যান** হতে পারে। **দেবযান** তেমনি এক প্রকার মানসিক পন্থা, যার উপর নির্ভর করে মানুষের জীবন'যাত্রা' অতিবাহিত হয়। এই **দেবযান** নাকি চার কামরার একটি গাড়ি, যার কামরাগুলির নাম — সত্য, ক্ষমা, দম, অলোভ। তবে, একথা মানতেই হবে যে, ইংরেজি philosophy শব্দের সঙ্গে তুলনা করলে এই **যান**গুলিকে মানুষের মানসবিহারের ক্ষেত্রে অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত শব্দ বলেই মনে হয়।

আমরা জানি, নিজ নিজ জীবনদর্শনের উপর নির্ভর করে প্রত্যেক মানুষের জীবন'যাত্রা' চলে। অশিক্ষিত মানুষ, পশুপাখি, গরুছাগল, কীটপতঙ্গদেরও একরকম স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক জীবনদর্শন থাকে। শুধুমাত্র গ্রহণ-বর্জন-পুনরুৎপাদন করে জীবন কাটিয়ে দেওয়াও একটি জীবনদর্শন, তাকে বলা হত **পিতৃযান**। দর্শনহীন কোনো জীবই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে না। মানুষের আদি জীবনদর্শন ছিল স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক এবং এক ও অখণ্ড। তাকে বলা হত **অধ্যাত্ম**। এই অধ্যাত্মবোধ খণ্ডিত হয়ে প্রথমে দুরকম এবং পরে পরে ক্রমান্বয়ে বহু রকমের খণ্ড অধ্যাত্মবোধের বা জীবনদর্শনের জন্ম দেয়। একালে সেই খণ্ডিত অধ্যাত্মবোধগুলিকে philosophy বলে। এগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি মানসিক **যান** রূপে ব্যবহৃত হতে পারার যোগ্যতা ধরে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই মানসিক **যান**গুলিকে এত গভীর ভাবে বুঝতেন যে, 'সহজিয়া-দর্শন'কে **সহজযান** বলে চিহ্নিত করতে তাঁদের কোনো অসুবিধাই হয়নি। তবে, এই জীবনদর্শনগুলি যেমনই হোক না কেন, এদের মূলে থাকে একধরনের **বিশ্বাস**। সেই বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের নামকরণ করা হয়। বৌদ্ধবিশ্বাসের একটি রূপকে বলা হত **মহাযান** এবং অন্য একটি রূপকে বলা হত **হীনযান**।

ভারতসমাজে, সম্ভবত সর্বাগ্রে, যে-মানসিক **যান**-এর প্রচলন হয়েছিল, তার নাম **দেবযান**। আদিযুগে এই **যান**-এর কদর ছিল সর্বাধিক। তাতে বিশ্বাস করা হত, **দেবন করা হবে**, দেওয়া হবে, কিন্তু পরিবর্তে কিছু নেওয়া হবে না। এভাবে ব্যক্তিমানুষের ও তাদের সমাজের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হলে, সেই হবে সার্থক জীবন। আদিতে **অসুর** ও **দেবতা** উভয়েই এই প্রকার **দেবযান**-এ আরোহন করে জীবন'যাত্রা' চালানোতেই বিশ্বাসী ছিলেন। পরে এই **দেবযান** দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। প্রথম ভাগটি ঘোষিতভাবে আগের মতোই থাকে, যদিও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ অনেকটাই বদলে যায়। এই মতের অনুসারী থেকে যায় **অসুর**রা। তারা আগের মতোই 'দেওয়ার পরিবর্তে কিছু নেওয়া হবে না' বলত, কিন্তু তারপর যেরকম **দেবন** করত, তার চেয়ে **দেবন**-এর বদলে যথাযথ দাম নিয়ে নিলে গ্রহীতার পক্ষে সুবিধাজনক হত; বিনিময়হীন দানের নামে মানুষকে অত্যাচার সইতে হত না। আর, দ্বিতীয় ভাগে বিশ্বাস করা হত, '**দেবন** করা হবে এবং পরিবর্তে কিছু নেওয়াও হবে'। এই পন্থার অনুসারী হয়ে পড়েছিল **দেবতা**রা। কিন্তু 'পরিবর্তের হার' ঠিক করবে কে? এই অনিশ্চয়তা গ্রহীতার জীবনকে ক্রমে ব্যতিব্যস্ত করে দিল। ফলে, পরবর্তী কালে **দেবতা**রাও তাদের সীমা অনায়াসে লঙ্ঘন করতে লাগল। **দেবযান** তার সমস্ত গৌরব হারিয়ে জনসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক **যান**-এ পরিণত হতে লাগল।

তার মানে, একসময় **দেবযান** দ্বিখণ্ডিত হয়ে অসুরস্বামিক-**দেবযান** ও ইন্দ্রস্বামিক বা সুরস্বামিক-**দেবযান**, এই দুরকম **দেবযান**-এ পরিণত হয়ে গেল। (দ্র. **ইন্দ্রধনু**)। জনসাধারণকে অসুরেরা ডাকতে লাগল, 'আমাদের বাসে উঠুন'; সুরেরা চেঁচাতে লাগল, 'আমাদের বাসে উঠুন'। শুরু হয়ে গেল **দেবাসুর-সংগ্রাম**। জনসাধারণ একবার এ-বাসের দিকে ছোটে, একবার ও-বাসের দিকে ছোটে!

প্রায় ২৫০০ বছর ধরে চলা এই ছোটাছুটি, অর্থাৎ, বৌদ্ধযুগের আগে থেকে চলা এই টানাপোড়েন, বর্তমানে আরও ভয়ানক জায়গায় এসে হাজির হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সুরস্বামিক-**দেবযান**-এর রমরমা বেড়েছিল এবং বিশ্বায়নের নামে 'সারা পৃথিবীতে কেবল সুরস্বামিক-**দেবযান**ই চলবে, অসুরস্বামিক-**দেবযান** অবশ্যত্যাজ্য' — এই কথা ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দশটা বছর যেতে না যেতেই মানুষ বুঝতে শুরু করে, দুটো **দেবযান**-এর কোনোটাই এখন আর চলবে না। অবিলম্বে নতুন মানসিক-**যানের** ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে এই লজ্‌ঝড়্ **দেবযান**-দুটিকে এক্ষুনি পরিত্যাগ করা যায়।

দেবযানী : ২. *দেবযান-এর গতিশীল আধার যে।* **৩.** শুক্রাচার্য্য-দুহিতা। ইনি কচের রূপে মোহিতা হইয়া, কচকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। কচ, গুরুকন্যা বলিয়া বিবাহ অস্বীকার করিলে, ইনি কচকে অভিশাপ দেন। কচও, 'ঋষিপুত্র তোমার পতি হইবেন না', বলিয়া ইঁহাকে শাপ দিয়া প্রস্থান করেন। একদা দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা তীরে বস্ত্র রাখিয়া স্নানার্থ জলে অবতীর্ণ হইলে, বায়ুবেগে বস্ত্র পরিবর্তিত হয় এবং একের বস্ত্র অন্যে পরিধান করেন। এইরূপ বস্ত্রপরিবর্তনজন্য বিবাদে শর্ম্মিষ্ঠা দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যান। মৃগয়ার্থী যযাতি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেবযানীকে উদ্ধার করেন ও শুক্রাচার্য্যের আজ্ঞানুসারে বিবাহ করেন। কর্ম্মফলে শর্ম্মিষ্ঠা দাসীরূপে দেবযানীর অনুগমন করেন। যদু, তুর্ব্বসু দেবযানীর পুত্র। (ব.শ.)।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের প্রথমা কন্যা। ... মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করার জন্য ... বৃহস্পতিপুত্র কচ শুক্রাচার্যের কাছে এসে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং গুরুর সেবা করতে থাকেন। ... অসুরেরা কচের অভিসন্ধি জ্ঞাত হয়ে তাঁকে হত্যা করে। তখন কচের প্রতি প্রণয়াসক্ত দেবযানীর কাতর প্রার্থনায় শুক্রাচার্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা তাঁকে পুনর্জীবিত করেন। ... তিনবার। ... সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করে কচ স্বর্গলোকে প্রস্থানোদ্যত হলে, কচের প্রতি প্রণয়াসক্ত দেবযানী তাঁকে

বিবাহ করতে চান। কিন্তু পূজনীয়া গুরুকন্যাকে কচ বিবাহ করতে অসম্মত হলে দেবযানী তাঁকে অভিসম্পাত দেন ... বিদ্যা নিষ্ফল হবে। ... এর উত্তরে কচও তখন দেবযানীকে অভিশাপ দেন যে, কোনো ব্রাহ্মণ-তনয় দেবযানীকে বিবাহ করবে না। ...

দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে দেবযানীর বন্ধুত্ব ছিল। একবার এঁরা দুজনে সহচরীদের সঙ্গে যখন জলক্রীড়ায় মত্ত ছিলেন, সেই সময়ে ইন্দ্র বায়ুরূপ ধারণপূর্বক সরোবরতীরস্থ দুই বান্ধবীর বস্ত্রগুলি মিশ্রিত করে দেন। ফলে, স্নানান্তে শর্মিষ্ঠা ভুলক্রমে দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন। এমত অবস্থায় দেবযানী শর্মিষ্ঠাকে সদাচারহীনা অসুরী বলে তিরস্কার করেন, এবং শর্মিষ্ঠাও ক্রুদ্ধ হয়ে দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্যকে শর্মিষ্ঠার পিতা বৃষপর্বার স্তাবক বলেন এবং দেবযানীকে ভিক্ষুকী বলে কটূক্তি করেন। তখন দেবযানী তাঁর বস্ত্র আকর্ষণ করায় শর্মিষ্ঠা তাঁকে এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করে স্বগৃহে প্রস্থান করেন। সেই সময় মৃগয়ারত রাজা যযাতি নিকটেই উপস্থিত ছিলেন। কূপমধ্যে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে তিনি দেবযানীকে উদ্ধার করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ... সংবাদ শুনে শুক্রাচার্য কন্যার কাছে উপস্থিত হন। ... সব শুনে তিনি বৃষপর্বাকে সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁর রাজ্য ত্যাগ করতে উদ্যত হন। তখন বৃষপর্বা তাঁকে অনুনয়-বিনয়ে সন্তুষ্ট করেন। তখন শুক্রাচার্য বলেন দেবযানীকে প্রসন্ন করতে। বৃষপর্বা দেবযানীকে প্রসন্ন হতে বললে, তিনি বলেন, সহস্র কন্যাসহ শর্মিষ্ঠা যদি দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকার করেন ও পিতা যেখানে তাঁর বিবাহ দেবেন, সেখানে শর্মিষ্ঠাও তাঁর অনুগামিনী হন, তবেই তিনি প্রসন্ন হবেন। শুক্রাচার্যের প্রসন্নতার জন্য শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসীত্ব স্বীকার করেন। ... মৃগয়ারত রাজা যযাতির সঙ্গে দেবযানীর পুনরায় সাক্ষাৎ হলে ... দেবযানী যযাতির নিকট বিবাহের প্রস্তাব করেন। যযাতি শুক্রাচার্যের বিনা অনুমতিতে এই অসবর্ণ বিবাহে সম্মত হতে চান না। ... কচের অভিশাপ স্মরণ করে শুক্রাচার্য বিবাহের অনুমতি দেন ও বলেন যে, এই বিবাহের ফলে কোনো সাংকর্যদোষ হবে না। পরে যযাতি ও দেবযানীর বিবাহ হয়। দেবযানীর সহিত সহস্র কন্যাসহ শর্মিষ্ঠাও তাঁর দাসীরূপে যযাতির গৃহে যান। শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে যযাতিকে সসম্মানে তাঁকে রাখতে বলেন, কিন্তু শয্যায় আহ্বান করতে নিষেধ করেন। কিছুকাল পরে দেবযানীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। শর্মিষ্ঠা তখন পুত্রকামনায় যযাতিকে আহ্বান করেন। শুক্রাচার্যের নিষেধ স্মরণ করে যযাতি অসম্মত হলে শর্মিষ্ঠা বলেন যে, দেবযানীকে বিবাহ করে যযাতি তাঁরও স্বামী হয়েছেন। তখন যযাতি তাঁর প্রার্থনা পূরণ করেন। এইরূপে ক্রমে যযাতির ঔরসে ও দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসু এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামক পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ... শুক্রাচার্য তখন যযাতিকে অভিশাপ দেন যে, এর ফলে তিনি অকালে জরাগ্রস্ত হবেন। যযাতির অনুনয়ে শেষে তিনি বলেন যে, যযাতি ইচ্ছা করলে অন্যকে তাঁর এই জরা দান করতে পারবেন। যযাতি ... তাঁর পুত্রদের তাঁর জরা নিতে বললে ... একমাত্র শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ছাড়া সকলেই অসম্মতি প্রকাশ করেন। যযাতি তখন অন্যান্য পুত্রদের অভিশাপ দিয়ে কনিষ্ঠ পুত্রকেই তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** অর্থহীন নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** অসুরগুরু **শুক্রাচার্য্য। তিনি যে জনগোষ্ঠীর পরিচালক,** সেই জনগোষ্ঠী **দেবযান-নীতির আধার, তাঁরা দেবযান** অবলম্বন করে জীবনযাত্রা **অতিবাহিত করেন। এদেরই বলা হত দেবযানী।** তবে কিনা, তাঁদের **অবলম্বিত এই দেবযান ছিল** অসুরস্বামিক-**দেবযান** এবং **স্বভাবতই অধঃপতিত।** মহর্ষি-পরিচালিত এই জনগোষ্ঠী যা কিছু উৎপাদন করত, তা গোষ্ঠির সকল সদস্যদের জন্য ভাগ করে দিয়ে দেওয়ার নীতি ঘোষিতভাবে মান্য করত বটে, কিন্তু বাস্তবে তা কার্য্যকরী করতে অনিচ্ছুক ছিল। মনে মনে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পদের আকাঙ্ক্ষা জন্মে গিয়েছিল এবং সেসময় সেই আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল, অথচ ঘোষিতভাবে অসুরস্বামিক-**দেবযান** নীতি মান্য করার কারণে ব্যক্তিগত সম্পদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত করার উপায় ছিল না। ফলে, তাদের অবস্থা ছিল 'পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ'। এই ছিল **দেবযানী** জনগোষ্ঠীর চরিত্র। **দেবযানীর** এই চরিত্র বর্তমান কালেও সুস্পষ্ট দেখা যায় সেই সব দেশনেতাদের মধ্যে, যাঁরা মুখে সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম-এর জয়গান করেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পুঁজির আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করতে থাকেন। তাঁদের পুঁজিবাদবিরোধী আচরণগুলি প্রায়শই সেই কাপুরুষদের মতো, নিজ নিজ কুলবধূতে যাদের নিষ্ঠা নেই, ওদিকে বেশ্যালয়ে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা থাকলেও সাহসে কুলোয় না; আর সেজন্যই তারা বেশ্যাবৃত্তিকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করে থাকে।

বলতে গেলে একইভাবে শুক্রাচার্য্যদুহিতা **দেবযানী** বৃহস্পতিপুত্র কচকে অভিশাপ দেয়। কিন্তু হলে কী হবে, তার সখী শর্ম্মিষ্ঠা **দেবযানী**কে ভিক্ষুকী এবং তার পিতা শুক্রাচার্য্যকে আপন পিতা বৃষপর্ব্বার স্তাবক বলতে কসুর করে না; যা দেখে মনে হয় এক ধনী-ক্ষমতাধর-কমিউনিস্টের মেয়ে দরিদ্র-তাত্ত্বিক-কমিউনিস্টের মেয়েকে হেনস্থা করছে। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি, বৃষপর্ব্বা ছিলেন **দনু**র পুত্র **দানব,** যে কিনা বৈদিক (সমাজতান্ত্রিক) নীতি ঘোষিতভাবে মান্য করলেও কার্যত সম্পদ আত্মসাৎ করা উচিত বিবেচনা করত। ফলে, পরিস্থিতি ছিল একেবারেই একালের তাত্ত্বিক সৎ-কমিউনিস্টের দরিদ্র কন্যার সঙ্গে ক্ষমতাধিষ্ঠিত অসৎ-কমিউনিস্টের ধনী কন্যার ঝগড়ার মতো। ...

এদিকে 'যেমন চলছে তেমন চলুক', এই **যযাতি** বা status-quo সত্তার সঙ্গে **দেবযানী**-জনগোষ্ঠীর 'বিশেষ রূপে বহনের চুক্তি' বা 'বিবাহবন্ধন' হয়। দানব বৃষপর্ব্বার কন্যাকে সে দাসী বানিয়ে তবে আরাম পায়। ... কিন্তু শেষমেষ দুই জনগোষ্ঠীই status-quo বা **যযাতি**র চালেই চলতে থাকে। এর অনিবার্য ফল হয় **যযাতির** অকালে জরাগ্রস্ত হয়ে পড়া। এবং শেষ পর্যন্ত আর কেউ নয়, শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র **পুরুই** সেই জরা গ্রহণ করে এবং এই অসুরব্যবস্থার উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। এই **পুরু** থেকেই পরে **কৌরব ও পাণ্ডব**দের জন্ম হয়েছিল। ...

দেবযোনি : **২.** *দেব-এর **যোনি** (নবরূপে যাওয়া গতিশীলভাবে অন) যে। /* দেব যোনি (উৎপত্তিতে আদিকারণ) যাহার। (ব.শ.)। **৩.** বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত — ইহারা দেবযোনি। দেবাংশক, দেবের উৎপত্তিস্থান।

(ব.শ.)। দেবতা হতে যাদের জন্ম। সংখ্যায় দেবযোনি দশটি। বিদ্যাধর, অপ্সরা ... — এরাই দেবযোনি; দেবতা ও মানুষের মধ্যবর্তী প্রাণী। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই শব্দটিকে খুব গোলানো হয়ে থাকে। কারণ, কে কার থেকে জন্মেছে, সংশয় তাই নিয়ে — গাছ আগে না ফল আগে! ব.শ. এদের বলেছেন 'দেবাংশক'। তার মতে, বিদ্যাধরাদি দশ দেবাংশকেরা দেবের উৎপত্তিস্থান। একথা খুবই স্পষ্টভাবে বলেছেন ব.শ. এবং তাঁর সেই বক্তব্যের ভিত্তিতে রয়েছে নির্ভরযোগ্য অমরকোষ-এর সমর্থন। অন্যদিকে পৌ.অ. বলছেন, এই দশ দেবযোনি জন্মেছে দেব থেকে। ...

কার্যত, একটি সুদীর্ঘ সামাজিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে — দক্ষ-যক্ষ-রক্ষ পেরিয়ে নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে (দ্র. **আশা, উত্তানপাদ**) — একসময় দেবাংশক সত্তাসমূহের জন্ম হয়। তার থেকে যেমন **দেব** জন্মায়, **দেব**-এর জন্মের পর সেই দেবাংশক সত্তাসমূহেরও ক্রমশ বাড়বৃদ্ধি হতে থাকে। অর্থাৎ, এরা পরস্পরের পরিপূরক। এরই আদি রূপটিকে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে এইভাবে — 'দেবতাদের জন্মের পূর্ব্বে অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছিল। তাহা হইতে আশার জন্ম হয়। তাহার পরে উত্তানপাদের জন্ম হইয়াছিল। ... অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন। হে দক্ষ! অদিতি যিনি জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা। তাহা হইতে ভদ্র ও অবিনাশী দেবগণ উৎপন্ন হইলেন।' (১০/৭২)।

উপরোক্ত বিদ্যাধরাদি দশ **দেবযোনি**র অর্থ পৃথকভাবে উদ্ধার করা দরকার। তা করতে পারলে, নিশ্চয় আমরা বুঝতে পারব, এরা কারা? কীভাবে এদের থেকে **দেব**গণের জন্ম হয়? এবং কীভাবেই বা একেবারে বিপরীতটা ঘটে। দ্র. **গন্ধর্ব্ব, কিন্নর**।

দেবরাত : ২. / দেব কর্ত্তৃক রক্ষিত যে। (ব.শ.)। ৩. পরীক্ষিৎ (কৃষ্ণ উত্তরার গর্ভ আবৃত করিয়া অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরঃ হইতে রক্ষা করেন বলিয়া পরীক্ষিৎ 'বিষ্ণুরাত', 'দেবরাত'।) বিশ্বামিত্রপুত্র। (ব.শ.)। (ক) অর্জুনের পৌত্র ও অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ। উত্তরার গর্ভবাসকালে অশ্বত্থামা ব্রহ্মশির অস্ত্রের বলে গর্ভস্থ শিশুকে বধ করতে উদ্যত হন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করেন। এইজন্য পরীক্ষিৎ 'দেবরাত' নামে পরিচিত হন। (খ) ইক্ষ্বাকুবংশীয় নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র দেবরাত। দক্ষযজ্ঞ পণ্ড করবার জন্য মহাদেব একখানি ধনু আকর্ষণপূর্বক দেবতাদের শিরশ্ছেদ করতে উদ্যত হন। কারণ তাঁরা মহাদেবকে যজ্ঞভাগ দিতে অস্বীকৃত হন। দেবতারা ভীত হয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হলে, তাঁর ক্রোধের উপশম হয়। তখন তিনি সেই ধনু দেবতাদের কাছে গচ্ছিত রাখেন। দেবতারা তা নিমির পুত্র দেবরাতের নিকট গচ্ছিত রাখেন। এই হর-ধনু ভঙ্গ করে রাম সীতাকে বিবাহ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্র.। ৫. দ্র. **পরীক্ষিৎ, নিমি**।

দেবর্ষি : ২. *যিনি দেব, তিনিই ঋষি।* / যিনি দেব ও মন্ত্রদর্শন হেতু ঋষিত্ব প্রাপ্ত (হইয়াছেন)। (ব.শ.)। ৩. **সুরর্ষি** — ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ। অঙ্গিরাঃ। কণাদাদি। তুম্বুরুভরতাদি। মহাদেব। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **ঋষি** শব্দের অর্থ থেকে আমরা জানতে পারি সাধারণভাবে **ঋষি** সাত প্রকার। তার মধ্যে এক প্রকার হল **দেবর্ষি**। এরা দেব-ক্রিয়া বা দেওয়া ক্রিয়া করেন, আবার ঋষি ক্রিয়াও করেন অর্থাৎ মনোলোকে চাষাবাদও করেন। অতি প্রাচীন কালে এঁদের যে-গৌরব ছিল, পরে আর তা থাকে না। কেননা, **দেবন** করা ও **ঋষ্** করা, দুটো কাজই ক্রমে অধঃপতিত হয়ে যায়। ফলে, নারদাদি ঋষিকে যখন আমরা পাচ্ছি, তখন দোকানদারির ঝগড়াটে স্বভাবকেও আমরা তার মধ্যে পেয়ে যাচ্ছি। 'নারদ নারদ' বলে ঝগড়া লাগানোর যে বোধ জনসাধারণ্যে আজও কমবেশি প্রচলিত রয়েছে, তা সেই বোধেরই উত্তরাধিকার। অথচ, এক কালে মহত্তম মনচাষা ঋষি, যিনি তাঁর চাষের ফসলকে অকাতরে জনসাধারণকে দিয়ে দিতেন, **দেবর্ষি** শব্দে তাঁদেরই বোঝাত।

দেবল (দেউল, দেউলিয়া, দেউল্যা) : ২. *দেবল = দেব-এর লালন-লয়ন যাহাতে।* ***দেউল*** *= দিশাগ্রস্ত গতিশীল দান নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে লালিত বা লয়প্রাপ্ত হয় যেখানে।* ***দেউলিয়া (দেউল্যা)*** *=* ***দেউল*** *যাহার সর্ব্বস্ব লইয়াছে।* / **দেবল** = যে জীবিকার্থ দেব গ্রহণ করে। (ব.শ.)। ৩. **দেবল** = দেবাজীব, দেবদ্রব্যোপজীবী ব্রাহ্মণ, প্রতিমাপরিচারক, ধার্ম্মিক, নারদমুনি, মুনিবিশেষ (ইনি ব্যাসশিষ্য, অসিতমুনির পুত্র। ইনি রম্ভাশাপে অষ্টাবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। (ব.শ.)। মহর্ষি অসিতের পুত্র এক মুনিবিশেষ। ইনি বেদব্যাসের শিষ্য এবং পাণ্ডবদের কুলপুরোহিত ধৌম্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রম্ভার অভিশাপে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ও অষ্ট অঙ্গ বক্র হয়ে 'অষ্টাবক্র' নামে অভিহিত। ... দেবল জৈগীষব্যের কাছে মোক্ষধর্ম গ্রহণ করে সিদ্ধিলাভ করেন। মহর্ষি অসিতদেবল হিমালয়পত্নী মেনকার অন্যতমা কন্যা একপর্ণাকে বিবাহ করেন। ইনি **'অসিতদেবল', 'দেবল', 'অসিত'** — এই তিন নামে খ্যাত। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. সবার আগে বলে নেওয়া দরকার যে, দেবল, **অসিত, অসিতদেবল**, অষ্টাবক্র.— একই সত্তার চারটি নাম। তায় আবার অষ্ট বক্রতার কারণ দুরকম, পিতা কহোড়ের অভিশাপ (দ্র. **অষ্টাবক্র**) এবং রম্ভার অভিশাপ। ফল একই। এঁর স্ত্রী **একপর্ণা**। তাঁর দিদি **একপটলা** হলেন **জৈগীষব্যের** স্ত্রী, আর বোন **অপর্ণা** হলেন মহাদেবের **উমা**। কম কথা নয়! অতএব এই **দেবল**কে বুঝতে হলে **অসিত, অসিতদেবল, অষ্টাবক্র, জৈগীষব্য** — এদের প্রত্যেককে জানা দরকার। জানা দরকার, **দেবাজীব**কেও। কারণ, ব.শ. **দেবল** শব্দের প্রথম অর্থই দিয়েছেন 'দেবাজীব'।

এইগুলি জেনে নিলে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নজরে এসে যাবে — ক) যে হিংসাযুক্ত ধর্ম্ম ত্যাগ করে, তাকে বলা হত **সিত**। আর, যে-সত্তা হিংসাযুক্ত ধর্ম্মও ত্যাগ করে না, তাকে বলা হত **অসিত**। **সিত** থেকে **অসিত** তুলনামূলকভাবে মন্দ। এই হিংসাকারী **অসিত**-এর সঙ্গে যোগ ঘটে **দেবল**। কে সে? দেবদ্রব্য উপজীবিকা যাহার, তাকে বলা হত **দেবল**। ব.শ. স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, 'যে জীবিকার্থ দেব গ্রহণ করে' সেই হল **দেবল**। এই **দেব**-গ্রহণ মানে কী হতে পারে?

যেহেতু **দেবদ্রব্য** তিন ধরনের দ্রব্যকে বোঝায়, এই **দেবল** স্বভাবতই তিনরকম জীবিকার তিনটিই কিংবা যে-কোনো একটি গ্রহণ করে জীবিকা চালাত — জনসাধারণের জন্য প্রদত্ত বস্তুসমুদয়ের

কিছু অংশ নিয়ে নিত; অথবা, সরাসরি পণ্যবিনিময়ের কাজ করত; কিংবা, মন্দিরে প্রদত্ত বস্তুসমুদয় গ্রহণ করত। যেভাবেই সে জীবিকা অর্জন করুক না কেন, তার অগ্রগতি ব্যক্তিমালিকানা তথা পণ্যজীবিতার দিকে; এবং নিঃসন্দেহে তা ছিল বেদবিরোধী। এর সঙ্গে জৈগীষব্য-এর যোগ বিষয়টিকে আরও হিংস্র করে দেয়। ...

এই হিংসা শেষমেষ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল, সে ইতিহাস এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু জনমানসে তার যে ছায়াটি উত্তরাধিকার হিসেবে থেকে গেছে, তাকে এখনও সবাই চিনতে পারে। তা হল **দেউলিয়া, দেউলে, দেউল্যা** প্রভৃতি শব্দের উত্তরাধিকার। **দেবল**-এর খাঁই মেটাতে মানুষ সর্বস্বান্ত না-হয়ে থাকলে বাংলাভাষীর মনের গভীরে এমন স্মৃতির ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আর সেকারণেই ব.শ. থেকে শুরু করে কোনো অভিধানই শব্দ তিনটির সঙ্গে মন্দিরের ও bankrupt হওয়ার কোনো সম্পর্কই খুঁজে পায়নি, কিছু কল্পনার বাজে খরচ ছাড়া।

দেবসেনা : ৩. সাবিত্রী-গর্ভজাত প্রজাপতির কন্যা। এঁর অন্য নাম ষষ্ঠী। ইনি মাতৃকাশ্রেষ্ঠা ও শিশুপালিকা। এঁর ভগিনীর নাম দৈত্যসেনা। একদা কেশীদানব এঁকে হরণ করে। ইন্দ্র তখন এঁকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র দেবসেনাপতি কার্তিককে বলেন যে, এই কন্যার জন্ম না হতেই স্বয়ম্ভু এঁকে আপনার স্ত্রী বলে নির্দিষ্ট করেছেন। কার্তিক এঁকে বিবাহ করেন। ব্রাহ্মণরা এঁকে ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, আশা, সুখপ্রদা ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. আধারশক্তিরূপিণী জনগোষ্ঠীকে যে একটি কন্যার নামে চিহ্নিত করা হত, এবং জনশক্তির আধারকে বর্ণনা করার এই রীতিই যে প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, 'বেতনভুক সৈন্যবাহিনী'কে **দেবসেনা** নামে এক কন্যা বলা তারই এক সাক্ষাৎ প্রমাণ। **দেবসেনা** বিষয়ে পৌরাণিক অভিধানের উপরোক্ত বয়ানেই বাকি কথাগুলি বলা আছে। দ্র. **ষষ্ঠী**।

দেবহুতি (দেবহূতি) : ৩. ইনি স্বয়ম্ভুব মনুর কন্যা ও প্রজাপতি কর্দমের স্ত্রী। মহর্ষি কর্দম এঁর পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে এঁকে দিব্যজ্ঞান দান করেন। ইনি অরুন্ধতী প্রভৃতি নয়টি কন্যা ও মহর্ষি কপিলের মাতা। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কর্দম**।

দেবাঙ্গনা : ২. / দেবের অঙ্গনা। (ব.শ.)। ৩. দেবযোষিৎ, অপ্সরা। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দেবাঙ্গনা শব্দটি অপ্রচলিত হলেও **অপ্সরা** বা অপ্সরা শব্দটি এখনও বেশ প্রচলিত। **দেবযোনি** শব্দে আমরা যে দশপ্রকার **দেবযোনি**র সাক্ষাৎ পেয়েছি — বিদ্যাধর, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত — **অপ্সরা** তন্মধ্যে দ্বিতীয়। এই সত্তাও একপ্রকারের দেবাংশক। এই সত্তাটিকে স্বর্গবেশ্যাও বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ হল আদি দোকানদার সত্তার প্রকৃতি রূপ। পুরুষ রূপটিকে পাওয়া যায় **কর্ণ**-তে। (সৃ ক্রিয়ায় **অপ্সরা** দেখুন)।

দেবাজীব (দেবাজীবী, দেবাজীবিন্) : ২. / দেব আজীব যাহার। (ব.শ.)। ৩. দেবল। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দেবল**।

দৈব, দৈবজ্ঞ, দৈবাৎ : ১. দেব = দেব + অ (অণ)। দৈবজ্ঞ = দৈব + ✓জ্ঞা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। দৈবাৎ = দৈব + আৎ। (ব.শ.)। ২. *দৈব = দিব হইতে জাত। দৈবজ্ঞ = দৈব বিষয়ে জানেন যিনি। দৈবাৎ = দৈব-এর আধার হইতে তারণ থাকে যাহাতে।* / **দৈব** = দেব হইতে আগত। **দৈবজ্ঞ** = যিনি গ্রহোৎপাত-প্রশমনাদির বিষয়ে জানেন। (ব.শ)। ৩. **দৈব** = দেবসম্বন্ধী, দেবভাবসম্পন্ন, 'সত্ত্বপ্রধান', দেবে সম্ভব, অলৌকিক, অত্যদ্ভুত, দেবকর্তৃক, দিব্য, স্বর্গীয়, আকাশভব, পূর্বজন্মকৃত পৌরুষ, দানফল, দেবতারাধন, হোমাদি, শ্রাদ্ধবিশেষ, দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ, দেবতা। **দৈবজ্ঞ** = জ্যোতিষিক, গণক, গণনোপজীবী বিপ্র, গ্রহাচার্য্য, সঙ্কীর্ণজাতিবিশেষ। **দৈবাৎ** = দৈববশে, হঠাৎ। (ব.শ.)। ৪. about god অর্থে **দৈব**, astrologer অর্থে **দৈবজ্ঞ**, এবং suddenly অর্থে **দৈবাৎ** প্রচলিত। ৫. জীব থেকে যেমন জৈব হয়, তেমনি **দিব** থেকে **দৈব** হয়। আগেই বলা হয়েছে, যেহেতু গতিশীলতার (ই-কারের) পুনরাবৃত্তি চললে তা দিশাগ্রস্ত (এ-কার) হয়ে যায়, তাই **দিব** থেকে **দেব** হয়; এবং তার থেকে **দৈব** হওয়ার কথাই বলা হয়ে থাকে। এবার **দেব** শব্দের অর্থরূপে যদি প্রতিদানহীন দানকারী সত্তাদের বোঝানো হয়, তাহলে **দৈব** শব্দের অর্থ হয়ে যাবে ঊর্ধ্বদেবগণের (দ্র. **দেব**) এলাকা। স্বভাবতই **দৈবজ্ঞ** ও **দৈবাৎ** দুটোই আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। এবার যদি **দেব** শব্দের অর্থ বিনিময়কারী **দেব** ভাবা হয়, তাহলে **দৈব** হয়ে যাবে মার্কেটিংয়ের দুনিয়া, **দৈবজ্ঞ** হয়ে যাবেন অর্থনীতি-বিশেষজ্ঞ এবং **দৈবাৎ** শব্দের মানে হয়ে যাবে 'ধনপতির কৃপা হইতে'। দ্র. **অনুদ্যূত, ঘট, ঘটনাচক্র**। যেহেতু **দেবন** করার একটি উপাদান হল **ঘট** বা পণ্য, এবং **ঘটন** চালান মানেই পণ্য উৎপাদন করে বাজারে ছাড়তে থাকা, যিনি **ঘটনাচক্র** হিসাব করতে

একালে তাঁদের বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ বলে, সেকালে তাঁদের যথাক্রমে দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষী বলা হত। **ঘটনাচক্রে** কোনো কিছু হাতে এসে গেলে তাকে বলা হত **দৈবাৎ**।

দিশ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিদেশ, অদেশ, অনাদিষ্ট, অনাদেশ, অনির্দিষ্ট, অনির্দেশ্য, অন্বাদেশ, অব্যপদেশ্য, আদিষ্ট, আদেশ, আদেশক, আদেশকর, আদেশকারী, আদেশন, আদেশানুযায়ী, আদেষ্টা, আনখা, আনদেখা, উদ্দিষ্ট, উদ্দেশ, উদ্দেশ্য, উপদিষ্ট, উপদেশ, উপদেষ্টা, একদেশ, এদিক, ঔপদেশিক, দিক্ (দিশ্), দিক, দিককন্যা, দিককামিনী, দিককরী, দিককুঞ্জর, দিকচক্র, দিকদন্তী, দিকদাহ, দিকদেশ, দিকপতি, দিকপদ, দিকপাল, দিকবারণ, দিকবিজয়, দিকবিদিক, দিকভোলা, দিকশত, দিকশূল, দিকি, দিকিন, দিকু (বিপ - সন্তাল, সাঁওতাল), দিক্ষু, দিগ, দিগন্ত, দিগন্তর, দিগম্বর, দিগম্বরা, দি(দী)গর, দিগাড়িম্ব, দিগাদিগ, দিগাম্বর, দিগার, দিগীশ, দিগীশ্বর, দিগ্গজ, দিগদর্শন, দিগ্দিগন্ত, দিগ্দিগ(গা)ন্তর, দিগ্বধূ, দিগ্বলয়, দিগ্বসন, দিগ্বস্ত্র, দিগ্বাণ, দিগ্বাস, দিগ্বাসাঃ, দিগ্বাহ, দিগ্বিজয়, দিগ্বিদিক(গ), দিগ্হস্তী, দিঙ্নাগ, দিঙ্মণ্ডল, দিঙ্মাত্র, দিঙ্মুখ, দিঙ্মূঢ়, দিঙ্মোহ, দিশ্, দিশ, দি(দী)শই, দিশপাশ (দিসপাস), দিশা, দিশাবিশা, দিশামিশা, দিশার, দিশারি, দিশাহারা, দিশি, দিশী, দিশে,

দিশ্য, দিষ্ট, দিষ্টি, দিষ্ট্যা, দিস, দীগ, দীগর, দৃশ্য, দেদীপ্যমান, দেখা, দেশ, দেশক, দেশকার, দেশকারী, দেশকাল, দেশকালজ্ঞ, দেশকালপাত্র, দেশজ, দেশ-দেশান্তর, দেশধর্ম্ম, দেশপালী, দেশবরাড়ী, দেশব্যবহার, দেশভাষা, দেশরূপ, দেশা, দেশাকা, দেশাখী, দেশান্তর, দেশান্তরী, দেশিক, দেশিত, দেশিনী, দেশী, দেশীয়, দেশোয়ালী, দেশ্য, দেষ্ঠ, দৈশিক, দৈষ্টিক, নিরুদ্দেশ, নির্দ্দিষ্ট, নির্দ্দেশ, প্রদেশ, প্রদেশন, প্রদেশনী, প্রদেশিনী, প্রাদেশিক, বিদিশা, বিদেশ, যথাদেশ, সন্দেশ, সমুদ্দিষ্ট।

দিশ্ = গতিশীল দানের (শক্তিরূপে) বিচ্ছুরণ। **দিশ** = গতিশীল দানের (শক্তিরূপে) বিচ্ছুরণ যাহাতে।

দিক্, দিগ্, দিশ্ (দিশা, দৃশ্য, দেখা — এ শব্দগুলি পরে আবার থাকবে) : ৫. সবাই জানেন, একটি বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত আলো আমাদের দৃষ্টিতে এসে পড়ে বলেই বস্তুটিকে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সেটি কীভাবে ঘটে, তা একটু বিস্তারে বোঝা দরকার। বস্তু থেকে বিচ্ছুরিত আলোকশক্তির অজস্র কিরণরেখা সূর্য্যকিরণের মতো সবদিকে সমভাবে গতিশীল থাকে। (**শ্** বর্ণের অর্থে আমরা জেনেছি, 'সবদিকে সমভাবে শক্তির' ইত্যাকার 'বিচ্ছুরণ'কে শ্ বলে।) তারই এক বা একাধিক কিরণরেখা আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে বলেই আমরা দশজন বস্তুটির দশদিকে বসে বস্তুটিকে একইসময়ে একইসঙ্গে একইরকম দেখতে পাই। বস্তুর থেকে বিচ্ছুরিত সর্বদিকগামী আলোকশক্তির এই কিরণরেখাগুলি ধরে চলমান কিরণ-প্রেরণকেই বলা হয় **দিশ্** বা 'গতিশীল দানের শক্তিরূপে বিচ্ছুরণ'। (কয়েকটি রেখায় কিরণ-প্রেরণকে দেখলে তাকে বলতে হবে **দিষ্** এবং একটিমাত্র কিরণরেখায় কিরণ-প্রেরণকে পৃথকভাবে দেখলে, তাকে বলতে হবে **দিস্** বা 'dis-'।)

যে বস্তু থেকে **দিশ্** ক্রিয়া চলতে থাকে, তা দ্রষ্টার পক্ষে মন্দ-ভাল দুটোই হতে পারে। মন্দ হলে কী হয়, তার উত্তরাধিকার বাংলা-ভাষায় রয়েছে **দিক্**-করা, **দেশ্য, দেষ্ঠ** শব্দে; রয়েছে আরবি ভাষায় **দিক্**-করা, **দিগ্**-করা বা বিরক্ত করায়; আর রয়েছে ইংরেজির dis-যুক্ত অজস্র শব্দে (disable, disburse, discard, discharge ... ইত্যাদি)। আর, ভাল হলে দ্রষ্টার তরফে সেটিই তার **দিশা** হয়ে যায়। কারণ, '**দিশ্**-এর আধার'কেই (দ্রষ্টার) **দিশা** বলে। এমনকি, তাকেই দ্রষ্টার চোখে-দেখা **দৃশ্য**ও বলা হয়ে থাকে। কেন এবং কীভাবে — সেকথায় আসছি।

বস্তু থেকে বহির্গত এরকম আলোকশক্তির চলমান কিরণরেখা তো সবসময়ই বিচ্ছুরিত হচ্ছে; কিন্তু তাতেই আমাদের দেখার কাজটি সম্পন্ন হয়ে যায় না। **দিশ্**-এর অন্ততপক্ষে একটিও কিরণরেখা আমাদের (**অশ্**-কারক) **অক্ষি**তে পড়া চাই। আর সেরকম হলেই দ্রষ্টার দৃষ্টি সচকিত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ, কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই, দ্রষ্টার অক্ষির **অশ্**-করণে 'গতিশীলতা দান করা' (= **দিক্**) হয়ে যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে অক্ষির **অশ্** ক্রিয়ার **দিক** (= দিশ্-এর প্রতি দৃষ্টির 'গতিশীলতা দান কৃত' হয়ে যায় বা) নির্ণীত হয়ে যায়। এতক্ষণ ধরে যে-সত্তা **দিশ্** করে চলছিল, **দিক্** (= বিরক্ত) করছিল, সেটিই তখন দ্রষ্টার দ্রষ্টব্য বা **দিক** হয়ে যায়। ফলে, কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই, অক্ষিস্বামীর বা দ্রষ্টার দৃষ্টি চলে যায় **দিশ্**-কারী বস্তুটির দিকে। 'গতিশীল দৃষ্টিশক্তির' এই 'গমন'কে **দিগ্** বলে। এবং দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তির এই গতিশীল গমন বা **দিগ্** যার 'দিকে' যায়, সেই **দিশ্**-কারী **দিশ্**-আধারই দ্রষ্টার **দিগ্**-এর **দিশা** হয়ে যায়। (ক্রিয়ার বদলের কারণেই যে কেবল **দিক্** পরিণত হয় **দিগ্**-এ, তা নয়। অন্য শব্দের সঙ্গে সন্ধিকালে আমাদের জিহ্বাও এই পরিবর্তনকে সমর্থন করে থাকে।)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, **দিশ্**-কারী সত্তাটি দ্রষ্টার নজরে পড়ার পরই সেই **দিশ্** পরিণত হয়ে যায় দ্রষ্টার **দিক্**-এ; অর্থাৎ, (বস্তুর কেন্দ্রকে 'ক' এবং দ্রষ্টার অক্ষি-ছিদ্রকে 'খ' ধরলে) ক-বিন্দুর বিচারে যা **দিশ্** ছিল, খ-বিন্দুর বিচারে সেটিই **দিক্** হয়ে গেল। দ্রষ্টা এ**দিক্**-ও**দিক্**-সে**দিক্** থেকে **দিক্**-এ **দিক্**-এ চোখ ফেরায়, প্রতিটি **দিক্**-এর অন্ত বা **দিগন্ত** জুড়ে তার **দিক্**-চক্র গড়ে ওঠে।

বাংলায় এই **দিক্** শব্দটি **দিশ্** থেকে জাত শব্দ রূপেই প্রচলিত। এই **দিশ্**-কারী **দিশাই** একসময় **দিশা** থেকে **দৃশ্য** হয়ে যায়। দ্রষ্টার দৃষ্টিশক্তি দ্রষ্টব্য বস্তুর সমস্ত কিরণরেখাগুলিকে যদি **ছুঁয়ে ছুঁয়ে** যায়, যদি কিরণবিচ্ছুরণকারী বস্তুটিকে তার সবদিক থেকে ঘুরে ঘুরে দেখে, তখন একদিকে যেমন দ্রষ্টব্য তার আপন '**শক্তিবিচ্ছুরণ**'কে '**আবর্ত্তনশীল**' করে ফেলে, তেমনি যে দেখে তার দেখা কার্যত '**আবর্ত্তনশীল দৃষ্টিশক্তির বিচ্ছুরণ**' হয়ে যায়। আর সেকারণেই এই যুগপৎ ক্রিয়াটি দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য উভয়ের দিক থেকে হয়ে যায় '**দৃশ্**' করা। যাকে বধ করা হয় তাকে যেমন বধ্য বলে, তেমনি যাকে **দৃশ্** করা হয়, তাকে **দৃশ্য** বলে। বস্তুর নিজেকে দেখানোর এই যে সতত চেষ্টা, **দৃষ্ট** (dress, drest) হবার চেষ্টা, তাকেও **দৃশ্য** বলা যেতে পারে। তবে তার উত্তরাধিকার বাংলার নেই, রয়েছে ইংরেজির। dress করা বা **দৃশ্** করার মানেই ছিল নিজেকে **দৃশ্য**বস্তু হিসেবে উপস্থিত করা।

তবে যেহেতু বস্তুর **দিশ্** দ্রষ্টার কাছে গিয়ে তার দৃষ্টিশক্তি-ক্ষেপনের **দিক্** ঠিক করে দেয়, সেই কারণে সংস্কৃত ভাষায় লোকন করা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় — পশ্যতি ও দ্রক্ষ্যতি বা দৃশ্যতে। দুটির মধ্যে বাংলা কেবল দ্রক্ষ্যতির দিকটি বেছে নিয়ে সেটিকে নিজের মতো করে বদলে নিয়ে 'দেখ্' (= একদিশায় গতিশীল-দানের করণস্থিতি) বা 'দেখা' করে নিয়েছে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, দ্রক্ষ্যতিই **দেখায়** পরিণত হয়ে গেছে।

বিষয়টিকে অন্যভাবেও বোঝা সম্ভব। **অক্ষির অশ্** থেকে বা ব্যাপক হওয়ার জন্য গমন থেকে জাত হয় **আশ** (= যাওয়ার বা গিয়ে পৌঁছে **দিশ্**-কারী বস্তুটিকে পাওয়ার ইচ্ছা)। তার আধারকে **আশা** বলে, **দিক**ও বলে। এই **দিক**-এর **দিকে** তাকানো বাংলায় 'দিকি' ('বল্ দেখি ...' বা 'বল্ দিকি ...') জাতীয় শব্দের জন্ম দিয়েছে। ... এসব থেকে মনে হয়, বাংলা-শব্দবিদগণ যেভাবেই হোক বুঝেছিলেন যে, দ্রষ্টাই প্রধান, দ্রষ্টব্য বস্তু অপ্রধান। ওদিকে 'পশ্য' এবং 'দৃশ্য' শব্দের মধ্যে দ্রষ্টব্য বস্তুটিই প্রধান, দ্রষ্টা অপ্রধান। সংস্কৃত দুদিক থেকেই লোকন-ক্রিয়াটিকে নজর করেছিল। বাংলাভাষীদের সেকথাটি মনে ধরেনি। তাই তারা **দিক্**-কেই প্রধান করে নেয়।

এর পরও কিছু কথা আছে। মানুষের দিক্ জ্ঞানের জন্ম হল কখন এবং কীভাবে? কেন অধিকাংশ মেয়েরাই দিক্‌জ্ঞান ঠিকঠাক অর্জন করতে পারে না? (দ্র. 'Men Can't Listen & Women can't read maps' by Allen Pease and Barbara Pease)। গরুছাগল পশুপাখিদের কি দিক্‌জ্ঞান আছে? পূর্ব-পশ্চিম প্রভৃতি দশ দিকের জ্ঞানই কি মানুষের 'দিক্-দিশাজ্ঞান'-এর শেষ কথা। আজকাল বাজেট ঘোষণার পরে যে খবরের কাগজে লেখা হয় 'দিশাহীন বাজেট', এই বাজেটেরও কি তবে দিক্‌জ্ঞান থাকে?

আসলে দিক্‌জ্ঞান দুরকম — বাহ্যিক (পার্থিব) ও মানসিক। **দিশ্** এসে দৃষ্টিমান জীবের **দিক্** ঠিক করে দিলে, সে বিশেষ দিকে যেতে শুরু করে। তখনই তার অন্য-অন্য **দিক্**গুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। এভাবেই সকল জীবের বাহ্যিক **দিক্**জ্ঞান গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অন্য জীবেরা তাদের বাহ্যিক **দিক্**জ্ঞান কে-কতখানি অর্জন করতে পেরেছে, তার কথা এখন অপ্রাসঙ্গিক। মানুষ যে তাদের বাহ্যিক **দিক্**জ্ঞান দশ দিক — পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-বায়ু-অগ্নি-ঈশান-নৈর্ঋত-উর্ধ্ব-অধঃ — পর্যন্ত প্রসারিত করতে পেরেছে, সেকথাই বিবেচ্য। (দ্র. **অধঃ**)। অবশ্য যে মানুষেরা অধিক প্রকৃতিগুণসম্পন্ন, দেখা যায় তাঁদের বাহ্যিক **দিক্**জ্ঞান তুলনামূলকভাবে কম।

মানসিক **দিক্**জ্ঞান কেবলমাত্র মানুষেরই রয়েছে বলে মনে করা হয়। সেই সুবাদে মানুষের সমাজেরও দিক্‌দিশা থাকে। সরকারের যে বাজেট কোনো বিশেষ দিকে যাচ্ছে না, তাকেই বলা হয় 'দিশাহীন বাজেট'। এরকম মানসিক '**দিক্**'-এর জন্মের কথা পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো ইতিহাস বা ঐতিহাসিকরা জানেন না; কিন্তু ভারতের ইতিহাস ও ইতিহাসকারগণ জানতেন।

ঋগ্বেদ সাক্ষ্য দেয়, 'অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছিল, তাহা হইতে **আশার** জন্ম হয়। ... **উত্তানপাদ** হইতে **দিক্** হইল।' (১০/৭২) তার মানে, সমাজে কারুশিল্পের আবির্ভাবের আগে, মানবসমাজের কোনো **দিক্**জ্ঞান ছিল না। কোন বিশেষ দিকে সমাজ বিকশিত হয়ে এগোয় বা এগোতে পারে, সে বিষয়ে সমাজপরিচালকদের কোনো ধারণা ছিল না। কেননা, তার আগে কোনো কিছু পাওয়ার **আশা**র জন্ম হওয়া জরুরি ছিল, সেই **দিক**-এ যাওয়ার কামনার জন্ম হওয়া জরুরি ছিল। ঋগ্বেদ বলছেন, কারুশিল্পের আবির্ভাবের পরই মানবসমাজের **দিক্**জ্ঞান হয়, সে দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে সে একটি বিশেষ **আশার দিকে** চলেছে। একে বলা হয় **দক্ষিণ** দিক। এ কিন্তু south দিক নয়। এ হল ক্রমশ দক্ষের দিকে চলা, স্পেশালাইজেশনের দিকে চলা। ... আমাদের মনে হয়েছে, নেচার প্রত্যেক জীবেরই প্রজাতিগত অগ্রগতির বিশেষ **দিক্** নির্ধারিত করে রেখেছে, এমনকি মানুষেরও। মানুষের জন্য নেচারের নির্দিষ্ট করা সেই **দিক্**টিকে সঠিকভাবে চিনে নিয়ে সচেতনভাবে সেই দিকেই এগোনোর চেষ্টা করা ভাল। অন্যথায় মানবসভ্যতার ক্ষতির সম্ভাবনা থেকেই যায়। **৬.** ইংরেজি dis-যুক্ত অজস্র ইংরেজি শব্দ। তাছাড়াও dictum, dictation, dress, drest ... ইত্যাদি।

আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ, সন্দেশ : দ্র. **দেশ**। (নিম্নে দেখুন)।

উদ্দেশ, উদ্দেশ্য : দ্র. **দেশ**। (উৎ-ক্রিয়ায় একবার আলোচিত হয়েছে। এখানেও তার **উল্লেখ করা হয়েছে**।)

দিক্ (দিশ্) : **১.** দিক্ = ✓দিশ্ + ক্বিন্ (০) - কর্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***দিক্*** = *গতিশীল (কোনো কিছুর) দান করণ (থাকে যাহাতে)।* ***দিশ্*** = *গতিশীল (কোনো কিছু) দানের শক্তিবিচ্ছুরণ (থাকে যাহাতে)।* / **দিক্** = যাহা অবকাশ দেয়। (ব.শ.)। **৩. দিশ্** = আদেশ, কথন, নির্দেশ, দান। **দিক্** = স্থান, ইঙ্গিত, প্রকার, পক্ষ (side), সঙ্কেত দর্শিত বিষয়, দিক্‌সংখ্যানুসারে দশ (১০) সংখ্যা, শ্রোত্রাধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, দন্তক্ষত, ভাগ, অভিমুখ ভাগ, খরচের বিভাগ। **৪.** towards অর্থে প্রচলিত। **৫.** উপরে দ্র. **দিক্, দিশ্, দশদিকপাল**। **৬.** ইংরেজি *des*tination।

দিগন্ত : **১.** দিক্ + অন্ত = **দিগন্ত**। **৫. দিক্**-এর অর্থাৎ দৃষ্টির গতিশীল (চলন) দানের অন্ত হয় যেখানে, সেই স্থানটিকে বলে **দিগন্ত**।

দিগ্বিজয় : **১.** দিক্ + বিজয় = দিগ্বিজয়। **৫. দিক**-এর উপর বিজয় লাভ করা হয় যে আচরণে, তাকে **দিগ্বিজয়** বলে। কিন্তু **দিক** তো একটি নয়, মানুষের বাহ্যিক দিক কমপক্ষে দশটি এবং মানসিক দিক কত, তার হিসেব নেই। **দিগ্বিজয়** শব্দটি সেই সমস্ত দিককে জয় করা বোঝায় না। একটি দিক বা অনির্দিষ্ট সংখ্যক দিককে জয় করা বোঝালে, শব্দটি হত 'দিগ্‌জয়'। এতে 'বিজয়' কথাটি রয়েছে। কেউ আক্রমণ করলে তার বিপরীতে জয়ের কথা রয়েছে **দিগ্বিজয়** শব্দে। তার মানে, যে যে **দিক** থেকে **দিশ** (dis-) এসে 'দিক্' (= বিরক্ত) করেছিল, *dis*turb করেছিল, সেই সেই দিককে জয় করাকেই **দিগ্বিজয়** বলে।

দিকু : **২.** *দিক নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **৫.** কোনো বাংলা অভিধানে শব্দটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। মেদিনীপুর-পুরুলিয়া অঞ্চলের সাধারণ বাংলাভাষীরা অনেকেই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। সেখানে তাঁরা জানেন, সাঁওতালরা অ-সাঁওতালদের **দিকু** নামে অভিহিত করেন। অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন, মানুষের দুটি জাতি — আদিবাসী (= সাঁওতাল ইত্যাদি) ও দিকু। তার মানে, **দিকু** শব্দটি তথাকথিত-সভ্যমানুষদের বোঝাতে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। আমাদের বিচারে, **দিকু** শব্দটির অর্থ অনেকটাই আরবি 'দিক্' ও ইংরেজি 'dis-' শব্দের মতো। ইতোপূর্বে **দিশ্** শব্দের ভাল-মন্দের যে-কথা বলা হয়েছে, তার মন্দের অর্থটি সর্বোচ্চে ধরা রয়েছে এই **দিকু** শব্দে।

মানবসমাজে **দক্ষের** (= স্পেশালাইজেশনের) মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর, যারা তা মেনে নিল, দক্ষদের ভাষায় তারা হয়ে গেল 'সভ্য', 'ভদ্র' ... ইত্যাদি। আর, যারা তা মানল না, দক্ষরা তাদের গালাগালি দিতে লাগল 'অসভ্য', 'বর্ব্বর' ... ইত্যাদি ব'লে। আদি (মহেঞ্জদারো ইত্যাদি) নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ভেঙে নতুন গ্রামসভ্যতার প্রতিষ্ঠা হল। স্বভাবতই দক্ষদের প্রতিষ্ঠিত ওই (মন্দিরকেন্দ্রিক) গ্রামসভ্যতায় দক্ষকথিত 'অসভ্য'রা যোগ দিল না, নগরকেন্দ্রিক

ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পর সবাই যেমন ইতস্তত পাহাড়-জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা সেভাবেই থেকে গেল।

কিন্তু দক্ষ যাদের 'অসভ্য' নাম দিল, তারা দক্ষদের কী নাম দিয়ে চিহ্নিত করেছিল? যতদূর অনুমান করা যায়, তারা প্রথম প্রথম দক্ষদের নাম দিয়েছিল **দিকা**। কেননা, এই দক্ষসমাজ বিশেষ দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল এবং অতএব **দিক**-এর আধার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যখন সেই দক্ষদের গ্রামসমাজ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভের পর অসভ্যদের ভূমি ও সম্পদের দিকে হাত বাড়াল, তখন 'অসভ্য'রা দেখল, এই দক্ষসমাজ তো কেবল **দিশা**গ্রস্ত বা **দিক্**গ্রস্ত **দিকা**ই নয়, সে তো উল্টে তাদের উপর আক্রমণ করছে! **দিক** বা 'দিক্'-কারী (বিরক্তকারী, দিশ্-কারী, disturb-কারী) নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে **দিকু** হয়ে গেছে! অতএব, দক্ষের বিপরীত পক্ষেও একটি দোষারোপের বা ঘৃণার ভাষার জন্ম হয়ে গেল। দক্ষ-'সভ্য'রা এতদিন যাদের 'অসভ্য' বলে নিন্দা করত, গালাগালি করত, এবার তারাই সেই 'সভ্য'দের গালাগালি করতে লাগল **দিকু** ব'লে, নিন্দা করতে লাগল **দিকু** ব'লে।

দিগ্‌গজ, দিগ্‌হস্তী, দিঙ্‌নাগ (দিক্‌পতি, দিক্‌পাল, দশ-দিক্‌পাল) : ২. ***দিগ্‌গজ, দিগ্‌হস্তী, দিঙ্‌নাগ*** *= দিক্ রক্ষা করে যে গজ বা হস্তী বা নাগ।* ***দিক্‌পতি, দিকপাল*** *= দিকের পতি বা পালক যে।* ৩. **দিগ্‌গজ, দিগ্‌হস্তী** = দিগ্‌রক্ষক হস্তী, ঐরাবত-প্রভৃতি, শ্রেষ্ঠার্থ, প্রধান, (সাদৃশ্যে) মহাকায়, আট (৮) এই সংখ্যা। **দিঙ্‌নাগ** = দিগ্‌রক্ষক হস্তী, দিগ্‌গজ, কালিদাস-প্রতিপক্ষ দিঙ্-নাগাচার্য্য। (ব.শ.)। **দশদিক, দশদিকপাল** = পূর্ব্ব, অগ্নি, দক্ষিণ, নৈর্ঋত, পশ্চিম, বায়ু, উত্তর, ঈশান, ঊর্দ্ধ, ও অধঃ — এই দশ দিক্; ইঁহারা ব্রহ্মার কন্যা। ইঁহারা যথাক্রমে ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের, ঈশান, ব্রহ্মা, ও অনন্ত এই দশ দিক্‌পাল দ্বারা রক্ষিত হন। **দিক্‌পতি, দিক্‌পাল** = দিগধীশ্বর গ্রহ। পূর্ব্বাদি দশদিকের রক্ষক ইন্দ্র ... (থেকে) ... অনন্ত পর্যন্ত দশজন। সূর্য্য, শুক্র, মঙ্গল, রাহু, শনি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি পূর্ব্বাদিক্রমে অষ্ট দিকের অধীশ্বর এই আট। যে ব্যক্তি বিলক্ষণ ক্ষমতাপন্ন হয় এবং অনেকের উপর আধিপত্য করে তাদৃশ ব্যক্তি দিক্‌পাল শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। **দিঙ্‌নাগ** = দিগ্‌গজ, দিকের নাগ (গজ)। (ছা.অ.)। **দিক্‌পাল** = ... ঐরাবত পূর্বদিক, পুণ্ডরীক অগ্নিকোণ, বামন দক্ষিণদিক, কুমুদ নৈর্ঋতকোণ, অঞ্জন পশ্চিমদিক, পুষ্পদন্ত বায়ুকোণ, সার্বভৌম উত্তরদিক, ও সুপ্রতীক ঈশানকোণ রক্ষা করেন। **দশদিকপাল** = দশ দিকের অধীশ্বর। এই দেবতারা দশ দিক রক্ষা করেন। ইন্দ্র পূর্বদিক, অগ্নি অগ্নিকোণ, যম দক্ষিণদিক, নির্ঋত নৈর্ঋতকোণ, বরুণ পশ্চিমদিক, মরুৎ বায়ুকোণ, কুবের উত্তরদিক, ঈশ ঈশানকোণ, ব্রহ্মা ঊর্ধ্বদিক, অনন্ত অধোদিক। (পৌ.অ.)। ৪. কেবলমাত্র **দিগ্‌গজ** শব্দটি ঠাট্টাচ্ছলে ব্যবহৃত হয়; এছাড়া অন্য শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অষ্টদিগ্‌গজ, অষ্টচণ্ডী** ইত্যাদি। দ্র. **উত্তর, দক্ষিণ**। এই বিষয়টি একটি পৃথক গবেষণার অপেক্ষা রাখে। কেননা, আমাদের পূর্বসূরী শব্দবিদগণ কেবল দশদিকের নামকরণই করেননি। সেই দশ দিকের রক্ষকদের নামকরণও করে গেছেন। সম্ভবত পরে ঐ দশ দিকের মধ্যে ঊর্দ্ধ ও অর্ধ এই দুই দিকের গুরুত্ব কমে যায়। তখন যা কিছু আলোচনা, তা সবই হয় আট দিক্ নিয়ে। ইতোপূর্বে **অষ্টচণ্ডী, অষ্টতারিণী, অষ্টদিক্‌পাল, অষ্টদিগ্‌গজ, অষ্টদিগ্‌বাহু, অষ্টনাগ, অষ্টনায়িকা, অষ্টনিধি** প্রভৃতি শব্দে বিষয়গুলি কমবেশি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর সঙ্গে আট রকম সামাজিক সংগঠন (অষ্টকুলগিরি, অষ্টকুলাচল) ইত্যাদির অর্থ একত্রে নিয়ে পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করা দরকার। ...

দিশ (দিক্) দিশা : ১. ✓দিশ্ + ক্বিন্ (০) - কর্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দিশ্*** *= গতিশীল শক্তিবিচ্ছুরণ (থাকে যাহাতে)।* ***দিক্*** *= গতিশীল (কোনো কিছুর) দান করণ (থাকে যাহাতে)।* ***দিগ্*** *= গতিশীল (কোনো কিছুর) দানের গমন (যাহাতে)।* / **দিক্** = যাহা অবকাশ দেয়। (ব.শ.)। ৩. **দিশ্** = আদেশ, কথন, নির্দ্দেশ, দান; দিক্, দিগ্‌বোধ, কাণ্ডজ্ঞান। **দিক্** = স্থান, দেশ, ইঙ্গিত, প্রকার, পক্ষ (side), সঙ্কেত দর্শিত বিষয়, দিক্‌সংখ্যানুসারে দশ (১০) সংখ্যা, শ্রোত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতা, দন্তক্ষত, ভাগ, অভিমুখ ভাগ, খরচের বিভাগ। **দিশা** = দিক্, দিঙ্‌নির্ণয়, নির্দ্দেশ, সঙ্কেত, কর্তব্যনির্দ্ধারণ, দিগ্‌ভ্রম, মূঢ়তা, লক্ষ্যে স্থিরতা, ধুয়া। (ব.শ.)। ৪. towards অর্থে প্রচলিত। ৫. **দিশ্** ক্রিয়ার শুরুতে **দিক্, দিশ্** ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

দেশ (দেশ্) : ১. দেশ = ✓দিশ্ (নির্দ্দেশ) + অ (ঘঞ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দেশ্*** *= দিশাগ্রস্ত-গতিশীল দানের শক্তিবিচ্ছুরণ।* ***দেশ*** *=* ***দেশ্*** *থাকে যাহাতে; যে এক দিশায় চলেছে।* / **দেশ** = পৃথিবীর যে-অংশে একজাতীয় ও একভাষাভাষী লোকের বাস থাকে। (ছা.অ.)। ৩. **দেশ** = ভূগোলাংশ-বিশেষ, সমুদায়জনপদ, বিষয়, জনপদ, জনপদৈকদেশ, প্রদেশ, রাষ্ট্র, রাজ্য, স্থান, অংশ, ভাগ, অবয়ব, পুণ্যস্থান, কুরুক্ষেত্রাদি, রাগবিশেষ, সমীপ। (ব.শ.)। ৪. country অর্থে অধিক প্রচলিত, space অর্থেও প্রচলিত। ৫. ছিপ ফেলে মাছধরা ও জাল ফেলে মাছধরার মধ্যে ফারাক আছে। ছিপে একবারে একটিই মাছ পড়ে। কিন্তু জালে একবারে অনেক মাছ পড়ে, পড়তে পারে। যাঁরা সমুদ্রে মাছ ধরেন, তাঁরা জানেন, বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে বিশেষ জাতের মাছের ঝাঁক ঘোরাফেরা করে এবং সেখানে জাল ফেললে সেই মাছের ঝাঁক-কে-ঝাঁক ধরা পড়ে। প্রতীকী শব্দার্থবিধিতে ছিপের মতো একটি শব্দে একটিই মানে ধরা দেয়; অর্থাৎ, একটিমাত্র বিষয় বা বস্তুকে সে নির্দেশ করে। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে জালে মাছ ধরার মতো একটি শব্দে অনেক মানে ধরা দেয়; অর্থাৎ, বহু বিষয় বা বস্তুকে সে নির্দেশ করে; একটি বিশেষ চরিত্রের ক্রিয়াকারী সত্তার ঝাঁক ধরা পড়ে একটি মাত্র শব্দের উচ্চারণে। আপনি **অজ** উচ্চারণ করলেন, 'নেই জনন যাহাতে', তেমন চরিত্রের সমস্ত সত্তার ঝাঁক ধরা পড়ে গেল আপনার **অজ** শব্দোচ্চারণে। আপনি **অজ**-পদবাচ্য ব্রহ্মা থেকে ছাগল পর্যন্ত অনেককে একসাথেই পেয়ে গেলেন। (দ্র. **অজ**)।

কিন্তু এমন তো হতেই পারে, যে, ধরা পড়া সকল **অজ**কে আপনি চেনেন না! অথচ আপনার 'অজ'-উচ্চারণের শ্রোতা ভাবতেই পারে, আপনি সকল **অজ**কেই চেনেন! সেক্ষেত্রে শ্রোতার সন্দেহ

হতে পারে, আপনি কি এত বেশি জ্ঞানী! অর্থাৎ, আমাদের সন্দেহ হয়, শব্দসৃজনকারী আমাদের পূর্বসূরীগণ কি এত জ্ঞানী ছিলেন? তাঁরা এক-একটি শব্দে যাদের চিহ্নিত করা যায়, তাদের সবাইকে চিনতেন?

ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে গিয়ে প্রায়শই এই সংশয় দেখা দেয়। শব্দসৃজনকারী আমাদের পূর্বসূরীগণ তাঁদের উচ্চারিত শব্দের দ্বারা যাদের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করা যেতে পারে, তাদের সবাইকেই চিনতেন — এমন কথা ভাবতে যথেষ্ট দুঃসাহস লাগে। তবে, সত্যিই তাঁরা সবাইকে চিনতেন কি না, আমরা সে-বিতর্কে যাইনি। আমরা কেবল এই সত্যটুকু বুঝবার চেষ্টা করেছি যে, তাঁদের উচ্চারিত শব্দ কাকে কাকে নির্দেশ করবার ক্ষমতা ধরত। আর সে-কাজ করতে গিয়েই আমরা দেখছি, সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে সত্যের সদ্য-আবিষ্কারে আপ্লুত, সেই সত্যকেও জানার ও জানানর ক্ষমতা ধরত প্রাচীনকালের শব্দসৃজনকারীদের শব্দগুলি; পার্থক্য এই যে, তাঁদের জানা ছিল অব্যক্তরূপী (tacit) এবং একালের বৈজ্ঞানিকদের জানা ব্যক্তরূপী (explicit)। আর, এই বিষয়ের সবচেয়ে ভাল উদাহরণ ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে উদ্ধার করা **দেশ** শব্দটির মানে।

শৈশব থেকে অধিকাংশ বাংলাভাষী 'দেশ-কাল-পাত্র' শব্দবন্ধটি শুনে আসছেন। আজকাল অবশ্য কথাটি একটুখানি বদলে গিয়ে হয়েছে 'স্থান-কাল-পাত্র'। এই **দেশ**-এর অর্থ অনেকে বোঝেন place, কেউবা বোঝেন space। আমরা একে space-time বলেই চিনতে শিখেছিলাম। তারও একটু কার্য্যকারণ ছিল — 'যার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই এবং যে-সত্তা সর্বত্র বিরাজমান, সেই যদি ঈশ্বর হয়, তবে এই দেশ-কাল বা space-time-ই ঈশ্বর' — এই ব'লে নাস্তিকেরা মোক্ষম তর্কে আমাদের পরাস্ত করতেন। কিন্তু পাত্র?!

না, আধুনিকতাবাদী নাস্তিকেরা **পাত্র**কে পাত্তা দিতেন না। কারণ, ইয়োরোপ তখনও পাত্রকে দেখেনি। আর, ইয়োরোপ যাকে দেখেনি, আধুনিকতাবাদীরা তাকে দেখবেন কীভাবে! তাই পাত্রের কথা তাঁরা সরাসরি নাকচ করে দিতেন। এমনকি আইনস্টাইনও মনে করতেন — আমরা থাকি না-থাকি, এই পৃথিবী, এই space-time আছে এবং থাকবে। আইনস্টাইনের মতো মানুষের মুখে এমন কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি তুলেছিলেন — আমরা না-থাকলে ওসব কিছুই থাকে না; কেননা তাদের দেখার জন্য সুপাত্র কুপাত্র কাউকে তো থাকতে হবে! নইলে তারা থাকলেও নেই! বাঙালী-রবীন্দ্রনাথের সেকথায় আইনস্টাইনের বিশ্বাস হয়নি। (রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন সাক্ষাৎকার দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে, নতুন যুগের কোয়ান্টাম-বিজ্ঞানীরা মঞ্চে এসে আইনস্টাইনের সামনেই ঘোষণা করে দিলেন — আমরা না-থাকলেও যাদের থাকার কথা আইনস্টাইন বলছেন, তারা কিন্তু কেউই থাকে না, যদি-না participator রূপে কোনো না কোনো সত্তা থাকে! অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের **পাত্র**কে ইয়োরোপ খুঁজে পেয়ে গেল তাদের মতো করে। এই participator বা **পাত্র** না-থাকলে পৃথিবী থাকে না, space-time, **দেশ-কাল** কেউই থাকে না।

আইনস্টাইনের মতো উচ্চচিন্তাকারী উত্তম-অধিকারীদের স্তরেই হোক আর যোদো-মোধোদের মতো নিম্নতম-চিন্তাকারী নিম্ন-অধিকারীদের স্তরেই হোক, **দেশ-কাল-পাত্র** সর্বদা একত্রেই থাকে। ধরা যাক, চুক্তি ছিল যোদো মোধোকে ১০০ টাকা দেবে; কিন্তু কোথায় দেবে, কখন দেবে? ১০০ টাকার পাশে এই দেশ-কাল না থাকলে সবটাই অবান্তর। অর্থাৎ কিনা, প্রতিটি অস্তিত্বের পাশে সদা সর্বদা **দেশ-কাল সংলগ্ন থাকে**, অন্যথায় অস্তিত্বটিই অসম্ভব। আমাদের সমস্ত কথার পেছনে **দেশ-কাল-পাত্র** সবসময় প্রেক্ষিত হিসেবে উপস্থিত থাকে বলেই আমাদের প্রত্যেকটি কথার মানে হয়; অন্যথায় সব কথাই বাজে কথায় পরিণত হয়ে যেত। এই তিন সত্তাকে ছাড়া যেমন গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই মিথ্যা, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে সমস্ত ধারণাও মিথ্যা। অতএব বোঝাই যাচ্ছে, 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ' — কথাটি রবীন্দ্রনাথ অনেক ভেবেই বলেছিলেন। কারণ, পান্না সবুজ হলেও হতে পারে, যদি আমি তাকে বিশেষ স্থানে বিশেষ সময়ে দেখি। বিশেষ স্থান-কালে আমি না থাকলে পান্নাই থাকে না, তার সবুজ হওয়া না-হওয়ার তো প্রশ্নই থাকে না। যাই হোক, এখানে আমরা শুধু **দেশ** নিয়েই কথা বলব। **কাল** ও **পাত্র**কে পাওয়া যাবে তাদের নিজ নিজ ভুক্তিতে।

দেশকে দেখতে পায় **পাত্র**। আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণ **দেশ**কে কেমন দেখেছিলেন? দেখেছিলেন, সে একমুখী, বিশেষ দিশার দিকে চলেছে; তাই **দেশ**। কিন্তু **দেশ**-এর এই স্বভাবের কথা প্রাচীন ভারতবাসী জানলেও আধুনিক বিশ্বের সবাই ভুলে গিয়েছিল। এমন সময় এলেন আইনস্টাইন। আইনস্টাইন বললেন — হ্যাঁ, space তো বাঁকাই, যেন-বা কোনো গতিশীলতার দিশার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে তার এই গতিশীল দিশাগ্রস্তভাব! অতএব, মহর্ষি আইনস্টাইনের দৌলতে ইয়োরোপ **দেশ**কেও তার স্বরূপে আবিষ্কার করে ফেলল।

কিন্তু **দেশ**-এর এই বাঁকা বা দিশাগ্রস্ত-গতিশীলভাব তো শব্দটির ভিতরেই ঢুকিয়ে রেখে গেছেন প্রাচীন শব্দকারেরা। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির বিচারে **দেশ** শব্দের মধ্যেই তার ওই স্বভাবের কথা বলা আছে, অনেক পরে আইনস্টাইন যা আবিষ্কার করে আমাদের বলছেন। তার শব্দতাত্ত্বিক প্রমাণ (যা আমরা একটু পরেই দাখিল করব) বাদ দিলেও উত্তরাধিকার সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায়। **দেশ** শব্দের যে-ব্যবহার বাংলাভাষায় আজও প্রচলিত রয়েছে, তার ভিতরেও কথাটি নানাভাবে বলা আছে।

গ্রামবাংলায় এখনও মা-মাসীরা বহিরাগতকে শুধোন, 'তুমি কোন দেশের লোক, বাছা!' এই প্রশ্ন তাঁরা এমনকি পাশের জেলার লোককেও জিজ্ঞাসা করেন। শুধু তাই নয়, গ্রামবাংলা থেকে যাঁরা কলকাতা শহরে চাকুরি করতে আসেন, তাঁরাও বলেন, 'সাতদিনের ছুটিতে দেশে যাচ্ছি।' অর্থাৎ **দেশ** বলতে অ্যাকাডেমি যেমন country বা state বোঝে, তাঁরা তেমন বোঝেন না। তাঁরা **দেশ** বলতে ঠিক কী বোঝেন, সেকথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলতেও পারেন না। অনেক তত্ত্বতালাশ করার পর অবশেষে আমরা তাঁদের মর্মকথা যেটুকু বুঝেছি, তা হল, আসলে তাঁরা সেই ভূমিকেই **দেশ** বলে মনে করেন, 'যে ভূমিতে (তা সে পার্থিবভূমি ও মনোভূমি যাই হোক) বসবাসকারী মানুষেরা একই ভাষা-সংস্কৃতি অনুসরণ করে একই দিশার উদ্দেশে

এগিয়ে চলেছে'। আর, এদিকে আমরা অবাক হয়ে দেখি যে, **দেশ** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ আমাদেরকে ঠিক ওই অবস্থানেই নিয়ে গিয়ে হাজির করছে! তার মানে, বাংলার মা-মাসীদের মনে **দেশ** বলতে যে-ভাবনা অন্তর্লীন থাকে, শব্দসৃজনকারী আমাদের পূর্বসূরীদের শব্দবিজ্ঞানের বিচার-বিবেচনাতেও সেই ভাবনা বিধৃত ছিল! সেই ভাবনাই যুগের পর যুগ বাহিত হয়ে হয়ে আজও গ্রামবাংলার মানুষের মনের গভীরে টিকে রয়েছে! উভয় ক্ষেত্রেই **দেশ** শব্দের ভিতরে 'দিশাগ্রস্ত ভূমি'র ধারণাটি আজও অটুট।

যাই হোক, উত্তরাধিকারের সাক্ষ্য অনুসারে, যে সত্তা বিশেষ দিশার দিকে চলেছে, দিশাগ্রস্ত তেমন স্থানকে **দেশ** বলে। space নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে, স্পেস বা দেশ মাত্রেই দিশাগ্রস্ত। **অর্থ** শব্দের অর্থে যে 'জনপদ অধ্যুষিত ভূভাগ'কে আমরা পাই, সেই **দেশের** জনসাধারণও বিশেষ দিশায় দিশাগ্রস্ত থাকেন। তাই সেই 'জনপদ অধ্যুষিত ভূভাগ'কে **দেশ** বলে। যে জনসাধারণ বৌদ্ধ বা ইসলাম দর্শনে বিশেষ দিশা দেখছে এবং সেই দিকে চলেছে, তাদের অস্তিত্বও তাই দেশ-পদবাচ্য। দর্শন, ধর্ম্ম, **উপদেশ** প্রভৃতি 'চিন্তাধারা' মাত্রেই যে মানুষকে বিশেষ দিশায় দিশামুখী করে, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বলে রাখা ভাল, এমনকি বৌদ্ধযুগেও '**দেশ**' শব্দটি তার অন্তর্নিহিত অর্থে জীবন্তরূপে প্রচলিত ছিল; বুদ্ধ **দেশন** করতেন, লোকে বুদ্ধের সেই **দেশনা** শুনতে যেত। আর সেই মূল **দেশ**-এর সহযোগী **দেশনা**গুলি পাওয়া যেত বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদের কাছে, সেগুলিকে বলা হত **উপদেশ**। বর্তমানে **দেশ** শব্দটি ইংরেজি country অর্থে সীমিত হয়ে গেছে।

দিশ শব্দের অর্থে আমরা জেনেছি — ি = গতিশীল, দ্ = দান, শ্ = (শক্তিরূপে) বিচ্ছুরণ, অ = যাহাতে; অর্থাৎ, 'গতিশীল দানের (শক্তিরূপে) বিচ্ছুরণ যাহাতে'। এই গতিশীলতা (= ই-কার) যদি একদিকে ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ, গতিশীলতা যদি একমুখী বা দিশাগ্রস্ত হয়ে যায়, তাহলে একধরনের স্থিতিশীলতার (অ-কার) দ্বারা গতিশীলতা দূষিত হয়; **শ** ঝুঁকে যায় **ষ**-এর দিকে। (উপদেশ > উপদেষ্টা)। আর, তখন ই-কারের সঙ্গে অ-কারের মিশ্রণ ঘটে যায় এবং ি-কার পরিণত হয় ে-কারে; **দিশ** পরিণত হয় **দেশ**-এ। স্বভাবতই এই **দেশ** একমুখী (বা দিশাগ্রস্ত) গতিশীলতায় প্রদত্ত কোনো-না-কোনো শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটাতে থাকে। আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণ **দেশ** শব্দটিকে 'দিশাগ্রস্ত-গতিশীল ভূ-শক্তিবিচ্ছুরণ' ও 'দিশাগ্রস্ত-গতিশীল ভূ-শক্তিবিচ্ছুরণ দান' — এই দুই অর্থে ব্যবহার করেছিলেন বলেই মনে হয়। একে 'মনের পায়ের তলায় মাটি যোগানো'ও বলা যেতে পারে। সেই সুবাদে **দেশ** শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ দাঁড়ায় — 'দিশাগ্রস্ত-গতিশীল ভূমি' এবং 'দিশাগ্রস্ত-গতিশীল ভূমি দান করা'। **কর** শব্দের অর্থ যেমন 'করে যে', অর্থাৎ 'হাত' হয়, তেমনি **করা**ও হয়। ঠিক একইভাবে **দেশ** শব্দের অর্থ 'দিশাগ্রস্ত-গতিশীল ভূমি' হয় এবং তদ্রূপ 'ভূমিদান'ও হয়। অবশ্যই এই ভূমি একাধারে পার্থিব ভূমি, মনোভূমি, এবং এই সকল ভূমিকে দান করাও বোঝায়; একে ভূমির কথা 'বলে দেওয়া' বা 'দেখিয়ে দেওয়া'ও বলা যেতে পারে। তবে, অদৃশ্য ভূমি ও সেই ভূমি দান করার কথাই ছিল আমাদের প্রাচীন পুরুষদের মনোগত ইচ্ছা; কেননা, দৃশ্য বিষয় নিয়ে তাঁদের বিশেষ সমস্যা ছিল না, সমস্যা ছিল অদৃশ্য বিষয়কে বোঝা ও বোঝানো। তাই মনোভূমি দানের বিষয়েই বহু কথা বলার দরকার পড়েছিল মানুষের। হয়তো সেজন্যই বাংলাভাষায় মনোভূমি দানের বিষয়ে নানা কথা বলতে গিয়ে **আদেশ, উদ্দেশ, উপদেশ, নিরুদ্দেশ, নির্দেশ, সন্দেশ** প্রভৃতি বহু কথার জন্ম হয়েছিল। এই শব্দগুলি সবই মনোভূমি দানের বা মনোভূমির বিশেষ স্থান দেখিয়ে দেওয়ার নানা রূপের সঙ্গে জড়িত। মোট কথা, **দেশ** বাহ্যভূমি বা মনোভূমির দিশাগ্রস্ত স্থানকে যেমন বোঝায়, তেমনি সেই স্থানকে দেখানো বা দিশাদর্শনকেও বোঝায়।

অতএব সংক্ষেপে **দেশ** শব্দের তিনটি অর্থ — প্রথমত, দিশাগ্রস্ত গতিশীল মনোভূমি জোগানো; দ্বিতীয়ত, দিশাগ্রস্ত গতিশীল মনোভূমি; এবং তৃতীয়ত, দিশাগ্রস্ত গতিশীল পার্থিবভূমি। এই পার্থিবভূমি অর্থটিই এখন অধিক প্রচলিত, বাংলাভাষী জনসাধারণ দৃশ্যত যার মানে বোঝেন country এবং মনের গভীরে যার মানে বোঝেন — যে-ভূমিতে (তা সে পার্থিবভূমি ও মনোভূমি যাই হোক) বসবাসকারী মানুষেরা একই ভাষা-সংস্কৃতি অনুসরণ করে একই দিশার উদ্দেশে এগিয়ে চলেছে। — যাই হোক, এখন এই **দেশ** থেকে যে-সকল শব্দ প্রসূত হয়েছে, তাদের বিষয়ে এক এক করে বলে নেওয়া যাক।

আদেশ : ২. *দেশ-এর (দিশাদর্শনের) আশ্রয় যাহাতে।* ৪. order অর্থে প্রচলিত। ৫. **দেশন** শব্দের অর্থ (নিম্নে দেখুন) হল, মনোভূমির বিশেষ স্থানে যাওয়ার জন্য **দিশা** দেখানো। সেই **দেশন**-এর বিশেষ্য রূপ হল **দেশ**। সেইরূপ **দেশ** বা **দেশ**গুলি থাকে যে ঘোষণায়, ঘোষণাপত্রে, কিংবা হুকুমে, তাকে বলে **আদেশ**।

উদ্দেশ, উদ্দেশ্য : দ্র. উৎ।

উপদেশ (উপদিষ্ট), উপদেষ্টা : দ্র. উৎ। পুনশ্চ : ২. *উপদেশ = দেশ-এর উপ যে। উপদিষ্ট = দিশ টঙ্কারিত যাহাতে, তাহার উপ যে। উপদেষ্টা = উপদেশ টঙ্কারিত যে আধারে।* ৪. advice ও advisor অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **আদেশ**। মনোভূমির বিশেষ স্থানে যাওয়ার জন্য **দিশা** দেখানো থাকে যাতে, তাকে **দেশন** বা **দেশ** বলে। সেই **দেশ**-এর সহযোগিতাকারী পথ-প্রদর্শনকে বলে **উপদেশ**। সেই উপদেশ যিনি দেন, তাঁকে **উপদেষ্টা** বলে; এবং যে তা পায় তাকে **উপদিষ্ট** বলে।

দেশক (উপদেশক) : ২. *দেশ (দেশ্-অন) করে যে; দিশা দেখায় যে।* ৩. শাসনকর্তা, উপদেশক। (ছা.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. 'তার তো পায়ের তলায় মাটি নেই' — এই ধরনের বাক্য বাংলায় খুবই প্রচলিত। কিন্তু ইংরেজি কালচারে এরকম বাক্য বলাই যায় না। বাংলায় এরকম বলা যায় এইজন্য যে, বাংলার সংস্কৃতিতে মানুষের মনের পায়ের তলায় মাটি থাকা না-থাকার কথা সবাই কমবেশি জানে। মনের পায়ের তলায় মাটি থাকে, যদি, মনকে ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়; অর্থাৎ, কোন্ যুক্তির ভিত্তিভূমিতে মন পা রাখবে, তার দিশা দেখিয়ে দেওয়া হয়। একেই বলে **দেশন** করা। যিনি এরকম করেন, তাঁকে বলে **দেশক**। এই **দেশকের** সহকারীকে বলে **উপদেশক**।

দেশন : ২. *দেশ্ অন (on) যাহাতে।* ৪. অপ্রচলিত। ৫. মানুষের মন যুক্তির যে-ভিত্তিভূমিতে পা রাখতে পারে, তার দিশা

দেখিয়ে দিতে থাকলে তাকে বলে **দেশন** করা। দ্র. **দেশক**।

দেশনা : ২. *দেশন-এর আধার যে।* ৩. উপদেশ, নির্দেশ, আদেশ, শিক্ষা, পরামর্শ। (ব্য.বাং.অ.ঢাকা)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. বাংলায় এধরনের শব্দ খুব কম দেখা যায়; হিন্দিতে দেখা যায় বেশি। যেমন কর্ > কর্না, চল্ > চল্না, ইত্যাদি। একই নিয়মে প্রসূত হয়েছে **দেশনা** শব্দটি। **দেশন**-এর বিশেষ্য রূপ হল **দেশনা**। সেই সুবাদে উপরে প্রদত্ত শব্দটির প্রতীকী অর্থগুলি সবই ঠিক।

দেশিক : ২. *দেশ-কে (দিশাদর্শনকে) গতিশীল করে (বা রাখে) যে। / যিনি 'দেশনা' দেন।* (ব্য.বাং.অ.ঢাকা)। ৩. দেশজাত, দেশীয়, দেশবাসী, উপদেশে নিপুণ, উপদেষ্টা, গুরু, দেশতত্ত্বজ্ঞ, পথিক। (ব.শ.)। পথিক, গুরু। (ছা.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ব.শ. প্রদত্ত প্রতীকী অর্থগুলিই বলে দেয়, তারা সবাই উপরোক্ত ২-এর ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দেশিকোত্তম : ২. *যিনি দেশিকগণের মধ্যে উত্তম।* ৩. শ্রেষ্ঠ আচার্য, গুরু, পথনির্দেশক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদেয় ডিলিট বা 'ডক্টর অব ফিলোসফি' সমপর্যায়ের সম্মানসূচক উপাধি। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. উপরোক্ত উপাধি অর্থে প্রচলিত। ৫. **দেশিক**-শ্রেষ্ঠ বোঝাতে শব্দটির সৃষ্টি করা হয়েছে সম্প্রতিকালে। এই শব্দটি আবার আমাদের জানায়, Physics-এর অনুবাদ 'পদার্থবিজ্ঞান' করার জন্য যেরূপ বাংলাভাষাজ্ঞান লাগে, তেমন জ্ঞানী মানুষ বাংলায় ছিলেন, হয়তো এখনও নিশ্চয় দু-দশজন আছেন। তাঁদেরই কেউ **দেশিকোত্তম** শব্দটি প্রস্তুত করেছিলেন। তবে বাস্তব ততদিনে অনেক বেশি প্রতীকী হয়ে গেছে। যে কারণে তিনি **উত্তম** শব্দটিকে **দেশিক**-এর পাশে যোগ করা অনুচিত বিবেচনা করেননি। আজ আমরা জানি, শ্রেষ্ঠ ও **উত্তম** এক ব্যাপার নয়। **উত্তম**-এ **তম** আছে। **দেশিক**-এর সঙ্গে **তম** যোগ করলে **দেশিক**কে অবগুণান্বিত করে ফেলা হয়ে যায়। যাঁরা **কাব্যতীর্থ, পুরাণতীর্থ** উপাধি দান করতেন, তাঁরা দার্শনিকশ্রেষ্ঠ বোঝাতে এরকম উপাধি দিতে ইতস্তত করতেন।

দেশিত : ২. *দেশন তারিত যাহাতে; যাহাকে দেশ (দিশাদর্শন) দেওয়া হইয়াছে; যে দেশ (দিশাদর্শন) পাইয়াছে।* ৩. আদিষ্ট, উপদিষ্ট, নির্দ্দিষ্ট, নিয়ন্ত্রিত। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

দেশিনী : ২. *দেশন করিয়ে দেয় যে আধারশক্তি; যাহার দ্বারা (পার্থিবভূমি বা মনোভূমির) দিশা দেখিয়ে দেওয়া হয়।* ৩. তর্জ্জনী, অঙ্গুলি। (ছা.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এ শব্দের নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত অনেক অর্থ হতে পারে; যেমন — গুরুপত্নী, শিক্ষিকা, দার্শনিক কবিতা, ... ইত্যাদি এবং সবশেষে তর্জ্জনী বা অঙ্গুলি, যার সাহায্যে পথ-প্রদর্শন করিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সেরকম অর্থ কোনো অভিধানে নেই। ...

দেশী : ২. *দেশ-এর গতিশীল আধার যে। / দেশে যে জন্মে, বা যাহা জন্মে; দেশে যাহা প্রস্তুত হয়; দেশে যাহা সহজে পাওয়া যায়।* (ছা.অ.)। ৩. (নিম্নে **দেশকারী** দ্র.) দেশজাত, দেশবাসী, দেশ-প্রচলিত। (ব.শ.)। ৪. of the country অর্থে খুবই প্রচলিত। ৫. **দেশী**তে 'মনোভূমির-**দেশ**'-বাচ্য কিছুই নেই, সবই পার্থিবভূমির বিষয়ে। তাহলে, মনোভূমির কোনো-কিছুকে কি **দেশী** বলা যায় না? যায়। তবে সেজন্য আমাদের **দেশকারী** শব্দে যেতে হবে।

দেশীয় : ২. *দেশী যায় যাহাতে।* ৩. দেশসম্বন্ধী, দেশভব, দেশস্থিত, দেশজাত, দেশ-প্রচলিত, 'ঈষদ্‌সমাপ্তি' অর্থে তদ্ধিত। (ব.শ.)। ৪. এটিও of the country অর্থে খুবই প্রচলিত। ৫. পার্থিবভূমির সম্পর্কিত যে **দেশ**, তার সঙ্গে যা কিছু জড়িত তাদের প্রত্যেককেই **দেশীয়** বলে।

দেশ্য : ২. *দেশ থাকে যাহাতে।* ৩. দেশভব, দেশস্থ, দেশীয়, দেশ-প্রচলিত, বাহ্লিকাদিদেশজাত, উপদেশ্য, তদ্দেশবর্তী (তৎস্থানীয়) সাক্ষী, সাধ্যবিষয়, **পূর্ব্বপক্ষ**। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. শব্দটির ব.শ. প্রদত্ত অর্থগুলি পার্থিবভূমির সঙ্গে সম্বন্ধিত; কিন্তু শেষ তিনটি — সাক্ষী, সাধ্যবিষয়, **পূর্ব্বপক্ষ** — এগুলি মনোভূমির সঙ্গে সম্বন্ধিত। এগুলিতে **দেশ** দর্শিত দিশা থেকে যায়। তাই তারাও **দেশ্য**।

দেষ্ঠ : ২. *দেশ-এর টঙ্কারস্থিতি যাহাতে। /* যে অকাতরে দান করে। (ছা.অ.)। ৩. অতিশয় দানশীল। (ছা.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

নিরুদ্দেশ : ২. *নেই উদ্দেশ যাহার।* ৩. উদ্দেশহীন, সন্ধানরহিত, ঠিকানাশূন্য। ৪. missing অর্থে খুবই প্রচলিত। ৫. দ্র. **উদ্দেশ**।

নির্দ্দেশ (নির্দ্দিষ্ট) : ২. *নির্দ্দেশ = নিঃসারিত দেশ (দেশন) যাহাতে। নির্দ্দিষ্ট = নিঃসারিত দর্শন (দিশা দেখানো) টঙ্কারিত যাহাতে।* ৩. **নির্দ্দেশ** = শাসন, আজ্ঞা, কথন, উপদেশ, প্রদর্শন, বেতন, প্রতিপাদক শব্দ, নাম। নির্দ্দিষ্ট = কৃতনির্দেশ, প্রদর্শিত, কথিত, শাস্ত্রোক্ত। (ব.শ.)। ৪. instruction অর্থে **নির্দ্দেশ** এবং defined অর্থে **নির্দ্দিষ্ট** প্রচলিত। ৫. বুদ্ধের **দেশনা** যারা শুনতে যায়, বা যাদের শোনানো হয়, তারাও তো **দেশ** (দিশাদর্শন) শুনতেই যায়। কিন্তু সেই **দেশ** শোনা বা শোনানোর সঙ্গে **নির্দ্দেশ**-এর গুরুতর পার্থক্য রয়েছে। সেই কারণে বুদ্ধের **দেশনা**কে কখনোই **নির্দ্দেশ** বলে না। কারণ, প্রথমত **দেশনা** কখনোই হুকুম নয়, দ্বিতীয়ত তা **নির্দ্দিষ্ট**ও নয়; বিজ্ঞানের সংজ্ঞার মতো well-defined-ও নয়। যেকারণে, **দেশনা** গ্রহণ করে তদনুসারে চলা না-চলা শ্রোতার ইচ্ছাসাপেক্ষ। কিন্তু **নির্দ্দেশ** ও **নির্দ্দিষ্ট** উভয়ই অলঙ্ঘনীয়। যাকে **নির্দ্দেশ** দেওয়া হয়, সে সেই নির্-দেশিত মানসলোকে বা **দেশে** যেতে বাধ্য; তদনুযায়ী সক্রিয় হয়ে উঠতে বা তদনুযায়ী আচরণ করতে বাধ্য।

প্রদেশ (প্রদেশন) : ২. *প্রদেশ = প্রকৃষ্ট দেশ (দিশাদর্শন) যাহাতে। প্রদেশন = প্রদেশ অন (on) যাহাতে।* ৩. **প্রদেশ** = নির্দ্দেশ, অতীত বিষয় দ্বারা প্রস্তুত বা বর্ত্তমান বিষয়ের সাধন। **প্রদেশন** = প্রসারিত তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ, উদাহরণ। (ব.শ.)। ৪. province অর্থে **প্রদেশ** প্রচলিত; **প্রদেশন** অপ্রচলিত। ৫. **দেশ** শব্দের অর্থ country করে ফেলার পর, **দেশ** শব্দটি সম্পূর্ণ প্রতীকী হয়ে যায়। এর পর country-র অংশ বোঝাতে **দেশ**-এর সঙ্গে **প্র**-উপসর্গ যোগ করে **প্রদেশ** শব্দটি বানিয়ে ফেলা হয়। **প্রদেশ** শব্দটিও **দেশ** শব্দের মতো সম্পূর্ণ প্রতীকী হয়ে যায়। কিন্তু **প্রদেশ** শব্দের আদি অর্থ সেরূপ ছিল না। তার প্রমাণ উপরোক্ত ব.শ. প্রদত্ত অর্থেই বোঝা যেতে পারে। আমরা ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটিও দিয়েছি; সেও তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

প্রদেশনী, প্রদেশিনী : ২. *প্রদেশনী = প্রদেশন-এর গতিশীল*

*আধার যে। **প্রদেশিনী** = **প্রদেশ**-কে গতিশীলভাবে এগিয়ে নিয়ে যান যিনি (যে প্রকৃতিশক্তি)। /* **প্রদেশনী** = যাহার দ্বারা নির্দেশ সাধন করা যায়। **প্রদেশিনী** = নির্দেশ করেন যিনি (যে স্ত্রীশক্তি)। (ব.শ.)। **৩. প্রদেশনী, প্রদেশিনী** = তর্জ্জনী। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. শব্দটি প্রকৃতপক্ষে প্রস্তুত করা হয়েছিল **দেশের** বা দর্শিত দিশার প্রকৃষ্ট অংশকে পৃথকভাবে দেখায় যে সত্তা, তাকে বোঝানোর জন্য। ইনি একজন জ্ঞানবাহক আধারশক্তি গুরু হতে পারেন, গুরুপত্নী হতে পারেন, এমনকি নির্দেশক আঙুলটিও হতে পারে। অর্থাৎ, প্রদেশনী শব্দের সবচেয়ে নিম্ন স্তরের অর্থ হল 'তর্জ্জনী'। অন্য অর্থগুলি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে পুনরুদ্ধারের পথটি রুদ্ধ নয়।

বিদেশ : ২. *বিশেষ বা বিপরীত **দেশ** (দেশন) থাকে যাহাতে।* ৩. বিভিন্ন দেশ, দেশান্তর, পরদেশ। (ব.শ.)। ৪. শহুরে অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষীরা foreign-country অর্থে **বিদেশ** শব্দ ব্যবহার করেন; এবং গ্রামবাংলার মানুষেরা আপন চেনাজানা এলাকার বাইরের অঞ্চলকে **বিদেশ** শব্দে চিহ্নিত করে থাকেন।

সন্দেশ : ২. *সম্যক **দেশ** (দিশাদর্শন) থাকে যাহাতে।* ৩. সন্দিষ্ট অর্থ, বার্ত্তা, সন্দেষ্টব্যার্থ, আদেশ, বিবরণ, বার্ত্তা (সংবাদ) পাওয়ার নিমিত্ত প্রেরিত দূতের নিকট প্রদত্ত উপহার, উপহার, মিষ্টান্ন, নারিকেল নাড়ু, মোদক, ছানা-চিনির পক্ক মিষ্টান্নবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. মিষ্টির নাম রূপে অধিক প্রচলিত, খবর অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। ৫. মাত্র পঞ্চাশ বছর আগেও **সন্দেশ** বলতে লোকে খবরও বুঝত, বিশেষ প্রকারের মিষ্টিও বুঝত। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও শব্দটি দিশাদর্শনাত্মক **সন্দেশ** বা খবর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; সুকুমার রায়ের আমলেও হয়েছে। এমনকি এখনও হিন্দিভাষীগণ সেভাবেই **সন্দেশ** শব্দটির ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু বাংলাভাষীরা শব্দটির উচ্চস্তরীয় অর্থটিকে ফেলে দিয়ে, রেখে দিয়েছেন কেবল নিম্নঅধিকারীসুলভ অর্থ — **সন্দেশ** নামক মিষ্টি! এই মহান(!) কীর্ত্তির কৃতিত্বের মুখ্য দাবিদার হতে পারেন বাংলার তথাকথিত অ্যাকাডেমিক-বিশেষজ্ঞগণ। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা বাংলাভাষীরা দিশাদর্শনমূলক **সন্দেশ** হারিয়ে বাহ্যিক খাদ্য-**সন্দেশ** পেয়েছি। সেই আনন্দে আমরাও তাঁদের সঙ্গে গলা ও পা মিলিয়ে 'নাকের বদলে নরুণ পেলাম, টাক ডুমা ডুম ডুম' গানটা গাইতে ও নাচতে পারি!

দেশ, দেশকার, দেশকারী, দেশপালী, দেশমল্লার, দেশা, দেশাকা, দেশাখী, দেশী : ২. *দেশ = (উপরে **দেশ** দ্রষ্টব্য); দিশাদর্শন থাকে যাহাতে। **দেশকার** = **দেশ** কৃত যাহাতে। **দেশকারী** = **দেশকার** করে যে। **দেশপালী** = **দেশ** পালন করে যে আধারশক্তি। **দেশমল্লার** = **দেশ** ও **মল্লার** (বলধারক রহে যাহাতে), **দেশা** = **দেশ**-এর আধার যে। **দেশাকা** = **দেশা** করে যে তাহার আধার। **দেশাখী** = **দেশ**-এর আধার ক্ষয়কারী যে। **দেশী** = **দেশ**-এর গতিশীল আধার যে।* ৩. **দেশ** = রাগবিশেষ, শার্ঙ্গদেবের মতে ঋ-বর্জ্জিত, মতান্তরে সম্পূর্ণ। ইহার গ্রহ অংশ ন্যাসগান্ধার, মতান্তরে ষড়জ গ্রহ। **দেশকার** = সম্পূর্ণজাতীয় রাগবিশেষ। প্রাতঃকালে পাঁচ দণ্ড পর্যন্ত গেয়। **দেশকারী** = ইহা দেশকারের সংস্কৃত নাম। ইহার গ্রহাংশন্যাস ষড়জ। হনুমন্মতে মেঘরাগের ভার্য্যা। গানসময় বর্ষা ঋতুর নিশান্তকাল। সঙ্গীতদর্পণ মতে গানসময় প্রাতঃকাল। নারদসংহিতায় এই মূর্ত্তি ও ইহাকে দিন্দোলপত্নী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। **দেশপালী** = দেশকারীর অপর নাম। **দেশমল্লার** = সম্পূর্ণজাতীয় রাগবিশেষ। **দেশা** = জনৈক গন্ধর্ব্ব; সোমেশ্বরের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। **দেশাকা** = রাগিণীবিশেষ। **দেশাখী** = রাগিণীবিশেষ। বোধ হয় ইহাই এখন দেওশাক নামে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। **দেশী** = রাগিণীবিশেষ। হনুমন্মতে দীপকরাগের ভার্য্যা। পঞ্চমবর্জ্জিত। ঋষভ, গ্রহ অংশ ও ন্যাস। গানসময় গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন, সোমেশ্বরমতে বসন্তরাগের পত্নী। মতান্তরে ধৈবতবর্জ্জিত। ইহা মধুমাধবসারঙ্গ ও পাহাড়ী বা টোড়ী ও খট যোগে উৎপন্ন। (ছা.অ.)। ৪. সঙ্গীতজগতে শব্দগুলি সবই প্রচলিত, যদিও সাধারণ বাংলাভাষীর ভাষণে এদের দেখা মেলে না। ৫. রবীন্দ্রনাথ ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি, কোন রাগরাগিণীতে কীরূপ মনোভাবের ভার কী নিয়মে চাপানো হয় ও নামানো হয়। তাই তিনি 'সঙ্গীতবেত্তাদিগের প্রতি' ... 'নিবেদন' করেন যে, 'কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে; তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন।' কারণ তিনি 'স্পষ্টই' জানতেন যে, 'আমাদের দেশে রাগরাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল।' (*সংগীতচিন্তা* / রবীন্দ্রনাথ / পৃষ্ঠা ১৩-১৪)। তাই তিনি নিবেদন করেন, সঙ্গীতজ্ঞগণ যেন সেই নিয়মগুলি আবিষ্কার করে জনসাধারণ্যে প্রকাশ করে দেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই কাজটি কেউই করে উঠতে পারেননি। আমরা দেখছি, **দেশ** ও তৎসংশ্লিষ্ট নামে কয়েকটি সমজাতীয় রাগরাগিণীর কথা আছে। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি তাদের নামগুলির অর্থ উদ্ধার করতে সমর্থ। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, **দেশ**-বাচক রাগরাগিণীগুলিতে দিশাদর্শনের কথা রয়েছে। হয়তো ঐ রাগরাগিণীগুলি মানুষকে তার মনোলোকের কোনো ভূমি গড়ে উঠতে সহায়তা করে। আমরা সঠিক জানি না। কিন্তু এটুকু নিশ্চিত রূপে বুঝতে পারি যে, কথার মাধ্যমে যেমন দিশাদর্শন করানো যায়, তেমনি রাগরাগিণীর মাধ্যমেও এককালে মনোভূমির দিশাদর্শন করানো যেত। সঙ্গীতজ্ঞ পাঠক বিষয়টি ভেবে দেখতে পারেন।

দিহ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অসন্দিহান, দিগ্ধ, দিল্লি (দিল্লী, দেহলী), দিহ্, দেহ, দেহকর্ত্তা, দেহকোষ, দেহগত, দেহজ, দেহতত্ত্ব, দেহবান, দেহভাক্, দেহন্তর, দেহযাত্রা, দেহরক্ষা, দেহলি, দেহলী (দিল্লি), দেহাত্মপ্রত্যয়, দেহাত্মবাদ, দেহান্তর, দেহিনী, দেহী, দৈহিক, দৈহ্য, সন্দিগ্ধ, সন্দিহান, সন্দেহ।

দিহ্ = গতিশীল দান-এর হওয়ন। **দিহ্** = গতিশীল দান-এর (নির্য্যাসত্যাগ) হওয়ন যাহাতে।

দিগ্ধ (সন্দিগ্ধ, সন্দিহান) : ১. দিগ্ধ = ✓দিহ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দিগ্ধ = **দিহ্** তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, গতিশীল দান গমনপূর্ব্বক ধৃত হয় যাহাতে। **সন্দিগ্ধ** = সম্যক **দিগ্ধ** যে। **সন্দিহান** = সমান **দিহ্** (= গতিশীল দানের নির্য্যাসত্যাগ) অন*

(on) যাহাতে। **৩. দিগ্ধ** = লিপ্ত, উপলিপ্ত, মিশ্র, বিষলিপ্ত, বিষাক্ত, বিষলিপ্ত শর, অগ্নি, স্নেহ, তৈল, প্রবন্ধ। **সন্দিগ্ধ** = সংলিপ্ত, সন্দেহবিষয়ীকৃত, বিষমিশ্রিত, সন্দেহযুক্ত, অস্পষ্ট, সংশয়াপন্ন। **সন্দিহান** = সন্দেহযুক্ত, সংশয়াপন্ন। (ব.শ.)। **৪. দিগ্ধ** অপ্রচলিত, কিন্তু বাকি তিনটি শব্দ suspicion বা তৎসংশ্লিষ্ট অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **দেহ**।

দেহ, সন্দেহ : ১. দেহ = ✓দিহ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। সন্দেহ = সম্ + ✓দিহ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***দেহ*** = *দিশাগ্রস্ত গতিশীল দান (ত্যক্ত) হয় যাহা হইতে।* ***সন্দেহ*** = *সমান* ***দিহ্*** *যাহাতে।* / **দেহ** = যাহা বাড়ে। **সন্দেহ** = একধর্মিক বিরুদ্ধভয়প্রকারকজ্ঞান (যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. দেহ** = কায়, শরীর, লেপন। **সন্দেহ** = বিচিকিৎসা, প্রাণসংশয়, অর্থালঙ্কারবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** body অর্থে প্রচলিত। **৫.** বিসর্গ (ঃ), স্, হ্ — তিনটি বর্ণই আসলে একই ক্রিয়ার তিনরকম শাব্দিক প্রকাশ। এই ক্রিয়াটিকে ব.শ. বলেছেন 'নির্য্যাসত্যাগ'। **দিগ্ধ**-এর বেলায় এই 'নির্য্যাসত্যাগ' ধারণ করে যে, সে নিজে অন্যের নির্য্যাস দ্বারা লিপ্ত এবং অন্যের পক্ষে বিষবৎ হলেও হতে পারে। তবে এই শব্দটিকে সহজে বোঝা যায়, যদি মনে করা হয় যে, দোহন (দুহন) করলে একপক্ষ দোহিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর অন্য পক্ষ পেয়ে যায় দুগ্ধ; তাহলে দহন করে একপক্ষ দগ্ধ হয় এবং অন্য পক্ষ পায় তাপ বা তাপজাতীয় অন্য কিছু। একইভাবে, দিহন ক'রে একপক্ষ দেহ (যাহা বাড়ে) পায়, অন্যপক্ষ দিগ্ধ হয় (ত্যক্ত নির্য্যাস দ্বারা লিপ্ত হয়)। তার মানে, মলমূত্রাদি ত্যাগ করে দেহ; আর যেখানে তা ত্যক্ত হয় তা হয়ে যায় দিগ্ধ। তাই **দিগ্ধ** শব্দের অর্থে 'লিপ্ত' কথাটি বারংবার আসে।

খাদ্যরূপে আমরা কত কীই না মুখগহ্বরে ঢোকাই, পেটে জমাই। তার মধ্যে একটি অংশ থেকে যায়, বাকি অংশ মল আকারে মলদ্বার দিয়ে ত্যক্ত হয়ে বেরিয়ে যায়। এই গ্রহণ ও ত্যাগের পরিমাণের হেরফের ঘটে শৈশব থেকে বার্ধক্যে। শৈশবে গ্রহণের তুলনায় ত্যাগ কম, তখন দেহ বৃদ্ধি পায়, বাড়ে; প্রৌঢ়ত্বে হয়ে যায় সমান সমান, বার্ধক্যে ত্যাগের মাত্রা বেড়ে যায়। তখন **দেহ** আর বাড়ে না, ফলে সে আর **দেহ** থাকে না, সে হয়ে যায় শরীর, শুরু করে শীর্ণ হতে। দ্র. **কায়**।

কিন্তু **সন্দেহ**-র বেলায় সমান পরিমাণ **দিহ্** বা নির্য্যাসত্যাগের ব্যাপার আসে। ক যেমন তার অপ্রয়োজনীয় অংশ ত্যাগ করে খ-এর গায়ে ফেলে দিল, খ তেমনি তার অপ্রয়োজনীয় অংশ ত্যাগ করে ক-এর গায়ে ফেলে দিতে পারে। এ যেন ক-এর থুতু ফেলার অভ্যাস আছে এবং সে দেখছে খ একই ভাবে থুতু ফেলতে উদ্যত হয়েছে। স্বভাবতই ক-এর মনে হচ্ছে, থুতুটা ক-এর গায়েই খ ফেলবে না তো! একেই বলে **সন্দেহ**। তার মানে **সন্দেহ** যে করে সে খুব একটা ভাল মানুষ নয়। বাংলা শব্দবিদগণ **সন্দেহ** শব্দের ভেতরে এরকম একটা বিপরীত অর্থ ঢুকিয়ে রাখতে গেলেন কেন? তাঁরা কি মনে করতেন, **সন্দেহ** যে করে, সে নিজেই কলুষিত?

ঠিক তাই। মানুষের মন সুন্দর হলেই পৃথিবী সুন্দর বলে বোধ হয়; আর, মন কলুষিত হলেই পৃথিবী কলুষিত বোধ হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, আমাদের মনের ভেতরে যে কয়রকম রং রয়েছে, বাইরের জগতে সেই কয়েকটি রংকেই নাকি আমরা চিনতে পারি। তার বাইরে কোনো রং পৃথিবীতে থাকলেও আমরা নাকি তাকে দেখতে অক্ষম। সেই সুবাদে, কেউ কাউকে কুকর্মকারী বলে **সন্দেহ** করতে পারে কেবল তখনই, যখন তার নিজের মনে ঐরূপ কুকর্মের কোনো ছায়া রয়েছে। অন্যথায় তার মনে সেরকম **সন্দেহ**-র উদয়মাত্র হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, **সন্দেহ**কারী মাত্রেই 'সমান **দিহ্**-করণ' পিপাসু। ধরা যাক, অমল কোনোদিন বোমা বাঁধেনি, কাউকে কখনও বোমা মারেনি, মারার ইচ্ছাও তার কোনোদিন হয়নি, সেও যদি সর্বদা-চারিদিকে-বোমাবাজি-চলা-সমাজে বাস করে, নারকেলের বস্তাবাহককে তার বোমাপাচার-কারী বলে **সন্দেহ** হতেই পারে। কিন্তু এরূপ **সন্দেহের** জন্য ভাবা চলে না যে, অমলের মনেও বোমাবাজি করার ইচ্ছে ছিল বলেই তার ঐরকম **সন্দেহ** হয়েছে। তার মনে যে কুকর্মের ছায়া পড়েছে, সেটি তার নিজস্ব ইচ্ছা থেকে জন্মায়নি, জন্মেছে সামাজিক প্রেক্ষিতের থেকে ছোঁয়াচে রোগ হিসেবে। সেই ছোঁয়াচে রোগের শিকার হয়ে সেও **সন্দেহ** করতে শুরু করেছে। রসগোল্লার রস টকে গেলে যেমন রসগোল্লা খারাপ হয়ে যায়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আবহাওয়া খারাপ হয়ে গেলে তার মধ্যে বসবাসকারী মানুষও খারাপ হয়ে যায়।

তবুও মানতে হবে, অমলের মনটিও পরিস্থিতির দাস হয়ে গেছে, এবং ছোট হয়ে গেছে। হিংস্রতার বন্যায় দুনিয়া ডুবে গেলে অমলদের মনও তাতে ডুবে যায়; না চাইলেও বন্যার জলকাদা থেকে তাদের রেহাই মেলে না। পণ্ডিতেরা অনেক ভেবেই বলেছেন — বঞ্চনা কেবল প্রবঞ্চককেই ছোটমানুষে পরিণত করে না, প্রবঞ্চিতকেও ছোট করে দেয়!

দী (*দীক্ষ্, দীধী*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিদীন, অদীন, অদীনসত্ত্ব, অদৈন্য, দী, দীক্ষ্, দীক্ষক, দীক্ষণ, দীক্ষা, দীক্ষিত, দীক্ষিতা, দীধিতি, দীধী, দীন, দীনদয়াল, দীননাথ, দীনপনা, দীনবৎসল, দীনবন্ধু, দীনহীন, দীনা, দীনার, দৈন্য।

দী (দীক্ষ্, দীধী) = গতিশীল দানের আধার যে। **দীক্ষ** = **দী**-এর ক্ষ-অন যাহাতে। **দীধী** = **দী**-কে ধারণ করে গতিশীল রাখে যে।

অদৈন্য : দ্র. **দীন**।

দীক্ষক (দীক্ষ্, দীক্ষণ, দীক্ষা, দীক্ষিত, দীক্ষিতা) : ১. দীক্ষক = ✓দীক্ষ্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***দীক্ষ্*** = *গতিশীল দানাধারীর* ***ক্ষ****-করণ (শক্তি বা অধিকার) থাকে যাহাতে।* ***দীক্ষণ*** = ***দীক্ষ্*** *অন যাহাতে।* ***দীক্ষক*** = ***দীক্ষণ*** *করে যে।* ***দীক্ষা*** = ***দীক্ষ্****-এর আধার যাহাতে।* ***দীক্ষিত*** = ***দীক্ষণ*** *তারিত যাহাতে।* ***দীক্ষিতা*** = ***দীক্ষিত****-এর স্ত্রী-আধার যে।* **৩. দীক্ষ্** = উপনয়ন, ব্রতোপদেশ, মুণ্ডন, মুণ্ডিতমস্তকীভাব, যজন, নিয়ম, নিয়মগ্রহণ। **দীক্ষক** = মন্ত্রোপদেশক। **দীক্ষণ** = মন্ত্রোপদেশ, ব্রতানুষ্ঠান, যজন। **দীক্ষা** = মন্ত্রোপদেশ, দেবমন্ত্রগ্রহণ, নিয়মগ্রহণ, ব্রতানুষ্ঠান, যজন, যজ্ঞ, নিয়ম,

সংস্কার, বিধি, উপনয়নসংস্কার। **দীক্ষিত** = দীক্ষাযুক্ত, কৃতমন্ত্রোপদেশ, সংস্কারযুক্ত, কৃতসংস্কার, ধৃতব্রত, কৃতাভিষেক, অভিষিক্ত, উপনয়নসংস্কারযুক্ত, উপনীত, যজ্ঞমাত্রে ধৃতব্রত বা নিয়মী, হোমযাগাদির যজমান, যজ্ঞের যজমান মাত্র, শিষ্য। **দীক্ষিতা** = মন্ত্রোপদেষ্টা, দীক্ষাদাতা। (ব.শ.)। **৪.** ধর্মভীরু সাধারণ বাঙালীদের মধ্যে একপ্রকার ধর্মাচার রূপে **দীক্ষা** শব্দটি প্রচলিত এবং **পদবী** রূপে **দীক্ষিত** শব্দটি প্রচলিত। বাকি সবগুলিই অপ্রচলিত। **৫. দী** মানে, যে সদা সর্বদা দিয়ে দিচ্ছে, এমনি এক সত্তা। ফলে তার নিজের একপ্রকার **ক্ষয়-ক্ষতি** চলছে, সে **দীন** হয়ে যাচ্ছে। তবে সবাই জানেন, ধন-ইত্যাদি দান করলে ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে যায় বটে, কিন্তু বিদ্যা দান করলে ক্ষয় তো হয়ই না, উলটে সেটি বেড়ে যায়। সেইপ্রকারে, **দী** যদি সবাইকে বিদ্যা দেয়, বুদ্ধি দেয়, কুশলতার জ্ঞান দেয়, অর্থাৎ জগতের বস্তু-বিষয়-শক্তিকে ক্ষয় করে আনার (**ক্ষ**-অন করার) কৌশলাদি দেয়, তবে সে হল **দীক্ষ্**। তবে এ-কাজ সবাই করতে পারে না। তার জন্য তাকে **শিক্ষা** লাভ করতে হয়, এবং শিক্ষাশেষে **দীক্ষা** লাভ করতে হয়। এই **দীক্ষ্**-এর অধিকার যার আছে, যে **দীক্ষা** পেয়ে গেছে, **দীক্ষিত** হয়ে গেছে, সেই কেবল সেরকম জ্ঞান-বুদ্ধি দান করতে পারে। আর, ভারতের প্রাচীন সমাজের নিয়মানুসারে এরকম **শিক্ষা**প্রাপ্ত ও **দীক্ষা**প্রাপ্ত ব্যক্তিই কেবল কর্মযজ্ঞে **যজন** করার অধিকারী, ব্রত-অনুষ্ঠান করার অধিকারী। তাঁরাই সেকালে সমাজের কর্মযজ্ঞসমূহের পরিচালক ছিলেন। রাষ্ট্র তাঁদের সসম্মানে কর্মযজ্ঞের দায়িত্ব দিত। তাঁরাও তা পালন করতেন এবং তাঁদের নির্দেশেই জনসাধারণ বিভিন্ন সামাজিক কর্মযজ্ঞে লিপ্ত হত। ...

কিন্তু হলে কী হবে! ইংরেজ ভারতে আসার পর নানান কারণে এসব কথা আমরা আগাগোড়া ভুলে গেলাম। এসব ধর্মের ব্যাপার বলে এই ধারণাগুলি সমেত শব্দগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। সমাজ চালানোর বিদ্যা, ছেলেমেয়েদের **শিক্ষা-দীক্ষার** মাধ্যমে কীভাবে তাদেরকে সামাজিক কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব সমর্পণ করা হত, তার সব কথা আমরা ভুলে গেলাম। এমনকি, ১৯০০ সাল পর্যন্ত বাংলাভাষী জ্ঞানী মানুষেরা জানতেন, **দীক্ষা** কাকে বলে, **দীক্ষান্ত** ভাষণ কী ব্যাপার, **সমাবর্তনই** বা কী বস্তু। এখন সে-বোধটুকুও বাংলাভাষীদের মহল থেকে হারিয়ে গেছে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আমাদের 'গ' গ্রন্থের 'উত্তরপ্রজন্মের শিক্ষাদীক্ষা ও লালনপালন' নিবন্ধে।

দীন (দীনহীন, দৈন্য, অদৈন্য,) : **১.** দীন = ✓দী + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *দীন = গতিশীল দান তারিত যাহা হইতে। দীনহীন =* ***দীন*** *(বলিয়া) হীন যে।* ***দৈন্য*** *=* ***দীন*** *(ক্রিয়াকারী) থাকে যাহাতে।* ***অদৈন্য*** *= নেই* ***দৈন্য*** *যাহাতে বা যাহার। /* ***অদৈন্য*** *=* যাহার দৈন্য নাই। (ব.শ.)। **৩. দীন** = দরিদ্র, নির্ধন, দুঃখিত, বিষণ্ণ, দুর্গত, দুরবস্থাপন্ন, কাতর, করুণ, কৃপণ, আশ্রিত, যাচনাদিদৈন্যযুক্ত, ক্ষীণ, বিবেকহীন, কলুষিত, ভীত, দীনভাব, তগরপুষ্প। **দৈন্য** = দীনভাব, কার্পণ্য, শোচ্যতা, বিষাদ, দারিদ্র্যাদি হেতু নিস্তেজস্কতারূপ ব্যাভিচারভাব, অনুদারভাব, অকিঞ্চনভাব, কাতরতা, ইষ্টসাক্ষাৎকারে দীনতাসূচক বাক্য, অভাব। **অদৈন্য** = দীনতাহীন, কার্পণ্যরহিত, ধনবান, সম্পন্ন। (ব.শ.)। **৪.** poor অর্থে প্রচলিত। **৫. দি** শব্দের অর্থ আমরা জেনেছি 'গতিশীল দান'। সেই সুবাদে **দী** শব্দের মানে দাঁড়ায় '**দি**-এর আধার'। এর অর্থ 'গতিশীল দানকারী'; অর্থাৎ, যে স্থান থেকে ক্রমান্বয়ে দান ক্রিয়াটি হয়ে চলেছে। এই সত্তা একজন ধনদানকারী, জ্ঞানদানকারী বা অন্য যেকোনো প্রকার দানকারী হতে পারে; এমনি কি হতে পারে একটি বিদ্যালয়, হোটেল, ব্যাঙ্ক, দোকান ... ইত্যাদি অনেক কিছুই। তবে **দী**-দান বললে খাদ্যাদি দিতে দিতে হোটেলটাই দিয়ে দেওয়া, টাকা দিতে দিতে ব্যাঙ্কটাই দিয়ে দেওয়া, কিংবা বিদ্যা দিতে দিতে বিদ্যালয়টিই দিয়ে দেওয়া।

তা সে যাই হোক, দাতব্য বস্তুটি জ্ঞান না হয়ে বাহ্যসম্পদ হলে, এবং সর্বদা তা অন্যকে দিতে থাকলে, মানুষের হাতে কিছুই থাকবে না — এটাই স্বাভাবিক। সেই কারণে, **দী**-তারণকারী মাত্রেই **দীন**-পদবাচ্য। জ্ঞানদানকারী কখনোই **দীন** হন না।

আরও স্মর্তব্য যে, **দীন** বলতে আমরা সাধারণত poor man বা গরীব মানুষ বুঝে থাকি। **দীন** শব্দটির মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র সেরকম কথা নেই। **দীন** মানে যে-মানুষ দিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে বা নিঃস্ব হয়ে যায়। একইভাবে **হীন** মানে যে ত্যাগ করে করে হীনতাপ্রাপ্ত হয়েছে। অতএব **দীনহীন** জন মানে, যে ব্যক্তি দিয়ে দিয়ে এবং ত্যাগ করে করে দরিদ্র ও সর্বহারা হয়ে গেছে। তবে **দৈন্য** শব্দটি ধনের দীনতার পাশাপাশি জ্ঞানৈশ্বর্য্য বা মানসিক ঐশ্বর্য্যের দীনতাও বোঝায়। গুরুর কাছে জ্ঞানপ্রত্যাশীর ব্যবহারে এই **দৈন্যের** প্রকাশ ঘটে। আবার **অদৈন্য** শব্দটিও ঠিক তার বিপরীত অর্থের ধারক। এই সত্তা কেবল ধন বিষয়ে অদীন নয়, জ্ঞান বিষয়েও অদীন। তাই **অদৈন্য**। পঞ্চাশ বছর আগেও বাংলাভাষী শব্দটির মর্ম বুঝতে সক্ষম ছিলেন। তখন মানুষের নাম হিসেবেও শব্দটির প্রচলন ছিল, যথা 'অদৈন্যলাল বসু'।

দীপ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আদীপক, উদ্দীপ, উদ্দীপনা, উদ্দীপ্ত, দিউটি(টী), দিয়টি, দিয়াটি, দিয়ড়ি, দিয়ড়ী, দীপ্, দীপ, দীপক, দীপকলিকা, দীপকিট্ট, দীপছায়া, দীপতি, দীপধর, দীপন, দীপবর্ত্তী, দীপবৃক্ষ, দীপভাজন, দীপমালা, দীপশত্রু, দীপশলাকা, দীপশিখা, দীপশৃঙ্খলা, দীপান্বিত, দীপান্বিতা, দীপাবলি, দীপাবলী, দীপালি(লী), দীপিকা, দীপিত, দীপী, দীপোৎসব, দীপ্ত, দীপ্তকিরণ, দীপ্তকীর্ত্তি, দীপ্তজিহ্ব, দীপ্ততপাঃ, দীপ্তবান, দীপ্তমূর্ত্তি, দীপ্তলোহ, দীপ্তশক্তি, দীপ্তা, দীপ্তাংশু, দীপ্তাগ্নি, দীপ্তি, দীপ্তিমান, দীপ্য, দীপ্যমান, দীপ্র, দীয়টি(টী), দেউটি(টী), দেওয়ালী, দেয়ালি(লী), দেরকো, দেরখো, প্রদীপ, প্রদীপ্ত, সন্দীপক, সন্দীপন।

দীপ্ = গতিশীল দানের আধারের পালন। **দীপ** = গতিশীল দানের আধারের পালন / পান থাকে যাহাতে।

উদ্দীপক (উদ্দীপনা, উদ্দীপ্ত) : **১.** উদ্দীপক = উৎ + ✓দীপ্ + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***উদ্দীপক*** *= উদ্‌লোকে (মনোলোকে)* ***দীপন*** *করে যে।* ***উদ্দীপনা*** *= উদ্‌লোকে (মনোলোকে)* ***দীপন*** *করার আধার যে।* ***উদ্দীপ্ত*** *= যাহার উদ্‌লোকে (মনোলোকে)*

***দীপন** তারিত হইয়াছে।* **৩. উদ্দীপক** = অতিদীপয়িতা, উদ্ভাসক, অতিদীপক, উগ্র, তীব্র, প্রকাশক, উত্তেজক, উদ্রেককর। **উদ্দীপনা** = রসের উদ্বোধক বা পরিপোষক বিভাববিশেষ। **উদ্দীপ্ত** = প্রজ্বলিত, অতিদীপ্ত, দীপ্তিমান, প্রকাশিত, উদ্রিক্ত। (ব.শ.)। **৪.** exciting অর্থে **উদ্দীপক**, excitement অর্থে **উদ্দীপনা** এবং excited অর্থে **উদ্দীপ্ত** প্রচলিত। **৫.** দ্র. **দীপ, দীপন**। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

দীপ (দীপ্‌), দীপন, দীপক : ১. দীপ = ✓দীপ্‌ + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***দীপ্‌** = (আলোক) দানকারীর পালন। **দীপ** = (আলোক) দানকারী পালিত যাহাতে। **দীপন** = **দীপ** অন (on) যাহাতে। **দীপক** = **দীপন** করে যে।* / **দীপ** = যাহা দীপ্তি পায় বা গৃহাদি দীপিত করে। (ব.শ.)। **৩. দীপ** = জ্বলদ্‌বর্ত্তি, প্রদীপ, মৃত্তিকাদিকৃত বর্ত্তির আধার; দীপ্তি পাওয়া, জ্বলা। **দীপন** = দীপয়িতা, উদ্দীপক, জঠরানলবর্দ্ধক, প্রকাশক, ময়ূরশিখা, পলাণ্ডু, কাসমর্দ্দ, কুঙ্কুম, তগরমূল; জ্বালান, জঠরানলবর্দ্ধন, উদ্দীপন, প্রকাশন। **দীপক** = দীপয়িতা, দীপ্তিজনক, প্রকাশক, প্রজ্বলনকারী, পরিপাকশক্তিবর্দ্ধক, বিবৃতিকারক, প্রদীপ, কামদেব, শ্যেন, যমানী, রাগবিশেষ, কুঙ্কুম, অর্থালঙ্কারবিশেষ। (... এক কারকের অনেক ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইলে 'দীপক' হয়)। (ব.শ.)। **৪.** lamp অর্থে **দীপ** প্রচলিত, অর্থহীন নাম রূপে **দীপক** প্রচলিত। **দীপন** অপ্রচলিত। আজকাল অবশ্য কেউ কেউ **দীপন** শব্দটিকেও অর্থহীন নামরূপে ব্যবহার করে থাকেন। **৫.** 'স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে' —বাক্যটি নিয়ে একসময় বাংলাভাষী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মহা আলোড়ন পড়েছিল। তাঁরা বাক্যটি শুনে **উদ্দীপ্ত** হয়ে উঠেছিলেন। এর কারণ হল, নিজের পূর্বপুরুষের অর্জিত **দীপক** শব্দটির অর্থ তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন। সেটি যদি তাঁরা জানতেন, তাঁরা যে আদৌ উদ্দীপ্ত হতেন না, সেকথা নিঃসন্দেহে বলে দেওয়া যায়। কেননা, যে আলোর **দীপ** শত শত হাজার হাজার **দীপ**কে জ্বালিয়ে দিয়ে জগৎ আলোময় করে দিতে পারে, তাকেই বলা হত **দীপক**। এই আলো পার্থিব আলোও হতে পারে, জ্ঞানের আলোও হতে পারে, সুরের আলোও হতে পারে। এমনকি সে যে দাবানলও হতে পারে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা **দীপক**কে কখনোই দাবানল-সৃষ্টিকারী বলেননি। কারণ সম্ভবত এই যে, তাঁরা ধ্বংসাত্মক-নঞর্থক ভাবনা ভাবতেন না। কেননা, **দীপক** শব্দেরই অত্যন্ত নিম্নমানের নেগেটিভ-ডেস্ট্রাকটিভ ধারণার ব্যবহার ঘটানো হয়েছে 'স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করতে পারে' বাক্যে।

আগেও বিভিন্ন সময় আমরা জানিয়েছি, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন বলে আমরা বহু প্রাকৃতিক বস্তুর নাগাল পাই না। উপরোক্ত তথ্য বলছে যে, ময়ূরশিখা পলাণ্ডু কাসমর্দ্দ কুঙ্কুম তগরমূলকেও **দীপন** এবং শ্যেন, যমানী, কুঙ্কুমকেও **দীপক** বলা হত। অর্থাৎ, এই বাহ্যবস্তুগুলি কোনো না কোনো ভাবে **উদ্দীপক** বা অনলবৃদ্ধিকারক গুণাবলীর আধার। আমাদের পূর্বসূরী শব্দবিদগণ সেকথা জানতেন বলেই ঐ বস্তুগুলিকে **দীপন** ও **দীপক** শব্দে শনাক্ত করে গেছেন। মানুষের সন্তানের নাম **দীপক** রাখতে শুরু করেছিলেন তাঁরাই। যে ছেলে আপন অন্তরের আলোকশিখা দিয়ে পাশাপাশি সমস্ত মানুষের **মনে আলোকশিখা জ্বালিয়ে দিতে পারে, তার নাম তো দীপক হওয়াই উচিত। হায়, পাশ্চাত্যের দেখাদেখি আমরাও মানুষের নামকে 'অর্থহীন শব্দ' ভাবার বোকামিকে কেন যে প্রশ্রয় দিলাম!**

তবে, আমাদের **সেই পূর্বসূরী শব্দবিদগণের সর্বোচ্চ অর্জন** রয়েছে রাগরাগিণীর দুনিয়ায় **দীপক** রাগের ব্যবহারে। একটি রাগসঙ্গীত, যা কিনা গাইলেই সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুই **দীপ্ত** হয়ে ওঠে, **উদ্দীপ্ত** হয়ে ওঠে, ঝলমলিয়ে ওঠে সুরঝর্নার সমগ্র প্রেক্ষাপট, তাকেও তাঁরা শনাক্ত করে নাম দিয়েছিলেন '**দীপক** রাগ' নামে। সঙ্গীতজ্ঞগণ নিশ্চিত জানেন, **দীপক** রাগের সেই গৌরব কেন এবং কীভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে।

দীপ্ত (দীপ্তি) : ১. ✓দীপ্‌ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***দীপ্ত** = **দীপ্‌** তারিত যাহাতে। **দীপ্তি** = **দীপ্‌** তারণপূর্ব্বক গতিশীল যাহাতে।* **৩. দীপ্ত** = দীপ্তিযুক্ত, প্রজ্বলিত, প্রচণ্ড, তেজোময়, দগ্ধ, উদ্রিক্ত, প্রকাশান্বিত, বিকৃতস্বর, শোভাবান, সিংহ, নিম্বুক, স্বর্ণ, হিঙ্গু। **দীপ্তি** = দীপন, অভিব্যক্তি, শোভা, কিরণ, নায়িকার যৌবনে স্বভাবজ সাত্ত্বিক অলঙ্কারবিশেষ, লাক্ষা, কাংস্য। (ব.শ.)। **৪.** illuminated অর্থে **দীপ্ত** এবং illumination অর্থে **দীপ্তি** প্রচলিত। **৫.** দ্র. **দীপ**। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

দু (দুর্‌, দুশ্‌, দুষ্‌, দুস্‌, দু) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অদোষ, দউড়, দোউড়, দড় (দু-অড়, আড়), দপ্‌, দপ্‌দপ্‌, দপট, দবদব, দবদবা, দবাগ্নি, দবানল, দবিষ্ঠ, দাপ, দাপট, দাব, দাবকি, দাবড়, দাবড়ানি, দাবা, দাবাগ্নি, দাবানল, দাবি, দাবি-দাওয়া, দাবিড়ি, দাবুড়ি, দু, দুউও, দুও, দুঃ (দুর্‌, দুস্‌), দুঁদে, দুঃ, দুঃক্ষ, দুঃখ, দুঃখচ্ছেদ্য, দুঃখজাত, দুঃখত্রয়, দুঃখপাসরা, দুঃখপ্রায়, দুঃখভাক্‌, দুঃখশীল, দুঃখসঞ্চার, দুঃখহা, দুঃখার্ত্ত, দুঃখিত, দুঃখী, দুঃখোত্তর, দুঃশকুন, দুঃশলা, দুঃশাস, দুঃশাসন, দুঃশীল, দুঃসঞ্চার, দুঃসন্ধান, দুঃসন্ধেয়, দুঃসহ, দুঃসাধ, দুঃসাধ্য, দুঃসাহস, দুঃস্থ, দুঃস্থিত, দুঃস্থিতি, দুঃস্পর্শা (আলকুশি, বিছুটি), দুঃস্পর্শ, দুঃস্পর্শা, দুঃস্পৃষ্ট, দুঃস্মর, দুঃস্বপ্ন, দুক্ষ, দুকখ, দুকখি, দুকখিত, দুক্ষ, দুখ, দুখলি, দুখিনী, দুখী, দুগ্‌গাভোগ, দুঠ, দুঠ্‌ঠ, দুপদাপ, দুপদুপ, দুবর, দুবল, দুবলা, দুব্বা, দুয়া, দুয়ো, দুর্‌, দুরক্ষ, দুরক্ষর, দুরতিক্রম, দুরত্যয়, দুরদিনমান, দুরদুর, দুরদৃষ্ট, দুরধিগ, দুরধীত, দুরনুপালন, দুরনুষ্ঠিত, দুরন্ত, দুরন্তক, দুরন্তর, দুরন্বয়, দুরপনেয়, দুরবগম, দুরবগাহ, দুরবগ্রহ, দুরবস্থ, দুরবস্থা, দুরবাপ, দুরবেক্ষিত, দুরাকর্ষ, দুরাক্রন্দ, দুরাক্ষর, দুরাগ্রহ, দুরাচর, দুরাচার, দুরাত্মা, দুরাধর্ষ, দুরানম, দুরাপ, দুরারক্ষ, দুরারাধ্য, দুরারুহ, দুরারোহ, দুরালোক, দুরাশয়, দুরাসদ, দুরাসিত, দুরাহর, দুরিত, দুরিষ্ট, দুরুক্ত, দুরুক্তি, দুরুচ্ছেদ, দুরুত্তর, দুরুৎসহ, দুরুদাহর, দুরুদুরু, দুরুপসর্পী, দুরূহ, দুরোদর, দুর্গ, দুর্গপাল, দুর্গ(া)টুনটুনটুনি, দুর্গত, দুর্গতি, দুর্গন্ধ, দুর্গম, দুর্গা, দুর্গামণ্ডপ, দুর্গোৎসব, দুর্গোমণ্ডা, দুর্গ্রহ, দুর্ঘট, দুর্জন, দুর্জন, দুর্জর, দুর্জাত, দুর্জাতি, দুর্জ্ঞেয়, দুর্ণয়, দুর্দ্দম, দুর্দ্দর্শ, দুর্দ্দশা, দুর্দ্দান্ত, দুর্দ্দাম, দুর্দ্দিন, দুর্দ্দিবস, দুর্দ্দুর, দুর্দ্দুরি, দুর্দ্দৃশ্য, দুর্দ্দৃষ্ট, দুর্দ্দৈব, দুর্দ্দ্যুত, দুর্দ্ধর, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্দ্ধী, দুর্নয়, দুর্নিগ্রহ, দুর্নিবার, দুর্নিমিত,

দুর্নিমিত্ত, দুর্নিরীক্ষ্য, দুর্নিশি, দুর্নীত, দুর্নীতি, দুর্ব্বচ, দুর্ব্বর্ণ, দুর্ব্বল, দুর্ব্বসতি, দুর্ব্বহ, দুর্ব্বাক, দুর্ব্বাক্য, দুর্ব্বাচ্য, দুর্ব্বার, দুর্ব্বাসনা, দুর্ব্বাসাঃ, দুর্ব্বিগাহ, দুর্ব্বিগাহ্য, দুর্ব্বিজ্ঞেয়, দুর্ব্বিদগ্ধ, দুর্ব্বিনয়, দুর্ব্বিনীত, দুর্ব্বিপাক, দুর্ব্বিবাহ, দুর্ব্বিষহ, দুর্ব্বুদ্ধি, দুর্ব্বৃত্ত, দুর্ব্বোধ, দুর্ব্বোধ্য, দুর্ব্ব্যবহার, দুর্ব্ব্যাহৃত, দুর্ব্রজিত, দুর্ভগ, দুর্ভগা, দুর্ভাগা, দুর্ভাগ্য, দুর্ভাষী, দুর্ভিক্ষ, দুর্ভিদ, দুর্ম্মতি, দুর্ম্মদ, দুর্ম্মনঃ, দুর্ম্মনায়মান, দুর্ম্মন্ত্রিত, দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ম্মল্লিকা, দুর্ম্মল্লী, দুর্ম্মুখ, দুর্ম্মুশ, দুর্ম্মূল্য, দুর্ম্মেধাঃ, দর্ম্মশঃ, দুর্য্যোগ, দুর্য্যোধ, দুর্য্যোধন, দুর্য্যোনি, দুর্লঙ্ঘ, দুর্লভ, দুর্লভা, দুর্ললিত, দুর্লহ, দুর্লেখ্য, দুর্হৃৎ, দুলভ, দুলহ, দুশমন (দুঃমন), দুশ্চর, দুশ্চরিত, দুশ্চরিত্র, দুশ্চর্ম্মা, দুশ্চারিণী, দুশ্চিকিৎসা, দুশ্চ্যবন, দুষ্, দুষণ, দু(দু)ষী, দুষ্কর, দুষ্কর্ম্ম, দুষ্কুল, দুষ্কৃৎ, দুষ্কৃতি, দুষ্কৃতী, দুষ্খ, দুষ্ট, দুষ্টচক্র, দুষ্টচারী, দুষ্টা(ষ্ট)মি, দুষ্টি, দুষ্ঠু, দুষ্পচ, দুষ্পরিগ্রহ, দুষ্পরিহর, দুষ্পার, দুষ্পূর, দুষ্প্রধর্ষ, দুষ্প্রবৃত্তি, দুষ্প্রবেশ, দুষ্প্রসহ, দুষ্প্রাপ, দুষ্প্রাপ্য, দুষ্মন্ত, দুস্তর, দুস্ত্যজ, দুস্ত্যজ্য, দুস্থ, দুস্থিত, দুস্থিতি, দূ, দূত, দূতী, দূতীগিরি, দূতীপনা, দূত্য, দূন, দূর, দূরগত, দূরগামী, দূরতঃ, দূরদর্শন, দূরদূরান্ত, দূরবর্ত্তী, দূরবীক্ষণ, দূরশ্রুত, দূরাদূর, দূরাধিরোহী, দূরান্তর, দূরায়ত, দূরীকৃত, দূর্ব্বা, দূর্ব্বাষ্টমী, দূষক, দূষি(ষী), দূষিকা, দূষী, দূষ্য, দূষ্যা, দের (দূর), দেরি, দেরী (দূরে), দোখ, দোতি(তী), দোপটে, দোপট্টে, দোর্দণ্ড, দোষ, দোষগ্রাহী, দোষঘ্ন, দোষজ্ঞ, দোষত্রয়, দোষদৃষ্টি, দোষবান, দোষভাক্, দোষল, দোষা, দোষাকর, দোষাতন, দোষারোপ, দোষাবহ, দোষী, দৌড় (দূ-র-পর্যন্ত গতি), দৌড়া, দৌড়াদৌড়ি, দৌত্য, দৌরাজ্য, দৌরাত্ম্য, দৌর্গত্য দৌর্গন্ধ্য, দৌর্জ্জন্য, দৌর্ব্বল্য, দৌর্ভাগ্য, দৌভ্রাত্র, দৌর্মনস্য, দৌহার্দ, দৌর্হৃদয়, দৌশ্চর্ম্ম, দৌষ্মন্ত, প্রদোষ, বিদূষক, সদোষ।

দু (দুর্, দুশ্, দুষ্, দুস্, দূ) = নবরূপী দাতা যে। **দুর** = নবরূপী দাতা রহে যাহাতে। **দুশ** = নবরূপী দাতার শয়ন যাহাতে। **দুষ** = নবরূপী দাতার দিশাগ্রস্ত শয়ন যাহাতে। **দুস** = নবরূপী দাতার একান্ত শয়ন যাহাতে। **দূ** = নবরূপী দাতার আধার যে।

দপ্, দপ্দপ্, দাপ, দাপট : ২. ***দপ্*** = *(আলো, তাপ) দাতার পালন (যাহাতে)।* ***দপ্দপ্*** *=* ***দপ্****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***দাপ*** *=* ***দপ*** *হইতে জাত।* ***দাপট*** *=* ***দাপ*** *টঙ্কারিত যাহাতে।* **৩. দপ্** = হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠার ভাব। **দপ্দপ্ (দবদব)** = অতিদীপ্তভাবে, সমুজ্জ্বল, অতিদীপ্তপ্রকাশের ভাব, তীব্রশোকজ্বালার অনুভব। **দাপ** = দর্প, অহঙ্কার, প্রতাপ, প্রভাব, দবদবা; দর্প করা, আস্ফালন করা, চাপিয়া ধরা, চাপা। **দাপট** = দর্প, সদর্পে বেগে পদবিক্ষেপ বা উল্লম্ফন, সদর্প সবেগ অভিযান, প্রচণ্ডতা, প্রবলতা, আধিক্য, বেগ, প্রবল প্রতাপ, দবদবা। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** কোনো অভিধানেই **দপ্** শব্দের মূলে কোনো ক্রিয়া সেভাবে দেখানো নেই। ব.শ. **দব** শব্দের মূলে **দু** ক্রিয়া দেখিয়েছেন এবং বলেছেন দপ্দপ্ ও দবদব সমার্থক। কেবল তাই নয়, তিনি **দাপ** ও **দাপট** শব্দের অর্থেও 'দবদবা' শব্দটিকে রেখেছেন; যদিও **দাপ** শব্দটির 'দৃপ্' ক্রিয়া রয়েছে বলে জানিয়েছেন। আমরা শব্দগুলিকে আপাতত **দু** ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেই উপস্থিত করলাম। শব্দার্থের নিয়মানুসারে **দ**-এর বা '(?)দাতার' **প্** (= পালন) যাহাতে, তাকে **দপ্** বলা যায়। আলো, জ্বলন, জ্বালা, তাপ, প্রতাপ, টাকার ও ক্ষমতার গরম — এসবকেই **তেজ** বলা যায়। সেই তেজ-দাতার পালন যাহাতে, তাই **দপ্** পদবাচ্য। এই **দপ**-এর থেকে জন্মায় **দাপ**। 'বিদ্যা টাকা ক্ষমতা প্রতিপত্তি কী নেই চক্কোত্তির। যেমন **দাপ** তেমনি **দাপট**।' গ্রামবাংলায় 'জমি বাপের নয়, দাপের' কথাটি খুবই প্রচলিত। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে কথাটিকে তুলে এনেছেন। আমাদের 'চ' গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় আমরা 'দাপের বাপ কে' তা জানতে গিয়ে সামাজিক ক্ষমতার উৎসকে শনাক্ত করেছি। আর, জমিদারের **দাপটে** বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাওয়ার গল্প তো বছর পঞ্চাশ আগেও বলা হত। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে, গ্রামবাংলায় শব্দ দুটি আজও অবিকল এইভাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

দব, দবদব, দবদবা, দাব, দাবকি, দাবড়, দাবড়ানি, দাবু : ১. দব = ✓দু + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. দব** = *(তেজ) দাতাকে বহন করে যে।* ***দবদব*** *=* ***দব****-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ***দবদবা*** *=* ***দবদব****-এর আধার যে।* ***দাব*** *=* ***দব*** *হইতে জাত; দাবিয়ে রাখা যাহাতে।* ***দাবকি*** *=* ***দাব****-করণ গতিশীল করে যে।* ***দাবড়*** *=* ***দাব****-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে।* ***দাবড়ানি*** *=* ***দাবড়****-এর আধার গতিশীলভাবে অন যাহাতে।* **৩. দব** = বন, অরণ্যবহ্নি, দাবানল, অগ্নি, জ্বর, উপতাপ। **দবদব** = **দপ্দপ্**। **দবদবা** = (আরবি শব্দ) প্রভাব, প্রতাপ, আতঙ্ক। **দাব** = **দব**, আধিপত্য, প্রভাব, দমন, তাড়া, ধমক, চাপ; দমন করা, শাসন করা, চাপা, চাপ দিয়া বসান, চাপিয়া ধরা, ভয় দেখান, শাসান, চাপ দেওয়া, চাপ দিয়া চালান, চাপা দেওয়া। **দাবকি** = ভয়প্রদর্শন, শাসান, ধাবকি। **দাবড়** = বেগে পদক্ষেপ বা পদক্ষেপ শব্দ, প্রচণ্ডভাব, বেগ, সদর্প বীর্য্য, বিক্রম। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. দপ ও দব** এবং তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলির বিশেষত্ব এই যে, তারা দৃশ্য আগুন ও তৎসঞ্জাত তাপের কথা যেমন প্রকাশ করে, তেমনি একইসঙ্গে অদৃশ্য আগুন ও তৎসঞ্জাত তাপের কথাও সমান ভাবে প্রকাশ করে। আর, বাংলাভাষার ক্ষেত্রে এই কথাটি সবসময় মনে রাখা দরকার যে, এই ভাষার শব্দস্রষ্টারা মূলত অদৃশ্য বিষয় ও বস্তুকে দেখানো ও বোঝানোর জন্যই শব্দের সৃষ্টি করেছিলেন। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অদৃশ্য বিষয়টির সমধর্মী দৃশ্য জাগতিক-বিষয়কেও ওই একই শব্দে উল্লেখ করে গিয়েছেন। আরবি ভাষার **দবদবা** শব্দটি একই উৎস থেকে জাত এবং ব.শ. তাকে যথার্থেই চিহ্নিত করতে পেরেছেন। **৬.** ইংরেজির dab, dap ও তৎসংশ্লিষ্ট বেশ কয়েকটি শব্দ।

দাবা, দাবান, দাবানল, দাবু : ২. ***দাব*** *=* ***দব*** *হইতে জাত। (উপরে* ***দব*** *দ্রষ্টব্য)।* ***দাবা*** *=* ***দাব****-এর আধার যে;* ***দাব*** *ক্রিয়া চালায় যে।* ***দাবান*** *=* ***দাব*** *অন (on) যাহাতে।* ***দাবানল*** *= যে অনল অন্য সব কিছুকে দাবায়; যে অনল* ***দাব দাব*** *(দাউ দাউ) করে জ্বলে।* ***দাবু*** *=* ***দাব*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* **৩. দাবা** = শতরঞ্জ খেলায় মন্ত্রী বা সেনাপতি। (মন্ত্রীর চাল অবারিত; সকল বল দাবিয়া রাখে বলিয়া মন্ত্রী 'দাবা'।) ...। **দাবান** = দমন করা, শাসন করা, চাপা, চাপিয়া

ধরা, ভয় দেখান, শাসান, চাপ দেওয়া, চাপ দিয়া চালিত করা বা চালান। **দাবানল** = বনজাত অগ্নি, বনবহ্নি। (ব.শ.)। ৪. chess অর্থে দাবা প্রচলিত। অন্য শব্দগুলি যথার্থে প্রচলিত। ৫. অন্য কোনো বাংলা অভিধানে নেই, এমন দুটি শব্দ এখানে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি — **দাবু**, **উলাড়**। (**উল্** ক্রিয়ায় **উলাড়** শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করে এসেছি. **কিন্তু** ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, সেই ব্যাখ্যা এখানে দেওয়া হল।) গ্রামবাংলায় শব্দ দুটি খুবই ব্যবহৃত হয়, বিশেষত যাঁরা গরুগাড়িতে মালপত্র বহন করেন তাঁদের কথাবার্তায় শব্দটির ব্যবহার প্রায়শই শুনতে পাওয়া যায়। গরুগাড়িতে মাল বোঝাই করার সময় একটি নীতি অবশ্যই মান্য করতে হয়। তা হল, আগে পেছনে যেন সমান ভার থাকে। কোনো কারণে সামনে অধিক ভার হয়ে গেলে, তাকে বলে **দাবু** এবং পেছনে অধিক ভার হয়ে গেলে তাকে বলে **উলাড়**। অধিক **দাবু** হয়ে গেলে, বলদ দুটির কাঁধে অধিক চাপ পড়ে; ভারের চাপ সামলে গাড়ি টানতে তাদের কষ্ট হয়। আবার, **উলাড়** হয়ে গেলে, গাড়ির জোয়াল বলদ দুটির কাঁধে ঠিকঠাক বসে না, ফলে তারা কাঁধের জোয়ালে জোর লাগিয়ে গাড়ি টেনে নিয়ে যেতে পারে না; তার ওপর কাঁধের জোয়াল উপর দিকে উঠে গিয়ে গাড়ি উলটে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই গাড়োয়ানেরা বারংবার পরীক্ষা করে নেয়, গাড়ির বোঝাই **দাবু** হয়ে গেল নাকি **উলাড়** হয়ে গেল। তবে, সাধারণত একটুখানি **দাবু** করেই গাড়ি বোঝাই করা হয়, যাতে বলদ দুটির কাঁধে জোয়ালটি একটু চেপে থাকে; তাতে তাদের পক্ষে গাড়ি টানার সুবিধে হয়। কিন্তু তা না হয়ে **উলাড়** হয়ে গেলে গাড়ির চলা তো দূরের কথা, গাড়িটির পেছন দিকে উলটে যাওয়ার ভয় থাকে।

এই **দাবু** ও **উলাড়** শব্দ একশোভাগ ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মে প্রসৃত হয়েছে। '**দাব** নবরূপে উত্তীর্ণ' হয়েছে **দাবু**-তে; আর 'উলটো দিকে আড়' হয়েছে **উলাড়**-এ। আজকের শহুরে মধ্যবিত্তর জীবন বলতে গেলে গরুগাড়ির বলদের মতোই। সামনে তার পরিবারের সাংসারিক কাজের ভার, আর পেছনে তার অফিসের কাজের ভার — এ দুটোর মধ্যে একটা ভারসাম্য রেখে সে তার কর্মের বোঝা টানতে থাকে। সাংসারিক কাজের ভার **দাবু** হয়ে গেলেও চলে, কিন্তু অফিসের কাজের ভার বেশি হয়ে গেলে বা **উলাড়** হয়ে গেলে তার সমূহ বিপদ। এবং সত্যি বলতে কী, সাম্প্রতিক বিশ্বায়নবাদী সমাজে চাকুরীজীবীদের জীবন **উলাড়** হয়ে গেছে বলেই আজকের মানুষ দিক্‌দিশা খুঁজে পাচ্ছে না, দিশাহারা অবস্থা মানুষের।

দাবি, দাবি-দাওয়া : ২. ***দাবি*** = ***দাব*** *গতিশীল যাহাতে।* ***দাবি-দাওয়া*** = ***দাবি*** *ও দাওয়া (দাতা নবরূপে যায় যাহাতে)।* ৩. **দাবি** = স্বত্ব, হক; স্বত্বজ্ঞাপন, দাবী, প্রাপ্য, পাওনা। 'দাওয়া' - দাবি (একার্থক)। আরবি শব্দ 'দাওয়া'। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দাবিয়ে যা চাওয়া হয়, সেটাই **দাবি**। কারণ, তাতে **দাব** (দাবানো) গতিশীল থাকে। দাবি-দাওয়া শব্দটি মুজতবা আলী কথিত সমার্থক বাংলা-আরবি, বাংলা-ফারসি শব্দের যোড়; যেমন 'হাট-বাজার' ইত্যাদি। তাছাড়া, 'দবা' (দওয়া = ঔষধ), 'দাবা' (দাওয়া = দাবি) প্রভৃতি সব শব্দই যে মূলে **দব** শব্দ থেকে জাত, তা নিয়ে এখন আর কোনো সংশয় নাই। বলে রাখা ভাল, একালে যাকে suppressive medicine বলা হয়, তার ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ ধরে রেখেছে 'দবা'।

দু, দুঅ, দুঅজ, দুআওরি, দুই, দো : দ্র. **দ্বি**।

দুঃ (দুর্, দুস্, দুষ্) : ২. ***দুঃ*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ দানের নির্য্যাসত্যাগ বা অন্ত (শেষ রূপ) যাহাতে।* ***দুর্*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ দানের রক্ষণ-ভক্ষণ (যাহাতে)।* ***দুস্*** = *নবরূপে উত্তীর্ণ দানের একান্ত টিকে থাকা (যাহাতে)।* ৩. **দুঃ (দুর্, দুস্)** = উপসর্গবিশেষ, দুষ্ট, নিন্দা, দুঃখ, নিষেধ, অভাব, ঈষৎ, কৃচ্ছ্র, কৃশ, অবক্ষেপণ, অসম্পত্তি, সঙ্কট, কোপ। (স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম বর্ণ, য র ল ব হ পরে থাকিলে দুস্ হয়ে যায় দুর্; ক প পরে থাকিলে দুস্ হয়ে যায় দুষ্, শ ষ স পরে থাকিলে দুস্ হয়ে যায় দুঃ।) (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **উপসর্গ**। ইতোপূর্বেই আমরা দেখেছি, কোনো বর্ণের সঙ্গে উ-কার যুক্ত হলে, সেই বর্ণের অর্থের আমূল পরিবর্তন হয়; সে নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে দেখা দেয়। আ-কার, ই-কার যুক্ত হলেও **দ** দান অর্থেরই কোনো না কোনো এলাকায় সক্রিয় থাকে; কিন্তু উ-কার যুক্ত হয়ে গেলে দান তার বিপরীত রূপ নিয়ে নেয়; দানের বদলে সে খাবলে নেওয়ার চেষ্টা করে, ভয় দেখায়। আর হাত পাতলেও দান আসে না, কুকুর আসে। প্রার্থী চেঁচায় — ভিক্ষা চাই না মা, কুকুর সামলান। তার মানে, **দুঃ** শব্দের অর্থ হল, 'যে দান কুকুর রূপে কামড়াতে বা খাবলে নিতে আসে'। অর্থাৎ কিনা, **দ দা দি দী** প্রভৃতি পদে **দান** থাকলেও **দুঃ**-তে যে **দান** থাকে তা কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার মতো বিপজ্জনক। তাই তা সর্বদা নঞর্থক অর্থ ধারণ করে থাকে। ...:

এই **দুঃ** কোন কোন প্রেক্ষিতে **দুস্, দুর্, দুষ্** হয়ে যায়, ব.শ. তা বিস্তারে দিয়েছেন। (উপরে **৩** দেখুন)। এই পরিবর্তন কেবল জিহ্বা-যন্ত্রের চলাচলের নিয়মেই হয়, তা নয়; আমরা দেখেছি, বাস্তবে দুই ক্রিয়ার যৌথতার ক্ষেত্রেও সন্ধ্যাঞ্চলে এই বদল ঘটে থাকে।

মনে হতে পারে, এই শব্দটির বুঝি একক ব্যবহার নেই। তা কিন্তু ঠিক নয়। '*দুঃ!*' '*দুস্-শালা*', '*দূর-দূর!* যত সব বাজে কথা!' — বাংলাভাষী এধরনের বাক্যও ব্যবহার করে থাকেন এবং এরকম প্রয়োগে **দুঃ** শব্দের যথার্থ প্রয়োগই হয়ে থাকে।

দুঃখ (দুঃখত্রয়) : ১. দুঃখ = দুস্ + ✓খন্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দুঃখ*** = *যাহা নবরূপে উত্তীর্ণ দানের বিসর্গশক্তি (বা সৃষ্টিবিরোধী শক্তি) রূপে দেহ-মনকে ক্ষ-করে (খনন করে বা খাবলে নেয়); যে-দান গ্রহীতার ক্ষতি করে।* ***দুঃখত্রয়*** = *তিন প্রকার* ***দুঃখ****-এর সমাহার।* ৩. **দুঃখ** = ক্লেশকর, কষ্টজনক, অসুখ, অপ্রিয়, দুষ্কর, কৃচ্ছ্র, কষ্ট, পীড়া, ব্যথা, দুঃখহেতু, প্রতিকূলবেদনীয় রজঃপরিণামভেদ, আত্মধর্ম্মভেদ। **দুঃখত্রয়** = আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক — এই ত্রিবিধ দুঃখ। (ব.শ.)। ৪. sorrow অর্থে **দুঃখ** প্রচলিত, **দুঃখত্রয়** অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দুঃ, আধি, ত্রিতাপ**। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

দুঃশলা : ২. *যাহাতে ক্ষতিকর* ***শলা*** *(কৌ****শল****বুদ্ধি) থাকে; যে সত্তা ক্ষতিকর শলা-পরামর্শ দেয়।* ৩. ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর একমাত্র কন্যা, দুর্যোধনের কনিষ্ঠা ভগিনী। ইনি সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের স্ত্রী। কুরুক্ষেত্র

যুদ্ধে জয়দ্রথের মৃত্যু হলে ... দুঃশলা শিশুপুত্র সুরথকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জুন যজ্ঞাশ্ব নিয়ে সিন্ধুদেশে উপস্থিত হলে ... সুরথ মূর্চ্ছিত হন ও মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন অর্জুন সুরথের নাবালক পুত্রকে সিন্ধুদেশের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে দুঃশলাকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রস্থান করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. একালে আমরা ঘটনাক্রমের বর্ণনা দিই বা ইতিহাস লিখি, কোন্ ব্যক্তি অন্য কোন্ ব্যক্তির সাথে কী করল না-করল তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে। সেকালে ইতিহাস লেখার সেরকম নিয়ম ছিল না। তাঁরা দেখতেন কোন্ সামাজিক সত্তা ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছে। ক খ-এর সম্পত্তির প্রতি আসক্ত হল, এবং তা আত্মস্থ করার জন্য খ-এর সম্পত্তির দিকে হাত বাড়াল। স্বভাবতই খ ক-কে আঘাত করল। ক ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে খ-এর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হল। এই ঘটনার বর্ণনা সেকালে দেওয়া হত এইভাবে — কাম লক্ষ্মীর প্রতি আসক্ত হইলে নারায়ণ তাহাকে নিরস্ত করেন। তাহাতে কাম আহত হইলে তাহার পুত্র ক্রোধ নারায়ণের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। — ঘটনার বর্ণনা এইভাবে বিমূর্ত হয়ে যাওয়ায় একালের পাঠক আর সে বর্ণনার অর্থ ঠিকঠাক বুঝতে পারেন না। সেই কারণে মহাভারতাদিতে বর্ণিত ইতিহাস আমাদের বোধের বাইরে থেকে যায়।

আসলে, অতি প্রাচীন কালে সমাজ যখন সম্পূর্ণ যৌথ স্বভাবের ছিল, তখন সামাজিক সত্তাগুলিকে চিনতে বুঝতে কোনো অসুবিধা হত না। তারই উত্তরাধিকার পৃথিবীর সব দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কমবেশি রয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে সমাজ যতই খণ্ড খণ্ড হতে থাকে, বর্ণনার কৌশলও বদলে যায়। লোকে ব্যক্তিকে ঘটনার ঘটক রূপে দেখবার যোগ্য হয়ে ওঠে। এবং সেভাবেই পরবর্তীকালের ইতিহাস বর্ণিত হতে থাকে।

কিন্তু জগৎকে দেখবার বুঝবার ও বর্ণনা দেবার প্রাচীন অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গি ও বাক্‌রীতি রাতারাতি খণ্ডভাবে দেখবার বুঝবার ও বর্ণনা দেবার দৃষ্টিভঙ্গি ও বাক্‌রীতিতে বদলে যায়নি। মাঝে একটা অবস্থান্তর প্রাপ্তির যুগ বা transitional period ছিল এবং সে যুগটিও বেশ দীর্ঘ ছিল। তার ওপর ভারতীয় পণ্ডিতেরা পূর্বতন রীতিতে ভাষাকে সংস্কার করে প্রচলিত ভাষার সংস্কৃত-পাঠ বানিয়ে ফেলেছিলেন। ভারতের রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদি গ্রন্থ এবং ইয়োরোপের ইলিয়াড ওডিসি ও অন্যান্য পুরাণাদি গ্রন্থ এই অবস্থান্তরপ্রাপ্তির যুগে রচিত। ফলে, এতে সামাজিক সত্তাকে ধরে ধরেই ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এতে কাম একজন ব্যক্তিবিশেষ যেমন হতে পারেন, তেমনি একদল মানুষও হতে পারেন। দেখা হয়, সমাজে যে-সত্তাটি সক্রিয় সে আসলে কে? সে কি রাষ্ট্রকে ধরে রেখেছে যে, সেই সামাজিক বিশ্বাস বা **ধৃতরাষ্ট্র**? সে কি যে-শাসন মানুষের ও তাদের সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, সেই **দুঃশাসন**? সে কি যে-দীর্ঘস্থায়ী আইনযুদ্ধ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর, সেই **দুর্যোধন**? সে কি যে-শলাপরামর্শ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর, সেই **দুঃশলা**? ...

এখন আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, মহাভারতের রচয়িতাগণ (ব্যাস) সমাজ-ইতিহাসের বর্ণনা করার উপায় রূপে সর্বাগ্রে সেইসব সামাজিক সত্তাগুলিকে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তারপর সেগুলির ঘটনাক্রমের বর্ণনাকে মানুষের বংশধারা ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে রেখে উপস্থাপন করেছিলেন। ... কাজটি সেকালের পণ্ডিতদের পক্ষে কিন্তু খুব কিছু কঠিন ছিল না।

দুঃশাসন : ১. দুস্ + শাস্ + অন (যুচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দুঃ শাস (= শাস্তির ভয়) অন (on) যাহাতে; যে শাসন (মানুষের পক্ষে) ক্ষতিকর।* ৩. ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর দ্বিতীয় পুত্র। ইনি দুর্যোধনের অতি প্রিয় ছিলেন এবং এঁর পরামর্শ অনুসারেই দুর্যোধন সমস্ত কর্ম সমাধা করতেন। ... যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হলে ... ইনি একবস্ত্রা ও রজঃস্বলা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করে রাজসভায় নিয়ে এসে কর্ণের পরামর্শমতো দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করতে চেষ্টা করেন। ... কৃষ্ণের কারণে ... দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করতে অসমর্থ হন। ... ভীম দুঃশাসনের বক্ষোরক্ত পান ও সেই রক্তে দ্রৌপদীর কেশ রঞ্জিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ... (পৌ.অ.)। ৪. 'কুশাসন' অর্থে এখনও কমবেশি প্রচলিত। মহাভারতের চরিত্র হিসেবেও অনেকে জানেন। পঞ্চাশ বছর আগেও লোকে সন্তানের নাম রাখত 'দুঃশাসন'। (কলেজে কলিম খান-এর এক সহপাঠীর নাম ছিল 'দুঃশাসন চন্দ'। মেদিনীপুর জেলার দাঁতন মহকুমার এক গ্রামে তার বাড়ী ছিল।) ৫. দ্র. **দুঃশলা**। মহাভারত গ্রন্থে ভারত সমাজের যে ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তাতে একসময় ভারতসমাজ যে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের দ্বারা শাসিত ছিল, তা দুঃখদায়ক হয়ে উঠেছিল। পরিকল্পিত প্রচার (= বায়ুপুত্র) নামক পুঁজিবাদী সত্তা (= ভীম) এর বুক চিরে রক্তপান করে; অর্থাৎ সারা ভারতে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে যাঁরা কর্মচারী রূপে কাজ করতেন, জনসাধারণের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে এমন প্রচার করা হয় যে, জনসাধারণ তাদের ধ্বংস করে দেন। যে কারণে মহাভারতের যুদ্ধোত্তর যুগে (৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পর) ভারতসমাজে কিছুকালের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দেখতে পাওয়া যেত না। পাঠান-মোগলেরা যখন ভারতে আসে, তখন দেশী-রাজকর্মচারীদের দেখা যেত না।

দুরন্ত : ২. **দুঃ** *অন্ত যাহার। (দুঃখের অন্ত করে যে, অথবা যাহার অন্ত করা দুঃখকর।)।* [*দুঃ-এর (ক্ষয়ক্ষতি-দানের বা দুঃখের) অন্ত (শেষ) যাহাতে; যাহার অন্ত করা* **দুঃ** *(দুঃখে সাধ্য), অর্থাৎ যাহা অন্ত পর্যন্ত* **দুঃ** *(দুঃখদায়ী)।*] / দুর্ অন্ত যাহার; যাহার অন্ত দুষ্প্রাপ। (ব.শ.)। ৩. দুষ্টাবসান, দুঃখাবসান, অপার, অত্যন্ত, সাতিশয়, গম্ভীর, দুর্ব্বোধ, দুর্জ্জেয়, দুঃখে যাপনীয়, অতিক্লেশকর, দুঃখদ, দুরতিক্রম, দুর্ব্বৃত্ত, দুরাত্মা, দুরাচার, প্রবল, ভীষণ, ঘোর, দুঃসহ, অশুভ, সুদৃঢ়, অশান্ত, অধীর, হিংস্র, মারাত্মক, অরক্ষণীয়, দুর্নিবার, অন্তহীন, বিপুল। (ব.শ.)। ... দুষ্ট, দামাল, দুর্দম, দুর্দমনীয়, দুর্দান্ত, উগ্র, প্রচণ্ড তাপযুক্ত, দুরতিক্রমণীয়। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ... প্রতিকার বা প্রতিবিধান কষ্টসাধ্য এমন। (সংসদ অভিধান, কলকাতা)। ৪. প্রধানত beyond control অর্থে প্রচলিত। তবে উপরোক্ত অর্থগুলিতেও শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। ৫. এই শব্দটির অর্থ ব.শ. যা যা রয়েছে, তার বাইরে আরও কয়েকটি রয়েছে ঢাকার অভিধানে এবং একটি বাড়তি অর্থ রয়েছে সংসদ অভিধানে। সেকারণে সেই তথ্যও দিয়ে দেওয়া হল।

এই একটি শব্দ, যা আজও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তার অর্থ ঠিক কী, তা খুব স্পষ্ট নয়; কিন্তু উপরোক্ত ৩-এ আমরা দেখলাম, নানার্থে

শব্দটির প্রয়োগ হয়ে থাকে। এমনকি পরস্পরবিরোধী অর্থও রয়েছে — যে দুঃখের অবসান ঘটায় এবং যে দুঃখ দেয়, দুটো সত্তাকেই **দুরন্ত** শব্দের অর্থে দেখতে পাওয়া যায়। এর কারণ হল, শব্দটি প্রসূত হয়েছে **অজয়** শব্দের মতো — নেই জয় যাহাতে। অর্থাৎ, সে কাউকে জয় করে না, কেউ তাকে জয় করতে পারে না। **দুরন্ত**ও তেমনি শব্দ — **দুঃ** অন্ত যাহার। অর্থাৎ, দুঃখের অন্ত করে যে এবং যার অন্ত করা দুঃখকর। উপরে ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে (২-এ) তা আরও বিস্তারিত করে দেখানো হয়েছে।

যাই হোক, শব্দটির উদ্ভব রহস্য এইরকম দ্বিমুখী হওয়ায় এর দ্বারা শনাক্ত সত্তাদের আমরা অনেক সময় পরস্পরবিরোধী দেখি। কিন্তু বাংলাভাষার তাতে কোনো অসুবিধা হয় না। তার এরকম দ্বৈতাদ্বৈতরূপী বেশ কিছু শব্দ রয়েছে; এবং বাংলাভাষী জনসাধারণ বিশেষত মায়েরা এইরকম শব্দ ব্যবহারে অত্যন্ত অভ্যস্ত। তাঁরা পরস্পরবিরোধী সত্তাকে অনায়াসে একত্র করে **অম্লমধুর** করে নিতে পারেন। দুষ্টের সঙ্গে প্রিয়কে মিশিয়ে তাঁরা করেছেন **দুষ্টু**। এ দুষ্ট বটে, প্রিয়ও বটে। **দুরন্ত**ও তেমনি। সে দুঃখদায়ী, আবার সে-ই সব দুঃখের মোচনকারী। তাঁদের মুখে তাই **দুরন্ত** শব্দের দ্বৈতাদ্বৈত প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায় — 'হ্যাঁ বাবা, দুলালকে দেখলে? কোথায় যে গেল! ভারি **দুরন্ত** হয়েছে!' **৬.** en*dure*, *dura*tion প্রভৃতি এবং dur-যুক্ত বহু ইংরেজি শব্দ এই একই উৎসজাত। পাশ্চাত্যে যে Durant শব্দটি মানুষের নামের মধ্যে পাওয়া যায়, যেমন মার্কিন পণ্ডিত Will Durant, সেটিও এই উৎসজাত। মহাকবি দান্তের Dante নামটি Durante-র সংক্ষিপ্ত রূপ।

দুরুদুরু (দুরু) : **২.** ***দুরু** = নবরূপে উত্তীর্ণ দানের রক্ষণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **দুরুদুরু** = **দুরু**-র পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **৩.** হর্ষাবেগে দ্রুত হৃৎকম্প, কামাবেগে দ্রুত হৃদয়াদি-কম্পন, ভয়-লজ্জা-প্রভৃতি হেতু হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দন, দোলন। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. দুঃ** শব্দের অর্থে আমরা দেখেছি, দানকারীর দান 'মুষ্টিপূর্ণ চাউল' না হয়ে 'লেলিয়ে দেওয়া কুকুর' হয়ে গেছে। কিন্তু সেই কুকুর যদি প্রার্থীকে কামড়ানোর বদলে তার সামনে গিয়ে লেজ নাড়তে শুরু করে এবং তার হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগে, তাহলে 'লেলিয়ে দেওয়া কুকুর'রূপী দানকে কী বলা হবে? হ্যাঁ, এই সত্তাটিকেই বলা হয় **দুরু**। সে এসেছিল **ক্ষয়ক্ষতিকর-দান** রূপে দুঃখ দেবে বলে, কিন্তু এখন সে ক্ষয়ক্ষতির বদলে কিছু লাভজনক বা শুভ কিছু করবে বলে ভরসা দিচ্ছে। **দুঃ** বা **দুর্** হয়ে গেছে **দুরু**। এই যে দোটানা, লাভ-লোকসানের মাঝে, শুভ-অশুভের মাঝে, শত্রুর সহসা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাঝে এই যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোটানা — একেই বলে **দুরু**। এই দোটানা বারংবার একনাগাড়ে হতে থাকলে তাকে বলে **দুরুদুরু**।

দুরূহ : **১.** দুর + **উহ্** + অ (খল্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***দুঃ** উহ যাহার। (দুঃখকে **উহ** করে যে, অথবা যাহাকে **উহ** করা দুঃখকর।)* **৩.** দুর্বিতর্ক্য, দুর্জ্ঞেয়, দুঃখসঙ্কুল, কষ্টবহুল, কঠোর, অবশ্যপালনীয়, দুরবজ্ঞেয়, দুর্নিবার, সুগভীর, কঠিন, দুঃসাধ্য। (ব.শ.)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫. উহ কথাটির অর্থ হল**, প্রচলিত কর্মধারা থেকে, জীবন থেকে, বিশেষ প্রেক্ষিত থেকে কোনো কিছুকে উপরে তুলে পৃথক করে রাখা। এমন বহু ব্যাপার আছে, যাকে এভাবে পৃথক করা প্রায় অসম্ভব। সেগুলি সবই **দুরূহ**। আবার খোদ দুঃখ ব্যাপারটিকেই মানুষের জীবন থেকে পৃথক করে আলাদা করে রাখা প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ, দুঃখকে **উহ** করাও অসম্ভব, তাই সেটিও **দুরূহ**। সমূহ শব্দটির ভেতরে **উহ** রয়েছে। এই **উহ** কর্মযজ্ঞ থেকে উৎপাদিত বস্তুগুলিকেও বোঝায়। সেগুলিকে একত্রে ধরলে তাদের **সমূহ** বলে।

দুর্গ, দুর্গত, দুর্গতি, দুর্গপাল, দুর্গম : **১.** দুর্গ = দুর্ + ✓গম্ + অ (ড) - অধিকরণে। (ব.শ.)। **২.** ***দুর্গ** = **দুঃ** (= ক্ষয়ক্ষতিদানমূলক) গমন থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে গমন করা দুঃখকর। **দুর্গত** = **দুর্গ** তারিত যাহাতে; অথবা, যে দুঃখে (দুঃখ সহিয়া) গমন করিয়াছে। **দুর্গতি** = **দুর্গ** তারণ গতিশীল যাহাতে; অথবা, দুঃখকর গতি যাহার। **দুর্গপাল** = **দুর্গ** পালন করে যে। **দুর্গম** = **দুর্গ** সীমায়িত যাহাতে; অথবা, দুঃখকর গমন যাহাতে।* **৩. দুর্গ** = অশক্যগমন, দুর্জ্জেয়, অসুরবিশেষ, বিষ্ণু, মহাবিঘ্ন, গুগ্‌গুলু, পর্ব্বতাদিহেতু দুর্গম পুর, দুর্গমস্থানমাত্র, দুস্তর সাংসারিক দুঃখ, দুঃখমাত্র, দুস্তর ব্যাধিশত্রুরাজ-পীড়াদিভয়, দুর্গমবর্ত্মমাত্র, বন্ধুরভূমি। **দুর্গত** = দৈন্যগত, দুরবস্থাপন্ন, দুঃখিত। **দুর্গতি** = মন্দাবস্থা, দারিদ্র্য, নরক। **দুর্গপাল** = দুর্গরক্ষক, দুর্গাধ্যক্ষ, সঙ্কটে পালক। **দুর্গম** = দুঃখে গমনীয়, অশক্যগমন, দুর্জ্জেয়, দুরাপ, দুষ্পূরণীয়। (ব.শ.)। **৪. দুর্গপাল** অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **দুঃ**। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

দুর্গা : **১.** দুর্গ + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** ***দুর্গ**-এর আধার যে; অথবা, যে আধারশক্তিকে গমন করা **দুঃ** (ক্ষয়ক্ষতিদানকর বা দুঃখকর)।* / যাহাকে দুঃখে পাওয়া যায়। (ব.শ.)। **৩.** দ্র. **দশভুজা**। দেবীবিশেষ — মহাবিঘ্নাদিনাশিনী দেবী 'দুর্গা'। মতান্তরে 'দুর্গ' নামক দৈত্যনাশ হেতু 'দুর্গা'। দকার দৈত্যনাশ, উকার বিঘ্ননাশ, রকার রোগনাশক, গকার পাপনাশ ও আকার ভয়শত্রুনাশ হেতু 'দুর্গা'। নববর্ষা কুমারী, নীলী, অপরাজিতা। (ব.শ.)। পরমাপ্রকৃতি, বিশ্বের আদি কারণ ও শিবপত্নী। ... ব্রহ্মার বরে মহিষাসুর পুরুষের অবধ্য হন। বিষ্ণু তখন বলেন যে, এই অসুরকে বধ করতে হলে নিজ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে স্ব স্ব তেজের কাছে এই প্রার্থনা করতে হবে যে, এই সমবেতভাবে উৎপন্ন তেজ হতে যেন এক নারীমূর্তি আবির্ভূতা হন। এই নারীই অসুরকে বিনাশ করবেন। ... সকল দেবতা তাঁদের নিজ নিজ অস্ত্রসমূহ এঁকে দান করেন। এই দেবী মহিষাসুরকে তিনবার বধ করেন। প্রথমবার অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা রূপে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার দশভুজা দুর্গারূপে। ... মহিষাসুরের প্রার্থনায় দেবী বলেন, 'উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গা — এই তিন মূর্তিতে তুমি সব সময় আমার পদলগ্ন হয়ে দেবতা, মানুষ ও রাক্ষসদের পূজ্য হবে।' (দেবী ভাগবত, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী ও কালিকাপুরাণ)।

সত্যযুগে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য দুর্গামূর্তি প্রস্তুত করে তিন বৎসর পূজার্চনা করেছিলেন। ত্রেতাযুগে রাবণ চৈত্রমাসে বসন্তকালে এঁর পূজা করতেন। সেজন্য এই পূজা বাসন্তী পূজা নামে বিখ্যাত।

রামচন্দ্র অকালে বোধন করে রাবণবধের জন্য এই পূজা করেছিলেন। (পৌ.অ.)। **৪. দশভুজা** দেবী **দুর্গা** অর্থে প্রচলিত। বর্তমানে বাংলাভাষী হিন্দুদের বৎসরের মুখ্য উৎসব এই **দুর্গা** পূজাকেন্দ্রিক উৎসব। তাই ঠাকুর অর্থেই **দুর্গা** খুবই প্রচলিত। মেয়েদের নাম রূপেও প্রচলিত। **৫.** দ্র. **কালী, চণ্ডী, ছিন্নমস্তা, মহামায়া**। এর একটি দার্শনিক সামাজিক অর্থ যেমন আছে, তেমনি ঐতিহাসিক অর্থও আছে। ঐতিহাসিক অর্থে আমরা পরে যাব।

দুর্গা শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল, যাহাতে গমন করা কষ্টকর এমন আধারশক্তি। কিন্তু, আগেই বলা হয়েছে, উর্ধ্বলোকের সত্তা এবং নিম্নলোকের সত্তাকে আমরা সাধারণত চিনতে পারি না; যেমন আমাদের পূর্বপুরুষেরা পারতেন। যেকারণে আমরা স্বর্গলোকের দেবী **দুর্গা**কে যেমন স্পষ্ট চিনি না, তেমনি নয় বছরের কুমারী, নীলী, অপরাজিতা কেন **দুর্গা**-পদবাচ্য তাও বুঝতে পারি না; কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষেরা পারতেন। তাঁরা বিচার করে দেখেছেন, যে, এই সমস্ত সত্তাগুলিতে 'গমন করা কষ্টকর'; তাই এদের প্রত্যেককেই তাঁরা **দুর্গা** নামে চিহ্নিত করে গেছেন। তবে হ্যাঁ, আজকাল আমরা মধ্যলোকের **দুর্গা**কে কমবেশি চিনতে পারি।

ইনি হলেন সমগ্র জনসাধারণের (মহামায়ার) একটি অংশ, একালে যাঁদের বলা হয় 'মধ্যবিত্ত জনসাধারণ'। এঁরা মাঝারি মানের জ্ঞান-ধনের মালিক। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেভাবেই হোক বুঝেছিলেন, এদেরকে জয় করা সবচেয়ে কঠিন, কষ্টকর। তাই তাঁরা এঁদের নাম দিয়েছিলেন **দুর্গা**। আমাদের প্রকাশিত বিভিন্ন নিবন্ধে এ বিষয়ে কিছু কিছু ব্যাখ্যা রয়েছে, বিশেষত 'ঙ' গ্রন্থের 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন' নিবন্ধে এ নিয়ে আলোচনা আছে। এখানে তার দু-একটি কথা জানিয়ে রাখা যাক।

মহাত্মা সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর সাধনপ্রদীপ গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'বৈশ্যদিগের সর্বসাধারণের অভীষ্টদেব সাধারণত জগৎ প্রতিপালক বিষ্ণু।' অর্থাৎ নারায়ণ পণ্যজীবীদের অভীষ্ট (নগদ-নারায়ণ) দিয়ে থাকেন। তেমনি নেতা-ওস্টানো শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর আরাধ্যা দেবী দুর্গা, এবং হাভাতে হতদরিদ্র সমাজবিরোধী (ডাকাত) সহ সকল নিপীড়িত সর্বহারা কর্মীজনগণের আরাধ্যা দেবী স্বয়ং দশমহাবিদ্যার কালী, তাঁরা শ্যামাপূজা করেন, আজও। কিন্তু প্রশ্ন হল, বৈশ্যরা (পণ্যজীবীরা) কেন বিষ্ণুপূজা করেন, কেনইবা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী দুর্গাপূজা করেন? এবং শ্রমজীবী জনগণ শ্যামাপূজা করেন? কারণ প্রকৃতির বিধান ঐরকমই, শাস্ত্রেরও অনুকূল নির্দেশ। কী রকম?

প্রকৃতি মানুষের স্বভাবের মধ্যে ঐ ইচ্ছা ঢুকিয়ে রেখেছে। ক্ষুদে শচীনেরা যেমন শচীন তেণ্ডুলকরের ছবি টাঙায়, ক্ষুদে বিষ্ণুরা বিষ্ণুর, ক্ষুদে দুর্গারা দুর্গার এবং ক্ষুদে কালীরা কালীর তেমনি ফ্যান (ভক্ত) হয়ে থাকে। যে যার স্বায়ত্তের এলাকা দেখতে পায় তার তার আরাধ্যে। নিজে যা, উঠতে চায় তারই শীর্ষে, তারই 'Grand'. 'Divine' রূপে। ... বলে রাখা ভালো, বাংলাভাষীদের মধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর জনসংখ্যা ঠিক যে-হারে বেড়েছে, তাঁদের সমাজে দুর্গাপূজার বাড়বৃদ্ধি হুবহু সেই হারেই বেড়েছে।

ভারত সমাজের ইতিহাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দিয়ে যে কয়টি সামাজিক উপপ্লব ঘটানো হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিকে **দুর্গা** বিষয়ক কাহিনীর মধ্যে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়। এর মধ্যে নেতানিধন কাণ্ডের কাহিনীটি রয়েছে মহিষাসুর মর্দ্দনের ঘটনাবলীর বর্ণনায়। তবে এই কাহিনীটিকে সাধারণীকরণ করতে গিয়ে অনেক বেশি বিমূর্ত করে ফেলা হয়েছে বলে, এর ঐতিহাসিক কালনির্দেশ করা কঠিন। কিন্তু রামচন্দ্রের **অকালবোধন** করে **দুর্গা** পূজা করার কাহিনীর বর্ণনা যথেষ্ট মূর্ত। এই ঘটনার কাল ১০০ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ। এই সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে জাগিয়ে বেদবাদী-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়; যদিও শেষ পর্যন্ত একেবারেই বিপরীত ফল ফলে। রবীন্দ্রনাথের মতে, 'বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কারজাল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া যেরূপ সংস্কারজালে বদ্ধ করিয়া দিয়াছে, এমন আর কোনো কালেই করে নাই।' ... মনে রাখা ভালো, এখন যে **দুর্গা**পূজার বিশাল বাড়বৃদ্ধি ঘটেছে এবং ঘটছে, তা সবই রামচন্দ্রের অকালবোধনের **দুর্গা**। এই **দুর্গা**র পূজা মানে, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে ব্যক্তিচিন্তা থেকে সমষ্টিচিন্তায় উত্তীর্ণ করার প্রতীকী চেষ্টা। এই **দুর্গা**র পূজার মাধ্যমে তাদের বোধন-উদ্বোধন করে সামাজিক অশুভকে পরাস্ত করার প্রতীকী চেষ্টা করা হয় এবং শুভ ও সত্য প্রতিষ্ঠার প্রতীকী প্রচেষ্টা চালান হয়। প্রকৃত চেষ্টার সঙ্গে এই প্রতীকী চেষ্টার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। রবীন্দ্রকথিত 'অতীতের সঙ্গে ভারতের আত্মবিচ্ছেদ'ই এই সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ। ...

দুর্জন : ২. **দুঃ** *(= ক্ষতিকর দান) করে যে জন; অর্থাৎ, দুঃখকষ্ট দেয় যে* ***জন*।** **৩.** দুষ্ট জন। (ব.শ.)।

দুর্দ্দশা : ২. **দুঃ** *(= ক্ষতিকর দান) রহে যে দশায়; অর্থাৎ, যে* ***দশা*** *(সত্তার পক্ষে) দুঃখকষ্টকর।* **৩.** মন্দ দশা। (ব.শ.)।

দুর্দ্দান্ত: ২. *যাহাকে দমিত করা কঠিন (দুঃখকষ্টকর)।* **৩.** দুঃখে দমিত। (ব.শ.)।

দুর্দ্দম : ২. *যাহাকে দমন করা কঠিন (দুঃখকষ্টকর)।* **৩.** দুঃখে দমনীয়। (ব.শ.)।

দুর্দ্ধর : ২. *যাহাকে ধরা (ধরে রাখা, ধারণ করা) কঠিন (দুঃখ-কষ্টকর)।* **৩.** দুঃখে ধার্য্য। (ব.শ.)।

দুর্দ্ধর্ষ : ২. *যাহাকে ধর্ষ (ধারণপূর্বক দিশাগ্রস্ত শক্তিক্ষেপণ) করা কঠিন (দুঃখকষ্টকর)।* **৫. ধর্ষ** শব্দের অর্থ, কাউকে ধারণ করে বা ধ'রে বা ধরাবাঁধা করে তাতে একমুখী শক্তিক্ষেপণ করা; তা সে আটার গোলাতে ঘি নুন দেওয়া হতে পারে, একান্ত অনিচ্ছুক শিশু-কিশোর কিংবা জেলখানার কয়েদিদের শিক্ষার বা সভ্যতার পাঠ দেওয়া হতে পারে ... এরকম অনেক কিছুই হতে পারে; এমনকি কোনো নারীকে ধর্ষণ করাও হতে পারে। যাকে এরকম ধরেবেঁধে কিছু দেওয়া যায় না, সেই হল **দুর্দ্ধর্ষ**।

দুর্নিবার : ২. *যাহাকে নিবারণ করা* **দুঃ** *(= ক্ষয়ক্ষতিকর বা দুঃখদায়ক)।* **৩.** দুঃখে নিবার্য্য। (ব.শ.)।

দুর্ব্বহ : ২. **দুঃ** *(= ক্ষয়ক্ষতিকর বা দুঃখদায়ক) বহন থাকে যাহাতে;*

যাহাকে বহন করা কষ্টকর। **৫.** যাকে বহন করে নিয়ে যেতে অনেক দুঃখকষ্ট সইতে হয়, বাংলায় তাকে বলা হত **দুর্ব্বহ**। তবুও যে ব্যক্তি তা বহন করে নিয়ে যেতে পারত, তাকে বলা যেতে পারত বহ দুর্। কিন্তু বাংলায় সেরকম কথার প্রচলন ছিল না, ছিল তুর্কী ভাষার। পরে পাঠানেরা যখন ফারসী আরবী নিয়ে ভারতে এলে, তাদের হাত ধরে তুর্কী ভাষাও এসে গেল। সেই তুর্কী ভাষার 'বহ্-দুর'কে আপন **দুর্ব্বহ** শব্দের আত্মীয় বলে চিনতে বাংলাভাষীর দেরি হল না। সে তাকে **বাহাদুর** বানিয়ে আপন শব্দ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিল। অতঃপর সেই **বাহাদুর** বাবুর বাড়ীর নেপালী দারোয়ান থেকে সমাজের দারোয়ান সরকার-**বাহাদুর** পর্যন্ত সর্বস্তরের **বাহাদুর**-এর চাকরি করতে লাগল।

দুর্ব্বাসাঃ (দুর্ব্বাসস্) : ১. দুঃ, বস্। ২. *দুঃ বাসঃ (মানসিক ও দৈহিক বসবাস) যাহার।* ৩. দ্র. **দত্তাত্রেয়**। মুনিবিশেষ। ইঁহার পিতা অত্রি, মাতা অনসূয়া। শঙ্করের অংশে ইঁহার উৎপত্তি। ইনি অতিকোপন ছিলেন। বনবাসকালে যুধিষ্ঠিরাদির অনিষ্টেচ্ছায় দুরাত্মা দুর্যোধন, দ্রৌপদীর ভোজনান্তে কাম্যকবনে পাণ্ডবের আতিথ্যগ্রহণার্থ ইঁহার নিকটে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ... (ব.শ.)। (মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ও ভাগবত অনুসারে) মহর্ষি অত্রির ঔরসে ও স্ত্রী অনসূয়ার গর্ভে দুর্বাসার জন্ম হয়। ... ঔর্বমুনির কন্যা কন্দলীকে ইনি বিবাহ করেন। ... স্ত্রীকে শত অপরাধ মার্জনা করার পর তিনি ভস্ম করে দেন। ... কন্যাশোকাতুর ঔর্ব শাপ দেন যে, দুর্বাসার দর্প হত হবে। এর ফলে ইনি মহারাজ অম্বরীষের কাছে হতদর্প হন। ... এঁর বরেই কুন্তী পুত্রাদি লাভ করেন। ... এঁর দেওয়া 'সন্তানক' পুষ্পমাল্যের অমর্যাদা করার জন্য ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হন। ... এঁরই শাপে শকুন্তলা দুষ্মন্ত কর্তৃক পরিত্যক্তা হন। ... তাঁর বরে কৃষ্ণের পদতল ব্যতীত সর্বদেহ অভেদ্য হয়। ... তাঁর অভিশাপের ভয়েই লক্ষ্মণকে সরযূ-সলিলে প্রাণ দিতে হয়। ... দুর্বাসার শাপে শাম্ব যদুবংশনাশক মুষল প্রসব করেন। তারই ফলে যদুবংশ ধ্বংস হয়। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. বাংলার সংস্কৃতিতে এখনও অতিকোপনস্বভাব মানুষকে কেউ কেউ **দুর্ব্বাসা** বলে উল্লেখ করে থাকেন। এর থেকে বোঝা যায়, কোনো এককালে ভারতের ইতিহাসে এরকম একটি সত্তা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাকে ঐতিহাসিকভাবে চিহ্নিত করা যায়নি। তবে শব্দার্থ অনুসারে এই সত্তার চরিত্র কীরূপ ছিল, তা কমবেশি স্পষ্টভাবে নিরূপণ করা যায়। — **দুঃ** অর্থাৎ যে দান ক্ষয়ক্ষতি করার জন্য আসে। আর, **বাসা** হল বাসধারী, বাসনাকারী, এবং যাহাতে বাস করা যায়। সেই রূপ **দুঃ বাসা** যাহার, সেই হল **দুর্ব্বাসা**। কিন্তু কে সে, আমরা এখনও জানি না।

দুর্যোগ : ১. দুঃ, যোগ। ২. *দুঃ যোগ যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে ক্ষয়ক্ষতিকর সত্তার যোগ ঘটিয়াছে।* ৩. দুষ্ট যোগ, দুষ্টগ্রহ-যোগবিশেষ, দুষ্টভাব, কলহ, ঝড়বৃষ্টি, ঝঞ্ঝাবাত। (ব.শ.)। ৪. 'ঝড়বৃষ্টি' অর্থে প্রচলিত। ৫. আগের কালে **দুর্যোগ** বলতে ক্ষতিমূলক দানের যোগ বোঝানো হত, যে ক্ষতিকর দান উলটে কিছু না কিছু নিয়ে নেয় বা ক্ষয় সাধন করে। তাই তাকে 'দুষ্টগ্রহ' বলা হত। কিন্তু পরে পরে, বিশেষ করে বাংলায় যে-কোনো ধরনের ক্ষতিকর যোগকেই **দুর্যোগ** বলার চল্ হয়ে যায়। ক্রমপ্রতীকায়নের স্বাভাবিক নিয়মে এই শব্দ পরে আরও স্থির রূপ নেই ক্ষতিসাধনকারী প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলিতে। তখন একমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই হয়ে যায় **দুর্যোগ**।

দুর্যোধন : ১. দুর্ + ✓যুধ্ + অন (যুচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। ... বনবাসান্তে পাণ্ডবেরা স্বরাজ্য, তদভাবে পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিলে, ইনি বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমি দিবেন না, প্রতিজ্ঞা করায় ভারত-সমরের সূত্রপাত হয়। ... এই যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুদ্বয় ভগ্ন হয়। সৌপ্তিকপর্ব্বে অশ্বত্থামার নিকটে পাণ্ডবাদির নিধনসংবাদ-শ্রবণের পরে দুর্যোধনের প্রাণত্যাগ হয়। (ব.শ.)। ৩. ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শতপুত্রের মধ্যে ইনি জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। ... গান্ধারী-প্রসূত লৌহকঠিন মাংসপিণ্ডকে শীতলজলে সিক্ত করে রাখলে ... তা থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একশত ভ্রূণ পৃথক হয় ও তাদের পৃথক পৃথক ঘৃতপূর্ণ কলসে রাখা হয়। একবৎসর পরে একটি কলসে প্রথমে দুর্যোধনের জন্ম হয়। ভীম ও দুর্যোধন একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মমাত্রই দুর্যোধন গর্দভের ন্যায় চীৎকার শুরু করেন। ... শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামের কাছে শিক্ষালাভ করে দুর্যোধন গদাযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী হন। ... দুর্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, চম্পানগরী পালনের ভার দেন। ... ভীমকে বিষপান করিয়ে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ ... জতুগৃহ নির্মাণ করে পাণ্ডবগণকে হত্যার চেষ্টা ... দ্যুতক্রীড়ার মাধ্যমে পাণ্ডবদের সর্বস্ব হরণ ইত্যাদি বহুপ্রকার চেষ্টা চালান। ... আজীবন পাণ্ডবদের অনিষ্টসাধনেই ইনি তৎপর ছিলেন। ... ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনকালে শাম্ব নামে এক ব্রাহ্মণ বলেন যে, দুর্যোধনের প্রতি প্রজাদের পিতার ন্যায় বিশ্বাস ছিল। (পৌ.অ.)। ৪. মহাভারতের চরিত্র রূপে 'দুর্যোধন' এখনও জনমানসে প্রচলিত। ৫. দ্র. **দুঃশলা**। 'যুধ্' ক্রিয়া থেকে 'যুধিষ্ঠির' ও 'দুর্যোধন' দুটি শব্দই প্রসূত হয়েছে। দুটি শব্দই মূলত সেই দুটি সত্তাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হত, যারা যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত। যুধ অন যাহাতে, সেই হল যোধন। যে যোধন **দুঃ** (ক্ষয়ক্ষতি দান) করে, তাকে **দুর্যোধন** বলে। ভারতসমাজের ইতিহাসে এই সত্তাটিকে সুস্পষ্ট চেনা যায়। এটি মৌলবাদী হয়ে পড়া বৈদিক (অধঃপতিত সমাজতান্ত্রিক) ব্যবস্থার সরকারি আইনের লড়াই। নানা রকমের আইন দেখিয়ে আমলাতন্ত্র সবসময়ই বহুরকমের যেসকল আইনী যুদ্ধ চালায় ও প্রজাদের জীবন ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, সেই আইনী যুদ্ধকেই **দুর্যোধন** বলা হত। এর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিল **দুঃশাসন**। ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পর থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১২৫০ বছর ধরে ভারত সমাজে বৈদিক মতবাদ (= আদিম সমাজতন্ত্রবাদ) ও বৌদ্ধ মতবাদের (= পুঁজিবাদের) যে যুদ্ধ চলে, সেই যুদ্ধে **দুর্যোধন** ছিল বৈদিক মতবাদের পক্ষে প্রধান যোদ্ধা। ...

দুষ্, দুষী (দুশমন, দুষমন, দুষণ) : ১. দুষণ = ✓দুষি + অন (ল্যুট্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **দুষ** = *নবরূপে উত্তীর্ণ দানের (দানরূপ শক্তির) বিচ্ছুরণ দিশাগ্রস্ত যাহাতে।* **দুষী** = *গতিশীল* **দুষ**-*এর আধার যে।* **দুষমন** = **দুষ** *(দোষারোপ) করে মন যাহার।* (দুষ

= *নবরূপে উত্তীর্ণ দাতা দিশাগ্রস্ত যাহাতে।)* **দূষণ** = **দূষ** অন (*on*) *যাহাতে।* ৩. **দূষ্‌** = বৈকৃত, অশুদ্ধিভাব, দোষ। **দূষী (দূষী)** = দোষযুক্ত, অপরাধী। **দূষণ** = দোষজনক. রাক্ষসবিশেষ, সদোষতাপাদন, সদোষীকরণ. নিন্দন, দোষজনক বিষয়, দোষদর্শনপূর্ব্বক খণ্ডন, দোষ। (ব.শ.)। **দুষমন (দুশমন)** = (ফারসি) শত্রু, বিপক্ষ, বৈরী, প্রতিকূল, শয়তান, দুর্বৃত্ত, বিকট, ভীষণ, ভয়ঙ্কর। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **দূষণ** = রাবণের সেনাপতি। এর অন্য ভ্রাতার নাম খর। রাবণের রাজ্য গোদাবরী তীরস্থ দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খর ও দূষণ উভয়েই রাবণের সেনাপতিরূপে ১৪ হাজার সৈন্যসহ জনস্থান হতে এই রাজ্যের প্রান্তদেশ রক্ষা করত। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এই স্থানে পঞ্চবটীতে বনবাস করবার সময়ে রাবণ ভগিনী শূর্পনখা রামকে ও পরে লক্ষ্মণকে প্রেম নিবেদন করে এবং সীতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদ করেন। শূর্পনখা এই দুর্ঘটনা খর ও দূষণকে বিবৃত করলে তারা সসৈন্যে রাম-লক্ষ্মণকে আক্রমণ করে ... ও নিহত হয়। (পৌ.অ.)। ৪. pollution অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **খর, কাম্যকবন, গোদাবরী**। এখানে দেখা যাচ্ছে, **দুষ্‌** পরিণত হয়েছে **দূষ্‌**-এ। উ-কার ও **ঊ**-কার এই দুই স্বরে অর্থের যে পার্থক্য রয়েছে, তার কথা **ঊ, উ বর্ণের অর্থে** ব্যাখ্যা করা আছে। সেই সুবাদে **দুষ্‌** যদি 'ক্ষতিকর রাসায়নিক বা জৈব প্রক্রিয়া' হয়, তাহলে **দূষ্‌** বোঝাবে সেই রাসায়নিক বস্তু বা জীবাণুকে। বড় করে সামাজিক প্রেক্ষাপটে ভাবলে, **দুষ্‌** যদি রাষ্ট্রবিরোধী বহিরাগত উগ্রপন্থা হয়, তবে **দূষ্‌** বোঝাবে রাষ্ট্রবিরোধী বহিরাগত উগ্রপন্থীদের। আবার **দুষ্‌** যদি বহিরাগত অস্ত্রশস্ত্র হয়, **দূষ্‌** বোঝাবে সেই অস্ত্রশস্ত্রের বহিরাগত আধারশক্তিকে।

তা সে যাই হোক, আমরা দেখছি, **দুঃ** শব্দটির বিসর্গ (ঃ) শ্‌, ষ্‌, স্‌, হ্‌ প্রভৃতি বর্ণে বদলায়। **দুঃ** যখন 'দুশ্‌' হয়, তখন তার অর্থ দাঁড়ায় 'ক্ষতিকর দানের সর্বদিকে বিচ্ছুরণ'। **দুঃ** যখন 'দুষ্‌' হয়, তার অর্থ হয়ে যায় 'ক্ষতিকর দানের একমুখী বিচ্ছুরণ'। আর, **দুঃ** যখন 'দুস্‌' হয়ে যায়, তখন তার অর্থ দাঁড়ায় 'ক্ষতিকর দানের একটি মাত্র কিরণরেখার আগমন'। সবশেষে, **দুঃ** যখন 'দুহ্‌' হয়, তখন তার অর্থ দাঁড়ায় 'ক্ষতিকর দানের স্থির হওয়ন'।

আমাদের সমস্যা দূষ, দূষণ, দুশমন, দুষমনকে নিয়ে। শত্রু যখন বাইরে থেকে আসে, দিশাগ্রস্তভাবে (টর্চের আলোর মতো) তার শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটায় আমাদের উপর, তখনই সে দুষমন। সেই বিচারে **দুশমন** শব্দটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে **দুশমন** হলেও হতে পারে, কিন্তু যার সঙ্গে শত্রুতা করা হচ্ছে, তার দৃষ্টিতে দেখলে শব্দটি **দুষমন** হতে বাধ্য। এর অর্থ হল — যার মন দুষ্‌ (বা দোষারোপ) করে। তবে শব্দটির বানান যদি **দূষমন** লেখা হত, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াত, 'যার মন দুষকারীদের (আমাদের বিচারে, দোষীদের) পাঠায়'। যেমন কিনা, 'হিন্দু' শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে ছাত্রবোধ অভিধান জানাচ্ছেন — 'হীন দূষ যাহাদের তাঁহারা'। এই 'দূষ' নিঃসন্দেহে 'দুষ-এর আধার'; অর্থাৎ, দুষ্‌ ক্রিয়ার বিশেষ্য রূপ।

তবে **দূষণ** শব্দটির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, অতীতে শব্দটি প্রধানত মানসিক দোষক্ষেপণ অর্থেই ব্যবহৃত হত; বর্তমানে যা মূলত বাহ্যিক 'ক্ষতিকর শক্তির দান-করা' বা 'দূষিত'-করণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর মানসিক অর্থের প্রায় সবটাই চলে গেছে **দোষ** শব্দে।

দুষ্ট (দুষ্টু) : ১. ✓দুস্‌ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **দুষ্ট** = *দুঃ টঙ্কারিত যাহাতে।* **দুষ্টু** = **দুষ্ট** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. বিকৃত, দুর্ব্বৃত্ত, অধম, দুর্ব্বল, অপরাধী, নষ্ট, পরুষ, দুশ্চরিত্র, অবিনীত, যাতযাম, পাপ, পিত্তাদিদোষযুক্ত, হেত্বাভাসযুক্ত, দুশ্চিকিৎস্য, কুষ্ঠরোগ। (ব.শ.)। ৪. wicked অর্থে প্রচলিত। ৫. **দুঃ** শব্দের অর্থে আমরা জেনেছি, যে, তার ভেতরে ক্ষতিকর দান থাকে। সেই দান যার ভেতরে টঙ্কারিত হয়, সেই হল দুষ্ট; তা সে সমাজশরীরের সদস্য বদলোক হতে পারে, মানবশরীরের সদস্য বদরক্ত বা পিত্তাদিদোষ হতে পারে, মানবমনের সদস্য বদ-ইচ্ছা-স্বভাব-চিন্তা ইত্যাদিও হতে পারে। মোট কথা, **দুষ্ট** হল সেই সত্তা, দ্রষ্টাকে কোনো কিছু 'ক্ষতিকর দান' যে করতে পারে এবং তার সেই বদ-উদ্দেশ্য স্পষ্ট টঙ্কারিত হচ্ছে। **দুষ্টু** কিন্তু তা নয়। সে নবরূপে উত্তীর্ণ। তার মধ্যে **সুন্দর**-এর প্রয়োগ করে তাকে মিষ্ট করে নেওয়া হয়েছে। দ্র. **দুরন্ত**।

দুষ্মন্ত : ১. দুষ্‌ + ✓মন্‌ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। ২. ক্ষতিকর *দান দিশাগ্রস্তভাবে তারণ করে যে মন; অর্থাৎ, যে-মন অন্য মনগুলিকে দূষিত করে।* ৩. চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবিশেষ। ইঁহার পিতা পুরুবংশীয় সুবোধ, মাতা উপদানবী, পত্নী শকুন্তলা, এবং পুত্র চক্রবর্তী ভরত বা সর্ব্বদমন। এই ভরতের নামে তদ্‌বংশীয়েরা 'ভারত' নামে খ্যাত। (ব.শ.)। পুরুবংশের একজন বিখ্যাত রাজা। (মহাভারত অনুসারে) ... মৃগয়া করতে গিয়ে মালিনী নদীর তীরে কণ্বমুনির আশ্রমে ইনি ... শকুন্তলাকে দেখেন ... দুষ্মন্ত তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে শকুন্তলা বলেন যে, বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র মেনকাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। ... বিশ্বামিত্র তার প্রতি আসক্ত হন। ফলে, মেনকার গর্ভে এক কন্যার জন্ম হয়। সদ্যোজাত কন্যাকে মালিনীর তীরে ত্যাগ করে মেনকা স্বর্গে প্রস্থান করেন। স্নান করতে গিয়ে কণ্বমুনি এই পরিত্যক্তা কন্যাকে শকুন্ত (পক্ষী) কর্তৃক রক্ষিত হতে দেখে, গৃহে নিয়ে কন্যার মতো পালন করেন। শকুন্ত-রক্ষিত কন্যা বলে তাঁর নাম হয় শকুন্তলা। ... দুষ্মন্ত তাঁকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। ... বিবাহে সম্মতি দেবার পূর্বে শকুন্তলা দুষ্মন্তের নিকট হতে এই প্রতিশ্রুতি চান যে, তাঁর পুত্রই যেন রাজ্যলাভ করে। দুষ্মন্ত এই প্রতিজ্ঞা করেই তাঁকে বিবাহ করেন। ... এর পর শকুন্তলার গর্ভে বলশালী এক পুত্রের জন্ম হয়। ছয় বৎসর বয়সেই তিনি সর্বপ্রকার জন্তুকে দমন করতে সক্ষম হতেন বলে, আশ্রমবাসীরা তাঁকে সর্বদমন বলে ডাকতেন। ... রাজসভায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ... চিনতে পারেন না। ... শকুন্তলা ক্রোধে ও দুঃখে দুষ্মন্তকে তিরস্কার করে সভাস্থল ত্যাগ করে চলে যেতেই দৈববাণী হয় যে, দুষ্মন্তই শকুন্তলার পুত্রের পিতা এবং তিনি যেন এই পুত্রকে ভরণপোষণ করেন আর এই পুত্রের নাম রাখেন ভরত। ... এই ভরতের নাম অনুসারেই এদেশের নাম হয় ভারতবর্ষ। দুষ্মন্তের অপর স্ত্রী লক্ষ্মণার গর্ভজাত পুত্রের নাম জনমেজয়। (পৌ.অ.)। ৪. পৌরাণিক চরিত্রের নাম রূপে পুরাণাদির আলোচনায় ব্যবহৃত হয়, অন্যথায় অপ্রচলিত। ৫. **দুঃ** কথাটির মানে আমরা জেনেছি, 'ক্ষতিকর দান'। এই **দুঃ** যদি

দিশাগ্রস্ত পুনরাবৃত্তিমূলক ক্ষতিকর শক্তির দান রূপে বাইরে থেকে এসে কারও উপরে পড়ে, তখন দ্রষ্টার চোখে সেটি **দুষ্** পদবাচ্য হয়ে যায়। যার মন কাউকে এইভাবে **দুষ্** করে, দোষারোপ করে, দূষিত করে, তাকে সেই ব্যক্তির **দুষমন** বলে। স্বভাবতই এই **দুষমন** দুষ্ট মন বা দুষ্ট মনের অধিকারী শত্রু হতেই পারে। (তবে এই দুষমন শব্দটির উত্তরাধিকার সরাসরি আমাদের নেই, রয়েছে ফারসি ভাষার।) কিন্তু যে-মন এইরূপ দূষিত মননশীলতা তারণ করে, তাকে বলতে হবে **দুষ্মন**-ত বা **দুষ্মন্ত**। এই **দুষ্মন্ত** ভারত-ইতিহাসের একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। এখন প্রশ্ন হল, ইনি কী কাজ করেছিলেন যে এঁকে **দুষ্মন্ত** নাম দেওয়া হয়েছিল?

পিতা সন্তানের ভরণপোষণ করবেন — এই নীতি আজকের বিশ্বে অধিকাংশ দেশের অধিকাংশ সমাজে মান্য করা হয়। কিন্তু মানুষের সমাজ এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাল কীভাবে? পুরুষ-নারী মিলনে সন্তান জন্মায় ঠিকই, কিন্তু উভয়ের যৌথতায় জাত সন্তানের ভরণপোষণের দায় শুধুমাত্র পুরুষের উপর বর্তাল কীভাবে এবং কবে থেকে? ঝাঁকপ্রাণীদের দুনিয়ায়, জোড়বাঁধা দাম্পত্যপ্রথা যে যে প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে, তাদের সকলের ক্ষেত্রে কি এরকম সন্তানভরণের দায় পুরুষ প্রাণীটির উপর বর্তায়? এ বিষয়ে নেচারের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিধান কীরূপ? মানবপ্রজাতির ক্ষেত্রে আদিতে এই দায় কার ছিল? পুরুষেরই কি সন্তানভরণের দায় নেওয়া উচিত?

না, এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাওয়া খুবই দুরূহ। এ নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়নি। এমনকি কবে থেকে পুত্রভরণের দায় পিতার উপর বর্তাল, কেন বর্তাল, তা নিয়েও যথেষ্ট গবেষণা হয়নি। কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিতের রচনায় বিষয়টি এসেছে সম্পত্তির উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে। সেখানে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে তার 'ঔরস পুত্র', এই প্রশ্নে একদিকে যেমন একপতি-পত্নীত্বমূলক পরিবারপ্রথার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তেমনি পত্নীর সতীত্বের প্রশ্নও এসেছে। কারণ পত্নী সতী না থাকলে ঔরস পুত্র বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কিন্তু তার জন্য পরিবারপ্রথার চালক হতে হয় পুরুষকে, অর্থাৎ তার জন্য পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া চাই। আর, পিতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার একটি শর্তই হতে পারে পিতার পুত্রভরণের দায়। ... এখন প্রশ্ন হল, এইসব সমস্যার সমাধান সমাজ ঠিক কী কী ঘটনার ভিতর দিয়ে কীভাবে করেছিল, সে বিষয়ে আমাদের কাছে কি কোনো তথ্য আছে?

না, পাশ্চাত্যের লিখিত ইতিহাসে এসব প্রশ্নের উত্তর নেই বললেই চলে। ভারতের লিখিত ইতিহাসে কিন্তু এই বিষয়গুলির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, রয়েছে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় রচিত পুরাণাদিতে। যেমন পুত্রভরণের দায় পুরুষ ঠিক কখন থেকে নিল, কেন নিল, কে তা নিতে বাধ্য করল, এই সব প্রশ্নেরই উত্তর কমবেশি রয়েছে। তার মধ্যে পুত্রভরণের ঘটনাবলীর একটি অংশ হল **দুষ্মন্ত**-শকুন্তলার কাহিনী। তার বহু আগেই ভৃগু-পুলোমার কাহিনীতে (দ্র. **অগ্নিসাক্ষী**) একপতি-পত্নীপ্রথার পক্ষে সওয়াল উঠে গেছে, মা বোন বাদে যে কোনো স্ত্রীতে যে কোনো পুরুষের গমনের রীতি বেআইনী ঘোষিত হয়ে গেছে **উদ্দালক**পুত্র **শ্বেতকেতুর** হাতে; মাতৃতন্ত্রের বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পিতৃতন্ত্র। সম্পত্তির অধিকার মা-মাসী-বোনের হাত থেকে চলে গেছে **ভাই-ছেলে**-বোনপোদের হাতে। তখন স্বভাবতই ভাই-ছেলে-বোনপোদের আপন আপন স্ত্রীকে (যারা এতকাল অন্য গোষ্ঠীতে ছিল, তাদেরকে) ঘরে আনার পালা; কেননা তারাও তাদের সম্পত্তি তাদের **ভাই-ছেলে**-বোনপোদের দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। তো, এমতাবস্থায় একটি **প্রথাবহির্ভূত** ঘটনা ঘটতে বাধ্য — প্রথাসিদ্ধ স্ত্রীর স্থানে **প্রথাবহির্ভূত** (কিংবা, বলা ভাল, নতুন প্রথায় আনীত) স্ত্রীর গর্ভে **উৎপাদিত** সন্তানকে ভরণপোষণ করবে কে? সেই সন্তানের ভরণের দায় তো নতুন যুগের সম্পত্তিহীন নারী নিতে পারে না। অতএব পিতাকে এবার পুত্রভরণের দায় নিতেই হত।

অর্থাৎ কিনা, '**প্রথাবহির্ভূত** সন্তানের মালিকানা' কার হবে, তাই নিয়ে সমাজ খুবই জেরবার ছিল। কিন্তু 'প্রথাবহির্ভূত সন্তান' তো কেবল মানবীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তানাদিই ছিল না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃষিজ ও কারুজ উৎপাদনও প্রথাবহির্ভূতভাবে ঘটে যাচ্ছিল; প্রশ্ন উঠেছিল সেগুলি নিয়ে কী করা হবে? সেগুলিতে কার অধিকার হবে, মালিকানা কার হবে, সেগুলির বিতরণের কী হবে?

ভারত ইতিহাসে সেই প্রেক্ষাপটের ঘটনাবলীকে বুঝতে হলে আমাদেরকে **ভৃগু-পুলোমা, শ্বেতকেতু, বিশ্বামিত্র-মেনকা, দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, ভরত, ভরদ্বাজ** ইত্যাদি কাহিনীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি বিস্তারিতভাবে জানতে ও বুঝতে হয়; তাদের পৌরাণিক বয়ানকে ক্রিয়াভিত্তিক ভাষা থেকে একালের প্রতীকী ভাষায় রূপান্তরিত করে নিতে হয়। কিন্তু সে-কাজ এতই বিশাল যে, এখানে তার অবতারণা প্রায় অসম্ভব। আমরা অতি সংক্ষেপে তা বলার চেষ্টা করব, যদিও তাতে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে। ...

পুরাণাদিতে উপরোক্ত ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে দুটি স্তরে একসাথে। প্রথম স্তর হল ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কের স্তর। যে সময়ের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, তখন একটি গোষ্ঠীর পুরুষদের স্ত্রীরা থাকেন অন্য একটি গোষ্ঠীতে — এ হল ভাই-ছেলে-বোনপোদের ও মা-মাসী-বোনেদের এক একটি গোষ্ঠী, যেখানে সম্পদের মালিকানা কেবলমাত্র মেয়েদের; আর তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে তাদের ভাই, ছেলে ও বোনপোরা। তো, ক-গোষ্ঠীর পুরুষরা তাদের নিজেদের গোষ্ঠীতে মামা-ভাগ্নে, কিন্তু তাদের স্ত্রীদের গোষ্ঠীতে তারা যে-কোনো নারীর স্বামী, সে নারী মা মেয়ে মাসী হতেই পারে। অর্থাৎ ক-গোষ্ঠীর পুরুষরা জন্মসূত্রে খ-গোষ্ঠীর নারীদের স্বামী, বিপরীতে খ-গোষ্ঠীর নারীরা জন্মসূত্রে ক-গোষ্ঠীর সকল পুরুষের স্ত্রী। সেকারণেই **ঋচিক** মুনি একই সঙ্গে সত্যবতী ও তার মায়ের গর্ভের সন্তানের কারণ হতে পারেন। ...

এই ধরনের সামাজিক অবস্থায় কেউ যদি তার পূর্বনির্ধারিত গোষ্ঠীর নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত না হয়ে অন্য কোনো গোষ্ঠীর নারীকে পৃথকভাবে বিবাহ করেন, 'গান্ধর্ব বিবাহ' করেন, তার সন্তানের কী হবে? পুরুষটির তো নারী ও তার সন্তানটিকে আপন গোষ্ঠীতে আনার নিয়মই নেই, নারীটিরও ঐ সন্তানকে নিয়ে নিজের গোষ্ঠীতে থাকার কোনো উপায় নেই; কারণ তারা প্রথাবহির্ভূত কাজ করেছে। অতএব এ সন্তানকে নেবে কে? সেই কারণে **মেনকা-বিশ্বামিত্রের** সামনে কোনো পথ খোলা নেই, তারা তাদের সন্তান শকুন্তলাকে ফেলে আসে **কণ্ব** মুনির **আশ্রমে**। আবার, প্রথাবহির্ভূতভাবে জাত

কন্যা শকুন্তলা প্রথাসিদ্ধভাবে কোনো গোষ্ঠীর পুরুষদের স্ত্রী নয়, নতুন প্রথা সৃষ্টি করে নতুন পদ্ধতিতে তার স্বামী লাভ করার কথা। আর, সমাজের সেই ফাঁক পূর্ণ করে 'গান্ধর্ববিবাহ' এল, এল দুষ্মন্ত। কিন্তু সেই দুষ্মন্ত-শকুন্তলার সামনেও কোনো পথ খোলা নেই, **দুষ্মন্ত** ভরতকে আপন সন্তান বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। এদিকে সম্পত্তির অধিকারহীনা শকুন্তলার সামনেও সন্তানের ভরণপোষণের কোনো পথ খোলা নেই। অগত্যা শকুন্তলাই পৃথিবীর সেই আদি নারী হয়ে যায়, যে সর্বপ্রথম দাবী তোলে — পিতাকেই পুত্রভরণের দায়িত্ব নিতে হবে। তারপরে কী ঘটে, তা সবাই কমবেশি জানেন। দ্র. **ভরত** ও **ভরদ্বাজ**।

এই পৌরাণিক কাহিনীটির দ্বিতীয় স্তর হল সামাজিক স্তর। সামাজিক স্তরেও সে সমস্যার নাম 'প্রথাবহির্ভূত মালিকানা'। তবে এই মালিকানা মানবীজাত মানবসন্তানের মালিকানা নয়, কৃষিজ বা কারুজ সন্তান বা তদ্রূপ উৎপন্নই হল সেই সত্তা যাদের 'প্রথাবহির্ভূত মালিকানা' নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, সেগুলির উপর কার কী অধিকার, কীভাবে সেই উৎপন্ন বিতরণ করা হবে। কেননা, এ-ব্যাপারে পূর্বতন যৌথ-সামাজিক প্রথা মান্য করার উপায় আর নেই। কেননা, পরিচালক মহর্ষি (দুষ্মন্তের মতো) এখানে (শকুন্তলার মতো) স্বাধীনা-জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পৃথকভাবে কৃষিজ-কারুজ উৎপাদনে লিপ্ত হয়েছেন। এই উৎপাদন স্বভাবতই আগের মতো গোষ্ঠীসদস্যদের মধ্যে নিয়মানুসারে বিতরিত হতে পারে না। অগত্যা এই সকল উৎপন্নের উপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়; অন্যথায় ঐ উৎপন্নসকল (ভরতের মতো) অনাথ হয়ে যাবে! সমাজ সেরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাই **ভরত**কে শেষ পর্যন্ত **দুষ্মন্ত**ই গ্রহণ করেন। এবং পরে, 'সমস্ত পিতাকেই **পুত্র**ভরণের দায় নিতে হবে', এই নীতি ঘোষণা করেন। এমনকি, দোটানার এই পরিবেশে যে-সন্তান যৌথ নাকি ব্যক্তিগত, তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়, এবং ফলে, যাকে ভরণ করতে কোনো পক্ষই রাজী হয় না, সেই **ভরদ্বাজ**কে স্বয়ং **ভরত**ই ভরণপোষণ করেন। এখানে মনে রাখা ভাল — **বিশ্বামিত্র, মেনকা, দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, ভরত, ভরদ্বাজ** প্রভৃতি সত্তাগুলি সবই কোনো না কোনোভাবে ভারতসমাজে ব্যক্তিমালিকানা ও ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একেবারে প্রথম দিকে সক্রিয় ছিলেন। আর, এইভাবে 'আমার স্ত্রী', 'আমার পুত্র' ... ইত্যাদি ধারণার সামাজিক স্বীকৃতির পাশেপাশেই 'আমার উৎপন্ন', 'আমার পণ্য' ... ইত্যাদি ধারণারও জন্ম হয়ে যায়; সমাজ 'বিনিময়ের মর্যাদা' প্রতিষ্ঠার দিকে এগোতে থাকে।

তবে এতে **দুষ্মন্ত** কেন **দুষ্‌-মন্‌-ত?** কারণ, সে অন্তত দুটি প্রথাবহির্ভূত কাজ করেছিল, যা সমাজকে **দূষিত** করবে বলে সেকালের মানুষের মনে হয়েছিল। প্রথমত **প্রথাবহির্ভূত**ভাবে শকুন্তলাকে 'গান্ধর্ববিবাহ' করা; দ্বিতীয়ত **প্রথাবহির্ভূত**ভাবে শকুন্তলার সন্তানকে (ভরতকে) নিজের সন্তান বলে স্বীকৃতি দেওয়া এবং পরবর্তীকালে তাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা। এরূপ **প্রথাবহির্ভূত** কাজ সেকালের মানুষের চোখে ছিল **দুষ্‌** মন তারণকারী। কেননা, দুষ্মন্তের দেখাদেখি সবাই যদি নিজের নিজের পূর্বনির্ধারিত গোষ্ঠী-স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত না হয়ে যে-যার নিজের জন্য নিজের স্ত্রী নিয়ে আসে, তবে তো পূর্বতন সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে! সেই কারণে ইনি **দুষ্মন্ত**।

দূত : ১. ✓দূ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **দূ** *(নবরূপে উত্তীর্ণ দাতা তারিত যাহাতে। /* যে যথোক্তকথনে পরিতপ্ত করে; যাহা দ্বারা খিন্ন হয়। (ব.শ.)। ৩. সন্দেশহর, বার্তাবহ, প্রেষ্যমাত্র। (ব.শ.)। ৪. ambassador, messnger ইত্যাদি অর্থে প্রচলিত। ৫. **দূ** হল বাইরে থেকে দান রূপে আসা কোনো স্থির বস্তু বা বিষয়। সে যদি বিশেষ বার্তা হয়, এবং তাকে যদি কেউ বহন করে নিয়ে আসে, তবেই সে **দূত**।

দূর (দূরবর্ত্তী, দূরদর্শন, দূরদৃষ্টি, দূরীকৃত) : ১. দূর = দূর্‌ + ✓ই + র (রক্‌)। (ব.শ.)। ২. *দূর = নবরূপে উত্তীর্ণ দাতা রহে যাহাতে বা যেখানে; অর্থাৎ, দূ-এর আধার রহে যাহাতে।* **দূরবর্ত্তী** *= দূর আবর্ত্তিত যাহাতে।* **দূরদর্শন** *= দূর দৃষ্ট হয় যাহাতে।* **দূরদৃষ্টি** *= যে দৃষ্টিতে (দৃষ্টিভঙ্গিতে) দূরের দ্রষ্টব্যকে (দূর-কালের দেশ ও পাত্রকে) দেখা যায়।* **দূরীকৃত** *= দূর-এর গতিশীল আধার কৃত যাহাতে। /* **দূরদর্শন** = দূর বিষয়ের দৃষ্টি (থাকে যাহাতে); ভাবী বিষয়ের বোধ (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. **দূর** = বিপ্রকৃষ্ট, অধিক, গাঢ়, গম্ভীর, অবাঙ্মানসগোচর, বিপ্রকর্ষ, বক্তব্যের একান্ত অবিষয়। **দূরবর্ত্তী (দূরবর্তী)** = দূরস্থ, বিপ্রকৃষ্ট। **দূরদর্শন** = গৃধ্র, পণ্ডিত, পরিণামজ্ঞান। **দূরীকৃত** = দূরে নীত, অপনীত, নিরাকৃত, প্রত্যাদিষ্ট। (ব.শ.)। ৪. far অর্থে **দূর, দূরবর্ত্তী**, television অর্থে **দূরদর্শন**, এবং removed অর্থে **দূরীকৃত** প্রচলিত। ৫. শব্দার্থের নিয়মে 'দূ-এর আধার রহে যাহাতে বা যেখানে' তাকে নিশ্চিতভাবেই **দূর** বলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল, দূ-এর আধার রইলেই সে কাছে রহে না কেন, **দূর**-এ রহে কেন? না, এর সন্তোষজনক উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। তবে এইটুকু লক্ষ্য করা যায় যে, যে-দান দেরিতে পাওয়া যায়, যাকে পাওয়ার জন্য অনেক অপেক্ষা করতে হয়, সে দান নিশ্চয় **দূর**-এ থাকে, **দূর** থেকে আসে। যেকারণে **দূরদর্শন** শব্দের অর্থ ব.শ. দিয়েছেন 'ভাবী বিষয়ের বোধ' কিংবা 'যাকে দূরে দেখা যায়'। এই অর্থে মানসিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার দূরত্ব অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তবে আমাদের বাহ্যিক **দূরদর্শন** কিন্তু আমাদের **দূরদৃষ্টি**র ঘোর শত্রু রূপে দেখা দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি যত **দূরদর্শন** বা টিভি দেখে, তার **দূরদৃষ্টি** ততই কমে যায়! দ্র. **দেরী**। ...

দের, দেরি, দেরী : ২. *দের = দিশাগ্রস্ত গতিশীল দান রহে যাহাতে। দেরি = দের গতিশীল যাহাতে। দেরী = দেরি-র আধার যে।* ৩. (ফারসি শব্দ 'দের্‌') বিলম্ব। ৪. late অর্থে ব্যবহৃত। ৫. বলা হয়, শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে। তা আসুক। কিন্তু যা কিছু 'দের'-পদবাচ্য, তাই তো আসলে 'দূর'-পদবাচ্য। কারণ, তা দূর-এ থাকে বলেই তো তাকে পেতে 'দের্‌' হয়, দেরি হয়, দেরী হয়ে যায়!

দোষ : ২. *দূষ্‌-এর সার্বিক আধার যে।*

দৌড় (দৌড়াদৌড়ি) : ২. *দৌড় = দূ-এর বা নবরূপে উত্তীর্ণ*

*দাতার গড়ান-উড়ান যাহাতে; অথবা, **দূর** পর্যন্ত উড়ান-গতি যাহার। দৌড়াদৌড়ি = দ্র. কেশাকেশি!* ৩. দৌড় = ধাবন, দ্রুতগতি, একদৌড়ের পথ, গতির সীমা, বুদ্ধির সীমা, সীমা, বেগ, বিস্তার; ধাবিত হওয়া, ছোটা। ৪. run অর্থে প্রচলিত। ৫. প্রদত্ত উড়ান থাকে যাহাতে, সেটাই **দৌড়**। দৌড় কথাটির ভেতরে 'দ'-এর আগম হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, এর মধ্যে 'উড়ান দেওয়া'র ব্যাপারটি বিদ্যমান রয়েছে; আর সেজন্যই আমরা **দৌড়** 'দিই'।

প্রদোষ : ১. প্র + ✓দুষ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *প্র (দ্র. **প্র**) দোষ যাহাতে। /* প্রকৃষ্ট দোষ (যাহাতে); প্রারব্ধ দোষা (রাত্রি) যে সময়ে। (ব.শ.)। ৩. দুষ্ট, দোষ, রাত্রিপ্রারম্ভ, রজনীমুখ, সন্ধ্যারম্ভ, রাত্রিমাত্র। (ব.শ.)। ৪. শব্দটিকে কেবলমাত্র সাহিত্যের দুনিয়ায় evening অর্থে প্রচলিত দেখা যায়। ৫. **প্র** শব্দের অর্থের বিস্তার অনেক। এটি উপসর্গ। এখানে শব্দটির দুরকম অর্থ দিয়েছেন ব.শ.। প্রথম অর্থের ভিত্তি তাঁর দেওয়া প্রথম ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ — 'প্রকৃষ্ট দোষ যাহাতে।' অতএব এ সত্তা 'দুষ্ট' না হয়ে যায় না। আর, দ্বিতীয় অর্থের ভিত্তি তাঁর দেওয়া দ্বিতীয় ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ — 'প্রারব্ধ দোষা (রাত্রি) যে সময়ে।' আমাদের ধারণা, এই দুইরকম ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের মূলে একই ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ রয়েছে — '**প্র** দোষ যাহাতে'। এই হল **প্র**-দূষণকারী **প্রদোষ**। তার মানে, সে প্রকৃষ্ট-দূষণকারী **প্রদোষ** বা 'দুষ্ট' হতে পারে; কিংবা সে প্রারব্ধ-দূষণকারী **প্রদোষ**ও (সন্ধ্যাকালও) হতে পারে। কেননা, অন্ধকার দ্বারা দূষিত যে রাত্রি, **প্রদোষ** তার প্রাক্-কাল। ইংরেজিতে এই **প্র** pre-রূপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

দুহ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিদোহ, অতিদোহন, দই, দধি, দধিকুর্চিকা (ছানা), দধিজ, দধিত্থ, দধিমঙ্গল, দধিমণ্ড, দধিমুখ, দধিসার, দধিস্নেহ, দধীচ, দধীচি, দ(দো)য়েল, দহি (দহী), দহিয়াল, দু, দুওয়া, দুগ্ধ, দুগ্ধকুষ্মাণ্ড, দুগ্ধচই, দুগ্ধচিড়া, দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধদা, দুগ্ধনিভশয্যা, দুগ্ধপাচন, দুগ্ধপুলি, দুগ্ধপোষ্য, দুগ্ধফেন, দুগ্ধবটী, দুগ্ধমুখ, দুগ্ধসমুদ্র, দুগ্ধসিন্ধু, দুগ্ধাব্ধি, দুগ্ধিকা, দুগ্ধী, দুধ, দুধকমল, দুধকুসুম্ভা, দুধথোড়, দুধফেনী, দধরাজ, দুধল, দুধে, দুধে-আলতা, দুধেল, দুয়া-ভুয়া, দুহ্, দুহ, দুহা, দুহাঁ, দুহাঁর, দুহাকার, দুহিতা, দুহ্য, দুহ্যমান, দুহার, দৈ, দৈয়াল, দোআ, দোগ্ধা, দোয়া, দোয়াদরুদ, দোহ, দোহদ, দোহন, দোহল, দোহলা, দোহা, দোহাই, দোহান, দোহাল, দৌউত্র, দৌহিত্র, দোহ্য, ধীদা।

দুহ্ = নবরূপী দাতার হওয়ন। **দুহ** = নবরূপী দাতার হওয়ন যাহাতে।

দধি (দধিত্থ, দধিমঙ্গল) : ১. ✓দধ্ (ধারণ) + ই (ইন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দধি = দাতার ধারণ গতিশীল যাহাতে। **দধিত্থ** = দধি তারিত হয়ে থাকে যাহাতে। **দধিমঙ্গল** = **দধি** ও **মঙ্গল**।* ৩. দধি = অম্লযোগজন্য দুগ্ধবিকারবিশেষ, (সাদৃশ্যে?) বস্ত্র। **দধিত্থ** = কপিত্থবৃক্ষ। **দধিমঙ্গল** = উপনয়ন ও বিবাহের পূর্ব্বরাত্রিতে **মাণবক** ও বরের দধিমিশ্র মিষ্টান্নভক্ষণরূপ আচারবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. curd অর্থে প্রচলিত। ৫. **দধি** শব্দের মানে শুধুমাত্র curd হলে আমরা ভাবতাম, একমাত্র ঐ বস্তুটিতেই 'দাতার ধারণ গতিশীল থাকে'। কিন্তু তা তো নয়। সে যে বস্ত্রেও থাকে! এমনকি সেই **দধি** 'তারিত হয়ে থাকে' যাহাতে, সেটি নাকি **কপিত্থবৃক্ষ** অর্থাৎ কয়েত বেলের গাছ! এদের সাধারণ গুণ হল অম্ল; দধি টক, বেলও টক। কিন্তু 'দধি মাত্রেই শেষে কষায়'। (ছা.অ.)। গৈরিকরক্তবস্ত্রও কষায়। তাহলে **দধি** জিনিসটি আসলে ঠিক কীরূপ ক্রিয়ার কথা বলে?

আমরা আগেই জেনেছি, **বৃক্ষ** সামাজিক সংস্থাকেও বোঝায়। তো, টক-বেলের গাছও একধরনের সামাজিক সংস্থা হতেই পারে। আর সেরকম হতে আপত্তির কোনো কারণই দেখা যায় না, যদি জানা যায় যে, এই **দধিত্থ** বৃক্ষকেই **কপিত্থবৃক্ষ** বলে। আর, যে গাছে বানরদের লাফালাফি চলে, তেমন সমাজিক সংস্থাতেই তো কেরানীকুলেরও লাফালাফি চলে!

তা চলুক। এখান থেকে আমরা বাহ্যিক দই, সামাজিক দই, এই দুই প্রকার দইয়ের সমগ্র প্রেক্ষাপটটিই চেষ্টা করলে দেখে নিতে পারি। বাহ্যিক দইয়ের চরিত্র হল — সেটি আদতে দোহন করে আনা সম্পদ। তাকে জমালেই তার ভিতরে **অম্ল**গুণের সম্ভাবনা দেখা দেয়। অম্লগুণ বেশি হয়ে গেলেই তার ভক্ষণে **টঙ্কারের** উপক্রম হয়, **টক টক** লাগে। কিন্তু এই দধির শেষে থাকে কষায়গুণ। যা কিনা টঙ্কারগুণের ঠিক বিপরীত। যেকারণে পেটে **আম** হলে, **আমাশয়** হলে, **টক** দধি তাকে নিশ্চয় নির্মূল করতে পারে।

আর, সামাজিক দইয়ের চরিত্র হল — সেটিও আদতে প্রকৃতিকে (ভূমিকে, পৃথিবীকে, প্রজাদেরকে) দোহন করে আনা সম্পদ। (দ্র. **পৃথিবীদোহন**)। তাকে জমালেও তার ভেতরে অম্লগুণের বা আমিত্বের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেই আমিত্ব বেশি হয়ে গেলেই তার ভোগে টঙ্কারের উপক্রম হয়, আমার হেন আছে ত্যান আছে ইত্যাদি অহঙ্কারবাক্যের প্রকাশ হতে থাকে, মানুষ **টকে** যায়। কিন্তু এই দধির শেষেও থাকে কষায়গুণ, যা কিনা টঙ্কারগুণের ঠিক বিপরীত। যে কারণে সম্পদসঞ্চয়কারী মানুষ শেষ বয়সে হঠাৎই কষায়বস্ত্র ধারণ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, বিষয়বিমুখ হয়ে ওঠে।

আরও আছে, সে হল মানসিক দই। সে দই কেমন, তার তত্ত্ব অনুধাবন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সেকথা তিনি কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বলে গেছেন। মধ্যযুগের **রাধেশ্যামের** উপাসক বাংলাভাষী অনেক ভাল করেই বুঝেছিলেন যে, **গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণ** কেবল milk-এর বা commodity ও surplus value-র কারবারী ছিলেন না, নবোদ্ধৃত **নবনী**র বা নবোদ্ভাবিত ও নবাবিষ্কৃত জ্ঞানের কারবারী **ননীচোরা শ্যাম**ও ছিলেন। (দ্র. **গৌরী**)। তবে সেসব প্রসঙ্গে এখন আমরা যাব না।

তার মানে, দান ধারিত হয় **দধ**-এ। সেই **দ-ধারণ** গতিশীল হয় যাহাতে তাকে **দধি** বলে। অন্যথায় তা **দদ্** হয়ে দদ্রু হয়ে যায়, **কণ্ডু**দায়ক চর্ম্মরোগ হয়ে যায়। **কুষ্ঠ**রোগের দিকে হাঁটা দেয়। **দধি** কিন্তু সেরকম নয়, সে সাময়িকভাবে **টক**গ্রস্ত করলেও অন্তিমে শান্তি দেয়। সেই সুবাদে এর মধ্যে দুই বিপরীত ক্রিয়ার একপ্রকার সামঞ্জস্য বিদ্যমান বলেই মনে হয়।

আমাদের **পূর্বপুরুষেরা** আমাদের মতো প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন ও যন্ত্রনির্ভর ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন প্রকৃতিসংলগ্ন এবং অত্যন্ত অনুভবশীল। জড়বস্তুর মধ্যে, জৈববস্তুর মধ্যে, সামাজিক বস্তুর মধ্যে, মানসলোকে — সর্বত্র একই গুণের, একই ক্রিয়ার চলনকে দেখবার যোগ্য ছিলেন তাঁরা। সেই কারণে তাঁরা একদিকে যেমন শ্বেত অপরাজিতার মধ্যে **দধি**গুণ দেখতে পেয়েছিলেন, তেমনি কয়েৎ বেলের মধ্যেও সেই গুণ দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া, তাঁদের এই উপলব্ধি কতদূর বিস্তৃত ছিল সেকথা আমরা জানতে পারি **দধিমঙ্গল** শব্দ থেকে।

তাঁরা জানতেন **দধি** মানুষকে দৈহিক শক্তিবর্দ্ধক বলসম্পদ, মানসিক শক্তিবর্দ্ধক জ্ঞানসম্পদ এবং দেহমন-উভয়ের শক্তিবর্দ্ধক ধনসম্পদ দেয় বটে, কিন্তু **দধি** তার একটা সীমাও রক্ষা করে। সেই কারণে তাঁরা **দধিমঙ্গল**কে একটি সামাজিক আচারের অন্তর্ভুক্ত করে গেছেন। সেই আচারটিকে একটু গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করলেই আমরা এর সত্যতা টের পাই।

ব্রাহ্মণসন্তানের **উপনয়নে**র আগে এই আচার অবশ্যপালনীয়। কেননা, ধর্ম্মানুসারে পরদিন থেকেই ব্রাহ্মণসন্তান সামাজিক কর্ম্মযজ্ঞের ফল 'নয়নকারী' হওয়ার অধিকার লাভ করে। তখন সে যেন প্রয়োজনাতিরিক্ত যজ্ঞফল আনয়ন না করে। তার আনয়ন-প্রক্রিয়া যেন **দধি**র মতো হয় — 'দান ধারণ গতিশীল যাহাতে'। তার চেয়ে বেশি নয়, কমও নয়।

একই নিয়ম বরের ক্ষেত্রেও। সে তো পরদিন থেকে সন্তান উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছে। যেন **দধি**র মতো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। অধিক সন্তান জনন না করে, অত্যল্পও না করে।

একই কথা ঋষিবর-মহর্ষিবরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁরা তো সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিবাহিত বা চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন। তাঁদের সবাইকে দিয়ে পরদিন থেকে সারা বছর ধরে সামাজিক উৎপাদন কর্মযজ্ঞ চালাবেন। সেখানে তাঁরাও যেন অত্যধিক উৎপাদন না করেন, অত্যল্পও না করেন। তবেই **দধিমঙ্গল** হবে।

শুধু তাই নয়, **দধি**-যুক্ত শব্দগুলিকে যদি আমরা একটু নিবিষ্ট মনে বিচার করি, আমরা দেখতে পাব, সব ক্ষেত্রেই তাঁরা কত সূক্ষ্মভাবে বিষয়টি নজর করে শনাক্ত করে গেছেন। যেমন তাঁদের মতে (ক) **দধিগ্রাম** = শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানবিশেষ, অর্থাৎ যেখানে নগদ-নারায়ণ তাঁর কালো রূপে লীলা করেন। দ্র. **গৌরী**। (খ) **দধিধর্ম্ম** = দধিসংস্কারক বৈদিককর্ম্মবিশেষ। এটি কেবল বাহ্যিক দই দিয়ে সংস্কার নয়, নয় যে, সেকথা আমরা **দধিমঙ্গল** শব্দে অনায়াসে বুঝতে পারি। (গ) **দধিপুষ্পিকা** = শ্বেত অপরাজিতা, যাকে পরাজিত করা যায় না! (ঘ) **দধিবামন** = বিষ্ণু, কৃষ্ণ, শালগ্রাম মূর্ত্তিবিশেষ। দধিই বামন — বামের (বিপক্ষের) ন (বন্ধন) যাঁহা হইতে, তিনি। এই দধি যে curd নয়, এ যে ধনসম্পদ ও জ্ঞানসম্পদের **দধি**, আশা করা যায়, পাঠক তা অনুভব করতে পারবেন। দ্র. **গৌরী**। (ঙ) **দধিবিজ্ঞান** = দধি ত্রিবিধ — মধুর, অম্ল, ও অত্যম্ল। সর্বপ্রকার দধিই পশ্চাৎ কষায়। দধি সাধারণের গুণ — অম্ল, গুরু, বাতদোষনাশক, সংগ্রাহক, মূত্রাবহক, বল্য, শোথ, কফ আর্ত্তি ও অরুচির নাশক, বহ্নিশান্তিকর, কাসশ্বাস-পীনস বিষমজ্বর ও শীতজ্বরে হিতকর, রক্তোদ্রেক-শুক্রবর্দ্ধক। এই **দধিবিজ্ঞান**কে কেবলমাত্র মানবশরীরের ক্ষেত্রে বাহ্যদধির ক্রিয়া দিয়ে বিচার করলে এর প্রকৃত রহস্য ধরা দেয় না; একে মানবমনের ক্ষেত্রে মানসিকদধির (জ্ঞানসম্পদজাত দধির) ক্রিয়া দিয়ে বিচার করতে হয়। আর, দেহমনের যৌথতার ক্ষেত্রে যৌথদধির (ধনসম্পদজাত দধির) ক্রিয়া দিয়ে বিচার করতে হয়। মানসিক **দধি** বিষয়ে কারও যদি সন্দেহ হয়, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তকে অনুসরণ করতে পারেন। তিনি জানতেন **দধি** কাকে বলে।

দধিমুখ : ২. *যে মুখের ভিতর দিয়ে গিয়ে দধি খেতে হয়।* ৩. সুগ্রীবের মাতুল। ইনি মধুবন নামে এক রমণীয় কানন রক্ষা করতেন। সীতার সংবাদ নিয়ে হনুমান প্রত্যাবর্তন করলে, অঙ্গদ প্রভৃতি বানরদের এত আনন্দ হয় যে, তাঁরা মধুবন ধ্বংস করে মধুপানে মত্ত হন। ((পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই **মুখ** শব্দটিকে আজকাল আমরা চিনতে পারি **মুখপাত্র** হিসেবে। এই পাত্র থালা নয়, একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ইনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সামনে দাঁড়িয়ে সেই বিষয়কে রক্ষা করেন, সেই বিষয়ের হয়ে কথা বলেন, সেই বিষয়ে অন্যের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করেন। রামায়ণের যুগে সুখসম্পদের উপবন 'মধুবন'-এ যে সত্তা সেই মুখপাত্রের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁর নাম ছিল **দধিমুখ**।

দধীচ, দধীচি : ১. √দধ্ (দান করা) + ঈচ্, ঈচি, কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. ***দধীচ*** *= দান-ধারিকা চয়িত যাহাতে।* ***দধীচি*** *=* ***দধীচ*** *গতিশীল যাহাতে।* ৩. ইঁহার পিতা অথর্ব্বা, জননী চিত্তি। ব্রহ্মার উপদেশে, ইন্দ্র বৃত্তনিধনার্থ ইঁহার অস্থিসমূহ প্রার্থনা করিলে, ইনি দেহত্যাগপূর্বক অস্থি প্রদান করেন। ইন্দ্র সেই অস্থিসমূহে বজ্র নির্ম্মাণ করাইয়া বৃত্রাসুর নিহত করেন। (ব.শ.)। অথর্ব মুনির ঔরসে এবং কর্দমকন্যা শান্তির গর্ভে এঁর জন্ম হয়। ইন্দ্র দধীচিকে কয়েকটি বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে বলেছিলেন যে, যদি তিনি এই বিদ্যা অন্য কাউকে শিক্ষা দেন, তবে তাঁর শিরশ্ছেদ অনিবার্য। অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচির নিকট হতে এই বিদ্যা শিক্ষা করবেন সঙ্কল্প করে দধীচির শিরশ্ছেদ করেন ও তাঁর মস্তক অন্যত্র রেখে দিয়ে সেই স্থানে অশ্বের মস্তক স্থাপনকরতঃ এই বিদ্যা অধ্যয়ন ও শিক্ষা করেন। ইন্দ্র সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত হয়ে যখন দধীচির অশ্বমস্তক কর্তন করেন, তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় অন্যত্র রক্ষিত দধীচির মস্তক তাঁর মস্তকস্থানে সংযুক্ত করে দেন।

মহাভারতে কথিত আছে যে, অথর্বের ঔরসে ও তাঁর সহধর্মিনী শান্তির গর্ভে দধীচির জন্ম হয়। ইনি কঠোর তপস্যায় সকল সময়ই নিমগ্ন থাকতেন। শিবভক্ত ছিলেন বলে দধীচি দক্ষকে শিবহীন যজ্ঞ করতে নিষেধ করেন। দক্ষ এঁর উপদেশ উপেক্ষা করায় ইনি দক্ষযজ্ঞে অনুপস্থিত থাকেন। বৃত্রাসুরের আক্রমণে উৎপীড়িত ও স্বর্গচ্যুত দেবগণ যখন জ্ঞাত হন যে, দধীচির অস্থিনির্মিত অস্ত্রে বৃত্রের নিধন অবশ্যম্ভাবী, তখন দেবরাজ ইন্দ্র দধীচির নিকট গমনপূর্বক তাঁর অস্থি প্রার্থনা করেন। পূর্বে একবার তপোভঙ্গ করায় ইন্দ্র দধীচির বিরাগভাজন হন। ঐ সময় দধীচির উগ্র তপস্যায় ভীত হয়ে তাঁর তপোভঙ্গের জন্য ইন্দ্র অলম্বুষা নামে এক অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। তাঁর দর্শনেই দধীচির শুক্র সরস্বতীর জলে পতিত হয়। সরস্বতী নদী

তা উদরস্থ করে সারস্বত নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। উদারচেতা দধীচি (তা সত্ত্বেও) ইন্দ্রের পূর্ব-শত্রুতা বিস্মৃত হয়ে দেবতাদের উপকার সাধনে প্রাণবিসর্জন দেন। ইন্দ্র সেই অস্থিদ্বারা বজ্র নির্মাণ করে ৯৯ বার বৃত্রদের নিহত করেন। অগ্নিপুরাণ মতে দধীচির অস্থিতে অনেক প্রকার অস্ত্র নির্মিত হয়েছিল। (পৌ.অ.)। ৪. পৌরাণিক চরিত্রের নাম ভিন্ন শব্দটি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দধি**। **দধীচি** সত্তাটি দক্ষযজ্ঞের আগে থেকেই সক্রিয়। ইনি শিবভক্ত। দক্ষযজ্ঞবিরোধী। সম্পদ চয়ন করেন, কিন্তু তার একটা মাত্রা থাকে। তিনি স্বভাবতই অপরাজেয় শক্তির আধার। কিন্তু অবয়বের শক্তি তো অবয়বের ভেতরে যে অস্থি বা কাঠামো থাকে, তারই উপর নির্ভর করে! সেই structure হল একপ্রকার সামাজিক সংগঠনের কাঠামো, যার উপর নির্ভরশীল হয়ে **দধীচি** তাঁর চয়নকার্য্য চালাতেন। সেই structure-টিই চেয়ে বসল আসন্ন পুঁজিবাদের প্রতিনিধি (= ইন্দ্র)। ঠিক যেন ভারতের নির্বাচন কমিশন মধ্যশিক্ষাপর্ষদকে বলল, তোমার সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের দাও, আমি দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে বর্তমান রাষ্ট্র-পরিচালককে মেরে ফেলব, এবং নতুন শাসকের জন্ম ও প্রতিষ্ঠা দেব। মধ্যশিক্ষাপর্ষদ বলল, তাহলে তো আমার নিজের কাজকর্ম সবই বন্ধ করে দিতে হবে। অতএব লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে দিতে যে কয়দিন সময় লাগে, সে কয়দিন পরে তুমি এসো; আমার অস্থি নিয়ে যাও। ঠিক এভাবেই **দধীচির** অস্থি (institutional structure) নিয়ে পূর্ব্বতন আদিম সমাজতান্ত্রিক বা 'বেদবাদী সমাজব্যবস্থা'কে (= বৃত্রাসুরকে, যা কিনা ইতোমধ্যে মৌলবাদী ও অধঃপতিত হয়ে সেকেলে হয়ে পড়েছিল, তাকে) ধ্বংস করা হয়েছিল। কেননা, সেই ব্যবস্থা কিছুতেই আসন্ন পুঁজিভিত্তিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পথ ছেড়ে দিচ্ছিল না। আর তা করার জন্য **দধি**-চয়নকারী প্রাচীন ব্যবস্থাটির কাঠামোটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। কারণ এই কাঠামো ছিল অপরাজেয়। কারণ, এর মূলে ছিল **দধি**।

দু, দুওয়া, দোয়া, দোহা, দোহাই : ১. ✓দুহ্। ২. দু = *দান নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***দুওয়া (দোয়া)*** *= **দু** ক্রিয়াশীল হইয়া যায় যাহাতে।* ***দোহা*** *= **দু**-এর হওয়নের আধার যে।* ***দোহাই*** *= **দোহা** গতিশীল যাহাতে।* ৩. **দু** = দোহন করা, নিঃসারণপূর্বক শূন্য বা রিক্ত করা (to drain), নিঙড়াইয়া বাহির করা (to squeeze out)। **দুওয়া (দোয়া)** = আশীর্ব্বাদ, মঙ্গল প্রার্থনা, দোয়া ও ঔষধ। **দোহা** = দোহন করান, দোহান। **দোহাই** = দিব্য, পরিত্রাহি ডাক, ঘোষণা, ঘোষণার্থ ঢেঁঢরা, রক্ষার্থ প্রভাবান্বিত বা বিখ্যাত লোকের নাম ঘোষণা। (ব.শ.)। ৪. প্রত্যেকটিই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. লক্ষ্যণীয় যে, আরবি **দোয়া**, হিন্দি (পাঞ্জাবী?) **দোহা** প্রভৃতি শব্দ অর্থনৈতিকভাবে তো বটেই, এমনকি চেহারাতেও হুবহু বাংলার মতোই। যদিও শব্দগুলিকে যাঁরা 'আরবি থেকে আগত' কিংবা 'হিন্দি থেকে আগত' বলতে ভালবাসেন, তাঁদের স্পষ্ট বিরোধিতা করে শব্দগুলি আপন অর্থের গভীরে আপনাদিগের আত্মীয়তা উপলব্ধি করায়। সেকথা জোর করে মানতে না চাইলে অন্য কথা।

দুগ্ধ (দুগ্ধদা, দুগ্ধসমুদ্র, দুগ্ধসিন্ধু, দুগ্ধিকা, দুগ্ধী) : ১. ✓দুহ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **দুগ্ধ** = *নবরূপে উত্তীর্ণ দানের গমন ধারিত যাহাতে।* ***দুগ্ধদা*** *= **দুগ্ধ** দেয় যে।* ***দুগ্ধসমুদ্র*** *= **দুগ্ধ**-এর সমুদ্র।* ***দুগ্ধসিন্ধু*** *= **দুগ্ধ**-এর সিন্ধু।* ***দুগ্ধিকা*** *= **দুগ্ধ**-কে গতিশীল করে যে আধারশক্তি।* ***দুগ্ধী*** *= **দুগ্ধ**-এর গতিশীল আধার যে। /* **দুগ্ধদা** = দুগ্ধ দাত্রী (দান করে) যে। (ব.শ.)। ৩. **দুগ্ধ** = কৃতদোহন, প্রপূরিত, উপভুক্ত, স্ত্রীস্তননিঃসৃত দ্রবদ্রব্যবিশেষ, দুগ্ধবৎ বৃক্ষনির্য্যাস, স্তনদুগ্ধ। **দুগ্ধদা** = পয়স্বিনী। **দুগ্ধসমুদ্র, দুগ্ধসিন্ধু** = ক্ষীরোদ সমুদ্র। **দুগ্ধিকা, দুগ্ধী** = দুগ্ধবৎ নির্য্যাসযুক্ত বৃক্ষভেদ, ক্ষীরা, দুধলে। (ব.শ.)। ৪. milk অর্থে **দুগ্ধ** কদাচিত প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. যা কিছু দোহন করে কোনো আকারে বা প্রকারে ধরে রাখা হয়, তা সবই **দুগ্ধ** পদবাচ্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে এটুকু অবশ্য জানা চাই, কার থেকে দোহন করা হল, কী দোহন করা হল। তা না হলে **দুগ্ধ**কে চেনা যাবে না। গরুর দুধ দিয়ে আর যাই হোক, **দুগ্ধসমুদ্র** বা **দুগ্ধসিন্ধু** হয় না। এগুলো পরমাপ্রকৃতির বিস্তীর্ণ করে রাখা প্রাকৃতিক সম্পদ দোহন করে আনা **দুগ্ধ** কিংবা প্রজা সাধারণকে দোহন করে আনা ধনসম্পদ-রূপ **দুগ্ধ** হতেই পারে। এমনকি পরমব্রহ্মাকে দোহন করে আনা **দোয়া** বা **দোহা** স্বরূপ অমৃতজ্ঞানের **দুগ্ধ**ও হতে পারে। কী হবে, সেটি ঠিক করে প্রেক্ষিত। অতএব এখন যে **দুগ্ধ**-এর কথা হল, সে বিমূর্ত্ত **দুগ্ধ**। বাস্তব ক্ষেত্রে যখন তার প্রয়োগ হবে, তখনই বলা যাবে, এ দুগ্ধ কেমন দুগ্ধ।

দুহ্, দুহ, দোহ, দোহন : ১. দোহ = ✓দুহ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **দুহ্** = *নবরূপে উত্তীর্ণ দানের হওয়ন।* ***দুহ*** *= নবরূপে উত্তীর্ণ দানের হওয়ন যাহাতে।* ***দোহ*** *= **দুহ্** ক্রিয়ার সার্বিক আধার যে।* ***দোহন*** *= **দোহ** অন (on) যাহাতে।* ৩. **দুহ্** = দোহন, আকর্ষণপূর্ব্বক দ্রবদ্রব্যনিঃসারণ, প্রপূরণ, ব্যক্তীকরণ, বধ। **দুহ** = দোহন করা। **দোহ** = দোহন, প্রপূরণ, দুগ্ধ, দোহনপাত্র। **দোহন** = অন্তঃস্থিতদ্রব্য-নিঃসারণ-ব্যাপার, স্তন হইতে দুগ্ধনিঃসারণ, দোয়া। (ব.শ.)। ৪. এই শব্দগুলি এখন সমার্থে 'দুয়ে নেওয়া' বা 'দোয়া' এবং '**দোহন** করা' রূপে প্রচলিত। সেভাবে বললে, **দুহ্, দুহ, দোহ** এখন অপ্রচলিত শব্দ। ৫. দুধ দোয়া থেকে শুরু করে কলঙ্কের ভয় দেখিয়ে টাকা দুয়ে নেওয়া বা দোহন করা পর্যন্ত — এসব ধারণা এখনও কমবেশি প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু পুরাণাদিতে 'পৃথিবীদোহন', 'বেদদোহন' ... জাতীয় যেসব বয়ান রয়েছে, এখন তা দুর্বোধ্য এবং অপ্রচলিত। কিন্তু ভারতভূমিতে দুনিয়ার সর্বপ্রথম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর (দ্র. **পৃথু**) মানবসভ্যতার যে মহত্তম অর্জনগুলি সম্ভব হয়েছিল, তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে হরিবংশ পুরাণের **পৃথিবীদোহন** অধ্যায়ে। ...

দুহিতা (দুহিতৃ) : ১. ✓দুহ্ + তৃ (তৃচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **দুহ্** *(= দোহন ক্রিয়া) গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে তাহার আধারশক্তি। /* **দুহিতা** = যে বিবাহাদিতে ধনাদি গ্রহণ করে; অথবা, যে গোদোহন করে। (ব.শ.)। ৩. কন্যা। (ব.শ.)। কন্যা, পুত্রী। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে কন্যাকে সযত্নে পালন ও যথাবিহিত শিক্ষাদান করিয়া

এই শব্দার্থকোষ কীভাবে পড়তে হয়, তা জানার জন্য 'ভূ-১' পৃষ্ঠা দেখুন। সংক্ষিপ্ত আকারে তা ১ পৃষ্ঠাতেও পাওয়া যাবে।

উপযুক্ত পাত্রে দান করিবার বিধি আছে। কেহ বলেন, পূর্ব্বকালে গৃহের কন্যাগণ গাভী দোহন করিত বলিয়া তাহাদের দুহিতা নাম হইয়াছে। তাঁহারা অন্যান্য ভাষার সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য দেখাইয়া থাকেন; যেমন সংস্কৃত দুহিতা, পারসিক দোখ্‌তর, গ্রীক দাইগেতর, ইংরাজি ডটার। (ছা.অ.)। ৪. daughter অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ঝি**। একথা সত্য বলেই মনে হয় যে, প্রাচীন কালে সব দেশেই পরিবারের কন্যাগণ গাভী দোহনের কাজ করতেন। ছাত্রবোধ অভিধান যেমন সেকথা উল্লেখ করেছেন, তেমনি ইংলন্ডের প্রাক্‌-শিল্পবিপ্লব গ্রামজীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসে দেখা যায়, বাড়ির অনূঢ়া মেয়েরা গাভী-দোহনের কাজ করছে। এমনও হতে পারে যে, প্রাচীন যৌথ পরিবারের **কন্যাগণ** প্রকৃতিকে দোহনের কাজে পরিবার-পরিচালককে অগ্রণী হতে তাগাদা দিত। সেকারণেই তারা **দুহিতা** পদবাচ্যা হয়ে যায়। ৬. Avesta - dughdar, Greek - thugater, German - tochter, Teutonic - dauhter, Lithuanian - dukter, Dutch - dochter, Anglo-Saxon - dohter, English - daughter। (ব.শ.)।

দোহদ : ১. দোহ + ✓দা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দোহন ক্রিয়ায় সাহায্য দান করে যে।* / আকর্ষণ দান করে যে। (ব.শ.)। ৩. ইচ্ছা, স্পৃহা, মনোরথ, গর্ভিণীর মনোরথ, সাধ, গর্ভমাত্র, বৃক্ষাদির প্রসবকারণ সংস্কারদ্রব্য, বৃক্ষাদিপোষক। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **দোহদ** শব্দটি তৈরি করা হয়েছে দুভাবে। যখন তা **দ্বি** থেকে তৈরি, তখন তার অর্থ দাঁড়ায় 'গর্ভিণীর ইচ্ছা' বা 'সাধ'; যে-গর্ভিণী আসলে মা-ছেলে দুজন। আর, যখন তা **দুহ্‌** থেকে তৈরি, তখন তার মানে দাঁড়ায় 'দোহনের সহায়ক'। দোহনের সহায়ক বহুরকমের হতে পারে। বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে বলা যাক।

একালের দুধব্যবসায়ীদের কথা আমরা বলছি না, গ্রামবাংলার মানুষেরা তাঁদের গোয়ালের গাইয়ের দুধ দোয়ার স্বাভাবিক যে রীতি অনুসরণ করেন, তার কথাই এখানে বলব। সেই রীতি এইরকম — রাত্রি দশটার আগে কোনো সময় বাছুরটিকে তার মায়ের কাছে আনা হয়, যতটা দুধ খাওয়ার ইচ্ছে তাকে খেতে দেওয়া হয়, তারপর বাছুরটিকে বেঁধে দেওয়া হয়। সকালে বাছুরটির প্রচণ্ড খিদে থাকে, গাইয়ের স্তনে দুধও থাকে। তখন বাছুরটিকে একটুখানি ছেড়ে গাইয়ের স্তনে মুখ দিতে দেওয়া হয়। তাতেই হু হু করে দুধের ধারা নেমে আসতে থাকে। তখনই বাছুরটিকে টেনে নিয়ে বেঁধে রেখে দুধ দোয়া শুরু হয়। বালতি ভর্তি হয়ে যাবার পর বাছুরটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে এইবার তার মায়ের প্রায় নিঃশেষিত স্তন চুষতে থাকে এবং তার তৃষ্ণা প্রায়শই মেটে না। তবে, গ্রামবাংলার মানুষেরা এরপর বাছুরটিকে আর বাঁধেন না, সারাদিন ছেড়ে রাখেন, যখন যখন তার ইচ্ছে হয় সে তার মায়ের দুধ খেতে পারে। এবং সারাদিন ধরে সে বিভিন্ন সময়ে দুধ খেয়ে তার তৃষ্ণা মেটায়; ঐ রাত্রি দশটা পর্যন্ত। তারপর আবার তার বাধ্যতামূলক অনশন।

কিন্তু কোনো কোনো গাই তার সন্তানের সঙ্গে এই অন্যায় আচরণ বরদাস্ত করতে রাজি হয় না। বাছুর তার স্তন থেকে মুখ সরিয়ে নিলেই তার দুধের ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন পুনরায় বাছুরটিকে ছেড়ে তার স্তনে মুখ দেওয়াতে হয়, তখন আবার দুধের ধারা নামে। তখন পুনরায় গোয়ালা বালতি নিয়ে বসে যায়। একটু পরে আবার ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন আবার বাছুরের ডাক পড়ে। এইভাবে চার-পাঁচবার বাছুরের মুখ লাগানো হয় স্তনে, দুধের ধারা নেমে আসে, বাছুরকে সরিয়ে গোয়ালা যতটা পারে দুয়ে নেয়। আবার বাছুরের পালা পড়ে। বলে রাখা ভাল, এখন যে দুধ-ব্যবসা চলে, তাতে বাছুরকে দুধ প্রায় খেতেই দেওয়া হয় না।

এখন কথা হল, এই যে বাছুর মুখ দিলেই দুধের ধারা নেমে আসা, এর কারণেই বাছুরটি ঐ গাইয়ের দুধের **দোহদ**। তো, সেকালের মানুষের মাথায় এই কথাটি বোধহয় ঢুকে গিয়েছিল যে, প্রকৃতির আর যে যে সত্তাকে 'দোহন' করে **দুগ্ধ** পাওয়া যায়, তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এইরকম **দোহদ** পাওয়া সম্ভব। সেই **দোহদদের** সহায়তা নিতে পারলে অনেক বেশি **দুগ্ধ** অনেক কম পরিশ্রমে পাওয়া যেতে পারবে। এবং তাঁদের অত্যন্ত অনুভবশীলতার জোরে তাঁরা সেই সমস্ত **দোহদদের** এক এক করে চিহ্নিত করেছিলেন। সেগুলি কীরূপ তা নিয়ে ইতোপূর্বেই আমাদের নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। — 'চাঁপা বা কনকচাঁপা গাছে বেশি বেশি ফুল ফোটে মেয়েরা যদি সে-গাছে ফুঁ দেয় বা তার চারদিকে নাচানাচি করে। তিলগাছের ওসব লাগে না, মেয়েদের কটাক্ষপাতেই তার গা সিরসিরিয়ে ওঠে, উপচে পড়ে তার ফুল, ফল। আর বকুল গাছের চাই মেয়েদের ধিক্কার, থুতু। তখন সে ঘুরে দাঁড়ায়, দেখিয়ে দেয় কত ফুল সে ফোটাতে ও ঝরাতে পারে! তবে অশোক গাছটা ভারি বেহায়া, তার ন্যাওটা বায়নাক্কা — 'দেহিপদপল্লবমুদারম্‌'; মেয়েদের লাথি না খেলে তার মন ওঠে না, পাদস্পর্শেই ফুলে ফুলে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে তার সারা শরীর। সহকার গাছের আবদার আরও বেশি, তার চাই মেয়েদের আলিঙ্গন। পাকেচক্রে তা যদি সে পেয়ে যায়, তাহলে 'যায় যদি যাক প্রাণ' বলে সে এত মুকুল, এত ফল ফলিয়ে বসে যে, ফলের ভারে তার ডালপালা ভেঙে পড়ে।' (কলিম খান রচিত 'বাংলার মাটি বাংলার জল ...' নিবন্ধ থেকে, যা প্রকাশিত হয়েছে 'রোয়াক' পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় ২০০৮ সালে।)

যাই হোক, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেই **দোহদদের** চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমরা তাঁদের চিহ্নিত করা **দোহদদের** একটি তালিকা এখানে উপস্থাপিত করছি।

গাভী	দোহদ
অশোক	স্ত্রী-পদাঘাত
কনকচাঁপা	পুরোভাগে স্ত্রী-নর্তন
তিল	স্ত্রী-বীক্ষণ
চম্পক	স্ত্রীলোকের ফুঁ (বক্তবাত)
বকুল	স্ত্রীলোকের আস্যমদিরা (থুতু)
সহকার (আম)	স্ত্রী-আলিঙ্গন
কুরব (পীতঝিণ্টী)	রমণীর আলিঙ্গন
চূত	স্ত্রী-গীত

এই তথ্যগুলি সবই নেওয়া হয়েছে ব.শ. থেকে। আরও অনেক হয়তো রয়েছে। তা সব সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এর বাইরেও কিন্তু **দোহদ** রয়েছে। ধ্রুপদী সঙ্গীতের সাধকেরা তেমন তেমন **দোহদ**

শ্রোতা পেয়ে গেলে কখন যে রাত কাবার করে দেন, শ্রোতা ও সাধক কেউই তা বুঝতে পারেন না। একই কথা যথার্থ জ্ঞানী গুরু সম্পর্কেও বলা যায়। প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুকে **দোহদ** রূপে পেয়ে গেলে তিনি যে বক্তৃতা দেন, অন্য সময় তাঁর মুখ থেকে সেরকম বক্তৃতা শুনতে পাওয়া যায় না। দ্র. **চম্পক**।

দৃ (দৄ, দরিদ্রা, দারি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিদারুণ, অতিদীর্ঘ, অত্যাদর, অদরিদ্র, অদার, অদ্বার (দৌবারিক), অনাদর, অনাদৃত, আদর, আদরণীয়, আদরবাদর, আদরসিংহাসন, আদর্ত্তব্য, আদরিণী, আদীর্ঘ, আদুরী, আদৃত, কদর, কদরদান, ডিগডিগে, ডিগবাজি (দীর্ঘবাজি), ডিগি, ডিহি, দড়, দড়মসা, দড়মা, দড়বড়, দড়বড়ি, দড়া, দড়াম, দড়াশদড়াশ, দড়াসদড়াস, দড়ি, দড়ী, দঢ়, দঢ়া, দর, দরইজারা, দরকার, দরখাস্ত, দরগু‌আ(য়া), দরজী, দরদ, দরদর, দরপত্র, দরপত্তনী, দরপেষ(স), দরবার, দরবেশ, দরমা, দরমাহা, দরাজ, দরি(রী), দরিদ্র, দরিদ্রা, দরিয়া, দরুণ(ন), দর্দ্দরীক, দর্দ্দুর, দর্ব্বি, দর্ব্বিকা, দর্ব্বী, দর্ভ, দর্ভক, (দাতারক্ষণকে ভক্ষণ/ভরণ করে যে, তাহার কারক) দাড়ি, দাড়িম (ডালিম), দাড়িম্ব, দাদুর, দাদুরী, দার, দারক, দার(রু)চিনি, দারণ, দারব, দারা, দারি, দারিত, দারিদ্র্য, দারী, দারু, দারুক, দারুকা, দারুচিনী, দারুণ, দারুণী, দারুব্রহ্ম, দারুযন্ত্র, দারোগা (কোলদারোগা), দার্ঢ্য, দার্বাঘাট, দিঘল, দিঘালি-পাথালি, দীঘ, দীঘল, দীঘা, দীঘি, দীঘী, দীর্ঘ, দীর্ঘকণা, দীর্ঘকন্দক, দীর্ঘগতি, দীর্ঘগ্রীব (জিরাফও হতে পারে), দীর্ঘচ্ছ(ছ)ন্দ, দীর্ঘজঙ্ঘ, দীর্ঘতপাঃ, দীর্ঘতমা, দীর্ঘদর্শী, দীর্ঘদৃষ্টি, দীর্ঘনিদ্রা, দীর্ঘপ্রজ্ঞ, দীর্ঘরোমা, দীর্ঘল, দীর্ঘসত্র, দীর্ঘসূত্র, দীর্ঘসূত্রী, দীর্ঘা, দীর্ঘাই, দীর্ঘাড়ী, দীর্ঘাধ্বগ, দীর্ঘায়ুঃ, দীর্ঘায়ুধ, দীর্ঘায়ুষ্য, দীর্ঘিকা, দীর্ণ, দৃ, দৃঢ়, দৃঢ়ধন্বা, দৃঢ়নিশ্চয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দৃঢ়ভক্তি, দৃঢ়মুষ্টি, দৃঢ়লোমা, দৃঢ়সন্ধি, দৃঢ়সৌহৃদ, দৃঢ়হস্ত, দৃতি, দৃভৃ(ভী), দৃমি (দ্রিমিদ্রিমি), দৃমিকি, দৃহ্, দৈর্ঘ্য, দ্রঢ়িমা, দ্রাঘিমা, ধিঙ্গ (দীর্ঘ), ধিঙ্গধিঙ্গ, ধিঙ্গি, বিদারণ, বিদারিত, বিদীর্ণ, সদার, সন্দর্ভ, সমাদর, সাদর, হৃদয়বিদারী।

দৃ (দৄ, দরিদ্রা, দারি) = আবর্ত্তনশীল দান। **দৄ** = **দৃ**-র আধার যে। **দরিদ্রা** = দরির (**দর** = দাতা বা প্রদত্ত বস্তু রহে যাহাতে; **দরি** = **দর** গতিশীল যাহাতে) দান রহে যাহাতে তাহার আধার। **দারি** = দার (**দর** হইতে জাত) গতিশীল যাহাতে।

দৃ, দৃশ্ = একটি টেবিলকে দশ দিক থেকে দশ জন দ্রষ্টাই টেবিল রূপে দেখে। কারণ টেবিল-এর আলোকশক্তির বিচ্ছুরণ দশ দিকে সমভাবে প্রদত্ত-প্রকটিত হচ্ছে। **শ্** যখন 'আলোকশক্তির বিচ্ছুরণ' বোঝায়, **দৃ** তখন নিশ্চয়ই 'দশদিক সমভাবে প্রদান'কেই বোঝায়। এরকম সম্ভব হয় 'দান ক্রিয়াটির আবর্ত্তন' চলতে থাকলে; যদিও প্রত্যেক দ্রষ্টা প্রকটিত আলোকশক্তির একটি দিকের প্রকটনকেই দেখে। 'দান ক্রিয়ার এই আবর্ত্তন'কেই **দৃ** বলে। অ-আ, ই-ঈ, উ-ঊ প্রভৃতির নিয়মে, দৃ-র আধারকে বলতে হয় **দৄ**। বলে রাখা ভাল — **দৃপ্, দৃভ্, দৃশ্** প্রভৃতি ক্রিয়াপদগুলির মধ্যে এই 'আবর্ত্তনশীল দান' সক্রিয় থাকে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যেক পাত্র একটি দিকের প্রকটনকেই দেখে। সেকারণে শব্দগুলি তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাক্রমে **দর্প** (দর্‌প), **দর্ভ** (দর্‌ভ), **দর্শ** (দর্‌শ) হয়ে যায়।

দর (আদর, কদর, দরকার, দরদ) : **১.** দর = ✓দৃ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***দর** = দান রহে যাহাতে। **আদর** = **দর**-এর আশ্রয় যাহাতে। **কদর** = কারীর **দর** যাহাতে। **দরকার** = **দর** যে কার। **দরদ** = **দর** দান করে যে; অথবা, **দর** প্রদত্ত যাহাতে।* **৩.** **দর** = বিদারক, ভয়, **শঙ্খ**, কন্দর, বিল, গর্ত্ত, স্রোতঃ, প্রবাহ; মূল্য, দাম, হার, রেট, নিরিখ, **প্রতিষ্ঠা**, সম্মান, কদর; (ফারসি) অধীন, অন্তর্গত। **আদর** = **প্রীত্যতিশয়**, সৎকার, আসক্তি, যত্ন, প্রণয়, বাৎসল্য, গৌরব; আদর করা, সম্মান বা অভ্যর্থনা করা, স্নেহ প্রদর্শন করা। **কদর** = যোগ্যতা, উপাদেয়তা, গুণ, আদর, সম্মান, খাতির, মূল্য (worth)। **দরকাব** = (ফারসি) প্রয়োজনীয়তা, আবশ্যক। **দরদ** = দেশবিশেষ, দরদীস্তান, ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ, ক্রিয়াদিলোপ হেতু শূদ্রত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয়গণ; (ফারসি) ব্যথা, বেদনা, দয়া, করুণা, সহানুভূতি, সমবেদনা, মমতা, মায়া, টান। (ব.শ.)। **৪.** **যথার্থে প্রচলিত**। **৫.** **দৃ** করা মানে এখন আমরা বুঝি বিদারণ করা, তা সে নীচের দিকে মাটিতে পুকুর খোঁড়ার মতো হতে পারে, উপরে ছাদ ফুটো করে উর্ধ্বে উঠে পড়ার মতো হতে হতে পারে; কী হতে পারে তা কেবলমাত্র **দর** শব্দ থেকে বোঝার উপায় নেই। যেমন কিনা **কর**-জাত 'কার' শব্দটি বললে বোঝার উপায় নেই, সে কীরকম 'কার'? জানা যায় কেবল তখনই যখন তার সঙ্গে উপসর্গ যোগ করা হয়, যেমন উপকার, আকার, প্রকার ... ইত্যাদি। **কারখানা, কারচুবি** শব্দেও **কার**কে আমরা স্পষ্ট চিনতে পারি। ঠিক সেইরকম **দর** বললে চট করে বোঝা যায় না, কীরকম **দর**। কিন্তু যেই না তার সাথে **আ** যোগ করে **আদর**, **ক** যোগ করে **কদর** বানিয়ে ফেলা যায় তখন **দর**-এর অর্থ অনেকটাই বোধগম্য হয়। সেই সুবাদে উপর থেকে কাঠে বা মাটিতে ভ্রমর (drill) চালিয়ে কাঠ বা মাটি ফাটিয়ে দিলে তাকে বলা যেতে পারে **দর** করা বা **দার**; সেই **দার** অন করা হলে তাকে বলে **দারণ**, কিন্তু নীচে থেকে কোনো সত্তা যদি মাটি ফাটিয়ে উপরে উঠে আসে, তাকে বলে **বিদারণ** করা।

তার পরেও অবশ্য একটা ধোঁয়াশা থাকে। সেই ধোঁয়াশা কেটে যায়, যদি আমরা গর্ত কয় প্রকার, তা নিয়ে ভাবি। গ্রামবাংলায় যৌথ পরিবার পৃথগন্ন হলে, এক ভাই খানিকটা দূরে নিজের ভাগে পাওয়া জমিতে গিয়ে নতুন বসতবাটী তৈরি করে। তাতে সর্বাগ্রে একটি পুকুর কেটে সেই মাটি দিয়ে পুকুরের চারদিকটা মাটি ফেলে উঁচু করে নেয়। সেখানে ওঠাবসা করার জায়গা, জ্বালানি কাঠের চাঙাড়-ঘর, খামার, গোয়াল ... ইত্যাদি বানায়; সেখানেই সে তার সব্জিবাগান করে, আম-জাম প্রভৃতি ফলের গাছ লাগায়। এই যে পুকুর, তা আসলে একটি গর্ত হলেও এ-গর্ত বড় প্রয়োজনের, বড় নির্ভরের, বড় ভালবাসার গর্ত। আবার, এমনও দেখা যায়, হঠাৎ বাঁধ ভেঙে বন্যা হয়ে গেলে বসতবাটির চারদিকটি ডুবে যায়, স্রোত বয়, চারদিক জলময় হয়ে যায়। সেই বন্যার জল শুকিয়ে গেলে দেখা যায়, বেজায়গায় বিশাল বিশাল গর্ত হয়ে গেছে। সে গর্ত অপ্রয়োজনের, কোনো কাজে লাগে না, উল্টে নানান ক্ষতি করে, দুখ দেয়। এধরনের

গর্ত বরণীয় নয় বলে, এদের **বিবর** বলে। — এ তো গেল বাহ্যিক গর্তের কথা। আমাদের মনেও এই দুইরকম গর্ত হয়ে থাকে; সেগুলি মানসিক গর্ত। কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করলে মনে আঘাত লাগে, সেই আঘাতে মনে **দাগ** লাগে, **দাগা** লাগে, তাতেও মনে গর্ত হয়, ব্যথা হয়। আবার, প্রিয় বন্ধুর ভালবাসাতেও বুক ফেটে যায়, মনের মাটি বিদীর্ণ হয়, মনের মাটিতে গর্ত হয়।

আরও একপ্রকার গর্ত আছে, সে হল সামাজিক গর্ত। তার খবর পাওয়া যায় **ত্রিগর্ত** দেশে। দ্র. **কেতুধর্ম্মা**।

এই সব গর্তই **দর**। এরকম গর্ত করাও **দর**। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বাহ্যিক **দর**কে একালে বলা হয় **দরিয়া**। কারণ, এগুলি সবই শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি, প্রাকৃতিক শক্তি ... ইত্যাদির নানা রূপের প্রয়োগের সাহায্যে বাহ্যভূমি, মনোভূমি বিদীর্ণ করার ফলে (বা **দৃ** করার ফলে) গড়ে উঠেছে। মনের মাটিতে এরকম **দর্** করে দেয় যে, বা বিদারণ করে যে, সে আমাদের **দর্** দান (= দৃ) করে; ফলে আমাদের **দর্দ্** (দর্দ) করে, ব্যথা করে, ভয় করে। হিন্দিভাষীরা এই **দর**কে **ডর** বা ভয় রূপে ধরে রেখে দিয়েছে। বাংলাতেও এর কমবেশি ব্যবহার রয়েছে, যথা — 'রাবণ শ্বশুর মম মেঘনাদ স্বামী / আমি কি ডরাই কভু ভিখারী রাঘবে?' এই '**দর** (ব্যথা-গর্ত) দেয় যে', কিংবা এই '**দর** প্রদত্ত যাহাতে', তাদের আমরা **দরদ**-জাতি বলে জানতাম; তারা এককালে আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল, এখন তারাই মাঝে-মধ্যে এসে আঘাত করত, আমাদের সমাজমনে **দর** সৃষ্টি করে চলে যেত। কিন্তু '**দর** প্রদত্ত যাহাতে', তেমন ব্যথাপ্রাপ্ত সত্তা বা জাতির কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফারসির সঙ্গে সাক্ষাতের পর সেই **দরদ**কে আমরা আহত-হৃদয় বলে চিনলাম, তাকে উলটো অর্থে **দরদী** বলেও চিনলাম। কেবল তাই নয়, ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দেখা গেল, তাদের dar- ও dor- যুক্ত অধিকাংশ শব্দই এই **দর**-এর সহোদর। এমনকি তাদের Dorian তো হুবহু আমাদের **দরদ** জাতিই!

তবে **দর**-এর কথা এখানেই শেষ নয়, বরং শুরুই বলা যায়। এর পর রয়েছে আরও অনেক সত্তার কথা যেখানে '**দৃ** করা' হয়ে থাকে। যেমন ধরা যাক, আপনি একতাল কাদা নিয়ে তার স্বরূপের ভিতরে কলা-কৌশল-শ্রম-মেধার শক্তি প্রয়োগ করে তাতে রহস্যময় গর্ত করে দিলেন; কাদার তালটি হয়ে গেল সুন্দর একটি কলসী। এর ভেতরে যে রহস্যময় গর্তটি হল, তাকেও কলসীটির **দর** বলে। এতে যে কারীর **দর** রয়েছে, তা বুঝতে পারলেই লোকে কলসীটির **কদর** বোঝে, তা **দর**-দাম নির্ণয় করার চেষ্টা করে, **দরাদরি** করে। কারণ, কলসীটিতে যে শ্রম-মেধার গর্ত করা হয়েছে, **দর** করা হয়েছে, সেটি তো যে-সে **কার** নয় — **দর-কার**। ফলে কলসীটি তো **দরকারী** হবেই! **৬.** ইংরেজি dorian এবং dar- ও dor- যুক্ত অধিকাংশ শব্দ।

দরি (দরিদ্র, দরিয়া, দরী) : **১.** দরি (দরী) = √দৃ + ই (ইন্) - কর্ম্মবাচ্যে, বিকল্পে স্ত্রী ই (ঙীষ্)। (ব.শ)। **২.** *দরি = দর গতিশীল যাহাতে। দরী = দরি-র আধার যে। দরিদ্র = দরি-র দান রহে যাহাতে। দরিয়া = দরি যায় যাহাতে।* **৩. দরি (দরী)** = কন্দর, পর্ব্বত, বিবর। **দরিদ্র** = দুর্গত, নিঃস্ব, নির্ধন। **দরিয়া** = (ফারসি) সমুদ্র, বড় নদী, নদী। (ব.শ.)। **৪.** poor অর্থে **দরিদ্র**, sea অর্থে **দরিয়া** প্রচলিত; **দরি, দরী** অপ্রচলিত। **৫.** শুভ অশুভ বাহ্যিক মানসিক যে কোনো প্রকারের **দর** চলমান থাকলে, তাকে **দরি** বলা যায়। পুকুর সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা জানেন, তা প্রতি বছর পাড় ধ্বসিয়ে ক্রমশ বাড়তে থাকে, যদিও গভীরতা কমতে থাকে। এরূপ নানা রকমের চলমানতা থাকে। পর্ব্বত কন্দরও (কন্-দর) যদি গৃহ রূপে ব্যবহৃত হয় সেও **দরি (দরী)** পদবাচ্য হতে পারে। এক ভাইয়ের দ্বারা প্রতারিত অন্য ভাইয়ের অর্থবলের ভূমিতে করা সম্পদহীনতার গর্তও বাড়তে থাকে, বিশেষত সে যদি তথাকথিত 'দারিদ্র্যসীমার নীচে' বাস করে; আর মনোব্যথার গর্তের আচরণ হয় হুবহু পুকুরের বাড়বৃদ্ধির মতো। এ সবই **দরি (দরী)** পদবাচ্য হতে পারে। যে মানুষের অর্থবলের ভূমিতে এরূপ গর্ত আছে, তাতে যদি এরূপ গর্ত আবারও করা যায়, কিংবা আবারও করার সম্ভাবনা থাকে, তাকে বলে **দরিদ্র**। তার মানে, **দরিদ্র** শব্দটির ভিতরেই একথাটি বলা আছে যে, তার দারিদ্র্যের কারণ তার সম্পদহরণ।

ছাত্রবোধ অভিধান অবশ্য অপ্রচলিত **দরিত, দরিতা, দরিন্** শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে স্পষ্ট জানাচ্ছেন — দরিত (দরিতা) = ভীত, শঙ্কিত, কম্পিত, বিদীর্ণ, দুঃখ। দরিন্ = ভীরু, বিদারণশীল, সকম্প। এই সব কারণেই হিন্দিতে **দর** শব্দটি যেমন 'ডর'-এর পরিণত হয়েছে, ইংরেজিতে সেটিই হয়ে গেছে dread। তবে ফারসি-ভাষীরা অত কিছুতে যাননি। তাঁরা জলভরা পার্থিব গর্তকেই এক নামে শনাক্ত করে রেখেছিলেন — **দরিয়া**। আমাদের মধ্যযুগীয় পূর্বপুরুষেরা তাতে **দর**কে দেখতে পেয়ে **দরিয়া**কে আমাদের বাংলাভাষার শব্দসমাজের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। **৬.** ইংরেজি dread। তবে এটি '**দৃ** দেয় যে' বা 'দৃদ্' থেকে, কিংবা 'দৃয়াদ্' জাতীয় শব্দ থেকে জন্মেছে বলে মনে হয়। সব ক্ষেত্রেই মানেটা থাকে, যাকে বিদারণ করে দেওয়া হয়েছে, কিংবা বিদারণ করে দেওয়া হতে পারে বলে জানান দেওয়া হয়েছে।

দরুণ (দরুন) : **২.** *দরু-র (দর নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে, তাহার) ন (ন = অ = অস্তিত্ব) যাহাতে।* / যাহার নিকট বা যে কারণে পাওয়া যায় তাহার নিদর্শন (যাহাতে)। (ছা.অ.)। **৩.** (ফারসি) হেতু, জন্য, অন্তর্গত, সম্বন্ধী। (ব.শ.)। **৪.** for, for the reason অর্থে প্রচলিত। **৫.** ফারসিতে শব্দটির অর্থ ছিল 'অন্তর্গত, in, within', বলেছেন ব.শ.। তার ব্যবহারও তিনি দেখিয়ে গেছেন — 'দরুন সাহাপুরে ... পতিত ১২ কাঠা জমি'। অর্থাৎ, পুরো সম্পত্তি যদি **দর** হয়, তার যে কোনো একটি অংশ পৃথকভাবে উল্লেখ করলে, সেটি হবে **দরুন**। বাংলায় পাঠান-মোগল আমলে দলিলাদির কাজে শব্দটি এইরূপ ফারসি অর্থে ব্যবহৃত হলেও হেতু, জন্য, সম্বন্ধী অর্থেই এখনও খুবই ব্যবহৃত হয়। তার মানে, ফারসি শব্দ 'দরূন্' এদেশে আসার পর, আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাকে নিশ্চয় বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং দেখেছিলেন যে, সে আসলে আমরা যাকে **দর** বলি, তারই কোনো নিকটাত্মীয়। সে কে হতে পারে? তাঁরা তাঁদের নিজস্ব শব্দার্থবোধের সাহায্যে শব্দটিকে নিজেদের মতো করে বুঝে নিয়েছিলেন। সম্ভবত

সেটি ছিল — 'নবরূপে উত্তীর্ণ **দর**-এর কারণ যাহাতে'। তার থেকেই তাঁরা 'হেতু, জন্য, সম্বন্ধী' প্রভৃতি অর্থে পৌঁছে গিয়ে থাকবেন। কিন্তু ঠিক কীভাবে পৌঁচেছিলেন, তা এখনও সুস্পষ্ট নয়।

দর্ভ (বিদর্ভ, বিদর্ভজা, বিদর্ভা) : ১. ✓দৃ + ভ - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দর** ভরণ / ভক্ষণ করে যে। **বিদর্ভ** = বিগত **দর্ভ** যাহার। **বিদর্ভজা** = **বিদর্ভ** হইতে জাতা যে। **বিদর্ভা** = **বিদর্ভ**-এর আধার যে।* ৩. **দর্ভ** = কুশ, কুশবিশেষ, কাশ। (ব.শ.)। কুশ কাশ বল্বজ তীক্ষ্ণরোমশ মৌঞ্জ শাদ্বল — এই ছয়প্রকার তৃণ। (ছা.অ.)। **বিদর্ভ** = 'বিগতদর্ভ', দেশবিশেষ, বিদর্ভদেশবাসীগণ। ইহা বিন্ধ্যের দক্ষিণপার্শ্বে ছিল। দময়ন্তীপিতা ভীম ও রুক্মিণীপিতা ভীষ্মক ইহার অধিপতি ছিলেন। ইহা আধুনিক 'বড়নাগপুর' বা 'বিরার' (Berar)। প্রসিদ্ধি যে, কোনো মুনিপুত্র কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে মুনিশাপে এই দেশ কুশশূন্য ও 'বিদর্ভ' নামে অভিহিত হয়। **বিদর্ভজা** = দময়ন্তী, রুক্মিণী, লোপামুদ্রা। **বিদর্ভা** = বিদর্ভ রাজধানী কুণ্ডিননগর। (ব.শ.)। বিদর্ভ মুনিবিশেষের অভিসম্পাতগ্রস্ত স্থান-বিশেষ।... কুশাঘাতে কোনো এক ঋষিকুমারের এই স্থানে অকালমৃত্যু হওয়ায় উক্ত ঋষি এদেশে আর দর্ভ জন্মাবে না বলে শাপ দেন। সেই হতে এই স্থানের নাম হয় বিদর্ভ। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দৃ, দৃভ্**। বিশাল প্রান্তরের মাঝে কোনো **দর** (অর্থাৎ বড় খাদ বা যোজনজোড়া নিম্নাঞ্চল) হলে, সেখানে **কাশ** বা অন্য নানারকমের **তৃণ** জন্মায়। সেগুলিকে **দর্ভ** বলে। ছা.অ. তাদের ছয়টি জাতিতে ভাগ করে দেখিয়েছেন (উপরে দ্রষ্টব্য)। মনোলোকেও এরকম **দর** এবং **দর্ভ** হতেও পারে, আমরা চিনি না। তবে সমাজের মনোলোকে এরকম **দর** বা গর্ত যে হয়, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। (সেরকম একটি দেশের নাম **ত্রিগর্ত** দেশ। দ্র. **কেতুধর্ম্মা**।) সেই **দর**-এ যে **দর্ভ** জন্মায়, তাকে **কুশ** (সুদ) বলে। **বিদর্ভ** দেশে কোনো এক কালে এই **দর্ভ** নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের 'গ' গ্রন্থের 'বিদর্ভের কথা : ভারত ইতিহাসের অমৃতকথার কণিকামাত্র' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

দার (দারক, দারণ, দারা, দারি, দারিত, দারিদ্র্য, দারী, হৃদয়বিদারী) : ১. ✓দারি + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দার** = **দর** হইতে জাত। **দারক** = **দার** করে যে। **দারণ** = **দার** অন যাহাতে। **দারা** = **দার**-এর আধার যে। **দারি** = **দার** গতিশীল যাহাতে। **দারিত** = **দারি** তারিত যাহাতে। **দারিদ্র্য** = **দারি**-র দান রয়ে যাহাতে। **দারী** = **দারি**-র আধার যে। **হৃদয়বিদারী** = যাহাতে হৃদয় বিদারিত হয়।* / **দার** = চিত্ত দ্রব করে যে। **দারক** = দুঃখ নাশ করে যে। (ব.শ.)। ৩. **দার** = বিদারণ, ভেদন, কৃষ্ট ভূমি, পত্নী, ভার্য্যা; যুক্ত, খচিত, অধিকারী, অধ্যক্ষ, কারক, কর্ম্মকুশল। **দারক** = বিদারক, ভেদক, বালক, শাবক, গ্রাম্যশূকর। **দারণ** = বিদারক, ভেদক, কতকফল, বিদারণ, ভেদন, ব্রণাদিস্ফোটনকারক ঔষধ। **দারা** = ভার্য্যা, স্ত্রীলোক। **দারি** (দারী) = বেশ্যা, পরদারগমন, বেশ্যাগমন, লাম্পট্য। **দারিত** = বিদারিত। **দারিদ্র্য** = দরিদ্রভাব, নির্ধনতা, দৈন্য। (ব.শ.)। ৪. poverty অর্থে **দারিদ্র (দারিদ্র্য)** প্রচলিত; বাকি সব **শব্দই অপ্রচলিত**। **৫.** যেহেতু **দর শব্দটি বহু অর্থধারী, দর হইতে জাত দার শব্দটিও বহু অর্থধারী** না হয়ে যায় না। তার মধ্যে **শুভ দর ও অশুভ দর** থেকে জাত দুরকম **দারই** থাকতে পারে। যেমন, যার সাহায্যে বিদারণ করা যায়, যাকে বিদারণ করা যায়, কিংবা বিদারিত করা হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই **দার** পদবাচ্য হতে পারে। সেই সুবাদে সে একটি প্রকৃতিগুণসম্পন্না যে কোনো আধারশক্তি হতে পারে, কৃষ্টভূমি হতে পারে, ভার্য্যা হতে পারে, বেশ্যাও হতে পারে, এমনকি কারও হৃদয়ও হতে পারে। আবার, আপন প্রিয়াকে বিদারণ করা হয়, এরকম কথা শুনতে ভাল লাগে না বলে কেউ কেউ **দ্রব শব্দ** থেকে **দার** শব্দের উদ্ভব দেখানোর চেষ্টা করে থাকেন। তার কিন্তু প্রয়োজন নেই। শুভ **দর** অর্থটি মনে রাখলেই আমরা আমাদের প্রিয়া **'দারা-পুত্র-পরিবার'**-এর **দারার** দেখা পেতে পারি। লক্ষ্যণীয় যে, **দর, দার** শব্দের উত্তরাধিকার ইংরেজি ভাষায় ব্যাপক ভাবে প্রচলিত রয়েছে dar-, der-যুক্ত অনেক শব্দে। যথা dard, dare, darg, dark, dart, der-doing ... ইত্যাদি। এমনকি আমরা যাকে **'স্ত্রী'** অর্থে **দার**-রূপে পেয়েছি, ইংরেজ তাকে পেয়েছে 'দারলিঙ্গ' বা darling রূপে। তবে এখানে যা গুরুত্ব দিয়ে গবেষণা করা উচিত, তা হল, আমাদের 'দির্' বা 'দীর্' শব্দ নেই, রয়েছে **দীর্ঘ**, অবশ্য সেই **দীর্ঘ** শব্দের ভিতরে 'দির্' বা 'দীর্' রয়েছে। ইংরেজিতে কিন্তু 'দির্' বা 'দীর্' শব্দের উত্তরাধিকার স্পষ্টতই এখনো প্রচলিত রয়েছে। তবে, তাকে **দর** বা **দার**-এর উত্তরাধিকারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। দ্র. **দীর্ঘ**। ৬. ইংরেজি dar-, der-যুক্ত অনেক শব্দ। যথা dare, dark, darn, dart, dear, derive ... ইত্যাদি।

দারু (দারুক, দারুকা, দারুণ, দারুণী, দারুব্রহ্ম, দারুযন্ত্র, দারোগা) : ১. ✓দৃ + উ (উণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দারু** = **দার** নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **দারুক** = **দারু** করে যে। **দারুকা** = **দারুক**-এর আধার যে। **দারুণ** = **দারু** রহস্যরূপী যাহাতে। **দারুণী** = **দারুণ**-এর গতিশীল আধার যে। **দারুব্রহ্ম** = **দারু** স্বরূপ যে ব্রহ্ম। **দারুযন্ত্র** = **দারু**-স্বরূপ যন্ত্র। **দারোগা** = **দারু**-র গমন থাকে যাহাতে।* ৩. **দারু** = বিদারক, ভেদক, কাষ্ঠ, ইন্ধন, কাষ্ঠময়, দেবদারু, পিত্তল, ডাঁড়ুকা; ঔষধ, মদ্য। **দারুক** = শ্রীকৃষ্ণের সারথি, দারু, কাষ্ঠ, দেবদারু। **দারুকা** = কাষ্ঠপুত্তলিকা, শৃঙ্খল, ডাঁড়ুকা। **দারুণ** = বিদারক, ভেদক, অতিকঠিন, অতিনিষ্ঠুর, পরুষ, দুঃসহ, কঠোর, তীব্র, দুর্ব্বিষহ, ভয়হেতু, পাতকাভিযোগী, দৃঢ়, প্রচণ্ড, মর্ম্মস্পর্শী, পাপজনক, দুষ্ট, দুর্নিবার, অশুভ, ভয়ানক রস, চিত্রকবৃক্ষ, বিষ্ণু, পারুষ্য। **দারুণী** = অরসিকা, অবিদগ্ধা। **দারুব্রহ্ম** = দারুরূপব্রহ্ম, জগন্নাথ, ধর্ম্ম, বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ, বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। **দারুযন্ত্র** = দারুকৃত যন্ত্র। কাষ্ঠপুত্তলিকা। **দারোগা** = পুলিশের প্রধান কর্মচারী বিশেষ। (ব.শ.)। ৪. উপরোক্ত বহু অর্থে **দারুণ,** liquer অর্থে **দারু,** এবং পুলিশের প্রধান অর্থে **দারোগা** শব্দ প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫. দার** পর্যন্ত কথাটি ছিল **দর** হইতে জাত, ঠিক যেরকম **কর** হইতে জাত **কার** হয়, সেইরকম। এই **কারকে** চিনতে আমাদের অসুবিধা হয় না, যখন আমরা আকার, প্রকার, উপকার ...

কিংবা কারখানা, কারচুপি প্রভৃতি শব্দের কথা স্মরণ করি। সেভাবেই **দার**কে চিনতে বিশেষ অসুবিধা হয় না, যখন আমরা কাউকে **দার**-পরিগ্রহ করতে দেখি। (উপরে **দার** দ্রষ্টব্য)। আবার, **কার** যখন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়, তখন তাকে বলে **কারু**। এই **কারু**কে আমরা **কারুশিল্প** শব্দে সহজে চিনতে পারি। বুঝতে পারি যে, এ বস্তু এমন একপ্রকারের 'কৃ' বা **কর** ক্রিয়ার ফল, যাতে করার ফল বা **কার** নতুন রূপ নিয়েছে। একই ভাবে, **দার** যখন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়, তখন তাকে বলে **দারু**। এই **দারু**কে আমরা **দারুশিল্প** শব্দে সহজে চিনতে পারি। বুঝতে পারি যে, এ বস্তু এমন একপ্রকারের 'দৃ' বা **দর** ক্রিয়ার ফল, যাতে দরার (বা বিদারণ করার) ফল বা **দার** নতুন রূপ নিয়েছে। অর্থাৎ কিনা, **দর** (= বিদারণ) করে বা খোদাই করে বানানো শিল্পকে **দারুশিল্প** বলা যায়। যে-কারণে জগন্নাথদেবের কাঠখোদাই করা মূর্তিকে **দারুব্রহ্ম** বলে। মোট কথা, কাউকে **দারু** করে সে তার আগের রূপে থাকতেই পারে না, কারুকার্য্যময় কিংবা বিকট হয়ে যায়। যেহেতু আদিতে একমাত্র শুকনো গাছকে বা কাঠকে খোদাই করেই এই কাজ করা হত, হয়তো সেকারণেই পরে পরে সব রকমের শুকনো কাঠকেই **দারু** বলার চল হয়ে যায়।

কেবল তাই নয়, এরকমভাবে কোনো সত্তাকে, তা সে কাঠ হোক, ব্যক্তি হোক, ভূমি হোক, সামাজিক গোষ্ঠী হোক, কিংবা মানসিকতাই হোক, তাকে খোদাই করা সেকালের খোদাইকারদের চোখে মহত্তম ব্যাপার বলে মনে হলেও, যাদের **দারু** করা বা খোদাই করা হত, তাদের চোখে ব্যাপারটি ছিল ভয়ানক। সেকারণেই **দারুণ** মানে একদিকে যেমন মহত্তম ব্যাপার বোঝায়, তেমনি অপরদিকে ভয়ানক ব্যাপারও বোঝায়। তবে, ভয়ানক অর্থেই **দারুণ** শব্দটির অধিক ব্যবহার চলে। আর, মানুষের প্রতি সেরকম ভয়ানক ব্যবহার করে বলে, তাদের সম্পত্তি, পরিবার, সামাজিক সম্পর্কের স্তরকে **দারু** করে বা খোদাই করে দেয় বলেই **দারোগা** শব্দটি সার্থক হতে পেরেছে।

দীর্ঘ (দীর্ঘকণা, দীর্ঘগতি, দীর্ঘগ্রীব, দীর্ঘজঙ্ঘ, দীর্ঘতপাঃ, দীর্ঘতা, দৈর্ঘ্য, দীঘ, দীঘল, দীঘা, দীঘি, দীঘী, ডিগ, ডিগডিগে, ডিগবাজি, ডিগি) : ১. দীর্ঘ = √দৃ + ঘ (ঘক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দীর্ঘ** = গতিশীল দাতার গতি স্থিত যাহাতে (বা যেখানে, যে-পর্যন্ত)। **দীর্ঘকণা** = **দীর্ঘ** যে কণা। **দীর্ঘগতি** = **দীর্ঘ** গতি যাহার। **দীর্ঘগ্রীব** = **দীর্ঘ** গ্রীবা যাহার। **দীর্ঘজঙ্ঘ** = **দীর্ঘ** জঙ্ঘা যাহার। **দীর্ঘতপাঃ** = **দীর্ঘ** তপঃ যাহার (যাহার উৎপাদনকর্ম শেষই হয় না!)। **দীর্ঘতা** = **দীর্ঘ** তারিত যাহাতে, তাহার আধার। **দৈর্ঘ্য** = দিশাগ্রস্ত **দীর্ঘ** থাকে যাহাতে। **দীঘ** = গতিশীল দাতা গতিস্থিত যাহাতে। **দীঘল** = **দীঘ** লালিত যাহাতে। **দীঘা** = **দীঘ**-এর আধার যে। **দীঘি** = **দীঘ** গতিশীল যাহাতে। **দীঘী** = **দীঘি**র আধার যে। **ডিগ** = গতিশীল ডয়নের গমন থাকে যাহাতে। (ডিগডিগ = **ডিগ**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।) **ডিগডিগে** = **ডিগডিগ** দিশাগ্রস্ত যাহাতে। **ডিগবাজি** = **ডিগ** বাহকের জনন গতিশীল যাহাতে। **ডিগি** = **ডিগ** গতিশীল যাহাতে।* ৩. **দীর্ঘ** = আয়ত, **লম্বা**, সন্তত, অবিচ্ছিন্ন, অতিপ্রবল, উপচিতস্থিতিকাল, উচ্চৈঃ, **চিরকালসাধ্য**, উচ্চ, দূর, লম্বিত, অতীন্দ্রিয়দর্শী, বিস্তারপ্রাপ্ত, দ্বিমাত্র - আ, ঈ, **ঊ** ... ইত্যাদি, উষ্ট্র, সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক রাশি, শরতৃণবিশেষ, লতাশাল বৃক্ষ। **দীর্ঘকণা** = শ্বেতজীরক। **দীর্ঘগতি (দীর্ঘগ্রীব, দীর্ঘজঙ্ঘ)** = উষ্ট্র। **দীর্ঘতপাঃ** = মহাতপাঃ গৌতম। **দৈর্ঘ্য (দীর্ঘতা)** = দীর্ঘভাব, আয়াম। **দীঘ** = দীর্ঘ, দীর্ঘতা, দৈর্ঘ্য। **দীঘল** = দীর্ঘ, আনিতম্ব-লম্বমান, লম্বা ...। **দীঘি (দীঘী)** = দীর্ঘ সরোবর বিশেষ, বাপী। **ডিগ (ডিগি)** = নাগরা দগড় বা ডম্ফবাদ্যের ধ্বনি (**ডিগডিগ, ডিগিডিগি** = নিরন্তর ডিগিধ্বনি)। **ডিগডিগে** = ('দীর্ঘ-দীর্ঘ') দীর্ঘ, লম্বা, ছিপছিপে। **ডিগবাজি** = দুই হাতে মাটি ধরিয়া মাথা নিচু করিয়া পা উল্টাইয়া ঢেঁকির মত (?) হইয়া পড়া (somersault)। (ব.শ.)। ৪. কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **দগদগ, দগ্ধ**। বাংলায় **দর** আছে, **দার** আছে, কিন্তু 'দির' (গতিশীল দান রহে যাহাতে) বা 'দীর' (গতিশীল দাতা রহে যাহাতে) নেই। তবে **দর** শব্দ দার, দির, দীর পেরিয়ে যেখানে উত্তীর্ণ হতে পারে, তেমন অন্য দুটি শব্দ রয়েছে — **দীর্ঘ, দীর্ণ**। যে ভূমি (তা সে পার্থিব-ভূমি কিংবা মনোভূমি যে-ভূমিই হোক) বিদারিত হয়ে গেছে, তাকে বলে **দীর্ণ**; আর, বিদারণ যে-পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছে, তাকে বলে **দীর্ঘ**। একটি 'ফাল' (লাঙলের ফলা), যা কিনা 'ফালা ফালা করে' বলেই **ফাল**-পদবাচ্য, সেটি মাটিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হল; মাটি বি**দীর্ণ** হল। এই কর্মটিতে 'শক্তিদান রহে' বলে একে **দর**ও বলে। এরপর লাঙলটি যদি বলদে টানতে শুরু করে এবং পেছনে একজন হেলে-**কৈবর্ত্ত** লাঙলের বোঁটা চেপে ধরে এবং বলদ দুটির পেছনে পেছনে সেভাবেই চলতে থাকে, তখন মাটির বিদীর্ণ হওয়াও এগোতে থাকে — একেই বলে **দীর্**-গমন। কেননা, এতে 'গতিশীল (বিদারণ) দাতা (সক্রিয়) রহে এবং সেভাবেই এগিয়ে চলতে থাকে'। এই দৃশ্য সবাই দেখেছেন, একে বলে 'লাঙল করা' বা ভূমি কর্ষণ করা। চাষীর পক্ষে এটি আনন্দদায়ক হলেও, যার বুক বি**দীর্ণ** হয়ে চিরে যাচ্ছে, তার পক্ষে ভয়ানক বলেই মনে হয়। তো, এই **দীর্**-গমন যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, সেই পর্যন্ত বিদীর্ণ হওয়াকে বলে **দীর্ঘ**। সেই '**দীর্ঘ** তারিত যাহাতে, তাহার আধার'কে বলে **দীর্ঘতা** বা **দৈর্ঘ্য**। পরে পরে এই দীর্ঘ ধারণাটি আরও প্রসারিত হয়ে অনেকগুলি প্রতীকী অর্থে স্থির হয়ে যায়। ... ৬. ইংরেজিতে **দীর্ঘ** শব্দের উত্তরাধিকার সরাসরি দেখা যায় না। কিন্তু **দীর্ঘ** শব্দের মূলে শায়িত **দীর্** শব্দের অজস্র সমধারণাধারী ইংরেজি শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যথা — dear, dire, dirdum, direct, dirge, dirk, dirt ... ইত্যাদি।

দীর্ঘতমা (দীর্ঘসত্র) : ২. ***দীর্ঘতমা** = **দীর্ঘ** তমঃ-এর আধার যে। **দীর্ঘসত্র** = **দীর্ঘ** যে সত্র।* / **দীর্ঘতমা** = দীর্ঘ তমঃ যাঁহার। (ছা.অ.)। ৩. **দীর্ঘতমা** = কাশীরাজের পুত্র, ধন্বন্তরির পিতা। উতথ্যতনয়; বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভে উতথ্যের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। (ছা.অ.)। ঋষি উতথ্য ও মমতার পুত্র। মমতা যখন গর্ভিনী ছিলেন, তখন তাঁর দেবর ও দেবতাদের পুরোহিত বৃহস্পতি তাঁর সহিত সংগমেচ্ছু হন। ... গর্ভস্থ শিশু বৃহস্পতিকে রেতঃপাত করতে নিষেধ করেন; কারণ একই গর্ভমধ্যে দুইজনের স্থিতি সম্ভব নয়। কিন্তু বৃহস্পতি শিশুর কথায় কর্ণপাত না

করে মাতার অসম্মতিতে রেতঃপাত করেন। তখন শিশু নিজের পদদ্বারা শুক্র প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দেন। এতে বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হয়ে গর্ভস্থ পুত্রকে এই বলে অভিসম্পাত দেন, 'তুমি দীর্ঘ তামসে প্রবিষ্ট হবে, অর্থাৎ অন্ধ হবে।' ... এই পুত্রের নাম হয় দীর্ঘতমা। প্রদ্বেষী নামে এক কন্যার সঙ্গে এর বিবাহ হয়। দীর্ঘতমা ধার্মিক ও বেদজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সুরভি-সন্তান কামধেনু হতে গোধর্ম শিক্ষা করে যত্রতত্র সংগম করার জন্য প্রতিবেশী ক্রুদ্ধ মুনিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। এঁর স্ত্রীও স্বামীর এই ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে অন্ধ স্বামীকে ভরণপোষণ করতে অস্বীকার করেন। দীর্ঘতমার পুত্ররা মাতার আদেশে তাঁকে ভেলায় করে (লতা দিয়ে বেঁধে) গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন। বলিরাজা স্নানের জন্য গঙ্গায় এসে তাঁকে এই ভাসমান অবস্থায় দেখতে পান এবং তেজস্বী দেখে সন্তান উৎপাদনের জন্য তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে যান ও নিজ স্ত্রী সুদেষ্ণাকে দীর্ঘতমার কাছে গমন করতে বলেন। সুদেষ্ণা তাঁকে বৃদ্ধ ও অন্ধ দেখে অবজ্ঞাভরে স্বয়ং না গিয়ে তাঁর শূদ্রা দাসীকে বৃদ্ধ ঋষির কাছে পাঠিয়ে দেন। ফলে শূদ্রযোনিতে দীর্ঘতমা কাক্ষীবানাদি একাদশ পুত্রের জন্ম দেন। রাজা এই ঘটনা জ্ঞাত হয়ে পুনরায় স্ত্রী সুদেষ্ণাকে দীর্ঘতমার কাছে প্রেরণ করেন। তখন দীর্ঘতমা রাণীর অঙ্গ স্পর্শ করে বলেন যে, তাঁর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, ও সুহ্ম নামে পাঁচটি তেজস্বী পুত্র হবে এবং তাঁদের নামে এক একটি দেশ নামাঙ্কিত হবে। যথা — অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ (বিহার), বঙ্গের নামে বঙ্গদেশ (অবিভক্ত বঙ্গদেশ), কলিঙ্গের নামে কলিঙ্গদেশ (উড়িষ্যা), পুণ্ড্রের নামে পুণ্ড্রদেশ (বৃহত্তর আসামের কিছু অংশ), এবং সুহ্মের নামে সুহ্মদেশ (আসামের বাকি অংশ) হবে। (পৌ.অ.)। **দীর্ঘসত্র** = চিরকালসাধ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, চিরকালসাধ্য যজ্ঞ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. প্রাচীন ভারতীয় সত্তার নামগুলির (ইন্দ্র, অগ্নি, অগস্ত্য ... ইত্যাদি) ক্ষেত্রে আগেই আমরা দেখেছি, এগুলি একালের 'কংগ্রেস' শব্দের মতো। তা একটি বিশেষ মানসিকতা বা মতবাদ হতে পারে, সেই মতবাদ অনুসারী বা প্রয়োগকারী একাধিক মানুষ বা একটি মাত্র মানুষও হতে পারে। কিন্তু প্রেক্ষিত (স্থান-কাল-পাত্র) ছাড়া সেই নামগুলিকে বুঝতে অসুবিধা হয়। আর, যেহেতু প্রাচীন যুগের সেই সেই বিশেষ প্রেক্ষিত বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট জানা নেই, আমরা বহু ক্ষেত্রেই সেই নামগুলি যে যে সত্তাকে বোঝায়, তাদের যথাযথ ভাবে চিহ্নিত করতে পারি না। কিন্তু কোনো কারণে সেই প্রাচীন প্রেক্ষিত আমাদের বর্তমানকালেই যদি আমরা দেখতে পেয়ে যাই, তৎক্ষণাৎ শব্দটি তার প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে আমাদের হাতে ধরা দিয়ে দেয়। **দীর্ঘতমা** শব্দটিকে বোঝার সুবিধে এই যে, আমাদের বর্তমান ভারতসমাজেও সেই প্রেক্ষিত এখনও বিদ্যমান রয়েছে, প্রাচীন কালের **দীর্ঘতমা** নামক সত্তাটি যে-সামাজিক প্রেক্ষিতে সক্রিয় ছিলেন। কীরূপ সেই প্রেক্ষিত?

স্বাধীন হওয়ার পর নবগঠিত ভারত সরকার নব উদ্যমে দেশ গঠন করার জন্য 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার অর্থ ছিল, পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ড সমাধা করা এবং তার জন্য জনসাধারণের সম্পদ বা রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করা। মজা হল, সেই কর্মকাণ্ড পরবর্তী পাঁচ বছর কেন, পরবর্তী পঞ্চাশ বছরেও সার্বিকভাবে সম্পন্ন হয়নি। আর সেজন্যই কোনো কাজ চলতেই থাকলে আজকের ভারতবাসী ঠাট্টা করে বলেন — 'তোমার এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আর কতদিন চলবে!' তা সত্ত্বেও ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিগত ৬২ বছরে এরকম ১০/১২টি 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' গৃহীত হয়েছে। এগুলি ভারত দেশটিকে কতখানি গঠন করতে পেরেছে, সে প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। কিন্তু এগুলি যে জনসাধারণের সম্পদকে বা পাবলিক মানিকে দীর্ঘকাল ধরে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার একটি স্বীকৃত পন্থা রূপে প্রচলিত রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সেকালের ভাষায় এইরূপ জনসাধারণের অর্থে 'দীর্ঘকাল ধরে চলা কর্মযজ্ঞ'কে বলা হত **দীর্ঘসত্র** বা 'দীর্ঘকালীন যজ্ঞ', 'ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ'; ব.শ. যার অর্থ দিয়েছেন 'চিরকালসাধ্য যজ্ঞ'। দ্র. **দক্ষিণ, দক্ষিণা**। আজ আমরা জানি, 'আসি যাই পয়সা পাই, কাজ করলে ও.টি. পাই' — এরকম তামসিক নীতি গ্রহণ করতে না-পারলে একটি 'পরিকল্পিত কর্মকাণ্ড'কে 'চিরকালসাধ্য' কর্মযজ্ঞে পরিণত করা যায় না। মানুষের স্বভাব অত্যন্ত নষ্ট হয়ে গেলে, তার সত্ত্বগুণ রজোগুণ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে শুধুমাত্র তমোগুণের অস্তিত্ব ও বিকাশ চলতে থাকলে, তবেই মানুষ এরকম 'অমানুষিক' জীবন কাটানোর লজ্জা মেনে নিতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই যে **তমঃ**-সাধনা — আমাদের তথাকথিত 'প্ল্যানিং কমিশন', যে-সরকারি পরামর্শদাতারা এরকম দীর্ঘকালীন সম্পদহরণের পরিকল্পনা করেন তাঁরা, যাঁরা তার ভাগ পান তাঁরা, তাঁদের সকলকে, প্রত্যেককে, সেই মানসিকতাকে চিহ্নিত করার কোনো শব্দ কি আমাদের বর্তমান বাংলা কিংবা ইংরেজি ভাষায় আছে? এর সুস্পষ্ট উত্তর হল — না। কিন্তু সেকালে ছিল। বেদবাদী আদিম সমাজতন্ত্র অত্যন্ত সেকেলে ও গড্ডালিকায় পরিণত হয়ে যাওয়ার পর, মৌলবাদী হয়ে-পড়া দক্ষ-পন্থী মহর্ষিরা, তাঁদের অনুগামীরা, তাঁদের পরিচালিত দীর্ঘকাল ধরে চলা রাষ্ট্রীয় কর্মযজ্ঞ — এদের সবাইকে, প্রত্যেককে, মোটকথা এই সত্তাটিকে সেকালে চিহ্নিত করা হত **দীর্ঘতমা** নামে। ফলে, সেকালের পুরাণ-রচয়িতা ও পুরাণ-শ্রোতা মানুষেরা একটিমাত্র শব্দের সাহায্যেই বুঝে নিতে পারতেন, কার কথা বলা হচ্ছে। আজ আমরা চোখের সামনে **দীর্ঘতমা** সত্তাটি সক্রিয় থাকলেও তাকে চিহ্নিত করার জন্য শব্দ খুঁজে পাই না। — আসলে, শব্দ তো মনের সাঁড়াশি, যা দিয়ে আমরা ধারণাকে ধরি। সেই শব্দ ফেলে দিলে বা তার মানে কমিয়ে দিলে সাঁড়াশিটা ছোট হয়ে যায়। তখন কোনো অখণ্ডবোধকে, কোনো বড় ধারণাকে আর আমরা ধরতে পারি না। ফলে, আমাদের মস্তিষ্ক ছোট হয়ে যায়, মানুষ হিসেবে আমরা ছোট হয়ে যাই। তার ওপর খণ্ডবোধ ও সম্পূর্ণ প্রতীকী ভাষা নিয়ে এসে গেল ইংরেজি শিক্ষা। তারই প্রভাবে প্রভাবিত একালের অ্যাকাডেমি-শিক্ষা আমাদের সেই অখণ্ডবোধকে নস্যাৎ করে দিয়ে অ্যাকাডেমি-শিক্ষিতদের মস্তিষ্ককে ছোট করে দিয়ে তাদের বালখিল্য বা লিলিপুটে পরিণত করেছে। তাদের মনের সাঁড়াশি খুবই ছোট হয়ে গেছে। এখন সে বড়জোর সরকারি কর্মচারীকে 'ফাঁকিবাজ' বলে চিনতে পারে, কিন্তু সে যে **দীর্ঘতমা** সত্তাটির একটি রূপ, সে যে সমগ্র পরিকল্পনার একটি নাটবল্টু বা যন্ত্রাংশ মাত্র, সেকথা আর বুঝতে পারে না।

এভাবে শব্দ হারিয়ে, শব্দের মানে হারিয়ে আমরা সমগ্র ধারণাকে

হারিয়ে ফেলি। তারই ফলস্বরূপ, একালের 'প্ল্যানিং কমিশন'কে, তার পরিকল্পনা প্রয়োগকারী ভূরি ভূরি **দক্ষিণা** গ্রহণকারী সরকারি স্পেশালিস্টদের এখন আর আমরা **দীর্ঘতমা** নামে ডাকতে পারি না। জানতেই পারি না, গোটা ব্যবস্থাটাই কেমন করে **দীর্ঘতমা** সত্তার কুক্ষিগত হয়ে গেছে।

তা সে যাই হোক, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে **দীর্ঘতমা** একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্তা। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে তার নাম জড়িত। **ঘটি, ঘটী** শব্দে সেকথার সংবাদ আমরা পেয়েছি। **বঙ্গদেশ** ও **বঙ্গজাতির** উদ্ভব কালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই **দীর্ঘতমা** সত্তাটির। কেমন সেই ভূমিকা?

তথ্যানুসারে, **দীর্ঘতমা** সত্তাটির জন্ম হয়েছিল **উতথ্য**-এর ঔরসে ও **মমতার** গর্ভে। তার মানে, মৌলবাদী হয়ে পড়া অন্ধ তথ্যের ঔরসে এবং যে-জনগোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে 'আমার' 'আমার' ভাব এসে গেছে (মম-তা), সেরকম জনগোষ্ঠীর গর্ভে **দীর্ঘতমার** জন্ম হয়েছিল। **দীর্ঘতমার** গর্ভধারিণী এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তি-মালিকানার ইচ্ছা এসে গিয়েছিল, কিন্তু তারা পুরোনো অধঃপতিত আদিম সমাজতান্ত্রিক (= বেদবাদী) পদ্ধতির উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকেই অনুসরণ করে চলছিল। স্বভাবতই **দেবগুরু** বৃহস্পতির মনে এই জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণতই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ও বণ্টন পদ্ধতিতে পরিচালিত করার অভিলাষ দেখা দেয়। তাই সে জ্যেষ্ঠভ্রাতার পরিচালিত জনগোষ্ঠীর (বা বৌদি **মমতার**) গর্ভে পুঁজিবাদী বীর্য নিষেক করতে অগ্রণী হয়। স্বভাবতই ইতোপূর্বে অনুসৃত পদ্ধতির ফল ও ফসল **দীর্ঘতমা** সত্তাটি তাতে আপত্তি করে। এ আপত্তি আমাদের বঙ্গবাসীদের খুবই চেনা — সরকারি সংস্থার প্রাইভেটাইজেশন হয়ে যাবে শুনলেই আমাদের একালের সমাজতন্ত্রবাদীরা কী ভীষণ চেঁচামেচি শুরু করে, তা আমরা দেখেছি, শুনেছি। স্বভাবতই বৃহস্পতির মুখ থেকে 'অভিসম্পাত' ('তুমি দীর্ঘ তামসে প্রবিষ্ট হবে, অর্থাৎ অন্ধ হবে।') তো বেরোবেই — তোরা আসি যাই পয়সা পাই করে করে সিক-ইন্ডাস্ট্রিতে পর্যবসিত হয়ে মর্ -গে যা! সেই **দীর্ঘতমাকে** যদি কোনো জনগোষ্ঠীর পরিচালক করা হয়, তার ফল কারও পক্ষেই শুভ হয় না। ... অগত্যা নিষ্কর্মাদের ভাগ্যে জোটে জনস্রোতে আবদ্ধ ভেসে-যাওয়া। ...

কিন্তু যত নিষ্কর্মাই সে হোক, সে যে আদিম সমাজতান্ত্রিক ভাবনার উত্তরসূরী। কিছু অর্জন তো সে জন্মসূত্রেই পেয়েছিল। যৌথসমাজ পরিচালনার বুদ্ধি, তা সে যতই সেকেলে বুদ্ধি হোক, সে বুদ্ধি তার কমবেশি ছিলই। আর, কর বা ট্যাক্স বসিয়ে সকলের কাছ থেকে তা আদায় করে রাজত্ব চালাতে গেলে যৌথতার বুদ্ধি লাগে, ধনতান্ত্রিক দর্শনে তার বিধান নেই (প্রয়োজনে, আদিম সমাজতান্ত্রিকদের কাছ থেকে ধনতন্ত্রকে সেটা শিখতে হয়।)। স্বভাবতই **দীর্ঘতমাকে** দেখে **বলিরাজার** মনে হয়, ইনি 'তেজস্বী', এবং আপন রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে 'সন্তান উৎপাদনের জন্য তাঁকে (**দীর্ঘতমাকে**) স্বগৃহে নিয়ে যান'। সুদেষ্ণার মনে হয়, এ হল '**বৃদ্ধ ও অন্ধ**'। ঠিকই, বেদবাদী আদিম সমাজতন্ত্র ততদিনে সত্যিই **বৃদ্ধ ও অন্ধ** হয়ে গিয়েছিল। ...

তা হোক, কিন্তু তারই **ঔরসে সুদেষ্ণার** গর্ভে পাঁচটি সন্তান জন্মাল — **অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র সুহ্ম**। কারা তারা, কেন তাদের ওইরূপ নামকরণ, শব্দগুলির নিজ নিজ ভুক্তিতে তার আলোচনা আছে।

দীর্ণ : দ্র. **দীর্ঘ**।

দৃপ্ (দর্পি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিদর্প, দপ্‌পন, দরপণ, দরপণী, দর্প, দর্পক, দর্পণ, দর্পণী, দর্পহর, দর্পহা, দর্পী, দাপ, দাপট, দাপদুপ, দাপন, দাপনা, দাপনি(নী), দাপা, দাপাদাপি, দাপিত, দাপুনি, দৃপ্, দৃপ্ত, সদর্প।

দৃপ্ = আবর্ত্তনশীল দাতার পালন-পান। **দৃপ** = আবর্ত্তনশীল দাতার পালন-পান যাহাতে। **দর্পি** = দাতা-রক্ষণের পালন-পান গতিশীল যাহাতে।

দর্প (দর্পক, দর্পণ, দর্পণী) : ১. ✓দৃপ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দর্প = দর্ পালিত-পানকৃত হয় যাহাতে। দর্পক = দর্প করে যে। দর্পণ = দর্প অন যাহাতে। দর্পণী = দর্পণ-এর গতিশীল আধার যে।* / **দর্প** = অন্যকে খর্ব্ব করার ইচ্ছা (থাকে যাহাতে); যাহা পীড়ন করে। **দর্পণ** = যাহা হৃষ্ট করে। (ব.শ.)। ৩. **দর্প** = অহঙ্কার, পরহ্রাসেচ্ছা, ধনস্বজনাদিনিমিত্ত উৎসেক বা গর্ব্ববিশেষ, উচ্ছৃঙ্খলতা, বিকত্থন, হর্ষজন্য গর্ব্ব, ধর্ম্মমর্য্যাদাতিক্রম, উৎসাহ, মৃগমদ, উষ্মা, তাপ। **দর্পক** = দর্পকারক, মোহকারক, অনঙ্গ। **দর্পণ** = মুকুর, আদর্শ, আরশি, পর্ব্বতবিশেষ, নদবিশেষ। **দর্পণী** = ছোট দর্পণ। (ব.শ.)। ৪. vanity অর্থে **দর্প** এবং mirror অর্থে **দর্পণ** প্রচলিত, বাকি দুটি শব্দ অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দর, দার**। অন্যকে **দৃ** করে দেবো, drill (দৃল্) করে দেবো, **বিদারণ** করে দেবো বা দিতে পারি, এই **অহঙ্কার** রহে যে আচার-আচরণে, তাকে বলে **দর্প**। তাই '**দর্** পালিত যাহাতে' তাকে **দর্প** বলা হয়। ইংরেজিতে দেখা যায়, এই ধারণাটি ধৃত রয়েছে drive শব্দে। যাই হোক, **দর্প** পর্যন্ত বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। সমস্যা দেখা দেয় তখনই, যখন আমরা **দর্পণ** শব্দে আরশি বা mirror বুঝি। কেউ যদি তার **দর্প** অন (on) করে রাখে, তাকে কি **দর্পণ** বলা যায়?

হ্যাঁ, যায়। **দপ** করে যে আগুন জ্বলে, তাকে দেখা যায়, তার তেজকে অনুভব করা যায় দৈহিকভাবে; আর **দর্প**-এর মাধ্যমে যে আগুন জ্বলে তাকে পার্থিব চোখে দেখা যায় না, কিন্তু তার তেজকে অনুভব করা যায়। প্রতিটি অস্তিত্বের মধ্যে যে তেজ থাকে (দ্র. **অংরূপিণী**) তাও এক প্রকারের **দর্প** এবং আয়নায় সেই **দর্প** অন (on) হয়ে থাকে বলেই, তাকে দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া, **দপ** থেকে যেমন **দীপ** হয়, তেমনি **দৃপ** (> **দর্প**) থেকে **দৃপ্ত** হয়। **দপ** করে জ্বলা আগুনের শিখা **দীপ**-এ দৃশ্য হয়, **দৃপ** থেকে জ্বলা তেজের স্বরূপ তেমনি **দৃপ্ত**-এ দৃশ্য হয়। দ্র. **দৃপ্ত**। ৬. ইংরেজি drill, drive।

দাপ, দাপট, দাপা, দাপাদাপি : দ্র. **দু - দপ**।

দৃপ্ত : ১. ✓দৃপ্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দৃ-পালন তারিত হয় যাহাতে।* ৩. দর্পযুক্ত, গর্ব্বিত, দুষ্ট। (ব.শ.)। ৪. proud অর্থে প্রচলিত।

দৃশ্ (দৃক্, দর্শি) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিদর্শী, অদর্শন, অদিষ্ট, অদীর্ঘসূত্র, অদৃশ্য, অদৃষ্ট, অদৃষ্টকর্ম্মা, অদৃষ্টচর, অদৃষ্টপূর্ব্ব, অদৃষ্টবান, অদৃষ্টায়ত্ত, অদেখ, অদেখা, অনদেখা, অপশু, অসদৃশ, আদরা, আদর্শ, আদর্শক, আদর্শচরিত্র, আদর্শন, আদর্শপুরুষ, আদর্শবিম্ব, আদর্শমণ্ডল, আদল, আদৃষ্টি, আদেখ, আদেখলে, আরশি (শী), আরসি (সী), ঈদৃশ, একদৃষ্টি, এতাদৃশ, দরখাস্ত (দৃক্ষ রাস্তা, রাস্তা দেখাও), দরশ, দর্শ, দর্শক, দর্শন, দর্শনী, দর্শনীয়, দর্শয়িতা, দর্শা, দর্শান, দর্শিত, দর্শী, দার্শনিক, দার্ষ্টান্তিক, দিট, দিঠ, দিঠি, দিদৃক্ষা, দীঠ, দীঠি, দূরদৃষ্ট, দৃক্, দৃক্পাত, দৃগঞ্চল, দৃশ্, দৃশ, দৃশ(ষ)ৎ, দৃশ(ষ)দ্, দৃশি, দৃশী, দৃশ্য, দৃশ্যকাব্য, দৃশ্যমান, দৃশ্বন্, দৃশ্বা, দৃষৎ, দৃষদ্বতী, দৃষ্ট, দৃষ্টদোষ, দৃষ্টপূর্ব্ব, দৃষ্টান্ত, দৃষ্টি, দৃষ্টিক্ষেপ, দৃষ্টিগোচর, দৃষ্টিপথ, দৃষ্টিপাত, দৃষ্টিপূত, দৃষ্টিবিদ্যা, দৃষ্টিবিভ্রম, দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টে, দেখ, দেখচোর, দেখতা, দেখন, দেখনহারা, দেখনহাসি, দেখনাই, দেখমার, দেখা, দেখাদেখি, দেখাশুনা, দেখাশোনা, দেখা-সাক্ষাৎ, দ্রষ্টব্য, দ্রষ্টা, প্রদর্শক, প্রদর্শনী, বিসদৃশ, সদৃশ, সন্দর্শন, সমদর্শন, সাদৃশ্য, সুদর্শ, সুদর্শন, সুদৃশ্য।

দৃশ্ (দৃক্, দর্শি) = আবর্ত্তনমান-দাতার শয়ন। **দৃশ** = আবর্ত্তমান-দাতা শায়িত যাহাতে। **দৃক** = আবর্ত্তমান-দাতা করে যে। **দর্শি** = **দৃশ (দর্শ)** গতিশীল যাহাতে। (দ্র. দৃ।)

অদৃশ্য (অদৃষ্ট) : **১.** ন + দৃশ্য, ন + দৃষ্ট। **২.** / **অদৃশ্য** = যাহা দৃশ্য নহে। **অদৃষ্ট** = যাহা দৃষ্ট নহে। (ব.শ.)। **৩. অদৃশ্য** = চক্ষুর অবিষয়, দৃষ্টিবহির্ভূত, দর্শনের অযোগ্য। **অদৃষ্ট** = অনবলোকিত, অননুভূত, অবিহিত, অচিন্তিত, প্রাক্তন বা জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কর্ম্ম, ভাগধেয়, ভাগ্য, দৈব, নিয়তি, বিধি। ... (ব.শ.)। **৪.** unseen অর্থে **অদৃশ্য** এবং fate অর্থে **অদৃষ্ট** প্রচলিত। **৫.** দ্র. **দৃশ্য, দৃষ্ট**। আদিতে যৌথযুগে 'ভাগে যা পাওয়া যেত' তাকেই '**ভাগ্য**' বলা হত এবং সেই ভাগের ব্যাপারটি স্বচ্ছ ছিল বলে 'দৃষ্ট'ও ছিল। কালে কালে ভাগাভাগির ব্যাপারটি কীভাবে হচ্ছে তা বোঝার উপায় থাকে না, transparency-র অভাব ঘটতে থাকে। তখন যা পাওয়া যায়, সবটাই 'অদৃষ্ট' হয়ে যায়। (দ্র. **কপাল**)। তবে এর একটি আরও গভীর অর্থ রয়েছে। তার উল্লেখ পাওয়া যায় ভর্তৃহরির 'বাক্যপদীয়: ব্রহ্মকাণ্ডে'। (দ্র. শ্লোক ৩৭, ৩৮)। তাতে 'অদৃষ্ট' বলতে সেই সম্পর্কগুলিকে বোঝায়, যেগুলি পার্থিব চোখে দেখা যায় না, কিন্তু জ্ঞানকর্মের যোগসাধনকারী **যোগী**রা বা বিজ্ঞানীরা দেখতে পান। যথা অভিকর্ষ।

আদর্শ (আদর্শবিম্ব, আদর্শমণ্ডল) : **১.** আ + ✓দৃশ্ + অ (ঘঞ্) - অধিকরণে। (ব.শ.)। **২.** ***আদর্শ** = **দর্শ**-এর আশ্রয় যে; অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর বিষয় ও বস্তু সমূহের আশ্রয় যাহাতে।* / **আদর্শ** = যাহাতে বিম্বিত দেহাদি দৃষ্ট হয়; যে পুস্তকে পাঠাদি দেখিয়া অন্য পুস্তক লিখিত হয়; গ্রন্থার্থ প্রদর্শন করে যে; যাহার অনুকরণ করা যায়। (ব.শ.)। **৩. আদর্শ** = দর্পণ, আরশি, টীকা, মূলগ্রন্থ, নিদর্শন, প্রতিরূপ, অনুকরণীয় বস্তুমাত্র, নমুনা, জনপদসীমাভেদ। (ব.শ.)। **৪.** ideology বা model অর্থে বর্তমানে প্রচলিত। **৫.** আয়না বা আরশি হল দৈহিকভাবে দৃশ্য বস্তুসমূহের আশ্রয় বা দৈহিক আদর্শ। আর ideology হল মানসিকভাবে দৃশ্য বিষয় বা বস্তুসমূহের আশ্রয় বা মানসিক আদর্শ। দুটি অর্থেই প্রাচীন আদর্শ শব্দটি প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে কেবল মানসিক আদর্শ অর্থেই শব্দটি প্রচলিত। mirror অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার এখন প্রায় অপ্রচলিত। মানুষ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ভেবে চলে। ভূতের বা অতীতের দর্শ (যা কিছু দৃষ্টিগোচর) এবং ভবিষ্যতের যা কিছু দর্শ, তা সব জেনে নিয়ে বর্তমানের দর্শটির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিধান করে মানুষ তার যে বর্তমান কর্মপন্থা ঠিক করে সক্রিয় হয়, সেটিই সেই মানুষটির আদর্শভিত্তিক কর্মপন্থা। এই আদর্শ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বদলায়, নতুন আদর্শে মানুষ উত্তীর্ণ হয়; এবং তখন আবার সেই পরিবর্তিত আদর্শের উপর নির্ভর করে মানুষ তার জীবনযাত্রার পথে চলতে থাকে।

প্রতিটি মানুষেরই তাই নিজ নিজ আদর্শ থাকে। কেউ কেউ অবশ্য বাজারে যেসব আদর্শ বিক্রি হয়, যেমন মার্কস্‌ইজম, গান্ধীইজম, হিন্দুইজম, ইসলামইজম, খ্রিস্টানইজম, বুদ্ধইজম ... ইত্যাদি, সেগুলির কোনো একটি বা কয়েকটি সংগ্রহ করে নিয়ে তার সঙ্গে নিজের আদর্শ মিলিয়ে-মিশিয়ে নিজের মতো একটা আদর্শ বানিয়ে নিয়ে সেটিই অনুসরণ করে থাকে এবং তাই দিয়ে বিচার ক'রে বলে 'এটা খারাপ', 'ওটা ভাল' ইত্যাদি। পাগল ছাড়া আদর্শহীন কোনো মানুষ পৃথিবীতে নাই।

এই প্রসঙ্গে আমাদের কৌষিতকী উপনিষদে 'বালার্কি-অজাতশত্রু সংবাদ' রূপে যে অধ্যায়টি আছে, তার কথা উল্লেখ করব।

"বালার্কি কহিলেন, 'যে পুরুষ আদর্শে (দর্পণে) বাস করেন, আমি তাহার উপাসনা করি।' অজাতশত্রু তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাকে ওই পুরুষের বিষয়ে শিক্ষা দিবেন না। আমি তাঁহাকে প্রতিরূপ বলিয়া উপাসনা করি। যিনি ওইরূপে তাঁহাকে উপাসনা করেন, তাঁহার একটি প্রতিরূপ পুত্র জন্মে, অন্যরকম পুত্র জন্মে না। ..."

কেউ যদি বিশেষ একটি কালখণ্ডে বা তালখণ্ডে আটকে যায়, যেমন পিন আটকে যায় রেকর্ড-প্লেয়ারে, তাহলে তার মুক্তি মেলে না। যদি প্রচলিতের পুনরাবৃত্তিই ভবিতব্য হয়ে দাঁড়ায়, যদি পুরুষ কেবলমাত্র 'প্রতিরূপ'-এ বিরাজ করতে থাকে, তখন তো কেবল জেরক্সের জেরক্স, তস্য জেরক্স; তার থেকে 'অন্যরকম পুত্র জন্মে না'; যা জন্মায় সবই সেকেন্ডহ্যান্ড। এরকম চললে পঞ্চম-ষষ্ঠ বারের জেরক্স কপি (প্রতিরূপ) তো পাঠের অযোগ্য হয়ে যাবে! মূল বা অরিজিনাল আদর্শ পুরুষটিকে তার হুবহু পঞ্চম-ষষ্ঠ জেনারেশনে আর চেনাই যাবে না। অতএব অজাতশত্রুর মতে, আদর্শ অনুসরণের বিষয়ে 'প্রতিরূপ' বানানোর বালার্কি-কথিত পন্থা বিষয়ে তাকে যেন উপদেশ দেওয়া না হয়। এ বিষয়ে আরও আলোচনা রয়েছে আমাদের 'চ' গ্রন্থের ৮৯-৯০ পৃষ্ঠায় *'প্লীজ! আর আদর্শ অনুসরণ করতে বলবেন না'* শীর্ষক নিবন্ধে।

দর্শ, দর্শক, দর্শন, দর্শনী, দর্শনীয়, দর্শয়িতা : **১.** ✓দৃশ্ + অ (ঘঞ্) - অধিকরণে। (ব.শ.)। **২.** ***দর্শ** = যে (সার্বিক) শক্তিবিচ্ছুরণে দান রহে। **দর্শক** = **দর্শ** (দর্শন) করে যে। **দর্শন** = **দর্শ** অন (on) থাকে যাহাতে। **দর্শনী** = **দর্শন** গতিশীল রূপে ধারিত যাহাতে।*

দর্শনীয *=* ***দর্শন*** *গতিশীল হইয়া যায় যাহাতে।* ***দর্শয়িতা*** *=* ***দর্শন*** *গতিশীল রূপে গিয়া তারিত হয় যাহাতে। /* **দর্শ** = যে তিথিতে সূর্য্যচন্দ্র গণনায় একত্র দৃষ্ট হয়। **দর্শন** = যাহার দ্বারা দৃষ্টি সাধিত হয়। **দর্শনী** = দর্শনকালে যে অর্থ দেওয়া হয়; বিবাহে পাকা দেখার সময় যে অর্থ দেওয়া হয়। (ব.শ.)। **৩. দর্শ** = সূর্য্যেন্দুসঙ্গম, অমাবস্যা, অমাবস্যায় করণীয় যাগ, দর্শন, দৃশ্য, দর্পণ; দৃষ্টিগোচর বা জ্ঞানগোচর হওয়া, ঘটা, হওয়া। **দর্শক** = দ্রষ্টা, প্রবীণ, প্রধান, দর্শয়িতা, বোধয়িতা, উৎপাদক, দ্বারপাল। **দর্শন** = দ্রষ্টা, দর্শয়িতা, অবলোকন, উপলব্ধি, বুদ্ধি, সাক্ষাৎকারশক্তি, সাক্ষাৎকার, জ্ঞানমাত্র — দর্শনস্পর্শনাদি, স্বপ্ন, প্রকাশন, সমীপে আনয়ন, নেত্র, অধ্যাত্মজ্ঞানসাধন — সাংখ্য-বেদান্তাদি, শাস্ত্র, ধর্ম্ম, যজ্ঞ, দর্পণ, বর্ণ, রং, রূপ, আকৃতি। **দর্শনী** = প্রণামী, নজর, ভিজিট, ফি। **দর্শনীয়** = দ্রষ্টব্য, সুন্দর, মনোহারী, চক্ষুগ্রাহ্য, প্রদর্শনার্হ, দেখানোর যোগ্য। **দর্শয়িতা** = প্রদর্শক, উপদেষ্টা। (ব.শ.)। **৪.** শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **দৃ, দিক, দিশ**। দৃশ্ ক্রিয়া কেমন করে দর্শ-তে রূপান্তরিত হয়, সে বিষয় আমরা দৃ-র আলোচনায় জেনেছি। কেবল একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, তার সঙ্গে উপরোক্ত শব্দগুলির সকল অর্থ মিলে যায়। সেই ব্যতিক্রম হল — **দর্শ** শব্দের অর্থ 'সূর্য্যেন্দুসঙ্গম' বা অমাবস্যা কেন? পুরাণাদিতে আর একটি সমগোত্রীয় শব্দ দেখতে পাওয়া যায় — **দর্শপৌর্ণমাস**। **দৃ, দৃশ্** শব্দের অর্থে আমরা দেখেছি, সত্তা থেকে সর্বদিকে সমভাবে শক্তিবিচ্ছুরণ চলে বলেই তা **দৃশ্** পদবাচ্য। কিন্তু সবদিক থেকে সেই শক্তিবিচ্ছুরণকে একসঙ্গে দেখা সম্ভব নয়, কেবল একদিক থেকে দেখা সম্ভব হয়; সেজন্যই **দৃশ** হয়ে যায় **দর্শ**। কিন্তু গণনায় সবদিক একত্র করা সম্ভব, একত্রে দেখা সম্ভব। হয়তো সেকারণেই **দর্শ** শব্দের এরকম সর্বদিক একত্র করা চন্দ্র-সূর্য, অমাবস্যা-পূর্ণিমা ... ইত্যাদি অর্থ হয়ে থাকবে। আমরা নিশ্চিত নই।

দৃশ্য (দৃশ্যকাব্য, দৃশ্যমান, দৃশ, দৃশি, দৃশী, সদৃশ) : ১. ✓দৃশ্ + য (ক্যপ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***দৃশ*** *= আবর্ত্তমান (আলোক) শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে।* ***দৃশি*** *=* ***দৃশ*** *গতিশীল যাহাতে।* ***দৃশী*** *=* ***দৃশি****-র আধার যে।* ***দৃশ্য*** *=* ***দৃশ*** *থাকে যাহাতে।* ***দৃশ্যকাব্য*** *= যে কাব্য* ***দৃশ্য*** *হয়।* ***দৃশ্যমান*** *=* ***দৃশ্য*** *সীমায়িত রূপে অন (on) যাহাতে।* ***সদৃশ*** *= সমান* ***দৃশ*** *যে। /* **দৃশি (দৃশী)** = যাহার দ্বারা দর্শন সাধিত হয়। **দৃশ্যমান** = যাহা দেখা যাইতেছে। (ব.শ.)। **৩. দৃশি (দৃশী)** = চক্ষুঃ, শাস্ত্র, আলোক, পুরুষ, আত্মা, দর্শন। **দৃশ্য** = দর্শনীয়, দর্শনীয় বস্তু বিষয়, মনোহর, জ্ঞেয়মাত্র, জড়, অভিনেয় কাব্য। **দৃশ্যকাব্য** = রঙ্গালয়ে দর্শনীয় নাটক। **দৃশ্যমান** = অবলোক্যমান। **সদৃশ** = সমানরূপ, তুল্য, অনুরূপ, উচিত, সমান জাতীয়, স্থানার্থগুণপ্রমাণ-বিষয়ে সমান। (ব.শ.)। **৪. দৃশ, দৃশি** বাদে বাকি শব্দগুলি তাদের প্রতীকী অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **দিক্**। না, **দৃশ** শব্দটি স্বতন্ত্রভাবে প্রচলিত না থাকলেও অন্য শব্দের সঙ্গে সন্ধি-সমাস যোগে খুবই প্রচলিত, যথা *এতাদৃশ, বিসদৃশ* ... ইত্যাদি। প্রাথমিকভাবে এই **দৃশ** শব্দের অর্থ, একটি বস্তু থেকে যেভাবে আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। কিন্তু বিচ্ছুরিত হলেই হয় না, আর একজন সেটি দেখে। তাই এর মানে দাঁড়ায় '(যেরকম) দেখতে'। তার মানে, বস্তু নিঃসারিত আলোকবিচ্ছুরণ সর্বদা তার দর্শকের উপস্থিতির অপেক্ষা করে। বস্তুর তরফ থেকে ক্রিয়াটির অর্থ হয় — '(যেভাবে) আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে', কিন্তু দ্রষ্টার তরফ থেকে তার মানে হয় '(যেরকম) দেখতে'। অর্থাৎ, **দৃশ** শব্দের প্রকৃতপক্ষে দুরকম অর্থ হয়। তবে, কার্যত যেহেতু দ্রষ্টাই দেখে, তার দিক থেকেই বিচার চলে। অতঃপর, সেই **দৃশ** গতিশীল হয়; অর্থাৎ দেখা চলতে থাকে। একে বলে **দৃশি**। তার আধারকে বলতে হয় **দৃশী**। স্বভাবতই **দৃশী** শব্দের মানে দাঁড়ায় 'যাহার দ্বারা দর্শন সাধিত হয়'। এই দর্শন পার্থিব বস্তুকে দেখলে সেটি চক্ষুঃ, আর অপার্থিব বস্তুকে দেখলে সেটি শাস্ত্রাদি। তবে বস্তুর তরফ থেকে দেখলে এই **দৃশী** আলোককেও বোঝাতে পারে। এ-আলো পার্থিব আলো কিংবা জ্ঞানের আলো দুটোই হতে পারে। তাই ব.শ. **দৃশী** শব্দের অর্থ দিয়েছেন — চক্ষুঃ, শাস্ত্র, ও আলোক।

তা সে যাই হোক, একটি টেবিলকে দশ দিক থেকে দশ জন দ্রষ্টা 'একটি টেবিল' রূপেই দেখতে পায়। কারণ, তার থেকে আলোকশক্তির সমকালে সর্বদিকে সমভাবে বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে। যেন-বা 'আলোকদাতার আবর্ত্তমান' (**দৃ**) 'সার্বিক শক্তিবিচ্ছুরণ' (**শ্**) চলছে। এই **দৃশ্** থাকে যাহাতে, তাকেই বলা হয় **দৃশ্য**।

দৃষৎ (দৃষদ্, দৃষদ্বতী) : ১. ✓দৃ + ঋষদ্ (ড়ষদ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***দৃষৎ*** *(দৃ) = আলোকের দিশাগ্রস্ত বিচ্ছুরণের তারণ (বা দান) যাহাতে।* ***দৃষদ্বতী*** *=* ***দৃষদ্****-বহন তারিত যে আধারশক্তিতে।* **৩. দৃষৎ (দৃষদ্, দৃশৎ, দৃশদ্)** = পাষাণ, শিলা, শিলাপট্ট, পেষণাধার-শিলা, পাটা, শিল। **দৃষদ্বতী** = ব্রহ্মাবর্ত্তদেশের সীমান্তনদী-বিশেষ, কাত্যায়নী। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫. শ্, ষ্, স্** বর্ণের অর্থে আমরা জেনেছি যে, সূর্যের মতো সর্বদিকে সমকালে সমভাবে শক্তির বিচ্ছুরণকে বলে **শ্**, আলোকবর্ত্তিকার (টর্চের) মতো দিশাগ্রস্ত শক্তি বিচ্ছুরণকে বলে **ষ্**, এবং তাদের একটিমাত্র কিরণরেখাকে বলে **স্**। তা হলে **দৃষৎ** বা **দৃষদ্** শব্দের মানে হতে হবে 'দিশাগ্রস্ত শক্তির তারণ বা দান', তা সে আলোকশক্তির বা তাপশক্তির যে-শক্তির হোক না কেন। পাষাণ, শিলা, শিলাপট্ট ইত্যাদিতে তাপশক্তির বিস্তর দান ঘটে গিয়ে সেগুলি অত্যন্ত শক্ত হয়ে গেছে বলেই সেগুলিকে **দৃষদ্** বলা যেতেই পারে। কিন্তু **দৃষদ্বতী** বললে কেন যে অজ্ঞাত এক নদীকে এবং **কাত্যায়নী** বা দুর্গাকে বোঝায়, সেকথা চট করে বোঝা যায় না। কিন্তু যে মুহূর্তে আপনি মানসিক আলোকশক্তি ও তাপশক্তির (শ্রমশক্তির) কথা ভাববেন, কিংবা **সরস্বতী** ও **দৃষদ্বতী** নামের পৌরাণিক নদী দুটির কথা ভাববেন, হঠাৎই মনের সামনে থেকে কালো পর্দাটি সরে গিয়ে সবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সনাতন সভ্যতার বুক চিরে বেরিয়ে এসেছিল বৈদিক সভ্যতা। সেই বৈদিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল **আর্যাবর্ত্তে**। এতে যে জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত ছিল, তাকে বলা হত **সরস্বতী**; আর যে পণ্যের ধারা প্রবাহিত ছিল, তাকে বলা হত **দৃষদ্বতী**। এই **দৃষদ্বতী**কে কেন **কাত্যায়নী** বলা হত, সে বিষয় জানা যাবে **কাত্যায়নী** শব্দে। ইনি পণ্যউৎপাদনকারী এবং বিনিময় ও ভোগকারী জনসাধারণ।

দৃষ্ট (দৃষ্টদোষ, দৃষ্টান্ত, দৃষ্টি, দৃষ্টিক্ষেপ, দৃষ্টিগোচর, দৃষ্টিপথ,

দৃষ্টিপাত, দৃষ্টিপূত, দৃষ্টিবিদ্যা, দৃষ্টিবিভ্রম, দৃষ্টিভঙ্গি) : ১. ✓দৃশ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দৃষ্ = দৃশ্ টঙ্কারিত যাহাতে।* *দৃষ্টদোষ = দৃষ্ট কর্তৃক দূষিত যে। দৃষ্টান্ত = দৃষ্টকে অন্ত (নিশ্চয়) করে যে। দৃষ্টি = দৃষ্ট গতিশীল যাহাতে। দৃষ্টিক্ষেপ = দৃষ্টির ক্ষেপণ যাহাতে। দৃষ্টিগোচর = দৃষ্টির গোচরীভূত যে। দৃষ্টিপথ = দৃষ্টির পথ। দৃষ্টিপাত = দৃষ্টির পতন থাকে যাহাতে। দৃষ্টিপূত = যাহা দৃষ্টি দ্বারা পূত (পবিত্রীকৃত)। দৃষ্টিবিদ্যা = দৃষ্টি বিষয়ক যে বিদ্যা। দৃষ্টিবিভ্রম = যে দৃষ্টি বিপরীতভাবে ভ্রমণ করে। দৃষ্টিভঙ্গি = দৃষ্টির ভঙ্গ (দ্র. ঢঙ্গ) গতিশীল যাহাতে।* / **দৃষ্টান্ত = দৃষ্ট অন্ত (নিশ্চয়) যাহাতে। দৃষ্টি = যাহার দ্বারা দর্শন সাধিত হয়। **দৃষ্টিপূত** = দর্শন দ্বারা পূত। (ব.শ.)। **দৃষ্টিগোচর** = চক্ষুঃ দ্বারা যাহা দেখা যায়। **দৃষ্টিপূত** = স্বচক্ষে দেখিয়া যে বিষয়ের স্বরূপ-পরিজ্ঞান হইয়াছে; স্বয়ং দেখিয়া যে বিষয়ে আশঙ্কা বা সন্দেহ দূর হইয়াছে। (ছা.অ.)। ৩. **দৃষ্ট** = অবলোকিত, অবগত, জ্ঞাত, বিহিত, বিচারিত, নির্ণীত, মনুষ্যকৃত স্ববল হইতে চৌরাদিভয় ও পরবল হইতে দাহাদিভয়, স্বপরচক্র-ভয়, দর্শন, চক্ষু। **দৃষ্টদোষ** = অবগতদোষ (জন), লোভাদিদোষদূষিত, জ্ঞাতবাসনাজন্য-দোষ। **দৃষ্টান্ত** = শাস্ত্র, নিদর্শন, মরণ, অর্থালঙ্কার বিশেষ (সদৃশ বস্তুর সামান্যধর্ম্মের প্রতিবিম্বন, অর্থাৎ প্রণিধান দ্বারা পদার্থদ্বয়ের কার্য্যসাদৃশ্য-বোধ হইলে 'দৃষ্টান্ত' অলঙ্কার হয়।), ন্যায়মতে ষোড়শ পদার্থের অন্যতম। **দৃষ্টি** = চাক্ষুষজ্ঞান, জ্ঞান, চক্ষুঃ, অবধান। **দৃষ্টিক্ষেপ, দৃষ্টিপাত, দৃষ্টি-নিপাত** = নেত্রপাত, দর্শন। **দৃষ্টিগোচর** = চক্ষুর্বিষয়ীভূত, প্রত্যক্ষ। **দৃষ্টিপথ** = নেত্রবিষয়। **দৃষ্টিপূত** = কেশাদিপরিহারার্থ দর্শনশোধিত, রোগক্ষত প্রভৃতি হীন, সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট। **দৃষ্টিবিদ্যা** = নেত্রবিজ্ঞান (optics)। **দৃষ্টিবিভ্রম** = দর্শনভ্রান্তি, নেত্রবিলাসবিশেষ। (ব.শ.)। **দৃষ্টিভঙ্গি** = দেখবার বা আলোচনা করার রীতি বা ধরন। (সংসদ বাংলা অভিধান)। ৪. উপরোক্ত প্রতীকী অর্থে শব্দগুলি কমবেশি প্রচলিত। তন্মধ্যে **দৃষ্টদোষ, দৃষ্টিপূত, দৃষ্টিবিদ্যা** প্রভৃতি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **দৃষ্টি**যুক্ত এরকম আরও অনেক অপ্রচলিত শব্দ রয়েছে। ৫. প্রথমেই কয়েকটি প্রশ্ন রাখলে শব্দগুলিকে বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে বলে মনে হয়। ক) **দৃশ্**-এর **শ্** কেন এখানে **ষ্** হয়ে গেল? খ) **দৃষ্ট** একই সঙ্গে 'অবলোকিত' (looked) এবং 'অবগত' (known) উভয়কেই বোঝাচ্ছে কেন? গ) দেখার দোষ বা **দৃষ্টদোষ**-জাতীয় কোনো ধারণা কীভাবে সম্ভব, যখন কিনা ইংরেজি কালচারে সেরকম কোনো ধারণাই নেই? ঘ) **দৃষ্টান্ত** শব্দটির ভেতরে 'অন্ত' কেন, কার অন্ত হচ্ছে? ...

ইতোপূর্বে **দৃশ, দিক্** শব্দে আমরা জেনেছি, আলোকশক্তির সার্বিক বিচ্ছুরণকারী-বস্তুর দিক থেকে **দৃশ্** ক্রিয়াকে সক্রিয় অবস্থায় দেখলে, তার মানে হয় '(যেভাবে) আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে'; আর দ্রষ্টার দিক থেকে দেখলে তার মানে হয় '(যেরকম) দেখতে'। বস্তু থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়ে দ্রষ্টার চোখে পৌঁছায়, বস্তুটি আপনাকে **দৃশ্য** করে তোলে, এবং **স্বভাবতই** দ্রষ্টার চোখে **দৃষ্ট** হয়। যতক্ষণ **দৃশ্য** হয়, বস্তুটির আলোক**বিচ্ছুরণ** সূর্যের মতো সার্বিক। কিন্তু যখন তা **দৃষ্ট** হয় তখন তা বর্ত্তিকার (টর্চের) আলোর মতো দ্রষ্টার চোখে টঙ্কারিত। আর সেজন্যই **শ্ রূপান্তরিত** হয় **ষ্**-তে।

বাংলা শব্দের **ক্রিয়াভিত্তিক স্বভাবটিকে** অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সর্বদা স্মরণে না রাখলে **আমরা প্রায়শই** চিন্তার চলার পথে বড় বড় গর্তে পড়ি। যেমন কিনা, **দৃষ্টি মানে** eyesight বুঝলে **দৃষ্টির** অর্থ-সম্পদের ৮০ শতাংশ বাদ পড়ে যায় এবং আমাদের 'ধারণাসম্পদ' বা conceptual wealth-এর **খুবই ক্ষতি** হয়ে যায়। কারণ, **দৃষ্টি** যে বিষয় ও বস্তুগুলিকে বোঝায় বা বোঝানোর ক্ষমতা ধরে, তাদের মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ কিংবা তারও কম বিষয় ও বস্তুকে eyesight শব্দটি শনাক্ত করে থাকে। দ্র. **অক্ষি**। তার ওপর রয়েছে বাহ্যদৃষ্টি ও মানসিক দৃষ্টি, বাহ্যচোখ ও মনের চোখ। বাংলাভাষীরা সবাই জানেন, আমাদের বাহ্যিক চোখ রয়েছে, মনের চোখও রয়েছে। বাহ্যবস্তুকে বাহ্য আলোর সাহায্যে বাহ্যচোখ দিয়ে দেখি, মানসবস্তুকে (বিষয়কে) মানসিক আলোর (জ্ঞানের আলোর) সাহায্যে মানসিক চোখ (জ্ঞানচক্ষু) দিয়ে দেখি। স্বভাবতই আমাদের **দৃষ্ট** বাহ্যচোখ দিয়ে দেখা 'অবলোকিত' যেমন হতে পারে, তেমনি মানসচোখ দিয়ে দেখা 'অবগত' বা 'জ্ঞাত'ও হতে পারে। কেবল তাই নয়, আমাদের **দৃষ্টদোষ** কিংবা **দৃষ্টিপূত**ও উভয় ক্ষেত্রেই ঘটা সম্ভব। লক্ষ্যণীয় যে, এই শব্দগুলির ব্যবহার অপ্রচলিত হয়ে যাওয়ায় একালের গোলোকায়িত সমাজে প্রতিনিয়ত যে **দৃষ্টিদূষণ** চলছে, এবং তার ফলে সাধারণ মানুষকে যে ব্যাপকভাবে **দৃষ্টদোষে দুষ্ট** করা (বা কনজিউমারে পরিণত করা) চলছে, 'লোভাদিদোষ-দূষিত' করা চলছে, সেসব আর আমরা দেখতে পাই না, বুঝতেও পারি না। এমনকি 'স্বচক্ষে দেখিয়া যে বিষয়ের স্বরূপ-পরিজ্ঞান' বা স্বয়ং দেখে বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ নিরসন করা, সেরকম **দৃষ্টিপূত**করণ প্রক্রিয়া নিয়ত চালালেও তার নামকরণ করে তাকে বোঝানোর জন্য শব্দটি কখনোই ব্যবহার করি না।

আরও লক্ষ্যণীয় যে, **দৃষ্টান্ত** বললেই একালের অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষী ঐ শব্দটির প্রতীকী অর্থ রূপে **উদাহরণ** বা example বোঝেন। কিন্তু শব্দটি তো মূলে সেরকম ক্ষুদ্র অর্থ ধারণ করে না। একজন লোককে আপনার দিকে আসতে দেখছেন, ভাবছেন লোকটি কে বটে? কাছাকাছি আসতেই আপনার মনে হল একে কোথায় যেন দেখেছেন। হ্যাঁ, এ তো সেই রামপুরের রামবাবু! আর কী! একে দেখার তো এখানেই শেষ। একে দেখে আর কী হবে! এ তো সেই পূর্ব-**দৃষ্ট** চেনা লোকটিই! অর্থাৎ নব-**দৃষ্ট** রামবাবুকে দেখার অন্ত করে দেয় যে পূর্ব-**দৃষ্ট**-রামবাবু, সে-ই আপাতত আপনার দেখতে থাকার অন্ত ঘটাচ্ছে। তার মানে, নব-**দৃষ্ট**কে দেখতে থাকার অন্ত ঘটায় যে পূর্ব-**দৃষ্ট** সত্তা, সেই সত্তাটিই **দৃষ্টান্ত**। আর, এ-**দৃষ্টান্ত** কেবল বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা বাহ্য-**দৃষ্টান্তই** নয়, মানসদৃষ্টিতে দেখা মানস-**দৃষ্টান্ত**ও বটে। বলতে কী, শব্দটি মানসিক বা বৈষয়িক **দৃষ্টান্ত** বোঝাতেই **অধিক** ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সবশেষে বক্তব্য এই যে, আমরা বাংলাভাষীরা দ্রক্ষতিকে 'দেখা' করে নিয়েছি (দ্র. **দিক্**)। আমরা দেখছি, সংস্কৃত ভাষায় **দৃশ্** ক্রিয়াটিকে **পশ্** করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন? **দৃশ্য** যখন **পশ্য** হয়, তখন **দৃষ্ট** কি **স্পষ্ট** হয়ে যায় না? **পশ, পশ্চাৎ, পাশ** প্রভৃতি শব্দে আমরা তার কিছু উত্তর পাব। ...

দো ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অদিতি, আইচ, আদিতেয়, আদিত্য, আদিত্যদর্শন, আদিত্যপাক, আদিত্যবর্ণ, আদিত্যসূনু, অদিন, দইত্য, দত্তি, দাত্র, দাম, দামড়া, দামন, দামদুম, দামনী, দামলিপ্ত, দামা, দামামা (ধামামা, ধমাকা), দামামি (ধামাই), দামাল (ধামাল), দামিনী, দামী, দামুঘোষ, দামুদর, দামোদর, দাম্বা, দাম্বাল, দিত, দিতি, দিত্য, দিন, দিনকত, দিনকতক, দিনকর, দিনকর্ত্তা, দিনকানা, দিনকাল, দিনক্ষয়, দিনচর্য্যা, দিননাথ, দিনপতি, দিনপাত, দিনবল, দিনভর্ত্তা, দিনমণি, দিনমান, দিনমুখ, দিনযৌবন, দিনরত্ন, দিনরাজ, দিনাংশ, দিনাগম, দিনাত্যয়, দিনান্ত, দিনান্তর, দিনাবসান, দিনারি, দিনেমার, দিনেশ্বর, দিনৈক, দৈতেয়, দৈত্য, দৈত্যগুরু, দৈত্যমাতা, দৈত্যযুগ, দৈত্যসেনা, দৈত্যারি, দৈত্যেন্দ্র, দৈত্যেন্দ্রাণী, দৈত্যেশ, দৈত্যেশ্বর, দৈনন্দিন, দৈন্য, দো, সুদামা, সৌদামিনী।

দো = নবরূপে উত্তীর্ণ দানের (দ্) অস্তিত্ব (অ) যাহাতে। সর্ব প্রকারের দান ক্রিয়া থাকে যাহাতে।

অদিতি (দিতি — পরে এই শব্দটি পুনরায় রয়েছে**)** : **১.** অদিতি = ন + ✓দো + ক্তি - কর্ম্মবাচ্যে। (ছা.অ.)। দিতি = ✓দো + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***অদিতি** = যে **দিতি** নহে; যে (জনগোষ্ঠী) অখণ্ডবাদিতায় (যৌথসমাজে) বিশ্বাস করে।* **৩. অদিতি** = দিতিবিরোধিনী, দক্ষকন্যা কশ্যপপত্নী ও আদিত্যগণের জননী, ভূমি, পৃথিবী। (ব.শ.)। দেবমাতা। ইনি দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, এবং কশ্যপের পত্নী। ইঁহার গর্ভে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুও বামন অবতারে ইঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (ছা.অ.)। **দিতি** = অবখণ্ডন, ছেদন, বিভাগ, কশ্যপের পত্নী ও দৈত্যগণের জননী। (ব.শ.)। **৪.** কেবল নাম রূপে **অদিতি** শব্দের সচরাচর প্রয়োগ হয়ে থাকে; **দিতি** অপ্রচলিত। **৫.** প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পাঠ করতে গেলে বারংবার যে চরিত্রটির মুখোমুখি হতে হয় তার নাম **কশ্যপ**। এই কশ্যপের বহু স্ত্রীর মধ্যে দুজনের কথা বারংবার এসে পড়ে — **দিতি-অদিতি**। **দিতি** দৈত্যগণের জননী; আর, **অদিতি** আদিত্যগণের জননী। পৌরাণিক অভিধান জানাচ্ছেন, রামায়ণ মতে 'অদিতি অষ্টবসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও যুগল অশ্বিনীকুমার, মোট ৩৩টি দেবতা প্রসব করেন।' আর, **দিতি** প্রসব করেন 'দৈত্য সকলকে'।

বিষয়টি আমরা **কশ্যপ** শব্দের অর্থে কিছুটা অনুধাবন করতে পেরেছি। আসলে, সমগ্র প্রাচীন ইতিহাসকে পরবর্তীকালের পুরাণকারগণ যখন সাজাতে বসেছেন, তখন আদি যুগটাকে তাঁরা সাজিয়েছেন খানিকটা স্মৃতি থেকে, খানিকটা অঙ্ক কষে কষে। ঠিক যা ঘটেছিল, তার চেয়ে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জোর পড়ে যায় ঠিক যা ঘটতে পারত তার ওপরে। ফলে, তাঁদের রচিত পুরাণকাহিনী কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু-তিন রকম হয়ে গেছে। তবে তা সত্ত্বেও মানবসভ্যতার যথার্থ আদি ইতিহাস থেকে তা খুব-একটা বিচ্যুত হয়নি। ...

অসুর শব্দের অর্থে আমরা আগেই জেনেছি যে, আদিতে অসুর ও দেবতায় কোনো ফারাক ছিল না। পৌরাণিকের ভাষায় বললে বলতে হয়, তাঁরা একই মাতার সন্তান ছিলেন। কিন্তু **আর্য্যোৎপত্তির** পর (বৈদিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর) জনসমাজের চরিত্র আগের মতো থাকে না; এক অংশ থেকে যায় আগের মতো 'সব মানুষই সর্বপ্রকার জ্ঞানকর্মজীবী — এইরূপ অখণ্ডতায় বিশ্বাসী' (= **অদিতি**); অপর অংশ নতুন বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং তা হল, সমাজে জ্ঞানজীবী ও শ্রমজীবী দুরকম মানুষ একত্রে থাকতে পারে এবং সেরকম হওয়াই ভাল (= **দিতি**)। তার মানে, পূর্বতন সনাতন সমাজে জনসাধারণের স্বরূপ ছিল **অদিতি** পদবাচ্য; বৈদিক সমাজের প্রতিষ্ঠার পর সমাজে জনসাধারণের স্বভাব হয়ে গেল তিন রকম — **গণ** (= **অদিতি**) এবং 'জ্ঞানজীবী (বেদজীবী মহর্ষি) ও শ্রমজীবী (মহর্ষি পরিচালিত সম্প্রদায়)' (= **দিতি**)। শুরুতে এরূপ সমাজ ছিল খুবই বৈপ্লবিক এবং মানবসভ্যতার বহু মহত্তম অর্জন সম্ভব হয়েছিল বৈদিক ব্যবস্থার সূত্রপাতের এই যুগে। কিন্তু পরে পরে (প্রায় হাজার বছর) এই ব্যবস্থা একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি মান্য করে মৌলবাদী হয়ে যায়। ততদিনে **অদিতির** চরিত্রও অনেক বদলে যায়। ক্রমে **দিতির** সন্তানেরা অধঃপতিত আদিম সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) সমাজের প্রবক্তা ও অনুসরণকারী হয়ে যায় এবং **অদিতির** সন্তানেরা আদিম ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রবক্তা ও অনুসারী হয়ে যায়। ... (নিম্নে **দিতি** শব্দটি দ্রষ্টব্য)।

আদিত্য (আইচ, আদিত্যসূনু) : **১.** অদিতি + য অপত্যার্থে। (ব.শ.)। **২.** ***আদিত্য** = আদিত্য থাকে যাহাতে; অদিতি থাকে যে উত্তরাধিকারে। **আদিত্যসূনু** = আদিত্যের সূনু।* **৩. আদিত্য** = আদিত্যসম্বন্ধী, সূর্য্যবংশজাত, সূর্য্যদেবতাক (চরুমন্ত্রাদি), সূর্য্যোপাসক, অদিতিসম্বন্ধী, অদিতির পুত্র, দেব, সূর্য্য, অর্কবৃক্ষ, শ্রেষ্ঠার্থ, কায়স্থের উপাধিবিশেষ, অদিতিদেবতাক পুনর্ব্বসু নক্ষত্র, ইন্দ্রাদি দ্বাদশ দেবতাগণ। মহাভারত মতে — ইন্দ্র ধাতা মিত্র অর্য্যমা বরুণ অংশ ভগ বিবস্বান্ পূষা সবিতা ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। [ত্বষ্টার কন্যা সংজ্ঞা সূর্য্যতেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইলে, ত্বষ্টা সূর্য্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন। দ্বাদশ মাসে এই দ্বাদশ আদিত্যের উদয় হয়। মাঘে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য্য, চৈত্রে বেদজ্ঞ, বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতাঃ, কার্ত্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে চিত্র (মিত্র?) ও পৌষে বিষ্ণু।] হরিবংশ মতে দ্বাদশ নাম — ধাতা অর্য্যমা মিত্র বরুণ অংশ ভগ বিবস্বান্ ইন্দ্র পূষা পর্জ্জন্য ত্বষ্টা ও বিষ্ণু। ঋগ্বেদে — মিত্র অর্য্যমা ভগ বরুণ মিত্র অংশ, এই ছয়টি এবং স্থানান্তরে ও শতপথব্রাহ্মণে (সবিতা?) লইয়া সাতটি আদিত্যগণ। তৈত্তিরীয়ে মিত্র-প্রভৃতি চারিটি এবং ধাতা অংশু ইন্দ্র বিবস্বান্ — এই আটটি আদিত্যগণ। মহাভারতে 'অংশ'-স্থানে 'পর্জ্জন্য' ও হরিবংশে 'ইন্দ্র'-স্থানে 'শক্র' আছে। গরুড় অরুণ এবং বৃহস্পতিও আদিত্যগণের অন্তর্ভুক্ত। **আইচ** = দ্র. **পদবী**। **আদিত্যসূনু** = সূর্য্যপুত্র, সুগ্রীব, যম, শনৈশ্চর, সাবর্ণিমনু, কর্ণ, বৈবস্বত মনু। (ব.শ.)। **৪. আদিত্য** বা **আইচ** পদবী রূপে প্রচলিত, অন্যথায় অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **অদিতি**। সূর্য্যের এই দ্বাদশ রূপের কথা সেকালের পণ্ডিতেরা জানলেন কেমন করে, সেকথা ভাবলে বেশ একটু অবাক লাগে। আমরা তো কই বারো মাসে বারো রকম সূর্য্যের চেহারা স্পষ্ট

পার্থক্যে দেখতে পাই না। একালে দূরবীক্ষণ ইত্যাদির বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও কোনো জ্যোতির্বিদ বারো মাসে বারো রকম সূর্য্য দেখেছেন বলে এখনও শোনা যায়নি। তাহলে?

প্রকৃতপক্ষে সেরকম কিছু ঘটে কি না, সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। আসলে আমাদের সেই প্রাচীন জ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা যে সমস্যায় পড়ে এসব বলে ও লিখে গেছেন, সেকালের হিসেবে সে ছিল এক জ্বলন্ত সমস্যা। তখন সামাজিক সত্তাসমূহকে প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের সমান্তরালে দেখার ও চিহ্নিত করার কাজ চলছে। তো, যৌথসমাজের যে শক্তিকেন্দ্র — যেখানে এতকাল সমস্ত যৌথ সামাজিক অর্জন, জ্ঞানসম্পদ ধনসম্পদ সামাজিক-শক্তি প্রতিপত্তি ... ইত্যাদি, কেন্দ্রীভূত হচ্ছিল, তাকে নাম দেওয়া হয়েছিল সূর্য্য বা **আদিত্য**। শব্দটিকে 'দিত্যসমূহের আধার' বলা যেতে পারে এবং **দিত্য** শব্দ থেকেই দৈত্য শব্দটি প্রসূত হয়েছে। ...

কিন্তু সমাজ তো তার **আদিত্য** রূপেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল না, বিভাজিত হয়ে টুকরো টুকরো **সম্প্রদায়ে** পরিণত হয়ে যেতে লাগল। দেখা গেল, সেই সকল সামাজিক গোষ্ঠীগুলিতেও বেশ কিছু শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে, আগে যার অস্তিত্ব ছিল **আদিত্য**-এর স্বভাবে। তো, সেই সব দেখেশুনে সেই শক্তিগুলিকে প্রাচীন জ্ঞানীগণ চিহ্নিত করলেন দ্বাদশ **আদিত্য** নামে। বোঝা গেল, আদিম যৌথসমাজের কেন্দ্রে যে **সূর্য্য** ছিল, তারই নানা অংশ নতুন রূপে সক্রিয় হয়েছে। তার মানে, আদিম যৌথসমাজের কেন্দ্রীয় শক্তিকে পরবর্তী যুগে (কমপক্ষে) বারোটি রূপে সক্রিয় দেখা যাচ্ছে।

এই পর্যন্ত তাও বিশেষ সমস্যা ছিল না। কিন্তু সেকালের অখণ্ডজ্ঞানীরা বিচ্ছিন্নভাবে কোনোকিছুকেই বুঝতে রাজি ছিলেন না। যে শক্তি মানুষের সমাজে সক্রিয়, প্রকৃতিতেও তা সক্রিয় থাকতে বাধ্য। তাঁদের এই বিশ্বাসের যাথার্থ্য এতই জোরালো ছিল যে, তাঁরা বারোমাসে বারো রকম প্রাকৃতিক সূর্য্যের অস্তিত্বও মান্য করে তাঁদের অখণ্ডবোধকে সঠিকতায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। সেভাবেই সামাজিক সূর্য্যের যেমন বারো রকম বিভাজনকে চিহ্নিত করা গেল, তেমনি sky-এর sun-এর বারো রকম বিভাজনও চিহ্নিত (কিংবা কল্পনা) করে নেওয়া হল। ...

গ্রীক পুরাণের অন্তিম পর্যায়ে শুভশক্তির দেবতাদের সাধারণ নাম ছিল Theos। পুরাণ কাহিনী অনুসারে Theos-রা তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল শক্তিমান Titan-দের হারিয়ে দিয়ে। Titan-রা সকলে বিশাল শক্তির অধিকারী ছিল। মানুষের বিশেষ উপকারী Prometheus ছিল একজন Titan। Theos-রা Titan-দের হারিয়েছিল চাতুরীর জোরে, আমাদের পুরাণকাহিনীতেও দেবরাজকে যা প্রায়শই করতে দেখা যায়। ধ্বনিগত এবং অর্থগত নৈকট্যের বিচারে এই Theos = দেব, Titan = দৈত্য।

যাই হোক না কেন, মোটের উপর এই বিষয়টি অত্যন্ত বড়। এ নিয়ে পৃথকভাবে গবেষণা হওয়া দরকার। আমরা এখানে কেবল বিষয়টি ছুঁয়ে গেলাম। দ্র. **দিতি, দৈত্য**।

দাম (দামড়া, দামনী, দামলিপ্ত, দামামা, দামাল, দামিনী, দামী, সৌদামিনী) : ১. ✓দো + মন (মনিন্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দাম** = **দম** হইতে জাত; অথবা, শক্তিদাতার আধার সীমায়িত যাহাতে। **দামড়া** = **দাম**-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে তাহার আধার। **দামনী** = **দাম** অন যাহাতে তাহার গতিশীল আধার যে। **দামলিপ্ত** = **দাম** লিপ্ত যাহাতে। **দামামা** = **দাম**-এর অম্-রূপের আধার যে। **দামাল** = **দাম**-এর আধার লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে। **দামিনী** = **দাম** গতিশীলভাবে অন হয় যে প্রকৃতি আধারে। **দামী** = **দাম**-এর গতিশীল আধার যে। **সৌদামিনী** = সু যে **দামিনী**।* / **দাম** = যাহা দ্বারা গতি খণ্ডিত হয়। (ব.শ.)। **দাম** = যে দড়িতে অনেক গরু বাঁধা যায়। (ছা.অ.)। **৩. দাম** = বন্ধন, নিগড়, গোবন্ধনরজ্জু, ছাঁদনদড়ি, রজ্জু, মাল্য, লতা, পশুবন্ধনরজ্জু; মূল্য; কলমি-প্রভৃতি জলজাত লতার জালতুল্য জড়িত শাখা-প্রশাখা। **দামনী** = বৎসাদির চরণরজ্জু। **দামড়া** = বলদ, ষাঁড়। **দামামা** = নাগরা। দামাল (দাম্বাল) = দম্যবাল, দুরন্ত (শিশু)। **দামিনী** = দামযুক্তা, বিদ্যুৎ, মালাধারিণী। **দামী** = মূল্যবান। **সৌদামিনী (সৌদামনী)** = তড়িৎ, বিদ্যুৎ, তড়িদ্ভব, সুদামার বা ঐরাবতের পত্নী, অপ্সরোভেদ। (ব.শ.)। **দাম** = রজ্জু, সূত্র, দোঁকা, মাল্য, মূল্য, গুচ্ছ, তৃণবিশেষ, জাল। **দামলিপ্ত** = তমলুক। (ছা.অ.)। **৪.** price অর্থে **দাম**, 'কিশোর-বয়স্ক পুং বলদ' অর্থে **দামড়া**, turbulent অর্থে **দামাল**, valuable অর্থে **দামী** এবং মেয়েদের নাম রূপে **দামিনী** প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** শুরুতেই আমরা জানতে চাইব, **দাম** কথাটির মধ্যে এমন কী রয়েছে যে, সে একই সঙ্গে এমন বিচিত্র বিষয়কে বোঝানোর ক্ষমতা ধরে। কম **দাম** বেশি **দাম** সবাই বোঝেন, এমনকি কথার **দাম**ও কমবেশি বোধগম্য হয়, কিন্তু শৈবাল**দাম**, **দামড়া**, **দামাল** ... এবং সর্বোপরি **দামিনী** বা **সৌদামিনী**কে কিছুতেই বোঝা যায় না। সেই কারণে **দাম** শব্দটিকে ভাল করে বুঝে নেওয়া দরকার।

ব.শ. ঠিকই জানিয়েছেন, 'যাহা দ্বারা গতি খণ্ডিত হয়' তাকে **দাম** বলে। **দম** শব্দ থেকে আমরা জেনেছি, এতে গতিদাতার সীমায়ন থাকে; আর **দাম** তো '**দম** হইতে জাত'ই বটে। অভিজ্ঞতা বলে যে, সবচেয়ে ভাল সাঁতারুও দিঘির শৈবাল**দাম**-এ আটকে জলে ডুবে মারা যেতে পারে। যে নদীর জলে প্রচুর পরিমাণে শৈবাল থাকে, তার গতি শ্লথ হয়, খণ্ডিত হয়। যে-বালককে দমন করা দরকার, কিংবা দমন করা উচিত (= দম্য), তেমন বালককে বা 'দম্যবাল'কে বলা হয় **দামাল** বা 'দাম্বাল'। আর, গরুর যে-বাছুরের কিশোর বয়সে মুষ্ক 'ছাঁট' করে দেওয়া হয়েছে এবং তারপর তার বাড়বৃদ্ধি চমকপ্রদভাবে অন্য একটি মাত্রা নিয়েছে, তাকে বলে **দামড়া**। এইভাবে **দাম** যখন গতি সংকোচনের উপায়, তখন তা যে-কোনো বৎসের বন্ধনরজ্জুও হতে পারে। তাই **দামনী** শব্দের অর্থ হয় 'বন্ধনরজ্জু'। তবে, বধূর ওড়নার প্রান্তের সঙ্গে বরের উত্তরীয় বাঁধা থাকলে, তাতেও **দাম** অন হয়ে থাকে। একে **দামন** বলে। শব্দটি রয়েছে ফারসিতে এবং বাংলায় শব্দটির ব্যবহার করেছেন বিদ্রোহী কবি নজরুল। অনেক সময় মেয়েদের আঁচলকেই (যা অন্যের সঙ্গে বাঁধা হয়, তাকেই) **দামন** বলে। দয়িতার **দামন** বিপদে আপদে কখনো ত্যাগ না করাই ফারসি পৌরুষের অঙ্গীকার। ... এরকম **দম**জাত সত্তা আরও আছে। তবে এই সব **দাম** হল দৃশ্যজগতের **দাম**।

এবার অদৃশ্যজগতের **দাম**-এর কথায় আসা যাক। পণ্য উৎপাদিত

হয়ে ভোক্তার দিকে যাবে, পণ্যধারায় প্রবাহিত হবে, পণ্যের এই গতিশীলতা স্বাভাবিক। তাকে যে আটকায়, তাকে পণ্যটির **দাম** বলে। ব্যঞ্জনার্থে সেই **দাম** বস্তুমাত্রের উৎকর্ষের পরিমাপ হয়ে দাঁড়ায়, তা সে সোনার **দাম** হোক আর কথার **দামই** হোক। কিন্তু প্রশ্ন হল, প্রাচীন কালে, যখন পণ্যবিনিময়ের প্রচলন সবেমাত্র শুরু হয়েছে, তখন এক কড়ি **দাম**-এ একটি গরু (অর্থাৎ একশো কড়ির বিনিময়ে একশোটি গরু) — এরকম ব্যাপার লোকে বুঝত কীভাবে?

ধরা যাক, একজন বিক্রেতা তার গরুটিকে বেচতে এল হাটে। গরুর গলার দড়িটি যেমন **দাম**-পদবাচ্য, তেমনি তার 'মূল্য' বা price-ও **দাম**-পদবাচ্য; কারণ দুটোই গরুটিকে আটকাচ্ছে, আগ্রহীর কাছে চলে যেতে দিচ্ছে না। কিন্তু যে পাইকার অনেকগুলি গরু নিয়ে দাঁড়িয়ে বিক্রির অপেক্ষা দাঁড়িয়ে থাকে, তার গরুগুলি কিন্তু পৃথকভাবে বাঁধা থাকে না। গাঁদা ফুলের বোঁটার দিকটা গেঁথে গেঁথে যে **মালা** বানানো হয়, যাতে ফুলগুলি বাইরের দিকে ঝুলে থাকে, সেই **মালার** মতো ('**মাল** থাকে যাহাতে' = **মাল্য**) একই দড়িতে গরুগুলি বাঁধা থাকে। একালে এখনও, গরুহাটে গরু-পাইকারেরা এভাবেই তাদের গরুগুলিকে বেঁধে রাখে। এই দড়ি যেমন পাইকারীভাবে গরুগুলিকে আটকায় বলে, তাদের পাইকারী মূল্যও তাদের আটকায়। একে পাইকারী **দাম** বলা চলে, কিন্তু সেকালে এই পাইকারী **দামকে** বলা হত **দামনী**। (দ্র. ছা.অ.)। (এই **দাম**-এর কথা যখন চীৎকার করে বারংবার ঘোষণা করা হয়, **ঢাক** বাজিয়ে সবাইকে জানানো হয়, তখন তাকে **দামামা** বা 'নাগরা' বলে। বলা হয়, শব্দটি ফারসি **দমামহ্**; এর অন্যতর অর্থও হতে পারে।) এই **দামনীর** অধিকারীকে বলে **দামিনী**। সেকালে একে **মাল্যবানও** বলা হত। কিন্তু যার **দাম**-এর কথা ঝিলিক মারছে, মাত্র ১০০ টাকায় একটি সোনার আংটি (একালের বাজারদরে), কিন্তু নিতে গেলে একসঙ্গে ১০টি নিতেই হবে, অর্থাৎ পুরো **মালাটাই** নিতে হবে, তেমন **দামনীকে** বলা হয় **সৌদামনী**; আর, সেই সৌদামনীর অধিকারীকে বলা হয় **সৌদামিনী**। পাইকারী-হারে বিক্রয়ের জন্য বদ্ধ গরুর (পণ্যের) বন্ধনের মতো দেখতে যে ঝিলিকের রেখা আকাশে দেখতে পাওয়া যায়, সেই 'দত্ত-দাম্যত-দয়ধ্বম্'-এর বিদ্যুচ্চমকের রেখাকে সেকারণেই **দামিনী** বা **সৌদামিনী** বলে। **দময়ন্তীর** সঙ্গে এই **দামিনীর** বিস্তর ফারাক। তাছাড়া, **সৌদামিনী** শব্দটির ব্যবহারও বেশ অর্বাচীন, মাত্র কালীদাসের কাল থেকে এর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।

সবশেষে আমরা একালের পণ্যজগতের 'বিজ্ঞাপন' সমস্যার বিষয়ে উপরোক্ত শব্দগুলির কথা ভাবতে পারি। এমনকি ১৯০০ সালেও আধুনিক বাংলাভাষার পণ্ডিতেরা বাংলাভাষাকে অন্ততপক্ষে এতটা বুঝতেন যে, তাঁরা physics-এর বাংলা প্রতিশব্দ রূপে **পদার্থবিদ্যা** শব্দের এবং commerce-এর প্রতিশব্দ রূপে **বাণিজ্য** শব্দের উদ্ভাবন ও প্রচলন করে নেওয়ার যোগ্য ছিলেন। এখন সে যোগ্যতাও একালের অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত বাংলাভাষা-বিশেষজ্ঞরা হারিয়েছেন। ফলে, তথাকথিত 'বাণিজ্য'-এর বিপুল বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ইংরেজি শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ উদ্ভাবন ও প্রচলন করা যায়নি। **দাম** শব্দ আমাদের জানায়, এই সমস্যা সমাধানে সে কিছুটা সহায়তা করতে পারে। অন্ততপক্ষে **সুদাম, সুদামা, দামনী, সৌদামনী, দামিনী, সৌদামিনী** প্রভৃতি শব্দের একালীকরণ এক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করবে বলেই মনে হয়।

দামুদর (দামোদর) : ২. *যাহাতে দাম নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া বিদারণ করে। /* যাঁহার উদরে যশোদাকৃত-বন্ধনরজ্জু (বিদ্যমান)। (ব.শ.)। দাম উদরে যাহার। (ছা.অ.)। **৩.** দামোদর নদ, বিষ্ণু, নারায়ণ, বর্দ্ধমান জেলার নদবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** নদীর নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **দাম**। দৃশ্যলোকে এই নদীটি রয়েছে। এই নদীর জলধারায় নিশ্চয় যথেষ্ট পরিমাণে শৈবাল**দাম** ছিল বা আছে, যেকারণে একে **দামুদর** বা **দামোদর** নাম দেওয়া হয়েছিল। অদৃশ্যলোকে এ হল সেই পণ্যধারা, যেগুলিতে নানারকমের সরকারি বিধিনিষেধের শৈবালদাম বস্তুর লেনদেনকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে। ...

দিত (দিতি, দিত্য, দৈত্য, দৈত্যগুরু, দৈত্যমাতা, দৈত্যযুগ) : **১.** ✓দো + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***দিত*** *= দান গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে; অথবা, পূর্ণ থেকে কেটে টুকরো রূপে আলাদা করে নেওয়া হয়েছে যাকে।* ***দিতি*** *=* ***দিত*** *গতিশীল যাহাতে; অথবা, অবখণ্ডন চলতে থাকে যাতে।* ***দিত্য*** *=* ***দিত*** *থাকে যাহাতে।* ***দৈত্য*** *=* ***দিত্য*** *করে যে।* ***দৈত্যগুরু*** *= দৈত্যগণের গুরু যিনি।* ***দৈত্যমাতা*** *= দৈত্যগণের মাতা।* ***দৈত্যযুগ*** *= দৈত্যগণের জন্য প্রশস্ত যুগ।* **৩. দিত** = অবখণ্ডিত, ছিন্ন, দ্বৈধীকৃত। **দিতি** = অবখণ্ডন, ছেদন, বিভাগ, কশ্যপের পত্নী ও দৈত্যগণের জননী। (ব.শ.)। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে, ইনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, কশ্যপের স্ত্রী ও দৈত্যদের মাতা। এঁর গর্ভে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিল, তারাই দৈত্য নামে বিখ্যাত। দেবতাদের আক্রমণে সমস্ত পুত্র বিনষ্ট হলে দিতি স্বামীর নিকট ইন্দ্রবিজয়ী পুত্র প্রার্থনা করেন। কশ্যপ স্ত্রীর প্রার্থনা পূরণ করে বলেন, 'তোমাকে সহস্র বৎসর গর্ভধারণ করে, সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত সর্বদা দেহে ও মনে শুচি হয়ে থাকতে হবে।' ... একদিন দিতিকে অধৌত পদে শয়ন করতে দেখে ... ইন্দ্র দিতির গর্ভে প্রবেশ করে বজ্র দ্বারা তাঁর জরায়ুকে সপ্ত খণ্ডে বিভক্ত করেন। গর্ভের এই বিভক্ত সন্তানদের ক্রন্দনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ইন্দ্র ... প্রত্যেক খণ্ডকে আবার সাত খণ্ডে বিভক্ত করেন, এবং এই পুত্রদের 'মরুৎ' বলে সান্ত্বনা দেন। এইরূপে প্রসূত সন্তানেরা মরুৎ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ((পৌ.অ.)। **দিত্য** = দিতিজাত, দৈত্য। **দৈত্য** = দিতির অপত্য, অসুর, অসুরপ্রকৃতি জন। (ব.শ.)। কশ্যপের ঔরসে ও দক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা দিতির গর্ভজাত বংশধরগণ দৈত্য নামে পরিচিত। দেবতাদের সঙ্গে এদের চিরন্তন বিরোধ ও যুদ্ধ চলেছিল। এদের প্রধান কাজ ছিল দেবতাদের যজ্ঞ ও পূজা নষ্ট করা। ... দৈত্য ও দানব প্রায় একই শ্রেণীভুক্ত। ((পৌ.অ.)। **দৈত্যগুরু** = শুক্রাচার্য্য। **দৈত্যমাতা** = দিতি, দনু, সিংহিকা। **দৈত্যযুগ** = দেবপরিমাণে দ্বাদশসহস্র বর্ষ। (ব.শ.)। **৪.** একমাত্র **দৈত্য** শব্দটি ইংরেজি Giant অর্থে প্রচলিত, বাকি সব অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **অদিতি, আদিত্য, দেবগুরু**। একালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন ধনতন্ত্র-সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের পাওয়া যায়, তেমনি সমাজতন্ত্র-সমর্থক বুদ্ধিজীবীদেরও পাওয়া যায়। ধনতন্ত্র-সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের সেকালে বলা হত বৃহস্পতি, একালে

বলা হয় **দক্ষিণপন্থী** বুদ্ধিজীবী; আর, সমাজতন্ত্র-সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের সেকালে বলা হত শুক্রাচার্য্য, একালে বলা হয় **বামপন্থী** বুদ্ধিজীবী। এই শুক্রাচার্য্যই ছিলেন **দৈত্যগুরু**।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি একালের **বামপন্থী** আর সেকালের দৈত্য একই সত্তা? এর উত্তর হল হ্যাঁ এবং না। কারণ, **অদিতি-দিতি** শব্দের অর্থে আমরা দেখেছি, যে-সন্ধিক্ষণে আদিম যৌথ সমাজের ও তাতে অভ্যস্ত ধারণার ভাঙ্গন ঘটছে, তখন জনগোষ্ঠীর স্বভাব সব মিলিয়ে (অদিতি = ১, দিতি = ২, যোগ করলে ৩) তিন রকম হয়ে যাচ্ছে। **আদিত্যগণ** যৌথ একতার মানসিকতা থেকে জন্মাচ্ছে, কিন্তু বাস্তব সামাজিক পরিচালনভার **দিত্যগণের** দখলে, যে **দিত্যগণ** বা দৈত্যগণ জ্ঞানজীবী ও শ্রমজীবীতে দ্বিধাবিভক্ত। এমন জটিল পরিস্থিতি যে, খণ্ডবাদী দৈত্যগণ ফেলে আসা যৌথ-ব্যবস্থার পূজারী অথচ নিজেরা খণ্ডবাদী, ভেদবাদী, বেদবাদী। অপর দিকে ৩৩ সংখ্যক অদিতিপুত্রগণ (৮ বসু, ১২ আদিত্য, ১১ রুদ্র, ২ অশ্বিনীকুমার — ৩৩) অখণ্ডবাদী, কিন্তু পরে পরে এঁরা অতিখণ্ড পণ্যবাদিতার সমর্থক হয়ে যাচ্ছেন। স্বভাবতই ভারতসমাজের ইতিহাসের এই অধ্যায় অত্যন্ত জটিল। এ নিয়ে পৃথকভাবে গবেষণা হওয়া দরকার। আমরা আমাদের সাধ্যমতো বিষয়টি ছুঁয়ে গেলাম। দ্র. **আদিত্য**।

দিন : ১. ✓দো + ইন (ইনচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অবখণ্ডিত অংরূপিণী অন (on) যাহাতে।* / তিমির খণ্ডন করে যে। (ব.শ.)। ৩. সূর্য্যের উদয়াস্তমিত কাল, দিবস, ষষ্টিদণ্ডাত্মক কাল, চান্দ্রতিথিরূপ কাল, চান্দ্রমাসাত্মক পিতৃগণের কালভেদ, সৌরবর্ষরূপ দৈব কালভেদ, ব্রাহ্মকল্পরূপ কালভেদ, সুসময়, সুদিন, দুর্দ্দিন, দুঃসময়, জ্যোতিষমতে যাত্রাকাল, মৃত্যুকাল, জীবিতকাল, প্রভুত্বের সময়, সময়, কাল, সুযোগ। (ব.শ.)। ৪. day অর্থে প্রচলিত। ৫. **দিন** শব্দটি তৈরি করা হয়েছে 'দো' ক্রিয়া থেকে, যার মানে 'খণ্ডন' করা বা কেটে কেটে নিয়ে নেওয়া। বিশ্বজগৎকে যদি সার্বিক অন্ধকারের একটি অনাদি-অনন্ত সময় বলে ভাবা হয়, তবে তার থেকে বারোঘণ্টা অন্তর বারোঘণ্টা করে কেটে নেওয়া আলোকিত সময়কে বলে **দিন**। একালে অবশ্য ইংরেজি day অর্থেই **দিন** শব্দটির অর্থ সবাই বুঝে থাকেন, শব্দটি ঠিক সেভাবে তৈরি করা হয়নি; তৈরি করা হয়েছে এই ভাবে —

পৃথিবীতে আমাদের সময়কাল হল একটি একটানা রেখার মতো, যা দেখতে অনেকটা এইরকম (.............), বারোঘণ্টা কালো আঁধার রাত্রি ও বারোঘণ্টা আলোময় দিবসকাল। এই চিত্রটি যথাযথ হয়, যদি কালো কাগজের উপর সাদা কালি দিয়ে এই সমান বিন্দুগুলি আঁকা হয়। তখন, আঁধার বা কালোগুলি রাত্রি, আর মাঝের আলো বা সাদাগুলি হল **দিন**। কারণ, পৃথিবীর মানুষের সুবিধার জন্য (?) বিশুদ্ধ সার্বিক আঁধার বা কালোকে সমান সময়ের ব্যবধানে বারোঘণ্টা পর পর খণ্ডন করে, বারোঘণ্টা করে আলোর অবকাশ সরবরাহ করেছে সূর্য্যমণ্ডল। এভাবে সার্বিক কালোর মাঝে আলোর, বারোঘণ্টা অন্তর, বারোঘণ্টার অস্তিত্ব 'অবখণ্ডন' করে নেওয়া হয় বলেই, একে **দিন** বলে। অর্থাৎ 'অবখণ্ডিত অংরূপিণী অন যাহাতে' তাকে **দিন** বলে। সেজন্যই শব্দটি কেবল কালোর মাঝে আলোর day-টুকুকেই বোঝায় না, সর্বপ্রকারের কালোর মাঝে সর্বপ্রকারের আলোর সমপরিমাণ টুকরোগুলিকে বোঝায়। আর, সেজন্যই শব্দটি বহুভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কতভাবে, তার নিদর্শন পাওয়া যায় **দিন** যুক্ত শব্দগুলিতে। যথা —**দিনকত, দিনকতক, দিনকর, দিনকর্ত্তা, দিনকানা, দিনকাল, দিনক্ষয়, দিনচর্য্যা, দিননাথ, দিনপতি, দিনপাত, দিনবল, দিনভর্ত্তা, দিনমণি, দিনমান, দিনমুখ, দিনযৌবন, দিনরত্ন, দিনরাজ, দিনাংশ, দিনাগম, দিনাত্যয়, দিনান্ত, দিনান্তর, দিনাবসান, দিনারি, দিনেশ্বর, দিনৈক, দৈনন্দিন, দৈন্য** ইত্যাদি। আর, যেহেতু এর ভিতরে 'অংরূপিণীর' অস্তিত্ব রয়েছে, শব্দটি একই সঙ্গে অলৌকিকও বটে। সেকারণেই আরবিতে ইসলামী অধ্যাত্মবাদ পর্যন্ত প্রসারিত হতে পেরেছে, যদিও তাঁরা এর বানান লেখেন 'দীন্'। সেই সুবাদে 'দীন্ ইসলাম' কথাটির মানে দাঁড়ায় 'আলোকিত ইসলাম'। যেহেতু বাগদাদের ইসলাম কার্ডোভা হয়ে ইয়োরোপে ছড়িয়েছিল, সম্ভবত 'আলোকিত ইসলাম'-এর এই ধারণাটিই পরে ইয়োরোপের 'enlightenment'-এর ধারণায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।

দ্যুৎ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : জুআ, জুয়া, জুয়াচুরি, জুয়াড়ি, জোচ্চুরি(রী), জোছনা, জ্যোতি, জ্যোতিঃ, জ্যোতিরিঙ্গ, জ্যোতিরিঙ্গণ, জ্যোতির্ব্বিৎ, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, জ্যোতির্ম্মণ্ডল, জ্যোতির্ম্ময়, জ্যোতির্লোক, জ্যোতিশ্চক্র, জ্যোতিষ (দ্র. প্রাগ্জ্যোতিষ, প্রাগজ্যোতিষপুর), জ্যোতিষিক, জ্যোতিষী, জ্যোতিষ্ক, জ্যোতিষ্টোম, জ্যোতিষ্মান, জ্যোতিষ্মতী, জ্যোৎস্না, জ্যোতিপ্রিয় (চকোর), জোনাই, জোনাক, জোনাকি, জ্যৌতি, জ্যৌতিষিক, জ্যৌৎস্ন, দ্যুৎ, দ্যুতি, দ্যুতিকর, দ্যুতিত, দ্যুতিমান, দ্যো, দ্যোত, দ্যোতন, দ্যোতনা, দ্যোতনিকা, দ্যোতমান, দ্যোতি, দ্যোতিত, দ্যোতী, প্রদ্যোত, বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, বিদ্যুদ্গর্ভ।

দ্যুৎ = নবরূপী দান থাকে যাহাতে তাহার উল্লম্ফন বা তারণ।

জুয়া (জুয়াখেলা, জুয়াচুরি, জুয়াচোর, জুয়ার, জুয়াড়ী, জুয়ারী) : ২. **জুয়া** = *নবরূপে উত্তীর্ণ জনন যায় যাহাতে।* **জুয়াখেলা** = **জুয়া** *রূপী খেলা।* **জুয়াচুরি** = **জুয়ার** *মাধ্যমে যে 'চুরি করা' চলে।* **জুয়ার** = **জুয়া** *রহে যাহাতে।* **জুয়াড়ী** = **জুয়াতে** *গড়ান-উড়ান যে গতিশীল সত্তার।* **জুয়ারী** = **জুয়া** *গতিশীলভাবে রহে যাহাতে।* / **জুয়াচোর** = যে জুয়াচুরি করে। **জুয়ার** (জুয়ারী) = যে জুয়া খেলে। (ব.শ.)। ৩. **জুয়া** = দ্যুত, পণপূর্ব্বক খেলা, পাশকাদিক্রীড়া, বাজির খেলামাত্র, বিবাহান্তে বরকন্যার ক্রীড়ারূপ স্ত্রী-আচারবিশেষ। **জুয়াখেলা** = দ্যুতক্রীড়া। **জুয়াচুরি** (জোচ্চুরি) = জুয়া দ্বারা অপহরণ, কপটতাপূর্ব্বক আত্মসাৎকরণ। **জুয়ার** (জুয়ারি, জুয়ারী) = দ্যুতকার। (ব.শ.)। ৪. gambling অর্থে প্রচলিত। ৫. ব.শ. জানিয়েছেন, সংস্কৃত শব্দ **দ্যুত** থেকে **জুয়া** শব্দটি বিবর্তিত হয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তার মানে, **জুয়া, জুয়াড়ী, জুয়ার, জুয়ারী** ইত্যাদি শব্দগুলি বাংলাভাষীর নিজস্ব অর্জন। এখন প্রশ্ন হল,

দ্যুত শব্দটি **জুয়া** শব্দে বদলে যেতে পারল কী করে? **দ** বদলে যাবে **জ**-এ, বাংলায় এরকম কোনো নিয়ম নেই; আমাদের জিভ যন্ত্রটিও তার পক্ষে সায় দেয় না। তাহলে?

আমরা দেখছি, 'যে আচরণ দ্বারা নবরূপে উত্তীর্ণ (?)-দাতা তারিত হয়' তাকে বলে **দ্যুত**। আর, 'যে আচরণ দ্বারা নবরূপে উত্তীর্ণ জাত (বিপরীত দিকে) যায়' তাকে বলে **জুয়া**। সহজ করে বললে কথাটি দাঁড়ায় এরকম — **দ্যুতক্রীড়া** বা **অক্ষক্রীড়া**র মাধ্যমে লেনদেন চলে, তা সে যে বস্তুর লেনদেনই হোক না কেন। এই আচরণটিকে লেনদেনকারী পক্ষ দুটি দেখছে না, দেখছে তৃতীয় পক্ষ। কিন্তু আচরণটিকে যখন পক্ষ দুটি যে-যার নিজের দিক থেকে দেখছে, তখন প্রাথমিকতা লাভ করছে দেওয়ার বিষয়টির উৎপাদন। হাতে কোনো সম্পদ না থাকলে জুয়া খেলা যায় না। **দ্যুতক্রীড়া**র চালটি সেই দিতে পারে, যার হাতে বাজি ধরার বস্তুটি উদ্বৃত্তরূপে উৎপাদিত বা অর্জিত হয়েছে, তা সে টাকা হোক বা অন্য কোনো বস্তু (পণ্যাদিই) হোক। অর্থাৎ কিনা, ক-এর সঙ্গে খ-এর যে বাজি ধরাধরি **ক্রীড়া** চলছে, গ তা দেখলে তাকে বলা হয় **দ্যুত**। কিন্তু সেই একই আচরণ যখন ক-এর বা খ-এর চোখে দেখা হয়, তখন তাকে বলা হয় **জুয়া**। তার মানে, **দ্যুত** শব্দে লেনদেনটাই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাভাষী সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকেনি। সে লেনদেনের বস্তুটির উৎপাদনকে প্রাথমিকতা দিয়েছে। আর সেজন্যেই সে **দ্যুত** থেকে **জুয়া**য় উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পেরেছে। দ্র. **জ্যোতি**।

জ্যোতি (জ্যোতিঃ, জ্যোতিকণ, জ্যোতিঃশাস্ত্র, জ্যোতিরিঙ্গ, জ্যোতিরিঙ্গণ, জ্যোতির্ব্বিৎ, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, জ্যোতিষ, জোতিষী, জ্যোতিষ্ক) : **১.** জ্যোতিঃ = ✓দ্যুত্ + ইস্ (ইসিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***জ্যোতি*** *= নবরূপে উত্তীর্ণ জনিত-শক্তির গতিশীল তারণ যাহাতে।* ***জ্যোতিঃ*** *=* ***জ্যোতি****-র নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে।* ***জ্যোতিকণ*** *=* ***জ্যোতি****র কণা।* ***জ্যোতিঃশাস্ত্র*** *=* ***জ্যোতিঃ*** *বিষয়ক শাস্ত্র যাহা।* ***জ্যোতিরিঙ্গ (জ্যোতিরিঙ্গণ)*** *=* ***জ্যোতি****র ইঙ্গ অন (ing on) যাহাতে (দ্র.* ***জোনাকী****)।* ***জ্যোতির্ব্বিৎ (জ্যোতির্ব্বিদ্)*** *=* ***জ্যোতিঃ*** *বিষয়ে বিদিত যিনি।* ***জ্যোতির্ব্বিদ্যা*** *= যাহার দ্বারা* ***জ্যোতিঃ*** *বিষয়ে বিদিত হওয়া যায়।* ***জ্যোতিষ*** *= যাহার সাহায্যে* ***জ্যোতি*** *হইতে* ***ইষ্ট*** *পাওয়া যায়।* ***জ্যোতিষী*** *=* ***জ্যোতিষ*** *জানেন যিনি।* ***জ্যোতিষ্ক*** *=* ***জ্যোতি****-র প্রকাশ করে যে।* / **জ্যোতিঃ** = প্রকাশ করে যে; অথবা, যে পদার্থের দ্বারা দর্শন সাধিত হয়। **জ্যোতিরিঙ্গ** = যাহা জ্যোতিঃ ও গতিশীল। (ব.শ.)। **৩. জ্যোতি** = দীপ্তি, প্রভা, তেজঃ। **জ্যোতিঃ** = দীপ্তি, দ্যুতি, প্রকাশ, দীপক, তেজোময় পদার্থ, কিরণ, ব্রহ্মতত্ত্বরূপ তেজঃ, আলোক, নক্ষত্র, গ্রহাদি জ্যোতিষ্ক, প্রকাশয়িতা, আন্তরনেত্র, দৃষ্টি, স্বর্গলোক, জ্যোতিষশাস্ত্র, সূর্য্য ও চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বিষ্ণু, মেথিকা। **জ্যোতিঃকণ** = অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। **জ্যোতিঃশাস্ত্র** = জ্যোতির্বিদ্যা। **জ্যোতিরিঙ্গ (জ্যোতিরিঙ্গণ)** = খদ্যোত। **জ্যোতির্ব্বিৎ (জ্যোতির্ব্বিদ্)** = জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ, জ্যোতিষী (astronomer, astrologer)। **জ্যোতির্ব্বিদ্যা** = জ্যোতিঃসম্বন্ধী শাস্ত্র। **জ্যোতিষ (জ্যোতিষী)** = জ্যোতিঃসম্বন্ধী, জ্যোতির্বিষয়ক, জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ, জ্যোতির্ব্বিৎ, গণক, দৈবজ্ঞ, গ্রহনক্ষত্রাদিগতি-প্রভৃতির প্রতিপাদক শাস্ত্র, বেদাঙ্গবিশেষ। **জ্যোতিষ্ক** = গ্রহতারানক্ষত্রাদি, চিত্রকবৃক্ষ, মেথিকাবীজ, মেরুশৃঙ্গ বিশেষ। **৪.** light অর্থে **জ্যোতি**, astronomer অর্থে **জ্যোতির্ব্বিদ**, astrologer অর্থে **জ্যোতিষী** প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **অশ্বিন্যাদি দক্ষকন্যা, ইষ্ট, গণক, গ্রহ, নক্ষত্র, প্রাগজ্যোতিষ, প্রাগজ্যোতিষপুর**। যথারীতি **জুয়া** শব্দের মতো **জ্যোতি** শব্দের ক্ষেত্রেও আমরা প্রথম যে-প্রশ্নের মুখোমুখি হই, তা হল **দ্যুতি** কেমন করে **জ্যোতি** হয়ে গেল? ব.শ. যথারীতি জানিয়েছেন, শব্দটির মূলে রয়েছে **দ্যুত্** ক্রিয়া। তো, দেখা গেল, **দ্যুতি** ও **জ্যোতি** শব্দ দুটি একই বস্তুকে বোঝালেও, তাকে কোন দিক থেকে দেখা হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করেই বদলে যায়, তাকে **দ্যুতি** বলা হবে, নাকি **জ্যোতি** বলা হবে। যাঁরা **দ্যুতি**কে দেখছেন, তাঁদের পক্ষে তাকে **দ্যুতি** বলাই স্বাভাবিক; কিন্তু **দ্যুতি**র নিজের দিক থেকে নিজের প্রকাশ ঘটানোকে দেখলে, তাকে বলতে হবে **জ্যোতি**। অর্থাৎ কিনা, শিখাবান মোমবাতির বা মোমবাতির ধারকের দৃষ্টিতে শিখাটিকে **জ্যোতি** বলাই শব্দরীতিসম্মত, কিন্তু যারা সেই শিখাটি দেখছে, তাদের দৃষ্টিতে শিখাটিকে **দ্যুতি** বলাই উচিত।

স্বাভাবিক নিয়মেই শব্দটি **জ্যোতি**-প্রকাশক সমস্ত প্রকারের তেজোময় পদার্থকেই সত্তাকেই শনাক্ত করে থাকে, তা সে বাহ্যিক **জ্যোতি** হোক আর মানসিক **জ্যোতিই** (ব্রহ্মতত্ত্বরূপ তেজঃ) হোক। এমনকি তেজের আধার 'মেথিকা' বা মেথিশাকের বীজই হোক, আর 'নয়াফটকি' স্বর্ণলতাই হোক। শুধু তাই নয়, যে-জ্যোতি ইঙ্গ-অন (ing on) করে, অর্থাৎ জ্যোতি-নিঃসারণ করে করে চলতে থাকে, সেই জোনাকীপোকাকেও **জ্যোতি** শব্দ সহযোগে উল্লেখ করা হয়। তবে, আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা অবশ্য এলোমেলোভাবে এই **জ্যোতি**কে চিহ্নিত করেননি। তাঁরা মনোলোকের আকাশ, বাহ্য-আকাশ, এবং সামাজিক আকাশ, এই তিন-আকাশের তিন শ্রেণীর **জ্যোতিষ্ক**কে চিহ্নিত করেছিলেন। কেবল তাই নয়, তিন আকাশেই **উত্তরায়ণ** ও **দক্ষিণায়ন**কেও একই সঙ্গে শনাক্ত করে ছিলেন।

এই শব্দ দুটিকে বোঝার ক্ষেত্রে সবার আগে ঠিক করতে হয়, আপনি বাহ্যিক **উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়নে**র মানে বুঝতে চাইছেন, না কি মানসিক-সামাজিক **উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়নে**র মানে বুঝতে চাইছেন। বাহ্যিক মানে জানতে চাইলে ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থ পড়ে নিলেই হবে। আরও অধিক জানতে চাইলে Astronomy-র উচ্চতর গ্রন্থের শরণাপন্ন হতে পারেন। কিন্তু মানবসমাজের অর্থনৈতিক বিশ্বে কখন **উত্তরায়ণ** ও **দক্ষিণায়ন** হচ্ছে না হচ্ছে, সেসব বুঝতে গেলে আপনাকে পড়তে হবে ভারতীয় **জ্যোতির্ব্বিদ্যা** বা **জ্যোতিষী**বিদ্যা যা কিনা একই সঙ্গে Astronomy ও Astrology উভয়কে বোঝায়। তখন এমন হতেও পারে যে, আপনি তিনটি সমান্তরাল দুনিয়াকে একই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন। প্রথম ক্ষেত্রে পাবেন Astronomy-র দুনিয়াটা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাবেন মানবসমাজের অর্থনৈতিক (money-নৈতিক) বিশ্ব বা Astrology-র দুনিয়াটা, এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে পেতে পারেন মনোলোকের (ব্রহ্মলোকের) অর্থনৈতিক (meaning-নৈতিক বা মানেনৈতিক) বিশ্ব। আর, অবাক হয়ে দেখবেন যে, তিনটি বিশ্বেই রয়েছে যে-যার নিজস্ব বিশাল আকাশ, তার নিজস্ব সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-

তারাসহ তাদের নিজ নিজ পৃথিবীটাও, এবং তার **উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন**ও যথারীতি বর্ত্তমান রয়েছে। যে বিশ্বের গল্প রয়েছে Astronomy-তে, তাকে পৃথকভাবে অনেক বিস্তারিত ভাবে উদঘাটন করেছেন একালের বিজ্ঞানীরা, সুতরাং তার কথা বাদ দিন। আপনি দ্বিতীয় বিশ্বে যান। এটি Economic বিশ্ব, যার উত্তরাধিকার প্রেক্ষাপট ভুলে গিয়ে আমাদের জ্যোতিষীরা আজও চর্চা করে চলেছেন। এখানকার **সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা**দের কথা, **তিথি** ও **অতিথি**দের কথা, এখানকার **উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন**কে দেখবার ও বুঝবার চেষ্টা করুন। দেখবেন, মানবসমাজের ধনসম্পদের **জ্যোতি** প্রায় একই নিয়মে মানবসমাজের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারাদের মাঝে সক্রিয় রয়েছে, ঠিক যেভাবে Astronomy-র দুনিয়াতেও রয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্যও আপনার চোখে পড়বে, সেই পার্থক্য দুরকমের। Economic বিশ্বে এমন কিছু সত্তাকে পাবেন, যাদের Astronomy-র বিশ্ব এখনও চিহ্নিত করতে পারেনি। আর, একরকম পার্থক্য চোখে পড়তে পারে যা কিনা আসলে মানবসমাজের বিকৃতি, যেখানে সে তার প্রাকৃতিক স্বভাব থেকে নিজদোষে খানিকটা সরে গেছে, এবং সেটাই তার সাম্প্রতিক দুঃখের কারণ। এই পার্থক্যের মধ্যে Astronomy-র **উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন** ও Astrology-র **উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন**-এর ব্যাপারটিও রয়েছে। Astronomy-র **উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন** একালের Astronomy-বিশেষজ্ঞদের কৃপায় আপনি বিস্তারিতভাবে জানেন। কিন্তু Astrology-র **উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন** আপনি বিস্তারিত ভাবে জানেন না। এই কাজ করে রাখার কথা ছিল একালের অর্থনীতিবিদগণের। কিন্তু তাঁদের অতি-খণ্ডবাদিতার জন্য তাঁরা তা করে উঠতে পারেননি। পারলে আমরা জানতে পারতাম, কেন **উত্তরায়ণ**-এর সময় **দেবতা**রা ঘুমায় (একালের ভাষায়, পুঁজিপতিদের মন্দা চলে)। এই ঘুমানোর তথ্যটি দিয়ে গেছেন আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতেরা। এই ধারণাকে একালিকরণ করলে মানে দাঁড়ায় — পুঁজিবাদীদের রমরমার কাল হল **দক্ষিণায়ন** এবং সমাজতন্ত্র-বাদীদের রমরমার কাল হল **উত্তরায়ণ**।

জ্যোৎস্না (জোছনা, জ্যোৎস্নাপ্রিয়), ১. জ্যোতিস্ + ন অস্তর্থে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *জ্যোৎস্না = যে-জ্যোৎ (= নবরূপে উত্তীর্ণ জনিত-শক্তির গতিশীল তারণ) উদ্বর্তনপূর্ব্বক ক্ষালন করে; অর্থাৎ যে কিরণধারা স্নান করায়।* ***জোছনা*** *= যে নবরূপে উত্তীর্ণ জনিত সত্তা ছাদন করে, তাহার আধার।* ***জ্যোৎস্নাপ্রিয় = জ্যোৎস্না*** *যাহার প্রিয়।* ৩. চন্দ্রকর, কৌমুদী, জ্যোৎস্নাযুক্ত রাত্রি, জ্যোতির্যুক্তকাল, দুর্গা, পটোলিকা, ঝিঙ্গা। **জোছনা (জোচ্ছনা)** = জ্যোৎস্না। **জ্যোৎস্নাপ্রিয়** = চকোর। (ব.শ.)। ৪. moonlight অর্থে প্রচলিত। তবে **জ্যোৎস্না**র পরিবর্তে **জোছনা** শব্দটিই অধিক প্রচলিত। ৫. দ্র. **চকোর**। জ্যোৎস্না শব্দটি যেভাবে প্রসূত, তাতে বোঝা যায়, যে-আলোকণার স্রোতধারা পৃথিবীকে, তার সমস্ত বাহ্য অস্তিত্বকে, স্নান করায়, তাকে জ্যোৎস্না বলে। আর, **জ্যোৎস্নাপ্রিয়** কেন চকোরকে বোঝায়, তার জন্য **চকোর** অবশ্য দ্রষ্টব্য।

দ্রা ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিনিদ্র, অনিদ্র, দ্রা, দ্রাক্, দ্রাক্ষা, দ্রাণ, তন্দ্রা, নিদ্রা, মুদ্রা, হরিদ্রা।
দ্রা = দান-রক্ষকের ধারণ; দান-রক্ষকের আধার যে।

দ্রাণ (দ্রা, দ্রাক্ষা, তন্দ্রা, নিদ্রা, মুদ্রা, হরিদ্রা) : ১. √দ্রা + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দ্রা = আবর্তমান স্বরূপদানের আধার যে; অথবা, দ্রাবিত হয়ে যায় যে।* ***দ্রাক্ষা*** *= দ্রা-র ক্ষ-অনের আধার যে।* ***দ্রাণ*** *=* ***দ্রা*** *অন (on) যাহাতে।* ***তন্দ্রা*** *= তন* ***দ্রা*** *যাহাতে।* ***নিদ্রা*** *= নিহিত* ***দ্রা*** *যাহাতে।* ***মুদ্রা*** *= নবরূপে উত্তীর্ণ সীমায়ন দ্রাবিত হয় যাহাতে।* ***হরিদ্রা*** *= হর গতিশীলভাবে দ্রাবিত যাহাতে।* / **নিদ্রা** = যে অবস্থায় জীব অচেতন হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে। (ছা.অ.)। ৩. **দ্রাণ** = নিদ্রিত, পলায়িত, নিদ্রা, পলায়ন। দ্রা = পলায়ন, নিদ্রা। **দ্রাক্ষা** = লতাবিশেষ, দ্রাক্ষাফল, গোস্তনী। **তন্দ্রা** = ঈষৎ নিদ্রা, আলস্য ... ইত্যাদি। **নিদ্রা** = সুপ্তি, তন্দ্রা (নিদ্রার অন্তে ও আদিতে আলস্য), তত্ত্বাপ্রতিবোধ। **মুদ্রা** = প্রত্যয়কারিণী, নামের মোহর (seal), নামাক্ষরযুক্ত অঙ্গুরীয়, লিপিবিশেষ, স্বর্ণরৌপ্যাদি-মুদ্রা, চিহ্ন, শরীরে ধার্য্য ভগবদায়ুধাদিচিহ্ন, প্রতিষ্ঠাজ্ঞাপনার্থ মুদ্রা (medal), তালা (lock), নিবর্ত্তকদ্রব্য, ছিপি, গূঢ়বিষয়, ভঙ্গি, মুদ্রণ, নিমীলন, সঙ্কোচ, গীতবাদ্যাদিকালে অঙ্গভঙ্গি, পূজাজপধ্যান প্রভৃতিতে দেবতাবিশেষের প্রীতিকরী বিবিধ করাঙ্গুলিরচনা, অলঙ্কারবিশেষ, মুদ্রারাক্ষস রূপক, স্ফটিক বা হস্তিদন্তের কুণ্ডল। **হরিদ্রা** = হরিত-বর্ণগত, ওষধিবিশেষ, পীতা, হলুদগাছ। (ব.শ.)। **নিদ্রা** = সময়বিশেষে শারীরিক ও মানসিক ব্যাপারের বিরাম। (ছা.অ.)। ৪. drowsiness অর্থে **তন্দ্রা** এবং sleeping অর্থে **নিদ্রা** কমবেশি প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. এই **নিদ্রা-তন্দ্রা**র শেষে যে **দ্রা** শব্দটি রয়েছে, সেটি এমনই অদ্ভুত যে তার অর্থ আমাদের অবাক করে। সেই সব কথায় যাওয়ার আগে একটি মজার গল্প দিয়ে শুরু করা যাক। এটি সম্ভবত শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা বাঘ শিকারের গল্প। শিকারী ভদ্রলোকের বাঘ শিকার করতে মাত্র একটি ব্লেড, একটি পেরেক ও একটি হাতুড়ি লেগেছিল। বাঘটি তাঁকে দেখতে পেয়েই ধাওয়া করল, শিকারীও ছুটলেন। শিকারী ছুটছেন, পেছনে পেছনে বাঘও ছুটছে। সামনে বিশাল একটি গাছ। শিকারী গাছের আড়ালে, বাঘ পেছনে। গাছের চারদিকে শিকারী ঘুরছেন, পেছনে বাঘ ঘুরছে। শিকারীর সামনে বাঘের লেজ, পেছনে বাঘের মুখ; হঠাৎ পকেট থেকে ব্লেডটা বের করে শিকারী বাঘের নাকে মারলেন এক পোঁচ, বাঘের নাকটা কেটে গেল। তারপর সামনে বাঘের লেজটাকে নিশানা করে তাতে পেরেক বসিয়ে সজোরে মারলেন হাতুড়ি। লেজটি চেপে বসে গেল গাছের কাণ্ডে। আর, তৎক্ষণাৎ নাকের কাটা-অংশটা ফেটে বাঘটা সবেগে বেরিয়ে লাফ দিয়ে পড়ে মরে গেল, গাছের গায়ে ঝুলতে লাগল তার চামড়াটা। এই হল ভদ্রলোকের বাঘশিকার!

কোনো এক মহাসুনামির কারণে, অনেকটা এভাবেই কোনো মানুষ যদি তার গ্রাম ছেড়ে, ঘর ছেড়ে পরিবার নিয়ে পালায়, তারপর পালাতে পালাতে একসময় পরিবার-পরিজনকেও ছেড়ে দিয়ে জ্যান্ত শরীরটুকু নিয়ে পালাতে থাকে, তারপর এমন উদ্ভট ছুটন্ত আচরণ করতে থাকে যে, পারলে সে শরীরটাকেও ছেড়ে দিয়ে প্রাণটুকু

নিয়ে পালাতো ... ... এরকম পলায়নকে কী বলা হবে?

আমরা তো প্রথমে ভেবেই পাইনি যে, **দ্রা** শব্দের অর্থ 'পলায়ন' কেন? **নিদ্রা-তন্দ্রা-হরিদ্রার** সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কীরূপ? পূর্বসূরীগণের অভিধানাদিতে আমরা দেখছিলাম, যে-সত্তার ভিতরে **দ্রা** অন (on) হয়ে রয়েছে, সে 'নিদ্রিত' বা 'পলায়িত'। ক্রমে 'নিদ্রিত' শব্দের এরকম একটা মানে বোঝা গেল যে — জীবদেহকে একটি রথ ভাবলে, তার সারথি পালিয়েছে; নৌকা ভাবলে মাঝি পালিয়েছে; প্রাইভেট কার ভাবলে তার ড্রাইভার পালিয়েছে; আর সেকারণেই সে **তন্দ্রা**গত-**নিদ্রা**গত বা নিদ্রিত। আর একটু গভীরে ঢুকতেই ব্যাপারটির প্রকৃত রহস্য চোখে পড়তে লাগল।

প্রকৃতপক্ষে, বাহ্য অস্তিত্বমাত্রই কোনো-না-কোনো ধরনের অণুর সমন্বয়। প্রতিটি সমন্বয়ের গঠনগত বৈশিষ্ট্য থাকে এবং সেই বৈশিষ্ট্য প্রতিটি পদার্থের (এলিমেন্ট-এর) স্বকীয়। কোনো কারণে সেই বৈশিষ্ট্য বিপর্যস্ত হয়ে গেলে লোহা তার লৌহরূপ হারায়, সোনা তার স্বর্ণরূপ হারায়। অণুর সমন্বয়ের এই গঠনগত বৈশিষ্ট্য তার চূড়ান্তে পৌঁছালে পদার্থটি তার আত্মস্বরূপের এমন উচ্চতায় পৌঁছায় যে, পদার্থটির মধ্যে একধরনের আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষম কেন্দ্রীয় শক্তি জন্মায়; তখন তাকে 'সজীব পদার্থ' বলে। আর, সমন্বয়ের সেই গঠনগত বৈশিষ্ট্য সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছালে পদার্থটির আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও সর্বোচ্চ হয়ে যায়, তখন সেই 'সজীব পদার্থ'কেই 'মানব' বলে। তার মানে, এই পৃথিবীতে মানুষ থেকে শুরু করে '**ত্রসরেণু**' কিংবা 'পরমাণু' পর্যন্ত প্রতিটি অস্তিত্বের ভিতরে যে-যার নিজ নিজ গাঠনিক-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই গাঠনিক-বৈশিষ্ট্যই অস্তিত্বটিকে তার 'স্বরূপ দান (দ্) করে'। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এই গাঠনিক-বৈশিষ্টকেই বলেছেন অস্তিত্বের '**স্বরূপলক্ষণ**'। দ্র. **তট, তটস্থলক্ষণ**।

স্বরূপদাতা এই গাঠনিক-বৈশিষ্ট্যটি আবার বিশেষ নিয়মে চলে, যাকে বলা হয় জাগতিক নিয়ম — দ্র. **জগৎ**। এ জন্মায়, বড় হয়, তারপর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে অন্যতর রূপে উত্তীর্ণ হয়। তার মানে, পদার্থের 'স্বরূপদাতা অণুসমূহের গাঠনিক-বৈশিষ্ট্য'টির স্বভাবের মধ্যে একপ্রকার আবর্তন (**ঋ > র্**) রয়েছে। অর্থাৎ কিনা, প্রতিটি পদার্থের মধ্যে গাঠনিক-বৈশিষ্ট্য রূপে তাদের নিজ নিজ 'স্বরূপদায়ক আবর্তন' (= **দ্র্**) বা '**স্বরূপলক্ষণ**' বিদ্যমান রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, এই 'স্বরূপদায়ক আবর্তন' বা **দ্র্**-কে যদি আধার (**অ**) যুক্ত করে দেওয়া হয়; অর্থাৎ যদি পদার্থ থেকে সরিয়ে তার 'স্বরূপদায়ক আবর্তন'কে অন্য কোথাও রাখা হয়, তখন তার ক্রিয়া ও অভিধা দুটোই বদলে যায়। তখন ক্রিয়াটি হয়ে যায় (বস্তু থেকে তার) '**স্বরূপদায়ক আবর্তনের বা দ্র্-এর পৃথকীকরণ**' এবং অভিধাটি হয়ে যায় **দ্র**।। অর্থাৎ **দ্র** হওয়া মানে বস্তুর স্বরূপ ত্যাগ করে তার আবর্তনমূলক স্বরূপদাতার অন্যত্র **হাঁটা** দেওয়া। এবার সেই **দ্র**-এর সঙ্গে আর একটি **অ** জুড়ে দিলে, স্বরূপদানী কেবল হাঁটাই দেয় না, দৌড়াতে শুরু করে। ব্যাপারটিকে আমরা খুব সহজেই দেখতে পাব **দ্রব** শব্দে। — অতএব **দ্রা** মানে 'আবর্তনমূলক স্বরূপদাতার স্বরূপ ভেঙে ও ছেড়ে চলে যাওয়া'। **তন্দ্রা**র বেলায় **তন**কে ফেলে রেখে স্বরূপদাতা মন বা আত্মা পালায়। আর **নিদ্রা**র বেলায় স্বরূপদাতা সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপে নিঃসারিত বা **দ্রাত**, অর্থাৎ পলায়িত। **মুদ্রা**র বেলায় (নাম ইত্যাদির) স্বরূপ সীমায়িত রূপে গিয়ে হাজির হয় কোনো আধারে, কাগজে সোনায় বা রুপোয়। ... **হরিদ্রা**র বেলায় অন্য সত্তার ভিতরে থাকা মানুষের ক্ষতিকর গুণাগুণকে সে দ্রাবিত করে বের করে দেয়; অর্থাৎ বস্তুটিকে মানুষের গ্রহণযোগ্য করে সংস্কার করে দেয়। তবে **দ্রাক্ষা**র বেলায় **দ্র** করা হয় তার রসকে। অবশ্য যাঁরা আঙুর গাছ ও তার ফল বিষয়ে যথেষ্ট জানেন, তাঁরা বিষয়টি আমাদের চেয়ে অনেক ভালো বলতে পারবেন।

যাই হোক, এখন পর্যন্ত আমরা যতদূর বুঝেছি, তাতে আমরা বলতে পারি, মানুষের আদি জ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা নিশ্চয় মনে করতেন যে, সজীব সত্তা মাত্রেই আসলে একপ্রকার যৌথতা — 'দেহ ও মন', 'শরীর ও শরীর-পরিচালক মন বা আত্মা', 'চেতনা ও জড়'-এর একপ্রকার যৌথতা। এখন আমরা বুঝলাম, এই চেতনা আসলে 'আবর্তনমূলক-স্বরূপদায়ী অণুসমূহের সমন্বয়-বৈশিষ্ট্য'ই বটে। সেই চেতনা যখন পালিয়ে যায়, তখনই জীবশরীরটি **নিদ্রা**গ্রস্ত বা **তন্দ্রা**গ্রস্ত হয়। দেহপরিচালক চেতনার এই পলায়নই **দ্রা**। দেহকে গতিশীলতা দান করে এই দেহপরিচালক চেতনাই। সেই চেতনাই সজীব সত্তার সচলতা-দাতা, গতিদাতা। সে যখন পালায়, তখনই জীব নিদ্রাগ্রস্ত বা তন্দ্রাগ্রস্ত হয়। দ্র. **দ্রব**।

এই যে একটি পদার্থের স্বরূপদায়ক সত্তার পলায়ন, একে আমরা দেখছি পদার্থটির তরফ থেকে। তাই আমাদের কাছে **দ্র** হল ঘর ভেঙে, ঘর ছেড়ে পালানো। ইংরেজ এই ক্রিয়াকে দেখে উলটো দিক থেকে। সে একে বলে draw (**দ্র**), অর্থাৎ সত্তাটিকে টেনে ঘর থেকে বাইরে আনা; **দ্র**-এর গমন (**গ্**) করা বা drag (দ্রগ্) করা। যে পথ দিয়ে সেই সত্তাটিকে টেনে টেনে চলা বা draw করা বা drag করা হয়, তাকে তারা drawing বলে। তবে drug কথাটির সম্পর্ক রয়েছে **দ্রু**-র সঙ্গে, যার থেকে **দ্রব্য** হয়।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পদার্থটির তরফ থেকে ক্রিয়াটিকে ইংরেজ দেখতেই পায় না। সেভাবে যখন সে দেখে, তখন সে তাকে বলে drow, drown, drowse, drowsy ইত্যাদি। হ্যাঁ, পূর্বপুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় তাকে বলতে হয় শব্দগুলির 'উৎস অজ্ঞাত' ('origin unknown')। বলতে কী, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমস্ত মানুষের আদিম পূর্বসূরীরা **দৃর্** বা dr ক্রিয়াটিকে একই রূপে চিনতেন।

৬. ইংরেজি draw, drag, drown, drowse, drowsy।

দ্রু ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : উপদ্রব, উপদ্রুত, দরব, দর(রো)বস্ত (দ্রবস্থ), দুনী, দোন, দোনা, দ্রব, দ্রবকারক, দ্রবজ, দ্রবণ, দ্রবময়ী, দ্রবরস, দ্রবরসা, দ্রবিড়, দ্রবিণ, দ্রবিত, দ্রবীকরণ, দ্রবীভূত, দ্রব্য, দ্রব্যক, দ্রব্যগুণ, দ্রব্যজাত, দ্রব্যবাচক, দ্রব্যবান, দ্রব্যময়, দ্রব্যশুদ্ধি, দ্রব্যসংস্কার, দ্রাব, দ্রাবক, দ্রাবণ, দ্রাবিকা, দ্রাবিড়, দ্রাবিড়ী, দ্রাবিত, দ্রু, দ্রুঘণ(ন), দ্রুণ (drone), দ্রুত, দ্রুতগতি, দ্রুতপদ, দ্রুপদ, দ্রুম, দ্রুমময়, দ্রোণ, দ্রোণকাক, দ্রোণক্ষীরা, দ্রোণদুঘা, দ্রোণাচার্য্য, দ্রোণায়ণ, দ্রোণায়নি, দ্রোণি, দ্রোনী, দ্রৌণি, দ্রৌপদী, দ্রৌপদেয়, ধোড়কাক, বিদ্রবণ, বিদ্রূপ, শতদ্রু।

দ্রু = দান-রক্ষণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।

দ্রব (দ্রবণ, দ্রবিড়, দ্রাবিড়, দ্রাবিড়ী, উপদ্রব) : ১. ✓দ্রু + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *দ্রব = আবর্তমান-স্বরূপদাতা (অস্তিত্বের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য) বাহিত যাহাতে। (দ্র. দ্রা)। দ্রবণ = দ্রব অন (on) যাহাতে। দ্রবিড় = দ্রব-গতিশীল উড়ান-গড়ান যাহাতে। দ্রাবিড় = দ্রবিড় হইতে জাত। দ্রাবিড়ী = দ্রাবিড়-এর গতিশীল আধার যে। উপদ্রব = দ্র. উপ। /* **দ্রব** = যাহা যায়। (ব.শ.)। **৩. দ্রব** = তরল, পাতলা, গলিত, আর্দ্র, রসাত্মক, গতিযুক্ত, গতি, পলায়ন, ক্ষরণ, বেগ, নর্ম্ম, রস, দ্রবদ্রব্য, নিষ্যন্দ, ক্বাথ। **দ্রবণ** = গতিযুক্ত, ক্ষরিত, গতি, বেগ, গলন, ক্ষরণ, নিষ্যন্দ। **দ্রবিড়** = দেশবিশেষ, দ্রবিড়বাসীগণ, ব্রাহ্মণবিশেষ, সবর্ণায় ব্রাত্যক্ষত্রিয়জাত ক্ষত্রিয়ভেদ। **দ্রাবিড়** = পিত্রাদিক্রমে দ্রবিড়দেশবাসী, দ্রবিড়বাসিগণ, দ্রাবিড়দেশ, ক্রিয়ালোপাদি হেতু শূদ্রত্বপ্রাপ্ত দ্রবিড়জাত ক্ষত্রিয়গণ। **দ্রাবিড়ী** = স্ত্রী এলা। (ব.শ.)। **৪.** liquid অর্থে **দ্রব** ও melting solution অর্থে **দ্রবণ** প্রচলিত। বাকি অপ্রচলিত। **দ্রাবিড়** শব্দটি রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যে 'জনগণমন ...' জাতীয় সঙ্গীতে কোনোমতে টিকে থেকে গেছে। **৫. দ্র. দ্রা**। পদার্থের **দ্র** (= স্বরূপদাতা গঠনগত বৈশিষ্ট্য) আপনার অবস্থান ত্যাগ করে চলে গেলে পদার্থটি আর স্বরূপে থাকতে পারে না, গলে যায়, ক্ষরিত হয়। এই 'গলে যাওয়া' ক্রিয়াকে বহন করে যে, তাকে বলে **দ্রব**। ভারতসমাজের যৌথ-অস্তিত্ব ত্যাগ করে যারা বিন্ধ্যপর্বতের (দ্র. **অগস্ত্য**) দক্ষিণে পালিয়েছিল, তাদের বলা হত **দ্রবিড়**। এঁরা ক্ষত্রিয় হলেও, কোনো সময় এঁরা বেদ-বিরোধিতা করেছিলেন। সেই কারণে সেকালের সমাজশাসকেরা এঁদের **'ক্ষত্রিয়ত্ব'** (রাষ্ট্রীয় কর্মচারী হওয়ার জন্মগত অধিকার) কেড়ে নেন, ক্ষত্রিয়ের যা কিছু ক্রিয়া, সেগুলির বিলোপ ঘটিয়ে এঁদের শূদ্র হওয়া ছাড়া কোনো উপায় খোলা রাখেন না। তখন অনন্যোপায় তাঁরা দলে দলে বিন্ধ্যপর্বতপারে পাঁচটি প্রদেশে পালিয়ে যান। এই **দ্রবিড়**দের উত্তরসূরীদের বলা হয় **দ্রাবিড়**। ব.শ. প্রদত্ত তথ্যানুসারে এই দ্রাবিড় জাতি পাঁচ প্রকারের — কর্ণাটকবাসী, ত্রিকলিঙ্গবাসী, গুজরাটবাসী, অন্ধ্রবাসী, ও দ্রাবিড়বাসী — বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণ দিকে বাসকারী এঁরাই 'পঞ্চ-দ্রাবিড়'। শাসক 'পঞ্চ-**গৌড়**'-এর (দ্র. **গড়**) পাশাপাশি এঁরাই বিতাড়িত 'পঞ্চ-দ্রাবিড়'। মানবজগতের এই বিতাড়ন প্রক্রিয়াকে আমাদের জ্ঞানী প্রাচীন পুরুষেরা বাহ্যজগতে আবিষ্কার করেছিলেন **দ্রাবিড়ী** বা এলাচ-এ। অন্নব্যঞ্জনে তা প্রয়োগ করলে, সব দুর্গন্ধ বিতাড়িত হয়। ... **উপদ্রব** শব্দটির জন্য **উপ** দেখুন। **৬.** প্রাচীন, অর্থাৎ প্রাক্-খ্রিস্টীয়, ব্রিটেন, গল (= ফ্রান্স), ও জার্মান দেশে তৎকালে বসবাসকারী Celt (কেল্ট্) জাতির অনেক আচার-আচরণ আধুনিক পণ্ডিতদের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। এদের পুরোহিতকে বলা হত druid। এই শব্দটি 'দ্রবিড়' শব্দের জ্ঞাতিশব্দ।

দ্রব্য (দ্রব্যময়, দ্রব্যসংস্কার) : ১. ✓দ্রু + য (যৎ)। (ব.শ.)। **২.** *দ্রব্য = দ্রব থাকে যাহাতে। দ্রব্যময় = দ্রব্য-প্রচুর দ্বারা সীমায়িত যে। দ্রব্যসংস্কার = যাহাতে দ্রব্যকে সংস্কার করা হয়। /* **দ্রব্য** = অভিপ্রেত অর্থের পাত্রভূত যে। **দ্রব্যময়** = যাহা হইতে দ্রব্যকে সাধন করার কর্ম্ম সাধিত হয়। (ব.শ.)। **৩. দ্রব্য** = আত্মবান্, দ্রুমবিকারজাত, দ্রুমাবয়ব, বৃক্ষনির্য্যাস, উপকরণ, ভেষজ, বিলেপন, সুবর্ণাদিধন, বিত্ত, পিত্তল, জতু, (বৈশেষিকে) পৃথিব্যাদি নববিধ, পণ, মদ্য, যোগ্যপাত্র, সুপাত্র, বিনয়। **দ্রব্যময়** = যজ্ঞ। **দ্রব্যসংস্কার** = যজ্ঞার্থ দ্রব্যের শোধন। (ব.শ.)। **৪.** ইংরেজি thing বা article অর্থে **দ্রব্য** প্রচলিত; অন্য দুটি শব্দ অপ্রচলিত। **৫. দ্র. দ্রা, দ্রব**। পদার্থের **দ্র** (বা 'স্বরূপদাতা-বৈশিষ্ট্য') ত্যাগ করে যে সত্তা চলে যায়, গলে যায়, **ক্ষরিত** হয় ... তা সব যেখানে গিয়ে থাকে, **দ্রব**-এর সেই রূপটিকে **দ্রব্য** বলে। শব্দটি **দ্রু** ক্রিয়া থেকে প্রসূত। অর্থাৎ, বাইরের কোনো সত্তা থেকে বেরিয়ে ঝরে আমাদের হাতে আসে, যাকে বলা হয় **ক্ষরিত** হয়ে আসা। যেকারণে **ক্ষরিত** বা গলিত সত্তাকে নির্য্যাসও বলে। '**দ্রু** হয়ে গমন করে' বলে একে 'দ্রুগ' বলা যেতে পারে, কিন্তু সে শব্দের উত্তরাধিকার আমাদের নেই, রয়েছে ইংরেজের; তাঁরা একে বলেন drug।

যাই হোক, অতীতে **দ্রব্য** শব্দটির ব্যবহার হত মূলত মানুষের তৈরি করা জিনিস বা article বোঝাতে। যেকারণে উৎপাদন কর্মযজ্ঞকে বলা হত **দ্রব্যময়**। আর, সেই যজ্ঞে যে সকল **দ্রব্য** উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হত, ব্যবহারের আগে তাদের সংস্কার করে নিতে হত, একালেও তা করা হয়, করতে হয়। এই ক্রিয়াকে বলা হত **দ্রব্যসংস্কার**। অনেক দর্জি জামা-প্যান্ট সেলাই করার আগে থানকাপড় ধুয়ে নেন, একে যেমন **দ্রব্যসংস্কার** বলা যেতে পারে, তেমনি রান্নার আগে প্রয়োজন মতো উপকরণগুলিকে ধুয়ে ফেলাকেও **দ্রব্যসংস্কার** বলা যেতে পারে।

দ্রু (শতদ্রু), দ্রুত (উপদ্রুত), দ্রুম : ১. দ্রু = **✓দ্রু** + উ (ডু) - কর্তৃবাচ্যে। দ্রুত = **✓দ্রু** + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। দ্রুম = **✓দ্রু** + ম অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। **২.** *দ্রু = দ্র নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। শতদ্রু = শত (বহু) দ্রু যাহাতে। দ্রুত = দ্রু তারিত যাহাতে। উপদ্রুত = দ্রুত-এর উপ যে; অর্থাৎ, উপদ্রব করা হইয়াছে যাহাতে। দ্রুম = দ্রু সীমায়িত যাহাতে। /* **দ্রু** = যাহা উর্ধ্বে যায়। **দ্রুত** = বেগে গত (যে); যে লয়ে এক মাত্রার কালে দুই-দুইটি সুর উচ্চারিত হয় (দ্রুতলয়)। **শতদ্রু (শতদ্রূ)** = শত ধারা প্রবাহিতা (যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. দ্রু** = বৃক্ষ, শাখা, কাষ্ঠ, কাষ্ঠদ্রব্য। **দ্রুত** = ধাবিত, পলায়িত, স্রুত, ক্ষরিত, দ্রবীভূত, বিড়াল, বৃশ্চিক, লয়বিশেষ, ছন্দোবিশেষ। **উপদ্রুত** = উপদ্রবযুক্ত, বিকারযুক্ত, পীড়িত, বিপ্রকৃত, উপরক্ত, অশুভ। **দ্রুম** = দারুযুক্ত, বৃক্ষ। **শতদ্রু (শতদ্রূ)** = পঞ্জাবের নদীবিশেষ (Sutlej), গঙ্গা। (ব.শ.)। **৪.** quick অর্থে **দ্রুত** এবং disturbed অর্থে **উপদ্রুত** প্রচলিত। **দ্রু** অপ্রচলিত। **৫. দ্রা** ক্রিয়ার বেলায় আমরা সত্তার নির্য্যাসকে গলিত-দ্রবিত হয়ে, সত্তার বৈশিষ্ট্য ভেঙে-ছেড়ে, চলে যেতে দেখেছি। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে তাকে দেখলে, সেই ক্রিয়াটিই অন্য রূপে প্রতীয়মান হয়; মনে হয় বাইরের কোনো সত্তা থেকে কোনো কিছু (তা সে ভাল হোক আর মন্দই হোক) বেরিয়ে উপর থেকে আমার হাতে বা আমার উপর এসে পড়ছে। একেই বলা হয় **দ্রু**, যাতে **দ্র** নবরূপে উত্তীর্ণ। কিন্তু 'বৃক্ষ'কে কেন **দ্রু** বা **দ্রুম** বলে, সহসা তা বোঝা যায় না। কিন্তু যে কোনো সত্তা আপন অস্তিত্বের বর্তমানকে পেছনে রেখে ক্রমশ বিকশিত

হচ্ছে, তাদের প্রত্যেককেই **দ্রুম** বলা যায়। **দ্রু**-র সঙ্গে এর পার্থক্য হল, **দ্রু**-র মধ্যে নিয়ত গতি রয়েছে, যেকারণে শত ধারা প্রবাহিতাকে **শতদ্রু** নদী বলে; যখন কিনা **দ্রুম** প্রতি স্তরে সীমায়িত হয়ে থাকে। এই কারণে **দ্রুম** যেমন প্রাকৃতিক বৃক্ষকে বোঝায়, তেমনি সামাজিক বৃক্ষকেও (সংস্থা) বোঝায়। বলে রাখা ভাল, **দ্রু**-র সঙ্গে 'অ' (আধার) যোগ করলেই তা **দ্রব** হয়ে যায়; অপরদিকে 'ত' যোগ করলে **দ্রুত** হয়ে যায়। আর যে অঞ্চলে **উপদ্রব** করা হয়েছে, সেই অঞ্চল হয়ে যায় **উপদ্রুত** অঞ্চল। এই সেই কারণ, যেকারণে **দ্রুত**-অঞ্চলকে ইংরেজিতে drought-area বলে। তাছাড়া **দ্রুম** করা বা 'কিছু অংশকে আপন পরিধি থেকে বের করে স্তরে স্তরে সীমায়িত করা'কেই তো ইংরেজিতে drum-out করা বলে। বলতে কি, ইংরেজির drouth, drouk, drook, drove, drub ইত্যাদি সমস্ত শব্দই এই **দ্রু** বা **দ্রুম** শব্দেরই জ্ঞাতিভাই বটে।

দ্রুপদ : **২.** / **দ্রু** পদ যাঁহার তিনি। (ছা.অ.)। **৩.** যূপকাষ্ঠের প্রদেশবিশেষ, চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ। ইঁহার পুত্র শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং কন্যা দ্রৌপদী। ... অপমানিত দ্রুপদ দ্রোণবধার্থ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দ্রোণশত্রু পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও ক্ষত্রিয়ান্তকারিণী কন্যা দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হন। দ্রোণ এই ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক নিহত হন এবং দ্রৌপদীর জন্য ভারতসমরে ক্ষত্রিয়গণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইঁহার যজ্ঞজাত পুত্র ও কন্যা সেনাসদৃশ শত্রুনাশক বলিয়া ইনি 'যজ্ঞসেন' নামে খ্যাত। ... (ব.শ.)। ইনি পাঞ্চাল দেশের রাজা ও রাজা পৃষতের পুত্র। এঁর অন্য নাম রাজ্জসেন। ... ইনি দ্রোণের বাল্যসখা। দ্রোণ ও দ্রুপদ প্রথমে ভরদ্বাজের আশ্রমে ক্রীড়া করতেন। ... বাল্যসখা দ্রুপদ একদা দ্রোণকে বলেছিলেন যে, তিনি রাজ্যলাভ করলে সে রাজ্য তিনি দ্রোণকে দেবেন। ... (যথাকালে) দ্রোণ ... সেই সখ্য প্রার্থনা করলে দ্রুপদ বলেন যে, দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে রাজার সখ্য সম্ভব নয়। ... পরে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ... অর্জুন যুদ্ধে দ্রুপদকে বন্দী করে দ্রোণের নিকট উপস্থিত করেন। তখন দ্রুপদ গঙ্গার উত্তরস্থ অহিচ্ছত্র দেশ দ্রোণকে দান করে তাঁর সঙ্গে সখ্যস্থাপন করেন। ... এই অপমানের প্রতিশোধেচ্ছু দ্রুপদ দ্রোণহন্তা পুত্রলাভের জন্য যাজ ও উপযাজ নামে দুই স্নাতক তপস্বী ব্রাহ্মণের সাহায্যে এক যজ্ঞ করেন। ... যজ্ঞাগ্নি থেকে ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে এক পুত্র ও যজ্ঞবেদী থেকে শ্যামাঙ্গী দ্রৌপদী নামে এক কন্যা (যাজ্ঞসেনী বা কৃষ্ণা) উত্থিতা হন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পঞ্চদশ দিনের প্রত্যূষে তিন পৌত্রসহ দ্রুপদ দ্রোণের হস্তে নিহত হন এবং সেই দিনই ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে নিহত করেন। দ্রুপদের অন্য নপুংসক সন্তান শিখণ্ডী ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** **দ্রু**-এর বা সামাজিক উৎপাদন সংস্থাসমূহের উপরে ভর করে যার চলত, সেই সত্তার নাম দ্রুপদ। ভারতের ইতিহাসে আদিম সমাজতন্ত্রবাদী ও আদিম পুঁজিবাদী সত্তাদ্বয়ের দুই অংশী ছিলেন যথাক্রমে **দ্রোণ** ও **দ্রুপদ**। দৈত্যগুরু **শুক্রাচার্য্য** ও দেবগুরু **বৃহস্পতি** যেমন একই পিতা **অঙ্গিরা**র সন্তান, এঁরাও তেমনি একই গুরুর শিষ্য। প্রথম জন **দ্রু** ন করেন (সমাজতান্ত্রিক উৎপন্ন ভাগ করে খেয়ে নেওয়ার নীতি প্রয়োগ করেন?), দ্বিতীয় জন **দ্রু** পদে (ধনতান্ত্রিক উৎপন্ন পালন করে বিনিময়-ভিত্তিক দান করার উপর?) নির্ভরশীল। **যুধিষ্ঠির** ও **দুর্যোধন** শব্দদুটি যেমন একই 'যুধ্' ক্রিয়া দিয়ে তৈরি, **দ্রুপদ** ও **দ্রোণ** শব্দদুটিও তেমনি একই 'দ্রু' ক্রিয়া দিয়েই তৈরি। সামাজিক-ঐতিহাসিক সত্তা রূপে এদের ঘনিষ্ঠতা ও পার্থক্য এখানেই। ...

এখানে অন্য একটি প্রসঙ্গও গুরুত্বপূর্ণ। **দ্রুপদ**-এর যজ্ঞের দুই পুরোহিত ছিলেন যাজ (Judge) ও উপযাজ। যজন করা ও judge করা বা বিচার-বিবেচনা করা একই কথা। দ্র. **যজ্ঞ**।

দ্রোণ (দ্রোণকাক, দ্রোণি, দ্রোনী) : **১.** ✓দ্রু + ন - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। দ্র. **ঘৃতাচী**। **২.** ***দ্রোণ*** = অ **৩.** **দ্রোণ** = দগ্ধকাক, দাঁড়কাক, বৃশ্চিক, চতুঃশতধনুঃ পরিমিত জলাশয়, মেঘনায়ক, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, দণ্ডকলস; আঢ়ক (আট সের), বত্রিশ সের, সোমরসাধার, গৃহ, কাষ্ঠনির্মিত কলস, কাষ্ঠাম্বুবাহিনী, দোন; ধনুর্ব্বেদাচার্য্য। পিতা ভরদ্বাজ, পত্নী কৃপী, পুত্র অশ্বত্থামা। ভরদ্বাজের দ্রোণীস্থ স্খলিত রেতঃ হইতে জন্ম হেতু নাম 'দ্রোণ'। ... এঁর অস্ত্রগুরু পরশুরাম। (ব.শ.)। মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। একদিন গঙ্গাস্নানকালে আর্দ্রবক্ষে প্রায় নগ্ন অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখে কামার্ত ভরদ্বাজের শুক্রপাত হয়। সেই শুক্র দ্রোণ নামে এক যজ্ঞীয় পাত্রে তিনি রক্ষা করেন। সেই যজ্ঞীয় পাত্র থেকে এক পুত্রের জন্ম হয়। দ্রোণ বা পরিমাপক পাত্রে এই পুত্রের জন্ম হয় বলে এঁর নামকরণ হয় দ্রোণ। দ্রোণ ভরদ্বাজের শিষ্য ও অগ্নির পুত্র অগ্নিবেশ্য মুনির কাছে অস্ত্রশিক্ষা করে আগ্নেয়াস্ত্র লাভ করেন। মহর্ষি শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে দ্রোণ পিতৃআজ্ঞায় বিবাহ করেন। এঁদের একমাত্র পুত্র জন্মমাত্র উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় হ্রেষারব করায় অশ্বত্থামা নামে অভিহিত হন। ... দ্রোণ পরশুরামের কাছ থেকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করেন। ... দ্রোণ অতি দরিদ্র ছিলেন। এমনকি নিজপুত্র অশ্বত্থামা দুগ্ধপানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে, তাও দিতে তিনি অক্ষম হন। ... বাল্যসখা দ্রুপদের কাছে বাল্যপ্রতিশ্রুতি মতো সাহায্য চাইলে তিনি তাঁর সখ্য অস্বীকার করেন। ... কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত হবার পর তিনি দ্রুপদরাজ্য দখল করে অর্ধেক রাজ্য দ্রুপদকে দান করে সখ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ... নিজের প্রিয় শিষ্য অর্জুনকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করবার জন্য তিনি নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যের দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ পর্যন্ত গুরুদক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করেন। ... কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণ কৌরবান্নে প্রতিপালিত বলে কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। ... কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ইনি বিরাটপুত্র শঙ্খ ... অর্জুনপুত্র অভিমন্যু, রাজা বৃহৎক্ষত্র, শিশুপাল পুত্র ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্মা এবং দ্রুপদ ও বিরাটকে বধ করেন। ... যুধিষ্ঠিরের মুখে তাঁর পুত্র 'অশ্বত্থামা হত' এই সমাচার শুনে ... তিনি অস্ত্রত্যাগ করে রথের উপরই যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন হন। এই সময় দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণের রথোপরি আরোহনপূর্বক তাঁর ... শিরশ্ছেদ করেন। ... (পৌ.অ.)। দ্রোণকাক = দাঁড়কাক। দ্রোণি, দ্রোনী = জলসেচনার্থ কাষ্ঠাম্বুবাহিনী, দুনী, কদলীত্বগাদিকৃত পাত্রভেদ, ডোঙা, গবাদনী, জলাধার, কলশাকার পাত্রভেদ, কটাহ, শৈলদ্বয়ের সন্ধি, দ্বিসূর্পপরিমাণ, নীলীবৃক্ষ, কদলী। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** যতদূর বোঝা যায় — আমাদের শব্দজ্ঞানী পূর্বপুরুষেরা **দ্রোণ** সত্তাটিকে জড়ের দুনিয়ায় বিশেষ মাপের জলাশয়, দোনা বা দুনি, সোমরসাধার

পাত্র, কাষ্ঠনির্মিত কলস, কাষ্ঠাম্বুবাহিনী (জল সেচন করার কাঠের সেউনি বা দোন) রূপে শনাক্ত করেছিলেন; উদ্ভিদজগতে পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ (দ্রোণপুষ্প, যা কিনা দোন-এর মতো দেখতে), ও দণ্ডকলস বা ডানকুনি গাছকে শনাক্ত করেছিলেন; জীবজগতে দগ্ধকাক বা দাঁড়কাক, বৃশ্চিক (বিছে) এবং মানবসমাজে আইনশাস্ত্র-শিক্ষক বা ধনুর্ব্বেদাচার্য্যকে শনাক্ত করেছিলেন। কারণ, এই সত্তাগুলি প্রত্যেকটিই 'দ্রু ন করত'। ...

যে **কাক** সাধারণ পঙ্‌ক্তিতে বা শ্রেণীতে পড়ে তাকে বলা হয় 'পাতিকাক', আর যারা পাতিকাককে তাড়া করে বেড়ায়, দণ্ড দেয়, তাদের বলে 'দাঁড়কাক'। প্রাচীন ভারতসমাজে বেদব্যবস্থার (অধঃপতিত আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার) সমর্থক যে মহর্ষিগণ মনে করতেন, সমাজ উৎপাদন-ব্যবস্থা চালিয়ে মহর্ষিদের ভরণপোষণ করবে, তাঁদের একটি অংশকে বলা হত **দ্রোণাচার্য্য**। এঁরা কিন্তু নিষ্কলুষ বেদবাদী বা আদিম সমাজতন্ত্রবাদী ছিলেন না। জ্যেষ্ঠভ্রাতা **উতথ্যের পত্নী মমতার** গর্ভে **বৃহস্পতির** ঔরসে যে **ভরদ্বাজ** জন্ম লাভ করেছিলেন, তিনি নির্লোভ থাকতে পারেননি; একালের বহু কমিউনিস্ট যেমন শপিং মল দেখলে লালায়িত হয়ে ওঠেন, অনেকটা সেইরকম লালায়িত হয়েছিলেন **ঘৃতাচী**কে দেখে। বেদবাদী ব্যবস্থার ভেতরে এই **ঘৃতাচী অপ্সরা**কে দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন আরও অন্তত তিনজন মহর্ষি। তা সে যাই হোক, **ঘৃতাচীর** সঙ্গে তাই বলে ভরদ্বাজ মিলিত হয়েছিলেন, এমন কুকথা পুরাণকারগণও বলছেন না। কিন্তু ঘৃতাচী-দর্শনেই **ভরদ্বাজ**-এর যে মনোবিকার ঘটে, তারই ফলস্বরূপ **দ্রোণ**-এর জন্ম হয়। এঁরা পুঁজিবাদের বিরোধী সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজেরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুধসর-ঘৃতের বিশেষ অধিকার ভোগ করতে অভ্যস্ত। সেই কারণে, পুঁজিবাদ এদের ঘৃণা করে; বারবধূ যেরকম গোপন-পরকীয়াকারিণী গৃহবধূকে ঘৃণা করে, সেইরকম। **দ্রোণের** প্রতি **দ্রুপদ**-এর ঘৃণার সেটিই কারণ। সেকারণেই মানবসমাজের **দ্রোণ** সত্তার সঙ্গে পক্ষীসমাজের **দণ্ডকাক**-এর মিল ছিল। তাই তাকেও **দ্রোণকাক** বলা হত।

দ্রৌপদী : **১.** দ্রুপদ + ই (ইঞ্) + স্ত্রী ঈ (ঙীপ্)। (ব.শ.)। **২.** *দ্রুপদ নীতিতে চলে যে আধারশক্তি।* **৩.** দ্রুপদাপত্য স্ত্রী, কৃষ্ণা, ... পাতিব্রত্য হেতু ইনি অহল্যাদি পঞ্চকন্যার একতমা ও প্রাতঃস্মরণীয়া। (ব.শ.)। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের যজ্ঞবেদী হতে উদ্ভূতা কন্যা। দ্রোণবধের জন্য পুত্রলাভেচ্ছায় দ্রুপদ যখন গঙ্গা ও যমুনার তীরে যাজ ও উপযাজ নামে দুই ব্রাহ্মণের সহায়তায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, তখন যজ্ঞাগ্নি হতে বর্ম-মুকুট-খড়্গ-ধনুর্ধারী দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও যজ্ঞবেদী হতে শ্যামবর্ণা সুন্দরী যাজ্ঞসেনী উত্থিতা হন। দ্রৌপদী আজন্ম যুবতী, শ্যামবর্ণা, পদ্মপলাশলোচনা, নীল ও কুঞ্চিত কেশকলাপ-ভূষিতা। এঁদের জন্মকালে আকাশবাণী হয় যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ বধ করবেন ও যাজ্ঞসেনী ক্ষত্রিয়গণের কুলক্ষয় ও দেবতাদের মহৎ কর্ম সাধন করবেন ও এঁর দ্বারা কৌরবকুল বিনষ্ট হবে। দ্রৌপদীর অন্য নাম পাঞ্চালী, কৃষ্ণা, সৈরিন্ধ্রী ও নিত্যযৌবনা বেদিজা। ... জতুগৃহ থেকে উদ্ধার পাবার পর ... পাঞ্চালরাজের সভায় ... লক্ষ্যভেদ করে দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চভ্রাতা কুন্তীর নিকট উপস্থিত হয়ে গৃহের বহির্দেশ হতে মাতাকে বলেন যে, তাঁরা এক অপূর্ব সামগ্রী ভিক্ষা করে আনয়ন করেছেন। কুটিরের অভ্যন্তর হতে কুন্তী সেই জিনিস না দেখেই নির্দেশ দেন, 'তোমরা সকলে মিলেই সেই জিনিস ভোগ কর।' ... তারপর ব্যাসের বিধানমতে পঞ্চভ্রাতার সঙ্গেই দ্রৌপদীর বিবাহ হয়। ... পঞ্চপাণ্ডবের ঔরসে দ্রৌপদীর যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানীক ও শ্রুতসেন নামে পাঁচ পুত্র হয়। ... শকুনির কপটদ্যূতে পরাজিত হয়ে পাণ্ডবেরা সর্বস্বান্ত হন। ... দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে তাঁর বস্ত্রহরণ করতে উদ্যত হন। ... ভীম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করার ও দুঃশাসনের বক্ষোরক্ত পান ও সেই রক্তে দ্রৌপদীর কেশবন্ধনের প্রতিজ্ঞা করেন। ... বনগমনের আগে সূর্যদেব দ্রৌপদীকে এক তাম্রস্থালী দান করে বলেন যে, প্রতিদিন এই পাত্রে যেকোনো খাদ্য রন্ধন করে দ্রৌপদী যতক্ষণ অভুক্ত থাকবেন, ততক্ষণ এই পাত্র পূর্ণ থাকবে। ... কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষে দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পর অশ্বত্থামা কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সহায়তায় রাত্রিকালে পাণ্ডবশিবিরে প্রবেশ করে সুপ্ত অবস্থায় দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সহ সমস্ত পাণ্ডবপক্ষীয়কে হত্যা করেন। ... অশ্বত্থামাকে পরাজিত করে তাঁর মাথার মণি নিয়ে এসে ভীম দ্রৌপদীকে দিলে দ্রৌপদী সান্ত্বনালাভ করেন ও যুধিষ্ঠিরকে সেই মণি ধারণ করতে দেন। ... মহাপ্রস্থানের পথে ... দ্রৌপদী যোগভ্রষ্ট হয়ে পতিত হন। ... অর্জুনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে এই পতন হয়।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে দ্রৌপদীর কাহিনী এইরূপ — রাম যখন সীতার সহিত বনগমন করেছিলেন, তখন অগ্নি রামকে বলেছিলেন, 'প্রাক্তনকার্য দুর্নিবার্য, আপনি সীতাকে গোপনে রক্ষা করুন। কারণ, সাতদিনের মধ্যে রাবণ সীতাকে হরণ করবে।' তখন রাম সীতাকে নিয়ে যাবার জন্য অগ্নিকে অনুরোধ করেন। তাঁর কাছে ছায়া-সীতা বাস করবে। অগ্নি সীতাকে নিয়ে প্রস্থান করলে রামের সহিত ছায়া-সীতা অবস্থান করতে থাকেন। রাবণ এই ছায়া-সীতাকে হরণ করে। যে সময় সীতার অগ্নিপরীক্ষা হয়, সেইসময় অগ্নি ছায়াকে নিয়ে সীতাকে ফিরিয়ে দেন। এই ছায়া-সীতা নারায়ণ সরোবরে একশত বৎসর শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যা করে। মহাদেব এতে সন্তুষ্ট হয়ে ছায়া-সীতাকে বর দিতে চান। তখন ছায়া পাঁচবার স্বামী প্রার্থনা করেন। তখন মহাদেব বলেন, 'তুমি পাঁচবার স্বামী প্রার্থনা করেছ, সেই কারণ হরির অংশস্বরূপ পঞ্চ ইন্দ্র তোমার স্বামী হবেন। তাঁরা এখন পঞ্চপাণ্ডব নামে খ্যাত।' পরে এই ছায়া রাজা দ্রুপদের যজ্ঞকুণ্ড হতে উদ্ভূত হয়ে দ্রৌপদী নামে খ্যাত হন। ইনিই সত্যযুগে বেদবতী, ত্রেতাতে সীতা এবং দ্বাপরে দ্রৌপদী হয়েছেন। ইনি কৃষ্ণে ভক্তি-পরায়ণা ছিলেন বলে এঁর নাম কৃষ্ণা। রাজা দ্রুপদ অর্জুনের হাতে এঁকে সমর্পণ করেন। অর্জুন তাঁর মার কাছে গিয়ে বলেন যে, তিনি আজ একটি জিনিস লাভ করেছেন। কুন্তী উত্তরে বলেছিলেন যে, ভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই জিনিস সমভাবে সকলে ভোগ করুক। পূর্বে মহাদেবের বর ও মাতৃআজ্ঞার জন্য পঞ্চভ্রাতা মিলিত হয়ে দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** যাঁরা 'প্রাতঃস্মরণীয়া'-গণকে আজও প্রাতে স্মরণ করার রীতি অনুসরণ করেন, তাঁরা রোজ সকালে **দ্রৌপদীর** নাম উচ্চারণ করেন; জনসাধারণ্যে ইনি মহাভারতের 'হিরোইন' চরিত্র রূপে প্রচলিত। অন্যথায় অপ্রচলিত।

৫. সব বাবা-মা চান তাদের ছেলেমেয়েরা সুখে-শান্তিতে থাক, তাদের যেন অভাব অনটন না থাকে। সেজন্য কেউ কেউ উত্তরসূরীদের জন্য নানাভাবে ধনসম্পদ জমিয়ে রেখে যান। কিন্তু সে তো অস্থাবর সম্পত্তি! সেকথা যাঁরা বোঝেন, তাঁরা আরও সতর্ক হন। তাঁরা এমন ধরনের স্থাবর সম্পত্তি রেখে যাওয়ার চিন্তা করেন, যা বংশপরম্পরায় উত্তরসূরীদের জন্য বহুকাল ধরে ধনসম্পদ প্রসব করতে থাকবে। এখন ধরা যাক, এক খানবাহাদুর লাদাখ পাহাড়ের মালিকানা ৯৯৯ বছরের জন্য লিজ নিয়েছেন। নিয়েছেন এইজন্য যে, সেই পাহাড়ের বিশেষ বিশেষ কন্দরে (যার খবর অন্য কেউ জানে না) অতি মূল্যবান চুনিপাথর (ruby) রয়েছে, যা হাজার বছর ধরে কুড়িয়ে এনে বেচলেও শেষ হওয়ার নয়। তাহলে তো লিজের দলিল ও বিশেষ বিশেষ কন্দরের খবর বিশেষভাবে সংরক্ষিত থাকা চাই। তার জন্য তিনি একটি কোড (মন্ত্র) তৈরি করলেন এবং ঠিক করলেন, প্রতিদিন সকালে তাঁর পুত্রপৌত্রাদি স্নান করে এসে সেই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে তারপর জলগ্রহণ করবে। মন্ত্রের বা কোডের অর্থটি তিনি তাঁর পুত্রকে বলে দিলেন এবং রীতি করে দিলেন যে, সে তার উত্তরাধিকারীকে যথাসময়ে সেই কোডের মানে বলে দেবে। এখন হল কী, তিনপুরুষ পরে দেখা গেল এক দুর্ঘটনায় সেই মন্ত্র-জানা শেষ ব্যক্তিটি অকস্মাৎ মারা গেলেন, তাঁর উত্তরসূরীকে মন্ত্রের মানে বলে দেওয়ার আগেই। ফল হল এই যে, পরিবারের সবাই জানে কোডটির ভিতরে বিপুল সম্পদের কথা রয়েছে, কোডটি সবাই জানেও, কিন্তু তার মানে কেউই জানে না। এখন কী হবে? কোটি কোটি টাকার সম্পদ থাকতেও খানবাহাদুরের বংশের ভিখারী হওয়া ঠেকানো কঠিন।

আমাদের জ্ঞানী পূর্বপুরুষদের চুনীপাথরের খনির হয়েছে সেই দুরবস্থা। তাঁরা উত্তরসূরীদের জন্য রীতি করে দিয়েছিলেন যে, তারা পঞ্চকন্যার নাম প্রত্যহ প্রাতে স্মরণ করে জলগ্রহণ করবেন। কারণ সেখানেই রয়েছে এক মহাসম্পদের চাবিকাঠি। সেকারণেই প্রত্যহ সকালে অনেকেই আজও সেই প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার নাম স্মরণ করে থাকেন, কিন্তু তার মানে কী, তা আজ আর কেউই জানেন না। ফলে যে পঞ্চকন্যাকে স্মরণ করলেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, ('পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্') তাদের কথা আমরা ভুলে গেছি, যদিও তাঁদের নাম জানি এবং প্রত্যহ প্রাতে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের স্মরণও করে থাকেন। তাহলে তো এখন তাদের মানে জানা দরকার এবং কেন তাঁদের ঠিকভাবে চিনে রাখতে পারলে সমস্ত পাপ নাশ হতে পারে, তাও জানা দরকার।

তথ্য অনুসারে এই **পঞ্চকন্যা হলেন** — কুন্তী, তারা, মন্দোদরী, অহল্যা, দ্রৌপদী। একালের তথাকথিত আধুনিকতাবাদীদের চোখে এঁরা প্রত্যেকেই অসতী। কেননা, এঁদের প্রত্যেকেরই স্বামীর সংখ্যা একাধিক। অথচ আমাদের পূর্বপুরুষেরা বলে গেলেন, এঁদেরকে প্রত্যহ প্রাতে স্মরণ করতে। কেন?

কুন্তী, তারাকে আমরা তাদের নিজ নিজ ভুক্তিতে খানিকটা চিনেছি, **অহল্যা ও মন্দোদরীকেও** তার নিজস্ব ভুক্তিতে চেনা যাবে, এখন আমরা চিনব **দ্রৌপদীকে**। হ্যাঁ, নিয়মানুসারে এই সত্তাগুলি জড়, উদ্ভিদ, জীব, মানুষ ও তার সমাজ, এমনকী অলৌকিক জগতেও সক্রিয় থাকতে পারে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে তাঁদের সক্রিয়তার বিষয়ে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। আমাদের প্রাচীন জ্ঞানীপুরুষেরা জানতেন, **কুন্তী** সত্তাটি উদ্ভিদজগতে ছিল 'গুগ্‌গুল' ও 'শল্লকী' বৃক্ষ; **তারা** সত্তাটি শব্দজগতে ছিল 'সপ্তকবিশেষ' এবং জড়জগতে ছিল 'মুক্তা'; **অহল্যা** সত্তাটি জড়জগতে ছিল 'পতিত জমি'; আর **মন্দোদরী** ছিল 'মাদুর'। তাছাড়া, অতি লম্বা (দীর্ঘ-পদী) নারীর কন্যা মাত্রেই ছিলেন **দ্রৌপদী**। আমরা তাঁদের সেভাবে সর্বক্ষেত্রে চিনবার সাহসটাই হারিয়ে ফেলেছি। আমরা অনেক চেষ্টায় এই সত্তাগুলিকে কেবলমাত্র মানুষের সমাজে খানিকটা চিহ্নিত করতে পারছি। সেভাবেই আমরা **দ্রৌপদীকে** কোন সামাজিক সত্তারূপে সক্রিয় দেখতে পাই, এখন সেই বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

তারা যেমন মহামায়ার একটি রূপ, কিন্তু তাকে আমরা খুব সহজে চিনতে পারি মানবসমাজের 'কেরানি'শ্রেণী রূপে, তেমনি **দ্রৌপদী** হলেন ব্রহ্মাণীর একটি রূপ, তাকে আমরা সহজে চিনতে পারি পুঁজিবাদী সামাজিক সংস্থার প্রকৃতিশক্তি বা কোম্পানির আধারশক্তি কর্মচারী রূপে। পূর্বকালে (ত্রেতাযুগে) এই সত্তাটি পাইকারী-চাষের কাজে লিপ্ত জনগোষ্ঠী রূপে বা সীতা রূপে সক্রিয় হয়েছিলেন। তারও আগে (সত্যযুগে) এঁরা ছিলেন 'বেদবতী', অর্থাৎ বেদবাদী ব্রাহ্মণদের অনুগামী ছাত্রশ্রেণী। একালে (দ্বাপর যুগে) যেহেতু পুঁজিবাদী সামাজিক সংস্থা বা প্রাচীন ভারতের পণ্য-উৎপাদক কোম্পানির পরিচালকেরা পাঁচ ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন [কোম্পানির ধর্ম বা ফিলসফি = যুধিষ্ঠির; কোম্পানির প্রচার = ভীম; কোম্পানির নিয়োজিত সাদা টাকা = অর্জ্জুন; কোম্পানির বিশেষ শ্রমশক্তি = নকুল; কোম্পানির সেল্‌স্ ডিপার্টমেন্ট = সহদেব।], তাই **দ্রৌপদীকে** পাঁচ স্বামীর ঘর করতে হয়। ...

কিন্তু এঁরা প্রাতঃস্মরণীয়া কেন? এঁরা প্রাতঃস্মরণীয়া এই জন্য যে, আসলে এঁরা ভিন্ন ভিন্ন যুগে মহামায়ারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এঁদেরকে ঠিক ঠিক ভাবে চিনে রাখলে, জীবনের যে-অধ্যায়ে আপনি বিপন্ন হোন না কেন, সেই বিপদ থেকে মুক্তির উপায় দেখতে পাবেন। সেই বিপন্ন অধ্যায়ে মহামায়ার তৎকালীন বাহ্যিক, মানসিক, সামাজিক সত্তাটি কী রূপে সক্রিয়, জড়-জীব-মনুষ্যজগতে তার বাস্তব চেহারাটি কীরকম, তা জানা থাকলে আপনি সহজেই তার শরণাপন্ন হতে পারবেন এবং বিপন্মুক্তির উপায় ঠিক করতে পারবেন। কেননা, এই সত্তাই সমস্ত শক্তির আধার। চোখের সামনে তাঁকে চিনতে পারলে আরাধনা করার সুবিধে হয়। সেই কারণেই ইনি চির-আরাধ্যা, প্রাতঃস্মরণীয়া। মনে রাখা ভাল, এই **দ্রৌপদীকে নিত্যযৌবনা** বলা হত। ...

দ্রুহ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অদ্রোহ, দ্রুহ্, দ্রুহিণ, দ্রুহ্য, দ্রুহ্যু, দ্রোহ, দ্রোহকারী, দ্রোহী, বিদ্রোহ, বিদ্রোহী।

দ্রুহ্ = নবরূপে উত্তীর্ণ আবর্তনশীল দানের হওয়ন যাহাতে।

দ্রুহ্য (দ্রুহ্যু) : ২. *দ্রুহ্য = দ্রু-র হওয়ন থাকে যাহাতে। দ্রুহ্যু = দ্রু-র নবরূপে উত্তীর্ণ হওয়ন থাকে যাহাতে।* দ্র. **অনু, দেবযানী**। ৩.

(মহাভারত অনুসারে) রাজা যযাতির পুত্র। ইনি শর্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যযাতি সকল দিক জয় করে পুত্রদের ভাগ করে দিয়েছিলেন। প্রতীচী দিকের শাসনভার দ্রুহ্যর উপর অর্পিত হয়। যযাতি এই পুত্রকে নিজের বার্ধক্য দিয়ে এঁর যৌবন চেয়েছিলেন, কিন্তু তা দিতে অস্বীকার করায় যযাতি তাকে অভিশাপ দেন, 'তোমার কোনো প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ হবে না।' এর ফলে দ্রহ্যর বংশে কোনো রাজা হয় নাই। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **দ্রুহ্য** শব্দটি ব.শ.-তে নেই, পাওয়া যায় পৌ.অ.-তে। হয়তো এটি **দ্রুহ্য**-ই হবে। যাই হোক, প্রাচ্য-প্রতীচ্য ভাগ করে ফেলার এরকম কাহিনী ভারতের রয়েছে, অনেকে তা বিশ্বাসই করতে চাইবেন না। আমরা দেখছি, আমাদের পুরাণ সম্ভবত প্রাচীন পৃথিবীকে একত্রে দেখত। তা নইলে যযাতির অনু, পুরু, দ্রুহ্য ... প্রভৃতি পুত্রদের নামের অর্থ প্রায়ই এশিয়া ছেড়ে ইয়োরোপের দিকে ইশারা করতে থাকে কেন, তা কিছুতেই বোঝা যায় না। ...

দ্রোহ (দ্রোহী, বিদ্রোহ, বিদ্রোহী) : ১. ✓দ্রুহ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***দ্রোহ*** = *দ্রু-কারীকে স্তব্ধ করে যে।* ***দ্রোহী*** = ***দ্রোহ****-র গতিশীল আধার যে।* ***বিদ্রোহ*** = *বিপরীত বা বিশেষ দিকে* ***দ্রোহ*** *যাহাতে।* ***বিদ্রোহী*** = *যে* ***বিদ্রোহ*** *করিয়াছে।* ৩. **দ্রোহ** = অনিষ্টাচরণ, অপকার, বধ, হিংসামাত্র, ছদ্মবধ, ছলপূর্ব্বক বধ। **দ্রোহী** = দ্রোহকারী, অপকারী, অনিষ্টচিন্তক, হন্তা, ঘাতক, বিদ্বেষী। **বিদ্রোহ** = শাসনোল্লঙঘন, রাজদ্রোহ। **বিদ্রোহী** = শাসনবিরোধী, রাজদ্রোহী। (ব.শ.)। ৫. বাইরের দিক থেকে **দ্রু**-র যে আঘাত আসে, তাকে থামিয়ে দেয় যে, তাকে **দ্রোহ** বলে। বিষয়টি **আধিব্যাধি** শব্দের **ব্যাধি**র অর্থে পাওয়া যায়।

দ্বি (দ্বৃ, দ্বারি, দ্বিষ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অদ্বয়, অদ্বয়বাদ, অদ্বয়বাদী, অদ্বিতীয়, অদ্বৈত, অদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদী, অদ্বৈধ, দউ, দরওয়াজা, দরগা, দরজা, দরদালান, দরবান, দরোজা, দারোয়ান, দু, দুঅ, দুঅজ, দুআওরি (দোবারা), দু(দো)আনি, দুআ(য়া)র, দুআর(য়া)রপাল, দু(দো)আরি(রী), দুই, দুইবটী, দুঁহা, দুঁহু, দুঁহুঁ, দুকাটি, দুকুল, দুকূল, দুখণ্ড, দুগুণ, দুগুলি, দুঘড়ী, দু(দো)চকোব্রত, দুচারিণী, দুজা, দুঞর, দুটা, দুটানা, দুটো, দুন, দু(দূ)ন, দুনলা, দুনা, দুনু, দুনো, দুপর, দুপহর, দুপাটা, দুপাট্টা, দুপাটি(টী), দুপালটা, দুপুর, দুপোর, দুফাড়, দুফাড়া, দুফাল, দুফালা, দু(দো)ভাষী (অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে, খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে ইনটারপ্রিটার), দুমন, দুমনা, দুমুখ, দুমুঠো, দুমেটীয়া, দুমেটে, দুম্ব (লেজ), দুম্বা, দুয়জ, দুয়াড়ি, দু(দো)য়াদশ, দুয়ানী, দুয়ার, দু(দো)য়ারি (দুয়ারী) (পদবী), দুয়েম, দুয়ো, দুসতীন, দুসূতি, দুসূতী, দুহাতিয়া, দুহ্যমান, দো, দোআঁশলা (দ্র. আঁশলা), দোআ(য়া)শ, দোআ(য়া)নী, দোআপরি, দোঁহ, দোঁহু, দোঁহাকার, দোঁহার, দোহার, দোকতা (দোক্তা), দোকর, দোকলা, দোকা, দোকাটি, দোকাঠি, দোকান, দোকানদানি, দোখণ্ডী, দোছটি, দোছুটি, দোছোট, দোজপক্ষ, দোজবরে, দোটনা, দোতরফা, দোতার, দোথরি(রী), দোদুল (দুদিকে দুল), দোন, দোনা, দোনামনা, দোনো, দোনর, দোনলা, দোপর্দা, দোপাট, দোপাটা, দোপাটি, দোপিলে, দোফলা, দোফাঁক, দোফাল, দোফালা, দোবজা, দোবুজান, দোবারা, দোবে, দোভাজা, দোভাষী, দোমহলা, দোমালা, দোমেটে, দোয়জ, দোয়া, দোয়াব (দ্বীপ), দোয়ার(রি), দোর, দোরোখা, দোশালা, দোষর(রি), দোসর, দোসরি(রী), দোসুট, দোসু(সূ)তি, দোস্ত, দোঁহ, দোঁহাকার, দোঁহে, দোহ, দোহর, দোহরী, দোহা, দোহাতিয়া, দোহার, দোহার, দোহারী, দৌ, দৌবারিক (দিবার), দৌযাম, দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বচর, দ্বন্দ্বচারী, দ্বন্দ্বজ, দ্বন্দ্বভূত, দ্বন্দ্বাতীত, দ্বয়, দ্বাঃ, দ্বা(দ্বি)চত্বারিংশৎ, দ্বাত্রিংশৎ, দ্বাত্রিংশল্লক্ষণ (বত্রিশলক্ষণ), দ্বাদশ, দ্বাদশবার্ষিক, দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র, দ্বাদশাঙ্গুল, দ্বাদশাদিত্য, দ্বা(দ্বি)নবতি, দ্বা(দ্বি)পঞ্চাশৎ, দ্বাপর, দ্বাবিংশতি, দ্বার, দ্বারক, দ্বারকা, দ্বারগোপ, দ্বারনায়ক, দ্বারপট্ট, দ্বারপাল, দ্বারপিণ্ডী, দ্বারপিধান, দ্বার(রা)বতী, দ্বারবান, দ্বারবাহু, দ্বারযন্ত্র, দ্বারস্থ, দ্বারা, দ্বারাধিপ, দ্বারাধ্যক্ষ, দ্বারাবতী, দ্বারায়, দ্বারিক, দ্বারিকা, দ্বারিকানাথ, দ্বারিকাপতি, দ্বারী, দ্বারুক, দ্বারে, দ্বারেতে, দ্বা(দ্বি)ষষ্টি, দ্বা(দ্বি)সপ্ততি, দ্বি, দ্বিক, দ্বিখগ, দ্বিগু, দ্বিগুণ, দ্বিচারিণী, দ্বিজ, দ্বিজকুল, দ্বিজদাস, দ্বিজদেব, দ্বিজধর্ম্মী, দ্বিজন্মা, দ্বিজপতি, দ্বিজপ্রিয়া, দ্বিজবন্ধু, দ্বিজবাহন, দ্বিজমণি, দ্বিজরাজ, দ্বিজলিঙ্গা, দ্বিজলিঙ্গী, দ্বিজসেবক, দ্বিজা, দ্বিজাগ্র্য, দ্বিজাতি, দ্বিজিহ্ব, দ্বিজেন্দ্র, দ্বিজেশ, দ্বিজেশ্বর, দ্বিজোত্তম, দ্বিট্(ষ্), দ্বিতয়, দ্বিতীয়, দ্বিতীয়বান, দ্বিতীয়া, দ্বিতীয়াশ্রম, দ্বিত্র, দ্বিত্ব, দ্বিদল, দ্বিদশ, দ্বিধা, দ্বিপ, দ্বিপথ, দ্বিপদ, দ্বিপাদ, দ্বিপায়ী, দ্বিপেন্দ্র, দ্বিবচন, দ্বিবর্ষ, দ্বিবার্ষিক, দ্বিবিধ, দ্বিভুজ, দ্বিভূম, দ্বিমাতৃক, দ্বিমাত্র, দ্বিমুখ, দ্বিমূর্দ্ধ, দ্বিরথ, দ্বিরদ, দ্বিরাগমন, দ্বিরুক্ত, দ্বিরুক্তি, দ্বিরূঢ়া, দ্বিরূপ, দ্বিরেতাঃ, দ্বিরেফ, দ্বিলক্ষ, দ্বিলক্ষণ, দ্বিশত, দ্বিশফ, দ্বিষ্, দ্বিষ, দ্বিষ্ট, দ্বিসহস্র, দ্বিহায়ন, দ্বিহায়নী, দ্বিহীন, দ্বিহৃদয়া, দ্বীপ, দ্বীপবতী, দ্বীপিনখ, দ্বীপী, দ্বেষ, দ্বেষী, দেষ্য, দেষ্টা, দ্বৈকালিক, দ্বৈগুণিক, দ্বৈত, দ্বৈতবন, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতী, দ্বৈতীয়ীক, দ্বৈধ, দ্বৈধীকৃত, দ্বৈধীভাব, দ্বৈধীভূত, দ্বৈপ, দ্বৈপায়ন, দ্বৈবর্ষিক, দ্বৈবিধ্য, দ্বৈমাতুর, দ্বৈমাতৃক, দ্বৈরথ, দ্বৌ, দ্বৌকালীনজ্বর, দ্বৌবারিণী, দ্ব্যক্ষ, দ্ব্যক্ষর, দ্ব্যঙ্গুল, দ্ব্যঙ্গুলি, দ্ব্যঞ্জল, দ্ব্যঞ্জলি, দ্ব্যণুক, দ্ব্যর্থ, দ্ব্যর্থক, দ্ব্যশীতি, দ্ব্যহ, দ্ব্যহীন, দ্ব্যাত্মক, দ্যাত্মবাদী, দ্যামুষ্যায়ণ, দ্যামুষ্যায়ণক, দ্ব্যেকান্তরা, ধন্দ, ধাঁধা।

দ্বি (দ্বৃ, দ্বারি, দ্বিষ্) = দান-বহন গতিশীল যাহাতে। **দ্বৃ** = দান-বহন আবর্তিত যাহাতে। **দ্বারি** = দুইটি বারণ গতিশীল যাহাতে। **দ্বিষ** = দুই প্রকার ইচ্ছা যাহাতে।

দ্বি (দু, দো) [দ্বি থেকে জাত শব্দগুলির ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য এখানে প্রথমেই শব্দটির মূল গঠন নিয়ে আলোচনা করে নেওয়া হচ্ছে।] : দ্বি = ✓দ্বৃ + ডি - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. ***দ্বি*** = *দান-বহন গতিশীল যাহাতে।* ৩. **দ্বি** = দুই, সংখ্যাবিশেষ (২)। **দু** = দুই, ডবল, অল্প-স্বল্প, কিয়ৎসংখ্যক। **দো** = দ্বৌ, দ্বিসংখ্যক, দুই। ৫. মানবেতর জীবজন্তুর এক, দুই, তিন ... প্রভৃতি সংখ্যার জ্ঞান থাকে না বলেই আমরা জানি, কিন্তু কিছু কিছু মানুষের সংখ্যাজ্ঞান আছে। কিন্তু কীভাবে মানুষ এই সংখ্যাজ্ঞান অর্জন করল, তা আমরা জানি না। **এক, তিন, চার** ... প্রভৃতি শব্দের ক্ষেত্রে মানুষের সংখ্যাজ্ঞান

অর্জন বিষয়ে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে আমরা জানিয়েছি। এখানে আমরা দুই-এর ধারণা এবং সে ধারণা কীভাবে **দ্বি** শব্দ ধারণ করে থাকে সেকথা জানবার ও বুঝবার চেষ্টা করব।

সাধারণ গতিকে **ই** বলে। আপনার অস্তিত্বের অবস্থান থেকে আপনি পা ফেলে ফেলে এগোলেন। এই এক-একটি পা ফেলাকে বলে **ই** করা বা **ইক**। তার থেকে **এক** কথাটি তৈরি হয়েছে। হয়েছে এইভাবে — প্রথম পদক্ষেপের পর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ... এভাবে পর পর পা ফেলে এগোলেই গতিটি একটি একটি বিশেষ দিকে হয়ে যায় বা দিশাগ্রস্ত হয়ে যায়। এই দিশাগ্রস্ত পদক্ষেপকে বা দিশাগ্রস্ত **ইক**কে অতএব **এক** বলাই ঠিক, কেননা 'এ' মানেই 'দিশাগ্রস্ত গতি'। এই হাঁটা বা গতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় স্বাভাবিক গতির পাশে বিশেষ গতির সম্ভাবনা দেখা দিলে। তেমাথার মোড়ে পৌঁছে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, সামনের দুটি রাস্তার কোনটিতে অতঃপর যাওয়া যাবে। আমাদের মনে হয়, প্রাচীন মানুষের সামনে এই দুরকম সম্ভাবনা দেখা দিত গতিদানের ক্ষেত্রে — এদিকে যাবো না ওদিকে যাবো, একে দেবো না তাকে দেবো? **দ্** নাকি **ব্**? অর্থাৎ, **দ্ব**! কাঁধে নিয়ে বয়ে চলা আছে, মাঝে মাঝে তার থেকে কিছুটা দিয়ে দেওয়াও আছে। অর্থাৎ দান (**দ্**) আছে, বহনও (**ব্**) আছে। কেবল তাই নয়, তারা আবর্তিত হচ্ছে। একবার দান, পরের বারই বহন, আবার দান ... এইরকম। এরকম হলেই **এক** হয়ে যায় **দ্বি**।

এই **দ্বি**-এর ভিতরে **দ্** ও **ব্** দুটি বর্ণ রয়েছে এবং তার দুরকম উত্তরাধিকার বাংলা ইংরেজি সকল ভাষারই রয়েছে। বাংলায় একদিকে দু, দুই, দুটো, দোনলা, দোফলা ... ইত্যাদি শব্দ রয়েছে যাতে ব্ বর্ণটি বাদ থাকা সত্ত্বেও অর্থে 'দুই' ধারণাটি থেকে গেছে; অপরদিকে তেমনি বার, বাইশ, বত্রিশ, বিয়াল্লিশ ... ইত্যাদি শব্দও রয়েছে, যাতে দ্ বর্ণটি বাদ গেছে কিন্তু অর্থে 'দুই' ধারণাটি থেকে গেছে। ইংরেজিতে দ্-এর দিকটা যেমন double, duo ... ইত্যাদিতে রয়েছে, তেমনি bi-যুক্ত অজস্র শব্দও (যেমন bi-ceps, bi-cycle, bi-focal ... ইত্যাদি) রয়েছে; এবং সেখানেও **d** থাকলে **b** বাদ এবং **b** থাকলে **d** বাদ, অথচ শব্দগুলির অর্থে 'দুই'-এর ধারণা যথারীতি বিদ্যমান। এছাড়াও, **দ্বি**-এর ভিতরে দ্-এর সঙ্গে ব্-এর এই যে যুগলবন্দী, এর অন্যতর নিদর্শনও রয়েছে। ইংরেজিতে আমরা দেখতে পাই the class, the code ... ইত্যাদি শব্দবন্ধ যেমন ব্যবহৃত হয়, de-class, de-code ... ইত্যাদি শব্দও ব্যবহৃত হয়; আবার di- বা dis- যুক্ত সমধর্মী অজস্র শব্দও রয়েছে ইংরেজিতে (fuse-defuse, -gamy-bigamy, ... arm-disarm, charge-discharge ...)। এই শব্দগুলিতে মূল ধারাকে নির্দিষ্ট করে যেমন the বলা হচ্ছে, তেমনি ঠিক উলটো বা বিপরীত ধারাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে de-, dis- দিয়ে, এমনকি সরাসরি 'দুই' অর্থেও di- এর ব্যবহার হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে একই ধারায় প্রবলভাবে বা সুনির্দিষ্টভাবে (নির্দিষ্ট = the) সক্রিয় হওয়াকেও de-, di- প্রভৃতি শব্দযোগে বোঝানো হয়ে থাকে। বাংলায় আমরা দেখতে পাই **কল্প-বিকল্প**, **কর্ষ-বিকর্ষ** ... প্রভৃতি অজস্র শব্দে মূলধারার পাশাপাশি বিপরীত ধারা ও বিকল্প ধারা দুটোই চিহ্নিত হচ্ছে **বি** (bi-) শব্দে। **অর্থাৎ** কিনা, এই শব্দগুলিতে একটি সাধারণ ব্যাপার বিদ্যমান রয়েছে, তা হল, মূল ধারার পাশে সেই ধারার বিকল্প ধারা বা গতির নতুন একটি সুযোগ (option)।

তার মানে, **দ্বি**-এর ভিতরে two অর্থটি এমন ভাবে রয়েছে যে, তার থেকে জাত শব্দগুলি যে-কোনো একটি (**দ্** কিংবা **ব্**) দিয়েই 'দুই'-এর কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। এরকম সম্ভব হচ্ছে কীভাবে?

অনুসন্ধানে দেখা যায়, **দ্বি** শব্দটি প্রসূত হয়েছে **দ্ব** ক্রিয়া থেকে। এর অর্থ — দান-বহন আবর্ত্তিত যাহাতে। আমরা জানি, ব্ বর্ণটি প্রসূত হয় **উ** + **অ** বা অন্য কোনো স্বরবর্ণ জুড়ে। এটি অন্তঃস্থ ব্। এর নিজের ভিতরেই একধরনের দ্বৈরাজ্য রয়েছে। তার মানে, **দ্বি** শব্দটির ভিতরে দ্ + উ + ই — এই তিনটি বর্ণ সক্রিয় রয়েছে। অর্থাৎ 'দান নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে গতিশীল যাহাতে', তাকেই **দ্বি** বলা হয়। তার মানে এতে যে-দান গতিশীল হচ্ছে, গতিশীল হওয়ার সময় তার বদলও ঘটে যাচ্ছে নতুন রূপে। **অর্থাৎ**, **দ্বি** কথাটির মানেই হল দুরকম দানের সক্রিয়তা; একটি প্রচলিত বা প্রথাসিদ্ধ কিংবা মূল দান, অন্যটি নবরূপে উত্তীর্ণ দান। তাহলে দেখা যাচ্ছে, দান ও প্রদান একত্রে সক্রিয় থাকলে তাকেই আমরা **দ্বি** বলতে পারি। দান হল মূলধারা, প্রদান হল প্রকৃষ্ট (এবং অতএব **বিশেষ** বা বিপরীত) ধারা। **দ্বি**-ধারায় এভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে বলেই **দ্বি** ক্রমে **দুই** পদবাচ্য হতে পেরেছে। **৬.** Avesta - dva, duye; Greek - duo; Latin - duo; Russian - dva; Gothic - tvai; Dutch - twee; Danish - to; Icelandic - tvo; Old High German - zwene; Anglo Saxon - twegen, twa; English - two। (ব.শ.)।

অদ্বৈত : ২. *নেই দ্বৈত যাহার।* / যাহার দ্বৈত (ভেদ) **নাই**। (ব.শ.)। ৩. অদ্বয়, অভেদ, অসদৃশ, অতুল, কেবল, **অদ্বিতীয়**, **ব্রহ্ম**, দ্বৈতের অভাব, অদ্বৈধ, ব্রহ্মতত্ত্ব, উপনিষদবিশেষ। **(ব.শ.)**। **৪.** নামরূপে স্বল্পব্যবহৃত। কদাচিৎ 'দ্বিখণ্ডিত নয়' এই অর্থেও **ব্যবহৃত** হয়। **৫.** এর মূল অর্থ — একের ভিতর দুই; two in **one** — 'শান্তম্ শিবম্' = 'অদ্বৈতম্'। এটি ভারতের মানসসম্পদের **প্রবাহের** সর্বোচ্চ অর্জন। একে অদ্বৈতবাদ বলে। এতে মনে **করা হয়**, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই 'পুরুষ প্রকৃতি রূপে **বিভাজিত হয়েও** কামসূত্রে একত্রিত বা গ্রথিত'; অর্থাৎ সবকিছুই আসলে **এক**, **থাকে** দুই হয়ে। এই দুইয়ের একটি পুরুষ রূপে এবং অপরটি **প্রকৃতি রূপে** পরস্পরের সঙ্গে কামসূত্রে লিপ্ত থাকে, তা সে জড়জগতের **কোনো** অস্তিত্ব হোক আর জীবজগতের বা মানস-জগতের কোনো **অস্তিত্বই** হোক। আর, এ দুইয়ের সম্বন্ধগুলিকে (কামসূত্রে **আবদ্ধতার** নিয়মগুলিকে) সর্বমোট চার ভাগে ভাগ করা যায় — **পরস্পরকে** উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের সম্বন্ধ (যখন **পুরুষ প্রকৃতিকে আলাদা করে** চেনাই যায় না, উভয়ের **অভেদ** অবস্থা), সমমর্যাদার **সম্বন্ধ (উভয়কে** আলাদা করে চেনা গেলেও হিসেবী বা প্রেমমূলক **বন্ধন থাকে**, বিরোধ থাকে না), শাসক শাসিতের সম্বন্ধ (বন্ধন **সত্ত্বেও ভেদ স্পষ্ট** দেখা যায়), নিপীড়ক নিপীড়িতের সম্বন্ধ (বন্ধন **থাকলেও ভেদ** বিরোধিতায় পর্যবসিত)। অস্তিত্ব মাত্রেই নিরাকার-**একাকারের রূপ** হতে প্রথম সম্বন্ধ নিয়ে জন্মায়, তারপর সেখান থেকে **অবস্থিত** হয়ে দ্বিতীয় সম্বন্ধে অস্তিত্ব লাভ করে, সেখান থেকে **যায় তৃতীয় ও**

তৃতীয় থেকে চতুর্থ সম্বন্ধে। তারপর শুরু হয় উল্টোরথের পালা। চতুর্থ থেকে তৃতীয় ও দ্বিতীয় পেরিয়ে প্রথমে পৌঁছয় এবং একাকারে বিলীন হয়। তারপর পুনরায় শুরু হয় তার পরবর্তী অস্তিত্বলাভ, পুনরায় যাত্রা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অস্তিত্বের ক্ষেত্রে এই হল চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়ম। একথা সামান্য জড়বস্তুর বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনি মানবসমাজের বিকাশের ক্ষেত্রেও সত্য।

একালের পদার্থবিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এই পুরুষ প্রকৃতির অদ্বৈত রূপটিকে চিনেছেন তাঁদের wavicle ধারণায়। তাঁরা দেখেছেন, এই পুরুষ বা প্রকৃতির (তরঙ্গ বা কণার) যেরূপে সাধনা করা হয়, সে সেই ভাবে দেখা দেয়। এসবের বহু আগে ভারতের সাংখ্যকার কপিল, এবং পুরুষ-প্রকৃতি সম্বন্ধের রূপকার **বাৎস্যায়ন** বিষয়টিকে যথার্থে স্পষ্ট করে গেছেন তাঁদের ক্রিয়াভিত্তিক বয়ানে। ১৮৯৮ সালে ১০ জুন বিবেকানন্দ তাঁর একটি চিঠিতে এই অদ্বৈতকে চিহ্নিত করেছেন এই ভাবে — ... Advaitism is the last word of religion and thought and the only position from which one can look upon all religions and sects with love. I believe it is the religion of the future enlightened humanity. এ বিষয়ে আমাদের 'গ' গ্রন্থের ৮৩-৮৬ পৃষ্ঠায় ও 'ঙ' গ্রন্থের 'পরমাপ্রকৃতিতত্ত্ব' নিবন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।

দুভাষী (দোভাষী) : ২. *দুই ভাষার গতিশীল আধার যে; অর্থাৎ, যিনি দুই ভাবে (দুই ভাষায়) ভাষণ দেন বা দিতে সক্ষম।* / যিনি দুই ভাষার পণ্ডিত। (ব.শ.)। ৩. ভাষাদ্বয়বেত্তা। interpreter। (ব.শ.)। ৪. interpreter অর্থে প্রচলিত। ৫. যে ব্যক্তি দুটো ভাষাই জানে, দু-ভাষাতেই ভাষণ দিতে পারেন, তাকেই **দুভাষী** বা **দোভাষী** বলা যায়; সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটি একটু অন্যরকম হয়। যিনি একভাষা শুনে সেই ভাষণকে তৎক্ষণাৎ অন্যের বোধগম্য ভাষায় ভাষণ দিতে বা বলে দিতে পারেন, তাকেই **দোভাষী** বলা হয়ে থাকে। ইংরেজিতে এইরূপ ক্রিয়াকারীকে interpreter বলে। কিন্তু **দোভাষী** ও interpreter একই ব্যক্তিকে বোঝালেও শব্দ দুটি একেবারে হুবহু এক নয়। **দোভাষী**র বেলায় ক্রিয়াকারীকে দেখা হচ্ছে অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে, বলা হচ্ছে, সে দুটি ভাষাস্রোতে বা ভাষানদীতে তার নৌকা বাইতে পারে। আর, interpreter-এর বেলায় ক্রিয়াকারীকে দেখা হচ্ছে খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে, বলা হচ্ছে, সে দুটি ভাষানদীর দুটি ঘাটের মাঝে যে রাস্তাটি রয়েছে, সেই রাস্তায় মালবাহী যান (রিকশা, লরি ইত্যাদি) চালায়; এক নদীর ঘাট থেকে ধারণা তুলে বহন করে অন্য ঘাটে পৌঁছে দেয়। দুই ভাষাস্রোতে নৌকা বাইতে পারে বলেই (**দোভাষী** বলেই) যে সে এরকম এক-ভাষার ধারণার ঢেউ অন্য-ভাষার ধারণার ঢেউয়ে বদলে দিতে পারে (interpret করতে পারে), সেই সমগ্র কথাটি খণ্ড দৃষ্টিভঙ্গিতে থাকে না। বাংলার অধিকাংশ শব্দের সঙ্গে ইংরেজি শব্দের পার্থক্য প্রায়শই এইরকম। বাংলা শব্দে রয়েছে সামগ্রিকতার গৌরব, ইংরেজি শব্দে রয়েছে সুনির্দিষ্টতার সৌরভ।

দোকান (দোকানদানি, দোকানদার) : ২. *দোকান = দুই কান (কর্ণ) যাহার। দোকানদানি = দোকান থেকে (বিনিময়ভিত্তিক) দান গতিশীল যাহাতে। দোকানদার = দোকান দাতা রহে যাহাতে।* ৩. (ফারসি 'দুকান') পণ্যশালা, পসার, কামারের কর্মশালা, কামারশাল। (ব.শ.)। ৪. shop অর্থে **দোকান**, running a shop অর্থে **দোকানদানি** এবং shopkeeper অর্থে **দোকানদার** শব্দ প্রচলিত। ৫. দ্র. **কর্ণ, খাণ্ডব**। আমাদের **কর্ণ** বা **কান** শব্দটির অর্থ থেকে আমরা দেখতে পাই, ফারসি 'দুকান' আমাদের খুব একটা অনাত্মীয় নয়। জমিদার, থানাদার-এর মতো **দোকানদার**ও ফারসি থেকে আগত শব্দ। এঁরা এক কান (কর্ণ) দিয়ে শব্দ গ্রহণ করেন (পণ্য কেনেন), অন্য কান (কর্ণ) দিয়ে তা বের করে দেন (বিক্রি করে দেন)। সব মার্চেন্ট-কারবারেরই 'পার্চেজ ডিপার্টমেন্ট' বা 'কেনাকাটা'র (কাটা-র?) **আদান** বিভাগ রয়েছে, 'সেল্স্-ডিপার্টমেন্ট' বা **প্রদান** বিভাগও রয়েছে। সেকারণেই তাদের **দোকানদার** বলে। **খাণ্ডব** শব্দ থেকে আজ আমরা জানতে পারছি যে, একালের বড়বাজারকে সেকালের পৌরাণিক ভাষায় **খাণ্ডববন** বলা হত। **দোকানদানি** শব্দটি মেদিনীপুরের স্থানীয় হাটবাজারের কথাবার্তায় আজও শুনতে পাওয়া যায়। বোঝাই যায় যে, এর অর্থ হল — যে দু-কান (আগম-নিগম) ওয়ালা সত্তা থেকে (বিনিময়মূলক) দান করার কাজ চলে, সেটাই **দোকানদানি**।

দোদুল (দোদুল্যমান) : ২. *দোদুল = দু-দিকে দুলন যাহাতে। দোদুল্যমান = দোদুল্য (দোদুল থাকে যাহাতে) বর্তমান যাহাতে।* ৩. **দোদুল** = অত্যন্ত দোলায়মান, অতিচলচল, অতিকম্পমান। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. দুদিকে দুলন বলেই শব্দটি **দোদুল** হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে শব্দটিকে প্রতীকী করে দেওয়ার চেষ্টার ফল তার উপরোক্ত (৩) অর্থগুলি। এখনকার আধুনিক বাংলায় দুলন আর দোদুলন প্রায় একার্থক।

দ্বন্দ্ব : ১. দ্বম-দ্ব > দ্বন্দ্ব (নিপাতিত)। (ব.শ.)। ২. *দুইয়ের রহস্যরূপ দ্বিধাযুক্ত যাহাতে।* ৩. রহস্য, মর্য্যাদা, যুগল, যুগ্ম, স্থাবর-জঙ্গম-মিথুন, কলহ, মল্লযুদ্ধ, সন্দেহ, পরস্পর বিরুদ্ধ শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি, দুর্গ। (ব.শ.)। ৪. quarrel অর্থে প্রচলিত। ৫. পিতা হরিপদর মৃত্যুর পর দুই ছেলে যদু মধুর মধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা হল, রেষারেষিও শুরু হল। যদুর রান্নাশালে যখন মাছ রান্না হয়, তখন মধু ও তার বউবাচ্চার রাগ হয়; মধুর ছেলে যখন ক্লাসে ফার্স্ট হয় তখন যদু ও তার বউবাচ্চার রাগ হয়। অর্থাৎ কিনা, হরিপদর অস্তিত্বই কেবল দুভাগে বিভক্ত হয়নি, কাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তুও দুরকম হয়ে গেছে। কাঙ্ক্ষিত যখন যদুর কাছে, অনাকাঙ্ক্ষিত তখন মধুর কাছে; আবার ঠিক উলটোটাও ঘটে। এই যে **দ্বং** (দ্বম্, দ্বন্) বা হরিপদর দ্বিখণ্ডিত দুই সত্তা — যদু ও মধু, তাদের প্রাপ্যও দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, সুখ-দুঃখে ভাগ হয়ে গেছে — **দ্ব** হয়ে গেছে। এভাবে **দ্বং** যখন **দ্ব** হয়ে যায় তখনই শুরু হয় **দ্বন্দ্ব**। সুখ ও দুঃখ ঘন ঘন স্থানবদল করে। ... তখনই দুইয়ের মধ্যে **দ্বন্দ্ব** প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

দ্বয় : ১. দ্বি + অয় (অয়চ্)। (ব.শ.)। ২. *দ্বি অয়ন (ই) যাহাতে;*

অথবা, দুই সত্তার যাওয়া থাকে যাহাতে। **৩.** অবয়বদ্বয়যুক্ত, যুগল, দ্বৈধীভাব, কপট, ছল, (অভিধানে) পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** অয় শব্দটি তৈরি হয় **ই** ক্রিয়া থেকে (দ্র. **আয়**)। তাছাড়া, সবাই জানেন যে, 'যাওয়া'র যে 'য', সেটি আসলে ই + অ জুড়ে বানানো। অর্থাৎ, **দ্বি**-এর বা দুই সত্তার যাওয়া থাকে যাতে তাকেই দ্বয় বলে। এ যেন দুজনের মাঝের দুপা বেঁধে তিন পায়ের দৌড় (three-legged race) করছে এমন এক চলমান যুগ্ম সত্তা।

দ্বাপর : ২. / দুই এর (সত্য-ত্রেতার) পর যে যুগ; পাশার যেদিকে দুই বিন্দু থাকে। (ব.শ.)। দ্বাপরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বিন্দুদ্বয় যুক্ত পাশকতল। (ব.শ.)। **৩.** তৃতীয় যুগ। এর পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বৎসর। দ্বাপরে অর্ধপুণ্য ও অর্ধপাপ, মানবদেহ সপ্ত হস্তপরিমিত, এবং মানবের পরমায়ু সহস্রবর্ষ, তাম্রপাত্রে ভোজন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা একাদশীর দিন বৃহস্পতিবারে দ্বাপর যুগের উৎপত্তি হয়েছিল। এই যুগের অবতার কৃষ্ণ ও বলরাম। এই যুগে শাল্ব, বিরাট, হংসধ্বজ, কংস, ময়ূরধ্বজ, বভ্রুবাহন, রুক্মাঙ্গদ, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, বিশ্বকসেন, শিশুপাল, জরাসন্ধ, উগ্রসেন ইত্যাদি রাজা ছিলেন। (পৌ.অ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** এই যুগের অবতার ও রাজা বিষয়ক তথ্যগুলি বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। কিন্তু তার জন্য যে তথ্যগুলি প্রয়োজন, তার অনেক কিছুই হাতের কাছে নেই। আপাতত **চতুর্যুগ, কলিযুগ, যুগ** দেখুন।

দ্বার (দুয়ার, দোর, দ্বারবান, দারোয়ান) : ১. ✓দ্বারি (আচ্ছাদন) + অ (অচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***দ্বার*** *= দ্বি-আধার রহে যাহাতে; দুইটি বারণ যাহাতে; অথবা দো-পাল্লার বারণ যাহাতে।* **৩.** **দ্বার** = গৃহনির্গমনস্থান, প্রতীহার, মুখ, প্রবেশ, প্রবেশপথ, রন্ধ্র, ছিদ্র, ইন্দ্রিয়, উপায়, সাধন, সীমন্ত। **দুয়ার (দুআর, দোর)** = দ্বার, মুখ, আরম্ভস্থান, প্রবেশপথ, কপাট, গৃহ, বাড়ী। **দ্বারবান** = দ্বারপাল, দারোয়ান। (ব.শ.)। **৫.** 'ভোর হোলো দোর খোলো' পঙ্‌ক্তিটি একজন ইংরেজকে উচ্চারণ করতে বললে সে বলবে — Bhor holo door kholo। দুটো o বর্ণ থাকা সত্ত্বেও উচ্চারণ **হুবহু দোর**। বেচারা শুধু **দ** বলতে পারে না বলেই **দোর** না বলে 'ডোর' বলে। বিষয় এক, উচ্চারণও এক। কার্যত, **দ্বার** শব্দটিই বিবর্তিত হয়ে বাংলায় **দুয়ার, দুয়োর, দোর** প্রভৃতি শব্দে যেমন পরিণত হয়েছে, তেমনি ফারসি 'দরবান্' বা **দারোয়ান** এবং ইংরেজি door **শব্দেরও** জন্ম দিয়েছে।

দ্বারক, দ্বারকা, দ্বারিকা : ২. ***দ্বারক*** *=* ***দ্বার*** *করে যে।* ***দ্বারকা*** *=* ***দ্বারক****-এর আধার যে।* ***দ্বারিকা*** *=* ***দ্বার*** *গতিশীলভাবে কৃত যে আধারে।* **৩. দ্বারক (দ্বারকা, দ্বারিকা)** = **বহুদ্বারযুক্ত**, ... শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ...। (ব.শ.)। গুজরাটের পশ্চিম সীমায় অবস্থিত। কৃষ্ণের আদেশে বিশ্বকর্মা এই শহর নির্মাণ করেন। কংসবধের পর কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ ও অসুর কালযবনের অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণকে নিয়ে এই দ্বারকায় আসেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর যাদব নারীদের নিয়ে অর্জুন হস্তিনাপুরে যাত্রা করবার সঙ্গে সঙ্গে ই দ্বারকা সমুদ্রজলে প্লাবিত হয়। ... (পৌ.অ.)। **৪.** স্থান নাম রূপে **দ্বারকা** প্রচলিত; অন্যথায় তিনটি শব্দই অপ্রচলিত। **৫. দ্র. দ্বারবতী**।

দ্বারবতী (দ্বারাবতী) : ২. *(আমদানি-রপ্তানি উন্মুক্ত যাহার?)।* **৩.** দ্বারবতী (দ্বারাবতী) = বহুদ্বারযুক্তা পুরী দ্বারকা। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দরজার দুটো পাল্লা থাকে। সেই দুটো পাল্লা বন্ধ করে দিলে প্রবেশপথ বা নির্গমনপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। বাহ্যিক গমনপথ হোক আর মানসিক গমনপথ হোক, সেই পথে যদি কোনো দো-পাল্লার দরজা থাকে, তবে তাকেই **দ্বার** বলা যায়। যে দেশে বা নগরে ঢুকবার অনেক পথ রয়েছে, তেমন দেশকে **দ্বারকা** এবং তেমন নগরকে **দ্বারাবতী** বলা যেতেই পারে। মোট কথা কাস্টমসের **দুয়ার** পেরিয়ে যে দেশী পণ্য বিদেশে নির্গমন করে কিংবা বিদেশী পণ্য দেশে প্রবেশ করে, সেই **দুয়ার**-সম্পন্ন নগরী মাত্রেই **দ্বারবতী** বা **দ্বারাবতী** পদবাচ্য। সেই সুবাদে প্রাচীন **দ্বারকা** ও **দ্বারাবতী** নগর আমদানি রপ্তানির কেন্দ্র ছিল। তা যদি নাই হবে, **দ্বারগোপ, দ্বারপাল, দ্বারনায়ক, দ্বারপিণ্ডী, দ্বারিক, দ্বারিকানাথ,** প্রভৃতি শব্দের এত মর্যাদা থাকত না।

দ্বারা : ৫. ইংরেজিতে যাকে by শব্দে বোঝানো হয়ে থাকে, বাংলায় তাকে আমরা **দ্বারা** বলি; কেন বলি, তা বেশ রহস্যজনক মনে হয়। কিন্তু বোঝা যায়, 'যার দ্বারা' কথাটির মানে যে দরজার (উপায়ের) ভেতর দিয়ে সমস্যাটি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাচ্ছে কিংবা যাচ্ছে না, সেই হল **দ্বারা**। এর ভিতরে দু-পাল্লার দরজার কথাও রয়েছে; অর্থাৎ **দ্বি** রয়েছে, যার অর্থ **দ্বারা** শব্দটির ভিতরে **b** রয়েছে। হয়তো সেকারণেই ইংরেজি ভাষা এই **দ্বারার** অর্থ করেছে by। **৬.** by।

দ্বি : দ্র. **দ্বি ক্রিয়ামূলের বিস্তারিত অর্থ।**

দ্বিগু : ২. / দ্বি গো যাহার; যাহাকে গোদ্বয়ের বিনিময়ে ক্রয় করা হইয়াছে। (ব.শ.)। যাহার দুইটি গরু আছে। (ছা.অ.)। **৩.** গোদ্বয়-স্বামিক। (ব.শ.)। **৪.** ব্যাকরণ পাঠের সময় প্রচলিত, অন্যথায় অপ্রচলিত। **৫. গো** মানে ভুলে যাওয়ার কী ভয়ানক ফল হতে পারে, **দ্বিগু** শব্দটি তার একটি মোক্ষম উদাহরণ। কার্যত, দুটি **গো** (যাহা যায়) জোড়া হয় যে সমাসে, তাকে **দিগু** সমাস বলে। যেমন **ত্রি** আর **ভুবন**, এই দুটি হল **গো**। **দিগু** সমাস এই দুটিকে অক্ষত রেখে **ত্রিভুবন** শব্দ বানায়। ...

দ্বিজ (দ্বিজা) : ১. দ্বি + ✓জন্ + অ (ড) কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***দ্বিজ*** *= দুই বার জন্ম যাহার।* ***দ্বিজা*** *=* ***দ্বিজ****-এর আধারশক্তি যে। /* **দ্বিজ** = যে মৌঞ্জিবন্ধন হেতু দ্বিতীয়বার জন্মায়। (ব.শ.)। **৩.** **দ্বিজ** = উপনয়নকৃত ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, দন্ত, অণ্ডজ, পক্ষী, সর্প, মৎস্য, অণ্ডজমাত্র, কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত জন। **দ্বিজা** = রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য, ভার্গী, পালঙ্কী, পালঙশাক। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** যে সত্তা উদ্ভিদজগতে পালঙশাককে বোঝায়, তারই পুরুষ সত্তাকে মানবসমাজে পৈতাধারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকেও বোঝায়। এদের বিশেষত্ব হল, এঁরা **দ্বিজ** হওয়ার পরে সামাজিক

সংগঠনে এঁদের যে কাজ, তা করবার অধিকারী হয়ে যান। একালে যেমন প্যানকার্ড হোল্ডাররা এক শ্রেণীর **দ্বিজ**, পাশপোর্ট হোল্ডাররা আর এক শ্রেণীর **দ্বিজ** এবং ভোটার-কার্ড হোল্ডাররা সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর **দ্বিজ**।

দ্বিপ : ১. দ্বি + ✓পা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দ্বি পালিত হয় যাহাতে।* / মুখশুণ্ড দ্বারা পান করে যে। (ব.শ.)। ৩. হস্তী, নাগকেশর। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দ্বি**। হাতি মুখ দিয়ে জল পান করে না, শুঁড় দিয়ে জল পান করে। অর্থাৎ জলপানের ক্ষেত্রে সে দ্বিতীয় পথ গ্রহণ করে। কিন্তু যতদূর বোঝা যায়, এই শব্দটি প্রধানত সমাজবনের হস্তীকে বোঝাতেই ব্যবহৃত হত। সমাজবনের হস্তী বা দক্ষ তার হস্তের (শুণ্ডের) উপর নির্ভরশীল। ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত তত্ত্ব নিয়ে সে তারই পুনরাবৃত্তি করে থাকে। সেকালের চোখে জীবনযাত্রা পদ্ধতির এটাই ছিল দ্বিতীয় পথ। এই পথটিকে যে অনুসরণ করত, সেই ছিল **দ্বিপ**।

দ্বীপ (দ্বীপবতী, দ্বীপিনখ, দ্বীপী) : ১. দ্বি + ঈ + পক্ কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. ***দ্বীপ** = দ্বি-ধারীকে পালন করে যে* / **দ্বীপ** = যেখানে জল দুই বার (দুই দিক দিয়া) গত। (ব.শ.)। ৩. **দ্বীপ** = জলবেষ্টিত ভূভাগ, জম্বু শাক কুশ ক্রৌঞ্চ শাল্মলী প্লক্ষ, পুষ্কর — পৃথিবীর এই সপ্ত খণ্ডের একতম. চিত্রকর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, কড়ার সপ্তমাংশ। **দ্বীপবতী** = দ্বীপযুক্তা, নদী, পৃথিবী। **দ্বীপিনখ** = ব্যাঘ্রনখ। **দ্বীপী (দ্বীপিন্)** = চিত্রচর্ম্মবান, মহাব্যাঘ্র, চিত্রক, চিতাবাঘ। (ব.শ.)। ৪. island অর্থে **দ্বীপ** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. **তির** ও **তীর** শব্দ থেকে আমরা বুঝতে পারি, **তির**-এর আধারই **তীর** পদবাচ্য। তেমনই **দ্বিপ**-এর আধারই **দ্বীপ** পদবাচ্য। এর একটা মানে হতে পারে, 'যেখানে দ্বিপ বা হস্তী থাকে'। তবে কিনা, এ দ্বীপের প্রসঙ্গ elephant-হস্তী বিষয়ে নয়, সমাজবনের হস্তী বা দক্ষ বিষয়ে। সেই দক্ষ-হস্তীই জলের বা জনসাধারণের মাঝে **দ্বীপ** রূপে নিজের এলাকা পৃথক করে নেয়, জল থেকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। আর তা সম্ভব হয় তার **দ্বি**-নীতি পালনের কারণে। সেই দক্ষেরই **সিংহরূপ**, **ব্যাঘ্র**রূপ, চিতাবাঘরূপ হয়। দ্র. **দ্বৈপায়ন**, **জম্বু**, **জম্বুদ্বীপ**।

দ্বৈপায়ন : ১. দ্বীপায়ন + অ (অণ্) - স্বার্থে। (ব.শ.)। ২. / দ্বীপ অয়ন যাহার, তাহা হইতে জাত। (ব.শ.)। ৩. ব্যাসদেব, হ্রদবিশেষ। (ব.শ.)। মহর্ষি বেদব্যাসের অন্য নাম দ্বৈপায়ন। তিনি যমুনার কোনো এক দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে এই নামে অভিহিত হন। দ্র. মৎস্যগন্ধা, পরাসর। (খ) কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী হ্রদ। ... কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষে ... দুর্যোধন একাকী এই হ্রদমধ্যে আত্মগোপন করেন। ... পরে উঠে এসে ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে ... নিহত হন। (পৌ.অ.)। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. রস থেকে যেমন রসায়ন, রাম থেকে রামায়ণ, অনেকটা সেইরকম দ্বীপ থেকে দ্বীপায়ন। অয়ন শব্দটি জাত হয়েছে **ই** ক্রিয়া থেকে — **ই** (গতি) অন যাহাতে। দৃষ্টির গমন অন থাকে বলে চোখকে অয়ন বলে। রসের অয়ন থাকে যে বিষয়ে তাকে সেকারণেই রসায়ন বলে। একই নিয়মে **দ্বীপ**-এর অয়ন থাকে যাহাতে তাকে **দ্বীপায়ন** বলে এবং তার থেকে জাত হয় দ্বৈপায়ন। দক্ষজ্ঞান একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতি মান্য করে বলেই **দ্বিপ** থেকে **দ্বীপ** হয়। এ হল দক্ষ-পালক সমাজব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা বলবৎ রাখার যে দার্শনিক-সামাজিক তত্ত্ব, সেটি ধারণ করে যে, সেই হল **দ্বৈপায়ন**। দ্র. **মৎস্যগন্ধা**।

দ্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অদলবদল, অদলা, আদলি, দ, দং, দঁক, দক, দ-কার, দগড়, দগর, দত, দদস্ব, দদ্রু, দদ্রূ, দদ্রুণ, দোয়াত, দ্রকট, দ্রগড়, দপ্তর, দফতর, দফা, দফাদার, দফারফা, দহর, দহরম-মহরম (দ-রহম-ব-রহম, দরক্ষম-বরক্ষম), দাউ-দাউ (দপ-দপ, দব-দব, দাব-দাব, দাও-দাও), দাউদ, দাদ, দাদখাই, দাদখানি, দাদন, দাদরা, দিদার, দিধিষু, দিল, দিস্তা (তা, টা), দুঁড়ে, দুনিঞা, দুনিয়া, দুন্দুভ, দুন্দুভি, দু(দো)রস্ত, দুলচা, দুলিচা, দেক্ (দিক্দারী), দেড়, দেদার, দেয়ানা, দেয়াল, দেরাজ, দেল (হৃদয়), দেলাসা, দোয়াত, দোয়েল, দোরুস্ত, দোস্ত, দ্রকট, দ্রম্ম,

ধ

ধ্ বর্ণের অর্থ : **ধ** = ধ্-অন্ করে যে; ধারক, ধারী; দানস্থিত = দণ্ড = ধ। ধ্ বর্ণটি তৈরি হয়েছে (দ্ + হ্ = ধ্) দ্-এর সঙ্গে হ্ জুড়ে। সেকারণে, সাধারণভাবে ধ্-এর অর্থ হল দানস্থিত, অর্থাৎ 'দান যেখানে গিয়ে থেমে যায়'। বিপরীত দিক থেকে দেখলে, দানকে ধরে রাখে যে, সেই হল **ধ** বা ধারক অর্থাৎ ধারী। এই ধারক মহাধারক জগদ্ধাত্রী **ধ** হতে পারেন, আবার বিশেষ্য রূপে 'ধরা ক্রিয়া'টুকই হতে পারে।

তার মানে **ধ** ক্রিয়াটির দুটো দিক রয়েছে। দাতার দিক থেকে দেখলে, দান যেখানে গিয়ে থেমে যাচ্ছে, সেটিই **ধ**; বিপরীত দিক থেকে দেখলে, হাতে পাওয়া বিষয় বা বস্তুকে ধরে যে, সে হল **ধ**। এই **ধ** আসলে হাত পেতে রয়েছে ধরবে বলে কিংবা হাঁ করে রয়েছে খাবে বলে।

ধ করে যে, তাকে **ধক** বলে; **ধ** টঙ্কারিত যাহাতে, তাকে **ধট** বলে; **ধ** অন যাহাতে, তাকে **ধন** বলে; **ধ** পালিত যাহাতে, তাকে **ধপ** বলে। এই **ধক, ধট, ধন, ধপ** প্রভৃতি শব্দের স্বরূপ সহজে অনুভব করা যায় যথাক্রমে **থক, ঋট, ঝন, থপ** বা **ঝপ** শব্দের তুলনা করলে। তরণ থামে যেখানে সেটি থ, সেই থ পালিত হয় থপ-এ। আর, জনন থামে যেখানে সেটি ঝ, সেই ঝ পালিত হয় ঝপ-এ। একইভাবে, দান থামে যেখানে সেটি **ধ**, সেই **ধ** করে যে সে হল **ধক**। আর, সেই **ধ** পালিত হয় **ধপ**-এ। থপ-থপ, ঝপ-ঝপ, ধক-ধক, ধপ-ধপ ধ্বনির মধ্যে সেই পার্থক্য অনেকটাই স্পষ্ট। আমরা '**ধপ করে**' বসে পড়ি; 'খপ করে' তুলে নিই। এর ভিতরের ক্রিয়াটিকে এবং ধ্বনির সাযুজ্যকে মেলালে দেখা যায়, এদের ক্রিয়া ও ধ্বনির স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক মিল রয়েছে, এবং সেই সাযুজ্যকে আমরা আমাদের অজান্তেই চিনি। সেজন্যই '**ধপ** করে তুলে নেওয়া' কথাটি যে ত্রুটিপূর্ণ তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এমনকি 'থপ করে

বসে পড়া' ও 'ঝপ করে বসে পড়া' এবং '**ধপ** করে বসে পড়া'র মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য কী, তাও অনুভব করতে পারি। এই **ধ** সক্রিয় হলে আমাদেরকে বলতে হয়, **ধ** অন হয়ে রয়েছে অর্থাৎ **ধন**।

ধ-এর আধারকে ধা বলা যায়। এর রহস্যরূপটিকে আমরা 'ধাঁ' শব্দে সহজে চিনতে পারি। ধি, ধু প্রভৃতির অর্থের জন্য অতঃপর **ক বর্গের অর্থ** দ্রষ্টব্য।

ধ্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : *ধক্ (ধচ্, ধট্, ধড়্, ধত্, ধম্, ধ্মা), ধন্,* ধা (হা), ধাব্, ধু (ধৃ), ধৃ (ধারি, ধৃষ্), ধ্যৈ (*ধে,* ধৈ), ধ্রু, *ধ্ব (ধ্বংস্),* ধ্ = ৯ + ১

***ধক্ (ধচ্, ধট্, ধড়্, ধত্, ধম্, ধ্মা)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** *:* আধ্মাত, ধ, ধক্, ধকড়িয়া, ধকধক, ধকধকি, ধকধ্বক, ধকল, ধ-কার, ধকোধকো, ধক্ক, ধক্কধক্ক, ধট, ধটি, ধটিকা, ধটী, ধড়, ধড়ফড়, ধড়ফড়া, ধড়ফড়ি, ধড়ফড়ে, ধড়মড়, ধড়া, ধড়াধড়, ধড়াধ্বড়, ধড়াশ, ধড়াস, ধড়াস-ধড়াস, ধড়ি(ড়ী), ধড়িবাজ, ধড়িবাজি, ধৎ, ধম, ধমক, ধমকচমক, ধমকা, ধমকান, ধমকানি, ধমধম, ধমন, ধমনি(নী), ধম্বল, ধম্মিল, ধম্মিল্ল, ধাঁচ, ধাঁচা, ধাঁজ, ধাক্কা, ধাঙসা, ধামধুম, ধামধুমী, ধামসা, ধামসান, ধিক্, ধিক, ধিকধিক, ধিকিধিকি, ধিক্কার, ধিগ্‌দণ্ড, ধিগ্‌বাগ্‌দণ্ড, ধিঙ্গ (বিকাশশীল ধারকের গমন), ধিঙ্গধিঙ্গ, ধিঙ্গী, ধিৎকার, ধীবর, ধ্মা, ধ্মাত, ধ্মান।

ধক্ (ধচ্, ধট্, ধড়্, ধত্, ধম্, ধ্মা) = ধারী-করণ। **ধক** = ধারী করে যে। **ধচ** = ধারী চয়ন করে যে। **ধট** = ধারী টঙ্কারিত যাহাতে। **ধড়** = ধারীর গড়ান-উড়ান যাহাতে। **ধত** = ধারীর তারণ যাহাতে। **ধম** = ধারী সীমায়িত যাহাতে। **ধ্মা** = ধারণ-সীমায়নের আধার যে।

ধ : ১. ✓ধা + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. / ধারণ করে যে; নিধিগণকে ধারণ করে যে। (ব.শ.)। ৩. ব্রহ্মা, কুবের, ধর্ম্ম। (ব.শ.)। ৪. পৃথকভাবে অপ্রচলিত। ৫. ধারণ করে যে, বা ধরে রাখে যে, তাকে **ধ** বলা হয়; অর্থাৎ **ধ** মানে আধার। কিন্তু কিসের আধার? যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের আধারই **ধ**-পদবাচ্য। তবে সাধারণভাবে বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির আধারকেই **ধ** বলা হয়ে থাকে। যথা : প্রাণের আধার, মনের আধার, জ্ঞানের আধার, ধনের আধার, এবং সর্বোপরি নিয়মের আধার। কিন্তু সমস্যা হল, এই জগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা বস্তু কী এবং তাকে ধরে রাখে কে? মানুষের জ্ঞানকে যদি সেরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভাবা হয়, তাহলে সেই জ্ঞানের ধারক অবশ্যই **ব্রহ্মা** = **ধ**। আর তা যদি ধনের ধারক হয়, তাহলে তিনি অবশ্যই **কুবের (বিষ্ণু)** = **ধ**। কিন্তু জ্ঞান বা ধন না হয়ে সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি জগতের নিয়মাবলী হলে তিনি অবশ্যই আরও উচ্চমার্গের **ধর্ম্ম (মহেশ্বর)** = **ধ**। এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের পূর্বসূরীরা যে **ধ** মানে 'ব্রহ্মা, কুবের, ধর্ম্ম' বলে গিয়েছিলেন, তা সম্পূর্ণ নির্ভুল। সত্যিই **ধ** বা ধারক হওয়ার যোগ্যতা কার রয়েছে, তা নির্ণয় করার ব্যাপারে আমাদের পূর্বপুরুষগণের বিবেচনা অতুলনীয়!

ধক, ধকধক, ধকল, ধাক্কা : ২. *ধক* = *ধ করে যে। ধকধক = ধক-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। ধকল = ধক লালিত বা লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে। ধাক্কা = ধাক (= ধক হইতে জাত) করণের আধার যে।* ৩. **ধকধক** = ভয়াদি হেতু চিত্তচাঞ্চল্য বা স্পন্দন, হর্ষাবেশ হেতু চিত্তের আবেগ, প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দ, বিরহানলের প্রজ্বলনভাব, উজ্জ্বলতা, দীপ্তি। **ধকল** = ধাক্কা, আঘাত, পরিহিত বস্ত্রে টান বা দলন-মলন, উৎপাত, দুরন্তপনা, কাজের ধাক্কা বা খাটনি। **ধাক্কা** = সংঘর্ষ, *ঠেকাঠেকি* (collision), বেগে আঘাত (knock), ভার, চাপ ৷(ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. অকস্মাৎ ভয় পেলে বুকের ভিতরটা **ধক** করে ওঠে। কারণ, নতুন (মন্দ-) খবর ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে ধারকস্থানের পাশাপাশি স্থানগুলি অবাক হয়ে যায়, বিরক্ত হয়; যেন-বা কারও বাড়িতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে দেখে তার প্রতিবেশীরা বিস্মিত হয়ে যায়, বিরক্ত হয়, বিরোধিতা জানায়, সেরকম। এই অনুভবের প্রকাশই **ধক**। সেই **ধক** গতিশীল হয়ে বিপরীত দিকে গেলেই হয়ে যায় **ধিক**। তাই, দপ করে ওঠা ও **ধক** করে ওঠার মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে। প্রদীপের দপ করে জ্বলে ওঠার পর থেকে আলো-তাপ দানের পালন চলতে থাকে। কিন্তু **ধক** করে ওঠার মধ্যে নতুন কোনো বস্তু বা বিষয়কে ধারণ করার ক্রিয়াটি চলতে থাকে, এবং তার ফলে পারিপার্শ্বিকের উপর যে প্রতিক্রিয়া ঘটে, **ধক** শব্দটি সেই ব্যঞ্জনা-অর্থটি প্রকাশ করে থাকে। এই ক্রিয়ার যদি পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে, অর্থাৎ **ধকধক** চলতে থাকে, তাহলে ধারক ও তার পারিপার্শ্বিকের শক্তিক্ষয় হতে থাকে। সেকারণে, একদিকে যেমন **ধক** লালনের ক্রিয়া চলে, অন্যদিকে তেমনি শক্তিক্ষয়ের ক্লান্তিও জমে ওঠে। এই ক্রিয়াকে বলে **ধকল**। তবে **ধাক্কা** কথাটি এই **ধক**-এর আরও বিবর্তিত রূপ। **ধক** যেখানে ঘটে, সেখানে যে চাপ বা দাগ পড়ে তাকে ধাক বলতে হয়। সেই ধাক-করণের আধারকে বলে **ধাক্কা**।

ধড় : ২. *ধারীর গড়ান-উড়ান যাহাতে।* ৩. মস্তকহীন দেহ, হস্তপদশিরোহীন দেহ, দেহ। (ব.শ.)। ৪. headless-body অর্থে অধিক এবং শুধুমাত্র body অর্থে কম প্রচলিত। ৫. দ্র. **ধ**। সজীব সত্তার আধার তার দেহ, আধেয় তার প্রাণ মন ইত্যাদি। সজীব সত্তার আধেয় বাদে যে আধার বা দেহ, তাকেই **ধড়** বলে। তাতে প্রাণধারক সত্তাটি থাকে। কিন্তু ঠিক কোথায় থাকে? সারা শরীরে না কি কেবল মাথায়? বাংলা ভাষায় **ধড়** শব্দটির ব্যবহার বলছে, মানুষের মন-প্রাণ-আমিত্ব তার মাথাতেই থাকে। সেই মাথাকে নিয়ে গড়ান-উড়ান চালায় যে, তাকেই তার 'শিরোহীন দেহ' বা **ধড়** বলে। একে **কবন্ধ** বা **কেতু**ও বলা হয়। এর সাহায্যে মন-প্রাণ-আমিত্বের আধারের বা **ধ**-এর গড়ান-উড়ান চলে বলেই একে **ধড়** বলে। অর্থাৎ, অন্নব্যঞ্জনপূর্ণ থালাকে যদি সজীব সত্তা বলা হয়, তবে অন্নব্যঞ্জনহীন থালাকে তার **ধড়** বলা চলে।

ধড়ফড় (ধড়মড়) : ২. *ধড়ফড় = ধড় ও ফড় (পালনস্থিতির গড়ান-উড়ান যাহাতে)। ধড়মড় = ধড় ও মড় (সীমায়িত গড়ান-উড়ান যাহাতে।)* ৩. যন্ত্রণাহেতু হস্তপদের বেগে আস্ফালন বা

আক্ষেপ, ঈর্ষ্যাভয়াদি হেতু অশান্তভাব, ছটফট। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ধড়-এর বেলায় আমরা শিরোহীন দেহের উড়ান-গড়ানকে দেখেছি। কিন্তু ফড়-এর বেলায় আমরা তার বিক্ষিপ্ত আলো-বাতাস-শব্দ ইত্যাদির উড়ান-গড়ানকে দেখতে পাই। 'বেশি ফড়ফড় করিস না' — এরকম বাক্য বাংলাভাষায় হামেশাই শোনা যায়। এতে মানুষটির গড়ান-উড়ান নেই, রয়েছে তার বলা কথাবার্তার বা শব্দের। তাই ফড়ফড়। আর ধড়ফড় না হয়ে যদি ধড়মড় হয়, তাহলে, সত্তাটি যতটুকু গড়ান-উড়ান করে প্রসারিত হয়েছিল, ততটুকু নিজেকে গুটিয়ে নেয়, গুড়িয়ে-মুড়িয়ে নেয়। এই 'গুড়িয়ে নেওয়া' শব্দটি গ্রামবাংলার বাঙালির মুখে শুনতে পাওয়া যায়। শব্দটি 'কুড়িয়ে নেওয়া' ও 'গুটিয়ে নেওয়া' উভয়ার্থে ব্যবহৃত হয়।

ধড়ি, ধড়িবাজ, ধড়িবাজি : ২. *ধড়ি = ধড় গতিশীল যাহাতে। **ধড়িবাজ** = ধড়ি বাহকত্ব জনিত হয় যাহাতে। **ধড়িবাজি** = **ধড়িবাজ** গতিশীল যাহাতে।* ৩. **ধড়ি** = ধটিকা, চীর, বস্ত্রখণ্ড, পরিধেয় বস্ত্র। **ধড়িবাজ** = ধূর্ত্ত, প্রতারক, বদমাশ, চালাক, তুখড়। (ব.শ.)। ৪. ধড়ি অপ্রচলিত, cheat অর্থে **ধড়িবাজ** প্রচলিত। ৫. দ্র. **ট** ও ড/ড়। **ধড়** যার আবরণে গতিশীল হয়, সে তার বস্ত্র হতে পারে। সেই সুবাদে জামাকাপড়-পরা একটি দেহ এগিয়ে চলতে থাকলে, তাকে **ধড়ি** বলা যায়। কিন্তু সেই **ধড়ির** অগ্রগতি যদি অনেক বেশি এগিয়ে গিয়ে অন্যের ক্ষতি করে দেয়, তখন তাকে বলে **ধড়িবাজ**। তার মানে, **ধড়ের** সাহায্যে অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করা বা গা-জোয়ারি করে অন্যকে পর্যুদস্ত করাই **ধড়িবাজি** করা। কিন্তু বাস্তবে শব্দটির সেরকম ব্যবহার হয় না। মেয়েরা তো বলেই, 'তোমার রকমসকম দেখে গা জ্বলে যায়', কিন্তু কার্যত জ্বলে যায় তার মন। অর্থাৎ, জ্বলে যায় মানুষের মন, কিন্তু আমরা বলি, 'তার **গাত্রদাহ** হচ্ছে'। ঠিক সেইরকম। **ধড়িবাজির** ক্ষেত্রে লড়াইটা হয় মনের সঙ্গে মনের, একজনের মন অন্যের মনকে পর্যুদস্ত করেই কেবল তাকে প্রতারণা করতে পারে, অথচ আমরা বলি, 'লোকটা ধড়িবাজি করছে', যার শব্দগত অর্থ কিনা 'গা-জোয়ারি করছে'। কেন যে এইরকম উল্টো ব্যবহার, তা আমরা এখনও জানি না।

ধমক (ধমকা, ধমকান, ধমকানি) : ১. ✓ধ্মা + অক (কুন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ধমক = ধারীকে সীমায়িত করে যে। **ধমকা** = **ধমক**-এর আধার যে। **ধমকান** = **ধমকা** অন যাহাতে। **ধমকানি** = **ধমকান** গতিশীল যাহাতে।* ৩. **ধমক** = কর্ম্মকার, পিষ্টকবিশেষ, ভয়প্রদর্শনার্থ সশব্দ তিরস্কার, তাড়া, দাবড়ি, শব্দ, বেগ, বল। **ধমকা** = ধমক দেওয়া, তাড়া দেওয়া। **ধমকান, ধমকানি** = ধমককারণী, ধমক দেওয়া, তাড়া দেওয়া। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. এই শব্দটির মূলে যে ক্রিয়াটি রয়েছে তা হল **ধ্মা**। এর ভিতরে ধারণ ও সীমায়ন একত্রে মিলিতভাবে রয়েছে। এর অর্থ হল, বেঁধে-মুড়ে-চেপে ধরে রাখা। কোনো পিঠার ভিতরে সেভাবে পুর দেওয়া হয়ে থাকলে, তাকে **ধমক** বলা যেতে পারে। এমনকি, কামার যেভাবে লোহাকে পিটে পিটে সীমায়িত করে, সেজন্যে তাকেও ধম-কারী **ধমক** বলা যেতে পারে। তবে আজকাল সে অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। **শব্দের সাহায্যে, বকাবকি করে কাউকে কুঁকড়ে যেতে (সংযমিত হতে) বা সীমায়িত হতে বাধ্য করাকে (যম করাকে) ধমক দেওয়া বা ধমকান বলা হয়ে থাকে। ধমকান**-র কাজটি চলতে থাকে **ধমকানিতে**। ৬. ইংরেজি damn, damnation, condemn, damage ইত্যাদি।

ধিক্, ধিক, ধিকধিক, ধিকিধিকি, ধিক্কার, ধিগ্‌দণ্ড, ধিগ্‌বাগ্‌দণ্ড : ২. *ধিক্ = ধক্-এর গতিরূপ মাত্র। **ধিক** = **ধক** গতিশীল যাহাতে। **ধিকধিক** = **ধিক**-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। **ধিকিধিকি** = **ধিকি**-ব (= **ধিক** গতিশীল যাহাতে, তাহার) পুনরাবৃত্তি যাহাতে। **ধিক্কার** = **ধিক্** যে কার; অর্থাৎ **ধিক্** জানানো হয় যে ক্রিয়ার দ্বারা। **ধিগ্‌দণ্ড** = **ধিক্** জানানো হয় যে দণ্ডের দ্বারা। **ধিগ্‌বাগ্‌দণ্ড** = **ধিক্**-কার স্বরূপ যে বাক্য দণ্ড রূপে প্রদত্ত হয়।* / **ধিক্** = অপকারশব্দ দ্বারা ভয়োৎপাদন (যাহাতে)। **ধিগ্‌বাগ্‌দণ্ড** = 'ধিক্' বাক্যে নির্ভর্ৎসন করে যে। (ব.শ.)। ৩. **ধিক্** = নির্ভর্ৎসন, দোষ-আখ্যাপন, নিন্দা। **ধিক** = অধিক, উৎকৃষ্টতর, মহত্তর, পুণ্যজনক, বিশেষ, প্রয়োজনীয়, অধিকসংখ্যক, প্রিয়তর, অস্বাভাবিক। **ধিকধিক** = অতিপ্রদীপ্তভাব। **ধিকিধিকি** = অল্প-অল্প, মিট্‌মিট, অল্পে-অল্পে, ক্রমে-ক্রমে, মৃদুজ্বলনের ভাব, শ্বাসজন্য মৃদুকম্পন, ধুকধুক। **ধিক্কার** = 'ধিক্'-উচ্চারণ, 'ধিক্' বলা, নিন্দা। **ধিগ্‌দণ্ড** = 'ধিক্' এই দণ্ড, ধিক্কাররূপ দণ্ড, দুর্ব্বৃত্ত, নির্ভর্ৎসনদণ্ড। **ধিগ্‌বাগ্‌দণ্ড** = 'ধিক্' এই বাক্য-রূপ দণ্ডদাতা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ধক**। সত্তার পক্ষে ক্ষতিকর বহিরাগত কোনো ক্রিয়া, তা সে সত্তার গায়ে ছোঁড়া নোংরা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ যাই হোক না কেন, তা ধারণ করার পর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে **ধক্** গতিশীল হয়ে বহিরাগত ক্রিয়াটির কারকের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, তাকে **ধিক্** বলে। সেই **ধিক** করাকেই বলে **ধিক্কার**। ...

ধিঙ্গ, ধিঙ্গী : ২. *ধিঙ্গ = গতিশীল ধারীর রহস্যরূপী গমন যাহাতে। **ধিঙ্গী** = **ধিঙ্গ**-এর গতিশীল আধার যে।* ৩. **ধিঙ্গ** = বিশাল, দীর্ঘ। **ধিঙ্গী** = লজ্জাহীনা নারী, বেহায়া মেয়ে, নির্লজ্জ, বেহায়া, বেশরম, উন্মত্ত, উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল। (ব.শ.)। ৪. 'অতি লম্বা ও লজ্জাহীনা নারী' অর্থে প্রচলিত। ৫. '**ধিঙ্গী** মেয়ে' শব্দটি গ্রামবাংলায় প্রধানত অবিবাহিতা, দীর্ঘাঙ্গী ও খানিকটা লজ্জাহীনা কোনো মেয়ের উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে, তার 'লজ্জাহীনা' অর্থটি যেন-বা ইচ্ছাকৃত নয়; দীর্ঘাঙ্গী হওয়ার কারণে তার হাঁটাচলা স্বভাবতই একটু আলুথালু হয়ে থাকে। এবং সম্ভবত 'দীর্ঘাঙ্গী' শব্দটিই ক্রমে **ধিঙ্গী** শব্দে পরিণত হয়ে গেছে। তাতে অর্থটি যেরকম দাঁড়ায়, (২) সংখ্যক অর্থে সেকথাই লেখা হল।

ধীবর : ১. ✓ধা + বর (বরচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ধী বরণ করে যে।* ৩. কৈবর্ত্ত, দাশ। (ব.শ.)। ৪. fisherman অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **দাশ, কৈবর্ত্ত**। ইতোপূর্বে **ধ** বর্ণের অর্থে আমরা দেখেছি যে, তা মূলত তিনরকম বিষয়ের ধারক — জ্ঞান, ধন, নিয়ম। একালের বৈজ্ঞানিক অর্জন থেকে আমরা বুঝতে পারি, যত অধিক পরিমাণে

বিশ্বসংসারের নিয়মাবলী বা **ধর্ম্ম**কে জানতে পারা যায়, তত অধিক পরিমাণে জ্ঞান ও ধনের অধিকারী হওয়া যায়। যে-বুদ্ধি সেইরূপ অধিক '**ধর্ম্ম**কে গতিশীল রূপে জানে বা ধারণ করে', তাকে **ধী** বলে। যতদূর বোঝা যায়, যে-মানুষ সেই **ধী**কে বরণ করত, সেকালে তাকে বলা হত **ধীবর**। খুব সম্ভব তার আদি স্বভাব ছিল জ্ঞানধারায় নিয়মের 'মৎস্য' ('আমার জ্ঞান') ধরা। তখন পর্যন্ত সেই **ধীবর** ছিলেন আদি **দাশ**। দক্ষযজ্ঞের পরবর্তীকালে ক্রমে তার স্বভাব বদলে যেতে বাধ্য হয়। তাদের একটি অংশ অতঃপর পণ্যধারায় ধনের 'মৎস্য' ('আমার ধন') ধরতে শুরু করে। তারও বহু বহু কাল পরে সেই আদি **কৈবর্ত্ত** ক্রমে একদিন জেলে-কৈবর্ত্ত ও হেলে-কৈবর্ত্ততে পরিণত হয়ে যায়।

***ধন্* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অধন, অধন্য, ধন, ধনকাঙ্গালি, ধনকাম, ধনকুবের, ধনজাত, ধনঞ্জয়, ধনদ, ধনদণ্ড, ধনদাতা, ধনদৌলত, ধনপতি, ধনপাল, ধনপিশাচ, ধনপিশাচিকা, ধনপ্রয়োগ, ধনবতী, ধনবন্ত, ধনবান, ধনশ্রী, ধনসম্পত্তি, ধনস্থান, ধনাধিকারী, ধনাধিপ, ধনাধিপতি, ধনাধ্যক্ষ, ধনাপহার, ধনার্চ্চিত, ধনার্থী, ধনাশা, ধনি, ধনিক, ধনিন, ধনিয়া, ধনিষ্ঠ, ধনিষ্ঠা, ধনী, ধনীয়ক, ধনু, ধনুঃ, ধনুক, ধনুকী, ধনুকী, ধনুখরা, ধনুয়া, ধনুর্গ্রহ, ধনুর্জ্যা, ধনুর্দ্ধর, ধনুর্বিদ্যা, ধনুর্ব্বেদ, ধনুর্ভৃৎ, ধনুর্মখ, ধনুর্মধ্য, ধনুষ্টঙ্কার, ধনুষ্পাণি, ধনুষ্মান, ধনেশ, ধনেশ্বর, ধনৈষী, ধন্য, ধন্যা, ধন্ব, ধন্বদুর্গ, ধন্বন্তরী, ধন্বন্য, ধন্বা, ধন্বী, কামধনু, রামধনু।

ধন্ = ধারণ অন। **ধন** = ধারণ অন যাহাতে।

ধন (ধন্য) : ১. ✓ধন্ + অ (অচ্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ধন*** = *ধারণ অন যাহাতে।* ***ধন্য*** = ***ধন*** *থাকে যাহাতে।* / **ধন** = যাহা দ্বারা বাঁচে। **ধন্য** = ধনলাভ করে যে। (ব.শ.)। **৩. ধন** = অর্থ, টাকাকড়ি, বিভব, রিক্‌থ, স্বর্ণাদি, সম্পদ, গোধন, ধনসদৃশ বস্তুমাত্র, স্নেহপাত্র, ক্রেয়দ্রব্য, মূলধন, লুণ্ঠিতদ্রব্য, দ্বন্দ্বযুদ্ধে জেতার লব্ধ দ্রব্য, ধনিষ্ঠানক্ষত্র, যোগচিহ্ন '+', যোজ্য, লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থান। **ধন্য** = ধনলব্ধা, সুকৃতী, পুণ্যবান, প্রশংসার্হ, সুভগ, ভাগ্যবান, সাধু, সুখী, ধননিমিত্তক (সংযোগ, সংযোগাদি), ধনলাভজনক, মঙ্গলাবহ (দ্রব্য), ভাগ্যবান জন, বিষ্ণু, অশ্বকর্ণ বৃক্ষ, নাস্তিক, ধনার্থ হিত, অর্থশাস্ত্র, ধন্যাক। (ব.শ.)। ৪. money **অর্থে ধন শব্দটি** প্রচলিত। **ধন্য** শব্দটি প্রশংসার্থে কমবেশি প্রচলিত। ইংরেজি thank শব্দের পরিবর্তে আজকাল **ধন্যবাদ** শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যদিও এটি তার যথার্থ অনুবাদ নয়। **৫. ব.শ. জানিয়েছেন, ঋগ্বেদে ধন শব্দটি** 'ধননিমিত্ত সংগ্রাম' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, দেখা যায়। গণিতে শব্দটি যোগচিহ্ন রূপে প্রচলিত, যার বিপরীত **শব্দ ঋণ**। সবাই জানেন, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শব্দদুটি যথাক্রমে positive, negative বা plus, minus অর্থে প্রচলিত। এই সমস্ত তথ্যগুলি আমাদের জানায় যে, **ধন** শব্দটি এমন এক **ধ** বা ধারী-সত্তাকে বোঝায়, যে সর্বদা নিজের সঙ্গে কোনো কিছু আহরণ করে জুড়তে থাকে; 'ধারণ অন' করতে থাকে। সেই হিসেবে, যা কিছু অন্যকে নিজের সঙ্গে জোড়ার জন্য হাঁ করে আছে, কিংবা গ্রাস করার জন্য হাঁ করে আছে, তাকেই **ধন** বলা যায়। তবে, **চর** যেমন চরাকে (to graze) বোঝায় চরকেও (grazing-field) বোঝায়, সেইরকম **ধন** ধন-আনয়নকে বোঝায়, ধনকেও বোঝায়। তার মানে, **ধন** শব্দটির ভিতরেই একটি সদা বৃদ্ধিশীল স্বভাব বিদ্যমান রয়েছে। এই **ধন** অতএব 'জীবন যৌবন ধন মান'কেও যেমন বোঝায়, তেমনি যেসকল **ধন** পেলে মানুষ **ধন্য** হয়, তেমন সর্বপ্রকার **ধন**কে বোঝায়। তবে কিনা, প্রাচীনকাল থেকে মানুষের সভ্যতা যতই আধুনিক কালের দিকে এগিয়েছে, মানসসম্পদ থেকে ততই বাহ্যসম্পদ বা টাকাপয়সা অর্থে **ধন** শব্দটির ব্যবহার ক্রমশ বেড়েছে। তবে এর নিয়ত বৃদ্ধিগুণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। **ধনঞ্জয়, বিষ্ণু** ... প্রভৃতি শব্দে যেমন তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি পুঁজির স্বভাবের মধ্যেও তার প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। সে যে বিনিয়োজিত না-হয়ে 'অলস পুঁজি' রূপে বসে থাকতে একটুও রাজি হয় না, সেকথা পুঁজিবাদী মাত্রেই বোঝেন। তাছাড়া, বসে থাকলেও তার বৃদ্ধি বন্ধ থাকে না, সুদে সুদে বাড়ে। এমনকি, মুদ্রাসমূহ ভূগর্ভে পুঁতে রেখে দিলেও মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুর মূল্য বৃদ্ধির কারণে তা বাড়তে থাকে। যেকারণে মোগল আমলের বা ব্রিটিশ আমলের মুদ্রার দাম বর্তমান মুদ্রামান থেকে বেশি। ... কেন, সে বিষয়ে আমরা একটু পরেই আসছি।

পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তির যে বোধ আমাদের পূর্বপুরুষেরা অর্জন করেছিলেন, তাতে দেখা যায় — শিব বা পুরুষ (মন বা চেতনা) দণ্ডায়মান থাকে, যাকে '।' চিহ্নে প্রকাশ করা চলে; এবং প্রকৃতি বা শক্তি (দেহ বা জড়-আধার) শায়িতা থাকে, যাকে '—' চিহ্নে প্রকাশ করা চলে। **ধন**-এর বেলায় দেখা গেল, তাতে পুরুষ-প্রকৃতি (বা মন-দেহ / চেতনা-জড় / শিব-শক্তি) উভয়েই একত্রে 'স্বাভাবিক-রতাতুরা' (দ্র. **ছিন্নমস্তা**) রূপে বিদ্যমান রয়েছে। খুব সম্ভব সেকারণেই আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা একে '+' চিহ্নে প্রকাশ করেছিলেন। এতে চেতনা ও জড়ের একপ্রকার দ্বৈরাজ্য রয়েছে। ...

আমাদের উত্তরাধিকার আমাদের জানায় যে, **ধন** দিয়ে দিলে কমে যায়, যখন কিনা **জ্ঞান** দিয়ে দিলে বেড়ে যায় — 'দানে নৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্'। আজ আমরা জানি, ধনসম্পদ সৃষ্টিতে জড় ও চেতনার দ্বৈরাজ্য থাকে। পার্থিব বস্তুতে (হাঁড়ি তৈরির সময় মাটিতে) সজীব মানুষের শ্রম ও জ্ঞান (তেজ, মেধা) প্রযুক্ত হয়ে বাহ্যসম্পদ জন্মায়। একে বাহ্যসম্পদ বলা হলেও পুরোপুরি বাহ্যসম্পদ নয়, কিছুটা অলৌকিকত্ব রয়েছে। **ঋণ, দেবঋণ, তর্পণ** প্রভৃতি শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ থেকে আমরা জানতে পারি, এই বাহ্যসম্পদের ধারাও একটি চলমান ধারা, পরমাপ্রকৃতির বা ঈশ্বরের রাজত্বে যা কিনা মনুষ্যসৃষ্ট-ধারা। এই ধারায় আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের শ্রম-মেধা, চর্বি-ঘিলু, দেহ-মন, সবই ভূত হয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, ত্রয়ীশক্তির ত্রিস্বরূপের এ হল মধ্য রূপ বা বিষ্ণু রূপ। এই বিষ্ণুই তাঁর নগদ-নারায়ণ রূপে **ধন** পদবাচ্য। এই রূপ বাহ্যিক বটে, মানসিকও বটে। একালের মানুষের হাতে যে **ধন**সম্পদ রয়েছে, তা তার পূর্বপুরুষদের শ্রম ও মেধা, চর্বি ও ঘিলুর ভূত বলেই তার আচরণ ভূতের মতো হয়ে থাকে। যেকারণে

মার্কস সাহেবকে Capital-এর fetishism নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়েছিল। ...

ধনঞ্জয় : ১. ধন + √জি + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. / যিনি ধন জয় করেন। ধনকে বশীকরণ করে যে। (ব.শ.)। ৩. অর্জ্জুন, অর্জ্জুনবৃক্ষ, অগ্নি, চিত্রকবৃক্ষ, দেহস্থ বায়ুভেদ, বিষ্ণু, নাগভেদ। (ব.শ.)। (ক) অর্জুনের অন্য নাম। সমস্ত জনপদ জয় করে ধনসংগ্রহ পূর্বক তার মধ্যে বাস করতেন বলে অর্জুন এই নামে পরিচিত। (খ) মহর্ষি কশ্যপের অন্যতমা স্ত্রী ও দক্ষের কন্যা কদ্রু হতে যে সকল নাগ জন্মগ্রহণ করে, ধনঞ্জয় তাহাদের অন্যতম। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. সন্দেহ নেই যে, শব্দটির নিহিতার্থ 'ধনকে জয় করে যে'। কে কে এই ক্রিয়াটি করে? উপরোক্ত তথ্য বলছে, 'অর্জ্জুন, অর্জ্জুনবৃক্ষ, অগ্নি ... ইত্যাদি' সত্তাগুলি নাকি 'ধনকে জয়' করে। তাই তাদেরকেও **ধনঞ্জয়** বলা হয়। কিন্তু ঐ সত্তাগুলির অর্জ্জুনবৃক্ষ (অর্জ্জুনগাছ) আর অগ্নি (আগুন) ছাড়া আর কাউকে আমরা ঠিকঠাক চিনি না; সুতরাং তারা 'ধনকে জয়' করে কি না, সেকথা বলা কঠিন। তবে আমাদের চেনা অর্জ্জুনগাছ বা আগুন আর যাই করুক, 'ধনকে জয়' করে, একথা বলতে পারি না। অর্জ্জুনগাছকে টাকা রোজগার করতে আমরা দেখিনি। হ্যাঁ, অগ্নি সর্বভুক, সব জিনিসকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়; তার এই ক্রিয়াকে যদি 'ধন জয় করা' বলা হয়, তাহলে আলাদা কথা।

তাহলে ব্যাপারটি কী? **অর্জ্জুন** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ থেকে আমরা আগেই জেনেছি, যে, একালের ভাষায় যাকে white money বলে, সেকালে তাকে **অর্জ্জুন** বলা হত। কারণ তা ছিল সেই চরিত্রের ধনাত্মক সম্পদ, রাষ্ট্রশক্তি যাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু গায়ের রং সাদা বলেই অর্জ্জুনগাছকে **ধনঞ্জয়** বলা যায় কি না, তা ভাববার বিষয়। তবে **অগ্নি** অর্থে যদি সামাজিক তেজ বুঝি, তাহলে মানতেই হবে যে, তেজস্বী ব্যক্তিই ধনাত্মক অর্জ্জন করবার যোগ্যতা ধরে। সেক্ষেত্রে **অগ্নি**কে **ধনঞ্জয়** বলা যেতেও পারে। ব.শ. যখন বলছেন, অগ্নি 'ধনের বশীকারক', তখন আমরা সেকথায় সায় দিতে পারি, যদি সে-অগ্নি সমাজের কোনো শক্তিধর সত্তা হয়। এমনকি **নাগ** শব্দ থেকেও আমরা সেই তথ্যের সত্যতায় পৌঁছে যাই, যখন আমরা জানতে পারি, **নাগ** সত্তাটি হল আসলে সমাজের সর-পালনকারী সর্প। সেই বিচারে, যে-কোনো ধনসম্পদশালী ব্যক্তিই **ধন** অর্জ্জন করতে পারেন বলে তাঁরা **নাগ** পদবাচ্য। এককালে একমাত্র এরকম **নাগ**গণই নাগরিক (burgher) পদবাচ্য ছিলেন; বাকি সমাজসদস্যদের নাগরিক বলা হত না। স্বাধীনতাপূর্বকালে ভারতেও যারা 'চৌকিদারী tax' বা 'মিউনিসিপ্যালিটি tax' দিত, অর্থাৎ কমবেশি ধনী, তারাই ভোট দিতে পারত; অর্থাৎ তারাই **নাগরিক** পদবাচ্য ছিল। ইউরোপের ইতিহাস অনুসারে, এই burgher-রাই পরে bourgeois বা 'বুর্জোয়া'য় পরিণত হয়। পৌরাণিক ভাষায় এরাই **ধনঞ্জয় নাগ**। কিন্তু বাকি শব্দগুলি কেমন করে **ধনঞ্জয়** হয়, তার জন্য তাদেরকে আরও গভীরভাবে বোঝা দরকার।

এই কাজে আমাদের সহায়তা করতে পারে বিশ্বের চলমান অতিচেতনার ধারণা, যাকে আমরা দেখতে পাই গোরা, শ্যাম, ও কৃষ্ণের ধারণায়। দ্র. **গৌরী**। সেখানে আমরা দেখছি, সাদা অংশটি অর্জিত জ্ঞান-ধন বা **বিষ্ণু**-পদবাচ্য; যার কাজ হল কৃষ্ণকে শ্যামে পরিণত করে ক্রমে তাকে আপন শ্বেত রূপে আত্মস্থ করা। সে নিঃসন্দেহে **ধনঞ্জয়**ই বটে। তবে এ হল মানসলোকের সর্বোচ্চ অর্জন। বাহ্য দুনিয়ায় **অর্জ্জুন**গাছ, **চিত্রক**গাছ ... প্রভৃতি কেমন করে কৃষ্ণকে শ্যামে পরিণত করে আপন শ্বেতসত্তার অন্তর্ভুক্ত করে, প্রকৃতি থেকে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না।

এবার **ধনঞ্জয়**-এর সাম্প্রতিক রূপের কথা বলি। বাহ্যসম্পদের দুনিয়ায় সম্প্রতি **কৃষ্ণকে শ্যাম**-এ, এবং **শ্যামকে গৌরী**তে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে এক আসুরিক প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছে। আমরা জানি, অনিশ্চিত-অপরিমেয়র এলাকাই **কৃষ্ণের** এলাকা। সেখানে পণ্য-উৎপাদকের goodwill বা 'সুনাম', পণ্যের brand বা 'বরণচিহ্ন' ... প্রভৃতি বেশ কিছু অপরিমেয় বিষয়ের উদ্ভব হয়। আজকাল প্রায়শই সেই অপরিমেয়কে বিক্রি করে তাদেরকে পরিমেয়প্রায় করে ফেলা হয়; **কৃষ্ণ** পরিণত হয় **শ্যাম**-এ (একালের ভাষায় বলা হয় grey money-তে)। এরপর সেই goodwill, brand ... প্রভৃতির মূল্যকে পুঁজির জমার হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করে তাকে **গৌরী**তে রূপান্তরিত করে ফেলা হয় এবং (**বটবৃক্ষ**টির বা) কোম্পানিটির পুঁজি থেকে সমপরিমাণ **নগদ-নারায়ণ** সরিয়ে ফেলা হয়। সাম্প্রতিক কালের কিছু **ধনঞ্জয়** 'ধন জয় করা'র ক্ষেত্রে এই পথ গ্রহণ করছেন। মাঝ থেকে প্রকৃত পুঁজির স্থান দখল করে নিচ্ছে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত পুঁজি। তারপর পরবর্তীকালে কোনো প্রকৃত ঝড়ের মুখোমুখি হলেই কোম্পানিটির (বটবৃক্ষটির) ফোঁপরা মূলকাণ্ডটি বা চেহারাটি হঠাৎই সামনে এসে যায় এবং সেই কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত মানুষদের জীবনে দিনদুপুরে গভীর রাত্রি নেমে আসে। বটবৃক্ষ মড়মড় করে ভেঙে পড়ে। এ **ধনঞ্জয়** কালসর্পই বটে।

ধনপতি : ২. *ধনের পতি*। / ধন রক্ষা করে যে। (ব.শ.)। ৩. কুবের, ধনাধ্যক্ষ। (ব.শ.)। পুলস্ত্যের পুত্র বিশ্রবা, বিশ্রবার পুত্র ধনপতি। এঁর অন্য নাম কুবের ও বৈশ্রবণ। পুলস্ত্য একজন তপঃপরায়ন ঋষি ছিলেন। একদিন ভরদ্বাজ মুনি বিশ্রবার আশ্রমে এসে দেববর্ণিনী নামে এক কন্যাকে এঁর হাতে অর্পণ করেন। কালক্রমে এঁর একটি পুত্র হল ... এই পুত্রের নাম হল বৈশ্রবণ। বৈশ্রবণের সহস্র বৎসরের তপস্যায় প্রীত হয়ে ব্রহ্মা ... তাঁকে লোকপাল ও ধনাধ্যক্ষ হবার বর দেন। ... (পৌ.অ.)। ৪. rich man অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কুবের**।

ধনি, ধনিক, ধনিষ্ঠ, ধনিষ্ঠা, ধনী, ধনীয়ক : ২. ***ধনি*** *= **ধন** গতিশীল যাহাতে।* ***ধনিক*** *= **ধনি** করে যে।* ***ধনিষ্ঠ*** *= **ধনি** দিশাগ্রস্ত ভাবে টঙ্কারস্থিত হয় যাহাতে।* ***ধনিষ্ঠা*** *= **ধনিষ্ঠ**-এর আধার যে।* ***ধনী*** *= **ধনি**র আধার যে।* ***ধনীয়ক*** *= **ধনী**র যাওয়া কৃত হয় যাহাতে।* ৩. **ধনি, ধনী** = ধন্য, প্রশংসনীয়, ভাগ্যবান, কুলবধূ, যুবতী, সুন্দরী। **ধনিক** = ধনবান, ধনী, ধনী জন, উত্তমর্ণ, সাধু, বণিক, স্বামী, পতি, ধনিকভার্য্যা, বধূ, যুবতী, প্রিয়ঙ্গুলতা। **ধনিষ্ঠ** = অতিশয় ধনী। **ধনিষ্ঠা** = ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র (ইহাতে জন্মিলে নর

আচারবান আদৃত চারুশীল দয়ালু ধনবান বলী হয়।)। **ধনী** = ধনবান, আঢ্য, অধিকারী, স্বামী, ধনীজন, উত্তমর্ণ। **ধনীয়ক** = ধনিয়া, ধনে। (ব.শ.)। ৪. rich অর্থে **ধনী** প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. বাহ্যসম্পদকে **ধন** বলে ঠিকই, কিন্তু কী ধরনের বাহ্যসম্পদ? যে-বাহ্যসম্পদ বাড়তে থাকে, তাকেই **ধন** বলা হয়েছে। সামাজিক মানুষ বা পরিবারসদস্য মানুষের ক্ষেত্রে তা আর্থিক শক্তি বা টাকাপয়সা হতে পারে; ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে তা কিন্তু দৈহিক শক্তি হতে পারে, এমনকি যৌবনও হতে পারে। সেই কারণে, যে নারীর অস্তিত্বই তার যৌবনধনের মাধুরী বিলোতে থাকে, তাকে **ধনি** বা **ধনী** বলা যায়। আবার যে-মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব তার আর্থিক-**ধনের** সৌরভ ছড়ায়, সেও **ধনী**। একই ধরনের সৌরভ রয়েছে **ধনীয়ক** বা ধনে নামক শষ্যদানার। তাই সে **ধনীয়ক** বা **ধনে**। সর্বোপরি, বাহ্য-আকাশের গ্রহনক্ষত্র ও সমাজ-আকাশের গ্রহনক্ষত্র উভয়কে সমান্তরাল ভাবে বুঝে নিয়ে **জ্যোতিষ**-এ যে-ধনীশ্রেষ্ঠদের অস্তিত্ব ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে সে হল শ্রেষ্ঠ **ধনী**। দ্র. **জ্যোতিষ, প্রাগজ্যোতিষ**।

ধনু (ধনুঃ, ধনুর্দ্ধর, ইন্দ্রধনু, রামধনু, হরধনু) : ১. ✓ধন্ (শব্দ) + উ - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ধনু*** *=* ***ধন*** *নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ***ধনুঃ*** *=* ***ধনু****র নির্য্যাস যাহাতে।* ***ইন্দ্রধনু*** *= দ্র.* ***ইন্দ্র****।* ***রামধনু*** *= রামের* ***ধনু****।* ***হরধনু*** *= হরের* ***ধনু****।* ***ধনুর্দ্ধর*** *=* ***ধনুঃ*** *ধরে যে।* ৩. **ধনু (ধনুঃ)** = চাপ, রাশিবিশেষ (এই রাশিতে জাত নর বহুকলাজ্ঞ প্রবল সরলবাক বিমলস্বভাব সঞ্চয়ী ও কৃপণ হয়), চতুর্হস্তপরিমাণ, পিয়ালবৃক্ষ, রামধনু, ধনুরাকৃতি বৃত্তাংশ। (ব.শ.)। ৪. bow অর্থে **ধনু** প্রচলিত। ৫. দ্র. **আগ্নেয়াস্ত্র, ইন্দ্রধনু**। ইতোপূর্বে **ধন** শব্দে আমরা দেখেছি, **ধন**-এর মধ্যে একটি হাঁ করে গ্রাস করার ভাব রয়েছে। তার ছবি আঁকলে আমরা জ্যামিতির 'চাপ'-এর ঠিক বিপরীত আকারটিকে পাই। **ধনু**র বেলায় সেই চাপটি উল্টো দিকে ঘুরে যায়, অর্থাৎ প্রকৃত চাপটিকে পাই। এটি 'bow'-এর মতো দেখতে। তবে সে হল বাহ্যচোখে যে **ধনু** দেখা যায়, শিকারীরা যে **ধনু** দিয়ে পশুপাখী শিকার করে, সেই দৃশ্য বাহ্যবস্তুমাত্র। কিন্তু, যেকথা আগেও আমরা বহুবার বলেছি, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা দৃশ্যবস্তুকে বোঝানর জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিলেন না; তাঁদের সমস্যা ছিল, অদৃশ্য কিন্তু সমাজে সক্রিয় বস্তুগুলিকে বোঝানর জন্য শব্দের ব্যবহার। মানুষের সমাজে যে **ধনু** অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়, সেই **ধনুই** ছিল তাঁদের **ধনু (ধনুঃ)** শব্দের মূল ও প্রধান লক্ষ্য। এখন আমরা সেই অদৃশ্য **ধনু**কেই চিনে নেওয়ার চেষ্টা করব।

একজন শিকারীকে কল্পনা করুন, যে তার **ধনু**তে শর সংযোজন করে সেই শর বহু দূরে নিক্ষেপ করে। সেই শিকারী তার অবস্থানে দাঁড়িয়ে থেকে সব দিকে ঘুরে ঘুরে তীর ছুঁড়তে থাকলে, তার তীর যে পর্যন্ত যায়, সে পর্যন্ত একটি বৃত্ত হয়ে যায়। এই বৃত্তের পরিধিরেখা যেন একটি বিশাল সরোবরের পাড় বা **তীর**। সরোবরের কেন্দ্রে যেনবা শিকারীর অবস্থান। শিকারীর তীরের এই যে এলাকা, তার পরিধি পর্যন্ত শিকারীর ইচ্ছা সক্রিয় থাকতে পারে। নিম্নে **ধন্ব, ধন্বদুর্গ** দ্রষ্টব্য। দৃশ্যলোকের এই কল্পনাকে অদৃশ্যলোকে প্রয়োগ করলেই আমরা পেয়ে যাই সমাজ-পরিচালকের রীতির প্রায়োগিক এলাকা। এই রীতিকে একালে বলা হয় আইন, সেকালে বলা হত **ধনুঃ**। এই **ধন-উঃ** শূন্যগোলকের চাপের মতো হাঁ করে থাকে না, উল্টো ভাবে থাকে। **ধনুর্দ্ধর**-এর নিয়ন্ত্রিত এলাকায় **ধন**-এর চলাচলকে নিয়ন্ত্রিত করে বলেই আইনকে **ধনুঃ** বলে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই 'বিসর্গ'টি বাদ দিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু 'বিসর্গ'টি না থাকলে অর্থবিকৃতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে।

যাই হোক, আদিম যৌথসমাজ যে আইন বানিয়েছিল, তাকে বলে **হরধনু** (= সনাতন যৌথসমাজের সাম্যবাদী আইন)। রামচন্দ্রের সময়ে সেই **হরধনু** সেকেলে হয়ে (= আদিম সমাজতন্ত্রবাদী বেদবাদী ও মৌলবাদী) গিয়েছিল। তাই তিনি সেই **হরধনু** ভেঙে দেন; অর্থাৎ পূর্বতন সমাজের প্রচলিত আইন ভেঙে দেন। তিনি যে নতুন আইনের প্রচলন ঘটান, তাকে বলে **রামধনু** (= বিশ্বের প্রথম ধনতান্ত্রিক আইন)। অবশ্য বিশাল আকারের যে-কোনো বস্তুকে 'রাম' শব্দে উল্লেখ করার একটি রীতি বঙ্গসমাজে প্রচলিত আছে; সেই সুবাদে আকাশের **ধনু**কে **রামধনু** বলার চলও বিদ্যমান রয়েছে। তবে যেকোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যক্তির, জাতীয়তাবাদী জাতির ... ভিতরে যে আমিত্ববোধ বা **ইন্দ্র** থাকে, তার রীতিনীতি বা আইনকে বলে **ইন্দ্রধনু** (= ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আইন)। আইনের ভাষায় সব আইনই মানুষের আভরণ, মানুষকে রক্ষা করে। আবার, অধিকাংশ আইনই কখনও কখনও মানুষের চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন লোকে **ধনুর্ভঙ্গ** পণ করে বসে। একালের ভাষায় **ধনুর্ভঙ্গ** পণকে বলে আইন অমান্য আন্দোলন। ৬. ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল-এর আদিপুস্তকের ৬-৯ অধ্যায়ে আছে মহাপ্লাবনের কথা। নবম অধ্যায়ের ১২-১৭ পদের মধ্যে ঈশ্বর নোয়াকে জানালেন তাঁর সন্ধি বা চুক্তির কথা। ঈশ্বর আরও বললেন, সন্ধির চিহ্ন বা স্মারণ হবে মেঘের মধ্যে ফুটে ওঠা **ধনু** (rainbow)। স্পষ্টতই **ধনু** বললে অতীতের মানুষ বুঝত আইন বা নিয়ম। পূর্বে উল্লিখিত আরও বহু শব্দের মতো এক্ষেত্রেও **ধনু**র ধারণাটি ইংরেজিও উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, কিন্তু যথারীতি **ধনু** শব্দটি পায়নি।

ধন্ব (ধন্বদুর্গ, ধন্বা, ধন্বী) : ১. ✓ধন্ (শব্দ) + ব (বন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ধন্ব*** *=* ***ধন্*** *বহন করে যে।* ***ধন্বদুর্গ*** *=* ***ধন্ব****-রূপী যে দুর্গ।* *ধন্বা =* ***ধন্ব****-এর আধার যে।* ***ধন্বী*** *=* ***ধন্ব****-এর গতিশীল আধার যে।* ৩. **ধন্ব** = ধনুঃ, স্থল। **ধন্বদুর্গ** = চতুর্দ্দিকে পঞ্চযোজন মরুবেষ্টিত দুর্গবিশেষ। **ধন্বা (ধন্বন্)** = অল্পজলপ্রদেশ, মরুদেশ। **ধন্বী (ধন্বিন্)** = চাপবান, বিদগ্ধ, ধনুর্ভৃৎ, ধনুর্দ্ধর, অর্জ্জুন, বিষ্ণু, শিব, ধনুরাশি, অর্জ্জুনবৃক্ষ, বকুলবৃক্ষ। (ধন্বিস্থান = ধনুর্যোদ্ধার পঞ্চ অবস্থানভেদ — সমপাদ বৈশাখ মণ্ডল আলীঢ় প্রত্যালীঢ়।) (ব.শ.)। ৪. সব শব্দগুলিই অপ্রচলিত। ৫. **ধন** শব্দ বাহ্যিক wealth ছাড়িয়ে কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত, এই শব্দগুলিতে তার নিদর্শন রয়েছে। দ্র. **ধনুঃ**।

ধন্বন্তরি : ১. ধন্ব + অন্ত + ঋ + ই - কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. ***ধনু****র অন্ত (আবর্ত্তমান) রহে যাহাতে।* ৩. দেববৈদ্য। ইনি ভগবানের ষোড়শ অবতার ও আয়ুর্বেদপ্রবর্ত্তক। চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্রমন্থনে

সুধাপূর্ণ শ্বেত কমণ্ডলু লইয়া ইনি সমুদ্র হইতে উত্থিত হন। ইনি দ্বিভুজ শ্বেতবর্ণ। বৈবস্বত মন্বন্তরে ইনি কাশীরাজের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। (ব.শ.)। (ক) বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, মহাভারত, ভাগবত অনুসারে, ইনি দেববৈদ্য। সমুদ্রমন্থনকালে ইনি অমৃতভাণ্ড হস্তে সমুদ্র হতে উত্থিত হন। দুর্বাসার অভিশাপে ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট হলে বিষ্ণুর আদেশে দেবতারা সমুদ্রমন্থন করে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করার সময় আনুষঙ্গিক আরো জিনিসের মধ্যে শেষে অমৃত-হস্তে ধন্বন্তরি ও সর্বশেষে বিষ উৎপন্ন হয়। ইনি দেববৈদ্যরূপে গৃহীত হন। ইনি বেদজ্ঞ ও মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ। (খ) হরিবংশে ধন্বন্তরির জন্ম সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে — অমৃতমন্থন কালে ধন্বন্তরি অমৃতকলস হতে উৎপন্ন হন। উক্ত সময় তিনি বিষ্ণুর ধ্যানরত ছিলেন। বিষ্ণু ধন্বন্তরিকে দেখে বলেন, 'তুমি জল হতে জন্মগ্রহণ করেছ বলে তোমার নাম হবে অব্জদেব।' তখন ধন্বন্তরি বলেন, 'আমি আপনার পুত্র, তাই আমার জন্য যজ্ঞভাগ কল্পনা ও অবস্থানের নির্দেশ দিন।' তখন বিষ্ণু বলেন, 'তুমি দেবতাদের পরবর্তীকালে জন্মগ্রহণ করেছ। অতএব যজ্ঞভাগ গ্রহণে তুমি সমর্থ হবে না। ... পরজন্মে তুমি লোকমধ্যে খ্যাতিলাভ করবে। গর্ভাবস্থাতেই তোমার অণিমাদি সিদ্ধি হবে, আর সেই শরীরেই তুমি দেবত্বলাভ করবে। তুমি আয়ুর্ব্বেদ অষ্টভাগে বিভক্ত করবে।' অতঃপর ধন্বন্তরি ... সুনহোত্রবংশীয় কাশীরাজের পুত্র ... কাশীরাজ নামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহর্ষি ভরদ্বাজের কাছে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। পরে ইনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে অষ্টভাগে ভাগ করেন। ধন্বন্তরির কেতুমান নামে এক পুত্র হয়। (পৌ.অ.)। **৪.** নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **চরক**। মানবদেহ হোক আর সমাজদেহই হোক, তার বিপদ আসে দু'দিক দিয়ে। এক, তার বহিরাক্রমণ; দুই, তার অন্তরের দুর্বলতা বা আপন আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ত্রুটি। শেষ বিচারে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ত্রুটিই দেহের বিপদের বা অসুখবিসুখের কারণ। অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থিত সত্তার (দেহের পরিচালকের) পক্ষে **ধনু**র দিশা বদল করার উপরই সেই ত্রুটি সংশোধন করা নির্ভর করে। সেই কাজটিতে যিনি সহায়তা করেন, তিনিই **ধন্বন্তরি**।

অসুখবিসুখ রোগবালাই নিয়ে একালের মানুষ আমরা যখন কথা বলি, আমরা মানবদেহের রোগের কথাই বলি। কখনও-সখনও বড়জোর পশুপাখির অসুখবিসুখের কথাও ভাবি। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা সেরকম ভাবতেন না। তাঁরা জীবদেহ থেকে সমাজদেহ পর্যন্ত সর্বপ্রকার দেহের অসুখ-বিসুখের কথা একসঙ্গে ভাবতেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, সকল দেহের অসুখবিসুখের কারণ এবং তার নিরাময় করার উপায় সর্বক্ষেত্রে সমান্তরাল।

তা সে যাই হোক, দেখা যাচ্ছে, **ধন্বন্তরি**র প্রথম জন্ম হয়েছে সনাতন যুগে। কিন্তু দক্ষোৎপত্তির পরবর্তীকালে নিশ্চয় তার ভিতরে আয়ুর্ব্বেদ-জ্ঞানের অভিমান ও তজ্জাত মালিকানার বোধ এসে থাকবে, যা নিশ্চিতভাবেই শিবভক্ত **দুর্বাসার** ভাল লাগেনি এবং সেকারণেই তার অভিশাপে **ধন্বন্তরি**র অন্তর্ধান ঘটে। ধনতান্ত্রিক মানসিকতার সূত্রপাতের যুগে বা **চাক্ষুষ** মন্বন্তরে (দ্র. **চাক্ষুষ**) সেই **ধন্বন্তরি**র পুনরাবির্ভাব ঘটে সমুদ্রমন্থনে। তাই তিনি বিষ্ণুর পুত্র বলে দাবি করেন। আরও পরে, এই **ধন্বন্তরি**কে আমরা পাচ্ছি **দিবোদাস** রূপে।

ধা (হা) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিসন্ধান, অতিসন্ধি, অতিসন্ধিত, অতিসন্নিধান, অতিসৌহিত্য, অত্যধিক, অত্যহিত, অত্যাহিত, অদ্ধে, অধ, অধঃ (অধস্), অধঃশিরা, অধঃশিরস, অধগতি, অধপাত, অধভূম, অধম, অধমর্ণ, অধমা, অধমাঙ্গ, অধমাধম, অধমুখ, অধোদেশ, অনুসন্ধান, অধস্তন, অধস্তল, অধানন, অধার্ম্মিক, অধার্য্য, অধি, অধিক, অধিকদন্ত, অধিকন্তু, অধিকম্, অধিকরণ, অধিকরণিক, অধিকর্ত্তা, অধিকাঙ্গ, অধিকার, অধিকারস্থ, .অধিকারী, অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য, অধিগুণ, অধিজনন, অধিজিহ্ব, অধিজ্য, অধিজ্যকার্ম্মুক, অধিজ্যচাপ, অধিত্যকা, অধিদন্ত, অধিদেব, অধিদেবতা, অধিদেবী, অধিদৈব, অধিদৈবত, অধিনাথ, অধিনী, অধিপতি, অধিবাস, অধিবাসডালা, অধিবাসদ্রব্য, অধিবিন্না, অধিবেদ, অধিবেদন, অধিবেষ্টিত, অধিভূ, অধিভূত, অধিমাস, অধিযজ্ঞ, অধিযোধ, অধিরথ, অধিরাজ, অধিরাজ্য, অধিরূঢ়, অধিরোপণ, অধিরোহ, অধিরোহণী, অধিরোহিণী, অধিরোহী, অধিশ্রয়, অধিশ্রয়ণ, অধিশ্রী, অধীন, অধীনস্থ, অধীনে, অধীনী, অধীয়মান, অধীশ, অধীশ্বর, অধোক্ষজ, অধোগতি, অধোতে, অধোদারু, অধোদিক, অধোদৃষ্টি, অধোদেশ, অধোনিবাসী, অধোপুর, অধোবদন, অধোবায়ু, অধোবাস, অধোভাগ, অধোভুবন, অধোমুখ, অধোলোক, অধ্যবসান, অধ্যবসায়ী, অধ্যাক্রান্ত, অধ্যাত্ম, অধ্যাত্মজ্ঞান, অধ্যাত্মবিদ্যা, অধ্যাত্মরামায়ণ, অধ্যাপক, অধ্যাপন, অধ্যাপনা, অধ্যায়, অধ্যারূঢ়, অধ্যারোপণ, অধ্যাস, অধ্যাসিত, অধ্যাসীন, অধ্যাহরণ, অধ্যাহার, অধ্যাহার্য্য, অধ্যাহৃত, অধ্যেষণ, অনধিক, অনবধান, অনবধি, অনবহিত, অনাধি, অনুপধি, অন্বাধি, অন্বাধেয়, অপিধান, অপ্রধান, অবধান, অবধি, অবহিত, অবিধা, অবিধান, অবিধি, অবিধেয়, অবৈধ, অবিহা, অবিহিত, অব্ধি, অব্যবধান, অব্যবহিত, অভিধা, অভিধান, অভিসন্ধান, অভিহিত, অষুধ, অষুদ, অসন্ধি, অসন্ধিত, অসাধারণ, অসুদ, অহিত, অহিতকারী, অহিতমনাঃ, অহিতলক্ষণ, অহিতহিত, অহিতা, আই, আধমন, আধমর্ণ, আধাতা, আধান, আধায়ক, আধি, আধিকরণ, আধিকরণিক, আধিক্য, আধিক্ষীণ, আধিজ, আধিজ্ঞ, আধিদৈবিক, আধিবন্ধ, আধিবেদনিক, আধিব্যক্তি, আধিব্যাধি, আধিভোগ, আধিভৌতিক, আধিরথি, আধিরাজ্য, আধেয়, আধ্যাত্মিক, আহিত, আহিতাগ্নি, আহিতান্ত, উপধা, উপধান, উপাধি, ওষধি, ঔষধ, গুণনিধি, ছান, ছিঃ, ছিছি, ছিছিক্কার, ছেছে, জলধি, তিরোধান, তোয়ধি, দাই, দাইয়ানি(নী), দান (ধা-অন, ফা), দ্বিধা, ধ, ধন্যাক, ধা, ধাই, ধাউত, ধাউতালি, ধাগা, ধাড়া, ধাড়ি, ধাড়ী, ধাঢ়ী (ধারী), ধাত, ধাতকী, ধাতা, ধাতু, ধাতুকুশল, ধাতুক্ষয়, ধাতুগত, ধাতুঘটিত, ধাতুঘ্ন, ধাতুদ্রাবক, ধাতুনাশন, ধাতুপ, ধাতুপাঠ, ধাতুপুষ্টি, ধাতুবাদ, ধাতুবাদী, ধাতুবৈরী, ধাতুময়, ধাতুমল, ধাতুমান, ধাতুমারী, ধাতুরস, ধাতুশোধন, ধাতুসাম্য, ধাতুহা, ধাত্রিকা, ধাত্রী, ধাত্রেয়িকা, ধাত্রেয়ী, ধান, ধানক, ধানকাটি, ধানভানা, ধানভানানী, ধানা, ধানিকা, ধানী, ধানুকী, ধানুষ্ক, ধান্ন, ধান্য, ধান্যক, ধান্যকল্ক, ধানকোঠা, ধান্যকোশ, ধান্যকোষ, ধান্যকোষ্ঠক, ধান্যক্ষেত্র, ধান্যখল, ধান্যত্বক, ধান্যপঞ্চক, ধান্যবর্দ্ধন, ধান্যবীজ, ধান্যশীর্ষক, ধান্যশূক, ধান্যসার, ধান্যা, ধান্যাস্থি, ধান্যেশ্বরী, ধাপ, ধাপ্‌পা, ধাম (কাশীধাম, পুরীধাম, বৃন্দাবনধাম ইত্যাদি), ধামা, ধামি(মী), ধায়, ধিক, ধিকধিক, ধিকিধিকি, ধিক্কার, ধেড়ে, ধেনো,

ধেনোমদ, ধেয়, নিধান, নিধি, নিহিত, প্রণিধান, প্রতিনিধি, প্রতিবিধান, প্রধান, বহুধা, বিধা, বিধাতা, বিধান, বিধায়ক, বিধি, বিধেয়, বিবিধ, বিহিত, বৈধ, ব্যবধান, ব্যাধি, শতধা, শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধান্বিত, শ্রদ্ধাবান, শ্রদ্ধালু, শ্রদ্ধেয়, শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, শ্রাদ্ধকাল, শ্রাদ্ধবাসর, শ্রাদ্ধভুক্, শ্রাদ্ধভোজন, শ্রাদ্ধশান্তি, সংবিধান, সংহিত, সন্ধ, সন্ধা, সন্ধান, সন্ধানী, সন্ধি, সন্ধিৎসু, সন্নিধান, সন্নিহিত, সমবধান, সমাধান, সমাধি, সমাহিত, সহিত (সংহিত), সাধারণ, সাধারণতন্ত্র, সান্ধ্য, সান্নিধ্য, সাবধান, সাবধি, সুবিধা, সুবিহিত, সুরনিধি, সুহিত, সৌধ, স্কন্ধ, স্বাধিকারপ্রমত্তঃ, হ, হিত, হিতকর, হিতকাম, হিতকাম্যা, হিতকারক, হিতকারী, হিতপ্রণী, হিতপ্রেপ্সু, হিতবচন, হিতবাক্য, হিতবুদ্ধি, হিতবাদী, হিতবান(বৎ), হিতাধ্যায়ী, হিতানুবন্ধী, হিতার্থ, হিতার্থী, হিতাশংসা, হিতাশী, হিতাহিত, হিতাহিতীয়, হিতেচ্ছা, হিতেচ্ছু, হিতৈষণ, হিতৈষণা, হিতৈষা, হিতৈষিতা, হিতৈষিণী, হিতৈষী, হিতোক্তি, হিতোপদেশ, হিতোপদেষ্টা। **ধা (হা)** = ধারীর আধার যে; ধারণ করা। **হা** = হওয়ার আধার যে; হওয়ানো।

অধঃ (অধস্, অধ — অধঃকরণ, অধঃকৃত, অধঃপতন, অধঃপাত, অধঃশিরা, অধস্তন, অধস্তল ... ইত্যাদি) : **১.** অধঃ (অধস্) = অধর + অস (অসি)। (ব.শ.)। **২. অধ** = *অস্তিত্বের ধারণ যাহাতে (অর্থাৎ, চলন্তকে বা পড়ন্তকে ধারণ করে যে)।* ***অধঃ (অধস্)** = **অধ**-এর শেষাবস্থা বা নির্য্যাস যাহাতে।* **৩.** অধ = নিম্ন, নীচ। অধঃ (অধস্) = অধর লোক, পাতাল, অধর, নিম্ন। (ব.শ.)। **৪.** পৃথকভাবে অপ্রচলিত। 'অধগতি', 'অধভূম', 'অধোগতি' ... এইভাবে প্রচলিত। **৫.** বলা হয়, শব্দটির সংস্কৃত রূপ **অধঃ** বা **অধস্**। সেই **অধঃ** নাকি আসলে **অধর**, অর্থাৎ 'যা ধরা নহে'। কিন্তু ব্যবহারের সময় 'র'-এর লোপ হয় এবং 'অস্' যুক্ত হয়ে **অধস্** বা **অধঃ**-তে পরিণত হয়। সেই বিসর্গ (**ঃ**) লুপ্ত হয়ে **অধঃ** পরিণত হয় **অধ**-তে। যেমন বিসর্গযুক্ত শব্দ হল (অধঃ + গতি) বা 'অধোগতি'; আর, বিসর্গহীন শব্দ হল 'অধগতি'। অর্থ একই। তার মানে, **অধ** বলে যে শব্দটি আমরা বাংলাভাষায় পাচ্ছি, সেটি আসলে **অধঃ**; বাংলায় ব্যবহারের সময় তার 'বিসর্গ'টি লুপ্ত হয়েছে।

তা হোক। আমাদের জ্ঞাতব্য হল, **অধঃ** শব্দটি 'নিম্ন' অর্থ ধারণ করছে কীভাবে? আমরা জানি, **ধ** মানে ধারণ করে যে বা ধারক। সেই সুবাদে **অধঃ** শব্দের মানে হওয়ার কথা — অস্তিত্বধারকের শেষাবস্থা; অর্থাৎ কিনা, **অধঃ**-এর পরে আর কোনো রকম ধারক নেই; **অধঃ**-ই সর্বশেষ ধারক। সেই **অধঃ** বা শেষধারক যদি কোনো পড়ন্ত সত্তাকে না ধরে, এবং সেই **অধঃ**কে পেরিয়েও যদি পতনশীল সত্তাটি পতিত হতেই থাকে, তখন কী হবে?

ঠিক এখানেই রয়েছে শব্দের ভেতরে ধরে রাখা অব্যক্ত-লোকের বিজ্ঞান। **দিক** ও **দিশা** শব্দে আমাদের যে **দিক**-জ্ঞান জন্মায়, তা পূর্ণ হয় এখানে পৌঁছে। আপনি অনন্ত শক্তিসম্পন্ন একটি ঢিল বা রকেট ছুঁড়ে দিলেন **উর্ধ্বলোক**-এর দিকে। আটকানোর কেউ না থাকলে ঢিলটি ছুটে চলতেই থাকবে। শেষ যেখানে গিয়ে ঢিলটি থামবে সেটিই উর্ধ্বলোক। ধরে নিতেই হচ্ছে, সেই শেষের পরে আর শেষ নেই। থাকলে সেটিই হবে শেষ। তার পরে আর শেষ নেই। কিন্তু তারপরেও যদি শেষ ... ... — হ্যাঁ, যত শেষ থাকে বা থাকতে পারে, তাদের সকলের পরে যে সর্বশেষ; তার পরে আর শেষ নেই; তাই সেটিই **উর্ধ্ব** বা **উর্ধ্বলোক**। এবং ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, **উর্ধ্ব**-এর পরে আর **উর্ধ্ব** নেই। অসীম **উর্ধ্ব**কে এভাবেই সীমায়িত ধারণার মধ্যে ধরা হয়েছে। একই কথা **অধঃ** বা **অধোলোক** সম্পর্কেও বলা যায় — **অধঃ**-এর পরে আর **অধঃ** নেই; অধোলোকের নীচে আর কোনো অধোলোক থাকতে পারে না, নেই। অতএব **অধঃ** মানেই 'পতনশীল সত্তা পড়তে পড়তে নামতে নামতে শেষাবধি যেখানে গিয়ে থামে বা ধারিত হয়' সেটিই **অধঃ**, অর্থাৎ নিম্ন। কতখানি **অধঃ**, তা নির্ধারিত হয় বাক্যে ব্যবহৃত **অধঃ** শব্দের প্রেক্ষিত থেকে। **অধঃকরণ, অধঃপাত** ... ইত্যাদি **অধঃ**-যুক্ত যত শব্দ রয়েছে, সেসবই এই **অধঃ**-এর অনুসারী।

অধঃশিরাঃ, অধঃশিরস্ : **১.** অধঃ + শিরঃ। **২.** / অধঃ শিরঃ যাহার; যাহার মস্তক নিম্নাভিমুখ (থাকে)। (ব.শ.)। **৩.** অবাক্‌শিরাঃ। নরকবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্র.। **৫. অধঃশিরাঃ** শব্দটি অপ্রচলিত বটে, কিন্তু 'নতশির' শব্দটি এখনও কমবেশি প্রচলিত। তবে শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'নতশির'-এর শির অন্য কেউ নত করে দিয়েছে; কিন্তু **অধঃশিরাঃ** শির কেন অধঃ, সেকথা বলা নেই। হতে পারে সে নিজেই শির নামিয়েছে, অতএব অন্য কোনোভাবে শির নিম্নাভিমুখী হয়েছে। কীভাবে তা হয়েছে, সেকথা শব্দটির ভিতরে বলা নেই। কিন্তু **অধঃশিরাঃ**-ই কেন 'অবাক্‌শিরাঃ' (যার শির বাক্‌হীন বা মূক), তা আমরা আজও জানি না।

অধম : **১.** অধস্ + ম। (ব.শ.)। **২.** *(পড়তে পড়তে) অধঃ-তে (গিয়ে) সীমায়িত যে।* / যে অধঃ (অধো ভবতি)। (ব.শ.)। **৩.** কুৎসিত, নিন্দিত, নির্গুণ, অপসদ, ন্যূন, ন্যূনতম, নীচ, হীন, হীনবল, গৌণ, দুরাত্মা, খল, নিকৃষ্ট, ভারবাহী। (ব.শ.)। **৪.** lowest অর্থে প্রচলিত। **৫.** যে কোনো স্থানের উপর দিকে যেমন অজস্র **উর্ধ্ব**-স্থান থাকতে পারে তেমনি নীচের দিকে অজস্র **অধ**-স্থান থাকতে পারে। কথাটি জড়ের দুনিয়ার ক্ষেত্রে যেমন সত্য, মানসলোকের ক্ষেত্রেও সত্য। সমাজে, মানসলোকে যে সত্তা নীচের দিকে কোনো স্থানে, সামাজিক বিন্যাসের নিম্নধাপে **অবস্থান** করে, তাকে **অধম** বলা হয়ে থাকে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সেই **অধঃ**-স্থানে সত্তাটি নিজেকে সীমায়িত করে রেখেছে; তাই **অধম**।

অধি : **১.** আ + ধা + কি - কর্তৃবাচ্যে বা অধিকরণবাচ্যে বা কর্ম্মবাচ্যে। (ছা.অ.)। **২. অধ** *গতিশীল যাহাতে।* **৩.** উপরি, অধিকার, আধিক্য, ঐশ্বর্য্য, আনর্থক্য, উপরিস্থ, অধ্যারূঢ়, বিশিষ্টতা, প্রধান, লক্ষ্মীকরণ, উদ্দেশ, আরূঢ়, আরোপিত অধ্যারূঢ়, প্রাক্, পূর্ব্ব, অধ্যয়ন, বিভক্ত্যর্থ — অধিকরণ-প্রধান, আধেয়প্রধান। (ব.শ.)। **৪.** উপসর্গ রূপে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। **৫.** সভ্য মানুষের সমাজ উচ্চ নীচ বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়ে থাকে। তাতে সমাজসিঁড়ির যে ধাপগুলি থাকে, উপরের সর্বোচ্চ ধাপের পর থেকে সবগুলিই নিম্নধাপ বা **অব**-ধাপ

বা **অধ**-ধাপ। হয়তো সেজন্যই বাংলাভাষায় অন্যের পরিচয় জানার সময় আমরা মানুষটির **অবস্থান** কোথায়, জানতে চাই। অর্থাৎ, সমাজের সিঁড়ির কোন ধাপে মানুষটি নিজেকে **অবস্থিত** (conditioned) করে রেখেছে; **অধঃ**-পতিত করে রেখেছে; তা জানতে চাই। সেই ধাপে মানুষটির 'অস্তিত্বের ধারক' রূপটিই তার তাৎক্ষণিক **অধ**-রূপ; যেন-বা মানুষটি নিজস্ব একটি সামিয়ানা টাঙিয়ে তার তলায় বাস করছে। সেই '**অধ** গতিশীল হওয়া'র মানে হল, সামিয়ানাটা এগোচ্ছে, বাড়ছে, তার ছায়ার এলাকা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে। একেই বলে **অধি**। অর্থাৎ, **অধ**-এর এলাকার মধ্যে অন্যকে ঢুকিয়ে নেওয়াকেই **অধি** বলে। দ্র. **অধিক, অধিকার**।

অধিক : ১. অধি + কৈ + কর্তৃবাচ্যে। অধি অর্থাৎ আধিক্যকে ক বা কথনকারী; বা অধির ক দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠীতৎপুরুষ। (ছা.অ.)। অধ্যারূঢ় + ক (কন্) স্বার্থে। (ব.শ.)। **২.** ***অধি** কৃত যাহাতে।* **৩.** অতিরিক্ত, বেশি, অত্যন্ত, বয়োবৃদ্ধ, প্রচুর, নির্ভর পূরিত, প্রবল, অসাধারণ, উৎকৃষ্ট, অতিশয়, বলবান, বৃহত্তর, বরিষ্ঠ, সম্পন্ন, প্রিয়তর, প্রধান, উচ্চ, অনেক, বহু, অনুচিত, আধিক্য, অর্থালঙ্কারবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** more অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অধি**। **অধ**-এর এলাকার প্রসারণ ঘটতে থাকলে, অর্থাৎ **অধ**-এর এলাকার মধ্যে অন্যদের ঢুকিয়ে নেওয়া চলতে থাকলে, তাকে **অধি** বলে। এই **অধি** কথিত বা কৃত যাহাতে, তাকে বলে **অধিক**। আর, সেটাই তো স্বাভাবিক। কেননা, তাতে **অধ**-এর বা অস্তিত্বধারীর পরিমাণ বেড়ে যায়। সেই কারণে **অধিক** শব্দে আমরা 'অনেক' বুঝি।

অধিকরণ (অধিকরণিক, অধিকর্ত্তা) : ১. অধি + ✓কৃ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***অধিকরণ** = **অধি** করা অন থাকে যাহাতে। **অধিকর্ত্তা** = **অধি** করণকে তারণ করে যে।* / **অধিকরণ** = যাহা অধিকৃত হয়; যাহা দ্বারা বা যাহাতে পঞ্চাঙ্গ বিচার অধিকৃত হয়। (ব.শ.)। **৩. অধিকরণ** = নিয়োগ, বিষয়, অভিধেয়, দ্রব্য, বিচার্য্য বাক্য, আধার, ক্রিয়া আধাররূপ কারকবিশেষ, বিচারালয়, অধিকার, আধিপত্য, প্রভুত্ব, স্বামীত্ব। **অধিকর্ত্তা** = অধিকারী, স্বামী, প্রভু। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **অধিকার**। বিষয় ও বস্তু, তা সে বাহ্যিক কিংবা মানসিক যাই হোক না কেন, তাকে আপন **অধ**-এর অন্তর্ভুক্ত বা **অধি**-ভুক্ত করাকে বলে **অধিকরণ**। দ্র. **কারক**। যিনি সে কাজ করেন, তাঁকে বলে **অধিকর্ত্তা**।

অধিকার (অধিকারস্থ, অধিকারী, স্বাধিকারপ্রমত্তঃ) : ১. অধি + ✓কৃ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***অধিকার** = **অধি** (রূপ) **কার** যে; অর্থাৎ, **অধি** করণ থাকে যাহাতে। **অধিকারস্থ** = **অধিকার** স্থিত যাহাতে। **অধিকারী** = **অধি** করে যে; অথবা **অধিকার**-এর গতিশীল আধার যে। **স্বাধিকারপ্রমত্তঃ** = **স্ব**-লব্ধ **অধিকার**-এর শক্তিতে চূড়ান্ত প্রমত্ত যে।* / **অধিকারস্থ** = অধিকারে যে থাকে। **অধিকারী** = যে অধিকারে করে। (ব.শ.)। **৩. অধিকার** = পর্য্যবেক্ষণ, তৃষ্ণা, আরম্ভ, বিনিয়োগ, অধিক কার অর্থাৎ অধিক কার্য্য, বৈধ অনুষ্ঠানাদিতে **সম্বন্ধ, অধিকৃত বিষয়**, গণনাপ্রস্তাব, কর্তব্য বিষয়, ভার, নৃপাদির **চামরব্যজনাদিপ্রতিপত্তি**, অধিকৃত দেশ, প্রকরণ, ইচ্ছানুসারে ক্রয়বিক্রয়াদিকার্য্য-করণে **স্বামিত্ব, প্রভুত্ব**, কর্ম্মফলে স্বামিত্ব, পদ, রাজকীয় অসাধারণ বা বিশেষ **শক্তি**, স্থান, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, ব্যুৎপত্তি। **অধিকারস্থ** = পদস্থিত, নিয়োগবর্ত্তী, অধিকৃত দেশবাসী, রাষ্ট্রস্থ, রাজ্যস্থিত। **অধিকারী** = অধিকারবিশিষ্ট, **ক্ষমতাবিশিষ্ট**, যোগ্যপাত্রভূত, **স্বামিত্ববিশিষ্ট**, বিহিতকর্ম্মফল-ভোক্তা, অধিকৃত পুরুষ, প্রভু, অধ্যক্ষ, বৈধ **কর্ম্ম** যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে যোগ্য পাত্র, বেদান্ত-শাস্ত্রবেত্তা, পুরুষ, **পার্ষদে**র অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ পাত্র, বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণের উপাধি, **ভক্তিশাস্ত্রে** অধিকার বিশিষ্ট **ভক্ত**, বৈষ্ণবের উপাধি, প্রধান পার্ষদ, যাত্রা সম্প্রদায়ের কর্ত্তা বা মালিক। (ব.শ.)। **৪.** কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫.** '**অধি**র এলাকাভুক্ত **কার**'কে বলে **অধিকার**। ইংরেজির right ও responsibility-কে যদি একত্রে দেখা হয়, তবে তা খানিকটা **অধিকার**-এর সমতুল হয়। **অধিকার**-এর সক্রিয় আধারকে বলে **অধিকারী**। এই ক্রিয়াভিত্তিক নীতিতে শব্দদুটি প্রস্তুত করা হয়েছে বলে, শব্দদুটির ধারণক্ষমতা বিশাল এবং সেকারণেই বাংলাভাষায় তাদের ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে। কেননা, **অধি** করার কাজের তো শেষ নেই! মানুষের যা কিছু এখতিয়ারভুক্ত, তা সবই **অধি**র এলাকা। আমাদের নিজ নিজ **অধ**-এর এলাকায় যাকে যাকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারি বা **অধি** করতে পারি, সেসবই আমাদের '**অধি** রূপ কাজকর্ম' বা **অধিকার**। সেই কাজকর্ম করতে পারলে আমরা সেসবের **অধিকারী** কথিত হই। অবশ্য আমাদের সমাজশাসকগণের নানান বাধ্যবাধকতায় সব '**অধি** রূপ কাজকর্ম' সবাইকে করতে দেওয়া হয় না। তাই ব্যক্তিমানুষের সব **অধিকার** রাষ্ট্রস্বীকৃত বা সমাজস্বীকৃত **অধিকার** নয়। বলে রাখা ভাল, পরমাপ্রকৃতি মানুষকে জন্মসূত্রে তিনরকম **অধিকার** দিয়েছেন — এক) নিজের অস্তিত্বকে নিজের **অধ**-এর অন্তর্ভুক্ত রাখার অর্থাৎ নিজের উপর নিজের **অধিকার**; দুই) মানবঝাঁক বা সমাজ যা-কিছু আপন **অধিভুক্ত** করে, সমাজসদস্য হিসেবে তার প্রাপ্য অংশকে নিজের **অধ**-এর অন্তর্ভুক্ত করার **অধিকার**; এবং তিন) জগৎ যা-কিছু আপন **অধিভুক্ত** রেখেছে, জগৎসদস্য হিসেবে তার প্রাপ্য অংশকে নিজের **অধ**-এর অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার। প্রতিটি মানুষের এই তিনরকম **অধিকার**, একালের রাষ্ট্রগুলি তাতে নানা রকম বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। বলতে কী, মানুষের তৈরি করা একালের রাষ্ট্রগুলি এ বিষয়ে প্রায়-অন্ধের মতো আচরণ করে থাকে। 'মৌলিক **অধিকার**' বা fundamental rights বিষয়ে রাষ্ট্রগুলির বয়ানই সেকথা স্পষ্ট জানায়। মানুষকে প্রকৃতিপ্রদত্ত উপরোক্ত তিনরকম **অধিকার**-এর যে বিশাল এলাকা, তা তারা দেখতেই পায় না। তারা জানে না, মানুষের এই **অধিকার**ই ব্রাহ্মণের হাত হয়ে ঘুরপথে রাজার হাতে, কিংবা জনসমর্থনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে পৌঁছয় বলেই তারা সমাজের মূলপ্রশাসক হওয়ার **অধিকারী** হন। জনসাধারণ থেকে ঘুরপথে-পাওয়া সেই লব্ধ **অধিকার**কে অজস্র খণ্ডে বিভক্ত করে সেই মূল-প্রশাসকেরা তাঁদের অধঃস্তন আমলা কেরানি প্রভৃতি রাজপুরুষদের দিয়ে রাখেন বলেই তারা প্রজাসাধারণের উপর প্রশাসনকার্য চালাতে পারে। আজও সরকারি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বা

দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে সরকারি বাংলাতে বলা হয় সেই সেই বিভাগের 'আধিকারিক'; অর্থাৎ **অধিকারী**। এই **অধিকারী** যদি মূলপ্রশাসকের কাছ থেকে পাওয়া আপন **অধিকার**-এর মর্যাদা না রাখেন, তাঁর **অধিকার**-এর অপপ্রয়োগ করে **প্রমত্ত** হয়ে ওঠেন, একালের ভাষায় তাকে **অত্যাচারী** বলে। মহাকবি কালীদাস ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এইপ্রকার **অধিকারী**কে নাম দিয়েছিলেন **স্বাধীকারপ্রমত্তঃ**। কালীদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের যক্ষ রামগিরি পর্বতে এক বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছিল, কারণ সে **স্বাধিকারপ্রমত্তঃ** হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ একসময় লক্ষ্য করেছিলেন, ভারতে ব্রিটিশ শাসন **স্বাধীকারপ্রমত্তঃ** (তাঁর *কালান্তর গ্রন্থে 'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ'* নামে একটি নিবন্ধ রয়েছে)। হয়ে উঠেছে। কথাটির অর্থ হল, **অধির** যে এলাকা কোনো **অধিকারী**কে দেওয়া হয়েছে, আপন ক্ষুদ্রতাবশত সে সেই **অধিকার**-এর প্রবল শক্তিকে সমাজের সেবায় নিয়োগ করতে পারে না, বিপরীতে সেই শক্তির মোহে মদমত্ত হয়ে ওঠে। আজকাল অধিকাংশ দেশের অধিকাংশ প্রশাসক **স্বাধিকারপ্রমত্তঃ** হয়ে উঠেছেন। একালের ভাষায় **স্বাধিকারপ্রমত্তঃ**কে ফ্যাসিস্ট বলে।

ব.শ. সেকারণেই **অধিকার** ও **অধিকারী** শব্দ দুটির অর্থ প্রদান করতে গিয়ে এত বিচিত্র বিষয়ের উল্লেখ করেছেন (উপরে **৩.** দ্রষ্টব্য) যে, সেগুলিকে বুঝে নিতে রীতিমত নাকানি-চোবানি খেতে হয়। অথচ শব্দদুটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটি মনের মধ্যে জাগরূক রাখলে, ওই সব বিচিত্র অর্থের ভিতরে **অধি-করণ** ক্রিয়াকে সুস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

অধিকার বা **অধিকারী** শব্দের অর্থ আধুনিক বাংলা অ্যাকাডেমি ভুলে গেছে। কারণ, সে ইংরেজি right শব্দের প্রতিশব্দ রূপে **অধিকার** শব্দটিকে প্রতীকী রূপে বুঝতে গিয়ে বাংলাভাষার উপর তার **অধিকার**টাই হারিয়ে বসেছে। কারণ, এই শব্দদুটি কেবল ক্রিয়াভিত্তিক শব্দই নয়, একদিকে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে যেমন তার বিপুল প্রয়োগ রয়েছে অপরদিকে বাংলাভাষীদের ভাষা ব্যবহারে শব্দদুটি আজও ক্রিয়াভিত্তিক পদ্ধতিতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অধিত্যকা : ১. অধি + ত্যক (ত্যকন্) স্বার্থে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *যে ত্যকাকে **অধি**-ভুক্ত করা হইয়াছে।* **৩.** আরূঢ় স্থল, পর্ব্বতের উর্দ্ধ (উপরিস্থ) ভূমি (Table-land)। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **তাক, উপত্যকা**। দেয়ালের তাকের মতো পর্বতের যে অংশ বেরিয়ে থাকে, তাকে বলে **ত্যকা**। **পর্বতের পাদদেশে** সেইরকম যে সমভূমি বা সমভূমিপ্রায় এলাকা থাকে, তাকে বলে **উপত্যকা**। সেই ত্যকা বা উপত্যকার যে অঞ্চল পর্বত আপন **অধিভুক্ত** রেখেছে, সেই অঞ্চলকে বলে **অধিত্যকা**।

অধিদেব, অধিদেবতা, অধিদেবী (অধিদেবন) : ২. *(ভক্তকে) **অধি**-ভুক্ত করিয়াছেন যে **দেব** বা **দেবতা** বা **দেবী**। **অধিদেব** অন থাকেন যেখানে।* **৩. অধিদেব** = অধিষ্ঠিত দেব, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অধিক দেবতা, শ্রেষ্ঠ দেবতা, পরমেশ। **অধিদেবতা** = অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অধিদেব। **অধিদেবী** = অধিষ্ঠাত্রী দেবী। (ব.শ.)। **অধিদেবন** = দ্যূতক্রীড়াস্থান, পাশা খেলার জায়গা। **(ছা.অ.)। ৪.** অপ্রচলিত। **৫.** উপরোক্ত প্রতীকী অর্থগুলিই বলে দেয়, শব্দটিকে আদৌ ঠিকভাবে বোঝা হয়নি। পুরাণাদিতে কোন কোন শ্রেণীর জীবের **দেবতা** কে এবং **অধিদেবতাই** বা কে, তার তালিকার মতো বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে সেই বিস্তারে যাওয়ার অবকাশ নেই। সংক্ষেপে বিষয়টি হল — যে **দেব**-সত্তা মানুষকে, তার গোষ্ঠীকে, তার সমাজকে **অধি**-কৃত বা **অধি**-ভুক্ত করে, সেই **দেব** বা **দেবতাই** সেই সেই মানুষের, গোষ্ঠীর, সমাজের **অধিদেব** বা **অধিদেবতা**। এঁদের **অধিপতি**ও বলা হত। (নিম্নে **অধিপতি** দ্রষ্টব্য)। একালের ভাষায় বললে, ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্টের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষের **অধিদেবতা** ছিল লণ্ডনস্থিত ব্রিটিশ সরকার। ওই কালখণ্ডে ওই **অধিদেবতার** কারণে যে সকল দুঃখ ভারতবাসীকে পেতে হত, তা সবই ছিল **আধিদৈবিক**। (দ্র. **আধি, আধিদৈবিক, দেবঋণ**)। বর্তমানে বাজারনির্ভর এশিয়াবাসীর **অধিদেবতা** হয়েছেন 'বিশ্বায়ন'। আমাদের বর্তমান **আধিদৈবিক** দুঃখের কারণ তিনিই। সেকালে 'এপাশ থেকে ওপাশে মাল দেওয়া ও দাম নেওয়া'র খেলাকে পাশা খেলা বলা হত। এই খেলা চলে পণ্যবিনিময়-**তীর্থে**; অর্থাৎ, বাজারে। এই বাজারের বা পাশা খেলার স্থানের অপর নাম **অধিদেবন**।

অধিপতি : ২. *(আপন) **অধি**-র এলাকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বা **অধিকার**-এ লইয়া পতিত্ব করে যে। /* যে উপরিস্থ হইয়া পালন করে। (ব.শ.)। **৩.** রাজা, অধিকারী, ঈশ্বর, অধ্যক্ষ, স্বামী, প্রভু। সুশ্রুত মতে মস্তকের অংশবিশেষরূপ মর্ম্মস্থান। (ব.শ.)। পুরাণাদিতে কে কার অধিপতি, তার প্রচুর বর্ণনা নানা স্থানে রয়েছে। পৌ. অভিধানকার তার সারসংকলন করেছেন এভাবে — জলরাশির অধিপতি বরুণ, আদিত্যগণের বিষ্ণু, বসুগণের পাবক, প্রজাপতিগণের দক্ষ, মরুদগণের বাসব, দৈত্য ও মানবের প্রহ্লাদ, পিতৃগণের যম, যক্ষ রাক্ষস পিশাচ ও ভূতগণের শিব, শৈলবানগণের হিমবান, নদীগণের সাগর, গন্ধর্ব্বগণের চিত্ররথ, নাগগণের বাসুকি, সর্পগণের তক্ষক, (নাগ আর সর্প কি আলাদা? দ্র. **অষ্টনাগ**) গজগণের ঐরাবত, অশ্বগণের উচ্চৈঃশ্রবা, পক্ষিগণের গরুড়, মৃগগণের শার্দ্দুল, এবং বনস্পতিগণের প্লক্ষ। **৪.** রাজা অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** আদি অধিপতিদের অর্থ নিষ্কাশন করলে, তা এইরকম দাঁড়ায় — জনগণের (জলরাশির) অধিপতি অব্যাপ্তি (**বরুণ** / দ্র. **অংরূপিণী**), আদিম সমাজতান্ত্রিক (বৈদিক) ব্যবস্থার সম্পদ-ম্যানেজারগণের (**আদিত্য**-গণের) অধিপতি বিপরীত/বিশেষ জ্ঞানের বিকাশকারীগণ (**বিষ্ণু**), আদি ব্যক্তিমালিকগণের (**বসুগণেব**) অধিপতি ব্যাপ্তির গতিবর্ধক (**পাবক** বা আদি মিডিয়া), সাধারণ পরিচালক ঘটক সুপারভাইজার-গণের (**প্রজাপতিগণেব**) অধিপতি স্পেশালিস্টগণ (**দক্ষ**), ... ইত্যাদি। যথাবিহিত অবকাশে এদের আরও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

অধিবাস (অধিবাসডালা, অধিবাসদ্রব্য, অধিবাসন) : ১. অধি + ✓বাসি (সুরভীকরণ) + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***অধিবাস** = **অধি**-ভুক্ত করার সময় (সু)বাসিত করা হয় যাহাতে।*

/ বিধিপূর্ব্বক কোনো পদে স্থাপন বা বরণ (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. **অধিবাস** = সুরভীকরণ, যাগপূজাবিবাহাদিতে গন্ধাদি দ্বারা করণীয় সংস্কারবিশেষ, সুরভীকরণসাধন দ্রব্য, গন্ধদ্রব্য। **অধিবাসডালা** = বরণডালা। **অধিবাসদ্রব্য** = মহী গন্ধ শিলা ধান, দুর্ব্বা পুষ্প ঘৃত ফল দধি। রজত দর্পণ ক্ষেম, স্বস্তিক সিন্দুর হেম, কজ্জল গোরোচনা যথাবিধি।। **অধিবাসন** = গন্ধমাল্যাদি দ্বারা করণীয় সুরভীকরণরূপ সংস্কারবিশেষ, প্রতিমায় দেবতার অধিষ্ঠাপন, যজ্ঞের পূর্ব্বদিনে দেবতাদির আবাহনপূর্ব্বক পূজনাদিকর্ম্ম। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **বাস** শব্দটি ক্রিয়াভিত্তিক অর্থেই প্রচলিত থাকায়, এর প্রেক্ষিত অনুসারে নানারকম অর্থ এখনও প্রচলিত রয়েছে। এক্ষেত্রে যেমন তার কেবলমাত্র **গন্ধ** রূপটিকেই নেওয়া হয়েছে। কাউকে **অধি**-ভুক্ত করার সময় **অধিকারী** তাকে আপন গন্ধে বিমোহিত করে আপনার মতো করে নেয়। একেই বলে **অধিবাস**। ফলত, যাকে **অধি**-ভুক্ত করা হচ্ছে সে **অধিকারী**র চেয়ে উপরে বা নীচে যে-তলেই থাকুক, তাকে আপন তলের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। সেইকারণে **অধিবাস** কারও ক্ষেত্রে ভাল এবং কারও ক্ষেত্রে মন্দ হতেই পারে; তবে **অধিকারী**র পক্ষে সবসময়ই তা শুভ। কিন্তু **অভিবাসন**-এর ক্ষেত্রে এসব থাকে না। প্রথমত, তাতে গন্ধ অর্থে বাস কথাটির প্রয়োগ হয় না, হয় 'বসবাস-করা' অর্থে। এবং ডুবে যাওয়া, তলিয়ে যাওয়া মানুষদের উঁচু স্থলভাগে থাকার ব্যবস্থা করা হয় বলে একে **অভিবাসন** বলে।

অধিরথ : ১. রম্ = ক্রীড়া করা। (roam)। ২. *রথ **অধিকারে** যাহার।* / যিনি রথে আরূঢ় থাকেন। (ব.শ.)। ৩. সারথি। কর্ণের পালকপিতা। কুন্তী সদ্যোজাত শিশু কর্ণকে জলে নিক্ষেপ করিলে, ইনি তাহাকে গ্রহণ ও পুত্ররূপে পালন করেন। ইঁহার পত্নী রাধা। ইনি সূতজাতি। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. আদি ফেরিওয়ালার পালন-পোষণকারীগণ। ক্ষত্রিয়তন্ত্রের রথে আরূঢ় বা ক্ষত্রিয়তন্ত্রের সরকারি কর্মচারীগণ, যারা জনসাধারণের মধ্যে আদি বিনিময়জীবী রূপে ফেরিওয়ালার পালন-পোষণ করেছিল। তবে সে ফেরিওয়ালার জননী ছিল সমাজপরিচালকদের অনুসরণকারী একটি জনগোষ্ঠী, যাকে কুন্তী নামে শনাক্ত করা হয়। দ্র. **কুন্তী**। মনে রাখা দরকার, তার আগে বিনিময়ের সূত্রপাত হয়েছিল কেবল শিখরে শিখরে, এক সম্প্রদায়-শীর্ষে বসে থাকা মহর্ষিদের সঙ্গে অপর সম্প্রদায়ের শিখরে বসে থাকা **মহর্ষি**দের। এটি ব্যক্তিগত বিনিময় নয়, সম্প্রদায়ের তরফে সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের পণ্যবিনিময়। তাই সেসময় **গঙ্গা** থাকতেন **স্বর্গলোকে**। তখনও তিনি মর্তে নামেননি।

অধীন : ১. অধি (উত্তরপদ) + ইন; ইনকে অধিগত। (ব.শ.)। ২. *যাহাতে **ইন** (মানুষের অভ্যন্তরের সত্তা বা in) অন্য কারও **অধিকারে** থাকে। দ্র. **ইন্দ্র**।* / অধিগত ইন যাহা কর্ত্তৃক; প্রভুকে প্রাপ্ত (যে)। (ব.শ.)। ৩. নিঘ্ন, আয়ত্ত, বশগত, আশ্রিত, আজ্ঞাকারী, বশবর্ত্তী, পরাধীন। (ব.শ.)। ৪. subjugated অর্থে প্রচলিত। ৫. মানুষের ভিতরে যে থাকে, তাকে **আত্মা** বলে। এটিই **ইন** পদবাচ্য। দ্র. **ইন্দ্র**। এই ইন যখন অন্যের **অধি**র এলাকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, তখন সে **অধীন** হয়। ৬. **বাংলা ইন** আর ইংরেজি in যে সর্বৈব একই শব্দ এখানে তা স্পষ্ট **বোঝা** যায়।

অধ্যাত্ম (অধ্যাত্মজ্ঞান, অধ্যাত্মবিদ্যা), আধ্যাত্মিক : ২. *অধ্যাত্ম = অধিকৃত **আত্ম** যাহাতে। **আধ্যাত্মিক** = আধ্যাত্ম (অধ্যাত্ম হইতে জাত)-কে গতিশীল করে যে।* / **অধ্যাত্ম** = দেহাধিকারপূর্ব্বক ভোক্তৃরূপে স্থিত যে আত্মা বা জীব (থাকে)। **আধ্যাত্মিক** = আত্মাকে অধিকার করিয়া জাত (যে)। (ব.শ.)। ৩. **অধ্যাত্ম** = আত্মায়, অর্থাৎ ব্রহ্মে ক্ষেত্রজ্ঞে বা দেহাদিতে অধিকৃত ব্রহ্মবিষয়ক, ক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ক, দেহবিষয়ক, আত্মাদিবিষয়, দেহস্থ প্রত্যগাত্মবিষয় বস্তু, আত্মানাত্ম-বিবেক, অধ্যাত্মশাস্ত্র। **অধ্যাত্মজ্ঞান** = আত্মাদিবিষয় জ্ঞান, আত্মজ্ঞান। **অধ্যাত্মবিদ্যা** = অধ্যাত্মশাস্ত্র, আত্মজ্ঞানরূপা বিদ্যা। **আধ্যাত্মিক** = অধ্যাত্মভব, আত্মতত্ত্বসম্বন্ধী, আত্মবিষয়ক, ব্রহ্মসম্বন্ধী জ্ঞান বা বিদ্যা, মানস, জীবাত্মবোধক, চক্ষুরাদিকরণাভিমানী পুরুষ। (ব.শ.)। ৪. religious অথবা spiritual অর্থে **আধ্যাত্মিক** শব্দটি প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. **আত্মা** কাকে বলে, সেকথা ইতোপূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেই **আত্মা**কে অধিকার করে যে সকল বিষয়, তাকেই **অধ্যাত্ম** বলে। প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রকারের মানসব্যাপারই **অধ্যাত্ম**-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন সমাজ যেমন বিভাজিত হয়নি, মানসলোকেও বিভাজন ঘটেনি। পরে পরে সমাজের বিভাজন ও মানুষের মানসব্যাপার সমূহের বিভাজন যুগপৎ ঘটতে থাকে। **অধ্যাত্মজ্ঞান** বিভাজিত হয়ে নানা প্রকারের দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি পৃথক পৃথক মানসব্যাপারের উদ্ভব ঘটেছে। বলে রাখা ভাল, পাশ্চাত্যের মনোভূমির উত্তরাধিকার **অধ্যাত্মবিদ্যা**র বিভাজিত রূপগুলি থেকে। সেজন্য তাদের মানস-ব্যাপারের সূত্রপাত ঘটেছে দর্শন বা philosophy থেকে। সেকারণেই **অধ্যাত্ম** শব্দের কোনো ইংরেজি প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আমাদের 'খ' গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠা থেকে ৯৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্র. **আত্মা, দেবযান**।

অধ্যাপক (অধ্যাপন, অধ্যাপনা) : ১. অধি + ✓ই + ই (ণিচ্) + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***অধ্যাপক** = (ছাত্রের মানসিক) অগ্রগতিকে অধিকার করিয়া পালন করেন যিনি। **অধ্যাপন** = (ছাত্রের মানসিক) অগ্রগতি অধিকারপূর্ব্বক পালন থাকে যাহাতে। **অধ্যাপনা** = (ছাত্রের মানসিক) অগ্রগতি অধিকারপূর্ব্বক পালন থাকে যাহাতে তাহার আধার।* / যিনি অধ্যয়ন করান। (ব.শ.)। ৩. **অধ্যাপক** = অধ্যাপয়িতা, বেদাদিপাঠয়িতা, উপাধ্যায়। (অধ্যাপক দ্বিবিধ — আচার্য্য ও উপাধ্যায়)। **অধ্যাপন (অধ্যাপনা)** = অধ্যয়ন করান, পাঠনা, শিক্ষাদান, পড়ান, ব্রাহ্মণের শাস্ত্রবিহিত ষট্‌কর্ম্মের একতম। (অধ্যাপন ত্রিবিধ — ধর্ম্মার্থ, ধনার্থ, ও শুশ্রূষার্থ)। (ব.শ.)। ৪. teacher, teaching অর্থে শব্দ তিনটি প্রচলিত। ৫. এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি এই যে, **অধ্যাপনা** করা আর teaching করা কিংবা প্রফেসরি করা এক কাজ নয়। ইংরেজি teach শব্দের মানে বলা হয় 'to show'। এমনকী teach শব্দের উৎসে Old English-এর যে taecan (তাকাতে সাহায্য করা?) শব্দটিকে

পাওয়া যায়, তার মানেও 'to show'; এবং Greek ভাষার যে deiknynai (দেখিয়ে দেওয়া?) শব্দটিকে পাওয়া যায়, তারও মানে 'to show'। আর professor তো profess করে, কতকগুলি নীতির উপর তার বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি করে, আর 'এগুলি আমি জানি' এইরূপ জানান দেয়। **অধ্যাপনা** কিন্তু শুধুমাত্র 'to show' নয়, এমনকি profess করাও নয়। **অধ্যাপক** আপন **অধ**কে ছাতার মতো করে শিষ্যের বা ছাত্রের মনের অগ্রগতির উপর বাড়িয়ে দেয়, ছাত্রের মনের এগিয়ে চলার উপর ছাতা ধরে; ছাত্রের মনকে আপন **অধি**র এলাকায় আশ্রয় দিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে প্ররোচিত করে, পথ দেখায়। এগোয় কিন্তু ছাত্রই। **অধ্যাপক** তার এগোনোকে ছায়া দিয়ে, সুরক্ষা দিয়ে, প্ররোচনা দিয়ে, চলার পথের সামনে আলো ফেলে, সফল হতে সাহায্য করেন।

অধ্যায় : দ্র. ✓ই।

অবধি : ১. অব + ✓ধা + ই (কি) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *অস্তিত্ববাহকের ধারণ গতিশীল থাকে যেখানে।* ৩. পরিচ্ছেদ, সীমা, পর্যন্ত, চরম সীমা, কাল, সময়, অবসান, অবধান, গর্ত্ত, অবশিষ্ট। (ব.শ.)। ৪. upto অর্থে প্রচলিত। ৫. **অবধি** শব্দটি আমাদের জানায়, অধিকাংশ বস্তু বা বিষয় সূচনার পর থেকে ক্রমশ নীচের দিকে নামছে এবং একস্থানে গিয়ে 'অবধারিত' হচ্ছে। শেষ যেখানে গিয়ে এই মুহূর্তে অবস্থান করছে বা 'অবধারিত' হয়েছে, সেখানেই সে ধারিত হয়ে সক্রিয় রয়েছে। সেটাই তার এই মুহূর্তের সীমা বা চরম সীমা। **অবধি** অস্তিত্বের সেই শেষ সীমাটিকেই কেবল বোঝায় না, জানিয়ে দেয় যে, বহু আগে থেকে যাত্রা শুরু করে এইখানে, এই শেষ সীমায় সে পৌঁচেছে।

অভিধা, অভিধান, অভিহিত : ১. **অভিধা** = অভি + ✓ধা + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। **অভিহিত** = অভি + ✓ধা + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***অভিধা** = অস্তিত্বের **ভি** (ভবনের গতিশীল রূপ) ধারিত যাহাতে; অথবা, অস্তিত্বের মূলসত্তা ধারিত যাহাতে (যে শব্দে, যে নামে)।* ***অভিধান** = **অভিধা** অন থাকে যাহাতে। **অভিহিত** = যাহাকে **অভিধা**-ত করা হয়েছে বা নাম ধরে ডাকা হয়েছে।* / **অভিধা** = যাহা দ্বারা অভিহিত হয়; যে শক্তি শব্দনিষ্ঠ-অর্থবোধ জনন করে। (ব.শ.)। ৩. **অভিধা** = অভিধান, কথন, সংজ্ঞা, আখ্যা, নাম, শব্দ, শব্দশক্তিভেদ (শব্দের ত্রিবিধ শক্তি — অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা। শব্দের যে শক্তিতে তাহার মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ প্রতীত হয়, অর্থাৎ শব্দের উচ্চারণমাত্রেই তাহার কোষ-ব্যাকরণাদিপ্রসিদ্ধ অনায়াসলভ্য সহজ মুখ্য অর্থের বোধ হয়, তাহা 'অভিধা' শক্তি।)। **অভিধান** = কথন, উচ্চারণ, নির্দ্দেশ, সূচন, দ্যোতন, সংজ্ঞা, আখ্যা, নাম, উপাধি, শব্দ, শব্দার্থপ্রতিপাদক গ্রন্থ, শব্দার্থকোষ, একপর্য্যায়বোধক শব্দ। **অভিহিত** = কথিত, উক্ত, প্রধান, নির্দ্দিষ্ট, সংজ্ঞিত, কথিত বাক্য। (ব.শ.)। ৪. **অভিধা** শব্দটি অপ্রচলিত হলেও, **অভিধান** শব্দটি dictionary অর্থে এবং **অভিহিত** শব্দটি called অর্থে প্রচলিত। ৫. **অভি কাকে বলে**, সেকথা আমরা যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে পাব। এখানে সংক্ষেপে এটুকু বলে নেওয়া যেতে পারে, যে, 'অস্তিত্বের শোভা গতিশীল' থাকে যাতে, সেই হল **অভি**। একটি বিষয় বা বস্তুর **অভি** ধারিত হয় তার ক্রিয়ায়, যে ক্রিয়া দ্রষ্টার চোখে ধরা দেয়। দ্রষ্টা তদনুসারে তার সেই ক্রিয়ার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে এবং তা করার জন্য অনেক সময় দ্রষ্টা আঙুলের ব্যবহার না করে শব্দের বা আওয়াজের সহায়তা নেয়। সেই আওয়াজ প্রকৃতির নিয়মে সেই ক্রিয়ার কথাটি বলে দেয় — 'ওই দেখো, অমুক ক্রিয়াকারী।' যে শব্দের সাহায্যে বিষয় বা বস্তুর বিশেষ ক্রিয়াটিকে দেখানো সম্ভব হয়, তাকেই বস্তুটির **অভিধা** বা ক্রিয়াভিত্তিক শব্দে কথিত নাম বলে। (এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে আমাদের 'ঙ' গ্রন্থের ১৪৩ পৃষ্ঠায়।)

বিশ্বের সমস্ত মানুষের সমস্ত ভাষার আদিতে এই নিয়মেই জগতের বিষয় ও বস্তুসমূহের নামকরণ হয়েছিল। কোনো নামই অর্থহীন আওয়াজ মাত্র ছিল না, নেই। সমস্যা এইমাত্র যে, মানব-সমাজে দক্ষতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর লোকে সেই অর্থ ভুলে গেছে। তাই, পরে পরে ক্রমান্বয়ে সেই নামকরণে বিবর্তনের নানান ছাপ পড়ে এই মূল নীতিটি চাপা পড়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃতিসংলগ্ন সাধারণ মানুষের কথা বলার স্বভাবের ক্ষেত্রে আজও এই নীতির বিন্দুমাত্র রদবদল ঘটেনি। অসচেতনভাবে এই নিয়মেই মানবজাতি বিশ্বজগতের প্রতিটি 'দৃশ্য' ও 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' বিষয় ও বস্তুর নাম বা **অভিধা** নির্ণয় করেছে। সেই **অভিধা**র সাহায্যে যুগ যুগ ধরে মানুষ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেছে।

সেই নাম বা **অভিধা**গুলি অন থাকে মানুষের সংকলন করা **অভিধান** নামক গ্রন্থে। সেই **অভিধা**র সাহায্যে কাউকে ডাকা হলে বলা হয় তাকে **অভিধা**ত বা **অভিহিত** করা হচ্ছে। এভাবে **ধা** বর্ণটি কেবলমাত্র জিহ্বা নামক যন্ত্রের স্বভাবের নিয়মেই হি-তে পরিণত হয় না, ক্রিয়ার পরিবর্তনের কারণেও হয়ে থাকে। ধারিত বস্তু বা বিষয় মাত্রেই স্থির হয়ে যায়, অর্থাৎ **ধ** পরিণত হয় হ-তে। (নিম্নে **হিত** দ্রষ্টব্য)। সেই স্থির শব্দের গতিশীল ব্যবহারের কারণে **অভিধাত** পরিণত হয় **অভিহিত**-তে। একই ঘটনা ঘটে **আঘাত** থেকে **আহত** হওয়ার বেলায়।

আধি : ১. আ + ✓ধা + ই (কি) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। দ্র. **উপাধি (উৎ)**। ২. *অধি হইতে জাত।* / যাহা দ্বারা চিন্তা আহিত হয়। (ব.শ.)। ৩. মানসী ব্যথা, মনঃপীড়া, ব্যসন, অশুভ, বিপদ, যাতনা, কষ্ট, ঋণশোধনার্থ উত্তমর্ণ গৃহে ন্যস্ত দ্রব্য, বন্ধক, ন্যাস, বাঁধা, প্রত্যাশা, অহঙ্কার, কুটুম্বব্যাপৃত জন, অধিষ্ঠান, আক্রমণ, বন্ধন, বাঁধা দেওয়া। তুলনীয় উপাধি, সমাধি। (ব.শ.)। ৪. অপ্র.। ৫. **আধি** শব্দটি পৃথকভাবে এখন আর ব্যবহৃত হয় না, ব্যবহৃত হয় **আধিব্যাধি** রূপে। শব্দটির বর্তমান পরিচিতি বা অর্থ হল 'অসুখ ইত্যাদি' বা 'পীড়াদি'। এভাবেই বঙ্গভাষীরা আজকাল শব্দটি প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু অতীতে শব্দটির এরূপ অর্থ ছিল না। কী ছিল, জানার জন্য সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (১৯৯৪) খুললে পাবেন — *"আধিব্যাধি : দ্রষ্টব্য আধি। আধি — মানসিক পীড়া, দুশ্চিন্তা ('ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো'; রবীন্দ্র), আধিব্যাধি — মানসিক ও দৈহিক পীড়া।"* অর্থাৎ **আধি** মানে 'মানসিক পীড়া', আর **ব্যাধি** মানে 'দৈহিক পীড়া'।

তবে কিনা, এটা হল **আধিব্যাধি** শব্দের বিশেষ্যভিত্তিক অর্থ, নতুন পরিচিতি। মনে রাখা ভালো, সংসদ বাঙ্গালা অভিধান একটি বিশেষ্যভিত্তিক বাংলা অভিধান, এতে প্রধানত বাংলা শব্দের নতুন পরিচিতিই সংকলিত হয়েছে। কিন্তু হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত বঙ্গীয় শব্দকোষ গ্রন্থে বাংলা শব্দের অতীত পরিচিতির বা ক্রিয়াভিত্তিক অর্থেরও কিছু কিছু সংবাদ রয়েছে। অন্যত্রও রয়েছে। সেই সব সংবাদ একত্রিত করলে যা পাওয়া যায়, তা এইরকম —

'মনকে যে **অধিকার** করে' সেই হল **আধি (আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক**। দ্র. **ত্রিতাপ**)। একটি দুশ্চিন্তা আপনার মনকে অধিকার করে আছে, হতে পারে সেটি আর্থিক দুশ্চিন্তা বা অন্য কোনো দুশ্চিন্তা, সেটিই **আধি**। এরপর 'যাহা হইতে আধি বিগত' সেটি হল **ব্যাধি**। তার মানে, আপনার মনে যে দুশ্চিন্তা চলছিল, সেটি চলে গেল যখন আপনার পা ভেঙে গেল বা পেটব্যথা শুরু হল। দৈহিক পীড়া আশু সমস্যা হয়ে দেখা দিলে মানসিক পীড়া কিছুকালের জন্য পরিত্যক্ত হয়। তাই **ব্যাধি হল সেই, যে কিনা আধিকে** কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরিয়ে রাখে। এইজন্য বিশেষ্যভিত্তিক অভিধানকারগণ 'আধিব্যাধি' শব্দের মানে করেছেন 'মানসিক পীড়া ও দৈহিক পীড়া'। এটিই আধিব্যাধি শব্দের নতুন পরিচিতি। আর, আমরা দেখলাম, তার অতীত পরিচিতি ছিল 'মনকে যে অধিকার করে (= আধি) ও যাহা হইতে আধি বিগত (= ব্যাধি)' — বাংলাভাষা যখন ক্রিয়াভিত্তিক দেশে বাস করত, যখন সে উদ্বাস্তু হয়নি, তখন এই ছিল 'আধিব্যাধি' শব্দের প্রকৃত পরিচিতি বা অর্থ। উদ্বাস্তু হওয়ার পর 'আধিব্যাধি' বিশেষ্যভিত্তিক দেশে পৌঁছোলে তার অর্থ সংকুচিত হয়ে 'মানসিক ও দৈহিক পীড়া' হয়ে যায়। এখন সে-অর্থ আরও সংকুচিত হয়ে 'পীড়াদি' অর্থে পর্যবসিত হয়েছে।

এখানে সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, শব্দটির আদি অর্থের ব্যাপকতা। মনকে যে যে বিষয় বা চিন্তা অধিকার করে, সেই সেই বিষয়ের তালিকা তো বিশাল। আমরা ভুতোর বিধবা পিসির দু-মুঠো অন্নের সমস্যা থেকে কর্পোরেট ভাবুকদের বিশ্বায়নের সমস্যা পর্যন্ত, কিংবা সেই পিসির শতচ্ছিন্ন শাড়ির ফুটো সারানোর সমস্যা থেকে মহাকাশের ওজোন ফুটো (ozone hole) সারানোর সমস্যা পর্যন্ত, আপনার শিশুর পুতুলের পা ভেঙে যাওয়ার সমস্যা থেকে পথিক গুহর মাথায় চলা বৈজ্ঞানিক সমস্যা পর্যন্ত, ইরাক যুদ্ধ থেকে যোদো-মোধোর মারকাটারি পর্যন্ত বিশ্বের সমস্ত সমস্যাকেই মানুষের 'আধি' হয়ে উঠতে দেখতে পাই। বিপরীতে 'যা দেখা দিলে আধি বিগত হয়' সেই ব্যাধির তালিকাতেও আমরা শরীর ছাড়িয়ে আরও অনেককে দেখতে পাই। যেমন, একালের মতো করে বললে, আপনি কাকে ভোট দেবেন না-দেবেন এই নিয়ে চিন্তায় আছেন, ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় শুনলেন — সামনে যাওয়া যাবে না, বুথ জ্যাম। আপনি আর এগোতে পারছেন না। এই জ্যাম তো আপনার (কাকে ভোট দেবেন এই দুশ্চিন্তাকে বা) আধিকে তাড়িয়ে দিল। এও তো ব্যাধি। এরকম আরও অনেক ব্যাধি আছে, যারা আধিকে তাড়ায়। কেবল দৈহিক পীড়াই আধিকে তাড়ায় না।

আধিদৈবিক : ১. আধি + দৈবিক। ২. ***অধিদেব** হইতে জাত; অর্থাৎ, **অধিদেব** হইতে যা কিছু হয়*। **৩.** অধিদেবভব, দেবযোনি-প্রভৃতি হইতে সংঘটিত, যক্ষাদির আবেশনিবন্ধন (অর্থাৎ আবেশ হেতু) প্রবৃত্ত (দুঃখ), দেবতা অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত, দেবপ্রতিপাদক, অতিবাতবৃষ্ট্যাদিজনিত, দাহশীতাদিহেতুক। (ব.শ.)। ৪. supernatural অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ত্রিতাপ, ঋণ, দেবঋণ, দেবতর্পণ**। আদিতে যারা দিত, তারা **দেব** বা **দেবতা**। পরে তারা বিনিময়ে কিছু নিত। প্রথম প্রথম সেটা **সুদ জাতীয়**। পরে পরে 'বিনিময়ে প্রাপ্তব্য'টি **'দাম'** হয়ে যায়। তখন দেবতা হয়ে যায় বিনিময়জীবী, দোকানদার, ব্যবসায়ী, সবই **দৈবের** অধীন। ... একসময় 'ঘটিবাটি বন্ধক দেওয়ার ফলে যে দুঃখ' হত, সেটাই **ছিল দেবযোনি** থেকে প্রাপ্ত দুঃখ, বা যক্ষাদির আবেশনিবন্ধন **দুঃখ, অর্থাৎ আধিদৈবিক**। পরে বাহ্যসম্পদের দুনিয়ার নিয়ন্ত্রকদের থেকে যে সব দুঃখ, তা সবই **আধিদৈবিক** হয়ে যায়। মোট কথা, যে পণ্যজগৎ আমাদের **অধিকার** করে, এবং তার ফলে আমাদের যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাকে **আধিদৈবিক** দুঃখ বলে। দ্র. **আধিভৌতিক**।

আধিভৌতিক : ১. ভূ = বিদ্যমানতা, হওয়ন। ২. *অধিভূত হইতে জাত*। (ব.শ.)। **৩.** মনুষ্য পশু পক্ষী সরীসৃপ হইতে জাত (দুঃখ)। ক্ষিতিপ্রভৃতি পঞ্চভূতজনিত, স্থাবরনিমিত্তক (দুঃখ)। ... (ব.শ.)। ৪. natural অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ত্রিতাপ**। যে সকল সামাজিক বা পার্থিব বস্তু বা বিষয় (ভূত) আমাদেরকে **অধিকার** করে, এবং তার ফলে তাদের থেকে যে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাকে **আধিভৌতিক** দুঃখ বলে। তার মানে চিন্তাজগৎ আমাদের আত্মাকে **অধিকার** করলে যে সুখ বা দুঃখ হয়, তা **আধ্যাত্মিক**। পণ্যজগৎ আমাদের **অধিকার** করলে যে সুখ বা দুঃখ হয়, তা **আধিদৈবিক**। এবং ভৌতজগৎ বা পার্থিব সত্তারা আমাদের **অধিকার** করলে যে সুখ বা দুঃখ হয়, তা **আধিভৌতিক**।

ধাতা (ধাতৃ, বিধাতা, বিধাত্রী) : ১. ✓ধা + তৃ (তৃচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ধাতা** = ধারককে তারণ করে যে। **ধাতৃ** = ধারক তারণের আবর্তন থাকে যাহাতে। **বিধাতা** = বিশেষ প্রকারে ধারককে তারণ করে যে। **বিধাত্রী** = **বিধাতার** গতিশীল আধার যে।* / **ধাতা** = যিনি গর্ভধারণ করেন; যাহাকে (যাহার স্তন্যকে) পান করে। (ব.শ.)। **৩. ধাতা (ধাতৃ)** = ধারক, ভর্ত্তা, বিভক্তা, পোষক, কর্ম্মফলবিধাতা, ব্রহ্মা, স্রষ্টা, বিষ্ণু, উপেন্দ্র, শিব, আদিত্যবিশেষ, বায়ুবিশেষ, আত্মা, বিরাট্, সর্গশেষপ্রণেতা সপ্তর্ষি, ব্রহ্মার পুত্রভেদ, (১) এই সংখ্যা, জননী, পৃথিবী, গায়ত্রীরূপা ভগবতী, গঙ্গা, আমলকীবৃক্ষ; উপমাতা, ধাই-মা। **বিধাতা** = বিধানকর্ত্তা, প্রতিকারক, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, জনয়িতা, স্রষ্টা, নির্ম্মাতা, সৃষ্টিবিধায়ক, প্রজাপতি, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কামদেব, বিশ্বকর্ম্মা, ভাগ্য, মদিরা। **বিধাত্রী** = বিধানকর্ত্রী, জনয়িত্রী, পিপ্পলী। (ব.শ.)। **৪. ধাতা** অপ্রচলিত, God অর্থে **বিধাতা** কমবেশি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ধান**। এখানে কেবল এটুকু বলে রাখা যেতে পারে, যে, পরমাপ্রকৃতির বা নেচারের নিয়মাবলীকে **ধাতা** এবং মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম (সামাজিক, রাষ্ট্রিক বা সরকারী) নিয়মাবলীকে **বিধাতা** বলে। এই **ধাতাকেই** বাংলাভাষীর

পূর্বপুরুষেরা অলৌকিক স্রষ্টা বা ঈশ্বর বলতেন, রবীন্দ্রনাথ বলতেন 'অরূপরতন'; আর, এই **বিধাতাকে** তাঁরা লৌকিক স্রষ্টা, স্বামী, প্রভু, রাজা, ঈশ্বর ইত্যাদি বলতেন, রবীন্দ্রনাথ বলতেন 'অচলায়তন'। নেচারাল বা স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে বা **ধাতাকে** সেকারণেই (উপরের **৩** সংখ্যক অর্থগুলিতে) 'ধারক থেকে শুরু করে ... আমলকীবৃক্ষ, উপমাতা বা ধাই-মা' পর্যন্ত বলা হয়েছে। এগুলি সবই স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ও তজ্জাত ব্যবস্থার নানা প্রকারের নিধি ও প্রতিনিধি। আর, কৃত্রিম ব্যবস্থাকে বা **বিধাতাকে** সেকারণেই 'বিধানকর্ত্তা থেকে শুরু করে ... পিপ্পলী' পর্যন্ত বলা হয়েছে। এগুলি সবই মানুষের কৃত্রিম নিয়মাবলী ও তজ্জাত ব্যবস্থার নানারকম নিধি ও প্রতিনিধি। দ্র. **অশ্বত্থ**।

ধাতু (ধাতুকুশল, ধাতুপাঠ, ধাতুবাদ, ধাতুবাদী, ধাতুবৈরী, ধাতুমারী, ধাতুহা) : ১. ✓ধা + তু (তুন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *ধাতু = ধারকের তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* / **ধাতু** = ধারণ করে যে। **ধাতুবৈরী, ধাতুমারী (ধাতুহা)** = **ধাতু**র বৈরী যে, **ধাতু**কে মারে যে, **ধাতু**কে হনন করে যে। (ব.শ.)। **৩. ধাতু** = বায়ু পিত্ত ও কফ — এই ত্রিবিধ, রস রক্ত মাংস মেদঃ অস্থি মজ্জা শুক্র — এই সপ্তবিধ, অস্থি, পৃথিবীপ্রভৃতি পঞ্চমহাভূত, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ — পঞ্চ তন্মাত্র, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, স্বর্ণরৌপ্যাদি, সিন্দুরগৈরিকমনঃশিলাদি, ভূ গম্ ইত্যাদি নাম প্রকৃতি, পরমাত্মা, চিদ্‌ধাতু, লোক, বস্তু, গীতাংশ, ধাতুজন্য জীবনীশক্তি, নাড়ী, শুক্র, মোহজনক বস্তু, স্বভাব, ধাত। **ধাতুকুশল** = ধাতুদ্রব্যনির্ম্মাণপটু। **ধাতুপাঠ** = পাণিনি-আদি কৃত ধাতু-অর্থবোধক গ্রন্থভেদ। **ধাতুবাদ** = ধাতুবিজ্ঞান (mineralogy)। **ধাতুবাদী** = ধাতুবিজ্ঞানী (mineralogist)। **ধাতুবৈরী, ধাতুমারী (ধাতুহা)** = গন্ধক। (ব.শ.)। সষ্টিকর্তা; ঋক্‌বেদের পরবর্তী স্তোত্রে ধাতুর কোনো বিশেষ গুণাবলী বা ক্রিয়াকলাপ দেখা যায় না। সৃষ্টি-উৎপাদনে এবং স্বাস্থ্যরক্ষায় ধাতু সব সময়ে নিযুক্ত। বিবাহ-সংগঠনকারী, জন্মদাতা, গৃহদেবতা, ভগ্নস্বাস্থ্য-উদ্ধারক — এই সকল রূপে এঁকে দেখা যায়। ইনি একজন আদিত্য। পরবর্তী পুরাণে ইনি প্রজাপতি বা ব্রহ্মার সঙ্গে জড়িত। (পৌ.অ.)। **৪.** প্রধানত metal অর্থে এবং কদাচিৎ semen অর্থে প্রচলিত। mettle শব্দটি ধাত বা 'প্রকৃত স্বভাব' কিংবা 'প্রকৃত গৌরব' অর্থেও প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। **৫.** [এই বয়ান কমবেশি বহুরৈখিক অর্থে লিখিত হচ্ছে। একই সঙ্গে nature, human, language (ব্যাকরণ) — কমপক্ষে এই তিনটি sphere-এ একই সঙ্গে বলার জন্য বয়ানটি প্রস্তুত করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণ কৌমুদী প্রদত্ত বৈয়াকরণিক 'পরিভাষা' বা term-গুলি মনে রাখলে বাক্যগুলির অর্থ বুঝতে সুবিধা হবে।]

এই বিশ্বপ্রকৃতি **পদার্থ**ময়। তার মধ্যে কিছু পদার্থকে নিষ্কলুষ করলে যে মূল **প্রকৃতি**কে পাওয়া যায়, তাকে **ধাতু** বলে। তাই, **ধাতু**কে সঠিকভাবে বুঝতে হলে **পদ** ও তার **অর্থ**কে, অর্থাৎ, **পদার্থ**কে ঠিকঠাক জানা চাই। আমাদের প্রাচীন **পদ-অর্থ**-জ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, এই **প্রকৃতি**কে দুই ভাগে ভাগ করে দেখা যায় — ধাতু ও প্রাতিপদিক। এই ধাতু ও প্রাতিপদিক বিভক্তি যুক্ত হলে তাদের যে রূপ হয়, সেগুলিকে **পদ** বলে। সেই **পদ**-এর অর্থ হয়; তাই তারা **পদার্থ** বলে কথিত হয়। বস্তুজগতে ও ভাবজগতে আমরা **পদ** ও **পদার্থ**কেই দেখতে পাই, নিষ্কলুষ **ধাতু** ও প্রাতিপদিকদের দেখতে পাই না।

অতএব **ধাতু** একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। আমাদের প্রাচীন শব্দশাস্ত্রীরা জগৎকে কেমন বুঝতেন, **ধাতু** শব্দটি তার যথার্থ নিদর্শন। তাঁরা মনে করতেন, মানবশরীর, ভাষাশরীর, জগৎশরীর — প্রত্যেক শরীরেরই গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে হাড়ের কঙ্কালটির ভিত্তি হল **ধাতু**, এবং বাকিটা হল মাংসাদি নরম বস্তু। সেই ধারণার উত্তরাধিকার আমাদের 'হাড়মাস' শব্দটির মধ্যে এখনও বর্ত্তমান রয়েছে। কংক্রিটের ছাদ যেমন ইস্পাতের জাল ও বালু-সিমেন্ট-পাথরের মিশ্রণ দিয়ে গড়ে তোলা হয়, এর গঠনও তেমনি। ব.শ. একালের ভাষায় একে constitution বলে চিহ্নিত করেছেন। (মনে রাখা দরকার, এর একটি বাংলা প্রতিশব্দ হল **সংবিধান**। ধান থেকে **ধাতু** দূরে নয়।)

ঠিকই। আমাদের প্রাচীন পুরুষরা মনে করতেন, মানুষের অস্তিত্ব সফলভাবে গড়ে উঠতে পারে সত্ত্ব-রজঃ-তম, এই **ত্রিগুণ**-এর সাহায্যে; আর, তাতে **ত্রিদোষ** সৃষ্টি করে বায়ু-পিত্ত-কফ। পরে পরে কারও কারও মনে হয় যে, নাঃ। ত্রিগুণ নয়, এটা হবে সপ্তবিধ — রস রক্ত মাংস মেদঃ অস্থি মজ্জা ও শুক্র। কেউ বললেন, সপ্তবিধ হলেও মানবাস্তিত্বের মূলে কিন্তু হাড় বা অস্থিই প্রধান; কেউ বললেন, প্রধান একটিই, তার নাম শুক্র (semen) বা **ধাতু**, এবং তাকেই 'বীর্য্য' ও 'পারা' শব্দেও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এ **ধাতু** বা বীর্য্য যেমন মানবলিঙ্গ থেকে মানবীযোনিতে নিষেক করা হয়, তেমনি পরিকল্পনা রূপে কর্মক্ষেত্রে, তত্ত্ব (থিয়োরি) রূপে প্রয়োগে (প্র্যাকটিসে) অর্থাৎ, অমৃতলিঙ্গ থেকে ব্রহ্মযোনিতেও নিষিক্ত হয় ('ভ' গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ এই **ধাতু**বোধের সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ স্তর রয়েছে। সে বোধকেই এক পয়ারে সেরে রেখেছেন হিন্দিভাষী জ্ঞানী মানুষেরা — 'ভগ্ মে লিঙ্গ্, লিঙ্গ্ মে পারা / যো বুঝে সো গুরু হমারা।'

তাঁরা মনে করতেন, এই জগৎশরীরটি গড়ে উঠেছে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চমহাভূত দিয়ে; এগুলিই জগৎশরীরের **ধাতু**। অন্যেরা বিশ্লেষণ করে বললেন, আসলে এই বিশ্বশরীরের গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে পঞ্চতন্মাত্র — শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ; এরাই তার **ধাতু**। কিন্তু দেহবাদীরা বললেন, যে **ধাতু**গুলিকে আমরা হাতে-নাতে ধরতে পারি, সেগুলিই প্রকৃতপক্ষে এই জড়জগতের মূলে; আর সেগুলি হল সোনা রূপা তামা লোহা ... প্রভৃতি বাহ্য**ধাতু**। এই ধাতুগুলির ঘোর শত্রু — **ধাতুবৈরী, ধাতুমারী, ধাতুহা** — রূপে তাঁরা চিহ্নিত করলেন গন্ধক (sulphur) কে। সবচেয়ে ভাল মোটা লোহার পাইপও গলে যায়, ফুটো হয়ে যায়, দু-চার সপ্তাহের মধ্যে বদলাতে হয়, দেখে, sulphuric acid বানানোর কারখানা-মালিক কিছুতেই ভেবে পান না কোন অক্ষয় **ধাতু** দিয়ে তিনি তাঁর sulphuric acid plant বানাবেন; চোর কিন্তু সেই **ধাতুবৈরী** গন্ধকজ অ্যাসিড দিয়ে গৃহস্থের তালা নিশ্চিতভাবেই গলিয়ে খুলে ফেলতে পারে। ...

তা হোক, কিন্তু মানুষের যে বুধশরীর গড়ে ওঠে, তা কিন্তু

আসলে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বকের উপলব্ধি দিয়েই গড়ে ওঠে। অতএব মানববোধের **ধাতু** এরাই। ... আর ভাষাশরীর? বৈয়াকরণেরা বললেন, দশ গণে বিভক্ত ভূ গম্ কৃ মৃ মুচ্ ধাব্ এরকম অজস্র ক্রিয়াবাচক শব্দ রয়েছে; তারাই ভাষাশরীরের **ধাতু**। কেউ বললেন, [illegible] বাদ দাও; স্বয়ং পরমাত্মাই এই বিশ্বজগতের আসল **ধাতু**। ...

এইরকম অনেক পথ পেরিয়ে এসে আমাদের দ্বৈতাদ্বৈতবাদী পূর্বপুরুষেরা জানিয়েছিলেন যে, দুই রূপে (ধাতু ও প্রাতিপদিক রূপে) যে প্রকৃতিকে আমরা দেখছি, সে কিন্তু আসলে এক। metal ও non-metal-এর, ধাতু ও প্রাতিপদিকের, হাড় ও মাংসের এই প্রতিমায় যুক্তি ও আবেগের যে দ্বৈরাজ্য রয়েছে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে আমাদের 'সাম্য থেকে সামঞ্জস্যে : সুন্দরসমাজ' নিবন্ধে, যা প্রকাশিত হয়েছে 'অপর' পত্রিকার ২০০৯ বইমেলা সংখ্যায়।

তা সে যাই হোক, শেষমেষ সম্প্রতিকালের **পদার্থ**বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এ জগতের মূল **ধাতু** হল wavicle (wave + particle), অর্থাৎ তরঙ্গকণ্ (দ্বৈতাদ্বৈত = দুই কিন্তু এক = two in one = ঙ্ + গ্ = ঙ্গ্ = ng = ং), সেকেলে বাংলাভাষায় তার একটি নাম ছিল 'ং-রূপ' বা '**অংরূপিণী**'। কার্যত, এজগতের **ধাতু** যে কে, তার সুনিশ্চিত সুরাহা এখনও হয়নি। ৬. ল্যাটিন datum (= দাতুম্) শব্দটিকে **ধাতু** শব্দের 'অপরিণত' জ্ঞাতি বলে ভাবা যেতে পারে।

ধান, ধানা, ধানাই-পানাই (অনুসন্ধান, অনবধান, অপিধান, অপ্রধান, অবধান, অবিধান, অব্যবধান, অভিধান, অভিসন্ধান, আধান, উপধান, তিরোধান, নিধান, প্রণিধান, প্রতিবিধান, প্রধান, বিধান, ব্যবধান, সংবিধান, সন্ধান, সন্নিধান, সমবধান, সমাধান, সাবধান) : ১. ✓ধা + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ধান*** *=* ***ধা*** *(ধারক, ধারণেচ্ছা) অন থাকে যাহাতে।* ***ধানা*** *=* ***ধান****-এর আধার যে।* ***ধানাই-পানাই*** *=* ***ধানা*** *গতিশীল যাহাতে এবং* ***পানা*** *(পানের আধার) গতিশীল যাহাতে।* / **ধানা** = শরীরকে পোষণ করে যে। (ব.শ.)। ৩. **ধান** = ধারণ, পোষণ, ধারণস্থান, আধার। **ধানা** = ভাজা যব, ভৃষ্টতণ্ডুল (ভাজা চাউল), সক্তু, অভিনব-উদ্ভিদ, অঙ্কুর, ধন্যাক। (ব.শ.)। **ধানাই-পানাই** = অসংবদ্ধ কথা, আবোলতাবোল, নানা অপ্রাসঙ্গিক উক্তি। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. প্রতীকী অর্থে সব শব্দগুলিই কমবেশি প্রচলিত। ৫. আগেই **ধ**-বর্ণের অর্থে আমরা দেখেছি, যে, এ হল এমন এক প্রকার ধারণেচ্ছা, যা, কোনো কিছু গ্রহণ করার জন্য হাঁ করে রয়েছে; নিন্দার্থে নয়, সদর্থকভাবেই। এই **ধ** অন হয়ে থাকলে বা হাঁ করে গ্রহণ চালাতে থাকলে তাকে **ধান** বলাই সঙ্গত। অন্যভাবে বললে বলা যায়, যে সত্তা **ধন** গ্রহণ করে শরীরাভ্যন্তরে আনয়ন করতে থাকে, তাকেই **ধান** বলে; তবে এই **ধন** টাকাকড়ি থেকে অনেক বেশি বোঝায় অন্যধরনের ধনগুলিকে এবং তার পরিমাণ কত বেশি, তা আমরা উপরোক্ত উপসর্গাদিযুক্ত (**অনুসন্ধান** থেকে **সাবধান** প্রভৃতি) শব্দগুলির সংখ্যা থেকেই বুঝতে পারি।

যাই হোক, **ধান** কথাটিকে যদি ক্রিয়ারূপে দেখি, তাহলে তার অর্থ স্পষ্ট হয় **ধানা** ও **ধানাইপানাই** শব্দের অর্থ থেকে। **ধান** করা মানে, দানার মতো বস্তু এক এক করে গ্রহণ করা; আর **পান** করা মানে, তরল বস্তু মুখে ঢেলে গ্রহণ করা। ভাজা চাল কিংবা যবকে সেকারণেই **ধানা** বলে, যাদের গোটা গোটা মুখে ফেলে খেয়ে নেওয়া যায়; আর, বেলের '**পানা**'র কথা তো সবাই জানেন। এটি তরল সরবৎ জাতীয় বস্তু, একে পান করা যায়। এই তথ্য থেকে বোঝা যায় — **পানাই** মানে 'পান ক্রিয়াটি করি', যেমন **খাই** মানে 'খা ক্রিয়াটি করি'; একইভাবে, **ধানাই** মানে 'ধান ক্রিয়াটি করি'। ক যখন খ-কে বলে, '**ধানাই-পানাই** ছাড়ো, কী চাও বলো', তখন তার বাক্যটির মানে দাঁড়ায় — "তুমি যে আমার '**ধানা** খেয়ে নিই, **পানা** খেয়ে নিই' করছ, তা বন্ধ করো; ঠিক কী করতে চাও তা স্পষ্ট করে বলো।"

আর, **ধান** শব্দটিকে যদি বিশেষ্যরূপে দেখি, তবে তার স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করে **যান** কথাটি। যাওয়া অন থাকে **যান**-এ, ধাওয়া অন থাকে **ধান**-এ। এই 'ধাওয়া' আসলে 'ধাবন করা', গ্রাস করার জন্য কেউ যেন হাঁ করে খাদ্যবস্তুটির পিছনে ছুটছে। **যান** যেমন যে কোনো গাড়ি (যাহা গড়ায়) হয়, অর্থাৎ 'স্থানান্তরণের উপায়'কে বোঝায়, **ধান** তেমনি যে কোনো আধারকে বোঝায়, যে কিনা 'ধারণ করব, ধারণ করব' বলে তার 'ধারণেচ্ছা' নিয়ে সক্রিয় রয়েছে। তাহলে, দেখা যাচ্ছে, **ধান** মূলত আধারই বটে; কিন্তু কী রকম আধার?

আমাদের প্রাচীন পুরুষদের কাছে এই প্রশ্নটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে তাঁরা সমস্ত **ধান**গুলিকে তাদের ক্রিয়ার চরিত্র অনুসারে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছেন। নিম্নে সেই **ধান**গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হল —

ধান = ধারক অন যাহাতে।
বিধান = বিশেষভাবে বা বিপরীতভাবে ধারক অন যাহাতে।
প্রতিবিধান = **বিধান**-এর মুখোমুখি উল্টো **বিধান** যাহাতে।
প্রধান = প্রকৃষ্ট ধারক অন যাহাতে।
অবধান = **অব** ধারক অন যাহাতে।
অনবধান = নেই **অবধান** যাহাতে।
ব্যবধান = বিশেষ বা বিপরীত **অবধান** যাহাতে।
সাবধান = সহ **অবধান** যাহাতে।
উপধান = **উপ** ধারক অন যাহাতে।
সংবিধান = সম্যক ও বিশেষ বা বিপরীত ধারক অন যাহাতে।
সন্ধান = সম্যক ধারক অন যাহাতে।
আধান = আশ্রয়দাতা ধারক অন যাহাতে।
সমাধান = সম **আধান** অন যাহাতে।
তিরোধান = **তিরস্** ধারক অন যাহাতে।
নিধান = নির্গত বা নিহিত ধারক অন যাহাতে।
সন্নিধান = সম **নিধান** যাহাতে। ... ... ইত্যাদি।

উপরোক্ত শব্দ ও তাদের প্রদত্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থগুলির সঙ্গে ওই শব্দগুলির প্রতীকী অর্থগুলি মেলালে দেখা যাবে, তারা প্রত্যেকেই উপরোক্ত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ থেকেই তাদের সুনির্দিষ্ট রূপে পৌঁছে স্থির রূপ নিতে পেরেছে। দু-একটি উদাহরণ দিয়ে যাওয়া যাক। **ধান** তো স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ধারণেচ্ছার আধার। **বিধান** কিন্তু তা নয়। সে হল বিশেষ বা বিপরীত ধারণেচ্ছার আধার। মানুষের সমাজ যে

সকল কৃত্রিম আইন বানায়, সেগুলি সবই **বিধান**। **ধান**-এ **ধন** পাওয়া যায়, **ধন**কে ধারণ করা যায়; তবে **ধান** হল স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **ধন**-এর আধার। **বিধানেও ধন** পাওয়া যায়, কিন্তু সে হল বিশেষভাবে বা বিপরীত রীতিতে পাওয়া **ধন**-এর আধার; হতে পারে তা কৃত্রিম **ধন**-এর আধার। কিংবা **প্রধান**-এর কথাই ধরুন। তিনি একটি ব্যবস্থার **প্রধান** (প্রধান শিক্ষককেই ধরুন)। তিনি যে কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ব্যবস্থাটিকেই প্রকৃষ্ট রূপে ধারণ করেন তাই নয়, সেই ব্যবস্থার যে যে অঙ্গগুলি আপনার ছাত্রত্বকে ধারণ-পোষণ করে, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ রূপে সেই ধারণ-পোষণ ক্রিয়াও তিনি অন্যদের তুলনায় প্রকৃষ্ট রূপে করে থাকেন। সেকারণেই তিনি **প্রধান**।

ধান্য : **১.** ✓ধা + য (যৎ)। (ব.শ.)। **২.** ***ধান** থাকে যাহাতে।* / পোষণে সাধু (যে)। (ব.শ.)। **৩.** ব্রীহি, সতুষ তণ্ডুল, ধান, ধন্যাক, রতির চতুর্থাংশ। (ব.শ.)। **৪.** paddy (rice) অর্থে প্রচলিত। **৫.** **ধান** থাকে **ধান্য**তে। তার মানে **ধান্য** হল সতুষ তণ্ডুল। সেই তুষ ছাড়িয়ে দিলে যেটি থাকে, তাকে অতএব **ধান** বলা চলে। বাস্তবে কিন্তু তা বলা হয় না, বলা হয় **চাল**। খোসাসুদ্ধ চালকেই **ধান** বলা হয়ে থাকে। নিয়মানুসারে তার স্বভাবেই 'ধারণেচ্ছা অন' থাকার কথা। অমরকোষের উদ্ধৃতি দিয়ে ব.শ. জানাচ্ছেন, আমাদেরকে পোষণ (বা ধারণ) করার ব্যাপারে **ধানই** সাধু। তার মানে, আমাদেরকে ধারণ-পোষণের আধার হল **ধান**, সেই **ধান** থাকে খোসাসুদ্ধ একপ্রকার শস্যে। তার সেই গুণের জন্য, অর্থাৎ, **ধান** রূপে ক্রিয়া করার জন্য তাকে **ধান্য** বলে।

ধাপ (ধাপ্‌পা) : **২.** ***ধাপ** = **ধা** (ধারণের আধার) পালিত হয় যাহাতে। **ধাপ্‌পা** = **ধা**-পালন পালিত যাহাতে, তাহার আধার।* **৩.** **ধাপ** = সিঁড়ির পইঠা (step), একবার পদক্ষেপপরিমিত স্থান। **ধাপ্‌পা** = ছলনার কথা, মিথ্যা ভয় দেখানো (bluff)। (ব.শ.)। **৪.** step অর্থে **ধাপ** এবং bluff অর্থে **ধাপ্‌পা** প্রচলিত। **৫.** গমনশীল মানবশরীরের 'ধারণের আধার' হল তার পদক্ষেপ। পদক্ষেপের উপরই গতিশীল মানুষের শরীর নির্ভর করে। সেই পদক্ষেপ পালিত হয় যাতে, তাকে বলে **ধাপ**।

তবে কিনা মানুষের শরীর যত না গতিশীল, তার চেয়ে অনেক বেশি গতিশীল হল তার মন। শরীরের পায়ের মতো তার মনেরও পা হয়, যার উপর মন নির্ভর করে। ছেলের পরীক্ষার ফর্ম-পূরণের শেষ তারিখ তেসরা মার্চ। আপনি বেতন পাবেন দু-তারিখে এবং তাই দিয়ে ছেলের ফর্ম পূরণ করে জমা দেবেন। কিন্তু দু-তারিখে বেতন পেলেন না। কী হবে এখন? আপনার মন নির্ভর করেছিল আপনার বেতনদাতার কথার উপরে, সেই কথা সত্য নয়। আপনার মানসিক পদক্ষেপকে বা '**ধা**-কে পালন' করব করব বলে আপনাকে সাহস দিয়েছিল দু-তারিখের বেতন; কিন্তু করেনি। এই বেতন হল **ধাপ্**-পালক বা **ধাপ্‌পা**। এ আপনাকে **ধাপ** বাড়িয়ে দিয়েছিল আপনার মনের পা ফেলার জন্য, যখন পা ফেললেন তখন **ধাপ**টি নেই; আপনি পড়ে গেলেন। এই হল **ধাপ্‌পা**। যদি বেতনটা কথামতো দু-তারিখেই পেয়ে যেতেন তাহলে **ধাপ্‌পা** হয়ে যেত **ধাপ**। তার উপর নির্ভর করে আপনি এগিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তা হয়নি। তাই **ধাপ্‌পা** হয়ে গেল ঠকান।

ধাম, ধামা (কাশীধাম, পুরীধাম, বৃন্দাবনধাম ... ঋতধামা ... ইত্যাদি) : **১.** ✓ধা + মন্ (মনিন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***ধামা** = **ধা** (ধারণের আধার) সীমায়িত যাহাতে বা যেখানে। **ধামা** = **ধাম**-এর আধার যে।* / **ধাম** = দ্রব্যজাত-কে ধারণ করে যে; পরকৃত অপমানাদির অসহনত্ব (যাহাতে); যে স্থানে দেবতা অধিষ্ঠিত থাকেন। (ব.শ.)। **৩.** **ধাম** = গৃহ, স্থান, জ্যোতিঃ, রশ্মি, তেজঃ, প্রতাপ, আশ্রয়, বিষ্ণু, দেহ, জন্ম, সৈন্য, তীর্থস্থান, নিবাসস্থান, সমীপে। **ধামা** = আশ্রয়, আধার, বেত্রনির্মিত আধারবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** মধ্যযুগীয় বা বৈষ্ণবধর্ম সংশ্লিষ্ট বয়ানে **ধাম** শব্দটির বহুল প্রচলন থাকলেও আধুনিক বাংলায় শব্দটির প্রচলন নেই। আর, **ধামা** 'বেত্রনির্মিত পাত্র' অর্থে গ্রামবাংলায় আজও প্রচলিত। **৫.** *দ্র.* **ঋতধামা**। লেখাপড়া জানা বাংলাভাষীদের অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথের '... আজি আনন্দ**ধামে**' গানটি কিংবা 'কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ী ... বেতের বোনা **ধামা** কুলো' কবিতাটি জানেন। এই যে **ধাম** ও **ধামা**, এদের প্রতীকী অর্থ সবাই কমবেশি জানেন — **ধাম** হল গৃহ, যেখানে মানুষ থাকে; আর **ধামা** হল বেত দিয়ে বানানো একপ্রকার ঝুড়ি, যাতে ধান চাল বা অন্যান্য মালপত্র তুলে রাখা হয়। বাংলার সংস্কৃতিতে পরিচয় না থাকলেও নবাগতের **নামধাম** জানতে চাওয়ায় কোনো অপরাধ নেই। এই **ধাম** হল সেই স্থান, যেখানে নবাগত ব্যক্তি ছিলেন বা থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, মানুষ যেখানে থাকে তাকে **ধাম** এবং বেতের ঝুড়িকে **ধামা** বলে কেন?

ধাম শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল, 'ধারণের আধার সীমায়িত যেখানে'। আনন্দ**ধাম** বললে বুঝতে হবে, আনন্দ গিয়ে যে স্থানে, গৃহে, লোকালয়ে, অর্থাৎ যে-কেন্দ্রে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয় (ঠিক যেরকম কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ক্রমে শুকোতে থাকা ধানক্ষেতের মাছ ক্ষেতের কোণের চৌবাচ্চায় গিয়ে জমা হয়, সেইরকম); সেই স্থানকে আনন্দ**ধাম** বলে। আজকাল আমরা একই ধারণাকে বোঝানোর জন্য ইংরেজি centre বা (প্রতীকী অর্থে) 'কেন্দ্র' শব্দটি ব্যবহার করি। তবে এই centre বা 'কেন্দ্র' শব্দ প্রতীকী বলেই, তার স্বভাববশত সে স্থির, জড়। তার ভিতরে কোনো ক্রিয়ার কথা বলা নেই। **ধাম**-এর ভিতরে ক্রিয়ার কথাটি বলা আছে। **ধা** বা ধারণের আধার সেখানে সীমায়িত হয়, চারিদিক থেকে এসে কেন্দ্রীভূত হয়; সঞ্চিত হয়, জমা হয়, থাকে, ঘুমোয়। তাই স্থানটিকে **ধাম** বলে। গৃহকে **বসুধাম**, **মিত্রধাম** ইত্যাদি বলার চল হয়ে যায় এই কারণে যে, বসুরা, মিত্ররা সারা দিনের কর্মশেষে সেই সেই **ধামে** গিয়ে জমা হয়, খায়-দায়-শোয়। সেকারণেই সেগুলি **বসুধাম, মিত্রধাম** ইত্যাদি।

বাংলার স্বর্ণযুগে (মধ্যযুগে) ব্রজবিহারীগণ যেখানে গিয়ে জমা হতেন তার নাম ছিল **ব্রজধাম**। একই রকমভাবে **কাশ**কারীগণ গিয়ে জমা হতেন **কাশীধামে**। শঙ্করাচার্য্য ভারতক্ষেত্রের চার কোণে চারটি **ধাম** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন — দক্ষিণে তামিলনাড়ুতে রামেশ্বর**ধাম**, পূর্বে উড়িষ্যায় পুরী**ধাম**, পশ্চিমে গুজরাটে দ্বারকা**ধাম**, ও উত্তরে গাড়ওয়াল অঞ্চলে বদ্রিনাথ**ধাম**। ব.শ. মতে 'ভারতে ব্রাহ্মণের

আধিপত্য পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠাকারী' এই শঙ্করাচার্য্যের অনুগামীরা এই চার **ধামে** কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকেন। ...

গ্রামবাংলায় ১৯৬০-৬৫ সালেও বড় কৃষকদের গৃহে বেতের **ধামা** ব্যবহারের চল ছিল। এই **ধামার** ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হত ধান **আয়** করার সময়। ছড়ানো ধান তোলা হত একের পর এক **ধামায়**, তারপর সেই **ধামা**-ভরা ধান নিয়ে গিয়ে ঢেলে দেওয়া হত **হামার**-এ বা **মরাই**-এ। মোট কথা, **ধামার** কাজ ছিল **ধা**-কে নিজের আয়ত্তের ভিতরে সীমায়িত বা কেন্দ্রীভূত করা। সেকারণেই তাকে **ধামা** বলা হত। তবে তার আরও একপ্রকার ব্যবহার প্রায়শই হত। সেকালে আলু-কলা-মূলা-আম-কাঁঠাল এই **ধামায়** জমা করে, মুনিষের কাঁধে চাপিয়ে তা আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার রীতি ছিল। সামনে চলতেন গৃহস্বামী, আর পেছনে পেছনে চলত উপরোক্ত ফলমূলের **ধামা** ধরে-রাখা তাঁর **ধামা**-ধরা ভৃত্য। সম্ভবত ইংরেজ আমলে এই **ধামা-ধরা** শব্দটি আরও ব্যঞ্জনা-অর্থে পুষ্ট হয়ে **ধামাধরা** শব্দের জন্ম দেয়, যা ক্ষমতাবানকে খোশামোদ করতে যাওয়া প্রভুর অনুগামী সাগরেদকে বোঝাত। পরে পরে **ধামাধরা** শব্দটির মানে দাঁড়িয়ে যায় ক্ষুদ্রস্বার্থান্বেষীর নীচ এবং অন্ধ অনুগামী।

নিধি (প্রতিনিধি, গুণনিধি, সুরনিধি) : ১. নি + ✓ধা + ই (কি) - অধিকরণে। (ব.শ.)। **২.** ***নিধি*** *= নির্গত বা নিহিত ধারণ গতিশীল যাহাতে।* ***প্রতিনিধি*** *=* ***নিধির*** / **প্রতিনিধি** = যে সদৃশভাবে নিহিত। (ব.শ.)। **৩. নিধি** = আধার, পাত্র, কোষ, ধনাগার, কুবেরের অষ্ট বা নবরত্ন (অষ্টনিধি, নবনিধি), বিত্ত, ধন, ভূমিখাত অস্বামিক ধন, নিক্ষেপদ্রব্য, সমুদ্র, রত্নসদৃশ দ্রব্য, বিষ্ণু। **প্রতিনিধি** = প্রতিকৃতি, প্রতিরূপ, সদৃশ, স্বরূপ। **সুরনিধি** = সুরগণশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্র। (ব.শ.)। **৪.** representative অর্থে **প্রতিনিধি** প্রচলিত, বাকি দুটি শব্দ অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **অষ্টনিধি**। উপরে **ধান** শব্দে আমরা **অবধান** শব্দটির অর্থ জেনেছি। 'আপনি অবধান করুন' কথাটির মানে হল, আপনি মনের হাত পেতে (বিষয়টি) ধারণ করুন; অর্থাৎ, জানুন। ধারণ করে আত্মস্থ করে নিলে আপনি 'অবহিত' হবেন। (ধ কেমন করে এবং কেন হ-তে পরিণত হয়, সেকথা আমরা **অভিধার** ভুক্তিতে **অভিহিত** অর্থে ব্যাখ্যা করেছি, নিম্নে **হিত** শব্দের ব্যাখ্যাতেও তা পাওয়া যাবে।) তেমনি কোনো কিছু, ধরা যাক কিছু টাকা, কারও পকেটে 'নিধান' করে তার মানিব্যাগে ঢুকিয়ে 'স্থিত' করে দিলে টাকাটা 'নিহিত' হয়ে যায়। কিন্তু স্থিত না করে শুধুমাত্র 'নিধান' করলে এবং যার এখতিয়ারে নিধান করলেন, সে যদি তাকে যেমন-কে-তেমন ধরে রাখে, তবে সেই ব্যক্তিকে বলে **নিধি**। একালের প্রতীকী ভাষায় 'কুবেরের **নিধি**' কথাটির সহজ সরল অর্থ হল 'ব্যাঙ্কের ম্যানেজার'। সেকালের বাংলা-ভাষাজ্ঞানীগণ **নিধি** শব্দটির যথার্থ ব্যবহার জানতেন এবং ব্যবহার করতেন। '... কানু হেন **গুণনিধি** কারে দিয়া যাব।' এই বাংলা গানটি প্রায় সবাই জানেন। এই **গুণনিধি** হলেন সেই সত্তা, 'যার ভিতরে জগতের সকল **গুণ** নিহিত হয়ে ধারিত হয়ে গতিশীল রয়েছে'। অ্যাকাডেমিতে **নিধি** শব্দটির ব্যবহার নেই, যদিও হিন্দিভাষীরা এখনও শব্দটির যথাযথ ব্যবহার করে থাকেন। ইংরেজি Provident Fund অর্থে ভবিষ্য**নিধি** শব্দটি এখনও প্রচলিত রয়েছে।

ব্যাধি : দ্র. আধি।

শতধা (দ্বিধা, বহুধা, বিবিধ, সুবিধা) : ২. শতধা *= শত স্থানে ধারিত যে।* ***দ্বিধা*** *=* ***দ্বি*** *স্থানে ধারিত যে।* ***বহুধা*** *= বহু স্থানে ধারিত যে।* ***বিবিধ*** *= যে* ***বিবিধা*** *[বিশেষ বা বিপরীত স্থানে* ***বিধা*** *(বিশেষ বা বিপরীত স্থানে ধারিত)] হয়ে রয়েছে।* ***সুবিধা*** *= সু-ভাবে* ***বিধা*** *(বিশেষ বা বিপরীত স্থানে ধারিত) যে।* **৫.** একটি বিষয় বা বস্তুকে একশত স্থানে ধারণ করবার একমাত্র উপায় হল, বিষয় বা বস্তুটিকে একশত ভাগে ভাগ করে একশতটি খণ্ডে পরিণত করা এবং তারপর তাদের প্রতিটি খণ্ডকে ধারণ করা। আর সেজন্যেই **শতধা** কথাটির মানে দাঁড়িয়ে যায় 'শত ভাগে বিভক্ত'। কিন্তু **শতধা** শব্দটির ভিতরে 'শত ভাগে বিভক্ত' কথাটি নেই; রয়েছে 'শত স্থানে ধরে রাখা'র কথা। একইভাবে **দ্বিধা** কথাটির মানে হয়ে যায় 'দুই ভাগে বিভক্ত', যদিও শব্দটির ভিতরে রয়েছে 'দুই স্থানে ধরে রাখা'র কথা। **বহুধা, বিবিধ, সুবিধা** শব্দগুলি সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

হিত (অভিহিত, অহিত, আহিত, নিহিত, বিহিত, সংহিত, সমাহিত, সহিত, সুহিত) : ১. ✓ধা + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***হিত*** *= হওয়ন গতিশীলরূপে তারিত যাহাতে।* ***অভিহিত*** *= দ্র.* ***অভিধা****।* ***অহিত*** *= নেই* ***হিত*** *যাহাতে।* ***আহিত*** *=* ***হিত****-এর আশ্রয় যাহাতে।* ***নিহিত*** *= দ্র.* ***নিধি****।* ***বিহিত*** *= বিশেষভাবে কিংবা বিপরীতভাবে* ***হিত*** *যাহাতে।* ***সংহিত*** *= সম্যকভাবে* ***হিত*** *যাহাতে।* ***সমাহিত*** *= সম* ***আহিত*** *হইয়াছে যে।* ***সহিত*** *=* ***হিত****-এর সহ যে।* ***সুহিত*** *= সু* ***হিত*** *যাহাতে।* **৩. হিত** = নিহিত, স্থাপিত, উপকর্ত্তা, পথ্য, উপযোগী, অনুকূল, আরোগ্যকর, সমর্থ, ধৃত, আপ্তজন, শুভ, ইষ্টসাধন, ধর্ম্মতত্ত্ব, হিতকর জীবের ব্রহ্মভাব। **অভিহিত** = দ্র. **অভিধা**। **অহিত** = অশুভ ... ইত্যাদি। **আহিত** = স্থাপিত, আরোপিত ... ইত্যাদি। **নিহিত** = দ্র. **নিধি**। **বিহিত** = কৃত, ব্যবস্থাপিত ... ইত্যাদি। **সংহিত** = সংযুক্ত, সংশ্লিষ্ট ... ইত্যাদি। **সমাহিত** = অভিনিবেশিত, সমাধিস্থ ... ইত্যাদি। **সহিত** = সমন্বিত, মিলিত ... ইত্যাদি। **সুহিত** = অতিহিতকর, বিহিত ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **৪.** beneficial অর্থে **হিত**, called অর্থে **অভিহিত**, not beneficial অর্থে **অহিত**, kept inside অর্থে **নিহিত**, solved অর্থে **বিহিত**, along-with অর্থে **সহিত** শব্দ প্রচলিত; বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** এই শব্দগুলির বিশেষত্ব এই যে, এদের স্বভাবের মধ্যে ক্রিয়াভিত্তিক গুণ যথেষ্ট পরিমাণে থেকে যাওয়ায়, আধুনিক অ্যাকাডেমিক বাংলাভাষায় এদের প্রয়োগ ক্রমশ কমছে এবং যে কয়টির ব্যবহার এখনও চলছে তার অর্থকে সংকুচিত করে ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ করে ফেলা হয়েছে। অধিকাংশ বাংলা শব্দের ক্ষেত্রেই এই কাণ্ড কমবেশি করা হয়েছে, তাই এ প্রসঙ্গে এখন আমরা যাব না; অন্যত্র তা বিস্তারিত ভাবে আলোচিতও হয়েছে। আমাদের জানতে হবে **হিত** শব্দের অর্থ শুভ, ভাল, লাভজনক ইত্যাদি অর্থে বোঝা হয় কেন এবং **ধা** ক্রিয়া তারিত হলে **হি** হয় কেন।

আমরা জানি, **ধান** থেকে **ধাত** এবং তার থেকে **হিত** শব্দটি তৈরি হয়েছে; যেমন **অবধান** > **অবধাত** > **অবহিত**। এভাবেই

নিধান > **নিধাত** > **নিহিত, আধান** >> **আহিত, অভিধান** >> **অভিহিত, বিধান** >> **বিহিত** ... ইত্যাদি শব্দগুলি তৈরি হয়েছে। অর্ধ-হ্ যুক্ত বর্ণের বেলায় এরকম হতে দেখা যায় আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন — **ঘ, ভ**। যেমন **আঘাত** > **আহত, ব্যাঘাত** > **ব্যাহত** ... কিংবা **আভীর** > **আহীর** ... ইত্যাদি। এই প্রশ্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে **হ** বর্ণের অর্থে। আপাতত এটুকু বলে রাখা যেতে পারে যে, আঘাত যে দেয়, তার বিপরীত পক্ষ আহত হয়। অবধানের বেলায় **দান** যে দেয়, সে-পক্ষ অবহিত হয় না; **দান** যেখানে গিয়ে থামে, সেই পক্ষ অবধান করে এবং অবহিত হয়। (আমরা জানি **ঘ্** = গ্ + হ্, **ধ্** = দ্ + হ্।) উভয় ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, গমন (গ) ও দান (দ) ক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়ে তার রেশ স্বরূপ হওয়ন (হ) ক্রিয়াটি সক্রিয় রয়েছে। সেই কারণে ঘ, ধ, ভ স্থানে হ-এর স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তার মানে, **ঘা ধা** প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্রিয়া একটি হলেও তার দুটি দিক রয়েছে। শুরুর দিকটিতে ক্রিয়ার গতি রূপটির প্রাধান্য, শেষের দিকটিতে তার স্থির রূপটির প্রাধান্য। **আঘাত**-এর বেলায় **ঘা**-দেওয়ার গতিরূপের প্রাধান্য, **আহত**-এর বেলায় **ঘা**-খাওয়ার স্থিররূপের প্রাধান্য। একইভাবে **অবধান**-এর বেলায় **ধা**-করার গতিরূপের প্রাধান্য, **অবহিত**-এর বেলায় **ধা**-হওয়ার স্থিররূপের প্রাধান্য। ...

ধাব্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনুধাবন, ধাঁ, ধাঁউধাঁউ, ধাঁওধাঁও, ধাঁধাঁ, ধাঁঙধাঁঙ, ধাই, ধাউড়, ধাউড়ি, ধাউড়িয়া, ধাউনী, ধাওয়া, ধাওয়াধাই, ধাওয়াধাওি, ধাঙধাঙ, ধাড়া, ধাড়ী, ধাব, ধাবক, ধাবকা, ধাবকি (ধাবন করিব, এই ধমক), ধাবন, ধাবমান, ধাবাড়, ধাবাধাবি, ধাবিত, ধায়াধাই, ধোকড়, ধৌত, ধৌতি, পশ্চাদ্ধাবন।

ধাব্ = **ধা** (ধারণেচ্ছা বা ধারণের আগ্রহ) বহন। **ধাব** = ধারণের আগ্রহ বহন করে যে।

ধাব (ধাওয়া, ধাবক, ধাবকা, ধাবকি, ধাবন) : **১.** ✓ধাব্ + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***ধাব** = ধারণেচ্ছা বহন করে যে। **ধাবন** = **ধাব** অন থাকে যাহাতে। **ধাওয়া** = ধারণের উদ্দেশ্যে যাওয়া থাকে যাহাতে। **ধাবক** = **ধাবন** করে যে। **ধাবকা** = **ধাবক**-এর আধার যে। **ধাবকি** = **ধাবক** গতিশীল যাহাতে।* **৩. ধাব** = বেগ, গতি, শীঘ্রগমন, শুদ্ধিভাব। **ধাবক** = ধাবক, **মার্জ্জক**, শীঘ্রগামী, নির্ণেজক, শোধক, বস্ত্রাদি প্রক্ষালক, রজক, নাগানন্দ-প্রভৃতির কবি, দূত। **ধাবকা** = প্রভাব, চাপ। **ধাবকি** = ভয় দেখান। **ধাবন** = শীঘ্রগমন, দৌড়ান, মার্জ্জন, প্রক্ষালন, শোধন, ধোওয়া। (ব.শ.)। **ধাওয়া** = কাউকে ধরার জন্য তার পেছনে ছোটা। **৪. ধাব** শব্দটি অপ্রচলিত, বাকি শব্দগুলি যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** আগেই **ধ** বর্ণের অর্থে আমরা দেখেছি, সে যেন একটি হাঁ-মুখ, ধারণ করার জন্য (যেনবা খাওয়ার জন্য) আগ্রহী হয়ে অপেক্ষা করছে। **ধাব** হল কাউকে ধারণ করার ইচ্ছার বাহক। সেটি বোঝা যায়, সে যখন কারও পেছনে দৌড়োয়। সেই কারণে **ধাব** কথাটির মানে কারও পেছনে দৌড়োন। শব্দের নিজস্ব নিয়মে এরকম করতে থাকাকে **ধাবন** অর্থাৎ **ধাব**-অন করা কিংবা **ধাবাও** বলা যায়। সেই **ধাবাই** পরিণত হয়েছে **ধাওয়াতে**। যে ক্রিয়ায় 'ধাবন করিব' 'ধাবন করিব' বলে তেড়ে গিয়ে ধরবার ভয় দেখান থাকে, তাকে বলে **ধাবকা** বা **ধাবকি**। কিন্তু শব্দটির অর্থে 'নির্ণেজক', 'বস্ত্রাদি প্রক্ষালক', 'রজক' কিংবা 'ধোওয়া' ... ইত্যাদি আছে কীভাবে, তা এখনও বোঝা যায়নি।

ধু (ধূ) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অধুনা, অধুনাতন, অবধূত, অবিধবা, অবৈধব্য, আইঅত, আইও, আইওত, আই-মা, আইয়াতি, আইশাশ (আইশাশুড়ি), আইয়ো, আইয়্য, আইয়্যত, আইহ, আধুত, আধুনিক, আয়ত, আয়তি, আয়তী, আয়ত্রী, এও, এয়ো, এয়োজাত, এয়োত, এয়োরাণী, এয়োস্ত্রী, দুন্দুমার, ধওলা, ধন্দ (ধাঁধা, ধুম-দ), ধপ, ধপধপ, ধপধপে, ধপাৎ, ধপাস, ধব, ধবধব, ধবধবে, ধবল, ধবলা, ধবলিত, ধবলিম, ধবলী, ধবলোৎপল, ধ(ধু) বিত্র, ধল, ধলা, ধস, ধসকা, ধসধস, ধস্তাধস্তি, ধাঁদা, ধাঁধা, ধাঁদসে, ধাঁধাঁগুড়গুড় (ঢাকঢাক-গুড়গুড়), ধাধস, ধাধা, ধান্দা, ধান্ধা, ধাবড়া, ধু, ধুঁক, ধুঁএা, ধুঁত(থ)রা, ধুঁদুল, ধুঁধুরি, ধুঁয়া, ধুক, ধুকধুক, ধুকধুকি, ধুকনি, ধুকপুক, ধুকপুকুনি, ধুকুধুকু, ধুক্ষ, ধুক্ষিত, ধুঙা, ধুচ(চু)নি, ধুচয়, ধুএা, ধুত, ধুতি, ধুতুরা, ধুধু, ধুধুরী, ধুন, ধুনধুনধুন, ধু(ধু)না, ধু(ধু)নাচি, ধুনুচি, ধুনারি(রী), ধুনি(নী), ধু(ধু)নী, ধুন্ধু, ধুন্ধুকার, ধুন্ধুমার, ধুপ, ধুপি, ধুবি(বী), ধুপুস, ধুবকা, ধুবিত্র, ধু(ধু)ম, ধুমড়ী, ধুমধড়াক্কা, ধুমধাম, ধুমধুম, ধুমধুমি, ধুমসা, ধুমসো, ধুমুল, ধুয়া, ধুরন্ধর, ধুরপদ, ধুরা, ধুরীণ, ধুরীয়, ধুর্ব্ব, ধুর্য্য, ধুস্তর, ধুস্তুর, ধু, ধুঃ, ধূত, ধূন, ধূনক, ধূনী, ধূপ, ধূপক, ধূপছায়া, ধূপদান, ধূপন, ধূপপাত্র, ধূপবাস, ধূপমুদ্রা, ধূপাগুরু, ধূপাঙ্গ, ধূপাচি, ধূপায়িত, ধূপিত, ধূম, ধূমকেতু, ধূমক্ষেত্র, ধূমপথ, ধূমল, ধূমা, ধূমাবতী, ধূমাভ, ধূমায়, ধূমায়ন, ধূমিত, ধূমোদ্গার, ধূম্যা, ধূম্র, ধূম্রবর্ণ(া), ধূম্রল, ধূম্রলোচন, ধূম্রা, ধূম্রাক্ষ, ধূর্ধর, ধূর্বহ, ধূল, ধূল(লো)ট ধূলি, ধূলিকা, ধূলিকেদার, ধূলিধূসর, ধূলিন, ধূলিপুষ্পিকা, ধূলিসাৎ, ধূলী, ধূসর, ধসরি(রী), ধূসরিত, ধোঁক, ধোঁকা, ধোঁকার-টাটি, ধোঁয়া (ধুমা), ধোকা(খা), ধোঙা, ধোনা, ধোপ (ধু-অপ, ধপধপে, ধবধবে), ধোপদুরস্ত, ধোপা, ধোবা, ধোয়া, ধোয়াট, ধোয়ানী, ধোলাই, ধৌত, ধৌতি, ধৌম্য, ধৌম্র, ধ্যাবড়া, ধ্রুপদ (ধুরপদ), বিধবা, বিধৌত, সধবা।

ধু (ধূ) : **ধু** = ধারী নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে। **ধূ** = **ধু**-এর আধার যে।

অধুনা, অধুনাতন, আধুনিক : **১. অধুনা** = ইদম্ + ধুনা। **অধুনাতন** = অধুনা + তন। **আধুনিক** = অধুনা + ইক। (ব.শ.)। **২.** ***অধুনা** = অধ উন যাহাতে। **অধুনাতন** = **অধুনায়** স্থিত যে তন (দ্র. **তন, তনয়**)। **আধুনিক** = **অধুনা**-জাতকে গতিশীল করে যে।* **৩. অধুনা** = এই সময়ে, ইদানীম্, সম্প্রতি, এখন। **অধুনাতন** = অধুনাভব, ইদানীন্তন, এখনকার। **আধুনিক** = অধুনাভব, ইদানীন্তন, অধুনাতন, সাম্প্রতিক, অর্ব্বাচীন, নব্য। (ব.শ.)। **৪. অধুনাতন** এখন অপ্রচলিত। বাকি দুটি শব্দ তাদের নিজস্ব অর্থে এখন ব্যবহৃত হয় না। ইংরেজি

এই শব্দার্থকোষ কীভাবে পড়তে হয়, তা জানার জন্য 'ভূ-১' পৃষ্ঠা দেখুন। সংক্ষিপ্ত আকারে তা ১ পৃষ্ঠাতেও পাওয়া যাবে।

nowadays, modern শব্দের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৫. ব.শ. **অধুনা** শব্দের অর্থ দেওয়ার সময় পাণিনির উল্লেখ করে জানিয়েছেন, 'ইদম ধুনা' থেকেই **অধুনা** শব্দটি প্রস্তুত হয়েছে। এর অর্থ হল, 'এইমাত্র যাকে **ধুন** করা হয়েছে'। **অতীত** শব্দে আমরা আগেই দেখেছি, অতীত আর ভবিষ্যতের মাঝে একটি দরজা আছে, সেই দরজা হল 'বর্ত্তমান'। ভবিষ্যৎ সেই বর্ত্তমানের দরজা পেরিয়ে অতীতে চলে যায়। কিন্তু 'ইদম ধুনা' শব্দ দুটি আমাদের জানাচ্ছে, যে, ঐ দরজাটি নিষ্ক্রিয় দরজা মাত্র নয়। সেখানে ধুনন ক্রিয়া (দ্র. **ধুন**) চলছে। এই ক্রিয়া ভবিষ্যৎকে একটু একটু করে গ্রহণ করছে, তাকে (তুলো ধুনার মতো) ধুনছে আর অতীতের দিকে ক্ষেপন করে দিচ্ছে। এইমাত্র যাকে ক্ষেপন করা হল, সেই হল **অধুনা**।

আরেক ভাবেও শব্দটিকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। **অধ** শব্দের অর্থে আগেই আমরা জেনেছি যে, সিঁড়ির যে ধাপে অস্তিত্ব ধারিত হয়ে আছে, সেটিই **অধ**। কার্যত, একালে আমরা যাকে 'বিকাশ' বলি, তার মধ্যে যেনবা টর্চের আলোর মতো ক্রমবর্দ্ধমানতা রয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন শব্দশাস্ত্রীদের সেরকম ধারণা ছিল না। তাঁরা মনে করতেন, সবকিছু যেনবা **উর্ধ্বলোক** থেকে ক্রমশ অধঃপতিত হয়ে হয়ে নীচে নামছে। সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের সেরকম সুস্পষ্ট বয়ান রয়েছে। কালের বিকাশকেও তাঁরা সেভাবেই দেখতেন বলে মনে হয়। সেরকম ধারণা থাকার কারণেই তাঁরা বর্তমানকে দেখতেন একটি **অব** বা **অধ** রূপ হিসেবে। তার মানে এই মুহূর্তে যেখানে আছি, ঠিক তার একধাপ আগের রূপটিই সেই রূপ, যেখানে **অধ** উন হয়ে রয়েছে অর্থাৎ **অধুনা**। তার পরেই বর্তমান মুহূর্তটি সক্রিয়। সেই কারণে সম্প্রতি কাল বা **অধুনা** মানেই হল, এই মুহূর্তে যেখানে আছি, তার ঠিক আগের সময়কাল। সেই সময়কার যে **তন** সেটিই **অধুনাতন**। এভাবেই **নূতন** ও **পুরাতন** প্রভৃতি শব্দ তৈরি হয়েছে। দ্র. **তন**, **তনয়**। এই **অধুনা** শব্দের সঙ্গে **ইক** জুড়ে হয়েছে **আধুনিক**। দ্র. চ।

অবধূত (অবধূতী) : ১. অব + ✓ধূ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **অবধূত** = *যিনি (আপন অভ্যন্তরের)* **অবকে ধুত** *(ক্ষেপন, ত্যাগ) করিয়াছেন, কিংবা যাহাকে (সমাজ বা পরিবার) অবক্ষিপ্ত করিয়াছে।* **অবধূতী** = **অবধূত**-*এর আধার যে প্রকৃতিশক্তি।* / **অবধূত** = যে ব্যক্তিকে অবজ্ঞাপূর্বক লোকেরা পরিত্যাগ করিয়াছে। (ব.শ.)। ৩. কম্পিত, বিক্ষিপ্ত, আহত, নিবর্ত্তিত, অবজ্ঞাত, তিরস্কৃত, ত্যক্ত, ভ্রামিত, অভিভূত, অসংস্কৃতদেহ, অবধূতসম্বন্ধী, সংসারাসক্তি-শূন্য, বর্ণাশ্রমধর্ম্মহীন সংসারাসক্তিরহিত সন্ন্যাসী [অবধূত চতুর্বিধ — শৈবাবধূত, ব্রহ্মাবধূত, হংসাবধূত (পরমহংস বা পূর্ণভক্তাবধূত), পরিব্রাট্‌ (অপূর্ণভক্তাবধূত)। বন, অরণ্য, ভারতী, গিরি, পুরী ইঁহাদের উপাধি।], সংসারাসক্তিশূন্য বর্ণাশ্রমচিহ্নহীন গৃহস্থ, সদাশিব। **অবধূতী** = শিবাদেবী। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ভারতসমাজে একটা যুগ এমনও দেখা দিয়েছিল, যখন এমন কিছু কিছু মানুষ ছিলেন যাঁরা উচ্চনীচ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মানতেন না, সব মানুষকে সমান জ্ঞান করতেন, সংসারে আসক্তি ছিল না এবং সেকারণে সমাজ তাঁদের অবজ্ঞা করত, তিরস্কার করত, তাড়িয়ে দিত, আঘাত দিত ... ইত্যাদি। এঁদের বলা হত **অবধূত**। **কিন্তু এঁরা ছিলেন নিজ নিজ মনের মলিনতা ত্যাগকারী, সর্বপ্রকার অবগুণ**-ত্যাগী, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, সদাশিবতুল্য। এঁদের বলা হত **ভক্তমানুষ**, সাধু, সন্ত। তার মানে, এক শ্রেণীর মানুষ এঁদের **অত্যন্ত সম্মানও** দিত। ভারতসমাজের এই মহৎ চরিত্রগুলির **হুবহু প্রতিরূপ** খ্রিস্টান ও ইসলামী সংস্কৃতিতেও দেখতে পাওয়া যায়। **ইংরেজদের চোখে এঁরা ছিলেন** saint, holy man। আরব্য সংস্কৃতিতেও **প্রায় একই** চরিত্রের কিছু মানুষ ছিলেন, যাঁদের বলা হত **'ফকির'** বা **'মিশকিন'**। পরবর্তীকালে এই **অবধূত** গড্ডালিকায় **প্রবাহিত হলে**, তাঁদের মধ্যে অসংস্কৃতদেহে থাকাও একধরনের **ধর্ম্মপালন হয়ে** যায়; যেমন বৈষ্ণবদের মধ্যে, ফকিরদের মধ্যেও **হয়েছিল**। **তবে, অবধূত** কেন 'কম্পিত'কে বোঝায়, তার অর্থ পাওয়া যাবে **ধুতি**-তে।

ধপ (ধপধপ, ধপাৎ, ধপাস, ধব, ধবধব) : ২. **ধপ** = *ধারী পালিত হয় যাহাতে।* **ধপধপ** = **ধপ**-*এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* **ধপাৎ** = **ধপ**-*এর আধার হইতে তারিত; বা* **ধপ** *হইতে আগত।* **ধপাস** = **ধপ**-*এর* **আস** *যাহাতে।* **ধব** = *ধারী বাহিত হয় যাহাতে।* **ধবধব** = **ধব**-*এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে।* ৩. **ধপ** = তুলার বস্তা প্রভৃতি ফাঁপা দ্রব্যের পতনশব্দ। **ধপধপ** = অত্যন্ত শ্বেতবর্ণের ভাব, অতিধবল। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ধোপ**।

ধব (ধবল, বিধবা, সধবা) : ১. ✓ধু + অ (অচ্‌) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ধব** = *ধারীকে বহন করে যে।* **ধবল** = **ধব** *লালিত বা লয়প্রাপ্ত হয় যাহাতে।* **বিধবা** = *বিশেষ বা বিপরীত* **ধব**-*এর আধার যে।* **সধবা** = *সহ* **ধব** *যে আধারশক্তির।* / **ধব** = সন্তাপ দূর করে যে। **সধবা** = সহ ধব যাহার। (ব.শ.)। ৩. **ধব** = কম্পয়িতা, কম্পজনক, ধূর্ত্ত, পতি, স্বামী, অধিপতি, নর, জন, বৃক্ষবিশেষ, ধলা আকুড়া, কম্প, বিধুনন। **ধবল** = শ্বেতবর্ণযুক্ত, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ; শ্বেতবর্ণ, ধববৃক্ষ, বৃষশ্রেষ্ঠ, রাগবিশেষ, হিন্দোলরাগ, শ্বেত কুষ্ঠ। **বিধবা** = ধবহীন, পতিহীন, মৃতভর্তৃকা, পতিরহিতা স্ত্রী। **সধবা** = বিদ্যমানধবা, সভর্তৃকা, পতিবত্নী। ৪. **ধব** ও **ধবল** গ্রামবাংলায় প্রচলিত, অ্যাকাডেমিতে অপ্রচলিত। widow অর্থে **বিধবা** এবং married woman অর্থে **সধবা** প্রচলিত। ৫. **ধব** শব্দের ক্রিয়াটি হল **ধু** অর্থাৎ ধারী যেখানে নবরূপে উত্তীর্ণ। কী সেই নতুন রূপ? এক তো 'উ'-কারের বেলায় ক্রিয়াটি উল্টে যায়, সেই নিয়মে **ধু** মানেই দাঁড়ায় ধারণ না করে 'ত্যাগ করে যে'; অর্থাৎ, **ধু** মানে এপর্যন্ত যাকে সে ধরে রেখেছিল, এখন সে তাকে ছেড়ে দিচ্ছে। এইরকম **ধ** বা ধারীই হল 'নবরূপে উত্তীর্ণ **ধ**'; অর্থাৎ **ধু**। শরীর থেকে কোনো কিছুকে বের করে দিতে হল শরীর কাঁপে, তাই **ধু** মানে কম্পনও বটে। এই কারণে **ধব** মানে 'কম্পিত' হয়, 'ত্যক্ত'ও হয়। তবে সরাসরি **ধব** শব্দটিকে দেখলে এর আর একরকম অর্থ আমরা বুঝতে পারি। 'পুত্ররূপে জন্মে লোক ভার্য্যার উদরে' — এ হল প্রাচীন পৃথিবীর প্রায় সব জাতির উত্তরাধিকার লব্ধ জ্ঞান। যে কারণে আরব্য সংস্কৃতিতে পুত্রকে স্বামীর সমান সম্মান দিতেন পুত্রের মায়েরা এবং ইংরেজদের দেশেও প্রায়ই পিতার নামই এক বিশেষ

নিয়মে ধারণ করত পুত্র। ... কারণ, পতিকে পুত্ররূপে ধারণ করেন পত্নী। অতএব পত্নীই **ধ** (= ধারী)। সেই **ধ**-কে বিশেষ রূপে বহনের চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হন বা বিবাহ করে বহন করেন তাঁর পতি। অতএব তিনিই **ধব**। তাই পতি, স্বামী বা অধিপতি — এঁরা প্রত্যেকেই **ধব**।

এই **ধব** একই সঙ্গে কম্প, শ্বেতবর্ণ ... ইত্যাদি হয়। কারণ সে বারংবার কম্পিত হয়ে আপন কলুষ ত্যাগ করেছে। এই কম্পনশীল সত্তাটি যদি ভেজা কাপড় হয়, আর সে যদি এভাবে বার বার পতিত ও কম্পিত হতে থাকে, তার ময়লা চলে যাবে; সে নির্ম্মল শুভ্র হয়ে যাবে। তাই **ধব** শব্দটি শ্বেতবর্ণকেও বোঝায়। মনে হয় পরে পরে **ধব** শব্দের এই নির্ম্মল-শুভ্র অর্থটি প্রতীকী রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। **'ধববৃক্ষ'** বা ধলা-আকুড়া (বা ধ্যাওড়া) গাছকে **ধব**-বৃক্ষ বলার কারণ তার কাঠ সাদা রঙের হয়; তাকে কম্পিত করে কেচে সাদা করা হয় না। একই কথা **ধবলা** বা **ধবলী** গাই কিংবা 'শ্বেতকুষ্ঠ' সম্পর্কেও বলা যায়। এদের ধুয়ে সাদা করা হয়নি বা হয় না; এদের রং সাদা বলেই প্রতীকী শব্দের নিয়মে এদের **ধব** বলা হয়। আর তা না হলে মানতে হবে যে, এদের সাদা রঙের পিছনেও এদের আপন আপন কলুষমুক্তির চেষ্টাও কোনোভাবে এদের প্রত্যেকের ভিতরে সক্রিয় রয়েছে। আর সেকথাটি আমাদের প্রকৃতিলগ্ন পূর্বসূরীরা জানতেন, প্রকৃতিবিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছি বলে আমরা তা জানতে পারিনি। ৬. Greek - wittwe, Latin - vidua, German - wituwa, Goth - viduwo, vidowo, French - veuve, Rassian - vdova, Spanish - viuda, Italian - vedova, Anglo-Saxon - vidwe, Welsh - gwedaw, English - widow। মারাঠি - বিদৰা, ফারসি - বেৰা, বেওয়া। (ব.শ.)।

ধুত (ধুতি, ধৌত, ধৌতি, বিধৌত, অঙ্গধৌতি) : ১. ✓ধু + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ধুত** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ধারী তারিত যাহাতে।* **ধুতি** = *ধুত গতিশীল যাহাতে।* **ধৌত** = *যাহাকে সার্বিকভাবে ধুত করা হইয়াছে।* **ধৌতি** = *ধৌত গতিশীল যাহাতে।* **বিধৌত** = *বিশেষ বা বিপরীত ভাবে ধৌত করা হইয়াছে যাহাকে।* ৩. **ধুত** = কম্পিত, ত্যক্ত। **ধুতি** = পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র, শাড়ী, বস্ত্রখণ্ড, উৎকোচভাবে প্রদত্ত ধুতিবস্ত্র, পুরস্কার। **ধৌত** = প্রক্ষালিত, মার্জ্জিত, শোধিত, উজ্জ্বলীকৃত, নির্ম্মল, ধবলীকৃত, শুক্র, রৌপ্য, প্রক্ষালন। **ধৌতি** = হঠযোগের অঙ্গবিশেষ, ধুতি কাপড়। (ব.শ.)। ৪. **ধুত** অপ্রচলিত। **ধুতি** 'পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র' অর্থে প্রচলিত। ৫. **ধু**-এর ব্যাখ্যায় আগেই (দ্র. **ধব**) উল্লিখিত হয়েছে যে, এই ধারী আপন ধৃত কলুষাদি মলিনতাকে আর ধরে রাখে না, ছেড়ে দেয়, ত্যাগ করে, তাদের ধু বলে। এই **ধু** তারিত হলে সত্তাটিকে বলা হয় **ধুত**। কিন্তু এভাবে যাকে **ধুত** করা হয়, সে নিশ্চয় মার্জ্জিত, প্রক্ষালিত, উজ্জ্বলীকৃত, শুক্র, নির্ম্মল, বিশুদ্ধ, ধবলীকৃত হয়ে যায়। তখন তাকে **ধৌত**ও বলা হয়। আর, **ধৌতি** বা **ধুতি** হল সেই বস্ত্র, যার ভিতরে **ধুত** গতিশীল রয়েছে; অর্থাৎ, যে তার বিশুদ্ধতা, নির্ম্মলতা, শুভ্রতা, উজ্জ্বলতা ... ইত্যাদি প্রকাশ করছে। তার মানে **ধুতি** কোনো বোবাবস্ত্র নয়, সে আপন বিশুদ্ধতার কথা বলতে থাকে। যাঁরা 'ধুতিধারী-বাঙালি'কে করুণা করেন, তাঁদের ভেবে দেখার সময় এসেছে, তাঁরা যেসকল বস্ত্র পরিধান করেন, সেগুলি কী কথা প্রকাশ করে, কিংবা আদৌ করে কি না! ...

তবে, **ধৌতি** বলতে যে 'হঠযোগের অঙ্গবিশেষ' বলা হয়, আধুনিক মানুষের পক্ষে সেরকম ক্রিয়ার কথা ভাবাও কঠিন। এই প্রক্রিয়াকে **অঙ্গধৌতি**ও বলা হয়। এর নানা রূপ রয়েছে। একটি হল, দু-তিন লিটার জল পান করে নিয়ে পেটের ভেতরের সবকিছু ধুয়ে, একটু পরেই মুখ দিয়ে সমস্ত জলই কুলকুচো করে বের করে ফেলে দেওয়া। (এই প্রকার হঠযোগ রবি চক্রবর্তীর এক বাল্যবন্ধু করতেন, তিনি এখন দিল্লি-প্রবাসী এবং এখনও জীবিত।) শোনা যায়, কোনো কোনো হঠযোগী পায়ু দিয়েও একই প্রক্রিয়ায় জল গ্রহণ করে ত্যাগ করে দিতে পারেন। আর, বঙ্গদেশ যে কারণে **'নদীবিধৌত'** কথিত হয়, তা হল, তাকে প্রতিবছর বঙ্গদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির বন্যার জলে 'বিশেষভাবে বা বিপরীতভাবে ধুয়ে দেওয়া হয়'।

ধুন, ধুনা, ধুনাইত, ধুনান, ধুনারী : ২. **ধুন** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ধারী অন যাহাতে।* **ধুনা** = *ধুন-এর আধার যে।* **ধুনাইত** = *ধুনা গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* **ধুনান** = *ধুনা অন যাহাতে।* **ধুনারী** = *ধুনা (ক্রিয়াটি) গতিশীলভাবে রহে যাহাতে, তাহার আধার।* / **ধুনারী** = যে তুলা ধুনে। (ব.শ.)। ৩. **ধুন (ধুনা)** = তুলো ধোনা, কম্পিত করা, কাঁপান, নাড়া, ধনুক-যন্ত্রে তুলা ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া বা পিঁজিয়া সাফ করা, ছিন্ন-ভিন্ন করা, বিলোড়িত করা। **ধুনাইত** = কম্পিত। **ধুনান** = কম্পন, ভঙ্গি। **ধুনারী (ধুনুরী)** = যে তুলা ধুনে। (ব.শ.)। ৪. কেবলমাত্র তুলো পিঁজিয়া সাফ করা অর্থে **ধুনা** শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ৫. **ধ** নবরূপে উত্তীর্ণ হলে সে আর ধারণ করে না, যাকে ধারণ করে রেখেছিল তাকে ত্যাগ করে। এই ত্যাগের ক্রিয়ার জন্য ত্যাগকারীর শরীর কম্পিত হয় বলে একে কম্পিত করাও বলে। আওয়াজের বেলায় এ হল রামধুন গানের **ধুন**, যাতে থাকে মৃদু কম্পন, যাতে গানের কথা ও সুর মৃদু মৃদু ত্যক্ত হতে থাকে। তুলোর বেলায় এ হল ধৃত জট-তুলোকে কম্পিত করে করে ত্যাগ করা বা ছেড়ে দেওয়া, যাকে বলে তুলো পেঁজান। মানুষের বেলায় একে চেনা যায় **ধুন্**-ধু-মার বা **ধুন্ধুমার**-এ। মোট কথা, ধৃত বস্তু বা বিষয়কে একটু একটু করে ত্যাগ করাকেই বলে **ধুন** করা বা **ধুনা**।

ধুন্ধু, ধুন্ধুমার : ২. **ধুন্ধু** = *ধুনকে নবরূপে উত্তীর্ণ করে ত্যাগ করে যে।* **ধুন্ধুমার** = *ধুন্ধুকে মারে যে।* ৩. **ধুন্ধু** = মধু রাক্ষসের পুত্র এক রাক্ষস। এই রাক্ষস তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসাদির অবধ্য হয়ে উঠে সকলের ত্রাসের কারণ হয়। উতঙ্ক ঋষির আশ্রমের নিকট মরুপ্রদেশে উজ্জ্বালক নামে এক বালুকাপূর্ণ সমুদ্রের মধ্যে এই দানব বাস করত। বালুকার মধ্যে নিদ্রিত থেকে ধুন্ধু যখন বৎসরান্তে একবার নিঃশ্বাস ফেলত, তখন সূর্য পর্যন্তও ধূলি, অগ্নিশিখা ও ধূমে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়তেন, এবং প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী ভূমিকম্প হত। ধুন্ধু নানাভাবে উতঙ্কের আশ্রমে উপদ্রব করত। তখন উতঙ্ক ঋষির অনুরোধে বিষ্ণু কুবলাশ্ব রাজার দেহে প্রবেশ করেন। কুবলাশ্ব তাঁর একুশ হাজার পুত্র ও সৈন্য নিয়ে

ধুন্ধু বধের জন্য যাত্রা করেন ... এবং ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্যে ধন্ধুকে বধ করে 'ধুন্ধুমার' নামে বিখ্যাত হন। **ধুন্ধুমার** = ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কুবলাশ্ব। এঁর পিতা ছিলেন অযোধ্যার রাজা বৃহদশ্ব। ... মধুকৈটভের পুত্র দানব ধুন্ধুকে বধ করে কুবলাশ্ব 'ধুন্ধুমার' নামে বিখ্যাত হন। ... (পৌ.অ.)। ৪. **ধুন্ধু** অপ্রচলিত। **ধুন্ধুমার** tumultuous অর্থে প্রচলিত এবং তাও কেবলমাত্র **কাণ্ড** শব্দের বিশেষণ রূপে। ৫. যে সামাজিক শক্তি বছরে একবার প্রচুর পরিমাণে ধনসম্পদ ওড়াত, ঘোষণাদি বা চিৎকার এবং হৈ-হুল্লোড় করত, সম্ভবত সেরকম সত্তাকেই **ধুন্ধু** বলা হত। এই সত্তা জনগণের মধ্যে বা সমুদ্রে থাকত না, থাকত 'উজ্জালক' নামক **মরু**প্রদেশে, অর্থাৎ কেল্লায়। একে হত্যা করেছিল যে, তার নাম **ধুন্ধুমার**। এর অপর নাম কুবলাশ্ব। **কুবলয়াপীড়**-এর মতো এ হল কুবল **অশ্ব**।

ধুম, ধুমধড়াক্কা, ধুমধাম : ২. **ধুম** = *ধু (নবরূপে উত্তীর্ণ ধারী) সীমায়িত যাহাতে।* **ধুমধড়াক্কা** = *ধুম-এর ধড়-এর* **অক্কা** *(সর্বোচ্চ) যাহাতে।* **ধুমধাম** = **ধুম** ও **ধাম** *[ধম (= ধারী সীমায়িত যাহাতে) হইতে জাত] /* ৩. **ধুম** = গানে সমবেত উচ্চ সুর, শব্দ, শোরগোল, সমারোহ, মহাকাণ্ড, প্রভাব। **ধুমধড়াক্কা** = সমারোহ, জাঁকজমক, ঠাট-বাট। **ধুমধাম** = কোলাহল, শোরগোল, সমারোহ, ভারী দ্রব্যের পতনশব্দ। (ব.শ.)। ৪. শব্দগুলি কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. আগেই আমরা দেখেছি, **ধু** হল ধৃত বস্তু বা বিষয় ত্যাগ, এবং **ম্** মানেই সীমায়ন। সেদিক থেকে ভাবলে, **ধুম** শব্দটির প্রথম অর্থ ব.শ. যথার্থই দিয়েছেন। গানের সমবেত উচ্চ শব্দকেই **ধুম** বলা যায়, কেননা, সেরূপ ত্যক্ত শব্দের সুরেলা সীমায়নকে **ধুম** বলাই শব্দটির ক্রিয়াসম্মত হয়। মানুষের শোরগোল, সমারোহ ... ইত্যাদি সেই বিচারে **ধুমধাম** হতেই পারে। কিন্তু **ধুমধড়াক্কা** শব্দটি এই সব 'ধৃত বস্তু বা বিষয় নিঃসারণের ও সীমায়িতকরণের' চূড়ান্ত রূপকে প্রকাশ করে। **ধুম**-এর শরীর হল **ধুমধড়**। সে তার **অক্কা**কে বা সর্বোচ্চকে পায় **ধুমধড়**-এর চূড়ান্তে। দ্র. **অক্কা**।

ধুরন্ধর : ১. ধুরা + ✓ধৃ + অ (খচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ধুরং** *(= ত্যক্ত বা ভার রহে যে রহস্যে) ধরে যে। /* ভার বহন করে যে; যে কার্য্যভার সহন করে। (ব.শ.)। ৩. ভারধারক, ভারবাহী (বৃষাদি), তত্তৎকর্ম্মনির্ব্বাহরূপ-ভারবাহক, শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ, শিব, বাহন। (ব.শ.)। ৪. scrupulously expert অর্থে প্রচলিত। ৫. গরুগাড়ির ঠিক মাঝে একটি লোহার মোটা দণ্ড (rod) থাকে, সেই রডটি গলানো থাকে দুই চাকার ভিতরে। তার উপরই সম্পূর্ণ গাড়িটির ভর থাকে। এই রডটিকে **ধুর** বা **ধুরি** বলে। এই **ধুর** ধরে রাখে যে, তাকে **ধুরন্ধর** বলা যায়। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে ঐ **ধুর**-এর সমস্ত ভার গিয়ে পড়ে গাড়িটানা বলদ দুটির কাঁধে, অনেক সময় সেই ভার বহনকারী বলদ দুটিকেই **ধুরন্ধর** বলা হয়ে থাকতে পারে। তবে, সেই অর্থে শব্দটির ব্যবহার কম। এই চলমান বিশ্বে গরুর গাড়ি ছাড়াও মানুষের এই সমাজ, এই বিশ্বজগৎ ... এসবই চলমান। সমাজরথের কিংবা জগৎরথের **ধুর** বহন করে যে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও শিব, তাঁরাও **ধুরন্ধর** হতেই পারেন। বৌদ্ধ জাতকের গল্পগুলিতে এই সমাজ ও জগতের ধুরন্ধরদের বিষয়ে অনেক কথা আছে, এমনকী সেই ধুরন্ধরদের সৃজনশীল বৃষও বলা হয়েছে। আজকের বাংলাভাষায় ধারণাটি অবশ্য সামাজিক ধুরন্ধরদের বোঝাতেই ব্যবহৃত হয় এবং তাও সদর্থে নয়। **ধুর** ধারণ করে বহন করতে করতে **ধুরন্ধরেরা** সামাজিক বিধি-বিধান, নিয়ম-নীতি, সুবিধা-অসুবিধা ... ইত্যাদি বিষয়ে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ হয়ে পড়েন এবং স্বভাবতই অন্যদের ঠকিয়ে বোকা বানিয়ে নিজের সুবিধা করে ফেলতে পারেন। এমন ব্যক্তিকেই আজকাল **ধুরন্ধর** বলা হয়ে থাকে।

ধূপ (ধূপছায়া, ধূপন) : ১. ✓ধূপ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ধূপ** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ধারীর পালন করে যে।* **ধূপছায়া** = *ধূপ ও* **ছায়া** *(আচ্ছাদিত-হাঁটার আধার যে)।* **ধূপন** = *ধূপ অন যাহাতে। /* **ধূপছায়া** = যাহার মুখে এক মনে অন্য; যে রঙ উজ্জ্বল ও মলিন। (ব.শ.)। ৩. **ধূপ** = গুগ্গুলুপ্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যোত্থিত ধূম, তাদৃশ ধূমসাধন দ্রব্য, দ্রব্যবিশেষের যোগে কৃত সুগন্ধি ধূমবর্ত্তি, রৌদ্র। **ধূপছায়া** = ধূপছায়ারঙবিশিষ্ট, ময়ূরকণ্ঠীরঙযুক্ত, দো-রঙা, কপট, রৌদ্র ও ছায়া। **ধূপন** = সন্তাপক, যক্ষধূপ, ধুনা, ধূপসুরভী-করণ। (ব.শ.)। ৪. 'সুগন্ধ দ্রব্যোত্থিত ধূম' অর্থে **ধূপ** এবং রোদ ও ছায়া অর্থে **ধূপছায়া** প্রচলিত। **ধূপন** অপ্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

ধূম (ধূমকেতু) : ১. ✓ধূ + ম (মক্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. **ধূম** = *নবরূপে উত্তীর্ণ ধারীর আধার সীমায়িত যাহাতে।* **ধূম কেতু** *যাহার।* ৩. **ধূম** = অগ্নিযোগে আর্দ্রকাষ্ঠাদিজাত পদার্থভেদ, ধোঁয়া, বাষ্প, কুজ্ঝটিকা, মেঘ, ধূমকেতু, উল্কাপাত, অগ্নিমান্দ্যসূচক বায়ুভেদ, চোঁয়া ঢেকুর, ধূমপানরূপ চিকিৎসাভেদ। **ধূমকেতু** = অগ্নি, ধূমাভ তারকাভেদ, উৎপাত বিশেষ, কেতুগ্রহ, সূর্য্য, ধ্বংসবিধায়ী, ক্ষয়কর। (ব.শ.)। ৪. smoke অর্থে **ধূম** এবং comet অর্থে **ধূমকেতু** প্রচলিত। ৫. **ধূ** হল ধৃত বস্তু বা বিষয়ের ত্যাগকরণ, এই **ধূ**-এর আধারকে বলে **ধূ**। এর সঙ্গে যুক্ত **ম**, অর্থাৎ সীমায়িত যে। ভেজাকাঠ পুড়লে যে জলীয় বাষ্প ত্যক্ত ও সীমায়িত হয়ে **ধূম** বা ধোঁয়া রূপ পায়। এ হল জাগতিক **ধূম**। কিন্তু মানুষের পেটে যে 'অগ্নিমান্দ্যসূচক বায়ুভেদ' ঘটে বা চোঁয়া ঢেকুর ওঠে, সেও **ধূম**। আরও একপ্রকারের **ধূম** রয়েছে, কিন্তু তাকে আমরা চিনতে পারি **ধূমকেতু** শব্দে। এই **ধূম** নির্গত হয় সমাজদেহ থেকে, অভোগ্যকে ভোগের কারণে কিংবা অতিভোগের কারণে সমাজদেহের অগ্নিমান্দ্যসূচক বায়ুভেদ থেকে যাকে সামাজিক-চোঁয়া-ঢেকুরও বলা চলে। সমাজে কোনো বিশেষ ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর আড়ম্বর, ঠাট-ঠমক পতাকার মতো সেই সামাজিক চোঁয়া ঢেকুরের পাশে উড়তে থাকে। সাধারণ প্রজাদের কাছে এই **ধূমকেতু** স্বভাবতই উৎপাতবিশেষ।

ধূমা, ধূমাবতী : ২. **ধূমা** = *ধূম-এর আধার যে।* **ধূমাবতী** = *যে আধারশক্তির দ্বারা* **ধূমা** *বাহিত হয়ে তারিত হয়।* ৩. দুর্গা, ধূমবর্ণা মহাবিদ্যাবিশেষ। (ব.শ.)। দশমহাবিদ্যার এক বিদ্যা। তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে, ... একবার পার্বতী ক্ষুধিত হয়ে মহাদেবের কাছে খাদ্য

প্রার্থনা করেন। কিন্তু মহাদেব খাদ্য দান করতে অসমর্থ হন। তখন পার্বতী ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মহাদেবকেই গ্রাস করে ফেলেন। এই সময় পার্বতীর দেহ হতে **ধূম** নির্গত হয়ে তাঁকে বিবর্ণ করে। মহাদেব তখন মায়া দ্বারা শরীর কম্পিত করে বলেন, 'তুমি আমাকে গ্রাস করে বিধবা হয়েছ, অতএব এখন থেকে তুমি বৈধব্যবেশেই অধিষ্ঠান করবে এবং এই বেশেই তুমি পূজনীয়া হয়ে ধূমাবতী নামে প্রসিদ্ধা হবে।' (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দশমহাবিদ্যা**। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, পরিচালকদের গ্রাস করে ফেলায় একটি সমাজগোষ্ঠীর থেকে **ধূম** বা বিক্ষোভ নির্গত হয়, সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ ধোঁয়াটে হয়ে ঢাকা পড়ে এবং সেই **ধূম** সমগ্র সমাজকে বর্ণহীন বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মহীন করে দেয়। জনগোষ্ঠীর এই রূপটিকেই **ধূমাবতী** বলে। এরকম ঘটে তখনই যখন পরিচালকদের পরিচালনে গুরুতর ত্রুটি দেখা দেয়। আমাদের মনে হয়, যখন পরিচালক নিজেই স্থাণু (শিবের একটি রূপ) হয়ে পড়েন, পরিচালিতদের মধ্যে দেহবাদিতার রমরমা হয়, লোকে দেহের প্রয়োজনকেই একমাত্র বিচার্য বিষয়, কামনার বিষয় বলে মনে করে, তখনই। কিন্তু দেহবাদিতা মানে তো আগুনে ঘি ঢেলে নেভানোর চেষ্টা, এবং এ-চেষ্টা নিতান্তই পাগলামি। বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক কালখণ্ডে এরকম পরিস্থিতি খানিকটা দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি যদি আরও দশ-বিশ বছর চলে, আজকের পৃথিবীর সমাজগোষ্ঠীগুলিও **ধূমাবতী** হয়ে যাবে।

ধূম্র : ১. ধূম্র + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। ২. ***ধূম** রহে যাহাতে।* ৩. ধূম্রযুক্ত, কৃষ্ণলোহিত, মলিন, খরলোমবর্ণাভ কৃষ্ণলোহিত বর্ণ, তুরুষ্কনামক গন্ধদ্রব্য, শিব, নক্ষত্রবিশেষে যোগভেদ, ধূম। (ব.শ.)। বানর দলপতি জাম্ববানের ভ্রাতা। ইনি লঙ্কাযুদ্ধে বহু রাক্ষস বিনাশ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **ধূম** বলতে যা যা বোঝায়, সেগুলি যে যে সত্তায় থাকে তারা প্রত্যেকেই **ধূম্র**। তবে আজকাল লোকে যার মধ্যে ধোঁয়াটে ভাব রয়েছে তাকেই **ধূম্র** বলে। ...

ধূম্রলোচন : ২. ***ধূম্র** লোচন যাহার; ধোঁয়াটে (ঘোলাটে) চোখ যার।* ৩. কপোত। (ব.শ.)। দানবরাজ শুম্ভের সেনাপতি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অনুসারে ... শুম্ভের আদেশে ধূম্রলোচন ষাট হাজার সেনানী পরিবৃত হয়ে ভগবতীর সমীপস্থ হলে ... দেবী এমন প্রচণ্ড হুঙ্কার দিলেন যে, ষাট হাজার সৈন্যের সঙ্গেই ধূম্রলোচন ভস্মীভূত হল। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কপোত, কৌশিক**। এ ধরনের চোখ দুরকম মানুষের হয়। ধ্যানস্থ আবিষ্কারক কবি বিজ্ঞানী স্রষ্টা মানুষ, আর মদ খেয়ে সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্ত। তার মানে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও নষ্ট মানুষ দুজনেই দেখতে একরকম হয়। তাছাড়া, আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানী আর পাগল যে দেখতে একরকম হয়, সেকথা অনেকেই জানেন। 'ধূম্রলোহিত' শব্দে সেকারণেই শিবকেও বোঝায়।

ধূলি (ধূলী, ধোয়া, ধোলাই) : ১. ✓ধূ + লি (ক্লি) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ধূলি** = নবরূপে উত্তীর্ণ ধারী গতিশীলভাবে লালিত বা লয়প্রাপ্ত যাহাতে। **ধূলী** = **ধূলির** আধার যে। **ধোয়া** = সার্বিক **ধূ**-করণ চলে যাহাতে। **ধোলাই** = **ধূ**-এর সার্বিক লয়ন গতিশীল থাকে যাহাতে।* ৩. **ধূলি (ধূলী)** = রেণু, রজঃ, চূর্ণ, গুঁড়া। **ধোয়া** = ধৌত, প্রক্ষালিত, কাচা (কাপড়, বাসন), নির্ম্মল, কুটিলতাহীন, ধৌত করা, প্রক্ষালন করা, কাচা। **ধোলাই** = ধৌত করা, ধোয়া, কাচা, কাচার মজুরী। (ব.শ.)। ৪. dust অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **অজিন**। একালে আমরা **ধূলি** বা ধুলো বলতে dust বুঝি। কিন্তু **ধূলি** শব্দটি তার চেয়ে অনেক বেশি কথা বলে। **অজিন** শব্দের অর্থে সেকথা যেমন আমরা বুঝতে পারি, তেমনি উপরোক্ত (২) অর্থেও সেকথা বোঝা যায়। বস্তুত কোনো সত্তা যখন নিজের ভিতর থেকে ধৃতবস্তু বিন্দু বিন্দু রূপে ত্যাগ করে এবং সেই ত্যক্ত বস্তু 'রেণু, রজঃ, চূর্ণ, গুঁড়া' রূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়, তখনই তাকে **ধূলি** বলে। কোনো বস্তু বা বিষয়ের অভ্যন্তরে ধৃত সমস্ত কলুষকে বিন্দু বিন্দু করে বের করে দেওয়াকে সেকারণেই **ধোলাই** বলে। যে প্রক্রিয়ার দ্বারা **ধূ**-করা বা ভেতরের ধৃত কলুষকে বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, তাকে সেকারণেই **ধোয়া** বলে। ...

ধোপ (ধোপদুরস্ত, ধোপা, ধোবা) : ২. ***ধোপ** = সার্বিক **ধূ** পালিত হয় যাহাতে। **ধোপদুরস্ত** = **ধোপকে** দূরে তারণ করে যে। **ধোপা** = **ধোপ**-এর আধার যে। **ধোবা** = সার্বিক **ধূ** বহন করে যে।* ৩. **ধোপ** = ধোপার ধোয়া, ধোলাই। **ধোপা (ধোবা)** = রজক, রজকজাতি। (ব.শ.)। **ধোপদুরস্ত** = উত্তমরূপে ধোলাই করা হয়েছে এমন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. আপনার জামায় কালো দাগ পড়েছে। আপনি ধোপাকে বললেন, 'দেখো, জামার এইখানটায় কালো কালো ছোপ পড়েছে, এটাকে ধুয়ে ধোপদুরস্ত করে দিয়ো।' ছোপ-ছোপ দাগ জামার নিজস্ব রংকে ছাদিত করে দেয়, ঢেকে দেয়। আর সেই দাগকে **ধূ** করে বা **ধৌত** করে জামার নিজস্ব রংকে প্রকাশিত করে দেওয়া গেলে সে হয়ে গেল **ধোপ**। এই শব্দটির ব্যবহার এখন শোনা যায় না। কিন্তু এমনকি ১৯৫০ সালেও এর ব্যবহার ছিল। ছাত্রবোধ অভিধান এই শব্দের ব্যবহার দেখাচ্ছেন — 'কাপড়ের ধোপ খুলে নাই।' তাহলে দেখা যাচ্ছে, ছোপ শব্দের ভিতরে ছো-পালিত হয় বা গোপন করে দেওয়া হয়, আর ধোপ শব্দের ভিতরে ধো-পালিত হয় বা সুপ্রকাশ পালিত হয়। ...

ধৌম্য : ১. ধূম + য (ষ্যঞ্)। ব.শ.। ২. *সার্বিক ধূম থাকে যাহাতে।* ৩. ধূমের গোত্রাপত্য বা অপত্য, যুধিষ্ঠিরের পুরোহিত মুনিবিশেষ। দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। উৎকোচক তীর্থে ইঁহার আশ্রম ছিল। ... (ব.শ.)। (ক) ইনি মহর্ষি অসিতের পুত্র ও মহর্ষি দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ধৌম্য পাণ্ডবদের পুরোহিত ছিলেন। ... ইনি নারদের নিকট হতে সূর্যের এক স্তব লাভ করেন এবং তা যুধিষ্ঠিরকে শিক্ষা দেন। এই স্তবের প্রভাবে যুধিষ্ঠির অক্ষয়স্থালী প্রাপ্ত হন। (খ) আয়োদধৌম্য নামে আর একজন ঋষি ছিলেন। আরুণি, উপমন্যু ও বেদ নামে এঁর তিনটি শিষ্য ছিল। (গ) ইনি সত্যযুগের একজন ঋষি এবং ব্যাঘ্রপদ ঋষির পুত্র। ... দুধ না পেয়ে এবং মাতার পরামর্শে ইনি মহাদেবের তপস্যায় রত হন। এঁর কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব ... প্রার্থিত

এই শব্দার্থকোষ কীভাবে পড়তে হয়, তা জানার জন্য 'ভূ-১' পৃষ্ঠা দেখুন। সংক্ষিপ্ত আকারে তা ১ পৃষ্ঠাতেও পাওয়া যাবে।

বর দিলেন ... 'সামান্য দুধের জন্যে তুমি আমাকে লাভ করেছ। তোমার ইচ্ছামাত্র ক্ষীরসমুদ্র তোমার সমক্ষে আবির্ভূত হবে। এক কল্প পরে তুমি স্বর্গে যাবে। তোমার আশ্রমে আমি স্থায়ীভাবে বাস করলাম।' (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দেবল**। আদিম যৌথসমাজ যখন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিমালিকানা দ্বারা কলুষিত হতে শুরু করেছে, তখন চিন্তকদের দুনিয়ায় যে নানা ধোঁয়াশাপূর্ণ চিন্তাধারার জন্ম হয়, তারই একটি ধারার ধারক মহর্ষি ছিলেন **ধৌম্য**। **অসিত** ও **দেবল**-এর কাহিনী থেকেও তার সংবাদ মেলে। ব.শ. মতে **সিত** কথাটির মানে হল 'যে হিংসাযুক্ত ধর্ম্মও ত্যাগ করে'। সেই সুবাদে **অসিত** হল, 'যে হিংসাযুক্ত ধর্ম্মও ত্যাগ করে না।' আর, **দেবল** মানে যে 'দেবদ্রব্যোপজীবী', সেকথা ব.শ. স্পষ্টই বলে গেছেন। ...

ধৃ (ধারি, ধৃষ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অধম্ম, অধর, অধরপান, অধরবিম্ব, অধরবিম্বক, অধরমদিরা, অধরমধু, অধররস, অধরসঙ্গম, অধরসুধা, অধরামৃত, অধরীকৃত, অধরীভূত, অধরু, অধরোত্তর, অধরোষ্ঠ, অধর্ম্ম, অধর্ম্মদণ্ডন, অধর্ম্মনিয়ম, অধর্ম্মভীরু, অধর্ম্মাচারী, অধর্ম্মিষ্ঠ, অধর্ম্মী, অধর্ম্ম্য, অধৃষ্য, অনাধৃষ্য, অপ্রধৃষ্য, আধর্য্য, আধর্ষ, আধার, আধারশক্তি, আধারাধেয়ভাব, আধৃষ্য, আধৃষ্ট, আধৃষ্টি, জাতধর্ম্ম, ধন্না, ধর, ধরণ, ধরণছাড়ন, ধরণধারণ, ধরণি, ধরণী, ধরণীকীলক, ধরণীজ, ধরণীতল ধরণীধর, ধরণীপতি, ধরণীপুত্র, ধরণীশ্বর, ধরণীসুত, ধরতা, ধরনা (ধর্না, ঝর্না), ধরপাকড়, ধরম, ধরা, ধরাত্মজ, ধরাদেব, ধরাধর, ধরাধরি, ধরাধারক, ধরাবাঁধা, ধরামর, ধরিত্রী, ধরিমা, ধর্ত্তব্য, ধর্ত্তা, ধর্না, ধর্ম্ম, ধর্ম্মকাম, ধর্ম্মকৃৎ, ধর্ম্মকৃত্য, ধর্ম্মকোষ, ধর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মগ্রন্থ, ধর্ম্মঘট, ধর্ম্মচক্র, ধর্ম্মচর্য্যা, ধর্ম্মচারী, ধর্ম্মজ, ধর্ম্মজন্মা, ধর্ম্মজাত, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, ধর্ম্মজীবন, ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মণ, ধর্ম্মতলা, ধর্ম্মতাত, ধর্ম্মদান, ধর্ম্মদার, ধর্ম্মদ্রবী, ধর্ম্মদ্রোহী, ধর্ম্মধ্বজ, ধর্ম্মধ্বজী, ধর্ম্মনন্দন, ধর্ম্মনাশ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ধর্ম্মনিষ্পত্তি, ধর্ম্মপত্নী, ধর্ম্মপর, ধর্ম্মপুত্র, ধর্ম্মপ্রবক্তা, ধর্ম্মপ্রবচন, ধর্ম্মবাণিজিক, ধর্ম্মবাণিজ্যিক, ধর্ম্মবাপ, ধর্ম্মবাবা, ধর্ম্মবাহন, ধর্ম্মবিপ্লব, ধর্ম্মবীর, ধর্ম্মবৃদ্ধ, ধর্ম্মবৈতংসিক, ধর্ম্মব্রতা, ধর্ম্মভগিনী, ধর্ম্মভিক্ষুক, ধর্ম্মভীরু, ধর্ম্মভৃৎ, ধর্ম্মভ্রাতা, ধর্ম্মমণি, ধর্ম্মময়, ধর্ম্মমূল, ধর্ম্মযুগ, ধর্ম্মরতি, ধর্ম্মরথ, ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মরায়, ধর্ম্মরোধী, ধর্ম্মলক্ষণ, ধর্ম্মলোপ, ধর্ম্মশালা, ধর্ম্মশাসন, ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মশীল, ধর্ম্মষাঁড়, ধর্ম্মসংহিতা, ধর্ম্মসঙ্গীতি, ধর্ম্মসভা, ধর্ম্মসহায়, ধর্ম্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসার, ধর্ম্মসুত, ধর্ম্মসূত্র, ধর্ম্মসেতু, ধর্ম্মাচার্য, ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মাধিকরণ, ধর্ম্মাধিকার, ধর্ম্মাধিষ্ঠান, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাপেত, ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্মারণ্য, ধর্ম্মাসন, ধর্ম্মিষ্ঠ, ধর্ম্মী, ধর্ম্মেন্দ্র, ধর্ম্মোত্তর, ধর্ম্মোপদেশ, ধর্ম্ম্য, ধর্ষ, ধর্ষক, ধর্ষণ, ধর্ষণী, ধর্ষিত, ধর্ষিতা, ধর্ষী, ধামনা (ধর্ম্ম নেই যাহার, যেমন, ধর্ম্মণ), ধামনিকা, ধামনী, ধার, ধারক, ধার-ধারা, ধারণ, ধারণশীল, ধারণা, ধারণীয়, ধারয়, ধারয়িষ্ণু, ধারা, ধারাকদম্ব, ধারাগৃহ, ধারাধর, ধারানী, ধারানিপাত, ধারাপাত, ধারাবর্ষ, ধারাবর্ষণ, ধারাবাহিক, ধারাযন্ত্র, ধারাল(লো), ধারাশ্রু, ধারাসম্পাত, ধারাসার, ধারি, ধারিত, ধারিণী, ধারী, ধারোষ্ণ, ধার্ত্তরাষ্ট্র, ধার্ম্ম, ধার্ম্মিক, ধার্ম্মিকা, ধার্য্য, ধার্ষ্ট্য, ধাষ্টামি, **ধাষ্টামো**, **ধিষণ**, ধিষণা, ধিষ্ণ্য, ধুরন্ধর, ধুর্, ধূর্ত্ত, ধৃ, ধৃক্, ধৃজ্, ধৃত, **ধৃতবর্ম্মা**, ধৃতব্রত, ধৃতরাষ্ট্র, ধৃতরাষ্ট্রী, ধৃতাত্মা, ধৃতি, ধৃতিমান, ধৃষ্, **ধৃষ্ট**, **ধৃষ্টকেতু**, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্ণি, ধোর, ধোরণ, ধোরিত, ধৌরিত, ধৌরেয় (দুর-বহ, বাহাদুর), ধৌর্য্য, বিধর্ম্মী, বিধৃত, সধর্ম্ম, সমধর্ম্মা, **সহধর্ম্ম**, **সহধর্ম্মিণী**,

ধৃ (ধারি, ধৃষ্) = ধারীর আবর্ত্তন = ধারণ করা = ধরা। **ধারি** = ধার (ধর হইতে জাত-র) গতিশীল যাহাতে। **ধৃষ** = আবর্ত্তনশীল ধারীর দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে।

অধর (অধরপান, অধরবিম্ব, অধরমদিরা, অধরমধু, অধরসুধা, অধরোত্তর, অধরোষ্ঠ) : ১. ন + ধর। ২. **অধর** = *নেই ধরা যাহাতে।* / **অধর** = যাহা কিছু ধরে না; যে বাদী পূর্ব্ববাদ ত্যাগ করিয়া অন্য বাদ অবলম্বন করে। **অধরবিম্ব** = যাহা হইতে বিম্বফল অপকৃষ্ট। (ব.শ.)। ৩. **অধর** = অনূর্দ্ধ, অধঃস্থিত, হীন, পূর্ব্ব, হীনবাদী, উর্দ্ধ ও নিম্ন ওষ্ঠ, অধোভাগ, যোনি, চঞ্চু। **অধরপান** = অধরচুম্বন। **অধরবিম্ব** = জিতবিম্ব, বিম্বফলবৎ রক্ত ওষ্ঠ। **অধরমদিরা** = সুরাবৎ মত্ততাজনক অধররস। **অধরমধু** = অধরের মধুতুল্য। **অধরসুধা** = অধরামৃত। **অধরোত্তর** = অধর ও উত্তর, পূর্ব্বাপর। **অধরোষ্ঠ** = নিম্ন ওষ্ঠ, নীচের *ঠোঁট*। (বিপরীত 'উত্তরোষ্ঠ')। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. প্রাচীন বাংলায় **অধর** যোগ করে বহু শব্দ তৈরি করা হয়েছে। এর অধিকাংশই এখন আর ব্যবহৃত হয় না। তবে উপরোক্ত শব্দার্থগুলি আমাদের জানায়, **অধর** শব্দটি একদিকে যেমন **অধরার** বা না-ধরে রাখার ব্যাপারটিকে বোঝাত, তেমনি *ঠোঁটের* নিম্ন-ভাগটিকে বোঝাত। কেবল তাই নয়, যে চুম্বন পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে যথেষ্ট প্রকট, দেখা যাচ্ছে, বাংলার সংস্কৃতিতে তার অর্জনও নেহাত কম নেই। এমনকী, চুম্বনরস যে অমৃত থেকে বিষ (মদ) পর্যন্ত প্রসারিত, সেকথাও শব্দগুলির ভিতরে বিদ্যমান।

অধর্ম্ম : ১. ন + ধর্ম্ম। ২. *নেই ধর্ম্ম যাহাতে।* / ৩. ধর্ম্মবিরোধী, শ্রুতিস্মৃতিবিরোধী আচার, অবৈধ কার্য্য, দুষ্কৃত, পাপ, ব্রহ্মার পৃষ্ঠজাত ধর্ম্মবিরোধী পুরুষ। (ব.শ.)। ৪. রিলিজিয়ন বহির্ভূত আচারাদি অর্থে প্রচলিত। ৫. পুরাণাদিতে কথিত হয় — প্রজাপতি বেণ **'অধর্ম্মের মর্য্যাদা'** প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। **বেণ**-এর সময় হইতে বেণিয়াবৃত্তির সূত্রপাত। (banian tree, **বটবৃক্ষ** দ্র.)। চাষির ধর্ম্ম ধান ফলানো, তাঁতির ধর্ম্ম কাপড় বোনা। যে বিনিময়জীবী চাষির ধান তাঁতিকে দেয়, তাঁতির কাপড় চাষিকে দেয়, সে নিজে কিছু ফলায় না; তাই তার কোনো **ধর্ম্ম** নাই। সে যদি ঐরূপ বিনিময় করে নিজে কিছু রেখে দিয়ে তার সাহায্যে জীবন কাটায়, সে অধর্ম্মাচারী। সমাজে কোনো কিছু উৎপাদন না করে বিনিময় করা স্বীকৃত হলে **অধর্ম্মের মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠা হয়। দেবীপুরাণে একে 'মহৎ অধর্ম্মের মর্য্যাদা' বলা হয়েছে।

এর সাম্প্রতিক অর্থ হবে এই রকম — মানুষকে কমপক্ষে দুটো ধর্ম্ম পালন করতেই হয় — নিত্যধর্ম্ম ও সামাজিক ধর্ম্ম। কেউ জলে ডুবে যাচ্ছে দেখে তাকে উদ্ধার করা নিত্যধর্ম্ম। কাউকে কেউ খুন

করছে দেখলে তার বিরোধিতা করা নিত্যধর্ম্ম। বিবেক নিজে থেকেই এই বিরোধিতার কাজগুলো করে এবং করতে না পারলে মানুষের মনুষ্যত্ব নিজেকে গ্লানিগ্রস্ত বিবেচনা করে। আর, রোগীর চিকিৎসা করে রোগ নিরাময় করা ডাক্তারের সামাজিক ধর্ম্ম; সমাজের অর্জিত জ্ঞান উত্তরপ্রজন্মকে অর্থাৎ ছাত্রদের শিখিয়ে দেওয়া শিক্ষকের সামাজিক ধর্ম্ম; সরকারি নির্দ্দেশাদি অনুসারে কাজ করা সরকারি কর্ম্মচারীর সামাজিক ধর্ম্ম। কিন্তু যে ব্যক্তি মানুষের নিত্যধর্ম্ম ও সামাজিক ধর্ম্ম কোনোটিই মানে না, বাহ্যসম্পদ ও প্রতিপত্তির দাসত্ববন্ধনে বদ্ধ, সেইরকম ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যদি সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে — চিকিৎসাক্ষেত্রে, শিক্ষাক্ষেত্রে, প্রশাসনে — সর্বত্র ক্ষমতা দখল করে বসেন, তাহলে সমাজে **অধর্ম্মের** মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আজকের বিশ্বে ক্ষমতাধিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালক মানুষেরা অধিকাংশই বাহ্যসম্পদের ও প্রতিপত্তির দাসত্ব করতে লেগেছেন। ফল হয়েছে এই যে, সাধারণ মানুষ, সাধারণ পেশার মানুষও তাঁদের নিজ নিজ **নিত্যধর্ম্ম** এবং বহুক্ষেত্রেই নিজ নিজ **সামাজিক ধর্ম্ম** বা পেশার **ধর্ম্ম**ও আর পালন করতে পারছেন না; বারংবার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন। **অধর্ম্মের মর্য্যাদা** প্রতিষ্ঠা হলে এরকমই হয়। এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় হল সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে ক্ষমতার আসন থেকে **অধর্ম্মাচারী**দের সরিয়ে দিয়ে **নিত্যধর্ম্ম** ও **সামাজিক ধর্ম্ম** পালনকারী মানুষদের সেখানে বসিয়ে দেওয়া। দ্র. **ধর্ম্ম**।

আধার (আধারশক্তি, আধেয়) : ১. আ + ✓ধৃ + অ (ঘঞ্) - অধিকরণে। ২. ***আধার*** = *ধারণের আশ্রয় যাহাতে।* ***আধারশক্তি*** = *আধারস্বরূপ যে শক্তি।* ***আধেয়*** = *আধারে বা পাত্রে যা রাখা হয়ে থাকে।* / **আধার** = যে স্থানে ধারিত হয়; শস্যাদিসেচনার্থ সেতুবন্ধ দ্বারা যে স্থানে জল নিরুদ্ধ থাকে। **আধেয়** = যে দ্রব্য আধারে স্থাপন বা নিবেশিত করা হয়। (ব.শ.)। ৩. **আধার** = পাত্র, আশ্রয়, জলাশয় হ্রদাদি, আলবাল, শস্যার্থ জলধারণস্থান, অধিকরণ কারক, মূলাধার চক্র। **আধারশক্তি** = সর্ব্বাধারশক্তিরূপা পরমেশ্বরশক্তি মহামায়া, প্রকৃতি, মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তি, পীঠপূজনীয় দেবতাবিশেষ। **আধেয়** = আধানার্হ, স্থাপনীয়, বন্ধকরূপে স্থাপনীয়, উৎপাদ্য, যথাবিধি স্থাপনীয় বহ্নি, আধান, স্থাপন। (ব.শ.)। ৪. **আধার, আধেয়** 'পাত্র' ও 'পাত্রে রক্ষিত দ্রব্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়। **আধারশক্তি** অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ধার**। 'পাত্রাধার তৈল কি তৈলাধার পাত্র' — এই নিয়ে প্রাচীন বাংলায় বিস্তর তর্কাদি ছিল। বস্তুত এই **বিশ্বজগৎ**কে বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে **আধার** ও **আধেয়** বোধ ভারতীয় **চিন্তাশৃঙ্খলা**র গড়ে ওঠার ভিত্তিতে আজও সক্রিয় রয়েছে। **শরীরকে আধার** এবং মন বা আত্মাকে **আধেয়**, প্রকৃতিকে **আধার** এবং **পুরুষ**কে (masculine বা male নয়, দ্র. **পুরুষ**) **আধেয়**, **বিশ্বজগৎকে আধার** এবং সেই জগতে বিধৃত নিয়মাবলীকে **আধেয়** ... এইভাবে সমগ্র বিশ্বজগৎকে বুঝে নেওয়া হয়েছে। ইংরেজি চিন্তাপদ্ধতিতেও এই ধারণার একপ্রকার উত্তরাধিকার রয়েছে তাঁদের 'form and content' ধারণায়। তবে পাশ্চাত্যের ধারণার মূল যে অভাব, জগতের প্রতিটি সত্তাকে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে শবরূপে বা জড় সত্তা রূপে বুঝে নেওয়া, এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সেই কারণে তাদের form-content ধারণা বিশেষ বিস্তার লাভ করেনি। বাংলায় আধারকে যে কেবল **শক্তিরূপিণী** বলা হয়েছে, তাই নয়, **আধার-আধেয়**র ব্যবহার ও প্রয়োগ চিন্তার প্রায় সর্বক্ষেত্রে প্রসারিত হয়ে রয়েছে।

জাতধর্ম্ম : ২. *জাতি অনুসারে যে ধর্ম্ম।* ৪. শহরে ও অ্যাকাডেমিতে অপ্রচলিত, কিন্তু গ্রামবাংলায় প্রচলিত। ৫. গ্রামবাংলায় এখনও শব্দটি 'জাতি অনুসারে ধর্ম্ম' অর্থে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। যে ব্যক্তি যে বংশে জাত, সেই বংশের সামাজিক **ধর্ম্ম** যা ছিল (যেমন হেলে কৈবর্ত্তর চাষাবাদ, জেলে কৈবর্ত্তর মাছধরা), তা যদি সেই ব্যক্তি আচরণ করতে না পারে, তাহলে তার **জাতধর্ম্ম** নষ্ট হয়ে যায়। শহরাঞ্চলের আধুনিক বাংলাভাষায় কিন্তু সেরকম ভাবা হয় না। মনে করা হয়, শব্দটি আসলে 'জাতি ও ধর্ম্ম'। আধুনিক শিক্ষিত বাংলাভাষী 'জাতধর্ম্ম সবই গেল' বাক্যটির মানে করেন, 'জাতি গেল, religion-ও গেল'।

ধর (ধরণ, ধরণি, ধরণী) ধরা : ১. ✓ধৃ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। ... স্ত্রী রা। (ব.শ.)। ২. ***ধর*** = *ধারী (ধারণ করা ক্রিয়াটি) রহে যাহাতে।* ***ধরণ*** = ***ধর*** *অন যাহাতে।* ***ধরণি*** = ***ধরণ*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ধরণী*** = ***ধরণি****র আধার যে।* ***ধরা*** = ***ধর****-এর আধার যে।* / **ধর** = ধরাকে ধারণ করে যে। **ধরণি (ধরণী)** = জীবাদিকে ধারণ করে যে। **ধরা** = যে ধরে। (ব.শ.)। ৩. **ধর** = ধারক, পর্ব্বত, কূর্ম্মরাজ, বসুবিশেষ, বিষ্ণু, শিব, শ্রীকৃষ্ণ, বিট, কার্পাসতুলক, অক্ষ, গাড়ীর ধুরা, হিন্দুর উপাধি; ধারণ করা, রাখা, গ্রহণ করা, লওয়া, ব্যবহারার্থ হাতে লওয়া, আটকাইয়া রাখা, পরিগ্রহ করা, বহন করা, মনে করা, আশ্রয় করা ... ইত্যাদি। **ধরণ** = হিমালয়, ভুবন, লোক, স্থল, ধান্য, শস্য, সূর্য্য, সেতু, আলি, চতুর্ম্মাষক পরিমাণ, দল পল, আশ্রয়, ধারণ, ধরা, গ্রহণ, বর্ষণাভাব, প্রকার, ভাব, ভঙ্গি, প্রথা, রীতি, চাল, আদবকায়দা, সংবরণ, আকার, গড়ন, নির্ম্মাণপ্রণালী। **ধরণি (ধরণী)** = পৃথিবী, ভূতল, শাল্মলীবৃক্ষ, কন্দবিশেষ, শিরা, ভূমি, ধরণীর অংশ, দেশ। **ধরা** = ধারক, ধারা, আক্রমণকারী, ধৃত, গৃহীত, ধারণ ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. শব্দগুলি যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. ভেবে নেওয়া যেতে পারে যে, পর্বত হল সমুদ্রের বুকে একটি বড় পেরেক যাকে জড়িয়ে টিকে আছে সমগ্র স্থলভূমি। একই ভাবে সমগ্র মানবসমাজের বুকে সম্প্রদায়ের পেরেক রূপে **ধর** উপাধিধারীরা কাজ করে থাকবেন যারা সম্প্রদায়কে ধরে রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। গরুর গাড়ীর ধুরাও সমগ্র গাড়ীকে ধরে রাখে বলেই **ধর**-পদবাচ্য। কূর্ম্মরাজ কখন **ধর**-এর ভূমিকা পালন করেন, সেকথা আমরা **সমুদ্রমন্থন** কাণ্ডে পেয়েছি। আর মানুষের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে যে **বিশ্বাস**, সেই আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের **ধর** রূপে সক্রিয় থাকেন **শিব, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ** ইত্যাদি। কিন্তু শিমুল গাছকে কেন **ধরণী** বলে তা বোধগম্য হয়নি। ... তবে ভাব-ভঙ্গি রকম-সকম ... ইত্যাদি অর্থে **ধরণ** শব্দের ব্যবহার বেশি প্রচলিত।

ধরাধরি : ৫. **ধরা** প্রকৃতি, **ধরি** পুরুষ। দ্র. **কেশাকেশি**।

ধরিত্রী : ১. ✓ধৃ + ইত্র - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী ঈ (ঙীষ্)। (ব.শ.)। ২.

ধারণকে গতিশীলভাবে তারিত করে রক্ষা করেন যে আধারশক্তি। / ধারণ করেন যে কর্ত্রী। (ব.শ.)। ৩. ধরা, ধরণী, ধারয়িত্রী। (ব.শ.)। ৪. earth অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ধর**।

ধর্ত্তব্য : ২. *ধর্ তারণ তারিত হয়ে বাহিত হয়ে থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাকে ধরা যায়, ধরা উচিত, ধরা সম্ভব, ধরা কর্ত্তব্য।* ৩. গ্রাহ্য, গণনীয়, বিচার্য। (ব.শ.)। ৪. countable অর্থে- কমবেশি প্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

ধর্ম্ম : ১. ✓ধৃ + ম (মন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ধর্ মিতি মিত যাহাতে। /* শরীরসাধন যে কর্ম্মের অপেক্ষা করে। (অমরকোষ)। লোকধারণ করে যে। (ব.শ.)। ৩. শ্রেয়ঃ, শুভ অদৃষ্ট, পুণ্য, চতুর্ব্বর্গের একতম, আচার, শাস্ত্রদৃষ্টকার্য্যমাত্র, সম্প্রদায়বিশেষের শাস্ত্রবিধি, ন্যায়, নীতি, স্বভাব, অসাধারণ গুণ, উপমা, অভিধেয় বস্তু, অহিংসা, যজ্ঞাদি, উপনিষৎ, ঈশ্বরে অনুরাগ, আত্মা, সোমপ, যম, অর্হদবিশেষ, যুধিষ্ঠির, ব্রহ্মার দক্ষিণস্তনজাত দেবতাবিশেষ, জীবাত্মা, সৎসঙ্গ, ধনুঃ, তপঃশৌচাদিপাদচতুষ্টয়যুক্ত ধর্ম্মের বৃষরূপ, লগ্ন হইতে নবম স্থান, গ্রাম্য দেবতা ধর্ম্মঠাকুর। (ব.শ.)। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গ হতে ধর্ম উৎপন্ন হন। বরাহপুরাণে কথিত আছে, ব্রহ্মা সৃষ্টি করার মানসে যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন, তখন তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ হতে এক পুরুষের (ধর্ম) আবির্ভাব ঘটে। ব্রহ্মা তখন তাঁকে বলেন, 'তুমি চতুষ্পদ ও বৃষভাকৃতি। তুমি বড় হয়ে প্রজাপালন কর।' তখন ধর্ম সত্যযুগে চতুষ্পদ, ত্রেতায় ত্রিপদ, দ্বাপরে দ্বিপদ ও কলিতে একপদ হয়ে ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণ রূপে, ক্ষত্রিয়দের তিন ভাগে, বৈশ্যদের দুই ভাগে ও শূদ্রদের এক ভাগ দিয়ে রক্ষা ও পালন করতে থাকেন। গুণ, দ্রব্য, ক্রিয়া ও জাতি এই চারিটি ধর্মের পাদ। বেদে এঁর নাম তৃশৃঙ্গ। এঁর মাথা দুটি ও হাত সাতটি। বামনপুরাণ মতে ধর্মের স্ত্রী অহিংসা। এঁর গর্ভে চারিটি পুত্র হয় — সন্যকার, সনাতন, সনক ও সনন্দ। অন্যান্য পুরাণে এঁরার ব্রহ্মার মানসপুত্র বলে কথিত। (পৌ.অ.)। ৪. religion অর্থে **ধর্ম** বানানে প্রচলিত। ৫. দ্র. **ধীবর**। উপরে (৩) **ধর্ম্ম** শব্দের প্রদত্ত অর্থগুলির বিষয়ে আমরা কথা বলব শেষে। আপাতত **ধর্ম্ম** শব্দের নিহিত অর্থটিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা যাক।

ধর্ম্ম শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল — *ধর্ মিতি মিত যাহাতে। অর্থাৎ (কাউকে) ধরিবার (বা ধারণ করে রক্ষা করার) বিশেষ প্রকরণের বিশেষ রীতিনীতি থাকে যাহাতে; অথবা, মন্ (আত্মন্) ধারিত যাহাতে; অর্থাৎ, (অস্তিত্বের দ্বারা কৃত) যে-কর্ম্ম অস্তিত্বটির শরীরসাধন করে। (কর্ম্মই ধর্ম্ম, ধর্ম্মই কর্ম্ম)।* এই অর্থটি এতই গভীর ও ব্যাপক যে, বস্তুর **ধর্ম** বা স্বভাব (property) থেকে শুরু করে জীবধর্ম্ম মানবধর্ম্ম ইত্যাদি পেরিয়ে সমাজধর্ম্ম পর্যন্ত প্রসারিত বিশাল এলাকাকে **ধর্ম্ম** শব্দটি বোঝাতে সক্ষম। অবশ্য সেক্ষেত্রে শব্দটির বানান **ধর্ম্ম**-ই থাকতে হবে, **ধর্ম** লিখে ফেললে সে অর্থ শব্দটি ধারণ করতে পারবে না। ...

ব.শ. জানিয়েছেন, **কর্ম্ম, ধর্ম্ম ...** প্রভৃতি শব্দগুলি একই নিয়মে প্রসূত হয়েছে। শব্দগুলিতে **মন্** ব্যাপারটি কর্-এ এবং ধর্-এ (✓কৃ ও ✓ধৃ - তে) রূপায়িত হয় বলেই এদের যথাক্রমে **কর্ম্ম, ধর্ম্ম** বলা হয়ে থাকে। **ধর্ম্ম**-তে যেমন ✓ধৃ + ম (মন্) = **ধর্ম্ম**। অর্থাৎ এই শব্দে ধারণ করা ও ম্-অন করা, এই দুটি ক্রিয়ার যৌথতা রয়েছে। কাউকে পরিমিতিকরণ বা সীমায়ন (ম্) করতে থাকা বা কারও সীমায়ন হতে থাকা (on হতে থাকা) চলতে থাকলে, তাকে 'ম্-অন্' করা বলা যায়; যেমন চলন (চল্ + অন্), করণ ... ইত্যাদি। 'ম্ অন্' হতে থাকলে কী হয়? — কর্ (বা করা) কর্ম্মে পরিণত হয়, ধর্ (বা ধরা) ধর্ম্মে পরিণত হয়। তাতে কী হয়? **কর্ম্ম**-তে 'করিবার বিশেষ প্রক্রিয়ার (ক্রিয়াকৌশলাদির) বিশেষ এলাকা' চিহ্নিত হয়ে যায়; **ধর্ম্ম**-তে 'ধরিবার বিশেষ প্রক্রিয়ার (রীতিনীতির) বিশেষ এলাকা' চিহ্নিত হয়ে যায়। উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক।

আপনি একটি টেবিল বানাবেন। কাঠের টেবিল চেয়ার আলমারি খাট পালঙ্ক ইত্যাদি বানানোর যে সকল প্রক্রিয়া, তার সব কলাকৌশলের প্রয়োজন এখানে নেই। এই মুহূর্তে আপনি কেবল টেবিল 'করিবার বিশেষ প্রক্রিয়া'টুকু হাতে নিন। একে বলে কৃ-মিতি বা 'কৃ-ম'। এবার সেই 'করিবার বিশেষ প্রক্রিয়া' বা 'কৃ-মিতি'কে প্রয়োগ করে দিন কতকগুলি কাঠের টুকরোতে — হয়ে গেল টেবিল। কেবল টেবিলই হল না, আপনার কৃ-মিতি মিত হয়ে গেল একটি 'বিশেষ এলাকা'য় — কাঠের একটি টেবিলে। একে বলে **কর্ম্ম**। একই ভাবে প্রস্তুত হয়েছে **ধর্ম্ম** শব্দটিও। কৃষিকাজ করে শস্য উৎপাদন করা কৃষকের **ধর্ম্ম**। ধরবার যত প্রক্রিয়া আছে, তার ভিতর থেকে কৃষক কেবল শস্য-উৎপাদন প্রক্রিয়াকেই বাস্তবায়িত করার কথা ভাবেন। আর, তা যখন তিনি বাস্তবায়িত করে আত্মীয়-পরিজনের খাদ্যরূপে উপস্থিত করে দেন, তখনই তাঁর **ধর্ম্ম** রক্ষিত হল। এক্ষেত্রে 'বিশেষ প্রক্রিয়া' বা ধৃ-মিতি হল 'শস্য-উৎপাদন প্রক্রিয়া'; আর তা যে 'বিশেষ এলাকা'য় মিত হল, সেই এলাকা কৃষকের ক্ষেত্র ও আত্মীয়-পরিজন। এইভাবে কৃষকের এই সমগ্র আচরণটির দ্বারা তাঁর ধৃ-মিতি মিত হল ব'লে একে কৃষকের **ধর্ম্ম** বলে।

তার মানে, '**ধর্-এর মিতি মিত যাহাতে,** যে স্থানে, যে কর্ম্মে, যে আচরণে ...', সে সবকে **ধর্ম্ম** বলে। সেই হিসেবে সমাজকে ধরে রাখে যে বিশেষ প্রকারের ক্রিয়াকলাপ, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, তার সুনির্দিষ্ট এলাকাকে সমাজের **ধর্ম্ম** বলে। মানুষকে ধরে রাখে যে বিশেষ প্রকারের ক্রিয়াকলাপ আচারাদি, তার সুনির্দিষ্ট এলাকাকে মানুষের **ধর্ম্ম** বলে। বস্তুকে ধরে রাখে যে বিশেষ প্রকারের ক্রিয়াকলাপ, তার সুনির্দিষ্ট এলাকাকে বস্তুর **ধর্ম্ম** বলে।

এই যে **ধর্ম্ম**, এর দুটি দিক রয়েছে — অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয়, অর্থাৎ, ঘরের **ধর্ম্ম** এবং বাইরের **ধর্ম্ম**। বস্তু, মানুষ, সমাজ ... প্রত্যেকেরই আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ স্বতঃই প্রচলিত থাকে, এবং সেটিই তার অস্তিত্বের পরিসীমার মধ্যে তাকে ধরে রাখে; তাই সেটিই তার **ধর্ম্ম**। এই ধর্ম্ম পালন না করলে অস্তিত্বের শরীরটাই বিলুপ্ত হয়। যেকারণে অমরকোষ বলেছেন — 'শরীরসাধন যে কর্ম্মের অপেক্ষা করে, তাকেই শরীরের **ধর্ম্ম** বলে।' অণুর ভিতরে পরমাণুদের আচরিত কর্ম্মই অণুটির **ধর্ম্ম**। সেই **ধর্ম্ম** পালন না করলে অণুর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। সমাজের ভিতরে তার সদস্যস্বরূপ মানুষদের আচরিত কর্ম্মই সমাজের **ধর্ম্ম**। সেই **ধর্ম্ম** পালন না করলে সমাজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। প্রতিটি অস্তিত্বের বা সত্তার

ভিতরে এইরূপ নিজ নিজ **ধর্ম্ম** থাকে, যার উপর সত্তাটির টিকে থাকা নির্ভর করে। তার মানে, **কর্ম্ম** যেমন আত্ম-ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার কার্য্যাবলীকে বোঝায়, **ধর্ম্ম** তেমনি আত্ম-অস্তিত্বকে ধরে রাখার জন্য করণীয় কার্য্যাবলীকে বোঝায়। আর যেহেতু **কর্ম্মই** সেই কার্য্যাবলী, তাই **কর্ম্মই ধর্ম্ম**-পদবাচ্য।

অতএব এ জগতে প্রতিটি অস্তিত্বই তার নিজধর্ম্ম পালন ক'রে তবেই টিকে থাকে এবং সেই সুবাদে এ জগতে ধর্ম্মহীন কোনো সত্তাই নেই; সকলে আপন আপন **ধর্ম্মে** যথার্থেই ধর্ম্মপরায়ণ, ধার্ম্মিক। ধূলিকণা থেকে শুরু করে মহাবিশ্ব পর্যন্ত প্রতিটি সত্তাই **ধর্ম্ম**-পরায়ণ। অস্তিত্ব মাত্রেই, তা সে মাটির ঢেলাই হোক আর কুকুর বেড়াল ডাক্তার মাস্টার ... যেই হোক, প্রত্যেকেই যে-যার নিজের অস্তিত্বের **ধর্ম্ম** অবশ্যই মানেন, অন্যথায় তাঁর অস্তিত্বের বিপর্যয়, মৃত্যু বা বিলুপ্তি অনিবার্য।

অবশ্য অস্তিত্বসমূহের ইত্যাকার **ধর্ম্ম** স্বরূপে প্রকাশিত না হয়ে কখনো কখনো ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়, বিশেষত যখন অন্য কোনো সত্তার সঙ্গে এই ধর্ম্মপরায়ণ সত্তাসমূহের, অর্থাৎ এই বস্তু-ব্যক্তি-সমাজের সম্বন্ধ ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে। সত্তার এই প্রতিক্রিয়া-জনিত **ধর্ম্ম**-স্বরূপটিকে প্রায়শই ভিন্ন বলে মনে হয়। কিন্তু গভীরে অভিনিবেশ করলে বোঝা যায় যে, সেই প্রতিক্রিয়া-জনিত স্বরূপটি আদতে তাদের আভ্যন্তরীণ **ধর্ম্ম** থেকেই জন্ম লাভ করেছে। এটি কোনো নতুন **ধর্ম্ম** নয়; সম্বন্ধিত সত্তা দুটির আভ্যন্তরীণ **ধর্ম্মের** আত্মীয়তা ও শত্রুতার মিলিত ও নিঃসারিত ফল। (দ্র. **তট**, **তটস্থলক্ষণ**)। আজকাল একে বস্তুর 'প্রতিক্রিয়া' বলা হয়। পাশ্চাত্যে বস্তুর এই প্রতিক্রিয়াকেই বস্তুর **ধর্ম্ম** বা property বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু **ধর্ম্ম** শব্দের বানানে দুটো ম কেন? হ্যাঁ, ধর্ ক্রিয়ার সঙ্গে মন্-এর বা 'মিত'-এর যোগসাধন করতে গেলে মাঝে একটি ম্-এর আগম ঘটে। **কর্ম্ম, ঘর্ম্ম, চর্ম্ম** ... প্রভৃতি সকল সমজাতীয় শব্দের ক্ষেত্রেই এটি ঘটে। আর, সেটি কেবল জিহ্বা-যন্ত্রের সুবিধার জন্য ঘটে এমন নয়, বাস্তবেও একটি ক্রিয়ার সঙ্গে আর একটি ক্রিয়ার যোগসাধনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই পূর্বতন ক্রিয়াটিকে একটু ছাঁটকাট করে নিতে হয়, নইলে ক্রিয়াদুটি হাত ধরাধরি করতে পারে না, আগুপিছু হয়ে যায়। এই পরিস্থিতি তৈরি হয় পূর্ব্বতন ক্রিয়াটি (এখানে ধৃ বা **ধর্**) যদি আবর্ত্তন (**ঋ**) মূলক হয়। একটি মানুষ যদি বন বন করে ঘুরতে থাকে, তার হাত ধরা মুশকিল। তাই, ধৃ-কে **ধর্** করে নিলেই চলে না, তাকে **ধর্ম্**-এ পরিণত করে নিতে হয়। এবার তার সঙ্গে হাতে হাত ধরে দাঁড়িয়ে যেতে পারে **ম**। তখন '**ধর্** ক্রিয়ার মিতি (**ম্**) মিত (**ম**)' হয়ে **ধর্ম্ম**-তে পরিণত হয়ে যায়। আর তার ফলে 'ধরবার বিশেষ প্রক্রিয়ার বিশেষ এলাকা' অর্থটি **ধর্ম্ম** শব্দের মধ্যে ধরা হয়ে যায়। কিন্তু তা না করে শব্দটিকে **ধর্ম** লিখে ফেললে, তার মানে হয়ে যায় — 'ধর্ মিত যাহাতে'; অর্থাৎ, 'ধরবার বিশেষ এলাকা'। একই ঘটনা ঘটে **কর্ম্মাদি** শব্দের বেলায়।

উপরে **কর্ম্ম** ও **ধর্ম্ম** শব্দের নিহিত অর্থের ব্যাখ্যায় আমরা দেখেছি, 'করা'কে কমিয়ে শুধুমাত্র টেবিল-করার জ্ঞানে পৃথক করে না নিলে টেবিল বানানোর **কর্ম্মটি** করা যায় না; 'ধরা'কে অর্থাৎ শস্যাদি উৎপাদন ও বণ্টনে আপন **অস্তিত্ব ধারণ** করাকে পৃথক করে না নিলে কৃষকের **ধর্ম্ম** পালন করা যায় না। আপনি যদি আপনার সকল কারুকাজের জ্ঞান নিয়ে টেবিল বানাতে যান, টেবিল বানানো যাবে না; আর তাছাড়া সেরকম হওয়াও অসম্ভব।... তাই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি মান্য করতে হলে আপনাকে **কর্ম্ম, ঘর্ম্ম, চর্ম্ম, ধর্ম্ম** ... ইত্যাদি বানানে শব্দগুলি লিখতেই হবে। তবে প্রতীকী শব্দবিধিতে **কর্ম, ধর্ম** ... ইত্যাদি চলতে পারে। কারণ, তখন **কর্ম ধর্ম** শব্দের অর্থ আপনাকে শব্দদুটির ভিতর থেকে বের করতে হচ্ছে না, তখন **কর্ম** মানে work, **ধর্ম** মানে religion; শব্দের বানানের সঙ্গে যার কোনো সম্বন্ধই নেই।

উপরে **ধর্ম্ম** শব্দের **৩**-এ প্রদত্ত অর্থগুলি যাদের চিহ্নিত করে, দেখা যায় তারা কোনো না কোনোভাবে **ধর্ম্ম** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থের কোনো না কোনো রকম স্থির প্রতীকী হয়ে যাওয়া রূপ মাত্র। যেমন 'শাস্ত্রদৃষ্টকার্য্যমাত্র' শব্দটির কথাই ধরা যাক। শাস্ত্রাদিতে বা গ্রন্থাদিতে যে সকল কাজের কথা দেখতে পাওয়া যায়, সেসব প্রধানত মানুষের **নিত্যধর্ম্ম** ও **নৈমিত্তিক** ধর্ম্মের কথাই। প্রতিদিন যে খাদ্যাদি গ্রহণ, মলমূত্রাদি বর্জন ... ইত্যাদি করতে হয়, এসব হল **নিত্যধর্ম্ম**। আবার, কাউকে কেউ খুন করল, সেটা দেখে ফেললে খুনীর নাম বলে দেওয়ার জন্য মনুষ্যত্ব যে ছটফট করে, এটাও মানুষের **নিত্যধর্ম্ম**। কারও কাছে বেতন নিয়ে তার কাজ করে দেওয়া হল **নৈমিত্তিক-ধর্ম্ম**। সুতরাং **ধর্ম্ম** শব্দের প্রতীকী অর্থ রূপে 'শাস্ত্রদৃষ্টকার্য্য-মাত্র'কে উল্লেখ করাই যায়, আর ব.শ. সেটাই করেছেন। বলতে কী, ব.শ. লিখিত সমস্ত প্রতীকী অর্থগুলিই কমবেশি এই রকম।

'ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গ হতে ধর্ম উৎপন্ন হন।' — এইসব কথাবার্তা সঠিক এবং বেঠিকও। সঠিক এই জন্য যে, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধিতে এই বয়ানের অর্থ উদ্ধার করে পড়লে বোঝা যায়, এর ভিতরে ভারত সমাজের বিশেষ কালখণ্ডের বাস্তব ইতিহাসের বর্ণনা রয়েছে। আর বেঠিক এইজন্য যে, সেভাবে পড়ার পদ্ধতি সবাই ভুলে গেছেন এবং সেকারণে এগুলি পড়ে যে অর্থ বোঝেন তা কেবলমাত্র ভুলই নয়, অত্যন্ত বিভ্রান্তকারী। রবীন্দ্রনাথ তো বলেই গেছেন, ভারত যে মহাসত্য পেয়েছে, তা ঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারলে মানুষকে তা চূড়ান্ত মূঢ়তার পাঁকে ডুবিয়ে দেয়; আর পারলে মানুষ সকল প্রকার সমৃদ্ধির চূড়ায় পৌঁছতে পারে। ...

সবশেষে **ধর্ম্ম** শব্দের ব্যবহার বিষয়ে কিছু তথ্য জানা জরুরি। প্রথমত, আধুনিক শিক্ষিত বাংলাভাষী **ধর্ম্ম** শব্দটিকে ফেলে দিয়ে religion-বাচক **ধর্ম** শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু **ধর্ম্ম** শব্দটি এত ব্যাপক অর্থধারী ছিল যে, বাংলাভাষীর উত্তরাধিকারে মানুষের জীবনের ও সমাজের বিশাল অংশ জুড়ে সে বিদ্যমান ছিল। ফলে, ইংরেজিবাদী বাংলাভাষীর একগুঁয়ে চেষ্টা সত্ত্বেও **ধর্ম্ম** শব্দটি আদৌ পরিত্যক্ত হয়নি; সাধারণ বাংলাভাষীর মুখে তার ব্যবহার আজও ব্যাপকভাবে টিকে রয়েছে। তাছাড়া আজকের বাংলাভাষীর জীবনের প্রাত্যহিক প্রয়োজনই শব্দটির নবজাগরণ দাবি করছে বিপুলভাবে। একজন মজুর কিংবা কেরানি যথাসময়ে কাজে যান, নির্দেশমতো কাজ করেন, কর্ম্মান্তে বেতন নেন — ক্রিয়াভিত্তিক শব্দবিধি অনুসারে এরকম মানুষ যথার্থে **ধর্ম্মপরায়ণ, ধার্ম্মিক**। একই কারণে আপন আপন সামাজিক **নৈমিত্তিক-ধর্ম্মে** বা **কর্ম্মে** একনিষ্ঠ চাষী, জেলে,

ছুতার, কুলি, তাঁতি, শিক্ষক, ডাক্তার, সরকারি-কর্ম্মচারী ... ইত্যাদি মানুষেরা প্রত্যেকেই **ধার্ম্মিক** পদবাচ্য। কেননা, তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ **ধর্ম্ম** পালন করে থাকেন। টিকি-দাড়ি-পৈতা-টুপি পরে অদৃশ্য কোনো শাসকের প্রশংসায় যিনি সময় কাটান, তাকে আর যাই বলা যাক, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দবিধি অনুসারে **ধার্ম্মিক** বলা যায় না। একইভাবে যাঁরা শেয়ার বাজারে টাকা খাটায়, নিজে কোনো পণ্য বা পরিসেবা উৎপাদন করে না, কেবল **অধর্ম্ম**-দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে, কিংবা যারা **ধর্ম্মবৈতংসিক**, তাদেরকেও **ধার্ম্মিক** বলা যায় না।

ধর্ম্মক্ষেত্র : ২. *ধর্ম্মের ক্ষেত্র।* / ধর্ম্মের ও ধর্ম্মবৃদ্ধির ক্ষেত্র। (ব.শ.)। ৩. ধর্ম্মভূমি, ধর্ম্মকর্ম্মার্থ ভূমি, ভারত। (ব.শ.)। ৪. প্রায় অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র**।

ধর্ম্মঘট : দ্র. **ঘট, ঘটবারি**।

ধর্ম্মচক্র (ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন) : ২. *ধর্ম্মের চক্র।* ৩. ধর্ম্মসমূহ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন** — দ্র. **নেমি**। পাশ্চাত্যের মনোভূমিতে ধর্ম্মের চাকা বা wheel of religion বলে কোনো ধারণার দেখা পাওয়া যায় না। কিন্তু ধারণাটি আমাদের কমবেশি আছে। এমনভাবে আছে যে, তা প্রবাদে পরিণত হয়ে 'ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে' পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। প্রকৃতপক্ষে এ-**ধর্ম্ম** হল সামাজিক **ধর্ম্ম**, একালে যার নাম হয়ে গেছে 'আইন'। এই **ধর্ম্ম**-ধারণকারী ধর্ম্মাধিকরণকেও **ধর্ম্ম** বা আদালত বলে। এখানে **ধর্ম্মরাজ** যম থাকেন। বিচারককে আজও সেকারণেই **ধর্ম্মাবতার** বলা হয়ে থাকে। এর হাতে বিচারের মানদণ্ড, অথচ চোখ বাঁধা। দেখবার চোখ থাকা সত্ত্বেও না-দেখার বাধ্যবাধকতায় বদ্ধ। কারণ, ক-ধারায় এই হবে, খ-ধারায় ওই হবে ... ইত্যাকার যান্ত্রিক আইন মেনে তাকে বিচার করতে হয়। বাস্তবে যাই ঘটে থাকুক না কেন, তা দেখার উপায় নেই তার, তাকে কানে শুনে কাজ চালাতে হয় যন্ত্রের মতো। সেই কারণে বাংলাভাষী বিচারব্যবস্থাকে চিনেছিল **ধর্ম্মের** কল রূপে। আর, বায়ু হল মিডিয়া, প্রচার, খবর ছড়িয়ে পড়া; তা সে চিৎকৃত ঘোষণা হোক আর কানাঘুষাই হোক। সেই বায়ু বা বাতাসে খবর পৌঁছে যায় **ধর্ম্মের কলের** কানে। সে নড়ে ওঠে। তার নির্দেশে সাধু সেজে বসে থাকা অপরাধীকে গিয়ে পাকড়াও করে আদালতের পেয়াদা বা পুলিশ। এভাবেই **ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে ওঠে**। যাই হোক, সর্বপ্রকারের আইন ও আইনরক্ষককেও **ধর্ম্মই** বলা হয়। সেই আইনরক্ষকদের নিয়ে যে **চক্র** গড়ে ওঠে, তাকেই **ধর্ম্মচক্র** বলে। ...

ধর্ম্মচারী : ২. *ধর্ম্ম অনুসারে চরে বা আচরণ করে যে।* / ধর্ম্মকর্ম্ম করে যে। (ব.শ.)। ৩. যজ্ঞাদিকারক, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. সরকারের বা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট কর্ম্ম আচরণ করে যে, তাকে বলে **কর্ম্মচারী**। একইভাবে সমাজের বা দেশের সুনির্দিষ্ট সমাজধর্ম্ম আচরণ করে যে, তাকে **ধর্ম্মচারী** বলে। ব.শ. বলছেন, দেশের সুনির্দিষ্ট সমাজধর্ম্ম অনুসারে একটি কাজ হল 'যজ্ঞাদি করা'; অর্থাৎ, উৎপাদন-কর্ম্মযজ্ঞ বা উৎপাদন কর্ম্মকাণ্ড চালানো। যাঁরা **ধর্ম্মচারী তাঁরা কিছু না কিছু উৎপাদন করেন এবং** যিনি যা **উৎপাদন করেন, তিনি সেই ধর্ম্মের ধর্ম্মচারী**। যাঁরা নিজেরা কোনো **কিছু উৎপাদন করেন** না, অন্যের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে বেসাতি করে, তাঁরা **হলেন অধর্ম্মচারী**। দ্র. **অধর্ম্ম, অধর্ম্মের মর্য্যাদা**।

ধর্ম্মণ : ২. *ধর্ম্ম অন যাহাতে।* ৩. বৃক্ষবিশেষ, ধামনিগাছ, ঢেমনা সাপ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **ঢেমনা** সাপের ভিতরে, ধামনিগাছের ভিতরে কোথায় কীভাবে **ধর্ম্মণ** ক্রিয়াটি সক্রিয়, তা এখনও বোঝা যায়নি।

ধর্ম্মতলা : ২. *ধর্ম্ম-বৃক্ষের তলার যে স্থান।* ৩. ধর্ম্মঠাকুরের অধিষ্ঠিত ও পূজার্থ স্থান। (ব.শ.)। ৪. বর্তমানে কলকাতার esplanade অঞ্চলকে **ধর্ম্মতলা** বলা হয়ে থাকে। ৫. প্রাচীন ভারতের **ধর্ম্মতলা** নামে বেশ কিছু স্থানের নাম পাওয়া যায়। সেই স্থানগুলিতে সেই সেই অঞ্চলের মানুষেরা একত্রিত হয়ে সামাজিক **ধর্ম্ম**-এর গ্লানি, হানি, পুনঃপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন বলেই মনে হয়। সেই কারণে সেই স্থানগুলির নাম **ধর্ম্মতলা** হয়ে থাকবে। এমন হতেই পারে, যে, সেই স্থানে সেই সব **ধর্ম্মালোচনা** করার সময় **ধর্ম্মঠাকুর**-এর পূজাও করা হত। কিন্তু পরে তা বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হয়। এমনিতে **ধর্ম্মতলাকে** ধর্ম্মঠাকুরের পূজাস্থান বলে দিয়ে, তার সামাজিক-ধর্ম্মার্থকে বাদ দিয়ে, শব্দটিকে খানিকটা প্রতীকী শব্দে পরিণত করে ফেলা হয়েছে।

শহর এবং তার পাশের কেল্লা বা গড়-এর মাঝখানের মাঠকে ইংরেজের সংস্কৃতিতে esplanade বলে। esplanade শব্দের সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'গড়ের মাঠ'। লন্ডন শহরেও esplanade ছিল এবং বোধকরি এখনও আছে। আমাদের পরম মিত্র স্বর্গীয় মীজানুর রহমান কলকাতার আদি বাসিন্দা ছিলেন। esplanade অঞ্চল বোঝাতে তিনি অনায়াস স্বাভাবিকতায় 'গড়ের মাঠ' শব্দটি ব্যবহার করতেন। ১৯৫০-৬০ অবধি লোকে ঐ অঞ্চলকে 'গড়ের মাঠ'ই বলত। হুগলির কোন্নগর অঞ্চলে একটি রাস্তা বা অঞ্চল রয়েছে, যার নাম ধর্মডাঙা। কোন্নগরের দক্ষিণের গ্রাম ভদ্রকালীতে ধর্মতলা নামে রাস্তা রয়েছে। মনে হয়, বটতলা, নিমতলা, অশথতলা, পোড়া অশথতলা, বকুলতলা, শিবতলা, পঞ্চাননতলা, বেলতলা, পেয়ারাতলা, কদমতলা — ইত্যাদি নামাঙ্কিত অঞ্চল বা রাস্তা বহু গ্রামেই পাওয়া যাবে। কোনো না কোনো সময়ে সেই '...তলা' নামাঙ্কিত স্থানটি ঐ অঞ্চলের মানুষের কাছে 'বিশেষ স্থান' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। তবে যে স্থানটির নামের সঙ্গে **ধর্ম্ম** শব্দটি যুক্ত পাওয়া যায়, সেখানে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষজনের সামাজিক নিয়ম বা আইনের সম্পর্ক থেকে থাকবে; সে ইতিহাস লোকের মনে থাকুক চাই না থাকুক।

ধর্ম্মধ্বজ : ২. *ধর্ম্ম ধ্বজা (ধারণাবাহী বক্তব্য জনন করতে থাকে যে) যাহার।* ৩. মিথিলার জনকবংশের একজন রাজা। দণ্ডনীতি, সন্ন্যাসধর্ম ও মোক্ষশাস্ত্রে এঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ... (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. বোঝা যাচ্ছে যে, **জনক** রাজার কালে সমাজে

একটি সত্তা (একজন বা কয়েকজন মানুষ) যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সেই সত্তা সামাজিক রীতিনীতি বা আইন ও মানুষের জীবন**ধর্ম্মের** বিষয়ে যা যা বলতেন বা প্রচার করতেন, তা জনসাধারণ্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। সেই কারণে সেই সত্তাকে **ধর্ম্মধ্বজ** নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। **ধ্বজা** ওড়ানো মানেই বিশেষ ধারণার কথা বলতে থাকে বা জনিত হতে থাকে, এমন পতাকা ওড়ানো। তবে **ধর্ম্মধ্বজী** শব্দটির অর্থ আমাদের জানায় যে, সত্তাটি একসময় মৌলবাদী হয়ে কদাচারী হয়ে গিয়েছিল। **ধর্ম্মধ্বজা**কে সে তুলে ধরত **ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা** বা **ধর্ম্মরক্ষার** জন্য নয়, নিজের বাহ্যিক সুখসুবিধার জন্য।

ধর্ম্মধ্বজী : ২. *ধর্ম্ম-এর ধ্বজাকে গতিশীলভাবে ধারণ করে যে।* / যে জীবিকার্থ জটাদিচিহ্ন ধারণ করে; যে জনসমক্ষে ধর্ম্মাচরণ ও স্বতঃ পরতঃ দাম্ভিকতা প্রচার করে। (ব.শ.)। ৩. লিঙ্গবৃত্তি। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **ধর্ম্মধ্বজ**।

ধর্ম্মনাশ : ২. *ধর্ম্ম নষ্ট হয় যাহাতে।* ৩. ধর্ম্মহানি, পুণ্যক্ষয়, সতীধর্ম্মহানি, সতীত্বনাশ। (ব.শ.)। ৪. প্রায় অপ্রচলিত। ৫. অজস্র শব্দের ক্ষেত্রে আমরা জানাচ্ছি যে, শব্দটি এখন অপ্রচলিত। শব্দটির প্রচলন না থাকায় আমাদের কী ক্ষতি হচ্ছে, প্রচলিত থাকলে কী লাভ হত, তার উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। **ধর্ম্মনাশ** শব্দটির অপ্রচলন আমাদের কী ক্ষতি করেছে ও করছে, এবং শব্দটি প্রচলিত থাকলে কী সুবিধা হত, তা একবার ভেবে দেখা যেতে পারে। **ধর্ম্ম** শব্দটির অর্থ উদ্ধার করে আমরা জেনেছি যে, এই ধূলিকণা থেকে মহাবিশ্ব পর্যন্ত ক্ষুদ্র থেকে অতিবৃহৎ প্রতিটি সত্তারই নিজ নিজ **ধর্ম্ম** আছে। এর মধ্যে এমন একটি সত্তাও নেই এবং থাকতেও পারে না, যার **ধর্ম্ম** নষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তার অস্তিত্ব টিকে রয়েছে। তার মানে যে সত্তার **ধর্ম্ম** নষ্ট হয়ে গেছে, সেই বাস্তবে নেই। তাহলে উপরে ব.শ. **ধর্ম্মনাশের** কথা বলছেন কেন, সতীধর্ম্মনাশের কথা বলছেন কেন। বলছেন এইজন্য যে, **ধর্ম্মনাশ** কথাটি কেবলমাত্র মানুষের সমাজ**ধর্ম্মের** ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়। সমাজে কোনো কোনো মানুষ, কোনো কোনো সামাজিক গোষ্ঠী, তাদের সামাজিক-**ধর্ম্ম** মানছে না, তাদের **ধর্ম্ম**হানি হচ্ছে। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষা দিচ্ছে না, ডাক্তার রুগীকে নিরোগ করছে না, কর্ম্মচারী কর্ম্ম করছে না, দেশপরিচালক দেশকে পরিচালনা করার চেয়ে অধিক পরিমাণে আত্মসেবার কাজে নিয়োজিত আছে ... ইত্যাদি। এই ব্যাপারগুলি সকলের চোখের সামনে প্রতিনিয়ত ঘটছে এবং তার কুফল ফলছে, গোটা সমাজ কলুষিত হয়ে উঠছে, মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। অথচ ব্যাপারটি বলার জন্য বাংলাভাষীর মুখে ঠিকঠাক বয়ান নেই। যে বয়ান আছে, তা কুকর্ম্ম বা অধর্ম্মকে, কুকর্ম্মকারীকে বা অধর্ম্মচারীকে সরাসরি শনাক্ত করছে না, বিষবৃক্ষের দিকে আঙুল না দেখিয়ে গোটা বনটির দিকে আঙুল দেখাচ্ছে। অথচ 'এরা মানুষের **ধর্ম্ম** নষ্ট করছে, মানুষকে নিজ নিজ **ধর্ম্ম** পালন করতে দিচ্ছে না, ডাক্তারকে ডাক্তারি করতে দিচ্ছে না, শিক্ষককে শিক্ষকতা করতে দিচ্ছে না ... ইত্যাদি; এককথায় এরা মানুষের ও সমাজের **ধর্ম্মনাশ** করছে' — এটুকু বললেই কাজের কথাটি বলা হয়ে যেত। ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ শব্দের মাধ্যমেই ক্রিয়াকারীকে দেখিয়ে দেয়, তার অন্য বয়ান লাগে না। **ধর্ম্মনাশ** বলে দিলে যতখানি বলা হয়ে যায়, তাকে প্রতীকী শব্দ দিয়ে বলতে গেলে কমপক্ষে পাতার বয়ান দিতে হয়। আর **ধর্ম্মনাশ**কে সতীত্বনাশ বললে **ধর্ম্মনাশের** ক্রিয়াটিকে সিন্ধু থেকে বিন্দুতে সংকুচিত করে ফেলা হয়ে যায়।

ধর্ম্মনিষ্ঠ : ২. *ধর্ম্মে নিষ্ঠাবান যে।* / ধর্ম্মে আস্থাবান যিনি। (ব.শ.)। ৩. ধার্ম্মিক। (ব.শ.)। ৪. কম প্রচলিত। ৫. সেকালে একজন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্য বা **ধর্ম্ম** অনুসরণ করে জীবন কাটালে তাঁকে বলা হত **ধর্ম্মনিষ্ঠ**। একালে যদি দেখা যায়, একজন শিক্ষক চারিদিকের গণ্ডগোলের ও **ধর্ম্মনাশের** আবহাওয়ার মধ্যেও নিজের **ধর্ম্ম** পালন (ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি) করে চলেছেন, একজন সরকারি কর্ম্মচারী শত বন্‌ধ্ ঘেরাও হরতাল ইত্যাদির মধ্যেও কর্ম্মচারীর **ধর্ম্ম** পালন (যথাসময়ে যথাবিহিত সরকারি নির্দেশ বাস্তবায়িত করা) করে চলেছেন ... তাহলে এঁদেরকেও ক্রিয়াভিত্তিক শব্দবিধির নিয়মে বলতে হবে **ধর্ম্মনিষ্ঠ**।

ধর্ম্মপত্নী : ২. *ধর্ম্ম-অনুসারে পত্নী যে।* ৩. ধর্ম্মার্থ বা অগ্ন্যাধানাৎ অর্থ দার। (ব.শ.)। ৪. 'সামাজিক নিয়মে বিবাহিত স্ত্রী' অর্থে প্রচলিত। ৫. সেকালে সামাজিক রীতিনীতি বা আইনকে **ধর্ম্ম** বলা হত, একালে সামাজিক রীতিনীতি বা **ধর্ম্ম**কে **আইন** বলা হয়। সেই সুবাদে 'আইনানুসারে পত্নী'কে সেকালে **ধর্ম্মপত্নী** এবং একালে legally wife বলা হয়ে থাকে।

ধর্ম্মপুত্র (ধর্ম্মবেটা) : ২. *ধর্ম্ম অনুসারে পুত্র যে।* / পিতার ধর্ম্ম হেতু জাত যে; যে পুত্রের জন্মে পিতার ঋণশোধ ও অমৃতত্ব হয়, তাদৃশ পুত্র। (ব.শ.)। ৩. ধর্ম্মার্থ পুত্র, ঔরস পুত্র বা জ্যেষ্ঠ পুত্র। যুধিষ্ঠির। (ব.শ.)। যুধিষ্ঠিরের অন্য নাম। দুর্বাসার মন্ত্রপ্রভাবে কুন্তী ধর্মকে (যমকে) আকর্ষণ করেন। যমের ঔরসে ও কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। দ্র. দুর্বাসা, কুন্তী। ((পৌ.অ.)। ৪. প্রায় অপ্রচলিত। ৫. গ্রামবাংলায় আজও '**ধর্ম্মবেটা**' শব্দটির প্রচলন কমবেশি রয়েছে। বাংলার অ্যাকাডেমিগুলিতে **ধর্ম্মপুত্র** শব্দটি কমবেশি প্রচলিত থাকলেও তার অর্থ 'যুধিষ্ঠির', যা কিনা মহাভারতের একটি পদবীহীন চরিত্র এবং যার স্বরূপ কেউই জানে না। সেকেলে ভাষায় 'আইনত পুত্র' অর্থে শব্দটির প্রচলন হলেও পরে পরে শব্দটির মানে দাঁড়িয়ে যায় 'পাতানো পুত্র'। এমন ঘটনার কথাও আমরা শুনেছি, যে, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ভয়ে পশ্চিমবাংলায় আগত জনৈকা হিন্দু মা পরের বছর কালীপূজায় নিজের ছেলেদের বললেন, 'আমার ধর্ম্মবেটা আমিনুলকে চিঠি দিয়ে দাও, অমুক তারিখে আমি পূর্ববঙ্গে আমার শ্বশুরের ভিটায় যাব, কালীপূজা করে ফিরে আসব, সে যেন সব ব্যবস্থা করে।' এবং সেই তারিখে তিনি স্টিমার থেকে নামলেন এবং অপেক্ষারত **ধর্ম্মবেটার** হাত ধরে ভিটায় পা রাখলেন, পূজাদি সমাপন করে ফিরে এলেন পশ্চিমবঙ্গে। এরকম হয়, এরকম হত।

ধর্ম্মবাপ, ধর্ম্মবাবা : ২. *ধর্ম্ম অনুসারে বাপ, বাবা।* ৩. সখ্যাদি ধর্ম্ম হেতু প্রতিপন্ন তাত। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় এখনও কমবেশি প্রচলিত। ৫. প্রতিপন্ন তাত বা পাতানো বাবা সম্পর্কটি এখন গ্রামবাংলাতেও খুব একটা দেখা যায় না। শব্দানুসারে এটি হওয়ার কথা 'আইনত বাবা'।

ধর্ম্মবাহন : ২. / বৃষরূপী **ধর্ম্ম** বাহন যাহার। (ব.শ.)। ৩. শিব। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **বাহন**। মানুষের সমাজে যে মানুষেরা নতুন জ্ঞান অর্জন করেন, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করেন, নতুন নতুন সৃজন করেন, জ্ঞানকর্মের যোগসাধন করেন বা থিয়োরি ও প্র্যাকটিসকে মেলান, সেকালের শব্দশাস্ত্রীরা সেই উদ্ভাবক সত্তাটিকে নাম দিয়েছিলেন **শিব**। এই **শিবসত্তাটিকে** যাঁরা বহন করে নিয়ে চলতেন তাঁরা স্বভাবত বৃষস্বরূপ ছিলেন। এই বৃষকে একসময় **ধর্ম্মের ষাঁড়**ও বলা হত। যেহেতু সেই ষাঁড় বা বৃষই **শিবসত্তাকে** বহন করতেন, সেই কারণে **শিব**কে বলা হত বৃষবাহন বা ধর্ম্মবাহন। (দ্র. **ধর্ম্মরাজ**।) এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে আমাদের 'গ' গ্রন্থের পরিশিষ্ট অধ্যায়ে 'বৃষোৎসর্গ' শীর্ষক রচনায়।

ধর্ম্মবীর : ২. *ধর্ম্মে বীর যিনি।* ৩. ধর্ম্মসমন্বিত বীর, বৈদিক কর্ম্মে উৎসাহবান বীরবিশেষ — যুধিষ্ঠিরাদি। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এখন আমরা **ধর্ম্ম** শব্দের মানে জানি। সেই সুবাদে যে কোনো স্থান-কালে যিনিই আপন **ধর্ম্মে** বীরত্ব দেখাবেন, সামাজিক **ধর্ম্ম** পালনে বীরত্ব দেখাবেন, তিনিই **ধর্ম্মবীর** শব্দবাচ্য হবেন। কেবলমাত্র বৈদিক যুগের সামাজিক **ধর্ম্ম** যাঁরা বীরত্বের সঙ্গে পালন করেছিলেন, তাঁরা ছাড়া আর কোনো কালে কোনো সত্তাই **ধর্ম্মবীর** পদবাচ্য হবেন না, শব্দের এমন একচেটিয়া অধিকার হতেই পারে না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কি **ধর্ম্মবীর** ছিলেন না? তবে আজ একথা মেনে নিতেই হবে যে, বিশ্বায়নের সাম্প্রতিক কালে **অধর্ম্মের** মর্য্যাদা এত ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, **ধর্ম্মেরই** কোনো মর্য্যাদা নেই, গৌরব নেই; **ধর্ম্মবীরের** স্বীকৃতি ও মর্য্যাদার তো প্রশ্নই আসে না।

ধর্ম্মবৈতংসিক : ২. / ধার্ম্মিকত্ব প্রচারার্থ পাপকর্ম্মে ধনোপার্জ্জন করিয়া যে দান করে। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. একালে এইরূপ কর্ম্ম করেন, এমন বহু **ধর্ম্মবৈতংসিক** বিদ্যমান। কিন্তু তাদেরকে চিহ্নিত করার শব্দ নেই। এখন সমাজের সর্বোচ্চ আসনে **ধর্ম্মবৈতংসিকেরাই** বসে গেছে। এখন কে তাদের **ধর্ম্মবৈতংসিক** নামে ডাকবে! ব্যাপারটি সত্যি হলেও 'নিজের ঘরের কোণে বসে রাজার মাকে কানীবুড়ি' বলে গালি দেওয়া যায়, কিন্তু প্রকাশ্য রাজপথে সে সাহস দেখানো কঠিন কাজ।

ধর্ম্মভীরু : ২. *ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে, এই ভয়ে ভীত যে।* ৩. ধর্ম্মহানিতে ভয়শীল, অধর্ম্মভীরু। (ব.শ.)। ৪. God-fearing অর্থে প্রচলিত। ৫. আগে কথাটির মানে ছিল এরকম — **ধর্ম্মের** হানি হলে অস্তিত্ব সংকটগ্রস্ত হয়, **ধর্ম্ম** নষ্ট হয়ে গেলে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। অতএব অস্তিত্ব-সচেতন সত্তা মাত্রেরই আপন **ধর্ম্ম** প্রতিষ্ঠা করা, রক্ষা করা একান্ত জরুরি কর্তব্য বলে মনে করে। অর্থাৎ কিনা, অস্তিত্বমাত্রেই **ধর্ম্মভীরু**। **ঝাঁকজীব-রূপী** মানুষও স্বভাবতই **ধর্ম্মভীরু**। যেকারণে 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম্ম ভয়াবহ' কথাটি বাংলায় প্রবাদ হয়ে রয়েছে। কিন্তু পরে এই ধারণাটিই প্রায় বিলুপ্ত হল। **ধর্ম্ম** বলতে বোঝা হল মন্দির-মসজিদ-গির্জা-গুরুদ্বারাদিতে যে ঈশ্বর অধিষ্ঠান করেন তাঁকে এবং তাঁর ঘোষিত মানুষিক কর্তব্য ইত্যাদিকে। ফলে **ধর্ম্মভীরু** কথাটির মানে গিয়ে দাঁড়াল God-fearing-এ।

ধর্ম্মরাজ (ধর্ম্মরায়) : ২. / ধর্ম্মের রাজা; অথবা, যিনি ধর্ম্মানুসারে দণ্ডের বিধান করেন। (ব.শ.)। ৩. যম, জিন, রাজা, যুধিষ্ঠির, ধর্মঠাকুর। (ব.শ.)। যমের অন্য নাম ধর্ম। ইনি মৃতদের ধর্মাধর্মের বিচারকর্তা বলে ধর্মরাজ নামে বিখ্যাত। জীবদের পাপপুণ্যের ইনি বিচার কর্তা। এঁর বাহন মহিষ এবং আয়ুধ দণ্ড। (পৌ.অ.)। ৪. প্রায় অপ্রচলিত। ৫. আমাদের শব্দশাস্ত্রী পূর্বপুরুষগণের কতখানি সূক্ষ্মবোধ ছিল, তার একটি প্রমাণ **ধর্ম্মরাজ**-এর বাহনরূপে **মহিষ**কে শনাক্ত করার বোধ। একটু আগেই আমরা জেনেছি যে, **ধর্ম্মবাহন** হলেন শিব। আর এখানে দেখছি, **ধর্ম্মের** বা **ধর্ম্মরাজ** যমের বাহন হল মহিষ। ব্যাপারটি কী?

আদিম যৌথসমাজে, যখন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তখন সমাজ পরিচালক **শিব**, সামাজিক রীতিনীতি তখন যান্ত্রিক নয়। কিন্তু রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত, তখন সমাজ-পরিচালক **দক্ষ**; সামাজিক রীতিনীতি তখন আইনে পরিণত যা স্বভাবত যন্ত্রগুণসম্পন্ন। এও **ধর্ম্ম** বটে, কিন্তু এই **ধর্ম্ম** রাজত্ব করে; এই আইন দ্বারা শাসনকারী সত্তা তখন **যম**। এর বাহন বৃষ হতে পারে না। যে সত্তা তখন **যমের** বাহন হতে পারে, সে হল **মহিষ**। কেন, সেকথা **মহিষ**কে চিনতে পারলেই বুঝতে পারা যায়। দ্র. **মহিষ**।

ধর্ম্মশালা : ২. *ধর্ম্মের শালা।* ৩. ধর্ম্মাধিকরণ, বিচারালয়, ধর্ম্মার্থ অন্নাদিদান-শালা। (ব.শ.)। ৪. তীর্থযাত্রীদের জন্য কম খরচের guest-house বোঝাতে শব্দটির ব্যবহার চলে। ৫. যে কর্ম্মক্ষেত্রে যান্ত্রিক নিয়মে কোনো কর্ম্ম করা হয়, তাকে **শালা** বলে; যেমন কামারশালা, **পাঠশালা**, ঢেঁকিশাল ইত্যাদি। শব্দার্থের নিয়মানুসারে **ধর্ম্মশালা** সেই স্থানকে বোঝানোর কথা, যেখানে যান্ত্রিক আইনানুসারে বিচারাদি করা হয়। কিন্তু শব্দটির সেরূপ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। যে-ব্যবহারটি দেখা যায়, তা হল — পুণ্য অর্জ্জিত হবে এই আশায় যে স্থানে তীর্থযাত্রীদের বিনা খরচে বা অত্যন্ত স্বল্পব্যয়ে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাকেই **ধর্ম্মশালা** বলা হয়ে থাকে।

ধর্ম্মশাস্ত্র (ধর্ম্মশাসন) : ২. *যে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা (প্রজা) শাসন সাধিত হয়।* ৩. ধর্ম্মোপদেশ, মনু-আদি কৃত ধর্ম্মপ্রতিপাদক স্মৃতিগ্রন্থ। (ব.শ.)। ইহা হিন্দুদের ধর্মপ্রতিপাদক গ্রন্থ। ইহাকে আইন-গ্রন্থও বলা হয়। পূর্বে প্রধানতঃ মনুস্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি প্রভৃতিকে ধর্মশাস্ত্র বলা হত। পরে ভগবান হতে ঋষিদের প্রাপ্ত, যা পরে স্মৃতি হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তাহাও ধর্মশাস্ত্র বলে কথিত হয়। এই ধর্মশাস্ত্র তিনটি গুণবিশিষ্ট ছিল — আচার, ব্যবহার, প্রায়শ্চিত্ত। এই সব

অনুপ্রাণিত আইনজ্ঞ ঋষিরা সংখ্যায় ১৮ জন; যদিও অনেক স্থলে ৪২ জনের নাম অনেক সময় উল্লিখিত হয়। অবশ্য মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের স্থান অনেক উচ্চে এবং এঁদের বাদ দিয়েই শাস্ত্রজ্ঞ অনুপ্রাণিত ঋষির সংখ্যা ১৮ জন। এঁদের নাম হচ্ছে — অত্রি, বিষ্ণু, হারিত, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ভ, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, সাতাতপ, ও বশিষ্ঠ। এই সব নাম ছাড়া আরও কতকগুলি নাম উল্লিখিত হয়; যেমন নারদ, ভৃগু, মরীচি, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র ও বৌধায়ন। (পৌ.অ.)। ৪. religious book অর্থে শব্দটি প্রচলিত। ৫. book বললে একটি জড়বস্তু বোঝায়। **শাস্ত্র** কিন্তু তা নয়। 'যার দ্বারা শাসন সাধিত হয়' তাকে **শাস্ত্র** বলে। **ধর্ম্মোপদেশ** যে শাস্ত্রে লিখিত থাকে তাকে **ধর্ম্মশাস্ত্র** বলে। **ধর্ম্ম** যতদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক **ধর্ম্ম** রূপে থাকে, ততদিন তাকে উপদেশ আকারে লেখার দরকার হয় না; কৃত্রিম হয়ে যান্ত্রিক হয়ে গেলেই তাকে উপদেশ আকারে লিখতে হয়, শিলালিপিতে খোদাই করে প্রচার করতে হয়। ...

ধর্ম্মষাঁড় : ৫. *দ্র.* **ধর্ম্মবাহন**। আমাদের 'গ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে 'বৃষোৎসর্গ' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

ধর্ম্মাধিকরণ (ধর্ম্মাধিকার, ধর্ম্মাধিষ্ঠান, ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ধর্ম্মাবতার, ধর্ম্মাসন, ধর্ম্মেন্দ্র) : ১. ধর্ম্ম + অধি + ✓কৃ + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। ২. ***ধর্ম্মাধিকরণ*** = *ধর্ম্মের অধিকরণ। (দ্র.* ***অধিকরণ****)* ***ধর্ম্মাধিকার*** = ***ধর্ম্মের*** *অধিকার। (দ্র.* ***অধিকার****)।* ***ধর্ম্মাধিষ্ঠান*** = *যে স্থানে* ***ধর্ম্মের*** *অধিষ্ঠান ঘটিয়াছে।* ***ধর্ম্মাধ্যক্ষ*** = ***ধর্ম্মের*** *অধ্যক্ষ।* ***ধর্ম্মাবতার*** = ***ধর্ম্মর*** *অবতার।* ***ধর্ম্মাসন*** = ***ধর্ম্মের*** *আসন।* ***ধর্ম্মেন্দ্র*** = ***ধর্ম্মে*** *ইন্দ্র।* ৩. **ধর্ম্মাধিকরণ** = রাজার বা রাজপুরুষের ব্যবহারদর্শনস্থান, বিচারালয়, ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত পুরুষ, বিচারক, ধর্ম্মাধ্যক্ষ। **ধর্ম্মাধিকার** = বিচারাধিকার, ব্যবহারদর্শনকার্য্য, রাজকার্য্যপর্য্যবেক্ষণ। **ধর্ম্মাধিষ্ঠান** = ধর্ম্মাধিকরণ, বিচারালয়। **ধর্ম্মাধ্যক্ষ** = ব্যবহারে অধ্যক্ষ, বিচারক, বিষ্ণু। **ধর্ম্মাবতার** = ধর্ম্মের অবতার, নররূপী ধর্ম্ম, বিচারক, প্রভু, হুজুর। **ধর্ম্মাসন** = ধর্ম্মের অর্থাৎ ধর্ম্মদর্শনার্থ বিচারকের আসন। **ধর্ম্মেন্দ্র** = ধর্ম্মরাজ, যম। (ব.শ.)। ৪. আদালত বা তৎসংশ্লিষ্ট সত্তাগুলিকে বোঝাতে প্রচলিত থাকলেও শব্দগুলির প্রচলন খুবই কমে গেছে এবং পরিবর্তে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার তাদের স্থান দখল করেছে। ৫. **ধর্ম্ম** শব্দের মানে ক্রমে স্থির রূপ নিতে নিতে একসময় সম্পূর্ণরূপে আইনে বা যম-এ পরিণত হয়ে যায়। এবং আইন-আদালত বোঝাতে **ধর্ম্ম** শব্দের ব্যবহার প্রায় প্রতীকী ভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। উপরোক্ত শব্দগুলি তারই নিদর্শন।

ধর্ম্মারণ্য : ১. ধর্ম্ম + অরণ্য। ২. *যে* ***অরণ্যে*** *ধর্ম্মাচরণ করা হয়। /* ধর্ম্মের বা ধর্ম্মাচরণার্থ বন। (ব.শ.)। ৩. তাপসসেবিত বন, তপোবন, পুরবিশেষ, তীর্থবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অরণ্য, তপোবন**। কেউ যখন কারও নিমিত্ত কোনো কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মকে নৈমিত্তিক **কর্ম্ম** বলে। সেই হিসেবে একালের সকল 'পরিষেবা', তা সে ডাক্তারি, মাস্টারি, কুলিগিরি, চাকরি ... যাই হোক না কেন, সে সবই হল নৈমিত্তিক **ধর্ম্ম**-পালন। সেই **ধর্ম্ম** যে **অরণ্যে** পালন করা হয়, তাকে **ধর্ম্মারণ্য** বলে।

ধর্ষ (ধর্ষক, ধর্ষণ, ধর্ষণী, ধর্ষিত, ধর্ষিতা, ধর্ষী) : ১. ✓ধৃষ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ধর্ষ*** = *ধর্ দিশাগ্রস্ত যাহাতে; ধারণপূর্ব্বক দিশাগ্রস্ত শক্তিক্ষেপণ যাহাতে।* ***ধর্ষক*** = ***ধর্ষ*** *করে যে।* ***ধর্ষণ*** = ***ধর্ষ*** *অন যাহাতে।* ***ধর্ষণী*** = ***ধর্ষণ*** *গতিশীলভাবে ধারিত যাহাতে।* ***ধর্ষিত*** = ***ধর্ষ*** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* ***ধর্ষিতা*** = ***ধর্ষিত****-এর আধার-প্রকৃতি যে।* ***ধর্ষী*** = ***ধর্ষ****-এর গতিশীল আধার যে।* ৩. **ধর্ষ** = সংহতি, রাশীকরণ, হিংসা, অমর্ষ, অভিভব, প্রসহন, শক্তিবন্ধন, প্রগল্ভতা, স্ত্রী-দূষণ। **ধর্ষক** = হিংসক, অভিভবকারক, অসহিষ্ণু, দূষক, নট, পারদারিক। **ধর্ষণ** = ধর্ষকারক, পরিভব, অবমাননা। **ধর্ষণী** = অভিসারিকা, বন্ধকী, অসতী। **ধর্ষিত** = হিংসিত, পরিভূত, দূষিত, পরিভব, প্রসহন, মৈথুন। **ধর্ষিতা** = অসতী, কুলটা। **ধর্ষী** = হিংসক, অবিনীত, অভিভবকারী, দূষয়িতা, স্ত্রী-ধর্ষক। (ব.শ.)। ৪. **ধর্ষক, ধর্ষণ, ধর্ষিতা** শব্দ তিনটি যথাক্রমে rapist, rape, raped অর্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **দুর্দ্ধর্ষ**। কাউকে ধারণ করে বা ধ'রে বা ধরাবাঁধা করে তাতে একমুখী শক্তিক্ষেপণ করাকে **ধর্ষ** বলে। অতএব এই **ধর্ষ** আটার গোলাতে ঘি নুন দেওয়া হতে পারে, একান্ত অনিচ্ছুক শিশু-কিশোর কিংবা জেলখানার কয়েদিদের শিক্ষার বা সভ্যতার পাঠ দেওয়া হতে পারে ... এরকম অনেক কিছুই হতে পারে; এমনকি কোনো নারীতে বলপূর্ব্বক বীর্য্যনিষেক করাও হতে পারে। ব্যাপারটিকে আরও বড় প্রেক্ষিতে দেখলে আমরা বলতে পারি — মিলিটারির সাহায্যে একটি জাতিকে পদানত করে তার সর্বস্ব হরণ করাকেও **ধর্ষ** করা বলা যেতে পারে। এই **ধর্ষ** ক্রিয়া অন (on) থাকলে বা চলতে থাকলে তাকে **ধর্ষণ** বলে। ...

ধার (ধারক, ধার-ধারা, ধারণ, ধারণা, ধারণীয়, ধার্য্য) : ১. ✓ধারি + অ (অচ্, অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ধার*** = ***ধর*** *হইতে জাত।* ***ধারক*** = ***ধার*** *করে যে।* ***ধার-ধারা*** = ***ধার*** *করা ক্রিয়াটি থাকে যাহাতে।* ***ধারণ*** = ***ধার*** *অন (on) যাহাতে।* ***ধারণা*** = ***ধারণ****-এর আধার যে।* ***ধারণীয়*** = ***ধারণ****-এর গতিশীল আধার যায় যাহাতে।* ***ধার্য্য*** = ***ধার****-এর যাওয়া থাকে যাহাতে। /* **ধার** = দ্রব দ্রব্যের অবিচ্ছেদে পাত (যাহাতে)। **ধারক** = যাহাতে মল ধারণ বা বন্ধ করে। (ব.শ.)। ৩. **ধার** = ধারক, বিষ্ণু, গভীর, প্রান্ত, খড়্গাদির প্রান্তভাগ, প্রস্তরভেদ, করকা, ঋণ, জলধারাবর্ষণ, ধারাসম্বন্ধী জল; (ঋণসাদৃশ্যে) অবশ্যকর্তব্য প্রত্যুপকার, বন্ধকী দ্রব্যের বিনিময়ে লব্ধ দ্রব্য, অস্ত্রের পাতার তীক্ষ্ণ ভাগ, তীক্ষ্ণতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, প্রভাব, জলপ্রবাহ, প্রবাহ, **ধারক** = ধারণকর্ত্তা, কলস, পাত্র, অধমর্ণ। **ধার-ধারা** = ঋণবদ্ধ হওয়া, অপেক্ষা করা, তক্কা রাখা। **ধারণ** = ধরণ, পরিধান, নিগ্রহ, চিত্তসমাধান, গৃহীত বিষয়ের স্মৃতিরক্ষণ, মনে রাখা, ঋণগ্রহণ, ধারা। **ধারণা** = বিচারণ, যমাদি যোগাঙ্গের অন্যতম, ধৈর্য্য, মনোনিগ্রহ, নিশ্চয়, বিচারণা, বিধারণ, ন্যায়পথস্থিতি, সংস্থা, মর্য্যাদা,

বুদ্ধিভেদ। **ধারণীয়** = ধারণার্হ, ধার্য্য। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। **৫. ধার** একই সঙ্গে flow, side, edge, sharpness, loan ... ইত্যাদি বিষয়কে বোঝাচ্ছে কীভাবে। বোঝাচ্ছে এইভাবে — দশরথ থেকে যেমন দাশরথি হয়, **কর** থেকে **কার** হয়, ঠিক একই নিয়মে **ধর** থেকে **ধার** শব্দটি প্রসূত হয়; অনেকটা **ভর** থেকে যেমন **ভার** হয়, সেইরকম। আপনি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, আর একজন সেটি **ধরছে**, আপনি বলছেন '**ধর**', সে হাত পেতে **ধরছে**। ফলে **ধর** বা **ধরা** পরিণত হচ্ছে **ধার**-এ। যেহেতু আপনি দিচ্ছেন, আর সে হাত পেতে নিচ্ছে, তাই তার গৃহীত **ধারটি** ঋণও হতে পারে; বিশেষত সেই **ধার** যখন **ঋণ**-গ্রহীতাকে এক অদৃশ্য মানসিক বন্ধনে বেঁধে **ধরে** রাখে। তবে, আপনি যদি দিতেই থাকেন, আর সে যদি ধরতেই থাকে, তার এই **ধার** (বা **ধরণ** ও **ধারণ**) ক্রমান্বয়ে চলতে থাকবে। তখন স্বভাবতই একাদিক্রমে চলতে থাকা এই **ধার**-এর থেকে **ধারার** জন্ম না হয়ে পারে না।

কিন্তু এই **ধার** কেমন করে তীক্ষ্ণতা বা প্রান্ত হয়ে যাচ্ছে? হচ্ছে এইভাবে — **ধার** ধারিত হয় **আধার**-এ। আধার ছাপিয়ে আধারের প্রান্ত থেকে **ধারার** সূচনা হয়। তাই আধারের **ধার**-এর পরই **ধারার ধারাবাহিকতা**। সমভূমির মাঝ দিয়ে প্রবাহিত নদীতে সমভূমির সমস্ত জল গিয়ে পড়ে। সেই কারণে ভূমি ও নদীর সংযোগস্থলকে নদীর **ধার** বলে। সমভূমির প্রান্ত বা **ধার**-এর পরই নদী-**ধারার** প্রবাহ। পরে পরে যে কোনো বস্তু বা বিষয়ের প্রান্তকেই **ধার** বলার চল হয়ে যায়। কিন্তু তীক্ষ্ণতাকে **ধার** বলা হয় আরও সূক্ষ্ম কারণে। অতি দ্রুতগতি সম্পন্ন নদীধারা তার দু-দিকের **ধারকে** কেটে নীচের দিকে গভীর করে দেয়। একটু লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যায়, তীক্ষ্ণতা বা **ধার** যার আছে তেমন **ধারাল** ছুরি কাঁচি ইত্যাদি বস্তুর তীক্ষ্ণ দিকটি আসলে নদীর **ধার**-এর মতো হঠাৎই কেটে বসে গেছে। তাই সে **ধারাল**। তার মধ্যে **ধারা** লালিত ও লয়প্রাপ্ত হয়েছে, তাই সে **ধারাল**, তাই তার অত **ধার**। রইল বাকি **ধারণ** ও **ধারণার** কথা।

অস্তিত্বকে কেউ না কেউ ধরে রাখে। যে ধরে রাখে, সে সেই বস্তুর গভীরে বসে কোনো বিশেষ নিয়মে বস্তুটিকে ধরে রাখে বলেই বস্তুটি তদবস্থায় স্থিত থাকে। এই ধরে রাখা বা ধারণ করার দুটি দিক রয়েছে — বাহ্যিক ও মানসিক। **ধারণা** তাই দুরকম হতে পারে, বাহ্যিকভাবে ধারণ করে রাখা, এবং মানসিকভাবে ধারণ করে রাখা। বাহ্যিকভাবে ধারণ করা বস্তুর দেহের বা কাঠামোর কাজ, আর মানসিকভাবে ধারণ করা বস্তুর মনের বা চেতনার কাজ। প্রথমটি **কণামূলক**, দ্বিতীয়টি **তরঙ্গমূলক**। অন্যভাবে এই তরঙ্গমূলক প্রক্রিয়াকে বস্তুর অভ্যন্তরে সক্রিয় নিয়ম বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, বস্তু মাত্রেই **অবয়ব** ও **নিয়ম**-এর এক যৌথতা, শরীর ও চেতনার এক দ্বৈতাদ্বৈত রূপ। বস্তুর তাই দুরকম **ধারণ** বা দুটি **ধারণা**। এই দুটি কাজ প্রতিটি বস্তু করে বলেই সে আত্মস্বরূপে স্থিত থাকতে পারে। এই **ধারণা** বহন করে বলে প্রতিটি বস্তুকেই **ধব** বলা চলে। বস্তুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এইখানে যে, বস্তুর চেতনা বস্তুর নিজস্ব, নিজের বাইরে আর কারও ধারণা তার নেই, কিংবা থাকলেও সে বিষয়ে আমরা কিছু জানি না; কিন্তু মানুষ নিজের বাইরে বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুর **ধারণাকে** আপন অভ্যন্তরে ধারণ করে। সেই কারণে বিশ্বজগতের সম্পর্কে, **বিশ্বজগতের প্রতিটি বস্তুর সম্পর্কে মানুষের ধারণা** তৈরি হয়। **প্রতিটি বস্তুর** দ্বৈতাদ্বৈতরূপটিকে মানসিকভাবে আমরা ধারণ করি। **সংক্ষেপে বললে**, প্রতিটি বস্তুর নিজ নিজ **ধারণা** রয়েছে। মানুষের **সেরকম নিজ নিজ ধারণা** তো রয়েছেই, জগতের প্রতিটি বস্তুর **ধারণার ছবি** তুলে সে আপন মনের মণিকোঠায় সেগুলিকে **সুবিন্যস্ত করে** সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলেছে আজীবন। এই সাজিয়ে রাখা **ধারণাগুলিকেই** ইংরেজিতে concept বলে।

ধারা : ১. ✓ধারি + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***ধার-এর আধার যে।*** / দ্রবদ্রব্যের অবিচ্ছেদে প্রপাত থাকে যাহাতে। (ব.শ.)। **৩.** জলাদিপ্রবাহ, প্রবাহ, অতিবৃষ্টি, প্রবলবর্ষণ, বর্ষণ, অশ্বের গতিভেদ, অস্ত্রের নিশিতভাগ, প্রান্ত, চক্রপ্রান্ত, রথচক্র, পর্ব্বতাদিপ্রান্ত, কর্ণপ্রান্তভাগ, উদ্যানাদির বৃতি, বেড়া, সৈন্যাগ্রিমস্কন্ধ, সেনামুখ, শ্রেণী, সমূহ, যশঃ, উৎকর্ষ, জনপ্রবাদ, সাদৃশ্য, দাক্ষিণাত্যস্থ পুরভেদ, প্রস্তরভেদ, নিয়ম, পদ্ধতি, রীতি, শৃঙ্খলা, আইনের ক্রমিক বিধি (section)। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। **৫. দ্র. ধার**। বলে রাখা ভাল, পাশ্চাত্যের মনোভূমিতে অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় বিষয় ও বস্তুদের বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানত স্থির অচঞ্চল রূপে বোঝার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়; আর প্রাচ্যের মনোভূমিতে তাদের প্রধানত প্রবহমান **ধারা** রূপে বোঝার প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। **এই ধারা** কত প্রকারের, সেকথা **তীর্থ** শব্দের অর্থে বিস্তারিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও জানা যাবে আমাদের 'জ' গ্রন্থের 'ঝর্নাধারা থেকে সৃষ্টিধারা' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

ধারাপাত : ২. *ধারার পাতন থাকে যাহাতে।* / যে পুস্তকে শতক-পর্যন্ত অঙ্কের ধারাক্রমে পাতন থাকে। (ব.শ.)। ধারার বা শিক্ষা প্রণালীর পাত (সূত্রপাত) যাহাতে। (ছা.অ.)। **৩.** জলধারাপতন, শিশুর শিক্ষার্থ শতকীয়া-ইত্যাদির অঙ্কপুস্তক। (ব.শ.)। **৪.** শিশুশিক্ষার অঙ্কের বইয়ের নাম রূপে প্রচলিত। **৫. ধারাপাত** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ ব.শ. ও ছা.অ. থেকে দুরকম পাচ্ছি। আমরা দিয়েছি একটু অন্যরকম। তার কারণ এই যে, আমরা মূল অর্থটিকে রেখেছি, তার প্রায়োগিক দিকটিতে জোর দিইনি। কেননা, কোনো স্থান কাল পাত্রে যে কোনো ধারার পাতন থাকলেই তাকে **ধারাপাত** বলা যায়। ব.শ. জোর দিয়েছেন শতকীয়াতে, যা কিনা **ধারার** মতো ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত পাতিত হয়েছে। ছা.অ. জোর দিয়েছেন শিক্ষার প্রণালীর পাতনে। **ধারাপাত** গ্রন্থটি সেরকম নয় বলেই মনে হয়।

ধারাবাহিক : ২. ***ধারা*** *(প্র)বাহ গতিশীল কৃত যাহাতে।* / যাহা বরাবর চলিয়া যাইতেছে; যাহা কখনো রহিত বা স্থগিত হয় নাই। (ছা.অ.)। **৩.** ধারারূপে প্রবহমান, অবিচ্ছেদে প্রবর্ত্তমান, সন্তত, ক্রমিক। (ব.শ.)। **৪.** continuous অর্থে প্রচলিত। **৫. দ্র. ধার**।

ধারাল (ধারালো) : ২. ***ধারা*** *লালিত এবং বা লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* **৩.** ধারযুক্ত, তীক্ষ্ণ। (ব.শ.)। **৪.** sharp অর্থে প্রচলিত। **৫. দ্র. ধার**। তীব্রস্রোতা নদীর কিনারা বা **ধারকে** জলধারার গতি খেয়ে খেয়ে,

খাত করে করে, কত তীক্ষ্ণ করে ছেঁটে **ধারাল** করে দেয়, তা অনেকেই দেখে থাকবেন। চাকু ছুরি ... ইত্যাদির প্রান্তকেও 'উখা'র সাহায্যে **খাত** করে করে একই ভাবে তীক্ষ্ণ করে **ধারাল** করে ফেলা হয়। নদীখাতের গায়ে যেমন স্রোতধারার গতির লালিত হওয়ার ও লয়প্রাপ্ত হওয়ার সক্রিয়তা তাকে **ধারাল** করে থাকে, ঠিক সেভাবেই ছুরি-চাকুর প্রান্তের গায়ে উখার যাতায়াতের গতির লালিত হওয়ার ও লয়প্রাপ্ত হওয়ার সক্রিয়তাই তাকে **ধারাল** করে থাকে।

ধারী (ধারি, ধারিত, ধারিণী) : ১. ✓ধৃ + ইন্ (ণিনি) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***ধারী*** *= **ধার**-এর গতিশীল আধার যে।* ***ধারি*** *=* ***ধার*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ধারিত*** *=* ***ধারি*** *তারিত যাহাতে।* ***ধারিণী*** *=* ***ধারণ****-এর গতিশীল আধার যে।* **৩. ধারী** = ধারণকর্তা, ধারক, অধীতগ্রন্থধারণ-সমর্থ, ধারযুক্ত, প্রান্তবিশিষ্ট, অধমর্ণ, ধ্বজাদিধারক, পীলুবৃক্ষ। **ধারি** = মাটির ঘর, চাটাই। **ধারিত** = ধৃত, ঋণরূপে গৃহীত। **ধারিণী** = পৃথিবী, শাল্মলীবৃক্ষ, শচী-প্রভৃতি চতুর্দ্দশ দেবযোষিদ্‌গণ। (ব.শ.)। **৪.** প্রায় অপ্রচলিত। **৫.** দ্র. **ধার**।

ধৃত (ধৃতবর্ম্মা) : ১. ✓ধৃ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***ধৃত*** *= ধর্ বা ধরা তারিত যাহাতে।* ***ধৃতবর্ম্মা*** *=* ***ধৃত*** *বর্ম্ম যাহার, তাহার আধার যে।* **৩. ধৃত** = ধারিত, অবলম্বিত, গৃহীত, আক্রান্ত, পরিহিত, উপভুক্ত, তুলিত, স্থাপিত, সংস্তম্ভিত, সংযত, উদ্ধৃত, বন্দীকৃত, পতিত, ধারণ, স্থিতি, পতন। (ব.শ.)। **ধৃতবর্ম্মা** = ত্রিগর্তরাজ কেতুবর্মার পুত্র। এঁর ভ্রাতার নাম সূর্যবর্মা। অর্জুন যখন অশ্বমেধের অশ্ব নিয়ে ভ্রমণরত ছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গে এঁদের যুদ্ধ হয়। ... কেতুবর্মা ও সূর্যবর্মার মৃত্যুর পর ধৃতবর্মা পরাজিত হয়ে অর্জুনের বশ্যতা স্বীকার করেন। ... (পৌ.অ.)। **৪.** caught অর্থে **ধৃত** প্রচলিত, **ধৃতবর্ম্মা** অপ্রচলিত। **৫.** যা-কিছুকে ধরা হয়ে গেছে, সেই **ধৃত** সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরাণাদিতে যাকে **ধৃতবর্ম্মা** বলা হত, সেই সত্তাটি ঠিক কাকে বোঝাতো তা সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা এখনও সম্ভব হয়নি, কিছু কিছু অনুমান করা যায় মাত্র।

ধৃতরাষ্ট্র : ১. ধৃত + রাষ্ট্র। **২.** *ধৃত রাষ্ট্র (প্রচারিত বিধিনিষেধ) যাহাতে।* **৩.** (ক) শান্তনুর ... বংশলোপের আশঙ্কায় সত্যবতী (মৎস্যগন্ধা) নিজের কানীন পুত্র **কৃষ্ণদ্বৈপায়ন** ব্যাসকে স্মরণ করেন এবং তাঁকে দুই পুত্রবধূ অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভসঞ্চার করবার জন্য অনুরোধ করেন। সঙ্গমকালে ব্যাসের কৃষ্ণবর্ণ দীপ্ত নয়ন ও পিঙ্গল জটাশ্মশ্রু দর্শনে অম্বিকা চক্ষু মুদ্রিত করেন। ইহার ফলে পরে অম্বিকা এক অন্ধ পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রের নাম ধৃতরাষ্ট্র। ...ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ বলবান ছিলেন। বেদব্যাসের বরে ইনি শতহস্তীর ন্যায় বল লাভ করেন। গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারীর সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ... গান্ধারীর গর্ভে দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ, চিত্রসেন, প্রভৃতি ৯৯ জন পুত্র ও দুঃশলা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। ... গান্ধারীর গর্ভধারণকালে এক বৈশ্যনারী ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় নিযুক্ত ছিল। ধৃতরাষ্ট্র হতে তার গর্ভে যুযুৎসু নামে এক ধার্মিক পুত্রের জন্ম হয়। ... এই যুযুৎসু ভিন্ন আর সমস্ত পুত্রই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীমের হস্তে নিহত হয়। ... ক্রোধে ইনি লৌহভীম চূর্ণ করেন। ... কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পনের বছর পর ... ধৃতরাষ্ট্র বনবাসে যাত্রা করেন। ... (খ) গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র। ইন্দ্র এঁকে রাজা মরুত্তের নিকট পাঠিয়েছিলেন। দ্র. মরুত্ত। ... (পৌ.অ.)। **৪.** পৌরাণিক চরিত্রের নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** আগের কালে ঢাঁঢ়া পিটে সরকারি ঘোষণা প্রচার করা হত। কিন্তু রাষ্ট্র বা প্রচার তো করে দেওয়া হল, সেই রাষ্ট্র-করা বিধি বা নিষেধ কি কেউ ধরে রাখে? নইলে, সেই বিধিনিষেধ মান্য হল কি অমান্য হল, তা দেখবে কে? সমাজে এমন কোনো সত্তা কি আছে, রাষ্ট্র-করা বা ঘোষিত সমস্ত বিধিনিষেধ ধারণ করে যে বসে থাকে? মহাভারত মনে করেন — হ্যাঁ, অবশ্যই সেরকম সত্তা আছে, এবং তাকেই **ধৃতরাষ্ট্র** নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ হল পূর্বপুরুষাগত রীতিনীতি অনুসারে বা পূর্বঘোষণা মতে চলবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা।

মহাভারত এইরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম হল কীভাবে তার ঐতিহাসিক বর্ণনা দিয়েছেন উপরোক্ত সত্যবতী-পুত্র ব্যাসের সঙ্গে **অম্বিকার** সম্পর্কের ঘটনাবলীর মাধ্যমে। এগুলি ক্রিয়াভিত্তিক ভাষায় লেখা একশোভাগ সত্য ঐতিহাসিক ঘটনা। ... এ হল এমন এক অন্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা কানে শোনে, চোখে দেখে না। তাতে কী! শত শত স্পেশালিস্ট-আমলা **হস্তীর** বল এই রাষ্ট্রের শরীরে। পর পরিশ্রমভোগী পরাশরের ঔরসে এবং 'আমি' 'আমি' গন্ধ বা 'মৎস্যগন্ধ' যার ভেতরে এসে গেছে, সেই মৎস্যগন্ধ্যার বা প্রাচীন ব্যক্তিমালিকানার গর্ভে জাত পুত্র ব্যাসদেব এই রাষ্ট্রব্যবস্থার স্রষ্টা। বৈদিকব্যবস্থা (আদিম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা) মৌলবাদী হয়ে সেকেলে হয়ে এই ধৃতরাষ্ট্রের সত্তায় প্রচলিত, পুঁজিবাদের উদ্ভব হয়ে গেলেও সে **পাণ্ডু** রোগগ্রস্ত, যদিও তারই নামে ভর করে পঞ্চপাণ্ডব মঞ্চে উপস্থিত। এদিকে **গান্ধারীর** পুত্র রূপে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘস্থায়ী আইনযুদ্ধের ব্যবস্থা বা **দুর্যোধন**-এর জন্ম হয়ে গেছে, দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন বা **দুঃশাসন**-এর জন্ম হয়ে গেছে; এমনকি কুপরামর্শ দেয় যে সহযোগী সত্তা সেই **দুঃশলা**ও এসে গেছে মঞ্চে। ... এদের পুরো ঘটনাবলীই রয়েছে মহাভারতে। ...

ধ্যৈ (*ধে*, ধৈ) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অতিসন্ধ্যা, অধীর, অধৈর্য্য, আঢ্য, আধ্যান, দিমাগ (ধীমন্ত), ধ, ধিয়া, ধিয়ান, ধিরজ, ধিরিধিরি (ধিমা, ঢিমা), ধী, ধীগুণ, ধীমান, ধীর, ধীরললিত, ধীরা, ধীরাধীরা, ধীরে-সুস্থে (মন-শরীর-ভাল), ধীশক্তি, ধীসম্পন্ন, ধীহারা, ধে, ধেআ, ধেআন, ধেইধেই, ধেনু, ধেনুক, ধেনুকা, ধেনুকারি, ধেনুধন, ধেনুমক্ষিকা, ধেনুষ্যা, ধেয়, ধেয়া, ধেয়ান, ধৈবত, ধৈরজ, ধৈর্য্য, ধ্যাত, ধ্যান, ধ্যানগম্য, ধ্যানযোগ, ধ্যানস্থ, ধ্যানিক, ধ্যায়া, ধ্যায়ান, ধ্যেয়, বিদ্ধ, বিদ্ধ্য, সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকালীন, সুধা, সুধাংশু, সুধাকর, সুধাময়, সুধী, সুধীর।

ধ্যৈ (ধে, ধৈ) = দিশাগ্রস্ত ধারী থাকে যাহাতে তাহার আধার। **ধে** = দিশাগ্রস্ত ধারী থাকে যাহাতে। **ধৈ** = দিশাগ্রস্ত ধারীর আধার যাহাতে।

ধী (সুধী) : ১. ✓ধৈ —ক্বিপ্ (০) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ধী*** *= ধৈ (দিশাগ্রস্ত ধারীর আধার) থাকে যাহাতে; অথবা, গতিশীল ধারণ-এর আধার যে; অর্থাৎ, ধারণ করার জন্য (আত্মস্থ করার জন্য) ধাওয়া করে যে।* ***সুধী*** *= নবরূপে উত্তীর্ণ সত্তার* ***ধী*** *যে।* / **ধী** = যাহার দ্বারা ধ্যান সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. **ধী** = বুদ্ধি, চিত্তবৃত্তি, শাস্ত্রাদিতত্ত্বজ্ঞান। **সুধী** = শোভনবুদ্ধি, প্রাজ্ঞ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুবুদ্ধির কথা, জ্ঞান, সহজ ভাল বুদ্ধি। (ব.শ.)। ৪. পৃথকভাবে অপ্রচলিত। ৫. যদিও **ধ** প্রধানত **ধারণ** করার ব্যাপার, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে **ধী** কর্মটি প্রধানত মানসিক-ধারণের সঙ্গে যুক্ত। এতে বাহ্যিক ধারণের কোনো কথা নেই। মানসিকভাবে কোনো কিছুকে বুঝে নেওয়ার জন্য, আয়ত্ত করার জন্য চেষ্টা করে সফল হয় যে, সেই হল **ধী**।

ধীর (ধীর-স্থির, ধীরে-ধীরে, ধীরে-সুস্থে, সুধীর) : ১. ধী + ✓রা + অ (ক) কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ধীর*** *=* ***ধী*** *রহে যাহাতে।* ৩. **ধীর** = মনীষী, পণ্ডিত, ধৈর্য্যান্বিত, অনাকুল, স্থিত, মন্দ, মৃদু, মন্দ্র, বিনীত, বলযুত, স্বৈর, মনোহর, অলস, সংযতাত্মা, স্থিরোন্নতচিত্ত, বিদ্বান, উচ্চৈঃ, শিষ্টাচারসম্পন্ন, সমুদ্র, চিদাত্মা, বলিরাজ, ঋষভৌষধি, কুঙ্কুম। **সুধীর** = অতিধীর, সুপণ্ডিত, সুশান্ত। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **ধীর** কথাটি সেই সত্তাকে বোঝায়, যিনি বহু জ্ঞান চর্চা ও প্রয়োগের মাধ্যমে গতিশীলভাবে ধারণ করে রেখেছেন। সেই কারণে এইরকম ব্যক্তি শান্তস্বভাব হন। তাই **ধীর** বলতে মৃদুমন্দ-গতিসম্পন্ন বলেও মনে করা হয়। **ধীরে** বা **ধীরে-ধীরে** বললে বাংলাভাষী তার অর্থ বোঝেন 'মৃদু-গতিতে'। যদিও **ধীর-স্থির** বলতে মানসিকভাবে শান্ত এবং শারীরিকভাবে অচঞ্চল বোঝায়। আর, **ধীরে-সুস্থে** বললে বোঝায়, 'ভাল মনে ও ভাল শরীরে'।

ধেনু : ১. ✓ধে + নু - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দিশাগ্রস্ত ধারীর অন (on) থাকা নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* / বৎস যাহাকে পান করে। (ব.শ.)। ৩. অচিরপ্রসূতা সবৎসা গবী, নবসূতিকা, গবীমাত্র, কামধেনু, ধেনুমূর্ত্তি দানীয়দ্রব্য, গোরূপা পৃথিবী, হ্রস্বার্থক, পশু-স্ত্রীজাতিবাচক। (ব.শ.)। সবৎসা গো, নবপ্রসূতা গাভী। অন্য গাভীকে ধেনু বলে না। পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, সবৎসা ধেনুদানে অনেক পুণ্য। দানবিশেষ। দশবিধ ধেনুদানব্যবস্থা মৎস্যপুরাণে আছে। গুড়ধেনু প্রভৃতি দশবিধ ধেনু। এতদ্ব্যতীত সুবর্ণধেনু প্রভৃতির ব্যবস্থা কোনো কোনো স্থানে দেখা যায়। পদ্মপুরাণে দশবিধ ধেনু অন্যরূপ — গুড়ধেনু, ঘৃতধেনু, তিলধেনু, জলধেনু, ক্ষীরধেনু, মধুধেনু, লবণধেনু, রসধেনু ও নবনীতধেনু। (ছা.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কামধেনু, ত্রিজট**। ধেনুকে শুধুমাত্র গাই ভেবে ফেলা কতখানি ত্রুটিপূর্ণ আজ তা স্পষ্ট বোঝা যায়। 'শ্রীকৃষ্ণ মাঠে গরু চরাতেন' — কথাটি দেখলেই আমরা তার প্রাকৃত-পাঠ (প্রতীকী শব্দবিধি অনুসারে পাঠ) ক্রিয়াটি সেরে ফেলি। মানে বুঝি Srikrishna used to graze his cows on the field। এই যে বোধ, এ হল বাক্যটির নিম্ন-অধিকারীসুলভ বোধ। এর সর্বোচ্চ ও মধ্যবর্তী আরও অন্তত দুটি স্তরের বোধ এই বাক্যের ভেতর থেকেই পাওয়া যায়। মধ্যবর্তী বোধটি এরকম — **Black Money usually develops its holdings in the institutions**। আর, সর্বোচ্চ স্তরের বোধ হতে পারে — **The Great Unknown usually develops its principles in the known area**। ১৩০০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দে আমাদের বাংলার নব্যন্যায়-চর্চাকারী বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা চিন্তাচেতনার কোন উচ্চ লোকে বিরাজ করতেন, তাঁদের রাধাকৃষ্ণলীলার ব্যাপারটিকে অনুভব করতে না-পারলে তার কিছুই বোঝা যায় না। তাঁদের 'বেণুবনে ধেনু চরানো'র গল্পের কিছুই বোঝা যাবে না, যদি 'শ্রীকৃষ্ণ মাঠে গরু চরাতেন' বাক্যের কমপক্ষে উপরোক্ত ত্রিস্তরীয় বোধ অর্জন করা না যায়। যাঁরা রাধাকৃষ্ণ নিয়ে মস্‌করা করেন, তাঁদের কথা ভাবার দরকার নেই। এমনকি যাঁরা ইয়োরোপের মধ্যযুগ অন্ধকার ছিল বলেই ভারতের তথা বাংলার মধ্যযুগও অন্ধকার যুগ ছিল বলে মনে করেন, সেই ব্যক্তিদের কথাতেও আমরা যাব না। কেননা আমরা তো জানিই, বাংলার মধ্যযুগ ছিল কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী ... ইত্যাদির বিশাল সাহিত্য সম্ভার সৃষ্টির সুবর্ণযুগ। আমরা বরং জানতে চাইব — শ্রীকৃষ্ণ যে-ধেনু চরাতেন সে কেমন ধেনু?

পুরাণাদিতে যে **কামধেনু**র কথা বলা হয়েছে, সে কেমন গাভী, সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। সে যে cow নয়, পাঠক তা জেনে গেছেন। আর, এই **ধেনু** হল সবৎসা গাভী; তাও আবার নবপ্রসূত। একালের বোধের কাছাকাছি খুব সহজ একটি উদাহরণ দিতে হলে আমরা সেইরকম একটি 'আই টি কোম্পানি'র কথা ভাবতে পারি, যার ১০-২০টি কর্মচারী। একে বলে 'সবৎসা গাভী' বা **ধেনু**। সেকালে **ধেনু**-স্বরূপ 'জনপদ অধ্যুষিত ভূভাগ' দান করে দেওয়া হত 'জ্ঞানকর্ম্মের অগ্নিশিখা বহনকারী' শিবগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে। তাঁর নির্দেশ-উপদেশ অনুসারে চলতেন সেই ভূভাগের সমস্ত অধিবাসীরা। একালেও যখন ছোট ছোট কোম্পানি তার কর্মচারী সুদ্ধ বিক্রি হয়ে যায়, সেও 'সবৎসা-গাভী' দান বা **ধেনু**দানই বটে! সেভাবে বিচার করে দেখলে, সাম্প্রতিক এই মন্দার বাজারে ছোটবড় কোম্পানিগুলি যে দেউলিয়া হচ্ছে, তাদের মালিকানার হাতবদল হচ্ছে, বিলুপ্ত হচ্ছে ... আমাদের বাংলাভাষায় সেই ঘটনাগুলিকে এককথায় এইভাবে প্রকাশ করা যায় — দান করে দিয়েও আজকের বিশ্বায়িত সমাজ গাইবাছুরকে (কোম্পানি ও তার শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের) বাঁচাতে পারছে না, গোহত্যা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। দ্র. **ধনু**।

ধ্যান (ধ্যানগম্য, ধ্যানযোগ, ধ্যানস্থ) : ১. ✓ধৈ + অন (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***ধ্যান*** *= ধারণোদ্দেশে পশ্চাদ্ধাবন অন থাকে যাহাতে।* ***ধ্যানগম্য*** *=* ***ধ্যান****-এর সাহায্যে যেখানে গমন করা যায়।* ***ধ্যানযোগ*** *=* ***ধ্যান****-এর সাহায্যে যে যোগসাধন করা যায়।* ***ধ্যানস্থ*** *=* ***ধ্যান****-এ স্থিত যে।* / **ধ্যান** = (যাহাতে) অদ্বিতীয় বস্তুতে চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ (থাকে)। (ব.শ.)। ৩. **ধ্যান** = চিন্তন, মনন, ইষ্টদেবতা চিন্তন, পরমাত্মচিন্তন, যোগবিশেষ, দেবতাবিশেষের রূপবর্ণনমন্ত্র, ধ্যেয় বিষয়। **ধ্যানগম্য** = ধ্যানলভ্য, ধ্যানগোচর। **ধ্যানযোগ** = ধ্যানরূপ যোগ, ধ্যাতব্য-স্বীকারোপায়, ধ্যানাভ্যাস। (ব.শ.)। ৪. meditation অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **নিগদ, যোগ**।

বিন্ধ্য (বিন্ধ্যপর্ব্বত) : **১.** বি + ✓ধ্যৈ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *বিপরীত ধ্যান থাকে যাহাতে।* / সূর্য্যগতিরোধ হেতু বিরুদ্ধধ্যান করে যে। (ব.শ.)। **৩.** পর্ব্বতবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** বিন্ধ্যপর্ব্বত বিষয়ে ব.শ. জানাচ্ছেন — " বিন্ধ্য হল সে-ই 'যে সূর্যগতিরোধ হেতু বিরুদ্ধ ধ্যান করে'। ... ইহা ভারতের মধ্যস্থ পূর্বপশ্চিমে আয়ত পর্ব্বতশ্রেণী। ইহার উত্তর ভাগ 'আর্যাবর্ত' ও দক্ষিণভাগ 'দাক্ষিণাত্য'। 'সূর্য মেরুর ন্যায় আমার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিবে না কেন' — এই ঈর্ষায় বিন্ধ্য দেহবৃদ্ধি করিয়া সূর্যের গতিরোধ করিতে উদ্যত হইলে আপৎ-প্রতিকারার্থ দেবতার প্রার্থনায় অগস্ত্য বিন্ধ্যের নিকটে আসিয়া দাক্ষিণাত্য গমনের পথ চাহিলেন। বিন্ধ্য অবনত হইয়া মুনির আদেশ পালন করিলে, 'আমার প্রত্যাগমন পর্যন্ত তুমি এইরূপে অবস্থান কর'— এই বলিয়া অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করিলেন, আর ফিরিলেন না; বিন্ধ্যও অবনত হইয়া রহিলেন, সূর্যের গতিরোধ করা হইল না।" পৌরাণিক অভিধানকার বিন্ধ্য সম্পর্কে উপরোক্ত কথাগুলি তো বলেছেনই, বাড়তি যে-কয়টি তথ্য সরবরাহ করেছেন তা হল — ক) দেবতারা বিন্ধ্যপর্ব্বতে বিহার করেন বটে, কিন্তু দিনযাপন করেন সুমেরুপর্ব্বতে। সেজন্য সুমেরু বিন্ধ্যের অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ মনে করে। খ) অগস্ত্য ছিলেন বিন্ধ্যের গুরু, অর্থাৎ দুজনের ভিতরে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল।

'বিন্ধ্য' শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ হল 'যে বিরুদ্ধ ধ্যান করে'। সেকালে বিন্ধ্য বলতে কাকে বোঝানো হত, তা জানতে পারলে আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারব, সে কার বিরুদ্ধে কী ধ্যান করত? অতএব জানা দরকার — বিন্ধ্য কে?

ভারতের নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত প্রভৃতিকে ইয়োরোপীয় চিন্তাশৃঙ্খলার ভিতরে আঁটানো প্রায় অসম্ভব। ইয়োরোপের কোনো পাহাড়-পর্ব্বতের বিয়ে হওয়া, ছেলেমেয়ে হওয়া কিংবা তাদের পক্ষে কোনো মানুষের শিষ্য হওয়া — এসব কল্পনাতীত। কিন্তু ভারতের হিমালয় (হিমালয় কন্যার আগমনেই তো দুগ্গাঠাকুর, দুর্গাপুজো!) বা বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বতের ক্ষেত্রে তেমন হয়। স্বভাবতই এদেরকে বুঝে নিতে একালের ইয়োরোপ-প্রভাবিত আবহাওয়ায় ঘোরতর সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির নিয়মে এগোলে এসব বুঝতে খুব বেশি অসুবিধা হয় না।

'যা পর্ব্বে পর্ব্বে বিন্যস্ত থাকে' তাকে **'পর্ব্বত'** বলে। একালের ভাষায় একে বলা হয় 'র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলে' বিন্যস্ত 'সোস্যাল অর্গানাইজেশন' বা সামাজিক সংগঠন। উদাহরণ স্বরূপ —৩০০০ জন আনস্কিলড ওয়ার্কার বা হেল্পারের নিম্নতর পর্ব্বের উপর ১০০০ জন ইলেকট্রিশিয়ানের একটি পর্ব্ব বা স্তর, তার ওপর ১০০ জন সুপারভাইজারের আর একটি স্তর, তার ওপর ১০ জন ফোরম্যানের পর্ব্ব, এবং সর্বোপরি ১ জন ইঞ্জিনিয়ার — এইভাবে ৪১১১ জন লোককে নিয়ে গড়ে উঠতে পারে একটি বিদ্যুৎব্যবস্থাপক সামাজিক সংগঠন বা পর্ব্বত; একালের ম্যানেজমেন্টের ভাষায় 'পিরামিড'। প্রাচীন ভারতের মনোলোকে এরকম বহু পর্ব্বত রয়েছে। এমনকী ডানা-কাটা পর্ব্বতও রয়েছে, উড়ে বেড়াত বলে ইন্দ্র যার ডানা কেটে দিয়েছিল। এদের আচার-ব্যবহার মানুষের মতোই। কিন্তু প্রশ্ন হল — পর্ব্বত বা সংগঠনের স্বভাব কি মানুষের মতো হতে পারে?

বস্তুত, সরকার জড় বা অশরীরী কিছু হয় না। সরকার একটা পর্ব্বত বা সিস্টেম্যাটিক অর্গানাইজেশন হলেও মানুষের সঙ্গে যখন সে সম্পর্কিত হয়, তখন সজীব প্রাণীর মতোই আচরণ করে। বৈদিক (বা আদিম সমাজতান্ত্রিক) অর্থব্যবস্থাও সেইরকম পর্ব্বত, আদিম ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাও সেইরকম পর্ব্বত। সেকালের বৈদিক অর্থব্যবস্থাকে সুমেরুপর্ব্বত (কখনো-বা হিমালয় পর্ব্বত) বলা হত, এবং উঠতি ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে বিন্ধ্যপর্ব্বত বলা হত; আর সরকারি রাজকোষকে বলা হত সূর্য। আর্যাবর্তের বাইরে, বিশেষত দাক্ষিণাত্যের পুঁজিবাদী বিকাশ সেকালে সুমেরুর (বা হিমালয়ের) গর্বকে খর্ব করতে চলেছিল। ফলত, ব্যাপারটি সুমেরুর পরিচালক বেদবাদীদের স্বার্থবিরোধী হয়ে উঠেছিল। স্বভাবতই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে সংযত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। 'বিদর্ভের জনগোষ্ঠীর পরিচালকেরা' (= লোপামুদ্রার স্বামী) বা 'মহর্ষি অগস্ত্য' এই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার (বা বিন্ধ্যপর্ব্বতের) পরামর্শদাতাও (গুরু) ছিলেন। (একালেও তো কোনো কোনো রাজ্য সরকার কোনো কোনো বিষয়ে 'বিশেষজ্ঞ দল' নিয়োগ করে ও তার পরামর্শেই চলে! চলে না?) সেই অগস্ত্যকেই দায়িত্ব দেওয়া হয় উঠতি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বা বিন্ধ্যপর্ব্বতকে সংযত করতে। তাঁর পরামর্শেই যখন এই অর্থব্যবস্থার ক্রমবিকাশ বা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্থান একটু একটু করে ঘটছিল, তাঁকে দিয়েই বিন্ধ্যপর্ব্বতকে সংযত করা সহজ কাজ ছিল এবং সেটাই করা হয়েছিল। তাঁকে দিয়েই বিন্ধ্যপর্ব্বতকে বা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে মাথা নত করতে বাধ্য করা হয়, অর্থাৎ তাঁরই হস্তক্ষেপে এই ধনতন্ত্রের উত্থানকে পর্যুদস্ত করা হয়। ফলত, ভারতে পুঁজিবাদ আর বিকশিত হতে পারে না। অতঃপর ভারতের পুঁজিবাদী শক্তিগুলি বৈদিক সমাজতন্ত্রের অচলায়নের সামনে মাথা নীচু করে দিনগত পাপক্ষয় করতে থাকে।

তবে সেই পুঁজিবাদের আর বিকাশের কোনো চেষ্টা আর কক্ষনো হয়নি, এমন নয়। পরে, রামরাজত্বের কালে (১০০ থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ), পুঁজিবাদ আরেকবার তেড়েফুঁড়ে উঠেছিল, এবং বলতে গেলে পৃথিবীর আদিম ধনতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করেই ফেলেছিল। ফিনান্স ক্যাপিটালের জন্ম হয়ে গিয়েছিল, সে ক্ষমতাও দখল করেছিল; এমনকী (তথাকথিত মধ্যযুগের বাংলা বিহার উড়িষ্যায়) সমাজে কালো-টাকা বা ব্ল্যাক-মানিরও রমরমা দেখা দিয়েছিল, নগদ-নারায়ণের অবতার শ্রীকৃষ্ণ রূপে। কিন্তু ভারতসমাজ সেই সমস্ত অর্থনৈতিক বিকাশের উপর ঘোরতর নিষেধ প্রয়োগ করে সেই বিকাশকে এত কঠোরভাবে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল যে, ব্রিটিশের ভারত আগমনের আগে সে আর মুখ তুলতেই সাহস করেনি। ধনতান্ত্রিক বিপ্লবের সেই যোদ্ধাদের উত্তরসূরিরা সেই দুঃখে আজও 'অষ্টমপ্রহর' (= সারা দিনরাত্রি) 'হরে রাম, হরে কৃষ্ণ' গেয়ে কাঁদতে থাকে। তবে, ভারত-ইতিহাসের সে অন্য আরেক অধ্যায়।

সন্ধ্যা (যুগসন্ধ্যা) : **১.** সম্ + ✓ধ্যৈ + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে +

স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *সমান ধ্যান থাকে যাহাতে; অথবা, সমান ধ্যান করে যে।* / সন্ধিস্থানে জন্মায় যে। (ব.শ.)। ৩. সম্যক চিন্তা, সন্ধান, ধ্যানকাল, রাত্রিদিবার মধ্যবর্তী দণ্ডদ্বয় কাল, পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের সন্ধিকাল, যুগের আদি, সন্ধ্যাকালে বিহিত কৃত্য, গায়ত্রীজপ, কালের পত্নী (কালের তিন পত্নী — সন্ধ্যা, রাত্রি, দিন), নদীবিশেষ, পুষ্পবিশেষ, সন্ধ্যামণি ফুল (ইহা সন্ধ্যায় ফোটে), সংশ্রব, সীমা, সন্ধ্যায় উপাস্য দেবতা। **যুগসন্ধ্যা** = যুগপরিমাণের দশমাংশ কাল, অর্থাৎ সত্যযুগ চারি সহস্র দৈববর্ষ, তাহার সন্ধ্যা চারি শত দৈববৎসর, ত্রেতা তিন সহস্র দৈববর্ষ, তাহার সন্ধ্যা তিন শত দৈববৎসর, দ্বাপর দুই সহস্র দৈববর্ষ, তাহার সন্ধ্যা দুই শত দৈববৎসর, কলি এক সহস্র দৈববৎসর, তাহার সন্ধ্যা এক শত দৈববৎসর। (ব.শ.)। ৪. evening অর্থে প্রচলিত। **যুগসন্ধ্যা** অপ্রচলিত। ৫. রাত্রি ও দিনের বা অন্ধকার ও আলোর সমান ধ্যান করে যে, তাকে বলা হত **সন্ধ্যা**। মোট কথা, দুরকম পরিস্থিতির মাঝে উভয়ের প্রতি সমান **ধ্যান**কারী স্থান-কাল-পাত্রকে বলা হত **সন্ধ্যা**। হ্যাঁ, ঠিক এভাবেই ভাবতেন আমাদের বাংলাভাষীর পূর্বপুরুষেরা। এমনকি হিন্দিতে **সন্ধ্যা** বোঝাতে যে 'সাম' কথাটি রয়েছে, তাতেও এই 'সমান ধ্যানকারী' কথাটির ইঙ্গিত রয়েছে। ইংরেজিতে evening বলা হয়, তখন কোনোদিন কি আমাদের মনে হয়েছে, এতে even বা 'সমান' কথাটি কেন রয়েছে? এখন আর বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, একই উত্তরাধিকারের গন্ধ ইংরেজিরও থেকে গেছে।

ধ্রু ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অধ্রুব, ধুআ, ধ্র, ধ্রু, ধ্রুক্ (দ্রুহ্), ধ্রুপদ, ধ্রুপদী, ধ্রুব, ধ্রুবক, ধ্রুবতারা, ধ্রুবলোক, ধ্রুবা, ধ্রুবাবর্ত্ত, ধ্রৌব্য।

ধ্রু = ধারণ-রক্ষিত (বা ধরে রাখা) নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।

ধ্রুব : ১. ✓ধ্রু + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ধ্রু বহন করে যে।* / যে অঙ্গ বিনা জীবন থাকে না সেই অঙ্গ। (ব.শ.)। ৩. স্থির, নিশ্চিত, শাশ্বত, অব্যভিচারী, সতত, আবশ্যক, শঙ্কু, কীল, স্থাণু, শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বটবৃক্ষ, নক্ষত্রবিশেষ, উত্তরমেরু, যোগবিশেষ, অষ্টবসুর একতম, যজ্ঞিয় গ্রহপাত্রভেদ, নাসিকাগ্রভাগ, রোমাবর্ত্তভেদ, গীতাঙ্গবিশেষ, ধুয়া, শরারিপক্ষী, আকাশ, স্বর্গ, উত্তানপাদের পুত্র। (ব.শ.)। বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র উত্তানপাদের দুই রানী ছিল — সুনীতি ও সুরুচি। প্রথমা সুনীতির গর্ভে ধ্রুব ও দ্বিতীয়া সুরুচির গর্ভে উত্তম নামে রাজার দুই পুত্র হয়। রাজা সুরুচিকে সুনীতির চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। ... একদিন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম পিতার ক্রোড়ে বসে আছে দেখে ধ্রুবও রাজসভায় উপস্থিত হয়ে পিতার ক্রোড়ে বসতে চাইলেন। ঐ সময় বিমাতা সুরুচি ধ্রুবকে কটুবাক্যে অপমানিত করলে ব্যথিতচিত্তে ধ্রুব মার কাছে গিয়ে এই অপমানের কথা বর্ণনা করলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে সুনীতি বললেন যে, একমাত্র হরিই দুঃখীদের দুঃখমোচন করতে পারেন। যে হরির দয়ায় মানুষের মঙ্গল হয়, সেই হরিকে পাবার জন্যে ধ্রুব ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ... বিষ্ণুর আরাধনায় কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। ... বিষ্ণু ... ধ্রুবের কাছে এসে বললেন ... 'তুমি পূর্বে এমন একটি স্থান প্রার্থনা করেছিলে যা কেউ উপভোগ করেনি। তুমি পূর্বে এক ব্রাহ্মণপুত্র ছিলে এবং তোমার এক বন্ধু রাজপুত্রের ঐশ্বর্য দেখে তুমি রাজার পুত্র হতে চেয়েছিলে। তাই তুমি রাজা উত্তানপাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছ এবং আমাকে আরাধনা করে এখন তুমি মুক্তি পেয়েছ। তুমি সকল তারা ও গ্রহগণের উপরে তাদের আশ্রয়স্বরূপ হয়ে থাকবে। এই স্থানের নাম হবে ধ্রুবলোক।' ... যথাকালে ধ্রুব দেহত্যাগ করলে বিষ্ণুদত্ত ধ্রুবলোকে প্রস্থান করে নক্ষত্ররূপে অবস্থান করতে লাগলেন। (পৌ.অ.)। ৪. নামরূপে কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। তারার সঙ্গে যুক্ত রূপে **ধ্রুবতারা** রূপেও ব্যবহৃত হয়। ৫. ধরে রাখা নবরূপে বা স্থির রূপে উত্তীর্ণ হয়ে গেলে সত্তাটি দীর্ঘকাল একই অবস্থানে থেকে যায়। কথাটি উলটো করে ভাবলে বোঝা যায় — যে সত্তা দীর্ঘকাল একই অবস্থানে স্থির নিশ্চিত ও অপরিবর্তনীয় রূপে বিদ্যমান রয়েছে, বুঝতে হবে তার ভিতরের ধারণ-রক্ষক সত্তাটি সাধারণ অবস্থায় নেই। অস্তিত্বের সাধারণ পরিবর্তনশীলতার নিয়মটি থেকে সে স্থির রূপে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; অন্যথায় সে দীর্ঘকাল অপরিবর্তনীয় স্থির থাকতে পারত না। উপরে **ধ্রুব** শব্দের অর্থে যে সকল প্রতীকী অর্থ দেওয়া হয়েছে, তারা প্রত্যেকে নিশ্চয় অপরিবর্তনীয় স্থির স্বভাবের সত্তা। কিন্তু সেকথা প্রতিটি সত্তার ক্ষেত্রে পৃথকভাবে জানা যায়নি। 'বটবৃক্ষ', 'নাসিকাগ্রভাগ', 'রোমাবর্ত্তভেদ' ... ইত্যাদি কেন যে **ধ্রুব**-পদবাচ্য, তা আমরা এখনও জানি না।

আপনাকে জানানো হল যে, একটি দেশে এতকাল ধরে কেবলমাত্র কৃষিকাজ চলছিল, সম্প্রতি সেখানে কারুশিল্পের কাজকর্ম শুরু হয়েছে। তাতে কিছু লোক পরিশ্রম অনুসারে তাদের উৎপাদিত বস্তুর দাম নিয়ে কারুশিল্পের অগ্রগতি ঘটিয়ে চলেছে, আর কিছু লোক নিজেদের ইচ্ছাখুশি উৎপাদন করে বেশি বেশি সম্পদ বানানোর চেষ্টা করছে। এই সমগ্র ব্যাপারটিকে আপনি বর্ণনা করবেন। কিন্তু কৃষিকাজ, কারুশিল্প, উৎপাদন, উৎপাদিত বস্তু, বানানো, পরিশ্রম, স্থির, নিশ্চিত, ইচ্ছাখুশি ... এই শব্দগুলি ব্যবহার করতে পারবেন না। তাহলে কেমন করে সেই সমগ্র ব্যাপারটির বর্ণনা দেবেন।

পুরাণকারগণ বুঝিবা সেরকম সমস্যাতেই পড়েছিলেন। তাঁরা এই বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে **উত্তানপাদ**, সুনীতি, সুরুচি, উত্তম, ধ্রুব প্রভৃতি শব্দের আশ্রয় নিয়েছেন। **উত্তানপাদ** নামক পৌরাণিক চরিত্রটির বিষয়ে আমরা জ্ঞাত হয়েছি। সেই সুবাদে আমরা জেনেছি, কারুশিল্প জাতীয় উৎপাদন ও সেইরকম উৎপাদনের সামাজিক ধারণা-সত্তাকে **উত্তানপাদ** বলে। তার দুই আধারশক্তি সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতির ছেলে **ধ্রুব**, সুরুচির ছেলে **উত্তম**। কারুশিল্পের বিকাশের যে ভাল দিক, সেটিই সুনীতির দিক, লক্ষ্মীর দিক, সেদিক থেকেই জন্মেছিল **ধ্রুব**। সেদিকটিই যে শুভ দিক ছিল, সেদিকে এগোলেই যে সমাজের সবচেয়ে ভাল হত, সেই **ধ্রুব** বা নিশ্চিত বিকাশের দিকে সমাজ বেশিদূর যায়নি। তার যেটি মন্দ দিক, কুবেরের দিক, সেদিক থেকেই জন্মেছে **উত্তম**। সকলের দিকে না তাকিয়ে কেবল নিজের রুচি অনুসারে চলে **উত্তানপাদ** জন্ম দিয়ে ফেলেছিল **উত্তম**-এর। এই **উত্তম** যে **তমগুণসম্পন্ন** সমাজ সেকথা তখনই বুঝতে পারেনি।

ধব (ধ্বংস্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অপধ্বংস, অবধ্বংস, ধ্বংস্, ধ্বংস, ধ্বংসস্তূপ, ধ্বংসা, ধ্বকধ্বক, ধ্বজ্, ধ্বজ, ধ্বজগৃহ, ধ্বজপট, ধ্বজপাত, ধ্বজবতী, ধ্বজভঙ্গ, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, ধ্বজা, ধ্বজাংশুক, ধ্বজারোপণ, ধ্বজাহৃত, ধ্বজিনী, ধ্বজী, ধ্বড়ধ্বড়, ধ্বন্, ধ্বন্স্, ধ্বন, ধ্বনন, ধ্বননকাব্য, ধ্বননগ্রহ, ধ্বনননালা, ধ্বননবিকার, ধ্বনি, ধ্বনিত, ধ্বস্ত, ধ্বাঙক্ষ, ধ্বান, ধ্বান্ত, ধ্বান্তারাতি, ধ্বৃ, বিধ্বংস, বিধ্বংসী, বৃষধ্বজ।

ধব (ধ্বংস্) = ধব = ধারণ-বাহক (ধরে বয় যে)। **ধ্বংস = ধব**-এর রহস্যরূপের শেষ যাহাতে।

ধ্বংস (ধ্বংসক, ধ্বংসন, ধ্বংসিত, ধ্বংসী) : ১. ✓ধ্বংস্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***ধ্বংস*** *= ধারণবাহীর (ধারণাবাহীর) রহস্যরূপের সর্বশেষ অস্তিত্ব যাহাতে।* ***ধ্বংসক = ধ্বংস*** *করে যে।* ***ধ্বংসন = ধ্বংস*** *অন যাহাতে।* ***ধ্বংসিত = ধ্বংস*** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* ***ধ্বংসী = ধ্বংস****-এর গতিশীল আধার যে।* **৩.** স্খলন, ভ্রংশ, বিনাশ, ক্ষয়, তিরোভাব, বিনষ্ট; ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া, মরা, ধ্বংস করা, নষ্ট করা। **ধ্বংসক** = নাশক, ক্ষয়কারক। **ধ্বংসন** = ধ্বংসয়িতা, নাশক, বিনাশন। **ধ্বংসিত** = বিনাশিত, নিহত, ভ্রংশিত। **ধ্বংসী** = বিনাশী, ঘাতক, ধ্বংসশীল, নশ্বর, ধ্বংসযুক্ত। **৪.** destruction অর্থে **ধ্বংস** প্রচলিত। বাকি শব্দগুলিও কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। **৫. ধারণা** বলতে আমরা একপ্রকার চেতনা বুঝি। অস্তিত্ব মাত্রেই **ধব** বা ধারণাবাহী। প্রতিটি বস্তুর ভিতরে তার নিজস্ব ধারণাবাহী রয়েছে বলেই বস্তুটি টিকে রয়েছে। তবে কিনা, এই ধারণাবাহীর রূপটি সামগ্রিকভাবে এক ং-রূপ বা রহস্যরূপ। সেই রহস্যরূপে রয়েছে অজস্র শক্তিকণা। কোনো অস্তিত্বের একটি মাত্র শক্তিকণা যদি টিকে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে, সেই অস্তিত্ব **ধ্বংস** হয়ে গেছে। একে অন্যভাবেও ভাবা চলে। একটি অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তা বিলুপ্ত হয়ে গেল; থেকে গেল তার স্মৃতিটুকু। তখনই তা **ধ্বংস**-পদবাচ্য।

ধ্বজ (ধ্বজা, ধ্বজী, ধ্বজভঙ্গ) : ১. ✓ধ্বজ্ + অ (অচ্) অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। **২.** ***ধ্বজ = ধব*** *(ধারণাবাহী) হইতে জাত।* ***ধ্বজা = ধ্বজ****-এর আধার যে।* ***ধ্বজী = ধ্বজ****-এর গতিশীল আধার যে।* ***ধ্বজভঙ্গ = ধ্বজ*** *ভঙ্গ হইয়াছে যাহারা। /* **ধ্বজ** = অন্তর্ভাবিত অর্থ যাহাতে; যাহা যোধবিশেষকে জানায়। (ব.শ.)। **৩. ধ্বজ** = কেতন, পতাকা, পতাকাদণ্ড, বংশদণ্ডোপরিস্থ বস্ত্রখণ্ডভেদ, চিহ্ন, মদ্যপানগৃহের চিহ্নবিশেষ, ব্যবসায়ের চিহ্নবিশেষ (trade mark), শ্রেষ্ঠ, মেঢ্র, খট্টাঙ্গ, পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী গৃহ, দর্প, শঠতা, সুরাভাজনচিহ্ন। **ধ্বজা** = পতাকা, নিশান, দীর্ঘ বংশাদির দণ্ড। **ধ্বজী (ধ্বজিন্)** = ধ্বজবান, ধ্বজবাহক, চিহ্নযুক্ত, দোষার্থচিহ্নবিশেষযুক্ত, শ্রেষ্ঠতাবান ব্রাহ্মণ, শৌণ্ডিক, রথ, শৃঙ্গবান, পর্ব্বত, সর্প, অশ্ব, শিখাবান, ময়ূর। **ধ্বজভঙ্গ** = মেঢ্রশৈথিল্যকর বা ক্লীবতাজনক রোগবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** পতাকা বা **ধ্বজা তুললেন মানেই হল**, তার ভেতরে 'অন্তর্ভাবিত অর্থ' রূপে **ধব** বা **ধারণাধারী** উপরে উঠে পড়ল। **ধ্বজা** তুলে দেখাচ্ছেন মানেই হল, **ধব** জনিত হয়ে যথাস্থানে পৌঁচচ্ছে। সাদা **ধ্বজা** বা শান্তির **ধ্বজা** তুলে বিপরীত সৈন্যবাহিনীকে আজও শান্তির কথা জানান দেওয়া হয়। পুরাণাদিতে কোন বীর কীসের **ধ্বজা** উপরে তুলে ধরেন, তা দিয়ে তাদের পৃথক পৃথক নামকরণ হয়, যথা — কুশধ্বজ, সীরধ্বজ, বৃষধ্বজ, কপিধ্বজ, গরুড়ধ্বজ ... ইত্যাদি। সেই **ধ্বজ** একালে নানা রূপে বিভক্ত হয়ে গেছে। জ্ঞানজীবীদের দুনিয়া আপাতত থাক, পণ্যজীবীদের দুনিয়ায় এই **ধ্বজা** ট্রেডমার্ক নাম নিয়ে কত কীর্তিই যে করে চলেছে, তার ইয়ত্তা নেই। সাধারণ বাংলাভাষী কিন্তু সহসা বুঝতে পারে না এই ট্রেডমার্ক, ব্রান্ডনেম ... ইত্যাকার ব্যাপারের মানে কী। কিন্তু একবার তাকে বলে দিন, এসব যে যার নিজের **ধ্বজা** নিয়ে ঝগড়া করছে, **ধ্বজা** বিক্রি করছে, **ধ্বজা** তুলছে, লোকে কিন্তু ব্যাপারটি নিমেষে বুঝে নেবে। নিজেদের শব্দের ব্যবহার ফেলে দিয়ে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার কেবল চিন্তার দারিদ্র্যকেই সূচিত করছে না, বহু মানুষকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। ...

ধ্বনি (ধ্বন, ধ্বনন, ধ্বনিত) : ১. ✓ধ্বন্ + ই - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***ধ্বন = ধব্*** *(ধারণাবহন) অন (on) যাহাতে।* ***ধ্বনন = ধ্বন্*** *অন (on) যাহাতে।* ***ধ্বনি = ধ্বন*** *গতিশীল যাহাতে।* ***ধ্বনিত = ধ্বনি*** *তারিত যাহাতে।* **৩. ধ্বনি** = শব্দ, মৃদঙ্গাদিশব্দ, স্বর, গানশব্দ, মেঘশব্দ, বর্ণাত্মক শব্দ (word), ব্যঞ্জনাজন্য অর্থবোধ, ধ্বনিযুক্ত কাব্য, নামখ্যাতি, বাক্য। **ধ্বন** = ধ্বনিত করা। **ধ্বনন** = অব্যক্ত শব্দকরণ, গুঞ্জন, ধ্বনি, রসাদিপ্রতীতি, ব্যঞ্জনাজন্য বোধ। **ধ্বনিত** = শব্দিত, ব্যঞ্জিত, বাদিত, শব্দ, গর্জ্জিত। (ব.শ.)। **৪.** sound অর্থে প্রচলিত। **৫. ধ্বনি** শব্দটি যতদিন সম্পূর্ণ বাংলাভাষীর নিজের ছিল, ততদিন সবকিছু ঠিকই ছিল। কিন্তু ইংরেজের বাংলা দখলের পর অর্থাৎ ব্রিটিশ যুগে, বাংলাভাষী যখন লেখাপড়া শিখে ইংরেজির সঙ্গে ওঠাবসা করে **ধ্বনি**কে ইংরেজি sound শব্দের প্রতিশব্দ করে ফেলল, গণ্ডগোলটা শুরু হল তখন থেকেই। আমাদের **ধ্বনি** মানে ছিল 'ধারণাবাহী গতিশীল শব্দ', অর্থাৎ 'রসাদিপ্রতীতি', 'ব্যঞ্জনাজন্য অর্থবোধ' ইত্যাদি। সুতরাং তাকে ইংরেজিতে অনুবাদ করলে হত 'meaningful active sound'। তা কিন্তু করা হল না, ইংরেজ ছিল শাসক, তার প্রতিপত্তিও ছিল বেশি। তাই sound-এর বাংলা প্রতিশব্দ করে নেওয়া হল **ধ্বনি**কে। ফলে **ধ্বনি**র 'অর্থপূর্ণ সক্রিয়' অংশটি বাদ গিয়ে **ধ্বনি** মানে হয়ে গেল অর্থহীন নিষ্ক্রিয় 'আওয়াজ' মাত্র। তারই উপর নির্ভর করে বাংলাভাষী পণ্ডিতেরা লিখতে লাগলেন পাশ্চাত্যের Phonetics-এর আদলে **ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতত্ত্ব** নামধারী নানান গ্রন্থ। ফলে, তা হয়ে গেল অর্থহীন আওয়াজ নিয়ে বোকাদের কচকচি। তবে এ তো আর নতুন কথা নয়। অজস্র বাংলা শব্দের এই দুর্দশা হয়েছে এবং সেসব আমরা আগেই দেখেছি। আমাদের 'খ' গ্রন্থে সেসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে।

ধ্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অধুনা, অধুনাতন, ধাউস (ঢাউস), ধাঙড়, ধাঙ্গড়, ধান্সুরী, ধিধি, ধিনতা, ধিনধিন, ধিনিকধিনিক, ধিনিকিধিনিকি, ধিনিধিনি, ধিম্ব, ধিমধিম, ধিমা (ঢিমা, ধীরে), ধিমাতাল, ধিমেতাল, ধিয়া, ধিরাজ, ধিষ্ঠিত, ধূর্জ্জটি, ধূর্ত্ত।

ন

ন্ বর্ণের অর্থ : ন = ন্-অন (negation) করে যে; ন-কারী = অন্-কারী। কিন্তু ন-করণ বা না-করণ ক্রিয়াটি কীরূপ, তা বিস্তারে বোঝা দরকার। তার আগে ন্ বর্ণের জন্ম কীভাবে হল, সেকথাটি জেনে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

মূল শব্দ ং। তার অন্য একটি রূপ হল অম্। এই অম্ বিকশিত হয়েছে অ থেকে ম্ পর্যন্ত মোট ৪১টি বর্ণে। তার মধ্যে ম্-এর বিভাজন ঘটে পাঁচটি খণ্ডে। একে ং-রূপিণীর পাঁচটি খণ্ডরূপ — ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্ বলা যায়। এই পাঁচটি বর্ণ অং-রূপিণীর রহস্যরূপের ধ্বনি-প্রতীক বা আওয়াজ-প্রতীক। এই ং-রূপিণীর পরে ক খ গ ঘ থাকলে ং রূপান্তরিত হয় ঙ্-এ (ঙ্ক, ঙ্খ ...); পরে চ-বর্গ থাকলে ং রূপান্তরিত হয় ঞ্-এ (ঞ্চ, ঞ্ছ ...); পরে ট-বর্গ থাকলে তা রূপান্তরিত হয় ণ্-এ (ণ্ট, ণ্ঠ ...); পরে ত-বর্গ থাকলে ং রূপান্তরিত হয় ন্-এ (ন্ত, ন্থ ...); পরে প-বর্গ থাকলে ং রূপ পায় ম্-এ (ম্প, ম্ফ ...); এবং বাকি অন্য কোনো বর্ণ পরে থাকলে ং একই রূপে থেকে যায় (ংয, ংর ...)। এর মধ্যে প্রথম চারটি রূপ — ং, ঙ্, ঞ্, ণ্ দিয়ে কোনো শব্দ শুরু করা যায় না; এখানে ং-রূপিণী অব্যক্ত। ন্-তে ং-রূপিণী আধা-অব্যক্ত, ম্-তে ব্যক্ত। তাই কেবলমাত্র ন্, ম্ দিয়ে শব্দ শুরু করা যায়। এর থেকে বোঝা যায়, ং-রূপিণী তার অব্যক্ত রহস্যরূপ থেকে খানিকটা ব্যক্ত রূপ পায় ন্-এ, মোটামুটি পূর্ণ ব্যক্তরূপ পায় ম্-এ। এই পরিবর্তন কেবল জিহ্বাযন্ত্রের সুবিধার জন্য ঘটে না, ক্রিয়ার পরিবর্তনও তার কারণ। যেমন ং-এর পরে প-বর্গ থাকলে ং-কে সীমায়িত করে নিতে হয়, তখন ং পরিণত হয় ম্-এ।

যাই হোক, এবার আমরা ন্-ক্রিয়াকে বা 'ন-করণ' ব্যাপারটিকে জানতে চাইব, বোঝার চেষ্টা করব ক্রিয়াটি আসলে কীরকম। এই সত্তা কোনো কিছুকে 'ন' (no, negate) করে দেয়, বিলুপ্ত করে দেয়, নষ্ট করে দেয়, তাড়িয়ে দেয় ... ইত্যাদি। কিন্তু প্রশ্ন হল, কিছু থাকলে তবে তো তাকে 'ন' (no) করবে, negate করবে! কিছুই না থাকলে কাকে 'না' করবে? এই হল রহস্যরূপিণীর সমস্যা। তাই তার আচরণ ভারি অদ্ভুত। কেউ না থাকলে আসলে 'না' থাকে। তখন সে তাকে হ্যাঁ করে দেয়, যাকে বলে **অন্** করা; আর থাকলে তাকে না করে দেয়। একেবারে যোগ-বিয়োগের নিয়মে সে চলে। না না জুড়ে হ্যাঁ। বিষম্ বিষমৌষধম্, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস। প্রেক্ষিত যদি কালো হয়, সে সাদা বিন্দু সৃষ্টি করতে থাকে; আর প্রেক্ষিত যদি সাদা হয়, সে কালো বিন্দু প্রসব করতে থাকে। তার মানে, না-করণ সৃষ্টির দুনিয়ায় নাশকারী; না-এর দুনিয়ায় সৃষ্টিকারী। একে আমরা নাশকারী ও সৃষ্টিকারী দুরকম সত্তার মিলিত রূপ ভাবতে পারি। সেক্ষেত্রে আরও একটি কথা বলা চলে — ধ্বংস না হলে নির্মাণ নেই। যে ধ্বংস করে সেই নির্মাণ করে, এমন সত্তা তো এই পৃথিবীতে রয়েছেই, বিশেষত যাঁরা পূর্বতন রূপকে ধ্বংস করে নতুন রূপ সৃজন করে থাকেন। এই সত্তাকেই তো শিব বলা হয়।

যাই হোক, যা আছে, চলছে, সেই চলনকে বা চল্-অন্ (অ + ন্ বা on) কে সে উল্টে দিয়ে ন (ন্ + অ = no) করে দেয়। তখন চলন হয়ে যায় **ন + চল = অচল**। এই সেই কারণ, যেকারণে বাংলায় ন **প্রায়শই অ-এ বদলে** যায়। আমরা জানি, **অ** মানেই অস্তিত্ব, অস্তিত্বের **প্রথম একক**; অর্থাৎ, যাকে **অন** (on) করা হয়ে গেছে। তার মানে, ন্-ক্রিয়াটি অন্-কারী বা সৃষ্টিকারী বটে, ন-কারী (no-কারী) বা ধ্বংসকারীও বটে। অস্তিত্ব বটে, অনস্তিত্বও বটে। দ্র. **অন ও অ বর্ণের অর্থ**। তবে সে কখন কী রূপ নেবে, তা নির্ভর করে প্রেক্ষিতের ওপর, ন-এর আগে-পরে কে থাকছে না থাকছে, সেই সঙ্গীসাথীদের ওপর। সুতরাং **ন = ন-কারী** বা **অন্-কারী** বললেও তার পরিবর্তনশীল স্বরূপের কথা মনে রেখেই অর্থ নিষ্কাশনের কাজ করতে হবে। দ্র. নি।

বাংলা পদাবলী সাহিত্যে 'করতে নারি' জাতীয় শব্দবন্ধের দেখা মেলে। ব.শ. তার উদাহরণ দিয়েছেন — নার, নারিনু, নারিবে, নারিস, নারিল, নারি, নারিবেন, নারন্ত, নারম, নারিলোঁ প্রভৃতি শব্দে। গ্রামবাংলায় লোকমুখে 'করতে লারব' জাতীয় কথা হামেশাই ব্যবহৃত হয়। তার মানে ক = কারী-সত্তাকে যেমন বুঝে থাকি, তেমনি ন = ন-কারী সত্তাকে বুঝতে হবে। এই ন-কারী কী করে? সে করে না, করতে চায় না, করতে রাজি নয়, করতে পারে না, যা আছে তাকে অস্থির করে দেয়, নষ্ট করে দেয়, না করে দেয়, বিপরীত করে দেয়, বিপরীতের সৃষ্টি করে দেয়, **অন্** করে দেয়। মোটকথা, অংরূপিণীর আধা-ব্যক্ত এই সত্তা এমন অনেক কিছুই করে দিতে পারে, যা দৃশ্যত পরস্পরবিরোধী। এককথায় এই ন-কারী মানে যে সৃজন-অসৃজন করে। অর্থাৎ কিনা, পরমাপ্রকৃতি এই ন্-এর ভিতরে লীলা করেন, অবলীলাও করেন। **ল** যেমন লালন-লয়ন করে, খানিকটা সেইরকম। দ্র. **অন**। অতএব, **ন = ন-কারী, অন্-কারী**।

গ্রামবাংলার মানুষের মুখে প্রায়শই **ন** ও **ল** সমার্থকভাবে প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। 'এটা নয়'কে তাঁরা বলেন 'এটা লয়'। এর কারণ হল 'না-কৃত' হওয়া আর 'লয়-পাওয়া' একই কথা। তাই লোকে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিয়মে **ন** ও **ল**-এর স্থান বদল করে নেয়। যত বেশি প্রতীকী, শহুরে, অ্যাকাডেমি-শিক্ষিত, তত বেশি 'ন' বলার প্রবণতা থাকে; এবং যত বেশি গ্রামীণ ও প্রাচীন উত্তরাধিকার থাকে তত বেশি 'ল' বলার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়।

তাই আপাতত সিদ্ধান্ত করতে পারি — *ন = ন্-অন্ করে যে (no-on করে যে) = ন-কারী, অন্-কারী; ন-এর আধার যে = না; ন গতিশীল যাহাতে = নি; নি-এর আধার যে = নী; ন নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে = নু; নু-এর আধার যে = নূ; ন আবর্ত্তিত যাহাতে = নৃ; নৃ-র আধার যে = নৄ; ন দিশাগ্রস্ত যাহাতে = নে; নে-র আধার যে = নৈ; ন-এর সর্বরূপ যাহাতে = নো; নো-র আধার যে = নৌ।*

ন্ বর্গে জাত শব্দবংশের তালিকা : *নজ্, নট্ (নড়্, নল্)*, নদ্, নন্দ্, নম্, নশ্ (*নস্*, নিশ্), নহ্, *নাথ, নি* (নিন্দ্, *নিশ্*), নী, নু (নুদ্), *নৃ (নৄ)*, নৃত্, ন্ = ১৩ + ১

নজ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : নক্ত, নক্তক, নক্তচর, নক্তচারী, নক্তভোজন, নক্তব্রত, নক্তম, নক্তমচর্য্যা, নক্তমাল, নক্তা, নক্তান্ধ, নক্র, নক্রা, নগন, নগ্ন, নগ্নক, নগ্নকান্তি, নগ্নজিৎ, নগ্নসৌন্দর্য্য, নগ্নত্ব, নগ্না, নগ্নিকা, নজ্, নাঙ, নাঙট, নাঙ্গ, নাঙ্গা, নাগা, নেংগা, নেংটা, নেংটি, নেংটী, নেংটো, নেঙ(ঙ্গ)টা, নেঙ্গটি, নেজ, নেজক, নেজন, নেজনা, নেজা, নেজুড়, ন্যাংটি, ন্যাঙ্গা।

নজ্ = ন (no) জনন। **নজ** = ন (no) জনন করে যে।

নক্ত (নক্তক, নক্তা) : ১. ✓নজ্ + ত (ক্ত)। (ব.শ.)। ২. ***নক্ত*** *= ন-কারী (no-কারী) জনিত হয় যাহাতে।* ***নক্তক*** *=* ***নক্ত*** *করে যে।* ***নক্তা*** *=* ***নক্ত****-এর আধার যে।* ৩. **নক্ত** = রাত্রি, নক্তব্রত। **নক্তক** = মলিন জীর্ণ বস্ত্র, কর্পট, নেকড়া, ন্যাতা। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. আছে-গুলি সব না হয়ে যায় অন্ধকারে। এই অন্ধকার সৃজন করে যে, তাকে বলে ন-জননকারী **নক্ত**। এক বিচারে এটি কালো কালো অজস্র বিন্দুর সৃষ্টিই বটে। তাই দিয়ে জগৎসংসারকে ঢেকে দেয় বা না করে দেয় যে, সেই হল **নক্ত**। তবে **নক্তা** শব্দটি বাংলাভাষায় নেই, রয়েছে আরবিতে। বাংলায় যেমন র-বর্ণটিকে বোঝানোর জন্য ব-এর তলায় ফুট্‌কি বলি, যা কিনা আসলে কালো বিন্দুর আধার; আরবি বর্ণমালায় তেমনি কোনো কোনো বর্ণের উপরে ফুটকি বোঝাতে **নক্তা** বলা হয়। ৬. Greek - nux, Latin - nox, German - Nacht, Slav - nosti, Kelt - innocht। (ব.শ.)।

নগ্ন (নগ্না) : ১. ✓নজ্ (ব্রীড়া) + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নগ্ন*** *= অন্-কারীর জনন ন-কৃত যাহাতে।* ***নগ্না*** *=* ***নগ্ন****-এর আধার যে।* / **নগ্ন** = যাহার কুল বেদশাস্ত্রশ্রুতহীন। (ব.শ.)। ৩. **নগ্ন** = বিবসন, উপস্থাচ্ছাদনবাসরহিত, ক্ষপণক, বৌদ্ধসন্ন্যাসী, বিবস্ত্র-সন্ন্যাসীভেদ, নাগা, শিব, বন্দী, স্তুতিপাঠক। **নগ্না** = বিবস্ত্রা নারী, বিবস্ত্রা থাকার যোগ্যা বালিকা, নির্লজ্জা নারী, সহজসৌন্দর্য্যময়ী। (ব.শ.)। ৪. ইংরেজি naked অর্থে প্রচলিত। ৫. শরীরটি আছে, তার উপর **'ন-কারী জনন করা'** মানে তাকে শরীরের রং-এর বিপরীত রং-এর বিন্দু দিয়ে ঢেকে দেওয়া। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে নজ্ ক্রিয়া মানে শরীরটিকে ঢেকে দেওয়া, কাপড় পরানো। সেই কাপড় পরানোর কাজটিকে ন-কার করে দিলে কী হবে? শরীরটি যেমন ছিল তেমন থেকে যাবে, অর্থাৎ উলঙ্গ হয়ে যাবে। তাই **নগ্ন** মানে উলঙ্গ।

কিন্তু বন্দী বা স্তুতিপাঠককে **নগ্ন** বলা হয় কেন? সাধারণত রাজার, মন্ত্রীর, ক্ষমতাবানের স্তুতিপাঠক থাকে। এরা ক্ষমতাবানকে সঠিক-বেঠিক বাক্যে প্রশংসা করতে থাকে। প্রগল্‌ভ মোসাহেবের সঙ্গ করলেই টের পাওয়া যায়, অন্যকে ন্যায্য-অন্যায্য প্রশংসা করতে করতে, অন্যের উপর গৌরবের আভরণ চাপাতে চাপাতে সে নিজের মনটাকে উলঙ্গ করে ফেলে। এর ফলে দু'দিক থেকেই ক্ষতি হয়। প্রথমত, স্তুতিপাঠক মোসাহেবটি যেমন মানুষ হিসেবে ছোট হয়ে যায়, তেমনি যার প্রশংসা করা হয়, গৌরবের অত্যধিক আভরণ তাকে সত্যভ্রষ্ট করে। সেই কারণে বন্দী বা স্তুতিপাঠককে **নগ্ন** বলা হয়। অন্যের মনকে কাপড় পরাতে পরাতে তাদের নিজেদের মনটা উলঙ্গ হয়ে যায়। ৬. Greek - nochd, Latin - nudus, German - nockt, Russian - nagoi, Anglo-Saxon - nacod, Swedish - naken, English - naked। (ব.শ.)।

নাঙ্গ (নাং, নাঙ) : ২. ***নাঙ্গ*** *= যে রহস্যরূপে গমন নাই; অর্থাৎ, যে পুরুষকে গমন (করতে) দিতে নাই; অথবা, যে নারীতে গমন নাই বা গমন করা উচিত নয়।* ***নাঙ*** *= যে রহস্যরূপে না-করণ আছে।* ৩. জার। (ব.শ.)। ৪. গালি রূপে প্রচলিত। ৫. 'নাঙ্গ্-করা', বা 'নাঙ্-করা' কিংবা 'নাঙ্গ্-নাচানী' প্রভৃতি শব্দবন্ধ গালিরূপে গ্রামবাংলায় প্রচলিত। স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সঙ্গে এবং স্ত্রী ভিন্ন অন্য নারীর সঙ্গে গোপনে দৈহিক সম্পর্ক রাখলে, তাকে বলা হয় 'নাঙ্গ্-করা' বা 'নাঙ্-করা'; এবং তদ্রূপ পুরুষ বা নারীকে বলা হয় নাঙ্গ বা নাঙ্। যে নারী তার নাঙ্গদের আপন শরীরের লোভ দেখিয়ে তাতিয়ে বেড়ায়, তাকে বলে 'নাঙ্গ্-নাচানী'। এখানে বিশেষ কহতব্য এই যে, গ্রামবাংলার এই ধরনের গালাগালিমূলক শব্দগুলির অধিকাংশই যথার্থ ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মেই আজও প্রচলিত রয়েছে; এগুলির প্রতীকীকরণ হয়নি বললেই চলে।

নাঙ্গা (নাগা) : ২. ***নাঙ্গা*** *= নাই কিছুই অঙ্গে যাহার।* ***নাগা*** *= না-কৃত গা যাহার।* ৩. **নাঙ্গা** = নেংটা। **নাগা** = শৈব নগ্ন সন্ন্যাসিবিশেষ, দিগম্বর শিব, আসামের পাহাড়িয়া জাতিবিশেষ, নাগাজাতির বস্তির নিকটস্থ পাহাড়। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. একথা সহজবোধ্য যে, গায়ে কিছুই না থাকলে তাকে **নাঙ্গা** বা **নাগা** বলা যায়। কিন্তু শব্দটির ভিতরে এটুকুই নেই, আরও আছে। গ্রামবাংলায় যাঁরা মুনিষ খাটেন, তাঁদের মুখে হামেশাই 'নাঙ্গা' বা 'নাগা' শব্দটি শোনা যায়। কাজে কোনোদিন অনুপস্থিত থাকলে তাঁরা এভাবে বলেন — 'এ হপ্তায় একদিন নাঙ্গা (নাগা) হয়ে গেল'। অর্থাৎ প্রতিটি দিনই 'গা'-পদবাচ্য এবং তাতে হাজির থেকে সক্রিয় হলে সেটি হয় অং-রূপিণীময় গা বা অঙ্গা। ন-কৃত অঙ্গাই **নাঙ্গা** বা **নাগা**। 'কাল অনুপস্থিত থেকো না' কথাটি তাঁরা বলেন 'কাল নাগা করিস না'।

নেঙ্গট (নেংটা, নেংটি, নেঙ্গটি, লেঙ্গট, লেঙ্গটা) : ২. ***নেঙ্গট (লেঙ্গট)*** *= লিঙ্গ টঙ্কারিত হয় যাহাতে।* ***নেংটা (লেঙ্গটা)*** *=* ***লেঙ্গট****-এর আধার যে।* ***নেংটি (নেঙ্গটি)*** *=* ***নেঙ্গট*** *গতিশীল যাহাতে।* ৩. **নেংটা (লেঙ্গটা)** = উলঙ্গ, আদুড়, খালি। **নেংটি (নেঙ্গটি)** = ক্ষুদ্র মূষিকবিশেষ, শলা ইঁদুর। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. যে কাপড় দিয়ে পুরুষের কেবলমাত্র লিঙ্গটুকু ঢাকা যায়, তাকে নেঙ্গট, লেঙ্গট, ল্যাঙ্গট ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। শব্দটি সব অভিধানে নেই। সেই নেঙ্গট, লেঙ্গট বা ল্যাঙ্গট পরে যে, তাকে নেঙ্গটা, নেংটা, নেংটো, লেঙ্গটা, ল্যাংটা বা ল্যাঙ্গটা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ঐটুকু কাপড়ে তার শরীরের সবকিছু দেখা যায় বলে, ক্রমে ক্রমে একদিন কথাটির মানে দাঁড়িয়ে যায় 'উলঙ্গ'; যদিও শব্দের নিজস্ব নিয়মে **নেংটা** বা **লেঙ্গটা** কথাটির মানে হল, যে শুধুমাত্র **নেঙ্গট** বা **লেঙ্গট** পরে আছে। এই শব্দগুলি বহু রকম বানানে লেখা

হয়ে থাকে। তাতে 'ন ও ল সমার্থক' নীতিটি যেমন সক্রিয় থেকেছে, তেমনি ঙ্ ও ং বারংবার স্থান বদল করেছে।

***নট্ (নড়্, নল্)* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা :** আগনলা, আনলা, খুঁটিনাটি, খোলনলচে, নইচা, নইচে, নট্, নট (not), নটক, নটকী, নটঘট (not, naught, naughty, ন-এর টঙ্কার করে না, ঘ-এর টঙ্কারও করে না) নটচর্য্যা, নটচাঁদ, নটচান্দ, নটন, নটনঘটন (নটঘট), নটনারায়ণ, নটনবিভোর, নটনবিহার, নটনী, নটভূষণ, নটবর, নটমেলক, নটরঙ্গ, নটরাজ, নটিনী, নটী, নটুয়া, নটেশ্বর, নঠ, নঠী, নড়্, নড় (নল), নড়ক, নড়চড় (লড়চড়), নড়ন, নড়নড়, নড়বড়, নড়া (নলা), নড়াচড়া, নড়ান, নড়ি(ড়ী), নড়েভোলা, নড়্বল, নল্, নল, নলক (নোলক), নলকানন, নলকিনী, নলকুবর, নলখড়ি, নলখাক(গ), নলখাগড়া, নলখাড়া, নল-চালা, নলচে, নলদ, নলপট্টিকা, নলপা, নলবন, নলমীন, নলা, নলি, নলিকা, নলিচা, নলিত, নলিন, নলিনী, নলিনীদল, নলী, নলে, নব, নাট, নাটক, নাটকী, নাটকীয়, নাটন, নাটমন্দির, নাটশাল, নাটি (খুটিনাটি), নাটিকা, নাটিত, নাটুয়া, নাটেয়, নাটের-গুরু (লাটের-গুরু), নাটোআ(য়া), নাট্য, নাট্যপ্রিয়, নাট্যভাষা, নাট্যশালা, নাট্যশাস্ত্র, নাট্যাচার্য্য, নাট্যালঙ্কার, নাট্যোক্তি, নাড়, নাড়া, নাড়া (পত্রহীন), নাড়ি, নাড়িকা, নাড়িখুড়ি, নাড়িচক্র, নাড়ি-টেপা, নাড়ি-নক্ষত্র, নাড়িন্ধম, নাড়ি-ভুঁড়ি, নাড়ির-টান, নাড়ী, নাঢ়া, নাণ্ডামুণ্ডা, নাল, নালা, নালি, নালিক, নালিকা, নালি-ঘা, নালিতা, নালিম, নালী, নালীক, নালীব্রণ, নুটি, নুঠ, নুড়নুড়, নুন্নড়, নুন্নুড়, নুন্নুড়ী, নুড়া, নুড়ি, নুড়ো, নেড়, নেড়া, নেড়ি, নেড়িকুকুর, নেড়িয়া, নেড়ে, নেটি, নোটন (নটন), নোটা, নোড়, নোড়া(ঢ়া), ন্যাড়, ন্যাড়া, প্রণালী, লাট, লাটক, লাটমন্দির, লাটসাহেব, লাটুয়া।

নট্ (নড়্, নল্) = ন-এর টঙ্কারণ। **নট** = ন টঙ্কারিত হয় যাহাতে। **নড়** = ন-এর গড়ান-উড়ান যাহাতে। **নল** = ন-এর লালন-লয়ন যাহাতে।

নট (নটক, নটন, নটবর, নটরাজ, নটী) : ১. ✓নট্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নট = অন্-কারী টঙ্কারিত যাহাতে। নটক = নট করে যে। নটন = নট অন যাহাতে। নটবর = নট রূপে বরণীয় যে। নটরাজ = নটগণের শ্রেষ্ঠ বা রাজা। নটী = নট-এর গতিশীল আধার যে।* / **নট** = যে নৃত্য করে; যে নৃত্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে; যে নাটকের অভিনয় করে। (ছা.অ.)। ৩. **নট** = সূত্রধার, নর্ত্তক, নবরসাভিনয়চতুর, অভিনেতা, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত জাতিবিশেষ, অশোক, শোণ্যাকবৃক্ষ, নল-তৃণ; নৃত্য করা। **নটক** = নট, নর্ত্তক, দোষ, দুষ্ট, লম্পট। **নটন** = নর্ত্তন, নৃত্য, আঙ্গিক বা বাচিক অভিনয়। **নটবর** = সূত্রধার, নটশ্রেষ্ঠ। **নটরাজ** = নটভূপ, শ্রেষ্ঠনর্ত্তক। **নটী** = নট-স্ত্রী, নটজাতি-স্ত্রী, সূত্রধারের সহকারিণী অভিনেত্রী, বেশ্যা, নলীনামক গন্ধদ্রব্য। (ব.শ.)। **নটবর** = শ্রেষ্ঠ নর্তক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রীকৃষ্ণ। **নটরাজ** = নটেশ্বর, নর্তকশ্রেষ্ঠ, হিন্দুদেবতা শিব যিনি তাণ্ডব নৃত্য করেন। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. actor of theatre অর্থে **নট** এবং actress of theatre অর্থে **নটী** কমবেশি প্রচলিত। বাকি দুটি শব্দ অপ্রচলিত। ৫. পরমাপ্রকৃতি মানুষের সৃষ্টি করেছেন কেন? তার সহজ উত্তর হল — **লীলা** করবেন বলে। (দ্র. **চেষ্টা, ক্রীড়া, কেলি**।) কিন্তু করবেন কোথায়? তার জন্য শক্তিশালী বৃহৎ মন দরকার। সেই মনই হতে পারে পরমাপ্রকৃতির লীলার মাঠ। তো, মন বানাতে হবে, বড়ো মন গড়ে তুলতে হবে। সেই চেষ্টায় জড় থেকে জীবে এই প্রকৃতির যে বিবর্তন হয়েছে, তার সিঁড়ির সর্বোচ্চ ধাপে অবস্থিত জীবরূপে জন্ম হয়েছে মানুষ নামক জীবটির। তার মনের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি। পরমাপ্রকৃতিকে তাঁর লীলাখেলা করার মাঠ সরবরাহ করতে পারে বলেই মানুষের এত কদর।

অতএব একটি মানুষ, যার ভিতরে অংরূপিণী পরমাপ্রকৃতি লীলা করেন (বা অবলীলা করেন), সেই লীলাময়-মানবমন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। মানুষের ভিতর দিয়ে লীলাময়ী পরমাপ্রকৃতির শব্দময় আত্মপ্রকাশকে আমরা দেখতে পাই মানুষের সঙ্গীত ... ইত্যাদির ধারায়; আর, রূপময় আত্মপ্রকাশকে আমরা দেখতে পাই নৃত্যে, অভিনয়ে, নানারকম ভাবভঙ্গিতে, প্রকাশ্য আচরণে। দ্র. **নাট**। তার মধ্যে অন্-কারী পরমাপ্রকৃতি মানুষের অজস্র মুদ্রাসম্বলিত ছন্দময় শরীর সঞ্চালনমূলক (এবং অবশ্যই বিভিন্ন অর্থপ্রকাশকারী) নৃত্যে ও অভিনয়ে টঙ্কারিত হন। যে মানুষেরা তদ্রূপ টঙ্কারের আশ্রয়, তাঁদের **নট** বলে। সমাজে যাঁরা বিশেষ বিশেষ ঘট-প্রকল্পের সূত্র ধারণ করেন, কিংবা তদ্রূপ ঘটনাদির ছায়ার সূত্র ধারণ করেন, সেই **নট**দের সেকারণেই সূত্রধার বলে। এই সামাজিক ঘটপ্রকল্পে যাঁরা লাভবান হন, তাঁরা এবম্প্রকার **নট**কে বলেন **নটবর**, এবং যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাঁরা বলেন 'নাটের গুরু'। বলে রাখা ভাল, **নটবর** হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, আর **নটরাজ** স্বয়ং শিব। **লীলা** থেকে **অবলীলায়** পরমাপ্রকৃতি তাঁর লীলাখেলা খেলেন বলে, এর ভাল ও মন্দ দুই রকম অর্থ করা হয়ে থাকে। এই **নট**-এর ইংরেজি উত্তরাধিকার রয়েছে naught ও naughty ইত্যাদি শব্দে। ন-এর অনেক উত্তরাধিকার ইংরেজির রয়েছে kn-যুক্ত আরও কোনো কোনো শব্দে। **নট**-এর ন 'ভাল নাটের গুরু' অর্থে knight হলেও হতে পারে, কিন্তু মন্দ অর্থে কি knot হতে পারে না। অন্-কারী (on-কারী) কি প্রতিটি knot-এ বাধা পেয়ে টঙ্কারিত হয় না? হয়, যদি স্মরণ করা হয় যে, আমাদের **জ্ঞ** বা জানা ইংরেজের know হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে আমাদের **গাঁট** বা **গিঁট** ইংরেজের knit, knot হবে না কেন। ৬. ইংরেজি naught, naughty, not, knot।

নড় (নড়চড়, নড়ন, নড়নচড়ন, নড়নড়, নড়বড়, নড়া, নড়াচড়া, নড়ান, নড়ি, নড়েভোলা) : ২. *নড় = ন-এর (অন্-কারীর) গড়ান-উড়ান যাহাতে। নড়চড় = নড় ও চড় (দ্র. চড়)। নড়ন = নড় অন যাহাতে। নড়নচড়ন = নড় ও চড় অন যাহাতে। নড়নড় = নড়-এর পুনরাবৃত্তি যাহাতে। নড়বড় (নড়বড়ে) = নড় ও বড় (যাহা নড়ে এবং বড়হে বা বাড়ে।)। নড়া = নড়-এর আধার যে। নড়ান = নড়া অন যাহাতে। নড়ি = নড় গতিশীল যাহাতে।*

নড়েভোলা = *নড়ে যে ভোলা।* / **নড়** = যাহারা সীসার চুড়ি প্রস্তুত করে। (ব.শ.)। ৩. **নড়** = ভ্রংশ, নলতৃণ, জাতিবিশেষ, দৌড়, সরিয়া যাওয়া, প্রস্থান করা, ধাবিত হওয়া, যাত্রা করা, স্পন্দিত হওয়া, অন্যথা বা মিথ্যা হওয়া, নাশ পাওয়া, ত্বরান্বিত হওয়া, লড়াই করা। **নড়চড়** = নড়া ও চলা, অন্যথাভাব, ব্যতিক্রম। **নড়ন** = দ্র. নড়। **নড়নচড়ন** = নড়ন-চলন, নড়াচড়া। **নড়নড়** = অত্যন্ত নড়ার ভাব, অতিশিথিলভাব, ঢিলা। **নড়বড়** = শিথিলবন্ধভাব, সঞ্চলনভাব, শিথিলবন্ধন, জীর্ণ। **নড়া, নড়ান** = স্থানচ্যুত করা, স্পন্দিত করা, সরান, নড়ান। **নড়াচড়া** = নড়া ও চলা, স্রোতোবেগে গতি। **নড়ি (নড়ী)** = ছড়ি, লাঠি, মজুর। **নড়েভোলা** = অকর্ম্মণ্য-কাণ্ডজ্ঞানহীন, নগণ্য-হাবাগোবা। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **অন্**-কারী উড়বে উড়বে বা গড়াবে গড়াবে করলে, তাকে আমরা বলি **নড়** বা **নড়া**। অর্থাৎ গড়ানো উপর দিকে ঘটলে তাকে বলে **উড়া**, আর সমতলে ঘটলে তাকে বলে **নড়া**। ইংরেজ তাকেই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে তাদের nod করায়। তবে ন-এর অনেক উত্তরাধিকার ইংরেজির রয়েছে kn-যুক্ত আরও কোনো কোনো শব্দে। এখানে আমরা যাকে **নড়ি** শব্দে পাচ্ছি, সেই ছড়ি, লাঠি, মজুর, এরই উচ্চতর রূপ হল নাটের গুরু বা knight। যে **নড়ি** বা **নড়ে** মনের মতো ভাল কাজ করে তাকে অকর্ম্মণ্য বলা যায় না, যে সেরকম নয় তাকেই বলা যায় **নড়েভোলা**। ৬. ইংরেজি knight।

নল : ২. *ন (অন্-কারী) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে; অথবা, ন-এর (অন্-কারীর) উড়ান-গড়ান যাহাতে।* ৩. শর, খাগড়া, অন্তঃশূন্য গোলাকার দ্রব্যবিশেষ, চোঙা, ডাঁটা, পদ্ম, সৌরভ, পিতৃলোকবিশেষ, যদুর পুত্র। ক) নিষধরাজ, দময়ন্তীর পতি, নলনামক নরপতি। ইনি চন্দ্রবংশীয় নিষধরাজ বীরসেনের পুত্র। ইনি অতি ধর্ম্মশীল ও গুণবান ছিলেন, এজন্য অদ্যাপি পুণ্যশ্লোক নামে খ্যাত আছেন। খ) সূর্য্যবংশীয় নৃপবিশেষ, ইনি রামচন্দ্রের প্রপৌত্র, রামপুত্র কুশের পুত্র নিষধের পুত্র। গ) বানরবিশেষ, ইনি ঋতধ্বজ মুনির শাপে বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে গোদাবরীতীরে বানররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং শ্রীরামচন্দ্রের সৈনিক হইয়া সাগরবন্ধন করিয়াছিলেন। ঘ) দৈত্যবিশেষ। ইনি বিপ্রচিত্তির ত্রয়োদশ পুত্রের চতুর্থ। সিংহিকা ইহার মাতা। ঙ) নদবিশেষ, ইহা গঙ্গায় পতিত হইতেছে। চ) ভারতবর্ষীয় আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। যুদ্ধের সময় অশ্বপৃষ্ঠে রাখিয়া বাজাইতে হয়। (ছা.অ.)। নিষধরাজ। রাজা বীরসেনের পুত্র। ... দ্র. দময়ন্তী। ... স্বয়ংবর সভায় নলের ব্যবহারে দেবগণ তুষ্ট হয়ে নলকে বর দিলেন। ইন্দ্র বললেন যে, যজ্ঞকালে নল তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন; অগ্নি বললেন যে, নলের ইচ্ছামাত্রই তিনি আবির্ভূত হবেন; বরুণ বললেন যে, প্রার্থনামাত্রই নল জল পাবেন; এবং যম বললেন যে, নলের প্রস্তুত যে কোনো খাদ্যই সুস্বাদু হবে। ... নল-দময়ন্তীর ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা নামে এক পুত্র ও এক কন্যা হয়। ... কলি ও দ্বাপর দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারেননি। ইন্দ্রাদি দেবগণের কাছে দময়ন্তীর নলকে পতিত্বে বরণ করার সংবাদ শুনে তাঁরা নলের সর্বনাশ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কলি নলের দেহে প্রবেশের ছিদ্র খুঁজতে থাকেন ও দ্বাপরকে অক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতে বলেন। নল একদিন মূত্রত্যাগের পর পদপ্রক্ষালন না করে সন্ধ্যা করতে বসায়, সেই ছিদ্রে কলি নলের দেহে প্রবেশ করেন এবং নলের ভ্রাতা পুষ্করকে দ্যূতক্রীড়ায় নলের রাজ্য অপহরণ করতে পরামর্শ দেন। ... দ্র. দময়ন্তী ...। (পৌ.অ.)। ৫. দ্র. **কুণ্ডিন, কুণ্ডিননগরী, দময়ন্তী**। যার ভিতর দিয়ে **অন**-করণ লয়প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কোনো সত্তাকে (জল, দুধ, উৎপন্নদ্রব্য, পণ্যাদি) অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাকে **নল** বলে। সামাজিক সত্তা রূপে **নল** ভারতসমাজে ধনতন্ত্রের উদ্ভবকালে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে **নল**-স্বরূপ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই ভূমিকার কারণেই তিনি **নল** পদবাচ্য হয়েছিলেন। একে 'ন (বিত্ত) লালিত হয় যাহাতে' — এই অর্থেও গ্রহণ করা চলে। আমাদের 'গ' গ্রন্থের 'বিদর্ভের কথা : মহাভারতের অমৃতকথার কণিকামাত্র' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

নলচে (নলিকা, নলিচা, নইচা, নইচে, খোলনলচে) : ২. ***নলিকা*** = ***নল****-কে গতিশীল করে যে, তাহার আধার।* ***নলিচা (নলচে, নইচা, নইচে)*** = ***নল****-কে গতিশীল ক'রে চয়ন করে যে, তাহার আধার।* ***খোলনলচে*** = ***খোল*** *ও* ***নলচে****।* ৩. **নলচে (নলিচা, নইচে, নইচা)** = হুঁকার খোলে লগ্ন নলের মতো দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড, (সাদৃশ্যে) কণ্ঠনালী, গলা। **নলিকা** = নলাকার অস্ত্র-বিশেষ, ছোট নল ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। **খোল নলচে বদলানো** = রূপের আমূল পরিবর্তন, সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ দান। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। ৪. 'আমূল পরিবর্তন' অর্থে **খোলনলচে** শব্দটি বহুলপ্রচলিত থাকলেও বাকি শব্দগুলি অ্যাকাডেমিতে অপ্রচলিত; গ্রামবাংলাতেও ঐ শব্দগুলি আজকাল কম শোনা যায়। ৫. মনে করা হয় **নলিচা, নলচে, নইচা, নইচে** প্রভৃতি শব্দগুলি ফারসি থেকে এসেছে। হতে পারে। কিন্তু আমরা দেখছি, **নলিচা** শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ কেবলমাত্র উপরোক্ত চারটি শব্দকেই ধারণ করে না, **খোলনলচে** শব্দটির 'আমূল-পরিবর্তন' রূপ অর্থকেও অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেয়। **খোল** বহু অর্থবাচক শব্দ, কারণ তার মূলে রয়েছে **ক্ষু** ক্রিয়া। 'আবরণ' বা cover অর্থে যখন তা প্রযুক্ত হয়, তখন তা বাইরের **ক্ষু**-কারীর (খুবলে নেয় যে, তার) আক্রমণ থেকে আবৃত সত্তাকে রক্ষা করে। আর, **নলচে** হল সেই **খোল**-এর গা ফুটো করে বেরোনো সরু সরু নল, যে নল বা নলগুলি বাইরে বেরিয়ে এদিক-ওদিক থেকে নানা দরকারী বস্তু চয়ন করে আনে। যেন-বা এ হল কঠিন গোল আবরণে আবৃত একটি সত্তা, যার গা থেকে সরু সরু নল বেরিয়ে রয়েছে প্রয়োজনীয় দুধসর শুষে ভিতরে নিয়ে নেওয়ার জন্য। দৃশ্যলোকে এরকম কোনো জীবের কথা আমরা জানি না, তবে অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় লোকে এইরকম জীবের অভাব নেই। ছোট কোম্পানি থেকে সরকার পর্যন্ত যে কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরই **খোলনলচে** থাকে। প্রতিষ্ঠানের চেহারা যত বড়, তার **খোলনলচে** হয় তত বড় আকারের; তাকে বোঝা তত সহজসাধ্য। সরকারের বর্ম্মরূপ পুলিশপ্রশাসন, সৈন্যবাহিনী বা তদ্রূপ সংগঠনগুলি হল সরকারের **খোল**, সরকারকে তা 'খুবলে-নেওয়া' থেকে রক্ষা করে। আর, সরকারের অর্থধারা ধারণকারী করসংগ্রাহক নলের মতো সংগঠনগুলি হল তার **নলিচা**, তারা সরকারের রাজকোষ ভরে তোলে। প্রায়

একই অর্থবাহী বলে শ্বাপদের বা পক্ষীর নখকে নলি বলে। (দ্র. **নলি**)। **খোলনলচে** বদলে ফেলা মানে, একই সঙ্গে আবরণ-আরক্ষা-ব্যবস্থার বা **খোল**-এর বদল ঘটানো এবং রুজি-রোজগারের ব্যবস্থার বা **নলচে**-র বদল ঘটানো। এই অর্থেই শব্দটি আদিতে প্রচলিত হয়ে থাকবে। ফারসির আগমনের পর বাংলাভাষী স্বভাবতই ফারসির 'নাযেচা'কে দেখে নিজেদের **নলিচা** বলে চিনতে পারে এবং স্বভাবতই তাকে আপন করে নেয়। **৬.** ইংরেজি null।

নলিন (নলি, নলিনী, নলী) : ১. ✓নল্ + ইন (ইনচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***নলি** = **নল** গতিশীল যাহাতে। **নলিন** = **নল** গতিশীলভাবে না-কৃত যাহাতে; অথবা, যে **নল** (আপন সত্তার বা অন্য সত্তার ভিতরে) **ইন** (in) করে। **নলিনী** = **নলিন**-এর আধার যে। **নলী** = **নলি**-র আধার যে।* / **নলিন** = যে সৌরভ বন্ধ করে। (ব.শ.)। **৩. নলি (নলী)** = ছোট নল, তাঁতীর সূতা জড়াইবার ছোট কঞ্চির নল, গলার নল, কণ্ঠনালী, শ্বাপদের বা পক্ষীর নখ। **নলিন** = পদ্ম, জল, নীলিকা। **নলিনী** = পদ্মযুক্ত দেশ, পদ্মিনী, পদ্মলতা, পদ্মঝাড়, কমলাকর, সরসী, পদ্ম, ইন্দ্রপুরী, ব্যোমগঙ্গা, নারিকেল, নারিকেলাসব, পদ্মসমূহ। (ব.শ.)। **৪.** সরু 'pipe' অর্থে **নলি** প্রচলিত, **নলিনী** নামরূপে প্রচলিত, বাকি অপ্রচলিত। **৫.** বাংলাভাষীদের সাধারণ বিবেচনাই একথার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, যে-কোনো 'নলওয়ালী'কে **নলিনী** বলাই যেতে পারে; আর পদ্মফুল তো নলওয়ালীই বটে। উপরে সে রসরাজ হাসি ফুটিয়ে হাসছে ঠিকই, কিন্তু তার পিছনে রয়েছে সরু **নল**, যা দিয়ে সে রস টানছে। তবে সাহিত্যে **নলিনী** শব্দটির ব্যবহার থেকে বোঝা যায়, প্রধানত অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় লোকের **নলিনী**কে উল্লেখ করতেই শব্দটির ব্যবহার হত। মনে হয় এককালে সমাজে শোষক-নলওয়ালা সত্তামাত্রকেই **নলিনী** বলা হত। ইন্দ্রপুরী, ব্যোমগঙ্গা, এমনকি বিষ্ণুকে বোঝাতে 'নলিনেশয়' শব্দের প্রয়োগও সেকথাই প্রমাণ করে। আর নারিকেল গাছের নলের মতো শেকড় দেখলেই বোঝা যায়, কেন নারিকেলকে **নলিনী** বলা সম্ভব।

নাট (নাটক, নাটকী, নাটকীয়, নাটমন্দির) : ১. ✓নট্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***নাট** = **নট** হইতে জাত; অথবা, **নট** যাহা করিয়াছে। **নাটক** = **নাট** করে যে; অথবা, যাহা **নাট**-কৃত হয়। **নাটকী** = **নাটক**-এর গতিশীল আধার যে। **নাটকীয়** = **নাটকী** যায় যাহাতে। **নাটমন্দির** = **নাট**-এর মন্দির।* **৩. নাট** = নৃত্য, কর্ণাটক দেশ, লীলা, খেলা, কাণ্ড, অভিনয়, রঙ্গ, কৌতুক, ভাবভঙ্গি। **নাটক** = নর্ত্তক, অভিনেতা, অভিনেয় দৃশ্যকাব্য, নাটাই। **নাটকী** = ইন্দ্রসভা, নর্ত্তকী। **নাটকীয়** = নাটকসম্বন্ধী, নাটকলিখিত, নাটকে বর্ণনীয়। **নাটমন্দির** = দেবমন্দিরের সমীপস্থ নৃত্যগীতোৎসবের মণ্ডপ। (ব.শ.)। **৪.** drama অর্থে **নাটক** এবং dramatic অর্থে **নাটকীয়** শব্দ প্রচলিত; **নাটকী** অপ্রচলিত। **নাট** প্রচলিত কেবল 'নাট-এর গুরু' শব্দে। কী অর্থে সেকথা বলছি। **৫.** কর্ণাটক দেশকে **নাট** বলে কেন, এখনও তা আমরা জানি না। তবে, নাটাইকে **নাটক** বলার একটা কারণ দেখতে পাওয়া যায় **নট** শব্দের মূল থেকে। সেখানে **ঘট-প্রকল্পের মূলকে ধরে রাখে নট**। সে যা করে সেটিই **নাট**। তো, এই **নাটের গুরুই আসলে তার মূল বা নট**। এখন কথা হল, ঘুড়ি যে উড়ছে, **গোঁত্তা খাচ্ছে, পাক খাচ্ছে,** সোঁ করে উঠে যাচ্ছে ... এই **নাট করাচ্ছে কে? করাচ্ছে হাতের নাটাই**। আর, 'নাট যে করায়' তাকেও তো **নাটকই** বলতে হয়। সুতরাং, নাটাইকে **নাটক** বলা যেতেই পারে। তাছাড়া, যে মন্দির **ঘট-প্রকল্পের** কেন্দ্র, তার সম্মুখস্থ মণ্ডপ যদি **নাট-কর্ম্মে** ব্যবহৃত হয়, তাকেও **নাটমন্দির** বলা যায়। তবে সে হবে **বাহ্য নাটমন্দির**। একালের ভাবনায় 'ওয়েবসাইট'কেও **নাটমন্দির** বলা যায়। কারণ, প্রত্যেক বড় বড় **ঘট-প্রকল্পের** সম্মুখে প্রকল্পটির নিজ নিজ 'ওয়েবসাইট' আপন আপন **নটনাট্য** উপস্থাপন করে থাকে।

নাটি (খুঁটিনাটি, নাটিকা) : ২. ***নাটি** = **নাট** গতিশীল যাহাতে। **নাটিকা** = **নাটি** কৃত যাহাতে। **খুঁটিনাটি** = **খুঁটি** ও **নাটি**।* **৩. নাটিকা** = উপরূপকবিশেষ, নর্ত্তকী। **খুঁটিনাটি** = কৌটিল্যাভিনয়, ছলনা, চাতুরীর কথা, সামান্য বিষয় লইয়া কৃত শঠতা, বিবাদ-বিসম্বাদ বা বচসা, ছোট-খাট সাংসারিক বিষয় বা গৃহস্থের কার্য্য। ... বোধ হয়, 'খুটিনাটি'র মূল 'ক্ষুদ্রনাট্য'। (প্রাকৃতে খুড্ড + নট্ট) — সংসারের ক্ষুদ্র অভিনয়ের বিষয়, অর্থাৎ কার্য্য; গৃহস্থের ছোটখাট কাজ। (ব.শ.)। **খুঁটিনাটি** = কোনো বিষয়ের ছোট বড়ো সব কিছু, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল বিষয়, তুচ্ছ বা নিতান্ত সামান্য দোষত্রুটি। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **৪.** 'ছোট নাটক' অর্থে **নাটিকা** এবং trifling অর্থে **খুঁটিনাটি** প্রচলিত; **নাটি** পৃথকভাবে অপ্রচলিত কিন্তু সংস্কৃত ক্রিয়াপদ রূপে তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। দ্র. **নাট্য**। **৫.** 'খুঁটিনাটি ব্যাপার' শব্দবন্ধটি এখন বাংলাভাষায় খুবই প্রচলিত। ব.শ. একে লিখেছেন 'খুটিনাটি', 'খুঁটিনাটি', 'কুটিনাটি', 'কুটিনাটী' — চার ভাবে লিখেছেন। আমাদের মনে হয়, এটি 'খুঁটিনাটি'ই হবে। এর অর্থ এইরূপ — আপনি দিদির বাড়ি গিয়েছিলেন, আজ ফিরছেন ট্রেনে করে। বসে আছেন, ট্রেন চলছে। হঠাৎ মনে পড়ল, কলমটি ফেলে এসেছেন। খেতে খেতে ফোন এসেছিল, একটা নম্বর লিখতে কলমটি নিতে হয়েছিল, ওখানেই থেকে গেছে। তাছাড়া দিদি-জামাইবাবুর সাথে সব কাজের কথা হল, কিন্তু ভাগ্নিকে বলা হল না, সামনের পুজোতে ওর ইচ্ছে আপনি পূর্ণ করবেন। এই ভুলে যাওয়া কলমটি হল 'খুঁটি', আর ভাগ্নিকে না-বলা কথাটি হল 'নাটি'।

আসলে মানুষ মাত্রেই যেখানে যায়, সেখানেই সে তার আপন অস্তিত্বের চাদর বিছিয়ে বসে। যখন নিজের অস্তিত্ব সরিয়ে বা তুলে নেয়, তখন তার অস্তিত্বের চাদরের খুঁটিনাটি ব্যাপার সেখানে আটকে থেকে যেতে পারে। এর মধ্যে পার্থিব খুচরো ব্যাপারকে বলে **খুঁটি**, কারণ তাতে দৈহিক অস্তিত্বের **খুঁট** ছেড়ে থেকে যায়। আর মানসিক খুচরো ব্যাপারকে বলে **নাটি**, কারণ তাতে মানসিক **নাট**-এর (নট-কর্ম্মের) ক্ষুদ্রাংশ থেকে যায়। এক্ষেত্রে আপনার সেরকমই **খুঁটিনাটি** ব্যাপারে ভুল হয়ে গেছে। আপনি যদি আপনার অস্তিত্বের চাদরের **খুঁটটি** অর্থাৎ কলমটি মনে করে নিয়ে নিতেন এবং মনে করে ভাগ্নির সামনে **নট-কর্ম্মটি** করে নিতেন বা **নাট**-টি অভিনয় করে নিতেন, তাহলে আপনার **খুঁটিনাটি** ব্যাপারে এমন ভুল হত না। অর্থাৎ,

অস্তিত্বের দৈহিক চাদরের প্রান্তিক ক্ষুদ্রাংশকে **খুঁটি** এবং অস্তিত্বের মানসিক চাদরের প্রান্তিক ক্ষুদ্রাংশকে **নাটি** বলে। দুটিকে একত্রে বললে এই হল **খুঁটিনাটি** ব্যাপার।

নাট্য : ১. ✓নট্ + য (এ্যঃ)। (ব.শ.)। ২. *নাট থাকে যাহাতে।* ৩. নটকর্ম্ম, নটধর্ম্ম, নৃত্যগীতবাদ্য, তৌর্য্যত্রিক, নৃত্য; অভিনেয় দৃশ্যকাব্য, নাটক, নাট্যশাস্ত্র, বাক্যার্থাভিনয়, অভিনয়, অভিনেতা। (ব.শ.)। ৪. drama অর্থে প্রচলিত। ৫. গ্রামবাংলায় আজও বয়স্ক-বয়স্কা 'মুরুব্বি' মানুষেরা বটগাছের বীজ নিয়ে শিশুশিক্ষা দেন, 'এইটার ভিতরে কী আছে?' উত্তর দিতে হয়, 'এই গোটা বটগাছটাই রয়েছে ঐটুকু বীজের ভিতরে।' বাস্তবে যে বিশাল সামাজিক ঘটনা ঘটে গেছে, তার কাহিনী বা সারমর্ম থাকে নাট-এ। ইংরেজিতে সেকারণেই বীজকে nut এবং সারমর্মকে in a nutshell বলা হয়ে থাকে। সামাজিক ঘটনার সেই **নাট** থাকে যে গ্রন্থে কিংবা কয়েক ঘণ্টার যে-অভিনয়ে, তাকে তাই **নাট্য** বলে। ৬. ইংরেজি nut, nutshell ইত্যাদি।

নাড় (নাড়া) : ২. *নাড় = নড় হইতে জাত। নাড়া = নাড়-এর আধার যে।* ৩. স্থানান্তরে লওয়া, চালিত করা, অন্যথা করা, স্থানান্তরে রোপণ করা, ছড়ান; সঞ্চালন, অপসারণ, স্থানান্তরে রোপণ, আঘাত; ধানের নলের মতো গোড়া (stalk), বিচালি, খড়; মুণ্ডিতমস্তক, মুণ্ড, পত্রশূন্য, পল্লবহীন, মুড়া, বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষ। (ব.শ.)। ৪. to move অর্থে এবং গ্রামবাংলায় stalk অর্থে প্রচলিত। ৫. কথাটি গানের দুনিয়ায় খুব প্রচলিত — 'নাড়া বাঁধা'। আবার 'টিকি বাঁধা' শব্দটিও কমবেশি প্রচলিত। উভয় ক্ষেত্রেই 'বাঁধা' শব্দটির অর্থ হল বন্ধক দেওয়া। গানের বেলায় গোটা মুণ্ডটিই বাঁধা দেওয়া হয়। আজকাল শব্দটির বিস্তার ঘটেছে। সাংস্কৃতিক এলাকা ছেড়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এমনকি পুরনো দল ছেড়ে নতুন গুণ্ডাদলে যোগ দিলেও লোকে বলে বসে, 'ও তো এখন অমুকের ওখানে নাড়া বেঁধেছে।' আর, টিকি বাঁধার বেলায় বন্ধক দেওয়া থাকে সিদ্ধান্তমূলক বিষয়গুলি। 'ওঁর কাছে গিয়ে লাভ নেই, উনি তো শেষ কথা বলতে পারবেন না, অমুকের কাছে ওঁর টিকি বাঁধা আছে।'

নাড়ি (নাড়িনক্ষত্র, নাড়িনক্ষত্র-জানা, নাড়ী) : ১. ✓নল্ + ই (ণি) - করণবাচ্যে, + বিকল্পে স্ত্রী ঈ (ঙীষ্)। (ব.শ.)। ২. *নাড়ি = নাড় (নড় হইতে জাত) গতিশীল যাহাতে। নাড়িনক্ষত্র = নাড়ি ও নক্ষত্র (দ্র. নক্ষত্র)। নাড়ী = নাড়ির আধার যে।* ৩. নাড়ি (নাড়ী) = শিরা, স্নায়ু, হস্তের বা পদের শিরা, নাল, ব্রণবিশেষ, নালী-ঘা, ধান্যযবাদির নাল, নালমাত্র, গণ্ডদূর্ব্বা, নাড়ীতুল্য রেখাভেদ, প্রণালী, শাকাদির ডাঁটা, দণ্ড, নাড়ীসদৃশ স্তম্ভশিরা। **নাড়িনক্ষত্র** = ষড় নাড়ীচক্রে ও নবনাড়ীচক্রে স্থিত নক্ষত্র, লোকের জন্মনক্ষত্র এবং জন্ম হইতে দশম ষোড়শ অষ্টাদশ ত্রয়োবিংশ ও পঞ্চবিংশ নক্ষত্র, জন্মনক্ষত্র। **নাড়িনক্ষত্র-জানা** = আমূল সকল বৃত্তান্ত সবিশেষ জানা। (ব.শ.)। ৪. artery ও umbilical cord অর্থে **নাড়ি** ও **নাড়ী** প্রচলিত। ৫. যার ভেতরে **অস্তিত্ব** নড়ে, নড়চড় করে, নড়ানড়ি করে, সেটিই **নাড়**। সেই নাড় গতিশীল থাকলে তাকে **নাড়ি** বলে। হাত দিয়ে সেই নাড়ির অস্তিত্ব টের পান নাড়িটেপা ডাক্তার। সেই নাড়ির আধার যে নল, সেটিই **নাড়ী**। কিন্তু সেরকম নাড়ী তো কেবল হাতের কব্জিতেই থাকে না, পেটেও থাকে। মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে নাড়ীর যোগ ছিল, তাকে কেটে নাভিতে সমাধিস্থ করা থাকে। এ হল **নাভিনাল**। ইংরেজিতে একে 'অম্বা' শব্দের যোগে নাম দেওয়া হয়েছে umbilical cord। এর অধিক আমরা আধুনিক মানুষেরা আর বিশেষ কিছু জানি না।

তবে আমাদের তান্ত্রিক ও জ্যোতিষী পূর্বপুরুষেরা এ বিষয়ে অনেক কিছু জানতেন। মানবশরীর, জগৎশরীর, চৈতন্যশরীর — এই তিন লোককে তাঁরা ষট্চক্রের নাড়ী ও নবচক্রের নক্ষত্রের সঙ্গে একই সূত্রে অনুভব করে বুঝবার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। আমরা এখনও সে যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি। আর কেউ পেরেছেন, এমন সংবাদ আমাদের জানা নেই। মোট কথা, আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই **নাড়িনক্ষত্র**-জ্ঞান আজও 'আপডেট' করা হয়নি; কেবল এই অর্থটুকু উত্তরাধিকারসূত্রে আজও বাহিত রয়েছে যে, কোনো বিষয়ের **নাড়িনক্ষত্র** জানা মানে, বিষয়টির 'আমূল সকল বৃত্তান্ত সবিশেষ জানা'। অর্থাৎ, **নাড়িনক্ষত্র** শব্দটির প্রচলিত অর্থ **ভালোবাসা** শব্দের মতো, যাতে 'ভালো' নেই, 'বাসা'ও নেই, রয়েছে 'প্রেম' বা love। **নাড়িনক্ষত্র**তেও 'নাড়ি' নেই, 'নক্ষত্র'ও নেই; রয়েছে 'আমূল সকল বৃত্তান্ত'। আমাদের ধারণা, ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে অদূর ভবিষ্যতে উপরোক্ত যোগ্যতা অর্জন করা যেতে পারে। আর, সে কাজটি একটি পৃথক প্রকল্পের দাবি রাখে। আপাতত চেষ্টা করব, আমরা এই মুহূর্তে যতটুকু অনুভব করতে পেরেছি, তার সূত্রগুলি দিয়ে যেতে। দ্র. **আজ্ঞাচক্র, ডাকিনী, তন্ত্র, ষটচক্র**।

নাড়িনক্ষত্রের চারটি স্তর — মানবদেহ, ভারতদেহ, সমাজদেহ, জগৎদেহ। এই দেহগুলি একই তন্ত্র (system) অনুসারে চলে বলে উপলব্ধি করেছিলেন আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা। অর্থাৎ মানবদেহ-তন্ত্রের যা নিয়ম, ভারতদেহ, সমাজদেহ, জগৎদেহেরও সেই একই নিয়ম। সেই তন্ত্রজ্ঞান জানা থাকলে এগুলির প্রত্যেকটিকে ঠিকঠাক ভাবে চালিয়ে নিজেদের ভালো করা যায় বলে তাঁরা মনে করতেন।

প্রথম স্তর হল মানবদেহ। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেভাবেই হোক জেনেছিলেন যে, মানুষের শরীরে দুরকম ধারা প্রবাহিত হয় — ছয়রকম ও নয়রকম নদীর মাধ্যমে। তার জন্য ছয় ও নয় রকম নাড়ী রয়েছে। সেগুলি শরীরের অভ্যন্তরস্থ নদীর মতো, যারা রক্ত এবং অন্য আরও কিছু বিষয় বহন করে নিয়ে যায়। ছয়রকম ধারাকে আমরা বিস্তারিতভাবে পেয়েছি **ষটচক্র**তে। সবস্তরে অবশ্য সবগুলিকে হুবহু একরকম পাওয়া যায় না। যাই হোক, মানবশরীরের এই নদীর নাম দেওয়া হয়েছে — ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না ইত্যাদি। এদেরও **ত্রিবেণীসঙ্গম** হয়, হয়তো সেখানে দেহের কোষেদের **কুম্ভমেলাও** হয়। ব.শ. উদ্ধৃতি দিয়ে জানাচ্ছেন — 'ত্রিবেণীতে সেই নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র পায়'। **আজ্ঞাচক্র** থেকে আমরা জানতে পারি, সেখান থেকেই শরীরের সর্বত্র সমস্ত কোষেদের উদ্দেশে নির্দেশ পৌঁছায়, যেমন কোথাও কেটে গেলে সেখানকার কোষেরা কী কী করবে না-করবে। এমনকি মৃত্যুর পরেও **আজ্ঞাচক্র** থেকে নির্দেশ না পেলে

কোষেরা কিছুতেই হাতিয়ার ফেলে না, লড়ে যায়, কোষেদের মধ্যে পচন ধরে না। যাই হোক, ইতোমধ্যে নয়রকম নাড়ীর উল্লেখ আমরা পেয়েছি বটে, কিন্তু তাদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও আমরা পাইনি। মোটকথা, আমাদের পূর্বপুরুষেরা উপলব্ধি করেছিলেন, এই ৬ + ৯ = ১৫ রকম নাড়ীচক্রে নাকি ২৭ রকম **নক্ষত্র** রয়েছে। তাঁদের ধারণা ছিল, মানবশরীরের এই **নাড়িনক্ষত্র** একত্রে সক্রিয় থেকে মানবশরীরকে তার বিকাশ ও পরিণামের দিকে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয় স্তর হল ভারতদেহ। এটি পুরোপুরি ভৌগোলিক। এতে **ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, গঙ্গা, গোদাবরী** প্রভৃতি নদীজলের ধারা সক্রিয় রয়েছে। তারও **আজ্ঞাচক্রের** মতো মানস-সরোবর রয়েছে। সেখান থেকে **ব্রহ্মপুত্র** ও **সিন্ধু** দুই ধারা প্রবাহিত হয়ে থাকে; এবং তা হিমালয়ের মতো অচলায়তনের উদ্ভবের আগে থেকেই। ভারতদেশের শরীরে সে যেভাবে সক্রিয় থেকে তাকে তার বিকাশ ও পরিণামের দিকে নিয়ে চলেছে, সে বিষয়ে আমাদের রয়েছে কিছু খণ্ড খণ্ড বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানলব্ধ তথ্য; কোনো অখণ্ডবোধ নেই। তাই আমরা নিশ্চিত নই, এই ধারাগুলি ঠিক কীভাবে সক্রিয় হয়; তাদের নক্ষত্রই বা কারা। তবে হ্যাঁ, তাদেরও **ত্রিবেণীসঙ্গম** আছে, প্রয়াগ আছে। ...

তৃতীয় স্তর হল সমাজদেহ। সমাজদেহের নাড়ী বা ধারাগুলি হল জ্ঞানসম্পদ ও পণ্যসম্পদের (ধনসম্পদের) ধারা। তাতে **ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী** ... সবই রয়েছে। তাদের চিহ্নিতও করা গেছে। এমনকি সমাজদেহের **আজ্ঞাচক্র** থেকে নির্দেশের মাধ্যমে কেমন করে সমাজদেহ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকেও চিহ্নিত করা গেছে। মোটকথা, এই ধারাগুলি সমাজদেহকে বিকশিত হতে ও পরিণামে পৌঁছতে সহায়তা করে। সর্বোপরি, এই সামাজিক (অর্থনৈতিক) ধারাগুলিরও **ত্রিবেণীসঙ্গম** বা **সাগরসঙ্গম** হয়। পণ্যধারা (গঙ্গা), রেশনিং-এর ধারা (যমুনা), জ্ঞানের ধারা (সরস্বতী) **প্রয়াগ**-এর জনসমুদ্রে মিলিত হয় **কুম্ভমেলায়**। (এই **কুম্ভ**কে আগেই আমরা চিনেছি 'ব্যক্তিগত-ভাণ্ড' বলে; তা সে নিজ নিজ জ্ঞান রাখার ভাণ্ড হোক, আর নিজ নিজ ধন রাখার ভাণ্ডই হোক। এককথায় **কুম্ভমেলা** কথাটির মানে হল **কুম্ভ**বানদিগের বা জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের অধিকারীদিগের মেলা। সারা সমাজের সমস্ত জ্ঞানজীবী ও পণ্যজীবীরা এই মেলায় সমবেত হয়ে জনসমুদ্রে অবগাহণ করার সুযোগ পান। **প্রয়াগের** মেলা হয় বারো বছরে একবার।) সমাজ-দেহের এই নাড়ীগুলিতেও **নক্ষত্র** রয়েছে। এদের সাতাশ নক্ষত্র বলে। এরা সবাই **দক্ষকন্যা** এবং **চন্দ্রের** স্ত্রী। ... এরা সবাই মিলে সমাজদেহকে তার বিকাশ ও পরিণামের দিকে নিয়ে চলেছে।

চতুর্থ স্তর হল জগৎদেহ। এতে রয়েছে আকাশগঙ্গা বা তদ্রূপ অন্য কোনো ধারা। তবে, তাদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নেই। কিন্তু এই স্তরে গ্রহ-নক্ষত্রদের বিষয়ে স্পষ্ট তথ্যাবলী রয়েছে। সমাজদেহের সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে এই জাগতিক দেহের ব্যবস্থা সর্বৈব সমান্তরাল বলে অনুভব করেছিলেন আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা। মোটকথা, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর নিয়ে কাজ করেছিলেন আমাদের তান্ত্রিক পূর্বপুরুষেরা। আর, চতুর্থ, তৃতীয় নিয়ে কাজ করেছিলেন আমাদের জ্যোতিষী পূর্বপুরুষেরা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের সাধারণ ধারণাকে দুটি বা তিনটি স্তরে মিলিয়ে লিখে গেছেন, কোনো কোনো স্তরে তা তাঁরা পারেননি।

নাল (নালা, নালি, নালী) : ১. ✓নল্ + অ (অণ্)। (ব.শ.)। ২. *নাল = নল হইতে জাত। নালা = নাল-এর আধার যে। নালি = নাল গতিশীল যাহাতে। নালী = নালি-র আধার যে।* ৩. **নাল** = নলসম্বন্ধী, পদ্মাদির **দণ্ড**, নালসদৃশ অন্তঃশূন্য বস্তুমাত্র, শিরা, বন্দুক, হরিতাল, খাত, কুমুদিনী। **নালা** = খাত, খাল, নর্দ্দমা, চোঙ্গ। **নালি (নালী)** = নাড়ি, শাককড়ম্ব, ডাঁটা, খাত, নালা, ড্রেন, হস্তিকর্ণবেধনী, পদ্ম, নালি-ঘা। (ব.শ.)। ৪. **নাল** অপ্রচলিত, বাকি তিনটি শব্দ কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. **নাল** শব্দটির ব্যবহার গ্রামবাংলায় এখনও রয়েছে 'পদ্মের নাল' বা 'শালুকের নাল' বোঝাতে।

নদ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : নদ্, নদ, নদনদী, নদথু, নদাল, নদী, নদীকদম্ব, নদীকান্ত, নদীকান্তা, নদীজ, নদীতরস্থান, নদীদোহ, নদীনালা, নদীবেগ, নদীমাতৃক, নদীমুখ, নদীষ্ণ, নাদ, নাদবৎ, নাদব্রহ্ম, নাদমুদ্রা, নাদা, নাদি, নাদী, নাদুর-নুদুর, নাদুসনুদুস, নাদেয়, নাদেয়ী, নান্দিয়া, নিনাদ, নৈ।
নদ্ = ন-এর দান। নদ = ন দান করে যে।

নদ (নদাল, নদী, নদীকদম্ব, নদীকান্ত, নদীকান্তা, নদীজ, নদীনালা): ১. ✓নদ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নদ = ন (অন্-কৃত রহস্যময় বস্তু বা বিষয়) দান করে যে। নদাল = নদ-এর আধার লালিত বা লয়প্রাপ্ত যাহাতে। নদী = নদ-এর গতিশীল আধার যে। নদীকদম্ব = নদী ও কদম্ব। নদীকান্ত = নদীর কান্ত যে। নদীকান্তা = নদীকান্ত-এর আধার যে। নদীজ = নদী হইতে জাত। নদীনালা = নদী ও নালা।* / **নদীজ** = নদী হইতে জাত যে। (ব.শ.)। ৩. **নদ** = পর্ব্বতাদিজাত সাগরাদিমিলিত অকৃত্রিম জলপ্রবাহ, পুংবাচক সিন্ধুব্রহ্মপুত্রাদি, অম্বুপ্রবাহ, প্রবাহ, অব্যক্তশব্দ, গুঞ্জন। **নদাল** = ভাগ্যবান। **নদী** = অষ্টসহস্রধনুঃপরিমিত স্ত্রীবাচক জলপ্রবাহ, গঙ্গা-যমুনাদি, জলপ্রবাহমাত্র। **নদীকদম্ব** = নদীসমূহ। **নদীকান্ত** = সমুদ্র। **নদীকান্তা** = লতা। **নদীজ** = ভীষ্ম, হিজ্জলবৃক্ষ, অর্জ্জুনবৃক্ষ, বিটমাক্ষিক (antimony), পদ্ম। **নদীনালা** = নদী ও পয়োনালী। (ব.শ.)। ৪. river অর্থে **নদ, নদী** এবং river and drain অর্থে **নদীনালা** প্রচলিত। বাকি সবগুলি শব্দই অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কাবেরী, গোদাবরী, গঙ্গা**। আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের মূল সমস্যাটির কথা মনে না রাখলে এসব শব্দের মানে বোঝা খুবই কঠিন। সেই সমস্যাটি, আবারও বলছি, যা কিছু মানবসমাজে অত্যন্ত 'সক্রিয় কিন্তু অদৃশ্য', সমাজের বাকি সদস্যদের তা দেখানো ও বোঝানোর জন্য শব্দের ব্যবহার করা। মানুষের সমাজে মানসিক শ্রমোৎপন্ন ও দৈহিক শ্রমোৎপন্নের ধারা, অর্থাৎ জ্ঞানসম্পদ ও পণ্যসম্পদের ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে দিয়েছে, লোকে সেই ধারা থেকে নিজের প্রয়োজনীয় বিষয় ও বস্তু তুলে নিচ্ছে, আপন উৎপাদিত বিষয় ও বস্তু সেই ধারায় ত্যাগ করছে — সমাজের বুকে এই যে সক্রিয় কিন্তু অদৃশ্য মহাধারা প্রবাহিত হচ্ছে, জনসমুদ্রে গিয়ে মিশে যাচ্ছে,

মানবসমাজকে ব্যতিব্যস্ত করছে, কী বলা হবে তাকে? এরই নাম দেওয়া হয়েছিল **নদ**। এর ক্রিয়াটিকে চিনে নেবার সুবিধা দেয় গ্রামবাংলার মানুষের মুখের বয়ান — 'গরুটা লদ্ লদ্ করে নাদ্‌ছে গো'। এই 'লদ্ লদ্' শব্দটি 'নদ্ নদ্' শব্দের পরিবর্ত রূপ। তার মানে কোনো দেশ-কাল-পাত্র থেকে কোনো বিষয় বা বস্তু যদি 'নদ্' 'নদ্' করে ত্যক্ত হয়ে হয়ে একটি ধারার সৃষ্টি করে, তখন তাকে নদ বলা হয়। সেকালে ঝর্নাধারা থেকে শুরু করে সৃষ্টিধারা পর্যন্ত অনেক ধারাকেই এই নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কীভাবে এবং কখন?

বৈদিক ব্যবস্থার স্বর্ণযুগে, মানবসমাজের আদিরাষ্ট্র (পৃথুর) প্রতিষ্ঠার পরই এই ধারার সুস্পষ্ট সাক্ষাৎ পায় ভারতসমাজ; যদিও তার বহু আগে থেকেই সমাজে এর উদ্ভব হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সুস্পষ্ট ও প্রবল রূপ ধারণ করেনি। আদিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই জ্ঞানসম্পদের ধারা প্রবল রূপ নিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এর নাম দেওয়া হয় **ব্রহ্মপুত্র নদ** ও **সিন্ধু নদ**। **ব্রহ্মপুত্র** হল কোনো প্রকার বিনিময় না নিয়ে জ্ঞান-দেওয়ার ধারা, আর **সিন্ধু** হল কিছু বিনিময় নিয়ে জ্ঞান-দেওয়ার ধারা। যেহেতু জ্ঞান পুরুষপদবাচ্য, তাই এই দুই ধারাকে পুরুষবাচক প্রবাহ বলা হয়। তবে এগুলি ছিল স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রবাহ। ভৌগোলিক ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু যেমন ভৌগোলিক অচলায়তনস্বরূপ হিমালয়ের উত্থানের আগে থেকেই প্রবাহিত ছিল, তেমনি সামাজিক ব্রহ্মপুত্র এবং সামাজিক সিন্ধুও সামাজিক অচলায়তনস্বরূপ রাষ্ট্রের জন্মের আগে থেকেই প্রবাহিত ছিল। (নিম্নোল্লিখিত 'জ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। পরে ভারতসমাজে উৎপন্ন পণ্যে রূপান্তরিত হয় এবং পণ্যপ্রবাহের সম্ভাবনা দেখা দেয়। অনেক বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে কৃত্রিমভাবে সেই পণ্যপ্রবাহের প্রচলন ঘটানো হয়, অঞ্চলে অঞ্চলে হাট বা বাজার বসানো হয় ... এগুলিকে নাম দেওয়া হয় **গঙ্গা, গোদাবরী** ... ইত্যাদি। **নদাল** শব্দটির প্রদত্ত অর্থ থেকেও পাঠক বিষয়টি বুঝে নিতে পারেন। এই 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' সামাজিক জ্ঞানপ্রবাহ ও পণ্যপ্রবাহকে বোঝানর জন্য বাস্তবের দৃশ্য সমসত্তারও একই নামকরণ করা হয়। ফলে ভৌগোলিক নদনদী রূপে আমরা **ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী, গোদাবরী** ... প্রভৃতি নদনদীগুলির নাম পেয়ে যাই। ইউরোপের river কেন শুধুমাত্র river, আর আমাদের **নদ** কেন **নদী**ও হয়, তাদের বিয়ে-সাদি বালবাচ্চা হয় (**গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম** ইত্যাদি) ... এসব প্রশ্ন নিয়ে এগোলে আমরা এক বিশাল জ্ঞানরাজ্যের সাক্ষাৎ পাই। এ বিষয়ে আমাদের একটি বড় নিবন্ধ '**পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা**' প্রকাশিত হয়েছে আমাদের 'খ' গ্রন্থে এবং আরেকটি '**ঝর্নাধারা থেকে সৃষ্টিধারা**' প্রকাশিত হয়েছে আমাদের 'জ' গ্রন্থে।

নাদ (নাদবৎ, নাদা, নাদাপেটা, নাদি, নাদী, নিনাদ) : ১. √নদ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নাদ** = **নদ** হইতে জাত।* ***নাদবৎ** = নাদ-এর মতো যে।* ***নাদা** = **নাদ**-এর আধার যে।* ***নাদাপেটা** = নাদার মতো পেট যাহার।* ***নাদি** = নাদ গতিশীল যাহাতে।* ***নাদী** = **নাদি**-র আধার যে।* ***নিনাদ** = নিঃসারিত হয় যে নাদ।* ৩. **নাদ** = শব্দ, ধ্বনি, গর্জ্জন, কূজন, পক্ষিরব, ভূষণধ্বনি, বীণারব, ব্রহ্মস্বরূপ-ঘোষভেদ, সিংহনাদ, হুঙ্কার, বাহ্যপ্রযত্নভেদ। **নাদবৎ** = অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সানুনাসিক বর্ণ ( )। **নাদা** = মুখ-চওড়া বড় মৃৎপাত্রবিশেষ। **নাদাপেটা** = নাদার মত স্থূলোদর। **নাদি** = গো-প্রভৃতির মল, ছাগলাদির ক্ষুদ্র মলপিণ্ড। **নাদী** = শব্দকারী, গর্জ্জনকারী, নাদবান, ধ্বনিযুক্ত। **নিনাদ** = শব্দ, ধ্বনি, ঘোষ, রব, রথতুল্য শব্দ, গুঞ্জন। (ব.শ.)। ৪. সবগুলিই কমবেশি যথার্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. নদ। হ্যাঁ, **নাদ** শব্দটি **নদ** শব্দ থেকে জাত। যা কিছু 'নদ্ নদ্' করে ত্যক্ত হয়, সেই ত্যক্ত বস্তু বা বিষয়ই **নাদ** পদবাচ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যে কেবল গো-প্রভৃতির মলই হবে, এমন কোনো কথা নেই; শব্দের পুঞ্জ পুঞ্জ নির্গমনও হতে পারে অর্থাৎ গর্জনাদিও হতে পারে। আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা শব্দের এই **নাদ**কে এত দূর পর্যন্ত উপলব্ধি করার যোগ্য ছিলেন যে, তাঁরা **নাদব্রহ্ম** পর্যন্ত পৌঁছে **ওঁ** বা প্রণবকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ... এ বিষয়ে ছা.অভিধানের প্রদত্ত তথ্য এইরূপ — 'আকাশ হইতে নাদ জন্মে, ঐ নাদ কোনো বস্তুন্তরের আঘাতে উৎপন্ন হইয়া বায়ুসংযোগে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়া শ্রবণ-প্রত্যক্ষ হয় অর্থাৎ শোনা যায়। নাদ দ্বিবিধ — বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক; কণ্ঠ তালু প্রভৃতির অভিঘাতজনিত নাদকে ব্যক্ত বা বর্ণাত্মক নাদ কহে; যেমন বাক্যকথন। কোনো বস্তুতে অন্য বস্তুর অভিঘাতে যে নাদ অস্পষ্টরূপে উৎপন্ন হয়, তাহাকে ধ্বন্যাত্মক নাদ কহে; যেমন একটা কাষ্ঠ লইয়া অন্য কাষ্ঠের সহিত ঠক্‌ঠক্ শব্দ। বাস্তবিক শব্দমাত্রকেই নাদ বলা যায়। সঙ্গীতদামোদর মতে এই নাদ তিন প্রকার — প্রাণিভব, অপ্রাণিভব ও উভয়সম্ভব। এই নাদ হইতেই শ্রুতি, স্বর, সুতরাং মূর্চ্ছনাদি সৃষ্ট হইয়া সঙ্গীতকে পুষ্ট করিতেছে।'

নন্দ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অত্যানন্দ, অভিনন্দন, অভিনন্দিত, আনন্দ, আনন্দক, আনন্দকন্দ, আনন্দকানন, আনন্দবন, আনন্দগিরি, আনন্দঘন, আনন্দজ, আনন্দধাম, আনন্দধারা, আনন্দন, আনন্দপট, আনন্দবর্দ্ধন, আনন্দবিধান, আনন্দময়, আনন্দমূর্চ্ছা, আনন্দয়িতা, আনন্দরস, আনন্দলহরী, আনন্দলাড়ু, আনন্দসাগর, আনন্দাত্মা, আনন্দাশ্রু, আনন্দিত, আনন্দী, নন্দ্, নন্দ, নন্দক, নন্দকী, নন্দথু, নন্দদুলাল, নন্দন, নন্দনকানন, নন্দনবন, নন্দনা, নন্দবালা, নন্দমহোৎসব, নন্দলাল, নন্দা, নন্দি, নন্দিক, নন্দিকেশ্বর, নন্দিগ্রাম (নন্দীগ্রাম), নন্দিঘোষ, নন্দিত, নন্দিনী, নন্দিবর্দ্ধন, নন্দী, নন্দীমুখ, নন্দীশ্বর, নন্দীসরঃ, নান্দিকর, নান্দী, নান্দীকর, নান্দীবাদী, নান্দীমুখ, নান্দীমুখী, সদানন্দ, সানন্দ।

নন্দ্ = ন-অন্ (no-on) দান। **নন্দ** = ন-অন্ দান করে যে।

নন্দ (নন্দক, নন্দন, নন্দনা, অভিনন্দন, আনন্দ, আনন্দাশ্রু) : (নন্দ শব্দের পৌরাণিক অর্থ পরে পৃথক ভুক্তিতে রয়েছে)। ১. √নন্দ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নন্দ** = ন-অন্ (ন-কে অন্ ক'রে) দেয় যে।* ***নন্দক** = **নন্দ** করে যে।* ***নন্দন** = **নন্দ্** অন যাহাতে।* ***নন্দনা** = **নন্দন**-এর আধার যে।* ৩. **নন্দ** = বিষ্ণু, ভেক, একাদশাঙ্গ ল বেণুবিশেষ, কুবেরের নিধিবিশেষ, নন্দগণের সংখ্যানুসারে ৯ সংখ্যা, মৃদঙ্গবিশেষ, আনন্দ, হর্ষ। **নন্দক** = নন্দয়িতা, হর্ষজনক, কুলপালক,

বিষ্ণুখড়্গা, ভেক, নন্দগোপ। **নন্দন** = আনন্দয়িতা, হর্ষক, পুত্র, অপত্য, বিষ্ণু, শিবা, ভেক, বৎসরবিশেষ, পর্ব্বতভেদ, ইন্দ্রের উদ্যান, প্রীণন, তোষণ। **নন্দনা** = কন্যা। (ব.শ.)। **৪.** শুধুমাত্র **নন্দন** শব্দটি নামরূপে এবং 'পুত্র' অর্থে কমবেশি প্রচলিত, এবং কখনো কখনো 'খুশি করা' অর্থে প্রচলিত। বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** আজকাল বাংলাভাষীরা ছেলের নাম **নন্দ** রাখেন না। অথচ পঞ্চাশ বছর আগেও **নন্দ, নন্দদুলাল, নন্দলাল** প্রভৃতি নাম অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। কারণ তখন পর্যন্ত লোকে শব্দগুলির মানে কমবেশি জানত। ইংরেজির **নন্দার্থক** কোনো ধারণাই নেই; ইংরেজি প্রভাবিত একালের বাংলা অ্যাকাডেমিরও নেই। তারা জানেই না শব্দগুলির মানে কী! সেই বাংলা অ্যাকাডেমির চাপে-তাপে একালের শিক্ষিত বাংলাভাষীও শব্দগুলির মানে ভুলে গেছে, **নন্দাদি** শব্দের গৌরব দেখতে পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে, আর সেজন্যই শিক্ষিত-বাংলাভাষীদের এলাকা থেকে শব্দগুলির বিতাড়ন ঘটেছে। কিন্তু গ্রামবাংলা এখনও শব্দগুলির গৌরব ভোলেনি। কারণ, শব্দগুলির গৌরব সত্যই অপরিমেয়।

প্রত্যেক মানবশিশুর যে খেলাটি অবশ্যই ভাল লাগে সে হল লুকোচুরি খেলা। সবে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে, একবার চাদরের তলায় লুকোনো, একবার বেরিয়ে পড়া, এর মধ্যে প্রত্যেক শিশুই যে কী অপার **আনন্দ** পায়, তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন। কিন্তু কেন? কেন এরকম একবার বিলুপ্তি এবং পরক্ষণেই প্রকাশে মানবশিশু আনন্দ পায়? কী এমন ব্যাপার সমস্ত মানবশিশুর ভিতরে পরমাপ্রকৃতি এমন করে সর্বজনীন করে রেখেছেন, যে, প্রতিটি শিশুই গুপ্ত ও প্রকাশিত হতে পারার মধ্যে মহত্তম আনন্দকে দেখতে পায়? এর উত্তর পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথে, প্রকাশ নিয়ে তাঁর নানা কথায়। আমরা ইতোপূর্বে **অগ্নি, অংরূপিণী** ও **ইন্দ্র** শব্দে এই 'গোপন ও প্রকাশ' সত্তাটির সংবাদ দিয়েছি। আবারও সংক্ষেপে বলা যাক — অস্তিত্ব মাত্রেই তেজ বা **অগ্নি**, সেই তেজের আত্মোপলব্ধিই **ইন্দ্র** এবং সেই আত্মোপলব্ধির 'যেমন আছি তেমন গুপ্ত থাকব নাকি প্রকাশিত হব', এই দ্বিধাই **মিত্রাবরুণ**। মানুষের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে প্রধানত এই তিন দেবতার কথাই রয়েছে। এখানে এই **মিত্র** ও **বরুণের** কথাই হচ্ছে। বেদের মতে, এই মিত্র ও বরুণ এমন একজোড়া পরস্পরের পরিপূরক দেবতা, যাঁরা প্রতিটি জীবের ভেতরে সক্রিয় রয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এঁরা হলেন, 'প্রসারিত হবো, নাকি যেমন আছি তেমন থাকব' — এই দ্বি-মত। অর্থাৎ এই মিত্রদেবতা জীবকে আত্মপ্রসারণে প্ররোচিত করে, আর বরুণদেবতা জীবকে আত্মসংবরণের পরামর্শ দেয়। রবীন্দ্রনাথ বিষয়টিকে সহজ করে বলেছেন — *একটি কুকুরছানা একটি পোকার পেছন পেছন যায়, শোঁকে, হঠাৎ দু-পা পিছোয়, আবার এগোয়। প্রতিটি জীবের ভিতরে এই দুই সত্তা; একজন বলছে 'রোসো রোসো', অপরজন বলছে 'দেখাই যাক না'।*

এই 'রোসো-রোসো'র দেবতা বরুণ, আর 'দেখাই যাক না'-র দেবতা মিত্র। এই 'দেখাই যাক না' রূপে মানুষের চেষ্টাই দেখা দেয় আবিষ্কার রূপে, উদ্ভাবন রূপে, সৃষ্টি রূপে। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, "মানুষ আজ কর্ম করে 'অভাবে', দায়ে পড়ে, মানুষের সমস্ত দুর্গতির কারণ রয়েছে সেখানে। তিনি দেখেন, অভাবের কারণে, বাধ্যবাধকতার কারণে, দায়ে পড়ে কর্ম করার রীতি থেকে মানুষকে যদি স্বভাবে বা **আনন্দে কর্ম করার রীতিতে** অভ্যস্ত করে তোলা যায়, অর্থাৎ, মানুষ যদি **'আনন্দে' কর্ম** করে, তা হলে সে যে ফল পায় তাতে তার **বাহ্যলাভ** তো **হয়ই, ব্রহ্মলাভও** সুনিশ্চিত হয়।" (আমাদের 'গ' গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) কর্মের প্ররোচনাদাতা এই আনন্দকেই **নন্দ** বলে।

বর্ণানুসারে, ন (no) করা এবং অন্ (on) করা, দুটো করণ দেয় যে, তাকে বলে **নন্দ**। **অর্থাৎ**, না করা ও হ্যাঁ করা, বিলুপ্ত করা ও সৃষ্টি করা, লুকিয়ে ফেলা ও প্রকাশ করে দেওয়া ... এরকম পরস্পরবিরোধী ক্রিয়া দেয় যে, তাকে বলে **নন্দ**। এইরূপ অনেক **নন্দ** পেলেই লোকে **আনন্দ** পায়। শিশুর ক্ষেত্রে বিষয়টি চূড়ান্ত সূক্ষ্মতায় রয়েছে বলে, তাকে শনাক্ত করা কঠিন, কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে এটি তুলনায় প্রসারিত ব'লে তাকে চেনা খুব কঠিন নয়। কবি বা বিজ্ঞানী যখন আবিষ্কার করেন বা সৃষ্টি করেন, তখন আমরা তাতে প্রকাশের খেলাটি দেখতে পাই। আর, তা করার জন্য প্রচলিত কোনো না কোনো ব্যাপারকে ধ্বংস করার দরকার পড়ে। 'ধ্বংস না হলে নির্মাণ নেই' — বলে গেছেন মনীষীরা। অর্থাৎ, কিনা কোনো কিছুকে **ন** করে দিয়ে তার চেয়ে মহৎ কিছুকে **অন্** করে দিলে যে পার্থিব, সামাজিক, মানসিক প্রাপ্তি ঘটে, সেই প্রাপ্তিই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। তাতেই মানুষের সর্বোচ্চ **তৃপ্তি**। এই সর্বোচ্চ তৃপ্তিকে বলে **আনন্দ**। তাতেই মানুষের, তার সমাজের, জগতের ভাল হয়; মানুষ **নন্দকে** পায়, **নন্দিত** হয়।

শিশুরা এই **নন্দকে** পায় তাদের লুকোচুরি খেলায়, মায়েরা এই **নন্দকে** পান সন্তান প্রসব করে (সন্তানসন্ততিকে যেকারণে **নন্দন, নন্দনা, নন্দিনী** বলে), চাষী এই **নন্দকে** পান নতুন কোনো বিশেষ ফসল ফলিয়ে, ঘরামি পান নতুন কোনো বিশেষ রকমের ঘর বানিয়ে, বিজ্ঞানীরা পান নতুন কোনো আবিষ্কার করে, কবিরা পান নতুন কোনো কাব্য রচনা করে, গায়কেরা পান নতুন কোনো গান গেয়ে ... সাধকেরা পান নতুন কোনো সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে। মোটকথা, প্রত্যেকেই তাঁর তাঁর ক্ষেত্রে নতুন কোনো আবিষ্কার বা সৃজনকর্ম করলেই **নন্দকে** পান। এসবই হল **ন-অন্** দান থেকে প্রাপ্তি। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই **'ন-করে অন্-করা দান কৃত'** হয়ে থাকে বলেই এই ক্রিয়াধারী **নন্দ** পদবাচ্য।

অভিনন্দন : **১.** অভি + ✓নন্দি + অন (ল্যু) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *উপরিস্থ হইয়া নন্দন কৃত হয় যাহাতে।* **৩.** সন্তোষক, প্রশংসক, সন্তোষণ, প্রশংসা। (ব.শ.)। **৪.** felicitation অর্থে প্রচলিত। **৫.** এখানে বলে রাখা যাক, শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ আমাদের জানায় যে, রাজা সেনাপতিকে বা বীরকে **অভিনন্দন** জানাতে পারেন; কিন্তু বিপরীত হয় না। প্রধানশিক্ষক ছাত্রকে তার পরীক্ষার ভাল ফলাফলের জন্য **অভিনন্দন** জানাতে পারেন, কিন্তু প্রধানশিক্ষককে তাঁর কোনো গৌরবজনক কাজের জন্য ছাত্রেরা **অভিনন্দন** জানাতে পারেন না। অন্তত **অভিনন্দন** শব্দের ভিতরে সে সুযোগ রাখা নেই।

আনন্দ : **১.** আ + ✓নন্দি + অ - ক। (ব.শ.)। **২.** *নন্দ-এর আশ্রয় যাহাতে।* / যে আনন্দিত করে। (ব.শ.)। **৩.** আনন্দন, আনন্দবান, বিষ্ণু, শিব, বাসুদেবের বলবিশেষ, বৃহস্পতির সংবৎসরের

৪৮ বর্ষ, দশুকচ্ছন্দোবিশেষ, প্রীতি, হর্ষ, সুখ, প্রমোদ, আনন্দস্বরূপ, ব্রহ্মা, ব্রহ্মজ্ঞানজন্য পরম সুখ, মদ্য, গৃহবিশেষ, মূর্ত্তিময়ী প্রীতি, আনন্দজনক বস্তু। ৪. pleasure অর্থে প্রচলিত। ৫. ন-অন্ (no-on) দান করে যে, সে হল নন্দ। কার্যত জগতে সবকিছুই নিজের বিকাশের পথে ধাবমান বা অন্ (on) হয়ে রয়েছে; তাকে ন বা (no) করে দিলেই সেই ধাবমান সত্তাটি দৌড় থেকে খানিক থেমে (স্বল্পগতিতে ধাবমান হয়ে) অস্তিত্ব লাভ করে; এবার তাকেই কিংবা তার সঙ্গে আরও কাউকে অন্ করে দিলে যা ঘটে, তাকেই বলা হয় সৃষ্টি। এই সৃষ্টিতেই নন্দ হয়। এই নন্দ-এর আধারকেই আনন্দ বলে। প্রকাশকারীরা, আবিষ্কারকেরা, স্রষ্টারা এই আনন্দ লাভ করেন। যাঁরা তাঁর সেই সৃষ্টির কথা শোনেন, তাঁরাও আনন্দ লাভ করেন। কেননা, ন-অন্ দেয় ব'লে সৃষ্টিতেই আনন্দ। যে-কারণে আনন্দ কথাটি ঠিক কী বোঝায়, তা সবচেয়ে ভালো বুঝেছিলেন মহাস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলতেন, সুখ পাওয়া যায় সুগন্ধী সাবানে গায়ের ধুলো ধুয়ে; আর আনন্দ মেলে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে। এই বিচারে শারীরিক তৃপ্তিকে 'সুখ' এবং মানসিক তৃপ্তিকে 'আনন্দ' বলা যায়। ব্রহ্মলাভ করলে (আবিষ্কারক-স্রষ্টারা যা করে ফেলেন), অর্থাৎ ত্রিনয়নের উন্মেষ ঘটে গেলে সর্বোচ্চ মানসিক তৃপ্তি মেলে; সেটিই আনন্দ। এই আনন্দ লাভকে অমৃতলাভ, মোক্ষলাভ বা কৈবল্যলাভও বলে। অবশ্য কিছু কিছু তৃপ্তি রয়েছে যেগুলি সুখের সর্বোচ্চ ও আনন্দের সর্বনিম্ন রূপ। এগুলি সুখ ও আনন্দের মাঝের অধ্যায়। ...

আনন্দাশ্রু : ২. *আনন্দ হইতে জাত অশ্রু যাহাতে।* ৩. আনন্দজন্য নেত্রনীর, হর্ষাশ্রু। (ব.শ.)। ৪. tears of joy অর্থে প্রচলিত। ৫. মানুষের মনের বিভিন্ন ভাবের কি কোনো পরিমাপ করা যায়? হ্যাঁ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যায়। যে কোনো ভাব তার সর্বোচ্চে পৌঁছোলে দেখা যায়, ভাবটি তার বিপরীত গুণের মহিমাকে ছুঁয়ে ফেলেছে। যেমন একজন মানুষ সর্বোচ্চ আনন্দ লাভ করেছে কিনা, তা মাপার উপায় হল সেই মানুষটি আনন্দে আপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলেছে কি না। যদি কেঁদে ফেলে, বুঝতে হবে, মানুষটি সর্বোচ্চ আনন্দ লাভ করেছে। এর চেয়ে অধিক আনন্দ ঐ মানুষটির কাছে আর কিছুই নেই। এ বিষয়ে আরও ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে আমাদের 'সাম্য থেকে সামঞ্জস্য : সুন্দরসমাজ' নিবন্ধে, যা প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার 'অপর' পত্রিকার ২০০৯ বইমেলা সংখ্যায়।

নন্দ : (উপরে নন্দ শব্দটি আছে, এখানে শুধু পৌরাণিক অর্থ দেওয়া হল)। ২. *ন-অন্ দান করে যে।* ৩. ক) নরপতিবিশেষ — ইঁহার পিতা মহানন্দি, জননী শূদ্রা। ইঁহার নয় পুত্র শত বর্ষ রাজত্ব করেন এবং অবশেষে নন্দবংশ কৌটিল্য (চাণক্য) কর্তৃক উন্মূলিত হয়। ইহার পরে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হন। খ) গোপবিশেষ — শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা। ... নন্দের স্ত্রীর নাম যশোদা। ... যে রাত্রে যশোদার গর্ভে মহামায়া কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, সেই রাত্রেই শ্রীকৃষ্ণও মথুরার কারাগারে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ... কংসের ভয়ে বসুদেব সেই জলঝড়পূর্ণ মধ্যরাত্রে কৃষ্ণকে নন্দের আবাসে নিদ্রিতা যশোদার ক্রোড়ে স্থাপন করে, তাঁর অজ্ঞাতসারে কন্যা মহামায়াকে এনে দেবকীর কোলে রেখে দেন। মহামায়ার জন্মের সময় তাঁর মায়াতে সকলেই আচ্ছন্ন ছিলেন, সেইজন্য বসুদেবের এই সন্তান পরিবর্তন কেহই জানতে পারেননি। ... নন্দ ভীত হয়ে কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নিয়ে যান। ... একবার কংসের যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে নন্দ কৃষ্ণকে নিয়ে মথুরায় যান। সেখানে কৃষ্ণ কংসকে বধ করে তাঁর সিংহাসন অধিকার করেন। (পৌ.অ.)। ৪. নামরূপে কমবেশি প্রচলিত। ৫. ভারতসমাজের ইতিহাসের দুটি অধ্যায় ধরা পড়েছে উপরোক্ত নন্দ-এর কাহিনীতে। প্রথমটি ৩২৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের আগে, প্রজাপতি অশোকের আবির্ভাবের পঞ্চাশ বছর আগে। আর দ্বিতীয়টি ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পরে বঙ্গদেশে গোপাল-দেবপাল-ধর্মপালের রাজত্বের প্রারম্ভিক কালে। প্রথম ক্ষেত্রে এই নন্দ থেকে ভারতসমাজে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রাক্-পরিবেশ উদ্ভূত হয়। কৌটিল্য-চন্দ্রগুপ্তের হাতে তার পরাজয় ঘটলেও অশোকে তা রামরাজত্ব রূপে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। হর্ষবর্ধন পর্যন্ত এই রামরাজত্বের জয়-পরাজয় চলতেই থাকে। বিশ্বের ইতিহাসে এটিই আদি ধনতান্ত্রিক বিপ্লব। তবে, এই ধনতন্ত্র স্বভাবতই লক্ষ্মীসাধক, একালের পুঁজিবাদের মতো কুবেরসাধক নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই নন্দ থেকেই বঙ্গসমাজে ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত রূপ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও প্রতিষ্ঠালাভের প্রাক্-পরিবেশ উদ্ভূত হয়। একালের ভাষায় একে 'কালো টাকা'র জন্ম বলা যেতে পারে। ...

এখানে যে কথাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ধনতন্ত্রের সূত্রপাতের গোড়ায় যে-সত্তার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, তার নাম নন্দ। মার্কসবাদে এর কথা বিশেষভাবে বলা হয়ে থাকলেও, তা এত সুনিশ্চিত নামকরণের মাধ্যমে করা হয়নি বলে তাকে চট করে চেনা যায় না। মার্কস একে বলেছেন 'উৎপাদনের উপায়সমূহের মুক্তি'। ভারতের চিন্তাবিদরা তাকে বলছেন 'মুক্তির আনন্দ'। এই নন্দ আগেভাগে এসে না পৌঁছালে ধনতন্ত্র আসতে পারে না, তার অন্য রূপগুলিও আসতে পারে না।

নন্দদুলাল, নন্দলাল : দ্র. লালন। ৫. আমাদের 'গ' গ্রন্থের 'উত্তরপ্রজন্মের লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষা' নিবন্ধে শব্দ দুটির বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।

নন্দিগ্রাম (নন্দিগ্রামী) : ২. *নন্দন করে যে গ্রাম।* ৩. নন্দিগ্রাম = গ্রামবিশেষ (রামচন্দ্রের বনবাসকালে ভরত এইস্থানে সিংহাসনে রামপাদুকা রাখিয়া রাজ্যপালন করেন)। নন্দিগ্রামী = রাঢ়ীয় সাবর্ণগোত্র বিশ্বরূপের সন্তানগণ। (ব.শ.)। নন্দিগ্রাম = অযোধ্যা হতে এক ক্রোশ দূরে। রামকে বনবাস হতে ফিরিয়ে না আনতে পেরে, ভরত অযোধ্যায় না গিয়ে এই স্থান হতে রামের হয়ে রাজ্যপালন করেন। লঙ্কাজয়ের পর চতুর্দশ বৎসর বনবাস শেষ হলে, রাম এইস্থানে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হন ও অযোধ্যায় ফিরে আসেন। (পৌ.অ.)। ৪. স্থাননাম রূপে প্রচলিত। ৫. যে গ্রাম গ্রামবাসীদের কিংবা অন্যদের নন্দিত করে, সেই গ্রামকে নন্দিগ্রাম বলা যেতেই পারে। রামায়ণের কালে (প্রায় ২৫০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) ক্ষমতাকেন্দ্র রাজধানী অযোধ্যা থেকে দূরে প্রান্তিক-ক্ষমতাকেন্দ্র (একালের জেলা সদরের মতো) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে গ্রাম-এ, তার নাম দেওয়া হয়েছিল নন্দিগ্রাম। আর,

নন্দিগ্রামীদের বলা হয় **বিশ্বরূপে**র বংশধর। বিশ্বরূপের বিশেষত্ব ছিল এই যে, তিনি প্রকাশ্যে **দেবতা**দের (পণ্যজীবীদের) সমর্থন করলেও গোপনে **অসুর**দের (অধঃপতিত সমাজতন্ত্রবাদী-বেদবাদীদের) সাহায্য করতেন। দ্র. **বিশ্বরূপ**। এই নন্দিগ্রাম শব্দটিকে কেউ কেউ **নন্দীগ্রাম** লেখেন। সেক্ষেত্রে তার মানে বদলে গিয়ে হয়ে যাবে শিবের ও তাঁর অনুচরদের গ্রাম।

নন্দিনী : ১. ✓নন্দি + ইন্ (ণিনি) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী (ঙীপ্)। (ব.শ.)। ২. *নন্দন করে যে প্রকৃতিশক্তি। /* আনন্দিত করে যে (স্ত্রী-শক্তি)। (ব.শ.)। ৩. কন্যা, উমা, ননান্দা, গঙ্গা, সুরভিকন্যা বসিষ্ঠধেনু, তুলসী, ত্রয়োদশাক্ষর-পাদক বর্ণবৃত্তভেদ। (ব.শ.)। স্বর্গের গোমাতা সুরভির কন্যা। নন্দিনী মাতার মতো কামধেনু ছিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ নন্দিনীকে নিজের আশ্রমে রাখেন। সূর্যবংশের রাজা দিলীপ অপুত্রক হওয়াতে স্ত্রীসহ এই নন্দিনীকে সেবা করে পুত্র রঘুকে লাভ করেন। একবার সস্ত্রীক বসুগণের বনবিহারকালে দ্যৌ নামক বসুর স্ত্রী নন্দিনীকে দেখে তাঁকে পাবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করেন। দ্যৌ তখন অন্যান্য বসুর সাহায্যে একে হরণ করেন। এর ফলে বশিষ্ঠের শাপে বসুদের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। দ্যৌ ভীষ্মরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই কামধেনু নন্দিনীর জন্যই বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বশিষ্ঠের বিরোধ বাধে। ((পৌ.অ.)। ৪. কদাচিৎ কন্যা অর্থে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. এই পুরাণকথিত নন্দিনী আর যাই হোক, cow যে নয়, সে বিষয়ে আজ আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ হল একটি জনগোষ্ঠী, মহর্ষি পরিচালিত সম্প্রদায়, যারা মহর্ষির (এক বা একাধিক ঋষির) পরিচালনায় জীবনযাত্রা অতিবাহিত করত। দ্র. **কামধেনু**। এই **নন্দিনী** বা তার মাতা **সুরভি**কে জনগোষ্ঠী রূপে বুঝলেই কেবল বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিবাদকালের ঘটনাবলীকে যুক্তিগ্রাহ্যরূপে বুঝে নেওয়া সম্ভব হয়। কাহিনীতে আছে, বিশ্বামিত্র যখন নন্দিনীকে জোরপূর্বক গ্রহণ করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, নন্দিনী তাকে রক্ষা করার জন্য প্রভু বশিষ্ঠকে অনুরোধ করে। বশিষ্ঠ তাকে বলেন, তুমি নিজেকে নিজে রক্ষা করো। ফল হয় এই যে, এর আগে যে নন্দিনী বিশ্বামিত্র ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের জন্য মণ্ডা মিঠাই সহ নানারকম সুখাদ্য প্রসব করেছিল, যে কারণে নন্দিনীর গুণমুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র তাকে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ করেছিলেন, এবং তার জন্য জোরপূর্বক হরণ করতেও কুণ্ঠিত হননি, সেই নন্দিনী এইবার অস্ত্রশস্ত্র সহ সৈন্য প্রসব করতে লাগল এবং সেই সৈন্যরা বিশ্বামিত্র ও তাঁর সহযোগীদের পরাভূত করে বিতাড়িত করে দিল।

কোনো 'গাই' এরকম মণ্ডামিঠাইও যেমন প্রসব করতে পারে না, তেমনি অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যও প্রসব করতে পারে না। কিন্তু জনগোষ্ঠী পারে। সম্প্রদায় পারে। সুতরাং শব্দের অর্থের বিচারে এই **নন্দিনী** আনন্দ দান কারিণী হলেও ভারতসমাজের ইতিহাস অনুসারে এই সত্তা একটি নিষ্ঠাবান শক্তিশালী সম্প্রদায়ই বটে।

নান্দী (নান্দীমুখ, নান্দীমুখী) : ১. নান্দী = ✓নন্দ্ + অ (ঘঞ্) - অধিকরণে + স্ত্রী ঈ (ঙীষ্)। (ব.শ.)। ২. *নান্দ্-এর (নন্দ্ হইতে জাত-এর) গতিশীল আধার যে; নন্দজ-র বিকাশকারী যে। **নান্দীমুখ** = নান্দী মুখ যাহার। **নান্দীমুখী** = **নান্দীমুখ**-এর গতিশীল আধার যে। /* **নান্দী** = **দেবতারা যাহাতে আনন্দ লাভ করেন**। **নান্দীমুখ** = বৃদ্ধির মুখ (যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. **নান্দী** = বৃদ্ধি, বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত দেবদ্বিজনৃপাদির **আশীর্বচনযুক্ত স্তুতিশ্লোক**, আশীর্ব্বাদ, মঙ্গল্যবস্তু, দেবাদিস্তুতি, ভেরীসদৃশবাদ্যভেদ, সমৃদ্ধি, অভ্যুদয়। **নান্দীমুখ** = বিবাহাদি কার্য্যে অনুষ্ঠেয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, যাহার পিতৃ-প্রভৃতির তিনপুরুষ জীবিত তাহার বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি, লেপভুক পিতৃগণের ঊর্দ্ধ সপ্তম, অষ্টম ও নবম পুরুষ (পিতৃ-প্রভৃতি তিন পুরুষ 'পিণ্ডভাক', তদুত্তর তিন পুরুষ 'লেপ্‌ভাক্', তদুত্তর তিন পুরুষ 'নান্দীমুখ', তদুত্তর তিন পুরুষ 'অশ্রুমুখ' — সর্বসুদ্ধ দ্বাদশ পুরুষ তর্পণ-শ্রাদ্ধভাগী।), সমৃদ্ধিসাধন বিবাহাদি। **নান্দীমুখী** = নান্দীশ্রাদ্ধ-ভাগিনী মাতৃ-প্রভৃতি। (ব.শ.)। ৪. **নান্দীমুখ** হিন্দুধর্মের আচার-সংস্কারের জগতে প্রচলিত; আর ঐ নামে একটি থিয়েটারদল এখনও আধুনিক বাঙালির স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। বাকি দুটি শব্দ অপ্রচলিত। ৫. শব্দটি তৈরি হয়েছিল কী বোঝাতে, আর তার প্রয়োগ কোথায় এসে পৌঁছেছে, তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণের নিশ্চয় এমন ধারণা হয়েছিল, যে, যে সত্তাকে **নন্দ** শব্দে তাঁরা প্রকাশ করছেন, মানুষ সেই সত্তাকে লাভ করলে, অর্থাৎ **নন্দ**কে পেলে খুশি হয়ে ওঠে এবং সেই খুশিতে সে-মানুষ সৃজনকর্ম্মে নিয়োজিত হয়। তার সেই সৃজনের মাধ্যমে মানুষ তার **নন্দ**কে **অন** করে থাকে, যেকারণে তার সেই সৃষ্ট বস্তু বা বিষয়কে বলা হয় মানুষটির **নন্দন**। কিন্তু তাঁরা দেখেছিলেন, মানুষের সেই **নন্দন** অনেক রকম। বাহ্যবস্তুর সৃষ্টি, সন্তানসৃষ্টি, আওয়াজ-সৃষ্টি, মঙ্গলজনক বস্তু সৃষ্টি, স্তুতি সৃষ্টি ... ইত্যাদি। ব.শ. বাহ্যসৃষ্টিকে বলেছেন 'বৃদ্ধি'; আর আওয়াজ সৃষ্টিকে বলেছেন — 'বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত দেবদ্বিজনৃপাদির আশীর্বচনযুক্ত স্তুতিশ্লোক, দেবাদিস্তুতি, ভেরীসদৃশবাদ্যভেদ।' এছাড়া রয়েছে, 'আশীর্ব্বাদ, মঙ্গল্যবস্তু, সমৃদ্ধি, ও অভ্যুদয়।' এরমধ্যে **নান্দী** অর্থে অধিক প্রচলিত হয়ে যায় 'স্তুতিশ্লোক' বা স্তুতিমূলক বাক্যাদি। যেসকল মুখ থেকে এই **নান্দী**র প্রকাশ ঘটত, কালে কালে সেগুলি **নান্দীমুখ** নামে খ্যাত হয়ে যায়। 'বিবাহাদিকার্য্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ' আজও প্রচলিত রয়েছে। সম্ভবত ভবিষ্যত **নন্দন**-এর অভ্যুদয়কে আগে ভাগে শ্রদ্ধার সঙ্গে আবাহনকে বোঝায়। তবে, সপ্তম-অষ্টম-নবম পূর্বপুরুষকে কেন **নান্দীমুখ** বলে, তা এখনও বোঝা যায়নি।

নম্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অপরিণত, অবনত, আনত, আনমন, আনমনীয়, আনমিত, আনম্য, আনম্র, উন্নত, উন্নমন, উপনত, নত, নতবান, নতমান, নতি, নতিমান, নতোন্নত, নথ, নথ-নাড়া, নথ(থি)নী, নথি, নথী, নথিপত্র, নম্, নমঃ, নমঃশূদ্র, নমন, ন(না)মনা, নমনীয়, নমসিত (নমস্যিত), নমস্ক, নমস্কর, নমস্করণ, নমস্কার, নমস্কারি(রী), নমস্কৃতি, নমস্ক্রিয়া, নমস্য, নমস্যা, নমাজ (নামাজ), ন(না)মিত, নমোবাক, নম্য, নম্র, নম্রক, নম্রতা, নাম(মো), নামনা, নামা, নামান, নুঙা, নুঙান, নুয়ান, নেমাজ, নোঙা, নোএগ, নোয়া, নোয়ান, প্রণত, প্রণম্য, প্রণাম, বিনত, সন্নত, সমুন্নত। **নম্** = ন-এর সীমায়ন। **নম** = **ন** সীমায়িত যাহাতে।

নত (নত) : ১. ✓নম্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নত* = *ন তারিত যাহাতে; অর্থাৎ, অস্তিত্ব নমনকৃত যাহাতে। নতি = নত গতিশীল যাহাতে।* ৩. নত = নম্রীভূত, নমনযুত, চেপ্টা, অনুন্নত, কুটিল, বক্র, নমস্কৃত, প্রণত, নমন, নতি। **নতি** = নম্রভাব, নমন, নমস্কার, প্রণতি, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **নাতি**।

নথ (নথ-নাড়া, নথনী, নথি, নথিনী, নথিপত্র, নথী) : ২. *নথ* = *ন (অন্-কারী ও ন-কারী) থাকে যাহাতে বা যেখানে।* ***নথ-নাড়া*** = ***নথ*** *নাড়ান হয় যাহাতে।* ***নথনী (নথিনী)*** = ***নথ*** *অন-এর গতিশীল আধার যে।* ***নথি*** = ***নথ*** *গতিশীল যাহাতে।* ***নথিপত্র*** = ***নথি*** *ও পত্র (পতন থেকে ত্রাণ করে যে)।* ***নথী*** = ***নথ****-এর গতিশীল আধার যে।* **৩. নথ** = স্ত্রীলোকের বলয়াকার নাকের গহনা। **নথ-নাড়া** = নথপরা মুখ নাড়িয়া গর্বের কথা বলা। **নথনী (নথিনী)** = ছোট নথ। **নথি (নথী)** = সূতায় গাঁথা কোনো এক বিষয়ের কাগজপত্র, তাড়া, ফাইল। (ব.শ.)। **৪. নথনী, নথিনী ও নথী** ছাড়া বাকি শব্দগুলি খুবই প্রচলিত। **৫. নশ্ ও নাক** শব্দ থেকে আমরা জানতে পারি, মানুষের দুরকম নাক হয় — বাহ্যিক ও মানসিক। প্রাণ-সম্পদের আধার ও মানস-সম্পদের আধার যে **নাক**, সেখানেই **ন** (অন্-কারী ও ন-কারী) থাকে। তাকেই ধারণ করার প্রতীকী রূপ হল **নথ**। মানস-সম্পদের একটি অংশ হল বাস্তব সম্পত্তির মালিকানার বোধ। সেই সম্পত্তির আধারস্বরূপ সেই **নথ** গতিশীল থাকে যাহাতে, তাকে বলে **নথি**। এই **নথ** নাড়ালে যৌবনসম্পদ সহ সর্বপ্রকারের সম্পদই নড়ে উঠে ঝিলিক দেয়। ... তাছাড়া কাউকে **নথ** পরিয়ে দেওয়া মানেই, তার মালিকানা নিয়ে নেওয়া। এটি সমাজের একটি প্রাচীন প্রথা বলেই মনে হয়। গ্রামবাংলায় প্রথাটি সুপ্তভাবে রয়েছে বিয়েতে কনেকে **নথ** পরানোয়। শোনা যায়, বারবধূগণের পল্লীতে **নথ**-পরানোর প্রথা আজও বলবৎ আছে। ...

নমঃ (নমস্, নমঃশূদ্র) : ১. ✓নম্ + অস্ (অসুন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. *নমঃ (নমস্)*** = *ন-এর সীমায়নের শেষ যাহাতে।* ***নমঃশূদ্র*** = *যে শূদ্র নমনীয়তার শেষ অধ্যায়ে নীত।* **৩. নমঃ (নমস্)** = নতি, প্রণাম, নমস্কার। **নমঃশূদ্র** = বাঙালী শূদ্রবিশেষ, চাঁড়াল (বোধ হয় হেয়তাপপরিহারার্থ 'নমঃ'।)। (ব.শ.)। **৪. নমঃ** অপ্রচলিত। হিন্দুজাতির **'চণ্ডাল'**দের বোঝাতে **নমঃশূদ্র** শব্দটি কখনো কখনো ব্যবহৃত হয়। **৫.** দ্র. **নাপিত, চণ্ডাল, নমস্করণ**। **ন** সীমায়িত যাহাতে, সে হয় **নম**। অর্থাৎ, নিজের **অস্তিত্বকে** সংকুচিত করে বিন্দুবৎ করতে থাকাকে বলে **নম** করা। **বিন্দুতে পরিণত** হয়ে গেলে সে হয় **নমস্**। এই শেষ রূপ বা চূড়ান্ত **রূপই হল নমঃ** বা **নমস্**। তারও পরে তাকে নামাতে গেলে তার **অস্তিত্বই** আর থাকবে না।

নমন (নম্য) : ১. ✓নম্ + অন্ (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. *নমন*** = ***নম*** *অন যাহাতে।* ***নম্য*** = ***নম*** *থাকে যাহাতে।* **৩. নমন** = নতি, নমস্করণীয়, প্রণম্য, বক্রীকরণ, নোয়ান। **নম্য** = নমনীয়। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে **প্রচলিত**।

নমস্করণ (নমস্কার, নমস্কৃত, নমস্য, নম্র) : ১. নমস্ + ✓কৃ + অন্ (ল্যুট্), + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২. *নমস্করণ*** = ***নমস্*** *করা অন থাকে যাহাতে।* ***নমস্কার*** = ***নমস্করণ*** *থাকে যাহাতে।* ***নমস্কৃত*** = *যাহাকে* ***নমস্কার*** *করা হইয়াছে।* ***নমস্য*** = ***নমস্*** *থাকে যাহাতে।* ***নম্র*** = ***নম*** *রহে যাহাতে।* **৩. নমস্করণ (নমস্কার)** = প্রণাম, প্রণতি (নমস্কার ত্রিবিধ — কায়িক, বাচিক, মানসিক। দণ্ডপ্রণামাদি কায়িক, স্তবমন্ত্রাদিকৃত নতি বাচিক, ইষ্টাদিগত চিত্তে নতি মানসিক। ...)। **নমস্কৃত** = প্রণত, পূজিত। **নমস্য** = নমস্করণ, নমস্কারার্হ, পূজ্য। **নম্র** = নমনশীল, অবনত, বিনয়ান্বিত, প্রণত, কোমল, নিম্ন, অধঃস্থিত। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫. নমঃ** বা **নমস্** করা ভারতসমাজে ভাল আচার রূপে স্বীকৃত। ইতিহাসের বিচারে এর দুটি মন্দ দিক এবং একটি অত্যন্ত ভাল দিক রয়েছে। **নম** করা মানে অন্যকে বা নিজেকে সংকুচিত করা, কাউকে বা নিজেকে মিত বা পরিমিত করে নেওয়া। **নমঃ** বা **নমস্** করা মানে নিজেকে বা অন্য কাউকে সংকুচিত করে চূড়ান্ত রূপে নিয়ে যাওয়া বা বিন্দুতে পরিণত করা। মানুষে মানুষে সম্বন্ধের যে চতুর্থ রূপ, নিপীড়ক-নিপীড়িতের সম্বন্ধ, তাতেই এই **নমঃ** বা **নমস্**-এর বাস্তব রূপটিকে আমরা দেখতে পাই। **নমঃশূদ্র** শব্দটির উত্তরাধিকার আমাদের বলে দেয়, ভারতসমাজ একসময় একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে আত্ম-সংকোচনের চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যেতে বাধ্য করেছিল; যখন সে শুধুমাত্র কোনোমতে প্রাণটুকু বাঁচানোর অধিকারটুকু ছাড়া সব অধিকার হারিয়েছিল। আত্মসংকোচনের এই কদর্য রূপ একালে কেবলমাত্র চূড়ান্ত ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস থেকে জন্মায় বলে আমরা জেনেছি। দ্র. **আতঙ্ক, ইন্দ্রলুপ্ত**। সেই সুবাদে বলা যেতে পারে, আজকের কোনো কোনো সমাজ-পরিচালনার নীতি আজও প্রতিনিয়ত মানুষকে **নমঃশূদ্র** বানাচ্ছে। এই কাজে অগ্রণী হওয়ার ইতিহাস রয়েছে তথাকথিত মৌলবাদী কমিউনিস্ট ফ্যাসিবাদী প্রভৃতি সন্ত্রাস-নির্ভর শাসকদের।

নমস্কার-এর ভাল দিকটি দেখতে পাওয়া যায় মানুষে-মানুষে সম্বন্ধের প্রথম নীতিতে। এ নীতি হল 'পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার'-এর নীতি। বাস্তবে এই নীতির যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা এই **নমস্কারকে** দেখতে পাই। বড় মনের মানুষের ক্ষেত্রে, মনীষীদের কারও কারও ক্ষেত্রে, বৈষ্ণবদের মধ্যে, কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা এরকম **নমস্কার** দেখতে পাই। এতে দেখা যায়, মুখোমুখি দুটি মানুষ উভয়ে উভয়কে গড় হয়ে প্রণাম করছে, কিংবা হাতজোড় করে নমস্কার করতে করতে আবেগে আপ্লুত হয়ে পরস্পরের হাত ধরে ফেলছে। উভয়ের ব্যবহারে 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা' ধরনের আচরণ থাকে। আরব্য সংস্কৃতিতে একে আজকাল ঠাট্টা করে বলা হয় — 'পহলে আপ, পহ্লে আপ' ... ইত্যাদি। ভালমানুষদের, সত্যিকারের 'ভদ্রলোকদের' মধ্যে এই আচরণ থাকে। তাঁরা পরস্পরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহার করেন বলেই এইরূপ **নমস্কার** আচরণ করে থাকেন। এতে আত্মসংকোচনের ভাব আছে, কিন্তু অপরকে উচ্চ বলিয়া ব্যবহারের দ্বারাই আপন **নম্র** ভাব প্রকাশ পায়; প্রকৃতপক্ষে আত্মসংকোচন করা হয় না।

নাব (নাম, নাবনা, নামনা, নাবা, নাবাল, নামা, নামান, নামাল, নাবী, নামী) : ২. *নাম (নাব)* = *নম হইতে জাত। নামনা (নাবনা)* = *নামন (নাম অন যাহাতে) এর আধার যে। নামা (নাবা)* = *নাম-এর আধার যে। নামান* = *নামা অন যাহাতে। নামাল (নাবাল)* = *নামা লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* / **নাবী** = যাহা ঠিক সময়ের নহে। (ব.শ.)। ৩. **নাব (নাম)** = নিম্ন স্থান, হীন অবস্থা। **নাবা (নামা)** = অবরোহন করা, নামা, অবতীর্ণ হওয়া, অবরোহন করান, নামান, উলান, নত করা, নোয়ান, লম্বিত করা, ঝুলান, খুলিয়া ফেলা, খোলা। **নাবনা (নামনা)** = বটের শাখা হইতে লম্বমান শিকড়, বটের ঝুরি। **নাবাল** = নাব, নিম্ন, ঢালু (জমি)। **নাবী** = অসাময়িক (ফসল, বর্ষা)। (ব.শ.)। **নামাল** = নিম্ন অঞ্চল, দক্ষিণ দিকের নীচু ভূভাগ, একে **নাবাল**ও বলা হয়। **নামী** = পরবর্তী সময়ে হওয়া ফসল বা বর্ষা ইত্যাদি। একে **নাবী**ও বলা হয়। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. প্রথম সমস্যা হল, একালে আমরা যাকে **নামা** বা অবতরণ করা বলি, তা কোন ক্রিয়ামূলের বংশে জন্মেছে? আমরা দেখছি, ব.শ. তাকে **লম্ব্** (লগ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জাত শব্দ হিসেবে ধরেছেন। আমরা একে **নম্** ক্রিয়ামূলের বংশে নথিভুক্ত করেছি। কারণ, আমরা দেখেছি **নম্**-এর ভিতরেই নীচু হওয়ার ব্যাপারটি রয়েছে। **লম্ব্**-এর মধ্যেও রয়েছে বটে, কিন্তু এত সরাসরি নেই। যেহেতু গ্রামবাংলার প্রবণতা রয়েছে **ন**-কে **ল** উচ্চারণ করার, এবং শহুরে আধুনিক বাংলার প্রবণতা রয়েছে **ল**-কে **ন** উচ্চারণ করার, আমরা দেখেছি আধুনিক বাংলা যাকে বলে 'নামা-নামা', 'নেমে দাঁড়া', গ্রামবাংলা তাকেই বলে 'লাবা-লাবা', 'লেবে দাঁড়া'। কিন্তু **'নামাল দেশ'** বা **'নাবাল দেশ'** গ্রামবাংলার মুখেও **'লাবাল দেশ'** হয় না। এমনকি **'নাবী-চাষ'** বা **'নামী-চাষ'** কখনও **'লাবী-চাষ'** হয় না। এর থেকে আমাদের মনে হয়, **লম্ব্**-এর থেকে **নম্**-এর সক্রিয়তা এক্ষেত্রে বেশি। তাই আমরা এই শব্দগুলিকে **নম্** ক্রিয়া পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

এবার একটু অন্য বিষয়ে আসা যাক। **নাবী** বা **নামী** শব্দটি গ্রামবাংলায় খুবই প্রচলিত। এর অর্থ হল, যে সময়ে কোনো বিষয় হওয়ার কথা, তখন না হয়ে সময় আরও নেমে যাওয়ার পর হওয়াকে বলে **নাবী** বা **নামী**। ধরা যাক শ্রাবণ মাসের মধ্যে রূপশালী ধানের 'তলা' রোপণ করার কথা, বর্ষা যথাসময়ে হলে তা করাও যেত; কিন্তু দেরিতে বর্ষা হওয়ার কারণে ভাদ্র মাসে রুইতে হয়েছে। এই বর্ষাকে যেমন **নামী (নাবী)** বর্ষা বলা হয়, তেমনি এই চাষকেও **নামী (নাবী)** চাষ বলা হয়। কারণ, কালের বিবর্তন অনেকটা নেমে চলে এসেছে। তাই **নামী**। ব.শ. একে 'যাহা ঠিক সময়ের নহে' এবং 'অসাময়িক' বলেছেন।

নশ্ (নস্, নিশ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনশ্বর, অনাশী, অনিশ, অবিনাশ, অবিনাশী, অবিনাশ্য, নাটা, নশ্, নশ্যৎপ্রসূতিকা, নশ্বর, নষ্ট, নষ্টকোষ্ঠী, নষ্টচন্দ্র, নষ্টচেতন, নষ্টচেষ্ট, নষ্টজাতক, নষ্টপনা, নষ্টস্মৃতি, নষ্টামি, নষ্টি, নস্ (ন-অস্), নসা, নস্ত, নস্তা, নস্তিত, নস্তোত, নস্পর্শন, নস্য, নস্যা, নস্যোত, নাক, নাককড়াই, নাককাটা, নাককাটা-কানকাটা, নাকখত, নাকচ, নাকচ(চো)না, নাকচর, নাকছাবি, নাকনাড়া, নাকপৃষ্ঠ, নাকবনিতা, নাকফোঁড়া, নাকবিন্ধা, নাকলোক, নাকশী(সী)র, নাকসৎ, নাকারদা, নাকারা, নাকাল (নাক এলে যায় যাহাতে), নাকানি, নাকানি-চোবানি, নাকী, নাকুড়, নাকেশ্বর, নাকেশ্বরী, নাশ, নাশন, নাশা, নাশিত, নাশী, নাশ্য, নাষ্টিক, নাস, নাস (ন্যাস), নাসত্য (নাসত্য-দস্র), নাসা, নাসারন্ধ্র, নাসিকা, নাসিক্য, নাসীর, নাস্তানাবুদ, নাস্তি, নাস্তিক, নাস্তিকতা, নাস্য, নিশা, নিশাকর, নিশাকান্ত, নিশাকাল, নিশাচর, নিশাচরী, নিশাত্যয়, নিশাদান, নিশানাথ, নিশান্ত, নিশান্ধ, নিশাপতি, নিশাপালা, নিশাপুষ্প, নিশাবিহার, নিশাবেদী, নিশাভাগ, নিশামন, নিশামুখ, নিশারত্ন, নিশারাতি, নিশারাত্র(ত্রি), নিশি, নিশিকান্ত, নিশিকুটুম্ব, নিশিগন্ধা, নিশিদিশি(সি), নিশিনাথ, নিশিপতি, নিশিভাগ, নিশিভোর, নিশিমুখ, নিশী, নিশীথ, নিশীথবতী, নিশীথিনী, নিশীশ্বর, নিশু(ষু)তি, নেশা (নশা, নাশের আশ্রয়), নেশাখোর, বিনষ্ট, বিনষ্টি, বিনাশ, বিনাশী, লাট-করা (বিন্যাস), লাট-খাওয়া (নাশ)।

নশ্ (নস্, নিশ্) = ন-এর (no-এর) শক্তিবিচ্ছুরণ। **নশ** = ন-এর শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে। **নস** = ন-এর শেষ অস্তিত্ব যাহাতে। **নিশ** = গতিশীল ন-এর শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে। (ন-করা বা no-করা মানেই হল নাকরণ। অর্থাৎ, সত্তা যেভাবে, ধরা যাক, ০ থেকে ১০০ পর্যন্ত বিকশিত হয়ে, একটি বিশেষ স্বরূপ নিয়ে আছে, তার একটু একটু করে কমানো; ৯৯-৯৮-৯৭ ... এভাবে একটু একটু করে আত্মসংকোচন করে মূলে ফিরে এলেই সম্পূর্ণ বিলুপ্তি বা **নাশ** ঘটে। এই **নশ্** বা নাশকরণ আসলে একটি প্রক্রিয়া। এতে সত্তার অংশগুলিকে আত্ম-অবলুপ্ত করা হয়। বাইরের তাপে-চাপে যে বিলুপ্তি ঘটে, **নশ্** তেমন নাশকরণকে বোঝায় না; বোঝায় আত্ম-সংকোচনমূলক নাশকরণকে। বাইরের তাপে-চাপে তাকে দ্রুত করা যেতে পারে, কিন্তু মূল ক্রিয়াটি ঘটে ভেতর থেকে। সেই মূল ক্রিয়াটি হল ন-এর বা না-করার শক্তির সর্বৈব বিচ্ছুরণ, যা কিনা সত্তার অংশগুলিকে পাততাড়ি গুটিয়ে ঘরে ফিরে আসার ডাক দিচ্ছে। আবার **নিশ্**-এর বেলায় 'ন বা no গতিশীল হয়ে শক্তিবিচ্ছুরণ করে'। দ্র. **নিশা**।)

অনিশ : ২. *নেই নিশা যাহাতে।* / যাহাতে নিশা (ক্রিয়াবিচ্ছেদ) নাই। (ব.শ.)। ৩. বিরামহীন কাল, অবিরাম, সতত, নিশাহীন। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **নিশা**।

অবিনাশ (অবিনাশী, অবিনাশ্য) : ২. ***অবিনাশ*** = *নেই বিনাশ যাহার।* ***অবিনাশী*** = ***অবিনাশ****-এর গতিশীল আধার যে।* ***অবিনাশ্য*** = ***অবিনাশ*** *থাকে যাহাতে।*

নশ্যৎপ্রসূতিকা : ২. *নশ্ থাকে যাহার তারণে, সেইরূপ প্রসূতিকা যে।* / যে নারীর সন্তান নষ্ট হয়। (ব.শ.)। ৩. মৃতবৎসা। (ব.শ.)

নশ্বর : ১. ✓নশ্ + বর (করপ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নশ্****কে বরণ করে (বা বরণ করতে বাধ্য হয়) যে।* ৩. নাশশীল, অবশ্যবিনাশী,

নাশক, ভীষণ, মর, মানব। (ব.শ.)। **৪.** mortal অর্থে প্রচলিত। **৫.** নাশকে বরণ করে নেয় যে, সেই হল **নশ্বর**। আমরা শৈশব থেকেই জেনে আসছি — **'নশ্বর** এই জগত!' তার মানে, এ জগতের প্রতিটি সত্তাই আপন বিনাশকে বরণ করে নেয়, বা করে নিতে বাধ্য হয়। তাই তারা প্রত্যেকেই **নশ্বর**।

নষ্ট (নষ্টচন্দ্র, নষ্টচেতন, নষ্টচেষ্ট, নষ্টপনা, নষ্টস্মৃতি, নষ্টামি, নষ্টি) : ১. ✓নশ্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***নষ্ট** = **নশ্** তারিত যাহাতে। **নষ্টচন্দ্র** = **নষ্ট** হইয়াছে যে চন্দ্র। **নষ্টচেতন** = **নষ্ট** চেতনা যাহার। **নষ্টচেষ্ট** = **নষ্ট** চেষ্টা যাহার। **নষ্টপনা** = **নষ্ট** পালনের আধার যে। **নষ্টস্মৃতি** = **নষ্ট** স্মৃতি যাহার। **নষ্টামি** = **নষ্ট**-এর আধার গতিশীলভাবে সীমায়িত যাহাতে। **নষ্টি** = **নষ্ট** গতিশীল যাহাতে।* **৩. নষ্ট** = নাশপ্রাপ্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত, মৃত, দৃষ্টিপথাতীত, নিরুদ্দেশ, দুষ্ট, দুশ্চরিত্র, পলায়িত, নিষ্ফল, অপকৃষ্ট, হত, অপব্যয়িত, নাশ, ক্ষয়, মরণ, তিরোভাব। **নষ্টচন্দ্র** = দুষ্ট চন্দ্র, ভাদ্রের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্থীতে উদিত চন্দ্র (চন্দ্র ভাদ্রচতুর্থীতে গুরুপত্নী তারাকে হরণ করেন। তারাশাপে শশাঙ্ক কলঙ্কী হন। এই হেতু ঐ তিথিতে চন্দ্র নষ্ট। নষ্ট-চন্দ্রদর্শনে দর্শকের কলঙ্ক হয়।)। **নষ্টচেতন** = চেতনাহীন, অচেতন, মূর্চ্ছিত। **নষ্টচেষ্ট** = চেষ্টাহীন। **নষ্টপনা (নষ্টামি)** = দুষ্টামি, শঠতা। **নষ্টস্মৃতি** = স্মৃতিশক্তিহীন। **নষ্টি** = নাশ। (ব.শ.)। **৪. নষ্ট, নষ্টামি** যথাক্রমে ruined ও mischievousness অর্থে প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **৫.** যে সত্তার ভিতরে ন-এর (no-এর) দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ টঙ্কারিত হয়, তাকে **নষ্ট** বলে। অর্থাৎ এর ভিতরে না-করণ সর্বৈব সক্রিয় হয়ে গেছে; তাই **নষ্ট**। ... **৬.** ইংরেজি nasty, nest, nostalgia, nostology, nostomania, nostopathy, nostos ... ইত্যাদি।

নাক : ২. *নেই **অক** (অকারক) যাহাতে; **নক** (ন-করে যে) হইতে জাত। /* ন অক (দুঃখ) যাহাতে। (ব.শ.)। **৩.** দ্যুলোক, স্বর্গ, আকাশ; নাসিকা। (ব.শ.)। **৪.** nose অর্থে প্রচলিত। **৫. নাক** শব্দটি দুভাবে তৈরি হয়েছে — ন-অক, নাক। ফলে, একই **নাক** শব্দের দুরকম অর্থ হয়। প্রথম ক্ষেত্রে, **নাক** শব্দের মানে দাঁড়ায় 'কারী থাকে যাহাতে'। কারী থাকলেই তার দ্যুতি ছড়াবে, তাই সেটি দ্যুলোক। আমাদের **স্বর** (আমার রহে যাহাতে) **গুলি** সেখানে গমন করে, তাই সেটি **স্বর্গ**। আমাদের **কাশগুলি** সেখানে জড়ো হয়, তাই সেটি **আকাশ**। এখানে **জ্ঞানসম্পদ-ধনসম্পদ-যৌবনসম্পদ** প্রভৃতি সর্বপ্রকারের সম্পদের গন্ধ ধরা দেয়। এ-**হল মানসিক নাক**। এই **নাক**-এর কারণেই মানুষের মধ্যে সৃষ্টি **হয়েছিল 'গন্ধতন্মাত্রাত্মক** সংঘাত'। দ্র. **তন্মাত্র**। পুরাণাদি জানায় যে, এই সংঘাত থেকেই বর্তমান জগতের (পণ্যবাহী সমাজের) **সৃষ্টি হয়েছিল**। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে **নাক** শব্দের মানে হল, সে **নক** (ন-করে যে) থেকে জাত; **কর** থেকে যেমন **কার** হয় সেইরকম। **মানুষের এক** একটি নিঃশ্বাস পড়ে আর তার অস্তিত্ব এক বিন্দু করে **নষ্ট হয়** এই **নাক** দিয়ে। যখন শেষ নিঃশ্বাস পড়ে যায়, তখন **মানুষটির অস্তিত্ব** ফুরিয়ে যায়। অস্তিত্বকে **নক** করার আধার বলেই একে **নাক** বলে। তার মানে, একদিকে **নাক** আমাদের **ন-অক** বা আমাদের **কারীগুলির** বা সৃষ্ট সম্পদগুলির মহৎ আশ্রয় অর্থাৎ দ্যুলোক, স্বর্গ, আকাশ; আমাদের ইজ্জৎ। অপরদিকে সে আমাদের নিজ নিজ দেহের অংশ — **নাক** বা nose; যা দিয়ে আমরা বাহ্যিক গন্ধ টের পাই। অর্থাৎ, প্রথমটি মানসিক **নাক**, এবং দ্বিতীয়টি বাহ্যিক **নাক**। তবে এই দুই প্রকার **নাক** যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়, সেকথা আমাদের পূর্বসূরিরা জানতেন। তাঁরা জানতেন, আপন আপন সম্পদ নিয়ে লোকের **নাক-করা** স্বাভাবিক। সেরকম **নাক-করার** মতো সম্পদ-ইজ্জৎ থাকলে লোকে তা করেও; তখন অন্যের সঙ্গে **নাক-উঁচু** ব্যবহারও করে। তাঁরা জানতেন, **নাক-কাটা** গেলে কেবল বাহ্যিক-**নাক** বা nose-টাই যায় না, মানসিক **নাকটিও** কাটা যায় অর্থাৎ ইজ্জতও কাটা যায়। মেয়েদের বাহ্যিক **নাক-নাড়া** বা **নাক-ঝামটা** যে তার মানসিক **নাক**-এর বা ইজ্জতের বা যৌবনসম্পদের ঝিলিক দেয়, সেকথাও তাঁরা জানতেন। তাছাড়া, **নাক-করার** মতো মানসিক **নাক** আপনার থাকতেই পারে; সম্পদ, ধনরত্ন-লোকলস্কর-বোমাবন্দুক থাকতেই পারে; কিন্তু তাই বলে অন্যের ব্যাপারে আপনি আপনার সেই **নাক** গলাতে পারেন না; চাইলেই আপনি আপনার লোকলস্কর ভারতের দাঙ্গাদমনে পাঠিয়ে দিতে পারেন না। এমন **নাক-গলানো** অসহনীয়। দ্র. **নাসা**। ... **৬.** ইংরেজি knock, nock।

নাকাল (নাকানি-চোবানি) : ২. ***নাকাল** = **নাক** আল (এলিয়ে পড়ে বা এলে যায়) যাহাতে। **নাকানি-চোবানি** = **নাক**-এর আধার গতিশীলভাবে না-কৃত যাহাতে এবং সার্বিক **চুবানি** যাহাতে।* **৩. নাকাল** = ক্লান্ত, হয়রান, বিব্রত, নিগৃহীত, জব্দ, ধকল। **নাকানি-চোবানি (নাকানি-চুবানি)** = নাকে মুখে জল প্রবেশ, জলে ডোবা বা নিমজ্জন, অত্যন্ত হয়রান করা বা হওয়া যাতে নাকের জল ও চোখের জল এক হয়। প্রচুর নির্যাতন ভোগ, অশেষ লাঞ্ছনা। (ব্য.বা.অ.ঢাকা)। **৪.** যথার্থে প্রচলিত। **৫.** মানসিক **নাক** (সহায়-সম্পদ-শক্তি-ইজ্জৎ) নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে করতে ক্লান্ত ও শিথিল হয়ে পড়লে তাকে বলা হয় **নাকাল** হওয়া। একে **নাকানিও** বলে। কিন্তু সেই **নাক** যদি বাহ্যিক **নাক** হয়, তাহলে তা **নাকাল** হয় তাকে জলে চোবালে; একে তাই **চোবানি** বা **চুবানি** বলে। অর্থাৎ, মানসিক **নাকাল** ও বাহ্যিক **নাকাল** হওয়াকে যথাক্রমে **নাকানি-চোবানি** বলে।

নাশ (নাশক, নাশন, নাশা, নাশিত, নাশী) : ১. ✓নশ্ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** ***নাশ** = **নশ** হইতে জাত। **নাশক** = **নাশ** করে যে। **নাশন** = **নাশ** অন (on) যাহাতে। **নাশা** = **নাশ**-এর আধার যে। **নাশিত** = **নাশ** গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে। **নাশী** = **নাশ**-এর গতিশীল আধার যে।* **৩. নাশ** = ক্ষয়, হানি, মৃত্যু, অদর্শন, পলায়ন, অভাব, কারণলয়, নিষ্ফলত্ব, বিলয়, প্রতিকার, নির্ব্বাণ, অপনয়ন, নিরাকরণ; নষ্ট করা, নিহত করা, তিরোহিত করা। **নাশক** = নিহন্তা, অন্তক, ক্ষয়কারক। **নাশন** = নাশক, নিরাসক, নীচযোনিপ্রাপক, প্রতীকারক, বিলোপক; ধ্বংসন, মারণ, অপনোদন, বিস্মরণ, ভস্মীকরণ। **নাশা** = নাশক, বিলোপকারক, নাশিকা, বিহীনা,

নাশ। **নাশিত** = নিহত, নিরস্ত। **নাশী** = নাশক, ক্ষয়ী, নাশপ্রাপ্ত। (ব.শ.)। ৪. **নাশ** destroy অর্থে, **নাশক, নাশা** ও **নাশী** destroyer অর্থে, **নাশন** destroying অর্থে, **নাশিত** destroyed অর্থে প্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

নাসা (নাসিকা, নাসিক্য, নাসীর) : ১. ✓নাস্ (শব্দ) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *(**নাস** = **নস** হইতে জাত। **নস** = **ন**-এর নির্য্যাসত্যাগ যাহাতে; অর্থাৎ সত্তার ন-কৃত কণাত্যাগ যাহাতে।)* ***নাসা** = **নাস**-এর আধার যে। **নাসিকা** = **নাস**-এর গতিশীল কারিকা যে। **নাসিক্য** = **নাসিকা** হইতে জাত। **নাসীর** = **নাস**-এর ঈরণ (বিচ্ছুরণ) যাহাতে।* ৩. **নাসা** = নাসিকা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ভেদ, দ্বারোপরিস্থিত দারু, ঋনকাঠ, বাসকবৃক্ষ, পেঁয়াজের মতো নাসাস্ফীতি রোগবিশেষ। **নাসিকা** = নাসা, নাসাতুল্য দ্রব্যমাত্র, হস্তিদন্ত। **নাসিক্য** = নাসিকাভব, নাসাস্থ, নাসাজাত। **নাসীর** = সেনামুখ। (ব.শ.)। ৪. nose অর্থে **নাসা** ও **নাসিকা** প্রচলিত। বাকি দুটি শব্দ অপ্রচলিত। ৫. জীবদেহের ধর্ম্ম হল — গ্রহণ বর্জন ও পুনরুৎপাদন। এই বর্জনের সবচেয়ে ক্ষীণ পরিমাণ (**নস**) হল এক এক বারে ত্যক্ত নিঃশ্বাস। বাহ্যিক **নাক** দিয়ে দেহের এই নিয়ত আত্মত্যাগ একটি মাত্র সূক্ষ্ম কিরণরেখার মতো বের হয় বলে একে **নাস** বলে। এই **নাস**-এর আধারকে **নাসা** বলে। তবে ভোঁদা নাক ও **খাঁদা**-নাকের (বা টিয়া নাকের) মধ্যে যে পার্থক্য, **নাসা** ও **নাসিকার** মধ্যে সেই পার্থক্য। ৬. ইংরেজি nose ও nasal প্রভৃতি অনেক শব্দ।

নাস্তি, নাস্তিক : ২. *নাস্তি = নেই অস্তি যাহাতে। নাস্তিক = নাস্তি (বিশ্বাস) করে যে।* / **নাস্তি** = ন অস্তি; না আছে। **নাস্তিক** = 'পরলোক নাই' — ইহা যাহার মতি। যাহাতে তর্ক বলীয়ান, সর্ব্ব বস্তু স্বভাবসিদ্ধ, ঈশ্বর কাহারও কর্ত্তা নহেন, বেদ অকিঞ্চিৎকর, তাদৃশ শাস্ত্র। (ব.শ.)। ৩. **নাস্তি** = অবিদ্যমান, সত্তাহীন; নাই, নহে। **নাস্তিক** = পরলোকে অবিশ্বাসী, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, ঈশ্বরনাস্তিত্ববাদী (মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, চার্ব্বাক, দিগম্বর — এই ষড়্‌বিধ নাস্তিক।), পরলোকসাধনাদৃষ্টাভাববাদী, বেদনিন্দক। (ব.শ.)। ৪. an atheist অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **আস্তিক**। শব্দ দুটি — আস্তিক ও নাস্তিক। 'আছে'তে বিশ্বাস করে যে, সে হল **আস্তিক**; 'না আছে' বা 'নাই'তে বিশ্বাস করে যে, সে হল **নাস্তিক**। এখন প্রশ্ন হল, কার থাকা বা না-থাকার কথা হচ্ছে? শেষ বিচারে তিনি হলেন জগৎস্রষ্টা জগন্নাথ বা জগৎকারণ। **আস্তিক** শব্দের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, প্রকৃতপক্ষে **নাস্তিক** হওয়া অবাস্তব, অসম্ভব। অন্ততপক্ষে 'সর্ব্ব বস্তু স্বভাবসিদ্ধ' — এই জগৎকারণে বিশ্বাস না থাকলে কোনো জীবই বেঁচে থাকতে পারে না, নাস্তিকেরাও পারেনি।

নিশা (নিশিদিশি) : ১. **নিশা** = ✓নিশ্ (তনুকরণ) + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***নিশা** = ন (no) গতিশীল হইয়া শক্তিরূপে বিচ্ছুরিত হয় যাহাতে।* / **নিশা** = যে ব্যাপার তনু করে। (ব.শ.)। ৩. **নিশা** = রাত্রি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মেষ বৃষ মিথুন কর্কট ধনুঃ ও মকর রাশি। **নিশিদিশি** = রাত্রিদিন, অহোরাত্র, নিরন্তর, কখনও। (ব.শ.)। ৪. night অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **নক্ত**। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, 'সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে, আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না।' (*'আমার জগৎ'*)। সন্দেহ নেই, নিরাকারের এলাকাটিই অন্ধকারের এলাকা এবং আকারের এলাকাই আলোর এলাকা। পুরুষ-প্রকৃতির যে ধারণা, তাতে অন্ধকারই প্রকৃতি এবং আলোই পুরুষ; এবং প্রকৃতি থেকেই পুরুষের জন্ম হয়ে থাকে। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলে সেবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। (*'পরমাপ্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে। প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিনজনে॥... পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে। সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে।।'*) অতএব দেখা যাচ্ছে, 'আলোর অভাবই অন্ধকার' — এরকম কথা ভারতবর্ষ ভাবেনি। তার চোখে আকার-পুরুষ-আলো এক সত্তা, এবং নিরাকার-প্রকৃতি-অন্ধকার আরেক সত্তা। ভারতের চিন্তাভাবনা অনুসারে এই বিশ্বজগৎ এইরূপ দুই সত্তায় — পুরুষ-প্রকৃতি, আলো-অন্ধকার ... ইত্যাদিতে বিভাজিত হয়ে কামসূত্রে গ্রথিত হয়ে রয়েছে; এককে ছাড়া অন্যের চলে না; এককে না হলে অন্যের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়। ... এখন প্রশ্ন হল, আলোর যেমন **কিরণ**রেখা হয়, অন্ধকারের কি সেরকম কিরণরেখা হয়?

হ্যাঁ, হয়। অন্তত আমাদের প্রাচীন শব্দবিদগণের সেরকম ধারণাই ছিল বলে আমাদের মনে হয়েছে। একদিকে তাঁরা মনে করতেন, অন্ধকারের ভিতরে আলোর উদ্ভব যেমন সর্বদিকে অরুণবর্ণ কিরণ ছড়িয়ে অন্ধকারকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আলোর বলয় তৈরি করে, বিপরীতে অন্ধকারও সর্বদিকে কালো কিরণের প্রতিবলয় তৈরি করে সেই আলোর বলয়কে গ্রাস করে। তাঁদের এই ধারণাকে যদি আমরা মেনে নিই, তাহলে দেখা যায়, তাঁদের **নিশা, নিশাকর** প্রভৃতি শব্দের অর্থ সরাসরি বেরিয়ে আসছে। অন্যথায় কেন রাত্রিকে **নিশা** এবং চন্দ্রকে **নিশাকর** বলে, তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

'গতিশীল দানের শক্তিরূপে বিচ্ছুরণ'কে **দিশ্** বলে। অর্থাৎ সূর্য্যের থেকে সর্বদিকে যে কিরণরেখাগুলি ছুটছে, তারা প্রত্যেকেই **দিশ্** পদবাচ্য। কিন্তু যদি উল্টো হত? বিচ্ছুরিত কিরণরেখাগুলি যদি বিপরীত প্রক্রিয়ায় ফিরে আসত, তাহলে তাকে কী বলা হত? এর উত্তর হল **নিশ্**। **দিশ্** যেখানে গিয়ে ঠেকে, তাকে যেমন **দিশা** বলে, তেমনি **নিশ্** যেখানে গিয়ে ঠেকে, সেই স্থানকে তেমনি **নিশা** বলে। অর্থাৎ, **নিশ্**-এর আধার হল **নিশা**। আবার, **দিশ্** যেমন দিবস-এর কারণ, **নিশ্** তেমনি **নিশার** কারণ। সেজন্যেই **নিশিদিশি** শব্দের মানে হয় রাত্রিদিন। **দিশি** যেমন সর্বদিক আলোকিত করে দেয়, **নিশি** তেমনি সর্বদিক অন্ধকার করে দেয়। সেকারণেই '**দিশি** বা দিবা করে যে' তাকে 'দিবাকর' বা 'সূর্য্য' বলে এবং '**নিশি** বা **নিশা** করে যে' তাকে **নিশাকর** বা 'চন্দ্র' বলে। সন্ধ্যার পর থেকে যে অন্ধকারে আমাদের প্রত্যক্ষ জগৎ অনালোকিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, সেই অন্ধকার রাত্রি কার্যত এই **নিশাই** বটে। কিন্তু চন্দ্রকে যদি moon ভাবি, তাহলে **নিশাকর** কথাটি দুর্বোধ্য হয়ে যায়। কেননা, বাহ্যিক চন্দ্র (= moon) অন্ধকার (= darkness, night) সৃষ্টি করে না। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা সামাজিক চন্দ্রের (= capitalist-এর)

কথা ভাবব, সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে যে, **চন্দ্রই** নিশাকর বটে। তবে সে এক জটিল ব্যাপার এবং সে বিষয়ে এখন আমরা যাব না।

নিশাচর (নিশাচরী) : ১. নিশা + ✓চর্ + অ (ট) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নিশাকালে বিচরণ করে যে।* ৩. **নিশাচর** = নিশাবিহারী, রাত্রিচর, রাক্ষস, শৃগাল, পেচক, সর্প, চক্রবাক, ভূতপিশাচাদি, চৌর, শিব, নগররক্ষার্থ রাত্রিচর প্রহরী, কোটাল। **নিশাচরী** = রাক্ষসী, কুলটা, অভিসারিকা, কেশিনী নামক গন্ধদ্রব্য। (ব.শ.)। ৪. প্রায় অপ্রচলিত।

নিশীথ (নিশীথিনী) : ১. নি + ✓শী + থ (থক্) - অধিকরণে। (ব.শ.)। ২. ***নিশীথ** = গতিশীল ন (no) শায়িত থাকে যাহাতে। **নিশীথিনী** = **নিশীথ**-এর গতিশীল আধার যে।* ৩. **নিশীথ** = অর্দ্ধরাত্র, রাত্রিমাত্র। **নিশীথিনী** = নিশীথবতী, রাত্রি। (ব.শ.)। ৪. night অর্থে কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। ৫. **নিশা** শব্দের বেলায় আমরা দেখেছি, এই সময়কালে **নিশ্** এসে আধার রূপে ধারিত হয়। এখানে তার চেয়ে একটু বেশি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সে এখানে এসে শুয়ে পড়ে। তাই এই সময়কালকে বলে **নিশীথ**। তার আধারশক্তিরূপিণীকে স্বভাবতই বলা হয় **নিশীথিনী**।

নেশা (নেশাখোর) : ২. ***নেশা** = দিশাগ্রস্ত **নিশ** যে আধারে। **নেশাখোর** = **নেশার ক্ষু**-করণ রহে যাহাতে।* ৩. **নেশা** = মাদকসেবনজন্য মত্ততা, অত্যাসক্তি, উন্মত্ততা, মোহ, মাদকদ্রব্য। **নেশাখোর** = মাদকসেবনে আসক্ত, মাদকসেবী। (ব.শ.)। ৪. intoxication অর্থে **নেশা** এবং adiction to drinking etc. অর্থে **নেশাখোর** প্রচলিত। ৫. বলা হয়, আরবি 'নশা' শব্দ থেকে এই **নেশা** ও ফারসি 'খোর' শব্দ জুড়ে **নেশাখোর** শব্দটি এসেছে। হতে পারে। কিন্তু গ্রামবাংলায় কারও 'হাঁড়িয়া' বা 'তাড়ি' খেয়ে চেতনা-বিপর্যয় ঘটলে বলা হয়, 'লোকটা নিশা করেছে', বা 'নেশা করেছে'। জগৎ 'নিশাগ্রস্ত' হলে দেশ-কাল-পাত্র অন্ধকার হয়ে যায়, জগতে দিশাহীনতা ও রাত্রি নেমে আসে। মানুষ নিশাগ্রস্ত হলে তার মন অন্ধকার হয়ে যায়, মনে দিশাহীনতা দেখা দেয়, মানুষের মনে রাত্রি নেমে আসে। আবার, শব্দতত্ত্বের নিয়মে **নিশা** দিশাগ্রস্ত হলেই **নেশা** হয়ে যায়। আর, চেতনার বিপর্যয় তো দিশাগ্রস্ত **নিশা**রই ফল।

নহ্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনড়, অপিনদ্ধ, আঁট, আঁটন, আঁটরা, **আঁটরা-বাঁট, আঁটসাঁট**, আঁটা, আঁটাআঁটি, আঁটাসাঁটা, আঁটি, আঁটিয়া, **আঁটিসাঁটি**, আঁটুনি, আঁটুয়া, আঁটুবাঁটু, আঁটুলবাঁটুল, আঁটুলি, আঁঠি, **আনদ্ধ, আনদ্ধ-সন্নদ্ধ**, আনাড়, আনাহ, নদ্ধ, নভ, নভঃ, নভঃস্থল, নভগ, **নভশ্চর**, নভস, নভস্তল, নভস্য, নভস্বৎ, নভস্বত, নভস্বান, **নভোবীথী**, নভোগ, নভোগতি, নভোমণ্ডল, নভৌকাঃ, নহ্, নহ, নহন, **নহি, নহুষ**, না, নাই, নাগ্রি, নাগ্রিক, নাগ্রী, নাভি (navel), **নাভিকূপ, নাভিগয়া**, নাভিনাড়ী, নাভিনাল, নাভিভব, নাভিমূল, **নাভিচ্ছেদ, নাভিশ্বাস**, নাভ্য, নাহি, নাহিক, নাহুষ, সন্নদ্ধ, সোপান, **সোপানাবলী**।

নহ্ = ন-এর (no-এর) হওয়ন। **নহ** = ন-এর হওয়ন যাহাতে। (নাকরণ যখন আর কোনো কিছুকে 'না' করে না, 'নাকরণ-ক্রিয়া' করা বন্ধ করে দিয়ে একটি স্থির রূপ পেয়ে গেছে, তখনই সে **নহ**।)

নদ্ধ (আনদ্ধ, আঁট, আঁটরা, আঁটরা-বাঁট, আঁটি, আঁটাআঁটি, আঁঠি, সন্নদ্ধ) : ১. ✓নহ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ন (no) দান ধারিত যাহাতে।* ৩. **নদ্ধ** = বদ্ধ, খচিত, সমাবৃত, ধৃত, পরিহিত, বন্ধন। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **নহ** তারিত যাহাতে, তাকে **নদ্ধ** বলে। ভাল কথা। কিন্তু 'বদ্ধ' বা 'ধৃত' ... প্রভৃতিকে **নদ্ধ** বলে কেন? বলে এইজন্য যে, যাকে **নদ্ধ** করা হয় তাকে আসলে তার স্বরূপে স্থির করে অনড়-অচল করে দেওয়া হয়; তার আর কোনো বাড়বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয় হয় না। বাস্তবে ক্ষয় হলেও তার পরিমাণ খুবই কম। যে অবস্থায় সে থাকে, সেই অবস্থাতেই সে ধৃত; সেই অবস্থাতেই সে দীর্ঘকাল একরকম থেকে যায়, তাই **নদ্ধ**। আভরণের ক্ষেত্রে লোকে মাপ দিয়ে জামা-প্যান্ট বানায় এজন্যই। সে জামা-প্যান্ট বাড়ে না, কমেও না। সেই জামা গায়ে দিলে তখনই **নদ্ধ**। ঢাক-ঢোলের চামড়াটি এমনভাবে প্রস্তুত (tan) করা হয়, যাতে তা দীর্ঘকাল একরকমই থাকে; বাড়ে না, কমেও না। একই অবস্থানে এভাবে আটকে রাখাকে বলে **নহ্** করা। যাকে সেরকম করা হয়েছে, সেই হল **নদ্ধ**।

আঁট : ২. *আধারের রহস্যরূপ টঙ্কারিত যাহাতে।* ৩. দৃঢ়বদ্ধ, দৃঢ়সন্ধিযুক্ত, কষা, টানটান, দৃঢ়তা, যুক্তিযুক্ততা, নির্ভীকভাব, আসক্তি, ভালবাসা, টান, আঁটা, সমান হওয়া, পূর্ণতাহেতু টান (টনটনে) হওয়া, গণনায় মিল হওয়া, সমর্থ হওয়া, পারা, সমস্পর্দ্ধী হওয়া, শক্ত করা, শক্ত করিয়া কষিয়া বা টানিয়া বাঁধা ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ব.শ. জানিয়েছেন, **আঁট** শব্দটি **আনদ্ধ** শব্দের বিবর্তিত রূপ। দ্র. **নদ্ধ, আনদ্ধ**।

আঁটরা (আঁটরা বাঁট) : ২. ***আঁটন** রহে যাহাতে, তাহার আধার।* ৩. **আঁটরা** = আঁটির মত, দৃঢ়, শক্ত। **আঁটরা বাঁট** = যে গোস্তন (গোরুর বাঁট) হইতে সহজে দুগ্ধ নিসৃত হয় না। (ব.শ.)। ৪. গ্রামবাংলায় আজও প্রচলিত। ৫. দ্র. **আঁট**।

আঁটসাঁট : ২. ***আঁটন** ও **সাঁটন** (বিপরীত দিকের আঁটন) উভয় রয়েছে যাহাতে।* ৩. দৃঢ়গ্রন্থিযুক্ত, দৃঢ়বদ্ধ, সুদৃঢ়। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. ব.শ. জানিয়েছেন, শব্দবন্ধটি **আনদ্ধ-সন্নদ্ধ** শব্দের বিবর্তিত রূপ। আমাদেরও তাই মনে হয়। ...

আঁটি (আঁটাআঁটি, আঁঠি) : ২. ***আঁটি** = **আঁট** গতিশীল যাহাতে। **আঁটাআঁটি** = **আঁটা** ও **আঁটি**। (দ্র. কচাকচি)। **আঁঠি** = আধারের রহস্যরূপের টঙ্কারস্থিতি যাহাতে।* ৩. **আঁটি (আঁঠি)** = ফলের বীজ, বিচি, আঁটিয়া বাঁধা, আঁঠির মত দৃঢ়বদ্ধ তৃণকাষ্ঠাদির গুচ্ছ। **আঁটাআঁটি** = টানাটানি, কষাকষি, পীড়াপীড়ি, দৃঢ়তা, অতিনিষ্ঠা, স্পর্দ্ধাপ্রকাশ, স্পর্দ্ধাসূচক বাক্যপ্রয়োগ। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. লক্ষণীয় যে, এই সব শব্দগুলির প্রতীকী প্রয়োগ বহুমাত্রিক এইজন্য এ-শব্দগুলি এখনও অনেক বেশি ক্রিয়াভিত্তিক নিয়মে প্রচলিত। গ্রামবাংলার অধিকাংশ শব্দের চরিত্রই এরকম। 'আঁটা' ক্রিয়াটি খড়ের

আঁটি, এঁটে ওঠা, সংকুলান হওয়া, সমানে সমান হয়ে টক্কর দেওয়া, ফলের ভিতরে যে অংশটি এঁটে শক্ত হয়ে আছে সেই বিচিকে বোঝানো ... ইত্যাকার বহু কিছুকে বোঝায়। কাউকে হাতদুটো মাথার উপরে কোনো কিছুতে খুব শক্ত করে বেঁধে পা দুটিকে নীচের দিকে টেনে বাঁধলে সে 'আঁ' 'আঁ' চিৎকার করতে পারে। সেটিই 'আঁ'-এর টঙ্কার। কিন্তু এই বদ্ধ সত্তাটি যদি মানুষ না হয়ে খড়ের আঁটি, ঢোলের চামড়া ... ইত্যাদি হয়, তাদের টঙ্কার কানে শোনা যায় না, মনে বুঝতে হয়।

আনদ্ধ : ২. *নদ্ধ-এর আশ্রয় যাহাতে।* ৩. বদ্ধ, অমুক্ত, নিয়ন্ত্রিত, ধৃত, পরিহিত, আবৃত, চর্ম্মাবৃত, বদ্ধকোষ্ঠ, চর্ম্মাচ্ছাদিতমুখ বাদ্য — পটহ প্রভৃতি। (বাদ্য চার প্রকার — ঘন, তত, আনদ্ধ, শুষির। ... পটহ, মর্দ্দল ... প্রভৃতি ২৫ রকম বাদ্যের নাম প্রাচীন শাস্ত্রে পাওয়া যায়, যাদের আনদ্ধযন্ত্র বলে। পরে তবলা-আদি আরও অনেকগুলি আনদ্ধযন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। সভ্য (সভায় বাদনীয়), বহির্দ্বারিক (শোভাযাত্রাদিতে বাদনীয়), গ্রাম্য, সামরিক ও মাঙ্গল্য ভেদে আনদ্ধযন্ত্র পাঁচ প্রকার। সভ্য : মৃদঙ্গ তবলা ঢোলক। বহির্দ্বারিক : ঢাক ঢোল নহবৎ, নাগারা। গ্রাম্য : মাদল জোড়খাই ডুগডুগি ডমরু খঞ্জনী খোর্দ্দক হুড়কা ঘুট্‌ক। সামরিক : জগঝম্প দামামা কাড়া ঢক্কা তাসা। মাঙ্গল্য : টিকারা কাড়া নাগারা ডম্ফ খোল। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **নদ্ধ**। অপরিবর্তনশীল অর্থাৎ বদ্ধ বা **নদ্ধ** চামড়া ইত্যাদি লাগানো আছে যেখানে, **নদ্ধ**-এর সেই আশ্রয়স্বরূপ বাদ্যযন্ত্রকে **আনদ্ধ** বলে। উপরোক্ত তথ্যসমূহ জানায় কাদের সেই নাম দেওয়া হয়েছিল। ভারতের গান-নাচ-বাজনার যে কি বিশাল উত্তরাধিকার আজও রয়েছে, শুধুমাত্র একটি **আনদ্ধ** যন্ত্রের নাম থেকেই তা টের পাওয়া যায়। আমাদের দেশের সঙ্গীত, নৃত্য ও বাদ্যের বিষয়ে যত গ্রন্থাদি রয়েছে, পৃথকভাবে সেগুলির ক্রিয়াভিত্তিক পাঠ শুরু করা দরকার। একমাত্র এই ধরনের চেষ্টা থেকেই আমাদের জ্ঞানসম্পদের ঐতিহ্যের সেই বিশাল সরোবর নতুন করে স্বচ্ছসলিলে ও ফুলপাতা পাখির কলকাকলিতে ভরে উঠবে; রবীন্দ্রনাথ যাকে বলে গেছেন আমাদের ঐতিহ্যের শুষ্ক সরোবর, যার গর্তের বিপুল এলাকা দেখে তার অতীত বিশালতা তিনি অনুমান করেছিলেন।

সন্নদ্ধ : ২. *যাহা সম্যক রূপে নদ্ধ।* ৩. সম্যগ্‌বদ্ধ, কৃতসন্নাহ, ব্যূঢ়, আততায়ী, মন্ত্রাদিসংযুত, ব্যাপৃত, বিজৃম্ভিত, বহির্নিগত, সঞ্জাত, সজ্জিত, বিকাশোন্মুখ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. যাকে সম্যকভাবে **আনদ্ধ** করা হয়েছে আঁটা হয়েছে, তাকে বলে **সন্নদ্ধ** বা সাঁটা। সহজ কথায় বললে, এঁটে দেওয়া ও সেঁটে দেওয়ায় যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যই এক্ষেত্রে সক্রিয় রয়েছে। ...

নভ : ১. ✓নভ্ (হিংসা) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ন (no)-কে ভরণ-ভক্ষণ করে যে।* ৩. শ্রাবণমাস, আকাশ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত ৷৷ ৫. দ্র. **নভঃ**।

নভঃ (নভস্, নভঃস্থল, নভশ্চর) : ১. ✓নহ্ + অস্ (অসুন্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নভঃ (নভস্)** = নহ-এর বহনস্থিতি শেষ পর্যন্ত চলে যেখানে। **নভঃস্থল** = নভঃ রূপ স্থল যে। **নভশ্চর** = নভস্-তে চরে যে।* ৩. **নভঃ (নভস্)** = আকাশ, স্বর্গ, মেঘ, জল, শ্রাবণমাস, বর্ষাকাল, ঘ্রাণ, নাসিকা, পতদ্‌গ্রহ, পিকদানী, মৃণালসূত্র, লগ্ন হইতে দশম স্থান, স্বর্গ-মর্ত্ত্য। **নভঃস্থল** = নভোরূপ স্থান, আকাশ। **নভশ্চর** = গগনচারী, আকাশবিহারী, খচর, খেচর, পক্ষী, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, গ্রহাদি, মেঘ, বায়ু। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ভাবা চলে যে, যা কিছু উদ্ধৃত হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়, তা সে মুখের থুতু হোক আর উৎপাদিত পণ্যই হোক, তা সব আকাশে, স্বর্গে, মেঘে, পতদ্‌গ্রহে, পিকদানীতে, এমনকি ঘ্রাণে বা নাসিকায় গিয়ে পড়তে পারে, ঠেকতে পারে; এবং সেকারণে সেগুলি সবই **নভঃ**-পদবাচ্য হতেও পারে। কিন্তু জল শ্রাবণমাস বর্ষাকাল মৃণালসূত্র ইত্যাদি কেন যে **নভঃ**-পদবাচ্য তা আমরা এখনও জানি না।

নভগ : ৩. ভাগবত মতে, বৈবস্বত মনুর দশটি পুত্রের অন্যতম নভগ। ব্রহ্মচারী অবস্থায় থাকার সময় পিতৃধন বিভাগকালে ইনি পিতা এবং অন্যান্য ভ্রাতৃগণ কর্তৃক বঞ্চিত হন। পিতার কাছে অনুযোগ করলে মনু তাঁকে বলেন, 'তোমার ভ্রাতাদের বিশ্বাস করো না। আঙ্গিরস মুনিদের কাছে বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে সূক্ত পাঠ করে শোনাও। ফলে যজ্ঞের শেষে স্বর্গে যাবার সময় এঁরা যজ্ঞের অবশিষ্ট সমস্ত ধন তোমাকে দান করে যাবেন।' যজ্ঞান্তে নভগ দানগ্রহণে উদ্যত হলে এক কৃষ্ণকায় পুরুষ এসে তাঁকে বাধা দেন ও বলেন, 'এ ধন আমার।' পিতাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'এই কৃষ্ণকায় পুরুষ রুদ্র, এই ধনের প্রকৃত অধিকারী।' নভগ তখন সমস্ত ধন এঁকেই দান করলেন। পিতা-পুত্রের সত্যবাদিতায় সন্তুষ্ট হয়ে রুদ্র নভগকে ধন ও ব্রহ্মবিদ্যা দান করে অন্তর্হিত হলেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. এই কাহিনীটির গুরুত্ব অপরিসীম। এক) বৈদিক সভ্যতার সূচনার পর প্রজাপতিতন্ত্রের কালে ও রাজতন্ত্রের সূত্রপাতের আগে 'ব্রাহ্মণ সমুদয় সম্পত্তি পাইবার যোগ্য' — ভারতসমাজে এই কথা ঘোষিত হয় ও স্বীকৃত হয়ে যায়। কিন্তু তারও আগে, সনাতন সভ্যতার কালে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের সমাজ তার জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের অধিকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল, তাদের নেতৃস্থানীয় আবিষ্কারক-উদ্ভাবক আদি ব্রাহ্মণশ্রেণীকে। সেই আদি ব্রাহ্মণদের বলা হত শিব। এই শিব সকলের সম্পদ রক্ষা করতেন, কিন্তু নিজের সামান্য বাহ্যিক প্রয়োজনের অধিক কিছুই গ্রহণ করতেন না। কিন্তু যখন সবাই যে-যার নিজের যজ্ঞভাগ গ্রহণ করে নিচ্ছে, অথচ যে নেতৃস্থানীয় উদ্ভাবক সত্তা সকলের জন্য দিনরাত খেটে মরছে তাকেই তার সামান্যতম প্রয়োজনটুকুও দিতে ভুলে যাচ্ছে; তখন এই শিবই অধঃপতিত হয়ে রুদ্রশিবে পরিণত হন ও রুদ্ররূপে যজ্ঞভাগ দাবি করেন। দুই) **বিশ্বদেবগণ** যে দিবসে দেবতাদের এবং রজনীতে অসুরদের যজ্ঞভাগ দিয়ে দিতেন, তার এটি দ্বিতীয় প্রমাণ।

নহুষ : ১. ✓নহ্ + উষ (উষচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যে-নহ উদ্‌লোকে দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ করে।* ৩. চন্দ্রবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি পুরূরবার পৌত্র, আয়ুর পুত্র এবং যযাতির পিতা। ইনি অগস্ত্যশাপে সর্পযোনিপ্রাপ্ত হন এবং অজগররূপে ভীমকে আক্রমণ করিলে, যুধিষ্ঠির ভীমের উদ্ধারার্থ ইঁহার সমীপে উপস্থিত হন।

এইরূপে যুধিষ্ঠিরের সহিত সমাগমে ও হিতগর্ভ সম্ভাষণে মুনিবরে ইঁহার শাপান্ত হয়। শাপান্তে সর্পদেহত্যাগ করিয়া ইনি স্বর্গারোহণ করেন। (ব.শ.)। চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা-উর্বশীর পুত্র আয়ু নামক রাজার পুত্র। নহুষের ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যযাতি প্রসিদ্ধ। নহুষ অতি পুণ্যবান ও বীর্যবান ছিলেন এবং সাধনা দ্বারা আত্মসংযম অভ্যাস করেছিলেন। ... একদা তুণ্ড দৈত্যকে বধ করে ইনি ত্রিলোকের প্রশংসাভাজন হন। ... হঠাৎ গো-বধ রূপ মহাপাপ করেও ঋষিগণের কৃপায় এঁর দোষক্ষালন হয়। ইন্দ্র যখন প্রথমে ব্রহ্মহত্যা ও পরে বৃত্রাসুরকে মিথ্যাচারে বধ করে শ্রান্ত ও অচেতন হয়ে জলমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছিলেন, তখন দেবতা ও মহর্ষিরা তেজস্বী ও যশস্বী নহুষকে দেবরাজ করে দেন। ইনি শতসহস্র বৎসর দেবরাজ্য শাসন করেন। কিন্তু ইন্দ্রত্ব লাভ করে তিনি কামপরায়ণ ও বিলাসী হয়ে বৃহস্পতির কাছে গেলে তিনি কৌশলে এই ব্যাপারে বাধা দিলেন। দেবতা ও ঋষিরা নহুষকে পরস্ত্রী-সংসর্গের পাপ হতে এবং শচীকে স্ত্রীরূপে পাবর আকাঙ্ক্ষা হতে নিবৃত্ত হতে বললেন। ... এরপর ইন্দ্রের পরামর্শে শচী নহুষকে বললেন যে, ঋষিবাহিত যানে যদি নহুষ তাঁর কাছে আসেন, তবেই তিনি নহুষের অনুগামিনী হবেন। নহুষ ঋষিবাহিত যানে যাবার সময় ... অগস্ত্যের মাথায় পাদস্পর্শ করলেন। এর ফলে, ক্রুদ্ধ অগস্ত্যের শাপে নহুষ অজগর সর্পরূপে বিশাখযূপ বনে পতিত হলেন। নহুষের করুণ প্রার্থনায় অগস্ত্য বললেন যে, একদিন যুধিষ্ঠির তাঁকে শাপমুক্ত করবেন। পাণ্ডবদের বনবাসকালে ... ভীমসেন সর্পরূপী নহুষের কবলে পতিত হন। ... যুধিষ্ঠির তাকে ছেড়ে দিতে বললে ... অজগর বলল যে, যুধিষ্ঠির যদি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, তবেই ভীমকে সে ছেড়ে দেবে। অজগর প্রশ্ন করল — ব্রাহ্মণ কে? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন — সত্য, দান, ক্ষমা, অহিংসা, তপস্যা ও দয়া যাঁর আছে তিনিই ব্রাহ্মণ। সর্পের অন্য প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির আরো বললেন যে, শূদ্রের যদি ঐসব গুণ থাকে, তবে সে-ও ব্রাহ্মণ। ... অতঃপর নহুষ সর্পরূপ ত্যাগ করে দিব্যরূপ ধারণ করে স্বর্গে গমন করলেন। ((পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। **৫. দেবযানী**র বিবাহ হয়েছিল **যযাতি**র সঙ্গে। **নহুষ** সেই যযাতির পিতা। এই সেই কালখণ্ড যখন বিনিময়বিরোধী বেদবাদীরা তাঁদের সমান বণ্টনের নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমনই অধঃপতিত ব্যবহার করছেন যে, তার চেয়ে বিনিময় ভাল, এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে গেছে। দেবতারাও দানের বদলে সমপরিমাণ প্রতিদান নেওয়াকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছেন। এবং স্বভাবতই দেবাসুরের বিরোধ ক্রমশ বাড়ছে। এরই মধ্যে হঠাৎই ভাল অসুর রূপে বৃত্রাসুরের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু সামাজিক অধঃপতনের যে-অধ্যায়ে সমাজ ইতোমধ্যেই অধঃপতিত, তাতে বিনিময়ের পূর্ণ মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী এবং সমাজের পণ্যজীবী হয়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী। বৃত্রাসুরের আবির্ভাব তাকে সাময়িকভাবে আটকে দিয়েছে। স্বভাবতই ইন্দ্র অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে বৃত্রাসুর ব্যবস্থা ধ্বংস করেন। দ্র. **কলবিঙ্ক, ত্রিশিরা**। উপরোক্ত কাহিনী থেকে বোঝাই যায় যে, বেদবাদীদের সঙ্গে ধনতন্ত্রবাদীদের এই সংঘাতের সময় **নহুষ** ধনতন্ত্রবাদীদের সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু তার যে দাম তিনি দাবি করতে শুরু করেন, দেবতাদের পক্ষে তা ক্রমশই অত্যন্ত বেশি হয়ে দেখা দেয়। স্বভাবতই তাকে **অগস্ত্য**র সামনে পড়তে হয়েছিল, যেভাবে পড়তে হয়েছিল বেদবাদবিরোধী **বিন্ধ্য** পর্বতকে।

না (নাই, নাস্তি, নাহি, নাহিক) : ২. *না = ন-এর (no-এর) আধার যে। **নাই** = **না** গতিশীল যাহাতে। **নাস্তি** = **নাই** অস্তিত্ব যাহার। **নাহি** = **নহ**-জাত গতিশীল যাহাতে। **নাহিক** = **নাহি** করে যে।* ৩. **না** = নিষেধ (সংস্কৃতে ইহার প্রয়োগ নাই, বাংলায় ভূরি প্রয়োগ।)। **নাই** = না, অবিদ্যমান, অনুপস্থিত, অভাবার্থক ক্রিয়া, থাকে না। **নাহি** = না, নাই। (ব.শ.)। ৪. **নাস্তি** বাদে বাকি শব্দগুলি যথার্থে বহুল প্রচলিত। ৫. যেহেতু শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক স্বরূপ প্রায় অক্ষত, এমনকি তার বিবর্তনও ক্রিয়াভিত্তিক নিয়ম মান্য করেই ঘটেছে, তাই নানার্থে শব্দগুলির প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। ব.শ. এই প্রয়োগগুলিকে দেখিয়েছেন 'ক্রিয়ান্বিত না', 'উহ্যক্রিয়ান্বিত না' ... ইত্যাদি রূপে।

নাভি (নাভিনাল, নাভিভব, নাভিমূল, নাভিশ্বাস) : ১. ✓নহ্ + ই (ইঞ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নাভি*** *= নভজাত গতিশীল যাহাতে।* / **নাভি** = বন্ধন করে যে। (ব.শ.)। ৩. **নাভি** = প্রধানমহীপতি, চক্রবর্তী, মুখ্যনৃপ, চক্রমধ্যস্থ পিণ্ডিকা, মধ্যবিন্দু, কেন্দ্র, শ্রেষ্ঠ, প্রধান, গর্ভজাত নাড়ী, ক্ষত্রিয়, মনু-প্রপৌত্র, শিব, কস্তুরীমৃগ, প্রাণীর অঙ্গবিশেষ, গর্ভ, উদরাবর্ত্ত, মৃগনাভি। **নাভিনাল** = ভ্রূণের নাভিসংলগ্ন নাড়ী। **নাভিভব** = বিষ্ণুনাভিজাত, ব্রহ্মা। **নাভিমূল** = নাভির অধোভাগ। **নাভিশ্বাস** = নাভিনির্গত দীর্ঘশ্বাস। (ব.শ.)। ৪. navel অর্থে **নাভি** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. **নাভি** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দগুলির অর্থ আমাদের অনেক কিছু নতুন করে জানায়। আজকাল আমরা যাকে 'কেন্দ্র' বা centre বলি, সেকালের বাংলাভাষীরা তাকে **নাভি** বলতেন। তবে 'কেন্দ্র' শব্দতে 'কোন সমগ্র অবয়বের কেন্দ্র', সেই বোধটি প্রকট নয়; কিন্তু **নাভি**তে সেই বোধটিও প্রকট রয়েছে।

যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্ম প্রশ্ন করেছিলেন — ভুবনের নাভি কোথায়? যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন, 'যজ্ঞই ভুবনের নাভি।' অর্থাৎ কিনা, এই যে বিরাট মানবসমাজদেহ হাঁটছে, চলছে, বিকশিত হচ্ছে; এই সমাজদেহের কেন্দ্রবিন্দুটি কোথায়, যার উপর গোটা সমাজদেহটি টিকে রয়েছে? যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়েছিলেন, সামাজিক উৎপাদন-কর্মযজ্ঞই সেই কেন্দ্রবিন্দু। তারই উপর নির্ভর করে সমাজদেহ টিকে থাকে। সেই কর্মযজ্ঞে পরিবর্তন ঘটে গেলে সমগ্র সমাজদেহই বদলে যায়। রামায়ণের কাহিনী জানায়, রাবণের (উচ্চরবকারী নেতাদের দ্বারা) পরিচালিত সমাজদেহের কর্মযজ্ঞই তার নাভি। সেই নাভিতে আঘাত করলে, তবেই রাবণ ধরাশায়ী হবে। হয়েও ছিল। একালের ভাষায় বললে, বিশ্বের উৎপাদন-কেন্দ্রগুলিই আধুনিক বিশ্বের **নাভি**; আর World Trade Centre তার একটি মুখ মাত্র। লাদেন সেখানেই আঘাত করেছে। একালের রাবণ তাই মরেনি, উলটে ক্ষেপে গিয়ে ছুটে এসেছে লাদেনের দিকে। লাদেন তাই আজ ঘরছাড়া। ... nave, navel প্রভৃতি ইংরেজি শব্দ জানিয়ে দেয়, যে, সামাজিক উৎপাদন-কর্মযজ্ঞ যাঁরা পরিচালনা করতেন, কেমন করে তাঁরাই সমাজদেহের

কেন্দ্রবিন্দু বা **নাভিতে** পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। **৬.** Anglo-Saxon - nafa, nafu, Danish - nav, English - nave। (ব.শ.)।

***নাথ* ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনাথ, অনাথপিণ্ড, অনাথপিণ্ডিক, অনাথা, অনাথিনী, অনাথী, গোরক্ষনাথ, গোপীনাথ, দেবনাথ, নাথ্, নাথ, নাথবান, নাথহরি, নাথিত, নাহ। **নাথ** = না থাকে যাহাতে। (**না** = ন-এর আধার। **ন** = ন-কারী ও অন-কারী = no-কারী ও on-কারী। অবশ্য '**নাথ** = **নথ** থেকে জাত' — এভাবেও শব্দটির অর্থ নিষ্কাশন করা যেতে পারে।)

অনাথ : **২.** *নেই **নাথ** যাহার।* / যাহার প্রভু নাই। (ব.শ.)। **৩.** প্রভুহীন, নিরাশ্রয়, ঐশ্বর্য্যহীন, মাতৃপিতৃহীন, প্রমাণহীন। (ব.শ.)। **৪.** orphan অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **নাথ**।

অনাথপিণ্ড (অনাথপিণ্ডিক) : **২.** *অনাথের পিণ্ড যাহাতে। (যাহা) অনাথপিণ্ড বিষয়ে, তাহা।* **৩.** শ্রেষ্ঠিবিশেষ। ইঁহার নাম সুদত্ত, 'অনাথপিণ্ডদ' 'অনাথপিণ্ডিক' ইঁহার উপাধি। শ্রাবস্তি ইঁহার বাসস্থান। শ্রাবস্তির 'জেতবন' বিহার ইঁহারই অর্থে নির্ম্মিত হয়। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** আজকাল অনেক ধারণাকে ভাষা দেওয়ার জন্য বাঙালি ছটফট করে, কিন্তু ভাষা খুঁজে পায় না। এই যেমন **অনাথপিণ্ড** কিংবা **নাথহরি** ইত্যাদি। কারণ এরকম বহু শব্দ অপ্রচলিত হয়ে গেছে এবং তাদের অর্থ আমরা ভুলে গেছি। যাই হোক, **পিণ্ড** কথাটির মানে আজকাল কেবলমাত্র 'শ্রাদ্ধের পিণ্ডি' ভাবা হয়। কার্যত তা ঠিক নয়। যে কোনো খাদ্যের সংহত রূপকেই 'পিণ্ড' বলা যায়। 'মাংসপিণ্ড' শব্দটি অবশ্য এখনও প্রচলিত রয়েছে। তাছাড়া অন্নপূর্ণারা যখন রেগে গিয়ে নির্দেশ দেন, 'ঠিক আছে, এখন দয়া করে পিণ্ডিটা গিলে ফেল!' তখনও বোঝা যায়, খাদ্যরূপে 'পিণ্ড' শব্দের চল্ এখনও কিছুটা প্রচলিত আছে। এখানে **অনাথপিণ্ড** শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বৌদ্ধযুগে যিনি **অনাথকে** খাদ্য দান করতেন, তাঁকে বলা হত **অনাথপিণ্ডদ**। আর 'অর্থনীতি' থেকে যেমন 'অর্থনৈতিক' হয়, তেমনি 'অনাথপিণ্ড' থেকে **অনাথপিণ্ডিক** শব্দটি তৈরি হয়েছে, যার অর্থ **অনাথপিণ্ড**-বিষয়ক। একালে **অনাথপিণ্ডিক** ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে সারা বিশ্বে প্রচুর ব্যক্তি ও সংস্থা কর্মরত রয়েছে। কত কত ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাদের সেসব ব্যাপারকে বোঝাতে। কিন্তু নিজেদের ব্যাপকার্থক শব্দ থাকতেও তার প্রয়োগ করা হয় না।

গোপীনাথ : **২.** *গোপীগণের **নাথ** যিনি।* **৩.** কৃষ্ণবিগ্রহবিশেষ। (ব.শ.)। **৪.** ঠাকুরের নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** যাঁরা রাষ্ট্রের ভয়ে উৎপাদিত পণ্য গোপন করেন (১৯৬০-৬৫ সালে সরকারের লেভি দেওয়ার ভয়ে মেদিনীপুরের চাষীরা তাঁদের উৎপাদিত ধান গোপন করতেন, এসব আমাদের স্বচক্ষে দেখা), সেই আধারশক্তিরূপিণী জনগোষ্ঠীর **নাথকে** **গোপীনাথ** বলে। ধনসম্পদ গোপনের দৃষ্টিতে এরকম অর্থ হয় বটে, কিন্তু জ্ঞানসম্পদ বা অধ্যাত্মসম্পদ গোপনের দৃষ্টিতে **গোপীনাথ** শব্দটির অন্য একটি অর্থও হয়ে থাকে। দক্ষ সমাজপরিচালকদের অত্যাচারে যাঁরা নিজেদের অর্জিত জ্ঞানসম্পদ কিছুতেই প্রকাশ করেন না, করতে চান না, তেমন জনগোষ্ঠীর **নাথকেও** **গোপীনাথ** বলা চলে। ...

দেবনাথ : দ্র. **পদবী**, **নাথ**।

নাথ (নাথন, নাথবান, নাথহরি, নাথিত) : **১.** ✓নাথ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *নাথ = না থাকে যাহাতে। নাথন = নাথ অন যাহাতে। নাথবান = নাথ আছে যাহার। নাথহরি = নাথ-হরণ গতিশীল যাহাতে। নাথিত = নাথ গতিশীল রূপে তারিত যাহাতে।* / **নাথ** = যাহা উপতপ্ত করে। (ব.শ.)। **নাথহরি** = যে পশুর নাক ফুঁড়িয়া রজ্জুবদ্ধ করা হয়। (ছা.অ.)। **৩.** **নাথ** = ঈশ্বর, প্রভু, অধিপ, স্বামী, পতি, পালক, নায়ক, কার্য্যসাধক, রক্ষক, বৃষাদির নাসাবদ্ধ রজ্জু, ঐশ্বর্য্য, মনিব, গোরক্ষনাথ, মীননাথাদি প্রবর্তিত উপাসক সম্প্রদায়-বিশেষ, উপাধিবিশেষ, নাথসম্প্রদায়ের সাধক। **নাথবান (নাথবৎ)** = নাথযুক্ত, পরবান, পরাধীন, রক্ষকবান, প্রভুবিশিষ্ট, সনাথ, ঐশ্বর্য্যবান। **নাথিত** = যাচিত। (ব.শ.)। **নাথন** = প্রার্থনা। **নাথহরি** = নাকফোঁড়া পশু। (ছা.অ.)। **৪.** **নাথ** বাদে বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। **নাথ** শব্দটি সম্প্রদায়ের নাম ও **পদবী** রূপে এবং ব্যক্তি নামের অর্থহীন অংশ (রবীন্দ্র'**নাথ**' ঠাকুর) রূপে কমবেশি প্রচলিত। প্রাণনাথ, দীননাথ, জগন্নাথ ... ইত্যাদি অজস্র শব্দে এবং বাংলাভাষীর নামের অংশরূপে **নাথ** শব্দটির একরকম প্রচলন রয়েছে। অন্যদিকে **পদবী** রূপেও **নাথ** ও **দেবনাথ** শব্দদুটির প্রচলন রয়েছে; রয়েছেন **নাথ** সম্প্রদায়ের মানুষেরা। এর থেকে বোঝা যায়, মধ্যযুগে বা বাংলার স্বর্ণযুগে **নাথ** শব্দটির বিশেষ গৌরব ছিল। গৌরব না থাকলে লোকে শব্দটিকে নামের অংশরূপে এত বিপুল পরিমাণে ব্যবহার করত না। **৫.** **নাথ** শব্দটির ভিতরে ঠিক কী অর্থ রয়েছে যে, তা একাধারে ঈশ্বর প্রভু রক্ষক ... প্রভৃতি মাননীয় সত্তাগুলিকে যেমন বোঝায়, তেমনি গরুর নাকের দড়িকেও বোঝায়? এমনকি প্রার্থনাকেও বোঝায়?

এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় বাংলাভাষীর সংস্কৃতিতে বহুকালক্রমাগত অন্য একটি প্রশ্নের উত্তর থেকে — গাছ আগে না ফল আগে? এখন আমরা জানি, সেকালে সামাজিক সংগঠন বা সংস্থাকে গাছ এবং তার উৎপাদিত বস্তুকে ফল বলা হত। সেই হিসেবে প্রশ্নটি গিয়ে দাঁড়ায় মালিক আগে, না মাল আগে? অর্থাৎ সমাজে পণ্যের মালিক আগে জন্মেছে, নাকি পণ্য আগে জন্মেছে?

অর্থনীতির ছাত্রেরা জানেন, আদিম যৌথসমাজে উৎপন্ন ছিল কিন্তু পণ্য ছিল না। যেদিন থেকে উৎপন্ন কেবলমাত্র বিক্রির উদ্দেশ্যে উৎপাদিত হতে লাগল, সেদিন থেকেই সে পণ্যে পরিণত হল। কিন্তু পণ্য জন্মালেই তো হবে না, তার আপন গৌরব ও সেই গৌরবের মূল্য সম্পর্কে একটা বোধ চাই, এবং সেই মূল্য বা দাম বলার জন্য একজন মালিক চাই। মার্কস সাহেব বলেছেন — পণ্য উদ্ভূত হয়েই তার মালিকের খোঁজ করে। উদ্দেশ্য, মালিকটিকে সে বলবে, 'তোমার জিভটি আমাকে ধার দাও, আমি আমার দামের কথা বলি।' ('Could commodities themselves speak, they would say ...।' 'The owner must, therefore, lend them his tongue ...।'

Capital / Marx / Vol.I / p. 87, 98. / Progress Publishers, 1977)। স্বাভাবিক কারণেই যে ব্যক্তির হাতে পণ্যের মূলশক্তি রূপে আদি 'science and valour' (দ্র. 'ঘ', পৃষ্ঠা ৫০) বা গৌরব ছিল, এবং তা নিয়ে মনের-**অহঙ্কার** (দ্র. **অন্তঃকরণ**) ছিল; তার সেই মনের-**অহঙ্কার** (প্রকৃতিগুণ) এবার বুদ্ধির-**অহঙ্কারে** (পুরুষগুণে) পরিণত হয় এবং সেই 'আমি এটা করেছি'র বোধ বা **অহঙ্কার** নিয়ে সেই ব্যক্তি এগিয়ে আসে পণ্যের দামের কথা বলার জন্য। মানুষের সমাজে আদি মালিকের আবির্ভাব ঘটে যায়। তার মানে, মানবসমাজে সর্বাগ্রে প্রকৃতিগুণসম্পন্ন **অহঙ্কার** ('আমি এটা দেখেছি', 'আমি এটা করতে পারি' ইত্যাকার অনুসন্ধানাত্মিকা বোধ) জন্মায়, তার থেকে উৎপন্ন জন্মায়। তারপর তার থেকে যখন **পুরুষগুণসম্পন্ন অহঙ্কার** বা 'আমি এটা বানিয়েছি'র অভিমানাত্মক বোধ জন্মায়, তখনই উৎপন্ন পণ্যে পরিণত হয়, জন্মায় পণ্যের মালিক; সেই মালিক অতঃপর পণ্যের দাম বলতে শুরু করে এবং ব্যক্তিমালিকানা পূর্ণ রূপ পেয়ে আবির্ভূত হয়ে যায়।

অতএব সর্বাগ্রে গর্ব করার মতো বোধ চাই, গন্ধ বোঝার মতো **নাক** চাই। তখনই জন্ম নেবে গর্বপ্রকাশ করার **নাক**; শুরু হবে গন্ধতন্মাত্রাত্মক সংঘাত। (দ্র. **তন্মাত্র**)। তারপর আসবে **নথ**, সবশেষে আসবেন **নাথ**; **নাথ** এসে গেলেই নাক-নথ-নাথের বৃত্তটি পূর্ণ রূপ পেয়ে যায়। অতঃপর যার যার **নাক** আছে, তাদের প্রত্যেককে **নথ** পরিয়ে দেওয়া হয়; এই **নথ**-এর সাহায্যে বস্তুটির গৌরবের বোধকে দমন করে সসীম করে নেওয়া হয় বলে, একে **দাম**ও বলে। তারপরই গরুর **নাকে** দড়ি পড়ে, নারীর নাকে **নথ** পড়ে। আর সেই **নথ** যে পরায়, সে **নাথ**-পদবাচ্য হয়ে যায়। যাঁরা মানুষের এই সব প্রাচীন আচরণকে 'ট্যাবু' ইত্যাদি বলে নস্যাৎ করেন, তাঁরা প্রাচীন মানুষের মনস্তত্ত্বের কিছুই বোঝেন না। অতীতকে না-বুঝে ফেলে দিয়ে হা-হুতাশ করার ব্যাপারে ইউরোপীয় সভ্যতা সবচেয়ে অগ্রণী। তাদের আধুনিক শিক্ষা নিজেদের কাটা লেজ দেখিয়ে বিশ্বের সমস্ত দেশকে লেজ কেটে ফেলার পরামর্শ দিয়ে থাকে।

যাই হোক, অতঃপর একবার এই ধারণা সমাজে প্রচলিত হয়ে গেলে, প্রতিটি বিষয় ও বস্তুর মালিক বা **নাথ**-এর দেখা মিলতে শুরু করে। গরুর **নাথ** গরুর নাকে দড়ি পরায়, পণ্যের নাথ পণ্যের দাম নির্ধারণ করে ... ... ক্রমে উৎপন্নের দুনিয়া পেরিয়ে **নাথ** পৌঁছে যান সমগ্র জগতের ক্ষেত্রে। প্রতিটি পণ্যের যদি একজন **নাথ** থাকে, তবে জগতেরও একজন **নাথ** থাকতে হয়; জগৎটা বেওয়ারিশ হতে পারে না। অতএব ক্রমে একদিন জগতের **নাথ** রূপে জগন্নাথেরও জন্ম হয়ে যায়।

এইসব দেখেশুনে আমাদের মনে হয়, আদিম সমাজের যৌথসম্পদের ও যৌথবধূর ধারণা থেকে মানুষ যখন ব্যক্তিগত সম্পদের ও ব্যক্তিগত বধূর ধারণায় পৌঁছল, তখন থেকেই মেয়েদের নাকে **নথ** পরার চল হয়ে থাকবে। গ্রাম্য মেয়েদের নাকে ছিদ্র নেই, বিয়ের পর **নথ** পরতে পারবে না — এরকম হলে বয়স্কারা আজও আপত্তি তোলেন; বিয়ের সময় সে-কন্যা **নথ** পরবে কীভাবে! কারণ, ভারতসমাজের গভীরে এই বোধ আজও সক্রিয় রয়েছে যে, **নথ**-পরা মেয়ে মানেই সে কারও না কারও স্ত্রী। ...

যাই হোক, পণ্যের **নাথ** বা মালিক থেকে জগতের **নাথ** বা মালিক পর্যন্ত **নাথ**-এর বিকাশ সম্পূর্ণ হলে মালিকের বা **নাথ**-এর অত্যন্ত রমরমা হয়। অমরনাথ গোরক্ষনাথ বদ্রিনাথ শ্রীনাথ ... প্রভৃতি অজস্র নামের জগৎ-**নাথ** বা জগন্নাথ আবির্ভূত হন। দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত বস্তুর মালিকে মালিকে **নাথে নাথে** জগৎ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অধিকাংশ মালিকশ্রেণীর ভারতবাসী ও বঙ্গবাসী কিছু না কিছুর মালিক বা **নাথ** রূপে নিজেকে ঘোষণা করতে শুরু করেন। অলকনাথ, আলোকনাথ, উপেন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, কৃপানাথ, চন্দ্রনাথ, দীননাথ, রবীন্দ্রনাথ ... নাথে নাথে দেশটা ভরে যায়। তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীই তেত্রিশ কোটি **নাথ**-এ পরিণত হয়ে তেত্রিশ কোটি **দেবতা** হয়ে যায়। ...

এর পরেও **নাথ** রয়েছেন। এঁদের আদি উপাধি **শিব**। যতদূর বোঝা যায়, এঁরা সনাতন যুগের যৌথসমাজের আদি নেতাদের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। অর্থাৎ এককালে এঁরা ছিলেন সনাতন ব্রাহ্মণ বা আদিব্রাহ্মণ। স্বভাবতই সেসময় এঁরা ছিলেন জ্ঞান ও কর্ম্মের যোগসাধনকারী যোগীদের নেতা ও পরিচালক বা যোগীশ্রেষ্ঠ শিব। বৈদিক যুগের সূত্রপাতের কালে এঁরা স্বভাবতই বেদবিরোধী হয়ে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেদবাদীগণ সামাজিক ক্ষমতা দখল করায়, এঁরা অধিকাংশই যতিধর্ম্ম গ্রহণ করেন। যাঁরা থেকে যান, তাঁরা যোগীদের ব্রাহ্মণ রূপেই কমবেশি প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যে কারণে আজও এঁদের 'যুগীর বামুন' বলা হয়। এই যুগীরা বেদবাদীদের মানতে রাজি হননি, এবং বেদবিহিত কর্ম্ম না করে 'সর্ব্বলিঙ্গী' (সর্ব্ববর্ণচিহ্নধারী, সর্ব্বাশ্রমচিহ্নধারী, সর্ব্বলিঙ্গী = যারা সবরকম কাজ করে, যে কাজ পায় সেই কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে, বেদবিহিত জীবিকা অনুসরণ করে না। দ্র. 'ঘ')। হয়ে যান এবং কাহার, বাগাল ... ইত্যাদির কাজও করতে থাকেন। সেইজন্য বেদবাদীরা এঁদের নিন্দে-মন্দ করে, সামাজিকভাবে অসম্মানজনক করে রাখে। আরও পরে, সম্ভবত অশোকের সমসাময়িক কালে, উৎপাদনের উপায়সমূহের মুক্তির ডাক এলে এঁরা পণ্যবাদীদের পক্ষে সহায়ক হন এবং গোরক্ষনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, মীননাথ রূপে আবির্ভূত হন। মনে রাখা ভাল, গোরক্ষনাথ কথাটির একটি মানে হল 'পণ্যরক্ষাকারীদের স্বামী বা মালিক'। তখনই খেয়াল পড়ে যে, আদিতে যখন 'ব্যক্তিমালিকানা'র জন্মই হয়নি, তখন তাঁরাই তো ছিলেন সমাজের পরিচালক, **নাথ**। অতএব এই আদি সনাতনপন্থী শিবের উত্তরসূরীগণ **নাথ** উপাধি গ্রহণ করেন। মনে রাখা ভাল, ব্রাহ্মণদের বিভিন্ন গোত্র থাকলেও এবং তাঁদের এক গোত্রের সঙ্গে অন্য গোত্রের বিবাহাদির নানারকম নির্দেশ থাকলেও, এই **নাথ**-ব্রাহ্মণদের সকলের কিন্তু একটিই গোত্র — শিবগোত্র। আরও পরবর্তী কালে, সম্ভবত গোপাল-দেবপাল-ধর্ম্মপালের যুগে, একসময় দেখা যায়, এই **নাথ** ব্রাহ্মণগণের একটি অংশ স্বভাবতই বিনিময়জীবীদের শিল্পবৈপ্লবিক কর্ম্মকাণ্ডে বা দেবনকর্ম্মে সমর্থন জানিয়ে তাঁদের দলে যোগ দিয়েছেন। এঁদের পদবী হয়ে যায় **দেবনাথ**।

পদবীরূপে যে **নাথ** ও **দেবনাথ** আজও ভারতবাসীর নামের শেষে বিদ্যমান রয়েছে, তার হয়তো আরও বিস্তারিত ইতিহাস রয়েছে। আমাদের হাতে সেসব তথ্য নেই। আমরা কেবল শব্দগুলি থেকে

যে অর্থ বেরিয়ে আসে তাকে সামাজিক প্রেক্ষিতে বুঝবার চেষ্টা করলাম। দ্র. **পদবী**।

***নি* (*নিন্দ্, নিশ্*) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা** : অনিন্দিত, অনিন্দ্য, অন্যায়, আবেদন, আবেশ, উন্মেষ, নি, নিঅড়, নিআঁশ, নিংড়া, নিঃক্ষত্র, নিঃক্ষত্রি, নিঃক্ষত্রিয়, নিঃক্ষিপ্ত, নিঃশক্তি, নিঃশঙ্ক, নিঃশব্দ, নিঃশরণ, নিঃশলাক, নিঃশেষ, নিঃশ্রয়(য়ি)ণী, নিঃশ্রেণি (নিঃশ্রেণী, শ্রেঢ়ী, শিঁড়ি, সিঁড়ি, সিঁড়ী), নিঃশ্রেয়, নিঃশ্রেয়স, নিঃশ্ব(শ্বা)স, নিঃশ্বসন, নিঃসংশয়, নিঃসখা, নিঃসঙ্গ, নিঃসত্ত্ব, নিঃসত্য, নিঃসন্ততি, নিঃসন্তান, নিঃসন্দ, নিঃসন্ধ, নিঃসন্ধি, নিঃসপত্ন, নিঃসম্পাত, নিঃসম্বল, নিঃসর, নিঃসরণ, নিঃসলিল, নিঃসহ, নিঃসাড়তা, নিঃসার, নিঃসারণ, নিঃসীম, নিঃসৃত, নিঃস্নেহ, নিঃস্নেহা, নিঃস্পন্দ, নিঃস্পৃহ, নিঃস্যন্দিত, নিঃস্রব, নিঃস্ব, নিঃস্বত্ত্ব, নিঃস্বন, নিঃস্বাদু, নিঃস্বার্থ, নিঁদ, নিঁদা, নিকট, নিকটস্থ, নিকটিক, নিকড়ি(ড়ী)য়া, নিকড়্যা, নিকর, নিকরুণ, নিকর্ত্তন, নিকর্ষ, নিকর্ষণ, নিকল, নিকশ, নিকষ(স), নিকষগ্রাবা, নিকষপাষাণ, নিকষকুলীন, নিকষা(সা), নিকষাত্মজ, নিকষিত, নিকষোপল, নিকষ্টিয়া, নিকা, নিকান, নিকাম, নিকায়, নিকার, নিকারি, নিকাল, নিকাশ, নিকাষ, নিকাস, নিকুঞ্চক, নিকুঞ্জ, নিকুটিয়া, নিকুম্ভ, নিকুম্ভিলা, নিকুরম্ব, নিকৃত, নিকৃতি, নিকৃন্তন, নিকৃষ্ট, নিকেত, নিকেশ, নিকোচন, নিক্কণ, নিক্বাণ, নিক্ষত্র, নিক্ষিপ, নিক্ষিপ্ত, নিক্ষেপ, নিক্ষেপক, নিক্ষেপণ, নিক্ষেত্রী, নিখণ্ড, নিখনন, নিখর্ব্ব, নিখাত, নিখাদ, নিখিল, নিখুঁত, নিখুঁতি, নিগড়, নিগড়ি, নিগদ, নিগদিত, নিগম, নিগমন, নিগর, নিগাড়, নিগাদ, নিগার, নিগাল, নিগীর্ণ, নিগুঢ়, নিগূঢ়, নিগৃহীত, নিগ্রহ, নিগ্রহণ, নিগ্রাহ্য, নিঘ, নিঘণ্টু, নিঘর্ষ, নিঘর্ষণ, নিঘস, নিঘাত, নিঘাতি, নিঘাবানা, নিঘ্ন, নিঙাড়, নিঙ্গড়, নিঙ্গড়া, নিঙ্গাড়, নিঙ্গুড়, নিচয়, নিচল, নিচিত, নিচিন্তে, নিচিয়া, নিচুপে, নিচুল, নিচোড়, নিচোর, নিচোলা, নিচ্চ(চ্ছ)য়, নিছ, নিছক, নিছন, নিছনি, নিছনী, নিছুনী, নিজ্, নিজ, নিজনা, নিজাম, নিজস্ব, নিজে, নিজেকে, নিজের, নিজেরে, নিজ্জ(জ্ব)স, নিজঝুম, নিঝুম, নিঝর, নিট্ (net), নিটনকাত, নিটনকালি, নিটোল, নিঠুর, নিঠুরপনা, নিড়বিড়া, নিড়বিড়ে, নিড়া, নিডীন, নিত, নিতকলঙ্কে, নিতম্ব, নিতম্ববতী, নিতম্বভূমি, নিতম্বিনী, নিতম্বী, নিতরাম, নিতল, নিতা, নিতাই, নিতানি, নিতান্ত, নিতি, নিত্ত, নিত্তানি, নিত্য, নিত্যক, নিত্যকর্ম্ম, নিত্যকৃত্য, নিত্যগতি, নিত্যনৈমিত্তিক, নিত্যবদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিত্যযৌবনা, নিত্যশঃ, নিত্যসমাস, নিত্যহোম, নিত্যা, নিত্যানি, নিত্যানধ্যায়, নিত্যানন্দ, নিথর, নি(নী)দ, নিদয়, নিদয়া, নিদর্শক, নিদর্শন, নিদর্শনা, নিদা, নিদাঘ, নিদাঘার্ত্ত, নিদাটি(টী), নিদান, নিদানকাল, নিদারুণ, নিদালি, নিদিগ্ধ, নিদিগ্ধা, নিদিধ্যাস, নিদিধ্যাসন, নিদুটি(টী), নিদুলি, নিদেন, নিদেশ, নিদেশিনী, নিদ্দাম, নিদ্যাটী, নিদ্রা, নিদ্রাআলী, নিদ্রাউলি, নিদ্রাগত, নিদ্রাগম, নিদ্রাণ, নিদ্রাভিভূত, নিদ্রালস, নিদ্রালি, নিদ্রালিক, নিদ্রালী, নিদ্রালু, নিদ্রিত, নিধন, নিধনকারী, নিধনক্রিয়া, নিধনিয়া, নিধান (করুণানিধান, করুণানিধি, সুরনিধি), নিধাননাথ, নিধানপ, নিধানপাল, নিধানপ্রাপ্ত, নিধানি(নী), নিধি (প্রতিনিধি), নিধুবন, নিধুবনক্রীড়া, নিধুবনলীলা, নিন, নিনড়, নিনদ, নিনাদ, নিনাদন, নিনাদিত, নিনাদী, নিনু, নিন্দ্, নিন্দ, নিন্দক, নিন্দন, নিন্দনীয়, নিন্দা, নিন্দা(ন্দ্যা)টী, নিন্দাস্তুতি, নিন্দি, নিন্দিত, নিন্দুক, নিন্দুয়া, নিপট, নিপট্টবাহ্য, নিপঠ, নিপাঠ, নিপতন, নিপতিত, নিপাত, নিপাতন, নিপাতিত, নিপান, নিপীত, নিপীড়ন, নিপীড়িত, নিপুণ, নিপ্রত্যাশী, নিব, নিব-নিব (নিবু-নিবু), নিবড়, নিবন্ধ, নিবন্ধন, নিবন্ধনী, নিবন্ধী, নিবপন, নিবর্ত্ত, নিবর্ত্তন, নিবর্ত্তনা, নিবর্ত্তনীয়, নিবর্ত্তা, নিবর্ত্তিত, নিবর্ত্তিনী, নিবর্ত্তী, নিবর্হণ, নিবর্হিত, নিবস, নিবসতি, নিবস্তব্য, নিবসথ, নিবসন, নিবহ, নিবা, নিবাত, নিবাতকবচ, নিবাপ, নিবার, নিবারণ, নিবারিণী, নিবারিত, নিবাস, নিবিড়, নিবিরীস, নিবিষ্ট, নিবীত, নিবীতী, নিবৃত, নিবৃত্ত, নিবৃন্ত, নিবেদ, নিবেদক, নিবেদন, নিবেদনমিতি, নিবেদিত, নিবেদী, নিবেদ্য, নিবেশ, নিবেশন, নিবেশী, নিবেশ্য, নিবোধত, নিভ, নিভা, নিভঞ্জন, নিভাঁজ, নিভা, নিভান, নিভালন, নিভৃত, নিম (ন-বিকাশ সীমিত যাহাতে), নি(নে)মক, নিমকি(কী), নিমগ্ন, নিমজ্জথু, নিমজ্জন, নিমজ্জিত, নিমন্তন্ন, নিমন্ত্র, নিমন্ত্রণ, নিমন্ত্রিত, নিময়, নিমরাজি, নিমর্ম্ম, নিমা, নিমাই(ঞি), নিমাঞা, নিমান, নিমানন্দী, নিমাল(লি), নিমি, নিমিখ, নিমিত, নিমিত্ত, নিমিত্তজ্ঞ, নিমিত্তমাত্র, নিমিত্তী, নিমি(মে)ষ, নিমীলন, নিমীলিত, নিমীলনয়ন, নিমেয়, নিমেষ, নিম্ন, নিম্নগ, নিম্নগা, নিম্ব, নিম্বু, নিম্বুক, নিম্লোচ, নিম্লোচন, নিয়ড়, নিয়ত, নিয়তি, নিয়তঃ, নিয়ন্তব্য, নিয়ন্তা, নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রিত, নিয়ম, নিয়মন, নিয়মনিষ্ঠা, নিয়মবিধি, নিয়মিত (নিয়ত, নিত্য), নিয়র, নিয়াই, নিয়াম, নিয়ামক, নিয়ামৎ (নেয়ামৎ, নিয়মাৎ) , নিযুক্ত, নিযুক্তি, নিযুত, নিযুদ্ধ, নিযোক্তা, নিয়োগ, নিয়োগপত্র, নিয়োগী, নিয়োজ, নিয়োজন, নিযোজ্য, নির্, নিরংশ, নিরংশু, নিরক্ষ, নিরক্ষরেখা, নিরখ, নিরখিয়া, নিরগ্নি, নিরঙ্কুশ, নিরঞ্জন, নিরঞ্জনা, নিরঞ্জনী, নিরত (বিরত), নিরতি (বিরতি), নিরতিশয় (বিরতিশয়) , নিরত্যয়, নিরনুনাসিক, নিরন্ত, নিরন্তক, নিরন্তর, নিরন্ন, নিরন্বয়, নিরপত্রপ, নিরপরাধ, নিরপরাধী, নিরপেক্ষ, নিরপেক্ষতা, নিরপেক্ষী, নিরপেখি, নিরবকাশ, নিরবগ্রহ, নিরবচ্ছিন্ন, নিরবদ্য (অনবদ্য), নিরবধি, নিরবয়ব, নিরবলম্ব, নিরবশেষ, নিরবসিত, নিরবস্তার, নিরভিমান, নিরভ্র, নিরম, নিরমঞ্চ(ঞ্ছ), নিরমঞ্ছন, নিরমদ, নিরমল, নিরমা, নিরমাণ, নিরম্বু, নিরয়, নিরর্গল, নিরর্থ, নিরর্থক, নিরল, নিরলস, নিরশন, নিরস, নিরসন, নিরস্ত, নিরস্ত্র, নিরস্থি, নিরহঙ্কার, নিরহঙ্কৃত, নিরাকরণ, নিরাকর্ত্তা, নিরাকার, নিরাকাশ, নিরাকুল, নিরাকৃত, নিরাকৃতি, নিরাগ, নিরাগস, নিরা(রে)ট, নিরেট-বাঁজা (কাকবন্ধ্যা), নিরাতঙ্ক, নিরাদিষ্ট, নিরাধার, নিরানন্দ, নিরাপদ, নিরাবাধ, নিরাবিল, নিরাময়, নিরামিষ, নিরামিষাশী, নিরামিষ্য, নিরামিষ্ষি, নিরায়, নিরায়ত, নিরালম্ব, নিরালয়, নিরালা, নিরালোক, নিরাশ, নিরাশা, নিরাশীঃ, নিরাশ্রয়, নিরাশ্রিত, নিরাস, নিরাসক্ত, নিরাহার, নিরাহারী, নিরাহিত, নিরিখ, নিরিন্দ্রিয়, নিরিবিল, নিরিবিলি, নিরীক্ষ, নিরীক্ষক, নিরীক্ষণ, নিরীক্ষা, নিরীক্ষ্য, নিবাখ, নিরীতি, নিরীশ্বর, নিরীহ, নিরুক্ত, নিরুক্তি, নিরুৎসব, নিরুৎসাহ, নিরুৎসুক, নিরুদক, নিরুদ্দিষ্ট, নিরুদ্দেশ, নিরুদ্ধ, নিরুদ্যম, নিরুদ্বেগ, নিরুপদ্রব, নিরুপপত্তি, নিরুপম, নিরুপাধি, নিরুপাধিক, নিরুপাম, নিরূঢ়, নিরূঢ়া, নিরূঢ়ি, নিরূপক, নিরূপণ, নিরূপিত, নিরূহ, নিরূহণ, নির্ঋণী, নির্ঋতি, নিরেট, নিরেস, নিরোগী, নিরোদ্ধব্য, নিরোধ, নিরোধন, নিরোদ্ধার,

নির্গত, নির্গন্ধ, নির্গন্ধন, নির্গম, নির্মগমন, নির্গুণ, নির্গূঢ়, নির্গ্রন্থ, নির্গ্রন্থক, নিগ্রন্থিক, নির্গ্রাহ্য, নির্ঘণ্ট, নির্ঘাত, নির্ঘাতন, নির্ঘৃণ, নির্ঘোষ, নির্জন, নির্জর, নির্জরা, নির্জল, নির্জলা, নির্জ্জান, নির্জিত, নির্জীব, নির্ঝর, নির্ঝরিণী, নির্ঝরী, নির্ণত, নির্ণয়, নির্ণয়ন, নির্ণায়ক, নির্ণিক্ত, নির্ণিক্তি, নির্ণীত, নির্ণেক, নির্ণেজক, নির্ণেতা, নির্ণেয়, নির্দ্দণ্ড, নির্দ্দম, নির্দ্দয়, নির্দ্দর, নির্দ্দশ, নির্দ্দহন, নির্দ্দাতা, নির্দ্দায়, নির্দ্ধারিত, নির্দিষ্ট, নির্দ্দেশ, নির্দ্দেশক, নির্দ্দেশন, নির্দ্দেশনা, নির্দ্দোষ, নির্দ্দোষী, নির্দ্ধ(র্ধ)ন, নির্ধনী, নির্দ্ধার, নির্দ্ধারক, নির্দ্ধারণ, নির্দ্ধারিত, নির্দ্বন্দ্ব, নির্ধূত, নির্ধৌত, নির্নাভি, নির্নিমেষ, নির্ব্বংশ, নির্ব্বচ, নির্ব্বচন, নির্ব্বন্ধ, নির্ব্বন্ধন, নির্ব্বন্ধিত, নির্ব্বপণ, নির্ব্বর্ণন, নির্ব্বর্ণনীয়, নির্ব্বর্ত্তক, নির্ব্বর্ত্তী, নির্ব্বল, নির্ব্বলী, নির্ব্বহ, নির্ব্বহণ, নির্ব্বাক, নির্ব্বাচ, নির্ব্বাচক, নির্ব্বাচন, নির্ব্বাচনী, নির্ব্বাচিত, নির্ব্বাণ, নির্ব্বাত, নির্ব্বাদ, নির্ব্বাপ, নির্ব্বাপণ, নির্ব্বাপক, নির্ব্বাপয়িতা, নির্ব্বাপিত, নির্ব্বারিত, নির্ব্বাস, নির্ব্বাসন, নির্ব্বাসিত, নির্ব্বাহ, নির্ব্বাহণ, নির্ব্বাহিত, নির্ব্বাহী, নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিকল্পক, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিচার, নির্ব্বিচেষ্ট, নির্ব্বিঘ্ন, নির্ব্বিনোদ, নির্ব্বিন্ধ্যা, নির্ব্বিবর, নির্ব্বিবেক, নির্ব্বিবেকী, নির্ব্বিরোধ, নির্ব্বিরোধী, নির্ব্বিশঙ্ক, নির্ব্বিশেষ, নির্ব্বিষ, নির্ব্বিষয়, নির্ব্বিষ্ট, নির্ব্বীজ, নির্ব্বীর, নির্ব্বীরা, নির্ব্বৃত, নির্ব্বৃত্ত, নির্ব্বৃত্তি, নির্ব্বৃষ্টি, নির্ব্বেদ, নির্ব্বেশ, নির্ব্বেশনীয়, নির্ব্বৈর, নির্ব্ব্যথন, নির্ব্ব্যপেক্ষ, নির্ব্ব্যূঢ়, নির্ভয়, নির্ভর, নির্ভর্ৎসন, নির্ভাত, নির্ভিন্ন, নির্ভীক, নির্ভীত, নির্ভেদ, নির্ম্ম, নির্ম্মক্ষিক, নির্ম্মঞ্চন (নিছনি), নির্ম্মঞ্ছ, নির্ম্মঞ্ছন, নির্ম্মৎসর, নির্ম্মথন, নির্ম্মদ, নির্ম্মন্থন, নির্ম্মম, নির্ম্মর্য্যাদ, নির্ম্মল, নির্ম্মলী, নির্ম্মা, নির্ম্মাণ, (নির্ মান, মনে যা থাকে, তার বাস্তবায়ন। কনস্ট্রাকসনও তাই। কন হল সম, স্ট্রাকসন হল স্ত্যৈ-র একটি রূপ 'স্ত্রী-ক-এষণ', ফলত দুইয়ে মিলে মনের ভাবের সমান বাস্তবায়ন) নির্ম্মায়িণী, নির্ম্মায়ী, নির্ম্মালি, নির্ম্মাল্য, নির্ম্মিত, নির্ম্মিতি, নির্ম্মুক্ত, নির্ম্মুক্তি, নির্ম্মূল, নির্ম্মূলন, নির্ম্মোক, নির্ম্মোক্ষ, নির্ম্মোচন, নির্ম্মোহ, নির্যশস্ক, নির্যাণ, নির্যাপণ, নির্যাতন, নির্যা(য্যা)স, নির্যূষ, নির্যূহ, নির্যোল, নির্লজ্জ, নির্লজ্জিত, নির্লিপ্ত, নির্লেখন, নির্লেপ, নির্লোড়িত, নির্লোভ, নির্লোভী, নির্লোম, নির্লোমা, নির্হরণ, নির্হার, নির্হারক, নির্হারী, নির্হেতু, নির্হেতুক, নির্হৃত, নির্হৃতি, নির্হ্রাদ, নিল(লা)জ, নিলাজিনী, নিলয়, নিলয়ন, নি(নী)লাম, নিলামজারি, নিলামডাক, নিলিম্প, নিলীন, নিশ্, নিশঙ্ক, নিশঙ্কিনী, নিশব্দ, নিশমন, নিশস, নিশাচর, নিশাত, নিশান, নিশানদার, নিশানদিহি, নিশানা, নিশানি, নিশানী, নিশাস, নিশিত, নিশুম্ভ, নিশুম্ভমর্দ্দিনী, নিশোয়াস, নিশ্চই, নিশ্চএ, নিশ্চয়, নিশ্চয়তা, নিশ্চিত নিশ্চিতি, নিশ্চল, নিশ্চলতা, নিশ্চলা, নিশ্চিন্ত, নিশ্চেতন, নিশ্চেষ্ট, নিশ্ছন্দঃ, নিশ্ছিদ্র, নিশ্রুত, নিশ্বস, নিশ্বসিত, নিশ্বাস, নিষক্ত, নিষঙ্গ, নিষঙ্গী, নিষণ্ণ, নিষদ্যা, নিষধ, নিষাদ, নিষাদিত, নিষাদী, নিষিক্ত, নিষিঞ্চন, নিষিদ্ধ, নিষুতি, নিষুপ্ত, নিষূদক, নিষূদন, নিষেক, নিষেচন, নিষেধ, নিষেধক, নিষেধন, নিষেধাজ্ঞা, নিষেধবিধি, নিষেধী, নিষেবণ, নিষেবিত, নিষেবিতব্য, নিষেবী, নিষেবিনী, নিষ্ক, নিষ্কণ্টক, নিষ্কন্দিনী, নিষ্কপট, নিষ্কম্প, নিষ্করুণ, নিষ্কর্ম্মা, নিষ্কর্ষ, নিষ্কর্ষণ, নিষ্কল, নিষ্কলা, নিষ্কলী, নিষ্কষায়, নিষ্কাম, নিষ্কামী, নিষ্কারণ, নিষ্কাশ(স), নিষ্কাশন, নিষ্কাশিত, নিষ্কিঞ্চন, নিষ্কুট, নিষ্কুটি(টী), নিষ্কুল, নিষ্কুলীন, নিষ্কুষিত, নিষ্কুহ, নিষ্কুজ, নিষ্কৃত, নিষ্কৃতি, নিষ্কৃষ্ট, নিষ্কোষ, নিষ্কোষণ, নিষ্ক্রম, নিষ্ক্রমণ, নিষ্ক্রয়, নিষ্ক্রান্ত, নিষ্ক্রামণ, নিষ্ক্রিয়, নিষ্ঠ (একনিষ্ঠ), নিষ্ঠা, নিষ্ঠাবান, নিষ্ঠাকাষ্ঠা, নিষ্ঠান, নিষ্ঠিত, নিষ্ঠীব, নিষ্ঠীবন, নিষ্ঠুর, নিষ্ঠেব, নিষ্ঠেবন, নিষ্ঠ্যূত, নিষ্ণ, নিষ্ণাত, নিষ্পতিপুত্রা, নিষ্পত্তি, নিষ্পত্র, নিষ্পন্দ, নিষ্পন্ন, নিষ্পবন, নিষ্পরিগ্রহ, নিষ্পাণ্ডব, নিষ্পাদক, নিষ্পাদন, নিষ্পাদিত, নিষ্পাদ্য, নিষ্পাপী, নিষ্পাব, নিষ্পাবী, নিষ্পীড়, নিষ্পীড়িত, নিষ্পুলাক, নিষ্পেষ, নিষ্পেষণ, নিষ্প্রচার, নিষ্প্রতিঘ, নিষ্প্রতিভ, নিষ্প্রবাণি, নিষ্প্রভ, নিষ্প্রয়োজন, নিষ্প্লুষ্ট, নিষ্ফল, নিষ্ফলা, নিষ্ফলী, নিষ্য(স্য)ন্দ, নিষ্যন্দিনী, নিষ্য(স্য)ন্দী, নিস্, নিসর্গ, নিসর্গজ, নিসর্গসিদ্ধ, নিসাড়, নিসান, নিসানী, নিসিন্দা, নিসিন্ধু, নিসূদক, নিসূদন, নিসৃষ্ট, নিসৃষ্টার্থ, নিস্‌কড়ি, নিস্তন্ত, নিস্তন্দ্র, নিস্তন্দ্রি, নিস্তব্ধ, নিস্তমস্ক, নিস্তরঙ্গ, নিস্তরণ, নিস্তল, নিস্তলা, নিস্তার, নিস্তারিণী, নিস্তুষ, নিস্তেজাঃ, নিস্ত্রিংশ, নিস্ত্রৈগুণ্য, নিস্পন্দ, নিস্পৃহ, নিস্যন্দ, নিস্রব, নিস্রাব, নিস্বন, নিস্বান, নিহড়ি, নিহত, নিহন্তা, নিহনন, নিহাই, নিহাত, নিহার, নিহাল, নিহালী, নিহিংসন, নিহিত, নিহ্নব, নিহ্রাদ, নীধ্র, নীন, নীবাক, নীবার, নীবি, নীবিবন্ধ, নীবিনিবন্ধ, নীবী, নীরক্ত, নীরজস্ক, নীরজাঃ, নীরন্ধ্র, নীরব, নীরস নীরাজন, নীরাজনা, নীরুক, নীরুজ, নীরূপ, নীরোগ, নীহার, নীহারিকা, নেই, নেউগী, নেউট, নেওতা, নেকটানেকটি, নেঠা, নেবু (নিম্ব, নিম), নে(নি)মক, নেমকহারাম, নেমকহারামী, নেমন্তন্ন, নেয়াই, নেয়ামৎ, নেহাই, নেহাত, নেহানী, নেহার, নেহারণি, নেহারনি, নেহাল, নৈঋত, নৈঃশ্রেয়স, নৈকটিক, নৈকট্য, নৈকধা, নৈকষেয়, নৈকষ্য, নৈকষ্যকুলীন, নৈকৃতিক, নৈগম, নৈজ, নৈত্যক, নৈত্যিক, নৈদাঘ, নৈধন, নৈধ্রুব, নৈপুণ, নৈপুণ্য, নৈবিদ্দ, নৈবিদ্দি, নৈবেদ্য, নৈবেশিক, নৈমিত্তিক, নৈমিষ, নৈয়গ্রোধ, নৈরঞ্জনা, নৈরন্তর্য্য, নৈরাকার, নৈরাশ, নৈরাশ্য, নৈরুক্ত, নৈর্ঋত, নৈর্ঋতী, নৈর্গুণ্য, নৈশ, নৈষধ, নৈষাদি, নৈষ্কর্ম্ম্য, নৈষ্কৃতিক, নৈষ্ঠিক, নৈষ্ঠুর্য্য, নৈসর্গিক, নে, নেই, নেং, নেংড়া, নেক(খ)রা, নেকা, নেকামি, নেকি, নেকী, নে(ন্যা)কার, নেখরা, নেঙ, নেঙ(ঙ্গ)ড়া (লঙড়া, লঙ্গ), নেঙসা, নেটা, নেবা, নেবু, নেলা, নেলাক্ষেপা, নৈ, নো, নোআ, নোংরা, নোঙরা, ন্য, ন্যক্ (নি-অক, দ্র. ন্যঙ্কু), ন্যগ্রোধ, ন্যঙ্কু, ন্যঙ্গ, ন্যঙ্গতা, ন্যচ্ছ, ন্যস্ত, ন্যাকা, ন্যাকি, ন্যাঙ্গা, ন্যাটা (ন-কর্ম্ম থাকে যাহাতে = ন্য, ন্য টঙ্কারিত যাহাতে = ন্যট, তাহার আধার = ন্যাটা), ন্যাবা, ন্যায় (৫৪ প্রকার), ন্যায়তঃ, ন্যায়দণ্ড, ন্যায়পথ, ন্যায়পর, ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়বর্ত্তী, ন্যায়বাগীশ, ন্যায়বাদী, ন্যায়বৃত্ত, ন্যায়রত্ন, ন্যায্য, ন্যালা, ন্যালাক্ষেপা, ন্যাস, ন্যাসিবর, ন্যাসিমণি, ন্যাসিশিরোমণি, ন্যাসী, ন্যুঙ্খ, ন্যুব্জ, ন্যূন (nano), ন্যূনতা, ন্যূনপঞ্চাশদ্ভাব, ন্যূনাধিক, পরিবেশ, প্রতিনিয়ত, প্রতিবেদন, প্রতিবেশী, প্রবেশ, লেবু, লেম্বু, শিঁড়ি (সিঁড়ি, সিঁড়ী, শিড়ি, সিড়ি, শিঁড়ী — নিঃশ্রয়ণী, নিঃশ্রেণী), সংবেদন, হিসাব-নিকাষ।

নি (নিন্দ্, নিশ্) : নি = ন গতিশীল যাহাতে। **নিন্দ** = গতিশীল ন-এর নাকরণ দেয় যে। **নিশ** = গতিশীল ন-এর সার্বিক শক্তিবিচ্ছুরণ যাহাতে।

নি (নিশ্) : ২. *ন (অন্-কারী ও ন-কারী, অর্থাৎ on-কারী ও no-*

কারী) গতিশীল যাহাতে। **৩.** নিষেধ, নিশ্চয়, নিবেশ, নিত্য, কৌশল, সম্যক, আদেশ, বন্ধন, সংশয়, ক্ষেপ, উপরম, সামীপ্য, আশ্রয়, দান, মোক্ষ, অন্তর্ভাব, বিন্যাস, রাশীকরণ; স্বরসপ্তকে সপ্তম স্বর 'নিষাদ', অবিদ্যমান, কি, বিনয়, মাত্র, না; অভাবার্থক ক্রিয়া, প্রাপিত করা, গ্রহণ করা, অধিকার করা, অপহরণ করা, বধ করা, সঙ্গে লওয়া, চালিত করা, বহন করা, লইয়া যাওয়া, আক্রমণ করা, উপভোগ করা, মূল্য দিয়া গ্রহণ করা, উদ্ধার করা, আত্মসাৎ করা। (ব.শ.)। **৪.** ভূরি ভূরি প্রচলিত। **৫.** মূল কথাটি হল 'ন গতিশীল যাহাতে'। যেহেতু ন-এর ভিতরে অন্-কারী ও ন-কারী উভয়ে বিদ্যমান রয়েছে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর মানে নানাভাবে বদলে যায়।

ক) বিপরীতার্থক **নি** — এই **নি**-এর ভিতরে না-কারী সক্রিয় রয়েছে, যে কিনা অন্য সত্তাকে 'নেই' করে দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ — **নিখুঁত**; এর মানে 'নেই খুঁত যাহাতে'। এখানে **নি** শব্দটি (উপসর্গটি) খুঁতকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে বা 'নেই' করে দিয়েছে। তার মানে বাংলায় এমন বহু শব্দ রয়েছে, যেগুলির সামনে **নি** বসিয়ে দিলেই শব্দটির অর্থ প্রায় বিপরীত হয়ে যায়। এটা গেল **নি**-যুক্ত শব্দের একটি শ্রেণীর কথা।

খ) অন্-কারী **নি** — আর এক শ্রেণীর **নি**-যুক্ত শব্দ রয়েছে, তাদের **নি**-এর ভিতরে রয়েছে অন্-কারী, যে কিনা অন্য সত্তাকে অন্ করে দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ — **নিপীড়ন**; এর মানে 'অন্-কৃত পীড়ন যাহাতে'। এখানে **নি** শব্দটি (উপসর্গটি) পীড়নকে অন্ (on) করে দিয়েছে। তার মানে বাংলায় এমন বহু শব্দ রয়েছে, যেগুলির সামনে **নি** বসিয়ে দিলেই ক্রিয়াটিকে নিশ্চয়তার সঙ্গে সক্রিয় করা বা অন্-করা হয়ে যায়। এ হল আরেক শ্রেণীর **নি**-যুক্ত শব্দের কথা।

গ) নিঃশেষিত **নি (নিঃ, নির্, নিশ্, নিষ্, নিস্)** — এই শ্রেণীর **নি**-যুক্ত শব্দগুলি অন্য সত্তার নাকরণকে শেষ সীমায় নিয়ে গিয়ে ছাড়ে। উদাহরণ স্বরূপ — **নিঃস্ব**; এর মানে 'নিঃশেষিত স্ব যাহাতে'। এখানে **নি** শব্দটি যা কিছু স্ব ছিল, তাকে নাকরণ করে করে শেষ করে দিয়েছে। তবে এই **নি** আরও পাঁচটি রূপে প্রকাশিত হয় — **নিঃ, নির্, নিশ্, নিষ্, নিস্**। উদাহরণস্বরূপ **নিঃস্ব, নিরর্থক, নিশ্চল, নিষ্কাম, নিস্তেজ**।

ঘ) নির্গত **নি (নিঃ, নির্, নিশ্, নিষ্, নিস্)** — এই শ্রেণীর **নি**-যুক্ত শব্দগুলি আপন অভ্যন্তরকে নাকরণ করে বাইরে বের করে দেয় এবং অনেক সময় অন্য সত্তার ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। উদাহরণ স্বরূপ — **নিঃক্ষিপ্ত**; এর মানে 'নিঃসারিত ক্ষেপন যাহাতে'। এখানে **নি** শব্দটি আপন অভ্যন্তরের কোনো কিছুকে (শক্তিকে) নাকরণ করে বাইরে ক্ষেপন করেছে। এই **নি** আরও পাঁচটি রূপে প্রকাশিত হয় — **নিঃ, নির্, নিশ্, নিষ্, নিস্**। উদাহরণস্বরূপ **নিঃক্ষিপ্ত, নির্গত, নিশ্চিন্ত, নিষ্ফল, নিস্তার**।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, **নি**-যুক্ত শব্দগুলির সামনে বসে থাকা **নি** শব্দটির অর্থকে নানাভাবে বদলে দিয়ে বিশেষার্থক করে দিচ্ছে। সেই কারণে **নি**-যুক্ত শব্দগুলির অর্থ নিষ্কাশন কালে উপরোক্ত সম্ভাবনাগুলি বিচার করে তবেই শব্দগুলির অর্থ নিষ্কাশন করতে হবে।

নিকট, নিকটস্থ : দ্র. কট।

নিকল (নিকাল) : ২. ***নিকল*** *= নির্গত* ***কল*** *যাহা হইতে।* ***নিকাল*** *=* ***নিকল*** *হইতে জাত।* **৩. নিকল** = নির্গলিত হওয়া, বাহির হওয়া, ঘর হইতে বাহিরে আসা, উদ্গীর্ণ হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, প্রবাহিত হওয়া। **নিকাল** = স্থানান্তরে প্রেরণ করা, বাহির করা, নিঃসারিত করা, বাসচ্যুত করা বা নির্ব্বাসিত করা। (ব.শ.)। **৪.** মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শব্দ দুটির যথেষ্ট প্রয়োগ থাকলেও বর্তমানে সম্পূর্ণ অপ্রচলিত, কিন্তু হিন্দিতে শব্দ দুটি উপরোক্ত অর্থেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত। **৫.** এই শব্দটি তৈরি করা হয়েছে 'নির্গত **নি**' দিয়ে। **কল** কীরূপ ব্যাপার তা আমরা আগেই দেখেছি। কল-কল ধারায় যা কিছু বেরিয়ে যায়, তাই কলন পদবাচ্য। কেউ সেভাবে বেরিয়ে গেলে তাকে বলা হয় **নিকল**। হিন্দিতে বলে 'নিকল-যানা' বা বেরিয়ে যাওয়া। আর, কাউকে সেভাবে বের করে দিলে তাকে বলে **নিকাল**। হিন্দিতে বলা হয় 'নিকাল দেনা' বা বের করে দেওয়া।

নিকষ (নিকষগ্রাবা, নিকষপাষাণ, নিকষকুলীন, নিকষা, নিকষাত্মজ, নিকষিত, নিকষোপল, নিকষ্টিয়া, নৈকষেয়, নৈকষ্য, নৈকষ্যকুলীন, হিসাব-নিকাষ) : ১. নি + ✓কষ্ + অ (ঘ) - অধিকরণে। (ব.শ.)। **২.** ***নিকষ*** *=* ***নি*** *(অন্‌কারী)* ***কষ*** *যাহাতে।* ***নিকষগ্রাবা*** *=* ***নিকষ****-পূর্ব্বক গ্রাব (grab) করে যে।* ***নিকষপাষাণ*** *= যে পাষাণে* ***নিকষ****-কার্য্য করা হয়।* ***নিকষকুলীন*** *= যাহার কুল নিকষপাষাণে পরীক্ষিত।* ***নিকষা*** *=* ***নিকষ****-এর আধার যে।* ***নিকষাত্মজ*** *=* ***নিকষার*** *আত্মা হইতে জাত।* ***নিকষিত*** *=* ***নিকষ*** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* ***নিকষোপল*** *=* ***নিকষ****-কৃত উপল।* ***নিকষ্টিয়া*** *=* ***নিকষ****-কালে টঙ্কারিত হইয়া যায় যে।* ***নৈকষেয়*** *=* ***নিকষা*** *হইতে জাত যে।* ***নৈকষ্য*** *=* ***নিকষ****-এর দিশাগ্রস্ত আধার থাকে যাহাতে।* ***নৈকষ্যকুলীন*** *=* ***নৈকষ্য*** *হইয়াছে কুল যাহার।* ***হিসাব-নিকাষ*** *=* ***হিসাব*** *(হিস্যা বা অংশ বাহিত যাহাতে) ও* ***নিকাষ*** *(****নিকষ*** *হইতে জাত) যাহাতে।* / **নিকষ** = কষণ (করা হয়) যে স্থানে। **নৈকষ্য** = যাহার কৌলীন্য নিকষে পরীক্ষণীয়। (ব.শ.)। **৩. নিকষ** = স্বর্ণাদি পরীক্ষার্থ প্রস্তরভেদ, কষ্টিপাথর, বিশুদ্ধিপরীক্ষার্থ বস্তু, কষণ, কষণরেখা। **নিকষগ্রাবা, নিকষপাষাণ** = নিকষপ্রস্তর, পরীক্ষাস্থান। **নিকষকুলীন** = বৈবাহিকক্রিয়াদোষহীন কুলীন ব্রাহ্মণ। **নিকষা** = রাবণাদির জননী (বাল্মীকি রামায়ণে রাবণাদির জননী 'কৈকসী', পিতা 'বিশ্রবাঃ', মাতামহ 'সুমালী'। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণাদির জননী 'নিকষা', পিতা 'বিশ্বশ্রবা', মাতামহ 'মাল্যবান'। অমরকোষে 'নিকষা' পুলস্ত্যভার্য্যা।)। **নিকষাত্মজ** = **নিকষাপুত্র**, রাক্ষস, রাবণাদি। **নিকষিত** = নিকষে পরীক্ষিত, বিশুদ্ধ। **নিকষোপল** = নিকষপ্রস্তর। **নিকষ্টিয়া** = খিচাইয়া। **নৈকষেয়** = রাক্ষস, রাবণ, বিভীষণ। **নৈকষ্য** = নির্দোষ। (ব.শ.)। **৪. নিকষা** শব্দটি বাদে বাকি শব্দগুলি উপরোক্ত প্রতীকী অর্থে কমবেশি প্রচলিত। **৫.** দ্র. **কষ**। একটি সাঁড়াশি এখুনি দরকার, কিন্তু দেখলেন সাঁড়াশিটা যেখানে রেখেছিলেন, সেখানে নেই। শুনলেন শিশিবোতল সহ অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ভাঙাইওয়ালাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তারই মধ্যে

লোহার 'অপ্রয়োজনীয়' সাঁড়াশিটাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন আপনি কী করবেন?

আমাদের বাংলাভাষীদের হয়েছে এইরকম অবস্থা। আমাদের কাজের জিনিসগুলি কাজের সময় পাওয়া যাচ্ছে না, বাংলা অ্যাকাডেমি সেগুলিকে বর্জন করেছে। আপনি অনেক পরিশ্রম করে নিমগাছের বন সৃজন করেছেন, সেখানে যথাযথ নিয়মে মৌমাছিপালন করে যথার্থ নিমমধু বানিয়েছেন। এবার বোতলে করে বেচতে হবে। কিন্তু আপনার মধুর জাতি-কুল ঠিকঠাক আছে কি না, সেটা তো কোনো **নিকষে** পরীক্ষিত হওয়া দরকার, আপনার মধুটি যে নিমমধুর কুলে পরীক্ষিত **নিকষকুলীন**-নিমমধু, কেউ তো সে শংসাপত্র আপনাকে লিখে দেবে? খবরাখবর নিয়ে জানলেন, হ্যাঁ, ভারত সরকারের সেরকম অনেকগুলি সংস্থা রয়েছে। তাদের কেউবা প্রতিটি উৎপাদিত বস্তুর জাতি-ধর্ম্ম-কুল-শীল বিচার করে শংসাপত্র দিয়ে থাকে, কেউবা যথাবিহিত **কষ**-এর নিয়মে **কষা** হয়েছে কি না তার বিচার করে থাকে, কেউবা যথাবিহিতভাবে **কষা** না হয়ে থাকলে তাদের ধরে বা আটকায়, কেউবা ... ...। এরকম অনেক সংস্থা রয়েছে ভারত সরকারের। কিন্তু, নাহ্! এদের কারও বাংলা নাম নেই, সব ইংরেজি নাম। বাংলায় খুঁজলে এদের কাউকেই পাবেন না। তবে দু-চারটে নাম হিন্দিতে পেয়ে গেলেও যেতে পারেন, কিন্তু বাংলায় পাবেন না। Indian Standard Institution পাবেন, কিন্তু **ভারতীয় নিকষশৈল** পাবেন না; চলচ্চিত্রের Censor Board-কে পাবেন, চলচ্চিত্রের **নিকষগ্রীব**-কে পাবেন না; Auditor General-কে পাবেন, কিন্তু **নিকষোপল**কে পাবেন না। Audit Section মানেই তো **নিকষখণ্ড** এবং তার কর্মচারীরা সবাই **নিকষখাণ্ডব**, আর বিভাগীয় প্রধান **নিকষখণ্ডী**। ... কিন্তু সেরকম এখন আর বলতে পারবেন না। এমনকি আপনার নিমমধু সবরকমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শংসাপত্র পেয়ে গেলেও আপনাকে বলতে হবে examined, verified and certified; বলতে পারবেন না আপনার মধু **নিকষিত** হেম-এর মতোই **নিকষিত**-মধু। ... মোট কথা ভাব আছে, কিন্তু ভাষা নেই। সেই কারণে ইংরেজি থেকে তাদের ভাষার শব্দ ধার করে কাজ চালাতে হচ্ছে।

হিসাব-নিকাষ শব্দটি ব.শ. লিখেছেন **হিসাব-নিকাশ**। কাষ-এর বেলায় **কষ**-এ বা নির্দিষ্ট কাঠামোয় পরখ করার ব্যাপারটি থাকে, কিন্তু **কাশ**-এর বেলায় বাইরে বের করে দেওয়ার ব্যাপারটিই প্রধান বিষয়। তাই এক্ষেত্রে বানানটি **নিকাষ** হওয়াই স্বাভাবিক বলে আমাদের মনে হয়েছে। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, **আশে-পাশে** শব্দের মতো **হিসাব-নিকাষ** শব্দটিও এমনভাবে প্রচলিত রয়েছে যে, তার **নিকাষ** কথাটির যেন কোনো মানেই নেই। **কষ** হল এক ধরনের কাঠামো, format; তাতে ফেলে তার সঙ্গে মানানসই কি না, তার পরীক্ষা করা অর্থাৎ **কষ**-এ পরীক্ষা করে ছাড়পত্র দেওয়াই যে **নিকাষ শব্দের অর্থ**, সেকথা এখন আমরা ভুলে গেছি। আর, **হিসাবকে বিদেশী শব্দ** বলে তার কোনো অন্তর্নিহিত অর্থের খোঁজই করা হয়নি। ...

নিকাশ (নিকাশী) : ১. নি + ✓কাশ্ + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নির্গত* ***কাশ*** *যাহাতে।* ৩. তুল্য, সদৃশ, প্রকাশ, সমীপ, দিক্‌চক্র, নিষ্কাসন, নির্গমনপথ, আয়-ব্যয়-নির্ণয়ার্থ হিসাবের সমাপ্তি, শেষ করা, উদরসাৎ করা, বাহির করা, কোষমুক্ত করা। (ব.শ.)। ৪. শব্দটি এখন drainage system অর্থে **'নিকাশী-ব্যবস্থা'** শব্দবন্ধ রূপে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কাশ**। 'কাশের আশ্রয় যাহাতে' তাকে **আকাশ** বলে, এমন কথার অর্থ বুঝতে এখন অসুবিধা হয়। **নিকাশ** শব্দটি সে-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে।

নিকুঞ্জ (নিকুঞ্জবিহারী) : ১. নি + ✓গুঞ্জ্ + অ (ঘঞ্) - অধিকরণে। (ব.শ.)। ২. ***নিকুঞ্জ*** *= নি (অন্-কৃত)* ***কুঞ্জ*** *(নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর রহস্যরূপ জনিত) যেখানে।* ***নিকুঞ্জবিহারী*** *= যিনি* ***নিকুঞ্জে*** *বিহার করেন।* ৩. **নিকুঞ্জ** = কুঞ্জ। (নিকুঞ্জমন্দির = বিলাসভবন, শয়নগৃহ।)। (ব.শ.)। **নিকুঞ্জ** = উপবনে, উদ্যানে বা অরণ্যে লতা প্রভৃতি দ্বারা আবৃত গৃহাকার কুঞ্জ। (ছা.অ.)। ৪. শব্দগুলি এখন অপ্রচলিত। অথচ মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে এই ধরনের শব্দগুলি ছিল মণিমুক্তোর মতো মূল্যবান এবং সকল বাংলাভাষীর অনায়াস ব্যবহারযোগ্য। ৫. **কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, কুঞ্জবিহারী, নিকুঞ্জবিহারী** — এসব মণিমুক্তোর মতো বাংলা শব্দ আজ হারিয়ে গেছে। এককালে পার্থিব বনের ঝোপ-ঝাড়কে যেমন **কুঞ্জ** ও **নিকুঞ্জ** বলা হত, তেমনি সমাজবনের কারুশিল্পের কেন্দ্রগুলিকেও **কুঞ্জ** ও **নিকুঞ্জ** বলা হত। (দ্র. **নিধুবন**)। উভয় ক্ষেত্রেই **কুং**-এর (= নবরূপে উত্তীর্ণ কারীর রহস্যরূপের) জনন হত, উৎপাদিতের গুণগান বা **গুঞ্জন** ছড়িয়ে পড়ত। **পক্ষী**রা (= বিনিময়জীবীরা, দোকানদারেরা) **কূজন** করত। **কুঞ্জরেরা** (= হস্তীরা / দক্ষেরা / স্পেশালিস্টরা) দাপটে ঘুরে বেড়াত। ঘুরে বেড়াতেন **কুঞ্জবিহারী** ও **নিকুঞ্জবিহারী**গণ। ...

এই **কুঞ্জ** বা **নিকুঞ্জ**গুলি কিন্তু আদৌ হারিয়ে যায়নি। আগের তুলনায় হাজার হাজার গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এইসব সামাজিক **কুঞ্জ** ও **নিকুঞ্জ**-সমূহের রমরমা। এইসব **কুঞ্জে-নিকুঞ্জে** পাখিদের (বিনিময়-জীবীদের / দ্র. **পক্ষী**) কিচিরমিচিরে এখন কান পাতা দায়। **গুঞ্জন** এখন গর্জনে পরিণত। একালের Information Technology-র বা 'বায়ুবাহন-**কলা**'র দিগ্‌গজ **কুঞ্জরেরা** এখন সল্টলেকের সেকটর ফাইভে অজস্র **কুঞ্জ** ও **নিকুঞ্জে** প্রবল দাপটে বৃংহণ করছেন। ...

নিকুম্ভ (নিকুম্ভিলা) : ২. ***নিকুম্ভ*** *= গতিশীলভাবে ন-কৃত যে কুম্ভ।* ***নিকুম্ভিলা*** *=* ***নিকুম্ভ*** *করিলা।* ৩. **নিকুম্ভ** = কুম্ভকর্ণপুত্র, শিবানুচরভেদ, স্কন্দানুচরভেদ, বিশ্বদেবভেদ। **নিকুম্ভিলা** = লঙ্কার পশ্চিমভাগস্থ গুহাবিশেষ, নিকুম্ভিলাস্থিতা দেবী। লক্ষ্মণ, বিভীষণের সহিত নিকুম্ভিলা গুহায় যজ্ঞগৃহে প্রবেশ ও যজ্ঞধ্বংস করিয়া কুম্ভকর্ণপুত্র ইন্দ্রজিৎকে নিহত করেন। (ব.শ)। **নিকুম্ভ** = (ক) রাক্ষসবিশেষ। কুম্ভকর্ণের ঔরসে ও তাঁর স্ত্রী বজ্রমালার গর্ভে নিকুম্ভ রাক্ষসের জন্ম হয়। এর ভ্রাতার নাম কুম্ভ। এই রাক্ষস রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। (খ) ... হরিবংশ অনুসারে এই অসুর ব্রহ্মার কাছ থেকে এই বর পায় যে, কেবলমাত্র বিষ্ণুহস্তে এর মৃত্যু হবে। ইন্দ্রজাল-শক্তি থাকাতে সে নানাপ্রকার আকার ধারণ করতে পারত। শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু ব্রহ্মদত্তের কন্যাদের এই অসুর হরণ করে। ... অবশেষে সে

কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়। **নিকুম্ভিলা** = লঙ্কাপুরীতে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থানস্বরূপ উপবন। ইন্দ্রজিৎ এখানে যজ্ঞ করে যুদ্ধে যেতেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ বিভীষণের সাহায্যে ইন্দ্রজিৎকে বধ করেন। (পৌ.অ.)। (শুম্ভ-নিশুম্ভ স্মর্তব্য।)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **কুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভকার**। বাংলাভাষীর দুর্দশা, আগেই বলেছি, ভাব আছে ভাষা নেই। ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর বাবা দুজনেই করেছিলেন deprivatization বা nationalization। আমরা তাকে **নিকুম্ভিলা**-যজ্ঞ বলিনি। এখন চলছে denationalization বা privatization। কিন্তু তাকেও আমরা **কুম্ভিলা**-যজ্ঞ বলতে পারিনি। কারণ আমাদের ভাব আছে, ভাষা নেই। তাই আমরা ইংরেজের কাছ থেকে তাদের শব্দ ধার নিয়ে কাজ চালাচ্ছি। ...

নিকৃষ্ট : ১. নি + ✓কৃষ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নেই কৃষ্ট (= কৃষ্ তারিত এবং অতএব টঙ্কারিত যাহাতে) যাহাতে।* ৩. জাত্যাচারাদি হেতু নিন্দিত, নীচ, অধম, নিকট, অপকৃষ্ট। (ব.শ.)। ৪. low quality অর্থে প্রচলিত। ৫. পার্থিব জমি কর্ষণ করেই হোক আর মানবজমিন কর্ষণ করেই হোক, কর্ষণ করে ফসল রূপে যাকে আনা হয়েছে, সে হল **কৃষ্ট**। খুব ভাল উঁচু মানের কর্ষণের ফসল হয়ে থাকলে সে হল **উৎকৃষ্ট**। কিন্তু কর্ষণ করাই হয়নি, কোনোরকমে কিছু নিজে থেকে জন্মে গেছে এমন ফসল হল **নিকৃষ্ট**, যার ভেতরে কৃষ্ তারিত নেই।

নিকেশ : ২. *নেই-কৃত বা নিঃশেষিত কেশ যাহার।* ৩. সমাপ্তি, শেষ, শেষ হিসাব। (ব.শ.)। ৪. 'নেড়া করে দেওয়া' অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **কেশ**। 'মেরে নিকেশ করে দাও' — এ ধরনের বাক্য গ্রামবাংলায় আজও শোনা যায়। ১৯৬০ সালের আগেও গ্রামবাংলায় এর বাস্তব প্রয়োগ দেখা যেত। অতি বড় অপরাধীকে চরম শাস্তিস্বরূপ মাথা নেড়া করে বা **নিকেশ** করে মাথায় ঘোল ঢেলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। এর অন্য একটি অর্থও ছিল; তার সমস্ত প্রকার মালিকানা কেড়ে নেওয়া হত। তার মানে, বাহ্যিকভাবেই কেবল কেশহীন বা **নিকেশ** করা হত না, মানসিকভাবেও **নিকেশ** করে দেওয়া হত। আগের কালে বিধবাদের কোনো মালিকানা স্বীকার করা হত না বলে, তাদেরও **নিকেশ** করে দেওয়া হত। ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীরাও মস্তককে কেশহীন (= মস্তকমুণ্ডন) করে থাকেন সম্পত্তিতে মালিকানা ত্যাগের নিদর্শন হিসেবে। তবে, এই **নিকেশ** হিসেব-নিকেষের **নিকেষ** নয়; যদিও অনেক সময় সেরকম ত্রুটি হয়ে থাকে। দ্র. **নিকষ**।

নিখিল (অখিল) : ২. ***নিখিল** = ন-কৃত বা নিষ্কাশিত খিল যাহার।* ***অখিল** = নেই খিল যাহার।* / **নিখিল** = যাহা হইতে খিল (শেষ) নিবৃত্ত। (ব.শ.)। ৩. নিঃশেষ, সমগ্র, সর্ব্ব, বিশেষ। (ব.শ.)। ৪. দুটি শব্দই whole অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **খিল**। দুটো শব্দের কোনোটিরই যথার্থ অর্থ জানা না থাকায় অ্যাকাডেমি দুটোকেই 'সমগ্র' বা whole অর্থে ব্যবহার করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যার খিলই নাই; কোথাও কোনো বাধা নেই, **খিল** নেই, সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, এমন সমগ্রকে বলে **অখিল**। আর, বাধা ছিল, **খিল** ছিল, সেই **খিল** খুলে দেওয়া হয়েছে বলে আর কোনো বাধা নেই, এখন সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, এমন সমগ্রকে বলে **নিখিল**।

নিগড় : ২. *ন (অন্-কৃত) গড় যাহাতে।* ৩. লৌহময় পাদবন্ধোপকরণ, শৃঙ্খল, হস্তীর পাদবন্ধন-লৌহশৃঙ্খল, শৃঙ্খলা, বন্ধনমাত্র। (ব.শ.)। ৪. chain অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. গড়।

নিগদ (নিগদিত) : ১. নি + ✓গদ্ + অ (অপ্, ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নিগদ** = যাহাতে নির্গত গদ থাকে। **নিগদিত** = নিগদ গতিশীল ভাবে তারিত যাহাতে।* ৩. **নিগদ** = ভাষণ, কথন, শব্দমাত্র, উচ্চৈঃ মন্ত্রজপ। **নিগদিত** = ভাষণ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **গদ**। আমরা জেনেছি যে, **ধ্যান** শব্দের অর্থ হল, 'ধারণোদ্দেশে পশ্চাদ্ধাবন অন থাকে যাহাতে।' তবে এই পশ্চাদ্ধাবনের আরও দুটি ভাগ রয়েছে — **উপাংশু** ও **নিগদ**। উপাংশু হল এত আস্তে পশ্চাদ্ধাবনের কথা বা মন্ত্রগুলি বলা যাতে, নিজে ছাড়া অন্য কেউ শুনতে না পায়। আর, **নিগদ** হল জোরে জোরে সেই মন্ত্রোচ্চারণ করা। বস্তুত **গদ** মানে যে শব্দ উচ্চারণ করে কথা বলা, এই কথাটাই আমরা ভুলে গেছি। ফলে **গদা, গদ্য, নিগদিত** প্রভৃতি শব্দও তাদের মানে সহ আমাদের হাত ফসকে উধাও হয়ে গেছে। নিগদ বিষয়ে আরও ব্যাখ্যার জন্য আমাদের 'ঙ' গ্রন্থের ১৭৩-১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিগ্রহ (নিগৃহীত) : ১. নি + ✓গ্রহ্ + অ (অপ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নিগ্রহ** = ন-কৃত গ্রহণ যাহাতে। **নিগৃহীত** = নিগ্রহ গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে।* ৩. **নিগ্রহ** = নিরোধ, সংযম, নিয়ন্ত্রণ, সংহার, পরিভব, বন্ধন, অবরোধ, অনুগ্রহাভাব, ভর্ৎসন, নিরাকরণ ... ইত্যাদি। **নিগৃহীত** = নিয়ন্ত্রিত, নিরুদ্ধ, পীড়িত, পক্ষসমর্থনে বা হেতুবাদে পরাভূত। (ব.শ.)। ৪. শব্দ দুটি যথাক্রমে coercion ও coerced অর্থে প্রচলিত। ৫. শব্দ দুটি **অনুগ্রহ** শব্দের মতো। প্রভু অত্যল্প গ্রহণ করছেন, আমরা ভাবছি তিনি দয়া করছেন। কারণ, তিনি চাইলে সবটাই নিয়ে নিতে পারতেন, কিন্তু নেননি। তাই **অনুগ্রহ** কথাটির মানে দাঁড়িয়ে গেছে 'দয়া করা'। একই ভাবে গ্রহণ করতে দেওয়া হচ্ছে না, আটকানো হচ্ছে, রোধ করা হচ্ছে, নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, কিন্তু মানেটা দাঁড়িয়ে গেছে 'পীড়িত করা' হচ্ছে। কারণ, যাকে **নিগ্রহ** করা হচ্ছে, তারই কিন্তু গ্রহণ করার কথা ছিল।

নিছক : ২. *নেই ছক যাহার।* ৪. mere অর্থে খুবই প্রচলিত। ৫. মধ্যযুগ পেরিয়ে 'ভালবাসা'র মতো যে সমস্ত ক্রিয়াভিত্তিক শব্দ বানানো হয়েছে, **নিছক** শব্দটি তাদের মধ্যে একটি। ...

নিজ (নিজস্ব) : ১. নি (নিয়ত) + ✓জন্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নিজ** = গতিশীল ন-কারী (অন্-কারী) জনিত যাহাতে; অর্থাৎ নিহিত জনন যাহাতে। **নিজস্ব** = **নিজ**-এর **স্ব** (= অস্তিত্ববাহক; দ্র. তট)।* ৩. **নিজ** = স্বক, স্বীয়, নৈসর্গিক, সহোদর, নিত্য। **নিজস্ব** = স্বীয় ধন, ব্যক্তিগত দ্রব্য। (ব.শ.)। ৪. যথার্থে খুবই প্রচলিত। ৫.

নিজ শব্দটিকে বুঝতে গেলে **অজ** শব্দের সাহায্য নিতে হয়। 'নেই জনন যাহাতে' সে হল **অজ**; আর, 'নিহিত জনন যাহাতে' সে হল **নিজ**। তার মানে, একটি বংশধারা বাহিত হয়ে আসছে। যেখানে সেই বংশধারা রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর এগোচ্ছে না, সেই বিন্দুটি হল **অজ**। আর, যেখানে সেই বংশধারা রুদ্ধ না হয়ে পরবর্তী ধাপে পা ফেলেছে, সেই বিন্দুটি হল **নিজ**। অর্থাৎ, পূর্বতন অস্তিত্বের উত্তরাধিকার নিহিত হয়েছে যার ভিতরে সে হল **নিজ**। তার মানে, একটি ধারাবাহিকতার শেষ বিন্দুটি হল **নিজ**। এই **নিজ** কিন্তু 'স্ব' নয়, 'আপন' নয়; এই **নিজ**-এর **স্ব**-গুলিকে বা আপনগুলিকে বলা হয় **নিজস্ব**। কারণ, তাতে **নিজ**-এর অস্তিত্ব বাহিত হয়। স্ব হারিয়ে গেলে আবার কিছু স্ব বানিয়ে ফেলা বা আনিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু **নিজ** হারিয়ে গেলে তা বানিয়ে ফেলা যায় না, আনিয়ে নেওয়াও যায় না। কবি তাই বলেছেন 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি'।

নিতান্ত : ১. নি + ✓তম্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গতিশীল **ন** (অন্-কারী) **তম** তারিত যাহাতে।* ৩. অতিশয়, একান্ত, যথার্থ, সবিশেষ, কোনো প্রকারে। (ব.শ.)। ৪. প্রধানত extreme অর্থে প্রচলিত। ৫. সক্রিয় এবং নিহিত **তম** বা সর্বোচ্চ যার ভিতরে রয়েছে, তাকে বলে **নিতান্ত**। রামপ্রসাদ লিখছেন, '... হ ক্ষ আশ্রয় ভুরু, **নিতান্ত** কহিলা গুরু, এই ধ্যান করি ধন্য নরে।' এখানে গুরু সর্বোচ্চ যা বলা সম্ভব ততটাই বলেছেন; আর সে অর্থটি প্রকাশ করছে **নিতান্ত** শব্দটি। বাংলাভাষী শব্দটিকে আরও বহু ক্ষেত্রে বহু ভাবে প্রয়োগ করেন। তবে সবক্ষেত্রে মূলে শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থটিই বিরাজ করে।

নিত্য (নিত্যকর্ম্ম, নিত্যনৈমিত্তিক, নিত্যবদ্ধ, নিত্যমুক্ত, নিত্যযৌবনা, নিত্যানন্দ, নিতাই, নিতি) : ১. নি + ত্য (ত্যপ্) ধ্রুবার্থে। (ব.শ.)। ২. ***নিত্য** = গতিশীল ন-এর (অন্-কারীর) তারণ থাকে যাহাতে; অর্থাৎ, নি-এর তারণ থাকে যাহাতে। **নিত্যকর্ম্ম** = যে কর্ম্ম নিত্য করিতে হয়। **নিত্যনৈমিত্তিক** = নিত্য ও নৈমিত্তিক। **নিত্যবদ্ধ** = নিত্য বদ্ধ যে। **নিত্যমুক্ত** = নিত্য মুক্ত যে। **নিত্যযৌবনা** = নিত্য যৌবন যাহার। **নিত্যানন্দ** = নিত্য আনন্দ যাহাতে। **নিতাই** = নিত-এর আধার গতিশীল যাহাতে। **নিতি** = নিত গতিশীল যাহাতে।* / **নিত্য** = নিয়ত ধ্রুব যে। (ব.শ.)। ৩. নিত্য = সতত, পরিনিষ্ঠিত, সদৈকরূপ, জন্মনাশরহিত, প্রতিদিনসাধ্য, অবশ্যকর্ত্তব্য, সততস্থিত, অবিচ্ছিন্ন-পরম্পরাক, সমুদ্র, অকরণে প্রত্যবায়সাধন সন্ধ্যাবন্ধনাদি। **নিত্যকর্ম্ম** = দৈনিক-বিহিতকর্ম্ম, পঞ্চযজ্ঞাদি। **নিত্যনৈমিত্তিক** = নিয়মিত ও নিমিত্তহেতুক কার্য্য, পর্ব্বশ্রাদ্ধাদি। **নিত্যবদ্ধ** = সতত মায়ামুগ্ধ, ভগবৎ পরাঙ্মুখ। **নিত্যমুক্ত** = নিত্য মায়াবন্ধনহীন, ভগবৎপরায়ণ, কালত্রয়ে বন্ধনহীন, পরমাত্মা। **নিত্যযৌবনা** = দ্রৌপদী। **নিত্যানন্দ** = সতত আনন্দিত। **নিতাই** = নিত্যানন্দ। ইঁহার পিতা হাড়াই পণ্ডিত, মাতা পদ্মাবতী। ইনি অনন্তের অবতার। বীরভূমের অন্তর্গত একচক্রায় ইনি অবতীর্ণ হন। নবদ্বীপে নন্দনাচার্য্যের গৃহে চৈতন্যদেবের সহিত ইঁহার মিলন হয়। ইনি গৃহী ছিলেন। **নিতি** = সর্ব্বদা, প্রত্যহ। (ব.শ.)। ৪. তাদের উপরোক্ত প্রতীকী অর্থে সব শব্দগুলিই কমবেশি প্রচলিত, কিন্তু **নিত্য** শব্দটি অনেকটাই ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে প্রচলিত। ৫. **নিত্য** শব্দের নিহিত অর্থ আমাদের জানায় এই বিশ্বজগতে সময় বলতে আমাদের পূর্বসূরীরা ঠিক কী বুঝতেন। সব ধর্মগ্রন্থ, সব মনীষীরা বলেন, এই জগতের জন্মের আগে কিছুই ছিল না; কেবল 'না'-ই ছিল। আর, আমাদের বাংলাভাষার শব্দার্থতত্ত্ব বলছে, বিশাল সেই বিশ্বজাগতিক 'না'কে **ন** (no) করে দিলেই তা **অন্** (on) হয়ে যেতে পারত এবং নতুন সৃষ্টি রূপে জন্ম নিয়ে চলতে শুরু করত। সবাই জানেন, বিয়োগকে বিয়োগ করে দিলে যোগের উদ্ভব হয়, 'না'কে না করে দিলে 'হ্যাঁ' জন্মায়; এবং এই আদিম না-জগতের ক্ষেত্রেও নিশ্চয় সেরকমই ঘটেছিল। ...

আমাদের বাংলাভাষার শব্দার্থতত্ত্ব বলছে, যে-গতিশীল শক্তি সেই 'না'কে **ন** করে **অন্** করে দিতে পারে, তাকে **নি** বলে। সেই **নি**-এর দ্বারা জাত এই বিশ্বজগৎ অতএব সেই **নি**-এর তারণক্ষেত্র, যাতে সেই **নি** তারিত হয়ে বিরাজ করে বা থাকে। অতএব চলমান এই বিশ্বজগৎ হল **নিত্য**। এর প্রতিটি মুহূর্ত যেমন **নিত্য** পদবাচ্য, তেমনি এর উদ্ভব থেকে এখন পর্যন্ত সবটাই **নিত্য** পদবাচ্য। এই সেই কারণ, যেজন্য প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দিন, এবং সমগ্র সময় বা চিরন্তন সময় — সবটাই **নিত্য** পদবাচ্য। মানুষের **নিত্যধর্ম্ম** বললে আমরা এই চিরকালীন সময়ের ধর্ম্ম যেমন বুঝি, তেমনি প্রতিটি মুহূর্তের ধর্ম্মকেও বুঝি। তবে পরে পরে এই **নিত্য** শব্দটি প্রতিদিন অর্থে খানিকটা প্রতীকী হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন, 'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে', তখন তাঁর **নিতি** প্রতি-মুহূর্তের কথা বলতে চেষ্টা করে। দ্র. **তর্পণ**, **ধর্ম্ম**, **কর্ম্ম**।

নিত্যমুক্ত মানুষ হওয়া খুবই কঠিন। কিছু না কিছু বন্ধন থেকেই যায়। কিন্তু **নিত্যবদ্ধ** মানুষ প্রায়শই হয়। তাঁরা এ-গুরু ছেড়ে ও-গুরু ধরেন, মদের নেশা ছেড়ে ড্রাগের নেশা ধরেন, এ-পার্টি ছেড়ে ও-পার্টি ধরেন ...। গুরুহীন, নেশাহীন, পার্টিহীন ... হয়ে কাটাতেই পারেন না। এঁরাই **নিত্যবদ্ধ** মানুষ। তবে দ্রৌপদীকে কেন **নিত্যযৌবনা** বলা হত, তার জন্য **দ্রৌপদী** দ্রষ্টব্য। ...

নিদর্শন : ১. নি + ✓দৃশ্ + অন (ল্যুট্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নি (গতিশীলভাবে অনকৃত) দর্শন যাহাতে।* / যাহার দ্বারা নিশ্চয়তার সহিত দর্শন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. প্রমাণকৃত, অভিজ্ঞাপক, উদাহরণ, প্রমাণ, শাস্ত্রশাসন ...। (ব.শ.)। ৪. example বা proof অর্থে প্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

নিদান (নিদেন, নিদেনপক্ষে) : ১ নি + ✓দা + অন্ (ল্যুট্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নি (গতিশীলভাবে অন্-কৃত) দান যাহাতে।* / যাহা দ্বারা কার্য্যনিশ্চয় হয়। (ব.শ.)। ৩. আদিকারণ, কারণমাত্র, রোগহেতু, রোগনির্ণয়, পৈলমুনিকৃত চিকিৎসাগ্রন্থভেদ, রোগনিদানগ্রন্থ (pathology); শোধন, কারণক্ষয়, অবসান, শেষ দশা, মৃত্যু, একান্তপক্ষ, শেষপক্ষ, শেষ কথা, আদি, শেষদশাগত। (ব.শ.)। ৪. prescription অর্থে **নিদান** শব্দটির প্রয়োগ কদাচিৎ হয়ে থাকে এবং 'কমপক্ষে' অর্থে **নিদেনপক্ষে** কথাটির প্রচলন এখনও দেখতে

পাওয়া যায়। ৫. **নিদান** শব্দটি এক বিশাল ব্যাপ্ত অর্থ নিয়ে প্রসূত হয়েছিল. এখন তার ব্যাপকতা কমতে কমতে প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। **আদি** শব্দের অর্থ থেকে আমরা জানতে পারি, অতীতের দান পেয়েই অস্তিত্বের সূত্রপাত ও বাড়বৃদ্ধি এবং সেটিই আজ **বর্তমান** রূপে দৃশ্য। এই **আদি** দানই **নিদান**, ব.শ. যাকে বলেছেন 'আদিকারণ'। পরে পরে যে-কোনো **কারণই নিদান**-পদবাচ্য হয়ে যায়। আরও পরবর্তীকালে দেখা যায়, তা কেবলমাত্র যে-কোনো সমস্যার সমাধানের উপায়ে বা 'নির্ণয়'-এ গিয়ে ঠেকেছে। অবশেষে, সেই **নিদান** নিজেই দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে কম বা 'কমপক্ষে', যাকে বলে **নিদেনপক্ষে**।

নিদ্রা: ১ নি + √দ্রা + অ (অঙ্) - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. *নি (গতিশীল অন্-কৃত) দ্রা () যাহাতে।* ৩. সুপ্তি, তন্দ্রা অর্থাৎ নিদ্রার অন্তে ও আদিতে আলস্য, তত্ত্বাপ্রতিরোধ। (ব.শ.)। ৪. sleeping অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **দ্রাণ, তন্দ্রা**।

নিধন : ২. *নি (গতিশীল অন্-কৃত) হন (হত্যা) যাহাতে; নিহিত হনন যাহাতে।* ৫. শব্দটি তৈরি হয়েছে 'অন্-কারী ন' দিয়ে। তদ্রূপ নি-এর সঙ্গে **হন্** ক্রিয়া যুক্ত হয়ে **নিধন** শব্দটি প্রসূত হয়েছে। আর, শব্দের রূপ-পরিবর্তনের নিজস্ব নিয়মে **ধ** অনেক সময়ই **হ** হয়ে যায়। যথা অবধান > অবহিত, নিধান > নিহিত ... ইত্যাদি। সেই সুবাদে **নিধন** শব্দ থেকেই **নিহত** শব্দটি এসেছে।

নিধান (নিহিত, করুণানিধান) : ১ নি + √ধা + অন্ (ল্যুট্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নিধান** = **নি** (গতিশীল অন্-কারী) ধারক অন যাহাতে; অর্থাৎ, ধারণক্রিয়া গতিশীলভাবে অন (on) রয়েছে যাহাতে। **নিহিত** = **নিধান** তারিত যাহাতে। **করুণানিধান** = করুণার নিধান যে।* ৩. **নিধান** = স্থাপন, পোষণ ... ইত্যাদি। **নিহিত** = স্থাপিত, আহিত, নিক্ষিপ্ত। (ব.শ.)। ৪. laid অর্থে **নিহিত** প্রচলিত, কিন্তু বাকি দুটি শব্দ অপ্রচলিত। ৫. এমনকি **করুণানিধান**-এর মতো নামও এখন আর কেউ রাখে না। কারণ, **নিধান**-এর মানে হারিয়ে গেছে। ...

নিধি : ১. নি + √ধা + ই (কি) - অধিকরণে। (ব.শ.)। ২. *নি (গতিশীল অন্-কারী) ধারক সক্রিয় যাহাতে।* ৩. **নিধি** = আধার, পাত্র, কোষ, ধনাগার, কুবেরের অষ্ট বা নব রত্ন, বিত্ত, ধন, ভূমিখাত অস্বামিক ধন, নিক্ষেপদ্রব্য, সমুদ্র, রত্নসদৃশ দ্রব্য, বিষ্ণু। (ব.শ.)। ৪. হিন্দিতে **নিধি** শব্দটি স্বরূপেই এখনও প্রচলিত। কিন্তু বাংলায় অ্যাকাডেমির কল্যাণে শব্দটি স্বরূপে বর্জিত; তবে অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখনও প্রচলিত। যথা **প্রতিনিধি, সুরনিধি, গুণনিধি** ... ইত্যাদি। ৫. নি-ধারক সক্রিয় যাহাতে, তাকে বলে **নিধি**। গতিশীলভাবে অন (on) করে দেওয়া ধারণক্রিয়া সক্রিয়ভাবে করতে হয় যাদের, তাদের বলে **নিধি**। চাইলে একে আমরা সক্রিয় **নি-ধারক** বলতে পারি। এটি একটি বাড়িয়ে রাখা খাদ্যধারণক্ষম থালা হতে পারে, উপঢৌকন-ধারণক্ষম রাজকোষ হতে পারে, টাকাপয়সা-ধারণক্ষম ধনাগার বা ব্যাঙ্ক হতে পারে, ... এমনকি জলধারণক্ষম সমুদ্রও হতে পারে। এরা প্রত্যেকেই প্রদত্ত বস্তু বা বিষয় গ্রহণ করে ধারণ করে রাখে, দেখভাল করে, নষ্ট করে দেয় না। এইজন্য এদের **নিধি** বলে। অবশ্য থালাতে যেমন খাদ্য রাখা যায়, থালা থেকে তুলে তুলে খাওয়াও যায়। তবে যার জন্য রাখা হয়েছে, সেই খাবে, অন্যে খাবে না — এইভাবে দেখভাল করে যে, সেই হল **নিধি**। প্রাচীনকালে শব্দটির বিপুল ব্যবহার ছিল। করুণার তদ্রূপ আধারকে বলা হত **করুণানিধি**, সুরের সেরকম আধারকে বলা হত **সুরনিধি**, প্রাণের সেরকম আধারকে বলা হত **প্রাণনিধি**; গুণের সেরকম আধারকে বলা হত **গুণনিধি**। (উদাহরণ স্বরূপ 'মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব, কানু হেন **গুণনিধি** কারে দিয়া যাব? ...) এরকম আরও বহু প্রকারের **নিধি** ছিল। তবে যে **নিধি**র সবচেয়ে বেশি রমরমা ছিল, তারা হল কুবেরের **নিধি**; একালের ভাষায় যাদের বলা যেতে পারে রাজকোষের বা ব্যাঙ্কের সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিভাগ ও বিভাগীয় প্রধান অফিসারগণ। হিন্দিভাষায় প্রায় এই অর্থেই **নিধি** শব্দটি আজও প্রচলিত আছে। ... বলা হয়, সেকালে **কুবের**-এর আটটি বা নয়টি **নিধি** ছিল। দ্র. **অষ্টনিধি**। এই কাজে সেকালের সমাজ যে সমস্ত দিগ্‌গজ পণ্ডিতদের নিয়োগ করত, তাদের বলা হত **গজনিধি**। ...

কিন্তু **প্রতিনিধি** শব্দের অর্থ জানতে গিয়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। এখন আমরা শব্দটির অর্থ জানি representative। কিন্তু present না ক'রে re-present করে কেন? কাকে re-present করে? অর্থাৎ কিসের **নিধি**? কেনই বা **প্রতি-নিধি**? এক্ষেত্রে **নিধিই** বা কে? বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর করতে গিয়ে দেখা যায়, **নিধি** মাত্রেরই **প্রতিনিধি** থাকতে পারে। যেমন ধ্বনির প্রতিধ্বনি থাকে, লিপির প্রতিলিপি থাকে, মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি থাকে, সেইরকম। সেই সুবাদে medical representative বললে আমরা বুঝতে পারি ভেষজ বা ডাক্তারি-বিষয়ক কোনো সংস্থার **প্রতিনিধি**র কথা বলা হচ্ছে। এরকম **প্রতিনিধি** যে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার হতেই পারে, যদি সেই ব্যক্তি বা সংস্থা **নিধি** রূপে স্বীকৃত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে **অর্থ**সম্পন্ন মানুষ মাত্রেই, তা সে জ্ঞান-অর্থ হোক আর রূপ-যৌবন-ধন-মান প্রভৃতি যে-কোনো অর্থই হোক, **নিধি** পদবাচ্য এবং তার **প্রতিনিধি** থাকতেই পারে। রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর **প্রতিনিধি** পাঠাতে পারেন কোনো সাহিত্যসভায়, তেমনি নায়িকাও তাঁর সখীকে **প্রতিনিধি** রূপে পাঠাতে পারেন নায়কের কাছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, একজন সাধারণ মানুষকে কি **নিধি** বলা যায়? দেশের একজন সাধারণ মানুষের কী **অর্থ** আছে যে, সে তার **প্রতিনিধি** রূপে অন্য কোনো মানুষকে **গণ-প্রতিনিধি** বা peoples' representative বানিয়ে দেশের লোকসভায় পাঠাতে পারে?

বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করলে জানা যায়, দেশের প্রতিটি মানুষই বিশেষ অর্থধারী বলেই তারা প্রত্যেকেই **নিধি** পদবাচ্য। তিন রকম ধারণ ক্রিয়া নিহিত করে দেওয়া হয় প্রতিটি মানুষের মধ্যে। তাই তারা প্রত্যেকেই **নিধি**। সেই **নি-ধারণ** ক্রিয়াগুলি হল — ক) বিশ্বজগতের একজন অংশীদার হিসেবে এই বিশ্বে তার অংশগত অধিকার ও কর্তব্য ধারণ করতে হয় তাকে। খ) সমাজের একজন

অংশীদার হিসেবে এই সমাজে তার অংশগত অধিকার ও কর্তব্য ধারণ করতে হয় তাকে। এবং গ) আপন শরীরের অধিকারী হিসেবে এই শরীরের প্রতি তার অধিকার ও কর্তব্য ধারণ করতে হয় তাকে। এই তিন রকম অর্থের **নিধি** রূপে মানুষ নিজেকে, সমাজকে, ও বিশ্বজগৎকে ধারণ করে নিয়ে চলে। তার মানে, নিজের উপর সম্পূর্ণ, **সমাজের উপর আংশিক এবং জগতের উপর ততোধিক আংশিক** অধিকার ও কর্তব্যকর্ম্ম ধারণ করে রেখেছে প্রতিটি মানুষ; ঐ তিনরকম কর্ম্মই তার **নিধিত্বের** ভিত্তি। সেই কারণে প্রতিটি মানুষই **নিধি**। সুতরাং এরকম **নিধি**-মানুষের **প্রতিনিধি** হতেই পারে, এবং সেই **প্রতিনিধি** মানুষের ঐ তিন রকম **নিধিত্বের** প্রতিনিধিত্ব করতেই পারে। দ্র. **কশ্যপ, গুহ্যক**। আমাদের 'খ', 'গ', ও 'চ' গ্রন্থে জনগণের **প্রতিনিধিত্বের** অঙ্কটি কীভাবে সক্রিয়, তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

নিধুবন : ২. *নি (গতিশীলভাবে অন্-কৃত) ধুবন যাহাতে; অর্থাৎ, নি-ধারীর নবরূপে উত্তীর্ণ বাহক অন (on) থাকে যাহাতে। /* নি (অত্যন্ত) ধুবন (কম্পন) যাহাতে। (ব.শ.)। নি (নিশ্চিত) ধুবন (হস্তপদাদিচালন) যাহাতে তাহা। (ছা.অ.)। ৩. অতিকম্পন, সুরতলীলা, রতিক্রীড়া, মৈথুন, নর্ম্ম, পরীহাস, বৃন্দাবন অন্তর্গত কুঞ্জবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে আমরা এমন ছোট মনের মানুষ হয়ে গেছি যে, **নিধুবন** বললে আমরা sexual intercourse ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না, ঠিক যেরকম **লিঙ্গ** বললে penis ছাড়া আর কিছু আমাদের মাথাতেই আসে না। কেন উপরোক্ত 'বৃন্দাবন অন্তর্গত **কুঞ্জ**বিশেষ'কে **নিধুবন** বলা হত, সেকথা ভেবে দেখবার অবসর পাই না; ঠিক যেমন কেন ব.শ. 'যাহার দ্বারা জ্ঞান সাধিত হয়', তাকে **লিঙ্গ** বলতেন, তাও আমরা ভেবে দেখতে যাই না। (আমাদের 'ঙ' গ্রন্থের 'যোজনগন্ধবিকার : সিস্টেম ডিজাইনিং-এর একটি সমস্যা' শীর্ষক নিবন্ধে **লিঙ্গ** শব্দটিকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।) তার ওপর তথাকথিত ইংরেজি আধুনিকতা আমাদের শিখিয়েছে, নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্কের বিষয়ে অধিকাংশ কথা এবং আলোচনাই অশ্লীল। আর, **নিধুবন** শব্দের মানে যদি হয় sexual intercourse কিংবা intercourse-এর স্থান, তাহলে সে তো খুবই অশ্লীল কথা! অতএব **নিধুবন** শব্দটিকে বর্জন করে দাও! আধুনিক ইংরেজি ও তার প্রভাবিত বুদ্ধি এরকম সিদ্ধান্তই নিতে পারে। ঠিক সেকারণেই আজকের বাংলা অ্যাকাডেমি শব্দটিকে বর্জন করেছে।

নিধুবন শব্দের মানে আসলে কী ছিল? **নি-পীড়ন** যেমন অন্-কৃত পীড়নকে বোঝায়, তেমনি **নিধুবন**ও অন্-কৃত ধুবনকে বোঝাত। আর, **পীড়** অন (on) যাহাতে, তাকে যেমন **পীড়ন** বলে, তেমনি **ধুব** অন (on) যাহাতে, তাকেও **ধুবন** বলা হত। কিন্তু **ধুব** কী? 'ধারী নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে বাহিত যাহাতে' তাকে বলে **ধুব**। তার মানে, **ধ, ধা, ধি** পর্যন্ত প্রদত্ত বস্তু বা বিষয়ের ধারণ করা চলছিল, কিন্তু **ধু**-এর বেলায় ধারী নবরূপে উত্তীর্ণ, তার ধারিত বস্তু-বিষয়কে এবার সে নিজেই দান করছে (**ধু**) এবং সে-দান বাহিত (ব) হয়ে চলে যাচ্ছে অন্যত্র। এই যে **ধুব** ক্রিয়া, এ হল শ্রম-মেধা-বীর্য ইত্যাদি নিষেক করার ক্রিয়া। জ্ঞান-শ্রম-মেধা-বীর্যের অধিকারী পুরুষ কাঁচামন-কাঁচাকাঠ-কাঁচালোহা-কাঁচামাল ... প্রভৃতির অধিকারিণী প্রকৃতির ভিতর এই নিষেক ক্রিয়া চালায়। এ ক্রিয়া যেমন প্রতিটি পাঠশালে চলে, কর্মক্ষেত্রে চলে, ওয়ার্কশপে চলে, কারখানায় চলে, তেমনি নরনারীর সঙ্গমেও চলে। তাই এই ক্রিয়াকে বলা হত **নিধুবন**। এটি কিন্তু আদৌ forest নয়। মধ্যযুগের বাংলাভাষায় তা 'বৃন্দাবন অন্তর্গত কুঞ্জবিশেষ' হতেই পারে, আর **কুঞ্জ, নিকুঞ্জ** কাকে বলে, সে তো আমরা আগেই দেখেছি; কিন্তু একালের ভাষায় ঐ **নিধুবন** যে কোনো ধরণের সাধারণ ছোটখাট টেবিল-চেয়ার তৈরির কর্মশালা বা ওয়ার্কশপে চলা ক্রিয়া থেকে শুরু করে বিপুল বিশাল জাহাজ তৈরির আধুনিক কামারশালায় বা কারখানায় চলা ক্রিয়া পর্যন্ত সমস্ত প্রকারের নিষেক ক্রিয়াকেই বোঝাতে পারে; পাঠশালা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলা বিদ্যাদানকেও বোঝাতে পারে। হ্যাঁ, এমনকি বাসরে পুরুষের বীর্য নিষেক ক্রিয়াকেও বোঝাতে পারে। কিন্তু আমরা এখন সেসব স্বাভাবিক সামাজিক জ্ঞান-শ্রম-মেধা-বীর্য নিষেক ক্রিয়ার বিপুল বিশাল এলাকাকে দেখতেই পাই না, দেখি কেবল নরনারীর sexual ক্রিয়া। আমাদের দৃষ্টিশক্তি ও মনোলোক সর্ব প্রকারের **নিধুবন** দেখবার যোগ্যতা হারিয়ে নাকের বদলে নরুণ পেয়েছে, পেয়েছে কেবল নরনারীর sexual-**নিধুবন**; আর, 'ছিঃ! ছিঃ!' বলে সেটিও ফেলে দিয়েছে। সেই কারণে শব্দটি আজ পরিত্যক্ত।

নিন্দা (নিন্দক, নিন্দন, নিন্দনীয়, নিন্দাস্তুতি, নিন্দিত, নিন্দুক, অনিন্দিত, অনিন্দিতা, অনিন্দ্য) : ১ ✓নিন্দ্ + অ - ভাববাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। ২. ***নিন্দা** = নেই অন (on) দান (**নিন্দ্**) যাহাতে, তাহার আধার। **নিন্দক** = **নিন্দ** করে যে। **নিন্দন** = **নিন্দ** অন যাহাতে। **নিন্দনীয়** = **নিন্দন**-এর গতিশীল গমন যাহাতে। **নিন্দাস্তুতি** = **নিন্দা** ও **স্তুতি** (উদ্দীপিত করে যে)। **নিন্দিত** = **নিন্দ** গতিশীলভাবে তারিত যাহাতে। **নিন্দুক** = **নিন্দকে** নবরূপে উত্তীর্ণ করে যে। **অনিন্দিত (অনিন্দিতা)** = যে **নিন্দিত** নহে। **অনিন্দ্য** = **নিন্দ**হীনতা থাকে যাহাতে।* ৩. **নিন্দা** = গর্হা, কুৎসা, অপবাদ। **নিন্দক** = নিন্দাকারক, দূষক, তিরস্কারক। **নিন্দন** = গর্হণ, কুৎসন, অপবাদ, নিন্দুক। **নিন্দনীয়** = গর্হণীয়, দূষণীয়, কুৎসার্হ, গর্হিত। **নিন্দাস্তুতি** = নিন্দাস্থলে প্রশংসা, ব্যাজস্তুতি। **নিন্দিত** = গর্হিত, কুৎসিত। **নিন্দুক** = নিন্দাকারী, তিরস্কারক, অপবাদকারক। **অনিন্দিত** = অগর্হিত, প্রশস্ত, উৎকৃষ্ট, অনবদ্য, শোভন, সুন্দর, সাধু, ধার্ম্মিক। **অনিন্দিতা** = শোভনা, সুন্দরী, সাধ্বী। **অনিন্দ্য** = অগর্হ্য, প্রশস্ত, উৎকৃষ্ট। (ব.শ.)। ৪. প্রত্যেকটি শব্দই তার উপরোক্ত প্রতীকী অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. **নন্দ** ও **নিন্দ** শব্দ দুটি খুব কাছাকাছি। **নন্দ** মানুষের ভিতরের আগুনটাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে; **নন্দতে** মানুষ তাই **আনন্দ** পায়। **নিন্দ** সেই আগুনকে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে; **নিন্দাতে** মানুষ তাই দুঃখ পায়। মানুষ যখন সত্যযুগে বাস করত, তখন লোকে সত্য কারণে অভি**নন্দন** জানাত, সত্য কারণেই **নিন্দা** করত। কিন্তু একালে মিথ্যা **নন্দন** যেমন হয়, তেমনি অকারণ **নিন্দা**ও করা হয়। ফলে একদিকে যেমন তোষামোদের জন্ম হয় ও নন্দিত-ব্যক্তি ভুল ইন্ধনে বিশ্বাস করে একসময় অগ্নিহীন হয়ে নষ্ট হয়ে যায়; অপরদিকে অকারণ **নিন্দায়** নিন্দিত-ব্যক্তিরও ক্ষতিগ্রস্ত

হয়ে অগ্নিহীন হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। অথচ এককালে আমাদের ধর্ম্মপ্রাণ সাধু-সন্তরা **নিন্দাকে** অমৃত এবং **প্রশংসা** বা **নন্দকে** বিষবৎ জ্ঞান করতেন, তদ্রূপ জ্ঞান করতে উপদেশ দিতেন। তবে সে ছিল সত্যযুগের ব্যাপার। তখন **নিন্দা** করা হত সত্যের উপর ভিত্তি করে। ফলে নিন্দিত ব্যক্তি **নিন্দার** ভিতরে আপন ত্রুটি দেখতে পেতেন এবং সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারতেন। তাই তাঁরা **নিন্দাকে** অমৃতসমান জ্ঞান করতেন।

নিন্দক ও **নিন্দুক** শব্দ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। **নিন্দক** সত্যের উপর ভিত্তি করে **নিন্দা** করে, **নিন্দুক** বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে মিথ্যার উপর ভিত্তি করে নিন্দা করে। সেই বিচারে **নিন্দক**-এর **নিন্দা** নিন্দিতের পক্ষে শুভ এবং **নিন্দুক**-এর **নিন্দা** নিন্দিতের পক্ষে অশুভ। **অনিন্দ্য** শব্দটি **অজয় অজিত** প্রভৃতি শব্দের মতো। 'অ-নিন্দা বা নিন্দাহীনতা থাকে যাহাতে', তাকে বলে **অনিন্দ্য**। তার মানে **অনিন্দ্য** অভিধাটি সেই ব্যক্তিদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই খাটে, যাঁরা কখনো কারও নিন্দা করেন না এবং (তাঁরা এতই সঠিক পথে চলেন যে) কেউ কখনো তাদের নিন্দা করতে পারে না। আর, যে কখনো নিন্দিত হয়নি, তাদের বলা হয় **অনিন্দিত**, স্ত্রীলোক হলে **অনিন্দিতা**।

নিপাত (নিপাতন, নিপাতিত) : ১ নি + ✓পত্‌ + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নিপাত*** = ***নি*** *(গতিশীলভাবে অন্‌-কৃত) পতন হইতে জাত।* ***নিপাতন*** = ***নিপাত*** *অন (on) যাহাতে।* ***নিপাতিত*** = ***নিপাত*** *গতিশীল হইয়া তারিত যাহাতে।* / **নিপাত** = সূত্রানুসারে অনিষ্পন্ন বা অসিদ্ধ শব্দ (যাহাতে)। **নিপাতন** = সূত্রানুসারে অনিষ্পন্ন শব্দের সাধন (থাকে যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. **নিপাত** = পতন, অধঃপতন, উপরি পতন, আঘাত, মৃত্যু, বিনাশ, সূত্রানুসারে অনিষ্পন্ন বা অসিদ্ধ শব্দ, অদ্রব্যার্থবোধক, স্থাপন। **নিপাতন** = নাশন, ঘাতন, অধোনয়ন, নিপাত। **নিপাতিত** = নাশিত, পাতিত, সূত্রানুসারে অনিষ্পন্ন বা অসিদ্ধ (শব্দ)। (ব.শ.)। ৪. **নিপাত** অপ্রচলিত। throwing down অর্থে **নিপাতন** এবং thrown down অর্থে **নিপাতিত** শব্দটি প্রচলিত। ৫. **নিপাত** শব্দটির একটি সহজ অর্থ হয়। একটি বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য বিষয় বা বস্তুগুলিকে তুলে নেওয়ার পর যা কিছু পড়ে থাকল, সেইগুলি হল **নিপাত**। ধরা যাক, জেলের টানা জালে যা মাছ পড়ল, তা সব একটি বড় ঝুড়িতে করে এনে আপনার সামনে ঢেলে দেওয়া হল। আপনি ১০০ গ্রামের চেয়ে বেশি মাপের চিংড়ি, ৫০০ গ্রামের চেয়ে বেশি মাপের পোনামাছ তুলে নিলেন। যা পড়ে থাকল, সেগুলিই **নিপাত**। শব্দ সংকলনের সময় সেইভাবে বিশেষ নিয়মে গ্রহণযোগ্য শব্দগুলি তুলে নেওয়ার পর যেসব শব্দ পড়ে থাকে, তাদের বলে **নিপাত**। সেই **নিপাত**-শব্দগুলির থেকে আরও কিছু শব্দকে আপনি অন্য একটি বিশেষ নিয়মে কিংবা কোনো নিয়ম না মেনেই গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করলেন এবং তুলে তুলে আলাদা করে রাখতে লাগলেন। আপনার এই ঘোষণাকে তুলে রাখার ক্রিয়াকে বলা হবে **নিপাতন**। সেভাবে সেগুলিকে তুলে নিয়ে অন্য কোথাও রাখলে, তখন সেই শব্দগুলিকে বলতে হবে **নিপাতিত**।

নিপান : ১ নি + ✓পা + অন (ল্যুট্) - অধিকরণে। (ব.শ.)। ২. ***নি*** *(গতিশীলভাবে অন্‌-কৃত) পান থাকে যাহাতে বা যেখানে।* ৩. পশুগণের জলপানার্থ কূলসমীপস্থ জলাধার, পুষ্করিণ্যাদি জলাশয়, কূপ, গোদোহনপাত্র। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. যেখানে পানের ব্যবস্থা অন (on) করে রাখা হয়েছে, তাকেই **নিপান** বলে। সেই সুবাদে শুধুমাত্র পশুদের জন্য যেমন **নিপান** থাকতে পারে, মানুষের জন্যও থাকতে পারে। কিন্তু দক্ষসমাজ একটি শব্দের একই অর্থে পুনরাবৃত্তির চেষ্টা চালিয়ে যেতেই থাকে। সেই কারণে একসময় শুধুমাত্র পশুদের জন্য জল তুলে পানের জন্য রাখা স্থানকেই **নিপান** বলা ক্রমশ প্রতীকী হয়ে পড়ে এবং **নিপান** শব্দের ব্যাপকতা সংকীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু শব্দটির ভিতরের যে অর্থ, তাতে সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন মানের সর্বপ্রকারের 'খালাসিটোলা'র প্রত্যেকটিকেই **নিপান** বলা যেতে পারে। 'খালাসিটোলা' হল কলকাতার সেই বিখ্যাত মদ্যপান কেন্দ্র, যেখানে জাহাজের খালাসিরা এককালে বসে মদ খেত; পরে সেখানে কলকাতার বহু শিল্পী-সাহিত্যিক, এমনকি সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত, পদধূলি দিয়ে স্থানটির মাহাত্ম্য বাড়িয়ে দেন।

নিপুণ (নৈপুণ্য) : ১ নি + ✓পুণ্‌ (শুভকর্ম্মকরণ) + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নি*** *(গতিশীলভাবে অন্‌-কৃত) পুণ্‌ (পালন নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া রহস্যরূপ গ্রহণ করে) যাহাতে।* ৩. ক্রিয়াদক্ষ, প্রবীণ, কুশল, পটু, পণ্ডিত, তীব্র, সূক্ষ্ম, অভিজ্ঞ। (ব.শ.)। ৪. expert অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **পুণ্য**। ধান বা গমকে চাষ করে ফসল ফলিয়ে (পালন করে নবরূপে উত্তীর্ণ করে) বস্তাবন্দী করে তাকে **পণ্যে** পরিণত করলেন। এই কাজের কৌশল বা বিদ্যাটি হল **পুণ্‌** করার বিদ্যা। সেই **পুণ্‌**-করণ গতিশীলভাবে অন্‌-করা থাকে **নিপুণতায়** বা **নৈপুণ্যে**। ...

নিবাত (নিবাতকবচ) : ১. নি + ✓বা (হিংসা) + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নিবাত*** = *(বিপরীতার্থক)* ***নি*** *বাত যাহাতে; অর্থাৎ নেই বায়ু যাহাতে।* ***নিবাতকবচ*** = ***নিবাত কবচ*** *যাহার; নিরুদ্ধবায়ুই রক্ষাকবচ যাহার।* / **নিবাত** = নিরুদ্ধ বাত যাহাতে। (ব.শ.)। ৩. **নিবাত** = নিরুদ্ধবায়ু, নির্বাত, অভেদ্য, অহিংসিত, নির্বাতপ্রদেশ, শস্ত্র-অভেদ্য কবচ, আশ্রয়, বাতাভাব। **নিবাতকবচ** = অভেদ্যকবচ দৈত্যগণবিশেষ। ইহারা হিরণ্যকশিপুর পুত্র সংহ্লাদের বংশজাত। ইহাদের সংখ্যা তিন কোটি। ইহারা সমুদ্রমধ্যে দুর্গে বাস করিত। ইন্দ্রের আদেশে অর্জ্জুন ইহাদিগকে নিহত করেন। ভাগবতে, পুলোমা ও কালকার সহস্র পুত্র পৌলম-কালকেয়গণ 'নিবাতকবচ'। (ব.শ.)। **নিবাতকবচ** = (ক) হরিবংশ মতে, হিরণ্যকশিপুর অন্যতম পুত্র সংহ্লাদের বংশে নিবাতকবচ নামে তপস্যাপরায়ণ দানবেরা জন্মগ্রহণ করে। অর্জুন এদের বধ করেন। (খ) মহাভারত মতে, অভেদ্য কবচযুক্ত রসাতলবাসী দৈত্যগণ। প্রায় তিন কোটি দানব নিবাতকবচ নামে খ্যাত। তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে এরা নিরাপদে সমুদ্রমধ্যে বাস করবার এবং দেবগণের অবধ্য হবার বর পায়। ... ইন্দ্রের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার গুরুদক্ষিণা স্বরূপ ... অর্জুন এদের বিনাশ করেন। (গ) রামায়ণ অনুসারে, বিষ্ণু নিবাতকবচ

নামে দৈত্যদের বিনাশ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. দুটি শব্দই অপ্রচলিত। ৫. আগেও বলেছি, ভাব আছে ভাষা নেই, এই সমস্যায় ভুগছি আমরা বাংলাভাষীরা। এই যে বিশ্বায়নের হাওয়া উঠেছে, সারা পৃথিবীর সমস্ত দেশকে এক অর্থনৈতিক বিশ্বের ছাতার তলায় আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালান হচ্ছে, তার থেকে কি কারও রেহাই মিলবে না? আমাদের দেশের বর্তমান সরকার সেই হাওয়াকে হু হু করে ঢুকতে দিচ্ছে না, আবার পুরোপুরি রুদ্ধও করছে না। প্রাচীন ভারতে যারা পণ্যবাদীদের হাওয়াকে কিছুতেই ঢুকতে দেয়নি, এবং এই না-ঢুকতে দেওয়াকেই নিজেদের রক্ষাকবচ রূপে ব্যবহার করে আত্মরক্ষা করত, সেইরকম আদিম সমাজতন্ত্রবাদীদের বা বেদবাদীদের বলা হত **নিবাতকবচ**। অবশ্য সেই সমাজতন্ত্র বা বেদবাদিতা অধঃপতিত হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত তারা পণ্যবাদীদের কাছে হেরে যায়। দ্র. **কালকা, কালকেয়**।

নিবেদন (আবেদন, প্রতিবেদন, সংবেদন) : ১ নি + ✓বিদ্ + অন - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নি (গতিশীল অন্-কৃত) বেদন যাহাতে।* ৩. বিজ্ঞাপন, কথন, সমর্পণ, দেবোদ্দেশে দান। (ব.শ.)। ৪. appeal অর্থে প্রচলিত। ৫. মূল কথাটি হল **বেদন**। তার থেকে উপসর্গ যোগে **আবেদন, নিবেদন, প্রতিবেদন, সংবেদন** প্রভৃতি শব্দ প্রসূত হয়। এর মধ্যে 'বেদনের আশ্রয় যাহাতে' তাকে বলে **আবেদন**। 'আবেদন করে যে' = **আবেদক**। ...

'দিশাগ্রস্তভাবে বিদিত হওয়া যায় যার দ্বারা', তাকে বলে **বেদ**। প্রতিষ্ঠিত বিদ্যা মাত্রেরই এই দোষ। সে এমন ধরনে বিদিত করে যে, বাকি ধরনগুলি সম্পর্কে সদাসতর্ক না থাকলে আপনি একচক্ষু হরিণ হয়ে যাবেন, কষ্ট পাবেন, ব্যথা পাবেন; আর সে-ব্যথার প্রকাশ ঘটবে আপনার **বেদনায়**। সেই কারণে, আমাদের জীবনের অনেক অভিজ্ঞতাই আমাদের যেমন অনেক শিক্ষা বা 'বেদ' দেয়, তেমনি অনেক 'বেদনা'ও দেয়। সেই 'বেদনাসমূহের আধার'ই আপনার **আবেদন**; অর্থাৎ আপনার সেই সব 'বেদনা'র কথা যে-কাগজে আপনি লিপিবদ্ধ করে রাখেন, সেটিই আপনার 'আবেদন-পত্র'। অন্য কেউ যদি আপনার এই 'বেদনা'র প্রতিচ্ছবি তুলে নিয়ে কথায় তা প্রকাশ করে দেয়, সেটি হয়ে যায় আপনার সম্পর্কে লেখা **প্রতিবেদন**। এই **প্রতিবেদন** আপনার **বেদন**-এর সমান বলে একে আপনি সংবেদনও বলতে পারেন। **সংবেদন-শীল** মানুষেরা আপনার **বেদন**-এর সমান **বেদন** অনুভব করে ফেলে বলেই তাদের **সংবেদনশীল** বলা হয়।

অবশ্য আপনি যদি কখনো আপনার সেই 'বেদনা' সমূহের কথা, যা আপনি আপনার 'আবেদন-পত্রে' লিখে রেখেছেন, তা কাউকে জানান, তখন সেটি হয়ে যাবে আপনার **নিবেদন**। নিবেদনের উদ্দেশ্য থাকে। যাকে নিবেদন করছেন, তিনি যেন আপনার সেই বেদনাসমূহ দূর করার উপায় করেন, অর্থাৎ এই **নিবেদন** হল আপনার 'বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক প্রার্থনা'। একালে একে 'অ্যাপ্লিকেশন' বা 'নিবেদনপত্র' বলে। বর্তমানে ইংরেজি ভাষার অত্যন্ত দাপটের কারণে এখন আমাদের এই দুর্দশা হয়েছে। এখন আমরা **আবেদন** ও **নিবেদন** শব্দের একটিই মাত্র অর্থ বুঝি — prayer বা 'প্রার্থনা'।

নিবেশ : ২. *নি (গতিশীল অন্-কৃত) (প্র)বেশ যাহাতে।* ৪. পৃথকভাবে অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **বেশ (আবেশ, উপবেশ, প্রবেশ, পরিবেশ, প্রতিবেশ, প্রতিবেশী, সন্নিবেশ)**। শব্দগুলি **বিশ্** ক্রিয়ার সঙ্গে উপসর্গাদি যোগ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই **বিশ্** দিশাগ্রস্ত হলে **বেশ** হয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় **নি**। ফলে অর্থটি দাঁড়ায় — কোনো দেশ-কাল-পাত্রে গিয়ে স্থান গ্রহণ করা।

নিম (নিমাই, নিম্ব, নিম্বু, নিম্বুক, লেবু) : ২. ***নিম*** *= গতিশীল ন-এর মিতকরণ যাহাতে।* ***নিমাই*** *=* ***নিম****-এর আধার গতিশীল (যাহাতে)।* ***নিম্ব*** *=* ***নিম্*** *বহন করে যে।* ***নিম্বু*** *=* ***নিম্ব*** *নবরূপে উত্তীর্ণ হইয়া ধারিত যাহাতে।* ***নিম্বুক*** *=* ***নিম্বু*** *করে যে।* ***লেবু*** *= দিশাগ্রস্ত লালন-লয়ন বাহিত হইয়া নবরূপে উত্তীর্ণ যাহাতে।* ৩. **নিম (নিম্ব)** = নিম্ববৃক্ষ, নিম্বফল, নিম্বপত্র, (সাধর্ম্ম্যে) তিক্তদ্রব্য, তিক্তস্বাদ; অর্দ্ধ, প্রায়। **নিম্বু (নিম্বুক, লেবু)** = জম্বীরবিশেষ, কাগজীলেবু গাছ; নিম্বুকফল, কাগজী লেবু; নারঙ্গ। **নিমাই** = চৈতন্যদেব। দ্র. **চৈতন্য**। (ব.শ.)। ৪. the margosa tree or fruit or leaf অর্থে **নিম** এবং lemon অর্থে **লেবু** প্রচলিত, বাকি শব্দগুলি অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **তিক্ত**। গতিশীল ন-এর অর্থ হল, যে সক্রিয় ক্রিয়াশক্তি একই সঙ্গে **ন** (no বা নাশ) করে দিতে পারে এবং হ্যাঁ বা **অন** (on) করেও দিতে পারে। **অংরূপিণী**র এ হল একটি দ্বৈত কিন্তু অদ্বৈত, two in one বা দ্বৈতাদ্বৈত রূপের সংক্ষেপ-কৃত প্রক্রিয়া। **নিম** শব্দ স্বভাবতই অনেকগুলি অর্থই বোঝাতে পারে —

নি-এর (গতিশীল **ন**-কারী ও **অন্**-কারীর) মিতকরণ বা সীমায়ন যাহাতে, তাকে বলে **নিম**। এই **নিম**-এর বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায় **নিম**রাজি জাতীয় শব্দে, যাতে রাজি হওয়ার ব্যাপারটি খানিকটা না এবং খানিকটা হ্যাঁ-ও বটে। (এরকম আরও শব্দ রয়েছে, যথা — **নিম**খাসা, **নিম**খুন, **নিম**গোচ ইত্যাদি। এই **নিম** বাংলাই, ফারসিরও।) বাঙালির মনে বা হিয়ায় না-হ্যাঁ এই দুইয়ের সমসম্মান বলেই সে **বঙ্গাল** বা **বাঙালি** নামে অভিহিত হয়ে থাকে (দ্র. **ঘটি**)। সেই 'বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া **নিমাই** ধরেছে কায়া'। অর্থাৎ, সেই 'বাঙালির হিয়া'র দ্বৈততার অমৃত মন্থন করেই **নিমাই** শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু হয়েছিলেন। এই **নিমাই** সেকারণেই হরগৌরী, রাধাকৃষ্ণ, রাধেশ্যামের দ্বৈতবোধকে বৃহৎবঙ্গে ব্যাপ্ত করেছেন। ...

এই **নিম**কে বহন করে যে, তাকে বলে **নিম্ব**। এটি আবির্ভাবকালে **তিক্ত**, কিন্তু অন্তিমে শুভদায়ী। ক্ষতিকর, নষ্ট, ও সেকেলে পরিস্থিতির নাশ ঘটায় সে এবং নতুন পরিস্থিতির আবাহন করে। বাঙালির ভোজনের প্রথম পদ সেকারণেই **তিক্ত**। তবে এই **নিম্ব** যখন নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, যখন তার ভিতরে নাশকারী শক্তিটি আর থাকে না, অত্যন্ত বেড়ে যায় আবাহনকারী শক্তি। তখন একে **নিম্বু, নিম্বুক** বা **লেবু** বলে। তখন সে হয়ে যায় **টক** বা **অম্ল**। ... ৬. ইংরেজি nim, nimble প্রভৃতি nim-যুক্ত কিছু ইংরেজি শব্দ এই **নিম** শব্দের সগোত্র।

নিমি : ২. *নি (গতিশীলভাবে অন্-কৃত) সীমায়ন সক্রিয় যাহাতে।* ৩. ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপবিশেষ। ইনি মিথিলা-রাজবংশের আদিপুরুষ। ইঁহার পুত্র মিথির নামানুসারে 'মিথিলা'। (ব.শ.)। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত,

ও মৎস্যপুরাণ অনুসারে, সূর্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুর দ্বাদশ পুত্রের মধ্যে একজনের নাম নিমি। ইনি হিমালয়ের নিকট বৈজয়ন্ত নগরে রাজত্ব করতেন। একবার ইনি বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করে প্রথমে বশিষ্ঠকে ও পরে গৌতম, অত্রি, অঙ্গিরা ও ভৃগুকে আমন্ত্রণ করে যাজকত্বে বরণ করলেন; কিন্তু বশিষ্ঠ তখন ইন্দ্রের যজ্ঞের ব্রতী হয়েছেন, তাই তিনি নিমিকে ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু নিমি অপেক্ষা না করে গৌতমের উপর যজ্ঞের ভার দিলেন। ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত করে বশিষ্ঠ নিমির যজ্ঞে এসে গৌতমকে হোম করতে দেখে নিজেকে অপমানিত বোধ করলেন এবং ক্রুদ্ধ হয়ে নিদ্রিত নিমিকে শাপ দিলেন যে, তাঁর দেহ চেতনা-বিলীন হবে। নিমিও তখন জেগে উঠে বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিলেন যে, সুপ্তকে অভিশাপ দেবার ফলে তাঁরও মৃত্যু হবে। কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁর দেহ বহুকাল অবিকৃত থাকবে। পরস্পরের শাপের ফলে নিমি ও বশিষ্ঠ দুই জনেই দেহত্যাগ করে বায়বীয় দেহ পেলেন। নিমির এই শাপের ফলে বশিষ্ঠের তেজ মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হল। তারপর একদিন উর্বশীকে দেখে মিত্রাবরুণের রেতঃপাত হয়; এর ফলে সেই বীর্য হতে বশিষ্ঠ অন্য দেহ লাভ করেন।

নিমির মৃত্যুর পর তাঁর দেহ তেল ও গন্ধাদির দ্বারা সযত্নে রক্ষা করে ঋষিরা যজ্ঞ করতে লাগলেন। এতে দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে বললেন যে, নিমির দেহে চেতনা দান করা হবে; তখন নিমি উত্তর দিলেন যে, শরীর ও আত্মার পরস্পর বিয়োগ হওয়ার চেয়ে বেশি দুঃখ আর কিছুই নাই। এইজন্য তিনি আর শরীর ধারণ করতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু সকল লোকের নেত্রে তিনি বাস করতে ইচ্ছা করেন। দেবতারা তখন বর দিলেন — নিমি সর্বভূতের নেত্রে বিরাজ করবেন। এর ফলে সকলের চক্ষু বিশ্রামের জন্য বারংবার **উন্মেষ** ও **নিমেষ**প্রাপ্ত হবে। রামায়ণে কথিত আছে — নিমি দেবতাদের বরে বায়ুভূত হয়ে প্রাণীসমূহের নেত্রে বাস করেন, সেইজন্য মানবের **নিমেষ** হয়ে থাকে। তারপর ঋষিরা নিমির কোনো পুত্র না থাকায় তাঁর দেহ অরণিতে মন্থন করতে লাগলেন। এর ফলে মহাতপা মিথির জন্ম হল। মন্থনের ফলে জন্ম হওয়ায় তাঁর নাম হল মিথি। মৃতদেহ হতে জন্ম হওয়ায় তাঁর অন্য নাম হল জনক। বিদেহ (সচেতন দেহ) থেকে উৎপন্ন বলে তাঁর অন্য নাম হল বৈদেহ। (পৌ.অ.)। ৪. **নিমি** অপ্রচলিত। ৫. সত্তা একটিই — **জনক**। তার আরও দুটি নাম রয়েছে দেখতে পাওয়া যায় — মিথিলা, বৈদেহ। এই **জনক**-এর হাত ধরে ভারতসমাজের ইতিহাসে প্রথম পাইকারি হারে কৃষি উৎপাদনের প্রচলন ঘটে। এখানে দেখানো হয়েছে **নিমি**র পুত্র নেই, অথচ **দেবরাত**-এর ইতিহাস থেকে দেখা যায়, তিনি **নিমি**র পুত্র এবং তিনি শিবের বিখ্যাত **ধনু** গচ্ছিত রেখেছিলেন, যে-ধনু দিয়ে শিব দক্ষযজ্ঞকালে দেবতাদের **মুণ্ডচ্ছেদ** করবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন। অপরদিকে যে বশিষ্ঠকে বলা হয়েছে 'বার্দ্ধুষিক' বা 'বাড়িখোর' (ব.শ.) অর্থাৎ সুদখোর তাকেই দেখা যায় রামচন্দ্রের পুরোহিত রূপে সক্রিয় থাকতে। আর, **গৌতম**কে আমরা চিনেছি 'দীর্ঘসূত্রী' হিসেবে। সেই **গৌতম**কে দিয়ে যজ্ঞ করানোর জন্য **নিমি**কে বশিষ্ঠ অভিশাপ দিচ্ছেন। ফলে ব্যাপারটি বেশ জটিল। কেননা, পুঁজিবাদের সূত্রপাত যার হাত দিয়ে **নিমি** সেই **মিথি**র আদিপুরুষ; **মিথিলা, জনক** ... এঁদের পূর্বসূরী, অথচ তিনিই বশিষ্ঠকে বাদ দিয়ে দীর্ঘসূত্রী সমাজতন্ত্রবাদী **গৌতম**কে দিয়ে যজ্ঞ করাচ্ছেন। অন্য দিকে সেই **নিমিই** হলেন সূর্য্যবংশের (যৌথ-ব্যবস্থার সমর্থকদের) উত্তরাধিকারী। তাছাড়া, দেহমন্থন করে যেমন **মিথি**র জন্ম **পৃথু**রও জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করায়। অন্য দিকে বশিষ্ঠ **মিত্রাবরুণ**-এর ভিতর দিয়ে ঘুরে নতুন দেহ পান ... অর্থাৎ, এ এক বিশাল ও জটিল ইতিহাস। এর **পুঙ্খানুপুঙ্খ** ব্যাখ্যা করতে গেলে পৃথক গবেষণা লাগবে। আমরা আপাতত **নিমি** শব্দের মানেতেই গুরুত্ব দেব।

মি শব্দের অর্থ হল 'সীমায়ন গতিশীল যাহাতে'। তার সঙ্গে অন্-ক্রারী **নি** উপসর্গের যোগ ঘটলে নিয়ম অনুসারেই তার অর্থ দাঁড়ায় 'অন্-কৃত সীমায়ন গতিশীল যাহাতে'। **নিপীড়ন**-এর বেলায় আমরা দেখেছি, **নি** উপসর্গটি পীড়ন-ক্রিয়াকে সক্রিয় করে দেয়, বা গতিশীলভাবে অন করে দেয়। **নিমি**র বেলাতেও সেরকমই হওয়ার কথা। তাতে **নিমি** শব্দের মানে দাঁড়ায় — কোনো বিষয় বা বস্তুকে গতিশীলভাবে সীমায়ন করে দেওয়ার কাজকে সক্রিয় করে দেয় যে, সেই হল **নিমি**। সমাজে প্রয়োগ করে দেখলে বিষয়টি অনেক সহজে বোধগম্য হয়। তখন **নিমি**র মানে দাঁড়ায় — যে-সত্তা সামাজিক সম্পদ সীমায়িত করে, ধান গম গরু ছাগল ... ইত্যাদিকে টাকায় রূপান্তরিত করে, সেই হল **নিমি**। এই **নিমি**র পরিপূরক সত্তা হলেন গৌতম। কেননা তিনি ছিলেন 'দীর্ঘকালীন যজ্ঞ' করার নামে ভূরি ভূরি দক্ষিণা কামিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। (দ্র. **কল্প**)। সেকারণেই বশিষ্ঠকে বাদ দিয়ে গৌতমকে দিয়ে তিনি যজ্ঞ করিয়ে নেন। তাতে উভয়ের সুবিধা হয়। ...

এই **নিমি**র পুত্র **মিথি**; এবং তা হয় এইভাবে — **নি-মি** > **মি-থি**। তার মানে, **নিমি** যে **মি** করেন, সেই **মি** গিয়ে **থিতু** হয় বা জমা হয় **মিথি**তে। অর্থাৎ যৌথসমাজের অধঃপতনের একটি পর্যায়ে **নিমি** সত্তাটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভেতরেই ব্যক্তিগত পুঁজি তৈরি করতেন, এবং তাই দিয়ে পরে **মিথি**র জয়জয়কার শুরু হয়েছিল। হয়তো **নিমি** ও বশিষ্ঠের শাপ-শাপান্তের কারণ ছিল সেটিই।

নিমিত্ত (নিমিত্তকারণ, নিমিত্তজ্ঞ, নিমিত্তমাত্র, নিমিত্তের-ভাগী) : ১ নি + ✓মিদ্ + ত (ক্ত)- কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নিমিত্ত*** = ***নি*** *(গতিশীলভাবে অন্-কৃত)* ***মিদ্****-এর (সক্রিয় সীমায়ন দানের) তারণ যাহাতে।* ***নিমিত্তকারণ*** = ***নিমিত্তই*** *কারণ যাহার।* ***নিমিত্তজ্ঞ*** = ***নিমিত্ত*** *বিষয়ে জানেন যিনি।* ***নিমিত্ত-মাত্র*** = ***নিমিত্ত*** *পরিমিত ও ত্রাত যাহাতে।* ৩. **নিমিত্ত** = হেতু, কারণ, উদ্দেশ্য, ফল, লক্ষ্ম, চিহ্ন, শকুন, সাধনদ্রব্য (instrument), প্রবর্ত্তক, শরব্য, লক্ষ্য। **নিমিত্তকারণ** = কারণবিশেষ, ঘটের কুলালচক্রদণ্ডাদি। **নিমিত্তজ্ঞ** = শকুনজ্ঞ, শুভাশুভসূচকলক্ষণবিৎ। **নিমিত্তমাত্র** = হেতুমাত্র। **নিমিত্তের-ভাগী** = হেতুরূপে প্রতীয়মান। (ব.শ.)। ৪. for, for the purpose অর্থে প্রচলিত। ৫. **নি-পীড়ন**-এর **নি** যেমন **পীড়ন**কে **নি** (গতিশীলভাবে অন বা on করে দেয় বা চালু) করে দেয়, তেমনি **নিমিত্ত**-এর **নি**ও **মিত্ত**কে **নি** করে দেয়। '**মিত্ত** করা' মানে, **মিদ্**কে তারিত করা। আর, এই **মিদ্** হল সীমায়ন দান, বা মিত করে দেওয়া, যেনবা ঘটে যাওয়া বস্তু বা ব্যাপারগুলিকে বস্তাবন্দী করে ফেলা।

'রুমালটা বেড়াল হল কেমন করে', সেই প্রশ্ন তোলায়, সুকুমার রায়ের 'হযবরল'-এর বেড়ালটা তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিল, 'ছিল ডিম, হয়ে গেল একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস — এ তো হামেশাই হচ্ছে!' হ্যাঁ এরকমই হয়! **হেতু** থাকলে, **কারণ** থাকলে, এরকমই এক-একটি বস্তু বা বিষয় অন্য একটি বস্তু বা বিষয়ে বদলে যায়। **হেতু**র বেলায় কেউ না কেউ তার **হিতে**র উদ্দেশ্যে ঐ বদল-ঘটায়। **কারণ**-এর বেলায়, বিষয় বা বস্তুটির ভিতরে **কার** (কার্য্য) অন (on) হয়ে সক্রিয় থাকে বলেই বিষয় বা বস্তুটি একসময় বদলে যায়। আর, **নিমিত্ত**-এর বেলায় বস্তু বা বিষয়টি তার নিজস্ব **কারণে** বদলাচ্ছিল, কেউ এসে সেই বদলকে ত্বরান্বিত করে গুছিয়ে / গেঁথে / বেঁধে/তুলে বা অন্য কিছু করে / রাখে। তাই সে **নিমিত্ত**-মাত্র।

সামনে বিশাল সৈন্যবাহিনী, তাদের নেতৃত্বে আপন আত্মীয়, গুরু, জ্যেষ্ঠদের দেখে তাঁদের সম্ভাব্য মৃত্যুর কথা ভেবে দুঃখিত যুদ্ধবিমুখ অর্জুন ভাবতে বসেছিলেন, শেষে কিনা আপন আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যুর **কারণ** হতে হবে! শ্রীকৃষ্ণ তখন বলেছিলেন — যারা মরবার তারা তাদের নিজস্ব **কারণ**-এর জন্য মরবেই, তুমি তাদের মৃত্যুর **কারণ** নয়, **নিমিত্তমাত্র**। তার মানে প্রতিটি বদল তার নিজের ভিতরের **কারণেই** ঘটে চলেছে, ঘটে থাকে, ঘটবেও। এই সমস্ত বদলের মূলে থাকে **হেতু** বা **কারণ**। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বদলের ঠিক আগে কাকতালীয়-ঘটনার কাককে পাওয়া যায় **নিমিত্ত** রূপে। এই **নিমিত্ত**-এর আবির্ভাব তাই খানিকটা রসায়ন শাস্ত্রের 'অনুঘটক'-এর মতো মনে হলেও, **নিমিত্ত** কিন্তু সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় নয়। যদি তাকে নিষ্ক্রিয় ভাবা হয়, তাহলে **নৈমিত্তিক কর্ম্ম** অর্থহীন হয়ে যায়; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুন কিছুই করেননি বলে মেনে নিতে হয়। তাছাড়া এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে **নিমিত্তই কারণ**। অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাকের ভরেই তাল পড়ে, এবং তখন **নিমিত্ত** আর **কারণে** ভেদ লুপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে বদলের জন্য **নিমিত্ত**কেও দায়ী করা চলে। কেউই অবশ্য এমনতরো **নিমিত্তের-ভাগী** হতে চায় না।

নিমিষ (আমিষ, উন্মেষ, নিমেষ, নৈমিষ, নৈমিষারণ্য) : ১ নি + ✓মিষ্ + অ (ঘঞ্, ঘঞর্থে ক) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নিমিষ** = নেই **মিষ** (সীমায়ন করার ইচ্ছা) যাহাতে। **আমিষ** = **মিষ**-এর আশ্রয় যাহাতে। **উন্মেষ** = উদ্গত **মেষ** (দিশাগ্রস্তভাবে সীমায়ন করার ইচ্ছা) যাহাতে। **নিমেষ** = নেই **মেষ** যাহাতে।* নৈমিষ = ***নিমিষ** হইতে জাত।* ৩. **নিমিষ (নিমেষ)** = চক্ষুর্নিমীলন, পলক ফেলা, নিমেষোপলক্ষিত কাল, অত্যল্পকাল, নেত্রপক্ষ্মগত রোগবিশেষ, পুষ্পপত্র-নিমীলন, বিষ্ণু। **আমিষ** = **অম** দ্রষ্টব্য। **উন্মেষ** = চক্ষুরুন্মীলন, প্রকাশ, বিকাস, উদয়, উপবৃংহণ। **নৈমিষ (নৈমিষারণ্য)** = নিমিষসম্বন্ধী, ক্ষণিক। বিষ্ণু এই অরণ্যে নিমিষে দানববল নিহত করেন; এই হেতু ইহা 'নৈমিষ', 'নৈমিষারণ্য' নামে খ্যাত। এই তীর্থে রামচন্দ্রের অশ্বমেধ ও কুলপতি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক সত্র অনুষ্ঠিত হয়। পৌরাণিক সৌতি এই তীর্থে ঋষিমণ্ডলে ভারতকথার বর্ণনা করেন। (ব.শ.)। **নৈমিষারণ্য** = গোমতী নদীর নিকটবর্তী ঋষি ও মহর্ষিদের পবিত্র স্থান। গৌরমুখ মুনি এখানে নিমেষকালমধ্যে অসুরসৈন্য ভস্মীভূত করেছিলেন বলে এই স্থানের নাম নৈমিষারণ্য। এই অরণ্যে সমবেত ঋষির সম্মুখে সৌতি মহাভারত পাঠ করেছিলেন। ((পৌ.অ.)। ৪. non-vegetarian food অর্থে **আমিষ**, opening অর্থে **উন্মেষ**, a twinkling of an eye অর্থে **নিমেষ** প্রচলিত। **নিমিষ** অপ্রচলিত। ৫. **মিষ** কথাটির এলাকা এত বিশাল যে, তা নিয়ে একটি পৃথক গবেষণাগ্রন্থ লেখা যেতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য শব্দটির ভিতরে যে অর্থ রয়েছে, তাকে বোঝা এবং উৎ, আ, নির্, নি প্রভৃতি উপসর্গ যোগে শব্দটি আর কী কী অর্থ বোঝায় সেগুলি জানার চেষ্টা করা। অবশ্যই শব্দগুলির ব্যাবহারের ব্যাপক এলাকার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণও আমাদের দিয়ে যেতে হবে।

মিষ কথাটির অর্থ হল, গতিশীল সীমায়নের (= **মি**) দিশাগ্রস্ত শক্তি-বিচ্ছুরণ (= **ষ**) যাহাতে। এই আধা-অব্যক্ত অর্থটিকে আরও একটু ব্যক্ত করার চেষ্টা করলে তা এইরকম দাঁড়ায় — **ম-ইষ** বা মিত (= আপন অভ্যন্তরে গ্রহণ) করার ইচ্ছা (= ইষ্) ধারণ করে যে। আরও স্পষ্ট করলে, **মিষ** শব্দের অর্থ হয়, আপন করা, আত্মস্থ করা, হাত বাড়িয়ে টেনে নিজের ভিতরে ঢুকিয়ে নেওয়া, দখল করা, গিলে ফেলা ... ইত্যাদি। কিন্তু যাকে **মিষ** করা বা দখল-করা হচ্ছে, তার দিক থেকে দেখলে এই দখল-করার মানে তার পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। তার সাজানো বাগান থেকে আপনি কলা-মূলা-গরু-ছাগল তুলে নিয়ে চলে এলেন, অর্থাৎ **মিষ** করে নিলেন; সে শুধু কিছু পোষ্যই হারাল (miss করল) না, তার সমগ্র ব্যবস্থাটিই তো এলোমেলো হয়ে গেল। এভাবে, **মিষ** করার উলটো দিক থেকে দেখার ফলে ব্যাপারটির মানে দাঁড়ায় আপন কিছু অংশকে হারানো। **মিষ** শব্দের এমনতরো ধারণার উত্তরাধিকার আমাদের নেই, রয়েছে ইংরেজির। তাঁরা miss করেন, তাঁদের ব্যবস্থা in a mess হয়ে যায়, ill হয়ে যায়। এই কাজকে তাঁরা কিছুতেই স্বাভাবিক কাজ বা ভাল কাজ ভাবতেই পারেন না। লোকে কেন আমাদের বিষয় বা বস্তু দখল করবে, গিলে ফেলবে, **মিষ** করে নিয়ে যাবে? ফলত ইংরেজি ভাষা mis শব্দটিকেই একটি prefix বানিয়ে ফেলে। শুধু তাই নয়, dismiss, promise ইত্যাদি mis-যুক্ত অজস্র শব্দ (misbehave, miscall, misdeed ... ইত্যাদি) রয়েছে ইংরেজিতে, যেগুলির সবই মূলত **মিষ** ক্রিয়ারই বিপরীত দিক থেকে দেখা বোধের প্রকাশ। একই বোধের উত্তরাধিকার দেখা যায় আরবি ভাষাতেও, যথা — মিসকিন (নিঃস্ব), মিসমার (ধ্বংস), মিসর (**মিষ** চলে যেখানে; অর্থাৎ ইজিপ্ট দেশটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমিষভক্ষণকারীদের বা পণ্যজীবীদের দেশ) প্রভৃতি।

মিষ শব্দ থেকে আর যেসব বাংলা শব্দ তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে আমরা **উন্মিষ, আমিষ, নিমিষ** ও **নিরামিষ** ইত্যাদি শব্দকে পাই। শব্দতত্ত্বের নিজস্ব নিয়মানুসারে **উন্মিষ** ও **নিমিষ** পুনরাবৃত্ত হতে থাকলে (ফলে দিশাগ্রস্ত হলে) যথাক্রমে **উন্মেষ** ও **নিমেষ** হয়ে যায়। কিন্তু 'দখল-করা', 'গিলে-ফেলা' ইত্যাদি অর্থে **মিষ** শব্দের অর্থ বুঝলে **উন্মেষ** বা **নিমেষ** শব্দের মানে কী হবে? 'উদগত **মিষ** যাহাতে' অর্থাৎ 'যে দখল করতে বা গিলে ফেলতে উদ্যত'; তাকে বলতে হবে **উন্মেষ** এবং 'নেই **মিষ** যাহাতে', অর্থাৎ 'যে দখল

করে না বা গিলে ফেলে না', তাকে বলতে হবে **নিমেষ**! **উন্মেষ** ও **নিমেষ** শব্দের এ কীরকম অর্থ?

ব্যাপার হল, পরমাপ্রকৃতি আমাদেরকে তো জন্মই দিয়েছেন অভাবী করে। নিজের ভিতরে নিজে চুপ করে বসে থাকার উপায় তিনি আমাদের দেননি। ভিতরে অভাব দিয়ে তা পূর্ণ করার দায় দিয়ে আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। সেজন্যই আমরা আমাদের নিজ নিজ অস্তিত্বের বাইরে হাত বাড়াই, একে-তাকে ধরি, গ্রহণ করি, আত্মস্থ করি, আপন আপন অভাব পূরণ করি। ফলে আমরা এক পক্ষ যখন **মিষ** (দখল) করি, বিপরীত পক্ষ তখন miss করে। কিন্তু সবার আগে আমরা নিজেরা কেউই আমাদের কাম্য বস্তু বা বিষয়ের কাছে **মিষ** (দখল) করতে চলে যাই না, যায় আমাদের সর্বত্র ব্যাপনকারী বা 'অশ্-কারী' **অক্ষি** বা **চক্ষু**। সে-ই সবার আগে কাম্য বস্তুটির কাছে পৌঁছে গিয়ে তাকে **চক্ষণ** করে, চাখে (সেজন্যই সে **চক্ষু**-পদবাচ্য), তারপর ভাল বুঝলে তার প্রতিচ্ছবিটি আনয়ন করে (সেজন্যই সে **নয়ন**)। দৃষ্টের আনীত সেই প্রতিচ্ছবিকে নয়ন থেকে নামিয়ে মনের মণিকোঠার থাকে থাকে সুবিন্যস্ত করে গুছিয়ে রাখা হয়। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ছবিগুলিকে **লোচন**-এর সাহায্যে নামিয়ে এনে **আলোচনা** করে দেখি, কোনটি আমাদের কতখানি কাজে লাগবে, না লাগবে।

কিন্তু এসব করার জন্য সবার আগে চোখ দুটো খোলা রাখা চাই! আর সেজন্যই সবার আগে দেখা দেয় **উন্মিষ** বা **উন্মেষ**। সে হল চোখের জানালার পাল্লা খুলে দেওয়া। আর তখনই সেখান থেকে বেরিয়ে যায় আমাদের দৃষ্টি, আমাদের **অক্ষি**। সে গিয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুকে (বস্তুর প্রতিচ্ছবিকে) আনতে থাকে; চলতে থাকে আমাদের চোখের তথা মনের **আমিষ**-ভক্ষণ। এই কারণে **উন্মেষ** হল 'উদগত **মিষ** যাহাতে' অর্থাৎ 'যে দখল করতে বা গিলে ফেলতে উদ্যত'। আর, **নিমেষ** হল, যখন সেই জানালার পাল্লাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন আর আমাদের দৃষ্টি বেরিয়ে তার কাম্য বস্তুর কাছে যেতে পারে না। তবে, যাঁরা কাম্য বস্তু সমূহের ইত্যাকার **আমিষ**-ভক্ষণ পছন্দ করেন না, নিঃসন্দেহে তাঁরা **নিরামিষাশী**।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যখন সমাজের অর্থনীতিকে 'চক্ষু' বলা হয়, তখন আমরা খেয়াল করিনি যে, চক্ষুর **উন্মিষ**, **আমিষ**, **নিমিষ** ও **নিরামিষ** ইত্যাদি প্রক্রিয়া থাকে। তবে কৌটিল্য যে 'চক্ষু'র কথা বলেন, তা বাহ্যশরীরের এই 'চক্ষুরুন্মীলন' সমান্তরাল বটে, কিন্তু তা বাহ্যশরীরের চক্ষু নয়। তা হল মনের চোখ। তারও **উন্মেষ** এবং **নিমেষ** হয়। একে 'চোখ ফোটা' বা 'চোখ খুলে যাওয়া' বলে। কোনো মূর্খ গোবেচারা মানুষ কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির কর্মচারী রূপে কিছুদিন চাকরি করার পরই দেখা যায়, সে বেশ ভাল করে টাকাপয়সা রোজগার করা ও সঞ্চয় করার মানে বুঝে গেছে, এবং তা করতেও শুরু করেছে। লোকে তখন বলে, 'অমুকবাবুর চাকরি করে ভোলানাথের চোখ খুলে গেছে।' আমাদের চারপাশে এরকম 'চোখ খুলে যাওয়া'র অজস্র উদাহরণ রয়েছে। পুরাণাদি অনুসারে, মানুষের ইতিহাসে মনের চোখ খোলা ও বন্ধ হওয়ার সূত্রপাত হয়েছিল উপরোক্ত **নিমি**-রাজার রাজত্বকালের পর থেকে। তার আগে মানুষের মনের **উন্মেষ** ছিল না, **নিমেষ**ও ছিল না। দ্র. **নিমি**।

নৈমিষারণ্য তার নিহিত অর্থ অনুসারে একটি প্রাচীন হাটের কথা বলে। **সতীনাথ ভাদুড়ী রচিত 'ঢোঁড়াই চরিতমানস'** গ্রন্থে প্রাচীন তাঁতশিল্পের **ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা** পাওয়া যায়। সেই ধ্বংসাবশেষ প্রকৃতপক্ষে **বৌদ্ধযুগের রামরাজত্বের** নামে পৃথিবীর যে আদি **শিল্পবিপ্লব ভারতবর্ষে ঘটেছিল, তারই** ধ্বংসাবশেষের বর্ণনা। সেই বর্ণনাতে **অরণ্যগুলির আদি অর্থ** স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। **নৈমিষারণ্য ছিল** তেমনি এক আদি হাটের নাম। দ্র. **অরণ্য**।

নিম্ন (নিম্নগ, নিম্নগা) : ১ নি + ✓ম্না + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নিম্ন*** = ***নি*** *(গতিশীলভাবে অন্-কৃত)* ***ম্*** *(মিতকরণের অন্-কারী) যাহাতে।* ***নিম্নগ (নিম্নগা)*** = ***নিম্নে*** *গমন করে যে।* ৩. **নিম্ন** = নীচ, নাবাল, গভীর, গম্ভীর, কৃশ, নিকৃষ্ট, অধোদেশ, নিম্নাবয়ব — জঘনাদি, গর্ত্ত। **নিম্নগ** = নীচগামী, নিম্নপ্রবণ। **নিম্নগা** = নদী। (ব.শ.)। ৪. below অর্থে **নিম্ন** প্রচলিত। বাকি শব্দ দুটি অপ্রচলিত। ৫. **নি** = গতিশীল অন্-কারী, **ম্** = মিতকরণ, **ন** = অন্-কারীর আধার। এভাবেই তৈরি হয়েছে **নিম্ন**। কিন্তু এতে below অর্থটি থাকছে কীভাবে?

বলা হয়, পরিমাপ থেকে বিজ্ঞানের সূচনা। এই পরিমাপ করে ফেলা বা মিতকরণ ক্রিয়াটিকে বলা হয় **ম্**। ছুটন্ত রেলের বাঁশি শুনে অপু দুর্গা দৌড়চ্ছে। আপনি তাদের তদবস্থার একটি ছবি এঁকে ফেললেন। ছুটন্ত ট্রেনের সঙ্গে ছুটন্ত অপু-দুর্গার এই ছবি আর বদলাবে না; হয়ে গেল মিতকরণ। এর পর সেই ছবিকে অন্ করতে চাইলে আপনাকে ছবিটির জেরক্স করতে হবে। তখন **ম্**-এর **ন** বা অন্‌করণ হয়ে যাবে এবং তাকে বলতে হবে **ম্ন**। অতঃপর এই **ম্ন**-কে গতিশীলভাবে অন্ করে দিতে চাইলে, অর্থাৎ **নি** করে দিতে চাইলে আপনাকে সেই ছবির জেরক্সের পর জেরক্স করে যেতে হবে। তাহলেই তা হয়ে যাবে **নিম্ন**। ঠিক এভাবেই কোনো একটি পরিমিত স্থান-কাল-পাত্রের সক্রিয় রূপকে একটি সীমায় সীমাবদ্ধ করে নিয়ে তার পুনরাবৃত্তি করতে থাকলে আমরা সেই স্থান-কাল-পাত্রের ক্রমপরবর্তী পর্যায়ের দিকে এগোতে থাকি। এই ক্রমপরবর্তী পর্যায়গুলি স্বভাবতই সূচনা-বিন্দু থেকে অধঃপতিত হয়ে থাকে। একেই বলা হয় **নিম্ন**। ক্রমে এই **নিম্ন** শব্দটি প্রতীকী হয়ে গিয়ে যে কোনো প্রকারের **অব-স্থান**কে বোঝানোর কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে।

নিয়ত (নিয়তি, প্রতিনিয়ত) : ১ নি + ✓যম্ + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নিয়ত*** = ***নি*** *(গতিশীলভাবে অন্-কৃত) যাওয়ন তারিত যাহাতে।* ***নিয়তি*** = ***নিয়ত*** *গতিশীল যাহাতে।* ***প্রতিনিয়ত*** = ***নিয়ত****-এর বিপরীত যে।* ৩. **নিয়ত** = উপরত, নিবৃত্ত, বদ্ধ, সংযত, বশীকৃত, সমাহিত, নিত্য, অপরিহার্য্য, সেবাপর, সিদ্ধ, নিশ্চিত, ব্যবস্থিত, প্রকৃত, কৃতনিয়ম, আচারনিষ্ঠ। **নিয়তি** = নিয়মন, সংযম, দৈব, ভাগ্য, বিধি, নিয়ম। **প্রতিনিয়ত** = নিয়মপূর্ব্বক নিরূপিত, স্বাধিষ্ঠিত, নিরন্তর, সর্ব্বদা। (ব.শ.)। ৪. fate অর্থে **নিয়তি** এবং every moment অর্থে **প্রতিনিয়ত** প্রচলিত; **নিয়ত** অপ্রচলিত। ৫. **যম** কথাটির অর্থ হল 'যাওয়া সীমায়িত যাহাতে'। কিন্তু আজকাল এর প্রতীকী অর্থ করা হয় 'মৃত্যুর দেবতা' হিসেবে। এখন **যম**

বোঝাতে 'সংযম' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সেভাবে দেখলে, গতিশীলভাবে অন্-কৃত সংযম তারিত হয় যাহাতে, তাকে **নিয়ত** বলা যায়। অর্থাৎ কিনা **নিয়ত** শব্দটির মূল অর্থ হল, 'যাকে সংযমিত বা নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে'। উপরোক্ত প্রতীকী অর্থগুলি তার থেকেই জাত হয়েছে। কিন্তু **নিয়তি** শব্দটি তার এই অভিধা-অর্থ থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে হয়ে গেছে 'ভাগ্য' বোধক। আর সেটি সম্ভব হয়েছে এইভাবে — কৃত থেকে যেমন কৃতি হয়, তেমনি **নিয়ত** থেকে **নিয়তি**। স্বভাবতই এর অর্থ হয় 'নিয়ত-করণ সক্রিয় রয়েছে যে ক্রিয়ায়'। আজকাল একেই 'ভাগ্য' বলা হয়ে থাকে। তার মানে, ধরে নেওয়া হয়, জগতের সমস্ত ঘটনার পিছনে প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক বা অন্য কোনো অশরীরী অলৌকিক অজানা সত্তা বিশ্বব্যবস্থাকে (এবং মানুষকেও) নিয়ন্ত্রণ করছে। তারই একনিষ্ঠ চেষ্টায় বিশ্বপ্রকৃতির সবকিছু বদলাচ্ছে, এগিয়ে চলেছে। সেই **নিয়তি**। আর **প্রতিনিয়ত** শব্দটি বেশ অদ্ভুত। কেউ আপনাকে আইনের বাঁধনে ফেলল, আপনিও আইনের অন্য ফাঁক দিয়ে তাকে পাল্টা বেঁধে ফেললেন। এই পাল্টা বেঁধে ফেলাই **প্রতিনিয়ত**। আমাদের ভাগ্য আমাদের **নিয়ত** করছে, আর আমরা 'every moment' of our life সেই ভাগ্যকেই **প্রতিনিয়ত** করার চেষ্টা করি। এর পর 'প্রতি মুহূর্ত' অর্থে **প্রতিনিয়ত** শব্দটি ব্যবহার করে যাই। সেই কারণে শব্দটির ভেতরে 'প্রতি মুহূর্ত' অর্থকেই দেখতে পাওয়া যায়। ফলে **প্রতিনিয়ত** শব্দের মানে দাঁড়িয়ে গেছে 'প্রতি মুহূর্তে'।

নিরীহ : দ্র. ঈহা।

নিরুক্ত : ১. নি + ✓বচ্ + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *যাহা নিঃশেষে উক্ত বা কথিত হইয়াছে।* / যাহা নিঃশেষে ব্যাখ্যাত (হইয়াছে)। (ব.শ.)। ৩. **নিরুক্ত** : প্রকাশিত, নির্ব্বচন, পদভঞ্জন, পদের অবয়বার্থ-নির্ব্বাচক যাস্কাদিকৃত গ্রন্থভেদ, যাস্ককৃত নিঘণ্টু-ভাষ্যগ্রন্থ। (ব.শ.)। বৈদিক অভিধান। নিরুক্ততে বেদের কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ ও তার অর্থ আছে। কঠিন বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যা ও তার প্রয়োগ দেখানোই নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। ইহা যাস্ক কর্তৃক লিখিত। যাস্ক-প্রণীত নিরুক্তেরই এখনো অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইনি পাণিনির পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পণ্ডিতগণের মতানুসারে যাস্ক খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর গ্রন্থকার। ... যাস্কের পূর্বে ১৭ জন নিরুক্তকারের নাম পাওয়া যায়। নিরুক্তের প্রথম অধ্যায়ে শব্দশাস্ত্রের সাধারণ বিষয়গুলি উল্লিখিত আছে। ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে একার্থবোধক শব্দগুলির নির্ঘণ্ট এবং ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দুরূহ শব্দগুলির অর্থ দেওয়া আছে। ৭ম হতে ১২শ অধ্যায়কে শেষ ছয় অধ্যায় বলে — এর নাম দৈতবকাণ্ড। ১৩শ ও ১৪শ অধ্যায় নিরুক্তের পরিশিষ্ট। যাস্ক শব্দগুলির মূলজ ধাতুগত অর্থ গ্রহণ করে তারই সাহায্যে বেদ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **নিরুক্ত** একটি গ্রন্থের নাম। এই গ্রন্থটির গ্রন্থকার যাস্ক। এটিই বিশ্বের আদি শব্দকোষ। এর বিশেষত্ব হল, এই গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, শব্দের অর্থ শব্দের বাইরে নয়, শব্দের ভিতরেই রয়েছে, থাকে। যাস্ক রচিত এই গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে — 'শব্দের অর্থসাধন করা নিরুক্তের কার্য্য। যদি দেখা যায় ব্যাকরণানুমত প্রণালী অবলম্বন করিয়া কোনও শব্দবিশেষের অর্থ সাধন করা যায় না, তাহা হইলে সম্প্রসারণরূপ প্রণালী অবলম্বন করিবে; অর্থাৎ দেখিতে হইবে ... ... সম্প্রসারণযোগ্য বর্ণের সম্প্রসারণ করিয়া অর্থ নিষ্পত্তি করা যায় কি না। ... যদি ইহাতেও অর্থসাধন অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বর্ণসামান্যের ও অক্ষরসামান্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।' (নিরুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯১)। অর্থাৎ শব্দের অক্ষরই অর্থধারণ করে, শব্দে ধৃত মনোভাবকে ব্যাপ্ত করে। তার ভেতরে অর্থ রয়েছে, সেই অর্থ সে ব্যাপ্ত করে। চালক, কারক ... প্রভৃতি শব্দে অন্ত্য-'ক' মানে 'করে যে'। এই 'ক' অর্থহীন বর্ণমাত্র নয়। সে বেদ বা জ্ঞান ব্যক্ত করার যোগ্যতা ধরে। তাই সে **অক্ষর**। মোট কথা, **নিরুক্ত** নামক পৃথিবীর আদি অভিধান জানাচ্ছে যে, মানুষের মুখের ভাষার প্রতিটি শব্দের ভিতরে তার বর্ণগুলিতেই শব্দটির অর্থ ধরে রাখা আছে। শব্দার্থ জানার জন্য শব্দের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

নির্গুণ : ২. *নির্গত গুণ যাহা হইতে; যাহার কোনো গুণ নাই অথবা এত গুণ যে সর্বোচ্চ গুণের গুণবানকেও তার সঙ্গে তুলনা করা যায় না।* ৫. আমাদের সংস্কৃতির গভীরে অন্তঃসলিলা হয়ে শব্দটি আজও প্রবাহিত রয়েছে। লোকে কমবেশি জানে, **নির্গুণ** একটি অত্যন্ত উচ্চমানের ব্যাপার। সগুণ-ব্রহ্ম, **নির্গুণ**-ব্রহ্ম এসব কথা এখনও কারও কারও মুখে শুনতে পাওয়া যায়। সবাই কেমনভাবে জানি বোঝেন, **নির্গুণ** ও গুণহীন আদৌ এক ব্যাপার নয়। আসলে, শব্দটি অনেকটা **অমূল্য** শব্দের মতো — যার কোনো মূল্য নেই, অথবা এত মূল্য যে সে মূল্য দেওয়া যায় না। ঠিক সেইরকম।

একালের মতো করে এর একটি সহজ বাস্তব প্রয়োগ দেখানো যেতে পারে। একটি ১০০ টাকার নোটের এতখানি গুণ আছে যে, তা দিয়ে ১০০ টাকার বস্তু কেনাকাটা করা যায়। ১০ লাখ টাকার চেকেরও অনেক গুণ আছে, তা দিয়ে ১০ লাখ টাকার সমান পরিমাণের বস্তু বা বিষয় কিনে আনা সম্ভব। যদিও শিশু পাগল ও গরু ছাগলের কাছে ঐ নোট বা চেকটির কোনো মূল্যই নেই। তারা ওই দুটিকে পা দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাবে। কিন্তু 'ব্ল্যাংক চেক'? সে গুণবান, না কি গুণহীন? আমাদের বিচারে এই ব্ল্যাংক-চেকই প্রকৃতপক্ষে **নির্গুণ**। কেননা, পশু শিশু পাগল ও অক্ষরজ্ঞানহীনের কাছে 'ব্ল্যাংক-চেক'-এর কোনো গুণ নেই, মূল্য নেই; বিপরীতে সাংসারিক বুদ্ধিসম্পন্ন গড়পড়তা মানুষের কাছে 'ব্ল্যাংক-চেক'-এর অশেষ গুণ। যে-ব্যক্তি যত ধনী সে তত বেশি পরিমাণ অঙ্ক ঐ চেকে লিখে তাকে তত বেশি টাকায় পরিণত করে নিতে পারে। তার মানে, চেকে যখন টাকার অঙ্ক লিখে সই করা হয়ে যায়, সেই চেকটি 'সগুণ'-চেকে পরিণত হয়ে যায়; আর যত টাকার অঙ্ক লেখা হয়, চেকটির গুণ হয় তত টাকা। আর টাকার অঙ্কের ঘর ফাঁকা রেখে দিয়ে সই করা হয়ে গেলে, সেই চেকটি হয়ে যায় **নির্গুণ**। 'পার্টিসিপেটর'-এর বা ভক্তের স্বভাবগুণে সেই চেকটির গুণনির্ণয় হয়ে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ব্ল্যাংক-চেককে শূন্য বলে মনে হলেও কার্যত সে শূন্য নয়, তার শূন্যতা হল শক্তিপূর্ণ-শূন্যতা। একেই বলে **নির্গুণ**।

ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের বহু-অলোচিত **নির্গুণ-ব্রহ্ম** এইরূপ অতি উচ্চ মানের শক্তিপূর্ণ-শূন্যতার আধার। তার কদর অধ্যাত্মবাদীদের কাছে তাই সবচেয়ে বেশি। আমাদের 'চ' গ্রন্থে '*শূন্য কিন্তু জিরো নয়, ব্র্যাংক চেকের মতো ফাঁকা*' নিবন্ধে এর আরও ব্যাখ্যা রয়েছে।

নির্ব্বচন : ২. *নির্গত যে বচন।* ৫. অব্যক্তকে বচনের সাহায্যে প্রকাশ করাকে বলা হয় **নির্ব্বচন**। শব্দটির যথার্থ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত **নিরুক্ত** গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের বিভিন্ন শ্লোকের ব্যাখ্যা অংশে। উদাহরণস্বরূপ — 'যে সকল কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রয়োগ মাত্র বেদেই দৃষ্ট হয়, তাহাদের **নির্ব্বচন** যে বৈদিক ধাতু হইতেই করিতে হইবে তাহা নহে, লৌকিক সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ ধাতু হইতেও সেই সকল শব্দের **নির্ব্বচন** করিতে বাধা নাই।' (*নিরুক্ত*, সম্পা. অমরেশ্বর ঠাকুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃষ্ঠা ১৯২)।

নির্ব্বাচন : ২. *নির্গত যে বাচন।* ৫. 'বাচক দিয়ে বলা' বাক্যবন্ধটি গ্রামবাংলায় আজও প্রচলিত আছে। এর অর্থ হল, কোনো বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে বলা। প্রকৃতপক্ষে 'বচ্' বা উচ্চারণ অন (on) থাকে যাতে সেই হল 'বচন'; এ হল শুধুমাত্র 'উচ্চারণ করে বলা'। আর, এই 'বচন থেকে জাত' যে, তাকে 'বাচন' বলে। নির্গত বাচন বা **নির্ব্বাচন** একশো জনের ভিতরে একজন সম্পর্কে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে কিছু বলে। একালে একে বলা হয় 'ধ্বনিভোট'। তার মানে, একালে যাকে ভোট বলে, **নির্ব্বাচন** শব্দটির অর্থের সঙ্গে তা খাপ খায় না। ভোটারগণ যদি প্রকাশ্যে মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে কারও সম্পর্কে কিছু বলত (সমর্থনের কথা বা বিরোধিতার কথা বলত) তখন তাকে **নির্ব্বাচন** বলা যেতে পারত।

নির্ব্বাণ : ১ নির্ + ✓বা + ত (ক্ত) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নিঃশেষিত বা অন থাকে যাহাতে; সমস্ত বাণ নির্গত যাহা হইতে; যে নিভে গেছে।* ৩. শান্ত, দীপ্তিরহিত, মোক্ষপ্রাপ্ত, অস্তগত, কৃতমজ্জন, অস্তগমন, অন্তর্ধান, নির্বৃতি, মোক্ষ, লয় ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. ধর্মীয় আলোচনায় এখনও 'সর্বোচ্চ প্রাপ্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৫. শব্দটির মূলে রয়েছে 'বাওয়া' বা 'বয়ে যাওয়া' ক্রিয়া। যে সত্তা তার বয়ে যাওয়া ক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করেছে; উৎস থেকে জন্মে সমগ্র প্রবাহপথ পরিক্রমা করে অন্তিমে সেই প্রবাহপথের শেষ বিন্দু অতিক্রম করে গেছে, সেই সত্তা **নির্ব্বাণ** প্রাপ্ত হয়েছে। অন্যভাবে বললে, যার সব **বাণ** নিঃক্ষেপ করা হয়ে গেছে, অস্তিত্বের তূণে আর একটিও বাণ নেই, সেই সত্তাই **নির্ব্বাণ** লাভ করেছে।

নিষাদ (নিষণ্ণ, নিষদ্যা, নিষধ) : ১. নি + ✓সদ্ + অ (ঘঞ্) - অধিকরণে। (ব.শ.)। ২. ***নিষাদ** = নিঃসারিত সদ (পণ্য) দেয় যে। **নিষণ্ণ** = নিঃসারিত সদ্ অন থাকে যাহাতে। নিষদ্যা = **নিষদ** থাকে যাহাতে তাহার আধার। **নিষধ** = নিঃসারিত দিশাগ্রস্ত শক্তিবিচ্ছুরণ ধারণ করে যে।* / **নিষাদ** = পাপের আধার যে। (ব.শ.)। ৩. **নিষাদ** = ব্যাধ, কিরাত, চৌর্য্যবৃত্তি-দস্যুবৃত্তিসূচক কটুভাষী মৎস্য-মাংসলোভী ব্রাহ্মণ। **নিষণ্ণ** = আসীন, উপবিষ্ট। **নিষদ্যা** = পণ্যবিক্রয়শালা, দোকান। **নিষধ** = পর্ব্বত-বিশেষ, দেশবিশেষ, নিষধবাসীগণ, নিষধরাজগণ, নিষাদস্বর। (ব.শ.)। **নিষাদ** = (ক) অনার্য জাতি। কোশল রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে এদের রাজ্য। শৃঙ্গবেরপুর এদের রাজধানী ও রামসখা গুহক এদের রাজা ছিলেন। নিষাদরাজ মৎস্য, মাংস ও মধু উপহার নিয়ে ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। (খ) রাজা বেণের শরীর হতে উদ্ভূত জাতিবিশেষ। অগ্নিপুরাণে দেখা যায় — রাজা বেণের উরু মথিত হতে থাকলে এক কৃষ্ণবর্ণ খর্বাকৃতি পুরুষের জন্ম হয়। এই পুরুষ জন্মমাত্র ভীত অবস্থায় কৃতাঞ্জলিপুট হয়ে থাকে। তখন সকলে একে বলে 'নিষীদ' অর্থাৎ উপবেশন কর। সেই হতে এই পুরুষ নিষাদবংশের সৃষ্টিকর্তা হয়। মনুসংহিতায় দেখা যায় — এই জাতি ব্রাহ্মণের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. দ্র. **অগস্ত্য, কিরাত, নল, দময়ন্তী**। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রের উদ্ভবের আগে যৌথসমাজের ভিতরে বেণিয়ার আদিপুরুষ রূপে যে **বেণ**-এর জন্ম হয়, তার সান্নিধ্যে এই **নিষাদ**-এর উদ্ভব হয়েছিল। এ হল আদি ফেরিওয়ালা। সেকালে অধিক উৎপন্ন হয়ে গেলে সেই উৎপন্নকে 'পাপ' বলা হত। সেই কারণে আদি দোকানদারকে বলা হত 'পাপের আধার'। ব.শ. সেই সাক্ষ্যই দিয়ে গিয়েছেন। ...

ন্যায় (ন্যায়পথ, ন্যায়বাদী, ন্যায্য, অন্যায়, অন্যায্য) : ১ নি + ✓ই + অ (ঘঞ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *গতিশীল অন্-কৃত গতিতে যায় যে; যে যাওয়া পূর্বে ঘটেছে তার মতো যায় যে। **ন্যায্য** = **ন্যায়** থাকে যাহাতে। **অন্যায়** = দ্র. ই। **অন্যায্য** = **অন্যায়** থাকে যাহাতে।* / **ন্যায়** = উচিত হইতে অচলন (যাহাতে)। (ব.শ.)। ৩. **ন্যায়** = সমঞ্জস, বিচার, ঔচিত্য, ব্যবহারপদ, ধর্ম্ম, নয়, উপায়, সাধুতা, যথাশাস্ত্র শাসননীতি, শাস্ত্র, উদাত্তাদি স্বর, গৌতমকৃত দর্শনবিশেষ, ন্যায়দর্শন, তর্কশাস্ত্র, সদৃশ, তুল্য, লোকশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তবিশেষ (popular maxim)। **ন্যায়পথ** = মীমাংসাশাস্ত্র, ধর্ম্মমার্গ। **ন্যায়বাদী** = ন্যায়-কথনশীল, সত্যবাদী। **ন্যায্য** = ন্যায়ানপেত, উচিত, ন্যায়সিদ্ধ, ন্যায়ভব, ধর্ম্ম্য, শাস্ত্রীয়। **অন্যায়** = দ্র. ই। **অন্যায্য** = ন্যায়ভিন্ন, ন্যায়রহিত, অনুচিত, অযৌক্তিক। (ব.শ.)। ৪. প্রদত্ত প্রতীকী অর্থে শব্দগুলি প্রচলিত। ৫. **ই** ক্রিয়া পরিবারে **অন্যায়** দ্রষ্টব্য। আগে যেমন হয়েছে তার ন্যায় করাকেই **ন্যায়** বলে। ন্যায়শাস্ত্র আসলে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিষয়, বস্তু, ক্রিয়ার **ন্যায়** বা অনুরূপ কাজ করার ঔচিত্যবাদী শাস্ত্র। সেই সুবাদে বিশেষ কালে বিশেষ সমাজে যে মত প্রতিষ্ঠিত, তার বাইরের যে কোনো মতই সেই সমাজের চোখে **অ-ন্যায়**। ... যা কখনো বা এখনো ঘটেনি, তা সত্য নয়; যা ঘটে গেছে, তাই সত্য। সেই কারণে ইতোপূর্বে যা ঘটে গেছে, তার মতো যে বলে, তাকে ন্যায়বাদী বা সত্যবাদী বলা হয়ে থাকে। বেদবাদীগণের অন্ধ অনুসরণকারী **গৌতম** এই ন্যায়দর্শনের প্রণেতা। বলে রাখা ভাল, **ন্যায়**নীতি আবিষ্কারের বা উদ্ভাবনের বিরোধী। কেননা, আবিষ্কার বা উদ্ভাবন আগের মতো নয়, সে নতুন, তাই কারও ন্যায় নয়, তাই ন্যায়দর্শনের চোখে **অন্যায়** পদবাচ্য। অসীম বিপুল বিশাল অনাবিষ্কৃতকে **কৃষ্ণ** বলে। সদ্য আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত কিন্তু এখনও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত নয়,

তাকে **শ্যামসুন্দর** বলে। আবিষ্কৃত-উদ্ভাবিত এবং সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীতকে **রাধা** বলে। দ্র. **গৌরী**।

ন্যূন (ন্যূনাধিক) : ১ নি + ✓উন্ (পরিহাণ) + অ (অচ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ন্যূন = নি (নিহিত বা গতিশীলভাবে অন্-কৃত) অল্পায়ন ক্রিয়া অন যাহাতে।* ৩. **ন্যূন** = পরিহীণ, বিরহিত, ঊন, কম, গর্হ্য, অধম, অবর। **ন্যূনাধিক** = কম-বেশী, লঘু-গুরু, উচ্চ-নীচ। (ব.শ.)। ৪. minimal অর্থে **ন্যূন** প্রচলিত; **ন্যূনাধিক** অপ্রচলিত। ৫. কোনো বিষয় বা বস্তুকে সার্বিক ভাবে ক্ষুদ্রতর আকারের করে দেয় যে, তাকেই **ন্যূন** বলে। তবে **ন্যূনাধিক** শব্দের যে উদাহরণটি ব.শ. দিয়েছেন, তা এককথায় অনবদ্য। সেটি হল — 'এক হয়ে দুই (স্ত্রী-পুরুষ) হইলা লীলার কারণ। দুই মধ্যে ন্যূনাধিক নাহি কোন জন।।' ধারণাটি রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও পাওয়া যায়। ৬. ইংরেজি nano।

নী ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অগ্নি, অগ্রণী, অতিপ্রণয়, অনয়, অনায়ক, অনিত, অনীত, অনীতি, অনুনয়, অনুপনীত, অপনয়, অবিনয়, অবিনীত, অবিনির্ণয়, অভিনয়, অভিনীত, অভিনেতা, আণ, আন, আনয়ন, আনয়িতব্য, আনা, আনায়, আনি, আনীত, আনীল, আনেতব্য, আনেয়, উন্নয়ন, উন্নীত, উপনয়, উপনীত, দুর্ব্বিনয়, নওয়া, নঞ্‌শ, নঞ্জান, ননী, নয়, নয় (nine), নয়ছয়, নয়ন, নয়নকোণ, নয়নগোচর, নয়নচ্ছদ, নয়নজুলি, নয়নতারা, নয়নপথ, নয়নসুখ, নয়না, নয়নাঞ্চল, নয়নাঞ্জন, নয়নাভিঘাত, নয়নাভিরাম, নয়নাসার, নয়নী, নয়নোৎসব, নয়নোপান্ত, নাএক, নাএব (নায়েব), নায়, নায়ক, নায়কী, নায়িকা, নায়েক, নিয়ে-নেয়, নির্ণয়, নির্ণীত, নী, নীকাশ, নীচ, নীচক, নীচকৈঃ, নীচগ, নীচগা, নীচযোনি(নী), নীচু, নীচৈঃ, নীঝর, নীড়, নীত (net = যার দ্বারা আনীত হয়), নী(নি)তবর, নীতি, নীতিকুশল, নীতিজ্ঞ, নীতিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, নীতিবিশারদ, নীতিসন্ধি, নীপ, নীর, নীরজ, নীরদ, নীরধর, নীরধি, নীরনিধি, নীরেন্দ্র, নীল, নীলক, নীলকণ্ঠ, নীলকমল, নীলকর, নীলকান্ত, নীলকুঠি, নীলক্রৌঞ্চ, নীলগাই, নীলগাউ, নীলগিরি, নীলগ্রীব, নীলতাল (হিন্তাল, হেঁতাল), নীলধ্বজ, নীলপটল, নীলপদ্ম, নীলবর্ণ, নীলবসন, নীলবাসাঃ, নীলবৃষ, নীলমক্ষিকা, নীলমণি, নীলমাধব, নীলরতন, নীলরত্ন, নীলরাজি, নীললোহিত, নীলসার, নীলা, নীলাঙ্গ, নীলাঙ্গিনী, নীলাঙ্গী, নীলাচল, নীলাঞ্জন, নীলাঞ্জনা, নীলাদ্রি, নীলাব্জ, নীলাম্বর, নীলাম্বরী, নীলাম্বু, নীলাশ্মা, নীলিম, নীলিমা, নীলী, নীলোৎপল, নীলোপল, নু, নেওয়া, নেত, নেতব্য, নেতা, নেতুড়, নেত্র, নেত্রকোষ, নেত্রগোচর, নেত্রচ্ছদ, নেত্রজল, নেতপাট, নেত্রবন্ধ, নেত্রমল, নেত্রযোনি, নেত্ররঞ্জন, নেত্ররোগ, নেত্রানন্দ, নেত্রান্ত, নেত্রাভিষ্য(স্য)ন্দ, নেত্রাম্বু, নেত্রী, নেত্রোৎসব, নেত্রৌষধ, নেন-দেন, নেপথ্য (আনয়ন-পথ যাহাতে), নেপাল, নেমি, নেয়, নেয়া, নেষ্টা, প্রণয়, প্রণয়ন, প্রণয়ী, প্রণীত, বিনয়, বিনয়ী, বিনায়ক, বিনির্ণয়, বিনীত, লওয়া, লয়, লয়-ছয়, লাএক, লায়েক, সপ্রণয়, সবিনয়, সমুপানয়ন, সুনয়ন, সুনয়নী, সুবিনীত।

নী = গতিশীল ন-এর আধার যে।

নয় (নও, নওয়া, নয়ছয়-করা, নিয়ে-নেয়, নেওয়া, নেয়া, লওয়া) : ১. ✓নী + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নয় = গতিশীল ন-এর (ন-কারীর ও অন্-কারীর) আধার থাকে (যায়) যাহাতে। নয়ছয়-করা = যাহাতে নয় করা ও ক্ষয় করা হয়।* ৩. **নয়** = নেতা, নীতিযুক্ত, নীতি, শাস্ত্র, ন্যায়, চক্রাদিব্যূহরূপে সেনান্যাস, দ্যূতবিশেষ, উপায়, সিদ্ধান্ত, নীতিপ্রয়োগ, মত, পদ্ধতি, বিষ্ণু, প্রাপণ, আচরণ; নবসংখ্যক। **নয়ছয়-করা** = নষ্ট করা। (ব.শ.)। ৪. to negate অর্থে প্রচলিত। ৫. একই **নয়** শব্দের অর্থ একাধারে ৯-সংখ্যা, নেতা, নীতি ... ইত্যাদি নানারকম হচ্ছে কীভাবে, তা বোঝার চেষ্টা করা যাক। ক্রিয়ামূলের বিচারে দেখা যাচ্ছে, (**অক্ষর** শব্দের মতো) **নয়** শব্দটিও দু'ভাবে প্রসূত হয়েছে — **নী** থেকে (নী + অ > নয়) এবং **নু** থেকে (নু + অ > নব > নয়)। এই **নু** থেকে জাত **নয়** শব্দটিই ৯-সংখ্যা বাচক এবং তা সেকারণেই আলোচিত হবে **নব (নু)** শব্দে। এখানে আমরা **নী**-জাত **নয়** নিয়েই আলোচনা করব। এই নী-ও একটি যুগ্ম ক্রিয়ার কথা বলে — ন-করণ, ও অন্-করণ। ...

নী হল **নি**-এর আধার। আমরা আগেই দেখেছি, **ন** সত্তাটি একই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয়কে নাশ করে এবং প্রয়োজনীয়কে অন্ (on) করে দেয়। অংরূপিনী পরমাপ্রকৃতির সেটিই স্বভাব। **নয়** করাই অস্তিত্বের অগ্রগতির বা বিকাশের 'উপায়'। এই 'উপায়'বাচক **নয়** শব্দের সঙ্গে **আয়** ও **উপায়** শব্দদুটির তুলনা করলেই **নয়** শব্দের প্রকৃত অর্থ আমরা সহজে বুঝে নিতে পারি। **উপায়** হল 'আয়ের উপ (সহযোগী) যে'; আর **আয়** হল 'যা আসে'। সেই সুবাদে **নয়** হল 'যা আনে', এবং একই সঙ্গে 'যা নাশ করে'। এই **নয়** থেকেই একদিকে যখন 'নও', 'নেয়', 'নিয়ে যায়', 'নিয়ে নেয়', 'নেওয়া', 'নেয়া', 'নে', 'লওয়া' ... প্রভৃতি শব্দ প্রসূত হয়েছে; অন্যদিকে তেমনি নাশ হয়, নষ্ট হয়, না হয়, ন-করণ হয়ে যায়। তাই প্রকৃতপক্ষে কোনো কিছু নিতে গেলে, **নয়** করতে গেলে একদিকে অপ্রয়োজনীয়কে সরিয়ে, ফেলে দিয়ে, মেরে, নাশ করে, ধ্বংস করে ফেলতে হয়, অর্থাৎ **নয়** করে দিতে হয়; অন্য দিকে প্রয়োজনীয়কে চাগিয়ে, উদ্দীপ্ত করে, তুলে ধরে, আপন কেন্দ্রের দিকে আনতে হয়, **নয়** করতে হয়, **আনয়ন** করতে হয়; আ-নয়-অন করতে হয়। এই যে **নয়** করা, বাঁহাতে জঞ্জালকে সরিয়ে বা **নয়** করে দিয়ে ডানহাতে পাকা ফলটি কুড়িয়ে **নেওয়া** বা **নয়** করা; এটি একটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক রীতি। অধিকাংশ জীবই এই রীতি অনুসরণ করে থাকে। এই রীতি অনুসরণ করাই মানুষেরও স্বাভাবিক '**নয়** করার বা **নীত** করার রীতি' অর্থাৎ **নীতি** হয়ে দাঁড়ায়। যে কারণে উপরোক্ত (৩-এ প্রদত্ত) অর্থগুলিই **নয়** শব্দটির অর্থ হয়ে যায়। ... তবে এই যে যুগপৎ নাশকারী ও আনয়নকারী দ্বৈত-স্বভাবী **নয়**, তার চরিত্র অনেকটা **কার**, **চার** প্রভৃতি শব্দের মতো। নিজের অর্থের এলাকা যত না ব্যাপক ও স্পষ্ট, তার চেয়ে উপসর্গ-যোগে তার যে সন্তানাদি জন্মায় তাদের অর্থের মর্ম যেমন অনেক বেশি স্পষ্ট তেমনি এলাকাও বিশাল। যেমন — **অতিপ্রণয়, অনয়, অনুনয়, অপনয়, অবিনয়, অবিনির্ণয়, অভিনয়, আন, আনয়ন, আনয়িতব্য, আনা, আনায়, আনি, আনেয়, উন্নয়ন, উপনয়, দুর্ব্বিনয়, নির্ণয়, প্রণয়, প্রণয়ন,**

প্রণয়ী, বিনয়, বিনয়ী, বিনির্ণয়, সপ্রণয়, সবিনয়, সমুপানয়ন ... ইত্যাদি। — আর **নয়ছয়, লয়ছয়** প্রভৃতি শব্দের উৎস হল 'নয়ক্ষয়'। হিন্দিতে **ক্ষয়** শব্দটির উচ্চারণ হয় **ছয়**, হিন্দিতে যেমন লক্ষ্মী পরিণত হয়েছেন 'লছ্‌মী'তে। আমরা বাংলাভাষীরাও সেই **ছয়**কেই এক্ষেত্রে **নয়**-এর সঙ্গে জুড়ে নিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে এটি ষট্ থেকে জাত **ছয়** নয়। ... ৬. ইংরেজি net।

নির্ণয় : ১ নির্ + ✓নী + অ (অচ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নির্ (নির্দ্ধারিত) নয় যাহাতে।* ৩. নিশ্চয়, অবধারণ, গুণদোষনির্দ্ধারণ, বিবাদনিরাকরণ, বিচার। (ব.শ.)। ৪. to decide অর্থে প্রচলিত। ৫. কাকে নাশ (**নয়**) করা হবে আর কাকে আনয়ন (**নয়**) করা হবে, কাকে মেরে ফেলা হবে আর কাকে বাঁচানো হবে, কে যাবে আর কে থাকবে ... এই সব **নির্** (নির্দ্ধারণ) **নয়** করাকে বলে **নির্ণয়** করা।

নয়ন : ১. ✓নী + অন (ল্যুট্) - করণবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নয় অন (on) যাহাতে।* / যাহার দ্বারা বিষয়ে বুদ্ধি নীত হয়। (ব.শ.)। ৩. লোচন, প্রাপণ, আনয়ন, যাপন, বিনয়ন। (ব.শ.)। ৪. eye অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. অভাবী মানুষ তার অভাব পূরণ করার জন্য নিজের পরিধির বাইরে হাত বাড়ায়, কিছু না কিছু আনতে যায়। কিন্তু প্রথমেই মানুষ নিজে যায় না, সবার আগে যায় তার চোখ। দ্র. **চক্ষু, অক্ষি, নিমেষ**। সে গিয়ে অপ্রয়োজনীয়গুলিকে দেখে না, দেখে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয়গুলিকে। তারপর সেগুলির ছবি তুলে নিয়ে আসে, মনের মণিকোঠায় জমা দেয়। তার মানে, যুগপৎ **নয়**-কারী (নাশকারী-আনয়নকারী) অন (on) হয়ে থাকে আমাদের **নয়ন**-এ। আর সেজন্যই তাকে **নয়ন** বলে। এই **নয়ন** দর্শন-অযোগ্য সরিয়ে দিয়ে দর্শন-যোগ্যকে দেখে, তার প্রতিচ্ছবি **আনয়ন** ক'রে আমাদের মনের মণিকোঠায় পৌঁছে দেয়। তাই তাকে **নয়ন** বলে।

নায়ক (নায়িকা, নায়েক, বিনায়ক, লায়েক) : ১. ✓নী + অক (ণ্বুল্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নায়ক = অকাম্য-নাশ ও কাম্য-আনয়ন করে যে। নায়িকা = নায়কের প্রকৃতি শক্তি যে। নায়েক (লায়েক) = নায়ক দিশাগ্রস্ত যাহাতে। বিনায়ক = বিশেষ বা বিপরীত নায়ক যে।* ৩. **নায়ক** = প্রাপক, নেতা, অগ্রণী, শ্রেষ্ঠ, প্রভু, রাজা, সেনাপতি, দশগ্রামের অধিকারী, হার-মধ্যমণি, শাক্যমুনি, রতির আলম্বন, নিদর্শন, কবির আশ্রয়দাতা রাজা ইত্যাদি ...। **নায়িকা** = নেত্রী, শ্রেষ্ঠা, কর্ত্রী, গৃহস্বামিনী, পত্নী, দুর্গার অষ্টশক্তিভেদ (**অষ্ট-নায়িকা**), রতির আলম্বন রূপা নারী। **নায়েক (নাএক, লায়েক)** = গাঁয়ের প্রধান ব্যক্তি, গ্রামণী, উপাধিবিশেষ; সমর্থ, উপার্জ্জনক্ষম, যোগ্য, দক্ষ, পণ্ডিত, ফসলের যোগ্য। **বিনায়ক** = বিশিষ্ট নায়ক, বিঘ্ননাশক, নায়ক, নেতা, গুরু, বুদ্ধদেব, বিঘ্ন। (ব.শ.)। ৪. hero, heroine অর্থে **নায়ক, নায়িকা** প্রচলিত। **নায়েক, লায়েক** পদবীরূপে প্রচলিত। able অর্থেও **লায়েক** শব্দটি প্রচলিত। **বিনায়ক** শুধুমাত্র অর্থহীন নামরূপে প্রচলিত। ৫. সমাজ-পরিচালক বা নেতা তিনিই হন, যিনি সকলের চেয়ে ভাল সামাজিক আনয়ন কর্ম চালাতে পারেন। তবে একালে যাকে 'খলনায়ক' বলা হয়, সেকালে সম্ভবত তাকে **বিনায়ক বলা হত**। **বুদ্ধদেবকে বিনায়ক** বলার কারণ হল তিনি বেদবিরোধী **পক্ষের নায়ক ছিলেন**। তারও আগে লেনদেনকারী (দোকানদার, **বিনিময়কারী** ...) সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ শক্তি ছিল **গরুড়**। পুরাণাদিতে তাকেও **বিনায়ক** বলা হয়েছে। দ্র. **পদবী**।

নীত (আনীত, নীতবর) : ১. ✓নী + ত (ক্ত) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নীত = নী (নয়) তারিত যাহাতে; অথবা, যাহা আনয়ন করা হইয়াছে। আনীত = নীত-এর আশ্রয় যাহাতে। নীতবর = বরের সহিত নীত যে।* ৩. **নীত** = প্রাপিত, আনীত, যাপিত, গৃহীত। **আনীত** = স্থানান্তরপ্রাপিত, কৃতবহন। **নীতবর** = বিবাহে বরের সঙ্গী মিত্রভাবাপন্ন বর, কোলবর। (ব.শ.)। ৪. 'নীতবর' যথার্থে প্রচলিত, **নীত** অপ্রচলিত। ৫. যাকে **নয়** করে নিয়ে আসা হয়েছে, সেই নীত। এভাবে, যাহা দ্বারা **নীত** হয় বা **আনীত** হয় তাকেও নীত বলা যায়। **নয়** শব্দ থেকে উপসর্গ যোগে যেমন বহু শব্দ সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি **নীত** শব্দ থেকে উপসর্গ যোগে বহু শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। যথা — **অনীত, অনুপনীত, বিনীত, অভিনীত, অভিনেতা, আনীত, আনেতব্য, উন্নীত, উপনীত, নির্ণীত, প্রণীত, বিনীত, সুবিনীত** ... ইত্যাদি। ৬. ইংরেজি neat।

নীতি : ১. ✓নী + তি (ক্তিন্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নীত গতিশীল যাহাতে; অথবা, যাহার দ্বারা যথাযথভাবে নীত করা বা আনয়ন করা যায়।* ৩. নয়ন, প্রাপণ, অনুশাসনবাক্য, শুক্রাদিকৃত অনুশাসনগ্রন্থ, নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, অর্থশাস্ত্র, ন্যায়, নয়, সামদানাদি উপায়, নীতিসংগ্রহ, শিষ্টাচরণ, উপায়, কল্প। (ব.শ.)। ৪. principle অর্থে প্রচলিত। ৫. **নীত** গতিশীল যাহাতে, সেই হল **নীতি**। তার মানে **নয় কর্ম্মটি** ক'রে (কিছুকে বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু ও বিষয়গুলিকে আনতে থাকলে) যে **নীত-কর্ম্ম** হতে থাকে, সেটি একটি **নীতি**-জালের মতো। দ্র. **গৈতিজাল**। তাতে ফাঁক থাকে, আবার থাকেও না। ফাঁক দিয়ে অপ্রয়োজনীয় গলে যায়, প্রয়োজনীয় থেকে যায়। ইংরেজিতে এই **নীতিজালই** net-পদবাচ্য। **নীতিমান** ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বব্যবস্থা থেকে 'এটা নেব না, এটা নেব' — ইত্যাকার আচরণের যে বিশেষ নিয়ম পালন করেন, সেটিই তাঁর প্রয়োজনীয় বিষয় ও বস্তু সংগ্রহের পদ্ধতি; অতএব সেটিই তার **নীতি**। ভারতসমাজে সেই নিয়মের বিকাশ ঘটেছে সামবেদের সময় থেকে। পরে পরে এরই উপর সমস্ত **নীতিশাস্ত্র** গড়ে উঠেছে। সেই নিয়মের যাথার্থ এমনকি **লক্ষ্মী** শব্দের অর্থেও পাওয়া যায়। ব.শ. **লক্ষ্মী** শব্দের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ দিয়েছেন, 'যিনি নীতিমানকে দেখেন'। তার মানে, যিনি **নীতিমান, নীতি**কে দেখেন, ধনসম্পদও তাকেই দেখে। ৬. ইংরেজি net।

নীর (নীরজ, নীরদ, নীরেন্দ্র) : ১. ✓নী + র (রক্) - কর্তৃবাচ্যে। নি + ✓ঈর্ + অ (ক)। (ব.শ.)। ২. *নীর = নী রহে যাহাতে। নীরজ = নীর হইতে জাত। নীরদ = নীর দেয় যে। নীরেন্দ্র = নীর সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।* / **নীরজ** = জল হইতে জাত যে। **নীরদ** = জল দেয় যে। (ব.শ.)। ৩. **নীর** = জল, রস। **নীরজ** = জলজাত,

উদ্বিড়াল, উশীর, পদ্ম। **নীরদ** = মেঘ, মুস্তক, মুথা। **নীরেন্দ্র** = জলাশয়শ্রেষ্ঠ, সমুদ্র। (ব.শ.)। ৪. water অর্থে প্রচলিত। ৫. ব.শ. শব্দটির দুরকম ব্যুৎপত্তি দেখিয়েছেন। প্রথমটি প্রাচীন উনাদি সূত্র থেকে নেওয়া, দ্বিতীয়টি বৌদ্ধযুগে রচিত অমরকোষ থেকে। একই শব্দ দুই কালে দুরকম অর্থ হয়ে যাওয়ার কারণ হল, **নীর** শব্দটি যাকে বোঝানো হত, তার স্বভাব প্রাচীন কালে যা ছিল বৌদ্ধযুগে তা বদলে গিয়েছিল। **নী** রহে যাহাতে তাকে **নীর** বলা হত প্রাচীন কালে। তখন যৌথসম্পদ ছিল পুকুরের মতো, হ্রদের মতো, সমুদ্রের মতো। আর, নির্গত ঈরণ যাহাতে তাকে **নীর** বলা হত বৌদ্ধ যুগে, যখন ব্যক্তিমালিকানা ও বিনিময় কেবল প্রতিষ্ঠিতই নয়, ব্যক্তিগত পণ্য নির্গত হয়ে ঈরণ করছে বা সব দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, বায়ুতে নিম্নচাপ দেখা দিচ্ছে, বিশেষ দিকে ব্যক্তিগত পণ্যও ছুটতে শুরু করেছে। এও **নীর**, তবে এ **নীর** বৃষ্টি ফোঁটার মতো বিন্দু সমূহের সমাহার। এতেও সম্পদের ভাণ্ডার জমছে, পুকুর হ্রদ খাল বিল ভরছে, তবে সেসবই ব্যক্তিগত পুকুর বা হ্রদ, ব্যক্তিগত খাল বিল। আজও সমগ্র সমাজ জুড়ে প্রবাহিত সম্পদের ধারাকে এবং রাজকোষ বা রাষ্ট্রীয় সম্পদকে ব্যক্তিগত করা যায়নি বলেই নদী ও সমুদ্রকে 'আমার নদী' 'তোমার নদী' কিংবা 'আমার সমুদ্র' 'তোমার সমুদ্র', এভাবে ব্যক্তিগত নদী বা ব্যক্তিগত সমুদ্রে পরিণত করা যায়নি। ...

নীল : ১. ✓নীলী + অ (অন্)। (ব.শ.)। ২. *নী (গতিশীল ন-কারীর ও অন্-কারীর আধার) লালিত-লয়প্রাপ্ত যাহাতে।* / যাহা নীলী দ্বারা রঞ্জিত। (ব.শ.)। ৩. নীলবর্ণবান, শ্যামল, কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, নীলগিরি, মণিবিশেষ, নীল ওষধি, কুবেরের নিধিবিশেষ, বটবৃক্ষ, রামের কপিসেনাপতি, নীলকণ্ঠ পাখী, নীলবৃষ, লাঞ্ছন, চিহ্ন, মঙ্গল ঘোষ, নীলকর সাহেব, নীলচাষ; কাচলবণ, তালীশপত্র, বিষ, তুত্থাঞ্জন, সৌবীরাঞ্জন, নীলবর্ণ (indigo dye), অন্ধকার। (ব.শ.)। ... মণিবিশেষ (ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শনি); যদুর পুত্র, অজমীঢ়ের পুত্র, নীলিনীগর্ভসম্ভূত। (ছা.অ.)। ৪. blue অর্থে প্রচলিত। ৫. প্রশ্ন একই — **নীলকে নীল** বলে কেন? শব্দটির অন্তর্নিহিত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থ আমাদের জানায়, এর ভিতরে দু-জোড়া যমজ ক্রিয়া রয়েছে — ন-করণ (ক) ও অন্-করণ (খ), লালন করা (গ) ও লয় পাওয়া (ঘ)। সেই কারণে শব্দটির ক্রিয়াভিত্তিক অর্থই নয় প্রকার হতে পারে — কগ, কঘ, খগ, খঘ, কখগ, কখঘ, কগঘ, খগঘ, কখগঘ। ফলে, তার প্রায়োগিক অর্থ যে কত হবে, এক্ষুনি তা হিসেব করে বলা কঠিন। ...

আধুনিক তথ্যসমূহ আমাদের জানায়, **নীল** একপ্রকার বাহ্যিক রং মাত্রই নয়, সে একধরনের মানসিক রং বা জ্ঞানও (নীল-সাংবাদিকতা বা blue journalism) হয়। আবার সমুদ্রই কেবল **নীল** নয়, আকাশও **নীল**। আকাশের মতো **নীল** শূন্যকেও ইংরেজিতে nil বলে। আর, উপরোক্ত প্রাচীন তথ্যসমূহ বলছে, নীলগিরি, কুবেরের **নিধি**, বটবৃক্ষ (**banian tree**) ... প্রভৃতি ধনসম্পদের আধারগুলিও **নীল** হয়। গোপাল-দেবপাল-ধর্মপালের যুগে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে যখন নগদ-নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ রূপে **লীলা** করছেন, তখন কৃষি-উৎপাদনও বাজারমুখী; অর্থাৎ, বলরামও **নীল**বস্ত্রধারী। আর শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা-কারিণী রাধা তো চিরকালই **নীলাম্বরী**। ... বড় কাজ করতে গেলে সেই কাজে নষ্ট ও সৃষ্টি (ন-কারী ও অন্-কারী), কলঙ্ক ও গৌরব দুইই জোটে। কলঙ্কই তো বিষ, মনের বিষ, আর বিষের বাহ্যিক রঙের মতো মানসিক রং-ও **নীল** হয়। সেই কলঙ্ককেও **নীল** বলা হত বলেই শিবকে **নীলকণ্ঠ**, **নীলগ্রীব** হতে হয়েছিল। রামায়ণে অবশ্য আর এক **নীল** সত্তার কথা রয়েছে, তিনি **নীল**-সরস্বতী। **নীল**-জ্ঞানের বা blue-journalism-এর সে হল প্রাচীন ভারতীয় রূপ। ব.শ. অবশ্য এখানেই থামেননি, তিনি জানিয়ে গেছেন যে, **নীল** শব্দের ভিতরে 'শ্যামল', 'কৃষ্ণ' এবং 'অন্ধকার'ও রয়েছে। তাছাড়া **কাশ** যখন পণ্য, তখন তার আশ্রয় **আকাশ**কেও আমরা দেখি **নীলবর্ণ** হয়ে যেতে। আজ আমরা জানি, মহাশূন্য কৃষ্ণবর্ণ; হয়তো-বা কোথাও কোথাও একটু-আধটু শ্যামল থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তা কৃষ্ণবর্ণই বটে। কিন্তু নানান **কাশ**-এর আশ্রয় বলে শূন্য হওয়া সত্ত্বেও আমাদের উপরের আকাশটি কিন্তু শূন্য নয়, সেজন্যেই সে **নীলবর্ণ**। ...

নীল বিষয়ে এই যে বিচিত্র তথ্যসমূহ, এর মূলে রয়েছে একটিই ব্যাপার। যুগপৎ না-কারী ও হাঁ-কারী শক্তির লালিত ও লয়প্রাপ্ত হওয়া। দুটো যমজ ক্রিয়া একত্রে রয়েছে **নীল** শব্দের ভিতরে। তাই উপরোক্ত যে সত্তাগুলিকে **নীল** শব্দে শনাক্ত করা হয়েছে, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে হয় না-কারী শক্তির, কিংবা হাঁ-কারী শক্তির, অথবা উভয় শক্তির লালন, লয়, অথবা লালন-লয় উভয়ই রয়েছে। এবং সেজন্যই তাদের প্রত্যেককে **নীল** বলা হয়েছে। এদের একদল বাহ্যিক **নীল**, অপর দল মানসিক **নীল**। ...

সবক্ষেত্রে এই **নীল** সত্তাদের প্রত্যেকের **নীলত্ব** প্রমাণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তার জন্য যে পরিমাণ স্পর্শকাতরতা লাগে, তা আমাদের নেই; তা ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের। তাঁরা বলতে পারতেন, কাচলবণের ভিতরে, মঙ্গলঘোষণার মধ্যে, তালীশপত্রের ভিতরে, অন্ধকার-এর মধ্যে ... কী **নীলত্ব** তাঁরা দেখেছিলেন। আমাদের উত্তরসূরীরা যদি কোনোদিন আবার মানুষের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক স্বভাবে ফিরে যেতে পারেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এই রহস্যের উন্মোচন ঘটিয়ে দিতে পারবেন। ... ৬. ইংরেজি nil।

নীল : (ক) বানরবিশেষ। কথিত আছে, নীল অগ্নির অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইনি সুগ্রীবের সখা ছিলেন। বহু সহস্র বানরসহ ইনি সীতা-অন্বেষণে গমন করেন। সেতুবন্ধনের সময় এই বানর রামকে সাহায্য করে। (খ) মাহিষ্মতী নগরীর রাজা। অগ্নিদেব এঁর পরমাসুন্দরী কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে এঁকে বিবাহ করেন। রাজা নীলকে অগ্নি বর দেন যে, যিনি মাহিষ্মতী নগরী অবরোধ করবেন, তিনি দগ্ধ হবেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে সহদেব মাহিষ্মতী নগরী অবরোধ করলে অগ্নি সহদেবের সৈন্যদল বেষ্টন করেন। সহদেব বহু স্তুতি দ্বারা অগ্নিকে তুষ্ট করেন। অগ্নির মধ্যস্থতায় সহদেব নীলরাজার নিকট থেকে কর গ্রহণ করে ফিরে যান। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নীল পাণ্ডবপক্ষ গ্রহণ করে যুদ্ধ করেন এবং অশ্বত্থামার শরে নিহত হন। (পৌ.অ.)। ৫. ভারতের ইতিহাসে অগ্নি **নীল** রূপে কীভাবে সক্রিয় হয়েছিলেন, তারই বিবরণ রয়েছে উপরোক্ত বয়ানে। এখানে যেটুকু

আমরা বলতে পারি, তা হল, শক্তির আদি রং কৃষ্ণবর্ণ। প্রথমে তা দুই, তিন এবং ক্রমান্বয়ে আরও অনেক রং-এ খণ্ডিত হয়ে বিবর্তিত হয়ে থাকে। সামাজিক শক্তিও আদিতে কৃষ্ণ, পরে তা সবুজ (ব্রহ্মা) **নীল** (বিষ্ণু) ও লাল (রুদ্রশিব) এই তিন রং-এ খণ্ডিত হয়ে বিবর্তিত হয়েছিল বলেই মনে হয়। এই **নীল** রঙের সঙ্গে **অগ্নির** সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। রামায়ণের কালে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের একটি সত্তাকে বলা হত **নীল**। এঁদের পূর্বসূরী সত্তাটির জন্ম হয়েছিল আরও আগে, বৈদিক যুগে। যাঁরা বৈদিক যুগের প্রথম পর্যায়েই পুঁজির পক্ষপাতী হয়েছিলেন, সেই হৈহয় ক্ষত্রিয়গণ (দ্র. **কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন**) গঙ্গার চেয়েও অধিক পুণ্যদানকারী নদী **নর্ম্মদার** তীরে মাহিষ্মতী নগরী গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে যে-সত্তা এই মাহিষ্মতীর রাজা হয়েছিলেন তাঁর নাম **নীল**। এঁরা আদি-অভিজাত। ইয়োরোপ একে চেনে তাদের blue-blood ধারণায়। বলতে কী, **নীল** শব্দের ভিতরে যে না-সূচক ও হাঁ-সূচক দুরকম পরস্পরবিরোধী অতি-মন্দ ও অতি-ভাল ধারণা রয়েছে, সেই ধারণার প্রায় সবটাই ইংরেজি ভাষা তাদের blue-যুক্ত অজস্র শব্দে ধরে রেখেছে। ... যাই হোক, এই সত্তা রাজা রূপে, রং রূপে, গিরি রূপে ... কেন পণ্যের সঙ্গে জড়িত, তা নিয়ে বিশদভাবে গবেষণা হওয়া দরকার। ... ৬. ইংরেজি nil।

নীলকণ্ঠ : ২. ***নীল** কণ্ঠ যাহার।* ৩. শিব, ময়ূর, খঞ্জনপক্ষী, দাত্যূহপক্ষী, নীল রঙের একরকম পাখীবিশেষ (ইহার দর্শন মঙ্গলসূচক, বণিক জাতি অদ্যাপি বিজয়াদশমীর দিন কোনো কোনো স্থানে প্রতিমা বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে এই পক্ষী খুঁজিয়া প্রণাম করিয়া থাকে।), রাক্ষসবিশেষ। (ছা.অ.)। পুরাকালে দেবতা ও অসুরে সংগ্রাম আরম্ভ হলে, দেবতারা দিন দিন শক্তিহীন হতে লাগলেন; শেষে অসুরদের হাতে স্বর্গরাজ্য যাবার উপক্রম হল। ... বিষ্ণু সমুদ্রমন্থনের পরামর্শ দিলেন। ... সমুদ্রমন্থন থেকে একপ্রকার ভীষণ বিষ উৎপন্ন হল। ... পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্য অজর অমর মহাদেব এই বিষ পান করে সকলকে রক্ষা করলেন; কিন্তু এই বিষের ক্রিয়ায় তাঁর গলা নীলবর্ণে পরিণত হল। এইজন্য মহাদেবকে নীলকণ্ঠ বলা হয়। (পৌ.অ.)। ৪. নাম রূপে প্রচলিত। ৫. সমুদ্রমন্থনের কাহিনীটি সবিস্তারে পড়লে জানা যায়, আদিম-সমাজতন্ত্রবাদী বেদবাদী অসুর ও ধনতন্ত্রবাদী দেবতাদের বিস্তর মারামারি-কাটাকাটিতে সমাজ যখন ব্যতিব্যস্ত এবং স্বভাবতই দরিদ্র হয়ে পড়েছে, সেই সংকটকালীন সময়ে কীভাবে সমুদ্রমন্থন করে ঐ দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, তার বুদ্ধি যুগিয়েছিলেন তৎকালীন সমাজের আবিষ্কারক-উদ্ভাবক সত্তা; অর্থাৎ শিব। তারপর সেই পথনির্দেশ অনুসরণ করে সমুদ্রমন্থন করে (দ্র. **কূর্ম্মাবতার**) সকলের সব সমস্যার সমাধান তো হল, কিন্তু সব বড় কাজেরই গৌরব যেমন থাকে, তেমনি কলঙ্কও থাকে; সমুদ্রমন্থনের কলঙ্কের ভাগ নেবে কে? একালেও আমরা দেখি, স্বার্থ বিষয়ে উদাসীন আবিষ্কারক মানসিকতার মানুষটিকেই সমস্ত মন্দের দায়ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়। অমৃতের ভাগ নেওয়ার লোকের অভাব হয় না, কিন্তু বিষটা পান করতে হয় সেই ভালমানুষটিকেই। আর বিষের রং **নীল**। অতএব তিনি **নীলকণ্ঠ** হবেনই।

নীলিমা : ১. নীল + **ইমন্ (ইমনিচ্)**। (ব.শ.)। ২. ***নীল** গতিশীল হইয়া সীমায়িত হয় যাহাতে, তাহার আধার।* ৩. নীলভাব, নীলত্ব, নীলবর্ণ। (ব.শ.)। ৪. **অর্থহীন নাম রূপে প্রচলিত**। ৫. শব্দটির উপরিতলের অর্থ হল, যে প্রকৃতি সত্তার মধ্যে **নীল** রঙের মতো রং আছে; কিংবা **নীল** রঙের ভাব আছে, তাকে **নীলিমা** বলা যায়; ইংরেজিতে যাকে বলে bluish। এ হল বাহ্যিক বা দৈহিক **নীল** রঙের ভিত্তিতে দৃশ্য অর্থ — নীলাভ রঙের মেয়ে। কিন্তু উদ্‌লোকের দিকে গেলে শব্দটির আরও দুরকম অর্থের দেখা মেলে। প্রথমত মানসিক **নীল** ভাবের প্রকৃতিসত্তা, যে কিনা দর্শনের জগতের সৃষ্টিগুণ ও রক্ষণগুণের ধারিকা। দ্বিতীয়ত মানসিক ও দৈহিক উভয় প্রকারের **নীল**-ভাবের ধারিকা। অর্থাৎ **নীলিমা** কমপক্ষে তিন রকমের প্রকৃতি সত্তাকে বোঝায় — ক) নীলাভ বা bluish দেখতে যে প্রকৃতি; খ) নীলাভ বা ভাল (blue-eyed, blue-blooded) কিংবা মন্দ (blue-beard, blue-devil) দেখতে যে-**ত্রিশঙ্কু** প্রকৃতি; গ) নীলাভ বা ভাল (blue-sky-laws) দেখতে যে প্রকৃতি।

নেতপাট (নেত, নেতা[১], নেতাকানি, নেতান) : ২. *নেত = নি-এর দিশাগ্রস্ত তারণ যাহাতে।* ***নেতপাট** = নেত হয়ে গেছে যে পট্টবস্ত্র।* ***নেতা** = নেত-এর আধার যে।* ***নেতাকানি** = নেত-এর কানি (দ্র. **কান**)।* ***নেতান** = নেত অন যাহাতে।* ৩. **নেতপাট** = নেতপট্ট, নেতবস্ত্র। **নেতা** = বস্ত্রখণ্ড, নেকড়া, পাকপাত্র মোছার বা ঘর নিকানর বস্ত্রখণ্ড; জ্ঞাতি, সম্বন্ধ, সংশ্রব। **নেতান** = নেতার মতো শিথিল হওয়া। ৪. যথার্থে প্রচলিত। ৫. **নি**-এর ভিতরে যে ন-করণ বা নাশ করার ক্রিয়াটি রয়েছে, এই **নেত** বা **নেতা** শব্দে সেই ন-করণ ক্রিয়াটি বিদ্যমান রয়েছে। **নি**-এর নষ্ট হওয়া বা নষ্ট করা দিশাগ্রস্তভাবে তারিত হয় যে সত্তায় তাকেই **নেত** বলে। তারই আধারকে **নেতা** বলে। সাধারণত ঘরমোছার জন্য প্রায়-নষ্ট কাপড়ের যে টুকরো ব্যবহার করা হয়, তাকেই **নেতা** বলে। আর, কাপড়ের কানাচ বা **কানি** দিয়ে যে **নেতা** হয়, তাকে **নেতাকানি** বলে। দ্র. **কান, টেনা (টান)**। ৬. ইংরেজি knit।

নেতা[২] : ১. ✓নী + তৃ (তৃচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নী**-এর দিশাগ্রস্ত তারণ যে আধারে; আনয়নের সমস্যা থেকে ত্রাণ করে যে।* / যে লইয়া যায়। (ছা.অ.)। ৩. নায়ক, প্রেরক, বাহক, প্রাপক, নির্ব্বাহক, শিক্ষয়িতা, প্রবর্ত্তক, প্রভু, দণ্ডপ্রণেতা, কাব্যনায়ক, বিষ্ণু। (ব.শ.)। ৪. leader অর্থে প্রচলিত। ৫. **নি**-এর ভিতরে অপ্রয়োজনীয়কে সরিয়ে প্রয়োজনীয়কে আনয়ন করার যে দ্বিমুখী ক্রিয়া বিদ্যমান, তার সমগ্র রূপটিই রয়েছে এই '**নী+তৃ-করণ**' সত্তাটিতে। স্বভাবতই **নেতা** শব্দটি যাদের নেতা তাদের পক্ষে খুবই হিতকারী সত্তা। দ্র. **নেত্র**।

নেত্র : ১. ✓নী + ত্র (ষ্ট্রন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *দিশাগ্রস্ত নী-কে ত্রাণ করে যে; অথবা, আনয়নের সমস্যা থেকে শরীরকে ত্রাণ করে যে।* / যাহার দ্বারা (আ)নয়ন সাধিত হয়। (ব.শ.)। ৩. নেতা, প্রবর্ত্তক, চক্ষুঃ, লোচন, কার্য্যজ্ঞানকারণ, মন্থনরজ্জু, বৃক্ষমূল,

জটা, রথ, অংশুক, বস্ত্রবিশেষ, বস্তিশলাকা, ২-সংখ্যা, ৩-সংখ্যা। (ব.শ.)। ৪. eye অর্থে প্রচলিত। ৫. আনয়নের সমস্যা প্রধানত দু দিক থেকে। একদিকে অপ্রয়োজনীয়কে সরানো, তাদের না-করণ করে দেওয়া; অপরদিকে প্রয়োজনীয়কে চিহ্নিত করে নিয়ে আসা। এই দ্বিমুখী সমস্যায় পড়ে শরীর। মানবশরীরকে তার সেই সমস্যা থেকে ত্রাণ করে তার **নেত্র** বা **নয়ন**। আর, সমাজশরীরকে তার সেই সমস্যা থেকে ত্রাণ করে তার **নেত্র** বা **নেতা**। নেতা বা নেতৃগোষ্ঠীকে তাই সমাজশরীরের **নয়ন** বলা যায়।

নেপাল : ২. *দিশাগ্রস্ত আনয়ন (আমদানি) দ্বারা পালিত যে।* ৩. হিমালয়তটস্থ পর্ব্বতীয় দেশবিশেষ, নেপালবাসীগণ। (ব.শ.)। ৪. দেশের নাম রূপে প্রচলিত। ৫. **নে** বা আমদানি পালক যাহার।

নু (নুদ্) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : নআ, নই, নউমি, নও (নব, new), নওকর, নওজোয়ান, নওরোজ, নওল (নবল), নওলকিশোর(রী), নওলা, নওলী, নওশা, নকর (নবকর-চয়িতকর, চাকর), নগুণ (নবগুণ), নতুন, নত্তা (নব-তা), নদীয়া, নদে, নধর, ন-নর, ননী, ননীচোরা, নব, নবকুসুমিতা, নবখণ্ড, নবগুণ, নবগ্রহ, নবঘননীল, নবঘনশ্যাম, নবচত্বারিংশৎ, নবচ্ছিদ্র, নবজ্বর, নবডঙ্ক, নবডঙ্কা, নবত, নবতা, নবতি, নবতিকা, নবত্রিংশৎ, নবদণ্ড, নবদণ্ডক, নবদশ, নবদুর্গা, নবদীধিতি, নবদ্বার, নবদ্বীপ, নবধর, নবধা, নবনত্তা, নবনর্ত্তা, নবনবতি, নবনিধি, নবনী, নবনীত (ভাগবত), নবপঞ্চাশৎ, নবপত্রিকা, নবপত্রী, নবপ্রসূতা, নবপ্রস্থান, নবপ্রাশন, নববধূ, নববিংশতি, নবভাগ, নবম, নবমল্লিকা, নবমালিকা, নবযজ্ঞ, নবযৌবন, নবরঙ্গ, নবরত্ন, নবরস, নবরাত্র, নবল, নবলক্ষণ, নবশশী, নবশস্যেষ্টি, নবশাক, নবশাখ, নবশায়ক, নবশ্রাদ্ধ, নবষষ্টি, নবসপ্ততি, নবসূতি, নবস্ফুট, নবান্ন, নবাশীতি, নবিশ, নবিশ, নবীন, নবীভাব, নবযুবক, নবী, নবেতর, নবোঢ়া, নবোদক, নবোদ্ধৃত, নব্বই, নব্য, নয়দা, নয়ল, নয়(হ)লি, নয়া, নয়ান, নয়ানজুলি, নলিয়ান, নলেন, না (লা), নাঅ, নাইয়া, নাও, নাবারোহ, নাবিক, নাবী, নাবোপজীবন, নাব্য, নায়, নায়্যা (নাইয়া), নারঙ্গ, নিরানব্বই, নু, নু(নো)ঙা, নু(নো) য়া, নুত, নুত্ত, নুদি, নুদুরনাদুর, নুনি(নী), নুন্ন, নুয়া, নুয়ান, নুর, নুরি, নুরী, নূতন, নূত্ন, নূন (ন্যূন), নূনম্, নূপুর, নূর, নূরি, নূরী, নেআলী, নেউজ, নেপুর, নেয়া, নেহালি, নৈ, নৈদে, নোকর, নোদন, নোদয়িতা, নোধা, নোয়ান, নৌ, নৌকা, নৌকাখণ্ড, নৌকাডুবি, নৌঘর, নৌতুন, নৌজীবক, নৌতার্য্য, নৌদণ্ড, নৌবলাধ্যক্ষ, নৌবাটক, নৌবাহ (নাবিক), নৌবিদ্যা, নৌভঙ্গ, নৌযান, নৌসাধন, নৌসেনা, লা (নৌ বা লা লষ্ট হাটে), বিনোদ, বিনোদন, বিনোদিনী, লৌকা, শিক্ষানবিশ, শিক্ষানবিস।

নু (নুদ্) = নবরূপে উত্তীর্ণ ন-করণ যাহাতে। **নুদ** = **নু** দেয় যে।

নকর (নওকর, নবকর) : দ্র. **চাকর, নোকর**।

নব (নবম) : ১. ✓নু + অল্ - ভাববাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. *ন (ন-করণ) বহন করে যে।* ৩. নবসংখ্যক, সংখ্যাবিশেষ, ৯ সংখ্যা। (ব.শ.)। ৪. nine অর্থে প্রচলিত। ৫. **ন** বর্ণের অর্থ থেকে জানা যায়, তা ন-করণ ও **অন্**-করণ উভয় ক্রিয়াই বটে। কিন্তু যখন তা কেবল ন-করণ অর্থে সক্রিয় হয়ে বাহিত হয়, তখনই তা হয় সংখ্যার্থক **নব**। এই **নব** আসলে দশ থেকে এক কম অর্থাৎ **উন**-ব। ত্রিশ, চল্লিশ ... ইত্যাদির আগে যেমন এক কম বোঝাতে **উন** শব্দের ব্যবহার হয় (**উন**ত্রিশ, **উন**চল্লিশ ...) সেইরকম 'এক কম দশ' বোঝাতে **নব** শব্দের ব্যবহার। এখানে সেটি উল্টে নেওয়া হয়েছে — **উন** > **নু**। সেই **নু**-এর পরে অ যোগে **নব** শব্দটি প্রসূত হয়েছে। ফলত শব্দটি 'ন', 'নঅ', 'নয়', 'নও', 'নৌ' ... ইত্যাদি রূপ ধারণ করবার সুযোগ পেয়ে যায়। হিন্দিভাষীগণ **নব**কে 'নও', 'নৌ' ইত্যাদি বলে থাকেন; আর আমরা 'ন', 'নঅ', 'নয়' বলে থাকি।

তবে মানুষের প্রাচীন পূর্বপুরুষরা কেমন করে '৯' সংখ্যার ধারণায় পৌঁছেছিলেন, তা অনায়াসবোধ্য নয়। **এক, দুই, তিন, চার, ছয়, আট, দশ** প্রভৃতি সংখ্যার ধারণায় তাঁরা কেমন করে পৌঁছেছিলেন, বহু চেষ্টায় আমরা তা অনুধাবন করেছি এবং সেকথা আমরা **এক, দুই** ... প্রভৃতি শব্দের ভুক্তিতে বিবৃত করেছি। **নব**-এর ক্ষেত্রে এ-পর্যন্ত এই দুটি তথ্যই পাওয়া যায় — দশের এক কম অর্থে নব, এবং আটের পরবর্তী ফাঁক পূরণার্থে **নব**। এই **নব** সীমিত যাহাতে তাকে বলে **নবম**। ব.শ. তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন 'পূরণার্থে' **নবম**। ৬. ল্যাটিন novem, ইংরেজি nine। (ব.শ.)।

নব (নূতন, নতুন) : ১. ✓নু + অল্ - কর্ম্মবাচ্যে। (ছা.অ.)। ✓নু + অ (অপ্) - কর্ম্মবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নব** = ন (অন্-করণ) বাহিত যাহাতে। **নূতন** = নবরূপে উত্তীর্ণ ন-ধারী তারিত হয়ে অন থাকে যাহাতে। **নতুন** = ন-এর তারণ নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে অন থাকে যাহাতে।* ৩. **নব** = নূতন, তরুণ, অচির, কলামাত্র, অচিরজাত, সদ্যঃসম্ভূতসলিল, অচিরপ্রবৃত্ত, সদ্যঃপক্ক, অচিরবিকশিত, অচিরা-ভিষিক্ত, তৎকালনিঃসৃত, অনভিনীত, অনুপভুক্ত, অনাহত, আধুনিক, স্তব, রক্তপুনর্নবা। **নূতন** = নব, অনাহত, অচিরজাত ... ইত্যাদি। **নতুন** = নব, অচিরপ্রবৃত্ত ... ইত্যাদি। (ব.শ.)। ৪. তিন তিনটে শব্দ শুধুমাত্র new অর্থেই প্রচলিত। বাংলার শব্দ সংখ্যা কমে যাওয়ার এটি একটি প্রক্রিয়া। ৫. **ন** বর্ণের অর্থ থেকে জানা যায়, তা ন-করণ ও **অন্**-করণ উভয় ক্রিয়াই বটে। কিন্তু যখন তা কেবলমাত্র **অন্**-করণ অর্থে সক্রিয় হয়ে বাহিত হয়, তখনই তা হয় 'নূতন' অর্থবাহী **নব**। কোনো সত্তা যে অবস্থানে রয়েছে, তার পরবর্তী স্তরে **অন্** করে উত্তীর্ণ হয়ে গেলে, সে 'নূতন' হবেই। অর্থাৎ কিনা, এই নব শব্দটির নিহিতার্থ হল, 'পূববর্তী অবস্থান থেকে বর্তমান অবস্থানে সদ্য উত্তীর্ণ হয়েছে যে'। **নূতন** শব্দটি কিন্তু ঠিক এভাবে তার **নবত্ব** ধারণ করে না। **নূতন**-এ 'অন্-কারী নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে আধারপ্রাপ্ত' (= নূ) এবং 'তারিত হয়ে অন' (= তন) হয়ে থাকে; অর্থাৎ, 'পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে সে নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে সক্রিয় অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে'। তার মানে **নব**-র থেকে দুটি কথা এতে অধিক রয়েছে — আগের রূপের চেয়ে অন্যতর 'new' রূপ, এবং 'সক্রিয়ভাবে (আ)বর্ত্তমান' থাকা। আর, **নতুন**-এর **নবত্ব** আরও

উন্নীত। তাতে 'ন-করণ তারিত হয়ে' (= নত্) 'নবরূপে উত্তীর্ণ হয় ও অন' (= উন) হয়ে থাকে; অর্থাৎ, 'পূর্ববর্তী অবস্থানের কলুষিত অতীতকে ত্যাগ করে নবরূপে উত্তীর্ণ হয়ে সক্রিয় অবস্থানে বর্ত্তমান থাকে'। **নূতন**-এর চেয়েও এতে একটি কথা অধিক রয়েছে — কলুষিত অতীত ত্যাগ করা। অর্থাৎ, **নব**-র চেয়ে **নূতন**-এর অর্থের এলাকা বড়, তার চেয়েও **নতুন**-এর অর্থের এলাকা আরও ব্যাপক।

কারও কারও ধারণা, বাংলাভাষী সাধারণ মানুষ মূর্খ ও গাঁইয়া বলেই তারা সংস্কৃত উচ্চারণ করতে পারে না। তারা **নূতন** উচ্চারণ করতে পারে না বলে **নতুন** উচ্চারণ করে। এর ভিতরে আবার কোনো কোনো ব্যাকরণবিদ শব্দের চেহারা বদলের নিয়ম খুঁজেছেন। আমরা আগেও বলেছি, আবারও বলছি, ব্যাপারটি অত বোকা বোকা নয়। ***নতুন শব্দের সৃষ্টি হয় নতুন অর্থকে ধারণ করার জন্য। একটি বিশেষ ভাষাভাষী জনসাধারণ কেবল সেই ভাষার বাহকই নন, তাঁরাই সেই ভাষার নতুন নতুন শব্দের স্রষ্টাও বটে। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, পরমাপ্রকৃতি মানুষের মুখের ভাষার নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করার জন্য সাধারণ মানুষের মস্তিষ্ক ও জিহ্বা এমনভাবে ব্যবহার করেন যে, তাঁরা তা জানতেই পারেন না।*** অবশ্য, কোনো কোনো প্রকৃতি-সংলগ্ন কবি-সাহিত্যিক দু-চারটি শব্দ সৃষ্টি করতে পারেন বটে, তবে তাঁদের সংখ্যা নগণ্য এবং প্রায়শই শব্দ সৃষ্টির সঙ্গে তাঁদের মালিকানার সম্পর্ক অচিরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রতিটি ভাষার ক্ষেত্রেই একথা একশোভাগ সত্য।

অ্যাকাডেমি মালিকানাহীন কোনো শব্দই সৃষ্টি করতে পারে না। দু-একটি ক্ষেত্রে কিছু কিছু মালিকানাভিত্তিক শব্দ তৈরি করতে পারে বটে, তবে সেই শব্দগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার দায় অ্যাকাডেমিকেই নিতে হয়। জনসাধারণ সেই শব্দগুলিকে ব্যবহার করেন না, সেই শব্দগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার দায় গ্রহণ করেন না। ভারতীয় কিংবা রোমক সভ্যতার প্রথম পর্বের অ্যাকাডেমি যে সকল শব্দ তৈরি করেছিল, সেগুলির অধিকাংশেরই মৃত্যু ঘটেছে। একালের অ্যাকাডেমি যে-সব শব্দের জন্ম দিয়েছে, ভবিষ্যতে তাদেরও মৃত্যু ঘটবে। ৬. ইংরেজি new।

নবদুর্গা (নবপত্রিকা) : ২. *নয় প্রকার দুর্গা (= যাহাকে গমন করা দুঃসাধ্য) যাহাতে।* ৩. কদলী দাড়িমী প্রভৃতি নবপত্রিকা, কুমারিকা ত্রিমূর্ত্তি কল্যাণী রোহিণী কালী চণ্ডিকা শাম্ভবী দুর্গা ভদ্রা — এই নবনামিকা কন্যা, শৈলপুত্রী ব্রহ্মচারিণী ইত্যাদি দেবীনবক, পার্ব্বতী, দুর্গা, দুর্গাপ্রতিমা। (ব.শ.)। শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী, সিদ্ধিদা — এই নয় মূর্ত্তি। (ছা.অ.)। স্কন্দপুরাণ অনুসারে, কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, মুণ্ডমর্দিনী, চামুণ্ডা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ত্বরিতা, ও বৈষ্ণবী — এই নয়জন নবদুর্গা নামে খ্যাত। দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে এঁরা বীরভদ্রের সঙ্গে গমন করেছিলেন। ((পৌ.অ.)। ৪. বাঙালির দুর্গাপূজার সময় কোনো কোনো স্থানে **নবদুর্গা**র নয়টি প্রতিমার পূজা হয়ে থাকে। সেই সূত্রে শব্দটি প্রচলিত। ৫. দ্র. **কালী, চণ্ডী, ছিন্নমস্তা, মহামায়া**। আমরা **কালী** শব্দের অর্থে আগেই জেনেছি যে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে **দুর্গা বলে। এর যে নয়টি রূপ আমাদের পূর্বসূরীগণ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সেই অনুযায়ী যাঁরা নবদুর্গার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেন, তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ অনুসারে তাঁদের নবদুর্গার নাম প্রতিমার নীচে লিখে থাকেন।** এখানে আমরা ছাত্রবোধ অভিধানের দেওয়া **নবদুর্গা**র অর্থ দেওয়ার চেষ্টা করব। **কালী, কৃষ্ণ, গৌরী, চণ্ডী** প্রভৃতি শব্দে আমরা জানিয়েছি, আমাদের পূর্বসূরীগণ জড়, জীব, সমাজ, স্বর্গলোক ... প্রভৃতি বিভিন্ন লোকে একই সত্তাকে চিহ্নিত করার যোগ্যতা ধরতেন। যেমন কিনা, জড়জগতের **নবদুর্গা**কে তাঁরা চিহ্নিত করেছিলেন কদলী, দাড়িমী, ধান্য, হরিদ্রা, মানকচু, কচু, বেল, অশোক, জয়ন্তী — এই নয়টি উদ্ভিদকে; কিন্তু কিন্তু কেন তারা **দুর্গা** (যাদের গমন করা দুঃসাধ্য) তা আমরা জানি না। আমরা কেবল সামাজিক স্তরের **নবদুর্গা**র অর্থ খানিকটা বুঝতে পারি। এখনও, অন্য স্তরগুলি সম্পর্কে জানার প্রায় কোনো যোগ্যতাই আমরা অর্জন করতে পারিনি। স্বভাবতই আমরা এক্ষেত্রে **নবদুর্গা**র কেবল সামাজিক অর্থই দিতে পারব। তাও প্রথম দু-তিনটি একটু বিস্তারে দিয়ে বাকি সব সংক্ষেপে উল্লেখ করে যাব।

দুর্গা সত্তাটির সামাজিক রূপ হল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনসাধারণ। কেন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও মধ্যবিত্তের সংখ্যা বাড়লে **দুর্গা**পূজার সংখ্যা বাড়ে, সেকথা আমরা আমাদের 'ঙ' গ্রন্থের 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন' নিবন্ধে বিস্তারিত করেছি। এই জনসাধারণকে জয় করা (গমন করা) দুঃসাধ্য বলেই এঁদের দুর্গা বলা হয়। এঁদের নয়টি রূপ দেখেছিলেন আমাদের পূর্বসূরীগণ। সেগুলি এইরকম : —

শৈলপুত্রী : সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সন্তানসন্ততিগণ। সেকালের বয়ানে প্রতিষ্ঠানকে 'শৈল' বলা হত। সবচেয়ে ছোট প্রতিষ্ঠান হল মানুষের পরিবার; সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র। এইসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা, সরকারি কর্মচারীদের ছেলেমেয়েরা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগীদের ছেলেমেয়েরা — সবাই **শৈলপুত্রী**। জনসাধারণের এই যে রূপ, তার ভাবমূর্ত্তি কেমন হতে পারে, আমরা তা বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের পূর্বসূরীরা তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তদনুযায়ী **শৈলপুত্রী**র প্রতিমার বিষয়ে নির্দেশাবলী দিয়ে গিয়েছেন। তা মান্য করেই ঐ প্রতিমা নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

ব্রহ্মচারিণী : সমাজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীগণ। এঁরা ব্রহ্মচর্য পালন করেন বা সরকারি অ্যাকাডেমিতে শিক্ষালাভ করেন বলেই এঁদের **ব্রহ্মচারিণী** বলা হয়ে থাকে। এঁদের ভাবমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করেই **ব্রহ্মচারিণী**র প্রতিমা নির্মিত হয়ে থাকে।

চন্দ্রঘণ্টা : সমাজের সমস্ত সদ্য-পাশকরা তরুণতরুণীদের বলা হয় **চন্দ্রঘণ্টা**। কারণ, তারা এত টাকা রোজগার করে ফেলব, অত টাকা কামিয়ে ফেলব, আমাকে এত টাকা দিলে এইরকম একটা উদ্যোগ গড়ে তুলে এত টাকা রোজগার করে ফেলব — ইত্যাকার চাঁদির ঘণ্টা বাজাতে থাকে। এঁদের ভাবমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করেই **চন্দ্রঘণ্টা**র প্রতিমা নির্মিত হয়ে থাকে।

কুষ্মাণ্ডা : যে পাশকরা ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে থাকে, কিংবা টাকা নিয়ে কোনো ব্যবসা বা অন্য কোনো উদ্যোগ গড়ে তুলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে বাড়িতে বসে থাকে, কোনো রুজিরোজগার করে না,

পরিবারকর্তা যাদের 'অকালকুষ্মাণ্ড' বলে গালি পাড়েন (অকালের কুমড়ো পচে যায়, খাওয়া যায় না), সেই শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের বলে **কুষ্মাণ্ডা**। এই সত্তার প্রতিমার রূপ কেমন হবে, তারও নির্দেশ দিয়ে গেছেন আমাদের পূর্বসূরীরা।

স্কন্দমাতা : কথাটির একটি অর্থ 'মিলিটারির মা', অন্য একটি অর্থ 'চোরের মা'। কুষ্মাণ্ডা ছেলেরা অতঃপর মিলিটারিতে নাম লেখায়, কিংবা রাজকর্মচারী হয়ে প্রজাদের উৎপন্নে ভাগ বসায়। এদেরই **স্কন্দমাতা** বলে। (অতঃপর তাঁরা গৃহস্থ হন)। এই সত্তার অনুরূপ প্রতিমা কেমন হবে, আমাদের পূর্বসূরীরা তারও বিস্তারিত নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

কাত্যায়নী : যে গৃহস্থ জনসাধারণ আপন আপন সমাজসংসার পালন করেন ও দাদাগিরিকে ধ্বংস করেন। ...

কালরাত্রি : যাঁরা পূর্বতন প্রজন্মের শাসনের অবসান ঘটান ও তাঁদের প্রজন্মের শাসনকালের সূত্রপাত ঘটান, সেই জনসাধারণ। ...

মহাগৌরী : অতঃপর সে-যাবৎ অর্জিত জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের অধিকারী হন তাঁরা; সেই জনসাধারণকে **মহাগৌরী** বলে। জনসাধারণের এই অংশটিই সমাজের দায়িত্বশীল অংশ। ...

সিদ্ধিদা : প্রৌঢ় যে মানুষজন, যাঁরা সাধনা সিদ্ধির উপায় বলে দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, তাঁদের **সিদ্ধিদা** বলে। ...

অতি সংক্ষেপে এই হল **নবদুর্গা**র নয়টি রূপ। বিশেষত্ব হল, আমাদের পূর্বসূরীদের এই প্রকার **নবদুর্গা**র ধারণায় **দুর্গা**রূপিণী 'শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত জনসাধারণ'কে একত্রে একটিমাত্র সত্তা ধরে তার শৈশব থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত নয়টি ভাগে ভাগ করে তাকে দেখা হয়েছে। আরও একভাবে তাঁরা এই **নবদুর্গা**কে দেখেছিলেন। সেগুলি শ্রমিকশ্রেণী (কালী), কৃষকশ্রেণী (শ্যামা), জ্ঞানচর্চাকারী শ্রেণী (সরস্বতী) ... এই ধরনের বিভাজন করে দেখা। সেগুলি কার্যত সমগ্র জনসাধারণের বা **মহামায়া**রই নয়টি রূপ, শুধুমাত্র **দুর্গা**র (শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর) নয়টি রূপ নয়। তাই, তা **মহামায়া**তেই আলোচিত হবে।

নবদ্বার : ২. *যাহার নয়টি দ্বার থাকে। /* যাহাতে নব ছিদ্র। (ব.শ.)। ৩. দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, মুখ, পায়ু, উপস্থ — এই নবচ্ছিদ্রযুক্ত। (ব.শ.)।

নবনিধি : ২. *নয় জন **নিধি** যাহাতে।* ৩. মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল, খর্ব্ব — এই নবনিধি। (ব.শ.)। ৫. দ্র. **নিধি, অষ্টনিধি**।

নবনী (ননী, নবনীত) : ১. নব + ✓নী + অ (ড) - কর্ম্মবাচ্যে, + স্ত্রী ঈ (ঙীষ্)। (ব.শ.)। ২. ***নবনী** = নতুন **নি**-এর আধার যে; অর্থাৎ, যে নতুন সত্তাকে (সদ্য) আনয়ন করা হইয়াছে। **নবনীত** = যে নতুন সত্তা (সদ্য) আনীত হইয়াছে। **ননী** = ন-করণ গতিশীল-ভাবে ন-কৃত যাহাতে, তাহার আধার।* ৩. **নবনী (নবনীত)** = নবনীত, নবোদ্ধৃত, দুগ্ধসারভেদ, মাখন। **ননী** = মাখন, তাজা মাখন। (ব.শ.)। ৪. অ্যাকাডেমিক বাংলায় **শব্দগুলি** অপ্রচলিত। কিন্তু গ্রামবাংলায়, কীর্তনে শব্দগুলি আজও প্রচলিত। ৫. সবার আগে জানা দরকার দুধ থেকে কেমন করে ঘি হয়, সেই সমগ্র প্রক্রিয়াটি। যা দোহন করে আনা হয় [তা সে গাইগরুকে দুয়ে আনা হোক আর জনসাধারণকে দুয়ে আনা হোক, কিংবা প্রকৃতিকে (তার নিয়মাবলীকে) দুয়ে আনাই হোক] তাকে **দুগ্ধ** বা **দুধ** বলে। সেই দুধ জমালে তা **দধি**তে পরিণত হয়ে যায়। সেই দধিকে মন্থন করলে একদিকে ঘোল ও অপরদিকে মাখন বেরিয়ে আসে। সেই মাখনকে অগ্নিতে পাক করলে **ঘৃত** পাওয়া যায়।

একই প্রক্রিয়াতে মানুষের পণ্যসম্পদ বা ধনসম্পদও উঠে আসে। তার মূল অর্জনকে মধ্যযুগের বাংলাভাষী জ্ঞানী মানুষেরা নাম দিয়েছিলেন **নবনী**, আর ৫০০ বছর পরে জার্মান দেশের মনীষী মার্কসসাহেব নাম দিয়েছিলেন surplus value। তবে ভারতবর্ষ এখানেই থেমে যায়নি। সে তাকে ধনসম্পদের ও জ্ঞানসম্পদের সর্বোচ্চ রূপ **ঘৃতে** ও তার **গন্ধে** উন্নীত করে বুঝবার যোগ্য হয়ে উঠতে পেরেছিল। মধ্যযুগের বাংলাভাষী ধনী-জ্ঞানীরা সেই ব্রহ্মরসে, ব্রহ্মগন্ধে মজে থাকতেন। ... ...

নবশায়ক (নবশাক, নবশাখ) : ২. *নয় প্রকার **শায়ক** (শত্রুকে মেরে শুইয়ে দেয় যে) যাহাতে।* ৩. নববিধ শায়কতুল্য গোপাদি নব জাতি — গোপ, মালী, তেলী, তাঁতি, মোদক, বারুজ, কুলাল, কর্ম্মকার, নাপিত। (ব.শ.)। ৪. সাধারণভাবে অপ্রচলিত। ৫. বাংলাভাষী হিন্দুদের মধ্যে 'উচ্চবর্ণ' বলে স্বীকৃত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য তিনটি জাতির বিপরীত প্রান্তে রয়েছে অনেক অস্পৃশ্য জাতি, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যাদের স্পর্শ বা ছোঁয়া পর্যন্ত এড়িয়ে চলেন, যাদের স্পর্শ করা জল পর্যন্ত ব্যবহার করেন না। এই দুই মেরুর মাঝে আছে এই 'জলচল' **নবশায়ক** — নয়টি জাতি। উচ্চবর্ণের বিচারে এদের স্পর্শে জল নষ্ট হয় না। কিন্তু প্রশ্ন হল, প্রকৃতপক্ষে এঁরা কারা, তাঁদের **নবশায়ক** নাই বা হয়েছিল কেন?

না, তাঁদের এই নয় প্রকার গোষ্ঠী-বিভাজনগুলি প্রাচীনকাল থেকে আগত নয়; ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বঙ্গদেশে পাঠান রাজত্বের আগে (প্রায় ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এবং প্রায় ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে দুই কালখণ্ড, খুব সম্ভব তখনই এই বিভাজনগুলি সংঘটিত হয়েছিল। মোগল ও ব্রিটিশ যুগের জমিদারেরা এই জাতিগুলিকে অন্য জমিদারের বিরুদ্ধে সৈন্য রূপে ব্যবহার করত। এই কারণে এঁদের নয় প্রকার **শায়ক** বা **নবশায়ক** বলা হয়।

তবে, মানুষের এক একটি গোষ্ঠীকে এইভাবে ব্যবহার করতে পারা চাট্টিখানি কথা নয়। এক একটি সমগ্র গোষ্ঠী এমন করে অন্যের লাঠিসোঁটা রূপে ব্যবহৃত হতে পারে কেবলমাত্র তখনই, যখন তাদের মস্তিষ্ক সেরকম ব্যাপারকে স্বীকার করতে কেবল রাজিই হয় না, সেরকম ভূমিকা গ্রহণ করার মধ্যে নিজেদের জীবনের সার্থকতা দেখে। এবং ঠিক সেরকমই হয়েছিল। একদিকে ছিল বহুকালক্রমাগত বৈদিক ও হিন্দু 'সাম্প্রদায়িক' ব্যবস্থা, অধঃপতিত ব্রাহ্মণ্যবাদ যাকে ক্রমান্বয়ে বিভাজিত ক'রে ক'রে অনিবার্য করে তুলেছিল; অন্যদিকে ছিল অবহেলিত বঞ্চিত নিপীড়িত শূদ্রের শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকা পুঞ্জীভূত ক্রোধ। জমিদাররা আপন আপন উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য এই প্রদত্ত পরিস্থিতিকেই ব্যবহার করত। ...

নবীন : ২. *নব (নূতনত্ব) গতিশীলভাবে অন (on) যাহাতে।* ৩. নব, নূতন, আধুনিক, তরুণ, সদ্যঃস্ফুটিত, অচিরজাত, নবোদিত, নির্ম্মল। (ব.শ.)। ৪. young অর্থে কমবেশি প্রচলিত।

নবিশ (নবিস, শিক্ষানবিশ) : ২. ***নবিশ*** *= **নব** ইচ্ছা করে যে।* ***শিক্ষানবিশ*** *= শিক্ষার **নব** ইচ্ছা করে যে।* / কোনো বিষয় প্রথম শিখে যে। (ব.শ.)। ৩. **নবিস (নবিশ)** = লেখক, কেরানী। **শিক্ষানবিশ** = প্রথম শিক্ষার্থী; (ব.শ.)। ৪. apprentice অর্থে **শিক্ষানবিশ** প্রচলিত, কিন্তু **নবিশ** অপ্রচলিত। ৫. ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ৬. ইংরেজি novice।

নাবিক (নাবী, নাব্য) : ১. নৌ + ইক (ঠক্)। (ব.শ.)। ২. *নাবা বা নামা সংক্রান্ত বিষয় যাহাতে।* ***নাবী*** *= **ন** বাহিত যাহাতে, তাহার আধার। (দ্র. **নাব - নম্**)* ***নাব্য*** *= **নাব** থাকে যাহাতে। (স্মর্তব্য : **নেমে** দাঁড়ানো, **নেবে** দাঁড়ানো)* / **নাবিক** = নৌশুল্কাধিকারে নিযুক্ত যে; যে নৌকা দ্বারা উত্তীর্ণ হয়; যাহার নৌকা বাহ্যভাবে আছে। **নাবী** = যাহা ঠিক সময়ের নহে। (ব.শ.)। যে নৌকা চালায়; যে নৌকার হালি ধরে; যে নৌকায় কর্ম্ম করে। (ছা.অ.)। ৩. **নাবিক** = নৌযাত্রিক, কর্ণধার। **নাবী** = আসাময়িক। **নাব্য** = নবভাব, নূতনত্ব। (ব.শ.)। ৪. sailor অর্থে **নাবিক**, late অর্থে **নাবী** এবং navigable অর্থে **নাব্য** প্রচলিত। ৫. দ্র. **নাব (নম্)**। অর্থনীতি থেকে যেমন অর্থনৈতিক হয়, ঠিক সেইভাবে **নাব** থেকে **নাবিক** শব্দটি তৈরি করা যায়; আর **নাব** হল '**নব** হইতে জাত'। এখন কথা হল 'নাম' (নামো) এবং 'নাব' (নাবো) একই অর্থবাহক। 'নামাল দেশ' আর 'নাবাল দেশ' শব্দবন্ধ দুটিও সমার্থক। তার মানে নম্-ক্রিয়াজাত শব্দ ও নু-ক্রিয়াজাত শব্দের দুটি ধারা এক স্থানে মিলিত হয়ে একই ধারায় পরিণত হয়ে গেছে। এরকম ঘটনা আরও কয়েকটি শব্দের ক্ষেত্রে ঘটেছে। ৬. ইংরেজি naval, navy ... ইত্যাদি।

নূপুর : ১. ন্যূন (ন্যূনভাগ) + ✓পুরি + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নবরূপে উত্তীর্ণ **ন**-ধারী পুরিত থাকে যাহাতে।* ৩. পাদাঙ্গদ, মঞ্জীর, নেপুর। (ব.শ.)। ৪. পায়ের অলঙ্কার রূপে প্রচলিত। ৫. **না**-করণের একটি ফল হতে পারে ছোট গুলি। সেই গুলি পুরে রাখা থাকে **নূপুর**-এর ঘুঙুরগুলিতে। তাই তাকে **নূপুর** বলে; অর্থাৎ, **নূ** পুরে রাখা হয়েছে যাহাতে। তবে এ হল **নূপুর** শব্দের বাহ্য অর্থ। মনোলোকে এর আরও অন্ততপক্ষে দুরকম অর্থ হয়। প্রথম অর্থটি হয় ভোক্তা-ক্রেতার প্রতি পণ্যগুচ্ছের আবেদনে। কলম ও কলমগুচ্ছের কথাই ধরা যাক। একটি কলম ভোক্তা-ক্রেতার মনে একটি মৃদু ঝংকার তোলে, কিন্তু বারো রকম রঙের ও কালির একডজন কলমের প্যাকেট তার মনে যে আবেদন সৃষ্টি করে, তাকে যথার্থভাবে বলতে হলে আপনাকে অবশ্যই **নূপুর-নিক্কণ** শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয় অর্থটি হয়, বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মাবলীর গুচ্ছ-প্রতিবেদন' যখন ভক্তসাধকের মনের কর্ণকুহরে **নূপুর-নিক্কণ** হয়ে বেজে ওঠে। কাব্যস্রষ্টা ধর্ম্মস্রষ্টা কবিগুরু ধর্ম্মগুরুগণ সেই **নূপুর-নিক্কণ** শুনে শুনেই **পরমাপ্রকৃতি-মহামায়ার** চিরভক্ত হয়ে গেছেন; পরবর্তী জীবন **তাঁরই আরাধনায় জীবন উৎসর্গ** করেছেন। পরমাপ্রকৃতির পায়ের সেই **নূপুরের** ধ্বনি **জীবনে** যে একবার শুনেছে, তার জীবন ধন্য হয়ে গেছে! ...

নৃ (নৃ,) ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : অনৃশংস, আনৃশংস, আনৃশংস্য, নগদ-নারায়ণ, নচ্ছার, নর, নরঋষি, নরক, নরককুণ্ড, নরকান্তক, নরকারি, নরকেশরী, নরগণ, নরনাথ, নরনারায়ণ, নরপতি, নরপশু, নরম, নরম-গরম, নরমেধ, নরসানি (নৃহিংসক), নরসিংহ, নরসুন্দর, নরহরি, নরাঙ্কিতন্যায়, নরাধম, নরাধিপ, নরান্তক, নরায়ণ, নরাশন, নরী, নরেন, নরেন্দ্র, নরেশ, নরেশ্বর, নরোত্তম, নর্ক, নর্ম্ম (normal), নর্ম্মদা, নর্ম্মসখা, নর্ম্মসচিব, নর্ম্মসুহৃৎ, নর্ম্মী, নার, নারক, নারকিনী, নারকী, নারকীয়, নারদ, নারদীয়, নারসিংহ, নারাচ, নারাচিকা, নারাচী, নারা, নারাণ, নারায়ণ, নারী, নারীকলা, নারীরত্ন, নিকৃতি, নৃ, নৃকপাল, নৃকান্ত, নৃকেশরী, নৃগ, নৃজন্ধ, নৃদুর্গ, নৃদেব, নৃপ, নৃপতি, নৃপবল্লভ, নৃপমণি, নৃপশু, নৃপাঙ্গন, নৃপাত্মজ, নৃপাল, নৃপাসন, নৃপেন্দ্র, নৃবরাহ, নৃভুক, নৃমণি, নৃমিথুন, নৃমুণ্ড, নৃমুণ্ডমালিনী, নৃমেধ, নৃমেধযজ্ঞ, নৃলোক, নৃশংস, নৃশৃঙ্গ, নৃসিংহ, নৃসেনা, নৃহরি, নেপাল, নেপালকম্বল, নেপালিকা, নেপালী, প্রশংসা, বানর, বিশ্বানর।

নৃ (নৃ,) : নৃ = **নী**-এর আবর্তন যাহাতে। **নু** = নৃ-র আধার যে।

নর (বানর, বিশ্বানর) : ১. ✓নৃ (প্রাপণ) + অ (অচ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *ন-কে রক্ষণ-ভক্ষণ করে যে।* ৩. মানুষ, পুরুষ, মানুষের দৈর্ঘ্যপরিমাণ, পাশার ঘুঁটি, পুংপশু, অশ্ব, জীব, বিষ্ণু, শিব, ঋষিবিশেষ, অর্জ্জুন, ছায়াব্যবহার-উপযোগী কীলকবিশেষ। (ব.শ.)। ৪. man ও male (নর, মদ্দা) অর্থে প্রচলিত। ৫. **নবকে নর** বলে কেন? বলে এইজন্য যে, সে ন-কে রক্ষা করে, খেয়েও ফেলে। ন কী ব্যাপার সেকথা আমরা আগেই জেনেছি, আবারও স্মরণ করা যাক। না-করা বা অন্-করা, অর্থাৎ, অপ্রয়োজনীয়কে সরিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় আনয়ন করাই **ন**। এর ফলে আমাদের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদ আহরিত হয়ে যায়। এই সম্পদকে অতএব **ন** বলা যায়। ব.শ. সেকারণেই **ন** বর্ণের অর্থ দিয়েছেন 'বিত্ত'। এই বিত্ত রক্ষা করে যে, সে যেমন **নর**, তেমনি এই বিত্ত খায় যে, সেও **নর**। সেই বিচারে সমাজের সব সদস্যই **নর** পদবাচ্য। তবে এসব শব্দ যখন উদ্ভূত হচ্ছে, তখন সমাজ ছিল যৌথ। ফলে এই বিত্ত তখন যৌথসম্পদই বটে। সেই সম্পদ যারা শুধুই ভক্ষণ করে, তাদের **নর** বলাই যুক্তিসংগত; একালে যাদের বেকার বলা হয়। আর যারা শুধুই ভক্ষণ করে না, উৎপাদন করে নিয়েও আসে তাদের কেবল **নরই** বলা হত না, নৃ-ও বলা হত। এদের পতিই **নৃপতি**; একালের ভাষায় যাকে 'কর্মবীর' বলা যেতে পারে। তার মধ্যে যারা সমাজ-পরিচালকদের বা রাজার জন্য সম্পদ বহন করে নিয়ে আসত, তাদের বলা হত **বানর**। পরবর্তী কালে তাদের নাম হয়ে যায় **আমলা**। রামায়ণের কাহিনীতে এই **নর-বানরের** কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। তবে যারা সমাজ-পরিচালকদের বা রাজার আদেশানুসারে বিভিন্ন কাজকর্ম করত এবং

রাজসম্পদে ভাগ বসাত, তাদের বলা হত **কিন্নর**; একালে এদের রাজপুরুষ, public servant, government-employee বা সরকারি কর্মচারী বলা হয়ে থাকে। আর, যাঁরা কাঁচামালের ভিতরে শ্রম ও মেধার প্রবেশ ঘটাতেন সেই কারুকর্মজীবীদের বলা হত **বিশ্বানর**। দ্র. **উশীনর**।

নরক (নরককুণ্ড) : ১. ✓নৃ (প্রাপণ) + অক (বুন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২. *নরক*** = *নর করে যে (পরিস্থিতি); অর্থাৎ, বেকার করে যে পরিস্থিতি। /* ক্লেশ প্রাপণ করে যে; যে স্থানে পাপভোগ হয়। (ব.শ.)। **৩.** নিরয়, বিষ্ঠা, অসুরবিশেষ (ধরার গর্ভজাত বরাহরূপী বিষ্ণুর পুত্র। ইহার অন্য নাম 'ভৌম', রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। ব্রহ্মার বরদৃপ্ত নরক অদিতির কুণ্ডল ও বরুণের ছত্র হরণ এবং অমরাদি অধিকার করিলে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের প্রার্থনায় প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমনপূর্ব্বক অসুরকে নিহত করিয়া কুণ্ডল ও ছত্র উদ্ধার করেন। মতান্তরে, নরক ইন্দ্রপদ প্রার্থনা করিলে ইন্দ্র বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু চপেটাঘাতে নরককে নিহত করেন। (ব.শ.)। (ক) মৃত্যুর পর যে স্থানে গিয়ে পাপভোগ করতে হয়। সকল ধর্মশাস্ত্রেই অল্পবিস্তর নরকের প্রসঙ্গ দেখা যায়। অধর্মই নরকের একমাত্র হেতু বলে কথিত হয়েছে। (তবে) চার্বাক প্রভৃতি নাস্তিকেরা স্বর্গ-নরকের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। ... ভাগবতে আছে, এই ভূমণ্ডলের দক্ষিণ দিকে ভূমির নীচে ও জলের উপরে যম মৃত লোকদের আনয়ন করে তাদের কর্মানুসারে দোষ-গুণের বিচার করেন। এই স্থানে নরকসকল আছে। এই নরকের সংখ্যা একুশটি। ... সেগুলির নাম — **তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রবন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, সন্দংশ, তপ্তকুর্মী, বজ্রকণ্টকশাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালভক্ষ, সারমেয়ার্দন, অবীচী, ও অয়ঃপান।** (খ) অসুরবিশেষ এবং পৃথিবীর পুত্র। মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ মতে এই অসুর অদিতির কর্ণকুণ্ডল চুরি করে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের দুর্ভেদ্য দুর্গে রেখে দেয়। দেবতাদের অনুরোধে কৃষ্ণ সেখানে গিয়ে অসুরদের হত্যা করে ঐ কর্ণকুণ্ডল উদ্ধার করেন। ... হরিবংশে দেখা যায়, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা নরক দেবতাদের পরম শত্রু ছিলেন। তিনি একবার এক হাতীর রূপ ধারণ করে বিশ্বকর্মার কন্যাকে অপহরণ করেন এবং তাঁর সতীত্ব নষ্ট করেন। পরে তিনি গন্ধর্ব, মানুষ ও দেবতাদের কন্যাদের এবং অপ্সরাদের ধরে এনে এক সুন্দর অট্টালিকার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। এই ধৃতা নারীদের সংখ্যা ছিল ১৬ হাজার। তিনি এদের সমস্ত অলঙ্কার, বস্ত্র ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য অপহরণ করেন। কথিত আছে এই দুর্দান্ত অসুর আর জন্মগ্রহণ করে নাই। (পৌ.অ.)। **৪.** hell অর্থে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **নাক, উদাত্ত, অন্ধতামিস্র**। মানুষ স্বর্গে আরোহণ করে, **নরকে** পতিত হয়। এর থেকে বোঝা যায়, স্বর্গ জায়গাটা ওপরে এবং **নরক** জায়গাটি নীচে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্বর্গ কিংবা **নরক** কোনো জায়গারই সন্ধান মেলেনি। ... আমাদের '**ঙ**' গ্রন্থের '**নরকদর্শন** ...' নিবন্ধে বিষয়টির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তার মূল প্রতিপাদ্যটিকে এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করা যাক।

প্রকৃতপক্ষে মানুষকে **নরমাত্রে পরিণত করে যে, অর্থাৎ** যে সামাজিক পরিস্থিতি মানুষকে কেবলমাত্র সম্পদভক্ষণকারীতে পরিণত করে, তাকে **নরক** বলে। মানুষের সমাজ এরকম **নরক**-এ পরিণত হয় তখনই যখন সেই সমাজের অধ্যাত্মবোধ বা জীবনদর্শনের বোধ ক্ষতবিক্ষত হয়ে এতই সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, মানুষের বেঁচে থাকবার একটাই মানে আর অবশিষ্ট থাকে — 'আহার নিদ্রা মৈথুন'; 'খাও পিও মৌজ করো'। জন্তুজানোয়ারদের মতো গ্রহণ-বর্জন-পুনরুৎপাদনই মানুষের জীবনযাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে যায়। তখন চরম দেহবাদিতা মানুষের সমাজকে গ্রাস করে এবং মানুষ পশুতুল্য হয়ে যায়। এর ফলে মানুষের বাহ্যিক দুনিয়ায় যেমন নানান দুঃখদুর্দশা ও দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তেমনি মানুষের মনোলোকেও চরম বিপর্যয় ঘটে; মানুষের সমাজ **নরক** হয়ে যায়। আমাদের পূর্বসূরীগণ সেই বিপর্যস্ত সামাজিক ও মানসিক দুনিয়ায় যতরকম বিপর্যয় দেখেছিলেন, তাকে ২১ প্রকার **নরক** বলে চিহ্নিত করে সেগুলির উপরোক্ত নামকরণ করেছিলেন। এই **নরক**গুলিকে তাঁরা উভয় লোকে সমান্তরালভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁদের দেওয়া ওই ২১টি নামের অর্থ উদ্ধার করে আমরা আমাদের বর্তমান নরকপ্রায় সমাজের সঙ্গে সেগুলিকে মিলিয়ে বুঝে নিতে পারব।

আজকের তথাকথিত বিশ্বায়িত মানবসমাজের প্রত্যাশা চেষ্টা ধ্যানজ্ঞান সবই একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে — **ভোগ করো, ভোগ করো, ভোগ, ভোগ — অতএব ভোগো।** সম্পদভক্ষণই আজকের মানুষের অস্তিত্বের একমাত্র লক্ষ্য ও কারণ হয়ে গেছে; এবং স্বভাবতই দুঃখদুর্দশায় ভুগবারও কারণ হয়ে গেছে। এতকাল মানুষ বাঁচার জন্য খেত, বাহ্যশরীরটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য যেটুকু না হলে নয় সেটুকু ভোগ করত; আজকের বিশ্বায়িত সভ্যতার 'অতি বিজ্ঞানবাদী-যুক্তিবাদী-সভ্য' মানুষ শুধুমাত্র ভোগ করার জন্য বা খাওয়ার জন্যই বাঁচে! সুতরাং বিস্তর ভোগান্তি তাদের ভবিতব্য। বর্তমান সমাজে মানুষের মাঝেই অতএব **নরক** থাকা সম্ভব; এবং আছেও।

কিন্তু সেই ২১ প্রকার **নরক**গুলিকে এখন আমরা চিহ্নিত করতে পারি না, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন পারতেন। তবে আমাদের বয়স্ক বাংলাভাষী ও ধর্মপ্রাণ মানুষেরা এখনও ঐ **নরক**গুলির কোনো কোনোটির নাম তাঁদের কথাবার্তায় ব্যবহার করেন। ...

নরগণ : ২. *নর জাতীয় গণ-এর অন্তর্ভুক্ত যে।* **৩.** মনুষ্যসমূহ, নরনক্ষত্রবিশেষের গণ, নর জাত গণ। (ব.শ.)। **৪.** জ্যোতিষীদের মধ্যে প্রচলিত। **৫.** এ বিষয়ে আমরা কেবল এইটুকু জানি যে, জ্যোতিষীদের হাতে এক প্রকার জ্ঞান রয়েছে। তাতে প্রতিটি মানুষের একরকম গণ হয়, তা সে রাক্ষসগণ, নরগণ ... ইত্যাদি। সেই মতো তাঁরা মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান কেমন হতে পারে তার হিসাব কষেন। কিন্তু এই গণের অর্থ ঠিক কী, তা আদৌ স্পষ্ট নয়। পরিষ্কার বোঝা যায়, এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা প্রয়োজন।

নরম (নরম-গরম) : ২. *নরম* = *নর সীমায়িত যাহাতে।* **৩. নরম** = কোমল, মৃদু, শান্ত, মৃদু-প্রকৃতি, শান্ত-স্বভাব, সরস, স্নেহার্দ্র,

নিকৃষ্ট, বিকৃত। **নরম-গরম** = কড়ি-কোমল, মিঠা-কড়া, কটু-চাটু। (ব.শ.)। ৪. soft অর্থে **নরম**, এবং soft & hot অর্থে **নরম-গরম** প্রচলিত। ৫. দ্র. **নর্ম্ম, গর**। শব্দদুটি ফারসি থেকে আগত বলে মনে করা হয়। তা হোক, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদেরও যে সম্পর্ক প্রথম থেকেই ছিল, **নর্ম্ম** ও **গর** শব্দের মূলে সে সংবাদ রয়েছে। ...

নরমেধ (নরমেধ-যজ্ঞ, নৃমেধ, পুরুষমেধ) : ২. *নরমেধ = নর-এর মেধ (= দিশাগ্রস্ত মিতকরণ ধারিত) যাহাতে। নরমেধ-যজ্ঞ = নরমেধ করা হয় যে কর্মযজ্ঞে। নৃমেধ = নৃ-গণের মেধ যাহাতে। পুরুষমেধ = পুরুষগণের মেধ যাহাতে।* / **নরমেধ** = যে যজ্ঞে নরবলি হয়। (ব.শ.)। ৩. **নরমেধ** = পুরুষমেধযজ্ঞ। **নৃমেধ** = নরমেধ। **পুরুষমেধ** = পুরুষহিংসা, নরহত্যা, যজ্ঞবিশেষ। (ব.শ.)। **নরমেধ-যজ্ঞ** = এই যজ্ঞে পুরুষ বধ হয় বলে এর নাম নরমেধ। শুক্লযজুর্বেদের ৩০ ও ৩১ অধ্যায়ে দেখা যায় — ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই দুই বর্ণ অতিষ্ঠা কামনা করে এই যজ্ঞানুষ্ঠান করে থাকেন। (সকল ভূত অতিক্রম করে অবস্থানের নাম অতিষ্ঠা।) ৪০ দিনে এই যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। অম্বরীষ, হরিশ্চন্দ্র ও যযাতি এই যজ্ঞ করেছিলেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. সেকালে ভারতে 'বেকারদের কাজে লাগিয়ে কর্মযজ্ঞ', 'কর্মীদের লাগিয়ে কর্মযজ্ঞ' ও 'executive-দের লাগিয়ে কর্মযজ্ঞ' করাকে যথাক্রমে **নরমেধ-যজ্ঞ, নৃমেধ-যজ্ঞ** ও **পুরুষমেধ যজ্ঞ** বলা হত। দ্র. **অশ্বমেধ**।

নরসিংহ (নৃসিংহ-অবতার) : ২. *নরসিংহ, নৃসিংহ = নর বা নৃ-গণের মধ্যে সিংহ (= হিংসাকারী) যে।* ৩. নরশ্রেষ্ঠ, রাজা। যিনি নর ও সিংহ, বিষ্ণুর অর্দ্ধনর ও অর্দ্ধসিংহ চতুর্থ অবতার; নৃসিংহ। প্রহ্লাদের বাক্যরক্ষার্থ ও প্রহ্লাদের রক্ষার্থ ভগবান স্তম্ভভেদপূর্ব্বক নরসিংহরূপে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে নিহত করেন। (ব.শ.)। বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। এই অবতারে বিষ্ণু অর্ধনর ও অর্ধসিংহ রূপ ধারণ করে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন। ... ব্রহ্মার বরে হিরণ্যকশিপু দেব অসুর ও গন্ধর্বদের অবধ্য ছিলেন। এঁর চার পুত্র। তার মধ্যে প্রহ্লাদ অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। শুক্রাচার্যের পুত্র ষণ্ড ও অমার্ক দৈত্যপুত্রদের বিদ্যাশিক্ষার ভার নিয়েছিলেন। একদিন হিরণ্যকশিপু পুত্রদের বিদ্যা পরীক্ষা করবার জন্য সভায় আহ্বান করলেন। জিজ্ঞাসিত হলে প্রহ্লাদ বিষ্ণুর গুণ বর্ণনা শুরু করলেন। নিজের ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করার জন্য হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। পুত্রের মুখে শত্রুর প্রশংসা শুনে তিনি প্রহ্লাদকে খুব তিরস্কার করলেন। ... 'সর্বস্থানেই ঈশ্বর আছেন', প্রহ্লাদের এই কথা শুনে ... হিরণ্যকশিপু সম্মুখস্থ স্ফটিকস্তম্ভ দেখিয়ে পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তার মধ্যেও ভগবান আছেন কি না। ... প্রহ্লাদ 'নিশ্চয় আছেন' বলায় ... হিরণ্যকশিপু এক পদাঘাতে সেই স্ফটিকস্তম্ভ যেমন চূর্ণ করতে গেলেন, অমনি এক নরসিংহমূর্তি ভীম গর্জন করে স্তম্ভের ভিতর হতে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করে তাঁকে বধ করেন। (পৌ.অ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. *দ্র.* **অবতার**। শব্দের নিহিতার্থ অনুসারে, **নর**সমূহের সিংহ বা নৃ-গণের সিংহকে যথাক্রমে **নরসিংহ** বা **নৃসিংহ** বলে। ব.শ. অনুসারে **সিংহ** শব্দের অর্থ হল 'হিংসা করে যে'। **তার মানে, সম্পদভক্ষণকারীগণের মধ্যে যে-সত্তা সর্বোচ্চ হিংসাকারী তাকে নরসিংহ** বলা হত; আর, সম্পদস্রষ্টাদের মধ্যে যে-সত্তা **সবচেয়ে বেশি আক্রমণাত্মক**, তাকে **নৃসিংহ** বলা হত। পুরাণকথিত ভারত সমাজের বিকাশের ইতিহাসে পুঁজির উদ্ভব হয়েছিল দশ রকম রূপে, তাদের দশাবতার বলে। দ্র. **অবতার**। এর আবির্ভাবের **আগেই মৎস্যাবতার, কূর্ম্মাবতাব ও বরাহাবতার** যথাক্রমে individual ownership, production-organisation on the basis of division of labour, investment in labour-power and raw-material রূপে ভারত সমাজের বুকে আবির্ভূত হয়ে গেছেন। তারপরই আবির্ভাব ঘটে **নৃসিংহ-অবতারের**, যাকে একালের ভাষায় বলা হয় productive & competative capital।

নর্ম্ম : ১. ✓নৃ + মন্ (মনিন্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. *নৃ-র মিতকরণ অন (on) থাকে যাহাতে।* / আনন্দ প্রাপণ করে যে। (ব.শ.)। ৩. পরিহাস, বৈদগ্ধ্য, বৈদগ্ধ্যক্রীড়িত। (ব.শ.)। ৪. play, amusement, merry-making ইত্যাদি অর্থে কমবেশি প্রচলিত। ৫. দ্র. **ধর্ম্ম**। ধর্ মিতি মিত যাহাতে, তাকে বলে **ধর্ম্ম**। একই ভাবে **নর্** মিতি মিত যাহাতে, তাকে **নর্ম্ম** বলতে হয়। **ধৃ** থেকে যেমন **ধর্**, তেমনি **নৃ** থেকে **নর্**। এর অর্থ হল ন-এর আবর্তন থাকে যাহাতে। অর্থাৎ কিনা, ন-করণ (না-করণ ও অন্-করণ) আবর্তিত হতে থাকে যাহাতে, সেই হল **নৃ** বা **নর্**। সেই নৃ-র মিতকরণ মিত হয় **নর্ম্মে**। ব্যাপারটি কীরকম?

মানুষ যখন নাচ গান খেলা ইত্যাদি করে, তখন সে আসলে কী করে, তার কিছু কথা আমরা **খেলা, ক্রীড়া, কেলি** প্রভৃতি শব্দে বলেছি। প্রকৃতপক্ষে জীবজগতে অ্যামিবা থেকে মানুষ পর্যন্ত জীবের যে ক্রমবিকাশ দেখতে পাওয়া যায়, প্রতি উচ্চতর স্তরে তার অন্তত তিনটি পার্থক্য স্পষ্ট চোখে পড়ে — যত উচ্চতর সিঁড়ির জীব, তার তেজ বা জীবনীশক্তি তত উদ্বৃত্ত, তার আত্মনিয়ন্ত্রণক্ষমতা তত বেশি, তার মনের ক্ষুধা তত বেশি। স্বভাবতই প্রতিটি উচ্চতর সিঁড়ির জীবের শারীরিক ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টার চেয়ে মানসিক ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা ক্রমশ বেড়েছে এবং মানুষে পৌঁছে মানসিক ক্ষুধা ও সেই ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা সর্বোচ্চ রূপ লাভ করেছে।

তা সেই যাই হোক, এই যে উদ্বৃত্ত তেজ বা জীবনীশক্তি, তা নিয়ে উচ্চতর সিঁড়িতে অবস্থিত জীব দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। (নিম্ন সিঁড়িতে অবস্থিত জীবের সেরকম আচরণ থাকলেও তা এত অব্যক্ত যে, আমরা তা দেখতে পাই না।) একদিকে জীবিকা-কর্মের মিথ্যা অভ্যাস ক'রে পরবর্তী কর্মের জন্য নিজেকে আরও পটু করে তোলে; অপরদিকে নিজের মনের খোরাক যুগিয়ে মনের তৃপ্তিসাধন করে। তার জীবিকা-কর্মে মিথ্যা অভ্যাস করার আচরণগুলি সবই ক্রীড়া বা খেলা পদবাচ্য এজন্যই যে, এগুলিতে কোনো নতুন বস্তু উৎপন্ন হয় না অথচ (উদ্বৃত্ত) তেজের লয় হয় এবং অভিজ্ঞতার আবর্তন হয়। এই অভিজ্ঞতার আবর্তন একদিকে তাকে তার পরবর্তী জীবিকা-কর্মে আরও পটু করে তোলে, অপরদিকে তার মনের খোরাক যুগিয়ে মনকে আরও শক্তিশালী বা ধনী করে তোলে। এই অভিজ্ঞতার আবর্তনকেই বলেই নৃ-মিতি। এই নৃ-মিতি মিত বা সীমায়িত যাহাতে,

তাকে বলে **নর্ম্ম**। তার মানে, মানুষ পেটের দায়ে জগতের সঙ্গে কর্মে লিপ্ত হয়ে যে বাহ্যিক লাভ পায় সেটি পেট বা দেহ দিয়ে ভোগ করে; আর যে মানসিক লাভ বা অভিজ্ঞতা লাভ করে, **ক্রীড়াদির** মাধ্যমে সেই জমা অভিজ্ঞতার মন্থন করে মাখন তুলে তার ঘি বানিয়ে আপন আপন ঘিলুতে পাঠিয়ে মনের ক্ষুধানিবৃত্তি করে, ঘিলুর পুষ্টিসাধন করে। সেই বিচারে মানুষ জগৎ থেকে যা কিছু পেতে পারে, সেগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাপ্তব্য হল এই **নর্ম্ম**। কেননা, এই **নর্ম্ম**-এর ভিতরেই অভিজ্ঞতাবলী মথিত হয়ে সীমায়িত রূপ পেয়ে সেই সব সূত্রে পরিণত হয়, যেগুলি বিশ্বজগতের মূলনীতি। এর একটি অংশকে একালে principle বলা হয়। ... দ্র. **নর্ম্মদা**। **৬.** ইংরেজি norm, normal।

নর্ম্মদা : **১.** নর্ম্মন্ + ✓দা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে + স্ত্রী আ (টাপ্)। (ব.শ.)। **২.** *নর্ম দান করে যে।* **৩.** নদীবিশেষ। (ব.শ.)। (ক) নদীর নাম। (খ) রাজা পুরুকুৎসের স্ত্রী। (গ) এক গন্ধর্বী। সুন্দরী, কেতুমতী, ও বসুদার মাতা। অন্যমতে নর্মদা, কেতুমতী, ও বসুদা — এঁরা তিনজন ভগিনী। মাল্যবান নর্মদাকে বিবাহ করেন। (পৌ.অ.)। **৪.** নদীর নাম রূপে প্রচলিত। **৫.** **নর্ম্ম** কী, তা আমরা উপরের ভুক্তিতেই জেনেছি। **নর্ম্মদা** বিষয়ে যে সকল পৌরাণিক তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলি এখনও ঠিকঠাক উদ্ধার করা যায়নি। কিন্তু **নর্ম্মদা** নদী বা ধারাকে উদ্ধার করা গেছে। এ হল জাগতিক সূত্রসমূহের, সামাজিক সূত্রসমূহের ধারা; মূল জ্ঞানের ধারা। তথ্য এইরূপ যে, সর্বপ্রকারের পাপ স্খালন করার যোগ্যতা ধরেন **গঙ্গা**। সমাজের বুকে এই **গঙ্গার** যে ধারা তাকে আমরা ব্যক্তিগত পণ্যের ধারা রূপে সুনিশ্চিতভাবে শনাক্ত করেছি। মানুষের সমস্ত উদ্বৃত্ত-উৎপাদন বা পণ্যকে (অর্থাৎ পাপকে) সে গ্রহণ করে আপন প্রবাহে বাহিত করে নিয়ে যায়, সব পাপ ধুয়ে দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই **গঙ্গার** যদি পাপ জমে যায়, তাহলে সেই পাপ স্খালন করতে পারে কে? তথ্য বলছে যে, একমাত্র **নর্ম্মদাই গঙ্গার** সেই পাপ স্খালন করার যোগ্যতা ধরে। অর্থাৎ একালে যাকে মার্কেটিং সিস্টেম বলে, তার যদি পাপ জমতে শুরু করে, তা সাফ করার যোগ্যতা আর কারও নেই, একমাত্র সামাজিক-জাগতিক সূত্রসমূহের ধারা **নর্ম্মদাই** তা করতে পারে। তার মানে, শেষ পর্যন্ত **নর্ম্মদার** কাছেই মানুষকে যেতে হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে **নর্ম্মদা-পরিক্রমার** এত উচ্চ মর্য্যাদা তার কারণ নিহিত রয়েছে এখানেই। আজকের পৃথিবীতে **গঙ্গা** তার বাজার-অর্থনীতি-রূপে অত্যন্ত ক্লেদাক্ত হয়ে উঠেছে। তাকে যদি পাপমুক্ত করতে হয়, জাগতিক ও সামাজিক সূত্রসমূহের ধারার কাছেই যেতে হবে, **নর্ম্মদা-পরিক্রমা** করতে হবে। অন্য উপায় নেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই যে মানসিক **নর্ম্মদা**, এর সঙ্গে ভারতের বুকের উপর দিয়ে প্রবাহিত যে পার্থিব জলধারাবাহী **নর্ম্মদা** নদী, তার সম্পর্ক কোথায়? তার সম্পর্ক রয়েছে এমন এক নিয়মে, যা আমরা অজস্র বার প্রত্যক্ষ করেছি আমাদের শব্দানুসন্ধান প্রক্রিয়ায়; কিন্তু তার কারণ আমরা আজও জানতে পারিনি। একে আমরা সমান্তরাল সম্পর্ক হিসেবেই চিনেছি। মানসলোকে যে-**গঙ্গাকে** আমরা পণ্যধারা রূপে দেখি, হুবহু একই স্বভাবে বাহ্যলোকে আমরা তাকে পার্থিব জলধারাবাহী **গঙ্গা** নদী রূপে দেখি। সেভাবেই দেখতে পেয়েছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা এবং সেভাবেই দুটি ধারাকে তাঁরা একই নামে চিহ্নিত করে গেছেন। একই কথা বলা যায় **নর্ম্মদা** নদী সম্পর্কেও। এসব কথা কিছুই না-জেনে না-বুঝে কিছু মৌলবাদী দক্ষ মানুষ তথাকথিত নর্মদা-পরিকল্পনা নামে **নর্ম্মদার** বিস্তর ক্ষতি করছেন, করেছেন। এর ফল যে খুবই মন্দ হবে, তা বলাই বাহুল্য।

নারদ : **১.** নার + ✓দা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** / যিনি আত্মজ্ঞান দেন; যিনি পিতৃগণকে জল দেন। (ব.শ.)। **৩.** দেবর্ষিবিশেষ। (ইনি মনুর সৃষ্ট প্রজাপতিবিশেষ। ভাগবতে, ব্রহ্মার ইন্দ্রিয় হইতে এবং মতান্তরে, ব্রহ্মার উৎসঙ্গ (ক্রোড়) হইতে ইঁহার জন্ম। ইঁহার রচিত স্মৃতিগ্রন্থ 'নারদপঞ্চরাত্র'। নারদকথিত 'পুরাকল্প-জন্মবৃত্তান্ত' ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে।) (ব.শ.)। হরিবংশ মতে, ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা প্রজা সৃষ্টি করতে অভিলাষী হয়ে প্রথমে মরীচি, অত্রি, স্কন্দ প্রভৃতিকে ও পরে সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, নারদ ও রুদ্রদেবকে সৃষ্টি করেন। ইনি ... ত্রিকালদর্শী, ত্রিলোকজ্ঞ বেদজ্ঞ তপস্বী। নার শব্দের অর্থ জল; সর্বদা তর্পণের জন্য ইনি জলদান করতেন বলে এঁর নাম নারদ। ভাগবতে নারদ সম্বন্ধে এইরূপ বৃত্তান্ত আছে — পূর্ব জন্মে ইনি ব্রাহ্মণদের এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাতার আদেশে ইনি যোগীদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। একবার এই যোগীদের আজ্ঞায় তাঁদের উচ্ছিষ্ট অন্ন আহার করায় নারদের পাপমোচন হয়। ... সর্পাঘাতে মাতার মৃত্যুর পর ... ইনি বনমধ্যে প্রবেশ করে পরমাত্মার চিন্তায় নিয়োজিত থাকেন। এই সময় তাঁর হৃদয়ে ভগবান আবির্ভূত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। ... তারপর কল্পাবসানে যখন ভগবান বিষ্ণু সমুদ্রজলে শয়ন করে ছিলেন, তখন তাঁর নিঃশ্বাসযোগে নারদ তাঁর অন্তরে প্রবেশ করেন। যুগসহস্রের পর প্রলয়ের অবসান হলে, ভগবান যখন নিদ্রা থেকে উঠে পুনর্বার সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁর ইন্দ্রিয় হতে মরীচি, অত্রি প্রভৃতি ঋষিরা জন্মগ্রহণ করেন; নারদও তখন জন্মগ্রহণ করেন। সেই হতে নারদ দেবদত্ত বীণায় হরিগান করে সর্বত্র ভ্রমণ করে বেড়ান।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি ব্রহ্মার কণ্ঠ হতে উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁর অন্যান্য মানসপুত্রদের সঙ্গে নারদকে সৃষ্টিকার্যের ভার দেন; কিন্তু নারদ দেখলেন যে, সৃষ্টিকার্য নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে ঈশ্বরের চিন্তায় তাঁর বাধা পড়বে। তাই তিনি ব্রহ্মার এই আদেশ পালন করতে রাজী হলেন না। তখন ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে নারদকে অভিশাপ দিলেন। ব্রহ্মার শাপে নারদ গন্ধমাদন পর্বতে গন্ধর্বযোনিতে জন্মগ্রহণ করে উপবর্হণ নাম গ্রহণ করেন। এই জন্মে তিনি গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের ৫০টি কন্যাকে বিবাহ করেন। একদিন ব্রহ্মার সভায় অপ্সরা রম্ভার নৃত্য দেখে নারদ এত কামমোহিত হয়ে পড়েন যে, উত্তেজনায় তাঁর রেতঃপাত হয়। এতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে এঁকে অভিশাপ দেন। এই শাপের ফলে নারদ গন্ধর্বদেহ ত্যাগ করে নরলোকে জন্মগ্রহণ করেন। কান্যকুব্জবাসী দ্রুমিল নামে এক গোপরাজের কলাবতী নামে এক বন্ধ্যা স্ত্রী ছিলেন। একদিন কশ্যপ

নামে এক ঋষি স্বর্গের অপ্সরা মেনকাকে দেখে কামাতুর হয়ে রেতঃপাত করেন। কলাবতী এই রেতঃ ভক্ষণ করে গর্ভবতী হন। তখন কলাবতীর গর্ভে গন্ধর্ব উপবর্হণ মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। ব্রাহ্মণরা এঁকে ব্রহ্মার পুত্র জেনে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। একদিন ইনি বিষ্ণুমন্ত্র জপ করতে করতে ধ্যানস্থ অবস্থায় বিষ্ণুমূর্তি দেখতে পেলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই মূর্তি এই ভবিষ্যদ্বাণী করে অদৃশ্য হয়ে যায় যে — তোমার এই দেহ নষ্ট হলে আমাকে দেখতে পাবে। যথাসময়ে বিষ্ণুকে ধ্যান করতে করতে নারদের মৃত্যু হলে, তাঁর শাপমোচন হয় ও তিনি ব্রহ্মে লীন হন। কয়েক কল্প পরে ব্রহ্মা যখন আবার সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন, তখন তাঁর কণ্ঠ হতে নারদ উৎপন্ন হন।

বীণা হতে ইনি ত্রিভুবন ভ্রমণ করতেন এবং বীণা বাজিয়ে গান করে সকলকে মোহিত করতেন। সংবাদ ও পরামর্শদান, যুদ্ধবিগ্রহ, বিবাহাদি সংঘটনে এঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। ... শিবের বিবাহে ইনি ঘটক, ধ্রুবের তপস্যায় ইনি মন্ত্রদাতা। দক্ষের দর্পনাশেও নারদ ছিলেন। ... (প্রথম) ইনি ব্রহ্মার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ... বিষ্ণুর আদেশে উলুকেশ্বর নামে এক গন্ধর্বের কাছে (ইনি) সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ... এইরূপ প্রবাদ আছে যে, নারদের বাহন ঢেঁকি; কিন্তু শাস্ত্রে এর কোনো প্রমাণ নেই। (পৌ.অ.)। **৪.** সাধারণভাবে অপ্রচলিত। **৫.** গ্রামবাংলার মানুষ এখনও জানেন, ইনি বিষ্ণুভক্ত একটি চরিত্র, যিনি হরিগুণ গান করেন। কিন্তু হলে কী হবে, ইনি ঝগড়া লাগানোর কাজও করেন। এখনও 'নারদ নারদ' বলে গ্রামবাংলায় লোকে ঝগড়ায় উস্‌কানি দেয়। সত্তাটি ঠিক কাকে বোঝায়, তা আমরা আজও ঠিকঠাক উদ্ধার করে উঠতে পারিনি। আমাদের যেটুকু মনে হয়েছে, তা হল, সমাজে মাঝে মাঝেই এক একটি বিশেষ সামাজিক প্রয়োজন বিশেষ একটি বাক্যে স্লোগানের মতো উঠে আসে। 'নর হইতে জাত' বলে তাকে **নার** বলা যায়। হিন্দিতে একে 'নারা লাগানা' বলে। এইরূপ '**নার** দেয় যে' বা 'ধুয়া' তোলে যে, সেই সত্তাটিকে **নারদ** বলে। এই সত্তা সবসময়ই 'কী করে দু-পয়সা আসে', তার পক্ষে সওয়াল করে থাকে। একে স্বভাবতই 'হরিগুণ গাওয়া' বলা যেতেই পারে। ...

নারায়ণ (নগদ-নারায়ণ) : **২.** *নর হইতে জাত* = ***নার****; সেই নার-এর অয়ন যাহাতে।* / নার অয়ন যাঁহার; প্রলয়সলিল যাঁহার আশ্রয়; জীবসমূহের আশ্রয় যিনি। (ব.শ.)। নারা (জল) অয়ন (স্থান) যাঁহার, তিনি; নারের (নরসমূহের) অয়ন (আশ্রয়) যিনি, তিনি; নারের (সারূপ্যমুক্তির) অয়ন (স্থান) যিনি, তিনি। (ছা.অ.)। **৩.** ঋষিবিশেষ, অজামিলপুত্র, শ্রীকৃষ্ণের অর্বুদসংখ্যক গোপসৈন্যবিশেষ, নরদেহস্থিত অন্তর্যামী আত্মা বা ভগবান। (ব.শ.)। বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, নর-নারায়ণ অবতার, অজামিলের কনিষ্ঠ পুত্র, কান্ববংশীয় ভূমিমিত্রের পুত্র, কচ্ছস্থিত একটি পুণ্যসরোবর, তীর্থবিশেষ। (ছা.অ.)। **৪.** ঠাকুরের নাম রূপে **নারায়ণ** এবং 'টাকাপয়সা' অর্থে 'নগদ-নারায়ণ' প্রচলিত। **৫.** দ্র. **কাদম্বিনী**। বাংলাভাষায় ঈশ্বর বা ঈশ্বরপ্রতিম সত্তাগুলির নামকরণের অর্থ উদ্ধার করার ক্ষেত্রে আমরা একটি সাধারণ নিয়ম লক্ষ করেছি। শব্দগুলি প্রায়শই একইসঙ্গে অন্ততপক্ষে তিনটি স্তরে প্রযুক্ত — **জড়জাগতিক স্তর, সামাজিক স্তর,** ও স্বর্গীয় স্তর। তার মানে আমাদের **পূর্বপুরুষেরা তিনটি স্তরকেই যথাযথভাবে বুঝবার** যোগ্যতা ধরতেন। **আমরা কিন্তু** কোনো স্তরকেই সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি না, ছাড়া ছাড়া ভাবে এখানে একটু বুঝতে পারি তো ওখানে অন্য একটু বুঝতে পারি। তবে, আমাদের এই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধির সাহায্যে বর্তমানে আমরা সামাজিক স্তরটি অনেকখানিই বুঝতে পারছি। **নারায়ণ** শব্দের ক্ষেত্রেও আমরা কেবল সামাজিক স্তরে তার অর্থটি বুঝতে পেরেছি। অন্য স্তরের অর্থগুলি আমাদের কাছে এখনও অধরা।

উপরোক্ত **নারায়ণ** বিষয়ক তথ্যাবলী থেকে এমন কিছুই জানা যায় না যে, তাকে বাস্তবে শনাক্ত করা যায়। কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীর নীলকণ্ঠ কৃত টীকায় **নীলকণ্ঠ নারায়ণ** শব্দের যে অর্থ দিয়েছেন, তার থেকে তাঁকে অনেকটাই চেনা যায়। নীলকণ্ঠের মতে, 'নর শব্দের অর্থ অবিদ্যার দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিশিষ্ট জীব। ... সেই জীব দ্বারা বিষয়ীকৃত অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই নারায়ণ।'

অবিদ্যা শব্দের অর্থ এককথায় পুনরাবৃত্তিমূলক দক্ষজ্ঞান বা স্পেশালাইজড্ জ্ঞান। চাষী, জেলে, কামার, কুমার, ডাক্তার, মাস্টার, উকিল ... ইত্যাদি থেকে একালের সাইবার কুলি পর্যন্ত প্রত্যেকেই আসলে অবিদ্যাধর। চাষী যেমন তার বিশেষ ধানটির চাষাবাদ বিষয়ে দক্ষ বটে, কিন্তু সেই ধানটির ঐ প্রকার চাষের জ্ঞানের আদি-অন্ত কিছুই সে জানে না; ঠিক সেইরকম একজন কমপিউটার কর্মীও তার বিশেষ কাজটিতে দক্ষ হলেও তার বিজ্ঞানটির আদি-অন্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শুধু তাই নয়, তারা পরস্পরের বিষয় সম্পর্কেও প্রায় কিছুই জানে না। যে যার নিজ নিজ বিশেষ জ্ঞানের ঘন শক্ত রূপের আধার ব'লে, একালের প্রায় প্রতিটি মানুষই 'অবচ্ছিন্ন চৈতন্য বিশিষ্ট জীব'; যেন-বা প্রত্যেকেই এক একটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন পার্সোনাল কমপিউটার। নীলকণ্ঠ বলছেন, সেই **নর**-দ্বারা বিষয়ীকৃত অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মই **নারায়ণ**। তার মানে **নারায়ণ**কে যদি একটি বিরাট সামিয়ানা বলে ভাবা হয়, তবে সে সামিয়ানা অবশ্যই ছোট ছোট কাপড় জুড়ে জুড়ে বানানো; আর সেই ছোট ছোট কাপড়ের টুকরোগুলি হল **নর**। তবে এই জড় উদাহরণটি আমরা বিষয়টিকে সহজ করে বোঝানোর জন্যই দিলাম। আমাদের প্রাচীন শব্দকারগণ এই ক্ষেত্রে তরল ধারণার ব্যবহার করেছেন। **নারায়ণ** যেন এক পুকুর দুধ, আর **নর** যেন সেই দুধের প্রতিটি ফোঁটা। সেই ফোঁটা দ্বারা বিষয়ীকৃত হয়ে দুধপুকুর গড়ে উঠেছে।

এই **নারায়ণ**কে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তরের সাহায্যে এবার সহজেই চেনা সম্ভব। দুনিয়ার সব লোক আজকের দিনটাকে একই তারিখ, একই বার বলে উল্লেখ করেন কীভাবে? একই শব্দকে একটি ভাষার সমস্ত ভাষাভাষী মানুষ একই অর্থে বোঝেন কীভাবে? একটি দেশের একই অর্থ-মুদ্রাকে সেই দেশের মানুষেরা একই অর্থমানের মুদ্রা বলে বোঝেন কীভাবে?

বোঝেন এইভাবে — তারিখ, বার, শব্দ, মুদ্রা ... প্রভৃতির অর্থ-সম্বলিত ধারণাকে ধরে রাখেন প্রতিটি মানুষ বা **নর**। সেই **নরে-নরে** মিলিত হয়ে (কিন্তু মিশ্রিত না হয়ে) গড়ে ওঠেন **নারায়ণ** সত্তাটি। এই **নারায়ণই** হয়ে যান **গদ-নারায়ণ ও নগদ-নারায়ণ**।

শব্দ ও শব্দার্থ, তারিখ, বার, মাস, বছর, খ্রিস্টাব্দ, বঙ্গাব্দ ... এসবকে ধরে রাখেন **গদ-নারায়ণ** এবং মুদ্রা, মূল্য, চেক, টাকাপয়সা ... এসবকে ধরে রাখেন **নগদ-নারায়ণ**। আমাদের সঙ্গে পাঠকপাঠিকা রূপে আপনার এই মানসিক লেনদেন চলছে আমরা একই **গদ-নারায়ণ**-এর ভক্ত বলে। বাজারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত ব্যক্তিই একই **নগদ-নারায়ণ**-এর ভক্ত বলে আপনি আমি বাজারে গিয়ে নিজের প্রয়োজন মতো লেনদেন করতে পারছি। এই যে বাকফসলের দুনিয়ায় এবং অবাকফসলের (পণ্যের) দুনিয়ায় মানুষ লেনদেন করতে পারছে, তা সম্ভব হচ্ছে এই **নারায়ণ** সেই দুই লোকে বিরাজ করছেন বলেই। আমাদের প্রাচীন পুরুষেরা এই দুই লোকে **নারায়ণ**কে দেখতে পেয়েছিলেন বলেই তাঁরা তাঁদের গ্রন্থগুলির সূত্রপাতে এই শ্লোকটি লিপিবদ্ধ করে গেছেন — 'নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরঞ্চৈব নরোত্তমম্। দেবীং সরস্বতীং চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ।।' ... দ্র. **কৃশ, কৃষ্ণ, গদ, গদা, রাম, শ্যাম**।

নৃপ (নৃপতি) : ১. নৃ + ✓পা + অ (ক) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নৃপ*** *= নৃ-পালন করে যে।* ***নৃপতি*** *= নৃ-গণের পতি।* / **নৃপ** = নরকে পালন করে যে। (ব.শ.)। ৩. **নৃপ** = নরপতি, রাজা। **নৃপতি** = নরাধিপ, রাজা, কুবের, শ্রেষ্ঠার্থ। (ব.শ.)। ৪. অপ্রচলিত। ৫. **নর** শব্দে আমরা আগেই জেনেছি, **নর** ও **নৃ** সম্পূর্ণ এক শ্রেণীর মানুষকে বোঝায় না। উভয়ে মানুষ নামক জীবকে বোঝালেও তারা ক্রিয়ার বিচারে এক নয়; সম্পদভোগকারীকে **নর** এবং সম্পদসৃজনকারীকে **নৃ** বলা হয়। তাছাড়া, **নৃ** কথাটির মধ্যে ন-করণ ও **অন্**-করণের আবর্তন রয়েছে। ফলে, **নৃ** মানবিক গুণের উচ্চতর সত্তাকে বোঝায়। সুতরাং **নৃপ** যেমন কর্মী, বীর, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, জ্ঞানী ... ইত্যাদি মানুষদের পালনকারীদের বোঝায়, তেমনি **নৃপতি**ও তাদেরই **পতি**কে বোঝায়; শুধুমাত্র সম্পদভোজনকারীদের পতিকে বা **নরপতি**কে বোঝায় না। তবে একথা মানতেই হবে যে, বহু প্রাচীনকাল থেকেই **নৃ** ও **নর** শব্দটিকে গুলিয়ে তাদের পার্থক্য মুছে দিয়ে তাদেরকে একই সত্তা করে রাখা হয়েছে। ...

নৃশংস (প্রশংসা) : ১. নৃ + ✓শংস্ + অ (অণ্) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নৃশংস*** *= নৃ-র* ***শংসন*** *(শক্তির রহস্যরূপের* ***স*** *বা* ***কিরণ*** *রূপ অন যাহাতে) থাকে যাহাতে।* ***প্রশংসা*** *=* ***প্রকৃষ্ট*** *শংসন থাকে যাহাতে।* / **নৃশংস** = নরকে হিংসা করে করে যে। **প্রশংসা** = গুণাবিষ্কার পূর্ব্বক স্তুতি থাকে যাহাতে। (ব.শ.)। ৩. **নৃশংস** = ক্রুর, ক্রুরকর্ম্মা, পরদ্রোহী, ঘাতুক, নিষ্ঠুর, ক্রুরকার্য্য। **প্রশংসা** = গুণকীর্ত্তন, স্তুতি, সুখ্যাতি। (ব.শ.)। ৪. cruel অর্থে **নৃশংস** এবং praise অর্থে **প্রশংসা** প্রচলিত। ৫. **শংস কথাটির অর্থ হল** একধরনের শক্তিদান। এই দান কোনো বাহ্যশক্তি দান নয়, সহজ সরল মানসিক শক্তিদান — 'বাহ্, বেশ করেছ, ভালো করেছ!' এইরূপ কথন। তবে আমাদের কাছে প্রশ্নটি অন্যরকম, আমরা জানতে চাই — **নৃশংস** বললে 'নিষ্ঠুর' বোঝায় কেন, যখন কিনা **প্রশংসা** বললে 'স্তুতি' বোঝায়!

নৃ শব্দের অর্থে আমরা আগেই জেনেছি যে, **নৃ** একজন কর্ম্মবীর মানুষ। সেই মানুষটি 'হরিণ মেরে আসছে ফিরে স্কন্ধে ধনু তীর' দেখে তাঁর বন্ধুবান্ধব কিংবা রাজা তাকে শংসিত করতে পারেন। বীরের প্রতি তাঁদের এই যে **শংসন**, বীরের কাছে তা যতই তৃপ্তিদায়ক হোক না কেন, হরিণের কাছে সেটি খুবই ভয়ানক ব্যাপার। এমনকি নিরীহ অহিংস মানুষের চোখেও ব্যাপারটি নিরীহ মনে হয় না। ফলে, একের গৌরব অন্যের পক্ষে পীড়াদায়ক ব্যাপার রূপে প্রতীয়মান হয়ে যায়। সেকারণেই '**নৃ**-র **শংসন** থাকে যাহাতে', সেই **নৃশংস** ব্যাপারটি শংসাকারী ও শংসিতের চোখে সুখদায়ক মনে হলেও দ্রষ্টার চোখে তা **নৃশংস** ব্যাপার হয়ে যায়।

নৃত্ ক্রিয়ামূলের বংশে জনিত শব্দসমূহের তালিকা : আনর্ত্ত, আনর্ত্তন, আনর্ত্তিত, নাচ, নাচন, নাচন-কোদন, নাচনি(নী), নাচনীয়া, নাচায়ন, নাচিয়ে, নাচুনী, নাটাই, নৃৎ, নৃতি, নৃত্ত, নৃত্য, নৃত্যক, নৃত্যকী, নৃত্যগীত, নৃত্যপ্রিয়, নৃত্যশালা, নৃত্যস্থান, নর্ত্ত, নর্ত্তক, নর্ত্তকী, নর্ত্তন, নর্ত্তন-কুর্দ্দন, নর্ত্তনাগার, নর্ত্তনাগৃহ, নর্ত্তিত, নৃত্য।

নৃত্ = ন-এর আবর্ত্তনের তারণ। **নৃত** = ন-এর আবর্ত্তনের তারণ যাহাতে।

নাচ (নাচন, নাচন-কোদন) : ২. ***নাচ*** *=* ***নচ*** *(ন চয়িত যাহাতে) হইতে জাত।* ***নাচন*** *=* ***নাচ*** *অন (on) যাহাতে।* ***নাচন-কোদন*** *=* ***নাচন*** *ও* ***কোদন*** *(কুঁদ অন বা কুর্দ্দ অন) যাহাতে।* ৩. **নাচ** = নৃত্য, নৃত্যবৎ পশুর বা পক্ষীর অঙ্গভঙ্গি। (ব.শ.)। ৪. dance অর্থে প্রচলিত। ৫. যদিও নানান তথ্যে দেখান হয় যে, **নাচ** শব্দটি **নৃত্য** শব্দ থেকে নচ্চ > ণ(ন)চ্চ পেরিয়ে **নাচ** রূপে জাত হয়েছে, আমাদের সন্দেহ হয়। কারণ আমরা দেখছি, শব্দটি বাংলাভাষার নিজস্ব অর্জনও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ন-চয়িত যাহাতে তাকে **নচ** এবং তার থেকে **নাচ** শব্দের নির্ব্বচন করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে **নাচ**-এর ভিতরে **নর্ম্ম** শব্দের মূল যে 'অভিজ্ঞতার আবর্ত্তন', তাকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তাই সেভাবেই আমরা শব্দটির অর্থ প্রকাশ করলাম।

নৃত্য : ১. ✓নৃৎ + য (ক্যপ্) - ভাববাচ্যে। (ব.শ.)। ২. ***নৃৎ*** *(= ন-এর আবর্ত্তনের তারণ) থাকে যাহাতে।* ৩. তালমানাদিযুক্ত সবিলাস গাত্রবিক্ষেপ। (ব.শ.)। ৪. dance অর্থে প্রচলিত। ৫. দ্র. **নর্ম্ম**।

ন্ নিপাতে রক্ষিত শব্দসমূহের তালিকা : অনিত্য, অহিনকুল, ন, নং (no, number, দ্র. নাম), নকল, নকশ, নকস, নকশা, ন-কার, নকাশি, নকাসি, নকিঞ্চন, নকি(কী)ব, নকুল (নুকল), নকুলী, নকুলে, নক্ষত্র, নক্ষত্রচক্র, নক্ষত্রজীবী, নক্ষত্রদর্শ, নক্ষত্রনাথ, নক্ষত্রনেমি, নক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রমালা, নক্ষত্রযোগ, নক্ষত্ররাজ, নক্ষত্রলোক, নক্ষত্রশূল, নক্ষত্রামৃতযোগ, নক্ষত্রেশ, নখ, নখউধা, নখত, নখতর, নখতা (বিন্দু), নখকাটা, নখখাদী, নখদর্পণ, নখনিকৃন্তন, নখম্পচ, নখর, নখরঞ্জনী, নখরদর্পণ, নখরায়ুধ, নখলেখক, নখশূল, নখাঘাত, নখানখি, নখী, নগ, নগণ্য, নগদ, নগদান, নগদী, নগর, নগরকীর্ত্তন, নগরপাল, নগরমার্গ, নগরাধিকৃত, নগরাধিপ, নগরাধিপতি, নগরাধ্যক্ষ, নগরি(রী)য়া, নগরী, নগরীয়, নগরোপকণ্ঠ, নগরোপান্ত,

নগাঙ্গি, নগাধিপ, নগাধিপতি, নগাধিরাজ, নগাপগা, নগারি, নগেন্দ্র, নগোত্তম, নাং (নাগাত), নাং, নাঙ্, নাঙ্গ্ (ন-গম্য), নচিকেতাঃ, নচেৎ, নছ(স)ব্, নছি(সী)ব, নজদিক(গ), নজর, নজরবন্দী, নজরানা, নজিমা, নজি(জী)র, নঞ্ (ন, না), নতু, নতুবা, ননৎকার, না (নঞ্, লা), নাদরদ, ন্যক্কার, নৎকার, ননদ, ননদিয়া, ননন্দ (ন-নন্দন করে), ননন্দা, নন, নন্দাই, নপুংসক, নপ্তা (নপ্ত, নপ্তৃক), নফর, নফলা, নবত, নবাৎ, নবাব, নবাবজাদ (-জাত), নবাবজাদা(দী), নবাবী, নবি, (নবী), নবি(বী)সিন্দা, নমুচি, নমুদ, মুনা, নমেরু, নম্বর, নম্বরী (দ্র. নং), নরঙ্গ, নরুণ(ন), নর্দ্, নর্দ্দ, নর্দ্দ, নর্দ্দন, নর্দ্দিত, নর্দ্দী, নসীব (নছিব), নস্কর (লস্কর), নহবৎ, নহবৎখানা, নহর, না, নাঅর, নাই, নাই (নাপিত), নাইক(কো), নাউআ, নাতনি(নী), নাতি, নাক্ষত্র, নাগ, নাগকেশর, নাগগর্ভ, নাগচূড়, নাগদন্ত, নাগনায়ক, নাগপঞ্চমী, নাগবল্লরী, নাগলতা, নাগদনা, নাগপাশ, নাগপুর, নাগপুষ্প, নাগফট, নাগভূষণ, নাগমাতা, নাগযষ্টি, নাগর, নাগর, নাগরদোলা, নাগরপনা, নাগরাজ, নাগরালি, নাগরমুথা, নাগরমুস্তা, নাগরা, নাগরি(রী), নাগরিক, নাগরিমা, নাগরী (দেবনাগরী), নগর‍্যা, নাগলোক, নাগাঙ্গ না, নাগাড়া(রা), নাগান্তক, নাগাসন, নাগাহু, নাগাহুয়, নাগিনী, নাগেন্দ্র, নাগেশ, নাগোরা, নাচার, নাচাড়ি(ড়ী), নাচি(ছি), নাছ, নাছদরজা, নাছাড়, নাছোড়, নাজিম, নাজি(জী)র, নাজেহাল, নাণক, নাতজামাই, নাতনি(নী), নাতবউ, নাতি, নাতিখর্ব্ব, নাতিদীর্ঘ, নাতিদূর, নাতিন, নাতিনী, নাতিনীচ, নাতি-পুতি, নাতিমানিতা, নাতী, নাত্যুচ্ছ্রিত, নানক (নাণক?), নানা, নানান, নানাবিধি, নানাস্থানী, নান্ত, নাপসন্দ, নাপাক, নাপান, নাপানী, নাপিত, নাপিতা(তি)নী, নাপিতী, নাবড়, নাবালক(গ), নাবাল্যত, নায়র, নায়রী, নায়েব, নার, নারি (না-পারি), নারঙ্গ (নাগরঙ্গ, an orange), নারাঙ্গা (যে লেবু রাঙা নয়), না(ন)রাজ, নারাঞ্জি, নারিকল, নারিকের, নারিকেল, নারিকেলাসব, নারিচপত্র, নারে, নাল, নালবন্দী, নাহারে, নারেঙ্গা, নালায়েক (না-নায়ক), নালিশ, নালিশবন্দ, নাশ্‌তা, নাশপাতী, নাহক, নিকসিপেড়ে, নিকা (নিকাহ্), নিকে, নিত্য, নিব, নুল, নুলা, নুলো, নে, নেআলী, নেউল, নেওয়াজ, নেকড়িয়া, নেকড়ে, নেকনজর, নেকনাম, নেকী, নেগা (নিগাহ্), নেজামত, নেঞ্জা, নেতি, নেয়া, নেয়াপাতি, নেষ্ট, নেহাল, নেহালি, নেহোরা, নোকসান, নোকতা (নক্ষত্র), নৌবত, নৌবতখানা, নৌরাজা, নৌল, লা (না), লাওয়ারিশ, লাওয়ারেশ, (না-ব-ঋষ্ কিংবা না-বর-ঈশ), লাচাড়ি(ড়ী), লাচার (নাচার, নেই চারা যাহার), লাচারি, লাচারী।

নকুল (নকুলী, অহি-নকুল) : ১. ন + কুল। ২. **নকুল** = *নেই কুল যাহার; অথবা, কুল-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন যে।* **নকুলী** = **নকুল**-*এর গতিশীল আধার যে। /* **নকুল** = যাহার যূথ নাই। (ব.শ.)। ৩. **নকুল** = বেজি, নেউল, মাদ্রীসূত চতুর্থ পাণ্ডব (ইনি অশ্বতত্ত্বে পরম পণ্ডিত ছিলেন। অজ্ঞাতবাসে বিরাটগৃহে ইনি গ্রন্থিক নাম ধারণ করিয়া অশ্বচিকিৎসকের পদ গ্রহণ করেন।), শিব। (ব.শ.)। পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র ও চতুর্থ পাণ্ডব। ... পাণ্ডুর অনুরোধে কুন্তী মাদ্রীকে দুর্বাসালব্ধ মন্ত্র দান করেন। (মাত্র একবার ব্যবহার করার জন্য। আর এক বারে দুই পুত্র লাভের জন্য) মাদ্রীও অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ করাতে তাঁরা আবির্ভূত হয়ে নকুল ও সহদেব নামে যমজ পুত্রের জন্ম দেন। ... মাতা মাদ্রী স্বামীর সহিত সহমৃতা হলে নকুল ও সহদেব বিমাতা কুন্তীদ্বারা প্রতিপালিত হন। ... নকুল বিচিত্রভাবে যুদ্ধ করতে পারতেন। এই জন্য ইনি অতিরথ ও চিত্রযোধী নামে খ্যাতিলাভ করেন। ... এঁর ঔরসে দ্রৌপদীর গর্ভে শতানীক নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। ... ইনি ধৃষ্টকেতুর ভগিনী চেদিরাজকন্যা করেণুমতীকেও বিবাহ করেন। এঁর গর্ভে তাঁর নিরমিত্র নামে এক পুত্র হয়। রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে দিগ্বিজয় যাত্রাকালে নকুল পশ্চিম দিকে যাত্রা করে দশার্ণ, মালব, ত্রিগর্ত, ও পঞ্চনদ প্রভৃতি দেশ জয় করেন। ... মৎস্যরাজ বিরাটের ভবনে অজ্ঞাতবাসকালে নকুল রাজা যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষক ও অশ্বচিকিৎসক পরিচয়ে 'গ্রন্থিক' নাম ধারণ করে বিরাটের অশ্ব তত্ত্বাবধানের ভার নেন। তাঁর গুপ্ত নাম ছিল জয়সেন। ... দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ... অশ্বত্থামা কর্তৃক নিহত হলে নকুল উপপ্লব্য নগর থেকে দ্রৌপদীকে নিয়ে আসেন। ... সবচেয়ে বেশি রূপবান বলে গর্ব অনুভব করায় ইনি সশরীরে স্বর্গে যেতে পারেননি। ... (পৌ.অ.)। **নকুলী** = নকুলস্ত্রীজাতি, শিবপত্নী, কুঙ্কুম, শঙ্খিনী, জটামাংসী। (ব.শ.)। ৪. mongoose অর্থে কদাচিৎ প্রচলিত। **৫. দ্র. জটামাংসী**। জীবজগতে **নকুল** শব্দটি সেই প্রাণীকে বোঝায়, যাকে কখনো দলবদ্ধভাবে দেখতে পাওয়া যায় না; যে সর্বদাই একা একা থাকে। প্রবাহিত কুল-ধারা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন বলেই মনে হয়। কুলে থাকা মানেই জোটে থাকা, যৌথতন্ত্রে, যৌথচিন্তায়, যৌথমালিকানায় থাকা। আর **ন-কুলে** থাকা মানেই একা থাকা, স্বাতন্ত্র্যে থাকা, একক চিন্তায় থাকা, ব্যক্তিমালিকানায় থাকা। যাঁরা **জটামাংসী** অর্থাৎ জটিলভাবে প্রতিষ্ঠিত মালিকানার অংশ উৎপাদন-ক্ষেত্র থেকে বহু দূরে বসে **জটা**র সূত্রে ভোগ করেন (যথা, সেকালের নিয়মে সাগরমেলার মালিকানার অংশ, একালের নিয়মে শেয়ারের ডিভিডেন্ড), তাঁরাও **নকুল**-পদবাচ্য এইজন্য যে তারা স্বভাবতই ব্যক্তিমালিকানাবাদী এবং সেকারণেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীও বটে। আর **অষ্ট-ঐশ্বর্য্য**বান উদ্ভাবকের বা **শিবে**র সার্বিকতার পাশাপাশি ঐকান্তিকতাও একটি ঐশ্বর্য্য। তবে চতুর্থ পাণ্ডব **নকুল** যেকারণে কুলহীন, তা অনেক বড় বিষয়। অতি সংক্ষেপে বলি — সেকালে যাকে **পঞ্চপাণ্ডব** বলা হত, একালে তারই একটি অংশমাত্রকে 'জয়েন্ট স্টক কোম্পানি' বলা হয়। পঞ্চপাণ্ডবের ঐতিহাসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি রূপগুলি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক রূপটিকে দেখলে আমরা তার কোম্পানি রূপটিকে বুঝে নিতে পারি। কোম্পানির আইন বা ধর্ম্মই যুধিষ্ঠির, তার প্রচার-বিজ্ঞাপনাদি ভীম, তার পুঁজিই **অর্জ্জুন**, আর তার শেয়ারহোল্ডার ও এগ্‌জিকিউটিভদের দেখভাল করার যে বিদ্যা তাকেই **নকুল** বলে; আর মার্কেটিং ডিভিশনের দায়িত্বে যে-সত্তা তাকে বলে সহদেব। শেয়ারহোল্ডার হল ব্যক্তিমালিকানার ব্যাপার, যা কিনা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী বা **ন-কুলে** বিশ্বাসী।

তবে এই **নকুল**কে আমরা আরও স্পষ্ট চিনতে পারি **অহিনকুল** শব্দে। **অহি-নকুল** সম্পর্ক বললে সবাই বোঝেন 'সাপে-নেউলে সম্পর্ক'; একে 'আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক'ও বলা হয়ে থাকে। সমাজের ক্ষেত্রে এর মানে হল যৌথ-তন্ত্র বনাম স্ব-তন্ত্রের সম্পর্ক,

যৌথমালিকানা বনাম ব্যক্তিমালিকানার সম্পর্ক। আসলে, সামাজিক **নাগ** বা সর্পদের আদিপুরুষদের বলা হত **অহি**। এই সত্তাটি হল যৌথসমাজের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত এমন একধরনের সম্পদসংগ্রহকারী সত্তা, যে-সত্তা যৌথতার নামেই সম্পদসংগ্রহ করে, জমায়; যে-সত্তা স্বভাবতই ব্যক্তিগত সম্পদ ও ব্যক্তিমালিকানার ঘোর বিরোধী, অথচ যদিও, তার নিজের ভিতরেই একপ্রকার ব্যক্তিমালিকসুলভ মালিকানার বোধ সক্রিয় হয়ে গেছে। একেই বলে **অহি**। স্বভাবতই এই সত্তাটি হল যৌথতার আশ্রয়ে থাকা সুপ্ত-ব্যক্তিমালিকানাবাদী। ঘোষিত স্বাধীন ব্যক্তিমালিককে সে তার সবচেয়ে বড় শত্রু মনে করে; ঠিক যেরকম কুলে স্থিতা গুপ্ত-বারনারী-কুলবধূই ঘোষিত স্বাধীন বারবধূর জাতশত্রু হয়, এও সেইরকম। এরা কিছুতেই পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না। এদের মধ্যেকার সম্পর্ক স্বভাবতই **আদা**-য় **কাঁচকলায়** সম্পর্ক হয়। 'দানের আশ্রয়' হল 'আদা', সে আর্দ্র করে। এ একপ্রকারের যৌথতাও বটে। দ্র. **উন্দ, সুন্দর**। আর যে **কলা** কেঁচিয়ে দেয়, তাকে **কাঁচকলা** বলা যেতেই পারে। সেই **কাঁচকলাই** তো ব্যক্তিমালিকানাবাদী সমাজের দিকে পা ফেলেছিল! সেই কারণে, মূল সত্তার বিচারে **অহিনকুল, সাপে-নেউলে, আদায়-কাঁচকলায়** একই ব্যাপার। তবে কুঙ্কুম ও শঙ্খিনী কেন **নকুলী** পদবাচ্য, তা এখনও আমরা বুঝে উঠতে পারিনি।

নক্ষত্র : ১. **নক্ষত্র** = ✓নক্ষ্ (গতি) + অত্রন্। (ব.শ.)। ন + ✓ক্ষি + অত্রন্ কর্তৃবাচ্যে। (ছা.অ.)। ২. ***নক্ষত্র* = *ন*** *(ন-করণপূর্ব্বক অন্-কারীর)* ***ক্ষ**-করণকে **ত্রাণ** করে যে।* ৩. **নক্ষত্র** = তারা, অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি তারকা। (ব.শ.)। তারকা, অশ্বিন্যাদি। ইঁহারা দক্ষের কন্যা ও চন্দ্রের পত্নী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। চন্দ্র যথানিয়মে ইঁহাদিগকে ভোগ করেন। (ছা.অ.)। ৪. star অর্থে **নক্ষত্র** প্রচলিত। ৫. দ্র. **অশ্বিনী, দক্ষ, দক্ষকন্যা, ইষ্ট, গণক, গ্রহ, তারা, প্রাগ্জ্যোতিষ, জ্যোতি (দ্যুৎ), নাড়িনক্ষত্র**। আগে বলা হয়েছে, আবারও বলি। প্রথমত, 'অদৃশ্য কিন্তু অত্যন্ত সক্রিয়' সামাজিক সত্তাগুলিকে চিহ্নিত করে সবাইকে জানানোই ছিল মানুষের প্রাচীন পূর্বপুরুষদের শব্দসৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তাতেই ব্যাপারটি বোঝানো যায় না, শব্দটির দ্বারা চিহ্নিত সত্তাটির সদৃশ কোনো বাস্তব দৃশ্য সত্তাকে দেখিয়ে তবেই বোঝানো সম্ভব হয়। সমাজে পণ্যধারা বা 'মার্কেট-ফ্লো' প্রবাহিত হয়ে চলেছে, হাটের পর হাট, গঞ্জের পর গঞ্জ ছুঁয়ে ছুঁয়ে সে এগিয়ে চলেছে। এই পণ্যধারা অদৃশ্য কিন্তু সমাজে সে অত্যন্ত সক্রিয়। সন্দেহ নেই, মানুষই এই পণ্যধারার প্রতিষ্ঠা করে। এর নাম দেওয়া হয় **গঙ্গা**। বাস্তবে অনুরূপ দৃশ্য সত্তা হল একটি নদী, যা প্রায় একই ভাবে তীর্থে তীর্থে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছে। অতএব তারও নাম দেওয়া হল **গঙ্গা**। উত্তম-অধিকারী মানুষেরা মানসলোকের অদৃশ্য **গঙ্গা** এবং বাস্তবের দৃশ্য **গঙ্গা**, উভয় **গঙ্গাকেই** চিনতে-বুঝতে পারলেন; এবং নিম্ন-অধিকারীরা মানস-লোকের **গঙ্গাকে** না বুঝলেও বাস্তবের দৃশ্য **গঙ্গাকে** বুঝতে পারলেন। দ্বিতীয়ত, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা যেভাবেই হোক জেনেছিলেন যে, বাস্তব দুনিয়ার সত্তাসমূহ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক যেভাবে সক্রিয় থাকে, মানসলোকের **সত্তাগুলি** এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও ঠিক সেভাবেই সক্রিয় থাকে। (কিন্তু কেন বাস্তবের সঙ্গে মনোলোকের এমন সমান্তরাল সম্পর্ক তা তাঁরা হয়তো বা জানতেন, কিন্তু আমরা এখনও জানতে পারিনি।) ফলে, যাঁরা নিম্ন-অধিকারী, তাঁরা শুধুমাত্র বাস্তবের **গঙ্গাকে** চিনলেও সমাজের কাজ চলে যায়; কারণ একই অঙ্ক তার মাথাতেও সক্রিয় থাকে। সে নিজে না হোক, তার উত্তর-প্রজন্ম উভয়লোকের **গঙ্গাকে** একদিন বুঝে নিতে পারবে।

নক্ষত্র শব্দটিও এই একই অঙ্কে প্রসূত। যৌথসমাজেই মানুষের জ্ঞানসম্পদ ও ধনসম্পদের তেজ নিয়ে যৌথসম্পদের ভাণ্ডার বা সূর্য্যের জন্ম হয়ে গিয়েছিল। তারপর আবির্ভাব ঘটল হাতিয়ার-নির্মাণে দক্ষ, কৃষিকর্মে দক্ষ, লবণসংগ্রহে দক্ষ, কারুশিল্পে দক্ষ, বস্ত্র-বয়নে দক্ষ ... প্রভৃতি নানাজাতের দক্ষ মানুষদের; অর্থাৎ **দক্ষ** নামক সামাজিক সত্তার। একদিন এসে গেল **দক্ষযজ্ঞ**। যৌথসমাজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। অতঃপর স্বভাবতই **দক্ষের** অনুসারী বিশেষ বিশেষ কর্মে দক্ষ মানুষদের নিয়ে সংহত হতে লাগল মন্দিরকেন্দ্রিক সম্প্রদায়মূলক সভ্যতা। **দক্ষের** বিশেষ বিশেষ ধরনের কর্মদক্ষতাকে তারণ করার দায় নিল এই সম্প্রদায়গুলি। স্বভাবতই এদের নাম হয়ে গেল **তারকা** বা **তারা**। **দক্ষ** হইতে লব্ধ দীপ্তি (= কন্) ধারণ করে তার প্রকাশ ঘটায় বলে, এদের বলা হল **দক্ষকন্যা**। এই কন্যাগণ সংখ্যায় ২৭টি পৃথক সত্তা রূপে প্রতীয়মান হন। এদেরই অপর নাম **নক্ষত্র**। ... যৌথসম্পদ বা সূর্য্যের পাশাপাশি এবার ব্যক্তিগত সম্পদ বা **চন্দ্র**ও জন্ম লাভ করল। একালে যাকে 'ক্যাপিটাল' বলা হয়, এই **চন্দ্র** তার আদি রূপ। দীপ্তি-প্রকাশক **নক্ষত্র**গুলির সঙ্গে স্বভাবতই **চন্দ্রের** পতি-পত্নী সম্পর্ক দৃষ্ট হতে থাকে। এরই পিছু পিছু আসে **গ্রহগণ**। সমাজের আকাশে সূর্য্য, **চন্দ্র, গ্রহ, তারা** বা **নক্ষত্র** স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু একে বোঝানো যাবে কীভাবে? উত্তম-অধিকারীগণ একই নামে চিহ্নিত করে দিলেন মহাকাশের সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারাকে। অতএব হে নিম্ন-অধিকারীগণ, এখন আপনারা মহাকাশের সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারাকে দেখে মানব সমাজের অর্থনৈতিক আকাশের সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারাদের বুঝে নিন।

কিন্তু **দক্ষকন্যা**গণের নাম **নক্ষত্র** হল কেন? কারণ তারা **নক্ষ**-কে **ত্রাণ** করে। অপ্রয়োজনীয়কে ফেলে দিয়ে প্রয়োজনীয়কে তুলে নেওয়াই **ন**-করা। সেই কর্ম্ম দ্রুত অতিফলপ্রসূ হয়ে যায় বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগে। **ন**-করণের সেই বিশেষ পদ্ধতিই হল **নক্ষ**। এই **নক্ষ**কে বাস্তবায়িত করলে নিঃসন্দেহে বিপুল পরিমাণ সম্পদ উৎপাদিত হতে পারে। কিন্তু তা করবে কে? এগিয়ে এলেন **দক্ষকন্যারা**। তাঁরা **নক্ষ**কে ত্রাণ করার দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। সেই কারণে তাঁদের নাম হয়ে যায় **নক্ষত্র**। সমাজের বাকী অংশ সেই **নক্ষত্র**দের (star-player-দের) অনুসরণ করে। এই **নক্ষত্র** এক আরাধ্য আদর্শ রূপে দেখা দেয় মানুষের মনে। সেজন্যেই **নক্ষত্রকুমার** নামটি শুনলেই তাকে রূপকথার নায়ক মনে হয়। বিহারের বিখ্যাত বিপ্লবী **নক্ষত্রকুমার** (নছত্তর মালাকার বা নক্ষত্র মালাকার), 'ঘোড়েওয়ালেবাবু' নামে যার কথা আমরা দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীতে (রিপোর্টাজ) পাই, তাকে মানুষ কী চোখেই না দেখত! যদিও আধুনিকতাবাদীরা মাটি থেকে উঠে আসা সেই মহানায়ককে নানান কৌশলে ধ্বংস করে দেয়।

আর একভাবেও **নক্ষত্র** শব্দটির অর্থ নিষ্কাশন করা যায়। সেক্ষেত্রে ভাবতে হয় শব্দটি **ন-ক্ষত্র**, অর্থাৎ যে **ক্ষত্র**কর্ম্ম করে না, যে ক্ষেতি করে না, যে **ক্ষত্রিয়** নয়। ...

কিন্তু **নক্ষত্র** শব্দের অর্থ এটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। **নাড়িনক্ষত্র** শব্দে আমরা দেখতে পাই, এই **নক্ষত্র** বহুদূর ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। ধরা যাক, একটি পুকুর থেকে আপনি পাম্পসেট বা সেচনী দিয়ে জল তুলে তুলে ফেলছেন। সেই ফেলা জল সমতলের উপর দিয়ে নালা তৈরি করে করে এগোতে লাগল। সারা দিনের শেষে দেখলেন, নালাটি সাতাশ ভাগে বিভক্ত হয়ে সাতাশটি প্রান্তে গিয়ে ঠেকেছে এবং আপনি দেখলেন সেগুলি আসলে সাতাশটি সব্জিক্ষেত, সেচের জল পেয়ে যা সম্পূর্ণতই সিক্ত। দক্ষতা এভাবেই সাতাশটি সব্জি-উৎপাদন ক্ষেত্রে বা সাতাশ নক্ষত্রে পরিণত হয়েছে। ...

তার মানে, গোড়ায় রয়েছে **নড়** হইতে জাত **নাড়** (নাড়ায় যে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে **দক্ষ**); নালাগুলি হল **নাড়ি**, আর ক্ষেতগুলি হল **নক্ষত্র**। মানুষের সন্তানের ক্ষেত্রে যে 'নাড়ির টান' ইত্যাদির কথা বলা হয়, সেই নাড়িও আসলে বংশানুক্রমিক সম্পর্কের নালা, এবং মানুষ মাত্রেই দৈহিকভাবে সে একটি **নক্ষত্র**ও বটে। কারও **নাড়িনক্ষত্র** জানা বললে তার 'সবকিছু জানা' বোঝায় এজন্যই যে, কোন্ নালা বেয়ে তার অস্তিত্ব রূপ লাভ করেছে, সেই নালা (বা নাড়ি) ও তার বর্তমান রূপ, সবটাই জেনে ফেলা।

নখ (নখদর্পণ) : **২.** *নখ = নেই খ (= করণস্থিত, আকাশ) যাহাতে। নখদর্পণ = নখ দর্পণ যাহার।* / **নখ** = ইন্দ্রিয় নাই যাহার। **নখদর্পণ** = নখই দর্পণ (যাহাতে); দর্পণতুল্য প্রতিবিম্বিত অভীষ্ট বিষয়ের দর্শণ করে যে; কোনো বিষয়ের ঘটনাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রদর্শনার্থ ব্যবস্থা (যাহাতে)। **নখ** = নখাকৃতি কণ্টক যুক্ত (যাহাতে)। (ব.শ.)। **৩. নখ** = নখর, নখীনামক গন্ধদ্রব্য। **নখদর্পণ** = সবিশেষ অবগত বিষয়। (ব.শ.)। **৪.** nail অর্থে **নখ** প্রচলিত, **নখদর্পণ** অপ্রচলিত। **৫.** গ্রামবাংলায় আজও নখ দিয়ে ভূমিতে আঁচড় কাটলে বয়স্ক মানুষেরা প্রচণ্ড আপত্তি তোলেন। 'বসুমতী মাকে নখ দিয়ে আঁচড়াতে নেই' — এই হল বহুকাল-ক্রমাগত একটি নিষেধবাক্য। কিন্তু কেন?

'আমিই তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' — মানবশরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এই কথা বলে উপহাস করে যে, তাকে বলে **হস্ত** বা হাত। হাতের ব্যবহার মানেই আঙুলের ব্যবহার। (দ্র. **অঙ্গুলি**)। আর আঙুলের ব্যবহার করতে গেলে **নখ** যায় সর্বাগ্রে। তাকে ব্যবহার করতে ভয়ও করে না, কারণ সেই **নখ**-এ প্রাণ নেই, ইন্দ্রিয় নেই; সে **নখ** খানিকটা কেটে গেলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু একথা তো ঠিকই, অচেনা অজানা বস্তুকে সবার আগে **নখই** ছুঁয়ে, আঁচড়ে, দাগ কেটে দেখতে পারে এবং প্রয়োজনে দেখেও। তার মানে, হাতওয়ালা প্রাণী দৈহিকভাবে কারও সঙ্গে কোনো আচরণ করতে গেলে সবার আগে **নখ** ব্যবহার করে। অর্থাৎ আমাদের অস্তিত্বের বাইরের বস্তুসমূহের বিষয়ে প্রায়োগিক জ্ঞান সর্বাগ্রে লাভ করে **নখ**। ...

কিন্তু আপনি যদি একজন জমিদার বা কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান হন, আপনার আমলা, সরকারবাবু থাকবে, তাদেরও পিওন, পেয়াদা ... এসব থাকবেই। সেই পিওনদের কাউকে কোথাও পাঠালে প্রতিষ্ঠানের **আঙুল**-এর ব্যবহার হল। কিন্তু তা না করে সেই **আঙুল**-এর জানাশোনা কিংবা ভাড়াকরা লোককে দিয়ে খবরাখবর লাগালে, হয়ে গেল **নখ**-এর ব্যবহার। যে প্রতিষ্ঠানের এরকম দশটি পিওন ও তাদের দশটি **নখ** রয়েছে, সেই **নখ**দের ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানটি তার প্রয়োজনীয় সব **খবরই** সংগ্রহ করে নিতে পারে। একেই বলে **নখদর্পণ**। ব্যক্তিশরীরের **নখে নখে** যে সংবাদ থাকে তাতেও প্রয়োজনীয় সব **খবর** থাকে বলেই মনে হয়, কিন্তু সে খবর উদ্ধার করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁরা আভিচারিক ক্রিয়া জানেন, তাঁরা হয়তো পারেন। কিন্তু সামাজিক সংগঠনের শরীরের **নখদর্পণে** অবশ্যই সব **খবরই** থাকে। ...

নগ : **১.** ন + ✓গম্ + অ (ড) - কর্তৃবাচ্যে। (ব.শ.)। **২.** *নেই গমন যাহাতে; অর্থাৎ, যাহাতে গমন করা যায় না এবং যাহার গমন বা অগ্রগতি (বা বিকাশ) নাই।* / **নগ** = যে যায় না। (ব.শ.)। **৩. নগ** = পর্ব্বত, বৃক্ষ, স্থাবর, সূর্য্য, কুলপর্ব্বতের সংখ্যা অনুসারে সাত সংখ্যা। (ব.শ.)। **৪.** অপ্রচলিত। **৫.** আদিম যৌথসমাজ ভেঙে যাওয়ার পর মানুষ যখন ছন্নছাড়া, সেই সময় দলবদ্ধ সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিল। একসময়, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য দলবদ্ধ হয়ে, কে কে কী কী কাজ করবে না-করবে, সেইসব বিশেষ রকমের কর্ম বিভাজন করে একটি 'দলবদ্ধ সামাজিক অস্তিত্ব' গড়ে ফেলা হল। কিন্তু এই 'দলবদ্ধ সামাজিক অস্তিত্ব'কে কী নামে শনাক্ত করা হবে? আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা সর্বাগ্রে তাকে নাম দিয়েছিলেন 'বৃক্ষ'। বায়ুপুরাণ সাক্ষ্য দেয় যে, কালে কালে সেই সামাজিক 'বৃক্ষ'গুলি তাদের সজীবতা খোয়াতে থাকে। তখন যে সকল নতুন 'সামাজিক সংগঠন' গড়ে তোলা হতে থাকে, সেগুলি হয় জড়গুণসম্পন্ন অর্থাৎ যান্ত্রিক নিয়মে চলার গুণসম্পন্ন। সেগুলির নাম দেওয়া হয় 'পর্ব্বত'। তবে এই সংগঠনগুলির মূল চরিত্র হয় 'গমনহীনতা'। কেউ তাদের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না, গমন করতে পারে না; আর সে নিজেও একটি বিশেষ রূপে স্থির হয়ে থাকে, তার নিজেরও কোনো গমন থাকে না, অগ্রগতি থাকে না। সেই কারণে এই সমস্ত সামাজিক সংগঠনগুলির একটি সাধারণ নাম হয়ে যায় — **নগ**। ছোটখাট যৌথ পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সবই হয়ে যায় **নগ**-পদবাচ্য। এই **নগ**-এর অধিপ হয়ে যায় **নগাধিপ**, এই **নগ**-এর অধিপতি হয়ে যায় **নগাধিপতি**, এবং এভাবেই **নগভিৎ**, **নগাধিরাজ**, **নগারি**, **নগেন্দ্র**, **নগোত্তম** ... প্রভৃতি সত্তার জন্ম হয়ে যায়। অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয় এই সামাজিক সংগঠনকে বোঝাতে দৃশ্য জগতে হিমালয় পাহাড়ও হয়ে যায় **নগপতি**। ... দ্র. **নগর**।

নগর (নগরী) : **১.** নগ + র অস্ত্যর্থে। (ব.শ.)। **২.** *নগর = নগ রহে যাহাতে। নগরী = নগর-এর সক্রিয় আধার যে।* / **নগর** = পর্ব্বততুল্য-প্রাসাদ আছে যাহার। (ব.শ.)। **৩. নগর** = পুর, পত্তন। **নগরী** = পুরী, নগর। (ব.শ.)। **৪.** town অর্থে দুটি শব্দই প্রচলিত। **৫.** রাষ্ট্রের কেন্দ্র বা রাজধানী কিংবা রাষ্ট্রের শাখা-প্রশাখার কেন্দ্রগুলি

হল আসলে সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক সংগঠন বা তার শাখা; অর্থাৎ **নগ**। এই **নগ** রহে যেখানে, তাকে বলে নগর। তার মানে **নগর** শব্দের দুটো রূপ, একটি অদৃশ্য অপরটি দৃশ্য। অদৃশ্য **নগর** হল 'সামাজিক সংগঠনের কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান যেখানে থাকে'। আর দৃশ্য অর্থ হল, 'বড় বড় প্রাসাদ রাস্তাঘাট ইত্যাদি সমন্বিত যে শহরাকৃতি জনপদ'। সহজ করে বললে, মানসিক **নগর** থাকে বাস্তবিক **নগরে**; ঠিক যেরকম মানসিক মানুষ থাকে দৈহিক মানুষের ভিতরে। পরে পরে কালে কালে এই মানসিক **নগর**-এর কথাটি লোকে ভুলে যায়, পড়ে থাকে কেবল বাস্তবিক **নগর**। অতঃপর জড়বাদী ইংরেজ আসার পর তাদের town, city-র সঙ্গে আমাদের **নগর**কে সমার্থক করে নেওয়া হয়। **নগরের** যে প্রাণ, তার ভিতরে সক্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান স্বরূপ যে **নগর**, তার কথা আমরা ভুলে যাই। **নগরের** দৈহিক অর্থটুকুই কেবল বেঁচে থাকে। যদিও আমরা আজও স্পষ্ট দেখতে পাই, দেহে যেমন প্রাণ থাকে, সেইরকম প্রতিটি নগরেই (শহরেই) প্রতিষ্ঠানগুলি (**নগর**) আজও সক্রিয় রয়েছে। তবে একথা ভোলা উচিত হবে না যে, যেকালে **নগর** শব্দটির সার্বিক অর্থ সবাই বুঝতেন তখনই **নগর** শব্দের রমরমা হয়েছিল। লোকে **নগরকীর্ত্তন, নগরপাল, নগরমার্গ, নগরাধিকৃত, নগরাধিপ, নগরাধিপতি, নগরাধ্যক্ষ, নগরিয়া, নগরী, নগরীয়, নগরীয়া, নগরোপকণ্ঠ, নগরোপান্ত ... নাগর, নাগরদোলা, নাগরপনা, নাগরালি, নাগরমুথা, নাগরমুস্তা ...** প্রভৃতি অজস্র শব্দ বানিয়েছিল এবং তার ব্যবহার করেছিল। আর সেজন্যই **নগর** ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দের ঐতিহ্যপূর্ণ উত্তরাধিকার আজও আমাদের রয়েছে।

বলে রাখা যাক, এখনকার কলকাতা কর্পোরেশনে যে 'বরো' বিভাজন রয়েছে, সেই 'বরো' শব্দটি ইংরেজি, জারমান প্রভৃতি ভাষার borough (যার প্রাচীনতর রূপ burgh বা burg) থেকে এসেছে। এই burgh ইংরেজির burgher, ফরাসি ভাষার bourgeois (= বুর্জোয়া) প্রভৃতি শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। এই burg শব্দটির আর একটি রূপ হল berg, জারমান গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষায় যার অর্থ 'পর্বত' বা শৈল। স্মরণযোগ্য যে, Edinburgh, Hamburg, Luxemburg, iceberg (= সমুদ্রজলে ভাসমান হিমশৈল) প্রভৃতি শব্দ। তার মানে, **নগ বা নগর শব্দের মূলে যে 'পর্ব্বত' ধারণাটি ছিল**, পাশ্চাত্যে তার উত্তরাধিকার burg ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দ রূপে আজও প্রচলিত রয়েছে। আমরা, বাংলাভাষী নকলনবীশরা, সেই burg-এর 'বর্‌' রূপটিকে ধার করে নিজেদের 'বরো' করে নিয়েছি।

নাতি (নাতি-পুতি, নাতিনী, নেপো) : ২. ***নাতি = নত-জাত গতিশীল যাহাতে। নাতি-পুতি = নাতি ও পুতি (পুত্‌ গতিশীল যাহাতে)। নাতিনী = নাতি অন থাকে যে গতিশীল আধারে। নেপো = নেয় যে পো-এরা (উত্তরাধিকারীগণ)।*** **৩. নাতি** = পৌত্র, দৌহিত্র, পৌত্রের সম্পর্কবিশিষ্টমাত্র। **নাতি-পুতি** = পৌত্র-পৌত্রী। **নাতিনী** = পৌত্রী, দৌহিত্রী, পৌত্রীর সম্পর্কবিশিষ্টা নারী। (ব.শ.)। **৪.** কন্যার পুত্র ও কন্যার কন্যা অর্থে যথাক্রমে **নাতি** ও **নাতিনী** প্রচলিত। **নাতি-পুতি** কন্যার পুত্র ও পুত্রের পুত্র অর্থে প্রচলিত। **৫.** গ্রামবাংলায় কদাচিৎ 'নতপত', 'লতপত' শব্দ দুটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'অমুকের সঙ্গে আমাদের লতায়-পাতায় সম্পর্ক' — এরকম বাক্য প্রায়শই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'নেতিয়ে পড়া', 'নাতান' প্রভৃতি শব্দেরও সাক্ষাৎ মেলে। কার্যত, একটি সত্তার পেছনে পেছনে 'নতপত' বা 'লতপত' করে 'নেতিয়ে' চলে যে, সেই হল **'নত হইতে জাত'** বা নাতি; আর সেভাবেই **'পত হইতে জাত'** বা পুতি। আমাদের কন্যা ও পুত্রের পিছন পিছন লতার মতো যারা আসে, তারা নিঃসন্দেহে আমাদের 'লাতি-পুতি' বা **নাতি-পুতি**। তবে সেখানেই ব্যাপারটি থেমে থাকে না। বাংলাভাষীরা সেই উত্তরসূরী **নাতি-পুতি**দের টেনে নিয়ে গেছেন **নেপো** পর্যন্ত। যার ধন সে তো খেয়ে না-খেয়ে রোজগার করে আনে (দ্র. **নবনী**), তার দুয়ে আনা দুধসর জমে দই হয়। সেই দই সে খায় না, খাওয়ার আগেই তাকে হয়তো বা চলে যেতে হয়, তখন **'নেপোয় মারে দই'**। **৬.** ল্যাটিন nepos, ইংরেজি nephew, nepotism।

নাগ : ১. নগ + অ; নাগ + অ (অণ্‌)। (ব.শ.)। **২.** ***নগ হইতে জাত।*** / পর্ব্বতে স্থিত বা জাত। (ব.শ.)। **৩.** হস্তী, হস্তীসম্বন্ধী, স্থূল, নাগকেশর বৃক্ষ, পুন্নাগ, নাগদন্তক, মেঘ, মুস্তক, দেহস্থবায়ুভেদ, সীসক, তাম্বুলী, দেশভেদ, শ্রেষ্ঠ, সর্প, নরাকার ফণাঙ্গুলাদিযুক্ত দেবযোনি-বিশেষ, অনন্ত-কর্কোটক ইত্যাদি (ইহারা কদ্রুগর্ভজাত কশ্যপসন্তান। ইহাদের মধ্যে অনন্তাদি ষড়্‌বিংশতি নাগ শ্রেষ্ঠ। পাতাল অর্থাৎ নাগলোক ইহাদের বাসস্থান), ক্রূরাচারী, গ্রাহ, মকরাদি, রঙ্গ (রাং), করণবিশেষ, অশ্লেষানক্ষত্র, কায়স্থ ও বারুজির উপাধি। (ব.শ.)। নরাকার দেবযোনিবিশেষ। বরাহপুরাণ অনুসারে, পাতালে অর্থাৎ নাগলোকে এদের বাসস্থান। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করবার সঙ্গে সঙ্গে কশ্যপের জন্ম হয়। এঁর কদ্রু নামে এক স্ত্রী ছিল। এই কদ্রুর গর্ভে কয়েকজন পরাক্রান্ত পুত্রের জন্ম হয়। এদের নাম অনন্ত, বাসুকি, কম্বল, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, কুলিক, ও অপরাজিত। এরাই কশ্যপের বংশধর নাগ নামে অভিহিত। এদের পুত্র-পৌত্রাদিতে ক্রমে সমস্ত পৃথিবী নাগ-পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ... যখন এই নাগদের বিষের প্রভাবে প্রজাসকল ক্ষয় হতে লাগল, তখন তারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়ে তাদের রক্ষা করতে বলল। ব্রহ্মা তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বাসুকি প্রভৃতি নাগদের ডেকে শাপ দিলেন যে, নাগবংশ কল্পান্তরে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। ... তখন তারা ব্রহ্মার স্তব করতে লাগল। তারা ব্রহ্মার কাছে নিবেদন করল, কুটিল ও বিষপূর্ণ করে আপনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন; আপনি এখন আমাদের জন্য পৃথক স্থান নির্দেশ করুন। তখন ব্রহ্মা নাগদের পাতাল, বিতল ও সুতল, এই তিন লোকে অবস্থানের আদেশ দিলেন। ব্রহ্মা আরো বললেন যে, যে সব মানুষ কালপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের নাগেরা ভক্ষণ করতে পারবে ও যারা মন্ত্রৌষধি প্রভৃতি ধারণ করে, তাদের নাগেরা স্পর্শ করতে পারবে না। (পৌ.অ.)। **৪. নাগ** শব্দটি snake অর্থে ও কায়স্থ জাতির পদবী রূপে প্রচলিত। **৫.** দ্র. **ধনঞ্জয়, নগ, নগর, কশ্যপ, কদ্রু, জনমেজয়, গরুড়, অষ্টনাগ, অনন্ত**। বুর্জোয়ারা মানবসমাজের চরম শত্রু — এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল সমাজতন্ত্রবাদীরা। কিন্তু মানবসমাজে সেই বুর্জোয়ারা জন্মাল কীভাবে? অনুকূল পরিবেশ ছাড়া তো কারও জন্ম হতে পারে না! এমন একটি শয়তান সত্তাকে মানবসমাজ সেরকম

অনুকূল পরিবেশ দিতে গেল কেন, কখন, এবং কীভাবে?

এর যথার্থ উত্তর কেউ জানেন, আমাদের হাতে সেরকম কোনো তথ্য নেই। আমরা দেখছি, মার্কসসাহেব একসময় এই বুর্জোয়াদের উদ্ভব রহস্য খুঁজতে শুরু করেছিলেন এবং গিয়ে ঠেকেছিলেন burgher-এ। কিন্তু সে তো প্রায় আধুনিক কালের ব্যাপার। তার বহু আগেই তো বিশ্বসমাজে পুঁজির আবির্ভাব ঘটে গেছে! প্রাচীন ভারতীয় পণ্য এসে পাশ্চাত্যের যৌথসমাজগুলিকে ভেঙে দিয়েছে, আর মার্কস দেখলেন, সে-সবই ঘটে গেছে 'খ্রিষ্টীয় ধারণা অনুসারে বিশ্বসৃষ্টিরও আগে'! তাহলে তো বুর্জোয়ার জন্মরহস্য জানতে হলে ভারতের ইতিহাস জানা চাই! কিন্তু মার্কসসাহেব দেখলেন, 'ভারতের কোনো ইতিহাস নেই, অন্তত জানা কোনো ইতিহাস।' ফলে মার্কস সাহেবের পক্ষে বুর্জোয়ার জন্মরহস্য জানা হল না। হয়তো সেজন্যেই বুর্জোয়ার মৃত্যুকামনাও তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেল।

আমরা কোনোরকমের 'দোষারোপবাদী দর্শন'-এ বিশ্বাসী নই। জগতের কোনো সত্তাই কারণ ছাড়া জন্মায়নি এবং কারণ ছাড়া বিলুপ্তও হবে না — এই আমাদের বিশ্বাস। তা সে যাই হোক, মার্কসসাহেব কিন্তু একটি কথা ঠিকই বুঝেছিলেন, পণ্যের, পুঁজির, পুঁজিপতির আদি ইতিহাসটি কিন্তু ভারতের প্রাচীন ইতিহাসেই রয়েছে; যদিও সে ইতিহাস তিনি জেনে যেতে পারেননি। আমরা দেখছি, ভারতে **নাগ**দের জন্মরহস্যের পৌরাণিক বয়ানই হল পুঁজিপতির জন্মরহস্যের প্রকৃত বয়ান। পুরাণাদিতে এই **নাগ**দের উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণামের কথা বিস্তারিত ভাবে লিখে রাখা হয়েছে। এমনকি এদের ধ্বংস করার জন্য যে **সর্পনিধনযজ্ঞ** করা হয়েছিল এবং যে-যজ্ঞ শেষমেষ **আস্তিক** মুনির চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছিল, সেই ধ্বংসযজ্ঞের হোতা ছিল এই বঙ্গসমাজ। দ্র. **জনমেজয়**।

এবার **নাগ** শব্দটির মূলে যাওয়া যাক। যৌথসমাজ ভেঙে পড়ার পর প্রথম প্রথম যে সামাজিক সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছিল, সেগুলি কমবেশি **প্রাণবন্ত** ছিল, সজীব ছিল। তাই সেগুলিকে নাম দেওয়া হয়েছিল **'বৃক্ষ'**। পরে পরে এগুলির স্থান নেয় 'পর্ব্বত'। এগুলি সবই **নগ**-পদবাচ্য। এই **নগ** থেকে জন্মায় **নাগ**। প্রাচীন **নগ** থেকে যে **নাগ** জন্মায়, তাকে বলে হস্তী। অর্থাৎ কিনা, যৌথসমাজ ভেঙে বেরিয়ে আসা **দক্ষ**রাই এই **নগ**-ব্যবস্থার বিশেষজ্ঞ **দিগগজ**। এই ব্যবস্থাই তাদের আশ্রয় হয় এবং তাদেরই অনেকে **দিঙ্নাগ**-এ পরিণত হয়। তাই **যৌথসমাজ** ভেঙে পড়ার পর প্রথম যেসকল **নগ** গড়ে উঠেছিল, সেখানকার **নাগ** রূপে দেখা দিয়েছিল **গজ** বা হস্তীরাই।

কিন্তু পরবর্তী কালে, **'সমাজবৃক্ষ'**গুলি নষ্ট হয়ে জড় ও যন্ত্রগুণসম্পন্ন **'পর্ব্বত'** জন্মাল। এও **নগ**-পদবাচ্য। তখন এই **গজ**রাই ক্রমশ সমাজের 'সরপালনকারী' সর্প হয়ে ওঠে, দিক রক্ষাকারী **নাগ** বা **দিঙ্নাগ** হয়ে ওঠে। এরা হয়ে যায় **অধর্ম্মজীবী**, নিজেদের পায়ে নিজেরা ভর দিয়ে হাঁটে না, বুকে হেঁটে চলে, 'নেই গমন যাহার' সেই **নগ** থেকে যথার্থেই জাত **নাগ**। ফলে এতকাল **নাগ** শব্দের মানে ছিল 'হস্তী' বা **গজ**; এখন **নাগ** শব্দের অর্থ হয়ে গেল 'সর্প'। প্রধানত এরাই **নগর**-এর বাসিন্দা। কাগজপত্রে বা 'পাতা'য় 'পাতা'য় এদের সম্পদ দলিলে, দস্তাবেজে, হিসেবের খাতায়, নানা রকমের সরকারি নির্দেশে, কাগজের 'পাতা'য় লেখা থাকে বলে এরা 'পাতাল' লোকের বাসিন্দা। **এরাই আদি নাগরিক**। **ইংরেজিতে** এদের burgher বলা হয়, যার **থেকে** * বুর্জোয়াদের জন্ম হয়েছে। দ্র. **ধনঞ্জয়**।

রামরাজত্বের **নামে বৌদ্ধযুগে** ভারতবর্ষে সর্বাগ্রে আদি শিল্পবিপ্লব সম্ভব হল, অথচ **তার শিল্পপুঁজি নাই, পুঁজিপতি নাই, পুঁজির** সংস্কৃতি নাই — এমন তো হতে পারে না। কোথায় গেল সেই পুঁজি ও পুঁজিপতিরা— **এর উত্তর হল — নাগ সত্তাটিই** ছিল আদি পুঁজিপতি, সমাজের সর-**পালনকারী** সর্প। পশ্চিমবাংলার বাঙালিরা সনাতন ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, **ইসলাম ধর্ম** ... ইত্যাদি ত্যাগ করে মার্কসীয় ধর্ম গ্রহণ করার পর **ঈশ্বরের বা** দেবতার বিপরীত শক্তিরূপে যে-দৈত্য বা শয়তানকে **'বুর্জোয়া'** নামে ডাকতে শিখেছেন, সেই 'বুর্জোয়া'র আদিপুরুষের **ভারতীয় নাম ছিল নাগ**। যদিও এঁরা মূলত কৃষিজাত পণ্যের থেকেই **তাঁদের পুঁজি** গড়ে তুলেছিলেন, এঁরা কিন্তু **নগর**-এর বাসিন্দা ছিলেন। তবে **কুবেরসাধক পাশ্চাত্যের বুর্জোয়ার** সঙ্গে এঁদের মূল পার্থক্য **এই ছিল** যে, এঁরা ছিলেন প্রধানত লক্ষ্মীসাধক, আর সেজন্যই এঁদের পক্ষে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছিল, তা সে মাত্র কয়েক **শতাব্দীর** জন্য হলেও।

যাই হোক, ভোলা উচিত হবে না যে, যেকালে আমাদের দেশে নাগগণের রমরমা হয়েছিল, লোকে সামাজিক **নাগ**-এর মানে বুঝতেন, তখনই **নাগ** শব্দেরও রমরমা হয়েছিল। লোকে **নাগ** হতে, **নাগ** পদবী গ্রহণ করতে গৌরব বোধ করত। সমাজের চোখে তখন **নাগ** অত্যন্ত সম্মানীয় ছিল। ফলস্বরূপ দেশে **নাগ**-পদবীধারী মানুষের যেমন বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল, আমাদের ভাষাতেও **নাগ**-যুক্ত শব্দেরও বৃদ্ধি ঘটেছিল। **নাগকেশর, নাগগর্ভ, নাগচূড়, নাগদন্ত, নাগনায়ক, নাগপঞ্চমী, নাগবল্লরী, নাগলতা, নাগদনা, নাগপাশ, নাগপুর, নাগপুষ্প, নাগফট, নাগভূষণ, নাগমাতা, নাগযষ্টি, নাগরাজ, নাগরা, নাগরিক, নাগরিমা, নাগরী (দেবনাগরী), নাগলোক, নাগাঙ্গনা, নাগান্তক, নাগাসন, নাগাহু, নাগাহ্বয়, নাগেন্দ্র, নাগেশ** ... ... প্রভৃতি শব্দের প্রচলন ঘটেছিল।

নানা (নানান) : ২. *নানা = না-কৃতের বা না-কৃত বিষয় ও বস্তুসমূহ থাকে যাহাতে। নানান = নানা অন যাহাতে।* ৩. **নানা** = পৃথক, ভিন্ন, অনেক, নানাজাতীয়, উভয়, বর্জ্জন, বিনা। **নানান** = নানা, বহুপ্রকার। (ব.শ.)। ৪. many অর্থে এই শব্দদুটি খুবই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ৫. এই **শব্দটি** ভারি অদ্ভুতভাবে বানানো হয়েছিল। এলোমেলো ভাবে ডাঁই করে রাখা শত শত বইয়ের গাদা থেকে আপনাকে একটি বিশেষ বই খুঁজে বের করতে বলা হল। আপনি এক একটি বই দেখছেন আর বাঁদিকে সরিয়ে রাখছেন — না, এটা সেরকম বই নয়, যেরকম আপনি **খুঁজছেন** — না, এটা না; না, এটাও না। এটাও না। ... ... **এইভাবে বহু** বই আপনার বাঁদিকে জমে গেল। এই বাঁদিকের বইগুলি হল 'না-না'করা বই, **অর্থাৎ** না-না রকমের বই; আপনি যেরকম **বই খুঁজছেন** সেরকম নয়। জগতের বহু বিষয় ও বস্তুকে এভাবে — 'না, এটা না', 'না, এটা না' — ক'রে ক'রে একদিকে জমা করে দিলে সেগুলিই হয়ে যায় **নানা** রকমের বস্তু ও বিষয়। পরে পরে এই **নানা** শব্দটিই সম্পূর্ণ প্রতীকী হয়ে গিয়ে **'বহু'** অর্থবাচক হয়ে যায়।

বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ

প্রথম খণ্ড

কলিম খান
রবি চক্রবর্তী

ভাষাবিন্যাস